ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ

দেববাণী

স্বামী বিবেকানন্দ

Talkes delivered by Swami Samarpanananda on Swamiji's *Inspired Talks* before the students of RKMVERI, Belur Math during the year 2017 & 2018
(Transcribed and Edited by Amit Ray Chaudhuri)

আচার্য – স্বামী সমর্পণানন্দ

অনুলিখন ও সম্পাদনা – অমিত রায় চৌধুরী

<u>সূচীপত্র</u>

দেববাণী

Talkes delivered by Swami Samarpanananda on Swamiji's *Inspired Talks*
before the students of RKMVERI, Belur Math
(Transcribed and Edited by Amit Ray Chaudhuri)

ভূমিকা

বাংলায় 'দেববাণী' ইংরাজীতে 'Inspired Talks', স্বামীজীর এই বিখ্যাত বইয়ের উপর আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি। স্বামীজীর দেববাণীর মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে দেববাণীর ব্যাপারে কিছু তথ্য ও কয়েকটি মৌলিক কথা আমাদের জেনে রাখা খুবই দরকার। দেববাণীর প্রেক্ষাপট, কিভাবে এই বই রচিত হল, স্বামীজীর নিজস্ব শ্রেষ্ঠ মৌলিক চিন্তাগুলিকে কিভাবে এই বইতে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে আর মূলতঃ এই বইতে কি কি বলা হয়েছে, এই কটি জিনিস খুব ভাল করে আমাদের বুঝে নিতে হবে।

স্বামীজীর বাণী ও রচনার শুরু চিকাগো ধর্মসভায় ১৮৯৩ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরে স্বামীজীর প্রথম বক্তৃতা দিয়ে। ধর্মসভা শেষ হওয়ার পর স্বামীজী বেশ কিছু দিন আমেরিকার বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে বক্তৃতাদি দিলেন, তারপর তিনি ক্লাশ নিতে শুরু করলেন, সব ক্লাশের নোটস নেওয়া হল। সেখান থেকে তিনি ইংল্যাণ্ডে গেলেন, সেখানেও তাঁর ক্লাশের নোট নেওয়া হল। তারপর তিনি ভারতবর্ষে ফিরে আসার পর ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা দিলেন, পরে সেই বক্তৃতাকে সঙ্কলন করে 'ভারতে বিবেকানন্দ' বই তৈরী হল। এই ভাবে স্বামীজীর সব বাণী আমাদের কাছে এসেছে।

১) বেদরূপী স্বামীজী

তখনকার দিনের প্রবীন সন্ন্যাসীবৃন্দ, বিদগ্ধ পণ্ডিত ও চিন্তাবিদরা এবং বিভিন্ন পাঠকরা স্বামীজীর বাণী ও রচনা ও স্বামীজীর কথাগুলোকে বিভিন্ন ভাবে নিয়েছেন। কেউ এর মধ্যে দেশভক্তির কথা পান, কেউ নূতন ভারতের বীজ দেখতে পান। কেউ আবার এতে ভারতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসকে দেখতে পান। কিন্তু স্বামীজীর বাণী ও রচনাকে খুব গভীর ও নিষ্ঠার সাথে অধ্যয়ন করলে একটা জিনিস খুব ভাল ভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যে কথা আগের আগের বিদগ্ধ স্বামীজীরাও বলেছিলেন, তা হল, স্বামীজীর বাণী ও রচনা পুরোটাই বেদ। স্বামীজীর বাণী ও রচনাকে বেদ বললে অনেকেই মনে করবে এটা কোন প্রশংসাসূচক উক্তি, স্তুতি করার মত। কিন্তু এগুলো স্তুতি কিছু নয়, এটাই সত্য। ঠাকুরকেও অনেকে বেদস্বরূপ বা বেদরূপী শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন। খুব মন দিয়ে দেখলে দেখা যাবে ঠাকুরের কথাগুলো উপনিষদের পরম্পরাতেই চলেছে। উপনিষদের পরম্পরা মানে, যেখানে আধ্যাত্মিক সত্তাই একমাত্র সত্য, তার বাইরে আর কিছু নেই। উপনিষদে যেমন বলছেন, ব্রহ্মই সত্য বাকি সব নাম আর রূপের খেলা। সেই ব্রহ্মই যখন রামায়ণ বা মহাভারত বা পুরাণাদিতে আসছেন এবং পৌরাণিক পরম্পরায় নেমে আসেন তখন একটা কথা সবাই বলছেন, ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু। বিভিন্ন শাস্ত্র তা হিন্দু ধর্মেরই হোক বা যে ধর্মেরই হোক, সবাই এই কথাই বলেন, ঈশ্বর যিনি আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, আধ্যাত্মিক সত্তা, তাঁকে কিভাবে পাওয়া যেতে পারে। উপনিষদও তাই বলে, পুরাণাদিও তাই বলে, যোগশাস্ত্র, তন্ত্রশাস্ত্রও তাই বলে। ঠাকুর সেই পরম্পরাতেই চলছেন আর কথাগুলোও সেই রকমই বলছেন, এটাকেই বলছেন উপনিষদের পরম্পরা।

যে শাস্ত্রে ভক্তি আর মুক্তির কথা বলা হয় সেটাই মোক্ষশাস্ত্র। ভক্তি ও মুক্তির মধ্যে কোন তফাৎ নেই, দুটো একই কথা, শুধু আলাদা আলাদা ভাবে বলা হয়। উপনিষদ পুরোপুরি মোক্ষশাস্ত্র, একমাত্র মুক্তির কথাই বলছেন। তফাৎ হল, উপনিষদ আজ থেকে পাঁচ ছ'হাজার বছর আগেকার রচনা। তারপর থেকে অনেক ঋষিরা এসেছেন, তাঁরাও অনেক কথাই বলে গেছেন, যে কথাগুলো আমাদের যোগশাস্ত্রে, তন্ত্র ও পুরাণাদি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু নেই, ঈশ্বর বই আর কিছু জানি না, এই শুদ্ধ ভাবের উপর ভারতের যে আধ্যাত্মিক ইতিহাস, এই ইতিহাস ঠাকুরের সাধনা ও সিদ্ধির মধ্যে সমাহিত। শুধু ভারতেই নয়,

সমগ্র বিশ্বে যত রকম আধ্যত্মিক উপলব্ধি হয়েছে, তার সবটাই ঠাকুরের মধ্যে হয়েছে। ভবিষ্যতে কি কি আধ্যাত্মিক অনুভূতি হতে পারে, কোন কোন পথে হতে পারে, আমরা জানি না, তাই সেই ব্যাপারে কোন কথা না বলাই উচিৎ। কিন্তু বেদের সময় থেকে শুরু করে গতকাল পর্যন্ত মোক্ষমার্গের সাধনা ও সিদ্ধিতে ভারতে যা যা হয়েছে আর বিশ্বের যেখানে যেখানে যা যা হয়েছে, তার সমস্ত সিদ্ধান্ত, সমস্ত সত্য ঠাকুরের কথামৃতে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে। কথামৃতের বাইরে অল্প যা এক আধটা কথা থেকে গেছে, সেটা লীলাপ্রসঙ্গে এসে গেছে।

কিন্তু স্বামীজীর বাণী ও রচনাতে এসে জিনিসটা অন্য রকম হয়ে যায়। ঠাকুর যে কথাগুলো বলেছেন, তিনি যা যা উপলব্ধি করেছেন, যা যা সিদ্ধি হয়েছে এবং সেই উপলব্ধি বা সিদ্ধি যে ভাবকে কেন্দ্র করে হয়েছে, যেহেতু সিদ্ধির অনেক কিছু হতে পারে, আধ্যাত্মিক অনুভূতি অনেক ধরণের হতে পারে, সেইহেতু তার ভাব একটা থাকবে, যে ভাবকে কেন্দ্র করে তাঁর আধ্যাত্মিক অনুভূতিগুলি হয়েছে, সেগুলো থাকবে। সেই ভাব আমরা স্বামীজীর বাণী ও রচনায় খুব স্পষ্টরূপে ও সহজে পেয়ে যাই। কিন্তু কথামৃত হল মোক্ষশাস্ত্রের শেষ কথা, মিছরি যেমন মিষ্টির খনি। স্বামীজীর বাণী ও রচনা পুরোটাই বেদ বলে দিলে সেই দিক থেকে তফাৎ হয়ে যায়। কারণ বেদ বললেই আমরা বুঝি দেবী-দেবতাদের স্তুতি, দেবী-দেবতাদের নামে যজ্ঞ, যজ্ঞে তাঁদের নামে আহুতি। স্বামীজীর বাণী ও রচনার মধ্যে এর কিছুই নেই। কিন্তু বেদ শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে কেন স্বামীজীর বাণী ও রচনাকে বেদ বলা হচ্ছে। বেদের অর্থ বিদ্ ধাতু থেকে আসে, যার অর্থ জ্ঞান। বিদ্ ধাতু থেকেই বিদ্যা, বিদ্যা যেখান থেকে এসেছে বেদ সেখান থেকেই এসেছে, এটাই বেদের আসল অর্থ। বেদে যেমন যজ্ঞাদির কথা আছে, যজ্ঞাদি সম্পাদনের পদ্ধতির কথা রয়েছে, যজ্ঞাদি সম্পাদন করলে কি কি সিদ্ধি হবে তার কথাও রয়েছে, কিন্তু সর্বোপরি বেদ হল জ্ঞানরাশি।

বেদে দেবতাদের কিভাবে তুষ্টি করতে হবে, আর সেই তুষ্টির পর মানুষ জীবনে কি কি সুখ সম্পত্তি পাবে তার বর্ণনা রয়েছে ঠিকই; কিন্তু সেই বেদকে আধার করে বেরিয়ে আসে ছয়টি বেদাঙ্গ – শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ। বেদের সঙ্গে এই ছয়টি বেদাঙ্গ চলে। যজ্ঞ ঠিক ভাবে সম্পাদনের জন্য আরও অনেক কিছু লাগে, এই আনুষাঙ্গিক গুলিকেই বেদাঙ্গ বলা হয়। এই ছয়টিকে সরাসরি বেদ বলা যায় না, কিন্তু বেদের বিদ্যাকে আধার করে এই ছয়টি বেদাঙ্গ বেরিয়েছে। পরবর্তি কালে সমগ্র ভারতবর্ষের সংস্কৃতি বলতে যা বোঝায়, সেই সংস্কৃতির সব কিছু এবং ভারতের জ্ঞান সমূহ যা কিছু আছে, এর পুরোটাই বেদ ও বেদাঙ্গ থেকে বেরিয়েছে। কিছু জিনিস বেদ থেকে বেরিয়েছে বাকি জিনিসগুলো বেদাঙ্গ থেকে বেরিয়েছে। যেমন বেদাঙ্গ বলে দিচ্ছে যজ্ঞের বেদি কিভাবে তৈরী করতে হবে। সেই বিদ্যা থেকে ভারতবর্ষে বেরিয়ে এলো জ্যামিতি। সেই জ্যামিতি থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো বীজগণিত, বীজগণিত থেকে বেরোল শূন্যের ধারণা। কিন্তু সব কিছুর মূল রয়েছে বেদে। ছোটবেলা থেকে আমরাও শুনে আসছি যে, বেদে সব কিছু আছে। স্বামীজী মজা করে বলছেন, তখন এমন একটা অবস্থা হয়ে গিয়েছিল যে, কারুর গরু হারিয়ে গেলে বলা হত বেদে খোঁজ গরু পেয়ে যাবে। তার মানে বলতে চাইছেন, এমন কোন কিছু নেই যেটা বেদে নেই। আবার বলা হয় বেদের বেশির ভাগ অংশ হারিয়ে গেছে, হারিয়ে যাওয়ার পরেও যা কিছু অবশিষ্ট আছে তাতেই সামলানো যায় না। যদিও এগুলো সবই স্তুতি, স্তুতিকে এর বেশি নেওয়া যায় না।

বর্তমান হিন্দু জাতিকে তখনকার দিনে আর্য বলা হত। আর্যই বলা হোক আর যে নামেই বলা হোক, এনাদের বিদ্যার একটা পরম্পরা ছিল। যে কোন বিদ্যার পরম্পরাতে কিছু জিনিস হারিয়ে যায়, হারিয়ে যাওয়ার পরেও কিছু জিনিস থেকে যায়। কিছু জিনিস হারিয়ে গেলেও কিছু এসে যায় না, খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলো কখন হারায় না। ওর মূল কোন না কোন ভাবে কোন না কোন সাহিত্যে এসে প্রতিফলিত হবে। কোন প্রাচীন লাইব্রেরীতে কোন লেখকের হঠাৎ একটা বই বেরোল, লোকেরা আগে লেখকের নামই জানত না। এরপর সেই লেখকের নাম তুলে ধরা হল। কিন্তু ভাল করে দেখলে দেখা যাবে, ওই লেখকের যে চিন্তা-ভাবনা তা যদি ঠিক থাকে, তা কোথাও কোন না কোন ভাবে কোন লেখককে প্রভাবিত করে রেখেছে। তার মানে কোন জাতির তার যে racial memory যেটা collective consciousness, সেখান থেকে কোন চিন্তা ভাবনা হারায় না। সেইজন্য কত বেদ হারিয়ে গেছে তাতে কিছু আসে যায় না। কারণ হারিয়ে যাওয়া বেদের যে চিন্তা-ভাবনা, কোন না কোন ভাবে সেই চিন্তা-ভাবনা আমাদের জাতিতে থেকে গেছে।

হিন্দুদের যা কিছু সামাজিক, পারিবারিক ও ধর্মীয় আচার-ব্যবহার আছে, সব বেদ থেকেই এসেছে। হিন্দুদের যে বিবাহ প্রথা তার মূল বেদে, হিন্দুদের যে দাহ সংস্কার তারও মূল বেদে। বর্তমানকালে গণিত বিদ্যা নিয়ে যা কিছু করা হচ্ছে, যদিও অনেক আগেকার, কিন্তু এরও মূল বেদে রয়েছে। ভারতের যত কাব্যশাস্ত্র, কাব্যশাস্ত্র ছন্দের উপর চলে, ছন্দও একটা বেদাঙ্গ, যেখান থেকে কাব্যশাস্ত্র বেরিয়েছে। ভারতের যত জ্যোতিষ বিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান আছে সব জ্যোতিষ শাস্ত্র থেকে বেরিয়েছে। জ্যোতিষ শাস্ত্র বেদেরই একটি অঙ্গ, বেদাঙ্গ। ভারতের যা কিছু সংস্কৃতি, যা হিন্দু-সংস্কৃতি রূপে পরিচিতি লাভ করেছে, সেই সংস্কৃতিতে এমন কোন কিছু নেই যা সরাসরি বেদ থেকে আসেনি। অন্যান্য যাঁরা ঋষি, মনীষিরা ছিলেন, তাঁরাও নিজের মত অনেক কিছু অবদান রেখে গেছেন, সেখান থেকে জ্ঞানরাশি বৃদ্ধি পেতেই থেকে গেছে। গঙ্গোত্রী থেকে যেমন সুতোর মত একটা ছোট্ট জলাধারা নেমে আসে, সেই জলাধারা যখন মালদহ, মুর্শিবাদের কাছে এসে পৌঁছায় তখন সে বিরাটাকার রূপ ধারণ করে নেয়। তার একটা অংশ বাংলাদেশের দিকে প্রবাহিত হয়ে যায়, আরেকটি অংশ কলকাতা হয়ে গঙ্গাসাগরে এসে বঙ্গোপসাগরে মিলে যায়। এই বিশাল নদীর মূল সেই গঙ্গোত্রীর গোমুখ। ঠিক তেমনি বেদ থেকে যে বিদ্যা একটা সুতোর মত বেরিয়ে এসেছে, সেই বিদ্যা যেমন যেমন এগিয়ে চলেছে তেমন তেমন তার কলেবর বৃদ্ধি পেতেই থেকে গেছে। সাত-আট হাজার বছর ধরে এই বেদ পুরো একটা জাতির সংস্কৃতিকে, বিশেষ করে হিন্দুজাতির পুষ্টি সাধন করে আসছে।

ইতিমধ্যে নূতন নূতন বিদ্যা, বিজ্ঞানের নূতন নূতন দিক খুলতে শুরু হয়ে গেল। ইউরোপিয়ান সভ্যতায়, যাকে আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতা বলছি, বিজ্ঞানের নূতন নূতন তত্ত্বের আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী পুরোপুরি পাল্টে যেতে লাগল। শুধু বিজ্ঞানই না, ভুগোলের দৃষ্টিভঙ্গীও পুরোপুরি পাল্টে গেছে। পুরাণের ভৌগলিক বর্ণনা পড়লে এখন আমাদের হাসি পায়, কারণ পুরাণ রচয়িতারা এই দিকটা নিয়ে খুব বেশি চিন্তা-ভাবনা করেননি, যদিও তাঁদের মূল উদ্দেশ্য ছিল অন্য কিছু। এছাড়া চিকিৎসা শাস্ত্রে আমাদের ছিল চরক, শুশ্রুতাদি শাস্ত্র; কিন্তু বর্তমান এ্যালোপ্যাথি, পাশ্চাত্য যে চিকিৎসাবিদ্যা, তাতে তারা ওই জিনিসগুলোকে এখন আর মানতেই চায় না। আগেকার দিনে আয়ুর্বেদিক সিদ্ধান্তে বলা হত, যে জিনিসের প্রভাবে শরীরে ব্যাধির আক্রমণ হয়, সেই জিনিসকেই নিয়মিত ভাবে প্রয়োগ করলে ঐ ব্যাধির উপশম হয়ে যায়। কিন্তু বর্তমান পাশ্চাত্য চিকিৎসা পদ্ধতিতে এই সিদ্ধান্ত সব সময় প্রযোজ্য হয় না। তেমনি পদার্থ, রাসায়ন, জীববিদ্যায় সব কিছুই এখন অন্য রূপ ধারণ করে নিয়েছে। তাহলে বেদ বলতে যে সমগ্র জ্ঞানরাশি বলা হয়, আর আমাদের বেদেই যে সমস্ত জ্ঞান নিহিত রয়েছে, কথাটা তো এখানে মিলছে না। ঠিকই, মিলবে না, আবার বেদকে যে জ্ঞানরাশি বলা হয়, এটাও পুরোপুরি ঠিকই বলা হয়। খুব গভীরে গিয়ে চিন্তা-ভাবনা না করলে, মনন না করলে এই জিনিসটাকে বোঝা যাবে না।

আমরা যখন স্বামীজীর বাণী ও রচনায় আসি তখন দেখতে পাই, বেদ যে সংস্কৃতিকে ধরে আছে, ওই সংস্কৃতির পুরো রূপরেখাটাই স্বামীজীর বাণী ও রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে। বেদের পরে যে নানা রকমের অনেক আবর্জনা বেরিয়েছে, আমরা হিন্দুরা যতই গর্ব করে বলি না কেন যে, আমাদের এখানে সব ভাল, জিনিসটা ঠিক তা নয়। যে কোন সমাজে কিছু ভাল জিনিসের সাথে অনেক ভুলভাল জিনিসও থাকে। তেমনি প্রত্যেক ধর্মে তার আধ্যাত্মিক সত্যগুলো ছাড়া যা কিছু থাকে তাতে অনেক ভুলভাল জিনিসও থাকে, আমাদেরও আছে। যারা জানে না, যাদের পড়াশোনা নেই, তারা মনে করে আমাদের সবটাই ভাল। আমাদের ধর্মে যত আবর্জনা ছিল, স্বামীজী তার সবটাই কেটে বাদ দিয়ে দিলেন। যেগুলো ঠিক ছিল সেগুলো ধরে রাখলেন। তার সাথে পাশ্চাত্যের ধ্যান-ধারণা এবং তাদের জ্ঞানকে স্বামীজী নিজের মধ্যে নিয়ে যে বাণী ও রচনা তৈরী হল সেটা যেন হিন্দু জাতির জন্য, ভারতবাসীর জন্য একটা নূতন যুগের সূচনা। আট হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষের বিদ্যা যেমন বেদ থেকে বেরিয়ে এসেছে, যে বিদ্যা হিন্দু জাতি ও ভারতবর্ষকে ধরে রেখেছে, এখন থেকে স্বামীজীর বাণী ও রচনা থেকে যে বিদ্যা বেরোবে এই বিদ্যা হিন্দু জাতি ও ভারতবর্ষকে অনেক দিন ধরে রাখবে। তবে হাজার বছর, নাকি দু হাজার বছর ধরে রাখবে আমরা জানি না, কিন্তু ধরে রাখবে। স্বামীজীর বাণী ও রচনা সবে একশ বছর হতে চলল, এই ধরণের মণীষীদের ক্ষেত্রে একশ বছর খুব কম সময়। তিনশ, চারশ বছর যাওয়ার পর মানুষ স্বামীজীর বাণী ও রচনার উপর ঠিক ঠিক কাজ করতে শুরু

করবে। স্বামীজী ইতিহাসকে নূতন ভাবে দেখছেন, ভূগোলকে নূতন ভাবে দেখছেন, শিক্ষা ব্যবস্থা – স্বামীজী নূতন ভাবে দেখছেন, বিজ্ঞান – স্বামীজী নূতন ভাবে দেখছেন।

আমরা সেইভাবে পড়াশোনা করি না, চিন্তা-ভাবনা করি না, সেইজন্য অনেকেই মনে করে, স্বামীজী ইংরাজী শিক্ষা পেয়েছিলেন, বিদেশে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে তিনি যে শিক্ষা পেয়েছেন, সেই শিক্ষা আত্মসাৎ করে তিনি যা কিছু করেছেন। এটি সম্পূর্ণ একটি ভুল ধারণা, স্বামীজী একেবারেই এইভাবে সব কিছু আত্মসাৎ করে কিছু করেননি। একটা উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে, ভারতবর্ষের ভূগোলে পৃথিবী হল টেবিলের মত ফ্ল্যাট। শুধু ভারতবর্ষেই নয়, পৃথিবী যে ফ্ল্যাট, পৃথিবীর সমস্ত জাতিরই এই ধারণা। আগেকার দিনে যারা জাহাজ চালাত, তাদের ভয় ছিল, যেতে যেতে একেবারে ধারে চলে গেলে; টেবিলের যেমন শেষ আছে, সেখানে পোঁছে গেলে তারা পড়ে যাবে। তখন প্রশ্ন উঠল, এই টেবিলের পরে কি আছে। সমুদ্রের তীরে পোঁছে দেখছেন সমুদ্রের জল লবণাক্ত। ওনারা ভাবলেন এই লবণাক্ত জল অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত, তারপরে মিষ্টি জল আছে, তারও পরে দুধের সমুদ্র আছে, সেখান থেকে এসে গেল ক্ষীরসাগর যেখানে ভগবান বিষ্ণু থাকেন। এগুলো কোন ভূগোল নয়, সব কল্পনা রাজ্যের ছবি। ওনারা কল্পনা করছেন তাহলে তো সমস্ত জল পড়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু পড়ে যাচ্ছে না কেন? তাহলে জলকে কে ধরে রেখেছে? একটার পর একটা কল্পনা চলে আসছে। এই সমস্যা শুধু আমাদেরই নয়, বিশ্বের সমস্ত ধর্ম সাহিত্যেই এই সমস্যা।

এরপর ওনারা আরও কিছু কিছু জিনিসকে লক্ষ্য করতে শুরু করলেন। তার মধ্যে অনেক আগেকার খুব নামকরা পর্যবেক্ষণ হল, মধ্যগগনে সূর্য যখন মাথার উপর চলে আসে তখন সূর্যের আলোতে একটা লাঠি রেখে লাঠির ছায়াকে তাঁরা লক্ষ্য করতে শুরু করলেন। তাঁরা দেখলেন, একটা জায়গা আছে যেখানে ছায়াটা পুরো শূন্য হয়ে যায়, সেখান থেকে ওনারা ভাবনা চিন্তা করতে লাগলেন যে, পৃথিবীটা চ্যাপ্টা নয়, পৃথিবীটা গোল। পৃথিবী যে গোলাকার এটা অনেক আগেই ধারণা করে নিয়েছিলেন। তারপর এলেন মার্কপোলো, সত্যিই পৃথিবীটা গোল কিনা দেখার জন্য একটা লম্বা সমুদ্র যাত্রা করলেন। অনেক বছর পর দেখলেন, যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন শেষ পর্যন্ত সেখানেই পোঁছে গেছেন। নিউটন আসার অনেক আগের এই ঘটনা, যেখান থেকে ধীরে ধীরে মানুষের ধারণা হয়ে গেল পৃথিবীটা গোলাকার।

যদি পৃথিবী গোল হয় তাহলে আকাশটাও গোল হবে। কিন্তু অন্তরীক্ষ, অন্তরীক্ষ বলতে যা বোঝায়, এটা সব সময় অবক্র। কিন্তু স্বামীজীই প্রথম বললেন স্পেস হল curved, এখান থেকে সূর্য পর্যন্ত একটা রেখা টানলে, ওটা কখনই সোজা লাইন হবে না। কিন্তু সূর্যের দিকে তাকাবার সময় একটা সরল রেখাই মনে হবে, আসলে সরল রেখা নয়, রেখাটা বেঁকে গেছে। এর উপমা দিচ্ছেন, পৃথিবীতে একটা দিকে কেউ এগিয়ে চলতে থাকলে, দেখা যাবে চলতে চলতে অনেক দিন পর আবার সেখানেই সে ফিরে এসেছে যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিল। ঠিক তেমনি আকাশের দিকে যদি একটা রেখা যেতে থাকে, অনেক দিন পরে ঘুরে ঘুরে আবার ওই জায়গাতেই ফিরে আসবে। তার মানে অন্তরীক্ষ বক্র। পাশ্চাত্য জগৎ তখনও অন্তরীক্ষ বক্র বলে জানত না। যদিও curved spaceএর geometry এসে গিয়েছিল, তবে তা স্বামীজীর জানার কথা না, কারণ সেই সময় পর্যন্ত ওনার এত advanced mathematics জানার কথা ছিল না। স্বামীজীর শরীর যাওয়ার পরে পরে আইনস্টাইন এর উপর কাজ করে করে সিদ্ধান্তে এলেন space is curved, যাকে আধার করে তাঁর Theory of Relativity এসেছে। স্বামীজী যেটা intuitively বলেছেন, আইনস্টাইন সেটাকেই mathematically নিয়ে এলেন। ভবিষ্যত বিজ্ঞানের বীজ কিভাবে স্বামীজীর বাণী ও রচনায় এসে গিয়েছিল, তারই একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া হল। কিন্তু আমাদের মস্তিষ্ক এতই দুর্বল যে, এগুলোকে ধরা বা বোঝার কোন ক্ষমতাই আমাদের নেই। স্বামীজী বলছেন, একটা লাইন যদি এখান থেকে অন্তরীক্ষের দিকে টানা হয়, সেই লাইনটা যদি যেতেই থাকে দেখা যাবে অনেক দিন পরে ঘুরে ঠিক ওই জায়গাতেই চলে আসবে, যার অর্থ অন্তরীক্ষ বক্র; অন্তরীক্ষ অনন্ত, কিন্তু বাঁধা।

এমনকি আইনস্টাইন যিনি নিজে এই সিদ্ধান্ত নিলেন, যখন বলা হল আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ড সীমিত, যেখান থেকে বিগ ব্যাঙ থিয়োরী এসেছে, আইনস্টাইন এই থিয়োরী মানতে রাজী হলেন না। কারণ তাঁর যে ধর্মীয় বিশ্বাস ও ভিত্তি, তাতে বিগ ব্যাঙ হতে পারে না, আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন ইতি হতে পারে না। কিন্তু

সেই সময়কার বিজ্ঞানীরা mathematically করে দেখালেন এটাই হতে হবে; আর বর্তমানে বিভিন্ন ভাবে এর অনেক প্রমাণ এসে গেছে। আইনস্টাইন বলেছেন space is curved but unbound, কিন্তু স্বামীজী আগেই বলে গেছেন curved but bound, bound মানে যেটা যাবে সেটা ঘুরে চলে আসবে। আজকের astrophysicও তাই বলছে, অন্তরীক্ষ অনন্ত কিন্তু বাঁধা। অনন্ত এই কারণেই, কোন জায়গা থেকে এর শুরুও হয় না, কোন জায়গায় গিয়ে শেষ হয়েও যায় না। পৃথিবীর যেখানেই আমি দাঁড়াবো সেটাই তার কেন্দ্রবিন্দু, এর কোন শুরু নেই শেষ নেই। স্বামীজী আত্মাকে নিয়ে, মানুষকে নিয়ে বারবার এই কথাই বলছেন, ঈশ্বর যিনি সব জায়গাই তাঁর কেন্দ্র, এই যে স্পেস এর সব জায়গাই কেন্দ্র। কোন ভাবে বলা যাবে না যে এর কেন্দ্র এই জায়গাটা। এটা একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া হল যে, তখনকার দিনে বিজ্ঞানের যে সিদ্ধান্ত, স্বামীজী তার থেকে এগিয়ে বলছেন। স্বামীজী বৈজ্ঞানিক নন, বিজ্ঞানের শিক্ষাও তাঁর ছিল না, আর স্কুল কলেজে ফিজিক্স, কেমেস্ট্রি, অঙ্কে তাঁর নম্বর আহামরি কিছু ছিল না। কিন্তু intuitive knowledge, ধ্যানের গভীরে যে জ্ঞান পাওয়া যায়, ওই জ্ঞানে তিনি সমৃদ্ধ ছিলেন। বেদের ঋষিদেরও ধ্যানের গভীরে এই জ্ঞানগুলো উপলব্ধি হয়েছিল।

এটা শুধু একটি দৃষ্টান্তের কথা বলা হল, এই ধরণের হাজার হাজার কথা স্বামীজীর বাণী ও রচনায় ছড়িয়ে আছে। আমরা সবাই স্বামীজীর বাণী ও রচনা পড়ছি কিন্তু আমাদের নজরে পড়ে না। আগামী দিনে এখান থেকেই নূতন নূতন বিদ্যা বের হতে শুরু হবে। শুধু একটা বিদ্যাই বেরোবে না, ফিলজফি এখান থেকে বেরোবে, মনস্তাত্ত্বিক বিজ্ঞান এখান থেকে বেরোবে, ইতিহাস বেরোবে। আমরা মনে করছি ইতিহাস তো হয়ে গেছে, কিন্তু না, ইতিহাস হয়ে যায়নি। ইতিহাস তো ঘটনা, কিন্তু স্বামীজী দিচ্ছেন philosophy of history। রামায়ণ ও মহাভারতে যে ইতিহাস ছিল সেখানে কিছু ঘটনার কথা বলছেন, সীতার অপহরণ হয়েছে, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ হয়েছে, এই সব ঘটনাকে আধার করে এনারা মানুষকে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের শিক্ষা দিচ্ছেন। স্বামীজী সেখান থেকে পুরোপুরি সরে যাচ্ছেন। স্বামীজী বলছেন, ইতিহাস হল, এখানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এক এক করে রাজ করে, জাতি, বর্ণ বিভিন্ন সময় ক্ষমতায় আসে। ভারতের ইতিহাস তাই কখন টাকার জোরে চলে, কখন তলোয়ারের জোর চলে, কখন বিদ্যার জোরে চলে। এখন আমরা দেখছি পুরো বিশ্ব ধীরে ধীরে বিদ্যার দিকে এগিয়ে চলেছে। যাদের কম্প্যুটার টেকনোলজি উন্নত তারাই রাজ করবে, মিসাইল তাদের থেকেই বেরোবে, বিশ্ব বাজার তারাই নিয়ন্ত্রণ করবে। ইতিহাসের এই বিশ্লেষণ স্বামীজী দিয়ে গেছেন, কোন ঐতিহাসিক কোন দিন এই ধরণের কোন ধারণা দেননি আর এর উপর আজ পর্যন্ত কোন বড় কাজও হয়নি। একজন দুজন আছেন যাঁরা স্বামীজীর এই জিনিসটাকে নিয়ে কাজ করেছেন।

আবার স্বামীজী ভারতের ভবিষ্যৎ নিয়েও বলছেন, জনগণকে অধিকার দাও, তা নাহলে এরা তোমাদের শেষ করে দেবে। আবার বলছেন, আমি দেখতে পাচ্ছি শূদ্ররাই তাদের শূদ্রত্বের জোরে ভারতে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে আসবে। শূদ্র হল যারা অসংস্কৃতি সম্পন্ন, অশিক্ষিত। তখনকার দিনে কেউ জানতই না যে এখন এভাবে সারা দেশে নির্বাচন হবে। তিন চার হাজার বছর ধরে যাদের কোন শিক্ষা দেওয়া হয়নি, হিন্দু সমাজ যাদের অবহেলা করে এসেছে, আজকে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করার সুযোগ তারা পেয়ে গেল। ইতিহাসের চাকা ঘুরে গেল, এমনই ঘুরে গেল যে সমস্ত বর্ণ ভারত থেকে উড়ে গেল। এখন যার হাতে সংখ্যা তার হাতে ক্ষমতা। স্বামীজী এই জিনিসটাকে ধরতে পেরেছিলেন তাই ভবিষ্যদ্বাণী করে দিলেন। তিনি অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন বলে যে এভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করছেন তা নয়, মন যখন শুদ্ধ পবিত্র থাকে তখন intuitive knowledge এভাবেই আসে।

স্বামীজী বলছেন, ভারতবর্ষে জাতিপ্রথা থাকবে না। শিষ্য তাঁকে জিজ্ঞেস করছেন, তাহলে শূদ্রের কাজ কে করবে? স্বামীজী বলছেন, মেশিন করবে। এই কথা স্বামীজী ১৮৯৭ সালে বলছেন, তখন মেশিন বলতে কেউ কিছু জানত না, খালি রেলইঞ্জিন জানত। আজকে বাড়ির সব কাজ মেশিন করছে। ধোপার কাজ আজ মেশিন করছে। বাড়ির কাজের মহিলারা যে কাজগুলো করে আসছিল, আজ মাইক্রোক্লিনার থেকে শুরু করে বিভিন্ন মেশিন সেই কাজগুলো করে দিচ্ছে। কাপড় কাচা, বাসন মাজা থেকে শুরু করে রান্নার কাজ আজ সব মেশিন করছে। ভারতবর্ষে যখন মেশিনের কোন আইডিয়াই ছিল না, তখনই স্বামীজী বলছেন সমস্ত কাজ মেশিন করবে। আগে একটা ভিত কাটার কাজে কত লোক কাজ করত আজ সেই কাজ বুলডোজারের মত বড়

বড় মেশিনগুলো করে দিচ্ছে। এগুলো স্বামীজী আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। এই ধরণের চিন্তা শুধু একটা বিষয়েই নেই, প্রত্যেকটি বিষয়ের উপর স্বামীজী অনেক আগেই চিন্তা করে রেখে গেছেন।

বেদের যত ঋষিরা ছিলেন তাঁদের সবার যত অনুভূতি বা উপলব্ধি হয়েছিল, সবটা মিলে বেদ হয়েছে। কিন্তু স্বামীজী একাই এত কিছু দিয়ে গিয়েছেন যে, যা কোন কিছুর সাথে কোন তুলনাই করা যেতে পারে না। আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের, পিতৃপুরুষদের সম্মান করি, গুরুকে সম্মান করি, কিন্তু একটা জিনিস আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, evolutionএর দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা তাঁদের থেকে শ্রেষ্ঠ। আজ থেকে দু হাজার বছর আগে আমাদের পিতৃপুরুষরা কতটুকু আর জানতেন, জ্ঞানের দিক থেকে, বিদ্যার দিক থেকে আমাদের থেকে তাঁরা অনেক পিছিয়ে ছিলেন। সারা জীবনে তাঁরা যত জ্ঞান অর্জন করেছিলেন, আজকের প্রজন্ম পাঁচ বছর বয়সে তার থেকে অনেক বেশি শিখে নিচ্ছে। স্বামীজীও ঠিক তাই, বেদের ঋষিরা তপস্যা করে, ধ্যানের গভীরে যে জ্ঞানাদি অর্জন করেছিলেন, স্বামীজী সেটাই কয়েক বছরের মধ্যে আয়ত্ত করে নিলেন। এটাই হয়, এই যেমন নূতন প্রজন্ম আসছে, কয়েক বছরের মধ্যে এই প্রজন্ম সব রকম টেকনোলজিকে নিজের দখলে নিয়ে আসছে। তিন থেকে দশ বছর হতে হতেই বাচ্চারা কম্প্যুটারকে কব্জা করে নিচ্ছে। একটা মাউজকে আয়ত্ত করে ঠিক মত আমরা বয়স্ক মানুষরা চালাতে পারি না, কিন্তু ওদের কাছে কোন ব্যাপারই না। একটা জাতি খেটেখুটে যে বিদ্যা অর্জন করেছে, তারা সেটাকে কয়েক দিনের মধ্যে অর্জন করে নেয়, সেইজন্য জ্ঞানের দিক থেকে এরা অনেক শ্রেষ্ঠ এতে কোন সন্দেহ নেই। বর্তমান কালে যে বিষয়গুলো চলছে, একশ দুশো বছর পর ভবিষ্যতে যে বিষয়গুলো আসবে, সব বিষয়ের সিদ্ধান্ত বাক্যগুলো স্বামীজীরা বাণী ও রচনায় এসে গেছে। আর কাব্যের যে ঋষিরা ছিলেন, জ্যোতিষ শাস্ত্রের যে ঋষিরা ছিলেন, এনারা বেদের ঋষি নন। বেদের ঋষিরা যে সিদ্ধান্তগুলো দিয়েছিলেন, সেগুলোকে তাঁরা work out করলেন বেদাঙ্গ রূপে। সেই বেদাঙ্গকে যখন খুলে দেওয়া হল তখন আমরা জানতে পারছি বাল্মীকি, ব্যাস আদি ঋষিদের নাম। বাল্মীকি বৈদিক ঋষি নন, কিন্তু এনারা যে বিদ্যাকে বিরাটা মহিরূহে দাঁড় করালেন, সেই বিদ্যার মূলে রয়েছে বেদের কয়েকটি সিদ্ধান্ত বাক্য। স্বামীজীর বাণী ও রচনা সেই বেদ, ভবিষ্যতে যেখান থেকে শত শত জ্ঞানের শাখা বেরিয়ে আসবে, এখনও বেরোতে শুরু হয়নি।

স্বামীজীর অনেক বিষয়ের মধ্যে একটা বিষয়কে নিয়ে ইদানিং সবাই লেখালেখি করছেন, তা হল, শিক্ষা। কিন্তু বক্তৃতায়, প্রবন্ধে সবাই শুধু কোটেশানই দিয়েই খালাস, Education is the manifestation of the perfection already in man। কিন্তু এটাকে কিভাবে work out করবে আজ পর্যন্ত কেউ বলছেন না। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী স্বামীজীকে নিয়ে অনেক ভাল ভাল কথা বলে যাচ্ছেন, খুবই ভাল। কিন্তু স্বামীজী তাঁর যতগুলো নীতি দিয়ে গেছেন, এখনও পর্যন্ত দেশে সব তার বিপরীত চলছে। স্বামীজী বলছেন, শিক্ষা বলতে আমার কাছে গুরুগৃহ বাস। আর এখন গুরুগৃহ বাস অনেক দূরে থাক, স্কুলেই নিজের বাচ্চাকে পাঠাতে লোকেরা ভয় পাচ্ছে। রামকৃষ্ণ মিশনের কত আবাসিক স্কুল আছে, সেখানেও যাঁরা পড়াচ্ছেন তাঁরা জানেন কোন রকমে ছাত্রদের ভাল নম্বর দিয়ে দিতে হবে, বাবা-মায়েদেরও তাই, ছেলে আমার প্রচুর নম্বর নিয়ে বেরিয়ে ভাল কোথাও একটা চাকরি পাবে। কিন্তু গুরুগৃহ বাস রূপে যেটা হওয়ার কথা সেটা শূন্য। শিক্ষার ব্যাপারে স্বামীজী বারবার বলছেন, man making character building, সেই শিক্ষার তো কোন প্রশ্নই উঠছে না। আরও যেটা মারাত্মক ব্যাপার, স্বামীজী বলছেন বিদ্যার খরচ গুরু বহন করবে। আর আজ শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে তাকালে এর কোন অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যাবে না, দিনে দিনে শিক্ষার যে দাম চক্রহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, সাধারণ মানুষের কাছে শিক্ষা এক দুর্লভ বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাইমারী স্কুল থেকে শুরু করে যে কোন স্কুলে ভর্তির ফি, মাসিক ফির বহর দেখলে আমাদের মাথা ঘুরে যাবে। মুখে স্বামীজীর আদর্শের উপর ফুলঝুড়ি দিয়ে যাচ্ছি, আর কার্যে আমরা পুরো স্বামীজীর বিপরীত যাচ্ছি, স্বামীজীর কিসের আইডিয়া আমরা নিচ্ছি! স্বামীজী স্পষ্ট বলে দিচ্ছেন বিদ্যার্জনের জন্য যে এসেছে তার খরচ গুরুকে বহন করতে হবে। কিন্তু ইদানিং কেউ এগিয়ে এসে এর প্রয়োগ করবে সেই রকম দৃঢ়চেতা নেতাই দেশে নেই, আর কারুর পক্ষে সম্ভবও নয়। তাহলে হয় আমাদের বলতে হবে স্বামীজী ভুল বলেছেন, আর তা নাহলে আমরা সবাই ভুল করছি। এখন কে ঠিক বলছে? কারণ যা যা স্বামীজী বলেছেন সবটাই তার ঠিক বিপরীত হচ্ছে। বাইরের লোকেরা পুরুলিয়া, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের স্কুলকে নম্বরের জন্যই জানে। স্বামীজী যে সত্যগুলোকে বলে দিয়ে গেছেন, যা

কিনা বেদের সত্য, আর শিক্ষার ক্ষেত্রে যেটাতে সবচেয়ে বেশি কাজ হয়েছে, সেটাতেই এই দুরবস্থা। এরপর স্বামীজীর বাকি যত সত্যগুলো আছে তাকে নিয়ে আমরা কোন চিন্তাই করতে পারছি না।

স্বামীজীর এই চিন্তা-ভাবনাকে আইডিয়া বলা যায় না, যতক্ষণ স্বামীজীর বাণী ও রচনাকে বেদ রূপে না দেখা হয় ততক্ষণ আমাদেরা চিন্তা-ভাবনাগুলিও ভুলভাল হবে। আইডিয়া মানে brain wave, চুপচাপ বসে আছি হঠাৎ মাথায় চিন্তা এলো, উঠল বাই তো কটক যাই, এটাকে বলে আইডিয়া। আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে, এবার পূজাতে নেপাল যাব। স্বামীজীর চিন্তা-ভাবনার কোনটাই আইডিয়া ছিল না, স্বামীজী কিছু সত্য দিয়ে দিলেন। ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের যে সংস্কৃতি হবে তার পুরোটাই স্বামীজীর শব্দের উপর দাঁড়িয়ে আছে। ভারতের গত আট হাজার বছরের সংস্কৃতি বেদের উপর দাঁড়িয়ে ছিল। স্বামীজী হলেন বর্তমান আর আগামী দিনের বেদ। এই হল স্বামীজীর দেববাণীর উপর প্রথম কথা।

এই আলোচনায় আমরা দেখলাম স্বামীজীকে কেন বেদস্বরূপ বলা হয়। বেদের যে আলোচনা করা হল এটা traditional, এখানে আমরা বেদের নূতন কোন অর্থ বার করছি না। বেদের traditional অর্থই হল বিদ্যা। পতঞ্জলি বেদকে পরিভাষিত করতে গিয়ে বলছেন, বেদ হল জ্ঞানরাশি। বেদ শব্দ নয়, বেদ মানেই জ্ঞানরাশি। ভারতবর্ষের বিশেষ করে হিন্দুদের দুর্ভাগ্য যে আমরা চারটে বেদে যে শব্দগুলো রয়েছে, বেদ বলতে ওটাকেই বুঝি। স্বামীজীও বারবার বলছেন বেদ বলতে তার জ্ঞানরাশি। শুধু যে জ্ঞানরাশি তা নয়, ওই জ্ঞানকে আধার করে বিভিন্ন বিদ্যা একটা একটা করে বেরোবে। আমরা যাদের বিদ্বান, বুদ্ধিমান মনে করি, তাঁদেরও এগুলো বোঝার ক্ষমতা নেই। বিদেশীদের যাদের ক্ষমতা আছে, তারা এগুলো দেখবেই না। আর সত্যি কথা বলতে বেদের সভ্যতাও একদিনে হয়ে যায়নি, হাজার হাজার বছর লেগেছে evolve করতে, যে কোন চিন্তা-ধারা, সংস্কৃতির evolve হতে সময় লাগে। স্বামীজীও বলছেন, এই ভাব পনেরশ ষোলশ বছর চলবে। স্বামীজীর ভাব নূতন কিছু না, স্বামীজী যা কিছু বলছেন সব বেদান্তের কথাই বলছেন। বেদান্ত ভারতবর্ষের চিরদিনের ধর্ম, নূতন কিছু নয়। সেইজন্য ঠাকুর, স্বামীজী নূতন কিছু বলছেন না। বেদান্তের ভাব যতদিন মানব জাতি আছে ততদিন চলবে। কিন্তু জ্ঞানরাশি পাল্টে যাবে। বিজ্ঞান, ভূগোল, চিকিৎসা, ইতিহাস সব কিছুই পাল্টাতে থাকবে। সমাজ বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞান, রাজনীতি সব কিছু পাল্টাতে থাকবে।

২) দেববাণীর প্রেক্ষাপট (ব্রহ্মবিদ্যা, ঠাকুরের কাজ)

স্বামীজীর প্রত্যেকটি বাক্য বেদ, বেদের ঋচা। যদি কেউ গভীরে গিয়ে এর উপর চিন্তা-ভাবনা করতে পারে, ওই ঋচাকে কেন্দ্র করে ভবিষ্যতে অনেক কিছু বেরোবে। তার জন্য দরকার অনেক উন্নত ও একাগ্র মন। স্বামীজীর বাণী ও রচনার মধ্যে একটা section হল Inspired Talks, বাংলায় দেববাণী। এক সময় কিছু শিষ্যকে নিয়ে স্বামীজী একান্তে ছিলেন, সেই সময় শিষ্যদের তিনি অনেক শিক্ষা দিয়েছিলেন, শিক্ষা দিতে গিয়ে যা কিছু বলেছেন সেই কথাগুলোকে শিষ্যরা পয়েন্ট আকারে নোট নিতেন। পরে সেই নোট সংগ্রহ করে যে বই প্রকাশ হল, সেই বইয়ের কোন নাম হতে পারে না, ওনারা একটা নাম দিয়ে দিলেন Inspired Talks। পরে বাংলায় অনুবাদ করার পর নাম দেওয়া হল দেববাণী। অনুবাদ করার সময় আমাদের চেষ্টা থাকে শব্দের অনুবাদ করতে, কিন্তু অনুবাদ ঠিক তা নয়। যখন অনুবাদ হয় তখন ওটা একটা স্বতন্ত্র রচনার রূপ নেয়।

দেববাণীর একটা ছোট্ট প্রেক্ষাপট আছে, দেববাণীর প্রেক্ষাপট না জানা থাকলে এর মূল ভাব সমুদয়কে বোঝা যাবে না। এই যে স্বামীজীর বাণী ও রচনাকে বলা হল বেদসমগ্র, ভবিষ্যতে যে এক নূতন ভারতবর্ষ আসছে, সেই ভবিষ্যত-ভারতের যে ইতিহাস লেখা হবে, আমাদের জ্ঞানের যে ইতিহাস, আধ্যাত্মিক ইতিহাস, সব স্বামীজীর বাণী ও রচনা থেকেই বেরোবে। মোক্ষ শাস্ত্রের দুটো রূপ, একটা হল চাক্ষুস অর্থাৎ এই রকম হতে পারে কিনা। ভারতের যত রকমের সাধনা হয়েছে, বেদের সাধনা, উপনিষদের সাধনা, পুরাণ মতে সাধনা, তন্ত্র মতে সাধনা, যোগ সাধনা, যত সাধনা আছে সবই ঠাকুর নিজে করে দেখিয়ে দিলেন, এভাবে হতে পারে বা করা যেতে পারে, আর এভাবে হয় আর এভাবেই হয়েছে। দ্বিতীয় হল তথ্যমূলক, এই সাধনা কিভাবে হয়, সেই সাধনার কি পদ্ধতিতে হয়, এগুলো কথামৃত ও লীলাপ্রসঙ্গে বিস্তারিত ভাবে রয়েছে। উপনিষদ যেমন

পুরোপুরি মোক্ষশাস্ত্র, একটা দুটো সাংসারিক কথা থাকতে পারে, তেমনি কথামৃতেও একটা দুটো জাগতিক কথা থাকতে পারে, যে কথার কোন দাম নেই, কিন্তু মূলতঃ মোক্ষশাস্ত্র। ঠাকুরের আধ্যাত্মিক ভাব বা সত্যের দুটি রূপ, একটা হল যেটা সত্য, সত্য বলতে এটাই। দ্বিতীয় হল এই সত্য যখন সমাজের আঙিনায় আসবে তখন কিভাবে দেখা হবে। এর সব কিছুই স্বামীজী বাণী ও রচনাতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, কিন্তু দেববাণীতে পুরোটাই ঘনীভূত রূপে রয়েছে। Condensed milk থেকে একটু দুধ নিয়ে তাতে জল মিশিয়ে দিলে অনেক দুধ হয়ে যাবে, দেববাণী ঠিক তাই। স্বামীজীর যে আধ্যাত্মিক ভাব, যে মোক্ষ বিদ্যা তিনি ঠাকুরের কাছ থেকে পেয়েছেন এর সবটাই দেববাণীতে ঘনীভূত রূপে রয়েছে। দেববাণীতে শুধু যে উপনিষদীয় উপাদান আছে তা নয়, এতে যেমন পৌরণিক উপাদান আছে তেমনি বিজ্ঞান, ইতিহাস অন্যান্য অনেক কিছুরই উপাদান আছে। কিন্তু এত ঘনীভূত রূপে কোন রচনা স্বামীজীর অন্য কোন বাণী ও রচনাতে পাওয়া যাবে না। তার সাথে আগামী দিনে আধ্যাত্মিকতার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী এবং আধ্যাত্মিক ভাব কেমন হবে, কিভাবে হবে, সমস্ত কিছু যেন এখানে বীজাকারে রাখা আছে।

বিশ্বধর্ম সম্মেলনে অংশ নেওয়ার জন্য স্বামীজী ১৮৯৩ সালের মে মাসে জাপান হয়ে আমেরিকা পৌঁছালেন। আমেরিকায় পৌঁছে তিনি জানতে পারলেন ধর্ম মহাসভা বেশ কিছু দিনের জন্য পিছিয়ে গেছে। যার ফলে তাঁকে আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে পড়তে হল, সঙ্গে টাকা-পয়সা যা নিয়ে গিয়েছিলেন সব শেষ হয়ে গেছে। অনেক প্রতিকুলতাকে অতিক্রম করে ঈশ্বরের ইচ্ছায় সেখানকার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ হল, যাঁদের সাহায্যে স্বামীজী বিশ্বধর্ম সম্মেলনের সভায় যোগদানের সুযোগ পেলেন। ১১ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৩, welcome to the address, সম্মেলনের সংগঠক মিঃ ব্যারল ভাষণ দিলেন, তার ধন্যবাদ দেওয়া হল। মঞ্চে বিশ্বের প্রায় সব ধর্মের নামকরা প্রতিনিধিরা ছিলেন। সবাই খুব ভাল বক্তৃতা দিলেন। আমরা জানি সেই মঞ্চ থেকে স্বামীজী এক নূতন আধ্যাত্মিক ইতিহাস রচনা করলেন। আমরা সবাই সেই ঐতিহাসিক ঘটনা জানি। স্বামীজী Sisters and brothers of America শব্দ কটি দিয়ে তাঁর ভাষণ শুরু করলে সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলী দাঁড়িয়ে করতালি দিতে শুরু করলেন। পরবর্তি কালে স্বামীজীকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে স্বামীজী নিজেই বলছেন, ওই শব্দের পিছনে ছিল অখণ্ড ব্রহ্মচর্যের শক্তি, যে শক্তি সবাইকে দাঁড় করিয়ে দিল। মহিলারা স্বামীজীকে স্পর্শ করার জন্য বক্তৃতার পর মঞ্চের দিকে দৌড়ে গেছে। এই ধরণের নানা রকম কাহিনী আছে। এখানে এগুলো আমাদের জন্য বেশি গুরুত্ব নয়।

স্বামীজী কেন আমেরিকায় গিয়েছিলেন? এই নিয়ে অনেক মতামত আছে। স্বামীজী যেমন কখন বলছেন বিশ্বের প্রাচ্যের জন্য ভগবান বুদ্ধের যেমন সন্দেশ ছিল, তেমনি পাশ্চাত্যের জন্য আমার সন্দেশ রয়েছে। ভগবান বুদ্ধ যেমন বিশ্বের প্রাচ্য জগৎকে আধ্যাত্মিকতার আলোকে প্রভাবিত করে দিলেন, তেমনি আধ্যাত্মিক ভাবধারার তরঙ্গে সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎকে আলোড়িত করার জন্য স্বামীজীর আমেরিকায় আগমন। তেমনি স্বামীজী আবার বলছেন, ভারতবর্ষে কাজের জন্য আমার টাকার দরকার, সেইজন্য তিনি আমেরিকাতে গেলেন। এখানে প্রসঙ্গক্রমে একটা মজার ব্যাপার উল্লেখ করা যেতে পারে; আমেরিকায় আজ পর্যন্ত যাঁরাই গেছেন, তাঁরা যেই হন, ডাক্তার হন, ইঞ্জিনিয়ার হন, বিজ্ঞানী হন, সবাই একটা ভিক্ষার পাত্র নিয়ে আমেরিকা থেকে কিছু পাওয়ার আশায় গেছেন; কারুর বিদ্যার দরকার, কারুর টাকার দরকার। ভারত থেকে একমাত্র স্বামীজীই আমেরিকাকে কিছু দিতে গিয়েছিলেন। স্বামীজী বলছেন, এখানে আমি গুরুর আসনে বসব, দক্ষিণা রূপে যা পেলাম তো পেলাম, তুমি দিলে না দিলে তাতে আমার কিছু যায় আসে না। এ-সব কথা লোকেরা অতটা বোঝেও না, জানেও না, এ-গুলোকে নিয়ে আলোচনা করারও কোন প্রশ্ন নেই।

বাড়ি ছেড়ে কে বেরোয়? ঝড়ো বাতাস বইছে, বৃষ্টি পড়ছে, যেখানে বরফ পড়ে সেখানে তুষারপাত হচ্ছে। ঐ দুর্যোগে পশু পাখিরাও নিজের বাসা ছেড়ে বেরোয় না। মানুষ যে এত আরাম প্রিয়, নিজের শরীরকে যে পশুর মত ভালবাসে, সে কেন এই দুর্যোগে বাড়ি ছেড়ে বেরোবে? বাড়ি তারাই ছাড়ে যারা অত্যন্ত দুখী, দুখী না হলে কেউ নিজের বাড়ি ছেড়ে বেরোয় না। ভগবান বুদ্ধ ভিতর থেকে এত দুখী হয়ে গেছেন, চারিদিকে তিনি দুঃখই দেখছেন, গভীর রাত্রে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। গভীর রাতে মানুষ যখন যুবতী স্ত্রীর পাশে শুয়ে থাকে তখন তার মনে হয় এর থেকে সুরক্ষা, শান্তি, সুখ আর কিছু হতে পারে না। ভগবান বুদ্ধ সেই

অবস্থায় নিজের স্ত্রী, নিজের সাম্রাজ্য, রাজাপ্রাসাদের ভোগ, প্রাচুর্য, সব ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। যারাই বাড়িঘর ছেড়ে বিদেশ বিভুঁইয়ে পড়ে আছে, তাদের নিশ্চয় কোথাও অভাব বোধ আছে বলেই পড়ে আছে, সে কিছু চাইছে। কিছু চাওয়া না থাকলে সে বেরোত না। দ্বিতীয় যাঁরা ঘরবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসেন, তাঁরা হলেন সন্ন্যাসী। জগতের দুঃখ-কষ্ট, জগতের অজ্ঞানতা তাঁকে ধাক্কা দিয়েছে, মানুষকে শিক্ষা দিতে হবে। জ্ঞানপ্রাপ্তির পর ভগবান বুদ্ধও বেরিয়ে গেলেন মানুষের মঙ্গলের জন্য, তাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য। এই দুজনই ঘর ছেড়ে বেরোয়, যার অভাব আর যিনি পরিপূর্ণ, এই পরিপূর্ণতা আধ্যাত্মিক অর্থে। ভারতবর্ষ থেকে যারাই আমেরিকা যায় সবাই অভাবগ্রস্থ, কেউ টাকা চাইছে, কেউ বিদ্যা চাইছে, কেউ নাম চাইছে। স্বামীজীও আমেরিকা গেলেন, কিন্তু তিনি আর রাজকুমার সিদ্ধার্থ নন, বোধিবৃক্ষের নীচে জ্ঞানপ্রাপ্তির পর উত্থিত ভগবান বুদ্ধ। জগতের মঙ্গলের জন্য তিনি এবার চলতে শুরু করলেন। ঘর ছেড়ে এই দুজনই বেরিয়ে আসে, একজন অভাবগ্রস্থ, আরেকজন আত্মজ্ঞানের আলোকে পরিপূর্ণ। স্বামীজী নিজের আত্মজ্যোতির আলোকবর্তিকা নিয়ে অজ্ঞান, অন্ধকারময় জগৎকে আলো দেওয়ার জন্য বেরিয়ে এলেন। স্বামীজীই একমাত্র, যিনি আমেরিকাতে গিয়ে বলছেন, আমি তোমাদের দিতে এসেছি। তেমনি এই চিন্তাও ছিল, ভারতবর্ষ অভাবগ্রস্থ, দারিদ্রতা, কুসংস্কার আমার দেশবাসীকে গ্রাস করে রেখেছে, এদের জন্যও আমাকে কিছু করতে হবে। গুরুকে দক্ষিণা দিতে হয়, উপনিষদও বলছেন, হাতে দক্ষিণা ও অরণিকাষ্ঠ নিয়ে গুরুর সমীপে যেতে হয়। স্বামীজী আশা করছেন, এখানকার লোকেরা তাঁকে গুরু রূপে বরণ করে দক্ষিণা দেবে। দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু আশানুরূপ দক্ষিণা তিনি পাননি। সেই দক্ষিণার টাকা নিয়ে কিছু রিলিফের কাজ শুরু হল, বেলুড় মঠের স্থাপনা হল। স্বামীজী চাইতেন, তিনি এমন একটা মেশিন বসিয়ে দেবেন যে মেশিন থেকে ভারতবর্ষে চিরদিন কাজ চলতে থাকবে। স্বামীজী যে আদর্শকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, যে আদর্শের তিনি মূর্তরূপ, সেই আদর্শটা চলতে থাকবে।

কি ছিল স্বামীজীর সেই আদর্শ? স্বামীজী বার বার বলছেন, দেশের মঙ্গলের জন্য লেগে যাও। স্বামীজী কী চাইছিলেন? ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসীদের বলা হয় ঠাকুরের কাজ করতে। সন্ন্যাসীরাও মনে করেন আমি ঠাকুরের কাজ করছি। ঠাকুরের কাজ কি? স্বামীজী বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠা করলেন, রামকৃষ্ণ মিশন করলেন, তাতে কিছু কাজ হয়েছে, কিছু কাজ বাকি আছে। তবে রামকৃষ্ণ মিশন কিছু কিছু যে আদর্শ শুরু করল, প্রত্যক্ষ ভাবে না হলেও অনেক কিছু জিনিস পরোক্ষ ভাবে ভারতে ঢুকে গেছে। যেমন মেকলের শিক্ষা পদ্ধতির কথা আমরা বলছি ঠিকই, কিছু জিনিস আমরা নিয়েছি ঠিকই, কিন্তু আজকে স্কুল কলেজে আমাদের নিজস্ব অনেক কিছু ঢুকে গেছে। যেমন জাতীয় সঙ্গীত করা, সরস্বতী বন্দনা, শিক্ষকদের প্রণাম করা এগুলো আমাদের পরম্পরার, মেকলের শিক্ষা পদ্ধতি এগুলোর অনুমতি দেবে প্রশ্নই নেই। এই ভাবে আমাদের ঐতিহ্যের অনেক কিছু জিনিস যে ঢোকেনি তা নয়, আর স্বামীজী ঠিক এই পথেই এগোতে চেয়েছিলেন। তার থেকেও যেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ, যেটা আমাদের খুব ভাল ভাবে বোঝা দরকার, ঠাকুরের কাজ ঠিক কি হতে পারে, যে কাজের জন্য স্বামীজী বিদেশে গেলেন? স্বামীজী বিদেশ থেকে কিসের জন্য টাকা আনতে চাইছিলেন? স্বামীজী বেলুড় মঠের স্থাপনা কেন করলেন? ভাসা ভাসা চিন্তা করলে এই জিনিসগুলো কখনই বোঝা যাবে না।

হিন্দুদের নিন্দুকরা হিন্দু জাতিকে ধুর্ত জাত বলে মনে করে, হিন্দুরা লোকেদের ঠকায়। বিদেশে হিন্দুদের খুব নীচু দৃষ্টিতে দেখা হয়। হাজার হাজার বছর ধরে যে জাতি গোলামি করে এসেছে তারা এই রকমই হয়ে যায়। একটা সিংহকেও যদি অনেক দিন খাঁচায় বন্দী করে রাখা হয়, ঠিক মত যদি খেতে না দেওয়া হয়, কিছু দিন পর থেকে সেও শেয়ালের মত ব্যবহার করতে শুরু করে দেবে। কিন্তু যাঁরা একটু বোঝেন, তাঁরা মনে করেন হিন্দু জাতি মানে আধ্যাত্মিক জাতি। ধর্ম নিয়ে, আধ্যাত্মিকতা নিয়ে যাবতীয় যা কিছু হতে পারে, বিশ্বের অন্যান্য ধর্মে যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান রয়েছে তার সবটাই হাজার হাজার বছর আগে থেকেই ভারতবর্ষে বসে আছে, এতে কোন সন্দেহই নেই। তুলনামূলাত্মক ধর্ম নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যাবে, ইসলামিক হোক, খ্রীশ্চানিটিই হোক, জুদাইজিমই হোক, যে ধর্মই নেওয়া হোক না কেন, এই সব ধর্মের আধ্যাত্মিক সত্যগুলো (এখানে ধর্মীয় অনুশীলনকে ধরা হচ্ছে না), ধর্মীয় অনুভূতি যা আছে তার সবটাই অনেক আগে থেকেই বেদে গিয়ে বসে আছে। ভাগবতের দশম স্কন্ধের শুধু কৃষ্ণকথাকে বার করে আনলে ওখানেই খ্রীশ্চানদের বাইবেলে যা কিছু আছে সব শেষ হয়ে যায়। তার উপরেও অনেক কিছু থেকে যাচ্ছে। ভাগবতের বাইরে হিন্দুদের যে এত বিশাল ধর্মগ্রন্থগুলো আছে সেগুলো বাকি থেকে যাবে। কারণ বেদে যে উপাচার

রয়েছে, উপনিষদে যে আধ্যাত্মিক সত্য, অহং ব্রহ্মাস্মির ধারণা, এগুলো আসবেই না। হিন্দু ধর্ম গ্রন্থের অনেক কথা, যা আমাদের ঋষিরা পেয়েছেন, সেই ধরণের কথা অন্যান্য ধর্মেও আছে, নেই যে তা নয়। কিন্তু হিন্দুদের যে শেষ কথা, অহং ব্রহ্মাস্মি, তুমি সেই ব্রহ্ম, তুমি ডিভাইন, তুমি ঈশ্বরের অংশ নও, তুমি ঈশ্বরের সন্তানও নও, তুমি ঈশ্বরের সাথে এক, এই সত্য কোন ধর্ম বলেনি, বলার সাহস পাবে না, অনুশীলন করার কোন প্রশ্নই উঠছে না। এই বিদ্যাকে বলে **ব্রহ্মবিদ্যা**।

ব্রহ্মবিদ্যা মানে, যেখানে ব্যক্তি যিনি, আমি যিনি, তিনি যখন এটা অনুভব করেন, বোধে বোধ করেন আমি সেই ব্রহ্ম, এটাকে বলে ব্রহ্মবিদ্যা। এই ব্রহ্মবিদ্যা একমাত্র হিন্দু জাতির কাছেই আছে, অন্য কোন জাতির কাছে এই বিদ্যা নেই। ঠাকুর খুব সুন্দর বলছেন, সাপের মাথায় মণি কিন্তু সাপ মরা ব্যাঙ খেয়ে মরে। হিন্দুদের যত গালাগাল দিক, যত নিন্দাবাদ করুক, হিন্দু জাতি হল সাপ, যার মাথায় মণি, কিন্তু ব্যাঙ খেয়ে মরছে। হিন্দু জাতি এখন কাঙালী ভিখারী হয়ে বসে আছে, কবে সরকার কোন ভর্তুকি দেবে, কোন স্কিমে কত টাকা ছাড়বে এই আশায় বসে আছে। ভারতের মূল শিক্ষা ব্রহ্মবিদ্যা, যেখানে বলছে তুমি ঈশ্বর স্বরূপ, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তোমার পায়ের তলায়, আর তুমি কিনা সরকার কবে কোন স্কিমে কত টাকা ছাড়বে এই আশায় কাঙালী ভিখারীর মত পথ চেয়ে বসে আছ! যত সংবাদপত্র আছে সব সংবাদপত্রে প্রথম খবর থাকবে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিবাদ দিয়ে, এই খবর পড়া হয়ে যাওয়ার পর তখন দেখবে অমুক ঢপ বাবাজীর হয় তার নামে প্রশংসা, আর তা নাহলে কোন বাবাজী জেলে গেছে, কোন বাবাজী ধাপ্পাবাজীতে ধরা পড়েছে, কোন নেতা কত কোটি টাকার স্ক্যামে ধরা পড়েছে। সেখান থেকে তৃতীয় ধাপে এসে দেখবে কোথায় কার শ্লীলতাহানি হয়েছে। সব সংবাদপত্র এর মধ্যেই ঘুর ঘুর করছে। কোন ফিল্মস্টারের সাথে সাত বছর আগে কি হয়েছিল, তার উপর রোজ ধারাবাহিক ভাবে খবর ছাপিয়েই যাচ্ছে। মানুষের এখন অঢেল সময়, আগে তাকে কাপড় কাচতে হত, এখন মেশিন কাপড় কেচে দিচ্ছে, রান্নাবান্না আগে রোজ করতে হত, এখন এক সপ্তাহের রান্না একদিনে করে ফ্রীজে ঢুকিয়ে দিচ্ছে, আর তা নাহলে একটা ফোন করে দিল বাড়িতে ফাস্টফুড পৌঁছে দিচ্ছে, ওই খেয়েই থেকে যাচ্ছে। কাউকেই কাজকর্ম করতে হচ্ছে না। আমাদের এই অফুরন্ত সময়কে কাজে লাগাবার জন্য ষোল পাতার খবরকাগজে মুখরোচক খবর সাপ্লাই দিয়ে যাচ্ছে, আর টেলিভিশন একটার পর একটা সিরিয়াল চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ আমরা হলাম জাত সাপ, মাথায় আমাদের মণি, কিন্তু ব্যাঙ খেয়ে মরছি। ব্রহ্মবিদ্যা হল সেই মণি। ভারতের মূল শক্তিই হল ব্রহ্মবিদ্যা। তুমি পূর্ণ, অংশও নও, অপূর্ণের তো কথাই উঠছে না। তুমি ঈশ্বরের সন্তান নও, ঈশ্বরের সেবক নও, চাকর নও, তুমি ঈশ্বরের সাথে এক।

Power of positive thinking, How to be a good friend, How to succeed in life, Be successful, Be great এসবের উপর ইদানিং কালে প্রচুর বই লেখা হচ্ছে। লোকেরা এসব বই অবশ্যই কিনছে, না কিনলে হাজার হাজার বই প্রকাশন কোম্পানিগুলি বাজারে ছাড়ত না। কোথাও মানুষকে এই ধরণের চিন্তা-ভাবনা প্রভাবিত করছে, তবেই তো মানুষ বই কিনছে। শুধু যেখানে বলে দিচ্ছে, তুমি পারবে তাতেই মানুষ অনেক কিছু করে বসছে। জেহাদিদের শুধু বলে দেওয়া হয়েছে বিধর্মীকে মারতে গিয়ে তুমি যদি মারা যাও মরার পর বাহাত্তরটা হুরী পাবে, তাতেই তারা নিজেদের এত প্রিয় প্রাণের তোয়াক্কা না করে সবাইকে বোমা মেরে যাচ্ছে। ওদের ভগবান স্বর্গে ওদের জন্য বাহাত্তরটা হুরী নিয়ে অপেক্ষা করে আছেন। তাহলে কেউ যদি জেনে যায় আমি ঈশ্বরের সাথে এক, তাহলে তার ক্ষমতাটা কেমন হবে একবার ভেবে দেখুন। যে জেনে যাবে আমি ঈশ্বরের অংশও নই, চাকরও নই, ঈশ্বরের সন্তানও নই, আমি ঈশ্বরের সঙ্গে এক, তার ক্ষমতা কেমন হবে! একটা ভিখারী যদি জানতে পেরে যায়, আসলে সে একজন রাজা, তাহলে তার ব্যবহারটা কেমন হবে! কিন্তু আমরা মানব না, আমরা একটা কথাই মানব, আমি একটা ঢোঁড়া সাপ, আমি ব্যাঙ খেয়েই মরব। স্বামীজী এটাকে চিরদিনের জন্য মিটিয়ে দিলেন। কিভাবে মেটালেন? আমাদের বেদ উপনিষদের যে মূল কথা ব্রহ্মবিদ্যা, এই ব্রহ্মবিদ্যার স্থাপনা করে দিলেন। ভারতবর্ষের যুবকদের, রামকৃষ্ণ মিশনকে বললেন, ব্রহ্মবিদ্যার প্রতি সমর্পিত হও।

ব্রহ্মবিদ্যার প্রতি সমর্পিত হওয়ার একটা পথ হল, মানবজাতির সেবা। তুমি নিজেকে এখন দেহ ছাড়া কিছু জানো না, স্বার্থপরতার চরমে নিমজ্জ হয়ে আছ, মানবজাতি ও জীবসেবার মাধ্যমে তোমার এই

স্বার্থপরতার স্বভাব কাটবে। একটা যুবতী যতই সুন্দরী হোক, লোকে তার প্রশংসা করে, সম্মান কেউ করে না। যখন সেই যুবতী মা হয়ে যায় তখন সে মাতৃত্বের সম্মান পায়। কারণ তখন সে ত্যাগ করতে শেখে। সমাজসেবাতেও ত্যাগের ভাব জাগে, ত্যাগেই মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়। মানুষ নিজের শরীর ছাড়া আর কিছু জানে না, এটাই কাপুরুষতা, স্বামীজী এই স্বার্থপরতা আর কাপুরুষতাকে দেশের জন্য ভাঙলেন। কেন ভাঙলেন? তুমি এখন ঢোঁড়া সাপ হয়ে ব্যাঙ খেয়ে মরছ, কিন্তু তুমি তো সেই সাপ যার মাথায় মণি, তুমি দিব্য, তুমি ঈশ্বরের সঙ্গে এক, কেন তুমি কাঙালী ভিখারীর মত আচরণ করছ! ঠিকই বলছ, তোমার এই জ্ঞান এখন আসবে না। কারণ এই জ্ঞান আসার জন্য দেহের প্রতি আসক্তি, সংসারের প্রতি যে আসক্তি, এই আসক্তিকে তোমার ত্যাগ করতে হবে। ত্যাগ কিভাবে হবে? সব থেকে সহজ উপায় হল দেশের দশের সেবা কর। এই দিয়ে শুরু হয় স্বামীজীর ব্রহ্মবিদ্যা ও তার প্রাপ্তির উপায়। মঠ মিশনের পরম্পরায় বলা হয়, ঠাকুরের কাজ কর। এর অর্থটা কি? স্বামীজী যে ব্রহ্মবিদ্যার কথা বললেন, বিশ্বে যত ধর্ম আছে সেখানে বিভিন্ন ধরণের সাধনার কথা, সিদ্ধির কথা বলা হয়েছে, কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যা, যে বিদ্যাতে বলা হয় মানুষ ঈশ্বরের সাথে এক, এই ব্রহ্মবিদ্যা আর কারুর কাছে নেই, একমাত্র হিন্দুদের কাছেই আছে।

একবার যদি ব্রহ্মবিদ্যা কি বুঝে নেওয়া যায় আর এর সাথে ঠাকুর-স্বামীজীর কি সম্পর্ক, তাহলে অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে। ব্রহ্মবিদ্যা বলে মানুষ দিব্য, দিব্য বলতে শুধু যে ঈশ্বরের সন্তান, ঈশ্বরের দাস, তা নয়, সে ঈশ্বরের সাথে এক। এখন বিভিন্ন মতাবলম্বীরা কি বলছেন, কি বলছেন না, তাতে আমাদের কিছু আসে যায় না। আমরা এখানে স্বামীজীকে দেখছি, আমাদের যে পরম্পরা, এটাকে বলে সম্প্রদায় বিদ্যা। উপনিষদের যে সম্প্রদায় বিদ্যা, আচার্য শঙ্কর বারবার বলছেন সম্প্রদায় বিদ্যা এটাই। রামানুজ, মাধ্বাচার্য, চৈতন্য মহাপ্রভু অন্যান্য যাঁরা এসেছেন তাঁরা অন্য ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, এই ব্যাপারে আমরা এর বেশি কিছু আলোচনা করছি না, পরে দেববাণীতেই প্রসঙ্গক্রমে আলোচনায় আসবে।

স্বামীজী ঠিক কি করছিলেন বিদেশে গিয়ে? উনি কি ওখানকার লোকেদের খোল-করতাল নিয়ে কীর্তন শেখাতে গিয়েছিলেন? শেখাননি। উনি কি পূজা-উপাচারাদি শেখাতে গিয়েছিলেন? তাও না। তিনি যে পূজা-উপাচার জানতেন না তা নয়, বেলুড় মঠে উনি তাও করেছেন। কিন্তু একটা সীমারেখা টেনে করেছিলেন। স্বামীজী চাইতেন না বেশি পূজা-উপাচার নিয়ে মানুষ মেতে থাকবে, কারণ এগুলো করার জন্য অনেকেই আছেন। বেলুড় মঠের নিয়মাবলীতে তিনি বলে দিলেন, এটা বাবাজীদের আখড়া হবে না। তার মানে, তুমি পূজা-অর্চনা কর, কিন্তু ওটাই যেন তোমার মূল না হয়ে যায়। মূল হল ব্রহ্মবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা মানে তোমাকে জানতে হবে তুমি অনন্ত, তোমার আশেপাশে যারা আছে তারাও অনন্ত। তোমাকে এই অনন্তের জ্ঞান উপলব্ধি করতে হবে, তোমার আশেপাশে যারা আছে তাদেরকেও অনন্তের উপলব্ধি করাতে হবে।

এই ব্রহ্মবিদ্যা কাদের কাছে আছে? একমাত্র হিন্দু জাতির কাছেই আছে। শুধু হিন্দু জাতি না, হিন্দু জাতির মধ্যে একটা খুব ছোট অংশ, অদ্বৈত বেদান্তী যাঁরা, একমাত্র তাঁদের কাছেই আছে, আর কারুর কাছে নেই। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, দ্বৈতবাদীরা এই জিনিসটা কোন দিন মানবেনই না। আপনি মানুন আর নাই মানুন, শেষ কথা হল আপনার কাছে এই বিদ্যা নেই। কারণ, আপনি যদি বলেন, এই রকম একটা মত আছে আমি জানি, কিন্তু আমরা মানি না। তার মানেই এই বিদ্যা আপনার কাছে নেই। আগেকার দিনে জাতিপ্রথা ছিল, জাতিপ্রথায় ব্রাহ্মণ আলাদা, ক্ষত্রিয় আলাদা, বৈশ্য ও শূদ্র আলাদা। একজন ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞেস করা হল, 'মহাশয়! এই তলোয়ার আপনার কাছে আছে'? ব্রাহ্মণ বলবে, 'আমরা ওসব মানি না, তুমি আসতে পার'। কিছু ক্ষত্রিয় আছে তারা তলোয়ারবাজি করে। আপনি তলোয়ারবাজি মানুন আর নাই মানুন, ওর অনুমতি আপনি দিন আর নাই দিন, মূল কথা হল তলোয়ার বিদ্যাটা আপনার কাছে নেই। ঠিক তেমনি সারা বিশ্বে যত মত আছে, যত ধর্ম আছে কারুর কাছে এই ব্রহ্মবিদ্যা নেই। কিছু আছে যারা ওই পর্যন্ত পৌঁছাতে পারছে না, কিছু আছে যারা ওটাকে মানতে পারছে না, কল্পনা করতে পারছে না। কিন্তু অনেকে আছেন যাঁরা জানেন ওই রকম একটা বিদ্যা আছে, যেমন রামানুজাদিরা ছিলেন, কিন্তু কোন কারণে তাঁরা এই বিদ্যাকে মানবেন না। গীতায় বলছেন, বেশির ভাগ লোক এর কথা শুনতেও পায় না, শুনলে বুঝতে পারে না, ধারণা করতে পারে না। ঠিক তেমনি অনেকে আছেন যাঁরা ব্রহ্মবিদ্যার কথা শোনেনইনি। আবার অনেক আছেন যাঁরা ব্রহ্মবিদ্যার কথা শুনেছেন, কিন্তু

তাঁরা মানবেন না। অনেক আছেন যাঁরা মানেন কিন্তু উপলব্ধি করবেন না। মূল কথা, সাধারণ লোকের কাছে এই ব্রহ্মবিদ্যা নেই। যিনি নিজের ধর্মকে যত বড়ই মনে করুন তাতে আমাদের কিছু আসে যায় না, এখানে আপনার ধর্ম বড় কিনা, আপনার সম্প্রদায় বড় কিনা, এর কোন গুরুত্ব নেই, গুরুত্ব হল ব্রহ্মবিদ্যা আপনার কাছে আছে কি নেই। আজ থেকে পাঁচশ বছর আগে কোন ব্রাহ্মণকে যদি বলা হত, কুম্ভকাররা যে মাটির কাজ করে সেই বিদ্যা আপনি জানেন কি জানেন না? ব্রাহ্মণ বলবে, আমি জানিও না, মানবও না, মরে গেলেও আমি ওই কাজ করব না। আপনি করবেন কি করবেন না সেটার গুরুত্ব নেই, গুরুত্ব হল এই বিদ্যা আপনার কাছে নেই। বিশ্বের যে ধর্মই হোক, ইসলাম, খ্রীশ্চান, এদের কারুর কাছে ব্রহ্মবিদ্যা নেই।

ব্রহ্মবিদ্যা মানে যেখানে বলছেন তুমি ঈশ্বরের সন্তানও নও, তুমি ঈশ্বরের দাসও নও, তুমি ঈশ্বরের সৃষ্টিও নও, তুমি ঈশ্বরের সঙ্গে এক। ঈশ্বরের সাথে তোমার কোন ভেদ নেই, তুমি আর ঈশ্বর অভেদ, এটাই বিশুদ্ধ অদ্বৈত। এই জগৎ যতক্ষণ আছে ততক্ষণই ভেদ। তোমার দেহ-মনের উপাধি সরিয়ে দিলে, ঈশ্বরের উপরে যে সূক্ষ্ম শরীরের উপাধি দেওয়া আছে সেই উপাধিকে সরিয়ে দিলে দেখতে পাবে তোমার আর ঈশ্বরের মধ্যে কোন তফাৎ নেই; এটাই ব্রহ্মবিদ্যার সব থেকে বড় কথা। আগেকার অনেক আচার্যরাও এই নিয়ে অনেক আপত্তি করেছিলেন, তাঁরা এটা মানতেন না। ব্রহ্মবিদ্যার প্রয়োগ আরও সাংঘাতিক। তার মানে তোমার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, তোমার সুখ নেই তোমার দুঃখ নেই, পাপ নেই, পূণ্য নেই। এখন যে তুমি এত কান্নাকাটি করছ, তোমার যে এত শোক মোহ, কাল আমার কি হবে, সে আমাকে ভালবাসল না, ও আমার নিন্দা করল, সব কিছুই তখন মনে হবে এগুলো ছেলেখেলা। পাঁচ বছর বাচ্চারা এই গলাগলি করে খেলছে, এই বলছে তোর সাথে কথা বলব না, তোর সাথে আড়ি, একটু পরেই সব মিটে গিয়ে আবার গলাগলি। এই বন্ধুত্ব এই গলাগালি। কোনটারই দাম নেই, বন্ধুত্বেরও দাম নেই, ছাড়াছাড়িরও দাম নেই, মারামারিরও দাম নেই, ভালবাসারও দাম নেই, এটাই জগৎ। কারণ সব সেই এক। প্রায়ই এই উপমা নেওয়া হয়, চিনির যে মঠ তৈরী করা হয় তাতে হাতি আছে, ঘোড়া আছে, ইঁদুর আছে। বাচ্চারা মঠ নেওয়ার সময় ঝগড়া করবে, আমাকে সিংহ কেন দিল না, ইঁদুর কেন দিল। বড়রা জানেন, ইঁদুরটাও যা, সিংহটাও তাই, সবটাই সেই চিনি, খেলে মিষ্টি লাগবে। এই জ্ঞান যার হয়ে যায় তার আর কোন কিছুতেই অশান্তি লাগে না, হাতিও যা, ঘোড়াও তাই, ইঁদুরও তাই। আমিও যা, সেও তাই, উপাধি রহিত আমরা সবাই এক, এটাকেই বলে ব্রহ্মবিদ্যা।

জাতির দিক থেকে এই বিদ্যা একমাত্র হিন্দু জাতির কাছেই আছে, আর কারুর কাছে নেই। হিন্দু জাতি মূলতঃ ভারতবর্ষে থাকে, নেপালকেও আমরা ধরে নিতে পারি, কারণ নেপাল আর ভারতের একই সংস্কৃতি। এই তিনটে, ব্রহ্মবিদ্যা, হিন্দু জাতি আর ভারতবর্ষ, এই তিনটের মধ্যে যখন একটাকে সেবা করা হয় তখন এটাই হয়ে যায় ঠাকুরের কাজ। যখনই কোন অবতার আসেন তখন তিনি আসেন এই ব্রহ্মবিদ্যা স্থাপন করার জন্য। আচার্য শঙ্কর গীতার ভাষ্যে বলছেন, অবতার আসেন ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব রক্ষার জন্য। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব মানেই অধ্যাত্ম বিদ্যাকে ধরে রাখা। আচার্য বলছেন, অধ্যাত্ম বিদ্যা যদি ঠিক থাকে তাহলে বর্ণাশ্রম ঠিক থাকবে, বর্ণাশ্রম যদি ঠিক তাহলে প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম আর নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম দুটোই ঠিক থাকবে। তার মানে সমাজে শান্তি বজায় থাকবে, সমাজের সব কিছু ঠিকঠাক চলবে। অন্য দিকে যাঁরা ঈশ্বরের দিকে যেতে চাইছেন তাঁরা খুব সহজেই সেই দিকে যেতে পারেন। ঠাকুরও বলছেন অবতার আসেন জ্ঞান ভক্তি শেখাতে। কোন জ্ঞান ভক্তি শেখাতে আসেন? যে জ্ঞান ভক্তি মানুষকে মুক্তির দিকে নিয়ে যেতে পারে, আর মুক্তি মানে অদ্বৈত, অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা। যে বিদ্যা আমাদের ব্রহ্মবিদ্যা দেয় না, যে বিদ্যাতে অহং ব্রহ্মাস্মি নেই, বেদান্তে মতে সেই বিদ্যা কোন বিদ্যাই নয়।

কিন্তু আমাদের সংশায়িত চিত্ত, আমরা মনে করতে পারি উপনিষদে এগুলো ঠিক বলছে কিনা আমরা জানি না, শঙ্করাচার্য পণ্ডিত মানুষ তিনি তাঁর পাণ্ডিত্য দিয়ে কিছু একটা বলে দিয়েছেন। আবার দেখছি ঠাকুর, মা ও স্বামীজী এনারাও একই কথা বলছেন, শ্রীমা বলছেন, বাবা তোমাদের ঠাকুর অদ্বৈতী ছিলেন, তোমরাও অদ্বৈতী। তখন আমাদের স্বভাবতই মনে হতে পারে তাহলে বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈত এরা সবাই কোথায় থাকবে? দেববাণীতে এই জিনিসগুলোকেই আমরা পর পর দেখতে থাকব। শ্রীকৃষ্ণ অবতার, বৈষ্ণবরা বলেন কৃষ্ণই ভগবান, কৃষ্ণই সব। খুব ভাল কথা। কৃষ্ণই সব কেন? তিনি ব্রহ্মবিদ্যাকে স্থাপনা করে দিয়েছেন, আর আমরা

ভাল ভাবে জানি যে, যাঁরা একটু ধর্মশাস্ত্র জানেন, ব্রহ্মবিদ্যার ব্যাপারে যাঁরা একটু বোঝেন তাঁরা জানেন, ঠাকুর আসাতে যে ব্রহ্মবিদ্যা ভারত থেকে প্রায় লোপ পেয়ে গিয়েছিল, আবার সেই ব্রহ্মবিদ্যা নূতন করে স্থাপিত হল। সেইজন্য ঠাকুর অবতার। কেউ বলে শ্রীরাম রাবণ বধ করেছিলেন, কৃষ্ণ কংসকে বধ করেছিলেন, এগুলো অবতারের কোন কাজই নয়। এনারা ব্রহ্মবিদ্যাকে পুনরায় স্থাপিত করে দিয়েছিলেন। অবতারের একটাই কাজ, তিনি অবতার কেন, কারণ তিনি ব্রহ্মবিদ্যাকে পুনঃ স্থাপনা করে দিয়েছেন। পুনঃ স্থাপনা এই জন্যই বলা হচ্ছে যে, ব্রহ্মবিদ্যা ভারতবাসীর কাছে চিরদিনই আছে। ঠাকুর অবতার, কারণ তিনি এই ব্রহ্মবিদ্যার পুনঃ স্থাপনা করে দিলেন। ঠাকুরের যে পূজা-সেবা এটাও ঠাকুরের কাজ। স্বামীজী বেলুড় মঠ স্থাপন করলেন যাতে ব্রহ্মবিদ্যাকে ধরে রাখা যেতে পারে, হিন্দু জাতিকে যেন শক্তির যোগান দিতে থাকে, ভারতবর্ষ আর ভারতবাসীর কল্যাণের জন্য যেন কাজ করতে পারে আর ঠাকুরের যে ভাব সেই ভাব নিয়ে ঠাকুরের সেবা-পূজা করা। ঠাকুর যখন চলে গেলেন তখন শ্রীমা খুব দুঃখ করে বলছেন, হে ঠাকুর! তুমি এলে, কদিন কয়েকজনকে নিয়ে আনন্দ করে, আনন্দ দিয়ে হেসে খেলে চলে গেলে, তোমার কি শুধু এর জন্যই আসা? ঠাকুর তো শুধু এটুকুর জন্য আসেননি, তিনি এসেছিলেন ব্রহ্মবিদ্যা স্থাপন করতে।

সেইজন্য দরকার একটা মঠ, মঠ হল একটা central machine, যে ওই আদর্শের জন্য পাঁচটা জিনিসটাকে ধরে রাখবে। ঘুরে ফিরে আমরা দেখছি পাঁচটা জিনিস হচ্ছে, এই পাঁচটাই ঠিক ঠিক ঠাকুরের কাজ। প্রথম হল ব্রহ্মবিদ্যার চর্চা, দুই হিন্দুজাতির রক্ষা করা, তৃতীয় ভারতবর্ষের রক্ষা করা, চতুর্থ ঠাকুরের ভাব নিয়ে সেবা-পূজা করা এবং পঞ্চম রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের যে কোন কাজে নিজেকে নিয়োজিত করা। ভারতের সীমান্তে যে সৈনিকরা দেশের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছে, কিসের জন্য করছে? ভারতবর্ষ একটা আইডিয়া। এই আইডিয়া হল হিন্দু জাতির আইডিয়া, যে আইডিয়াতে acceptance আছে, যেখানে universality আছে। অন্যান্য ধর্ম যতই নিজেরা চেঁচামেচি করুক, তারা কি কখন মনে করে অন্য ধর্ম ঠিক? অন্য ধর্মও যে ঠিক এটাকে অন্য ধর্ম কোন মতেই মানতে চাইবে না। একমাত্র হিন্দু ধর্মই বলে, তোমার ধর্মও ঠিক। বিশ্বভ্রাতৃত্ব বোধ, বিশ্বজনীনতা বলতে যা বোঝায় এবং গ্রহণীয়তা এই তিনটে হিন্দু ধর্ম ছাড়া আর কারুর কাছে নেই।

কম্যুনিস্টরা বলছে সবার মুখে যেন সমান খাবার যায়। তার থেকে হিন্দু ধর্ম তো অনেক এগিয়ে। হিন্দু ধর্ম বলছে মানুষ মাত্রই দিব্য, মানুষ মাত্রই ঈশ্বরের সাথে এক। কম্যুনিস্টদের প্রথম কথা আমার মতের বিরুদ্ধে যারা তাদের মারো। রাশিয়ায় তাই হয়েছিল, তারা বলে দিল মানুষকে ভাল করতে হবে তাই আগে তাকে কম্যুনিস্ট বানাতে হবে। কথায় বলে, আমার যারা দুষমন তারা আমার খুব কম ক্ষতি করেছে, যারা আমার ভাল করতে চেয়েছিল তারাই আমার বেশি ক্ষতি করেছে। শৈশবে বাবা-মা বললেন সন্তানকে মানুষ করতে হবে, মানুষ করতে গিয়ে একগুচ্ছ অনুশাসন চাপিয়ে দিল, অনুশাসনের ঠেলায় সন্তান বিরক্ত হয়ে গেল। তারপর স্কুলে গেল, সেখানে মাস্টাররা তার ভাল করতে শুরু করলেন। তারপর সমাজ, সমাজও আমাকে ভাল করতে উঠে পড়ে লেগেছে। কিছু কিছু ধর্ম আছে, তারা বলছে আমাদের কথা মত না চললে তোমার ভাল হবে না। যখনই কেউ বলে, তোমার ভালর জন্যই বলা হচ্ছে, তখনই বুঝতে হবে এবার তার কিছু একটা গোলমাল হতে যাচ্ছে। হিন্দু ধর্ম কখনই কাউকে ভাল করতে যায় না, হিন্দু ধর্ম কাউকে তাই ধর্মান্তরও করে না। এই যে সৈনিকরা দেশের রক্ষা করছে, সৎ পুলিশরা যারা দেশকে ঠিক ভাবে পরিচালিত করছে, এই জন্যই করছে যে ভারত একটা আইডিয়া, ভারতের এমন একটা ভাব আছে, যে ভাবকে সবাইকে রক্ষা করার দরকার। যারাই কোন না কোন ভাবে ভারতের সেবা করছে তারা হিন্দু ধর্মকেই রক্ষা করছে, যারা হিন্দু ধর্মের রক্ষা করছে, হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করা মানে একটা আইডিয়াকে রক্ষা করছে। ইসলাম, খ্রিশ্চানিটি, জুদাইজিমকে যেভাবে তারা রক্ষা করে, সেই মত এরা রক্ষা করছে না, একটা আইডিয়াকেই রক্ষা করছে।

মুসলমানরা যখন বলছে আল্লাই আছেন, হিন্দু ধর্মের বৈষ্ণবরাও তাই বলছে, কৃষ্ণই আছেন। যদি কেউ কৃষ্ণ নামকে সরিয়ে বলে শুদ্ধ চৈতন্যই আছেন, সবাই একই কথা বলছে, কোথাও নূতনত্ব নেই। নূতনত্ব বেদান্তে আছে, বেদান্ত বলছে তুমিই সেই, যিনি পরব্রহ্ম তিনিই বাসুদেব, আর তুমিই সেই পরব্রহ্ম। তুমি বাসুদেব নও, কারণ তোমার উপর উপাধি লেগে আছে, যেখানে তুমি দেহ, মনে আবদ্ধ। এই উপাধিকে তুমি

যদি সরিয়ে দাও, বাসুদেবের উপাধিকেও যদি সরিয়ে দাও, তখন তিনি যা তুমিও তাই। কিন্তু তুমি 'তিনি' কোন দিন হতে পারবে না, সেটা আলাদা জিনিস। বাকিরা 'তিনি', 'তুমি' এর মধ্যেই চলছে। বেদান্ত এক ধাপ এগিয়ে বলছে, 'তিনি'টাকেও ছাড়ো 'তুমি'টাকেও ছাড়ো। এটাই ব্রহ্মবিদ্যা, এই ব্রহ্মবিদ্যাই হিন্দুদের বৈশিষ্ট্য। হিন্দুরা ভারতবর্ষে থাকে, যেখানে যেখানে হিন্দুরা গেছেন তাঁরা এই বিদ্যাকে নিয়েই গেছেন।

এই বিদ্যার latest আচার্য ঠাকুর। যদি জিজ্ঞেস করা হয় latest আর earliestএর মধ্যে তফাৎ কোথায়? বিদ্যার দিক দিয়ে কোন তফাৎ নেই, তবে একটা তন্মাত্রার তফাৎ থাকে। কারণ তিনি খুব কাছাকাছি থাকেন, তাঁর স্মৃতিটা আমাদের মনে খুব জোরাল ভাবে থাকে। যখন অনেক দূরে চলে যান তখন তাঁর প্রভাবটা যেন কমে যায়। এখানে শব্দটা 'যেন', তবে এনাদের কথা বেদ, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্রের কথা বেদ। বেদ চিরন্তন, কিন্তু তা হলেও, যখন আমরা জানছি ঠাকুর এই জায়গাতে ছিলেন, তখন স্মৃতিগুলো খুব সতেজ। টাটকা জিনিসের একটা আলাদা মূল্য থাকে। ঠাকুরের ভাবকে কেন্দ্রিভূত করে বেলুড় মঠ ধরে রেখেছে। ঠাকুরের সেবা মানেই এই পাঁচটি। স্বামীজী এই পাঁচটাই ঠিক ঠিক ভাবে করছিলেন।

শিকাগো ধর্মসভায় স্বামীজী Sisters and brothers of America বলার পর সব মেয়েরা দৌড়ে গেল স্বামীজীর একটু স্পর্শ পাওয়ার জন্য। সভাতে একজন মহিলা ছিলেন, তাঁর নাম মিসেস লজেট। তিনি শিকাগো মেয়েদের জানতেন, সবাই এলিট সোসাইটি থেকে গেছে। মিসেস লজেট মনে মনে স্বামীজীর নামে বলছেন, Youngman if you can resist this temptation you are God। অনেক পরে মিসেস লজেটের সাথে স্বামীজীর আবার যোগাযোগ হয়। স্বামীজীর সাথে দেখা হওয়াতে তিনি খুব উৎফুল্ল। কথাবার্তা বলতে বলতে স্বামীজী একটু যেন উদ্দিপ্ত হয়ে বললেন, I have a temptation, মিসেস লজেট সঙ্গে সঙ্গে বলছেন, Who is she? স্বামীজী বলছেন, ব্যক্তি নয়, এটা একটা অর্গানাইজেশান। ওটাই ছিল রামকৃষ্ণ মঠ স্থাপনের সূত্রপাত, যা তিনি মিসেস লজেটকে প্রথম মুখে প্রকাশ করলেন। সেখানে স্বামীজী এও বলছেন, আমি জানি যে কোন নূতন সংস্থা নূতন ধরণের সমস্যার জন্ম দেয়, কিন্তু আমার কোন উপায় নেই, আমাকে এটাই করতে হবে। স্বামীজী শব্দটা বলছেন evil। যে কোন সমাজে যখনই একটা কোন system দাঁড় করান হয়, ওই system কিছু নূতন সমস্যা তৈরী করবে। গণতন্ত্র ব্যবস্থায় এক রকম সমস্যা হবে, রাজতন্ত্রে আবার অন্য রকম সমস্যা হবে। স্বামীজীও বলছেন, রামকৃষ্ণ মিশনও সমস্যা তৈরী করবে, কিন্তু এই মুহুর্তে এ-ছাড়া আমার কোন পথ নেই আমাকে এটাই করতে হবে। ঠাকুরের নাম করে স্বামীজী পরে বলছেন, বেলুড় মঠে যত দিন ত্যাগ তপস্যার ভাব থাকবে ঠাকুর তত দিন এখানে সূক্ষ্ম শরীরে অবস্থান করবেন।

অনেকেই স্বামীজীকে নিয়ে বলেন, স্বামীজী ভারতবর্ষের নামে এই বলেছেন, সেই বলেছেন। একজন সন্ন্যাসী কেন কোন দেশের ব্যাপারে বলতে যাবেন, সমাজকে নিয়ে কেন বলতে যাবেন, এটা সন্ন্যাসীর কাজ নয়। স্বামীজী এই জন্যই বলেছেন, কারণ ভারতবর্ষ মানেই হিন্দু ধর্ম। কিন্তু সন্ন্যাসী যিনি জগদ্‌গুরু তিনি কেন হিন্দু ধর্ম নিয়ে বলছেন? সন্ন্যাসীর কাছে সব ধর্মই সমান। স্বামীজী হিন্দু ধর্মকে নিয়ে বলছেন, কারণ ব্রহ্মবিদ্যা একমাত্র হিন্দুদের কাছেই আছে। স্বামীজীর মূল উদ্দেশ্য সেটাই যেটা অবতারদের থাকে, তা হল ব্রহ্মবিদ্যা, এই ব্রহ্মবিদ্যাকে মানবজাতির কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য স্বামীজী দেশে বিদেশে গেছেন। দামী গয়নাকে রাখার জন্য একটা ভাল কেস দরকার, সেই কেসকে রাখার জন্য একটা মজবুত বাক্স দরকার, বাক্সে আবার তালা দেওয়া, এই ধরণের নানা রকম protection নেওয়া হয়। এই ব্রহ্মবিদ্যাকে সেইভাবে protected রাখতে হবে। ব্রহ্মবিদ্যার প্রথম রক্ষা করছে হিন্দু ধর্ম, ভারতবর্ষ তাকে রক্ষা করছে। আর ওটাকে ধরে রাখার জন্য আবার অবতাররা মাঝে মাঝে আসেন। এই পাঁচটার মধ্যে যে কোন এক বা একের অধিককে যদি প্রাণপনে সেবা করা হয়, সেটাই হবে ঠাকুরের ঠিক ঠিক কাজ। হিন্দু জাতি ও হিন্দু ধর্মের জন্য নিজেকে পুরোপুরি সমর্পিত করে দেওয়া, এটাই ঠাকুরের কাজ। ভারতবর্ষের প্রতিটি নাগরিককে আমার ভালবাসতে হবে। আমার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে আমি যতটুকু করতে পারি। যে কেউ আসুক আমার কাছে সাহায্যের জন্য, আমার সীমিত ক্ষমতা দিয়ে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। ব্রহ্মবিদ্যা যদি আমি নাও বুঝতে পারি, ঠাকুরের প্রতি সমর্পিত করে দেওয়াতেই অনেক কিছু হবে, ঠাকুর ছাড়া আমার জীবনে আর কেউ নেই। আমার জীবনের কেন্দ্রে ঠাকুর, আমার নির্ভরতা ঠাকুরের প্রতি। আমার পরিবার, আমার সম্পদ, আমার দেহ, মন সব

গৌণ। একমাত্র ঠাকুরই আমার জীবনের মুখ্য, আর তা নাহলে রামকৃষ্ণ মিশন, রামকৃষ্ণ মিশন যে কাজ করছে সেই কাজে যোগদান দেওয়া। রামকৃষ্ণ মিশনের কাজে কেন যোগদান দেওয়া? কারণ এনারা ব্রহ্মবিদ্যার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। ব্রহ্মবিদ্যার এই যে পাঁচটা রূপ, এটাই স্বামীজী করেছিলেন। স্বামীজীর জীবনে তাকালে আমরা দেখি তিনি সব কিছুই করেছেন, কিন্তু একেবারে মূলে ছিল ব্রহ্মবিদ্যা। ব্রহ্মবিদ্যা বলতে ঠিক কি বোঝায় এটাকেই তিনি আমেরিকার সহস্রদ্বীপে কয়েকজন বাছাই করা শিষ্যদের কাছে ব্যাখ্যা করছেন। ঠাকুরের কথামৃত পুরোটাই ব্রহ্মবিদ্যা নিয়ে। ব্রহ্মবিদ্যার বিভিন্ন অঙ্গ হতে পারে, বেদ আর বেদাঙ্গ যেমন, ঠিক তেমনি কথামৃতে যোগসাধনার কথাও রয়েছে, তন্ত্র সাধনার কথাও আছে, দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত সাধনা থেকে শুরু করে সমস্ত রকম সাধনার কথা রয়েছে, কিন্তু সব কিছুর কেন্দ্রে রয়েছে ব্রহ্মবিদ্যা।

স্বামীজী সেখান থেকে আরেকটু এগিয়ে নিয়ে এই যে পাঁচটা রূপ বলা হল, এর সবটাকে নিয়েই তিনি বলছেন, কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যা সবার চূড়ামণি, এই চূড়ামণিকে তিনি সহস্রদ্বীপে মাত্র বারোজন শিষ্যকে উপদেশ দিয়েছিলেন, যে উপদেশগুলো আমাদের কাছে টুকরো টুকরো হয়ে এসেছে, সবটাকে এক জায়গায় সংগ্রহ করে এর নাম দেওয়া হল **দেববাণী**, ইংরাজীতে **Inspired Talks**।

এই পাঁচটা বিষয়ের মধ্যে যে কোন একটা বা একাধিক বিষয়ে নিজেকে সমর্পিত না করতে পারে তাহলে জীবনটা বৃথা। যেমন অনেক জায়গায় আমরা চারটি আদর্শের কথা বলেছি – বিদ্যা, সম্পদ, সেবা ও ত্যাগ। এই চারটের কোন একটাতে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে দিয়ে দেওয়া। যেমন ক্ষুদিরাম বোস, একটা বাচ্চা ছেলে সে জানেও না কি করতে যাচ্ছে। তার মনে হল আমি দেশের সেবা করব, দেশকে স্বাধীন করব। সে গিয়ে একটা বোমা মেরে এলো, বোমাতে আবার ভুল লোক মারা গেল। ক্ষুদিরামের যে বয়স, তার যে ইমোশান আর তার যে কার্য, এগুলোকে আমরা বিচার করতে পারি না। কিন্তু উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ক্ষুদিরামের যে intention সেটাকে দেখব। তার intention ছিল আমি দেশ সেবা করব, দেশের মুক্তি আমি একা এনে দিতে পারব না, ঠিক আছে, দুটো ইংরেজকে আমি শেষ করে দিচ্ছি। এখানে বক্তব্য এটাই, তোমার intensity of purpose আছে কিনা। যদি intensity of purpose থাকে, এরপর তার যদি দুটো ভুলভাল কাজ হয়ে যায় তাতে কোন দোষ নেই। বিদ্যা, সম্পদ, সেবা ও ত্যাগ নিয়ে আলোচনা করার সময় বলা হয়েছিল, যখন তুমি বিদ্যাতে নিজেকে সমর্পিত করে দাও তখন কি তোমার এই অনুভূতিটা থাকে যে আমি বিদ্যা অর্জন এমন ভাবে করব যে ওই বিদ্যার জগতে আমি বিশ্বের সেরা হব, আমার ধারে কাছে কেউ থাকবে না। এটা হল বিদ্যাতে ঠিক ঠিক নিজেকে সমর্পিত করে দেওয়া। সম্পদের ক্ষেত্রে আমি আমার দেশের জন্য সম্পদ তৈরী করছি। সম্পদ সৃষ্টি যদি নাও করতে পারি, কিন্তু দেশের কোন কিছুর, এমনকি একটা পয়সাও অপচয় হতে দেব না। এটা যদি না পারি আমি সবার সেবা করব। লোকেদের সাথে দুটো মিষ্টি কথা তো বলতেই পারি, সুযোগ পেলে লোকেদের ভাল করতে পারি। যাঁরা শ্রেষ্ঠ মানের, তাঁরা সব কিছু ত্যাগ করে নিজেকে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যান। এটা হল একদিক থেকে নিজের আদর্শকে দেখা। এই পাঁচটা যেটা ব্রহ্মবিদ্যার ব্যাপারে বলা হল, এটা আরেক দিক থেকে দেখা। আদর্শ বিহীন মানুষের জীবনে কিছুই থাকে না। ছিড়িক ছিড়িক তারাবাজির আলোর মতে জ্বলে জ্বলে জীবনদীপ নিভে যায়। ওটাকেই যদি বারুদ ঠাসা হয় তখন বোমার মত ফেটে পরে। একই জিনিস, মশলা সেই এক, কেউ তারাবাজির মত শেষ হয়ে যাবে, তা নাহলে বোমার মত ফাটবে।

সাধারণ মানুষের মনুষ্য-জীবন এমনিই নষ্ট হয়ে যায়। কারণ নিজের আর নিজের খুব কাছের মুষ্টিমেয় কয়েকজন পরিজনের স্বার্থ ছাড়া এরা আর কিছু দেখে না। এদের কোন দোষ নেই, এরা এই রকমই। কিন্তু যাঁরা উচ্চ কথা শুনেছেন, শুনে বোঝার চেষ্টা করেছেন, ভাল বই পড়েছেন, ভাল মানুষের সঙ্গ করেছেন, কোথাও তাঁর মধ্যে এই স্পার্কটা জাগতে হবে। শ্রাবণ মাসে রাস্তা দিয়ে হাজার হাজার তীর্থযাত্রীরা তারকেশ্বরে শিবের মাথায় জল ঢালতে যায়। রাস্তার ধারে প্যাণ্ডাল তৈরী করে মাইক বাজিয়ে কিছু লোক এই তীর্থযাত্রীদের শরবৎ, খাবার-দাবার দিয়ে সেবা করে। কোথাও তাদের মধ্যে এই ভাবটা জেগেছে যে, এরা সবাই তীর্থ করতে যাচ্ছে, এদের আমি একটু সেবা করলাম। এরা ভাবছে, আমি তো যেতে পারলাম না, কিন্তু এদের সেবা করে আমারও কিছু পূণ্য হল। এটাকেই যদি ঘুরিয়ে দেওয়া হয়, আমি হিন্দু এরাও হিন্দু, হিন্দুদের এরা একটা

উপাচার পালন করছে, তাই এদের এই সেবা করছি। এটাই তখন অনেক উচ্চভাবে চলে গেল। তাজমহল তৈরী করার উপর একটা কাহিনী আছে। তাজমহলের একজন কারিগরকে জিজ্ঞেসে করছে, ‘এটা তোমরা কি করছ?’ কারিগর উত্তর দিল, ‘কি আর করব! বাদশার আদেশ তাই কাজ করছি, এই কাজটাই আমি করতে জানি, করতে বলেছে তাই করছি’। আরেকজন কারিগরকে একই প্রশ্ন করা হল। সে বলছে, ‘আমি এই কাজই জানি, বাড়িতে আমার গিন্নী আছে, দুটো বাচ্চা আছে, সারাদিন কাজ করলে পাঁচটি টাকা পাবো, সেই টাকা দিয়ে বাড়ির লোকেদের আমি খাওয়াব, এর জন্যই আমি কাজ করছি’। আরেকজনকে জিজ্ঞেস করাতে বলল, ‘জানো না, আমাদের শাহেনশা এখানে বিরাট এক তাজমহল তৈরী করছেন, সেই বিরাট কাজে আমি আমার সামান্য একটু অবদান রাখছি’। তিনজন একই কাজ করছে, কিন্তু তিনজনের দৃষ্টিভঙ্গী আলাদা। একজন বলছে, করতে বলেছে তাই করছি, আরেকজন বলছে, বাড়ির লোকেদের খাওয়াবার জন্য করছি, অন্যজন বলছে, এটা একটা আদর্শ, এখানে এমন এক জিনিস তৈরী হচ্ছে যা বিশ্বের কোথাও নেই, সেই কাজে আমি আমার যোগদান দিচ্ছি। স্বামীজী বলছেন, এখানে মা কালী পাঁঠা খাবেন, কৃষ্ণ বাঁশী বাজাবেন আর শিব ষাঁড়ের পিঠে চেপে ঘুরে বেড়াবেন। সেই শিবের মাথায় কয়েকজন জল ঢালতে যাচ্ছে, কিছু লোক তাদের সেবা করছে। এটা অন্য জিনিস, এরা ভুলে যাচ্ছে যে আমার ঘরে যারা আছে তারাও হিন্দু, আর বিশাল লাউড স্পীকার লাগিয়ে নিম্নমানের ভোজপুরী গান চালিয়ে অন্যদের অশান্তি তৈরী করছে, কারণ ওদের ওই বোধটাই নেই। ভাবছে এদের খাইয়ে দিলে আমার পূণ্য হয়ে গেল। কিন্তু যারা কিছুই করছে না, সারা জীবন কিছুই করেনি, এরাই মৃত্যুধর্মা, *সস্যমিব মর্ত্যঃ পচ্যতে সস্যমিবাজায়তে পুনঃ,* ধান গমের মত জন্মেছে, ধান গমের মত মরবে।

এমন কোন মানুষ কি আছে যে, যে একটা আদর্শের উপর নিজের জীবনকে সমর্পিত করে অন্ততঃ পাঁচ বছর যাবৎ অতিবাহিত করেছে, যে বলতে পারবে ওই আদর্শের জন্যই আমি বেঁচে আছি? সন্ন্যাসীরাই পারছেন না, সাধারণ মানুষের কথা তো অনেক দূরের। মূল বক্তব্য হল, ঠাকুরের কাজ বলতে এই পাঁচটি কাজই, এর বাইরে ঠাকুরের কোন কাজ নেই। যে কাজই হোক, কাজের উদ্দেশ্য হবে আমি ব্রহ্মবিদ্যাতে আমার অবদান রাখছি। ব্রহ্মবিদ্যা আমাদের জাতির চূড়ামণি, এর প্রতি আমি নিজেকে সমর্পিত করছি। যুদ্ধের সময়, বন্যা হয়ে গেলে সবাই কিছু না কিছু ভাবে সাহায্য দিয়ে ত্রাণ কার্যে নিজেকে যুক্ত করে। কেউ সোয়েটার বানিয়ে সৈন্যদের পাঠিয়ে দেয়। তার এই ভাব, আমি এই বয়সে যুদ্ধ করতে পারব না, বদলে আমি এই সোয়েটারটা পাঠালাম। কিন্তু সব থেকে গুরুত্ব হল আমাদের একমাত্র যে বৈশিষ্ট্য ব্রহ্মবিদ্যা, সেই ব্রহ্মবিদ্যার জন্য নিজেকে এই পাঁচ ভাবে লাগিয়ে দেওয়া। যাদের মধ্যে চেতনা জেগেছে তারা এই ব্রহ্মবিদ্যাতে অবদান দেবে। যার মনে এই ভাব জেগেছে যে আমাকে দেশের সেবা করতে হবে, হিন্দু জাতিকে রক্ষা করতে হবে, বুঝতে হবে সে ঠাকুর স্বামীজীর কাজটাকে ধরে নিয়েছে। আমি হিন্দু এটা তার কাছে একটা গর্বের ব্যাপার, হিন্দুদের জন্য কাজ করছি এটা একটা গর্বের ব্যাপার, এরপর আমি যেটাই করব ভারতবর্ষের জন্য, হিন্দুদের জন্য করব, কারণ মানবজাতির যে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা একমাত্র হিন্দু জাতির কাছেই আছে, হিন্দুরা মূলতঃ ভারতবর্ষেই থাকে। আমি যদি এর জন্য মার খেয়ে যাই, হেরে যাই, তাতে আমার কিছু আসে যায় না, কারণ আমি একটা আদর্শের প্রতি সমর্পিত। ক্ষুদিরাম বোস ফাঁসিতে প্রাণ দিয়ে দিলেন, কিন্তু তাঁর যে জীবনদর্শন ছিল, ওই জীবনদর্শন এক মহৎ দর্শন। জীবনদর্শন যদি মহৎ হয়, আর সেটাকে কার্যকর করতে যদি তার ভুলও হয়ে যায়, ওই ভুলের জন্য যদি সে মারাও যায় তাতে কিছু আসে যায় না। মানুষ দুই প্রকারের, আদর্শবান আর আদর্শবিহীন। আদর্শবান পুরুষের জীবনে শান্তি আসে, একটা শক্তির উন্মেষ হয়।

মহাভারত ও পুরাণাদিতে এসে সাধনাটা বেদ থেকে পাল্টে যায়, সাধনা পাল্টে যায় কিন্তু সিদ্ধি একই থাকে। যে জিনিসগুলোকে virtues বলা হয়, যেমন যোগশাস্ত্রে সত্য, অহিংসা, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ বলা হচ্ছে, এগুলোই মূল্যবোধ। এই মূল্যবোধের অনুশীলন সবাইকেই করতে হয়। যাঁরা এগুলোর অনুশীলন করেন তাঁদের আমরা ভাল মানুষ বলি, এনারাই সমাজের প্রকৃত ভাল লোক। মহাভারত ও পুরাণ এগুলোকেই সাধনা বানিয়ে দিলেন। তার মানে, কেউ যদি সত্য সাধনা করে তাতেই তার সিদ্ধি লাভ হবে। কেউ যদি অহিংসা সাধনা করে বা ব্রহ্মচর্য পালন করে তাতেই তার সিদ্ধি হয়ে যাবে। এই সাধনা কতটা কার্যকর আমরা তাতে যাচ্ছি না। কিন্তু এতে তাদের সাধনার পদ্ধতিটাই পুরো পাল্টে গেল। বেদের সাধনা ছিল তুমি যজ্ঞ কর তাতেই তোমার সব হয়ে যাবে, উপনিষদের সাধনা ব্রহ্মচিন্তন, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন কর, তোমাকে আর

কিছু করতে হবে না। মহাভারত ও পুরাণ আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে বলছে, এই যে কয়েকটি মূল্যবোধ বলা হল এগুলোকে তুমি অনুশীলন কর তাতেই তোমার সব হবে। তার মানে, যে জিনিসটা সবারই করা উচিৎ, সবাই করছে, যেমন সমাজে সবাই সত্যি কথা বলে, সত্য কথা বলাকে সাধনা রূপে নিয়ে নিলে তুমি পুরো পাল্টে গেলে। গান্ধীজী তাই করলেন, উনি বলে দিলেন, আমি সত্য আর অহিংসাতে প্রতিষ্ঠিত থাকব। আমরাও সত্য পালন করি, অহিংসা পালন করি, কিন্তু গান্ধীজী দুটোকে একেবারে চূড়ান্ত অবস্থায় নিয়ে গেলেন। যে কোন জিনিসকে যখন চরমে নিয়ে যাওয়া হয় তখন সেটাই সাধনা হয়ে যায়। যতক্ষণ চরমে নিয়ে যাওয়া না হয়, ততক্ষণ ওটা মূল্যবোধ হয়েই থাকে। আমরা সবাই বিদ্যাচর্চা করছি, সবাই ঠাকুরের মন্ত্র একশ আটবার জপ করছি, এখানে সবাই ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিই আছে। এটাই যখন একেবারে চরমে নিয়ে যাওয়া হবে, ঠাকুর যেমন বলছেন, মাইরি বলছি আমি ঈশ্বর বৈ আর কিছু জানি না। আমরাও জানি ঈশ্বর ছাড়া আমাদের কেউ নেই। কিন্তু আপদ বিপদ আসার আগে বলি ঠাকুর রক্ষা কর। সত্যিই যখন আপদ বিপদ এসে পড়ে তখন বলি, হে ঠাকুর! তুমি এ কি করলে! হাত ভেঙে যাওয়ার পর ঠাকুরও দুঃখ করে সবাইকে দেখিয়ে বলছেন, আমার এই রকমটি কেন হল বল তো, আমি তো মায়েরই নাম করছিলাম। খুব interesting sentence। দুঃখ করছেন, আমি তো মায়েরই নাম করছিলাম, আমার কেন এ রকমটি হল। আমাদেরও ঠিক এই সমস্যা হয়, আমি তো ঠাকুরেরই ভক্ত, আমার কেন এমন হল। শারীরিক, মানসিক ব্রেকডাউন সবারই হবে, ঠাকুরেরই হচ্ছে সেখানে আমি আপনি কোন ছার। তিনি কাকে কিভাবে চালাচ্ছেন আমরা কি করে জানব, জানার কোন উপায় নেই। এটাই যখন চরমে চলে যায়, ঠাকুরের ক্ষেত্রে বিশেষ, আমি তো মায়েরই নাম করছিলাম, তাও কেন এমনটি হল। আমরাও বলি, হে ঠাকুর! আমি তো তোমার শরণাগত, কিন্তু তাও কেন আমার এমন হল। কিন্তু ওখানেই আমাদের সব শেষ। তারপরেও যে ধরে রাখবে, ধরে রেখে এগিয়ে নিয়ে যাবে, সেটা আর হয়ে ওঠে না। এখানেই ঠাকুর আর আমাদের মধ্যে তফাৎ হয়ে যায়। অনুশীলন আমাদের সবারই আছে; আমরা সবাই দেশের জন্য, হিন্দুদের জন্য কোন না কোন ভাবে সেবা করছি। মন্দিরে গিয়ে দুটো টাকা প্রণামী দেওয়াটাও ঠাকুর সেবাই হল। কিন্তু সাধারণ দৈনন্দিন অনুশীলন যা করছে, ওটাকেই যদি চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে চলে যায়, ওটাই তখন আদর্শ হয়ে যায়, সাধনা হয়ে যায়। সবাই আমরা জীবনে জান্তায় অজান্তায় যা কিছু করছি, সেখানে আমরা এই ব্রহ্মবিদ্যারই খুব হাল্কা, আবছা ভাবে অনুশীলন করে যাচ্ছি। কিন্তু সব ছেড়ে যখন পুরোপুরি শুধু ঐটাই করা হয়, তখন ওটাই আদর্শ হয়ে যায়। জীবন তখনই সার্থক হয়, সফল হয়। দুর্গাপূজার সময় পাড়ার ছেলেরা ফুর্তি করছে, নেশা করছে কিন্তু ওর মধ্যেও গরীবদের কম্বল, ধুতি বিতরণের মত ভাল ভাল কাজ করছে। সে জানে যে এই সেবা দেখালে আমি লোকেদের কাছ থেকে সামনের বছর ভাল চাঁদা পাবো। এই সেবা ভাবটাই যখন কারুর জীবনধারা হয়ে যায়, সেবা ছাড়া আমি আর কিছু জানি না, সে তখন একজন মাদার টেরেসা হয়ে যায়।

১৮৯৩ সালে চিকাগো শহরে স্বামীজী বিশ্বধর্ম সম্মেলনে ভাষণ দিলেন, সেই ভাষণ থেকে অনেকে স্বামীজীকে জানলেন, চিনলেন, মানলেন। এই চেনা-জানাটা এরপর ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। মিলিয়ে গেলেও ইতিমধ্যে স্বামীজীরও কিছু গুণী লোকের সাথে পরিচিতি হয়েছিল, যেমন মেরী হেল পরিবারের সাথে তাঁর ভাল সম্পর্ক তৈরী হয়ে গিয়েছিল, আজীবন স্বামীজী তাঁদের সাথে সম্পর্ক রেখেছিলেন। এইভাবে আরও কয়েকজনের সাথে স্বামীজীর পরিচিতি হতে শুরু হল। স্বামীজী একটা উদ্দেশ্য নিয়ে আমেরিকা গিয়েছিলেন। আমরা আগে বললাম যে, স্বামীজীর উদ্দেশ্য মানে ব্রহ্মবিদ্যা স্থাপনা। ব্রহ্মবিদ্যা স্থাপনা মানেই হয় হিন্দু জাতির রক্ষা। স্বামীজীর সময় ভারত ইংরেজের অধীনে ছিল। সেই সময় ভারতের লোকেদের খাওয়া-পড়া নেই, চিকিৎসা নেই, শিক্ষা নেই, তার উপর দারিদ্রতা, অশিক্ষা, কুসংস্কার মানব জীবনের যত রকমের দুর্ভোগ হতে পারে সবটাই তখন ভারতে পুরো জাঁকিয়ে বসে আছে। স্বামীজীর মাথায় তখন টাকার প্রয়োজন অনুভব হল। আগে নিজের বাড়িটাকে ঠিক করতে হবে আর এই বাড়ির জিনিসটাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে লোকেদের সামনে রাখতে হবে যাতে বাড়িটা ঠিক হতে পারে। অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবার আছে যারা অবস্থা পরে গেলে তাদের সঞ্চিত পারিবারিক সোনা বিক্রি করে দেয় যাতে পরিবারের সব কিছু ঠিক মত চলতে পারে। ব্রহ্মবিদ্যা হল আমাদের সঞ্চিত পারিবারিক সোনা। পারিবারিক সোনা আর ব্রহ্মবিদ্যার মধ্যে তফাৎ হল, পারিবারিক সঞ্চিত সোনা বিক্রি হয়ে যাওয়া মানে চলে যাওয়া, ব্রহ্মবিদ্যা চলে যাবে না। আমি যখন খুশি এটাকে বিক্রি করতে পারি। স্বামীজীর

মনে এই জিনিসটাই ছিল, এই ব্রহ্মবিদ্যাকে আমাকে বাইরে নিয়ে যেতে হবে, যার প্রভাবে বাইরের লোকেরা প্রভাবিত হয়ে ভারতকে কিছু সাহায্য করতে পারে যার দ্বারা ভারতবর্ষের মঙ্গল হতে পারে।

স্বামীজী এতে কতটা সফল হলেন আমরা জানি না, তবে আমরা জানি ভারত স্বাধীন হল, ভারতের সরকার এখন আমাদের নিজেদের। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ভারত এত উন্নতি করেছে যে আজ ভারতের খাওয়া-পড়ার কোন অভাব নেই, সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের ব্যবস্থা হয়েছে। একদিকে হাজার হাজার কোটি টাকা চুরি করে যাচ্ছে তা সত্ত্বেও ভারতের লোকেদের খাওয়া জুটছে। ভারতের স্বাধীনতার পর মানুষ কল্পনাই করতে পারত না যে কেউ হাজার কোটি টাকা চুরি করবে। তখন লোকেরা সৎ ছিল কিন্তু না খেয়ে মরত, এখন লোকেরা অসৎ তাও লোকেরা খেতে পাচ্ছে। কারণ বেশির ভাগ সৎ লোকেরাই অপদার্থ হয়, ঠাকুর বলছেন লেজে হাত দিলে শুয়ে পড়ে। অসৎ লোকেরা কিছু কাজ-টাজ করে। এখন চারিদিকে স্ক্যাম, স্ক্যাণ্ডাল, দেখে মনে হয় দেশে চোর জোচ্চর ছাড়া যেন আর কিছু নেই। যেখানে একতলা বাড়ি ছিল সেখানে সাততলা বাড়ি হয়ে গেছে, গাড়ির সংখ্যা এত বেড়ে গেছে যে রাস্তা পারাপার করা যায় না। আগে যারা দুবেলা ভাত-ডাল খেতে পেত না আজ তারা দুবেলা পেট পুরে খেতে পাচ্ছে, আগে যারা ভাত-ডাল দুবেলা খেতে পেত আজ তারা বিরিয়ানি পোলাও খাচ্ছে। যারা আগে গঙ্গাজল আর তুলসি পাতা খেয়ে চিকিৎসা করত, তারা এখন সামান্য অসুখ হলে বড় বড় হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা করাচ্ছে। মূল কথা হল এখন প্রাচুর্য এসে গেছে। স্বামীজী এই জিনিসটাই চেয়েছিলেন, ভারতের মানুষ যাতে দুবেলা পেট ভরে খেতে পায়, ভাল শিক্ষা, ভাল চিকিৎসা পায়। ভারতে যে অভাব নেই তা নয়, অভাব অবশ্যই আছে, কিন্তু সেই অভাব মেটানোর জন্য সরকার প্রচুর উদ্যোগ নিচ্ছে। উদ্যোগে কিছু লোক টাকা আত্মসাৎ করছে ঠিকই, কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু গরীব লোকের হাতে টাকা যাচ্ছে। স্বামীজী এই চেষ্টাই করছিলেন, যাতে লোকেদের হাতে কিছু টাকা আসে, যাতে তাদের মঙ্গল হয়। স্বামীজী চেয়েছিলেন যুবকরা দেশের মঙ্গলের জন্য কাজে নামবে আর খুব কাজ করবে, এটা কিন্তু আজ সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে গেছে। বিভিন্ন গ্রামেগঞ্জে, আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় অনেক শিক্ষিত লোক নামযশ, টাকা-পয়সা রোজগারের ইচ্ছা থেকে সরে এসে মানুষের জন্য কাজ করছে। অনেকে নিজেদের সম্পত্তি দান করে এই ধরণের সেবার কাজে নেমে পড়ছে। প্রত্যক্ষ ভাবেই হোক বা পরোক্ষ ভাবেই হোক স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রচুর লোক ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করছে। এর আগে পর্যন্ত আমি মানবজাতির সেবা করে সিদ্ধির পথে এগোব, পূর্ণতার দিকে এগোব, এই ভাব ভারতবর্ষে ছিল না। ইষ্টাপূর্তের ধারণা বেদেই ছিল, ইষ্টাপূর্ত মানে যজ্ঞাদি হলে, বাড়িতে বিবাহ বা উপনয়নাদির মত কোন সামাজিক বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান হলে তারা কিছু গাছ লাগিয়ে দিল, রাস্তা তৈরী করে দিল বা পুকুর কাটিয়ে দিল। এই জিনিসগুলো প্রাচীন ভারতবর্ষে ছিল। তীর্থস্থানে ধর্মশালার ব্যবস্থা ছিল, বৃন্দাবন, কাশীতে বৃদ্ধদের বসবাসের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু মানবজাতির সেবাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য, এটাই আমার আদর্শ, এই ভাবনা ভারতে এর আগে ছিল না। স্বামীজীর আগমনের পর থেকেই এই ভাবনা শুরু হয়। এখন বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমেও মানুষের মঙ্গলের জন্য কাজ হচ্ছে। অনেকেই বড় বড় কাজ করছে এতে কোন সন্দেহ নেই।

সিস্টার নিবেদিতা স্বামীজী জীবনীর ভূমিকায় খুব সুন্দর লিখছেন, মাদ্রাজের যুবকরা কোন পরিকল্পনা না করে, কোন খবরাখবর না নিয়ে স্বামীজীকে আমেরিকাতে পাঠিয়ে দিলেন। যুবকদের ধারণা যে, স্বামীজীকে ওরা যেমনি দেখে নেবে সঙ্গে সঙ্গে সবাই অভিভূত হয়ে গিয়ে স্বামীজীর পায়ে লুটিয়ে পড়বে। যাওয়ার পর জানা গেল পার্লামেন্টে নাম নথিভুক্ত করার তারিখ অনেক আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে, স্বামীজীকে কোন ভাষণ দিতে দেওয়া হবে না। দৈবাৎ কিভাবে প্রফেসর রাইটের সাথে দেখা হল, তিনি চিঠিপত্র লিখে দেওয়াতে বহু কষ্টে কোন রকমে স্বামীজীর নাম নথিভুক্ত করা গেল। স্বামীজীও ঠিক সেই রকম ভাবলেন, আমেরিকা যাচ্ছি, আমি আছি আর আমার বিদ্যা আছে, ভারতের বিদ্যা দেব আর হুড়মুড় করে টাকা এসে যাবে। পরে স্বামীজী নিজেই হতাশ হয়ে লিখছেন, যা ভেবেছিলাম তার কিছুই হল না। কোন টাকা-পয়সাই আসছিল না। আমেরিকার সবটাই বিজনেস, লেকচার দেওয়াটাও বিজনেস, ধর্মের কথা বলাও বিজনেস। কিছু দিন পর উনি একটা লেকচার ব্যুরোর খপ্পরে পড়ে গেলেন। ওই লেকচার ব্যুরো স্বামীজীকে নাচাতে শুরু করল। ১৮৯৩, তখন সবে রেলগাড়ি হচ্ছে আর এর বিকল্প ছিল ঘোড়ার গাড়ি। রেলগাড়ি আর ঘোড়ার গাড়ি এর বাইরে আর

কোন যানবাহন ছিল না। স্বামীজীর বর্ণনা আছে, তখনকার দিনে ওই অবস্থায় বিকেলে এখানে লেকচার দিয়েছেন, দেওয়ার পর পাঁচশ কিলোমিটার দূরে যাত্রা করে সেখানে সকালবেলা আবার লেকচার, দুপুরে আবার লেকচার, বিকেলে ওই এরিয়াতেই আরেকটা লেকচার। এরপর আবার ট্রেন ধরে অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছেন। পাঁচশ কিলোমিটার আমেরিকায় তখনকার দিনে কোথাও বরফ পড়ছে, কোথাও প্রচণ্ড গরম, এত আবহাওয়ার তারতম্য ভাবাই যায় না। ওর মধ্যে স্বামীজী সারা আমেরিকাতে ঘুরে ঘুরে লেকচার দিয়ে বেড়াচ্ছেন। এইভাবে দিনের পর দিন চলতে চলতে একটা সময় তাঁর শরীর খারাপ হয়ে গেল।

এসে গেল ১৮৯৪, নূতন বছর আসতে আসতেই তিনি বিরক্ত হয়ে গেলেন, স্বামীজী দেখলেন এতে কিছুই হবে না। লেকচার ব্যুরো স্বামীজীকে উপস্থাপনা করছে একটা জোকারের মত, ভারত থেকে যেন এক জোকার এসেছে, তার উপর আবার লেকচার দিতে হত তেলের ড্রাম উল্টো করে রেখে তার উপর দাঁড়িয়ে। সার্কাসওয়ালারা যেমন এই শহর থেকে সেই শহরে ঘুরে বেড়ায়, লেকচার ব্যুরোর কাছে স্বামীজী হলেন একজন চলমান সার্কাস। এরপর আরও বাজে অবস্থা, দেখা গেলে লেকচার কোম্পানি স্বামীজীকে পুরো চিট করে যাচ্ছে। এমন ভাবে তারা কন্ট্রাক্ট বানিয়ে রেখেছে যে, শেষে দেখা গেল স্বামীজীর কাছে আদৌ কোন টাকা-পয়সা আসছে না। তিনি সম্পূর্ণ ভাবে হতাশ হয়ে গেলেন। প্রথমের দিকে তিনি ভেবেছিলেন লেকচার দিয়ে টাকা পাওয়া যাবে, সেটাও হল না, পরে লেকচার ব্যুরোর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে লেকচার দেওয়া শুরু করলেন, তাতেও টাকা পেলেন না। দুদিক থেকেই তাঁর কাছে কোন টাকা-পয়সা আসেনি, মাঝখান থেকে অতিরিক্ত ধকলে তাঁর শরীরটাও ভেঙে গেল। এবার উনি ঠিক করলেন, বক্তৃতা না দিয়ে ক্লাশ নিতে হবে।

১৮৯৪এর মার্চের মাঝখান থেকে আগ্রহী শ্রোতাদের জন্য স্বামীজী ক্লাশ নিতে শুরু করলেন। মেরি লুই বার্কের ওই সময়কার খুব সুন্দর বর্ণনা আছে, ১৮৯৪ সালে নিউইয়র্ক কেমন ছিল, সেখানে কিভাবে একটা এ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়ে স্বামীজী ক্লাশ নিতে শুরু করলেন। কিছু প্রচারপত্র বিলি, কিছু লেখার মাধ্যমে, কিছু মুখের কথায় খবর পেয়ে ধীরে ধীরে লোকজন আসতে শুরু হল। স্বামীজীর ক্লাশে তখনও নোটস্ নেওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। কোন আমন্ত্রণে স্বামীজী নিউইয়র্ক থেকে বাইরে লেকচার দিতে গেলে, ওখানকার নিউজপেপারগুলো ওই লেকচারগুলো কভার করত, ওদের কাছে স্টেনোগ্রাফার ছিল। ভুল হোক, ঠিক হোক ওরা যা ছাপল, আর ওই শহরের তিন চারটে নিউজপেপারে যা ছাপা হল, মেরি লুই বার্ক সব কটা পেপার সংগ্রহ করে মিলিয়ে মিলিয়ে দাঁড় করালেন স্বামীজী ওই শহরে এই ধরণের একটা লেকচার দিয়েছিলেন। এরপর ওনারা দেখলেন এভাবে স্বামীজীর সব কথা ঠিক ভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখা যাবে না। তখনই কিছু পারশ্রমিকের বিনিময়ে স্টেনোগ্রাফার গুডউইনকে নেওয়া হল। এরপর থেকে মিঃ গুডউইনই স্বামীজীর সব লেকচারগুলো শর্টহ্যাণ্ডে সংগ্রহ করে রাখলেন। আজকে আমরা যে দশ খণ্ডে স্বামীজীর বাণী ও রচনাবলী দেখছি এর পুরো গুডউইনের জন্যই বাস্তবায়িত হয়েছে। কিন্তু তত দিনে স্বামীজীর প্রচুর অমূল্য লেকচার নষ্ট হয়ে গেছে। তবে ধর্ম সম্মেলনের পর লেকচার ব্যুরোর মাধ্যমে স্বামীজী যে লেকচারগুলো দিয়েছিলেন সেগুলো কখন কদাচিৎ নিউজপেপারে এসেছিল, মেরি লুই বার্ক এগুলো সব সংগ্রহ করে তাঁর বইতে প্রকাশ করেছেন। প্রায় এক বছর ধরে স্বামীজী নিউইয়র্কে আছেন, নিয়মিত ক্লাশ নিচ্ছেন, কিছু লোকের সাথে সবারই ভাল পরিচিতি হয়ে গেছে। এর সাথে তিনি আশেপাশের শহরগুলিতেও যেতেন, বিশেষ করে ডেট্রয়টে খুব স্বামীজী যেতেন। ওই পাব্লিক ক্লাশগুলোও স্বামীজীর মনঃপূত হচ্ছিল না। এবার স্বামীজী চাইছেন আচার্য রূপে তিনি নিজের মত থাকবেন, বাছা বাছা কয়েকজন তাঁর সঙ্গে থাকবেন, যাঁদের দৈনন্দিন রুটিন স্বামীজীর মত হবে, স্বামীজী যা বলবেন নিঃশর্ত ভাবে তাঁরা সেটাকে গ্রহণ করবেন। ভারতীয় পরম্পরায় আচার্য যেমন হন, শিষ্যরা যেমন হন, ঠিক সেই পরম্পরায় এবার তিনি ক্লাশ নিতে চাইছেন।

ইতিমধ্যে একটা দুটো আমন্ত্রণ আসছে লেকচারের জন্য, স্বামীজী আর তাতে বেশি আগ্রহ দেখালেন না। ওই সময়ে স্বামীজীর ক্লাশে মিস্ ডাচার আসতেন। উনি একজন গোঁড়া খ্রীষ্টান ছিলেন, স্বামীজীর ক্লাশ শুনতেন, এবং প্রভাবিতও হয়েছিলেন। নিউইয়র্ক থেকে তিনশ কিলোমিটার দূরে বিশাল চওড়া সেন্ট লরেন্স নদী প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে। সুন্দরবনের মত সেন্ট লরেন্স নদীর মধ্যেও প্রচুর দ্বীপ আছে, বিভিন্ন দ্বীপের বিভিন্ন নাম। তার মধ্যে একটা দ্বীপের নাম থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড। থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড দ্বীপ সমূহের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম

দ্বীপ। দ্বীপের নিজস্ব মিউনিসিপ্যালিটি আছে, জল সরবরাহ, বিদ্যুৎ সরবরাহ সবই ছিল। স্টীম ইঞ্জিন দিয়ে তখন জল উপরে তোলা হত, সেখান থেকে জল সরবরাহ হত। ওই দ্বীপে মিস্ ডাচারের একটা ছোট্ট কটেজ আছে। থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ডের একটা বিরাট ইতিহাস আছে, যাঁরা ওই দ্বীপে বসবাস করতে গিয়েছিলেন তাঁরা প্রচণ্ড গোঁড়া খ্রীশ্চান ছিলেন; প্রথমের দিকে খ্রীশ্চানরা ছাড়া ওখানে কেউ প্রবেশ করতে পারত না। কিন্তু ১৮৯৫ সালে যখন এই ঘটনাগুলো ঘটে তখন ওনারা অনেক লিবারাল হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাও একজন হিন্দু সন্ন্যাসী সেখানে গিয়ে হিন্দু পরম্পরায় শিক্ষা দেবেন সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এটা চিন্তাই করা যায় না। যাই হোক, যখন ঠিক হল স্বামীজী থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ডে যাবেন, তখন স্বামীজী শিষ্যদের পরিষ্কার বলে দিলেন, নিজের সব কিছু ছেড়ে ওই তিনশ কিলোমিটার দূরে মিস্ ডাচারের কটেজে যেতে হবে। প্রায় দেড় বছর আগে স্বামীজী পাঁচশ কিলোমিটার পর্যন্ত নিত্য যাতায়াত করছেন, আর সেখানে তিনশ কিলোমিটার নিজেদের জিনিসপত্র নিয়ে যাবেন তাতেই সবার গায়ে জ্বর এসে গেছে। তখনও রেলপথের সুবিধা অতটা মসৃন হয়নি, বিভিন্ন ভাবে যাতায়াত করতে হত, আর শেষ পর্যায়ে স্টীমারে যেতে হত।

মিস্ ডাচার যেমনি শুনলেন স্বামীজী এসে থাকবেন, ওনার সাথে দশ বারোজন শিষ্য থাকবেন; খুব উৎফুল্ল হয়ে কাজে নেমে গেলেন। অত তাড়াতাড়ি করে বড় ঘর করা যাবে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও খুব চটজলদি করে একতলা বাড়িকে দোতালার মত করে দিলেন। স্বামীজীর রুম পুরো আলাদা। উপরে একটা করে ঘর আর নীচে একটা হলঘরের মত, একটা কিচেন আর দুটো কি তিনটে ঘর, যাঁরা আসবেন সবাই ওর মধ্যেই থাকবেন। বাড়িটির চারিদিকে গাছপালা। দোতালায় মিস্ ডাচার কায়দা করে একটা ব্যালকনি বানিয়ে দিলেন, বাইরে থেকে কোন ভিজিটর এলে ওখান থেকেই সিড়ি দিয়ে ব্যালকনিতে উঠে আসতে পারত। ব্যালকনি থেকে নীচের দিকে তাকালে শুধু বৃক্ষরাজি, সবুজের সমুদ্র। সেই সবুজ সমুদ্র থেকে বেশ দূরে দেখা যাবে বিশাল সেন্ট লরেন্স নদী রাজকীয় ভাবে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। ডাচারের কটেজে পাড়া প্রতিবেশীদের যাতায়াত ছিল শুধু ব্যালকনি থেকে প্রকৃতির এই নৈসর্গিক দৃশ্য দেখার জন্য। অন্য কোন ঘরবাড়ি দেখা যেত না, শুধু সবুজের জঙ্গল, সবুজ জঙ্গল থেকে দূরে সেন্ট লরেন্স নদীর গাম্ভীর্য পূর্ণ প্রবাহ। মাঝে মাঝে দেখা যায় নদীর বক্ষ চিরে স্টীমার চলে যাচ্ছে কোন এক অজানা রাজ্যে।

মিসেস বুলকে স্বামীজী খুব ভালবাসতেন, তিনি তাঁকে মা বলে ডাকতেন। ওনাকে স্বামীজী বলেছিলেন, আমি কিছু যোগী তৈরী করতে চাই। সেইজন্য এই থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্ক। যাঁরা যোগী হবেন, যিনি যোগী বানাবেন, এনারা সবাই যেখানে পৌঁছালেন, সেই জায়গার নাম থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্ক। ১৮৯৪ এর ১৮ই জুন স্বামীজী লঞ্চ থেকে নেমে থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ডে পদার্পণ করলেন। ওখানে স্বামীজীর বারোজন শিষ্য-শিষ্যা একসাথে ছিলেন, কিন্তু বারোজন এক সঙ্গে যাননি, কয়েকজন আগে পরে পৌঁছেছিলেন। সেখান থেকে শুরু হল স্বামীজীর শিক্ষা, এই শিক্ষার বিবরণই পরে এই Inspired Talks গ্রন্থ রূপে প্রকাশিত হয়।

স্বামীজী থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ডে পৌঁছানর আরও কিছু দিন পর দুজন ভদ্রমহিলা পৌঁছে গেলেন। স্বামীজী যেদিন পৌঁছালেন ঠিক তার পরের দিন থেকেই তিনি ক্লাশ নিতে শুরু করলেন। এর আগে যে স্বামীজীকে বেদস্বরূপ বলা হল, সেখান থেকে স্বামীজীর যে ভাব, যে ভাব তাঁকে থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ডে যাওয়ার জন্য প্রেরিত করল, এই আলোচনাগুলো করা হল এটা দেখানোর জন্য যে, একটা যেন বিরাট প্রস্তুতি চলছিল। একটা নূতন ভারত, নূতন বিদ্যার সূচনা হতে যাচ্ছে। দেড় বছরের কিছু বেশি সময় আমেরিকাতে থাকার পর স্বামীজী দেখলেন লেকচার দিয়ে কিছু হবে না। শুধু লেকচারে অবশ্য কিছু হয় না, ঠাকুরও নিন্দার সুরে বলছেন, কলকাতার লোকগুলো হুজুগে আর শুধু লেকচার দেয়। কাজ যেটা হয় সেটা মুষ্টিমাত্র কয়েকজনকে দিয়েই হয়। আচার্য কয়েকজন শিষ্যকে উপদেশ দেবেন, শিষ্যরা সেই উপদেশ শুনবে, আত্মস্থ করবে, তারাই পরে আচার্যের কথাগুলো চারিদিকে বহন করে নিয়ে যাবে। স্বামীজীও ঠিক তাই চাইছিলেন। একটা চিঠিতেও স্বামীজী তাঁর মনের ভাব জানিয়ে লিখছেন, আমি সত্যিকারের কিছু যোগী তৈরী করতে চাই।

ওখানে শেষ পর্যন্ত বারোজন ছিলেন, বারোজনকেই পরে স্বামীজী মন্ত্রদীক্ষা দিয়েছিলেন। আর সবাইকে তিনি আলাদা আলাদা ভাবে তৈরী করেছেন। বয়সের দিক দিয়েও তারা আলাদা ছিলেন। কিন্তু শিক্ষা দেওয়ার সময় স্বামীজী বেদস্বরূপ, বেদরূপী স্বামীজী সবাইকে এক শিক্ষা দিচ্ছেন। আগেও আমরা বলেছি যে, জগতে

যত রকমের বিদ্যা হতে পারে, ভবিষ্যতে আগামী পাঁচশ-হাজার বছর পর্যন্ত ভারতবর্ষে যে বিদ্যাগুলো আসবে, তার বীজ যেন স্বামীজীর রচনাবলীতে দেওয়া আছে। যেমন বেদে সমস্ত বেদাঙ্গের বীজ রয়েছে, সেই বেদাঙ্গ থেকে ভারতের যত বিদ্যা পরে পরে বেরিয়েছে। ভারতের যে বিজ্ঞান, ভারতের যে ইতিহাস চিন্তা, যেভাবে ইতিহাস দেখতেন, ভারতের যে কাব্য, বীজগণিত, জ্যামিতি সব বেদ থেকে বেরিয়েছে। সরাসরি বেরোয়নি ধাপে ধাপে বেরিয়েছে, ঠিক তেমনি স্বামীজীর বাণী ও রচনায় সেই বীজগুলো রয়েছে। এর উপর আগে আলোচনা করা হয়েছে। আমরা এখন আলোচনা করছি থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ডের ওই কটি সপ্তাহ তাঁদের জীবনধারা কেমন ছিল।

৩) থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ডের দিনলিপি ও স্বামীজীর শিক্ষাদানের পদ্ধতি

স্বামীজী পৌঁছাবার পরের দিন থেকে শুরু হয়ে গেল স্বামীজীর শিক্ষা। এই শিক্ষার মধ্যে স্বামীজীর কোন লেকচার নেই। কোন প্রথাগত রুটিন ছিল তা নয়, তবে ওনারা সকাল আটটার মধ্যে প্রাতঃরাশ সম্পন্ন করে প্রস্তুত হয়ে একটা হলঘরে সবাই জড়ো হতেন, স্বামীজী সেখানে টানা দু ঘন্টা ক্লাশ নিতেন। কোন কোন দিন বিকেলের দিকেও স্বামীজী ক্লাশ নিতেন। এই ছ-সাত সপ্তাহের মধ্যে একদিন সবাইকে নিয়ে স্বামীজী কাছে একটা জায়গায় পিকনিকে গিয়েছিলেন। সেদিন কোন ক্লাশ হয়নি। এর বাইরে কিন্তু সারাটা দিন জপ-ধ্যান চলত, একটা নিষ্ঠাপূর্ণ আধ্যাত্মিক জীবন চলতে লাগল, তার মধ্যে স্বামীজীর কথা চলত। স্বামীজী এভাবে ছয় থেকে সাত সপ্তাহ ক্লাশ নিলেন, এই কটি সপ্তাহে স্বামীজী সবার মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনা ঢেলে দিলেন। শিষ্য-শিষ্যরা সবাই আমেরিকান, সবাই ধর্মে খ্রীশ্চান, শৈশব থেকে সবাই বাইবেল পড়েছেন, সবার মধ্যে একটা ধর্মীয় ভাব আছে। পরের দিকে যে দুজন মহিলা এসেছিলেন, তাঁরা এসে স্বামীজীকে বলছেন, আমরা ঠিক ওই ভাবেই আপনার কাছে ছুটে এসেছি, যেভাবে আমরা যীশুর কাছে যেতাম। এই ভাব সবারই মধ্যে ছিল, একদিকে বাইবেলের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস, অন্য দিকে স্বামীজীর প্রতি একটা দিব্য আকর্ষণ।

হিন্দুদের মূল গ্রন্থ বেদ, আগেকার দিনের ব্রাহ্মণরা বেদ পড়তেন ও পড়াতেন আর বর্তমান যুগে বেশির ভাগ ব্রাহ্মণ বেদ পড়া দূরে থাক, বেদ বুঝতেই পারে না। বেদের বাইরে যে আরও শাস্ত্র রয়েছে, বাল্মীকি রামায়ণ, মহাভারত এগুলোও কেউ পড়ে না। ভাগবত ছাড়া আর কোন বই বেশি কেউ পড়ে না, কিছু লোক গীতা পড়েন। কিন্তু যখন ধর্মীয় আচারের ব্যাপার আসে তখন সাপের পূজো থেকে শুরু করে গাছপালার পূজো, সব পূজোই চলছে। প্রত্যেক দিন কোন না কোন বাড়িতে মায়েরা ধর্মীয় আচরণ করে যাচ্ছে। এই ধর্মীয় আচরণের পিছনে কোন তাৎপর্য আছে কি নেই তাতে তাদের কিছু আসে যায় না। লোকচারই এখন ধর্ম, লোকাচার ছাড়া আর কোন ধর্ম নেই। এই জিনিস শুধু ভারতেই নয়, সব দেশেই হয়। আমেরিকাতে এই জিনিসটা খুব বেশি মাত্রাতে ছিল, এমন বিচিত্র বিচিত্র জিনিস করত ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। ইদানিং দিল্লীর মত বড় বড় শহরগুলিতে আভিজাত্য পরিবারের মহিলারা সবই করছে, আর্ট অফ লিভিং, রেইকি, ম্যাগনেটিক থেরাপি সব করছে। এর মধ্যে কোথায় ধর্ম, কোথায় চিকিৎসা এরা জানেই না, জানার আগ্রহও নেই, তাদের কাছে এগুলো হল স্ট্যাটাস সিম্বল। তখনকার দিনে আমেরিকার খ্রীশ্চানদের মধ্যেও এই ধরণের জিনিসগুলোই ধর্ম রূপে ছিল। পরে একজন লিখছেন, স্বামীজী যখন আমেরিকাতে লেকচার এবং ক্লাশ নিতে শুরু করলেন তখন থেকে তিনি সব ধর্মের সমস্ত আবর্জনাকে চাঁচাছোলা ভাষায় কেটে ফেলে দিলেন। স্বামীজী কখনই শ্রোতৃমণ্ডলী দেখে ভাষণ দিতেন না ঠিকই, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কি বলবেন মনে মনে তার একটা রূপরেখা তৈরী করে রাখতেন। এরপর যখন শ্রোতাদের কাছে বলতে শুরু করলেন তখন এরা সবাই হয়ে গেল তাঁর আপনজন। আপনজনের কাছে আর কোন রাখঢাক নেই, এবার সব খুলে বলতে শুরু করলেন।

কথামৃতে আমরা পাই, ঠাকুরের কাছে মাস্টারমশাই আসতেন, আরও অনেকে আসতেন। ঠাকুর যে কথাগুলো বলতেন মাস্টারমশাই সেগুলোকে নোট করে রাখতেন, সেই নোট থেকেই পরে তিনি কয়েকটি খণ্ডে বিস্তার করে কথামৃত সৃষ্টি করলেন। কিন্তু ভাবীকালের সন্ন্যাসী শিষ্যরা আর অন্যান্য খুব কাছের শিষ্যরা যখন আসতেন তখন তিনি তাঁদের রবিবার বাদ দিয়ে অন্য দিন আসতে বলতেন, যাতে অন্যরা কেউ না থাকে। ঠাকুর বাইরে গিয়ে দেখতেন ধারে কাছে কেউ আছে কিনা, কেউ নেই দেখার পর দরজা বন্ধ করে খিল দিয়ে বসতেন, তারপর তিনি তাঁর অন্তরঙ্গদের আসল তত্ত্ব কথা বলতে শুরু করতেন। হাতির যেমন দু-রকমের দাঁত,

খাবারের জন্য এক রকম আর বাইরে শোভা দেখানোর জন্য অন্য রকম। ধর্মও ঠিক এই দু-ভাবেই চলে, যাঁরা একেবারে পুরোপুরি আধ্যাত্মিকতা নিয়ে চলেন তাঁদের জন্য ধর্ম এক রকম হয়, যাঁরা ধার্মিক তাঁদের জন্য ধর্ম অন্য রকম। ইসলাম ধর্মে সুফিরা হলেন একেবারেই অন্য রকমের। প্রফেট মহম্মদের সময় কিছু লোক ছিলেন যাঁরা সব সময় মহম্মদের বাড়ির বাইরে পড়ে থাকতেন। মহম্মদ আল্লার যে কথাগুলো বলতেন সেগুলো কোরাণে আছে, কিন্তু সুফিরা বলেন মহম্মদের বিশেষ প্রশিক্ষণ ওই কয়েকজনই পেয়েছিলেন, এঁদেরকেই পরে সুফি বলা হত, যাঁরা সম্প্রদায় বিদ্যাতে ছিলেন, সুফিদের ভাষায় সম্প্রদায় বিদ্যাকে সিলসিলা বলা হয়। হিন্দুদের যে ভাবে দীক্ষা দেওয়া হয়, সুফিদের মধ্যেও সেইভাবে দীক্ষা দেওয়া হয়। সুফিদের বক্তব্য হল, মহম্মদ যে ধর্মীয় কথাগুলো বলেছেন সেগুলো কোরাণে আছে, কিন্তু মহম্মদ যে বিশেষ শিক্ষা দিয়েছিলেন, সেই শিক্ষা ঐ কয়েকজন সুফিরাই পেয়েছিলেন। এখানে ধর্মীয় কথা মানে শুধু আচার-আচরণাদির কথা নয়, ধর্মীয় কথার মধ্যেও আধ্যাত্মিক জিনিস থাকে, কিন্তু সেটাকে সব সময় এমন ভাবে পরিবেশিত করা হয় যাতে লোকেরা গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু ঈশ্বরকে নিয়ে যেগুলো একেবারে মূল সত্য, সেই কথাগুলো কখনই সাধারণের সামনে বলা হয় না। আর সত্যিই এখন তার দরকার নেই। শিশু জন্ম নিয়ে শুধু মায়ের দুধ খেতে পারবে, গরুর দুধ খেতে পারবে না। গরুর দুধ যে খেতে পারবে না, তাকে কি করে কণ্ডেসড মিল্ক দেওয়া যাবে! আর কষা মাংস, পিৎজা খেতে দিলে শিশু ওখানেই মারা যাবে। মায়ের দুধ খেয়ে খেয়ে এমন একদিন আসবে যখন সে সব ধরণের খাবার খেতে পারবে। ধর্মের ক্ষেত্রে ঠিক তাই হয়, প্রথমে শুরু হয় খুব সাধারণ জিনিস দিয়ে, ওই সাধারণ জিনিসগুলি করে করে সে ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠতে শুরু করে। স্বামীজীও ঠিক সেইভাবে শিক্ষা দিতে শুরু করলেন। সেইজন্য Inspired Talks হল স্বামীজীর core spiritual realisation। অন্যান্য লেকচারেও এই জিনিসগুলো রয়েছে, তবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কারণ সাধারণ লোকের মত করে বলতে হয়েছে। উপনিষদে কোন কিছু মেশানো নেই, সত্য যেমনটি তেমনটি বলা হয়েছে, সেইজন্য উপনিষদের কথা সাধারণ মানুষের পক্ষে ধারণা করা প্রায় অসম্ভব। মহাভারত, পুরাণাদি গ্রন্থে আমাদের মত সাধারণ লোকেদের মত করে বলা হয়েছে, যাতে আমরা আধ্যাত্মিক মূল সত্যগুলিকে ধারণা করতে পারি।

ওখানকার একজন শিষ্যা ক্রিষ্টিন পরে খুব সুন্দর বলছেন, time and space then vanished for us, স্বামীজী যখন ক্লাশ নিতেন তখন ওই ক্লাশের পরিবেশ যে কি রকম হয়ে যেত তা বর্ণনা করা যায় না। দেশ কাল হারিয়ে যেত, সময় কোথা দিয়ে চলে যেত, কোথায় আছি এই বোধ কারুর থাকত না। স্বামীজীও বলছেন, শ্রোতাদের মন এমন স্তরে চলে যেত যে কেউ বুঝতেই পারত না তারা থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ডে আছে নাকি আমেরিকায় আছে, সময় আর স্থান বলে কিছু থাকত না। স্বামীজী বার বার বলতেন মায়া মানেই দেশ কাল, দেশ কালকে স্বামীজী বলছেন absolute and relative, ঈশ্বর হলেন absolute আর relative হল জগৎ। জগৎ মানেই দেশ কাল, যেখানেই দেশ কাল সেখানেই কার্য কারণ সম্পর্ক থাকবে। দেশ, কাল ও ক্রিয়া এই তিনটেকে মিলিয়েই মায়া বলে। ওখানে সবাই মায়ার রাজ্যেই ছিলেন, কেউ ব্রহ্মজ্ঞানী হয়ে যাননি, কিন্তু মায়ার যে আবরণ, মায়ার যে অবস্থা সেই অবস্থা থেকে ওনারা অনেক উপরে উঠে যেতেন, এটাকেই বলছেন দেশ কাল মুছে যেত। শুধু যে ক্রিষ্টিনই এই কথা বলছেন তা না, সবাই একই ধরণের উপলব্ধির কথা বলেছেন। আর বলছেন, স্বামীজী সারাদিন আমাদের সাথে থাকছেন, মাঝে মাঝে কিছু কথা বলছেন, আবার অনেক সময় স্বামীজী গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে যেতেন। এমন গভীর ধ্যানমগ্ন হয়ে যেতেন যে কয়েক ঘন্টা সমাধির অবস্থায় বা ধ্যানমগ্ন অবস্থাতে ডুবে থাকতেন।

ক্রিষ্টিন আরও বলছেন, উনি যখন কথা বলছেন তখন বিভিন্ন ধর্ম থেকে বিশেষ করে ভারতবর্ষের উপর আর তার বিভিন্ন বিষয়, ইতিহাস, দর্শন, এগুলোকে একটা অন্য ভঙ্গিতে সবার সামনে পরিবেশন করতেন। ঈশ্বরই সত্য, ঈশ্বরই এই বস্তু এই একটি সত্যকে তিনি কত ভাবে সবার সামনে উপস্থাপন করতেন ভাবলে এখন অবাক হয়ে যেতে হয়। আমরা প্রায়ই বলি হিন্দুদের বৈশিষ্ট্য এটাই, ঈশ্বরই বস্তু এই একই কথা বেদে এক রকম ভাবে বলছেন, উপনিষদে অন্য ভাবে বলছেন, রামায়ণ মহাভারতে আরেক ভাবে বলছেন, গীতাতে আবার অন্য রকম ভাবে বলছেন। একই সত্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আসে। অন্যান্য ধর্মে এই জিনিস হয় না, যেটা তাদের দেওয়া হয়েছে ওটাই থাকে, ওর বাইরে তারা কেউ যাবে না। স্বামীজীকে যে বেদস্বরূপ বলা হয় তার

মানেই এটা, একই সত্যকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বলছেন, তা সে পাঁচ রকম হতে পারে, ছয় সাত যত রকম হতে পারে। ওই একই সত্যকে কখন ইতিহাস দিয়ে বলছেন, কখন দর্শন দিয়ে বলছেন, কখন পৌরাণিক কাহিনী দিয়ে বলছেন, কখন আচার-আচরণের মাধ্যম দিয়ে বলছেন, আবার যখন বিজ্ঞান থেকে কিছু বলছেন, তখনও সেই একই কথা বলছেন। কিন্তু যেটাই বলছেন নিজের ভাবে বলছেন। স্বামীজী নিজের মত কররে বলে যাচ্ছেন, শেষ দিকে কেউ প্রশ্ন করলে তার উত্তর দিচ্ছেন, সবাই থ হয়ে শুনে যাচ্ছেন।

আরেকটা বর্ণনায় বলছেন, একদিন দুপুরবেলায় খাওয়া-দাওয়ার পর সবাইকে নিয়ে স্বামীজী কথা বলছেন। কথা বলতে বলতে তিনি ত্যাগ-বৈরাগ্যের মহিমা বলতে শুরু করলেন, সবাই দেখছেন বলতে বলতে তাঁর শরীরটা যেন পাল্টাতে শুরু হয়ে গেল। কথামৃতেও দেখা যায়, ঠাকুর বিভিন্ন কথা বলতে বলতে অনেক সময় ওই ভাবে মজে যেতেন। স্বামীজী তখন সবাইকে ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন, একটা গাছের তলায় বসলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি ঘরে ফিরে এলেন, এসে তিনি সেখানেই সন্ন্যাসীগীত রচনা করলেন। স্বামীজী তখন ত্যাগ বৈরাগ্যের ভাবের চরম অবস্থায় চলে গিয়ে ইংরাজীতে এই সন্ন্যাসীগীত রচনা করলেন। সবাই পড়ে দেখছেন এর মধ্যে সবটাই সন্ন্যাসের, ত্যাগের ভাব। থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ডে যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁরা কেউই casual নন, আগেই বলা হয়েছিল নিউইয়র্ক থেকে তিনশ কিলোমিটার দূরে যাঁরা যেতে পারবেন, এটা আবার তখনকার দিনের কথা যখন ট্রেনে বাসে যাতায়াতের কোন সুবিধা ছিল না, তাঁর নিশ্চয় অন্য আধারের ছিলেন।

ওখানে বিভিন্ন মনের মানুষরা ছিলেন, কেউ নরম মনের, কেউ গোঁড়া মনের, কেউ শক্ত মনের। স্বামীজী সবাইকে যেন বারংবার হাতুড়ি দিয়ে ঘা মারতেন, আবার কারুর প্রতি তিনি খুব স্নেহপ্রবণ, কারুর মধ্যে দেখছেন খুব আমিত্ব বা অহঙ্কারের ভাব আছে, তাকে স্বামীজী সেই ভাবেই ধাক্কা মারছেন। আবার কখন সখন কারুর প্রতি খুব কড়া হয়ে যেতেন। তখন অনেকের মনে হত স্বামীজীর এর উপর এতটা কড়া হওয়া বা একে এত আক্রমণ করাটা যেন ঠিক হয়নি। কিন্তু পরে পরে যখন তাকাচ্ছেন তখন তাঁরা বুঝতে পারলেন, যে ব্যক্তির মধ্যে যে দুর্বলতা ছিল স্বামীজী ওইভাবে সেটাকে শুধরে দিচ্ছেন। তিনি আচার্য, যে শিষ্যের যেমনটি ভাবে দরকার তাঁকে তিনি সেই ভাবেই তৈরী করছেন আর তার মাঝখান দিয়েই তিনি মূল শিক্ষা দিয়ে চলে যাচ্ছেন। আগেকার দিনে বৈদিক সময়ে বা বৈদিক সমাজের পরে পরেও দেখা গেছে, শিষ্যরা গুরুর কাছে শিক্ষা নিতে যাচ্ছে, সেখানে সকালে উঠে বেদপাঠ করল, বেদপাঠের পর আশ্রমের বিভিন্ন কাজে সবাইকে লাগিয়ে দেওয়া হত। তুমি এবার সেবা কর। সবাই গুরুর সেবা করে যাচ্ছে, গুরুও খুব উচ্চমানের ব্রাহ্মণ, সেবা করার মাঝে মাঝে গুরু তাদের একটা দুটো কথা বলে দিলেন। বর্তমান কালে স্কুল, কলেজ বা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয়, ফিজ্ দিয়ে ভর্তি হও, টাইমে আসো আর তোমাকে লেকচার দিয়ে দেওয়া হবে, এভাবে শিক্ষা হয় না। গুরুর কাছে পড়ে থাকতে হবে, গুরুর সেবা করে যেতে হবে। গুরুগৃহ বাস করতে করতে এই যে কাজ করছে, গুরুর সেবা করে যাচ্ছে এতে মনের যে আবর্জনাগুলো আছে সেগুলো ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে যেতে থাকবে, এরপর গুরু শিষ্যকে একটা কথা বলে দেবেন, বিদ্যার বীজ গিয়ে পড়বে তখন সেটাই জ্ঞানরূপী বৃক্ষ হয়ে উঠবে। শিক্ষাদানের এই পদ্ধতিকে বলে ক্যারিস্টাল মেথড, স্বামীজীও তাই করতেন, যাঁরা মহান আচার্য ছিলেন, বিশেষ করে আধ্যাত্মিক জগতে, তাঁরা এভাবেই শিক্ষা দিতেন। প্রাচীন কালে চীন, গ্রীস দেশে যাঁরা বড় বড় আচার্যরা ছিলেন তাঁরাও এভাবেই শিক্ষা দিতেন।

আবার বলছেন, আলোচনার মাঝখানে কোন সমস্যা নিয়ে যদি কেউ কথা বলত, স্বামীজী তার সমাধান দিতেন না। না দিয়ে উনি general principles গুলো বলে দিতেন। সিদ্ধান্ত বলে দিলেন, এবার তুমি নিজেই ওটাকে বার কর। স্বামীজী সব সময়ই চাইছেন তুমি তোমার নিজের পায়ে দাঁড়াও। থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে যাঁরা যাঁরা ছিলেন, তাঁরা তাঁদের স্মৃতিকথায় একটা কথা সবাই ঘুরে ঘুরে লিখছেন, স্বামীজীর শিক্ষা ছিল তোমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। তোমার যা সমস্যাই থাকুক, স্বামীজী ওভাবে কখনই সমাধান দিতেন না, কিন্তু সিদ্ধান্ত কি বলে দিলেন, সমস্যাকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে দিলেন, এরপর তোমাকে নিজেই এর সমাধান করে নিতে হবে। সমস্যা মানে এখানে জীবনের সমস্যার কথা বলা হচ্ছে না। সমস্যা মানে, দর্শন, আধ্যাত্মিকতা, উপলব্ধি, ধারণা, এই সমস্যাগুলোর কথা বলা হচ্ছে। স্বামীজীর কথাগুলোর মধ্যে পৌরুষত্বে ভরপুর ছিল, কথার মাধ্যমে শক্তি উৎসরিত হত। স্বামীজী পরের দিকেও বার বার বলছেন strength, শক্তি

না হলে সমাজেও সে কিছু করতে পারবে না, সেখানে আধ্যাত্মিক জীবন কি করে চালাবে! শক্তি না থাকলে আধ্যাত্মিক সত্যগুলো কি করে ধারণা করতে পারবে! Strength of understanding মনের মধ্যে যদি জোর না থাকে, ভিতরে যদি শক্তি না থাকে এদের দ্বারা কিছুই হবে না, মিনমিনে, পিনপিনেদের দিয়ে কিছু হয় না। তার সাথে দরকার চরিত্র, চরিত্র মানে কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল বিচার করার ক্ষমতা। শক্তি পেয়ে গেল মানে এই নয় যে যাকে খুশি গালাগাল দেবে, যাকে ইচ্ছে হবে দুটো চড় মেরে দেবে, এগুলো শক্তি বলে না, এগুলো দুর্বলতার লক্ষণ। Strength মানে নিজের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। যেমন যেমন মানুষের মধ্যে শক্তির বিকাশ হয় তেমন তেমন তার বোঝার ক্ষমতা হয়, তেমন তেমন তার জ্ঞান গ্রহণের ক্ষমতা বাড়ে, যত জ্ঞান বাড়ে তত তার শক্তি বৃদ্ধি পায়। থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ডে স্বামীজী একেবারে নিজের শিষ্যদের নিয়ে আছেন, আপন মনে প্রাণ খুলে কথা বলতে পারছেন, তাই প্রাণ ভরে তিনি বিদ্যা ঢেলে যাচ্ছেন।

যদিও স্বামীজী ওখানে অনেকগুলো বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন, কিন্তু পদ্ধতির মধ্যে যে মূল জিনিস তার সাথে কোন অবস্থাতে কোন ধরণের দুর্বলতাকে তিনি অনুমতি দেবেন না। যেমন ভগবানের উপর বিশ্বাস, ঠাকুর আমাকে দেখবেন, এটাও একটা দুর্বলতা, সেটাকেও স্বামীজী উড়িয়ে দিচ্ছেন। নিজের উপর আস্থা রাখাটাই strength। নিজের উপরে পুরোপুরি আস্থা নিয়ে চলাটা সত্যিই খুব কঠিন জিনিস। একজন লিখছেন, স্বামীজী পুরুষদের manliness দেখাচ্ছেন, আবার মেয়েদের কাছ থেকেও তিনি corresponding quality আশা করছিলেন যেটার জন্য কোন শব্দ নেই। Manliness বললে এটা পুরুষের শব্দ হয়ে যায়, মেয়েদের ক্ষেত্রে এর সঠিক কি শব্দ হবে? যদি বলা হয় manlinessএর বিপরীত feminess হবে, না তা হয় না। মেয়েদেরও সেই শক্তিটাই চাই, যেটা পুরুষদের জন্য বলা হচ্ছে। যাঁরা সেই সময়কার ঘটনাগুলো লিখেছেন সেখানে তাঁরা বলছেন, কিন্তু স্বামীজী শিক্ষা দেওয়ার সময় সেখানে মেয়েরা যাঁরা ছিলেন তিনি তাঁদের মধ্যেও সেই শক্তির সঞ্চার করে দিচ্ছেন, যে শক্তিকে পুরুষদের ক্ষেত্রে manliness হয়, আর নারীদের ক্ষেত্রে যার কোন শব্দ নেই, যিনি পড়ছেন তিনি বুঝে নিন ওটা কি শব্দ হবে। স্বামীজীর মূল বক্তব্য হল, নিজের পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা, যার ইংরাজী শব্দ হল manliness।

থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে এই ছ-সাত সপ্তাহে প্রতিদিন সকালে দু ঘন্টা বাধ্যতামূলক ক্লাশ হত, বাকি সময় বাড়ির কাজকর্ম হত, রান্নাবান্না হত, ঘোরাফেরা সবই হত কিন্তু তার সাথে ছিল কিছু informal কথা। স্বামীজী formal ক্লাশ নিচ্ছেন, informal কথা বলছেন কিন্তু সবটাই ছিল আধ্যাত্মিক ভাবকে নিয়ে। এটাকে আমরা অনেকটা Spiritual Retreatএর মত বলতে পারি। খাওয়া-দাওয়া, গান-বাজনা, গল্পগুজব, ঘোরাফেরা সবই হচ্ছে কিন্তু সবটারই ভাব এক জায়গায় কেন্দ্রিভূত, তা হল আধ্যাত্মিক। স্বামীজী তাঁর আলোচনায় অনেক বইকে আধার করেছিলেন। কিন্তু স্বামীজী এমন উচ্চমানের ভাবের অবস্থায় থেকে বলতেন আর এত দ্রুত বলতেন যে কারুর পক্ষে নোটস্ নেওয়া একেবারেই সম্ভব ছিল না। এই কটি সপ্তাহ স্বামীজীর সাথে যাঁরা ছিলেন তাঁরাই একমাত্র জানেন সেই সময় থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ডে ঠিক কি হয়েছিল। কারণ তাঁদের হৃদয়ে ওই কটি দিনের ছবি চিরদিনের মত ছাপ পড়ে গিয়েছিল। স্বামীজীর ঐ উচ্চ ভাব, আর যেভাবে তিনি আধ্যাত্মিক শক্তিকে পুরো ঢালছেন, ওই অবস্থায় কারুর পক্ষেই নোটস্ নেওয়া সম্ভব ছিল না। ওই যে উচ্চ ভাবের জিনিসগুলো শুনছেন তখন সবারই মন জগৎ ছাড়া হয়ে যাচ্ছে, এটা subjective জিনিস। Subjective মানে, একজনের যে রকম বোধ হচ্ছে, আমার অন্য রকম বোধ হচ্ছে, এটাকে শব্দে বর্ণনা করা যায় না। কথামৃতে বর্ণনা আছে, দক্ষিণেশ্বরে কলকাতা থেকে কয়েকজন এসেছে, ঠাকুর কথা বলছেন তারা একাগ্র মনে শুনছে। তাদের মধ্যে কেউ ছটফট করছে, খালি বলে যাচ্ছে আর কতক্ষণ শুনবে। যখন আর পারছে না, তখন বলছে, ঠিক আছে তুমি বোস আমি নৌকাতে গিয়ে বসছি। যে শুনছে, উঠে যেতে চাইছে না, তার মানে কোথাও তার sense of uplift হয়ে গেছে। এখানেও যাঁরা অনেক দিন ধরে ক্লাশ শুনছেন তাঁদের একটা মানসিক প্রস্তুতি হয়ে গেছে, তাঁরা বোঝেন এখানে সিরিয়াস জিনিস হচ্ছে, নিজেকে সংযত রাখেন। কিন্তু হঠাৎ করে কেউ এলে তাদের শ্রদ্ধা থাকে না, নিষ্ঠা থাকে না। কিন্তু সব থেকে গুরুত্ব হল তাদের প্রস্তুতিটা নেই, সেই পাত্রতটা তৈরী নেই। এখানে স্বামীজী যাঁদের নিয়ে গেছেন, তাঁদের সেই পাত্রতা তৈরী হয়ে গেছে। পাত্রতা তৈরী হয়ে যাওয়ার জন্য তাঁরা এক মন দিয়ে স্বামীজীর কথাগুলো নিতে পারছেন। কেউ হয়ত নিতে পারছেন না, কিন্তু এটা বুঝতে পারছেন যে তাঁকে এই জগৎ থেকে তুলে অন্য কোন জগতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

স্বামীজী যখন বলতেন তখন তিনি কারুকে উদ্দেশ্য করে, কাউকে বোঝানর জন্য বলতেন না, কারুর দিকে তাকিয়ে বলতেন না। বিশেষ করে সকালের দিকে তিনি যে ক্লাশ নিতেন সেখানে মনে হত যেন তিনি নিজের সাথে নিজে কথা বলে যাচ্ছেন। যাঁরা শুনছেন তাঁরা মনে করতেন এটা তাঁর জন্যই বলা হচ্ছে। কিন্তু একটু মন দিয়ে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে তিনি কাউকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলছেন না, তিনি নিজের সাথে নিজে কথা বলছেন। আর ভাবের এমন গভীরতা, এত গভীর অবস্থা যে সেখানে একজন বর্ণনা করছেন, we almost held our breath for fear of disturbing him and checking the flow of his thoughts। বারোজন যাঁরা ছিলেন তাঁরা দম বন্ধ করে স্বামীজীর কথা শুনতেন। নিঃশ্বাস নিতেও তাঁদের ভয় করছে, নিঃশ্বাস যে নেব তার জন্য যে ওই অতটুকু disturbance হবে, তাতে যে স্বামীজীর যে thought process রয়েছে ওতে ব্যাঘাত হয়ে যাবে, সবাই নিশ্চল, সম্পূর্ণ রূপে এক নৈঃশব্দ বিরাজ করত। ভারত পাকিস্তান ক্রিকেট ম্যাচ হচ্ছে, ভারত জেতার মুখে, দমবন্ধ করে আমরা দেখছি। সিনেমাতেও অনেক দৃশ্য আছে যেখানে আমরা দমবন্ধ করে দেখি। এখানে জিনিসটা সেই রকম হচ্ছে না, যাঁরা শুনছেন তাঁদের নিঃশ্বাস নিতে ভয় করছে। যদি কল্পনা করা হয় যে, কোথাও খুব ভয়ের ব্যাপার আছে, কাছে কোন ডাকাত আছে বা আতঙ্কবাদীরা আছে, আমি জানি একটু আওয়াজ হলেই ওরা জেনে যাবে আমি কোথায় আছি। ওই রকম ভয়ের পরিস্থিতিতে মানুষ নিঃশ্বাস নিতেও ভয় পায়। নিঃশ্বাসেরও একটা আওয়াজ হয়, মনে হয় সেই আওয়াজ শুনে ওরা বুঝে গিয়ে গুলি চালিয়ে দেবে। স্বামীজীর শিষ্যদের নিঃশ্বাস নিতেও ভয় করছেন, স্বামীজীর চিন্তার যে স্রোত সেটা যেন রুদ্ধ হয়ে যাবে। তার মানে এত উচ্চমানের সেই ক্লাশ গুলো হত।

আবার বলছেন, ভারতের পুরাণ সাহিত্যের কথা কাহিনীর স্বামীজীর এত স্টক যে তিনি বলতেই থাকতেন। এশিয়াটিক জাতিদের মধ্যে বিশেষ করে আর্যদের কাছে এত কথা ও কাহিনী রয়েছে যে ভাবাই যায় না। এত রকম বৈচিত্র্যপূর্ণ কথাকাহিনী একটা আর্য জাতি দাঁড় করিয়েছে। বিকেলের দিকে যখন সবাই একটু হাল্কা থাকতেন সেই সময় স্বামীজী সেই সব কাহিনীগুলো নিয়ে আলোচনা করছেন, সেগুলোর অন্তর্নিহিত ভাবের ব্যাখ্যা করতেন। ব্যাখ্যা করে দেখাচ্ছেন আমাদের পুরাণে যে কাহিনীগুলো রয়েছে বা রামায়ণ ও মহাভারতে যে গল্পগুলো রয়েছে, সেই কাহিনীগুলো আসলে কি বলতে চাইছে, কাহিনীর আড়ালে যে আধ্যাত্মিক সত্যগুলো রয়েছে সেগুলোকে সবার সামনে স্বামীজী তুলে ধরতেন। ভারতের ধর্মগ্রন্থগুলি যেন কাহিনীর খনি। যাঁরা শুনছেন তাঁদের কাছে এই কাহিনী বা বেদান্তের আইডিয়া, বেদের আইডিয়া সবটাই তাঁদের কাছে একেবারে নূতন। সবাই বেদান্তের ভাব নিতে পারছেন না, একটু একটু করে গ্রহণ করছেন। কারণ সবাই খ্রীশ্চান পরম্পরায় বড় হয়েছেন, ইউরোপিয়ান ভাবধারায় তৈরী হয়েছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা এই ভাবগুলো ধীরে ধীরে নিচ্ছেন।

ওখানে মিস্ ওয়াল্ডো নামে একজন মহিলা ছিলেন, তিনি শর্টহ্যাণ্ড জানতেন না, কিন্তু তিনি ক্লাশের পরে লং হ্যাণ্ডে চটপট করে লিখে নিতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বামীজীর অনেক কথা বাদ চলে যেত, অন্যান্যদের থেকে অনেক কিছুর অর্থ জিজ্ঞেস করে জেনে নিতেন। আমরা পরিষ্কার দেখতে পাই অনেক জায়গায় ডট্ ডট্ দেওয়া আছে, তার মানে উনি পরিষ্কার মেনেই নিচ্ছেন যে উনি মনে করতে পারছেন না ওই জায়গায় কি শব্দ বলা হয়েছিল বা আরও কি কি বলা হয়েছিল। সত্যিই এটা কখনই সম্ভব নয় যে দু ঘন্টা ক্লাশ শোনার পর সব কথাই মনে রাখতে পারবেন। কিন্তু যদিও সব কথা উনি লিখতে পারেননি, তারপরেও আমরা যে Inspired Talks পাই এটা স্বামীজীর কাজ নয়, কারণ স্বামীজী যা যা বলেছিলেন, যা যা করেছিলেন সবটাই লেখা হয়নি। মিস্ ওয়াল্ডোর নোট থেকেই আমরা যা কিছু পাই। কিন্তু তার যে depth আর তার যে essence, স্বামীজী মূলতঃ কি বলতে চাইছিলেন, এটাকে নিয়ে কেউ কোন সন্দেহ করেন না। বলছেন, একদিন এমন হল যে স্বামীজী শুনেছেন মিস্ ওয়াল্ডো কি লিখেছেন, যদিও উনি কিছু কিছু জিনিস সংক্ষেপে লিখেছিলেন, যার জন্য মনে হয় এটা যেন শাস্ত্র। স্বামীজীর যতগুলো বই আছে তার কোনটাই শাস্ত্র নয়। শাস্ত্র যদি বলতে হয় তাহলে একমাত্র Inspired Talksকেই শাস্ত্র বলা যায়, তার কারণ হল উনি সূত্রাকারে, ছোট ছোট শব্দে লিখেছেন। শাস্ত্র মানেই তাই, খুব সংক্ষেপে বলে দেয়। বলছেন, স্বামীজী যখন বলতেন তখন স্বামীজীর কথাগুলো তাঁর মুখ থেকে বেরোত না, আইডিয়াস গুলো যেন স্বামীজীর শরীর থেকে বিচ্ছুরিত হত। এটা মিস্ ওয়াল্ডোরই বর্ণনা, খুবই সুন্দর বর্ণনা, কিন্তু বর্ণনার মধ্যে কোন অতিরঞ্জিত কিছু নেই। আর ওই নোটগুলো যে

তিনি নিয়েছেন তা ওই আইডিয়াসগুলো স্বামীজীর শরীর থেকে বেরিয়ে নিজে থেকেই যেন সাদা কাগজে লেখা হয়েছে। একদিন মিস্ ওয়াল্ডো তাঁর নোটস্ থেকে কয়েকজনকে পড়ে শোনাচ্ছিলেন তিনি কি কি লিখেছেন। স্বামীজী হঠাৎ বারাণ্ডাতে এসে পায়চারি করছিলেন, তিনি শুনলেন, শুনে স্বামীজী অবাক হয়ে গেলেন। স্বামীজী মিস্ ওয়াল্ডোকে বলছেন, how could you have caught my thought and words so perfectly। স্বামীজী ওখানে বলছেন, শুধু যে শব্দ ছিল তা না, চিন্তা-ভাবনাও ছিল, সেই চিন্তা-ভাবনাগুলো কিছু শব্দের মাধ্যমে আসছে, কি বলতে চাইছেন সেটা ভিতরে থাকছে। এটা হল Inspired Talksএর জন্য সব থেকে বড় প্রশংসা, স্বামীজী নিজেই অবাক হয়ে বলছেন, আমি যে চিন্তা-ভাবনা নিয়ে ছিলাম, যে ভাবে ছিলাম সেটাকে তুমি কিভাবে ধারণা করে নিলে? মহাভারত যুদ্ধের আগে অর্জুন যুদ্ধ করতে চাইছেন না, শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁকে গীতার উপদেশ দিলেন। গীতার উপদেশ শুনে অর্জুন সোজা হয়ে দাঁড়াল আর তারপরের ইতিহাস সবারই জানা। সব কিছু মিটে যাওয়ার অনেক দিন পর অর্জুন একদিন শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন, অনেকদিন আগে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের সময় আমাকে একটা উপদেশ দিয়েছিলেন সেটা আমার এখন মনে নেই, যদি আরেকবার বলেন তো ভাল হয়। শ্রীকৃষ্ণ শুনে খুব অসন্তুষ্ট হয়ে গেলেন, বিরক্ত হয়ে বলছেন, তখন আমি যোগের অবস্থায় ছিলাম, আমিও এখন সেটা আর বলতে পারব না। যোগ অবস্থায় যেটা বলা হয়, তিনি যদি অবতারও হন তিনিও সেটা পরে আর ধরতে পারবেন না। যোগ অবস্থায় তিনি ঈশ্বরের সাথে যেন এক হয়ে গেছেন। প্রফেট মহম্মদ কোরাণে যে কথাগুলো বলেছেন এই কথাগুলো ওনার কথা নয়, আল্লার কথা। কারণ তখন তিনি এমন একটা ভাবে থাকতেন সেই সময় ডিভাইন যিনি, মুসলমানরা যাঁকে আল্লা বলছেন, প্রফেট মহম্মদের যে ব্যক্তিত্ব আর ডিভাইন যিনি, দুটো মিলে এক হয়ে যেত, এটাকেই বলে যোগ অবস্থা। তখন যে শব্দগুলো বেরোবে, তখন ওই শব্দগুলো আর বক্তার শব্দ থাকে না। ওই শব্দগুলো একবার হারিয়ে গেলে দ্বিতীয়বার আর আসবে না, চিরদিনের মত হারিয়ে গেল। বড় লেখক, বড় কবি, যাঁদের আমরা খুব সম্মান করি, তাঁরাও ঠিক ঐ রকমই, একটা ভাবের অবস্থায় চলে যান যেখানে ঈশ্বরীয় শক্তি বা ঈশ্বরীয় যে জ্ঞান সেই ভাবের সাথে এক হয়ে যান। ওটাকে যদি সঙ্গে সঙ্গে লিপিবদ্ধ না করে নেওয়া হয় ওটা হারিয়ে যাবে, ঐ জিনিসটা আর আসবে না। তিনি আবার হয়ত যোগ অবস্থায় থাকবেন, কিন্তু তখন অন্য কথা বের হবে। এই কথাগুলো ঠিক এভাবে থাকবে না। স্বামীজী যখন থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ডে আছেন তখনই এই জিনিসগুলো ঘটছে, মিস্ ওয়াল্ডো তখনই নোট করে নিয়েছেন, স্বামীজী শুনছেন, স্বামীজীও অবাক হয়ে যাচ্ছেন। কি করে তুমি আমার সেই অবস্থাটাকে ধারণা করে নিলে? এটা ধারণা করা যায় না।

যাই হোক স্বামীজীর কথাগুলো নোট রূপে অনেকদিন বন্দী হয়ে রাখা ছিল। স্বামীজীর মহাসমাধি হয়ে গেছে, তারও অনেক পরে ১৯০৭ সালে প্রায় বারো বছর পার হয়ে যাওয়ার পর সিস্টার দেবমাতা নোটস্গুলো দেখতে পান। দেখার পর তিনি অবাক হয়ে বলছেন, 'এত মূল্যবান জিনিসকে বাক্সবন্দী করে রেখে তুমি কত বড় অপরাধ করছ বুঝতে পারছ না'? দেবমাতা দেখে বলছেন, 'এটা তো টুকরো টুকরো অসম্পূর্ণ নোটস, কারণ স্বামীজী যেভাবে শ্রোতাদের উপরে নিয়ে গিয়েছিলেন সেই ভাব এখানে পাওয়া যাচ্ছে না, দ্বিতীয় স্বামীজী যে কথাগুলো বলেছিলেন তার ভাব এর মধ্যে নেই, তৃতীয় যে কথাগুলো তিনি বলেছিলেন তার সবটাই এখানে নেই'। তারপর ওয়াল্ডো নিজেই দেবমাতাকে বললেন 'তুমি যদি এটাকে সম্পাদনা করে দাও তাহলে এটাকে নিয়ে আমরা ভাবতে পারি'। সিস্টার দেবমাতা নোটগুলি এডিট করলেন। এডিট করতে গিয়ে তিনি কোথাও ছুঁলেন না, কোথাও কোথাও একটা দুটো শব্দ জুড়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই সংযোজন করলেন না। যার জন্য দেববাণী পড়লে এখনও কোথাও কোথাও ফাঁকগুলো পাওয়া যায়। যার ফলে বোঝা যায় ওয়াল্ডো কিছু জিনিস ধরতে পারেননি আর সিস্টার দেবমাতাও সেখানে কিছু সংযোজন করেননি। তিনি এমন কিছু করেননি, অসম্পূর্ণ বাক্যগুলোকে পূর্ণ করে দিয়েছেন, কোথাও কোথাও একটা দুটো শব্দকে এদিক সেদিক পাল্টে দিয়েছেন। তাতে ওয়াল্ডো খুব খুশি হয়েছিলেন যে তেমন কিছু পরিবর্তন করতে হয়নি। পরে সেটাই Inspired Talks গ্রন্থ রূপে ছাপা হয়ে আসে। এই হল Inspired Talksএর প্রেক্ষাপট, কিভাবে এই বই আমাদের কাছে এসেছে।

৪) দেববাণীর বিষয়বস্তু

Inspired Talksএ সামগ্রিক ভাবে মোট ৪৩টি লেকচার নোট করা হয়েছে, প্রত্যেক দিন সকালবেলায় স্বামীজী যেটা বলতেন। মেরি লুই বার্ক বলছেন, Inspired Talksকে তিনটে ভাগে বিভাজন করা যায়। তখনকার দিনে যাঁরা চিঠিপত্র বা নোটস্ রেখেছিলেন, তাঁদের সব কিছু সংগ্রহ করে দেখার পর একটা মোটামুটি work out করা যায় যে এর তিনটে ভাগ, প্রথম ভাগ বাইবেল দিয়ে শুরু হয়। স্বামীজী প্রায়ই হাতে একটা বই নিয়ে ক্লাশে আসতেন, কিন্তু কথা শুরু করতে করতেই বই কোথায় থেকে যেত আর তিনি কোথায় হারিয়ে চলে যেতেন। বাইবেল ছিল, বাইবেলের সাথে নারদ ভক্তিসূত্র ছিল, সেটা থেকেও তিনি ক্লাশ নিয়েছিলেন আর গীতা, এই তিনটে বই ছিল মূল। প্রথম ভাগে এই তিনটে বই, তার মধ্যে একটা দুটো ক্লাশ তিনি ঠাকুরের উপর বলেছিলেন, তার সাথে মা কালী বা শক্তিকে নিয়ে বলেছিলেন। প্রথমের দিকে এই চার পাঁচটা বিষয় নিয়ে তিনি ক্লাশ নেন, বাইবেল, নারদ ভক্তিসূত্র, গীতা, ঠাকুর। দ্বিতীয় ভাগে তিনি ব্রহ্মসূত্রকে নিয়ে বলেছিলেন, তার মধ্যে শঙ্কর, রামানুজ ও মাধ্বাচার্যের ভাষ্যকে নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করছেন। স্বামীজী মাধ্বাচার্যকে খুব বেশি গুরুত্ব না দিয়ে শঙ্কর আর রামানুজকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। রামানুজের যে মত, যেভাবে রামানুজ সব কিছুকে দেখেন, দেখা গেল, যে শিষ্যরা ছিলেন তাঁরা শঙ্করাচার্যের মতের থেকে রামানুজের মতকেই বেশি পছন্দ করলেন। যে কোন আচার্য যদি যোগের অবস্থায় থেকে ক্লাশ নেন আর শিষ্যরা যদি ঠিক ঠিক ভাল হয়, শ্রোতারা যদি ভাল হয় তখন আচার্য নিজের সাথেই কথা বলেন, শিষ্যদের সাথে কথা বলেন না। এখানে স্কুলের ক্লাশ সিক্স ফাইভের ছেলেদের পড়ানো হচ্ছে না।

আইনস্টাইনের নামে বলা হয় যে, তিনি যে লেকচার দিতেন তাতে বেশির ভাগ লোকই ওনার কথা বুঝতে পারত না, উনি নিজেও জানতেন যে এরা বুঝতে পারছে না। উনি শুধু দেখতেন শ্রোতাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কিনা যার একেবারেই এই বিষয়ে কোন আগ্রহ নেই, এই রকম শ্রোতা না থাকলেই হল। দ্বিতীয় দেখতেন সবাই একেবারে stupid না হলেই হল। একটু বুদ্ধি আছে, মোটামুটি একটু বোঝার ক্ষমতা থাকলেই হল, আর কেউ আঙুল মটকাছে না, ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক সেদিক দেখছে না, সেখানে তিনি ঘন্টার পর ঘন্টা বলে যাবেন, শ্রোতারা জানে আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না, আইনস্টাইনও জানেন এরা কিছুই বুঝতে পারছে না, আসলে কিন্তু উনি নিজের সাথে কথা বলে যাচ্ছেন। ঠাকুরও বলছেন, কাকেই বা বলব কেই বা বুঝবে। সব মহান আচার্যরাই জানেন এরা আমার কথা বুঝবে না, তিনি তাও বলে যাবেন, কারণ তিনি তখন নিজের সাথেই কথা বলছেন। ক্লাশ থ্রী ফোরের ছেলেদের সামনে আইনস্টাইনকে লেকচার দিতে দেওয়া হলে তিনি পারতেন না, তখন ওনার ব্রেন ফেল করে যাবে। আর নূতন প্রজন্মের চ্যাংড়া ছেলেমেয়েদের যদি রেখে দেওয়া হয়, তখনও উনি পারবেন না। খুব সাধারণ বোদ্ধাসম্পন্ন, শ্রদ্ধা নিয়ে শুনতে চাইছে, এই ধরণের শ্রোতারা লোকেদের বলতে পারবে যে আমি আইনস্টাইনের লেকচার শুনে এলাম। এদের কাছে আইনস্টাইন নিজের মত ঘন্টার পর ঘন্টা বলে যাবেন। স্বামীজীও নিজের মত বলে যাচ্ছেন। তবে কি হয়, যোগ অবস্থায় আছেন বলে নূতন নূতন অনেক ভাব আসতে থাকে। খুব নামকরা যে আইডিয়াস গুলো স্বামীজী থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে বার করলেন তার মধ্যে প্রথম হল –

বেদান্তকে তিনি ধর্ম রূপে পরিভাষিত করলেন। এর আগে বেদান্তকে ধর্ম রূপে কেউ পরিভাষিত করেননি, বেদান্ত মানে ধর্ম।

স্বামীজী পরে ই ডি স্টার্ডিকে চিঠিতে লিখেছিলেন, খুব নামকরা কথা – এই বেদান্ত, বেদান্ত বলতে মাধ্বাচার্যের দ্বৈত, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈত এবং শঙ্করের অদ্বৈত এই তিনটে মিলিয়ে বেদান্ত। ভারতবর্ষে যত মত, মতবাদ, সম্প্রদায় রয়েছে, সেখানে যখন এই বেদান্তকে প্রয়োগ করা হয় তখন সেটা হয়ে যায় হিন্দু ধর্ম। তার মানে বেদান্ত আর হিন্দু ধর্ম আলাদা নয়। বেদান্তী মানে যাঁরা এই তিনটেকেই গ্রহণ করছেন। এই তিনটেকে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈতকে যখন ভারতবর্ষের সম্প্রদায়গুলিতে নামানো হয় তখন তাকে বলে হিন্দু ধর্ম। যখন এই দ্বৈত ভাবকে ইউরোপিয়ান কালচারে নামানো হয় তখন এটা হয়ে যায় খ্রীশ্চানিটি। তার মানে সমগ্র খ্রীশ্চানিটিকে যদি দেখতে যাই তাহলে ইউরোপের যে ধর্মীয় চিন্তা, সেখানে যদি দ্বৈতবাদকে দিয়ে দেওয়া হয়, তখন সেটা খ্রীশ্চান ধর্ম হয়ে যাবে। আসলে ভাগবতের দশম স্কন্ধে যা আছে ওর মধ্যেই খ্রীশ্চান ধর্ম শেষ

হয়ে যায়। মাধ্বাচার্যের দ্বৈতবাদের একেবারে গোঁড়া ভাবগুলো, সেগুলোকে সব কাহিনী দিয়ে সিদ্ধ প্রতিপন্ন করা, এই ভাবটাই হয়ে যায় খ্রীশ্চানিটি। আর একই জিনিস সেমেটিক গ্রুপের উপর, আরব দেশের যে সংস্কার, সেখানে যদি দিয়ে দেওয়া হয় তখন এটাই ইসলাম হয়ে যায়। সেইজন্য ইসলাম আর খ্রীশ্চানিটিতে খুব বেশি তফাৎ নেই। স্বামীজীর মত হল বেদান্তের দ্বৈতবাদকে যখন ইউরোপিয়ান কালচারে ফেলে দেওয়া হবে তখন খ্রীশ্চানিটি হয়ে যায়, আরবিক কালচারে সেটা ইসলাম হয়ে যায়। ঠিক তেমনি অদ্বৈতের ভাব যখন যোগের মারফৎ আসে তখন সেটা বৌদ্ধ ধর্ম হয়ে যায়। বৌদ্ধ ধর্মে যোগের একটা বিরাট ভূমিকা আছে, তার সাথে তাদের যে মূল সত্য সেটা অদ্বৈতের দিকে নিয়ে যায়। স্বামীজী সেই রকম বলছেন, এই বেদান্ত যখন বিভিন্ন জাতির কাছে যায়, বিভিন্ন দেশে যখন যায়, তাদের পরিবেশ, তাদের যেমনটা প্রয়োজন সেই অনুসারে যখন গ্রহণ করে তখন ওটাই ওখানকার ধর্ম হয়ে যায়।

ঠিক তেমনি আবার বলছেন, দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত আর অদ্বৈত এই তিনটে সাধনাই পর পর হতে থাকে। সাধনার প্রথমে দ্বৈত ভাব নিয়ে শুরু হয়, তারপর বিশিষ্টাদ্বৈত হয়ে অদ্বৈত ভাবে যায়। স্বামীজী পরের দিকে এই কথাগুলো অনেকবার বলেছেন, আর রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুদের বলে গিয়েছিলেন, এই ভাবকে অবলম্বন করে যেন উপনিষদ আদির উপর ভাষ্য লেখা হয়। যদিও এখন পর্যন্ত এই কাজ করা সম্ভব হয়নি। স্বামীজী বলছেন, শঙ্করাচার্য, রামানুজ ও মাধ্বাচার্য এনারা নিজের নিজের দিকটাকে নিয়েই লিখেছেন। কিন্তু তিনটেই যে একই সত্যের তিনটে রূপ এই দৃষ্টিকে মাথায় রেখে ভাষ্য লিখতে হবে। ভারতবর্ষে ফিরে আসার পর স্বামীজী এই জিনিসটাকে নিয়েই বললেন, এই নিয়ে অনেকে আপত্তি করেছেন ঠিকই। চেন্নাইতে অনেকে আপত্তি করে বললেন, আচার্যরা তো এভাবে করতে বলেননি। স্বামীজীর নিজের উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল, তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে দিলেন, this was waiting for me, এই সত্যটা আমার জন্য অপেক্ষা করছিল।

আরও গুরুত্বপূর্ণ হল, স্বামীজী যখন দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈতকে ব্যাখ্যা করছেন তখন তিনি নিজের মত ব্যাখ্যা করছেন। তিনি চিরাচরিত মত বা ব্যাখ্যা দিয়ে যেতেন না, যাওয়ার কথাও নয়। এই নিয়ে অনেকে অনেক রকম মন্তব্য করে থাকেন। হয়ত অনেক ক্ষেত্রে তিনি আচার্য শঙ্করের সাথে একমত হতেন না, রামানুজের মতের সাথে একমত হতেন না, কিন্তু এটাই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারা। সেইজন্য দেববাণী সবারই পড়া দরকার। দেববাণীর ভাব যদিও স্বামীজীর বাণী ও রচনায় ছড়িয়ে আছে কিন্তু এখানে একেবারে সার রূপে এসেছে।

দেববাণীর প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হল, স্বামীজী যাঁদের সামনে খ্রীশ্চানিটিকে নিয়ে যখন আলোচনা করছেন, তাঁরা সবাই খ্রীশ্চান ছিলেন, খ্রীশ্চান ধর্ম সবাই বুঝবে; কিন্তু তখন কোথায় খ্রীশ্চান ধর্মের আলোচনা শুরু হচ্ছে আর কখন সেটা বেদান্তের সাথে মিলে যাচ্ছে, তফাৎ করা খুবই মুশকিল ছিল। আজকে আমরা কথায় কথায় বলি সব ধর্মই সত্য, সব ধর্ম সত্য সে তো আপনি বলছেন, ঠাকুর বলে গেছে সব ধর্ম সত্য, ঠাকুরের বোকা ভক্তরাও সেই বুলি আওড়ে যাচ্ছে। কিন্তু কেউ মানবে সব ধর্ম সত্য? মসুলমানরা মানবে সব ধর্ম সত্য? খ্রীশ্চানরা মানবে? আপনার যদি বুকের পাটা থাকে, তাহলে দেখান কি ভাবে সব ধর্ম সত্য। আপনি বলবেন, আমাদের ঠাকুর দেখিয়েছিলেন সব ধর্ম সত্য। মুসলমানরা বলবে, আমাদের মহম্মদ দেখেছিলেন সব ধর্ম সত্য নয়, ইসলামই সত্য। এরপর আপনি কি বলবেন? আমাদের স্বভাব টিয়া পাখির মত, যেখানে যেটা শুনে নিলাম সেটাই চারিদিকে বলে যাচ্ছি। স্বামীজী তা করছেন না, তিনি খ্রীশ্চানিটিকে নিয়েই চলছেন, চলতে চলতে কখন যে বেদান্তে ঢুকে গেলেন, শ্রোতারা বুঝতেই পারছেন না যে খ্রীশ্চানের সাথে বেদান্তের কোথায় তফাৎ, কোথায় মিল, কিন্তু দুটো মিলে যেন এক হয়ে যাচ্ছে। এই অভিজ্ঞতা শ্রোতাদের সবারই হয়েছিল। যেমন যেমন আমরা স্বামীজীর বাণীতে ঢুকব তখন দেখতে পারব যে জিনিসটা তাই, তখন বোঝা যায় যে সত্যিই তাই, সব ধর্ম যেন এক।

তৃতীয় ভাগের শেষের দিকে যে ক্লাশগুলো ছিল সেখানে প্রথম ভাগে এবং দ্বিতীয় ভাগে যা বলা হল, সব কটাকে এবার নিয়ে এসে যেন সমন্বয় করা হচ্ছে। ওর মধ্যে পতঞ্জলি যোগসূত্র, আবার গীতা, বৃহদারণ্যক উপনিষদ, কঠোপনিষদ এই গ্রন্থগুলিকে কেন্দ্র করে শেষের ক্লাশগুলো নিয়েছিলেন।

দেববাণীতে যেটা সব থেকে বেশি দেখা যায় তা হল, যেগুলো intellectual discussion ছিল না, শুধু মাত্র spiritual discussionও ছিল না, বলছেন, মানুষের বাস্তব জীবনে যেটা সব থেকে বেশি দরকার, সেই জিনিসগুলিকে স্বামীজী খুব সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করছেন। ভগবান আছেন তাতে আমার কি, ভগবান কি আমায় কষ্ট দিচ্ছেন, ভগবান কি আমার মঙ্গল করবেন? যদি বলেন, হ্যাঁ ভগবান আমায় কষ্ট দিচ্ছেন, তিনিই আমার মঙ্গল করবেন, এটা হল practical aspect। স্বামীজী কখনই এই practical aspectকে চোখের সামনে থেকে চলে যেতে দিতেন না। স্বামীজী যে লেকচারগুলো, বিশেষ করে ভারতবর্ষে যে লেকচারগুলো দিয়েছেন তাতে দেখা যায়, এই practical aspect of religion, practical aspect of Vedant, এর উপর তিনি বারবার বলে যাচ্ছেন। Practical of Vedantএর উপরই তাঁর নামকরা চারটে লেকচার হয়েছিল, ধর্ম যদি সরাসরি অনুশীলন না করা হয়।

স্বামীজী একবার আমেরিকায় ঘোড়ার গাড়ি করে যাচ্ছেন। এক জায়গায় এসে কোচম্যান গাড়িটা দাঁড় করাল, গাড়ি থেকে নেমে রাস্থার ধারে এসে দুটো খুব সুন্দর বাচ্চা, রাজকুমারের মত দেখতে, কোলে নিয়ে চুমু খেয়ে কোল থেকে নামিয়ে আবার গাড়িতে এসে রওনা দিল। স্বামীজী খুব অবাক হয়ে গেলেন ওর কথা শুনে। তিনি কোচয়ানকে বললেন, 'বাচ্চা দুটোকে দেখে মনে হল খুব বড় অভিজাত বংশের ছেলে'। কোচয়ান বলল, 'হ্যাঁ! ওরা আমারই সন্তান'। স্বামীজী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করছেন, 'তুমি ঘোড়ার গাড়ি চালাও'? সে বলছে, 'হ্যাঁ! আমি অমুক দেশের রয়েল ফ্যামিলির লোক, অবস্থা ও পরিস্থিতির দুর্বিপাকে এখন ঘোড়ার গাড়ি চালাই, কিন্তু আমার সন্তানদের রাজকীয় ভাবে রাখি'। স্বামীজী বারবার বলছেন, this is practical Vedanta। আমি দুর্দিনে পড়ে গেছি কিন্তু আমার যে অস্তিত্ব এটাকে আমি কোন দিন ভুলব না।

স্বামীজী যে ভারতবর্ষের কল্যাণের কথা বলছেন, তার পিছনের মূল ভাবটাই হল অদ্বৈত। আসল যে সত্তা তা হল ঈশ্বরীয় সত্তা, তিনিই বহু রূপে বিরাজমান। আমি যদি মানুষের পূজা করি, আমি যদি মানুষের সেবা করি তাতে আমি তাঁরই পূজা, তাঁরই সেবা করছি। কারুর যদি কষ্ট হয় সেটা আমারই কষ্ট, এটাই practical Vedanta। কোন অবস্থাতেই স্বামীজী এই ভাব থেকে নিজেকে আলাদা করতেন না, থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে যখন আছেন তখনও এই ভাবটা থাকছে। স্বামীজীর বক্তব্য হল, যখন অপরকে ভালবাসছ তখন তুমি নিজেকেই ভালবাসছ। আমাদের ভাব হল, ধর্ম বুড়ো বয়সে করা যাবে আর যদি ধর্ম করতে হয় তাহলে বিনা পয়সায় করার ফিকির খুঁজবে।

আমাদের আলোচনা দেখানো হল স্বামীজী কেন বেদস্বরূপ। দ্বিতীয় স্বামীজীর জীবনের মিশন কি ছিল? স্বামীজী কেন এসেছিলেন? পরম্পরায় আমরা শুনে আসছি ঠাকুর স্বামীজীকে সপ্তর্ষি মণ্ডল থেকে নিয়ে এসেছিলেন। বেদস্বরূপ বলতে গিয়ে বলা হয়েছিল, স্বামীজীর বাণী ও রচনায় সমস্ত রকমের জ্ঞান কোথাও বিস্তারে, কোথাও সংক্ষেপে, কোথাও বীজাকারে রাখা আছে। আধ্যাত্মিক সত্যগুলো আমাদের বেদেই রয়েছে, ওগুলোকে নিয়ে কোন দিন প্রশ্ন করা যাবে না; উপনিষদে রয়েছে, কোন দিন প্রশ্ন করা যাবে না; তেমনি গীতাতে রয়েছে, কথামৃতে রয়েছে, এগুলোকেও কোন দিন প্রশ্ন করা যাবে না। কিন্তু ওই সত্যগুলোকে আমরা কিভাবে দেখব? যেমন খুব একটা সাধারণ কথায় বলা যায়, বেদে যে যজ্ঞাদির বর্ণনা আছে, দেবতাদির বর্ণনা রয়েছে, এগুলোকে একটু খুঁটিয়ে দেখলে মনে হবে, কোথাও গিয়ে এই যে প্রাকৃতিক শক্তিগুলো রয়েছে, সেগুলোকে ঈশ্বরীয় রূপে দেখে যেন প্রকৃতির ব্যাপারটাকে ফেলে দিয়েছে, কিন্তু সেই দিব্য শক্তিটা থেকে গেছে। যেমন বাতাস, বাতাস যখন জোরালো হল তখন বায়ু হয়ে গেল, এবার বায়ুকে দেখছে ঈশ্বর রূপে। মাঝখান থেকে বাতাসের যে বৈশিষ্ট্য সেটা খসে পড়ে গেল, সেখান থেকে তিনি হয়ে গেলেন বায়ু দেবতা। সেই বায়ু দেবতার বৈশিষ্ট্যকে অনন্ত ঈশ্বরের সাথে জুড়ে দিল। ইন্দ্রকে বলা হয় বৃষ্টির দেবতা, সেখান থেকে তাঁকে বলছে দেবতাদের রাজা। বৃষ্টি সত্যিই ভারতবর্ষের জীবনের সাথে ওতপ্রোতো ভাবে জড়িয়ে আছে। এখন বৃষ্টির যাবতীয় যা গুণ রয়েছে, সেই বৃষ্টি হয়ে গেলে একটা প্রাকৃতিক দিব্য শক্তি। সেই দিব্য শক্তি হয়ে গেল ইন্দ্র। এরপর ইন্দ্রের যে গুণ সেই গুণ দিয়ে অনন্ত ঈশ্বরের গুণকে পরিষ্কার দেখা যায়।

কিছু দিন পর এনারা দেখলেন বেদে দেবতাদের শেষ নেই, কখন তিন দেবতা, কখন তেত্রিশ দেবতা, এখন হয়ে গেছে তেত্রিশ কোটি দেবতা। এনারা যদি ঠিক ঠিক ঈশ্বর হন তাহলের ঈশ্বরের চরিত্র বলতে আমরা

যা বুঝি দেবতাদেরও ঠিক তাই হতে হবে। যেমন ঈশ্বরকে আমরা অনন্ত রূপে জানি, দেবতাদেরও অনন্ত হতে হবে আর অনন্ত শক্তিমান হতে হবে। যেমন শিব আমাদের কাছে অনন্ত শক্তিমান। শিব অনন্ত আবার বিষ্ণুও অনন্ত, ব্রহ্মাও অনন্ত, কৃষ্ণ অনন্ত, কালীও অনন্ত। এতগুলো অনন্ত কোথা থেকে আসবে আর কি করে হতে পারে? এবার তার ব্যাখ্যা এসে গেল, *একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি*। তিনি এক, ঋষিরা তাঁকে বিভিন্ন নামে সম্বোধন করেন। এটাও বেদের মন্ত্র হয়ে গেল। এটাও শাস্ত্র হয়ে গেল, বেদ হয়ে গেল। ঠিক সেই ভাবে স্বামীজী নূতন কোন ভগবানকে নিয়ে আসছেন না; আমাদের এত দেবতা, এত দেবী রয়েছে তার উপর তিনি আরও পাঁচটা নূতন দেবতাকে নিয়ে আসছেন তা নয়। আর তিনি যে কোন দেবতাকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে উপরে তুলে দিচ্ছেন, তা তিনি করছেন না। যেমন বেদের সময় ইন্দ্রই প্রধান, অগ্নি, বরুণ তাঁর পিছনে, পিছনে বলতে কার কত প্রার্থনা বেদে দেওয়া আছে সেই হিসাবে বলা হচ্ছে। বেদে সেই সময় বিষ্ণু একজন সাধারণ দেবতা, পুরাণে এসে বিষ্ণু প্রধান দেবতা হয়ে গেলেন। বিষ্ণু যখন প্রথম দেবতা তখন শ্রীরামচন্দ্র এলেন, শ্রীকৃষ্ণ আরও পরে এলেন, বর্তমান কালে শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ হয়ে গেলেন প্রধান দেবতা। বেদে শিবের কোন অস্তিত্বই নেই, তিনি আজ হয়ে গেলে প্রধান দেবতা। তার মানে এক সময় যাঁরা অতি সাধারণ বা কোন নাম নেই, তাঁরাও দেবতা হয়ে যাচ্ছেন। হয় নূতন কোন দেবতা হয়ে যাচ্ছেন, নয়তো খুব নগণ্য থেকে বড় মাপের দেবতা হয়ে যাচ্ছেন। স্বামীজী কি কোন নূতন দেবতাকে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন, বা যিনি নগণ্য ছিলেন তাঁকে বিরাট কিছু করে দিচ্ছেন? স্বামীজী এর কোনটাই করছেন না। স্বামীজী এটাই করছেন, যে শাস্ত্রগুলো রয়েছে সেগুলোর একটা interpretative value দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন তুমি জিনিসটাকে কিভাবে দেখবে। ভাষ্যকাররা এই কাজটাই করেন। শঙ্করাচার্য একদিকে নিজে তিনি ভাষ্যকার, অন্য দিকে তাঁর ভাষ্যটাই একটা শাস্ত্র আবার আরেকদিকে ঠাকুর তাঁকে বলছেন অবতার, স্বামীজী তাঁকে ভগবান শঙ্করাচার্য বলে সম্বোধন করছেন। স্বামীজীর Inspired Talks গুলোর মধ্যে হিন্দু ধর্মের নামকরা শাস্ত্রগুলিকে এক জায়গাতে নিয়ে এসে তার যে সারটুকু আছে সেটাকে নিজের মত করে ব্যাখ্যা করে দেখাচ্ছেন এই সত্য গুলিকে কিভাবে দেখতে হবে। শুধু হিন্দু ধর্মই নয়, যে কোন ধর্ম, তার ধর্ম কি, ধর্ম তত্ত্ব কি জানতে হলে তাই আমাদের সবাইকে অবশ্যই Inspired Talks পড়তে হবে। Inspired Talksএর মত শাস্ত্র বিশ্বে নেই।

আগে যে বলা হল বেদ থেকেই সব কিছু বেরিয়েছে, ঠিক তেমনি আগামী হাজার বছরে স্বামীজীর বাণী ও রচনা থেকেই সব কিছু বেরোবে, এই কারণেই তাঁকে আমরা বেদস্বরূপ বলছি। *একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি* এর যে interpretative value রয়েছে, বেদের সময় যে এত সংখ্যায় দেবতারা ছিলেন, সব কটাকে এই মন্ত্র এক জায়গায় এনে দেওয়া হল, ঠিক তেমনি স্বামীজী সমস্ত ধর্মকে, এখানে আর হিন্দু ধর্ম থাকছে না, একটা জায়গায় একটা প্ল্যাটফরমে এনে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

<u>১৯শে জুন, বুধবার, ১৮৯৫</u>

বাইবেলের 'Word' শব্দকে ব্রহ্ম, ঈশ্বর, জগৎ, মায়া ও শক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা

স্বামীজী ১৮ই জুন মঙ্গলবার, ১৮৯৫ সালে থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে পোঁছালেন, রাত্রিটা বিশ্রাম নিলেন। সকাল হয়েছে, ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে, স্বামীজী ১৯শে জুন থেকে ক্লাশ শুরু করে দিলেন। প্রথমের দিকে আট-নয় জন ছিলেন, পরে দুজন এসেছিলেন। আরেকজন ছিলেন, যাঁর নাম জানা নেই, এও জানা যায় না যে তিনি প্রথম থেকে ছিলেন কিনা। প্রথম দিন স্বামীজী হাতে বাইবেল নিয়ে ক্লাশে প্রবেশ করলেন। সবাইকে বলছেন, তোমরা যারা এখানে আছ সবাই খ্রীশ্চান, সেইজন্য খ্রীশ্চান ধর্মগ্রন্থ দিয়েই শুরু করছি। শুরু করলেন Book of John থেকে।

বাইবেলের দুটো ভাগ, Old Testament আর New Testament। জহুদিরা Old Testamentকে মানেন, অ্যাব্রাহমরা Old Testament বলে না, ওদের কাছে এটা বাইবেল। খ্রীশ্চানরা দুটোকেই নেয়, oldকেও নেয় newটাকেও নেয়। New Testamentএ চারজন মহাপুরুষ, তাঁরা যেমনটি খ্রাইস্টের ব্যাপারে শুনেছিলেন, যেমন তাঁর কথা জেনেছিলেন, সেগুলোকে লিপিবদ্ধ করেছেন। এগুলোতে অনেক ঐতিহাসিক ব্যাপার রয়েছে, কেউ বলে এগুলো অনেক পরে লেখা হয়েছে, আমরা এই বিতর্কে যাচ্ছি না। যে জাতি নিজের ধর্মগ্রন্থকে ধর্মগ্রন্থ রূপে মানে অপরকেও সেটা মেনে নিতে হয়। পরম্পরায় যেটা ধর্মগ্রন্থ সেটাই ধর্মগ্রন্থ। খ্রীশ্চান সমাজ যে ধর্মগ্রন্থকে পালন করে দাঁড়িয়েছে সেটাই তাঁদের ধর্মগ্রন্থ, যদি অন্য রকম কিছু থাকে তাতে আমাদের কিছু আসে যায় না। যেমন গীতাকে নিয়ে অনেক কথা বলা হয়, এই চারটে শ্লোক আগে ছিল না, পরে এসেছে, এতে কিছু আস যায় না। গীতার এই সাতশটি শ্লোকের উপর শঙ্করাচার্য ভাষ্য রচনা করেছেন, এই গীতাকে অবলম্বন করে হিন্দু সমাজ দাঁড়িয়ে আছে, এটাই গীতা। শ্রীকৃষ্ণ আদৌ এই কথা অর্জুনকে বলেছিলেন কিনা, আমাদের তাতে কিছু আসে যায় না। কারণ হিন্দু জাতির যে চিন্তা-ভাবনা এই গীতাতে রয়েছে, আর গীতাতে যা রয়েছে সেটাই আজকের হিন্দু জাতির চিন্তা-ভাবন।

New Testamentএর চারজনই খুব নামকরা মহাপুরুষ, চারজনের এক-একটা অংশকে খ্রীশ্চানরা বলে 'বুক'। যখন ওনারা পাঠ করেন তখন ওনারা বলেন, according to…। খ্রীশ্চানদের যে আক্রমণ করা হয়, যদিও এই আক্রমণ করাটা কখনই ঠিক নয়, খুবই বোকা বোকা। তারা বলে, 'এই তো তোমাদের যীশুর অবস্থা, তিনি নিজে লিখেছেন, নাকি কেউ পরে লিখেছে কিছু জানা নেই; আমাদের ধর্মগ্রন্থ বেদ, বেদ অপৌরুষেয়, ভগবান থেকে সরাসরি এসেছে'। মুসলমানরা বলবে কোরাণের কথা আল্লার কথা, 'তোমাদের কথা তো একেই duplicate, তার উপর খ্রাইস্ট কবে এসেছিলেন সেটাকে আবার অনেক পরে কেউ লিখছে'। এগুলো খুবই নীচু মনের কথা, ধর্মগ্রন্থ মানে ধর্মগ্রন্থ, সেখানে কোন প্রশ্ন ওঠে না, বাইবেলও যা বেদও তাই। দুটো তিনটে প্রজন্মের পরেও যদি লেখা হয় তাতেও সেই বেদ। ধম্মপাদ অনেক পরে লেখা হয়েছে, কিন্তু বৌদ্ধরা যখন সেটাকে ধর্মগ্রন্থ বলে জানে তখন আমাদের কাছেও সেটা ধর্মগ্রন্থ। বেদকে বলা হয় অপৌরুষেয়, ভগবানের মুখ থেকে বেদ বেরিয়েছে, আমরা দেখি ঋষিরা ধ্যানের গভীরে যে সত্যগুলোকে দেখেছেন সেটাকে তিনি লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন। কিন্তু চার প্রজন্ম পরে যদি সেটাকে পদ্য রূপে বা গদ্য রূপে লেখা হয় তাও সেটা শাস্ত্র। সেইজন্য বেদ হোক, গীতাই হোক, কোরাণ হোক, বাইবেল হোক, ধম্মপাদ হোক কোন ধর্মগ্রন্থকে নিন্দা করা যায় না আর উচিতও নয়। যারা নিন্দা করে বুঝতে হবে তারা অপরের ধর্ম তো বোঝেই না, নিজের ধর্মকেও বোঝে না।

বাইবেলের প্রথমটা হল ম্যাথু, দ্বিতীয় হল মার্ক, তৃতীয় হল লিউ এবং শেষে জন। চারটে মিলিয়ে বাইবেল। সবটাই ভগবান যীশুর কথা, এর মধ্যে কোনটা বেশি, কোনটা কম আমরা বলতে পারি না। তবে জনের বই অনেক গভীর ও কঠিন। Book of Johnএর শুরুই হয় এই কথা দিয়ে In the beginning was the Word, wordএর 'W'টা capitalএ লেখা, and the Word was with God and the Word was God। বাংলা অনুবাদে Wordএর অনুবাদ করেছেন শব্দ, শব্দ অনুবাদটা ভুল। কারণ শব্দ হলে capital 'W' থাকত না, capital 'W' থাকা মানে এর অন্য গূঢ় ব্যাপার আছে। স্বামীজী সব কথা

বলেছিলেন ইংরাজীতে, মিস ওয়াল্ডো নোট নিয়েছিলেন ইংলিশে আর সিস্টার দেবমাতা এটাকে ইংলিশে সম্পাদনা করেছেন। পরে বাংলায় অনুবাদ করার সময় আমাদের যে ভাবধারা সেই অনুসারে অনুবাদ হওয়ার জন্য কোথাও কোথাও এর মূল ভাবটা হারিয়ে যায়। In the beginning was the Word এর বাংলা অনুবাদ করছেন, আদিতে শব্দ ছিল। আমাদের পরম্পরাতে গীতা উপনিষদের উপর ভাষ্য লেখা হয় এর মূল অর্থ ও ভাব ব্যাখ্যা করার জন্য। গীতার উপরেই যে কত ভাষ্য আছে ভগবান জানেন, ঠিক তেমনি বাইবেলের উপর প্রচুর ভাষ্য আছে। এর মধ্যে কিছু ভাষ্য খুব নামকরা। ক্যাপিটাল 'W'দিয়ে Wordএর কি ব্যাখ্যা হতে পারে এই ব্যাপারে খ্রীশ্চানদের মধ্যে অনেক মতান্তর আছে। বেশির ভাগ খ্রীশ্চানদের মতে Word মানে ভগবান যীশু। আমরা Wordএর ব্যাখ্যাতে শব্দ ব্রহ্ম বা ভগবান যীশুতে ঢুকছি না।

সেন্ট জন বলছেন, এই যে Word এটাই প্রথমে ছিল। কখন? সৃষ্টির প্রথমে। সৃষ্টি যখন হচ্ছে তখন Word ছিল, আর এই Word ভগবানের সঙ্গে ছিল, এই Wordই ভগবান। এই বাক্যের এত গভীরতা যে আমাদের অনেক সময় মনে হয়, যাঁরা বেদান্ত জানেন না তাঁদের পক্ষে এই বাক্যের appreciation করা খুব মুশকিল। Hans Torwesten একজন জার্মান লেখক ছিলেন, শৈশব থেকে তাঁর স্বপ্ন ছিল তিনি বিশ্বের সবাইকে একদিন খ্রীশ্চান ধর্মে নিয়ে আসবেন। ধীরে ধীরে বড় হলেন, বিভিন্ন জায়গায় গেলেন, কিভাবে কিভাবে তিনি ঠাকুরের কথা পড়লেন। হিন্দু ধর্মের প্রতি যাঁর প্রচণ্ড তাচ্ছিল্যের ভাব ছিল, কিন্তু ঠাকুরের কথা পড়ে আগ্রহ হয়ে আরও কিছু বই নিয়ে পড়লেন, আরও গভীরে গেলেন, আরও আগ্রহ বেড়ে গেল, খুব প্রভাবিত হয়ে গেলেন। সারা জীবন তিনি গোঁড়া খ্রীষ্টান রয়ে গেলেন ঠিকই, কিন্তু পরে তিনি একটা খুব ভাল বই লিখলেন, Ramakrishna and Christ : The Paradox of the Incarnation। বইটির বক্তব্য হল যদি কেউ বাইবেলকে বুঝতে চায় তাহলে তাকে বেদান্ত জানতে হবে। আর যদি কেউ যীশুকে বুঝতে চায় তাহলে তাকে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনকে জানতে হবে। ঠাকুরের জীবনকে যদি জানা যায় তবেই যীশুর জীবন ভাল ভাবে বোঝা যাবে।

আমাদের বেদান্তে আদিকাল থেকেই শব্দ ব্রহ্মের ধারণা আছে। ঈশ্বর যখন ভাবেন সৃষ্টি হোক, ঈশ্বরের মনে এই যে চিন্তা হল এর নাম হল Word। বর্তমান কালে শব্দ বলতে আমরা যেটা বুঝি, খুব প্রাচীন সংস্কৃতে কিন্তু এই শব্দের অর্থ হল চিন্তা। চিন্তা-ভাবনাকে ইংরাজীতে বলা হয় ideas বা thoughts। তিনি যখন ভাবলেন সৃষ্টি হোক, এই যে তাঁর ভাবনা, বর্তমান সৃষ্টি থেকে পিছনের দিকে যেতে যেতে আমরা যে সৃষ্টির উৎসকে জানতে চাইছি, শেষে আমরা কোথায় পোঁছাব? ঈশ্বরের এই চিন্তনে। তাঁর এই চিন্তনকেও যদি কেউ ভেদ করে যায় তখন আর কিছুই থাকবে না, তখন শুধু নির্গুণ নিরাকার। সেইজন্য তখনকার কোন অবস্থার কথা বলা যাবে না। শেষ যেটা আমরা ভাবতে পারি, তা হল, ঈশ্বরের সেই যে চিন্তন যেখান থেকে সৃষ্টি হয় এটাকে বলছেন In the beginning was the Word, আমরা এটাকে বলি শব্দ ব্রহ্ম, বেদান্তে এর আরেকটা নাম মায়া।

কিন্তু খ্রীশ্চান পরম্পরায় এটা মায়াও নয়, শব্দও নয়, চিন্তনও নয়, এটা হল ভগবান যীশু। অর্থোডক্স খ্রীশ্চানদের মতে ভগবানই আছেন, সৃষ্টি যখন হয় তখন তিনি নিজেই সব কিছু হয়ে যান, একে এনারা বলেন God the Father, God the Son, God the Holy Spirit। ভগবানের যে হওয়া, God the Son, Jessusএর মাধ্যমে হন, এটাকে এখানে বলছেন Word। আর জগৎ যেটা চলছে সেটা Holy Spiritএর মাধ্যমে হয়। মানুষ ভাল মন্দ যা কিছু করে সব Holy Spiritএর জন্য হয়। সেই একই ঈশ্বর, এই তিনটের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। যদিও বেদান্তে এর অনুবাদ হবে না, কিন্তু ভাবের দিক থেকে যদি এর অনুবাদ করা হয় তখন সেটা একটা খুব মজার অনুবাদ হবে। এই যে তিনটে জিনিস বলা হল, God the Father, God the Son and God the Holy Spirit। এটাই যখন সৃষ্টিতে আসে তখন হয়ে যায় ঈশ্বর আছেন, the Word অর্থাৎ Jessus এর মাধ্যমে সৃষ্টি হল আর Holy Spiritএর মাধ্যমে সৃষ্টি চলে। খ্রীশ্চানদের মতে এই তিনটের মধ্যে কোন তফাৎ নেই, সর্বাবস্থায় তিনটে এক। যখন তিন নেই তখনও এক, যখন তিন আছে তখনও এক। হিন্দুদেরও একই মত রয়েছে, কিন্তু হিন্দুদের মত আর খ্রীশ্চানদের মত এক নয়, হিন্দুদের ধারণা পুরো আলাদা। এই ধরণের একটা ভাব আমাদের হিন্দু ধর্মে আছে। খুব কাছাকাছি যেটা এর কাছে আসে

স্বামীজী সেটাকে বলছেন ওঁ, হ্রীম্ ও ঋতম্। ওঁ হল সেই God the Father, এটাই ultimate। হ্রীম্, যেখান থেকে সমস্ত সৃষ্টি চলছে। ঋতম্, সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে চালায়। ওঁ, হ্রীম আর ঋতম্ God the Father, God the Son and God the Holy Spirit এই তিনটের খুব কাছাকাছি অনুবাদ হতে পারে। সেটাকেই যখন ভাষায় নিয়ে আসছেন তখন হয়ে যাচ্ছে, In the beginning was Word, Word was with God and the Word was God। ওঁ আর হ্রীম্ দুটোর মধ্যে কোন তফাৎ নেই, ওঁ আর ঋতম্ দুটোর মধ্যেও কোন তফাৎ নেই, হ্রীম্ আর ঋতমেও কোন তফাৎ নেই, তিনটে এক। তিনটে এক অথচ তিনিই আছেন, ওঁ বলতে ভগবান, ওঁ মানেই ভগবান, কিন্তু সৃষ্টির সময় যখন আসে, শক্তি ছাড়া সৃষ্টি হবে না, তিনি তখন হ্রীঁম্। আর যখন ক্রিয়া শুরু হয়ে যায় তখন তিনি একটা divine law, তিনি একটা divine power হয়ে যান, সেটাকে বলছেন ঋতম্।

ঠাকুর বলছেন, সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়, গায়ত্রী ওঙ্কারে লয় হয়, যোগী তাঁর কৃপায় প্রণব ভেদ করে ঈশ্বর দর্শন করেন। প্রণব ভেদ করে যদি তাঁর সাক্ষাৎ হয় তাহলে জগৎ আর তাঁর মাঝখানে প্রণব একটা বাধা রূপে আছে, খুব সহজ যুক্তি। ওটাকেই শব্দ ব্রহ্ম বলে। সৃষ্টি যখন হয় তখন ভগবান চিন্তা করলেন, সৃষ্টি হোক, এই যে ভগবানের চিন্তা এটাকেই বলছেন শব্দ ব্রহ্ম। এটাই শব্দ রূপে প্রকট হয়। শব্দ রূপে প্রকটা হওয়াকে আমরা মনে করি, একটা চকলেট বোম ফাটল, দুম্ করে আওয়াজ হল, একটা কিছু হল আর সৃষ্টি হতে শুরু করল। একেবারেই তা নয়, যেখানে কিছু নেই সেখানে কিসের আওয়াজ হবে, আওয়াজ হওয়ার জন্য space দরকার, আওয়াজকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাতাস দরকার। কিছুই তো নেই আওয়াজ কি করে হবে! সেইজন্য এগুলোকে বুঝতে বা ধারণা করতে অনেক সমস্যা হয়। আগে তাই বলা হল, আগেকার সংস্কৃতে শব্দ মানে চিন্তা বা আইডিয়া। ঈশ্বরের মনে যে চিন্তা, তার নাম শব্দ।

খ্রীশ্চানদের পরম্পরা অনেক পুরনো, জহুদিদের পরম্পরার উপর খ্রীশ্চানদের পরম্পরা দাঁড়িয়ে ছিল। জহুদিদের পরম্পরা রীতিমত খুব প্রাচীন পরম্পরা, হাজার হাজার বছর ধরে ওনারা নিজেদের ধর্মে সমর্পিত করে রেখেছেন। সেন্ট জন কোথা থেকে এই Word শব্দটা নিয়েছিলেন, এটা কারুরই জানা নেই। কিন্তু বাইবেলে যখন বলছে, সেখানে খ্রীশ্চানদের কাছে Word মানে সরাসরি Jesuss, এটাকে বলে trinitarian, Fathar, Son and Holy Spirit। এই যে Son এটাকে বলছেন Word, সেটাই হলেন Jesuss, এটা ওনাদের পরম্পরাতেই আছে। কিন্তু পরম্পরাতে থাকলে এই জিনিসটা পরিষ্কার হওয়া মুশকিল। জহুদিদের খুব শক্তিশালী পরম্পরা থাকলেও খ্রীশ্চানদের পরম্পরা ছিল না। ওরা ধীরে ধীরে ইউরোপের দিকে, বিশেষ করে রোমের দিকে সরে যেতে থাকলেন, যার ফলে ওদের সেই পরম্পরা ছিল না। তখন ওরা নিজেদের মত বাইবেলের অনেক কিছুর ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন। পরম্পরা না থাকার জন্য নিজেদের কিছু ধারণা নিয়ে ব্যাখ্যা করার ফলে বাইবেলের ব্যাখ্যা বা ভাষ্য যদি কেউ পড়তে যায় সে বুঝতে পারবে না। এর আগে যে Hans Torwesten এর কথা বল হল, তিনি নিজে একজন গোঁড়া খ্রীশ্চান হয়ে বলছেন, যদি বাইবেলকে বুঝতে হয় তাহলে হিন্দু ধর্ম দিয়ে বুঝতে হবে। কেন যে Word ভগবানের সাথে ছিল, কেন যে Holy Spirit ভগবানের সাথে ছিল, এর ব্যাখ্যাগুলো খ্রীশ্চানরা নিজের মত দেয়, সেগুলো আমাদের কাছে ছেলেমানুষী বলে মনে হয়। কিন্তু খ্রীশ্চানদের কাছে ওটা একটা বিরাট থিয়োলজি।

আমাদের কাছে এগুলো কিছুই না, আমাদের যেমন বলা হয়, ঈশ্বরের ইচ্ছা শক্তি আছে, তাঁর ক্রিয়া শক্তি আছে আর তাঁর জ্ঞান শক্তি আছে, এই তিনটে শক্তির কথা বলছেন। তিনটে শক্তির কথা যদি বলা হয় তাহলে ভগবান আর তিনটে শক্তি হয়ে যায়। কিন্তু তা না, ভগবান নির্গুণ নিরাকার, তিনি ইচ্ছা করলেন সৃষ্টি হোক, সেই ইচ্ছাটা এবার তিনটে শক্তির মধ্যে ভেঙে যায়, সেখান থেকে সৃষ্টি হতে থাকে। খ্রীশ্চানরা এগুলো নিজের মত বোঝে, নিজেদের বিভিন্ন সম্প্রদায় নিজের নিজের মত ব্যাখ্যা করে। আমাদের গীতার ব্যাখ্যাও হিন্দুদের বিভিন্ন সম্প্রদায় নিজের নিজের মতানুযায়ী ব্যাখ্যা করে। এখানে রামানুজের সম্প্রদায় আছে, মাধ্বাচার্যের সম্প্রদায় আছে, চৈতন্য মহাপ্রভুর সম্প্রদায় আছে, এই রকম হাজার হাজার সম্প্রদায় আছে। কিন্তু গীতার প্রথম লাইন *ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে* এর অর্থ সবার কাছে একটাই অর্থ হবে, কুরুক্ষেত্র ভূমিতে যুদ্ধ হচ্ছিল। খ্রীশ্চান সম্প্রদায়ে সেন্ট জনের প্রথম লাইনটাই In the beginning was the Word ব্যাখ্যা করতে

গোলমাল পাকিয়ে দেয়। ওরা যখন ব্যাখ্যা করে তখন সবাই নিজের নিজের মত ব্যাখ্যা করে। এই ব্যাখ্যাটা এবার স্বামীজী দিচ্ছেন। স্বামীজীর যে ব্যাখ্যা তাতে বেদান্তের ব্যাখ্যা আসছে। আমরা এখনও সেই আলোচনায় ঢুকিনি। শুধু জানানো হল স্বামীজী এটা দিয়ে থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে Inspired Talks শুরু করেছিলেন।

বাইবেলে প্রথমে রয়েছে In the beginning was the Word, তার মানে Jessus প্রথম থেকেই ছিলেন। কোথায় ছিলেন? ঈশ্বরের সঙ্গে এক ছিলেন আর তিনি ঈশ্বরের সাথে এক। এই ঈশ্বর তিনটে রূপে আসেন, ঈশ্বর, যীশু আর Holy Spirit। Holy Spirit হল এই জগতের ক্রিয়া শক্তি। তবে আমরা সহজ রূপে যে ক্রিয়া শক্তি মনে করি এখানে তা নয়, Holy Spirit সবারই ভিতরে আছে, সে মানুষকে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায়, অশুভ জিনিসের দিকে সে যেতে দেয় না। খ্রীষ্ট ধর্মে Holy Spirit একটা শুভ শক্তি, কিন্তু আমাদের কাছে শক্তি মানে যে কোন শক্তি, শুভ শক্তি, অশুভ শক্তি সব। খ্রীশ্চানরা মনে করে Devil মানুষকে অশুভ জিনিসের দিকে নিয়ে যায়, Devil মানে যা কিনা অশুভ শক্তি, এই অশুভ শক্তি Saturn থেকে আসে। এগুলো সব বাইবেলের কথা। এবার আমরা দেখব স্বামীজী কিভাবে এই জিনিসটাকে ব্যাখ্যা করছেন।

In the beginning was the Word, এই Wordকে বাংলায় অনুবাদ করছেন শব্দ ব্রহ্ম রূপে। কিন্তু স্বামীজী বলছেন, The Hindu calls this Maya, the manifestation of God, because it is the power of God. (*হিন্দুরা এই শব্দকে বলে থাকেন মায়া বা ব্রহ্মের ব্যক্তভাব, কারণ এটি ব্রহ্মেরই শক্তি*।) খ্রীশ্চানরা স্বামীজীর এই কথা কোন মতেই মানবে না। বিশেষ করে এইজন্যই মানবে না, মায়া ব্যাপারটা কি, এর কি অর্থ, খ্রীশ্চানরা আদৌ বোঝে না। পাশ্চাত্য জগতে, বিশেষ করে যারা ধর্মের technicality বোঝে না, তাদের কাছে মায়া হল একটা ছলনা, মোহিত হয়ে যাওয়া বা মুগ্ধ হয়ে গিয়ে ভুল করা। বেদান্তে ঠিক ঠিক মায়া বলতে যা বোঝায় সেটাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। মায়া ঈশ্বরীয় শক্তি, এমন শক্তি যা সবাইকে মুগ্ধ করে দেয়। গীতায় মায়াকে বলছেন *দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া*, এই মায়া আমার শক্তি, দৈবী শক্তি, *দুরত্যয়া*, মায়াকে বোঝা যায় না, মায়াকে অতিক্রম করা অসম্ভব। *মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে*, কিন্তু যে আমার শরণাগত একমাত্র সেই মায়াকে অতিক্রম করতে পারে। তার মানে মায়াকে যে পার করে বেরিয়ে যায় সেও কিন্তু মায়াকে জানতে পারে না। মায়া শব্দ এসেছে 'মা' আর 'যা' থেকে। 'মা' মানে না, আর 'যা' মানে যাকে বোঝা যায় না। মায়া মানেই যাকে কোন দিন জানা যাবে না, অথচ মায়া আছে। যখন মায়ার মধ্যে আছে তখন মায়াকে জানা যাবে না, মায়াকে যখন অতিক্রম করে যাবে তখন দেখে মায়া বলে কোন কিছুর অস্তিত্বই নেই। তাই মায়ার ব্যাপারটা বোঝাও যায় না, বোঝানও যায় না, কিন্তু মায়া আছে। যেমন ভালবাসা, ভালবাসাকে বোঝাও যায় না, বোঝানও যায় না, শুধু আমরা জানি ভালবাসা বলে কিছু একটা আছে। এটা একটা গুণ বা quality, qualityকে কখন ব্যাখ্যা করা যায় না। একটা বস্তুকে quality দিয়ে বোঝানো যায় বা জানা যায়। যে কোন বস্তু, যেমন একটা পাথর, পাথরকে আমরা বলব এটা hard, এই hardnessটা পাথরের quality। Hardness কি? এটাকে বোঝান যাবে না। Hardnessকে যেটা দিয়ে ব্যাখ্যা করা হবে, সেটাকে আরও বোঝান যাবে না। Qualityকে বোঝান যায় না, এটাই অস্তিত্ব, এটাই থাকে। ঠিক তেমনি মায়াকে বোঝান যায় না।

মায়াকে স্বামীজী বিভিন্ন জায়গায় এই বলে ব্যাখ্যা করছেন, Maya is a statement of fact, মায়া আছে ব্যস এইটুকু, এর বাইরে আর কিছু জানা যায় না। এক হিন্দু রমণী, তার স্বামী আছে, হিন্দু সমাজ তাকে শিক্ষা দিয়েছে তুমি পতিব্রতা হও। স্বামীজীও বলছেন, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী তোমার আদর্শ, সেও তাই শিখে এসেছে। এবার সেই স্বামী একটা লম্পট, মাতাল। রোজ মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরে স্ত্রীর উপর অত্যাচার করে, স্ত্রী চাইলে তাকে ডাণ্ডা মেরে বাড়ি থেকে বার করে দিতে পারে, কিন্তু পারে না, এটাই মায়া। মা ছেলেকে ভালবাসে, ছেলে রোজ মায়ের কাছ থেকে বাবার টাকা নিয়ে ফুর্তি করে বেড়ায়, টাকা না দিলে মায়ের উপর অত্যাচার করে। মা শুধু চোখের জল ফেলে আর বলে, 'আমি চলে গেলে বুঝবি তোর কপালে কি আছে, তোকে তো আমি ছাড়া আর কেউ দেখার নেই, তখন বুঝবি আমি তোর জন্য কি করেছি'। ছেলে বলে, 'যাও না কে তোমাকে আটকাচ্ছে'। মা তবুও ছেলের প্রতি ভালবাসা ছাড়তে পারে না, এটাই মায়া। সে জানে কাজটা ভুল হচ্ছে কিন্তু না করে থাকতে পারে না, এটাই মায়া। মায়ার আসল কাজ হল আবরণ বিক্ষেপ, যে

জিনিসটা আছে ওটাকে ঢেকে দেয়, যেটা নেই সেটাকে দেখিয়ে দেয়। ম্যাজিসিয়ানরা যেমন দেখায়, একটা গ্লাশকে ঢাকা দিয়ে দিল, ঢাকা সরিয়ে দিল, সবাই দেখছে গ্লাশের জায়গায় একটা পায়রা এসে গেছে। যদি ম্যাজিকের দৃষ্টিতে দেখা হয় তাহলে পায়রাটা এলো কোথা থেকে? আসলে ছিল অন্য কিছু, দেখাচ্ছে আরেকটা কিছু। সেইজন্য মায়াকে অনেক সময় জাদুকরী, মায়াজাল রূপে দেখা হয়। কিন্তু যেভাবেই আমরা ব্যাখ্যা করি না কেন, যত শব্দই আনা হোক না কেন, মায়াকে কোন দিন কেউ বোঝাতে পারবে না, সম্ভবই নয়। আর যত দিন মায়াকে না বোঝা যাবে তত দিন বেদান্তকেও বোঝা যাবে না। সেইজন্য স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, Time, Space and Causation এটাই মায়া। অখণ্ডই আছে, কিন্তু কোথা থেকে দেশ, কাল আর কারণ এসে সব কিছুকে খণ্ডিত করে দিল, এটাই মায়া। ঠাকুর তিন বন্ধুর গল্প বলছেন, তিন বন্ধু এক জায়গায় গিয়েছে, সেখানে বিরাট প্রাচীর, প্রাচীরের ওপারে খুব নাচ গান হচ্ছে। একজন বন্ধু কোন রকমে প্রাচীরে উঠে ওই আনন্দের ফোয়ারা দেখে সে ওখান থেকেই ঝাঁপ মারল, অন্যদের আর খবর দিতে পারল না। দ্বিতীয় বন্ধুরও একই হাল হল। তৃতীয় জনেরও সেই একই অবস্থা হল। অখণ্ড আর এই জগৎ মাঝখানে এই দেওয়াল। দেওয়ালে যদি একটা ফুটো করে দেওয়া হয়, ওই ফুটো দিয়ে সেই অনন্ত অখণ্ডের রূপ দেখা যায়। অবতাররা হলেন সেই ফুটো, অবতারকে দিয়ে সেই অখণ্ডকে জানা যায়। অখণ্ড আনন্দকে একটা প্রাচীর দিয়ে বিভাজন করে দিচ্ছে, এই প্রাচীর যেটা বিভাজিত করছে, স্বামীজী সেটাকে সহজ করে আমাদের ভাষায় বলছেন, time, space and cuasation।

Time মানে কাল, তন্ত্র ঠিক এই মতের উপর দাঁড়িয়ে আছে; যেখানে কাল সেখানে কালী, মহাকাল, এটাই অখণ্ড আর জগতের মাঝখানে বিভজান রেখা, যা কিনা সচ্চিদানন্দকে জগৎ থেকে আলাদা করে দিচ্ছে। যেমনি কাল আসে তেমন space এসে যায়। Time আর space থাকলে সেখানে ক্রিয়া হবে। এটাও একটা পরিভাষা, কিন্তু মায়ার কখন সঠিক পরিভাষা হতে পারে না। তাহলে মায়াকে জানা যাবে কি করে? ধ্যান করে। শাস্ত্রের কথা শুনে অনুধ্যান করবে, নিদিধ্যাসন করবে, তখন বুঝতে পারবে এটাই মায়া। জীবনে যে আমরা এত কষ্ট পাচ্ছি, সব মায়ার জন্যই পাই। কেন মায়ার জন্য? কারণ আমরা নিজেকে এই দেহ মনে করি। একজন খুব দুঃখ করে বলছে, ভালবাসা খুব বাজে জিনিস, শুধু চোখের জলই ফেলতে হয়। তাকে বলা হল, তাহলে ভাল না বাসলেই তো হয়। প্রত্যুত্তরে সে বলছে, ভাল না বেসে থাকা যায় না, চোখের জলও ফেলব, ভালও বাসব। এটাই মায়া।

মায়া যেমন ব্যষ্টি স্তরে আছে, তেমনি সমষ্টির স্তরেও মায়া আছে। সমষ্টি স্তরে যে মায়া তাকে বলে অবিদ্যা বা মায়াও বলা হয়। মায়ার আরেকটা নাম অজ্ঞান, ব্যষ্টির স্তরে বলে অজ্ঞান, সমষ্টির স্তরে বলে মায়া। স্বামীজী এখন বলছেন, এই যে Word, এটাই মায়া। এবার Wordকে যদি সরিয়ে তার জায়গায় মায়াকে বসিয়ে দেওয়া হয়, তখন পুরোটা এই ভাবে দাঁড়াবে, মায়া তখন ঈশ্বরের সাথে ছিল, কিন্তু মায়া ঈশ্বর নয়। স্বামীজী মায়া শব্দটা আনছেন। কিন্তু তন্ত্র মতে যদি নেওয়া হয় তখন মায়া না হয়ে শক্তি এসে যাবে, শক্তি ঈশ্বরের সঙ্গে এক, শক্তিই ঈশ্বর। তন্ত্রেও শিব আর শক্তিকে এক বলা হয়। কিন্তু স্বামীজী হলেন বেদান্তের আচার্য, তিনি বেদান্তের ভাবে পর পর ব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন।

এই যে মায়া, এটাই ঈশ্বরের প্রকাশ, manifestation, এটাই ঈশ্বরের শক্তি, শক্তি আর শক্তিমান এক। মায়াকে আমরা যেভাবে মনে করি যে বোকা বানানো হচ্ছে, ভুল দেখানো হচ্ছে, তার মানে ঈশ্বর একটা ভেলকি লাগিয়ে রেখেছেন, জাদুকর যেমন ভেলকি দেখিয়ে যাচ্ছে, এই অর্থে মায়াকে আনা হয় ঠিকই, কিন্তু তার ঠিক ঠিক শব্দ হয় ঈশ্বরের শক্তি। তাহলে মায়া না বলে পরিষ্কার শক্তি বললেই হয়। মায়া শব্দকে কেন আনছেন? তন্ত্র মতে শিব-শক্তি এক বলছে, তারাই তো ঠিক বলছে। না, ঠিক নয়, কারণ ঈশ্বরীয় শক্তি বা দৈবী শক্তি, আর আমার আপনার যে শক্তি, এই দুটোর মধ্যে তফাৎ আছে। নির্বিকল্প সমাধিতে দেখে অখণ্ড ছাড়া কিছু নেই। শক্তি যদি সত্য হয় তাহলে নির্বিকল্প সমাধিতেও সেটা থাকবে। যদিও নির্বিকল্প সমাধিতে কি হয় মুখে বলা যায় না, এই অর্থে বলা যায় না, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় আর জ্ঞান তিনটে মিলে এক হয়ে যায়। অখণ্ড মানে সেখানে দুইয়ের কোন সম্ভবনা নেই, তার মানে ঠাকুরের যে ভক্ত ঠাকুরের সাধনা করে করে নির্বিকল্প অবস্থায় যাওয়ার পর তার কাছে ঠাকুরও থাকছেন না, থাকছে সেই এক অখণ্ড। এই অখণ্ডকে একও বলা যায়

না, শূন্যও হয় না আর দুইও হয় না। এই যে বহু দেখাচ্ছিল, হঠাৎ দেখাচ্ছে সেই বহু নেই, সেই একও নেই, অদ্বৈত, অখণ্ড। সেইজন্য ওনারা মায়া শব্দটা নেন। তন্ত্র মতে শক্তি বললে একটা বড় তফাৎ হয়ে যায়, তন্ত্রে শক্তি সত্য, শিব সত্য, শিব আর শক্তির মিলনে যে জগতের উৎপত্তি সেটাও সত্য, তার মানে বহুটাও সত্য। ধ্যানের গভীরে তাদের শেষ কথা হল শিব আর শক্তিকে একসাথে দেখা, কৈলাসে গিয়ে বাস। যদিও পরের দিকে আরেক ধাপ নিয়ে গিয়ে দেখান, কিভাবে সেই অখণ্ডই শিব আর শক্তি হয়ে যান। এদেরও অনেক যুক্তি তর্ক আছে।

কিন্তু আচার্য শঙ্করের methodologyতে সোজাসুজি বলে দিচ্ছেন শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতি। এখানে আমার তোমার আবেগের কথা চলবে না, দেখতে হবে বেদে কি বলছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের অনুভূতি কি রকম। এবার সব কটাকে যুক্তি দিয়ে যোগ কর, reasoning নিয়ে এসো, তোমার reasoning আমার চলবে না, reasoning যেটা চলবে তার আবার পরিষ্কার নিয়ম-কানুন আছে। এই পরিষ্কার নিয়ম-কানুন আবার শঙ্করাচার্য দিচ্ছেন না, অন্যান্য যাঁরা ন্যায় মতে চলেন, পূর্বমীমাংসার মতে চলেন, তাঁরা যুক্তি কিভাবে হবে, তার পদ্ধতি নির্ধারিত করে দিয়েছেন, আচার্য শঙ্কর ওনাদের নির্ধারিত পদ্ধিতেই যুক্তিকে নিয়ে যাচ্ছেন। সেই নিয়মে যুক্তি-তর্ক এনে এবার তিনি সব কটাকে কেটে উড়িয়ে দিয়ে দেখাচ্ছেন তন্ত্র মত নেওয়া যাবে না, দ্বৈত মত নেওয়া যাবে না, বিশিষ্টাদ্বৈত মতও নেওয়া যাবে না। ওদেরই তৈরী নিয়মে পুরো reasoning করে করে দেখাচ্ছেন এগুলো কোনটাই থাকবে না। কি থাকবে? অদ্বৈতম্। তাহলে বহুটা কি? বহু আদপেই নেই। কিন্তু আমি তো এখানেই দেখছি আমি, আপনি, সবাই আলাদা। বলছেন এটাই মায়া। সেই অখণ্ডকে যে বহু রূপে দেখাচ্ছে এটাই মায়া। আর এই মায়া কোন ম্যাজিক নয়, কোন ছলনা নয়, এটাই দৈবী শক্তি। কারণ তিনিই বহু হয়ে দেখাচ্ছেন, সেইজন্য এটা ছলনা নয়। আমাদের যখন কেউ বোকা বানায় তখন সেখানে কেউ একজন আমাদের সাথে ছলনা করছে, এই জায়গায় কেউ ছল করছে না। ভগবান কাউকে ঠকাচ্ছেন না, ভগবান আমাদের পরীক্ষা নিতেও এখানে পাঠাননি, কিছুই নয়। ওনার ইচ্ছা হয়েছে, আমি এক আমি বহু হব। তখন তিনিই গাছপালা হয়ে গেলেন, তিনিই সিংহ-বাঘ হয়ে গেলেন, তিনিই সাপ-বিছে হয়ে গেলেন, তিনিই মানুষ হয়ে গেলেন। সেই সাপ যখন মানুষকে ছোবল দিচ্ছে, তখন ঠিক ঠিক বেদান্তী বলবেন, এই দেখো! সেই সাপ রূপী নারায়ণ মানুষ রূপী নারায়ণকে ছোবল দিল আর এই মানুষ রূপী নারায়ণ চিৎপটাং হয়ে পড়ে গেল। দর্শক রূপী নারায়ণ বলল, এই লোকটি পটকে গেছে। আসলে কিছুই হচ্ছে না, সেই নারায়ণে কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। কিন্তু দেখাচ্ছে সেই নারায়ণ সাপ হয়ে গেছে, সেই নারায়ণ মানুষ হয়ে গেছে, সাপ মানুষকে ছোবল দিচ্ছে। এই এক বহু হয়ে যাওয়া ঈশ্বরীয় শক্তি ছাড়া সম্ভব নয়। কিন্তু এটা কোন বাস্তবিক পরিবর্তন হচ্ছে না, যদি বাস্তবিক পরিবর্তন হত তাহলে এটাকে শক্তি বলা হত। কিন্তু যেহেতু বাস্তবিক পরিবর্তন হয় না, সেইহেতু বেদান্তে শক্তি না বলে মায়া বলা হয়। স্বামীজীও এটাকে মায়া বলছেন।

এবার স্বামীজী ব্যাখ্যা করছেন, এই যে the Word, এই মায়া, এই শক্তি, যে তিনটে শব্দ আমরা বললাম, সেটাকে স্বামীজী বলছেন অখণ্ড; যিনি অখণ্ড তিনি Absolute। স্বামীজী ব্রহ্ম শব্দ ব্যবহার করতেন ঠিকই, কিন্তু বিদেশীরা ব্রহ্ম শব্দ বুঝবে না বলে তিনি প্রায়ই Absolute শব্দটা ব্যবহার করতেন। থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে স্বামীজীর একজন শিষ্য জয়েন করেছিলেন, ওনার একটু বয়স হয়ে গিয়েছিল। ভদ্রলোক খুব মন দিয়ে স্বামীজীর কথা দু-ঘন্টা ধরে শুনতেন। স্বামীজী কখনই বসে ক্লাশ নিতেন না, তিনি লেকচার দেওয়ার সময় ঘুরে ঘুরে বলতে থাকতেন। এতে এটাই ইঙ্গিত করছে যে, ওনার চিন্তা-ভাবনা তখন এত জোরালো ছিল যে ওনাকে স্থির হয়ে বসতে দিত না। চার-পাঁচ বছরের বাচ্চারা কিছুতেই বসে থাকতে পারে না, ওদের চিন্তা এত জোরালো যে ওরা নিজেকে ধরে রাখতে পারে না, ছটফট করতে থাকে। বয়স হয়ে যাওয়ার পর, শঙ্করাচার্য বলছেন *বৃদ্ধাস্তাব চিন্তামগ্না*, একটা দুশ্চিন্তা এসে গেল এবার ওটাতেই ডুবে আছে, বয়স হয়ে গেলে চিন্তাশক্তি থাকে না বলে বৃদ্ধরা নড়াচড়াও করতে পারে না। যাদের চিন্তা-ভাবনা জোরালো তারা একটা জায়গায় স্থির হয়ে বসে থাকতে পারবে না। পাগলগুলো এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে থাকতে পারে না, কারণ ভিতরে তাদের চিন্তা-ভাবনাগুলো চন্ চন্ করে তাদের নাচিয়ে যাচ্ছে। স্বামীজী ক্লাশ নিচ্ছেন, ওই ভদ্রলোক প্রত্যেক দিন দু-ঘন্টা ক্লাশ হয়ে যাওয়ার পর স্বামীজীকে বলতেন, So Swamiji! You want to say that we are Absolute। উনি বলতে চাইছেন, বক্তব্য হল আমরা Absolute তো? ভদ্রলোক দিনে এই একটা কথা

এতবার করে বলতেন যে ক্লাশের সবাই ওনার নামই Absolute দিয়ে দিয়েছিলেন। এই অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে স্বামীজী বলছেন Absolute।

প্রকৃতি ও অবতার

স্বামীজী বলছেন, The Absolute reflecting through the universe is what we call nature. (*যখন সেই নিরপেক্ষ ব্রহ্মসত্তাকে আমরা বিশ্বজগতে প্রতিফলিত দেখি, তখন তাকে প্রকৃতি বলে থাকি।*) সেই যে অখণ্ড, সেই যে Absolute, সেই যে ভগবান, সেই যে ঈশ্বর, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তাঁর যে প্রতিচ্ছবি দেখি, এটাই প্রকৃতি। আগে আমরা বলেছি, এখনও বলছি, পরেও বলব, স্বামীজী যেভাবে যে যে কথাগুলো বলেছিলেন, ঠিক সেইভাবে নোটস্ গুলো পুরোপুরি আমাদের কাছে আসেনি, স্বামীজী যেটা বলতে চেয়েছিলেন সেটাকে কয়েকটা বাক্যে লেখা আছে, এই রচনাকে কোন দিন ভাল ভাবে সম্পাদনা করে নূতন ভাবে সাজানো হয়নি, আর সম্ভবও নয়; কারণ স্বামীজী যা বলেছিলেন আজ তা হারিয়ে গেছে; কিন্তু essenceটা থেকে গেছে। এখন তাই স্বামীজী শব্দটা যদি একটু ডানদিক বামদিক বলে থাকেন, আমরা সেটা জানি না। যাঁরা বেদান্ত জানেন, বেদান্ত অধ্যয়ন করেছেন, যাঁরা শঙ্করাচার্যকে পড়েছেন, ঠাকুরের কথামৃত পড়েছেন তাঁরা জানবেন, Inspired Talksএ যে কথাগুলো আছে তাতে বেদান্তের সাথে কোথাও অমিল কিছু নেই। স্বামীজী এখানে শব্দটা নিচ্ছেন reflection, প্রতিবিম্ব বা অন্য ভাবে আমরা বলতে পারি, এই যে চৈতন্যের আলোতে আলোকিত হয়ে রয়েছে, বাইরে আমরা গাছপালা দেখছি, সামনে লোকজন দেখছি, আসলে জগৎ তো পদার্থের, এর উপর চৈতন্যের আলো যেটা পড়েছে এটাকেই আমরা বলছি প্রকৃতি।

মানুষের যেমন প্রকৃতি হয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরও প্রকৃতি আছে। ফিজিক্স, কেমেস্ট্রি, বায়োলজি, বিজ্ঞানের যত শাখা আছে, এরা সমস্ত কিছুর যে study করছে এটাকেই বলছি study of nature। সেইজন্য এর নামই হল natural sciences। প্রথমের দিকে ইউরোপে যে বিদ্যার চর্চা শুরু হয়েছিল, সেই চর্চা এসেছিল ফিলজফি থেকে, এ্যরিস্টটল এবং অন্যান্য দার্শনিকদের থেকে। বাকি বিদ্যা গুলিকে ওনারা বলতেন natural sciences। যদিও natural sciences বলা হচ্ছে, কিন্তু তাঁরা যখন ডিগ্রী দিতেন সেটা ফিলজফিতেই দিতেন। যার জন্য এখনও পিএইচডি, ডক্টর অফ ফিলজফি বলা হয়। সে হয়ত ডক্টরেট পেয়েছে গণিতে কিন্তু বলা হয় গণিতে পিএইচডি করেছে। কারণ ওদের কাছে একটাই সাবজেক্ট ছিল, ফিলজফি। Natural Scienceকে ওনারা খুব হেয় দৃষ্টিতে দেখতেন। গণিত, বায়োলজি, কেমেস্ট্রি এগুলো কিছু না, আসল হল ফিলজফি। এখন উল্টো হয়ে গেছে, এরা এখন ফিলজফিকে হেয় দৃষ্টিতে দেখে, কিন্তু ডিগ্রীটা এখনও ডক্টর অফ ফিলজফি রয়ে গেছে। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপর যখন ঈশ্বরের আলো পড়ে তখন আমরা তাকে বলি প্রকৃতি আর ব্যষ্টি মানুষের মধ্যে যখন ঈশ্বরের আলো পড়ে তখন সেটাকেও প্রকৃতি বলা হয়। সমষ্টি প্রকৃতিও যা মায়াও তাই, শব্দ ব্রহ্মও তাই।

বাইবেল থেকে শুরু করে কখন যে স্বামীজী বেদান্তে ঢুকে যাচ্ছেন বোঝা যায় না। প্রসঙ্গ শুরু করলেন বাইবেল থেকে কিন্তু এবার তিনি ঢুকে গেলেন বেদান্তে। স্বামীজী বলছেন, The Word has two manifestations – the general one of nature, and the special one of great Incarnations of God – Krishna, Buddh, Jesus, and Ramakrishna, Christ। (*শব্দের দুটি বিকাশ, একটি এই প্রকৃতি – এইটিই সাধারণ বিকশ; আর এর বিশেষ বিকাশ হচ্ছে কৃষ্ণ, বুদ্ধ, ঈশা, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতার-পুরুষগণ।*) একদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু এনারা হলেন অবতার আর অন্য দিকে থেকে গেল প্রকৃতি। স্বামীজী আবার বাইবেলের সঙ্গে বেদান্তকে link করে দিলেন। এই যে Word বলা হল, এটা হল ঈশ্বরীয় শক্তি যেটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড; ফিজিক্স, কেমেস্ট্রি যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তা না। সমগ্র সৃষ্টি, যার মধ্যে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে; সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে দুটো সত্তা এসে যায়। একটা সত্তা হল যেটাকে আমরা প্রকৃতি, nature বা Word বলে জানি, আর দ্বিতীয় হল ঈশ্বরের অবতার রূপে আমরা যাঁদের জানি। যখন মানুষ রূপে থাকেন তখন অবতার বলি, পরে ভগবান বলা হয়। তার মানে, সেই ব্রহ্ম, সেই ঈশ্বর, সেই গড্, তাঁর প্রতিবিম্ব যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রতিফলিত হয়, যখন তাঁর শক্তির খেলা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে চলে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটাও তাঁর খেলা, তখন এই Word, এই মায়া, এই শক্তি। এই প্রকৃতি দু ভাবে আসে – একটা হল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে

যেটাকে প্রকৃতি বা nature বলা হয়, আরেকটা হল তাঁর দিব্য স্বরূপ, যেটাকে আমরা অবতার বা incarnation বলি।

গীতার সপ্তম অধ্যায়ের চার ও পাঁচ নম্বর শ্লোকে ঠিক এটাকেই ভগবান বলছেন, *ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতিয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা। অপরেয়মিতস্তন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ।।* ভগবান বলছেন, আমার দুই প্রকার প্রকৃতি, পরা প্রকৃতি ও অপরা প্রকৃতি। পরা হল শ্রেষ্ঠ আর অপরা হল নিকৃষ্ট। আমার অপরা প্রকৃতি দিয়ে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নির্মিত হয়েছে, যেটা ক্রমাগত পরিবর্তন হতে থাকে। আর আমার পরা প্রকৃতি *যয়েদং ধার্যতে জগৎ*, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করে আছে। এই পরা প্রকৃতিই যুগে যুগে অবতার হয়ে আসতে থাকেন। সেই ভগবান, তিনি বললেন সৃষ্টি হোক, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়ে গেল। তাই ভগবানের বাইরে কিছু নেই, যা কিছু আছে ভগবানের মধ্যেই আছে।

অন্য ভাবে বলা হয়, ভগবানের চিৎ শক্তি যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ঢুকে যায় তখন তা দুই রূপে আসে – matter and spirit। Matterকেই আমরা প্রকৃতি রূপে জানছি, spiritকে ঈশ্বরীয় শক্তি বা ঈশ্বর রূপে জানি, যেটা খুব সহজ ভাবে এখানে স্বামীজী বলছেন, ঈশ্বরীয় অবতার। যেখানেই অবতার সেখানেই সেই ভগবান, তাঁর প্রতিবিম্ব বা তাঁর manifestation, তা তিনি বুদ্ধই হন, ঈশাই হন, রাম হন, কৃষ্ণ হন বা রামকৃষ্ণই হন, সেখানে ঢুকছে এই Word শব্দ দিয়ে। সেইজন খ্রীশ্চানরা বলে Jesusই হলেন Word। খ্রীশ্চানরা Word বলতে Jesusকেই বোঝায়, কিন্তু আমরা বুদ্ধ, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, যীশু, শ্রীরামকৃষ্ণ সবাইকে ভগবানের অবতার, ভগবানের পরা প্রকৃতির আবির্ভাব মনে করি। ভগবান আর অবতার আলাদা কিছু নন, দুজনই এক। শঙ্করাচার্য, যিনি ঘোর অদ্বৈতবাদী, তিনি তাঁর গীতার ভাষ্যে একই কথা বলছেন, *স চ ভগবান জ্ঞানৈশ্বর্যশক্তিবলবীর্যতেজোভিঃ সদা সম্পন্ন*, সেই ভগবান, তিনি যখন অবতার হয়ে আসেন তখন ঈশ্বরের জ্ঞান, ঐশ্বর্য, শক্তি, বল, বীর্য ও তেজ এই গুণে সদাসম্পন্ন হয়েই থাকেন। *স্বপ্রয়োজনাভাবেহপি ভূতানুজিঘৃক্ষয়া*, আর তিনি জগতের সবার মঙ্গলের জন্যই অবতীর্ণ হন, তিনিই বাসুদেব, শ্রীকৃষ্ণ হয়ে অবতার হয়েছেন। শঙ্করাচার্য একই কথা বলছেন। আর ভগবানের সেই শক্তি এই জগৎকে ধারণ করে আছে – এটাই Word। বাইবেল হিন্দুদের থেকে আলাদা কিছু বলছে না। কিন্তু খ্রীশ্চানরা নিজের মত বোঝে, অপরকে মানতে চায় না, বুঝতে চায় না, তার থেকেও বাজে, বুঝতে পারেও না।

থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে যাঁরা ছিলেন তাঁরা পরে নিজেদের স্মৃতিকথায় লিখছেন, স্বামীজী বাইবেল দিয়ে শুরু করে বেদান্তে চলে যেতেন, তখন বোঝা যেত না কখন বাইবেল আর বেদান্ত মিলে এক হয়ে যেত, আমরা এখন বাইবেল পড়ছি নাকি বেদান্ত পড়ছি। শেষমেশ গিয়ে দেখা যায় দুই ধর্ম কখনই দুই ধরণের কথা বলতে পারে না। দুটো ধর্মের সিদ্ধান্তকে link করার জন্য দরকার পরে একজন বিরাট মাপের master mind। Master mind যদি না হয়ে থাকেন তাহলে কখনই দুটো ধর্মের মূল সিদ্ধান্তকে এক জায়গায় আনতে পারবেন না, আনবেন যদি তিনি অবতার হয়ে থাকেন। কিন্তু সাধারণ ভাবে দেখা যায় যাঁরা অবতার ছিলেন তাঁরা এক অপরের কথা তেমন কিছু জানতেন না। যাঁরা অল্প একটু জানতেন তাঁরা বলতেন, তিনি একই কথা বলছেন। কিন্তু এখন বিদ্যার অনেক প্রসার হয়ে গেছে তাই এখন সবাই সবার কথা জানেন।

বাইবেলে বলা হচ্ছে In the beginning was the Word, আর স্বামীজী বলছেন এটাই প্রকৃতি, এই প্রকৃতি দুই প্রকার, পরা ও অপরা। বাইবেল আর বেদান্তকে স্বামীজী এই একটা কথা দিয়ে link করে দিলেন। এই একটা জিনিসকেই ব্যাখ্যা করতে আমাদের কত সময় লাগছে, অথচ স্বামীজী কথাটা বলে বেরিয়ে যাচ্ছেন। সেইজন্য ঠিকমত ব্যাখ্যা না করা হলে Inspired Talks কিছুই বোঝা যাবে না। আমরা এর আগে একটা কথা বলেছিলাম, যেখানে স্বামীজী বলছেন, আমি এবার কয়েকজন যোগী তৈরী করতে চাই। স্বামীজী নিজের উপস্থিতি দিয়েই তাঁদের সবার মনকে যেন পাল্টে দিচ্ছেন, মনকে পাল্টে দিয়ে সেখানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আধ্যাত্মিক সিদ্ধান্তের চূড়ান্ত সত্যগুলিকে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন। স্বামীজী এখানে যা যা বলছেন তা একেবারে শেষ অবস্থার কথা বলছেন।

শ্যামপুকুরবাটীতে ঠাকুর আছেন, ডাঃ সরকার ও গিরিশ ঘোষও আছেন, সেখানে গিরিশ ঘোষ ডাঃ সরকারকে বলছেন, আমি প্রমাণিত করে দেব যে কৃষ্ণ ভগবান, তা নাহলে আমার জিব কেটে ফেলব। ঠাকুর বলছেন, উগুনো কিছু না। বলতে চাইছেন, আবোলতাবোল বলছেন। রাস্তাঘাটে, পাড়ার চায়ের দোকানে, ক্লাবে, বাসে-ট্রেনে প্রায়ই চ্যাংড়া থেকে বয়স্করা তর্ক জুড়ে দেয়, একদল বলতে চাইছে ঈশ্বর বলে কিছু নেই, আরেক দলের বক্তব্য ঈশ্বর অবশ্যই আছেন। মাঝে মাঝে আমাদেরও ইচ্ছে করে তর্কের মাঝখানে ঢুকে আমারও একটা বক্তব্য আছে বলে দুটো কথা বলি। ভগবান আছেন এটা একটা ধর্মীয় কথা, ধর্মজগতের কথা। স্বামীজী যখন বলছেন, ঈশ্বর আছেন, তখনও ধর্মীয় কথা, ঠাকুর যখন বলছেন, ঈশ্বর আছেন, ধর্মীয় কথা। আর ঠাকুর যখন দক্ষিণেশ্বরে ঘরের দরজা বন্ধ করে নরেনকে বলছেন, ঈশ্বর আছেন, তখন সেটা একটা অন্য স্তরে চলে যাচ্ছে, যেটা একমাত্র ঠাকুর জানেন আর স্বামীজী জানেন। আমাদের কাছে এগুলো শব্দ মাত্র, ওনাদের দুজনের মধ্যে ওটা একটা সত্য। থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে ঠিক এই জিনিসটাই হচ্ছে। অনেক সময় যেগুলো ধর্মের কথা সেগুলো আলোচনা হচ্ছে, কিন্তু তখন সেগুলো আর শব্দ মাত্র থাকছে না, যেগুলো আমরা সচরাচর বলে থাকি। এগুলোই আধ্যাত্মিক সত্য, যেটা স্বামীজী জানেন সেটাকেই transfer করে দিচ্ছেন ওই কয়েকজন শিষ্যদের মধ্যে যাঁরা স্বামীজীর ক্লাশ শুনছেন। স্বামীজী বাইবেল থেকে বলতে শুরু করলেন, প্রথম বাক্যেই বলছেন, In the beginning was Word, এই 'the Word' শব্দের ব্যাখ্যা করে স্বামীজী বলছেন, manifestation of the absolute in nature, যেটাকে Word বলা হল, এই Wordকে এবার ঠিক ঠিক traditional অর্থে নিয়ে আসছেন, এটাই প্রকৃতি – পরা প্রকৃতি ও অপরা প্রকৃতি, জগৎ আর জগতের অবতার। খ্রীশ্চানরাও এটাই মানে, তারা বলে এই 'Word'ই হল ঈশা। স্বামীজী ব্যাখ্যা করছে, 'Word' মানে শুধু যীশুই নন, যে কোন অবতার। কিন্তু ঐ অবতার আর ভগবান আলাদা কিছু নন, দুজনই এক।

বিশেষ কয়েকজনকেই অবতার তাঁর স্বরূপের একটু ঝিলিক দেখিয়ে দেন

স্বামীজী বলছেন, Christ, the special manifestion of the Absolute, is known and knowable. (*সেই নির্গুণ ব্রহ্মের বিশেষ বিকাশ যে খ্রীষ্ট, তাঁকে আমরা জেনে থাকি, তিনি আমাদের জ্ঞেয়।*) এই যে জগতে ঈশ্বরের যে প্রকাশ, যেটা special manifestation, পরা প্রকৃতি রূপে যেটাকে বলা হচ্ছে, অবতার যাঁকে বলা হচ্ছে, একমাত্র তিনিই known and knowable। ভগবানকে কোন দিন জানা যাবে না, কারণ তিনি মায়ার পারে, তিনি absolute, ব্রহ্মকে কোন দিন জানা যাবে না। ঠাকুর বিদ্যাসাগরকে বলছেন, সব কিছু উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু ব্রহ্ম কোন দিন উচ্ছিষ্ট হবে না। কারণ ব্রহ্মকে কোন দিন কেউ জানতে পারবে না, যাকে জানা যাবে না তাকে মুখ দিয়ে কি করে বলবে! যদি ভগবানকে জানতে হয় তাহলে তাঁর প্রকৃতিকে দিয়ে জানতে হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আমরা আজকে জানতে পারি না, কিন্তু তাঁর রচিত সাহিত্য দিয়ে তাঁকে জানতে পারি। একজন লোককে জানার ব্যাপারে আমরা অন্য ভাষায় বলি, তার প্রকৃতি দিয়ে তাকে জানা যাবে সেই লোকটি কেমন। ঈশ্বরকেও তাঁর প্রকৃতি দিয়ে জানা যায়। কিভাবে? এই ভাসমান জগৎকে দিয়ে। কিন্তু জগৎ হল তাঁর অপরা প্রকৃতি, আর পরা প্রকৃতি দিয়ে তিনি অবতার রূপে আসেন। সেইজন্য ঈশ্বরকে যদি জানতে হয় তাহলে আমাদের অবতারকে জানতে হবে। বাইবেলে এই কথাই বলছেন, if you have known the son, you have known the Father, পুত্রকে জানলে তার বাবাকে জানা যায়। সন্তানকে জানলে কি বাবাকে জানা হয়? কখনই জানা হয় না, সন্তান হয়ত একটা লম্পট, বাবা হয়ত একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। কিন্তু এখানে এই বাবা-সন্তানের কথা বলা হচ্ছে না, ঈশ্বরের কথা বলা হচ্ছে, বাইবেলে Son বলতে সেই অবতারের কথা, Jesusএর কথা বলা হচ্ছে। এটাই এখানে বলছেন, অবতারকে জানা যা ঈশ্বরকে জানাও তাই। জন তাঁর প্রথম লাইনে বলছেন, and the Word was God, অবতার হলেন ভগবান। শুধু বাইবেলই এই কথা বলছেন না, শঙ্করাচার্য গীতার ভাষ্যে পদে পদে বলছেন, সেই যে ব্রহ্ম তিনিই নারায়ণ, আর তিনিই বাসুদেব কৃষ্ণ। পরে স্বামীজী বলবেন সেই ব্রহ্ম, তিনিই আত্মা। ব্রহ্মকে, ঈশ্বরকে কোন দিন জানা যাবে না, একমাত্র অবতারের মাধ্যমেই তাঁকে জানা যায়।

ভারতের বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন প্রান্তে মাঝে মাঝে হঠাৎ হঠাৎ করে কেউ বলে ওঠেন আমি অবতার, সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষরাও দলে দলে দৌড়ে দৌড়ে দেখতে যাচ্ছে। অনেকে এসে সন্ন্যাসীদের প্রশ্ন করে, এই

যে অমুক বাবাজি বলছেন তিনি নাকি ঠাকুরের অবতার, আপনি কি এগুলি মাননে? সন্ন্যাসীরা কেউ তাঁর নামই শোনেননি, কিছু দিন পরে খবরকাগজে বেরোল, সেই বাবাজী নাকি কি কি কেলেঙ্কারিতে ধরা পড়ে জেলে চলে গেছে। যে কেউ নিজেকে অবতার বলে দিতে পারে, আর সত্যিই এভাবে অবতারকে জানা যায় না, জানতে পারবেও না। কথামৃতে ঠাকুর বলছেন, ঋষিরাও শ্রীরামচন্দ্রকে অবতার বলে চিনতে পারলেন না, শ্রীকৃষ্ণকেও লোকেরা চিনতে পারল না। আজকে ঠাকুরের নামে কত কি হচ্ছে, দেশে-বিদেশে তাঁর নামে মন্দির হচ্ছে, কিন্তু বেঁচে থাকার সময় তাঁকে কজন চিনতে পেরেছিলেন? স্বামীজীও কি প্রথম দিনেই তাঁকে অবতার বলে মেনে নিতে পেরেছিলেন? অবতারের বিশেষ শক্তি থাকে, সেই শক্তি তিনি বিশেষ কয়েকজনের উপরেই দেখান, সবার উপর দেখান না। সেইজন্য যে কোন অবতার যদি অনেককে, বিশেষ করে দশ বারোজনের বেশি লোকেদের নিজের শক্তি দেখাতে যান তাহলে বুঝতে হবে কিছু গোলমাল আছে। গণবিবাহ হতে পারে কিন্তু গণআধ্যাত্মিকতা কখনই হয় না, কোন দিন হবেও না, ধর্মেও গণধর্ম বলে কিছু হয় না।

অবতার বিশেষ কয়েকজনকে বেছে নেন, এই কয়েকজনকে নেওয়া হল, এর মধ্যে এই এই গুণ আছে, ওর মধ্যে বিদ্যা বুদ্ধি হয়ত নাও থাকতে পারে, কিন্তু বিরাট সাত্ত্বিক গুণ আছে। তখন তিনি তাঁর যে স্বরূপ, তাঁর যে অখণ্ড জ্ঞান ও ভক্তির ভাণ্ডার, তার একটা ঝলক তাকে দেখিয়ে দেন। অবতারের সংজ্ঞাতে বলা হয়, তিনি জ্ঞান ও ভক্তি শেখাতে আসেন। জ্ঞান ভক্তি যদি তিনি তাকে শেখাতে যান, ফিউজ উড়ে যাবে, ভোল্টেজ বেশি এসে গেলে ফিউজ উড়ে যাবে। অবতার হলেন সাক্ষাৎ ভগবান, ভগবান আর অবতার এক। এবার তিনি কয়েকজনকে বাছলেন, কাদের বাছলেন? স্বামী অদ্ভূতানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, এনাদের মত আরও কয়েকজনকে। কিন্তু এনারা তো মানুষ, কেউ তো এনারা ভগবান নন, তা আমরা ঈশ্বরকোটিই বলি, নিত্যসঙ্গী বলি, যাই বলি না কেন, গুণগত ভাবে তফাৎ আছে। এবার অবতার তাঁদের উপর জ্ঞান ভক্তির চার্জ দিচ্ছেন। আমরা কোন রকমে তার সংগ্রহ করে মেইন বক্সের সাথে জুড়ে দিতে পারি, কিন্তু একবার সুইচ্ অন্ করলেই ফিউজ উড়ে যাবে। ওনাদেরও ফিউজ উড়ে যাবে, ফিউজ উড়তে বাধ্য। সেইজন্য দীর্ঘ দিন ধরে তাঁদের একটু একটু করে তৈরী করতে থাকেন। তৈরী করতে করতে মাঝে মাঝে একটু ঝিলিক দেখিয়ে দেন, এই দেখ এটাই জ্ঞান, এটাই ভক্তি, এটা আমার স্বরূপ। এর ফলে ওনাদের মধ্যে একটা অন্য ধরণের আস্থা তৈরী হয়ে যায়।

ভগবান যীশু ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পর তাঁর শিষ্যদের উপর অনেক ভাবে পীড়ন করা হল, কিন্তু কেউ তাঁরা তাঁদের আস্থা থেকে এক চুলও সরলেন না। কারণ তাঁরা সেই দিব্য জিনিস দেখে নিয়েছিলেন, Christএর বাস্তব স্বরূপ তাঁরা জেনে গিয়েছিলেন। তাঁরা সবাই ছিলেন অতি সাধারণ মানুষ, জেলে, মাছ ধরে বেড়াত। কিন্তু যীশু তাঁদের কোথায় তুলে নিয়ে চলে গেলেন। এই যে যীশু তিন বছরের মত তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দিলেন, ঠাকুর পাঁচ বছরের মত শিক্ষা দিলেন, তাঁদের মনগুলোকে একটু একটু করে তৈরী করা হল। তৈরী করার পর একটা ঝিলিক দিয়ে দেওয়া হল, একটা ঝাঁকি দর্শন করিয়ে দিলেন। এরপর তাঁদের মধ্যে একটা গভীর আস্থা তৈরী হয়ে যায়, পরে নিজে সাধন ভজন করে অনেক উপরের দিকে উঠে আসেন। সেখান থেকে শুরু হয় আধ্যাত্মিক নবজাগরণ। আধ্যাত্মিক জাগরণ যে যীশুর জন্য হয় বা শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য হয়, না তা নয়। তাঁরা তাঁদের শিষ্যদের মধ্যে যে দিব্য শক্তি সঞ্চার করে দিলেন, ওটাই এবার মানুষের নেওয়ার উপযোগী হয়।

এর একটা উপমা দেওয়া যেতে পারে, যদিও উপমাটা ততটা ভাল নয়, কিন্তু এই ব্যাপারটা ধারণা করতে সাহায্য করবে। এই জগতে যা কিছু চলে সব সূর্যের আলো দিয়েই চলে। কিন্তু সেই সূর্যের আলো সরাসরি আমরা গ্রহণ করতে পারব না, সরাসরি নিলে আমরা বাঁচতে পারব না। প্রথমে সেই সূর্যের আলো ফটো সিন্থেসিস হচ্ছে, ফটো সিন্থেসিস হয়ে গাছপালা, ঘাস, লতাপাতা হচ্ছে, সেটাকে গরু, ছাগল খাচ্ছে। গরু সেই খেয়ে দুধ দিচ্ছে, সেই দুধ খেয়ে, ছাগলের মাংস খেয়ে আমরা হৃষ্টপুষ্ট হচ্ছি। সেই সচ্চিদানন্দ যেন সূর্য, অবতার যেন তাঁকে ফটো সিন্থেসাইজ করে দিচ্ছে, আর তাঁর শিষ্যরা আমাদের উপযুক্ত করে পরিবেশন করছেন, তবেই আমরা সেই সচ্চিদানন্দকে একটু আমাদের মত নিতে পারি। যারা পেট রোগা, হজম শক্তি কম, তাদের জন্য দুধে আরও জল মেশাতে হয়। তাদেরকে তাই বলতে হয়, তুমি ঠাকুরের নাম নাও তোমার

মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবে। এবার সে দু টাকার সন্দেশ নিয়ে দৌড়ে বেলুড় মঠে ঠাকুরের কাছে চলল। কিন্তু মূল তত্ত্ব হল ঈশ্বরকে যদি জানতে হয় অবতারকে দিয়েই জানতে হবে।

অবতারকে জানাও যা, ঈশ্বরকে জানাও তাই

আর বলছেন, The absolute cannot be known; we cannot know the Father, only the Son. We can only see the Absolute through the 'tint of humanity' through Christ. (*আমরা পরমপিতাকে জানতে পারি না, কিন্তু তাঁর তনয়কে জানতে পারি। নির্গুণ ব্রহ্মকে আমরা শুধু মানবত্ব-রূপ রঙের মধ্য দিয়ে দেখতে পারি, খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে দেখতে পারি।*) ঈশ্বরকে যদি জানতে হয় তাহলে মানুষের যে ভাব, ঐ ভাব দেখলেই আমরা বুঝতে পারি। মানুষের মধ্যে যে মানবীয় গুণের প্রকাশ, ঐ প্রকাশ দিয়েই আমরা একমাত্র ঈশ্বরকে জানতে পারি, এছাড়া ঈশ্বরকে জানার কোন উপায় নেই। বাইবেলে যেখানে শুরু করছেন, In the beginning was the Word, the Word was with God and the Word was God, সেখানে এই জিনিসটাকেই বলতে চাইছেন। Jesus অবতার, অবতার ঈশ্বরের সাথে এক, অবতারই ঈশ্বর। তাই যিনি যীশুকে জেনেছেন, যিনি বুদ্ধকে জেনেছেন, ঠাকুরকে জেনেছেন, তিনিই একমাত্র ঈশ্বরকে জেনেছেন। ঠাকুরের ভজনা করা যা, ঈশ্বরের ভজনা করাও তাই। ঠাকুরের ভাবকে জানা যা, ঈশ্বরীয় ভাবকে জানাও তাই। ঠাকুরকে ভালবাসা যা ঈশ্বরকে ভালবাসাও তাই। কারণ ভগবানকে কোন দিন ভালবাসা যাবে না, সম্ভবই না। কারণ নির্গুণ, নিরাকারকে ভালবাসা যায় না। ব্রাহ্মরাও তাই হারিয়ে গেল। ঠাকুর বলছেন, গরুর দুধ যদি নিতে হয় তাহলে তোমাকে গরুর বাঁটে হাত দিতে হবে, শিংএ বা অন্য কোথাও হাত দিলে দুধ পাবে না, ঠিক তেমনি ঈশ্বরকে যদি জানতে হয় তাহলে অবতারকে ধরতে হয়। এইভাবে স্বামীজী বাইবেলের প্রথম বাক্যকে বেদান্তের মায়া বা শক্তির যে সিদ্ধান্ত সেখানে নিয়ে গিয়ে দেখাচ্ছেন, এই জগৎ ঈশ্বরেরই অভিব্যক্তি, ঈশ্বরেরই প্রকৃতি, যেটা দু-ভাবে আসে। যদি ঈশ্বরকে জানার ইচ্ছা হয় তাহলে তাঁর অবতারকে ধরতে হয়।

এরপর স্বামীজী বলছেন সেন্ট জনের বাইবেলে যে প্রথম পাঁচটি বাক্য, তাতেই সমস্ত খ্রীশ্চান ধর্মের মূল সার তত্ত্বগুলি দেওয়া আছে। এর প্রত্যেকটি বাক্য অত্যন্ত গভীর দার্শনিক তত্ত্বে সমৃদ্ধ। আমাদের যেমন পর পর শ্লোক থাকে, বাইবেলে সেই রকম পর পর বাক্য থাকে, বাক্যকে ওনারা বলেন ভার্সেস(verses)। বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি দেওয়ার সময় ওনারা প্রথমে বলে দেন – জন, ডট্, তারপরে চ্যাপ্টার, তারপরে বাক্য। বাইবেলের প্রত্যেকটি বাক্যই গভীরতম। বলছেন, সেন্ট জনের বাইবেলের প্রথম পাঁচটি বাক্যে বাইবেলে কি বলতে চাইছে, তার সার রয়েছে।

যখনই essence, সার, এই শব্দগুলি আসে তখন এটা একটু tricky হয়ে যায়। যেমন ঠাকুর সাংখ্যের কথা বলতে গিয়ে বলছেন, অনুষ্ঠান বাড়িতে গিন্নী সব কাজ করে বেড়াচ্ছে আর কর্তা এক জায়গায় বসে শুধু ভুড়ুক ভুড়ুক করে তামাক খেয়ে যাচ্ছে, গিন্নী এসে মাঝে মাঝে খবর দিয়ে যাচ্ছে আর কর্তা একটু মাথা নেড়ে সম্মতি দিয়ে দিচ্ছে। এখানে ঠিকই যে সাংখ্যের সার কথা বলা হয়ে গেল। অনেক ক্ষেত্রে লোকেরা সার কথাকে সিদ্ধান্ত বলে মনে করে ভাবে যে বিষয়টা তার জানা হয়ে গেল। কিন্তু এভাবে সম্পূর্ণ জানা হয় না, প্রথমে জিনিসটাকে খেটেখুটে জানতে হয়, জেনে যাওয়ার পর তখন জিনিসটার সারটাকে ধরে নিতে হয়, বা সারটুকু জেনে বাকি জিনিসটা নিয়ে এলে তখন বোঝা যায় এখানে এই জিনিসটার কথাই বলা হচ্ছে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, বিশেষ করে আমরা ভারতীয়রা একটা বাক্য বা অর্দ্ধ বাক্য শুনে নিয়েই মনে করি বিষয়টা জেনে গেলাম; বলতে থাকি, আমি বুঝে গেছি কি বলতে চাইছে, আমার আর জানার দরকার নেই। কোন কিছুকে জানার ব্যাপারে আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত যে, এই ভুলটা যেন না হয়। কারণ যে কোন বিদ্যার, যে কোন বিষয়ের যে বিস্তার থাকে, যেমন শেক্সপিয়ারের নামকরা নাটকের আমরা তিন-চার লাইনে লিখে দিতে পারি; কিন্তু যতক্ষণ পুরো নাটকটা না জানা থাকে, ততক্ষণ বোঝা যায় না, পুরো নাটকে কি বলতে চাইছেন, ওর ঠিক ঠিক majesty আসে না। এখানে যাঁরা স্বামীজীর ক্লাশ শুনছেন সবাই খ্রীশ্চান, সবাই তাঁদের ধর্ম পালন করেন, নিজের ধর্মকে জানেন। যখন কেউ একটা বিষয়কে পুরো বিস্তারে জেনে গেল, তখন একটা বাক্য বলা হলে তার পুরোটাই পরিষ্কার হয়ে যায়। আমাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে বলা যায় যে, ধর্ম জীবনে দুটো সমস্যা

হয়। প্রথম সমস্যা হল ill informed, হয় আমি পুরো জিনিসটা জানি না, নয়ত আধ-খ্যাঁচড়া জানি। যেমন হিন্দু ধর্মের ব্যাপারে আমরা সবাই ill informrd, আর যাঁরা পড়াশোনা করেছেন, তাঁরা ill informed নন, কিন্তু ঠাকুরের কথাগুলো তাঁদের জানা জিনিসের মধ্যে খাঁচে খাঁচে বসাতে পারেন না। খাঁচে খাঁচে বসানোর জন্য দরকার পড়ে essence, essenceটা শুধু তাঁদের জন্য যাঁরা পড়াশোনা করেছেন, এবার জিনিসটাকে খাঁচে খাঁচে বসানো দরকার। কিন্তু essentটা যদি আগেই জেনে যায় আর information যদি তার কাছে না থাকে, তখন পুরো গোলমাল হয়ে যায়। যাঁরা অনেক দিন ধরে শাস্ত্রের কথা শুনছেন, শাস্ত্র মন দিয়ে অধ্যয়ন করছেন, এখন যদি তাঁদের বলা হয় এর বক্তব্য এই, তখন তাঁর মনে হবে, আরে তাই তো, পুরো জিনিসটা এর মধ্যেই ঘুর ঘুর করছে। এখানে স্বামীজী বলে দিলেন বাইবেলের সার এই পাঁচটি বাক্যে, এই কথা শোনার পর কেউ যেন মনে না করে, আমি সব জেনে গেলাম, তাহলে সে ভুল করবে। সব জানার তাকে পুরো বাইবেল পড়তে হবে।

বাইবেলের পাঁচটি বাক্য - মানুষের শ্রেষ্টত্ব এবং খ্রীশ্চানদের বিশ্বাস

যাই হোক প্রথম বাক্যে বলছেন, In the beginning was the Word, এর উপর আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। দ্বিতীয় বাক্যে বলছেন, The sin was in the beginning with God, খ্রীশ্চানরা প্রথম বাক্যের Wordকে বলছেন যীশু। এখানে বাক্যে beginning মানে হয় সৃষ্টির আগে। যেমনি শক্তি বা মায়া শব্দ নেওয়া হবে, তার মানেই হবে In the beginning, কারণ তখনও সৃষ্টি হয়নি, তখন এটা ঈশ্বরের সঙ্গেই ছিল। আর বলছেন, and all things were made by Him, এই জগতে যা কিছু আছে সব ঈশ্বরের সৃষ্টি, and without he was not anything made that was made। যে জিনিসটাই জগতে সৃষ্টি হয়েছে সব তিনিই সৃষ্টি করেছেন। এটা বাইবেলের তিন নম্বর বাক্য। কী আশ্চার্য! বলছেন যে এই জগতে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে সব ভগবানেরই সৃষ্টি। জগতে এমন কোন কিছু সৃষ্ট পদার্থ নেই যেটা ভগবান সৃষ্টি করেননি। তার মানে সাপ, বিছে, বাঘ, সিংহ সব ভগবানই সৃষ্টি করেছেন।

সমস্যা হল popular religionএ বলা হয় ভগবান সমস্ত প্রাণী সৃষ্টি করে মানুষকে সবার উপরে বসিয়ে দিলেন। এখানে এসে খ্রীশ্চান, জহুদি, ইসলামের থেকে হিন্দুরা আলাদা হয়ে যায়। ভগবান সব সৃষ্টি করেছেন কোন সন্দেহ নেই, মানুষ শ্রেষ্ঠ তাতেও কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু মানুষের এই শ্রেষ্ঠত্বটা হল evolutionary। Evolutaionary মানে, তোমার বুদ্ধি সব থেকে বেশি, তুমি ঈশ্বরের অবধারণা করতে পার সেইজন্য তুমি শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যদি তুমি মনে কর এই জগতে সব কিছুর উপর তুমি আধিপত্য বিস্তার করবে, সবার মাথায় পদাঘাত করার জন্য তুমি আছ, তা কখনই নয়। কারণ সেও ঈশ্বরের সৃষ্টি, তোমার কোন অধিকারই নেই যে তুমি তাকে তোমার পদানত করে রাখবে। এই জায়গাতে এসে বিরাটা সমস্যা হয়ে যায়। শুধু সমস্যাই হয় না, খ্রীশ্চানিটিতে আরও মারাত্মক ব্যাপার হল, ওরা বলে মানুষ ছাড়া আর কারুর মধ্যে আত্মা নেই। এমনকি কুকুর, বেড়াল, গাছাপালা এদের মধ্যে কোন আত্মা নেই। হিন্দুদের উপর আক্রমণ করার সময় খ্রীশ্চানরা ঠিক এই জিনিসটাকে নিয়েই আক্রমণ করে। নিন্দার সুরে বলেন, তোমরা তো জন্মান্তর মানো, এই বিড়ালটা যাচ্ছে হয়ত দেখো গিয়ে তোমার ঠাকুরমা বা দিদিমা যাচ্ছে। মনুষ্যতের জীবের মধ্যে আত্মা আছে কিনা এটা খ্রীশ্চানদের কাছে বিরাট বড় সমস্যা। সমস্যাও নয়, ওরা ধরেই নিয়েছে মানুষ ছাড়া আর কোন প্রাণীতে আত্মা বলে কিছু নেই। আমেরিকানরা যতই নিজেদের ধর্মের ব্যাপারে, চিন্তার ব্যাপারে উন্নতমনা বলুক কিন্তু তাদের মত এত গোঁড়া আর কোথাও নেই। স্বামীজীকে ওরাই বলেছিল, পঞ্চাশ বছর আগে এলে আপনাকে পুড়িয়ে মারা হত। এই থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে স্বামীজী যাওয়ার কয়েক বছর আগে খ্রীশ্চান ধর্মের লোক ছাড়া কেউ যেতেই পারত না, দ্বীপটি মেথডিস্টদের জন্যই ছিল। এরা ছাড়া অন্য কোন ধর্মের কেউ এখানে ঢুকতে পারত না, কোন কথা বলতে পারত না। স্বামীজী যখন গেছেন তখন এই নিয়মটা একটু শিথিল হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু কয়েক বছর আগে একজন হিন্দু সন্ন্যাসী গিয়ে ওখানে বেদান্তের ক্লাস নেবেন চিন্তাই করা যেত না।

ইশিগুরো এই বছর সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন, তাঁর একটা উপন্যাস আছে যেখানে তিনি খ্রীশ্চানদের এই থিমকে প্রেক্ষাপট করে লিখেছেন, খুবই interesting। সেখানে তিনি দেখাচ্ছেন সমাজ, মানুষ

সবাই বিজ্ঞান, চিকিৎসায় খুব উন্নত হয়ে গেছে, সবাই রীতিমত ক্লোনিং করতে পারে। সমাজের যারা ক্রিমিনাল, আমাদের ভাষায় যারা সমাজের আবর্জনা, যাদের স্থান একমাত্র হতে পারে জেলে, জেলেই তাদের পচে মরা উচিৎ, তাদেরকে ক্লোন করা হচ্ছে। ক্রিমিনালদের ক্লোন করে যে মানুষগুলো তৈরী হচ্ছে, তাদের সবাইকে একটা জায়গায় আলাদা সামাজিক পরিবেশে রাখা হয়। এই সমাজের মানুষরা হল সুস্থ স্বাভাবিক সভ্য সমাজের মানুষদের জন্য organ donors। Organ donor মানে সভ্য সমাজদের মানুষদের যখন কিডনির দরকার হবে, চোখের দরকার হবে তখন এগুলো কোথা থেকে আনা হবে? তখন ক্লোনিং করা মানুষগুলোকে নিয়ে আসা হয় আর ওদের অঙ্গটা কেটে সভ্য মানুষকে দেওয়া হয়। শুধু এই টপিককে আধার করে ইশিগুরো তাঁর এই উপন্যাসকে সাজিয়েছেন, পড়লে গা শিউড়ে ওঠে। ওদের আবার দুটো গ্রুপ, একটা গ্রুপ হল যারা শুধু donors, যখন দরকার হবে তখন তাদের কারুর চোখ, কারুর কিডনি দিয়ে দিতে হবে। আরেকটা গ্রুপ হল যারা এদের দুঃখের সময় তাদের নিয়ন্ত্রণ করে। যেভাবে গরু, ছাগলকে কষাইখানাতে নিয়ে যাওয়া হয়, এদেরকে সেইভাবে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, by turn সবাইকে ওটা করতে হয়। ওরা প্রথম থেকেই জানে আমাদের ভবিষ্যত এটাই, আমরা এই কাজের জন্যই আছি। সভ্য সমাজের একজন মহিলা এখন প্রমাণিত করতে চাইছেন যে যাদের ক্লোন করা হয়েছে এদের ভিতরেও soul আছে। মহিলাটা এদের দিয়ে নানা ধরণের হাতের কাজ করাচ্ছেন, কাউকে দিয়ে ছবি আঁকাচ্ছেন, সেলাই করাচ্ছেন, এসব করে তিনি সভ্য সমাজের লোকেদের কাছে নিয়ে যাচ্ছেন, এদের জন্য লড়াই করে প্রমাণিত করতে চাইছেন যে এদেরও soul আছে। খ্রীশ্চানদের কি অদ্ভূত ধারণা, যদি সে ছবি আঁকতে পারে তাহলে তার মধ্যে soul থাকবে। আমাদের কাছে আশ্চর্য লাগে স্বামীজী যখন তাদের কাছে বেদান্তের চিন্তা-ভাবনা দিচ্ছেন সেটা তারা বুঝতে পারছে কিন্তু এই ধারণাটা কি করে থাকতে পারে ভাবা যায় না।

ইশিগুরো জাপানী, কিন্তু ইংল্যাণ্ডে গিয়ে স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে থাকেন। দশ-বারো বছর আগে তাঁর এই উপন্যাস রচিত হয়েছিল। ক্লোন করা মানুষরা বিয়ে করতে পারবে না, লেখাপড়া শিখতে পারবে না, কোন কিছু করারই অনুমতি নেই। তোমরা আছো শুধু সভ্য মানুষদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সরবরাহ করার জন্য, তোমার অঙ্গ কাটা হয়ে গেলে তুমি যদি মরে যাও তো মরে যাবে, তুমি তো ক্লোন, তোমার মধ্যে তো কোন soul নেই। এরপর কয়েকজন ইয়ং ছেলেমেয়েদের মনে হল, ব্যাপারটা কি, কেন আমাদের এভাবে মরতে হবে। এদের মধ্যে একটি যুবক ছেলে আর মেয়ের মধ্যে ভালোবাসা হয়। একদিন তারা পাঁচিল ডিঙিয়ে পালিয়ে গেছে, দুজনের খুব ইচ্ছে বিয়ে করে ঘর-সংসার পাতবে। সেই মহিলা ওদের বলল, দেখ আমি তোমাদের জন্য অনেক চেষ্টা করলাম, তোমাদেরও যে soul আছে আমি এই সত্যকে সভ্য মানুষদের কাছে প্রমাণিত করার জন্য অনেক কিছু করেছি, এদের ভিতরেও soul আছে, এদের সাথে এভাবে ব্যবহার করবেন না। কিন্তু আমি এদেরকে বোঝাতে পারলাম না, আমার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেছে। এরপর দেখাচ্ছেন, এই দুজনকে খ্রীশ্চান সমাজের লোকেরা ট্র্যাপ করে ধরে ফেলে আবার ওদের নিজেদের জায়গায় ঢুকিয়ে দিয়েছে। এবার ওদেরও ডোনার হিসাবে কাজে লাগান হবে। ইশিগুরো দেখাচ্ছেন, কিভাবে একটা ভুল ধারণাকে কেন্দ্র করে কতকগুলো মানুষকে গরু-ছাগল, ইঁদুর, গিনিপিগের মত ব্যবহার করা হচ্ছে।

সেন্ট জন বলছেন, সব কিছু তিনিই সৃষ্টি করেছেন, জগতে এমন কিছু নেই যেটা তিনি সৃষ্টি করেননি। কিন্তু জুদাইজিমে বলা হয় মানুষই শ্রেষ্ঠ, তুমি শ্রেষ্ঠ তাই তুমি শ্রেষ্ঠ কাজগুলো কর। এখান থেকে এই ধারণা এসে গেছে যে জগতে যা কিছু আছে সব কিছুর থেকে আমরা শ্রেষ্ঠ, আর আমাদের মধ্যে, অর্থাৎ মানুষের মধ্যে খ্রীশ্চানরা শ্রেষ্ট। খ্রীশ্চানদের মধ্যে আবার ক্যাথলিকরা বলবে ক্যাথলিকরা শ্রেষ্ঠ, প্রোটেস্টানরা বলবে তারা শ্রেষ্ঠ। ঘুরে ঘুরে হয়ে গেল, আমার মত শ্রেষ্ঠ এই জগতে আর কেউ নেই। একটা বাচ্চাও মনে করে আমি সবার থেকে শ্রেষ্ঠ, এই জগতে কেউ মনে করে না যে আমার থেকে জগতে কেউ শ্রেষ্ঠ আছে। কোন মেয়ে নেই যে মনে করে না যে আমি বিশ্বসুন্দরী। আর যদি খুবই খেঁদি পেঁচি হয় তখন মনে করে, আমার রূপ না থাকতে পারে কিন্তু আমার মত চরিত্র কারুর নেই। মানুষের মধ্যে এটা in built আমি শ্রেষ্ঠ। এই পর্যন্ত তাও ঠিক আছে, কিন্তু তাই বলে অপরকে আমি ছোট কখনই করতে পারি না।

আমেরিকার এক নামকরা অভিনেত্রী, দেখতে তিনি খুব রূপসী ছিলেন। একদিন তিনি এক সুপার মার্কেটে গিয়েছেন, সেখানে এক সেলস গার্ল ছিল, সেই সেলস গার্লও দেখতে খুব সুন্দরী ছিল। সেলস গার্ল সব সময় ভাবত যে সে ওই অভিনেত্রীর থেকেও সুন্দরী। অভিনেত্রী ওখানে যাওয়ার পর থেকেই সেলস গার্লটি তাঁর সাথে অভদ্র আচরণ করতে শুরু করেছে। অভিনেত্রী বুঝে গিয়েছিলেন, তিনি সেলস গার্লকে খুব ভদ্র ভাবে বললেন, তোমার কি মনে হয় তুমি আমার মতই রূপসী? সেলস গার্লটি নাক সিঁটকে বলছে, yes, definitely not less। অভিনেত্রী তখন তাকে বলছেন, then why you badly behave with me? তুমি যদি মনে কর আমার থেকে সুন্দরী তাহলে আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করছ কেন? এটাই বলা হচ্ছে, তুমি নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করতে পার, কিন্তু জগৎকে তুমি ছোট করবে কেন?

প্রত্যেক ধর্মে এই সমস্যা আছে। হিন্দুরা মনে করে তাদের universal acceptance রয়েছে, ঠিকই হিন্দুরা অন্যান্য ধর্মের ভাল ভাল জিনিসগুলো নেয়, কিন্তু অন্যান্য ধর্ম হল ম্লেচ্ছ। ব্রাহ্মণ বাদে যারাই আছে সবাই অচ্ছুৎ। নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করছ ঠিক আছে, কিন্তু অপরকে কেন ছোট করতে যাবে? অধ্যাত্ম রামায়ণে ঈশ্বরকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে, আপনি যেখানে নেই সেটা অনীশ্বর, তার কোন সত্তা নেই। যে জিনিসটারই সত্তা আছে, যে জিনিসরই সৃষ্টি হয়েছে, সেটা আপনি শুধু করেননি, আপনি সেটাতে বিদ্যমান। এই জায়গাতে হিন্দুরা খ্রীশ্চানদের থেকে আরেক ধাপ এগিয়ে যায়। সেন্ট জন বলছেন, জগতে এমন কিছু নেই যেটা ঈশ্বর সৃষ্টি করেননি আর এমন কোন সৃষ্ট জিনিস নেই যেটা তিনি করেননি। এখানে জোর দিয়ে বলতে চাইছেন যে সবাই ঈশ্বরেরই সন্তান। তাই একে ছোট করা, তাকে বড় করা যায় না। কিন্তু খ্রীশ্চানদের বিভিন্ন মত আছে, ওল্ড টেস্টামেন্টে কিছু কিছু কথা আছে, যেমন সাপ, সাপ আদম আর ইভকে প্রলোভিত করেছিল, সেখান থেকে অভিশাপ দেওয়া হল, এদের সন্তান তোমার সন্তানকে শেষ করে দেবে। মানুষ এখন অধিকার পেয়ে গেল সাপ দেখলেই তোমাকে মারতে হবে। হিন্দুদের মধ্যে তা নেই, সাপ হল ভগবান শিবের আভূষণ, সাপ দেখলে হাতে তালি দিয়ে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। বেশি ফোঁসফাস করলে অনেকে মারে, কিন্তু বেশির ভাগ সময়ই চেষ্টা থাকে না মারার। কারণ সেও ঈশ্বরের সৃষ্টি, সে নিজের মত আছে তাকে সেইভাবে থাকতে দাও।

পরের বাক্য হল, In him was life and the life was light of man, এই লাইফ্ বলতে শুধু জীবন নয়, যে soul এর concept বলা হল, সেই ভগবানের মধ্যে ছিল লাইফ, এটাই পরা প্রকৃতির কথা আগে যেটা বলা হল, and the life was light of man, সেই মানুষের মধ্যে জীবন গেল। এর অর্থ দাঁড়ায় বাকীদের মধ্যে এই লাইফ যাচ্ছে না। জুডিশ পরম্পরা থেকে এই ধারণাটা এসে খ্রীশ্চান ধর্মের এই ফাঁকটা এসে যায়, সেখান থেকে মানুষ হয়ে গেলে শ্রেষ্ঠ। মানুষদের মধ্যে তাদের কাছে বাইবেল আছে বলে তারা আরও শ্রেষ্ঠ। তাই না, পরে Jesus বলছেন, I am the life of the world, he who will follow in me shall never walk in darkeness, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তিনি আত্মা, যে আমাকে অনুসরণ করবে সে কোন দিন অন্ধকারে যাবে না।

দু-হাজার বছর আগের ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, ভারতবর্ষ, চীন এই কয়েকটি দেশ ছাড়া সব ছিল বর্বরদের দেশ। আমেরিকার খবর তো তখন কেউ জানতই না, ইংল্যাণ্ড ছিল বর্বরদের দেশ। রোমানরা এক দিক দিয়ে সংস্কৃতির জগতে উন্নত ছিল কিন্তু আধ্যাত্মিক দিক থেকে বর্বর। আশেপাশের সব দেশই ছিল বর্বর, আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি বলে তাদের কিছুই ছিল না। জহুদিদের আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি ছিল, কিন্তু জাতি রূপে তারা ছিল বর্বর, এক গোষ্ঠির সাথে আরেক গোষ্টির মারামারি লেগেই থাকত। সেখানে ভগবান যীশুর মত একজন ব্যক্তিত্ব, যিনি ছিলেন একটা spiritual power house, তিনি এসে যে তত্ত্ব কথা বলছেন যা বেদান্তেরই কথা। কি কথা? অবতারকে যে মানবে, অবতারের পিছনে যে আসবে সে ধন্য হয়ে যাবে। স্বামীজীও বলছেন, ঠাকুরের এই জগৎ রূপী রথ চলছে, যে এতে হাত লাগাবে সে ধন্য হয়ে যাবে। যদি হাত না লাগাতে চাও তাহলে সরে দাঁড়াও, যদি একে আটকাতে যাও তুমি পিশে যাবে। খ্রাইস্টও একই কথা বলছেন। কিন্তু তাদের কাছে এই কথার অর্থ হয়ে গেল, যারা খ্রীশ্চান তারাই ধন্য, বাকিরা হেয়। বক্তব্য তা নয়, বক্তব্য হল, যাঁরা অবতারকে অনুসরন করবে, সে কোন দিন অন্ধকারে যাবে না।

জেরুজালেমের মত এলাকায় এতদিনে যীশু একজন সত্যিকারের অবতার এসেছেন, যে ওনার কথা শুনে নিজেকে আধ্যাত্মিক জীবনে উৎসর্গ করে দেবে, সে ধন্য হয়ে যাবে। সত্যিকারের তাই হল, তাঁর শিষ্যরা সবাই ধন্য হয়ে গেল। ভবিষ্যতে যাঁরা যীশুর পথে নিজের জীবন দিয়ে দিলেন তাঁরাও সবাই ধন্য হয়ে গেলেন। কিন্তু মুর্খরা ধর্মকে নিজের স্ট্যাটাস সিম্বল বানিয়ে নিয়েছে, আমি না বেলুড় মঠ থেকে দীক্ষা নিয়েছি, আমি না গোলপার্কে যাই, আমি বেলুড় মঠের অমুক মহারাজকে জানি, এগুলো স্ট্যাটাস সিম্বল, ধর্মের সাথে যার কোন সম্পর্ক নেই। এখানে বলতে চাইছেন, in him was light, সত্যিই তাই, ঈশ্বরের যে পরা প্রকৃতি সেটাই light, সেটা মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রকাশিত, সবচেয়ে বেশি ব্যক্ত। যদি এর পরে কোন জাতি বা নূতন কোন জীব আসে, তাদের মধ্যে আরও বেশি হতে পারে, কিন্তু এখন আমরা জীবনকে যে ভাবে জানি তাতে আমরা জানি চৈতন্য, চেতনার বোধ মানুষের মধ্যে সবার থেকে বেশি, সেইজন্য মানুষ শ্রেষ্ঠ। কিন্তু সেইজন্য তাদের কোন অধিকার নেই যে বাকি প্রাণীদের উপর সে অত্যাচার নিপীড়ন করবে। তোমার মধ্যে চেতনা জেগেছে মানেই হয়, তুমি আর তোমার শরীরের মধ্যে আবদ্ধ থাকবে না। বড় বড় বিজ্ঞানী, কবি, শিল্পী তাঁদের দেহবোধ অন্যদের তুলনায় কম থাকে। দেহবোধ যাদের বেশি থাকে তাদের প্রাণের প্রতি মায়া অনেক বেশি হয়। যার জন্য পশুপাখি, নিম্ন প্রজাতি প্রাণীদের প্রাণের প্রতি আসক্তি অনেক বেশি, কারণ তাদের চেতনার বিকাশ হয়নি। তাই এদেরকে মারার কোন অধিকার মানুষের নেই। কিন্তু আমরা এর বিপরীতটাই দেখি। এবার বলছেন, এই যে ঈশ্বরের আলো, ঈশ্বরের আলো মানেই চৈতন্য, shining in darkness। স্বামীজী পরের প্যারাগ্রাফেই darkness নিয়ে বলবেন।

সব দ্বন্দ্ব ও মায়ার রাজ্যের পারেই পূর্ণতা

স্বামীজী বলছেন, The Perfect never becomes imperfect, পূর্ণ কখন অপূর্ণ হয় না, হতে পারে না। আচার্য শঙ্কর ঠিক এই যুক্তিটাই নিচ্ছেন, স্বভাবত যিনি অখণ্ড তিনি খণ্ডিত কিভাবে হবেন! মাণ্ডুক্যকারিকাতে বলছেন, *আপ্তকামস্য কা স্পৃহা*, যিনি পূর্ণ তিনি কিভাবে অপূর্ণ হবেন। যিনি আপ্তকাম, যাঁর সমস্ত কামের পুর্তি হয়ে গেছে, তাঁর আবার কিসের কামের স্পৃহা হবে, তিনি কেনই বা সৃষ্টি করতে যাবেন, এইভাবে তাঁরা যুক্তিকে অন্য দিকে নিয়ে যান। স্বামীজী বলছেন perfect কখন imperfect হয় না। ফলে কি হয়, যখন darknessএর মধ্যে থাকে, সেন্ট জন যেটা বলছেন and the light shining in darkness, তাই এই darkness এটাকে ধারণা করতে পারছে না। Darkness বলতে সেন্ট জন অন্ধকারকে বোঝাতে চাইছেন না; এই darkness মানে মায়া, darkness বলতে duality, যেখানে দ্বন্দ্ব রয়েছে।

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান অর্জুনকে বলছেন, অর্জুন! তুমি এই দ্বন্দ্বের পারে যাও, সুখ-দুঃখ, শীত-উষ্ণ, ভাল-মন্দ, পাপ-পূণ্য সব দ্বন্দ্বের পারে যাও। যিনি অখণ্ড, যিনি অদ্বৈত, তিনি যখন অবতার রূপে এই মায়ার রাজ্যে থাকেন তখন মায়ার রাজ্যের কোন গুণই, সুগুণই হোক আর দুর্গুণই হোক, তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। ভগবানের আলো এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আছে; এর আগে বলা হল, ভগবানের আলো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপর পড়ে, তখন তাঁকে দুই ভাবে জানা যায়, যেটা সাধারণ তাকে আমরা প্রকৃতি বলি, আর যেটা উৎকৃষ্ট তাঁকে আমরা অবতার বলি। আমরা এখন সবাই প্রকৃতির অঙ্গ, কারণ আমাদের এখনও সিদ্ধি হয়নি। যখন সিদ্ধ পুরুষ হয়ে যাব, জ্ঞান হয়ে যাবে, তখন আমরাও পরা প্রকৃতির অঙ্গ হয়ে যাব। মানুষ রূপে আমরা এখন অপরা প্রকৃতিতে আছি।

বলছেন, এই যে ভগবান, তিনি যখন মায়ার রাজ্যে থাকেন, সেখানে দ্বন্দ্ব রয়েছে, পাপ-পূণ্য রয়েছে, ধর্ম-অধর্ম রয়েছে। কিন্তু তিনি কখনই imperfect হন না। তাঁর আলো যেটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পড়ছে; এই যে অন্ধকার, যে darknessএর কথা সেন্ট জন বলছেন, সে কখন আলোকে ছুঁতেও পারে না, বুঝতেও পারে না। যদি স্পর্শ করে নিত তাহলে perfect imperfect হয়ে যেত। জ্ঞান হয়ে গেলে অন্ধকার চিরদিনের মত চলে যাবে, মায়া কিন্তু কোন দিন যাবে না, দশজনের যদি জ্ঞান হয়ে, দশজনের যদি মুক্তি হয়ে যায় তাও মায়া যেমন আছে তেমন থাকবে। এই দ্বন্দ্ব ভাব, এই দ্বৈত ভাব কোন দিন যেতে পারে না। স্বামীজী বলছেন, এই যে পাঁচটি বাক্য বলা হল এর মধ্যে খ্রীশ্চানিটির সার নিহিত। শুধু খ্রীশ্চানিটির সার না, সমস্ত ধর্মের সার রয়েছে। ঠিক ঠিক ধর্মের সার এই পাঁচটি বাক্যে রয়েছে।

এই জিনিসটাকে টেনে স্বামীজী বলছেন, ঈশ্বর কখনই অপূর্ণ হন না, ঈশ্বর কখনই কাম যুক্ত হন না। সবারই উপর তাঁর কৃপা, সবারই প্রতি তাঁর করুণা। কিন্তু দুষ্ট প্রকৃতির দুষ্ট স্বভাব কখনই ভগবানকে স্পর্শ করতে পারে না। সন্তান বদ হয়ে গেলে মাকে সবাই বলবে, তোমার ছেলেকে সামলাও, মা সন্তানের কার্য দ্বারা কোন না কোন ভাবে সম্পৃক্ত হয়, ভগবানের সেই রকম কিছু হয় না। কঠোপনিষদের মন্ত্রে যমরাজ ঠিক এই জিনিসটাকেই সূর্যের উপমা দিয়ে বলছেন, *ন লিপ্যতে চাক্ষুস্যৈর্বাহ্যদোষৈঃ,* সূর্যের আলো ভালতেও পড়ছে মন্দতেও পড়ছে, তাই বলে মন্দতে আলো পড়লে সূর্যের কোন দোষ হয় না। আগেকার দিনে রাস্তা দিয়ে বাড়ি আসার পর পা ধুয়ে ঘরে প্রবেশ করতে হত, এখনও অনেকেই এই নিয়ম মেনে চলে। কারণ বাইরে থেকে আসা মানেই তুমি অশুদ্ধ হয়ে গেছ, রাস্তায় কত রকম নোংরা ময়লা মাড়িয়ে এসেছ কোন ঠিক নেই। অনেক পরিবারে বাইরের জুতো ঘরের জুতো আলাদা করে রাখা থাকে। তার মানে, নোংরা কিছু ছুঁয়ে নেওয়া মানে তুমি অশুদ্ধ হয়ে গেলে। সূর্য, যিনি জগতের চক্ষু, সেই চোখের দৃষ্টি জগতের কত নোংরা বস্তুর উপর পড়ছে, তাহলে তাকেও শুদ্ধির প্রক্রিয়া করে নিতে হবে। কিন্তু সূর্যের তা করতে হয় না, কারণ সূর্যের আলো যত নোংরা অশুদ্ধ বস্তুর উপর পড়ুক না কেন তাতে সূর্য কখনই অশুদ্ধ হয় না। অগ্নির মধ্যে যাই দেওয়া হোক না কেন, অগ্নি কখনই অশুদ্ধ হয় না। ঠিক তেমনি ভগবান এই জগতের মধ্যেই আছেন, ভগবানের আলোও এই জগতের মধ্যে পরা প্রকৃতি রূপে, আত্মা রূপে আছেন, কিন্তু জগতের কোন কিছুতেই ভগবানের কোন দোষ হয় না।

পাপ ও অপূর্ণতা

এখান থেকে এগিয়ে স্বামীজী এবার ২৯ নং ভার্স বলছেন, taketh away the sin of the world, Jesus কেন এসেছেন? জগতের পাপ দূর করার জন্য। স্বামীজী বলছেন, খ্রাইস্ট এসেছেন আমরা যাতে মুক্তির দিকে এগোতে পারি, আমরা যেন পূর্ণ হতে পারি। বক্তব্য হল, ঈশ্বর যীশু রূপে এসেছেন মানুষকে দেখানোর জন্য তার আসল স্বরূপ কি, আসল স্বভাব কি। আমাদের স্বরূপ হল আমরা চৈতন্য স্বরূপ, আমরা সবাই সেই দিব্য, সেই শুদ্ধ চৈতন্য, যার উপর মানুষের আবরণ দেওয়া আছে, ভগবান এই জিনিসটাকে দেখানর জন্য খ্রাইস্ট রূপে এসেছেন। চৈতন্য স্বরূপে আমিও যা, খ্রাইস্টও তাই, মানুষ রূপে কখনই এক হবে না, আমি কখনই খ্রাইস্ট নই, আমি কখনই শ্রীরামকৃষ্ণ নই। কিন্তু চৈতন্য স্বরূপে তিনিও যা আমিও তাই।

খুবই দুর্ভাগ্য যে, taketh away the sin of the world, খ্রীশ্চানরা এর ব্যাখ্যা করার সময় বলেন, আদম আর ইভ ঈশ্বরের কথা অমান্য করল, ওদের মধ্যে নারী পুরুষের বোধ এসে গেল, নারী-পুরুষের বোধ, এই আদিপাপ আমাদের কপালে এখনও লেগে আছে, সেইজন্য যারাই জন্ম নেয় তারা সবাই born sinner। ভগবান এই পাপকে নিজের উপর নিয়ে নেওয়ার জন্য নিজের সন্তানকে বলি রূপে পাঠালেন যাতে এরা সবাই পাপ থেকে শুদ্ধ হয়ে যেতে পারে। জুইস পরম্পরায় বলি দেওয়ার প্রথা আছে, সেইজন্য ঘুঘু পাখি বিভিন্ন ধর্মীয় স্থানে বলি দেওয়া হয় প্রায়শ্চিত্তের জন্য। মানবজাতির উপর যে গণপাপ রয়েছে, এই পাপকে শুদ্ধ করার জন্য ভগবান যীশুকে উৎসর্গ করে পাঠালেন, যার জন্য তাঁকে পরে ক্রুশবিদ্ধ হতে হল। সেইজন্য যে যীশুকে অনুসরণ করবে তার উপর এই আদিপাপ থাকবে না, সে শুদ্ধ হয়ে যাবে। সেইজন্য দুটি শুদ্ধির কথা বলা হয়, প্রথম শুদ্ধি ব্যাপটিজম্, যীশুর শুদ্ধি করা জল দিয়ে যে পাপ জন্ম থেকে নিয়ে আসছিল সেটাকে শুদ্ধ করা হল, এরপর যেদিন সে সত্যিকারের খ্রীশ্চান হবে তখন তার সব পাপ চলে যাবে। ঠাকুর এক জায়গায় বলছেন, ওদের একটা বই পড়লাম তাতে শুধু পাপ আর পাপ। সত্যিই এটা খুব দুর্ভাগ্যজনক, এই পাপের আইডিয়া জুইস পরম্পরাতেও নেই, ইসলাম ধর্মেও নেওয়া হয়নি। কবে আদম আর ইভ একটা কি আপেল খেয়েছিল, সেই পাপ সমস্ত মানবজাতির উপর একটা গণপাপ হয়ে আছে, যার জন্য সবাইকে নরকে যেতে হবে, যার জন্য ভগবানকে নিজের সন্তানকে পাঠাতে হল, যার জন্য ভগবানের সন্তানকে ক্রুশবিদ্ধ হতে হল সবাইকে শুদ্ধ করার জন্য। বেদান্তের দৃষ্টিতে এই ধরণের ধারণা একেবারেই দাঁড়ায় না। স্বামীজী তাই এখানে এটাই বলছেন, ভগবান যীশুকে পাঠিয়েছিলেন, পাঠিয়েছিলেন এই অর্থে যে, ভগবান নিজেই যীশু হয়ে এই জগতে এসেছিলেন মানুষকে পথ দেখাতে। ঠাকুর বলছেন, মানুষকে জ্ঞান ভক্তি শেখাতেই অবতারের আসা।

বেদের আদর্শে জীবন চালানো যায় না, চালানো যায় না মানে, আমাদের জীবন একটা গতানুগতিক ভাবে চলে, আরেকটা হল একটা আদর্শ নিয়ে চলে। গতানুগতিক ভাবে যেটা চলে সেটাও আদর্শ, কিন্তু ওটা একটা নিম্ন আইডিয়া। নিম্ন আইডিয়া এই জন্য, বাড়ির লোকেরা এটা করে আসছে, কেউ জানে না কেন করে আসছে, ওটাকেই একটা আদর্শ রূপে মনে হয়। প্রকৃত পক্ষে ওটা কোন আদর্শ নয়। সত্যিই যদি আদর্শ রূপে চলে, তাহলে দেখা যাবে, ঐ আদর্শ কোথাও না কোথাও ঘুরে বেদে যে আদর্শগুলো দেওয়া হয়েছে সেই আদর্শের সাথে মিলে যাচ্ছে।

স্বামীজীর বাণী ও রচনার সার দেববাণী

প্রসঙ্গ থেকে সরে আমরা একটা অন্য বিষয়ে আলোকপাত করছি, যাতে Inspired Talksএ স্বামীজীর বক্তব্যগুলি আমরা আলোচনার মাধ্যমে সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। ভারতের ইতিহাসে ১৮৩৬ সালটা দুটো ঘটনার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এই বছর ঠাকুরের আবির্ভাব আর দ্বিতীয় ঘটনা হল মেকলে ভারতে নূতন শিক্ষা নীতি নিয়ে এলেন। বর্তমান যে ইংরাজী শিক্ষা ব্যবস্থা, যদিও এই শিক্ষা নীতিকে অনেকেই সমালোচনা করেন, কিন্তু সমালোচনা করার কিছু নেই, কারণ মেকলের শিক্ষা নীতির জন্য ভারত রক্ষা পেল, তা নাহলে ভারত অনেক দিন আগেই তালিবানদের দেশ হয়ে যেত। শরৎ মহারাজ তাঁর লীলাপ্রসঙ্গে লিখছেন, মেকলের শিক্ষা নীতিকে আটকানোর জন্যই যেন ঠাকুর এলেন। অনেক বড় বড় বক্তারাও এর উপর প্রচুর লেকচার দেন এবং বলতে দ্বিধা বোধ করেন না যে, মেকলে এসে দেশের বরবাদ করে দিতে গিয়েছিলেন, ঠাকুর এসে দেশের বরবাদ হওয়াকে আটকালেন। শরৎ মহারাজ এনারা ঋষি, ঠাকুরের কৃপায় এনারা সবাই জীবনমুক্ত হয়ে গেলেন। ঠাকুর হলেন অবতার; ঋষিরা যুগ পাল্টান না, অবতাররা যুগ পাল্টান। কোন ঋষি যুগ পাল্টাতে পারেন না, অবতার ছাড়া কারুর ক্ষমতাই নেই যে যুগ পাল্টে দেবেন। মেকলেকে আটকাবার জন্যই কি ঠাকুরের আবির্ভাব? একেবারেই তা নয়। যুগের পরিবর্তন হওয়ার সময় হয়ে এসেছিল, ঠাকুর আর মেকলে একসাথেই এসেছেন, মেকলে হলেন সেই ঠাকুরেরই অঙ্গ। এই কথা শুনলে অনেকেই ক্ষুব্ধ হবেন, কিন্তু এটাই বাস্তব। বাচ্চাদের বাড়িতে শিক্ষা দেওয়ার সময় বলা হয় সব সময় কথা বলবে, মা যেমনটি শিখিয়েছে তেমনটি করবে। বেদ কিন্তু তা নয়, আর স্বামীজীও তা নন। ঠিক ঠিক কোন আদর্শ যেমনি জীবনে নেওয়া হবে ওটা এমনিতেই বেদে চলে যাবে। আদর্শ যেমনি নেওয়া হবে, ওটা এমনিতেই স্বামীজীতে চলে যাবে। শুধু যাচাই করে নিতে হবে এটা মিলছে কিনা, সেইজন্য স্বামীজী বেদস্বরূপ। যখন কেউ বলছে আমার কাছে সব ধর্মই সত্য, তখন এটা স্বাভাবিক ভাবেই বেদে চলে গেল, যেখানে বেদ বলছেন, *একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি*। বেদ এই কথা বলছে বলে বা স্বামীজী এই কথা বলছেন বলে কাউকে মানতে হবে না, যখন কেউ সাধনা করবে তখন দেখবে, ঠিকই তো এটাই বেদ বলছে। ঠিক তেমনি বর্তমান কালে আমরা জীবন-যাপন করতে যাব তখন দেখব তাই তো, এটাই স্বামীজী বলছেন।

তাহলে বেদ আর স্বামীজীতে কোন তফাৎ হয়ে যাচ্ছে কি? কারণ ১৮৩৬ সালটা একটা বিভাজন রেখা, ১৮৩৬ সাল পর্যন্ত ছিল ঋগ্বেদ, সামবেদের সময়, ১৮৩৬ সাল থেকে হয়ে গেল স্বামীজী ও বেদ। এখানেই কোথাও একটা পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। স্বামীজী যে সত্যগুলো বলছেন তাতে বেদের সত্যগুলোর মধ্যে কোথাও একটা রীতিমত বড় পরিবর্তন নিয়ে এলেন। আসলে স্বামীজী যে কথাগুলো বলেছিলেন সেই কথাগুলো বেদে কোথাও পাওয়া যাবে না। যেমন উপনিষদ বলছে *সত্যং বদ ধর্মং চর*, স্বামীজী বলছেন, গরু মিথ্যা কথা বলে না, দেওয়াল চুরি করে না, মানুষই মিথ্যা কথা বলে, মানুষই চুরি করে, আবার এই মানুষই আত্মজ্ঞান লাভ করে, গরু কোন দিন আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারবে না। মূল্যবোধের ধারণাটা পাল্টে গেল, তার মানে সত্যি কথা বলছি না তাতে দোষের কিছু নেই, কারণ সেখানে তার বিকাশ হচ্ছে। মানুষের বিকাশের উপরই স্বামীজী জোর দিচ্ছেন। মানুষকে তিনি এত বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন আর তার সাথে মানুষের যত রকমের দুর্বলতা হতে পারে সবটাই তিনি মেনে নিয়ে এই কথা বলছেন। স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী একটা শব্দ প্রায়ই বলতেন, diluted materialism, ভৌতিকবাদকে সহজ করে বলা। স্বামীজীও বার বার বলছেন দেশে ভৌতিকবাদও দরকার, চিকাগোতেও তিনি বলছেন, ক্ষুধার্তরা রুটি চাইছে, রুটির বদলে আমরা তাদের ধর্ম দিচ্ছি। ক্ষুধার্ত লোককে ধর্ম দেওয়া মানে রুটির বদলে পাথর দেওয়া, এটাই diluted materialism। বেদ কখনই এই জিনিস

মানবে না। তাহলে কি স্বামীজী বেদের বিরুদ্ধে বলছেন? কখনই তিনি তা করছেন না, তিনি বনের বেদান্তকে শহরে নিয়ে আসছেন। ঈশ্বর সত্য স্বামীজী কখনই না করছেন না, কিন্তু যখন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ হবে তখন পুরো মূল্যবোধটাই পাল্টে যাবে। স্বামীজী বলছেন এটাই হাজার বছর, পনেরশ চলবে। এগুলো প্রথম প্রথম শুনলে বা পড়লে বুঝতে অসুবিধা হবে যে স্বামীজী হাজার বছর, পনেরশ বছর কি বলতে চাইছেন। আসলে এর অর্থ হল স্বামীজী যা বলে গেছেন এটাই হাজার বছর পনেরশ বছর চলবে। লোকেরা মনে করত, এখনও করে, ধর্ম ব্রাহ্মণরা পালন করবে, বুড়ো বয়সে আমাদের ধর্ম করা যাবে, বিশেষ তিথি পার্বণে ধর্ম করা যাবে। স্বামীজী এগুলোকে কেটে বাদ দিয়ে নিয়ে এলেন নূতন এক ধর্ম, সেই ধর্মের মানে সবারই জন্য চব্বিশ ঘন্টার ধর্ম-অনুশীলন। যে জুতো সেলাই করছে, সেও যদি ঠিক ভাবে জুতো সেলাই করে সেও ধর্ম করছে। ভারত এক সমাজ রূপে ধর্মের সাধনা করে নেবে, এই ধরণের কোন কথাই বেদে নেই, অথচ এগুলোই ধর্মের সিদ্ধান্ত হয়ে যাচ্ছে। এইসব কারণে স্বামীজীর বাণী ও রচনা কঠিন, সেই তুলনায় কথামৃত অনেক সহজ। কথামৃতে একই কথা অনেকবার একই ভাবে বলছেন, বাণী ও রচনাতেও একই কথা বলছেন কিন্তু সেখানে স্বামীজী বিভিন্ন ভাবে উপস্থাপনা করছেন, একই জিনিসকে অন্য ভাবে বলছেন।

যখনই কোন বিদ্যা খুব উচ্চ পর্যায়ে চলে যায় তখন তাকেই স্তুতি করে বেদ বলা হয়, যেমন ধনুর্বেদ, নাট্যবেদ, আবার ভাগবতকে পঞ্চম বেদ বলা হয়। এখানে স্বামীজীর বাণী ও রচনাকে স্তুতির অর্থে বেদ বলা হচ্ছে না, বাস্তবিক অর্থেই বলা হয়। বেদের অর্থ জ্ঞান, বেদের যে জ্ঞানরাশি, বেদের যে আধ্যাত্মিক সত্য তার উপর আধার করেই ১৮৩৬ সাল পর্যন্ত হিন্দু সমাজ চলেছে। ১৮৩৬ সালে মেকলে নূতন শিক্ষানীতি নিয়ে আসার পর ভারতের জনগণের যে মন এত দিন রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল সেটা যেন খুলে গেল। যবে থেকে আর্যদের সমাজ চলে আসছিল, তা দু হাজার বছরই হোক বা আট হাজার বছরই হোক, একটা বিদ্যাকে নিয়ে এনারা চলে আসছিলেন। সেই বিদ্যাতে দু-রকমের জিনিস ছিল। একটা হল আধ্যাত্মিক সত্যগুলি আর দ্বিতীয় হল ওই আধ্যাত্মিক সত্যগুলোর প্রয়োগ। ভারতের কাব্যশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, নাট্যশাস্ত্র এগুলোতে বৈদিক বিদ্যার প্রয়োগ হয়েছিল। কিন্তু তার ভূমিকা শেষ হয়ে গিয়েছিল এইজন্যই বিজ্ঞান সারা বিশ্বে এগোতে শুরু করে দিয়েছিল। আজকে যদি আমরা বেদের বিদ্যার উপর চলি, বেদের বিদ্যাকে যদি সমাজে চালাতে যাওয়া হয় তাহলে আরেকটা তালিবান সৃষ্টি হবে, পুরো দেশটাই মুর্খের দেশ হয়ে যাবে।

এখানে কিন্তু ভাল করে মনে রাখতে হবে, বেদের সিদ্ধান্তগুলি, সত্যগুলি কোন দিনই পাল্টাবে না, অহং ব্রহ্মাস্মি কোন দিনই পাল্টে যাবে না, কিন্তু এর ব্যবহারিক প্রয়োগটা পাল্টাবে। অহং ব্রহ্মাস্মি বা সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, যা কিছু দেখছ সবই ব্রহ্ম – এর ব্যবহারিক প্রয়োগ যখন আসছে তখন স্বামীজী যে কথাগুলো বলছেন, যেভাবে বলছেন, তোমার ভিতরেই সব শক্তি, সেই শক্তিকে তোমাকে জাগাতে হবে, তারপর সেই শক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। উপনিষদে বলছেন *উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত*, ওঠো জাগো, এগিয়ে চল। স্বামীজী এর অনুবাদ করলেন, Arise awake and stop not till the goal is reached। স্বামীজী এই যে ঋষিবাক্য, বেদবাক্য বলছেন, এই বাক্য একজন মহিলার জন্য, একজন গৃহবধুর জন্য, মুচি, চাষী, বিজ্ঞানী, পণ্ডিত সবারই জন্য Arise awake and stop not till the goal is reached। বেদবাক্য পালটে গেল, উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত ভুল কিছুই বলছে না, বেদের মূল্য উদ্দেশ্য ছিল একমাত্র ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে যাওয়া বা স্বর্গপ্রাপ্তি। স্বামীজী হলেন বেদস্বরূপ, তাই বেদও পাল্টে গেল। স্বামীজীর কাছে স্বর্গের কোন স্থান নেই। স্বামীজী স্বর্গকে এই পৃথিবীতে নামিয়ে আনলেন, diluted materialismএর ধারণা নিয়ে আসছেন। ভৌতিকবাদকে স্বামীজী সরিয়ে দিচ্ছেন না, এর ব্যবহারিক প্রয়োগের কথা তিনি চিকাগো ধর্মমহাসভায় ঘোষণা করলেন এই বলে, ক্ষুধার্ত মানুষকে ধর্মের কথা বলা অন্যায়। ধর্মের তত্ত্বটাই পাল্টে গেছে।

ঠাকুর বলছেন, ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু, ঈশ্বর দর্শনই মানব জীবনের উদ্দেশ্য, এগুলো আধ্যাত্মিক সত্য, এর সাথে কোথাও কোন আপোষ করা হচ্ছে না। কিন্তু বেশির ভাগ মানুষই ওই স্তরে পৌঁছাতে পারবে না, ঈশ্বর দর্শনই মানবজীবনের উদ্দেশ্য, এই অবস্থায় পৌঁছান খুব কঠিন, কোটিতে দু-একজন ছাড়া কেউ আসতে পারবে না। ঠাকুরের মত মাইরি বলছি ঈশ্বর বই আমি আর কিছু জানি না, এই ধরণের কথা বলার মানসিকতা অর্জন করা সহজ নয়, ভান করা সহজ। তাহলে বাকি লোকেদের কি হবে? বেদ এদের জন্য ঠিক

করে দিলেন স্বর্গপ্রাপ্তি। স্বামীজী স্বর্গের ধারণাটাই উড়িয়ে দিয়ে বলে দিচ্ছেন, অনাসক্ত হয়ে জীবনটাকে ভোগ কর, কিন্তু তোমার উদ্দেশ্য হবে আত্মোন্নতি।

স্বামীজী বলছেন, হিন্দু ধর্মে জাগতিক বলে কিছু নেই। বাস্তবিকই তাই, হিন্দু ধর্মে এটা জাগতিক, এটা আধ্যাত্মিক এই ধরণের কোন তফাৎ নেই, খ্রীশ্চান ও ইসলামে আছে। আমাদের কাছে সবটাই আধ্যাত্মিক। মানুষ যখন ভোগ করে সেটাও আধ্যাত্মিক ব্যাপার, যেমন সন্তানোৎপাদনের জন্য যখন স্বামী স্ত্রীর সমাগম হয় তখন সেটাও আধ্যাত্মিক ব্যাপার। খ্রীশ্চান ধর্মে ফিজিক্স, কেমেস্ট্রি, জ্যামিতি এগুলোকে secular sciences বা secular education বলে। হিন্দু ধর্মে seular education বলে কিছু হয় না। এই জিনিসগুলিকে স্বামীজী খুব স্পষ্ট করে তুলে ধরলেন। এটা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়, আগেও আমরা এর উপর আলোকপাত করেছি, যদি সম্ভব হয় পরে আরও বিস্তারে আলোচনা করা যাবে।

রামকৃষ্ণ ভাবধারাকে নিয়ে যাঁরা চলেন, যাঁরাই ঠাকুর, মা ও স্বামীজীকে জানেন, মানেন, তাঁদের জন্য দেববাণী হল গীতা। গীতা যেমন সমস্ত বেদ উপনিষদের সার, হিন্দু ধর্মের আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সার, ঠিক তেমনি আধ্যাত্মিক ব্যাপারে ঠাকুরের সার স্বামীজী, স্বামীজীর সার দেববাণী। হিন্দু ধর্মকে ঠিক ঠিক বুঝতে হলে গীতা অধ্যয়ন করতে হবে, গীতার ভাষ্য দিয়ে গীতাকে বুঝতে হবে এবং আচার্যদের কাছে গিয়ে গীতা বুঝতে হবে। স্বামীজী যা যা আদর্শের কথা বলে গেছেন হাজার, দু হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষ এই আদর্শগুলোকে নিয়েই চলবে। স্বামীজী বলেছেন বলেই চলবে তা নয়, বিশ্ব চেতনাটাই এখন পাল্টে গেছে। স্বামীজীর বাণী ও রচনাকে যদি কাউকে পড়তে না দেওয়া হয়, যদি লুকিয়ে রেখে দেওয়া হয়, তাও দেখা যাবে ভারতীয় সমাজ ঠিক এই লাইনেই চলছে। প্রত্যেক দশ বছর পর ভারতে যা কিছু হচ্ছে, যা কিছু হচ্ছে না, যা কিছু শুভ হচ্ছে, দেখা যাবে স্বামীজী ওটা আগেই বলে গেছেন। স্বামীজী বলে গেছেন বলেই যে এটা হচ্ছে, তা না; দুটো একই সঙ্গে চলে। সিদ্ধান্ত স্বামীজীর দিক থেকে এসেছে। ঈশ্বর যখন সৃষ্টি করেন তখন তাঁর বস্তুর কোন দরকার হয় না। একটা বাড়ি তৈরী করতে গেলে আমাদের বালি লাগবে, ইট লাগবে, সিমেন্ট লাগবে। ভগবান যখন সৃষ্টি করেন তখন এভাবে হয় না। ভগবান ভাবলেন সৃষ্টি হোক, তাঁর ভাবাও যা সৃষ্টি হওয়াও তাই। কিভাবে হয়? বলা হয় তিনটে ধাপে হয়, বিচার, শব্দ ও বস্তু। আমরাও কিছু করার আগে কত ভাবনা চিন্তা করি, সেখান থেকে শব্দ রূপে প্রকাশ করা হয় আর শেষ ধাপে বস্তু রূপে পরিণত করা হয়, বস্তু মানে external manifestation। বর্তমান ভারতের সমাজ, সারা বিশ্বে বর্তমান ধর্মের যে রূপ নিচ্ছে, এটা একটা বস্তু, external manifestation, three dimensional একটা reality। এরই সিদ্ধান্ত হল স্বামীজীর বাণী ও রচনা। স্বামীজীর বাণী ও রচনা থাকুক আর নাই থাকুক, সত্য ওটাই থাকবে।

এর খুব ভাল দৃষ্টান্ত ঠাকুরের জীবনেই পাই, ঠাকুর জীবনে কোন দিন বেদ পড়েননি, উপনিষদ পড়েননি, বারো বছর ধরে শুধু সাধনা করে চলে গেলেন। সাধনা করে তাঁর যে অনুভূতিগুলি হয়েছিল পরে দেখা গেল তাঁর সব অনুভূতিই শাস্ত্রের সাথে মিলে যাচ্ছে। ঠাকুর যদি বেদ, উপনিষদ পড়ে থাকতেন তাহলেও তাঁর সিদ্ধি ওটাই হত, বেদ না পড়েও তাঁর সিদ্ধি তাই হল। ভারতের সমাজ আর স্বামীজীর বাণী ও রচনার ঠিক এই সম্পর্ক। স্বামীজীকে না পড়লেও তার যে growth pattern হবে, পড়ে নিলে ওই একই pattern থাকবে। তবে পড়া থাকলে কাজটা সহজ হয়ে যায়, যেগুলো patternalize হয়নি সেগুলো জেনে নিলে সুবিধা হয়ে যাবে। কেউ অমরনাথ যাবে, অমরনাথের উপর বই পড়ে গেলেও অমরনাথ তাই থাকবে, বই না পড়ে গেলেও অমরনাথ তাই থাকবে। যে অমরনাথ গেছে তার সাথে কথা বলে গেলে অমরনাথ তাই থাকবে, কথা না বলে গেলেও অমরনাথ যাত্রা তাই থাকবে। তবে যদি কথা বলে নেয়, দুটো বই পড়ে নেয় তার জন্য অমরনাথ যাত্রা সহজ হবে। আমরা যখনই বলি স্বামীজীর আদর্শে চলতে হবে, কিন্তু স্বামীজীর আদর্শে কেউ চলতে পারবে না। এই জন্যই বলা হচ্ছে যে, এটাই মানুষের স্বাভাবিক উন্নতি, ওই ভাবেই মানুষ উন্নতি করবে। আর একটা যে pattern দেশে ধীরে ধীরে আসছে, এটা কিন্তু বেদের pattern না। এখন যে চারিদিকে হিন্দুত্বের কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু তারা কেউ বুঝতে পারছে না যে এটা স্বামীজীর হিন্দুত্ব নয়। স্বামী বিবেকানন্দের হিন্দুত্ব আলাদা। ওনারা যে হিন্দুত্বের কথা বলছেন সেটা হল ঠাকুরমা, দিদিমার ধর্ম। ঠাকুরমা, দিদিমারা যেটা পালন করেন সেটা কখন ধর্ম হয় না। হয় তুমি বেদে যাও, তা নাহলে তুমি বিবেকানন্দে

এসো। মাঝখানের যে ধর্ম সেটাই ঠাকুরমা, দিদিমার ধর্ম, যেটাকে স্বামীজী আটকে দিচ্ছেন। যাই হোক আমরা আবার দেববাণীর প্রসঙ্গে ফিরে আসছি।

অবিদ্যা, কাম ও কর্ম = অপূর্ণতা

স্বামীজী বাইবেলের সেন্ট জনের কথা উল্লেখ করে বলছেন খ্রাইস্ট কেন এসেছিলেন, In the twenty ninth verse, 'taketh away the sin of the world' means that Christ would show us the way to become perfect. (*জনের ঊনত্রিংশ শ্লোকে যে লেখা আছে, 'তিনি জগতের পাপ দূর করেন' – তার মানে এই যে, খ্রীষ্ট আমাদিগকে পূর্ণতা লাভ করবার পথ দেখিয়ে দেবেন।*) স্বামীজী ব্যাখ্যা করে বলছেন sin মানে imperfection। এটাই অপূর্ণতা, বেদান্তে তিনটে শব্দ দিয়ে বলা হয় অবিদ্যা, কাম ও কর্ম। যিনি পূর্ণ, যিনি সচ্চিদানন্দ তিনি কেন যে ভাবেন আমি এক আমি বহু হব, সৃষ্টি হোক, বাইবেলে বলছেন, let there be light, কেন উনি বলেন এর উত্তর কারুর কাছে নেই, এটাই মায়া। এর বেশী আমরা জানি না; যিনি পূর্ণ তিনি কেন বহু হতে চাইলেন, এই প্রশ্নও করা যায় না।

ভগবান সচ্চিদানন্দ, তিনি চৈতন্যস্বরূপ, তিনিই চৈতন্য, আমাদের যে মন এটা প্রতিবিম্বিত চেতনা। চেতনা কখন চৈতন্যকে প্রশ্ন করতে পারে না, আর কোন দিন বুঝতেও পারবে না। মায়া আসা মানে তখন কোথাও একটা অবিদ্যা এসে গেল। যিনি এক ছিলেন তিনি বহু রূপে প্রতিত হন, যিনি পূর্ণ ছিলেন তাঁকে এখন কামনাযুক্ত বলে মনে হয়। ফলে সৃষ্টি যেটা হয় সেটাও কামনাযুক্ত সৃষ্টি হয়। কারণ সেখানে অবিদ্যা ঢাকা রয়েছে, অবিদ্যা যদি ঢাকা না থাকে সৃষ্টিই হবে না। অবিদ্যাটা কি? আমি পূর্ণ কিন্তু মনে করছি আমি অপূর্ণ। যখন নিজেকে মনে করছি আমি অপূর্ণ তখনই মনে কামনা আসে, আমার টাকা নেই টাকা চাই, আমার গাড়ি নেই গাড়ি চাই, আমার ভাল লাগছে না, আমাকে বিবাহ করতে হবে, এই ভাবে হাজার হাজার কামনা এসে গেল। অপূর্ণতা থেকেই আসবে কামনা, কামনা এলেই কামনার পুর্তির জন্য কাজ করতে হবে। তাই তাঁরা বলেন অবিদ্যা, কাম, কর্ম। যেমনি কোন কাজ করবে, ভাল কাজ করলে তার সাথে দুটো মন্দ কাজ হবে, মন্দ কাজ করতে গেলে দুটো ভাল কাজ হবে। কাজ মানেই তার একটা ফল হবে, কাজের শুভ অশুভ ফল হবেই। কাজের ফল যখন হবে তখন আমরা শুভ ফলকে ধরতে চাইব আর অশুভ ফল থেকে বাঁচতে চাইব। শুভ ফলকে ধরতে যাওয়া মানেই আমি অপূর্ণ, অশুভ ফল থেকে দূরে থাকতে চাইছি, তার মানে আমি অপূর্ণ। অপূর্ণ মানেই অবিদ্যা, অবিদ্যা হলেই কাম, কাম এলেই কর্ম। তার মানে আরও নূতন নূতন কামনা আসবে, কামনা থেকে নূতন নূতন কর্মের সৃষ্টি হবে, কর্ম সৃষ্টি হতে থাকা মানেই কাজের বৃদ্ধি। যত কাজ বাড়ছে তত কামনা বাড়তে থাকে। ছোটবেলায় আমরা দেখতাম দেশের লোকেরা খেতে পেত না, এখন সবাই খেতে পাচ্ছে। গ্রামের লোকেরাও এখন বিদেশী খাবার খাচ্ছে, মদ খাওয়া এখন একটা ফ্যাশান হয়ে গেছে, স্মার্ট ফোন সবারই দরকার। টাকা-পয়সা হলেই যে মানুষের সব বাসনা মিটে যাবে তাতো নয়, বরঞ্চ আরও বাসনা বাড়ে। এভাবে অবিদ্যা, কাম ও কর্ম চলতেই থাকে, কোন দিন শেষ হয় না। খ্রাইস্ট যখন এলেন, তিনি ওই পাপটাকে নিয়ে নিলেন। পাপকে নিয়ে নিলেন মানে, তিনি আমাদের ভিতরের পাপটাকে সরিয়ে দিলেন। পাপ মানে অবিদ্যার ভাব, অপূর্ণতার ভাবটা সরিয়ে দিলেন।

যীশুর শিষ্য হওয়ার জন্য এক বৈশ্য ছেলে এসেছে। যীশু তাকে বলে দিলেন, তোমার যা কিছু আছে সব বিক্রি করে তার পয়সা গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে আমার সাথে চলে এসো। আরেকজন এসে বলছে, আমার বাবা মারা গেছেন তাঁকে কবরে দিয়ে তারপর আমি আপনার সাথে আসছি, যীশু তাকে বলছেন, let the dead buried dead, মৃতেরা মৃতের সৎকার করুক। দুটো ঘটনার বক্তব্য একটাই – এই জগৎকে ছাড়, কর্ম বাদ দাও, কামনা ফেলে দাও, তবেই তোমার অবিদ্যা দূর হবে। কবীর দাসও একই কথা বলছেন, যো ঘর জারী আপনা চলে হামারে সাথ, যে নিজের বাড়িতে আগুন লাগাতে পারবে সে আমার সাথে আসুক। একই ভাব, যীশু ওখানে যা বলছেন, এখানে কবীর দাস সেটাই বলছেন। আবার উপনিষদ বলছেন, ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হয়, এছাড়া অন্য কোন পথ নেই। গীতাও শুধু ত্যাগ আর ত্যাগের কথা বলে যাচ্ছেন। মূল বক্তব্য এক, কিন্তু যীশু যেখানে ছিলেন সেখানে আধ্যাত্মিক পরম্পরা ছিল না। তাদের কাছে সবটাই নূতন, কারণ জিউস পরম্পরাতে, ওল্ড টেস্টামেন্টে ত্যাগের ভাব নেই। ফলে এই কথাগুলো তাদের কাছে একেবারেই

নূতন। তাই ‘taketh away the sin of the world’ এই কথাগুলো ওনারা তাই নিজের মত ব্যাখ্যা করেন। জিউস পরম্পরায় এর ব্যাখ্যা করে বলা হল, ভগবান নিজের সন্তানদের বলি দিলেন। বলি প্রথা যেমন হিন্দুদের রয়েছে তেমনি জুইসদেরও রয়েছে। এই জিনিসটাকে আগেও আমরা আলোচনায় নিয়ে এসেছিলাম, লিঙ্ক করার জন্য এখানে বলা হল।

মানুষ হল দিব্য কিন্তু তার উপর একটা আবরণ পড়ে আছে, সেই আবরণটা সরিয়ে দিচ্ছেন। শঙ্করাচার্য বলছেন, এই বন্ধনটা যদি সত্য হয় তাহলে বন্ধন চলে গেলে আবার বন্ধন এসে যাবে। খ্রীশ্চানরা যে পাপের কথা বলে এই পাপ যদি সত্য হয়, তাহলে যীশু এই পাপ নিয়ে নিলেও আবার পাপ আসবে। কিন্তু পাপটা যদি সত্য না হয়, absolute যদি না হয়, ঈশ্বরের মত যদি তার সত্তা না থাকে, তবেই সেটা নেওয়া যাবে। যদি ঈশ্বরের মত সত্য না হয়, তার মানে ওটা আবরণ, ওটা তার স্বরূপ নয়। সেইজন্য খ্রীশ্চানরা যখন man is the born sinner বলে তখন তারা theoretically ভুল বলছে। মানুষ যদি born sinner হয় তাহলে ওটা তার সত্তা হয়ে গেল, সত্তা যদি হয়ে যায় তখন ঐ পাপ ভগবানও সরাতে পারবেন না। কারণ ভগবানের নিজের স্বরূপ নিজেও সরাতে পারবেন না। এখানে স্বক্রিয়া অভাব হয়ে যাচ্ছে, ডান হাত ডান হাতকে ধরতে পারে না, চোখ নিজেকে দেখতে পায় না, কারণ নিজের উপর ক্রিয়া করা যায় না। পাপ যদি স্বাভাবিক হত তাহলে ভগবানও এই পাপকে সরাতে পারবেন না। সেইজন্য পাপ এটা একটা আবরণ, লণ্ঠনের কাঁচের উপর আবরণ দেওয়া আছে, আলো চাপা পড়ে গেছে। খ্রীশ্চানরা বলবে, এই কথা আমাদের বাইবেলেই আছে, আমি তোমার কথা কেন শুনতে যাব! গীতা নিজে নিজে পড়ার সময় যতটুকু বোঝার আমরা বুঝে নিই, বাকিটুকু বোঝার জন্য আমাদের শঙ্করাচার্য, রামানুজ ও মাধ্বাচার্যের ভাষ্যের উপর নির্ভর করতে হয়। শঙ্করাচার্যকে ঠাকুরও অবতার বলছেন, স্বামীজীও অবতার বলছেন, বাকিরা আচার্য। আচার্য মানেই ওনাদের বুদ্ধি রয়েছে, যেখানেই বুদ্ধিবৃত্তি আছে সেখানেই imperfection থাকবে, সে কখনই perfect হতে পারে না। কারণ বুদ্ধি মায়ার রাজ্যের জিনিস, মায়ার রাজ্যের কোন জিনিসই perfection হয় না।

আমরা যখনই কোন কিছু জানছি, শিখছি সেখানে ইমোশান বিরাট ভূমিকা পালন করে। ইমোশান ছাড়া আমরা একটা জিনিসকে কিভাবে শিখি, জানি, এটা একটা বড় বিস্ময়ের জিনিস। নিওরো বিজ্ঞানীরা এখনও এর উপর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু তাঁরাও কোন ফাইনাল কিছু বলছেন না, আজকে একটা থিয়োরি দিচ্ছেন, আগামীকাল আরেকটা থিয়োরি এনে আগের থিয়োরিকে নস্যাৎ করে দিচ্ছেন। অবশ্য এটা ঠিক যে নিওরো বিজ্ঞান বিজ্ঞানের সব শাখা থেকে এখনও শিশু, এর উন্নতি হতে এখনও অনেক সময় লাগবে। কিছু দিন আগে বলা হল, কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় একটা লোক মরে গিয়েছিল কিন্তু দেখা গেল মরার পর বেঁচে উঠেছে, তখন তারা কিছু কিছু বর্ণনা দেয়। সেগুলোকে হ্যালুসিনেশান ইত্যাদি বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমেরিকার কয়েকটা হাসপাতালের বিজ্ঞানীরা চাইলেন এর উপর গবেষণা করবেন। গবেষণা করতে গিয়ে এনারা লক্ষ্য রাখছেন যে রোগীরা ক্লিনিক্যালি মৃত, এমন কোন রোগী যদি বেঁচে চলে আসে তারা সব কিছু ঠিক ঠিক বর্ণনা করে দিচ্ছে। এক মৃত শরীরকে এক বিশেষ মেশিনে রাখা হয়েছে। তাঁরা দেখছেন ব্রেন ওয়েভ কাজ করছে, কিন্তু ব্রেনে অক্সিজেন যাচ্ছে না, ব্রেনও মৃত। ওদের কাছে এটা একটা রহস্য। কোন রোগী যদি বেঁচে চলে আসে, বিজ্ঞানীরা দেখছেন সেই রোগী কতজন ডাক্তার দাঁড়িয়ে ছিল, ডাক্তারদের দেখতে কি রকম; সব কিছু বর্ণনা করে দিচ্ছে। অথচ তাকে বেহুঁশ করে রাখা ছিল আর ক্লিনিক্যালি মৃত, কিন্তু তারপরেও সব কিছু বর্ণনা করে দিচ্ছে। গবেষণার পেপারে ওনারা বর্ণনা করছেন, মানুষের মধ্যে যে চেতনা জড়িয়ে আছে, কিছুক্ষণের জন্য ওই চেতনা ওখানে থেকে যায়। সেই চেতনা সব কিছু ইন্দ্রিয় ছাড়াই গ্রহণ করে। এদের এই কথা হিন্দুরা তো ছ-সাত হাজার বছর আগে থেকে বলে আসছে। কি বলে আসছে? মানুষ যখন মারা যায় তার সূক্ষ্ম শরীর ওখানে দাঁড়িয়ে থাকে। সূক্ষ্ম শরীর মানে মন আর ইন্দ্রিয় দিয়ে যা নির্মিত, মনের আবার সব সময় ইন্দ্রিয়ের দরকার পড়ে না, সরাসরি সে জানতে পারে। কিছুক্ষণ সে ওখানে থাকবে, তারপর যখন দেখে এই শরীর দিয়ে আমার আর কাজ চলবে না, তখন সে ওখান থেকে ছেড়ে অন্য লোকে চলে যায়। শ্রীশ্রীমায়েরও এই ধরণের অভিজ্ঞতার বর্ণনা আছে। তিনি নিজের মুখে বলছেন, একদিন দেখছেন তাঁর শরীর ছেড়ে দিয়েছে, তিনি দেখছেন রুগ্ন, জরাজীর্ণ কঙ্কালসার শরীরটা পড়ে আছে, আবার এই শরীরের মধ্যে তিনি ঢুকতে চাইছেন না, যতক্ষণ ভাবছেন ততক্ষণের মধ্যে আবার তিনি ঢুকে গেলেন। পরম্পরায় এই ধরণের প্রচুর বর্ণনা পাওয়া

যাবে। কে দেখছে কঙ্কালসার শরীরটা পড়ে আছে? যাই হোক, এর উত্তর তাদের কাছে নেই। একটা জিনিস আমরা জানি, যে কোন জিনিসকে যদি আমরা জানতে চাই, বুঝতে চাই, মনে রাখতে চাই, তার জন্য ইমোশান দরকার। কোন একটা কারণে ইমোশান যদি খুব পাওয়ারফুল হয়, তখন আমাদের মস্তিষ্কের কোশিকাগুলো যে রাসায়নিক পদার্থ ছাড়ে তাতেই সব কিছুকে মনে রাখা সম্ভব হয়। আগেকার দিনে ছাত্রদের শিক্ষকরা খুব উত্তম-মধ্যম দিতেন, তাতে যে ব্যাথা হত, ওই ব্যাথাতেই ওরা সব পড়াশোনা ভালভাবে মনে রাখত। কাউকে যদি খুব ধমক দিয়ে কিছু বলা হয়, সেই কথা সে কোন দিন আর ভুলবে না। খুব ভালবাসাতেও তাই হয়, কাউকে যদি কেউ খুব ভালবেসে থাকে, ওই ভালবাসা সে কোন দিন ভোলে না।

Teaching, preaching, learning ঠিক এই patternএ চলে। আচার্যরা যখন শাস্ত্রের কথা বোঝার চেষ্টা করেন, নিজের চেষ্টায় যখন বুঝে নেন, তাঁরা ইমোশানালি চার্জড হয়ে যান, তখন তাঁরা শাস্ত্রের যে কথাই বলেন সেটা পুরো জোর দিয়ে বলেন। কিন্তু তাঁরা আচার্য, তাঁরা অবতার নন। এখন তাঁর ওই গভীর পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রের প্রতি তীব্র অনুরাগ দেখে কিছু লোক আকর্ষিত হয়ে তাঁর পাশে জড়ো হয়ে যায়। কিন্তু এদের ইমোশান তাঁর মত নয়, অনেক কম। ফলে তারা আরও কম বোঝে। তিনি যদি এখন তাঁর কথাগুলো না লিপিবদ্ধ করে দিয়ে যান তাহলে পরে তাঁর কথাগুলোর মধ্যে অনেক ভুলভাল জিনিস ঢুকে যাবে। এই জিনিস প্রত্যেক ক্ষেত্রেই হয়, বিজ্ঞানেও হয়, কলার ক্ষেত্রেও হয় আবার ধর্মে অর্থাৎ খ্রীশ্চানিটিতেও হয়, ইসলামেও হয়, হিন্দু ধর্মেও হয়। খ্রীশ্চানিটিতে এই রকম জিনিস প্রচুর রয়েছে, বিশেষ করে যীশুকে নিয়ে আর চার্চকে নিয়ে। খ্রীশ্চানিটিতে তিনটে খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ভূমিকা নেয় – ভগবান নিজে, যীশু আর চার্চ। চার্চকে সবাই মানে না, বিশেষ করে প্রোটেস্টান্টরা একেবারেই মানে না, ক্যাথলিকরা মানে। এখন যাঁরা সাধনা করেছেন, যাঁরা বড় সাধক তাঁরা নিজের মত যীশুকে দেখছেন। তাঁদের মধ্যে কিছু ছিলেন যাঁরা বেশি অনুরাগী হয়ে আরও গভীরে গিয়েছেন, সেখান থেকে তাঁরা যা বললেন সেটা থেকে একটা আলাদা সম্প্রদায় হয়ে গেল। হিন্দুদের মত খ্রীশ্চানিটিতে এইভাবে হাজার হাজার সম্প্রদায় তৈরী হয়েছে। কিন্তু তাদের বাইবেল এক, ঈশ্বরের অবধারণা এক, কিন্তু সেখানেও সামান্য কিছু কিছু তফাৎ আসতে পারে। তবে যীশু যে একজন দিব্য ব্যক্তিত্ব এই ব্যাপারে কেউ কোন প্রশ্ন করে না। এদের এতগুলো এক জিনিস রয়েছে, তাদের শাস্ত্র এক, গড্ এক, যীশু এক, সেখানে হিন্দুদের বহু শাস্ত্র, কোন একজন ভগবান নেই; খ্রীশ্চানিটি আর হিন্দু ধর্মে এই জায়গাতে একটা বড় তফাৎ হয়ে যায়।

ত্রিতত্ত্ববাদ ও একত্ববাদের ধারণা

এবার স্বামীজী যীশুকে নিয়ে বলতে যাচ্ছেন, তিনি যীশুকে নিয়ে দুটো ধারণা নিয়ে আসছেন – triinitarian and Unitarian (ত্রিতত্ত্ববাদী ও একত্ববাদী)। খ্রীশ্চান ঐতিহ্যে তিনকে বলা হয়, যিনি ভগবান তিনি তিন রূপে সামনে আসেন, God the Father, God the Son and God the Holi spirit। আগে এই নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। এই তিন আসলে এক, কিন্তু তিন রূপে দেখান। আমরা যেমন বলি ভগবান বিষ্ণু তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই শিব, তিনিই বিষ্ণু। কিন্তু God the Father তিনি সৃষ্টি করেন, তিনিই আসল। God the Son ভগবান সৃষ্টি করেছেন, যীশুকে ভগবান নিয়ে এসেছেন। God the Holi spirit - মানুষকে যে শক্তি শুভের দিকে, আধ্যাত্মিক পথে নিয়ে যায়। এটাই trinitarian বা ত্রিতত্ত্ববাদী, যেখানে ত্রিমূর্তির বর্ণনা করছেন। এর বিপরীতে Unitarian ধারণা রয়েছে। এই ধারণাতে বলা হয়, যীশু আমাদেরই মত একজন ছিলেন, তিনি সাধনা করলেন, সাধনা করে তিনি সিদ্ধ পুরুষ হয়ে গেলেন। সিদ্ধ পুরুষ হয়ে যাওয়াতে তিনি হয়ে গেলেন ভগবানের সন্তান। Trinitarianদের মতে যীশু চিরদিনই ভগবানের সঙ্গে এক, God the Father and God the Son দুটোই এক। এই কথা বলে বলছেন, ভগবানকে দেখা যায় না, কিন্তু ভগবানের সন্তানকে দেখা যায়, ভগবানের সন্তানকে দেখা যা ভগবানকে দেখাও তাই। যীশুকে দেখা যা ভগবানকে দেখাও তাই। এই দুটো ধারণা এসে গেল, একটা ধারণায় যীশু মানুষ থেকে দিব্যত্ব লাভ করেছেন, আরেকটা ধারণা হল যীশু সাক্ষাৎ ভগবান, অবতারও নন।

এরপর স্বামীজী এটাকে ব্যাখ্যা করে বলছেন, এই যে Trinitarian concept, এই যীশু আসলে আমাদের কোন দিন সাহায্য করতে পারেন না। কারণ তিনি আমাদের থেকে অনেক উপরে, তিনি ভগবান।

অন্য দিকে Unitarian conceptএ যীশু একজন মানুষ, সেইজন্য তিনি কোন দিন আমাদের সাহায্য করতে পারবেন না। কথায় কথায় আমরা একবার আলোচনা করেছিলাম যে, কোন ঋষি যুগের পরিবর্তন করতে পারেন না, অবতারই যুগ পরিবর্তন করেন। যা কিছু করেন ভগবানই করেন, ভাল যখন হয় তখন ভগবানই তা করেন, মন্দ যখন হয় তখনও ভগবান করেন, সৃষ্টি তিনিই করেন, বিনাশও তিনি করেন। এই অর্থে যদি বলা হয় তিনিই সব কিছু করেন, কিন্তু এই অর্থকে যদি সরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে ভগবান কখনই জগতের লীলাখেলাতে নামেন না। তাহলে এই যে লীলাখেলা চলে, যুগপুরুষ হয়ে এসে যিনি এগিয়ে নিয়ে চলে যান, এটা একমাত্র অবতারই পারেন। অথচ অবতারের ধারণা, যিনি ভগবান তিনি মানুষ রূপে এসেছেন, মানুষের মতই আচরণ করেন কিন্তু তিনি অবতার, মানুষের কল্যাণের জন্যই তিনি আসেন।

থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ডে স্বামীজীর শিষ্যরা সবাই খ্রীশ্চান ছিলেন, খ্রীশ্চান পরম্পরাতেই সবাই বড় হয়েছেন, তাঁদেরকেই যীশুর মাধ্যমে বেদান্তের ধারণা দিচ্ছেন। কি ধারণা? যে ভগবান ভগবান রূপেই থাকেন, সেই ভগবান আমাদের কোন কাজে লাগে না, যাঁরা সাধু পুরুষ, তাঁরাও আমাদের পাপ নিতে পারবেন না বা আমাদের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করতে পারবেন না। স্বামীজী বলছেন, যীশু হলেন ভগবানের অবতার, তিনিই আমাদের সাহায্য করতে পারেন। খ্রীশ্চানিটিতে যাঁরা পরম্পরায় আচার্য হয়েছেন, যাঁরা ভাষ্য রচনা করেছেন, এনারা কিন্তু কেউই ঋষি পরম্পরার ওই অর্থে নেই যেভাবে হিন্দুদের ঋষি পরম্পরা রয়েছে। হিন্দু জাতি পুরোপুরি নিজেকে ধর্মে উৎসর্গ করে দিয়েছিল বলে হিন্দুদের খুব শক্তিশালী ঋষি-পরম্পরা চলে আসছে। কোন মানুষই perfect হয় না, একমাত্র ভগবানই perfect। কেউ যদি imperfection এর জন্য দোষ করেন, আরেকজন এসে ওই দোষটাকে মিটিয়ে দিয়ে ঠিক করে দেন; যে ব্যাপারটা এখন বিজ্ঞানে দাঁড়িয়ে গেছে। কোন বৈজ্ঞানিকই সব কিছু জানেন না, তিনি হয়ত দশটা ঠিক কথা বললেন, দুটো ভুল কথা বললেন, তখন আরেকজন বৈজ্ঞানীক এসে ওই ভুল কথাগুলো ঠিক করে দেন। এই কারণে হিন্দুদের পরম্পরা অত্যন্ত বলিষ্ঠ পরম্পরা। আমরা এটা মানি যে একজন সন্ত মহাত্মা আমাদের দুটো আশীর্বাদ দিয়ে দিতে পারেন, আমাদের অনেক কিছু ভাল হয়ে যেতে পারে, কিন্তু আমাদের অজ্ঞান অন্ধকার, খ্রীশ্চান ধর্মে যেটাকে sin বলা হচ্ছে, এটাকে দূর করা তাঁর পক্ষে কোন দিন সম্ভব হবে না, সেই ক্ষমতাই তাঁদের নেই। ঠাকুর হাভাতে কাঠ ও বাহাদুরী কাঠের কথা বলছেন। এনারা হলে হাভাতে কাঠ কোন রকমে নিজে ভেসে চলে যেতে পারেন, অপরকে নিতে গেলে তিনি নিজেও ডুববেন অপরকেও ডুবিয়ে ছাড়বেন। অবতাররা হলেন বাহাদুরী কাঠ, নিজেও ভেসে চলে যাবেন আবার সাথে দশজনকে সঙ্গেও নিয়ে যাবেন। কারণ তিনি যে ঈশ্বরের সাথে এক, তিনি সেই সাক্ষাৎ ঈশ্বর এই রূপে এসেছেন, এই জিনিসটাকে তিনি কক্ষণ ভোলেন না।

কিন্তু খ্রীশ্চান পরম্পরায় আমরা যেভাবে অবতারকে বুঝি সেভাবে বোঝে না। ওদের কাছে সব সময় অবতার হলেন God the Son, one with father। আমরা এটাকে কখনই মানব না, আমরা বলব He is being father। Jesusও নিজের সম্বন্ধে বলছেন I and my Father in heaven are one। কিন্তু খ্রীশ্চানরা এটাকে Trinitarian অর্থেই নেয়, যিনি Father তিনিই Son। পরম্পরা না থাকলে যা হয়, একটা জিনিসের বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা হতে থাকে। হিন্দিতে একটা নামকরা ছড়া আছে, একটা গ্রামের পথ দিয়ে একটা হাতি চলে গেছে, গ্রামের লোকেরা জানেই না হাতি জিনিসটা কি হতে পারে। গ্রামের ধুলোতে হাতির বড় বড় পায়ের ছাপ। ওই গ্রামে একজন ছিল সে সবজান্তা। গ্রামের লোকেরা তার কাছে গেছে, 'তুমি বল তো এটা কি'? সবজান্তা এসে রাস্থায় ধুলোতে হাতির পায়ের ছাপ দেখল। সেও কোন দিন হাতি দেখেনি। অনেকক্ষণ দেখার পর ভাবনা-চিন্তা করল। সারাদিন পায়ের ছাপ দেখছে, মাপজোক করছে, করার পর বিকেলবেলায় বলছে, 'তোমরা মুর্খ এটা তোমরা কেউ কিছু বুঝতে পারলে না! একমাত্র আমিই বুঝতে পারলাম। গ্রামে একজন দুষ্ট লোক আছে, সে রাত্রে পায়ে উখল বেঁধে এখানে হেঁটেছে'।

বেশির ভাগ ভাষ্যকাররা এই রকমই। এবার অন্যরা বলবে, আপনি কি করে বলছেন যে আপনাদেরটা ঠিক? এইজন্যই আমি ঠিক, কারণ আমাদের সম্প্রদায় বিদ্যা রয়েছে। আমাদের পরম্পরায় প্রচুর ঋষিরা ছিলেন, কোন একজন ঋষি এই কথা বলছেন না। কোন একজন ঋষির কথাও যদি বলা হয়, তার মধ্যেও দোষ থাকতে পারে। আর যাই হোক, আপনার যেখানে মত সেখানে আমারও মত রয়েছে। যদি আপনার মত

পাঁচজনের ভাল লাগে তাহলে পাঁচজন ওটার জন্যই উপযুক্ত। আমি যেটা বলছি সেটা যদি আরও পাঁচজন পছন্দ করে, তাহলে ওই পাঁচজন আমার মতের জন্য উপযুক্ত। স্বামীজী এক জায়গায় বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, একজন দাঁড়িয়ে বলল, Swamiji! I don’t agree with you, স্বামীজী! আমি আপনার এই মতের সাথে একমত নই। স্বামীজী তাকে বললেন, then it is not meant for you, তাহলে এটা তোমার জন্য নয়। আমরা আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, স্বামীজী যে কথাগুলো থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ডে বলেছিলেন তার সব কথা মিস ওয়াল্ডো লিপিবদ্ধ করতে পারেননি, সম্ভবও ছিল না, কিন্তু স্বামীজীর বক্তব্যের যে ভাব সেটাকে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। বক্তব্য হল, যে মনে করে যে যীশু ভগবানের সাথে এক সেই ভগবান কোন দিন আমাদের সাহায্য করবেন না, কোন ভগবানই কোন দিন কাউকে সাহায্য করেন না।

একবার এক ভক্ত একজন মহারাজকে এসে বলছেন, আমার মারাত্মক অসুখ হয়েছিল, ঠাকুরের অসীম কৃপায় ভাল হয়ে গেছি। মহারাজ সেই ভক্তকে বলছেন, ঠাকুরের অসীম কৃপা যদি আপনার উপর থাকত তাহলে আপনার অসুখ কোন দিন হত না। মন্দ কিছু হলে অন্য কেউ, আর ভাল হলে ভগবানের অসীম কৃপা, এভাবে হয় না, নিতে হলে দুটোই নিতে হবে, ভালটাও নিতে হবে মন্দটাও নিতে হবে। ভগবানকে আমরা যেভাবে ভাবি, মনে করি, তিনি আলাদা। তাঁর ভারি বয়ে গেছে, আমি প্রার্থনা করলে তিনি এসে আমাকে বাঁচাবেন। প্রচলিত অনেক কাহিনীতে, গল্পে এগুলো বলা হয় ঠিকই, কারণ আমাদের এমন এমন অবস্থা হয় যে তখন আমরা বুঝতে পারি না, জানি না এই বিপদ থেকে কে আমাকে রক্ষা করলেন, কিভাবে রক্ষা পেলাম। কেউ বলে কর্ম, কেউ বলে স্বভাব, কেউ বলে দৈবাৎ, কেউ বলে ভাগ্য, কেউ বলে ভগবান। কিন্তু তিনিই যদি আমাকে বাঁচিয়ে থাকেন তাহলে তিনি কেন আমাকে ওই ঝামেলায় ফেললেন, না ফেললেই তো হত। অনেকে বলে, ‘উয়ার একটা মানে আছে’। গ্রামের জমিদার মোসায়েবদের সাথে ধান ক্ষেতের আলের উপর দিয়ে আসছিল, হঠাৎ পা পিছলে পড়ে যায়। জমিদার পড়ে গেছে, মোসায়েবগুলো হাসাহাসি করবে, জমিদার সায়েব উঠে বলছেন, আমি যে পড়ে গেলাম উয়ার একটা মানে আছে। নিজের ভুল অপরে যাতে না বুঝতে পারে তার জন্য বলা হয়, ওর একটা মানে আছে। সাধারণ লোকেদের বুদ্ধি অতি সাধারণ, ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার উচ্চ জিনিসগুলোকে তারা নিতে পারে না, তখন তাদের ওই ভাবেই কাহিনী বানিয়ে বলতে হয়, তাঁর কাছে প্রার্থনা করলে তিনি শোনেন। তাই বলে উচ্চ জিনিসটা যে কাউবে বলা হবে না, তা নয়। স্বামীজী মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে বেছে নিয়ে থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে চলে গেলেন, এরা আমার কথা বুঝতে পারবে।

আচার্য শঙ্কর গীতার ভাষ্যে প্রথমেই বলছেন, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এইজন্যই উপাদেশ দিলেন কারণ ভাল শিষ্য পেলে প্রচার ভাল হয়। আহাম্মক, মুর্খদের নিয়ে ভগবান কি করবেন, কোন কাজেই লাগবে না। আধ্যাত্মিকতার উচ্চ জিনিসগুলো কয়েকজন মুষ্টিমাত্র লোকেদের জন্যই হয়। দিল্লীর মেট্রো ট্রেনে একবার রামকৃষ্ণ মঠের একজন মহারাজ সফর করছিলেন। ট্রেনে একজন ভদ্রলোক মহারাজকে ধরে বলছে, আপনি কোন আশ্রমের। মহারাজ বললেন, রামকৃষ্ণ মিশন। ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনাদের মিশনের কত শিষ্য হবে? পাঁচ লাখ, দশ লাখ?’ ভদ্রলোক নিজের আইফোন এগিয়ে দিয়ে বলছে, ‘এই দেখুন আইফোন, আজ এর কোটি কোটি ভক্ত, বর্তমান কালে ফোনই ভগবান। আপনাদের ভগবান এই ভগবানের কাছে কিছুই না, ফেলে দিন আপনাদের এই ভগবানকে, আপনিও বুঝুন আপনার লোকেদেরও বোঝান’। মহারাজ তখন বললেন, ‘আপনি কোয়ান্টাম ফিজিক্সের নাম শুনেছেন?’ ভদ্রলোক শোনেননি। ‘থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি শুনেছেন, আইনস্টাইন শুনেছেন?’ বলল, ‘হ্যাঁ শুনেছি’। মহারাজ তখন বললেন, ‘এই জগতে থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি কজন বোঝে, আপনি তো কোয়ান্টাম ফিজিক্সের নামই শোনেনি। তাহলে আমেরিকাতে যে নামকরা যত ইউনিভার্সিটি আছে সব কটা বন্ধ করে দেওয়া হোক। কারণ যারা আছে বেশির ভাগই দুই-দু গুণে চার, এর বেশি জানে না। মুর্খদের জন্য ফোনই ভগবান থাকবে আর যাঁরা বিদ্বান তাঁদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণই ভগবান থাকবেন। যেমন দুই-দু গুণে চার অঙ্কের শেষ আর হায়ার লেভেলে রিলেটিভিটি হল ফিজিক্সের শুরু’। ততক্ষণে মহারাজের গন্তব্য স্টেশন এসে গেছে, তিনি নামতে যাচ্ছেন তখন পাশের একজন সেই ভদ্রলোককে বলছে, ‘পড়েলিখে সন্ন্যাসী হ্যায়, সামাহলকে বাত্ করনা’।

আমাদের এই জিনিসগুলো বুঝতে হবে, সাধারণ লোকেরা যত ধর্মের কথা বলে ওটা ধর্ম নয়। ভগবান আমাকে দেখছেন, ভগবান আমাকে দেখবেন এগুলো ঠিক আছে, খুবই ভাল। কিন্তু তার সাথে আসল জিনিসটাকেও জানা দরকার। স্বামীজী দেববাণীতে আসল তত্ত্বটাকে বলছেন। এই তত্ত্বটা কি? অবতার যখন আসেন তিনিই একমাত্র মানুষের মঙ্গল করেন, সাধনা করে করে যিনি সিদ্ধ পুরুষ হয়েছেন, তিনি তা পারেন না। যুগ পরিবর্তন কখনই সিদ্ধ পুরুষ দিয়ে হয় না। অবতার যদি আসেন আমরা কি করে তাঁকে চিনব? অবতার এলে যুগের পরিবর্তন শুরু হয়ে যাবে, যুগের চিন্তা পাল্টাতে শুরু হয়ে যাবে।

তারপরেই স্বামীজী যেটা বলছেন সেটা আরও গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা নিজেকে প্রথম থেকেই জানেন আর তাঁরা হচ্ছেন সেই অভিনেতার মত, যাঁদের খেলা শেষ, শুধু লোকেদের আনন্দ দেওয়ার জন্য আসেন। তাঁরা এই খেলাতে নেই, অপরের মঙ্গলের জন্য, ভাল করার জন্যই আসেন। এই জগতে যা কিছু দুর্বলতা রয়েছে, অপূর্ণতা রয়েছে সেটা কখনই এনাদের স্পর্শ করতে পারে না। তাঁরা দেহ ধারণ করেন, আমাদের যে দুর্বলতা রয়েছে সেগুলোকেও কিছু দিনের জন্য ধারণ করেন যাতে আমাদের শিক্ষা দিতে পারেন। কিন্তু তাঁরা কখনই অপূর্ণ নন, তাঁরা কখনই মানুষ নন। শঙ্করাচার্যও গীতা ভাষ্যে প্রথমেই বলছেন *ভূতানুজিঘৃক্ষয়া*, মানুষের ভালর জন্য ভগবান অবতার হন। আর বলছেন, *দেহবানিব জাত ইত চ লোকনুগ্রহং কুর্বন্ লক্ষ্যতে*, ভগবান দেহবান হয়ে যান, মানুষের মত দেহ ধারণ করেন, মানুষের মতই কর্ম করেন, আসলে তিনি তা নন। গীতায় ভগবান বলছেন, *জন্ম কর্ম চ মে দিব্যং*, আমার জন্ম, আমার কর্ম সবটাই দিব্য। এই যে জগৎ, এই জগতের নিয়মে, এখানকার নিয়মে তিনি চলেন না, কিন্তু এমন ভান্ করেন মনে হবে যেন এই নিয়মেই তিনি চলছেন। Jesus হলেন সেই অবতার, যিনি ভান্ করছেন তিনি যেন আমাদেরই মত একজন। সেইজন্য কেউ যদি মনে করে তিনি একজন সন্ত মহাত্মা, তাতে সে ভুল কিছু করছে না, কারণ তিনি মানুষের মতই আচরণ করছেন। ঠাকুরকে কেউ যদি বলে তিনি সন্ত মহাত্মা, সেখানেও সে কোন ভুল করছে না, কারণ ঠাকুরের আচরণ আমাদেরই মত। কিন্তু ভিতরে গিয়ে যদি দেখে তখন দেখবে, আরে তাই তো, তিনি তো আলাদা। কি কি আলাদা? এর প্রথম কথা হল, অবতার তত্ত্ব নিয়ে যে আলোচনা হয় সেগুলোকে দেখতে হয় আর দেববাণীতেই আমরা কয়েকটা জিনিস পাব। তার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হল, অবতারের অবতরাত্ব কিছু দিন পরে, দুশো, পাঁচশ বছর পরে বোঝা যায়। অবতারের সমকালীন যাঁরা বিখ্যাত লোক ছিলেন তাঁদেরকে দিয়ে বিচার করা যায়। যেমন ঠাকুরের সময় কেশবচন্দ্রের কত নামডাক, বিদ্যাসাগরের কত সুনাম, কিন্তু যেমন যেমন সময় চলতে থাকে, সমাজের চিন্তাধারায় পরিবর্তন শুরু হতে থাকে তখন অবতারকেই সবাই মনে রাখে। যেমন যীশুর সময় কজন লোক তাঁকে জানতেন! কিন্তু সেই সময় যাঁরা রাজনীতি, বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষমতায় ছিলেন তাঁদের সবাই জানতেন। আর দু হাজার বছর সেই নামগুলো হারিয়ে গেছে, কারুর নাম খুঁজে পাওয়া যাবে না, কিন্তু যীশু এখন ঘরে ঘরে বিরাজ করছেন। অবতারের সবচেয়ে বড় টেস্ট হল টাইম। এটা হল মুখ্য, কিন্তু যেটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ তা হল, অবতার যে কোন মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাব জাগ্রত করে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যেতে পারেন। একটু পরে এই ব্যাপারটাকে নিয়ে স্বামীজী বলবেন।

ঈশ্বর সব দ্বন্দ্বের পারে

ঈশ্বরের ব্যাপারে বলতে গিয়ে স্বামীজী বলছেন, God is near truth, but is not yet truth, ঈশ্বর সত্যের খুব কাছের, অথচ তিনি সত্য নন। বেদান্ত ছাড়া এই বাক্যকে বোঝা বা ধারণা করা অসম্ভব। যেখানেই আমরা সত্য বলছি সেখানে মিথ্যাও রয়েছে, যেখানে আলো আছে সেখানে অন্ধকারও আছে, যেখানে পূণ্য আছে সেখানে পাপও আছে। সেইজন্য এগুলোকে বলা হয় গুণ। সাধারণ ভাবে আমরা যেগুলোকে দুর্গুণ বলি মূলতঃ সেগুলোকে তমোগুণ বলা হয়। মানুষ যখন নিজেকে সামনে নিয়ে আসার জন্য কিছু করে তখন এগুলোকে রজোগুণ বলা হয়। আর যে গুণগুলোকে শুভ গুণ বলা হয় সেগুলোকে সত্ত্বগুণ বলা হয়। সত্ত্বগুণ ঈশ্বরের খুব কাছের, যদি কারুর মধ্যে সত্ত্বগুণের উদয় হয়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে ঈশ্বর দর্শনের তার আর দেরী নেই। এই ধরণের কথা ঠাকুর অনেকবার বলেছেন। যেখানে সত্য, করুণা, অহিংসা, মৃদু ভাব দেখা যায়, তখন বুঝতে হবে এখানে এবার ঈশ্বরের আবির্ভাব হতে পারে। ঠাকুর আবার খুব সুন্দর বর্ণনা করে দেখাচ্ছেন, কোন রাজা যদি নিজের কোন কর্মচারীর উপর খুব প্রসন্ন হয়ে গিয়ে বলেন, আমি তোর বাড়ি যাব, তখন রাজা

নিজেই তার দরকারি জিনিসগুলো সেই কর্মচারীর বাড়িতে পাঠাতে শুরু করে দেন। সবাই তখন বুঝতে পারে যে, এর বাড়িতে কোন বড়লোক আসছেন। এই জগৎ তমোগুণ আর রজোগুণ দিয়ে চলে, সত্ত্বগুণ দিয়ে জগৎ চলতে পারে না। যার শাস্ত্রপ্রীতি এসেছে, ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ এসে গেছে, শুভ প্রবৃত্তির উদয় হয়ে গেছে, বুঝতে হবে এবার সে অন্য পথ নিয়ে নিয়েছে। কিন্তু তাই বলে সে আধ্যাত্মিক পুরুষ হয়ে যায়নি বা হয়ে যাবে না। ধার্মিক হওয়া মানে সত্ত্বগুণী হওয়া, আধ্যাত্মিক হওয়া মানে তিনগুণের পারে চলে যাওয়া। দিন ও রাতের অনুভব আমরা এই পৃথিবী লোকেই করি, এখানে দিনও আছে রাতও আছে, কিন্তু সূর্যলোকে দিন ও রাত নেই। যেখানে সর্বদাই আলো সেখানে দিন ও রাত হয় না, এটাই অদ্বৈতের ভাব। যে সূর্যলোকে বাস করে তাকে যদি বলা হয়, 'আপনাদের এখানে সব সময়ই দিন থাকে?' সূর্যলোকের বাসিন্দা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করবে, 'মশাই! দিন জিনিসটা কি?' 'তার মানে আপনার সব সময় আলোতে থাকেন?' 'আলোটা কি?'

একটা জিনিসকে জানার জন্য তার বিপরীত জিনিসটাকে জানতে হয়, যে জিনিসের বিপরীত নেই সেই জিনিসকে জানা যায় না। এই জগৎ দ্বন্দ্বাত্মমূলক, দ্বন্দ্বের উপরই জগৎ চলছে। এখানে যে কোন জিনিসের তার বিপরীতটাও আছে – শীত আছে গরম আছে, ভাল আছে মন্দ আছে, সব কিছুর বিপরীত আছে। ভগবান এই সব কিছুর পারে। আমরা যতই চেষ্টা করে নিই না কেন, এই জিনিসটাকে ধারণা করা অসম্ভব। বেদান্ত বাদে যত ধর্ম আছে, প্রত্যেকটি ধর্মে এই সমস্যা লেগে আছে। তাদের কাছে যে ভাল সে হল আধ্যাত্মিক। নামকরা ইংরেজ ঔপন্যাসিক টমাস হার্ডি তাঁর লেখায় meditation শব্দের ব্যবহার করছেন, এমনকি পিজি উডহাউস যিনি অসাধারণ কমিক্সের স্রষ্টা, যখনই কারুর কোন ভাল গুণের বর্ণনা করছেন তখন বলছেন, he so spiritual, কারণ তিনি কখন মিথ্যা কথা বলেন না। মিথ্যা কথা বলেন না, সেইজন্য তিনি spiritual। এটাই এদের সাধারণ সমস্যা, এরা মনে করে, যে মিথ্যা কথা বলে না, চুরি করে না, ভাল মানুষ, সে হল আধ্যাত্মিক। হিন্দু ধর্মে কখনই তা হয় না, হিন্দু ধর্মে এগুলো হল শুভ সংস্কার, কিন্তু আধ্যাত্মিক নয়, ঈশ্বরের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। ঠাকুরও বার বার বলছেন, পাপ-পূণ্যের পারে, শুভ-অশুভের পারে। স্বামীজী বলছেন, God is near truth, but is not yet truth।

মাঝে মাঝে আমাদের মনে হয়, তখনকার দিনের খ্রীশ্চানরা স্বামীজীকে নূতন শুনছেন, ততটা জানেনও না, তাঁরা যে পরম্পরায় বড় হয়েছেন সেখানে সত্যটাই ভগবান। আর স্বামীজীর কাছে শুনছেন সত্যটাই ভগবান নয়, শোনার পর তাঁদের কেমন মনের অবস্থা হয়েছিল। মিস ডেচার্ড, যিনি থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কের কুঠিয়াটা দিয়েছিলেন, তিনি নিজে খুব গোঁড়া খ্রীশ্চান ছিলেন। স্বামীজী নিজের ভাবে এই কথাগুলো বলে গেছেন। মিস ডেচার্ড নিজেই কুঠিয়া ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। স্বামীজীর কথা, শিক্ষা তিনি নিতে পারছিলেন না। তিনি কাঁদতে শুরু করে দিতেন। পরিচিতরা পরে বুঝিয়ে তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতেন। এত দিন যে ধারণাগুলো নিয়ে বড় হয়েছেন, সেই ধারণাগুলো ভেঙে চুড়ে চুড়মার হয়ে যাচ্ছে।

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ

পরের বাক্যে বলছেন, After learning not to be disturbed by evil, we have to learn not to be made happy by good. (*অমঙ্গল যেন আমাদের বিচলিত করতে না পারে, এটি শেখবার পর আমাদের শিখতে হয় মঙ্গলও যেন আমাদের সুখী করতে না পারে।*) প্রথমে শিখতে হয় বাজে জিনিসগুলোর দ্বারা যেন আমরা উদ্বিগ্ন না হয়ে যাই, আর ভাল বা শুভ হলে যে খুশি হয়ে যাব, সেটাকেও ছাড়তে হয়। গীতায় এই কথাই ভগবান বলছেন, *দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ*, দুঃখে মন অনেকরই বিচলিত হয়ে যায় আবার সুখে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। সুখ আর দুঃখ প্রকৃতির নিয়মে আসে যায়। ভাষ্যকার বলছেন, যখন সুখ আসে তখন সে জানে, আমার কিছু শুভকর্ম করা আছে তাই এই সুখ এসেছে। এই সুখ বেশি দিন থাকবে না, আবার খারাপ সময় আসবে। তখনও সে বিচলিত হয় না, কারণ সে জানে আমার কিছু বাজে কর্ম আছে তাই এই খারাপ সময় এসেছে, পিছনে ভালটাও আসছে, কারণ আমার শুভকর্ম করা আছে। গীতাতেই পরে অন্য জায়গায় আবার বলছেন, *সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ*, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, সত্ত্বগুণ সুখ ও জ্ঞান দিয়ে সে সত্ত্বগুণীকে বাঁধে। সুখ বাঁধে, সেইজন্য কি আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব, প্রভু আমাকে দুঃখ দাও, দুঃখ সহ্য করার ক্ষমতা দাও! তার মানে সুখ চাইছি। সুখ দুঃখ প্রকৃতির নিয়মে চলে, ভগবানের ভারি

বয়ে গেছে আমাদের সুখ দুঃখ দেওয়ার। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমাদের অস্তিত্ব একটা পিঁপড়ের থেকেও নিকৃষ্ট, এই অস্তিত্ব বিহীন আমাদের নিয়ে ভগবান নাকি ভাবছেন তিনি কাকে দুঃখ পাঠাবেন, কাকে সুখ পাঠাবেন।

লিলিপুটদের নিয়ে লেখা গ্যালিভার ট্রাভেলস পড়ে ভল্টায়ার্স এত অভিভূত হয়েছিলেন যে তিনি পরে মাইক্রোমেগাস নামে একটা বই লিখে ফেলেন। কাহিনী হল, দূরে একটা তারা আছে, সেখানকার জীবরা খুব বড় আকৃতির। ওদের মধ্যে একটা বেঁটে লোক আছে, বেঁটে লোকটাই পৃথিবীর মাপে আট কিলো মিটার লম্বা, বাকিরা বারো থেকে পনের কিলো মিটার লম্বা হয়। কোন কারণে বেঁটে লোকটির সাথে তার স্ত্রীর খুব ঝগড়া হয়েছে, স্ত্রী রেগেমেগে তাকে একটা চড় মেরেছে। তাতে তার মনটা খারাপ হয়ে গেছে। মন তার এতই খারাপ হয়ে গেছে যে, সেই ওই জায়গা ছেড়ে ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণে বেরিয়ে গেছে। ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণে বেরিয়ে সে একজন সঙ্গী পেয়ে গেছে, তারও ওই রকম কি একটা সমস্যা আছে। এবার ও পৃথিবীতে নেমেছে। পৃথিবীতে সে প্রশান্ত মহাসাগরে নেমেছে, প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরতা পাঁচ কিলোমিটার, আর সে আট কিলোমিটার লম্বা। প্রশান্ত মহাসাগরকে তার মনে হচ্ছে যেন সে একটা ডোবা পেরোচ্ছে। দেখছে কয়েকটা জাহাজ যাচ্ছে, বুঝতে পারছে না সমুদ্রে দেশলাই খোলের মত কি ভাসছে! লোকটি একটা জাহাজকে হাতে করে তুলে নিয়েছে। জাহাজের প্যাসেঞ্জাররা তার হাতের উপর দিয়ে হাঁটছে। লোকটি ভাবছে হাতের উপর দিকে পিঁপড়ের মত কি চলছে। ভল্টায়ার তখন সেখানে নিজের কাল্পনিক ক্ষমতা দিয়ে বর্ণনা করছেন। দেখাচ্ছেন জাহাজে একজন বিজ্ঞানী ছিল, সে একটা পাইপের মত বড় চোঙ বানালো। ওই চোঙ দিয়ে বিজ্ঞানী কথা বলছে, সে শুনছে, এরা আবার উত্তর দিচ্ছে। পৃথিবীতে আমাদের কত রকমের যে নির্বুদ্ধিতা চলছে লোকটি অবাক হয়ে শুনছে। এই যে আমরা কথা বলে যাচ্ছি এর মধ্যেই পৃথিবীর এক জায়গায় দুটো বড় বড় আর্মি এক অপরের গলা কেটে যাচ্ছে, কারণ একদল বলছে দাড়ি রাখা ঠিক, আরেক দল বলছে, দাড়ি রাখাটা ঠিক না। ভল্টায়ার্স এখানে মুসলমান খ্রীশ্চানদের লড়াইয়ের কথা বলছেন। এইভাবে কথা চলতে চলতে একটা কি কথাতে জাহাজে একজন দার্শনিক ছিল সে মাইক্রোমেগাসকে বলছে, আমরা তোমার অস্তিত্বকে মানি না, তুমি জানো এই পৃথিবীতে আমরা হলাম শ্রেষ্ঠতম প্রজাতি। এই কথা শুনে মাইক্রোমেগাসের খুব জোর হাঁসি পেয়েছে আর এমন জোর হাঁসতে শুরু করেছে যে কখন তার হাত থেকে জাহাজটা পড়ে গেল সে বুঝতেও পারল না। জাহাজটা কোথায় পড়ে গেল সে আর খুঁজে পাচ্ছে না। ভল্টায়ার এটাই বলতে চাইছেন যে, আমরা মানুষরা অত্যন্ত insignificant, আমরা মনে করছি ভগবান আমাদের নিয়ে ভাছেন!

আমরা জানি না যে, সুখ হোক, দুঃখ, সত্য হোক, মিথ্যা হোক সব কিছু এই মায়ার রাজ্যে। এই মায়ার রাজ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও রয়েছে। যতক্ষণ এই মায়ার রাজ্য থেকে বেরিয়ে না আসা যায় ততক্ষণ কিছুই কিছু না। ততদিন তুমি শুধু ভাবতেই থাক, কেন আমার মন্দ হল, কেন আমায় এত দুঃখ দিলেন। বাচ্চারা কত নিষ্ঠার সাথে মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা করে, হে ঠাকুর আমার মাস্টারের যেন অসুখ হয়ে যায়, আজ যেন মাস্টার স্কুলে না আসতে পারে। ঠাকুর বলছেন বাচ্চাদের হৃদয় কত পবিত্র, কত সরল। আর তারাই কত নিষ্ঠা নিয়ে ঠাকুরের সামনে প্রার্থনা করছে। ঠাকুর যদি বাচ্চাদের প্রার্থনা শুনতেন তাহলে জগতের সব মাস্টাররা অসুস্থ হয়েই থাকত। ঠাকুর বলছেন, সরল, পবিত্র হৃদয় হলে প্রার্থনা তিনি শুনবেনই শুনবেন। কিন্তু বাচ্চাদের কোন প্রার্থনাই তিনি শোনেন না। একটা দুটো প্রার্থনা যদি দৈবাৎ লেগে যায়, তখন বলি, ঠাকুর আমার প্রার্থনা শুনেছেন। লক্ষ লক্ষ লোক লটারির টিকিট কাটছে, যে দু-একজনের লটারিতে টাকা লাগছে তাদেরই নাম টাঙানো হয়, বাকি লক্ষ লক্ষ লোকের নাম কোন দিন জানা যায় না। এই কজনের নাম দেখেই মানুষ লটারির টিকিট কিনেই যাচ্ছে। ঠিক তেমনি আমাদের কোটি কোটি যে প্রার্থনাগুলো তিনি শুনছেন না সেগুলোর কথা কেউ এসে বলে না, কেউ দেখতেও পায় না। প্রার্থনা লেগে গেলে বলছি ঠাকুর শুনেছেন। আর হাজারটা প্রার্থনা যে লাগছে না? তখন বলছি আমারই পাপের জন্য হয়েছে। ভাল সব ভগবান নেবেন আর সব মন্দের দায় আমার। ভগবান বলছেন, কেউ আমার প্রিয়ও নয়, কেউ অপ্রিয়ও নয়, কারুর প্রতি আমার দ্বেষ নেই। ভগবান যদি কাউকে প্রিয় মনে করে সুখ দেন আর কাউকে দ্বেষ করে দুঃখ দেন তাহলে তো শাস্ত্রে যে তাঁর নিজের কথা আছে, তার বিরুদ্ধে তিনি চলে যাচ্ছেন। ভগবান নিজেই শাস্ত্র বিরোধী হয়ে যাবেন, তা কি কখন সম্ভব!

তাহলে কি প্রার্থন করব না? প্রার্থনা না করে করবটা কি, কোথায় যাব? আমার দুঃখ-কষ্টের কথা নিজের আপনজন ছাড়া কাকে বলব! ঠাকুর আমার আপনজন তাই ঠাকুরকে আমার দুঃখের কথা জানাচ্ছি। আমি বলেছি বলে তিনি আমার দুঃখ ঘুচিয়ে দেবেন, পাঁঠা বলি দিয়েছি বলে আমার সমস্যা মিটে যাবে, তাহলে ঐ পাঁঠা কেনার টাকাটা জলে যাবে, কাজের কাজ কিছুই হবে না। ঠাকুর অবতার, তাঁর হাত ভেঙে যাওয়াতে তিনিও বলছেন, আমি মায়ের নাম করি তাও কেন আমার এমন হল। এই রকমই হয়। সীতা অত শুদ্ধ পবিত্র, তাঁকেও রাবণ অপহরণ করে নিয়ে চলে গেল। ঠাকুর স্পষ্ট ভাষায় বলে দিলেন, মায়ার রাজ্যে এটা থেকে সেটা হবে কখনই বলা যায় না। প্রার্থনা করলেই যে তিনি শুনবেন তা নয়, আর তিনি যে শুনবেন না তাও নয়। এই মায়ার রাজ্যে এসে গেলে কি হবে আর কি হবে না, কিছুই বলা যায় না। কিন্তু আমাদের তো কোন উপায় নেই, দুঃখ-কষ্ট হলে প্রথমে আমরা নিজেরা চেষ্টা করি সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে, তারপর নিজের পরিজনদের কাছে যাই, কোথাও থেকে কোন সুরাহা না হলে শেষে ভগবানের কাছে হাতজোড় করে প্রার্থনা করি। কেউ যদি মনে করে প্রার্থনা করব আর সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, এটাই তখন আমাদের শাস্ত্রে যত মতবাদ আছে, কর্মবাদ আছে সবেরই বিরুদ্ধে চলে যাবে। ঈশ্বর স্বাধীন, এই মূল ধারণাটাই ভুল হয়ে যাবে। মায়ার রাজ্যে কি হবে কিছু বলা যায় না, এই সত্যটাও মিথ্যা হয়ে যাবে। আর তার সাথে, জগতে ঈশ্বরের কেউ প্রিয় নেই, কারুর প্রতি তাঁর দ্বেষ নেই, গীতার এই বাক্যের কোন দাম থাকবে না। যত শাস্ত্র বাক্য আছে সব মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে যাবে। তবুও আমাদের প্রার্থনা করে যেতে হবে, প্রার্থনা করলে তিনি শোনার হলে শুনবেন, না শোনার হলে শুনবেন না। শোনা না শোনা সেটা তাঁর ব্যাপার।

ঠাকুরের যখন খুব শরীর খারাপ চলছে, সবাই গিয়ে ঠাকুরকে বলছে, মাকে একবার বলুন না তিনি যেন রোগটা সারিয়ে দেন। আমরা ভগবানের কাছে নির্লজ্জের মত চেয়ে বেড়াই, ঠাকুর সেখানে লজ্জার জন্য রোগের কথা বলতে পারছেন না। ঠাকুর অবতার, কিন্তু তিনিও কোন রকমে মাকে লজ্জা করে বলছেন, মা গলার ব্যাথার জন্য খেতে পারছি না। মা দেখিয়ে দিলেন, এত মুখে যে খাচ্ছিস! যদি আমি ঠাকুরকে সামনে পেয়ে বলি, কেন আপনি দিলেন না, তার উত্তরও ঠাকুরের কাছে আছে। তার কারণ আমাদের বুদ্ধি এতটুকু, আর তিনি চৈতন্য স্বরূপ, তাঁর বুদ্ধি আমাদের বুদ্ধি থেকে লক্ষ গুণ বেশি। শুধু নাকচই করে দেবেন না, সাথে তার কারণটাও জানিয়ে দেবেন। ঠাকুরকেও জগন্মাতা কারণটা দেখিয়ে দিলেন। ঠাকুর তাই বলছেন, কখন ভাবি তিনি ভাল আবার কখন ভাবি তিনি মন্দ। তিনি কেন করেন, কেন করেন না, কিছুই বলা যায় না। আমরা যদি আশা করি যে, আমি ঠাকুরের নামগুণগান করি আমার সব কিছু ভাল হবে, খুবই ভুল ধারণা। এগুলো অত্যন্ত উচ্চ আধ্যাত্মিকতার ব্যাপার, সাধারণ মানুষের এগুলো বোঝার কথা অনেক দূরের, শোনার দমটুকুও নেই। সেইজন্য বেদান্তের বক্তব্য হল, ভাল-মন্দ, পাপ-পূণ্য, শুভ-অশুভ সব মায়ার রাজ্যের, ঈশ্বরের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। ভক্তের কোথাও যাওয়ার নেই, দুঃখ এলে যেমন পাঁচজনকে বলে, তেমনি ঠাকুরকেও বলে, ঠাকুরকে আরও প্রাণের গভীর আর্তি নিয়ে বলে। আমরা কেন প্রার্থনা করি? আমি তাঁকে ভালবাসি, আমার ভাল লাগে তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে, তাই করি। তিনি আমাদের দিকে তাকান আর নাই তাকান তাতে আমার কিছুই আসে যায় না। মীরাবাঈ শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসতেন, সারা জীবন ভালবেসে গেছেন। স্বামীজী তাই বলছেন, জীবনের চেষ্টা হবে শুভ-অশুভের পারে যাওয়া।

বেনারসে এক জায়গায় এক সন্ন্যাসী চা খাচ্ছিলেন, হঠাৎ একটা লোক এসে সন্ন্যাসীকে খুব করে গালাগাল দিয়ে বলতে শুরু করেছে, 'লজ্জা করে না আপনার, মা-বাবাকে ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাসী হয়েছেন'! মহারাজ তখন খুব শান্ত হয়ে লোকটিকে বলতে লাগলেন, 'দেখুন, আমি যদি বিদেশে বড় চাকরি করতাম তাহলে বাবা-মাকে প্রচুর টাকা দিতাম, এটা মানছেন তো'? 'হ্যাঁ মানছি'। 'আর যদি আমি কোন অফিসে কেরানি হতাম তাহলে বাবা-মাকে কম টাকা-পয়সা দিতাম, মানছেন তো'? 'হ্যাঁ মানছি'। 'তার মানে আমি যা আয় করব তার একটা ভাগ আমি আমার বাবা-মাকে দেব, এটাই তো আপনি বলতে চাইছেন'? 'হ্যাঁ এটাই বলতে চাইছি'। সন্ন্যাসী হয়ে আমার আয় জিরো, তাই আমি জিরো দিচ্ছি, আর আধ্যাত্মিক জগতে আমার যত পূণ্য অর্জন হচ্ছে তার একটা অংশ আমি বাবা-মাকে দিয়ে দিচ্ছি, এর মধ্যে আপনি দোষ কোথায় দেখছেন? অনেকেরই ছেলে কাঙালী হয়, ভিখারী হয়, কারুর ছেলে চোর হয়, ডাকাত হয়, স্মাগলার হয়, তারা সবাই নিজের মত বাবা-মাকে দিচ্ছে, আমি আমার মত দিচ্ছি'। লোকটি সব শোনার সন্ন্যাসীর পা ছুঁয়ে বলল,

'জীবনে কেউ আমাকে কেউ এভাবে বোঝাতে পারেনি'। ভগবানের দিকেও কেউ যখন এগোয় তখন তিনি তাকে কি দেবেন? তাঁর কাছে যেটা আছে তিনি তাকে সেটাই তো দেবেন। ভগবান কি? তিনি চৈতন্যস্বরূপ, তিনি আমাদের জ্ঞান, ভক্তি ছাড়া আর কি দেবেন! হাজরা বলছেন, তিনি ঐশ্বর্যময়, চাইলে তিনি ঐশ্বর্যও দিতে পারেন। ঠাকুর শুনে বলছেন, গত জন্মে হাজরা কাঙালী ছিল, তাই ঐশ্বর্যটাই মনে পড়ল। অবতারকেও তিনি ঐশ্বর্য দিলেন না। ভগবানও ঐশ্বর্য নিয়ে আসনে না, আমাদের তিনি কোথা থেকে ঐশ্বর্য দেবেন। ঠাকুর গল্প বলছেন, একজন ভগবতীর খুব সাধনা করেছে, মা তাকে দর্শন দিলেন, খুব আদর যত্ন করলেন, জ্ঞান-ভক্তি সব দিলেন কিন্তু তার কাঙাল অবস্থাটা ঘুচল না। বলে, গঙ্গায় স্নান করলে সব পাপ চলে যায় কিন্তু চোখের কানাত্বটা যায় না।

জীবন মানেই শুভ-অশুভ, ভাল-মন্দের ব্যালেন্স

এই জগতে যেটা বোঝার তা হল, স্বামীজী বলছেন, We must find that we are beyond both evil and good; we must study their adjustment and see that they are both necessary.(*আমাদের জানতে হবে যে, আমরা মঙ্গল-অমঙ্গল দুয়েরই বাইরে। ওদের উভয়েরই যে যথাযোগ্য স্থান আছে, সেটি আমাদের লক্ষ্য করতে হবে ও বুঝতে হবে – একটা থাকলেই অপরটাও থাকবেই থাকবে।*) জীবন চালাবার জন্য আমাদের শুভ-অশুভ দুটোই দরকার। শুভ-অশুভ না থাকলে জীবন চলবে না। বাইবেলে একটা নামকরা কথা আছে 'food chain', এ ওকে খায়, ও তাকে খায়, এভাবেই সব কিছু ব্যালেন্সে চলে। এর মধ্যে কোন একটা জিনিসকে যদি শেষ করে দেওয়া হয় তাহলে পুরো chain systemeএ গোলমাল লেগে যাবে। অস্ট্রেলিয়াতে বড় বড় সাপ ছিল যার নাম র‍্যাটল স্নেক, ওখানে সাপগুলোকে মারা শুরু হল। এত র‍্যাটল স্নেক মারা পড়ল যে, ইঁদুরের সংখ্যা প্রচণ্ড বেড়ে গেল। এত ইঁদুর হয়ে গেল যে, সব ইঁদুর ক্ষেতের ফসল শেষ করে দিতে লাগল। ইঁদুর থেকে বাঁচার জন্য ওরা চার-পাঁচ ফুট নীচ থেকে ইলেক্ট্রিক্যাল ফেন্সিং দিতে লাগল যাতে ইঁদুর গুলো মারা যায়। ইতিমধ্যে ইঁদুর মরতে শুরু হয়ে যাওয়াতে সাপেদের খাদ্য সঙ্কট দেখা দিল, সাপগুলো এবার বাড়িতে ঢুকতে শুরু করেছে। এই ঘটনা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, শুভ-অশুভ দুটোরই দরকার। জিম করবেটে তাঁর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লেখায় দেখাচ্ছেন জঙ্গলে বাঘ, হরিণ, বন্যপশুরা কিভাবে এক অপরকে রক্ষা করছে। ইদানিং মানুষের শক্তি বেড়ে গেছে, হাতে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র এসে গেছে, যাকে খুশি গুলি করে মেরে দিচ্ছে, যেটা করার দরকার নেই সেটাও করছে। একটা বাঘ কোন রকমে একটা শিকার করলে ওটাকেই তিন দিন ধরে সবাই খাবে। আমাদের এখন প্রাচুর্য হয়ে গেছে, বিয়ে বাড়িতে খাবারের এত এলাহি আয়োজন করা হয় যে সবাই খেতেও পারে না, শেষে ফেলে দিতে হয়।

অনেক আগেকার কথা, একজন সন্ন্যাসী আমেরিকায় গেছেন। সেখানে এক জায়গায় তাঁকে খাবার দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় প্রথায় থালাতে কোন খাবার কেউ ছেড়ে দেয় না। উনি সেখানে পুরো প্লেটটা পরিষ্কার করে খেয়েছেন। আমেরিকাতে আবার প্লেটের সব খাবার খাওয়াটা রীতি বিরুদ্ধ, কিছু খাবার অবশিষ্ট থাকতে হবে। সন্ন্যাসী পরিষ্কার করে খেয়ে প্লেটটা নিয়ে যাচ্ছেন, ওয়েটার স্বামীজীর দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলছে, 'প্লেটটা কেন ছেড়ে দিলেন'? আমেরিকানদের প্রাচুর্য রয়েছে, তাদের কাছে প্লেটে কিছু খাবার ছেড়ে দেওয়াটা ভদ্রতার ব্যাপার; চেটেপুটে খাওয়াটা কাঙালীপনার লক্ষণ। ফুড চেনে যে বন্যপ্রাণীরা রয়েছে, তারা এটা কোন দিন করবে না, প্রকৃতি সবটাই ব্যালেন্সে রাখে। এখানে সাপেরও দরকার, বিছেরও দরকার। আগে বাঘ সিংহ মানুষকে বন্যপ্রাণী থেকে বাঁচাত। এখন মানুষের ক্ষমতা বেড়ে গেছে, এখন বাঘ সিংহকেই মানুষ মারছে। বাঘ সিংহ কমে যাওয়াতে এখন আবার অন্য সমস্যা দেখা দিয়েছে। স্বামীজী তাই বলছেন, এটা যেন মানুষ বুঝে নেয় যে এই জগতে ভালর সঙ্গে মন্দেরও দরকার। ঠাকুর ঠিক এই জিনিসটাকে বোঝাবার জন্য গোলক চৌধুরীর কথা বলছেন। এক জমিদারের কিছু প্রজা দুর্দান্ত হয়ে উঠেছে, জমিদারের কথা শুনছে না। গোলক চৌধুরীর নামে সবাই কাঁপে, জমিদার গোলক চৌধুরীকে পাঠিয়ে দিল, সে একা গিয়ে সবাইকে ঠাণ্ডা করে দিল। কঠোরতারও দরকার আছে। কিছু দিন আগে সমীক্ষায় জানা গেল যে ভারতে এখন বেশির ভাগ লোকই চাইছে মিলিটারি শাসন হোক। কারণ ভারতে বর্তমানে সব কিছু এত খারাপ হয়ে গেছে যে, কেউ কারুর কথা শুনছে না, যে যাকে যা খুশি গালাগালি দিয়ে যাচ্ছে, কোন শিক্ষকের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা নেই, কোন সন্ন্যাসীর

প্রতি শ্রদ্ধা নেই, ডিসিপ্লিন বলে কিছু নেই, মানুষ চাইছে একটা কড়া শাসন ব্যবস্থা কায়েম হোক। এই জগতে ভাল-মন্দ দুটোরই দরকার আছে। কিন্তু যিনি আধ্যাত্মিক মানুষ, যিনি ভগবানের পথে চলে গেছেন, তাঁর ভালরও দরকার নেই, মন্দেরও দরকার নেই। তাহলে ভাল আর মন্দ এলো কোথা থেকে?

এর আগে আমরা আলোচনা করেছিলাম ঈশ্বর সত্যস্বরূপ, সত্যের কাছে কিন্তু তিনি সত্য নন। যেমন গান্ধীজী সত্যবাদী, তিনি চেষ্টা করে করে নিজেকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, কিন্তু ঠাকুর হলেন সত্যস্বরূপ। ঠাকুরের মধ্যে মিথ্যার কল্পনা করা যায় না। যার মিথ্যা বোধ আছে তার সত্য বোধও আছে, কিন্তু যার মিথ্যা বোধ নেই তার সত্য বোধও নেই। যেমন একটা শিশু মিথ্যা কি জিনিস জানে না, সেইজন্য বলা যাবে না যে শিশু সত্যি কথা বলে। তবে শিশুর মস্তিষ্ক এখনও বিকশিত হয়নি। ভগবান চৈতন্যস্বরূপ, তিনি সত্যস্বরূপ। তিনি চৈতন্যস্বরূপ, তাঁর মধ্যে চেতনা নেই, মানুষের মধ্যে চেতনা আছে, পশুপাখির মধ্যে চেতনা কম আর পাথরের মধ্যে চেতনা নেই। কিন্তু ভগবান তিনি হলেন চৈতন্যস্বরূপ। তেমনি ভগবান হলেন সত্যস্বরূপ, সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ যখন বলা হয় তখন সত্যম্ বলতে সৎস্বরূপ রূপেই বলা হয়। অনেকে মনে করে তিনি সত্য, কিন্তু তা নয়। তাহলে প্রশ্ন ওঠে এই যে ভাল মন্দ যা কিছু হয়, ভালটা কে করেন, মন্দটা কে করেন? খ্রীশ্চান ধর্মে বলছে স্যাটার্ন থেকে মন্দ গুলো আসে। অথবা আমরা বলি, আমার মধ্যে ভাল মন্দ দুটোই আছে, এই ভাল ও মন্দের মধ্যে যেন সব সময় যুদ্ধ চলছে। গীতায় পাণ্ডব কৌরবের মধ্যে যে যুদ্ধ, বলা হয় এই যুদ্ধ আমাদের সবারই মধ্যে সব সময় চলছে। শ্রীকৃষ্ণ হলেন সেই পরম চেতনা, যিনি এটাকে ঠিক পথে পরিচালিত করে লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যান।

দ্বৈতবাদের উৎস

একদিকে বলা হয় যে ঈশ্বর চৈতন্যস্বরূপ, ভাল-মন্দের পারে, ঈশ্বর সত্যস্বরূপ তাই ঈশ্বরের মধ্যে মিথ্যার কল্পনাও হয় না। তাহলে ভাল-মন্দের ধারণা, ঈশ্বর ভালর দিকে নিয়ে যান, ঈশ্বর ভাল করেন, এই ধারণাগুলো কোথা থেকে এলো? স্বামীজী বলছেন The idea of dualism is from the ancient Persians. (*দ্বৈতবাদের ভাবটি প্রাচীন পারসিকদের কাছ থেকে এসেছে।*) পার্সিয়ান থেকে আসে পার্সি। পার্সি বা ইরানের ইতিহাস, বিশেষ করে তার আধ্যাত্মিক ইতিহাস খুব জটিল। ইরানের ভাষা, বিশেষ করে পরের দিকে ওদের যে ভাষা আর বেদের ভাষা, দুটো ভাষা একেবারে সমান, দেবী-দেবতার নামও এক। একটা মতে বলা হয়, হিন্দু জাতি আর পার্সিয়ান জাতি এক সময় এক জাতি রূপে একসাথে ছিল। কোন ভাবে এই জাতি দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে একটা অংশ ইরানের দিকে আরেকটা অংশ ভারতের দিকে চলে গেল। এই নিয়ে ইতিহাসবিদদের অনেক মত আছে, তবে ইতিহাসবিদরা আজ যে কথা বলছেন, আগামীকাল তারই বিপরীত কথা বলেন। আমরা ইতিহাসবিদদের এই বিশ্লেষণে যাচ্ছি না, তবে এটা মেনে নেওয়া হয় যে ইরানীরা ভারত ভূখণ্ড থেকেই ইরানে গিয়েছিল। এই মতটি ঐতিহাসিক দিক দিয়ে সত্য না হলেও পৌরাণিক দিক থেকে সত্য।

সৃষ্টির সময় ব্রহ্মা কিছু প্রজাপতিদের সৃষ্টি করলেন, কিছু ঋষিদের সৃষ্টি করলেন, সেখান থেকে তাঁদের কিছু সন্তানাদি হয়ে হয়ে ধীরে ধীরে সৃষ্টি এগিয়ে চলতে থাকল। পুরাণে বলা হয়, একদিকে যেমন কশ্যপ মুনি ছিলেন, অন্য দিকে তেমনি দক্ষ প্রজাপতি ছিলেন। দক্ষ প্রজাপতির অনেকগুলো কন্যা ছিল। কশ্যপ মুনির সাথে দক্ষের কন্যাদের বিবাহ হল, সেই কন্যাদের থেকে অনেকগুলো প্রজাতির জন্ম হল। তার মধ্যে অদিতি বলে যে কন্যা ছিল তাঁর থেকে যে সন্তানদের জন্ম হল তাঁরা হলেন আদিত্য, এনারাই দেবতা হলেন। দনু নামে যে কন্যা ছিল তার থেকে দানবাদির জন্ম হয়, দিতির সন্তানদের দৈত্য বলা হয়, একত্রে সবাইকে অসুর বলা হয়। ছোটবেলা থেকে আমরা শুনে আসছি দেবতারা ভাল আর অসুররা সব খারাপ, এদের মধ্যে সব সময় লড়াই লেগে থাকত। ইরানে এসে এর ঠিক উল্টো হয়ে যায়। ইরানে 'স'কে 'হ' বলে, সিন্ধু থেকে হিন্দু হয়ে গেল। আমাদের কাছে যারা অসুর, ইরানীদের কাছে সেটাই হয়ে গেল আহুর। আহুর হল তাদের ভগবান। আমাদের যারা দেবতা, তাদের কাছে সেটাই হয়ে গেল দৈত্য। যজ্ঞ তাদেরও আছে, যজ্ঞকে ওরা যশ্না বলে। যজ্ঞেরই অপভ্রংশ হয়ে যশ্না হয়ে যায়। আমরাও অগ্নির উপাসক, ওরাও অগ্নির উপাসক, ওরাও কোমড়ে পুষ্টি পড়ে আমরাও পড়ি, এখনও তারা পড়ে। এই কাহিনীগুলো অনেক আগেকার। ইরানের আদিবাসীদের একটা সংস্কৃতি ছিল, সেখানে আর্যদের কিছু সংস্কৃতি গিয়ে মিশে ব্যাপারটা খুব জটিল আকার ধারণ করেছে। এদের মধ্যে

জরাথ্রুষ্ট ছিলেন, তিনি ধ্যান ধারণা করতেন। যীশু, মহম্মদ বা এ্যব্রাহম, এনারা যেভাবে চৈতন্য সত্তা বা ভগবান থেকে আদেশ পেয়েছেন, ইনিও ভগবান থেকে আদেশ পেলেন। খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা যায়, এনারা আহুর মাজদার ধারণা নিয়ে এলেন। মাজদার অর্থ হয় আলো, আহুর মানে অসুর, আমরা যেমন দেবতা বলি, ওরা আহুর বলে। পার্সিয়ানদের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ধারণা হল আহুর মাজদা(Ahura Mazda) হলেন শুভ, আর এর বিপরীত হল আহিরমান্ (Ahriman), অশুভের প্রতীক। সৃষ্টি যবে থেকে হয়েছে সেই থেকে আহুর মাজদা আর আহিরমানের লড়াই চলছে। জগতের ভালর জন্য আহিরমানকে দমন করা দরকার। জরাথ্রুষ্ট লোকেদের ভাল হওয়ার জন্য উৎসাহিত করলেন, ভাল হলে শক্তি হবে, সেই শক্তি দিয়ে আহিরমানকে দমন করা যাবে। তার মানে, এখান থেকেই পরিষ্কার দুটো জিনিস এসে গেল – ভাল আর মন্দ। ভাল আসছে আহুর মাজদা থেকে যেটা আহুর মাজদার দিকে নিয়ে যায় আর মন্দ আসছে আহিরমানের থেকে যেটা আহিরমানের দিকে নিয়ে যায়। এই লড়াই এখনও চলছে, লড়াই তখনই শেষ হবে যেদিন শুভ শক্তি অশুভ শক্তির উপর জয় পাবে। এগুলো শুনতে খুবই ভাল লাগে। আমাদের দুর্গোৎসবে যে মহিষাসুর বধ হয়, দীপাবলীতে যে রামলীলাতে রাবণের বধ হয় সেখানেও আমরা বলি অশুভ শক্তির উপর শুভ শক্তির বিজয়।

বেদান্তের এই ভাব নয়, হিন্দু ধর্মেরও নয়, এই ভাব ধর্মের খুব প্রাথমিক স্তর। ঠাকুরও মা কালীর দর্শন পাওয়ার পর ভাল মন্দের কথা বলছেন। ঈশ্বর দর্শন হয়ে গেলেও মানুষ কখনই ভাল মন্দের পারে যেতে পারে না। একমাত্র অদ্বৈত অবস্থায়, নির্বিকল্প অবস্থায় যে জ্ঞান লাভ হয়, ঐ জ্ঞান না আসা পর্যন্ত বলা যাবে না ইনি শুভ অশুভের পারে। মা কালীকেও ঠাকুর যখন ঐ রূপে দেখছেন তখন তিনি ঐ ভাবেই দেখছেন, বলছেন কে জানে কালী কেমন। মা কালী তাঁর কাছে মুখের কথা না, তিনি ভাল, তিনি মন্দ, নাকি তিনি নিষ্ঠুর, নাকি তিনি প্রিয়, কিছু বলা যাবে না। কারণ এই প্রশ্নগুলিই ওঠে না। এই ভাবের মূলটা এসেছে পার্সিদের কাছ থেকে। বিজ্ঞানে যেমন কোয়ান্টাম ফিজিক্স আছে, এ্যস্ট্রো ফিজিক্স আছে আবার সাধারণ জিনিসও আছে। ক্লাশ এইট, নাইন বা টেনে আমরা ফিজিক্সের যে খুব সাধারণ জিনিস নিয়ে পড়াশোনা করেছি, এখনও আমরা তাতেই খুশি থাকি, আমাদের অতশত জেনে কাজ নেই। ধর্মের ক্ষেত্রেও একই জিনিস হয়, অত শত জেনে কাজ নেই। আমি আছি, ঠাকুরে আছেন, আমার ইষ্টমন্ত্র আছে, আমার প্রার্থনা আছে, কাজকর্মও করছি, ঠাকুর আছেন তিনিই দেখবেন, ভাল-মন্দ যা হবে তিনিই দেখবেন, ভাল হলে আনন্দ হবে, মন্দ হলে কষ্ট পাব। এর বেশি ধর্ম আমার লাগবে না। প্রশ্ন উঠবে, কেনই বা লাগবে? কারণ আমি জন্মেছি আমি একদিন মরে যাব, যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন আমি আর আমার সব কিছু যেন ভাল ভাবে চলে। এই ভাব যদি কারুর মধ্যে থাকে তাহলে সে কিন্তু দর্শনের দিক দিয়ে চার্বাক মতের হয়ে গেল, অর্থাৎ ভৌতিকবাদী হয়ে গেল। চার্বাকরা এটাই বলে, *যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ*, যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন সুখ আর আনন্দ নিয়েই বাঁচব, দরকার হলে ধার করে ভোগ্য সামগ্রী সংগ্রহ করতে হবে। আর সাধারণ ভক্তদের এটাই কাম্য, যতদিন বেঁচে আছি ততদিন ভাল থাকব, দরকার হলে ঠাকুরের কাছে যাব, প্রণাম করব, প্রণামী দেব, প্রসাদ চড়াব, চরণামৃত পান করব আর সুখে থাকব। চার্বাক আর ভক্তদের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। মরে গেলে পুড়িয়ে দেবে ওখানেই সব শেষ, কে কাকে আর ফেরত আসতে দেখেছে। কোথাও যেন আমরা সবাই চার্বাক, আমরা ভৌতিকবাদী। এদের ভিতর থেকে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে কেউ যদি বলে, আপনার কথায় আমার প্রাণ ভরল না, আমি সুখ চাইছি ঠিকই কিন্তু আমি মরে যাওয়ার পর আমাকে পুড়িয়ে দিলে আমি শেষ হয়ে যাব, এটা মানতে পারছি না, আমার কিন্তু মনে হয় কোথাও না কোথাও আমার অস্তিত্ব থেকে যাবে, আমি আবার কোথাও জন্ম নেব। এবার তার ধর্মের পথে যাত্রা শুরু হল।

যতদিন না আমরা মনে করছি মৃত্যুর পরেও আমাদের অস্তিত্ব কোন না কোন ভাবে চলতে থাকবে, শুধু চলবেই না, পুরোদমে চলতে থাকবে, যা ভাল করেছি মন্দ করেছি, তার সব কিছুই আমার অস্তিত্বের সাথে চলতে থাকবে, ততদিন আমাদের ধর্ম শুরু হবে না। ইসলাম ও খ্রীশ্চান ধর্মে সাধারণ মানুষদের খুব সহজ ধারণাগুলো দিয়ে দেওয়া হয়েছে, চারজন বিধর্মীকে মেরে দিলাম, এবার আমি স্বর্গে যাব, যেখানে বাহাত্তর জন হুরী আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে। ঠিক ঠিক ধর্ম শুরু হয় সেখান থেকে যেখানে সে মনে করছে, আমি যা করছি এর জন্য আমিই দায়ী এর ফল আমাকেই পেতে হবে। স্বামীজী বারংবার খ্রীশ্চান ও ইসলাম ধর্মকে আক্রমণ করে এই কথা বলছেন, সাধারণ বিজ্ঞানে বলে কোন বস্তুতে যে পরিমাণ শক্তি লাগানো হবে সেই বস্তু

ততটুকুই চলবে। শুভকর্ম করলে সেই শুভকর্ম আমাকে ততদিনই উঁচুতে রাখবে যতদিন ওই শুভকর্মের ফল দেবে, তারপর ওই উঁচু থেকে আমাকে পড়ে যেতে হবে। গীতাও একই কথা বলছে *ক্ষীণে পূণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি*, পূণ্য শেষ হয়ে যাওয়ার পর তোমাকে আবার মর্ত্যলোকে নেমে আসতে হবে। সেইজন্য অনন্ত স্বর্গের ধারণা যুক্তিতে দাঁড়ায় না। একটা দশ বছরের ছেলের ব্যপটাইস্ট হয়ে গেল, তারপর ভাল জীবন অতিবাহিত করেছে, ভাল কাজ করেছে, এর জন্য সে অনন্ত স্বর্গের সুখ পাবে যুক্তিতে কোন ভাবেই দাঁড়ায় না।

আমরা ধর্ম পালন করছি বলি ঠিকই, নিজেকে ধার্মিক মনে করাতেও কোন দ্বিধা নেই, কিন্তু কোথাও না কোথাও আমাদের ভিতরে এই দৃঢ় বিশ্বাস যে, মৃত্যুতেই সব শেষ। যার এই বিশ্বাস হয়ে গেছে, মৃত্যুর পর আবার আমাকে আসতে হবে, আমাকেই আমার কর্মের ফল ভোগ করতে হবে, তার জীবনযাত্রাটাই অন্য রকম হয়ে যাবে। বাড়ির অল্প বয়সী একটা ছেলে নিজের জামা-কাপড় যেখানে সেখানে ছড়িয়ে রাখে, সব মাকেই গুছিয়ে রাখতে হয়, ছেলেটি জানে যে আমাকে আর কিছু করতে হবে না, মা সব করে দেবে। রাত্রে খাওয়া-দাওয়া হল, মা সবাইকে পরিবেশন করে খাওয়ালো, খাবার পর এঁটো বাসন-পত্র জমে গেল। খেয়ে উঠে মায়ের প্রথম কাজ আগে সব বাসন মাজতে হবে। কারণ জানে যে, যদি না মেজে রাখা হয় সকালে উঠে তাকে এঁটো বাসনই মাজতে হবে। ছেলে নিজের পোশাক ছুড়ে ফেলতে পারে, নিজের জুতো ছুড়ে ফেলতে পারে, কিন্তু ছেলে যতই রাত্রে মাকে ডাকুক, মা এখন বাসন মাজাটা ছাড়বে না। একটু আমার কাছে আসো না, মা কিন্তু বাসন না মাজা পর্যন্ত ছেলের কাছে আসবে না। কারণ জানে রাত্রে যেখানে ছেড়ে দেবে সকালে ওখান থেকেই শুরু করতে হবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে আমাকে এসব কিছু পোয়াতে হবে না, সেইজন্য আমরা আমাদের মত চলতে থাকি। কিন্তু মায়ের মত যাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, আমি যে কাজটা যেখানে ছেড়ে যাব পরে ওই কাজটাই আমাকে ওখান থেকে শুরু করতে হবে, তার আচার ব্যবহার সব পাল্টে যাবে। এই জন্মে যাদের আমি কষ্ট দিচ্ছি, আমি যদি জেনে যাই পরের জন্মে আমাকে ঐ কষ্ট ভুগতে হবে, তখন আমি নিজে থেকেই সাবধান হয়ে যাব। খ্রীশ্চান, ইসলাম ধর্মের এত জনপ্রিয় এই কারণেই, আমি যদি সপ্তাহে একবার করে চার্চে যাই, দিনে পাঁচবার নমাজ পড়ি আমার জন্নৎ নিশ্চিত হয়ে গেল।

কিন্তু হিন্দু ধর্মের এটাই প্রাণ, তোমার কর্ম তোমাকেই পরিষ্কার করতে হবে, তাই জন্ম জন্ম ধরে তোমাকেই আসতে হবে। এই ব্যাপারটা যে একবার বুঝে নেবে তখনই সে বলবে, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি, তখনই ভিতরে ভিতরে তার আধ্যাত্মিক অভিযান শুরু হয়। এই লীলা খেলা ততদিন চলবে যতদিন না তোমার পূর্ণ জ্ঞান হয়। আমাদের কোথাও এই বিশ্বাস যে, একবার মরে গেলে আর এই ঝামেলা পোয়াতে হবে না। ঠিকই এই জন্মের ঝামেলা গুলো আর পোয়াতে হচ্ছে না, কিন্তু মরে তুমি বাছুর হবে নাকি রাস্থার কুকুর হয়ে জন্মাবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। আর যে জায়গাটা তুমি ছেড়ে গেছ, ওই জায়গাতে আসতে তোমার যে কত জন্ম লাগবে ঠাকুরই জানেন। যে আচার্যরা এই সত্যকে জেনে যান, তাঁরা তখন করুণাবশতঃ বলেন, বাপু! তুমি যেটা মনে করছে আসলে তা নয়। জীবনের উদ্দেশ্য শুধু সুখ পাওয়া নয়, ঋণ করে ঘি খাওয়ার সুখ আর ঠাকুরকে প্রার্থনা করে যে সুখ তুমি পাও, দুটো একই জিনিস, কোন তফাৎ নেই। মনে রাখবে তুমি একদিন মারা যাবে। মহাভারতে যক্ষ যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করছেন, *কিমাশ্চর্যম্*, আশ্চর্য কি? মানুষ রোজ মানুষের মৃত্যু দেখছে কিন্তু তাও মনে করে আমি মরব না। একটু কোন ভাবে বৃদ্ধ বয়সেও যদি বিশ্বাস হয়ে যায় আমাকে আবার জন্ম নিতে হবে, তখন বলে আর আসার প্রশ্নই উঠছে না। মুখে সবাই দুটো কথা বলে দিতে পারে কিন্তু বিশ্বাস কখনই হয় না, সেই কারণেই আমাদের বিশেষ করে হিন্দু জাতির এত দুর্গতি। আমাদের বিশ্বাস চুরি চামারি করে ধরা যদি না পড়ি তাহলে তো আমার কেল্লা ফতে। তুমি বলছ ভগবান দেখছেন, ঠিক আছে আমার চুরির একটা অংশ মন্দিরে ভগবানের নামে দান করে দেব। কিন্তু এই বিশ্বাস নেই যে আগামী জন্মে আমি হয় সেই চোর বাটপার হয়েই জন্মাব, নয়তো গুণ্ডা কি স্মাগলার হয়ে জন্মাব আর সারা জীবন আমাকে পুলিশ তাড়া করে বেড়াবে। আজকে একটা বাজে কাজ করছে, ধীরে ধীরে ওই ধরণের কাজের প্রবৃত্তিটা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। আমরা যতই এসব কথা শুনে যাই না কেন আমাদের বিশ্বাস হতে চায় না। কারণ সাধারণ মানুষ জুরাষ্ট্রিয়ানদের যে ধারণা, শুভ-অশুভের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, এই দ্বন্দ্বের মধ্যে ঘুরতে থাকে, এর থেকে বেরোতে পারে না।

বেদান্ত এটাকে ছাড়িয়ে গেছে। ইরানের পাশেই ইজ্রাইল, আবার ইরানের পাশেই আরব, এই দেশগুলো খুব কাছাকাছি হওয়ার জন্য পরস্পরের চিন্তা-ভাবনা এক রকমের। আমাদের এখানে যেমন বিষ্ণু ভক্ত আছে, শিব ভক্ত আছে, কালী ভক্ত আছে কিন্তু সবারই মধ্যে উপনিষদের ভাব ঢুকে গেছে, ঠিক তেমনি জুরাষ্ট্রিয়ানদের ধর্ম খুব প্রাচীন ধর্ম, যদিও জহুদিরদের থেকে পরে কিন্তু খ্রীশ্চানদের থেকে সাতশ-আটশ বছরের পুরনো আর ইসলাম ধর্ম থেকে প্রায় হাজার বছরের পুরনো, ফলে এই ধর্মের সাধারণ ভাবগুলো বিশেষ করে ভাল-মন্দ, শুভ-অশুভের দ্বন্দ্বের ধারণা পরস্পরের মধ্যে ঢুকে গেল, আর সেখান থেকে আজ সারা বিশ্বের বেশির ভাগ ধর্ম ভাল-মন্দের ধারণাকে আঁকড়ে থাকল। কিন্তু ভারতীয় ধর্মগুলির যে পরম্পরা, যেখানে হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম ও শিখ ধর্ম রয়েছে, এরা কিন্তু শুভ-অশুভ, ভাল-মন্দের এই ধারণাকে মানে না। ভারতীয় ধর্মের মূল ভাব তোমাকে ভাল-মন্দ, শুভ-অশুভ, পাপ-পূণ্য, সব রকম দ্বন্দ্বের পারে যেতে হবে। অশুভটা যেমন বন্ধন, শুভটাও বন্ধন। এই শিক্ষা যখন তাদের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় তখন তারা জিনিসটাকে মানতে পারে না, বোঝাটাও একেবারই অসম্ভব।

ভাল-মন্দ, শুভ-অশুভ সব মনেতেই

স্বামীজী এইবার থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে নিজের খ্রীশ্চান শিষ্যদের এই শিক্ষা দিতে গিয়ে বলছেন, Really good and evil are one, and are in our own mind. (*প্রকৃতপক্ষে ভাল-মন্দ দুই-ই এক জিনিস এবং উভয়ই আমাদের মনে।*) ভাল আর মন্দ বাইরে কোথাও নেই, সব আমাদের ভিতরেই রয়েছে। ভগবান গীতায় বলছেন *ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ*, আমার কেউ প্রিয় নেই, অপ্রিয়ও কেউ নেই। বস্তুও ঠিক তাই, বস্তু ভালও হয় না, মন্দও হয় না। রসগোল্লা রসগোল্লাই, তার যা বৈশিষ্ট্য সেটাই সে, মধুর মত মিষ্টি। বাচ্চারা বলবে রসগোল্লার মত মিষ্টি হয় না, ডায়বেটিস রোগী বলবে রসগোল্লা বিষ। আমার আপনার মনের উপর নির্ভর করছে জিনিসটা ভাল কি মন্দ। শুধু বস্তুই নয়, একজন নামকরা ক্রিমিনাল, তার বাড়ির লোকেরা পথ চেয়ে বসে আছে কখন সে দুটো টাকা নিয়ে আসবে, তাই দিয়ে আমাদের খাবার জুটবে। আর যার উপর ক্রাইম হচ্ছে সে তার আদ্যশ্রাদ্ধ করছে। তার মানে, কোন বস্তুর মধ্যে ভাল-মন্দ নেই, ভাল-মন্দ আমার মনের মধ্যেই বিদ্যমান। বস্তুর মধ্যেই ভাল-মন্দ নেই তাহলে ভগবানের মধ্যে ভাল মন্দ কোথা থেকে আসবে! যে আগুন ঘরবাড়ি পুড়িয়ে ছাই করে দেয়, সেই আগুন ব্যাতিরেকে আমাদের রান্না হবে না। গ্যাসের সিলিণ্ডার একদিন দিতে দেরী হয়ে গেলে বাড়িতে সবাই চেঁচামেচি শুরু করে দেবে; একটা গ্যাসের সিলিণ্ডার জোগাড় করা জন্য চারিদিকে ছুটোছুটি করবে। আগেকার দিনে বর্ষাকালে গ্রামের দিকে আগুন পাওয়া যেত না, লোকেদের রান্না করা খুব মুশকিল হয়ে যেত। যে আগুনের জন্য এত আতঙ্ক, সেই আগুনের জন্য মানুষ হা পিত্যেস করছে।

মাঝ রাত্রে একজনের তামাক খাওয়ার নেশা চেপে গেছে। সে বেচারা এখন হাতে একটা লণ্ঠন নিয়ে বেরিয়েছে কোথাও যদি একটু আগুন পাওয়া যায়। একজন বন্ধুর বাড়ির দরজায় কড়া নেড়ে ডাকছে। বন্ধু বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করছে, 'এই রাত দুপুরে এত হাঁকডাক কেন'? 'একটু আগুন দাও তো, তামাক খাবো'। 'তুমি তো হাতে লণ্ঠন নিয়ে ঘুরছ'। একটু আগুনের জন্য রাত দুপুরে এত হাঁকাডাক করে বেড়াচ্ছে, আগুন যদি এতই খারাপ হয়ে থাকে তাহলে আগুনের জন্য এত হাঁকডাক কেন করছে? যে আগুন শীতে আমাদের তাপ দেয়, যে আগুন বাড়ির রান্না করে দেয়, সেই আগুনই আবার ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়। যখন বাড়ি পোড়ায় তখন আগুনকে আমরা গালাগাল দিই, যখন নিজের কাজে লাগাই তখন আগুনের মত জিনিস হয় না। বস্তুরই যদি এই হাল হয় তাহলে ভগবানের ক্ষেত্রে কি হবে? কিসের তিনি ভাল, কিসের তিনি মন্দ! তিনি তিনিই, আমাদের মনের মত যদি কিছু হয় তখন বলি, আহা! তিনি কত করুণাময়, যখন খারাপ কিছু হয় তখন ভয়ে বলি না যে ভগবানের মত বাজে লোক আর হয় না, যদি অভিশাপ লেগে যায়, সেইজন্য বলি, হে ঠাকুর! তুমি আমাকে কৃপা করলে না! স্বামীজী তাই বলছেন, জগতে কোন বস্তু বা মানুষ ভাল কেউ নয়, মন্দ কেউ নয়, তোমার যেমনটি দরকার সেই অনুসারে কোন কিছুকে ভাল বলে মনে হয়, মন্দ বলে মনে হয়।

স্বামীজী বলছেন, When the mind is self-poised, neither good nor bad affect it. (*মন যখন স্থির ও শান্ত হয়, তখন ভাল-মন্দ কিছুই তাকে স্পর্শ করতে পারে না।*) মন যখন শান্ত হয়ে নিজের

মধ্যে অবস্থিত হয়ে যায় তখন ভাল আর মন্দ কোনটাই মনকে আর প্রভাবিত করতে পারে না। আমরা সব সময় চাইছি আমারই যেন সুবিধা হয়। ট্রাফিক জ্যামে পড়লে আমরা ভাবি আমার গাড়িটা যাতে কোন রকমে বেরিয়ে আগে চলে যেতে পারে। জ্যামে সবাই চেষ্টা করে নিজের গাড়িটা যাতে এগিয়ে যেতে পারে, করতে গিয়ে ট্রাফিকের আরও জট পাকিয়ে যায়। সবাই অপরকে পিছনে ফেলে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। যারা ওস্তাদ ড্রাইভার, বিশেষ করে বয়স্ক বাঙালী ট্যাক্সি ড্রাইভার যদি হয়, সে কোন চেষ্টা করবে না, লাইনেই দাঁড়িয়ে থাকবে। ওরা জানে রাস্তাঘাটে আজকাল এই রকমই হয়, আমার কিছু করার নেই। আমি আপনি বললেও সে আমাদের কথা শুনবে না, শান্ত হয়ে নিজের মত নিয়ে চলে যাবে। সাধু মহাত্মারা শান্ত হয়ে গেছেন। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে আমরা সবাই শিশু, আমরা চাই সব কিছু আমাদের মত চলুক, আমরা চাই আমি আগে যাব বাকি সবাই পিছনে থাকবে। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতেও তাই চলে, আমি সুখে থাকি, বাকিদের হলে ভাল না হলে কিছু না, আমি কারুর ক্ষতি চাই না। যারাই বলে আমি কারুর ক্ষতি চাই না, তারা বলে আমারটা যেন ঠিক থাকে। কিন্তু যাদের মন শান্ত হয়ে গেছে তাদের ভালতেও কিছু হয় না, মন্দতেও কিছু হয় না।

এটা খুব উচ্চ অবস্থার কথা। স্বামীজী খুব যুক্তি দিয়ে বলছেন, ভাল আর মন্দ এটা fact নয়, religionএ এটা আছে ঠিকই কিন্তু এটা এসেছে জুরাথ্রিজিয়ামদের থেকে। দ্বিতীয় হল, বস্তুর মধ্যে কখন ভাল মন্দ হয় না, এর আগে আমরা রসগোল্লার উদাহরণ দিলাম। বাচ্চাদের কাছে রসগোল্লা খুব লোভনীয় কিন্তু একজন ডায়বেটিকস রোগীর কাছে বিষ। সেইজন্য ভগবানও সেই রকম, বস্তুই যদি নিউট্রাল হয় ভগবান তো নিউট্রাল হবেন। এই নিউট্রালিটিকে কে দেখতে পান? যাঁরা একটা উচ্চ অবস্থায় চলে গেছেন, যাঁদের মন একটু উপরে চলে গেছে। দাদু, দিদার সামনে বাচ্চারা দুরন্তপনা করলে, অবাধ্যতা করলে তাঁরা কিছু মনে করেন না। তাঁরা জানেন বাচ্চারা এই রকমই করবে, লাফাবে, খেলবে, দস্যিপনা করবে। বাচ্চার বাবা-মা তার সাথে অন্য রকম আচরণ করছে, তার দাদা অন্য রকম ব্যবহার করছে, কিন্তু ঠাকুর্দা-ঠাকুরমারা অন্য রকম আচরণ করবেন না, কারণ অন্যদের তুলনা তাঁদের মন অনেক শান্ত হয়ে গেছে। সাধু সন্ন্যাসীদের মনও শান্ত হয়ে যায়। যার মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা যাবে বুঝতে হবে তার মধ্যে এখনও ভাল মন্দ খেলা করছে। যাঁর মন শান্ত হয়ে গেছে তার ভাল বলে কিছু মনে হয় না, মন্দ বলেও কিছু মনে হয় না।

স্বামীজী যখন কলেজে পড়তেন তখন যে পাড়াতে sex workerরা থাকত সেই পাড়া দিয়ে তিনি যেতেন না। এখন তিনি এক ঘরে থাকতে পারেন, মন শান্ত হয়ে গেছে। স্বামীজী বার বার এই কথা বলতেন যে, Sex worker যারা ওরা খারাপ কিছু না, ওরা আছে বলে ভদ্র বংশের মেয়েরা নিরাপদে আছে। ভদ্র বংশ মেয়েদের যে শীল, যে চরিত্র সব নিরাপদে রক্ষিত হচ্ছে শুধু মাত্র sex workerরা আছে বলে, সমাজের পুরুষদের সব আবর্জনাগুলো ওরা ওদের উপর নিয়ে নিচ্ছে। শিব যেমন জগতের গরল ধারণ করে জগৎকে রক্ষা করেছিলেন, এই মেয়েরা সমাজের passionএর যে বিষ, সেই বিষ নিজের উপর নিয়ে নিচ্ছে। শিব জগতের বিষ ধারণ করার পরেও দাঁড়িয়ে ছিলেন, কিন্তু এদের জীবনটা শেষ হয়ে গেল। ঠাকুর আবার এদের সাক্ষাৎ ভগবতী দেখে মা মা বলতে বলতে সমাধিতে চলে যাচ্ছেন। ঠাকুরের কাছে কোন তফাৎ নেই, মন শান্ত হয়ে গেছে। মন যাদের শান্ত হয়নি, এখনও মন চঞ্চল তারা বলবে, আহা! কি ভদ্র বাড়ির মেয়ে ছিল আর এখন কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে।

সোনার শিকল ও লোহার শিকল

স্বামীজী সেইজন্য বলছেন, Be perfectly free; then neither can affect it, and we enjoy freedom and bliss. (*শুভাশুভ দুয়েরই বন্ধন কাটিয়ে একেবারে মুক্ত হও, তখন এদের কেউ আর তোমায় স্পর্শ করতে পারবে না, তুমি মুক্ত হয়ে পরমানন্দ ভোগ করবে।*) এখানে স্বামীজীর লেকচারের পুরো লাইন বাই লাইন লেখা হয়নি, মন পুরোপুরি শান্ত, self-poised, মন শান্ত তারই হয় যার freedom এসে গেছে। তারপর বলছেন, then neither can affect it, যতদিন ভাল আর মন্দ আমাদের affect করছে, ভাল হলে খুশি হচ্ছি, মন্দ হলে মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে, ততদিন বুঝতে হবে আমি free হয়নি। Free হওয়া মানে *দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ*, তিনি জেনে গেছেন, সুখ-দুঃখ নিজের মত আসে নিজের মত যায়। আধ্যাত্মিক জগতে যারা শিশু, জগতের অনেক কিছুকে নিয়ে তাদের উল্লাস হয়, তার মানে এখনও সে বন্ধনে

আছে, ভাল-মন্দের পারে যেতে তাদের অনেক সময় লাগবে। আধ্যাত্মিক অভিযান যখন শুরু হয় তখন ভাল মন্দ কোনটাই তাকে আর ছুঁতে পারে না। ভাল মন্দ হল পরিযায়ী পাখির মত, একটা সময় কখন ভাল আসবে, আবার কখন মন্দ আসবে। যাঁরা নিজেদের মুক্ত করে নিয়েছেন তাঁদের ভাল আর মন্দ প্রভাবিত করতে পারে না। নরেন রাখালকে নিয়ে ঠাকুরকে একজন বলছেন, কায়েতের ছেলেগুলোর জন্য আপনি কেন এত উতলা হন? ঠাকুর বলছেন, আমি যদি ওদের উপর মনকে না নামিয়ে রাখি তাহলে আমার মন সমাধিতে চলে যাবে, এই দ্যাখো আমি ওদের উপর থেকে মন তুলে নিলাম। বলতে বলতেই ঠাকুর সমাধিতে চলে গেলেন, সবাই দেখছে ঠাকুর চুল লোম সজারুর কাঁটার মত সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। ঠাকুর যে এদের উপর মন রাখছেন, এটা হল মনকে জোর করে নামিয়ে সত্ত্বগুণের আধারে রাখছেন। বড় বড় গ্যাস বেলুনকে ভাল করে বেঁধে না রাখলে উড়ে বেরিয়ে যাবে। আমরা কোন রকমে নীচ থেকে ওই জায়গায় যদি পৌঁছাই, মনে করব আমরাও ঠাকুরের মত হয়ে গেছি। কিন্তু আমরা এটা বুঝছি না, আমাদের যেখানে শেষ তাঁদের সেখানে শুরু। অবতার আর সন্তের মধ্যে এটাই তফাৎ। অবতাররা উপর থেকে নেমে যে জায়গাটায় জোর করে ধরে রাখেন, সন্তরা বহু কষ্টে নিজেকে সেই উচ্চস্তরে নিয়ে যান। যাদের আমরা ভাল মানুষ বলে জানি, তারা তো আরও নীচে, তাদের আধ্যাত্মিকতার ভূমিটাই তৈরী নেই। সন্তরা তাও অনেক চেষ্টা করে এমন একটা ভাল অবস্থায় পৌঁছে যান, তিনি আর মন্দ করবেন না। কিন্তু যে ভাল মানুষ, সমস্যায় পড়লে সে মন্দটাও করে বসবে। ভাল তিনজনই, অবতারও ভাল, সন্ত বা ঋষিও ভাল আর ভদ্রলোক যিনি তিনিও ভাল। কিন্তু তিনটে ভালর মধ্যে এই তফাৎ। সমস্যা এসে গেলে ভদ্রলোক মন্দ কাজ করবে, সন্ত করবে না, আর অবতারকে বহু কষ্টে ওই জায়গাতে বেঁধে রাখা আছে, একটু ছাড়া পেলেই তিনি ত্রিগুণাতীত অবস্থায় চলে যাবেন। স্বামীজী বলছেন, এই অবস্থাতেই মানুষ ঠিক ঠিক আনন্দ পায়।

Evil is the iron chain, good is the gold one; both are chains, অশুভ, মন্দ হল লোহার শিকল আর ভাল বা শুভ হল সোনার শিকল , শিকল দুটোই। কাউকে সোনার শিকল দিয়েই বাঁধুক আর লোহার শিকল দিয়েই বাঁধুক তাতে কি আর আসে যায়, বন্ধন দুটোতেই। গীতায় ভগবান তিনটে গুণের কথা বলতে গিয়ে সত্ত্বগুণের ব্যাপারে একই কথা বলছেন, *সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ*। মানব জাতির উদ্দেশ্য জ্ঞান পাওয়া, কিন্তু প্রতিটি মানুষ জীবনে সুখ পেতে চাইছে। যে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে, সেও মনে করে যে আত্মহত্যা করলে সে সুখ পাবে, তার যে অশান্তি চলছে সেটা থেকে মুক্তি পাবে। সত্ত্বগুণের লক্ষণই হল সুখ আর জ্ঞান। সত্ত্বগুণ এই সুখ আর জ্ঞান দিয়ে মানুষকে বেঁধে রাখে, তাকে এগোতে দেবে না। সুখ আর জ্ঞান, এর থেকে ভাল আর কি হতে পারে, এর থেকে উঁচু আর কি হতে পারে! নির্মল আনন্দ, ঠিক ঠিক মুক্তির কাছে সুখ ও জ্ঞানও কিছুই না। আমরা এই জিনিসগুলোকে বুঝতে পারি না, তার কারণ সমাজ ও পরিবারের মধ্যে শিক্ষার মাধ্যমে আমরা যেভাবে বড় হয়েছি, এমন এমন লোকের সঙ্গ করছি বলে এই জিনিসগুলোকে আমরা ধারণা করতে পারি না। মনে রাখতে হবে, কোন বস্তু বা কোন মানুষ ভালও না মন্দও না, আমার মন যেমনটি সেই অনুসারে আমরা ভাল মন্দ দেখছি। মন যদি ভাল মন্দ দেখা বন্ধ করে দেয় তখন আমরা মন্দতেও ভাল দেখব, ভালতে ভাল তো দেখব।

স্বামীজী বলছেন, Be free, and know once for all that there is no chain for you. (*মুক্ত হও এবং জন্মের মতো জেনে রাখো – কোন শিকলই তোমায় বাঁধতে পারে না।*) গীতার ভাষায় বলা হল, আমি শুধু ভাল চাই, এটাও একটা চাওয়া। এর আগে অবিদ্যা, কাম ও কর্ম প্রসঙ্গে আলোচনা করার সময় বলা হয়েছিল, অপূর্ণতা যেখানেই থাকে সেখানেই কামনা থাকবে, যেখানে কামনা সেখানেই কর্ম। আমি ভাল চাই, আমি সুখ চাই বলা মানেই এখনও তার চাওয়া আছে। ঠাকুর কোথাও বলছেন না যে আমার কিছু চাওয়া আছে। স্বামীজী এখানে আবার বিশ্লেষণ করে দিচ্ছেন, ঈশ্বর লাভের ইচ্ছাটা চাওয়ার মধ্যে নয়। Lay hold the golden chain to loosen the hold of the iron one, then throw both away. The thorn of evil is in our flesh; take another thorn from the same bush and extract the first thorn; then throw away both and be free. (*সোনার শিকলটির সাহায্যে লোহার শিকলটি আলগা করে নাও, তারপর দুটোই ফেলে দাও। অশুভ রূপ কাঁটা আমাদের শরীরেই রয়েছে; ঐ ঝাড়েরই আর একটি শুভ-রূপ কাঁটা দিয়ে পূর্বের কাঁটাটি তুলে ফেলে শেষে দুটোকেই ফেলে দাও, এবং মুক্ত হও।*) শিকল

যদি ধরতেই হয় তাহলে আগে সোনার শিকলটি ধর যাতে লোহার শিকলটা ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। লোহার শিকল তমোগুণ, সোনার শিকল সত্ত্বগুণ। Then throw both away, তারপর দুটোকেই ছেড়ে দাও। পায়ে কাঁটা ফুটেছে, আরেকটা কাঁটা এনে সেটা দিয়ে ওই কাঁটাটা বার করে দুটো কাঁটাই ফেলে দাও, এবং মুক্ত হয়ে যাও; *কন্টকেয় কন্টকম্*। সোনার শিকলটাকেও যদি ধরে রাখো তাহলে আর মুক্তি হবে না।

উপায় – জগতে দাতার ভূমিকা নাও

এই জিনিসটাকে আয়ত্ত করার জন্য স্বামীজী বলছেন, In the world take always the position of the giver, এই জগতে তুমি সব সময় দাতার ভূমিকা পালন কর। সব দিতেই থাক ফিরে তাকিও না। তুমি কাঙালী কেন হবে! ব্রহ্মচর্য মন্ত্রে বলছেন, আমি পূর্ণকাম আমার কিছু লাগবে না, যাদের কামনা পুর্তি হয়নি তাদের কামনা পুর্তির চেষ্টা আমি করব। স্বামীজী যে শুধু ভারত ভারত করে যাচ্ছেন, হিন্দু ধর্মকে নিয়ে এত কথা বলছেন, সেখানেও স্বামীজীর নিজের জন্য কিছু করছেন না, কিন্তু যারা তাঁর আপনজন, যারা অভাবে আছে, কষ্টে পড়ে আছে, তাদের দুঃখ দারিদ্র দূর করার চেষ্টা করছেন। সেইজন্য বলছেন Give everything and look for no return, শুধু দিয়ে যাও, প্রতিদানে কিছু চেও না। যেমনি কেউ দিতে শুরু করল আর প্রতিদানে কিছু চাইছে না, জানবেন এটা তার সোনার শিকল হয়ে গেল। প্রতিদানে কিছু চাইছে, তখন এটা লোহার শিকল হয়ে গেল। সোনার শিকল হয়ে গেল মানে, তার মুক্তির আর বেশি দেরী নেই। দাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া মানে এবার সে মুক্তির দিকে এগোচ্ছে। স্বামীজী বলছেন, Give love, give help, give service, give any little thing you can, but keep out barter, ভালবাসা দাও, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দাও, সেবা দাও, তোমার সামর্থে যতটুকু সম্ভব ততটুকুই দাও, কিন্তু তাতে যেন কোন বেনে বুদ্ধি না থাকে। বাচ্চারা যেমন বলে, আমি তোকে চকলেট দিচ্ছি তুই আমাকে তোর খেলনাটা দে। কিন্তু তুমি তো বাচ্চাদের মত না, তুমি দিয়ে যাও। তোমার কি আছে? আমার জ্ঞান আছে। সবাইকে জ্ঞান দাও। তোমার ভিতরে ভালবাসা আছে, সবাইকে ভালবাসা দাও। তোমার ভিতরে সেবার ভাব আছে, মানুষকে সেবা কর। তোমার যা আছে তাই সবাইকে দিয়ে যাও। আমরা দিই, কিন্তু কিছু না হলেও একবার ভাবব, আমাকে ধন্যবাদটুকুও দিলে না! ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে একবার বলা হল, উনি আপনার নিন্দা করছিলেন। বিদ্যাসাগর বলছেন, আমার তো মনে পড়ছে না যে আমি তার কোন উপকার করেছিলাম। তার মানে তিনি সত্ত্বগুণে আবদ্ধ হয়ে গেছেন। এটুকু প্রত্যাশা যে আমি তাকে সাহায্য করছি, সে অন্তত আমার নিন্দা করবে না। এখানে কোন তুলনা করা হচ্ছে না, উদাহরণ রূপে দেওয়া হল বোঝাবার জন্য। উপকার করে আমরা আশা করি সে আমার ভাল করবে না, কিন্তু মন্দটা যেন না করে।

স্বামীজী বলছেন, Make no conditions, and none will be imposed, তুমি যদি কোন condition না দাও, তোমার উপরেও কোন condition চাপবে না। সেইজন্য বলছেন, ভগবান আমাদের সব কিছু দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছেন, আমাদের বুদ্ধি দিয়েছেন, জ্ঞান দিয়েছেন, ক্ষমতা দিয়েছেন, অর্থ দিয়েছেন, তুমিও শুধু দিয়ে যাও। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা কাঙালীর মত শুধু নিতেই জানি। ঘর সংসার যদি একশ টাকা দিয়ে চালানো যায়, নব্বুই বা পচানব্বুই টাকা দিয়েও চালানো যায়। ওই পাঁচটা টাকা আলাদা সরিয়ে রেখে যে টাকা জমবে সেটাকে আমরা দান কার্যে ব্যবহার করতে পারি। কিন্তু আমরা পারি না, জন্ম থেকেই আমরা কাঙালী কিনা। আমরা শুধু নিতেই জানি, সরকারের এখন কত স্কীম আসছে, সবাই ভাবছে ওই স্কীম থেকে, সেই স্কীম থেকে কত টাকা নেওয়া যেতে পারে।

ভগবানই একমাত্র দিতে পারেন। স্বামীজী তাই বলছেন, The Lord is the only Giver, all the men in the world are only shopkeepers, এই জগতে সবাই দোকানদার, সবাই বেনিয়াগিরি করে যাচ্ছে; দেনেওয়ালা একমাত্র ভগবান। Get His cheque, and it must be honoured everywhere, ঈশ্বরের সই করা চেক যদি এসে যায়, তার মানে দেওয়ার প্রবৃত্তি যখন এসে গেল, এই চেক কেউ বাতিল করতে পারবে না, সর্বত্রই তার খাতির হবে, ঐ চেককে dishonoured করার কোন প্রশ্নই নেই। মানুষের চেক হল নেওয়ার, ভগবানের চেক হল দেওয়ার। তুমি দিতে থাক, দেখবে তোমার কোন দিন কোন সমস্যা হবে না। আমাদের সমস্যা হল আমরা সব সময় পাওয়ার জন্য দৌড়াচ্ছি।

স্বামীজী শেষে বলছেন, 'God is the inexplicable, inexpressible of love', to be known, but never defined. (*ঈশ্বর অনির্বচনীয় প্রেমস্বরূপ – তিনি উপলব্ধির বস্তু; কিন্তু তাঁকে কখনও ইতি করা যায় না।*) ঈশ্বরের ভালবাসা ব্যাখ্যাতীত, অবর্ণনীয়, শুধু বোধে বোধ করা যায়। ঠিক তেমনি ঈশ্বরকে জানা যায় কিন্তু পরিভাষিত করা যায় না। যিনি ঈশ্বরকে ভালবাসেন, ঈশ্বর চিন্তনের গভীরে যখন চলে যান তখন তিনি ঈশ্বরকে জানতে পারেন। *মূকাস্বাদাবৎ*, যে বোবা সে কথা দিয়ে কিছু প্রকাশ করতে পারে না, ঠিক তেমনি ঈশ্বরের বর্ণনা কেউ করতে পারবে না, পরম ভক্তও করতে পারবে না, অবতারও করতে পারবেন না, শুধু বোধে বোধ করা যায়।

স্বামীজী প্রথম দিনের বিষয় থেকে ধীরে ধীরে অন্য অন্য বিষয়ের উপর আলোচনা করছেন। প্রায়ই প্রশ্ন করা হয়, উপায় কি? বিভিন্ন আচার্যরা বিভিন্ন কথা বলেন, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কথা বলেন, বিভিন্ন লোককে বিভিন্ন কথা বলেন, আর একই লোককে আলাদা আলাদা সময়ে আলাদা আলাদা কথা বলেন। এই দিনকার ক্লাশে স্বামীজী উপায় বলছেন, দাও, দিয়ে যাও। কেন দিতে বলছেন? ভগবানই একমাত্র দাতা, তিনি যখন দেন তখন তিনি কোন প্রত্যাশার অপেক্ষা রেখে দেন না। ঠিক তেমনি তুমিও যখন আশা প্রত্যাশার অপেক্ষা না রেখে দেবে তখন তোমার ভিতরেও সেই গুণ আসতে শুরু হয়ে যাবে।

হিন্দু ধর্মের সাথে অন্যান্য ধর্মের বিরাট পার্থক্য, মাঝে মাঝেই এই পার্থক্যগুলি আমাদের আলোচনায় আসতে থাকবে। অন্যান্য ধর্ম বিশেষ একটা গ্রন্থকে আধার করে চলে, গ্রন্থকে আধার করে চলা মানে কথার উপর দিয়ে চলে। হিন্দুরাও বেদকে আধার করে চলে, কিন্তু তারা বেদের কথা নিয়ে চলে না, তারা বেদের সিদ্ধান্ত নিয়ে চলে। একটা খুব সামান্য উদাহরণ দিলে জিনিসটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। একজন খ্রীশ্চান ফাদার বলছেন, তুমি mercifull হও। কেন? ভগবান merciful, Jesus merciful, তিনি জগতের পাপ নিয়েছিলেন, তুমিও এই রকম হও। এটাই বাইবেলের কথা হয়ে গেল। আমাদের কেন merciful হতে হবে? Jesus merciful ছিলেন আর ঈশ্বর merciful। এটাই যখন বেদান্তে আসে তখন বেদান্তীরা বলবেন অবস্থার চ্যুতি। অবস্থার চ্যুতি কেন হয়েছে? কামনার জন্য হয়েছে, এই কামনা থেকেই আসে কাম, কাম ভোগের জন্য সঞ্চয় করে, সেখান থেকে পূর্বাবস্থায়, অর্থাৎ নিজের স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য দরকার ত্যাগ। সিদ্ধান্ত হল ত্যাগ, যতটা পারো ত্যাগ কর। সাধারণ ত্যাগের মাধ্যমে মানুষ উপরে ওঠে, আর পূর্ণ ত্যাগ হলে তার নিজের স্বরূপে স্থিত হয়ে যাবে। এখানে পুরোটাই সিদ্ধান্ত নিয়ে চলছেন। অন্যান্য ধর্মে যে সিদ্ধান্ত নেই তা না, অন্যান্য ধর্মেও সিদ্ধান্ত আছে। স্বামীজী যে এখানে বলছেন, দিয়ে যাও, এটা কিন্তু স্বামীজীর আদেশ নয়। এই আদেশ উপনিষদেরও নয়, বেদেরও আদেশ নয় – এটা সিদ্ধান্ত। উপনিষদে যেখানে বলছেন ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হয়, এটা একটা সিদ্ধান্ত। ত্যাগের দ্বারাই মানুষ অমর হয়, ত্যাগের দ্বারাই মানুষ জ্ঞান লাভ করে – এটা একটা সিদ্ধান্ত। সেই সিদ্ধান্তকে আমরা যখন ব্যবহারিক জগতে লাগাতে যাচ্ছি তখন এর প্রয়োগ অন্য রকম হয়ে যায়।

জুইস্ পরম্পরায় অর্থাৎ ইহুদিদের পরম্পরায় বলা হয়, মানুষের পতনের কারণ তারা ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করল। ঈশ্বরের আদেশ যদি কেউ মেনে চলে সে তার আগের অবস্থায় ফেরত চলে যাবে – এটা কিন্তু সিদ্ধান্ত হয়ে গেল। তার মানে ভগবানের আদেশ যদি শোনা হয় তাহলে আবার সে পুরনো অবস্থায় চলে যাবে। কিন্তু যখনই বলা হচ্ছে Gods Commandment, তখন কিন্তু দেখা যাবে বিভিন্ন জায়গায় commandments বিভিন্ন রকম হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ওদের ধর্ম এই সিদ্ধান্তের উপর দাঁড়িয়ে আছে – ঈশ্বরীয় আদেশ পালন করা হয়নি বলে আমাদের এই দুরবস্থা, তাই আমাদের ঈশ্বরীয় আদেশ মানতে হবে। ঈশ্বরীয় আদেশ কি, পর্যালোচনা করতে গেলে সমস্যা শুরু হয়ে যাবে। ঈশ্বরীয় আদেশ আসা মানে, ঈশ্বরের কোন দূত মারফতই আসতে হবে। এই জিনিসটাকে মুসলমানরাও নিল, এব্রাহাম যেমন ঈশ্বরের দূত ছিলেন, ঠিক তেমনি মহম্মদও আল্লার দূত রূপে এসে গেলেন। মহম্মদ শুধু দূতই নন, তিনি আল্লার শেষ দূত। আল্লা মহম্মদকে দিয়ে এই কথাগুলো বলে পাঠিয়েছেন, এই কথাগুলো যদি পালন না করা হয় তাহলে তোমার অনেক সমস্যা হবে। এদিক দিয়ে জুইস্ ও ইসলাম পরম্পরা খুব কাছাকাছি। খ্রীশ্চানরা আবার হিন্দুদের বৈদান্তিক ট্রাডিশানের কাছাকাছি।

খুব ভাল করে খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে, বিশ্বে যত রকম ধর্ম আছে তাতে দু-রকমের ট্রাডিশান পাওয়া যাবে, একটা ট্রাডিশান হল গৃহস্থদের জন্য আর অন্য ট্রাডিশানটা হল সন্ন্যাসীদের জন্য। সন্ন্যাসীদের যে ট্রাডিশান সেখানে সব সময় বলা হয়, সব কিছু ত্যাগ করে দাও। গৃহস্থদের ট্রাডিশানে বলা হয়, ঈশ্বরের আদেশ পালন কর। ঈশ্বরের আদেশ পালন করা মানেই হয়ে যাবে গৃহস্থ ধর্ম। ঈশ্বরের জন্য সব কিছু ত্যাগ হল সন্ন্যাসীদের ধর্ম। সেদিক থেকে জহুদিদের ধর্ম পুরোপুরি গৃহস্থদের ধর্ম, পার্সি ধর্ম পুরোপুরি গৃহস্থদের ধর্ম, ইসলাম পুরোপুরি গৃহস্থদের ধর্ম। সেইজন্য এইসব ধর্মে কোথাও সন্ন্যাসীর ধারণা নেই। ভারতবর্ষে শিখ ধর্ম পুরোপুরি গৃহস্থ-ধর্ম, গুরু যা আদেশ দিয়ে গেছেন সেই আদেশগুলো পালন করলেই হবে, তোমাকে আর কিছু করতে হবে না। বেদান্ত ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম আর জৈনদের ধর্ম আর ঐদিকে খ্রীশ্চান ধর্ম, এই চারটি সন্ন্যাসীদের ধর্ম। কিন্তু হিন্দুদের একটি বৈশিষ্ট্য, যা অন্যান্য ধর্ম থেকে হিন্দু ধর্ম আলাদা হয়ে যায় তা হল, হিন্দু ধর্মে গৃহস্থদের জন্যও ধর্মগ্রন্থ আছে আবার সন্ন্যাসীদের জন্যও ধর্মগ্রন্থ আছে। একই ধর্ম, কিন্তু দুটো ক্ষেত্রে পাল্টে যায়। খ্রীশ্চানদের বাইবেল পুরোপুরি সন্ন্যাসীদের ধর্মগ্রন্থ, সন্ন্যাসী ছাড়া এই ধর্ম পালন করা যায় না। ওনারা পরে এগুলোকে এমন ভাবে অনুবাদ করলেন যে মনে হবে এগুলো গৃহস্থ ধর্মেও আনা যাবে। কিন্তু তাও দেখা যাবে, ওদের যে মূল, যাদের ক্যথলিকস বলছে, তারা কিন্তু সন্ন্যাসী। ওদের যাঁরা ফাদার হন তাঁরা বিবাহ করেন না, সন্ন্যাসীদের মত জীবন-যাপন করেন। বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম পুরোপুরি সন্ন্যাসীদের ধর্ম। ফলে এই ধর্মকে সাধারণ জীবনে প্রয়োগ করার সময় তখন অনেক সমস্যা দেখা দেয়। তার ফলস্বরূপ চীনাদের হাতে আজ তীব্বতীদের কি দুরবস্থা। অহিংসা পালন করতে গিয়ে তারা মার খেয়েই যাচ্ছে, কিছুই করতে পারছে না। ভারতবর্ষেও একই সমস্যা, কারণ অহিংসা সন্ন্যাসীদের ধর্ম, গৃহস্থদের জন্য নয়।

আচার্য শঙ্কর যে দুটো ধর্মের কথা বলছেন, প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম আর নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম, সেখানে প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্মের অর্থই হল ঈশ্বরের আদেশ পালন করা আর নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্মের অর্থ ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। একমাত্র হিন্দু ধর্মেই প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম ও নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম দুটোই আছে। যখনই গৃহস্থ-ধর্ম আসে তখনই ভাল-মন্দের ব্যাপার এসে যায়, কারণ তখন আদেশ মানা, আদেশ না মানার ব্যাপারে এসে যায়। নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্মে থাকে একমাত্র ত্যাগ, শুধু ত্যাগ আর ত্যাগ। স্বামীজী এখানে তাই ত্যাগের মাহাত্ম্য বলছেন, ত্যাগের দ্বারাই মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে, তোমরাও ত্যাগের অনুশীলন কর।

জগতের দুঃখকষ্ট, সংঘর্ষ ঈশ্বরের কাছে নিছক একটা খেলা মাত্র

সেখান থেকে স্বামীজী বলছেন, In our miseries and struggles the world seems to us a very dreadful place. (*আমরা যখন দুঃখকষ্ট ও সংঘর্ষের মধ্যে পড়ি, তখন জগৎটা আমাদের কাছে একটা অতি ভয়ানক স্থান বলে মনে হয়।*) যখন আমাদের দুঃখকষ্ট আসে আর তার জন্য যে সংঘর্ষ করতে হয়, তখন মনে হয় এই জগতের মত এত জঘন্য স্থান আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু যাঁরা জ্ঞানী, যাঁরা জ্ঞানের ওই অবস্থায় চলে গেছেন তাঁদের কাছে জগৎটা মনে হয়, স্বামীজী বলছেন, But just as when we watch two puppies playing and biting we do not concern ourselves at all, realizing that it is only fun and that even a sharp nip now and then will do no actual harm. (*যেমন আমরা দুটো কুকুর-বাচ্চাকে পরস্পর খেলা করতে বা কাড়াকামড়ি করতে দেখি সেদিকে আদৌ মনোযোগ দিই না, জানি যে দুটোতে মজা করছে, এমন কি, মাঝে মাঝে জোরে এক-আধটা কামড় লাগলেও জানি যে, তাতে বিশেষ কিছু অনিষ্ট হবে না।*) কুকুরের বাচ্চাগুলো একসাথে খেলছে, কামড়া-কামড়ি করছে, তাতে আমরা ঘাবড়ে যাই না, যদি কোন কারণে কুকুরের বাচ্চাগুলো এক অপরকে জোড়ে কামড়ে দেয় তাতে বড় কোন ক্ষতি হয় না। ফলে কি হয়? All our struggles are but play in God's eyes. (*তেমনি, আমাদেরও মারামারি-ইত্যাদি যা কিছু – সব ঈশ্বরের চক্ষে খেলা বই আর কিছু নয়।*) আমাদেরও যত দুঃখ-কষ্ট ভগবানের দৃষ্টিতে সবটাই খেলা, এগুলো কিছুই না।

দুটো কুকুরের বাচ্চা এক অপরের সাথে লড়াই করছে, ভালবাসছে আবার কামড়া-কামড়ি করছে, থাবা মারছে, আমাদের দেখতে মজা লাগে। ঠিক তেমনি ঠাকুরও যখন আমাদের দুঃখ-কষ্ট দেখেন, আমাদের লড়াই,

বিবাদ, সংঘর্ষ দেখেন তাঁরও মজা লাগে। কেন মজা লাগে? আমরা জানি কুকুরের বাচ্চাগুলো যতই লড়াই করুক তাতে ওদের কোন ক্ষতি হতে যাচ্ছে না। কুকুরের মা শুয়ে শুয়ে দেখতে থাকে বাচ্চাগুলো মারামারি করছে, ওর কোন হেলদোল নেই তাতে। তেমনি ভগবানও জানেন আমাদেরও আসলে কোন ক্ষতি হতে যাচ্ছে না। আমাদের মনে হতে পারে কি করে ক্ষতি হচ্ছে না? একজন বিধবা হয়ে গেল, তার তো ক্ষতি হয়েই গেল। বাড়িতে আগুন লেগে গেল, ক্ষতি তো হয়ে গেল। যদি কোন কারণে কোন একটা কুকুরের বাচ্চা ক্যাঁ ক্যাঁ করে মার কাছে ছুটে আসে মা তাকে দুধ খাইয়ে দেয় বা ওদের দিকে ঠেলে দেয়, কিছু একটা করে দেয়। তিনি সব দেখছেন, আসল কোন ক্ষতি হয় না। ক্ষতি যদি হত তিনি তখন কিছু একটা করে দেবেন। যেমন দেবাসুরের সংগ্রাম, পুরো জগতের সাম্য ভাব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তখন তিনি সরাসরি হস্তক্ষেপ করেন, তবে সচরাচর করেন না। কারণ তিনি জানেন এদের কোন ক্ষতি হয় না।

স্বামীজী এর আগে বললেন, আমাদের মনটাই জগৎ। মন জগৎ হওয়ার জন্য আমরা যেটাকে ভাল মনে করি সেটাতে আমরা প্রাণ দিয়ে দিচ্ছি। স্কুল-জীবনে আমাদের কাছে পরীক্ষায় পাশ করাটা একটা বিরাট কিছু ছিল, কিন্তু আজকে বয়স হয়ে যাওয়ার পর ওটা কোন ব্যাপারই নয়। যে সময় যেখানে থাকছি সেই সময় সেখানে মনে হয় জীবনে এর থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু হতে পারে না। সেখান থেকে মানুষ ধীরে ধীরে এগোতে থাকে। একটা ছোট্ট পাহাড়ী নদী নীচে নামছে, তার পাহাড়ে থেকে নামা যদি আটকে যায় বুঝতে হবে সেখানে পাথর তত বড় আছে। পাথর যত বড় হবে তাকে ওড়ানোর জন্য ডায়নামাইটও তত বড় লাগবে। জলের ধারা যদি ছোট হয় তাহলে ছোট পাথরে আটকে যাবে, পা দিয়ে একটু ঠেলে দিলেই সরে যাবে। কিন্তু পুরো একটা বিরাট নদী তাকে আটকাবার জন্য ভাকড়া-নাঙ্গাল ড্যাম দেওয়া হয়েছে। ওই নদীর পথ যদি খুলতে হয় তাহলে কত শত শত ডায়নামাইট লাগিয়ে ওই ড্যামকে ওড়াতে হবে। গঙ্গা যখন স্বর্গ থেকে মর্ত্যে নামছে তখন পাথর তাকে আটকে দিয়েছে, ঐরাবতকে বলা হল আপনিই একমাত্র এই পাথর সরাতে পারেন।

আমরা সবাই সেই পূর্ণব্রহ্ম, আমাদের মধ্যে পূর্ণ শক্তি। কিন্তু আমাদের ভিতরটা অজ্ঞানের নানা রকম পাথরে বোঝাই হয়ে আছে। কখন কদাচিৎ ভগবান কৃপা করে পাথর সরিয়ে দেন। বেশির ভাগ সময় জগতে লড়াই করে, মারামারি করে ওই পাথরগুলো একটার পর একটা বুম্ বুম্ করে উড়ে যায়। যখনই দুঃখ-কষ্ট আসে বুঝতে হবে একটা পাথর উড়ল। আবার দুঃখ-কষ্ট আসছে তার মানে আরেকটা পাথর উড়ল। নদী থেকে খাল কেটে জল আনার জন্য সব সময় উল্টো দিক থেকে খাল কাটা হত। যেখানে জল আনা হবে সেখান থেকে কাটতে কাটতে নদীর কাছে চলে যায়। নদীর কাছে গিয়ে শেষটুকু আর কাটে না, না কেটে ওভাবেই ছেড়ে দেয়। নদীর জলের চাপ ওই মাটিটুকুকে নিজে থেকেই ভেঙে সরিয়ে দিয়ে কুল কুল করে জল খালের মধ্যে আসতে শুরু করে। জীবনে যখনই বড় একটা দুঃখ আসে বুঝতে হবে খাল কাটার বড় একটা কোপ পড়ল, আরেকটা দুঃখ এলো, আরেকটা কোপ পড়ল। আমরা এটাকে দু-ভাবে কল্পনা করতে পারি, খাল নদীর সঙ্গে জুড়তে এগোচ্ছে। দ্বিতীয় হল, আমার জীবনে অনেক গুণ আছে, কিন্তু প্রকাশ হতে পারছে না, এবার একটা কোপ পড়ল একটা গুণ খুলে গেল, আরেকটা কোপ পড়ল আরেকটা গুণ খুলে গেল। আমরা বলতে পারি, অনেক সময় দেখা যায় মানুষ অনেক দুঃখ-কষ্ট পেলে আত্মহত্যা করে নেয়। ওখানে খ্রীশ্চান ধর্মে, ইসলাম ধর্মে সমস্যা হবে ঠিকই, কারণ ওদের একবার মরে গেলে সব শেষ। কিন্তু আমাদের এখানে মৃত্যুতে সব কিছু শেষ হয়ে যায় না, জীবন চলতে থাকবে। আত্মহত্যা করে নিল মানে, ওর এখনও অনেক দুঃখ-কষ্ট পাওয়া দরকার, ওর অনেক ধাক্কা খাওয়া দরকার। বলা হয়, অনেকে দেখে শেখে, অনেক ঠেকে শেখে। ধাক্কাটা যখন লাগল তখন শিখল, ওর এখন আচ্ছা করে ধাক্কা লাগবে। কিছু কিছু কাশি আছে যাতে তুলসী পাতা, আদার রস করে খাইয়ে দিল, কাশি সেরে গেল। আবার অনেক কাশি আছে তাতে কাফ সিরাপ দিতে হয়, কাফ সিরাফে না কমলে এ্যন্টি বায়োটিক দিতে হয়। আবার তাতেও না উপশম হলে ডাক্তারের কাছে পরীক্ষা করে দেখা গেল তার গলায় ক্যান্সার, তখন কেমো থেরাপি দিতে হবে। একই কাশি কিন্তু ওষুধ এক এক রকম হয়ে যাচ্ছে।

আমাদের সমস্যা সবার একই রকম মনে হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও কাকে একটু ধাক্কা দিলেই হবে আর কাকে অনেক নাচাতে হবে বলা খুব মুশকিল। কারণ কত বড় পাথর ভিতরে জমে আছে বলা খুব মুশকিল।

এটা আমাদের মনে রাখা দরকার, কষ্ট যত বড়, শত্রুও তত বড় বেরনোর অপেক্ষায় আছে, কারণ তাকে আটকে রাখা হয়েছে। তবে এটা মনে রাখতে হবে কখনই ওটা ক্ষতিকর নয়। ভগবান কেন হস্তক্ষেপ করেন না? কারণ ভগবানের কাছে আমাদের যা কিছু সুখ তার কোন দাম নেই, আমাদের যা কিছু দুঃখ তারও কোন দাম নেই। আমার যেটা চৈতন্যস্বরূপ একমাত্র সেটারই তাঁর কাছে দাম। যদি কখন কোন কারণে কারুর চৈতন্যস্বরূপে কিছু বাধা হয়ে যায় তখন তিনি হস্তক্ষেপ করবেন। আমরা প্রায়ই অনেককে বলতে শুনি, ও আমার জীবনটা শেষ করে দিল। কি করে জীবন শেষ করে দেব! আমরা শুদ্ধ আত্মা, ভগবানের সন্তান, যেখানে ভগবানও আমাদের নাশ করতে পারবেন না সেখানে একটা মানুষ কি নাশ করবে! আমাদের অত্যন্ত দুর্ভাগ্য যে, আমরা এগুলো জানি না, জানলে চিন্তন করি না, চিন্তন করলেও ঠিক বুঝে উঠতে পারি না, তাই নিজে থেকে মেনে নিতে পারি না। অথচ আমরা কত বার কত জায়গায় বলতে থাকি, আমার জীবনটা তুই শেষ করে দিলি, ওই লোকটার জন্য আমার জীবনটা শেষ হয়ে গেল, ইত্যাদি। আমরা কি এতই সাধারণ যে একজন এসে ঈশ্বরের সন্তানকে নাশ করে দেবে! সত্যিই আমাদের জন্য দুর্ভাগ্য যে আমরা আমাদের জীবনকে, অস্তিত্বকে ছোট ছোট পুটলি করে খুঁটিতে ঝুলিয়ে রেখেছি, খুঁটিটা ভেঙে পড়ে গেল আর পুটলিটাও মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগল। কাউকে ভালবাসছি, সেটা একটা খুঁটি, টাকার দরকার সেটা একটা খুঁটি, ভাল খাওয়া-দাওয়া চাই, সেটা একটা খুঁটি। একটা করে খুঁটি ভেঙে যায় আমাদের অস্তিত্বটাও মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ে।

ঠাকুরের কাছে ভক্তরা এসেছেন, সেখানে সুখ-দুঃখের কথা হচ্ছে, ঠাকুর বলছেন সবই তো তাঁর লীলা। এই কথা শোনার পর একজন ভক্ত বলছেন, তাঁর লীলা কিন্তু প্রাণ তো আমাদের যায়। ঠাকুর তখন বলছেন, তুমি মানো আর নাই মানো তুমি সেই রাম। তাহলে প্রাণ কার যাচ্ছে? সেই রামেরই যাচ্ছে। আমাদের সমস্যা খুব জটিল, সমস্যা এই জন্য জটিল নয় যে, আমার চাকরি নেই, আমার টাকা নেই, আমার ছেলে অবাধ্য, মেয়ের বিয়ে দিতে পারছি না, ছাদ দিয়ে জল পড়ছে, এগুলো সমস্যা নয়। আমাদের সমস্যা হল আমরা ভুলে গেছি যে আমরা ঈশ্বরের সন্তান, ভুলে গেছি যে আমি সেই শুদ্ধ চৈতন্য, আরও মারাত্মক হল আমরা ভুলে গেছি যে আমার ভিতর অসীম ক্ষমতা। আমরা ভুলে গেছি যে, একটি করে আঘাত নেমে আসে তখন ওই আঘাত আমাকে আরও মজবুত করছে। কাঁচকে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করলে ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। কিন্তু লোহাকে যখন স্টীল বানানো হয় তখন তাকে আগুনে দেয়, আগুনে দিয়ে হাতুড়ি মারতে থাকে, তখন স্টীল টেম্পার্ড হয়, স্টীলের ক্ষমতা বাড়ে। আমাকে ঠিক করতে হবে আমি কাঁচ, নাকি আমি ইস্পাত। কিন্তু বাস্তব অন্য, বাস্তব হল আমরা সবাই ইস্পাত, কাঁচ তো কোন মতেই নই। প্রথমে ধাক্কা আমরা এই কারণেই পাই যে আমরা নিজেকে কাঁচ মনে করি। ওই ধাক্কা খাওয়ার পর যখন ভেঙে গেল, তখন আরও গায়ের জোরে আমরা নিজেকে কাঁচ বানিয়ে নিয়েছি, অথচ আমরা সবাই ইস্পাত। ভগবান আমাদের দুঃখ-কষ্ট দেখছেন, কিন্তু তিনি নির্বিকার, তাঁর কোন এই নিয়ে চিন্তা নেই, কারণ আমরা তো আমাদের আসল জায়গা থেকে সরে আসছি না। বাচ্চারা মাঠে যখন ফুটবল খেলে তখন তারা কত ধাক্কাধাক্কি করছে, ল্যাং মারছে, মা-বাবারা মাঠের বাইরে থেকে সব দেখছে কিন্তু তাদের এই নিয়ে কোন দুশ্চিন্তা হয় না। ইদানিং সবারই একটি করে সন্তান বলে একটু চিন্তা করে, আগেকার দিনে কেউ ভাবতও না। বাবা-মা জানে এতে আমার সন্তানের কোন ক্ষতি হয় না, বরঞ্চ শরীর ও পেশীর শক্তি বাড়ছে, ক্ষমতা বাড়ছে। আমাদের জানা দরকার আমার ভিতরে অনন্ত শক্তি, অনন্ত জ্ঞান, কিন্তু এই শক্তি বেরোতে পারছে না। আমার আশেপাশে যারা আছে সবাই অজান্তায় আমি ওর ঢেলা ভাঙছি, ও আমার ঢেলা ভেঙে যাচ্ছে। এই ভাবে আমিও অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, সেও অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

একজন লোক, ছেলে হোক মেয়ে হোক, তুমি তাকে ভালবাস। সে একদিন তোমাকে ধোকা দিয়ে চলে গেল, তুমি এবার কাঁদবে, নিশ্চয়ই কাঁদবে, ভালবাসার লোক চলে গেলে কষ্ট তো হওয়ারই কথা। একদিন দুদিন তিনদিন খুব কষ্ট লাগবে, কিন্তু তারপর? তারপর তো তোমার আনন্দ হওয়ার কথা, এই রকম একটা বাজে লোক, যার কোন stability নেই, যে নিজের কথা রাখতে পারে না, সে কিনা তোমার জীবনের ছায়াসঙ্গী হতে যাচ্ছিল! তুমি কত বড় ঝামেলা থেকে বেঁচে গেলে একবার ভেবে দেখ, ভেবে তো তোমার আনন্দ হওয়া উচিত। তদুপরি তুমি শিক্ষা পেয়ে গেলে যার তার উপর ভরসা করতে নেই। যার মধ্যে অনন্ত জ্ঞান, যার জীবনের উদ্দেশ্যই হল সেই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, তাকে একজন লোক শিক্ষা দিয়ে দিল, সবার

উপর বিশ্বাস করতে নেই, সে জেনেশুনে শিক্ষা দেয়নি, অজান্তায় শিক্ষাটা দিয়ে দিল। তার প্রতি তো তোমার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের কি দুর্ভাগ্য, সারা জীবন ধরে আমরা তাকে গালাগাল দিতে থাকি, ওই বদমাইশটা আমার জীবনে এসে আমাকে শেষ করে দিয়ে গেল। ভগবানকে যেমন কোন মানুষ নাশ করতে পারবেন না, কোন দেবতা বা অসুর নাশ করতে পারবে না, ঠিক তেমনি তোমাকেও কেউ কোন দিন নাশ করতে পারবে না। তোমার ঠ্যাঙ খোড়া করে দিতে পারে, তোমাকে অন্ধ করে দিতে পারে, তোমার টাকা-পয়সা কেড়ে নিতে পারে, তোমাকে বিধবা করে দিতে পারে, কিন্তু তোমাকে কি করে নাশ করবে! তুমি তো চৈতন্যস্বরূপ, চৈতন্য সত্তারই তুমি প্রকাশ। এটা গেল বেদান্তের দৃষ্টিতে। ভক্তির দৃষ্টিতে ভক্ত জানে আমি ভগবানের সন্তান, আমাকে কে কি করতে পারবে!

শেষে স্বামীজী বলছেন, This world is all for play and only amuses God; nothing in it can make God angry. (*এই জগৎটা কেবল খেলার জন্য – ভগবানের এতে শুধু মজাই হয়। জগতে যাই হোক না কেন, জগতের কোন কিছুই তাঁর কোপ উৎপন্ন করতে পারে না।*) এই জগৎ তাঁর লীলাখেলা, কোন কিছুই ভগবানকে বিরক্ত করতে পারে না। জহুদি, ইসলাম ট্রাডিশানে অন্য রকম চিন্তাধারা, সেখানে ভগবান খুব অসন্তুষ্ট হন যদি ভগবানের কথা মানা না হয়। এটাকেই স্বামীজী ভাঙছেন, কুকুরের বাচ্চাদের খেলা দেখে আমরা যেমন উদ্বিগ্ন হই না, ঠিক তেমনি ভগবানেরও আমাদের দুঃখ-কষ্টে কোন কিছু আসে যায় না। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে গয়না চুরি হয়ে গেল, মথুরবাবু বলছেন, মা তুমি নিজের গয়নাকে রক্ষা করতে পারলে না! শুনে ঠাকুর খুব বিরক্ত হয়ে গেলেন। সাক্ষাৎ লক্ষ্মী যাঁর লীলাসঙ্গিনী, যিনি তাঁর পদসেবা করেন, তোমার এই দু পয়সার গয়না তাঁর কাছে মাটির ঢেলা বই কিছু না। অন্য দিক থেকে আবার যে গৃহস্থ সে ঈশ্বরের, যে পুলিশ সেও ঈশ্বরের, যে চুরি করছে সেও ঈশ্বরের। তাই ঠাকুরকে সবার দিকে নজর দিতে হয়, যে চোর তাকেও দেখতে হয়, পুলিশকেও দেখতে হয়, গৃহস্থকেও দেখতে হয়। চৌর্য বৃত্তিতে যার জীবন চালাতে হয় তারও ব্যবস্থা ঠাকুরকে করে দিতে হয়, এটাই ঠাকুরের কাজ। আমরা ভাবছি তিনি কেন আমার ঘরে চুরি করালেন, আমার জাগা ঘরে চুরি। চুরি না করলে সে বাঁচবে কি করে। চুরি করাটা খারাপ। খারাপ সেতো আমার আপনার কাছে, তার কাছে তো ভাল জিনিস। যে চুরি করতে পেরেছে তার কত আনন্দ, তার বাড়ির লোকেদের কত আনন্দ, আর পাড়াপ্রতিবেশী যারা আমাকে পছন্দ করে না, তাদের কত আনন্দ যে আমার বাড়ির সব চুরি হয়ে গেছে। এই একটা ঘটনায় শুধু আমারই চোখে জল বেরোচ্ছে, অন্য দিকে কত লোকের আনন্দ হল।

মাতৃশক্তি

এরপর স্বামীজী জগজ্জননী, মাতৃশক্তি সম্বন্ধে এবং তাঁর প্রকাশ কিভাবে কোথায় হয় এই নিয়ে আলোচনা করছেন। এই আলোচনাতে যাওয়ার আগে আমরা শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের একটা ঘটনা নিয়ে বলতে যাচ্ছি, যে ঘটনা আমরা সকলেই জানি। এই ঘটনাকে নিয়ে আবার দুটো মজার কথাও আছে, সবটা বললে এই টপিকটা আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে। মা জয়রামবাটীতে আছেন, একদিন সেখানে আমজাদ এসেছে। মা তাকে কিছু খাবার দিতে বললেন। মা দেখছেন আমজাদকে রুটি ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছে। মা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে গেলেন, কোন মানুষকে কি এভাবে খেতে দিতে আছে! তারপর মা নিজের হাতে আমজাদকে খাওয়াতে লাগলেন। সেখানেই মা তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তিটি বলছেন, শরৎ যেমন আমার ছেলে, আমজাদও আমার তেমনই ছেলে। যেখানেই মায়ের কোন প্রসঙ্গ হয় সেখানে বক্তারা প্রায়শই এই ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। কোন এক আশ্রমে মায়ের দেড়শত বর্ষ জন্মোৎসব পালিত হচ্ছিল, সেখানে জনসভায় অনেক বক্তা আছেন, প্রথম বক্তা এসে মায়ের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে বললেন, মা বলছেন শরৎ যেমন আমার ছেলে আমজাদও আমার তেমন ছেলে। দ্বিতীয় বক্তা এলেন, তিনিও বললেন, মা বলছেন শরৎ আমার যেমন ছেলে তেমনি আমজাদও আমার ছেলে। তৃতীয় বক্তা এলেন, তিনিও এই কথা দিয়ে শুরু করলেন। চতুর্থ বক্তা এলেন, এবার শ্রোতাদের মাঝখান থেকে একজন বলে উঠলেন, 'আমরা ইতিমধ্যে জেনে গেছি শরতও মায়ের ছেলে আমজাদও মায়ের ছেলে, দয়া করে এটা আর বলবেন না, বাকি যা বলার বলুন'। আরেকটি সেন্টারে এই রকম একটা সভা হচ্ছিল, সেখানে সব বিজ্ঞ বক্তারা ছিলেন। সেখানেও একজন সন্ন্যাসী বক্তৃতায় এই একই

কথা বলেছেন। সভা শেষ হওয়ার পর একজন প্রাচীন সাধু সেই সন্ন্যাসীকে ডাকলেন। তাঁকে বলছেন, ‘তুমি যে বললে শরৎ যেমন আমার ছেলে আমজাদও তেমনি আমার ছেলে, এই কথার তুমি কি বোঝ আমাকে একটু ব্যাখ্যা করে বল তো’।

স্বামীজী এখন যে বক্তব্য রাখছেন তার মূল ভাব এটাই, জগজ্জননী যিনি, তাঁকে আমরা যে নামেই বলি না কেন, মা জগদম্বে, মা দূর্গা, মা কালী, সেই জগজ্জননী রূপে মা সারদাদেবীকে না নিলে কখনই শরতও তাঁর ছেলে আমজাদও তাঁর ছেলে হতে পারবে না। জগজ্জননী ছাড়া মাকে যদি অন্য কোন রূপে দেখা হয়, তাহলে শরৎ আমার ছেলে আমজাদাও আমার ছেলে হবে না। মায়ের এই বিখ্যাত উক্তিটি, আমি শরতেরও মা, আমজাদেরও মা, এর অন্তর্নিহিত ভাব যে কত কঠিন আমরা ধারণাই করতে পারব না। যতক্ষণ না মাকে জগজ্জননী রূপে দেখা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু এই উক্তির কোন অর্থই হয় না। স্বামীজী এই জিনিসটাকেই এখানে স্বতন্ত্র ভাবে নিজস্ব ভঙ্গীতে বলছেন। ঠাকুর বলছেন, জেঠী, খুড়ীদের কোঁদল শুনে বাচ্চারা যেমন বলে, তোর ঈশ্বরের দিব্যি। ঠিক তেমনি আমরাও না বুঝেই বলি, মা সতেরও মা অসতেরও মা, মা শরতেরও মা আমজাদেরও মা।

অনেক অল্প বয়সে আমরা একটা কবিতা পড়েছিলাম, কবির নামটা ঠিক এখন মনে পড়ছে না, কবি এক গরীব ভিখারীর কথা বর্ণনা করছেন সেখানে একটা লাইন আছে যেখানে বলছেন, shutting from the God and shutout from the world, গরীব ভিখারী মানেই তাই, জগৎ তাকে ছেড়ে দিয়েছে, সমাজ তাকে বার করে দিয়েছে। এর থেকেও গভীরে গিয়ে কবি লিখছেন, কারণ তিনি ছিলেন ইংরেজ কবি, বাইবেলের দ্বারা, খ্রীশ্চান ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত, খ্রীশ্চান ধর্মে মনে করা হয় God the son, God the father and God the Holi Spirit। প্রথমের দিকে আমরা এর উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছি। হোলি স্পিরিট যিনি এই জগৎকে চালাচ্ছেন, যিনি সবাইকে শুভমতি দেন, তিনিই মানুষকে ধর্ম পথে নিয়ে যান, তিনিই মানুষকে ভালর দিকে নিয়ে যান। তিনিই যখন তাঁর করুণা ফেরত নিয়ে নেন মানুষ তখন খারাপ পথে চলে যায়। এটাই খ্রীশ্চান ধর্মে এ্যঞ্জেল আর ডেভিল রূপে এসেছে।

Shutout from the world আমরা বলতেই পারি, কিন্তু shutting from God যখন বলছে তখন সেটা খ্রীশ্চান ধর্মে হতে পারে, হিন্দুদেরও কিছু কিছু সম্প্রদায়ে হতে পারে, কিন্তু বেদান্তে কোন যুক্তিতেই এই কথা দাঁড়াবে না। অনেক সন্ন্যাসীদের দেখা যায় যিনি ঘোর বেদান্তী, বেদান্ত নিয়েই জীবন অতিবাহিত করেছেন; এমন এমন জায়গায় তিনি থেকেছেন যেখানে শুধু বেদান্তরই চর্চা হয়, এই রকম এক সাধু একজন অন্য এক সাধুর কথা বলছেন, সেই সাধুর দিনকাল খারাপ যাচ্ছিল। সেই বেদান্তী সাধু তাঁর সম্বন্ধে একজনকে বলছেন, ‘ভগবানই যাঁকে মেরে রেখেছেন, আমি আর কেন তাঁর কষ্ট বাড়াতে যাব’। শুনে অন্য সন্ন্যাসীদের মনে খটকা লাগলল, এটা কি রকম কথা বলছেন তিনি! ভগবান কেন কাউকে মারতে যাবেন? যে ভগবান গীতায় বলছেন *ন মে দ্বেষোঽস্তি ন মে প্রিয়ঃ*, কারুর প্রতি আমার দ্বেষ নেই আর কেউ আমার প্রিয় নয়, সেই ভগবান কেন অপরকে মারতে যাবেন? অন্য দিকে প্রচলিত কথায় বলা হয়, হরি যাকে রাখেন তাকে কে মারবে আর হরি যাকে মারেন তাকে কে বাঁচাবে। তার মানে আমার আপনার ব্যক্তিত্ব রূপে কোন দামই নেই। অথচ দুটো জায়গাতেই আমরা বিরোধ করছি। বেদান্তের মূল সিদ্ধান্ত, কোন মানুষ, মানুষের কথা ছেড়ে দিন, একটা ছোট্ট যে পিঁপড়ে বা একটা এ্যমিবা, স্বরূপতঃ সেও সেই পূর্ণব্রহ্ম। তাহলে এটাই দাঁড়ায় যে অধোগতি কারুরই কখন হতে পারে না, সর্বনাশ কখনই হতে পারে না, সর্ব শেষ হয়ে যাওয়া কখনই হতে পারে না, চিরদিনের জন্য নরক প্রাপ্তি কখনই হতে পারে না। তবে হ্যাঁ, দিনকাল খারাপ চলতে পারে। দিনকাল খারাপ চলাটা পাল্টাতে বেশি সময় লাগে না। যে কোন মানুষের দিনকাল খারাপ চলাটা এক মুহূর্তে পাল্টে যেতে পারে। বাড়ি তৈরী করতে অনেক সময় লাগে, বাড়িটা জ্বালিয়ে ছাড়খাড় করে দিতে কয়েক মিনিট লাগবে। কাঠ সংগ্রহ করে কাঠের স্তুপ বানাতে অনেক সময় লাগে, কিন্তু স্তুপিকৃত কাঠ পুড়িয়ে ভস্ম করে দিতে এক মিনিটও লাগবে না। তেমনি মানুষের পতন হতে অনেক সময় লাগে, সেখান থেকে উঠে দাঁড়াতে এক মিনিট লাগে। আমাদের মনে হতে পারে এই কথার মধ্যে বিরোধ এসে যাচ্ছে। অনেকে বলতে পারেন সম্মান অর্জন করতে অনেক সময় লাগে, সেই সম্মান এক লহমায় ধূলাতে গড়াগড়ি যেতে পারে। একজন রাজনৈতিক নেতা তিল তিল করে

নিজেকে তৈরী করে একটা উঁচু অবস্থায় নিয়ে গেল, আর একটা কলঙ্ক হয়ে গেলে মুহূর্তে সেখান থেকে পড়ে যাবে। ঠিকই, সম্মানটা তার চলে যেতে পারে, কিন্তু মানুষ রূপে সে কখনই শেষ হয়ে যাবে না। কারণ, যে কোন জীব, তা সে যতই অনু প্রমাণ হোক না কেন, তার পিছনে যে আসল শক্তি লেগে আছে সেটা ঈশ্বরের শক্তি।

ঈশ্বরের এই শক্তিকে স্বামীজী এখানে মা বলে সম্বোধন করছেন। সেই মায়ের শক্তিতে সে চলছে, কিছু ভুল করা মানে, তার কাঁচা আমি তাকে মায়ের কাছ থেকে দূরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। তার মনে হচ্ছে সে মায়ের কাছ থেকে দূরে চলে গেছে। যারা দেখছে তারাও বলছে সে দূরে চলে গেছে। কিন্তু মায়ের শক্তি কখনই তাকে দূরে যেতে দেয় না। কারণ যেটা অশুভ সেটাও মায়েরই শক্তি। কাউকে তিনি কখনই অশুভে নিয়ে যান না। শ্রীশ্রীচণ্ডীর চতুর্থ অধ্যায়ে দেবতারা জগন্মাতার স্তুতি করে বলছেন, যাঁরা কৃতধি, যাঁদের বুদ্ধি পবিত্র হয়ে গেছে তাদের কাছে মা আপনি সুকৃতি রূপে অর্থাৎ লক্ষ্মী রূপে থাকেন, আর যাদের বুদ্ধি কলুষিত, গোলমেলে লোকেদের বাড়িতে মা অলক্ষ্মী অর্থাৎ দারিদ্র রূপে থাকেন। যখন দারিদ্র, দুঃখ আসে তখন বুঝতে হবে মা এখন আমার গৃহে দারিদ্র রূপে এসেছেন। আর যখন শুভ কর্ম করতে শুরু করে, ধর্মে যখন মতি আসে তখন তার জীবনে একটা শ্রী আসে। শ্রী মানে প্রাচুর্য নয়, অনেকেই এই ভুলটা করেন। জগন্মাতার যখন কৃপা হয় তখন শ্রী আসে, শ্রী মানে ঐশ্বর্যের ভাব। আগেকার দিনে দেখা যেত, গরীব ব্রাহ্মণ, দু-বেলা হয়ত পেটভরা খাবার-দাবার জোটে না, কিন্তু চেহারাটা ঝকঝক করছে, তার মানে চেহারায় একটা শ্রী আছে। তার বিপরীত হল বিশ্রী, শ্রী হীন। একজনের প্রচুর টাকা-পয়সা হতে পারে, কিন্তু শ্রী নেই, কান্তিহীন চেহারা। কর্মের জোরে যে টাকা আসে কিছু দিন পর সেটা চলেও যাবে। কিন্তু শুভ কর্ম করে, সুকৃতি করার পর যে লক্ষ্মী আসেন, তার প্রাচুর্য চলে যেতে পারে কিন্তু শ্রী কোন দিন যাবে না। সেও জানে এই যা কিছু ভাল এসেছে এটাও যেমন মায়েরই রূপ আবার দুঃখ যখন আসে সেটাও মায়েরই রূপ।

এই ভাবটাই স্বামীজী শিষ্যদের বলছেন। বলছেন, ঈশ্বরের করুণা, ঈশ্বরের কৃপা, ঈশ্বরের শক্তি সদা সর্বদা সবারই জন্য সমান ভাবে কাজ করছে। বিভিন্ন লোকের মন বুদ্ধি বিভিন্ন ভাবে কাজ করে, সবাই তাই ঈশ্বরের করুণা, কৃপা, শক্তি এগুলিকে বিভিন্ন ভাবে নেয়। স্বর্গটাও ঈশ্বরের, নরকটাও ঈশ্বরের, পাতালটাও ঈশ্বরের। একটা প্রচলিত গল্পে আছে, ভগবান বিষ্ণু একবার রেগে নারদকে বললেন, তুমি নরকে যাবে। নারদ বলছেন, 'প্রভু! নরকটা কি জিনিষ আমি জানি না, আপনি আমাকে একটু এঁকে বুঝিয়ে দিন'। ভগবান তখন মাটিতে এঁকে দেখালেন এই হল স্বর্গ, এই হল নরক। সঙ্গে সঙ্গে নারদ মাটিতে সেই নরকের উপর গড়াগড়ি দিয়ে বললেন, 'ভগবান নিজের হাতে যে নরক এঁকে দেখালেন এটাই আসল নরক, আমার এই নরক বাস হয়ে গেল, আর নরক বাস করতে হবে না'। সবই তো ভগবানের তৈরী আর ভগবান যেটাতেই হাত দেবেন তিনি সেটাই। তাহলে নরকটা কি ভগবানের বাইরে? পাতাল কি ভগবানের বাইরে? আমরা এই জিনিসগুলোকে বুঝতে পারি না।

এখন আমি আপনি কোনটা চাইছি? ধরুন আমার পয়সাও প্রচুর আছে, আনলিমিটেড ক্রেডিট কার্ড, মালও আনলিমিটেড। এবার আমি কি চাইছি? ভগবানের যে ঐশ্বর্য তা অনন্ত। মুক্তির অবস্থা থেকে শুরু করে, বৈকুন্ঠ ধাম থেকে শুরু করে, দেবতাদের অপ্সরাদের লোকদের শুরু করে, পাতালের ঐশ্বর্য থেকে শুরু করে, নরকের যন্ত্রণা থেকে শুরু করে সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা সবটাই আছে। আর আমার কাছে ব্ল্যাঙ্ক চেক। এবার বলতে হবে আমার কি চাই? রোজ আমরা চেক কেটে যাচ্ছি। ছেলে মেয়েকে বলে আমি তোমার দাস হতে চাই। ব্ল্যাঙ্ক চেক ছিল, তাতে লিখে দিল আমি তোমার দাস হব। মন যখন ভরে যাবে, স্ত্রীর বাক্যবাণে যখন জর্জরিত হতে থাকবে, তখন ভাববে, অন্যটা ভাল ছিল। অন্যটার কাছে যখন অবৈধ প্রেম করবে তখন আরেক ভাবে ফাঁসবে। সেখান থেকে আরেকটার কাছে যাবে। বৈরাগ্য না হওয়া পর্যন্ত এই জিনিস চলতেই থাকবে। ঈশ্বরের সুপার মার্কেটে মালের শেষ নেই আর আমাদের কাছে ক্রেডিটের কোন লিমিট নেই, আমরা যত খুশি চেক কাটতে থাকি। যে সিগারেট খায় সে কি জানে না যে এতে তার ফুসফুসের ক্ষতি হচ্ছে, তাও খায়। যে মদ খাচ্ছে সে কি জানে না মদ লিভারের পক্ষে খারাপ, তাও খায়। চেক তো সে ইস্যু করছে, ওকে তো কেউ

জোর করছে না। ভগবান কেন কাউকে মারতে যাবেন? তাঁর ভারি বয়ে গেছে। সিগারেটটাও তাঁর, মদটাও তাঁর, গঙ্গাজলটাও তাঁর আর অক্সিজেনটাও তাঁর। আপনি কি চাইছেন বলুন?

এটাকে স্বামীজী এবার একেবারে স্পষ্ট শব্দে রাখছেন। আমরা হয়ত বলব, এগুলো তো আমরা কথামৃত আদি পড়ে বুঝছি, পুরোটা বুঝতে না পারলেও কিছুটা তো বুঝতে পারছি। এখানে আবার মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে, থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে যাঁরা গেছেন তাঁরা বেশির ভাগই গোঁড়া খ্রীশ্চান, তাঁদের কাছে ঈশ্বরকৃপা মানে শুভ শক্তি, ভাল, শুধু ভাল। ওই জায়গাতে স্বামীজী বোমা মারছেন, যেখানে স্বামীজী বলছেন, শুভটাও তাঁর অশুভটাও তাঁর, প্রাচুর্যটাও, তাঁর দারিদ্রটাও তাঁর। স্বামীজী গান ভাল জানতেন, তিনি এটাকেই একটা বিখ্যাত বাংলা মাতৃসঙ্গীতের মাধ্যমে ইংরাজীতে শিষ্যদের বলছেন – 'পড়িয়ে ভবসাগরে ডুবে মা তনুর তরী। মায়া-ঝড় মোহ-তুফান ক্রমে বাড়ে গো শঙ্করী......'।। গানের মাধ্যমে বর্ণনা করে বলছেন, আমার যে মাঝিরা দাঁড় বাইছে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলো বোকা, যে হাল ধরে আছে অর্থাৎ বুদ্ধিটা দুর্বল। এটা প্রচলিত ভাব, এই ভবসাগরে আমার তরী ডুবে যাচ্ছে, তার কারণ আমার ইন্দ্রিয়গুলো নিজের মত দৌড়াচ্ছে আর আমার মন দুর্বল, সেইজন্য আমার ভক্তি, শ্রদ্ধা সব হারিয়ে গেছে। এই অবস্থা থেকে বাঁচবার জন্য মায়ের কাছে কাতর ভাবে প্রার্থনা করা হচ্ছে।

এবার স্বামীজী এই গানকে অবলম্বন করে পুরো জিনিসটাকে ব্যাখ্যা করছেন, কিন্তু ব্যাখ্যাটা গানের পুরো বিপরীতে যাচ্ছে। সংসারে আমরা ডুবে যাচ্ছি এটা ঠিক, কিন্তু আমাদের ডোবাচ্ছেন না। সংসারের জ্বালা যন্ত্রণায় মানুষ অতীষ্ঠ, মানুষ এর থেকে বেরোবার জন্য মায়ের কাছে প্রার্থনা করে। আগেও আমরা আলোচনা করেছি যে, আমরা যে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি, ঠাকুর আমার এই হোক, সেই হোক, তিনি আমাদের সেই প্রার্থনা নাও পূরণ করতে পারেন; কিন্তু জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য যেটা স্বামীজী দক্ষিণেশ্বরে মা কালীর কাছে গিয়ে প্রার্থনা করেছিলেন, সেই প্রার্থনা করলে সে অবশ্যই পাবে। জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য এই চারটে জিনিস যে কোন মানুষ যদি ভগবানের কাছে আন্তরিক ভাবে প্রার্থনা করে সে অবশ্যই পাবে। অর্থ নাও পেতে পারে, সন্তান নাও পেতে পারে, কিন্তু জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য অন্তর থেকে প্রার্থনা করা হলে এগুলো অবশ্যই পাবে। আচার্য শঙ্করের মত অদ্বৈতবাদী তিনিও ভগবানকে পরিভাষিত করছেন, ভগবান কে? যিনি ভক্তদের কামনা পূর্ণ করেন। ভগবানের কাছে জাগতিক কোন কিছু প্রার্থনা করলে তিনি নাও পূরণ করতে পারেন, কিন্তু যদি কেউ বলে আমার জ্ঞান চাই, ভক্তি চাই, বিবেক চাই, বৈরাগ্য চাই তখন তিনি তা দেবেনই দেবেন। কেন দেবেন? তাতে সে ভগবানের কাছে যাবেন বলেই কে দেবেন? একেবারেই না। ভগবানের ভারি বয়ে গেছে তুমি তাঁর কাছে গেলে কি গেলে না, কারণ বিবেক বৈরাগ্য যদি নাও থাকে তাও সে ভগবানের কাছেই থাকবে। সে যদি নরকেও থাকে তাও সে ভগবানের কাছেই থাকবে। তিনি দেবেন কারণ, মানুষের যে স্বভাব, এটা হল আত্মা। আত্মার স্বভাবই হল সে সংসার থেকে আলাদা। বৈরাগ্যটা তাঁর স্বভাব, বিবেক, সংসারে লিপ্ত না হওয়াটা তাঁর স্বভাব, জ্ঞান আর ভক্তি তাঁর স্বভাব। স্বভাবের জন্য তাকে কোন চেষ্টা করতে হয় না। স্বভাবের উপর যেটা চাপানো আছে সেটাকে ফেলে দেওয়াটা সহজ, স্বভাবের বিপরীত যেটা সেটাকে আনতে কষ্ট হয়। সেইজন্য জগতে টাকা আয় করা কষ্ট, মনের মত মানুষ জোগার করা কষ্ট, মান সম্মান পাওয়াটা কষ্ট। কারণ ওগুলো আমাদের স্বভাব নয়। জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য আমাদের স্বভাব, সেইজন্য সহজে পাওয়া যাবে। মানুষ স্বভাবে আত্মা, আত্মার স্বভাবই হল নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত, তাই বিবেক, বৈরাগ্য, মুক্তি, এগুলোই মানুষের স্বভাব। তাকে বলা হচ্ছে তুমি স্বভাবের বিরুদ্ধে গিয়ে টাকা আয় কর, সুখের পিছনে ছোট, মান-সম্মান অর্জন কর, কামিনী-কাঞ্চনে লিপ্ত হও। কদাচিৎ কেউ পেয়ে যায়, তারপর একটা সময় দেখে হাত থেকে একদিন সব ছিটকে বেরিয়ে গেছে। আমরা চেষ্টা করেও ধরে রাখতে পারি না।

একজন বড় ক্রিকেটার, ক্রিকেট খেলতে নামলে ব্যাটে বলে রানের ফুলঝুড়ি ছড়িয়ে দেবে। কিন্তু তাকে যদি ফুটবল খেলতে নামিয়ে দেওয়া হয়, সে খেলে দেবে কিন্তু ক্রিকেটের মত স্বচ্ছন্দে খেলতে পারবে না। তার সাথে এমন একটা মন জুটেছে যে সব সময় বলে যাচ্ছে আমার এটা চাই, সেটা চাই। সংসারে যেমন কেউ থাকে, স্বামী বা স্ত্রী, সব সময় খিট খিট করে যাচ্ছে। বাংলায় একটা হাসির গল্প আছে, একজন লোক অফিসে যাওয়ার সময় খেতে বসেছে, একটা তরকারী মুখে দিয়েই মাকে চেঁচিয়ে বলছে, 'এটা কি রান্না হয়েছে, নুন

নেই, ঝাল নেই, ট্যালট্যালে পানসে ঝোল, এ কী খাওয়া যায়'। ভিতর থেকে তার গিন্নী বলছে, 'আজকে মা রান্না করেনি আমি করেছি'। তখন সে বলছে, 'খেতে খেতে ভালই লাগছে'। এই খিট খিটানির ভয়ে অনেকেই বাধ্য হয়ে করে। মনটাও সব সময় খিট খিট করে যাচ্ছে। বেচারী আত্মার মন ইন্দ্রিয়ের সাথে জড়িয়ে রেখেছে, সে চেষ্টা করছে। নিজের পুরো শক্তি লাগিয়ে দেয়, কিন্তু তার স্বভাবে নেই, কোথা থেকে করবে। সিংহ অনেক কিছুই করতে পারে কিন্তু গাছে চড়াটা ওর ধাতে নেই, পারেও না। আমরা এখন সিংহকে বলছি গাছে চড়তে, ওটা ওর স্বভাবে নেই, কি করে চড়বে!

সেইজন্য মায়ের কাছে প্রার্থনা করছে, মা! সংসারে আমি ডুবে যাচ্ছি, তুমি রক্ষা কর। রক্ষা তার হবেই হবে। কিন্তু যদি প্রার্থনা করে, মা আমার এত দেনা আছে, দেনার ভারে আমি ডুবে যাচ্ছি, তুমি রক্ষা কর। এতে রক্ষা হতেও পারে নাও হতে পারে। না হওয়ার সম্ভবনাই বেশি। এটা হল basic principle, এখানে ইমোশানের কিছু নেই। অত্যন্ত simple logic, আমরা বুঝি বা না বুঝি তাতে কিছু আসে যায় না। Logicটা হল, আমার যা স্বভাব সেই স্বভাবের বাইরে করতে গেলে পরিশ্রম অনেক, সাফল্য সামান্য। মানুষ রূপে আমরা আত্মা, আত্মা মানে স্বভাবেই আমরা বিবেক, বৈরাগ্য ও জ্ঞান, ভক্তির ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকারী। ঠাকুরের কাছে চাইলেই পাওয়া যাবে। কারণ ঠাকুরকে এগুলো দিতে হয়, এটাই আত্মার স্বভাব। আমাদের ভিতরে আজেবাজে যে সংস্কারগুলো রয়েছে, এগুলো আমরা কুড়িয়ে এনেছি। যেগুলো কুড়িয়ে আনা হয়েছে সেগুলো ফেলতে কতক্ষণ, কুড়াতে অনেক সময় লাগে, খাটনিও প্রচুর কিন্তু ফেলতে সময় লাগে না, খাটনিও তেমন কিছু লাগে না। সেইজন্য আধ্যাত্মিক হওয়াটা খুব কঠিন জিনিস নয়। ভক্তি পথে কঠিন জিনিস, কারণ সেখানে আমাদের অর্জন করতে হয়, বিবেক, বৈরাগ্য অর্জন করতে হয়, ফেলাটা সব সময় সহজ। মুশকিল হল, যে জিনিসগুলো এত কষ্ট করে অর্জন করা হয়েছে সেগুলোকে ফেলতে মায়া লাগে। J.R.R.Tolkeinএর নামকরা বই, The Lord of the rings, যেটা পরে সিনেমা হয়েছিল, তাতে যে নায়ক, তাকে বলা হয়েছে, যে রিং যেটা সব কটার মাস্টার সেটাকে ওখানেই গিয়ে ফেলতে হবে যেখানে তার সৃষ্টি। ঠিক যখন ফেলতে যাবে তখন সে আর ফেলতে চাইছে না। এত দিন ধরে আংটিটাকে নিজের কাছে রেখে দিয়েছে, তার মায়া জন্মে গেছে। শেষে যখন ফেলতে চাইছে না, তখন এমন অবস্থা হল যে তার আঙুলটাই কেটে ফেলতে হল। না কাটলে সে ছাড়বে না। ওই মায়া এমন ভাবে গ্রাস করে নেয় যে সে কিছুই ছাড়তে চায় না।

স্বামীজী বলছেন, 'Mother, Thy light stops not for the saint or the sinner, it animates the lover and the murderer'. (*মা, তোমার প্রকাশ যে-শুধু সাধুতেই আছে আর পাপীতে নেই, তা নয়; এ প্রকাশ প্রেমিকের ভিতরেও যেমন, হত্যাকারীর ভিতরেও তেমনি রয়েছে।*) মা, তোমার যে জ্ঞানের আলো, আধ্যাত্মিক আলো কখনই কারুর জন্য অন্তিম হয় না, যিনি মহাত্মা তাঁর জন্যও নয়, যে পাপী, দুরাত্মা তার জন্যও নয়। আমাদের প্রচলিত ধারণায় মহাত্মা ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে গেছে আর দুরাত্মা ঈশ্বরের থেকে দূরে চলে গেছে। ঈশ্বরের দিক থেকে দেখলে কিছুই না, মহাত্মাও তাঁর মধ্যে, দুরাত্মাও তাঁর মধ্যে। তফাৎ হল, মহাত্মা নিজেকে ঈশ্বরের আত্মা বলে জানেন, দুরাত্মা নিজের স্ত্রী, সন্তানকেই নিজের আত্মা বলে জানে। ফলে মহাত্মা ভগবানের প্রিয়, কারণ মহাত্মার চেতনা সেই অবস্থায় চলে গেছে যেখানে তিনি পুরোপুরি ভগবানের মধ্যেই বাস করেন। তিনি নিজেকে আত্মা ছাড়া বা ভগবানের ভক্ত ছাড়া কিছু দেখেন না। মানুষ সব সময় নিজের আত্মাকেই ভালবাসে। আমি আপনি যেটাতে নিজের আত্মাকে দেখি সেটাকেই আমরা ভালবাসি। কামী পুরুষ নিজের স্ত্রীকে, নিজের প্রেয়সীকে আত্মা মনে করে তাই ভালবাসে। যে কৃপণ সে টাকা-পয়সাকে আত্মা মনে করে তাই সে টাকা-পয়সাকে এত ভালবাসে, ছাড়তে চায় না। অনেকে নামযশকে নিজের আত্মা মনে করে, নামযশ চলে গেলে আমি কিছুই না। ইদানিং ভারতবর্ষে কত আত্মহত্যার ঘটনা ঘটছে। কারণ তাদের কাছে আমি বলতে টাকা-পয়সা, আমি বলতে মান-সম্মান, নেই তাই আত্মহত্যা করে নাও। অথচ আমরা নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা। এরপর বলছেন, Mother is manifesting through all. (*মা সকলের মধ্য দিয়েই আপনাকে অভিব্যক্ত করছেন।*) জগতে যা কিছু আছে সব কিছু মায়েরই প্রকাশ। তন্ত্র মতে পঞ্চ মকারের মত অনেক রকম উপাচার আছে ঠিকই কিন্তু সেখানেও এটাই খুব জোর দিয়ে বলছে জগতের সব কিছু মায়েরই প্রকাশ। ঠাকুরকে মথুরবাবু কলকাতায় গণিকাদের বাড়িতে নিয়ে গেলেন, ঠাকুর তাদের মধ্যেও সেই জগন্মাতাকেই দেখছেন, তিনি মা মা বলতে বলতে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। ভাল মন্দ সবটাই ভগবতী।

এই কথা বলার পর স্বামীজী উপনিষদের খুব নামকরা কথা নিয়ে আসছেন, The light is not polluted by what it shines on, nor benefited by it. (*অশুচি বস্তুর উপর পড়লেও আলোক অশুচি হয় ন, আবার শুচি বস্তুর উপর পড়লেও তার গুণ বাড়ে না।*) আলোর কিরণ ভালতেও পড়ে মন্দতেও পড়ে, তাতে আলোর কিছু হয় না, শুচিতে পড়লে আলোর গুণের বৃদ্ধি হয় না আর অশুচি কিছুতে পড়লে আলো কোন ভাবেই দূষিত হয় না। শুদ্ধ জায়গাতে থাকলেও ভাল, অশুদ্ধ জায়গাতে থাকলেও ভাল। কারণ, The light is ever pure, আলো সব সময় শুদ্ধ, ever changeless, আলোর কোন কিছুরই কোন পরিবর্তন হয় না। আলো আলোই, ভাল কাঁচ দিয়ে এলেও আলো, মন্দ কাঁচ দিয়ে এলেও আলো, শুচিতে পড়লেও আলো, অশুচিতে পড়লেও আলো।

স্বামীজী বলছেন, Behind every creature is the 'Mother', pure, lovely, never changing. (*সকল প্রাণীর পিছনের সেই 'সৌম্যাৎ সৌম্যতর', নিত্যশুদ্ধস্বভাবা, সদা অপরিণামিনী মা রয়েছেন।*) আলোর যেমন পরিবর্তন হয় না, ঠিক তেমনি এই জগতে যা কিছু আছে, মহাত্মা, দুরাত্মা, ছোট, বড়, এ্যমিবা, ব্যাক্টেরিয়া, যা কিছু আছে, সব কিছুতে মায়ের সেই দিব্য শক্তির প্রকাশ, এই প্রকাশ কখনই পাল্টায় না। আমরা যখন দেখি তখন দেখছি কোনটার মধ্যে আলোর বেশি প্রকাশ, কোনটাতে কম প্রকাশ। লণ্ঠনের কাঁচের বাইরে দিয়ে অনেকগুলো আবরণ দেওয়া আছে। আবরণগুলো যেমন যেমন সরিয়ে ফেলা হয় তেমন তেমন আলোর প্রকাশ বাড়তে থাকে। আলো কি করে বাড়বে, আলো যা ছিল তাই আছে, শুধু আবরণ গুলো সরে যাচ্ছে, আলো একই আছে। সন্ত মহাত্মার মধ্যে মায়ের যে উপস্থিতি, একটা ক্রিমির মধ্যেও মায়ের সেই একই উপস্থিতি।

স্বামীজী ওই লাইনটাকে নিয়ে এসে বলছেন, She is equally in suffering, hunger, pleasure, sublimity. (*তিনি দুঃখকষ্ট, ক্ষুধাতৃষ্ণার মধ্যেও রয়েছেন, আবার সুখের ভিতর, মহান্ ভাবের ভিতরও রয়েছেন।*) যেখানে দুঃখ-কষ্ট সেখানে মা-য়ই আছেন, যেখানে ক্ষুধা সেখানে তিনিই আছেন, যেখানে সুখের প্রাচুর্য সেখানেও তিনি আছেন, যেখানে শান্ত ভাব সেখানেও তিনি। গীতার সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান বলছেন, যত রকমের কাম হতে পারে তার মধ্যে প্রজনন আমি, sex desire কামের মধ্যে সর্বোচ্চ, এরপরে আর কিছু হয় না, ওটা আমি নিজে। এই ভাব অন্যান্য ধর্মের পক্ষে গ্রহণ করা শুধু কঠিনই নয়, অসম্ভব।

নীরোদ চৌধুরী, সারাটা জীবন বিদেশে বসে ভারতকে, বিশেষ করে হিন্দু ধর্ম আর তার শাস্ত্রগুলিকে শুধু গালাগাল দিয়ে গেলেন। উপনিষদের উপর কিছু নির্বাচিত অংশ নিয়ে অনেক কিছু লিখলেন, তাতে তিনি উপনিষদের উপর সাধারণ মানুষের যে প্রচলিত ধারণা সেগুলোকে নিয়ে লিখলেন, দেখাতে চাইলেন উপনিষদ কোন উচ্চমানের জিনিস নয়, এই দেখুন তাতে এই জিনিসগুলো আছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যে sex related জিনিসগুলো আছে সেগুলোকে তিনি উল্লেখ করছেন। অল্প বয়সে এসব লেখা পড়লে সন্ন্যাসীদেরও মাথাটা বিগড়ে গিয়ে মন খারাপ হয়ে যাবে। বয়স বাড়ার পর আরও পড়াশোনা করার পর এবং বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের সাথে সাথে উচ্চমানের সাধুদের সঙ্গ করার পর তাদের ভুলটা ভাঙে। তখন নিরোদ চৌধুরীর নামটা শুনলে লজ্জা হয়।

সাধুদের নিজেদের মধ্যে মজা করে অনেক কথা বলা হয়, যেমন গীতাকে নিয়ে বলবেন, স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণে বলছেন, *প্রজহাতি যদা কামান্*, এই দেখো গীতায় বলছে কত বড় যুদ্ধ হয়েছিল, প্রজা ছিল অর্থাৎ পদাতিক ছিল, হাতি ছিল, কামান ছিল, এই সব নিয়ে যুদ্ধ হয়েছে। আরও আছে *ন চাভবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্*, যে চা পান করে তার কোন চিন্তা ভাবনা থাকে না, যে চা খায় তার কখন অশান্তি হয় না। এগুলো নিজেদের মধ্যে মজা করে বলা যেতে পারে। কিন্তু প্রবচনে বা প্রবন্ধে যদি কেউ এই রকম আবোলতাবোল কথা বলে বা লেখে তাহলে বুঝতে হবে চিন্তনের স্তরে সে অনেক নীচে পড়ে আছে। একজন একটা প্রবন্ধ লিখে দেখাচ্ছেন গীতাতে, উপনিষদে কিভাবে মায়ের স্তুতি করা হয়েছে, যেমন বলছেন, *ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ*, সংস্কৃতে 'মা' মানে 'না', অর্জুনকে ভগবান ক্লীব ভাব ধারণ করতে নিষেধ করছেন, কিন্তু প্রবন্ধাকার দেখাচ্ছেন, এই দেখুন এখানেও মায়ের স্তুতি আছে। সেটাও আবার একটা বাংলা পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল।

ঈশোপনিষদে বলছেন *মা গৃধঃ কস্য সিদ্ধনম্*, তিনি লিখছেন এখানেও মায়ের স্তুতি করা হয়েছে। তার সাথে দেখা হতে সবাই তাকে বলছেন, 'এগুলো আপনি কি লিখেছেন'? তিনি বলছেন, 'ভাই, তোমরা পুরনো ব্যাখ্যা নিয়ে কত দিন থাকবে, তোমরাও নূতন কিছু ব্যাখ্যা দাও'।

উপনিষদ বলছেন, যদি তুমি ভাল সন্তান চাও তাহলে প্রজনন ক্রিয়ার সময় এই পদ্ধতি অবলম্বন কর। সেখানে নীরোদ চৌধুরী সেক্স নিয়ে এলেন। গীতায় ভগবান বলছেন, কামের মধ্যে আমি প্রজনন, এটাকেই বলছেন, ভগবান নিজেকে সেক্সের মধ্যে নিয়ে গেছেন। ভগবান কোথায় এই কথা বলছেন? ভগবান তা বলছেন না। কথামৃতে এক জায়গায় ঠাকুর বলছেন, তোমাদের আমি অত্যন্ত গুহ্য কথা বলছি কাউকে বলতে যেও না, কুকুর কুকুরীর মৈথুনের মধ্যে আমি দেখলাম সেই ব্রহ্মজ্যোতি লক্ লক্ করছেন। এসব কথা কাকে বোঝান যাবে? এই কথা বোঝার কারুর দম আছে! এরাই আবার হিন্দু ধর্মের নিন্দা করে। গীতাতে এই একই কথা বলছেন, উপনিষদে একই কথা বলছেন, ঠাকুরও একই কথা বলছেন, স্বামীজীও একই কথা বলছেন। তোমাদের ধর্মে নেই, না থাকারই কথা, কারণ তোমাদের পরম্পরাতে এই জিনিস নেই।

একজন বিজ্ঞানী দিয়ে বিজ্ঞান হয় না। বিজ্ঞানকে দাঁড় করাবার জন্য প্রচুর বিজ্ঞানীর দরকার। ঠিক তেমনি ধর্মও একজনকে দিয়ে হয় না, ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মুনি-ঋষিদের মত অনেক ধর্মপ্রাণ মানুষ লাগে। স্বামীজী এদের প্রাচীন অবধারণা গুলোকে ভাঙছেন। শ্রীশ্রীচণ্ডীর চতুর্থ অধ্যায়ে পরিষ্কার দেখাচ্ছেন, সুকৃতিটাও মা, দুষ্কৃতিটাও মা, ভালটাও তিনি মন্দটাও তিনি। বাংলায় কালীপূজার সময় অনেক জায়গায় লক্ষ্মী পূজাও হয়। পূজার দিন সন্ধ্যাবেলায় শণ, পাট সব জড়ো করে উনুনে জ্বালায়, পরে সেই আলো বাইরে অন্ধকারে এনে বলতে থাকে অলক্ষ্মী এই আলোতে তোমাকে পথ দেখিয়ে দিচ্ছি, তুমি এবার বিদায় হও আর মা লক্ষ্মীকে বলে, মা এই আলোকে অনুসরণ করে তুমি আমার ঘরের ভিতর এসো। লক্ষ্মীও মা, অলক্ষ্মীও মা, অন্ধকারে আলো জ্বালিয়ে অলক্ষ্মী রূপিণী মাকে বিদায় দিচ্ছে আর আলো দেখিয়ে বলছেন, হে লক্ষ্মী রূপিণী মা তুমি কৃপা করে ভিতরে এসো। যদি গৃহে অলক্ষ্মী থাকে? থাকার হলে থাকবে, আমাদের কিছু করার নেই। এখানে দর্শনটা কি দেখার, মা তুমি অলক্ষ্মী রূপেও আছ, কিন্তু আমার এই রূপ লাগবে না। গীতার একাদশ অধ্যায়ে ভগবান যখন অর্জুনকে তাঁর বিশ্বরূপ দেখাচ্ছেন তখন বলছেন, *কালোহস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো*, এই দেখো, এই জগৎকে নাশ করার জন্য আমি এই বিশাল রূপ ধারণ করেছি। অর্জুনও ঘাবড়ে গিয়ে বলছেন, প্রভু আমি আপনার এই রূপ দেখতে চাই না, আপনার সেই শান্ত সৌম্য রূপে আমার সামনে বিরাজ করুন। ভগবান তখন তাঁর ওই রূপ সংবরণ করলেন। আমরাও তাই বলি, হে মা, আমি তোমার এই অধর্ম রূপ চাইছি না।

ভোগ সর্পের মত, ঠাকুর বলছেন, সাপকে বলতে হয় সাপ তোমার মুণ্ডু দেখিও না, তোমার লেজ দেখাও, অর্থাৎ বলতে চাইছেন, তুমি আমার সামনে থেকে বেরিয়ে যাও। ভোগকে সেই ভাবেই বলতে হয়, সন্ন্যাসীরাই বলেন। কারণ সন্ন্যাসীদের কাছে ভোগ হল সাপের মত। স্বামীজী এসব কথা বলছেন না, এগুলো এখানকার মত। বিদেশীদের কাছে এই ধরণের মত হজম করা খুব কঠিন। স্বামীজী বলছেন, মধুকর যখন পুষ্পরস পান করে, তখন তা প্রভুই পান করছেন। ফিলোকালিয়া নামে খ্রীশ্চানদের খুব নামকরা বই আছে যেটা রাশিয়ানদের চার্চে খুব প্রসিদ্ধ। সেখানে ওনারা অন্য ভাবে দেখান, ঈশ্বরই সব করাচ্ছেন এই রূপে দেখানো হয়েছে। কিন্তু এখানে তা নয়, এখানে ঈশ্বরই সব করছেন। স্বামীজী তখন বলছেন, Knowing that the Lord is everywhere, the sages give up praising and blaming. (*ঈশ্বরই সর্বত্র রয়েছেন জেনে জ্ঞানী ব্যক্তিরা নিন্দা-স্তুতি দুই-ই ছেড়ে দেন।*) নিন্দা স্তুতি সব তখনই ত্যাগ হবে যখন জানবে সব তিনিই করছেন। আমি যখন কারুর উপর রেগে যাচ্ছি তখন আমি জানি সে সে আর আমি আমি। আমি যখন কাউকে ভালবাসছি, আমি জানি আমি আমি, ও ও। কিন্তু যিনি জানেন আমার সামনের লোকটি সাক্ষাৎ ঠাকুর, তখন তিনি কি কারুর সাথে ঝগড়া করতে পারবেন! এই ভাবকে মহাভারতে একটা লম্বা কাহিনীর মাধ্যমে মহান করে দেওয়া হয়েছে। অর্জুন তখন বনবাসে আছেন, শিবের কাছ থেকে তিনি পাশুপত অস্ত্র পাওয়ার জন্য জঙ্গলে তপস্যা করছেন। সেখানে কীরাত এসেছে। শিকার করা একটা জন্তুর অধিকার নিয়ে দুজনের তর্কাতর্কি থেকে লড়াই শুরু হয়েছে। লড়াইয়ে অর্জুন কিছুতেই যখন পেরে উঠছেন না, তখন তিনি তাড়াতাড়ি করে একটা শিব মুর্তি গড়ে তাতে ফুলের মালা দিলেন। দেখছেন সেই মালা কীরাতের গলায় শোভা পাচ্ছে। অর্জুন সঙ্গে

সঙ্গে বুঝে গেলেন স্বয়ং শিবই এই কীরাত। মুখে যতই বলা হোক অপরের নিন্দা করো না, যদি কারুর সম্বন্ধে কিছু বলতেই হয় সব সময় ভালটাই বলবে, কিন্তু আমরা পারি না। যিনি মহাত্মা, যিনি সমদর্শি হয়ে গেছেন, তিনি দেখছেন ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই, তিনিই একমাত্র নিন্দা-স্তুতির পারে চলে যেতে পারেন। যিনি দেখেন মা সব কিছুর মধ্যেই বিরাজ করছেন, সতী স্ত্রীও যেমন মায়েরই রূপ, আর যে অসতী, গণিকা সেটাও মায়েরই রূপ, তিনি কার নিন্দা করবেন আর কারই বা স্তুতি করবেন।

ওই অবস্থা থেকে মন যখন নীচে নেমে দ্বৈত জগতে অবস্থান করে তখন মানুষ অন্য রকম ভাবে। সেইজন্য স্বামীজী বলছেন, Know that nothing can hurt you. How? Are you not free? Are you not Atman? (*জেনে রাখো যে, কিছুতেই তোমার কোন অনিষ্ট করতে পারে না। কি করে করবে? তুমি কি মুক্ত নও? তুমি কি আত্মা নও।*) ঈশ্বর ছাড়া তো কিছু নেই, কে তোমার ক্ষতি করবে, ঈশ্বর কেন তোমার ক্ষতি করতে যাবেন! আমাদের সমস্যা হল আমরা মনে করি সে অমুক, আমি তমুক, ও অন্য কেউ, সবাইকে আমরা আলাদা আলাদা ব্যক্তি সত্তা রূপে দেখছি। কিন্তু আত্মাই আছেন, আমি সেই আত্মা, সেও সেই আত্মা, আমরা তো সবাই মুক্ত। স্বামীজী বলছেন, He is the life of our lives, the hearing or ears, the sight of our eyes. (*তিনি আমাদের প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র-স্বরূপ।*) কেনোপষিদ থেকে স্বামীজী বলছেন, *শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্ বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ। চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি।।* আমি শুদ্ধ আত্মা, আমি নিত্য, আমি বুদ্ধ, আমি মুক্ত, আমাকে কে ক্ষতি করতে পারবে? কয়েকটা জিনিসকে আমরা নিজের করে নিয়েছি, এই শরীরকে আমি নিজের মনে করছি, মনকে নিজে মনে করছি, কিন্তু আমার আসল আমি যেটা তার কে ক্ষতি করতে পারবে! ভগবান কারুর ক্ষতি করতে কেন যাবেন? কারণ আমি আর তিনি এক। সেই ভগবান মানুষ রূপে আছেন, যদি তাঁকে মানুষ রূপে দেখা হয়, মানুষের কোন ক্ষমতা আছে যে সে আমার ক্ষতি করবে! কারণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমি সর্বত্র ছড়িয়ে আছি। মানুষ রূপে তাঁরা আমাকে ছুঁতে পারবে না, ঈশ্বর রূপে তিনি আমার ক্ষতি করবেন না। আমরা মিছিমিছি কেঁদে বেড়াচ্ছি, ভয়ে কুঁকড়ে আছি; এগুলো কিছু না, যেটা বলা হল এটাই বাস্তব। যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হচ্ছে তিনি নির্বিকার, তাঁর কাছে কিছুই না।

অশান্তির মূল কারণ

এরপর স্বামীজী এই কথা বলে সেদিনের ক্লাশ শেষ করছেন, We go through the world like a man pursued by a policeman and see the barest glimpses of the beauty of it. (*আমরা সংসারের মধ্য দিয়ে চলেছি, যেন পাহারাওয়ালা আমাদের ধরবার জন্য পিছু ছুটছে – তাই আমরা জগতের যা সৌন্দর্য, তার শুধু ঈষৎ আভাসমাত্রই দেখে থাকি।*) একজন চোর চুরি করে পালাচ্ছে, পিছনে পুলিশ তাকে তাড়া করছে, রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় ভাল ভাল দৃশ্য আসছে কিন্তু সেগুলোকে সে কতটুকু আর দেখবে, হয়ত এক সেকেণ্ডের জন্য কোন রকমে দেখেই আবার দৌড়াচ্ছে। আমাদেরও এই রকমই জীবন, আমরা সবাই দৌড়াচ্ছি। কেন দৌড়াচ্ছি? ভয় আমাদের তাড়া করছে। একটু দেরী হলে ওকে মিস করব, একটু দেরী হলে এত টাকা হাত থেকে চলে যাবে, এমন তাড়া করছে যে ওই তাড়ার মধ্যে আমরা কতটুকুই বা ভোগ করব, শহরের রোশনাই কি দেখব! খুব সহজ উপমা হল, গ্যাসের ওভেনে দুধ বসিয়ে বাজি পোড়ান দেখছি, গ্যাসের দুধে মন পড়ে থাকলে কি আর বাজি পোড়ার মজা পাওয়া যাবে! জপ করতে বসেছি, ধ্যান করতে বসেছি কিন্তু গ্যাসের ওভেনে দুধ চাপানো। কোথায় মন থাকবে? মাঝখান থেকে আমাদের কোনটাই ঠিকঠাক হয় না। এটাই আমাদের সমস্যা। ওই যে ভয় তাড়া করছে, ওটা নিজেকেই বন্ধ করতে হবে, গ্যাসের ওভেন আমাকেই বন্ধ করতে হবে। এই কারণেই এই জগতের সৌন্দর্য, ঈশ্বর যে জগৎ জুড়ে বিরাজমান, এই ভাব আমাদের মনে আসতেই চায় না।

এই অশান্তির মূলে একটাই কারণ, All this fear that pursues us comes from believing in matter. Matter gets its whole existence from the presence of mind behind it. What we see is God percolating through nature. (*এই যে আমাদের এত ভয়, ওটা জড়কে সত্য বলে বিশ্বাস করা থেকে এসেছে। পিছনে মন রয়েছে বলেই জড়তার সত্তা লাভ করে আমরা জগৎ বলে*

যা দেখছি, তা প্রকৃতির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত ঈশ্বরই।) আমরা জড় পদার্থকে সত্য বলে মনে করছি। জড়কে সত্য মনে করার জন্য আমার শরীর সত্য, পেট সত্য, খাবার-দাবার সত্য, সেইজন্য আমাদের দশ রকম আয়োজন দরকার, দামী দামী রেস্তোরাঁয় যেতে হবে। দামী রেস্তোরাঁয় যেতে হলে অনেক টাকা লাগবে, সেই টাকা অর্জন করতে হবে, টাকা অর্জন করার জন্য এদিক সেদিক দৌড়াদৌড়ি করতে হবে। আমরাই সমস্যাকে ডেকে আনছি, ছাড়াটা আমার হাতে, আমি যদি বলে দিই আমার ওসব কিছু লাগবে না, আমার ঝোলভাত হলেই হয়ে যাবে। এবার দেখুন রাতারাতি সমস্যা কমে যাবে, টাকার গরজ কমে যাবে, সময় সাশ্রয় হবে। কিন্তু আমরা করব না, কারণ আমাদের কাছে এই জড় জগৎটাই সত্য। তার সাথে মনে করছি, আমার এই একটাই জীবন, চোখ বুজলেই সব শেষ, যতদিন বাঁচি ততদিন লুটেপুটে খেয়ে নাও। এরপর চোখ দিয়ে যখন জল বেরোবে তখন দেখবে চোখের জল মোছার জন্য তোমার পাশে কেউ নেই।

কেন আমরা জড়কে ভালবাসি? কারণ এই জড়ের পুরো অস্তিত্ব রয়েছে, এর পিছনে রয়েছে সমষ্টি মন। জড় মানেই প্রকৃতি, প্রকৃতির মধ্যেই মন রয়েছে, ইন্দ্রিয় রয়েছে, আর সব কিছুর মধ্যে ঈশ্বর প্রকাশমান, ঈশ্বর আছেন বলেই সব কিছু তার অস্তিত্ব জাহির করছে। জড় যে ঈশ্বরের বাইরে তা না। জড়ের মধ্যেও ঈশ্বরের প্রকাশ, এই যে মন এতেও ঈশ্বরের প্রকাশ, আমাদের মধ্যে যে শুদ্ধ আত্মা তিনিই সাক্ষাৎ ঈশ্বর। আমি বলতে আমি নিজেকে যেটা ভাবছি সেটা চেতনা। এবার আমাকেই ঠিক করতে হবে, আমি কি জড়কে ভালবাসতে যাব, নাকি আমি আমার চেতনার স্বরূপে অবস্থিত থাকতে চাইব। জড়কে ভালবাসলে শুধু চোখের জলই বেরোবে, ঈশ্বরকে ভালবাসতে গেলে তখনও চোখের জল বেরোবে, কিন্তু অন্য রকমের জল বেরোবে। আমাকেই ঠিক করতে হবে আমি কি চাই। পাশ্চাত্যে যত ধর্ম আছে তাতে ঈশ্বর আলাদা, জড় আলাদা, জগৎ আলাদা, কার্টিশান ডিভাইডের মত, ঈশ্বর একদিকে জগৎ একদিকে। আমাদের এখানে তা নেই, এখানে বলছেন, সেই জগতের মধ্যে ঈশ্বর প্রকাশমান, ঈশ্বরের জন্যই জগতের অস্তিত্ব। কিন্তু সেটা ঈশ্বর নয়, ঈশ্বর সেখানে প্রকাশিত। তুমি কোনটা চাও? তুমি কি জড়কে অর্থাৎ এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎকে ভালবেসে তার পিছনে ছুটে বেড়াতে চাও, নাকি তোমার চৈতন্য সত্তায়, যেটা তোমার আসল স্বরূপ, তাতে প্রতিষ্ঠিত হতে চাও?

<u>রবিবার, ২৩শে জুন</u>

১৯শে জুনের পর স্বামীজী আবার ২৩শে জুনের ক্লাশে অন্য প্রসঙ্গে বলছেন। ২৩শে জুন রবিবার ছিল। স্বামীজী সকালে দু ঘন্টার মত ক্লাশ নিতেন। শিষ্যদের বর্ণনায় পাওয়া যায়, স্বামীজীর মস্তিষ্কে এত উচ্চ চিন্তনের প্রবাহ চলত যে তিনি শান্তিতে কোথাও স্থির হয়ে বসে থাকতে পারতেন না। এমনিতেও মাথায় অনেক চিন্তা-ভাবনা থাকলে মানুষ এক জায়গায় স্থির হয়ে বসতে পারে না। দু ঘন্টায় স্বামীজী অনেক কথাই বলতেন, কিন্তু মিস্ ওয়াল্ডোর পক্ষে সব কথা মনে রাখা সম্ভব ছিল না, যতটুকু তিনি নিজের স্মৃতিতে ধরে রাখতে পেরেছিলেন সেটুকুই তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ঠিক কি বলেছেন আমরা জানি না, ব্যাসদেব যেভাবে উপস্থাপিত করে দিয়েছেন ওই ভাবেই গীতা আমাদের কাছে এসেছে।

নিষ্ঠা, ভক্তি ও বিশ্বাস

এদিন স্বামীজী প্রথমে ইষ্টের প্রতি নিষ্ঠা, সাধনা কিভাবে হয় এই নিয়ে বলছেন। ঠাকুরের যাঁরা ভক্ত তাঁদের কাছে কথাগুলো নূতন কিছু মনে হবে না। রামকৃষ্ণ পরম্পরায় সব সময় বলা হয়, যত তীর্থাদিতে যাবে সেখানে সমস্ত দেবী দেবতাদের এই ভাবে মানবে যে সবই ঠাকুরের বিভিন্ন রূপ, সবারই প্রতি শ্রদ্ধা রাখবে, সবাইকেই মানবে। কিন্তু তোমাকে যে মন্ত্র দেওয়া হয়েছে, যেভাবে জপ ধ্যান করতে বলা হয়েছে, সেই ভাবেই তোমাকে সাধনা করে যেতে হবে। একটু ভিতরে দিকে গেলে দেখা যাবে একটা ভাব সর্বত্র বিরাজ করে, তা ভারতবর্ষে তো বটেই এমনকি বিদেশেও, আমি যে পথে আছি সেই পথই ঠিক, সেই পথের বাইরে যেন আর কিছু নেই। সবাই নিজের ধর্মকে বিরাট মনে করে তার সাথে অপরের ধর্মকে নিন্দা করাটা যেন স্বাভাবিক হয়ে গেছে। কোন একটা ধর্ম তা করে না, সব ধর্মের লোকেরাই করে, হিন্দুরাও করে মুসলমানরাও করে, খ্রীশ্চানরাও করে। অপরের ধর্মের কিছু না কিছু একটা দোষ বার করবে আর সেটাকে নিয়ে দেখাবে তার নিজের ধর্মটাই ঠিক, অপরের ধর্ম ঠিক নয়। হিন্দু ধর্মে আবার বিভিন্ন পথের কথা বলা আছে, সেখানেও যিনি

যে পথ নিয়েছেন তিনি মনে করেন এটাই ঠিক পথ। মাঝখানে কিছু দিন ধরে কিছু মহারাজ একটা শব্দ ব্যবহার করতেন, রামকৃষ্ণ মিশন একটা sectless sect। তার মানে আমার একটা sect কিন্তু sectless sect। বলা হয় যে, যারা সহিষ্ণু হন, সবাইকে মেনে চলেন, তারাই সবচেয়ে বেশি অসহিষ্ণু হন, খুব নামকরা কথা। যারা তথাকথিক ক্যাথলিক, যারা খুব open, ওটাই তাদের কাছে হয়ে যায় যে, আমরা তোমাদের থেকে বেশি খোলামেলা, তোমরা হলে মৌলবাদী, তোমরা সঙ্কীর্ণ, তোমরা এই, তোমরা সেই, এই সব বলে গালাগাল দিতে থাকবে। মানুষের পক্ষে হৃদয়কে উন্মুক্ত করা সম্ভব হয় না, এটাই বাস্তব। ধর্ম পথে তো একেবারেই না। Socio political systemগুলিতে দেখা যায়, যেমন communism, এরা বলছে আমরা সবাইকে নিয়ে চলব, কিন্তু যারা ওদের মানবে না তাদের সবাইকে মেরে উড়িয়ে দেবে। Inclusive হওয়া খুব কঠিন জিনিস, সবাইকে নিয়ে চলা, সবারই মতকে মেনে চলা আর সবারই মত আমারই মতের একটা রূপ মনে করাটা একেবারেই অসম্ভব। এটা হিন্দুদের মধ্যেই পাওয়া যায় না, অন্যদের কথা ছেড়ে দিন। এখানে স্বামীজী যাঁদের কাছে বলছেন, তাঁদের অনেকরই প্রস্তুতি হয়ে গেছে, অনেকে আবার গোঁড়া খ্রীশ্চান, যাঁদের কাছে খ্রীশ্চানিটির বাইরে অন্য কোন মতকে গ্রহণ করা তেমন কিছু নয়, কারণ স্বামীজীর কাছে এসেছেন মানেই হল কিছুটা তাঁরা খুলেছেন।

স্বামীজী তাঁদের বোঝাচ্ছেন ঈশ্বর অনন্ত, অনন্ত মানেই হল তাঁর অনন্ত রূপ আর তাঁকে পাওয়ার অনন্ত পথ। কার মন কোন পথের জন্য উপযুক্ত অবতার ছাড়া কেউ বলতে পারবেন না। অবতারদের মধ্যেও আগেকার দিনের শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণের সেই রকম বর্ণনা আমাদের কাছে নেই, ভগবান বুদ্ধের ব্যাপারে আমরা জানি তিনি পরিষ্কার যে চত্বারি সত্যাদি বলে দিলেন সেখানেই শেষ। অন্য দিকে যীশু, মহম্মদ এনাদের একেবারে পরিষ্কার – এই এই পথ। সেখান থেকে আরও পরের দিকে এসে আমরা চৈতন্য মহাপ্রভুকে পাই, তিনি আবার কীর্তন ভজন ছাড়া বেশি কিছু বললেন না। যদিও তিনি অদ্বৈত পরম্পরাতে বড় হয়েছেন, কিন্তু তিনি বললেন এটাই পথ। শরৎ মহারাজ ঠাকুরের জীবনী লীলাপ্রসঙ্গে একেবারে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লিখেছেন, সেখানে তিনি বর্ণনা করছেন, কেউ যখন ঠাকুরের কাছে আসছেন ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে দেখে বুঝে যাচ্ছেন, এর এই মানসিকতা, তাঁকে ঠাকুর তাঁর ভাব অনুযায়ী সেই ভাবে শিক্ষা বা মন্ত্র দিচ্ছেন। কাউকে শ্রীরামের ভাবে শিক্ষা দিচ্ছেন, কাউকে শক্তি মতে নিয়ে যাচ্ছেন আবার কাউকে বেদান্ত মতে শিক্ষা দিচ্ছেন। অবতাররা কিভাবে নিজের শিষ্যদের ট্রেনিং দেন আমরা পুরোপুরি জানি না। কিন্তু ঠাকুরের ক্ষেত্রে আমরা জানি। তবে হাজার কথার একটি কথা হল, ঈশ্বর যদি অনন্ত হন আর এই জগৎ, এই মন যদি একটা ছোট্ট জিনিস হয়, এখান থেকে যখন উঠবে তখন স্বাভাবিক ভাবে রাস্তা বাড়তে শুরু হয়ে যাবে। একটা inverted কোণ, নীচে রয়েছে পয়েন্ট, ওই পয়েন্ট থেকে দুটো রেখা উপরের দিকে ধীরে ধীরে অনন্তের দিকে এগোচ্ছে, বড় হচ্ছে। এবার যদি নীচের দিকে চলতে শুরু করে তখন সবাই দেখে হ্যাঁ ঐ জগৎ, মন ওর মধ্যেই আছে। কিন্তু উপরের দিকে যত যাচ্ছে তত বিস্তার হচ্ছে। আমরা জগতে যেখানে আছি এটা একটা ছোট্ট পয়েন্ট, এখান থেকে ধীরে ধীরে যদি সাধনার মাধ্যমে সিদ্ধির দিকে এগোতে শুরু করে তখন পথ অনন্ত হয়ে যাবে। কিন্তু তিনি যে পথ নিয়েছেন, যে পথে তিনি যাচ্ছেন তিনি বুঝতে পারবেন না, কিন্তু দেখছেন এটাই পথ। কিন্তু শেষমেশ যদি উপরে চলে যান তাহলে তিনি দেখবেন, আরে সব পথ তো এখানেই আসছে। এর খুব স্থূল উপমা হল, আমি দিল্লী যাচ্ছি, আমার ট্রেন হাওড়া থেকে ছাড়ল, বর্ধমানে গিয়ে দেখলাম একট লাইন আমার লাইন থেকে সরে আলাদা হয়ে অন্য দিকে চলে গেল। এরপর আরেকটু এগিয়ে আসানসোল থেকে ট্রেনটা বাঁ দিকে চলে গেল, মোগলসরাই এসে আবার অন্য দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু সব ট্রেনই ঘুরে ঘুরে হয়ত দিল্লী গিয়ে পৌঁছাচ্ছে।

উপমা দিয়ে কখনই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না, সত্যকে বোঝানর জন্য উপমা দেওয়া হয়। এটাও একটা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উপমা নেওয়া হল। স্বামীজী সেই সত্যটা কি বলছেন, নিষ্ঠা যদি কারুর থাকে আর সেই নিষ্ঠা নিয়ে একটা পথকে অবলম্বন করে যদি এগোতে শুরু করে, শেষে গিয়ে দেখবে তিনিই আছেন। তখন সে দেখতে পাবে সব পথ একই জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে। হিন্দুদের মতে সাধনা আর সিদ্ধির কোন তফাৎ নেই, সাধনা যা সিদ্ধিও তাই। যে জিনিসটা আমাকে পেতে হবে সেই জিনিসটা আমাকে এখন থেকেই করতে হবে। আধ্যাত্মিক জীবনে আমি কি পেতে চাই? যাঁরা দীক্ষা নিচ্ছেন, দু বেলা জপ করছেন, ধ্যান

করছেন, শাস্ত্রের কথা শুনছেন, তাঁদের কাউকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, 'এসব করে আপনি আসলে কি পেতে চাইছেন'? 'ঠাকুরের দর্শন পেতে চাইছি'। 'বেলুড় মঠে ঠাকুরের বিগ্রহ আছে, গিয়ে দেখে আসুন, ঘরে ঘরে ঠাকুরের ছবি আছে, ঠাকুরের দর্শন তো হয়েই গেল। শ্রীশ্রীমা তো বলেই দিয়েছেন ছায়া কায়া সমান, বেলুড় মঠে গর্ভমন্দিরে ঠাকুরের বিগ্রহ দেখলাম, ছায়া-কায় সমান, ঠাকুরের দর্শন তো হয়ে গেল। আর কিসের জন্য সাধনা'? আসলে ঠাকুরের দর্শন তা নয়, শাস্ত্র অধ্যয়ন করলে বোঝা যায়, সমস্ত জীব-জগৎ যা কিছু আছে সব তিনিই হয়েছেন। এই ভাব একটু ধারণা হলে আধ্যাত্মিকতা এবার একটু রূপ ধারণ করল, এবার ঠিক ঠিক ধর্মের পথে এগোন শুরু হল।

একজন খ্রীশ্চানের কাছে জীবনের উদ্দেশ্য হল মৃত্যুর পর স্বর্গে যাওয়া, ইহজগতে তার সাধনা ও সিদ্ধি দুটো আলাদা জিনিস হয়ে গেল। ভাল কাজ করবে, সেই ভাল কাজের জন্য একটা ফল পাবে। হিন্দুদের কাছে, ঠিক ঠিক বেদান্তে সাধনা আর সিদ্ধি এক। যিনি বেদান্তের জ্ঞান পেতে চাইছেন, *অহং ব্রহ্মাস্মি* এই সত্যে প্রতিষ্ঠিত হতে চাইছেন, তাঁর জন্য হল আমি সেই ব্রহ্ম। তার মানে যা কিছু জগতে আছে সব আমার থেকেই বেরিয়েছে, আত্মা ছাড়া, শুদ্ধ চৈতন্য ছাড়া আর কিছু নেই, এই জ্ঞান তাঁকে লাভ করতে হয়। যাঁরা ভক্তিমার্গের তাঁরা এটাই দেখবেন, ঈশ্বর বই আর কিছু নেই। যাঁরা ধর্ম পথে যান তাঁরা ওটাই দেখবেন, সব ঈশ্বরেরই সন্তান। মানুষের সেবা কিনা ঈশ্বরের সেবা। যোগের পথেও একই, সাধনা করে করে মন এমন হয়ে যাবে যে মনে অন্য কোন বৃত্তিই আসবে না, মানে নিজেকে পরিবর্তিত হতে দেবে না, এটাই যোগপথের সিদ্ধি, তার সাধনাটাও তাই। সাধনাতে যা যা বলছেন সিদ্ধিতে তাই তাই হবে।

এই সাধনা যখন খুশি শুরু করা যায়। যাকে দেখছি সেও আমার ভাই, সেও আমার বোন, সেও ঈশ্বরের একটা রূপ, ঈশ্বরই সেটা হয়ে রয়েছেন, এই ভাব যখন দৃঢ় হয়ে যায় তখন কোন পথকে, কোন পথের সাধককে আর নিন্দা করা যায় না। কিন্তু নিজে যে পথ বেছে নিয়েছে, সেই পথের প্রতি শ্রদ্ধা থাকতে হবে, নিষ্ঠা অটুট রাখতে হবে। নিজের পথের প্রতি নিষ্ঠা যদি না থাকে তাহলে ওটা নষ্ট হয়ে যায়, এগোতে পারবে না। আমার এই পথ নির্দেশ করে দেওয়া হয়েছে, এই পথ দিয়ে আমি আমার সিদ্ধিতে পৌঁছাব, তখন দেখব সবই এক।

কিন্তু সব পথেই সাধক যেমন যেমন সাধনা করে এগোবে তেমন তেমন তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ করতে হবে, ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিককে উন্মোচন করতে হবে। যদি ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিকগুলোর উন্মোচন না করা হয় তখনই গোঁড়ামি এসে গ্রাস করে নেয়। বৈষ্ণবরা অনেক সময় খুব গোঁড়া হয়, মাধ্বাচার্য খুব গোঁড়া ছিলেন। তাঁর সিদ্ধি সাধনা নিয়ে কেউ প্রশ্ন করছেন না, একটা জিনিসকে নিয়েই এগিয়ে গেছেন। কিন্তু আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যের অনেক কিছু জিনিস তাঁর কাছ থেকে হারিয়ে গেল, ঈশ্বরের যে অনন্ত রূপ, সেই ভাব আর পেলেন না। এই ভাবটাকে নিয়ে এবার স্বামীজী আলোচনা করছেন।

Be brave and be sincere; then follow any path with devotion, and you must reach the Whole. (*সাহসী হও, অকপট হও – তারপর তুমি যে-পথে ইচ্ছা ভক্তিবিশ্বাসের সহিত চল, অবশ্যই সেই পূর্ণ বস্তুকে লাভ করবে।*) তুমি সাহসী হও, শক্তি অর্জন কর, বীর্যবান হও, নিষ্ঠাবান হও। শক্তি অর্জন করা মানে, আমি করব, এটা করার জন্য কোন দুর্বলতাই বাধা হতে পারবে না। বীর্যবান হওয়া মানে, আমার সিদ্ধি হোক আর নাই হোক আমি লেগে থাকব। ধরে রাখা, এটাই আমাদের হিন্দুদের ভাব, বিশেষ করে বেদান্তের আর ঠাকুরের তো অবশ্যই। ঠাকুর পদে পদে বলছেন, তোরা একটাকে ধরে থাক, একটাকে ধরে থাকলে সব হবে। আমাদের সহজ ভাষায় মূল কথা হল লেগে থাকা, এই লেগে থাকাকেই স্বামীজী বলছেন, Be brave and be sincere। যে কোন একটা ক্ষেত্রে তুমি লেগে থাক, দেখবে অনু থেকে বৃহতে তুমি পৌঁছাবেই। Once lay hold of one link of the chain, and the whole chain must come by degrees. (*একবার শিকলের একটা কড়া কোনমতে যদি ধরে ফেল, সমগ্র শিকলটা ক্রমে ক্রমে টেনে আনতে পারবে!*) উপমা দিচ্ছেন, শিকলের একটা ঘাঁট কোন ভাবে যদি ধরে নেওয়া হয়, ওটাকে ধরে ধাপে ধাপে এগোতে থাকলে শেষে পুরো শিকলটাই ধরা হয়ে যাবে। একটু সময় দিতে হয়, ধীরে ধীরে সমস্ত শিকলটাই এসে যাবে, তার আগে একটাকে তোমায় ধরতে হবে। হরিদ্বারে গঙ্গার স্নান ঘাটে পিলারের সাথে

শিকল বাঁধা আছে, যাতে স্নান করতে করতে কেউ যদি স্লিপ করে যায় তখন কোন রকমে একটা শিকলকে ধরে নেয়, আর ধরে নিয়ে এরপর একটা একটা করে ধরে ধরে ঠিক উপরে চলে আসবে। ধর্মজীবনেও তাই, একটা ভাব, একটা পথকে প্রথমে ধরতে হবে, তারপর ওটাতেই লেগে থাকতে হবে।

স্বামীজী বলছেন, Water the roots of the tree (that is, reach the Lord), and the whole tree is watered; getting the Lord, we get all. (*গাছের মূলে যদি জল দাও, সমগ্র গাছটাই জল পাবে। ভগবানকে যদি আমরা লাভ করতে পারি, তবে সবই পাওয়া গেল।*) স্বামীজী আরেকটি উপমা দিচ্ছেন, গাছের মূলে যদি জল দেওয়া হয় তাহলে সমস্ত গাছটাই জল পেয়ে যায়, ঠিক তেমনি ঈশ্বরে যদি নিষ্ঠা থাকে তাহলে আশেপাশে যা কিছু থাকে সবটাই পুষ্টি পেয়ে যায়। তার মানে তুমি ঈশ্বরের নামের প্রতি নিষ্ঠাবান হও।

বিভিন্ন ভাবের বিকাশের দ্বারা সঙ্কীর্ণতাকে প্রতিহত করা

কিন্তু ওটা করতে গিয়ে যা হয়, যেটা আমরা প্রথমের দিকে আলোচনা করলাম, স্বামীজী সেটাই বলছেন, One-sideness is the bane of the world, (*একঘেয়ে ভাবই জগতে মহা অনিষ্টকর।*) একটা জিনিসকে ধরে নিয়ে মনে করছে এটাই সব, এই সঙ্কীর্ণতাই জগতের অভিশাপ। The more sides you can develop the more souls you have, and you can see the universe through all souls – through the Bhakta (devotee) and the Jnani (philosopher). (*তোমরা নিজেদের ভিতর যত ভিন্ন ভিন্ন ভাবের বিকাশ করতে পারবে, ততই জগৎকে বিভিন্নভাবে – কখনও জ্ঞানীর দৃষ্টি, কখনও বা ভক্তের দৃষ্টিতে সম্ভোগ করতে পারবে।*) যেমন যেমন আমাদের বিভিন্ন ভাবের বিকাশ হতে থাকবে তেমন তেমন যত শুদ্ধ আত্মারা রয়েছেন তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যাবে। এই কথাগুলো সাধারণ স্তরের ভক্ত, যারা মন্ত্র যাতে ভুলে না যায় তাই দু বেলা ১০৮ বার করে জপ করে, তাদের জন্য নয়। এই কথাগুলো সত্যিকারের অত্যন্ত উচ্চমানের সাধকদের জন্য। স্বামীজীর দেববাণী হল গীতা, দেববাণীতে স্বামীজী যা বলেছেন, স্বামীজীর সমস্ত রচনাবলী জুড়ে এই একই কথা বিভিন্ন ভাবে বলা আছে। স্বামীজীর কাছে যাবতীয় যা যা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আছে, যেটা তিনি ঠাকুরের কাছ থেকে পেয়েছিলেন আর নিজের সাধনার দ্বারা যা প্রত্যক্ষ করেছেন তার সবটাই এই দেববাণীতে দেওয়া আছে। গীতা সাধারণ মানুষের জন্য নয়, গীতার সার ধারণা করার জন্য খুব উচ্চ আধারের লোক হতে হয়। আমরা অতি সাধারণ মানুষ, পুরাণের মজার মজার কাহিনী, তুলসীদাসের রামচরিতমানসের মত কাহিনীগুলোই আমরা নিতে পারি, এর বেশি উচ্চ চিন্তা আমাদের নেওয়ার ক্ষমতা নেই। এসব কথা শুনতে আমাদের তিক্ত লাগতে পারে কিন্তু এটাই বাস্তব।

যারা জ্ঞানমার্গের সাধক হন, তাঁরা আবার ভক্তিমার্গের লোকদের হেয় মনে করেন। এতে ভক্তিপথের অনেকে ব্যক্তিগত ভাবে সঙ্কুচিত হয়ে যায়। আধ্যাত্মিকতা মানেই হয় অনন্ত ব্যপ্তিকে পাওয়া, অনন্ত ব্যপ্তিকে পাওয়া মানেই, সবাইকে নিজের মধ্যে নিয়ে নেওয়া। সেইজন্য এই স্তরের সাধনা অনেক উঁচু স্তরে গিয়ে আসে। যখন এগোতে শুরু হয় তখন মনে করে, আমার এই পথ আমি এর বাইরে আর যাব না, আমি শ্রীরামকৃষ্ণকে মানি আমি আর অন্য জায়গায় যাব না বা যারা শ্রীকৃষ্ণকে মানে আমি আর শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দিরে যাব না। এতে কিন্তু তার একটা অমূল্য দিক হারিয়ে যাবে। যিনি সত্যিকারের আধ্যাত্মিক পুরুষ তিনি কিন্তু কাউকেই বাদ দিয়ে চলবেন না। এর একটা সমস্যা হল, তখন অন্যরা বলবে, তুমি তো সবাইকে নিচ্ছ তাহলে আমারটাও নাও, আমাকেও গ্রহণ কর। আমি কিন্তু তোমারটা গ্রহণ করব না। সেটা কিন্তু একাচারী, নিষ্ঠা মানে তাই, আমার মতকে আমি ছাড়ব না, ওটাই আমার প্রাণ। হিন্দুদের এটাই বৈশিষ্ট্য, হিন্দুরা কাউকেই না করে না, যেখানে যা পায় সবটাই নিয়ে ওর মধ্যে যেটুকু সার আছে সেটাকে নিয়ে বাকিটা ফেলে দেয়। হিন্দুদের ধর্মীয় অনুশীলন, হিন্দুদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী সব সময় evolve করে চলেছে; অন্যান্য ধর্মের মত একটা জায়গাতেই আবদ্ধ হয়ে পড়ে থেকে যায়নি। কিন্তু হিন্দুদের যে মূল আধ্যাত্মিক চিন্তা-ভাবনা, যে আধ্যাত্মিক সত্যকে ধরে হিন্দু ধর্ম দাঁড়িয়ে আছে, ওই জায়গাতে কোন দিন কোন আপোষ হবে না। সেটার সাথে আপোষ করতে বলাও হচ্ছে না। মুসলমানরা যেমন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে, সেই ভাবে হিন্দুরা হয়ত বলবে না, কিন্তু এটা কোন দিন বলবে না যে তোমাদের আল্লা একজন false God। আল্লাকে তোমরা মানো খুব ভাল, আমরাও আল্লাকে

সম্মান করি। সম্মানই যদি কর তাহলে আমাদের সাথে চলে এসো। না না, তা হবে না, আমি আমার পথ থেকে সরব না।

ঠাকুর খুব সহজ ভাবে আমাদের জন্য করে বলছেন, বাড়ির গিন্নী পরিবারের সবাইকে খুব সেবা যত্ন করে, শ্বশুড়, ভাসুর, দেওড় সবারই সেবা করে, কিন্তু স্বামীর সাথে তার আলাদা সম্পর্ক। এটাই নিষ্ঠা। স্বামীজী তাঁর শিষ্যদের অন্য ভাবে বোঝাচ্ছেন, যত দিক তোমার খুলবে, যত জনকে তুমি গ্রহণ করবে, তত তোমার ব্যক্তিত্ব সম্প্রসারিত হবে। একটা খুব নামকরা কথা আছে, যে শুধু ইংল্যাণ্ড দেখেছে সে কি আর ইংল্যাণ্ডকে ভালবাসবে! যে শুধু কলকাতা দেখেছে সে কলকাতাকে কত আর ভালবাসবে! একটু মুম্বাই যাক, দিল্লী, ব্যাঙ্গালোর ঘুরে দেখুক, বিভিন্ন দেশ বিদেশ দেখুক; তারপর দেখুক কলকাতা শহর ভাল লাগে কি লাগে না। যারা অপরকে নিয়ে চলে, অপরকে গ্রহণ করেছে, যারা অপরকে আত্মসাৎ করেছে, তারাই ঠিক ঠিক নিজের ভাবকে সম্মান দিতে পারবে, কারণ তাদের ওই দিকটা খুলে যায়। যারা গান-বাজনা করে, নামকরা গায়ক কিংবা বাদক, তাঁরা নিজের বাদ্যযন্ত্রে খুব খ্যাতি অর্জন করেছেন কিন্তু অন্য বাদ্য-যন্ত্রও বাজাতে জানেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আমরা কবি রূপে জানি, কিন্তু তিনি উপন্যাসও লিখেছেন, উচ্চমানের ছবি এঁকেছেন, ভ্রমণ কাহিনী লিখেছেন, খুব নামকরা তাঁর লেকচারও আছে। বিখ্যাত মানুষদের অনেকগুলো দিক থাকে।

ঠাকুর বলছেন, আমি এক ডেলে গাছ, বলতে চাইছেন ঈশ্বর ছাড়া আর কোন কিছুতে ঠাকুরের মন নেই, সংসারের দিকে মন নেই। ঠিক কথা, কিন্তু তাঁর গান, তাঁর নৃত্য এত উচ্চমানের যে এগুলোকে নিয়ে এখন অনেক গবেষণাও হচ্ছে। তাঁর কণ্ঠস্বর এমন মধুর ছিল যে তাঁর গান যে শুনেছে আর কোন গান শুনতে তার ভাল লাগত না। এক ডেলে হলেও, সাংসারিকতার দিকে তাঁর মন নেই ঠিকই, কিন্তু অন্যান্য অনেক দিক তাঁর খোলা ছিল। দিক যদি না থাকে তাহলে ব্যক্তিত্বের প্রসার হয় না। বাংলা সাহিত্য নিয়ে যাঁরা ডিগ্রী করছেন, খুব ভাল, একটা কালচারকে ধরে রাখছেন; কিন্তু অন্যান্য ভাষার সাহিত্য যদি না পড়া থাকে, বিজ্ঞান যদি একটু না পড়া থাকে তাহলে অন্যান্য দিকগুলো তাঁর খুলবে না। আইনস্টাইন অত বড় বিজ্ঞানী, তিনি খুব সুন্দর বেহালা বাজাতেন। প্রতিভাবানদের অনেকগুলো দিক থাকে, যত দিক থাকবে তত গুলো যেন আত্মা এসে গেল। যাঁরা বলছেন *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, অহং ব্রহ্মাস্মি*, আমিই সব কিছু হয়েছি, কিন্তু কোন কিছুর দিকে আপনি যেতেই পারছেন না, তার মানে এগুলো আপনার মুখের কথা। যারা বলে আমার একটাই দিক, বুঝবেন তাদের কোন দিকই নেই। কারণ যাদের একটা দিক ঠিক ঠিক আছে তাদের আরও পাঁচটা দিক খুলে যাবে। আধ্যাত্মিক জীবন মানেই, তাঁর ব্যক্তিত্বে অন্যান্য অনেক দিক খোলা আছে।

সেইজন্য স্বামীজী বলছেন – see the universe through all souls – through the Bhakta and the Jnani। জ্ঞানীরা যে ভাবে জগৎকে দেখে সেটাও তুমি নাও, ভক্তরা যেভাবে জগৎকে দেখে সেইভাবে তুমিও দেখার চেষ্টা কর। কিন্তু, Determine your own nature and stick to it. (*তোমার প্রকৃতিটা আগে ঠিক কর, তারপর সেই প্রকৃতি-অনুযায়ী পথ অবলম্বন করে তাতে নিষ্ঠাপূর্বক থাকো।*) তোমার নিজস্ব কি ভাব, কি স্বভাব সেটা খুব ভাল করে বোঝ, বুঝে ওই ভাবকে আঁকড়ে ধরে রাখ। তোমার ভাব, তোমার স্বভাবকে ছাড়া চলবে না, ছেড়ে দিলে দুধে জল মিশে দুধের ভাব নষ্ট হয়ে যাবে। যে ধরণের লোকেদের সাথে তুমি মেলামেশা করবে, তুমি তাদের মতই হয়ে যাবে। এরপর তোমার দ্বারা আর সাধনা হবে না, সেইজন্য স্বামীজী বলছেন, Nistha is only method for the beginner; but with devotion and sincerity it will lead to all. (*প্রবর্তকের পক্ষে নিষ্ঠাই (একটা ভাবে দৃঢ় হওয়া) একমাত্র উপায়; কিন্তু যদি যথার্থ ভক্তিবিশ্বাস থাকে এবং যদি ভাবের ঘরে চুরি না থাকে, তবে ঐ নিষ্ঠাই এক ভাব থেকে সব ভাবে নিয়ে যাবে।*) সাধনার শুরুতে নিষ্ঠার খুব দরকার, শুরুতে মন সবারই কাঁচা থাকে। প্রথমে একটাকে ধরেই এগোতে হবে, যদি কিছু শিখতে চাও তাহলে একটা জিনিসকে দৃঢ় আর নিষ্ঠার সাথে ধরতে হবে, তাই বলে অপরদের হেয় বলা যাবে না। যখন তুমি পুরো নিষ্ঠার সাথে একটা কিছু করবে তখন দেখবে অন্যরা কি করছে সেটাও তুমি ধীরে ধীরে জানতে পারবে। ঠাকুর একমাত্র মাকে ধরে ছিলেন, মা ছাড়া তিনি আর কিছু জানতেন না, কিন্তু তিনিই আবার মাকে বলছেন, মা, বেদ-বেদান্তে কি আছে তুমি আমাকে শিখিয়ে দাও। মাও এক এক করে শিক্ষা গুরু পাঠিয়ে ঠাকুরকে সব শিখিয়ে দিলেন। জানতে হবে প্রাথমিক স্তরে সবাইকে নিজের

প্রকৃতি অনুযায়ী একটাকে ধরে নিষ্ঠাকে এবার ওই একটাতেই রাখতে হবে। এই নিষ্ঠাটা, প্রবর্তকদের জন্য, অর্থাৎ প্রথমের দিকে যারা শুরু করছে তাদের জন্য খুব দরকার।

চারাগাছকে বেড়া দেওয়া - বেদের পারে যাওয়া

Churches, doctrines, forms are the hedges to protect the tender plant. (*গীর্জা, মন্দির, মত-মতান্তর, নানাবিধ অনুষ্ঠান, এগুলি যেন চারাগাছকে রক্ষা করবার জন্য তার চারদিকে বেড়া দেওয়া।*) চারাগাছকে রক্ষা করার জন্য তার চারপাশে বেড়া দিতে হয়, বেড়া না দিলে গরু ছাগলে খেয়ে নেবে। But they must later be broken down that the plant may become a tree. (*কিন্তু গাছকে যদি বড় করতে চাও, তা হলে শেষে সেগুলিকে ভেঙে দিতে হবে।*) পরে ওই বেড়াকে ভেঙে ফেলতে হবে যাতে চারাগাছ বৃক্ষে পরিণত হতে পারে। আমাদেরও নিয়মকানুনের বেড়াজাল থেকে একটা সময় বেরিয়ে না এলে আমরা কোন দিন বড় হতে পারব না। আগেকার দিনে বিধবারা এতটুকুই জানতেন, আমি গঙ্গাজল খাব, তুলসিপাতা খাব, ঠাকুরের নাম করব, এর মধ্যেই আমি থাকব, আমার আর কিছু লাগবে না। এতে তাঁদের উন্নতি হচ্ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁদের আমরা পুরো আধ্যাত্মিক বলতে পারব না। কারণ এনাদের নানান দিকগুলো খোলেনি, ঠিক ঠিক ব্যক্তিত্বেরও বিকাশ হয়নি, একটা জায়গায় গিয়ে আটকে থাকে। যেমনি একটু এগোল বিভিন্ন দিক খুলে দিতে হয়, না খুললে এগোন যাবে না। আগেকার দিনে উনুন ধরাবার সময় একটা দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে কত সাবধানে উনুনের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়, যাতে বাতাসে নিভে না যায়। এরপর যেই উনুনে দিয়ে দেওয়া হল তখন তোলা উনুনকে বাইরে খোলা বাতাসের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয় যাতে আগুনটা দাউ দাউ করে জ্বলতে পারে, বসা উনুন হলে পাখা দিয়ে হাওয়া করে বাতাস দিতে হয়। প্রথমে বাতাস লাগলে দেশলাই কাঠি নিভে যাবে, পরে বাতাস যদি না পায় আগুন নিভে যাবে। প্রথমের দিকে রক্ষা করতে হয়, ওই রক্ষা যদি না করা হয় তাহলে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যাবে। পরের দিকে যদি রক্ষা করা হয়, তাতেও বিনষ্ট হয়ে যাবে। এগুলো অনেকেই বুঝতে পারেন না, স্বামীজী হলেন প্রকৃত আচার্য, তাঁর নিজের শিষ্যরা যাঁরা থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে তাঁর সাথে আছেন, তাঁদের কাছে প্রাণের কথা খুলে বলছেন।

আর বলছেন, So the various religions, Bibles, Vedas, dogmas all are just tubs for the little plant. (*এইরূপ বিভিন্ন ধর্ম, বেদ, বাইবেল, মত-মতান্তর – এ-সবও যেন চারাগাছের টবের মতো।*) বাইবেল, বেদ সব ধর্মগ্রন্থই এক একটা গামলা, যাতে বীজ থেকে অঙ্কুরিত ছোট্ট চারাগাছটা বড় হচ্ছে। একমাত্র বেদই বলে, যখন সাধনা করে সিদ্ধির দিকে এগিয়ে যায় তখন বলে *তত্র বেদা অবেদা ভবন্তি*, বেদ তখন অবেদ হয়ে যায়। গীতাতেও ভগবান বলছেন, *ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন*, বেদ মানেই সে তিনটে গুণের মধ্যে আবদ্ধ। বেদের মত উচ্চমানের গ্রন্থেরই এই অবস্থা সেখানে অন্যান্য গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। ঠাকুরও বলছেন, সমাধির অবস্থায় বেদ, পুরাণ সব কত নীচে পড়ে থাকে, যখন আমি ওঁ বলি তখন মন একশ হাতে নীচে নেমে আসে। তখন শুধুই ওঁ থাকে, এরপর বেদ যখন আসছে তখন আরও কত নীচে নেমে যাচ্ছে। এই অবস্থা শুধু ঠাকুরের হচ্ছে না, সবারই হয়। যদি বলে আমি এখনও বেদকে ধরে আছি, বাইবেলকে ধরে আছি, বুঝতে হবে এখনও সে এগোয়নি। আমাদের এই কথা বলার কোন অধিকার নেই, এই কারণেই অধিকার নেই, আমরা এখনও এগোয়নি, দুটো কথা শিখে নিয়ে টিয়া পাখির মত আওড়ে যাচ্ছি। এগুলো সত্যিকারের খুব উচ্চমানের জিনিস। মানুষ যে গ্রন্থের সাহায্য নিয়ে বড় হয়েছে, একটা সময় সেই গ্রন্থই নীচে পড়ে থাকে। আমরা এর উপমা দিতে পারি, একটা স্যাটেলাইটকে মহাকাশে পাঠানোর সময় রকেটের সাহায্যে পাঠানো হয়। ওই রকেট যখন হাই ভেলোসিটি নিয়ে চলতে শুরু করে তখন একটা অরবিটে গিয়ে রকেটটা স্যাটেলাইটাকে স্পেসে ছেড়ে দেয় আর রকেটটা আপনা থেকে ফুস্ করে পড়ে যায়। আধ্যাত্মিক যাত্রায় মানুষ যখন ওই জ্ঞানের দিকে এগোয় তখন সব ধর্মগ্রন্থগুলো রকেটের মত। এই রকেট তাকে একটা অরবিটে নিয়ে চলে গেল, ওই স্পীডে নিয়ে চলে গিয়ে তাকে ছেড়ে দেবে, এবার বাকিটা নিজের স্পীডে বেরিয়ে যাবে। এটাই স্বামীজী শিষ্যদের এভাবে বলছেন, it must get out of the tub, একটা সময় আসবে যখন চারাগাছকে ওই গামলা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। Nistha is, in a manner, lacing the plant in the tub, shielding the struggling soul in its path, (*নিষ্ঠা যেন চারাগাছটিকে টবে*

বসিয়ে রাখা – সাধককে তার নির্বাচিত পথে আগলে রাখে।) প্রথমের দিকে নিষ্ঠা এই ভূমিকা পালন করে, যেমন চারাগাছ গামলায় থাকে।

আত্মার দৃষ্টিতে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই আমার শরীর

এরপর স্বামীজী বলছেন, Look at the ‘ocean’ and not at the ‘wave’, see no difference between ant and angel, (*সমগ্র সমুদ্রের দিকে চেয়ে দেখ, এক একটি তরঙ্গের দিকে দেখো না; একটা পিঁপড়ে ও একজন দেবতার ভিতর কোন প্রভেদ দেখো না।*) আমাদের সমস্যা হল, সমুদ্র দেখতে গিয়ে আমরা সমুদ্র দেখতে পারি না, আমাদের পক্ষে সম্ভব না, আমরা সব সময় সমুদ্রের ঢেউ দেখি। ঢেউ দেখাটাই আমাদের স্বাভাবিক, মুখে আমরা যতই বলি না কেন, যখনই আমরা সমুদ্র দেখতে যাই তখন সমুদ্র জিনিসটা মাথায় আসে না, মাথায় সব সময় ঢেউই আসে। স্বামীজী বলছেন, একটা পিঁপড়ে আর একটা দেবদূতে কোন তফাৎ হয় না। এখানে আমরা যত কজন আছি সবাই আমরা এক একটা ঢেউ, কাউকে ভাল বলছি, কারুর নিন্দা করছি, মূলতঃ আমরা ঢেউয়ের উপরেই আলোকপাত করছি। স্বামীজী এই ঢেউ দেখাটা বন্ধ করতে বলছেন, তরঙ্গ না দেখে তুমি সমুদ্রকে দেখার চেষ্টা কর। পিঁপড়েটাও একটা ঢেউ, দেবতারাও একটা ঢেউ। কারণ, Every worm is the brother of the Nazarene. (*প্রত্যেকটি কীট প্রভু ঈশার ভাই।*) ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র যে ক্রিমি, অতি ক্ষুদ্র পোকা সেও Jesusএর ভাই। এই একটা লাইন পড়লেই আমাদের মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে হয়, হে ঠাকুর! স্বামীজী কি করে খ্রীশ্চানদের সামনে এই কথা বলেছিলেন! খুব উচ্চমানের অদ্বৈতের ভাব থেকে স্বামীজী এই কথা বলছেন।

একটু আগে স্বামীজী যীশুকে অবতার বা ভগবান বললেন। ওখানে ভক্তিভাবে বলেছিলেন। ঠাকুরও বলছেন, জ্ঞানীদের জন্য অবতার নেই, জ্ঞানীরা অবতার মানে না। জ্ঞানীদের কাছে একমাত্র শুদ্ধ চৈতন্য সচ্চিদানন্দই আছেন, বাকি যা কিছু আছে সব লীলাখেলা, সেইজন্য অদ্বৈত বেদান্তে বা জ্ঞানমার্গে অবতার বলে কিছু হয় না। এক পাতা না যেতে যেতেই স্বামীজী জ্ঞানমার্গে ঢুকে গেছেন। জিনিসগুলো ঠিক ঠিক জানা না থাকলে যে কারুর পক্ষে সংশয় হতে বেশি সময় লাগবে না। এক পাতা আগে যীশুকে বলছেন ভগবান আর এখানে বলছেন একটা ক্রিমি, একটা পোকা যীশুর ভাই। তাই কি করে বলবে, How say one is greater and one less? Each is great in his own place. (*একটাকে বড়, অপরটাকে ছোট বলো কি করে? নিজের নিজের স্থানে সকলেই যে বড়।*) একজন বড় একজন ছোট, কারণ দুটোই ঢেউ, সব ঢেউ সমুদ্রেরই, সবাই সবার ক্ষেত্রে বড়। We are in the sun and in the stars as much as here. (*আমরা যেমন এখানে রয়েছি, তেমনি সূর্য, চন্দ্র, তারাতেও আছি।*) দূর দূরান্তে যত সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ নক্ষত্র আছে, এই দেহে আমি যতটুকু আছি ততটুকু আমি ওই সব কিছুতেও আছি। Spirit is beyond space and time and is everywhere. (*আত্মা দেশ-কালের অতীত ও সর্বব্যাপী।*) এই শরীর রূপে বা মন রূপে আমি হয়ত ওই জায়গায় নেই, কিন্তু আত্মা রূপে আমি সর্বত্র আছি।

যখনই প্রশ্ন করা হয়, আমি কে? তখনই আমরা বেশির ভাগ সময় নিজের শরীরকেই আমি বলে ভাবি, খুব হলে মনকে আমি ভাবি, কিন্তু আত্মা রূপে আমরা নিজেকে ভাবতে পারি না। দেহ রূপে আমরা ওসব জায়গায় নেই ঠিকই, কিন্তু সেটাকে নিয়েও কিছু কিছু বর্ণনা আছে, কিন্তু স্বামীজী এখানে আত্মা রূপে বলছেন। ঈশোপনিষদের ব্রাহ্মণ সারা জীবন নিষ্ঠার সাথে সাধন-ভজন করার পর মৃত্যুর সময় বলছেন *তত্ত্বং পূষন্নপাবৃনু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে*, এইসব বলার পর বলছেন, *যোহসাবসৌ পুরুষঃ সোহমস্মি*, ঐ সূর্যের পিছনে যে পুরুষ, যে চৈতন্যসত্তা বিদ্যমান, সেটা আমি নিজে। স্বামীজী বলছেন, Every mouth praising the Lord is my mouth, every eye is seeing is my eye. (*যে-কোন মুখে প্রভুর গুণগান উচ্চারতি হচ্ছে, তাই আমার মুখ; যে কোন চক্ষু কোন বস্তু দেখছে, তাই আমার চক্ষু।*) যত মুখে ঈশ্বরের নাম উচ্চারিত হচ্ছে সব আমারই মুখ, যত চোখে সবাই দেখছে সব আমারই চোখ। গীতাতেও ভগবান ঠিক এইভাবে বলছেন, *সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোহক্ষিশিরোমুখক্। সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।।* সমস্ত শরীরের হস্ত ও পদ তাঁরই হস্ত পদ, সমস্ত শরীরের চোখ, কান তাঁরই চোখ কান, সমস্ত শরীরের মস্তক, মুখ তাঁরই মস্তক, মুখ। আর আমি আর

তিনি এক, তাই জগতে যত হাত আছে, পা আছে, চোখ আছে, কান আছে, মাথা আছে, মুখ আছে সব আমারই হাত, পা, চোখ, কান, মাথা, মুখ।

We are confined nowhere; we are not body, the universe is our body. (*আমরা কোন নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ নই; আমরা দেহ নই, সমগ্র ব্রহ্মণ্ডই আমাদের দেহ।*) আমাকে কে সীমিত করতে পারে, এই সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই আমার শরীর। রাজযোগেও একই কথা বলা হয়, যোগী সাধনা করতে করতে তাঁর মনের বৃত্তির সংখ্যা যত হ্রাস পেতে থাকে তত দেখেন, যে বিশ্বব্রহ্মণ্ডকে এতদিন তাঁর বিশাল মনে হচ্ছিল আর নিজেকে ক্ষুদ্র মনে হচ্ছিল, সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এখন ধীরে ধীরে ক্রমাগত ছোট হয়ে আসছে আর নিজেকে বড় দেখতে থাকেন, এইভাবে হতে হতে একটা সময় এসে দেখেন সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কি আর, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির পিছনে যে শক্তিগুলো আছে সেই শক্তি তাঁর পায়ের নখের সমান হয়ে যায়। এটা কোন তাত্ত্বিক কথা নয়, বাস্তবিক এই রকম হয়। খ্রীশ্চান, মুসলিম ধর্মের ধারণা নিয়ে যাঁরা বড় হয়েছেন, তাঁদের পক্ষে এই তত্ত্ব ও ভাবকে ধারণা করা অসম্ভব। তোমার মত দিয়ে তুমি মনে করছ আমি ভুল বলছি, আমিও তো আমার মত দিয়ে বলছি তুমি ভুল বলছ। তাহলে ফয়সালা হবে কি করে? তুমি বলবে বন্দুক বার করছি, আমি বলব তুমি ধ্যান কর, তখন নিজেই তুমি দেখে নেবে।

প্রথমের দিকে ভারতবর্ষে এসে ইংরেজদের অনেকেই হিন্দু ধর্মের বহু ভাব ও ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। William Darlympleএর নামকরা সৃষ্টি White Mughalsএ বর্ণনা আছে, প্রথমের দিকে যে ইংরেজরা ভারতবর্ষে এসেছিল তারা কিভাবে ভারতীয়দের মত ব্যবহার করত, আচরণ করত। পরে যেমন যেমন তাদের ক্ষমতা বাড়তে শুরু হয়েছে তেমন তেমন একটা দেওয়াল দাঁড় করিয়ে দিল, কারণ এটাই নিয়ম। রাজা প্রজাদের সাথে কখন মিশতে পারে না, এটা ঠিক কথা নয়, বর্তমান ম্যানেজমেন্ট শাস্ত্রাদিতে এই ধরণের কথা বলা হয় না। কিন্তু আমেরিকানরা সবাই সবাইকে নাম ধরে ডাকে, অধঃস্তন কর্মচারী তার মালিককেও নাম ধরে ডাকছে। কিন্তু এখানে তা হয় না, রাজা রাজাই, রাজাকে সব সময় Your Majestic Holi বলেই সম্বোধন করতে হয়, তা নাহলে system collapsed করে যাবে। যে জাতি গোলাম জাতি, সেই জাতিকে রাজা কখনই সম্মান দিতে চাইবে না। যার জন্য ভারতবর্ষ সব দিক দিয়ে মার খেয়ে গেছে।

হিন্দু ধর্মের যখনই অন্য ধর্ম থেকে নিন্দা করা হয় তখন ওরা ওদের থিওরী নিয়ে এসে আমাদের প্র্যাক্টিসকে নিয়ে বলবে। থিয়োরী আর প্র্যাক্টিসে কখনই মিল থাকবে না। থিয়োরী তুমি একটা সিস্টেমের নেবে, থিয়োরী খুব উচ্চমানের হবে, আর অন্য সিস্টেমের নেবে প্র্যাক্টিস। তা কি কখন সম্ভব! তোমার প্র্যাক্টিস আর আমার প্র্যাক্টিসকে নিয়ে এসো তখন বোঝা যাবে। কম্যুনিস্টরা বলে আমাদের কত উচ্চমানের থিয়োরী। কি রকম উচ্চমানের থিয়োরী? সমান অধিকার, সমান সম্পত্তির মালিকানা ইত্যাদি। তাহলে বিশ্ব জুড়ে কম্যুনিস্টদের থিয়োরী কেন মুখ থুবড়ে পড়ল? তখন বলবে, ওটা সিস্টেমের দোষ, থিয়োরীর দোষ নয়। এবার তুমি পথে এসেছ। তোমরা ভারতের সব কিছুর নিন্দা করছ, তুমি যে আন্দোলন চালাতে চাইছ, তোমরা একটা থিয়োরী নিয়ে আসতে চাইছ বলেই এসব করছ? আর সেই থিয়োরীর প্র্যাক্টিস করতে গিয়ে সারা বিশ্বে মার খেয়ে গেছ। তোমার যে উচ্চমানের থিয়োরী, all are equal, সেটাকে তুমি তুলনা করে দেখাতে চাইছ ভারতে কোন equality নেই। সেটাই যদি করতে হয় তোমরা বেদান্তকে গ্রহণ কর, বেদান্ত বলছে না all are equal, বেদান্ত বলছে only one exists। থিয়োরী যদি নিতে হয় আমার থিয়োরী নেব, কারণ আমার থিয়োরী অনেক শ্রেষ্ঠ। আর যদি প্র্যাক্টিসে নামতে হয় তাহলে জানবে হিন্দুরা এখনও দাঁড়িয়ে আছে আর তোমরা সারা বিশ্ব থেকে মুছে গেছ। অন্যান্য ধর্মের লোকেরা যখন হিন্দু ধর্মের নিন্দা করে তখন ঠিক এই সমস্যা এসে যায়। ওদের যে থিয়োরেটিক্যাল কথা রয়েছে সেগুলোকে এনে হিন্দুদের প্র্যাক্টিসের সাথে তুলনা করে, কিন্তু হিন্দুরা যদি তাঁদের উপলব্ধ আধ্যাত্মিক সত্যগুলিকে নিয়ে, যে সত্যগুলো একজন নয় একাধিক ঋষি মুনিরা উপলব্ধি করেছেন, সেটাকে নিয়ে যেমনি তাদের সাথে তুলনা করতে যাবে তখন তারা দাঁড়াতেই পারবে না। তুমি তোমার ঈশ্বরের যে অবধারণার কথা বলছ, সেটা আজ থেকে কেউ দু হাজার, তিনি হাজার বছর আগে উপলব্ধি করেছিল, এখনও তুমি তাই বলে যাচ্ছ। আমরা তো বলছি এগুলো নিয়মিত সত্য, আর তুমিও এগুলো পারবে, এই নয় যে তুমি পারবে না। তোমার কথাগুলো বইয়ের কথা, আমার কথাগুলো অনুশীলনের

দ্বারা উপলব্ধ। এই যে বলছেন, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমিই আছি, এগুলো থিয়োরেটিক্যাল কিছু না, এটাই বাস্তবিক।

স্বামীজী উপমা দিচ্ছেন, We are magicians waving magic wands and creating scenes before us at will. (*আমরা যেন ঐন্দ্রজালিকের মতো মায়াযষ্টি ঘোরাচ্ছি, আর ইচ্ছামত আমাদের সম্মুখে নানা দৃশ্য সৃষ্টি করছি।*) সেই শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ, তিনি বলছেন সৃষ্টি হোক, সৃষ্টি হচ্ছে। আমরা সেই জাদুকর, জাদুকর সামনে ছড়ি ঘোরাচ্ছে আর সামনে নানা রকমের দৃশ্য এসে যাচ্ছে। আমার সামনে যে বহু, সব আমারই সৃষ্টি করা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমারই সৃষ্টি করা, কারণ আমি সেই শুদ্ধ আত্মা। এই যে আমি অমুক বলছি, এই আমি সেই অমুক আমি নয়, অমুক ব্যক্তির পিছনে যে আধ্যাত্মিক সত্তা, সে এগুলো করছে, যার মধ্যে আমার নিজের শরীরটাকেও সে সৃষ্টি করে দিচ্ছে।

স্বামীজী মাকড়সার জালের উপমা দিচ্ছেন, মাকড়সাই নিজের জাল তৈরী করে, জাল তৈরী করে সেই জালের একটা জায়গায় অবস্থান করে। We are the spider in his huge web, who can go on the varied strands wheresoever he desires. (*আমরা যেন মাকড়সার মতো আমাদেরই নির্মিত বৃহৎ জালের মধ্যে – মাকড়সা যখন ইচ্ছা করে, তখনই তার জালের সুতোগুলোর যে-কোনটাতে যেতে পারে।*) এই জগৎটা যেন বিরাট একটা মাকড়সার জাল, যেখানে খুশি সে যেতে পারে, কিন্তু, The spider is now only conscious of the spot where he is, but he will in time become conscious of the whole web. (*বর্তমানে সে যেখানে রয়েছে, সেইটাই জানতে পারছে, কিন্তু কালে সমস্ত জালটাকে জানতে পারবে।*) মাকড়সা যে জায়গাটায় বসে আছে তার ওই জায়গাটুকুরই শুধু চেতনা থাকে, কিন্তু সমস্ত জালটা তারই তৈরী। যেখানে খুশি সে যেতে পারে, কোন কারণে সেই জায়গাটুকুতেই সে তার চেতনাকে আবদ্ধ করে নিয়েছে, কিন্তু একটা সময় ঠিক সে জানতে পারবে যে সমস্ত জালটা তারই। We are now conscious only where the body is, we can now use only one brain. (*আমরা এখন যেখানে আমাদের দেহটা রয়েছে, সেখানেই নিজ সত্তা অনুভব করছি, এখন একটি মাত্র মস্তিষ্ক ব্যবহার করতে পারি।*) আমাদেরও ঠিক একই অবস্থা, যেখানে আমাদের শরীর চেতনা শুধু সেইখানে। মাকড়সার জালের যে জায়গাতে সে আছে, ও মনে করে আমি এতটুকুই আমার ক্ষমতা এতটুকুর মধ্যেই সীমিত। আমরাও মনে করছি, আমি এতটুকুই, আমরা ঘরবাড়ি যেটুকুর মধ্যে আমি থাকি, আমি এতটুকুরই মালিক। অথচ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে সবটাই আমার।

But when we reach ultra-consciousness, we know all, we can use all brains. (*কিন্তু যখন পূর্ণজ্ঞান বা জ্ঞানাতীত অবস্থায় উপনীত হই, তখন আমরা সব জানতে পারি, সব মস্তিষ্ক ব্যবহার করতে পারি।*) এই জায়গাতে কিছু কথা বাদ চলে যেতে পারে, স্বামীজী যেটা বলছেন সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমার, সেখানে যখন বলছে ultra-consciousness, মিস্ ওয়াল্ডো যখন লিখছেন তখন ওই জায়গাতে নিশ্চয় কিছু গ্যাপ থেকে গেছে। আসলে বলতে চাইছেন, মানুষ যখন ধ্যানের গভীরে এগুলোর উপরে চলে যায়, সেটাকে স্বামীজী ultra-consciousness বলছেন, যদিও ইদানিং এর নূতন শব্দ হয়ে গেছে super conscious। এখন তুমি যে একটা ব্রেনে কাজ করছ, সেই অবস্থায় তুমি সমস্ত ব্রেন দিয়ে, সমস্ত মন দিয়ে কাজ করবে। এটাও থিওরেটিক্যাল কিছু না, বাস্তবিকই এই রকম হয়। আবার বলছেন, Even now we can 'give the push' in consciousness, and it goes beyond and acts in the superconscisousness. (*এখনই আমরা আমাদের বর্তমান জ্ঞানকে ধাক্কা দিয়ে এমন ঠেলে দিতে পারি যে, সে তার সীমা ছাড়িয়ে চলে গিয়ে জ্ঞানাতীত বা পূর্ণজ্ঞানভূমিতে কাজ করতে থাকবে।*) এখুনই এখানে বসে তুমি যদি চাও তুমি তোমার চেতনাকে অতিচেতনাতে নিয়ে যেতে পারো। এগুলো কিছুই না, সাত দিন খুব নিষ্ঠার সাথে সকাল বিকাল এক ঘন্টা করে জপধ্যান করলে, তার সাথে সংযমিত জীবন-যাপন করলে, কয়েক দিনের মধ্যেই অপরের মনের খবর জানার ক্ষমতা এসে যাবে। সামনের লোকটি কি বলতে চাইছে বলার আগেই সে বুঝে যাবে। আমরা মনে করি এগুলো সিদ্ধাই, কিন্তু এগুলো কিছুই না, অত্যন্ত সাধারণ জিনিস। কিন্তু সমস্যা হল, আমাদের মন এতই চঞ্চল; স্বামীজী যে মনের উপমা দিচ্ছেন, একটা বানর মদ খেয়ে নিয়েছে, তার উপর তাকে একটা বৃশ্চিক

দংশন করেছে আর ঘাড়ে একটা ভূত চেপে গেছে, আমাদের মন এই বানরের মত। মাতালের যেমন নিজের শরীরের দিকেই হুঁশ থাকে না, আমাদেরও মাতালের অবস্থা, আমরা কি করে এই সব যোগশক্তির ধারণা করতে পারব! বলা হচ্ছে যোগশক্তি, কিন্তু এগুলো অতি স্বাভাবিক জিনিস। প্রথমে শরীরের উপর নিয়ন্ত্রণ, আরেকটু উন্নত হলে মনের উপর নিয়ন্ত্রন, আরও উন্নত হয়ে গেলে আশপাশে যত মন আছে সবার ব্যাপারে সজাগ হয়ে যাব, সব কিছুর উপর নিয়ন্ত্রণ এসে গেলে পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত মন আছে সব মনের উপর আধিপত্য এসে যাবে। সাধারণ অবস্থায় আমাদের শরীরে মশা আসছে বসছে, যতক্ষণ না কামড়ে রক্ত বার করে নিচ্ছে আমরা টের পাই না, কারণ আমরা সজাগ নই। একটু সজাগ হয়ে মনকে কেন্দ্রিত করলে পরিষ্কার আশে পাশে কি হচ্ছে দেখা যাবে। মন একটু অন্য দিকে দিয়ে দিলে নিজের দিকে আর চেতনাটা থাকবে না। চেতনার স্তর একটু উন্নত হয়ে গেলে মনের শক্তি অনেক বেড়ে যাবে। তখন সে বুঝতে পারবে যোগশক্তি কাকে বলে, এগুলো খুবই সাধারণ জিনিস, কারণ সমস্ত মন এক অপরের সাথে জুড়ে আছে। নিজের মনের উপর নিয়ন্ত্রণ এলেই অপরের মনে কি হচ্ছে জানা যাবে। যেমন একজন নিজের মনকে জানে, তেমনি সে তখন অপরের মনকেও জানতে পারবে।

স্বামীজী বলছেন, We are striving 'to be', আমরা সব সময় কিছু একটা হতে চাইছি, এই হবো, সেই হবো, and nothing more, no 'I' even – just pure crystal, reflecting all, but ever the same. When that state is reached, there is no more doing, the body becomes a mere mechanism, pure without care for it; it cannot become impure (*আমরা চেষ্টা করছি, কেবল অস্তি-মাত্র – সৎস্বরূপ হতে; তাতে 'আমি' পর্যন্ত থাকবে না –শুদ্ধ স্ফটিকের মতো হবে; তাতে সমগ্র জগতের প্রতিবিম্ব পড়বে, কিন্তু তা যেমন তেমনই থাকবে। এই অবস্থা ভাল হলে আর ক্রিয়া কিছু থাকে না, শরীরটা কেবল যন্ত্রের মতো হয়ে যায়; সে সদা শুদ্ধভাবাপন্নই থাকে, তার শুদ্ধির জন্য আর চেষ্টা করতে হয় না; সে অপবিত্র হতেই পারে না।*) যখন ওই উচ্চ অবস্থায় চলে যাবে, যেখানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে শুধু আমিই আছি, আমাকে আলাদা করে কোন কিছু হতে হবে না; এটা কোন তামসিক অবস্থা নয়। কঠোর সাধনা করে করে ওই অবস্থায় এসে দেখে আমাকে আর কিছু করতে হবে না। যোগশাস্ত্রেও একই কথা বলা হয়, সাধনা করতে করতে একটা অবস্থা আসে যখন তিনি বুঝতে পারেন – আমার আর অত কিছু জেনে কাজ নেই, যা জানার আমার জানা হয়ে গেছে। ওই অবস্থায় শরীরকে একটা মামুলি যন্ত্র বলে বোধ হবে। মাতৃসঙ্গীতে আছে, আমি রথ তুমি রথী, তুমি বলতে মা, মা বলতে সেই আত্মা। তখন তুমি দেখবে, আমার শরীর শুদ্ধ পবিত্র, আমার মন শুদ্ধ পবিত্র।

Know you are the Infinite, then fear must die. Say ever, 'I and my Father are one'. (*নিজেকে সেই অনন্তস্বরূপ বলে জানো, তা হলে ভয় একদম চলে যাবে। সর্বদাই বলো, 'আমি ও আমার পিতা (ঈশ্বর) এক'।*) একবার যদি তুমি জানতে পার তুমি অনন্ত তখন তোমার আর কিসের ভয়। ঈশোপনিষদে বলছেন, *তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যতি*, যখন একত্ব বোধ হয়ে গেল, নিজেকে অনন্ত জেনে গেল, তখন তার কি নিয়ে মোহ হবে, আর কি থেকে তার ভয় আসবে। আর তো দুই নেই, একত্ব ছাড়া তো কিছু নেই, তাহলে কিসের ভয়, কাকে ভয় করবে? কারণ সমস্ত ভয়ের মূলে হল দুই বোধ। বাইবেলে যীশু বলছেন – I and my Father are one। একদিন তুমিও এভাবে বলতে পারবে, আমি আর আমার ঈশ্বর এক, আমি তাঁর সন্তান। তখন আর কোন কিছুর থেকে ভয় হবে না। সমস্যা হল, আমরা একটা জায়গাতে নিজেকে সীমাবদ্ধ করে ভাবছি এটাই আমি, এটা আমার। ভুলে যাচ্ছি যে সমস্ত জালটাই তার। ঠিক তেমনি আমরা ভুলে গেছি যে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমার আর আমি জানি শরীরটুকুই আমার। তাই না, এমনই দুর্ভাগ্য যে এই শরীরটার বোধও থাকে না আমাদের। কিন্তু সাধনা যখন শুরু হয়, যখন শুরু হয় I and my Father in heaven are one, আমি আর আমার ঈশ্বর এক, তখন বন্ধন গুলো খসে পড়তে শুরু করে।

অবতার – অদ্বৈত ভাবের দৃষ্টিতে

স্বামীজী এবার পুরো জ্ঞানমার্গ, অদ্বৈত ভাব অবলম্বন করে অবতারদের দেখছেন। কথামৃতে ঠাকুর বলছেন, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে জাম গাছের কাছে নিয়ে গিয়ে দেখাচ্ছেন জাম ফলে রয়েছে। অর্জুনকে ভাল করে

কাছে গিয়ে দেখতে বলে বলছেন, 'কি দেখছ'? 'জাম দেখছি'। 'ভাল করে দেখ'। অর্জুন দেখছেন, থোলো থোলো কৃষ্ণ ফলে আছে। কিন্তু সেটা অন্য অর্থে বলছেন, ঠাকুর বলতে চাইছেন কৃষ্ণ ছাড়া কিছু নেই। এখানে স্বামীজী আঙুরের যে কথা বলছেন, তাতে তিনি বলতে চাইছেন, এই সৃষ্টিতে দু হাজার বছর আগে আমরা যীশুখ্রীষ্টকে দেখলাম, ভগবান বুদ্ধকে দেখলাম, এনাদেরকে স্বামীজী এবার জ্ঞানীদের দৃষ্টিতে জীবনমুক্ত রূপে দেখছেন। এই ধারণাগুলিকে নেওয়া আমাদের পক্ষে খুব মুশকিল, কারণ আমরা যুক্তি ছাড়া কোন কিছুই নিতে পারি না, কোন ভাবেই আমরা অযৌক্তিক থাকতে পারি না। সব কিছুতে আমরা pattern দেখি, patternএর বাইরে আমরা কিছু নিতে পারি না, আর pattern মানেই হল ওই জায়গাতে কোন কোন যুক্তি প্রযোজ্য হবে আমরা দেখতে চাইছি। আমাদের মন এমন যে, যদি কখন কোন ভুল কাজ করি, মন আমাদের একটা হতাশার মধ্যে ডুবে যাবে। সেইজন্য মানুষ যখনই কোন ভুল কাজ কর তখন সেটাকে আগে justify করে, rationalize করে, না করলে সে পাগল হয়ে যাবে। যে কোন কিছু করার পিছনে যুক্তি নিয়ে আসতে হবে। এই যে আমি ভুল কাজ করলাম, ভুল কাজ তো আমি করতে পারি না, এটাকে সাফাই দেওয়ার জন্য এবার একটা যুক্তি নিয়ে আসতে হবে। ভুল কাজ করা যাবে না।

ঈশ্বরীয় কথা বা তত্ত্ব আলোচনা করার সময় সেখানেও আমরা যুক্তি নিয়ে আসি, তাতে আমরা আরও সমস্যায় পড়ে যাই। এটা ঠিকই যে ধর্ম খুবই অযৌক্তিক, কিন্তু ওই অর্থে অযৌক্তিক নয় যে অর্থে আমরা যৌক্তিক মনে করছি। আমাদের কাছে যুক্তি মানে হয়, আমাদের মস্তিষ্কের নিউরোনস্ গুলো যে কাজ করে, যেটা দিয়ে আমাদের মনের বোধ আসে, চেতনার যে বোধ আসে, সেখানে আমরা একটা pattern দাঁড় করাই। একটা জিনিসকে যখন মাপা হয়, তা যেভাবেই মাপা হোক, তরল মাপি, দূরত্বই মাপি, বস্তুর ওজনই মাপি, কেজিতে মাপি, লিটারে মাপি, মিটারেই মাপি, এইভাবে যেটাই নিয়ে আসা হোক সেটাকে একটা প্যাটার্নে নিয়ে আসা হয়। প্যাটার্ন না হলে আমাদের মস্তিষ্ক কোন কিছুই নিতে চাইবে না। যখনই প্যাটার্নের বাইরে কোন কিছু এসে যায় তখনই মস্তিষ্ক confused হয়ে যায়, কারণ আমাদের মস্তিষ্কের ক্ষমতা খুবই সীমিত। ঈশ্বর তত্ত্ব আধ্যাত্মিক ব্যাপার, এটা ম্যাটার নয়, ম্যাটার নয় বলে একে মিটারে মাপা যাবে না, লিটারে মাপা যাবে না, কিলোগ্রামে মাপা যাবে না, তার মানে প্যাটার্ন সৃষ্টি করা যাবে না, এই অর্থে ধর্ম অযৌক্তিক। কিন্তু তার নিজস্ব এক যুক্তি আছে, যেটা super logic, তিনি অনন্ত, তিনি আবার সান্ত হয়ে আসতে পারেন, তখন তাঁকে জীবনমুক্ত রূপে দেখতে পারি। জ্ঞানীরা, যাঁরা ভগবান মানেন না, তাঁরা জীবনমুক্ত দেখবেন। যেমন মুসলমানরা অবতার মানে না, মহম্মদকে তারা প্রফেট রূপে দেখছে, তাঁকে বলছে পয়গম্বর, ঈশ্বরের দূত। তারা ঈশ্বরের দূত বলছে, যেটা আমাদের এখানে জীবনমুক্তের প্রায় কাছাকাছি হয়ে যাচ্ছে। আমরা যেভাবে অবতার বলব, অন্য systemএ আরেকটা কিছু বলবে। আমরা বলব, এটা কি করে হয়? স্বামীজী নিজেই আগে যে কথাগুলো বললেন সেখানে অন্য রকম কথা বলেছেন। ধর্মে ঠিক এই জিনিসটাই এসে যায়। আমার মনের গঠন কি রকম, তার উপর নির্ভর করে, জিনিসটাকে কিভাবে দেখা হবে। স্বামীজী আগে যীশুকে অবতার রূপে দেখালেন, এবার জীবনমুক্ত রূপে দেখাচ্ছেন। ভগবান বুদ্ধের ব্যাপারটা আবার অন্য রকম, তাঁকে বোধিসত্ত্ব রূপে দেখা হয়। জীবনমুক্তের সেই ক্ষমতা থাকে, যিনি অপরকেও পারে নিয়ে যেতে পারেন। আর অবতাররাও এই কাজ পারেন। কোথাও এসে দুটো যেন মিলে যায়। শেষ পর্যন্ত এটা ভাবের ব্যাপারে এসে দাঁড়ায়, যাঁর যেমন ভাব তিনি জিনিসটাকে সেইভাবে দেখবেন।

এবার বলছেন, এই যে কদাচিৎ যীশুর মত একজনকে দেখা হল, একজন ভগবান বুদ্ধকে দেখা হল, কালে এনারা থোলো থোলো হবেন। তার মানে রাস্তায় রাস্তায় এই রকম জীবনমুক্ত ঘুরে বেড়াবেন। আলেকজাণ্ডারের সময় কিছু কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়, সেই সময় ভারতে ব্রাহ্মণরা যাঁরা ছিলেন তাঁরা এমন জ্ঞানী, এমন পণ্ডিত আর ত্যাগ তপস্যায় এমন প্রতিষ্ঠিত, সচরাচর এমন পাওয়া যায় না। সমাজে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম মানুষের সমাবেশ হয়। স্বামীজী সেটাই বলছেন In time to come Christs will be in numbers like bunches of grapes on a vine, then the play will be over and will pass out. As water in kettle beginning to boil shows first one bubble, then another, then more and more, until all is in ebullition and passes out as steam. (*আঙুরগাছে যেমন থোলো থোলো আঙুর ফলে, ভবিষ্যতে তেমনই থোলো খ্রীষ্টের অভ্যুদয় হবে। তখন সংসার খেলা শেষ হয়ে*

যাবে। সকলেই সংসারচক্র থেকে বেরিয়ে মুক্ত হয়ে যাবে। যেমন একটা কেটলিতে জল চড়ানো হয়েছে; জল ফুটতে আরম্ভ করলে প্রথমে একটার পর একটা করে বুদ্বুদ উঠতে থাকে, শেষে সমস্ত জলটা টগবগ করে ফুটতে থাকে ও বাষ্প হয়ে বেরিয়ে যায়।) কেটলিতে জল গরম করার সময় প্রথমে একটা দুটো জলের বুদ্ বুদ্ উঠতে শুরু করে, এইভাবে ফুটতে ফুটতে সব জল বাষ্প হয়ে বেরিয়ে যায়। সৃষ্টিতে জীবও ঠিক এই রকম, কোন জীবের যখন অদ্বৈত জ্ঞানপোলব্ধি হয় গেল, তখন তার মুক্তি হয়ে গেল। যীশু হলেন সেই মুক্ত পুরুষ যাঁর মুক্তি হয়ে গেছে। এটা আমরা দেখছি জ্ঞানীর দৃষ্টিতে। স্বামীজীকে আমরা কখন দেখছি ঠাকুর তাঁকে সপ্তর্ষি মণ্ডল থেকে নিয়ে এসেছেন, আবার কখন দেখছি তিনি এক যুবক যিনি নিজের সাধনার জোরে সিদ্ধ পুরুষ হয়েছেন। দুটো দু রকমের দৃষ্টিভঙ্গী, প্রথমটা হলে ভক্তের দৃষ্টিভঙ্গীতে, দ্বিতীয়টা জ্ঞানীর দৃষ্টিতে। এখানে স্বামীজী জ্ঞানীর দৃষ্টিতে বলছেন, এমন একটা সময় আসবে যেখানে থোলো থোলো আঙুরের মত জীবনমুক্ত জগতের বুকে বিচরণ করবে। আর বলছেন, কেটলিতে জল গরম করার সময় জলের মধ্যে কিছুক্ষণের মধ্যে একটা দুটো বুদ্বুদ উঠতে শুরু করে, তারপর টগবগ করে ফুটতে ফুটতে সব জল বাষ্প হয়ে উড়ে যায়, ঠিক তেমনি জীব আর নেই, সৃষ্টি শেষ।

বলছেন, Buddha and Christ are the two biggest 'bubbles' the world has yet produced. (*বুদ্ধ ও খ্রীষ্ট এই পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় দুটি বুদ্বুদ।*) ভগবান বুদ্ধ আর যীশুখ্রীষ্ট এনারা দুজন হলেন যেন বিরাট বুদ্বুদ। Moses was a tiny buble, greater and greater ones came. (*মুশা ছিলেন একটি ছোট বুদ্বুদ, তারপর ক্রমশঃ বড় বড় আরও সব বুদ্বুদ উঠেছে।*) মোজেসেরও ধর্মের জগতে বড় অবদান রয়েছে, স্বামীজী নিজের মত যীশুর সাথে তুলনা করে বলছেন, মোজেস তাঁর তুলনায় যেন একটা ছোট বুদ্বুদ। জহুদিরা অবশ্য এই তুলনাকে মানবে না, তাদের কাছে মোজেস অনেক বড়, সেই তুলনায় যীশু অনেক সাধারণ। তারপর আরও বড় বড় বুদ্বুদ এলেন। Sometime, however, all will be bubbles and escape; but creation, ever new, will bring new water to go through the process all over again. (*কিন্তু সৃষ্টি তো অবিরাম প্রবাহে চলছে, আবার নূতন জলের সৃষ্টি হয়ে ঐ পূর্ব প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চলতে থাকবে।*) ধীরে ধীরে এমন হবে যে অনেক অনেক জীবনমুক্ত হয়ে যাবে, সবাই একদিন মায়ার রাজ্য ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু সৃষ্টি এমনই এক জিনিস যে এর শেষ কোন দিন হবে না, আবার নূতন করে সৃষ্টি এসে যাবে; যার জন্য সৃষ্টিতত্ত্ব খুব কঠিন। সৃষ্টি কিভাবে হয় আমরা জানিনা। যে ধারণাগুলো নিয়ে আমরা বড় হয়েছি, যে ধারণাগুলো আমরা বুঝি, সেই ধারণাগুলো সৃষ্টিতত্ত্বে কাজ করে না। বিভিন্ন ধর্মে সৃষ্টিতত্ত্বে একটা চক্রের কথাই পাওয়া যায়। এই সৃষ্টি হয়ে গেছে। এর শেষ কিভাবে হবে? এক এক করে সব ঈশ্বরের নাম করবে, সাধনা করবে, একটা সময় সৃষ্টি শেষ হয়ে যাবে। এরপর ঈশ্বর সবার বিচার করবেন, বিচারের পর কেউ স্বর্গে যাবে, কেউ নরকে যাবে। আমাদের কাছে সৃষ্টি চক্রাকারে চলতেই থাকবে। এই চক্রাকারের নিয়মে আবার ব্রহ্মার দিন ও রাত এসে যায়, তার মানে একটা চক্র হল ব্রহ্মার একটি জীবন। এই সৃষ্টি নাশ হওয়ার পর আবার যখন কল্পান্তে সৃষ্টি হবে তখন যে জিনিসগুলো দিয়ে আগের আগের কল্পে সৃষ্টি হয়েছিল, সেই জিনিসগুলি দিয়েই নূতন সৃষ্টি হবে। কিন্তু ব্রহ্মার জীবন শেষ হয়ে যাওয়া মানে সৃষ্টি শেষ, এটাকে স্বামীজী তুলনা করছেন, সমস্ত জল বুদ্বুদ হয়ে বাষ্প হয়ে গেল।

কিন্তু ঈশ্বর অনন্ত, তাঁর যখন ইচ্ছে হবে তখন আবার তিনি নূতন সৃষ্টি শুরু করবেন। তাঁর কাছে জীবাত্মা তৈরী করা কোন ব্যাপারই নয়। কারণ, তিনি সচ্চিদানন্দ, তিনি অখণ্ড, তিনি অনন্ত, তিনি যেমনি মায়ার আবরণ নিয়ে নিলেন তেমনি কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড, কোটি কোটি জীবাত্মা দাঁড়িয়ে গেল। আবার খেলা শুরু হয়ে গেল, এই খেলা চলতেই থাকবে। একটা সৃষ্টির নাশ হয়ে গেলে কিছু দিন এই খেলা থাকবে না। কত দিন থাকবে না, কেউ বলতে পারবে না। কারণ তিনিই আছে, তিনি সচ্চিদানন্দ, তিনিই আবার জগৎ রূপে আছেন। এভাবেই চলতে থাকবে। কিন্তু আমরা জগৎকে যেভাবে দেখি, যেখানে আমরা যীশুকে জ্ঞানী দেখছি, বুদ্ধকে জ্ঞানী দেখছি, কিন্তু একটা সময় আসবে যখন রাস্থা-ঘাটে, হাটেবাজারে জ্ঞানীরা ঘুরে বেড়াবে, স্বামীজী বলছেন থোলো থোলো আঙুরের মত খ্রীষ্টের আবির্ভাব হবে।

ডারইউনের Theory of Evolutionকে কিছু কিছু পণ্ডিতরা নিয়েছিলেন, তার মধ্যে মিৎসে খুব নামকরা দার্শনিক ছিলেন, তিনি আবার এই থিয়োরীকে আধার করে সুপারম্যানের ধারণা নিয়ে এসেছিলেন। আর বার্ণাড'শ এটাকে আধার করে 'Man in Superman' নামে খুব বিখ্যাত নাটক রচনা করেছিলেন। এখন সুপারম্যান বলতে আমরা কি বুঝি? মিৎসের একটা ধারণা আছে, বার্ণাড'শয়ের অন্য একটা ধারণা আছে। স্বামীজীর কাছে সুপারম্যানের ধারণা হল জীবনমুক্ত, যাঁর কাছে আত্মজ্ঞান আছে। স্বামীজীর কাছে যীশু হলেন সুপারম্যান, বুদ্ধ সুপারম্যান, কারণ তাঁরা নিজেকে জেনে গেছেন। নিজেকে জানা মানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে জেনে যাওয়া, আর জানা মানেই মালিক হয়ে যাওয়া। যেমন পদার্থকে জেনে গেলে আমরা পদার্থের মালিক হয়ে যাব, যেমন খুশি তাকে চালাতে পারব। এনার্জিকে আমরা জেনে গেলাম, আমরা তার মালিক হয়ে গেলাম। আত্মাকে জেনে যাওয়া মানে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে শক্তি, যেটা তার আধার, সেটাকে জেনে গেলে তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মালিক হয়ে গেলেন। একটা জিনিসকে জানা মানেই সেই জিনিসের উপর তার ক্ষমতা এসে যাওয়া। এই যে ক্ষমতা, যেটা ইতিহাসে মাত্র কয়েকজনের হয়েছে, স্বামীজী বলছেন এটা হল sign, একটা বুদ্বুদ উঠল মানে আরও বুদ্বুদ উঠবে, উঠতে হবেই। আমরা বলতে পারি, দু হাজার বছরে মাত্র একটা বুদ্বুদ উঠল? কিন্তু আমরা জানি না যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে আয়ু তাতে দু হাজার বছরের কোন দাম নেই। একটা সময় আসবে যখন সবারই আত্মজ্ঞান হয়ে যাবে।

বার্ণাড'শয়ের আরেকটা নাটক আছে, যাতে তিনি দেখাচ্ছেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ক্ষমতা অর্জন করা নিয়ে একটা পরিকল্পনা কি রকম হতে পারে। এই আইডিয়াগুলো, বিশেষ করে মানুষ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে উন্নত হতে হতে শেষ পর্যন্ত কোথায় পৌঁছাবে, অনেকের মাথাতেই ঘোরাফেরা করছিল। কিন্তু এই জায়গাতে একটা সমস্যা থেকে যায়, যদিও স্বামীজী Theory of Evolution নিচ্ছেন না, evolutionএর থিয়োরী মানে একটা জিন, একটা প্রজাতি ক্রমশ এগিয়ে যেতে থাকে, এগিয়ে যেতে যেতে ক্রমশ সে উন্নত প্রজাতিতে চলে যাচ্ছে। স্বামীজী বলছেন, শুধু এগিয়েই যায় না, পিছিয়েও আসে। কখন পিছিয়ে আসে? কর্ম যদি খারাপ হয় তখন পিছিয়েও আসে। তার মানে, Evolution প্রাণীরও হয় না, জিনেরও হয় না, হয় আত্মার। আত্মার উপর যে জ্ঞান সেটারই উন্নতি হয়, কঠোপনিষদে যমরাজও বলছেন জ্ঞান আবার *যোগ হি প্রভবাপ্যয়ৌ*, যতক্ষণ না পূর্ণ জ্ঞান অর্থাৎ বিজ্ঞানী হয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ জ্ঞান কখন বাড়ে কখন কমে। ঠাকুর যেমন বলছেন, জ্ঞানীও ভয়তরাসে, এর অর্থ হল, যার পুর্ণজ্ঞান প্রাপ্ত হয়নি তার ওঠা নামা হবে।

ডারউইনের থিয়োরী, ডারউইনের সাথে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের থিয়োরী, বার্ণাড'শয়ের থিয়োরী, সবার থিয়োরীর সাথে এখানে এসে স্বামীজী যেটা বলছেন তার অনেক তফাৎ হয়ে যায়। এনারা সবাই ছিলেন খ্রীশ্চান পরম্পরার, খ্রীশ্চান পরম্পরায় ভগবান সৃষ্টি করে দিলেন, ভগবান যখন সৃষ্টি করেছেন তখন নিশ্চয় তাঁর কোন উদ্দেশ্য থাকবে। কি সেই উদ্দেশ্য? যে উদ্দেশ্যই হোক তাদের কাছে সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ করাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য। তখন খ্রীশ্চানরা এটাকে নিয়ে অনেক কিছু ভাবতে শুরু করে। ভগবানের সৃষ্টিতে আমরা হলাম শ্রেষ্ঠ জীব, বাইবেল এই কথা বলছে, বাইবেল থেকে কোরানেও এই কথা এসেছে। সেইজন্য ভগবানের উদ্দেশ্যকে সার্থক করাই আমাদের চরম লক্ষ্য। কিন্তু কোথা থেকে শুরু করবে? একটা স্টার্টিং পয়েন্টকে তো থাকতে হবে, তাহলে evolution যে এগোচ্ছে তার একটা পরিসমাপ্তি হবে, ওই পরিসমাপ্তিতে পৌঁছে যাওয়াটাই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। কিন্তু ভারতীয় চিন্তাধার পুরো অন্যভাবে চলে। ভারতীয় চিন্তাধারায় কিছু হয়ে হওয়াটা উদ্দেশ্য নয়, আমাদের কাছে becomingটা important না, being টা important। Becoming মানে আমাকে এটা হতে হবে, ওটা হতে হবে, অমুক হতে হবে। বাচ্চা বয়স থেকে বড়রা বাচ্চাদের জিজ্ঞেস করে যাচ্ছে, বড় হয়ে তুমি কি হতে চাও? কোন বাচ্চা যদি বলে 'আমি আমি হতে চাই'। সবাই ধরে নেবে এর মাথাটা গেছে। যারা কিছু হতে চায় না, তাদেরও অনবরত বলে যাচ্ছে, কিছু একটা তোমাকে হতে হবে, বড় হয়ে তোমাকে ডাক্তার হতে হবে, ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে, অমুক হতে হবে, তমুক হতে হবে। কেউ একবারও বলছে না, তুমি শুদ্ধ পূর্ণ আত্মা, তুমি আত্মজ্ঞানী হও। কেউ আছেন যে বাড়িতে গিয়ে আজ আমার সন্তানকে বলব, বাছা! তুমি আত্মজ্ঞানী হও? কোন দিন কেউ বলবেন না। ভক্ত পরিবার থেকে কেউ যদি সন্ন্যাসী হয়ে যায় তখন ঠাকুর থেকে শুরু করে মঠের আজকের যত সন্ন্যাসী আছে সবার আদ্যশ্রাদ্ধ করতে শুরু করে দেবে। ক্ষুদিরাম বোস অপরের বাড়িতে হোক, আমার বাড়িতে না, সন্ন্যাসীদের আমরা প্রণাম

করব, প্রণামী দেব, সেবা করব, সব করব কিন্তু আমার বাড়ির যেন কেউ সন্ন্যাসী না হয়। কেউ কারুর সন্তানকে বলে না যে, বাবা তোমাকে কিছু হতে হবে না, তুমি যা তুমি তাতে প্রতিষ্ঠিত হও, তুমি আত্মজ্ঞানী হও।

সোমবার, ২৪শে জুন

স্ফটিককরণ ও আধ্যাত্মিক সাধনা

২৪শে জুন ক্লাশে স্বামীজী নারদীয় ভক্তিসূত্র গ্রন্থের উপর আধার করে খুব সংক্ষেপে মূল বক্তব্য বলছেন, মাত্র দুই থেকে তিন পাতার মধ্যেই স্বামীজীর বক্তব্য শেষ হয়ে যায়। এতে বোঝা যায় যে স্বামীজী একটা দিনই শুধু নারদীয় ভক্তিসূত্রের উপর ক্লাশ নিয়েছিলেন। স্বামীজী এখানে ভক্তিসূত্রের সারটুকুই বলছেন। পাত্রতা যদি থাকে তখন একটা দুটো মূল কথা বলে দিলেই হয়ে যায়। পাত্রতা তৈরী না থাকলে অনেক কথা এদিক সেদিক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলতে হয়। স্ফটিক তৈরী করার সময় যে জিনিসটাকে স্ফটিক বানানো দরকার, যেমন ফিটকিরি, সেটাকে জলের মধ্যে ঢেলে যাচ্ছে, এইভাবে পুরো একটা সলিউশান যখন তৈরী হয়ে গেল সেটা আর নেবে না, তখন ওটাকে আগুনে ফোটাতে হয়। জলের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার জন্য ওর থেকে আরও কিছু স্ফটিক পড়ে যাবে, ওই স্ফটিক পড়ে গেলে আর ও কিছু নিতে পারবে না। তখন একটা শুদ্ধ, ৯৯.৯% পিওর বা ১০০% পিওর স্ফটিক বাইরে থেকে যদি দিয়ে দেওয়া হয় তখন ওই পুরো জিনিসটাকে নিয়ে একটা স্ফটিক তৈরী হয়ে যাবে, বাকি গুলো গাদ হয়ে পড়ে থেকে যাবে। সাধন জীবন একেবারে ঠিক এই রকম, এখানে কোন তফাৎ নেই। এখন আমরা যত বই পড়ে যাচ্ছি, শুনে যাচ্ছি, এতে কিছুই হবে না। কিছুই হবে না বলতে, জীবনে কিছুই হবে না তা নয়। বক্তব্য হল, একটা কথা শুনে নিলেই যে হয়ে যাবে, তা হবে না। ঠাকুর বলছেন, সময় না হলে কিছু হবে না, তবে শুনে রাখতে হয়। শুনে রাখতে কেন বলছেন? শোনা মানে ক্রিস্টাল পড়ছে। কিছু হওয়াটা মানে, যখন ক্রিস্টালাইজেশান হয়ে যায়।

জ্ঞানের সাধনা, ভক্তির সাধনা মানেই তাই, ক্রিস্টালাইজেশানের সাথে যে তুলনা তার সাথে এর কোন তফাৎ নেই। আলোচনা করা, শাস্ত্র অধ্যয়ন করা, সাধুসঙ্গ করা, জ্ঞানীদের সঙ্গ করা, এতে জ্ঞানের যেসব কথা মনের ভিতরে এসে পড়ছে, মনটা যেন দ্রবণ সেখানে ক্রিস্টাল গুলো পড়ছে। মন যখন আর নিতে পারে না, তখন তাকে সাধনা করতে হবে, সাধনা মানে জপধ্যান করা, মানুষের সেবা করা, নিঃস্বার্থ ভাবে কাজকর্ম করা। সাধনা করলে মনের ক্ষমতা বাড়ে। মনের ক্ষমতা বাড়লে তখন আরও জ্ঞানের কথা নিতে পারে। মহাপুরুষদের কথাগুলো হল ১০০% পিওর, তখন একটি কথা এসে পড়বে আর দুম্ করে ক্রিস্টালাইজেশান হয়ে যাবে। তখন সেও একজন মহাপুরুষ হয়ে গেল। এর খুব প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হল, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে বৈষ্ণবদের নিয়ে কথা হচ্ছিল, বৈষ্ণবরা জীবে দয়ার কথা বলে। এই কথা বলেই হঠাৎ ঠাকুর থু থু করতে শুরু করলেন আর বলছেন, জীব অতি সাধারণ, সে কি দয়া করবে! সাধারণ জীব শুধু ঈশ্বর জ্ঞানে জীবের সেবা করতে পারে। নরেন তখন সেখানেই উপস্থিত ছিলেন। পরে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নরেন অন্যান্যদের বলছেন, 'আজ আমি এক বিশেষ কথা ঠাকুরের মুখে শুনলাম, যদি কোনদিন সুযোগ পাই এটাকে আমি করে দেখাব'। ঠাকুরের কাছে সেই সময় আরও অনেকে ছিলেন, তাঁরাও কেউ কম কিছু না? কিন্তু তাঁদের মাথায় তো এটা আসেনি। ঠাকুর একটা কথা একবার বলেননি, পরেও অনেকবার বলেছেন, তখনও তো কারুর মাথায় আসেনি। শুধু তাই নাই, স্বামীজী যখন সেবার কাজ শুরু করলেন, তখন তাঁর গুরুভাইরা আপত্তি করেছেন। তফাৎ হল, স্বামীজীর মন তৈরী ছিল।

স্বামীজীকে যদি আমরা ঋষি রূপে নিই, যাঁকে সপ্তর্ষিমণ্ডল থেকে আনা হয়েছে, তাঁর মন তাই একেবারে তৈরী। অবতারের একটা করে কথা পড়ছে আর সেই কথা ঋষিদের মাধ্যমে কার্যে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। বেদ এভাবেই রচিত হয়। ঈশ্বরের ভাব ঋষির মুখ দিয়ে বেরোয়। সপ্তর্ষিমণ্ডলের ব্যাপারটা না নিয়ে আমরা হিন্দুদের মতে বলতে পারি, জন্মজন্মান্তরের সাধনাতে স্বামীজীর মনটা তৈরী হয়ে গিয়েছিল। যেই ঠাকুরের একটা করে কথা পড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে ক্রিস্টালাইজেশান হয়ে যাচ্ছে। আর যদি বলা হয় আমরা অত সপ্তর্ষিমণ্ডলেও যেতে চাই না আর জন্মজন্মান্তরের প্রসঙ্গে যেতে চাই না, খুব সহজ ভাবে যেখানে বলা যেতে

পারে, তিনি জন্মালেন, বাচ্চা বয়স থেকে তিনি নিজেকে প্রস্তুত করেছেন, এত কথা শুনেছেন, এত শাস্ত্র পড়েছেন, এত চিন্তন করেছেন, এত ধ্যান-ধারণা করেছেন, ওনার মন তৈরী। আমরা স্বামীজীকে এই তিনটের মধ্যে একটাই নেব, হয় তিনি সপ্তর্ষিমণ্ডল থেকে আসা ঋষি, নয়তো তিনি জন্মজন্মান্তর ধরে সাধনা করে করে সিদ্ধির দিকে এগোচ্ছেন, আর তা না হলে জন্মালেন, সাধনা করলেন, মারা গেলেন। এই তিনটের মধ্যে যে কোন একটাই আমরা নেব। কিন্তু বিষয়টা থেকে যাচ্ছে, ওখানে সবাই এত কথা শুনল, একবার না হয় বহুবার ঠাকুরের কাছে শুনল, কিন্তু কারুর মনে তো হল না যে জীবে দয়া করাটা হবে না, এটা সেবা হবে। শুধু এই একটা কথা না, স্বামীজীর যে পুরো রচনাবলী, এখানে আমরা যে পর পর স্বামীজীর কথাগুলো আলোচনা করে যাচ্ছি, অবাক হয়ে যেতে হয় যে স্বামীজী এটা কি করে পারছেন? পারছেন এই কারণেই, ওনার যে সলিউশানটা, যেখান থেকে ক্রিস্টাল তৈরী হয়, সেটা সুপারস্যাচুরেটেড হয়ে গেছে। একটা করে ক্রিস্টাল আসছে আর ক্রিস্টাল ফর্ম করে যাচ্ছে।

আমরা যে জ্ঞান অর্জন করি, ঐ জ্ঞানকে ভিত্তি করে আমরা অপর কাউকে তখনই শিক্ষা দিতে পারব, যখন নিজে একটা ক্রিস্টাল হয়ে যাব। নিজে ক্রিস্টাল না হলে কোন দিন কাউকে শিক্ষা দিতে পারবে না। আমরা মনে করতে পারি যে ঠাকুর তো পড়াশোনা করেননি। ঠাকুরকে একজন এসে বলছে, আপনি তো মশাই কিছুই পড়েননি, ঠাকুর বলছেন শুনেছি কত। জিনিসটা একই, পড়া হোক আর শোনাই হোক ক্রিস্টাল আসতে হবে। যে পাত্রতার কথা বলতে গিয়ে এতগুলো কথা বলতে হল, এখানে স্বামীজী যাঁদের শিক্ষা দিচ্ছেন তাঁরা কিছু দিন ধরে স্বামীজীর সঙ্গে থাকছেন, তাঁর কথা শুনেছেন, বিশেষ করে নিউইয়র্কে তাঁদের একটা প্রস্তুতি হয়ে গেছে। আমরা এটা ধরেই নিচ্ছি থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে স্বামীজী দু ঘন্টা ক্লাশ নিতেন। এদিনও তিনি দু ঘন্টার ক্লাশ নিচ্ছেন আর তিনি এক জায়গায় না বসে ঘুরে ঘুরে তাঁর কথাগুলো বলে যাচ্ছেন। খুব সংক্ষেপেও যদি বলতে হয় তাতে নারদীয় ভক্তিসূত্র দু ঘন্টায় বলা যেতে পারে, বিশেষ করে তার সার তত্ত্বগুলো। নারদীয় ভক্তিসূত্রে ঠিক কি আছে, আর স্বামীজী কি বলেছিলেন সেটাকে আমরা খুব সংক্ষেপে আগে বলে নিচ্ছি।

ঈশ্বরের পথে এগোবার যে সাধনা, সাধারণ ভাবে তার দুটি পথ, একটা জ্ঞান পথ আরেকটি ভক্তি পথ। যদিও কর্ম ও যোগ পথের কথাও বলা হয়, কিন্তু কর্মকে বলা হয় বহিরঙ্গ সাধন আর যোগ হল অন্তরঙ্গ সাধন। পথ কিন্তু দুটি, জ্ঞান আর ভক্তি। স্বামীজী যদিও বলছেন, কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি এক কিন্তু ঠিক ঠিক ভিতরে যদি যাওয়া হয় তখন দেখা যাবে বহিরঙ্গ সাধন মানেই কর্ম। পূজা, জপ, ধ্যান সবটাই কর্ম, কর্ম সব সময় বাইরে সাধনা করা হয়। যখন ধ্যানের মাধ্যমে বৃত্তিগুলোকে কমানো হয় তখন সেটাও কর্ম, কিন্তু সেটাই যখন বিশেষ বিধিতে করা হয় তখন সেটাকে বলা হয় যোগ, যোগকে বলা হয় অন্তরঙ্গ সাধনা। কর্ম ও যোগের মাধ্যমে সাধনা করতে করতে এই দুটো তখন জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে যে কোন একটা পথকে ধরে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যায়, হয় জ্ঞানের পথ নয়তো ভক্তির পথকে অবলম্বন করে এগিয়ে যায়। জ্ঞান পথের সাধক শেষে দেখে আত্মাই আছেন, জ্ঞানীর সাধনা মানেই নেতি নেতি সাধনা, নেতি নেতি মানে যা কিছু অনাত্ম বস্তু, তাকে বাদ দিয়ে দেওয়া। ভক্তিতে হয় ইতি ইতি, ইতি ইতি মানে ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন, ঈশ্বরের বাইরে কিছু নেই। জ্ঞানমার্গীর সাধক খুব কম হন। কিন্তু বিভিন্ন ধর্মের ইতিহাস আর, যে কোন ধর্মের গভীরে গেলে প্রত্যেক ধর্মেই জ্ঞানমার্গী সাধক পাওয়া যাবে। কিন্তু সাধারণ ভাবে ধর্ম মানেই ভক্তিমার্গের সাধক। তবে বৌদ্ধ ধর্ম পুরোপুরি জ্ঞানমার্গের সাধনা, জৈন ধর্মও তাই, পুরোপুরি জ্ঞানমার্গের সাধনা। খ্রীশ্চানিটি সেদিক দিয়ে একটু অন্য রকম, খ্রীশ্চানিটিকে কখন মনে হয় জ্ঞানমার্গের সাধনা, কখন মনে হবে ভক্তিমার্গের সাধনা। ইসলাম, জুদাইজিম্, পার্সি এগুলো পুরোপুরি ভক্তিমার্গের সাধনা। কিন্তু তাদের মধ্যেও জ্ঞান পথ ইচ্ছে করলে নিতে পারে। তবে সাধারণ ভাবে ধর্ম মানেই ভক্তিমার্গ।

ভগবান গীতায় চার ধরণের মানুষের কথা বলছেন, যারা ঈশ্বরের পথে আসেন – *আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ*, আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই চার ধরণের মানুষ ঈশ্বরের পথে আসেন। ভক্তও তাই চার প্রকার। কারুর মধ্যে কোন কিছুর কামনা আছে, টাকা-পয়সা চাইছে বা অন্য কিছু চাইছে, এরা হলেন অর্থার্থী। আর্ত মানে, কোন বিপদে পড়ে গেছে, সেই বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য ভগবানকে ভক্তি করছে, যেটা সাধারণ মানুষ দিনরাত করছে, কোন ঝামেলায় পড়ে গেলে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে।

জীজ্ঞাসু, আচ্ছা মানুষ কেন সাধন-ভজন করে, কেন সন্ন্যাসী হয়, সত্যিই ঈশ্বর বলে কেউ আছেন কিনা, এই জিজ্ঞাসা মনে জেগেছে, সেখান থেকে মানুষ ভক্তিমার্গে চলে যায়। আর শেষে হলেন জ্ঞানী। এইভাবে গীতা ভক্তিমার্গের একটা শ্রেণীবিন্যাস করছেন। এটা যেমন এক রকম শ্রেণীবিন্যাস, আবার অন্য রকম শ্রেণীবিন্যাসও করা যেতে পারে; মানুষ যখন ঠিক ঠিক ভক্তির দিকে যেতে শুরু করে, ঈশ্বরকে যখন পেতে চাইছে, একটা আদর্শকে যখন পেতে চায়, তখন ভক্তি দুই প্রকার হয়ে যায়। একটা হল পাঁচ জনের কাছে ধর্মের কথা শুনেছে, বইতে পড়েছে, গুরু বলে দিয়েছেন, এটাকে এবার সাধনা রূপে নিয়ে খাটতে শুরু করল। যেমন, কেউ শুনেছে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী নিলে চাকরি পাওয়া যাবে, চাকরি পেলে টাকা হবে, বিয়ে করা যাবে, বাড়ি হবে, ঘর-সংসার করা যাবে, সেইজন্য সে এবার একটা ডিগ্রী নেওয়ার চেষ্টা করছে। আবার সারা বিশ্বে কদাচিৎ কেউ কেউ একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা বিষয়কে জানার জন্য ভর্তি হয়। উপনিষদে এই ধরণের অনেক কাহিনী আছে, যেমন সত্যকাম গুরুর কাছে গিয়ে বলছেন, আমি আপনার কাছে জানার জন্য এসেছি। ভক্তিতেও ঠিক এই রকম কেউ কেউ আছেন যিনি নিয়মিত শাস্ত্র পড়ে যাচ্ছেন, গীতায় যেমন ভগবান বলছেন *মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে*, হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কেউ কেউ এই পথে আসেন, *যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ*, এদের মধ্যে কদাচিৎ কেউ আমাকে তত্ত্বতঃ জানতে পারে, তার মানে ঠিক ঠিক ভক্তি মুষ্টিমেয় কয়েকজনরই হয়।

নারদীয় ভক্তিসূত্রে এবং কথামৃতেও ঠাকুর খুব পরিষ্কার করে বলছেন, ভক্তি দুই প্রকার – বৈধী ভক্তি এবং পরা ভক্তি বা রাগাত্মিকা ভক্তি বা প্রেমা ভক্তি। যে কোন ধরণের উপাচার, মন্দিরে গিয়ে প্রণাম করতে হবে, এত জপ করতে হবে, গঙ্গাজল খেতে হবে, মহাপ্রসাদ খেতে হবে, গুরুর নির্দেশে জপধ্যান করতে হবে, ভাল জীবন-যাপন করতে হবে, শুদ্ধ পবিত্র থাকতে হবে, সবটাই হয়ে গেল বৈধী ভক্তি। অনেক দিন বৈধী ভক্তি করতে করতে কখন কারুর মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি সত্যিকারের ভালবাসা জন্মে যায়। এই ভালবাসা কার মধ্যে জাগবে জানা নেই। সবাই এসে বলে, এত কিছু করে যাচ্ছি কিছুই তো হচ্ছে না, আদৌ কিছু হবে কিনা বুঝতেও পারছি না? তা নয়, *যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ*, যাঁরা চেষ্টা করে যাচ্ছেন তাঁদের মধ্যে কদাচিৎ কখন কেউ তাঁর ভক্তি পেয়ে যান। বিজ্ঞানে যেমন আইনস্টাইন, ঠিক তেমনি ধর্ম বিজ্ঞানেও কেউ কেউ আইনস্টাইন হয়ে যান। যেমন শ্রীমতী রাধা, তিনি কৃষ্ণ ছাড়া কিছু জানেন না, মীরাবাঈ কৃষ্ণ ছাড়া কিছু জানেন না। আবার হঠাৎ আধ্যাত্মিক রূপান্তর হয়ে গিয়ে পরা ভক্তির উদয় হয়ে যায়। যেমন তুলসীদাসের কাহিনী, যদিও তুলসীদাসের জীবন-কাহিনীতে অনেক অতিরঞ্জিত করা আছে, কিন্তু একটা জিনিসকে বোঝানর জন্য অতিরঞ্জিত করা যেতে পারে। তুলসীদাস স্ত্রীকে ছাড়া একটা রাতও থাকতে পারতেন না। একদিন তাঁর স্ত্রী বাপের বাড়ি গিয়েছেন, তুলসীদাস অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে গভীর রাতে স্ত্রীর কাছে হাজির হয়ে গেছে। স্ত্রী খুব বিরক্ত হয়ে স্বামীকে বলছেন, 'এই প্রীতি যদি তোমার রামের প্রতি থাকত তাহলে এতদিনে তুমি রামকে পেয়ে যেতে'। স্ত্রীর ওই একটি কথাতে তুলসীদাসের জীবন পুরো পাল্টে গেল। এই যে জীবনটা পাল্টে গেল, এবার তিনি পরা ভক্তিতে ঢুকে গেলেন। পরা ভক্তি মানেই যে সে তাঁকে পেয়ে যাবে তা না। বৈধী ভক্তিতে তো কোন দিনই ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে না, এটা ঠিক যে বৈধী ভক্তি তাকে কোন দিন নষ্ট হয়ে যেতে দেবে না, কিন্তু বৈধী ভক্তি কোন দিন ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যেতে পারবে না। বৈধী ভক্তি হল উড়োজাহাজের মত, এ্যারোপ্লেনের গতি যতই হোক পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে কোন দিন অতিক্রম করে বেরিয়ে যেতে পারবে না। পরা ভক্তি হল রকেটের মত, প্রথমে পৃথিবীতেই থাকে। উৎক্ষেপণের পর রকেট প্রথমে পৃথিবীর চারিদিকে প্রদক্ষিণ করতে থাকে, তারপর একটা সময় এসকেপ ভেলোসিটি নিয়ে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে অতিক্রম করে স্পেসে বেরিয়ে চলে যায়। তুলসীদাস পরা ভক্তিকে ধরে নিলেন, মীরাবাঈ পরা ভক্তিকে ধরে নিলেন। পুরো ভারতবর্ষে শ্রীমতি রাধাকে যেভাবে দেখা হয় তাতে শ্রীরাধার ভক্তিকে পরা ভক্তি বলাটা একেবারেই ঠিক হবে না, প্রেমা ভক্তিরও যেন উপরে, যেখানে তাঁর কাছে সব কিছুই কৃষ্ণময়, কৃষ্ণ ছাড়া তিনি কিছুই দেখছেন না।

নারদীয় ভক্তিসূত্রে বলছেন, উদ্দেশ্য হল প্রেমা ভক্তিতে আসা, পরা ভক্তিতে আসা, এই ভক্তিকে আমরা যে নামই দিই না কেন, এটাই নারদীয় ভক্তসূত্রের চরম লক্ষ্য। নারদীয় ভক্তিসূত্রে এই ভক্তিকে বলছেন, *সা তস্মিন্ পরমপ্রেমরূপা*। পরম প্রেমরূপ, যে প্রেম পরম হয়ে যায়, যে প্রেমের উপরে আর কিছু হতে পারে

না। অন্য কোন কিছুর দিকে আর দৃষ্টি নেই, খাওয়া-দাওয়া, সাজ-পোশাক, শরীরের যত্ন নেওয়া সব পড়ে থাকে, ওই পরম প্রেমের আমরা কল্পনা করতে পারব না। আর এই প্রেম *অমৃতস্বরূপ চ*, অমৃতের সাগরে পড়লে মানুষ যেমন অমর হয়ে যায়, ওই প্রেমাভক্তির উদয় হলে ভালবাসাটা অমর হয়ে যায়। বৈধী ভক্তি অমর হয় না, বৈধী ভক্তি ওঠা নামা করে, কখন ভক্তি কমে কখন ভক্তি বাড়ে। বৈধী ভক্তির কথাও নারদীয় ভক্তিসূত্রে বলা হয়েছে, তবে খুব কম বলা হয়েছে, বেশির ভাগই প্রেমা ভক্তির বর্ণনা করা হয়েছে। স্বামীজী নারদীয় ভক্তিসূত্রের মূল বক্তব্যটা খুব সংক্ষেপে বলছেন। তবে স্বামীজী যেটাই বলেন সেটাই নিজের মত করে বলেন, এখানেও নারদীয় ভক্তিসূত্রকে তিনি নিজের মত করে বলছেন। তবে মূল জিনিসটা মনে রাখা দরকার, তা হল, প্রেমা ভক্তি আর বৈধী ভক্তি। বৈধী ভক্তিতে যাঁরা থাকেন তাঁরা আচার্য হতে পারেন কিন্তু প্রেমা ভক্তিতে যাঁরা চলে যান তাঁরা সন্ত মহাপুরুষ হয়ে যান। প্রেমা ভক্তিতেও আবার অনেক রকম শ্রেনী আছে, তার মধ্যে অবতারও আছেন। ঠাকুর বলছেন অবতার মানুষকে প্রেম ভক্তির শিক্ষা দিতে আসেন। আবার আচার্য পর্যায়ের সন্তরাও আছেন। এই সব কিছুকে মিলিয়ে স্বামীজী এবার বলছেন।

নারদীয় ভক্তিসূত্র

ভক্তিসূত্রের প্রথম দিকের সূত্র *সা তস্মিন্ পরম প্রেমরূপা*, আর *অমৃতাস্বরূপা চ*, এই ধরণের কয়েকটি সূত্রকে স্বামীজী এবার ব্যাখ্যা করছেন – 'Extreme love to God is Bhakti, and this love is the real immortality, getting which a man becomes perfectly satisfied, sorrows for no loss, and is never jealous; knowing which man becomes mad'. (*ভক্তি ঈশ্বরে পরমপ্রেম-স্বরূপ এবং অমৃত-স্বরূপ – যা লাভ করে মানুষ সিদ্ধ হয়, অমৃতত্ব লাভ করে ও তৃপ্ত হয় – যা পেলে আর কিছুই আকাঙ্ক্ষা করে না, কোন কিছুর জন্য শোক করে না, কারও প্রতি দ্বেষ করে না, অপর কোন বিষয়ে আনন্দ অনুভব করে না এবং সাংসারিক কোন বিষয়েই উৎসাহ বোধ করে না – যা জেনে মানুষ মত্ত হয়, স্তব্ধ হয় ও আত্মারাম হয়।*) মত্তো ভবতি, becomes mad এর অর্থ তাই মনে হবে; কিন্তু স্বামীজী ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা ও প্রেমে মজে যাওয়াকেই বলতে চাইছেন। ঈশ্বরে ঠিক ঠিক ভক্তি ও ভালবাসায় কোন কামনা থাকে না, *ন তু কাময়েমানা* অথবা বলছেন *সা ন কাময়মানা নিরোধরূপত্বাৎ*, অর্থাৎ এর মধ্যে কোন কামনা থাকে না, আর এর মধ্যে কোন জার ভাব থাকে না, একেবারে শুদ্ধ পবিত্র প্রেম।

স্বামীজী ঠাকুরের কথা উল্লেখ করে বলছেন, My Master used to say, 'This world is a huge lunatic asylum where all men are mad, some after money, some after women, some after name or fame, and a few after God. (*গুরুদেব বলতেন, 'এই জগৎটা একটা মস্ত পাগলা-গারদ। এখানে সবাই পাগল, কেউ টাকার জন্য পাগল, কেউ মেয়েমানুষের জন্য পাগল, কেউ নামযশের জন্য পাগল, আর জনকতক ঈশ্বরের জন্য পাগল'।*) ঠাকুরকে একবার একজন বলেছিল, ইনি ঈশ্বর চিন্তা করে করে বেহেড হয়ে গেছেন। উল্টোপাল্টা কথা বলে কেউ নিন্দা করলে ঠাকুর একদম সহ্য করতে পারতেন না। গীতাদি পড়ে ও শুনে আমাদের ধারণা যে পরমহংস মানেই নিন্দা-স্তুতির পারে, ঠাকুর একেবারেই তা ছিলেন না। কেউ কিছু উল্টোপাল্টা কথা বলেছে খবর পেয়ে গেলে, সেই লোক সামনে এলে তাকে ধুচিয়ে একেবারে সোজা করে দিতেন। ঠাকুরও তাকে বলছেন, জড়ের চিন্তা করে করে তোমার মাথা ঠিক আছে আর আমি চৈতন্যের চিন্তা করে করে বেহেড হয়ে গেছি! যেমন ভাব তেমন লাভ, এই যে কথা বলা হয়, এটা আমাদের জানা দরকার যে, যে জিনিস নিয়ে আমার মন মজে আছে, মরে আমাকে সেটাই হতে হবে। মাণ্ডুক্যকারিকাতেও এটাই বলছেন, মানুষের যে ভাব সেই ভাবই তাকে রক্ষা করে, মৃত্যুর পর ওই ভাবের সাথেই সে এক হয়ে যায়।

মানুষ এখন টাকার জন্য পাগল। বর্তমান ভারতে এখন যা হচ্ছে ভাবলে আতঙ্ক লাগে। ক্ষমতা, মুনাফা আর সেক্স এই তিনটে ছাড়া মানুষের মাথায় আর কিছু নেই। হোয়াটসাপ, ফেসবুক হল আমাদের জ্ঞানের একমাত্র উৎস, কোথায় কে একটা কি লিখেছে, কে কি বলেছে সেটাকে কপি করে সবাইকে ফরোয়ার্ড করতে থাকবে, নিজের এক লাইন লেখার ক্ষমতা নেই, অপরের উচ্ছিষ্ট খেয়ে যাচ্ছে, আর অপরকে খাইয়ে যাচ্ছে। তাও তার মধ্যে সব ভুলভাল তথ্যে ভরা। জীবনটাকে আমরা একটা কেমন খেলো বানিয়ে দিয়েছি। একটু

আদপে যদি কারুর মন থাকে তাও সেটা থাকে টাকা-পয়সা আর ভোগ সামগ্রীতে। আর সেক্স তো এখন রাস্থাঘাটে গড়াগড়ি খাচ্ছে। খবরের কাগজে চোখ রাখলেই প্রতিদিন দেখা যাবে কিভাবে চারিদকে শীলহানি হচ্ছে। এর মধ্যেই কখন কদাচিৎ কেউ থাকেন যিনি ঈশ্বরের প্রতি মন দেন, বা জ্ঞানের প্রতি তার ভালবাসা জন্মায়, যেমন বড় বড় বিজ্ঞানীরা হন।

ঠাকুর বলতেন, I prefer to be mad after God. God is the philosopher's stone that turns us to gold in an instant. (*অন্যান্য জিনিসের জন্য পাগল না হয়ে ঈশ্বরের জন্য পাগল হয়াটাই ভালো নয় কি? ঈশ্বর হলেন পরশমণি।*) ভগবান হলেন পরশমণি, যাঁর ছোঁয়াতে লোহা সোনা হয়ে যায়। যাঁর হৃদয়ে ভক্তির উদয় হয়েছে বা ভক্তির বীজ অঙ্কুরোদ্‌গমন হয়েছে, তিনি মহাত্মা হয়ে গেছেন। নারদীয় ভক্তিসূত্রে পরে বলবে, যার মধ্যে ভক্তির উদয় হয়েছে সে তো ঈশ্বরের সাথে এক, এমনকি তাঁর কাছে যা কামনা করা হবে সেই কামনার পুর্তি হয়ে যাবে। কারণ সমস্ত কামনার পুর্তি তো ভগবানই করেন, তিনি আর ভগবান তো এক হয়ে গেছেন। কঠোপনিষদে বলছেন, *যো বিদধাতি কামান্*, যিনি সবার কামনার পুর্তি করেন, আত্মার ব্যাপারেই বলছেন। যিনি সন্ত মহাত্মা, যাঁর ভিতরে ভক্তির উদয় হয়েছে, তাঁর অন্তরাত্মা ঈশ্বরের সাথে এক, সেইজন্য তিনিও কামনার পুর্তি করে দিতে পারেন। আর তাঁদের কাছে গেলে সৎ চিন্তার উদয় হয়। বলছেন, the form remains, but the nature is changed – human form remains, but no more can we hurt or sin, (*'তাঁর স্পর্শে মানুষ এক মুহূর্তে সোনা হয়ে যায়;, আকারটা যেমন তেমনি থাকে বটে কিন্তু প্রকৃতি বদলে যায় – মানুষের আকার থাকে, কিন্তু তার দ্বারা কারও অনিষ্ট করা যেতে পারে না, কিংবা কোন অন্যায় কর্ম হতে পারে না'*।) ভক্তির উদয় হয়ে গেলে, ঈশ্বরকে জেনে গেলে বা ঈশ্বরের দিকে চলে গেলে, তার আকৃতিটা মানুষেরই থেকে যায়, মনটাও মানুষের, সব কিছুই মানুষের মত থেকে যায়, কিন্তু সে কাউকে কষ্ট দিতে পারে না, কোন পাপকর্ম অর্থাৎ কোন ভুল কাজ করতে পারে না।

বলছেন, Thinking of God, some weep, some sing, some laugh, some dance, some say wonderful things, but all speak of nothing but God. (*'ঈশ্বরের চিন্তা করতে করতে কেউ কাঁদে, কেউ হাসে, কেউ গায়, কেউ নাচে, কেউ কেউ অদ্ভূত বিষয় সব বলে। কিন্তু সকলেই সেই এক ঈশ্বরেরই কথা কয়'*।) ভক্ত ভগবানের কথা চিন্তা করতে করতে কখন কাঁদে, কখন ভাবে গান গায়, কখন হাসে, কখন নৃত্য করতে থাকে, কখন ঈশ্বর বিষয়ক রোমাঞ্চকর কথা বলে। ইমোশানস্ গুলো আলাদা আলাদা হতে পারে কিন্তু তাঁর মূল এক, শুধু ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ ছাড়া আর কোন কথা বলবেন না। গীতায় ভগবান বলছেন *কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ*, আমার ভক্তরা যখন পরস্পরের সাথে দেখা করে তখন তারা আমারই কথা বলে, আমার কথাতেই তারা আনন্দ পায়, আমার কথাতেই তারা রমণ করে। এখানে যাঁরা খুব উচ্চমানের ভক্ত তাঁদেরই বর্ণনা চলছে। এই ধরণের উচ্চমানের ভক্ত বলতে আমরা চৈতন্য মহাপ্রভুকে জানি, ঠাকুরকে জানি, আর যেভাবে বর্ণনা করছেন তার সবটাই এনাদের জীবনের সাথে মিলে যায়। মাস্টারমশাই কথামৃতে ঠাকুরের এই অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলছেন, ভাবে গর্‌গর্ মাতোয়ারা।

স্বামীজী বলছেন, Prophets preach, but the Incarnations like Jesus, Buddha, Ramakrishna can give religion; one glance, one touch is enough, *মহাপুরুষরা ধর্মপ্রচার করে যান – কিন্তু যীশু, বুদ্ধ, রামকৃষ্ণ প্রভৃতির ন্যায় অবতারেরা ধর্ম দিতে পারেন। তাঁরা কটাক্ষে বা স্পর্শমাত্রে অপরের মধ্যে ধর্মশক্তি সঞ্চারিত করতে পারেন।*) এর আগে যেখানে আমরা অবতার নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সেখানেও এই প্রসঙ্গটা এসেছিল। ধর্মের কথা আচার্যরাও বলেন আবার অবতাররাও বলেন, এই দুজনই ধর্মের কথা বলেন। আচার্য যে ঈশ্বরীয় কথা বলেন আর অবতার যে ঈশ্বরীয় কথা বলেন, দুজনের কথার মধ্যে কোন তফাৎ থাকে না, কথা দুজনেরই সমান। অবতার আর আচার্যের মধ্যে তফাৎ হয়ে যায় ক্ষমতায়। অবতারের শুধু কৃপা দৃষ্টিতেই কারুর মধ্যে ধর্মের উদয় হয়ে যাবে, অবতার চাইলে স্পর্শমাত্রেই কারুর মধ্যে ধর্ম জাগরণ করে দিতে পারেন।

স্বামীজীর ক্লাশে যাঁরা ছিলেন সবাই ধর্মে খ্রীশ্চান ছিলেন। বাইবেল পড়তে গেলে একটু ওল্ড টেস্টামেন্টের, বিশেষ করে জহুদিদের পরম্পরার ব্যাপারে ধারণা থাকা দরকার। জহুদিরা খুবই ধর্মপ্রাণ জাতি।

হিন্দুদের মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণরা বিদ্যার প্রতি সমর্পিত ছিলেন, জহুদিদের মধ্যেও বিদ্যাচর্চার প্রতি একটা সংস্কার ছিল, কিন্তু তাদের বিদ্যাটা একটু সঙ্কীর্ণ। হিন্দুদের ব্রাহ্মণরা যেচে কাউকে কখন বিদ্যা দিতে যেতেন না; যদি কেউ তাঁর কাছে বিদ্যাচর্চা করতে আসে, তিনি তখন তাকে বিচার করে দেখবেন, সে এই বিদ্যার জন্য যোগ্য কিনা ইত্যাদি। হিন্দুদের মধ্যে যেমন সন্ন্যাসী হয়, সাধু হয়, জহুদিদের মধ্যেও সন্ন্যাসী হতেন, তাঁদের প্রফেট বলা হত। আগে আমাদের গ্রাম দেশে দেখা যেত কোন সাধুবাবা ভিক্ষার জন্য ঘুরতে ঘুরতে কোন গ্রামে পোঁছে যেতেন, গ্রামের মন্দিরে তিন দিন থাকলেন, লোকের ভিক্ষা নিয়ে তাঁর কাছে হাজির হতেন, সন্ধ্যেবেলা গ্রামের সবাই মন্দিরে জড়ো হত, তিনি তাদের ধর্মোপদেশ দিতেন, বা কোথাও প্রবচন দিতে যেতেন। ব্রাহ্মণদের বিদ্যাচর্চা আর এই ধরণের সাধুদের যে সাধুত্ব ভাব, এই দুটোকে এক করে দিলে যা হবে, সেটাকেই জহুদিদের মধ্যে বলা হত প্রফেট। এনারা শাস্ত্র ভাল ভাবেই জানতেন, যেখানেই এনারা যেতেন সেখানেই শিক্ষা দিতেন। নামকরা একজন Preacher হলেন Jhon the Baptiest, যিনি Jesusকে ব্যাপটাইস্ করেছিলেন। যাই হোক এই ধরণের প্রফেটরা ছিলেন যাঁরা শিক্ষা দিতেন, ব্যাপটিজমের পরম্পরা ছিল। ব্যাপটাইস্ হওয়ার পর যীশু চলে গেলেন পাহাড়ে। এরপর তিন-চার বছর তাঁর কোন খবর পাওয়া যায় না। যখন ফেরত এলেন তখন তিনি যেখানেই যাচ্ছেন সেখানেই লোকেদের শিক্ষা দিতে লাগলেন। ভগবান বুদ্ধও নির্বাণ লাভ করার পর সবাইকে শিক্ষা দিতে শুরু করলেন। যীশুও তাই করতে লাগলেন, কুয়ো থেকে মেয়েরা জল তুলছিল, তাদের কাছে গিয়ে তিনি ধর্মীয় কথা বলতে শুরু করেছেন। গ্রামের মেয়েরা জল তুলছে আর যীশুর কথাও শুনছে, শুনে তারা সবাই অবাক হয়ে যাচ্ছে। বাইবেলে খুব সুন্দর বর্ণনা আছে, এরা অনেক প্রফেট দেখেছিল, but here was a person, who knew, were the authority। যীশুও পরে বলছেন, I have the authority। এটাকেই ঠাকুর বলছেন, চাপরাশ। গ্রামের অশিক্ষিত মেয়েরা কুয়ো থেকে জল তুলছিল, যীশুর কথা শুনে বলছে, ইনি আর দশজন প্রফেট নন, ইনি বলছেন, মনে হচ্ছে যেন তাঁর চাপরাশ আছে, মনে হয় উনি ঈশ্বরকে জেনেছেন। যখনই আমরা প্রফেট শব্দটা শুনি তখনই মনে হয় যেন প্রফেট মহম্মদের কথা বলতে চাইছেন, কিন্তু এখানে স্বামীজী মহম্মদের কথা বলছেন না। স্বামীজী প্রফেট বলতে, জহুদিদের এই প্রফেটদের কথাই বলতে চাইছেন। খ্রীশ্চান পরম্পরায় প্রফেট শব্দটা একটা technical term। স্বামীজী বলছেন, প্রফেট আর অবতারের মধ্যে তফাৎ কোথায়? অবতারের একটু কৃপা কটাক্ষ, বা একটু স্পর্শ করে দিচ্ছেন তাতেই তার সব অজ্ঞান অন্ধকার বিদূরিত হয়ে যাচ্ছে। ঠাকুরও একবার নরেনকে ছুঁয়ে দিলেন, নরেনের সব অলৌকিক দর্শন হতে শুরু হয়ে গেল।

That is the power of the Holy Ghost, the 'laying of hands' the power was actually transmitted to the disciples by the Master. (*খ্রীষ্টধর্মে এটাকেই পবিত্রাত্মার শক্তি বলেছে – এই ব্যাপারকে লক্ষ্য করেই 'হস্ত-স্পর্শের' কথা বাইবেলে কথিত হয়েছে।*) বাইবেলে আছে, যীশু জানছেন যে তিনি আর বেশি দিন নেই, তিনি অবতার, ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সবটাই তাঁর জানা; শিষ্যদের বলছেন, তোমরা এবার গিয়ে শিক্ষা দাও। শিষ্যরা বলছেন, আমরা কিছু জানি না, শিক্ষা দেওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। যীশু বলছেন, I will give you the authority as I was got authority from my Father। এটাই গুরু-শিষ্য পরম্পরা। যীশু যা করেছেন আর এখনও তাই করা হয়ে আসছে, বিবাহের সময় বা কিছু করার সময় পাদরি বলবেন, By the power invested upon me by the Church, চার্চ হল যীশুর স্থুল শরীর। ওই পাওয়ারটা পরম্পরায় চলে আসছে, কিন্তু যীশুর যে বারোজন শিষ্য ছিলেন তাঁরা হলেন বিশেষ। এই জায়গাতে আচার্য আর অবতারের মধ্যে বিরাট তফাৎ হয়ে যায়। ফল দিয়ে বৃক্ষকে জানা যায়; যদি জানতে হয় ইনি আচার্য না অবতার, তাহলে তাঁর শিষ্যদের গিয়ে দেখতে হয়। ইদানিং নামকরা সব আচার্যরা আছেন, কেউ নিজেকে ভগবান বলেন, কেউ শ্রীরাধার অবতার বলেন। যে যাই বলুক, এনাদের দেখে বিচার করতে যাওয়া ঠিক হবে না, এনাদের কথা ও কার্যকেও বিচার করতে যাওয়া যাবে না। এনাদের শিষ্যদের আগে খুঁজে বার করুন, দেখুন তাঁর শিষ্যরা কেমন। শিষ্যদের মধ্যে অপরকে আধ্যাত্মিক ভাব দেওয়ার ক্ষমতা কতটা আছে, কেমন আছে, সেটা দেখে বুঝতে পারা যাবে তাঁর ক্ষমতা আছে কি নেই। তিনি যদি অবতার হন, সিদ্ধ পুরুষ হন তাহলে তাঁর শিষ্যদের মধ্যেও সেই শক্তি থাকতেই হবে। ওই শিষ্যের যে শিষ্য হবে তার সেই শক্তি নাও থাকতে পারে, কারণ তাদের ওটা নিজে থেকে অর্জন করতে হয়। স্বামীজী

এটাই এখানে বলছেন, the power actually transmitted to the disciples by the Master – the 'chain of Guru-power', এটাই গুরু-শিষ্য পরম্পরা।

That the real baptism, has been handed down for untold ages, (*এই যথার্থ ব্যপটিজম্‌ই অনাদিকাল থেকে জগতে চলে আসছে।*) খ্রীশ্চান ধর্মের ইতিহাস জানা না থাকলে এর অর্থ বোঝা যাবে না। জিউসদের ধর্ম এব্রাহামের হাত ধরে শুরু হয়ে অনেক বড় বড় ঋষিদের মাধ্যমে এগিয়ে গেছে, যার মধ্যে মোজেসও ছিলেন। ওনাদের মধ্যে অনেক সময় কেউ রাজা ছিলেন, অনেক সময় ঋষিও ছিলেন। কোন একটা সময় থেকে জিউসদের ব্যাপটিজম্‌ প্রথা শুরু হল। এর পশ্চাৎপট হল, সেই সময় ইস্রায়াইলে অনেকগুলো ট্রাইব ছিল, ট্রাইব বলতে ওরা বুঝত অশুদ্ধ, অপবিত্র। এদিকে যারা ঠিক ঠিক এব্রাহিমিক ধর্মের পরম্পরাকে অনুসরণ করছিল তারা মনে করল, ট্রাইবদের যদি আমরা ফাদার ইন হেভেনের কথা বলি, জোহবার কথা বলি, এদেরকে আগে শুদ্ধ পবিত্র করতে হবে। আমরা যেমন গঙ্গাজল ছিটিয়ে শুদ্ধ পবিত্র করি, ওরাও সেই রকম জর্ডন নদীর জল দিয়ে শুদ্ধ পবিত্র করে ওদের জিউস ধর্মে নিয়ে এলো। জহুদের ধর্মেও ধর্মান্তকরণ আগে ছিল, যদিও এখন বন্ধ হয়ে গেছে। হিন্দুদেরও একই প্রথা চলে আসছে, তুমি জন্ম থেকেই অপবিত্র। মজা করে বলা হয় যে, মানুষ জন্ম থেকে হিন্দু হয়, কিন্তু খ্রীশ্চান পরিবারে ব্যাপটিস্ট হয়ে গেলে খ্রীশ্চান হয়ে যায় আর ছুন্যৎ আদি হয়ে গেলে মুসলমান হয়ে যায়, কিন্তু এই কথা বলছে না যে, যখন তুমি জন্ম নিচ্ছ তখন হিন্দুরা তোমাকে অশুদ্ধ অপবিত্র মনে করে। হিন্দুরাও মনে করে যে, তোমার যজ্ঞ উপবীৎ হয়ে গেলেই তুমি ঠিক ঠিক দ্বিজ হবে, তখনই তুমি হিন্দু হলে, তা নাহলে তুমি শূদ্রই থেকে যাবে। শূদ্রদের যে যজ্ঞের অধিকার দেওয়া হত না, শুভকর্ম করতে তাদের ডাকা হত না, পরবর্তিকালে এই নিয়ে অনেক কথা উঠেছে। কিন্তু এটাও ভুল, যেমন চাণক্য চন্দ্রগুপ্তকে যজ্ঞোপবিৎ দিয়েছেন। হিন্দু মাত্রকেই যজ্ঞোপবিৎ দেওয়ার রীতি আছে, মূল হল তাকে শুদ্ধ পবিত্র করে বেদ পাঠের অধিকার দিয়ে দাও, গায়ত্রী মন্ত্র দিয়ে দাও। এই যে আপার ক্লাশ, লোয়ার ক্লাশ, আপওয়ার্ড, ব্যাকওয়ার্ড, চাকরি সুবিধার জন্য এগুলোর সুযোগ নিচ্ছে ঠিক আছে, কিন্তু বেদের জ্ঞানার্জনে, ধর্মের জ্ঞান লাভে কেন বাধা দেওয়া হবে! বিষয়টা হল শুদ্ধিকরণকে নিয়ে, মনু বার বার বলছেন, শূদ্র যদি ব্রাহ্মণদের মত আচরণ করে তাহলে তাকে ব্রাহ্মণ বলেই ধরে নেওয়া হবে। তাকে তো যজ্ঞোপবিৎ দিয়ে শুদ্ধ করেই দেওয়া যায়। জুইসদের মধ্যে এই প্রথা অনেক প্রাচীন, পরে এই প্রথা খ্রীশ্চানরা নিল। যার জন্য খ্রীশ্চানদের মধ্যে ব্যাপটিজম্‌ এখনও চলে আসছে। জন্ম নেওয়ার কিছু দিন পরেই তাকে চার্চে নিয়ে যেতে হয়, পাদরি এসে জল ছিটিয় দেওয়ার পর সে এবার খ্রীশ্চান হয়ে গেল। হিন্দুদেরও একই জিনিস চলে আসছে, কিন্তু হিন্দুদের হিন্দু না বলে দ্বিজ বলা হত।

স্বামীজী বলছেন, ঠিক ঠিক যে ব্যাপটিজম্‌, এই প্রথা অনাদিকাল থেকে চলে আসছে; অবতারদের পরম্পরা থেকে চলে আসছে। জন দি ব্যাপটিস্ট খুব উচ্চমানের সাধক ছিলেন। তিনি জর্ডন নদীরে তীরে এসে সবাইকে শুদ্ধ পবিত্র করছেন। সেখানে বলছেন, আমি তোমাকে জল দিয়ে ব্যাপটাইজ্‌ করছি, আমার পিছনে যিনি আসছেন তিনি তোমাকে আগুন দিয়ে ব্যাপটাইজ্‌ করবেন। যীশু আসার পর জন দি ব্যাপটিস্ট যীশুকে বলছেন, আমি তোমার জুতোর ফিতা বাঁধারও যোগ্য নই। যীশু তাঁকে বলছেন, যেমনটি চলে আসছে তেমন প্রথাই চলবে। জন দি ব্যাপটিস্ট তাঁকে ব্যাপটাইজ্‌ করলেন, জীবনে আর কাউকেই তিনি ব্যাপটাইজ্‌ করলেন না, যীশুই শেষ। স্বামীজী বলছে, এগুলোই হল real baptism।

এরপর বলছেন, Bhakti cannot be used to fulfil any desires, itself being the check to all desires. (*ভক্তিকে কোন বাসনাপূরণের সহায়রূপে গ্রহণ করতে পারা যায় না, কারণ ভক্তিই সমুদয় বাসনা-নিরোধের কারণস্বরূপ।*) নারদীয় ভক্তিসূত্রে বলছেন, *নিরোধরূপত্বাৎ*, ভক্তি মানেই নিরোধ, আটকে দেয়, সেইজন্য ভক্তি কোন দিন কোন জিনিসের কামনার পুর্তি করতে পারে না। হাজরা মশাই ঠাকুরের সামনে বলছেন, ভগবান ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ, ইচ্ছে করলে তিনি ঐশ্বর্যও দিতে পারেন। ঠাকুর রেগে গিয়ে বলছেন, হাজরা গত জন্মে কাঙাল ছিল তাই এখনও খালি ঐশ্বর্য ঐশ্বর্য করে।

যার যেটা ধর্ম বা স্বরূপ সেই স্বরূপের বিপরীত সে কখনই যাবে না। আগুনের ধর্ম হল সে সব কিছু পুড়িয়ে দেয়, এখন আমি যদি মনে করি ম্যাজিকের মাধ্যমে বা ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করে বা অন্য কোন

পদ্ধতিতে আমি আগুন পান করব, আগুন কোন দিন আমার জন্য পেয় অর্থাৎ জল হতে পারবে না। অগ্নি নিজের স্বভাব কখনই পাল্টাতে পারবে না, সে পোড়াবেই। ঠিক তেমনি ভক্তির স্বরূপই হল *নিরোধরূপত্বাৎ*, যতক্ষণ নিরোধ না হয়ে যায়, জাগতিক যত কামনা আছে সেগুলোকে না আটকানো পর্যন্ত ভক্তি আসবে না। সব কামনা-বাসনা যখন ত্যাগ হয়ে যাবে তখনই ভক্তি আসবে।

এই যদি হয়, তাহলে ভক্তি কোথা থেকে কাউকে ফল দেবে? আমরা দিনরাত ঠাকুরের কাছে গিয়ে কত কিছু প্রার্থনা করছি, হে ঠাকুর! আমাকে এই দাও, সেই দাও, এটা করে দাও – এটা আর যাই হোক একে ভক্তি বলে না, এটা হল bartering system, আমি কিছু দিলাম তুমিও কিছু দাও। কিছুক্ষণের জন্য ঠাকুরকে আমরা অবতার রূপে না দেখে সিদ্ধপুরুষ রূপে দেখছি – ঠাকুরের মত ভক্ত কে আছে, তাও ঠাকুরের গলায় ক্যান্সার রোগ কেন হল? ঠাকুর কত বড় ভক্ত ছিলেন, তাও তাঁকে কাঙালীর মত মরতে হল কেন? সারা জীবন ঠাকুর মা মা করে গেলেন তাও ঠাকুরের অবর্তমানে শ্রীশ্রীমায়ের এই দুরবস্থা কেন হল? কেন তাঁর ত্যাগী সন্তানদের পেটভরা খাবারটুকু জুটত না? এত প্রশ্নের একটাই উত্তর, ভক্তি *নিরোধরূপত্বাৎ*। আমার এই রকম ভক্তি লাগবে না। ঠিকই বলছ, তোমার জন্য ভক্তি নয়।

একজন খুব নামকরা মহারাজ ছিলেন, তিনি দীক্ষা নেওয়ার আগেই ভক্তদের বলে দিতেন, দেখো ভাই, তোমরা দীক্ষা নিতে এসেছ, দীক্ষা নিয়ে আমার কাছে এসে বলবে না, আমার ছেলেকে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে ভর্তি করে দিন, আমার রোগীকে সেবা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করে দিন। এগুলোর জন্য আমরা দীক্ষা দিই না। দীক্ষা তো তুমি তোমার আত্মকল্যাণের জন্য নিয়েছ, এই কথা বলতে যেও না যে, আমি বেলুড় মঠ থেকে দীক্ষা নিয়েছি আমার ছেলে কেন নরেন্দ্রপুরে পড়ার সুযোগ পাবে না, আমি কেন গেস্ট হাউসে থাকার জায়গা পাব না। এটা তো গেল খুব স্থূল ক্ষেত্রে, আর আরও হায়ার লেভেলে কি হয়? আমি ঠাকুরের ভক্ত, আমার সব কিছু ভাল হবে। বলছেন, ভক্তি মানেই *নিরোধরূপত্বাৎ*, ভক্তিতে কোন কামনা-বাসনা চলে না।

নারদীয় ভক্তিসূত্রের উল্লেখ করে স্বামীজী বলছেন, Narada gives these as the signs of love: 'When all thoughts, all words, and all deeds are given up unto the Lord, and the least forgetfulness of God makes one intensely miserable, then love has begun'. (*নারদ ভক্তির এই লক্ষণগুলি দিয়েছেন, 'যখন সমুদয় চিন্তা, সমুদয় বাক্য ও সমুদয় ক্রিয়া তাঁর প্রতি অর্পিত হয় এবং ক্ষণকালের নিমিত্ত তাঁকে বিস্মৃত হলে হৃদয়ে পরম ব্যাকুলতা উপস্থিত হয়, তখনই যথার্থ ভক্তির উদয় হয়েছে, বুঝতে হবে'।*) ভক্তিসূত্রে নারদ ভক্তির লক্ষণ বলছেন, *নারদস্তু তদর্পিতাখিলাচারতা তদ্বিস্মরণে পরমব্যাকুলতেতি*, একটু যদি ঈশ্বরের স্মরণ না হয়, তাঁর চিন্তনে মননে যদি ঈশ্বর না উদিত হন তখন মনের মধ্যে এমন ছটফটানি হয় যে প্রাণ আটুপাটু করতে থাকে, এই ব্যাকুলতাকেই নারদ ভক্তি বলছেন। ঠাকুর মথুরবাবুর সাথে কাশী গেছেন, মথুরবাবু সেখানে অন্যদের সাথে জমিদারির কথা বলতে শুরু করেছে, ঠাকুর বলছেন, মা তুই কোথায় আমাকে নিয়ে এলি, দক্ষিণেশ্বরেই তো ভাল ছিলাম। একটু কিছুক্ষণের জন্য যে বিষয়কথা হচ্ছে তাতেই ঠাকুর মাকে বলছেন, মা তুই আমায় কোথায় নিয়ে এলি। আমার এসব কথা লাগবে না, কানে বাজে, কষ্ট হয়।

This is the highest form of love because therein is no desire for reciprocity, which desire is in all human love. (*পূর্বোক্ত ভক্তিই প্রেমের সর্বোচ্চ অবস্থা। কারণ অন্যান্য সাধারণ প্রেমে প্রেমিক প্রেমাস্পদের কাছ থেকে প্রতিদান চায়, কিন্তু ভক্ত এই প্রেমে কেবল তাঁর সুখে সুখী হয়ে থাকে।*) পরমপ্রেমের একটা লক্ষণ হল আমি তোমাকে শুধু ভালবাসা দিয়ে যেতে চাই, আমি তোমাকে ভালবাসি, তুমি আমাকে ভালবাসলে কি বাসলে না তাতে আমার কিছুই আসে যায় না। আমি একমাত্র তোমাকেই ভালবেসেছি, আর কাউকে ভালবাসতে যাব না, আর এই অপেক্ষাও রাখি না যে, তুমি আমাকে ভালবাসবে কি ভালবাসবে না – ভক্তিসূত্রে নারদ বলছেন – *নাস্ত্যেব তস্মিন্ তৎসুখসুখিত্বম্*। এটাই পরমপ্রেমের একটা লক্ষণ। মানুষের ভালবাসা হল দেয়া-নেয়া। বাচ্চারা যেমন বলে, তোকে আমি চকলেট দিলাম তুই আমাকে তোর খেলনাটা কেন দিলি না? ছেলে আর মেয়ের ভালবাসায় দিনরাত বলা হয়, আমি তোমাকে ভালবাসলাম আর তুমি কিনা আমার সাথে এই রকম করলে। যেখানে ভালবাসাকে দাঁড়িপাল্লা দিয়ে ওজন করা হয় সেটা আর যাই হোক ভালবাসা

কখনই হতে পারে না। পাশ্চাত্য জগতে মা নিজের সন্তানকে বলে, আমি তোমাকে এত ভালবাসা দিলাম আর তার এই প্রতিদান দিচ্ছ, যেটা ইদানিং ভারতের মায়েরাও বলতে শুরু করেছে। ছেলে ডাক্তারি পাশ করে বিদেশে আরও শিক্ষা নিতে গেছে, বাবার ঘোর আপত্তি তাতে। বাবা চাইছে, ছেলে এখানেই এখন ডাক্তারি প্র্যাক্টিস করে টাকা আয় করুক। বাবা যে এতদিন ছেলেকে ভাল স্কুলে পড়ানো, ডাক্তারি পড়ালেন, এটা কি সে কোন ব্যবসাতে টাকা ঢালার মত পড়িয়েছে নাকি ছেলের মঙ্গলের জন্য পড়িয়েছে? যদি সকাম হয় তাহলে বিজনেস, আর বিজনেসে তো অনেকেরই টাকা ডুবে যায়, নূতন কি আর হল, ছেলে বাবার কথা শুনছে না, বাবার টাকাটা ডুবে গেল। আর যদি নিষ্কাম হয় তাহলে আপনার এত চিন্তার কি আছে, ছেলেকে নিজের পড়াশোনাটা চালিয়ে যেতে দিন। বিজনেসে তো অনেকেরই টাকা ডোবে। আপনি ছেলেকে ছেলে মনে না করে মনে করছিলেন আমি আমার ছেলের পিছনে টাকা ইনভেস্ট করছি, ভাল স্কুলে পড়ালাম, মেডিক্যাল কলেজে পড়ালাম, এইবার আমাকে গরু দুধ দেবে। গরুটা মাঝখান থেকে মরে গেল, গরু তো মরেও যায়, আপনি এবার কি আর করবেন! আপনি মনে করুন আপনার বিজনেস ডুবে গেল, মন খারাপ করার কি আছে! আর সন্তান মনে করে ওর কল্যাণের জন্য যদি করে থাকেন, তাহলে ওকে উৎসাহ দিয়ে বলুন, বাছা তুমি এগিয়ে যাও। বড় হয়ে তুমি আমাদের দেখাশোনা করবে এই প্রত্যাশা নিয়ে তোমার জন্য কিছু করিনি, তখনও করিনি এখনও করছি না, যদি তোমার টাকা লাগে আমি চেষ্টা করব। কিন্তু বর্তমান যুগে সন্তানকে বাবা-মায়েরা একেবারে নিংড়ে খাচ্ছে। তিন বছর মা যদি তাকে বুকের দুধ খাইয়ে দেয় সারা জীবন এবার সে তাকে কখন মাতৃভক্তির নামে, কখন আদর্শের নামে, কখন এই নামে, সেই নামে নিংড়ে নিংড়ে খাবে। এই হল মানুষের ভালবাসা। ঈশ্বরীয় ভালবাসা এভাবে চলে না, পরমপ্রেমের তো কোন প্রশ্নই নেই।

সন্ন্যাসী কে?

স্বামীজী এবার ভক্তিশাস্ত্রকে আধার করে সন্ন্যাসকে ব্যাখ্যা করছেন। A man who has gone beyond social and scriptural usage, he is a Sannyasin. *(প্রকৃত ভক্তিলাভ হলে যে সবকিছু ত্যাগ হয় –বলা হয়েছে, তার তাৎপর্য – ভক্তের সমুদয় লৌকিক ও বৈদিক কর্ম ত্যাগ হয়ে যায়।)* সন্ন্যাসীদের নিয়ে কোন আলোচনা উঠলে সেখানে প্রায়ই প্রশ্ন ওঠে সন্ন্যাসী কে? সন্ন্যাসী তিনিই হন যিনি সব বিধি নিষেধের পারে চলে গেছেন। বিধি নিষেধের পারে যাওয়ার অর্থটা আমাদের অনেকের কাছেই পরিষ্কার নয়। যেমন হিন্দুদের মূল বিধি বেদ থেকেই আসছে, সেখান থেকেই পরে আমাদের বিভিন্ন শাস্ত্রে বিধি সমূহ আরও বিস্তারে এসেছে। বিধি-নিষেধ মানে, শাস্ত্র বলে দিচ্ছে কোনটা করবে আর কোনটা করবে না। সাধারণ গৃহস্থদের জন্য এবং সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষদের জন্য বিধি-নিষেধ পালন করা জরুরী। সবাই জানে আমাকে এগুলো পালন করতে হবে। তেমনি আবার অন্য দিকে কিছু শাস্ত্রে, যেখানে আধ্যাত্মিক সাধনার কথা বলা হয়, সেখানে বিধি-নিষেধের পারে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। সন্ন্যাসী মানে, জগতের সব কিছুকে সে ত্যাগ করে দিয়ে বেরিয়ে এসেছে, ঈশ্বর ছাড়া সে আর এখন কিছু জানে না। ঠাকুর খুব সহজ ভাষায় বলছেন, সন্ন্যাসী তালগাছ থেকে পড়বে, হাত-পা নাড়বে না। ঈশ্বরের উপর নির্ভরতা কেমন হবে সেটাকেই ঠাকুর দেখাতে চাইছেন। স্বামীজী বলছেন, আমি এমন একশজন মানুষ চাই, যে রাস্থায় বেরিয়ে এসে বলবে আমি ঈশ্বর বৈ আর কিছু জানি না।

এ সম্ভব নয়, খুব কঠিন জিনিস। সন্ন্যাসের যে আদর্শ, খুব উচ্চতম আদর্শই শুধু না, খুব কঠিন আদর্শ, যেখানে সব নির্ভরতা একমাত্র ঈশ্বরের উপর। সন্ন্যাসীর দৃষ্টিকোণ দিয়ে যদি শ্রীমতি রাধার প্রেমের ব্যাখ্যা করা হয়, যার আলোচনা আমার এর আগে করেছি, তাহলে শ্রীমতি রাধা হলেন আদর্শ সন্ন্যাসী। মীরাবাঈয়ের যে ভালবাসা, সেদিক দিয়েও মীরাবাঈ একজন আদর্শ সন্ন্যাসীনি। মীরাবাঈ কৃষ্ণ বৈ আর কিছু জানেন না, তাঁর বিধি নেই নিষেধ নেই। বাল্মীকি রামায়ণে ভীল জাতের শূদ্রা রমণী শবরীর কথা বলা হয়েছে। শবরী শুনেছেন শ্রীরামচন্দ্র এদিকে আসবেন, শোনার পর থেকে শ্রীরামের সেবার জন্য ফল সংগ্রহ করে রেখেছেন। বাল্মীকি রামায়ণে খুব সুন্দর বর্ণনা আছে। কিন্তু তুলসীদাস তাঁর রামচরিতমানসে শবরীর কাহিনীতে পরা ভক্তি কাকে বলে, তার এক দুর্ধর্ষ বর্ণনা করেছেন, বাল্মীকি রামায়ণে যে বর্ণনা পাওয়া যাবে না। অবশ্য বাল্মীকি রামায়ণে পরা ভক্তির ধারণাটাই নেই, সেখানে শ্রদ্ধা, ভক্তি দিয়ে অতিথি সেবা, শ্রীরামচন্দ্রের মত মহাপুরুষের সেবা

কিভাবে হবে তার বর্ণনা করা হয়েছে। তুলসীদাস নিজে একজন বড় সাধক ছিলেন, বড় কবি ও পণ্ডিত ছিলেন, রামচরিতমানসে তাই শবরীর চরিত্র চিত্রণ করতে গিয়ে তিনি পরা ভক্তি জিনিসটা কি রকম, তার এক সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। শ্রীমতি রাধা ও গোপীদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে প্রেম, যেখানে পরকিয়া প্রেম, যত রকম সামাজিক মর্যাদা হতে পারে, সব মর্যাদাকে উল্লঙ্ঘন করে গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের দিকে ছুটে যাচ্ছেন। এমনকি যে গোপীদের বাড়ির লোকেরা ঘরের দরজা বন্ধ করে আটকে রেখেছে, সেই গোপীরা তাঁদের সূক্ষ্ম শরীর নিয়ে বেরিয়ে শ্রীকৃষ্ণের কাছে চলে এসেছেন।

মর্যাদা ও মর্যাদার লঙ্ঘন

মর্যাদা শব্দটা সব সময় আমরা সমাজে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মনে করি। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ক্ষেত্রেই শুধু মর্যাদা আসে না, মর্যাদা সব কিছুতেই আসে। কৃষ্ণের প্রতি যশোদার ভালবাসাকে ভাগবতে যেখানে বর্ণনা করছেন সেখানে আমরা দেখি যশোদা কিভাবে একেবারে শ্রীকৃষ্ণে ডুবে আছেন। তাতে একটা বর্ণনা আছে, যশোদা মাখন তৈরী করার জন্য দধি মন্থন করছেন, যশোদার চিন্তায় আছে এই মাখন শ্রীকৃষ্ণ খাবে, দু-হাত দিয়ে মন্থন করছেন, হৃদয়ে কৃষ্ণের কথা চিন্তন করছেন, মুখে তিনি কৃষ্ণের লীলা বিষয়ক গান করছেন, *মনসা-বাচা-কর্মণা*, সবটাই কৃষ্ণে ডুবে আছে। ভক্তিতে যে মর্যাদার লঙ্ঘন করে দেয়, যশোদার ভক্তিতে সেটা নেই, যেটা শ্রীমতির আছে, গোপীদের আছে। আর মর্যাদাকে লঙ্ঘন করে যাওয়ার ব্যাপারটা তুলসীদাস খুব সুন্দর নিয়ে এসেছেন শবরীর প্রসঙ্গে। শ্রীরাম আসবেন জানার পর থেকে তিনি ভাল ভাল ফল শ্রীরামের জন্য সংগ্রহ রেখেছেন। শুধু তাই না, শবরীর আবার ফলটাকে কামড়ে দেখে নিচ্ছেন ফলটা মিষ্টি কিনা, কারণ শ্রীরামচন্দ্রকে টক ফল দেওয়া যাবে না। এখানে মর্যাদা ভঙ্গ হয়ে গেল। মর্যাদা কি হবে? উচ্ছিষ্ট জিনিস শুধু অতিথিকেই নয়, কাউকেই দেওয়া যায় না। কিন্তু শবরী শ্রীরামের প্রতি ভক্তিতে এমন ডুবে আছেন যে কোন হুঁশ নেই।

মায়েরা সন্তানের জন্য সব সময় মর্যাদাকে লঙ্ঘন করে। যে মা বলে, আমি সব সময় সত্যি কথা বলি, এটা অবধারিত যে সে মিথ্যা কথা বলছে। যখন সেই মা যৌবনে প্রেম করছিল তখন হয়ত সে মিথ্যা কথা বলেনি, বিয়ের পর স্বামীর জন্যও হয়ত মিথ্যা কথা বলেনি; কিন্তু সন্তান হওয়ার পর সেই সন্তানের জন্য তাকে দশটা মিথ্যা কথা অবশ্যই বলতে হয়। ছেলে বদমাইসি করে এলে ছেলের বাবাকে কোন দিন জানতে দেবে না। এমনকি শ্রীশ্রীমা তিনিও ঠাকুরের কাছে মিথ্যা কথা বলছেন, পাঁচ সের দুধকে তিনি একসের বলছেন। মা মানেই তাকে মিথ্যা কথা বলতে হবে। এই মিথ্যা কথায় তার কোন পাপ হবে না, এই মিথ্যা কথা তার কোন কর্ম বন্ধন হবে না, কিন্তু মর্যাদা রেখাকে পার করতে হবে। আমাদের সবারই একবার ভেবে দেখা দরকার, আমি জীবনে কারুর জন্য কত বার মর্যাদা রেখাকে পার করেছি। যদি একটা কিছুর জন্য অনেকবার মর্যাদার অতিক্রম করে থাকে তাহলে বুঝতে হবে সেই কাউকে সত্যিকারের ভালবেসেছে, তখন ভক্তি কি জিনিস বুঝতে পারবে, নাহলে ভক্তি বোঝা যাবে না। যেখানে আচার শুদ্ধি আছে, বিধি শুদ্ধি রয়েছে, সেখানে ভালবাসা কি কখন আসতে পারে! ওটা কিছুই না। ভালবাসা মানেই মর্যাদা রেখাকে অতিক্রম করেছে। দুই বন্ধু স্কুলে, কলেজে যদি এক অপরকে ভালবাসে, দুজনই এক অপরের জন্য ক্রমাগত মিথ্যা কথা বলতে থাকে। মর্যাদা রেখা লঙ্ঘন করবেই, ভালবাসা আছে কিনা। একজন আধ্যাত্মিক জীবনে এগোতে পারবে কিনা খুব সহজেই বলে দেওয়া যায়, শুধু দেখা জীবনে সে কত বার মর্যাদা রেখা লঙ্ঘন করেছে। যদি খুব বেশি করেনি তাহলে বুঝতে হবে তার এখনও অনেক সময় লাগবে। মানুষকেই ভালবাসেনি সে ভগবানকে কি ভালবাসবে! যাকে চোখের সামনে দেখছে তাকে ভালই বাসতে পারছে না, আর আকাশে না কোথায় ভগবান থাকেন তাই জানি না, তাঁকে কি ভালবাসব! ট্রেনিংটা তাই প্রথমে নীচের দিক থেকেই নিতে হয়, আগে কলাগাছ বিঁধতে শিখতে হয় তারপর উড়ন্ত পাখি। সন্ন্যাসীর ঈশ্বরকে ভালবাসার কথা, কারণ ঈশ্বরকে ভালবেসেই সে সন্ন্যাসী হয়েছে। সেইজন্য বেদান্তে পরে পরে সন্ন্যাসকে আলাদা আলাদা করে শ্রেনী বিভাগ করে দেওয়া হয়েছে, বিবিদিষা সন্ন্যাস, বিদ্বৎ সন্ন্যাস ইত্যাদিতে। বিদ্বৎ সন্ন্যাস মানে যার মধ্যে ওই ভাবটা ঠিক ঠিক এসে গেছে, বাকিরা এখনও চেষ্টা করছে। গেরুয়া পড়ে নেওয়া মানে, নিজেকে বেশি মনে করিয়ে দেওয়া যে আমি সন্ন্যাসী, সৎ ভাবে থাকব, লোকেরাও সাবধান থাকবে ইত্যাদি। যদিও গীতাতে বলছেন *জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি*

ন কাঙ্ক্ষতি, এগুলো হল বিধি। কিন্তু স্বামীজী সন্ন্যাসের যে ব্যাখ্যা করছেন বা ঠাকুর যে ব্যাখ্যা করছেন, সেখানে সন্ন্যাসকে প্রেমা ভক্তির দিকে নিয়ে গেছেন। ঠাকুরের জন্য আমি সব ছেড়ে দিয়েছি, সমস্ত মর্যাদাকে ছেড়ে দিয়ে আমি বেরিয়ে এসেছি। এর আগে যশোদার যে প্রেমের কথা বলা হল, গোপীদের যে বাঁধন ছাড়া প্রেমের কথা বলা হল, শ্রীরামের প্রতি শবরীর যে ভালবাসার কথা বলা হল বা আমরা লায়লা মজনুর কাহিনী যেটা জানি, এখানে সবাই মর্যাদা রেখাকে অতিক্রম করে গেছেন।

সন্ন্যাসী মর্যাদাকে পেরিয়ে যায়। কিভাবে পেরোয়? বিধি-নিষেধ দুই প্রকার, একটা শাস্ত্রীয় আরেকটা সামাজিক। সমাজের বিধিতে বলছে বাবা-মার সেবা করবে, সমাজের বিধি বলছে, সমাজের প্রতি তোমার একটা দায়ীত্ব আছে, দেশের প্রতি দায়ীত্ব আছে। সন্ন্যাসী এই বিধিগুলোকে পার করে যায়। শাস্ত্র মর্যাদা মানে? ঠাকুর বর্ণনা করছেন, একবার এক সাধু এসেছিল, দেখছেন সাধু ধর্মগ্রন্থ আর তাঁর গুরুর খড়ম একসাথে রেখেছেন। ঠাকুর দেখে বলছেন, এতটাই যখন করা হল তাহলে আর পূজা করা কেন? বলছেন, সবটাই করা চাই, এও করা চাই। সাধু বিধি-নিষেধের পারে চলে গেছেন। সন্ন্যাসী বিধি-নিষেধের পারে চলে গেছেন।

এর আগে স্বামীজী এক জায়গায় বলছিলেন, প্রত্যেকটি ধর্ম, ধর্মশাস্ত্র এগুলো যেন এক একটা গামলা যেখানে চারা রাখা হয়েছে বড় করার জন্য। সেটাই এখানে বলে যাচ্ছেন, Obey the scriptures until you are strong enough to do without them; then go beyond them. (*যতদিন না তোমার চিত্তের এতদূর দৃঢ়তা হচ্ছে যে, শাস্ত্রবিধি প্রতিপালন না করলেও তোমার হৃদয়ের যথার্থ ভক্তিভাব নষ্ট হয় না, ততদিন ঐগুলি মেনে চল, কিন্তু তারপর তুমি শাস্ত্রের পারে চলে যাও।*) শাস্ত্রীয় কথা ততদিন পালন করে চলবে যতদিন না ঈশ্বরের প্রতি তোমার ভক্তিকে তুমি একটা দৃঢ়ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করতে পারছ। একবার ভক্তি দৃঢ় হয়ে গেলে তুমি শাস্ত্রের পারে চলে যাও। ঠাকুর বলছেন, সন্ধ্যা-গায়ত্রী কতদিন, যতদিন না হরিনামে চোখ দিয়ে জল বেরোয়। একবার হরি বললে যদি চোখ দিয়ে অশ্রুপাত হয়, তার আর সন্ধ্যা-গায়ত্রী লাগবে না, সে এগুলোকে পেরিয়ে গেছে। স্বামীজী যখন বলছেন, বেদ-উপনিষদ কতদিন, এই আলোচনার অর্থ হল, ঈশ্বরের চিন্তায় সে মজে গেছে আর ডুবে আছে।

Books are not an end-all. (*শাস্ত্রের বিধিনিষেধ মেন চলাটাই জীবনের চরম উদ্দেশ্য নয়।*) শাস্ত্র বা গ্রন্থ শেষ কথা নয়। স্বামীজীর এই কথাগুলো অন্যান্য ধর্মের লোকেদের পক্ষে ধারণা করা খুব কঠিন, কারণ একমাত্র হিন্দুরাই এত পরিষ্কার করে এই কথা বলতে পারে। গীতা, উপনিষদও বেদের পারে যাওয়ার কথা বলছেন, কারণটাও বলা হচ্ছে। ভগবান যীশুও বার বার বলছেন, letters killeth, শব্দ মানুষকে মেরে দেয়। কিন্তু যাঁরা যীশুর অনুগামী তাঁরা নিজেরাই সেই বাইবেলে আবদ্ধ হয়ে যান, বাইবেলের পারে তাঁরা কোন মতেই যাবেন না। কিন্তু অবলম্বন রাখতে হয়, যেমন একজন খ্রীশ্চান সাধক তিনি যত উঁচুতেই চলে যান, মনটা তাঁর যখন নামবে তখন তিনি বাইবেলেই রাখবেন। রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীও যত উপরেই চলে যান, শেষে কিন্তু কথামৃতে এসে মনকে ধরে রাখবেন। অনেকে বলবেন, ঠাকুর তো রাখতেন না। না, ঠাকুরও রাখতেন। ঠাকুর সাধনা করেছিলেন মায়ের নাম নিয়ে, সেইজন্য মনটাকে সমাধি থেকে নেমে এসে মায়ের নামেই দাঁড় করাতেন। শাস্ত্র নিয়েই সাধনা করুন আর ঈশ্বরের কোন নাম নিয়েই সাধনা করুন, অবলম্বনও তাঁর সেই রকম হবে। যাঁরা ঠাকুরের ভক্ত, যাঁরা কথামৃত নিয়মিত পড়েন, কথামৃতের শব্দগুলো গুরুত্ব নয়, ওই শব্দগুলো যে ভাবকে তুলে ধরতে চাইছে, সেটার প্রতি পূর্ণ সমর্পণ। বেদেও ঠিক তাই হয়, পতঞ্জলি ব্যাখ্যা করছেন, বেদের শব্দরাশি বেদ নয়, বেদের শব্দরাশি যে জ্ঞানরাশির কথা বলতে চাইছে, সেই জ্ঞানরাশিই গুরুত্ব। যেমনি জ্ঞানরাশির দিকে চলে গেল তখন শব্দরাশি পড়ে থেকে যায়। সেইজন্য গ্রন্থে আবদ্ধ থাকা যায় না। ঠাকুর স্বামীজীর পরম্পরা খুব সমৃদ্ধ পরম্পরা, কিন্তু স্বামীজী সন্ন্যাসীদের যে নিয়মাবলী করে দিয়ে গেছেন, সেখানে পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন, পরে পরে সাধনা করে যদি কেউ নূতন পথ বার করে, সেই পথকেও ঠাকুরের পথ বলে মনে করতে হবে। পথের ইতি করা যায় না, ঠাকুর এতটুকু করে গেছেন আর আমরাও এখানেই শেষ করে দেব, তা হয় না।

ধর্ম হল প্রত্যক্ষের বিষয়

স্বামীজী বলছেন, Verification is the only proof of religious truth. (*আধ্যাত্মিক সত্যের একমাত্র প্রমাণ – প্রত্যক্ষ করা।*) বেদান্ত মতে তিনটেকে নিয়ে চলে – শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতি। আমি মানছি এটা বেদে আছে, বাইবেলে আছে, কথামৃতে আছে কিন্তু এটা কি যুক্তিসঙ্গত? বিচার করে দেখ এটা যুক্তিতে দাঁড়ায় কিনা। এরপর তুমি এই সত্যকে নিজে উপলব্ধি কর। Each must verify for himself; and no teacher who says, 'I have seen, but you cannot', is to be trusted, only that one who says, 'You can see too'. (*প্রত্যেককে নিজে নিজে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। যদি কোন ধর্মাচার্য বলেন, 'আমি এই সত্যকে দর্শন করেছি, কিন্তু তোমরা কোনকালে পারবে না', তাঁর কথায় বিশ্বাস করবে না; কিন্তু যিনি বলেন, তোমরাও চেষ্টা করলে দর্শন করতে পারো, কেবল তাঁর কথায় বিশ্বাস করবে।*) যেমনি কোন গুরু বা আচার্য বলে দিলেন, আমি দেখেছি তুমি পারবে না, তাকে বিশ্বাস করা যাবে না। নরেন এসে ঠাকুরকে বলছেন, মশাই! আপনি ঈশ্বরকে দেখেছেন? ঠাকুর বলছেন, দেখেছি, তোকেও দেখাতে পারি। নরেন না হয় উচ্চমানের ঋষি, যাঁকে ঠাকুর সপ্তর্ষি মণ্ডল থেকে নিয়ে এসেছেন। এবার থিয়েটারওয়ালারা এসেছে, তারা ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করছে, মশাই! ঈশ্বর দর্শন কেমন? তাদেরও ঠাকুর সহজ সরল ভাবে ঈশ্বর দর্শন জিনিসটা কি রকম বুঝিয়ে দিচ্ছেন – তোমাদের থিয়েটারে যখন পর্দা ফেলা থাকে তখন এক অপরকে দেখে, কথা বলে, গল্প করে আর যেমনি পর্দা উঠে গেল সব কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গিয়ে সবার দৃষ্টি স্টেজে থিয়েটারের দৃশ্যে চলে গেল, ঈশ্বর দর্শন এই রকম। ঠাকুরের ঈশ্বর দর্শনের এই বর্ণনা প্রথম যাঁরা কথামৃতে পড়বেন তাঁদের থ হয়ে যেতে হয়। এই হলেন আচার্য। পদ্মচরণের মত মানুষরা ঠাকুরের কাছে এসেছেন, তাদের সাথেও ঠাকুর ঈশ্বরীয় কথা বলছেন, সপ্তঋষির একজন নরেন, তাঁকেও বলছেন আমি দেখেছি তোকেও দেখাতে পারি। আর এই থিয়েটারওয়ালারা এসেছেন, তখনকার দিনের একেবারে গ্রাম্য থিয়েটারের লোক, গিরিশ ঘোষের মত নাট্যকার ও অভিনেতা নয়, খুবই সাধারণ থিয়েটারের শিল্পী, কিন্তু তাদেরকেও ঠাকুর বুঝিয়ে দিচ্ছেন ঈশ্বর দর্শন কেমন। এই হলেন আচার্য।

কাউকে যদি কিছু জিজ্ঞেস করার পর বলে, ভাই তুমি এটা বুঝতে পারবে না, বুঝতে হবে সে নিজে কিছু বোঝেনি। আমি যদি ঠিক ঠিক বুঝে থাকি তাহলে অপরকেও আমি বুঝিয়ে দিতে পারব। যখনই কোন আচার্য, শিক্ষক, সন্ন্যাসী বা অন্য কেউ বলবে, তুমি এটা বুঝবে না, বুঝতে হবে তার মধ্যে কিছু গোলমাল আছে। এই যে স্বামীজী বলছেন, যেমনি কেউ বলল, I have seen, but you cannot, বা যদি বলে আমি হলাম শেষ প্রফেট, বুঝতে হবে গোলমাল আছে। স্বামীজী বলছেন, only that one who says, 'You can see too', যেমন স্বামীজীকে ঠাকুর বলছেন, আমি দেখেছি তুমিও দেখতে পার। শ্বেতাশ্বর উপনিষদে বলছেন *বেদাহবেদং পুরুষং মহান্তং আদিত্য বর্ণং তমসাঃ পরস্তৎ*, এই কথা বলার পর বলছেন, *নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়*, এছাড়া অন্য কোন পথ নেই। আমি দেখেছি, তোমাকেও দেখতে হবে। আমি দেখেছি বলে তোমারও উদ্ধার হয়ে যাবে, এই আশায় থেকো না, তোমাকে নিজে দেখতে হবে, এটাই উদ্ধারের একমাত্র পথ। ঠাকুরকে একজন এসে বলছে, কেউ আমাকে দেখিয়ে দিক ঈশ্বর আছেন কিনা, তবে আমি বিশ্বাস করব। ঠাকুর শুনে বলছেন, যে দেখেছে তার ভারি বয়ে গেছে তোমাকে দেখাতে।

থিয়েটারওয়ালারা খুবই সাধারণ মানুষ, অশিক্ষিত, তারা এসেছে, কোথাও শুনেছে এখানে এমন একজন আছেন যিনি ঈশ্বরের জন্য পাগল, যিনি ঈশ্বরের সাথে কথা কন। তারাও খুব বিনয়ের সাথে জিজ্ঞেস করছে, মহাশয়, ঈশ্বর দর্শন কেমন? তাদেরকেও তিনি তাদের মত করে ঈশ্বর দর্শন কি রকম বুঝিয়ে দিলেন। জীবনে আর হয়ত কোন দিন ঠাকুরের সাথে এদের দেখা হবে না, পরে হয়ত এই কথা মনেও করতে পারবে না। কিন্তু কখন সখন হয়ত মনে পড়বে, স্বামীজীর নাম শুনবে, স্বামীজীর সাথে সাথে ঠাকুরের কথাও শুনবে, তখন তাদেরও হয়ত মনে পড়বে যে, আমরা সবাই মিলে একদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলাম, ঠাকুর আমাদের সঙ্গে অনেক কথা বলেছিলেন। আমরা শুধু ভাবছি কি বিশাল ও গভীর এক তত্ত্বকে কত সহজ করে ঠাকুর বুঝিয়ে দিলেন, এই হলেন যথার্থ আচার্য। স্বামীজীর সাথে অনেকেরই সাক্ষাৎ হয়েছিল, কথাবার্তা হয়েছিল, তারা অনেকেই কিন্তু মনে রেখেছিল, তাদের অনেক স্মৃতিকথা মেরি লুইবার্কের বইতে লিপিবদ্ধ করা আছে।

স্বামীজী বলছেন, All scriptures, all truths are Vedas in all times, in all countries; because these truths are to be seen, and any one may discover them. (*জগতের সকল যুগের সকল দেশের সকল শাস্ত্র – সকল সত্যই বেদ। কারণ এই-সব সত্য প্রত্যক্ষ করতে হয়, আর যে কোন মানুষই ঐ-সব সত্য আবিষ্কার করতে পারে।*) বেদ হল চিরন্তন, সনাতন, সেইজন বেদকে বলা হয় অপৌরুষেয়, সত্য সব দেশে, সব জায়গায় থাকে। জিউসরা যেমন বলে, we are the chosen of the Lord, তার মানে তোমাদের বাইরে যারা আছে তারা condemned by the God, তোমার যে সত্য, সেটা একটা ছোট্ট গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে গেল। খ্রীশ্চানরা বলে যাদের ব্যাপটিজম্ হয়ে যাবে তাঁরা রক্ষা পেয়ে যাবে, সেখানেও সত্য আবদ্ধ হয়ে গেল। মুসলমানরা বলে, মুসলমানরা ছাড়া বাকিরা সবাই নরকে যাবে, তারাও আবদ্ধ হয়ে গেল। বেদান্ত বলছে, মানুষ অমৃতের সন্তান, সে তুমি ভারতীয় হও, ইউরোপিয়ান হও আর তুমি এই পথ সেই পথ যে পথই নাও না কিনা, এটাই সার্বজনীন সত্য।

বাইবেল কোথাও বলছে না যে, যারা খ্রীশ্চান তারাই সুরক্ষিত হবে। যীশু বলছেন ঠিকই যে, he who follows Me will not walk in the darkness, তার জীবন আলোময় হয়ে যাবে। কিন্তু এই 'Me'টা কে? যীশু কোন ব্যক্তি নাকি কোন ভাব? ব্যক্তি, শব্দ ও ভাব, মানে জ্ঞান, এর মধ্যে যে শব্দকে অনুসরণ করছে ঠিক আছে, ভাবকে অনুসরণ করছে তার মানে সে মহাপুরুষ, আর যখন ব্যক্তিকে অনুসরণ করছে তখন সে নিকৃষ্টতম। যিনি ঠাকুরকে অনুসরণ করছে সে জঘন্য, ঠাকুরের কথা বা শব্দকে যে পালন করছে সে অনেক ভাল, আর ঠাকুরের জ্ঞানরাশির যে অনুসরণ করছে সে মহাপুরুষ। যীশু হলেন সেই আধ্যাত্মিক জ্ঞানরাশি, তাঁকে যে অনুসরণ করছে he shall never walk in darkeness। আর সেটাকে অবলম্বন করে খ্রীশ্চানরা যদি বলে দেয় যারা খ্রীশ্চান নয় তারা নরকে যাবে, তখন এর থেকে দুর্ভাগ্য আর কিছু হতে পারে না। খ্রীশ্চানরা universal truthকে ধীরে ধীরে localised বানিয়ে দিল। বেদ কখনই localised হবে না, সব সময়ই universal থাকবে। স্বামীজী বলছেন, because these truths are to be seen, and any one may discover them, বেদ সেটাই বলবে, যে সত্যকে যে কোন মানুষ independently দেখতে পারে।

এর খুব ভাল দৃষ্টান্ত হল, জিউসদের আগে এ্যব্রাহাম ছিলেন, এ্যব্রাহামের আগে ওনাদের ওই ধারণা ছিল না, যেটা পরে ফাদার ইন হেভেন এলো। আর জরাথ্রুষ্ট যিনি পার্সি ধর্মকে আনলেন, তাঁরও এই পরম্পরা ছিল না। ঠাকুরের ক্ষেত্রে কি হয়, এখানে পরম্পরাটা ছিল, ঠাকুর সেই পরম্পরাতে বড় হয়েছেন ঠিকই কিন্তু শাস্ত্র অধ্যয়ন করেননি, কিন্তু সাধনা করে তিনি যে দিব্য অনুভূতিগুলি পেয়েছিলেন আর কথামৃতে ঠাকুরের যে পাওয়া যায়, বেদ, পুরাণের সাথে সব বর্ণনাগুলো হুবহু মিলে যাচ্ছে। তার মানে, বেদ, উপনিষদ, পুরাণ অধ্যয়ন করে কারুর যদি জ্ঞান লাভ হয় খুব ভাল কথা, সেই জ্ঞানই আরেকজন যিনি বেদ উপনিষদ পুরাণ কিছুই জানেন না, তা সত্ত্বেও তিনি ওটা পেতে পারেন, তবেই ওটা বেদ, তা নাহলে ওটা বেদ না। বেদ হল universal truth, universal truth মানে তুমি পেয়েছ আমিও পেতে পারি, তিনিও পেতে পারেন। এই ছেলেটি আপনার সন্তান, এটা সত্য কিন্তু universal truth নয়, কারণ এ শুধু আপনারই সন্তান। ঈশ্বর সবারই জন্য, এটা হয়ে গেল universal truth, ভারতের জন্য, আফ্রিকানদের জন্য, চীনাদের জন্য বিশ্বের সবার জন্য সত্য। বেদ মানেই হল বেদের সত্যকে বিশ্বের সবাই উপলব্ধি করতে পারবে, যদি সবাই না করতে পারে, তাহলে এটা বেদ নয়। বাইবেল, কোরাণ পড়ার সময় আমরা যে সত্যগুলো পাই সেগুলোও কিন্তু শাশ্বত সত্য। কিন্তু যেমনি তাদের কেউ বলে দিল, যারা আমাদের ধর্মকে মানছে তাদের ছাড়া এই জ্ঞান আর কারুর হবে না, এবার কিন্তু ওটা আর বেদ থাকল না।

অধ্যাত্ম বা ধর্ম হল অনুভূতির ব্যাপার, আমিও দেখেছি, তুমিও দেখতে পারবে। ঠিক এই জায়গাতে এসেই ধর্ম আমাদের জীবন থেকে পুরো সরে যায়। রামায়ণ, রামচরিতমানস হিন্দুদের খুব নামকরা গ্রন্থ, হিন্দুদের প্রাণ বলা যেতে পারে। কিন্তু রামায়ণের যে কোন চরিত্র, শ্রীরামচন্দ্র, সীতা, লক্ষ্মণ বা হনুমানজী, যিনিই হন না কেন, তাঁদের কথা চিন্তা করলে প্রথম যেটা আমাদের মাথায় আসে তা হল, আমি এদের কারুর মতই হতে পারব না। তাহলে কি হবে? কি আর হবে, আদর্শ রূপে পূজা করব। কিন্তু আদর্শ রূপে পূজা করার সময় কেউ চেষ্টা করছে না বা বলছে না যে আমিও এই রকম হতে চাই। ঠিক এই জায়গাতে এসেই ধর্ম

হারিয়ে যায়। স্বামীজী বার বার বলছেন, ধর্মকে যদি তুমি নিজের জীবনে না নিয়ে আসতে পার তাহলে ঐ ধর্মের কোন দাম নেই। পূজা অর্চনা, প্রথমের দিকে ঠিক আছে, একটা কিছু শুরু করার জন্য এই প্রচেষ্টা ঠিক আছে। শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি আমার ভক্তি আছে, খুব ভাল, কিন্তু যে কোন সত্য যদি জীবনে না নামানো যায়, তাহলে ঐ ধর্মের ও ভক্তির কোন দাম হয় না।

ধর্ম সাধারণত তিনটে স্তরে চলে, প্রথম হল recital mode, শব্দ মাত্র, যেমন ব্রাহ্মণরা বেদের শব্দ আবৃত্তি করেই যাচ্ছে, রামচরিতমানস লোকেরা বংশ পরম্পরায় পাঠ করেই যাচ্ছে, কিন্তু মাথায় কিছু ঢুকছে না। অন্য দিকে আছে realization mode, যেখানে মানুষ ঐ সত্যকে উপলব্ধি করে ধন্য হয়ে যাচ্ছে। মাঝখানে একটা থেকে যায় ritual mode, দিনের পর দিন পূজা উপাচারের মাধ্যমে ধর্ম জীবন পালন করে যাচ্ছে। এই তিনটে মোড – Recital, Realisation and Ritual। আমাদের সমস্যা হল, শুধু আমাদেরই নয়, সব ধর্মেই এই সমস্যা আছে; অবতাররা কটি কথা বলেছেন, সেই কথাগুলো নিয়ে আমরা জীবন চালাবার চেষ্টা করে যাচ্ছি। যেমন ঠাকুরের ভক্তদের কাছে কথামৃত, কথামৃতে ঠাকুর অনেকগুলো কথা বলেছেন, সেখান থেকে দুটো কথাকে নিয়ে তার মত করে জীবন কাটাতে চাইছি। মাঝখান থেকে ঠাকুর চলে গেলেন একটা পূজার জায়গায়। মাঝখান থেকে যিনি ভাবরূপী ঠাকুর সেই ভাবরূপী ঠাকুরকে আমরা ভুলে গেলাম। উপনিষদ সেদিক থেকে অনেক ভাল, উপনিষদে Ritual mode বলে কিছু নেই, হয় Recital mode, না হলে Realisation modeএ চলে যাও। যেখানে বলছেন অহং ব্রহ্মাস্মি, সেখানে অহং ব্রহ্মাস্মি পূজা করার কেউ নেই, আমাকেও পূজা করার নেই, আমিকেও পূজা করার নেই, ব্রহ্মকেও পূজা করার নেই। খুবই সহজ, হয় ওটা আমার জন্য শব্দ মাত্র, তা-নাহলে সোজা realization।

অনেকে বলবেন, পূজা-উপাচারে পবিত্র কিছুকে ধরে শুদ্ধ জীবন-যাপনের চেষ্টা করা, এতে একটুতো ভাল হবেই। ঠিকই বলছে, কিন্তু পূজা-উপাচারটা ধর্ম নয়। ধর্ম হল উপলব্ধির জিনিস। নিয়মিত যে শাস্ত্র আমরা অধ্যয়ন করছি, তা যে কোন শাস্ত্রই হোক না কেন, সেই শাস্ত্রের সত্যগুলো যদি জীবনে প্রতিফলিত না হয়, ঐ শাস্ত্র পড়ার কোন দাম নেই। শাস্ত্রের প্রত্যেকটি কথা যেন আমাদের জীবনে প্রতিফলিত হয়। তা নাহলে শাস্ত্র আমাদের জন্য নয়। যদি কেউ মনে করে আমি দুটো কথাকে নিয়ে এগিয়ে যাব, না, তাতেও হবে না। কথামৃতের একটাই কথা, ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু, যদি এটাকে নিয়ে না চলা হয়, কথামৃত বেকার হয়ে যাবে। উপনিষদেও একই জিনিস, বাইবেলেও তাই, কোরাণেও তাই। যদি উপলব্ধির পর্যায়ে না যায় তাহলে ধীরে ধীরে ঐ ধর্মের কোন মূল্য থাকবে না, তাৎপর্যহীন হয়ে যাবে। এই জিনিসটাকে স্বামীজী এর আগে বলেছিলেন – ধর্ম উপলব্ধির ব্যাপার, আমিও পেয়েছি তুমিও পেতে পার।

তদ্বিস্মরণে পরমব্যাকুলতেতি

এরপর বলছেন, যেভাবেই হোক, শাস্ত্র আবৃত্তি করেই হোক, জপ করেই হোক বা ধ্যান করেই হোক বা অন্য যে ভাবেই হোক, ভিতরে ভালবাসা জেগে গেলে সেটাই ভক্তি হয়ে যায়। এর আগে দুই প্রকার ভক্তি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে –অপরা ভক্তি বা বৈধী ভক্তি আর পরা ভক্তি। বৈধী ভক্তি করতে করতে সত্যিই যদি ভিতরে ভালবাসা জেগে যায়, যেটা লোকেদের জাগে না, প্রায় অসম্ভব, যদি জেগে যায় তখন স্বামীজী বলছেন – When the sun of Love begins to break on the horizon, we want to give up all our actions unto God, (*যখন ভক্তিসূর্যের কিরণে দিগন্ত প্রথম উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তখন আমরা সকল কর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করতে চাই এবং এক মুহূর্ত তাঁকে বিস্মৃত হলে অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করি।*) ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা যখন জাগে তখন মানুষ তার সমস্ত ক্রিয়া, জাগতিক যা কিছু আছে সব ঈশ্বরকে অর্পণ করে দিতে চায়। এটা যে শুধু ঈশ্বরকে নিয়েই হয় তা না, যে কোন আদর্শকে নিয়েও হতে পারে। সত্যি কথা বলতে আমরা যদি একটু খতিয়ে দেখি, আমাদের জীবনে কোন আদর্শ নেই, আমরা মনে করে যেমন তেমন ভাবে জীবন চলে গেলেই হল।

কানপুর শহরে কিছু গাড়ি আছে যে গাড়িগুলিকে বলা হয় ডাগ্‌গামার গাড়ি। অন্য সব গাড়ির লাইসেন্স আছে আর নির্দিষ্ট রুটও আছে। কিন্তু ডাগ্‌গামার গাড়ির কোন নির্দিষ্ট রুট নেই, লাইন্সেও নেই; যেখানকার

সওয়ারি পাবে সেইদিকেই চলে যাবে। কানপুরের খবরের কাগজে প্রায়ই খবর থাকে, আজকে পুলিশের নজরদারিতে এতগুলো ডাগ্‌গামার গাড়ি ধরা পড়েছে। সেখান থেকে নাম হয়ে গেল ডাগ্‌গামার ডাক্তার, হাসপাতালে যে রোগের রোগী পাবে সেই রোগেরই ডাক্তার হয়ে যাবে। ভক্তরাও হল ডাগ্‌গামার ভক্ত, আজকে ঠাকুরের কাছে যাচ্ছে, আবার তিরুপতিতেও যাচ্ছে, তারকেশ্বরেও বাঁক নিয়ে যাচ্ছে, সাঁইবাবার কাছেও যাচ্ছে আবার ইদানিং কালের বিভিন্ন বাবাজীদের কাছেও যাচ্ছে। এই ডাগ্‌গামার ভক্ত দিয়ে কিছু হয় না। শুধু তাই না, আমাদের জীবনটাই হয়ে গেছে ডাগ্‌গামার জীবন। আমাদের মত লোকেরা তাই ভক্তির এই গূঢ় জিনিসগুলো কোন দিন বুঝতেই পারব না। যারা একটা আদর্শকে নিয়ে থাকে, তখন তার যত ক্রিয়াকলাপ সবটাই ওই আদর্শকে কেন্দ্র করেই হয়। বরাহনগর মঠে ঠাকুরের মহাসমাধির পর নরেন আদি শিষ্যরা ঠাকুরকে নিয়ে ঠাট্টা আদি করছেন, সেই দেখে একজন বলছে, এই ভাবে ঠাকুরকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করা ঠিক হচ্ছে না। স্বামীজী তার কথা শুনে রেগে গেলেন, স্বামীজী খুব কড়া ভাবে বলছেন, ঠাকুরকে নিয়ে মজা করব না তো কি তোমাকে নিয়ে মজা করব! আমার আদর্শ ঠাকুর, মজা যদি করতে হয় তাঁকে নিয়েই মজা করব। গ্রাম দেশে ধান মাপছে, তাতেও রাম রাম করে মাপছে, এক রাম, দুই রাম, তিন রাম। আমি যা কিছু করব সব কাজ তাঁকে নিয়েই হবে। এটা শুধু ভক্তিতেই হয় না, যাঁরা বিদ্যাচর্চা নিয়ে থাকেন, তাঁদেরও মন সব সময় জ্ঞানচর্চায় থাকে। আর যাঁদের একটু ভক্তি জেগেছে তাঁরা সমস্ত কিছু ঈশ্বরের জন্যই করে। আর বলছেন, তাঁকে কিছুক্ষণের জন্য ভুলে থাকলে তাঁর প্রচণ্ড কষ্ট হয়, *তদ্বিস্মরণে পরমব্যাকুলতেতি*। নারদের মতে এটাই ভক্তির সংজ্ঞা, কিছুক্ষণের জন্য ঈশ্বরের থেকে যদি মন সরে আসে, তখন তাঁর বিরাট কষ্ট হয়। ভক্ত তো ঈশ্বরকে ভুলে যায় না, কিন্তু এমন কোন পরিস্থিতি হয়, যার জন্য মনটা কিছুক্ষণের জন্য ঈশ্বরে রাখতে পারছে না। মহারাজরা ভোরবেলা সাড়ে তিনটে, চারটের সময় উঠে মন্দিরে মঙ্গলারতিতে যান, কোন কারণে শরীর খারাপের জন্য হয়ত যেতে পারলেন না, তাতেই তাঁদের মাথা বিগড়ে যায়। এই জিনিস আদর্শকে নিয়েও হয়। খুব কামী পুরুষরা যাকে ভালবাসে তার মুখ না দেখলে শান্তি হয় না। মায়েদেরও সন্তানের মুখ না দেখলে শান্তি হয় না। ভক্তদেরও ঠিক তাই হয়।

ঈশ্বর ও ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসার মাঝে কিছু যেন না থাকে

আর বলছেন, Let nothing stand between God and your love for Him. (*ঈশ্বর ও তাঁর প্রতি তোমার ভক্তি – এ দুয়ের মাঝখানে যেন আর কিছু বাধা না হয়ে দাঁড়ায়।*) ঈশ্বরের প্রতি তোমার যে ভালবাসা, এই ভালবাসার মাঝখানে যেন কোন কিছু না আসে। বাইবেলে যীশু বলছেন, এক খাপে দুটো তলোয়ার থাকতে পারে না, তেমনি আবার বলছেন, you cannot serve God and mammon at the same time। জগৎ আর ঈশ্বর দুটোকে একসাথে ভালবাসা যায় না। আমাদের মনে রাখতে হবে, স্বামীজী নারদীয় ভক্তিসূত্রের যে আলোচনা করছেন, এখানে খুব উচ্চমানের ভক্তদের কথা বলছেন আর খুব উচ্চস্তরের ভক্তির কথা বলছেন। আমি হয়ত পারছি না, কিন্তু তাই বলে আদর্শকে কখন ছোট করা যাবে না, আদর্শের সাথে কোন আপোস করা চলবে না। তুমি পারছ না বলে ছেড়ে দিও না, চেষ্টা কর। চেষ্টা করতে গেলে প্রথমে পারবে না, তখন আবার চেষ্টা করতে হবে। আদর্শের সাথে compromise কখনই করা যাবে না; যারাই বলে ঈশ্বরও হবে জগৎও হবে, বুঝতে হবে তারা মানুষকে বোকা বানাতে চাইছে, তার নিজেরাও জানে না, অপরকেও ভুল শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছে।

আগেকার দিনে আমাদের সীমিত সম্পদ ছিল, উন্নত টেকনোলজি ছিল না, তাতেও আমাদের ঋষিরা আপ্রাণ চেষ্টা করতেন কি করে সাধারণ মানুষকে ধর্মপথে নিয়ে আসা যায়। সেই সময় নারীরা ছিল অবহেলিত, শূদ্রদের কোন ধর্মীয় কাজে আসতে দেওয়া হত না, কিন্তু তাতেও সেখানে তাদের জন্য একটা রাস্তা খুলে দিলেন – তুমি তোমার কর্ম ঈশ্বরের সেবা বা উপাসনা রূপে করে যাও, তোমার ভালবাসার যে বস্তু বা ব্যক্তি, তাকেই ঈশ্বর রূপে ভালবাস, তাতেই তোমার ধর্মপথের রাস্তা খুলে যাবে। একজন নারীকে যখন বলা হচ্ছে পতি পরমেশ্বর, আমরা প্রায়শই ভুলে যাই যে, পতি পরমেশ্বর যে আদর্শ সেখানে তুমি পতিকে ঈশ্বর রূপে দেখবে। তোমার এটাই সাধনা, কারণ তুমি অন্য কিছু তো করতে পারছ না। যদি অন্য পথ খুলে যায় তাহলে পতিকে নর্দমায় ফেলে দিও, তাতে কিছু এসে যাবে না। তোমাকে মাথায় রাখতে হবে যে, তোমার যেন

একজন পরমেশ্বর থাকে, সে গুরু পরমেশ্বর হোক, পতি পরমেশ্বর হোক, সন্তান পরমেশ্বর হোক বা অন্য কেউ পরমেশ্বর হোক, তাতে কিছু আসে যায় না। একজন কাউকে থাকতে হবে যাকে তুমি ভগবান রূপে দেখবে। কারণ নির্গুণ নিরাকারকে দেখা যায় না, দেখা দূরে থাক চিন্তন মননও তুমি করতে পারবে না, ওই চিন্তন-মনন না করতে পারার জন্য তোমার একটা প্রকৃষ্ট সাকার রূপ দরকার। তোমার খুব কাছের যে মানুষটি আছে, ঠাকুর যেমন একজনকে বলছেন, তুমি তোমার ভাইপোকে খুব ভালবাসো তো, ঠিক আছে ভাইপোকেই তুমি গোপাল দেখ, ভাইপোই তোমার পরমেশ্বর। এটা হল একটা খুব সহজ পথ, আর এটাকেই আক্ষরিক ভাবে নিয়ে লোকেরা নিজেদের কামনা চরিতার্থ করার কাজে লাগিয়ে দিল। আমাদের শাস্ত্র কোথাও বলছে না যে তোমার স্বামী পরমেশ্বর, শাস্ত্র বলতে চাইছে জীবনের উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে যাওয়া। অন্য কোন তোমার সুযোগ নেই, তাই তোমার স্বামীকেই পরমেশ্বর মনে করে এগিয়ে যাও। আগামীকাল যদি কোন মহাত্মা তোমার জীবনে আসে আর তাঁকে যদি তুমি পরমেশ্বর মনে করে এগিয়ে যাও, খুব ভাল। সারা জীবন স্বামীর গোলাম হয়ে থাকার জন্য কখনই তোমাকে পতি পরমেশ্বর বলা হচ্ছে না, শাস্ত্রের উদ্দেশ্য কখনই তা নয়।

আমাদের দুর্ভাগ্য যে, শাস্ত্রের অমূল্য আধ্যাত্মিক কথা আমাদের মানুষ জানতেই পারল না, জানার চেষ্টাও নেই। যারাও বা একটু জানতে পেরেছে তারা বুঝতেই পারল না শাস্ত্র কি বলতে চাইছে। আসলে আমাদের দেশে সাধারণ মানুষের মধ্যে গভীর গিয়ে অধ্যয়ন করার কোন রেওয়াজ ছিল না। এমনিতেই ভারতীয়রা স্বভাবে প্রচণ্ড কুঁড়ে, বাড়িতে শালগ্রাম শিলা আছে কিন্তু তার পূজাটাও করার ইচ্ছা নেই, বাইরে থেকে পুরোহিত এনে পূজো করাবে। যে সমাজ এত অলস, সেই সমাজের লোকেরা পড়াশোনা, উচ্চচিন্তন কি করে করবে! টেলিভিশন, ইন্টারনেট, সোস্যাল নেটওয়ার্কের দৌলতে ইদানিং বই পড়ার অভ্যাসটাও একেবারেই চলে গেছে। দেশের মানুষ শাস্ত্র উল্টেপাল্টে দেখল না, শাস্ত্র কি বলতে চাইছে বুঝতেই পারল না। আমাদের অমূল্য শাস্ত্রগুলি যে কত উচ্চচিন্তনের রসদে সমৃদ্ধ, সে ব্যাপারে আমরা মূর্খই থেকে গেলাম। এখানে শাস্ত্রের বলার উদ্দেশ্য হল, তোমার কোন উপায় নেই তাই তুমি এভাবে চল। তোমার স্বামী কখনই ঈশ্বর হতে পারে না। তোমার উপায় নেই তাই পতিকে পরমেশ্বর মনে করে এগিয়ে যাও। এগিয়ে যেতে যেতে তুমি একদিন মহৎ হয়ে যাবে, তারপর তোমার স্বামী কোথায় পড়ে থাকবে স্বামী বেচারা জানতেও পারবে না। সেইজন্য বলছেন, আসলে তোমার আর তোমার ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসার মাঝখানে কেউ যেন না থাকে। যে স্ত্রী স্বামীকে পরমেশ্বর বলে দিচ্ছে, সেই স্বামীও ওই ভালবাসার মাঝখানে আসবে না, কারণ স্বামী ওখানে পরমেশ্বর রূপে আসছে। স্বামী উদ্দেশ্য নয়, স্বামীর সেবা করাটা উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য পরমেশ্বর, পরমেশ্বরের সেবা করা, পরমেশ্বরকে বোধ করা।

আর বলছেন, let the world say what it will, জগতের লোকেরা যা বলার বলুক তাতে তোমার কিছু আসে যায় না। তুমি আর তোমার কৃষ্ণের মাঝখানে যেন কেউ না আসে, মীরাবাঈ আর কৃষ্ণ যেমন, তাঁদের মাঝখানে আর কেউ আসতে পারত না, এমনকি মীরার স্বামীও না।

তিন প্রকার ভালবাসা- পরোপকার ও চিত্তশুদ্ধি- যাঁকে ভার দিলে তাঁর চিন্তন করে তাঁর মতে হয়ে যাও

এরপর স্বামীজী খুব নামকরা কথা বলছেন, Love is of three sorts – one demands, but gives nothing; the second is exchange; and the third is love without thought of return – love like that of the moth for the light. (*প্রেম তিন প্রকার – প্রথম প্রকারে দাবির ভাব, নিজে কিছু দেয় না; দ্বিতীয় প্রকারে বিনিময়ের ভাব থাকে; তৃতীয় প্রকারে প্রতিদানের কোন চিন্তা নেই যেন আলোর প্রতি পতঙ্গের ভালবাসা – পুড়ে মরব, তবু ভালবাসতে ছাড়বে না।*) তিন প্রকার ভালবাসার কথা বলছেন, প্রথম প্রকার ভালবাসায় শুধু চাওয়া আর চাওয়া, বদলে আমি কিছু দেব না; দ্বিতীয় প্রকার ভালবাসায় আমি তোমাকে ভালবাসি তুমিও আমাকে ভালবাসো। আমি তোমাকে কত দিন ভালবাসব? যত দিন তুমি আমাকে ভালবাসবে। তৃতীয় প্রকার ভালবাসায়, আমি তোমাকে ভালবাসি, তুমি আমাকে ভালবাসো আর নাই ভালবাসো তাতে আমার কিছু আসে যায় না, আমি তোমাকে ভালবাসি, আমি তোমাক ভালবাসব। পতঙ্গ যেমন আলোকে ভালবাসে, আলোর দিকে উড়ে যায়, কিন্তু আলো তাকে ভালবাসে না, তাকে পুড়িয়ে দেয়, তবুও সে আলোকে ভালবাসে, আমি তোমাকে ভালবাসি তাই তোমার কাছে এলাম। স্বামীজী বলছেন, Love is

higher than work, than Yoga, than knowledge, নারদীয় ভক্তিসূত্রে একটা নামকরা সূত্রে বলছেন, *সা তু কর্মজ্ঞানযোগেভ্যোহপ্যধিকতরা*, এই ভক্তি বা প্রেম কর্ম থেকে, যোগ থেকে, জ্ঞান থেকে শ্রেষ্ঠ। এর পিছনে এনাদের ব্যাখ্যাও আছে। যারা যে মতে চলে তারা তাদের মতের প্রশংসা করবে, সেই মতকেই শ্রেষ্ঠতম বলবে। তবে ভালবাসাতে যেটা হয় তা হল, বেশির ভাগ মানুষের হৃদয়েই ভালবাসা থাকে, সেই ভালবাসাকে কাজে লাগিয়ে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যাওয়াটাই ভক্তির উদ্দেশ্য।

বলছেন, Work is merely a schooling for the doer; it can do no good to others. (*কর্মের দ্বারা কর্মকর্তার নিজেরই চিত্তশুদ্ধি হয়, তার দ্বারা অপরের কোন উপকারই হয় না।*) কর্মযোগে যে কর্ম করছে তাতে একমাত্র তারই ভাল হয়, তার চিত্তশুদ্ধি হয়ে যায়, যার জন্য করা হয় তার কোন ভাল হয় না। অধ্যাপনা বা শিক্ষকতার ক্ষেত্রে অবশ্য একটু অন্য রকম মনে হতে পারে। শিক্ষক ছাত্রদের পড়াচ্ছেন, ছাত্ররা জ্ঞানার্জন করে উপকৃত হচ্ছে, সাথে সাথে শিক্ষকেরও উন্নতি হয়, তার নিজের বিষয়ের জ্ঞানটা আরও পরিষ্কার হয়, পড়াবার অভিজ্ঞতাও অর্জন করতে পারেন। তবে সাধারণ ভাবে যখনই কেউ কোন কাজ করে তখন তাকে মনে রাখতে হবে, এই কাজ করার মাধ্যমে একমাত্র তারই মঙ্গল হবে। বিশেষ করে যারা মনে করছে, আমি সমাজসেবা করছি, অপরের ভাল করছি, তাদের এই জিনিসটা মাথায় রাখা দরকার – এই কাজের দ্বারা একমাত্র আমারই মঙ্গল হবে। স্বামীজী বলছেন, জগৎটা হল কুকুরের লেজ, কুকুরের লেজ সোজা করার চেষ্টা করলে কোন দিন সোজা হবে না, তাও আমাদের ওই চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, কারণ কুকুরের লেজ সোজা করতে গিয়ে মাঝখান থেকে আমরাই সোজা হয়ে যাব। কুকুরের লেজকে সোজা করাটা উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য হল নিজেকে সোজা করা। যখন আমরা অপরের ভাল করতে যাচ্ছি, সেবা করছি, যা কিছু করছি তাতে অপরের কোন ভাল হয় না, ও নিজের মতই চলবে, ও যা চায় আমি আপনি না করলে অন্য একজন করে দেবে। আগে দেখ তুমি বাঁচতে চাও কিনা, তুমি নিজেকে উন্নত করতে চাও কিনা, যদি চাও তাহলে কাজ কর। স্বামীজী এই জিনিসটাকে এখানে ব্যাখ্যা করছেন।

We must work out our own problem, the prophets only show us how to work. (*কর্ম দ্বারা আমাদের নিজেদের সমস্যা সমাধান করতে হবে, মহাপুরুষরা কেবল আমাদের পথ দেখিয়ে দেন মাত্র।*) মিস ওয়াল্ডো যখন নোট নিয়েছিলেন, স্বামীজী সেখানে হয়ত আরও কিছু কথা বলেছিলেন, যতটুকু মনে রাখতে পেরেছিলেন ততটুকুই তিনি নোট করেছেন। আমার সমস্যার সমাধান আমাকেই করতে হবে, অন্য কেউ এসে সমাধান করে দিতে পারবে না। অবতার পুরুষরা এসে আমাদের দেখিয়ে দেন জীবন-যাপন কিভাবে হয়, কাজ কিভাবে হয়। কিন্তু তারপর আমাদের নিজেদেরকেই সব করতে হবে। অপর কেউ যদি আমার জন্য কিছু করে দেয়, জানতে হবে যে ওতে আমার সমস্যার কোন সমাধানই হবে না। পথটা আমাকে দেখিয়ে দেবেন, বাকিটা আমাকে নিজেই করতে হবে। আর বলছেন, What you think, you become, তুমি যা চিন্তা করবে তুমি তাই হয়ে যাবে। ভাগবত আদি গ্রন্থে বার বার এই জিনিসটার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। খ্রীশ্চান পরম্পরায় একটা নামকরা কথা আছে, যেখানে যীশু বলছেন, তোমাদের যাদের কাঁধে বোঝা আছে, আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের বোঝা নিয়ে নেব। আমাদের এখানেও এই ভাবটা রয়েছে, গুরুর চরণে আমার সব সমস্যা অর্পণ করলাম, ঠাকুরের চরণে আমার সমস্ত সমস্যা অর্পণ করলাম। স্বামীজী এটাকে ব্যাখ্যা করে বলছেন, যখনই আমরা মনে করি যে, ঈশ্বরকে বা কোন মহাপুরুষকে আমার সমস্যাগুলো অর্পণ করে দিলাম, if you throw your burden on Jesus, you will have to think of Him and thus become like Him, you love him. (*যীশুর উপর যদি তুমি তোমার ভার দাও, তা হলে তোমায় সদা সর্বদা তাঁকে চিন্তা করতে হবে, এই চিন্তার ফলে তুমি তদ্ভাবাপন্ন হয়ে যাবে, তুমি তাঁকে ভালবাসবে।*) আমরা বলি বটে আমি আমার সুখ-দুঃখ সব ঠাকুরকে দিয়ে দিলাম, কিন্তু সুখ-দুঃখ ঠাকুরকে দিই না। কষ্টে পড়লে আমরা ঠাকুরের কাছে আসি, ঠাকুরের কাছে হাতজোড় করে বলি, হে ঠাকুর! এই সমস্যায় পড়েছি, তুমি একটু দেখো। ধর্মশাস্ত্র কিন্তু এ-কথা কখন বলছে না। বাইবেলে যীশুর একটা কথাকে খ্রীশ্চানরা খুব প্রচলিত করে দিয়েছে, যে কথাকে অবলম্বন করে খ্রীশ্চানরা সারা বিশ্বে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেখানে যীশুর বক্তব্য হল, সংসার জ্বালায় যারা জ্বলে-পুড়ে মরছ, যারা কষ্টে আছ, তারা আমার কাছে এসো, আমাকে সব কষ্ট দিয়ে দাও, আমি তোমাদের বোঝা নিয়ে নেব। এটাকে স্বামীজী ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন, যারা

যীশুকে সব বোঝা দিয়ে দেবে তাদেরকে যীশুর কথা ভাবতে হবে। যত যীশুর কথা ভাববে ততই তুমি তার মত হয়ে যাবে। মানুষ যার কথা চিন্তা করে, সে তার সত্তা পেয়ে যায়।

ভগবান বুদ্ধের প্রধান শিষ্য আনন্দ একদিন ভিক্ষায় বেরিয়েছেন। ঘুরে ঘুরে তাঁর জল পিপাসা পেয়েছে। এগিয়ে দেখেন একটা আদিবাসী মেয়ে কুয়ো থেকে জল তুলছে। আনন্দ কুয়োর কাছে গিয়ে মেয়েটির কাছে জল চাইলেন। মেয়েটি আনন্দকে বলল, 'আমি নিচু জাতের'। আনন্দ বলছেন, 'তোমার কাছে আমি তোমার জাত জানতে চাইনি, তোমার কাছে জল চেয়েছি'। মেয়েটি আনন্দের কথা শুনে অভিভূত হয়ে গেছে, তার ধারণার মধ্যে আসছে না যে, এই পৃথিবীতে এমন কেউ আছে যে এমন মিষ্টি করে, সুন্দর করে আমার মত নিচু জাতের মেয়ের সাথে কথা বলবে। মেয়েটি সেখানেই জলের ঘড়া ফেলে দিয়ে আনন্দের পিছন পিছন হাটতে শুরু করে দিয়েছে, একে ছাড়া আমি বাঁচব না। গেরুয়াধারী এক সন্ন্যাসী ভিক্ষা করতে বেরিয়ে এক নিচু জাতের মেয়েকে একটু মিষ্টি কথা বলে দিলেন, মেয়েটি এবার সন্ন্যাসীর পেছু নিয়েছে, ওকেই আমি বিয়ে করব। আনন্দও খুব সমস্যায় পড়ে গেছে। আনন্দ সোজা ভগবান বুদ্ধের সামনে গিয়ে হাজির হয়ে গেলেন, মেয়েটিও তাঁর পিছন পিছন সেখানে হাজির হয়ে গেছে। ভগবান বুদ্ধ সব শুনলেন। সব শোনার পর ভগবান বুদ্ধ মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আনন্দের কোন জিনিসটা তোমার পছন্দ হয়েছে'? মেয়েটি উত্তর দিল, 'ওনার এই মিষ্টি ব্যবহার'। 'তাহলে তুমি অপরকে কেন পেতে চাইছ, ওটা তুমি নিজের ভিতরে নিয়ে এসো, তাহলে অপর কাউকে তোমাকে ভালবাসতে হবে না'।

যদি ঠাকুরের কোন ভক্তকে জিজ্ঞেস করা হয়, আপনি ঠাকুরের ভক্ত, ঠাকুরের কোন জিনিসটা আপনার ভাল লাগে? ভক্ত কিছুই বলতে পারবে না। যিনি বলছেন, আমি কৃষ্ণকে মানি, আমি কালীকে মানি, আমি শিবকে মানি, তাঁকে জিজ্ঞেস করুন, আপনি যাঁকে মানেন তাঁর কোন জিনিসটা পছন্দ করেন? যদি বলেন ওনার বিগ্রহটাই ভাল লাগে। তাহলে জেনে রাখুন, ওনার বিগ্রহটা মার্বেল পাথরের, মরে গিয়ে আপনি মার্বেল পাথরই হবেন। কারণ তাঁর যেটা ভাল লাগে আপনি সেটাই হবেন। অনেকে বলবেন, আমি ঠাকুরের সরলতাকে ভালবাসি। তাহলে আপনিও সরল হয়ে যান, ঠাকুরও বলছেন সরল না হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। সহজ না হলে সহজকে ধরা যায় না। সরল জিনিসটা কি, এর ব্যাখ্যা অবশ্য কেউ করতে পারে না। আমাদের মন খুব জটিল, যারা বোকা হয় তারাও রীতিমত জটিল স্বভাবের হয়। সাধনা করে করে জ্ঞানের আলো আসতে শুরু হলে, ধীরে ধীরে মনের জটিলতা গুলি খসতে শুরু করে, হয়ে হয়ে এমন একটা জায়গায় চলে যায়, যেখানে সে সরল হয়ে যায়। যিনি বলছেন, আমার কাছে ঠাকুর মানে সরল, তাহলে আপনাকেও সরল হতে হবে, সরল হওয়া মানে আপনাকে জ্ঞানী হতে হবে। জ্ঞানী হতে হবে মানে, আপনাকে শাস্ত্র জানতে হবে, জপ-ধ্যান সাধনা করে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ করতে হবে, তবেই আপনি সহজ সরল হবেন। যদি এগুলো না করেন, আর বলেন আমি ঠাকুরের ভক্ত, তাহলে আপনি সবাইকে বোকা বানাচ্ছেন।

ভগবান বুদ্ধ মেয়েটিকে বললেন, 'তুমি কিছু দিন এখানে থাক, আমরা যা যা করি সেই রকম তুমিও কর, ছ-মাস পরেও যদি তোমার সেই রকম ইচ্ছা থাকে, তখন দেখা যাবে'। ভিক্ষুণী হয়ে মেয়েটি থেকে গেল, কিন্তু মাথায় তার ঘুরছে, কবে আনন্দকে বিয়ে করব। কিন্তু ছ-মাস ধরে সব রকম অনুশীলন করার পর, ধীরে ধীরে ওর মনটাই পাল্টে গেল। মনটা যখন পাল্টে গেল, তখন আনন্দের থেকে ওর দৃষ্টি সরে গিয়ে নিজের উপর এসে গেল। আনন্দের যে করুণার ভাব, আনন্দের যে ভালবাসা, আনন্দের যে উচ্চমানের চিন্তন, সেই ভাব, ভালবাসা, চিন্তনে নিজেই চলে গেল।

ধর্মের ঠিক এই সমস্যাটাই হয়ে যায়, শুধু ধর্মেই নয়, টেকনোলজিতেও এই সমস্যা আছে। বাড়িতে সবাই বিদ্যুতের ব্যবহার করছি, কিন্তু কেউ জানার চেষ্টা করি না ফিউজ কেন উড়ে যায়। মোবাইল ফোন সবাই ব্যবহার করছি কিন্তু জানার চেষ্টা করি না, ফোন কিভাবে কাজ করে। ধর্মেও অনেকটা তাই, গভীরে যাওয়ার কেউ চেষ্টা করছে না। ফলে, ধর্মকে নিজের ভিতরে না নিয়ে, পূজোর স্তরেই রেখে দেওয়া হয়। এক গ্লাশ দুধ খেতে দেওয়া হয়েছে, দুধ না খেয়ে আমরা সেই দুধের গ্লাশকে পূজা অর্চনা করে রেখে দিলাম। ঠাকুর বলছেন, সিদ্ধি গায়ে মাখলেও নেশা হয় না, সিদ্ধি খেতে হয়, তবে নেশা হবে। ধর্মও ঠিক তাই, ধর্মকে ভিতরে নিতে হয়। স্বামীজী এই জিনিসটাকেই বলছেন, যীশুর উপর তুমি যখন সব ছেড়ে দিলে, তখন তোমাকে যীশুর কথা

চিন্তন করতে হবে। গীতায় ভগবান বলছেন, *সর্বধর্মান্ পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ,* ধর্মাধর্ম সব আমার উপর ছেড়ে দিয়ে আমার শরণে এসো। যদি সব কিছু তাঁর উপর ছেড়ে দেওয়া হয় তখন সব সময় তাঁর কথাই ভাবতে হবে। গিরিশ ঘোষ ঠাকুরকে বকলমা দিলেন, গিরিশ ঘোষকে ঠাকুরের কথাই ভাবতে হবে। তখন কি হয়? যাঁর চিন্তা করা হচ্ছে, চিন্তা করতে করতে তাঁর সাথে এক হয়ে যাবে। বকলমা দেওয়ার কথা উঠলেই শরণাগত হওয়ার কথা আসে, শরণাগত হওয়া মানে, এবার চব্বিশ ঘন্টা শুধু তুমি তাঁর চিন্তনই করবে; যা কিনা আমাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। ঠাকুর খুব মজা করে বলছেন, পণ্ডিত মশাই হরিনাম করতে করতে নদীর উপর দিয়ে হাটবেন, আগে কাপড়টা তুলে নিচ্ছেন যাতে ভিজে না যায়। আমাদের অবস্থাও পণ্ডিতের মত, এটাও করছি, সেটাও করছি। যিনি ঠিক ঠিক ঠাকুরের উপর পুরোপুরি নির্ভর, তাঁর অন্য কোন দিকে আর দৃষ্টি থাকে না। এখানে প্রেমের খুব উচ্চাবস্থার বর্ণনা করছেন।

এই আলোচনার পরিসমাপ্তির করে স্বামীজী বলছেন, Exetreme love and higest knowledger are one, অদ্বৈত বেদান্তের জ্ঞান আর ভক্তিশাস্ত্রে পরমপ্রেমের যে কথা বলা হয়, দুটো এক, দুটোর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। To love is to know, to know is to love, একটা জিনিসকে যখন আমি জানি, ঠিক ঠিক বোধ করছি তখন আমি তাকে ভালবাসছি, যাকে আমরা ভালবাসি তাকে আমরা জানি। গীতায় ভগবান বলছেন, *প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ,* জ্ঞানী আমার সব থেকে প্রিয়, জ্ঞানীর জন্য আমি প্রিয়, আমার জন্য জ্ঞানী প্রিয়। যিনি ঈশ্বরতত্ত্ব জানেন তিনিই ঈশ্বরকে ভালবাসতে পারেন। আমরা ঈশ্বরতত্ত্ব জানিনা, আমরা তাঁকে কি ভালবাসব! ঈশ্বরকে ভালবাসি এটা আমাদের মুখের কথা। ঈশ্বর সম্বন্ধে দুটো কথা শুনেছি, ওটাকে আধার করেই আমরা মন্দিরেও যাচ্ছি, জপধ্যানও করছি আর অন্য ধরণের সব কাজও করে যাচ্ছি। কিছু না করার থেকে এটা অবশ্যই ভাল, কিন্তু এই ভাব আমাদের বেশি দূর নিয়ে যেতে পারবে না, কারণ ঠিক ঠিক ধর্মের ক্ষেত্রে এর কোন দাম নেই।

অনেকের মনে প্রশ্ন হতে পারে, স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, to be, not to become, কিন্তু এখানে বলছেন you will become like Jesus, তুমি যীশুর মত হয়ে যাবে, দুটো বিপরীত হয়ে গেল না? এখানে বিপরীত কিছু নেই। বেদান্তের দৃষ্টিভঙ্গীতে শঙ্করাচার্য দুই প্রকার সাধনার কথা বলছেন। আচার্য যেমন উপমা দিচ্ছেন, চন্দন অনেকদিন জলের মধ্যে থাকলে সুগন্ধ চলে গিয়ে চন্দনে দুর্গন্ধ এসে যায়। কিন্তু সেই চন্দনকেই আবার ঘষে দিলে স্বাভাবিক অবস্থায় চলে আসবে। এটা একটা প্রকার। এর অর্থ, তুমি যা তুমি তাই হয়ে যাও। চন্দনের দুর্গন্ধটা তার স্বাভাবিক অবস্থা নয়। তোমার যেটা স্বাভাবিক অবস্থা নয় কিন্তু তুমি সেটাই হয়ে আছ, সেটাকে তোমায় ছাড়তে হবে। তুমি যা সেটাই তুমি হয়ে যাও। যেটা চাপিয়ে রাখা হয়েছে সেটাকে ফেলে দেওয়াটাকে কি becoming বলা যাবে? কখনই বলা যাবে না, তুমি যা আছ সেটা হয়ে যাও। আমি আঙুল ছাড়াতে পারছি না, বলে চেঁচিয়ে যাচ্ছে। তুমি তো আঙুল নিজে ধরে রেখেছ, হাত থেকে আঙুল ছেড়ে দিলেই ছেড়ে যাবে। এই ছেড়ে দেওয়াকে যদি becomingবলা হয়? Technically ভুল বলা হবে। Becoming মানে কি তাই? একটা পাথর আছে, সেটাকে কেটে কেটে একটা মূর্তি বানিয়ে দেওয়া হল। সেটাকেও ঠিক ঠিক becoming বলা যাবে না। মাইকেল এঞ্জেলো বলতেন, মূর্তিটা ওই পাথরের মধ্যেই ছিল, মূর্তির উপর কিছু অবাঞ্ছিত পাথর ছিল, সেগুলোকে আমি সরিয়ে দিয়েছি। এটাই হয়ে গেল বেদান্তের দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু মাটি দিয়ে যখন কোন প্রতিমা গড়া হয়, তখন সেটাকে আমরা বলতে পারি যে নূতন কিছু গড়া হচ্ছে। কিন্তু তাতেও ওরা বলবে, ওই প্রতিমা মাটির মধ্যেই ছিল। মূল কথা হল, যখন খুব সচেতন ভাবে বলছেন, তুমি আবর্জনা চাপিয়ে রেখেছে এগুলোকে ফেলে দাও, এটাকে তখন বলা হবে To be। তোমাকে নূতন কিছু হতে হবে না, তুমি যা তুমি তাই হবে। কিছু আগে আমরা যে সহজ সরল নিয়ে আলোচনা করছিলাম, আসলে তুমি সহজ সরল। কিন্তু তুমি নিজেকে জটিল বানিয়ে রেখেছ, সব জটিলতাকে ছেড়ে দিলেই তুমি আবার সহজ সরল হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় প্রকার সাধনা হল ভক্তিমার্গের, ভক্তিমার্গে বলা হয় তোমাকে কৃষ্ণের মত হতে হবে। এবার মনে করা যাক, becomingএর approach নেওয়া হয়েছে। শেষ অবস্থায় যখন যায়, যেখানে Exetreme love and higest knowledger are one, তখন দেখে সে চিরদিন কৃষ্ণই ছিল। এতদিন ধরে যেটা

becoming becoming করে সাধনা করা হল, সেটাই তখন দেখে এতদিন তো আমি এটাই ছিলাম। মুণ্ডকোপনিষদে দুটি পাখির কথা বলা হচ্ছে, একটা পাখি গাছের শীর্ষে মগডালে বসে আছে, আরেকটা পাখি নীচের ডালে বসে কখন মিষ্টি ফল খাচ্ছে, কখন কটু ফল খাচ্ছে। মিষ্টি আর কটু ফল খেতে খেতে উপরের দিকে উঠতে থাকে আর ভাবে উপরের পাখির মত হতে হবে। শেষে উপরে গিয়ে দেখে উপরের পাখি কোন সময়ই ছিল না; স্বামীজী being and becoming এই অর্থেই বলছেন। Beingটা বেদান্ত থেকেই আসে, আর স্বামীজীর অনেক কোটেশান আছে যেগুলো শাস্ত্রে যে অর্থে বলা হয়েছে ঠিক ওই অর্থে নেওয়া যায় না। তবে বেদান্তের দৃষ্টিভঙ্গি হল being আর ভক্তিমার্গের দৃষ্টিভঙ্গি হল becoming। Being যখন হয়ে যায় তখনও আমরা বলব নরেন স্বামী বিবেকানন্দ হয়ে গেলেন, নরেন ব্রহ্মজ্ঞানী হয়ে গেলেন। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানী কেউ হয় না, সে চিরদিনই ব্রহ্মজ্ঞানী, তার উপর অজ্ঞানের আবরণ পড়ে আছে। ভক্তিমার্গে ভক্ত সাধনা করে করে কিছু হয়ে গেল, শেষে গিয়ে দেখে সে চিরদিনই ঈশ্বরের সাথে অভিন্ন ছিল। সেইজন্য becoming কখন হয় না, যেটা হয় সেটা beingই হয়।

আমরা বলছি ঠাকুর সরল ছিলেন আমাদেরও সরল হতে হবে। আমরা স্বভাবেই সরল, যেদিন জন্ম নিয়েছি সেদিন থেকেই আমরা সরল ছিলাম, জটিল স্বভাবটা আমরা পরে নিয়ে এসেছি। আমরা বলতে পারি, পড়াশোনা করে তো আমরা গ্রাজুয়েট হয়েছি, ডাক্তার হয়েছি, ইঞ্জিনিয়ার হয়েছি। এই পড়াশোনাটা জগতে চলার জন্য। কিন্তু শাস্ত্র পড়ে ধ্যান-ধারণা করে যে অনুভূতি বা জ্ঞান হবে, সেটা আমাদের সকলের ভিতরেই বিদ্যমান। এমনকি জগতে চলার জন্য যে শিক্ষা দরকার সেক্ষেত্রেও স্বামীজী বলছেন, all knowledge is within you, সমস্ত জ্ঞান আগে থাকতেই তোমার মধ্যে আছে। শিক্ষক যে শিক্ষা দেন তাতে তিনি শুধু suggestions দেন, ওই suggestion থেকে তার ভিতরের জ্ঞানটা উপরে উঠে আসে। উচ্চতর ক্ষেত্রে সেইজন্য being কখন becoming হয় না, যদিও সাধারণ অবস্থায় মনে হয় যে becoming হচ্ছে। অন্য দিকে becomingটা being হয় উচ্চতর অবস্থায় গিয়ে। তবে খুব ভাল করে মনে রাখতে হবে বেদান্ত সাধনায় কখনই becoming হয় না। কিন্তু আশেপাশের সাধারণ লোকেরা যারা দেখছে, তারা দেখবে সে পাল্টে যাচ্ছে, তার পরিবর্তন হচ্ছে। কিন্তু কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। পরিবর্তন যেটা হচ্ছে, তা হল, যত আবর্জনা জুটিয়ে ছিল সেগুলোকে ফেলছে, সাথে সাথে সে যা সে তাই হয়ে যাচ্ছে।

আদম আর ঈভকে স্বর্গ থেকে বহিস্কৃত করে দেওয়া হল, সেই থেকে মানবজাতি চেষ্টা করে যাচ্ছে স্বর্গে ফেরত যাবার। তার মানে, মানবজাতির স্বাভাবিক অবস্থাটাই হল স্বর্গের, স্বর্গে অবস্থান করাটাই তার স্বাভাবিকত্ব। এই মর্ত্যভূমি তার জন্য অস্বাভাবিক। তাই স্বর্গে যাওয়াটা আমাদের কাছে প্রচেষ্টা, কিন্তু ওটাই আমাদের স্বাভাবিক স্থিতি। ঠিক তেমনি আত্মজ্ঞান, আমাদের যে জ্ঞানের অবস্থা সেটাই স্বাভাবিক। তাই beingটাই আসল, becomingটা শুধু লোকচর্চার জন্য, লোকেদের বোঝাবার জন্য।

এবারে স্বামীজী বলছেন, But theorizing about God will not do, we must love and work. (*তবে ঈশ্বর-সম্বন্ধে কেবল নানা মত-মতান্তরের আলোচনা করলে চলবে না। তাঁকে ভালোবাসতে হবে এবং সাধন করতে হবে।*) চিন্তা-ভাবনা করে ঈশ্বরের ব্যাপারে আমরা একটা ধারণা তৈরী করে নিই, নিজের নিজের মতানুযায়ী ঈশ্বরকে ব্যাখ্যা করে দিই, এভাবে কিছুই হয় না। ঠাকুরও অনেকবার বলছেন, বিচার করে ঈশ্বরকে এক রকম জানা যায়, আবার তাঁর সাক্ষাৎ হলে আরেক রকম জানা যায়। আমরা বেশির ভাগই ঈশ্বরের ব্যাপারে নিজের মত একটা ধারণা করে নিয়েছি। স্বামীজী বলছেন, এভাবে হয় না। তাহলে কিভাবে হয়? We must love and work, ঈশ্বরকে ভালবাসতে হয়, ঈশ্বরকে কেন্দ্র করেই সমস্ত কাজ করতে হবে। Give up the world and worldly things, especially while the 'plant' is tender. (*সংসার ও সাংসারিক বিষয় সব ত্যাগ কর, বিশেষতঃ যতদিন 'চারাগাছ'- মন শক্ত না হয়।*) জগৎ আর জাগতিক বিষয়বস্তুকে ছাড়। ধর্মের পথ, মুক্তির পথ তুমি যদি বেছে নিয়ে থাক তাহলে সংসার, সাংসারিক ভাব এগুলোকে আসতে দিও না, তা নাহলে তোমার ভিতরে যে মুক্তির ইচ্ছার চারাগাছটা বেরিয়েছে সেটাকে নষ্ট করে দেবে।

স্বামীজী বলছেন, Day and night think of God and think of nothing else as far as possible. The daily necessary thoughts can all be thought through God. (*দিবারাত্র ঈশ্বরচিন্তা কর এবং যতদূর সম্ভব অন্য বিষয়ের চিন্তা ছেড়ে দাও। দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় চিন্তাগুলি সবই ঈশ্বর-ভাবিত হয়ে করা যেতে পারে।*) যতটা সম্ভব দিবারাত্রি শুধু ঈশ্বরকে নিয়েই ভাববে। এমনকি জীবননির্বাহের জন্য যা কিছু দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্ম, সেগুলিও ঈশ্বরের মাধ্যমে করা যেতে পারে। যেমন Eat to Him, drink to him, sleep to him, see him in all. Talk of God to others; this is most beneficial, যখন খাওয়া-দাওয়া করছি তখন ঈশ্বরকে অর্পণ করে খাচ্ছি, জলপান করছি সেটাও ঈশ্বরকে অর্পণ করে করছি, ঘুমোচ্ছি, যেন মায়ের কোলেই ঘুমিয়ে আছি, হাটছি যেন মাকে প্রদক্ষিণ করছি, অন্যের সাথে কথা বলছি তখন ঈশ্বরীয় কথাই বলছি। এভাবে চললে ঈশ্বরীয় ভাবটা ধরে রাখা যায়, কিন্তু এগুলো সবই প্রস্তুতি, এটাই শেষ কথা নয়। তবে ভাব একবার পাকা হয়ে যাওয়ার পর, তখন জগৎটাই অন্য রকম হয়ে যাবে।

ভগবান লাভের প্রধান দুটি উপায়

নারদীয় ভক্তিসূত্র থেকে স্বামীজী বলছেন, Get the mercy of God and of His greatest children; these are the two chief ways to God. (*ভগবানের অথবা তাঁর যোগ্যতম সন্তান যে-সব মহাপুরুষ – তাঁদের কৃপালাভ কর। এই দুইটি হল ভগবান লাভের প্রধান উপায়।*) নারদীয় ভক্তিসূত্রের সূত্রটি এই রকম – *মুখ্যতস্তু মহৎকৃপয়ৈব ভগবৎকৃপালেশাদ্বা*। বলছেন, মহাপুরুষের অনুগ্রহ বা ঈশ্বরের একটু কৃপা হলেই ঈশ্বরের দিকে মন যায়, ভক্তি লাভ হয়। সাধারণ অর্থে বলা হয়, একটু যেন সাধুসঙ্গ হয়, সাধুসঙ্গে অনেক কিছু হয়ে যায়। ঠাকুরও বার বার সাধুসঙ্গের কথা বলছেন। কিন্তু একটু গভীরে গেলে এই ব্যাপারটা অন্য রকম হয়ে যায়।

আমরা যখন এক অপরকে দেখছি বা অপরের কথা ভাবছি, তখন আমিও সত্য আর যাকে দেখছি বা যার কথা ভাবছি, সেও সত্য। ঠাকুরের ভক্তরা ঠাকুরকে মানে, ঠাকুরের কথামৃতকে মানে, ঠাকুর যখন বলছেন ঈশ্বর সত্য তখন সেটাও মানে। এবার একটু চিন্তা করে যদি দেখি, আমরা কোন কোন জিনিসকে সত্য বলে মনে করি? আমার হাতে একটা ফোন আছে, আমার কাছে ফোনটা সত্য, সামনে টেবিল আছে, বই আছে, টেবিল, বই সবটাই সত্য, মাথার উপর পাখা ঘুরছে, পাখাটাও সত্য। মশা-মাছি উড়ছে, মশা মাছিগুলো আমার কাছে সত্য, আমি আমার কাছে সত্য। তার মানে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে জগৎটা সামনে আছে সেটা আমাদের কাছে সত্য। এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে পেন একটা জড় বস্তু, পাখাতে ইলেক্টিসিটি কাজ করছে, আর মাছি, মশা রয়েছে যারা কোন রকমে তাদের জীবন চালিয়ে নিচ্ছে। এর বাইরে গরু আছে, ছাগল আছে, সেখান থেকে মানুষ আছে, তার মধ্যে যাযাবর আছে, এক জায়গায় স্থায়ীভাবে বসবাসকরা মানুষ আছে, সুসভ্য, অসভ্য, সংস্কৃতিবান, অসংস্কৃতিবান সবই আছে, তার মধ্যে আমরাও আছি। আমরা যে জগতে আছি এটা যেন একটা দ্বীপ, এই দ্বীপটা পৃথিবী। এরপর অনন্ত আকাশ, যেখানে আর কিছু নেই। আর বহু দূরে, সূদূরে আরেকটি যেন গ্রহ আছে, সেটা যেন ঈশ্বরের গ্রহ, যেটা আমরা কিছুটা মানি, কিছুটা মানি না।

যারা পুরোপুরি ভৌতিকবাদী, তাদের কাছে ঈশ্বর নেই, আছে শুধু এই ছোট্ট দ্বীপ, যেখানে পাথর থেকে ছোট্ট জীবনের সূত্রপাত হয়, এনার্জি থেকে শুরু হয়ে পাথরাদি থেকে হয়ে হয়ে মানুষ, মানুষ থেকে আমি, কাহিনী শেষ। ভক্তের কাছে কাহিনী এখানেই শেষ নয়, এরপর আছেন ঠাকুর, অর্থাৎ শুদ্ধ চৈতন্য। ঈশ্বরকে বোঝাতে গিয়ে ঠাকুর বলছেন, তিনি চৈতন্য, তিনিই সচ্চিদানন্দ, সর্বাবস্থায় তিনিই আছেন, তিনি চৈতন্যময়, তিনি আনন্দময়। আবার বলছেন, তাঁর দর্শন হলে রম্ভা, তিলোত্তমা, মেনকাদের চিতাভস্ম বলে মনে হয়। রম্ভা, মেনকাকে সৌন্দর্যের চরমতম রূপ বলেই মনে করা হয়, তাকে কিনা বলছেন চিতভস্ম। ঈশ্বর দর্শনে যে আনন্দ হয় সেই আনন্দের তুলনা করছেন, শরীরের যত রোমকূপ আছে তাতে রমণসুখ অনুভব হয়। এই উপমাগুলোর সাহায্যে ঈশ্বর দর্শনের আনন্দ কত বিশাল আর ব্যপ্তিময় হতে পারে বোঝান হচ্ছে।

আমাদের এই ভৌতিক জগৎ, যেখানে পাথর থেকে শুরু করে আমরা পর্যন্ত আছি, এটা যেন একটা দ্বীপ, এই দ্বীপের পর যেন অনন্ত একটা ফাঁকা জায়গা। এই দ্বীপে আমার আপনার যে সুখ, যে সৌন্দর্য, যে

রূপ, তার সাথে অনন্তের সুখ, সৌন্দর্যের মধ্যে বিরাট একটা ফাঁক। এই দ্বীপে রম্ভা, মেনকার রূপের কাছে অন্য মেয়েদের রূপ অতি নগণ্য মনে হবে। একদিকে এই নগণ্য রূপ আর সেখান থেকে সোজা ঈশ্বরের সৌন্দর্য, মাঝখানে পুরো ফাঁকা, যুক্তিতে কি কখন সম্ভব ঈশ্বরের রূপের সাথে তুলনা করা! একদিকে কাঠ, মাটি, পাথরের মত সম্পূর্ণ জড় পদার্থ, সেখান থেকে বিবর্তিত হয়ে হয়ে মশা, মাছি, সেখান থেকে বিবর্তিত হয়ে হয়ে পশু, পাখি, সেখান থেকে আবার বিবর্তিত হয়ে হয়ে সাধারণ মানুষ। আর এই সাধারণ মানুষ থেকে বিবর্তিত হয়ে সোজা চৈতন্য হয়ে যাচ্ছে? আমাদের মত সাধারণ লোকের চেতনার স্তর আর সেখান থেকে সোজা শুদ্ধ চৈতন্য হয়ে যাবে, তা কি কখন হয়? যুক্তিতেই দাঁড়াবে না। যেখানে সবটাই ক্রমবিকাশ, পাথর থেকে ক্রমবিকাশ হতে হতে মানুষ পর্যন্ত এসে গেল, মানুষে এসে যেন পুরোটা ভ্যাকুইম্ হয়ে যাচ্ছে। একটা গরু আর মানুষের মধ্যে যে তফাৎ, মানুষ আর ঈশ্বরের মধ্যে কি একই তফাৎ হবে? না কি কোটি গুণ তফাৎ হয়ে যাবে? অবশ্যই কোটি কোটি গুণ। তার মানে মানুষ আর ঈশ্বরের মাঝখানে আরও অনেক কিছু থাকতে হবে। তা নাহলে যুক্তিতেই জিনিসটা দাঁড়াবে না। কিন্তু আমাদের সবার এটাই অবধারণা হয়ে আছে যে, একদিকে পাথর, তারপর মশা মাছি, তারপর গরু ছাগল, তারপরই আমরা, তারপরে যেন অনন্ত শূন্য। এই অনন্ত শূন্যের পরে সেই শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ – এই পুরো অবধারণাটাই সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। তা নাহলে আমাদের বলতে হবে, তালেগোলে পাথর থেকে শুরু হয়ে কিভাবে মানুষ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে, এরপর কি আছে আমাদের জানা নেই, কাহিনী এখানেই শেষ। তাই যদি হত, ঠাকুর আর ঠাকুরের কথামৃতকে আবর্জনার বাক্সে ফেলে দিতে হবে। এটাই যদি হয়, তবে গিয়ে এটা যুক্তিতে দাঁড়াবে।

কিন্তু যে মুহূর্তে ঠাকুরকে নিয়ে আসা হবে, শুধু ঠাকুরই না, যীশু, ভগবান বুদ্ধ, বাইবেল, কোরাণ, যেটাই নিয়ে আসা হোক না কেন, যেখানে ঈশ্বরের স্বরূপের কথা বলা হচ্ছে, তখন আর আমাদের ওই অবধারণাটা যুক্তিতে দাঁড়াবে না। যদি শুধু আমি হতাম আর ঈশ্বর হতেন, তাহলেও যুক্তিতে মিলে যাবে। কিন্তু পিছনের দিকে তাকালে দেখছি এত এত প্রাণী রয়েছে, ক্রমবিকাশের স্তরে যারা অনেক পিছিয়ে রয়েছে। এখানে তিনি যেন মাটি আর আকাশ এতটাই ফাঁক, এই জিনিস কখনই বাস্তবে সম্ভব নয়। তখনই মানতে হবে এই বিশাল গ্যাপের মধ্যে অন্যান্য প্রজাতিও রয়েছে। হিন্দুরা চিরদিনই এটাকে মেনে আসছে, ভালর দিকেও মেনে রেখেছে, মন্দের দিকেও মেনে রেখেছে। ভালোর দিকে, দেবতারা আছেন, গন্ধর্বরা আছেন, ঋষি মহর্ষিরা আছেন, সিদ্ধরা আছেন, অপ্সরাদিরা আছেন। আর মন্দের দিকে আছে অসুরদের মত প্রজাতিরা। আমরা তো কাউকে দেখতে পাই না। আমরা দেখতে পাই না, কারণ আমাদের দেখার ক্ষমতা নেই। যুক্তিতে এটাই দাঁড়ায়। ক্ষমতা না থাকার পিছনেও কারণ আছে, আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় যেমন এই ভৌতিক জগৎকে দেখছে, তারা কেউ ভৌতিক নয়।

তখনই মনে প্রশ্ন আসে, ভৌতিক যদি না হয়ে থাকে তাহলে এরা কোন শক্তিতে চলছে? এই ভৌতিক জগৎ, যেটা আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করছি, এই জগৎ চলছে ফিজিক্যাল এনার্জি দিয়ে, ম্যাটার আর এনার্জি। আর আমরা বলছি, সেখান থেকে সরাসরি ভগবান, যেখানে শুদ্ধ চৈতন্য, যাঁর ইচ্ছা মাত্র সব কিছু হচ্ছে; আবার গ্যাপ হয়ে যাচ্ছে। একদিকে ফিজিক্যাল এনার্জি, যেটাকে আমরে মেপে নিতে পারছি আর সেখান থেকে সোজা ঈশ্বর চৈতন্যময়ে চলে যাচ্ছে, যেটা ধারণাই করা যায় না, মাপামাপির কথা ছেড়েই দিচ্ছি, ধারণাই করা যাচ্ছে না, সে কি কখন হয়! তার মানে মাঝখানে কিছু শক্তি থাকতেই হবে। যাঁকে মন দিয়ে জানা যায় না, চিন্তা-ভাবনা করে জানা যায় না, আর দুম্ করে সেখান থেকে এনার্জি কনভার্টেড হয়ে বেরিয়ে এলো! তা কখনই হতে পারে না। ওই এনার্জি আরও বেশি গভীর ও ব্যপ্তি, যেটা আমাদের শাস্ত্রে বার বার বলছেন, স্বামীজী বার বার বলছেন, সেটা হল আধ্যাত্মিক শক্তি। আমাদের যে ভৌতিক শক্তি রয়েছে, এরও পিছনে রয়েছে আধ্যাত্মিক শক্তি ও বিভিন্ন ধরণের শক্তি।

অনেকেই বিশ্বাস করবে না হয়ত, মানতেও না পারে, হ্যারি পটারের যে সাত আটটি ভলিউম আছে, পুরো বইয়ের বক্তব্য খুব সহজ। হ্যারি পটারের জন্মের পর থেকে ঠিক হয়ে আছে যে তাকে আসুরিক শক্তি মারবে। নিজের ছেলেকে বাঁচাবার জন্য মা তখন নিজেকে বলিদান দিয়ে দিচ্ছে, মায়ের এই বলিদানের জন্যই হ্যারি পটার সব সময় সুরক্ষিত হয়ে আছে। আসুরিক শক্তি সবাইকে সহজে যেভাবে ধরে ফেলছে সেভাবে

হ্যারি পটারকে কিছুতেই ধরতে পারছে না, হ্যারি পটারকে সহজে মারতে পারছে না। লেখিকা বার বার দেখাচ্ছেন যে, মা নিজেকে সন্তানের জন্য বলিদান দিয়েছিল বলে সে সুরক্ষিত, তাই হ্যারি পটারকে অশুভ শক্তি মারতে পারছে না। বিদেশীদের কাছে এটা বিরাট কিছু, কিন্তু আমাদের এখানে দিনরাত মায়েরা এটাই করে যাচ্ছে। ভারতবর্ষের মায়েরা সারাটা বছর আজ এই উপোস কাল এই উপোস, পরশু রাত্রে এই ব্রত, কাল সেই ব্রত, তরশু রাতে সারা রাত জেগে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছে, সন্তানের মঙ্গলের জন্য কিছু না কিছু করেই যাচ্ছে। মায়েরা আজকে স্বামীর জন্য ব্রত করছে, কাল ছেলের জন্য ব্রত করছে, পরশু মেয়ের জন ব্রত করছে। আমরা সত্যি সত্যি জানি মায়ের যে ভালবাসা, মায়ের যে তপস্যা এটা দিয়ে তার পরিবার ও সন্তানের মঙ্গল সাধিত হয়। সন্তান সে এত কিছু বোঝে না, পুরো ভৌতিক শক্তি দিয়ে তার জগৎ চলে, কিন্তু মায়ের তপস্যাই তাকে রক্ষা করছে। এই যে মা তপস্যা করছে, এখান থেকেই তার মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি উন্মেষ হয়। পুরুষরা এই শক্তি তৈরী করতে পারে না, মায়েরাই পারে। সেই পুরুষরা পারেন, যাঁরা জপধ্যান, পূজা অর্চনা, তপস্যাদি করেন, বাকিরা কেউ পারে না। যে কোন পরিবারে স্ত্রী যদি তপস্যা না করে, মা যদি সন্তানের জন্য তপস্যা না করে, তাহলে এই সংসার তাকে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে টের পাবে না। মেয়েরা যদি জপধ্যান করে, ব্রতোপবাস করে, তাতেই বাড়ির পুরুষরা স্বচ্ছন্দে সংসারে টিকে থাকবে।

পুরুষরা তপস্যার জন্য, যেমন বিশ্বামিত্রাদি ঋষিরা ছিলেন। তপস্যা করছেন, সাথে সাথে তাঁদের আধ্যাত্মিক শক্তি তৈরী হচ্ছে। বিশ্বামিত্র ঋষি আবার সেই শক্তি দিয়ে অনেক কিছু করে দিচ্ছেন। রাক্ষস সৃষ্টি করে বশিষ্ঠের সন্তানকে বধ করিয়ে দিলেন। তাঁর ওই শক্তির জন্য স্বর্গের অপ্সরারা তাঁর কাছে চলে আসছে। এই করে শক্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, আবার তিনি তপস্যায় ডুবে যাচ্ছেন, সেখান থেকে আবার শক্তি সঞ্চয় করে বেরিয়ে আসছেন। এটাকে বলে আধ্যাত্মিক শক্তি। ভৌতিক শক্তি রূপে যে শক্তিকে আমরা সহজেই জানছি, বুঝতে পারছি, সেই শক্তি থেকে আধ্যাত্মিক শক্তি অনেক বেশি সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম থেকে আরও সূক্ষ্মতর শক্তি হয়। যোগশাস্ত্রে পতঞ্জলি খুব বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করছেন, যোগী যখন তপস্যা করেন আর তাঁর মন যেমন যেমন সূক্ষ্ম হতে থাকে তেমন তেমন বিভিন্ন জগতে তিনি অবাধে বিচরণ করতে শুরু করেন। এমন এমন জগতে যোগী চলে যাচ্ছেন, যেখানে ভৌতিক শক্তির কোন ভূমিকাই নেই, সেখানে মনের শক্তি দিয়েই সব কিছু হয়, তিনি যা যা ইচ্ছা করবেন তাই তাই হয়ে যাবে। যেখানে মনের শক্তি দিয়েই সব চলে সেটাকেই বলে আধ্যাত্মিক শক্তি। মনের শক্তি যত সূক্ষ্ম হয়, তাঁর শক্তি তত বাড়ে, আর মনের শক্তি যত স্থূল হয় তত তার শক্তিও স্থূল হবে। ট্রেনের ইঞ্জিনের শক্তি, এ্যারোপ্লেনের ইঞ্জিনের শক্তি দেখে আমরা অবাক হয়ে যাই, কিন্তু ঐ শক্তিই যখন এ্যটমিক শক্তিতে যাচ্ছে তখন অনেক সূক্ষ্ম হয়ে যাচ্ছে। আবার Radiation Energyতে যখন যায় তখন আরও সূক্ষ্ম হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই শক্তিই যখন মনের শক্তিতে চলে যায় তখন সেই শক্তি আরও সূক্ষ্ম হয়ে যায়, আরও ক্ষমতাশালী হয়ে যায়।

যাঁরা সাধনা করেন, তপস্যা করেন, সেই ঋষি-মুনিরা এই শক্তির মালিক। কোন বন্ধ্যা মেয়েকেও যদি এনারা কেউ আশীর্বাদ করে বলে দেন, পুত্রবতী ভব, ওই নারীর সন্তান হবেই হবে, কারুর আটকাবার ক্ষমতা হবে না, ভগবানও আটকাতে পারবেন না। দরকার হলে ভগবানকেই ওই নারীর গর্ভে সন্তান হয়ে আসতে হবে। মানুষের ভাগ্যকে কখনই পালটানো যায় না, একমাত্র দুজনই পাল্টাতে পারেন, এক হলে ভগবান আর দ্বিতীয় হলেন ভগবানের একনিষ্ঠ ভক্ত, ভগবান ছাড়া যিনি আর কিছু জানেন না। নরেনের পরিবারের সবাই অভুক্ত, একবেলা কোন রকমে যদিও দু-মুঠো অন্ন জুটছে, অন্য বেলায় খাবার কিছুই নেই। সেই নরেনকে ঠাকুর বলে দিলেন, যা, তোর মোটা অন্ন মোটা বস্ত্রের অভাব হবে না। শেষে তাই হল। ঠাকুর বলছেন, নরেন শিক্ষে দেবে, তাই হল, সারা জগৎ স্বামীজীকে যুগাচার্য রূপে বরণ করে নিল। ঠাকুর যেটা বলছেন, সেটাই হয় যাচ্ছে। নরেন শিক্ষে দেবে, এটা না হয় আমরা বলতে পারি যে, ঠাকুর দিব্যদৃষ্টিতে দেখছেন, কিন্তু দিব্যদৃষ্টিতে যে দেখছেন, এটাই তো আধ্যাত্মিক শক্তি বা দিব্য শক্তি। আর যখন ঠাকুর বলছেন, তোর মোটা অন্ন আর মোটা বস্ত্রের অভাব হবে না, ওখানে ঠাকুর নরেনের ভাগ্যটাকে পাল্টে দিলেন। এইভাবে ঠাকুর অনেকের ভাগ্যই পাল্টে দিয়েছেন। তিনি সব সময়ই পাল্টে দেন তা না, কারণ কর্মের বিধানকে ভগবানও পাল্টাতে চাইবেন না, ঋষি, মহাত্মারাও পাল্টাতে চাইবেন না। এই কারণেই সাধুদের কাছে, মহাত্মা, বাবাজীদের কাছে মানুষ দৌড়ে যায়, যদি তিনি আশীর্বাদ করে কিছু বলে দেন। তবে সবারই যে এই ক্ষমতা বা শক্তি থাকবে তা

নয়। জাগতিক দুঃখ-কষ্ট নিয়ে ঋষি-মুনিদের কাছে কেউ গিয়ে বলতে থাকলে তিনি শুনে যাবেন, কিন্তু কিছু বলবেন না। কিন্তু কোন কারণে যদি একবার মুখ দিয়ে বলে দেন, এবার সেটাকে বাস্তবায়িত হওয়া থেকে সংসারের কোন শক্তিই আর আটকাতে পারবে না।

এটা গেল সাংসারিক ব্যাপারে। আধ্যাত্মিক ব্যাপারে কি হয়, মানুষ যখন ঈশ্বরকে ভক্তি করে তখন ঈশ্বরের ভাবটাকে যেন নিজের ভিতরে নেয়, তারপর তার পরিবর্তন হতে শুরু হয়ে যায়। একই জিনিস হয়, খুব উচ্চস্তরের সাধু মহাত্মাদের কাছে গেলে আমার ভাব যদি পরিবর্তন হতে শুরু হয়, বুঝতে হবে আমার হৃদয়ে ভক্তির উদয় হতে শুরু হল। এটাকেই স্বামীজী বলছেন, Get the mercy of God, ঈশ্বরের করুণা হওয়া মানেই, তাঁর ভাবকে নিজের ভিতরে নেওয়া। ভগবানের কারুর প্রতি দ্বেষও নেই আর কেউ তার প্রিয়ও নয়। যে জপধ্যান, তপস্যা করছে, তাঁর ভাব তার মধ্যে আসছে। Of His greatest children মানে, ভগবান বুদ্ধ, যীশু, শ্রীরামকৃষ্ণ, অবশ্য আমাদের লৌকিক দৃষ্টিতে, আর যদি ঠাকুরকে ভগবান রূপে নেওয়া হয় তাহলে তাঁর greatest childrenরা হলেন স্বামীজী, রাজা মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজরা। এই ধরণের ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের যখন আমরা ভক্তি করব, সেবা করব তখন এনারাই আমাদের ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যাবেন। কারণ এনাদের ভক্তি করলে, সেবা করলে এনাদের ভাব ধীরে ধীরে আমাদের ভিতরে আসবে। সাধুসঙ্গে এটাই লাভ, সাধুসঙ্গ করলে সাধুর যে গুণ সেই গুণ নিজের ভিতরে আসে। সেইজন্য ঈশ্বরকে যদি কেউ ভক্তি করতে চায়, ঈশ্বরের দিকে যদি কেউ এগোতে চায়, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি যদি কেউ লাভ করতে চায়, তাহলে তার সব থেকে সহজ উপায় হল ঈশ্বরের ভালবাসা, করুণা পাওয়া বা ঈশ্বরের যাঁরা শ্রেষ্ঠ সন্তান, তাঁদের করুণা পাওয়া। করুণা পাওয়া মানেই হয়, তাঁদের সঙ্গ করা, তাঁদের ভাবকে নিজের ভিতরে নেওয়া।

ঈশ্বরের করুণা কি করে পাওয়া যাবে? উপনিষদ বলছেন, *যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যোঃ*, আত্মা যাঁকে বরণ করেন একমাত্র তিনিই আত্মজ্ঞান পান। ঠিক তেমনি ঈশ্বর যাঁকে বরণ করেন তিনি ঈশ্বরের কৃপা লাভ করেন, ঈশ্বরের ভক্তি পান। দ্বিতীয় পথ হল, যাঁরা ঠিক ঠিক ঈশ্বরের ভক্ত, এই ধরণের ভক্তদের পুরাণে বা গীতাতে সিদ্ধ বলছেন, তাঁদের কৃপা পাওয়া। সিদ্ধরা এই পৃথিবীতে থাকেন না, সপ্তর্ষি মণ্ডলাদি সূক্ষ্ম লোকে থাকেন। এই দুটি পথ ছাড়া আবার নবধা ভক্তি দিয়েও তাঁর কৃপা পাওয়া যায়। এর বাইরে হল যে যার সম্প্রদায়ে আছে, সেই সম্প্রদায়ের পরম্পরাতে যা যা করতে বলে দেওয়া হয়েছে সেগুলোকে নিয়মিত নিষ্ঠার সাথে করে যাওয়া। যেমন আমরা ঠাকুরের ভক্ত, আমাদের এখানে নবধা ভক্তির কথা বলে দেওয়া হয়নি, এখানে বলে দিয়েছেন, মাঝে মাঝে একান্ত বাস, জপধ্যান, ইন্দ্রিয় সংযম আর সাধুসঙ্গ। তবে ইন্দ্রিয় সংযম জোর করে করতে গেলে কোন লাভ হয় না, কারণ মানুষ যেমন যেমন ভক্তির দিকে এগোতে থাকে তেমন তেমন ইন্দ্রিয় সংযম নিজে থেকেই হয়ে যায়, দুটো পাশাপাশি চলে। যখন তাঁর কৃপা বা তাঁর শ্রেষ্ঠ সন্তানদের কারুর কৃপা পায় তখনই সে ভক্তির দিকে এগোতে শুরু করে।

মহাপুরুষদের সঙ্গলাভ দুর্লভ

এই কথা বলার পর স্বামীজী বলছেন, The company of these children of light is very hard to get. (*এই-সকল মহাপুরুষের সঙ্গলাভ হওয়া বড়ই কঠিন।*) সমস্যা হল এই ধরণের ঈশ্বরের সন্তানের সঙ্গ পাওয়া বা দর্শন পাওয়া অত্যন্ত দুরূহ, প্রায় অসম্ভব। যে কোন বিখ্যাত মন্দিরে গেলে আমরা প্রথমেই দেখতে পাই কাঙালী ভিখারীরা বসে আছে। তারপর পূজার সামগ্রী বেচার জন্য দোকানীরা এমন ভাবে টানাটানি করতে শুরু করবে যে আমাদের কিছু করার থাকবে না। এদের পেরিয়ে মন্দিরের ভিতরে যেতে না যেতেই পাণ্ডা, পুরোহিতরা এসে ঘিরে ধরবে, এদেরও পেরিয়ে সামনে বিশাল লাইন। মন্দিরের বিগ্রহ দর্শন করতেই কত বাধা, বিগ্রহ দর্শন করাটাই কত কঠিন। ঠিক তেমনি, ঠিক ঠিক সাধু মহাত্মার দর্শন পাওয়া, ওনাকে চেনা, খুঁজে বার করা খুবই কঠিন। সেইজন্য আমাদের নামকরা শাস্ত্রে সব জায়গায় বলছেন উত্তম আচার্য পাওয়া খুব মুশকিল। এখানে বর্ণনা করছেন না যে, আমরা সাধু মহাত্মাদের চিনব কি করে। বাহ্যিক দৃষ্টি দিয়ে যদি চিনতে চাই তাহলে দেখতে হবে তিনি কামিনী-কাঞ্চনের ভোগ থেকে দূরে আছেন কিনা, আর অন্তর থেকে যদি তাঁকে দেখতে যাই তাহলে এটাই দেখতে হবে, তাঁর উপস্থিতিতে আমার মন উচ্চ অবস্থায় যাচ্ছে কিনা, অর্থাৎ যাঁর কাছে গেলে আমার সাংসারিক ভাব প্রশমিত হচ্ছে কিনা। কারণ আমরা সব সময়

সংসার নিয়েই থাকি, সংসারের ভাব সব সময় গিজ্‌গিজ্‌ করছে, ওই ভাবের মধ্যেই আমরা ডুবে থাকি। ঐ মানসিকতা নিয়েও কিছুক্ষণ যদি মঠের অধ্যক্ষ মহারাজ, সহাধ্যক্ষ মহারাজের ঘরে অনুমতি নিয়ে দশ পনেরো মিনিট দাঁড়ানোর সুযোগ পাওয়া যায়, তাতেই আমরা নিজেদের কত ধন্য মনে করি, মনের মধ্যে একটু শান্তি অনুভব করি। সবাই সংসারের জ্বালা, যন্ত্রণা, দুঃখ নিয়েই মহারাজের কাছে আসছে, মহারাজ আমার এই কষ্ট, একটু আশীর্বাদ করুন যাতে সব কিছু ঠিক হয়ে যায়। মানুষেরও উপায় নেই, কোথাও সাহায্য পাচ্ছে না, সমস্যার কোন সুরাহা খুঁজে পাচ্ছে না; ঠাকুরের কাছে কৃপা প্রার্থনা করছে, ঠাকুরের যাঁরা সন্তান তাঁদের কাছে যাচ্ছে, ভাবছে যদি একটু আশীর্বাদ পাওয়া যায়। এটা গেল এক ধরণের। একজন কষ্টে পড়ে আছে, তার আর কোন উপায় নেই, সে তাই এখন ঈশ্বরের শরণাগত হচ্ছে। কিন্তু সত্যিই কেউ যদি সাধু সন্ন্যাসীর কাছে পৌঁছে যায়, তখন সে সেখানে গিয়ে কি ধরণের কথা বলে? সন্ন্যাসী, বাবাজী, মাতাজীদের কাছে গেল, তাঁর কাছে বসে একবার হয়ত জিজ্ঞাসা করল, মহারাজ, ভাল আছেন? ঠিক আছি। দ্বিতীয় কথা, আবার কবে আমাদের ওখানে লেকচার দিতে যাবেন? তৃতীয় আর প্রশ্ন থাকে না, ওখান থেকেই শুরু হয়ে যাবে সংসারের কথা। যিনি ঠিক ঠিক সন্ত মহাত্মা, তাঁর কাছে গেলে এই রকম হবে না। তাঁর কাছাকাছি গেলেই মনের মধ্যে যে সাংসারিক ভাবগুলো রয়েছে, সেগুলো নিজে থেকেই থেমে যাবে। স্বামীজী বলছেন, এই ধরণের সন্ত মহাত্মাদের সঙ্গ পাওয়াটাই দুঃসাধ্য, অত্যন্ত দুর্লভ।

স্বামীজী সন্ত মহাত্মা না বলে children of light বলছেন; স্বামীজী তাঁর expressions গুলো নিজের মত দিতেন। ঈশ্বর হলেন চৈতন্য, অমৃত, ঈশ্বরের সন্তান না বলে বলছেন চৈতন্যের সন্তান, *অমৃতস্য পুত্রা*কে এখানে স্বামীজী children of light বলছেন। যীশুও নিজেকে ওই রকম light বলছেন। এই-সকল মহাপুরুষের সঙ্গ পাওয়া দূরে থাক, সন্ধান পাওয়াটাই মুশকিল। কিন্তু কেউ যদি পেয়ে যায়, পাঁচ মিনিটেই তার জীবন পাল্টে যাবে। আমাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে, ঠাকুরের কাছে কত লোকই তো আসতো, কজনের পাঁচ মিনিটে জীবন পাল্টে গেছে? ঠাকুর নিজেই বর্ণনা দিচ্ছেন, দুই বন্ধু এসেছে, কিছুক্ষণ পর একজন অন্যজনকে বলছে, আর কতক্ষণ শুনবি? তাও উঠছে না, তখন বলছে, আচ্ছা তুই আয়, ততক্ষণে আমি নৌকায় গিয়ে বসছি। এই ধরণের কিছু ঘটনা থাকতে পারে ঠিকই, কিন্তু পরিবর্তন ঠিকই হয়। স্বামীজী এখানে পাঁচ মিনিটের কথা যেটা বলছেন, five minutes in their company will change a whole life, এটাকে পুরোপুরি আক্ষরিক অর্থে নেওয়া যাবে না। যাঁরা এনাদের কাছে যান তাঁদের বেশির ভাগই হলেন সংসারী লোক, সংসারী লোকেরা তাঁদের কাছে পাঁচ মিনিটের বেশি থাকতেই পারবে না। ঠাকুর আঁশ চুপড়ির গন্ধের কথা বলছেন, যার কথা এখানে স্বামীজী পরে বলবেন। এক মেছুনি হাট থেকে মাছ বিক্রি করে পাওনা-গণ্ডা সব মিটিয়ে বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে গেছে, রাতটা হাটেরই এক ফুলওয়ালীর বাড়িতে থেকে গেছে। রাতে তার ঘুম আসছে না, কারণ যে ঘরে ফুল রাখা হয় সেই ঘরেই সে শুয়েছে, ফুলের গন্ধে তার ঘুম আসছে না, হাঁসফাঁস করছে। ফুলওয়ালী ওকে জিজ্ঞেস করেছে, কি সমস্যা। মেছুনি তখন তার মাছের চুপড়িটা আনিয়ে তাতে একটু জলের ছিটে দিয়ে পাশে রেখে শুয়ে পড়ল। ঠাকুর বর্ণনা করছেন, তারপর মেছুনি ভঁস ভঁস করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ল। মাছের আঁশটে গন্ধ ছাড়া সে ঘুমোতে পারছিল না। আমাদেরও ঠিক একই সমস্যা, মহাত্মার কাছে যাওয়ার পর দু মিনিট যদি ভক্তির কথা, জ্ঞানের কথা বলতে শুরু করেন, অস্বস্থি হতে শুরু করবে, আমাদের মস্তিষ্ক নিতে পারবে না, মনে হবে যেন জোঁকের মুখে নুন পড়েছে। তখন দরকার আঁশ চুপড়ি, সংসারের আঁশটে গন্ধ নাকে না গেলে আমাদের মাথা ঝিম ঝিম করতে শুরু করে দেবে, পাঁচ মিনিটও ওই গন্ধ ছাড়া আমরা থাকতে পারব না।

স্বামীজী যে পাঁচ মিনিট বলছেন, এটা তিনি তাঁদেরকেই বোঝাতে চাইছেন, যারা পাঁচ মিনিট মহাত্মার কাছে টিকতে পারছে, তার মানে কোথাও তার আগে থেকেই একটা প্রস্তুতি হয়ে আছে। ঠাকুর যাদের কথা বর্ণনা করছেন, এরা পাঁচ মিনিট তো দূরের কথা, পাঁচ সেকেণ্ডও টিকতে পারছে না। ঠাকুরও আধার দেখে বেছে বেছে নিজের লোকদের কাছে টেনে নিয়েছেন, তবে ঠাকুর কাউকে সচরাচর পরিবর্তন করে দেননি। ঠাকুর যাঁদেরকেই নিজের দিকে টেনে এনেছেন, তাঁদের সবারই আগে আগে বিরাট কিছু করা ছিল। স্বামীজীর কথা আলাদা, তিনি হলেন spiritual warior, convert করার জন্যই তিনি এসেছিলেন। এই conversion মানে অন্য ধর্ম থেকে হিন্দু ধর্মে convert করা না, এখানে spiritual conversionএর

কথাই বলা হচ্ছে। ঠাকুর যেমন স্বামীজীকে বলছেন, আমি তোকে আমার সব শক্তি দিয়ে দিলাম, এতে সংসারের মঙ্গল হবে ইত্যাদি, কিন্তু ঠাকুর নিজে কখন ব্যবহার করেননি। অনেকে বলতে পারেন ঠাকুর গিরিশ ঘোষকে পাল্টালেন, কিন্তু গিরিশ ঘোষের জীবনী খুব ভাল করে দেখলে দেখা যাবে, আধ্যাত্মিকতার ভাব তাঁর আগে থেকেই ছিল। কিন্তু conversion যাকে বলে, অপরের মনকে নিজের দিকে নিয়ে আসা, এই জিনিস স্বামীজীই একমাত্র করেছেন। ভগবান বুদ্ধের জীবনে, যীশুর জীবনে এই ধরণের conversion প্রচুর দেখা যায়। কিন্তু সচরাচর এই জিনিস দেখা যায় না, সামনে গিয়ে তার মনকে পালটে দেওয়া, সন্ত মহাত্মার সবাই এতটা পারেন না।

মেরি লুই বার্কের গবেষণামূলক গ্রন্থ New Discoveryতে অনেকগুলো ঘটনার বর্ণনা আছে, যেগুলো তিনি পরে পরে চিঠিপত্র ও স্মৃতি কথা থেকে তুলে দিয়েছেন। যেমন একজন অনেক পরে লিখছেন, স্বামীজী জাহাজে করে যাচ্ছিলেন তিনি জানতেনই না যে স্বামীজী কে, কিন্তু স্বামীজীর এমন personality যে তিনি সেটা ভুলতে পারেননি। স্বামীজী তাঁকে বলছেন, Come, I will teach you how to die, are you interested? তিনি বললেন, না। অনেক পরে, প্রায় চল্লিশ বছর পর তিনি লিখছেন, 'সেদিন স্বামীজী আমাকে শেখাতে চেয়েছিলেন কিভাবে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে, সেদিন মৃত্যুর কথা ভেবে ভয়ে আমি পিছিয়ে এসেছিলাম, আর শেখা হল না, আজ আমার আফশোস হচ্ছে'। পাশ্চাত্যের লোক কিনা, ওরা ভৌতিক জীবনকে ভালবাসে, মৃত্যুর নাম শুনলে ভয় পায়। আমাদের কাছে মৃত্যু কোন ব্যাপারই নয়। এই ধরণের প্রচুর ঘটনা আছে, স্বামীজীকে কিছুক্ষণের জন্য দেখেছেন, স্বামীজী তাকে দুটো কথা বলছেন, তখন কোন গুরুত্ব দেয়নি, পরে গিয়ে ওটাই তার জীবনে বিরাট প্রভাব বিস্তার করছে। প্রফেসর রাইট ছিলেন, যাঁর সাথে স্বামীজীর ট্রেনে দেখা হয়, সেখানেই তিনি স্বামীজীর নামে চিঠি লিখে দিলেন – এনার credential চাওয়া মানে সূর্যকে বলা তোমার কি অধিকার আলো দেওয়ার। পরে স্বামীজী রাইটের অতিথি হয়ে ওনার বাড়িতে ছিলেন। প্রফেসর রাইটের সন্তানের তখন আট দশ বছর বয়স। স্বামীজী ঐ ছোট্ট ছেলেটির সাথে অনেক গল্পগুজব করতেন। পরে রাইটের ছেলে ফ্যান্টাসি জগতের উপর একটা উপন্যাস লেখেন, তাতে স্বামীজীর সব আইডিয়াতে ভর্তি, তাতে বলছেন ওঁ একটা খুব মূল্যবান জিনিস। অতটুকু বাচ্চা, তার সাথে যতটুকু স্বামীজী কথা বলেছেন তাতেই সে প্রভাবিত হয়ে গেছে। ইদানিং আমেরিকাতে যোগ থেকে শুরু করে কৃষ্ণ চেতনা ইত্যাদি কত কিছু হচ্ছে। কিন্তু এই থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ডে স্বামীজী যে সময় ক্লাশ নিচ্ছেন, তখন আমেরিকার সমাজ পুরোপুরি অর্থোডক্স, যা কিছু আছে হয় ভৌতিকবাদের প্রভাব আর তা নাহলে খ্রীশ্চানিটির প্রভাব, তার মধ্যে ঢুকে স্বামীজী এদের টেনে নিচ্ছেন। যাঁরা ঠিক ঠিক সন্ত মহাত্মা তাঁরা পাঁচ মিনিটেই মানুষের জীবন পাল্টে দিতে পারেন।

স্বামীজী বলছেন, and if you really want it enough, one will come to you, (*সত্য-সত্য প্রাণে প্রাণে যদি এই মহাপুরুষের সঙ্গ চাও, তবে তোমার কোন-না-কোন মহাপুরুষের সঙ্গলাভ হবেই হবে।*) যদি তোমার এই ধরণের সন্ত মহাত্মার কোন সন্ধান জানা না থাকে, কিন্তু তুমি যদি সত্যিই হৃদয় থেকে আকাঙ্খা করে থাক, তাহলে এই ধরণের গুরু, এই ধরণের মহাত্মা তোমার কাছে নিজে থেকেই চলে আসবেন। এই মতটা আমাদের পরম্পরাতে খুব প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। ঠাকুরও বলছেন, কেউ যদি পুরীর দিকে যেতে গিয়ে ভুল করে অন্য দিকে চলে যায়, তখন কেউ না কেউ এসে বলে দেবে তুমি ভুল দিকে যাচ্ছ, এই দিকে যেতে থাক। স্বামীজীর খুব প্রিয় একটা মত ছিল, যে মতে বলছে, cause will have its effect, কর্মবাদের সিদ্ধান্তে বলে, যখন কোন কর্ম করা হয় তখন সেই কর্ম কোন না কোন সময় ফল দেবে। স্বামীজী এই সিদ্ধান্তকেই আরেকটু টেনে নিয়ে বলতেন, ক্ষেত যদি তৈরী থাকে তাহলে কিন্তু বীজ আসবেই আসবে। কেউ হয়ত একটা কাজের জন্য সব কিছু তৈরী করে দিয়েছে, এবার ওর বীজ আসবেই আসবে। যেসব লেখকরা খুব গভীর ভাবে কাজ করেন, কিছু একটা জানার জন্য তাঁকে অন্য কোন বইয়ের সাহায্য নিতে হবে, কিন্তু সেই বই এখন আর কোথাও পাওয়া যাবে না, দেখা যাবে কোন না কোন ভাবে সেই বইটা না হলেও ওই ধরণের কোন একটা বই তাঁর কাছে এসে যাবে।

একজন বিখ্যাত লেখকের জীবনেই এই ধরণের ঘটনা আছে, তিনি গভীর ভাবে একটা জিনিসের উপর লেখালেখি করছিলেন। কোন কাজে তাঁকে তাঁর দাদার বাড়িতে যেতে হয়েছিল। বৌদিকে তিনি খুব একটা

পছন্দ করতেন না, সব সময় বকর বকর করতে থাকে। যাই হোক, তিনি যাওয়ার পর বৌদি একটা বই এনে তাঁকে দেখিয়ে বলছে, তুমি তো অনেক লেখালেখি কর, দেখো তো এই বইটা তোমার কোন কাজে লাগবে কিনা। উনি বইটা হাতে নিয়েই দেখেন, বইতে ঠিক ঐ বিষয়ের উপর আলোচনা করা হয়েছে যেটা তিনি এতদিন খোঁজাখুজি করছিলেন। ঠাকুরও একটা কাহিনীতে বলছেন, একজনের খুব অসুখ করেছে, কিছুতেই সারছে না, একজন এসে বলল, স্বাতী নক্ষত্রের জল মরার খুলিতে পড়ে থাকবে, একটা ব্যাঙকে সাপ তাড়া করবে, সাপটা মড়ার খুলির উপর দিয়ে লাফাতে যাবে, সেই সময় সাপটা ব্যাঙকে ছোবল মারতে যাবে, সাপের বিষ সেই জলে পড়বে, সেই জল খাওয়ালে এর রোগ সারবে। এই যে এত কিছুর যোগাযোগ হওয়া, এটা অসম্ভব। কিন্তু তাও সেই লোকটি খুব ব্যাকুল হয়ে স্বাতি নক্ষত্রে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

আমাদের সাধারণ জগতে এই জিনিসগুলোকে ব্যাখ্যা করা যায় না। কিন্তু এটা জেনে রাখা দরকার, আধ্যাত্মিক পথে এটা গ্যারান্টি দিয়েই বলা যায় যে, এবার আর কোন কিছুই অসম্ভব নয়। নিঃস্বার্থ সেবা করা আর ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি দুটো এক জিনিস। এবার তার সাহায্য আসবেই আসবে। কেউ একজন পরিকল্পনা করল, গ্রামে কোন মন্দির নেই, একটা মন্দির তৈরী করতে হবে, যেখানে গ্রামের লোকেরা নিয়মিত সমবেত হয়ে ঠাকুরের নামগুণগান করবে। এতে তার কোন স্বার্থ নেই, আর সত্যিই গ্রামের লোকেদের মধ্যে ধর্মীয় ভাব জাগাবার জন্য সে কিছু করতে চাইছে। এবার একটা জায়গায় সে একটা নোটিস লাগিয়ে বসে গেল, এই জায়গাটা আমাদের চাই, এর সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই, শুধু মাত্র লোকেদের মঙ্গলের জন্য। কিছু দিনের মধ্যেই দেখা যাবে এক বিচিত্র নিয়মে অনেক জায়গা থেকে সাহায্য আসতে শুরু হয়ে যাবে, আসবেই। বেলুড় মঠের অনেক সেন্টারেও এই ধরণের অনেক ঘটনা পাওয়া যাবে। তাঁরা সত্যি সত্যি কিছু কাজ করতে চাইছেন, কিন্তু কোন অবলম্বন নেই, কারুর সাথে সেই রকম কোন যোগাযোগ নেই, কিছু নেই। একটা নোটিশ লাগিয়ে বসে গেলেন। কিছু দিন পর, হঠাৎ দেখা গেলে এখান ওখান থেকে সাহায্য আসতে শুরু হয়ে গেছে। আমরা সব কিছুকে ভৌতিক জগৎ দিয়ে দেখতে যাই, সেইজন্য এগুলোকে ব্যাখ্যা করা যায় না। স্বামীজী এটাই বলছেন, তুমি যখন ভক্তির জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলে, তখন গুরু যদি নাও পাও, দেখবে কিছু দিনের মধ্যে ঠিক ব্যবস্থা হয়ে যাবে, এমন একটা যোগাযোগ হয়ে কিছু একটা ঘটবে, তিনিও এসে হাজির হয়ে যাবেন। আর তোমার যতটুকু দরকার ততটুকু করে তিনি তোমার কাছ থেকে সরে যাবেন। প্রকৃতির এ এক বিচিত্র নিয়ম।

সাধু-মহাত্মাদের মহিমা

এর আগে মহাত্মার দুটো গুণের কথা বলা হয়েছিল, যে গুণ দিয়ে বোঝা যাবে যে তিনি ঠিক ঠিক মহাত্মা কিনা। প্রথম হল কামিনী-কাঞ্চনে তাঁর কোন আকর্ষণ নেই, দ্বিতীয় তাঁর উপস্থিতিতেই মন থেকে সাংসারিক ভাব সরে যাবে এবং ঈশ্বরীয় ভাবের উদয় হবে। এরপর স্বামীজী ব্যাখ্যা করে বলছেন, The presence of those who love God makes a place holy, ‘such is the glory of the children of the Lord’. They are He; and when they speak, their words are scriptures. (*এই ভক্তেরা যেখানে থাকেন, সেই স্থান তীর্থস্বরূপ হয়ে যায়; তাঁরা যা বলেন, তাই শাস্ত্রস্বরূপ; তাঁরা যে-কোন কার্য করেন, তাই সৎকর্ম; এমনই তাঁদের মাহাত্ম্য।*)

নারদীয় ভক্তিসূত্রের এটি একটি বিখ্যাত সূত্র – *তীর্থীকুর্বন্তি তীর্থানি সুকর্মীকুর্বন্তি কর্মাণি সচ্ছাস্ত্রী কুর্বন্তি শাস্ত্রাণি*। এই ধরণের ঈশ্বরের ভক্ত বা সন্তরা যে জায়গাতে যান, সেই জায়গাকে তাঁরা পবিত্র করে দেন। যেসব তীর্থাদি আগে থেকেই আছে, সেই তীর্থগুলি তাঁদের চরণস্পর্শে আরও পূণ্য ও পবিত্র হয়ে যায়। কাশীধামে গিয়ে ঠাকুর দিব্যচক্ষুতে দেখছেন সেখানে সাক্ষাৎ শিব বিরাজ করে আছেন। আরও গুরুত্বপূর্ণ হল, হাজার হাজার বছর ধরে বিভিন্ন সাধকরা, সিদ্ধ মুনি ঋষিরা ওখানে যে তপস্যাদি করেছেন, তীর্থের মাহাত্ম্যকে বৃদ্ধি করতে তাঁরা এভাবে যোগান দিয়ে যান। সাধারণ মানুষরা সেখানে সাংসারিক ভাবনা চিন্তা নিয়ে যায়, তাদের বৈষয়িক চিন্তা-ভাবনা তীর্থকে কলুষিত করে। কয়েক বছর আগে কেদারে যে ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক বিপর্যয় হয়ে গেল, সেখানকার এক পুরোহিত খুব দুঃখ করে বলছিলেন, ‘পবিত্র তীর্থস্থান অথচ এখানে সবাই আসছে হনিমুন করতে, প্রকৃতির রোষ হওয়ারই কথা’। কথাট শুনতে কটূ মনে হবে ঠিকই, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ হল, তীর্থস্থানে সাধারণ মানুষরা নিজের সাংসারিকতা নিয়েই যায়, ফলে তীর্থের তন্মাত্রাটা অন্য রকম হয়ে যায়।

হিন্দুরা সেইজন্য মন্দিরাদি এমন জায়গায় করত, যেখানে সাধারণ লোকেরা সহজে পৌঁছে যেতে না পারে। তারাই সেখানে যাওয়ার চেষ্টা করবে যার মধ্যে ঠিক ঠিক শ্রদ্ধা ভক্তি জেগেছে। কিন্তু এখন যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নত হয়ে গেছে, মন্ত্রী থেকে শুরু করে আমলারা, বিরাট বড়লোকরা এখন হেলিকপ্টার নিয়ে সেখানে চলে যাচ্ছে। সেখানে গিয়ে আবার তার এই সার্ভিস চাই, সেই সার্ভিস চাই, তীর্থ করতে তাদের বয়ে গেছে, শ্রদ্ধা ভক্তি কিছুই নেই। ভোগীরাই এখন তীর্থস্থানের সব হোটেল দখল করে আছে। কিন্তু সাধুরা, বিশেষ করে এই ধরণের মহাপুরুষরা যখন তীর্থে যান, তীর্থ তখন জেগে ওঠে।

স্বামীজী ভক্তিসূত্রকে আধার করে আরও জোর দিয়ে বলছেন, such is the glory of the children of the Lord, স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজ বেলুড় মঠের মন্দিরে আত্মারামের কৌটাকে সামনে রেখে ঠাকুরের বিগ্রহের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করছেন, তিনি দেখছেন, ঠাকুর এসেছেন, স্বামীজী এসেছেন। আর সেই থেকে একশ বছর হতে চলল নিত্য সেখানে মঙ্গলারতি থেকে শুরু করে সন্ধ্যারতি হচ্ছে, নিত্য পূজা হচ্ছে, শত শত সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, ভক্তরা নিত্য জপধ্যান করে যাচ্ছে। ভূমিকম্প হোক, যুদ্ধ হোক, ঝড় হোক, বৃষ্টি হোক হয়েই যাচ্ছে। বেলুড় মঠ আধ্যাত্মিক ভাবে তেতে উঠছে। ভিজিটিংএর সময় ট্যুরিস্টরা এসে সেই ভাবকে কিছুটা নষ্ট করে দিচ্ছে, আবার সাধুরা জপধ্যান করে চার্জড্ করে দিচ্ছেন। সেইজন্য কোন তীর্থে বা মন্দিরে গেলে জপধ্যান, উচ্চ চিন্তার ভাব নিয়ে যেতে হয়। তা নাহলে জানতে হবে যে আমরা সেখানকার ভাবকে আমাদের সাংসারিকতার ভাব দিয়ে দূষিত করে দিচ্ছি।

সুকর্মীকুর্বন্তি কর্মাণি সচ্ছাস্ত্রী কুর্বন্তি শাস্ত্রাণি এটাকে ব্যাখ্যা করে স্বামীজী বলছেন, They are the He; and when they speak, their words are scriptures, তিনি যে-সকল শুভকর্ম করেন সেই কর্ম সমূহকেই সমাজ সৎকর্ম রূপে জানে। মহাভারতের খুব নামকরা শ্লোক, *মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ*, মহাপুরুষরা যে পথে গমন করেন সেটাই পথ, *সুকর্মীকুর্বন্তি কর্মাণি*, একই জিনিস, মহাপুরুষরা যে কর্ম করেন সেই কর্ম করা যেতে পারে। এই ধরণের সন্ত পুরুষরা ঈশ্বরের সাথে এক, এনারা যে কথা বলেন সেটাই শাস্ত্র হয়ে যায়। আর তিনি যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, যে শাস্ত্রের কথা আলোচনা করেন সেই শাস্ত্রের মাহাত্ম্য বেড়ে যায়। স্বামীজী এখানে scriptures বলতে শাস্ত্রকেই বোঝাতে চাইছেন, কিন্তু বেদতুল্য হয়ে যায়। খ্রীশ্চান ধর্মে বাইবেল যেমন খুব গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু আবার টমাস এ কেম্পিসের Inivitation of Christ, সেটাও একটা শাস্ত্রের মধ্যে পড়ে, ব্রাদার লরেন্সের Power of Prayer, সেটাও একটা শাস্ত্রের মধ্যে পড়ে, এই রকম খ্রীশ্চানিটিতে অসংখ্য শাস্ত্র রয়েছে, যেগুলো খুব উচ্চমানের ধর্মগ্রন্থ, কিন্তু বাইবেলের তুলনায় এগুলোকে কম গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়। এটাই বোঝাতে চাওয়া হচ্ছে যে, এনাদের সাধারণ কথাগুলো শাস্ত্র হয়ে যায়।

স্বামীজী সন্ত, মহাত্মাদের মহিমা বলে যাচ্ছেন। বলছেন, The place where they have been becomes filled with their vibrations, and those going there feel them and have a tendency to become holy also. (*তাঁরা যে-স্থানে বাস করেছেন, সেই স্থান তাঁদের দেহনিঃসৃত পবিত্র শক্তি-স্পন্দনে পূর্ণ হয়ে যায়। যারা সেখানে যায়, তারাই এই স্পন্দন অনুভব করে; তাতে তাদেরও ভিতরে পবিত্র ভাবের সঞ্চার হতে থাকে।*) এই ধরণের সন্ত পুরুষরা যেখানে যেখানে থাকেন, সে-সব স্থানগুলি তাঁদের শরীর-মনের তন্মাত্রা, ব্যক্তিত্বের তন্মাত্রাতে সব সময় ভরে থাকে। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন, ঠাকুরের তন্মাত্রাতে দক্ষিণেশ্বর ভরে আছে। ওখানে লোকেরা যখন যায় তখন তাদেরও শরীর মন ওই ভাবে চলে যায় বলে তাদেরও তন্মাত্রা ভাল হয়ে যায়। স্বামীজী এক জায়গায় এই উপমা দিচ্ছেন, আগুন জ্বালানো হল, জ্বালাবার পর আগুনটা সরিয়ে দেওয়া হল। কিছু পরে কেউ গেলে তখনও তারা সেখানে তাপের অনুভব পাবে। সাধু-মহাত্মারা যে-স্থানে থাকেন, তপস্যা, সাধন-ভজন, উচ্চ-চিন্তনের দ্বারা সেই স্থানে একটা আধ্যাত্মিক তাপের সৃষ্টি করে দেন। তাঁরা চলে যাওয়ার পরেও ঐ আধ্যাত্মিক তাপটা থেকে যায়। যাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাব আছে তারা গেলে তাপটা টের পাবে, যে কোন লোক গেলেই তাপের অনুভব পাবে না। বলা হয়, মলয়ের বাতাস যখন প্রবাহিত হয় তখন সব গাছ চন্দন হয়, কিন্তু কলাগাছ, বাঁশ গাছ হয় না। যাদের মধ্যে সার নেই তাদের গেলে হবে না। মানুষের কাছে এখন সব জায়গাই ভোগের জায়গা, এত ট্যুরিস্ট স্পট করে দেওয়া হয়েছে, তবুও সবাই মিলে তীর্থস্থানে গিয়ে এ্যাডভেঞ্চার করবে, না হয় কেনাকাটা আর স্ফূর্তি করবে। কারণ

ভোগ সামগ্রী ছাড়া তারা থাকতে পারবে না। ইদানিং কালে আবার এই ধরণের সাধু-মহাত্মার সংখ্যাও কমে যাচ্ছে, ফলে তীর্থের মাহাত্ম্যও কমে যাচ্ছে। তবে হাজার হাজার বছর ধরে ঋষি মুনিরা যে তন্মাত্রা ঢেলে গেছেন, তার জোরেই এখনও কিছুটা চলছে। সত্যিকারের ভক্তরা এইসব তীর্থস্থানে গেলে তাঁরা তাই শুদ্ধ পবিত্র হয়ে যান।

এরপর যাঁরা মুখ্যা ভক্তিতে চলে গেছেন, তাঁদের নিয়ে স্বামীজী বলছেন, To such lovers there is no distinction of caste, learning, beauty, birth, wealth, or occupation; because all are His, (*এইরূপ ভক্তগণের ভিতর জাতি, বিদ্যা, রূপ, কূল, ধন প্রভৃতির ভেদ নেই। যেহেতু তাঁরা তাঁর।*) স্বামীজী নারদীয় ভক্তিসূত্রের দুটো সূত্রকে এক করে বলছেন, প্রথম সূত্র হল, *নাস্তি তেষু জাতি-বিদ্যা-রূপ-কুল-ধন-ক্রিয়াদিভেদঃ*, এবং দ্বিতীয় সূত্র হল, *যতস্তদীয়াঃ*। এই ধরণের ভক্ত বা মহাত্মাদের দৃষ্টিতে কোথাও কোন ভেদ থাকে না, এ মন্দ, এ ভাল, এ উচ্চবংশের, সে সাধারণ বংশের, এ বিদ্বান, এ মুর্খ, কোন ভেদ দেখেন না, কারণ সবাই ঈশ্বরেরই সন্তান। হয় বেদান্তের দৃষ্টিভঙ্গী আর তা নাহলে ভক্তির দৃষ্টি। ভক্তিতে দেখেন যারা আছে সবাই তাঁরই সন্তান, সবাই যদি তাঁরই সন্তান হয় তখন কাকে বেশি ভালবাসবে আর কাকে কম ভালবাসবে! এই হল সন্ত মহিমা, মূল হল যেটা নারদীয় ভক্তিসূত্রে বলছেন স্বামীজী সেটাকে একটা ছোট্ট প্যারাগ্রামে বলে দিচ্ছেন। মূল বক্তব্য হল, সন্ত মহাত্মাদের করুণা পেতে হয়, কৃপা পেতে হয়। সন্ত মহাত্মাদের হৃদয় সব সময় ঈশ্বরে ডুবে থাকে, তাই এনারা ঈশ্বরেরই মত। ঈশ্বরের কাছে আমরা যা যা পাই, এনাদের কাছেও তাই তাই পাওয়া যাবে। এনারা যে জায়গাতে থাকেন সেই জায়গা শুদ্ধ পবিত্র হয়ে যায়, যাঁরাই এনাদের কাছে যান, তাঁরাও শুদ্ধ পবিত্র হয়ে যান।

অসৎসঙ্গের পরিহার

স্বামীজী নারদীয় ভক্তিসূত্রকে আধার করে বলে যাচ্ছেন, Give up all evil company, especially at the beginning. (*অসৎসঙ্গ একেবারে ছেড়ে দাও, বিশেষতঃ প্রথমাবস্থায়।*) যারা সংসার নিয়ে ডুবে আছে, সাংসারিক ও গ্রাম্য কথাবার্তা নিয়েই যারা সব সময় মশগুল থাকে, এদের সঙ্গকে বলছেন evil company। আমরা অনেকে মনে করি চোর, ডাকাত, মদ্যপ এদের থেকে দূরে থাকতে বলছেন। এখানে তাদের কথাই বলা হচ্ছে, যারা কামিনী, কাঞ্চন আর সংসার এই তিনটে নিয়ে আলোচনা করে, যাদের মন এই তিনটেতেই সব সময় ডুবে থাকে। ঠাকুর বার বার বলছেন, যেটা খুব powerful impulsive সেটাতে আমাদের মন খুব সহজেই influenced হয়ে যায়। আমাদের মন যেন লোহার একটা সাধারণ ছুঁচ, আর সামনে একটা দুর্বল চুম্বক থাকলে ছুঁচটা হাল্কা ভাবে নড়বে। হঠাৎ একটা বিরাট শক্তিশালী চুম্বক এসে গেল, এবার নড়ানড়ি বন্ধ হয়ে বুম্ করে ছুঁচ ওটার সাথে এক হয়ে যাবে।

দেবাসুরের সংগ্রামে অসুররা সব সময় দেবতাদের বেদম মারতে থাকে, আর এক আধ দিনের জন্য না, হাজার হাজার বছর ধরে অসুররা দেবতাদের পিটিয়েই আসছে। যে কোন পুরাণ খুললে বা বেদের ব্রাহ্মণ অংশ খুললে শুধু এই দৃশ্যই দেখা যাবে। দেবতারা শেষে অসহায় হয়ে বিষ্ণুর কাছে গেলেন বা শক্তির আরাধনা করলেন, শক্তি এসে অসুরগুলোকে বধ করে দেবতাদের নিষ্কন্টক স্বর্গ ভোগের ব্যবস্থা করে দিলেন। কিন্তু কত দিনের জন্য? খুব বেশি দিনের জন্য নয়। মা আবার বলে দিয়ে গেছেন, আবার যদি কোন ঝামেলায় পড় আমাকে মনে করো, আমি এসে অসুরগুলোকে আবার শায়েস্তা করে যাব। কদিন পরেই শুম্ভ-নিশুম্ভ এলো, তার আগে মধুকৈটভ। মা যখন আসেন তখন অসুরগুলোকে নিধন করেন। অসুর মানে যারা মন আর ইন্দ্রিয়ের শক্তি দিয়ে চলে। সারা জগৎ মন আর ইন্দ্রিয় দিয়েই চলছে, আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, পুরো পাশ্চাত্য জগৎ মন আর ইন্দ্রিয়ের শক্তিতেই চলছে। ভারতবর্ষেও একই পরিস্থিতি, শুধু ইন্দ্রিয় আর মনের শক্তিতে সবাই চলছে। যখনই আমরা মোবাইল, ইন্টেরনেট, সোস্যাল নেটওয়ার্ক ধরে নিলাম, বুঝে নিন তখনই আমরা ইন্দ্রিয় আর মনের শক্তিতে নেমে গেলাম। বলা হয় যে, জগৎ সব সময় এই রকমই থাকে। আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়ে যখন কেউ চলে তখন তাঁকে দেবতা বলা হয়। দেবতাদের মত কেউ যদি আমাদের কাছে চলে আসেন, বুঝতে হবে এবার পাওয়ারফুল চুম্বক এসে গেছে।

কেউ হয়ত বহু সাধ্য সাধনা করে একটু সামান্য জপধ্যান করতে বসেছে। ঠিক সেই সময় বাড়ীতে একজন আত্মীয় বা বন্ধু এসে উপস্থিত। অপেক্ষা করতে লাগল কখন সে জপ সেরে উঠবে। কোন রকমে একটু নমো নমো করে জপ করে উঠে পড়ল। ও আপনি এসেছেন, চা খান। চা খেতে খেতেই শুরু হয়ে গেল, অমুকের মেয়ের কাণ্ড, অমুকের স্ত্রীর কেচ্ছা, আর সেও পুরোদমে ওই আলোচনাতে নেমে গেল। আমাদের জপধ্যান যেন একসের দুধে পাঁচ সের জল মেশানো। সেইজন্য সব সময় চেষ্টা করতে হয়, কিভাবে এইসব লোকেদের সংস্রব থেকে দূরে থাকা যায়। সঙ্ঘ সাধু সন্ন্যাসীদের রক্ষা করার জন্য, সাধুরা যে সেবাকার্য করেন তাতে সমাজই তাঁদের ভিক্ষাদি করা থেকে বাঁচিয়ে দিচ্ছে। যাঁরা ভক্ত তাঁদেরকেও সংসারী লোকেদের থেকে বাঁচতে হয়, তাই এদের সঙ্গ করতে নেই। সংসারীভাবের কিনা কি করে বুঝব? প্রথমে দেখতে হবে সে কি ধরণের কথাবার্তা বলতে ভালবাসে। দ্বিতীয় তার কাছে গেলে আমার মনে কি ধরণের ভাব ওঠে। স্বামীজী তাই বলছেন, Avoid worldly company, that will distract your mind. (*বিষয়ী লোকের সঙ্গ ত্যাগ কর, তাতে চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়ে থাকে।*) সংসারী লোকেদের সাথে ওঠাবসা করলে, সংসারী বিষয়ের মধ্যে থাকলে মনটা ওর মধ্যেই টেনে নেবে। চৈতন্য মহাপ্রভুও বলতেন, না কহিবে গ্রাম্যকথা, না শুনিবে গ্রাম্যকথা, গ্রাম্যকথা মানে সাংসারিক কথাবার্তা।

এরপর বলছেন, Give up all 'me and mine', 'আমি ও আমার' ভাব ত্যাগ কর, সব ঈশ্বরের উপর ছাড়। To him who has nothing in the universe the Lord comes. (*জগতে যাঁর 'আমার' বলতে কিছুই নেই, ভগবান তাঁর কাছে আসেন।*) প্রভু তাঁর কাছেই আসেন, এই জগতে যাঁর আমি ও আমার বলে কিছু নেই। কিন্তু এটা আমাদের ভাল করে জেনে রাখা দরকার, যার কেউ নেই তার খোদাও নেই, আহাম্মক, অপদার্থদের জন্য খোদাও আসেন না। যীশুর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, যীশুর যা ক্ষমতা, তাতে তাঁকে ক্রুশিফাই করার সময় তিনি চাইলে শত শত দেবদূতদের ওখানে হাজির করিয়ে দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করলেন না। যীশু বলছেন, ঈশ্বরের নামে সব কিছু ত্যাগ কর, এই জগতে যারা গরীব তারাই স্বর্গের উত্তরাধিকারী। এর অর্থ এই নয় যে গরীব কাঙালীরাই স্বর্গে যাবে, অর্থ হল, যারা নিজের সব রকম আমিত্ব ত্যাগ করেছে, তারাই স্বর্গের উত্তরাধিকারী। এর খুব সহজ ও সাধারণ উপমা হল, একজনের কাছে ষোল চাকার একটা বিরাট গাড়ি আছে। ওই ষোল চাকার গাড়ি এবার চলবে বোম্বে হাইওয়েতে। কিন্তু যতক্ষণ না পর্যন্ত রাস্তা থেকে টোটো, অটো, সাইকেল, রিক্সা, মোটর সাইকেল, লোকজনের চলাচল বন্ধ করা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ওই ষোল চাকার গাড়ি চালানোই যাবে না। বড় বড় ট্রলারকে খুব স্পীডে চলার জন্য রাস্তাকে সব রকম ছোট খাটো ট্রাফিক থেকে পরিষ্কার রাখতে হবে।

'আমি ও আমার' ভাব ছাড়ো – একমাত্র ঈশ্বরের নামে ডুব দাও

ভগবান হলেন ষোল চাকার গাড়ি, ওই গাড়ি যদি রাস্তায় নামানো হয় আর রাস্তায় যদি রিক্সা, টেম্পো, টোটো, সাইকেল থাকে, ভগবান চলতেই পারবেন না, দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। যদি চলে সব গাড়িকে পিষে দিয়ে বেরিয়ে যাবে। সেইজন্য আগে সব ছোট খাটো গাড়িগুলোকে রাস্তা থেকে সরাতে হবে। এটা তো মিলিটারি যুদ্ধ নয় যে ট্যাঙ্ক চালিয়ে উড়িয়ে দেবে। আমাদের মনের মধ্যে যে নানা ধরণের হিজিবিজি চিন্তা-ভাবনা গুলো চলে, এগুলো হল ক্রিং ক্রিং বাজানো সাইকেল, পোঁ পোঁ বাজানো অটো, টোটো, প্যাঁক প্যাঁক বাজানো রিক্সা, এটাই হল সাংসারিকতা। মন থেকে যতক্ষণ না এগুলো পরিষ্কার করা হবে, অর্থাৎ মন থেকে যতক্ষণ সাংসারিকতা না চলে যাচ্ছে, ষোল চাকার গাড়ি ওখানে ব্রেক মেরে বসে থাকবে। ট্রাফিক পুলিশ বলবে গাড়ি চালাতে, চলব'টা কোথায়, আগে রাস্তা ফাঁকা কর। আমিই হলাম আমার ট্রাফিক পুলিশ, আমাকেই আগে রাস্তা পরিষ্কার করাতে হবে, তবেই ভগবানের ষোল চাকার গাড়ি রাস্তায় চলবে।

ঠাকুর রোজ এসে আমাদের ঘরের দরজায় কড়া নেড়ে যাচ্ছেন, ওগো আমি এসেছি, তোমার ঘরে জায়গা আছে? আমরা বলে যাচ্ছি, ঘরে জায়গা নেই, আমার আমিত্ব, আমার স্বামী/স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, নাতি-নাতনী, আমার অহঙ্কার, আমার কামনা-বাসনা, আমার চিন্তা-ভাবনাতে ঘর একেবারে ঠাসা, তোমাকে বসার জায়গাটুকু দিতে পারছি না। ঠাকুর রোজ এসে ঘুরে যাচ্ছেন, আমরা কিছুই করতে পারছি না। এয়ারপোর্টে রানওয়ে থাকে, যেখানে এ্যরোপ্লেন নামে। রানওয়েতে যদি পর পর প্লেন দাঁড়িয়ে থাকে তখন অন্য প্লেনগুলো যতক্ষণ

না রানওয়ে থেকে প্লেন সরিয়ে পরিষ্কার হচ্ছে ততক্ষণ আকাশের উপরেই চক্কর মারতে থাকে। সুপারপ্লেন হারকিউলাসগুলো এয়ারপোর্টে আসে আর আকাশে কয়েকটা চক্করে মেরে ফেরত চলে যায়। আমরা মনে করছি আমরা ভগবানকে খুঁজছি, ভগবান ইচ্ছে করে আমাদের ধরা দিচ্ছেন না। কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে, আমরা যেভাবে ভগবানকে খুঁজছি ভগবান তার থেকে আরও ব্যাকুল হয়ে আমাদের খুঁজছেন, কোন ভক্ত আছ যে যার ঘরে নামতে পারি। আর অল্প বয়সে আমরা ভাবছি, যা করার বুড়ো বয়সে করা যাবে। বুড়ো বয়সে আমাদের করার কিছু থাকে না, তখন আমাদের সব ভোগ করা হয়ে যাবে, নাতি-পোতারা সব বড় হয়ে যাবে, তখন এয়ারপোর্টের রানওয়ে অনেকটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। তা কি কখন হয়? কখনই হয় না, বৃদ্ধ বয়সে নিজের বাহ্য-প্রস্বাবেই নিয়ন্ত্রণ থাকে না, সে করবে নিজের মনের নিয়ন্ত্রণ! আমাদের এটাই সমস্যা, অল্প বয়সে ভাবে বুড়ো বয়সে করব, আর বুড়ো বয়সে ভাবে আগামী জন্মে করা যাবে। এই করেই একটার পর একটা জন্ম আমাদের কেটে যাচ্ছে, ভগবানের সুপারপ্লেন আসে, এসে দেখে রানওয়ে ফাঁকা আছে কিনা, দেখছেন রানওয়ে এখন খুব জ্যাম, সুপারপ্লেনটা আকাশে কয়েকটা চক্কর দিয়ে ফেরত চলে যায়। রানওয়েটা ফাঁকা আমাকেই করতে হবে। সেইজন্য স্বামীজী বলছেন, To him who has nothing in the universe the Lord comes, এই জগতে যার কিছু নেই ভগবান তারই কাছে আসেন। 'যার কিছু নেই', এর সাথে গরীব কাঙালীদের মিশিয়ে দিলে হবে না। যাঁরা সব কিছু ছেড়ে দিয়েছেন, ভগবান তাঁর কাছে আসেন। এটাই সত্য, কিন্তু আমরা মানতে চাই না।

তার সাথে বলছেন, Cut the bondage of all worldy affections; go beyond laziness and all care as to what becomes of you. (*সব রকম মায়িক প্রীতির বন্ধন কেটে ফেল। আলস্য ত্যাগ কর। 'আমার কি হবে?' – এরূপ ভাবনা একেবারে ভেবো না।*) তোমার কি হবে, কি হবে না, সব ভুলে যাও, আলস্য ছাড়ো, সব কিছু ছেড়ে তাঁতে ঝাপ দাও। ঠাকুর বলছেন, ডুব দাও, তাঁর নামে ডুব দাও। আমরা কোমড়ে দড়ি বেঁধে গাছের সাথে বেঁধে রেখেছি, নদীতে ডুব দিলে কতটাই বা আর যাবে, দড়ির টানে আবার ফেরত চলে আসবে। নদীর গভীরে ডুব দেওয়ার জন্য আমাদের ওই আমিত্বের দড়িটাকে কাটতে হবে। আমি ও আমিত্বের দড়ি যদি না কাটা হয় কোন দিন আমরা ঈশ্বরে ডুব দিতে পারব না। এই কথা বলার পর বলছেন, Never turn back to see the result of what you have done, (*তুমি যে-সব কাজ করেছ, তার ফলাফল দেখবার জন্য ফিরেও তাকিও না।*) তুমি কতটা কি কি করেছ এগুলোকে নিয়ে কখনই ভাববে না, এগুলো হল সাংসারিক ভাব। আমি এই করেছি, সেই করেছি, তার সাথে আছে আলস্য, তার সাথে আছে আমার কি হবে কি জানি। যা হওয়ার তা হয়ে গেছে, সব ছেড়ে দিতে হয়, ভুলে যেতে হয়। ফলাফলের চিন্তা না করে ঈশ্বরের নামে ঝাঁপ দাও, তাঁতে ডুবে যাও।

ভক্তির বর্ণনা করে স্বামীজী বলছেন, The whole soul pours in a continuous current to God; there is no time to seek money, or name, or fame, no time to think of anything but God; there is no time to seem money, or name or fame, no time to think of anything but God, (*যখন সব মনপ্রাণ এক অবিচ্ছিন্ন ধারায় ভগবানের দিকে যায়, যখন টাকাকড়ি বা নামযশ খুঁজে বেড়াবার সময় থাকে না, ভগবান ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করবার অবসর থাকে না,*) এই রকম তৈলধারার মত যখন ভালবাসা ঈশ্বরের দিকে যায় তখন আর টাকা-পয়সা, নাম-যশ কোন কিছুর দিকে মন যায় না। এই জিনিস বাস্তবিক হয়, সন্ত মহাত্মাদের জীবনী পড়লে এই জিনিসই দেখা যাবে। এখানে সত্যিকারের উচ্চমানের ভক্তদের কথাই বলা হচ্ছে। আমাদের মত সাধারণ ভক্তদের এই জিনিসগুলোকেই একটু চেষ্টা করে করতে হয়, যাতে মনটা একটু ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যাওয়া যায়। ঈশ্বরের দিকে মনটা একবার যদি টানা চলতে থাকে, তখন এমনিতেই সব কিছু খসে পড়ে যাবে, জাগতিক কোন কিছুর দিকেই সে মন দিতে পারবে না। এই রকম যখন মনের অবস্থা হয় তখন কি হয়, স্বামীজী বলছেন, then will come into our hearts that infinite, wonderful bliss of Love. (*তখনই হৃদয়ে সেই অপার অপূর্ব প্রেমানন্দের উদয় হবে।*) ঈশ্বরের যে প্রেম, ঈশ্বরের যে অনন্ত ভালবাসা, সেই প্রেম, ভালবাসা হৃদয়ে তখনই আসে। ঠিক ঠিক ভক্তি বা প্রেম পুরো আলাদা জিনিস, ঈশ্বরের সেই প্রেম বা ভক্তির সামনে জাগতিক সমস্ত কামনার বস্তু তুচ্ছ হয়ে যায়। তুলনা করে বলা হয় ভক্তি যেন হীরে, আর জাগতিক কামনাগুলো যেন সব কাঁচের পুঁতি।

সাধারণ লোকেদের মুক্তার মালা, হীরের মালা পড়ার ক্ষমতা কই! কাঁচের পুঁতির মালা পড়েই তাদের দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে হয়

ভক্তির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

নারদীয় ভক্তিসূত্রে বলছেন, *গুণরহিতং কামনারহিতং প্রতিক্ষণবর্ধমানবিচ্ছিন্নং সূক্ষ্মতরমনুভবরূপম্*, এই সূত্রকেই স্বামীজী নিজের মত করে বলছেন, Love of God increases every moment and is ever new, to be known only by feeling it. (*প্রকৃত প্রেম বা ভক্তি অহৈতুকী, এতে কোন কামনা নেই, এটি নিত্য নূতন ও প্রতিক্ষণ বাড়তে থাকে, সূক্ষ্ম অনুভব-স্বরূপ। অনুভবের দ্বারাই একে বুঝতে হয়।*) এই অবস্থায় ভালবাসা দিনে দিনে বাড়ে, মীরাবাঈ ভজনে বলছেন, দিনে দিনে বড়ত সবায়ো, পায়ো জী মে রামলখন ধন পায়ো। ভক্তি এমনই এক জিনিস, কখন কমে যায় না, দিনে দিনে বাড়তেই থাকে। আমাদের মন সব সময় নূতন নূতন জিনিস চায়, এটাই মনের স্বভাব, পুরনো যে কোন জিনিস আমাদের মনকে একঘেঁয়ে করে দেয়। সেইজন্য আমরা পরিবর্তন চাই, নিত্য নূতন নূতন জিনিস চাই। কিন্তু এই প্রেম, ভক্তির এমন একটা লক্ষণ যে সব সময় মনে হবে চিরনূতন, তরতাজা। যখনই দেখা যাবে জপধ্যানে মন বসছে না, ভক্তি ভাব ভাল লাগছে না, তখনই বুঝতে হবে যে তার ভালবাসা এখনও গভীর হয়নি। ভালবাসা যদি গভীর হয় তখন এই প্রেম ভক্তিকে সব সময় টাটকা, সতেজ মনে হবে। ফলে আকর্ষণও তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। এই ভালবাসা, প্রেম, ভক্তিকে জানার কোন উপায় নেই, একমাত্র ভিতরের অনুভূতি দিয়ে বোঝা যায়। ভক্তির এটাই মূল, মন দিয়ে বোঝা যায় না, কারুর কাছে ব্যক্ত করা যায় না, এই ভালবাসাকে একমাত্র বোধে বোধ করা হয়।

Love is the easiest of all, it waits for no logic, it is natural. (*ভক্তিই সবচেয়ে সহজ সাধন। ভক্তি স্বাভাবিক, এতে কোন যুক্তিতর্কের অপেক্ষা নেই; ভক্তি স্বতঃপ্রমাণ, এতে আর অন্য কোন প্রমাণের অপেক্ষা নেই।*) ভালবাসা জিনিসটা স্বতঃ, এর মধ্যে কোন যুক্তিতর্ক নেই। একটা ছেলে যখন কোন মেয়েকে ভালবাসে, তখন যতই তাকে বোঝান হোক, কেন এই বাজে একটা মেয়েকে ভালবাসতে যাচ্ছ, সারা জীবন আফশোস করতে হবে, বোঝানর সব চেষ্টাই বৃথা হয়ে যায়। নিজের সম্প্রদায়, নিজের পরিবার, সংস্কৃতি সব কিছু ছেড়ে কোন মেয়ে একজনকে সত্যিকারের ভালবেসে ফেলেছে, তাকে যতই বোঝান হোক সে বুঝতে চাইবে না। কারণ ভালবাসাটা এমন মৌলিক জিনিস যে, এটাকে বোঝান যায় না। যে সত্যিকারের প্রেম করেছে, যার মধ্যে ঠিক ঠিক ভালবাসার উদয় হয়েছে সেই ঠিক ঠিক জানে, বোঝে প্রাণ বোঝে যার। সেখানে কোন যুক্তি চলে না, কোন ব্যাখ্যা চলে না, কোন কিছুই আর চলে না। যাঁরা ভক্তি করেন তাঁকে কিছু দেখাতে হয় না, তাঁকে কিছু প্রমাণিত করতে হয় না। কোন প্রমাণ নেই, সে শুধু জানে আমি ভালবাসি। যদি বলা হয়, তুমি যে ভালবাসছ তার প্রমাণ দাও, কোন প্রমাণ সে দিতে পারবে না। ভালবাসার কোন প্রমাণ নেই, আমি ভালবাসি, এইটুকুই শুধু বলা যায়। ভক্তি, ভালবাসা আমাদের স্বভাবেই রয়েছে। যেমন সন্তানের প্রতি মায়ের ভালবাসা বা মায়ের প্রতি সন্তানের যে নির্ভরতা, এটা স্বাভাবিক। ঠিক তেমনি ঈশ্বরের প্রতি যে ভক্তি, এতে কোন যুক্তিতর্ক চলে না। ভালবাসা, শুধু ভালবাসা। তখন কি হয়?

ভালবাসা, ভক্তিতে তিনটি অবস্থা থাকে – আমি থাকে, তুমি থাকে আর ভালবাসা থাকে। ভালবাসা যখন গভীর থেকে গভীরতর হয়ে যায়, তখন আমি তুমি মিটে গিয়ে শুধু থেকে যায় ভালবাসা। ভক্তি মানেই তাই, ভক্তিতে আমি তুমির ভেদটা চলে যায়। যদিও ভক্তিশাস্ত্রে বলা হয়, ভক্তিকে আস্বাদ করার জন্য 'আমি'র একটা ক্ষীণ আবরণ থেকে যায়, কিন্তু ঠিক ঠিক ভক্তিতে এই আবরণটাও থাকে না। ঠাকুর শ্রীমতীর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভালবাসার উপমা নিয়ে এসেছেন, সেখানে এই জিনিসটাকেই দেখাচ্ছেন কিভাবে শ্রীরাধা কৃষ্ণপ্রেমে ডুবে গেছেন। রাসলীলাতে শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীদের বর্ণনায় দেখাচ্ছেন, গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের ভাবে এমন ডুবে গেছেন যে তারা নিজেদেরকেই ভুলে গেছেন। তখন নিজেরাই শ্রীকৃষ্ণের লীলার অভিনয় করতে শুরু করেছেন। কোন গোপী কৃষ্ণ হয়েছেন, কোন গোপী বাছুর হয়েছেন, অভিনয় করতে করতে যখন তাঁদের মনে হল আমরা শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসি, তখন সবাই উচ্চঃস্বরে কাঁদতে শুরু করেছেন, কারণ কৃষ্ণ তাদের কাছে নেই। এক সময়

তাঁরা সবাই কৃষ্ণপ্রেমে হারিয়ে যাচ্ছেন আবার অন্য সময় কৃষ্ণের জন্য রোদন করছেন। ওই ভালবাসাতে আমি তুমি ভুলে যায়, ভুলে যায় আমি কে, শুধু ভালবাসাই থাকবে।

এখানে কোন যুক্তিতর্ক থাকে না, কারণ, Reasoning is limiting something by our own minds, যে কোন জিনিসকে নিয়ে আমরা যখন যুক্তিতর্ক বা প্রমাণ দিই সেটাকে আমরা সীমাবদ্ধ করে দিই। প্রায়ই লোকেরা ঈশ্বরের ব্যাপারে, ধর্মের বোকা বোকা সব কথা বলে – ধর্ম কি যুক্তিসঙ্গত, ঈশ্বরকে কি যুক্তি দিয়ে জানা যাবে, ইত্যাদি। অবশ্যই জানা যাবে, কিন্তু যখনই যুক্তি লাগানো হবে, জানবেন ঈশ্বর যিনি অনন্ত তাঁকে আপনি বেঁধে দিলেন, ছোট করে দিলেন। যুক্তি মানেই হয় প্রমাণ, প্রমাণ মানে একটা জিনিসকে মেপে নেওয়া। যেমন এই ঘরটার মাপ নিতে হবে, একটা ফিতে এনে দৈর্ঘ্য প্রস্থ মেপে নিয়ে দেখা গেল ঘরটা কুড়ি বাই পনের ফুট। ঘরটাকে মেপে নেওয়া হল, মানে ঘরটা তিনশ স্কয়ার ফিটের উপরেও নয়, নীচেও নয়। প্রমাণ শব্দ আসে 'মা' ধাতু থেকে, মেপে নেওয়া। যে কোন জিনিসের যুক্তিতর্ক হওয়া মানে, বুদ্ধি গিয়ে যেখানে ধরে, তার মানে একটা কাঠামো দেওয়া আছে তার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। ইট তৈরী করার সময় মাটিকে একটা ফর্মার মধ্যে বেঁধে দেওয়া হল। যুক্তিতর্কও তাই, একটা কাঠামোর মধ্যে তাকে বেঁধে দেওয়া হল। একদিকে বলছেন ঈশ্বর অনন্ত, অন্য দিকে বলছেন ঈশ্বরের ব্যাপারে যুক্তি চাই, দুটো বিপরীত হয়ে গেল, যুক্তি মানেই বেঁধে দেওয়া, একদিকে অনন্ত আবার তাঁকে বেঁধে দিতে চাইছেন, কি করে তা হবে! কেউ যদি এসে প্রশ্ন করে, ধর্ম, ঈশ্বর এগুলো কি যুক্তিসঙ্গত? তখনই তাকে বলে দিতে হবে, ভাই তোমার প্রশ্নটাই অযৌক্তিক। অনন্তকে সীমিত করা, এর থেকে বেশি অযৌক্তিক কথা কিছু হতে পারে কি? স্বামীজী তাই বলছেন, যুক্তিতর্ক আমাদের মনকে সীমিত করে দেয়।

এরপর স্বামীজী বলছেন, We throw a net and catch something, and then say that we have demonostrated it; but never, never can we catch God in a net. (*আমরা যেন (মনরূপ) জাল ফেলে কোন বস্তুকে ধরে বলি, এই বিষয়টা প্রমাণ করেছি। কিন্তু ঈশ্বরকে আমরা কখনও জাল দিয়ে ধরতে পারব না – কোন কালেও নয়।*) ঠাকুর বলছেন, এক সের ঘটিতে কি তিন সের দুধ ধরে! এই জগতে নানান রকমের জিনিস আছে, নানা ধরণের চিন্তা আছে। আমাদের মন যেন একটা জাল। মনরূপী জাল দিয়ে জগতের সব কিছুকে আমরা ধরি। নদী বা পুকুরে জাল ফেলা হয়, জাল যতটা বড়, জালের ফোকর যেমন মাপের হবে সেই অনুসারে সেই আকারের মাছ জালে ধরা পড়বে। জাল থেকে মাছ ছাড়িয়ে নিয়ে আবার জাল ছোঁড়া হল, আরেক রাউণ্ড মাছ ধরা পড়ল, আরেক বার ফেলা হল, আরও কিছু মাছ ধরা পড়ল। যত বারই জাল ফেলা হোক না কেন, জাল কোনটাকে ধরবে? যেটা জাল থেকে ছোট। বিরাট আকারের তিমি মাছ যদি হয়? এই জাল দিয়ে তিমি মাছ ধরা সম্ভব নয়। ঈশ্বর অনন্ত, তিনি এতই বড় যে, যত বড় জালই হোক, বুদ্ধি যতই বিকাশ করুক, অনন্তের সামনে সেই বুদ্ধি সব সময়ই সীমিত। সেইজন্য কোন দিনও ওই জালে ঈশ্বর ধরা পড়বেন না। অন্য দিকে ঈশ্বর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। জালের ফোকর গুলো যদি বড় হয় তাহলে ছোট মাছগুলো বেরিয়ে যাবে, আরও ছোট ফোকর যদি হয় তাহলে জল বেরিয়ে যাবে, তার থেকেও যদি সূক্ষ্ম ফোকর হয়, জালের বদলে ধুতি ফেললে জল হয়তো বেরোতে পারবে না, কিন্তু বাতাস বেরিয়ে যাবে। কিন্তু ঈশ্বর তার থেকেও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। ঠিক তেমনি মন আমাদের যত সূক্ষ্মই হোক, ওই সূক্ষ্ম মন দিয়ে কোন দিন আমরা ঈশ্বরকে জানতে পারব না। একদিকে তিনি অনন্ত, বৃহৎ থেকেও বৃহৎ, আবার অন্য দিকে তিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। যাদের পড়াশোনা নেই, মস্তিষ্কের অনুশীলন করে না, গভীর চিন্তা-ভাবনা করে না, তাদের জাল যেন ছোট। যারা পড়াশোনা করেছে, আলাপ আলোচনা করেছে, চিন্তন-মনন করেছে, তাদের জাল যেন আরও বড়। যার জাল যত বড় সে তত সমুদ্র থেকে বড় জিনিসকে ধরে নিতে পারবে। আমাদের তত পড়াশোনা নেই, তত জ্ঞান নেই, সেইজন্য আমাদের মন অনেক কিছুই ধরতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বরকে কেউই ধরতে পারবে না। সমস্ত ধর্ম, সমস্ত ধর্মের দার্শনিকরা এই একই কথা বলেন।

স্বামীজী বলে যাচ্ছেন, Love should be unrelated. Even when we love wrongly, it is of the true love, of the true bliss; the power is the same, use it as we may. (*ভক্তি নিরেপেক্ষ হওয়া চাই। এমন কি, আমরা যখন প্রেমের অযোগ্য কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে ভালবাসি তখনও তা*

প্রকৃত প্রেম, প্রকৃত আনন্দের খেলা। প্রেমকে যেরূপেই ব্যবহার করি না কেন, শক্তি সেই একই।) ভালবাসার কোন কিছুর সাথে কোন সম্পর্ক নেই, একেবারে পবিত্র। কোন কারণে যদি কোন ভুল বস্তু বা ব্যক্তিকে ভালবেসে ফেলে, ভালবাসা যদি ভুলও হয়ে যায়, তাহলেও তা সেই শুদ্ধ প্রেম, শুদ্ধ ভালবাসারই রূপ। ফলে ভালবাসার যে শক্তি, ওতে কোন তারতম্য নেই। সেইজন্য ভালবাসায় ঠিক আর ভুল বলে কিছু হয় না, ঠিক জিনিসকে ভালবাসল বা ভুল জিনিসকে ভালবাসল তাতে ভালবাসাতে কিছু যায় আসে না, ভালবাসা ভালবাসা। একটা ভুল আদর্শকেও ভালবেসে ফেলে, তাতেও কিছু হয় না। কারণ তার যে আদর্শ সেটা ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে।

কারুর মধ্যে সত্যিকারের ভালবাসা এসেছে কিনা, বোঝা যাবে দুটো জিনিস দিয়ে – শান্তি ও আনন্দ। কারণ ভালবাসার স্বভাব হল শান্তি ও আনন্দ। একজন ব্যক্তিকে ভালবাসছে, কোন আদর্শকে ভালবাসছে, একটা আইডিয়াকে ভালবাসছে, কোন জিনিসকে ভালবাসছে, দেখতে হবে ওই ভালবাসার জন্য তার জীবনে শান্তি আসছে কিনা, আনন্দ আসছে কিনা; নাকি ভালবেসে তার জীবনে অশান্তি আর উৎপাত বেড়ে গেছে। রাবণ সীতাকে অপহরণ করে লঙ্কায় নিয়ে এসেছে। সীতাকে রাবণ জোর করে তার বিছানায় টেনে নিয়ে যেতে চাইছে, সেই সময় মন্দোদরী রাবণকে বোঝাচ্ছেন, কোন পুরুষেরই কোন মেয়েকে জোরপূর্বক টেনে আনা ঠিক না, কারণ মেয়ে যদি নিজে থেকে তার কাছে না আসে তাহলে তাতে সেই পুরুষের মধ্যে তাপ সৃষ্টি হয়, ওই তাপ মনকে অশান্ত করে দেয়। ভারতবর্ষে ইদানিং যেভাবে শ্লীলতাহানি হচ্ছে এতে কেউ বুঝতে পারছে না যে, মেয়েদের এর ফলে ক্ষতি হচ্ছে এতে কোন সন্দেহ নেই, আর এই নোংরামির জন্য দেশের ও সমাজের দুর্নাম হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু যে এই কাজ করছে সে কল্পনা করতে পারছে না, সে নিজের কত বড় ক্ষতি করছে। আমরা একে কাম বাসনাই বলি আর যাই বলি, ও এখন আকর্ষিত হয়ে গেছে, এই আকর্ষণ ওর মধ্যে তাপ সৃষ্টি করে দিচ্ছে, যে তাপ তার মনকে অশান্ত করে তোলে, ওই অশান্ত মন একটা সময়ে তাকে হিংস্র পশুতে রূপান্তরিত করে দেয়। অশান্ত মন, হিংস্রতার ভাব, এগুলো আর যাই হোক, ভালবাসা নয়। যারা ভক্তি ভাব নিয়ে থাকে, যাদের মধ্যে সংস্কৃতি আছে, তারা প্রথমেই দেখেন জিনিসটা আমাকে উদ্বেলিত করে দিচ্ছে কিনা, আমার মনকে চঞ্চল করে দিচ্ছে কিনা, সেই জিনিস থেকে সে সব সময় দূরে থাকতে চাইবে। ভালবাসা মনকে শান্ত করে দেবে আর আনন্দে ভরিয়ে দেবে। যে কোন ধরণের ভালবাসা, ছেলে ও মেয়ের ভালবাসা, প্রেমিক-প্রেমিকার ভালবাসা, স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা, মা ও সন্তানের ভালবাসা, বন্ধুর প্রতি বন্ধুর ভালবাসা, যে ভালবাসায় মনকে অশান্ত করে দিচ্ছে, মনে উত্তাপ সৃষ্টি করছে, তবে সেটা আর যাই হোক, ভালবাসা কোন ভাবেই হতে পারে না, কারণ ভালবাসার স্বভাবই হল peace and biss, শান্তি ও আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।

স্বামীজী আবার বলছেন, The murderer when he kisses his baby forgets for an instant all but love, নারদীয় ভক্তিসূত্রকে স্বামীজী নিজের মত ব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন, একজন যে খুনী, সেও যখন নিজের সন্তানকে ভালবাসে, স্নেহ করে তখন সেই মুহূর্তে সে সব কিছু ভুলে যায়, শুধু ভালবাসাটাই থাকে। পশুপাখিরাও যখন তাদের ছানাপোনাদের নিয়ে থাকে তখন তারা অন্য কোন প্রাণীকে কাছে আসতে দেবে না। বাঘিনী যখন শিকার ধরে তখন যে দাঁত দিয়ে ধরে আর যখন নিজের বাচ্চাকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাবে তখনও সেই দাঁত দিয়েই ধরছে, কিন্তু ব্যবহারটা অন্য রকমের হয়ে যায়। এখানেও ভালবাসা ছাড়া আর কিছু নেই।

আমরা কি জীবনে সত্যিই এমন কাউকে ভালবাসতে পেরেছি যে, বলতে পারব, এর জন্য আমি সারা জীবন কলঙ্কিত হয়ে কাটিয়ে দিতে পারি। প্রাণ দিয়ে দেওয়া সহজ, ট্রেনের তলায় ঝাঁপ দিলেই প্রাণ চলে যাবে, কিন্তু কলঙ্কিত হয়ে সারা জীবন কাটানো অত্যন্ত দুঃসাধ্য। যাদের জীবনে এই রকম ভালবাসার অভিজ্ঞতা নেই, তারা শ্রীকৃষ্ণ-যশোদার, শ্রীকৃষ্ণ-গোপীদের ভালবাসা কি করে বুঝবে! এই গভীর ভালবাসা বিহীন লোকেরা রাসলীলার মধ্যে নারী-পুরুষের নোংরামিটাই দেখবে, এর বাইরে কিছু নিতে পারার ক্ষমতাই তাদের নেই। কারণ আমাদের মন যেমনটি তেমনটিই আমরা সব দেখব, আমাদের মন নোংরামিতে ভর্তি তাই সব কিছুতেই নোংরামি দেখি। স্বামী স্ত্রীর জন্য, বা স্ত্রী স্বামীর জন্য বলতে রাজী আছে যে আমি তোমার জন্য সারা জীবন কলঙ্কিত হয়ে থাকলেও আমার কিছু যায় আসে না। সারা জীবনের জন্য নয়, কিছুক্ষণের জন্যই হোক, পাঁচ

মিনিটের জন্যই হোক, এই ভাব মনের মধ্যে ধরে রাখা, তোমার জন্য আমি সারা জীবন কলঙ্কিত হয়ে থাকতে রাজী আছি। পাঁচ মিনিটের পর সে পাল্টে যাক তাতে কোন অসুবিধা নেই, কিন্তু ওই পাঁচ মিনিটের জন্য সেই intensity যদি এসে থাকে তাহলে সে বুঝতে পারবে ভালবাসায় সত্যিকারের কী intensity হয়। স্বামীজী এটাই বলছেন, ভালবাসা ভালবাসা, সে একজন নারীকে ভালবাসছে, সে সন্তানকে ভালবাসছে, সে ঈশ্বরকে ভালবাসছে, তাতে কিছু আসে যায় না। একজন সতীর পতির প্রতি যে টান আবার একজন স্বামীর তার স্ত্রীর প্রতি যে ভালবাসা আর ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা, সবটাতেই ভালবাসাটা এক। Intensityর তফাৎ অবশ্যই হয়, ঠাকুরও বলছেন, সতীর পতির প্রতি টান, বিষয়ীর বিষয়ের প্রতি টান আর মায়ের সন্তানের প্রতি টান, এই তিন টান এক হলে তবেই ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা হয়। কিন্তু common factor হল ভালবাসা।

Give up all self, all egotism; get out of anger, lust, give all to God. (*অহংটাকে একেবারে নাশ করে ফেলো। কাম, ক্রোধ ত্যাগ কর – ঈশ্বরকে সর্বস্ব সমর্পণ কর।*) যেমন একজন খুনী নিজের সন্তানকে আদর করার সময় ভুলে যায় যে সে খুনী, ওর আমিত্বটা চলে গিয়ে থেকে যায় শুধু ভালবাসা। তোমার ভিতরে যে কাম, ক্রোধ, লোভ আছে সব ঈশ্বরের প্রতি দিয়ে দাও। এটাকেই ঠাকুর বলছেন মোর ফিরিয়ে দেওয়া। ‘I am not, but Thou art; the old man is all gone, only Thou remainest’, (*নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু – পুরাতন মানুষটা একেবারে চলে গেছে, একমাত্র তুমিই আছ।*) আগের তুমিটা শেষ। সেইজন্য হিন্দু ধর্মে সন্ন্যাসের যে নিয়ম, তাতে বলা হয়, সন্ন্যাস মানেই তুমি আগে যেটা ছিলে সেটা মরে গেল, আজ থেকে তোমার এক নূতন জন্ম হল। খুব নামকরা কথাতে বলা হয়, জাত না পুছো সাধোকি। জন্ম সম্পর্কিত যা কিছু, তুমি কোন বংশের, কোন জাতের, বাবা-মা কে, এগুলো নিয়ে সাধুকে প্রশ্ন করতে নেই, কারণ সন্ন্যাস নেওয়ার সাথেই ওগুলো শেষ।

ভক্তিতেও তাই, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি উদয় হলে তখন তার সব কিছুই নূতন হয়ে যায়। যারা খুব উচ্চ অবস্থায় আছেন শুধু তাঁদের জন্যই নয়, যাঁরা ঠিক ঠিক ঈশ্বরের দিকে যেতে চান, তাঁদেরও এটাকে মেনে নিতে হয়, আমি আর সেই পুরাতন আমি নেই, এক নূতন আমি জন্ম নিয়েছি। এই আমি নূতন আমি, এখানে পুরনো কোন কিছুর আর জায়গা নেই। আমার আমিত্ব বলে যা কিছু আছে সব ঈশ্বরের দিকে, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ এগুলো তো একদিনেই যাবে না, এগুলোকেও ঈশ্বরের দিকে মোর ফিরিয়ে দিলাম। Blame none; if evil comes, know the Lord is playing with you and be exceeding glad. (*কারও নিন্দা করো না। যদি দুঃখ বিপদ আসে, জেনো – ঈশ্বর তোমার সঙ্গে খেলা করছেন, আর এইটি জেনে পরম আনন্দিত হও।*) কারুর প্রতি দোষারোপ করো না, তোমার সাথে খারাপ কিছু যদি হয়, জীবনে যদি মন্দ কিছু আসে, জানবে ভগবান তোমার সাথে এভাবেই খেলা করতে চাইছেন। তুমিও নিজেকে তাঁর খেলার সঙ্গী মনে করে আনন্দে খেলা চালিয়ে যাও। জীবন তোমার আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে।

স্বামীজী ২৪শে জুনের ক্লাশ এই বলে শেষ করছেন, Love is beond time and space, it is absolute. (*ভক্তি বা প্রেম দেশকালের অতীত, উহা পূর্ণস্বরূপ, নিরপেক্ষ।*) ভালবাসা জিনিসটা দেশ কালের পারে। আসলে কি হয়, ঈশ্বর হলেন সচ্চিদানন্দ, তিনি আনন্দস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ মানেই ভালবাসার স্বরূপ। সেই আনন্দস্বরূপের সামনে যে মায়া বা শক্তি এসে যায়, স্বামীজী তাকে বলছেন দেশ, কাল ও বস্তু। বেদান্তের ভাষ্যকাররাও সচ্চিদানন্দের সৎকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন এই সৎ দেশ, কাল ও বস্তুতে অপরিচ্ছিন্ন। পরিচ্ছিন্ন যদি হয়ে যায়, বাঁধা যদি হয়ে যায় তখন এটাই মায়া, সৎ অসৎ হয়ে গেল, আর যদি না বাঁধা থাকে তাহলে সেটাই সৎ। ঈশ্বর আনন্দস্বরূপ, ভালবাসাই আনন্দ, তাই প্রকৃত ভালবাসা দেশ, কাল ও বস্তুর পারে। যখনই কেউ বলছে, আমি তোমাকে ভালবাসি, জানতে হবে সে মিথ্যা কথা বলছে, মানে না বুঝে বলছে। যেমনি বলছে আমি তোমাকে ভালবাসি, তখনই বুঝতে হবে ওর ভালবাসা দেশ, কাল ও পাত্রে বাধিত। ও ওই মেয়েটাকেই ভালবাসে, ওই জায়গাতেই ভালবাসে, ওই সময়েই ভালবাসে। কাল যদি জেনে যায় মেয়েটি ক্যান্সারের রোগী, সব ভালবাসা ওখানেই শেষ। কিংবা যদি জানতে পারে মেয়েটির সাথে আরও কয়েকজনের সাথে সম্পর্ক আছে বা ছিল, সে আর ওদিকেই এগোবে না। ঠিক ঠিক যেখানে ভালবাসা হয়, যার খুব কাছাকাছি উপমা আমরা পাই, গ্রামের ঠাকুরমা, দিদিমারা। আগেকার দিনে গ্রাম দেশের ঠাকুরমারা যে শুধু

নিজের নাতিদেরই ভালবাসতেন তা না, গ্রামের সবাইকে ভালবাসতেন। ঠাকুরও বলছেন, শুধু নিজের সন্তানকে ভালবাসা হল মায়া, আর সবার সন্তানকে ভালবাসা হল দয়া। এটা একটা term, কিন্তু মূল হল সত্যিকারের ভালবাসা দেশ, কাল ও পাত্রের বাইরে চলে যাবে। একটা ইয়ং ছেলে হঠাৎ হয়ত কাউকে ভালবেসে ফেলেছে, এবার দেখা যাবে ওর সব কিছু পাল্টে যাচ্ছে, ওর ব্যবহার পাল্টে যায়, সবার প্রতি ওর একটা মিষ্ট ভাব এসে যায়। কিন্তু মীরাবাঈয়ের ভালবাসা, তিনি সবাইকে ভালবাসছেন, যীশু ঈশ্বরকে ভালবাসছেন, তিনি যে শুধু নিজের শিষ্যদের ভালবাসছেন তা নয়, সবাইকে ভালবাসছেন, ঠাকুরও যে শুধু নরেন আর রাখালকেই ভালবাসছেন তা নয়, সমস্ত মানবজাতিকেই ভালবাসছেন।

আমরা মনে করি strength আর weakness দুটো আলাদা, কিন্তু দুটো আলাদা কিছু নয়, যেটাই strength হয় সেটাই তার weakness হয়, যেটাই weakness হয় সেটাই তার strength হয়, শুধু আমাদের ঠেলে ওটাকে শেষ পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। যদি কারুর কোন দুর্বলতা থাকে, যেমন কাপুরুষতা, আমাকে সবাই মিলে পিটিয়ে দিচ্ছে আমি কিছু করতে পারছি না, এটা আমার দুর্বলতা। ইদানিং কালে নয়, আগেকার দিন মায়েরা সহ্য শক্তি নিয়েই সংসার চালাতেন। আর গান্ধীজী এটাকে এমন পর্যায়ে নিয়ে গেলেন যেখানে বলছেন, তুমি যত ডাণ্ডাই মারো আমি হাত তুলব না, এই আমি সবাইকে নিয়ে সত্যাগ্রহে বসে আছি, সেখান থেকে তিনি কোথায় চলে গেলেন, আন্তর্জাতিক মানচিত্রে আজ সবাই গান্ধীকে চেনে। দুর্বলতাকে ঠেলে ঠেলে এমন জায়গায় নিয়ে চলে গেলেন, সেই দুর্বলতাই হয়ে গেল তাঁর শক্তি। ঠিক তেমনি, শক্তিকে যদি বেশি ঠেলতে থাকে, ঠেলতে ঠেলতে ওই শক্তিই দুর্বলতা হয়ে যাবে। যেমন কোম্পানীগুলোর ক্ষমতা অনেক বেড়ে গেল, তারপর দেখা গেল দুম্ করে collapse করে গেছে। রাশিয়া এত বড় হয়ে গেল যে collapse করে গেল। এই জিনিস হবেই, কিছু করার নেই। যে কোন জিনিসের যখন শক্তি বাড়ে তখন ওই শক্তিই তার কাল হয়ে যায়। আর দুর্বলতা ঠেলে ঠেলে এমন জায়গায় নিয়ে চলে যাওয়া হয়, ওটাই তখন একটা বিরাট শক্তি হয়ে দাঁড়াবে। একটা কামী পুরুষ একটা মেয়েকে ভালবাসছে, এটা তার দুর্বলতা। ওই কামী পুরুষ যদি জগতের সব মেয়েকেই ভালবাসতে শুরু করে দেয়, তখন ওটাই হয়ে যাবে ভালবাসা, ভালবাসা মানেই সবাইকে ভালবাসা। স্বামীজী যখন বলছেন, Love is beyond time and space, it is absolute, এটাই হল, দুর্বলতাকে ঠেলে ঠেলে এমন জায়গায় নিয়ে যাবে যখন দেশ কালের সীমাকে ছাড়িয়ে গেল, তখন সেটাই শক্তি হয়ে যায়। এই ভালবাসা যখন একজনের মধ্যে সীমিত থাকে এটাই তখন হয়ে যায় নিন্দনীয়, আর এই ভালবাসাই যখন সবারই প্রতি হয়ে যায়, দেশ কালকে ছাড়িয়ে যায় তখন এটাই ভালবাসা, এটাই ভক্তি, এটাই আনন্দ।

২৫শে জুন, মঙ্গলবার

২৫শে জুন স্বামীজী মূলতঃ জীব আর জগতের কি সম্পর্ক, সাধনার সময় আমরা জগৎকে কিভাবে দেখব, এই নিয়ে আলোচনা করছেন। স্বামীজীর এই আলোচনায় যাবার আগে সাধন-জীবন সম্বন্ধে কয়েকটা জিনিস আমাদের জেনে নেওয়া দরকার। সাধারণ ভাবে আমরা জানি নিজেকে ঈশ্বরে সমর্পিত করে যা কিছু করা হয় সেটাই সাধনা। স্বামীজী খুব সহজ ভাষায় চারটি যোগের কথা বলছেন, জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম ও যোগ; মূলতঃ এই চারটিই সাধনার পথ। এই চারটি যোগের সংমিশ্রণে আরও অনেক প্রকার যোগ হতে আরে। কিন্তু মোটামুটি ভাবে সব কিছুকে ধরে এই চারটি যোগেই দাঁড় করান হয়। আমরা জানি নিষ্ঠা সহকারে জপ আর ধ্যান করে গেলেই হল, আর কিছু করার দরকার হয় না। ধ্যান অনেক রকমের হয়। মন যখন নানা রকম বস্তুর চিন্তা করে এবং বস্তুর আকার ধারণা করে নেয় তখন এটাকে বলা হয় বৃত্তি। জপ ও ধ্যানের উদ্দেশ্য মনের এই বৃত্তিকে আটকানো। তার মানেই এটা নেতি নেতি সাধনা হয়ে গেল। এটাই যখন বেদান্তে আসে ওনারা বস্তু ও অবস্তুর বিচার করেন, ব্রহ্ম বা আত্মা বা ঈশ্বরই বস্তু আর বাকি সব অবস্তু। শুদ্ধ চৈতন্যই আমাদের আসল সত্তা, বাকি কোন কিছুই না, তাই বাকি সব কিছুকে ছেড়ে দিয়ে ঈশ্বরকে ধরা, এটাই নেতি নেতি সাধনা। ভক্তিমার্গের সাধক দেখার চেষ্টা করেন যে একমাত্র ঈশ্বরই আছেন, এই জগৎ ঈশ্বরেরই প্রকাশ, তাঁর মন শুধু ঈশ্বরের দিকেই যাবে, অন্য কোন কিছুর দিকে যাবে না।

অন্তঃজীবন ও বহিঃজীবনের সামঞ্জস্য

এখানেই সাধনা দুই প্রকারের হয়ে যায়, এক প্রকার হল যেটাকে দর্শনের দিক দিয়ে দেখা হচ্ছে, ব্রহ্মই সত্য, আত্মাই সত্য বা ঈশ্বরই সত্য, যে কোন প্রকারে মনকে ওখানে রাখতে হবে। মনকে ওখানে রাখার জন্য অনেক ধ্যান করেন, আবার অনেকে ধ্যানের আগে জপ করেন, অনেকে শুধু জপ করেন। শ্রীশ্রীমাও বলছেন, জপাৎ সিদ্ধি, জপেতেও সিদ্ধি হয়। জপ হোক আর ধ্যানই হোক, এটাকে আচার্য শঙ্কর অন্তরঙ্গ সাধন বলছেন। এর বিপরীত একটা সাধন হয়, যাকে বলা হয় বহিরঙ্গ সাধন। বহিরঙ্গ সাধন মানে শরীরের বাইরে যে কাজ করা হয়, যেমন কর্মযোগ। কিন্তু যাঁরা কর্মযোগ করছেন না, সাধন-ভজন করছেন বা ঋষি-মুনি যাঁরা জপধ্যান করছেন বা যাঁরা সংসারে থেকে নিজেকে পুরোপুরি জপধ্যানে দিয়ে বলছেন, আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ঈশ্বর প্রাপ্তি, এনারাই যখন জগতের সাথে সম্পর্ক করেন, জগতের সাথে এনাদের যে আচার-ব্যবহার, তখন তাঁদের জগতের প্রতি একটা দৃষ্টিভঙ্গী রাখতে হয়, জগতের প্রতি তাঁর কি দর্শন, অর্থাৎ জীবনকে এবং জগৎকে তিনি কিভাবে দেখছেন। গীতায় অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে এই প্রশ্নই করছেন, *স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব। স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কীম্।* স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি যখন সমাধিতে থাকেন তখন কিভাবে থাকেন, যখন সমাধি অবস্থা থেকে বাইরে আসেন তখন তিনি কিভাবে কথা বলেন, তাঁর হাঁটাচলা, আচার-ব্যবহার কেমন? এখানেও প্রশ্ন হল, যাঁরা খুব নিষ্ঠা সহকারে জপধ্যান বা সাধন-ভজন করেন তাঁদের জীবনদর্শন কি, জগতের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী কি? তবে সব কিছু দেখে বা শাস্ত্র পড়ে এটা নিশ্চিত ভাবে বলা যেতে পারে যে, অন্তরঙ্গ সাধনে ও বহিরঙ্গ সাধনে যদি ভারসাম্য না থাকে তাহলে জীবনটা গোলমেলে হয়ে যাবে। অন্তরঙ্গ সাধন মানেই তিনি জপধ্যান, তপস্যাদি করছেন, সেটা তাঁর ইষ্টের সাথে তাঁর সম্পর্ক। একজন হয়ত শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসেন এবং শ্রীকৃষ্ণের নামগুণগান করে যাচ্ছেন, শ্রীকৃষ্ণের কীর্তন করে যাচ্ছেন, এগুলো অন্তরঙ্গ সাধনা। কেউ লক্ষ লক্ষ জপ করে যাচ্ছেন, কেউ চোখ বুজে ধ্যান করে যাচ্ছেন, সেটাও অন্তরঙ্গ সাধন। কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবনে কোন part time affair হয় না। আমি সারাদিনে এক ঘন্টা কি দু-ঘন্টা জপধ্যান করলাম, আর মনে করছি, এটাই আমার আধ্যাত্মিক জীবন। এর বাইরে বিষয়ীরা বা সংসারীরা যেভাবে জগৎকে দেখে থাকে, যেভাবে জগতে বিচরণ করে, আমিও যদি সেইভাবে জগৎকে দেখি এবং জগতে বিচরণ করতে থাকি, তাহলে জানবেন এই যে আমি জপধ্যান করলাম এটা সঙ্গে সঙ্গে নিষ্ফল হয়ে যেতে বাধ্য; সবারই ক্ষেত্রে এটাই হবে। ঠাকুর বলছেন, কলকাতার লোকেরা, এমনকি নোংরা মেয়েরাও লক্ষ লক্ষ জপ করছে, কই কারুরই তো কিছু হয় না। কোন দিন কিছু হবে না। তার কারণ, এই যে ঘন্টার পর ঘন্টা জপধ্যান করছে, লক্ষ লক্ষ জপ করছে, সেখান থেকে যেমনি আসন ছেড়ে বাইরে আসছে তখন তার কাছে যে জগৎ আসছে, সেই জগৎটা বৈষয়িকদের জগৎ। একটা বালতি কলের নীচে পেতে জল ভরতে দিয়েছে, কিন্তু খেয়াল করেনি যে বালতিটা ফুটো। বলছে, বালতি কেন ভর্তি হচ্ছে না? ভরবে কি করে, তোমার বালতিটা তো ফুটো, জল ভরছে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে যাচ্ছে। কুড়ি পঁচিশ বছর জপধ্যান করে দেখছে কিছুই হয়নি, যেমন আগে ছিল এখনও তেমনই আছে। কিছু হবে কি করে? জগতের প্রতি তোমার দৃষ্টিভঙ্গীটা, তোমার দর্শন একই রকম আছে, সেখানে তোমার কোন পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারোনি। দর্শন মোটামুটি দুই প্রকার হয়, একটা হল আত্মাই আছেন, যা কিছু দেখছি এটা হল মায়া, জগৎটা নাম আর রূপের খেলা মাত্র। দ্বিতীয় হল, একমাত্র ঈশ্বরই আছেন, যা দেখছি সব ঈশ্বরেরই রূপ।

যে কোন মহিলার পক্ষে সংসারে থেকে সাধন-ভজন করা খুব সহজ। কারণটা আমাদের শাস্ত্রে খুব পরিষ্কার করে বলে দেওয়া হয়েছে। একজন প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলার তিনটি রূপ, প্রথমটা প্রেমিকার রূপ, দ্বিতীয়টা সহধর্মিণীর রূপ আর আর তৃতীয় হয় মাতৃরূপ। এই তিনটে রূপকেই ভাগবতের দশম স্কন্ধে খুব সুন্দর ভাবে নিয়ে আসা হয়েছে। রাধা বা গোপীদের যে রূপ শ্রীকৃষ্ণের সাথে, সেখানে প্রেমিকার রূপ দেখাচ্ছেন। প্রেমিকা কি চাইছে? কিছুই না, আমি তোমার খুশির জন্য সব কিছু করতে পারি, বিনিময়ে আমার কিছু লাগবে না। তোমার খুশিতেই আমার পূর্ণতা। যখন স্ত্রী হয়ে গেল, তখন রুক্মিণী, সত্যভামার মত – কৃষ্ণের সেবাই আমার একমাত্র অবলম্বন, আমার আর কিছু লাগবে না। ভাগবতের একটা অধ্যায়ে আছে, রুক্মিণী একবার অহং ভাবে শ্রীকৃষ্ণের উপর নিজের অধিকার বোধ দেখাতে গেছেন। শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে রুক্মিণীকে বলে দিলেন, তোমাকে তো শিশুপাল বিয়ে করতে চেয়েছিল, তোমাকে ভালবাসত; এক কাজ কর, তুমি শিশুপালের কাছেই চলে যাও।

ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসায় সামান্যতম অহং ভাব যদি এসে যায় তখন আর ভক্তি থাকবে না। যখন মা হয়ে গেল, তখন ভাগবতকার দেখাচ্ছেন যশোদাকে, নিজের প্রাণের থেকেও যশোদা কৃষ্ণকে ভালবেসে যাচ্ছেন। কৃষ্ণ দুষ্টুমি করলে যশোদা তাঁকে শাস্তিও দিচ্ছেন, দরকার হলে উলুখুলের সাথে বেঁধেও রাখছেন, কিন্তু তিনি নিজেও কাঁদছেন, তাঁর বুকটা ব্যাথায় ফেটে যাচ্ছে। যশোদা জানেন, আমার এই জীবন পুরোপুরি কৃষ্ণেরই জন্য।

আমাদের সমস্যা হল, আমরা আধ্যাত্মিক জীবনটাকে খুব সহজীকরণ করে নিই। সাধারণ লোকেরা, সমাজে যারা বিচরণ করে বেড়াচ্ছে, তারা তো সহজীকরণ করেই রেখেছে। আমি তোমাকে যতটা দিয়েছি তুমিও আমাকে ততটাই দেবে, পারলে আমি যতটা দিয়েছি আমাকে তার থেকেও তোমাকে বেশি দিতে হবে, যদি না দিতে পার আমার জীবন থেকে তুমি চলে যাও। সরকারী অফিসে কর্মচারীদের কিছু করতে বললে প্রথমেই জানতে চাইবে, ইসমে হামকো ক্যায়া মিলেগা। তার মানে, এরা যে চাকরি করছে, শুধু চাকরি না, চাকরির উপরে যে ঘুষ সেটাও তাকে দিতে হবে। মায়েরা সেটাই চাই, একটা ছেলেকে বড় করছে সেখানেও সে ভাবছে আমি কি পাব। সে ধরে আছে যে ছেলে বড় হয়ে আমার কথা মতই চলবে। তোমার লেখাপড়া শেখা, তোমার পরীক্ষার রেজাল্ট, তোমার চাকরি, তোমার বিবাহ সব আমার কথা মত যেন হয়। একজন মা ছেলেকে যতটা দিয়েছে এখন তার থেকে ঢের বেশি চাইছে। সব ক্ষেত্রে একই অবস্থা।

সাধন জীবন যখন শুরু হয় তখন সব কিছু পাল্টাতে থাকে। ভাগবতে খুব সুন্দর ভাবে দেখানো হয়েছে, গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে কিভাবে ভালবাসছেন, যশোদা কৃষ্ণকে কিভাবে ভালবাসছেন, আর রুক্মিণী, সত্যভামা কৃষ্ণকে কিভাবে ভালবাসছেন। পুরুষতান্ত্রিক হয়ে গেল বলে লোকেরা চেঁচামেচি শুরু করে দেবে। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক কেন হতে যাবে! এখানে গুরুত্ব হল ব্যক্তির উন্নতি। তাহলে পুরুষদের ক্ষেত্রে কি হবে? ঠিকই, যদি কোন গৃহস্থ মনে করে, সংসারে থেকেই আমি আধ্যাত্মিক জীবন-যাপন করব, সঙ্গে সঙ্গে তার আশেপাশে যারা আছে সবাই তার ইষ্ট হয়ে যাবে। মজার ব্যাপার হল, বেদ, উপনিষদ, ভাগবত, যেগুলো আমাদের ঠিক ঠিক শাস্ত্র, সেখানে কোথাও বলছেন না যে, স্ত্রীকে নিয়ে কিভাবে সাধন করবে। এটা ঠিকই যে তন্ত্রে স্ত্রীকে নিয়ে বা বীরভাবে সাধনার কথা আছে, এর বাইরে অন্য কোন শাস্ত্রে নেই। সেখানে একটাই কথা আসে, সবাইকে ইষ্ট রূপে দেখতে হবে। সবাইকে যদি ইষ্ট রূপে দেখা হয় তাহলে নিজের স্ত্রীও ইষ্ট হয়ে যাবে। স্ত্রীকে ইষ্ট রূপে দেখার সাধন কি হবে একমাত্র ঠাকুরই দেখিয়ে গেছেন, শ্রীশ্রীমাকে তিনি মাতৃরূপে দেখছেন। স্ত্রী যদি ইষ্ট হয়ে যায়, তখন স্ত্রী স্বামীর সেবার জন্য, মঙ্গলের জন্য যা কিছু করবেন তখন স্বামী দেখছেন জগন্মাতা খাবার দিচ্ছেন, জগন্মাতা আমার সেবা করছেন। ঠাকুর এই কথাই বলছেন, শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের পদসেবা করছেন, তখন ঠাকুর বলছেন, যিনি মন্দিরে বিরাজ করে আছেন, যিনি আমার গর্ভধারিণী তিনিই আমার এখন পদসেবা করছেন। সেইজন্য পুরুষদের পক্ষে সংসারে থেকে সাধন-ভজন করা খুব কঠিন, এই কারণেই পুরুষরা যাঁরা আধ্যাত্মিক পথে আসতে চান তাঁরা সন্ন্যাসী হয়ে যান। সন্ন্যাসী হয়ে গেলে সব কিছু সহজ হয়ে যায়। কিন্তু একজন মেয়ের মধ্যে এই তিনটে রূপ, তাকে এই তিনটে রূপে সাধনা করে যেতে হবে।

জগতের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী, এবং সেই অনুসারে জগতের সাথে আচার ব্যবহার এভাবেই পাল্টাতে হয়। যাঁরা জপধ্যান করেন, তিনি পুরুষই হন আর নারীই হন, তাঁর জীবন-দর্শন যদি না পাল্টায়, জগতের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী যদি না পালটায় তাহলে কিন্তু বিরাট সমস্যা হয়ে যাবে। আমাদের শাস্ত্র বলছেন, সাধনা যা সিদ্ধিও তাই, সিদ্ধি ও সাধনাতে কোন তফাৎ নেই। যিনি শিবের ভক্ত, দিনে দু ঘন্টা শিবের মন্ত্র জপ করেন। জপের পর তিনি কি দেখছেন জগতে যা কিছু আছে সবই তাঁর ইষ্ট শিব, তুলসীদাস যেমন বলছেন, সিয়ারাম ম্যায় সব জগ জানু। অধ্যাত্ম রামায়ণেও একই কথা বলছেন, দেবর্ষি নারদ শ্রীরামচন্দ্রের স্তুতি করে বলছেন, হে রাম! পুং বাচক যা কিছু আছে সবটাই তুমি, আর স্ত্রী বাচক যা কিছু আছে সবটাই সীতা। এইভাবে কি আমরা জগৎকে দেখছি? যদি না দেখে থাকি তাহলে জপধ্যান সব ফুটো বালতিতে জল ঢালা। জীবন-দর্শন যদি খুব ভাল হয়, অদ্বৈত বেদান্তের ভাব নিয়েছে, কিন্তু জপধ্যান নেই, তাহলেও জানবেন অদ্বৈত বেদান্তের ভাব ধীরে ধীরে কিছু দিনের মধ্যে নষ্ট হয়ে যাবে। জগৎকে মিথ্যা রূপে দেখছে বা জগৎকে ঈশ্বরের সমষ্টি রূপে দেখছে, কিন্তু তার সাথে জপধ্যান নেই, মনের যে শক্তি দিয়ে যে উচ্চতর জীবন-দর্শন তৈরী হয়, ওই শক্তি অনবরত

যদি তৈরী না হতে থাকে তাহলে ধীরে ধীরে তার ওই জীবন-দর্শন নষ্ট হয়ে গিয়ে সে একজন সাধারণ ব্যক্তিতে পর্যবসিত হয়ে যাবে। ঠিক তেমনি, জপধ্যান করতে করতে প্রতিনিয়ত যদি জীবন-দর্শন ঠিক না করা হয়, এটা নিশ্চিত যে তার জপধ্যান নিষ্ফল হবেই, কিছু করার নেই। ভারতের তীর্থস্থানগুলিতে সাধু, বাবাজীদের জীবন দেখলে এই ব্যাপারটা ভাল বোঝা যায়। জপধ্যান তাঁরা ঠিকই করছেন, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে তাঁরা খিটখিটে বদ মেজাজের হয়ে যাচ্ছে।

এর খুব ভাল দৃষ্টান্ত হল, তোতাপুরী ঠাকুরের সাথে আছেন, সব সময় জগৎ মিথ্যা বলে যাচ্ছেন। আর অন্য দিকে দক্ষিণেশ্বরের এক কর্মচারী তামাক খাবে বলে ধুনি থেকে আগুন নিতে গেলে তোতাপুরী সঙ্গে সঙ্গে চিমটে তুলে তাকে মারতে যাচ্ছেন। তার মানে তার জীবন-দর্শন ভুল হয়ে গেল, জগৎ আর মিথ্যা থাকল না। ঠাকুর হি হি করে হাসতে শুরু করলেন, এই তুমি বলছিলে জগৎ মিথ্যা আর এখন একজন কলকে ধরাবে বলে পবিত্র অগ্নিকে স্পর্শ করেছে তাই তুমি তাকে চিমটি দিয়ে মারতে যাচ্ছ! এভাবে ধর্মজীবন হয় না। যাঁরা ধর্ম জীবন-যাপন করেন, তিনি যেই হয়ে থাকুন, একজন বিধবা প্রচুর তপস্যা করছে, আর বড় বড় মন্দিরে, মঠে, আশ্রমে যে সাধুবাবারা তপস্যা করছেন, এই জায়গাতে এসে সবাই ব্যর্থ। ব্যর্থ এই কারণেই হয়, হয় তার জপধ্যান নেই, আর তা নাহলে তার জীবন-দর্শন গোলমেলে। সাধু হয়ে তিনি হয়ত দিনে এক ঘন্টা কি দু ঘন্টা নিষ্ঠার সাথে জপধ্যান করছেন বা নমো নমো করে একশ আটবার জপ করে নিয়ম রক্ষা করছেন, কিন্তু যেমনি জগতে নামছেন তখন তাঁর কাছে জগৎটা জগতের মতই এসে যাচ্ছে। জগৎ যদি জগতের মত এসে যায়, তবে এটা নিশ্চিত যে, তাঁর তপস্যা বৃথা। তবে সাধু-সন্ন্যাসীদের একটা তফাৎ থাকে, অভ্যাস বশেই হোক বা খেলার ছলেই হোক, কোন একটা সময় যখন সাধন-ভজন করেছেন, তখন ঠাকুরই সব কিছু হয়েছেন কিংবা আত্মাই আছেন, এই ভাব নিয়েই সাধনা করে থাকবেন, এই ভাবটা কখন সখন তাঁর ভিতরে নাড়া দিতে থাকবে। ওর জোরেই তাঁরা কিছুটা চলেন, অবশ্য এ-ভাবে চললে তিনি মুক্তির দিকে যেতে পারবেন না বা তাঁকে মহাপুরুষ বানিয়ে দিতে পারবে না। মানুষকে মানুষ রূপেই জ্ঞান করতে পারেন না, মানুষকে ভগবান রূপে কী জ্ঞান করবেন! যে আমার বিরুদ্ধে যাবে তাকে আমি শেষ করে দেব, আমার মতের বিরুদ্ধে যারা তাদের উপর সব সময় খড়্গহস্ত, এরা করবে জপধ্যান! যতক্ষণ অন্তর্জীবন আর বাহ্যিক জীবন, এই দুটোকে সামঞ্জস্য না করে চলতে পারবে, ততক্ষণ আধ্যাত্মিক জীবন শুরুই হবে না। অন্তর্জীবন আর বহির্জীবন পুরোপুরি যদি synchronize না থাকে, দুটো জীবনের সুর যদি এক না থাকে, তাহলে আর যাই হোক, আধ্যাত্মিক জীবনে কোন দিন যেতে পারবে না। স্বামীজী দেববাণীতে অন্তর্জীবনকে নিয়েও বলে যাচ্ছেন, সাথে সাথে বহির্জীবনকে নিয়েও বলে যাচ্ছেন। আচার্য শঙ্কর এটাকেই বলছেন অন্তরঙ্গ সাধন আর বহিরঙ্গ সাধন। এখানেও স্বামীজী বহিরঙ্গ সাধন, তোমার জীবন-দর্শন কেমন হবে, এটাকে নিয়ে বলতে যাচ্ছেন। এর আগে নারদীয় ভক্তিসূত্রকে আধার করে যা যা বললেন আর এখন যেটা বলছেন, এর পুরোটাই হল যদি তুমি আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি করতে চাও তাহলে তুমি জগৎকে কিভাবে দেখবে।

দরকার হলে ফোঁস করতে হবে, ঠাকুর এই কথা গৃহস্থদের জন্য বলছেন নিজেদের বাঁচানোর জন্য, কিন্তু কারুর যেন ক্ষতি না হয়। কিন্তু সন্ন্যাসীর আত্মরক্ষারও অধিকার নেই। এমনকি সন্ন্যাসীর উপর লাঞ্ছনা এলে, তিনি তার জন্য কোন অভিযোগ ও প্রতিকার করবেন না। সন্ন্যাসী মানেই তিনি একজন উচ্চমানের সাধক। ওই উচ্চমানে চলে যাওয়ার পর নিজের রক্ষা করার কোন চেষ্টা থাকে না। ফোঁস করা ব্যাপারটা অনেক নীচের অবস্থার জন্য। উচ্চমানের সাধকরা হলেন, স্বামীজী গল্প বলছেন, জঙ্গলে একটা ষাঁড় বসে আছে, একটা মশা এসে শিংএর উপর বসেছে। কিছুক্ষণ বসার পর হঠাৎ মশাটার মনে হল, অনেকক্ষণ বসে আছি, ষাঁড়টাকে খুব কষ্ট দিলাম। উড়ে গিয়ে ষাঁড়ের কানের কাছে গিয়ে বলছে, 'অনেকক্ষণ তোমার শিংএ বসেছিলাম, তোমাকে অনেক কষ্ট দিলাম'। ষাঁড় বলছে, 'তোমার পুরো গুষ্টিকে নিয়ে আমার শিংএ এসে এক মাস বাস করে যাও, আমার তাতে কিছু আসে যায় না'। ফোঁস করা হল দুর্বলদের জন্য, এখনও তার আত্মরক্ষা দরকার। আধ্যাত্মিক জীবনে যখন অনেক উপরে উঠে যায়, তখন ষাঁড়ের মত বলেন, তোমার যত লোক আছে সবাই এসে আমার শিংএ বাস করে যাও। যেমন যীশু, তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করা হচ্ছে কাউকে তিনি কিছুই বলছেন না, আত্মরক্ষা করার কোন চেষ্টাই করলেন না। এগুলো অনেক গভীরে গিয়ে একটু ভাবতে হয়। ফোঁশ করা, আত্মরক্ষা এগুলো প্রাথমিক স্তরে চলে, তার মানে এখনও সংসারকে তার সংসারের মতই বোধ হচ্ছে। কাম,

ক্রোধ, লোভ, রাগ, দ্বেষ এগুলো তখনও খুব প্রবল, এবারে বলছেন, প্রথমের দিকে তোমাকে ফোঁস করতে হবে। ধীরে ধীরে উন্নতি করতে করতে ফোঁস করাটাও ছেড়ে দিতে হয়। সেখান থেকে আরেকটা স্তরে গিয়ে সেখানে ভগবান যদি রক্ষা করেন ঠিক আছে, যদি না রক্ষা করেন তাতেও তাঁর কিছু এসে যায় না।

এর আগেও আমরা এই নিয়ে অনেক আলোচনা করেছি, একটা হল ধর্ম জীবন আরেকটা হল আধ্যাত্মিক জীবন। ধর্ম জীবন মানে, আমার জগৎটাও লাগবে কিন্তু তার মধ্যে যতটুকু পারি আমি ঈশ্বরকেও ধরে রাখতে চাইছি। এই ধর্ম হল প্রাকৃত ধর্ম বা গেঁয়ো ধর্ম। আধ্যাত্মিকতায় বলে, ঈশ্বর বই আমি আর কিছু জানি না, তখন আর এই জগৎটার কোন মূল্যই তার কাছে থাকে না। জগৎ আর আধ্যাত্মিকতা একসাথে চলতে পারে না। আমি আমার স্বামীকে ফোর নাইন্টি এইটে জেলে ঢুকিয়ে ছাড়ব, আর তার সাথে বলছেন আমি আধ্যাত্মিকতার পথে চলব, এই জিনিস কখনই সম্ভব নয়। এর আগে আমরা গোপীদের কথা, যশোদার কথা আর রুক্মিণী ও সত্যভামার কথা বললাম। কোন মহিলা এসে যদি বলে, এসব কি বলছেন, আমার স্বামী আমার উপর অত্যাচার করবে আর আমি সব মেনে নেব! তখন তাকে বলতে হয়, আপনাকে মানতে হবে না, কিন্তু তার সাথে জেনে রাখুন আধ্যাত্মিকতা আপনার জন্য নয়। দুটোর মধ্যে আপনাকে একটাকে ছাড়তে হবে, আপনিই ঠিক করুন আপনি কোনটা ছাড়বেন। এখানেই আসে বহিরঙ্গ সাধন, বহিরঙ্গ সাধন মানেই আপনার জীবন-দর্শন, জগতের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীটা ঠিক করতে হবে। আপনি আধ্যাত্মিকতাকে চাইছেন নাকি জগৎ যেমন আছে তেমন ভাবেই সংসারে থাকতে চাইছেন? এটাকে আগে আপনার ঠিক করে নিতে হবে। আধ্যাত্মিকতায় এসে জগতের সাথে কোন আপোষ চলবে না। যদি কেউ আধ্যাত্মিকতাকে বরণ করে নিতে চায় তাহলে জগৎকে বিষয়ীরা যেভাবে দেখে, প্রথমেই ওই ভাবে দেখাটা পুরোপুরি পাল্টে দিতে হবে। বিষয়ীদের কাছে জগৎ মানে, আমাকে বদলা নিতে হবে, প্রতিরক্ষা করতে হবে, এদের জন্য ধর্ম জীবন নয়, এদের এখনও অনেক জন্ম এভাবেই কাটাতে হবে। অনেক অনেক জন্মের পর হয়ত ধর্ম জীবন শুরু হবে। ওই ধর্ম জীবনের মধ্য দিয়েই উত্তরণের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক জীবনের যাত্রা শুরু হবে। আর তার বিপরীতে হল, *পুনরপি জননং পুনরপি মরণং। পুনরপি জননি জঠরে শয়নম্*। আধ্যাত্মিক জীবন একেবারেই সহজ জীবন নয়, সাধু-সন্ন্যাসীরাই আধ্যাত্মিক জীবনকে সব সময় ধরে রাখতে পারেন না, গৃহস্থরা কি করে পারবে। সন্ন্যাসী মানে, যিনি পুরোপুরি আধ্যাত্মিক জীবনে চলে গেছেন। ঠাকুর বলছেন, সন্ন্যাসী তালগাছ থেকে পড়বে হাত-পা নাড়বে না। তবে কোন গৃহস্থ যদি পুরোপুরি আধ্যাত্মিক জীবনে চলে যায়, সেও সন্ন্যাসী।

আধ্যাত্মিক জীবনের দুটি পথ, একটা জ্ঞানমার্গ, আরেকটি ভক্তিমার্গ। জ্ঞানমার্গে আত্মাই আছেন, আত্মাই যদি থাকেন, তাহলে আমাকে যে মেরেছে সেটাও কিছু না। ঠাকুর বলছেন, জ্ঞানমার্গের সাধন খুব কঠিন, হাত কেটে গেছে, দরদর করে রক্ত বেরোচ্ছে বলছে, আমার তো কিছু হয়নি। 'এ আমার দ্বারা হবে না', এই কথা যারা বলবে, তাদের জন্য ভক্তিমার্গ। যিনি মেরেছেন কেন মেরেছেন, 'নিশ্চয়ই আমার কিছু পাপ ছিল, তাই ঈশ্বর ওকে দিয়ে আমাকে মারিয়েছেন'। এভাবেও যারা নিতে পারবে না, তাদের জন্য এখন মোক্ষ সাধনা নয়, এদের জন্য এখন ধর্ম, অর্থ ও কাম, তাদের জন্য এখনও জাঁতা কলে গম পেষাই হতে হবে। এই দৃষ্টান্ত গুলি দিয়ে একটা আইডিয়া পাওয়া যায় আধ্যাত্মিক জীবন কত কঠিন। যীশুর কাছে একজন এসে বলছে, আমি আপনার শিষ্য হব। যীশু সঙ্গে সঙ্গে তাকে বলছেন, তোমার যা কিছু আছে সব বিক্রি করে গরীবদের মধ্যে দান করে দাও, তারপর আমার কাছে এসো। লোকটি ওখান থেকে যে চলে গেল, আর ফিরে এলো না। আমাদের সমস্যা হল, আমরা সব সময় সহজ পথ খুঁজি। সহজ পথ হল যেটাকে আমি জানি না, যেটাকে জানে সেটাকে সব সময় কঠিন পথ বলে মনে হয়। ঠাকুর বলছেন, নিজের স্বামী যেমন তেমন, অপরের স্বামী রসরাজ। কারণ তাকে জানে না, কাছে থাকলে দুদিনেই রসরাজের সব রস বেরিয়ে যাবে। যার সঙ্গে ঘর করেনি তাকে ভাল মনে হয়, যে কাজ করেনি সেই কাজকে সহজ মনে হয়। কবিতায় বলছেন, নদীর এ কূল কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস, ওই কুলেতে সর্ব সুখ আমার বিশ্বাস।

আমি আধ্যাত্মিক জীবন যাপনের জন্য প্রস্তুত কিনা মাত্র একটা পরীক্ষাতেই জানা যাবে। তার কোন কর্তব্য বোধ আছে কিনা। কর্তব্য বোধ, দায়ীত্ব পালনের বোধ থাকলে বুঝতে হবে সে আধ্যাত্মিক জীবন যাপনের জন্য এখনও প্রস্তুত নয়, সে ধার্মিক জীবনে এখনও পড়ে আছে। যদি মনে হয়, আমার মা-বাবার প্রতি

কর্তব্য আছে, দেশের প্রতি কর্তব্য আছে, সমাজের প্রতি কর্তব্য আছে, মানবজাতির প্রতি কর্তব্য আছে, নিজের স্ত্রী/স্বামীর প্রতি কর্তব্য, নিজের সন্তানের প্রতি কর্তব্য আছে, জেনে রাখুন এখনও সে আধ্যাত্মিক জীবনে প্রবেশ করার জন্য উপযুক্ত হয়নি। আধ্যাত্মিক জীবন মানে, আমার মা-বাবা নিকুচি করেছে, দেশ, সমাজ নিকুচি করেছে, সব পুড়ে যাক। কে কে পুড়বে? আমার বাবা পুড়ুক, আমার মা পুড়ুক, সমাজ পুড়ুক, যে বলবে, আমার কোন দায়ীত্ব নেই আমি চললাম, আধ্যাত্মিক জীবন শুধু এদেরই জন্য। বাকি সবারই জন্য হল ধার্মিক জীবন, ধার্মিক জীবন মানে, একটু ঠাকুরের নাম করবে, দুটো সন্তানও হবে, দুটো পয়সাও আসবে, আবার মাঝে মাঝে স্ত্রীসঙ্গও হবে, এটাও হবে সেটাও হবে। আশ্রমে সন্ন্যাসীরা থাকেন, সেখানে কর্তৃপক্ষরা সন্ন্যাসীদের অনেক রকম কাজের দায়ীত্ব দেন, এবং তাঁরাও নিষ্ঠা নিয়ে কাজগুলো করে দেন, এখানে কিন্তু দায়ীত্ব বোধে কর্ম করছেন না, আশ্রমে থাকতে গেলে আশ্রমের নিয়ম পালন করতে গিয়ে কিছু কাজকর্ম অবশ্যই করতে হয়, আর কর্তৃপক্ষরা বলেছেন করতে তাই করে দিচ্ছেন। এটা প্রথম দিনেই হয় না, জয়েন করার দশ পনের বছর পর দায়ীত্ব বোধে কর্ম করাটা ধীরে ধীরে চলে যায়। ডাক্তারকে রোগী একটা পারিশ্রামিক দিল, তার বিনিময় ডাক্তার রোগীর চিকিৎসা করে দিলেন, সেখানে রাগ-দ্বেষ কিছু নেই, ধর্ম রূপে তিনি চিকিৎসা করে দিচ্ছেন। ধর্ম মানে হল, এটাই আমার জীবনধারা, এটাই আমাকে আপাততঃ করে যেতে হবে। সন্ন্যাসীরাও আশ্রমে, ডিসপেন্সারিতে, স্কুলে যা কিছু করছেন, এটাই তাঁদের জীবনধারা। স্কুলে ছাত্ররা দুষ্টুমি করলে তাকে বকাঝকা করছেন, শাস্তিও দিচ্ছেন, ওখানেই সব চুকে গেল। কিন্তু এরপর তামসিক গৃহস্থের মত, যে গল্প ঠাকুর কথামৃতে বলছেন, তামসিক গৃহকর্তা চোরকে ধরল, আগে সব মাল কেড়ে নেবে, আচ্ছা করে মারধোর করবে, তারপর পুলিশে দেবে, বুঝতে হবে এদের এখনও অনেক দেরী আছে। কেউ অন্যায় করলে, তার নামে একটা কমপ্লেন লিখুন, তার শাস্তির ব্যবস্থা করুন, এটা একজনকে দায়ীত্ব দেওয়া হয়েছে, সে এটা করে দিল। এই দায়ীত্ব থেকেও যিনি মুক্ত হতে চাইছেন, তাঁকে তাহলে বাইরে বনে জঙ্গলে গিয়ে থাকতে হবে। বাইরে গিয়ে থাকলে সেখানেও কাউকে অন্য রকম কিছু করতে দেখলে দুটো কথা বলতে হবে। শঙ্করাচার্যও থাকলে বলবেন, এই রকম করো না। সেখানে অবশ্য তার মঙ্গলের জন্য বলা হচ্ছে, এখানে নিজের কোন স্বার্থ নেই।

সুখ-দুঃখ এবং সুখ-দুঃখের পারে

World view স্পষ্ট করার পর স্বামীজী বলছেন, After every happiness comes misery, (*যখনই কোন সুখভোগ করবে, তারপর দুঃখ আসবেই আসবে।*) সুখ-দুঃখ একটা চক্রাকারে চলে, যদি কাউকে দেখা যায় সে এখন খুব সুখে আছে, সব কিছু ভাল চলছে, জানবেন তার দুঃখ আসছে, বেশি দূরে নেই। স্বামীজী বলছেন, they may be far apart or near. (*এই দুঃখ তখন তখনই আসতে পারে, অথবা খুব বিলম্বেও আসতে পারে।*) হয় কিছু দিন তার সুখ চলছে, তার বেশ কিছু দিন পর তার দুঃখ আসবে। আর তা নাহলে, আজকে সুখ কালকেই দুঃখ এসে গেলো। The more advanced the soul, the more quickly does one follow the other. (*যে আত্মা যত উন্নত, তাঁর সুখের পর দুঃখ তত শীঘ্র আসবে।*) আধ্যাত্মিক জীবনে যাঁরা খুব উন্নত, তাঁদের জীবনে সুখ-দুঃখ খুব তাড়াতাড়ি আসা-যাওয়া করতে থাকে। যদি দেখা যায় কারুর সুখ এসেছে, আর অনেক দিন ধরেই তার সুখ চলছে, কিন্তু দুঃখ তারও একদিন আসবে, কিন্তু এটা জানবেন সে অতি প্রাকৃত লোক। সত্যিকারের আধ্যাত্মিক পুরুষ হলে এতদিন তার সুখ থাকত না, দুঃখও এত দিন থাকত না, আজকেই দেখা যেত তুঙ্গে গেছেন, আর কালকেই দেখা গেল একেবারে গোল্লায় চলে গেছেন। যখনই আমরা কারুর নামে বলি, লোকটা গোল্লায় গেছে, বুঝবেন যে আধ্যাত্মিক জীবনে একটু সে এগোল।

মুণ্ডকোপনিষদের *দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া* মন্ত্রের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন, নীচের পাখি কখন মিষ্টি ফল খাচ্ছে, কখন তিক্ত ফল খাচ্ছে। যখন তিক্ত ফল খায় তখন পাখিটা একটু উপরের দিকে উঠে আসে। যে ডালে বসে মিষ্টি ফল খাচ্ছে সে ওই ডালেই বসে থাকতে চায়, ওই ডাল ছেড়ে নড়তে চায় না। কিন্তু যেমনি একটা তিক্ত ফল খেয়ে ফেলে সে তখন ওই ডালটা ছেড়ে আরেকটা উঁচু ডালে গিয়ে বসে। এই করে করে সে ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠতে থাকে। সুখ যখন আসে তখন জানতে হবে এই অবস্থা কোন দিন তাকে উপরে নিয়ে যেতে পারবে না। যতক্ষণ দুঃখ না আসে, যতক্ষণ বাড়িতে আগুন না লাগছে, মৃত্যু এসে নিজের

সন্তান, স্বামী বা স্ত্রী কাউকে না কেড়ে নিচ্ছে, সমাজ ও পরিবারের লোকেরা যতক্ষণ লাথি ঝাঁটা না মারছে ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ আধ্যাত্মিক জীবনে আসতে পারবে না। দুটো তিনটে ধাক্কা খাওয়ার পর সেইজন্য মানুষ বলে, ঠাকুর আমি যা ছিলাম ভালই ছিলাম, আমাকে ছেড়ে দাও, তোমার দর্শন আমার লাগবে না। স্বামীজী নিজে এই কথা বলছেন। অথচ এই কথা কোন শাস্ত্রেই পাওয়া যাবে না, এত বিস্তারে বর্ণনা নেই। সেইজন্য দেববাণীর একটা বিশেষ দাম। একটা ছোট্ট ঘটনা দিয়েই জিনিসটা বোঝা যাবে।

বেলুড় মঠের তখন অধ্যক্ষ রাজা মহারাজ, স্বামী ব্রহ্মানন্দজী। বেলুড় মঠে নিয়ম আছে যে, সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী সবাই সকালে অধ্যক্ষ মহারাজকে প্রণাম করতে যান। একদিন রাজা মহারাজ একজন মহারাজকে দেখে তাঁকে তিনটে আঙুল দেখালেন। যে মহারাজকে রাজা মহারাজ তিনটে আঙুল দেখালেন, তিনি ঘাড় নেড়ে রাজা মহারাজকে একটা আঙুল দেখালেন। এরপর যত বার রাজা মহারাজ তিনটে আঙুল দেখাচ্ছেন, সেই মহারাজও তত বার একটা আঙুল দেখিয়ে যাচ্ছেন। শেষে রাজা মহারাজ ওনাকে বললেন, আচ্ছা তাই হোক। পরে অন্যান্য সাধুরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা তিন এক করে যাচ্ছিলেন, এর অর্থ কি'? 'আসলে রাজা মহারাজ বলতে চাইছেন, তোমার আর তিন জন্ম লাগবে, আমি বললাম এটাই আমার শেষ জন্ম। অনেকবার করার পর রাজা মহারাজ শেষ রাজী হয়ে গেলেন'। তারপর থেকে সেই সাধুর জীবনে যা ঝড়ঝাপ্টা আসতে শুরু হল, এই আজকে শরীর প্রচণ্ড খারাপ, এই ভাল হয়ে গেল, আবার অন্য ধরণের রোগ এসে ধরল, তার উপর নানা রকমের ঝামেলা আসতে শুরু করে দিল। তিন জন্মের ভালমন্দ এক জন্মের উপর দিয়েই ভোগ করিয়ে দিলেন।

আগেকার দিনের গ্রামফোন রেকর্ডের স্পীড একটু বাড়িয়ে দিলে গানগুলো বিচিত্র রকম শোনাত। ঠিক তেমনি যাঁরা আধ্যাত্মিক জীবন নিয়ে নিলেন, তাঁদের সুখ-দুঃখ এই ভাবে স্পীডে চলতে শুরু হয়। যখনই দেখা যাবে কারুর জীবনে এক বিরাট তাণ্ডব নৃত্য চলছে, বুঝবেন এবার তার আধ্যাত্মিক জীবন শুরু হচ্ছে। বাকিরা যদি একটু ধাক্কা খায়, তখন তার মধ্যে একটু বৈরাগ্য আসে। আবার কিছু দিন পরে সব ঠিক হয়ে যায়। কিছু দিন সুখে থাকার পর আবার একটা ধাক্কা খায়, আবার একটু বৈরাগ্য এলো। এইভাবে বৈরাগ্য জমতে জমতে যখন অনেক বৈরাগ্য জমে তখন মনে ধর্মভাব আসে। ওই ধর্মভাব যখন আসে তখন ওই ধাক্কাগুলো আরও তাড়াতাড়ি আসতে শুরু হয়ে যায়। প্রত্যেক ধাক্কার পর তার মনে হতে থাকে এটা কি করে এলো, এটা কেন হল, হে ঠাকুর তুমি কেন আমায় এত কষ্ট দিচ্ছ! কিন্তু এটা বুঝতে পারছে না যে ঠাকুরের ভারি বয়ে গেছে যেচে কাউকে ধাক্কা দিতে। এই ধাক্কা খেতে খেতে এবার সে আধ্যাত্মিক পথে চলে যাবে। আধ্যাত্মিক পথে ঢুকে যাওয়ার পর এবার বুঝে নিতে হবে যে, সে এবার আস্ফানের মধ্যে পড়ে গেছে। এই উপরে যাচ্ছে, এই নীচে পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু তখন সে নিজেকে ছেড়ে দেয়। তখন তার বেড়াল ছানার অবস্থা হয়ে যায়, বেড়ালের মা কখন তার ছানাকে বিছানায় রাখে, কখন হেঁসেলে রাখে, বেড়ালের ছানা শুধু মিউ মিউ করে। এখানেও তাই হয়, তার আর কিছু লাগবে না, ঠাকুর আমাকে ধরে নিয়েছেন, আমার আর কিছু লাগবে না, তিনি এই আমাকে উপরে নিয়ে যাচ্ছেন, এই নীচে নামিয়ে আনছেন। স্বামীজী এটাই বলছেন।

মানুষ তিন ধরণের, পুরোপুরি বিষয়ী লোক, ধর্মপ্রাণ লোক আর আধ্যাত্মিক পুরুষ। বিষয়ী লোকেদের একটাই চেষ্টা কি করে সুখকে অনেক দীর্ঘ সময়ের জন্য ধরে রাখা যায়, আর দুঃখকে কি করে দূরে ঠেলে রাখতে হবে। কিন্তু দুঃখ তারও আসবে। ধর্মপ্রাণ যাঁরা তাঁদের সুখ-দুঃখ খুব তাড়াতাড়ি আসে। আধ্যাত্মিক পুরুষদের সুখ-দুঃখ আরও ঘন ঘন আসতে থাকে, আজকে খুব ভাল চলছে, কালকে ধপাস করে নীচে পড়ে গেল। আধ্যাত্মিক পুরুষদের যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তা হল, ঈশ্বরকে ধরে রাখা। যত ঝড়ঝাপ্টাই আসুক আমি তোমাকে ধরে রেখেছি, তোমাকে আমি আর ছাড়ছি না।

সেইজন্য, What we want is neither happiness nor misery. (*আমরা যা চাই তা সুখও নয়, দুঃখও নয়।*) মানুষ যখন ঈশ্বরের সাথে এক হয়ে যায়, যখন জ্ঞান লাভ হয়ে যায়, তখন সে সুখ-দুঃখের পারে চলে যায়। Both make us forget our true nature, (*উভয়ই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ ভুলিয়ে দেয়।*) ভাল যেমন আমার স্বভাবকে ভুলিয়ে দেয়, তেমনি মন্দটাও, অর্থাৎ দুঃখ যখন আসে সেটাও আমার স্বভাব ভুলিয়ে দেয়। ভাল যখন কিছু হয় তখন আমাদের ভিতরে একটা তৃপ্তি আসে, তৃপ্তি হলে একটা সুখের

অনুভূতি হয়, এই সুখের অনুভূতি আমার স্বভাবকে ঢেকে দেয়। গীতাতে ঠিক একই কথা বলছেন, সত্ত্বগুণ সুখের সাথে আমাদের বেঁধে দেয়, *সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ*। দুঃখ যখন আসে তখন হতাশা এসে আমাদের গ্রাস করে নেয়, আমি মরে যাব, আমি শেষ হয়ে গেলাম। এই দুটোই মানুষের বাস্তবিক স্বভাবের বিরুদ্ধে কাজ করে। স্বামীজী বলছেন, both are chains, one iron, one gold, (*উভয়ই শিকল – একটা লোহার, অপরটা সোনার।*) দুটোই শৃঙ্খল, একটা লোহার শিকল, আরেকটা সোনার শিকল, শিকল দুটোই। কিন্তু, behind both is the Atman, who knows neither happiness nor misery. (*উভয়ের পশ্চাতেই আত্মা রয়েছেন – তাঁতে সুখও নেই, দুঃখও নেই।*) এই সুখ-দুঃখের পিছনে রয়েছেন সেই আত্মা, তিনি জানেন না সুখ কি দুঃখ কি।

আমরা যদি কল্পনা করি, যদিও এই কল্পনা অবাস্তবিক, আমাদের মত একজন মানুষ, যার শরীর, মন, ইন্দ্রিয় আছে, সে কোন ভাবে সচ্চিদানন্দ সাগরে ডুবে গেল। সচ্চিদানন্দ সাগর মানে তিনি পুরো চৈতন্যময়, তাঁকে গিয়ে বলছে, 'মশাই! আপনিই এই সমস্ত জগৎকে চালাচ্ছেন, তাই না'? 'হ্যাঁ, আমিই চালাচ্ছি'। 'আপনি জানেন জগতে কত দুঃখ'? তিনি বলবেন, 'দুঃখ! সেটা আবার কি জিনিস'? 'দুঃখ মানে সুখের অভাব'। 'সুখ! সেটা আবার কি'? 'এই যে বিয়োগ হয় এটা দুঃখ, আর যে সংযোগ হয় সেটা সুখ'। ভাই! সংযোগটা কি আর বিয়োগই বা কি'? তিনি কিছু বুঝতেই পারবেন না। উপমাটা অযৌক্তিক, কিন্তু কল্পনাতে যদি আমরা এই উপমাকে নিয়ে যেতে পারি তখন এটাই ঠিক ঠিক উপমা হবে। নর্থপোলে সমুদ্র আছে, সমুদ্রে বরফ আছে, বরফগুলো এক অপরের সাথে ধাক্কা খাচ্ছে। ধাক্কা খেতে খেতে বরফের নানা রকমের আকৃতি হচ্ছে। এবার একটা বরফের চাঁই কোন ভাবে আসল সমুদ্রে পড়ে গেল। সমুদ্রকে বরফ বলছে, 'আপনি জানেন ওখানে কত রকমের আকৃতির বরফ আছে'। সমুদ্র বলবে, 'আমি জানি না তো, সবটাই তো আমি। জলই সমুদ্র, সমুদ্রই জল, ওই আকৃতিগুলিও সমুদ্র'। 'আপনি কি জানেন, একটার সাথে আরেকটার ধাক্কা লাগলে কত কষ্ট হয়'? 'কিসের কষ্ট, আমি তো নিজেকেই নিজে স্পর্শ করছি, কিসের কষ্ট'! এভাবে যদি আমরা কল্পনা করতে পারি তাহলে একটু ধারণা করা যেতে পারে। এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ আর জগতের পারে যিনি সচ্চিদানন্দ, এই দুটোর তফাৎ কোথায়?

স্বামীজী বলছেন, These are states, সুখ-দুঃখ এগুলো হল অবস্থা, আর, and states must ever change, অবস্থার পরিবর্তন হবেই। যেটা অবস্থা নয়, সেটার কখন পরিবর্তন হয় না। যেটারই পরিবর্তন হবে সেটাই অবস্থা। গীতাতে যে ভাব ও অভাবের কথা বলছেন, সেখানেও এই কথা বলছেন, যেটা ভাব সেটা সব সময়ই আছে, যেটা অভাব এটা একটা অবস্থা। জগৎ ছয়টি অবস্থাতে পরিবর্তিত হতে থাকে – তার জন্ম হয়, কিছু দিন অবস্থান করে, তার বৃদ্ধি হয়, তার অপক্ষয় হয়, তার নাশ হয়, এগুলো হল অবস্থার পরিবর্তন। আমাদের এই শরীর এই ভাল থাকছে, এই মন্দ থাকছে। শরীর একটা অবস্থা, শরীর কখনই বাস্তব হতে পারে না। মন সকালে ভাল থাকে, বিকেল হতে না হতেই খারাপ হয়ে যায়, কিছু লোককে দেখলে মন খুশী হয়, আবার কিছু লোককে দেখলে মনের মধ্যে জ্বালা হতে থাকে, তার মানে সুখ-দুঃখের মত মনও একটা অবস্থা। এগুলো সবই পরিবর্তনশীল, ক্ষণস্থায়ী, তার মানে আমি কখনই এগুলো হতে পারি না। আত্মাই একমাত্র বাস্তব, কারণ আত্মা কোন অবস্থা নয়। স্বামীজী বলছেন, but the nature of the Soul is bliss, peace, unchanging, আত্মা আনন্দস্বরূপ, অপরিণামী, শান্তিস্বরূপ। মাণ্ডুক্য উপনিষদে আত্মার কথা বলতে গিয়ে বলছেন, আত্মা হলেন *শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্*।

We have not to get it, we have it; only wash away the dross and see it, (*আত্মাকে যে আমাদের লাভ করতে হবে, তা নয়; আত্মাকে আমরা পেয়েই আছি; কেবল তাঁর উপর যে ময়লা পড়েছে, সেটি ধুয়ে ফেলে তাঁকে দর্শন কর।*) আত্মাতে আমাদের পৌঁছাতে হবে না, আমরা সেটাই, আমরা হলাম সেই মহাসমুদ্র, যার উপর ঢেউ খেলছে। ঢেউ উঠছে, ঢেউ জলে মিলিয়ে যাচ্ছে, উঠছে নামছে, আবার হারিয়ে যাচ্ছে, আমরা মনে করছি আমরা এটাই। আমদের দৃষ্টি সব সময় ঢেউয়ের দিকে, সমুদ্রের দিকে দৃষ্টি যায় না। কিন্তু ঢেউকে আমরাই সৃষ্টি করছি, ঢেউয়ের ওঠা নামাকে শান্ত করে দিলে দেখব আবার সেই মহাসমুদ্র, শান্ত। আমাদের বাস্তবিক অবস্থা এটাই, *শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্*। কঠোপনিষদে বলছেন,

নিত্যোনিত্যানাম্ চেতনশ্চেতনানাম্, অনিত্যের মধ্যে তিনি নিত্য, নিত্যকে ছেড়ে দিয়ে আমরা অনিত্যকেই নিত্য মনে করি। অনিত্যকে নিত্য মনে করার ফলে আমরা সুখ পাই, দুঃখ পাই। দুঃখ পেলে হা হুতাশ করি, এটা ভুলে যাই যে এই দুঃখ আমারই সৃষ্টি।

স্বামীজী happiness and bliss নিয়ে বলার উদ্দেশ্য হল, স্বামীজীর ক্লাশে যাঁরা ছিলেন তাঁরা সবাই ছিলেন গোঁড়া খ্রীশ্চান, খ্রীশ্চানদের কাছে happiness, goodness এগুলোর খুব গুরুত্ব। স্বামীজী এদের প্রচলিত যে বিশ্বাস, বিষয়ীরা যে বিশ্বাস নিয়ে চলে, সাধারণ মানুষরা যে প্রচলিত ধর্ম পালন করে, তাদের এই ধারণাগুলোকে ভাঙছেন। তুমি যেটাকে সুখ মনে করছ, যে সুখের পিছনে তুমি ছুটে মরছ, ওই সুখ আর দুঃখটা কোন আলাদা কিছু নয়, দুটো যমজ বোন, একটা থাকলে অপরটাও থাকবে। যদি তুমি দুঃখের পারে যেতে চাও, তাহলে তোমাকে সুখের পারেও যেতে হবে। কিন্তু এই দুটোর পারে চলে যাওয়াতে তোমার নূতন করে কিছু পাওয়া হচ্ছে না, এই নয় যে এটাকে ছেড়ে তোমাকে সেখানে যেতে হবে। তুমি ওখানেই আছ, আসলে তুমি হাত বাড়িয়ে এগুলোকে ধরে রেখেছ। এগুলো তুমি ছেড়ে দাও, তোমার জীবনে শান্তি এসে যাবে। এই হল স্বামীজী সুখ-দুঃখকে কিভাবে দেখছেন। সংসার মানেই সুখ-দুঃখের খেলা, আধ্যাত্মিক জীবনে যাঁরা একটু এগিয়ে গেছেন, তাঁদের জীবনে সুখ-দুঃখ খুব তাড়াতাড়ি আসতে থাকে, বিষয়ীদের ক্ষেত্রে দেরীতে আসে। এগুলো আমাদের পক্ষে ধারণা করা কঠিন, মেনে নেওয়া আরও কঠিন, অথচ এটাই বাস্তব।

প্রশ্ন হল, সুখ-দুঃখের পারে, ভাল-মন্দের পারে কি হয়? যাঁদের শাস্ত্র নিয়ে চর্চা আছে, যাঁরা জপধ্যান করেন, তাঁদেরও অনেকের মনে প্রশ্ন আসে, ভালর পারে কেন যেতে হবে, কিংবা সুখ-দুঃখের পারে কেন যেতে হবে? সাধারণ মানুষ এই পারে যাওয়ার জিনিসটা বুঝতে পারে না। অন্যান্য ধর্মও মুক্তির কথাই বলছে। খ্রীশ্চানরা eternal Heavenএর কথা বলে, মুসলমানরা জন্নতের কথা বলে। এদের ধর্মগ্রন্থ গুলো পড়লে দেখা যাবে, বৈষ্ণবরা যেভাবে বিষ্ণুলোকের কথা বলে, যেখানে বলে ভগবান বিষ্ণুর কাছে থাকা, এটাই তাদের কাছে মুক্তি। তার মানে, ভগবানকে ছেড়ে এই জগতে তাদের আর আসতে হবে না, এটাই মুক্তি। *তদ্বিষ্ণো পরমং পদম্,* এটাই পরম, বিষ্ণুর কাছে থাকা। মুসলমানরা এটাকেই বলে আল্লার কাছে থাকা, খ্রীশ্চানরা বলবে, গড্এর কাছে থাকা। এখন প্রশ্ন হল, আমাকে কেন বিষ্ণুলোকে যেতে হবে, কেন স্বর্গ বা জন্নত যেতে হবে? আমি ওসব চাই না। ধর্ম বলতে ওটাকেই কেন মানতে হবে? বেশির ভাগ লোকেরাই তো বিষ্ণুপদ চায় না। সব জিনিস এক সঙ্গে জড়িয়ে আছে। সুখ-দুঃখের পারে, ভাল-মন্দের পারে, জন্ম-মৃত্যুর পারে আর মুক্তির ইচ্ছা যেখানে জন্ম-মৃত্যুকে পার করে যাবে, এগুলো কি এবং কেন? সব কিছু একই। জগৎকে যদি খুব কাছ থেকে দেখি, তখন দেখছি জগতে এমন কিছু জিনিস আছে যে জিনিসগুলোর পারে আমরা যেতে পারি না। আমরা দিনরাতই মৃত্যু দেখছি, মৃত্যুকে আমরা খুব ভাল ভাবেই জানি, জন্মটাও দেখছি, কিন্তু যে মারা গেল তাকে আর জন্মাতে দেখছি না। যদিও কিছু কিছু ঘটনায় দেখা যায় পূর্বজন্মের কথা বলে দিচ্ছে, কিন্তু সাধারণ ভাবে আমরা জানি, যে লোক মারা গেল সে যদিও বা জন্মায় কিন্তু তার একই শরীর থাকছে না, সব কিছুই তার পাল্টে যাবে। কিন্তু মিলন আর বিরহ এই দুটো জিনিস সাধারণ, যাদের ভালবাসি তাদের সাথে আমাদের মিলন হয়ে যায়, আবার কোন কারণে তাদের সাথে বিচ্ছেদও হয়ে যায়। যে জিনিসগুলো আমরা ভালবাসি সেগুলোর সাথে আমাদের সংযোগ হয়, আবার বিয়োগও হয়ে যায়। যে জিনিসগুলোকে আমরা পছন্দ করি না, সেগুলোর সাথে সংযোগ হওয়াকে আমরা দুঃখ বলি, বিয়োগ হয়ে গেলে আমরা শান্তি পাই, আঃ বাঁচলাম। এই যে মিলন ও বিরহ, এই যে ইষ্ট প্রাপ্তিতে সুখ, যে আমার মনের মত তাকে ভালবাসি, যে বস্তুকে ভালবাসি, তার সাথে সংযোগ হয়ে গেলে যে আনন্দ হয় সেটাকে আমরা সুখ বলছি। এর বিপরীতে অনিষ্ট প্রাপ্তিকে আমরা দুঃখ বলি।

সুখ-দুঃখ, বিরহ-মিলন, এগুলো কি? কোথা থেকে আসে? একটু গভীরে গিয়ে দেখলে দেখা যাবে, সুখ-দুঃখ, বিরহ-মিলন, জন্ম-মৃত্যু সব বাইরে থেকে আসে। মনের মত খাওয়া পেলে কত আনন্দ পাই, আনন্দ বলা মানে কত সুখ পেলাম। সবাই বলে love at first sight, কিন্তু কিছু দিনে আগে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে বার করে বললেন, কোন লাভ-টাভ কিছুই হয় না, it is always last at first sight। আমরা যাকে আনন্দ বলছি, ওটা আনন্দ না, সুখ হয়। কিসের সুখ? ইন্দ্রিয়ের সুখ। যেমন জিহ্বা একটা ইন্দ্রিয়, যখন সুস্বাদু

কিছু খাচ্ছি তখন জিহ্বা একটা সুখ পায়। খাবার পেটে চলে যাওয়ার পর পেট মনকে একটা সঙ্কেত পাঠায়, আমার পেট ভরে গেছে। মনও একটা ইন্দ্রিয়, খাওয়ার পর পেট ভরে গেলে মনের একটা তুষ্টি হয়, সেই তুষ্টিকেও বলা হয় সুখ। ইন্দ্রিয়ের তুষ্টি সব সময় বহির্জগতের উপর নির্ভর করে, বহির্জগৎ থেকে যখন কোন জিনিস আসে, সেই জিনিসের থেকে যখন তুষ্টি হয়, সেটাকেই আমরা বলি সুখ। আর বহির্জগৎ থেকে যদি কিছু অশান্তি, উপদ্রব এসে যায় তখন সেটাকে বলছি দুঃখ। ঠিক তেমনি বিরহ-মিলন এটাও বহির্জগৎ থেকে আসছে। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো কখনই নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকতে চায় না, সব সময় চায় আলোড়িত হতে। চোখ ভাল দৃশ্য দেখতে চায়, কান ভাল মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনতে চায়, মনের মত গান শুনতে চায়। যাকে ভালবাসি তার কথা কত মিষ্টি লাগে, তার সাথেই যখন ঝগড়া হয়ে যায় তখন তার কথাগুলো কর্কশ লাগে। ইন্দ্রিয় সব সময় উদ্বেলিত হয়ে থাকতে চায়।

এখন বহির্জগৎ থেকে যে জিনিসগুলো আসে সেটা সত্য, নাকি অন্তর্জগৎ থেকে যেটা আসে সেটা বেশি সত্য? বহির্জগতে ঘুরে ঘুরে সুখের বদলে মানুষ যদি শুধু দুঃখই পেতে থাকে, তখন সে চেষ্টা করে কি করে আরও বেশি সুখ পাওয়া যেতে পারে। তখন মনে করে আমার শত্রুদের ভালো টাইট দিতে পারলে আমি সুখে থাকব। বিশ্বের বড় বড় দেশগুলো সব সময় চাইছে অপর দেশগুলোকে ঠাণ্ডা রাখতে হবে, আমেরিকা চাইছে রাশিয়াকে ঠাণ্ডা রাখতে, চীন চাইছে ভারতকে ঠাণ্ডা রাখতে, উত্তর কোরিয়া চাইছে আমেরিকাকে ঠাণ্ডা রাখতে। আমাদের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই, অপরকে ঠাণ্ডা রাখতে হবে। স্ত্রী চাইছে স্বামীকে ঠাণ্ডা রাখতে, স্বামীও চাইছে স্ত্রীকে ঠাণ্ডা রাখতে হবে, সবাই সবাইকে ঠাণ্ডা রাখতে চাইছে। যখন দেখে সবাইকে ঠাণ্ডা রাখতে পারছি, তখন ভাবে আমি বেশ সুখে আছি। যেমনি কোথা থেকে একটা প্রতিরোধ এসে গেল তখন অশান্তি লেগে যায়। এরা সবাই সাধারণ মানুষ।

এদের বাইরে যারা একটু বিজ্ঞ, যাদের সামান্য বুদ্ধি আছে, তারা যখন সুখ-দুঃখের কথা ভাবে তখন তাদের মনে প্রশ্ন আসে, সুখ-দুঃখের পারেও কি কিছু আছে? অশান্তির কারণ কি হতে পারে? বিচার করে দেখছে, অশান্তির কারণ তো আমি নই, অশান্তির কারণ এই জগৎ, জগৎ এসে আমার ইন্দ্রিয়গুলিকে উদ্বেলিত করে দিচ্ছে। শান্তি পেতে হলে হয় আমাকে বহির্জগতের সাথে আমার সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে, তা নাহলে ইন্দ্রিয় সংযম করতে হবে। যখন এই বহির্জগৎ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে ইন্দ্রিয়কে সংযমিত করা শুরু করে তখন ধর্ম জীবন শুরু হয়। ধর্ম জীবন মানে এবার সে বহির্জগতের সাথে সম্পর্ক কমাতে শুরু করে দিয়েছে, ইন্দ্রিয়ের দমন অর্থাৎ শম দম শুরু করেছে।

এবারে একটা মজার ব্যাপার হতে শুরু করবে। যা যা জিনিসের পিছনে এতদিন সে দৌড়াচ্ছিল, যাদের সঙ্গ এতদিন তার সুখের কারণ ছিল, আর যার বিয়োগ তার চোখের জলের কারণ ছিল, এগুলোর কোন কিছুর পিছনেই সে আর দৌড়াচ্ছে না। যার সঙ্গ তার খুব ভাল লাগত, সে ঘুরে ঘুরে এসে তাকে জিজ্ঞেস করবে, তুমি আমাকে আর ভালবাস না? সে চাইছে ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। সে আরও কাছে এসে বলবে, একবার তুমি আমার দিকে তাকাও। সে বলবে, আমার আর কিছু লাগবে না। এতে সেও একটা মজা পেতে থাকে, তাই তো এখন আমি অন্য রকম একটা মজা পাচ্ছি। গ্রহণের দ্বারা এই মজাটা পাচ্ছি না, ত্যাগ করে আমি আনন্দ পাচ্ছি। এতদিন গ্রহণ করে করে আনন্দ পাচ্ছিল, এবার ত্যাগ করে সে আনন্দ পেতে শুরু করল। প্রথম একটা আনন্দের স্বাদ সে পেল। ইয়ং ছেলেরা অনেক সময় মজা করে বলে, দুদিনের জন্য যদি কোন কারণে আমার স্মার্ট ফোনটা বিগড়ে যায়, প্রথম দুদিন মাথাটা খারাপ হয়ে যাবে, দুদিন পর থেকে কিন্তু খুব ভালই লাগে। যেমনি কেউ ত্যাগের পথ নিয়ে নেয়, প্রথম দিকটায় ছটফট করে, কিন্তু তারপরেই শান্তি।

এই করে করে একটা সময় থেকে আধ্যাত্মিক জীবনের যাত্রা শুরু হয়। আধ্যাত্মিক জীবন শুরু মানেই, জগৎ থেকে ধীরে ধীরে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া, আর ইন্দ্রিয় যে জায়গাটায় ওর গেটওয়ে রয়েছে সেটাকে নিয়ন্ত্রিত করা। একটা বড় স্টেডিয়াম, বিরাট ভিড় হয়, আমি বলে দিলাম লোক কমাতে হবে, মাত্র দশ হাজার টিকিট দেওয়া হয়েছে, আবার গেটগুলিকেও রেগুলেট করে দেওয়া হল। ঢোকার সময় ভিড় নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে গেল। স্বাভাবিক ভাবেই স্টেডিয়ামের ভিতরে সবাই শান্তিতে খেলা দেখতে পারবে। আগে খোলা মাঠ ছিল, সবাই আসছে যাচ্ছে, যা খুশি করছে। আধ্যাত্মিক জীবন মানেই তাই, ভিড়টাও কমে গেল, নিয়ন্ত্রণটাও বেড়ে

গেল। এইভাবে হতে হতে শেষে গিয়ে দেখে, বহির্জগৎটা যত কমছে ইন্দ্রিয় সংযমও তত বাড়ছে। হতে হতে ইন্দ্রিয়গুলো এত সংযমিত হয়ে যায় যে, ইন্দ্রিয়গুলো নিস্তেজ হয়ে পড়ে থাকে। এগুলো এখন মরা জোঁক, ওকে এখন রক্ত দিলেও কিছু হবে না, চুন দিলেও কিছু হবে না, নুন দিলেও কিছু হবে না। থেকে যায় তার মন। ওখান থেকে যখন আরও ভিতরে যেতে থাকে শেষে মনেরও নাশ হয়ে যায়। মনোনাশ হয়ে গেল, ইন্দ্রিয়গুলো মরে পড়ে থাকল, তার মানে গেটগুলো পুরো বন্ধ হয়ে গেল। স্টেডিয়ামের সব গেট বন্ধ হয়ে গেল, এখন স্টেডিয়ামে ভাল লোক থাকবে, নাকি মন্দ লোক থাকবে? আগে যখন সব গেট খোলা ছিল তখন ভাল মন্দ সব লোকই আসছিল, উপদ্রবও হচ্ছিল, ভালও হচ্ছিল। গেটগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার পর ভাল লোকরাই আসছিল আর সব ভাল হচ্ছিল। এখন সব গেট বন্ধ, তাই ভালও থাকবে না, মন্দও থাকবে না।

এই যে সুখ-দুঃখের কথা বলা হল, সংযোগ-বিয়োগের কথা বলা হল, ভাল-মন্দের কথা বলা হল, এগুলো সব হয় বহির্জগৎ থেকে। এখন বহির্জগৎ শুধু বন্ধই হয়ে যায়নি, চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। এই যে অবস্থা, এটাই শুদ্ধ চৈতন্যের অবস্থা, আমি শুদ্ধ চৈতন্য, আমিই আছি, আমি ছাড়া কোথাও কিছু নেই। ভক্ত দেখেন আমি ঈশ্বরের দাস, শেষে বাস্তবিকই নিজেকে ঈশ্বরের দাস রূপে দেখেন। বহির্জগৎ থেকে কোন কিছু আসছে না, কোন উত্তেজনা আসছে না তাই সুখও নেই দুঃখও নেই, ভাল নেই মন্দও নেই, সংযোগ নেই বিয়োগও নেই। বহির্জগৎ থেকে কোন sensation আসছে না বলে জন্মও নেই মৃত্যুও নেই। সব রকম দ্বৈত ভাব মিটে গেছে, থেকে গেল শুধু – আমি শুদ্ধ চৈতন্য বা আমি ঈশ্বরের দাস। ঈশ্বর কে? চৈতন্য কে? বলছেন সচ্চিদানন্দ, তিনি আছেন, তিনিই চৈতন্য স্বরূপ, তিনিই আনন্দ স্বরূপ। এতক্ষণ যে সুখ আসছিল এই সুখ হল ইন্দ্রিয়ের আলোড়ন। ইন্দ্রিয় শেষ হয়ে গেছে, এখন দেখছে, আরে এ যে আনন্দের মহাসমুদ্র! তার মানে এই ইন্দ্রিয়ের আলোড়ন, এই সুখ, এই বিরহ, এই দুঃখ, এ-সবের আর কোন প্রশ্নই হয় না। কারণ সে এখন ওই সচ্চিদানন্দের অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। সেইজন্য সুখও নেই দুঃখও নেই। কি আছে? শুধু আনন্দ আর আনন্দ। জন্ম নেই মৃত্যু নেই। কেন নেই? কারণ সচ্চিদানন্দই শুধু আছেন।

এর উপলব্ধি কিভাবে করা যাবে? কোন উপলব্ধিই হবে না। কারণ আমরা সব সময় ওটাই। আমরা ওটাই আছি, সমস্যা আমাদের এটাই যে, আমাদের এমনই শক্তি যে এই মহাসমুদ্রে আমরা সংসার রূপী ঢেউ তুলছি। আমি আপনি সেই মহাসমুদ্র, যাঁর চেতনা রয়েছে, যিনি শুদ্ধ চৈতন্যময়। আমরা চিন্তা করলাম এই রকম হোক, ঢেউ উঠতে শুরু করল। এবার দেখছি বড় ঢেউ, ছোট ঢেউ, এই ঢেউ উঠল, ওই ঢেউ মিলিয়ে গেল, এইভাবে ঢেউয়ের পর ঢেউ শুধু উঠতেই থাকল। এবার আমরা সমুদ্রকে ভুলে গেলাম, ভুলে গিয়ে এখন শুধু ঢেউ দেখে যাচ্ছি। একটা ঢেউকে আমি ভালবাসতে শুরু করলাম, আহা কি সুন্দর ঢেউ, কিন্তু নিয়মানুসারে কিছুক্ষণ পর ঢেউটা জলে মিশে যাবে। মিশে যেতেই আমার চোখে জল, ঢেউটা কোথায় হারিয়ে গেল, আর ওই ঢেউকে কোন দিন দেখা যাবে না। কোথায় হারিয়ে যাবে? ঢেউ বলে আদপে কিছুই নেই, জলই ছিল, জলই আছে, জলই থাকবে। জলের যে একটু পরিবর্তন হল সেটাকে আমি ঢেউ বলে মনে করছিলাম, ওই ঢেউকে দেখে আনন্দ করছিলাম, না দেখে কান্নাকাটি করছিলাম। বহির্জগৎকে ভিতরে নেওয়া মানে এটাই, সেই সচ্চিদানন্দ সাগরে নানা রকমের ঢেউ, সেই ঢেউয়ের কোনটার সাথে আমি নিজেকে জুড়ে দিয়ে সুখ বোধ করছি, ঢেউটা মিলিয়ে যেতে দুঃখ বোধ করছি। তার মানে যিনি ভক্তি লাভ করেন, যিনি আধ্যাত্মিকতা লাভ করেন, তিনি সুখ-দুঃখের পারে চলে যান, সংযোগ-বিয়োগের পারে চলে যান, নানা রকমের যে দ্বৈত ভাব রয়েছে, দ্বন্দ্ব রয়েছে, সব কিছুর ভাল-মন্দের পারে চলে যান। আমাদের মনের মত কিছু হলে তাকে আমরা ভাল বলি, মনের মত না হলে মন্দ বলি। কিন্তু মনটাই তো মরে পড়ে গেছে, তখন তো আর বস্তুই থাকবে না।

দেববাণীতে স্বামীজী এই জিনিসগুলোকে আরও ব্যাখ্যা করবেন। এগুলোকে নিয়ে আমরা আগেও আলোচনা করেছি, কিন্তু আমরা ধারণা করতে পারি না, সেইজন্য মনে রাখতে পারি না। শুধু শুনে গেলে কিছু হবে না, যতক্ষণ আমরা নিজের জীবনে না নামাতে পারছি, এগুলোকে work out করছি, ততক্ষণ জানবেন, এগুলোকে কোন দিন ধারণা হবে না। আমাদের যত শাস্ত্র আছে, তা বেদ হোক, গীতা-উপনিষদ হোক, মহাভারত, পুরাণ হোক, ঠাকুর-মা স্বামীজীর কথাই হোক, এর প্রত্যেকটি কথা বেদবাক্য, বেদবাক্য মানে এগুলো সব আধ্যাত্মিক সত্য, যা কোন পরিস্থিতিতেই পাল্টাবে না। যদি এর কোন কথার অর্থের ব্যাপারে

সংশয় হয় বা এর কোন উত্তর পাওয়া না যায় বা আমার মনের সাথে মিলছে না, বুঝে নিতে হবে আমার বুদ্ধি এখনও তৈরী হয়নি। এর অর্থকে বার করার জন্য এবার আমাকে খাটতে হবে। শাস্ত্রে যা যা বলা হয়েছে সব সত্য, আমরা যে ধারণা করে রেখেছি সেটা ভুল। আমাদের জীবনে যত কষ্ট, সব কষ্টের কারণ হল সত্যকে আমরা ধরে রাখতে পারছি না, উত্তরটা আমাকেই খেটে বার করতে হবে। কোন মহাত্মা, যত বড় সন্ন্যাসীই হন, খোদ শ্রীরামকৃষ্ণও আমাদের কারুর সংশয় দূর করতে পারবেন না। তাহলে স্বামীজী ঠাকুরের স্তবে কেন বলছেন, সংশয় রাক্ষসকে বিনাশ করেন। ওখানে একটা বিশ্বাস হয়, আচ্ছা তাহলে এই যে কথাগুলো বলা হয়েছে ভাল-মন্দের পারে, সুখ-দুঃখের পারে, পাপ-পূণ্যের পারে, ঠাকুর তো তাই। তাহলে এটা সত্য, তা সত্ত্বেও বুঝতে কেন ভুল হচ্ছে? এবার নিজেকে খেটেখুটে এর উত্তরটা বার করতে হবে। যতক্ষণ না বার করা যাচ্ছে, ততক্ষণ যত শাস্ত্রই পড়ুন, যত গ্রন্থ পড়ুন, যত সাধুসঙ্গ করুন, যত মহাত্মার সঙ্গ করুন, এক কণা জ্ঞানও আপনার আসবে না। উত্তরটা নিজেকেই বার করতে হবে। শুধু মেনে নিতে হবে যে, শাস্ত্রে যা যা বলা হয়েছে সব অক্ষরে অক্ষরে সত্য। এই বিশ্বাস নিয়ে উত্তরটা নিজেকে বার করতে হবে, শাস্ত্রে এই কথার মাধ্যমে কি বলতে চাইছেন।

আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হও

ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখের কথা বলার পর স্বামীজী এবার বলছেন, Stand upon the Self, then only can we truly love the world. (*এই আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হও, তা হলেই আমরা জগৎকে ভালবাসতে পারব।*) আমরা সবাই ভালবাসতে চাই, কতজনকেই না আমরা বলি, আমি তোমাকে ভালবাসি। কিন্তু সত্য হল, কেউ কাউকে ভালবাসতে পারে না, lusting ছাড়া কিছু নেই। একজন মা যে সন্তানকে ভালবাসছে, সেখানেও তার অনেক রকম প্রত্যাশা জড়িয়ে থাকে। সেও জানে আমি যখন বৃদ্ধা হব তখন সে আমাকে দেখবে, তার আগে সে আমাকে মানবে। ছেলে একটু যদি এদিক সেদিক করল, ব্যস্, মায়ের চোখে জল আসা শুরু হয়ে গেল, এই জন্যই কি আমি তোকে লালন পালন করে এত বড় করলাম, জানিস আমি তোর জন্য কি কি করেছি। কে বলেছিল তোমাকে এত কিছু করতে? যদি তুমি কাউকে ভালবাসতে চাও তাহলে stand up on the Self। কাউকে ভালবাসার আগে আমি আত্মা, আমি সেই শুদ্ধ আত্মা, এই আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হও। Take a very, very high stand, (*খুব উচ্চভাবে প্রতিষ্ঠিত হও,*) নিজেকে বিরাট উপরে নিয়ে যাও, অহঙ্কারের অর্থে উপরে নিয়ে যেতে বলা হচ্ছে না, এই যে তুমি নিজেকে দেহ মনে করছ, নিজেকে মন মনে করছ, এর থেকে বেরিয়ে নিজেকে শুদ্ধ আত্মা রূপে দেখার কথা বলা হচ্ছে। আমি শুদ্ধ আত্মা, আমার না আছে সুখ, না আছে দুঃখ, না আছে পাপ বোধ, না আছে পূণ্য বোধ, বহির্জগৎ আমাকে ছুঁতে পারে না, কারণ আমি আমার ওই গেট গুলোকে বন্ধ করে দিয়েছি, আমার ইন্দ্রিয়গুলিকে দমিয়ে দিয়েছি, আমার মনকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছি, আমার কিসের দুঃখ, কিসের সুখ, তখনই তুমি কাউকে ভালবাসতে পারবে। Knowing our universal nature, we must look with perfect calmness upon all the panorama of the world, (*আমি যে সেই অনন্ত আত্মস্বরূপ – এই জেনে আমাদের জগৎ-প্রপঞ্চের দিকে সম্পূর্ণ শান্তভাবে দৃষ্টিপাত করতে হবে।*) জগতে এই যে নানা রকমের খেলা চলছে, এই চিত্র-বিচিত্র জগৎকে খুব শান্ত হয়ে দেখতে হবে।

মঠে একজন বয়স্ক মহারাজ ছিলেন, তখনই তাঁর নব্বুই বছর বয়স হয়ে গেছে, তিনি একজন অত্যন্ত ভাল সাধু, মহাত্মা ছিলেন। যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে তখন উনি প্রায় শয্যাশায়ী। ওনার মনকে একটু নীচে নামিয়ে রাখার জন্য ওনার ঘরে একটা টিভি লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। টিভির কোন কিছুই ওনার মাথায় ঢুকত না। মহারাজকে দেখার জন্য Attendance ছেলেগুলোই বসে বসে টিভি দেখত। একদিন ইস্টবেঙ্গল আর মোহনবাগানের ম্যাচ হচ্ছে। ওনাকে একজন এসে জিজ্ঞেস করল, 'মহারাজ, ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান ম্যাচ হচ্ছে, আপনি কাকে সাপোর্ট করেন'? উনি বললেন ইস্টবেঙ্গল। আরেকজন এসে একই কথা জিজ্ঞেস করল, 'মহারাজ, মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ হচ্ছে আপনি কার সাপোর্টার'? মহারাজ বললেন, মোহনবাগান। উনি প্রথমে যে শব্দটা শুনে নিলেন তাকেই সাপোর্ট করছেন। এখন সবাই শুনে নিল মহারাজ মোহনবাগানকে সাপোর্ট করছেন, এদিকে ইস্টবেঙ্গল একটা গোল দিয়েছে। মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে খুব জোর হাততালি দিতে শুরু

করলেন। সবাই বলল, 'মহারাজ আপনার দল গোল খেয়ে গেল, হাততালি কেন দিচ্ছেন'? মহারাজও শিশুর মত হেসে বলছেন, 'আরে গোল তো হয়েছে'। কার দিকে গোল হল তাতে মহারাজের কিছু আসে যায় না, গোল তো হয়েছে। এটাকে বলে calmness, কোন কিছুর সাথে কোন identification নেই, যে যেদিকে গোল দিল তাতেই তিনি হর্ষোল্লাস করছেন, এটাকে বলে, নিউট্র্যালিটি। স্কুলে রেজাল্ট বেরোবার সময় নিজের ছেলের কি র‍্যাঙ্ক হল, কত নম্বর হল সেই নিয়ে বাবা-মার কত টেনশান, কিন্তু যিনি শিক্ষক তাঁর কিছু আসে যায় না। জগতে আমরা পঞ্চাশ জনের সাথে নিজেদের জুড়ে রেখেছি, এ আমার বিশেষ বন্ধু, এ আমার সাধারণ বন্ধু, এ আমার স্ত্রী, এ আমার পুত্র, এ আমার আপন, এদের সুখ-দুঃখ আমার সুখ-দুঃখ, এদের আনন্দ আমার আনন্দ। কিন্তু ভুলে গেছি যে এগুলোর কোনটাই আমি নই।

একজন খুব সিনিয়র মহারাজ তাঁর জীবনের একটা ছোট্ট ঘটনা বলছিলেন। উনি যখন কম বয়সের সন্ন্যাসী ছিলেন তখন উনি খুব সৌখিন ছিলেন। কোন ভাল জিনিস দেখলে কদর করতেন। অনেক মহারাজ আছেন, যাঁরা উচ্চ বংশ থেকে আসেন, তাঁদের কিছু কিছু জিনিসের প্রতি শৌখিনত্বটা থেকে যায়। যেমন স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের পেনের খুব শখ ছিল, ওনার কাছে প্রচুর ভাল ভাল পেন থাকত। এই মহারাজ ওনার থেকে সিনিয়র অন্য একজন মহারাজের কাছে গিয়ে দেখলেন একট খুব সুন্দর পেন দিয়ে লেখালেখি করছেন। উনি দেখে বললেন, 'বাঃ পেনটা তো খুব সুন্দর'। সিনিয়র মহারাজ বলছেন, 'ও! তোমার পছন্দ হয়েছে, তুমি নিয়ে নাও'। উনি তখন বলছেন, 'মহারাজ! আমারও একটা বয়স হয়েছে, একটা ভাল জিনিস দেখলেই যে ওটা আমাকে নিয়ে নিতে হবে, এই অবস্থাটা আমি পেরিয়ে এসেছি'।

আমাদের সমস্যা এটাই, যখনই ভাল কোন কিছু দেখি, তখন মনে করি এটা যেন আমার হয়ে যায়। একটা ভাল বাড়ি দেখলে মনে হয়, আহা আমারও যদি এই রকম একটা বাড়ি থাকত। না হলে গাত্রদাহ হতে শুরু হয়ে যাবে। তারপর এই চিন্তা আসবে, আমার যদি না হয় তাহলে অপরেরও যেন না হয়। ভাল বাড়িকে ভাল বাড়ির মত আমরা appreciate করতে পারি না। একটা ভাল কিছু দেখে শুধু যে একটু appreciate করতে হবে, সেটাও আমরা পারি না। Appreciation মানে appreciation, এটা আমার হয়ে যাক, এই ভাব নিয়ে না। যা কিছু পরিবর্তন হচ্ছে, যা কিছু সৌন্দর্য চোখে পড়ছে, সব কিছুকে নিরপেক্ষ ভাবে দেখা। Nutrally থাকা তো দূরের কথা, সুন্দরী মেয়ে দেখলে তাকে আমার চাই, যদি না পায় মুখে এ্যাসিড ছুঁড়ে মারছে। তুমি যদি সত্যি তাকে ভালবাসো, ওর রূপের প্রতি তোমার আকর্ষণ হয়েছে, ওর রূপের প্রশংসা তুমি করতেই পারো, কেউ বারণ করছে না, দূর থেকে কি appreciate করা যায় না! না, ও যদি আমার না হয়, ও কারুর হতে পারবে না।

জগৎকে প্রাধান্য দেওয়াটা বন্ধ কর

স্বামীজী বলছেন, It is but baby's play, and we know that, so cannot be disturbed by it. (*এই জগৎ একটি ছোট শিশুর খেলার মতো; আমরা যখন তা জানি তখন জগতে যাই হোক না কেন, কিছুতেই আমাদের চঞ্চল করতে পারবে না।*) এ্যাস্ট্রিক্স সিরিজে সবই কার্টুন চরিত্র, ওরা সব সময় নিজেদের মধ্যে মারামারি করে। সবারই কিছু না কিছু গোলমাল আছে, এ পচা মাছ বিক্রি করে, ও অমুক করে ইত্যাদি। একদিন পুরুষরা সবাই লড়াই করতে কোথায় চলে গেছে। এবার ওদের সন্তানরা ওদের বাবাদের নকল করে খেলা করছে, ওরা ওই ভাবেই নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছে যেভাবে ওদের বাবারা ঝগড়া করে। একজন আরেকজনকে বলছে, তোর বাবা পচা মাছ বিক্রি করে, সেই নিয়ে দুজনের মধ্যে মারামারি। ইতিমধ্যে গ্রামের মহিলাদের একটা পার্টি হবে, সেটার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। মহিলারা এসে বাচ্চাদের বলছে, বাচ্চারা এখান থেকে যাও, তোমরা দূরে গিয়ে খেলা কর। প্রথমে মনে হবে মহিলাদের মধ্যে এবার হয়ত জোর ঝগড়া হবে, এই দেখো তোমার ছেলে কি রকম নোংরা কথা বলছে। কিন্তু কিছুই হল না, 'বাচ্চারা সবাই দূরে গিয়ে খেলা কর, জায়গাটা খালি করে দাও' এই বলে সব কটা বাচ্চাকে সরিয়ে দিল। মা-ঠাকুরমারা জানে, বাচ্চারা খেলা করছে, ভালবাসছে আবার লড়াই করছে।

একজন নামকরা লেখক নিজের ছোটবেলার কথা লিখতে গিয়ে বলছেন, আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন বাবা-মা আমাদের দূর থেকে নজর রাখতেন। সারাটা দিন আমরা বদমাইশি করে বেড়াতাম, কার গাছে আম আছে, বিশেষ করে পাড়া প্রতিবেশীর গাছে যদি আম থাকে, অবশ্যই চুরি করে নুন দিয়ে আমরা সেই আম খাব। আমরা নিজেদের ভিতরে লাইব্রেরি তৈরী করতাম, সেখানে কত রকমের কমিক্সের বই থাকত। কত রকমের বাঁদরামি করতাম, হাত-পা ভাঙতাম, বাবা-মা কখন কিছু বলতেন না। আমাদের যত ঝুট ঝামেলা হত, বাবা-মা সব ঝামেলাই সামলে নিতেন। এখনকার বাবা-মায়েদের দেখি, তারা দিনক্ষণ সব ঠিক করে রাখে কবে আমাদের সন্তান হবে, আর তখন থেকে সন্তানের সব কিছুই বাবা-মা ঠিক করে রাখে। ছেলের হবি কি হবে, বাবা-মা ঠিক করে দেবে, ছেলের বন্ধুরা কেমন হবে বাবা-মা ঠিক করে দেবে। ছেলে কখন খাবে, কি খাবে সব বাবা-মা ঠিক করে দিচ্ছে। আর ওর কেরিয়ার কি হবে সেটাও ঠিক করে রাখছে। আগেকার দিনে বাবা-মারা জানতেনই না কত রকমের কেরিয়ার হয়, ছেলেমেয়েরা নিজেরাই খুঁজে খুঁজে বার করত। এই প্রজন্মের বাবা-মায়েরা সন্তানের সব কিছু তার হয়ে করে দিচ্ছে। তার মানে এই প্রজন্মের বাবা-মায়েরা কতটা সাংসারিক হয়ে গেছে কল্পনাই করা যায় না। নিজের জীবনটা সর্বনাশ করে রেখেছে, এরপর নিজের সন্তানদের জীবনেরও সর্বনাশ ডেকে আনছে। এই ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে তারা তাদের সন্তানদের কি করবে, ভগবানই জানেন।

স্বামীজীর এখানে বক্তব্য হল, জগৎটা হল বাচ্চাদের খেলার জায়গা, জগৎকে বেশি প্রাধান্য দিতে নেই। কিন্তু আমরা কি করছি? যেখানে সত্যিকারের বাচ্চাদের জগতে আমরা ঢুকে পড়ে ওদের সব কিছুকে সিরিয়াসলি নিয়ে শিশুদের আনন্দটুকুর সর্বনাশ করে দিচ্ছি, আর সেখানে বড়দের জগৎকে বাচ্চাদের জগৎ বলে মনে করা অসম্ভব। এই জিনিসটাকে যদি মাথায় না রাখা হয়, তাহলেই অশান্তি লেগে যাবে। যদি না বেরিয়ে আসা যায় তখন কি হয়? দুটো ভাল কথা কেউ বলে দিলে আমরা খুশি হয়ে যাই, আর একটা কটূ কথা কেউ বলে দিলে আমরা ভেঙে পড়ি। স্বামীজী এটাই বলছেন, If the mind is pleased with praise, it will be displeased with blame, (*যদি প্রশংসায় মন উৎফুল্ল হয়, তবে নিন্দায় নিশ্চয় বিষণ্ণ হবে।*) ভাল কথা শুনলে কারুর আনন্দ হয়, তাহলে জানবেন খারাপ কথা শুনলে তার মন ভাঙবেই। প্রশংসায় যদি কেউ উল্লসিত হয় তাহলে নিন্দায় সে ফোঁস করবেই। আপনি হয়ত বলবেন, প্রশংসায় কাউকে কুণ্ঠিত হতে তো দেখা যায় না। কাউকে প্রশংসা করে বলা হল, 'আপনি আমাদের যা উপকার করলেন'। 'না না কি বলছেন, কি আর এমন করেছি'। ভিতরে ভিতরে কিন্তু ফুলে উঠছেন, কোথাও একটু কুণ্ঠিত ভাব রয়েছে। একবার কেউ ওর নিন্দা করে দেখুক – 'আমার নামে এই কথা বলছে'! এই ফুলে যাওয়া, এই কুণ্ঠিত হওয়া, এই ফোঁস করা, এগুলো হল জগৎকে খুব সিরিয়াসলি নেওয়ার লক্ষণ। জগৎকে সিরিয়াসলি নেওয়া মানেই সে এখনও জগতে আবদ্ধ, তার এখন কষ্টের শেষ নেই।

এখানে জটিলতার কিছু নেই, জিনিসটা খুব সাধারণ, আমাদের সমস্যা হল সুখ আর দুঃখ যে যমজ, এটাই আমরা কিছুতেই আমাদের ধারণাতে নিয়ে আসতে পারছি না। আমরা মনে করি যত ভোগের উপকরণ মজুত করতে পারব তত আমরা খুশি হব। মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠের মত যেখানে সুখ আছে সেখানে দুঃখও থাকবে। তার মানে আমি যদি একজনকে নিয়ে সুখ পাই তাহলে দুঃখও এক গুণ থাকবে। আমরা তখন মনে করতে পারি একজন চলে গেলে কি আছে, আরেকজন তো আমার থাকবে, তার কাছ থেকে সুখ পেতে থাকব। জিনিসটা তা হয় না, যদি দশ জনের থেকে সুখ পায়, তাহলে দুঃখটাও দশ গুণের সম্ভবনা বেড়ে গেল, এটা আমরা বুঝতে পারি না। মানুষ যখন ত্যাগ করতে শুরু করে, তখন যত ত্যাগ হয় তত তার শান্তি হয়। আমি যত কোল্ড ড্রিঙ্কসই খাই না কেন, কিছুক্ষণ পরে আমাকে প্রস্বাব করতে যেতেই হবে। যদি কেউ মনে করে, এত দামী কোল্ড ড্রিঙ্কস খেয়েছি, এটাকে আমি ছাড়ব না, কিছুক্ষণের মধ্যেই তার অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। মলমূত্র বিসর্জনে যেমন শরীর মন একটা শান্তি পায়, ঠিক তেমনি সংসারে যত রকম সংযোগ হতে পারে, এগুলো হল ভাল খাওয়া-দাওয়ার মত, মল-মুত্রের মত যত তাড়াতাড়ি এগুলো বিসর্জন করবে তত শান্তি। যতটুকু নেওয়ার নিয়ে এবার তাকে ছেড়ে দিতে হবে। না করতে পারলে চোখের জলে ভাসবে। ত্যাগ যত বেশি হবে সুখ তত কমবে, আনন্দ তত বেশি হবে।

সুখ ও আনন্দের তফাৎ - নিরেপেক্ষ সুখের অন্বেষণ কর

বাইরে থেকে ভাল লাগার যে ভাব আসে সেটাকে আমরা সুখ বলি, ভিতর থেকে যে ভাল লাগাটা আসে ঐ ভালো লাগাকে আমরা আনন্দ বলি। বাইরে থেকে যা কিছু আসে, সেগুলোকে আমরা ধরে নিয়ে আসি। যখন ধরে আনা বন্ধ হয়ে যায়, এমনকি যেটা নিজে থেকে আসছে, সেটাকেও যদি সরিয়ে দেওয়া হয়, বাইরেরটা পুরো বন্ধ হয়ে গেল, এবার যা কিছু থাকার সব ভিতরে থাকল। যদি এটাকে কেউ কিছু দিন জীবনে একটু প্রয়োগ করে দেখে তাহলেই বুঝতে পারবে শান্তি, আনন্দটা কেমন। কিন্তু আমরা পারি না। যে অবলম্বন গুলোকে নিয়ে আমরা চলি, সেগুলোকে আমরা ছাড়তে পারি না। পায়ে জখম হলে মানুষ ক্রাচ নিয়ে হাঁটে, প্রথম প্রথম অসুবিধা হয়, পরে অভ্যাস হয়ে যায়। পা ঠিক হয়ে যাওয়ার পর ক্রাচ সরিয়ে দিলে অস্বস্থি লাগে, ছাড়তে চায় না। আমাদের জগৎটা হল পাওয়া নিয়ে, আমরা পেতে চাই, আরও বেশি বেশি পেতে চাই। অধ্যাত্ম হল সব কিছু ছাড়া। লেকচারে, ভক্ত সম্মেলনে এগুলো শুনতে খুব ভাল লাগে, কিন্তু জীবনে অনুশীলন করতে গেলে আতঙ্ক লেগে যায়। যেটাকে মনে হয় সুখের বস্তু, বুঝতে পারি না যে সেটা একটা ঝামেলার বস্তু।

স্বামীজী সুখ-দুঃখের পারে যাওয়ার ব্যাপারে বলতে গিয়ে আরও বলছেন, All pleasures of the senses or even of the mind are evanescent; but within ourselves is the one true unrelated pleasures, dependent upon nothing. (*ইন্দ্রিয়ের – এমন-কি মনেরও সমুদয় সুখ অনিত্য; কিন্তু আমাদের ভিতরেই সেই নিরপেক্ষ সুখ রয়েছে, যে-সুখ কোন কিছুর উপর নির্ভর করে না।*) কল্পনা করা যাক একটা কেল্লা আছে, কেল্লায় একটা সিংহদুয়ার আছে, আর দরজার বাইরে আরেকটা জগৎ আছে। তিনটে জগৎ হয়ে গেল, বাইরে বহির্জগৎ, কেল্লার ভিতরটা অন্তর্জগৎ আর দরজটা হল মনের জগৎ, তিন জগতের আনন্দও তিন রকম। কেল্লার বাইরের জগৎটা হল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ। কেল্লার সিংহদ্বারে যিনি বসে আছেন, তিনি যেন হাত বাড়িয়ে বাইরের আনন্দগুলো পাচ্ছেন, খুব মজা পাচ্ছেন আর তা-নাহলেও দরজার যেখানে আছেন, ওই জায়গার আনন্দটা পাচ্ছেন। কিন্তু ভিতরে যে হাজার গুণ, কোটি গুণ আনন্দ আছে, সে আনন্দ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, ওই আনন্দের দিকে তিনি ফিরে তাকান না। এটাই বাস্তবিক।

ভিতরের ওই আনন্দটাই আধ্যাত্মিক আনন্দ। আধ্যাত্মিক আনন্দ তখনই সে পায় যখন সে সব কিছু ছেড়ে দেয়। ছাড়ার ব্যাপারটা শুরু হয় ইন্দ্রিয়সুখ ছাড়া দিয়ে, পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জগৎ থেকে যে সুখ পাচ্ছে, আগে সেই সুখ ছাড়তে হবে। ওই সুখ ছাড়ার পর, এবার মনের মধ্যে যে সংস্কারগুলো পড়ে আছে, সেখান থেকে যে আনন্দ আসে, সেগুলোকে ছাড়তে হবে। যে কোন মননশীল ব্যক্তি কবিতা পড়ে আনন্দ পাবে, কোন একটা ছবি দেখে, কোন একটা দৃশ্যের কথা মনে পড়ে আনন্দ পাবে বা অতীতের কোন ভালবাসার কথা মনন করে আনন্দ পাবে। শুধু মনে মনে ভেবে যে আনন্দ পাওয়া যায়, এটা আরও সূক্ষ্ম। স্কুলে একটা নোটিশে জানিয়ে দেওয়া হল, আগামীকাল ছুটি, তখন সেই আনন্দের আর শেষ নেই। আসল ছুটিটা যখন হয় তখন এমন আহামরি আনন্দ কিছু হয় না, কিন্তু ছুটি থাকবে, এই ভেবেই একটা আনন্দ হয়। যারা খেতে ভালবাসে, সামনের সপ্তাহে রবিবার ছুটির দিন পিকনিক হবে, সাতদিন আগে থেকেই কত আনন্দ হতে থাকবে। আর পিকনিকে গিয়ে যখন খাচ্ছে তখন ততটা আনন্দ হয় না, যতটা সাতদিন মনে মনে ভেবে যে আনন্দ হচ্ছিল। ইঞ্জেকশানের নাম শুনলেই কিছু লোকের আতঙ্ক হয়, ইঞ্জেকশান দিতে এলে দেওয়ার আগে থেকেই আতঙ্কে ঘেমে নেয়ে একশেষ। আর সত্যিকারের ইঞ্জেকশান যখন দেওয়া হয় তখন ততটা ব্যাথা লাগে না। এটা যে সুখের ক্ষেত্রেই হবে তা না, ব্যাথা বেদনার ক্ষেত্রেও একই জিনিস হয়। বাড়িতে খুব প্রিয়জনের কঠিন ব্যাধি, অনেক ডাক্তার দেখান হচ্ছে। কিছু দিন পর ডাক্তাররা বলে দিলেন, 'ওকে সারিয়ে তোলাটা দিন দিন আমাদের হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে, খুব জোর দু মাস টেনেটুনে থাকতে পারে, আপনারা মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে নিন'। শোনার পর থেকে বাড়ির সবার দুঃখের আর শেষ নেই, কিন্তু সত্যি সত্যি যেদিন মারা যাবে, দেখা যাবে তখন আর আগের মত সেই শোক বা দুঃখ হচ্ছে না। এটাতেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে, মনে যে জিনিসটা চলে সেটা অনেক বেশি সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হওয়ার জন্যই মনের সব কিছু খুব জোরালো হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সুখ আসে যায়, মনের সুখ আসে যায়, ইন্দ্রিয় আর মনের সব কিছুই ক্ষণস্থায়ী।

স্বামীজী বলছেন, but within ourselves is the one true unrelated pleasure, dependent upon nothing. (*কিন্তু আমাদের ভিতরেই সেই নিরপেক্ষ সুখ রয়েছে, যে-সুখ কোন কিছুর উপর নির্ভর করে না।*) আমাদের প্রত্যেকের ভিতরেই সেই আনন্দ রয়েছে, যে আনন্দের কারুর সাথে কোন সম্পর্ক নেই। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গার ঘাটে দাঁড়িয়ে আছেন, এক বৃদ্ধা আরেকজনকে বলছে, যাই একবার নাতির চাঁদমুখটা দেখে আসি। ঠাকুর খুব রেগে গেছেন, বলছেন, চাঁদমুখ না পোড়ার মুখ। বহির্জগতের বস্তুর উপর নির্ভর করা আর নির্ভর করে সুখ পাওয়া এবং সেই সুখ মনে মনে আস্বাদ করা, সবটাই সব কিছুর সাথে জড়িয়ে থাকে, যেমন যাকে ভালবাসে তাকে দেখে আনন্দ, তার কথা শুনে আনন্দ ইত্যাদি। কিন্তু ভিতরে যে আনন্দ রয়েছে সেই আনন্দের কারুর সাথে কোন সম্পর্ক নেই। সেইজন্য ভক্তিশাস্ত্রে বলা হয় আত্মারাম, আনন্দ তার ভিতরেই আছে, বাইরে কারুর উপর নির্ভর করতে হচ্ছে না। স্বামীজীও বলছেন, It is perfectly free, it is bilss, কেন free, (*ঐ সুখ সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত সুখ, ঐ সুখ আনন্দস্বরূপ।*) কারণ কোন কিছুর সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। আমদের জীবনের প্রত্যেকটা মুহুর্ত পরনির্ভরতাকে আশ্রয় করে আছে। একটু হাসব, তার জন্যও পরনির্ভরতা। মন খারাপ হয়ে আছে, যেই শুনল পাশের বাড়ির কোন ক্ষতি হয়ে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে মন খারাপ হওয়াটা একদিকে পড়ে থাকল, মনটা চাঙ্গা হয়ে আনন্দ এসে গেল। নিজের ভাল হোক না হোক তাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু প্রতিবেশীর, যার সাথে রেষারেষি, ক্ষতি হয়েছে শুনলেই আনন্দ হয়। মৃত্যুপথ যাত্রী মানুষও যদি শত্রুর কোন ক্ষতির সংবাদ পায়, সেও চাঙ্গা হয়ে উঠে বলে, যাক একটু শান্তি পেলাম। একটু আনন্দ, সেটাও অপরের উপর নির্ভর করে আসছে। হয় আপনজনের ভাল হোক, নয়তো অপরের ক্ষতি হোক। খেয়ে যে আনন্দ পায়, সেখানেও মানুষের আনন্দ একটা খাওয়ার উপর নির্ভর করে আছে। ভিতরের যে আনন্দ, সেই আনন্দ কারুর উপর বা কোন কিছুর উপর নির্ভর করে না, সেটাকেই বলছেন, আত্মারাম, নিজেতেই আনন্দে আছেন। আমরা যাকে happiness বলি, pleasure বলি, এটাকেই বলে আনন্দ। আমরা কথায় কথায় সব ক্ষেত্রে আনন্দ শব্দটা ব্যবহার করি, তোমাকে দেখে কত আনন্দ হল, কিন্তু প্রকৃত অর্থে ওটা হল সুখ।

সমাধিবান পুরুষের আনন্দ

স্বামীজী বলছেন, The more our bliss is within, the more spiritual we are. (*সুখের জন্য বাইরের বস্তুর উপর নির্ভর না করে যত ভিতরের উপর নির্ভর করব – যতই আমরা 'অন্তঃসুখ, আত্মারাম' হবো, ততই আমরা আধ্যাত্মিক হবো। এই আত্মানন্দকেই ধর্ম বলে।*) আমরা যে ধর্ম কথা বলি কিন্তু আসল জিনিসটা হল spirituality, আমি কতটা spiritual। Spirit থেকে spiritual শব্দ এসেছে, spirit বলতে বোঝায় ভিতরে যিনি শুদ্ধ আত্মা আছেন, তাঁকে। মানুষ যখন শুদ্ধ আত্মার দিকে এগোয়, সেটাই তখন হয়ে যায় অধ্যাত্ম। সমস্ত ধর্মই অধ্যাত্ম, সব ধর্মের একটাই উদ্দেশ্য, কিভাবে মানুষ নিজের স্বরূপে অবস্থিত হতে পারে, আত্মার জ্ঞানে কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কি করে বুঝব যে একজন লোক আধ্যাত্মিক কিনা? যে কোন সাধুবাবা দাঁড়িয়ে বলে দিতে পারে, আমি একজন সিদ্ধ মহাত্মা, আর সে নিজে থেকে যদি নাও বলে, কিন্তু দুজন চেলা তৈরী করে দাঁড় করিয়ে দেবে, তাদের দিয়েই বলাতে থাকবে, উনি খুব বড় মহাত্মা, পৌঁছে হুয়ে মহাত্মা। কিন্তু আমরা কি করে বুঝব? একটাই লক্ষণ নিজের মধ্যে আনন্দে আছে কিনা, বাইরের কোন কিছুর উপর তাঁর কোন রকম নির্ভরতা নেই। নিজের মধ্যে আনন্দে বুঁদ হয়ে আছে দেখাবার জন্য, যাতে বাইরের লোকেরা মনে করবে আমি বিরাট কিছু, অনেক সাধুবাবা গাঁজা খাওয়া শুরু করে। গাঁজা খাওয়ার পর মনে হবে শরীরটা যেন ভাসছে, আর মুখে একটা বোকা বোকা হাসি লাগিয়ে রাখবে, সবাই দেখে মনে করবে নিজের মধ্যে বুঁদ হয়ে আছেন, কত বড় সমাধিবান মহাত্মা। সমাধিবান পুরুষের আনন্দ নিয়ে বলা হয়, মন্ত্র, ঔষাধাদি দিয়েও সমাধির আনন্দ পাওয়া যেতে পারে। যারা নেশাগ্রস্ত, ড্রাগ নিয়ে তারা একেবারে বুঁদ হয়ে থাকে। তিনিও সেই ড্রাগের উপর নির্ভর করে থাকেন। কি সেই ড্রাগ? আত্মার আনন্দে আত্মারাম, সমাধিবান পুরুষের আনন্দ বাইরের কোন বস্তু, কোন ব্যক্তির উপর নির্ভর করে নেই; এটাই সমাধিবান পুরুষের পরীক্ষা। কোন রকম বাহ্যিক নির্ভরতা যদি থাকে, তা কোন বস্তু হোক, কোন ওষুধ হোক, কোন ব্যক্তি হোক, যাই হোক, বুঝতে হবে এখনও তার আধ্যাত্মিক আনন্দের আস্বাদ হয়নি। সত্যিকারের ভিতরের আনন্দে সে নিজের মত থাকবে; ঠাকুর ভ্রমরের উপমা দিচ্ছেন, ভ্রমর ফুলের মধুপান করে গুন্ গুন্ করতে থাকে, আনন্দে ভাসছে।

তিন-চার মাসের শিশু মায়ের দুধ পান করে পেট ভরে যাওয়ার পর সে নিজের মত থাকে, ও তখন আর কারুর দিকে তাকাবে না, নিজের আনন্দে নিজে নিজেই খেলা করতে থাকে। ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক পুরুষরাও ভ্রমরের মত, তিন-চার মাস শিশুর মত বাইরের কোন কিছুকেই তোয়াক্কা করেন না। যখন-তখন তাঁর দর্শন পাওয়াটাও কঠিন হয়ে যায়, যদি দেখা করতে হয়, কয়েকটা নির্দিষ্ট সময়েই দেখা করা যেতে পারে।

নিজের মধ্যে যদি কেউ বুঁদ হয়ে থাকতে পারে, তাহলে বুঝতে সে ব্যক্তি আধ্যাত্মিক। কোন বাইরের জিনিসের উপর যদি তার নির্ভরতা থাকে, তাহলে এখনও তার অনেক পথ অতিক্রম করতে হবে। অপরের সেবা করতে আমার ভাল লাগে, সমাজের সেবা করে যেতে চাই, তাতেই আমার আনন্দ, তার মানে এখনও সে আধ্যাত্মিকতার পথে পা রাখেনি, কোথাও গোলমাল আছে। মহারাজদের সঙ্গ, সাধুবাবাদের সঙ্গ আমার খুব ভাল লাগে, তার মানে এখনও সে আধ্যাত্মিক হয়নি। আধ্যাত্মিক হওয়া মানে কোন সঙ্গ থাকবে না, এমনকি শেষ অবস্থায় ঠাকুর ও ঠাকুরের মন্দিরও থাকবে না, কারণ তখন সে নিজের ভিতরেই বুঁদ হয়ে আছে। নারদীয় ভক্তিসূত্রে খুব সুন্দর এর বর্ণনা আছে, *মত্তো ভবতি স্তব্ধো ভবতি আত্মারামো ভবতি*, নিজের মধ্যে মত্ত হয়ে যান, স্তব্ধ মানে, জগতের সাথে সব সম্পর্কের নাশ হয়ে যায়। কারুর সাথে দেখা হয়ে গেল, খুব ভাল, দেখা না হলেও কিছু নেই।

The pleasure of the Self is what the world call religion, (*আত্মার যে আনন্দ, তাকেই ধর্ম বলা হয়।*) এই যে আত্মার আনন্দ জগতে এটাকেই ধর্ম বলা হয়। ধর্ম কেন? ধর্ম এইজন্য, জগতে যখনই মানুষ সুখ পায় তখন ঐ সুখের সাথে দুঃখও আসে; সুখের পর দুঃখ আবার দুঃখের পর সুখ পেতে পেতে মানুষ একটা সময় বিরক্ত হয়ে যায়। তখন সে জানতে চায়, এমন কিছু কি আছে যেখানে গেলে সত্যিকারের আনন্দ পাওয়া যাবে, যে আনন্দ কোন অবস্থায় পরিবর্তন হয় না? এমন কোন মানুষ কি আছেন যাঁর সুখের অবস্থার পরিবর্তন হয় না? তখন সে খুঁজতে শুরু করে। কিভাবে কিভাবে খোঁজ পেলো, আমি যেমনটি মানুষকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, অমুক জায়গায় ঐ রকম একজন সাধুবাবা আছেন। সাধুবাবার কাছে পৌঁছে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি এই অবস্থায় কিভাবে এলেন'? সাধুবাবা বললেন, 'আমি যেভাবে যা যা করেছি তুমিও সেইভাবে কর তোমারও এই অবস্থা হবে'। দুদিন থাকার পর লোকটি হয়ত পালিয়ে যাবে, আমার দ্বারা এসব হবে না। এই কারণেই হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরণ করা হয় না, যাকে তাকে শাস্ত্রের উপদেশ দেওয়া হয় না। সবাই মহাত্মাদের কাছে এসে এমন বোকা বোকা প্রশ্ন করবে যার উত্তর এনাদের কাছে নেই বা বললে এরা কেউ বুঝতে পারবে না। ঠাকুরের কাছে অনেকেই আসত যদি তিনি একটা তাবিজ দিয়ে দেন বা কিছু টোটকা দিয়ে দেন যাতে আমার রোগব্যাধি ভাল হয়ে যায়। আধ্যাত্মিকতা এসবের জন্য নয়।

মহাত্মাদের কাছে হল, ভাই, তুমি কি বুঝতে পারছ যে, তুমি দুঃখ-কষ্টের মধ্যে আছ? এটাও কি বুঝেছ যে সুখ বা দুঃখ কোনটাই স্থায়ী নয়? বোঝার পর তুমি কি এই জগৎ থেকে তিতিবিরক্ত হয়ে গেছ? তাহলে তোমার জন্য ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা। আধ্যাত্মিকতা মানে আনন্দ ছাড়া আমার আর কিছু লাগবে না। বেদান্তের এর খুব সুন্দর উপমা দেওয়া হয়, তপ্তো শিরোবৎ, কারুর চুলে যদি আগুন ধরে যায় সে তখন কি রকম ছটফট করতে শুরু করবে, যে করে হোক চুলের আগুনটা নেভাতে হবে। এই জগতের প্রতি যদি কারুর এই ভাব এসে থাকে, তবেই তার জন্য ঠিক ঠিক ধর্ম। যদি এই ভাব না এসে থাকে, তাহলে তাকে এখনও অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। সেইজন্য ওনারা সমাজে ধর্মের প্রয়োগ করেন, কারণ একদিনে তো কেউ আধ্যাত্মিক হতে পারবে না। মানুষ ভোগ করতে চাইছে করুক, কিন্তু তার সাথে সাথে একটু যোগ করুক, একটু ধর্ম করুক। যদি একটু একটু ধর্ম করে তাহলে অতটুকু তো তার সুখ শান্তি আসবে। সমাজে ধর্ম নামিয়ে দেওয়াকে আমরা বন্ধন মনে করি, কিন্তু একেবারেই তা নয়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের যে সুখ সেই সুখের বাইরেও যে একটা সুখ আছে, যে সুখটা চিরস্থায়ী, সেই সুখকে দেখানোর জন্য, বোধ করানোর জন্যই ধর্ম; যার উচ্চতম অবস্থা হল যেখানে সে একজন যীশু বা ভগবান বুদ্ধের মত হয়ে যেতে পারে। এরই নিম্নতম অবস্থা হল, পূজা-অর্চনা করা, পুরোহিতকে দক্ষিণা দেওয়া, তীর্থ করা, গরীব-দুখীদের দান করা ইত্যাদি। এতেও মানুষের একটা আনন্দ হয়। যখন এটাই একটা ঝামেলার ব্যাপার মনে হবে, অনেক টাকা-পয়সা খরচ হয়ে গেল, তখন বুঝতে হবে এতে আর ধর্মীয় ভাব থাকল না। যেমন বিবাহের ক্ষেত্রে, মেয়ে বা ছেলের বিয়েতে প্রচুর টাকা খরচ করে

বিরাট পার্টি দেওয়া হল, কত কষ্ট করে উপার্জিত অর্থ শেষ হয়ে গেল, তখন আর এতে ধর্মের ভাব থাকল না, এটাই তখন সামাজিক ব্যাপার হয়ে গেল। সমাজের গণ্যমান্য কিছু লোক আর নিজের পরিচিতদের নিমন্ত্রণ করে এলাহি রকমের খাওয়ার আয়োজন করবে; এরমধ্যে ধর্মের কোন ভাব নেই। ধর্মের ভাবে করা মানে, যতটুকু ক্ষমতা সেই ক্ষমতানুযায়ী সে কিছু লোককে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াবে, আর তাতে তার আনন্দ হবে, তার মনে হবে যে আমি প্রাণ দিয়ে সবার সেবা করলাম, বদলে সে আমার সন্তানকে আশীর্বাদ করবে যাতে তার নূতন জীবন সার্থক হয়। স্বামীজী এটাই বলছেন, pleasure of the self এই জিনিসটা যখন জগতের উপর প্রয়োগ করা হয় তখন এটাকেই ধর্ম বলা হয়।

এখানে এটা পরিষ্কার যে জাগতিক সব রকম আনন্দ থেকে মনকে ধীরে ধীরে সরিয়ে না আনলে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা কিছুই হবে না। তবে এটাও ঠিক যে, দুম্ করে জাগতিক সুখ বা আনন্দ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে এলে মানুষ পাগল হয়ে যাবে। সেইজন্য শুধু বাহ্যিক জগৎ থেকে সরে এলে হবে না, সরে এসে অন্তর্জগতে ঢুকতে হবে। বৈষয়িক জগৎ থেকে সরে এসে অন্তর্জগতে না ঢুকলে পাগল হয়ে যাবে। সেইজন্য দেখা যায় বেশির ভাগ সাধু সন্ন্যাসীরা পাগল হয়ে যান। কারণ তাঁর বহির্জগৎ চলে গেছে, কিন্তু অন্তর্জগতে ঢোকেননি। শুধু মাত্র ত্যাগেই অন্তর্জগতে ঢুকতে পারবে না, যতক্ষণ না এই বহির্জগতের ব্যাপারে মোহ ভঙ্গ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সে ত্যাগ করতে পারবে না। শুধু আমাদের ধর্মেই নয়, সমস্ত ধর্মেই বলা হয় যে, বাপু মোহ ভঙ্গ তোমার এত সহজে হবে না, মোহ ভঙ্গ হতে সময় লাগে। তবে একটু একটু করে এখনই ধর্মের কথা জেনে রাখো, মোহ ভঙ্গ যখন হবে তখন যাতে চটপট সব কিছুকে ধারণা করে নিয়ে অন্তর্জগতে প্রবেশ করতে পার। তখন তুমি আর পাগলের মত ঘুরে বেড়াবে না, পঞ্চাশটা প্রশ্নও মাথায় আসবে না। ভগবান বুদ্ধ যেমন ছোটবেলা থেকেই সব কিছু জানতেন, যেদিন তাঁর মোহ ভঙ্গ হল, এই জগতে কিছু নেই, সেদিনই তিনি বেরিয়ে যেতে পারলেন। এই বেরিয়ে যাওয়াটা ভগবান বুদ্ধের এক দিনেই আসেনি, তিনি জানতেন এখানে সাধু মহাত্মারা আছেন, তপস্যা কি জানতেন। এই জগতে কিছু লোক আছেন যাঁরা পুরোপুরি ঈশ্বরের সমর্পিত, ঠাকুর যেমন বলছেন কুটো দিয়ে বাঁধা, অগ্নির একটু স্ফুলিঙ্গ লাগলেই তাঁরা তেড়েফুড়ে জগৎ সংসার থেকে বেরিয়ে আসেন। গীতায় ভগবান বলছেন, *তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্*, যখন সময় হয় তখন আগের জন্মে যে জায়গাতে সাধনা শেষ হয়েছিল, ঠিক সেই জায়গার সাথে তাঁর সংযোগ হয়ে সে বেরিয়ে চলে যাবে। বাকিদের জন্য সব রকম ধর্ম সাধনা, তপস্যা, এটা করো, সেটা করো।

বহির্জগৎ অন্তর্জগতেরই ছায়াময় প্রক্ষেপমাত্র

বহির্জগতের সুখ, অন্তর্জগতের আনন্দের কথা বলতে বলতে এবার স্বামীজী বলছেন, The internal universe, the real, is infinitely greater than the external, which is only a shadowy projection of the true one. (*অন্তর্জগৎ - যা বাস্তবিক সত্য, তা বহির্জগতের চেয়ে অনন্তগুণ বড়। বহির্জগৎটা সেই সত্য অন্তর্জগতের ছায়াময় প্রক্ষেপমাত্র।*) বহির্জগৎ থেকে অন্তর্জগৎ অনেক বৃহৎ, শুধু বৃহৎই নয়, অনন্তগুণ বড়। অনেক বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী মহারাজদের বলতে শোনা যায়, 'আমার এত বয়স হয়ে গেল এতদিনে গিয়ে ধর্মতত্ত্বগুলি বুঝতে শুরু করেছি, অথচ স্বামীজী তিরিশ বছর বয়সে শাস্ত্রের সব তত্ত্বগুলোকে বুঝে নিয়ে লেকচার দিয়ে যাচ্ছেন, এই বয়সে স্বামীজীর কথাগুলো পড়ে, খেটেখুটে চিন্তা-ভাবনা করে একটু বুঝতে পারছি'। আমাদের সমস্যা হল, আমাদের কোন অনুভূতি নেই, কোন আইডিয়া নেই, কোন জ্ঞান নেই, ফলে আমরা ধারণা করতে পারি না যে অন্তর্জগৎ কত বিশাল। অন্তর্জগৎ হল রাজাধিরাজ। এর আগে আমরা কেল্লার উপমা নিয়েছিলাম, কেল্লার মূল ফটক আছে, ফটকের বাইরে আবার জগৎ আছে। কেল্লার ভিতরে যিনি বসে আছেন তিনি হলেন রাজা, রাজার রাজকীয়তার সামনে কেল্লার বাইরের লোকগুলো দাঁড়াতেই পারে না, ওরা সবাই তাঁর চাকর, অতি নগণ্য। আমাদের দুর্ভাগ্য হল, আমরাই সেই রাজা বা সেই রাজার সাথে এক, অথচ আমরা সবাই গোবরকুড়ানি, ঘুটেকুড়ানির পিছন পিছন দৌড়াচ্ছি। আমাদের মর্যাদাকে যে কোথায় নামিয়ে এনেছি আমরা কল্পনাই করতে পারি না।

সংস্কৃতে একটা নামকরা কাহিনী আছে, এক রাজা জঙ্গলে শিকার করতে গিয়ে কিভাবে মন্ত্রী, সেনাপতি সবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন জঙ্গলে হারিয়ে গেছে। জঙ্গলের ভিতর যেতে যেতে গভীর বনের ভিতর সে দেখতে

পেল একটা বাড়ি। সেই বাড়ি থেকে এক সুন্দরী যুবতী নারী বেরিয়ে এসে রাজাকে জল দিল। রাজা সেই নারীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছে। মুগ্ধ হয়ে যাওয়ার পর এবার রাজা বলছে তাকে বিয়ে করবে। তারপর জানা গেল মেয়েটি হল সেই বংশের যাদের কাজ মোষ কাটা আর মোষের চামড়া বিক্রি করা। রাজা সব কিছু ছেড়ে মেয়েটির সঙ্গে থাকতে রাজী হয়ে গেল। রাজা ওখানেই থাকতে লাগল, মোষ কাটে আর মোষের চামড়া বিক্রি করে। হঠাৎ একদিন দেখে সেই রাজ্যকে রাজার লোকেরা আক্রমণ করেছে। রাজার মন্ত্রী দেখে, আরে এই তো সেই আমাদের হারিয়ে যাওয়া রাজা। রাজাকে এক্ষুণি আমাদের রাজ্যে ফেরত নিয়ে যেতে হবে। এখন সে দেখছে আমি যে রাজা এটা তো স্বপ্ন দেখছিলাম। রাজা বুঝতে পারছে না, কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যা। খুব মজার কাহিনী, শেষ পর্যন্ত বোঝা যায় না, কোনটা স্বপ্ন, কোনটা বাস্তব। কিন্তু শেষ কথা হল, রাজা নিজের রাজ মর্যাদা হারিয়ে এক কষাই বংশের মেয়েকে বিয়ে করে রাজকার্য ছেড়ে মোষ কাটছে আর মোষের চামড়া বিক্রি করছে।

আমাদের অবস্থাও ঠিক তাই, আমরা বাস্তবে যাই হই না কেন, আত্মা হই, ব্রহ্ম হই, ঈশ্বরের সন্তান হই, আসল জগতে আমরা কাদের সাথে ঘুরে বেড়াচ্ছি ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। বলবে, যাদের সাথে ঘুরছে সেও তো আত্মা। না, তা কি করে হবে, তার তো সেই বোধ নেই, কিন্তু আপনার আমার এই বোধটা এসে গেছে। আমরা বলি বসুধৈব কুটুম্বকম্, আমরা সবাই একটা পরিবার। আমি আপনি মানছি যে আমরা একটা পরিবার, কিন্তু সন্ত্রাসবাদীরা, যারা বোমা মেরে নিরীহ মানুষগুলোকে খুন করছে, তারা কি মানছে? যদি না মানে, তাহলে কিছুক্ষণের জন্য বসুধৈব কুটুম্বকম্ এই ভাবকে সরিয়ে রেখে তাদের সাথে সেই ভাবেই মোকাবিলা করতে হবে।

ইদানিং অনেক সিনেমাতে অনেক রকম বিতর্ক হয়। সিনেমার মাধ্যমে এরা ইতিহাসকে বিকৃত করছে, আর দোহাই দিয়ে বলছে এটা আমাদের creative license। বেশ কিছু সমাজ আছে, ধর্ম আছে, আপনাদের creative license নিয়ে ওদের সঙ্গে থেকে দেখুন না, দু দিনেই শিখিয়ে দেবে creative license দেওয়া যায় কি, যায় না। আমরা কিভাবে নিজেদের মর্যাদাকে নীচে নামিয়ে কাদের সাথে মিশছি, এই ব্যাপারে কোন ধারণাই নেই। আমরা যখন বলি withdraw কর, withdraw করা এই নয় যে সবার সঙ্গ থেকে withdraw কর, যারা ওই মর্যাদার স্তরে আছে তাদের সাথে তুমি এক থাক। কিন্তু তা না করে তুমি চোর ছ্যাঁচড়দের সাথে ঘুরে বেড়াচ্ছ। তুমি তোমার মর্যাদার দিকে একবার তাকাও। একটা কিছু দেখলাম, কাউকে দেখলাম, দেখার পর আমি সম্মোহিত হয়ে গেলাম, এরপর ওর সাথে পরিচয় হতে ওর ব্যাপারে আরও কিছু সত্য জানলাম, যেগুলো আমার মর্যাদার সাথে একেবারেই খাপ খায় না, তা সত্ত্বেও মিশছি, কারণ সম্মোহনের ওই আবিলতার ঘোরটা কিছুতেই আমাদের যেতে চায় না। এই যে রাজার গল্প বলা হল, রাজা যদি ভাবত মেয়েটির বাবা কি করে? ইস্! এই নোংরা কাজ করে! আমি তো মেয়েটিকে ভালবেসেছি, মেয়ের বাবাকে তো ভালবাসিনি, বাবার কর্মকে তো ভালবাসিনি, এটাকেই বলে নিজের মর্যাদার সাথে compromise করে নেওয়া। একটা মেয়ের জন্য এমন একটা বংশের সাথে সে নিজেকে জুড়ে দিচ্ছে, যেটা তার জন্য একেবারেই যোগ্য নয়। মেয়েটি নিজেই যদি গোলমেলে হত তাহলে তো সে ওদিকে যেতই না। আসল যে জগৎ, যেটা আমাদের অন্তর্জগৎ সেই জগতের ব্যাপারে আমাদের কোন ধারণা নেই, আমাদের বিশ্বাস হয় না। আমরা জানিই না যে, এই বহির্জগতটা অন্তর্জগতেরই প্রতিফলিত আলোছায়া মাত্র।

ছোটবেলায় অশ্বত্থামা দুধ খাবার জন্য মায়ের কাছে আবদার করছে, মা তাকে আটা গুলে জলে মিশিয়ে দুধ বলে খাইয়ে দিল। মা বলছে এটাই দুধ, অশ্বত্থামাও আনন্দ করে বলছে, বাঃ এটাই দুধ। সেই দেখে তার বন্ধুরা হাসছে। স্বামীজী এটাকেই বলছেন shadowy projection, আলোছায়ার খেলা। এই জগৎটাও আসল বস্তু নয়, এটা শুধু আলোছায়ার খেলা। সিনেমাতে যেমন shadow projection করে, ঠিক তেমনি এই জগৎটাও shadow projection। আসল বস্তুকে ছেড়ে দিয়ে ওই shadow projectionকে নিয়ে আমরা নাচানাচি করছি, লাফাচ্ছি, আনন্দ করছি আর মনে করছি জগৎ বিরাট কিছু। আসল বস্তু আমি নিজে, অথচ আমরা ওই ছায়ার পিছনে দৌড়ে যাচ্ছি, এর থেকে আর দুর্ভাগ্য কি হতে পারে। স্বামীজী বলছেন, This world is neither true nor untrue, আমরা যে জগৎকে দেখছি, আসলে এর কোন সত্তা নেই।

কিন্তু তাই বলে যে এর কোন সত্তা নেই এই কথাও বলা যাবে না, এটাই মায়া, আছে অথচ নেই। স্বামীজী তাই বলছেন, it is the shadow of truth, যেটা সত্য সেটারই এটা আলোছায়া। সেইজন্য বলা যাবে না এটা কিছুই না, মৃগমরীচিকা তাও বলা যাবে না, কারণ shadow রয়েছে, সেই সাথে এটা যে সত্য তাও বলা যাবে না, কারণ এটা ছায়া। ছায়া বলে ওটা নিত্য নয়, ওটা ছায়া সেইজন্য সত্য নয়।

স্বামীজী কবির উক্তি দিয়ে বলছেন, 'Imagination is the gilded shadow of truth', কল্পনা হল বাস্তবিক বস্তুর shadow। কি রকম? Gilded, সোনা দিয়ে মোড়ানো, এটাই কল্পনা। বাকি সব জিনিসগুলোই ছায়া, কিন্তু আমরা যখন কল্পনা করি, কল্পনাতে আমরা কোন জিনিসকে পছন্দ করি, কোন কিছুকে চাই। এগুলো হল সব সোনার জল লাগানো, দাম বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য সোনার জল দেওয়া হয়, কিন্তু আসলে ওটা ছায়া। ঠাকুর বলছেন, সাপের মাথায় মণি, কিন্তু সাপ মরা ব্যাঙ খেয়ে মরে। আমাদের ভিতরেও কুবেরের থেকেও বেশি ধনরাশি, আমরাই সব কিছুর মালিক, অথচ আমরা জগতের অতি সাধারণ জিনিসের জন্য দৌড়াচ্ছি। সমাধিবান আচার্যরা এসে আমাদের এই সত্যটাকে সামনে তুলে ধরেন, সেখান থেকে আমরা কিছু শিক্ষা পাই বা আমাদের নিজেদের আরও উন্নত করতে পারি, কিন্তু আবার আমরা ভুলে গিয়ে পিছনের দিকে ফেরত চলে যাই। তবুও ওই যে কিছুক্ষণের জন্য যে একটু ধারণা বা শিক্ষা পেয়েছিলাম তাতে ওই সংস্কারটা থেকে যায়। এই সংস্কারই ধীরে ধীরে মানুষকে আধ্যাত্মিক পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

সৃষ্টিতে আমরাই প্রবেশ করে সৃষ্টিকে প্রাণবন্ত করি

জগতে আমরা যা কিছু পেতে চাই, যে যে জিনিস থেকে আমরা পালাতে চাই, বস্তুর মূল্য আমাদের কাছে কিভাবে নিরুপণ হয়? একটা জিনিসকে আমরা কেন ভালবাসি? কোন জিনিস থেকে আমরা কেন সরে আসি? সেই ব্যাপারে স্বামীজী ব্যাখ্যা করছেন। ব্যাখ্যা করার আগে বলছেন, এই জগৎটা কি, হিন্দুরা জগৎকে কিভাবে দেখে। বেদে সৃষ্টির দুটো খুব নামকরা বর্ণনা দেওয়া হয়েছে – পুরুষসূক্তম্ এবং নাসদীয় সূক্তম্। নাসদীয় সূক্তম্ বলছে, তিনিই আছেন, শুদ্ধ সচ্চিদানন্দই আছেন আর তাঁরই প্রকৃতি হল আকাশ ও প্রাণ। আকাশ হল ম্যাটার আর প্রাণ হল এনার্জী, দুটোই খুব সূক্ষ্ম। প্রাণ যখন আকাশের উপর আঘাত হানতে থাকে, আঘাত করতে করতে তখন এই জগৎ সৃষ্টি হয়। পুরুষসূক্তম্ বলছে, ভগবানই সব কিছু হয়েছেন।

এই দুটো সিদ্ধান্তকে অবলম্বন করে পুরাণে দেখানো হয়েছে সৃষ্টি কিভাবে হয়। তাতে বলা হয় ভগবান আছেন, তিনি যখন ইচ্ছা করেন সৃষ্টি হোক তখন ভগবানের যে প্রকৃতি বা শক্তি, সেই প্রকৃতিতে একটা ক্ষোভণ হয়, প্রকৃতি যেন নড়ে ওঠে। বাচ্চারা যে গুলি খেলে, সেই গুলি গুলোকে কেউ পরপর সাজিয়ে স্তূপের মত করে রেখেছে, সব কটা গুলি ব্যালেন্সে দাঁড়িয়ে আছে। এবার হাল্কা করে যদি গুলির ওই স্তূপে ফুঁ দেওয়া হয় তাতেই গুলির ব্যালেন্স নষ্ট হয়ে দুমদাম করে লাফাতে লাফাতে সারা জায়গায় গড়িয়ে যাবে। মার্বেল হল কাঁচের, একটা নিরেট বস্তু। যদি আমরা কল্পনা করে নিই, যার এনার্জি অফুরন্ত আর তিনটে রঙ আছে, লাল, কালো আর সাদা। অফুরন্ত এনার্জিতে তিনটে রঙ এক অপরের মধ্যে পাল্টাচ্ছে। লাল রঙের লালটা কখন কমে যায়, কমে গিয়ে কখন সাদা হয়ে যায়, আবার সেখান থেকে লালচে হয়ে যায়, লালচে থেকে আবার কখন কালো হয়ে যায়। এই তিনটে রঙ হল সত্ত্বগুণ, রজোগুণ আর তমোগুণ। তিনটে সব সময় একসাথে থাকে, এই তিনটে এক অপরের মধ্যে পরিবর্তিত হতে থাকে। এরা সব সময় চলমান, সব সময় দৌড়াচ্ছে, এটাই সৃষ্টি। সৃষ্টি মানে সাম্য অবস্থটা নষ্ট হয়ে যাওয়া। একটা ব্যালেন্স ছিল, মার্বেলের উপমা দেওয়া হল, সেই ব্যালেন্সটা বিগড়ে গেছে, ব্যালেন্সটা বিগড়ে যেতেই এই তিনটে চলমান হয়ে যায় আর নিজেদের মধ্যে পরিবর্তিত হতে থাকে, এটাই সৃষ্টি।

আমরা যা কিছু দেখছি, টিউবলাইট জ্বলছে, টিউবলাইটের ভিতরে ইলেক্ট্রিসিটি প্রবাহিত হচ্ছে আর ইলেক্ট্রনগুলো দৌড়াচ্ছে, ফলে আমরা আলো দেখছি। আমাদের শরীরের ভিতরে রক্ত দৌড়াচ্ছে, সেইজন্য আমরা বেঁচে আছি। সৃষ্টির সব কিছুতে এনার্জি কাজ করছে, সব সময় দৌড়াচ্ছে। এই যে বৈষম্য অবস্থা, এটাই সৃষ্টি। এরা যখন সাম্য অবস্থায় চলে যায়, দৌড়ান যখন বন্ধ হয়ে গেল, তখন প্রলয়, সৃষ্টির নাশ হয়ে যায়। প্রলয় বলতে আমরা মনে করি বিরাট কোন শক্তি এসে সৃষ্টিটাকে নাশ করে দিচ্ছে, কিন্তু জিনিসটা পুরো

উল্টো। শক্তি এসে যখন ধাক্কা মারে তখন সেটা সৃষ্টি, আর যখন ওই শক্তিটা চলে গেল বা থেমে গেল, থেমে যাওয়া মানে মরে যাওয়া। আমরা যখন বলি, আর কত দৌড়াব, সারা জীবন দৌড়েই যাচ্ছি, তার মানে আমি নিজের কাহিনীকে শেষ করতে চাইছি। যতক্ষণ দৌড়াচ্ছে ততক্ষণই জীবন চলছে।

পুরাণে সৃষ্টির বর্ণনা করতে গিয়ে খুব সুন্দর একটা কাহিনী নিয়ে আসা হয়েছে; তাঁর ইচ্ছায় যখন তিন গুণের দৌড় শুরু হয়ে গেল, তখন বস্তুর সৃষ্টি হয়ে গেল, ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হয়ে গেল। চক্ষু ইন্দ্রিয়ের কাজ হল আলোকে ধরে নেওয়া। এখন আলোরও সৃষ্টি হয়ে গেছে আর চক্ষু ইন্দ্রিয়েরও সৃষ্টি হয়ে গেছে, কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলি কেউই কাজ করতে পারছে না। তখন সব ইন্দ্রিয় একজোট হয়ে ভগবানের কাছে উপস্থিত হয়ে বলছে, হে ভগবান! আপনি তো আমাদের সৃষ্টি করে দিলেন কিন্তু আমরা কাজ করতে পারছি না। এগুলো আখ্যায়িকা, আখ্যায়িকার মাধ্যমে একটা তত্ত্বকে বোঝান হচ্ছে। বস্তু জড়, ইন্দ্রিয়গুলিও জড়, বস্তু যে যে জিনিস দিয়ে তৈরী হয়, ইন্দ্রিয়ও সেই একই জিনিস দিয়ে তৈরী। ভগবান তখন নিজে এই জগতের মধ্যে ঢুকে গেলেন। ঢুকে যাওয়ার পর দেখা গেল, এবার ইন্দ্রিয়গুলোর মধ্যে কার্য করার ক্ষমতা এসে গেল। এরপর ইন্দ্রিয়গুলোর নড়াচড়া করার ক্ষমতা এসে গেল, এবং সৃষ্টিও ঠিক ঠিক মত এগিয়ে চলল।

এটা গেল সমষ্টির স্তরে সৃষ্টি কিভাবে হয় তার বর্ণনা। এবার ব্যষ্টি, আমরা যে অবস্থায়, যেখানে আছি, সেখানেও ওই একই জিনিস ঘটে। যেমন এই পেন দেখছি, পেনের একটা objective reality আছে, আবার এর একটা বাস্তবিক সত্তা আছে, এটা কলম, এটা দিয়ে লেখা হয়। এই পেনকে যদি কেউ স্পর্শ না করে, পেন যেখানে রাখা হয়েছে সেখানেই পড়ে থাকবে। যে জানে না পেন কি জিনিস, তার কাছে একটা পেন্সিলও যা, একটা পেনও তাই, সব কিছুই তার কাছে সমান। যে জানে এটা পেন, টেবিলে এই পেন পড়ে থাকলে সে বলবে, আরে এটা তো পেন। দামী কোম্পানীর পেন হলে বলবে, এটা পার্কার কোম্পানীর পেন। একটা বাচ্চা ছেলে বলবে, এটা তো একটা পেন, পরীক্ষার সময় এই পেন দিয়ে লিখতে হয়। পেন দেখলেই ছেলের পরীক্ষার কথা মনে পড়ছে, আমি দেখছি এটা খুব দামী পেন।

রসগোল্লা দেখলে আমাদের অনেকের জিহ্বা দিয়ে জল পড়ে, রসগোল্লা কী সুস্বাদু, কী মিষ্টি। অন্য দিকে একজন ডায়বেটিক রোগী দেখে বলবে রসগোল্ল বিষ। রসগোল্লার মধ্যে তাহলে কি আছে, বিষ কি রসগোল্লাতে আছে নাকি ওই ডায়বেটিক রোগীর মনের ভিতরে? রসগোল্লা যদি objective হত তাহলে বাচ্চার মনেও ওটাকে বিষ মনে হত। তাহলে কি হচ্ছে? ওই রসগোল্লা একটা বস্তু, ওর মধ্যে আমরা গিয়ে প্রবেশ করে যাচ্ছি। যেমন ঈশ্বর ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে প্রবেশ করাতে তারা প্রাণ পেয়ে গেল, টিউবলাইটের মধ্য দিয়ে ইলেক্ট্রিসিটি গেলে টিউবলাইট প্রাণ পেয়ে যায়, ঠিক তেমনি এই রসগোল্লারও কোন দাম নেই। কিন্তু আমি আপনি যখন রসগোল্লাকে দেখছি, তখন আমরা ওকে দেখে আমরা ওকে প্রাণবন্ত করে দিই। প্রাণবন্ত করে দেওয়ার পর যদি আমার পছন্দের হয় তখন রসগোল্লা হয়ে যাবে আমার কাছে অমৃত। একজন মিষ্টি খুব একটা পছন্দ করত না, খেতেও চাইত না। কি একটা অসুখ হওয়ার পর সেখান থেকে তার ডায়বেটিস রোগে ধরল। বন্ধুরা তাকে বলছে, তোমার তো ভালই হল, এমনিতেই তুমি খুব একটা মিষ্টি খেতে চাইতে না। বন্ধুদের সে বলছে, যেদিন থেকে শুনলাম আমার ডায়বেটিস হয়েছে সেদিন থেকে আমার মিষ্টি খাওয়ার খুব ইচ্ছে হতে লাগল। এই জিনিসটার কথাই বলা হচ্ছে, আগে মিষ্টি জিনিসটা তার কাছে নিউট্রাল ছিল, এখন সে মিষ্টির মধ্যে ঢুকে থাকতে চাইছে।

বলা হয় যে লায়লা-মজনু কাহিনীতে লায়লা নাকি আহামরি সুন্দরী ছিল না। লায়লা-মজনুকে কেন্দ্র করে দুটো উপজাতির মধ্যে লড়াই বেঁধে গেছে। লড়াই লেগে যাওয়াতে রাজা লায়লা আর মজনু দুজনকেই ডেকে পাঠালো। রাজা দুজনকে দেখে হতবাক, মজনুকে দেখতে এত রূপবান আর লায়লাকে দেখতে কিছুই না। রাজা মজনুকে কাছে ডেকে এনে বলছে, তুমি এই রকম বাজে দেখতে মেয়েকে ভালবাসতে গেলে, এর থেকে কত সুন্দরী মেয়ে তোমার জন্য রয়েছে। রাজার কথার উত্তরে মজনু খুব নামকরা কথা বলছে, জাঁহাপনা! আপনি নিজের চোখ দিয়ে লায়লাকে দেখবেন না, আমার চোখ দিয়ে দেখুন। ইংরাজীতেও এই ধরণের খুব নামকরা কথা আছে Beauty lies in the eyes of the beholder। যে দেখছে সৌন্দর্য তার চোখেই বিরাজ করে, সৌন্দর্য মুখে থাকে না, কানে থাকে না। এগুলোকে নিয়ে প্রচুর কাহিনী, প্রচুর মজার জোকস্

আছে। মানুষ যাকে ভালবাসে, তাকে নিজের চোখ দিয়ে দেখেই ভালবাসে। এটাকেই যদি আরেকটু গভীরে নিয়ে যাওয়া হয়, যে কোন বস্তু, পেন, রসগোল্লা, ফুল, সব হল সম্পূর্ণ রূপে জড়, মৃত, আমরাই এদের প্রাণবন্ত করে দিচ্ছি। একটা নারীর যে সৌন্দর্য, সৌন্দর্য জিনিসটাই dead, আমরাই ওর মধ্যে ঢুকে প্রাণবন্ত করে দিই।

স্বামীজী এটাই বলছেন, We enter into creation, সৃষ্টির মধ্যে আমরা ঢুকে যাই। ভগবান যেমন সৃষ্টি করে ওর মধ্যে ঢুকে যান, ঢুকে যান বলে সৃষ্টি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। ওর মধ্যে ঢুকে ভগবান নিজেই মুগ্ধ হয়ে যান, আঃ কী দারুণ করলাম। গ্রীকদের অনেক মাইথোলজির মধ্যে একটা খুব নামকরা মিথ্ আছে যার নাম Pygmalion, বার্ণাড 'শ এর আবার নাট্যরূপও দিয়েছিলেন। একজন ভাস্কর এত সুন্দর একটা মূর্তি বানিয়েছে যে, সেই মূর্তি দেখে নিজেই মুগ্ধ হয়ে গেছেন। এমনই মুগ্ধ হয়ে গেছেন যে, সব কিছু ছেড়ে তিনি নিজের সৃষ্টির দিকে সারাক্ষণ তাকিয়ে বসে আছেন। সেই শিল্পী পরে আর কিছু সৃষ্টি করলেন না। যিনি স্রষ্টা তিনিই নিজের সৃষ্টিকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। সৃষ্টি পুরুষ আর প্রকৃতির খেলা, পুরুষ প্রকৃতিকে প্রাণবন্ত করে দেয়, কিন্তু প্রকৃতিকে দেখে পুরুষ মুগ্ধ হয়ে যায়, আর সে প্রকৃতিকে ছাড়তে চায় না। আমাদের ব্যক্তি স্তরে ঠিক একই জিনিস হয়, আমরাও কোন জিনিসকে, কোন মানুষকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যাই। ঠাকুর বলছেন, মেয়েদের মা বলে ডাকতে, কিন্তু পুরুষ ভেড়ার বাচ্চার মত ম্যা ম্যা করে মেয়েদের পিছনে দৌড়ে যায়।

যেমনি আমরা ওই সৃষ্টির মধ্যে ঢুকে গেলাম, সব কিছু জীবন্ত হয়ে গেল, এটাকেই স্বামীজী বলছেন, We enter into creation, and then for us it becomes living। এই টিউবলাইট কিছুই না, কিন্তু যেমনি ওর মধ্যে ইলেক্ট্রিসিটি এসে গেল, টিউবলাইট আলোয় ঝলমল করে প্রকাশমান হয়ে গেল। আমার এই পেন, এটা একটা জড়, প্রাণহীন, কিন্তু যেমনি আমি এর মধ্যে ঢুকে গেলাম, এটা প্রাণবন্ত হয়ে গেল। প্রাণবন্ত হয়ে যাওয়ার পর আমরা কোন জিনিসকে পছন্দ, কোন জিনিসকে অপছন্দ করতে থাকি, কোন জিনিসকে কাছে টেনে নিতে চাই, কোন জিনিসকে ভয়ে বা ঘৃণায় দূরে সরিয়ে রাখতে চাই। স্বামীজী বলছেন, Things are dead in themselves; only we give them life, and then, like fools, we turn around and are afraid of them, or enjoy them. (*আমরাই জগতের পদার্থসমূহকে জীবন দান করছি, কিন্তু আবার মুর্খের মতো ঐ কথা ভুলে গিয়ে কখন তা থেকে ভয় পাচ্ছি, কখন আবার তাই ভোগ করতে যাচ্ছি।*) আমরাই মৃত বস্তুতে জীবন দিয়ে দিলাম, জীবন দেওয়ার পর আমরা ওটা থেকে ভয় পেয়ে সরে আসি বা তাকে ভালবেসে ফেলি। আমাদের হয়ত এই ধরণের কথা শুনে মনে হতে পারে যে এগুলো শুনতে ভাল লাগে কিন্তু বাস্তবে তা নয়। কিন্তু এর পুরোটাই একেবারে অক্ষরে অক্ষরে সত্য। আমাদের ইমোশান যেখানেই বেরিয়ে আসে, সেখানেই যদি একটু বিচার করে দেখি, একটা বস্তু ছিল, মানুষও আসলে একটা বস্তু, তার মধ্যে আমি আপনি ঢুকে যাচ্ছি, ঢুকে গিয়ে তাকে প্রাণবন্ত করে দিচ্ছি। প্রাণবন্ত করার পর হয় আমরা তার কাছে যেতে চাই, নয়তো দূরে সরে থাকতে চাই। জগতে যে জিনিসগুলোকে আমরা ভয় পাই, যেসব জিনিসকে আমরা ঘৃণা করে, সেটাকে আমরাই মূল্য দিয়ে রেখেছি। সব কিছু থেকে নিরপেক্ষ হতে শুরু করে দিলে বস্তুর আকর্ষণ বিকর্ষণ কোনটাই আর থাকবে না। আমরা অনেক সময় অসহায় হয়ে বলে ফেলি, যা হবার হবে, তার মানে এবার সে indifferent হয়ে গেল। এতক্ষণ সে বিরক্ত ছিল, অশান্ত ছিল, শেষে এবার বলছে, যা হবার হবে। একগুচ্ছ ইমোশানকে নষ্ট করার পর এবার আমরা বলছি, যা হয় হবে। স্বামীজী বলছেন, like fools, মুর্খের মত আমাদের আচরণ। ঘৃণার বস্তু, ক্রোধের বস্তু, ভয়ের বস্তু, ভালবাসার বস্তু আমরাই সৃষ্টি করি, কারণ আমরা ওর মধ্যে ঢুকে গেছি, আমরাই ওর সাথে নিজেকে জুড়ে দিয়েছি। আমিই জুড়লাম, জোড়ার পর আমি এবার ওকে পাওয়ার জন্য হয়তো ওর দিকে ছুটে যাচ্ছি, নয়তো ওর থেকে ভয়ে পালাচ্ছি।

একটা নামকরা গল্প আছে, ছোটবেলা অনেকেই এই গল্প পড়ে থাকবে। চারজন পণ্ডিত ছিল, চারজনেরই নাকি প্রচুর যোগশক্তি সম্পন্ন। একবার জঙ্গল দিয়ে যেতে যেতে একটা হাড় দেখে একজন পণ্ডিত বলছে, 'আমি এই হাড় দেখে বলে দিতে পারি এটা কোন বাঘের হাড়'। দ্বিতীয় পণ্ডিত বলছে, 'ও তাই, আমি তো এর থেকে একটা বাঘ বানিয়ে দিতে পারি'। মন্ত্র মারল একটা হাড়ের বাঘ হয়ে গেল। তৃতীয় পণ্ডিত বলছে, 'আমি এর মধ্য চামড়া, মাংস, মজ্জা সব দিতে পারি'। মন্ত্র মারল সঙ্গে সঙ্গে তাই হয়ে গেল। চতুর্থ পণ্ডিত বলল, 'আমার এমন ক্ষমতা যে আমি এর মধ্যে প্রাণ দিয়ে দিতে পারি'। মন্ত্র মারল, বাঘ জীবন্ত হয়ে

চারজনকেই খেয়ে ফেলল। আমরাই সব তৈরী করছি, এরপর যখন সেই আমাকে আক্রমণ করছে, আমরা তখন বলছি, ও মা একি হল!

জগৎটা আঁষচুপড়ি

স্বামীজী ঠাকুরের বিখ্যাত মেছুনি আর ফুলওয়ালির গল্প বলছেন, But be not like certain fisherwomen, who, caught in a storm on their way home from market, took refuge in the house of a florist। (*সেই মেছুনীদের মতো হয়ো না। কয়েকজন মেছুনী আঁষচুবড়ি মাথায় করে বাজার থেকে বাড়ি ফিরছিল –এমন সময় খুব ঝড়বৃষ্টি এলো। তারা বাড়ি যেতে না পেরে পথে তাদের এক আলাপী মালিনীর বাগানবাড়িতে আশ্রয় নিলে।*) কথামৃতে এটাই আঁষ চুপড়ির গন্ধের গল্পে বলা হয়েছে। এক মেছুনি বাজারে মাছ বিক্রি করে বাড়ি ফিরতে দেরী হয়ে যাওয়ায় এক ফুলওয়ালীর বাড়িতে একটা রাতের জন্য আশ্রয় নিয়েছে। রাত্রিতে শোওয়ার পর মেছুনির আর ঘুম আসছে না, বিছানায় শুয়ে খালি উশখুশ করে যাচ্ছে। মালিনী দেখছে মেছুনি উশখুশ করছে, উঠে তাকে জিজ্ঞেস করেছে, 'তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে'? মেছুনি বলছে, 'ফুলের গন্ধে কেন জানি না আমার ঘুম আসতে চাইছে না। আচ্ছা এক কাজ কর, আমার মাছের চুপড়িটা আমার কাছে এনে দাও তো'। মালিনী তাড়াতাড়ি করে মাছের চুপড়িটা এনে দিয়েছে। মেছুনি তাতে একটু জল ছিটা দিয়ে মাছের আঁষটে গন্ধ নাকে যেতেই এবার ভোস ভোস করে ঘুমুতে লাগল। আমাদের সবারই নিজের নিজের আঁশ চুপড়ি আছে, ওই আঁশ চুপড়ির গন্ধ ছাড়া আমরা থাকতে পারি না। বছরের পর বছর, জন্ম জন্ম ধরে আমাদের মধ্যে কত রকমের যে দুর্গন্ধ জমে আছে, আমরা নিজেরাই জানি না। শোওয়ার আগে আর সকালে উঠে আমরা ওর মধ্যে একটু জল ছিটিয়ে দিই, আর ওই যে গন্ধটা আসে ঐ গন্ধের নেশা এবার সারাদিনের জন্য দৌড়াদৌড়ি করতে আমাদের প্রস্তুত করে দেয়। স্ত্রীর মুখ, সন্তানের মুখ, স্বামীর মুখ, নাতির মুখ এগুলো সব হল আঁষ চুপড়ি, একদিন, একবেলা, কিছুক্ষণ না দেখলে প্রাণ ছটফট করতে থাকে। এগুলোর কোন বাস্তবিক সত্তা নেই, যদি সত্যিই এদের ভিতর কারুর দম থাকত তাহলে যে কোন মানুষ তাকে দেখলেই শক্তি পেয়ে যেত। যেমন বেলুড় মঠে ঠাকুরের বিগ্রহ আছে, হাজার হাজার মানুষ মঠে গিয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করে এবং শক্তি পায়। কিন্তু নিজের স্ত্রীকে দেখে একমাত্র তার স্বামীরই শক্তি আসে, আর কেউ দেখলে শক্তি আসে না, তার মানেই ওটা আঁষ চুপড়ি। যদি দেখা যায়, আমি ছাড়া আর কেউ শক্তি পাচ্ছে না, তার মানেই ওটা আঁষ চুপড়ি। এটাই স্বামীজী বলছেন, জগতে যা কিছু বস্তু আছে তার মধ্যে ঢুকে গিয়ে আমরাই বস্তুগুলিকে প্রাণবন্ত করি, আমরাই এগুলোর কোনটা থেকে মুর্খের মত ভয় পাই, কারুকে দেখে আনন্দ পাই, কারুর প্রতি ক্রোধ করি, ঘৃণা করি। এই জগৎটা একটা আঁষ চুপড়ি।

শাস্ত্রগুলো দুটো স্তরে চলে। প্রথম স্তরের শাস্ত্র হল, যে শাস্ত্র অবতার নিজে বলছেন, যেমন বেদ, গীতা, কথামৃত এগুলো অবতারদের মুখের কথা। এর বাইরে যত শাস্ত্র আছে সব দ্বিতীয় স্তরের; বাল্মীকি রামায়ণই হোক, মহাভারতই হোক, পুরাণই হোক, এগুলো হল সন্ত মহাত্মাদের কথা। অবতার আর সন্ত মহাত্মাদের মধ্যে একটা গুণগত তফাৎ আছে। লৌকিক দৃষ্টিতে অবতার আর আমাদের মধ্যেও সেই পার্থক্যটা রয়েছে। কিন্তু আমাদের আর সন্ত মহাত্মাদের মধ্যে যে তফাৎ, এটা গুণগত তফাৎ নয়, ঊনিশ কুড়ি বা কুড়ি পঞ্চাশ, এর বেশি তফাৎ নয়। এই জিনিসটাকে আমাদের মাথার মধ্যে ভাল করে বসিয়ে নিতে হবে, আমাদের সাথে সন্ত মহাত্মাদের যে তফাৎ এটা বিরাট কিছু না। সন্ত-মহাত্মারা একটা জিনিসকে নিয়ে অনেক খেটেছেন, যার ফলে ওনারা অনেক কিছু আবিষ্কার করতে পেরেছেন। আমরা অলস তাই আমরা পারিনি। এখানে আমরা আট দশ বছর শাস্ত্রের ক্লাশ করছি, সন্ত মহাত্মারাও এতদিন ক্লাশ করেননি। হরিদ্বার, নর্মদা, উত্তরকাশীতে যত মহাত্মারা আছেন, তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগ, শতকরা আটানব্বুই জন আমাদের থেকে কম জানে। ফরর্ ফরর্ করে এমন কয়েকটা সংস্কৃতের শ্লোক ঝেড়ে বলে দেবে যে আমরা ভয়ে পিছিয়ে যাব। কিন্তু যেমনি তত্ত্ব কথার আলোচনা শুরু হবে তখন দেখা যাবে ওনারা কোথাও দাঁড়াতে পারছেন না।

স্বামীজী আগেও বলেছেন, পরেও আবার বলবেন, জগৎটা কিছু না, এতে কিছু নেই। যেমন পেন, পেনটা কিছু না, প্লাস্টিক, রিফিল, কালি মিলে একটা পেন হয়ে গেছে। পেন একটা কাজের জিনিস, পেন দিয়ে

আমরা লেখালেখি করি। কিন্তু এরপর আমরা আমাদের মনকে এই পেনের সাথে যোগ করে যাচ্ছি। আমি একজনকে নিজের প্রাণ থেকেও খুব ভালবাসি, সে আমাকে একটা পেন দিয়েছে, আমি সেই পেনকে খুব যত্ন করে সামলে রেখে দিয়েছি। কাউকে এই পেন দিয়ে লিখতেও দিই, ধরতেও দিই না। যদি কেউ নিতে আসে বা ছুঁতে যায়, তার সাথে আমার হাতাহাতি হয়ে যাবে। এই হাতাহাতি কি ওই পেনের জন্য হচ্ছে? কখনই না, ইমোশানের জন্য হচ্ছে। ওই ইমোশান কোথা থেকে এসেছে? সেতো আমিই দিয়েছি। তেমনি এই জগতে কিছু নেই, তার মানে জগতে যা কিছু হচ্ছে, এটা হল আমার দুর্গন্ধ যুক্ত মাছের চুপড়ি।

দুই মাতাল মদ খেয়ে টং হয়ে একজন আরেকজনকে বলছে, চল আমরা একটা বাড়ি বানাই। রাস্তায় ধুলোর উপর কাঠি দিয়ে দাগ এঁকে দুজনে একটা বাড়ি বানাল। একজন যেখানে রান্নাঘর করেছে তার পাশে অন্যজন বাথরুম বানিয়েছে। তখন ওই মাতাল অন্য মাতালকে বলছে, তুই আমার রান্নাঘরের পাশে বাথরুম করতে পারিস না। এই নিয়ে দুজনের কথা কাটাকাটি, কথা কাটাকাটি থেকে হাতাহাতি, মারামারি, মাথা ফাটাফাটি। পুলিশ এসেছে, কি ব্যাপার? ও আমার রান্নাঘরের পাশে বাথরুম বানিয়েছে। এখন ধস্তাধস্তি করতে গিয়ে দুজনের আঁকা বাড়ি ধুলোতে মিশে গেছে। পুলিশ বলছে বাড়িটা কোথায়? ধুলোর উপর দুজনে মিলে খুঁজে খুঁজে বলছে, এখানেই তো ছিল। কিছুই নেই, সবটাই মনের মধ্যে চলছে। আমাদের ঠিক এই সমস্যা, একটু বিচার করে যদি দেখা হয়, যাকে আমরা ভালবাসি, যে জিনিসটাকে আমরা মূল্য দিই, দেখা যাবে এগুলো কিছুই না, মাতালের বাড়ির মত। যাকে ভালবাসি সে আমার ভালবাসারই যোগ্য নয়, সে আমার কাছ থেকে কোন সম্মান পাওয়ারই যোগ্য নয়। কিন্তু আমাদের মধ্যে এমন একটা বোকামি কাজ করছে, এমন এক দুর্বলতা রয়েছে, যার জন্য আমরা মনে করছি এই জগৎ থেকে আমরা ভালবাসা পাবো, তার একটু ঠোঁটের হাসি, তার একটু চোখের চাহনিতে আমার প্রাণ জুড়িয়ে যাবে। ওই আশায় আমাদের ভিতরে যে ভালবাসা মজুত হয়ে আছে তার সবটাই ঐ মানুষটির প্রতি বা সামনের বস্তুর প্রতি ঢেলে দিচ্ছি।

অনেক সময় কুকুরের এই উপমা নেওয়া হয়, একটা কুকুর কোথা থেকে একটা শুকনো হাড় পেয়েছে। শুকনো খটখটে হাড়কে কুকুর খুব করে কামড়াতে থাকে, এমন কামড়াতে থাকে যে, কুকুরের দাঁত বা জিভ থেকে রক্ত বেরিয়ে আসে, নিজের রক্তের আস্বাদ তার এত ভাল লাগে যে, ওই হাড়কে সে আরও আনন্দে চিবোতে থাকে। নিজের রক্তের স্বাদেই তার আনন্দ, অথচ সে বুঝতে পারছে না। জগতে যদি কাউকে আমি ভালবাসি, বুঝতে হবে ওর মধ্যে কোন গুণ নেই, ভালবাসাটা আমার মধ্যেই আছে। কোন কিছুকে যখন সম্মান দিচ্ছি তখন ওই বস্তুর মধ্যে কিছু নেই, যে দিচ্ছে তার মধ্যেই আছে। ঠাকুর বার বার বলছেন মোর ফিরিয়ে দিতে। আমাদের মধ্যে যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ যা কিছু আছে, সংসারের প্রতি রয়েছে, এর মোরটা ঈশ্বরের দিকে ফিরিয়ে দাও। কারণ ওই বস্তুর মধ্যে কোন সার নেই, ঠাকুর বলছেন, এই সংসার হল আমড়া, আটি আর চামড়া, খেলে অম্লশূল। যাকে ভালবাসছে সেও আমড়া, আটি আর চামড়া, ভালবাসা নিয়ে এগিয়ে গেলে অম্লশূল, শেষে প্রাণান্তকর অবস্থা। ভালবাসাটা তার মধ্যে, যে ভালবাসতে চাইছে, যাকে ভালবাসতে চাইছে তার মধ্যে কোন ভালবাসা নেই।

দিব্যত্বের প্রকাশ

ঠাকুর তাই বলছেন, ঈশ্বরের দিকে এই ভালবাসা মোর ফিরিয়ে দাও। ঈশ্বর হলেন সেই, যাঁর মধ্যে সমস্ত গুণ রয়েছে, তাঁর মধ্যে আছে অফুরন্ত ভালবাসাও, তাঁকে ভালবাসলে সেই ভালবাসাটাও ফেরত আসবে। এগুলো আমাদের কাছে থিয়োরেটিক্যাল কথা মনে হতে পারে। কোন থিয়োরেটিক্যাল কথা নয়, এটাই একমাত্র সত্য। একটু যদি আমরা বিচার বিশ্লেষণ করে দেখি, খুব সামান্য ব্যাপার, আমরা নিজেদের জীবনের দিকে দু মিনিটের জন্য যদি ফিরে তাকিয়ে দেখি – শৈশবে আমাদের কিছু বাল্যবন্ধু ছিল বা কোন শিক্ষক ছিলেন, যাঁর প্রতি আমার প্রচণ্ড ভালবাসা ছিল, এমন এক বন্ধু ছিল, যার সাথে খাওয়া, শোওয়া, বসা, ঘোরা সব একসাথে হত। আজকের দিনে তাকালে দেখছি তার অনেক কিছুই আমাদের মন থেকে হারিয়ে গেছে, হাল্কা একটু স্মৃতি হয়ে মনের কোণে হয়ত পড়ে আছে, বা তাও নেই। ঠাকুর নিজেই তাঁর এক বাল্যবন্ধুর কথা বলছেন, দুজনে এত ভালবাসা ছিল যে, গ্রামের লোকেরা বলত, এদের একজন যদি ছেলে আর মেয়ে হত, দুজনের নিশ্চয় বিবাহ হত। সেই বাল্যবন্ধু দক্ষিণেশ্বরে এসেছে, তার পালিত ছেলে মারা গেছে, ঠাকুরের কাছে দুঃখ করে

বলছেন, ‘আমি পরিবারকে বললুম, খেপী তুই মন খারাপ করিস না’। শুনে ঠাকুর রেগে গেলেন, ‘বলে কিনা খেপী, একেবারে ডাইলুট হয়ে গেছে’। কয়েকটা ইংরাজী শব্দ ঠাকুর জানতেন। নিজের ভিতরের যে ভালবাসা সেটা পুরো ঢেলে দিয়েছে ওই পালিত ছেলের উপর।

আরেকটু গভীরে যদি যাই, আমাদের ভিতরে যে দিব্যত্ব, যে ঈশ্বরীয় গুণগুলো রয়েছে, সেই দিব্যত্ব আমাদের শরীর মন দিয়ে বিভিন্ন ভাবে বেরিয়ে আসে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বকবি, ওনার ভিতরে যে ঈশ্বরীয় শক্তি, যে দিব্যত্ব ছিল সেটা তাঁর কবিতার মাধ্যমে বেরিয়ে এসেছে। কোন নামকরা অভিনেতা বা অভিনেত্রী, সেই ঈশ্বরীয় শক্তিই তাঁর অভিনয়ের মাধ্যমে বেরিয়ে আসছে। বিদেশ থেকে স্বামীজী প্রথমবার ভারতে ফিরছেন। আসার পথে কিছু সময়ের জন্য জাহাজ কায়রো বন্দরে দাঁড়ায়। স্বামীজী ও তাঁর সঙ্গীরা কায়রো শহর দেখার জন্য জাহাজ থেকে নেমে শহরের দিকে চলেছেন। যেতে যেতে তার ভুলে অন্য পথ ধরে এগিয়ে যেতেই একটা রেড লাইট এরিয়ার মধ্যে ঢুকে পড়েছেন। সঙ্গীরা বুঝতে পেরে স্বামীজীকে সরিয়ে নিয়ে অন্য পথে যেতে চাইছিলেন, কিন্তু ইতিমধ্যে মেয়েগুলো তাঁদের দেখে খিল খিল করে হাসাহাসি করতে লাগল, ওদের মত নানা রকম ইশারা করে অঙ্গভঙ্গী করতে শুরু করল। স্বামীজী ওদের দেখে করুণায় আপ্লুত হয়ে গেলেন। ওদের মধ্যে যারা বেশি অঙ্গভঙ্গী করছিল, স্বামীজী তাদের দিকে এগিয়ে গেলেন। স্বামীজীর চোখে জল এসে গেছে, সঙ্গীদের বলছেন, আহা! এরা এদের নিজেদের দিব্যত্বকে কিভাবে পুরোপুরি শরীরে ঢেলে দিয়েছে, আর আজ দেখ এদের কি দুরবস্থা। যারা শরীরকেই আত্মা মনে করে তারা শরীরের প্রতি সব কিছু ঢেলে দেয়, শরীরকেই সাজায়, শরীর ছাড়া কিছু বোঝে না। ওই শরীর দিয়ে তারা অর্থোপার্জন করছে, ওই শরীর দিয়ে সব কিছু ভোগ করছে, কয়েক দিনের মধ্যে শরীরটা ভেঙে যাবে, সেও মানসিক ভাবে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে শেষ হয়ে যাবে। স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের এমনই প্রভাব যে, মেয়েগুলো স্বামীজীর পায়ের তলায় হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে গেল। ওদের চোখেও জল, স্বামীজীর পোষাক ছুঁয়ে তাদের স্প্যানিশ ভাষায় বলে যাচ্ছে, Man of God।

এই জিনিসটাকেই এখানে বলা হচ্ছে, যে দিব্যত্ব একজন সাধু মহাত্মার ভিতরে থাকে, সেই দিব্যত্বই একজন বিজ্ঞানীর ভিতরে, সেই দিব্যত্ব একজন কবির ভিতরে, সেই দিব্যত্ব আমার আপনার সবার ভিতরে সব সময় সমান ভাবে বিদ্যমান। যখন ওই দিব্যত্বকে manifest করছে, তখন একটা শক্তি রূপে সামনে চলে আসে। যার দিব্যত্ব যত বেশি অভিব্যক্ত হবে, তার ক্ষমতা তত বেশি হবে। যেমনি এই দিব্যত্বকে শরীর, সংসারের উপর দেবে, সে অবশ্যই সেখান থেকে কিছু পাবে। যারা সুন্দরী, যারা সব সময় নিজের শরীরকে সাজাতে ব্যস্ত, তার মানে তার দিব্যত্বকে সে শরীরে দিয়ে দিয়েছে। যতই শরীরের যত্ন নেওয়া হোক, শরীর তো বেশি দিন চলবে না, শরীরের ধর্ম অনুযায়ী শরীর একদিন না একদিন ভাঙতে শুরু করবে, এটা কারুর হাতে নেই। বাজারে অনেকে টাকা দিয়ে পচা মাল কিনে বাড়ি ফেরে, টাকাটা তারা নষ্ট করে দিল। শরীরকেই যখন কেউ ভালবাসছে, ধরে নেওয়া যাক একজন বারঙ্গনা নারী, দেখতে সুন্দরী, তাকে দেখে লোকেরা আসছে, এই যে লোকেরা আসছে, এরা কেউ ওকে দেখে আসছে না, ওর মধ্যে যে একটা সৌন্দর্য, ওই সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েই আসছে। আমরা কেউ এটা বুঝতে পারি না। এই জিনিসটাকে স্বামীজী এখন সত্ত্বগুণ, রজোগুণ আর তমোগুণ দিয়ে ব্যাখ্যা করছেন।

স্বামীজী বলছেন, The world is our fish basket, we must not depend upon it for enjoyment. Those who do are the Tamasas or the bound. (*এই সংসার আঁশচুবড়ির মতো – আমরা যেন সুখভোগের জন্য ওর উপর নির্ভর না করি, যারা করে, তারা তামসপ্রকৃতি বা বদ্ধ জীব।*) এই সংসার আর এর আশেপাশে যা কিছু আছে, এটা হল মাছের চুবড়ি। আমাদের যত রকম আনন্দ আছে সব আনন্দের জন্য আমরা ওই মাছের আঁশ চুবড়ির উপর নির্ভর করি, একটু জল ছিটিয়ে দিলে যে আঁষটে গন্ধ বেরোবে, সেই গন্ধতেই আমাদের আনন্দ। আমাদের জন্য এটা একেবারেই ঠিক না, কারণ এর দ্বারা আমরা নিজেদের নষ্ট করি। গুণ আমাদের ভিতরেই রয়েছে, সেই গুণকে আমরা বাইরের ব্যক্তি হোক, বস্তু হোক, সেগুলির উপর আরোপ করছি, আরোপ করে আবার নিজের দিকে টেনে আনছি। গ্রীক পুরাণে নার্সিসাস নামে একটা চরিত্র আছে, তাকে দেখতে খুব সুন্দর ছিল। একবার সে এক জলাশয়ের ধারে গেছে, জলাশয়ের জলের উপর তার প্রতিবিম্বিত রূপ দেখতে পেয়েছে, নিজের ওই রূপ দেখে সে মুগ্ধ হয়ে গেছে। এমন মুগ্ধ হয়ে গেল

যে, সে আর জলাশয়ের ধার থেকে উঠে আসতে চাইছে না। বাড়ির লোকেরা, পাড়াপড়শিরা এসে তাকে ওঠাতে চাইছে, সে জলাশয়ের কাছ থেকে কিছুতেই উঠতে চাইছে না। না খেয়ে না খেয়ে ওখানেই একদিন মরে পড়ে গেল। এই নার্সিসাস থেকে পরে নার্সিসিজম্ শব্দ এসেছে, যার অর্থ মানুষ যখন নিজেকে বড্ড বেশি ভালবাসে। এবার যখন কেউ একটা কোন আদর্শকে ভালবাসছে, মানুষ থেকে আদর্শকে ভালবাসা অনেক গুণ ভাল কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু জানতে হবে ওই আদর্শের মধ্যে দম নেই, দম যে ভালবাসছে, তার মধ্যে রয়েছে। ঠাকুর বলছেন, কারুর মধ্যে যদি কোন গুণের প্রকাশ দেখ, জানবে সেখানে ঈশ্বরেরই প্রকাশ হচ্ছে। ঈশ্বরের শক্তি, ঈশ্বরের গুণ সবারই মধ্যে আছে, দেখতে হবে প্রকাশটা সেখানে পাচ্ছে কিনা। সত্যিকারে যিনি কবি, কবিতা লিখে যিনি আনন্দ পান, তিনি কবিতা লেখার পর কে পছন্দ করল, কে প্রশংসা করল না, ওই নিয়ে কোন তার মাথা ব্যাথা নেই। ব্যাসদেব যখন মহাভারত রচনা করছেন, তখন তার ভারি বয়ে গেছে কে তাঁকে মানছে, কে তাঁকে মানছে না। কিন্তু যে শরীরে মন দিয়ে দিয়ে রেখেছে, সে সব সময় একে তাকে জিজ্ঞেস করবে, আজকে আমায় কেমন দেখাচ্ছে। রান্না করে পাঁচবার জিজ্ঞেস করবে, কেমন হয়েছে রান্না, ঝাল ঠিক আছে, নুন ঠিক আছে, ইত্যাদি। অতিথি যত বড় মাপের হবে তত তার থেকে প্রশংসার প্রত্যাশাটাও বেশি হবে, সে প্রশংসা করলে তার শান্তি। এখান থেকে স্বামীজী সাংখ্য দর্শনের একটা তত্ত্ব, যেটা বেদান্তেও আসে, তিনটে গুণের ব্যাপারে আলোচনা করছেন।

তিন গুণের খেলা এবং সৃষ্টির উৎপত্তি ও বিনাশ

হিন্দু ধর্মের সৃষ্টিতত্ত্বে বলা হয় সচ্চিদানন্দই আছেন, ভগবানই আছেন। ভগবান যখন ইচ্ছা করেন সৃষ্টি হোক, সেই ইচ্ছাটা তখন কার্যত তিনটে গুণের মধ্যে পরিবর্তিত হয়ে যায়। একটা গুণ হল, কোন কাজ করতে চায় না, বসে থাকতে চায়, এটাকে বলে তমস। দ্বিতীয় হল দৌড়াতে চাইছে, এটা রজো গুণ। তৃতীয় হল সাম্য ভাব, এটাকে বলে সত্ত্ব। এই তিনটে গুণ থাকবে সব সময় একসাথে, কিন্তু অপরকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করে যাবে আর দৌড়াতে থাকে, এই দৌড়ানটাই সৃষ্টি। যখন সৃষ্টি থাকছে না, তখনও কিন্তু সত্ত্ব, রজো ও তমো গুণ থাকে। সেই সময় এই তিনটে গুণ একেবারে সমান সমান ভাবে এক তৃতীয়াংশ করে থাকে। তিনটে গুণ সমান অনুপাতে থাকা মানে তখন সৃষ্টিও নেই। যখনই ভগবান বলেন সৃষ্টি হোক তখনই ওদের সাম্য ভাবটা বিগড়ে যায়। যেমনি বিগড়ে গেল তখন এক অপরকে দাবাতে শুরু করে দেয়, ফলে কখন তমোগুণ রজোগুণে পরিবর্তিত হয়ে যায়, রজোগুণ কখন সত্ত্বগুণে পরিবর্তিত হয়। ঐ যে motion এসে গেল, যে motionএর জন্য তিনটে গুণের সাম্য ভাবটা নষ্ট হয়ে গেল, এই motionকেই আমরা বলি সৃষ্টি। সৃষ্টিতে যাবতীয় যা কিছু আছে, যা কিছুর আমরা কল্পনা করতে পারি, চিন্তা ভাবনা, বস্তু, মানুষ, গাছপালা, পশুপাখি সব কিছু সত্ত্ব, রজো ও তমো এই তিনটে গুণের সংমিশ্রণ। পুরোটাই সত্ত্ব, পুরোটাই রজো বা পুরোটাই তমো কখনই হয় না। প্রত্যেকের মধ্যে কিছু না কিছ অন্য দুটো গুণ থাকবে আর তিনটে এক সঙ্গেই থাকবে। বর্তমান কোয়ান্টাম ফিজিক্সে কিছু কিছু ধারণা এই ভাব থেকেই এসেছে। তমোগুণ হল অলসতা, সব সময় নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকতে চায়। অলস প্রকৃতির, সর্বদা শুয়ে বসে দিন কাটিয়ে দিতে চাই, কোন চিন্তা-ভাবনা করতে পারে না, তার মানে এদের মধ্যে তমোগুণের জোর প্রভাব। সব সময় কাজের মধ্যে থাকতে চাইছে, তার মানে রজো গুণের প্রভাব বেশি। আর এই দুটোর গুণের যে সাম্য অবস্থা এটাকে বলা হয় সত্ত্বগুণ। কথামৃতে ঠাকুর সব কিছুতেই সত্ত্ব, রজো ও তমোকে নিয়ে এসেছেন, ভক্তিকেও তিনটে গুণের মাধ্যমে দেখাচ্ছেন, ভক্তির তমো, ভক্তির রজো ও ভক্তির সত্ত্ব।

স্বামীজী বলছেন, Those who do are the Tamasas or the bound, যারা নিজের আনন্দের জন্য এই জগতের উপর নির্ভর করে, এরা তামসিক। আচার্য শঙ্কর বলছেন, *বাল্যস্তাবৎক্রীড়াসক্ত-স্তরুণস্তাবৎ তরুণীসক্তঃ। বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ,* শৈশবে মানুষ খেলনা আর খেলা নিয়ে মগ্ন থাকে, বাল্যাবস্থা থেকে যেমনি একটু বয়স হয়ে যৌবন এলো তখন কামিনী-কাঞ্চনের পিছনে দৌড়াতে থাকে। আর বয়স হয়ে গেলে কেউ আর তাকে চায় না, গোবেচারা নাতি-নাতনীরাই তখন তার সঙ্গ দেয়, তাদের গল্প শোনাবে, আদর করবে, একটু বড় হয়ে গেলে তারাও আর পাত্তা দেয় না। তখন হয়ে যায় চিন্তামগ্ন, সারা জীবন কি করলাম, কি পেলাম আর কি পেলাম না, এটা হল তামসিক লক্ষণ। এটা যেমন তমসের একটা সংজ্ঞা দেওয়া হল, তেমনি তমসের

আরও অনেক বিস্তার আছে। যেমন কোন লোক যদি বলে, তুমি যদি আমার পাশে থাক আমি জগৎ জয় করে নেব, বুঝবেন তামসিক লোক।

রজোগুণীরা জগতের উপর নির্ভর করে না, স্বামীজী বলছেন, Then there are the Rajasas or the egotistical, who talk always about 'I', 'I'. (*তারপর আবার রাজসপ্রকৃতির লোক আছে, তাদের অহংটা খুব প্রবল, সর্বদা 'আমি, আমি' করে।*) আমি এই করেছি, সেই করেছি, আমি এই করব, আমি সেই করব, সব সময় 'আমি' 'আমি' করে যাচ্ছে। এরা জগতের উপর আর ততটা নির্ভর করে না, কিন্তু সব ক্ষেত্রে 'আমি', 'আমি', করে যায়। যেমনি রজোগুণ থেকে পড়বে তখন তমোগুণী হয়ে যাবে, তমোগুণে পড়ে যাওয়ার পর বলতে থাকবে, জানো আমি এমন করেছিলাম, তুমি কিছু এই ব্যাপারে শুনেছ কি? They do good work sometimes and may become spiritual. (*এরা কখন কখন সৎকার্য করে থাকে, চেষ্টা করলে তারা ধার্মিক হতে পারে।*) রজোগুণীর কখন কখন ভাল কাজ করে, নিজের যদি প্রচেষ্টা থাকে আর ঈশ্বরের কৃপা যদি থাকে তাহলে ঈশ্বরের দিকে মন চলে যায়, সেখান থেকে সে একজন আধ্যাত্মিক পুরুষও হয়ে যেতে পারে। যারা বড় বড় মন্দির তৈরী করছে, সেই মন্দিরকে কেউ কৃষ্ণ মন্দির বলবে না, শিব মন্দির বলবে না, বলবে বিড়লা মন্দির, জেকে টেম্পল। রজোগুণের জন্য মন্দির হয়েছে, সে যাই হোক, এতেও দুটো লোকের তো মঙ্গল হচ্ছে। আর অনেক সময় পুরোপুরি আধ্যাত্মিক হয়ে যায়, আধ্যাত্মিক মানে ঈশ্বরে পুরোপুরি মন চলে যাওয়া।

স্বামীজী এরপর বলছেন, But the highest are the Sattvikas, introspective, those who live only in the self. (*কিন্তু সাত্ত্বিক প্রকৃতিই সর্বশ্রেষ্ঠ – তারা সর্বদাই অন্তর্মুখ – এরা সদাই আত্মনিষ্ঠ।*) ঠিক ঠিক যাঁরা সাত্ত্বিক তাঁরা নিজের ভিতরে থাকেন, ঈশ্বরের চিন্তন করে, ঈশ্বরের চিন্তনেই ডুবে থাকেন। সাত্ত্বিক মানুষ বাইরের জগতের কোন কিছুতে একেবারেই যাবেন না। ঠাকুর সত্ত্বগুণীর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলছেন, সকালে উঠে মশারির ভিতরে ধ্যান করে, বাড়ির সবাই মনে করছে বাবুর রাত্রিবেলা ঘুম হয়নি, তাই এখন ঘুমিয়ে আছেন। সাত্ত্বিক পুরুষের লোক দেখানি কিছু থাকে না, তাঁর ভক্তিটাও লোক দেখানি থাকে না। আর বলছেন, These three qualities, Tamas, Rajas and Sattva (idleness, activity and illumination), are in everyone, and different ones predominate at different times, (*প্রত্যেক ব্যক্তিতেই এই সত্ত্ব, রজো ও তমোগুণ আছে; এক এক সময় মানুষের এক এক গুণের প্রাধান্য হয় মাত্র।*) একই মানুষের মধ্যে কখন সত্ত্বগুণ দেখা যায়, কখন রজোগুণ দেখা যায় আবার কখন তমোগুণ দেখা যায়। আবার জীবনের সাথে সাথে গুণগুলিও পাল্টে যায়। রত্নাকর দস্যুর যে কাহিনী, সে একটা সময় স্বভাবে তমোগুণী ছিল, হিংসা কর্মে রত থাকত। কিন্তু ঋষির কৃপা হল, সেখান থেকে সে ধীরে ধীরে সত্ত্বগুণী হয়ে গেল। একই মানুষের মধ্যে পরিবর্তন হয়, একই মানুষের মধ্যে একই দিনে আলাদা আলাদা পরিবর্তন হয়। যখন কাজ করে তখন রজোগুণে থাকে, যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন তমোগুণে আছে, ঠাকুরের নাম করছে তখন সত্ত্বগুণে আছে। উদ্দেশ্য হল ধীরে ধীরে সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

সত্ত্ব, রজো ও তমো নিয়ে বলার পর স্বামীজী সৃষ্টি নিয়ে বলছেন। সত্ত্ব, রজো ও তমোতে বলা হল এই তিনটে গুণের ভারসাম্য যখন নষ্ট হয়ে যায় তখনই সৃষ্টি হয়। যখনই আমরা সৃষ্টির কথা ভাবি, এই সংসার, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কথা বলি, সৃষ্টি শব্দ এলে আমরা প্রথমেই ভাবব, ঈশ্বর বললেন সৃষ্টি হোক, সৃষ্টি হয়ে গেল। বাইবেলে বলছে, Let there be light, there was light। ছোটবেলা থেকে আমরা শুনে আসছি ভগবান এভাবে সৃষ্টি করলেন। কিন্তু আমরা কিছুতেই চিন্তা করতে পারছি না যে, সবটাই হল সচ্চিদানন্দ সাগরে সচ্চিদানন্দ ইচ্ছা করলেন আর সেটা গুণ রূপে হয়ে এক অপরের সঙ্গে মিলে মিশে এই জগৎটা হয়ে রয়েছে। এই ঘরে খুব কষ্ট করে নানা রঙের মার্বেল সাজিয়ে রাখা আছে, একজন এসে ফুঁ দিতেই সব মার্বেল ছড়িয়ে পড়ল। এবার এই মার্বেলগুলো দৌড়াচ্ছে, এনার্জি তার ক্রমাগত সাপ্লাই হয়ে যাচ্ছে। এখন ঘরের মালিক এসে চেষ্টা করবে গুলি গুলোকে একত্রে জড়ো করার, ভারসাম্যে নিয়ে আসা। আমরা যে সৃষ্টিকে দেখছি, এটা বলা অসম্ভব যে, এই সৃষ্টি এগোচ্ছে না পিছোচ্ছে। এগোচ্ছে মানে, যদি ভগবান সৃষ্টি করে থাকেন, ভগবান তো কোন পাগল কেউ নন, তিনি যদি করে থাকেন তাহলে কোন একটা উদ্দেশ্য থাকবে। যদি উদ্দেশ্য থাকে

তাহলে সৃষ্টি এগোতেই থাকবে। তিনি নিশ্চয় সৃষ্টিকে গুটিয়ে নেবেন না, কেন তিনি বিনাশ করতে যাবেন! অন্য দিকে আমরা দেখছি মানুষ জন্মায়, মানুষ মারা যায়। এই ধরণের অনেক প্রশ্ন আমাদের মনে উদয় হয়। হিন্দুদের কাছে এগুলো কোন ব্যাপারই নয়, সাম্য অবস্থা মানে সংহার, বৈষম্য মানেই সৃষ্টি। Simplicity মানে death, complexity মানে life। Simplicity মানে, এই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আছে, এটা যখন ধীরে ধীরে কার্বন অবস্থায় চলে যাবে, সত্ত্ব, রজো ও তমো তিনটেই এক তৃতীয়াংশে চলে যাবে তখন সৃষ্টি শেষ। কিন্তু যখন বলা হয় সংহার হবে, এখন যে নূতন শব্দগুলো এসেছে, global warning, environmental issues, আমরা তখন এটাই ভাবছি যে, এমন একটা আগুন লাগবে বা ভূমিকম্প হবে, যার প্রভাবে সব শেষ হয়ে যাবে। কি করে শেষ হয়ে যাবে! সৃষ্টি ঈশ্বরের। হ্যাঁ, এমন হতে পারে যে মানুষ প্রজাতি থাকবে না, কিন্তু অন্য প্রজাতি আসবে, যারা ওই তাপমাত্রায় থাকতে পারে, তারা থাকবে। সৃষ্টির কখন নাশ হতে পারে না। সৃষ্টি নাশ হবে, যদি সত্ত্ব, রজো ও তমো ব্যালেন্সে এসে যায়। কোন মানুষের মধ্যে যদি ওই ব্যালেন্স এসে যায় তখন সে শেষ। কি শেষ? সে মরে যাবে না, সে মুক্ত হয়ে যাবে। যতক্ষণ অসাম্য থাকে ততক্ষণ বলা হয় যে, তার মাথাটা বিগড়ে আছে। মাথা বিগড়ে আছে মানে সত্ত্ব, রজো আর তমো বিগড়ে আছে, সৃষ্টিও আছে। যদি মাথা সুস্থ হয়ে যায় তখন সত্ত্ব, রজো ও তমো ব্যালেন্সে এসে যাবে, তখন তার জন্ম-মৃত্যুর চক্রটাও শেষ।

এই ভাবটাকে স্বামীজী এবার ব্যাখ্যা করছেন। বলছেন, Creation is not a 'making' of something, it is the struggle to regain the equilibrium, as when atoms of cork are thrown to the bottom of a pail of water and rush to rise to the top, singly or in clusters. (*সৃষ্টি মানে একটা কিছু নির্মাণ বা তৈরী করা নয়, সৃষ্টি মানে – যে সাম্যভাব নষ্ট হয়ে গেছে, সেইটাকে আবার ফিরে পাবার চেষ্টা, যেমন একটা শোলার ছিপি যদি টুকরো টুকরো করে জলের নীচে ফেলে দেওয়া যায়, তা হলে সেগুলো যেমন আলাদা আলাদা বা একসঙ্গে কতকগুলো মিলে জলের উপরে ভেসে ওঠবার চেষ্টা করে, সেই রকম।*) সৃষ্টিকে আমরা যেভাবে মনে করি কিছু নির্মাণ হওয়া, সেই রকম কিছু নয়। এক গাদা কর্ককে নিয়ে গিয়ে পুকুরের জলে চুবিয়ে ছেড়ে দেওয়া হল, যেমনি ছেড়ে দিয়ে চলে আসা হবে তখনি একটা কর্ক বা অনেকগুলো কর্ক দুম্ করে উপরে চলে আসার চেষ্টা করবে। সৃষ্টি মানেই তাই, কোথাও equilibriumটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সৃষ্টি চাইছে আমি আবার সেই পূর্ণ অবস্থায় চলে যাই, সেই equilibriumএ চলে যাই। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু হচ্ছে, আমার, আপনার যা কিছু চেষ্টা, আসলে সেই সাম্য অবস্থায় ফিরে যাবার চেষ্টা চলছে। তারের বাদ্যযন্ত্র সেতার শান্ত অবস্থায় রাখা আছে, একজন ওস্তাদ সেতারের তারটা একটু টেনে দিতে টুং করে উঠল। তারকে যতটুকু টানা হল, সে রেগেমেগে ততটুকু পিছনের দিকে যায়। কিন্তু ওটা ওর স্বাভাবিক অবস্থা নয়, আবার পিছনের দিকে আসে, সেখান থেকে সৃষ্টি হয় সা রে গা মা সুরের লহরী। সেতারের বাদকরা কি করেন, সেতারের equilibriumটা নষ্ট করে দিচ্ছেন, মাঝখানে সেতারের তার বলছে আমার equilibriumটা নষ্ট হতে দেব না, মাঝখান থেকে একটা সুন্দর মিষ্টি রাগ সৃষ্টি হয়ে গেল। জগৎ ঠিক এই রকম, ভগবান ওর ব্যালেন্সটা নষ্ট করে দিচ্ছেন, কিন্তু সত্ত্ব, রজো ও তমো বলছে আমরা আমাদের সাম্য অবস্থা ফিরে পেতে চাই, মাঝখান থেকে সৃষ্টির বিচিত্র খেলা চলতে থাকে।

আগেকার দিনে বড় বড় ঘড়ির লম্বা পেণ্ডুলাম থাকত, পেণ্ডুলামকে টেনে ছেড়ে দিলে পেণ্ডুলাম রেগেমেগে অন্য দিকে ফেরত যাবে। পেণ্ডুলামের কেমন দুর্ভাগ্য, পেণ্ডুলাম সব থেকে বেশি restএ কোথায় থাকে? যেখানে তার maximum instablity। Stable মানে যেখানে তার ব্যালেন্স, instable মানে যেখানে ব্যালেন্স নেই। পেণ্ডুলামকে যদি টানা হয় তখন একটা দিকের শেষে গিয়ে পুরো restএ চলে আসে, থেকে যায়, কিন্তু সেটা হল তার maximum instable state। ফলে সেখানে সে থাকতে পারে না, দুম্ করে সেখান থেকে চলে আসে, আর যে জায়গাতে ওর ব্যালেন্স, সেই জায়গাতে তার maximum speed থাকে, ফলে ওখান থেকে শুট্ করে অন্য দিকে চলে যায়। ফলে বেচারি confused হয়ে যায়, যেখানে মনে করে এটা আমার অবস্থান, আমার রেস্ট, সেখানে দেখে unstable, যেখানে রেস্ট সেখানে maximum speed। ফলে পেণ্ডুলাম অনবরত দুলতেই থাকে, মাঝখান থেকে সমগ্র জগৎ তার থেকে সময় আদায় করে নিচ্ছে। গ্যালিলিও প্রথম আবিষ্কার করলেন, কিভাবে সময় মাপা হবে। পেণ্ডুলামের এই আইডিয়াটা পরে ধীরে ধীরে ওয়াচ মেকার্সরা নিল, তারপর তাতে স্প্রিং লাগানো হল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওই প্রিন্সিপ্যালটাই থাকল।

পেণ্ডুলামকে যদি ব্যালেন্সে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে ঘড়ি বন্ধ হয়ে যাবে। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দোদুল্যমানতা যদি নষ্ট হয়ে যায়, সৃষ্টি শেষ।

আইনস্টাইন থিয়োরী অফ রিলেটিভিটি এনে দেখালেন কিভাবে হাইস্পীডে যখন যায় তখন টাইম থেমে যায়, লো স্পীডে টাইম অন্য রকম চলে, কী আশ্চর্য! কিন্তু মাঝখানে কি হচ্ছে, যদি আমরা টাইম থিয়োরীকে ছেড়ে বিন্দু থিয়োরীতে আসি, তখন এসে যায় কাল। কালের বিশেষত্ব কি? ওকে disturb করে দেওয়া হয়েছে, সৃষ্টি এসে গেল, টাইম না থাকলে সৃষ্টি হবে না। তারের বাদ্যযন্ত্র সেতারের তারকে disturb করে দেওয়া হল, সঙ্গীতের জন্ম হয়ে গেল। তেমনি সত্ত্ব, রজো ও তমোকে এমন disturb করে দিলেন যে, যার থেকে এই সুন্দর বৈচিত্রময় সৃষ্টি এসে গেল। কিন্তু তিনটে গুণ বলছে আমরা ব্যালেন্সে ফিরে যেতে চাই, কিন্তু ভগবান এমন ফুঁ মেরে রেখেছেন বেচারিরা ব্যালেন্সে আসতে পারছে না। প্রাণপন চেষ্টা করে যাচ্ছে ব্যালেন্সে আসার, কিন্তু পারছে না। স্বামীজী এটারই উপমা দিচ্ছেন কর্ক দিয়ে, কর্ককে জলে চুবিয়ে দিলে ওরা সবাই উপরে ভেসে উঠতে চায়।

Life is and must be accompanied by evil. (*যেখানে জীবন – যেখানে জগৎ, সেখানে কিছু না কিছু মন্দ, কিছু না কিছু অশুভ থাকবেই থাকবে।*) সেইজন্য এই সংসার কখনই ব্যালেন্সে আসবে না, জীবনের সবটাই কোন দিন ভাল হবে না, সবটাই কোন দিন খারাপ হবে না। ভালর সাথে মন্দ, মন্দের সাথে ভাল সব সময় থাকবে, কারণ ওখানে ব্যালেন্সটা বিগড়ে আছে, সেইজন্য সৃষ্টিও নির্বিঘ্নে চলতে থাকে। A little evil is the sourc of life. (*একটুখানি অশুভ থেকেই জগতের সৃষ্টি হয়েছে।*) এই যে একটু গোলমাল হয়ে আছে, এটাই জীবনের উৎস, এটাই জীবনের স্রোত। সোনাতে একটু খাদ না মেশালে সোনার গয়না তৈরী করা যাবে না। ভালর সাথে একটু খাদ যদি না মেশানো হয়, সৃষ্টি হবে না। স্বামীজীও একই কথা বলছেন, the little wickedness that is in the world is very good; for when the balance is regained, the world will end, because sameness and destruction are one, (*একটুখানি অশুভ থেকেই জগতের সৃষ্টি হয়েছে। জগতে যে কিছু কিছু মন্দ রয়েছে, এ খুব ভাল; কারণ সাম্যভাব এলে এই জগৎই নষ্ট হয়ে যাবে, কারণ সাম্য ও বিনাশ এক কথা।*) যা কিছু আমরা মন্দ মনে করি, সব মন্দের শেষ হয়ে যাওয়া মানেই সমত্ব এসে যাওয়া, সমত্ব হওয়া যা, সৃষ্টির নাশ হয়ে যাওয়াও তাই। গীতায় বলছেন *সমত্বং যোগ উচ্যতে*, যোগ মানেই সমত্ব, সমত্ব মানে একেবারে sameness এসে গেল, sameness এসে গেল মানেই আধ্যাত্মিক জ্ঞান, আধ্যাত্মিক জ্ঞান মানেই সৃষ্টি শেষ।

আদম আর ঈভ স্বর্গে বেশ ভালই ছিল, ওদের মনে ছোট্ট একটা পাপ ঢুকল। কি সেই পাপ? স্বর্গের আপেল খাওয়া নিষিদ্ধ, তারা আপেল খেয়ে নিল। ওই ছোট্ট একটা দোষ, তাতেই বুম্ করে সৃষ্টি এসে গেল। সৃষ্টি এখন চেষ্টা করছে আগের অবস্থায় ফেরত যেতে। সবাই যেতে পারবে না, কর্কগুলো যেমন সবাই একসঙ্গে উপরে আসতে পারবে না, যার উপরে যেমন বোঝা চাপানো আছে সেই অনুসারে আসবে। যার বোঝা কম সে দুম্ করে উপরে উঠে আসছে। আমাদের এখানেও তাই, একজন দুজন মুক্তি পেয়ে যাচ্ছে, অবতার এলে দশ-বারোজন মুক্তি পেয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু সবাই ধীরে ধীরে সেই equilibriumএর দিকেই অগ্রসর হচ্ছে।

আমরা বলি, জীবনে দুঃখের শেষ নেই, দুঃখ তো জীবনে থাকবেই। সবাই সবাইকে উপদেশ দিয়ে যাচ্ছে, চিন্তা করো না, সুখ থাকলে দুঃখ আসবে, দুঃখ এসেছে মেনে নাও, আবার সুখের দিন আসবে। কিন্তু নিজের জীবনে যখন দুঃখ আসে তখন হা হুতাশ করে। কিন্তু কেন সুখের সাথে দুঃখ থাকবে? এই কারণেই থাকবে, সৃষ্টি মানেই imbalance, অসাম্য। পুরো সুখ আসা মানে ব্যালেন্স এসে গেল, পুরোটাই দুঃখ মানে ব্যালেন্স এসে গেল, সব কিছুই যদি শুভ হয়ে যায় সেখানেও ব্যালেন্স এসে গেল, সৃষ্টি আর থাকবে না। সৃষ্টি থাকাও যা, imbalance থাকাও তাই। সমত্ব মানেই যোগের অবস্থা, যোগের অবস্থা মানে সংহার। সংহার মানে ভূমিকম্প হয়ে সব ধ্বংস হয়ে যাবে, বন্যায় সব ভেসে যাবে, এ্যাটম বোমে সব ভস্ম হয়ে যাবে, তা কখনই না, সংহার মানে সমত্ব। সৃষ্টির নাশ তখনই হবে যখন সত্ত্ব, রজো ও তমো perfect balanceএ এসে যাবে। এসব কথা শুনতে খুব আজব লাগে ঠিকই, কিন্তু এটাই সত্য।

স্বামীজী বলছেন, When this world goes, good and evil go with it; but when we can transcend this world, we get rid of both good and evil and have bliss. (*যতদিন এই জগৎ চলবে, ততদিন সঙ্গে সঙ্গে ভাল-মন্দও চলবে; কিন্তু যখন আমরা জগৎকে অতিক্রম করি, তখন ভাল-মন্দ দুয়েরই পারে চলে যাই – পরমানন্দ লাভ করি।*) সংসার নাশ হয়ে গেলে ভাল-মন্দ দুয়েরই নাশ হয়ে গিয়ে সমত্ব এসে যাবে। কিন্তু আমরা যদি চেষ্টা করি, তপস্যা, সাধনা করে করে জগতের পারে চলে যেতে পারি, জগতের পারে চলে গেলে আমরা ভাল-মন্দ দুয়েরই পারে চলে যাব। হিন্দুদের কোন শাস্ত্রেই একজন ভাল মানুষ হওয়াকে জীবনের উদ্দেশ্য বলা হয় না। কিন্তু অন্যান্য ধর্মে, বিশেষ করে খ্রীশ্চান, পার্সিদের ধর্মের উদ্দেশ্যই হল ভাল হওয়া। কিন্তু হিন্দু ধর্মে বলা হয়, ভাল যেখানে আছে, সেখানে অবশ্যই মন্দও থাকবে। সেইজন্য পুরোপুরি ভাল বা পুরোপুরি মন্দ কখনই হবে না। ভাল-মন্দ কোনটাই যখন পুরোপুরি হয় না, সেইজন্য একমাত্র উপায়, ভাল-মন্দের পারে চলে যাওয়া। এটাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য, ভাল-মন্দের পারে যাওয়া। স্বামীজী এই জিনিসটাকে বার বার ব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন। শুধু স্বামীজীই বলছেন না, বেদান্তে বা শঙ্করাচার্যের যত ভাষ্য আছে, সব জায়গাতেই বলা হয়, ভাল মন্দের পারে যাওয়া। ভাল থাকলেই মন্দ থাকবে, জীবন থাকলেই মৃত্যু থাকবে, পূণ্য থাকলেই পাপ থাকবে, ধর্ম থাকলেই অধর্ম থাকবে। মানবজীবনের উদ্দেশ্য হল সব রকম দ্বন্দ্বের পারে যাওয়া। গীতায় ভগবানও অর্জুনকে দ্বন্দ্বরহিত হওয়ার উপেদশ দিচ্ছেন। শুধু গীতাতেই না, হিন্দু ধর্মের সব শাস্ত্রের উদ্দেশ্যই হল, মানুষকে দ্বন্দ্বাতীত অবস্থায় নিয়ে যাওয়া।

সেইজন্য এইবার স্বামীজী বলছেন, There is no possibility of ever having pleasure without pain, good without evil; for living itself is just the lost equilibrium. (*জগতে দুঃখবিরহিত সুখ, অশুভবিরহিত শুভ – কখনও পাবার সম্ভাবনা নেই; কারণ জীবনের অর্থই বিনষ্ট সাম্যভাব।*) জীবনে শুধু সুখই পেতে থাকব, দুঃখ কোন দিন পাব না, কখনই তা সম্ভব নয়, আর জীবনে সব সময় আমার ভালই হবে মন্দ কখনই হবে না, এও কোন ভাবে সম্ভব নয়। জীবন মানেই সাম্য ভাবের অভাব, equilibrium নষ্ট হয়ে যাওয়াটাই জীবন। আমরা অন্য রকম ভাবি, আমরা মনে করি disintregation হওয়া মানে জীবনের নাশ, ব্যালেন্সটা হল জীবন। সমষ্টির দৃষ্টিতে দেখলে, বিশেষ করে বেদান্ত যে অনেক চিন্তা-ভাবনা করে একটা তত্ত্ব বা দর্শনকে নিয়ে আসছেন, একেবারেই তা নয়, ঋষিরা ধ্যানের গভীরতম অবস্থায় পোঁছে বাস্তবিক দেখছেন, জিনিসগুলো এভাবেই হয়। যোগ শাস্ত্রে পুঙ্খানুপঙ্খ ভাবে বর্ণনা আছে, যোগ মতে যখন যোগীরা ধ্যান করেন তখন তাঁরা দেখেন, যে আবরণগুলো রয়েছে সেই আবরণগুলো একটার পর একটা সরে যাচ্ছে, এক এক করে আবরণ সরে যেতে যেতে শেষে দেখেন শুধু সত্ত্ব, রজো ও তমো আছে, এই তিনটে গুণের ব্যালেন্স যেমনি এসে গেল, তিনি এই তিনটে গুণের পারে চলে যান। তাই স্বামীজী বলছেন, জীবন মানেই ওই ব্যালেন্সটা নষ্ট হয়ে যাওয়া। What we want is freedom, not life, nor pleasure, nor good, (*আমাদের চাই মুক্তি; না জীবন, না সুখ বা না শুভ –এসবের কোনটাই নয়।*) বেদান্ত কখনই ভালও চায় না, সুখও চায় না, বেদান্ত শুধু চায় মুক্তি, , বেদান্তের উদ্দেশ্য চিরজীবন নয়, চিরসুখ নয়, উদ্দেশ্য একমাত্র মুক্তি।

অনেকে সন্ন্যাসীদের এসে জিজ্ঞেস করে, 'মহারাজ, ঘরবাড়ি ছেড়ে এসেছেন, শান্তি কি পেলেন'? সন্ন্যাসীরাও উত্তর দেন, 'আপনি কোথায় পেলেন শান্তি পাওয়া জীবনের উদ্দেশ্য? ঠাকুরও বলছেন না, স্বামীজীও বলছেন না আর বেদান্তও কোথাও বলছে না যে শান্তি পাওয়া জীবনের উদ্দেশ্য'। শান্তি পাওয়ার জন্য অত কিছু করার কোন দরকার নেই, মরে গেলেই তো শান্তি, বা গাঁজা খেয়ে নিন, ড্রাগস নিয়ে নিন, বুঁদ হয়ে পড়ে থাকুন, শান্তি এসে যাবে। যেমনি নেশার ঘোর কেটে যাবে আবার অশান্তি এসে যাবে, আবার খেয়ে নিন। চিতায় উঠে গেলে, আত্মহত্যা করে নিলে শান্তি, উদ্দেশ্য শান্তি নয়, উদ্দেশ্য হল মুক্তি। মুক্তি হলেই শান্তি এসে যাবে? একেবারেই তা নয়। যীশু মুক্ত পুরুষ ছিলেন, তাঁকে ক্রুশিফাই করে দিল। ভগবান বুদ্ধ মুক্ত পুরুষ, সকাল হতেই ভিক্ষাপাত্র হাতে তুলে নিয়ে বাড়ি বাড়ি ভিক্ষার জন্য ঘুরছেন, ভিক্ষা পাবেন কি পাবেন না, কোন ঠিক নেই। ঠাকুর শুধু মুক্ত পুরুষই ছিলেন না, অবতার বরিষ্ঠ, কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে দেখুন, কাশীপুরে দেখুন, তাঁর কি দুরবস্থা। শ্রীশ্রীমা মুক্ত আবার জগন্মাতা, অথচ কি নিদারুণ কষ্টের মধ্যে দিন গুজরান করেছেন, একদিকে খাবার জুটছে না, অন্য দিকে শাড়িতে গিট দিয়ে অবগুণ্ঠনময়ী মাকে লজ্জা নিবারণ করতে হচ্ছে। মুক্তির সাথে

শান্তির কোন সম্পর্ক নেই। কারণ সুখ শান্তি বলে কিছু হয় না। কাকে আমরা সুখ শান্তিতে থাকতে দেখেছি? যেসব মহাপুরুষদের দিকে আঙুল তুলে আমরা সব সময় দেখাচ্ছি, তাঁদের জীবনে কিসের সুখ, কিসের শান্তি ছিল! গান্ধীজী সারা জীবন অশান্তিতে ভুগলেন, নেতাজী সারা জীবন পালিয়ে পালিয়ে বেড়ালেন, আর আজ পর্যন্ত তাঁর কোন খোঁজই কেউ পেল না। মুক্ত পুরুষ হয়ে গেলে তাঁরও অশান্তি থাকবে, কিন্তু সেই অশান্তি তাঁকে আর বাঁধতে পারবে না। আসল যে শান্তি, আত্যন্তিক যে শান্তি সেটাকে আবার সাধারণ মানুষ বুঝতে পারবে না। আধ্যাত্মিক পুরুষদের প্রতি আমাদের যে দৃষ্টিভঙ্গী তাতে আমাদের মনে হয় তাঁদেরও কত অশান্তি, কিন্তু আসলে তিনি ভিতরে শান্ত, সেটা আলাদা জিনিস। যে অর্থে আমরা শান্তি বুঝি, সব কিছু ঠিকঠাক মত চলা, মন অশান্ত না থাকা, রোগব্যাধি না হওয়া ইত্যাদি। উদ্দেশ্য হল জ্ঞান, উদ্দেশ্য আত্মজ্ঞান।

স্বামীজী তাই বলছেন, Creation is infinite, without beginning and without end, the ever-moving ripple in an infinite lake, (*সৃষ্টিপ্রবাহ অনন্তকাল ধরে চলেছে –তার আদিও নেই, অন্তও নেই, যেন একটা অগাধ হ্রদের উপর সদা-গতিশীল তরঙ্গ।*) সৃষ্টির না আছে কোন শুরু, না আছে কোন শেষ। একটা সমুদ্রের যদি কল্পনা করা হয়, সেই সমুদ্রে অনবরত ঢেউ চলছে, সেই ঢেউ অনন্ত কাল ধরে চলেছে তো চলছেই, সৃষ্টি মানে তাই। সচ্চিদানন্দ সাগর, তার মধ্যে একটা ঢেউ উঠল, সেই ঢেউএর নাম সৃষ্টি, সেই ঢেউ এখন ব্যালেন্সে ফিরে আসতে চাইছে। সমুদ্রে ঢেউ ওঠার আগে সমুদ্র শান্ত ছিল, কিন্তু কোন কারণে ঢেউ উঠে গেছে, ঢেউ এখন চেষ্টা করছে, আমি কিভাবে শান্ত হব। শান্ত হতে গিয়ে একবার নীচে নেমে আসে, আরেকবার উপরে উঠে যায়। এই উপরে যাচ্ছে, এই নীচে নেমে আসছে, এই ভাবে চলতে চলতে তার শক্তি শেষ হয়ে গেলে ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে যায়। এটা একটা উপমা, কিন্তু সৃষ্টিটা ঠিক তাই, এই disturbanceটাই সৃষ্টি। স্বামীজী বলছেন, There are yet unreached depths and others where the equilibrium has been regined, (*ঐ হ্রদের এমন সব গভীর স্থান আছে, যেখানে আমরা এখনও পৌঁছাতে পারিনি; আর কতকগুলি জায়গা আছে, যেখানে সাম্যভাব পুনঃস্থাপিত হয়েছে।*) ওই সচ্চিদানন্দ সাগরের যদি কল্পনা করা হয়, সমুদ্রের অনেক গভীরে যদি যাওয়া যায় দেখা যাবে ওখানে সত্যিই কোন আলোড়ন নেই, আবার ওই সচ্চিদানন্দ সাগরে অনেক এলাকা আছে, যেখানে এক সময় অনেক ঢেউ উঠেছিল কিন্তু এখন শান্ত হয়ে গেছে। আমরা যখন অনন্তের কথা চিন্তা করি তখন মনে করি অনন্ত আকাশের মত, কিন্তু আকাশ অনন্ত কি করে হবে, আকাশ তো সীমিত বা মনে করছি সমুদ্র অনন্ত, সমুদ্র কি করে অনন্ত হবে! কবিরা যে অনন্তের কথা বলেন আসলে তাঁরা বিরাট বড় কিছুর কথা বলতে চাইছেন। যাঁদের আধ্যাত্মিক অনুভূতি হয়েছে, সেও সাধারণ অনুভূতি নয়, ঠাকুরের মত অনুভূতি হয়েছে, একমাত্র তাঁরাই জানেন অনন্ত বলতে কি। আমরা বলি এই পৃথিবী অনন্ত, অন্তরীক্ষ অনন্ত, কিন্তু এগুলো একেবারেই অনন্ত নয়, সবটাই সীমিত। অনন্ত একমাত্র ঈশ্বর। সেই অনন্ত ঈশ্বরে কত সৃষ্টি হয়ে চলেছে, কত কোটি ব্রহ্মাণ্ড এলো গেলো, কত কোটি ব্রহ্মাণ্ড equilibriumএ পৌঁছে গিয়ে একেবারে শান্ত হয়ে গেছে, কে তার খোঁজ রাখবে!

সেখান থেকে স্বামীজী বলছেন, but the ripple is always progressing, the struggele to regain the balance is eternal. (*কিন্তু উপরের তরঙ্গ সর্বদাই চলেছে, সেখানে অনন্তকাল ধরে ঐ সাম্যাবস্থা-লাভের চেষ্টা চলেছে।*) এই সৃষ্টি এগিয়ে চলেছে, সমুদ্রের কোথাও ঢেউ এগোচ্ছে, কোথাও এগিয়ে গিয়ে শান্ত হয়ে গেছে। ঢেউয়ের যে সংগ্রাম, আমি সমত্বে ফিরে যেতে চাই, শান্ত হয়ে যেতে চাই, এই লড়াই চিরন্তন। সৃষ্টি চাইছে যে সৃষ্টিটা থামুক, কিন্তু সৃষ্টি থামবে না। যদি ব্যালেন্সে এসে যায়, ওই ওঠা আর নামাটা যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে সৃষ্টিও শেষ। এই সৃষ্টিটা শেষ হয়ে যাবে ঠিকই, কিন্তু একই সাথে কত জায়গায় কত সৃষ্টি চলছে আর কত নূতন করে সৃষ্টি হচ্ছে, কেউ জানতে পারে না।

জীবন ও মৃত্যু – একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ, দুটোই মায়ার খেলা

Life and death are only different names for the same fact, the two sides of the one coin. (*জীবন ও মৃত্যু একটা ব্যাপারেরই বিভিন্ন নামমাত্র, একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ।*) জীবনকে আমরা খুব চাই, মৃত্যুকে আমরা কিছুতেই চাই না, কিন্তু আমরা মানতে পারি না যে, জীবন ও মৃত্যু একই জিনিস, আর এটাই সত্য। স্বামীজী এই জিনিসটাকে নিয়ে অনেকবার আলোচনা করেছেন। আমাদের শরীরের

কোষিকা গুলো অনবরত পাল্টাতে থাকে, তার মানে শরীরের পরিবর্তন সব সময় হচ্ছে, মৃত্যু হল ঝপাৎ করে পরিবর্তন হয়ে যাওয়া, খুব দ্রুত পরিবর্তন হয়ে গেল। জীবনও যা মৃত্যুও তাই, যে কোন মুদ্রায় যেমন দুটো দিক থাকে, হেড অ্যান্ড টেইল, ঠিক তেমনি জীবন থাকলে মৃত্যু থাকবে, মৃত্যু থাকলে জীবন থাকবে। আমরা এই ব্যাপারটা কিছুতেই বুঝতে পারি না, বুঝলেও মেনে নিতে পারি না, কারণ আমরা যাদেরকে নিয়ে আছি, যাদের নিয়ে বড় হয়েছি, তাদেরকে আমরা আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে যেতে দিতে চাই না। স্বামীজী এর আগে যেটা বললেন, আমরা আমাদের চিন্তা-ভাবনা সামনের বস্তু বা ব্যক্তির উপর আরোপিত করে দিই আর সেই অনুসারে আমাদের জীবন চলে। বাবা, মা, ভাই, বোন, স্বামী, স্ত্রী, যাদের ভালবাসছি এরা যেন বেঁচে থাকে, এটা আমার ভাব। তাকে দেখলে আমি খুশি হই, আসলে আমার ভিতরে আনন্দ, কিন্তু আমরা ভিতরের আনন্দকে আরোপ করে দিচ্ছি সামনের কোন বস্তু বা লোকের উপর। কাউকেই আমরা আমাদের চোখের আড়াল হতে দিতে চাই না, সেইজন্য মৃত্যু জিনিসটা আমরা ভিতর থেকে মেনে নিতে পারি না। জীবনও যা মৃত্যুও তা, ঢেউ যখন ওঠে সেই জলই উঠছে, নীচে যখন যাচ্ছে সেই জলই নীচে যাচ্ছে। আবার ঠাকুর বলছেন, জল হেললে-দুললেও জল, শান্ত থাকলেও জল।

এটাই স্বামীজী এবার বলছেন, Both are Maya, the inexlicabale state of striving at one time to live, and a moment later to die. (*উভয়ই মায়া –এ অবস্থাটা পরিষ্কার করে বোঝাবার জো নেই; এক সময় বাঁচবার চেষ্টা হচ্ছে, আবার পরমুহূর্তে বিনাশ বা মৃত্যুর চেষ্টা।*) এই মায়ার হেতু এক সময় মনে করে আমি বেঁচে থাকতে চাই, আবার অনেক সময় মনে করি আমি আর পারছি না, এবার চলে গেলেই হয়, একই জিনিস চলছে, সৃষ্টিও তাই। আসলে একগুলো খুবই উচ্চমানের কথা। আমাদের হিন্দুদের যত শাস্ত্র আছে, অন্যান ধর্মে যত শাস্ত্র আছে, এভাবে জিনিসগুলোকে কোথাও ব্যাখ্যা করা হয়নি। মায়া সব সময় নিজেকে অনুভব করতে চাইছে, জীবন রূপে অনুভব করে, মৃত্যু রূপে অনুভব করে। Beyond this is the true nature, the Atman. (*আমাদের যথার্থ স্বরূপ আত্মা –এ দুয়েরই পারে।*) এই মায়ার পারে শুদ্ধ আত্মা, সেই শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ। সমুদ্র রয়েছে ঢেউও রয়েছে, ঢেউএর যে আধার সেটাও সমুদ্র, এই ঢেউটাই মায়া, এই ঢেউটাই সৃষ্টি, সমুদ্রই আসল।

উপাস্যই উপাসকের প্রকৃত আত্মা, সে নিজে

স্বামীজী বলছেন, While we recognize a God, it is really only the Self which we have separated ourselves from and worship as outside of us; but it is our true Self all the time, the one and only God. (*আমরা যখন ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করি, তা আর কিছু নয়, তা প্রকৃতপক্ষে সেই আত্মাই –যা থেকে আমরা নিজেদের পৃথক বলে উপাসনা করছি। কিন্তু সেই উপাস্য চিরকালই আমাদের প্রকৃত আত্মা –এক ও একমাত্র ঈশ্বর, যিনি পরমাত্মা।*) স্বামীজী একটা অত্যন্ত কঠিন বিষয়কে নিয়ে বলছেন, স্বামীজী যাদের সামনে এটাকে নিয়ে আলোচনা করেছিলেন, তাদের মনকে স্বামীজী তৈরী করে রেখেছিলেন, দ্বিতীয়তঃ স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব এমন ছিল যে, যারা বুঝতে চাইছেন, বোঝার যোগ্য নয়, তাদেরকেও তিনি নিজের ব্যক্তিত্বের প্রভাব দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

ঈশ্বর বা সচ্চিদানন্দ যিনি আছেন, একমাত্র তিনিই আছেন, তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। যখন জগতের মাধ্যমে বা জগৎ দিয়ে তাঁর দিকে তাকানো হয় তখন আমরা তাঁকে ঈশ্বর রূপে দেখি। জগৎটা যেন একটা কাঁচ, সেই কঁচের ভিতর দিয়ে সেই অনন্তকেই আমরা দেখছি। আগেকার দিনের বায়স্কোপে একটা ছোট লেন্স থাকত, একটা কোন গান বাজত, তাজমহল দেখো, দিল্লী কা কুতবমিনার দেখো, সাথে সাথে সেই লেন্সের ভিতর দিয়ে বাচ্চারা নানা রকম দৃশ্য দেখতে থাকত, ঠিক তেমনি জগতরূপী কাঁচ দিয়ে যে দৃশ্যগুলি আসছে আমরা সেই দৃশ্যগুলিকে দেখতে থাকি। সেই অনন্ত সচ্চিদানন্দ, তাঁকে যখন আমরা ছোট্ট একটা কাঁচের ভিতর দিয়ে দেখি, কাঁচ মানে জগৎ, তখন তাঁকে ঈশ্বর রূপে দেখায়। সেই ঈশ্বর হলেন সর্বশক্তিমান, সর্বনিয়ন্তা আর তিনি কামধেনুর মত তাঁর ভক্তদের সমস্ত ইচ্ছাপূরণ করেন। জগতে শুভ অশুভ যা কিছু হয় তিনি তাঁর নিয়ামক, তিনিই যখন আবার সবাইকে নিজ নিজ কর্মফল প্রদান করেন, তখন তাঁকে বিধাতা বলছি। আমরা মনে করি ঈশ্বর, যাঁর মধ্যে এই গুণগুলো রয়েছে, তিনিই আমাদের সৃষ্টি করেছেন।

বাইবেলে একটা বাক্য আছে, God made man in his own image, ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করলেন নিজের ইমেজে, তিনি যেমন মানুষও তেমন। যার জন্য মানুষ যখন ঈশ্বরের অবধারণা করার চেষ্টা করে তখন তাঁকে মানুষের মতই দেখে, কারণ বাইবেলেই এই কথা আছে। তাই থেকে পাশ্চাত্য দার্শনিকরা বলছেন, Man made God in his own image, আমরা যেমন, ঈশ্বরকেও আমরা সেই রকমই ভাবি। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ, বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র পড়লে দেখা যায়, ঈশ্বরের ব্যাপারে অবধারণা ভিন্ন ভিন্ন রকমের। কিন্তু এই জায়গাতে এসে স্বামীজী সব চুরমার করে ভেঙে দিয়ে জিনিসটাকে পুরো পাল্টে দিলেন। ঘোর অদ্বৈতের ভাবই হল, সচ্চিদানন্দ ছাড়া কিছু নেই, এটাই বেদান্তের মূল ভাব। যতই আমাদের কঠিন মনে হোক না, আর ঠিকই এটা খুবই কঠিন, কিন্তু এটাই বেদান্তের মত। বেদান্তের মত মানে, এটা কোন ফিলজফি নয়, কোন চিন্তা-ভাবনা প্রসূত কোন কিছু নয়, এটাই সত্য, সচ্চিদানন্দ ছাড়া কিছু নেই। সচ্চিদানন্দ ছাড়া বাকি যা কিছু আছে বলে মনে হচ্ছে, ওটা মায়া। মায়া কি রকম? এতক্ষণ ধরে যে আলোচনা চলছে, সমুদ্র আর ঢেউ। ঢেউ কি? সত্ত্ব, রজো ও তমো। আমি বাস্তবে সেই সচ্চিদানন্দ কিন্তু ঢেউএর সাথে এক করে আমি নিজেকে ঢেউ মনে করছি। কিন্তু বাস্তবে আমরা সবাই সেই শুদ্ধ সচ্চিদনন্দ সমুদ্র। কিন্তু ওখানে যে ঢেউটা উঠছে, যদি কল্পনা করা যায়, একটা সমুদ্র রয়েছে, বা একটা পুকুর আছে, ছোট বড় যাই হোক, মনে করা যাক সেই পুকুরের চিন্তা করার শক্তি আছে। পুকুর নিজের মত শান্ত হয়ে পড়ে আছে, এবার হঠাৎ একটা ঢেউ উঠল। পুকুর এবার চিন্তা করতে শুরু করল, আমি এই ঢেউ। পুকুর নিজেকে ভাবতে পারে আমিই সেই ঢেউ, সত্যিই তো সে ঢেউ, কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সেখানেই সে ইতি হয়ে যাচ্ছে না, সে আরও অনেক কিছু। আর দ্বিতীয় আরেকটা চিন্তা করতে পারে, এই ঢেউটা আমার। আমাদের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়, এই দেহটা আমার, কিন্তু আমরা মনে করি আমি এই দেহ। এই মন আমার, কিন্তু আমরা মনে করি এই মনটাই আমি। যাকে বা যে বস্তুকে ভালবাসি, সেটাকেও মনে করে ওটা আমি। মানুষ নিজের বাড়িকে ভালবাসি, মনে করে এই বাড়িটা আমি। বলার সময় বলবে, এটা আমার বাড়ি, কিন্তু মনে করে এটা আমি, এই গাড়ি আমি, এই সন্তান আমি, এই নাতি আমি। এটাকেই গীতায় ভগবান বলছেন, *অসক্তিরনভিসঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু*, *অসক্তি* হয় নিজের শরীর মনের সঙ্গে আর *অভিষঙ্গ* হয় বাইরের জিনিসগুলির সাথে যে আসক্তি, নিজেকে জুড়ে নেওয়া।

স্বামীজী এবার আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে বলছেন, এই যে সচ্চিদানন্দ সাগর, যেটা আমি আপনি সবাই, এটাই আবার চিন্তা করে, একটা ভাব কল্পনা করে, আর সেটা ঈশ্বর রূপে সামনে এসে দাঁড়িয়ে যায়। আমি যাঁকে ঈশ্বর রূপে দেখছি, আসলে তিনি অন্য কেউ না, আমি নিজে। আমরা যেমন নিজেকে শরীর রূপে কল্পনা করি, নিজেকে যেমন মন রূপে কল্পনা করি, যে বাড়িকে এখন মনে করছি এটা আমার বাড়ি, দুদিন পরে ওই বাড়ি আমার ব্যক্তিত্বের সম্প্রসারিত রূপ হয়ে যাবে, যদিও বলি আমার বাড়ি কিন্তু আসলে মনে মনে ভাবছি এটা আমি নিজে। ঠিক তেমনি, যাঁকে আমরা ঈশ্বর বলে মনে করি, সেটা আমারই নিজের রূপ। তবে এই জায়গাতে একটা সমস্যা হয়ে যায়, ওখানে ঠিক আমি আমার নিজের রূপে নেই। যাঁরা বেদান্ত ঠিক ঠিক বোঝেন না, তাঁরা মনে করেন যে, আমি আমাকে বলতে যেটা বুঝি এটা তারই রূপ। কিন্তু তা নয়, এটা হল, যেখানে সমস্ত বৃত্তিগুলি, অর্থাৎ দেহ, মন, শুদ্ধ চিন্তন, সব কটা বৃত্তিগুলিকে পুরো যখন ভেঙে দেওয়া হবে। যদিও রামানন্দের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা, মধ্বাচার্যের দ্বৈতবাদীরা এসব কথা শুনলে মুখে আগুন ছুঁড়ে মারবে। কিন্তু যাঁরা বেদান্তী তাঁরা জানেন, যাঁকে আমি ঈশ্বর রূপে উপাসনা করছি, আসলে তা আমারই রূপ, আমরা যে পূজা করছি তা আমরা নিজের রূপকেই পূজা করছি। তাহলে পূজা বন্ধ করে দিলেই হয়। কিন্তু না, আমি জানতাম না যে আমি নিজেকে শরীর মনে করছি, নিজেকে মন মনে করছি, নিজেকে অহঙ্কার মনে করছি, নিজেকে চিত্ত আদি মনে করছি, সেইজন্য যিনি ঈশ্বর তিনি আমার থেকে অবশ্যই আলাদা, সেইজন্য ঈশ্বরকে ঈশ্বর রূপেই পূজা করতে হবে। কিন্তু এটা কখনই ভুলে যাওয়া যাবে না যে, কি দুর্ভাগ্য আমি নিজেকে এসব কিছুর সাথে জুড়ে রেখেছি বলেই আমি আমার আসল রূপকে দেখতে পারছি না, জানতে পারছি না। স্বামীজী তাই বলছেন, Beyond this is true nature, the Atman, এই সমস্ত পরিবর্তনের পারে আত্মা। While we recognize a God, it is really only the Self which we have separated ourselves from and worship as outside of us, আমরা ঈশ্বরকে মানছি, কিন্তু ওই ঈশ্বর কে? আমারই আত্মা আলাদা

হয়ে আমার থেকে বাইরে গিয়ে আমার সামনে আমারই ইষ্ট রূপে দাঁড়িয়ে আছেন, কিন্তু আমরা যখন বাইরে তাঁর পূজা করছি তখন আমরা ভুলে যাচ্ছি যে ওটাই আমি।

শুনতে আমাদের খুব অবাক লাগে। অবাক হওয়ার কিছু নয়, ঈশাবাস্যোপনিষদে দুটো ভাবের কথা বলা হয়েছে, প্রথম ভাবটা সন্ন্যাসীদের ভাব, যাঁরা দেখছেন সবটাই আত্মা, আর দ্বিতীয় ভাব হল, যিনি সারা জীবন শুদ্ধ পবিত্র গৃহস্থ জীবন যাপন করেছেন, স্বাধ্যায় করেছেন, যজ্ঞ-যাগ করেছেন, এবার তাঁর মৃত্যুর সময় এসে গেছে, তাই তিনি তাঁর ইষ্ট দেবতা সূর্যের কাছে মৃত্যুর সময় প্রার্থনা করছেন, হে দেবতা! তোমার এই আলোর রশ্মিকে গুটিয়ে নাও, আমি তোমার পিছনে যে আধ্যাত্মিক সত্তা রয়েছে সেটাকে দেখতে চাই। কেন দেখতে চাই? এটাই আমার অধিকার, *সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে*, আমি তপস্যা করেছি, শুদ্ধ জীবন-যাপন করেছি, এটা আমার অধিকার। আর তাই না, *যোহসাবসৌ পুরুষঃ সোহহমস্মি*, তোমার পিছনে যে আধ্যাত্মিক সত্তা রয়েছে ওটা আমি নিজে, এটা তাই আমার অধিকার। ঠাকুর বলছেন, মায়ের তেমন ছেলের নামে নালিশ চলে না, কারণ মায়ের সব কিছুর উপর, মায়ের সম্পত্তির উপর ছেলের সব সময়ই অধিকার। ছেলেও জানে এটা আমার অধিকার, যিনি তপস্যা করেছেন, সাধনা করেছেন, এটা তাঁর অধিকার। উপনিষদেই বলছে, *যোহসাবসৌ পুরুষঃ সোহহমস্মি*, ওটা আমি। স্বামীজীও বলছেন, যাঁকে পূজা করছে, ভগবান বিষ্ণুর পূজা করছে, সেটা তারই রূপ। দুর্ভাগ্য যে সে নিজেকে শরীরের সাথে, মনের সাথে ও আরও হাজার রকম জিনিসের সাথে জুড়ে রেখেছে। উপনিষদের সেই ব্রাহ্মণ, যিনি মৃত্যুর সময় নিজেকে এই কথা বলতে পারছেন, কারণ তিনি সারাটা জীবন ধরে তপস্যা করেছেন, স্বাধ্যায় করেছেন, গুরুসেবা গুরুসঙ্গ করেছেন, সাধনা করেছেন। তার সাথে তিনি বলতে পারছেন, দেখো, আমি এখনও দেখতে পাইনি ঠিকই কিন্তু তত্ত্বগত ভাবে আমি জানি যে ওটা আমারই রূপ। কিন্তু যিনি আত্মজ্ঞানী তিনি আগেই জেনে গেছেন, তিনি দেখে নিয়েছেন, সেইজন্য তিনি আগেই বলতে পারছেন, *তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ*। আত্মজ্ঞানীর একত্বের জ্ঞান হয়ে গেছে, সেইজন্য তাঁর পূজাও নেই, অর্চনাও নেই কারণ তিনি জানেন, তুমিও যা আমিও তাই। গৃহস্থ ব্রাহ্মণ তত্ত্বতঃ জিনিসটাকে জেনে গেছেন, কিন্তু এখনও সেই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হননি।

এটাকেই স্বামীজী এখানে মনে করিয়ে দিচ্ছেন, ঈশ্বর রূপে তুমি যাঁর উপাসনা করছ, আসলে ওটা তোমারই রূপ। কিন্তু আমাদের পক্ষে এগুলো অনেক সময় খুব বিপজ্জনক হয়ে যেতে পারে, কারণ কাঁচ মন যাদের তারা এগুলো বুঝতে পারে না। ঠাকুরের কাছে এসে একজন বলছিল, আমরা যে বহির্পূজা করি সেতো আমরা নিজেকেই পূজা করি। শুনে ঠাকুর বলছেন, ওটা খুব উঁচু কথা। সেইজন্য বলা হয়, অদ্বৈত সবার জন্য নয়, বেদান্ত সবার জন্য নয়। ইদানিং ছাপাখানা হয়ে গেছে, আর স্বামীজীর সৌজন্যে সবাই এখন উপনিষদ পড়ার সুযোগ পেয়ে গেছে। কেউ কিছু বোঝে না, কিন্তু তাতে কোন দোষ নয়, তবে তখনই সমস্যা হয় যখন এর ভুল ধারণা করে নিজের জীবনকে উল্টোপাল্টা ভাবে চালাতে যায়। দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দিরে একজন ছিলেন, যিনি বেদান্তের উপর প্রচুর কথা বলতেন, কিন্তু অন্য দিকে তাঁর চরিত্র একেবারে নষ্ট ছিল। ঠাকুর তাঁকে একদিন বলছেন, একদিকে তুমি বেদান্তের কথা বল আর অন্য দিকে এসব নোংরা কাজ করে বেড়াচ্ছ! লোকটি বলছে, এটাও মিথ্যা। ঠাকুর তার উপর প্রচণ্ড রেগে গেলেন, তোমার বেদান্ত জ্ঞানে আমি ইত্যাদি করি। আমি যখন পূজা করছি তখন আমি নিজেরই পূজা করছি, কারণ ঈশ্বরের রূপ আমারই রূপ, এই কথা যিনি বলবেন, জানতে হবে হয় তিনি ঈশাবাস্যোপনিষদের সেই ব্রাহ্মণের মত সৎ জীবন-যাপন করেছেন, সারাটা জীবন তপস্যা করেছেন আর তা নাহলে এক শুদ্ধ সন্ন্যাসীর মত ত্যাগ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন, যে আত্মজ্ঞানের জন্য তাঁর কারুর প্রতি বিশেষ ভালবাসা নেই, কারুর প্রতি কোন বিদ্বেষ নেই, তাঁর শোক নেই, তাঁর মোহ নেই, তাঁর গলা যদি কেটে দেওয়া হয় তাতেও তাঁর কিছু এসে যাবে না, তাঁকে যদি খুব সম্মান জানানো হয়, তাতেও তাঁর কিছু আসবে যাবে না। এগুলো কোন মুখের কথা নয়, তিনি বাস্তবিক জানেন যে সচ্চিদানন্দ ছাড়া কিছু নেই। তখন যদি কখন তিনি মা কালীর মন্দিরে গিয়ে পূজা করেন, তখন তিনি জানবেন যে মা কালী আমার মালকিন নন, তিনি আমার নিয়ন্তা নন, তাঁর কাছে আমার ভয়ের কিছু নেই, কারণ তিনিও যা আমিও তাই। যদিও এটা খুব উচ্চ অবস্থার কথা, কিন্তু এটাই সত্য।

আমরা যত আলোচনা করে যাই না কেন, আমি আলাদা, ঈশ্বর আলাদা, এই ভাব থেকে আমরা কিছুতেই বেরিয়ে আসতে পারব না। আমি, তুমি, ঈশ্বর এক আধারে নিয়ে আসা বা ঠাকুর যেটা বলছেন, গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণব বা ভাগবৎ, ভক্ত, ভগবান এক দেখা, এই জিনিস আমাদের পক্ষে অসম্ভব, সম্ভবই না। যতক্ষণ না কোন দর্শনকে মন-প্রাণ দিয়ে আয়ত্ত করে সমগ্র জীবনকে ওর মধ্যে ঢেলে না দিতে পারছি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ধারণা করতে পারব না যে, এখানে স্বামীজী কি বলতে চাইছেন। ভাল কথা শুনছি, শুনতে ভাল লাগছে, সৎসঙ্গ হচ্ছে, এর বেশী কিছু আর হবে না।

সাম্যাবস্থায় ফিরে যাওয়ার উপায়

কিন্তু ওই সাম্যাবস্থায় আমরা কিভাবে ফেরৎ যাব? স্বামীজী বলছেন, To regain the balance we must counteract Tapas by Rajas; then conquer Rajas by Sattwa, the calm beautiful state that will grow and grow until all else is gone. Give up bondage; became a son, be free, and they you can 'see the Father', as Jesus. Infinite strength is religion and God. Avoid weakness and slavery. You are only a soul, if you are free; there is immortality for you, if you are free, there is God, if He is free.(*সে নষ্ট সাম্যাবস্থা ফিরে পেতে গেলে আমাদের প্রথমে তমকে ব্যর্থ করতে হবে রজ দ্বারা, পরে রজকে জয় করতে হবে সত্ত্ব দ্বারা। সত্ত্ব অর্থে সেই স্থির ধীর প্রশান্ত অবস্থা, যা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে, শেষে অন্যান্য ভাব একেবারে চলে যাবে। বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে দাও, মুক্ত হও, যথার্থ 'ঈশ্বরতনয়' হও, তবেই তুমি যীশুর মত পিতাকে দেখতে পাবে। ধর্ম ও ঈশ্বর বলতে অনন্ত শক্তি, অনন্ত বীর্য বুঝায়। দুর্বলতা –দাসত্ব ত্যাগ কর। যদি তুমি মুক্তস্বভাব হও, তবেই অমৃতত্ব তোমার করতলগত; যদি মুক্ত স্বভাব হন, তবেই বলব –ঈশ্বর যথার্থ আছেন।*)

স্বামীজী জগতের ব্যাপারে আরও বলতে গিয়ে বলছেন, The world for me, not I for the world. Good and evil are our slaves, not we theirs. It is the nature of the brute to remain where he is (not to progress); it is the nature of man to seek good and avoid evil; it is the nature of God to seek neither, but just to be eternally blissful. Let us be God! Make the heart like an ocean, go beyond all the trifles of the world, be mad with joy even at evil; see the world as a picture and then enjoy its beauty, knowing that nothing affects you. Children finding glass beads in a mud puddle, that is the good of the world. Look at it with calm complacency; see good and eveil as the same, both are merely 'God's play'; enjoy all. (*জগৎটা আমার জন্য, আমি কখনও জগতের জন্য নই। ভাল-মন্দ আমাদের দাসস্বরূপ, আমরা কখনও তাদের দাস নই। পশুর স্বভাব – উন্নতি করা নয়, বরং যে অবস্থায় আছে, সেই অবস্থায় পড়ে থাকা; মানুষের স্বভাব –মন্দ ত্যাগ করে ভালটা পাবার চেষ্টা করা। আর দেবতার স্বভাব –ভাল-মন্দ কিছুর জন্য চেষ্টা থাকবে না, সর্বদা সর্বাবস্থায় আনন্দময় হয়ে থাকা। আমাদের দেবতা হতে হবে। হৃদয়টা সমুদ্রের মতো মহান্ করে ফেলো; সাংসারিক তুচ্ছতার পারে চলে যাও; এমন-কি অশুভ এলেও আনন্দে উন্মত্ত হয়ে যাও; জগৎটাকে একটা ছবির মত দেখ; এইটি জেনে রাখো যে, জগতে কোন কিছুই তোমাকে বিচলিত করতে পারে না; আর এইটি জেনে জগতের সৌন্দর্য উপভোগ কর। যেমন ছোট ছোট ছেলেরা খেলা করতে করতে কাদার মধ্য থেকে কাচের পুঁতি কুড়িয়ে পেয়েছে। জগতের সুখদুঃখের উপর শান্তভাবে দৃষ্টিপাত কর, ভাল-মন্দ উভয়কেই সমান বলে দেখ –দুই-ই ভগবানের লীলাখেলা; সুতরাং ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ –সবেতেই আনন্দ কর।*)

পঁচিশে জুনের আলোচনা চলছে। ভক্ত, ঈশ্বর, সাধু, মহাত্মা এই শব্দগুলো আমাদের সবারই পরিচিত, অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ, এই দুটো শব্দও আমরা প্রায়ই ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না যে, অন্তর্জগৎ আর বহির্জগৎ দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জগৎ। আমার ভিতরে যে জগৎ সেটা একটা আর বাইরের জগৎ আরেকটা জগৎ। এই দুটো জগৎকে যতদিন আমরা একটা স্তরে নিয়ে গিয়ে মেলাতে না পারছি, অন্তর্জগৎ যেমন চলছে, বহির্জগৎ তেমনি চলবে, ততদিন আমরা জীবনে উন্নতির আলো থেকে বঞ্চিত হতে থাকব। কিছু দিন

আগে একটা লেখা বেরিয়েছিল, যেখানে লেখক বলছেন, জীবনের দুঃখ-কষ্ট, জীবনের বেদনা আর মৃত্যু, এগুলোকে দুই ধরণের লোক খুব ভাল ভাবে মোকাবিলা করেন। প্রথম, যারা ঘোর নাস্তিক, আমি কোথা থেকে এলাম, কোথায় যাব অত ভাবার দরকার নেই, এই জীবন এসেছে, একদিন এই জীবন শেষ হয়ে যাবে। এরা পুরোপুরি নাস্তিক। দ্বিতীয় হল যারা খুব ধার্মিক, যাদের মধ্যে ধর্মের ভাব সত্যিকারের প্রবল। কাহিনী, গল্পে এমন অনেক কিছু পাই, যা আমাদের মনে গভীর রেখাপাত করে; কিন্তু বাস্তবেও অনেক কিছু ঘটনা ঘটে যা আমাদের নাড়া দিয়ে যায়। বেশ কয়েক বছর আগে, পার্ক সার্কাস অঞ্চলে কিভাবে এক মুসলমান ভদ্রলোকের দুটি ছেলে পথ দুর্ঘটনায় একই সাথে মারা যায়। ঘটনাটা সংবাদপত্রে এসেছিল। মারা যাওয়ার খবর পেয়ে ভদ্রলোকের চোখে জল কিন্তু বলছেন, আল্লা দিয়েছিলেন, আল্লা নিয়ে নিলেন।

যদি আমরা মনে করি, অন্তর্জগতে ঈশ্বর আছেন, আমরা ঈশ্বরের সন্তান, তিনিই সব কিছু হয়েছেন, তাহলে বহির্জগতেও আমাদের এই ভাব নিয়ে আসতে হবে। যদি না নিয়ে আসা হয়, তাহলে ওটা মুখের কথা হয়েই থেকে যাবে, ওই কথার কোন দাম নেই। তেমনি আমরা যদি মনে করি বহির্জগৎটা বিভিন্ন পদার্থের মিশ্রণে তৈরী, তাহলে অন্তর্জগৎকেও আমাদের সেইভাবে দেখতে হবে, দুটো জগৎকে একই ভাব দিয়ে পুষ্ট করতে হবে। সব রকম দুঃখ-কষ্টের মূল হল, আমরা ভিতরে অন্তর্জগতে এক রকম কথা ভাবি আর বহির্জগতে অন্য রকম করি। ভৌত দর্শনকে ছেড়ে আমরা যদি ধর্মজীবনের দিকে তাকাই, তাহলে হিন্দুদের আমরা দুটি পথ বা দুটি ভাব দেখতে পাই। প্রথমটাকে বলে জ্ঞানের পথ, যেখানে বলা হয় আত্মা বা শুদ্ধ চৈতন্যই আছেন, বাকি যা কিছু আছে সব নাম আর রূপের খেলা। এতক্ষণ পর্যন্ত স্বামীজী নাম-রূপের খেলা নিয়ে আলোচনা করলেন। সেখান থেকে স্বামীজী এবার চলে আসছেন ভক্তিতে। ভক্তিতে যিনি ইষ্ট, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণই হন, বিষ্ণু হন, কালী হন, আল্লাই হন, যিনিই হন, উচ্চতম অবস্থায় দেখেন তিনিই সব কিছু হয়েছেন, আর সব কিছুকে তিনিই চালাচ্ছেন, অন্য কোন শক্তি চালাচ্ছে না। ঠাকুরকে কোন ভক্ত জিজ্ঞেস করছে, মহাশয় স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছু আছে কি? ঠাকুর বলছেন, ভক্ত দেখে সব তিনিই করাচ্ছেন। যতক্ষণ এই বোধ না হয়, ততক্ষণ মনে হয় আমি করছি। সত্য হল, ভিতরে যিনি চৈতন্য সত্তা, তাঁকে আত্মাই বলি, অন্তর্যামীই বলি, ঈশ্বর বলি, যেটাই বলা হোক না কেন, তিনিই সব কিছু চালান। কিন্তু সেই চালনা আমাদের মন দিয়ে হয়, আমি হাত নাড়ছি, কথা বলছি, চিন্তা করছি এগুলো সব মন দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়, ফলে আমাদের মনে হয় আমি করছি। আমি যদি নিজেকে মন মনে করি তখন মনে করব আমার মনই সব করছে। যদি আমি মনে করি আমি শুদ্ধ আত্মা, তখন আমি মনে করব, আত্মা আছেন বলে এগুলো হচ্ছে। আর আমি যদি ভক্ত হই তাহলে মনে করব, তিনিই সব করাচ্ছেন। ঠিক ঠিক অদ্বৈতবাদীরা দেখেন কোথাও কোন ক্রিয়া হচ্ছে না, জিনিসগুলো নিজের মত নড়ছে, এখানে আমিত্ব বলে কিছু নেই। এই ভাবটাকে এবার স্বামীজী নিয়ে আসছেন, দেখাচ্ছেন ব্যাবহারিক জীবনে কিভাবে এই ভাবকে নামানো যাবে।

প্রাথমিক অবস্থায় অসৎ ও অশুভ থেকে দূরে থাকতে হবে

স্বামীজী এই ভাবকে বলতে গিয়ে শুরুতেই বলছেন, My Master used to say, 'All is God; but tiger-god is to be shunned. (*আমার গুরুদেব বলতেন, 'সবই নারায়ণ বটে, কিন্তু বাঘ-নারায়ণের কাছ থেকে সরে থাকতে হয়।*') স্বামীজী ঠাকুরের কথা বলছেন, সবই নারায়ণ, হাতি নারায়ণ, মাহুত নারায়ণ, নারায়ণই সব হয়েছেন, বাঘও নারায়ণ কিন্তু তাকে কেউ আলিঙ্গন করতে যায় না। যারা শাস্ত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, তাদের কথা আলাদা, কিন্তু যারা শাস্ত্র পড়েছে কিন্তু ঠিক মত বোঝে না, নিজের মত চিন্তা-ভাবনা করে কিছু একটা দাঁড় করিয়ে দেয়, তর্কাতর্কি করার সময় অনেক বড় বড় কথা বলে, বুঝতে হবে এদের কোন প্রকার ধর্মের অনুশীলন নেই। আমরা যা কিছু করছি সবটাই ঈশ্বরের, যার ক্ষতি করছি সেটাও ঈশ্বরের, কিন্তু তার সাথে আমাদের মনে রাখতে হবে, স্বর্গটাও ঈশ্বরের নরকটাও ঈশ্বরের। আমাদের খুব প্রচলিত একটা কথা আছে, আর প্রায়শই আমরা এই কথা বলে থাকি, বিশেষ করে যারা দীক্ষাদি নিয়েছে, 'ঠাকুর এসে আমাদের নিয়ে যাবেন'। কোথায় নিয়ে যাবেন সেটা আর বলছে না। কেউ বলবে রামকৃষ্ণলোক, কিন্তু বুঝতে পারছেন না যে, নরকটাও রামকৃষ্ণলোক। নরক কি ঠাকুরের বাইরে? নরকটাও ঠাকুরের, পাতালটাও ঠাকুরেরই। কথায় বলে, জাতে মাতাল, তালে ঠিক। মদ খেয়ে মাতলামি করছি, কিন্তু একবার ওর পকেটে হাত দিয়ে দেখুন, খপ্

করে হাত চেপে ধরবে, এত বড় আস্পর্ধা! আমার পকেট থেকে টাকা নেওয়া হচ্ছে। মুখে সব বড় বড় কথা বলবে, সব সময় ঈশ্বর ঈশ্বর করবে, সবই ঠাকুরের। খুব ভাল কথা, যদি আপনার সন্তান মরে যায় তখন কি বলতে পারবেন, 'ঠাকুরের জিনিস ঠাকুর নিয়ে গেছেন'? তখন বলবে, 'শালার ঠাকুর'। আমরা যখন অসৎ কাজ করি, তখন বলছি ঠাকুর আছেন। এখানে এই জিনিসটাকে আটকানো হচ্ছে, প্রথমে তোমাকে অশুভ কর্ম থেকে, অসৎ লোকেদের থেকে দূরে থাকতে হবে। গীতার দশম অধ্যায়ে ভগবান বলছেন, যত শুভ জিনিস আছে আমি সেখানে আছি। ঈশ্বর সব কিছুতেই আছেন, কিন্তু যে জিনিসগুলোতে সত্ত্বগুণের আধিক্য, যেখানে তাঁর প্রকাশ বেশি, প্রথমে এই শুভ জিনিসগুলিকে দেখার অনুশীলন করতে হবে। যেখানে যেখানে শুভ শক্তি রয়েছে, যেখানে সত্ত্বগুণের প্রকাশ বেশি, আগে ঐ-সব জিনিসের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখার চেষ্টা করতে হয়। সেখান থেকে ধীরে ধীরে এগোতে হয়। এই ভাবটাই স্বামীজী এই কথাতে বলতে চাইছেন, My Master used to say, 'All is God; but tiger-god is to be shunned, সবই নারায়ণ কিন্তু বাঘ নারায়ণ থেকে দূরে থাকতে হয়।

All water is water; but we avoid dirty water for drinking. (*সব জলই নারায়ণ বটে, তবে ময়লা জল খাওয়া যায় না।*) ঠাকুর বলছেন, আপো নারায়ণঃ, সব জলই নারায়ণ, কিন্তু আমরা জানি কোন জল খেতে হয়, কোন জল খেতে নেই। দৈনন্দিন জীবনে এই বিচারটা রাখতে হয়, বিশেষ করে যারা ধর্মজীবনে নূতন আসছে; তাদের জন্য এটা অত্যন্ত জরুরী। নারদীয় ভক্তিসূত্রে বলছেন, যাঁরা ঈশ্বরের ভজনা করেন, যাঁরা সব সময় ঈশ্বরীয় কথা বলেন, তাঁদেরই সঙ্গ করতে হয়; যাঁরা বিষয়ের কথা বলে, যাদের ভাব বিষয়ী, তাদের থেকে দূরে থাকতে হয়, তাদের সঙ্গ করলে ভাব নষ্ট হয়ে যায়। যারা সবে ধর্ম পথে এসেছে, একেবারে নূতন, যাদের ভিতরে এখনও বিষয়ীর ভাব প্রবল, হয়ত জন্মজন্মান্তরে কোন শুভ সংস্কারের দরুন তার ভিতরে অল্প একটু শুভ ভাবের উদয় হয়েছে, ওই শুভ ভাবকে এবার বাড়াতে হবে, ভাবকে আরও পাকা করতে হবে। যেখানে আগুন জ্বালানো হয়েছে, সেখানে যদি খুব বাতাস চলে সেই আগুনকে প্রথমে খুব সামলে রাখা হয়, সামলে না রাখলে আগুন নিভে যাবে।

জগদ্ব্যাপী সর্বত্র তাঁরই পূজা চলছে – পৃথক মন্দিরে কি প্রয়োজন

স্বামীজী বলছেন, The whole sky is the censer of God, and sun and moon are the lamps. (*'গগনময় থালে রবিচন্দ্র-দীপক জ্বলে'।*) আগেকার দিনে চার্চ আদিতে একটা পাত্রে ধুপ-ধুনো জ্বালিয়ে ধুনো দেওয়া হত, ওই পাত্রকে censer বলা হয়, বাংলায় এর অনুবাদ করছেন থালা, কিন্তু censer আরেকটু আলাদা। আকাশরূপী থালাতে সূর্য, চন্দ্র যেন প্রদীপ, ভগবান হলেন সেই থালা; সব কিছুকে জুড়ে ভগবান কিনা। অনেক জায়গায়, যেমন মুণ্ডকোপনিষদে বলছেন *চক্ষুষী চন্দ্রসূর্যৌ* সূর্য চন্দ্র তাঁর চক্ষু, এগুলো কল্পনা করা, এগুলো যে বাস্তবিক তাও নয়, ভুলে যেন আমরা না ভাবি এটাই সত্য। ধ্যানের জন্য এভাবে কল্পনা করা হয়। ভক্ত ধ্যানে দেখতে চান এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যেন তাঁরই শরীর। পুরুষসূক্তমে কল্পনা করা হয়, সব কিছু তাঁর থেকে বেরিয়েছে, যার জন্য তিনি এই সব কিছু। তাই বলছেন, What temple is needed? এরপর অন্য মন্দিরের আর কি প্রয়োজন!

All eyes are Thine, yet Thou has not an eye; all hands are Thine; yet Thou has not a hand. (*সব চক্ষু তোমার চক্ষু, অথচ তোমার চক্ষু নেই, সব হস্ত তোমার হস্ত, অথচ তোমার হস্ত নেই।*) যিনি দেখছেন এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তাঁর শরীর, তিনি জীবন্ত প্রতিমা, তাঁর সামনে পূজা হচ্ছে। ঠাকুর একদিন তাঁর সেই অনুভূতির স্তর থেকে বলছেন, ঈশ্বরের এই বিরাট রূপী শরীর আর দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে যে বড় বড় ফুল গাছ, সেগুলো যেন এক একটা ফুলের তোড়া রূপে ঈশ্বরের সম্মুখে অর্ঘ্য দেওয়া হয়েছে। এই জিনিসগুলো সাধকরা বাস্তবিক দেখেন। আমাদের সমস্যা হল, গুরুর কাছে ইষ্টমন্ত্র নিয়েছি, কোন রকমে নমো নমো করে একশ আটবার জপ করে ঝামেলাটা মিটিয়ে নেওয়া। আবার অনেকে আছে, অনেক জপ করছে, কিন্তু মন অন্য কোথাও ঘুরে বেড়ায়। যখন বাইরের জগৎকে দেখছে, তখন বইতে হয়ত কোথাও পড়েছে, সেটাই মুখে আউড়ে যাচ্ছে, কিন্তু নিজে যে চিন্তন করবে, চিন্তন করে ধারণা করবে, *এতাবানস্য মহিমা*, এই যে সৃষ্টি এটাই তাঁর মহিমা, এটাই তাঁর বিস্তার, এই চিন্তন করার ক্ষমতাটুকুও নেই। জগৎ থেকে তিনি আলাদা কিছু

নন, জগতের বাইরে তিনি আলাদা কিছু না। ফলে কি হয়, যেখানেই চোখ সেটা তাঁরই চোখ। পুরুষসূক্তমে প্রথমেই বলছেন, *সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ*, যে কোন চোখ, যে কোন পা, তাঁরই চোখ, তাঁরই পা, আলাদা করে তাঁর কোন কিছু থাকে না। গীতাতেও ভগবান বলছেন, *সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোক্ষিশিরোমুখম্*, সব জায়গায় তাঁর পা, সব জায়গায় তাঁর মুখ, সর্বত্র তাঁর চোখ, যেখানে যত প্রানী আছে সব প্রানী তাঁরই বিভিন্ন রূপের অভিব্যক্তি, তাঁর বাইরে আলাদা বলে কিছু নেই।

যদি অন্য ভাবে তাঁকে দেখার কারুর ইচ্ছে হয়, তাহলে সে দেখতে পারে, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তাঁর শরীর, আমাদের দৃষ্টিতে সূর্য আর চন্দ্র সব থেকে বড় জ্যোতিষ্মান্, তাই সূর্য আর চন্দ্র তাঁর চোখ। ছায়াপথের অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্রের রাজ্যে কোন তারায় যদি চলে যাওয়া যায়, যেখানে জীবন আছে, সেখানে বড় বড় যা কিছু থাকবে সেটাই তাঁর চোখ হবে, কারণ এটা তার কল্পনা, এ তো আর ভগবানের বাস্তবিক শরীর নয়। আমাদের হৃদয়ে যেমন ভক্তি, ভাব ও ভালবাসা, আমরা সেই ভক্তি-ভালবাসা দিয়ে তাঁকে দেখছি। সেইজন্য যেখানেই ভক্তির ব্যাপার আসে সেখানে ভক্তির ব্যাপারটা বোঝানর জন্য প্রেম জিনিসটাকে নিয়ে আসতে হয়। মানুষ যদি কাউকে প্রেম করে, আর প্রেমের গভীরে যদি সে ডুবে যায়, তখন সেই প্রেম আভাস দেয়, ঠিক ঠিক ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি কেমন হতে পারে। চৈতন্য মহাপ্রভু সমুদ্র দেখে ভাবছেন যমুনা, কোন একটা জিনিস common আধার হয়ে যাচ্ছে, যার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। কোন ছেলে একটা মেয়েকে প্রেম করে, মেয়েটি হলুদ শাড়ি পরে ঘুরে বেড়ায়, এখন যাকেই হলুদ শাড়ি পরা দেখছে মনে করছে, ওই তো আমার প্রেমিকা এসে গেছে। ঈশ্বরকে যিনি ভালবাসেন, তিনিও সুন্দর যা কিছু দেখেন ভাবেন, আহা আমার ঈশ্বর এই রকম। এখানে যে কোন মিথ্যা কল্পনা হচ্ছে বা কোন নাটক হচ্ছে, তা না, একেবারে বাস্তবিক দেখেন। যেখানে সুন্দর চোখ দেখছে, আহা এই চোখ তো তাঁরই চোখ।

ভালোও তিনি, মন্দও তিনি – অনাসক্ত হও

এই রকম অবস্থা যখন হয় তখন কি হয়? Neither seek nor avoid, take what comes. (*কোন কিছু পাবার চেষ্টা করো না, কিছু এড়াবার চেষ্টাও করো না –যা কিছু আসে গ্রহণ কর।*) স্বামীজীর এটা খুব নামকরা কথা। কর্মযোগেও তিনি বার বার বলছেন, avoid not seek not। সংস্কৃতে এই দুটো শব্দ 'রাগ' আর 'দ্বেষ', রাগ মানে অনুরাগ, ভালবাসা আর দ্বেষ মানে যেটাকে আমরা পছন্দ করি না, যেটা থেকে আমরা সরে আসতে চাই। আমাদের জীবনের দিকে তাকালে দেখা যাবে, আমাদের স্থৈর্য নেই। আমরা সব সময় কিছু একটা হতে চাইছি, কিন্তু আমরা যা আছি সেটার দিকে আমাদের দৃষ্টি নেই। যে জিনিসকে আমরা পছন্দ করছি, সেই জিনিসের দিকে আমরা দৌড়ে যাচ্ছি, যে জিনিসকে আমরা পছন্দ করি না, সেই জিনিস থেকে আমরা পালাচ্ছি। এই প্রাণান্তকর দৌড়াদৌড়ি সারাটা জীবন ধরে চলছে। একবার যদি বুঝে যাই, সবটাই তাঁর, ভালটাও তাঁর মন্দটাও তাঁর, তখন এই প্রাণান্তকর দৌড়ানাটা বন্ধ হয়ে যায়। তখন এর মত বদমাইশ লোকের থেকে দূরে থাকবো, যেটাকে স্বামীজী বলছেন, avoid, ওকে ভাল লাগে, ওর দিকে দৌড়াব, seeking, পালানো আর কাছে পাওয়া, এই দুটোই বন্ধ হয়ে যায়। এই জিনিসটাকে আমরা খুব সহজে বলে দিলাম, কিন্তু এর অনেক বিস্তার, কিছু কিছু এখানেও আসবে।

বলছেন, take what comes, যেমন যেমন যখন যা কিছু আসছে সব কিছুকে তখন তেমন তেমন গ্রহণ করে নাও, *'যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্ট'* হও। আধ্যাত্মিকতাকে যখন দৈনন্দীন জীবনে নামিয়ে আনা হয়, তখন ওটাও আধ্যাত্মিক জীবন হয়ে যায়। আধ্যাত্মিক জীবনের খুব সহজ তুলনা হল, বেলুড় মঠের পাশ দিয়ে গঙ্গা প্রবাহিত হয়ে চলেছে। আমি ঠিক করলাম গঙ্গায় সাঁতার কেটে হরিদ্বার যাব। সাঁতার কাটতে শুরু করতেই দেখছি উলটো দিক থেকে একটা মরা কুকুর ভেসে আসছে, তাড়াতাড়ি করে আমি ধাক্কা দিয়ে ওটাকে সরিয়ে দিলাম। তার কিছুক্ষণ পরে দেখছি কচুরিপানা আসছে, ওটাকেও সরিয়ে দিলাম। আবার দেখছি কোন মরাকে ফুল দিয়ে সাজান হয়েছিল, সেই ফুলগুলো ভেসে আসছে, ভাবছি ফুলের মালাগুলোকে ধরব কি ধরব না। জগৎ এভাবেই চলে, আমি চাই আর নাই চাই, ভাল মন্দ নিজের মত আসতেই থাকবে। ঘরে নিজের মত আছি, সেখানেও দেখা যাবে, ভাল জিনিস মন্দ জিনিস নিজের মত আসছে যাচ্ছে, আসতে বাধ্য। যদি নিজেকে কোন গুহার মধ্যে বন্ধ করে রাখি, সেখানেও চিন্তা-ভাবনা রূপে আসবে। আর কর্ম যদি প্রচুর খারাপ থাকে, তাহলে

দেখা যাবে ভূমিকম্পে ওই গুহার ভিতরেই একটা পাথরের চাঁই এসে পড়েছে। উদ্দেশ্য হল, বেলুড় মঠ থেকে গঙ্গায় সাঁতরে হরিদ্বার যাওয়া, তখন গঙ্গার জলে মরা কুকুর ভেসে আসছে, মরা গরু ভেসে আসছে, ফুলের তোড়া আসছে, এই নৌকা আসছে, এই বড় স্টীমার আসছে, তাতে আমার কি! উদ্দেশ্য আমার একটাই, আমাকে হরিদ্বার যেতে হবে, কোন কিছু থেকে আমাকে সরে যেতে হবে না, কোন কিছুর দিকে আমাকে এগিয়েও যেত হবে না, আমাকে শুধু লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। এই ভাব যতদিন না আসছে ততদিন জীবনে শান্তির মুখ সে দেখতে পারবে না। আমি কি করছি সেটা কোন গুরুত্ব নয়, আমি কেরানী হতে পারি, আমি স্কুল টীচার হতে পারি, আমি প্রফেসর নাকি সন্ন্যাসী, জীবনে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এগুলো কোন ব্যাপারই নয়। আমি যদি একজন ডাক্তার হই, তাহলে আমার উদ্দেশ্য হল চিকিৎসার মাধ্যমে রোগীর সেবা করা। আমার বন্ধুকে ভাল করে চিকিৎসা করব, আমাকে যে দামী দামী উপহার দেয় তাকে আমি যত্ন নিয়ে চিকিৎসা করব, আর যে গরীব তাকে হেলাফেলা করে চিকিৎসা করব, জেনে নিতে হবে যে, আমার আধ্যাত্মিক জীবন শুরু হতে অনেক অনেক জন্ম বাকি। ভাল ডাক্তার মানেই, আমার চেম্বারে যে রোগীই আসুক, সে বন্ধুই হোক, বড়লোক হোক, গরীব হোক, সবাই আমার কাছে সমান। আর যাঁরা পুরোপুরি আধ্যাত্মিক জীবনকে ধরে নিয়েছেন, সাধু-মহাত্মারা, তাঁদের জন্য সবটাই সমান হয়ে যায়।

It is liberty to be affected by nothing; do not merely endure, be unattached. (*কোন কিছুতে বিচলিত নাহওয়াই মুক্তি বা স্বাধীনতা। কেবল সহ্য করে গেলে হবে না, একেবারে অনাসক্ত হও।*) শুধু সহ্য করা নয়, সাথে সাথে নিষ্কাম হতে হবে, অনাসক্ত হতে হবে। বেলুড় মঠের গঙ্গা দিয়ে আমি হরিদ্বার যাচ্ছি, আমি চাই আর নাই চাই, গঙ্গার জল বিপরীত দিক থেকে আসতেই থাকবে, জলের সাথে পাঁচটা জিনিস ভেসে আসবে, সেইজন্য কোন কিছুতে বিরক্ত হওয়ারও কিছু নেই, কোন কিছুতে খুশীতে আনন্দে উৎফুল্ল হওয়ারও কিছু নেই, আমাকে মেনে নিতে হবে জিনিসগুলো এভাবেই আসতে থাকবে। সব কিছুকে যে সহ্য করে যেতে হবে তা না, আমাকে অনাসক্ত হয়ে থাকতে হবে। অনেক আগেকার কথা, বেলুড় মঠের কোন ব্রহ্মচারী মহারাজ শীতকালে সাড়ে ছটায় ডাইনিং হলে গিয়ে ব্রেকফার্স্ট করছেন, চা খেতে খেতে বলছেন, 'উঃ কী ঠাণ্ডা'! পাশে একজন সন্ন্যাসী মহারাজ ছিলেন, তিনি খুব রেগে গেলেন, 'তুমি ঘরে গিয়ে একটা সোয়েটার বা চাদর চাপিয়ে আসো, এভাবে প্রকৃতির ব্যাপারে কমপ্লেন করবে না'। ভাল হোক, মন্দ হোক, কোনটাতে প্রতিক্রিয়া করতে নেই, বিশেষ করে খাওয়া-পরা, শোওয়া, বাসস্থান, এগুলোকে নিয়ে। এগুলোর প্রতি প্রতিক্রিয়া জানানো মানেই সে পুরোপুরি ইন্দ্রিয় জগতে সিঁদিয়ে আছে। জয়রামবাটী থেকে গ্রামের মহিলারা বেলুড় মঠ দেখতে এসেছেন। ওখান থেকে বাগবাজারে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে ফিরে গেছেন। মা তাঁদের জিজ্ঞেস করছেন, 'কেমন মঠ ঘুরলে?' 'খুব সুন্দর, গরু যা দেখলাম!' 'মন্দির দর্শন করলে?' 'অবশ্যই, মন্দির দেখব না! কিন্তু গরুগুলো যা দেখলাম!' 'মঠে তোমাদের খাতির টাতির করল?' 'ও বাবা! খাতির করবে না, ওরা তোমার শিষ্য বলে কথা, কিন্তু গরু যা দেখলাম।' ওদের মন গরু থেকে আর সরছে না। শুধু জয়রামবাটীর মহিলাদেরই না, আমাদেরও একই অবস্থা, সাধু-মহাত্মাদের কাছে গিয়েও জিজ্ঞেস করবে, এই টেবিলটা তো দারুণ, কি কাঠ, কত দাম? আপনার ফোনটা তো দারুণ, এটা কোন কোম্পানীর?

স্বামীজী আরেক ধাপ এগিয়ে বলছেন, শুধু সহ্য করাই না, অনাসক্ত হও। আধ্যাত্মিক জীবন মানে ধারার বিপরীতে যাওয়া, জীবনে সব কিছু এভাবেই আসবে যাবে, এই জিনিসটাকে বুঝে যাওয়া। এরপর স্বামীজী একটা খুব নামকরা গল্প বলছেন, জঙ্গলে একটা ষাঁড় শুয়ে ছিল, তার শিংএ একটা মশা এসে বসে আছে। মশাটা অনেকক্ষণ বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ তার মনে হল, এটা আমি ঠিক করছি না, মশাটা তখন ষাঁড়ের কানের কাছে উড়ে গিয়ে বলছে, 'ভাই আমি অনেকক্ষণ আপনার শিংএ বসেছিলাম, আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম, ক্ষমা করে দেবেন'। ষাঁড় বলছে, 'তোমার গুষ্টির সবাইকে নিয়ে এসে আমার শিংএ যত দিন খুশি বসে থাক তাতে আমার কিছু আসে যায় না'। ষাঁড়ের শিংএ একটা মশা এসে বসেছে, ষাঁড়টা যদি নিজেকে মাছি ভাবত তাহলে লড়াই লেগে যেত। আমাদের দুরবস্থা এটাই, আমি ঈশ্বরের সন্তান, আমি পূর্ণব্রহ্ম, যেমনি কেউ অশান্তি করে বলে তুমি কি মনে করেছ, তখন বলতে পারছি না, আরে এটাই তো মনে করেছিলাম যে আমিও যা আপনিও তাই। কারুর সাথে ঝগড়া চেঁচামেচি করছে, গালাগালি দিচ্ছে, ঝামেলা সৃষ্টি করছে, জানবে যে, সে হেরেছে আপনি জিতেছেন। ছোটবেলায় স্বামীজী খুব দুরন্তপনা করতেন, বড়রা কেউ মারতে এলে

স্বামীজী সোজা নর্দমায় নেমে যেতেন। কেউ আর তখন তাঁর দিকে এগোত না, যে তাঁকে মারতে যাবে তাকে নর্দমায় নামতে হবে। সমাজের লোকেরা এমন, ওই নর্দমায় নামিয়ে দেয়, কুস্তি লড়বেন আমার সাথে, আসুন নর্দমায় আপনাকে নামিয়ে দিচ্ছি। তার মানে, আমরা যখনই কারুর সাথে ঝগড়া করছি, সব্জিওয়ালা, রিক্সাওয়ালাদের সাথে যখন তর্কাতর্কি করছি তখন এরা আমাকে নর্দমায় নামিয়ে দিল। একবার দুবার তর্কাতর্কি হতেই পারে, কিন্তু নিত্যকার ব্যাপার যদি হয়, যদি এটাই স্বভাবে থাকে, তাহলে তো আমি আপনি কিছুই নয়, দেখতে ষাঁড়ের মত বিশাল বলশালী, আসলে কিছুই না, কাগুজে বাঘ মাত্র। এটাই স্বামীজী এখানে বলছেন, ভাল মন্দ দুটোরই প্রতি তোমার বৈরাগ্য থাকবে, অনুরাগ ভালর প্রতি থাকবে না, বিরাগ মন্দের প্রতিও থাকবে না। জীবন এভাবেই চলে, এটাই একমাত্র পথ, যা দিয়ে মানুষ শান্তিতে থাকতে পারে, যা থেকে মানুষ ঈশ্বরের দিকে এগোতে পারে। এরপর আসছে স্বামীজীর ২৬শে জুনের ক্লাশের বক্তব্য।

২৬শে জুন, বুধবার

অনাসক্ত

Our best work is done, our greatest influence is exerted, when we are without thought of self. (*যখন আমাদের আমিত্ব ভাব থাকে না, তখনই আমরা সবচেয়ে ভাল কাজ করতে পারি, অপরকে আমাদের ভাবে সবচেয়ে বেশী অভিভূত করতে পারি।*) Self মানে হয় আমিত্ব, উপনিষদে বারবার যে আত্মার কথা বলা হচ্ছে, আত্মা মানে হয় self, কিন্তু আমরা সব সময় মনে করি আত্মা বলতে আমাদের শরীরের ভিতর জ্যোতির্ময় কিছু একটা আছে, সেটাই আত্মা। কিন্তু তা না, আত্মা মানেই আমি, আমি নিজেকে যেটা মনে করি সেটাই আত্মা। আমি যদি নিজেকে দেহ মনে করি তাহলে দেহটাই আমার কাছে আত্মা, আর যদি নিজেকে মন মনে করি তাহলে মনটাই আমার জন্য আত্মা। আর যদি নিজেকে শুদ্ধ আত্মা বা শুদ্ধ চৈতন্য মনে করি, তাহলে সেটাই আত্মা। যখনই self শব্দটা আসে, যেখান থেকে selfish শব্দটা, স্বার্থপরায়ণ, স্বার্থপর এই শব্দগুলো এসেছে। তার মানে হল, আমি নিজেকে আমার দেহ, মন, বুদ্ধির সাথে জুড়ে রেখেছি। সেইজন্য এই দুটোকে সব সময় আলদা করা হয়, দেহ, বুদ্ধি, মন এটাকে অনেক সময় selfish বলে, আর যখন শুদ্ধ চৈতন্যে চলে যায় তখন unselfish বলা হয়। স্বামীজী বলছেন, যারা নিজের selfকে, অর্থাৎ আমিত্বকে ত্যাগ করে; আমি বলতে সবটাই, এই অর্থেও হয়, সেই অর্থেও হয়, কিন্তু এখানে আমি বলতে বোঝাচ্ছেন দেহ-মন-বুদ্ধিকে জড়িয়ে যে আমিত্ব; মানুষ যখন এই আমিত্বকে ছেড়ে দেয়, তখনই মানুষ বড় কাজ করে। আমিত্বকে না ছাড়লে মানুষ কখনই কোন বড় কাজ করতে পারবে না। নূতন প্রজন্মের ছেলেরা এরা কোথাও গীতার কথা শুনেছে, এসে বলে এই তো গীতায় বলছে, 'কাজ কর কিন্তু ফলের চিন্তা করো না, এসব কথা আজকের দিনে অচল, ফলের চিন্তা না করলে আমরা কাজ করব কি করে'! আগেকার দিনে গ্রাম দেশে বড় বড় খামার থাকত, যেখানে ধান, গম, ডাল ইত্যাদি চাষের জিনিস মজুত করা থাকত। ইঁদুর গিয়ে সেখানে বড় বড় গর্ত করে খামারে ঢুকে সব শষ্য নষ্ট করে দিত। সেইজন্য খামারের দরজার কাছে মুড়ি-মুড়কি ছড়িয়ে রাখা থাকত, যাতে ইঁদুরগুলো ওগুলো খেয়েই চলে যায়, ভিতরের অফুরন্ত শষ্য ভাণ্ডারের আর সন্ধান পায় না। আমরাও ইঁদুরের মত মিষ্টি গন্ধ মুড়কি নিয়ে পড়ে আছি, শষ্যের বিশাল ভাণ্ডারের দিকে, যেখানে অফুরন্ত খাবার পড়ে আছে, সে-দিকে আমাদের দৃষ্টি যায় না। আমিত্ব নিয়ে এলে প্রথমে কাজের ফল খারাপ হবে, পরে কাজটাও খারাপ হয়ে যাবে, যদিও এই জিনিসটাকে মানা কঠিন, কিন্তু এটাই সত্য।

নেট প্র্যাক্টিস করার সময় ব্যাটসম্যানরা দুম-দাম ব্যাট চালিয়ে চার ছক্কা মেরে দিতে পারে, কিন্তু যেমনি মাঠে খেলতে নামল দেখা গেল প্রথম বলেই আউট। কারণ নেট প্র্যাক্টিসে তার পা খুব ফ্রি থাকে, এগিয়ে যাচ্ছে, বাঁ দিকে যাচ্ছে, ডান দিকে যাচ্ছে, কিন্তু যেমনি পিচে নামছে তখন তাকে বেঁধে দেওয়া হল। ওখানে বাঁধা, একটু এগিয়ে গেলে স্ট্যাম্প হয়ে যাবে। আর প্র্যাক্টিসের সময় ফিল্ডার বলতে গেলে থাকেই না, কিন্তু ম্যাচের সময় চারিদিকে ফিল্ডাররা ঘিরে থাকে। যখনই আমরা self জিনিসটাকে নিয়ে আসি, তখন আমি আর কাজ দুটো জুড়ে এক হয়ে গেল, ব্যাট আর বল জুড়ে এক হয়ে গেল। এই যে ব্যাট আর বল জুড়ে এক হয়ে গেল, এবার আর চার ছয় মারা যাবে না। ধোনিকে যদি বলা হয়, ব্যাটের উপর এই বল রাখা হল, এবার

আপনি ছয় মারুন তো। ওই বল ব্যাট থেকে কত আর দূরে যাবে। ব্যাট আর বলের মাঝখানে ধোনিকে একটু জায়গা দিয়ে দেখুন বল সোজা স্টেডিয়ামে পাঠিয়ে দেবেন, ওই স্পেসটা দিতে হয়। ওই স্পেস দেওয়া মানে, আমিত্বটা সরিয়ে দেওয়া। আমিত্বকে না সরালে স্পেস আসে না, তাই কাজ হয় না। আমরা জীবনের যে কোন সাফল্য হলেই গলা ফাটিয়ে বলতে থাকি, এটা আমি করলাম, আমি এ রকম করলাম, আমি এটা কিনেছি, আমি ছাড়া কিছু নেই, কিন্তু কাজের প্রতি কারুর নিষ্ঠা নেই, শুধু আমি আর ফলের প্রতি নিষ্ঠা। আগেকার দিনে, এখনও কোথাও কোথাও আছে, গ্রামের লোকেরা গ্রামের ভিতর কিছু ফলের গাছ লাগিয়ে দিত, গাছ বড় হয়ে ফল হলে গ্রামের বাচ্চারা খাবে। এখানেও একটা ফলের চিন্তা আছে, এই গাছটা ভাল গাছ, ফল হলে বাচ্চারা খাবে, কিন্তু সেখানে আমিত্বটা নেই। কিন্তু যারা আরও উপরে তাদের ফলেও কোন আগ্রহ নেই আর আমিত্বের তো কোন প্রশ্নই নেই। তখন এনারা যে কাজ করেন সেই কাজটাই প্রচণ্ড শক্তিশালী কাজ হয়। স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, Unselfishness is more pain, only people do not have the patience to practice। নিঃস্বার্থ হয়ে কাজ করে একটু দেখুন, কেমন ফল দেয়, একটু ধৈর্য ধরুন, কিন্তু আমাদের সেই ধৈর্য নেই। আমরা আজকে বীজ দিলাম, পরশু আমাদের চাই গাছ, তরশু চাই ফল।

স্বামীজী বলছেন, All great geniuses know this. (*বড় বড় প্রতিভাশালী লোকেরা সকলেই এই কথা জানেন।*) সত্যিকারের যাঁরা এই জগতে জিনিয়াস, তাঁরা জানেন, আমিত্ব লাগিয়েছে কাজ নষ্ট হয়েছে। বাড়িতে সবারই সন্তান আছে, নাতি-নাতনি আছে, সবাই নিজের সন্তানের জন্য কত খরচ করে, একবার তারা ভেবে দেখুক যে, এই সন্তান আমার না, সন্তান ঈশ্বরের, আমার ছেলে ঈশ্বরেরই রূপ, আমি তার সেবা করছি। এবার সে self থেকে সরে গেল, যশোদা যেভাবে শ্রীকৃষ্ণকে বড় করেছিলেন, সেও সেইভাবে সন্তানকে বড় করবে। ছেলে যদি কোন কারণে মারা যায়, বা বড় হয়ে কুলাঙ্গার হয়ে যায়, তখন বলতে পারবে, সন্তান তো আমার কোন দিনই ছিল না, ঈশ্বরের সন্তান। এই ভাব নিয়ে সেবা করে দেখুক কেমন সেবা হয়। আমাদের সমস্যা হল, আমার সন্তান ঈশ্বরের সন্তান, অন্যের সন্তান অপরের সন্তান। স্কুল বাসে কোন ছেলের শরীর খারাপ হয়েছে – এই খবর শোনা মাত্র সব বাবা-মা অস্থির হয়ে স্কুলে ফোন করতে শুরু করবে, যেমনি জেনে গেল আমার ছেলে ঠিক আছে, তখনি ঘটনা থেকে মনটা সরে গেল, মন সরে যাওয়া মানেই আমিত্বটা এসে গেল। নিজের সন্তানের সাথে আমিত্বটা জুড়ে যাচ্ছে, অপরের সন্তানের থেকে আমিত্বটা সরে আসছে। এই জুড়ে যাওয়া আর সরে আসা, এটাই চলতে থাকে, কাজও তাই ভাল হয় না। সরকারী চাকুরেরা মনে করে সরকার আমাকে মাইনে দেবে। কেন মাইনে দেবে? আমি পড়াশোনা করেছি, পরীক্ষায় পাশ করেছি, এবার আমাকে সরকার মাইনে দেবে, কাজ কেন করব! কাজ করতে গেলে উপরি চাই, ঘুষ না দিলে আমি কাজ করব না। আমিত্বটা পুরোদমে ঢুকে গেল তার। জগতে যাঁদের নাম সবাই জানে, চেনে, যাঁরা বড় কাজ করেছেন, দেখা যাবে তাঁরা সবাই কিন্তু আমিত্বটাকে ছেড়ে কাজ করেছেন। আইনস্টাইন যখন নিজের ক্ষেত্রে কাজ করছেন, নিউটন যখন তাঁর কাজ করছেন, তখন তাঁদের মধ্যে আমিত্বের কিছু নেই, বিদ্যাটা জানতে হবে। আমি এই কাজ করছি, আমার নামযশ হবে, এই ভাবটা তাঁদের মধ্যে একেবারেই ছিল না।

আমিত্বের নাশ - তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা - অনাসক্ত হওয়া

স্বামীজী বলছেন, Let us open ourselves to the one Divine Actor, and let Him act, and do nothing ourselves. (*ঈশ্বরই একমাত্র যথার্থ কর্তা –তাঁর কাছে হৃদয় খুলে দাও, নিজে নিজে কিছু করতে যেও না।*) মনের সব দরজাগুলো খুলে দিতে হবে, আর সেই ঈশ্বরকে, যিনি সব কিছুর আসল কর্তা, তাঁকে ভিতরে পুরো ঢুকে যেতে দাও; এবারে দেখো, যিনি আসল কর্তা, তিনিই তখন সব কাজ করতে থাকবেন। তোমার শরীর, মন এগুলো এক একটা যন্ত্র রূপে তখন সব কাজ করবে। আসল কর্তাকে কাজ করতে দাও, তখন জানতে পারবে তাঁর শক্তি কেমন। আমিত্ব ভাব যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ বিরাট কোন কাজ হতে পারবে না। ঠিক ঠিক ভক্ত জানে আসল কর্তা তিনিই, আমি যন্ত্র তিনি যন্ত্রী, আর সে-ভাবেই ভক্ত সব কাজ করে। যখন সে কোন কাজ করে না, তখন দু হাত দিয়ে ঈশ্বরকে ধরে রাখে। এই ভাব ভিতরে আসার পরই মানুষের ভিতর শক্তি আসে এবং সে লক্ষ্যের দিকে এগোতে শুরু করে। আমাদের দেহ-মনের শক্তি ভাল,

একাগ্র মনের শক্তি আরও বেশি, কিন্তু ঈশ্বরীয় শক্তির সামনে এগুলোর কোন তুলনাই হয় না, ওটা আলাদা এক শক্তি। আমাদের আমিত্বের দরজাটা খিল দিয়ে ঠাসা, দরজা না খুলে দিলে তিনি আসবেন কিভাবে!

মনের সব দরজা, জানলা খুলে দিলে কি হয়, গীতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে স্বামীজী বলছেন, O Arjuna! I have no duty in the whole world. (*শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জুনকে বলছলেন, 'হে অর্জুন, ত্রিলোকে আমার কর্তব্য বলে কিছুই নেই'।*) গীতায় ভগবান অর্জুনকে বলছেন, *ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন*, এই তিন লোকে আমার কোন কর্তব্য নেই, কিন্তু তাও আমি কাজ করি। আমরা আমাদের আমিত্বকে কিছুতেই ছাড়তে পারছি না। দোষ কিছু নেই, কারণ আমার হাতে যেটা আছে, আমি চাই না সেটাও আমার হাত থেকে বেরিয়ে যাক। কিছু দিন আগে মনস্তত্ত্বের উপর রিসার্চ করে দেখা গেছে, কাউকে যদি বলা হয় এখানে একশ টাকা ইনভেস্ট করুন তাতে আপনি পরে হাজার টাকা পেয়ে যাবেন, কোন দিন কেউ লাগাতে যাব না, কারণ একটু ঝুঁকি আছে। আমি যে খেটেখুটে একশ টাকা লাগাবো সেটাও মাঝখান থেকে চলে যাবে, আমার হাজার টাকা লাগবে না। এটা মানুষের স্বভাব, হাতে যেটা আছে সেটাকে কেউ ছাড়তে চাইবে না। ঠিক সেই রকম আমরা মনে করি, এই দেহ, মন, বুদ্ধি আমার, এগুলো কেন ছাড়তে যাব, ছেড়ে দেওয়ার পর আমার কি হবে? এই সংশয় মনের মধ্যে কাজ করে। সর্বক্ষণের জন্য না ছেড়ে কিছুক্ষণ ছেড়ে দেখুন, দিনে এক আধ ঘন্টার জন্য ছেড়ে দেখুন, দেখি কেমন হয়। অতটুকু সময় নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ করছি। ডাক্তাররা কষ্ট করে, পয়সা খরচ করে ডাক্তারী পাশ করেছে, তাকে পয়সা দিয়ে রোগী দেখতে হবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ডাক্তাররা যদি ঠিক করে নেয়, দিনে আমি কম করে পাঁচ জন রোগীকে বিনা পয়সায় দেখব, করে দেখুক না একবার। আমরা সব সময় আমাদের আমিত্বের সঙ্গে, টাকা-পয়সা, সম্পত্তির সঙ্গে জুড়ে রেখেছি। আমরা মনে করছি পরিবারের প্রতি আমার দায়ীত্ব আছে, কিন্তু একটু নিজেকে খুলে দেখুক না, দেখবে তখন দায়ীত্ব অনেক ভাল ভাবে পালন করতে পারছে।

স্বামীজী বলছেন, Be perfectly resigned, perfectly unconcerned; then alone can you do any true work. (*তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর কর, সম্পূর্ণভাবে অনাসক্ত হও, তা হলেই তোমার দ্বারা কিছু কাজ হবে।*) স্বামীজী শরণাগতির কথা বলছেন, ঠিক ঠিক ভাবে তাঁর শরণাগত হয়ে যাও, তখন তিনিই সব কিছু দেখবেন। ঈশ্বরই আসল কর্তা, তিনি তো আছেন দেখার জন্য, ঠিক ঠিক কাজ যদি করতে হয় তাহলে অনাসক্ত হয়ে যাও, কোথাও আমিত্বকে রাখবে না। ঠাকুর বলছেন, গুরু, কর্তা, বাবা শুনলে আমার গায়ে কাঁটা দেয়। ঠাকুর এগুলো একেবারেই পছন্দ করতেন না। গুরু মানে আমি তোমাকে শিক্ষা দিচ্ছি, কর্তা মানে আমি তোমার মালিক, এই বোধ যেন তোমার না থাকে। জগতে কাজ কিভাবে হয়, এবার স্বামীজী সেটাকে বলছেন, No eyes can see the real forces, we can only see the results. (*যে-সব শক্তিতে কাজ হয়, সেগুলি তো আর আমরা দেখতে পাই না, আমরা কেবল তাদের ফলটা দেখতে পাই মাত্র।*) আমাদের সমস্যা হল, আসল যে শক্তিগুলো কাজ করে, সেটার ব্যাপারে আমাদের জানা নেই, আমরা শুধু কাজের পরিণাম গুলোকেই দেখতে পাই।

ঠাকুর খুব সহজ ভাষায় বলছেন, উনুনের উপর হাড়ির জলে আলু পটল লাফাচ্ছে, বাচ্চারা মনে করে আলু পটল নিজে থেকেই লাফাচ্ছে, কিন্তু ওরা বুঝতে পারে না যে, নীচে আগুন আছে বলে আলু পটল লাফাচ্ছে। আমরা ঠাকুরকে ভক্তি করি, ঠাকুর আমাদের ইষ্ট, ঠাকুরের কথাকে আমরা মেনে নিই। অনেক সময় অপরকে বোঝাবার জন্য আমরা এই শব্দগুলো ব্যবহার করি, কিন্তু নিজের উপর এই জিনিসগুলো যখন আসে তখন মন এটাকে মেনে নিতে চায় না। যাঁদের বিদ্যাবুদ্ধি ছিল, শাস্ত্র পারঙ্গম ছিলেন, ওনাদের দিকে তাকালে দেখা যাবে, ওনারা যে কথাগুলো বলতেন, নিজেরাও কিন্তু সেগুলো তাঁরা অনুশীলন করেননি।

আমাদের দেহ আর ইন্দ্রিয় নিকৃষ্ট, মন এদের থেকে অনেক উপরে। আমেরিকার একটা ঘটনা, একবার নামকরা এক এ্যাথলেটিকের এ্যক্সিডেন্টে একটা পা খুব জঘন্য ভাবে জখম হয়ে গিয়েছিল। হাসপাতালে অনেকদিন ভর্তি ছিল। হাসপাতালে তাকে ট্রেনিং দেওয়া হল, তুমি মনে মনে ভাব যে তুমি দৌড়াচ্ছ। ছেলেটি এবার মনে মনেই পুরো নেমে গেল ট্রেনিংএ। মনে মনে ভাবছে, বিছানা থেকে নামলাম, জুতো পরলাম, হেঁটে হেঁটে মাঠে এলাম, প্রত্যেকটা পদক্ষেপকে সে কল্পনা করে যাচ্ছে। এবার প্র্যাক্টিসে নামলাম, দৌড়াচ্ছে,

কল্পনায় সে পুরোটা দেখছে। প্রায় তিন মাস সে বিছানায় ছিল। যেদিন বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, দেখছে তার পেশীগুলো ততটাই তৈরী যতটা সত্যিকারের দৌড়ালে হত।

দক্ষিণ ভারতীয় এক সাধু, উনি দলিত সম্প্রদায়ের ছিলেন। যার জন্য কোন মন্দিরে তিনি যেতে পারতেন না, কিন্তু খুব ইচ্ছা ছিল ভগবান বিষ্ণুর সেবা করবেন। সেখানকার রাজা প্রচুর টাকা খরচ করে একটা বিরাট মন্দির তৈরী করেছে। ইনি সাধারণ লোক, তিনি কি আর মন্দির বানাবেন! কিন্তু তিনি ধ্যান করে মনে মনে ভগবান বিষ্ণুর জন্য একটা মন্দির বানাতে শুরু করে দিলেন। মনের জগতে মন্দির তৈরী হচ্ছে। রাজা যেভাবে বানাচ্ছে ঠিক সেইভাবে তৈরী করছেন। মনে মনে কল্পনা করলেন, একটা মাঠ আছে, জমির মাপজোপ করলেন, একটা একটা করে ইট বসাচ্ছেন, এইভাবে কল্পনা করে করে মন্দির তৈরী হল, বিগ্রহ আনা হল। এবার তিনি প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে পূজা করবেন। এমনই কাকতালীয় ব্যাপার হয়ে গেল যে, রাজার মন্দিরে যেদিন প্রাণ প্রতিষ্ঠা, সেদিন এনার মনে মনে তৈরী করা মন্দিরেও প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে। ভগবান বিষ্ণু এসে রাজাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, আজকে তোমার এখানে আমি পূজা গ্রহণ করব না। বলছেন, ওখানে অমুক লোক একটা মন্দির তৈরী করেছে, ওখানে আজ প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে, ওখানেই আজকে আমি যাব। রাজা স্বপ্নেই বলছে, আমি তো কখন শুনিনি যে আমারই রাজ্যে এই রকম কোন মন্দির তৈরী হয়েছে। ভগবান বিষ্ণু তাও বললেন, না, ওর মন্দির আছে। রাজা সকালে গিয়ে খোঁজ নিতে লাগলেন, কে এমন ব্যক্তি, যার বাড়িতে ভগবান বিষ্ণু আসছেন! তখন সেই সাধুটি বলছেন, মন্দির তো আমার মনের ভিতরে। এই ভক্তের বারো বছর লেগেছে মন্দির বানাতে। এটাকে বলে সাধনা। আমরাও যদি জপে বসে মন্দির বানাতে চেষ্টা করি, এক মিনিটেই আমাদের মন্দির বানানো হয়ে যাবে। প্রথম পাঁচ সেকেণ্ড লাগল জমি ঠিক করতে, পরের পাঁচ সেকেণ্ড লাগবে মন্দির তৈরী হতে, তারপর পাঁচ সেকেণ্ডে ঠাকুর বসে যাবেন। আসলে আমাদের মন বানর স্বভাবের কিনা, কল্পনার জগতেও সব কিছু সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যায় বলে আর কিছু হয় না। কিন্তু মনে মনে একটা একটা করে ইট বসিয়ে শিব মন্দির করছে, ওঁ নমঃ শিবায় একবার জপ করছে আর একটা করে ইট বসাচ্ছে, এবারে ভাবুন তার মন্দির বানাতে কত সময় লাগবে। তার সাথে মনে রাখতে হবে কতটা গাঁথনি হয়েছে, সব কিছু এভাবেই হয়, বহির্জগতটা খুবই সাধারণ।

একজন পরিচিত ডাক্তার ছিলেন, তাঁর শরীর খারাপ যাচ্ছিল। সব রকম চিকিৎসাদি করা হল, কিন্তু কোন চিকিৎসাই রোগের উপশম করতে পারল না। কোন খাওয়া হজম হচ্ছে না, ওজন কমে যাচ্ছে, সবাই ধরে নিয়েছে এবার মরেই যাবে। ডাক্তারকে ভদ্রলোক বলে দিলেন, আমার আর কোন চিকিৎসার দরকার নেই, আমি নিজেই আমার রোগ ঠিক করব। এরপর উনি সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত নিজেকে এই ভেবে ভেবে visualise করতে লাগলেন, আমার শরীর সুস্থ, আমার কোন রোগ নেই, যা খাব সব হজম হবে। একটু সময় লাগল ঠিকই, কিন্তু তিনি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে গেলেন। ওনার এক ভাইঝি ছিল, ভাইঝি আবার বড় সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়ার। ভাইঝির আবার প্রচণ্ড মাইগ্রেনের সমস্যা ছিল, তিনি ভাইঝিকে নিজের কথা বললেন, ভাইঝিও শুনল। ভাইঝি ইয়ং মহিলা, সে আবার নামকরা ম্যাগাজিনে অনেক কিছু লেখালেখি করি। নিজের এই ব্যাপারটা নিয়ে সে একটা লেখা লিখল, তাতে বলছে, আমি শুনলাম, আমাকেও করতে বলা হল। প্রথমে আমার মনে হয়েছিল, আমার মাইগ্রেন কি কোন মেন্টাল কেস নাকি, কিন্তু আমিও সব রকম চিকিৎসা করেও ব্যর্থ হয়ে আমি এটা করতে শুরু করলাম, আর পনের দিনের মধ্যে আমি ফল পেতে শুরু করে দিলাম।

আমরা যে মনে করব এটা কোন isolated exceptional case, তা না। আমাদের ভিতরে যে শক্তি আছে, আসলে সেই শক্তিই সব কিছু সারায়। কোন ভাল ডাক্তারকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, তিনিও ওটাই বলবেন। ওষুধ দেওয়া হয় ঠিকই, কিন্তু সারানোর ব্যাপারটা ভিতর থেকে হয়। কেন হয়, কিভাবে হয়, কোন ডাক্তারদের জানা নেই। ইদানিং কালে তাই power of positive thinkingকে নিয়ে একটা আওয়াজ উঠেছে। কিন্তু সমস্যা হল, আমরা positive thinking এক সেকেণ্ডে ভেবে নিই। একটা ছেলে পরীক্ষায় বসবে, তার power of positive thinking কি? আমি তো পরীক্ষায় নাইন্টি পারসেন্ট পাব। ওভাবে হয় না, power of positive thinking মানে হয়, সবটাতেই ধীরে ধীরে synchronise করতে হয়, আমি পারবই, আমি পারবই পারব। আমি জানি যে আমি পারছি না, কিন্তু না, আমি পারব, আমাকে পারতে হবে।

এভাবে চিন্তা করতে শুরু করে দেখুক, ভিতরে ওই শক্তি এবার ধীরে ধীরে তৈরী হতে শুরু হয়ে যাবে। এ-সব ভেবেই আমাদের হনুমান চালিশা আদি পাঠ করতে বলা হয়। নিজেকে কেউ যদি খুব দুর্বল মনে করে থাকে, এক মাস হনুমান চালিশা পাঠ করে দেখুক, এক মাস পর তার সামনে কেউ দাঁড়াতে পারবে না। হনুমান চালিশার ভাব ভিতরে এমন শক্তি তৈরী করে দেবে যে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেবে। হনুমান চালিশার শব্দে থোরাই শক্তি তৈরী হয়, তৈরী হয় নিজের আত্মার শক্তিতে। যে পাঠ করে তার ভিতরে আত্মার শক্তি জেগে ওঠে। এরপর তাকে আর কেউ কারণে অকারণে দাবাতে পারবে না। আমাদের মনে হতে পারে যে, এত লোক হনুমান চালিশা পাঠ করছে, পুরো বিহার, ইউপির লোকেরা রোজ হনুমান চালিশা পাঠ করে যাচ্ছে, কেউ স্নান করতে করতে, কেউ বা স্নান করার পরে, কিন্তু কিছুই তো হয় না। হয় না, কারণ ওদের সেই নিষ্ঠাটা নেই, পাঠ করার সময় ওরা মন দিচ্ছে না। পাঠ করছে ঠিকই কিন্তু মন অন্য জায়গায় ঘুরতে থাকে, সেইজন্য কিছু হয় না। যেটাই পাঠ করবে, একাগ্র মনে নিষ্ঠা সহকারে পাঠ করতে হবে। খুব আপদ-বিপদ চলছে, কোন কাজই ঠিকমত হচ্ছে না, অশুভ শক্তি চারিদিক থেকে ঘিরে রেখেছে, আমি শক্তি সঞ্চয় করতে চাই, এবার সে একাগ্র মনে, খুব নিষ্ঠা নিয়ে শ্রীশ্রীচণ্ডী ও হনুমান চালিশা পাঠ করুক, তিন দিনের মধ্যে তার শরীর আর মনের শক্তিকে আর সামলান যাবে না। হনুমানজীর শক্তি ভিতরে এসে গেছে, বাস্তবিকই এই রকম হয়। কেন হয়, কিভাবে হয় বলতে গিয়ে আধ্যাত্মিক পুরুষরা এটাকে psychic energy বলছেন। আসলে সাধারণ মানুষরা এই psychic energyতে কিভাবে কাজ হয় দেখতে পায় না, তারা ফলটাই দেখতে পায়। আসলে যা কিছু চলে সব ঈশ্বরের শক্তিতেই চলে, কিন্তু আমরা আমাদের তৈরী করা ক্ষুদ্র জগতে শরীর মন ইন্দ্রিয় দিয়ে সবাই বাঁধা হয়ে আছি বলে আমরা মনে করি এটাই সব, এর বাইরে আর কিছু নেই। যেমন আমাদের চোখ, চোখ বহির্জগতের, সে সব সময় ফলকেই দেখতে পারে, ভিতরের শক্তিকে তাই আমরা দেখতে পাই না।

আমিত্ব যত কমবে, ঈশ্বর তত ভিতরে আসবেন

স্বামীজী আরও বলছেন, Put out self, lose it, forget it; just let God work, it is His business. (*অহংকে সরিয়ে দাও, নাশ করে ফেলো, ভুলে যাও; তোমার ভিতর দিয়ে ঈশ্বর কাজ করুন –এ তো তাঁরই কাজ।*) একবার আমিত্বটাকে নাশ করে দেখ, ঈশ্বরকে তাঁর কাজ করতে দাও। আমাদের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে, স্বার্থ চিন্তা যদি নাই করি, যদি রাগ-দ্বেষ ছাড়া কাজ করি, তাহলে আমার আর মেশিনের মধ্যে তো কোন তফাৎ থাকল না। যে কোন মেশিন যখন কাজ করে তখন সে কোন বাছবিচার করে না, রেলের ইঞ্জিন যখন ছুটে যায় তখন সামনে একটা মানুষ এসে গেলে তাকে পিশে দিয়ে যাবে, একটা পাথর পড়ে থাকলে তাকেও পিশে দিয়ে বেরিয়ে যাবে। তাহলে আমার আর মেশিনে মধ্যে তফাৎ থাকল কোথায়? আধ্যাত্মিক শাস্ত্রেও তো এটাই বলছে, তোমার শরীরটাকে মেশিন মনে কর, তোমার শরীর, তোমার ইন্দ্রিয়, তোমার মন এগুলো মেশিনের মত নয়, বাস্তবিকই মেশিন, কিন্তু তুমি তা নও। কম্প্যুটারের সামনে বসে অনেকক্ষণ কাজ করে যাচ্ছি, কাজ করতে করতে কাজের মধ্যে এমন ডুবে গেলাম যে আমি ভুলেই গেছি যে, আমি আর কম্প্যুটার আলাদা। এবারে কম্প্যুটারে যা যা ভাল মন্দ হবে সেটা আমারও মনে হবে, কিন্তু আমি তো কম্প্যুটার নই। কম্প্যুটারের সামনে বসে থেকে থেকে একটা জগৎ খুলে যাচ্ছে, শুধু শরীরকে নিয়ে বসে থেকে থেকে অন্য আরেকটা জগৎ খুলে যাচ্ছে। কিন্তু আমি আর ওই জগৎ আলাদা। শ্যামাসঙ্গীতে বলছেন, আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র মানে শরীর মন এগুলো যন্ত্র। গীতাতেও তাই বলছেন, হাত, পা, চোখ, কান, এই ইন্দ্রিয়গুলি নিজের নিজের বস্তুর উপর কাজ করতে থাকে, ওদের কাজ করতে দাও, ওদের কাজে তুমি নিজেকে জড়িও না, একবার করে দেখোই না। পিছনের দিকে একবার তাকিয়ে দেখো, যীশু, ভগবান বুদ্ধ, ঠাকুর, এনাদের কি প্রচণ্ড শক্তি! কিন্তু তখন আবার তুমি বলবে, এনারা তো ভগবান। আবার যেমনি ধর্মের কথা বলা হবে, তখন বলবে, আমি ঈশ্বর-ফিশ্বর মানি না। একটা ঠিক করে নাও, যদি বল তুমি মানো না, তাহলে দেখো সাধারণ মানুষরা কোথায় চলে গেছে। তুমি ঠাকুর, স্বামীজীকে ছেড়ে দাও, ওনাদের পরেও যাঁরা এসেছেন, তাঁদের ক্ষমতাটা কেমন দেখো। নিঃস্বার্থ ভাবে যাঁরাই কাজ করেছেন, তাঁদের কাজ দেখো, তাঁরা আগে কি ছিলেন আর পরে কি হলেন!

স্বামীজী বলছেন, We have nothing to do but stand aside and let God work. (*আমাদের আর কিছু করতে হবে না –কেবল সরে দাঁড়াতে হবে, তাঁকে কাজ করতে দিতে হবে।*) আমাদের ভিতরে যে ঈশ্বরীয় শক্তি, সে ছটফট করছে কাজ করার জন্য। কিন্তু আমরা তাঁকে কাজ করার জন্য বেরিয়ে আসতে দিচ্ছি না। সেই শক্তিরই যে প্রতিবিম্বিত শক্তি আমাদের দেহ, ইন্দ্রিয়, মনের মধ্যে প্রতিফলিত, আর ওটাকেই নিয়ে আমরা লাফাচ্ছি আর খুব খুশি হচ্ছি এই ভেবে যে বিরাট কিছু করছি। কিছু হচ্ছে না, আমিত্বকে ছাড়, তারপর দেখ কাজ কিভাবে হয়। সেইজন্য স্বামীজী বলছেন, The more we go away, the more God comes in. (*আমরা যত সরে যাব, ততই ঈশ্বর আমাদের ভিতর আসবেন।*) আমিত্ব ভাব যত কমবে, ভিতরে আধ্যাত্মিক ভাবের বিকাশ তত বেশি হতে থাকবে। দিনে আমরা একটি ঘন্টা ঠিক করে নিতে পারি, যেমন সন্ধ্যে ছটা থেকে সাতটা আমার সামনে যে আসবে তাকে আমি ঈশ্বর রূপে দেখব, কথা যখন বলব ঈশ্বরীয় কথাই বলব কারণ তিনি ঈশ্বর, তাঁর সাথে ওই এক ঘন্টা যে আচার ব্যবহার হবে সব ঈশ্বর রূপেই হবে। বাকি তেইশ ঘন্টা আমার মত থাকব। একবার করে দেখলেই হয়, তাহলে বোঝা যাবে কেমন লাগে। এবার এটা ধীরে ধীরে বাড়াতে হবে, এক ঘন্টার জায়গায় দু ঘন্টা, দু ঘন্টা থেকে তিন ঘন্টা। কিছু দিনের মধ্যেই দেখতে পাব শক্তি বেড়ে গেছে, কাজ করার শক্তি, চিন্তন করার শক্তি, ধারণা করার শক্তি, সব বেড়ে গেছে। দু-তিন দিনের মধ্যেই তফাৎ দেখতে পাওয়া যাবে। Get rid of the little 'I', and let only the great 'I' live. (*'কাঁচা আমি' টাকে দূর করে দাও। কেবল 'পাকা আমি' টাই থাক্।*) ঠাকুর কাঁচা আমি আর পাকা আমির কথা বলতেন, কাঁচা আমি নিজের আমিত্বের সাথে জুড়ে থাকা আর পাকা আমি হল, আমি ঈশ্বরের দাস, আমি ঈশ্বরের সন্তান। কাঁচা আমিকে সরিয়ে পাকা আমিকে নিয়ে আসতে বলছেন। যেমনি পাকা আমি ঢুকবে, তারপর দেখুন কি হয়।

আমার চিন্তাই আজ আমার 'আমি'কে বানিয়েছে

We are what our thoughts have made us. (*এখন আমরা যা হয়েছি, তা আমাদের চিন্তারই ফলস্বরূপ।*) আমরা যেমনটি ভাবব, যেমন যেমন চিন্তন করব, আমরা তেমন তেমনই হয়ে যাব। আজ আমরা যা কিছু হয়েছি, জগতের যে কোন মানুষ যা কিছু হয়ে আছে, সবাই যেমন যেমন চিন্তা করেছে, তেমন তেমনই সবাই হয়েছে। নাম আর গুণ দুটো আলাদা জিনিস, রাম ভাল মানুষ, রাম একজন ব্যক্তি, ভালটা তার বিশেষণ। জীবনের উদ্দেশ্য হল, নাম থেকে সরে বিশেষণে চলে যাওয়া। সাধনা মানেও তাই। ঠাকুরের বৈশিষ্ট্য কি? কিছুই না, তাঁর নামটাই বিশেষণ হয়ে গেছে। সব ধর্মই ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায়, এই ভাব নিয়ে যদি কেউ সাধনা করে, তখন লোকে বলবে, উনি তো রামকৃষ্ণ পরমহংস হয়েছেন। নামটাই বিশেষণ হয়ে গেছে। আমি যা চিন্তা করেছি, আমি সেটাই। চিন্তাটা যখন একাগ্র হয়ে যায়, তখন সে ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠতে শুরু করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত থাকে ওটাই, তার যেটা চিন্তা, যেটা তাকে একটা নাম বানিয়ে দিচ্ছে, সেটাই তাকে একটা বিশেষণও বানিয়ে দিতে পারে। উদ্দেশ্য হবে, চিন্তা প্রণালী এমন হবে, নাম থেকে সরে গিয়ে সেটা যেন বিশেষণ হয়ে যায়, তার নামটাই একটা বিশেষণ হয়ে যাবে। চিন্তা-ভাবনাকে আমাদের নিয়ন্ত্রিত করে করে এমন অবস্থায় নিয়ে যেতে হবে, আমাদের খুব সচেতন থাকতে হবে যে, এই চিন্তা-ভাবনা গুলো আমাকে যেন ওই গুণের দিকে নিয়ে যায়, আমি এটা। বলছেন, so take care of what you think. Words are secondary. (*সুতরাং তোমরা কি চিন্তা কর, সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রেখো। বাক্য তো গৌণ জিনিস।*) আমরা কি কি চিন্তা-ভাবনা করছি, সেই ব্যাপারে আমাদের খুব সাবধান ও সচেতন থাকতে হবে। অথচ আমরা কি করছি? আমাদের আলোচনা গুলো একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, আমরা বেশির ভাগ সময় ব্যক্তি ও ঘটনা নিয়েই আলোচনা করি, কে কি করল, প্রধানমন্ত্রী কি বললেন, মুখ্যমন্ত্রী কি করলেন। সামাজিক অনুষ্ঠানে সবাই যে ভাবে খাওয়া-দাওয়া নিয়ে আলোচনা করে, যা একেবারেই ভাল না। আমরা কি চিন্তা-ভাবনা করছি, কি ধরণের চিন্তার পদ্ধতির মধ্যে আছি, এই ব্যাপারে খুব সাবধান থাকতে হবে, কারণ আমার চিন্তা-ভাবনাই আমাকে তৈরী করে। আমরা কি কথাবার্তা করছি সেটা কখনই গুরুত্বপূর্ণ নয়, কি চিন্তা করছি সেটার গুরুত্ব অনেক বেশি। আমাদের কার্যক্ষেত্রে নামায় আমার চিন্তা ভাবনাই, মুখের শব্দগুলো না।

আগেকার দিনের মায়েদের একবারও নিজের সন্তানকে বলতে হত না যে, আমি তোমাকে ভালবাসি; কিন্তু ইদানিং মায়েদের এই বলে প্রতিনিয়ত জানান দিয়ে যেতে হয় যে আমি তোমাকে ভালোবাসি। বর্তমানে হোয়টস্আপে, ফেসবুকে, ফোনে সবাই এ তাকে, সে ওকে আই লাভ ইউ করে যাচ্ছে। আর একটু এদিক সেদিক কিছু হয়ে গেলেই বলবে, তোমার মরা মুখ না দেখা পর্যন্ত আমি শান্তি পাব না। কারণ ছেলের চিন্তনে মেয়ে নেই, মেয়ের চিন্তনে ছেলে নেই, ছেলে একসাথে পাঁচটা মেয়েকে ভাবছে, মেয়েটাও একসাথে পাঁচটা ছেলেকে ভাবছে। শেষ পর্যন্ত আমি আপনি ওটাই, যেটা আমরা চিন্তা-ভাবনা করি।

সেইজন্য বলছেন, Thoughts live, they travel far. (*চিন্তাগুলিই বহুকালস্থায়ী, আর তাদের গতিও বহুদূরব্যাপী।*) আমাদের মুখের শব্দগুলো বেশি দূর যাবে না, কিন্তু চিন্তন দীর্ঘদিন স্থায়ী থাকবে এবং অনেক দূর যাবে। Each thought we think is tinged with our own character, so that for the pure and holy man, even his jests or abuse will have the twist of his own love and purity and do good. (*আমরা যে-কোন চিন্তা করি, তাতেই আমাদের চরিত্রের ছাপ লেগে যায়; এইজন্য সাধুপুরুষদের ঠাট্টায় বা গালাগালিতে পর্যন্ত তাঁদের হৃদয়ের ভালবাসা ও পবিত্রতার একটুখানি রয়ে যায় এবং তা আমাদের কল্যাণসাধনই করে।*) আমি আর আমার চিন্তন এক, আমি বলতে আমার চরিত্র হয়ে যায়। আমরা যা কিছু চিন্তন করি, সেই চিন্তন আমাদের চরিত্রের সাথে এক রঙে রাঙিয়ে যায়, চরিত্র আর শব্দ মিশে যায়। পবিত্র মানুষ, সন্ত মহাত্মারা যদি আমাদের ভালবেসে দুটো কথা বলেন তাতে আমাদের ভাল হবে, তাঁরা যদি আমাদের সাথে মজা করেন, তাতেও আমাদের মঙ্গল হবে, তাঁরা যদি আমাদের দুটো বকুনি দেন বা গালাগালও দেন, বুঝবেন তাতে আমাদের শুভই হবে। মঠে সাধুদের কাছে যত লোকজন আসে, বেশির ভাগই হল চিড়ে ভেজা বুদ্ধি। কোন সাধু যদি একবার একটা কথা বলে কাউকে শোধরাতে যান, দ্বিতীয়বার আর সে সাধুর কাছে আসবে না। এদের এতটুকু বোধ নেই যে, এ-সব সাধুদের সাধারণ গৃহীদের সাথে কোন স্বার্থ নেই। সন্তান মায়ের শরীরের অঙ্গ, বাচ্চাও জানে, মাও জানে, এক অপরের জন্য জীবনধারণ। সেই মা সন্তান দোষ করলে যে তিরস্কার করছে, বা উত্তমমধ্যম দিচ্ছে, সেখানে মা সন্তানের মঙ্গলের জন্যই এই কাজ করছে। একজন সাধু মহাত্মার হৃদয় হল ঈশ্বরের বাসস্থান, তাঁর কাছে সমস্ত সৃষ্টি ঈশ্বরের, সমস্ত ভূতবর্গ তাঁর সন্তান। তিনি পবিত্র। পবিত্র মানে কি? নিঃস্বার্থপর। তিনি যদি তিরস্কার করে দুটো কটূ কথা বলেও দেন, বুঝতে হবে তাতে তার মঙ্গলই হবে। এই জিনিসগুলো আমাদের বোঝার ক্ষমতা নেই। কারণ আমরা নিজেরা অপবিত্র কিনা, নিজেরা অপবিত্র বলে বাকিদেরও অপবিত্রতার চোখ দিয়ে অপবিত্র দেখি। চোর সবাইকে চোর ভাবে, মিথ্যাবাদী মনে করে সবাই মিথ্যা কথা বলে, আমি আপনি যা আমরা অপরকে তাই দেখব। সেইজন্য বুঝতে হয়, জগতে যত বড় বড় কাজ হয়েছে, যত মহৎ কাজ হয়েছে, একটু খোঁজ নিলে দেখা যাবে, যাঁরা এই কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন তাঁরা সবাই ছিলেন নিঃস্বার্থপর। যদি জীবনে আমাদের বড় হতে হয়, বড় কাজ যদি করতে হয়, কাজে যদি শক্তি আনতে হয়, কাজে যদি সাফল্য আনতে হয়, তাহলে আমাদের পবিত্র হতে হবে, পবিত্র হওয়া মানেই হয় নিঃস্বার্থপর হওয়া। যিনি নিঃস্বার্থ তিনিই পবিত্র। লেখক-লেখিকাদের রচনায় নৈতিকতা, মূল্যবোধ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়ে থাকে। সামারসেট মঙ্ক ছিলেন, তিনি নিজের গল্পগুলিতে খুব কায়দা করে পবিত্রতাকে নিয়ে অনেক আলোকপাত করেছেন। এক জায়গায় তিনি দেখাচ্ছেন কিভাবে একজন পরিস্থিতির চাপে পরে গিয়ে সেক্স ওয়ার্কার হয়ে গেছে, কিন্তু তার মন তখনও শুদ্ধ পবিত্র। আমরা এটাকে মেনে নিতে পারব না, খ্রীশ্চান মরালিটি কোন মতেই মানবে না। কিন্তু হিন্দু ধর্মের খুব গভীরে গেলে দেখা যাবে যে, এসব ক্ষেত্রে হিন্দু ধর্ম খুব পরিষ্কার, এখানে মরালিটিকে নিয়ে তাদের কোন মাথাব্যাথার কারণ নেই। যেহেতু সেই মেয়ের কোন স্বার্থ নেই; কোন কারণে পরিস্থিতি বশতঃ কিছু হয়ে গেছে। যা করছে নিঃস্বার্থ ভাবে করছে। সাধারণ লোকেরা এটা বুঝতে পারে না। কিন্তু যদি কাউকে বড় হতে হয়, বড় কাজ যদি করতে হয় তাহলে কিন্তু এভাবেই করতে হবে। এইভাবে মানুষ যখন মহাত্মা হয়ে যান, তখন তাঁর হাসি, মজা, তিরস্কার এগুলোর মধ্যেও একটা ভালবাসার ছোঁয়া থাকে।

স্বামীজী এতক্ষণ আমিত্বকে সরিয়ে রাখার কথা বলে গেলেন। সমস্যা হল এই ধরণের কথা আমাদের বিশ্বাসই হয় না, কোন রকমে বিশ্বাস যদিও বা হয়ে যায়, আমরা ভরসা করতে পারি না। এ্যলবে কামু একজন খুব নামকরা লেখক, দি প্লেগ নামে তাঁর একটা উপন্যাস আছে, সেখানে তিনি দেখাচ্ছেন কিভাবে এক শহরে

প্লেগ হয়েছে, যার জন্য পুরো শহরটার জনজীবন স্তব্দ হয়ে গেছে। উপন্যাসের মূল চরিত্রে একজন ডাক্তার আছেন, যিনি প্লেগের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন, লোকেদের উৎসাহ দিচ্ছেন, চিকিৎসা করছেন। একটা জায়গায় তিনি খুব সুন্দর একটা কথা বলছেন, যদি কল্পনা করা হয় মানবজাতি কোন কারণে ভূগর্ভের নীচে পাকাপাকি ভাবে বাস করছে। এরপর কোন কারণে ভূগর্ভে বিদ্যুতের সরবরাহটা বন্ধ হয়ে গেছে, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, খাবার-দাবার নেই, যুদ্ধের সময় যেমন হয়। সেই সময় ওদের মধ্যে কেউ যদি খেটে খুটে বিপরীত দিকে গিয়ে গুহার মুখটা আবিষ্কার করতে পারে, তখন গুহার মুখে এসে সে দেখবে চারিদিকে আলো আর আলো, ঠাণ্ডাও নেই, গরমও নেই, আর চারিদিকে খাবারের প্রাচুর্য ছড়িয়ে আছে। এবার সে যদি দৌড়ে গিয়ে বাকি লোকেদের উপনিষদের ঋষির মত বলে, *শৃন্বন্তু অমৃতস্য পুত্রা*, শোন ভাই আমাদের কষ্টের দিন শেষ, আমি সেই দরজা পেয়ে গেছি, সেই দরজার বাইরে আলো আর আলো, কোন ঠাণ্ডা নেই, প্রচুর খাবার, সবাই চলো সেদিকে যাই। কেউ তার কথা শুনবেই না। এক আধ জন যদি কদাচিৎ বিশ্বাস করেও নেয়, সে বলবে, আপনার কথাগুলো খুব সুন্দর, সবটাই মানলাম, কিন্তু এইমাত্র খবর পেলাম পাশের রেশন দোকানে পাউরুটি এসেছে, আগে আমি আমার পাউরুটিটা নিয়ে আসি, তারপরে আপনার কথা শুনব।

খুব সুন্দর কথা, খ্রীশ্চনরা যীশুর জীবন থেকে আধারিত করে সব বলে, যীশু Kingdom of Heavenএর কথা বলছেন, মানুষ তাঁর কথা বিশ্বাস করছে না, আমরাও করি না। আমরা আজকে যীশুর সময় থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি, সেইজন্য মনে হয় আমরা বিশ্বাস করি, কিন্তু কিছুই বিশ্বাস নেই। যে মানুষ বিশ্বাস করে যে, আগুনে হাত দিলে হাত জ্বালিয়ে দেবে, সে কি দ্বিতীয়বার আগুনে হাত দেবে! যার বিশ্বাস আছে যে যীশু ভগবান, যার সত্যিই বিশ্বাস আছে Kingdom of Heaven আছে, সেকি নরকের মধ্যে ঘুরপাক খেতে যাবে? প্রশ্নই উঠছে না। যারা ধর্মের নামে জহুদিদের উপর এত অত্যাচার করেছে, ধর্মের নামে এখনও যারা বিধর্মীদের খতম করে যাচ্ছে, তাদের কি নিজেদের বিশ্বাস আছে যে, ভগবান আছেন? সব মুখের কথা। আমাদেরও সেই বিশ্বাস নেই। স্বামীজী যখন বলছেন, একটু নিঃস্বার্থ হও, একটু নিষ্কাম হও, নিজেদের আমিত্বকে ত্যাগ করে কাজ কর, তখন আমরাও এই কথাগুলি বিশ্বাস করতে চাইছি না। আমরা তো আমিত্বকে ত্যাগ করে একটু কাজ করে দেখতে পারি, দেখিই না কি হয়। কেউই দেখতে চায় না।

আমাদের জীবনে কোন আদর্শ নেই, আদর্শ বলতে সত্যিকারের চারটি আদর্শ আমাদের সামনে খোলা। প্রথম আদর্শ, দেশের জন্য, সমাজের জন্য আমি সম্পদ তৈরী করব; দ্বিতীয় আদর্শ বিদ্যা, যে কোন বিদ্যা, ওই বিদ্যা অর্জনের জন্য আমি সব কিছু করতে রাজী আছি; তৃতীয় আদর্শ সেবা, আমি যে কোন ক্ষেত্রে কাজ করি না কেন, যেমন আমি যদি শিক্ষক হই, আমি যখন ছাত্রদের পড়াচ্ছি তখন আমি তাদের সেবা করছি। শেষ আদর্শ হল ত্যাগ, যাঁরা আধ্যাত্মিক পথে যাবেন, ঈশ্বরের জন্য তাঁরা সব কিছু ত্যাগ করবেন। এই চারটি আদর্শ ছাড়া পঞ্চম আর কোন আদর্শ হয় না। আমাদের সমস্যা হল, আমাদের জীবনের কোন আদর্শ নেই, একটা কোন উদ্দেশ্য নেই। কি করছি, কেন করছি, আমরা নিজেরাই জানি না। দশটা কুকুরের লেজে যদি স্পিরিট বা পেট্রল ঢেলে দেওয়া হয়, লেজে ঠাণ্ডা লাগে বলে কুকুর গুলো দৌড়াতে থাকে, হাওয়াতে আরও ঠাণ্ডা লাগে যার ফলে খালি পাগলের মত দৌড়াতে থাকে। কেন দৌড়াচ্ছে সেও জানে না, শুধু জানে যে পিছনে তার ঠাণ্ডা লাগছে। আমাদের জীবনে একই অবস্থা, কেন দৌড়াচ্ছি, কোথায় যাচ্ছি, কিছুই জানি না।

ঈশ্বরই সব কিছু করেন, শুধু ঈশ্বরের চিন্তন কর

স্বামীজী বলছেন, Desire nothing; think of God look for no return. (*কিছু কামনা করো না; ঈশ্বরের চিন্তা কর, কিন্তু কোন ফল-কামনা করো না।*) একবার যদি জানতে পারি আমি কে, তখন কি হবে আমরা ধারণাই করতে পারব না। আমরা যতই বলি আমি দেহ নই, ইন্দ্রিয় নই, আমি ঈশ্বরের সন্তান, আমি আত্মা, কিন্তু ঘুরে ফিরে চলে আসবে আমি অমুক, আমি এই, আমি সেই, এই ভাব। ঠাকুর বলছেন, আজ অশ্বত্থ গাছ কেটে দিলে কালই আবার ফেকড়ি বেরিয়ে যাবে। আমার আমিত্ব আবার ঘুরে আসবেই। আমরা যদি পুরোপুরি তত্ত্বগত ভাবটা নিয়েও চলি যে, আমি দেহ নই, আমি ইন্দ্রিয় নই, আমি মন নই, বুদ্ধি নই, আমি শুদ্ধ আত্মা। আমি যদি শুদ্ধ আত্মা হই, অন্তর্যামী রূপে আমার ভিতরে যিনি আছেন, সেটাই যদি সত্তা হয়, তাহলে কাজ যত হয় সব কাজ তিনিই করছেন। ভগবান তো কোন কিছু চান না, আর আমি যদি ভগবানের

সাথে এক থাকি, তাহলে আমি চাইব কি করে! যাঁরা মনে করছে বিধর্মীদের খুন করে আমি ঈশ্বরের কাজ করছি, এটা ঈশ্বরের কাজ কেন হতে যাবে? ঈশ্বর তো এমনিই করে দিতে পারেন, তাঁর ভারি বয়ে গেছে কাউকে মারতে। এবার যদি একটু গভীরে গিয়ে চিন্তা ভাবনা করা হয়, তখন দেখা যাবে আমাদের সবটাই ভুলে ভরা, জীবনে কোন কিছুই ঠিক হচ্ছে না। আমরা যা কিছু করছি আসলে সব কিছু কে করছেন? এই জিনিসটাকে একটু যদি গভীর ভাবে চিন্তা করা হয়, তাহলে দেখা যাবে আসলে সব কাজ তিনিই করেন। আমাদের মন বুদ্ধির দরুণ মনে করছি আমি করছি। ফলে সব কিছু মিলে মিশে একটা বিতিকিচ্ছিড়ি কাণ্ড হয়ে গিয়ে মনে হয় আমি করছি।

সেইজন্য স্বামীজী বলছেন, It is the desireless who bring results. (*যাঁরা কামনাশূন্য, তাঁদেরই কর্ম ফলপ্রসু হয়।*) আমরা মনে করি আর মুখেও বলি, যে কাজে নামে সে কাজে সাফল্য পায়, কিন্তু তা না, যারা কামনাশূন্য তারাই সাফল্য পায়। কাজ কিভাবে করবে, গীতায় ভগবান বলছেন, *সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত*, সাধারণ মানুষ আসক্ত হয়ে সব কর্ম করে, যে কোন কাজ করার সময় মনে করে, আমি এই কাজ করছি এই কাজের ফলস্বরূপ আমার এটা চাইই চাই। কিন্তু যিনি বিদ্বান পুরুষ তিনি অনাসক্ত হয়ে লোকসংগ্রহার্থে কাজে নামেন। আমাদের সমস্যা হল, আমরা কাজ করতে করতে যেমনি কাজ ছেড়ে দিই, তখন বলি, ধুর! তাঁর কাজ তিনিই দেখবেন।

কাজ কিভাবে করতে হবে বলতে গিয়ে আচার্য শঙ্কর তাঁর ভাষ্যের এক জায়গায় বলছেন, *অহং কর্তা ঈশ্বরায় ভৃত্যবৎ করোমি*, এই কাজের কর্তা আমিই কিন্তু ঈশ্বরের জন্য করছি। কিভাবে? তাঁর সেবক যেভাবে করে। আগেকার দিনে রাজার যে সেবক, যে সেবার কাজ করে, কল্পনা করা যায় না যে সে কাজে ফাঁকি দেবে, রাজা তাকে শেষ করে দেবে। এখন গণতান্ত্রিক প্রথায় সব অন্য রকম হয়ে গেছে। আমাদের সমস্যা হল, আমিত্ব না থাকলে আমরা আর কাজ করব না। আমিত্ব ছেড়ে কাজ করার চেষ্টা একটু করে দেখাই যাক না, তখনই আসবে কাজে সাফল্য। গান্ধীজী যখন দেশকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন সেখানে তাঁর আমিত্ব বলে কিছু ছিল না। নেতাজী যখন নেতৃত্ব দিচ্ছেন, আমার দেশের মুক্তি চাই, আমি প্রধানমন্ত্রী হব, নিজের কিছু হবে ভেবে তিনি কিছুই করছেন না। ভারতবাসী আজও ওনাদের মাথায় করে রেখেছে। ভগৎ সিং, আমি দেশের স্বাধীনতা চাই, আমার নিজের কিছু লাগবে না, এই দেখ আমি বোমা মারতে যাচ্ছি। আমাদের বাবা, ঠাকুর্দারা, কত কি ছিলেন, এনারাও তো গান্ধীজীর সময় ছিলেন, তাঁরাও তো ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিংএর সময় ছিলেন, কিন্তু পরিবারের কয়েকজন ছাড়া কে তাঁদের মনে রেখেছে। এর কারণ কি? কারণ তাঁরা আসক্ত হয়ে কাজ করে গেছেন, দেশের জন্য কোন অবদান নেই, ত্যাগ নেই, শুধু তাঁদের বদন্যতায় আমাদের এই পার্থিব শরীরগুলো এসেছে। সমাজে, দেশে বা যে কোন ক্ষেত্রে যা কিছু বড় কাজ হয়, সব কাজ desireless থেকেই হয়। আজকে কত বিজ্ঞানী নোবেল প্রাইজ পাচ্ছেন, কজনের নাম আমরা মনে রাখছি, কিন্তু তখনকার দিনে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা সবাই নিষ্কাম ভাবে বিদ্যার্জন করেছেন, নিষ্কাম ভাবে গবেষণা করেছেন, সেইজন্য তাঁরাও অবদান রেখে যেতে পেরেছেন। এখন বেশির ভাগই হলেন যারা অর্থের আশায়, নামযশের আশায় লেখাপড়া করছে, সেইজন্য কাজও সেই রকম হচ্ছে, তার ফলও সেই রকম হয়। কিন্তু আমরা এটাকে মানতে পারি না।

ভারতে যেভাবে ধর্মের বিস্তার হয়েছে

তখন স্বামীজী বলছেন ধর্ম ভারতবর্ষে কিভাবে চলে, The begging monks carry religion to every man’s door; but they think that they do nothing, they claim nothing, their work is unconsciously done. (*ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসীরা লোকের দ্বারে দ্বারে ধর্ম বহন করে নিয়ে যান, কিন্তু তাঁরা মনে করেন আমরা কিছুই করছি না। তাঁরা কোনরূপ দাবিদাওয়া করেন না, তাঁদের কাজ অজ্ঞাতসারেই হয়ে থাকে।*) আগেকার দিনে সাধুবাবাদের কোথাও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা ছিলে না, ওনারা তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াতেন। কোন মন্দিরে থাকলেও গ্রামের একটু বাইরেই থাকতে পছন্দ করতেন। ওখান থেকে গ্রামে গিয়ে ভিক্ষা করতেন, তখন গ্রামের লোকেদের ধর্মের দুটো কথা বললেন বা লোকেরাই ঘিরে তাঁকে দুটো ধর্মের কথা বলার জন্য অনুরোধ করত। এই করেই ভারতবর্ষে ধর্মের বিস্তার হয়েছে। তখনও আমাদের কোন central authority বা central বই ছিল না। জুহুদিদেরও এই পরম্পরা ছিল, তাঁদেরকে প্রফেট বলা হত।

প্রফেটরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে ধর্মের কথা বলতেন। আমাদের এখানেও বিভিন্ন ধরণের সাধু সন্ন্যাসীরা এই কাজ করতেন, তাঁদের মধ্যে বড় বড় সাধু, সাধারণ সাধু সব ধরণের সাধুরা থাকতেন। ওনারা মাঝে মাঝে কোন বড় মহাত্মাকে কেন্দ্র করে কোন জায়গায় জড়ো হয়ে দুদিন তিন দিনের কোন বড় সভা করতেন, যেখানে ধর্মীয় আলোচনাদি চলত। সেখানে অনেকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রবচন দিতেন, লোকেরা সবাই শুনত। এই করে করে পুরো ভারতবর্ষে একই ধরণের ধর্ম, একই ধরণের ধর্মীয় অনুশীলন করা হত। কিন্তু ওনারা জানতেন, আমরা ধর্ম প্রচার করছি না। ইদানিং কালের জেহাদীরা সচেতন ভাবে বলে বেড়ায়, আমিই ধর্ম রক্ষা করছি, আমি ধর্ম প্রচার করছি, আমি আল্লার কাজ করছি, আমি তোমাকে মারব। এদের আমি ছাড়া আর কিছু নেই। সাধুরা যখন ধর্মের কথা বলতে, ওনারা জানতেন আমি বলার কে, এই কথাগুলো ঈশ্বরীয় কথা, ঋষিরা এই কথাগুলো জেনেছিলেন, পরম্পরায় আমার কাছে এসেছে, তাঁদেরই কথা আমি এখন বলছি। এই ভাবে আমাদের ধর্ম চলেছে, এভাবেই সারা দেশে ধর্ম ছড়িয়েছে।

স্বামীজী বলছেন, If they should eat of the tree of knowledge, they would become egoists, and all the good they do would fly away. (*যদি তাঁরা (ঐহিক) জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খান, তা হলে তো তাঁদের অহঙ্কার এসে যাবে, আর যা কিছু লোক-কল্যাণ তাঁরা করবেন –সব লোপ পেয়ে যাবে।*) যেমনি ওনারা মনে করতেন আমি করছি, এই শিক্ষা আমি দিচ্ছি, সঙ্গে সঙ্গে ফলগুলি নিষ্ফল হয়ে যেত। ভারতবর্ষের যে আজকে ধর্মের এত উচ্চ ভাব, এই ভাব থাকত না। ভারতের যে কোন মন্দিরে গেলে আমরা দেখতে পাই, সব জায়গায় সেই রীতি, সেই উপাচার, যেগুলো আমরা সব সময় করে থাকি, কিছু মন্ত্রের হয়ত একটু এদিক সেদিক হতে পারে, কিন্তু হিন্দু মানেই সেই একই ধরণের সব অনুশীলনগুলি চলে আসছে, ভাবতে অবাক লাগে। অথচ পুরো জিনিসটাকে এই জায়গায় নিয়ে এসেছেন সেই সব ভবঘুরে ভ্রাম্যমাণ সাধুরা। ওনারাও আবার বিভিন্ন জায়গা থেকে শিক্ষা নিতেন, বিভিন্ন মতের সাথে যুক্ত থাকতেন, কিন্তু ঘুরে বেড়াতেন। ঘুরে ঘুরে তাঁরা ধর্ম প্রচার করে গেছেন। আমেরিকায় যাওয়ার পর স্বামীজীও ঠিক এই জিনিসটাই চেয়েছিলেন যে, রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুরা ঠিক এইভাবে শিক্ষা দান করবে। সেই সময় মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ছিল না, সেইজন্য স্বামীজী বললেন, তোমরা গ্লোব আর ম্যাজিক লণ্ঠন নিয়ে লোকেদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার কর। যেভাবে ধর্মের প্রচার প্রসার করা হয়েছিল, ঠিক সেইভাবে স্বামীজী শিক্ষার প্রচার প্রসার করতে চেয়েছিলেন। এখন অবশ্য এর দরকার নেই। বলছেন, As soon as we say ‘I’, we are humbugged all the time; and we call it ‘knowable’, (*যখনই আমরা ‘আমি’ এই কথা বলি, তখনই আমরা আহাম্মক বনে যাই আর বলি আমরা জ্ঞানলাভ করেছি।*) আমরা যেটাকে জ্ঞান বলে জানি, যখনই বলবে জ্ঞান, তখনই জানবেন যে, আমার আমিত্ব সেখানে ঢুকে গেছে, আর ওই আমিত্ব জ্ঞানের শক্তিকে পুরো শেষ করে দিয়েছে, মজার ব্যাপার হল আমরা এটা বুঝতেও পারি না।

ভাগবতে একটা খুব মনোজ্ঞ আলোচনা আছে, রাজা জনকের কাছে একজন তপস্বিনী এসেছেন, রাজা জনক তাঁকে বলছেন, ‘তুমি শোন’। দুবার তিনবার ‘তুমি শোন’ বলাতে তপস্বিনী বলছেন, ‘আপনার এত অহঙ্কার কেন যে, আপনি ‘তুমি শোন’ বলছেন? আপনি নিজেকে কি মনে করছেন যে, আপনি সেই জ্ঞানের উচ্চ অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত আছেন যে কাউকে শিক্ষা দিতে পারেন’? যেমনি বলছেন, ‘তুমি শোন’, তার মানে আমিত্ব ঢুকে গেছে, কেউ তার কথা শুনবে না। যার আমিত্ব নেই তার কথা সবাই শুনবে, কারণ তার শক্তি আছে। স্বামীজী বলছেন, but it is only going round and round like a bullock tied to a tree, একটা গরুকে গাছে বেঁধে দেওয়া হয়েছে, গরু এখন ওইটুকুর মধ্যেই ঘুরপাক খেয়ে যাচ্ছে। আমরাও অসহায় হয়ে ঘুরে যাচ্ছি, বুঝতেও পারছি না যে আমরা ঘুরে যাচ্ছি। আসল বিদ্যা এভাবে আসে না, আসল বিদ্যা অন্য ভাবে আসে, যেখানে আমিত্ব বলে কিছু নেই।

ঈশ্বর নিজেকে লুকিয়ে রাখেন, তাই তাঁর কাজ সর্বশ্রেষ্ঠ

গীতাতে আমরা নিষ্কাম কর্মাদির কথা শুনে থাকি, এখানে স্বামীজী যে কথাগুলো বলছেন এগুলো তাঁর original কথা। আসলে স্বামীজীর রচনাবলীতে ভুরি ভুরি স্বামীজীর original কথা আছে, থেকে থেকে স্বামীজী তাঁর original কথা, arguments গুলি original presentation দিচ্ছেন। এখন যেটা স্বামীজী

বলছেন, এটাও একটা original comments, The Lord has hidden Himself best, and His work is best. (*ভগবান বেশ ভালভাবে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছেন, তাই তাঁর কাজও খুব ভাল।*) ঈশ্বর এই সৃষ্টি করে নিজেকে ওর মধ্যে লুকিয়ে রেখেছেন, এমন রহস্য যে কেউ তাঁকে খুঁজে পায় না। এই নিয়ে অনেক সুন্দর সুন্দর কথা ও কাহিনী আছে, কঠোপনিষদে বলছেন, *পরাঞ্চি খানি ব্যতৃনাৎ স্বয়ম্ভূঃ,* যিনি স্বয়ম্ভূ তিনি ভিতরে ঢুকে ইন্দ্রিয়গুলি তৈরী করলেন, আর সম্পর্কটা কেটে দিলেন। আর *তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্,* সেইজন্য মানুষ বাইরের জগতের দিকেই তাকায়, ভিতরের দিকে তাকায় না। *কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মনমৈক্ষদ্ আবৃতচক্ষুর,* কিন্তু কোন কোন ধীর ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে ভিতরের দিকে চালিত করে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করে অমৃতত্ব লাভ করেন। তুমিও যদি স্বয়ম্ভূকে দেখতে চাও ধীর ব্যক্তির মত ইন্দ্রিয়াদি সংযমের দ্বারা ভিতরে দিকে দৃষ্টি দাও, তুমিও তাঁর সাক্ষাৎ পেতে পার।

এই ধরণের আরেকটা খুব নামকরা গল্প আছে, ভগবান প্রানীকুলের সৃষ্টি করলেন, তিনি দেবতা, অসুর সবাইকে সৃষ্টি করে সমস্ত প্রজাতিগুলিকে আলাদা আলাদা শক্তি দিলেন, দেবতা, অসুর সবাইকে বিভিন্ন রকম শক্তি দিলেন, কিন্তু মানুষকে আত্মজ্ঞান দিয়ে দিলেন। সেই থেকে মানুষ ছাড়া আর কোন প্রজাতি নিজের স্বরূপকে জানতে পারে না। দেবতারা ভগবানকে গিয়ে বলছেন, 'আপনি এটা কী করলেন প্রভু, মানবজাতি যদি নিজের স্বরূপ জেনে যায়, তাহলে তো মানুষ আমাদের দাবিয়ে রাখবে, ওরা আমাদের কথা শুনবেই না'। ভগবান তখন দেবতাদের বললেন, 'তোমাদের একটা অধিকার দিলাম, তোমরা মানুষের এই আত্মজ্ঞানকে যে কোন জায়গায় লুকিয়ে রাখতে পার'। দেবতারা খুব খুশি, এবার তাঁরা গুহার ভিতরে লুকিয়ে রাখতে গেলেন, সমুদ্রের তলায় নিয়ে গেলেন, গহন অরণ্যের মধ্যে লুকিয়ে রাখলেন। দেবতারা দেখছেন যেখানেই লুকিয়ে রাখি না কেন, মানুষ সব জায়গায় পৌঁছে যেতে পারে, ওরা ঠিক খুঁজে বার করে নেবে। অনেক বিচার করে করে দেবতারা দেখলেন, ওদের ভিতরেই লুকিয়ে রাখা যেতে পারে। এরা এত বহির্মুখী যে কখনই ভিতরের দিকে তাকাবে না, সব সময় বাইরের দিকেই তাকাবে। মানুষ কোন দিন ভিতরের দিকে তাকাবে না, আর কোন দিন এই আত্মজ্ঞানকে ওরা খুঁজে পাবে না। সেই থেকে মানুষ বাইরেই খুঁজে যাচ্ছে, তার ভিতরেই যে অমূল্য রতন রয়েছে এর সন্ধান আর পায় না।

ভিতরে কে আছেন? অন্তর্যামী রূপে ঈশ্বর নিজে আছেন। এই সৃষ্টির মধ্যেই তিনি ঢুকে আছেন, আর আমরা সবাই তাঁকে বাইরেই খুঁজেই যাচ্ছি। খুঁজতে গিয়ে আমরা বিষ্ণুলোক, শিবলোক, হেভেন, জন্নৎ ইদানিং রামকৃষ্ণলোক তৈরী করে ওখানে খুঁজেই যাচ্ছি। বিষ্ণুলোকে বিষ্ণুণা সহিত মোদতে, শিবলোকে শিবেন সহিতা মোদতে শ্লোক বানিয়েই যাচ্ছি, বিষ্ণুর সাথে ওখানে গিয়ে আনন্দ করবে, শিবলোকে শিবের সাথে আনন্দ করবে। আমাদের শিবের মত হওয়ার যোগ্যতা নেই, শিবের সাথে আনন্দ করা তো আরও দূরের ব্যাপার।

সহজ এই ব্যাপারটা যদি আমরা বুঝে নিতে পারি, যিনি ঈশ্বর, যিনি কর্তা, তিনি নিজেকে খুব সুন্দর ভাবে লুকিয়ে রেখেছেন, তিনি কারুরই চোখের সামনে নেই, এটা সবাই মানছে। কিন্তু তিনি যে সেইজন্য শ্রেষ্ঠ, এটা কেউ বুঝতে পারছে না। স্বামীজী তাই বলছে and His work is best, আমরা জানি সেইজন্য ঈশ্বরের কার্য সর্বশ্রেষ্ঠ, so he who hides himself best, accomplishes most. (*এইরূপ যিনি নিজেকে সম্পূর্ণ লুকিয়ে রাখতে পারেন, তিনি সবচেয়ে বেশী ভাল কাজ করতে পারেন।*) ঈশ্বরের মত তুমিও নিজেকে লুকিয়ে নাও, দেখবে তোমার কাজটাও শ্রেষ্ঠ হবে। তুমি অন্যদের সাথে একমত নাও হতে পার, এখন তা হয়ত অন্য ভাবে চলছে। কিন্তু best কাজ কে করেছেন? ঈশ্বর। কিভাবে করেছেন? স্বামীজী এখানে বলছেন, তিনি নিজেকে পিছনে রেখে করেছেন। ঠিক তেমনি, তুমিও যদি নিজেকে পিছনে করে নাও, তোমার কাজটাও best হবে। যুক্তিটা খুব সুন্দর আর এর একটা নূতনত্ব আছে। আগেকার দিনে সব বাড়িতেই দুটো তিনটে করে সন্তান থাকত, মা-বাবা যদি তাদের ছোট্ট কোন কাজ দিয়ে দেয়, ওরা করতে চাইবে না। ছেলেকে বলা হল গম ভাঙিয়ে আনতে, যাবে না, বাজার করে নিয়ে এসো, লজ্জায় মরে যাবে, বাড়ির কোন কাজ করার প্রশ্নই উঠছে না। এরাই যখন স্কুল কলেজে ফাংশান হবে তখন রাতদিন জেগে প্রাণপাত করে কাজ করবে। বিয়ে বাড়িতে কাজ করতে দিলে, কাজ করে ফাটিয়ে দেবে, বাবা-মা অবাক হয়ে দেখছে আর ভাবছে, এ আমারই ছেলে যে এত কাজ করছে! কারণ এখানে তার আমিত্ব নেই, বাড়িতে তার আমিত্বটা থাকে, যেমনি

ওই আমিত্ব এসে যায়, তখন আর কাজ করতে চাইবে না। Conquer yourself, and the whole universe is yours, নিজেকে জয় কর, নিজেকে জয় করলে সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তোমার পায়ের তলায় এসে যাবে। নিজেকে জয় করা মানে, আমিত্বের নাশের কথাই স্বামীজী বলছেন।

স্বামীজী যে আমিত্ব নাশের কথা বলছেন, এগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সব সময় অনুশীলন করা খুবই দরকার। আমরা কিছুই করব না, অন্য দিকে অপরের নিন্দা করব, অনুশোচনা করব আর ভাগ্যের দোষ দেব। কেউ হয়ত একটা দোকান চালায়, তার অনুশীলন কিভাবে হবে? একটা হল এই দোকানের মাধ্যমে আমি সমস্ত রকম মানুষের সেবা করছি, দ্বিতীয় হল আমি দেশের জন্য, সমাজের জন্য সম্পদ সৃষ্টি করছি। তৃতীয় আমার জন্য কোন কিছু নেই। এই যে সম্পদ সৃষ্টি হবে, তার একটা অংশ আমার জীবন নির্বাহের জন্য আমার কাছে চলে আসবে। ওই অংশের এবার এতটা দানে যাবে। সেবা কিভাবে হবে? যার কাছ থেকে মাল কিনছি তার সেবা করা হচ্ছে, যাদের বিক্রি করছে তাদেরও সেবা হচ্ছে, আমার যে কর্মচারীরা আছে তাদেরও সেবা হচ্ছে। চারজন যে কর্মচারী আছে তাদের আমি সেবা করছি, তাই তাদের বকাবকিও করতে পারব না। বকা যাবে, যশোদা যেমন শ্রীকৃষ্ণকে বকতেন। খদ্দের আমার নিজের লোক, আমি তো আছি খদ্দেরদের জন্যই। আমি একটা সম্পদ তৈরী করছি, লোকে যাতে জানতে পারে এই অঞ্চলে এত বড় একটা দোকান আছে। বছরের শেষে যে মুনাফা হবে, তার এতটা আমার কাছে আসবে, এতটা কর্মচারীদের ওয়েলফেয়ারে যাবে। আমি যেমন আমার কর্মচারীদের সেবা করছি, তেমনি আমি আমার পরিবারের লোকেদেরও সেবা করছি। এখানে কোথাও আমিত্বটা নেই। হঠাৎ বন্ধুরা এলে, দেরাজ থেকে একশ টাকা নিয়ে ভালমন্দ খেলাম, এগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। ক্যাশ বাক্স থেকে টাকা নেওয়া যাবে না, কারণ আমিত্ব নেই কিনা, এই টাকা সমাজের, পরিবারের টাকা, এতে আমার কোন ব্যক্তিগত অধিকার নেই। ঠাকুর মথুরবাবুকে বলছেন, তুমি মায়ের অছি, তোমার এই কাজের জন্য মায়ের সন্তান কষ্ট পাচ্ছে, এটা তোমার পয়সা নয়।

এইভাবে একটি মাস করলেই রাতারাতি তার প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীটাই পাল্টে যাবে। একটা সময় থেকে লোকেরাই তার কাছে সদুপদেশ নিতে আসবে। কিন্তু আমরা আমাদের আমিত্বকে ছাড়তে পারি না, আমাদের ভয় হয়, ছাড়ারও কিছু নেই, শুধু orientationটা পাল্টে যাচ্ছে। শুধু দোকান চালাতে গিয়েই যে হবে তা না, যে কোন ক্ষেত্রেই এটা পাল্টে দেওয়া যায়। বারবার বলা হচ্ছে, বিদ্যা, সম্পদ, সেবা ও ত্যাগ, এই চারটের বাইরে কোন পঞ্চম আদর্শ হয় না। এটা এমন কিছু কঠিন নয়, খুবই সহজ।

সত্ত্বগুণী জিনিসটা যেমন তেমনটিই দেখেন

এখান থেকে আরেকটু এগিয়ে স্বামীজী বলছেন, In the state of Sattva we see the very nature of things, we go beyond the senses and beyond reasons. (*সত্ত্বগুণে অবস্থিত হলে আমরা সকল বস্তুর আসল রূপ দেখতে পাই, তখন আমরা পঞ্চেন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির অতীত দেশে চলে যাই।*) এর আগেও সত্ত্বগুণ, রজোগুণ ও তমোগুণের উপর আলোচনা করা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছিল, জগতে এমন কোন কিছু নেই যেটাতে এই তিনটে গুণের কোন একটা গুণ নেই, সব কিছুতে সত্ত্ব, রজো ও তমো থাকবেই, কম বেশিতে তারতম্য হতে পারে। সাধারণ ভাবে মানুষের মধ্যে, এমনকি সন্ন্যাসীদের মধ্যেও তমোগুণ ও রজোগুণের আধিক্য দেখা যায়। কিন্তু কারুর মধ্যে সত্ত্বগুণ যদি অনেক বেড়ে যায়, তার মন সব সময় শান্ত থাকবে, কম ঘুম, চার থেকে পাঁচ ঘন্টা ঘুমেই হয়ে যাচ্ছে, কারুর প্রতি তার কোন রাগ-দ্বেষ হবে না, খাওয়া-দাওয়াতে কোন বাহুল্য থাকবে না। এর উপর স্বামীজী সত্ত্বগুণের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের কথা বলছেন, সত্ত্বগুণে জিনিসটা যেমন তেমনটি দেখে। এখন আমরা কি দেখছি? আমি যেটা দেখতে চাই সেটাই আমি দেখি।

ইদানিং নেগেটিভ এনার্জি, পজিটিভ এনার্জি, পজিটিভ ইমোশানস্ এগুলোকে নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়। কিন্তু একটু ভাল করে ভেবে দেখলে দেখা যাবে, এনার্জি এনার্জিই হয়, ইমোশানস্ ইমোশানই হয়, এর পজিটিভ নেগেটিভ বলে কিছু হয় না। আমি আপনি যেমনটি চিন্তা করব সেই অনুসারে জিনিসটা নেগেটিভ বা পজিটিভ বলে মনে হবে। আমি আপনি যত কথা বলি, যারা সেই কথাগুলোকে পছন্দ করবে তারা বলবে, উনি খুব পজিটিভ লোক, কথাগুলো যাদের মনের মত নয়, তারা বলবে লোকটি মহা নেগেটিভ লোক। সিংহ যদি

সত্যি সত্যিই হিংস্র হত তাহলে সে নিজের সন্তানকেও খেয়ে নিত, কিন্তু সিংহ, বাঘ এরা কেউ নিজের সন্তানকে খেয়ে ফেলে না। সিংহ যাদের ভক্ষণ করে তাদের কাছে সিংহ এক অতি ভয়ঙ্কর প্রানী, কিন্তু সেই সিংহ তার শাবকের কাছে একজন মা, মা ছাড়া কিছু হয় না। তাই পজিটিভ নেগেটিভ বলে কিছু হয় না। আমি যেমন আর আমার চিন্তা-ভাবনা যেমন, সেই অনুসারে আমি দেখব আপনি কেমন লোক। তাহলে আপনি আসলে কি? আসল আপনাকে আমি কোন দিন দেখতে পাচ্ছি না, আমি কেন কারুর পক্ষেই দেখা সম্ভব না। অথচ ঠাকুর বলছেন, যখন কেউ আমার ঘরে এসে ঢোকে, সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝে যাই লোকটা কেমন। কারণ ঠাকুর ছিলেন সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত, জিনিসটা যেমন তেমনটা তিনি দেখতে পাচ্ছেন। একটু তপস্যা করে, জপধ্যান করে মনটাকে কেউ যদি উপরে নিয়ে যায়, তার দৃষ্টভঙ্গীটা পুরো পাল্টা যাবে। যাদের খারাপ লোক বলে মনে করছি, যাদের শত্রু মনে করি, একবার গিয়ে তার সাথে কথা বলে দেখিই না, কথা বললে দেখা যাবে যে, লোকটা আসলে তো তা নয়। কোথাও কোন ভুল বোঝাবুঝি ছিল, কোন রাগ হয়ত ছিল, তখন মনে হবে যে, এতদিন আমি কি সব উল্টোপাল্টা ভেবে এসেছি। সেইজন্য যার মধ্যে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হয়, তার শত্রুর সংখ্যা অনেক কমে যাবে, যাদের এতদিন সে খারাপ মনে করে এসেছে, তাদের সংখ্যা কমে যাবে। কারণ সব মানুষই স্বভাবে ভাল। যদিও সে সিংহ, কিন্তু সেও নিজের সন্তানের পরিপালন করছে, তাহলে খারাপ বলে কিছু হতে পারে না। যাদের আমরা হিংস্র প্রানী বলে জানি, তারাও নিজেদের সন্তানদের দেখাশোনা করে। তাহলে শুধু স্বভাবের জন্যই তারা খারাপ হতে পারে না। মানুষ হল উন্নত প্রজাতি, মানুষ খারাপ কি করে হবে! যাকেই আমার খারাপ মনে হচ্ছে, যারই আমরা নিন্দা করছি, যার প্রতি আমার রাগ আছে, একটা মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে তার সাথে কথা বললে দেখা যাবে, তাকে যেমনটা ভেবেছি প্রকৃতপক্ষে সে-তো তেমন নয়। কোন মানুষ যখন রেগে যায় তখন সে খুব বাজে মানসিক অবস্থায় চলে যায়। এক গ্রামে দুই মহিলার সব সময় ঝগড়া। কপাল এমনই যে, এক মহিলার ছেলে মারা গেছে। শ্রাদ্ধ হয়েছে, শ্রাদ্ধে সবাইকে খাওয়াতে হয়, কিন্তু ওই মহিলাকে সে ডাকেনি। শ্রাদ্ধে পরিচিতকে নিমন্ত্রণ না করাটা খুব অপমানজনক। সেই মহিলা খুব রেগে গেছে, রেগে গিয়ে বলছে, ও কি মনে করেছে, আমারও ছেলে আছে। রেগে গেলে মানুষ এত নীচে নেমে যায়, এত তমোগুণে চলে যায় যে, তখন খেয়ালও থাকে না যে, সে কি বলছে। সত্ত্বগুণে মানুষ মূলতঃ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের পারে চলে যায়, সেখান থেকে জিনিসটা যেমন তেমনটি দেখতে পায়। যেখানে চৈতন্য সত্তা, যেখানে ভগবান, সেখানে সেটাকে সেভাবেই দেখে।

আমিত্ব দ্বারা নির্মিত জগতের নাশ

The adamantine wall that shuts us in is egoism; we refer everything to ourselves, thinking, 'I do this, that, and the other'. (*অহংই সেই বজ্রদৃঢ় প্রাচীর, যা আমাদের বদ্ধ করে রেখেছে –সত্যের মুক্ত বাতাসে যেতে দিচ্ছে না –সকল বিষয়েই, সকল কাজেই, 'আমি, আমার' এই ভাব মনে এনে দেয় –আমরা ভাবি আমি অমুক কাজ করেছি, তমুক কাজ করেছি ইত্যাদি।*) পাথরের বিশাল প্রাচীরের জন্য কেল্লাকে জয় করা যায় না, এই 'আমি'টা হল কেল্লার দেওয়াল, আমিত্বের দেওয়াল আমাদের এমন ভাবে ঘিরে রেখেছে, কিছুতেই আমাদের বেরোতে দেবে না। ফলে আমাদের সেই রকম কাজও করতে দেবে না, জিনিসটাকে বুঝতেও দেবে না। স্বামীজী বলছেন, Get rid of this puny 'I'; kill this diabolism in us; 'not I, but Thou', say it, feel it, live it. (*এই ক্ষুদ্র আমিত্বটাকে দূর করে দাও, আমাদের মধ্যে এই যে অহংরূপ শয়তানী ভাব রয়েছে, তাকে একেবারে মেরে ফেলো। 'নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু' – এই মন্ত্র উচ্চারণ কর, প্রাণে প্রাণে এটা অনুভব কর, জীবনে ঐ ভাবটাকে নিয়ে এস।*) ঠাকুরও এই কথা বারবার বলছেন, নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু। তুমিও বলতে শেখ নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু।

Untill we give up the world manufactured by ego, never can we enter the kingdom heaven. (*যতদিন না এই অহংভাব দ্বারা নির্মিত এই জগৎকে ত্যাগ করতে পারছি, ততদিন আমরা কখনই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারব না।*) স্বামীজী দেববাণী তাঁর খ্রীশ্চান শিষ্যদের সামনে বলেছিলেন, তাই এখানে কিংডম অফ হেভেনের কথা বলছেন। খ্রীশ্চানদের কাছে কিংডম হেভেনই শেষ অবস্থা। বলছেন, তোমার আমিত্ব যে সংসারের সৃষ্টি করে রেখেছে, যতক্ষণ এই সংসারের নাশ না হয় ততক্ষণ তুমি

স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। একটা বোতলে জল রাখা আছে, ওই বোতলে দুধ রাখা যাবে না, দুধ রাখতে হলে আগে জল ফেলে বোতলকে খালি করে দিতে হবে। বোতল যখন খালি তখন তাতে বাতাস আছে, বাতাস যতক্ষণ না বের হয়, ততক্ষণ জল রাখা যাবে না। এই জগতে আমরা যে আমিত্বের সংসার সৃষ্টি করে রেখেছি, আমি তাকে ভালবাসি, ওকে আমার পছন্দ নয়, আমি এটা চাই, ওটা চাই না, এই যে জগৎ, যতক্ষণ না এই জগৎ ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ আমরা কেউই কিংডম অফ হেভেনে যেতে পারব না।

উনিশ শতকের রাশিয়ার চার্চের উপর একটা নামকরা অর্থোডক্স বই আছে, যার নাম 'A Way of Piligrim', তাতে একজন লোক স্বপ্নে দেখছে একটা কাঁটা তারের বেড়াকে ডিঙোবে কিন্তু তার পিঠে এক বিরাট বড় বোঝা চাপান, বেরোতে গিয়েও সে আর বেরিয়ে আসতে পারছে না; পিঠের বিশাল বোঝা নিয়ে তারের ফাঁক দিয়ে গলে বেরিয়ে আসতে পারছে না। সেখান থেকে তার মনে হল, এই জগৎটা আমার বোঝা, আমাকে ঈশ্বরের পথে যেতে হবে; এই বোঝার জন্য আমি এগোতে পারছি না। এরপর তিনি এই বইটি রচনা করলেন, খ্রীশ্চান জগতের একটি খুব সুন্দর বই। এই জগৎটাও আমাদের পিঠে একটা বিরাট বোঝা হয়ে চেপে আছে, কিন্তু এমনই দুরবস্থা যে আমরা বোঝার ওজনটা বুঝতে পারছি না, কারণ জন্ম থেকে বয়ে যাচ্ছি কিনা, বোঝাটা আমাদের স্বাভাবিক হয়ে গেছে। কিন্তু যেমনি কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে যাচ্ছি, বোঝাটা দরজায় আটকে যাচ্ছে, ঘরের ভিতর প্রবেশ করাই যাচ্ছে না। None ever did, none ever will, কেউ এই আমিত্বের বোঝা নিয়ে দরজার চৌকাঠ পেরোতে পারেনি, ভবিষ্যতেও কেই কোন দিন পারবে না।

To give up the world is to forget the ego, to know it not at all, living in the body, but not of it. (*সংসার ত্যাগ করা মানে –এই অহংটাকে একেবারে ভুলে যাওয়া, অহংটার দিকে একেবারে খেয়াল না রাখা; দেহে বাস করা যেতে পারে, কিন্তু আমরা যেন দেহের না হয়ে যাই।*) এই আমিত্বকে ছাড়া মানেই হয়, এই দেহে তুমি থাকবে কিন্তু কোন দিন এই দেহের হবে না। আমরা কিছুতেই নিজেদের দেহবোধ, দেহের সান্নিধ্য থেকে বেরিয়ে আসতে পারি না। আধ্যাত্মিক মহাপুরুষরা বারবার বলে যাচ্ছেন, জগতে কেউ তোমার নয়। কেউ যদি না হয়, তাহলে জগতে থাকব কি করে? অবশ্যই থাকবে, ওই বাড়িতেই থাকবে, এই জগতেই থাকবে, এই জগতেই আছো, কিন্তু জানবে তুমি এই জগতের কেউ নও। ঠাকুর এর অনেকগুলো উপমা দিচ্ছেন, যেমন এক জায়গায় বলছেন, সংসারে বড়লোকের দাসীর মত থাকবে, আবার বলছেন নষ্টা মেয়ের মত থাকবে। বড়লোকের দাসী মনিবের বাড়ি সব কাজ করে যাচ্ছে, কিন্তু তার মনটা দেশের বাড়িতে পড়ে আছে। ঠিক তেমনি এই শরীরও তাই, এই শরীরে আমি আছি, এই শরীর দিয়ে আমাকে অনেক কাজ নিতে হবে, কিন্তু জানতে হবে এটা উদ্দেশ্য নয়। নদীর ওপারে যাওয়ার জন্য নৌকার সাহায্য নিতে হবে, খেয়াল রাখতে হবে নৌকাতে যেন জল না ঢোকে, কিন্তু যেমনি ওপারে পৌঁছে যাব, নৌকা নৌকার জায়গায়, আমি আমার গন্তব্যস্থলের দিকে এগিয়ে যাব। এই বোধ যদি না থাকে তাহলে আমাদের জীবনের সমস্যার অন্ত থাকবে না। যাদেরই সমস্যা আছে, চোখে জল আসে, বুঝতে হবে তারা এই আমিত্ব দিয়ে নির্মিত জগতের মধ্যেই ঘুর ঘুর করে যাচ্ছে, এখান থেকে কিছুতেই বেরোতে পারছে না। একেই আমিত্ব থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না, তার উপর সেই আমিত্বকে আবার বিক্রি করে রেখেছে আরেকজনের কাছে। যাকে ভালবাসে সে একটা মিষ্টি কথা বললে তার প্রাণ জুড়িয়ে যাবে, সেই ভালবাসার লোক যদি অন্য আরেকজনকে ভালবাসে তখন সে হয়ত আত্মহত্যা করে বসবে, আর তা নাহলে যার মুখের দুটো কথা শুনলে প্রাণ জুড়িয়ে যেত, এখন তার নাম শুনলেই তেলে বেগুনে জ্বলতে থাকবে। This rascal ego must be obliterated. (*এই বজ্জাৎ অহংটাকে একেবারে নষ্ট করে ফেলতে হবে।*) যতক্ষণ এই আমিত্বের নাশ না হচ্ছে ততক্ষণ তুমি এগোতে পারবে না।

দুঃখ যে দেয়, যে আঘাত দেয়, তার প্রতি কৃতজ্ঞ হও

সেইজন্য, Bless men when they revile you. Think how much good they are doing you; they can only hurt themselves. (*লোকে যখন তোমায় মন্দ বলবে, তুমি তাদের আশীর্বাদ করো; ভেবে দেখো, তারা তোমার কত উপকার করছে; অনিষ্ট যদি কারও হয়, তো কেবল তাদের নিজেদের হচ্ছে।*) এটি খুবই মূল্যবান কথা। তুলসিদাস তাঁর রামচরিতমানস রচনা শুরু করার পূর্বে সবাইকে

প্রণাম করে বলছেন, বন্দৌ সন্ অসজ্জনচরণা, যাঁরা সন্ত মহাত্মা তাঁদের চরণে প্রণাম, অসজ্জন যারা তাদের চরণে প্রণাম। তুলসিদাস যুক্তি দিচ্ছেন, যাঁরা সাধুপুরুষ তাঁরা কাছে এসে আনন্দ দেন, অসাধু পুরুষ চলে গিয়ে আনন্দ দেয়। আনন্দ দুজনেই দিচ্ছে। এখানে কিন্তু উদ্দেশ্য তা নয়, যারা তোমাকে কষ্ট দিয়েছে, যারা তোমার নিন্দা করে; তাঁদের প্রতি তুমি কৃতজ্ঞ হও। কারণ কষ্ট তারাই পাবে, তুমি পাবে না। এটা যে কত দামী কথা আমরা সাধারণ মানুষরা বুঝতেও পারব না। সাধু মহাত্মারা সব সময়ই বলেন, যে তোমাকে কষ্ট দেয় তার প্রতি তুমি কিন্তু কৃতজ্ঞ থাকবে। এই কথা শুনলে সত্যিই আমাদের অস্বাভাবিক লাগবে। জাগতিক দৃষ্টিতে খুবই অস্বাভাবিক, জাগতিক মানুষ, সাংসারিক মানুষদের পক্ষে যে তাকে কষ্ট দিচ্ছে, নিন্দা করছে, তার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার কোন প্রশ্নই নেই।

কিন্তু তোমার যদি আধ্যাত্মিক পথে এগোন উদ্দেশ্য হয় তাহলে তুমি একটু চিন্তা কর –আধ্যাত্মিক জীবন মানে তুমি এতদিন ডাঙায় ছিলে, এখন তুমি নদীতে নেমে গেছ। নদীটা খুবই সরু, ওই সরু নদীতে তোমার বড় নৌকা নেমে গেছে। এই নৌকাকে এবার বড় নদীতে নিয়ে ফেলতে হবে, সেখান থেকে সমুদ্রে ভাসাতে হবে। সরু নদী দিয়ে যাওয়ার সময় তোমার বড় নৌকা থেকে থেকে গাছের ডালে, কোন ঘাটের সিঁড়ির খাঁজে বা পাড়ের মাটিতে আটকে যাবে। যত বার আটকাবে, প্রত্যেক বার তোমাকে নৌকাকে ধাক্কা মারতে হবে, ধাক্কা না মারলে মূল স্রোতে আসবে না। নৌকা একবার এদিকে আটকাবে, আরেকবার ওইদিকে আটকাবে। নদীর স্রোত কিন্তু ধীরে ধীরে তোমার নৌকাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বা তুমি দাঁড় দিয়ে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছ। সাধু-মহাত্মারা, ভাল মানুষরা তোমাকে টেনে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। ঠাকুর, মা, স্বামীজী, শাস্ত্রের কথা বা যে কোন সাধুপুরুষ বা যাঁদেরকে তুমি সৎপুরুষ রূপে জানো, বাবা, মা, শিক্ষক, সবাই তোমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তুমি তো সাধারণ কোন লোক নও, তোমার মত লোককে টেনে নিয়ে যাওয়াটাও চারটি খানি কথা নয়। কারণ তুমি হলে এক বিরাট বড় নৌকা, থেকে থেকে তুমি আটকে যাবে, এই ভালবাসার ডালে আটকে গেল, ওই ভালবাসার ঘাটে আটকে গেল। যাকে যত ভালবাসছ, বুঝবে সেখানে তুমি তত বেশি জবরদস্ত ভাবে আটকে গেছ। এবার তুমি আটকে সেখানেই থেকে যাবে, নদী যতই খরস্রোতা হোক, আর কোন দিন এগোতে পারবে না। এগোবে, যদি বন্যা হয়ে যায় তখন তোমাকে টেনে নিয়ে বার করে দেবে, আর তা নাহলে তুমি ওখানেই থেকে যাবে। এবার যাকে ভালবাসছ, যার ভালবাসায় তুমি আটকে আছ, সে তোমাকে এক লাথি মারল। এই যে লাথি মারল এবার নৌকাটা স্রোতে এসে গেল। Push and pull, সৎপুরুষরা আমাদের টেনে আনেন, pull করেন, অসৎপুরুষরা আমাদের ধাক্কা মারে, অর্থাৎ push করে। সবাই কিন্তু তোমাকে সাহায্য করছে নদীর স্রোতে এগিয়ে যেতে। এই জিনিসটাকে যদি মনে রাখতে পারি তাহলে আমাদের জীবনে কোন দিন কষ্ট হবে না। অধ্যাত্ম মানেই হল push and pull। সৎপুরুষরা আমাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছেন, শাস্ত্র আমাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে, গুরু, বৈষ্ণব সবাই আমাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু আমরা আমাদের জন্মজন্মান্তরের স্বভাব বশতঃ, আমরা চড়ায়, নাহলে, কোন ঘাটের সিঁড়িতে, বা কোন গাছের ডালের সাথে আটকে যাই। সৎসঙ্গ টেনে নিয়ে যায়, অসৎ সঙ্গ আমাদের ঠেলে দেয়, এটাই অধ্যাত্ম। যারা তোমাকে গালাগাল দিয়েছে, তোমার জন্য তারা দরজা বন্ধ করে দিয়েছে, তুমি বেঁচে গেলে, ওইরকম একটা বাজে লোকের পাল্লায় পড়ে তোমার সর্বনাশ হতে যাচ্ছিল। লোকে বলবে, তুমি কোন প্রেতনীর পাল্লায় পড়েছ, প্রেতনী যদি ছেড়ে দেয় তো তুমি বেঁচে গেলে। মেয়েদেরকে বলবে কোন ভূতের পাল্লায় পড়েছে। ভূত প্রেতনী যতক্ষণ না ছাড়ছে ততক্ষণ তোমার এগোবার কোন পথ নেই। তুমি যত ওঝা, যত ফকির বাবাদের নিয়ে আস না কেন, এই ভূত তোমাকে ছাড়বে না। কোন কারণে ভূত যদি ছেড়ে যায়, যাওয়ার আগে সে তোমাকে একটা লাথি মেরে যাবে। তুমি এবার এগোবার জন্য তৈরী হয়ে গেলে, এর জন্য তুমি তার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। স্বামীজীই শুধু এই কথা বলছেন না, সমস্ত শাস্ত্রই বলে, যারা তোমার নিন্দা করে, তোমাকে কষ্ট দেয়, আর কষ্ট তোমাকে কে দেবে, দূরের লোক কি কখন তোমাকে কষ্ট দিতে পারে, দূর থেকে রিভলবারের গুলি চালিয়ে তোমাকে কি কিছু করতে পারবে, কাছ থেকে চালালে তুমি মারা যাবে। কষ্ট কখন দূরের লোকে দেয় না, কাছের লোকেই দেয়। সারা জগতে আপনজনরাই মারে। যদি তোমার উদ্দেশ্য সংসার হয়, বিষয়ভোগ যদি তোমার উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তুমি চোখের জল ফেলতে থাক। অধ্যাত্ম যদি তোমার উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তুমি এবার একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচলে, তোমার নৌকা এবার ছাড়া পেয়ে বড় নদীর দিকে এগোতে শুরু করেছে।

তুলসীদাস যখন বলছেন, বন্দৌ সন্ অসজ্জনচরণা, তখন তিনি অন্য ভাবে বলছেন। কিন্তু জিনিসটা তাই, সাধুকে প্রণাম, অসাধুকেও প্রণাম, সাধু আমাদের টেনে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, অসাধুরা ধাক্কা মেরে মেরে আমাদের নৌকাকে এগিয়ে দিচ্ছে।

স্বামীজী ওই ভাবটা নিয়েই চলেছেন, উপমা দিচ্ছেন, জগৎটা যেন মৃত বানর বাচ্চার ছাল। বলা হয় যে, বানরের বাচ্চা হলে প্রথমেই তারা বাবা দেখে এটা পুরুষ না মেয়ে, মেয়ে হলে ঠিক আছে, ছেলে হলে সঙ্গে সঙ্গে মেরে দেবে। কিন্তু বানরীর মাতৃত্ব এমন, সে তার মৃত সন্তানকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে রাখে, ততক্ষণই রাখে, যতক্ষণ দুর্গন্ধ না বেরোতে শুরু করে। একবার মা বানরের মাতৃত্বের ভালবাসার উপর একটা পরীক্ষা চালানো হয়েছিল, একটা বানরের মাকে নিয়ে আসা হয়েছে, সদ্য যার সন্তানকে তার বাবা মেরে ফেলেছে। এবার তাকে একটা খাঁচার মধ্যে লোহার পাতের উপর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর নীচ থেকে ধীরে ধীরে গরম দিতে শুরু করেছে। বানরের মা মরা সন্তানকে বুকে জড়িয়ে রেখেছে। যত গরম বাড়তে শুরু করছে তত সে একবার ডান পায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে থাকে, আরেকবার বাঁ পায়ে দাঁড়িয়ে থাকছে। গরমে যখন আর একটুও দাঁড়াতে পারছে না তখন সে বুকের মৃত সন্তানকে লোহার পাতের উপর রেখে তার উপর দাঁড়িয়ে গেল। এই পরীক্ষার দ্বারা এনারা প্রমাণিত করলেন যে, অপরের প্রতি যত ভালবাসাই থাক, নিজের দেহকে ভালবাসাটাই শেষ পর্যন্ত সত্য হয়। স্বামীজী এই ভাবকেই আধার করে বলছেন, Think how much good they are doing you; they can only hurt themselves, যারা তোমার নিন্দা করছে, আসলে তারা নিজেদেরকেই আঘাত করছে।

Go where people hate you, let them thrash the ego out of you, and you will get nearer to the Lord. (*এমন জায়গায় যাও, যেখানে লোকে তোমাকে ঘৃণা করে; তারা তোমার অহংটাকে মেরে মেরে তোমার ভিতর থেকে বার করে দিক্ –তুমি তাহলে ভগবানের খুব কাছে অগ্রসর হবে।*) তোমার আমিত্বের উপর যত লাঠি, ঝাঁটা এসে পড়বে, যত বেদম মার খাবে, তখন বলবে ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। তখন এই আমিত্বই বলবে, আমার আর ভালবাসা লাগবে না। তখনই আসবে শান্তি। এরপর স্বামীজী বানরের উপমা নিয়ে আসছেন, যে জিনিসটাকে তুমি ধরে আছ, যে সংসারকে তুমি ধরে আছ, এটাকে যখন মাটিতে ফেলে দিয়ে তার উপর দাঁড়াবে, তখনই তুমি ভগবানের কাছে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হবে। Blessed it is to be persecuted for the sake of righteousness. (*ন্যায়ধর্মের জন্য যদি অপরের অত্যাচার সহ্য করতে হয় তো আমরা ধন্য।*) যখন তুমি একটা ভাল পথ নিয়ে নিলে, একটা জীবনদর্শনকে বেছে নিলে, আর তার জন্য যদি তোমাকে কষ্ট পেতে হয়, তাড়না সহ্য করতে হয়, ঠিক আছে, কোন অসুবিধা নেই।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, আমরা যে কষ্ট পাই, আমাদের নিজেদের অপকর্মের জন্যই পাই, আমরা নিজেরাই অনেক ভুলভাল কাজ করি, তদুপরি আমাদের নিজস্ব অনেক দুর্বলতা রয়েছে। যত দুঃখ কষ্টের রাশি আমাদের জীবনের উপর নেমে আসে মূলতঃ এই কারণেই নেমে আসে। দেবতারা মুনিবর দধীচিকে গিয়ে বললেন, আপনার শুদ্ধ হাড় দিয়ে বজ্র বানাতে হবে। দধীচি সঙ্গে সঙ্গে বলে দিলেন, খুব ভাল কথা, নিয়ে নাও আমার হাড়। এনাদের কাছে কোন ব্যাপারই নয়, ধর্ম পথে আছেন। একটা আদর্শের জন্য যখন তুমি এগোচ্ছ, তখন জীবন আর কোন কিছুতে লাগে না।

আমরা আগেও অনেকবার আলোচনা করেছি, জীবনদর্শন খুব গুরুতপূর্ণ, জীবন থেকেও বেশি গুরুত্ব। সৈন্যরা সীমান্তে বিদেশীদের আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য লড়াই করছে, দিনরাত সৈন্যরা মারা যাচ্ছে, তাদের একটা জীবনদর্শন আছে, আমি দেশের সেবা করছি। আমাদের মত সাধারণ লোকেরা যারা চাইছে কিভাবে ঘুষ নিয়ে, দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে নিজের আখের গোছাব, এরা ওই রকম দেশের জন্য জীবন দিয়ে দেওয়ার মত সার্ভিসে যাবেই না। যাদের জীবনদর্শন আছে, যারা ধর্মের পথে, সত্যের পথে আছে, তখন তাদের যদি কোন কষ্ট হয়, সেটা তাদের কাছে কোন ব্যাপারই নয়। তুমি আদর্শের পথে আছ, আর তোমার কোন কষ্ট হচ্ছে না, লোকেরা তোমাকে প্রতারণা করছে না, তাহলে ভাই তুমি বুঝে নাও, তুমি ঠিক ঠিক কোন আদর্শের পথে নেই। মানুষ দুটো পরিস্থিতিতে প্রতারিত হয়, একটা হল, হয় সে বদমাইশি, বাঁদরামো করছে, যেটা সে নিজেও জানে, আর তা নাহলে সে একটা আদর্শের পথে আছে। আদর্শের পথে আছে, কিন্তু লাঠি,

ঝাঁটা কিছুই খাচ্ছে না, তাহলে সে কিছুই না, একটা ঢ্যামনা সাপ ছাড়া আর কিছুই না। আদর্শের পথ নিয়ে নেওয়া মানে সে প্রকৃতির বিরুদ্ধে যেতে শুরু করেছে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে যাওয়া মানে, এবার ঢেউগুলো সরাসরি মুখের উপর ধাক্কা মারবে। যতক্ষণ প্রবাহের সাথে যাওয়া যাবে ততক্ষণ আরামসে জীবন চলতে থাকবে। প্রবাহের বিপরীতে যাওয়া মানেই, তাকে অনবরত ধাক্কা খেতে খেতে এগোতে হবে। লোকেরা তাকে প্রতারিত করবে, গালাগাল দেবে, ওগুলোকে দাঁড়িয়ে যখন সহ্য করে নেবে, তারপরই জগৎ তার পূজা করবে।

আর বলছেন, Blessed are we if we cannot read, we have less to take us away from God. (*যদি আমরা লিখতে পড়তে না জানি তো আমরা ধন্য; ঈশ্বরের কাছ থেকে আমাদের তফাৎ করবার জিনিস কমে গেল।*) স্বামীজীর মত মানুষ, এত পড়াশোনা করার পরেও এই কথা বলছেন, আমি যদি পড়াশোনা নাও করতে পারি তাতে কিছুই হবে না, কারণ যে আবর্জনাগুলো পড়তে হয়, যেভাবে ছোটবেলা থেকে বইএর মধ্যে মুখ গুঁজে মুখস্ত করে শিক্ষায়তনের গণ্ডীগুলো এক এক করে পেরোতে হয়, এগুলো থেকে অন্তত বেঁচে যাব। উদ্দেশ্য হল, আমি কিভাবে ঈশ্বরের দিকে এগোব। সেখান থেকে নিয়ে যাচ্ছেন ঠাকুরের ব্যাপারে, ঠাকুর পড়াশোনা করেননি, সেইজন্য আরও সহজ ভাবে পুরো মনটা ঈশ্বরের দিকে দিতে পেরেছেন।

নৈরাশ্য, অবসাদ যতই আসুক, ভোগের পথ ছেড়ে ত্যাগের পথে লেগে থাকো

সেখান থেকে স্বামীজী বলছেন, Enjoyment is the million-headed serpent that we must tread under foot. (*ভোগ হচ্ছে লক্ষফণা সাপ –তাকে আমাদের পদদলিত করতে হবে।*) ভোগ হল সহস্র ফণা যুক্ত সর্প, ওই ভোগ সব সময় আমাদের সামনে নাচছে। একটা মাথা কেটে দিলে আরেকটা মাথা বেরিয়ে আসবে। এই সর্পকে পায়ের তলায় যদি দাবিয়ে না রাখা যায়, ধর্ম জীবনেরর পথে, অধ্যাত্ম জীবনের পথে কোন দিন সে এগোতে পারবে না। We renounce and go on, then find nothing and despair; but hold on, hold on. (*আমরা এই ভোগ ত্যাগ করে অগ্রসর হতে থাকি; কিছুই না পেয়ে হয়তো আমরা নৈরাশ্যে অবসন্ন হই। কিন্তু লেগে থাকো, লেগে থাকো – কখনই ছেড়ো না।*) যেমনি আমরা ত্যাগের পথে নামব, কোন আদর্শকে জীবনে নিয়ে এগোতে শুরু করলাম, তখন দেখছি শুধু শুষ্কতা, ফাঁকা, কিছু নেই; মানুষ তখন হতাশ হয়ে যায়, আগে বেশ তো ছিলাম, ভালই তো ছিলাম। ওই সময় নিজেকে ধরে রাখতে হয়। এবার যখন এগোতে শুরু করবে, তখন hold on, hold on, ধরে রাখতে হয়। এরপর যা আসবে ভালই আসবে। প্রথমে একটা আদর্শকে নিয়ে তোমাকে চলতে হবে, দোকান চালাচ্ছ, এটাকেই একটা আদর্শ নিয়ে চালাও। যারা মাল দিচ্ছে তাদেরও সেবা করছ, খদ্দেরদেরও সেবা করছ, দোকানে যারা কাজ করছে তাদেরও সেবা করছ, বাড়ির লোকদেরও সেবা করছ। আর তার সাথে দেশের জন্য তুমি সম্পদ সৃষ্টি করছ। লোকেরা জানবে এখানে একটা ভাল দোকান আছে, একটা থেকে দুটো দোকান, দুটো থেকে তিনটে দোকান হয়ে যাবে। এটা কোন মডার্ন ম্যানেজমেন্ট নয়, মডার্ন ম্যানেজমেন্ট মানেই কিভাবে তোমার টাকা আমার পকেটে আসবে। কিন্তু তুমি বলবে, আমি এমন ভাবে অর্থ তৈরী করব যাতে আমার পকেটের টাকা তোমার পকেটেও যায়। মডার্ন ম্যানেজমেন্টের উদ্দেশ্য ভারতের ভাবধারা নয়। মহাভারতের যুদ্ধে, পাণ্ডব কৌরব দু পক্ষ দিনে লড়াই করছেন আর সূর্যাস্তের পর সেই বন্ধুত্ব। আমার সাথে তোমার শত্রুতা কিছু নেই, আমরা ধর্মযুদ্ধ করছি, যুদ্ধে তুমি আমাকে মারবে, আমিও তোমাকে মারব, আমাদের একজন কেউ বাঁচবে, কিন্তু রাত নেমে এলে সবাই এক অপরের শিবিরে গিয়ে দেখা করছেন। কোম্পানি যখন টেক-ওভার হবে তখন আমি চাইব, আমারও যেন ভাল হয় আর তোমারও ভাল হোক। ভারতীয় মডেল হল, আমি টাকা তৈরী করব যাতে আমার পকেটেও টাকা আসে আর তোমারও পকেটে টাকা যায়। পাশ্চাত্যের মডেল হল, আমি টাকা তৈরী করি না করি, তোমার টাকা যেন আমার পকেটে আসে। এটা কখনই আধ্যাত্মিক আদর্শ হতে পারে না, আধ্যাত্মিক আদর্শ মানে সবাইকে নিয়ে চলা। আমিত্ব ছাড়া মানে, এবার প্রথমে যা কিছু করব সবার জন্যই করব, শুধু আমার আর আমার পরিবারের জন্য নয়, সমাজের জন্য আমি সম্পদ সৃষ্টি করছি। প্রথমের দিকে মনে হবে, আমি তো কিছুই পেলাম না, কিন্তু কিছু দিন পরে দেখবে ভিতরে তোমার শক্তি বৃদ্ধি হচ্ছে।

একটা ফরাসী কোম্পানী ছিল, বিরাট কিছু ক্যাপিট্যাল নেই, কিন্তু এখনও বহাল তবিয়তে আছে। এক ভদ্রলোক ১৯৮৭ সালে এই কোম্পানীর পত্তন করেছিলেন। কোম্পানীর মুনাফা যা হত তা সবার মধ্যে ভাগ হয়ে

যেত। তার সাথে সবাই হল কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডার। যে যেমন টাকা লাগিয়ে রাখবে, সে সেই হিসাবে মুনাফার অংশ পাবে। প্রত্যেক বছর কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ভোটে নির্বাচিত করা হত। অথচ তিনিই মালিক, আর প্রত্যেক বছর উনিই ভোটে নির্বাচিত হতেন, কোম্পানীর সব স্টাফেরা বলত, আপনি ছাড়া কোম্পানী কেউ এত ভাল চালাতে পারবে না। গত পনের বছর ধরে উনিই ম্যানেজিং ডিরেক্টর পদে নির্বাচিত হয়ে আসছেন। এটাও একটা মডেল, আমি মালিকানা রাখছি, কিন্তু যদি তুমি আমার থেকে ভাল চালাতে পারো, চালাও। আর আমারও শেয়ার আছে, প্রফিট আমি এমনিতেই পাব। এগুলো আমাদের বিশ্বাস হয় না, কারণ আমরা অতি সাধারণ মানসিকতার মানুষ কিনা।

স্বামীজী বলছেন, The world is a demon. It is a kingdom of which the puny ego is king. (*এই সংসার একটা অসুরের মতো। এ যেন একটা রাজ্য –আমাদের ক্ষুদ্র 'অহং' তার রাজা।*) এই জগৎটা একটা আসুরিক সাম্রাজ্য, আর এই সাম্রাজ্যের অধিপতি হল আমাদের ক্ষুদ্র অহংকার। Put it away and stand firm. Give up lust and gold and fame and hold fast to the Lord, and at last we shall reach a state of perfect indifferene. (*কাম-কাঞ্চন, নাম-যশ ত্যাগ করে দৃঢ়ভাবে ঈশ্বরকে ধরে থাকো, অবশেষে আমরা সুখে দুঃখে সম্পূর্ণ উদাসীনতা লাভ করব।*) কামিনী-কাঞ্চন, নাম-যশ এগুলোকে ছাড়ো, ছেড়ে ঈশ্বরের দিকে মন দাও। আমিত্বের খুব সহজ ব্যাখ্যা করে স্বামীজী বলছেন, কামিনী-কাঞ্চন, নাম-যশ। এই আমিত্বকে ছাড়তে হবে। তুমি কাজ করা ছেড়ে দিও না, কাজ তুমি করে যাও। গীতায় ভগবানও বলছেন, *কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন*, কর্মেই তোমার অধিকার, কাজ কর, ফলের দিকে তাকিও না। কেমন কাজ হবে, একেবারে perfect কাজ। বাচ্চা বয়সে আমরা মায়ের কাছে কত কিছু আবদার করতাম, মা এটা দাও, মা ওটা দাও, মা ওখানে যাবো। মাকেও রেগেমেগে অনেক সময় বলতে হত, সব সময় চাই চাই, কিন্তু সেই কথার মধ্যেও মায়ের কোন বিরক্তির প্রকাশ নেই। মা কখন কোন কিছু দিয়ে দিত, কখন আবার কিছুই দিত না। এখন বড় হয়েছি, মায়েরও বয়স হয়েছে, এখন কি আর সেভাবে মায়ের কাছে চাইতে পারব? কখনই পারব না, ছোটবেলার সেই সব কথা মনে করে এখন হাসি পায়। কিন্তু তখন মাকে যা ভালবাসতাম এখনও ভালবাসছি। তখন চাহিদার ভালবাসা ছিল, এখন কোন চাহিদার ভালবাসা নেই, আজকে আমিই মাকে দিয়ে যাচ্ছি। ভালবাসারও কোন চাহিদা নেই, তার মানে কোন আমিত্ব নেই। ঈশ্বরের সাথেও আমাদের ঠিক এই সম্পর্ক হয়। আধ্যাত্মিক জীবনে যখন আমরা শৈশবে থাকি তখন আমরা সব সময় ঈশ্বরের কাছে চাই চাই করে যাচ্ছি। ধীরে ধীরে আধ্যাত্মিক পথে যত এগোতে থাকে আস্তে আস্তে এই চাই চাই ব্যাপারটা অনেক কমে আসে, একটা সময় কোন চাহিদাই থাকে না। মায়ের সাথে আমার যে সম্পর্ক ঈশ্বরের সাথে ঠিক একই সম্পর্ক। আর কোন দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক নেই, খুব হলে দেওয়া। এই পূজা করছি, এই ভোগ দিচ্ছি, এই অর্পণ করছি, ঈশ্বরকে ভালবাসি তাই করছি, কোন কিছু চাওয়া-পাওয়া নেই, সম্পর্কটা উল্টো হয়ে যায়। কিন্তু আধ্যাত্মি জীবনে এখনও শিশু কিনা, তাই একদিনেই এভাবে চলতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারি না। কিন্তু লেগে থাকতে থাকতে তুমি যখন অভ্যস্ত হয়ে উঠবে তখনই তুমি reach a state of perfect indifference।

স্বামীজী বলছেন, The idea that the gratification of the senses constitutes enjoyment is purely materialistic. (*ইন্দ্রিয়চরিতার্থতাই সুখ –এ ধারণা একেবারে জড়বাদী।*) আমাদের যেন ধারণা হয়ে গেছে যে, ইন্দ্রিয়সুখ পাওয়াটাই আসল সুখ। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা, জড়বাদী চিন্তাভাবনাই এই ভ্রান্ত ধারণার মূলে। There is not one spark of real enjoyment there; all the joy there is, is a mere reflection of the true bliss. (*ইন্দ্রিয়সুখে এক কণাও যথার্থ সুখ নেই; যা কিছু সুখ, তা সেই প্রকৃত আনন্দের প্রতিবিম্বমাত্র।*) এই সংসারে সুখের গন্ধ মাত্র নেই। আমাদের ভিতরে শুদ্ধ সচ্চিদানন্দের যে আনন্দ রয়েছে, ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সেই আনন্দেরই একটা ক্ষীণ আলো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুগুলোতে প্রতিবিম্বিত হয়, তাতেই ইন্দ্রিয়গুলোর মনে হয় এগুলো যেন একটা বিরাট কিছু। কিন্তু তা না, বস্তুতে কিসের আনন্দ! আগে আগে অনেকবার আলোচনা হয়েছে, ইন্দ্রিয় আর বস্তু, এগুলো কিছু না।

শব্দের শক্তির উৎস পবিত্রতা, মৌনতা ও ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ

Those who give themselves up to the Lord do more for the world than all the so-called workers. (*যাঁরা ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করছেন, তাঁরা তথাকথিত কর্মীদের চেয়ে জগতের জন্য অনেক বেশী কাজ করেন।*) স্বামীজী বলছেন, যাঁরা ঈশ্বরের জন্য নিজেকে সমর্পিত করে দেন, তাঁরাই জগতের সত্যিকারের মঙ্গল করেন। আমরা যাঁদের বড় বড় কর্মবীর মনে করি, তাঁদের দ্বারা এমন কিছু আহামরি কাজ হয় না। One man who has purfified himself thoroughly accomplishes more than a regiment of preachers. (*নিজেকে সম্পূর্ণ শুদ্ধ করেছেন, এমন একজন লোক হাজার ধর্মপ্রচারকের চেয়ে বেশী কাজ করেন।*) যিনি নিজেকে শুদ্ধ পবিত্র করে নিয়েছেন, একজন যে উপদেশ দিচ্ছে, তার যদি পুরো বাহিনী থাকে, তাদের থেকেও ইনি বেশি কাজ করেন। গান্ধীজী একজন মহাপুরুষ কি করে হলেন, তিনি নিজেকে শুদ্ধ পবিত্র করে নিয়েছিলেন। নেতাজীকে কেন আমরা এত মানছি? তখনকার দিনে এত নেতা ছিলেন, এত স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন, তাও নেতাজীকেই কেন সবাই মনে রেখেছে? কারণ তিনি নিজেকে শুদ্ধ পবিত্র করে নিয়েছিলেন, তাঁর আমিত্বটা চলে গিয়েছিল। সেইজন্য বলছেন, Out of purity and silence comes the word of power. (*চিত্তশুদ্ধি ও মৌনতা থেকেই কথার ভিতর জোর আসে।*) শব্দের যে শক্তি আসে, যে শক্তি সবাইকে নাড়িয়ে দেবে, যেমন গান্ধীজী বললেন, ইংরেজ ভারত ছাড় (Quit India), নেতাজী বললেন, দিল্লী চল। এই শব্দের শক্তি কোথা থেকে আসছে? Purity and silence থেকে, purity মানে purity of purpose, যেখানে কোন আমিত্ব নেই। আমাদের একটা ভাব হল, চরিত্রবান গরু হও, যে গরু দুধ দেয় না, কোন ষাঁড়ের সাথে পাল খায় না। আমাদের শব্দের মধ্যে না আছে ভালবাসা, না আছে শক্তি, কিছুই নেই। বরঞ্চ একজন মা যখন তার সন্তানকে কিছু বলে, সেই কথার মধ্যে একটা শক্তি থাকে, কারণ সেখানে মায়ের সন্তানের প্রতি ভালবাসা আছে, ওখানে কোন স্বার্থ থাকে না। যদি আমরা চাই, আমার মুখ থেকে শক্তির শব্দ বের হবে, যে শক্তি জগৎকে নাড়িয়ে দেবে, তার জন্য আমাদের পবিত্র হতে হবে, পবিত্রতা মানে কোন স্বার্থ থাকবে না। আর silence, মনকে একেবারে নৈঃশব্দে নিয়ে যেতে হবে। জীবনে যদি শক্তি পেতে চাও তাহলে মৌনতার অনুশীলন কর আর স্বার্থশূন্য হও।

এক নষ্টা মেয়েকে মারার জন্য সব লোকেরা হাতে পাথর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যীশু তাদের বলছেন, যে কোন দিন পাপ করনি, সেই প্রথম পাথর মারবে। সবাই পাথর রেখে নিজের জায়গায় চলে গেল। এই রকম কোন পরিস্থিতিতে আমরা যদি যীশুর মত বলতে যাই, সবাই আমার দিকেই পাথর মারতে থাকবে। ভগবান বুদ্ধ অঙ্গুলিমালের সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন, আমি তো দাঁড়িয়ে গেছি, তুমি কবে দাঁড়াবে? অঙ্গুলিমাল ভগবান বুদ্ধের পায়ে পড়ে গেলেন। কি করে হল? কারণ ভগবান বুদ্ধের শক্তি এসেছে silence থেকে, purity থেকে। মানুষ যদি আমার কথা না শোনে, তাহলে জানতে হবে আমার মধ্যে silence আর purity দুটোই অনুপস্থিত। মন silenceএ থাকা মানে, ধ্যান-ধারণার মধ্যে ডুবে আছে। ঠাকুর কেশব সেনের নামে বলছেন, কেশবের ওই ধ্যানটুকু ছিল বলে এত নাম-যশ হয়েছে। ধ্যান যদি না করা থাকে, মন যদি শান্ত না থাকে আর স্বার্থহীন যদি না হয়ে থাকে, বুঝে নিন কোন দিন জগৎ তার কথা শুনবে না। ওরে পোদো শাঁখ বাজিয়ে তুই করলি গোল, ভোঁ ভোঁ করে শাঁখ বাজালে কেউ শুনবে না।

অনেক আগেকার কথা, একবার এক সন্ন্যাসী বেলুড় মঠে রাগারাগি করে হৃষিকেশে এক বছরের জন্য তপস্যায় চলে যাবেন বলে ঠিক করলেন। তখন মহাপুরুষ মহারাজ মঠের অধ্যক্ষ। উক্ত সন্ন্যাসী মহাপুরুষ মহারাজকে গিয়ে বলেছেন, 'আমি হৃষিকেশে এক বছর তপস্যায় যাচ্ছি'। 'খুব ভাল কথা'। সন্ন্যাসী তখন আরও জোর দিয়ে বলছেন, 'এক বছর আমি মৌন থাকব'। মহাপুরুষ মহারাজ শুধু একটা শব্দে বললেন, 'ভিতরটাও'। বলতে চাইছেন, বাইরে মুখ বুজে মৌন হয়ে শব্দ বন্ধ করলে হবে না, ভিতরে যে শব্দগুলো আসবে ওটাকেও বন্ধ করতে হবে।

এরপর স্বামীজী কেশব সেন আর শ্রীরামকৃষ্ণের তুলনা করে বলছেন, শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন ও শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব জগতের ভিতর পাপ বা অশুভ দেখতে পেতেন না –তিনি জগতে কিছু মন্দ দেখতে পেতেন না, কাজে সেই মন্দ দূর করবার কোন চেষ্টা করারও কোন

প্রয়োজন বোধ করতেন না। কেশব সেন খ্রীশ্চান ভাবধারা দ্বারা একটু প্রভাবিত ছিলেন, তখন ব্রাহ্ম সমাজেও ওনারা পাপ পাপ করতেন, আর শ্রীরামকৃষ্ণদেব ছিলেন পাপ-পূণ্যের পারে। স্বামীজী বলছেন, The first as a great ethical reformer, leader, and founder of the Brahmo-samaj. (*কেশবচন্দ্র একজন মস্ত নৈতিক সংস্কারক, নেতা এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাত ছিলেন।*) এরপর বলছেন, After twelve years the quiet prophet of Dakshineswar had worked a revolution not only in India, but in the world. (*দ্বাদশ বর্ষ পরে এই শান্তপ্রকৃতির দক্ষিণেশ্বরের মহাপুরুষ শুধু ভারতে নয়, সমগ্র জগতের ভাবরাজ্যে এক বিরাট পরিবর্তন এনে দিয়ে গেছেন।*) এটা স্বামীজীর খুব powerful quotation, স্বামীজী প্রফেট ছিলেন কিনা। কেশব সেন ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, তিনি এত কিছু করলেন, আর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে নীরবে শুধু মায়ের নাম করে গেলেন, ধ্যান করে গেলেন, আর বারো বছর পর, অর্থাৎ স্বামীজী যখন বলছেন, ঠাকুরের মহাসমাধি ১৮৮৬ সালে, তার একটু আগে থেকে ধরে আমেরিকাতে যখন এই কথাগুলো বলছেন, ১৮৯৫ সালে, এই বারো বছর শুধু দেশেই নয়, সারা বিশ্বে ঠাকুরের আধ্যাত্মিক ভাব তরঙ্গ প্রবাহিত হতে শুরু করেছে। The power is with the silent ones, who only live and love and then withdraw their personality. (*এই সকল নীরব মহাপুরুষ বাস্তবিক মহাশক্তির আধার –তাঁরা প্রেমে তন্ময় হয়ে জীবন-যাপন করে জগৎরঙ্গমঞ্চ হতে সরে যান।*) যাঁরা প্রকৃত সন্ন্যাসী তাঁরা সবাইকে ভালবাসেন, শক্তি তাঁদেরই হয়। মুখে আমরা যতই বলি না কেন, অমুক নেতা, তমুক বুদ্ধিজীবি, আমি এই করতে পারি, সেই করতে পারি, এগুলো কিছু না। যদি তোমার মনে হয় তোমার ভিতরে একটু শক্তি আছে, কথা বলা বন্ধ করে দাও আর মানুষকে শুধু ভালবেসে যাও, তুমি দেখতে পারবে, ওখান থেকেই তোমার ভিতরে শক্তি আসতে শুরু করে দিয়েছে।

They never say 'me' and 'mine'; they are only blessed in being instruments. Such men are the makers of Christs and Buddhas, ever living fully identified with God, ideal existences, asking nothing, and not consciously doing anything. They are the real movers, the Jivan-muktas, absolutely selfless, the little personality entirely blown away, ambition non-existent. They are all principle, no personality. (*তাঁরা কখনও 'আমি, আমার' বলেন না। তাঁরা নিজেদের ঈশ্বরের যন্ত্রস্বরূপ জ্ঞান করেই ধন্য মনে করেন। এরূপ ব্যক্তিগণই খ্রীষ্ট ও বুদ্ধ সকলের নির্মাতা। তাঁরা সদাই ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে তাদাত্মা লাভ করেন, এই বাস্তব জগৎ থেকে বহুদূরে এক ভাব-জগতে বাস করেন। তাঁরা কিছুই চান না এবং জ্ঞাতসারে কিছু করেনও না। তাঁরাই প্রকৃতপক্ষে জগতের সর্বপ্রকার উচ্চভাবের প্রেরকস্বরূপ –তাঁরা জীবনমুক্ত, একেবারে অহংশূন্য। তাঁদের ক্ষুদ্র অহংজ্ঞান একেবারে উড়ে গেছে, কোন আকাঙ্ক্ষা একেবারেই নেই। তাঁদের ব্যক্তিত্ব লুপ্ত হয়ে গেছে, তাঁরা শুধুই তত্ত্বস্বরূপ।*)

এই ধরণের মহাপুরুষরা, যাঁরা পবিত্রতা ও নৈঃশব্দে প্রতিষ্ঠিত, এনারা মানুষ তো কোন মতেই নন, কোন ব্যক্তিত্বও নন, এনারা হলেন সেই সিদ্ধান্ত। আগের একটা আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে বলা হয়েছিল, জীবনের উদ্দেশ্য হল কিভাবে noun থেকে verb হয়ে যাওয়া, verb মানে সিদ্ধান্ত। যখন আমরা বলছি বুদ্ধ, বুদ্ধ একটা অবস্থা, যেখানে শুধু অস্তিত্বের অবস্থা, যেখানে আর কিছু নেই। বুদ্ধ কোন ব্যক্তি নন, কোন ব্যাক্তিত্বও নন। সেই রকম Christs, কোন ব্যক্তিও নন, কোন ব্যাক্তিত্বও নন, এটাই pure existence। খুব কাছ থেকে এই ধরণের মহাপুরুষদের জীবনকে যদি দেখা হয়, তাহলে দেখা যাবে এনাদের আমিত্ব বলে কিছু ছিল না, শুধু pure existence। একটু যদি ঢেউ এসে যায় তখন ব্যক্তিত্ব হয়ে যাবে, যখন অনেকগুলো ঢেউ এসে যাবে তখন মানুষ হয়ে যাবে। যিনি যত স্বার্থশূন্য, যাঁর যত অহং নাশ হয়েছে, তিনি তত শুদ্ধ অস্তিত্বের দিকে চলে যান, তত শুদ্ধ ভালবাসার দিকে চলে যান, জানবেন তিনি তত ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তিত্ব থেকে সিদ্ধান্তের দিকে চলে যান। এই জায়গাতে পৌঁছেই মানুষ ঠিক ঠিক কাজ করে। যীশু দু হাজার বছর কি কি সব বলে গেছেন, কিন্তু সারা পৃথিবীর মানুষ আজও সেই কথাগুলি অনুসরণ করে চলেছে। যাঁরা আমাদের ধর্ম দিয়েছেন, এনারা কেউই মানুষ নন, মহাপুরুষও নন, আসলে এনারা হলে সিদ্ধান্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষও নন, ব্যক্তিত্বও নন, মহাত্মাও নন, অবতারও নন, তিনি একটা ভাব, একটা সিদ্ধান্ত। যারা ঠাকুরকে মানুষ রূপে

দেখে বা যখন আমরা ঠাকুরকে অবতার বলছি, কোথাও আমরা ভুল করছি, ঠাকুর ব্যক্তিও নন, ব্যক্তিত্বও নন, তিনি একটা ভাব।

২৭শে জুন, বৃহস্পতিবার

২৭শে জুনের সকালের ক্লাশে স্বামীজীর হাতে বাইবেল (New Testament) ছিল। বাইবেলে একটা খুব নামকরা কথা আছে, যীশুর মা মেরী তিনি যদিও যোশেফকে বিবাহ করেছিলেন, কিন্তু এনারা বলেন যীশু দৈবীর ইচ্ছাতে মায়ের গর্ভে এসেছিলেন। তার মানে, স্বামী-স্ত্রীর স্বাভাবিক দৈহিক সম্পর্ক থেকে যেভাবে সন্তান উৎপন্ন হয়, যীশুর জন্ম সেভাবে হয়নি। এই পয়েন্টটাকে আলোচনা করতে গিয়ে স্বামীজী বলছেন, Mohammed claimed to be the 'Comforter' that Christ promised to send. (*যীশুখ্রীষ্ট যে শান্তিদাতা পাঠিয়ে দেবেন বলেছিলেন, মহম্মদ নিজেকে সেই 'শান্তিদাতা' বলে দাবি করতেন।*) যীশু বলেছিলেন, আমি পরে আরেকজনকে পাঠাবো, যে তোমাদের comfort দেবে, তাঁকে বাইবেলে বলছেন, Comforter। যীশু বলে দিলেন, তোমাদের ভিতরে যে দুঃখ আছে, সেই দুঃখে সে তোমাদের সান্ত্বনা দেবে।

ইজরাইলীদের পৌত্তলিক পূজা ও হিন্দুদের দেব-দেবীর পূজার পার্থক্য

আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগে, অর্থাৎ প্রায় দু হাজার খ্রীষ্টপূর্বে বর্তমান ইজরাইলে কিছু উপজাতিরা থাকত, তারা নিজেদের মত থাকত। তবে আমরা জনজাতি বলতে যা মনে করি, ট্রাইবাল বা ট্রাইব শব্দ যে অর্থে নিয়ে থাকি, ওই অর্থে তারা ট্রাইবাল ছিল না। তাদেরও একটা আলাদা সভ্যতা ছিল, কারণ পাশেই ছিল ঈজিপ্ট সভ্যতা, যারা খুবই উন্নত ছিল। গ্রীক সভ্যতা, ঈজিপ্সিয়ান সভ্যতা রীতিমত উন্নত ছিল আর ঈশ্বর ও দেবতাদের ব্যাপারে, সমাজের ব্যাপারে এবং আরও অনেক কিছুর ব্যাপারে তাদের নিজস্ব অনেক রকম ধারণা ছিল। আজকের দিনে পিছনের দিকে ফিরে তাকালে ওই ধারণাগুলোকে আমাদের খুব উন্নত ধারণা বলে মনে হবে না। ইজরাইলের উপজাতিরা মূর্তি পূজা করত, তবে মূর্তি পূজা বলতে হিন্দুদের মূর্তি পূজা নয়, পৌত্তলিক বলতে যা বোঝায়, ওরা হল ঠিক ঠিক পৌত্তলিক। মূর্তি পূজা তারা এই উদ্দেশ্যে করত –আমার এই ভাল হবে, সেই ভাল হবে ইত্যাদি। হিন্দুদের এই পৌত্তলিক পূজা কোন দিন ছিল না। মুসলমানরা প্রায়ই হিন্দুদের আক্রমণ করে বলে যে, হিন্দুরা পৌত্তলিক। এমনকি কেশবচন্দ্র সেন যে সময় ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করলেন, তিনিও হিন্দুদের বিরুদ্ধে বলার সময় এই পৌত্তলিক শব্দটা ব্যবহার করতেন। কিন্তু হিন্দুরা কখনই পৌত্তলিক ছিল না, এরা কোথাও হিন্দু ধর্মকে বুঝতে ভুল করেছে। পৌত্তলিক বলতে বোঝায়, একজন দেবতা, তিনি এতটুকু। যেমন মা কালী, মা কালী কি? মা কালী এতটুকু। আমাদের সাধারণ মন, সাধারণ মন দিয়ে শিবের বর্ণনা করার সময় আমরা বলি, শিব আছেন, তিনি একা কি করে থাকবেন, সেইজন্য তাঁর একজন স্ত্রী জোগাড় করে দেওয়া হল। শুধু স্ত্রী হলেই হবে না, তাঁর কয়েকটি সন্তান দরকার, তাই কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে এনে দেওয়া হল। আবার অনেক সময় দেখা যায়, আগেকার দিনে হিন্দুরা চারটে পাঁচটা বিয়ে করত, সেই ধারা অনুযায়ী তাঁর আরেকটা স্ত্রী জোগাড় করে দেওয়া হল, এখন বোঝা যাচ্ছে না তিনি স্ত্রী কিনা। কিন্তু হিন্দু ধর্মের যত মূল শাস্ত্র আছে, সেখানে কোথাও এভাবে বলা হচ্ছে না।

হিন্দু শাস্ত্রে ঈশ্বর বলতে সচ্চিদানন্দ, সচ্চিদানন্দ হলেন যিনি নিত্য, অনন্ত শব্দকেই আমরা নিত্য রূপে ব্যবহার করি। তিনি শুদ্ধ, অর্থাৎ কোন ধরণের সাংসারিকতা তাঁর মধ্যে নেই। তিনি চৈতন্য, তাঁকেই শুদ্ধ আত্মা বলা হয়। মানুষের মন এতই সাধারণ যে, মানুষ এই ভাবকে কিছুতেই গ্রহণ করতে পারে না। ঠাকুর এটাকেই খুব সহজ ভাষায় বলছেন, একসের ঘটিতে তিন সের জল ধরবে না। আমার পাত্রটা ছোট আর আমি মনে করছি আমার এই পাত্রে অনেক কিছু ভরে নিয়ে যাব, তা হবে না, আমার পাত্র যতটুকু ততটুকুই আমি নিতে পারব। মানুষের মন পাত্রের মত, তার মধ্যে সে কতটুকু ধারণা করে রাখতে পারবে! অন্য দিকে ঈশ্বর হলেন আবার অনন্ত। আমরা এই ধারণাও করতে পারব না যে, আমাদের এই সীমিত মন অসীমকে ধারণা করতে পারে না। ঠাকুর এটাকে আরও সহজ করে বলছেন, একটা চিনির পাহাড়, সেই পাহাড়ে কোন ভাবে একটা পিঁপড়ে চলে গেছে, সে এবার মুখে একটা চিনির দানা নিয়ে নিজের গন্তব্যের দিকে যাচ্ছে আর ভাবছে, পরের বার যখন আসব তখন পুরো পাহাড়টাই মুখে করে নিয়ে যাব। ঠাকুর বলছেন, শুকদেব, নারদাদি এনারা হলেন

ডেঁয়ো পিঁপড়ে, তাঁরা হদ্দ দুটো কি তিনটে দানা মুখে নিয়ে আসতে পারেন। যাঁরা অবতার পুরুষ বা যাঁরা অবতারের কৃপা লাভ করেছেন বা সাধনা করে মহাপুরুষ হয়েছেন, এনারা ছাড়া এই জিনিসটাকে কেউ ধারণা করতে পারবে না। আমাদের মন কখনই ঈশ্বরের ধারণা করতে পারবে না। মুখে বললেও ভিতরে ওই ধারণাটা আসে না। যতক্ষণ না আমাদের মনে ঈশ্বরীয় কৃপায় একটু চেতনা না খুলে গিয়ে থাকে, ওটাকে ধারণা করা যায় না। কিন্তু সাধারণ মন যখন ঈশ্বরের কথা ভাবে, তখন ভাবে আমি যেমন ঈশ্বরও তেমন, আমার যেমন দুঃখ-কষ্ট আছে তাঁরও হয়ত আছে, কিন্তু তিনি আমাদের থেকে অনেক বেশি ক্ষমতাবান। রাজা যেমন ক্ষমতাবান, তিনি রাজার থেকেও বেশি ক্ষমতাবান। ঈশ্বরকে একজন বড় রাজার মত ভাবে। তিনি ইচ্ছামাত্র আমাদের সব রকম দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিতে পারেন। যখন এই ভাবে আমাদের দুঃখ-কষ্ট দূর হয় না, তখন লোকেরা মনে করে, ঈশ্বর বলে কেউ আছে কিনা কে জানে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃতে এত বড় পণ্ডিত, তাঁর মত উচ্চ ব্যক্তিত্বের মধ্যেও এই প্রশ্ন উঠছে, ঈশ্বর যদি থেকে থাকেন তাহলে সংসারে এত দুঃখ কষ্ট কেন। আসলে ঈশ্বরের ব্যাপারে আমাদের কোন স্পষ্ট ধারণাই নেই, যখন একটু ধারণা হবে তখন বুঝতে পারবে যে, সুখটাও ভগবানের, দুঃখটাও ভগবানের, জন্মটাও ভগবানের, মৃত্যুটাও ভগবানের, এই কারণে জগতে সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু লেগেই আছে। ধারণা হওয়ার জন্য আমাদের সিদ্ধ পুরুষের সঙ্গ করতে হবে, সাথে সাথে নিজেকেও সাধনা করতে হবে, তা নাহলে কোন ধারণাই হবে না।

সাধারণ মানুষ ভাবে, দেবতারা আমাদের মতই সীমিত। ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি বেদে যত দেবতার নাম পাওয়া যায়, এইসব দেবতাদের প্রতি বেদের ঋষিদের দৃষ্টিভঙ্গীকে অজ্ঞতাবশতঃ আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করার সময় অনেক সময় আমাদের পৌত্তলিক বলে মনে হয়। বেদের আরও গভীরে গেলে দেখা যাবে আসলে বেদের দেবতারা তা নন। ঋষিরা দেখাচ্ছেন, সচ্চিদানন্দ অনন্ত, অনন্তের অবধারণা করা যায় না, সেইজন্য অনন্তের একটা মুখোশ দেবতাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হল, সেই মুখোশকে যেন আমরা দেখছি, ইন্দ্র একটা মুখোশ, অগ্নি একটা মুখোশ ইত্যাদি। ঠাকুর এর অন্য একটা উপমা দিচ্ছেন, একটা বিরাট দেওয়াল আছে, দেওয়ালের ওপারে একটা বাগান আছে, সেখানে প্রচুর আমোদ-আহ্লাদ হচ্ছে, কিন্তু কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তখন দেওয়ালে একটা ফুটো করে দেওয়া হল, সেই ছোট ফোকর দিয়ে কোন রকমে একটু দেখা যাচ্ছে। এই যে মায়ার দেওয়াল, এই দেওয়ালে ইন্দ্র একটা ছোট ফোকর, শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানে আরেকটু বড় ফোকর। কিন্তু কেউ যদি মনে করে, ঠাকুরের সাধনা করে ঠাকুরকে জানার পর অনন্তকে জেনে নেব – না সেটা কোন দিনই জানা যাবে না। যত বড় অবতারই হন, আর যেই হন, যে কোন দেবতা বা যে কোন ভগবান, শিব, বিষ্ণু যিনিই হন না কেন, কোন দিন আমরা ঈশ্বরকে জানতে পারব না। কারণ এনারা সবাই কেউ ছোট ফোকর, কেউ বড় ফোকর।

আমিই সেই শান্তিদাতা এবং আমিই শেষ প্রফেট – মহম্মদের এই দাবির প্রেক্ষাপট

তখনকার ইজরাইলে যে ছোট ছোট দেবতাদের ধারণা ছিল, সেই সময় সেখানে এ্যব্রাহম নামে একজন প্রফেট ছিলেন। তিনি ঈশ্বরের ভক্ত, তিনি তাঁর ভক্তি থেকে বুঝতে পারলেন, এই ছোট ছোট দেবতারা সত্য নন, আসলে সব কিছুর পিছনে এক ভগবান রয়েছেন। এই এক ভগবানের ধারণাকে বলা হয় একেশ্বরবাদ। সেখান থেকে নূতন এক ধর্ম শুরু হল, যার পরে নাম হল জুদাইজিম্ বা জুহুদি ধর্ম। জুহুদি শব্দটা এসেছে জেহোবা থেকে। জেহোবা ওনাদের দেবতা, জেহোবার বানানটাও বিচিত্র, যার উচ্চারণ করা যায় না; তাৎপর্য হল, ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করা যায় না, তাই তাঁর কোন নাম হয় না। ইজরাইলের ওই জায়গার নাম ছিল জুডিয়া, সেখান থেকে তাদের ধর্মের নাম হয়ে গেলে জুদাইজিম্। যে কোন ধর্মে দেখা যায়, তোমার যত বড়ই অবতার হন, যত বড় প্রফেটই হন, ধীরে ধীরে সবাই আচার ও অর্চনা বিধিতে নেমে যান। উপাচার সব সময় পুরোহিতদের দ্বারা সম্পাদিত হয়। কিন্তু দু হাজার বছর আগে যে এ্যব্রাহাম এসেছিলেন, সেখান থেকে প্রথম দু হাজার বছরের মধ্যে অনেক বড় বড় আধ্যাত্মিক পুরুষরা এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে মোজেস হলেন খুব নামকরা। দেখা গেল, জুহুদিদের ধর্ম পরে পুরোপুরি উপাচারের ধর্ম হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। সেই সময় আবির্ভূত হলেন যীশু খ্রীষ্ট, তিনি সমস্ত উপাচারকে উড়িয়ে দিলেন, আর বললেন, ঈশ্বরকে ভালবাসাই জীবনের উদ্দেশ্য। এই প্রথম তারা আস্বাদ করতে পারল যে, ঈশ্বর হলেন এক ভালবাসার বস্তু।

যীশুর সময় তাঁর সব কথা লিপিবদ্ধ করা হয়নি, শরীর যাওয়ার বেশ কিছু দিন পর তাঁর কথাগুলোকে লিপিবদ্ধ করা হল, সেখানে এই কথাটাও লিপিবদ্ধ করা হল, আমার পরে আরেকজন আসবে, সে তোমাদের দুঃখ দূর করবে। যীশুর শরীর যাওয়ার ছ'শ বছর পর এলেন প্রফেট মহম্মদ। জুদাইজিম, খ্রীষ্ট ধর্ম আর ইসলাম, এই তিনটি ধর্মের মধ্যে একটা যোগসূত্র আছে। এই তিনটে ধর্মকে একসাথে মিলিয়ে বলা হয় এ্যব্রাহামিক রিলিজিয়ন। ইজরাইলের ওই অঞ্চলের ভাষা ছিল সেমাইক, সেখান থেকে এই তিনটে ধর্মের নাম হল সেমেটিক রিলিজিয়ন। এই তিনটে ধর্মের মধ্যে যেমন অনেক মিল আছে, তেমনি অনেক অমিলও আছে। মহম্মদ মক্কাতে জন্ম নিলেন, মক্কার পাশেই ছিল মদিনা। মদিনাতে জুহুদিরা ছিল, খ্রীশ্চানরাও অনেকে ছিল। মক্কাতে ব্যবসা-বাণিজ্যের খুব প্রসার হয়েছিল, ব্যবসার কারণে সেখানে জুহুদি ও খ্রীশ্চানদের যাওয়া-আসাটা ভাল ছিল। মহম্মদ ওদের সাথে মিশতেন বলে ওদের ধর্মীয় কথাগুলো জানতেন। আল্লার কাছ থেকে মহম্মদের কাছে জ্ঞান আসতে শুরু হয় আর পরে মহম্মদের মুখ দিয়ে আল্লার যে কথাগুলো আসতে শুরু হল, সেই সব কথা কোরানে লিপিবদ্ধ হয়ে গেল। তিনি নিজেকে বললেন, আমি হলাম সেই Comforter, যাঁর কথা যীশু বলেছিলেন। মহম্মদ নিজে খুব বেশি পড়াশোনা করেননি, কিন্তু তিনি লোকের মুখে শুনে শুনে এইসব কথাগুলো জানতেন। অন্যান্য ধর্মের পণ্ডিতদের কাছ থেকেও তিনি অনেক কথা শুনেছিলেন। আল্লার যে কথাগুলো প্রফেট মহম্মদের মুখ থেকে বেরিয়েছে, তার সাথে সাথে তিনি নিজেও কিছুটা সতর্ক ছিলেন, যাতে অন্যান্য যে ধর্মগুলো আগে থেকে রয়েছে, সেই ধর্মগুলির সাথে তাঁর ধর্ম এক না হয়ে যায়, সেইজন্য তিনি কিছু কিছু জিনিসকে নিজের তরফ থেকে যোগ করে দিলেন। জুহুদি ধর্মের যে কথা বলা হল, ওদের মধ্যে অনেক প্রফেট ছিলেন। আমরা প্রফেট আর অবতার এক মনে করি, কিন্তু এক নয়, প্রফেট ও অবতারে অনেক তফাৎ আছে। প্রফেটরা প্রাণপনে ধর্মের শিক্ষা দেন, আর তাতে যেন তাঁদের একটা অথোরিটি আছে। জিউসদের মধ্যে তাদের নিজস্ব একটা পরম্পরা ছিল, যীশু এসে এমন একটা শক্তি নিয়ে এলেন, মনে হল যেন ওদের এই পরম্পরটা বন্ধই হয়ে গেল, কিন্তু হাল্কা একটা ইঙ্গিত দিয়ে দিলেন যে, পরে একজন আসবেন। এই কথাকে নিয়ে মহম্মদ বলে দিলেন, আমিই সেই আর আমিই শেষ প্রফেট, যাতে আর কেউ না বলতে পারে আর কেউ প্রফেট আছেন। এই হল এর প্রেক্ষাপট।

জন্ম কর্ম চ বে দিব্যং

এই প্রেক্ষাপটের পর স্বামীজী বলছেন, Mohammed claimed to be the 'Comforter' that Christ promised to send. He considered it unnecessary to claim a supernatural birth for Jesus, যা আমরা এর আগে বললাম, যেটা আমরা বাইবেলেও পাই। যীশুর জন্ম দিব্য – মহম্মদ এই ধরণের কিছু মনে করার প্রয়োজন মনে করতেন না। তাঁর কাছে ছিল আমিও প্রফেট তিনিও প্রফেট ছিলেন, মোজেসও প্রফেট ছিলেন। দৃষ্টিভঙ্গীটা তফাৎ, একটা বিরাট উঁচু জিনিস, কি রকম উঁচু জিনিস হয়? খুব সহজ ভাষায় বলা যেতে পারে, যীশু শিক্ষা দিতে শুরু করে প্রথম তিনি উপদেশ দিলেন গ্রামের কয়েকজন অশিক্ষিত মহিলাদের। এখন ইজরাইলে যেমন জলের অভাব, তখনকার দিনেও জলের অভাব ছিল, কুয়ো থেকে মেয়েরা জল তুলছে, যীশু সেখানে গিয়ে তাদের কাছে জল চেয়েছেন, আর তাদেরকে তিনি ঈশ্বরীয় কথা বলছেন। মেয়েরা তাঁর কথা শুনে অবাক হয়ে গেছে, 'ইনি কে? এই রকম কথা আমরা আগে কখনও শুনিনি'। গ্রামের সব মেয়েরা বলছে, 'বাকিরা যেন বইয়ের কথা বলত, কিন্তু He talks with authority, এই কথাগুলো বলার অধিকার যেন তাঁরই আছে'। এই স্তরে যখন মানুষ এসে যায়, লোকেরা যখন তাঁর দিকে তাকায় তখন অবাক হয়ে ভাবে, 'ইনি কে? ইনি কি আমাদের অবস্থা থেকেই উঠে ধীরে ধীরে এই স্তরে পৌঁছেছেন, নাকি স্বর্গের ওপার থেকে কেউ নীচে নেমে এসে এই কথাগুলো বলছেন'। এর কোন ব্যাখ্যা নেই।

একটা পুকুরে মাছেরা খেলা করছে, পুকুরের জলে চাঁদের ছবি প্রতিবিম্বিত হয়েছে। মাছেরা সারা রাত সেই প্রতিবিম্বিত চাঁদের সাথে খেলা করেছে, এই ভেবে খেলা করেছে যে, এও আমাদেরই মত একটা মাছ। সকাল হল; চাঁদ অস্তমিত হয়ে গেল। মাছগুলো ভাবছে এই তো এখানে ছিল, এখন সে কোথায় চলে গেল। এই যে অবতাররা আসেন, এনারা কি আরেকটি মাছ, নাকি আকাশের চাঁদ, এটাকে জানার একেবারেই কোন পথ নেই। একটাই পথ আছে, আমরা যাঁকে অবতার বলে মনে করি, তিনি যদি নিজের শিষ্যকে দেখিয়ে দেন,

এই দ্যাখ আমি এই। যীশু তাঁর শিষ্যদের দেখিয়েছেন, মৃত্যুর পর তাঁর পুনরথ্থান হয়েছে, শিষ্যরা বুঝতে পারলেন, তিনি ঈশ্বর, তিনি ঈশ্বরের সন্তান। আরও অনেকে ছিলেন, যাঁরা যীশুকে তাঁর শরীর যাবার পর সাক্ষাৎ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। যাঁরা সন্ত হন তাঁরাও অনেক সময় দর্শন দেন, স্বপ্নেও দর্শন দেন বা সশরীরের দর্শন দেন। স্বামীজীও সিন্ধু নদীর তীরে বেদের এক প্রাচীন ঋষির দর্শন পেয়েছিলেন। এই ধরণের দর্শন যে হয় না তা নয়, কিন্তু খুব কম। কিন্তু ঈশ্বর যদি অবতার হয়ে আসেন, তিনি যে আত্মপ্রকাশ করেন সেটা তিনি একজন দুজনের কাছে করেন না, অনেকের কাছেই করেন, বিভিন্ন ভাবে করেন আর বিভিন্ন শক্তি দিয়ে করেন। তাতে বোঝা যায় এনারা আমাদের মতন নন। শুধু আমাদের মতই নন, আমাদের সাথে কোন কিছুতেই মিল নেই। এই জিনিসটাকে সাধারণ মানুষকে বোঝান খুব মুশকিল, সেইজন্য আমরা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলি, মা-বাবার দৈহিক সম্পর্ক থেকে এনাদের জন্ম হয়নি। ভগবান গীতায় বলছেন, *জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ*, আমার জন্ম দিব্য, আমার কর্ম দিব্য।

আমরা যখনই কিছু করি তখন আমরা কর্ম প্রেরিত হয়েই করি, আমাদের পুরনো সংস্কারগুলো টেনে নিয়ে গিয়ে সব কর্ম করায়। যেমন, খিদে পেলে আমরা খাই, তৃষ্ণা পেলে আমরা জল পান করি, আমাদের সব সময় ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। অবতার পুরুষকে কর্ম টেনে নিয়ে যায় না, সেইজন্য তাঁর যে জন্ম সেটাও কর্মের প্রভাবে হয় না। শ্রীকৃষ্ণকে যদি আমরা ভগবান বলে মনে করি, তাহলে শ্রীকৃষ্ণের কোন কাজকে নিয়েই প্রশ্ন করা যাবে না। আগে আমাদের ঠিক করতে হবে, শ্রীকৃষ্ণ কি ভগবান? হ্যাঁ কি না। যদি বলি শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, তাহলে শ্রীকৃষ্ণ সারা জীবনে যা যা করেছেন, তার কোন কর্মকেই আমরা আর বিচার করতে পারি না। কারণ ভগবানের কোন কাজকেই সমাজের রীতিনীতি দিয়ে বিচার করা যায় না। যদি মনে করি শ্রীকৃষ্ণ একজন মানুষ, যিনি অনেক কিছু করেছেন, যেমন গান্ধীজী, নেতাজী, তাহলে আমরা যত ধরণের প্রশ্ন করি, সেগুলোও করা যাবে না। তিনি মানুষ, মানুষ মাত্রেই দুর্বলতা থাকবে। দুর্বলতা যদি থাকে, তাহলে প্রশ্ন করা কেন? আমরা যে প্রশ্ন করি, শ্রীরামচন্দ্র লুকিয়ে বালীকে কেন বধ করেছিলেন, আমরা যে প্রশ্ন করি সীতাকে তিনি কেন বনে পাঠালেন, আমরা যে প্রশ্ন করি শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সাথে কেন রাসলীলা করলেন, শ্রীকৃষ্ণ মহাভারতের যুদ্ধে কেন মিথ্যা কথা বললেন, এই প্রশ্নগুলো কখনই হয় না। যদি আমরা বলি তিনি ভগবান তখন প্রশ্ন শুধু এই কারণেই করা যাবে না, কারণ তাঁর সমস্ত কর্মই দিব্য, ভগবানের কোন কর্মই সংস্কার প্রেরিতবশাৎ হয় না। আর তাঁকে যদি মানুষ বলে দেওয়া হয়, তাহলে তাঁকে নিয়ে আমরা আলোচনা করতে যাব কেন, মানুষকে নিয়ে আলোচনা করার কিছু নেই।

যীশুখ্রীষ্ট খ্রীশ্চানদের কাছে ভগবান। তাঁকে বোঝানর জন্য খ্রীশ্চানরা যদি এখন বলে, যীশু যোশেফ ও মেরীর সন্তান নন, তিনি ঈশ্বরের সন্তান, তাতে দোষের কিছু নেই। আমাদের কাছে এই নিয়ে কোন সমস্যা নেই, সমস্যা অন্যদের কাছে। মহম্মদ বলছেন, ঈশ্বরের অবতার হয় না, সেইজন্য মুসলমানদের মধ্যে অবতারের কোন ধারণাই নেই, জিউসদের মধ্যেও নেই, এবং খ্রীশ্চানদের মধ্যেও নেই। ঈশ্বর স্বয়ং শরীর ধারণ করে এই পৃথিবী আসেন, এই ধারণা একমাত্র হিন্দুদের মধ্যেই আছে। এব্রাহিমিক ধর্মের ধারণায় ঈশ্বরের দূত হয়, ঈশ্বরের দূত মানে, তাঁরা মানুষই ছিলেন, কিন্তু সাধনা করে করে তিনি ঈশ্বরের কৃপা পেলেন, তিনি কৃপা করে তাঁকে আধ্যাত্মিক শিক্ষাগুলো দিলেন, যাতে জগতের মঙ্গল হয়। যীশু এর থেকে আলাদা, তিনি ঈশ্বরেরই রূপ, ঈশ্বরের সন্তান। তাঁকে পাঠানো হল, তিনি ঈশ্বরের সন্তান রূপে এসেছেন জগতের মঙ্গলের জন। কিন্তু এই ধারণা জিউসদের পরম্পরায় নেই, অন্য দিকে মহম্মদের পরম্পরাতেও এই ধারণা আসছে না, এরাও তাই কেউ মানে না যে, যীশু ঈশ্বরের সন্তান। সেইজন্য যীশুকে ঈশ্বরের সন্তান বা সাক্ষাৎ ঈশ্বর রূপে একমাত্র খ্রীশ্চানরাই দেখে। মুসলমানরা আবার বলে, জিউসদের যেমন প্রফেটরা ছিলেন, যীশুও সেই রকম একজন প্রফেট, আর সেই প্রফেটের পর মহম্মদ হলেন শেষ প্রফেট, এনার পর আল্লা আর কোন প্রফেটকে পাঠাবেন না।

যীশুর supernatural birth, যার উপর খ্রীশ্চানিটি দাঁড়িয়ে আছে সেটাকে নিয়ে স্বামীজী বলছেন, Such claims have been common in all ages and in all countries. All great men have claimed gods for their fathers. (*সব যুগে, সব দেশেই এইরূপ দাবি দেখতে পাওয়া যায়। সকল মহামানব দাবি করেছেন, দেবতা থেকেই তাঁদের জন্ম।*) যদিও খ্রীশ্চান পরম্পরাতে বলা হয় যে যীশু ভগবানের

সন্তান, সেইজন্য তাঁর জন্ম সাধারণ ভাবে হয়নি। কিন্তু যাঁরাই বড় নেতা, বিশেষ করে পাশ্চাত্য জগতে, তাঁদের সবারই ক্ষেত্রে দেখা যায়, ওনারা দাবী করেন, আমি আমার পিতার সন্তান নয়, আমি হলাম অমুক দেবতার সন্তান। এই ব্যাপারে খুব নামকরা নাম হল আলেকজাণ্ডার। আলেকজাণ্ডারের মধ্যে এই ভাবটা আগে থেকেই ছিল যে, আমি জয়ী হব। ওদের প্রাচীন মন্দিরগুলিতে ওরাকেলরা থাকত, ওখানে গেলেই ওরাকেলদের বলতে বলা হত, বল আমি অমুক দেবতার সন্তান। বলার পর বলেই দিত যদি না বল, গলা কেটে ফেলে দেব। আমাদের এখানে যেমন বলে ওকে অমুক দেবী ভর করেছে, ওদেরও ভর করে। ভর করার পর যে বলবে, আলেকজাণ্ডার তার থেকে সহজ পথ পেয়ে গেল। কিভাবে ভর করিয়ে দেবে? তলোয়ার দেখাতেই তার ভর এসে গেল। এবার বল আমি অমুক দেবতার পুত্র। সেখান থেকে হয়ে গেল আলেকজাণ্ডার অমুক দেবতার পুত্র। এই ধরণের কিছু হয়ে থাকে।

আমাদের সমস্যা হল, কারুর উন্নতি হতে দেখলেই আমরা মনে মনে অনেক কিছু চিন্তা-ভাবনা করতে থাকি, এই লোকটির পক্ষে এত কিছু করা কি করে সম্ভব হল! যীশুর ক্ষেত্রেও তাই, তাঁর বাবা-মার দিকে তাকিয়ে সবাই ভাবতে লাগল, কি করে এদের এই রকম সন্তান হতে পারে। আমরা যাদের সাথে বড় হই, পরে সে অনেক বড় হয়ে যাওয়ার পর ভাবি, ওতো আমাদের মতই ছিল, আমাদের সাথেই খেলেছে, দুষ্টুমি করেছে, বড় হয়েছে, কি করে সে আজ এই জায়গায় পৌঁছাল। আমরা অনেক সময় বলি স্বর্গ থেকে এসেছে, কিংবা তার কোন শুভ কর্ম ছিল। কিন্তু বলার মত একটা কথা হল – আসলে পৃথিবীতে যে ওর বাবা, সে ওর বাবা নয়, অমুক দেবতার সন্তান। বাল্মীকি রামায়ণেও আমরা এই জিনিস পাই, যদিও সব ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়, ওর বাবা পবনদেবতা, নয়ত অমুক দেবতা। যখনই কোন একটা বিশেষ শক্তি দেখা যায় তখন কোন দেবতাকে নিয়ে আসবে। স্বামীজী সেদিনের ক্লাশে নিউ টেস্টামেন্ট নিয়ে এসেছিলেন, সেখান থেকে তিনি বলছেন, যীশুর দিব্য জন্মকে মহম্মদ এই কারণেই মানতেন না। কিন্তু এই ভাবটা বিভিন্ন ধর্মে পাওয়া যায়, এটাই আমরা এতক্ষণ ব্যাখ্যা করলাম।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ, অনুমান প্রমাণ ও উপমান প্রমাণ

প্রথমের দিকে আমরা আলোচনা করেছি যে বাইবেলের চারটে বই আছে, তার মধ্যে বুক অফ জন্ খুব নামকরা বই। বুক অফ জন্ই সেদিন ক্লাশে স্বামীজী নিয়ে এসেছিলেন। সেখান থেকে স্বামীজী এবার জ্ঞান জিনিসটাকে ব্যাখ্যা করছেন। আমরা কোন জিনিসকে যে জানি বা জানছি, কিভাবে জানছি? জ্ঞান কি, জ্ঞান কিভাবে হয়? জগতের জ্ঞান কিভাবে হয়, ঈশ্বরীয় জ্ঞান কিভাবে হয়? ঈশ্বর দর্শন বলতে কি বোঝায়? ঠাকুর মা কালীর দর্শন পেয়েছিলেন, ঠাকুরের অনেক ভক্ত আছেন যাঁরা জপ-ধ্যান করে, সাধনা করে তাঁরাও ঠাকুর বা মায়ের দর্শন পেয়েছেন। স্বামীজী এই বিষয়গুলোর উপর আলোচনা করতে যাচ্ছেন।

ভারতীয় দর্শনই হোক বা পাশ্চাত্য দর্শনই হোক, প্রত্যেকটি দর্শনে এই জিনিসগুলিকে নিয়ে আলোচনা করা হয়, একটা জিনিসকে আমরা জানি কিভাবে, ইংরাজীতে বলা হয় epistomology। একটা জিনিসকে কিভাবে জানা হয়, এটাই নিজের মধ্যে একটা বিজ্ঞান। বিজ্ঞান বলতে আমরা যেভাবে বুঝি, এই বিজ্ঞান সেইভাবে বিজ্ঞান নয়, কিন্তু দর্শন শাস্ত্রের মতে এটা একটা বিজ্ঞান। আমরা এই পেন দেখছি, আমরা জানি এটা পেন, এর রঙ নীল, শুঁকলে একটু কালির গন্ধ পাওয়া যাবে, হাতে ধরা সহজ, বেশি মোটা হলে ধরতে অসুবিধা হয়। এই যে এতগুলো জ্ঞান এলো, এই জ্ঞান আমাদের মধ্যে কিভাবে আসে? কিংবা আমরা যে ভাল মন্দ বিচার করি, এই বিচার কিভাবে করা হয়? তার সাথে এটাও হয় যে, অনেক কিছু জিনিস আগে আমরা দেখেছি, শুনেছি, তখন হয়ত কিছু বুঝিনি কিন্তু চুপচাপ বসে আছি হঠাৎ মনে হল, ওরা তো এটাই বলছিল, দুম্ করে একটা জ্ঞান জেগে উঠল। রাত্রে ঘুমিয়ে আছি, ঘুমের অবস্থায় কিছু জানলাম। কিংবা বসে বসে কল্পনা করছি, কল্পনায় অনেক কিছু মনে হতে লাগল। সামনে যে জগৎকে দেখছি সেখান থেকে কিছু জ্ঞান পাচ্ছি, পুরনো দিনের কথা মনে করে সেখান থেকে একটা জ্ঞান পাচ্ছি। এত রকমের জ্ঞান আর তার সাথে আরেকটা সত্যিকারের জ্ঞান হল, ঈশ্বর জ্ঞান, যে জ্ঞানের কথা ঠাকুর কথামৃতের পাতায় পাতায় বলছেন। এই জ্ঞান কিভাবে হয়, জ্ঞান বলতে কি বোঝায়, ঈশ্বর জ্ঞান আর বস্তু জ্ঞান, এই দুটোর কি তফাৎ, এই জিনিসগুলোকে নিয়েই স্বামীজী এখন আলোচনা করছেন।

বেদের উপর আধার করে হিন্দুদের ছয়টি মূল দর্শন – এই ছয়টি দর্শন হল, সাংখ্য দর্শন, যোগ দর্শন, ন্যায় দর্শন, বৈশাষিক দর্শন, পূর্বমীমাংসা দর্শন আর উত্তরমীমাংসা দর্শন বা বেদান্ত দর্শন। বেদান্ত দর্শনের আবার তিনটে শাখা, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত এবং দ্বৈত। এই ছয়টি দর্শনকে এক সঙ্গে বলা হয় ষড়দর্শন। পাশ্চাত্য বা ভারতীয় যে কোন দর্শনই হোক না কেন, তাকে আগে epistemology define করতে হবে। আগে আমাকে পরিষ্কার করে পরিভাষিত করে বলে দিতে হবে আমি জিনিসটাকে জানছি কি করে। সেখান থেকে আসবে, আমি যেটা জানলাম সেটা ঠিক না ভুল। এই ভাবে ধীরে ধীরে দর্শন শাস্ত্র এগোয়। যে কোন দর্শন শাস্ত্র পড়লে দেখা যাবে, ওনারা এটাকে নিয়েই আলোচনা করেন, আর নিজের মধ্যে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ বিষয়, এবং খুবই জটিল সাবজেক্ট। হিন্দুরা মোটামুটি তিনটেকে মানেন – ইন্দ্রিয় দিয়ে যা কিছু জানছি, এই জানাটা একটা জ্ঞান। ইন্দ্রিয় দিয়ে যে জ্ঞান পাওয়া গেছে, সেটাকে চিন্তা-ভাবনা করে যুক্তি সহকারে যখন রাখা হয়, সেটাও একটা জ্ঞান। অঙ্ক শেখার আগে কিছু বেসিক জিনিস আমাদের শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেমন সংখ্যা গুলো শিখিয়ে দেওয়া হল, এবার যোগের সময় দুইয়ে দুইয়ে চার হয়, এই প্রসেসটাও শিখিয়ে দেওয়া হল। এরপর চার আর চার কত হবে সেটা আমাদের শেখানো হয়নি, কিন্তু আমরা প্রসেসটা শিখে গেছি, ফলে সেখান থেকে কিছুটা আমার জ্ঞান, কিছুটা অন্য জায়গার জ্ঞান মিলিয়ে তৃতীয় একটা জ্ঞান এসে যায়। এগুলোর আবার আলাদা আলাদা পরিভাষা আছে, যখন ইন্দ্রিয় দিয়ে জ্ঞান হয় তখন তাকে বলা হয় প্রত্যক্ষ প্রমাণ, বিচার করে, যুক্তি দিয়ে যখন কোন জ্ঞানে পৌঁছায় তখন তার টেকনিক্যাল নাম হয় অনুমান প্রমাণ। সমগ্র বিজ্ঞান অনুমান প্রমাণের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে, সব কিছুকে বিচার করেই তারা একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছায়। যেমন ফিজিক্সের দুটো ব্রাঞ্চ, একটা থিয়োরেটিক্যাল ফিজিক্স আরেকটা প্র্যাক্টিক্যাল ফিজিক্স। প্র্যাক্টিক্যাল ফিজিক্স অবজার্ভ করে, কিন্তু অনেক সময় তার কাছে সব কিছু পরিষ্কার হয় না, তখন থিয়োরেটিক্যাল ফিজিক্স বিচার করে বলে দেয় এটা এই রকম। তৃতীয় হল শ্রুতি প্রমাণ বা শব্দ প্রমাণ, এটি আবার খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ। শ্রুতি প্রমাণ হল, শাস্ত্র থেকে ঈশ্বরের ব্যাপারে আমরা যে জ্ঞান পাই। অনুমান প্রমাণে আবার খুব দুটো নামকরা লজিক আসে, Deductive logic and Inductive logic।

Epistemology নিয়ে যখনই কোথাও আলোচনা হয় সেখানে বেশি অংশ চলে যায় এই অনুমান প্রমাণের আলোচনায়, তার কারণ অনুমান প্রমাণে এসে অনেক রকম জটিলতা আসতে শুরু হয়ে যায়। যারা পুরোপুরি ভৌতিকবাদী, পদার্থ শাস্ত্রকেই একমাত্র শাস্ত্র বলে মনে করে, তারা বেদ, কোরান, বাইবেলকে মানবে না। ধর্ম জগতে যাদের বিচরণ তারা শ্রুতি প্রমাণকে খুব বেশি মান্যতা দিয়ে চলে। তাদের কাছে যুক্তি হল, যাঁরা অবতার পুরুষ ছিলেন, প্রফেট ছিলেন, ঋষিরা ছিলেন, এনারা সবাই ছিলেন সম্পূর্ণ ভাবে শুদ্ধ চরিত্রের, তাঁদের মন পবিত্র, শুদ্ধ চরিত্র ও পবিত্র মন দিয়ে ধ্যানের গভীরে যে সত্যগুলো তাঁরা পেয়েছেন, সেই সত্যের ব্যাপারে আমরা কোন প্রশ্ন করতে পারি না। একেবারে প্রাথমিক স্তরে ছাত্রদের বিজ্ঞান পড়ানোর সময় আগেকার বিজ্ঞানীরা যা যা বলেছেন সেগুলোকে সত্য বলে ধরে নিয়ে তাদের এগোতে হয়, ঠিক সেইভাবে আমাদের সত্য মনে করে এগোতে হয়। পরে দেখব জিনিসটা তাই। ফিজিক্সে যে সিদ্ধান্ত দিয়েছে, ল্যাবরটরিতে গিয়ে দেখছি সেই সিদ্ধান্ত ঠিক। কিন্তু আরও এগিয়ে যাওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে অনেক সিদ্ধান্ত মিলছে না। তখন বিজ্ঞান আরেকটু এগিয়ে যায়, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা এভাবেই এগিয়ে গেছে।

এর মধ্যে আরেকটা প্রমাণ আসে, তার নাম উপমান প্রমাণ। উপমান মানে তুলনা করে করে একটা জিনিসকে জানা। দাঁড়িপাল্লাতে ওজন করা হয়, একদিকে দু কিলো বাটখারা রাখা হল, অন্য দিকে দ্রব্য রাখা হল, পাল্লার কাঁটা সমান সমান হয়ে গেল, দু কিলো ওজনের মাল নিয়ে আমরা চলে আসি, আমরা এর বেশি বিচার করতে যাই না। কিন্তু উপমান একটা পরিভাষা, যার অর্থ হল, একটা জিনিসের কিছু আর আরেকটা জিনিসের আরও কিছু জিনিসকে মিলিয়ে জিনিসটাকে জানা। এর খুব সহজ দৃষ্টান্ত হল, একজন প্রথমবার চিড়িয়াখানা দেখতে যাচ্ছে, তার সিংহ দেখার ইচ্ছে, সে কোন দিন সিংহ দেখেনি। আগেকার দিনে ছবিটবিও থাকত না, তাই ওকে বোঝান হল, বেড়াল দেখেছ তো, বেড়ালের মত মুখ, রঙ হলুদ, মনে কর বিরাট আকারের একটা হলুদ রঙের বেড়াল, মুখটা হাড়ির মত। এর কোনটাই সিংহের বর্ণনা নয়। এবার প্রথমে একটা খাঁচার সামনে গিয়ে দেখে বাঘ, ভাবল এটাই বুঝি সিংহ। তারপর মনে হল এটা ঠিক নয়। একটু পরে

হঠাৎ সিংহ দেখতে পেল, যদি এদিকের বর্ণনা ঠিক থাকে তাহলে সিংহ দেখে সঙ্গে সঙ্গে সিংহের জ্ঞান হয়ে যাবে। তাকে কেউ বলে দেয়নি যে এটা সিংহ, সে জানল এটা সিংহ। কিভাবে জানল? আগে সিংহের ব্যাপারে কিছু জ্ঞান ছিল, সেই জ্ঞানের সাথে এই জ্ঞানকে মিলিয়ে নূতন একটা জ্ঞান হল, এটাকে বলে উপমান। উপমানকে ইংরাজীতে যদিও বলা হয় comparison, কিন্তু comparison শব্দটা উপমানের ঠিক শব্দ নয়।

আমরা যা কিছু শিক্ষা পাই, আমাদের সমস্ত বিদ্যা উপমান বিধিতেই আসে। সদ্যোজাত শিশু, আমরা ধরে নিচ্ছি বাচ্চাটি সুস্থ। জন্ম নিয়েই বাচ্চাটি চেঁচাচ্ছে, তাড়াতাড়ি নার্সরা তার মায়ের বুকে মুখ দিয়ে দিল, প্রথম দুগ্ধপান করতে শুরু করল। দু মাস, তিন মাস যেতে ধীরে ধীরে, গন্ধের দ্বারা এবং আরও কিছু জিনিস দিয়ে সে বুঝতে শুরু করল, এটা আমার খাদ্যের উৎস। বাচ্চা এছাড়া আর কিছু বোঝে না, আমাদের অস্তিত্ব এই খাদ্যের উৎস দিয়ে রক্ষিত হয়। তখনও সে মা বলে কিছু জানে না, সে জানে এটা আমার ফুড সোর্স। পেট ভরে গেলে আনন্দে হাত-পা ছুঁড়তে থাকে। এবার থেকে থেকে ওর ভোকাল কর্ডস থেকে আওয়াজ হতে শুরু হল, তখন বাড়ির লোকেরা তাকে ধীরে ধীরে ট্রেনিং দিতে শুরু করল। মা শব্দটার সাথে সে পরিচিত হয়, তখন সে বুঝতে পারে যেটা আমার ফুড সোর্স সেটা আমার মা। কোন মহিলাকে দেখলে মনে করে এ আমার মা, তখন তাকে ট্রেনিং দেওয়া হয়, এ তোমার মা নয়, তোমার দিদা। যার জন্য প্রথম শব্দগুলো সহজ শব্দ হয়। 'মা', 'বা', 'পা', 'দা' শব্দগুলো বাচ্চারা সহজে বলতে পারে। তখন সে বুঝতে শুরু করে যে, এটা হল মা আর ওটা হল দা, দুটোর মধ্যে তফাৎ আছে। দুজনই আমার কাছে আসা যাওয়া করে, কিন্তু একজন আমার ফুড সোর্স, অন্যজন আমার ফুডসোর্স নয়। এইভাবে comparison শুরু হল। এই দুটো জ্ঞান এসে যাওয়ার পর, সেখান থেকে ধীরে ধীরে একটু একটু করে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ জ্ঞান আসতে থাকে আর সেও confused হয়ে যায়। তারপর তাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ শব্দ শেখানো হয়, আন্টি, যেটা একটু পরে শেখে। এখন যাকে দেখবে আন্টি রূপে, সারা জীবন তাকে আন্টিই বলতে থাকবে। যে মা নয়, দিদা নয়, বাকি সব আন্টি। এরপর অঙ্ক শেখানোর সময়েও প্রথম ওই ভাবেই শেখানো হয়, মা এক, মা-বাবা দুই। এবার ধীরে ধীরে সে গুনতে শুরু করে। মা এক যে অর্থে আমরা এক বলি সেই অর্থে নয়, মা-বাবা যে অর্থে দুই বলি সেই অর্থে দুই নয়, কিন্তু বোঝান হয়। এই জিনিসটাকেই সংস্কৃত সাহিত্যে ওনারা নিতেন। যদি এক বলার থাকত তাহলে বলতেন সূর্য। সূর্যের আবার হাজারটা নাম, কিন্তু ওর কোন একটা নাম দিয়ে দিল। আগেকার দিনে যখন গণনা করা হত তখন রাম দিয়ে শুরু করা হত, বলত রামে রাম, এক রাম এক, দো রাম দো। পকেটে কত পয়সা আছে? রাম। মানে এক পয়সাও নেই। পকেটে এক টাকা আছে, এক রাম। রাম মানে শূন্য, কেন রামকে শূন্য বলা হত জানা নেই। এখন যদি বলা হয় পকেটে কত টাকা আছে, বললাম সূর্য। মানে এক টাকা আছে, সূর্য একাই হয়। সংস্কৃতে সাহিত্যে এটাই খুব প্রচলিত একটা পদ্ধতি ছিল। উপমান এভাবে করা হয়। যখনই জ্ঞান আসে সেখানে তখন তিনটে জিনিস জড়িয়ে থাকে।

ঈশ্বর দর্শন বা ঈশ্বর জ্ঞান

শুধু জ্ঞানের ক্ষেত্রেই নয়, যে কোন কার্যের ক্ষেত্রেও তিনটে জিনিস লাগে। এই তিনটে জিনিস হল, কর্তা, কর্ম আর ক্রিয়া। কর্ম এখানে দ্বিতীয়ার অর্থে। ক্রিয়া সম্পর্ক করে কর্তা আর কর্মকে, অর্থাৎ প্রথমা আর দ্বিতীয়াকে। যেটার উপর কাজ হয় সেটা হল কর্ম বা object, মানে দ্বিতীয়া। আমি রুটি খাই, 'আমি' প্রথমা, 'রুটি' দ্বিতীয়া আর খাওয়াটা ক্রিয়া। জানার ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়, সাবজেক্ট থাকতে হবে, যে জানছে; একটা অবজেক্ট থাকতে হবে, যেটাকে জানা হয় আর মাঝখানে নলেজ। জানার ক্ষেত্রে প্রথমা, দ্বিতীয় ও ক্রিয়া না বলে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় আর জ্ঞান বলা হয়। যেহেতু জ্ঞানের জগৎটা একটা আলাদা জগৎ, সেইজন্য এইভাবে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান বলা হয়।

আমরা যে পেনের উদাহরণ দিয়েছিলাম, পেনের ক্ষেত্রে আমি হলাম এই পেনের জ্ঞাতা, পেন হল জ্ঞেয় আর আমি জানলাম এটা পেন, পেনের জ্ঞান হয়ে গেল। কিভাবে জানলাম? পেন এখানে আছে, আলো এসে পেনের উপর পড়ছে, আলোর রিফ্লেকশান আমার চোখে গেল, নার্ভগুলোকে উত্তেজিত করল, সেখান থেকে ব্রেনে গিয়ে নিওরোন গুলিকে সক্রিয় করল, সক্রিয় হয়ে একটা বিচিত্র পদ্ধতিতে, নিওরো বিজ্ঞানীরা এখনও জানেন না এটা কিভাবে হয়, আমরাও জানি না কিভাবে হয়; জেনে গেলাম এটা পেন। আমরা এই পুরো

ক্রিয়াকে নাম দিয়েছি মন, মন জানতে পারল এটা একটা পেন। প্রথম আমরা কিভাবে জানলাম এটা পেন, যে কোন দিন পেন দেখেনি সে কিভাবে জানবে এটা পেন? বাচ্চারা পেন দেখলেই মুখে দেবে, কারণ বাচ্চার কাছে সবটাই ফুড সোর্স, যাই থাকুক, কারণ ওর কাছে সবটাই খাওয়া। বাচ্চা পেনকে মুখে দিতেই মা দৌড়ে এসে বলবে, ওটা মুখে দিতে নেই, ওটা পেন। বাচ্চা কিছুই বুঝতে পারছে না মা কি বলতে চাইছে। অনেক কায়দা করে বোঝাবার পর ও বুঝল এটা দিয়ে লেখা হয়, পেনকে এভাবে টানলে দাগ পড়ে। স্কুলে এখন না হয় শাস্তি দেওয়া বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু আগেকার দিনে কোন ছেলে বদমাইশি করেছে, ধরা পড়ল, শাস্তিও পেল। তুমি এই অন্যায় করেছ, তাই তোমাকে এই শাস্তি দেওয়া হল। কিছু দিন পর দেখা গেল ছেলেটি আবার সেই একই অন্যায় করেছে, ধরাও পড়েছে, আবার তাকে শাস্তি দেওয়া হল। যদি ওকে জিজ্ঞেস করা হয়, তোমাকে না বারণ করা হয়েছিল, তাও তুমি কেন আবার করলে। ও কিন্তু বলবে না যে এই কাজ করাটা অন্যায়, ও মনে করে ধরা পড়ে যাওয়াটা দোষ। পরের বার ওই অন্যায় কাজ করার সময় ওর চেষ্টা থাকে যাতে ধরা না পড়ে। বাচ্চা বয়স থেকে দেখে আসছে যে, মিথ্যা কথা বললে আমি বেঁচে যাই, এবার যদি ও ধরা পড়ে যায়, তখন সে এটা মনে করে না যে মিথ্যা কথা বলা দোষের, দোষ হল ধরে পড়ে যাওয়াটা। সেইজন্য আমাদের learning processটা খুব জটিল।

এবার আমরা নামছি ঈশ্বর দর্শনে। বস্তুগুলিকে আমরা যেভাবে জানি, এই যে বলা হল পেন কিভাবে উপমার মাধ্যমে এসেছে, আর কিভাবে আমরা পুরো জিনিসটা জানি। এই জগৎকে আমরা এভাবেই জানছি, সেইজন্য আমরা মনে করি ঈশ্বরকেও আমাদের এভাবেই জানতে হবে। কিছুতেই এই জিনিসটাকে সাধারণ মানুষদের মন থেকে সরানো যাবে না। এই পেনকে জানার জন্য একটা পেনের দরকার, আলো দরকার, ইন্দ্রিয়ের দরকার, মনের দরকার। খুব সংক্ষেপে মনের দরকার, যে জানছে, মন হল জ্ঞাতা, পেন হল জ্ঞেয়, আর পুরো পদ্ধতি, ওই পদ্ধতির মধ্যে আলো থাকুক বা যাই থাকুক, এর শব্দটা হল জ্ঞান, একটা জিনিসকে জানার জন্য এই তিনটে জিনিস, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় আর জ্ঞান দরকার। হিন্দুরা জন্মান্তরবাদকে মানে, এই জ্ঞাতা, জ্ঞেয় আর জ্ঞান, এই ধারণাটা জন্মজন্মান্তর ধরে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলে আসছে। যত দিন না আমাদের মুক্তি হয়ে যাচ্ছে ততদিন জ্ঞাতা, জ্ঞেয় আর জ্ঞান চলতে থাকবে। তার মানে এই তিনটে জিনিসকে আমরা জন্ম জন্মান্তর ধরে বহন করে চলেছি। যেমনি ঠাকুর বললেন, ঈশ্বর দর্শন বা ঈশ্বর জ্ঞান, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এতদিনের যে জ্ঞান সেটা বেরিয়ে আসে, জ্ঞাতা জ্ঞেয় আর জ্ঞান। জ্ঞাতা আমি, জ্ঞেয় কে? ইষ্ট বা ঠাকুর। আর জ্ঞান কি? ঈশ্বরকে জানা। কিছুতেই মানুষকে এর থেকে বার করা যাবে না যে, ঠাকুর বা ঈশ্বর কোন বস্তু নয় যে তিনি এসে তোমার সামনে দাঁড়াবেন। তিনি বস্তু নন, তিনি জ্ঞেয় নন।

তাহলে ঈশ্বরকে কিভাবে জানা যায়? কারণ ঈশ্বরই হলেন একমাত্র জ্ঞাতা। আমাদের ভিতরে যিনি আত্মা, আমাদের ভিতরে যিনি শুদ্ধ চৈতন্য, তিনিই একমাত্র জ্ঞাতা, আত্মা যিনি তিনিই ঈশ্বর। তার মানে জ্ঞাতা আর জ্ঞেয় এই দুটি জিনিস আলাদা কিছু নয়। ঈশ্বর জ্ঞানে জ্ঞাতা আর জ্ঞেয় থাকে না। জ্ঞাতা আর জ্ঞেয় নেই, সেইজন্য জ্ঞান থাকে না, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় আর জ্ঞান এই তিনটে মিলে এক হয়ে যায়। কথামৃতে এই কথা অনেকবার এসেছে, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় আর জ্ঞান এক, ধ্যাতা, ধেয় আর ধ্যান এক। যতক্ষণ মনে হবে আমি ধ্যান করছি, ততক্ষণ বুঝতে হবে যে ধ্যান হচ্ছে না। ধ্যান তখনই হবে, যখন ধ্যাতা, ধেয় আর ধ্যান এই তিনটে এক হয়ে যাবে। যোগশাস্ত্রে প্রথমে বলছেন, যোগ হল চিত্তবৃত্তি নিরোধ। বৃত্তি নিরোধ হলে কি হয়? *তদাদ্রষ্টু স্বরূপে অবস্থানম্*, দ্রষ্টা যিনি, যিনি চেষ্টা করছেন, তিনি নিজের স্বরূপে অবস্থান করেন, মানে ধ্যাতা, ধেয় ও ধ্যান এই তিনটে জিনিসের আলাদা আলাদা অস্তিত্ব মিটে যায়। জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান এই তিনটেও মিটে যায়। তার মানে, যতক্ষণ আমার এই বোধ হচ্ছে যে, আমি জানছি, তাহলে আমি জানছি না। যে বলছে, আমি তোমাকে ভালবাসি, তার মানে তুমি ভালবাস না। ভালবাসা মানেই হল, আমি আছি, তুমি আছো, আমাকে আর তোমাকে যেটা সংযুক্ত করছে, সেই সংযুক্তিটা আছে। ঠিক ঠিক ভালবাসাতে তিনটে এক হয়ে যায়। আমি কি আমার হাতকে ভালবাসি? কখনই না। আমিই আমার হাত। সন্তান যখন মায়ের গর্ভে তখন সে মায়ের অঙ্গ। আর সন্তান যখন মায়ের গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসে তখনও সে মায়ের অঙ্গ। মা কি করে বলবে, আমি আমার সন্তানকে ভালবাসি, দুজন তো এক। বর্তমান কালের মায়েরা হয়ে গেছে অন্তঃসারশূন্য, নিজের স্বার্থ ছাড়া কিছু

জানে না, বোঝে না, তারাও আজকাল ছেলেকে মেয়েকে বলে, মাম্মা লাভস্। কাকে তুমি লাভস্ বলছ, ওটা তো তুমিই, তুমি আর তোমার সন্তান কি আলাদা!

ঈশ্বর-জ্ঞানের ক্ষেত্রে একই জিনিস হয়। আর তার সাথে, আমি কখন নিজেকে জানতে পারি না। *বিজ্ঞাতামরে কেন বিজানিয়াৎ*, যিনি জ্ঞাতা, যিনি সব কিছু জানেন, তাঁকে আমরা কিভাবে জানব! এই চোখ সমস্ত জগৎকে দেখে নিতে পারে, কিন্তু চোখ চোখকে দেখতে পায় না। এটাকেই সংস্কৃতে খুব সুন্দর বলা হয়, *স্বক্রিয়া অভাবঃ*, নিজের উপর কোন ক্রিয়া হয় না। কোন জিনিস নিজের উপর ক্রিয়া করতে পারে না। আমার ডান হাত যে কোন জিনিসকে ধরে নেবে, কিন্তু ডান হাত নিজেকে কোন দিন ধরতে পারবে না। তেমনি আমি সবাইকে জানতে পারি, কিন্তু নিজেকে কোন দিন জানতে পারব না। কেন জানতে পারব না? আমি তো নিজেকে আয়নাতে দেখতে পাই। কিন্তু না, আমি আয়নাতে নিজেকে দেখি না, আমি আমার প্রতিবিম্বকে দেখি। গীতাতে যে ভগবান বলছেন, আত্মাকে কেউ মারতে পারে না, কিন্তু ভগবান তো সবই পারেন, আত্মাকে মারতে পারবেন না কেন? না, আত্মাকে ভগবানও মারতে পারবেন না, কারণ *স্বক্রিয়া অভাবঃ*, নিজের উপর ক্রিয়া হয় না। আত্মা আর ঈশ্বর এক, সেইজন্য আত্মাকে ঈশ্বরও মারতে পারবেন না। সেইজন্য বলছেন, আত্মা অজর, অমর, অব্যয়।

এবার স্বামীজী বলছেন, Knowing is only relative; we can be God, but never know Him. (*জ্ঞান আপেক্ষিক মাত্র। আমরা ঈশ্বর হতে পারি, কিন্তু তাঁকে কখনই জানতে পারি না।*) খুব মূল্যবান কথা। আমি ঈশ্বরের সাথে এক হতে পারি, কিন্তু ঈশ্বরকে কোন দিন জানতে পারব না। ঈশ্বরকে তাহলে কিভাবে জানা যাবে? ঈশ্বরকে কি কখন জানা যাবে না? হ্যাঁ জানা যাবে, যখন তুমি ঈশ্বরের সাথে এক হয়ে যাবে। ঈশ্বরের সাথে এক না হওয়া পর্যন্ত ঈশ্বরকে জানা যাবে না। স্বামীজীর খুব নামকরা কথা – We can be God, but never know Him। আমি আপনি কোন দিন ঈশ্বরকে দর্শন করতে পারব না, ঈশ্বর হতে পারি। কেন দর্শন করতে পারব না, ঠাকুর তো মা কালীর দর্শন করেছিলেন? স্বামী সারদানন্দের রচিত ঠাকুরের নির্ভরযোগ্য জীবনীগ্রন্থ লীলাপ্রসঙ্গ পড়লে বোঝা যাবে, ঠাকুর কোন মা কালীকে দেখেননি। ঠাকুর অনুভব করেছিলেন যে, শুধু চৈতন্য, চৈতন্যই আছে। ওখান থেকে তাঁর মন একটু নীচে নেমে আসার পর তাঁর মন বলছে, মা আছেন, তখন দেখছেন সামনে মা কালীর মুখ। কিন্তু আসল যে জ্ঞান হয়, সেটা অন্য ধরণের, ওই জায়গায় গিয়ে তাঁর আমিত্বটা হারিয়ে যায়। আমরা যেটা দেখি বা সাধকরা দেখেন, সেখানে তাঁরা ঈশ্বরের রূপ দেখেন, আসল যে ঈশ্বর তাঁকে কোন দিন দেখা যাবে না, কিন্তু ঈশ্বর হওয়া যাবে।

বেদান্তের দৃষ্টিতে স্বামীজীর আদম ও ঈভের কাহিনীর ব্যাখ্যা

স্বামীজী বলছেন, Knowledge is a lower state; Adam's fall was when he came to 'know'. (*জ্ঞান একটা নিম্নতর অবস্থামাত্র। তোমাদের বাইবেলেও আছে, আদম যখন 'জ্ঞান লাভ' করলেন, তখনই তাঁর পতন হল।*) জ্ঞান অনেক নীচে। আদম আর ঈভের গল্প আমরা অনেকেই জানি।

এই জায়গাতে আমাদের একটু আলোচনার দরকার। এর আগেও আমরা বিস্তারিতে আলোচনা করেছি, জুদাইজিম, খ্রীশ্চানিটি আর ইসলাম এই তিনটে ধর্মকে বলে এ্যব্রাহামিক ধর্ম। সৃষ্টির ব্যাপারে এই তিনটে ধর্মই বলে, সৃষ্টির আগে স্বর্গ ছিল, সেখানে শুধু ভগবানই ছিলেন। ওই সৃষ্টিতে সব কিছু ছিল, কিন্তু সেটা ছিল স্বর্গ। সেখানে ছিল আদম আর ঈভ, নারী ও পুরুষ, আর সেখানে ছিল এক বৃক্ষ, যেটাকে আপেল গাছ বলছে, তার নাম Tree of knowledge। ভগবান আদম আর ঈভকে বলে দিলেন, তোমরা এখানে যা খুশি কর কিন্তু এই বৃক্ষের ফল কখন খাবে না। ওখানে একটা সাপ থাকত, সেই সাপ আদম আর ঈভকে দুর্বুদ্ধি দিল, আরে তোমরা একটা আপেল খেয়ে নাও না, কিছু হবে না। ওরা আপেল খেয়েছে, যেমনি আপেল খেল আদম জেনে গেল যে সে পুরুষ আর ঈভ জানল সে নারী। নিজেদের নারী ও পুরুষ রূপে জানার সাথে সাথে তাদের মধ্যে লজ্জার ভাব এসে গেল। ভগবান তাদের দুজনকে দেখেই বুঝতে পারলেন, ওদের মুখে চোখে আগের সেই ঔজ্জ্বলতা নেই, স্বচ্ছতা নেই। তিনি বুঝে নিলেন যে, এরা নিষিদ্ধ ফল খেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এদের দুজনকে স্বর্গ থেকে বার করে দিলেন। আদম আর ঈভ কাঁদতে কাঁদতে স্বর্গ থেকে বেরিয়ে গেল।

এটা একটা আখ্যায়িকা, এই ধরণের প্রচুর কাহিনী পুরাণেও পাওয়া যাবে। এই ধরণের মিথোলজি যেখানে থাকে, আমরা যাকে পৌরাণিক বলি, সেখানে তাঁদের উদ্দেশ্য হয়, খুব উচ্চমানের আধ্যাত্মিক সত্য, যে সত্যকে সাধারণ মানুষ ধারণা করতে পারবে না, সেই সত্যকে বোঝানর জন্য এই ধরণের কাহিনী তৈরী হয়। গল্প অনেক রকমের থাকে, একটা বড় গল্প থাকে, ছোটবেলায় আমরা রামের সুমতি পড়েছি, এগুলো মডেল স্টোরি। আধ্যাত্মিক সত্যকে কেন্দ্র করে, আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিতরণের জন্য যে কাহিনী তৈরী হয়, তাকে পৌরাণিক কাহিনী বলা হয়। ইংরাজীতে যদিও পৌরাণিককে বলছে মিথলজি, কিন্তু মিথলজি শব্দটা ঠিক নয়। কারণ মিথলজিতে পাশ্চাত্যে এমন এমন সব গল্প নেওয়া হয়, যেখানে কোন আধ্যাত্মিক সত্য থাকে না। যেমন গ্রীক মিথলজি, খুব নামকরা সব মিথলজি, গ্রীক দেশের যত দেবী-দেবতা আছেন, সেখানে তাঁদের কাহিনীগুলো বলা হয়। কিন্তু আমাদের এখানে মিথলজি অন্য রকম; যে আধ্যাত্মিক সত্যগুলিকে সাধারণ মন সহজ ভাষায় গ্রহণ করতে পারে না, সেই সত্যগুলিকে সাধারণ মানুষদের মধ্যে সহজ ভাবে ধারণা করানোর জন্য একটা আখ্যায়িকা তৈরী করা হয়, তাকেই আমরা পৌরাণিক কাহিনী বলি।

আদম আর ঈভের স্বর্গ থেকে পতনকে দু ভাবে দেখা হয়। জুহুদিরা দেখে, ভগবান আদম আর ঈভকে স্বর্গের ফল খেতে নিষেধ করেছিলেন, তারা ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করে ফল খেল, যার জন্য তাদের স্বর্গ থেকে নিষ্কাশিত করে দেওয়া হল। এটা তাদের একটা দোষ, তার এই দোষ করেছিল। খ্রীশ্চনরা এটাকে নিয়ে চলে গেল আদি পাপে, এটা একটা পাপ কাজ, সেখান থেকে আমরা হয়ে গেলাম জন্ম থেকেই পাপী। আদি পাপের কথা শুনে শুনে খ্রীশ্চানরা এত বীতশ্রদ্ধ হয়ে গেছে, সব এখন খ্রীশ্চান ধর্ম ছাড়তে শুরু করেছে। মুসলমানরা এটাকে বলে গাফলা, গাফলা মানে mistake। ওরা এটাকে আরও হাল্কা ভাবে নিয়েছে, কিন্তু তিনজনই মনে করে আমাদের শুরু ওই আদম আর ঈভ স্বর্গের ফল খাওয়ার জন্য। এর ব্যাখ্যাটা কেউ দিতে পারে না, এর ব্যাখ্যা একমাত্র বেদান্তই দিতে পারে। বেদান্ত মতে knowledge is absolute and undivided, যেটা একটু আগে বলা হয়, যেখানে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় আর জ্ঞান এক। কিন্তু যেমনি জ্ঞাতা, জ্ঞেয় আর জ্ঞান আলাদা হয়ে গেল, তেমনি এই জ্ঞানটা relative হয়ে গেল। Relative জ্ঞান মানে, মায়ার জগৎ এসে গেল, তার মানে সৃষ্টির মধ্যে ঢুকে গেল, সংসারের মধ্যে প্রবেশ করে গেল। তার মানে জগৎ দুটো হয়ে গেল, একটা এই অখণ্ডের জগৎ, আরেকটা প্রকৃতির জগৎ। অখণ্ডের জগতে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান এক, একও বলা যাবে না, কারণ তিনটেই মিলে গেছে, এক বলার জন্য সেখানে কেউ নেই। যেমনি তিনটে আলাদা হয়ে গেল, তেমনি মায়ার বিভাজন রেখা এসে গেল, আমরা যাকে প্রকৃতি বলি, আমরা যেটাকে কাল বলি। মূল কথা, আমরা যে জগৎ দেখছি, যেভাবেই জগতের অনুভব হয়ে থাকুক, আর সে যত রকমের জগৎই হোক, দেবতাদের জগৎ হোক, ব্রহ্মার জগৎ হোক, মানুষের জগৎ হোক, সমস্ত জগতে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান এই তিনটে আলাদা। আচার্য শঙ্কর তাঁর খুব নামকরা ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে বলছেন, যুস্মৎ প্রত্যয় অস্মৎ প্রত্যয়, জগতে আমি তুমি বিভেদ সব সময় থাকবে। একটা যে গরু, সেও জানে আমি আলাদা ঘাস আলাদা। একটা পাখিও জানে, আমি আলাদা আর এটা আমার খাদ্য। যেখানেই এই যুস্মৎ প্রত্যয় আর অস্মৎ প্রত্যয় থাকবে সেখানেই মায়া, সেখানেই প্রকৃতি, সেখানেই সৃষ্টি।

আদম আর ঈভ যতদিন ঈশ্বরের কাছে ছিল ততদিন তাদের এই জ্ঞানের বিভেদ ছিল না। যেদিন Tree of knowledgeএর ফল খেয়ে নিল, তার মানে যেদিন relative knowledge এলো, ওরা জেনে গেল আমি পুরুষ সে নারী, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় আর জ্ঞান এসে গেল। জ্ঞাতা, জ্ঞেয় আর জ্ঞান এসে গেল মানেই, তুমি এখন আর absolute নও। এটাকেই আমরা প্রকৃতি বলি, এটাকেই আমরা মায়া বলি। যদিও স্বামীজী এভাবেই জিনিসটাকে বলেছেন, কিন্তু জুইসরা এটাকে কখনই মানবে না। জুইসরা আদম আর ঈভের ঘটনাকে একেবারে আক্ষরিক অর্থেই নেয়, আদম আর ঈভ স্বর্গে ছিল, ভগবানের আদেশ পালন করেনি, সেইজন্য তাদের স্বর্গ থেকে বার করে দেওয়া হল। আমাদের কাছে এগুলোর কোন দাম নেই। আদম আর ঈভ স্বর্গে ঈশ্বরের সাথে এক ছিল, তার মানে তখন জ্ঞাতা, জ্ঞেয় আর জ্ঞান এক ছিল। যেমনি তাদের এই বোধ এসে গেল, যে কোন বোধ যদি এসে যায়, যাতে আমি তুমির বিভেদটা স্পষ্ট ভাবে বোধ হয়, সেখান থেকেই সৃষ্টি শুরু হয়ে যায়।

স্বামীজী খ্রীশ্চান পরম্পরাকে আধার করে ব্যবহারিক জগতের কথা বলছেন; ব্যবহারিক মানে ব্যবহার কালে। আচার্য শঙ্কর উপনিষদ, গীতার ভাষ্যে পরম সত্যকে বলছেন পরমার্থ, পারমার্থিকতার শেষ কথা আত্মা ও ব্রহ্মের ঐক্য। কিন্তু সৃষ্টি যখন আসে তখন এই কথাগুলো চলে না, তখন ঈশ্বর আলাদা, জগৎ আলাদা, আমি আলাদা। খুব প্রচলিত একটা কথা আছে, অহং ব্রহ্মাস্মি, অহং ব্রহ্মাস্মি এটা পারমার্থিক সত্য, আমিটাকে যদি সরিয়ে দেওয়া হয়, আমি বলতে যেটা বোঝা যায়, শরীর, মন, চিন্তন, বুদ্ধি, সবটাই যদি সরিয়ে দেওয়া হয়, তখন সে ব্রহ্মের সাথে এক হয়ে যায়। সেটা হল Absolute, কিন্তু relative যেটা, relative মানে ব্যবহার, সেখানে সত্যটা অন্য রকম হয়ে যায়, সেটাকে বলে ব্যবহারিক সত্তা। জাগতিক যা কিছু আমাদের সব সময় চলছে, সব ব্যবহারিক সত্তাতেই চলে। আমরা যে ঈশ্বরকে মানছি, সেখানেও আমরা ব্যবহারিক সত্তাতেই মানি। শাস্ত্র অধ্যয়ন, সাধনা ব্যবহারিক সত্তাতেই চলে। যিনি একবার পরমার্থ দর্শন করে নিয়েছেন, সেখানে ঈশ্বরও থাকে না, ঠাকুর বলছেন, রূপ-টুপ সব উড়ে যায়। বেদ-বেদান্ত কোন শাস্ত্রই আর সেখানে চলে না, কোন আচার, বিধি থাকে না, সব খসে পড়ে যায়। সেটা যে একটা পিওর স্টেট সেটাও আমরা বলতে পারি না, কারণ পিওর বললেই আমাদের মনে ইমপিওর ভাবটাও ভেসে উঠবে। পবিত্রের ধারণা যার আছে তার অপবিত্রের ধারণাও থাকবে, দিনের আইডিয়া থাকলে রাতের আইডিয়াও থাকবে। ভালর সাথে মন্দের আইডিয়াও থাকবে। সেইজন্য ঈশ্বরকে ভাল বলতে পারি না, তিনি ভাল-মন্দের পারে, পাপ-পূণ্যের পারে, দ্বন্দ্বাত্মক যা কিছু আমরা জানি, যার অন্য শব্দ আছে, তিনি তার পারে। শুদ্ধ বা পবিত্র যখন বলছি, আত্মা শুদ্ধ পবিত্র, ব্রহ্ম শুদ্ধ পবিত্র, তখন আমরা যে অর্থে পবিত্রকে বুঝি, সেই অর্থে পবিত্র নয়। পবিত্র মানে হল, পবিত্র-অপবিত্রের পারে। ঈশ্বরকে সত্য বলা হয়, আমরা যে অর্থে সমাজে সত্য বুঝি সেই অর্থে নয়, তিনি সত্য-মিথ্যার ঊর্ধ্বে। চিন্তা-ভাবনা যেমনি এসে গেল, মন যেমনি এসে গেল, তখন এগুলো সব আলাদা হয়ে যায়, ভাল-মন্দ আলাদা হয়ে যায়, সত্য-মিথ্যা আলাদা হয়ে যায়, ধর্ম-অধর্ম, পাপ-পূণ্য, শুদ্ধ-অশুদ্ধ, সুখ-দুঃখ, জীবন-মৃত্যু সব আলাদা হয়ে যায়।

বাইবেলে যে জায়গায় বলছেন, আদম আর ঈভ যখন স্বর্গে ছিল, সেটা ছিল সেই পবিত্র অবস্থা, যেখানে ভাল নেই, মন্দ নেই, যেখানে সুখও নেই, দুঃখও নেই, আছে শুধু অস্তিত্ব। সেই জায়গার বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন, Before that he was God, he was truth, he was purity. (*তার পূর্বে তিনি স্বয়ং ঈশ্বরস্বরূপ, সত্যস্বরূপ, পবিত্রতাস্বরূপ ছিলেন।*) He was God মানে আদমের কথা বলা হচ্ছে, ঈশ্বরের সাথে এক কিনা। সেইজন্য বলছেন He was God। তখন তার মনে কোন ধরণের জাগতিক চিন্তা নেই। হিন্দু ধর্মে মোটামুটি দুই ধরণের সাধনার কথা বলা হয়, একটাকে বলে ভক্তিমার্গের সাধনা, আরেকটাকে বলে জ্ঞানমার্গের সাধনা। জ্ঞানমার্গের সাধনা হল আচার্য শঙ্কর যে শিক্ষা আমাদের দিয়েছেন, আর উপনিষদে যে কথা বলা হয়, যার শেষ কথা – আমি সেই ব্রহ্ম, আমার মধ্যে কোন অশুদ্ধি নেই। কিন্তু ভক্তিমার্গে, যাকে দ্বৈতমার্গের সাধনা বলা হয়, তাতে একজন ইষ্টকে নিয়ে সাধনা করা হয়। কেউ বিষ্ণুকে ইষ্ট রূপে মনে করে সাধনা করে, কেউ মা কালীকে ইষ্ট মনে করে সাধনা করে, কেউ শিবকে ইষ্ট মেনে সাধনা করে। ওই সাধনা করে যাঁরা এই মার্গের শেষ অবস্থায় যখন চলে যান, তখন শিবের ভক্ত বলেন তিনি শিবলোকে চলে যাবেন, বিষ্ণুর ভক্তরা বলেন, তাঁরা বিষ্ণুলোকে বা বৈকুণ্ঠধামে চলে যাবেন। শিবলোক বা বৈকুণ্ঠলোকে চলে যাওয়া যা, ঈশ্বরের সাথে এক হয়ে যাওয়াও তাই। তখন ওনারা ভক্তির তারতম্যকে আধার করে ভক্তের বিভিন্ন অবস্থার কথা বলেন, সালোক্য, সামীপ্য, সাযুজ্য ইত্যাদি। এগুলো শব্দ মাত্র, কেউ দেখেনি, কেউ জানে না, আর কিছু বোঝাও যায় না। মূল কথা হল যিনি বৈকুণ্ঠধামে এসে গেলেন তিনি ঈশ্বরের সাথে এক হয়ে গেলেন।

খ্রীশ্চান, মুসলিম, জুহুদিদের যে স্বর্গ, সেই স্বর্গের কথা ওল্ড টেস্টামেন্ট বাইবেলে বলা আছে। তারা বলে, স্বর্গে আদম আর ঈভ ছিল, তারা জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়ার জন্য স্বর্গ থেকে বহিষ্কৃত হয়ে গেল। তার আগে পর্যন্ত তারা পবিত্র, অপবিত্র, ভাল-মন্দের পারে অবস্থান করছিল। এটাই স্বামীজী বলছেন, Before that he was God, he was truth, he was purity, এখানে truth বলতে আমরা সত্যবাদী বলতে যে অর্থে মনে করি, সেই সত্যবাদী নয়, এর অর্থ হয় অস্তিত্ব, ও আছে, আছে ছাড়া ওর ব্যাপারে আর কিছু বলা যায় না, অস্তি মাত্রম্ বা সত্তা মাত্রম্। অধ্যাত্ম রামায়ণে খুব সুন্দর বলছেন, সূর্যে যারা বাস করে তাদের কাছে দিন আর রাতের কোন ধারণাই নেই। পৃথিবীলোক থেকে কেউ যদি সূর্যলোকে পৌঁছে যায়, জিজ্ঞেস করবে, ভাই

তোমাদের এখানে সব সময়ই কি দিন থাকে। সূর্যলোকের বাসিন্দারা কোন উত্তর দিতে পারবে না, ওরা জানেই না দিন জিনিসটা কি। কারণ দিন মানেই রাত থাকতে হবে, রাত না হলে দিন কি বস্তু বোঝা যাবে না। মন্দ না হলে ভাল বোঝা যাবে না। ঠিক তেমনি ঈশ্বরের ব্যাপারে যখন আমরা truth বলছি, সেখানে দুই নেই, সত্য ও মিথ্যা কোনটাই নেই। গান্ধীজী সত্যের অনুশীলন করেছিলেন, কারণ তাঁর মনে মিথ্যার বোধটা ছিল। যেখানে মিথ্যার বোধ আছে, সেখানে সত্যের অনুশীলন করা হয়। যেখানে হিংসার বোধ আছে সেখানে অহিংসার অনুশীলন করা হয়। কিন্তু যার মধ্যে কোন অহিংসার বোধ নেই, যেমন একটা তিন মাসের শিশু, আমরা কি বলব, ও এখন অহিংসার অনুশীলন করছে? ওর হিংসার বোধই নেই। যার হিংসার বোধই নেই, তার কাছে কিসের হিংসা আর কিসের অহিংসা। যাঁর আত্মজ্ঞান হয়ে গেছে, তিনি এই অবস্থায় থাকেন। স্বামীজী আদম আর ঈভের কাহিনীকে এই দৃষ্টির আলোকে ব্যাখ্যা করে দিলেন।

আনন্দই ভালবাসা, ভালবাসাই আনন্দ

তার সাথে বলছেন, We are our own faces, but can see only a reflection, never the real thing. (*আমাদের মুখ আমাদের থেকে কিছু পৃথক পদার্থ নয়, কিন্তু আমরা কখনও আসল মুখটা দেখতে পাই না, শুধু প্রতিবিম্বটাই দেখতে পাই।*) স্বামীজীর প্রথম ক্লাশের আলোচনায় আমরা স্বক্রিয় অভাবকে নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। স্বক্রিয়ার অভাব মানে, নিজের উপর ক্রিয়া হয় না, নিজের ডান হাত দিয়ে নিজের ডান হাতকে ধরা যায় না। ঠিক তেমনি আমাদের চেহারা আছে, কিন্তু কোন দিন আমাদের চেহারাকে দেখতে পারব না। আমরা আমাদের চেহারার প্রতিবিম্বটুকুই দেখতে পাই। এটা খুবই সাধারণ মানের সত্য, কিন্তু যেটা অত্যন্ত সাধারণ জিনিস, কিন্তু মৌলিক সত্য, মানুষ সেটাকে ধরতে পারে না। আমি যেটা, আমি সেটাকে কোন দিন জানতে পারি না। জানতে গেলে, যেমনি আমি আমাকে জানার চেষ্টা করছি, তখনই যে 'আমি'কে আমি জানতে যাচ্ছি দুটো আলাদা হয়ে যায়। এই দুটো কখন আলাদা হতে পারে না, সেইজন্য জানা জিনিসটা হতে পারে না। এই জিনিসটাকেই স্বামীজী এবার বলছেন, We are love।

শাস্ত্রে যেখানে ঈশ্বরের বর্ণনা করা হয় সেখানে বলা হয়, তিনি সৎ, চিৎ ও আনন্দ – তিনি সৎ, সর্বাবস্থায় আছেন, সৎ মানে সত্য নয়, সৎ মানে তাঁর অস্তিত্ব সব সময়ই আছে। তিনি চিৎ, সব সময় তিনি চৈতন্যস্বরূপ। তিনি আনন্দ, সব সময় তিনি আনন্দস্বরূপ। যখন বলছেন, সত্যং শিবং সুন্দরম্ তখন একই জিনিস বলা হয়। এই যে আনন্দ, এটাই ভালবাসা। আদম আর ঈভের ক্ষেত্র যেমন বলা হল, আমাদের পতন হয়ে যাওয়ার আগে আমরা ঈশ্বরের সাথে এক, আমরা সবাই ভালবাসার মূর্তরূপ। কিন্তু আমরা এটা ভুলে যাই। একটু বিচার করে দেখলে মনে হবে, সত্যিই কি আশ্চর্য, বাস্তবে আমরা ঈশ্বরের সাথে এক, ঈশ্বরের সন্তান, কোন না কোন ভাবে আমরে ঈশ্বরের সাথে জড়িয়ে আছি। কিন্তু আমাদের সব সময় মনে হয়, অমুক দিন আমার জন্ম হয়েছে, কিছু দিন পর মারা যাব। মরে যাওয়াটা হয়ত ভাবে না, কিন্তু সবাইকে মরতে দেখে, চোখের জল ফেলে, কত কি হয়। অথচ আমাদের শাস্ত্রে পাতায় পাতায় বলে যাচ্ছেন, তোমরা ঈশ্বরের সন্তান। আমরা এখানে এতজন বসে আছি, বেশির ভাগই আমরা বেলুড় মঠ থেকে দীক্ষা নিয়েছি, আর গুরুও বলে দিয়েছেন, নিজেকে ঠাকুরের সন্তান রূপে ভাবতে। কখন কি ভাবি আমি ঠাকুরের সন্তান, কখন না হলে কদাচিৎ হয়ত ভাবি যে আমরা ঠাকুরের সন্তান। আমি যদি ভাবি আমি ঠাকুরের সন্তান, তাহলে বাবা-মা কেউ মারা গেলে আমরা কেন চোখের জল ফেলছি, আমার বাবা-মাও তো ঠাকুরের সন্তান। মরে গিয়ে কোথায় যাবেন? তিনিও তো ঠাকুরের কাছেই যাচ্ছেন, ঠাকুরের সত্তাতেই আছেন। শুধু তাই না, তাঁদের বয়স হয়েছে, ভাল জীবন-যাপন করেছেন। এবার মৃত্যুর পর অন্য লোকে যাবেন, সেখানে আরও ভাল সুখ পাবেন, এটা তো আনন্দের কথা। শোক এই জন্য হতে পারে, ওনার সাথে কথা বলতাম, আর কথা বলতে পারব না, এটা একটা বিরাট ক্ষতি। কিন্তু ওনার জন্য এই মৃত্যুটা কোন ক্ষতিই নেই, বরঞ্চ একটা ভাল শরীর নিয়ে আনন্দ করবেন।

ইদানিং ফেসবুকের দৌলতে কি সব কি সব শব্দ সবাই ব্যবহার করছে কল্পনাই করা যায় না। অনেকে লিখছে আরআইপি, যারা লিখছে তারা নিজেরাও জানেও না কি লিখছে। আরআইপি ফ্রেঞ্চ শব্দ, অর্থ হল, শান্তিতে বাস কর। ইংরাজীতে লিখবে, May his soul rest in peace। এগুলো খ্রীশ্চান কালচার, খ্রীশ্চানদের ধারণা হল, তোমার সোলকে টেনে নেওয়া হচ্ছে, এবার তাকে মেরে মেরে শুদ্ধ করবে, সেইজন্য

বলছে শান্তিতে থাকুক। কিন্তু হিন্দুদের এই নিয়ে কোন সমস্যাই নেই। জীবন-যাপন যদি ভাল ভাবে করে থাকে তাহলে একটা ভাল স্বর্গে যাবে, সেখান থেকে আবার নামবে, এরপর আবার আরও উপরে যাবে। বদমাইশি করলে কিছু দিনের জন্য নরকে যাবে, সেটাও তোমার অস্থায়ী। তোমার বাবা-মা খ্রীশ্চান না, তোমার ঠাকুর্দা খ্রীশ্চান না, হঠাৎ তোমার May his soul rest in peace কোথা থেকে এসে গেল? এগুলো হল অজ্ঞতাপ্রসুত নীচু মনের চিন্তা-ভাবনা, কোন জ্ঞান নেই। ভাল মানুষ, বয়স হয়েছে, মারা গেল, এবার তো আনন্দ করারই কথা, উত্তম লোকে ভাল একটা শরীর নিয়ে অনেক বেশি সুখ ভোগ করবে। আর দুষ্ট বদমাইশ লোক মরলেও আনন্দ, জগতের শান্তি। উভয় দিকেই শান্তি, ভাল মানুষ হলে মৃত্যু ওর জন্য ভাল, দুষ্ট লোক থাকলে জগতের জন্য ভাল, দুটোতেই আনন্দ। বৈষ্ণবদের রীতিতেই আছে কেউ মারা গেলে খোল করতাল নিয়ে হরিনাম করতে করতে শ্মশানে নিয়ে যাবে। এটাই আমাদের প্রথা, প্রথার পিছনে মূল ভাব হল, আমি সৎ, আমার নাশ হয় না। সেমেটিক ধর্মের যারা, মৃত্যুর পর তারা সবাই কবরে পড়ে থাকবে, তারপর কত বছর পর ভগবান আসবেন, সবাইকে কবর থেকে বার করে আনা হবে, বিচার হবে, বিচারে কাউকে চিরদিনের জন্য জাহান্নমে, কাউকে স্বর্গে পাঠাবে। আমাদের এসবের কোন সমস্যা নেই।

আমরা আর চৈতন্যের দিকে গেলাম না, আনন্দকে নিয়ে বলা হচ্ছে। ঠাকুরের কথামৃতে, হিন্দুদের প্রতিটি মূল শাস্ত্রে বারবার এক কথা বলে যাচ্ছেন, তুমি ঈশ্বরের সন্তান, তুমি অমৃতের সন্তান, তুমি সেই নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা। তার মানে আমাদের ভিতরেই আনন্দের অনন্ত সাগর। তাও না, আনন্দ আমার ভিতরে নেই, আমিই আনন্দ। আর আমরা কি করছি, অশান্তি, উদ্বেগের জন্য রাত্রে ঘুম হয় না, রোজ ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোতে হয়। জীবনে হতাশা, অশান্তি বেশি হলে মানুষ গলায় দড়ি দিয়ে দিচ্ছে। ভাবছে আমার জীবন থেকে সব আনন্দ হারিয়ে গেছে, আমার জীবনে আর কোন দিন আনন্দ আসবে না। ঠাকুরের প্রতি, শাস্ত্রের প্রতি যদি এক বিন্দু বিশ্বাসও থাকত, তাহলে তো এই রকম মানসিক অবসাদ হওয়ার কোন প্রশ্নই হত না। তুমি আনন্দের সমুদ্র, তোমার ভিতরে সমুদ্র নেই, তুমি নিজেই সেই সমুদ্র। সৎ, চিৎ ও আনন্দ, এই আনন্দ ঈশ্বরের নয়, আনন্দই ঈশ্বর। ঠিক তেমনি আমাদের ভিতরে কোন আনন্দ নেই, আমরা আনন্দস্বরূপ, অমৃতস্বরূপ। আমাদের যখন অজর, অমর বলা হচ্ছে, তার মানে এই নয় যে আমার কখন মৃত্যু হবে না, স্থূল শরীর প্রকৃতি নিয়মে একদিন নাশ হবেই। ঠাকুর খুব সহজ ভাষায় বলছেন, সাপের মাথায় মণি আর সাপ মরা ব্যাঙ খেয়ে মরে। আমাদেরও ঠিক এই অবস্থা, মাথায় আমাদের মাথায় মণি, আমরা সেই আনন্দস্বরূপ, অমৃতস্বরূপ, ঈশ্বরস্বরূপ, অথচ মৃত্যুকে ভয় পাই, আপনজন মরে গেলে হা হুতাশ করি। বৃদ্ধাবস্থায় চলে এসেছি, খুব আনন্দের কথা, এখন তো শুধু খোল করতাল নিয়ে হরিনাম করা যাবে। আগে আগে যৌবন অবস্থায় গাধার মত খাটতে হত, স্ত্রীর জন্য খাটতে হত, সন্তানের জন্য খাটতে হত। এখন তো নিশ্চিন্ত, কেউ বিরক্ত করতে আসবে না, শুধু হরিনাম করে যাওয়া যাবে। কিন্তু বার্ধক্য অবস্থায় যে ঈশ্বর চিন্তন করবে আগে থেকে কোন তার ট্রেনিংটাই নেই, সেইজন্য ঈশ্বর চিন্তনটাও করতে পারে না। তাই কি আর করবে, মমতা কি করছে, মোদি কি বলছে, এই করে খবরের কাগজের আগাপাস্তা আর টিভি দেখে সারাদিন কাটিয়ে দেবে। যার ফলে অশান্তির শেষ নেই, অশান্তি তো আমরাই ডেকে আনছি। ভগবান সব সময় আমাদের ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন, যাতে আমরা শান্তিতে থাকতে পারি। কিন্তু আমরা করব না।

কারুর মৃত্যু হয়ে গেল, বুড়ো বয়সে তার তাস খেলার পার্টনার চলে গেল, মর্নিং ওয়াকের পার্টনার চলে গেল। এখনও তোমার পার্টনার! দেখে মনে হয় একটু পয়সা যদি থাকত, হাঁটা চলার শক্তি যদি থাকত, তাহলে আরেকটা বিয়ে করে নিত। এখনও তোমার পার্টনার চাই, এখনও তোমার অন্যের সঙ্গ চাই, এখনও তোমার টিভি চাই, কিছু না কিছু অবলম্বন চাই। তাহলে কবে নিরালা একাকী বসে ঈশ্বরের চিন্তন করবে? শেষ যাত্রায় তোমাকে একাই যেতে হবে, যেখানে যাবে সেটাও অন্য এক জগৎ, এর প্রস্তুতি তুমি কবে আর নিতে শুরু করবে! তুমি যে আসলে নিজেই আনন্দস্বরূপ সেটারই খোঁজ নিলে না, সেইজন্য চারিদিকে তুমি আনন্দ খুঁজে বেড়াচ্ছ। কেউ টাকায় আনন্দ খুঁজে বেড়াচ্ছে, কেউ অপরের চেহারায় আনন্দ খুঁজছে। কিন্তু এটা বুঝতে পারছে না যে সে নিজেই আনন্দস্বরূপ, লোকেরাই তাকে দেখে আনন্দ পাওয়ার কথা। স্বামীজী এই কথাই বলছেন, We are love। আমরা সবাই জগৎ থেকে আনন্দ পেতে চাই, অপরের কাছ থেকে ভালবাসা পেতে

চাই। যখন কারুর কাছে ধাক্কা খাই, তখন মনে করছি, আর জীবনে আমার আনন্দ আসবে না। আনন্দই যদি না আসে তাহলে বেঁচে থেকে কি হবে। গলা দড়ি দিয়ে দিলেই সব ল্যাটা চুকে যাবে।

বহির্জগৎ আমাদের চিন্তারই বহিঃপ্রকাশ

স্বামীজী বলছেন, We are love, but when we think of it, we have to use a phantasm, which proves that matter is only externalized thought. (*আমরা নিজেরাই প্রেমস্বরূপ, কিন্তু যখন ঐ প্রেমসম্বন্ধে চিন্তা করতে যাই, তখনই দেখি – আমাদের একটা কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। তাতেই প্রমাণ হয় যে, জড়বস্তু চিন্তারই বহিঃপ্রকাশ।*) আমি যা, আমার যেটা স্বরূপ, সেটাকে নিয়ে আমি কোন দিন চিন্তা করতে পারব না। এর আগে যেমন বলা হল, আমার ডান হাত দিয়ে ডান হাতকে কখন ধরা যাবে না, আমার চেহারা জগৎ দেখতে পারবে, কিন্তু আমি কোন দিন নিজের চেহারা দেখতে পারব না, এর প্রতিবিম্বই আমি দেখব। প্রেম, ভালবাসাকে নিয়েও যদি চিন্তা করতে হয় তাহলে একটা ফ্যান্টাসি সামনে দাঁড় করাতে হবে। আমার ভিতরের ভালবাসা, প্রেমকে যদি বুঝতে হয়, তাহলে আমরা সামনে একটা মূর্ত রূপ দাঁড় করাতে হবে। তা নাহলে ভালবাসা বুঝতে পারব না, কারণ আমিই প্রেমস্বরূপ কিনা। যদি বলা হয়, তোমার কি বাম হাত আছে? হ্যাঁ আছে। ডান হাত দিয়ে বাম হাত ছুঁয়ে দেখিয়ে দিলেই হয়ে গেল। কিন্তু আমি যেটা নিজে, সেটাকে আমি কখনই বলতে পারব না, কারণ স্বক্রিয়ার অভাব। ঠিক তেমনি আমার ভিতরে ভালবাসা যদি থাকে, আমি কি করে বুঝব যে আমার ভালবাসা আছে? ওই ভালবাসাকে জানার জন্য সামনে একজনকে নিয়ে আসতে হবে।

কেনোপনিষদে আছে, দেবতারা একবার অসুরদের বিরুদ্ধে জয়ী হয়ে মনে করল, আমাদের ক্ষমতাতেই আমরা অসুরদের উপর জয় পেয়েছি। ইন্দ্র, অগ্নি ও বায়ুকে দেখনোর জন্য যে, তোমরা কিছুই না, সেখানে এক অজানা, অচেনা যক্ষ এসে উপস্থিত হলেন। দেবতারা সেই যক্ষকে দেখে বুঝতে পারছে না, এটা কি বস্তু। তখন দেবতারা অগ্নিকে পাঠালেন দেখে আসতে এটা কি বস্তু। অগ্নি যেতেই তিনি প্রশ্ন করলেন, তোমার কি ক্ষমতা। অগ্নি বলল আমি সব কিছু পুড়িয়ে দিই। যক্ষ তখন একটা ঘাসের টুকরো নিয়ে বলল, এই তৃণের টুকরোকে পুড়িয়ে তোমার ক্ষমতা দেখাও। অগ্নি তাঁর সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও ঘাসের টুকরোর কিছুই করতে পারল না। আমি আপনি সবাই মনে করি, আমার মত বুদ্ধিমান দুনিয়ায় কেউ নেই। কোন লোক পাওয়া যাবে না, যে মনে করে না আমার মত সবজান্তা কেউ আছে। এক সক্রেটিস বলেছিলেন, I know that I know nothing, তারপর আর ওই নিয়ে কেউ ভাবেনি। সক্রেটিস মুখে বলেছেন, ভিতরে ভিতরে কি ভাবতেন আমরা জানি না, কারণ নিজের জ্ঞান যখন হল, তখন যাকে পেতেন তাকেই উপদেশ দিতে থাকতেন। কারণ আমরা চৈতন্যস্বরূপ, চৈতন্যস্বরূপের দৌলতে আমরা জানি আমি সর্বজ্ঞ। বাচ্চা থেকে শুরু করে বড়ো পর্যন্ত কেউ নেই, যে নিজেকে সর্বজ্ঞ মনে করে না। এখন যদি বলা হয়, তুমি তো সর্বজ্ঞ, ভাই এর উত্তরটা দেবে? পরীক্ষা নিতে হবে। ঠিক তেমনি কারুর যদি শক্তি বেড়ে গিয়ে থাকে, তাকে বহির্জগতের কিছু একটা দিতে হবে, দেখ তো ভাই এটা করতে পারো কিনা। আমি যদি বলি আমি একটা লটারি পেয়েছি, মোটামুটি আমার পাঁচশ কোটি টাকা আছে। তাহলে আপনি পায়ে হেটে কেন আসা-যাওয়া করছেন, একটা গাড়ি কিনুন না। ন না, আমার সেই টাকা আমার ব্যাঙ্ক এ্যকাউন্টে রাখা আছে। যে টাকা কোন দিন বার করা যাবে না, কেউ চোখে দেখতে পারবে না, ওই টাকার কি কোন দাম আছে?

বহির্জগতে আমাদের চৈতন্যস্বরূপের verification হয়। ভালবাসাটাও তাই, ভালবাসার verification হয়। একটা বস্তু এলো, আমি তাকে কেমন ভালবাসতে পারছি, তাই দিয়ে বোঝা যায় আমার ভিতরে কেমন ভালবাসা আছে। ঠাকুর বলছেন, মা বেড়াল পুষিয়ে সংসার করিয়ে নেন। সন্ন্যাসীদের মধ্যেও দেখা যায়, সর্বত্যাগী, ভাল সন্ন্যাস জীবন অতিবাহিত করেছেন। বুড়ো বয়সে গিয়ে দেখা যায়, কুকুরদের ডেকে ডেকে খাওয়াচ্ছেন, বেড়াল পুষেছেন, নিজে কম খেয়ে বেড়ালের জন্য নিয়ে যাবেন। ভিতরে ভালবাসা আছে, সেই ভালবাসা এখন যাবে কোথায়। আর তা নাহলে প্রসাদের পায়েস, নয়তো বাতাসা রেখে দেবেন, ভক্ত বা ভক্তানির হাতে দিয়ে বলবেন, তোমার নাতির জন্য রেখেছিলাম। নিজের নাতি হল না, অপরের নাতির জন্য

চিন্তার শেষ নেই। নিজের সন্তান নেই, অপরের সন্তানের পড়াশোনার ব্যবস্থা করে বেড়াচ্ছেন, বাইরে পড়তে যাবে তার জোগাড় যন্ত্র করে বেড়াচ্ছেন। কারণ ভিতরে ভালবাসা আছে, টপ্ টপ্ করে বেরোচ্ছে।

এরপরেই স্বামীজী বলছেন, which proves that matter is only externalized thought, সমস্ত বিশ্বে যত প্রচলিত দর্শন আছে, তার দুটো ভাগ হয়। একটাকে বলে Idealism, এই মতে বলা হয়, যা কিছু আছে আমার মনের মধ্যেই আছে, আমার মাথায় আছে বলেই আমি বহির্জগতকে দেখতে পাচ্ছি। আরেকটা মতে বলা হয়, আমি থাকি আর নাই থাকি, এই জগৎটা আছে, এটাকে বলে Realism। পাশ্চাত্য জগৎ এই দুটো দর্শনকে নিয়ে চলে। ভারতবর্ষে ন্যায় দর্শন হল Realism, আর বেদান্ত দর্শন হল Idealism। Idealism মতে, যা কিছু আছে সব আমার মনের ভিতরেই আছে। এই নিয়ে মজার একটা গল্প আছে। বৌদ্ধদের মধ্যেও এই দুটো দর্শনই আছে। যারা মনে করে সবটাই মনের ভিতরে আছে, তাদেরকে যদি বলা হয়, এই যে একটা বড় পাথর এখানে পড়ে আছে, এই পাথরটা কি বাইরে আছে নাকি তোমার মনে আছে? Idealistic দৃষ্টিতে বলবে, মনেই আছে। তখন এরা বলছে, তাহলে তো তোমার মাথাটা একটা বড় পাথরের। এগুলো হল এক দর্শনের আরেক দর্শনের উপর আক্রমণ ও প্রতিআক্রমণ। আমাদের খুব সাধারণ ভাবে মনে হবে, এই পেন আছে, পেন তো বাইরেই দেখছি। হ্যাঁ, ঠিকই বাইরে দেখছি। দর্শন এত সহজ ভাবে চলে না, একটু ভিতরে ঢুকলে খুব গভীর হয়ে যায়। যার জন্য লোকেরা দর্শনের নাম শুনলে ঘাবড়ে যায়। এই পেন কোথায় আছে? পেনটা কি বাইরে আছে, নাকি আমার মাথায় আছে? আমরা সহজ উত্তরে বলব, পেন বাইরে আছে। তাহলে পেন যে বাইরে আছে, আমরা জানছি কি করে যে পেন বাইরে আছে? পেনের উপর যে আলো পড়েছে, এই আলো আমার চোখে প্রতিফলিত হয়ে আমার মস্তিষ্কে গিয়ে একটা অনুভূতি হচ্ছে, তার মানে আমরা যা কিছু জানছি সব মস্তিষ্কের ভিতরেই জানছি, মস্তিষ্কের বাইরে আমরা কিছুই জানতে পারছি না। খুবই সহজ ব্যাপার, যখন কোন আইডিয়া আমাদের ভিতরে যাচ্ছে তখন বস্তুর প্রতিবিম্ব যাচ্ছে, আলোর প্রতিফলন ভিতরে যাচ্ছে, পেনটা কখনই আমাদের ভিতরে যাচ্ছে না। তাহলে আমরা পেনের প্রতিফলিত আলোকেই জানছি, পেনটাকে আমি জানছি না। তাহলে অস্তিত্ব যেটা রয়েছে, ওটা কি পেনের অস্তিত্ব রয়েছে, নাকি আমি যেটা জানছি, পেনের যে প্রতিবিম্বিত আলো সেটাকে আমি জানছি? এখান থেকে প্রচুর জটিল আলোচনা শুরু হয়ে যায়।

আমাদের কাছে এগুলো মনে হতে পারে দর্শনের কচকচানি। কিন্তু একটুও কচকচানি নয়, বর্তমান বিজ্ঞান যে এতদূর এগিয়েছে তাতে বিজ্ঞান বলে, realismএর আরেকটা খুব বড় ফাঁড়া হল objectivism। যেটা আমি পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে জানতে পারব সেটাই সত্য, তার বাইরে আর কোন সত্য নেই। বিজ্ঞান এই objectivism নিয়েই চলত, কিন্তু পরে দেখা গেল, objectivismকে যদি সব কিছুতেই খুব seriously নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে ইক্যুয়েশান যেগুলো তৈরী হয়, সেগুলিও চলবে না। যেমন ধরা যাক, আজকের কোয়ন্টাম ফিজিক্স, ইলেক্ট্রনকে আজ পর্যন্ত কেউ দেখেনি, প্রোটনকেও আজ পর্যন্ত কেউ দেখেনি, কিন্তু তার কার্যকে আমরা জানি, আর বর্তমান কালে কোয়ান্টাম ফিজিক্স এমন জায়গায় চলে গেছে যে, কেউ কোন দিন জানতে পারবে না, কারণ এগুলো পিওর একটা ম্যাথামেটিক্যাল মডেল। তাহলে বিজ্ঞান যে সব সময় সবার কাছে নিজেকে এত র‍্যাশানাল র‍্যাশানাল বলে জাহির করে যাচ্ছে, কিন্তু তুমি তো নিজেই র‍্যাশানাল নও। বিজ্ঞান বলছে আমরা হলাম খুব র‍্যাশানাল, র‍্যাশানাল মানে, যে জিনিসগুলো আমি ইন্দ্রিয় দিয়ে জানব, বা কোন ভাবে আমরা বুদ্ধি দিয়ে ধারণা করে জানতে পারব, সেগুলোকেই আমি মানব। সমগ্র কোয়ান্টাম ফিজিক্স, যাকে নিয়ে সমস্ত বিজ্ঞানীরা দিব্যি খাচ্ছে, তার implications মাত্র কয়েকজন বিজ্ঞানীই বোঝেন। আর এটা একটা ম্যাথমেটিক্যাল মডেল, যে মডেল অনবরত পাল্টাচ্ছে, আর কেউ জানে না যে, আদপে ওটা সত্যি কিনা। তাও তারা গলা ফাটিয়ে বলে যাচ্ছে, আমরা র‍্যাশানাল। কিসের তুমি র‍্যাশানাল! তখন তারা বলে এটা অন্য ধরণের র‍্যাশানালিটি। কোয়ান্টাম ফিজিক্স যদি অন্য ধরণের র‍্যাশানালিটি হতে পারে, তাহলে ধর্ম কেন অন্য ধরণের র‍্যাশানালিটি হতে পারবে না।

স্বামীজী এর আগে থেকে আলোচনা করে যাচ্ছেন, আমরা যখন কোন কিছুকে জানি তখন আমরা কিভাবে জানি; সেখানে মেথড অফ নলেজ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল, যেখানে বলা হয়েছিল জ্ঞাতা, জ্ঞেয়

আর জ্ঞান এই তিনটে সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। জানার পদ্ধতি আর আমি দুটো সম্পূর্ণ আলাদা, এই ব্যাপারটা যতক্ষণ কেউ না বুঝতে পারছে, ততক্ষণ এই জিনিসটা কোন দিন বোঝা যাবে না। আমি আলাদা, বস্তু আলাদা, আর যে পদ্ধতিতে এই বস্তুর জ্ঞান আমার হচ্ছে, সবটাই আলাদা। এর আগে আমরা এর উপর বিস্তারিত আলোচনা করে নিয়েছি। মানুষ কখনই নিজেকে জানতে পারে না, শুধু নিজের প্রতিবিম্বকে জানতে পারে। যখন আমরা শাস্ত্র অধ্যয়ন করি বলা হয় তখন দুটো সত্তা এসে যায়। আসল যিনি জ্ঞাতা তিনি শুদ্ধ আত্মা, ইংলিশে যাকে বলছে spirit, জ্ঞান এই spiritএর বাইরে, সেটাকে বলে পদার্থ, আমরা বলছি চিজ্জড়গ্রন্থি, চিৎ হল চৈতন্য আর জড় হল পদার্থ। খ্রীশ্চান পরম্পরায় এটাকে বলে spirit আর matter। আমাদের এখানে চৈতন্য আর জড়, এই দুটি সত্তা। এবার যখন জেনে গেলাম, আমরা যে চিন্তা-ভাবনা করি সেটা আমার থেকে পুরোপুরি আলাদা, আর আমরা যা কিছু দেখতে পাচ্ছি, ওটা আমারই প্রতিবিম্ব। কি রকম? যেমন চেহারা আমার প্রতিবিম্ব, আমার ভালবাসা যেটা সেটাও আমার প্রতিবিম্ব। যখনই কোন জিনিসকে জানছি, সেটা শুধু আমারই প্রতিবিম্ব, আমি ওটাকে verify করে যাচ্ছি। মাঝখানে আমরা বললাম, কারুর যদি জ্ঞান হয়ে থাকে, সেই জ্ঞানের যদি পরীক্ষা নিতে হয়, তাহলে ওকে বাইরে থেকে কিছু দিয়ে বলতে হবে, তুমি করে দেখাও। তার যদি ক্ষমতা হয়ে থাকে, তাকে বাইরে করে দেখাতে হবে তার ক্ষমতা আছে কিনা। তার মানে যা কিছু রয়েছ এই জগতে, তার verification হবে বাইরে। আমি আলাদা জ্ঞান আলাদা, আর তার verification হয় বাইরের জগতে, এটাকেই এবার স্বামীজী নিয়ে আসছেন।

শেষ পর্যন্ত দুটি সত্তাই থাকবে, চৈতন্য আর জড়, শুদ্ধ আত্মা আর পদার্থ বা matter and spirit। Spirit এর বাইরে যা কিছু আছে সবটাই পদার্থ, চৈতন্য বাদে জগতে যা কিছু আছে সবটাই matter। চিন্তা-ভাবনটাও পদার্থ। চিন্তা-ভাবনাও দুই প্রকার হয়ে যায়, একটা আন্তরিক, আরেকটা বাহ্যিক। তার মানে আমি ছাড়া বাইরে যা কিছু আছে সব পদার্থ, চিন্তা-ভাবনাটাও বাইরের, চিন্তার নিজস্ব কোন অস্তিত্ব হয় না, সেইজন্য পদার্থ হল exeternalised thought। Internalised thought যদি হয় সেটা আসবে আমার স্মৃতি রূপে, আসবে স্বপ্ন রূপে। আর exeternsalised thought যেটা, সেটা পদার্থ রূপে আসবে। তাহলে এই পেন কি? এটা exeternalised thought। কারণ আমি আলাদা, জ্ঞান আলাদা, পদার্থ আলাদা। যা কিছু জিনিস আছে, যেগুলোকে আমি জানছি, আসলে এটা হলা আমার verification। কিসের verification? আমার ভিতরে এই পেনের ব্যাপারে যে জ্ঞান রয়েছে, যেটা আমার থেকে আলাদা, সেটা এই পেনে গিয়ে verify হচ্ছে। কিভাবে verify হচ্ছে? আমি যখন কোন কিছু লিখতে চাইছি, তখন লেখার জন্য আমার দরকার কাগজ, দরকার পেন। আমি ভিতরে যেমন যেমন চিন্তা করছি তেমন তেমন আমার ওই বস্তুর দরকার।

যেখান থেকে আমরা শুরু করেছিলাম এবার সেখানে ফেরত যাচ্ছি। আমরা যখন নিজেকে দেখতে বা জানতে চাই, আমাদের দরকার প্রতিবিম্ব। আমরা যখন কাউকে ভালবাসি, তখন সেটাও কিন্তু আমার নিজের ভালবাসা প্রতিবিম্বিত হচ্ছে সেই ব্যক্তির উপর গিয়ে। আমার যা কিছু ক্ষমতা, সেই ক্ষমতাও গিয়ে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে কোন জিনিসের উপরে। যেমন, অর্জুন বলছেন তিনি বাণ খুব ভাল চালাতে পারেন। তুমি কি রকম ভাল বাণ চালাতে পারো তার ভেরিফিকেশান দরকার, ওই যে পাখি দেখছ, পাখির চোখটা বিদ্ধ কর। অর্জুনের বাণ চালানোর ক্ষমতা গিয়ে প্রতিবিম্বিত হল পাখির চোখে তীর বিদ্ধ হয়ে। বোঝানর জন্য যে দুটি উপমা দেওয়া হল, এটা শুধু উপমাই নয়, সমস্ত ক্ষেত্রেই এটা সত্য। ওটা আমার ভিতরেই আছে, তাই আমি বহির্জগতে ওটাকে দেখতে পাচ্ছি। আমার আপনার নিজের যে জ্ঞান, নিজস্ব যে চিন্তা-ভাবনা সেটাই বাইরে গিয়ে প্রতিবিম্বিত হয়, বাইরে কিছু হয় না।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, যাজ্ঞবল্ক্যের স্ত্রী যাজ্ঞবল্ক্যকে আত্মার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছেন। তখন যাজ্ঞবল্ক্য এটাই বলছেন, objective reality বলে কিছু নেই, সবটাই subjective। কেউ নিজের স্ত্রীকে স্ত্রীর জন্য ভালবাসে না, সে নিজের আত্মাকে ভালবাসে, স্ত্রীর মধ্যে নিজের আত্মাকে দেখে তাই স্ত্রীকে ভালবাসে। নিজের সন্তানকে যখন ভালবাসে আসলে সে নিজেকেই ভালবাসছে, কারণ সন্তানের মধ্যে সে নিজের আত্মাকে দেখছে। সোনা বা সোনার অলঙ্কারকে সোনার জন্য কেউ ভালবাসে না, সোনার মধ্যে নিজের আত্মাকে দেখতে পায়, তাই সোনাকে ভালবাসে। আমরা এভাবেও ভাবতে পারি, একজন মা হাসপাতালে এক

শিশুর জন্ম দিয়েছে, শিশুকে খুব আদর করছে, আমার সোনা, আমার ধন বলে বলে প্রচণ্ড আদর করছে। দুদিন পর নার্স এসে বলল, খুব ভুল হয়ে গেছে, আসলে এই বাচ্চাটা অত নম্বর বেডের ভদ্রমহিলার আর ওই বেডের বাচ্চাটা আপনার, ভুল করে পাল্টাপাল্টি হয়ে গেছে। মা তখন কি করবে? ধুর ধুর করে বাচ্চাটা সরিয়ে আরেকটা বাচ্চাকে কোলে নেবে। তাহলে ওই ভালবাসা বাচ্চার জন্য ছিল, নাকি তার ভিতরের জিনিস?

একটা স্কুলের ছেলে রোজ বাস করে স্কুল যায়, যাওয়ার পথে রাস্থার ধারে একটা মন্দিরের মত ছিল। ছেলেটি বাস থেকে মন্দিরের দিকে তাকিয়ে খুব করে প্রণাম করে প্রার্থনা করে আমি যেন স্কুলে সব পড়া পারি, পরীক্ষায় যেন ভাল ফল করতে পারি ইত্যাদি। কোন কারণে কোন দিন যদি প্রণাম করতে ভুল হয়ে যেত, ওর দুশ্চিন্তা হতে শুরু হয়ে যেত, আজকে হয়তো স্কুলে বকা খেতে হবে, আজ হয়ত বন্ধুদের সাথে ঝগড়া হবে, ইত্যাদি। চার বছর পর ছেলেটি জানতে পারল ওটা মন্দির নয়, একটা মসজিদ। ছেলেটির তখন মনে হতে লাগল, ছি ছি আমি এতদিন কি করছিলাম, মন্দির ভেবে মসজিদের উদ্দেশ্য প্রণাম করে গেছি। আমি মন্দির ভেবে রোজ প্রণাম করে যাচ্ছি, কয়েকদিন পর জানলাম ওটা আগে মন্দির ছিল এখন পাব্লিক টয়লেট হয়ে গেছে, ছি ছি করে ওই দিনেই প্রণাম করা বন্ধ করে দেব। তাহলে আমরা কি ঠাকুর দেবতাদের প্রণাম করি, নাকি আমার নিজের শ্রদ্ধা ভক্তির objectification অন্য কোথাও গিয়ে হয়? আসলে ওটার objectification হয়।

স্বামীজীর রচনাবলী পড়ে আমাদের এটা পরিষ্কার হয় না যে, স্বামীজী idealismকে মানতেন, নাকি realismকে মানতেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে স্বামীজী প্রায়ই বলছেন, বাইরে যে জিনিসটা আছে, যেমন এই পেন, এই পেন একটা তন্মাত্রা ছাড়ে আর আমাদের ভিতরের সত্তা সেই তন্মাত্রাকে জাগিয়ে দেয়। এখানে তাও এক ধরণের realism হয়, বাইরে বস্তু আছে, বস্তুটা আমার মনের ভিতরে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করছে, সেখান থেকে আমার ক্রিয়াকলাপ চলছে। এই জায়গাতে স্বামীজী কিন্তু approachটা পুরো অন্য নিয়েছেন। বস্তু কোথাও আছে, কি বস্তু নেই, কিন্তু আমার ভিতরে ক্ষমতা আছে, জ্ঞান আছে, ভালবাসা আছে, ওটাই টগবগ করে বেরিয়ে আসে। তিব্বতে একটা গল্প আছে, ভেড়ার দল যাচ্ছে, দূর থেকে একজন মনে করছে সব অসুর যাচ্ছে। সে তখন নিজের তলোয়ার নিয়ে আক্রমণ করে দিয়েছে। ওগুলো কি ভেড়া ছিল নাকি অসুর ছিল? ভেড়া ছিল। আর ভেড়াও ছিল কিনা কে জানে। আমরা যারা দেখছি সবারই কাছে ভেড়া মনে হচ্ছে। এর আগে আমরা আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলাম, একটা দু-তিন মাসের শিশু নিজের মাকে মা রূপে দেখে না, দেখে তার ফুড সোর্স রূপে। পরে শিশুকে বোঝান হয়, এই যে ফুড সোর্স, যে তোমাকে সারা জীবন খাওয়াবে, এটাকে বলে মা।

স্বামীজী এখানে খুব উচ্চমানের অদ্বৈতের ভাব দিচ্ছেন, জগৎ বলে কিছু নেই। আমাদের ভিতরে যে চিন্তা-ভাবনা রয়েছে, সেটারই বহিঃপ্রকাশ হয় ওই বস্তুর উপরে, আর আমাদের যে ভালবাসা, আমাদের যে জ্ঞান, আমাদের যে ক্ষমতা, সেই বস্তুর উপর দিয়ে বের হয়। তার মানে বস্তু আমাদের ভিতরের চিন্তার বহিঃপ্রকাশ। যতই আমরা এই কথা বলে যাই না কেন, এই জিনিসটাকে ধারণা করা খুব কঠিন। একটা সহজ উপমা দিলে, জিনিসটা কিছুটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। ইদানিং কালে, হোয়াটসাপ, ফেসবুকে সারাদিন ছেলে আর মেয়ে এক অপরকে লিখে যাচ্ছে, আই লাভ ইউ, আই লাভ ইউ। হঠাৎ কিছু হল, তারপর শুরু হয়ে যাবে, তোর মরা মুখ দেখব, তোর মরা মুখ দেখব, বলে দুজন দুদিকে চলে গেল। পরের দিন দেখা গেল, এ আরেকজনকে বলছে আই লাভ ইউ, সে আরেকজনকে বলছে আই লাভ ইউ। এর মধ্যে 'আই' কে আর 'ইউ' কে? এরমধ্যে 'আই'টাও কিছু নেই, 'ইউ'টাও কিছু নেই, 'লাভ'টাই আসল। যে 'আই' বলছে, ওর মধ্যে ভালবাসা আছে। ওই মেয়ে যদি কোন ছেলে না পায়, তখন আরেকটা কোন বস্তুর উপর গিয়ে ওর ভালবাসা বেরোবে। ছেলেটি যদি মেয়ে না পায়, তখন প্রেমের কবিতা লিখতে শুরু করবে। কারণ ভালবাসার বহিঃপ্রকাশের কোন বস্তু পেল না, তখন কবিতা লিখতে শুরু করল।

বেরেলিতে এক স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে রোজ ঝগড়া হত, ঝগড়া হতে হতে এক অপরকে বলে দিয়েছে ডিভোর্স। ডিভোর্সের কেস ফাইল হয়ে গেছে। এবার দুজনেই ফেসবুকে ফেক্ আইডি তৈরী করেছে। এরপর দুজনের মধ্যে আদান-প্রদান হতে হতে দেখছে দুজনের ম্যাচিং হচ্ছে তখন দুজন দুজনের কাছে পৌঁছে গেছে।

দুজন দুজনকে ডেকেছে, অমুক রেস্তোরাঁতে গিয়ে আমাদের দেখা হবে। ছেলেটি বলে দিয়েছে আমার জামাতে লাল গোলাপ থাকবে, মেয়েটি বলে দিয়েছে আমার খোঁপাতে বেলফুল থাকবে। ছেলেটি গিয়ে দেখে তার স্ত্রী বসে। ছেলেটি চেঁচাচ্ছে, 'তুমি এখানে কি করছ'। মেয়েটিও চেঁচাচ্ছে, 'তুমি কি করতে এখানে এসেছ'। এত চেঁচামেচি করতে শুরু হয়ে গেল যে পুলিশকে আসতে হল, পুলিশ এসে দুজনকে ধরে নিয়ে গেল। পুলিশ ওদের পুরো কাহিনী শুনল, ডিভোর্স ফাইল করে রেখেছে, কিন্তু এই এই ব্যাপার হয়ে গেছে। পুলিশেরও আর হাসি থামতে চায় না। পুলিশ তাদের দুজনকে বুঝিয়ে বলল, ভগবান তোমাদের দুজনকেই এক অপরের জন্য ঠিক করে রেখেছেন, এখান থেকে গিয়ে ডিভোর্স ফেরত নিয়ে শান্তিতে বাস কর, তোমরা এক অপরের জন্য। ওরা আবার ঝগড়া করতে করতে একটা গাড়ি নিয়ে কোর্টে চলে গেল। এটা সত্যিই খুব interesting ঘটনা। আমরা এখানে destinyকে নিয়ে বলছি না, এখানে হল ভালবাসা। বলা হয় যে, কেউ দেখে শেখে, কেউ ঠেকে শেখে। লোকটা নিজের স্ত্রীর কাছে তো ঠেকল, কিন্তু আবার তার ইচ্ছা হয়েছে। হবেই, কারণ খেঁদি-পেঁচি মুখ দেখে কেউ ভালবাসে না, ভালবাসা তার ভিতরে আছে, সেটাই হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসে।

ঠিক তেমনি, মানুষ যখন রেগে যায় তখন রাগটা থাকে ভিতরে, আর যার প্রতি রাগ সেই অফিসের বাবুর কাছ থেকে ধমক খেয়েছে, বাবুকে কিছু বলতে পারবে না, বললে চাকরি চলে যাবে। সেই রাগ বাড়িতে এসে স্ত্রীর উপর, নাহলে ছেলেমেয়ের উপর, তাও যদি না পায়, রাস্থায় বেরিয়ে সামনে একটা কুকুর পেল তাকে একটা ইট তুলে মারতে গেল। ওই কুকুর বা যার উপর রাগ উগড়ে দিচ্ছে, ওরা কিছু না, ভিতরের রাগের বিষটা আরেকজনের উপর দিয়ে বেরোচ্ছে। এটাকেই স্বামীজী বলছেন, matter is only externalized thought। আমরা ভালবাসার স্বরূপ, কিন্তু আমরা বাইরে গিয়ে ভালবাসি।

মজা করে অনেক সময় বলা হয়, ঈশ্বর সৃষ্টি কেন করলেন? কারণ তিনি জানেন তিনি সর্বশক্তিমান, কিন্তু তাঁকেও verify করতে হল যে, দেখি আমার সব শক্তি আছে কিনা। তিনি তখন বললেন, সৃষ্টি হোক, সৃষ্টি হয়ে গেল, ওনার verificationও হয়ে গেল। কিন্তু এরপর তিনি সৃষ্টিকে আর গুটিয়ে নিতে পারছেন না। মজা করে বলা হয় ঠিকই, কিন্তু এটাই ঘটনা। এর ভাল একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে, নিজের খুব ভালবাসার লোকের সাথে এক ঘন্টা সময় কাটানোর পর মনে হয় দশ মিনিট সময় কেটে গেল। আর কারুর জন্য যখন অপেক্ষা করি তখন দশ মিনিট অপেক্ষা করার পর মনে হবে, এক ঘন্টা হয়ে গেল। বাচ্চারা এত চঞ্চল আর সব ব্যাপারে এত সক্রিয় থাকে যে, বুঝতেই পারে না, কিভাবে গরমের এক মাস ছুটিটা কেটে গেল। খুব গভীর মনোযোগে কাজ করছে, কাজ করতে করতে একেবারে কাজের মধ্যে ডুবে গেছে, হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকাতেই তার সম্বিৎ ফিরে এল, আরে এত সময় চলে গেল! ঘড়ির দিকে যদি না তাকায়, ও জানতেই পারবে না, কত সময় হল। মন যে সময়কে নিয়ে চলে, এই সময় কিন্তু সব সময় একভাবে যায় না। কখন মনের সময় দ্রুত চলতে থাকে, কখন মনের সময় ধীর গতিতে চলে। এটাকে verify করার জন্য বাইরে ঘড়ির কাঁটার দরকার, ঘড়ির কাঁটা আমাদের বলে দেয়, তোমার এতটা সময় চলে গেছ, তখন আমরা আবার নিজের মনের সময়কে ঠিক করে নিই।

ঠিক তেমনি আমার ভিতরের ভালবাসা, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, সব কিছু বাইরে বেরিয়ে কাজ করে। সেইজন্য পদার্থ বলে কিছু নেই, যখন মনের ভিতরে বন্ বন্ করতে থাকে তখন সেটা internalized thought, বাইরে যখন যাচ্ছে তখন সেটাই হয়ে যায় externalized thought। আগেকার দিনে কুয়ো থেকে লোকেরা জল তুলত, এখনও গ্রামে কুয়ো দেখতে পাওয়া যায় ঠিকই, কিন্তু অনেক কমে গেছে। কুয়োত যদি বালতি বা ঘটি পড়ে যেতে তখন এক ধরণের কাঁটা দেওয়া শিকল ব্যবহার করা হত। শেকলের মাথায় অনেকগুলো কাঁটা দেওয়া হুক থাকত। কোন কিছু কুয়োতে পড়ে গেলে, কুয়োতে ওই কাঁটা দেওয়া হুক নীচে ফেলে দেওয়া হত, একটা না একটা হুকে বালতি ফাঁসবেই, এরপর আস্তে আস্তে টেনে বালতিকে উপরে নিয়ে আসা হত। ইদানিং লুপ্স অ্যান্ড হুকসের চেন ব্যবহার করা হয়, টানলে চ্যাড় চ্যাড় করে আওয়াজ হয়। জগতের যত বস্তু, যত লোক সব হল লুপ, আর আমার গায়ে আছে কোটি কোটি হুকস্। যেমনি জগতে চলতে শুরু করলাম, কত জায়গায় যে হুকস্ গুলো ফাঁসছে তার কোন ঠিক থাকে না। ভালবাসা, জ্ঞান, এগুলো সবই হল হুক্, আর জগতের সব কিছু হল লুপ। যদি এমনও অবস্থা হয় যে লুপ পেল না, তখন সে মনে মনেই লুপ

তৈরী করে নেয়। যেমন যার ভিতরে ভয় আছে, ভয়ের যদি কোন কারণ না থাকে, রাত্রে সে ভূত দেখতে শুরু করবে, কারণ ভূত বাইরে নেই, ভূত মাথায় আছে।

বহির্জগৎ বলে কিছু আছে কি নেই, বস্তু আছে কি নেই, মানুষ আছে কি নেই, দর্শনের খুব গভীরে গেলে জিনিসগুলো আর পরিষ্কার থাকে না, সব কিছু কেমন যেন জট পাকিয়ে যায়। আমাদের খুব নামকরা উপনিষদ, মাণ্ডুক্য উপনিষদের উপর একটা ভাষ্য আছে, যাকে মাণ্ডুক্যকারিকা বলা হয়, সেখানে ওনারা একটা সিদ্ধান্ত দাঁড় করিয়ে দিলেন অজাতবাদ, যার মূল বক্তব্যই হল সৃষ্টি বলে আদপে কিছু নেই। আমরা বলব, কি বলছেন সৃষ্টি বলে কিছু নেই! কিন্তু ঠিক ঠিক আচার্যের কাছে উপযুক্ত ট্রেনিং সহ আমরা যদি একবার পড়ার সুযোগ পাই, তখন মনে হবে ঠিকই তো, সৃষ্টি বলে কিছু নেই। ভারতবর্ষে প্রচুর সাধু সন্ন্যাসী আছেন, যাঁরা এই অজাতবাদ সিদ্ধান্তকে নিয়ে সাধনা করেছেন। সেখান থেকে একটা প্রচলিত কথাই হয়ে গেছে যে, ত্রিকাল মে জগৎ নহি হ্যায়, সংসার বলে কিছু নেই। কিন্তু সৃষ্টি হয়েছে কি হয়নি, সৃষ্টি আছে কি নেই, আমরা এর মধ্যে যাচ্ছি না। এর আগে আমরা আলোচনা করলাম, আমার ভিতরে যা কিছু আছে, সব বহির্জগতে গিয়ে verify হয়। ঠাকুর বলছেন, মোর ঘুরিয়ে দাও। কথামৃতের এই কথাগুলো অত্যন্ত গভীর জিনিস, প্রচুর সাধন-ভজন, সাধুসঙ্গ করা না থাকলে, এই কথাগুলো কোন দিন ধারণা করা যাবে না। ইমোশান যেটাকে আমরা বাইরে ভাবি, এর কোন দাম নেই। ঠাকুর বলছেন, যদি ভালবাসতে হয় ঈশ্বরকে ভালবাস। রাগ যদি করতে হয়, তাহলে নিজের উপর রাগ কর এই ভেবে যে, এখনও আমার ঈশ্বর দর্শন হল না। এই জিনিসগুলোকে ঋষিরা অনেক কাহিনী, গল্পের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন, যাতে সাধারণ মানুষ ধারণা করতে পারে।

মহাভারতে ঔর্ব নামে এক ঋষির কাহিনী আছে। ঋষি এক সময় রেগে গিয়ে বললেন, সৃষ্টিকে আমি পুড়িয়ে ভস্ম করে দেব। দেবতারা দেখলেন ঋষির যা তপস্যার জোর তাতে তিনি সৃষ্টিকে পুরো ভস্ম করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। দেবতারা এসে খুব করে অনুরোধ করলেন, এভাবে সৃষ্টির নাশ করবেন না। ঔর্ব ঋষি বলছেন, আমি আমার কথা থেকে সরে আসব না। ঔর্ব ঋষির পিতৃপুরুষদের প্রতি এক সময় প্রচুর অত্যাচার হয়েছিল, সেটার প্রতিহিংসা বশতঃ তাঁর ভিতরে ক্রোধের জন্ম হয়েছিল। সেই পিতৃগণরাও এখন স্বর্গ থেকে নেমে এসে তাঁদের বংশধরকে বলছেন, 'আমরা এখন স্বর্গে সুখে আছি, তুমি তোমার ক্রোধকে সম্বরণ কর'। তখন ঋষি বলছেন, 'আমি যে এই দিব্যি করেছি, এটা যদি মিথ্যা হয়ে যায়, তাহলে আমার সব তপস্যা বিফল হয়ে যাবে, সৃষ্টিকে আমার নাশ করতেই হবে'। তখন পিতৃরা বলছেন, 'বেদে বলছেন জল থেকেই সব কিছুর সৃষ্টি, সমুদ্রই সব কিছুর সৃষ্টির স্থান, সেইজন্য তোমার এই ক্রোধাগ্নিকে একটা জায়গায় পুঞ্জিভূত করে অগ্নি রূপে সমুদ্রে কোথাও স্থাপন করে দাও'। ঋষি খুব বড় যোগী, তিনি তাঁর সমস্ত ক্রোধকে ভিতর থেকে বার করে অগ্নি রূপে সমুদ্রে রেখে দিলেন। বলা হয় এখনও নাকি সমুদ্রে সেই আগুন জ্বলছে, সংস্কৃতে যাকে বাড়ানল বলা হয়। দাবানল যেমন জঙ্গলের আগুন, বাড়ানল তেমনি সমুদ্রের আগুন। এগুলো পৌরাণিক কাহিনী, আখ্যায়িকা, এগুলোর কোন দাম নেই। কিন্তু কাহিনীর পিছনে যেটা সত্য, সেটার দাম আছে। কি সেই সত্য? আমি যদি চাই, আমার ভিতরের সব আবেগকে এক জায়গায় জড়ো করে, বাড়িতে জঞ্জাল নোংরাকে ঝাঁটা দিয়ে এক জায়গায় করে যেমন বাইরে ফেলে দেওয়া হয়, আমিও সেই রকম করতে পারি। ঠাকুর এটাকেই বলছেন মোর ফিরিয়ে দাও।

কিন্তু আমরা মোর ফেরাতে চাই না, আমরা আমাদের ক্রোধকে জাগিয়ে রাখতে চাইছি, ওর সর্বনাশ না হওয়া পর্যন্ত আমার শান্তি হবে না। গড ফাদার একটা নামকরা উপন্যাস, যার সিনেমাও হয়েছে। সেখানে আছে, গড ফাদারের ছেলেকে তার ভগ্নিপতি ছুরি দিয়ে মুখের উপর মেরেছিল, তাতে মুখের উপর একটা ক্ষত হয়ে গিয়েছিল। ছেলেটি কিছুতেই সেই ক্ষতটা সারিয়ে নিতে চাইত না। সবাই তাকে বলছে, তুমি এটা অপারেশন করিয়ে নাও, কিন্তু অপারেশান ও কিছুতেই করাবে না। তার বোন কিন্তু ভয়ে মরছে, ভাই যে ক্ষতটা সারাচ্ছে না, তার মানে কিছু গোলমাল আছে। কিন্তু অন্যরা কেউ বুঝতে পারছে না, কেন ক্ষতটা মুখের মধ্যে রেখে দিয়েছে। ওটা রেখেছে এই জন্য যে, এই ক্ষতটা আমাকে যেন সব সময় মনে করিয়ে দেয় এর বদলা আমাকে নিতে হবে। আর ঠিক তাই হল, নিজের হাতে নিজের ভগ্নিপতিকে সুযোগ পেয়ে শেষ করে দিল।

অনেক সময় দেখা যায়, কোন মা যদি কারুর বদলা নিতে চায় তখন নিজের ছেলেকে তাতাতে থাকে, যাতে ও যেন ভুলে না যায়।

প্রবৃত্তিমূলক ধর্ম ও নিবৃত্তিমূলক ধর্ম

কিন্তু যাঁরা সাধন পথে এসেছেন, তাঁরা এখন ঈশ্বর ছাড়া কিছু জানবেন না। সেইজন্য সাধনার প্রথম ধাপেই শম, দম, উপরতির কথা বলে হয়ে থাকে। সেখানে বলা হয় তোমার মন ও ভিতরের ইন্দ্রিয়গুলিকে দমন কর, তোমার বহিরিন্দ্রিয় গুলিকে দমন করা, আর যেটুকু দমন করেছ সেটা যেন আবার বেরিয়ে না আসে। বস্তুর মধ্যে সত্যিই যদি কোন আকর্ষণ থাকত, তাহলে আমাদের সেই দম নেই যে, নিজেকে বস্তুর আকর্ষণ থেকে টেনে সরিয়ে রাখতে পারব। তা নাহলে আমাকে যোগীদের মত কোন গুহায় বা জঙ্গলে গিয়ে থাকতে হবে। সাধনা তো সেভাবে হয় না, সাধনা সমাজের মাঝখানে থেকেই হয়। ঠাকুর, মা, স্বামীজী এনারা সবাই সমাজেই ছিলেন। আরা যারা গুহায় বা জঙ্গলে গিয়ে থাকে তাদের তাতেও হয় না, কারণ গোলমাল সব মনের মধ্যেই রয়েছে, এটাই বাইরে বেরিয়ে আসে। যখন বহির্বস্তু পায় না, তখন ওটাকে তৈরী করে নেয়, তখন ফ্যান্টাসিস, হ্যালুসিলেশানস হতে শুরু হয়ে যায়। ঈশ্বরের পথে যখন প্রথম পা রাখবে তখন বলছেন, এগুলোকে আগে বন্ধ কর। যখন এগুলোকে বন্ধ করা হয় তখন এটাকে বলে নিবৃত্তি, জিনিসটাকে টেনে ভিতরে নিয়ে আসা, আর যখন বাইরে যায় তখন সেটাকে বলে প্রবৃত্তি। এটাকে বলা হয় নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম আর অন্যটিকে বলে প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম। ঈশ্বরের সাধন-ভজন এই দুই প্রকারের হয়। একটা হল, যেখানে ক্রিয়া করা হয়, যেমন পূজা, অর্চনাদি করা; এটাকে বলে প্রবৃত্তি, প্রবৃত্তি মানে একটা জিনিসে লেগে যাওয়া। অন্যটা হল, সব কিছু ত্যাগ করা, এটাকে বলে নিবৃত্তি।

ঠিক ঠিক পূজা-প্রার্থনাদিও নিবৃত্তি দিয়েই হয়, প্রবৃত্তি দিয়ে হয় না। আমরা যদি ঠাকুরের কাছে গিয়ে দিনরাত প্রার্থনা করি, ঠাকুর আমার এই যেন হয়ে যায়, সেই যেন হয়ে যায়, কিন্তু কিছুই হবে না। কদাচিৎ কখন-সখন হয়ত কোন কোন প্রার্থনা হয়ে যায়, তাতেই ঠাকুরের নাম হয়ে যায়। ঝড়ে বক মরে যোগীর নাম বাড়ে। একটা কোন কাকতালীয় ব্যাপারে কোন প্রার্থনা লেগে গেল, ভগবানের নাম বেড়ে গেল। বাচ্চারা কত নিষ্ঠার সাথে সরল মনে প্রার্থনা করে, হে ঠাকুর আজ যেন ঝড় বৃষ্টি হয়ে স্কুলে জল ঢুকে যায়, অঙ্কের শিক্ষকের যেন শরীর খারাপ হয়ে যায়, কিন্তু কোন দিন হয় না। কিন্তু কেউ যদি ত্যাগের উপর আশ্রিত হয়ে প্রার্থনা করে, ওই প্রার্থনা পূরণ হবেই হবে। আমি গিয়ে যদি বলি, ঠাকুর আমার ভিতরে এই দোষটা আছে, এটা যেন চলে যায় অথবা কিছু কারণে একটা অনৈতিক দিকে আমার মন চলে গেছে, আমি যদি ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি, ঠাকুর এই ধরণের খারাপ কাজ করাটা আমার ঠিক হচ্ছে না, ওখান থেকে যেন আমার মন সরে আসে। প্রার্থনা করতে থাকলে হঠাৎ একদিন দেখব যে আমার সেই দোষটা চলে গেছে বা ঐ খারাপ কাজ করাতে আমার মন আর সায় দিচ্ছে না অথবা সেই লোকটা, যে আমাকে দিয়ে মন্দ কাজ করিয়ে নিতে চাইছে, আমার জীবন থেকে চলে যাবে, যাবেই যাবে। যে কোন জিনিস, যার সাথে ত্যাগের ব্যাপার জড়িয়ে আছে, সেটাকে নিয়ে প্রার্থনা করলে, একশ ভাগ প্রার্থনার সদুত্তর পাওয়া যাবেই যাবে। এর খুব সহজ কারণ হল, মানুষের স্বভাবই হল আত্মার, আত্মা শুদ্ধ পবিত্র, অপবিত্র জিনিসগুলো বাইরে থেকে এসে জুটেছে। সাধন-ভজন মানেই তাই, ওই অপবিত্র জিনিসগুলিকে ফেলে দেওয়া। প্রার্থনা যখন করা হচ্ছে, তখন সে তার আসল সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকছে, ওটা হবেই হবে। আমি যদি প্রার্থনা করে বলি, ঠাকুর, ওই লোকটা আমাকে বড় কষ্ট দিচ্ছে, ওকে তুমি সরিয়ে দাও। আগামী দিনগুলিতে দেখব লোকটা খুব বহাল তবিয়তেই আছে, রোজ দেখছি লোকটি এসে আমার দিকে তাকাচ্ছে। কিন্তু যদি আমি প্রার্থনা করি, ঠাকুর ওই লোকটা এমন এমন অশান্তি তৈরী করছে, বা অমুক লোকের প্রতি আমার এমন দুর্বলতা যে, তোমার দিকে মনটা দিতে পারছি না। এবার কিছু একটা হবে, হয় সে আমার জীবন থেকে সরে যাবে বা মরে যাবে। পুরো জিনিসটা খুবই বিচিত্র, কেন হয়, কিভাবে হয় আমাদের জানা নেই।

তবে বেদান্তের দৃষ্টিতে যদি এর ব্যাখ্যা খুঁজতে যাওয়া হয় তখন এর খুব সহজ ব্যাখ্যা পেয়ে যাবে। বেদান্ত মানেই হয়, সব কিছু ত্যাগ, এটাকে বলে নিবৃত্তি। পৌরাণিক কাহিনীতে বলা হয়, ভগবান বললেন সৃষ্টি হোক, তখন প্রথমেই বেরিয়ে এলেন ব্রহ্মা। এবার ব্রহ্মাই সব কিছু সৃষ্টি করবেন, ভগবান সরাসরি সৃষ্টি করেন

না, ব্রহ্মাকে দিয়ে করান। ব্রহ্মা তপস্যা করতে শুরু করলেন। তিনি তপস্যা করলেন এটা জানার জন্য যে, আমার অস্তিত্ব কেন? সবাই জানতে চায়, আমি এই জগতে কেন আছি? জীবনের উদ্দেশ্য কি? ব্রহ্মা কয়েক হাজার বছর তপস্যা করলেন, শুধু এটুকু জানার জন্য আমার অস্তিত্ব কেন। আমাদেরও মাঝে মাঝে জানতে ইচ্ছে হয় কেন আমরা এই জগতে এসেছি, কিন্তু আমাদের কোন তপস্যা নেই, তাই কিছুই জানতে পারি না। তপস্যা করে ব্রহ্মা জানতে পারলেন, আমার অস্তিত্ব হয়েছে সৃষ্টি করার জন্য। জানার পর আবার তপস্যা করতে শুরু করলেন যাতে সৃষ্টি করতে পারেন। এবার ব্রহ্মা বললেন সৃষ্টি হোক। ব্রহ্মা প্রথমে মন থেকে সৃষ্টি করতে শুরু করলেন, আর ওই শুদ্ধ পবিত্র ও একেবারে সত্ত্বগুণে পরিপূর্ণ মন থেকে বেরিয়ে এলেন চার কুমার, সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার। এরপর কাহিনীর সাথে কাহিনী যোগ হতে থাকে।

এরপর কাহিনী হল, একবার ভগবান হংস রূপে চার কুমারকে শিক্ষা দিলেন –এই সংসার, সৃষ্টি অনিত্য। ভগবানের কথা শুনে চার কুমার সব ছেড়ে কমণ্ডুলু হাতে নিয়ে ঈশ্বরের অন্বেষণে পথে বেরিয়ে গেলেন। আজও তাঁরা বেঁচে আছেন, ঈশ্বর ছাড়া ওনারা আর কিছু জানেন না। ব্রহ্মা খুব হতাশ হয়ে গেলেন, কত তপস্যা করার পর আমি এদের সৃষ্টি করলাম সৃষ্টির কার্যে আমাকে সহয়তা করার জন্য, কিন্তু এরা সবাই হয়ে গেল সন্ন্যাসী। আচার্য শঙ্কর এটাকে বলছেন, নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম, মূলতঃ সন্ন্যাসীদের ধর্ম। তত দিনে ব্রহ্মার সত্ত্বগুণ অনেক কমে গেছে। আবার তিনি সৃষ্টির কার্যে নামলেন, সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন সপ্তর্ষি ও প্রজাপতিগণ। এভাবে তিনি মন থেকে এক এক করে সৃষ্টি করে যাচ্ছেন, কিন্তু দেখলেন মন থেকে সৃষ্টি করতে অনেক সময় চলে যাচ্ছে। এবার তিনি নিজের শরীরকেই দুটো ভাগে বিভক্ত করে দিলেন, সেখান থেকে তিনি পুরুষ ও নারী হয়ে গেলেন। নাম নিলেন মনু ও শতরূপা। ইতিমধ্যে কিছু প্রজাপতির সৃষ্টি হয়েছিল, তাঁদের কিছু কন্যা আছে, ঋষিরা আছেন। এনারা সবাই প্রবৃত্তিমূলক ধর্মের পথ অনুসরণ করলেন। এরপর সৃষ্টি পুরোদমে এগিয়ে চলল।

এই পয়েন্টকে নিয়ে স্বামীজী এবার বলছেন, Nivritti is turning aside from the world, (*নিবৃত্ত-অর্থে সংসার থেকে সরে আসা*), turning asside মানে আগে যেটা বলা হল, আমাদের মনের ভাবটাই গিয়ে বাইরে প্রকাশ হয়, সৃষ্টি বা বস্তু বলে কিছু নেই, যা কিছু আছে সব মনেই আছে। Hindu mythology says that the four first-created were warned by a Swan (God Himself) that manifestation was only secondary; so they remained without creating, (*হিন্দুদের পুরাণে আছে, প্রথম সৃষ্ট চারজন কুমারকে হংসরূপী ভগবান শিক্ষা দিয়েছিলেন –সৃষ্টিপ্রপঞ্চ গৌণমাত্র; সুতরাং তাঁরা আর প্রজাসৃষ্টি করলেন না।*) যে চারজন কুমারের কথা বলা হল, এই চারজন কুমার ব্রহ্মার প্রথম সৃষ্টি। ভগবান হংস রূপে এসে বলে দিলেন, সৃষ্টি হল secondary of lesser importnat, আসলে আমরা এই পর্বে প্রথম থেকে এটাই আলোচনা করে আসছি যে, পারমার্থিক সত্তাই আসল, ব্যবহারি সত্তা বা মায়ার জগৎটা কম সত্য।

কথামৃতে ঠাকুর বারশো নেড়া আর তেরশ নেড়ীর গল্প বলছেন। বীরভদ্রের তেরশ শিষ্য ছিল, তাদের এমন তেজ যে যেদিক দিয়ে যাবে আর তাদের পান থেকে চুন খসলে সব ভস্ম হয়ে যাবে। এই কারণে গুরু তাঁর এই তেরশ শিষ্যদের নিয়ে খুব চিন্তিত ছিলেন। তিনি তখন তেরশ মেয়ে জোগাড় করলেন, এদের সাথে তেরশ শিষ্যের বিয়ে দিয়ে দিলে ওদের তেজ কমে যাবে। সবাইকে ডেকে গুরু তাদের স্নান করে তাঁর কাছে আসতে বলে দিলেন। একশ জন শিষ্য খুব তুখোড় বুদ্ধিমান ছিল, ওরা বুঝে গেল যে কিছু একটা গোলমাল হতে যাচ্ছে। কিন্তু গুরুর আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করতে পারবে না, সেইজন্য নদীতে ডুব দিয়ে সেখান থেকেই তারা পালিয়ে গেল, গুরুর কাছে আর ফেরত যায়নি। বাকি বারশো জন শিষ্য গুরুকে মানে, তারা সবাই গুরুর কাছে গিয়েছে। গুরু তাদের তেরশ মেয়ে দিয়ে বললেন, এই নাও এরা তোমাদের আজ থেকে সেবা করবে। আর সেবা করবে! সবাই এই আশায় বিয়ে করে যে স্ত্রী আমার খুব সেবা করবে, কিন্তু কিছু দিন যেতে না যেতেই উল্টে স্ত্রীর সেবাই করতে হয়, আর সারাটা জীবন স্ত্রীর সেবা করতে করতেই সব তেজ চলে যায়। এই ধারণাই চলে আসছে, গুরুও যখন আদেশ করে তখন কিছু লোক ঈশ্বরের পথে বেরিয়ে যায়, আর কিছু লোক গৃহস্থ হয়ে সংসার জীবন-যাপন করে, কিছু করার নেই।

শব্দ দ্বারা আত্মাকে অভিব্যক্ত করা মানেই আত্মার ভাবকে নষ্ট করা

Meaning of this is that expression is degeneration, because Spirit can only be expressed by the letter and then the 'letter killeth'; yet principle is bound to be clothed in matter, though we know that latter we shall lose sight of the real in the covering, (*এর তাৎপর্য এই যে, অভিব্যক্তির অর্থই অবনতি; কারণ আত্মাকে অভিব্যক্ত করতে গেলে শব্দ দ্বারা ঐ অভিব্যক্তি সাধিত হয়, আর শব্দ ভাবকে নষ্ট করে ফেলে। তা হলেও তত্ত্ব জড়াবরণে আবৃত না হয়ে থাকতে পারে না, যদিও আমরা জানি যে অবশেষে এইরূপ আবরণের দিকে লক্ষ্য রাখতে রাখতে আমরা আসলটাকেই হারিয়ে ফেলি।*) শুদ্ধ আত্মাকে আমরা যখন বহিঃপ্রকাশে নিয়ে আসছি, তখন তার প্রকাশ কমে যায়। আমাদের ভালবাসা হোক, আমার জ্ঞান হোক বা আমার অস্তিত্বই হোক, যদি এটাকে প্রকাশ করতে হয়, তাহলে প্রথমে আমাদের সেটাকে চিন্তনে আনতে হবে, আর চিন্তন থেকে বহিঃচিন্তনে নিয়ে যেতে হবে, যেটা objective world। আত্মার প্রকাশকে যদি জানতে হয়, তাহলে চিন্তন দরকার, আর চিন্তনের জন্য বহিঃচিন্তনের দরকার, তার মানে সে অনেক নীচে নেমে এল। এর আগে আমরা বলেছি যে, আগেকার দিনের মায়েরা, ঠাকুরমারা কোন দিন নিজের সন্তান বা নাতি নাতনীকে বলতেন না যে, আমি তোমাকে ভালবাসি। ভালবাসা মানেই ভালবাসা, কিন্তু যখনই আমি বলে দিলাম, আমি তোমাকে ভালবাসি, তার মানে শব্দ এসে গেল। শব্দ এসে যাওয়া মানেই বুঝতে হবে এবার এটা শেষ। যীশু বাইবেলে ঠিক এই কথাই বলছেন, letter killeth, শব্দ তাকে মেরে দিল। যখনই কোন জিনিসের বহিঃপ্রকাশ হয়ে গেল, তার মানে ওটা শেষ। বিশেষ করে ভিতরের কোন ভাব যদি বহিঃপ্রকাশ হয়ে যায়, ওই ভাবটা শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু সত্যিকারের যেটা অধ্যাত্ম, যেটা আত্মা, এর যদি বহিঃপ্রকাশ হয়ে যায়, সে যে শুধু শেষ হয়ে যাবে তাই না, পঞ্চভূতের ফাঁদে পড়ে এবার সে কাঁদতে থাকবে। আমাদের প্রবাদেই বলা হয়, পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।

এখানে ব্যাখ্যাগুলো অনেক দীর্ঘায়িত করতে যাচ্ছে, কারণ এক একটা পয়েন্টকে ব্যাখ্যা করার জন্য একটু বিস্তারিত ব্যাখ্যা দরকার। স্বামীজী ২৭শে জুনের ক্লাশে দেখাচ্ছেন, spirit বা আত্মাকে জানা যায় না, জানা যায় না সেইজন্য মুখ দিয়েও বলা যায় না। তৈত্তিরীয় উপনিষদেও বলছেন, *যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ*, আত্মার অবস্থায় মন পৌঁছাতে পারে না, মন যেটাকে ধরতে পারে না, সেটাকে বাণী কি করে প্রকাশ করবে! তার মানে আত্মজ্ঞানকে মন বাণী দিয়ে জানা যায় না। আত্মা যখন নিজেকে প্রকাশ করেন, তার ভালবাসা হোক, তার জ্ঞান হোক, যেটাই হোক, করে দেবে, কিন্তু ওটা এত degenerate করবে যে, আত্মাকে আর বোঝাই যাবে না। ঠাকুর বলছেন, সমাধি অবস্থা থেকে নেমে যখন ওঁ বলি তখন আমি একশ হাত নেমে এসে বলি। তার মানে যেমনি আমরা শাস্ত্রের কথা বলছি, কয়েক হাজার হাত নেমে এসে বলছি, তা যে কোন শাস্ত্রই হোক না কেন। সমস্যা হল পাশ্চাত্যের লোকেরা এই জিনিসটা বোঝে না, আর মানেও না। হিন্দু ধর্মে হাজার হাজার ঋষির আবির্ভাব হয়েছে, আমরা তাই এটাকে আদ্যোপান্ত জানি। পাশ্চাত্য দুনিয়া যেমন বিজ্ঞানকে ভাল ভাবে জানে, ঠিক সেই রকম আমাদের এখানে ধর্মকে আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত জানে। ঠাকুর বলছেন, ওঁ বলা মানে সমাধি থেকে একশ হাত নীচে নেমে আসা, আর শাস্ত্র তো আরও নীচে এসে হয়, তা সে বেদ হোক, বাইবেল হোক আর কোরান যাই হোক। ওঁ হল শেষ অবস্থা, ধ্যানের গভীরে সব ছেড়ে ছেড়ে যখন ওঁমে যায়, তখন ওই ওঁমকে ভেদ করে সমাধিতে যায়। তাহলে বেদ তো আরও নীচে। তার মানে আসল যে সত্তা, সেই সত্তার তুলনায় সব শাস্ত্রগুলো অনেক নীচে, এটাকে যীশু বলছেন letter killeth। আমাদের এখানে বলে, *তত্র বেদা অবেদা ভবতি*, বেদ তখন নীচে পড়ে থাকে। ঠাকুর বলছেন, এখানকার অনুভূতি বেদ-বেদান্তকে ছাড়িয়ে গেছে। কারণ বেদ, বেদান্তের সমস্ত সারকে গুটিয়ে গুটিয়ে শেষে ওঁএ এসে দাঁড়ায়। এই ওঁ উচ্চারণ করার সময় ঠাকুরকে সমাধি থেকে একশ হাতে নীচে নেমে আসতে হচ্ছে।

একজনকে ছোট বাচ্চাকে খাওয়ানোর জন্য দুধ কিনতে দোকানে পাঠানো হয়েছে। সে কনডেন্সড মিল্ক কিনে নিয়ে এসেছে। এবার ওই বাচ্চাকে কনডেন্সড্ মিল্ক খাওয়াতে হলে দুধে অনেক জল মেশাতে হবে, জল মিশিয়ে মিশিয়ে দুধের ঘনত্ব কমিয়ে একেবারে পাতলা করে বাচ্চাকে খাওয়াতে হবে। যে কনডেন্সড্ মিল্ক নিয়ে এসেছে, সে দেখছে দুধটা কত পাতলা। কিন্তু জানে না যে দুধ ওটাই কিন্তু হাজার গুণ diluted হয়ে গেছে।

যে কোন শাস্ত্র পরম সত্তার কথাই বলে, কিন্তু ঐ পরমসত্তাকে আমাদের উপযোগী করে নামাতে গিয়ে massive dilution হয়ে গেছে, যীশু এটাকেই বলছেন letter killeth। শুদ্ধ আত্মাকে কখনই শুদ্ধ ভাবে জানা যায় না, প্রতিবিম্ব রূপেই জানা যায়। কিন্তু প্রতিবিম্বতে জানা মানে, এত নীচে নেমে আসে যে কিছুই জানার থাকে না। কিন্তু সত্য গুলিকে আমরা সরাসরি কখনই ধরতে পারব না। ধরার জন্য আমাদের ওর মধ্যে একটা আবরণ দিতে হবে, নাহলে কেউ ধরতে পারবে না।

শুদ্ধতত্ত্বকে সরাসরি উপস্থাপন করার জন্য দরকার আবরণ

কভারিং জিনিসটা কি রকম? পুরাণে বলে মানুষের একশ বছর আয়ু, মানুষের একশ বছর আয়ু সমান দেবতাদের একটা দিন, এই হিসাবে দেবতাদের একশ বছর আয়ু, দেবতাদের একশ বছর সমান ব্রহ্মার একটা দিন আর এই হিসাবে ব্রহ্মারও একশ বছর আয়ু। শাস্ত্র বলতে চাইছেন ভগবান অনন্ত। অনন্ত জিনিসটা কি? মানুষকে তো বোঝানো যাবে না অনন্ত কি, তখন মানুষ যাতে একটু ধারণা করতে পারে তাই পুরাণ এইভাবে একটা মডেল তৈরী করে দিচ্ছেন। যদি ঈশ্বর সত্য হন, তিনি যদি অনন্ত হন, তাহলে অনন্তকে ধারণা করার জন্য এটা একটা সুন্দর মডেল। আচার্য শঙ্কর যিনি মাণ্ডুক্যকারিকায় বলছেন অজাতবাদ, সৃষ্টি হয়নি, তিনিই আবার গীতার ভাষ্যে বলছেন, ব্রহ্মা যখন সৃষ্টি করলেন তখন প্রথমে এই চারজন কুমারের সৃষ্টি করলেন। কারণ শাস্ত্রে যেখানে যেটা যেভাবে আছে সেখানে ওই ভাবেই বলতে হবে, তা নাহলে সাধারণ লোক নিতে পারবে না। ধর্মের জগতে যারা শিশু তাদের কনডেন্সড মিল্ক পান করার ক্ষমতা নেই, ওর ঘনত্বকে কমানোর জন্য জল মিশিয়ে তরল করতেই হবে। সত্যের উপর একটা আবরণ দিতেই হবে, নইলে সাধারণ মানুষ নিতে পারবে না।

যারা বায়োলজি নিয়ে পড়াশোনা করে তাদের যখন গাছের পাতা পরীক্ষা করতে হয়। পরীক্ষার জন্য মাইক্রোস্কোপে পাতাকে ফেলে হরাইজেন্টাল সেকশান করতে হয়। কিন্তু ও-ভাবে পাতাকে কাটা যাবে না, সেইজন্য পাতাকে মোমের মধ্যে লাগিয়ে দেওয়া হয়। এবার মেশিনে মোমকে কাটতে কাটতে পাতাও মাঝখান থেকে কেটে যায়। এদিকের মোম আর ওদিকের মোম ফেলে দিলে মাঝখানে পরীক্ষা করতে সুবিধা হয়ে যায়। পাতা এত লড়বড়ে যে সরাসরি কাটা যাবে না। এই তত্ত্বগুলিও ঠিক তাই, নানা রকমের কাহিনী, নানা রকমের কভারিং দিয়ে সামনে রাখা হয়। আসল তত্ত্বটাকে যেই ধারণা করে নিল, এবার ওই জিনিসগুলোকে সরিয়ে দেওয়া হয়। আমরা জানি এগুলো সব আখ্যায়িকা, কাহিনী, কিন্তু এভাবেই আমাদের নিতে হবে। আমরা জানি এগুলো কোনটাই সত্য না, চতুর্যুগ বলুন, অসুরের লড়াই বলুন, দেবতাদের লড়াই বলুন, কোনটাই সত্য না, এগুলো কাহিনী, এগুলো আখ্যায়িকা, কিন্তু শাস্ত্রে যেভাবে দেওয়া আছে এগুলোকে ঐ ভাবেই পরিবেশন করতে হবে। তা নাহলে ধারণাই করতে পারবে না। যারা বলে আমরা সত্যকে জানতে চাই, তাদের বোঝা উচিৎ যে, আধ্যাত্মিক সত্যগুলি শোনার ক্ষমতাই তোমাদের নেই, ধারণা করা তো অনেক দূরের ব্যাপার।

স্বামীজী বলছেন, Every great teacher understands this, and that is why a continual succession of prophets has to come to show us the principle and give it a new covering suited to the times, (*সকল বড় বড় আচার্যরাই এ-কথা বোঝেন, আর সেইজন্যই অবতারেরা পুনঃপুনঃ এসে আমাদের মূল তত্ত্বটা বুঝিয়ে দিয়ে যান, আর সেইকালের উপযোগী তার একটা নূতন আকার দিয়ে যান।*) সত্য সেই একই থাকে, কিন্তু নূতন নূতন অবতাররা এসে ওই সত্যকে যুগোপযোগী করে মানুষের সামনে উপস্থাপন করেন। এই দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখতে গেলে, যীশুর সত্য আর মহম্মদের সত্য কখনই এক হবে না। আবার যীশু ও মহম্মদের সত্য আমাদের ঋষিদের সত্যের সাথে এক হবে না। আর ঋষিরা যে সত্য দিয়ে গিয়েছেন সেটা আবার ঠাকুরের সাথে এক হবে না। সিদ্ধান্তের কোন পরিবর্তন হবে না, যত সিদ্ধান্ত আছে সব একই থাকবে, কিন্তু যুগোপযোগী করে মানুষকে বোঝাবার জন্য তার উপস্থাপনা, তার coveringটা সম্পূর্ণ ভাবে আলাদা হবে।

স্বামীজী বলছেন, ঠাকুর আসার পর সত্যযুগ শুরু হয়েছে। কারণ তা নাহলে বর্তমান কালের জন্য যদি না হয় লোকে রিলেট করতে পারবে না। সত্যকে এবার সব জায়গায় শব্দের একটা এনামেলিং দিতে হবে,

এনামেলিং যদি না হয় তাহলে ওটা চলবে না। অবতাররা এসে ওই এনামেলিংটা দেন। আচার্য শঙ্করও গীতার ভাষ্য লিখতে গিয়ে একই কথা বলছেন, ভগবান যখন অবতার হয়ে আসেন তখন তিনি আবার ধর্মের স্থাপনা করেন। ধর্মের স্থাপনা মানে, তত্ত্ব, সিদ্ধান্ত ওটাই থাকবে। আমরা বলতে পারি, আমাদের উপনিষদ তো আছেই, আর কেন নূতন করে তত্ত্বের দরকার? কিন্তু উপনিষদ নেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই, ব্যাসদেব তাই উপনিষদকে অন্যভাবে গীতায় রেখে দিলেন, গীতাও নেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই, এরপর পুরাণ তৈরী করলেন। এখন পুরাণ পড়লে মনে হবে সব গালগপ্পো। পরে তুলসীদাস রামচরিতমানস রচনা করলেন, এখন আমাদের কাছে রামচরিতমানসও গালগপ্পো বলে মনে হয়। এনারা সবাই কিন্তু একই সত্যকে বলে যাচ্ছেন। এবার ঠাকুর এসে বললেন। এখনও ঠাকুরের কথাকে গালগপ্পো বলা শুরু হয়নি, কিছু দিন পর থেকে বলা শুরু করবে। তখন আবার অন্য একজন অবতার আসবেন।

২৭শে জুন তারিখের ক্লাশের প্রথমে স্বামীজী মহম্মদকে নিয়ে বলতে শুরু করেছিলেন, Mohammed claimed to be the 'Comforter' that Christ promised to sent, এই লিঙ্কটা স্বামীজী এবার এখানে আনছেন। যীশু বলেছিলেন আমার পরে আরেকজন আসবে, যীশুর পরে কেন, অবতাররা আসতেই থাকবেন, যত দিন সৃষ্টি থাকবে অবতারের আসা কোন দিন বন্ধ হয়ে যাবে না, অনন্ত অবতার, তাই অবতার আসতেই থাকবেন। অবশ্য হিন্দুরাই একমাত্র এই কথা জোর দিয়ে বলেন। যুগধর্ম মানুষ যাতে বুঝতে পারে সেইজন্য অবতারকে আসতেই হবে। সত্য সেটাই থাকবে, সত্যের উপর যে কভারিং দেওয়া হবে, সেটা আলাদা হয়ে যাবে।

স্বামীজী বলছেন, My Master taught that religion is one; all prophets teach the same; but they can only present the principle in a form; so they take it out of the old form and put it before us in a new one, *(আমার গুরুদেব বলতেনঃ ধর্ম এক; সকল অবতারকল্প পুরুষ একপ্রকার শিক্ষাই দিয়ে যান, তবে সকলকেই সেই তত্ত্বটি প্রকাশ করতে কোন-না-কোন আকার দিতে হয়। সেইজন্য তাঁরা তার পুরাতন আকার থেকে তুলে নিয়ে একটি নূতন আকারে আমাদের সামনে ধরেন।)* ঠাকুর তাঁর শিষ্যদের বলতেন, যখন অবতার আসেন তখন তিনি সেই পুরনো সত্যকে নিয়ে নূতন পাত্রে ঢেলে দিয়ে যান। ইংরাজীতে নিন্দার অর্থে বলা হয় Old wine in a new bottle। কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে এটাই ঠিক। যদি নূতন মদ নূতন বোতলে হয়, তাহলে ভাই তোমাকে বিশ্বাস করতে পারছি না। এই যে অবতাররা এসে ধর্মে নূতন প্রাণ দেন, নূতন প্রাণ দেওয়া মানেই হল ত্যাগের পথে প্রতিষ্ঠিত করিয়ে দেওয়া। যদি কেউ আদর্শের সাথে সমঝোতা করে, তাহলে তার বুকের পাটা থাকা চাই যে, সে বলতে পারে, আমি দুর্বল, আমি পেরে উঠছি না, তাই আমি আদর্শের সাথে সমঝোতা করে নিলাম। কিন্তু আমি দুর্বল বলে আদর্শকেই নামিয়ে দেব, এটা ঘোরতর অন্যায় – সমাজ শেষ হয়ে যায়। যারা সংসারে আছে, সংসার ধর্ম পালন করছে, তাদের দম নেই যে তারা সর্বস্ব ত্যাগ করে বেরিয়ে আসবে। পাঁচটা টাকা ভিখারীকে দিতে চায় না, বাজারে আনাজ কেনার সময় একটা টাকার জন্য সব্জিওয়ালার সাথে ঝগড়া করে, এরা বলবে সন্ন্যাসের কথা! অথচ এরাই আবার সন্ন্যাসীদের নিন্দা করার সময় যা নয় তাই বলে যাবে। তাহলে তুমি কি সন্ন্যাস-ধর্মকে তুলে দেবে? তুমি ভুলে যাচ্ছ, হিন্দু ধর্ম একটা যে উচ্চতম আদর্শ নিয়ে এসেছিল, সেই আদর্শকে তুমি নষ্ট করে দিতে চাইছ। তুমি এও ভালো করে জানো, যমরাজ এসে যখন তোমাকে পায়ে দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে চলে যাবে, তখন তোমার সব কিছু এখানে পড়ে থেকে যাবে। ঠাকুর বলছেন, আমের সিন্দুকটাও পর্যন্ত তার নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা থাকে না। তার মানেই হল, ত্যাগ হল জীবনের একটা চিরন্তন আদর্শ; বিচ্ছেদই এই জীবনের একমাত্র নিয়ম ও একমাত্র ধর্ম, এখানে অন্য কোন নিয়ম চলবে না, অন্য কোন ধর্ম খাটবে না; বাকি সব ফাঁকা আওয়াজ।

স্বামীজী বলছেন অবতার যখন আসেন, তিনি নূতন করে ধর্মে প্রাণ সঞ্চার করেন। ধর্মে প্রাণ সঞ্চার করা মানে, ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত করিয়ে দেওয়া। আর বলছেন যে কোন অবতার যখন আসেন, তখন তিনি আগের আগের যত অবতাররা আছেন, তাঁদের কাউকেই মিথ্যা প্রমাণিত করেন না, তাঁকে পরিপূর্ণ করেন। মহম্মদ যখন নিজেকে কম্ফোর্টার বলছেন, তখন ওই অর্থেই বলছেন, তিনি পরিপূর্ণ করছেন। যীশুও বলছেন, I have not

come to destroy but to fulfill। কোন অবতার এসে যদি বলেন, আগেকার সব অবতাররা যা যা বলেছেন সব ভুল বলেছিলেন, আমি যেটা বলছি এটাই ঠিক, প্রথমেই এই ধরণের বাবাজীকে ফালতু বলে ফেলে দিতে হবে, কোন গ্রাহ্যের মধ্যেই আনা যাবে না। বলছে নাকি জগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে। শাস্ত্রে কোথায় বলছে জগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে, কোথাও কোন শাস্ত্রে বলছে না। হয় তোমার কোন অসৎ মতলব আছে, নয়তো তুমি একটা মুর্খ। কোন প্রফেট নূতন কথা বলেন না, কোন অবতারই নূতন কথা বলেন না, পুরনো কথাকে নূতন ভাবে সামনে উপস্থাপন করেন। এটাই স্বামীজীর বক্তব্য।

সিদ্ধান্ত ও বাহ্যিক আকার

বেদের আধ্যাত্মিক সত্যগুলোই উপনিষদে নূতন আঙ্গিকে রাখা হয়েছে, উপনিষদের কথাগুলোই নূতন আঙ্গিকে গীতায় এসেছে, গীতারই কথা আবার নূতন আকারে কথামৃতে এসেছে, সেটাই স্বামীজী আমাদের উপযোগী করে নিজের মত সাজিয়ে দেববাণীতে শিষ্যদের সামনে পরিবেশন করেছেন। যে কোন মানুষেরই সমস্যা হল, সিদ্ধান্তকে মানুষ নিতে পারে না, সব সময় মানুষ নেয় তার আকারকে। কারণ আমাদের মনটা স্থুল, সূক্ষ্ম মন নয়। মাছ ধরার জালের ফোকর যদি বড় বড় হয়, তাহলে ছোট মাছ জালে ধরা পড়বে না। ফোকর যত ছোট হবে, তত বেশী মাছ ধরা পড়বে। যারা ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক পুরুষ, তাঁদের মন এত সূক্ষ্ম যে, সূক্ষ্মতম সত্যগুলি ঐ জালে ধরা পড়ে যায়। মানুষ প্রচুর পড়াশোনা নিয়ে থাকতে পারে, বড় বড় ডিগ্রীধারী হতে পারে, কিন্তু দেখা যাবে তাদের কারুরই মনটা সূক্ষ্ম নয়। মন সূক্ষ্ম নয় বলেই ভারতবর্ষে এত এত ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, এত বিজ্ঞানী কিন্তু সারা বিশ্বে তাদের নিজেদের ক্ষেত্রে একটা কোন উল্লেখযোগ্য অবদান নেই। একটা কোন এমন আবিষ্কার নেই যে, একটা কোন এমন বই লেখা নেই যে, দেশে বিদেশে জানবে যে, এই জিনিস আর কোথাও নেই। কারণ আমাদের মনটাই স্থুল প্রকৃতির। তাই বলে কি বিদেশীদের সূক্ষ্ম মন? তাদেরও সূক্ষ্ম মন নয়, তবে বিদেশীরা একটা সময়ে প্রচুর খেটেছিল। বিদ্যার প্রতি তাদের যে আগ্রহ, আগেকার দিনে আমাদের ঋষিদের যে রকম আগ্রহ ছিল, ষোল, সতেরো শতাব্দীর ইউরোপে ঠিক সেই রকম আগ্রহ ছিল। সেই আগ্রহ এখন আস্তে আস্তে অনেক স্তিমিত হয়ে গেছে। পাশ্চাত্যে এখন যে বিদ্যার চর্চা, তা শুধু টাকার জন্য। বিদ্যাচর্চার প্রতি যখন মানুষের আগ্রহ হয়, তারা তখন সিদ্ধান্তের দিকে যায়। মন যখন অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয়ে যায় তখন সিদ্ধান্তের দিকে যায়। মন যখন স্থুল থাকে তখন নাম ও রূপের দিকে যায়। যাঁরা ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক পুরুষ, আমরা যাঁদের আচার্য বা অবতার বলি, ওনাদের মন এতই সূক্ষ্ম যে, সূক্ষ্মতম সত্যগুলো তাঁদের মনের জালে ধরা পড়ে যায়।

স্বামীজী এখন সিদ্ধান্ত আর বাহ্যিক আকার এই দুটো জিনিসকে নিয়ে অনেকগুলো কথা বলবেন। বেদান্তে বলা হয়, শেষ অবস্থায় গিয়ে দেখবে আত্মাই আছেন। আত্মা একটা সিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্ত বলতে ওটা থিয়োরী না, সিদ্ধান্ত মানে এটাই সত্য। আর বাকি যা কিছু আছে, শরীর, ঘরবাড়ি, গাছপালা এগুলো আত্মার উপর একটা আকার খেলা করছে। মহাভারতের কাহিনী, রামায়ণের কাহিনী, পুরাণের কাহিনী, সব কাহিনীর পিছনে একটা সিদ্ধান্ত রয়েছে, একটা সত্য রয়েছে। ঠিক তেমনি আমাদের শরীরের পিছনেও একটা সত্য রয়েছে। সত্য ওটাই থাকে, আকারটা পাল্টাতে থাকে। আকারের যদি নাশ হয়ে যায়, তাতে সিদ্ধান্তের কোন দিন নাশ হবে না। এই কথাগুলো আমরা যতই বলি, যতই শুনে যাই, যতই ধারণা করার চেষ্টা করি, এটা আমাদের মন নিতে পারবে না। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান অর্জুনকে আত্মার ব্যাপারে কত কথা বলে যাচ্ছেন, যেমন বলছেন *বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোহপরাণি*, পুরান বস্ত্র জীর্ণ হয়ে গেলে নূতন বস্ত্র পরিধান করে, দেহের তাতে কিছু আসে যায় না, ঠিক তেমনি দেহের নাশ হলে আত্মার কিছু হয় না। টিয়া পাখির মত আমরা এই সিদ্ধান্ত বাক্যগুলি শিখে নিয়েছি, আর মুখেও আওড়াতে থাকি, কিন্তু নিজের উপর যখন আসে তখন আর সত্যকে মেনে নিতে পারি না, নিজের উপর প্রয়োগ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব না। কেন সম্ভব না, কারণ আমরা বলতে চাইছি আত্মা সত্য শরীর অনিত্য, তার মানে আপনি বলতে চাইছেন সিদ্ধান্ত সত্য শব্দ মিথ্যা। সিদ্ধান্ত হল সত্য আর শব্দ হল তার শুধু আবরণ মাত্র। তার মানে আবরণে যেতে নেই, তার যে আসল সেটাতে যেতে হয়। আপনি তো সেটাই করছেন। গীতা যে কথা বলতে চাইছে সেটা

একটা সত্য, সেই সত্যে আমরা ঢুকছি না। সত্যের আবরণ যে শ্লোক, সেই শ্লোক মুখস্ত করে দিনরাত ফরর ফরর করে বলে যাচ্ছি।

এক সাধুবাবা একদিন দেখল অনেক টিয়া পাখি জালে ফেঁসে আছে। ওদের দেখে সাধুবাবার খুব করুণা হল। এদেরকে সাধুবাবা মন্ত্র শিখিয়ে দিয়েছেন। শিকারী আসবে, জাল বিছাবে, জালের উপর দানা দেবে, ওর মধ্যে কেউ ফেঁসো না। পরে শিকারী এসেছে, শিকারীকে দেখে টিয়া পাখিগুলো চেঁচাচ্ছে, শিকারী আসবে। শিকারীর তো মাথায় হাত, এই রে পাখি-ধরার লোক আসবে ওরা টের পেয়ে গেছে। কি করবে আর, ওর তো আর কোন পথ নেই। শিকারী তাও জাল বিছিয়েছে। পাখিগুলো বলছে, জাল বিছাবে। এরপর শিকারী দানা ছড়াচ্ছে, পাখিরা সব বলছে, দানা ছড়াবে। শিকারী ভাবছে, আজকে আমার সব বিফলে গেল। এরপর পাখিগুলো বলছে, ভুলেও ওতে ফেঁসো না, বলেই ঝাঁপ মেরে সব জালের উপর নেমে পড়েছে। সাধুবাবা এসে দেখেন, সমস্ত টিয়া পাখী শিকারীর জালে ফেঁসে আছে আর তখনও বলে যাচ্ছে, ভুলেও ওতে ফেঁসো না। আমাদের মন ঠিক ওই রকমই। আমরা বাসাংসি জীর্ণানি বলে যাচ্ছি। বক্তব্য হল যেটা নিত্য সেটার কখনই নাশ হয় না। নিত্যের উপর যে আবরণ সেটা অনিত্য, সেটারই নাশ হয়। ঠিক তেমনি যে সিদ্ধান্তগুলো সেগুলো নিত্য, সিদ্ধান্তের উপর যে শব্দগুলো সেগুলো অনিত্য, সেটার নাশ হবে। এটাকেই আমরা বুঝতে পারছি না।

আরও সহজ দৃষ্টান্ত হল, আইনস্টাইনের ই ইক্যুয়াল টু এমসি স্কয়ার, এটা একটা সিদ্ধান্ত, সেই সিদ্ধান্তে তিনি কিভাবে পৌঁছালেন? আর সেই সিদ্ধান্তের কি প্রতিফল হতে পারে, এগুলো সব বইয়ের মধ্যে আছে। এক একটা বই যেন এক একটা আকার। কিন্তু তার মধ্যে সত্য হল ই ইক্যুয়াল টু এমসি স্কয়ার, বাকিগুলো সব হল তার আকার। বিভিন্ন বই এটাকে বিভিন্ন ভাবে দেখছে। এই সমস্ত বইগুলি যদি নাশ হয়ে যায়, ওই বিদ্যাটা কিন্তু নাশ হয়ে যাবে না, জ্ঞান জ্ঞানই থাকবে। বইয়ের সাথে জ্ঞানের কোন সম্পর্ক নেই। কঠোপনিষদে একটা আলোচনা করার সময় বলা হয় যে, ব্রহ্মাণ্ডের সব ঘট যদি নাশ হয়ে যায়, কিন্তু ওর সৎ বুদ্ধিটা থেকে যাবে, সৎ বুদ্ধি মানে ওর অস্তিত্বের ভাব, অস্তিত্বের ভাব কোন দিন যাবে না। আচার্য শঙ্কর এই জিনিসটাকে নিয়েই অদ্বৈত বেদান্তকে প্রতিষ্ঠিত করেন। জ্ঞানটা হল আধার, বই হল তার আকৃতি, তাই বইয়ের সাথে জ্ঞানের কোন সম্পর্ক নেই।

স্বামীজী এখন পুরো এটাকে নিয়েই আলোচনা করবেন। Principles আর form, formএর খুব গুরুত্ব আছে, কারণ form যদি না থাকে আমরা আমাদের স্থূল মন দিয়ে ওই principles কে কোন দিন ধরতে পারব না। কিন্তু আমরা মনে করছি formটাই সব কিছু, formকে নিয়ে আমরা বেশি নাচানাচি করছি, ভুলে যাচ্ছি যে formটা গৌণ। আমরা যখন কোন বস্তুকে দেখি তখন সেখানে দুটো বুদ্ধি লেগে থাকে, যেমন এই পেন দেখছি, একটা হল পেন আর এই পেন। এটা পেন, এটা হল অস্তিত্বের ভাব, এর আকৃতির ভাব। কোন কারণে যদি পেন নাশ হয়ে যায়, পেন যদি প্লাস্টিকের হয়, তাহলে প্লাস্টিক রূপে এটা আছে, এই আছে জিনিসটা কখন নাশ হবে না। এটাকে বলে সদ্বুদ্ধি, সদ্বুদ্ধির কখন নাশ হয় না। সমস্ত সৃষ্টিরও যদি নাশ হয়ে যায়, এই সৎএর নাশ হবে না। সৃষ্টির পর ব্রহ্মারও যদি নাশ হয়ে যায় তাও সদ্বুদ্ধির নাশ হবে না। এই যে সৎ, যেটা কখন নাশ হতে পারে না, এটাই আত্মা।

এর আগে আচার্য শঙ্করের কথা বলতে গিয়ে বলা হয়েছিল যে, আচার্য বলছেন সদ্বুদ্ধি ও অসদ্বুদ্ধি দুটো একসাথে চলে। যে কোন জ্ঞান আহরণ করার সময়, তা চোখ দিয়েই হোক, কান দিয়েই হোক বা যেভাবেই হোক, সেখানে এই দুটো সব জায়গাই থাকবে। পেনের উপমা দিয়ে আমরা বললাম, পেন আছে। এই পেনের মধ্যে একটা অসদ্বুদ্ধি আছে, কারণ পেনের একদিন জন্ম হয়েছিল, পেন একদিন নাশ হয়ে যাবে। কিন্তু এই পেনের পিছনে যে একটা আস্তিক্য বুদ্ধি আছে, এই বুদ্ধি নাশ হবে না। এই পেনের নাশ হয়ে গেলেও অন্য পেন থাকবে, আর সমস্ত পেনের যদি নাশ হয়ে যায়, তখন পেন একটা বস্তু, কিন্তু অন্য বস্তুগুলো থাকবে। বস্তু যদি নাশ হয়ে যায়, তাহলেও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থাকবে। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও যদি নাশ হয় যায় তখন এই অস্তি বুদ্ধি এর কখন নাশ হবে না। এই যে অস্তি বুদ্ধি, আছে এই যে বোধ, আচার্য শঙ্কর বলছেন, এটাই আত্মা।

জুহুদি ধর্মে মোজেস খুব নামকরা প্রফেট, মোজেসকে ভগবান দর্শন দিয়েছেন। দর্শন দিয়ে তাঁকে এটা কর, সেটা কর বলে আদেশ দিলেন। তখন মোজেস জিজ্ঞেস করল, লোকেরা যখন বলবে, তোমাকে কে এই কথাগুলো বলেছে, আপনি কে, তখন আমি কি বলব? ভগবান তখন বলছেন, I am, who I am, আমি যে, আমি সেই। লোকেরা যখন জিজ্ঞেস করবে, কে তোমাকে পাঠিয়েছে? ভগবান বলছেন, Tell them I am has sent you, এটা যে কত কঠিন একটা কথা, বেশির ভাগ মানুষ ধরতেই পারবে না। কিন্তু আমাদের কাছে এই জিনিসটা এত স্বাভাবিক যে আমাদের কাছে কোন সমস্যাই নয়। বেদান্তের ব্যাপারে যাঁর একটু ধারণা আছে, তাঁর কাছে এটা খুব স্বাভাবিক একটা বাক্য। যিনি সচ্চিদানন্দ, যিনি ঈশ্বর, তিনি যখন কারুর কাছে আত্মপ্রকাশ করবেন, তিনি যদি তাঁকে জিজ্ঞেস করেন লোকেদের আমি কি বলব? তিনি অবাঙমনসোগোচরম্ হবেন, তাঁর কোন নাম দেওয়া যাবে না, তখন তিনি এটাই বলবেন, সোহহং, আমি যা আছি তাই আছি। এর অর্থ একটাই, নাম আর রূপের তিনি বাইরে। এর আগেও আমরা বলেছিলাম যে, জুহুদিদের ভগবানের নাম জেহোবা, যার বানান হল YHWH, যার কোন উচ্চারণ করা যায় না। এর ভাব এটাই, ঈশ্বরের কখন নামকরণ হয় না। তাহলে হিন্দুরা বিষ্ণু, কালী, শিব কেন বলে? বলে তাদের সুবিধার জন্য, তাঁর নাম কালীও না, বিষ্ণুও না, শিবও না। ওই আকার কেন দেওয়া হয়েছে? যাতে মানুষ ধারণা করতে পারে। তাঁর কোন আকার নেই। ঠাকুর বলছেন, সমুদ্র দূর থেকে নীল দেখায়, কাছে যাও কোন রঙ নেই।

আমি কে?

এবার স্বামীজী বলছেন, When we free ourselves from name and form, especially from a body, -when we need no body, good or bad, then only do we escape from bondage. (*আমরা যখন নাম-রূপ থেকে – বিশেষতঃ দেহ থেকে মুক্ত হই, যখন আমাদের ভাল-মন্দ কোন দেহের প্রয়োজন থাকে না, তখনই কেবল আমরা বন্ধন অতিক্রম করতে পারি।*) রমণ মহর্ষির নামকরা বইয়ের নাম ‘Who am I’; আমি কে, শুধু এটাকে বিশ্লেষণ করার জন্য একটা বই লিখে ফেললেন। ঠাকুর কথামৃতে মাঝে মাঝে কোন ভক্তকে বলছেন, আচ্ছা বিচার করো তো তুমি কে? ঠাকুর সচারচর বেদান্তের এই ভাব, যেখানে বিচারের ভাব আছে, সবার সামনে বেশি বলতেন না। যাদেরকে বলতেন তাঁরা কতটা বুঝতেন আমাদের জানা নেই। ‘আমি কে’, এটা বিচার করা খুবই কঠিন জিনিস, কেমন একটা বিচিত্র জিনিস বলে মনে হয়। ঠাকুর যেদিন নরেনকে ছুঁয়ে দিলেন, নরেন চেঁচিয়ে বলছে, মশাই করছেন কি, আমার বাবা আছে, মা আছে। এই হল নরেনের অবস্থা, যিনি স্বামী বিবেকানন্দ হবেন, বিশ্বের আচার্য পুরুষ হবেন। ঠাকুরও নরেনকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, থাক থাক পরে হবে, সেখানে আমি আপনি কোন খার। আমি আপনি না হয় আমাদের শরীর নিয়েই বলব, নরেন আবার আরেক ধাপ এগিয়ে বলছেন, আমার বাবা আছে, মা আছে।

আমরা ঠাকুরের কথা মেনেই নিলাম যে, ঠাকুর নরেনকে সপ্তর্ষি মণ্ডল থেকে নিয়ে এসেছিলেন। সপ্তর্ষি মণ্ডল মানে যেখানে দেবতারাও যেতে পারেন না, সপ্তর্ষির ঋষিরা এতটাই উচ্চমানের। তাঁকে যখন দেহ ধারণ করিয়ে মর্ত্যলোকে আনা হল, তিনি কিনা বলছেন, ‘মশাই করছেন কি? আমার বাবা আছে, আমার মা আছে’। ঠাকুর কি আর করবেন, তুমি যেটা সপ্তর্ষি মণ্ডলে ধ্যানের গভীরে করছিলে, ওটাই তো তিনি তোমাকে দিতে চাইছিলেন। তোমাকে আনা হয়েছে বিশেষ কাজে, এই বাবা-মা তোমার নয়, আর তুমি বলছ, আমার বাবা আছে, মা আছে। তাহলে আমরা যদি বলি, আমার ঘর সংসার আছে, আমার এই নাম, আমার এই খ্যাতি, তাতে দোষের কি আছে! কদাচিৎ আমরা যদি কিছুক্ষণের জন্য গভীরে গিয়ে বিচার করে দেখি, তখন মনে হবে যে আমি শুধু এই দেহধারী নই, আমি হলাম কতকগুলি ভাবের মূর্ত রূপ। এবার যেন একটা বাঁধের দরজা খুলে গেল, এত জিনিস তখন বেরোতে শুরু হবে যে আমরা সামলাতে পারি না, সামলাতে পারি না বলে তাড়াতাড়ি দরজাটা আবার বন্ধ করে দিই। আমি আপনি bundle of ideas নই, bundle of ideas আমাদের শরীরের মাধ্যমে work out করছে। যেটা আমরা জানি না, সেটার ব্যাপারে আমরা জিজ্ঞেস করে নিই। আমি কে, আমরা জানি না, তাই আমাদের এটা জিজ্ঞেস করে নিতে হয়। আমি তো জানি না আমি কে, আপনিই বলুন আমি কে।

সব রকম শরীরই বন্ধন

এই যে কিছুক্ষণ আগে আস্তিক্য বুদ্ধির কথা বলা হল, অস্তি, আছে, সব সময়ই এই 'আছে' ভাবটা থাকছে, যার উপরে নামরূপের খেলা চলছে। সমুদ্রে যে ঢেউয়ের খেলা চলছে সেটাও নাম রূপের খেলা। কিন্তু সমুদ্র একটা জড় পদার্থ, dead matter। চৈতন্য পদার্থও নয়, জড়ও নয়, চৈতন্য চেতনার সমুদ্র। সেই সমুদ্রের উপর যখন ঢেউ খেলে, সেটা হল নাম-রূপের ঢেউ, আমাদের শরীর রূপী নাম রূপের ঢেউ। শরীরের আবরণ যেমন জামা কাপড়, ঠিক তেমনি এই শরীরের পিছনে রয়েছেন জীবাত্মা, জীবাত্মার উপর শরীরটা তাঁর পোশাক। ওই জীবাত্মার পিছনে আছে অজ্ঞান, যে অজ্ঞান সব কিছুর খেলা করাচ্ছে, বেদান্ত মতে শুদ্ধ আত্মার উপর এই অজ্ঞান আবরণ এসেছে। অজ্ঞান আবরণ মানে, আমি এক আমি বহু হব, আমি শুদ্ধ চৈতন্য আমার যে ঐশ্বর্য, সেই ঐশ্বর্যের আমি ভোগ করব, আমারই ঐশ্বর্য আমি ভোগ করব। কারণ ঈশ্বর ছাড়া তো আর কিছু নেই। ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই বলে, শুদ্ধ চৈতন্য ছাড়া কিছু নেই বলে, তিনি নিজেই একটা শরীর নিয়ে আসেন, এনে নিজেকে ভোগ করেন। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কোন সুন্দরী মহিলা নিজেকে দেখে যাচ্ছে, আয়নাতে নিজের সৌন্দর্যকেই সে ভোগ করে যাচ্ছে। এই ভাবে চলতে চলতে মাঝখান থেকে আমরা এতদিনে ভুলে গেছি যে, সেই শুদ্ধ চৈতন্য এই শরীর দিয়ে কিছু অভিব্যক্তি পাচ্ছে। কিসের অভিব্যক্তি পাচ্ছে? একট ভোগের, ওই ভোগের মধ্যে দিয়েই ধীরে ধীরে সে আবার তার স্বরূপের জ্ঞানের দিকে এগোচ্ছে। যেমন যেমন সে শরীর পাবে, তেমন তেমন তার ভোগ হবে। কিন্তু যখন সে জ্ঞানের দিকে এগোতে শুরু করে, তখন সে যদি পূর্ণ অভিব্যক্তি চায়, শুদ্ধ চৈতন্য বলতে যেটা বোঝায়, সেটাকে যদি চায়, তখন কিন্তু এই দেহ আর চলবে না, ওই জ্ঞানের জন্য তাকে দেহটাকে ছাড়তে হবে। ওই সূক্ষ্ম অজ্ঞানটাও না চলে গেলে হবে না।

সহজ করে বলতে হলে এভাবে বলা যেতে পারে – আমরা মজা করে বলি, পরনিন্দা পরচর্চা করলে পরের জন্মে ছারপোকা হয়ে জন্ম নিতে হবে। পরনিন্দা-পরচর্চা পিছন থেকে করা হয় কিনা। ছারপোকাও তাই করে, পিছনে এসে কামড়ায়। এবার ছারপোকা হয়ে প্রাণের সুখে অপরকে কামড়াতে থাকবে। কারণ এই শরীর দিয়ে বেশি পিছন থেকে কামড়ানো যায় না। মাংস খেতে খুব ভালবাসে, মাংস ছাড়া কোন খাওয়াই রুচবে না। খুব ভাল, আগামী জন্মে শকুন হয়ে জন্ম নেবে, প্রাণ ভরে মাংসই খাবে, শকুন মাংস ছাড়া কিছু খায় না। আমরা যে যে ভাবগুলির প্রতিনিধিত্ব করি, ঠিক সেই ভাব অনুসারে পরে আমাদের শরীর হয়ে যায়। যদি কেউ মনে করে, পরের জন্মে যদি আমি বড়লোক হয় জন্ম নিই, তার মানে তার ভাবটা বড়লোকের দিকে যাচ্ছে; এখনও সে বন্ধনে আছে। যদি বলে মৃত্যুর পর আমি স্বর্গে যেতে চাই, এখনো সে বন্ধনে আছে, দেবতাদের শরীর পেতে চাইছে, শরীর মানেই বন্ধন। স্বামীজী এটাই বলছেন, যতক্ষণ আমাদের দেহ থাকবে, তা বাজে শরীর হোক, ভাল শরীর হোক, সাপের শরীর হোক, বিছের শরীর হোক আর দেবতার শরীরই হোক, শরীর মানেই বন্ধন। যতক্ষণ মনে হবে আমার সুস্থ শরীর হোক, ভাল শরীর হোক, জানবেন সে বন্ধনে আছে। রোগে জরাজীর্ণ শরীর হলে আমরা সব সময় মনে করি, সুস্থ শরীর হলে ভাল হত। সুস্থ শরীরও বন্ধন, অসুস্থ শরীরও বন্ধন, এই শরীরের বাইরে আমাদের সবাইকে যেতে হবে।

স্বামীজী বলছেন, Eternal progression is eternal bondage; annihilation of form is to be preferred. (*'অনন্ত উন্নতি' মানে অনন্তকালের জন্য বন্ধন; তার চেয়ে সকল রকম আকৃতির ধ্বংসই বাঞ্ছনীয়।*) বিবর্তনবাদ একদিকে বলছে একটার পর একটা শরীর আসছে, আমাদের এখানে মনে করা হয়, একটা শরীর থেকে আরেকটা শরীরে ধীরে ধীরে সে আরও উন্নত হচ্ছে, পশু ছিল, সেখান থেকে মানুষ হল, এবার দেবতা হবে। এই যে eternal progressএর কথা বলা হচ্ছে, স্বামীজী বলছেন, কোন progressই হচ্ছে না, তুমি eternal bondageএই আছ। এই ভাবগুলি ধারণা করা খুব কঠিন। কারণ স্বাভাবিক ভাবে আমরা হলাম দেহধারী, যে সংস্কার নিয়ে জন্মেছি সেই সংস্কার সমূহ থেকে আমাদের মন বেরিয়ে আসতে চায় না, ওই ভাবেই আমরা থাকতে চাই। তখন এই ধরণের কথা শুনলে মনে হবে, কি সব আবলতাবোল বকছে। সেইজন্য ধর্মের কথা সবার সামনে বলা যায় না। স্বামীজী আরও খুব মারাত্মক কথা বলছেন, annihilation of form is to be preferred, যত রকমের আকৃতি হতে পারে, আকার হতে পারে, এর নাশ হয়ে যাওয়াটাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য। দেহ খারাপ হওয়ার হলে হবে। কিন্তু তখন এই আবার ভাব হবে দেহটা

যেন সুস্থ হয়ে ওঠে, অর্থাৎ আমি মৃত্যু চাইছি না। কারণ দেহ চলে গেলে আবার দেহ ধারণ করতে হবে, যেহেতু এখনও জ্ঞান হয়নি। দেহতে থেকেই জ্ঞান লাভ করে দেহ থেকে মুক্তিই উদ্দেশ্য।

স্বামীজী এই সব কথা থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে মুষ্টিমেয় কয়েকজন শিষ্যকে বলছেন, তাঁরা আবার সবাই খ্রীশ্চান পরম্পরায় বড় হয়েছেন। গৃহকর্তী মিসস ডাচার ছিলেন আবার গোঁড়া খ্রীশ্চান, স্বামীজীর সব কথা উনি নিতে পারতেন না। এমনও হত যে কোন কোন দিন তিনি চোখের জল ফেলতে ফেলতে কটেজ থেকে বেরিয়ে গিয়ে বাইরে কাটাতেন। সবাই তাঁকে বোঝাতেন, মেনে নিতে বলতেন। এখন আমরা যারা এখানে শুনছি, আমরা হিন্দু, ঠাকুরের ভক্ত, আমরা তাও মেনে নিতে পারি, কিন্তু যারা দ্বৈতবাদী পরম্পরায় বড় হয়েছে, যাদের কাছে জীবনের উদ্দেশ্যই হল স্বর্গে যাওয়া, স্বর্গে গিয়ে ভোগ করা, তাদের পক্ষে এই ধরণের কথা কোন ভাবেই মেনে নেওয়া সম্ভব না।

স্বামীজী বলছেন, We must get free from any body, even a 'god-body'. (*সব রকম দেহ, এমন-কি দেবদেহ থেকেও আমাদের মুক্তিলাভ করতে হবে।*) যেটা বলা হল, দেবশরীর থেকেও বেরিয়ে আসতে হবে, কারণ, God is the only real existence, there cannot be two. (*ঈশ্বরই একমাত্র সত্যবস্তু, সত্যবস্তু কখনও দুটি থাকতে পারে না।*) একটু আগে যে আস্তিক্য বুদ্ধি, সদ্বুদ্ধির কথা বলা হল, অস্তি একটাই, এর দুই হতে পারে না। কারণ যেখানেই দুই হবে সেখানেই অসদ্বুদ্ধি, অস্তিত্ব দুই হতে পারে না। ঈশ্বর, তিনি সেই এক। যদি দুই অস্তিত্বের কথা বলি, তাহলে আমরা দ্বৈতবাদে নেমে যাব। স্বামীজীর কাছে দ্বৈতবাদ সত্য নয়, নিম্ন সত্য, There is One Soul, and I am That. (*একমাত্র আত্মাই আছেন, এবং 'আমিই সেই'।*) শুদ্ধ আত্মা এক, যিনি সৎ, যাঁর অস্তিত্ব সব সময় আছে, জগতে যা কিছু আছে সব কিছুর আধার সেই সৎ, আর আমিই সেই।

বেদান্তের এই ধরণের বাক্য মানুষের পক্ষে মানা অসম্ভব আর বোঝা বা ধারণা করা আরও মারাত্মক কঠিন। জগতে এ-সব কথা লোকেরা শোনার সুযোগও পায় না। দুর্ভাগ্য হল, এটাই সত্য। প্রত্যেক মানুষকে, প্রত্যেক জীবকে, আজ হোক কিংবা কাল হোক, জ্ঞানের এই পথ দিয়েই যেতে হবে। যতদিন এই পথ দিয়ে না যাবে, ততদিন সৃষ্টি এভাবেই চলতে থাকবে। অজ্ঞান থাকলে সৃষ্টি থাকবে। সৃষ্টির নাশ এমনি এমনি হয়ে যাবে না, আকারটা মাঝে মাঝে পাল্টাবে, যেমন যোনিতে যাবে, তেমন তেমন শরীর ধারণ করবে। এই পৃথিবী নাশ হয়ে যাবে, পৃথিবীই কেন, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই একদিন নাশ হয়ে যাবে। নাশ হয়ে গেলেও এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পিছনে আরও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রয়েছে, যা এর থেকেও অনেক সূক্ষ্ম। জীব চৈতন্যের উপর আবরণ, চৈতন্য অন্য রূপে অন্য আবরণে দেহ ধারণ করবেন। মূল কথা এই সৃষ্টি কোন না কোন ভাবে চলতে থাকবে। যে অর্থে আমরা সৃষ্টি মনে করি, যতক্ষণ সবার জ্ঞান না হয়ে যায়, এই কোটি কোটি আবর্জনা রূপী সংস্কার যতক্ষণ পরিষ্কার না হয়ে যায়, তত দিন সৃষ্টি চলতেই থাকবে।

শুভকর্ম, সেবাকার্য মুক্তির একটা উপায়; উদ্দেশ্য নয়

খ্রীশ্চানদের যে প্রচলিত মত, আমাদেরও কিছু কিছু সম্প্রদায়ের যে প্রচলিত ধারণা – জীবনের উদ্দেশ্য হল স্বর্গে যাওয়া। স্বামীজী এতক্ষণ দেখালেন স্বর্গে যাওয়ার ইচ্ছা, এটাও অজ্ঞানেরই একটা লক্ষণ। আমাদের অনেকের ধারণা, জীবনের উদ্দেশ্য হল জগতে যত দিন বেঁচে আছি তত দিন ভাল কাজ করে যাওয়া। স্বামীজীও এক জায়গায় বলছেন, To be good and to do good, two of these are whole of religion। হিন্দু ধর্মে ঠিক ঠিক ধর্ম হল সত্ত্ব, রজো ও তমো এই তিনটে গুণের পারে যাওয়া, ধর্মও তিনটে গুণের মধ্যে আবদ্ধ রাখে। সাধারণ ভাবে মানুষ তামসিক হয়, তামসিক মানে নিজেকে ছাড়া আর কিছু জানে না, সব কিছু নিজের জন্য চাই, নিজের সুখ সমৃদ্ধির জন্য সে মারামারি, চুরি, মিথ্যার আশ্রয় নিতেও সঙ্কোচ বোধ করে না। এদের কাছে জগৎ ছাড়া কিছু নেই, নিজের অস্তিত্ব ছাড়া কিছু নেই। তমো গুণের হ্রাস হয়ে রজো গুণের আধিক্য হলে তখন অন্য ধরণের একটা শক্তির উদ্ভব হয়। সবার কাছে নিজেকে খুব জাহির করতে চায়, এরা দানধ্যানও করে, কিন্তু সব কিছুতে আমিত্বের ভাবটা খুব প্রবল থাকে। সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হলে নিজের চিন্তা-ভাবনা গুলো শুভ হয়ে যায়। To be good মানে শুভ চিন্তা-ভাবনা এবং শুভ কর্মের চেষ্টা করা।

শুনে শুনে আমাদের বদ্ধ একটা ধারণা হয়ে গেছে যে, অপরকে ভাল করা, সবার মঙ্গল করাটাই ধর্ম। জগতে ধর্ম দুই প্রকার, তার মধ্যে একটা হল, যাকে সাধারণ ধর্ম বলা হয়, সেই ধর্ম হল অপরের ভাল করা। কিন্তু ঠিক ঠিক ধর্ম হল, ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা, আত্মজ্ঞান, যেখানে ভালমন্দ দুটোরই পারে চলে যায়। অপরকে ভাল করা, এই যে খ্রীশ্চানদের ধারণা, এটাকে আক্রমণ করে স্বামীজী এবার বলছেন, Good works are only valuable as a means of escape; they do good to the doer, never to any other. (*মুক্তিলাভের সহায়ক বলেই শুভকর্মের যা মূল্য; যে কাজ করে, ঐ কর্ম দ্বারা তারই কল্যাণ হয়– অপর কারও কিছু হয় না।*) জগৎটা যেন একটা জেলখানা, এখান থেকে বেরিয়ে আসার জন্য একটা সিঁড়ির দরকার, শুভকর্ম হল সেই সিঁড়ি, যেটা দিয়ে বেরিয়ে আসা যায়। পোল ভল্টে একটা লম্বা ডাণ্ডা নিয়ে দৌড়ে এসে ওটার উপর ভর দিয়ে লাফ মেরে একটা বিশেষ উচ্চতাকে অতিক্রম করে। হাতে যদি পোল না থাকে বাধাটা অতিক্রম করে ঐ উচ্চতা ডিঙোতে করতে পারবে না। আর পোলটাকে যদি সব সময় ধরে রাখে তাহলেও ডিঙোতে পারবে না। পোলের দরকার আছে, কিন্তু লাফ দেবার আগের মুহূর্তে পোলকে ছেড়ে দিতে হবে, তা নাহলে বাধা অতিক্রম করতে পারবে না।

হিন্দুদের মধ্যে যাঁরা ধর্মকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন, অনুভব করেছেন, তাঁরা এটা বোঝেন যে, যাঁরা ঈশ্বর লাভ করতে চান, প্রথমে তাঁদের ভাল দিয়ে মন্দকে ফেলে দিতে হয়, পরে ওই ভালটাকেও ফেলে দিতে হয়। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলে দুটো কাঁটাকেই বাইরে ফেলে দিতে হয়। প্রথম প্রথম শাস্ত্র পড়ার সময় বোঝা যায় না, এই কথার মাধ্যমে শাস্ত্র ঠিক কি বলতে চাইছে। অপরের ভাল করা, মঙ্গল করা, এর থেকে ভাল কি আর হতে পারে! কিন্তু সাধনা করতে করতে পরে ধীরে ধীরে জিনিসগুলো পরিষ্কার হতে শুরু করে।

স্বামীজী বলছেন, they do good to the doer never to any other, খ্রীশ্চানদের বিশ্বাস অনুযায়ী অপরের ভাল করাকে কেউ নিন্দা করছে না। যারা বলে সেবাহি পরমো ধর্ম, ঠিকই তো জগতে সেবার থেকে পরম ধর্ম আর কি হতে পারে! কিন্তু যদি বলে সেবাই শেষ কথা, তাহলে কিন্তু সব গোলমাল হয়ে যাবে। কারণ, সেবাই যদি শেষ কথা হত, তাহলে আমাদের আচার্যরা এই কথা বলতেন, কিন্তু কেউ তা বলছেন না। আর সেবাই যদি শেষ কথা হয়, তাহলে ঈশ্বরকে আমরা যেভাবে দেখি, ঐ দেখার সাথে এটা মিলবে না। কারণ জীবন যদি ঈশ্বরের হয়, মৃত্যুটাও ঈশ্বরের, ভালটাও ঈশ্বরের, মন্দটাও ঈশ্বরের। সেবাই যদি শেষ কথা হত, তাহলে জগতে মন্দ কখন হত না। মন্দ আছে মানেই, ওটাও ঈশ্বরের থেকে আসছে। তার মানে ওটা শেষ কথা নয়। যদিও আমরা মনে করি সেবাকার্যে অপরের মঙ্গল হয়, কিন্তু আসলে সেবাকার্যে অপরের কিছুই মঙ্গল হয় না, ভাল যা হবার নিজেরই হয়। কিন্তু সেবা ব্যাপারটা আমরা যত সহজ মনে করি তত সহজ নয়। ঠাকুর বলছেন, সেবা করার মধ্যেও কোথা থেকে অহঙ্কার এসে যায় বুঝতে দেয় না, 'আমি করছি' এই ভাব এসে যায়। আমরা সংসারে আছি কিনা, সংসারে থাকার জন্য আমাদের মধ্যে সত্ত্ব, রজো ও তমো এই তিনটে গুণ সব সময় খেলা করছে, তিনটে জোঁক কখন যে ধরে নেবে বুঝতেই দেবে না। অন্য দিকে আবার সমস্যা হল, এই যে শুনছি, কখন জোঁক ধরে নেবে, কখন আমরা ফেঁসে যাব, এই ভেবে আমরা অপরের ভাল করাটাই ছেড়ে দিই। আমরা মনে করি, আমি তো ভাই মন্দ কিছু করছি না, তাই ভালটাও করতে চাই না। উত্তরাখণ্ডের বেশির ভাগ সাধু সন্ন্যাসীরা এই ভাব নিয়ে চলেন। সামনে কারুর কোন বিপদ দেখলে সেদিকে ফিরেও তাকাবে না, এই ভাব যে, ওদিকে তাকালে আমি মায়ার বন্ধনে পড়ে যাব। যে সাধুরা পুরো জিনিসটা ভাল ভাবে বুঝতেন না, তাঁদের বক্তব্য হল, সেবা কার্যে নেমো না, সেবা করা মানেই তোমার মনকে তুমি এই জগতে নামিয়ে দিলে, জগতে নামিয়ে দিলে মানে এবার তুমি ধীরে ধীরে জগতের বন্ধনে পড়ে যাবে।

স্বামীজীর দুজন ত্যাগী সন্তান স্বামী কল্যাণানন্দ ও স্বামী নিশ্চয়ানন্দ হরিদ্বারে প্রথম সেবা কার্য করতে শুরু করেন। স্বামীজী সব সময় বলতেন, সেবা হল মুক্তির একটা মাধ্যম। স্বামীজীর এই দুজন শিষ্যকে হরিদ্বারের অন্যান্য সাধুরা ভঙ্গি সাধু বলে সম্বোধন করতেন, ভঙ্গি মানে মেথর। সেই সময় হরিদ্বারে সাধুদের কোন ভাণ্ডারা হলে এই দুজন সাধুকে ডাকা হত না, কারণ এনারা অস্পৃশ্য। আজ পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। এই সেবা কার্যের জন্য এখন রামকৃষ্ণের প্রচুর সুনাম, এখনও হরিদ্বার ও তার আশেপাশে যাদের কেউ দেখার নেই, তাদের রামকৃষ্ণ মিশনই দেখাশোনা করে। হরিদ্বারে এখন বড় বড় হাসপাতাল তৈরী হয়ে গেছে,

বড় বড় সাধুরা, ধনীরা ওই সব হাসপাতালে যান, কিন্তু যাদের কিছু নেই, যাদের কেউ দেখার নেই, তারা সবাই রামকৃষ্ণ মিশনের হাসপাতালেই আসে। যারা মনে করে সেবাকার্য করলে বন্ধনে পড়বে, তারা এটা ভুলে যান, সেবাকার্য যদি না করা হয়, তাহলে কিন্তু আরও বেশি অজ্ঞানের বন্ধনে পড়ে যাবে, যেটা গীতাতে বারবার বলছেন। সেইজন্য ধর্ম অত্যন্ত গুহ্য জিনিস, ধর্মের গতি অত্যন্ত সূক্ষ্ম, ধর্মকে বোঝা তাই খুব মুশকিল। আর সেবাকার্যে সত্যিই কিছু সমস্যাও হয়, কোন সন্ন্যাসী একটা বড় আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে সেবাকার্য চালাচ্ছেন, আশ্রমের সাথে একটা বড় হাসপাতালও করা হয়েছে। সন্ন্যাসী জানেন, আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর থেকে আমার মৃত্যু পর্যন্ত আমি এখানকার অধ্যক্ষ। ধীরে ধীরে হাসপাতাল বড় হবে, আরও বেশি বেশি করে লোকেরা তাঁর কাছে আসতে থাকবে, লোকেরা আরও ডোনেশান, প্রণামী দেবে, আরও বেশি তাঁর নাম হবে, সেখান থেকে ধীরে ধীরে ওই সেবাকার্য করা থেকে কখন তিনি নিজেকে একজন ভগবান মনে করতে শুরু করবেন, বুঝতেই পারবেন না।

রামকৃষ্ণ মিশনের এই সমস্যা হয় না। কারণ এখানে সন্ন্যাসীদের সার্বিক মঙ্গলার্থে তাঁদের উপর একটা জায়গা থেকে নজরদারি চলতে থাকে। সেখান থেকে দেখা হয়, খুব ভাল কাজ করে করে বেশি নামযশ হয়ে যাচ্ছে, সাধুর মন ওই জায়গাতে আসক্ত হয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ একটা পোস্টকার্ড এসে যাবে, তুমি তাড়াতাড়ি হেডকোয়ার্টরসে চলে এসো, তোমাকে অমুক আশ্রমের দায়ীত্ব দেওয়া হল। একটা বিরাট সাম্রাজ্য দাঁড় করিয়ে সেখানকার অধিপতি হয়ে বসবেন যাই ভাবছিলেন, একটা পোস্টকার্ড এসে সব উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। এখানেই শেষ নয়, আবার কোন আশ্রমে এইভাবে একটা বিশাল সাম্রাজ্য তৈরী করার পর সেখানেও এক অবস্থা, এই ভাবে একবার দুবার, তিনবার ভাঙতে ভাঙতে বুঝতে পারেন আসলে কি চাই। ঠাকুর খুব সুন্দর বর্ণনা করছেন, একজন পাহাড়ের উপর একটা কুঠি বানিয়েছিল। একদিন জোর ঝড় উঠেছে, ঝড় উঠতেই দেখছে তার কুঠিটা নড়বড় করতে শুরু করেছে। সে ভাবল বাতাসের ভগবান পবনদেব, পবনদেবের পুত্র হনুমান, গলা ছেড়ে বলছে, হে পবনদেব এটা হনুমানের বাড়ি, দোহাই আপনি এই কুঠি রক্ষা করুন। তাও কুঠিটা ধড়মড় করছে, সে ভাবল হনুমানের মালিক শ্রীরামচন্দ্র, এটা রামের বাড়ি, রামের প্রিয় সীতা, এটা সীতার বাড়ি, লক্ষ্মণের বাড়ি, অমুকের বাড়ি, বলতে বলতে কুঠিটা শেষে যেই হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল; তখন বলছে, শালার বাড়ি।

স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ খুব সিরিয়াস কথাকেই এমন কৌতুক করে বুদ্ধিদৃপ্ত ভাবে কথা বলতেন যে তাতে হাসি ও চিন্তার খোরাক দুটোই পাওয়া যেত। সাধুরা রোজ সকালে মহারাজকে প্রণাম করতে যেতেন। মহারাজ সেই সময় কুড়ি পঁচিশ মিনিট সবার সাথে বেশ গল্পসল্প করতেন। মাঝে মাঝে সাধুরা মহারাজকে মজা করে কিছু প্রশ্নও করতেন। একদিন কোন সাধু বলছেন, 'মহারাজ! আপনি বলেন আজকালকার সাধুরা নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ করেন না, কিন্তু এই তো কত বড় বড় কাজ হচ্ছে, সবাই এসে বলেন ঠাকুরের ইচ্ছায় মন্দিরটা শেষ হল'। মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে বলছেন, 'ঠিকই বলছ, সবাই বলে ঠাকুরের ইচ্ছায় আমার সময়ে মন্দিরটা হয়েছে'। কিছুতেই আমরা এই 'আমি' থেকে বেরোতে পারব না। কিন্তু একবার এই অহঙ্কার ভেঙে দেওয়া হবে, দ্বিতীয়বার ভাঙা হবে, তৃতীয়বার ভাঙবে, তখন বলবেন, যেটুকু করতে বলা হয়েছে সেটুকু করে দিলাম, এর বেশি আর না, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। তখন উপলব্ধি হয়, এই যে কাজ করছি এটা অপরের মঙ্গলের জন্য নয়, নামযশও কিছুই না, আমাকে নিজেকে তৈরী করতে হবে। স্বামীজী ঠিক এই কথাই বলছেন, they do good to the doer never to any other। কেউ যদি মনে করে আমি এই কাজ অপরের জন্য করছি, তাহলে সে বিপদে পড়ে যাবে। কাজ আমি নিজের জন্য করছি, আর এই কাজের মাধ্যমে আমি নিজেকে উপরের দিকে নিয়ে যাব, এই ভাব যদি থাকে তাহলে এবার সে কাজের রহস্যটা জেনে গেল। কর্মের এই রহস্য না জানলে সে কোন দিন উন্নতি করতে পারবে না। এরপর স্বামীজী জ্ঞানের উপর বলছেন, আমরা কিভাবে জ্ঞান আহরণ করি।

এর আগে হিন্দু ধর্মের অন্যতম একটা method of knowledge উপমান প্রমাণের উপর আলোচনা করা হয়েছিল। উপমান মানে, একটা জিনিসকে অন্য কিছুর সাথে তুলনা করে করে জানা। যেমন একজন চিড়িয়াখানায় সিংহ দেখতে গেছে, সে আগে কখন সিংহ দেখেনি, কিন্তু কিছু কিছু কথা শুনে নিয়েছে, বেড়ালের

মত দেখতে হয়, গায়ের রঙ হলুদ হয়, মুখটা হাঁড়ির মত, এগুলো দিয়ে যখন তুলনা করা হয় তখন আসল সিংহ দেখলে তাকে আর বলে দিতে হবে না যে এটাই সিংহ। স্বামীজী এই জিনিসগুলোকে বর্তমান ভাষায় বলছেন, Knowledge is mere classification। এর আগে আলোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছিল, শিশু জন্ম নেওয়ার পর একটা জিনিসকেই সে জানে, তা হল food source। মায়ের দুধ খাওয়া শুরু করে, তখন তাকে বলা হয় এ হল তোমার মা। তারপর আরেকজন আসার পর তাকে বলা হল, এটা পা। এবার classification হচ্ছে, আমার যে food source, এ হল মা, বাকিরা পা। সেখান থেকে আরেকটা বলা হল, এটা পা না, এটা দা। এইভাবে classify করে করে সেখান থেকে এক দুই তিন, সেখান থেকে বিজ্ঞান, এই করে করে বিরাট জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করে যাচ্ছে। আগে এর উপর আমরা বিস্তারিত আলোচনা করে এসেছি, সেইজন্য আর পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে না।

স্বামীজী বলছেন, When we find many things of the same kind we call the sum of them by a certain name and are satisfied. (*আমরা একই প্রকারের অনেকগুলি জিনিস দেখলাম – দেখে সেই সবগুলির একটা কোন নাম দিলাম, তাতেই আমাদের মন শান্ত হল।*) যখন দেখি অনেকগুলো জিনিসের মধ্যে অনেক কিছুর মিল আছে তখন সেটাকে জাতি বলে দেওয়া হয়, জাতি দিয়ে classify করে দেওয়া হল। যখন দেখা যাচ্ছে একটা বয়সের পর এই এই জিনিস হয়, তখন বলে এনারা বয়স্ক। যেমনি আমরা বয়স্ক শব্দটা শুনি আমাদের মাথায় কতকগুলো আইডিয়া এসে যায়, বয়স্ক মানে মাথা থেকে চুল পড়ে গেছে, দাঁত নড়ছে, খেলে হজম হয় না, আচার্য শঙ্কর আরও বলছেন সমাজে সম্মান পায় না, পরিবারের লোকেরাও আর গুরুত্ব দেয় না। বয়স্ক শুনলেই এই ধরণের কতকগুলো আইডিয়া আমাদের ভিতরে আকার ধারণ করে নেয়। আর বলছেন, we discover 'facts', never 'why'. (*আমরা কতকগুলি ঘটনা বা তথ্য আবিষ্কার করে থাকি, কিন্তু কেন সেগুলি ঘটছে, তা জানতে পারি না।*) জ্ঞান হওয়া মানে কতকগুলি facts তুলে আনা, কিছু information সংগ্রহ করা। আগেকার দিনে লোকেরা খেটেখুটে information সংগ্রহ করত, ফলে কিছুটা ভিতরে ঢুকত। এখন কিছুই ভিতরে ঢোকে না, কাল যে সংবাদটা সারা দেশে হৈ হৈ কাণ্ড বাঁধিয়ে দিয়েছিল, দুদিন, চারদিন যেতে না যেতে কারুর মনেই থাকছে না যে, এই রকম কোন একটা জিনিস ঘটেছিল। আমরা সবাই 'facts'এর পিছনেই যায় 'why'এর পিছনে যাই না। আমরা কিছু তথ্যের পিছনে পাগলের মত দৌড়াচ্ছি। কেন হয়, কিভাবে হয়, এই ব্যাপারে আমাদের কোন ধারণা থাকে না।

বর্তমান যুগ হল ইনফরমেশানের যুগ, ইন্টারনেট, মিডিয়ার দৌলতে শুধু ইনফরমেশান আর ইনফরমেশান। তবে এই ইনফরমেশান কোন কাজের নয়। একটা সময় একটা খুব মজার জোক ছড়িয়েছিল, তখনকার দিনে মাইক্রোসফটই ছিল কম্প্যুটারের সব কিছু। মাইক্রোসফট চালিত কোন হেলথ সেন্টারে কোন সমস্যা নিয়ে যদি ফোন করা হয়, ওরা তখন এমন সব উত্তর দেবে যেগুলো টেকনিক্যালি ঠিক উত্তর, কিন্তু কোন কাজে দেবে না। একবার আমেরিকাতে একটা হেলিকপ্টার একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় যাওয়ার সময় পথ হারিয়ে ফেলেছে। কিছুতেই ওরা লোকেশান বুঝতে পারছে না ঠিক কোন জায়গাতে আছে। একটা জায়গাতেই ঘুরে যাচ্ছে। ওখানকার লোকজনরা সবাই নিজেদের ছাদে এসে জড়ো হয়েছে। একটা উঁচু বাড়ির ছাদে ওড়ার সময় হেলিকপ্টার থেকে একটা লম্বা ফেস্টুন ঝুলিয়ে দিয়েছে, তাতে ইংরাজীতে লেখা আমরা কোথায় আছি। তখন সেই উঁচু বাড়ির ছাদের উপর একটা বড় ব্যানার এসে গেল, তাতে লেখা, you are in helicopter। সঙ্গে সঙ্গে চালক বলল, এবার চল, রাস্তা আমি জেনে গেছি। কি করে জানলে? এই যে উঁচু বাড়িটা দেখছ, এটা মাইক্রোসফটের হেডকোয়ার্টার্স, উত্তর যেটা দেবে সেটা টেকনিক্যালি ঠিক, কিন্তু ওই উত্তর কোন কাজে লাগবে না। এবার আমার লোকেশান বুঝে গেছি। আমাদের কাছেও ঠিক এই রকম দুনিয়ার সব ইনফরমেশান আসছে, টেকনিক্যালি সব ঠিক ইনফরমেশান, কিন্তু আমাদের কোন কাজে লাগে না। স্বামীজীও তাই বলছেন, আমরা যাবতীয় যা শিক্ষা পাচ্ছি সব facts, সারা দুনিয়ায় কি কি হচ্ছে, কোথায় কোন নক্ষত্র আছে, গ্রহ আছে সব খবর আছে, কিন্তু নিজের ব্যাপারে কিছু জানে না, নিজের ঘর কিভাবে সামলাবে জানা নেই।

এই কিছু দিন আগে হরিয়ানার এক স্কুলের প্রিন্সিপাল এক ছাত্রকে বকেছে, ছেলেটি বাবার রিভলবার এনে চারটে গুলি মারল, প্রিন্সিপাল শেষ। ভিতরে কি ব্যাপার আছে আমাদের জানা নেই, কিন্তু এতটুকু বোঝা যাচ্ছে যে ছেলেটি সম্পূর্ণ বাবা-মার নিয়ন্ত্রণের বাইরে। বাবা-মার পয়সা আছে, নাম আছে, বাড়িতে লাইসেন্সড রিভলবার রেখেছে, সব কিছু করেছে কিন্তু সন্তানের প্রতি যে জায়গাতে বাবা-মার নজর দেওয়ার কথা সেখানে নজর দেয়নি। মাঝখান থেকে ছেলেটার ভবিষ্যত অনিশ্চয়তার মধ্যে চলে গেল। যে জিনিসগুলোকে নিয়ে আমাদের গভীর ভাবে চিন্তা করা দরকার, সেই সব দিকে আমরা মনও দিচ্ছি না। সোশ্যাল মিডিয়ায় যখনই একটা কোন নিউজ এসে যায় তখন দেখা যাবে সবারই একটা নিজস্ব মত আছে, শত শত মতামত এসে যাবে। নিজেকে কে শিক্ষা দেবে তার ঠিক নেই, কিন্তু সবাই জগৎকে শিক্ষা দিতে নেমে পড়েছে।

স্বামীজী এটাই বলছেন, we discover 'facts', never 'why'। এখানে স্বামীজীর জীবনের একটা ঘটনা খুবই প্রাসঙ্গিক। স্বামীজী যে সময় আমেরিকায় ছিলেন, সেই সময় তিনি সেখানকার বিভিন্ন ক্ষেত্রের নামকরা গুণী লোকেদের সাথে দেখা করতেন। আমেরিকায় সেই সময় রবার্ট ইঙ্গারসোল নামে একজন নামকরা অজ্ঞেয়বাদী ছিলেন, তখন তাঁর বয়স হয়ে গিয়েছিল। তাঁর সময়ে আমেরিকায় যত রকম ধর্ম মত ছিল, সেগুলোকে আক্রমণ করেই তিনি সারা জীবন কাটিয়েছেন। উনি এমন সব তীক্ষ্ণ ও ক্ষুরধার যুক্তি দিয়ে আক্রমণ করতেন যে, খ্রীশ্চান পাদরীরা ওঁর ভয়ে সব সময় আতঙ্কিত থাকত, ইঙ্গারসোলের তখন বিরাট নাম। উনি প্রায়ই একটা উপমা নিয়ে আসতেন, এই দেখ, আমার কাছে এই কমলালেবু আছে, আমি জানি এর রস আমাকে নিঙড়ে খেতে হবে। স্বামীজী ওনার সাথে দেখা করতে গেলেন, ইঙ্গারসোলের সাথে স্বামীজীর অনেক কথাবার্তা হল, আর স্বামীজীর সাথে কথা বলে তিনি রীতিমত সন্তুষ্টও হয়েছিলেন। স্বামীজীকে তিনি বলছেন, তুমি যদি পঞ্চাশ বছর আগে আসতে তোমাকে এখানে পুড়িয়ে মারা হত। উনি বলতে চাইছিলেন যে, তখন আমেরিকা এতটাই অসহিষ্ণু দেশ ছিল। স্বামীজী ইঙ্গারসোলের এই উপমাকে নিয়ে বলছেন, যেহেতু আমি ভারতীয় তাই আমার ফলের পছন্দ আলাদা, কমলালেবুর জায়গায় আমার পছন্দ হল আম। আপনি যেমন কমলালেবুর রস নিঙড়ে খেতে চান, আমিও আমটাকে নিঙড়ে খেতে চাইব। তফাৎ শুধু এইটুকু, আপনি জানেন আপনার এই জীবনটুকুই আছে, সেইজন্য আপনি তাড়াহুড়ো করে এর সব রসটুকু পান করতে চাইছেন, কিন্তু আমি জানি আমার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, আমি জানি আমি অনন্ত। সেইজন্য আমার সময়ও অনন্ত, তাই আমার কোন তাড়াহুড়ো নেই, আমি আরামসে আয়েস করে করে আমের সব রসটুকু নিঙড়ে নেব, একটা ফোঁটা রসকেও আমি ছাড়ব না।

স্বামীজী সেখানে বলছেন, we are interested in the 'why' of existence, we leave 'how' for the children of science। বিজ্ঞান কি করছে, শুধু facts আর facts, খালি information। স্বামীজী তাঁকে বলছেন, ভারতবর্ষ এসব দিকে কখন যায় না। তুমি ডারউইনের থিয়োরী অনুযায়ী বানর থেকে এসেছ, নাকি ঈশ্বর থেকে এসেছ, এসব চিন্তা করে তোমার কি হবে! এই তোমার জীবন, এসব information কতটুকু ভূমিকা তোমার জীবনে পালন করে! তোমার কাছে তোমার জীবনের দাম সব থেকে বেশি। এই 'why' কে স্বামীজী পরে ব্যাখ্যা করবেন। স্কুলে পড়ানোর সময় বাংলায় বলা হয়, অঙ্ক কষা শিখে নাও। তার মানে, তুমি কোন ভাবে শিখে নাও এই অঙ্কটা কিভাবে সমাধান করা হবে। কিন্তু কেন এইভাবে হচ্ছে, এটা কোন দিন কেউ শেখাবে না। বাচ্চাদের স্কুলে মুখস্ত করানো হয়, মাইনাস টু ইনটু মাইনাস টু সমান প্লাস ফোর। স্কুলের শিক্ষকদের যদি জিজ্ঞেস করা হয়, মাইনাস ইনটু মাইনাস কেন প্লাস হয়, বেশির ভাগ শিক্ষক উত্তর দিতে পারবেন না। একটু চিন্তা করে বলবেন, এইটাই নিয়ম। নিয়ম মানে কি, ভগবান কি এই নিয়ম বানিয়েছেন? ভগবান যদি নিয়ম বানিয়ে থাকেন তাহলে এটা আর অঙ্ক কেন হবে! মাইনাস ইনটু মাইনাস কেন প্লাস হয়, এর খুব সহজ প্রমাণ আছে। বেশির ভাগ শিক্ষকরা জানেন না, ছাত্রদেরও শেখানো হয় না। গতে বাধা মুখস্ত করিয়ে যাচ্ছে, মুখস্ত করেই ছাত্ররা পাশ করছে, তারাও পরে নিজের সন্তানদের ওই একই জিনিস শিখিয়ে যাচ্ছে। কেন হয় সেটা আর শেখাচ্ছে না। এটা একটা লেভেলের 'why' হল। স্বামীজী যে স্তরে গিয়ে এই কথা বলছেন, সেখানেও কিন্তু 'how' ওই categoryতে পড়ে।

বাড়িতে বাচ্চাদের পড়ানোর সময় বাচ্চারা বড়দের প্রচুর প্রশ্ন করতে থাকে, এটা কেন হয়, ওটা কেন হবে না। এত প্রশ্ন করতে থাকে যে, বাবা-মা বিরক্ত হয়ে বাচ্চাকে ধমক দিতে শুরু করে। কয়েকবার ধমক খাওয়ার পর বাচ্চা প্রশ্ন করা বন্ধ করে দেয়। এইভাবে বাচ্চাদের অনুসন্ধিৎসাটা ওখানেই নষ্ট হয়ে যায়। বিজ্ঞানে যত বড় বড় বিজ্ঞানীরা এসেছেন, যত বড় বড় আবিষ্কার হয়েছে, এর পিছনে বাচ্চাদের মত একটা তীব্র অনুসন্ধিৎসার স্পৃহা লেগে থাকে। বেশির ভাগ মানুষের মনে প্রশ্নই আসে না যে, এটা কেন হয়। যদি কারুর মনে কদাচিৎ কোন প্রশ্ন এসে যায়, তাড়াতাড়ি তাকে চুপ করিয়ে দেওয়া হয়। এদের মধ্যেও কিছু মানুষ থাকে, যে বলে আমি এটাকে বার করে ছাড়ব, এরাই মহাপুরুষ হয়ে যান। আমরা সব কিছুতে ‘how’ নিয়ে আসি, ‘why’কে আনবে শুধু ঝগড়া করার সময়। বাজারে গিয়ে চেঁচামেচি করবে, জিনিসপত্রের দাম কেন এত বাড়ল। বোকা বোকা জিনিসের ক্ষেত্রে আমরা ‘why’কে নিয়ে আসি।

স্বামীজী এবার এটাকে নিয়ে বলছেন, We take a circuit in a wider field of darkeness and think we know something. (*অজ্ঞান অন্ধকারেই আরও খানিকটা বেশী জায়গা এক পাক ঘুরে এসে আমরা মনে করি, কিছু জ্ঞানলাভ করলাম।*) আমরা অন্ধকারের মধ্যেই একটা বড় সার্কেল তৈরী করছি, কিন্তু যে অন্ধকার সেই অন্ধকার তো থেকেই যাচ্ছে। আমরা বুঝতে পারছি না যে, আমরা অন্ধকারের মধ্যেই ঘুরছি। বলছেন No ‘why’ can be answered in this world; for that we must got to God. (*এই জগতে ‘কেন’র কোন উত্তর পাওয়া যেতে পারে না; ‘কেন’র উত্তর পেতে হলে আমাদের ভগবানের কাছে যেতে হবে।*) এই যে ultimate ‘why’ যেটা হয়, এর উত্তর কখনই এই জগতে পাওয়া যাবে না, যতক্ষণ না আমরা ঈশ্বরকে জানতে পারছি। ঠাকুর এই জিনিসটাকে খুব সহজ ভাবে বলছেন, একের পরে দশটা শূন্য লাগিয়ে দিলে তার দাম হয়ে যায়, এক যদি পুঁছে দেওয়া হয় তাহলে ওই শূন্যের কোন দাম থাকবে না।

স্বামীজী বলতেন, গ্রীক সাহিত্যে ভারতকে নিয়ে কিছু কিছু কাহিনী আছে। গ্রীকদের কাছে ছিল, আমাকে জগৎকে জানতে হবে আর ভারতের দৃষ্টিভঙ্গী হল আমাকে নিজেকে জানতে হবে। আমরা ইতিহাসে যা পাই তাতে জানি যে, ভারতের ব্রাহ্মণরা খুব বড় পণ্ডিত ছিলেন। এই গ্রীক পণ্ডিত অনেক কথা বলছেন, ব্রাহ্মণ সব শুনে অবাক হয়ে বলছেন, ঈশ্বরকে না জেনে তুমি জগৎকে কি করে জানবে! আমি জানতে চাইছি মেশিন কিভাবে কাজ করে, মেশিন যে কাজ করে তার প্রধান অঙ্গ হল তার ফ্লাই হুইল। আগে আমাকে মেশিনের ওই অঙ্গটাকে জানতে হবে, মেশিনের বাকি কাজ ওখান থেকেই বেরিয়ে আসে। আমরা এই জিনিসটাকেই জানার চেষ্টা করি না।

মুণ্ডকোপনিষদে এর খুব সুন্দর বর্ণনা আছে, কয়েকজন ঋষি মিলে একজন বড় ব্রহ্মজ্ঞ ঋষির কাছে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, *কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি*, কোন জিনিসকে জানলে সব কিছু জানা যায়। ঋষি তখন জগতে কত রকম বিদ্যা আছে বলার পর শেষে বলছেন, আত্মাকে অর্থাৎ নিজেকে যদি জানা যায়, তাহলে সমস্ত বিদ্যা জানা হয়ে যায়। জ্ঞানের দুটো বিধি, subjective knowledge আর objective knowledge, subjective knowledge হল নিজেকে জানা, আর objective knowledge মানে হয় জগৎকে জানা। জগৎকে জানার ব্যাপারটা কাগজে লিখে দেওয়া যায়, যেমন সমস্ত বিজ্ঞানের বিষয়কে কাগজে লিখে দেওয়া হল, এবার কোন একটা মন সেটা পড়লে বুঝে নেবে কি বলতে চাইছে। কিন্তু subjective knowledge, যেটা আত্মজ্ঞান, তা কখনই বই পড়ে হয় না। বেদ উপনিষদের সব কথা, গীতার সব উপদেশ দিনরাত পড়ে গেলেও আত্মজ্ঞান হবে না, নিজেকে সেইভাবে transform করার মধ্য দিয়েই এই জ্ঞান হয়। এখন কোন কারণে দুটো প্রজন্ম যদি কেউই নিজেকে transform না করে, তখন ওই বিদ্যাটাই হারিয়ে যাবে, তখন এই বিদ্যাকে আজগুবি, অবাস্তব বলে মনে হবে।

যদি কল্পনা করা হয়, একটা আণবিক যুদ্ধ বা বিরাট প্রলয় হয়ে সব কিছু ছাই হয়ে গেল, কিন্তু বিজ্ঞানের বইগুলো কোন ভাবে রক্ষা পেয়ে থেকে গেল। ওই কটি বই ছাড়া সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, কিছুই নেই। দুটো প্রজন্মের পর বিজ্ঞানের ওই বইগুলো যদি কেউ পড়ে, তখন ভাববে, আমাদের পূর্বজরা কি সব আজগুবি গল্প তৈরী করত, বলছে রকেট নামে কি একটা ছিল যেটা নাকি চাঁদে চলে যেত, আমরা যেখানে

পায়ে হেঁটে এক ঘন্টায় পাঁচ কিলোমিটারও যেতে পারি না, আর তাঁরা নাকি তিন দিনেই চাঁদে চলে যেতে পারতেন, যত সব গাঁজাখুড়ি গপ্পো। একটা প্রজন্ম থেকে যদি জ্ঞান হারিয়ে যায় তখন সবটাই আজগুবি বলে মনে হবে। ভারতবর্ষের এখন সত্যিই দুর্ভাগ্য যে, অধ্যাত্ম বিজ্ঞান, অর্থাৎ আত্মজ্ঞান আজ আমাদের আজগুবি বলে মনে হচ্ছে। কারণ ওই জ্ঞানের সাধনা এখন ভারতে বেশির ভাগ লোকেরা করে না। ইদানিং কথা ও কাহিনী রচনা করতে গিয়ে যে জিনিসগুলোর কোন দরকার নেই, সেই জিনিসগুলোকে নিয়ে আলোচনা করে। ভক্তরা কামারপুকুর যায়, ঠাকুরকে প্রণাম করে ঠিকই, কিন্তু তাদের দেখার আগ্রহ ঠাকুর কোন দোকান থেকে জিলিপি কিনতেন, সেই দোকান থেকে জিলিপি কিনে খেতে হবে। জয়রামবাটীতে মায়ের একজন আত্মীয় ছিলেন, যিনি নিজের স্ত্রীর চুল ছিঁড়ে ভক্তদের কাছে মায়ের চুল বলে বিক্রি করত। ভক্তরাও দলবেঁধে তার কাছ থেকে প্রচুর টাকা দিয়ে চুল কিনত। মাঝখান থেকে তার স্ত্রীর মাথায় টাক পড়ে গেল। মানুষের এই জিনিসগুলোতেই বেশি আগ্রহ, আসল জিনিসটাকেই ভুলে গেছে। আমরা প্রকৃত অধ্যাত্ম বিদ্যা থেকে সরে এসেছি, আর যেগুলোর কোন দাম নেই সেগুলোকে নিয়ে মেতে আছি। ফলে যাদের একটু শ্রদ্ধা ভক্তি আছে তাদের জীবনটা কেটে যায়, কিন্তু পরের যে প্রজন্ম, তারা অধ্যাত্ম বিদ্যাকে আজগুবি, ফালতু মনে করে সব উড়িয়ে দেয়।

এই জিনিস বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও প্রচুর পাওয়া যাবে, যেহেতু বিজ্ঞান প্রতিনিয়ত ভাল গরুর মত দুধ দিয়ে যাচ্ছে বলে বিজ্ঞানকে সবাই মানছে। কিন্তু আগামীকাল যদি না দিতে পারে তখনই নানা রকম প্রশ্ন আসতে শুরু হবে। আইনস্টাইনের মত বিজ্ঞানী, তিনি বললেন $E=MC^2$, সেটা দেখে একজন বিজ্ঞানী এসে তাঁকে বললেন, স্যার আপনার এই ইক্যুয়েশান দিয়ে এ্যটম বোম তৈরী করা যায়। আইনস্টাইন শুনে রীতিমত রেগে গিয়ে বলে দিলেন, হতেই পারে না। তিনি ওই বিজ্ঞানীর সাথে কথা বলাই বন্ধ করে দিলেন। ওই বিজ্ঞানী কিন্তু ছাড়লেন না, ওর উপর ভিতরে ভিতরে কাজ করে করে উনি সত্যিই দেখছেন এ্যটম বোম তৈরী হয়ে যাচ্ছে। অথচ যিনি এই ইক্যুয়েশান দিয়েছেন তিনিই এটা মানতে চাইছেন না। অন্য একজন বিজ্ঞানী বিগ ব্যাঙের কথা বললেন, আইনস্টাইন বিগ ব্যাঙের কথা শোনার পর খুব বিরক্ত হয়ে বললেন, আপনার গণিতটা ভাল কিন্তু আপনি একজন নিকৃষ্ট পদার্থ বিজ্ঞানী। অথচ আজ বিগ ব্যাঙ সত্য বলে প্রমাণিত হয়ে গেছে। যে জিনিসটা আমাদের চোখের সামনে নেই, সেটা আমাদের পক্ষে মেনে নেওয়া খুব কষ্টের ব্যাপার, এমনকি আইনস্টাইন যিনি নিজের ইক্যুয়েশানের পরিণতি কি হতে পারে কল্পনা করতে পারছেন না বলে তাঁর পক্ষেও মেনে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আর জ্ঞানের পরম্পরার শৃঙ্খলা যদি একবার ভেঙে যায়, তখন কি দুরবস্থা হবে আমরা ভাবতেই পারছি না, অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের মত একই দুরবস্থা হবে।

এই কথা বলার পর স্বামীজী বলছেন, Knower can never be expressed; it is as when a grain of salt drops into the ocean, it is at once merged in the ocean. (*'জ্ঞাতা'কে কখন প্রকাশ করা যায় না। এ যেন এক-টুকরো নুনের সমুদ্রে পড়ে যাওয়া –যেই পড়ল, অমনি গলে সমুদ্রে মিশে গেল।*) এই যে 'why'এর মূল ঈশ্বর, সেই ঈশ্বরকে কোন দিন জানা যাবে না। ঠাকুর নুনের পুতুলের উপমা দিচ্ছেন, নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গেল, জলে নামতেই সে সমুদ্রে গলে মিশে গেল, তার আর খপর দেওয়া হল না। আমরা যদি ঈশ্বরকে জানতে চাই, আর ঈশ্বরকে যদি আমরা বাক্য দিয়ে ব্যক্ত করতে চাই, যা কোন দিনই সম্ভব নয়। স্বামীজী এর আগে বলেছিলেন, you can be God, but you cannot never know Him, never know মানে, পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে কোন দিন ঈশ্বরকে জানা যাবে না –এটি জ্ঞানের একটা মূল সিদ্ধান্ত। এখানে স্বামীজীর বক্তব্য হল, আমরা যে জ্ঞান মনে করছি, তাতে আমরা বুঝতেই পারছি না যে, এই জ্ঞান কোন জ্ঞানই নয়। ঠাকুর বলছেন, অন্ধকার রাতে জোনাকি পোকা মিটি মিটি করে জ্বলছে, জোনাকি মনে করছে আমি আলো দিচ্ছি। তখন জোনাকিকে বলছে, তুমি অন্ধকারকে আরও ঘন করছ, তোমার আলোতে বোঝা যায় অন্ধকার কত ঘন। দৈনিন্দিন ক্ষেত্রে আমরা যে জ্ঞান অর্জন করছি, সেখানে আমরা বুঝতেও পারছি না যে, এটা কোন জ্ঞানই নয়। আসলে আমরা অন্ধকারের মধ্যেই ঘুরছি, সেখানে একটু জ্ঞানের আলো পেয়ে মনে করছি বিরাট কিছু হয়ে গেছি। ঠিক ঠিক জ্ঞান, যেখানে সত্যিকারের আলোর বিকাশ হয়, সেই আলো ঈশ্বরের আলো। আমরা এর ব্যাখ্যাই শুধু করতে পারি, এইজন্যই ব্যাখ্যা করতে পারি, কারণ আমাদের সামনে ঠাকুর, স্বামীজীর মত মহাপুরুষরা আছেন, যাঁরা আত্মজ্ঞান পেয়েছিলেন। কঠোপনিষদে বলছেন, *ছায়াতপয়োরিব*

ব্রহ্মলোকে, যাঁরা ব্রহ্মলোকে বাস করেন, যাঁদের আত্মার জ্ঞান হয়ে গেছে; তাঁদের কাছে আত্মা আর অনাত্মা একটা বস্তু আর তার ছায়ার মত পরিষ্কার আলাদা পরিদৃশ্যমান। আমাদের মুখে এই জিনিসগুলো শোভা পায় না, কিন্তু এগুলোই ঋষিবাক্য, তাঁরা যেমনটি দেখেছেন তেমনটি ব্যাখ্যা করছেন। জ্ঞানের ব্যাপারে বলার পর স্বামীজী সৃষ্টির ব্যাপারে আরেকটা সিদ্ধান্তে নামছেন।

বৈষম্যই সৃষ্টি – সমতাই ঈশ্বর

স্বামীজী এবার সৃষ্টিকে ব্যাখ্যা করছেন। সৃষ্টির উপর হিন্দু ধর্মে খুব বেশি থিয়োরী নেই। বেদে মূলতঃ আমরা সৃষ্টির ব্যাপারে দুটো সিদ্ধান্ত পাই। খুব নামকরা একটা সিদ্ধান্ত হল নাসদীয় সূক্ত, যেখানে দেখানো হচ্ছে প্রথমে ঈশ্বরই ছিলেন, তিনিই পরে দুটো রূপ নিয়ে আকাশ ও প্রাণ হয়ে যান। আকাশ যেন matter আর প্রাণ হল energy। আকাশ মানে আমরা মাথার উপর যে আকাশ দেখি সেই আকাশ নয়, পরে সুযোগ হলে আমরা এর উপর বিশদ আলোচনা করব। আকাশ হল পদার্থের সূক্ষ্ম পার্টিকেলস, ওই সূক্ষ্ম পার্টিকেলসে প্রাণ ধাক্কা মারতে শুরু করে, সেখান থেকে ধীরে ধীরে ছোট থেকে বড় জিনিস বেরিয়ে আসতে থাকে। আমাদের মনে হতে পারে যে ছোট থেকে বড় কি করে হবে, বাড়ার সময় বড় থেকে ছোটই হয়। কিন্তু তা না, লোহার শিকল যে ভাবে বানানো হয়, দুটো পাবকে নিয়ে পিটিয়ে এক করে দেওয়া হয়, এই ভাবে শিকল বাড়তে থাকে। হিন্দুদের যে দর্শন তাতে বলা হয়, প্রথমে শুধু প্রাণ ছিল, ওই প্রাণ যখন নিজের উপর কাজ করতে শুরু করে তখন সেখান থেকে খুব সূক্ষ্ম পার্টিকেলসের জন্ম হতে শুরু করে। প্রাণ যখন ওই পার্টিকেলসের উপর কাজ করছে আর নিজের উপর কাজ করছে তখন আরও বড় পার্টিকেলসের সৃষ্টি হয়। এইভাবে হতে হতে শেষে এ্যটমের অবস্থায় আসে।

আজ থেকে দেড়শ বছর আগে এই জিনিসটাকে বিশ্বাস করা খুব মুশকিল ছিল, বিশেষ করে স্বামীজী যখন এটাকে নিয়ে বলছেন তখন তো জানার কোন উপায়ই ছিল না। কিন্তু আজকের পদার্থ বিজ্ঞানীরাও এই জিনিসটাকে মানছেন। বিজ্ঞানীদের কাছে ইলেক্ট্রন, প্রোটন এই জিনিসগুলো কিভাবে এসেছে পুরোপুরি পরিষ্কার নেই। কিন্তু তাঁরা এটা বুঝতে পারছেন যে, আগে এনার্জিই ছিল, সেই এনার্জি কোন ভাবে অত্যন্ত সূক্ষ্ম পার্টিকেলসের উপর কাজ করছে, সেখান থেকে আরও বড় আরও বড় পার্টিকেলস হতে শুরু করল। মূল গ্রীক দর্শনে যাঁদের এ্যটমিস্ট বলা হয়, তাঁদের এ্যটমের ধারণা আগে থেকেই ছিল। তাঁদের মতে এ্যটম চিরদিনই ছিল, এনার্জিও চিরদিনই ছিল, সেখান থেকে সৃষ্টি এসেছে। কিন্তু আমরা এটাকে মানি না। বর্তমান কালের বিজ্ঞানীরাও হিন্দুদের সৃষ্টির উপর যে সিদ্ধান্ত সেটাকেই মানছে। আগামীকাল যদি বিজ্ঞানের এই থিয়োরী পাল্টে যায় তাতেও হিন্দুদের কিছু আসে যায় না, এটা একটা মডেল মাত্র, ঋষিরা জিনিসটাকে এভাবে দেখেছেন। সৃষ্টির ব্যাপারে হিন্দুদের দ্বিতীয় আরেকটা দর্শন আছে, যেটা বেদের পুরুষসূক্তম্ থেকে আসে, যাতে বলা হয়, যিনি পুরুষ বা ভগবান তাঁর শরীর থেকেই সমস্ত কিছু সৃষ্টি হয়েছে।

হিন্দুদের যত দর্শন ও শাস্ত্র আছে, সবাই মোটামুটি এই দুটি ভাবকে নিয়েই চলে। অনেক জায়গায় আবার এই দুটি ভাবকে মিলিয়ে দেওয়া হয়। যেমন ভাগবতে নাসদীয় সূক্তম্ আর পুরুষসূক্তমকে মিলিয়ে দেওয়া হয়। এমন ভাবে মিলিয়ে দেন, ভগবান যখন মনে করলেন সৃষ্টি হবে তখন তাঁরই শরীর যেন গোচর হয়ে যায়। আর সেখানেই যেন একটা সমুদ্র প্রকট হয়, সেটাই যেন সত্ত্ব, রজ ও তমো রূপে আসে। এই তিনটে হলে শুদ্ধ গুণ। এই তিনটে শুদ্ধ গুণ কি এনার্জি নাকি ম্যাটার বলা যায় না। আমরা যখন লাল রঙ বলছি তখন লাল একটা জিনিস আর রঙ আরেকটা জিনিস। কিন্তু যদি শুধু লালত্ব বলা হয়, তখন এটাই হল গুণ। শুদ্ধ লালত্ব কি হবে? এই জিনিসটাকে ধারণা করার জন্য আমাদের মস্তিষ্কের সেই ক্ষমতাই নেই। যখনই লাল বলা হয় তখনই আমরা মনে করি লাল গোলাপ, রক্ত লাল, বিদ্রোহের পতাকা লাল, সিগন্যাল লাল এবার ট্রেন দাঁড়িয়ে যাবে। কিন্তু শুদ্ধ লালত্ব কি হতে পারে, আমরা ধারণা করতে পারি না। আমাদের শাস্ত্র এই জায়গা থেকেই শুরু হয়।

তিনটে শুদ্ধ গুণ – সত্ত্ব, রজো ও তমো। সৃষ্টি মানে এই তিনটে সত্ত্ব, রজো ও তমো। ভগবান যখন বিশ্রাম করছেন, সৃষ্টি যখন নেই, তখন এই তিনটে গুণ সমান অনুপাতে এক তৃতীয়াংশ করে সাম্য ভাবে

অবস্থান করে। ভগবান যখন ইচ্ছা করলেন সৃষ্টি হোক, তখন তিনি যেন এই তিনটে সাম্য অবস্থায় অবস্থিত গুণের উপর ফুঁ মেরে দিলেন। এবার এই সত্ত্ব, রজো ও তমোর ব্যালেন্সটা বিগড়ে যায়। ব্যালেন্স বিগড়ে গেলেও এই তিনটে গুণ থাকবে এক সঙ্গেই, কেউ কাউকে ছাড়বে না। এক সাথে থাকবে ঠিকই কিন্তু সব সময় তিনটে গুণ এক অপরকে দাবিয়ে রেখে নিজেকে উপরে নিয়ে আসতে চাইবে। তিনটের Sum total সব সময় এক থাকবে, সেইজন্য অনুপাতটা পাল্টাতে থাকে। সত্ত্ব মানে শুভ, শান্ত; রজো মানে যেটা দৌড়াচ্ছে, আর তমো হল যেটা চলতে চায় না। রঙের ক্ষেত্রে যেমন সত্ত্ব, রজো ও তমো আছে, তেমনি মানুষের স্বভাবের ক্ষেত্রেও সত্ত্ব, রজো ও তমো আছে; শুধু তাই না, ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন কিছু নেই যার মধ্যে এই তিনটে গুণ নেই। তিনটে গুণের অনুপাতের তারতম্য সব সময় হতে থাকে। যাকে বলছি, উনি কী ভাল মানুষ, উনি সত্ত্বগুণী। তার মানে তাঁর মধ্যে ছিয়ানব্বই বা পঁচানব্বই শতাংশ সত্ত্বগুণ আছে, সামান্য রজোগুণ আছে আর তমোগুণ খুবই কম। তমোগুণ না থাকলে কেউ ঘুমোতেই পারবে না। রজোগুণ না থাকলে শরীরের ক্রিয়াকলাপ চলবে না, তিনটে গুণ একসাথেই থাকে, কিন্তু অনুপাতের তারতম্য হয়। কেউ যদি খুব কামী ক্রোধী হয়, বুঝতে হবে তার মধ্যে রজোগুণের আধিক্য হয়ে গেছে। খুব হিংসাপরায়ণ, নিষ্ঠুর স্বভাব, বুঝতে হবে তার তমোগুণ বেড়ে গেছে।

এই তিনটেকে আমরা গুণ বলছি, গুণ রূপে যদি না বুঝতে পারি তাহলে আমরা খুব সূক্ষ্ম পার্টিকেল হিসাবেও নিতে পারি, যে সূক্ষ্ম পার্টিকেলস সব সময় এক অপরের সাথে পাল্টাচ্ছে। যখন এই তিনটের মধ্যে ব্যালেন্স এসে গেল, তার মানে এবার সৃষ্টি নাশ হয়ে গেল। যেমনি তিনটের ব্যালেন্স বিগড়ে গেল, সৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। পেণ্ডুলাম ঘড়ির পেণ্ডুলাম যতক্ষণ দুলতে থাকবে ততক্ষণ ঘড়ি সময় দিয়ে যাবে, পেণ্ডুলামের দোলা যেই বন্ধ হয়ে গেল, ঘড়ির সময় দেওয়া থেমে গেল। ঠিক তেমনি সত্ত্ব, রজো ও তমো যেমনি ব্যালেন্সে এসে গেল, সৃষ্টি শেষ। সত্ত্ব, রজো ও তমো যখন এক অপরকে টেক্কা দিতে শুরু করে তখন সৃষ্টিতে নূতন নূতন জিনিস বেরোতে থাকে। তিনটে ব্যালেন্সে এসে গেলে সৃষ্টিতে আর কিছুই থাকে না, তখন থাকেন একমাত্র ঈশ্বর, তিনি চৈতন্য স্বরূপ, আনন্দস্বরূপ। এখন কেন তাঁর ইচ্ছে হয়, কিভাবে হয় কেউ বলতে পারবে না। এই জিনিসটাকে আধার করে স্বামীজী এবার ব্যাখ্যা করছেন।

স্বামীজী বলছেন, Differentiation creates; homogeneity or sameness is God, (*বৈষম্যই সৃষ্টির মূল –এক রসতা বা সমতাই ঈশ্বর।*) যখন বৈষম্য আসে তখন এটাই সৃষ্টি, যখন সব কিছু সমান হয়ে এক রস হয়ে গেল তখন ওটাই ঈশ্বর। স্বামীজী যে sameness is God বলছেন, গীতাতেও তাই বলছেন, *সমত্বং যোগ উচ্যতে*, মন যখন সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থায় এসে যায় তখন এটাকেই যোগের অবস্থা বলছেন। যোগের অবস্থাকে বলে *তদাদ্রষ্টু স্বরূপে অবস্থানম্*, যাঁর মন সাম্য অবস্থা এসে গেছে, তিনি তখন ঈশ্বরের সাথে বা নিজের স্বরূপের সাথে এক হয়ে যান। এই সবগুলোকে মিলিয়ে যখন বলা হয় তখন sameness আর ঈশ্বর এক –সেটাই স্বামীজী বলছেন sameness is God। এতে অনেক সময় কোথাও কোথাও দর্শনের ক্ষেত্রে সমস্যা এসে যায়। কারণ ঈশ্বর কিন্তু নিজেকে কখনই বিভাজন করছেন না, বিভাজন করছে প্রকৃতি।

সৃষ্টি তত্ত্বের মূল দর্শন এসেছে সাংখ্য দর্শন থেকে। সাংখ্য দর্শনে প্রকৃতি জড়। তন্ত্র দর্শনও সাংখ্যের মতকে গ্রহণ করেছে, কিন্তু তন্ত্রে প্রকৃতি জড় থাকে না, তখন প্রকৃতি হয়ে যান মা কালী। তন্ত্র মতে সৃষ্টি যেন মা কালীরই বিস্তার। ভক্তি পথেও তাঁরা সবটাই মানে, কিন্তু তাঁরা মনে করেন, সব কিছু ঈশ্বরেরই সৃষ্টি, সব ঈশ্বরের সাথে এক, জগতে যা কিছু আছে সব ঈশ্বর নিজেই হয়েছেন। যিনি যে দর্শনকে মানছেন সেই অনুসারে সত্ত্ব, রজো ও তমো আর সেখান থেকে সংসারের বর্ণনা একটু একটু পাল্টে যায়। কিন্তু স্বামীজী বেদান্তকে আধার করে বলছেন, আমরাও বেদান্তকে আধার করে আলোচনা করছি। আর বেদান্তই এখন হিন্দুদের মূল দর্শন। তবে sameness is God বলে দিলে অনেক সময় সাংখ্য দর্শনের প্রকৃতি ঈশ্বর হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা থেকে যায়। সাংখ্য দর্শনে তাই বলা হয়, সৃষ্টি প্রকৃতিকে দিয়েই হয়, সেখানে ঈশ্বরের কোন দরকার নেই। সেইজন্য সাংখ্য দর্শন ঈশ্বর মানে না, যদিও এগুলো দর্শনের খুব সূক্ষ্ম বিচার। এখানে স্বামীজী বলছেন, same হয়ে গেল তখন ওটাই ঈশ্বর, ওই samenessটা কিন্তু ঈশ্বর নয়। যে বৈচিত্র্য ছিল ওই বৈচিত্র্য ঈশ্বরকে জানতে দেয় না, বৈচিত্র্যটা মিটে গিয়ে সব সমান হয়ে গেলে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় আর জ্ঞান তিনটেই

এক হয়ে যায়। জ্ঞাতা, জ্ঞেয় আর জ্ঞান এই তিনটের বিভাজন হয়ে যাওয়াটাই জগৎ। যখন তিনটে এক হয়ে যায় তখন আর জগৎ থাকে না, তখন থাকেন শুধু ঈশ্বর। যখন এই বিভাজনটা মিটে গেল তখন জগৎ শেষ, শুধু ঈশ্বরই আছেন।

মুক্তি –বৈষম্যের নাশ ও অনন্ত সমত্বের অবস্থায় প্রতিষ্ঠা

Sameness is God বলার পর স্বামীজী আলোচনা করছেন knowledge কি, differentiation কি, এবার তিনি আসল কথাটা বলছেন, Get beyond differentiation; then you conquer life and death and reach eternal sameness and are in God, are God. Get freedom, even at the cost of life. (*এই বৈষম্যভাবের পারে চলে যাও, তা হলেই জীবন ও মৃত্যু –দুই-ই জয় করবে, এবং অনন্ত সমত্বে পৌঁছাবে, তখনই ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হবে –ব্রহ্মস্বরূপ হবে। মুক্তিলাভ কর, সে চেষ্টায় প্রাণ যায়, তাও স্বীকার।*) জীবন যদি চলে যায় যাবে, মুক্তি তোমাকে পেতেই হবে। মুক্তি কি? যেখানে কোন বৈষম্য থাকবে না, অনন্ত সমত্ব থাকবে। আমার ভিতরে অজ্ঞান রয়েছে, অবিদ্যা রয়েছে, কারণ আমি নিজেকে জানি না। আমি জানি আমি আলদা ঈশ্বর আলাদা। ফলে কি হয়? জগতে বৈষম্যটা বেশি মাত্রায় দেখায়। কাউকে আমি বেশি ভালবাসি, কাউকে কম ভালবাসি, কাউকে আবার ঘৃণা করি। যাকে ভালবাসি তার কাছে যেতে চাই, যে জিনিসকে পছন্দ করি না, সেই জিনিসের থেকে দূরে থাকতে চাই। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই নানান রকমের কর্ম সৃষ্টি হয়। ক্রিয়া হলে ভালবাসাও বাড়ে, ক্লেশেরও বৃদ্ধি হয়, জীবনে যন্ত্রণার আর শেষ থাকে না।

স্বামীজী তাই বলছেন, get freedom। Freedom মানে sameness, এই samenessএ যাওয়ার জন্য আমাদের একটু অন্তত চেষ্টা করা এখনই শুরু করে দিতে হবে। সংসার ধর্ম চালানোর জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু হয়ে গেলে এবার samenessএর অনুশীলন করার দিকে এগিয়ে যেতে হয়। স্বামীজী থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে বেশির ভাগ সময় বেদান্তের কথা বলছেন। স্বামীজী যে উচ্চ মার্গের বেদান্তের কথা বলতেন ভাবতে আমাদের সত্যিই আতঙ্ক লাগে, সেখানে আটজন, কি দশজন, কি বারোজন, যাঁরাই শুনতেন, তাঁরা কি করে শুনতেন, কি করে সহ্য করতেন; ভাবলে আমরা অবাক হয়ে যাই।

স্বামীজী বলছেন, All lives belong to us as leaves to a book; but we are unchanged, the Witness, the Soul, upon whom the impression is made, as when the impression of a circle is made upon the eyes when a firebrand is rapidly whirled round and round. (*একখানা বইয়ের সঙ্গে তার পাতাগুলির যে সম্বন্ধ, আমাদের সঙ্গে জন্মান্তরের জীবনগুলিরও সেই সম্বন্ধ; আমরা কিন্তু অপরিণামী, সাক্ষিস্বরূপ, আত্মা; আর তারই উপর জন্মান্তরের ছায়া পড়ছে, যেমন একটা মশাল খুব জোরে জোরে ঘোরাতে থাকলে চোখে একটা বৃত্তের প্রতীত হয়।*) সারা জীবনব্যাপী জগতে আমরা যা কিছু দেখছি এগুলো হল সব পুস্তকের পাতার মত, আর আমি আপনি হলাম সেই পুস্তক। বইটা আমি আর জগতের যা কিছু দেখছি সব এই বইয়ের পাতা। কেউ এলো, পাতাটা পাল্টে নিলাম। যাকে বিয়ে করলাম, পঞ্চাশ বছর ধরে ওই একটা পাতাই খুলে যাচ্ছি। এটাকে যদি আরেক ধাপ পিছনের দিকে নিয়ে যাওয়া যায়, তখন এই বই যে জ্ঞান দিচ্ছে, ওই জ্ঞানটাই আমি আর সৃষ্টিটা যেন সেই বই, ওই জ্ঞানটাই বইয়ে আছে, সৃষ্টিতে যা কিছু আছে সব যেন বইয়ের এক একটি পাতা। কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি না যে, আমরা সেই পাতা। কি রকম? একটা মশালকে জ্বালিয়ে যদি খুব জোরে জোরে ঘোরাতে থাকে তখন মনে হবে একটা অগ্নির বৃত্ত। আসলে একটাই অগ্নির স্ফুলিঙ্গ, কিন্তু মনে হবে যেন একটা আলোর বৃত্ত। মাণ্ডুক্যকারিকাতে এর নামই হল আলাদ ঈশ্বর। এখন মনে হচ্ছে অগ্নির বৃত্ত, কিন্তু যেমনি মশাল ঘোরান বন্ধ করে দেওয়া হবে তখন কোথাও কিছু নেই। যেটাকে এতক্ষণ আগুনের একটা বিরাট বৃত্ত মনে হচ্ছিল, সেখানে এখন কিছুই নেই। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, এই প্রকৃতি প্রচণ্ড গতিতে নৃত্য করে চলেছে। এই মুহূর্তে আমি মনে করছি, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কত বৃহৎ, সেই তুলনায় আমি কতই না ক্ষুদ্র। কিন্তু মানুষ যখন ধীরে ধীরে জ্ঞানের দিকে এগোতে শুরু করে, তখন সে মনে করতে থাকে, আমিও বিরাট। আর যখন পূর্ণ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তখন দেখে, আমি তো এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছাড়িয়ে বৃহৎ থেকেও বৃহৎ। তখন দেখে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমার পায়ের নখাগ্র থেকেও ক্ষুদ্র। তখন কে তাকে কি নিন্দা করল, কি প্রশংসা করল, ওসবের দিকে আর কোন দৃষ্টি থাকে না।

স্বামীজী বলছেন, The Soul is the unity of all personalities, (*আত্মাতেই সমস্ত ব্যক্তিত্বের সঙ্গতি;*) যেখানে যা কিছু আছে, সব কিছুর একত্ব আত্মাতে, সেই চৈতন্য স্বরূপে, and because It is at rest, eternal, unchangeable, (*আর যেহেতু আত্মা অনন্ত, অপরিণামী ও অচঞ্চল, সেহেতু আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ –পরমাত্মা।*) আত্মা সব সময় অচঞ্চল, অপরিণামী, ওর উপর শরীরের নাচ হচ্ছে, ওই শরীরের চারিদিকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নাচ হচ্ছে। ওই নৃত্য দেখতে দেখতে আত্মা মনে করছে, আমি জন্মাচ্ছি, আম মরছি, আমার দুঃখ হচ্ছে, আমার আনন্দ হচ্ছে, আমি কাজ করছি ইত্যাদি। আসলে চোখটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়, অনেকক্ষণ নাগরদোলায় চাপার পর নেমে এলে মনে হয় সারা জগৎটা যেন ঘুরছে। যখন স্বাভাবিক হয়ে যায় তখন দেখে কোন কিছুই তো ঘুরছিল না, আমার চোখের সামনে এগুলো মনে হচ্ছিল ঘুরছে। পূর্ণ জ্ঞানের অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে ঠিক এটাই মনে হয়।

আত্মা জীবনও নয়, সুখও নয়

It is God, Atman, এই আত্মাই ঈশ্বর, পরমাত্মা। It is not life, but It is coined into life. (*আত্মাকে জীবন বলতে পারা যায় না, কিন্তু তাই থেকে সমুদয় জীবন গঠিত হয়।*) এই আত্মা জীবন নয়, পাশ্চাত্য দার্শনিক বা বিজ্ঞানীরা মনে করে, যেখানে জীবন আছে সেখানেই সোল আছে, সেটাই তাদের কাছে চৈতন্য; যেখানে জীবনের স্পন্দন নেই সেখানে কোন সোল নেই। খ্রীশ্চানরা প্রথমের দিকে মনে করত গাছে জীবন নেই, তাই গাছের মধ্যে কোন সোল হয় না। পাশ্চাত্যের এই যে ধারণা সোল মানে জীবন, এটাকেই স্বামীজী আক্রমণ করে বলছেন, It is not life, but It is coined into life, আত্মা মানে জীবন নয়, আত্মাকে এমন একটা আকৃতি দিয়েছে যার জন্য জীবন রূপে দেখায়। It is not pleasure, but It is manufactured into pleasure, (*এ-কে সুখ বলা যায় না, কিন্তু এই থেকেই সুখের উৎপত্তি।*) আমরা যে সুখ পাই, সেই সুখ ভিতরের, আত্মার সুখ নয়। কিন্তু আত্মাকে এমন ভাবে manufacturing করেছে যে ওটাকে সুখ রূপে মনে হয়। ফলে আমরা যখন কাউকে ভালবাসি, তখন সেই আত্মা সুখের রূপ হয়ে যাচ্ছে। আসলে ওই আত্মাই কেবল রয়েছেন, আত্মা জীবনও নন, আত্মা সুখও নন। অথচ এই জিনিসগুলোকে এই রূপেই দেখি। যতক্ষণ মানুষ এই জিনিসগুলো থেকে বেরিয়ে আসতে না পারছে, এগুলোর উচ্চ আধারকে না বুঝতে পারে, ততক্ষণ মানুষের অশান্তির শেষ নেই।

ঈশ্বরের উপযোগিতা

স্বামীজী এখন যে জিনিসটাকে নিয়ে বলতে যাচ্ছেন, এটা স্বামীজীর নিজের একটা খুব মজার observation। স্বামীজী দেববাণীতে যে কথাগুলো বলছেন, আমাদের মনে হবে যে এর অনেক কিছু আমি নিজেও এক সময় ভেবেছি। কিন্তু ওই ভাবনাগুলো বিদ্যুৎ চমকানোর মত এলো আর চলে গেল, ওই ভাবনা যে আমাদের ব্যক্তিত্বকে একটা উচ্চ অবস্থায় নিয়ে যাবে, সেই চেষ্টা কোন দিন করা হয়নি। আমরা ভাবি মানুষ মানে দেহমন বিশিষ্ট কোন ব্যক্তি, কিন্তু তা নয়, যে কোন মানুষই একগুচ্ছ ভাবের (bundle of ideas) একটা মূর্ত রূপ। সে যে কর্মগুলি করছে তাতে তার সংস্কার সমূহ তৈরী হয়, সংস্কারগুলো তৈরী হয়ে হয়ে যখন systemএ ঢুকে গেল, তখন তার ভাবনা চিন্তার যে পুটলি, তার মধ্যে যেন আরেকটা জিনিস সংযোজিত হয়ে গেল। আবার কিছু জিনিস বিচার করে করে বার করে দিলে ওই পুটলি থেকে একটা জিনিস কমে গেল, এভাবেই চলে। স্বামীজীও দেববাণীতে অনেক ধরণের কথা বলে যাচ্ছেন। এক জায়গায় স্বামীজী বলছেন, I am voice without form, তিনি এক বাণী, বাণীর অর্থ আধ্যাত্মিক যে আদর্শ, তার তিনি মূর্তরূপ। এখন তাই এটাই স্বাভাবিক যে, সেখানে অনেক ধরণের কথা আসছে, আর দেববাণীতে সবটাই যেন মুষলধারায় বৃষ্টির মত সব নেমে আসছে। তার মধ্যে অনেকগুলো কথা আমাদের মনে হতে পারে যে এই কথা কোথাও যেন পড়েছি, আর এটাই ঠিক। কিন্তু তার সবটাই যে আমাদের core personalityতে এসেছে, তা নয়।

কোন ভাব আমাদের core personalityতে এসেছি কিনা বোঝার কয়েকটা উপায় আছে। প্রথম হল, আমি যে কথা কাউকে বলছি, বা নিজে ভাবছি, সেটার ব্যাপারে আমি emotional কিনা। যদি emotional হই তাহলে বুঝতে হবে ওটা এখনও আমার core personalityতে আসেনি। কথামৃতে আছে, গিরিশ ঘোষ

একদিন বলছেন, আমি প্রমাণ করে দেব যে কৃষ্ণ ভগবান, না হলে আমি আমার জিভ কেটে ফেলব। ঠাকুর বিরক্ত হয়ে বলছেন, উগুনো কিছু না। যে কোন কিছু নিয়ে যখন কেউ খুব ইমোশানাল থাকে, তার মানে ঐ ভাব তার ব্যক্তিত্বে এখনও কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। যখন core personalityতে বসে যাবে তখন কোন ইমোশান, কোন প্যাশন্ থাকবে না। তারপর আসে আচার আচরণ, তার আচার আচরণ পুরোপুরি ওই ভাবের সাথে synchronized হয়ে যাবে। যা কিছু করছে, তার যে bundle of ideas আছে, সব কাজ তার মধ্যেই হয়। একদিকে বলছে, আমি ঠাকুরকে বিশ্বাস করি, তাঁকে মানি, অন্য দিকে চুটিয়ে মিথ্যা কথা বলছে, জাল জুচ্চুরি করতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না, তাহলে বুঝতে হবে তার এখনও কিছুই হয়নি। অর্কেস্ট্রার বাদ্যের মত জীবন যতক্ষণ না এক সুরে বাঁধা হচ্ছে, সমস্ত কর্ম, সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে রাতে শুতে যাওয়া পর্যন্ত সব কিছু কাজ, চলাফেরা, গতিবিধি এক সুরে বাঁধা না থাকে, তাহলে কিন্তু ব্যক্তিত্বে তার কোন কিছুই ঢোকেনি। স্বামীজী এখন যে মূল কথাগুলো বলবেন তার কিছু কিছু কথা মনে হবে জানা, কিছু কথা মনে হবে খুব গভীর, কিছু কিছু একেবারে নূতন মনে হবে, সবটা মিলিয়েই এই দেববাণী।

এখন স্বামীজী ঈশ্বরের উপযোগিতাকে নিয়ে বলছেন। Today God is being abandoned by the world because He not seem to be doing enough for the world. So they say, ‘Of what good is He? Shall we look upon God as a mere municipal authority? (*আজকাল জগতের লোক ভগবানকে পরিত্যাগ করেছে, কারণ তাদের ধারণা – জগতের যতদূর সুখস্বচ্ছন্দ্য বিধান করা উচিত, তা তিনি করছেন না; তাই লোকে বলে ‘তাঁকে নিয়ে আমাদের লাভ কি’? ঈশ্বরকে একজন মিউনিসিপ্যালিটির কর্তা বলে ভাবতে হবে নাকি?*) মানুষ ঈশ্বরের সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বলে, ঈশ্বর তো জগতের কোন কাজে লাগছে না। বড় বড় বিদ্বান পুরুষরাও অনেক সময় প্রশ্ন করেন, ঈশ্বর থাকতে জগতে এত অনাচার কেন? জগতের একটা বড় অংশের মানুষ নিজেদের মত জীবনকে কোন রকমে চালিয়ে যাচ্ছে, তারা ঈশ্বরের ব্যাপারে জানেও না, কোন ধারণাও নেই। খ্রীশ্চান, মুসলমান বা হিন্দু ধর্মের কোন পরিবারে জন্ম নিয়েছে, জন্ম নিয়ে পরিবারের কিছু ধর্মীয় আচরণ গতানুগতিক ভাবে পালন করছে, অথবা পালন করছে না। যারা পালন করছে, তাদের মধ্যে বেশির ভাগের ধারণা হল, ভগবান আছেন, তাঁর বিভিন্ন জায়গায় আবাস আছে, শিব কৈলাসে থাকেন, বিষ্ণু বৈকুণ্ঠে থাকেন, ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকে থাকেন, ওখান থেকে তিনি আমাদের সবাইকে দেখছেন, যখন আমরা ভাল করি তখন তিনি আমাদের ভাল করেন, কিন্তু তার থেকেও বেশি যখন আমরা প্রার্থনা করি তখন তিনি তার উত্তর দেন। যদি কখন তিনি উত্তর না দেন, তখনই আমাদের ভিতরে ক্ষোভের উদ্ভব হয়, তখন আমরা ঈশ্বরকে মানতে চাই না। যে ঈশ্বর আমাদের কোন কাজে লাগে না, সেই ঈশ্বরকে জেনে আমার কি লাভ!

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বেশ কিছু পরে একটা দেশে এক বড় বিজ্ঞানীকে পদার্থ বিজ্ঞানের উপর রিসার্চ করতে বলা হয়েছিল। তার জন্য একটা বড় মেশিনের দরকার, যাতে কয়েক শত কোটি ডলার খরচ হবে। ওখানকার বড় বড় সরকারি অফিসাররা তাঁকে জিজ্ঞেস করছেন, এই যে আপনি এত বড় রিসার্চ করবেন, এই রিসার্চ আমাদের কি কাজে লাগবে? যুদ্ধে কোন কাজে লাগবে কি? সেই ভদ্রলোক তখন বলছেন, যুদ্ধে এগুলো কাজে লাগবে কিনা আমার জানা নেই, কিন্তু যে জিনিসকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করা হয়, এটা সেই জিনিস।

শুধু দুই ইঞ্চি জমি পাওয়ার জন্যই যে যুদ্ধ হয় তা না, জমি রক্ষার থেকে আরও অনেক কিছু জিনিস আছে। আগেকার দিনে অবশ্য কিছু কিছু যুদ্ধ হত শুধু লুট করার জন্যই, যেমন মুসলমান বাদশারা ভারতকে লুট করতেই এসেছিল, আর কিছু কিছু যুদ্ধ হয় নিজের প্রভুত্বকে দেখাবার জন্য, যেমন আলেকজাণ্ডার। ইসলাম যখন প্রথম অন্য দেশের দিকে এগোতে শুরু করল তখন তাদের এই আইডিয়াটাই ছিল, ইসলামের আলো নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু আইডিয়ার দিক থেকে দেখতে গেলে, নেপোলিয়নের সময় থেকেই প্রথম নিজের প্রভুত্ব দেখাতে শুরু হয়। একটা দেশকে যখন রক্ষা করা হয়, তখন দেশের ভূমি রক্ষা আর জীবন রক্ষার জন্যই যুদ্ধ করা হয় না, একটা সংস্কৃতিকেও রক্ষা করা হয়। বিজ্ঞানও যে সব সময় আমাদের কারিগরি সুবিধা দিয়ে যাবে তা না, বিজ্ঞান একটা বিদ্যা। এই বিদ্যার সাধনার জন্য মানুষ পরিশ্রম করছে, নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করছে। ঈশ্বরের ব্যাপার যখন আসে তখন অনেকটা তাই। ঈশ্বর সব সময় আমাদের কিছু দিয়ে যাবেন তা নয়।

যখন আমাদের কোন আপদ-বিপদ আসে তখন প্রথমে আমাদের যে সম্পদ রয়েছে সেটাকে কাজে লাগানো হয়। বাড়িতে কারুর অসুখ হলে, টাকা-পয়সা খরচ করে ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ নিয়ে আসি। পরিচিত কোন বন্ধু ডাক্তার থাকলে ফোন করে এডভাইস নেওয়া হয়। যার যেমন resource আছে সে সেটাকে কাজে লাগায়। এমনকি জানে যে রোগীকে বাঁচানো যাবে না, ডাক্তাররাও বলে দিয়েছে আর বাঁচবে না, তখনও কিন্তু টাকা-পয়সা খরচ করে বড় নার্সিং হোমে ভেন্টিলেশানে রেখে দেয়, যেখানে যত পরিচিতি আছে সেগুলোকে কাজে লাগায়। অনেক সময় জানে যে বাঁচবে না, অনেক সময় নিশ্চিত নয় যে বাঁচবে কিনা, অনেক সময় জানে যে চিকিৎসা করালে ভাল হয়ে যাবে, সব ক্ষেত্রেই কিন্তু চেষ্টা করা ছেড়ে দিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকে না। আমরাও তাই করি, যখন কোন ঝামেলায় পড়ি, তখন আমাদের resource বলতে তো শুধু ঠাকুর, ঠাকুর ছাড়া আমাদের তো আর কোন resource নেই। তাই ঠাকুরের দুয়ারে গিয়ে মাথা ঠুকতে থাকি। কিন্তু তিনি শুনবেনই শুনবেন, তা একেবারেই নিশ্চিত নয়। হয়ত শুনবেন, নয়ত শুনবেন না, কিছুই আমরা বলতে পারি না। কিন্তু আমাদের মন এতটাই কাঁচা যে, আমরা বলতে ছাড়ি না যে, তিনি যদি আমার কথা না শোনেন তাহলে আমি কেন তাঁকে মানতে যাব! বিজ্ঞান যদি আমাদের সুবিধা না দেয়, বিজ্ঞান যদি আমার কোন কাজে না লাগে তাহলে কেন বিজ্ঞানের পিছনে এত সময়, অর্থ ও শ্রমের এত অপচয় করতে যাব কেন? আপনি যদি আমার কাজেই না লাগেন, তাহলে আমি আপনার সাথে কেন কথা বলতে যাব? এই জিনিসটাকে স্বামীজী এবার আলোচনায় নিয়ে আসছেন।

স্বামীজী যে সময় আমেরিকাতে গিয়েছিলেন, সে সময় সেখানে একটা জীবন দর্শন দাঁড়িয়েছিল, তাকে utilityterian philosophy বলা হয়। যে জিনিসটা আমার কাজে লাগবে, সেটাকে নিয়ে এই ফিলজফি। স্বামীজীর সময় উইলিয়ম জেমস্ খুব নামকরা দার্শনিক ছিলেন। উইলিয়ম জেমস্ একটা নূতন দর্শন শুরু করলেন, যার নাম pragmatism। Pragmatism বলতে অনেকে মনে করেন এটা practical, কিন্তু তা না। উইলিয়ম জেমসের যে pragmatism ছিল, তাতে উনি সব কিছুকে মাপতেন ডলার দিয়ে, যদি এই জিনিসটাকে ডলারে রূপান্তরিত করা হয় তাহলে এর কত ডলার হবে, সেই অনুসারে তিনি একটা জিনিসকে ঠিক না ভুল মাপতেন। যেমন একটা বিদ্যা, ইতিহাস বা ফিজিক্স, আমি ইতিহাস পড়ব না ফিজিক্স পড়ব? তখন সে দেখবে ইতিহাস পড়লে কেমন ডলার আয় করা যাবে বা ফিজিক্স পড়ে কতটা ডলার আয় করা যাবে। তার উপর নির্ভর করবে, কোনটা নিয়ে পড়াটা বেশি ঠিক। এটা সত্যিই একটা বিচিত্র দর্শন, কিন্তু তখনকার দিনে pragmatism খুব নাম করেছিল, আর এখনও লোকে বলে ঠিকই কিন্তু pragmaticকে এখন অন্য অর্থে নিয়ে আসা হয়েছে, ওটা এখন প্র্যাক্টিক্যাল অর্থে প্রচলিত। এটাকে বলে utilityterian philosophy, একে আমরা আমাদের চার্বাক দর্শনের খুড়তুতো ভাই বলতে পারি।

চার্বাক দর্শন মানেই ভৌতিকবাদী দর্শন, যেখানে বলা হয়, আমার এই শরীরটাই সত্য, এই শরীর দিয়ে, ইন্দ্রিয় দিয়ে যে সুখ আসে এটাই সত্য, আর এটাই একমাত্র শেষ কথা। যো সো করে, যদি দরকার পড়ে, ঋণ করে, চুরি করে টাকা সংগ্রহ করে ভোগ করা। এদের একটাই কথা, যত দিন বাঁচবে সুখে বাঁচবে, দরকার পড়ে তো ঋণ করেও ভাতে ঘি অবশ্যই খাবে। এটা একটা দর্শন, এখন সেখান থেকে সব কিছুতে এই বিচার আসছে, এতে আমি কি পাব? আমরা সত্যিই এতটাই ভৌতিকবাদী যে, আমরা এমন utilityterian হয়ে গেছি যে, যখন ঈশ্বরের ব্যাপার আসে তখন সেখানেও আমরা বিচার করি, আমি নিশ্চয়ই ভগবানের পূজা করব, কিন্তু তাতে আমি পাবোটা কি? সেইজন্য আমাদের বেদ থেকে শুরু করে সব শাস্ত্রেই একটা শব্দ আসে, অর্থবাদ। অর্থবাদ হল, একটা বিদ্যা বা গ্রন্থের স্তুতি। যেমন বলা হল, তুমি যদি এমনটি কর তাহলে তুমি স্বর্গে যাবে। শুভ কর্ম করলে একটা শুভ গতি হবে এতো স্বাভাবিক। কিন্তু এভাবে বলার একমাত্র উদ্দেশ্য, মানুষের মনকে ধর্মের পথে টেনে নিয়ে আসা।

মানুষ জন্ম থেকেই স্বাভাবিক ভাবে ভোগী। আমরা চাই সব সুখ আমার কাছেই থাকুক। আর আমরা চাই, আমার যারা পাড়া প্রতিবেশী আছে, আমার যারা নিন্দুক আছে, শত্রু আছে, তাদের জীবনে যেন প্রতিনিয়ত ঝামেলা, অশান্তি আসতেই থাকে। মা কালী এক হাতে খড়্গহস্তা আর অন্য হাতে বরাভয় মুদ্রাতে দণ্ডায়মান। বরাভয় মুদ্রা যেন আমার উপর থাকে আর খড়্গহস্তা যেন আমার পাশের বাড়ির উপর থাকে। এই

মনোভাব থেকে আমরা কিছুতেই বেরিয়ে আসতে পারি না। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শেষ কথা হল, ভগবান বলে যদি কেউ থাকেন, তিনি যেন আমার মঙ্গল করেন আর আমার শত্রুর যেন বিশেষ ভাবে অমঙ্গল করেন। আমাদের শহরে যত নার্সিং হোম, হাসপাতাল আছে সেখানে একটা করে মন্দির থাকে, আর যেখানে কোর্ট, তার পাশেও মন্দির থাকে। কোর্টে যখন উকিলরা যায় তখন তারা মন্দিরে প্রার্থনা করে যায় যে, আমি যেন এই কেসে জিতে যাই। সবাই জিততে চায় কেউ হারতে চায় না। হাসপাতালে যে মন্দির আছে সেখানে সব সময় যে রোগীর ভাল হয়ে যাওয়ার জন্য প্রার্থনা করবে তা নয়, বাড়ির বুড়োবুড়ি কেউ ভর্তি থাকলে তখন প্রার্থনা করবে, হে ঠাকুর মরে গেলে বেঁচে যাই। আমাদের দুর্ভাগ্য হল যে, আমরা এত নীচ, এত স্বার্থপর আর মন আমাদের এত সাধারণ যে, ঈশ্বরের ব্যাপারেও আমরা হিসাব করি –উনি আমাদের কি কাজে লাগবেন?

কি কাজে লাগবেন তাতেও অতটা দোষ নেই, কিন্তু তারপরে যেটা আসে সেটা আরও দুর্ভাগ্য। ঈশ্বরের স্বরূপের ব্যাপারে আমাদের জানা নেই, কিসের জন্য ঈশ্বর জানা নেই, ফলস্বরূপ ভুলভাল প্রত্যাশা ও জিনিস নিয়ে আমরা তাঁর কাছ থেকে আশা করতে থাকি। ঠাকুরকে একজন জিজ্ঞেস করছেন, ঈশ্বরকে ভক্তি করলে কি হয়? ঠাকুর বলছেন, জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্যের ঐশ্বর্য হয়। ঐশ্বর্য মানেই ঈশ্বরের ভাব, ঈশ্বরের ভাব মানে প্রভুত্ব, যেখানে নিজেকে বড় বলে মনে হয়। যেমন টাকার ঐশ্বর্য, ক্ষমতার ঐশ্বর্য, এই জিনিসগুলো ভগবান বিষ্ণুর আছে, লক্ষ্মী তাঁর হৃদয়ে বাস করেন। টাকাটা তাঁর তাই স্বাভাবিক ঐশ্বর্য, ক্ষমতা তাঁর স্বাভাবিক ঐশ্বর্য। ওই ঐশ্বর্যের একটু যখন মানুষ পায় তখন সে মনে করে আমার ভিতরে ঈশ্বরের ভাব এসে গেছে, গীতাতেই ভগবান বলছেন, *ঈশ্বরোঽহং*, নিজেকে ঈশ্বর বলে বোধ হয়। ঈশ্বরকে ভক্তি করলে, ঠাকুর বলছেন, তাঁর জ্ঞান ভক্তির ঐশ্বর্য হয়। পরে আবার তিনি একটা জায়গায় বলছেন, দেখো, পাণ্ডবদের মত এত জ্ঞানী কোথায়, পাণ্ডবদের মত এত ভক্ত কোথায়, কিন্তু তাদের দুঃখের শেষ নেই। ভীষ্মকে নিয়ে ঠাকুর বলছেন, শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের নিয়ে ভীষ্মের সাথে দেখা করতে গেছেন, শ্রীকৃষ্ণকে দেখে ভীষ্ম কাঁদছেন। ভীষ্ম কেন কাঁদছেন? শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান নারায়ণ, তিনি সর্বদা পাণ্ডবদের সাথে সাথে রয়েছেন, তাতেও তাদের দুঃখের শেষ নেই, এতদিনেও ঈশ্বরের মায়া বুঝতে পারলাম না। এই ভেবে ভীষ্ম কাঁদছেন। এত দুঃখ, এত যন্ত্রণা কিন্তু তাই বলে পাণ্ডবদের জ্ঞান, তাঁদের ভক্তি কি এতটুকু কমছে? কিছুই কমছে না।

মানুষ যখন ঈশ্বরের পথে যায়, ঈশ্বরকে ভক্তি করে, ভালবাসে, তখন তার উদ্দেশ্য একটাই, নিজের ভিতরে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি আর ঈশ্বরের জ্ঞান কিভাবে দিনে দিনে বাড়তে থাকবে। জ্ঞান, ভক্তির ঐশ্বর্য যখন বাড়ে, এর আগে যেটা বলা হয়, যেভাবে বাড়িতে কারুর অসুখ হলে টাকা-পয়সা দিয়ে মানুষ তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করে, পরিচিতি থাকলে তার সাহায্য নেয়, ঠিক তেমনি যাদের জ্ঞান ভক্তির ঐশ্বর্য রয়েছে, তারা তাদের জীবনের সমস্ত রকমের সমস্যাকে এই জ্ঞান ভক্তির ঐশ্বর্য দিয়ে মোকাবিলা করে। শরীর খারাপ হল, ডাক্তারের কাছেও গেল, যদি ভাল হয়ে গেল তো ঠিক আছে, যদি ভাল না হয়ে যায় তখন গঙ্গাজল, তুলসীপাতা খাবে, ঘুরে ফিরে সেই জ্ঞান ভক্তিতে চলে এলো। ঠাকুর যখন কেশব সেনের জন্য প্রার্থনা করছেন, সেখানেও ওই জ্ঞান ভক্তির ঐশ্বর্যের জোরেই করছেন। সংসারে দুঃখ-কষ্ট আসছে, শোক-মোহের ঝড় আসছে, ওই জ্ঞান ভক্তির ঐশ্বর্য দিয়েই সব সমস্যাকে সামলে নিচ্ছেন, যেভাবে অর্থবানরা অর্থ দিয়ে, ক্ষমতাবানরা ক্ষমতা দিয়ে সমস্যার মোকাবিলা করেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ একটি বারের জন্য দেখতে যায় না যে, ঈশ্বরকে আমি যদি ভালবাসি, ঈশ্বরের দিকে যদি যাই, তাহলে আমারও জ্ঞান ভক্তির ঐশ্বর্য হবে। এই জ্ঞান ভক্তির ঐশ্বর্যটাই একমাত্র লাভ, আর এই জ্ঞান ভক্তির ঐশ্বর্য দিয়েও আমি আমার জীবন চালাতে পারি।

প্রচণ্ড ভোগীদের কোন সমস্যা হয় না, আর নাস্তিকদেরও কোন সমস্যা হয় না। নাস্তিকরা জানে, আমি জন্মেছি, একদিন মরে যাব, সব ঝামেলা ওখানেই মিটে যাবে। অন্য দিকে যারা পুরোপুরি ভক্তির পথে চলে এসেছে তাদেরও কোন সমস্যা হয় না, তারা জানে, ঠাকুর আছেন, আমার ভাল-মন্দ সব তিনিই জানেন। কিন্তু যারা এদিকেও আছে আবার ওদিকেও আছে, এই ধরণের লোকেদের প্রাণান্ত হয়। এরা দিনের কিছুটা ভোগীর মত ব্যবহার করে, কিছুটা আবার যোগীর মত ব্যবহার করে। এদের কখন মানুষের উপর অভিমান, সমাজের উপর, দেশের উপর অভিমান হচ্ছে, কখন আবার ঈশ্বরের উপর অভিমান হয়। কখন নিজের কর্মের দোষ দিয়ে হা-হুতাশা করে যাচ্ছে। নাস্তিকদের এই সমস্যা থাকে না, ওরা ভগবানকে মানেও না, ভগবানের উপর

দোষারোপও করতে যায় না। যারা পুরো বিশ্বাসী তাদেরও কোন সমস্যা হয় না। যাদের ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, তাদের কোন কিছুর ব্যাপারে কোন অভিযোগও থাকে না। কিন্তু যারা সাধারণ মানুষ, স্বামীজী তাদের ব্যাপারে বলছেন, যখন তারা দেখে এই ঈশ্বর আমাদের কোন কাজে লাগছে না, তখন তারা ঈশ্বরের উপর দোষারোপ করতে থাকে। কারণ আমাদের ধারণা হল, ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। রাজা যেমন সর্বশক্তিমান, রাজা যেমন দুষ্টের দমন করেন সেই রকম ঈশ্বর যদি দুষ্ট লোকদের সায়েস্তা না করেন, বাড়িতে জরা মৃত্যু যদি না কমে, দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার যদি বন্ধ না করতে পারেন, সেই ঈশ্বরকে নিয়ে আমি কি করব!

আমাদের কাছে ভগবান হলেন একটা বিরাট বড় ডাস্টবিন, আমাদের যত সমস্যা, যত আবর্জনা সব নিয়ে গিয়ে ভগবানের দরজার সামনে রাখা ডাস্টবিনের বাক্সে ফেলে দিয়ে আসি। এটা কেন হল? ঠাকুরের ইচ্ছা। এটা কেন হল না? ঠাকুরের ইচ্ছা। তুমি এত ফাঁকিবাজ কেন? ঠাকুরের ইচ্ছা। আপনি কেন ঘুষ না নিয়ে কোন কাজ করতে চান না? ঠাকুরের ইচ্ছা। আপনি এত লোকেদের ঠকান কেন? ঠাকুরের ইচ্ছা। সব নোংরা ঠাকুর নামে ওই ডাস্টবিনে গিয়ে জড়ো হয়। আর যারা আরও সেয়ানা, তারা মনে করে আমার দরজার সামনে যত আবর্জনা পড়ে আছে, ঠাকুর এসে সব ওই আবর্জনা পরিষ্কার করবেন। স্বামীজী ঠিক এটাই এখানে বলছেন, Shall we look upon God as a mere municipal authority? খুব প্রচলিত ধ্যান ধারণা থেকে যখন মানুষ বলে, এই ঈশ্বরের কি দরকার, ধর্মের কি দরকার, তখন বুঝতে হবে, এদের মন খুব নীচুতে পড়ে আছে।

একবার একজন নামকরা বিজ্ঞানী বেলুড় মঠে এসেছিলেন, তাঁকে একজন মহারাজ গাইড হয়ে মঠ ও দক্ষিণেশ্বর ঘুরিয়ে দেখালেন, উনিও খুব আগ্রহ নিয়ে সব কিছু দেখলেন। শেষে তিনি একটা কথা বললেন, it is a different world, বেলুড় মঠ পুরো একটা অন্য জগৎ। যদি কেউ বলে, দেখুন আমি ধর্মটর্ম ভাল জানি না, ঈশ্বরের ব্যাপারেও জানি না, আমার মন বুদ্ধি জৈব জিনিসগুলোর উপর ঘোরাফেরা করে। এর থেকে এটা বুঝতে হবে যে, আর কিছু না হোক লোকটি অন্তত সৎ। কিন্তু এর বাইরে যত মানুষ আছে যারা ধর্ম, ঈশ্বর, সব কিছুকে উড়িয়ে দেয়, এরা নীচ প্রকৃতির, সে বিজ্ঞানীই হোক আর যাই হোক। প্রথমেই এরা বলে দেবে, এগুলো সব ধাপ্পা। যখনই কেউ অপরকে যে কোন ব্যাপারে উড়িয়ে দেয়, বুঝতে হবে লোকটি খুব নীচু মনের। ঈশ্বর কোন মিউনিসিপ্যালিটির কর্তৃপক্ষ নন। আর ঠাকুরের কথা দিয়ে আগে যে ব্যাখ্যা করা হল, যারা ঈশ্বরকে ভক্তি করে, তারা জ্ঞান ভক্তির ঐশ্বর্য পায়, এটাই একমাত্র উদ্দেশ্য।

এটা ঠিকই যে আমাদের সংসারে, জগতে যা কিছু চাওয়া-পাওয়া আছে, তার জন্য ঈশ্বর নন। কিন্তু আমরা আমাদের চাওয়া-পাওয়ার সাথে ঈশ্বরকে সব সময় জুড়ে রেখেছি, আর এই সম্পর্ক থেকে আমরা কিছুতেই বেরোতে পারি না। এখানে এটা বলে হচ্ছে না যে, দুঃখ-কষ্টে ঈশ্বরের কাছে কেউ যাবে না, যে ঈশ্বরের ভক্ত, সে ঈশ্বর ছাড়া কার কাছে যাবে! বরানগর মঠে সবাই মিলে ঠাকুরের নকল করে মজা করছেন, সেখানে নরেনও আছেন। ঠাকুরের নকল করে মজা করছে দেখে একজন আবার খুব আপত্তি করলেন। তাতে নরেন খুব রেগে গেছেন, তাঁকে খুব কঠোর ভাবে বলছেন, আমরা ঠাকুরকে নিয়ে মজা করব না তো কি তোমাকে নিয়ে মজা করব! ঈশ্বরকে নিয়ে এই ধরণের মজা করার জন্য ঈশ্বরের খুব আপন হতে হয়। ইংরাজীতে দুটো শব্দ আছে, একটা হল ক্যারিকেচার, আরেকটা হল ইমিটেট। যাকে আমরা ভালবাসি তাকে আমরা ইমিটেট করে মজা পাই। বাচ্চার কাছে তার বাবা হল জগতের শ্রেষ্ঠ পুরুষ, বাচ্চা বাবার নকল করে। কারুকে নিয়ে যখন ক্যারিকেচার করা হয়, তখন তাকে বিদ্রুপ করা হয়। স্কুল কলেজে যাঁরা খুব ভাল শিক্ষক তাঁকে ছাত্ররা নকল করে, আর অপদার্থ শিক্ষকদের নিয়ে সব সময় উপহাস চলে। কাউকে নকল করার সময় ভাল করে দেখতে হয়, সে উপহাস করছে নাকি খুব ভালবাসা থেকে নকল করছে। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদের এত গভীর ভালবাসা ছিল যে, তাঁরাও শ্রীকৃষ্ণের নকল করত। ভালবাসার জন্য কাউকে নকল করলে বুঝতে হবে, লোকটির আদর্শ তাকে খুব গভীরে গিয়ে স্পর্শ করেছে, এখনও সে ওই আদর্শের স্তরে যেতে পারেনি, সেইজন্য তাঁর অঙ্গভঙ্গিমা, কথা বলার ধরণ এগুলোকে নকল করে সে ওই ভাবটা পেতে চাইছে। ঈশ্বরের উপর যার পুরো নির্ভরতা এসে গেছে, সে তাঁর কাছেই প্রার্থনা করবে, শ্রীমাও করতেন, স্বামীজীও করতেন। আমাদের সমস্যা হল, প্রার্থনা করে যখন কিছুই হয় না, তখন শালার বাড়ি বলে আমরা বেরিয়ে আসি।

অনেকে প্রশ্ন করতে পারে, তিনি তো আমার অন্তর্যামী, আমার কি দরকার, কি দরকার নয়, সবই তো তিনি জানেন, তাহলে আলাদা করে আবার প্রার্থনা করার কি দরকার? এক শহরে রাত্রিবেলা একজন সাইকেল আরোহী বিনা আলোতে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিল। তাকে পুলিশ ধরেছে, তোমার সাইকেলে আলো নেই, তোমাকে জরিমানা দিতে হবে। লোকটি পুলিশকে বলছে, চারিদিকে যেখানে এত আলো আছে সেখানে আলাদা করে সাইকেলে আলো রাখার কি দরকার। পুলিশটি সঙ্গে সঙ্গে সাইকেলের চাকার হাওয়া খুলে দিয়ে বলে দিল, চারিদিকে এত বাতাস রয়েছে, তোমার চাকাতেও তাই কোন হাওয়ার দরকার নেই। আলো যদি সব দিকে থাকে, তাহলে বাতাসও তো সব দিকে আছে। চারিদিকে আমাদের সব খাবারই আছে, সূর্যের আলোতে সব ফটো সিন্থেসিস করে দেওয়ার পর আমরা সেই খাবার খাচ্ছি, আমরা তো ফটো সিন্থেসিস করতে পারছি না। আমাদের তাই খেতে হচ্ছে। যতক্ষণ খাওয়া-পড়া আছে, নিঃশ্বাস নেওয়া আছে, ততক্ষণ প্রার্থনাও আছে। যতক্ষণ এই আমি বোধ আছে, এমনকি জীবনমুক্তির পরেও ঠাকুর যদি তাঁর মধ্যে আমি বোধটা রেখে দেন, যেমন স্বামীজীর বিদ্যার আমি রেখে দিয়েছিলেন জগৎকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য, ততক্ষণ তাঁকেও প্রার্থনা করতে হবে। যতক্ষণ আমাদের খাওয়া-দাওয়া ব্যাপারে হুঁশ আছে, কাপড় পরার ব্যাপারে হুঁশ আছে, অন্যান্য জাগতিক ব্যাপারে হুঁশ আছে, ততক্ষণ প্রার্থনাটাও থাকবে। আমরা যে খাওয়া-দাওয়া করছি, কিসের জন্য করছি? শরীরের জন্য দরকার তাই খাওয়া-দাওয়া করছি, ঠিক তেমন মনের শান্তির জন্য প্রার্থনারও দরকার। একটা রেলওয়ে টিকিটের জন্য আমাদের আবেদন করতে হয়, তাহলে ঈশ্বরের কাছে আবেদন করতে আমাদের কিসের অসুবিধা! বাচ্চা বয়স থেকে আমরা শুধু দরখাস্ত আর আবেদন করেই যাচ্ছি, আমাদের জীবনটা যেন একটা long train of application। সমস্যা প্রার্থনা করাকে নিয়ে হয় না, সমস্যা হল, আমাদের এই প্রত্যাশা থাকে যে, আমি প্রার্থনা করেছি, তিনি আমার প্রার্থনা শুনবেনই শুনবেন। এই জায়গাতে গিয়ে আমাদের সব গোলমাল হয়ে যায়। আমার তো আর কিছু করার নেই, তাই ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছি।

এই ঈশ্বরীয় ভাবকে নিয়েই স্বামীজী বলে যাচ্ছেন, All we can do is put down all desires, hates, differences; put down the lower self, commit mental suicide, as it were; keep the body and mind pure and healthy, but only as instruments to help us to God; that is their only true use. (*আমরা এইটুকু করতে পারি যে, আমাদের সব বাসনা, ঈর্ষা, ঘৃণা, ভেদবুদ্ধি –এইগুলিকে দূর করে দিতে পারি। কাঁচা আমিকে নষ্ট করে ফেলতে হবে –মনকে মেরে ফেলতে হবে –এক-রকম মনে মনে আত্মহত্যা করা আর কি! শরীর ও মনকে পবিত্র ও সুস্থ রাখো –কিন্তু কেবল ঈশ্বরলাভ করার যন্ত্ররূপে; ঐটুকুই এদের একমাত্র যথার্থ প্রয়োজন।*) স্বামীজী এবার ধীরে ধীরে ঈশ্বরীয় ভালবাসাকে conclusionএর দিকে নিয়ে যাচ্ছেন আর ঠাকুর যে কাঁচা আমি ও পাকা আমির কথা বলতেন, সেটাকে নিয়ে বলছেন। দেহ ও মনের সাথে জুড়ে যে আমিত্ব সেটাই কাঁচা আমি, এই আমিই যখন ঈশ্বরের সাথে জুড়ে যায়, আমি ঈশ্বরের দাস, আমি ঈশ্বরের সন্তান, আমি তাঁর ভক্ত, তখন এই আমিটাই পাকা আমি হয়ে যায়। যখন কেউ ঠিক ঠিক বোধ করে আমি সেই শুদ্ধ আত্মা, তখন তার আমিটা পাকা আমি হয়ে গেল। অহং ব্রহ্মাস্মি যখন বলছে, আমিত্ব সেখানেও আছে, কিন্তু ওই আমিটা পাকা আমি। স্বামীজী যে বলছেন, commit mental suicide, তার মানে এই কাঁচা আমির ভাব যেটা রয়েছে এটাকে নাশ করতে বলছেন। যখন বলে kill thyselve, মানুষ তখন মনে করে আমাকে আত্মহত্যা করে নিতে হবে। এক শিষ্য গুরুর কাছে গেছে, গুরু তাকে উপদেশ দিয়ে দিলেন, kill thyselve। শিষ্য ছিল একেবারে মুর্খ, কিছু দিন এই সেই করে শেষে একদিন আগুনে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে। গুরু দেখতে পেয়ে বলছেন, ওরে মুর্খ, শরীরটা তো তোমার নয়, তুমি যেটাকে ঠিক ঠিক আমিত্ব বলে মনে করে, সেটার নাশ কর। সেটাই স্বামীজী বলছেন, আমরা যেটা করতে পারি তাহল, mental suicide। আমাদের মনে যত রকমের ভোগ-বাসনার উদয় হয়, যত রকম ঘৃণা, অপরের ক্ষতি করার চিন্তা, আমাদের মনের যে কুভাব আমাদের নিকৃষ্ট, কৃপণ, সংকীর্ণ বানিয়ে রাখে, এই ভাবগুলোকে নাশ করে দাও, এটাই mental suicide। এগুলোকে নাশ করে, নিজের শরীর, মনকে পবিত্র করা, শরীর মন পবিত্র হয়ে গেলে এই শরীর মনই স্বাভাবিক ভাবে ঈশ্বর লাভের, শুদ্ধ আত্মা বা চৈতনের আলোর প্রকাশের যন্ত্রস্বরূপ হয়ে যাবে।

ছোটবেলা থেকে আমরা পরিবার, সমাজ থেকে অনেক রকম কথা শুনে আসছি, অনেক রকম কথা শিখে আসছি। জীবনের ব্যাপারে আমাদের যে ধারণা, এই ধারণা প্রথম তৈরী হয় বাড়ির বড়দের কথা শুনে শুনে এবং পরবর্তিকালে কথামৃতের মত কিছু শাস্ত্রের কথা শুনে বা পড়ে। কিন্তু তাতেও জীবনের যে একটা উচ্চ দর্শন আছে, সেই ব্যাপারে কোন পরিষ্কার ধারণা হয় না। কিছু শাস্ত্র, বিশেষ করে যেগুলো ঠিক ঠিক ভক্তিশাস্ত্র, যেখানে ঈশ্বরকেই শেষ কথা রূপে বলা হয়েছে, এই ধরণের শাস্ত্রগুলি যদি খুব গভীর ভাবে অধ্যয়ন করা হয়, তাহলে একটা ধারণা স্পষ্ট হয়ে আসবে – এই যে আমার শরীর, এই শরীর ইন্দ্রিয় দিয়ে চলছে, আর শরীর ও ইন্দ্রিয় মন দিয়ে চলছে, মনের পিছনে যে সত্তা সেটা হল বুদ্ধির সত্তা, আর এর সব কিছুর পিছনে আছেন সেই আত্মা। এই শুদ্ধ আত্মা, চৈতন্যের সত্তা, যিনি ঈশ্বর, যিনি অন্তর্যামী, যিনি সবটাই জানেন, তিনি এই এতগুলো ধাপে ধাপে নামতে থাকেন।

প্রথমে হল বুদ্ধি, বুদ্ধি অপরিস্কৃত। কেন অপরিস্কৃত? কারণ শাস্ত্র অধ্যয়ন নেই, গুরুজনের সঙ্গ হয়নি, এরপরেও একটা কোন আশ্রমে যদি যায়, যেখানে ঠাকুরের কথা নিয়ে আলোচনা হয়, সেখানে একটু ঠাকুরের কথা শোনার পর মনটা ছটফট করতে শুরু করবে। কারণ মন ওই ধরণের কথা নিতে পারে না। আর কোন ভাবে যদি একটা আদর্শ জীবনের ধারণা হয়ে যায়, সেই অনুসারে যে জীবন-যাপন করব সেটা সম্ভবই না। বুদ্ধি মানে, কোনটা ঠিক আর কোনটা ঠিক নয়, সম্যক রূপে জানা, তার সাথে যেটা ঠিক সেটা করার ক্ষমতা থাকা চাই, এবং যেটা ঠিক নয়, সেটা থেকে সরে আসার ক্ষমতা থাকবে। যদি কেউ বলে আমি জানি এটাই ঠিক, কিন্তু আমি করতে পারিনা, যেমন দুর্যোধন বলছে, ওটাকে তাহলে বুদ্ধি বলা যাবে না, তার মধ্যে বুদ্ধির অভাব রয়েছে। বুদ্ধি মানেই, আমি জানি এবং আমার এটা করার ক্ষমতা আছে। যদি না জানা থাকে তখন সে ওটা শিখে নেয়, যেমন ইলেক্ট্রিক সুইচকে কিভাবে ব্যবহার করতে হয় জানা নেই, একজনের থেকে শিখে নিল, বুদ্ধি তাকে ওটা শেখাল।

এই বুদ্ধি আমাদের পুরোপুরি মেঘাচ্ছন্ন। ধর্মশাস্ত্রের অধ্যয়ন নেই, কোনটা ঠিক, কোনটা বেঠিক জানে না। সাধু সঙ্গ নেই, গুরু বা আচার্যের সঙ্গ করা নেই। কোন কারণে যদি সাধু বা গুরু কারুর সঙ্গ করে নেয়, তখন নিজেকে একটা বিরাট কিছু মনে করে। গুরুর সঙ্গ করছে কিন্তু সেই শ্রদ্ধার ভাব নেই। আর এগুলো সব করেও নিল, কিন্তু ভিতরে সেই আঁট নেই যে, জোর দিয়ে বলবে, আমি এটা করবই। সেখান থেকে যখন মনের উপর আসে, যেখানে বিচার করা হয়, সেই মনটাও মেঘাচ্ছন্ন আর তার সাথে ইন্দ্রিয়গুলো তিড়িং বিড়িং করে তার ভোগ্য বস্তুর দিকে দৌড়াচ্ছে, কোথায় ভাল খাবার পাওয়া যাবে, যে খাবার আমার রসনাকে তৃপ্ত করবে; কোথায় ভাল দৃশ্য আছে যা আমাদের চোখকে শান্তি দেবে। বাচ্চারা খেলনা দেখে আনন্দ পায়, তরুণ তরুণী এক অপরকে দেখে আনন্দ পায়, বৃদ্ধরা নাতির চাঁদমুখ দেখে আনন্দ পায়। যখন এগুলো থেকে একঘেঁয়েমি আসে তখন বছরে একবার দুবার ট্যুরিস্ট হয়ে কোথাও ঘুরতে চলে যাবে, আর এমন জায়গায় যাওয়া চাই যেখানে এর আগে কেউ আসেনি, সেইজন্য প্রত্যেক বছর নূতন কোন জায়গাতে যাওয়া চাই। শরীর, মন, ইন্দ্রিয়গুলি সুখ পাওয়ার জন্য ছটফট করছে। আর নিজের মুখ, চুল, হাত, পা ঘষে মেজে পালিশ করে সামনের জগৎকে দেখাবে, সবাই যেন আমাকেই দেখতে থাকে। কার এমন ফুসরৎ আছে তোমার দিকে তাকানোর!

স্বামীজী বলছেন, আগে এগুলোকে নাশ কর। এগুলোকে নাশ করার পর, তোমার ভিতরে যিনি শুদ্ধ আত্মা রয়েছেন, তাঁর পূর্ণ শক্তির বিকাশ করাতে সচেষ্ট হও। এই শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির পারে আছেন নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা। তাঁর প্রকাশ যখন ওই শুদ্ধ মন, শুদ্ধি বুদ্ধিতে প্রকাশিত হবে, তখন আত্মার আলো যেন বিচ্ছুরিত হতে থাকে। একটা হাজার ওয়াটের বাল্বের বাইরে দিয়ে একটা কাঁচ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেই কাঁচের উপর আবার মোটা একটা চাদর দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে, তার উপর আরও মোটা মোটা কাগজ দিয়ে পুরো কভারিং করে দেওয়া হয়েছে। এরপর একট সরু ছিদ্র করে দেওয়া হয়েছে, ওই সুরু ছিদ্র দিয়ে হাজার ওয়াটের বাল্বের একটু আলোর রেখা আসছে, ওটা দেখেই আমরা খুশি হয়ে যাই। আগেকার দিনে যখন হ্যারিকেনের আলো ব্যবহার করা হত তখন প্রত্যেক দিন হ্যারিকেনের কাঁচকে ভাল করে ঘষে মেজে নিতে হত, কারণ কালি পড়ে পড়ে কাঁচটা কালো হয়ে থাকত। পরিষ্কার করার পর হ্যারিকেনের আলো ঝকঝক করে বেরিয়ে আসত। ঠিক তেমনি আমাদের মন বুদ্ধির ওই আবরণগুলোকে একবার সরিয়ে দিলে আত্মার

আলো ফেটে বেরিয়ে আসবে। যাঁরা অবতার তত্ত্ব মানেন না, ঈশ্বরের অবতারকে মানেন না, তাঁরা অন্য ভাবে এটাই বলেন – সেই যে শুদ্ধ চৈতন্য, তাঁর যে প্রকাশ, শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধির ভিতর দিয়েই প্রকাশিত হয়, তাঁদের আলোতে জগৎ আলোকিত হয়ে যায়। তাঁদের তুলনায় যাঁরা নামকরা কবি বা বড় বিজ্ঞানী, অতি সাধারণ। কিন্তু সেখানেও সেই চৈতন্যরই প্রকাশ, বুদ্ধির একটা দিক, সেটারই প্রকাশ।

স্বামীজী সেটাই বলছেন, এই শরীর, মন, বুদ্ধির একমাত্র উপযোগিতা হল, এগুলোর মধ্যে যে আবরণ পড়ে আছে, এগুলোকে পরিষ্কার করা এবং শুদ্ধ আত্মার আলোকে প্রকাশিত করা। ঈশ্বর আমার কোন কাজে আসবেন, একটু আগে যেটা বলা হল – আসলে আমরা ঈশ্বরের উপযোগিতা খুঁজছি আমাদের শরীর, ইন্দ্রিয়, মনের সুখের জন্য, কিন্তু হওয়া উচিত ছিল উলটো। শরীর, মন ও ইন্দ্রিয়েরর উপযোগিতা থাকবে ঈশ্বরের জন্য, যাতে তিনি ঠিক ঠিক ভাবে এগুলোকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারেন, সমস্যাটা আমাদের এই জায়গাতে। ঘোড়ার গাড়িতে ঘোড়া গাড়ির সামনে থাকে, ঘোড়া টেনে গাড়িকে সামনের দিকে নিয়ে যায়। ঘোড়াকে যদি গাড়ির পিছনে লাগিয়ে রাখা হয়, ঘোড়ার গাড়ি আর চলবে না। আমরা ঠিক এই ভুলটাই করে যাচ্ছি। আমরা বিচার করছি, আমার শরীর মনের জন্য ঈশ্বরের কি উপযোগিতা আছে? কিন্তু সত্য হল, আমার এই শরীর মনকে এমন পুষ্ট ও সতেজ রাখতে হবে যাতে ঈশ্বর এর ঠিক ঠিক ব্যবহার করতে পারেন। ধর্ম আমাদের এটাই শেখায়, ধর্ম শেখায়, তোমার এই শরীর মন যেন ঈশ্বরের কাজে লাগে। এখন মিউনিসিপ্যালিটি থেকে জল সাপ্লাই দিচ্ছে, কিন্তু আমার বাড়ির জলের পাইপে নোংরা জমে আছে, বাড়িতে জল আসছে না, টিপ টিপ করে হয়ত সামান্য একটু জল পড়ছে, একটা বালতি ভর্তি হতে এক ঘন্টার উপর লেগে যাচ্ছে। জলের পাইপটা তুমি পরিষ্কার কর, তারপর দেখ জলের কি তোড়, কয়েক সেকেণ্ডে তোমার বালতি ভরে যাবে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আমরা মনে করছি ঈশ্বর আমাদের কাজের জন্য। কিন্তু ব্যাপারটা তো তা'নয়, ব্যাপারটা উল্টো, আমার শরীর, আমার মন, আমার ইন্দ্রিয় সব ঈশ্বরের জন্য।

সত্যের জন্যই সত্যলাভ, ঈশ্বরের জন্যই ঈশ্বরলাভ

সেইজন্য স্বামীজী তখন বলছেন, Seek truth for truth's sake alone, look not for bliss, (*কেবল সত্যের জন্যই সত্যের অনুসন্ধান কর; তার দ্বারা আনন্দলাভ হবে, এ-কথা ভেবো না।*) যখন সত্যকে চাইবে তখন সত্যের জন্যই সত্যকে চাইবে, যখন ঈশ্বরকে চাইবে তখন ঈশ্বরের জন্যই ঈশ্বরকে চাইবে। সেখানে কোন বেণে বুদ্ধি নিয়ে এসো না, এই চিন্তাও করবে না যে, সত্যকে পেলে আমার আনন্দ হবে, ঈশ্বরকে পেলে আমার আনন্দ হবে। কঠোপনিষদে খুব সুন্দর করে বলছেন, কাদের কাদের ঈশ্বর দর্শন হয় না, তার সব কিছু শুদ্ধ হয়ে গেছে, তার চরিত্রও ভাল, চেষ্টাও করছে, কিন্তু ভাবছে, আচ্ছা আমার কবে দর্শন হবে, আচ্ছা দর্শন হলে আমি কি আনন্দ পাব, এই ভাব যদি থাকে তারও ঈশ্বর দর্শন হবে না। যারা ঈশ্বরকে ভালবাসবে তারা শুধু ঈশ্বরকে ভালবাসার জন্যই ভালবাসবে। যারা সত্যের জন্য যায় তারা শুধু সত্যের জন্যই সত্যের পিছনে যাবে।

স্বামীজী তাই বলছেন, It may come, but do not let that be your incentive. Have no motive except God, (*আনন্দ আপনা হতে আসতে পারে, কিন্তু তার জন্যই যেন সত্যলাভে উৎসাহিত হয়ো না। ঈশ্বর লাভ ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য রেখো না।*) আনন্দ তোমার আসতে পারে, কিন্তু তোমার অভিপ্রায় তা নয়, তোমার অভিপ্রায় হল সত্য। সাধু সন্ন্যাসীদের পূর্বাশ্রমের পরিচিতরা কেউ এসে অনেক সময় জিজ্ঞেস করে, ঘরবাড়ি ছেড়ে এসেছো, আনন্দ কি পেলে? তখন সাধুরা এটাই বলেন, 'কিসের আনন্দ, কে তোমাকে বলেছে আনন্দ পাওয়ার জন্য ঘরবাড়ি ছেড়েছি? সাধু জীবনের উদ্দেশ্য আনন্দ লাভ করা, এটা তো আমি কোথাও পাইনি। সন্ন্যাস জীবনের, সাধু জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হল আত্মজ্ঞান, এছাড়া অন্য কিছু নেই'। আদর্শ যদি আনন্দই হয়, তাহলে একবার শ্রীকৃষ্ণের জীবনের দিকে তাকিয়ে দেখো, সারাটা জীবন শ্রীকৃষ্ণের কি অশান্তির মধ্যে কেটেছে। শ্রীরামচন্দ্র জীবনে কিসের আনন্দ পেলেন, জীবনের অমূল্য চৌদ্দটা বছর জঙ্গলে জঙ্গলে কাটিয়ে দিলেন। ভগবান যীশু ক্রুশবিদ্ধ হয়ে গেলেন, ভগবান বুদ্ধ সারা জীবন ভিক্ষাপাত্র নিয়ে ঘুরে বেড়ালেন। তাঁদের কিসের আনন্দ! কিন্তু তাঁরা সবাই ছিলেন সত্যে প্রতিষ্ঠিত। এমন এক সত্যে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন যে, কোন কিছুর জন্যই তাঁরা কোন দিন কারুর কাছে কোন অভিযোগ করেননি। বলছেন, যাঁরা ঠিক

ঠিক এই মনোভাবের, ধর্ম একমাত্র তাঁদেরই জন্য, ঈশ্বরও শুধু তাঁদের জন্যই, বাকিরা কোন ধর্তব্যের মধ্যেই আসে না। যদি তুমি আধ্যাত্মিক হতে চাও, যদি ধর্ম পথে আসতে চাও, তাহলে তুমি মনে রেখো, ঈশ্বর ছাড়া আমার আর কিছু লাগবে না, এই ভাবকে আঁকড়ে পড়ে থাকতে হবে। ঠাকুর বলছেন, মাইরি বলছি, আমি ঈশ্বর বৈ আর কিছু জানি না। মা কালী তাঁকে ভাল ভাবে রাখবেন নাকি মন্দ ভাবে রাখবে, মা কালী তাঁকে এটা দেবেন সেটা দেবেন, এই ধরণের কোন কল্পনাও ঠাকুরের মনে স্থান পায়নি, অসম্ভব।

শেষে স্বামীজী বলছেন, Dare to come to Truth even through hell. (*এই সত্যলাভ করবার জন্য যদি নরকের ভিতর দিয়ে যেতে হয়, তাতেও পেছ-পা হয়ো না।*) লোকেরা প্রায়ই কত বড় বড় কথা বলে, এক রাজনৈতিক নেতা বললেন, আমাদের রাজ্য ভেঙে যদি অমুক রাজ্য করা হয় তাহলে আমার মৃত শরীরের উপরেই তা হবে। আরেকজন বলল, ওই জিনিসটাকে পাওয়ার জন্য দরকার হলে আমি নরকেও যাব। এরা কেউই কিন্তু জীবনে কোন সময় কোন কষ্ট স্বীকার করেনি, অথচ বড় বড় কথা বলে যাচ্ছে। একজন লোক পড়াশোনা করে অনেক উঁচুতে উঠেছেন, মাস্টার ডিগ্রি করেছেন, পিএইচডি করেছেন, সত্যিকারের পারদর্শি, এইসব লোকেরা একটা সময় জীবনে কত পরিশ্রম করেছেন। এই খাটনিটাই একটা নরক, খাওয়া নেই দাওয়া নেই, লেগে আছে তো আছেই। যদি কেউ লেগে থাকতে পারে তবেই সে সাফল্যের মুখ দেখবে। আর শুধু তাই না, আমি এটাকে ভালবাসি, আমি সাফল্য পাই আর নাই পাই, তাতে কিছু আসে যায় না, এটাই আমার জীবন, এটাই আমার জীবনশৈলি। এই মানসিকতা যতক্ষণ না আসছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু কিছুই হবে না।

জর্জ বার্ণার্ড'শ একবার একটা জায়গায় ভবিষ্যতে যারা লেখক হতে চাইছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে বলছেন, তোমরা একটা পরিস্থিতির কল্পনা কর যে, তোমার বাড়িতে খাওয়া-দাওয়ার পয়সা নেই, তোমার সদ্যোজাত শিশুকে তোমার স্ত্রী বুকের দুধ পান করাতে যাচ্ছেন। তুমি তাড়াতাড়ি এসে তোমার স্ত্রীর বুক থেকে দুধটা বার করে নিলে। দৌড়ে গিয়ে বাজারে সেই দুধ বিক্রি করলে। বিক্রি করে যে পয়সা হল তাই দিয়ে তুমি কালি ও কাগজ কিনলে, এবার তুমি বাড়িতে এসে তাই দিয়ে তোমার সাহিত্য রচনা শুরু করে দেবে। যদি তোমাদের এই রকম করার দম থাকে, তবেই তোমরা সাহিত্যের জগতে এসো। বার্ণার্ড'শ এটা ভবিষ্যতের লেখকদের উদ্দেশ্যে বলছেন, কিন্তু এই জিনিস সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, are you ready to sacrifice yourself for this?

আমরাও এই ধরণের sacrificeএর কথা বলি, যখন মামলা মকোদ্দমা হয় তখন আমরা বলি, আমি সর্বস্বান্ত হলেও তোমাকে আমি শেষ করে ছাড়ব। অপরকে শেষ করার সময় আমরা বলি, আমি শেষ হয়ে যাই যাব, আমি কলঙ্কিত হই হব, অপমানিত হই হব, তবুও তোমাকে আমি শেষ কর মরব। কিন্তু কোন শুভ কিছুর দিকে, ঠিক ঠিক ঈশ্বরের দিকে যাব, সেটার দিকে আমাদের দৃষ্টি থাকে না। অপরকে নাশ করার সময় আমরা নিজেকে শেষ করে দিতে প্রস্তুত হয়ে যাই, কিন্তু একটা উচ্চ আদর্শে নিজের উত্থানের জন্য যে আমি সব কিছু ত্যাগ করব, সেই মনোভাব আমাদের হয় না, তাই আমরা সবাই এত সাধারণ হয়ে থাকি। আর জগতে যে এত ভালবাসার জিনিস, সেখানেও কেউ ত্যাগ করতে রাজি না। কারুর ভিতর কিছু নেই, কোন দম নেই। স্বামীজী এটাই বলছেন, Dare to come to Truth even through hell, মুখে আমরা বলে দিই, তোমার জন্য আমি নরকে যেতেও প্রস্তুত। এগুলো কিছু না, একটা কটূ কথা বললে সহ্য করতে পারে না, আর সে নাকি বলছে তার জন্য সে নরকে যাবে। এটাই স্বামীজী ভালবাসা নিয়ে বলছেন যে, ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসাটা ঠিক ঠিক কি জিনিস হতে পারে, এটাই আজকের স্বামীজীর বিষয়।

<u>২৮শে জুন, শুক্রবার</u>

এরপর আসছে ২৮শে জুন, শুক্রবার। দেববাণী বইতে ওই দিনের উপর যে টিপ্পণি দেওয়া আছে সেটা খুব মজার। ওই দিন স্বামীজীর সাথে সবাই একটা পিকনিকে গিয়েছিলেন। সবাই সেখানে আনন্দ করেছেন। স্বামীজী যেখানেই থাকবেন সেখানেই সব সময় কিছু না কিছু বিষয়ের উপর বলতে থাকতেন। আমরা এক একটা দিনের যে এক দেড় পাতা বা দু পাতার যে নোট দেখছি, এটা কিছুই না, স্বামীজী আরও লম্বা লম্বা

করে সব বলেছেন। মিস্ ওয়াল্ডো নিজের মত বুঝে যতটুকু পেরেছেন সেটাকে নোট করেছেন, তাতেই কত গভীর সব কথা লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে।

অন্নং ন নিন্দাৎ

এই দিন সবাই পিকনিকে গেছেন, সেখানেও স্বামীজী অনবরত যত কথা বলে গেছেন, তার মধ্যে মিস্ ওয়াল্ডো একটা কথাই নোট করেছেন, Be thankful for all food, it is Brahman. (*সর্বপ্রকার অন্নের জন্য ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞ হও –অন্নই ব্রহ্মস্বরূপ।*) সেখানে একটু খাওয়া-দাওয়াও হয়েছে, স্বামীজী ব্রেকফাস্ট শুরু করার আগে এই কথা বলছেন, সমস্ত খাদ্যই ব্রহ্ম। উপনিষদেরও এই ভাব, তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলছেন, *অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ*, অন্নকেই ব্রহ্ম বলে জানবে, আর আমাদের এই ব্রত হোক যে, আমরা কখন অন্নের নিন্দা করব না। সেটাই স্বামীজী এখানে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন, His universal energy is transmuted into our individual energy and helps us in all that we do. (*তাঁর সর্বব্যাপিনী শক্তিই আমাদের ব্যষ্টিশক্তিতে পরিণত হয়ে অমাদের সর্বপ্রকার কার্য করতে সাহায্য করে থাকে।*) আধ্যাত্মিক সত্যগুলো এত গভীর ও আর এত কিছু ভাবকে একসাথে নিয়ে চলে যে, সব কিছুকে ধারণা করে মাথায় রাখা খুব মুশকিল। হিন্দুরা এই ব্যাপারে সত্যিই প্রশংসার যোগ্য যে, তাঁরা এই জিনিসগুলোকেই তাঁদের দৈনন্দিন জীবনে নামিয়ে এনেছেন। ভারতবর্ষে কখনই অন্নকে নিন্দা করা হয় না, উপনিষদেই আছে, *অন্নং ন নিন্দাৎ*। যদি জাগতিক দৃষ্টিতে দেখা হয়, যে কোন অন্ন যখন আমরা খাচ্ছি, তখন আমরা জানব যে, এই অন্নটা আরেকজনের মুখে যেতে পারত। যে কোন অন্ন আমরা যখন খাচ্ছি, তখন আরেকজনের মুখের অন্ন কেড়ে নিয়ে আসা হচ্ছে। মাছ মাংস খাওয়ার ক্ষেত্রে আরও বিপদ, সেখানে একজনকে প্রাণ দিতে হচ্ছে শুধু আমাদের উদরপুর্তি ও শরীরের পুষ্টির জন্য।

সম্প্রতি সরকারের একটা সিদ্ধান্তকে নিয়ে খুব বিতর্ক হয়েছিল। সরকারের তরফ থেকে বলা হল যে, হোটেলগুলিতে যে খাওয়ার পরিবেশন করা হয় তাতে সেখানে খাদ্যের প্রচুর অপচয় হয়ে থাকে, এই অপচয়কে রোধ করার জন্য কিছু নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। সরকারের এই ইচ্ছার কথা বাইরে আসা মাত্র মিডিয়া হৈ হৈ করে সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নেমে পড়ল, সরকার এবার থেকে আমাদের জীবনের সব কিছুকেই নিয়ন্ত্রণ করবে, ইত্যাদি। এরা কেউই গভীরে যেতে চাইবে না, কেন জিনিসের অপচয় হবে, অপচয় হওয়াটা যে অপরাধ, এরা কি জানে না?

আমেরিকানদের প্রচুর ঐশ্বর্য, অঢেল সম্পদ, সেইজন্য তাদের খাদ্যের অপচয় বন্ধ করার মূল্যবোধটাও নেই। ওখানে হোটেলে বা কারুর বাড়িতে প্লেটের সব খাবার চেটেপুটে কেউ যদি খেয়ে নেয়, ওরা তাকে কাঙালী বলে গালাগালি দিয়ে দেবে। ওরা ধরেই নিয়েছে যে আমি কিছু খাবার নষ্ট করব। ভারতীয় ঐতিহ্যে এই রীতি কেউ কোনদিন কল্পনাই করতে পারে না, আমরা শুধু খাদ্যই না, যে কোন জিনিসকে নষ্ট করাটা পছন্দ করি না। একমাত্র গুরু বা আমরা যাঁদের শ্রদ্ধা করি, ওনারা ইচ্ছাকৃত ভাবেই কিছু খাবার অবশিষ্ট রেখে দেন শিষ্যরা প্রসাদ রূপে গ্রহণ করবে বলে। এর বাইরে আমাদের এখানে অন্ন নষ্ট করা প্রচণ্ড নিন্দনীয়।

স্বামীজী এখানে বলছেন, ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ, যিনি ব্রহ্ম তিনিই শক্তি। সেই শক্তি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন রূপে রয়েছে, আমরা যে নানা রকম এনার্জির কথা বলি, নানা রকম ফোর্সের কথা বলি, এই ফোর্স সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ব্যপ্ত হয়ে আছে। কিন্তু ওই এনার্জিকে আমরা সরাসরি নিতে পারি না। সেই ফোর্স, যে ফোর্স সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রবাহিত হচ্ছে, সেই এনার্জি কিভাবে ঘনীভূত হয়ে পদার্থ হয়ে সূর্য হয়ে আছে, সেই সোলার সিস্টেম এই পৃথিবীকে চালাচ্ছে। পৃথিবীতে যা কিছু আছে, যা কিছু এনার্জি আছে, তার পুরোটাই সূর্যের শক্তি থেকে আসছে। পৃথিবীর বুকে বাতাস চলছে, সূর্যের জন্য, পৃথিবীর অভ্যন্তরে জলের ভিতর যা কিছু হচ্ছে, সব সূর্যের জন্য হচ্ছে। আর গাছপালা, ক্ষেতে যত চাষবাশ হচ্ছে, সব জায়গায় সূর্যের রশ্মি দিয়ে সেখানে ফটো সিন্থেসিস হচ্ছে বলে আমরা বেঁচে আছি। কিন্তু আমরা সরাসরি সূর্যের শক্তিকে কাজে লাগাতে পারি না। এই ব্রহ্মাণ্ডের যেখানে যত রকম শক্তি আছে, শেষমেশ সেটা হলে ব্রহ্মের অভেদ শক্তি। সেই শক্তি বিভিন্ন রূপে আসে, আর ব্রহ্মের সেই অভেদ শক্তি যখন আমাদের কাছে আসে তখন অন্য রূপে আসে। ব্রহ্মের সেই অভেদ

শক্তিই অন্ন রূপে individualized হয়ে আমাদের কাছে আসছে। আমরা যে সব সময় আমি আমি করছি, এই আমি আমি করছি একমাত্র অন্নকে নিয়ে। এখনও পর্যন্ত যেভাবে মানবজাতি চলছে, মানবজাতির আমি আমি যে চলছে, এটা চলছে শুধু অন্নের জোরে। এই অন্নই শেষমেশ হল সেই পরমাত্মার শক্তি।

আমরা সবাই অপরের শক্তিতে চলছি। অনেক সময় বিদ্রুপ করে বলা হয়, এখনও বাপের পয়সায়, বাপের হোটেলে খাচ্ছ, তোমার তো কোন হুঁশ নেই। যাঁদের অনুগ্রহে আমরা খাওয়া-দাওয়া করছি, তাঁদের স্তুতি করতে হয়। আগেকার দিনে রাজা প্রজাদের খাওয়াতো, তারাও রাজার স্তুতি করত। এখনও কোন পার্টিতে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করলে একটা থ্যাঙ্ক ইউ বলতে হয়। এখানেও আমরা যে অন্ন খাচ্ছি, আমরা মনে করছি আমরা খেটেখুটে এই অন্ন অর্জন করেছি, কিন্তু আমরা ভুলে যাচ্ছি যে এই অন্ন এসেছে সেই ঈশ্বরের কাছ থেকেই। এক একটা ট্যাবলেট, ক্যাপসুল যেমন প্যাকেজড্ হয়ে আমাদের কাছে ওষুধ হয়ে আসে, ঠিক তেমনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে শক্তি ব্যপ্ত হয়ে আছে, সেই শক্তিই প্যাকেজড্ হয়ে চালের দানা, গমের দানা হয়ে আমাদের কাছে আসে। ডাক্তার যেমন বলে দেন, এটা জল দিয়ে খাবে, এটা এমনি খাবে, এটা খালি পেটে খাবে, এটা খাওয়ার পর খাবে, ঠিক তেমনি কোন জিনিসকে আমরা কাঁচা খাই, কোন জিনিসকে সিদ্ধ করে খাই, তখন ওই খাদ্যটা আমাদের শরীরের উপযোগী হয়ে যায়। এরপরেও আমরা যদি আমাদের জীবনকে কাজে না লাগাই, জীবনকে যদি ধন্য না করি, যদি আমরা মহৎ না হই, এর থেকে দুর্ভাগ্য আর কি হবে। স্বামীজী পিকনিকে গিয়ে আনন্দ স্ফুর্তির মধ্যেও তাঁর শিষ্যদের মধ্যে এই উচ্চ ভাব নিয়ে আসছেন।

<u>২৯শে জুন, শনিবার</u>

২৮শে জুন পুরো দিনটাই পিকনেকে চলে গেছে। পরের দিন ২৯শে জুন স্বামীজী গীতা হাতে ক্লাশে প্রবেশ করেছেন। গীতার সাতশটি শ্লোকের মধ্যে ভারতের বৈদিক ধর্মের সারকে রেখে দেওয়া হয়েছে। বৈদিক ধর্মের সার যখন বলা হয়, তখন বুঝতে হবে যে বৈদিক ধর্মের সার কোন একজনের ঋষি থেকে আসে না, বৈদিক ধর্ম কোন একজন ঋষির লেখা গ্রন্থ না। একজন ঋষির গ্রন্থ হলে একটি মনের চিন্তা-ভাবনাই সেখানে প্রতিফলিত থাকত। যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা, একটি মনের রচনা, সেই রচনা থেকে আমরা রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব, তাঁর চিন্তা-ভাবনা কোন স্তরের তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হচ্ছিল, আমরা ধরতে পারব। তেমনি ঠাকুর, একটা wave length থেকে মুভ করছেন, স্বামীজী একটা wave length থেকে মুভ করছেন। কিন্তু যেখানে একাধিক লোকের অবদান এসে যায়, তখন সেখানে দশজনের অবদান আলাদা হয়ে যায়। বেদ হল ভারতের ঋষিদের রেকর্ডিং। ফলে আমরা যদি বলি বেদের এই একটা সত্য, তাহলে সেটা বলা ভুল হবে এই কারণে, যদি একজনের রচিত হত তাহলে বলা যেতে পারত। কোন লেখক বা কবির জীবনের একটা নিজস্ব দর্শন থাকে, সেই দর্শনকে কেন্দ্র করেই তাঁরা কবিতা, উপন্যাস রচনা করেন, সেই থেকে অনেক সময় আমরা বলি, অমুকের দর্শন এই এই। কিন্তু বেদের দর্শন এভাবে হতে পারে না, কারণ বেদ কোন একজন ঋষির দ্বারা সমৃদ্ধ হয়নি। ফলে যাঁরা উপনিষদের মাধ্যমে বেদের ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁদের সবারই মত আলাদা। মত আলাদা হতেই হবে, শঙ্করাচার্যের এক রকম মত, রামানুজমের আরেকটা মত, মাধ্বাচার্যের আবার অন্য মত। সেই বেদকে ঘনীভূত করে গীতাতে নামানো হয়েছে, তাই সমস্যা আরও গভীর হয়ে যাওয়ার কথা। যে কোন জিনিসকে যখন ঘনীভূত করে বলা হয়, তখন সেটাকে ব্যাখ্যা করতে হয়। তাই প্রথমে গীতাকে ব্যাখ্যা করতে হবে, গীতার মূল জায়গায় নিয়ে যেতে হবে, আর সেখান থেকে বার করতে হবে এর অর্থ কি।

যার ফলে দেখা যায়, গীতার উপর এত রকমের ভাষ্য রচিত হয়েছে যে, কল্পনাই করা যায় না। আর সেই ভাষ্যগুলি এক অপরের থেকে এতটাই আলাদা যে দেখে মনে হবে যেন মারামারি করছে। আচার্য শঙ্করের যে গীতার ভাষ্য আছে, সেই ভাষ্যের উপর আবার একটা ভাষ্য আছে। আর সেই ভাষ্যের ভাষ্য দেওয়ার জন্য তার উপর আরেকটা ভাষ্য রয়েছে। গীতাতে যে কত ভাষ্য আছে, ভগবানই জানেন, হাজার হাজার রকম ভাষ্য আছে, হাজার হাজার ব্যাখ্যা আছে। আবার এক এক ভাষ্যেরর এক একটা নাম, কেউ বলে ভাষ্য, কেউ বলে টীকা, কেউ বলে গূঢ়ার্থদীপিকা। যাঁরা ভক্তিমার্গের তাঁদেরও আবার নিজস্ব একটা আলাদা গীতার ব্যাখ্যা আছে।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের রূপকাত্মক ব্যাখ্যা

স্বামীজী থাকাকালীনই মায়াবতীতে অদ্বৈত আশ্রম স্থাপিত হয়, কলকাতায় আরও পরে হয়। মায়াবতী আশ্রমে স্বামীজীর সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী স্বরূপানন্দ গীতার অনুবাদ করছিলেন, অনুবাদ করার সময় তিনি স্বামীজীর কাছে কিছু কিছু ব্যাপারে মতামত চাইতেন। স্বামীজী সেখানে তাঁকে খুব স্পষ্ট ভাবে বলছেন, 'আমরা হলাম আচার্য শঙ্করের অনুগামী, শঙ্করাচার্য যা যা বলেছেন সেটাই আমাদের মত'। সেইজন্য এখনও আমাদের যা কিছু করা হয়, লেখালেখি করা হয়, আমরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শঙ্করাচার্যের মতকেই অনুসরণ করি। কিন্তু যাঁরা ব্যাখ্যা করেন তাঁরা নিজেদের মন বুদ্ধিকে লাগিয়ে এক রকম ব্যাখ্যা করে দিতে পারেন। মহাভারতের যুদ্ধ, যেখানে গীতার উপদেশ দেওয়া হয়েছে, এই যুদ্ধকে অনেক সময় ব্যাখ্যা করে বলা হয়, পঞ্চ পাণ্ডব হল আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয়, কৌরবরা হল ইন্দ্রিয়ের বিষয়বস্তু, যেটাকে জগৎ বলছে, এর মধ্যে আমাদের জীবন চালিয়ে যেতে হবে। মহাভারতের কৌরব-পাণ্ডবদের যুদ্ধ যেন আমাদের নিজের জীবনের সংগ্রাম। স্বামীজী এখানে গীতাকে এই ভাব দিয়েই ব্যাখ্যা করেছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর শিষ্যদের মনে একটা ধারণা তৈরী করার জন্য এভাবে বলছেন।

যে কোন ঘটনা বা কাহিনী যদি লেখা হয় বা বর্ণনা করা হয় তখন সেটাকে যে কেউ নিজের মত করে সাজিয়ে বলে দিতে পারে। ভাগবতের যখন ব্যাখ্যা করা হয়, বিশেষ করে ভাগবতের দশম স্কন্ধের এক একটা শ্লোকের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভাগবত পণ্ডিতরা ভক্তিরসে রসিয়ে শ্রোতাদের সামনে এমন এমন সব ব্যাখ্যা করেন যে, আর একটার পর একটা ব্যাখ্যা করতেই থাকেন, একটা শ্লোকের যে কত রকম ব্যাখ্যা হতে পারে কল্পনাই করা যাবে না। যে শ্লোকের কোন ব্যাখ্যা হয় না, সেটারও টেনে হিঁচড়ে দশটা ব্যাখ্যা করে দেবেন। এভাবে টেনে হিঁচড়ে অর্থ বার করার কোন মানেই হয় না। এই শ্লোক আছে, এর এই অর্থ, আর এর ভিতরে যাওয়ার কোন দরকার নেই। আমি এই পেন দেখছি, কেউ আমার কাছে জানতে চাইল, এটা কি জিনিস? আমি বলে দিলাম এটা পেন। আমার পাশে একজন কবি বসে আছেন, তিনি তাড়াতাড়ি বলতে শুরু করলেন, এটা পেন নয়, এটা মানুষ, এটা তার দেহ, এটা তার মাথা, এটা তার নাক, এটা তার মুখ। কেউ আবার চাঁদকে দেখছেন ঝলসানো রুটি, কেউ আবার চাঁদকে নিজের প্রেমিকার মুখ দেখছে। চাঁদকে নিয়ে তুমি যাই বলে যাও, চাঁদ চাঁদই। কবিরা কবিতা লিখছেন, লিখুন। কিন্তু সব জিনিসের কোন বিশেষ অর্থ বার করার কোন দরকার হয় না। গ্রামের জমিদার খেতের আল দিয়ে যাচ্ছে, সঙ্গে কয়েকজন মোসায়েব আছে। আল দিয়ে যেতে যেতে জমিদার বাবু পা পিছলে মাটিতে ধরাশায়ী হয়ে গেছেন। বাবু পড়ে গেছে দেখে সবাই হাসবে, বাবু ধড়মড় করে উঠে মোসায়েবদের দিকে ফিরে বলছেন, আমি যে পড়লুম উর একটা মানে আছে। জোর করে সব কিছুতে এইভাবে মানে বার করার দরকার থাকে না। কিন্তু সব কিছুতেই পণ্ডিতরা দশটা মানে বার করে দিচ্ছেন, যেখানে কোন অর্থ নেই সেখানেও অর্থ বার করে দিচ্ছেন। কিন্তু যাঁরা খুব গভীর ভাবে ঈশ্বরের দিকে মন লাগিয়ে রেখেছেন, যেখানে যা কিছু ঘটে তাঁরা সেটাকে নিজের দিকে টেনে নিয়ে আসেন ঈশ্বরের দিকে নিজেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

এখানে একটা সুন্দর একটা ঘটনার কথা বলা যেতে পারে। বেলুড় মঠে সবাইকে দু বছর ব্রহ্মচারী ট্রেনিং সেন্টারে থাকতে হয়। ওই দুটি বছর ব্রহ্মচারীদের জপ, ধ্যান, ক্লাশ, অধ্যয়ন নিয়েই থাকতে হয়, একটা খুব উচ্চমানের জীবনধারা চলে। অনেক আগেকার কথা, তখন খুব লোডশেডিং হত, সেই সময় জেনারেটরও ছিল না। একজন ব্রহ্মচারী আরতিতে যোগদান করেছেন, ওখান থেকে এসে জপ করেছেন। নিয়ম ছিল একটা হলে ট্রেনিং সেন্টারের সব ব্রহ্মচারীরা জপ করবেন। ব্রহ্মচারী মহারাজ জপ করে নিজের ঘরে ঢুকতে যাচ্ছেন তখনই লোডশেডিং হয়ে গেছে। ঘরের ভিতরে হ্যারিকেন রাখা থাকত। উনি ভাবছেন ঘরে ঢুকে দেশলাই হাতড়ে বার করব, তারপর হ্যারিকেন জ্বালাব। ঘরের মেঝেতে একটা দেশলাই কাঠি পড়েছিল, কাঠিতে পা পড়তেই উনি পা স্লিপ করে মেঝেতে পড়ে গেছেন আর ওই দেশলাই কাঠিটা ফুস্ করে জ্বলে উঠেছে। একটু পরেই রাত্রে খাওয়ার সময়। উনি খাওয়ার হলে গিয়ে অন্য ব্রহ্মচারীদের ঘটনাটা বলছেন, এই দেখো এই রকম হয়, ঠাকুর কথামৃতে বলছেন মন যেন ভিজে দেশলাই, যতই ঘষতে থাক কিছুই হবে না, শুকনো দেশলাই হলে দপ্ করে জ্বলে উঠবে, মন যদি কামিনী-কাঞ্চন থেকে দূরে থাকে তখন সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের কথা উদ্দীপন হয়।

ব্রহ্মচারীর কথাটা সবারই মনকে ছুঁয়ে গিয়েছিল। এই যে একটা সুন্দর জীবন-যাপনের মধ্যে রয়েছেন, মনটাও সব সময় ঈশ্বরে আছে, তাই এই রকম একটা সাধারণ ঘটনাকে কোন উচ্চস্তরে নিয়ে যেতে পারে ভাবাই যায় না। আমরা হলে প্রথমেই চেঁচিয়ে উঠতাম, ওরে বাবারে! একি হল! কিন্তু ঠাকুর বলছেন, মূলো খেলে মূলোর ঢেকুর ওঠে। ব্রহ্মচারী সব সময় ঈশ্বরকে নিয়ে আছেন বলে ঈশ্বরের ঢেকুর উঠছে। যাঁদের মন এই রকম একটা ঈশ্বরীয় ভাবের স্তরে উঠে যায়, তাঁরা আর ঐতিহাসিক জিনিসের বর্ণনা, কাব্যিক বর্ণনা, মহাভারত, পুরাণের শ্লোকের অন্য ধরণের অর্থের ব্যাখ্যায় নামবেন না।

শ্রীকৃষ্ণ, পাণ্ডব, কৌরব ও অর্জুন

স্বামীজী এবার গীতার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রথমে বলছেন, Krishna, the 'Lord of souls', talks to Arjuna or Gudakesha, 'lord of sleep'. (*গীতায় 'হৃষীকেশ' অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বা (ইন্দ্রিয়যুক্ত) জীবাত্মা-গণের ঈশ্বর কৃষ্ণ গুড়াকেশকে অর্থাৎ নিদ্রাজয়ী অর্জুনকে উপদেশ দিচ্ছেন।*) শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন, তিনি সমস্ত আত্মার মালিক। অর্জুনের একটা নাম ছিল গুড়াকেশ। The 'field of virtue' (the battlefield) is this world, (*এই সংসারই 'ধর্মক্ষেত্র' কুরুক্ষেত্র।*) স্বামীজী বলছেন, এই জগৎটা হল যুদ্ধভূমি, the five brothers (representing righteousness) fight the hundred other borthers (all that we love and have to contend against), (*পঞ্চপাণ্ডব (অর্থাৎ ধর্ম) শত কৌরবের (আমরা যে-সকল বিষয়ে আসক্ত এবং যাদের সঙ্গে আমাদের সতত বিরোধ তাদের) সঙ্গে যুদ্ধ করছেন।*) ইন্দ্রিয় আর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ, যা কিছু জিনিস আমরা ভালবাসি, অথচ আমাদের নাগালের বাইরে তাই জয় করতে হবে, এটাই যেন কৌরব ভ্রাতারা, আর পঞ্চ পাণ্ডবরা হল ধর্ম, the most heroic brother, Arjuna (the awakened soul), is the general, (*পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর অর্জুন (অর্থাৎ প্রবুদ্ধ জীবাত্মা) সেনাপতি।*) অর্জুন হল জাগ্রত চেতনা, তিনি হলেন এই যুদ্ধের কমাণ্ডার।

ব্রহ্মস্বরূপ ভাবে সব ভাবকে ডুবিয়ে দেওয়া

We have to fight all sense-delights, the things to which we are most attached, to kill them. (*আমাদের সবচেয়ে আসক্তির বস্তু – সমুদয় ইন্দ্রিয়সুখের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে, তাদের মেরে ফেলতে হবে।*) যে জিনিসগুলির প্রতি আমরা আসক্ত, ওই আসক্ত বস্তুগুলিকে আগে মারতে হবে, না মারলে এরা আমাদের এক পা-ও আর এগোতে দেবে না, এই বস্তুগুলোই আমাদের আকর্ষিত করে সংসারে বেঁধে রেখে দেবে। We have to stand alone; we are Brahman, all other ideas must be merged in this one, (*আমাদের নিঃসঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। আমরা ব্রহ্মস্বরূপ, আমাদের আর সমস্ত ভাবকে ঐ ভাবে ডুবিয়ে দিতে হবে।*) আমাদের মনে যাবতীয় যা কিছুর প্রতি আসক্তি আছে, আইডিয়া আছে, সবটাকে ওই একটা আইডিয়ার মধ্যে নামিয়ে নিতে হবে, সেটা হল ব্রহ্ম, কারণ ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নেই। জগতে যাবতীয় যা কিছু দেখছি সব ব্রহ্ম। উপনিষদে খুব সুন্দর একটা মন্ত্র আসে, *অভয়ং সর্ব ভূতানাং মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে*, সমস্ত প্রানীকে আমি অভয় দান করছি, কারণ আমার থেকেই সমস্ত কিছু বেরিয়েছে।

ইদানিং বিভিন্ন ম্যানেজমেন্ট কোর্সে সবাই অহং ব্রহ্মাস্মি বলে শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছে। ম্যানেজমেন্টের ইয়ং ছেলে-মেয়েরা এক হাজার, দু হাজার টাকা ফিজ্ দিয়ে কোর্সে ভর্তি হয়, আর সেখানে স্পীকারদের মধ্যে সন্ন্যাসী থেকে শুরু করে বড় বড় পণ্ডিতরা রয়েছেন। তাঁরা উপনিষদ থেকে, গীতা থেকে এদের লম্বা লম্বা লেকচার দেন, দুর্দান্ত সব লেকচার, ছেলেরাও তিন দিনে অহং ব্রহ্মাস্মি শিখে বেরিয়ে আসছে। অহং ব্রহ্মাস্মি শুনে তুমি যখন চলে আসছ, তখন তার implication কি হবে জানো? আমি যদি ব্রহ্ম হই, তাহলে এই যে জগৎ দেখছি, এই জগৎ আমার ভিতর থেকে বেরিয়েছে, *মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে*। সেইজন্য *অভয়ং সর্ব ভূতানাং*, সবাইকে আমি তাই অভয় দিচ্ছি। তাহলে আত্মঘাতী সন্ত্রাসবাদী যারা আছে, এরা তোমার থেকেই বেরিয়েছে, মানতে রাজী আছ? যত ধর্ষণকারী আছে, যারা মেয়েদের শ্লীলতাহানি করছে, সবাই তোমার থেকে বেরিয়েছে, মানতে রাজী আছ? ওদের মঙ্গল কামনা করার সেই দম আছে? ওদের হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য তুমি একবেলা না খেয়ে উপোস করবে? কারণ এরা আমারই সন্তান, আমার থেকেই বেরিয়েছে, এদের দুষ্কর্মের জন্য

প্রচুর ক্ষতি হচ্ছে, এদের মঙ্গলের জন্য আমি আজকে এক ঘন্টা জপ করব। করতে পারবে? পারবে না। মুখে অহং ব্রহ্মাস্মি বলা যায়, কিন্তু তার implication কত মারাত্মক কঠিন আমরা কল্পনাই করতে পারব না।

আচ্ছা অহং ব্রহ্মাস্মিকে আমরা না হয় ছেড়ে দিলাম, তার বদলে ঈশ্বরকেই নেওয়া যাক। সবাই ঠাকুরের সন্তান। ঠাকুরের সন্তান কারা? যারা ভাল তারাই কি শুধু ঠাকুরের সন্তান? মন্দ লোকগুলো কার সন্তান? যারা আত্মঘাতী সন্ত্রাসবাদী তারা কার সন্তান হবে? রেপিস্ট, স্মাগলার, চোর, গুণ্ডা এরা কার সন্তান হবে? ঠাকুরের সন্তানই হতে হবে, সম্পর্কে তাহলে এরা সবাই তোমার ভাই। নিজের ভাইয়ের মঙ্গলের জন্য তুমি যেমন অনেক কিছু কর, এদের জন্য সেই রকম কিছু করতে পারবে? মুখে খুব ভাল ভাল কথা বলা যায়, কিন্তু অনুশীলন করা যায় না। যার জন্য দীক্ষার সময় বলে দেওয়া হয়, জগতের সবার জন্য মঙ্গল প্রার্থনা করবে। যদি তুমি অদ্বৈতবাদী হও, তাহলে সবাই তোমার থেকে বেরিয়েছে, আর তুমি যদি ভক্তিপথের পথিক হও, তাহলে সবাই তোমার ভাই। কারণ তারও সৃষ্টি সেখান থেকে, যেখান থেকে তোমার সৃষ্টি। মুখে বলা খুব সহজ, কিন্তু জীবনে নামানো যায় না। স্বামীজী বলছেন, আমরা যে নানা রকমের বৈচিত্র দেখছি, বহু দেখছি, ভাল হোক মন্দ হোক, সব কিছু ব্রহ্ম ভাব এনে বহুত্বকে সরিয়ে দিতে হয়। ঈশাবাস্যোপনিষদে বলছেন, মানুষ যখন একত্ব দেখে, অর্থাৎ সব কিছুতে ব্রহ্মকেই দেখছে, তখন তার শোক মোহ হয় না। মুখে এগুলো বলে দেওয়া যায়, ব্রহ্মার্পণং করে খাওয়া শুরু করার পর, বলতে শুরু করি, এটা একটা রান্না হয়েছে, মুখে দেওয়া যাচ্ছে না, এই তরকারিটা আমি খাবো না, আমাকে ওইটা দাও। ব্রহ্ম ভাবকে ধরে রাখা যে কত কঠিন, এটাকে বুঝে উঠতেই অনেক জন্ম কাটাতে হবে। স্বামীজী বলছেন, ব্রহ্ম ছাড়া যা কিছু আছে, সব কিছুকে ওই ব্রহ্ম ভাবে নিয়ে আসতে হয়।

এরপর স্বামীজী গীতার আরম্ভ করতে গিয়ে বলছেন, Krishna did everything but without any attachement. (*শ্রীকৃষ্ণ সব কাজই করেছিলেন, কিন্তু আসক্তিবর্জিত হয়ে।*) ভগবান কৃষ্ণ সব কিছুই করতেন, কিন্তু কোন কিছুতেই ওনার self interest ছিল না, he was in the world, but not of it, (*তিনি সংসারে ছিলেন বটে, কিন্তু কখনই সংসারের হয়ে যাননি।*) খুব নামকরা কথা, ঠাকুর এটাকেই খুব সহজ করে বলছেন, নৌকা জলে থাকে কিন্তু নৌকাতে যেন জল না থাকে। আমরাও এই জগতেই থাকব, কিন্তু জাগতিক ভাব যেন আমাদের ভিতরে প্রবেশ না করে। বলছেন, 'Do all work but without attachement; work for work's sake, never for yourself'. (*সব কাজ কর, কিন্তু অনাসক্ত হও, কাজের জন্যই কাজ কর, কখন নিজের জন্য করবে না।*) আমাকে এই কাজ করতে হবে, করলাম। এখানে আমার মধ্যে কোন self interest নেই। মা তার সন্তানের জন্য কত পরিশ্রম করে সব কাজ করে, সেইজন্য মার কোন কাজেই কোন আসক্তি থাকে না। মা জানে আমাকে এই কাজ করতেই হবে, না করলে আমার শিশু বাঁচবে না। মা যেভাবে নিষ্ঠা নিয়ে সন্তানের সেবা করে, ওই নিষ্ঠাপূর্ণ সেবার একটা সাংঘাতিক উচ্চমানের ফল হয়, ঠিক ওই ভাব নিয়ে জগতের সমস্ত কাজ করলে তার ফলও খুব উচ্চমানের হবে। আমরা মনে করি, আসক্ত যদি না হই তাহলে ফল কি করে হবে, যদি ফলের ইচ্ছা না থাকে তাহলে কর্ম কি করে হবে? কিন্তু গীতাতেই ভগবান বলছেন, *কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন*, কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে কোন তোমার অধিকার নেই, এই ভাব নিয়েই তো মা সন্তানের জন্য সব কাজ করে যাচ্ছে। মা জানে, আমার ফলের কোন ইচ্ছা থাকুক আর নাই থাকুক, আমাকে এই কাজ করতেই হবে সন্তানের স্বার্থে। সন্তানকে খাওয়ানোর দায়ীত্ব আমার, আর যেমন তেমন করে খাওয়ালে চলবে না, যত দূর ভাল করে যত্ন করে খাওয়াবার দরকার, সেইভাবেই খাওয়াবে। নিজের স্বামীকে কোন রকমে কিছু দিয়ে ম্যানেজ করে নিতে পারে, কিন্তু সন্তানের ক্ষেত্রে কক্ষণ তা করবে না। ইদানিং কালে মায়েদের মানসিকতা অন্য দিকে চলে যেতে পারে, কিন্তু কুড়ি পঁচিশ বছর আগে মায়েরা, যাঁরা ওই মূল্যবোধ নিয়ে বড় হয়েছেন, তাঁরা একেবারে সন্তানের প্রতি উৎসর্গিকৃত। আর এখনও বেশির ভাগ মায়েরা, যদিও এক আধটা ব্যতিক্রম দেখা যায়, সন্তানের জন্য নিজের প্রাণ ঢেলে দেয়, সন্তানের ব্যাপারে কোন আপোষ নেই।

নাম-রূপ মাত্রই বন্ধন

Freedom can never be true of name and form. (*নামরূপাত্মক কোন কিছু কখনই মুক্তস্বভাব হতে পারে না।*) আগেও আমরা এর উপর আলোচনা করেছি, যতক্ষণ নাম রূপ থাকবে ততক্ষণ মানুষ মুক্তি পাবে না। It is the clay out of which we (the pots) are made; then it is limited and not free, so that freedom can never be true of the related. One pot can never say 'I am free' as a pot; only as it loses all ideas of form does it become free, এটা একটা খুব important topic. (*মৃত্তিকা-রূপ আত্মা থেকে ঘটাদির মতো আমরা হয়েছি; এ অবস্থায় আত্মা সীমাবদ্ধ –আর মুক্ত নন; আপেক্ষিক সত্তাকে কখনও মুক্ত বলা যেতে পারে না*) যতক্ষণ পাত্রের আইডিয়া আমাদের মনের মধ্যে আছে ততক্ষণ মুক্তি হয় না, এর উপরে আমরা আগেও বিস্তারিত আলোচনা করেছি। (*ঘট যতক্ষণ ঘট থাকে, ততক্ষণ সে কখনই বলতে পারে না, 'আমি মুক্ত'; যখনই সে নাম-রূপকে বিসর্জন দেয়, তখনই মুক্ত হয়।*) যতক্ষণ একটা পাত্র পাত্র রূপে থাকবে, সেই অবস্থায় সে যদি মনে করে আমি মুক্ত, কোন দিন সে মুক্ত হতে পারে না। পাত্র মুক্ত হবে, যদি পাত্র আবার মাটি হয়ে যায়। ঠিক তেমনি, কোন মানুষ যদি বলে আমি মুক্ত, তার মানেই সে বন্ধনে আছে। কারণ 'আমি' বললেই তার মন এসে যাবে, মন এসে যাওয়া মানেই সে বন্ধনে আছে।

জগৎ একটি ঐকতান – একটি সুরে নানান সুরের খেলা

The whole universe is only the Self with variations, the one tune made bearable by variation. (*সমুদয় জগৎটাই আত্মস্বরূপ বহুভাবে অভিব্যক্ত; যেন এক সুরের মধ্যেই নানা রূপ-রং তোলা হয়েছে তা না হলে একঘেয়ে হয়ে পড়ত।*) সেই শুদ্ধ চৈতন্য, সেই শুদ্ধ আত্মারই প্রকাশ হল এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, সেই এক সুর বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র থেকে বিভিন্ন ভাবে বাজছে, sometimes there are discords, but they only make the subsequent harmony more perfect. (*সময়ে সময়ে বেসুরো বাজে বটে, তাতে বরং পরবর্তী সুরের ঐকতান আরও মিষ্ট লাগে।*) অনেক সময় দেখা যায়, অর্কেস্ট্র এক সুরে বাজছে, কখন কখন মনে হয় একটা বেসুরা তান এসে গেল। সুরের মধ্যে এ-রকম বেসুরো হয়ে থাকে। দেবাসুর সংগ্রাম এই বেসুরোকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু তারপরে যে সিমফনি আসে, সেটা আরও সুন্দর হয়। আমরা ইদানিং গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে অনেক কথা শুনতে পাই, বিনাশ হওয়ার থাকলে হবে। কিন্তু এরপর যে প্রজাতি আসবে তারা আরও শ্রেষ্ঠ হবে, কারণ সব কিছু ঈশ্বরেরই সৃষ্টি।

খ্রীশ্চান বা বিজ্ঞানের মত আমরা বলি না যে, একবার সৃষ্টি হয়ে গেছে আর হবে না। আমাদের মত হল, বিনাশ হওয়ার থাকলে হবে; আমরা তখন অন্য কোন লোকে থাকব, অন্য কোন অস্তিত্বের স্তরে থাকব। পৃথিবীতে আগে ডাইনোসারাদিরা ছিল, পরিবেশ তখন তাদের জন্য উপযুক্ত ছিল, এখন ওদের জন্য উপযুক্ত নয়, আমাদের জন্য উপযুক্ত তাই আমরা এখন আছি। যে আত্মা তখন ডাইনোসোরাস ছিল, সেই আত্মাই এখন আমাদের মধ্যে বিরাজ করছে। সেইজন্য ডায়নোসারাসের মত লোভী হয়ে সব কিছু নিজের পেটের মধ্যে ঢোকাচ্ছি। মানুষের এখন ডাইনোসোরাসের মতই পেট, তখন ওরা গাছপালা খাচ্ছিল, তারাই এখন শত শত কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করছে। স্বভাব পাল্টায় না, প্রজাতি পাল্টায়, ওই প্রজাতিতে একই জিনিস অন্য রূপে চলতে থাকে। স্বামীজী বলছেন, In the universal melody three ideas stand out, freedom, strength, and sameness. (*মহান্ বিশ্বসঙ্গীতে তিনটি ভাবের বিশেষ প্রকাশ দেখা যায় – মুক্তি, শক্তি ও সাম্য।*) সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে খুব ভাল করে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, এই তিনটি ভাব বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মহান্ সঙ্গীতে প্রকাশ পাচ্ছে, মুক্তি, শক্তি আর সাম্য। সবাই মুক্তির দিকে এগোচ্ছে, মুক্তির দিকে যাওয়ার জন্য দরকার শক্তি, সেই শক্তি সবারই ভিতরে কাজ করে চলেছে। আর মুক্তি কি হবে? সাম্য।

আর বলছেন, If your freedom hurts other, you are not free there. You must not hurt others. (*যদি তোমার স্বাধীনতা অপরকে ক্ষুণ্ণ করে, তা হলে বুঝবে তুমি স্বাধীন নও; অপরের কোন*

প্রকার ক্ষতি কখনও করো না।) নামকরা একটা কথা আছে, Your freedom to give a blow ends where my nose starts, আমি আমার হাত নাড়তে পারি, কত দূর নাড়তে পারি? তত দূর, যেখানে আমার নাক নেই। এখন বাক্ স্বাধীনতা নিয়ে কত কি হচ্ছে, এখানে ইংরাজী পড়া বুদ্ধিজীবিরা আছে, ওরা যা কিছু বলবে সেটা হয়ে যাবে ওদের freedom of speech, কিন্তু যেমনি ওদের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বলতে যাবে, তখন বলবে তুমি অসহিষ্ণু। অন্য ধর্মের লোকেরা কিছু করলে বলবে, তোমরা সহ্য কর, উল্টে তারা যদি সন্ত্রাস সৃষ্টি করে বিধর্মীদের উপর পাশবিক অত্যাচার করে তখন ওরা চুপ করে থাকবে। অপরকে কষ্ট দেওয়াটা কিসের ফ্রিডম! চারিদিকে ফ্রিডম্ অফ্ স্পীচ নিয়ে এত আলোচনা হচ্ছে, স্বামীজী খুব সহজ ভাবে বলে দিলেন, তোমার ফ্রিডমে যদি অপরের কষ্ট হয় তাহলে, you are not to be free। ওরা বলবে, 'আমার বাক্ স্বাধীনতা আছে আমি আমার কথা বলে যাব'। আসলে তোমরা বুঝতে পারছ না যে, তোমাদের বাক্ স্বাধীনতা নেই, তোমাদের গায়ের জোর আর ক্ষমতা আছে বলে বলছ, ক্ষমতা না থাকলে দু মিনিটে তোমাদের ঠাণ্ডা করে দেওয়া হত।

দুর্বলতাই দুঃখ ও কর্মের উৎস

স্বামীজী মিল্টনের খুব নামকরা কবিতা থেকে বলছেন, 'To be weak is to be miserable' says Milton. Doing and suffering are inseparabely joined. (Often, too, the man who laughs most is the one who suffers most.) "To work you have the right, not to the fruits thereof. (*মিল্টন বলেছেন, 'দুর্বলতাই দুঃখ'। কর্ম ও ফলভোগ – এই দুইটির অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। অনেক সময়ই দেখা যায়, যে বেশী হাসে, তাকে কাঁদতেও হয় বেশী, যত হাসি তত কান্না। 'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন' –কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে নহে।*) মানুষ যখন নিজেকে দুর্বল মনে করে তখনই মানুষ কাজ করে, যে দুর্বল নয় সে কেন কাজ করতে যাবে! আর যে দুর্বল সে দুঃখে আছে, আমরা দুঃখে থাকি, সেইজন্য আমাদের এত কাজ করতে হয়। স্বামীজী ব্যাখ্যা করে বলছেন, অনেক সময় দেখা যায়, যে প্রচুর হাসে, অপরকে হাসায়, বুঝতে হবে ভিতরে তার প্রচুর কান্না আছে। তবে এটা সব ক্ষেত্রে হয় না, স্বামীজী তাই 'often' শব্দ বলছেন, not always। সার্কাসের জোকাররা সবাইকে হাসাতে থাকে, নিজেরাও প্রচুর হাসে, কিন্তু এদের জীবনে যে কত দুঃখ বেদনা আছে, লোকেরা বুঝতেই পারে না। বাইরে থেকে দেখায় এদের কত চাকচিক্য, কিন্তু ভিতরে প্রচুর দুঃখ রয়েছে। একটু আঁচড় দিলে দেখা যাবে, বাইরে থেকে আমরা যা দেখছি, ভিতরে অন্য রকম। এটাই বাস্তব, কিন্তু সব ক্ষেত্রে নয়, অনেক সময় দেখা যায় মানুষ যদি প্রচুর হাসে, বুঝতে হবে ভিতরে প্রচুর দুঃখ জমা আছে। যেখানে ইমোশান থাকবে, বুঝতে হবে জিনিসটা স্বাভাবিক নয়। কেউ যদি এক লাখ টাকার লটারি পায়, সে পাড়া জুড়ে নেচে বেড়াবে, এই দেখ আমি লটারি পেয়েছি। কিন্তু যার কাছে কোটি টাকা আছে, সে কাউকে জানতেও দেবে না, যে তার কাছে এত টাকা আছে। তার কোথাও অভাব আছে বলেই সে এত হাসছে। তবে এটা কোন universal rule নয়, কিন্তু এটা খুব নামকরা কথা, আর বাস্তবিক।

এই বলে বলে স্বামীজী ঘুরিয়ে সেই গীতার কথাতে নিয়ে আসছেন, "To work you have the right, not to the fruits thereof", কাজ কর, ফলের কামনা করবে না। এইজন্যই কাজ কর, এটাই তোমাকে করতে হবে, জীবন আছে, জীবন চলছে, এর জন্য কাজ করতে হবে, ফলের কামনা করে কাজ করছ মানেই তুমি দুর্বল। তোমার দুর্বলতাই তোমাকে ফলের কামনা করাচ্ছে, সেইজন্য তোমার এত দুঃখ-কষ্ট।

শরীর ও মনে চিন্তার প্রভাব

স্বামীজী এবার চিন্তা-ভাবনার জগৎকে নিয়ে আলোচনা করছেন, তার সাথে আমাদের উপর চিন্তার প্রভাবকে নিয়ে বলছেন। স্বামীজী প্রথমে যে কথাটা বলছেন, এই কথা স্বামীজী অনেক জায়গাতেই বলেছেন, Evil thoughts, looked at materially are the disease bacilli. (*জড়বাদের দৃষ্টিতে দেখলে কুচিন্তাগুলিকে রোগবীজাণু বলা যেতে পারে।*) এরপরে বলছেন, Each thought is a little hammer blow on the lump of iron which our bodies are, manufacturing out of it what we

want it to be. (*আমাদের দেহ মন যেন লৌহপিণ্ডের মত আর আমাদের প্রত্যেক চিন্তা যেন তার উপর আস্তে আস্তে হাতুড়ির ঘা মারা –তাই দিয়ে আমরা দেহটাকে যেভাবে ইচ্ছা গঠন করি।*)

স্বামীজী দুটো বাক্যে মানুষের চিন্তা-ভাবনাকে নিয়ে বলছেন। প্রথমটায় বলছেন, আমাদের মনের নোংরা বা বাজে চিন্তাগুলি ভিতরে ভাইরাস ব্যাক্টেরিয়ার মত আমাদের শরীর ও মনকে খারাপ করে দেয়। এটাকেই ব্যাখ্যা করে বলছেন, আমরা যা কিছু চিন্তা-ভাবনা করি, এই চিন্তা-ভাবনাগুলো যেন হাতুড়ির আঘাতের মত আমাদের শরীর ও মনের উপর এসে পড়ে, এই আঘাতই আমাদের সেই অনুসারে দেহ ও মনকে গঠন করে দেয়, অর্থাৎ আমরা যেমনটি হতে চাই। স্বামীজী এই কথা অনেক জায়গায় অনেক বার বলেছেন, এতবার বলেছেন যে, স্বামীজীর জীবন-দর্শনের দিকে যদি আলোকপাত করা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে, স্বামীজী সব সময় শুভ চিন্তা, ভাল চিন্তার উপর খুব জোর দিতেন। এমনকি স্বামীজী বাচ্চাদেরও কোন ধরণের নেতিবাচক কথা বলতে নিষেধ করছেন; সব সময় তাদের বলতে হয়, তুমি পারবে, তুমি খুব ভাল। নেতিবাচক কথা শুধু বাচ্চাদেরই নয়, কাউকেই বলতে নেই। নেতিবাচক কথা বলা যার স্বভাবে, তার উপরেও এই ধরণের নেতিবাচক কথা প্রভাব ফেলতে দেখা যায়। মানুষ যেমনটি চিন্তা-ভাবনা, এই চিন্তা-ভাবনাই তেমনটি তার শরীর তৈরী করে দেয়। স্বামীজী এর উপর প্রচুর জোর দিতেন। স্বামীজীর রচনাবলী পড়লে আমাদের মনে হবে, এটা যেন স্বামীজীর একটা মৌলিক চিন্তা। ভক্ত সম্মেলনে বা যুব উৎসবাদিতে সব বক্তারাই স্বামীজীর এই ধরণের চিন্তা-ভাবনার উপর জোর দেন। যদিও আপাত দৃষ্টিতে এটাকে স্বামীজীর জীবন-দর্শন বলে মনে হয়, কিন্তু সেভাবে কিছু না।

জীবন দর্শন থেকেও যেটা গুরুত্বপূর্ণ, তা হল, আমাদের হিন্দু ধর্মে সৃষ্টির যে বর্ণনাদি পাওয়া যায়, সেখানেই এই জিনিসটা পাওয়া যাবে। মজার ব্যাপার হয়, আমাদের যত ধর্মগ্রন্থ আছে তার থেকে যদি আমরা উপনিষদ নিই, উপনিষদের সাথে গীতাকেও নেওয়া যেতে পারে, যেহেতু গীতা উপনিষদের সার এবং এর পাশাপাশি আচার্য শঙ্করের এই দুটোর উপর যে ভাষ্য আছে তাকেও যদি এই দুটো গ্রন্থের অর্থের ব্যাখ্যা বোঝার জন্য নেওয়া হয়, আর যদি নাও নেওয়া হয়, শুধু এই দুটো তিনটে জিনিসকে যদি বোঝার চেষ্টা করে বুঝে নেওয়া যায় – উপনিষদ ও গীতার ভাব, আমি কে, আমি কোথা থেকে এসেছি, কিভাবে এসেছি, কেন এসেছি; তাহলে স্বামীজীর রচনাবলী আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

আরও মজার ব্যাপার হল, উপনিষদের যে একটা ব্যবহারিক দিক আছে, স্বামীজী আসার আগে ভারতবর্ষ কোন দিন জানত না। বেলুড় মঠে ঠাকুরের মন্দির আছে, সেখানে ঠাকুর আছেন, এর বাইরে বিভিন্ন জায়গায়, শ্রীরামের মন্দির আছে, শ্রীকৃষ্ণের মন্দির আছে, বিভিন্ন অবতার পুরুষদের মন্দির আছে, আমরা নিজেদের সুবিধা মত সেখানে যাই, মন্দিরে বিগ্রহের দর্শন করি, তার সাথে আমরা যে ইষ্ট মন্ত্র পেয়েছি, তা সে যিনিই ইষ্ট হন, শিব, কালী, দূর্গা, কৃষ্ণ, রাম, রামকৃষ্ণ, সেই মন্ত্র জপ করি, আর ভাবছি, ভগবান আছেন, তিনি দেখবেন, তিনি কৃপা করবেন, এই ভাবে আমরা একটা জীবন-দর্শন বানিয়ে নিই। কিন্তু এই জিনিসকে যে দৈনন্দিন জীবনে নামানো যেতে পারে, এবং তার ফলশ্রুতিতে যে আমাদের জীবন-ধারা পুরো পাল্টে যাবে, এই জিনিসটাকে আমরা কখনই বোঝার চেষ্টা করি না। স্বামীজীর 'কলম্বো থেকে আলমোড়া'র লেকচার গুলো যদি পড়া হয়, দেখা যাবে স্বামীজীও সেখানে যখন উপনিষদের সত্যগুলিকে কিভাবে ব্যবহারিক প্রয়োগ করা যায়, দৈনন্দিন জীবনে কিভাবে নামানো যেতে পারে, এই নিয়ে বলছেন তখনও তিনি ঠিক এই ভাবটা নিয়ে আসছেন। ঋষি মুনিরা উপনিষদকে যে স্তরে নিয়ে গেছেন, সেটা দেখে মনে হয় না যে উপনিষদের ঋষি মুনিদের পর ভারতবর্ষে সেই রকম কেউ হয়েছেন। এরপর কোন নেতা বা কোন বিশেষ ব্যক্তি ধর্ম সম্বন্ধে যখন কিছু বলেন, আর তার পিছনে যেসব যুক্তি দেন, দেখে আমাদের অবাক লাগে। একজন বিজ্ঞানী যখন কোন নূতন কথা বলেন, তিনি তাঁর পূর্বসুরীদের অনেক কথাকেই উল্টে দেন, কিন্তু উল্টে দেওয়ার আগে পর্যন্ত সেটাই তো সত্য ছিল। সেটাকে নিয়েই এতদিন সবাই দিব্যি খেত। আমরা যাঁকে এতদিন একজন লব্ধ বিজ্ঞানী বলে মনে কর এসেছি, যাঁদের মনে করতাম সত্যের বাহক, তাঁদের থিয়োরীকেই আরেকজন বিজ্ঞানী এসে নস্যাৎ করে দিয়ে বলে দিলেন, এগুলো সব ভুল, আমার এই থিয়োরীই ঠিক।

নিউটন নিজের সব ফিজিক্সের থিয়োরীগুলি দেওয়ার পর সবাই বলতে শুরু করল, God is a great watchmaker। আগেকার দিনের ওয়াচমেকাররা ঘড়িগুলোর মেশিনগুলোকে একটা পজিশানে বানাতো, সেখানে থেকে সব জায়গায়, সব কিছুকে কার্য-কারণ দিয়ে ব্যাখ্যা করে দিচ্ছে। আইনস্টাইন এসে দেখালেন জিনিসটা তা নয়, আর কোয়ন্টাম ফিজিক্স আসার পর সব কিছুই এখন বাতিল হয়ে গেছে। তাহলে নিউটন থেকে আইনস্টাইন পর্যন্ত দুশ তিনশ বছর পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা বড় বড় কথা বলে যাচ্ছিলেন, সবাইকে শিক্ষা দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন, ধর্মকে উড়িয়ে দিচ্ছেলেন, সেটা আজ কি হল?

আচার্য শঙ্কর ভাষ্য রচনা করার সময় আগে থেকেই জানতেন যে, এই ভাষ্য পড়ার সময় পাঠকের মনে কি কি প্রশ্ন উঠতে পারে। আচার্য সেই প্রশ্নকে ভাষ্যের মধ্যে উত্থাপন করে তার উত্তরটাও দিয়ে দেন। ঠিক সেই রকম আত্মার ব্যাপারে একটা প্রশ্ন হল, আপনি তো বলছেন আত্মা সর্বব্যাপী ইত্যাদি, কিন্তু বেদের অনেক পণ্ডিতরা তো অন্য রকম ব্যাখ্যা করেন। আচার্য শঙ্কর এবার এই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন, তুমি যাদের বেদের পণ্ডিত বলে মনে করছ, তাদের পাণ্ডিত্য এতটুকু। বলার পর তিনি আবার দেখিয়ে দিচ্ছেন তাঁরা কি ধরণের ভুলভাল ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। তখন তিনি বলছেন, সম্প্রদায় বিদ্যায় ঠিক ঠিক গুরুর কাছে ঠিক ঠিক জ্ঞান যদি না হয়ে থাকে, বেদের সমস্ত জ্ঞান থাকলেও তাকে মুর্খের মত দেখবে। ইদানিং আমরা যাদের পণ্ডিত মনে করি, তা তিনি বিজ্ঞানেরই পণ্ডিত হন আর ইতিহাসেরই পণ্ডিত হন, কি-সব উদ্ভট জিনিস নিয়ে যে বিতর্ক করছেন, দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়।

এদের একদল খুব চরমে আছে, যাদের আমরা ফ্যানাটিক বলছি, অন্য দিকে রয়েছে লিবারালস। কিন্তু লিবারেলদের মত গোঁড়া বিশ্বে আর কেউ হয়নি। ফরাসী বিপ্লবের সময় একজনের পর একজনের মুণ্ডু কাটা যাচ্ছে, সেই সময় সেখানে এক খুব বিদুষী মহিলা ছিলেন, তাঁরও মুণ্ডু কাটা যাবে। তিনি মাথার উপর কাপড় পরতেন না, তাই সরাসরি তাঁকে গিলোটিনে যেতে হবে। মৃত্যুর আগে তিনি খুব নামকরা একটা কথা বললেন, ‘কিসের জন্য আমার মুণ্ডু কাটা হতে যাচ্ছে? লিবার্টির জন্য’। লিবার্টির নামে কত অসহায় লোকের মুণ্ড কাটা গেছে। লিবার্টি, ফ্যাকাল্ট, এগুলো ফ্রান্সের নামকরা কথা, আর আমাদের ইংরাজী পড়া লোকেরা সব লিবারাল হয়ে গেছে। ভারতে এত এত পণ্ডিত, জ্ঞানী লোকেরা এসেছেন, কেউ এই সামান্য কথাটা বলতে পারলেন না যে, উপনিষদের ঋষিরা উপনিষদে যে অমূল্য জিনিস দিয়ে গেছেন, এই অমূল্য জিনিসকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নামানো যেতে পারে এবং আমাদের জীবন-ধারা পুরো পাল্টে দেওয়া যেতে পারে।

উপনিষদে কি আর আছে, আত্মা আর ব্রহ্মের ঐক্যের কথাই বলছে, সে পরে দেখা যাবে, তার আগে কেদারনাথ, বদ্রীনাথে শিবের দর্শন করে আসা যাক। ফিজিক্সের যে নূতন নূতন নিয়ম বার করা হয়, পরে তার থেকে প্রচুর implications বেরিয়ে আসে। রিসার্চ মানেই তাই, আরও নূতন নূতন কি হতে পারে অনুসন্ধান করে যাওয়া। আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য, দৈনন্দিন জীবনে উপনিষদের কি কি implications হতে পারে, এটাকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা স্বামীজী আসার আগে কেউ করেননি। দর্শনের ক্ষেত্রে তাঁরা ষড়দর্শন দিয়ে গেছেন ঠিকই, কিন্তু সেটাও দৈনন্দিন জীবনে আসেনি। যাঁরা বলছেন শ্রীকৃষ্ণই ভগবান, রামাইত সাধুরা বলছেন রামই ভগবান, তাঁরা কিন্তু কেউ বলছেন না, আসলে ভগবান বলতে তাঁরা কি বোঝাতে চাইছেন। হিন্দুদের মূল দর্শন বেদান্ত কি বলতে চাইছে? ভগবান মানে সচ্চিদানন্দ, এটা বেদ উপনিষদের কথা, এই কথাকে নাকচ করার উপায় নেই। তাহলে সেই সচ্চিদানন্দ থেকে সৃষ্টি কিভাবে হয়? খুব সহজ করে একটা বলে দেওয়া হয়, তিনি ইচ্ছা করলেন সৃষ্টি হয়ে গেল। এটা কিন্তু কোন উত্তর নয়, উত্তর দেওয়ার সময় আরও একটা দুটো ধাপ আনতে হবে।

আমাদের সাংখ্য দর্শন তখন একটা দুটো করে ধাপে ধাপে সৃষ্টিকে বর্ণনা করেন। সাংখ্য দর্শন সৃষ্টি তত্ত্বের যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, সেই সিদ্ধান্ত পরে শক্তি মতে এসেছে, তন্ত্র মতে এসেছে, আর বেদান্তও সেই সিদ্ধান্তকে নিয়েছেন। যিনি সচ্চিদানন্দ তিনি আনন্দস্বরূপ, তিনি আবার চৈতন্যস্বরূপ, এতে আবার এনারা তিনটে শক্তি নিয়ে আসছেন, জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি আর ক্রিয়াশক্তি। যেমনি তিনি ইচ্ছা করলেন সৃষ্টি হোক, তখন তাঁর ক্রিয়াশক্তি দিয়ে সৃষ্টি হয়ে যায়। কিন্তু হিন্দুদের যে মূল দর্শন, তাতে ওনারা বলছেন, সচ্চিদানন্দ যেমনি ইচ্ছা করলেন সৃষ্টি হোক, তখন যেন শক্তির একটা আবরণ এসে যায়। বেদান্তীরা তাকে বলে অজ্ঞান

আবরণ, শাক্ত মতে বলে শক্তির আবরণ, যারা ভক্ত তারা বলে তাঁর লীলা। সেখান থেকে তখন বেরিয়ে আসে সত্ত্ব, রজো আর তমো তিনটে বিশুদ্ধ গুণ, এবার এই তিনটে গুণের খেলা শুরু হয়ে যায়। যিনি শুদ্ধ চৈতন্য, তিনি এবার দেখান বিশুদ্ধ মন রূপে। মন বলতে আমরা বুঝি, যেটা দিয়ে আমরা চিন্তা-ভাবনা করতে পারি। ঠাকুর যখন কোশাকুশিকে চৈতন্য দেখছেন, এই চৈতন্যের অর্থ হল, সেই চৈতন্য অজ্ঞান আবরণের ভিতর দিয়ে যখন আসে, তখন সেটাকে বলছেন বৈষয়িক মন, এই বৈষয়িক মনের সমস্ত ক্ষমতা আছে। তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করতে পারেন, নানান রকমের জীবজন্তু সৃষ্টি করতে পারেন, তিনি যে কোন জিনিস করতে পারেন। কারণ তাঁর মধ্যে রয়েছে সমস্ত শক্তি। সেই শক্তিকেই আমরা অনেক সময় ব্রহ্মা বলছি, অনেক সময় ঈশ্বর বলছি, বিভিন্ন নামে বলছি। কিন্তু মূল হল যিনি নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম, যিনি শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ, শুদ্ধ চৈতন্য, তাঁর উপর যেন শক্তির একটা আবরণ এসে গেছে। এই আবরণ বাস্তবিক কিছু না, কিন্তু আবরণের মত মনে হয়। যোগীরা ধ্যান করে এই ঈশ্বরকেই দেখেন। তার আগে কোন যোগীও নেই, কোন ঈশ্বরও নেই, আছেন সেই সর্বব্যাপী শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ। এগুলো ধারণা করা সত্যিই খুব কঠিন, তবে ঠাকুর বলছেন শুনে রাখা ভাল, সময় না হলে কিছু হয় না। শুনতে শুনতে মনের উপর একটা সংস্কার পড়ে।

এই বৈষয়িক মন থেকে ধাপে ধাপে নামতে শুরু হয়, প্রথমে আসে আমিত্ব, আমি ভাব, আমি আছি। আমিত্বের ভাব সেই ঈশ্বরের মধ্যে প্রথম আসে। সেখান থেকে আরেক ধাপ নামার পর বৈচিত্রের সমারোহ হতে শুরু হয়ে যায়। তার মধ্যে প্রাণ, অপান, উদান, ব্যান ও সমান এই পাঁচটি প্রাণ আসে। এই পাঁচটি প্রাণ প্রাণীর শরীরের মধ্যে খেলা করে, একত্রে বলা হয় পঞ্চপ্রাণ। পঞ্চপ্রাণের সাথে আসে দশটি ইন্দ্রিয়, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় আর পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় আর তার সাথে থাকে মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার। এই মন ব্যষ্টি মন, আমি আছি আর আমার মন আছে। কিন্তু সমষ্টি মন, যাকে মহৎ বলা হয়, সৃষ্টির পরেই যেটা আসে, এই সমষ্টি মন আর ব্যষ্টি মনের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। তফাৎ শুধু, বৈষয়িক মন সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাথে নিজেকে জুড়ে রাখে, ব্যষ্টি মন শুধু একটা বিশেষ শরীরকে জুড়ে থাকে। যেমন আমার মন আমার শরীরের সাথে জুড়ে আছে। ফলে ব্যষ্টি মন যে শরীরের সাথে জুড়ে আছে, সেই মন সেই একটি শরীরকে দিয়েই কাজ করবে।

আমি যদি কারুর মনের সাথে খুব গভীর ভাবে জুড়ে যাই, তাহলে আমার মন তার শরীরকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। হয়ত আমাদের বিশ্বাস হবে না, কিন্তু এটাই সত্য। গুরু যদি শিষ্যের সাথে এক হয়ে যান, তখন গুরুর শুভ চিন্তা দিয়ে শিষ্যের শরীর সঞ্চালন হবে। কোন মা যদি নিজের সন্তানকে সত্যিকারের খুব ভালবাসে, তাহলে সেই মা নিজের শুভ চিন্তা দিয়ে সন্তানের শরীরের রক্ষা করতে পারে, সেই মা তার সন্তানের মনকেও নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে পারে। বোকারা কারুর দু পয়সার প্রেমে মুগ্ধ হয়ে নিজের মনকে আরেকজনকে দিয়ে দেয়, তখন সে তার দ্বারা সঞ্চালিত হয়। সঞ্চালিত হবেই, কারণ বৈষয়িক মন আর সমষ্টি মনে কোন তফাৎ নেই, শুধু শরীরের তফাৎ। ব্যষ্টি মন একটা শরীরের সাথে, সমষ্টি মন সমস্ত শরীরের সাথে জুড়ে আছে।

পাঁচটি প্রাণ, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় তার সাথে মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, এই সব কটিকে মিলিয়ে বলে সূক্ষ্ম শরীর বা জীবাত্মা, আমি বলতে এটাই। এই সূক্ষ্ম শরীর যেমন যেমন দরকার হবে, তেমন তেমন সে শরীর ধারণ করে নেবে। সমস্ত প্রাণীর শরীরের পিছনে এক জীবাত্মা আছেন। এই জীবাত্মা পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় ও পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়ে কাজ করে। এই কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে চালাবার জন্য দরকার পড়ে পাঁচটি প্রাণশক্তি, যাকে আমরা পঞ্চপ্রাণ বলছি, আর মন। প্রাণ মূলতঃ একই শক্তি, ওই শক্তিকে আমরা পাঁচ ভাবে দেখি। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, ইন্দ্রিয়, মন আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সমষ্টি যে শক্তি রয়েছে, সেই শক্তি আমার শরীরে যে পদ্ধতিতে কাজ করে, সেটাকে বলছি প্রাণ। যেমন সূর্যের শক্তিতে সব কিছুই চলে। গাছপালা সরাসরি সূর্যের আলো থেকেই তার খাদ্য সংগ্রহ করে নিতে পারে, আমরা তা পারি না, আমাদের অন্য ভাবে নিতে হয়, এটাকে বলছেন প্রাণ।

কিন্তু পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চপ্রাণ, সব কটির রাজা হল মন। আসলে জীবাত্মার পিছনেই রয়েছে সেই শুদ্ধ চৈতন্য, কিন্তু শুদ্ধ চৈতন্য কোন কিছুতেই নিজেকে জড়ান না, শেষমেশ মনই জড়ায়। মন হল, যার চিন্তা শক্তি আছে, চিন্তন করতে পারে। তার সাথে কোন কথা যখন আমরা শুনছি, কোন জিনিস যখন আমরা দেখছি, যখন কোন জিনিস খাচ্ছি বা কিছু করছি, সব জিনিসগুলো গিয়ে মনের উপর একটা ছাপ ছেড়ে

দেয়। মনে যেমন যেমন ছাপ পড়ে, মন সেই অনুসারে শরীরকে তৈরী করে। গ্রামের একটি ছেলে, স্বভাবে সে হাবাগোবা, লাজুক প্রকৃতির। কিন্তু কিভাবে কিভাবে সে মিলিটারিতে জয়েন করে নিল। মিলিটারিতে সে এবার নানা রকম ট্রেনিং নিতে শুরু করল। মিলিটারিতে এমন সব ট্রেনিং দেওয়া হয় যে তার মৃত্যু ভয়টাই চলে যায়, শত্রু পক্ষ গুলি চালালে সে নির্বিকার চিত্তে সেই অবস্থাতেও শত্রু পক্ষের সৈন্যদের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে যুদ্ধ করতে থাকবে। গ্রামের যে ছেলেটি সবাইকে ভয় পেত, শরীর মন ছিল সম্পূর্ণ অনিয়ন্ত্রিত, সেই ছেলেই ট্রেনিং নিয়ে নিয়ে তার মন পাল্টে গেল। সেই মনই এখন তার শরীরকে নিয়ন্ত্রিত করছে, শরীর দিয়ে মনকে নিয়ন্ত্রিত করছে।

হিন্দুরা যেভাবে জীবনকে দেখে, হিন্দু ধর্মের চেতনার মূল কেন্দ্রকে যদি দেখা হয়, তখন দেখা যাবে মনটাই আমি, আমি বলতে মন। শরীর আমাদের কাছে কিছু না, আমার মন যেমন, শরীরকে মন তেমন বানিয়ে নেয়। আর মৃত্যুর পর যখন অন্য লোকে যায় তখনও মন যেমনটি থাকে, সেই অনুসারে তেমনটি শরীর নিয়েই যায়। কঠোপনিষদে যেমন বলছেন, *যথাকর্ম যথাশ্রুতম্*, যেমনটি তার কর্ম, চিন্তা-ভাবনা করে তার যেমনটি জ্ঞান হয়েছে, সে তেমন যোনিতেই যায়। কর্মের মধ্যে শুভ কর্ম আছে, অশুভ কর্মও আছে, শুভ অশুভ সব কর্মের যে ছাপ সেই ছাপ মনেই পড়ে, সেই মন নিজের মত শরীর গ্রহণ করে আর শরীরটাকে নিজের মত বানিয়ে নেয়। যদি এই ব্যাপারটা আমাদের বিশ্বাস না হয়, তাহলে মাত্র দশদিন আমরা এর একটা পরীক্ষা করে দেখে নিতে পারি। দশদিন যদি শুদ্ধ আহার গ্রহণ করা হয়, একেবারে বিধবাদের মত নিরামিষ খাবার, মাছ খেলেও সাধারণ ঝোলের মত খাওয়া যেতে পারে, যাতে কোন মশলা, ঝাল কিছু থাকবে না, আর দুবেলা ঈশ্বরের নাম করতে হবে, ভাল বই পড়া, টিভি দেখা, সিনেমা দেখা বন্ধ থাকবে, ভক্তিগীতি ছাড়া অন্য কোন ধরণের জাগতিক গান শোনা বা গাওয়া বন্ধ রাখতে হবে, দশ পনের দিনের মধ্যে দেখা যাবে তার চেহারাটাই অন্য রকম হয়ে গেছে। একটা কুমারী মেয়েকে বিবাহের আগে দেখতে এক রকম লাগে, বিবাহের পর তার পুরো চেহারাটাই অন্য রকম হয়ে যায়। চেহারা দেখলেই বোঝা যায় যে, তার মনের উপর একটা অন্য ধরণের ছাপ পড়েছে। আবার সেই মেয়েই যখন মা হয়ে যায়, তখন আবার তার চেহারাটা পাল্টে যায়। কারণ তখন তার মনের মধ্যে সদ্যোজাত সন্তানের প্রতি একটা আলাদা ভালবাসা এসে যায়। সেখানে তার ব্যক্তিত্ব সম্প্রসারিত হয়ে যায়। এইভাবে মন ক্রমাগত শরীরকে পাল্টাতে থাকে।

পৃথিবীতে যত মানুষ আছে, তাদের সবার পিছনে তার সূক্ষ্ম শরীরটাই মূল। মৃত্যুর পর এই সূক্ষ্ম শরীরটাই অন্য লোকে গিয়ে অন্য রকম শরীর ধারণ করে। এরই সরাসরি প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই, যেমন আমি চিন্তা করব তেমন আমার মন হবে, যেমনটি মন হবে তেমনটি আমার শরীর হবে। উচ্চ চিন্তন করে করে যেমনি মন অনেক সুক্ষ্ম হয়ে আসবে, তেমনি একটা সময় দেখা যাবে স্বামীজীর রচনাবলীর সব চিন্তা-ভাবনা হুড় হুড় করে বেরোতে শুরু হয়ে গেছে।

আমাদের ভাবলে অবাক লাগে, ভারতবর্ষে এত বড় বড় চিন্তকরা ছিলেন, বড় বড় পণ্ডিতরা ছিলেন, যাঁদের এত সম্মান করা হত, তাঁরা কেউই এই একটা খুব সাধারণ জিনিসকে ধরতে পারলেন না, শুধু কয়েকটা থিয়োরীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকলেন। স্বামীজী ওটাকে টেনে বাইরে নিয়ে এসে বললেন, তুমি যে চিন্তা-ভাবনা করছ, তোমার প্রত্যেকটি চিন্তা-ভাবনা তোমার মনকে তৈরী করছে, সেই মন তোমার শরীরকে তৈরী করছে। কিভাবে তৈরী করে? যেমন হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে একটা লোহার টুকরোকে একটা আকৃতি দেওয়া হয়। তুমি যদি অশুভ চিন্তা কর তাহলে জানবে, ওই অশুভ চিন্তা তোমার শরীরের উপর বিরাট কুপ্রভাব ফেলবে। স্বামীজী এখানে বলছেন, looked at materially, যেমন শরীরে কোন জীবানুর সংক্রামক হলে শরীরের অসুখ হয়, আর কলেরা, প্লেগ এই ধরণের কোন ব্যাক্টেরিয়া যদি শরীরে ঢুকে যায়, তাহলে যেভাবে শরীরকে শেষ করে দেয়, ঠিক তেমনি মনের মধ্যে যদি হিংসা, দ্বেষের মত কোন অশুভ চিন্তার উদয় হয়, ওই অশুভ চিন্তা তোমাকে শেষ করে দেবে।

স্বামীজী এখানে কোন উচ্চ অবস্থা থেকে গুরুর মত আমাদের উপদেশ দিচ্ছেন না বা আমাদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য কিছু উৎসাহব্যঞ্জক কথাও বলছেন না। অত্যন্ত সহজ একটা যুক্তি দিয়ে স্বামীজী বুঝিয়ে দিচ্ছেন। বেদান্ত কি বলতে চাইছে, উপনিষদের ঋষিরা কি বলতে চাইছেন, তাঁরা সত্যকে কিভাবে দেখেছিলেন, এই

জিনিসগুলিকে আমরা যদি একটু গভীরে গিয়ে অনুধাবন করি, তাহলেই কিন্তু স্বামীজীর এই সহজ যুক্তিটা আমাদের খুব প্রাঞ্জল বলে মনে হবে। ঠাকুর বলছেন, মাইরি বলছি ঈশ্বর বই কিছু নেই। সেই ঈশ্বর থেকে কিভাবে সৃষ্টি হল? ঠিক সেইভাবে, যেভাবে এর আগে বলা হল। সৃষ্টির বর্ণনা সাংখ্য দর্শন থেকে আসছে। এটাকেই যদি দৈনন্দিন জীবনে নামানো হয় তখন কি হবে? মনটাই তো শরীরকে নিয়ে ঘুরছে, সূক্ষ্ম শরীর স্থূল শরীরকে আশ্রয় করে। সূক্ষ্ম শরীরের মালিক মন, মনই সব কিছু করে। বহির্জগতের সব কিছু ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে মনের মধ্যে ঢুকছে, মন সেগুলোকে নিজের মত চিন্তা-ভাবনা করতে থাকে, ওই চিন্তা-ভাবনা শরীরকে তৈরী করে। স্বামীজী নিজের ভাষায় এই আইডিয়াটাকে আমাদের সামনে উপস্থাপন করছেন – যে কোন শুভ চিন্তন তোমার শরীরকে শুভ বানাবে, অশুভ চিন্তন ব্যাক্টেরিয়ার মত তোমার শরীরকে নাশ করে দেবে। তোমার কাছে এই শরীরের যদি দাম থাকে, তুমি যদি বর্তমান যুগের গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ডের নারী-পুরুষদের মত মনে কর তোমার শরীরটাই সব কিছু, তাতে কোন আপত্তি নেই, শরীরটাও তোমার একটা শুভ বস্তু, তুমি তোমার চিন্তা-ভাবনাটা শুভ করতে থাক তাহলে তোমার শরীরটা আরও সুন্দর হবে। দেবতাদের শরীর এত সুন্দর কেন, কারণ তাঁদের চিন্তা-ভাবনাগুলি শুভ।

অশুভ চিন্তনের দ্বারা শরীর কিভাবে খারাপ হয়ে যায়, এর উপর হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন শাস্ত্রে অনেক কাহিনী পাওয়া যাবে। অহল্যার প্রতি ইন্দ্রের দুর্বলতা, সেই দুর্বলতা বশতঃ অহল্যাকে ইন্দ্র তাঁর ক্ষমতা দিয়ে বশ করে নিলেন। অহল্যার স্বামী গৌতম মুনি ইন্দ্রের ছলনা ধরে ফেললেন, তারপর তিনি ইন্দ্রকে অভিশাপ দিয়ে দিলেন, তোমার যে এই নারী সম্ভোগের লোভ, তার জন্য তোমার শরীরে এই এই পরিবর্তন হবে। সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রের শরীরের সেই পরিবর্তন হয়ে গেল। কাহিনী অনুসারে আমরা জানছি, গৌতম মুনির অভিশাপে ইন্দ্রের শরীরের এই পরিবর্তন হল, কিন্তু এই কাহিনীর ভাব এটাই, দেবতাদেরও যদি পরস্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ থাকে, নারী-শরীরের প্রতি যদি তোমার বেশি আকর্ষণ থাকে তাহলে তোমার শরীরেরও পরিবর্তন হবে। স্বামীজী যে কোন নূতন চিন্তা-ভাবনা দিচ্ছেন তা না। স্বামীজী এটাকে নিজের মত ব্যাখ্যা করে আমরা যাতে বুঝতে পারি সেইভাবে আমাদের সামনে খুব সহজ উপমা দিয়ে উপস্থাপন করছেন।

অনেকের মনে প্রশ্ন আসে, গত জন্ম ছিল কিনা আমরা কি করে জানব? শঙ্করাচার্য বলছেন, পূর্বজন্ম, স্বর্গ, দেবতা এই জিনিসগুলোকে জানার কোন উপায় নেই, সেইজন্য শাস্ত্র যেটা বলেছে, সেটাকে মেনে নিতে হয়। শাস্ত্র বলছে, পূর্বজন্ম আছে, সেইজন্য পূর্বজন্ম আছে। যে যোগশাস্ত্র এত যুক্তি দিয়ে চলে, তারাও পূর্বজন্মকে পুরোদমে মেনে চলেছে। পূর্বজন্ম মানে, তার সাথে এটাও মানে যে, মৃত্যুর সময় যে চিন্তা করবে সেই অনুসারেই তার শরীর ধারণ হবে। ঠাকুর বলছেন, একজন বিধবা সারা জীবন খুব নিষ্ঠার সাথে জীবন-যাপন করেছে, মৃত্যুর সময় তাকে গঙ্গার ধারে নিয়ে আসা হয়েছে। তখন গঙ্গার ঢেউগুলো তার শরীরে এসে স্পর্শ করছে, এই স্পর্শসুখ তার খুব ভাল লাগল, মরার পর সে বেশ্যা হয়ে জন্মাল। এটা একটা কাহিনী, কাহিনীর মাধ্যমে দেখাচ্ছেন, মৃত্যুর সময় যে চিন্তা করেছিল, সেই চিন্তার মত সে শরীর পেল। ওই বিধবা ব্রাহ্মণী কি সারা জীবন ভাল কিছু করেনি? সেই শুভ কাজ, শুভ চিন্তার কি হবে?

আমাদের একটা প্রচলিত ধারণা হল, যমলোকে চিত্রগুপ্ত একটা খাতায় সবার হিসেব রাখছেন, সেই হিসাবের খাতা দেখে মানুষকে স্বর্গে বা নরকে পাঠাচ্ছেন। কিন্তু যোগশাস্ত্র বা বেদান্ত এভাবে চলে না। বেদান্ত মতে এবার তোমার একটা শরীর হয়ে গেল, এর আগে তোমার যে ভুলটা হয়েছিল, তোমার কোথাও না কোথাও সেই ভুলের ব্যাপারে খেয়াল হবে, শাস্ত্র শুনে হতে পারে, গুরুর কাছে শুনে হতে পারে। এখন তুমি যে ভাল কাজ করবে, ওই যে ভাল কাজ, শুভ চিন্তাগুলো আগে থেকে পুটলির মধ্যে পড়ে আছে, সেগুলো এবার বেরিয়ে এসে কাজ করতে শুরু করবে। দুঃখ সবার জীবনেই আছে, নিজের বর্তমান অবস্থার উপর কেউই সুখী নয়। কিন্তু আমার ভিতরে কিছু ভাল জিনিসও আছে, আবার প্রচুর খারাপ জিনিসও আছে, যেমনি খারাপ চিন্তন করব, তখন খারাপ চিন্তনের পুটলিটা বাড়তে থাকবে, ভাল চিন্তন করলে ভাল চিন্তনের পুটলিটা বাড়তে থাকবে। ভাল চিন্তন বাড়লে মৃত্যুর সময় ভাল চিন্তনই আসবে, ঈশ্বরের কথাই মনে আসবে। ঈশ্বরের চিন্তন নিয়ে যদি মারা যায় তাহলে এই দুরবস্থাটা থাকবে না, বর্তমানে যে দুরবস্থাটা চলছে। তাতেও তো আমার বাজে জিনিসগুলো থেকেই গেল, সেই বাজে জিনিসগুলো যখন বেরোবার সময় হবে তখন কি হবে? ওটা থেকে

বাঁচার জন্য সেইজন্য বলা হয় ঈশ্বরে প্রীতি করতে। ঈশ্বরে প্রীতি হয়ে গেলে, সেখান থেকে জ্ঞান যদি হয়ে যায় তখন যত অশুভ কর্ম আর তার সাথে যত শুভ কর্ম আছে, সবটাই পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। যদি তা না করা হয় তাহলে, কোন জন্মে ভাল যোনিতে যাবে, কোন জন্মে নিম্ন যোনিতে যাবে, উপর নীচ চলতেই থাকবে। ঋষিরা আমাদের বোঝাবার জন্য এগুলোকে আধার করে প্রচুর কাহিনী দিয়ে গেছেন, এগুলো শুধু কাহিনীই নয়, এইসব কাহিনীর মাধ্যমে আমাদের এই জিনিসগুলোকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার প্রচুর রসদ ঢুকিয়ে গেছেন। কথাগুলো খুবই কাজের, আমাদের শক্তি দেয় এতে কোন সন্দেহ নেই।

স্বামীজী এখানে আরেকটা কথা বলছেন, Evil thoughts, looked at materially, এটা একটা দার্শনিক পয়েন্ট, যা সহজে ব্যাখ্যা করা যাবে না। আমরা যা কিছু চিন্তা-ভাবনা করি, এই চিন্তা-ভাবনার স্বরূপটা কি? আমরা সাধারণ ভাবে বলার সময় বলি, পদার্থ একটা জিনিস, পদার্থের উপরে শক্তি কাজ করে। স্বামীজী যখন এই কথা বলছেন, তখন পর্যন্তও বিজ্ঞানীদের কাছে পদার্থ আর শক্তি আলাদা বলেই ছিল। কিন্তু স্বামীজী পদার্থ আর শক্তিকে এক দেখছিলেন। স্বামীজীর প্রয়াণের কিছু দিন পরেই আইনস্টাইন দেখালেন পদার্থ আর শক্তি এক। কিন্তু আমরা আমাদের সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে জানি পদার্থ আলাদা, শক্তি আলাদা। এই গ্লাশ আছে, আমি আমার হাত দিয়ে গ্লাশকে ঠেলতে শুরু করলে, অর্থাৎ শক্তি প্রয়োগ করছি, গ্লাশটাও সরতে শুরু করবে, আমরাও তাই বলছি পদার্থ আলাদা, শক্তি আলাদা। পদার্থ আর শক্তির পারে আরেকটা জিনিস হয়, সেটা হল চিন্তা-ভাবনা। চিন্তা-ভাবনাটা যেন অন্য একটা জাত। পদার্থ একটা জাত, শক্তি একটা জাত, চিন্তা-ভাবনাটাও একটা জাত। আর হিন্দু ধর্মে চৈতন্য একটা আলাদা জাত। স্বামীজী জিনিসগুলিকে এভাবে দেখতেন না।

স্বামীজীর একটা খুব প্রিয় উপমা ছিল, ফিজিক্সে বলা হয়, ইস্পাতের একটা দণ্ডকে যদি নাড়ানো হয় তখন একটা আওয়াজ হতে থাকে। নাড়ানোর গতি যদি ধীরে ধীরে বাড়িয়ে দেওয়া হয়, তখন আলো বিচ্ছুরিত হতে শুরু করবে, স্বামীজী এটাকে কম্পন বলতেন। ফিজিক্সে বলে, যদি হাই-ফ্রিকোয়েন্সিতে একটা কোন পার্টিকেল চলে যায়, আর সেটা যদি চার্জড পার্টিকেল থাকে তাহলে আলো দিতে শুরু করবে। কিন্তু তারপরেই স্বামীজী বলছেন, যদি ফ্রিকোয়েন্সি আরও বাড়িয়ে দেওয়া হয় তাহলে ওটাই মন হয়ে যাবে। স্বামীজী এটা কিভাবে বলেছিলেন, কেন বলেছিলেন, জানা নেই, বিজ্ঞানের কাছেও এর কোন উত্তর নেই, এটা বিজ্ঞানের এলাকা এসে গেল। স্বামীজীর বক্তব্য হল, চৈতন্যের যখন আবরণ এসে যায়, ওখানে তখন একটা শক্তি আসে, যাকে প্রকৃতি বলা হয়। এই প্রকৃতি হল খুব উচ্চ মানের কম্পন। কম্পন খুব হাই লেভেলে এসে গেলে তখন ওটাই মন হয়ে যায়, তার নীচে চলে গেলে এনার্জি হয়ে যায়, তারও অনেক নীচে এসে পদার্থ হয়ে যায়। বর্তমান ফিজিক্স বলছে এনার্জিই পদার্থ হয়, পদার্থই এনার্জি হয়, কিন্তু এনার্জি মন হয়ে যেতে পারে, এই জিনিসটা এখনও পর্যন্ত আমাদের জানা নেই। স্বামীজী যেহেতু এই কথা বলছেন, সেইজন্য এটাকে প্রশ্ন করা যায় না। কিন্তু স্বামীজীর বক্তব্য হল, চিন্তা-ভাবনাও একটা পদার্থ। তার মানে, এনার্জিকে যদি উপযুক্ত চ্যানেলে নিয়ে আসা যায়, ওটাকে পদার্থের উপরে প্রয়োগ করে পদার্থকে মুভ করানো যায়, ঠিক তেমনি চিন্তা-ভাবনাকে উপযুক্ত চ্যানেলে আনলে, সেটাকে এনার্জিতে নিয়ে আসা যাবে, পদার্থে রূপান্তরিত করা যাবে না। যোগশাস্ত্রে এটাই বলছেন, যোগীদের মনের উপর এমন নিয়ন্ত্রন থাকে যে, শুধু চিন্তা-ভাবনা দিয়েই তাঁরা অদৃশ্য হয়ে যেতে পারেন, চারটে শরীর বানিয়ে নিতে পারেন। হনুমানের চরিত্র যেভাবে আমাদের সামনে নিয়ে আসা হয়েছে, সেখানে যোগীবরের এই ভাবটাই নিয়ে আসা হয়েছে, যোগীবর মানে যোগের সব শক্তি তাঁর আছে।

স্বামীজীর মতে এটা পুরোটাই ফিজিক্যাল নিয়ম দিয়ে চলে। ফিজিক্সের যেমন কিছু আলাদা নিয়ম আছে, কেমেস্ট্রির যেমন কিছু আলাদা নিয়ম আছে, ঠিক তেমনি যোগেরও আলাদা নিয়ম আছে। যোগ শুধু মনকে নিয়ে চলে। ইদানিং যে নিওরো বিজ্ঞান এসেছে, তার থেকে যোগের নিয়ম আবার পুরো আলাদা। স্বামীজী বলছেন, জড়বাদের দৃষ্টিতে দেখলে কুচিন্তাগুলি আমাদের শরীরের উপর রোগবীজানুর মত আক্রমণ করে। ভাইরাস ব্যাক্টেরিয়া আক্রমণ করলে শরীর যেমন অসুস্থ হয়ে পড়ে, কুচিন্তাগুলি আমাদের শরীরকে সেভাবে খারাপ করে, যেটা আগে আমরা ব্যাখ্যা করে এসেছি।

সমস্ত শুভ চিন্তারাশির তুমি উত্তরাধিকারী

এরপরে স্বামীজী বলছেন, We are heirs to all the good thoughts of the universe, if we open ourselves to them. (*আমরা জগতের সমুদয় শুভচিন্তারাশির উত্তরাধিকারী, অবশ্য যদি সেগুলিকে আমাদের মধ্যে অবাধে আসতে দিই।*) ঋগ্বেদের ঋষি ঠিক একই ভাবে প্রার্থনা করে বলছেন, জগতের সমস্ত শুভ চিন্তন যেন আমার মধ্যে আসে। একটা মজার ব্যাপার হল, লক্ষ্য করে দেখলে দেখা যাবে, জগতে বেশির ভাগ নোংরা কাজ, অসামাজিক কাজ অন্ধকারে হয়, মদ খাওয়া অন্ধকারে হয়, চুরি ডাকাতি রাতের অন্ধকারে হয়, এই রকম বেশির ভাগ নোংরা কাজ অন্ধকারে হয়। অন্ধকার আর সঙ্কীর্ণতা এক। আমরা যত মনকে সঙ্কীর্ণ করব, মন তত নোংরা কাজে প্রবৃত্ত হবে, সঙ্কীর্ণ মনেই যত নোংরামী হয়। জলকে একটা জায়গায় বদ্ধ করে রেখে দিলে কিছু দিনের মধ্যে ওই জলে কীটানু, জীবানু আসতে শুরু হয়ে যাবে। জলের আধারকে খুলে দিলে জল শুদ্ধ পবিত্র থাকে। যেখানেই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহের আধিক্য আছে, অবশ্যম্ভাবি দেখা যাবে যে, ওখানে মনটা সঙ্কীর্ণ হয়ে আছে।

Exclusiveness আর Inclusiveness এই দুটো জিনিসকে দিয়ে জীবন-দর্শনকে ব্যাখ্যা করে দেওয়া যায়। Exclusiveness হল, মানুষ যখন নিজের প্রতি নিজেকে আবদ্ধ করে নেয়, বা আমি, আমার পরিবার এই ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে নিজেকে সঙ্কীর্ণ করে নেয়। বাঙালী যদি নিজেকে শুধু আমি বাঙালী বলে পরিচয় দিতে থাকে, এবার তার সর্বনাশ হতে শুরু হল। এটাকেই স্বামীজী আরেকটু বৃহত্তর ক্ষেত্রকে নিয়ে বলছেন, ভারতবর্ষ যেদিন বাইরের লোকেদের সাথে interaction বন্ধ করে দিল, সেদিন থেকে ভারতের সর্বনাশ শুরু হয়ে গেল। আমাদের সমস্যা হল, আমরা অল্প কিছু জানি, প্রথম আমরা জানি, আমাদের মনে যে উল্টোপাল্টা চিন্তা-ভাবনা হয় তা স্কুল মন থেকে এসেছে, বাকিটা ফ্যামিলি ট্রাডিশনে দু চারটে কথা শুনেছি আর খবরের কাগজ, কমিকস্ পড়ে এবং টিভি সিরিয়াল দেখে দেখে আমাদের মনে সব আইডিয়া তৈরী করে নিয়েছি, এরপরেও আমরা বলছি আমরা অনেক কিছু জানি। আমাদের এই ধারণাই নেই যে আমরা কত সঙ্কীর্ণ, এত সঙ্কীর্ণ যে কল্পনাতেই আসে না। সেই তুলনায় বিদেশের লোকেরা এদিক দিয়ে অনেক এগিয়ে গেছে।

একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে যাবে, ভারতবর্ষে সাধারণ ভাবে ইংরাজী বই বেশি বিক্রি হয়, ভারতে যদি এক বছরে কোন বই দশ হাজারের বেশি বিক্রি হয়, ভারতবর্ষে সে বইকে বলা হয় বেস্ট সেলার। আমেরিকাতে বেস্ট সেলার হওয়ার জন্য সেই বইয়ের কম করে পনের লাখ বিক্রি হতে হবে। আর আমরা বলছি ভারতবর্ষ পণ্ডিতদের দেশ। প্রাদেশিক ভাষাগুলির তো আরও দুরবস্থা, পাঁচ হাজারেও পৌঁছায় না। নিউজে অনেকেই পড়ে থাকবেন, ইউপি বোর্ডের এখন পরীক্ষা হচ্ছে, তাতে ষাট লক্ষ ছাত্র পরীক্ষায় বসার জন্য ফর্ম জমা দিয়েছিল, তার মধ্যে পনের লক্ষ ছাত্র পরীক্ষায় বসছে না; যেহেতু সরকার থেকে টোকাটুকি করার উপর কড়াকড়ি করে দেওয়া হয়েছে। প্রথম তিন দিন পরীক্ষাই দিতে আসেনি। ক্লাশ টেন পর্যন্ত মানুষ পড়তে চাইছে না, অথচ এটা নাকি পণ্ডিতের দেশ। আমরা চিরদিন গোলাম হওয়ারই যোগ্য ছিলাম, ভারত শূদ্রদের দেশ, আমাদের সব কিছু শূদ্রের মত, ব্যবহার শূদ্রের মত। এই যে চারিদিকে ধর্ষণাদির ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, এটাই শূদ্রের একটা বৈশিষ্ট্যমূলক স্বভাব। মনু এটাকেই চেষ্টা করেছিলেন, কিভাবে উপরে নিয়ে আসা যায়, কিন্তু এখন গণতন্ত্র এসে আবার যেই কে সেই, কিছু করার নেই। প্রতিবেশি দেশ চীন এখন শক্তি বৃদ্ধি করছে, তারা আমাদের আক্রমণ করবে, আবার দেশটা হাজার বছর গোলাম থাকবে, তারপর তাতে যদি কিছু মানুষ তৈরী হয়।

স্বামীজী যে কথা বলছেন, বেদেও একই কথা বলছে, চারিদিক থেকে আমাদের মধ্যে শুভ চিন্তা আসুক, শুভ চিন্তা আমাদের আরও উন্নত করুক। স্বামীজী আজ থেকে প্রায় ১২২ বছর আগে বলছেন – মনে রাখবে, অশুভ চিন্তা তোমার শরীরের উপর আঘাত হানে, শুভ চিন্তা আমাদের মানসিকতা, চিন্তা-ভাবনাকে উন্নত করে। উন্নত চিন্তা-ভাবনা শরীরের গঠণকে সুন্দর করে। স্বামীজী এখানে কোন উপদেশ দিচ্ছেন না, খুব সহজ যুক্তি দিয়ে একটা আধ্যাত্মিক সত্যকে ব্যক্ত করছেন। আর তার সাথে বলছেন – সমস্ত শুভ চিন্তা আমাদের ঐতিহ্য, এটা আমাদের অধিকার, ওই শুভ চিন্তাকে আমাদের মধ্যে আসতে দিতে হবে। আমরা সেই সচ্চিদানন্দের অংশ, আমরা সবাই পূর্ণ ব্রহ্ম, আমরা ঈশ্বরের সন্তান। তার অর্থ, ঈশ্বর, যিনি পূর্ণ জ্ঞানস্বরূপ, তাঁর জ্ঞানে আমাদের পূর্ণ অধিকার। এই জ্ঞান আমরা ভিক্ষা চাইছি না, এই জ্ঞানে আমাদের জন্মগত অধিকার।

কিন্তু তার জন্য আমাদের মনের আগলটাকে আগে খুলে দিতে হবে। যেমনি সঙ্কীর্ণ ভাব থেকে বেরিয়ে আসবে, ভাল ভাল জিনিগুলিও আসতে শুরু করে দেবে। বন্যায় চারিদিক জলে ভেসে গেছে, আর সেখানে আমরা নিজেদের একটা ছোট্ট জায়গাতে বদ্ধ করে জলহীন হয়ে জল জল করে যাচ্ছি, জল ঢুকবে কোথা থেকে! হিন্দিতে বলে, রমতা যোগী বহতা পানী, সাধু যদি আবদ্ধ হয়ে এক জায়গায় না থেকে চলতে থাকেন, স্রোতস্বিনী নদীর মত যদি প্রবাহিত হতে থাকেন, তখন কোন সঙ্কীর্ণ ভাব আসবে না। ওই সঙ্কীর্ণতা থেকে বেরিয়ে এলে শুভ চিন্তা আসতে শুরু করে দেবে। শুভ চিন্তা আসার জন্য শুধু আমাদের সমস্ত রকমের সঙ্কীর্ণতার উর্ধ্বে যেতে হবে। এই শুভ চিন্তা আসার জন্য যে আমাকে ভিক্ষা করতে হবে, কারুর কাছে প্রার্থনা করতে হবে, তা কখনই না। আমাদের ভিক্ষা করে চাইতে হবে না, এটা আমাদের সবারই স্বাভাবিক অধিকার। মা-বাবার সম্পত্তির উপর সন্তানের যেমন অধিকার, ঠিক তেমনি এই সম্পত্তির উপর আমাদের সরাসরি অধিকার।

স্বামীজী বলছেন, The book is all in us, শাস্ত্র তো সব আমাদের ভিতরেই আছে। Fool, hearest not thou?, মুর্খ, তুমি কি শুনতে পারছ না। In thine own heart day and night, is singing that Eternal music – *sachcidananda, soham, soham* (Existence-knowledge-bliss Absolute, I am He, I am He), (*তোমার নিজ হৃদয়ে দিবারাত্র সেই অনন্ত দিব্য সঙ্গীত ধ্বণিত হয়ে চলেছে – 'সচ্চিদানন্দঃ সচ্চিদানন্দঃ, সোঽহং সোঽহং'!*) তোমার হৃদয়ে চব্বিশ ঘন্টা ধ্বণিত হচ্ছে, সোঽহম্ সোঽহম্, আমি সেই পূর্ণ ব্রহ্ম, আমার ভিতরে সমস্ত শক্তি, সমস্ত জ্ঞান বিদ্যমান, অথচ আমরা কাঙালীর মত কেঁদে কেঁদে মরছি। আমরা মুর্খ তাই এই দিব্য ধ্বণিকে শুনতে পাই না। আমরা নিজেদের ছোট করে নিয়েছি, যেখানে আমাদের inclusiveness, অর্থাৎ *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*, এই জ্ঞান হওয়ার কথা, সেখানে আমরা, দুটো টাকা, সুন্দরী নারী, কামিনী-কাঞ্চনের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে ভাবছি – আমার জন্য এটাই মঙ্গলদায়ক। ঠাকুর বলছেন, সাপের মাথায় অমূল্য মণি, সাপ মরা ব্যাঙ খেয়ে মরে।

মানুষের দিব্যত্ব

শুভ চিন্তার উপর বলার পর এবার স্বামীজী তাঁর খুব প্রচলিত ও প্রিয় বিষয় নিয়ে বলছেন, তা হল সবার মধ্যে অনন্ত শক্তি, অনন্ত জ্ঞান। প্রত্যেক লেখক বা বক্তার একটা নিজস্ব থিম্ থাকে, সব কিছু লেখা বা বলার মধ্যে ঘুরে ঘুরে ওই থিমটা চলে আসে। স্বামীজীর থিম্ হল, man is divine। স্বামীজী নিজেও এক জায়গায় বলছেন, আমি যত শিক্ষা দিয়েছি, সংক্ষেপে সেই শিক্ষাকে একটা কথায় রেখে দেওয়া যায়, তা হল, man is divine। কথার মধ্যে তিনটে মাত্র শব্দ, কিন্তু ব্যাখ্যা করার সময় স্বামীজীর পুরো রচনাবলী হয়ে যাচ্ছে। Man কি, isness কি, divine কি আর এগুলোর implications কি সাংঘাতিক আমরা কল্পনাই করতে পারি না। তারই একটা implicationএর কথা স্বামীজী বলছেন, The fountain of all knowledge is in every one of us, in the ant as in the highest angel. (*আমাদের প্রত্যেকের ভিতর কি ক্ষুদ্র পিপীলিকা, কি স্বর্গের দেবতা – সকলেরই ভিতর অনন্ত জ্ঞানের প্রস্রবন রয়েছে।*) আমাদের সমস্যা হল, আমরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যা কিছু বলি, সেটা কথার কথা মত বলে বেড়াই, এই যেমন বলি, ঠাকুর আছেন, তিনিই সব দেবেন, তিনিই দেখছেন, ইত্যাদি। স্বামীজীর চিন্তা-ভাবনা এই লাইনে দিয়ে কখনই যায় না। মুখের এই কথাগুলোকে ভুল বলা হচ্ছে না। সত্যিই তো ঠাকুরই আছেন, যাকে যা দেওয়ার তিনিই দেন, কথাগুলিতে কোন ভুল নেই। কিন্তু ঘোর বেদান্ত দিয়ে যখন যাবে, তখন এসে যাবে, মানুষের মধ্যে অনন্ত শক্তি, অনন্ত জ্ঞান।

আমরা আগেও আলোচনা করেছি, কোন মানুষের মধ্যে যখন জ্ঞানের প্রকাশ, শক্তির প্রকাশ আমরা দেখতে পাই, সেটা দেখে আমরা সব সময় মনে করি এই জ্ঞান, এই শক্তি আমাকেও অর্জন করতে হবে, আমাকে ভাল হতে হবে। সব কিছুতেই আমাদের হওয়া, হতে হবে। বেদান্তে পুরো জিনিসটাই উল্টে যায়। বেদান্তে এই জ্ঞান, এই শক্তি, সব কিছু আমাদের মধ্যে আগে থেকেই আছে, কিন্তু ওর উপর একটা বাঁধন দেওয়া আছে। যেমন বিরাট জলরাশিকে ড্যাম তৈরী করে আটকে রাখা হয়েছে। ড্যামের কোন ছোট ফুটো দিয়ে একটু একটু করে জল বেরোচ্ছে। ফুটোটা একটু বড় করে দিলে জল আরেকটু বেশি করে আসতে থাকবে। আমরা মনে করছি এই জল নিয়ে আসার ব্যবস্থা আমরা করলাম। কিন্তু আমরা ভুলে যাচ্ছি, আমাদের

ভিতরে অনন্ত জলরাশি, অর্থাৎ জ্ঞানরাশি রয়েছে। সেইজন্য জ্ঞান অর্জন বা শক্তি অর্জন করা হয় না, ওই জ্ঞান বা শক্তি যেটা আটকে আছে, যেটা দিয়ে আটকানো আছে, সেটাকে একটু সরিয়ে দেওয়া। স্পোর্টসম্যান হোক, ফিল্মস্টার হোক, রাজনীতির নেতা হোক, পণ্ডিত হোক, যেই হোক, সবার ক্ষেত্রে এটাই সত্য, শুধু সত্য নয়, ঘোর সত্য। সমস্যা হল, সৃষ্টির শুরু থেকে আমরা যে বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আছি, যে অজ্ঞান অন্ধকারে পড়ে আছি, ওই অন্ধকারে অজ্ঞানের আবরণ এত গভীর যে, শত চেষ্টা করেও ওই বাঁধনকে সরানো যাচ্ছে না। আর ওই বন্ধনও এত মজবুত আর শক্তপোক্ত যে, ফুটো যে করা হবে, বাঁধনটাকে যে সরানো হবে, সেটাও আর হয়ে উঠছে না। কিন্তু যা কিছু থাকার সব ভিতরেই রয়েছে, বাইরে থেকে আমাদের কিছু আনতে হবে না। ঠাকুরের কাছে আমরা প্রার্থনা করছি, হে ঠাকুর আমাকে টাকা দাও, আমি যেন শান্তিতে থাকতে পারি, কিন্তু কে আমাকে টাকা দেবে, জগতের সমস্ত টাকার মালিক তো আমি। আমাকে কে শান্তি দেবে? সমস্ত শান্তির ভাণ্ডার আমি নিজে। আমাকে কে শক্তি দেবে? সমস্ত শক্তির উৎস আমি নিজে।

এসব কথা যে কাউকে উদ্দিপ্ত করার জন্য, উৎসাহ বর্ধনের জন্য বলা হচ্ছে, তা নয়, এটাই সত্য। আর এই কথা যদি স্বামীজী একা বলে থাকতেন, তাহলে আমরা প্রশ্ন করতে পারতাম, এই একই কথা বেদ বেদান্তের সব ঋষিরাই বলে এসেছেন। সেইজন্য এটাকে নিয়ে কোন প্রশ্নই করা যেতে পারে না। আর এটাই হয়, আমাদের যে যোগশাস্ত্র, আর যার implication আমরা ভক্তি সাধনা, জ্ঞান সাধনাতে দেখতে পাই, সেখানেও এটাই হয়। মানুষ কোন কিছুকে অবলম্বন করে তার মনকে যখন একাগ্র করতে শুরু করে, তখন অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত শক্তির উপর যে বাঁধ দেওয়া আছে, সেটা যেন একটু একটু করে খুলতে থাকে। আর শেষ অবস্থায় বাঁধটাকে যখন ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেয়, তখন সে একজন বুদ্ধ বা যীশু হয়ে যাবে। তাহলে কি বুদ্ধ একজন বড় বিজ্ঞানী হয়ে যেতেন? কোন দিন হতেন না, কারণ ভগবান বুদ্ধ কোন দিন সংসারের দু পয়সার জিনিসে মনকে কেন্দ্রিত করতে যেতেন না। কিন্তু যদি কেন্দ্রিত করেন, তখন বড় বড় বিজ্ঞানীরাও তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারবেন না।

ঠাকুর কখন নিজের শক্তি দেখাতেন না, যদিও লীলাপ্রসঙ্গে একটা দুটো সেই রকম ঘটনার উল্লেখ আছে, সেগুলোকে নিয়ে মহারাজরা বেশি আলোচনা করেন না, কারণ অলৌকিক, সিদ্ধাই আদি জিনিসের দিকে মন চলে গেলে আসল উদ্দেশ্যটাই হারিয়ে যায়। দু-একটা ছাড়া ঠাকুরের কোন শক্তির প্রকাশ দেখাবার ঘটনা পাওয়া যায় না। কিন্তু স্বামীজী ছিলেন খাপ খোল তরোয়াল, ওই যে অনন্ত শক্তি রয়েছে, ওই অনন্ত শক্তির প্রকাশ তাই কখন সখন ঠিকরে সবার সামনেই বেরিয়ে এসেছে। শ্রীরামচন্দ্র আত্মজ্ঞানী ছিলেন, তিনি ব্রহ্মাস্ত্র চালাতে জানতেন, শ্রীকৃষ্ণও আত্মজ্ঞানী, তিনি সুদর্শন চক্র এমন চালাতেন যে কেউ তাঁর ধারে কাছে আসতে পারত না। এগুলো সবই সেই আত্মারই শক্তি। রুক্মিনিকে একবার শিক্ষা দিতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, আমার কাছে আত্মজ্ঞান ছাড়া কোন শক্তি নেই। স্বামীজীও ঠিক তাই, স্বামীজীর যে আত্মজ্ঞান, এই আত্মজ্ঞান যে শুধু জ্ঞান তা না, এই আত্মজ্ঞানকে অন্যান্য বিষয়েও নামানো যায়, কিন্তু তার থেকে বেশি ফিজিক্যাল শক্তিতেও নামানো যায়। এর অনেক ঘটনা আমরা স্বামীজীর জীবনে দেখতে পাই।

একবার স্বামীজী আমেরিকার এক শহরে আছেন, সেখানে একটা নদীর জলে ডিমের খোসা ভেসে যাচ্ছে, বাচ্চারা এয়ারগান দিয়ে সেই ডিমের খোসাকে টিপ করে মারছে, কিন্তু পারছে না। স্বামীজী ওদের কাণ্ড দেখে হাসছেন। বাচ্চারা গিয়ে স্বামীজীকে বলছে, 'আপনি হাসছেন, আপনি কি পারবেন ডিমের খোসাগুলিকে টিপ করে মারতে?' স্বামীজী বন্দুকটা নিলেন, একবার দেখে নিলেন কিভাবে চালাতে হয়, তারপরেই ঢাঁই ঢাঁই করে বন্দুক চালিয়ে সব কটা ডিমের খোসাকে উড়িয়ে দিলেন। বাচ্চাগুলো অবাক হয়ে বলছে, 'আপনি নিশ্চই কোন কাউবয়।' পশ্চিম আমেরিকাতে সব কাউবয় ছিল, যারা গুলি চালাত। স্বামীজী বলছেন, 'না তা নয়, আমি জীবনে প্রথমবার বন্দুক ধরেছি।' তাহলে স্বামীজীকে অলিম্পিকের শ্যুটিং পাঠিয়ে দিলে হয়, কয়েকটা সোনার মেডেল নিয়ে আসবেন। স্বামীজীর এটা লাইনই নয়, এগুলো স্বামীজীর কাছে এত নীচু যে, ওসব জিনিসের দিকে উনি কোন দিন মনও দেবেন না। ঠাকুরকে একবার মাইক্রোস্কোপে কিভাবে ছোট জিনিসকে বড় দেখায় দেখাবার জন্য একটা মাইক্রোস্কোপ নিয়ে আসা হয়েছে। ঠাকুর চোখ দিতে না দিতেই সমাধিতে চলে গেলেন। ঠাকুর বলছেন, মনটা আমি ওখানে নামাতে পারছি না। মাটিতে ছবি এঁকে মাস্টারমশাই ঠাকুরকে

বোঝাচ্ছেন সূর্যগ্রহণ চন্দ্রগ্রহণ কিভাবে হয়, ঠাকুর বলছেন, আমার মাথা ঝিম্ ঝিম্ করছে। জিনিসটাকে জানার জন্য ওখানে মন দিতে হবে, কিন্তু কেন তিনি জগতের এই সামান্য জিনিসে মন দিতে যাবেন! যে মিছরির শরবত খেয়েছে তার আর চিটে গুড়ের পানা ভাল লাগে না। আমাদের কাছে এই জগৎ বিরাট কিছু, দুটো টাকা, সুন্দরী নারী আমাদের কাছে বিরাট কিছু। ওই উঁচু অবস্থায় চলে যাওয়ার পর তাঁর কাছে এগুলোর আর কোন দাম থাকে না।

স্বামীজী বলছেন, fountain of knowledge is in every one of us, fountain of knowledge শুধু নয়, fountain of peace, fountain of all strength, fountain of all power, সবটাই আমাদের ভিতরে। কোন সন্ন্যাসী যদি কাউকে এই কথা বলতে যায়, সে সঙ্গে সঙ্গে সেই সাধুকে থামিয়ে বলতে পারে, 'দাঁড়ান মশাই! আগে বলুন আপনার কিছু হয়েছে?' 'অবশ্যই হয়েছে, প্রত্যেক সাধু সন্ন্যাসীরই হয়। যাঁদের জপ, ধ্যান, তপস্যা আছে, আর যাঁর যত জপ, ধ্যান, তপস্যা হয়েছে তাঁর মন তত উন্নত'। সবাই সব সাধু সন্ন্যাসীদের স্বামী বিবেকানন্দের সাথে তুলনা করতে যান, কিন্তু সে'তো সম্ভব না। কিন্তু একটা তুলনা করা যেতে পারে। এই সন্ন্যাসী যদি আজকে সমাজে থাকতেন, তাহলে কি হতে পারতেন? দেখা যাবে, সন্ন্যাসী অন্যদের থেকে অনেক উপরে চলে গেছেন। একাগ্রতার শক্তি, মনের শক্তিকে যখন লাগানো হয় তখন মানুষ মাত্রই উন্নতি করে। কারণ ওই অনন্ত শক্তি, অনন্ত জ্ঞানের প্রবাহটা একটু বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি আসার জন্য যে ডিনামাইট লাগাতে হবে, সেটা সহজে আসবে না। লেগে থাকতে থাকতে, জপ, ধ্যান, তপস্যা করতে করতে আসে। স্বামীজী বলছেন, ছোট্ট পিঁপড়ে থেকে শুরু করে শ্রেষ্ঠ দেবতা পর্যন্ত, সবার ভিতরে ওই একই জিনিস।

সেখান থেকে স্বামীজী আবার বলে যাচ্ছেন, Real religion is one, but we quarrel with the forms, the symbols, the illustrations, (*প্রকৃত ধর্ম একটিই। আমরা তার বিভিন্ন রূপ নিয়ে, বিভিন্ন প্রতীক –তার বিভিন্ন প্রকাশ নিয়ে ঝগড়া করে মরি।*) ধর্ম এক, সেই সচ্চিদানন্দই আছেন, বাকি বাহ্যিক জিনিসগুলিকে নিয়ে আমরা মারামারি করি। The millennium exists already for those who find it; we have lost ourselves and then think the world is lost. (*যারা খুঁজতে জানে, তাদের কাছে সত্যযুগ তো এখনই রয়েছে। আমরা নিজেরাই নষ্ট হয়েছি, আর মনে করছি –জগৎ সংসার গোল্লায় গেছে।*) জগতের যে স্বর্গ, এই পৃথিবীর যে স্বর্গ, এই স্বর্গ আমাদের ভিতরে এবং এইখানেই আছে, তার জন্য আমাদের অন্য কোথাও যেতে হবে না। কিন্তু আমরা হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের ভিতরে যে স্বর্গ আছে, সেইদিকে আমরা তাকাই না বলে মনে করছি আমরা হারিয়ে ফেলেছি আর মনে করছি জগৎটা গোল্লায় গেছে।

শান্ত ভাব যেখানে সেখানেই পূর্ণশক্তি

জ্ঞানের কথা বলার পর শক্তির উপর বলছেন, Perfect strength will have no activity in this world; it only is, it does not act. (*এ জগতে পূর্ণশক্তির কোন কার্য থাকে না। তাকে কেবল 'অস্তি' বা সৎ মাত্র বলা যায়, তার দ্বার কোন কাজ হয় না।*) এই শক্তি যেখানে সেখানে গিয়ে নিজের ক্রিয়া দেখাতে যায় না, ও শুধু আছে। যখন আমরা ঈশ্বরীয় কথা বলি, তখন আমরা বলি সচ্চিদানন্দ, সচ্চিদানন্দের সৎ মানে অস্তিত্ব, সত্তা মাত্রম্, তিনি আছেন। ঈশ্বরের সমস্ত শক্তি এইজন্য যে, তিনি আছেন। তাঁকে যে সব সময় দেখাতে হবে আমার এই শক্তি আছে, মা কালীর মত ওখানে এখানে দু চারটে অসুর মেরে দেখিয়ে দেবেন, তা না। যে বড় মাপের রাজা, যার ক্ষমতা আছে, সে নিজের ক্ষমতা দেখিয়ে বেড়ায় না। কিন্তু একটা বাচ্চার হাতে বন্দুক দিয়ে দিলে, সে চারিদিকে দুম্ দুম্ করে বন্দুক চালিয়ে দেখাবে আমার কত ক্ষমতা। জঙ্গীদের হাতে বন্দুক এসে গেলে চারিদিকে তাদের জঙ্গীপনার ক্ষমতা দেখিয়ে বেড়াবে। যাদের সত্যিকারের ক্ষমতা আছে তারা তাদের ক্ষমতা দেখাতে যায় না।

স্বামীজী বলছেন, perfect strength তখনই হয় যখন মানুষ শান্ত ভাব অবলম্বন করে, তখন তাকে কিছু দেখাতে হয় না। আমরা সব সময় অপরকে দেখাতে চাই আমি কি করতে পারি, নিজেকে জাহির করতে করতেই আমাদের জীবন চলে যায়। আমি এক ভাল মানুষ, আমি কত ভদ্র, এটাকে জাহির করতে করতে প্রাণ

বেরিয়ে যায়। ভিতরে গজগজ করছে, কিন্তু বাইরে মিষ্টি কথা বলে বলে নিজের ভাল মানুষী দেখাবার চেষ্টা করছে। আর দ্বিতীয় হল, সব সময় প্রমাণ করার চেষ্টা করে যাবে যে, আমি এটা জানি। যেখানেই দেখা যাবে মানুষ নিজেকে জাহির করছে, আর দেখাবার চেষ্টা করছে, তখনই বুঝতে হবে তার ভিতরে শক্তি আসেনি। যাঁরা বিজ্ঞানী, অনেক রিসার্চ করে, পরিশ্রম করে অনেক উঁচুতে চলে যান, তখন আর কাউকে কিছু তাঁদের দেখাতে হয় না। আমাদেরও ওই অবস্থায় পৌঁছাতে হবে, যেখানে চলে গেলে আর কাউকে শক্তি দেখাতে হবে না, কোন কাজ করে কিছু দেখাতে হবে না। যারা প্রচণ্ড তামসিক, জাগতিক অর্থে একেবারেই অপদার্থ, তারাও ঠিক ওই ভাবে আচরণ করে যে, আমার কিছু দেখানোর নেই। কিন্তু যাঁরা ভিতর থেকে একেবারে শান্ত হয়ে গেছেন, এনাদেরই শক্তি আছে, ক্ষমতা আছে, কিন্তু কক্ষণ কাউকে সেই শক্তি বা ক্ষমতাকে জাহির করে দেখাতে যান না। ঠাকুরও বলছেন, যে দিল্লী গেছে, সে বলে বেড়ায় না যে, আমি দিল্লী গেছি। যখনই কেউ নিজেকে কোন কিছু দেখানোর চেষ্টা করছে, বুঝতে হবে যে এটা ওর স্বাভাবিক অবস্থা নয়। যে নিজের স্বাভাবিক অবস্থায় স্থিত হয়ে গেছে, সে শান্ত হয়ে যাবে।

সবটাকে মিলিয়ে স্বামীজী শেষে বলছেন, While real perfection is only one, relative perfections must be many. (*যথার্থ সিদ্ধিলাভ এক বটে, কিন্তু আপেক্ষিক সিদ্ধি নানাবিধ হতে পারে।*) Perfection বলতে আধ্যাত্মিকতা, আধ্যাত্মিক জিনিসটা হল perfection। Perfection এর বাংলা হয় পূর্ণতা। কিন্তু আপেক্ষিক জগতে যখন আসে, শক্তির এলাকায়, মায়ার রাজ্যে আসে, তখন তিনি বহু রূপে দেখান। ঈশ্বর এক, কিন্তু যত মন তত রূপে দেখান।

<u>৩০শে জুন, রবিবার</u>

একটা পিঁপড়ে আর দেবতার মধ্যে কিসে তফাৎ? শক্তির তারতম্যে তফাৎ হয়ে যায়, চৈতন্যে কোন তফাৎ নেই। শুদ্ধ চৈতন্য সব জায়গায়, সব সময় সমান। কিন্তু যে বুদ্ধি দিয়ে, মন দিয়ে চৈতন্যের প্রকাশ, যে বুদ্ধি দিয়ে আমরা একে-ওকে, এটা-সেটা জানছি, সেই বুদ্ধির আবরণে তফাৎ হয়ে যায়। আবরণটাই শক্তি, সাধারণ মানুষের মধ্যে ওই আবরণ এত মোটা যে, ওই আবরণকে ভেদ করে চৈতন্য নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না। যেটুকু বেরিয়ে আসছে, যেটা বেরিয়ে আসতে পারছে না, পুরো পদ্ধতিটাকে আমরা বলছি শক্তির তফাৎ। যেটা বেরিয়ে আসছে সেটা শক্তি রূপে বেরিয়ে আসছে, কিন্তু সব কিছুর পিছনে যিনি ঈশ্বর, তিনি এক। বুদ্ধির পিছনে যে ঈশ্বরের শক্তি –সবারই জন্য সমান। শ্রীশ্রীমা যে বলছেন, সবাই আমার সন্তান, এই জন্যই বলছেন, তাঁর ওই শক্তির আবরণটাই খসে পড়ে গেছে। হয়তো ক্ষীণ একটা আবরণ রয়েছে মনে হবে, কিন্তু ওই জ্ঞানটা এসে গেছে। তিনি নিজেকে সেই শক্তি রূপে দেখছেন, যেখান থেকে সব কিছু বেরিয়ে আসছে। সেইজন্য তিনি বলতে পারছেন, সবাই তাঁর সন্তান; যদিও এর মধ্যে সত্যিকারের একটা আধ্যাত্মিক ভাব আছে। কিন্তু যাঁদেরই ভিতরে সত্যিকারের মাতৃভাব থাকে, তিনি আচার্যই হন, গুরুই হন, সন্ন্যাসী হন, তাঁরা সবাইকে সমান ভাবে দেখেন, ভেদ ভাবটাই মুছে যায়। যেমন শঙ্করাচার্য ছিলেন, তাঁর কাছে সব শিষ্যরাই সমান, যার জন্য যে শিষ্য কম জানত বা চটপট সব বুঝতে পারত না, তাকেও তিনি একই স্নেহে দেখতেন। জাগতিক অর্থে আমরা এভাবে নিতে পারি, শ্রীশ্রীমায়ের এমন ভালবাসা ছিল যে, সেই ভালবাসা তাঁর সবারই প্রতি সমান ছিল। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে শ্রীশ্রীমা জগজ্জননী, সৃষ্টি যাঁর থেকে বেরিয়ে আসছে। শ্রীশ্রীমা আরেক জায়গায় বলছেন, আমার ভালবাসা সবারই প্রতি, যার প্রতি আমার ভালবাসা নেই, সেতো অভাগা। বেদান্তে বলছে, *মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে*, আমার থেকেই সব কিছু বেরিয়েছে। এই জ্ঞানে যিনি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন, তখন আর তাঁর পছন্দ, অপছন্দ বলে কিছু থাকে না। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বলতে গিয়ে ভগবান বলছেন, শুভ অশুভ কোনটাতেই তাঁর প্রতিক্রিয়া নেই। প্রতিক্রিয়া না থাকা মানে, সব কিছুতেই, ভাল-মন্দ, শুভ-অশুভ সবেতেই তিনি নির্বিকার। তিনি যেমন মন্দের ব্যাপারে উদাসীন, ভালর ব্যাপারেও উদাসীন থাকেন। কিন্তু শ্রীশ্রীমায়ের ক্ষেত্রেও তিনি যেমন ভালকে গ্রহণ করছেন, তেমনি মন্দকেও গ্রহণ করছেন। জ্ঞানী যেমন সব কিছুকেই ত্যাগ করেন, ভক্তিমার্গে ভক্ত সবাইকে গ্রহণ করে।

প্যাটার্ন ছাড়া মন কোন কিছু নিতে পারে না

স্বামীজী ৩০শে জুনের ক্লাশে এসেছেন। শিষ্যদের সাথে আছেন, কথাবার্তা করছেন, আরও যেন গভীরে ঢুকছেন। অনেক দিন হয়ে গেল, সব শিষ্যরা দিনরাত স্বামীজীর সাথে থাকছেন, শিষ্যরাও তাই স্বামীজীর সাথে একাত্ম বোধ করছেন। স্বামীজীও এই কজন শিষ্যদের সামনে নিজেকে যেন সম্পূর্ণ উন্মোচন করে দিয়েছেন আর স্বামীজীর ভাব ও জ্ঞান শিষ্যদের ভিতর যাওয়ার জন্য যেন প্রস্তুতি নিচ্ছে। প্রত্যেক গুরুর ক্ষেত্রেই এই চিত্র পাওয়া যায়। গুরু যখন শিষ্যের সাথে একাত্ম বোধ করেন, সত্যিকারের যদি এক হয়ে যান, তখন গুরুর জ্ঞান আর শিষ্যের জ্ঞান এক হয়ে যায়। ফলে গুরু তখন এই ভেবে শিষ্যকে কিছু বলেন না যে, সে বুঝছে কি বুঝছে না। প্রথমের দিকে যে কোন আচার্য কিছু বলার সময় একটু ভাববেন শিষ্য বুঝতে পারছে কিনা, একবার দুবার জিজ্ঞেস করবেন, তুমি এটা বুঝতে পারলে কিনা। কিন্তু যখন একটা হায়ার লেভেলে চলে যায়, গুরু তখন আর জিজ্ঞেস করেন না, উনি ধরেই নেন, আমি আর ও এক। গুরু তখন শিষ্যের সাথে বেশি কথা বলেন না, নিজের সাথেই কথা বলেন। আগেকার দিনে বেদের ঋষিরা ঠিক এভাবেই শিক্ষা দিতেন, ঠাকুরও তাই করতেন, যে কোন আচার্যই এই ভাবে শিক্ষা দেন।

বেদের ঋষিরা শিষ্যদের খুব খাটাতেন, কুঠিয়াতে হয়ত গুরুমা আছেন, আর দশ বিশ জন শিষ্যরা আছে, সবাই একটা পরিবারের মত থাকত। শিষ্যদের বেদ মুখস্থ করাটা বাধ্যতামূলক ছিল, তার সাথে গুরু কদাচিৎ একটা দুটো কথা বলে দিতেন। এই কথা বলাটা তাদের শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বলা হত না, স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে একটা কথা হয়ত বললেন, ফলে অনেক সময় যার প্রস্তুতি থাকবে, সে কথাটা ধরে ফেলবে, প্রস্তুতি না থাকলে কথাটা ওখানেই শেষ। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে একবার বৈষ্ণব শাস্ত্রের কথা বলতে গিয়ে বলছেন, জীবে দয়া। বলার পরেই ঠাকুরের ভাব পাল্টে গেল। ভাব পাল্টে যেতেই ঠাকুর থু থু করে বলছেন, মানুষের কি ক্ষমতা যে জীবে দয়া করবে! শিব জ্ঞানে জীবের সেবা। ওখানে অনেক ভক্তরাই বসে আছেন, নরেনও বসে আছেন। নরেন উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, বেরিয়ে গিয়ে বলছেন, আজ একটা নূতন কথা শিখলাম, যদি ঈশ্বর কোন দিন সুযোগ দেন আমি এটা করে দেখাব। আর পরবর্তী কালে আমরা দেখলাম স্বামীজী সেবার আদর্শ নিয়ে এলেন, স্বামী গম্ভীরানন্দ এর নামই দিয়েছিলেন সেবাযোগ।

এখানে দুটো খুব মজার ব্যাপার আছে। ঠাকুর একটা পরম্পরা কথা বলছিলেন, বলতে বলতে হঠাৎ তাঁর ভাবান্তর হল। ভাবান্তর হয়ে যাওয়ায় ঠাকুরের এখন কোন হুঁশ নেই যে ওখানে কে আছে, কে নেই, একে বোঝান তাকে বোঝানর কোন প্রশ্নই নেই, কারণ এখন তিনি নিজের মধ্যেই নেই। এই ভাবান্তরে ঠাকুর নিজের মত বলে যাচ্ছেন, সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনছেন। কিন্তু একজনই শুধু ঠাকুরের ওই কথাটা ধরতে পারলেন। এই জিনিস সমস্ত আচার্যদেরই হয়। আচার্যরা সব সময় খুব ঘনিষ্ঠ কয়েকজনকে খোঁজেন। স্বামীজীও প্রথমের দিকে কিছু দিন জন সমক্ষে ভাষণ দিয়েছিলেন, কিন্তু পরবর্তি কালে ঐ ভাষণ দেওয়া বন্ধ করে দিলেন। এরপর তিনি বিশেষ কয়েকজনকে নিয়ে ক্লাশ নিতে শুরু করলেন। ওই কয়েকজনের মধ্যে আরও যারা খুব ঘনিষ্ঠ, তাঁদেরকে সাথে করে থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে নিয়ে গেলেন। সেইজন্য দেববাণীর এই কথাগুলো ঠিক ঠিক সেই কথাগুলি, যেখানে ঈশ্বর যেন নিজের সাথে কথা বলছেন, তিনি আর উপদেশ দিচ্ছেন না। বোঝানর কোন চেষ্টা নেই, দর্শনের কোন থিয়োরীকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা নেই। তাঁর সমস্ত জ্ঞানরাশি যেন খেলা করছে। সমুদ্রে একটা বড় মাছ নিজের মত ভাসছে, ডুবছে; ও অপরকে কিছু দেখাচ্ছে না, নিজের মত নিজের আনন্দে খেলা করে যাচ্ছে। আচার্যরাও ঠিক সেই ভাবে জ্ঞানরাশিকে নিয়ে খেলা করেন। সেইজন্য ৩০শে জুনের ক্লাশের কিছু কিছু বিষয় আমাদের জন্য খুব কঠিন হয়ে যায়।

Materialism, Realism, Idealism

আলোচনা শুরু করার আগে দর্শনের তিনটে শব্দকে ভাল করে বুঝে নেওয়া দরকার। প্রথমটাকে বলে materialism, এর আরেকটা খুব প্রচলিত নাম objectivism, যাঁরা objectivist তাঁরা আবার নিজেদের materialist নামে শুনতে চায় না, materialism তাঁদের কাছে খুব নিন্দার শব্দ। দ্বিতীয়টাকে বলে realism আর তৃতীয় হল idealism। এই তিনটে খুব নামকরা শব্দ, আর এই তিনটের নানা রকম সংমিশ্রণে

আরও অনেকগুলো দর্শনের জন্ম হয়। বিশ্বে যতগুলো দর্শন আছে, বিশেষ করে যেগুলো চিন্তা-ভাবনা নিয়ে চলে, সেগুলোকে মোটামুটি এই তিনটে শ্রেনীতে বিভক্ত করা যায়। ভারতেও যত দর্শন আছে, সব এই তিনটের মধ্যেই ঘুর ঘুর করে।

Objectivism আর materialism মোটামুটি এক, objectivism হয় objectকে ভিত্তি করে আর materialism হয় matterকে ভিত্তি করে। Matter বলতে আমরা জানি পঞ্চ ভূত বা আমরা যেটা দিয়ে গ্রহণ করি, পঞ্চ ইন্দ্রিয়। Materialismএর বক্তব্য হল, আমি সেটাকেই মানব যেটা আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে আসছে, এর বাইরে আমরা কিছু মানব না। আইনস্টাইনের একটু আগে পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা সবাই objectivist ছিলেন। ফরাসী বিপ্লবের সময় কিছু কিছু চিন্তাবিদরা সামনে এগিয়ে এলেন, তাঁরা তাঁদের তলোয়ারের জোরে বলতে লাগলেন, পুরনো যা কিছু ছিল সবটাই পচা জিনিস, আমাদের এগুলোকে ফেলে দিতে হবে। এরপর বিজ্ঞান নূতন করে শুরু হল, সভ্যতাও নূতন করে শুরু হল, সংস্কৃতিও নূতন করে শুরু হল আর চিন্তা-ভাবনাও নূতন করে শুরু হল। ওই চিন্তা-ভাবনায় তাঁরা বললেন, আমাদের এখানে আমরা ইন্দ্রিয় দিয়ে যেটা জানব সেটাই সত্য, তার বাইরে কোন সত্য নেই। ফরাসী দেশ এই মতবাদকে প্রচণ্ড গুরুত্ব দেওয়ার ফলে এবং পরের দিকে আরও কিছু দার্শনিকরা পাশ্চাত্য দুনিয়ায় এই মতবাদকে গ্রহণ করার ফলে বিজ্ঞানের প্রচুর ক্ষতি হয়ে গেল। এমন কি, বিজ্ঞান যদি তখনকার দিনে কোন ইক্যুয়েশানস্ নিয়ে আসত, ইক্যুয়েশান মানে মনের খেলা, মনের খেলা হয়ে গেল মানে এটাকে আরে মানা যাবে না। পরের দিকে objectivistরা ওটাকে একটু সহজ করে বলে দিলেন, যদি লজিক্যালি চিন্তা করা যায় তাহলে আমরা এটাকে মেনে নিতে পারি। যেটা আমরা বললাম, একটু এদিকে সেদিক করে দিলে দর্শনটা পাল্টে যায়।

Realistরা বলেন, কেউ দেখুক আর নাই দেখুক, পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে কেউ অনুভব করুক আর নাই করুক, একটা জিনিস যদি আছে, সেটা আছে। Real মানে real, objectivism মানে যদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় তবেই সেটা সত্য। এখন এই দুটো মতকে নিয়ে বিরাট ঝামেলা লাগল। মনে করা যাক হিমালয়ে একটা জঙ্গল আছে, যেখানে আজ পর্যন্ত কেউ যায়নি, আর সেখানে গাছ থেকে একটা পাতা পড়ল, এই পাতা পড়া তো কেউ দেখেনি, কারণ সেখানে কেউ ছিল না। তাহলে প্রশ্ন হবে, পাতা পড়ল কি, পড়ল না? Objectivistরা বলবে, পাতা পড়েনি, কারণ কেউ দেখেনি। Realistরা বলবে, তুমি দেখলে কি দেখলে না, তাতে কি আসে যায়, কিন্তু পাতা পড়েছে। আমাদের মনে হবে এগুলো ছেলেখেলা, কিন্তু কোন ছেলেখেলা নয়। পুরো পাশ্চাত্য দর্শন শুধু এটাকে কেন্দ্র করে পক্ষে ও বিপক্ষে এমন এমন সব যুক্তি নিয়ে আসবে যে, আর এমন গভীরে যুক্তি চলবে যে, আমরা ধারণাই করতে পারব না, বুদ্ধিতে আসার কোন প্রশ্নই নেই।

Idealismএর নামকরা দার্শনিক ছিলেন ম্যানুয়াল কান্ট, তিনি দুটো মতবাদের মধ্যে একটা ব্যালেন্স বার করার চেষ্টা করলেন। তাঁর বক্তব্য হল Objectivismটাও ঠিক আর Realismটাও ঠিক। গাছের পাতা যদি পড়ে থাকে, তাহলে সত্যিই পড়েছে, কেউ দেখুক আর নাই দেখুক। কারণ ভগবান ওই পাতা পড়াটা দেখেছেন। ভগবান দেখছেন মানে, বৈষয়িক মন দেখছে, একজন দেখলেই হল। এখান থেকে এসে যায় Idealism। এখানে আমরা খুব সহজ করে আলোচনা করছি, কিন্তু এর conclusions গুলো খুব লম্বা লম্বা হয়ে যায়। তার মধ্যে একটা হয়, আমরা বলছি এই বস্তুটা আছে, কারণ এই বস্তুর যে সত্তা সেটাই বস্তু রূপে আছে। কিন্তু যাঁরা Idealist, তাঁরা যখন আরও গভীরে নিয়ে যাবে, তখন বলবেন, বস্তু বলে কোন কিছু নেই, যা আছে সব তোমার মস্তিষ্কে আছে।

এগুলোকে নিয়ে আবার ব্যালেন্স বার করা হয়, যেটা স্বামীজী বলছেন, এই যে বস্তু আছে, যখন সেই বস্তু আমার চোখে পড়ে sensation হয় তখন ওই sensation মস্তিষ্কে গিয়ে stimulation করে, সেখান থেকে পরে মনে যে reaction আসে, সেটাই হল জ্ঞান, হাইফেন দিয়ে এটাকে বলে subjectivism আর objectivism। প্রত্যেকের নিজস্ব উচ্চমানের যুক্তি আছে, তার বিরুদ্ধেও খুব উচ্চমানের যুক্তি আছে। সেইজন্য মানুষ যখন এগুলোর উপর পড়াশোনা করতে যায় তখন বেশীর ভাগ লোকই পুরো confused হয়ে যায়। ইদানিং ফিজিক্সের সব নূতন নূতন তত্ত্ব আসছে, এগুলো objectivismকে অনেক আগেই পেরিয়ে গেছে, পুরোপুরি চলে গেছে idealismএ। যেমনি ইক্যুয়েশানে ঢুকে গেল, যেমন ইলেক্ট্রন প্রোটন, এগুলোকে

কেউ কোন দিন দেখেনি, কিন্তু সত্য, আর এগুলোকে নিয়ে রীতিমত কাজও চলছে, সব কিছু হচ্ছে। ঠিক ঠিক ফিলজফির দিক দিয়ে গেলে, এগুলো কিন্তু সব idealistic philosophy of schoolsএ পরে, যদিও তারা বলে যে, যন্ত্রপাতির ব্যবহার হচ্ছে, তাই এটা materialism। অন্য দিক দিয়ে গেলে, খুব সহজ ভাষায় materialism মানে হল, পঞ্চ তত্ত্ব বাদে কিছু নেই, এমনকি মনটাও পঞ্চ তত্ত্বের জিনিস আর ঈশ্বর যদি হন, তিনিও পঞ্চ তত্ত্বের জিনিস, তা সেই তত্ত্ব পাঁচটিই হোক আর ছটিই হোক, কিন্তু তত্ত্বের বাইরে কিছু নেই। এই হল তিনটে দর্শনের ধারণা। এবার যদি আমরা এখান থেকে এগোতে শুরু করি তখন স্বামীজীর আজকের কথাগুলো পরিষ্কার হয়ে যাবে।

স্বামীজী প্রথমে শুরু করছেন, যদি কোন জিনিসকে আমরা চিন্তা করতে যাই, সেখানে যদি একটা মুর্ত রূপ না থাকে, তাহলে সেটাকে চিন্তা করা যায় না। To try to think without a phantasm is to try to make the impossible possible. (*একটা কিছু কল্পনা আশ্রয় না করে চিন্তা করবার চেষ্টা আর অসম্ভবকে সম্ভব করবার চেষ্টা –এক কথা।*) যে কোন জিনিসের concrete idea যদি আমাদের না থাকে এবং তারপর যদি ওই জিনিসের ধারণাটাকে আমরা বোঝার চেষ্টা করি, ওটা তখন হয়ে যাবে অসম্ভবকে সম্ভব করার মত, তার মানে concrete idea ছাড়া কখনই কোন কিছুর ধারণা করা সম্ভব নয়। সেইজন্য বেদান্ত, অদ্বৈত, মায়া, মহামায়া এই জিনিসগুলোকে ধারণা করা যায় না। কারণ আমাদের মন এমন যে, ইমেজ ছাড়া আমাদের মন কোন জিনিসকে ধারণা করতে পারে না। মনের গঠনটাই এমন যে, যতক্ষণ কোন মূর্ত কিছু না থাকে, মন কিছুই ধারণা করতে পারবে না, বুঝতে পারবে না।

আইনস্টাইনকে একবার একটা বাচ্চা মেয়ে জিজ্ঞেস করছে, What is theory of relativity? কারুর কাছ থেকে থিয়োরী অফ রিলেটিভিটির কথা শুনেছে। আইনস্টাইন তখন মেয়েটিকে বোঝানর জন্য বলছেন, ‘তোমার সাথে যদি এক ঘন্টা কথা বলি, মনে হবে পাঁচ মিনিট কথা বললাম। আর কোন বৃদ্ধার সাথে পাঁচ মিনিট যদি কথা বলতে হয়, তখন মনে হবে এক ঘন্টা ধরে কথা বলে যাচ্ছি’। এটা আদপেই থিয়োরী অফ রিলেটিভিটি নয়, কিন্তু বাচ্চাটা নিজের মত বুঝে নিল। একটা concrete কোন দৃষ্টান্ত দিলে মানুষ তখন বুঝতে পারে, কারণ আমাদের মন দুটো জিনিসকে বোঝে – একটা বোঝে প্যাটার্ন, প্যাটার্ন ছাড়া আমরা কখনই কোন জিনিসকে বুঝতে পারব না; যদি একটা জিনিসকে আমরা না জেনে থাকি। স্বামীজী একবার এক জায়গায় দেখছেন একজন লোক, তাকে নাকি ভূতে ভর করেছিল, তপ্ত লোহার উপর দিয়ে নির্বিকার চিত্তে হেঁটে চলে গেল, স্বামীজী হাত দিতে গেলেন, তাঁর হাত পুড়ে গেল। তিনি তখন ভাবছেন, এটা কি করে হল? কেন স্বামীজী ভাবছেন? প্যাটার্ন খুঁজছেন, সবাই প্যাটার্ন খুঁজছে। ঠাকুর বলছেন, মায়ার জগতে এটা থেকে ওটা হয় বলা যায় না, কিন্তু এই জগতে তিনি যখন আছেন, তখনও তিনি প্যাটার্ন খুঁজছেন। আচ্ছা ওই লোকটা কেন এই রকম করল? যেমনি কেউ বলছে, লোকটি কেন এমন করল, তার মানে সে প্যাটার্ন খুঁজছে। জগতে প্যাটার্ন আছে কি নেই, তাতে কোন কিছু আসে যায় না, কিন্তু আমাদের মন প্যাটার্ন ছাড়া নিতে পারে না।

প্যাটার্ন খোঁজার অর্থই হল আমরা একটা ইমেজ বার করে নিচ্ছি, ইমেজ ছাড়া আমরা কোন জিনিস কল্পনা করতে পারিনা। তার মানে, যিনি ঈশ্বর, তাঁকে যতক্ষণ বিষ্ণু রূপে, রাম রূপে, কৃষ্ণ রূপে না দেখি, আমরা বুঝতেই পারব না, তিনি কে। মানুষকে সেই জিনিসগুলোরই বর্ণনা করতে হবে, যেটার সাথে মানুষ সম্পর্ক করতে পারে। বাচ্চাকে বোঝান হল ঈশ্বর করুণাময়। বাচ্চা এবার প্রশ্ন করবে, করুণাময় জিনিসটা কি? তখন বলা হবে, যেমন মা; দুষ্টুমি করলেও মার কাছে গেলে রক্ষা পাওয়া যায়। বিশ্বের যে কোন ধর্মশাস্ত্র খুললে দেখা যাবে, সবাই ঠিক এই লাইনেই চলছে। কারণ মানুষ মা, বাবা, মালিক বা প্রভু, রাজা, এই তিন চারটে মূল জিনিসের মাধ্যমেই ঈশ্বরকে বোঝার চেষ্টা করে। সেইজন্য ভগবান হয় মা রূপে আসবেন, নাহলে বাবা রূপে আসবেন, প্রভু রূপে আসবেন, না হলে রাজা রূপে আসবেন, এই কয়েকটি জিনিসের মধ্যেই ঈশ্বরের রূপ ঘুর ঘুর করবে। কারণ আমরা এছাড়া ঈশ্বরের কিছু ধারণাই করতে পারব না।

আমাদের মস্তিষ্কের যে প্যাটার্ন করা আছে, যেমন লুডোতে চৌকো চৌকো ঘর আঁকা থাকে, গুটি চলার সময় এই ঘর থেকে সেই ঘরে গুটি এগোতে থাকে, ঠিক সেই রকম আমাদের মস্তিষ্কে খাঁজ খাঁজ করা আছে, যখনই কোন আইডিয়া আসবে তখন ওকে গিয়ে ওই খাঁচে ফিট করতে হবে। ওই খাঁচের বাইরে গেলে আমরা

কিন্তু আর নিতে পারব না। সেইজন্য কেউ যখন নির্গুণ নিরাকারের কথা বলে, কেউ যখন নিজের ধর্মকে নিয়ে বলার সময় বলে আমার ঈশ্বর নির্গুণ নিরাকার, তখন সে কি বলছে নিজেও জানে না। তাহলে বলছে কেন? কারণ নির্গুণ নিরাকার তার কাছে একটা শব্দ মাত্র। যখন বলছে, আমার ঈশ্বর নির্গুণ নিরাকার, তখন সে ওই শব্দের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। শ্রীশ্রীম যখন বলছেন, শরত যেমন আমার ছেলে আমজাদাও তেমন আমার ছেলে, তখন মায়ের এই কথার পিছনে যে আধ্যাত্মিক সত্য রয়েছে, সেই আধ্যাত্মিক সত্যকে ধারণা যে করব সেই আধ্যাত্মিক চেতনা আমাদের মধ্যে এখনও আসেনি। কিন্তু এটা আমরা জানি, মানুষ আছে, মানুষের মা হয়, মা সন্তানকে দেখে, এই ভাবটাই ওই ভাবের মধ্যে কোন ভাবে ফিট করে নেয়। যাঁর যেমন জপ, ধ্যান, তপস্যা, তিনি সেই রকম জিনিসটাকে বুঝবেন, উন্নত মনের দ্বারা তিনি যেটা বুঝবেন, বাকিদের পক্ষে সেই ভাবে ঐ জিনিসটাকে বোঝা কখনই সম্ভব না।

হিন্দীতে একটা সুন্দর গল্প আছে, একটা গ্রামে ভোজ হয়েছে। সেখানে একজন অন্ধ ও এক সাধারণ মানুষ খেতে গেছে। অন্য একজন লোক খেয়ে বেরিয়ে আসছে। তাকে অন্ধ লোকটি জিজ্ঞেস করছে, কি কি খেলে? বলল, পুরি, সব্জি ও ক্ষীর। সে কোন দিন ক্ষীর খায়নি? ক্ষীর জিনিসটা কেমন? সাদা মত হয়, খুব ভাল খেতে। সাদা জিনিসটা কি? দুধের মত সাদা। সাদা জিনিসটা কি? সাদা, মানে হাঁস হয় না, সেই হাঁসের মত। হাঁস জিনিসটা কি? তখন লোকটি পুকুর থেকে একটা হাঁস ধরে এনে তাকে দিল। অন্ধটি হাঁসের গলায় হাত বুলিয়েছে, হাঁসের ঘাড় ব্যাঁকা। ও এবার বুঝলাম, ক্ষীরটা ব্যাঁকা, হিন্দীতে গল্পের নামই টেরী ক্ষীর। অন্ধটিকে তখন লোকটি বলছে, তোমাকে বোঝান যাবে না। কারণ অন্ধের ক্ষীরের ব্যাপারে কোন ধারণাই নেই। প্যাটার্নের বাইরে কোন জিনিসকে ধারণা করা যায় না। স্বামীজী এটাই বলছেন, মানুষ অমূর্তের ধারণা করতে পারে না। স্কুলে বাচ্চারা অঙ্ক করতে চায় না, কারণ অঙ্ক অমূর্ত। পাটিগণিত তাও কোন রকমে চলে যায়, কিন্তু বীজগণিতে গিয়ে রীতিমত abstraction আসতে শুরু হয়ে যায়। শিক্ষকরা সেইজন্য দৈনন্দিন জীবন থেকে কিছু উদাহরণ নিয়ে আসেন, উদাহরণ দিয়ে দিয়ে ভীত তৈরী করার পর বীজগণিতে ঢোকার চেষ্টা করেন। কিন্তু একটু পরেই আর নিতে পারে না।

ঈশ্বর সম্বন্ধে অবধারণা না হওয়ার কারণ

এখান থেকে স্বামীজী বলছেন, We cannot think ‘mammalia’ without a concrete example. So with the idea of God. (*আমরা কোন একটি বিশেষ জীবকে অবলম্বন না করে স্তন্যপায়ী কোন জীবের ধারণা করতে পারি না। ঈশ্বরের ধারণা সম্বন্ধেও ঐ কথা।*) যখনই আমরা কোন মানুষ বা এই জগতের কোন কিছুর চিন্তা করতে যাই, তখনই আমাদের একটা concrete example লাগে। ঈশ্বরের ব্যাপারেও ঠিক তাই, যতক্ষণ একটা কংক্রীট আইডিয়া না থাকে, আমরা ঈশ্বরের ব্যাপারে কিছু নিতে পারি না।

তারপরেই স্বামীজী বলছেন, The great abstraction of ideas in the world is what we call God. (*জগতে যত প্রকার ভাব বা ধারণা আছে, তার যে সূক্ষ্ম সারনিষ্কর্ষ, তাকেই আমরা ‘ঈশ্বর’ বলি।*) অঙ্কে যত রকম ইক্যুয়েশানস্ হয়, সবই abstration। বর্তমান কালে ফিজিক্স এত abstractionএ চলে গেছে যে সাধারণ মানুষ ফিজিক্সের নূতন নূতন থিয়োরীগুলি বুঝতেও পারে না। ফিজিক্সে একটা থিয়োরী আছে, যাকে বলছে stream theory, এত abstration যে সাধারণ মানুষ বুঝতেও পারে না এটা কি জিনিস, কয়েকজন মুষ্টিমেয় বিজ্ঞানী ছাড়া কেউ বোঝে না। হঠাৎ একদিন নিউজপেপারে এলো stream theory খুব সঠিক। পরের দিনই এলো, stream theory proved wrong। এখন আবার নূতন একটা কথা শোনা যাচ্ছে, gravitational wave নাকি detect করেছে। এখন বলছে, gravitional wave detect হল, এর মানে stream theory ভুল।

কয়েকজন বিজ্ঞানী ছাড়া এসব জিনিস কেউ কিছু বোঝেও না, জানেও না। এনাদেরই কয়েকজন নামকরা বিজ্ঞানী আছেন, তাঁরাই বিভিন্ন কমিটিতে আছেন, নোবেল প্রাইজ তাঁরাই দেন। কিছু দিন পর শোনা গেল, যে থিয়োরী নিয়ে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিল, সেই থিয়োরীটাই নাকি ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। বায়োলজিতে একবার একজন নোবেল প্রাইজ পেলেন, দশ বছর পর ওই থিয়োরীর ঠিক উল্টো থিয়োরী যিনি

দিলেন, তাঁকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হল। এই হল ফিজিক্স, কেমেস্ট্রি, বায়োলজির অবস্থা, এমন abstraction levelএ চলে গেছে যে, যিনি করেন তিনি ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারবে না। আইনস্টাইন থিয়োরী অফ রিলেটিভিটি করলেন, তারপরেই তিনি হিটলারের ভয়ে জার্মান ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। হিটলার আইনস্টাইনকে খাটো করার জন্য একটা বই লেখালেন, বইয়ের নাম হল, 'Why fifty scientists think Einstain is wrong'। বইটা আইনস্টাইনের কাছে গেলে তিনি ওটা খুলেও দেখলেন না। একজন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বইটা খুলে দেখবেন না'? আইনস্টাইন তাঁকে বলছেন, 'আমি যদি ভুল হতাম, then one scientist could have been enough'; আমি যদি ভুল হতাম তাহলে পঞ্চাশ জন বিজ্ঞানীর দরকার হত না, একজন বিজ্ঞানীই যথেষ্ট। যখন পঞ্চাশ জনকে জড়ো করে এনে বলানো হচ্ছে, এই লোকটি বদমাইশ, বুঝতে হবে কিছু গোলমাল আছে। কাউকে বদমাইশ প্রমাণিত করার জন্য এক জন লোকই যথেষ্ট, বেশি লোক লাগে না। তার মানে আইনস্টাইনের থিয়োরী কেউই বুঝছে না। আইনস্টাইনের রিলেটিভিটিকে যে ঠিক বলছে সেও বোঝে না, আর যে বিরুদ্ধে বলছে সেও বোঝে না।

ঈশ্বরের ব্যাপার যখন আসে তখন ঈশ্বরের আইডিয়াস্ গুলো তেমনি abstract হয়ে যায়। যারা বলছে আমি ঈশ্বর মানি, সেও কিছু বোঝে না, যে বলছে ঈশ্বর বলে কিছু নেই, সেতো আরও কিছু বোঝে না। কারণ একটা জিনিস নেই, সেই জিনিসটাকে প্রমাণ করার জন্য জ্ঞান দরকার, এই জ্ঞানকে বলে অভাব জ্ঞান। যেমন আমরা এখানে সবাই আছি, এখানে হাতি নেই। হাতি এখানে নেই, এর কি প্রমাণ? এখানে হাতির অভাব, এটাই অভাব প্রমাণ, আমাদের মন অভাবকে জানতে পারে। ইন্দ্রিয় দিয়ে সরাসরি যে জিনিসের আমরা অনুভূতি পাই, যেমন চোখ দিয়ে আমি আপনাকে সরাসরি দেখছি, এটা যেমন প্রমাণ, ঠিক তেমনি, এই জিনিসটা নেই, এটাও আমাদের মনে একটা বৃত্তি তৈরী করে। প্রমাণ মানে, একটা জিনিসের জ্ঞান লাভ করার বা জানার যে পদ্ধতি, সেই পদ্ধতিকে বলে প্রমাণ। জানার অনেকগুলো পদ্ধতি ঠিক করে দেওয়া আছে। কিন্তু এগুলোকে নিয়ে আমাদের দার্শনিকদের মধ্যে অনেক তর্কবিতর্ক চলে, বিশেষ করে অভাব প্রমাণ প্রত্যক্ষ প্রমাণের মধ্যে পড়ে কি পড়ে না, প্রাচীন কাল থেকে এই নিয়ে প্রচুর বাগবিতণ্ডা এখনও চলে আসছে। কিন্তু আমাদের বড় বড় দার্শনিকরা, বেদান্তী, পূর্বমীমাংসকরা অভাব প্রমাণকে একটা আলদা প্রমাণ বলে মনে করেন। বড়লোকের ছেলে একটি মেয়েকে ভালবাসে, সে মেয়েটিকে দেখাবার জন্য একটা বড় পার্টি দিয়েছে। পার্টিতে সেই মেয়েটিই আসেনি। সবাই এসেছে, কিন্তু মেয়েটিই আসেনি। সবাই দেখছে মেয়েটি নেই, বুঝতে পারল কিছু একটা গোলমাল আছে, হয়ত সম্পর্ক ভেঙে গেছে। এটাকে বলে অভাব প্রমাণ।

তাহলে ঈশ্বর যে নেই, এটা কি অভাব প্রমাণ হয়ে গেল? ঈশ্বরকে কি আমি অভাবে জেনেছি? আমি তো ঈশ্বরকেই জানি না। তাহলে কি করে আমি বলব যে, ঈশ্বর বলে কিছু নেই। যে বলছে, ঈশ্বর আছেন, সেও তো ঈশ্বরকে দেখেনি, ফাঁকা আওয়াজ করে যাচ্ছে। ঠাকুরের সেই গল্প, ওরে পোদো শাঁখ বাজিয়ে তুই করলি গোল। ভাঙা মন্দির, চামচিকের বাসা হয়ে আছে, মন্দিরে বিগ্রহ নেই, সেখানে ভোঁ ভোঁ করে শাঁখ বাজিয়ে যাচ্ছে। কারণ ঈশ্বর হলেন abstract idea, এত abastract যে, জপ-ধ্যান করে, তপস্যা করে করে অনেক দিন পর মন যখন সূক্ষ্ম হয়, তখন সে abstractionকে কিছু কিছু ধারণা করতে পারে। যিনি abstractionকে ধারণা করতে পারেন তাঁকে আমরা বেশি সম্মান দিই। ঈশ্বর এত সূক্ষ্ম যে, তাঁর সেই সূক্ষ্মতাকে কোন রূপ দিয়ে যে বোঝান যাবে, সেটা কখন সম্ভবই নয়। বীজগণিত আমরা সহজে বুঝিয়ে দিতে পারি, কারণ তার সেই রকম related কিছু image আছে। কিন্তু যেমনি কোর্ডিনেট ইক্যুয়েশানে যাবে, এবার ধীরে ধীরে relation কমতে শুরু হয়ে গেল। বাইকোর্ডিনেটে আর কোন relationই নেই, imaginary নাম্বারে যখন যাবে তখন বেশির ভাগ লোক মাথায় হাত দিয়ে বসে যায়, তখন মুখস্থ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকে না। যার মস্তিষ্ক যত সূক্ষ্ম জিনিসকে নিতে পারে, তখন তার তত সূক্ষ্ম জিনিসকে ধরার ক্ষমতা হবে। ঈশ্বর এত বেশি সূক্ষ্ম যে, সাধারণ মানুষের পক্ষে মন দিয়ে ধারণা করা সম্ভবই নয়। যে বলছে, আমি ঈশ্বর মানি, সেও নিজেকে বোকা বানাচ্ছে, আর যে বলছে, আমি ঈশ্বর মানি না, সেও বোকা বানাচ্ছে। স্বামীজী এটাই এখানে বলছেন।

এই কথা বলার পর স্বামীজী বলছেন, Each thought has two parts, – the thinking and the word; and we must have both. (*প্রত্যেক চিন্তার দুটি ভাগ আছে – একটি হচ্ছে ভাব, আর দ্বিতীয়টি ঐ ভাবদ্যোতক ‘শব্দ’; আমাদের ঐ দুটিকেই নিতে হবে।*) একটা হল চিন্তা-ভাবনা, আর দ্বিতীয়টি হল শব্দ। আসলে অস্তিত্ব জিনিসটাই তিনটে স্তরে চলে – বিচার, শব্দ ও বস্তু। যেমন এই পেন, এই পেন একটা আইডিয়া, পেন এটা একটা শব্দ, আর পেন একটা বস্তু। বস্তু, শব্দ ও বিচার এই তিনটে একসাথে থাকে। আগেকার দিনে সংস্কৃতে ‘শব্দ’ মানে সেই এক, ‘শব্দ’ মানে বিচার আর ‘শব্দ’ মানে শব্দকে আমরা যেভাবে জানি। আগেকার দিনে ইংরাজীতে word মানে চিন্তা-ভাবনা হত, শব্দটাও হত। স্বামীজী সেইজন্য বলছেন, and we must have both, যতক্ষণ বিচারের সাথে শব্দ না থাকে, ওটা মানুষ নিতে পারবে না। শুধু তাই না, আমাদের মন এত স্থূল যে, শব্দের সাথে বস্তু যদি না থাকে, আমরা নিতে পারব না। যার মন প্রচণ্ড স্থূল, জ্ঞান লাভের জন্য তার বস্তুকে দেখা চাই। যাদের মন এর থেকে একটু সূক্ষ্ম হয়, তারা শব্দকে দিয়েই বস্তুর জ্ঞান পায়, যাদের মন এর থেকেও সূক্ষ্ম হয়, তারা আইডিয়াকে দিয়েই কোন জিনিসকে ধরে নিতে পারে। যারা দক্ষিণ ভারতে আছে, তাদের কাছে হিমালয়ের বর্ণনা করলে কিছু বুঝতে পারবে না। তাদের কাছে হিমালয় একটা শব্দ মাত্র হয়েই থাকবে।

স্বামীজী বলছেন, Neither idealists nor materialists are right. (*না বিজ্ঞানবাদী, না জড়বাদী, কারও মত খাঁটি সত্য নয়।*) সেইজন্য যদি বলা হয় যেহেতু সবটাই মনের ভিতর হয়, মনের ভিতর ঈশ্বরের চিন্তন করা যাচ্ছে, মনের মধ্যেই ঈশ্বরকে দেখছেন, তাই এটাই একমাত্র ঠিক, কিন্তু এটাও ঠিক না। আর যদি বলে, পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে যেটা জানছি, যেটা বর্তমানে আছে সেটাই ঠিক, সেটাও ঠিক হবে না। সেইজন্য স্বামীজী বলছেন, we must take both idea and expression, এখানে স্বামীজী জড়বাদকে অভিব্যক্তি রূপে নিয়ে আসছেন, কারণ যে জিনিসকে মন গ্রহণ করতে পারে, একমাত্র সেটাকেই আমরা ব্যক্ত করতে পারি। মন যে জিনিসটাকে নিতে পারবে না, সেটাকে মন কখনই ব্যক্ত করতে পারবে না। আইডিয়া এমন একটা জিনিস, যেটাকে ব্যক্ত করা যায় না। যেমন অদ্বৈত, অদ্বৈত হল খুবই সূক্ষ্ম আইডিয়া, সূক্ষ্ম আইডিয়া বলে অদ্বৈত কোন ভুলভাল জিনিস, কঠিন জিনিস হবে, তা নয়। এটাকে ধারণা করার জন্য অত্যন্ত সূক্ষ্ম বুদ্ধির দরকার। তেমনি ভক্তিশাস্ত্রে যে মায়া, মহামায়ার কথা বলা হয়, এগুলোও প্রচণ্ড সূক্ষ্ম। ধারণা হবে, যদি আচার্যের সাথে সব সময় সঙ্গ করা যায়, সঙ্গ করতে করতে বুদ্ধিটা খোলে, তখন আচার্য দু একটা কথা বলে দিলে সঙ্গে সঙ্গে জিনিসটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। কিন্তু কদিন পর আবার সংশয় এসে উপস্থিত হবে। সংশয় কেটে যাবে, নিজের তপস্যা ও আচার্যের সঙ্গ দ্বারা। আসল কথা এটাই, তপস্যা যদি না থাকে, সাধন-ভজন যদি না থাকে, অনাসক্তি না এলে, পবিত্র না হলে, শাস্ত্রের কথা, গুরুর দু চারটে কথা কখন স্পষ্ট ধারণা করা যাবে না। কারণ আমাদের মন এত স্থূল যে, বস্তু ছাড়া আমরা কোন কিছুর ধারণা করতে পারি না, শব্দে কদাচিৎ হবে, বিচার সম্ভব নয়। সেইজন্য যখনই বিচার হয়, যেমন আমি ঈশ্বর বললাম, ঈশ্বর শব্দের সাথে আমার কাছে তিনটে জিনিস আসছে, তাঁর রূপ, তাঁর শব্দ আর মনের ভাব। ঠাকুর মজা করে বলছেন, খুড়ী জ্যাঠীর কোঁন্দল শুনে বাচ্চারাও বলে ‘তোর ঈশ্বরের দিব্যি’, ঈশ্বর শব্দটা শুনেছে, কিন্তু কোন আইডিয়া নেই। ঠিক তেমনি সংসারীদেরও একই অবস্থা, মুখে ঈশ্বর ঈশ্বর বলে যাচ্ছে, কিন্তু কোন আইডিয়া নেই। স্বামী গীতানন্দ বোঝানর জন্য বলতেন, we believe that we believe God, আমাদের এই বিশ্বাস আছে যে, আমাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে। শুধু বিশ্বাস তা নয়, বিশ্বাসের পর আরেকটা বিশ্বাস দরকার আছে, আমাদের নিজের বিশ্বাস আছে।

স্বামীজীর বক্তব্য এখানে খুব সহজ, ঈশ্বরের অবধারণা করা যায় না। ঈশ্বর আর জগৎ আছে, জগতের যা কিছু আমরা পাই, সব আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পাই, সেইজন্য জড়বাদীরা মনে করে তারা ঠিক। অন্য দিকে Idealistরা মনে করে, যা কিছু আছে সব চিন্তার জগতে আছে, cosmic mindএ আছে। স্বামীজী এটাই বলতে চাইছেন, যেটা ভাবের স্তরে চলে, সেগুলো অত্যন্ত সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম জিনিসকে ধারণা করা বা বোঝা খুব কঠিন। অন্য দিকে ঈশ্বর হলেন সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্ম, ফলে বোঝা আরও মুশকিল। সেইজন্য materialist আর idealist দুটোই ঠিক। আমরা এটা বলতে পারি না যে আইডিয়া থাকবে কিন্তু expression থাকবে না, আবার এটাও বলতে পারি না যে, expression থাকবে আইডিয়া থাকবে না, দুটো এক অপরের সাথে যুক্ত

হয়ে আছে। এটা স্বামীজীর মত, তার মানে এটা যে শেষ কথা তা না। দার্শনিকদের কাছে নিয়ে গেলে তারা এই মতকেই তুলোধুনো করে ছেড়ে দেবে। ঠাকুর বলছেন, নিজেকে মারার জন্য একটা নুড়ুন হলেই হয়ে যায়, অপরকে মারার জন্য ঢাল তলোয়ার লাগে। স্বামীজীর কথাগুলো আমাদের জন্য নুড়ুন। এগুলোকে নিয়ে কে কি বলছে, সেদিকে আমাদের তাকাতে নেই।

প্রকৃতির সব কিছু সেই আত্মা বা ঈশ্বরেরই প্রতিবিম্ব

Materialism, Realism, Idealism নিয়ে আলোচনা করার পর এবার স্বামীজী ঘোর বেদান্তে আসছেন। ঘোর বেদান্ত বললেও, যে কোন ধর্মের যাঁরা উচ্চ সাধনাদি করেছেন, তাঁরাও ঠিক এইভাবে কথা বলেন, All knowledge is of the reflected, as we can only see our face in a mirror. No one will ever know his own Self or God; but we are that own Self, we are God. (*আমরা আরশিতেই আমাদের মুখ দেখতে পাই –সমুদয় জ্ঞানও সেইরকম প্রতিবিম্বিত বস্তুরই জ্ঞান। কেউ কখন তার নিজের আত্মা বা ঈশ্বরকে জানতে পারবে না, কিন্তু আমরা স্বয়ংই সেই আত্মা, আমরাই ঈশ্বর বা পরমাত্মা।*) এই জগতে যত রকম চিন্তা-ভাবনা আছে, যাবতীয় যা কিছু আছে, সব কিছুই হল সেই আসল বস্তু, আত্মা –যাঁকে আমরা ঈশ্বর বলছি, সচ্চিদানন্দ বলছি, যা কিছু দেখছি সব তাঁরই প্রতিবিম্ব, এটাই জ্ঞান। আমরা নিজেকে জানতে পারি না, কারণ স্বক্রিয়া অভাব, নিজের উপর কখন ক্রিয়া হয় না।

মানুষ যেমন নিজের চেহারা দেখতে পারে না, যেটা দেখতে পায় সেটা হল, আয়নাতে নিজের প্রতিবিম্ব। তেমনি এই যে প্রকৃতি, প্রকৃতি একটা technical term, বেদান্তে বলে, সেই সচ্চিদানন্দই আছেন, তিনিই ব্রহ্ম, তিনি একটা মায়া সৃষ্টি করে দেন। এই মায়াকে বলে অজ্ঞান। কিসের অজ্ঞান? এই প্রশ্নই হয় না। প্রশ্ন সব সময় দেশ, কাল ও বস্তুর মধ্যে হয়, মায়ার ভিতরে হয়। মায়ার পারে যা আছে, সেখানে এই প্রশ্ন হয় না। আমরা এর উপর অনেকবার আলোচনা করে এসেছি। বলা হয়, ঈশ্বর ইচ্ছা করেন, সেই ইচ্ছার মধ্যে একটা ইচ্ছা হল, যেটা উপনিষদে বলছেন, *একো অহম্ বহুস্যাম্ প্রজায়ামি*, আমি এক আমি বহু হব। বহু হওয়ার ইচ্ছা এসে গেল, এটাকেই বলছেন মায়া। তখন কি হয়? তিনি ইচ্ছা করলেন, আর তখনই এই মায়া, যেটা ত্রিগুণাত্মিকা, সত্ত্ব, রজো ও তমো সৃষ্টি হয়ে যায়। এই মায়া এতদিন ঈশ্বরের মধ্যেই ছিল, ঠাকুর বলছেন ব্রহ্ম আর শক্তি, অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তি, দুটোই অভেদ। ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ, ব্রহ্ম আর মায়া অভেদ, এবার মায়াটা যেন আলাদা হয়ে গেল।

সাংখ্য দর্শনে পুরুষ অর্থাৎ শুদ্ধ চৈতন্য আর প্রকৃতি সব সময় দুটো আলাদা সত্তা। এটাকে বোঝাবার জন্য সাংখ্যে নদীর উপমা নেওয়া হয়, পুরুষ আর প্রকৃতি যেন দুটো নদী অনন্তকাল ধরে পাশাপাশি প্রবাহিত হয়ে চলেছে। শুদ্ধ চৈতন্য আর প্রকৃতি, প্রকৃতি মানে পদার্থ, এই দুটো পাশাপাশি চলছে, আর কখন সখন পুরুষ আর প্রকৃতি নিজেরা কাছে চলে আসে। কেন কাছে এসে যায়, কিভাবে এসে যায়, আমরা জানি না, কিন্তু আসে। যেমনি কাছাকাছি এসে মিলন হয়ে গেল, এরপর থেকে সৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। চিৎ আর জড়ের এই গ্রন্থিকেই বলছেন চিজ্জড়গ্রন্থি, চিজ্জড়গ্রন্তি হওয়া মানেই সৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। বেদান্ত কিন্তু কখনই এই মত মানবে না, বেদান্তে প্রকৃতি আর পুরুষ আলাদা কিছু না, শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ যিনি, এই প্রকৃতি তাঁরই প্রকৃতি। তিনি ইচ্ছা করেছেন তাই প্রকৃতি রূপে সামনে এসেছেন। কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছা করাও যা, জিনিসটা হওয়াও তাই।

ঘোর বেদান্তে বলবে, প্রকৃতির মধ্যে সচ্চিদানন্দের প্রতিবিম্ব, কারণ যিনি শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ, যিনি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত, তিনি কখনই বন্ধনে পড়তে পারেন না। এই যে আমি আপনি বন্ধনে পড়ে আছি, আমরা অজ্ঞানে পড়ে আছি, আমরা নিজেদের অনিত্য মনে করছি, আমরা জন্মাচ্ছি, মরছি, এই জিনিস শুদ্ধ সচ্চিদানন্দে কক্ষণ হতে পারে না। তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায়, আমরা সত্যিই বন্ধনে পড়ে আছি, আমরা সত্যিই অনিত্য, কিন্তু শাস্ত্র তা বলছে না। তাহলে কোথাও আমাদের বুঝতে একটা ভুল হয়ে যাচ্ছে। বেদান্ত বলছে, বুঝতে এই জন্যই ভুল হচ্ছে, এই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, যাকে আমরা প্রকৃতি বলছি, এটা যেন একটা আয়না, এই আয়নাতে আমরা সবাই যেন প্রতিবিম্ব দেখছি। এই আয়নাটা একটা মাত্র আয়না নয়। কল্পনা করা যেতে পারে, সারা রাত হিম পড়ার পর সকালে বাগানে গিয়ে দেখছি, ঘাসের ডগায় প্রচুর শিশিরের বিন্দু দেখা যাচ্ছে। এবার আকাশের সূর্য সেই

হাজার হাজার শিশির বিন্দুর উপর প্রতিবিম্বিত হয়ে হাজার হাজার সূর্য দেখা যাচ্ছে। শিশির বিন্দু যত বড় হবে সূর্যকে তত বড় দেখাবে। যে জানে না, যে মাথা নীচু করে সব সময় নীচের দিকে তাকিয়ে আছে, সে বলবে এটা বড় সূর্য, এটা ছোট সূর্য। আর কোন কারণে যদি শিশির বিন্দুগুলি গোল না হয়ে আয়নার মত আলাদা আলাদা আকৃতির হয়ে থাকে, তখন দেখছি সূর্য কোনটা ব্যাঁকা, কোনটা ট্যারা।

এখানে আমরা আয়না বলছি, শিশিরকণা বলছি, কিন্তু পুরো জিনিসটা চলছে প্রকৃতিতে। প্রকৃতিতে যেখানে মন নিয়ে চলছে, সেই প্রকৃতিতে চলে গেলে তখন দেখছি, কেউ ধনী, কেউ গরীব, কেউ সুস্থ, কেউ অসুস্থ, কোথাও পিঁপড়ে, কোথাও দেবতা। সবটাই কিন্তু প্রকৃতির আয়নাতে শুদ্ধ সচ্চিদানন্দেরই প্রতিবিম্ব। ভালবাসা জিনিসটাকে আমরা সব থেকে সহজে বুঝতে পারি, সেইজন্য বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই ভালবাসাকে নিয়ে যাজ্ঞবল্ক্য স্ত্রীকে বলছেন, কোন মানুষ কোন জিনিসকে বা ব্যক্তিকে যখন ভালবাসে, তখন সে এইজন্যই ভালবাসে যে, সেখানে সে নিজের ছবিকে দেখে। কল্পনা করা যাক, এই ঘরের দেওয়ালের চারিদিকে বিভিন্ন রকমের প্রচুর আয়না লাগানো আছে। আমি একটা আয়নার সামনে দাঁড়াতেই দেখছি এই আয়নাতে আমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে, আমার খুব ভাল লাগছে। দেখতে দেখতে একঘেঁয়েমি এসে গেল। ওই আয়নার সামনে থেকে সরে আরেকটা আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, আয়নাতে আমার প্রতিবিম্বটা অন্য রকম লাগছে, কোথাও আমার প্রতিবিম্বটা যেন বিকৃত আকৃতির দেখাচ্ছে। আমার ভাল লাগছে না, আমি এগিয়ে আরেকটা আয়নার সামনে গেলাম।

জগৎটা ঠিক তাই, কিছু কিছু জায়গায় আমাদের ভাল ছবি আসে। একটা বদমাইশ লোক যদি আরেকটা বদমাইশ লোককে কাছে পায়, সে ওর মধ্যে নিজের ভাল ছবি দেখবে। ঠাকুর বলছেন, গাঁজাখোড় গাঁজাখোরকে দেখলে কোলাকুলি করে। কারণ নিজের ছবিকে ওখানে একেবারে ঠিক ঠিক দেখছে। কোন কারণে যদি সে কোথাও একটু ভাল কথা কিছু শুনল, শুনে মনটা তার একটু অন্য রকম হয়ে গেল, তখন কিন্তু সে আর ওই গাঁজাখোড়ের মধ্যে perfect ছবি দেখতে পাবে না, ছবিটা অনেক পাল্টে গেছে। যে জায়গায় গিয়ে ছবি পাল্টে যাচ্ছে না, সেই জায়গায় গিয়ে এবার সে বেশিক্ষণ দাঁড়াবে। আমাদের কাছে বিবর্তন মানে তাই, একটা পিপঁড়ে সে তার perfect ছবি পিঁপড়েতেই দেখবে। একটা গল্প আছে, মা লক্ষ্মী একবার তাঁর বাহন পেঁচাকে একটা মুক্তোর হাড় দিয়ে বললেন, সব থেকে একজন সুন্দরীকে এই মুক্তোর হাড়টা দিয়ে এসো। পেঁচা সারা বিশ্ব ঘুরে ঘুরে কোথাও কোন সুন্দরী খুঁজে পেল না। মা লক্ষ্মীর কাছে ফিরে আসছে, সেই সময় হঠাৎ দেখে গাছের একটা ফোঁকরে একটা পেঁচী মুখ বাড়িয়ে বসে আছে। পেঁচা ওর দিকে তাকাতেই দেখছে, আরে এর মত সুন্দরী তো কোথাও দেখতে পাইনি। সে সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে ওই পেঁচিকে গিয়ে মুক্তোর হাড়টা গলায় পড়িয়ে দিল। আমাদের ঠিক তাই, আমি যেমনটি আমি আমার মত সেই রকম কোন লোকের মধ্যে আমার সব থেকে ভাল ছবি দেখতে পাব।

ইংরাজীতে খুব নামকরা কথা আছে, A man is known by the company he keeps। Not only he keeps, he aspires for। এখন হয়ত সে যে সঙ্গ করছে, সেটা তাকে বাধ্য হয়েই করতে হচ্ছে, ভাল কোন সঙ্গ হয়ত সে পাচ্ছে না বলেই করতে হচ্ছে। তখন দেখতে হবে তার আকাঙ্ক্ষাটা কি? কোন না কোন সময় অবশ্যই সে যে রকম চরিত্রের ঠিক সেই রকম চরিত্রের লোক খুঁজে বার করবে। জগৎ সংসারটা ঠিক তাই, আয়না, শিশিরবিন্দু উপমার জন্য নিয়ে আসা হয়েছে, এগুলোকে তো আর সত্যিকারে নেওয়া যায় না। তবে আমরা যেমন যেমন কর্ম করি, যেমন যেমন লোকের মুখে দুটো কথা শুনছি, তাতে কিছু হয়ত পরিবর্তন হল, আবার হয়ত কোন পরিবর্তনই হল না। ওই একটু যে পরিবর্তন হল, এবার যেমনটি আমার পরিবর্তন হয়েছে, তেমনটি আয়নার সামনে গিয়ে আমি দাঁড়াতে চাইব। এটাই স্বামীজী বলছেন, জগৎটা হল একটা বিরাট আয়না, আত্মার জন্যই এই আয়না। সেই সচ্চিদানন্দ তিনি জ্ঞানস্বরূপ, তাঁরই এই প্রতিবিম্ব হল এই জগৎ। আমাদের জন্য এগুলো সবই প্রতিবিম্ব, চিন্তা-ভাবনাটাও তাঁরই প্রতিবিম্ব। ঈশ্বরকে আমরা জানতে পারি না। কেন জানতে পারি না? কারণ, কেউ কখন নিজেকে যেমন দেখতে পারে না, নিজেকে জানার জন্য তাকে আয়নার সামনে দাঁড়াতে হয়, কিন্তু সে হল সে। ঠিক তেমনি ঈশ্বরকে আমরা কোন দিন জানতে পারব না, কিন্তু আমরা ঈশ্বর হতে পারি। এর আগেও আমরা এর উপর আলোচনা করে এসেছি।

নির্বাণ-অবস্থা – আমিত্বের নাশ

তখন স্বামীজী বলছেন, In Nirvana you are when you are not. (*তখনই তোমার নির্বাণ-অবস্থা লাভ হবে, যখন তোমার 'তুমিত্ব' থাকবে না।*) ভগবান বুদ্ধেরও যে নির্বাণের অবস্থা, তা হল, যখন তুমি নেই, তখন তুমি। মনে হবে যেন contradiction হচ্ছে, না, কোন contradiction হচ্ছে না। ঠাকুর কাঁচা আমি ও পাকা আমির কথা বলছেন, কাঁচা আমিকে ত্যাগ করে দিলে, অর্থাৎ আমিত্বের ত্যাগ হয়ে গেলে তখন আসল আমিটা বেরিয়ে আসে। ধর্মকে যদি ব্যাখ্যা করতে হয় তাহলে খুব ছোট্ট একটা সাধারণ সফর দিয়ে ব্যাখ্যা করে দেওয়া যায় – 'অহং অস্মি' থেকে যাত্রা শুরু হয়ে 'অহং ব্রহ্মাস্মি'তে শেষ। বলা হয় আমরা চুরাশি লক্ষ যোনির ভিতর দিয়ে পরিব্রাজন করি। বিবর্তনের মতবাদে এই ধরণের অনেক রকম কথা বলা হয়, কিন্তু এগুলো কিছু না, অহং অস্মি, আমি আছি, আমার আমিত্ব আছে; অহং আর অস্মি এই দুটো শব্দের মাঝখানে একটা শব্দ শুধু যোগ করার জন্য চুরাশি লক্ষ যোনির ভিতর দিয়ে পরিভ্রমণ করতে হয়ে। সেই শব্দটা হল 'ব্রহ্ম'; যোগ করার পর হয়ে যায় অহং ব্রহ্মাস্মি, আমি সেই পূর্ণ ব্রহ্ম, এই এতটুকু জানা। আমরা এত যোনির মাঝখান দিয়ে যাচ্ছি অহং অস্মি এই দুটির শব্দের মাঝখানে শুধু ব্রহ্ম এই একটি শব্দ বসাবার জন্য।

আসলে আমরা ব্রহ্মই ছিলাম, ব্রহ্মই আছি, একটা শব্দ খসে পড়ে গেছে। একজন আচার্য খুব মজা করে বলতেন, একটা দোকানে গ্লো সাইনে লেখা ছিল 'তাঁতের কাপড় চান আসুন'। এখন 'তাঁতের' 'তাঁ' জ্বলছে না, 'কাপড়' শব্দের 'ড়'টা জ্বলছে না আর 'চান' শব্দের 'ন' জ্বলছে না, তার ফলে লেখাটা দেখাচ্ছে 'তের কাপ চা আসুন'। সবাই ভাবছে তের কাপ চা আসুন, তের কাপ চায়ের জন্য কেন আসব! আমাদের ঠিক এটাই, অহং ব্রহ্মাস্মি ছিল, ব্রহ্মের আলোটা জ্বলছে না, দেখাচ্ছে অহং অস্মি। শুধু ওই আলোটা জ্বালানোর জন্য আমাদের চুরাশি লক্ষ যোনি ঘুরতে হচ্ছে। কলকাতায় যারা আছে, তাদের বাড়ি থেকে নিমতলা ও কেওড়াতলা বেশি দূরে নয়, ওইটুকু দূরত্বে যেতে যেতে আমাদের সারা জীবন চলে যায়। স্বামীজী বলছেন নির্বাণ মানে, এই ছোট আমি, ঠাকুর যেটাকে কাঁচা আমি বলছেন, এই কাঁচা আমিটাকে ফেলে দেওয়া।

ভগবান বুদ্ধের কথা দিয়ে স্বামীজী বলছেন, 'You are best, you are real, when you are not' (when the little self is gone). (*বুদ্ধ বলছেন – যখন 'তুমি' থাকবে না, তখনই তোমার যথার্থ অবস্থা – তখনই তোমার সর্বোচ্চ অবস্থা অর্থাৎ যখন ক্ষুদ্র বা কাঁচাটা চলে যাবে।*) আমিত্ব চলে যাওয়ার পর যেটা থাকবে, সেটাই তুমি সেই আসল তুমি, তুমিই তখন শ্রেষ্ঠ হয়ে যাও। যদি কেউ জীবনে কিছু করতে চায়, যদি কেউ মহাপুরুষ হতে চায়, তাহলে প্রথমে তাকে এই কাঁচা আমিকে ছাড়তে শিখতে হবে। স্বামীজী বার বার বলছেন, old man has to die। Old man মানে হল আমি বা আমিত্ব, এই আমিত্বটাকে মারতে হবে। ঠাকুরও বলছেন, আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল। যতক্ষণ এই আমিত্ব না যায়, জগতে আমরা কিছুই করতে পারব না। আমরা যখন পড়াশোনা করি, সেখানেও তখন আমি লেগে আছে, আমাকে পাশ করতে হবে, আমাকে সাফল্যের চূড়ায় উঠতে হবে। মূল কথা আমিটাকে ছাড়তে হবে, আমি ছাড়লে সাফল্য পাওয়ার শক্তি পুরো দমে বেরিয়ে আসবে।

স্বামীজী এই জায়গায় খুব সুন্দর কথা বলছেন, এর আগেও আমরা এই কথা পেয়েছি, আবার উনি বলছেন, The Light Divine within is obscured in most people. It is like a lamp in a cask of iron, no gleam of light can shine through. (*অধিকাংশ ব্যক্তির অন্তরের মধ্যে সেই দিব্য জ্যোতি আবৃত ও অস্পষ্ট হয়ে রয়েছে; যেন লোহার একটা পিপের ভিতর একটা আলো রয়েছে, ঐ আলোর একটি রশ্মিও বাইরে আসতে পারছে না।*) ঠাকুরও প্রায়ই বলতেন, লন্ঠনে আলো আছে, লন্ঠনে কাঁচ দেওয়া আছে, সেই কাঁচের উপর আরও কিছু আবরণ চাপিয়ে দেওয়া আছে। ফলে লন্ঠনের আলো খুব ক্ষীণ ভাবে আসছে।

নির্বাণ অবস্থা প্রাপ্তির জন্য চাই নিঃস্বার্থপরতা ও পবিত্রতার অনুশীলন

স্বামীজী বলছেন, Gradually, by purity and unselfishness we can make the obscuring medium less and less dense, until at last it becomes as transparent as

glass. (*একটু একটু করে পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থপরতা অভ্যাস করতে করতে আমরা ঐ মাঝের আড়ালটাকে ক্রমশঃ পাতলা করে ফেলতে পারি। অবশেষে সেটা কাচের মত স্বচ্ছ হয়ে যায়।*) লন্ঠনের কাচে ধুলো বা কালি জমে আছে, ওই কালিটা পরিষ্কার করতে শুরু করে দিলেই হল। পরিষ্কার কিভাবে হয়? পবিত্রতা দিয়ে। পবিত্রতা জিনিসটা কি? নিঃস্বার্থপরতা। আমিত্বের ত্যাগ, আমিত্বের ত্যাগটাই পবিত্রতা। ছোটবেলা থেকে আমাদের কত রকম উপদেশ দেওয়া হয়, 'সত্য কথা বলিবে', অথচ শ্রীকৃষ্ণ সারা জীবন মিথ্যা কথাই বলে গেলেন। 'পরস্ত্রীর দিকে তাকাইবে না', শ্রীকৃষ্ণ যে মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে, তাকে অপহরণ করে নিয়ে চলে গেলেন। বারো বছর বয়স থেকে অপরের স্ত্রীদের নিয়ে খেলা করেছেন। 'চালবাজি করিবে না', মহাভারতের যুদ্ধে শুধু চালবাজিই করে গেলেন। তাহলে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান কেন? কারণ এগুলো হল কাহিনী, কাহিনী দিয়ে একটা সত্যকে সামনে নিয়ে আসা হচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণের আমিত্বটা কোথাও নেই। শ্রীকৃষ্ণের জীবন আর তাঁর বাণী এক, গীতায় বলছেন, কাজ করতে থাক আর নিষ্কাম থাক। নিষ্কাম থাকা মানে, আমিত্বটাকে কোথাও ঢুকতে না দেওয়া। আমাকে এটা করতে হবে, আমি করছি। দাঁত মাজার সময় কেউ ভাবে না যে, এতে আমার দাঁত ভাল থাকবে, এই হবে, সেই হবে, দাঁত মাজতে হবে তাই মাজছি। ঠিক তেমনি সকালে ঘুম ভাঙা থেকে রাতে শুতে যাওয়া পর্যন্ত যত কাজ আছে সব এই ভাবে করতে হবে, জপ-ধ্যান পর্যন্ত এই ভাবে করতে হবে। আমাকে এটা করতে হবে, আমি করছি, আমি নিষ্কাম, আমার আমিত্ব নেই। এইভাবে যতক্ষণ না কিছু করা হয় ততক্ষণ মানুষের কোন দিন কোন ধরণের উন্নতি হবে না। আমাদের মধ্যে যত আমিত্ব লেগে থাকবে তত আমরা সব ক্ষেত্রে অসফল হব। কেউ হয়ত বলবে, তা কেন, এই যে ফিল্মস্টার, ক্রিকেট প্লেয়াররা এদের মধ্যে এত আমিত্ব থাকা সত্ত্বেও এদের কত নামযশ, অর্থ, প্রতিপত্তি। হ্যাঁ ঠিকই, কিন্তু এদের মধ্যে যাদের আমিত্ব বেশি থাকে, তারা বেশি দূর এগোতে পারে না। কত প্লেয়ার প্রথমের দিকে খুব ভাল খেলছে, কিন্তু কদিন যেতে না যেতেই হারিয়ে যায়। অহঙ্কার, আমিত্ব নিয়ে বেশি দূর এগোতে পারবে না। ভগবান যে ক্ষমতা দিয়ে পাঠিয়েছিলেন, শুধু আমি আমি করে ওই ক্ষমতাকে নষ্ট করে দিয়ে হারিয়ে গেল। যে জীবনে সাফল্য পাচ্ছে না, তার সাথে তুলনা করলে হবে না, সমানে সমানে তুলনা করলে তখন দেখা যাবে, যার মধ্যে আমিত্ব বেশি সে বেশি দূর এগোতে পারবে না।

এই কথা বলার পর স্বামীজী বলছেন, Sri Ramakrishna was like the iron cask transformed into a glass cask through which can be seen the inner light as it is. (*শ্রীরামকৃষ্ণে ঐ লোহার পিপে কাচে পরিণত হয়েছে; তার মধ্য দিয়ে সেই অন্তঃজ্যোতি যথার্থরূপে দেখা যাচ্ছে।*) লন্ঠনের উপর লোহার যে একটা আবরণ দেওয়া আছে, শ্রীরামকৃষ্ণের ওই লোহাটা কাচের মত হয়ে গেছে, সেইজন্য ঠাকুরের মধ্য দিয়ে আমরা সেই দিব্য জ্যোতিকে যথার্থ রূপে দেখতে পাই। ঠাকুরকে যিনি অবতার বলে মনে করেন, তাঁর জন্য ঠাকুর অবতার, আবার যিনি ঠাকুরকে পূর্ণব্রহ্ম রূপে মনে করেন, তাঁর কাছে ঠাকুর সেই পূর্ণব্রহ্ম। কিন্তু ঠিক ঠিক দেখলে, ঠাকুর হলেন সেই আধার, যে আধারের মাধ্যমে ঈশ্বরকে জানা যায়। ঠাকুর নিজেও এই উপমা দিতেন, একটা বিরাট প্রাচীর, প্রাচীরের গায়ে একটা ছিদ্র আছে, সেই ছিদ্র দিয়ে প্রাচীরের ওই পারের অনন্তকে দেখা যাচ্ছে, এক একজন অবতার যেন সেই প্রাচীরের ছিদ্র। আমরাও সবাই ছিদ্র, কারণ সবার ভিতর সেই আত্মাই আছেন, আমার আপনার সবার মধ্য দিয়ে সেই অনন্তকেই দেখা যাওয়ার কথা, কিন্তু ওই ছিদ্রগুলো এত ক্ষুদ্র যে যতই আমি আপনি চোখ লাগাই অনন্তকে আর দেখা যায় না, শুধু অন্ধকার। শেষে কি দেখা যাবে? দেওয়াল, দেওয়াল ছাড়া আর কিছু দেখা যাবে না।

স্বামীজী বলছেন, We are all on the way to become the cask of glass and even higher and higher reflections. (*আমরা সকলেই এইরূপ কাচের পিপে হবার পথে চলেছি—এমন কি, এর চেয়েও উচ্চতর বিকাশের আধার হবো।*) আমরা সবাই এগোচ্ছি, সবাই আমরা লোহার পরিবর্তে কাচ হয়ে যাব, শেষে আমাদের সবার মধ্য দিয়ে সেই সূর্যের প্রতিবিম্ব দেখা যাবে। As long as there is a 'cask' at all, we must think through material means. No impatient one can ever succeed. (*কিন্তু যতদিন পর্যন্ত আদৌ কোন পিপে রয়েছে, ততদিন আমাদের জড় উপায়ের সাহায্যেই চিন্তা করতে হবে। অসহিষ্ণু ব্যক্তি কোন কালে সিদ্ধ হতে পারে না।*) যতক্ষণ এই জগৎ আছে, যতক্ষণ আমাদের মন আছে, ততক্ষণ আমাদের এভাবেই চিন্তা-ভাবনা করতে হবে, তা নাহলে ধর্ম, আধ্যাত্মিকতার কিছুই বোঝা যায় না।

অধৈর্য হলে চলবে না, যে অধৈর্য সে কোন দিন কৃতকার্য হতে পারবে না, ধৈর্য ধরে এই পথে লেগে থাকতে হবে। কঠোপনিষদেও এর উপর একটা খুব নামকরা মন্ত্রে বলছেন, যার চরিত্র এখনও ঠিক হয়নি, যার ইন্দ্রিয় সংযম হয়নি, যার মন একাগ্র হয়নি, তার সাথে যার এগুলো হয়ে যাওয়ার পরে ভাবছে কবে আমার জ্ঞান হবে, কবে আমার সমাধি হবে, এদের কারুরই হয় না। মাছ ধরতে হলে ছিপ ফেলে বসে থাকতে হয়, সেই রকম ঈশ্বরের ক্ষেত্রে সব কিছু ছেড়ে চুপচাপ বসে থাকতে হয়। এই হল ৩০শে জুনের ক্লাশের একটা অংশ।

সিদ্ধান্ত, ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তি

এরপর স্বামীজী সন্ত মহাত্মাদের জীবন নিয়ে বলছেন। দেখাচ্ছেন, সন্ত মহাত্মাদের জীবন যখন মানুষের জীবনে নামে, মানুষ যখন তাঁকে দেখে, তাতে কিভাবে সব কিছু অধোগামী হয়ে যায়। এই অধোগামী হওয়ার জন্য সমাজে অনেক রকম সমস্যার উদ্ভব হয়। ডারউইনের বিবর্তনের থিয়োরীতে দেখানো হচ্ছে পশু থেকে আমরা কিভাবে মানুষ হয়েছি। হয়ত তিনি ঠিক, মানুষকে যদি দেশ ও সমাজের নিয়মকানুনে ধরে না রাখা হয়, কিছু দিনের মধ্যেই মানুষ পশুর মত আচরণ করতে শুরু করে দেবে। সমাজে যদি কোন আদর্শ না থাকে, একটা আদর্শ যদি সমাজকে ধরে না রাখে, সে যে সমাজই হোক, সেই সমাজের পতন হতে শুধু সময়ের অপেক্ষা। বঙ্কিমবাবু ঠাকুরকে যে বলছেন, আহার, নিদ্রা মৈথুন এটাই মানব জীবনের উদ্দেশ্য, তাতে তিনি ভুল কিছু বলছেন না। মানব জাতি এইজন্যই অধোগামী হয়ে যাবে, আর মানবজাতি আর পশুজাতির মধ্যে তফাৎ করা অসম্ভব হয়ে যাবে। আমরা মনে করি আমাদের বুদ্ধি আছে, আমাদের মধ্যে সৃজনশীলতা আছে, আমরা মনের ভাব সুন্দর ভাবে আদানপ্রদান করতে পারি, এই ধরণের হাজারটা কথা বলতে পারি। কিন্তু যদি আমরা এর মূলে যাই, যদি মানুষের ব্যবহারগুলো ভাল করে বিশ্লেষণ করি, দেখা যাবে পশু ও মানুষ, এই দুটো প্রজাতির মধ্যে কোন তফাৎ নেই। যে কোন সমাজে বেশির ভাগ লোকই কোন আদর্শ নিয়ে জীবন-যাপন করে না। মানুষের পক্ষে জীবন যেমন খুব গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তার থাকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল জীবনদর্শন। জীবন হল বেঁচে থাকার লড়াই, আমাকে বেঁচে থাকতে হবে। জীবনদর্শন হল, বেঁচে থাকার থেকে উপরে চলে আসা।

কদাচিৎ কখন দেখা যায় যে, জীবন আর জীবনদর্শনের মধ্যে কোথাও একটা দ্বন্দ্ব এসে যায়। জীবনদর্শনকে নিয়ে চলতে গেলে অনেক সময় হয়ত জীবনটাই চলে যাবে। যেমন গান্ধীজী তাঁর জীবনদর্শন ঠিক করলেন, তিনি সত্যকে ধরে রাখবেন। তার জন্য তাঁকে জেলে যেতে হচ্ছে, তার জন্য তাঁকে পুলিশের লাঠি খেতে হচ্ছে। সক্রেটিস, জীবনদর্শনকে ধরে রাখতে গিয়ে তাঁর জীবনটাই চলে গেল। অন্য দিকে গ্যালিলিও ছিলেন, তিনি টেলিস্কোপ আবিষ্কার করার পর পর্যবেক্ষণ করে দেখছেন পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। এই কথা বলার জন্য চার্চ কর্তৃপক্ষ থেকে তাঁকে ডেকে পাঠানো হল ক্ষমা চাওয়ার জন্য। কারণ খ্রীশ্চানিটি গ্রীক দর্শন ও বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। ধর্মের কোন যুক্তি নেই যে, সে বিজ্ঞান নিয়ে কিছু বলবে, কিন্তু ধর্ম যেমনি ঈশ্বরকে নিয়ে আসে, ঈশ্বরের সৃষ্টিটাও সঙ্গে সঙ্গে চলে আসে। তখন ধর্ম ঈশ্বরের সৃষ্টিকেও ব্যাখ্যা করতে শুরু করে। হিন্দু ধর্মে যে পৌরাণিক ব্যাখ্যাগুলো রয়েছে, সেখানে বিভিন্ন পুরাণে সৃষ্টির ব্যাখ্যা বিভিন্ন ভাবে করা হয়েছে, সৃষ্টির একটা বর্ণনার সাথে আরেকটা বর্ণনার কোন মিল পাওয়া যাবে না। তাতে এটা বোঝা যায় যে, পুরাণ সৃষ্টি নিয়ে যে কথাগুলো বলছেন, সেগুলো খুব আক্ষরিক ভাবে মেনে নেওয়া যায় না। অন্যান্য ধর্ম একটি মাত্র ধর্মগ্রন্থ নিয়ে চলে, একটি মাত্র ধর্মগ্রন্থ থাকার জন্য সেই ধর্মগ্রন্থ যেটা বলছে সেটাকেই মানতে হবে। ঈশ্বরের সৃষ্টির কথা ধর্মগ্রন্থে যিনি বলে গেছেন, তিনি কেন বলেছিলেন, কিভাবে বলেছিলেন, সব ওদেরও জানা নেই, আমাদেরও জানা নেই। এখন সেই ধর্মের অনুগামীরা যদি সেটাকে যথার্থ বলে ধরে নেয়, আর ইতিমধ্যে যদি বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফলে অন্য রকম কোন সৃষ্টিতত্ত্ব এসে যায়, তখন সেই ধর্মের অনেক সমস্যা হয়ে যায়।

ক্লাশ থ্রী ফোরের বাচ্চারাও আজকে জানে পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। কিন্তু গ্যালিলিওর সময় এটাই অসম্ভব ব্যাপার ছিল। আর এই সত্যের আবিষ্কার চার্চের ভিত্তিকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। সমস্যা হল, যখনই বিজ্ঞানের নূতন কিছু আবিষ্কার হচ্ছে, সাথে সাথে যেন চার্চের ভিতটাও নড়ে যাচ্ছে। তারপরেও দেখা যাচ্ছে চার্চ এখনও দাঁড়িয়ে আছে। কারণ চার্চের আসল কাজ হল, মানুষকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান দেওয়া, সেখানে কোন গোলমাল নেই। কিন্তু তারা অপ্রয়োজনীয় ব্যাপারের মধ্যে নাক গলিয়ে সমস্যা তৈরী করে ফেলে। সন্ন্যাসীরাও

যেটা তাঁদের এক্তিয়ার নয়, সেখানে গিয়ে তাঁরা ঘুর ঘুর করছেন, শেখাচ্ছেন ম্যানেজমেন্ট কিভাবে করতে হয়। স্বামীজীকে একজন জিজ্ঞেস করছে, মহাশয়, বিধবা বিবাহ নিয়ে আপনার কি বক্তব্য। স্বামীজী বলছেন, আমি বিধবাও না আর আমাকে বিবাহও করতে হবে না, এই ব্যাপারে আমার কোন বক্তব্যও নেই। আজকের দিনে এসব কথা বলতে গেলে বুদ্ধিজীবিরা মিডিয়ার সামনে এমন গলা ফাটাতে থাকবে আর কি কি যে বলবে কোন ঠিক নেই, কাউকে কিছু বলার সুযোগই দেবে না। আসল কথা হল কেউ এগুলোকে বুঝতে চায় না, একটু গভীরে গিয়ে চিন্তাও করবে না।

এখন গ্যালিলিওকে বলছে, তুমি ক্ষমা চাও। গ্যালিলিও বেচারি আর কি করবেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে লিখে দিলেন, আমি যা বলেছি সব ভুল বলেছি। তাঁকে ওয়ার্নিং দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হল। কোর্ট থেকে তিনি যখন বেরিয়ে আসছেন, তখন উনি ফিস্‌ফিস্ করে বলছেন, আমি যা বলেছি সেটাই কিন্তু সত্য। আর তিনি যখন মারা গেলেন, তাঁকে খ্রীশ্চানদের যেখানে কবর দেওয়া হয় সেখানে কবর দিতে দিল না, কারণ সে ধর্মভ্রষ্ট। উনি কি আর করবেন, উনি জানেন এটাই সত্য, কিন্তু প্রাণের ভয়ে মেনে নিচ্ছেন অন্য রকম। ধর্মের এই সমস্যা গুলো হয়।

কিন্তু যেখানে একটা জীবন-দর্শন থাকে সেখানে মানুষ শ্রেষ্ঠ হয়। সন্ত মহাত্মাদের জীবন-দর্শন এত উচ্চমানের হয় যে, আমরা তখন অবাক হয়ে তাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকি। ওনারা যেমন যেমন জীবন-যাপন করেছেন, সেগুলিকে দেখে আমরা আমাদের জীবনে নামানোর একটু চেষ্টা করি। বলছেন, সিদ্ধ পুরুষদের কাছে যেটা স্বাভাবিক, সাধারণ মানুষ সেটাই সাধনার দ্বারা নিজের জীবনে নামানোর চেষ্টা করে, যাতে জীবনে একটু উপরে উঠতে পারে। যেমন ঠাকুর, ঠাকুর একদিকে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী, অন্য দিকে তিনি ঈশ্বর বই কিছু জানেন না এবং পুরোপুরি ঈশ্বরের দিকে মন দিয়ে রেখেছেন। ঠাকুর বলছেন, আমি ষোল আনা করেছি, তোরা এক আনা কর। তার মানে, ঠাকুরের যে ত্যাগ, ঈশ্বরের প্রতি যে অনুরাগ, মানুষ এটাকে জীবনে যদি নামাতে চায়, সে অতটা পারবে না, একটু চেষ্টা তাকে করতে হবে। কিন্তু সেই চেষ্টাটাও যদি ছেড়ে দেয়, তাহলে তো তার কিছুই থাকল না, ওখানেই তার সব কিছু শেষ।

আমরা যাদের মহাপুরুষ বলে মনে করি, যাঁদের জীবনমুক্ত মনে করছি, তাঁদের জীবনকে নিয়ে একটু বিচার করলে যে কোন মানুষের ক্ষেত্রে তিনটে সত্য এসে যাবে। প্রথম হয় ব্যক্তি, আমি, আপনি সবাই মানুষ। এর থেকে উপরে হয়ে যায় ব্যক্তিত্ব। সমাজে ব্যক্তি আর ব্যক্তিত্ব এই দুটোর মধ্যে বাচ খেলতে থাকে। সমাজে যাঁদের আমরা খুব বড় মনে করি, এনাদের খুব শক্তিশালী একটা ব্যক্তিত্ব থাকে, কারুর প্রতি আকর্ষিত হওয়ার পিছনে ব্যক্তিত্বের প্রভাব খুব কাজ করে। দেখতে সুন্দর, জ্ঞানী, এগুলো ব্যক্তিত্বেরই রূপ। অনেক সময় কোন মানুষকে আমরা জানলাম, জানার পর দেখছি, এর ব্যক্তিত্ব সাধারণ। আবার অনেক সময় কারুর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব দেখে তাঁর কাছে গেলাম, সেখান থেকে ধীরে ধীরে আমরা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসতে শুরু করি। এই দুটোরও উপরে আরেকটা হয় সিদ্ধান্ত, যেটা খুব কম লোকের মধ্যে হয়, এই ধরণের মহাপুরুষরা সিদ্ধান্তকে নিয়ে জীবনধারণ করে থাকেন। তাঁকে যদি ভয় দেখানো হয়, কোন প্রলোভন যদি দেওয়া হয়, কোন পরিস্থিতিতেই তিনি ওই সিদ্ধান্তের সাথে আপোষ করবেন না। এনারা খুবই মুষ্টিমেয় হন, কিন্তু প্রত্যেক সমাজেই, প্রত্যেক যুগেই এই ধরণের একজন দুজন থাকেন।

সিদ্ধান্ত, ব্যক্তিত্ব আর ব্যক্তি এই তিনটে স্তর। ভগবান যীশু বা ভগবান বুদ্ধ, এনারা ব্যক্তিও নন, ব্যক্তিত্বও নন, এনারা হলেন একটা সিদ্ধান্ত। যে কোন সন্ত মহাত্মারা হলেন সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্ত আর ব্যক্তিত্বের মধ্যে অনেক সময় আমাদের সংশয় হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে, ইনি কি ব্যক্তিত্ব না সিদ্ধান্ত। এর পরীক্ষা করার একটা উপায় আছে। ব্যক্তিত্ব মানে তাঁর কিছু গুণ আছে, কিছু গুণ থাকলে সে ব্যক্তিত্ব। কিন্তু গুণ আর সেই ব্যক্তি যদি inter changeable হয়ে যায়, একটা নাম যখন বলা হচ্ছে তখন সে নামটা বলছে নাকি ওই গুণ বলছে, এটাকে যখন তফাৎ করা যায় না, তখন বুঝতে হবে ইনি আর ব্যক্তিত্ব নন, ইনি একটা সিদ্ধান্ত হয়ে গেছেন। যেমন কোন লোক যিনি নিজে অহিংসার অনুশীলন করেন আর অন্যকেও অহিংস নীতির প্রশংসা করে সেই অনুসারে আচরণ করার কথা বলেন; আমরা দূর থেকে তাঁকে দেখলেই বলতে থাকি, 'ঐ যে গান্ধী আসছেন'। গান্ধী আসছেন মানে, গান্ধীজীর নামের সাথে অহিংসাটা এক হয়ে গেছে, উনি এখন গান্ধীবাদী।

গান্ধীজী অনেক কিছুই করতেন, কিন্তু গান্ধীজীকে যখন আমরা কোন কিছুর সাথে এক করি, তখন সাধারণত অহিংসার সাথেই এক করি। একটা বাচ্চা বলছে, আমার মা হলে লেডী হিটলার, মা যদি খুব কড়া হয়ে শাসন করে, বাচ্চারা তাই বলে। হিটলার আর ডিকটেটেরশিপ, এই দুটো যেন সমার্থক। গুণ আর ব্যক্তি inter changeable হয়ে গেছে। হিটলার বলাও যা ডিকটেটেরশিপ বলাও তাই। আবার সিদ্ধান্তের মধ্যে দেখা যায়, কোন মহাপুরুষের যে একটাই সিদ্ধান্ত থাকে, তা না। একটা খুব নামকরা বই আছে, যার নাম Life of Pi, ইদানিং কালের খুব উচ্চমানের বই, আর এর কাহিনীকে নিয়ে সিনেমাও হয়েছে। Life of Piএর যে চরিত্র, একটি বাচ্চা ছেলে, সে কখন হিন্দু ধর্ম, কখন খ্রীশ্চান ধর্ম আবার কখন ইসলাম ধর্ম সবটারই অনুশীলন করছে। তাকে তার বাবা বলছে, আরেক রামকৃষ্ণ পরমহংস এসেছে। বাইরে কোথাও যদি রামকৃষ্ণ বলা হয় তখন এটাকে সব সময় equate করবে সর্ব ধর্মের সাধনার সাথে। কিন্তু ঠাকুরের এই একটাই ছিল না, সর্ব ধর্মের সাধনার বাইরেও তাঁর আরও অনেক কিছু ছিল। শ্রীশ্রীমা বলছেন, ঠাকুর হলেন ত্যাগের বাদশা। ঠাকুর মানে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী। যে কোন ধর্মনেতা হলেন একটা সিদ্ধান্ত।

স্বামীজী এবার বলছেন, Great saints are the object-lessons of the Principle. (*বড় বড় সাধুপুরুষেরা আদর্শ তত্ত্বের দৃষ্টান্তস্বরূপ।*) একটা সিদ্ধান্ত কি হতে পারে, তারই একটা মূর্ত রূপ হলেন যে কোন সন্ত মহাত্মা। যেমন মীরাবাঈ, মীরাবাঈ এই নাম যেমনি কানে যাবে তখনই মনের মধ্যে একটা বৃত্তি উঠবে, যিনি ঈশ্বর-প্রেমে সম্পূর্ণ মগ্ন হয়ে আছেন। এই রকম যে কোন মহাত্মার নাম নিলে কোন না কোন ভাবে দেখা যাবে, তাঁর মধ্যে এমন একটা গুণ আছে, যেটা আর গুণ নয়, তিনি আর তাঁর সেই গুণ এক হয়ে গেছেন। বিশেষ্য বিশেষণ হয়ে গেছে, বিশেষণ বিশেষ্য হয়ে গেছে। যদিও এটাই জীবনের উদ্দেশ্য, ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিত্বে উন্নিত হওয়া, আর ব্যক্তিত্ব থেকে ধীরে ধীরে সিদ্ধান্ত হয়ে যাওয়া। নামটা তাঁর শুধু একটা বিশেষণ হয়ে যাবে, যেটা বিশেষণ সেটা তার নাম হয়ে যাবে। যেমন বলা হল হিটলারাও যা ডিক্টেটরশিপও তাই।

But the disciples make the saint the Principle, and then they fortget the Principle in the person. (*কিন্তু শিষ্যেরা ব্যক্তিকেই আদর্শ বা তত্ত্ব করে তোলে, আর ব্যক্তিকে নাড়াচাড়া করতে করতে তত্ত্বটাই ভুলে যায়।*) স্বামীজীর এটা একটা খুব সুন্দর উক্তি, কিছুদিন পরে দেখা যায় শিষ্যরা গোলমাল করে বসে, সেই সন্তকেই মনে করে ইনি হলেন সিদ্ধান্ত, কিন্তু ওই সন্তের ভিতরে যেটা সত্য ছিল সেটাকেই তারা পরে ধীরে ধীরে ভুলে যায়। এই সমস্যা সমস্ত ধর্ম সম্প্রদায়ে আছে। একজন ঈশ্বর প্রেমে মজে গেছেন, ওই ভাব দেখে মানুষ তাঁর প্রতি আকর্ষিত হয়ে ছুটে আসে। কিন্তু আমাদের মন অতি সাধারণ, ঈশ্বরের প্রতি ওই যে প্রগাঢ় ভালবাসা, ওই ভালবাসাটাই আমরা ভুলে যাচ্ছি। ভুলে গিয়ে আমাদের কাছে এখন ওই সন্তই হয়ে গেলেন সিদ্ধান্ত। কামারপুকুরে ভক্তরা যান, ঠাকুরের জীবনের ঘটনাবলীর সাথে যে যে জায়গা গুলো জড়িয়ে আছে, ওই জায়গাগুলো অবশ্যই একবার দেখতে যাবেন। দু ঘন্টার জন্য কামারপুকুরে যদি গিয়ে থাকেন, তাহলে আর যাই করুন না কেন, সাদা জিলিপি আর সাদা বোঁদে অবশ্যই কিনবেন, কারণ ঠাকুর জিলিপি খেতে ভালবাসতেন, জিলিপির কথা বলেছেন, তাই ঠাকুর মানে হয়ে গেল জিলিপি। শ্রীশ্রীমা যে যে জিনিসগুলির মূর্ত রূপ, পবিত্রতাস্বরূপিণী, মা সকলেরই মা, মা সবারই দোষ ত্রুটিকে ক্ষমা করে আপন করে নিচ্ছেন, মায়ের এই জিনিসগুলোকে আমরা নিতে পারছি না, নেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই। কিন্তু মা, তিনিই এক সিদ্ধান্ত হয়ে গেলেন। তিনি সিদ্ধান্ত হয়ে যাওয়া মানে, তিনি যে যে জিনিসগুলো করতেন, আমরাও সেই সেই জিনিসগুলোকে করতে নেমে যাচ্ছি। মঠ মিশনে প্রচুর কাজ কর্ম হচ্ছে ঠিকই, প্রচুর বইপত্র ছাপা হয়ে গেছে, কিন্তু ঠাকুরের ধর্ম এখনও শুরুই হয়নি। আসলে যে কোন অবতারের ধর্ম শুরু হতে খুব কম করে পাঁচশ বছর সময় দিতে হবে।

যখন দেখা যাবে ধীরে ধীরে জপ-ধ্যান-তপস্যা এগুলো থেকে মন সরে গিয়ে শ্রীমা তেলেভোল মাঠে কি করেছিলেন, ঠাকুর ওই সময় কি করেছিলেন এসবে নেমে গেছে, তখন বুঝতে হবে আমরা সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছি। এখান থেকেই যে কোন ধর্মের পতন হতে শুরু হয়। একজন মহাপুরুষের জীবনের যে সিদ্ধান্ত, জীবনের যেটা মূলাধার, জীবনের সেই সঙ্গীত, যে সঙ্গীতকে কেন্দ্র করে সমস্ত বাদ্যযন্ত্র বাজছে, সেটাকেই মানুষ ভুলে যায়। কারণ সাধারণ মানুষের সূক্ষ্ম জিনিস নেওয়ার ক্ষমতা নেই, তাই স্থূল জিনিসকে নিয়েই মাতামাতি

করে, আর এইভাবে একজন মহাপুরুষ সিদ্ধান্ত হয়ে যান। মানুষ মনে করে, ঠাকুর বা অন্যান্য সিদ্ধ পুরুষরা যেভাবে ওঠাবসা করতেন, ওনারা যেভাবে কথা বলতেন, চলাফেরা করতেন ইত্যাদি, আমিও যদি ওইভাবে করি তাহলে আমিও একদিন ওই অবস্থায় পৌঁছাতে পারব। এখানে আমাদের কারুর কিছু করার নেই, সমস্ত ধর্ম এভাবেই চলে। কিন্তু এর ফলে মূল সিদ্ধান্ত থেকে সরে গেল। একজন মানুষ সিদ্ধান্ত থেকে নেমে গেল ব্যক্তিত্বে, আরও বাজে, ব্যক্তিত্ব থেকে নেমে গেল ব্যক্তিতে। ব্যক্তিতে নেমে যাওয়ার পর এবার তার হাজারটা জিনিস সামনে এসে যাবে, সিদ্ধান্তে বেশি জিনিস থাকবে না। মীরাবাঈয়ের উপমা যদি নেওয়া হয়, মীরাবাঈয়ের একটাই সিদ্ধান্ত, ঈশ্বরের প্রেমে মজে যাওয়া, কিন্তু যেমনি মীরাবাঈ ব্যক্তি রূপে নেমে গেলেন এবার হাজার রকমের ঘটনা চলে আসবে। কেউ হয়ত মীরাবাঈয়ের চারটে ঘটনাকে নিয়ে একটা আলাদা সম্প্রদায় বানিয়ে দেবে। তারপর আরেকজন এসে মীরাবাঈয়ের অন্য জিনিসগুলোকে দেখবে, সেগুলোকে নিয়ে সেও আলাদা আরেকটা সম্প্রদায় বানিয়ে নেবে। ফলে আজ হিন্দুদের হাজার হাজার সম্প্রদায়, মুসলমাদেরও হাজার হাজার সম্প্রদায়, খ্রীশ্চানদেরও হাজার হাজার সম্প্রদায়, বৌদ্ধদেরও তাই। এর কারণ হল, সিদ্ধান্ত ছেড়ে ব্যক্তিতে নেমে গেছে, এই সমস্যা শুধু একটি ধর্মে নেই, সব ধর্মেই আছে।

ভগবান বুদ্ধ এবং ভারতে মূর্তিপূজার প্রভাব

এরপর স্বামীজী ভগবান বুদ্ধকে নিয়ে কিছু কথা বলছেন। স্বামীজী যে সময় থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে ছিলেন, সেই সময় আমেরিকার লোকেরা হিন্দু ধর্মকে যত না জানত, তার থেকে বেশি বৌদ্ধ ধর্মকে জানত। পল ক্যারাস্ বলে একজন ছিলেন, তাঁর লেখা বই ভগবান বুদ্ধের জীবনী খুব নাম করেছিল। হিন্দুদের কিছু কিছু গ্রন্থ সেই সময় ছিল, কিন্তু হিন্দুদের মূল গ্রন্থ বেদ, উপনিষদ, গীতাকে ধারণা করা অত্যন্ত কঠিন, খুব বৈদিক সংস্কৃতিমনস্ক না হলে এবং ভাল সংস্কৃত না জানা থাকলে মানুষ বেদ, উপনিষদের কথাগুলো ধারণা করতে পারবে না। বেশির ভাগ হিন্দুরাই বেদ উপনিষদ গীতা ধারণা করতে পারে না, সেখানে বিদেশীরা কি করবে! সেইজন্য স্বামীজী যখনই আমেরিকাতে কোথাও ধর্ম আলোচনা করতেন, প্রায়ই দেখা যেতে যে তিনি ভগবান বুদ্ধের মধ্যে ঢুকতেন, তা নাহলে যীশুর মধ্যে ঢুকতেন। এখানে এবার স্বামীজী হিন্দু ধর্ম ও ভগবান বুদ্ধকে একটা মঞ্চে এনে কিছু জিনিসের আলোচনা করছেন। The result of Buddha's constant inveighing against a personal God was the introduction of idols into India. (*বুদ্ধ সগুণ ঈশ্বর-ভাবকে ক্রমাগত আক্রমণ করেছিলেন বলেই ভারতে প্রতিমা-পূজার সূত্রপাত হল।*) ভগবান বুদ্ধ হিন্দুদের দেবী দেবতার বিরুদ্ধে এত কথা বলেছিলেন যার ফলে হিন্দুদের মধ্যে মূর্তি পূজা শুরু হয়ে যায়। এটা খুবই পরিহাসের যে, ভগবান বুদ্ধ দেবী দেবতার বিরুদ্ধে বললেন, কিন্তু হিন্দু ধর্মে শুরু হয়ে গেল মূর্তি পূজা। ভারতবর্ষে আগে মূর্তি পূজা ছিল না, মোটামুটি বৌদ্ধ ধর্ম আসার পর থেকেই ভারতে মূর্তি পূজা শুরু হয়।

In the Vedas they knew them not, because they saw God everywhere, but the reaction against the loss of God as Creator and Friend was to make idols, and Buddha became an idol – so too with Jesus. (*বৈদিক যুগে প্রতিমার অস্তিত্বই ছিল না, তখন লোকে সর্বত্র ঈশ্বর দর্শন করত। কিন্তু বুদ্ধের প্রচারের ফলে আমরা জগৎস্রষ্টা ও আমাদের সখা ঈশ্বরকে হারালাম, আর তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ প্রতিমাপূজার উৎপত্তি হল। লোকে বুদ্ধের মূর্তি গড়ে পূজা করতে আরম্ভ করল। যীশুখ্রীষ্ট সম্বন্ধেও তাই হয়েছে।*)

স্বামীজীর এই বক্তব্যের উপর আমাদের আলোচনা করে দেখতে হবে, স্বামীজী মূলতঃ কি বলতে চাইছেন। দেববাণীর আলোচনার শুরুতে বেদের দর্শনকে নিয়ে সামান্য একটু আলোচনা করা হয়েছিল, সেখানে এও আলোচনা করা হয়েছিল যে, ধর্মগ্রন্থ কিভাবে সৃষ্টি হয়। একটা কথা আমাদের অনেকবার বলতে হচ্ছে, তা হল, মানুষ যখন কর্মের জগৎ ছেড়ে শব্দের জগৎ ছেড়ে মৌন অবস্থায় প্রবেশ করে মন তখন শান্ত হয়ে যায়, আর তখনই উচ্চমানের কবিতা তৈরী হয়, উচ্চমানের চিন্তন আসে। মানুষ যখন ওই মনের জগৎকেও শান্ত করে দেয়, মনের জগৎটাও শান্ত হয়ে আসে, তখন সৃষ্টি ও স্রষ্টাকে নিয়ে যে সত্যগুলো আছে, সেই সত্যগুলো সামনে ভেসে ওঠে। কথামৃতে আমরা ঠাকুরের যে কথাগুলো পড়ি, সেগুলো যে ঠাকুরের শোনা কথা, চিন্তা-ভাবনার কথা, তা কিন্তু নয়। ঠাকুর ধ্যানের গভীরে গিয়ে, যাকে মাস্টারমশায় সমাধি-মন্দির বলছেন, সমাধির অবস্থায়

যে সত্যগুলোকে প্রত্যক্ষ করেছেন, সেগুলোকে তিনি শব্দের মাধ্যমে রেখেছেন। যে জিনিসগুলো ঠাকুর সমাধিতে দেখেছিলেন, সেই জিনিসের সব কিছু শব্দে দেওয়া যায় না। একদিন যেমন ঠাকুর ভক্তদের বলছেন, আজ আমি তোমাদের সব কথা বলব। তখন তিনি বলতে লাগলেন, কিভাবে কুণ্ডলিনী ওঠে, বলতে বলতে তিনি চুপ করে গেলেন। তারপর বলছেন, কে যেন আমার মুখ চেপে ধরেছে। তার মানে, সব কথা বলা যায় না। কিন্তু যে সত্যগুলোকে আমি জানি, সেগুলোকে কোন না কোন ভাবে সামনে রেখে দেওয়া যায়।

আট হাজার, দশ হাজার বছর আগে যে ঋষিরা ছিলেন, তাঁদের কে অবতার ছিলেন, কে ছিলেন না, আমাদের জানা নেই। অনেকে বলতে পারেন, আপনি ঋষি ঋষি কেন বারবার বলে যাচ্ছেন। কারণ বর্তমানে অবতার তত্ত্ব যেমন সবার কাছে পরিষ্কার, সেইভাবে বেদের সময় অবতারের ধারণা ছিল কিনা আমাদের জানা নেই, যেহেতু কাউকে সেভাবে তুলে ধরা হয়নি। তবে ভাগবতে যেখানে অবতার তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয় সেখানে কপিল মুনিকে অবতার রূপে গ্রহণ করা হয়েছে, সেইভাবে ব্যাসদেবকেও অবতার রূপে গ্রহণ করা হয়। বেদের সব ঋষিরা অবতার ছিলেন না, এটা সরাসরি বলা যায় না। ইসলামে প্রফেট মহম্মদকে বলছেন আল্লার দূত, পয়গম্বর। ঋষিদেরও সেইভাবে দেখা যায়, যাঁদের মাধ্যমে ঈশ্বরীয় কথাগুলো আমাদের কাছে এসেছে। কিন্তু পরে পরে ভারতবর্ষে যে প্রজন্ম এসেছেন, তাঁরা দেখছেন, যাঁদের মুখ থেকে ঈশ্বরীয় কথা আসছে, তাঁরা এত উচ্চমানের যে, তাঁদের অবতার ছাড়া কিছু ভাবাই যায় না।

দ্বিতীয় আরেকটা ব্যাপার হল, অবতার আর একজন মহাত্মা বা সাধুপুরুষদের মধ্যে একটা বড় তফাৎ আছে। যে কোন মহাত্মা বা সাধুপুরুষ ইচ্ছা করলেই কাউকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান দিয়ে দিতে পারবেন না। অবতার পুরুষরা দিতে পারেন। অবতার যদি ইচ্ছা করেন, সূক্ষ্ম শরীরে একসাথে অনেক মানুষকে, যে কোন একজন মানুষকে, যেখানে খুশি, যে কোন সময়ে দর্শন দিতে পারেন। আমরা যাঁদের ঋষি বলে যাচ্ছি, এনাদের মধ্যে কেউ অবতার ছিলেন কিনা আমাদের জানা নেই, কারণ কোন রেকর্ড নেই। আমাদের পূর্বজরা বলেন, সমস্ত বেদ ঈশ্বরের নিঃশ্বাস থেকে বেরিয়েছে, কারণ এই কথাগুলো মানুষের কথা নয়। কোন মানুষ চিন্তা ভাবনা করে এই উচ্চস্তরে নিয়ে আসতে পারে না, দ্বিতীয় কথা যদি নিয়েও আসে, সে ওই সম্মান পাবে না।

আমরা আগে অনেকবার আলোচনা করেছি, এর পরেও অনেকবার আলোচনা করা হবে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাস দেবদাস, যার তিনবার চারবার নাকি সিনেমা হয়েছে। একই সিনেমা মানুষ কতবার দেখবে? একবার, দুবার, খুব জোর তিনবার দেখবে। দেবদাস কতবার পড়বে? একবার পড়বে, দ্বিতীয় বার পড়বে, তারপর একটা গ্যাপ্ দিতে হবে, হয়ত পাঁচ সাত বছর পর আবার পড়বে। রবীন্দ্রনাথের গান 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল'রে', খুব বিখ্যাত গান, যে গান গাইতে ভালবাসে সেই মানুষ দিনে কবার এই গান গাইবে? একবার দুবার, তিনবার গাইবে। আর সে যদি হারমোনিয়াম নিয়ে সারাদিন একলা চলরে গাইতে থাকে, বাড়ির লোক বিরক্ত হয়ে তাকে বাইরে বার করে দিয়ে বলবে, তুমি একলা থাকো গিয়ে। অথচ পাশের মন্দিরে, সারাদিন হরিনাম হচ্ছে, হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে সারাদিন হয়েই যাচ্ছে, প্রচুর লোক গিয়ে শুনছে। রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাত হয় বলে বিরক্ত হয় ঠিকই, কিন্তু একঘেঁয়ে হচ্ছে না। আর যাঁরা মন্ত্রদীক্ষা নিয়েছেন, কিছু কিছু ভক্ত আছেন দিনে পাঁচ ছয় ঘন্টা করে জপ করেন, অনেক মহারাজ আছেন সারাদিনে বারো থেকে চোদ্দ ঘন্টা জপ করেন। তবে যাঁরা খুব নামকরা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের শিল্পী, তাঁরা দিনে গড়ে ষোল ঘন্টা করে রেওয়াজ করেন, এটা অবশ্য খুব উচ্চমানের জিনিস, এটাও একটা সাধনা। কিন্তু যতই উচ্চমানের কবিতা হোক, যতই উচ্চমানের নাটক হোক আর যত উচ্চমানের সাহিত্য হোক, সর্বক্ষণ ওর মধ্যে থাকা যায় না। কিন্তু যাঁরা জপ করছেন, ওই একই মন্ত্র চার ঘন্টা, বারো ঘন্টা জপ করেই যাচ্ছেন তো যাচ্ছেন, আর দিনের পর দিন, বছরের পর বছর। আমেরিকাতে একজন আশ্রমে গিয়ে দীক্ষা নিয়েছে। আমেরিকাতে ওদের সব কিছুই instant চাই, চটপট পেতে হবে। দীক্ষা নেওয়ার তিন মাস পর আশ্রমে গিয়ে গুরুকে বলছে, Swami, I have practiced three months but your mantra is not working, give me other mantra। গুরু তাকে বলছেন, আমিতো ভাই চল্লিশ বছর ধরে এই মন্ত্রই অনুশীলন করে যাচ্ছি। চল্লিশ বছর এক মন্ত্র নিয়ে সাধনা করে যাচ্ছে, ওদের এটা মাথাতে ঢুকতেই চায় না, ওদের সব কিছু সঙ্গে সঙ্গে

চাই। খুব উচ্চ মন ও সাত্ত্বিক হলেই ওই একটা মন্ত্র নিয়ে দিনের পর দিন, ঘন্টার পর ঘন্টা সাধনা করে যেতে পারে। উচ্চমানের আধ্যাত্মিক জ্ঞান আর উচ্চমানের সাহিত্য বা জাগতিক জ্ঞানে এই একটা বিরাট তফাৎ।

আধ্যাত্মিক সত্য আমাদের কখন একঘেঁয়ে লাগবে না। কথামৃত আমরা পড়তেই থাকি, বছরের পর বছর পড়তেই থাকি। হিন্দী বেল্টের লোকেরা বংশ পরম্পরায় রামচরিতমানস পড়েই যাচ্ছে, কখনই তাদের একঘেঁয়ে লাগে না। ঋষিরা যে মন্ত্রগুলো নিয়ে এলেন, কোথাও গভীর থেকে এমন একটা কিছু নিয়ে এসেছেন, যার জন্য ভারতের অধিকাংশ মানুষ গায়ত্রী মন্ত্র জপ করেই যাচ্ছে। গায়ত্রী মন্ত্র যদি চিন্তন করার বিষয় হত, তাহলে এতদিন চলত না, কবেই হারিয়ে যেত। কিন্তু এমন একটা আধ্যাত্মিক শক্তি আছে বলেই লোকেরা আজও গায়ত্রী মন্ত্রকে ধরে আছে। ঠাকুর অনেকগুলো আধ্যাত্মিক সত্যকে বোঝানর জন্য গল্পের আশ্রয় নিলেন, ভগবান বুদ্ধ অনেকগুলো কাহিনীর আশ্রয় নিলেন, যীশুও অনেক কাহিনীর আশ্রয় নিলেন। কথামৃতে ঠাকুরের কাহিনীগুলোর যেন একটা নূতনত্ব আছে, কাহিনীগুলো অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। সত্যিই এটা খুবই আশ্চর্যের, কি করে হল আমাদের জানা নেই। সাহিত্যের দিক থেকে দেখলেও এর একটা বিশেষ সম্মান আছে। ঠাকুর, যীশু, বুদ্ধ, এনারা যেভাবে আধ্যাত্মিক সত্যকে সামনে নিয়ে আসার জন্য যেভাবে কথা ও কাহিনীর আশ্রয় নিলেন, বেদের ঋষিরা আধ্যাত্মিক সত্যকে বোঝানর জন্য দেবী, দেবতা, স্বর্গ, এগুলোর সাহায্য নিলেন। এর মধ্যে দোষের কিছু নেই। বেদের পুরুষসূক্তমে বলছেন, ভগবানের মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, ভগবানের পা থেকে শূদ্র বেরিয়েছে। আসলে ঋষিরা বলতে চাইছেন, সৃষ্টিতে সব কিছু ঈশ্বর থেকেই বেরিয়েছে, ঈশ্বরের বাইরে কেউ নেই, কোন কিছু নেই। জহুদিদের ধর্মে বলছে, ভগবান মানুষ বানালেন, মানুষ বানিয়ে তার মধ্যে ফুঁ দিয়ে নিজের স্পিরিট মানে আত্মা দিয়ে দিলেন। এরপর মানুষের বুকের হাড় চিড়ে, তাই দিয়ে নারী সৃষ্টি করলেন। তার মানে, মেয়েরা নিকৃষ্ট হয়ে গেল, নারী ভগবানের সৃষ্টি না। বিশ্বে পুরো সেমেটিক ধর্ম সব সময় মেয়েদের নিকৃষ্ট মনে করে, আর গালাগাল দিয়ে হিন্দুদের বলে, তোমাদের ধর্মে বৈষম্য দোষ আছে। বৈষম্য দোষ তোমাদেরই আছে। তোমাদের কাছে ভগবান একমাত্র মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু বাকিদের কে সৃষ্টি করলেন? এমনকি নারীজাতি, যাদের থেকে মানুষ জন্ম নিচ্ছে, তারা হয়ে গেল নিকৃষ্ট। ঋষিরা কখনই এই ধরণের উদ্ভট কথা বলতে যাবেন না, এনারা কখনো আখ্যায়িকা দিয়ে, কখনো উপমা দিয়ে, কখনো দেবী দেবতাদের এনে বার বার বোঝানর চেষ্টা করছেন, ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই।

দ্বিতীয়, সৃষ্টিতে যাবতীয় যা কিছু আছে, সব ঈশ্বর থেকে বেরিয়েছে। মানুষ এটা নিতে পারে না, মানুষ দেখছে তফাৎ, বৈষম্য দোষ মানুষের মধ্যেই রয়েছে। ঠাকুরকে একজন বলছেন, মশাই, ঈশ্বরের বৈষম্য দোষ আছে। ঠাকুর প্রচণ্ড রেগে গেছেন, তোমার বেণে বুদ্ধি বলে ঈশ্বরের মধ্যেও বৈষম্য দোষ দেখছ। হিন্দু সমাজে জ্ঞান সবার উপরে, তাই বলছেন, ভগবানের মুখ থেকে বেরিয়েছে। এটাকে কেউ প্রমাণ করতে বলছে না, বলতে চাইছেন, সৃষ্টিতে সব কিছু ভগবান থেকেই বেরিয়েছে। একটু আগে যেটা বলা হল, মানুষ সিদ্ধান্তকে ভুলে যায়, থেকে যায় ব্যক্তিতে, মাঝখান থেকে মানুষ ভুলে গেল এই সিদ্ধান্তকে যে, ঈশ্বর থেকেই সব কিছুর সৃষ্টি, তার জায়গায় থেকে গেল দেবী দেবতা। ঋষিরা ইন্দ্র, মিত্র, অগ্নি, বরুণ আদি বিভিন্ন দেবী দেবতাদের এই জন্যই নিয়ে এসেছিলেন যে, অনন্তের উপর যেন দেবতাদের একটা মুখোশ লাগিয়ে দিলেন, যেটা দিয়ে মানুষ অনন্তকে বুঝতে পারে। কিন্তু মানুষ সিদ্ধান্তকে ভুলে গেল, থেকে গেল ব্যক্তি।

ভগবান বুদ্ধ এসে এই দেবী-দেবতা এবং দেবী-দেবতাদের নিয়ে যত রকম কর্মকাণ্ড তখন সমাজে চলছিল, সব জিনিসগুলোর বিরোধিতা করতে শুরু করলেন। আসলে বৌদ্ধ ধর্মে নূতন কিছু বলছে না, লোকেদের এটা বোঝানও যায় না, একটু গভীরে গেলে বোঝা যায়। হিন্দুদের বেদ ছিল সর্বোপরি, বেদের দেবী দেবতারা সর্বোপরি, বেদের যজ্ঞ সর্বোপরি। কিছু ঋষিরা দেখলেন, এই যে এত যজ্ঞ, এত দেবী-দেবতা, এগুলো বেকার, আত্মজ্ঞানটাই শ্রেষ্ঠ। যে কোন উপনিষদ নিলে দেখা যাবে, সব উপনিষদই কর্মের নিন্দা করছে, যজ্ঞের নিন্দা করছে, আর দেবী দেবতাদের কোন দাম নেই। বৈদিক সময়ে সমস্যা যেটা ছিল, তা হল, উপনিষদের ঋষিরা হয় জঙ্গলে থাকতেন, নয়ত গুহায় থাকতেন, কদাচিৎ কখন দু চারজন শিষ্যদের নিয়ে থাকতেন। গৃহস্থদের সাথে তাঁরা বেশি মেলামেশা করতেন না, ভিক্ষা নিতে গিলে ভিক্ষাটুকু নিয়ে চলে আসতেন। ভগবান বুদ্ধ হলেন ঠিক ঠিক ঋষি পরম্পরার মানুষ, বিশেষ করে উপনিষদের যে ঋষিরা ছিলেন,

সেই পরম্পরার লোক। তফাৎ হল, ভগবান বুদ্ধ জঙ্গলে থাকলেন না, গুহায় থাকলেন না, না থেকে তিনি সমাজে ফেরত চলে এলেন। ভগবান বুদ্ধ নূতন কথা কিছু বলেননি, যেটা আমাদের উপনিষদে নেই। বিদেশী গবেষকরা আমাদের সংস্কার, রীতিনীতি কিছুই জানে না, ওরা বলছে, ভগবান বুদ্ধ নাকি আমাদের শিক্ষা দেওয়ার পর উপনিষদ আদি সব বেরিয়েছে। ইদানিং ধীরে ধীরে ওদের মত পাল্টাচ্ছে।

গীতাতে ভগবান বলছেন, *ত্রৈগুণ্যাবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন*, বেদ সত্ত্ব, রজো ও তমের মধ্যে আবদ্ধ, এর বাইরে তুমি যাও। ভগবান বুদ্ধও এটাই বলছেন, তুমি এখান থেকে বেরিয়ে এসো। সমস্যা হল, যেখানে উপনিষদে কর্মের নিন্দা করা হয়েছে, আবার যেখানে অধিকারী ভেদ করা হয়েছে, সবাই এই উচ্চ জ্ঞানের অধিকারী নয়; সাধারণ মানুষ বেদের যজ্ঞাদি নিয়েই থাকবে, উচ্চ মনের যারা তারা ধ্যান ধারণাদি নিয়ে থাকবে; ভগবান বুদ্ধ এসে এই ভেদটাকে মিটিয়ে দিলেন, এই উচ্চতম জ্ঞানের দরজা সবার জন্য খুলে দিলেন। কিন্তু মানুষ কোন দিন সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকতে পারে না। বৌদ্ধরা তখন কি করলেন, এতদিন ধরে যে বেদের সিদ্ধান্তগুলি চলে আসছিল, সেগুলোকে ভুলে গিয়ে ভগবান বুদ্ধকেই একজন ভগবান বানিয়ে দিল। দেবী দেবতা আর যজ্ঞাদি সব উড়ে গেল, উড়ে গিয়ে শুধু একটা মূর্ত কিছুকে ধরে নিল।

স্বামীজী এই ভাবটাই এখানে বলছেন, The result of Buddha’s constant inveighing against a personal God was the introduction of idols into India., ভগবান বুদ্ধের শিক্ষা যেখানে রয়েছে, সেখানে তিনি ক্রমাগত এই জিনিসগুলি বলে গেছেন। ওনার ছিল, তুমি নিজেকে বাঁচাও, নিজের জ্ঞান প্রাপ্তির চেষ্টা কর। মূর্তি পূজা ভারতে আগে ছিল না, কারণ বলছেন, they saw God everywhere, বেদের যে কোন সূক্তে এই একটা জিনিসের উপর বার বার জোর দিয়ে বলছেন, ঈশ্বর সব রূপে আছেন। স্বামীজী বলছেন, but the reaction against the loss of God as Creator and Friend was to make a idols, ঋগ্বেদের প্রচুর মন্ত্র আছে, যেখানে ভগবানকে বিভিন্ন রূপে দেখা হয়েছে, ভগবানকে বন্ধু রূপে দেখছেন, পিতা রূপে দেখা হয়েছে, ভগবানকে ত্রাতা রূপে দেখা হচ্ছে, ভগবানকে প্রেমিক রূপে দেখা হচ্ছে, এমন কোন সম্পর্ক নেই যেটা দিয়ে ভগবানকে দেখা হচ্ছে না। পরে ভাগবতে ওই সম্পর্কগুলি নিয়ে আসা হয়েছে, প্রেমিকের সম্পর্ক নিয়ে আসা হয়েছে, সন্তানের সম্পর্ক নিয়ে আসা হয়েছে, শক্তি মতে আবার মায়ের সম্পর্ক নিয়ে আসা হয়েছে। এই সমস্ত সম্পর্ককে ভগবান বুদ্ধ এক ধাক্কায় উড়িয়ে দিলেন। মানুষ যেখানে একটা কোন সম্পর্ক দিয়ে ভগবানকে দেখার চেষ্টা করত, সেটাকেই ভগবান বুদ্ধ উড়িয়ে দিলেন। ইন্টারনেটে একটা ছবি এসেছে, যেখানে একটা দু বছরের বাচ্চা তার মাকে আবীর মাখাচ্ছে। নীচে একটা কমেন্ট এসেছে, তাতে বলছে, আহা! কৃষ্ণ যেন মা যশোদাকে রঙ লাগাচ্ছে। আমাদের ভারতবর্ষের এই ভাবটাই ছিল, বাচ্চা ছেলে যেন বালকৃষ্ণ, প্রেম যখন করছে, যেন শ্রীকৃষ্ণের সাথে প্রেম করছে। এই ছিল আমাদের ভাব, আমার যার সাথে যা সম্পর্ক, সমস্ত সম্পর্কের মধ্যে সেই ঈশ্বর। ভগবান বুদ্ধ সেটাকে ভেঙে দিলেন, এখন সমস্ত হিন্দু যে বৌদ্ধ হয়ে গেল, তা তো হয়নি, কিন্তু প্রভাব তো পড়ল। মানুষ তখন কি নিয়ে থাকবে, ভালবাসা কোথায় দেবে, শেষে সবাই মূর্তি পূজাতে নেমে গেল, and Buddha became an idol, ভগবান বুদ্ধ নিজেই হয়ে গেলেন একটা idol। তখনকার দিনের ঐতিহাসিকরা বলতেন, ভারতে প্রথম মূর্তি পূজা ভগবান বুদ্ধকে দিয়েই শুরু হয়।

যীশুখ্রীষ্টের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আরও মজার। জহুদিদের ধর্ম খুব প্রাচীন ধর্ম, ওরা ছিল পৌত্তিলক পূজারী, আর তাদের শত শত দেবী দেবতা ছিল। পরে ওনাদের পরম্পরায় এলেন এ্যব্রাহম, তাঁর প্রতি ঈশ্বরের কৃপা হয়, ঈশ্বরের প্রতি তাঁর ভক্তি হল। এ্যব্রাহামের বাবার একটা দোকান ছিল, যেখানে দেবী দেবতাদের মূর্তি বিক্রি হত। একদিন বাবা যখন ছিল না, তখন উনি একটা বড় সড় দেবতাকে রেখে, একটা হাতুড়ি দিয়ে বাকি সমস্ত দেবী দেবতার মূর্তি ভেঙে দিলেন। বাবা এসে ছেলেকে জিজ্ঞেস করেছে, কি করে এই কাণ্ড হল। এ্যব্রাহাম বাবাকে তখন বলছেন, ওই যে বড় দেবতাটা আছেন, উনি বাকি সব দেবতাকে চুড়মার করে দিয়েছেন। সেখান থেকে জহুদিরা হয়ে গেলে মূর্তি পূজার বিরোধী। ওই পরম্পরার সাথে সংযোগ থাকার জন্য ইসলামেও তাই মূর্তি পূজা নেই। খ্রীশ্চানিটি যখন পরে জুদাইজিমের অনেক কিছুকে নিয়ে আন্দোলন করেছে, তখন মানুষ নিয়ে তো নিল, কিন্তু সিদ্ধান্তকে ধরে রাখতে পারল না, ফলে খুব সহজেই ওরা যীশুরই প্রতিমা

বানিয়ে দিল। ওদের পরম্পরাতেই মূর্তি পূজা নেই, জিউসদের মূর্তি পূজা নেই, ইসলামে মূর্তি পূজা নেই, মাঝখান থেকে খ্রীশ্চানদের পুরোদমে মূর্তি পূজা শুরু হয়ে গেল। সেইজন্য সিদ্ধান্ত যেখানে থাকে, সেখানে প্রচলিত প্রথাগুলিকে নিয়ে বেশি নাড়াচাড়া করতে নেই। গীতায় বলছেন, *ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্*, সাধারণ মানুষের বুদ্ধিভেদ করতে নেই।

মূর্ত রূপ ছাড়া মানুষ চলতে পারে না

স্বামীজী তখন বলছেন, The range of idols is from wood and stone to Jesus and Buddha, but we must have idols. (*কাঠ-পাথরের পূজা থেকে যীশু-বুদ্ধের পূজা পর্যন্ত –সবই প্রতিমা পূজা, কিন্তু কোন না কোনরূপ মূর্তি ব্যতীত আমাদের চলতে পারে না।*) মানুষ সব সময় মূর্ত কিছুকে খোঁজে, সূক্ষ্ম জিনিসকে নিয়ে থাকতে পারে না। সেইজন্য মানুষ কোন না কোন ভাবে মূর্তি পূজা করবেই। স্বামীজী যখন বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা দিচ্ছেন, তিনি তখন সেখানে ইসলামেরও কিছু কথা নিয়ে আসছেন, জিউসদেরও অনেক কথা নিয়ে আসছেন। যেমন ইসলাম মূর্তি পূজা করে না, কিন্তু মক্কায় হজ করতে যায়। সেখানে কাবার পরিক্রমা করে, এগুলোও এক ধরণের মূর্তি পূজারই নামান্তর। এটা ওরা বুঝবেও না, বুঝলেও মানবে না। যখনই কোন জিনিস, কোন শহর, কোন কিছুকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় আচরণ করা হয়, তখনই সেটা মূর্তি পূজা হয়ে যায়। ওরা হিন্দুদের বলে পৌত্তলিক, জানে না যে ওরা নিজেরাই পৌত্তলিক। অন্যান্য ধর্মের যে পৌত্তালিকতা, সেটা আরও জঘন্য। আমেরিকায় যখন স্বামীজী গিয়েছিলেন, তখন সেখানে হিন্দুদের বলা হত যে, ওরা idol worshipers। সেমেটিক ধর্মে, মানে খ্রীশ্চান, ইসলাম আর জহুদি ধর্মে idol worshipersদের খুব inferior বলে মনে করা হয়, সেইজন্য হিন্দুরা নিকৃষ্ট, সেইজন্য আমরা এখনও জংলী, আদিম। কিন্তু ওরা জানে না, ওদের মধ্যে যখন প্রথম ধর্মের আভাস আসে, তার হাজার হাজার বছর আগে থেকে হিন্দুরা *অহং ব্রহ্মাস্মি, সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*, এই ভাব নিয়ে চলছে। এই আইডিয়াস গুলো আজ পর্যন্ত ওদের ধর্মে মেনে নিতে পারেনি। কিন্তু সাধারণ মানুষ মূর্ত কোন কিছুকে অবলম্বন করে নিজেকে ধর্মের দিকে পা রাখবে।

স্বামীজী যখন বিদেশে ছিলেন, তখন ওরা এই জিনিসগুলোকে নিয়ে সুযোগ পেলেই আলোচনা করত, এই জিনিসগুলোকে নিয়ে নিন্দার ভাব নিয়ে হিন্দুদের হেয় করার চেষ্টা করত। স্বামীজী এটার উপর আঘাত হানছেন। বলছেন, প্রথম কথা আমাদের আগে মূর্তি পূজা ছিল না, আর দ্বিতীয় হল, একজন একটা ভাল জিনিস নিয়ে আছে সেটা যদি সে ছেড়ে দেয়, তার অনেক সমস্যা হয়ে যাবে। ঠাকুর যেমন বলছেন, মা বেড়াল পুষিয়ে সংসার করিয়ে নেন। ভিতরে ভালবাসা আছে, সেই ভালবাসাটা যাবে কোথায়? যদি নিজের সন্তান না থাকে, নাতি-নাতনী না থাকে, তখন সে বেড়াল পুষবে, সমস্ত ভালবাসা বেড়ালের উপর ঢালবে। মানুষ একটা কংক্রিট কিছু চাইছে, ভালবাসতে চাইছে, ঈশ্বরকে একটা কংক্রিট রূপে ভালবাসতে চাইছে, যখন ওটা পারছে না, তখন মূর্তি নিয়ে আসছে। সেইজন্য স্বামীজী বলছেন, মূর্তি পূজাতে কোন দোষ নেই। কথামৃতের প্রথমের দিকে এই জিনিসটকে নিয়ে ঠাকুর মাস্টারমশাইকে অনেক কথা বলছেন। কিন্তু বিদেশে এগুলোকে নিয়ে স্বামীজীকে প্রচুর কথা শুনতে হত, শুধু যে অন্যান্য ধর্মের লোকেরাই এগুলোকে নিয়ে নিন্দাবাদ করতেন তা না, হিন্দুদের মধ্যেও অনেকেই মূর্তি পূজার বিরোধিতা করে অনেক কথা বলতেন। তখনকার ব্রাহ্ম সমাজও এগুলোর বিরোধিতা করে গেছে। কথামৃতের প্রথম দিকেই বর্ণনা আছে, মাস্টারমশায় ঠাকুর কাছে যখন আসছেন, তখন মাস্টারমশায়ও এই জিনিসটাকে উল্লেখ করছেন। আমাদের অনেক সময় মনে হয়, খ্রীশ্চানদের কাছে অর্থবল বেশি, ইংরাজীতে শিক্ষা ছিল, তারা যেন আমাদের থেকে শ্রেষ্ঠ, আমরা যা কিছু করছি সবটাই বাজে, আমরা যে মূর্তি পূজা করছি তাই এটাও বাজে। কিন্তু তা নয়, যদি আমরা ভিতরে ঢুকে দেখি, এগুলো কেন হয়েছিল, কি কারণে হয়েছিল, তাহলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, তা নয়, জিনিসটা অনেক গভীরে চলে। স্বামীজী সেইজন্য এখানে এই কথাগুলো বলছেন, আমাদের যে মূর্তি পূজা, এটা কোন দোষের নয়।

জোর করে কোন সংস্কার করা যায় না

ভগবান বুদ্ধের আগমনের পর ভারতবর্ষের যে যজ্ঞ ভিত্তিক ধর্ম, কোথাও যেন পাল্টে গেল। পাল্টে গিয়ে আবার যেন ধর্মের অন্দরমহলে দর্শনের দাপাদাপিটা অনেক বেড়ে গেল। সেখান থেকে যেন স্বামীজী টেনে এনে এবার বলছেন, Violent attempts at reform always end by retarding reform. Do not say, 'You are bad'; say only, 'You are good, but be better'. (*জোর করে সংস্কারের চেষ্টার ফল এই যে, তাতে সংস্কার বা উন্নতির গতিরোধ হয়। কাউকে বলো না, 'তুমি মন্দ', বরং তাকে বলো 'তুমি ভালই আছ, আরও ভাল হও'*।) পরিবর্তন নিয়ে আসা, reformএর ধারণা ভারতবর্ষে আগে ছিল না। যার জন্য ভগবান বুদ্ধ বা মহাবীর জৈন আসার পর ইদানিং কালে আমরা ওটাকে reform রূপে দেখছি। ইদানিং কালের ইতিহাসের বইয়ে, সমাজবিদ্যার বইয়ে, ঠাকুরকে, দয়ানন্দ সরস্বতীকে, মীরাবাঈ, তুলসীদাসের ওই পিরিয়ডকে reformist movement বলে। Reformist movementএর নামে কি বলতে চাইছেন, ভগবান জানেন। অনেক সময় মনে হয় এনারা কি সত্যিই বোকা? নাকি আমাদের বোকা বানাচ্ছেন? দুটোর মধ্যে একটা হবে। এনাদেরই যেন সব বুদ্ধি রয়েছে, আগেকার ঋষিদের যেন কোন বুদ্ধি ছিল না। আচার্য শঙ্কর পরিষ্কার বলছেন, যে কোন ধর্ম কালের প্রবাহে দুর্বল হয়ে যায়। তখন কোন সন্ত মহাত্মা বা অবতার পুরুষ এসে নিজের উপলব্ধ আধ্যাত্মিক অনুভূতি দিয়ে ধর্মের আবার নূতন করে জীবন দান করেন। তাহলে এটা কি করে reform হল?

Reform মানে, আমার ভাই অনেক রকম দোষ আছে, চলো আমি এগুলোকে পাল্টাবো। Reform দুই রকমের হয়, একটা হয় একটু হাল্কা স্তরে, এটাই যখন খুব জোরালো স্তরে চলে যায়, তখন আর reform না বলে revolution বলা হয়। Revolution বললে প্রথমেই আমাদের মাথায় আসে খুব powerful revolution ফরাসী বিপ্লব। তারপর থেকে সমাজে বা রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ছোট বড় যা কিছু পরিবর্তন হয়েছে আমরা সেগুলিকে reform বা revolution বলি। এর মধ্যে বিরাট একটা ভূমিকা হল মার্কিস্টদের, মার্কিস্টদের কাছে সব কিছুই হল শ্রেনী সংগ্রাম, শ্রেনী সংগ্রাম মানেই একটা reform বা revolution হবে। এদের আবার শেকড় জুড়ে রয়েছে হেগেলের মতাদর্শে, যাঁকে পরে শ্যপনেহাওয়ার বলছেন, monument of German stupidity। বলা হয় যে, জার্মানরা stupidityতে অনেক উপরে, তার মনুমেন্ট হলেন হেগেল।

হেগেল একটা বিচিত্র মতবাদ নিয়ে এলেন – Thesis and Anti thesis। যার অর্থ হয়, যে কোন সমাজে একটা ধারণা চলে, আর ওই ধারণার বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়া তৈরী হয়, সেটা হয়ে যায় Anti thesis। পরে এই দুটোকে আধার করে তৃতীয় একটা মতের ধারণা তৈরী হয়, যাকে বলে synthesis। সেখান থেকে মার্কিস্টরা নিয়ে এলো শ্রেনী সংগ্রাম, সব কিছুতেই reform। ঠিক ঠিক ভিতর থেকে যে revolution হয়েছে, তা হল ফরাসী বিপ্লব। তবে ফরাসী বিপ্লবের পরিবর্তি কালের পরিস্থিতির উপর যে সব বিশ্লেষণ হয়েছে, তার উপর লেখাগুলো পড়লে সব কিছু খুব দুঃখ ও হতাশাজনক মনে হবে। লেখকরা মূল যে কথাটা বলতে চাইছেন, তা হল, ফরাসী বিপ্লব হল রাজা-রানীর বিরুদ্ধে, ওখানকার আভিজত্যতার বিরুদ্ধে। কিন্তু মাঝখান থেকে ফরাসীর অনেক নামকরা সাহিত্যিক, কবি ও বিজ্ঞানীদের জিলোটিনে গলা কাটা গেল। যে মানুষগুলো রাজা-রানীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল, সেই মানুষগুলিই কয়েক বছরের মধ্যে নেপোলিয়নকে সম্রাট বানিয়ে দিল। ছিল রাজা, হয়ে গেল সম্রাট। তাহলে বিপ্লব কিসের জন্য করা হল? কোন মার্কিস্ট নেতাকে একবার একজন প্রশ্ন করেছিলেন, ভাই! তোমাদের সব থিয়োরীই তো অসফল প্রমাণিত হয়ে গেল। উত্তরে তিনি বলছেন, আসলে যা কিছু হচ্ছে কতকগুলি অঞ্চল ভিত্তিক হচ্ছে কিনা, কারণ কম্যুনিজম্ এমন একটা আইডিয়া, যেটা গ্লোবালি কার্যকর করতে হয়, সারা বিশ্ব জুড়ে হলে তবে এটা সফল হবে। একবার তখনকার রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি গরবাচভকে একজন মহিলা জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'স্যার, এই যে কম্যুনিজম, এটাকে বারবার আপনারা বলছেনন experiment, এটা social experiment নাকি scientific experiment'? গরবাচভ বললেন 'Social experiment'। 'ও তাই, তা নাহলে তো এটা আগে ইঁদুরের উপর করা হত, কারণ scientific experiment যা কিছু করা হয় প্রথমে ইঁদুরের উপর করা হয়'।

Colombo to Almorah lecturesএ স্বামীজী বারবার এই জিনিসটাকে নিয়ে আপত্তি করছেন। যেখানেই, যে কোন জায়গায় একটা কোন violent reformএর চেষ্টা করা হয়েছে, সেখানে পরবর্তিকালে

অবশ্যই দেখা গেছে যে অনেক সমস্যা নিয়ে এসেছে। ইদানিং দেখা যাচ্ছে ভারতের বেশির ভাগ বড় বড় নেতারা ভারতের বেশ কিছু মূল জিনিসকে ভুলে যাচ্ছেন। হঠাৎ কোন নেতার মাথায় খেয়াল হল এই জিনিসটাকে পাল্টাতে হবে, এবার সেটার জন্য মানুষকে violent করে দিচ্ছে। যাদের কোন সংস্কৃতি নেই, বিদ্যা নেই, তাদের কারুর হাতে টাকা এসে গেছে, তাদের কারুর হাতে সোস্যাল মিডিয়া, কারুর হাতে রাজনৈতীক ক্ষমতা এসে যাচ্ছে, আর এই ধরণের নেতাদের মনে হঠাৎ একটা খেয়াল চাপল, এই জিনিসটার পরিবর্তন করতে হবে। পরিবর্তন কর, পরিবর্তন করতে কোন অসুবিধা নেই, কিন্তু পরিবর্তন করার জন্য একটা পদ্ধতি লাগে, সময় লাগে। পদ্ধতির ব্যাপারটা না হয় জানে না, কিন্তু কোন সময় দেবে না, এক্ষুণি করা চাই। মাও সে তুঙ চীনে এত বড় একটা সামাজিক বিপ্লব নিয়ে এলেন, আর আজ আমেরিকার পর সব থেকে বেশি সংখ্যার বিলিনিয়ার্সের দেশ হল চীন। এটা কি কোন বিপ্লব, কিসের বিপ্লব? যে কোন সমাজে তিনটে প্রজন্ম সব সময় থাকবে, বয়স্ক, মাঝ বয়সী আর যুবক। যুবা বয়স মানেই চঞ্চল মন, চঞ্চল মন মানেই সব সময় বিপ্লব, সব কিছুতে পরিবর্তন চাই। যখনই কেউ কোন প্রচলিত ধারা বা ব্যবস্থার পরিবর্তন চায়, বুঝতে হবে এখনও তার মন চঞ্চল, তার ওই ছেলেমানুষীটা এখনও যায়নি। বন্দুকের শক্তিতেই হোক, গলার জোরেই হোক, মারামারির জোরেই হোক, যার জোরেই হোক, পরিবর্তন নিয়ে আসার সময় এরা বুঝতে চায় না যে, বয়স্ক মানুষরা এটা নিতে পারবে না।

যত দিনে ওই পরিবর্তন হয়, তত দিনে দেখা যায়, ওই যে সময়টা নিল তত দিনে ওদের আগ্রহটাও চলে গেল। এরপর নূতন যে প্রজন্ম আসবে তারা এবার আরেকটা নূতন বিপ্লবের কথা বলতে শুরু করে দেবে। স্বামীজী এটাই বলছেন, Violent attempts at reform always end by retarding reform। Violent মানে, রাতারাতি একটা পরিবর্তন করতে হবে, তা না। দেখা যায়, হঠাৎ যদি কেউ খুব বেগে দৌড়ে চলে যায়, ওই বেগটাই reformটাকে আটকে দেয়। আমরা একটু আগেই বললাম, গীতাতে বুদ্ধিভেদ করতে নিষেধ করছেন। একজন মানুষের তার একটা ভাব আছে, গায়ের জোরে তার ওই ভাবের পরিবর্তন করতে নেই। কেউ যদি এসে দুম্ করে তার ওই ভাবের পরিবর্তন করার জন্য তাকে বলে, আমি তোমার ভাল চাইছি সেইজন্য তুমি এই রকম হও, তাহলে জানবেন, তার আন্দোলনটা ওখানেই নষ্ট হয়ে যাবে। যদি কেউ কিছু পরিবর্তন করতে চায়, তাহলে তাকে ধীরে ধীরে পরিবর্তনের জন্য এগোতে হবে। যত দিন না পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারছ তত দিন *জোষয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্*, সে যেমনটি আচরণ করছে, তুমিও তেমনটি আচরণ করে যাও, তার স্তরেই তুমি নেমে যাও, নেমে গিয়ে এবার ধীরে ধীরে তার পরিবর্তন করতে শুরু কর। ফতোয়া দিয়ে রাতারাতি বন্দেমাতরম্ গান করা বাধ্যতামূলক করে দিল। কি দরকার, ধীরে ধীরে লাগু করুক। রামকৃষ্ণ মিশনের স্কুলগুলিতে সন্ধ্যেবেলা খণ্ডন ভব বন্ধন গান করা হয়। স্কুলগুলিতে অনেক মুসলিম ছাত্ররাও পড়াশোনা করে, ওদেরকে বলে দেওয়া হয়, দেখো ভাই, প্রার্থনাতে যাওয়া আমাদের ডিসিপ্লিন, তোমাকে আসতে হবে, এরপর তুমি গান করবে কি করবে না সেটা তোমার ব্যাপার। মিশনের স্কুলে অনেক সময় বিদ্যার্থি বরণ বা বিদ্যার্থি ব্রতের জন্য হোম আদি করা হয়, সেখানেও মুসলমান ছাত্রদের বলেই দেওয়া হয়, তোমরা এসব অনুষ্ঠানে এসো না, তোমার মনে অশান্তি সৃষ্টি করার দরকার নেই। কিন্তু যদি গায়ের জোরে বলে দেওয়া হয়, এটা তোমাকে করতে হবে, এটা আমাদের প্রথা, আমাদের নিয়ম মেনে তোমাকে চলতে হবে। এসবের কোন দরকার নেই।

প্রেম ও প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা দুটো বিপরীত

অনেক সময় দেখা যায়, একটা নূতন কোন আইডিয়া পাওয়ার পর মনে করি আমি ঠিক বাকিরা সবাই ভুল। স্বামিজী বলছেন, Do not say ‘You are bad’; say only, ‘You are good, but be better’, তুমি ভাল কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু তোমাকে এর থেকে আরও ভাল হতে হবে। অসুখ করার পর একজন ডাক্তারকে দেখানো হল, তিনি কিছু ওষুধ দিলেন, খেয়ে সারল না। আরেকজন ডাক্তারকে দেখানো হল, তিনি আগের প্রেসক্রিপশান দেখে বললেন, এই সব ওষুধ আপনাকে দিয়েছে! ফেলে দিন। আবার কিছু কিছু ডাক্তার আছেন, তাঁরা আবার অন্য রকম বলেন, আচ্ছা এই ওষুধ অনেক খাওয়া হয়ে গেছে, এবার এই

ওষুধটা খেয়ে দেখুন। যে ডাক্তার বলছেন, অনেক খাওয়া হয়েছে, এবার অন্য রকম ওষুধ খান, তিনি সত্যিকারের একজন ভাল ডাক্তার, অন্য ডাক্তারকে ছোট করছেন না।

ঠিক তেমনি ধর্ম সমাজের একটা অঙ্গ, ধর্মের অঙ্গে দুটো শক্তি চলে, একটাকে বলে priest, আরেকটা বলে prophet। Priest হলেন, যারা ধর্মের নানাবিধ উপাচারকে ধরে রাখেন, আর প্রফেটরা ধর্মের দর্শনের আলোতে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। স্বামীজী আবার ওখানে ঘুরে এসে বলছেন, Priests are an evil in every country, because they denounce and criticize, pulling at one string to mend it until two or three other are out of place. (*পুরোহিতরা সব দেশেই অনিষ্ট করে থাকে; কারণ তারা লোককে গাল দেয় ও তাদের সমালোচনা করে। তারা একটা দড়ি ধরে টান দেয়, মনে করে –সেটাকে ঠিক করবে, কিন্তু তার ফলে আরও দু-তিনটে দড়ি স্থানভ্রষ্ট হয়ে পড়ে।*) Priest বলতে আমরা মনে করি যে শুধু ঘন্টা বাজাচ্ছে, পূজা করছে আর আরতি করছে, কিন্তু তা না, priest মানে, যিনি কিছু উপাচারের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে রেখেছেন, তিনি যেই হন না কেন, তাঁকেই priest বলা যায়। যারাই উপাচারের মধ্যে আবদ্ধ, মানুষ রূপে হোক, ধর্ম রূপে, preacher রূপে, এরা সবাই priest। মাইক নিয়ে যারা ধর্মের প্রচার করে বেড়ায়, তোমাকে এটা করতে হবে, সেটা করতে হবে, এরাও কিন্তু priest। প্রায়ই দেখা যায় বিভিন্ন ধর্ম সংস্থান থেকে, মাইক নিয়ে, বিনা মাইকে বলতে থাকে, তুমি পাপী, তুমি এই পাপ করছ, তুমি এই গোলমাল করছ, বলতেই থেকে যাবে। সমারসেট মঙ্ক ইংরাজীতে নামকরা লেখক ছিলেন, কিছু কারণে তিনি নিজের ধর্ম খ্রিশ্চানিটির বিরুদ্ধে খুব বিরক্ত ছিলেন। তিনি তাঁর উপন্যাসে বিভিন্ন ভাবে দেখাচ্ছেন, christianityর যারা priest, তারা কি রকম ফাঁপা, কিভাবে তারা সেই সব পাপেই লিপ্ত, যেটাকে তারা নিন্দা করে যাচ্ছে।

স্বামীজী বলছেন, Love never denounces, only amibition does that. There is no such thing as 'righteous' anger or justifiable killing. (*প্রেমে কেউ কখন গালমন্দ করে না, শুধু প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাতেই মানুষ ঐ রকম করে থাকে। 'ন্যায়সঙ্গত রাগ' বলে কোন জিনিস নেই।*) এই যে কিছু মানুষ ধর্মের নামে অন্য ধর্মের মানুষদের নির্বিচারে মেরে যাচ্ছে, সবাই জানে কারা মারছে, নেতারা বলবে যারা মারছে তাদের ধর্মের সবাই সন্ত্রাসবাদী নয়। কিন্তু সব ধর্মের কাছেই এই সমস্যা আছে, দক্ষিণ ভারতে আগে বৈষ্ণব আর শৈবদের মধ্যে এই লড়াই ছিল। এরা আবার তাদের এই কাজের সপক্ষে অনেক কথা বলে। Justifiable killing এর অর্থ হল, এই মারাটা দরকার ছিল, কিন্তু এভাবে ধর্ম হয় না। স্বামীজী বলছেন, love never denounces, মানুষ যাকে সত্যিই ভালবাসে, কখনই সে তাকে ছোট করবে না। ছোট করা হয় সেখানেই, যেখানে ভালবাসা জিনিসটা নেই, শুধু প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খা আছে। মানুষের মনের ভিতরে প্রচুর আকাঙ্খা রয়েছে, তার মধ্যে একটা শক্তিশালী আকাঙ্খা হল, আমি তোমার থেকে শ্রেষ্ঠ, আমি তোমার উপর প্রভুত্ব করব। মায়েরা নিজের সন্তানকে বলে, আমি তোকে বড় করলাম, মানুষ করলাম, তুই আমার কথা শুনবি না? বন্ধু বন্ধুকে বলে, তোর জন্য এত কিছু করলাম, তোর জন্য আমি কি না করেছি, আর তুই আমার কথা শুনছিস না! তার মানে, মায়ের সন্তানের প্রতি, বন্ধুর প্রতি বন্ধুর ভালবাসা নেই। ভালবাসা কখন কাউকে ছোট করে না, ছোট যখন কেউ করে তখন বুঝতে হবে তার মধ্যে আকাঙ্খা রয়েছে, ভালবাসা নেই।

স্বামীজী বলছেন, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী তোমার আদর্শ। কিন্তু ইদানিং কালের ইংরাজী জানা পণ্ডিতরা টেলিভিশনে, পত্রিকায় তারস্বরে চিৎকার করে বলছে, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী এদের জীবনধারা সম্পূর্ণ ভুল ছিল। তাই হয়ত হবে, আমাদের ঠাকুরমা, দিদিমারা হয়ত পাগল ছিলেন। বর্তমান যুগ হল ৪৪৮ ধারার যুগ, কিছু একটা হলেই কেস ঠুকে দাও, তোমার স্বামী, তোমার বৃদ্ধ শ্বশুড়, শাশুড়িকে জেলে পুরে দাও, এটাই এখন যুগের আদর্শ, তাই সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীরা ভুল ছিল। কিছু দিন আগেও ভারতে কোন স্ত্রী স্বামীর সাথে ঝগড়া করবে, অনেক কিছুই করবে, কিন্তু স্বামীকে কোথাও কোন ভাবে ছোট হতে দেবে না; ঝগড়া করাটা ছোট করা নয়। নিজের স্বামী, নিজের পরিবারের কাউকে ছোট করে তারাই, যারা মানসিক ভাবে দুর্বল। শিক্ষক ছাত্রকে বকাঝকা করতে পারে, উত্তম মধ্যম দিতে পারে, কিন্তু তার ব্যক্তিত্বের উপর আঘাত করে যদি তাকে ছোট করে দিতে দেখা যায়, তাহলে বুঝতে হবে শিক্ষকের সেখানে প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খা রয়েছে, নিজেকে বড়

দেখানোর চেষ্টা করছে। ভালবাসা কখন ছোট করে না, যদি ছোট করে, বুঝতে হবে, সেখানে ভালবাসা নেই, প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খা আছে। সেইজন্য righteous anger বলে কিছু হয় না, ধর্মযুদ্ধ বলে কিছু হয় না। ধর্মের নামে মানুষ খুন, ধর্মের নামে নরসংহার কখনই হতে পারে না। খ্রীশ্চানরা একদিকে ভগবান যীশুর ভালবাসার কথা বলছে, অন্য দিকে বিশ্বের সর্বত্র ধর্মের নামে কত অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। ভালবাসার নাম করে যখন একটা বেড়া দিয়ে দেওয়া হয়, তখন মানুষ সেখানে ফেঁসে যায়। স্বামীজী এরপর যেটা বলছেন, এই ধরণের কথা স্বামীজী পরে অনেক জায়গায় বলেছেন।

সবার ভিতরে যে অনন্ত শক্তি তার প্রকাশ করার সুযোগ দিতে হবে

If you do not allow one to become a lion, he will become a fox. (*যদি তুমি কাউকে সিংহ না হতে দাও, তা হলে সে ধূর্ত শৃগাল হয়ে দাঁড়াবে।*) মানুষের অসীম ক্ষমতা, মানুষের ভিতরে অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি, তাকে তার শক্তির প্রকাশ করার সুযোগ করে দিতে হয়। যদি শক্তির প্রকাশ না করতে দেওয়া হয়, তার ভিতরে তো শক্তি রয়েছে, সেই শক্তি যাবে কোথায়, তখন সে এক ধুর্ত শৃগাল হয়ে যাবে। আমাদের সবাইকে মনে রাখা দরকার, সিংহকে যদি শৃগাল করে দেওয়া হয়, তাহলে জানবেন এর থেকে বড় পাপ আর কিছু হতে পারে না। আর সে নিজেও সিংহ হয়ে যদি শৃগাল হয়ে যায়, তাহলে এর থেকে আর বড় দুঃখের কথা তার জন্য কিছু হতে পারে না। স্বামীজী যে অনন্ত শক্তি অনন্ত জ্ঞানের কথা বারবার বলছেন, ওই শক্তিকে যদি সামনে না আসতে দেওয়া হয়, ওই মানুষই দেশের জন্য, সমাজের জন্য, পরিবারের জন্য অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে। ঠাকুরের মহাসমাধির পর ১৮৮৬ সাল থেকে ১৮৯৩ সালে বিদেশে যাবার আগে সারা ভারত স্বামীজী পরিক্রমা করলেন, দেশের মানুষকে তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন। ভারতবর্ষের যে জনগণ, তার দশ থেকে বারো শতাংশ মানুষ উচ্চবর্ণের, এই দশ শতাংশের বাইরে বাকি সব বিশাল জনরাশি, আমরা তাদের শূদ্র বলি, যাই বলি না কেন, তাদের individualityটা কোথায়? তাদেরকে এটাই বলার, তোমরা সিংহ, তোমরা উঠে দাঁড়াও। ভারতবর্ষে আজকে কত বড় বড় দুর্নীতির কেলেঙ্কারি হচ্ছে, আমরা মনে করছি কয়েকটা কোটিপতি ব্যবসায়ী আর নেতারা দুর্নীতিগ্রস্ত। কিন্তু রাস্তাঘাটে বাজারে বেরিয়ে দেখলে, চলতে ফিরতে চোখ রাখলে দেখা যাবে, সব্জিওয়ালা থেকে বড় বড় মলের মালিক সবাই চুরি করছে। রিক্সাওয়ালা নূতন লোক দেখলে ন্যায্য ভাড়া থেকে দ্বিগুণ ভাড়া চাইবে, রোদ হলে ভাড়া বেশি, বৃষ্টি হলে ভাড়া বেশি। ট্যক্সিওয়ালা মিটারে ভাড়া যেতে চাইবে না। নার্সিং হোমে রোগীকে পাঠিয়ে ডাক্তাররা চুরি করছে। কোথায় চুরি নেই, শিক্ষা ক্ষেত্র থেকে শুরু করে চিকিৎসা ক্ষেত্রে সবাই যে যার মত চুরি করে যাচ্ছে। যার যেমন ক্ষমতার জোর, টাকার জোর, সে সেই অনুসারে চুরি করছে, সুযোগ যার কম সে কম চুরি করে, সুযোগ যার বেশি সে লুট করে। এর একটাই কারণ, হাজার হাজার বছর ধরে ভারতের লোকগুলিকে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ক্ষমতাবান লোক সিংহ হতে দেয়নি, সব এখন ধুর্ত শেয়ালে রূপান্তরিতে হয়ে গেছে, যে যেখানে যেমন সুযোগ পাচ্ছে চুরি করে যাচ্ছে। আগে ভারতে ধর্মের একটা প্রভাব ছিল, এখন ধর্মের সেই প্রভাবটাও উড়ে গেছে। আমাদের সবার উচিৎ, ঘরের দেওয়াল থেকে সব ঠাকুর দেবতার ছবি সরিয়ে স্বামীজীর এই একটি বাণীকে বড় বড় করে লিখে বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রাখা - If you do not allow one to become a lion, he will become a fox।

স্বামীজী এরপর যে কথা বলছেন, নারীজাতিকে নিয়ে এই মন্তব্য এখন আর সেভাবে করা যাবে না, বর্তমানে অন্য রকম পরিস্থিতি হয়ে গেছে, স্বামীজী বলছেন, Women are a power, only now it is more for evil because man oppresses woman; she is the fox, but when she is no longer oppressed, she will become the lion. (*স্ত্রীজাতি শক্তিস্বরূপিণী, এখন ঐ শক্তি কেবল মন্দ বিষয়ে প্রযুক্ত হচ্ছে। তার কারণ, পুরুষ তার উপর অত্যাচার করছে। এখন সে শৃগালীর মতো; কিন্তু যখন তার উপর আর অত্যাচার হবে না, তখন সে সিংহী হয়ে দাঁড়াবে।*) মেয়েরা নিজেরাই একটা শক্তি, স্বভাবেই নারীরা শক্তিমতী হয়। কিন্তু পুরুষরা নারীদের উপর প্রচুর অত্যাচার করে এসেছে, সব কিছুতে তাদের দাবিয়ে রেখেছে, আজকে তাই মেয়েদের নামে যে নানা রকম কথা বলা হয়; মেয়েরা চালাকি করে, ধুর্তামি করে, কিছু করার নেই, কারণ মেয়েদের দাবিয়ে রাখতে রাখতে তাদের এই রকম বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু নারী শক্তির

প্রতিমূর্তি, শক্তি তার স্বভাবেই, সেই শক্তি যাবে কোথায়! যেখানে সিংহের শক্তি হওয়ার কথা ছিল, সেখানে তা না হয়ে শৃগালের শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

সমাজে যারা মিথ্যা কথা বলে, চালবাজি করে, অপরকে বোকা বানাবার চেষ্টা করে, সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নিতে হবে, এদের ভিতরে যে শক্তি আছে, সেই শক্তিকে সমাজ ছলেবলে দাবিয়ে রেখেছে, এদের শক্তিকে সামনে আসতে দেওয়া হয়নি, আজ তাই সবাই শেয়াল হয়ে গেছে। পরিবারের বাবা-মা যদি ভাল মানুষ হয়, দেখা যাবে, তাদের সন্তানদের সততা অনেক বেশি হয়, সত্য কথা বলার দম থাকে। কারণ মানুষকে যখন দাবিয়ে দেওয়া হয়, মানুষ তখন দেখে আমি যদি সত্য কথা বলি আমার বিপদ আছে, তখন তাকে কায়দা করে কথা বলতে হয়, যার ফলে তার সততাটা কমে যায়। স্বামীজী স্ত্রীজাতিকে সামনে এনে বলছেন, মেয়েরা হল একটা শক্তিশালী জেনারেটর, কিন্তু মেয়েদের সমাজ দাবিয়ে রেখেছে। দাবিয়ে রাখার জন্য মেয়েরা আর কি করবে, বাঁচার জন্য তাই তাকে নানান রকম চালাকির আশ্রয় নিতে হয়। ঠাকুর খুব মজা করে বলছেন, একজন গিন্নী তার স্বামীকে খুব ভাল ভাল রান্না করে আদর করে খাওয়াচ্ছে আর বলছে, ওগো জানো, পাশের বাড়ির স্বামী তার স্ত্রীকে একটা গয়না করে দিয়েছে। আজকের দিনে আমরা এটা কল্পনাই করতে পারি না, মেয়েরা এখন অনেক স্বাধীন, তার নিজের উপার্জন আছে, সে যেটা পেতে ইচ্ছা করবে স্বামীকে অর্ডার করে কিনিয়ে আনবে। ঠাকুর যে বর্ণনা দিচ্ছেন, ওখানে গিন্নীর একটা চালাকি আছে। কেন চালাকি আছে? সে জানে সরাসরি বললে সে পাবে না। এই জিনিস দু দিকেই চলে, নিজের উপরেও চলে। যদি আমার কখন মনে হয়, আমি চালাকি করছি, চালবাজি করছি, মিথ্যাকে আশ্রয় নিচ্ছি, আমাকে বুঝতে হবে কোথাও আমাকে দাবিয়ে রাখা হয়েছে, যার জন্য আমার শক্তি প্রকাশ হতে পারছে না। আগেকার দিনে স্ত্রীর উপর স্বামী, পরিবারের লোকেরা কত নির্যাতন করুত, দাবিয়ে রাখত, কিন্তু নিজের সন্তানকে সব সময় চেষ্টা করত তার যেন শক্তির বিকাশ হয়। যার জন্য সন্তান কোন অন্যায় করে এলে, বাবা, জ্যাঠারা বকাঝকা করলে, মা তাকে সামলে নিয়ে আগলে রাখত। স্বামীজী আরও বলছেন, but when she is no longer oppressed, she will become the lion, নারীদের যে দাবিয়ে রাখা হচ্ছে, এটাকে যেদিন সরিয়ে দেওয়া হবে, সেদিন নারীজাতির শক্তি বেরিয়ে আসবে।

স্বামীজীর একটা স্বপ্ন ছিল ভারতে যেন নারীশক্তির জাগরণ হয়। স্বামীজীকে নারীর সমস্যার ব্যাপারে যখনই কিছু জিজ্ঞেস করা হলে তিনি সব সময় বলতেন, আগে নারীজাতির শিক্ষার ব্যবস্থা করো। শিক্ষা দেওয়া মানেই, তাকে আর কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না, তারা তাদের নিজেদের সমস্যার কথা নিজেরাই বুঝতে পারবে, আর নিজেরাই নিজেদের সমস্যার সমাধান করতে পারবে। তাদের সমস্যায় পুরুষরা নাক গলাবার কে! বাল্মীকি রামায়ণে সীতার চরিত্র কত উচ্চমানের চরিত্র, রামচন্দ্রকে যখন যেটা বলছেন, রামচন্দ্র সেটাই করতে বাধ্য হচ্ছেন, আমি বনবাসে যাবো, রামচন্দ্রকে সীতাকে বনবাসে নিয়ে যেতে বাধ্য হলেন। কিন্তু রামচন্দ্র রাজা, রাজা তাঁর ধর্মের কিছু জিনিস মেটাতে চাইছেন, সীতা সেটাকেও মেনে নিচ্ছেন, নিজের দুর্বলতার জন্য মেনে নিচ্ছেন না, এখানেও সীতা তাঁর নিজের শক্তিতে মেনে নিচ্ছেন। আমাদের এসব জিনিস বোঝার ক্ষমতা নেই। স্বামীজী এটাই বলছেন, মানুষকে যদি সিংহ না হতে দাও, সে একটা ধুর্ত শেয়াল হয়ে যাবে। এটাকেই আমাদের জীবনের মূল মন্ত্র করতে হবে, নিজের জীবনের জন্য করতে হবে, আশেপাশে যারা আছে তাদের জন্যও করতে হবে, কাউকে দুর্বল করব না, দুর্বল হতে দেব না, যখনই কারুর মধ্যে কোন দুর্বলতা আসবে তার মধ্যে শক্তি সঞ্চার করতে হবে, তবেই ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, দেশ উঠে দাঁড়াবে।

স্বামীজীর মূল বক্তব্য হল, মানুষের ভিতরে যে অনন্ত শক্তি আছে, সেই শক্তিকে বেরিয়ে আসার সুযোগ করে দিতে হবে, যদি না বেরিয়ে আসতে দেওয়া হয়, তাহলে যেখানে তার সিংহ হওয়ার কথা সেখানে সে এক ধূর্ত শৃগাল হয়ে দাঁড়াবে। সব মানুষই বেঁচে থাকতে চায়। বেঁচে থাকার ইচ্ছা যে সবারই ভিতরে থাকে তা না, অনেকে আছেন যাঁরা বলেন, আমি মরে যাব তাও ভাল, কিন্তু আমার স্বধর্মকে আমি ত্যাগ করব না। কিন্তু আবার এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে যায় যে, তাকে বেঁচে থাকতে হয়। কিন্তু তার উপর এমন চাপ আসতে থাকে যে, যার জন্য তাকে অনেক চালাকির আশ্রয় নিতে হয়। আবার আমার একটা আদর্শ আছে, সেই আদর্শের জন্য আমি অপরকে দাবিয়ে দেব, সেটাও যেন অনেকের মনঃপূত হয় না, বিশেষ করে যাদের ভিতরে

হিন্দু ধর্মের ভাব বেশি আছে। এই জিনিসটা দেখা যায় যাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা পাওয়ার লোভ প্রবল। শুধু একটা রাজনৈতিক মতাদর্শে মিল না থাকার জন্য বা ক্ষমতা লাভের জন্য অপরকে খুন করা, মারামারি করা, সবাইকে দাবিয়ে রাখা, এই জিনিসটা একেবারেই ঠিক নয়।

আমাদের ভাল করে মনে রাখতে হবে স্বামীজীর দেববাণী হল সূত্রাকারে। আমাদের পরম্পরায় সূত্রাকারে লেখার প্রথা প্রথম থেকেই ছিল। পতঞ্জলি যোগসূত্রে যেমন যোগের যাবতীয় দর্শন, যোগের অনুশীলন, সব কিছুকে দুশোটা সূত্রের মধ্যে গ্রথিত করে দেওয়া হয়েছে, সবটাই আবার খুব গুছিয়ে লেখা। গীতার সব শ্লোকও খুব গুছিয়ে লেখা হয়েছে। স্বামীজীর দেববাণীও সূত্র বা শ্লোক ধর্মী সাহিত্যের মধ্যে পড়ে। কিন্তু এখানে গুছিয়ে লেখা নেই। স্বামীজীর মনে যেদিন যে ভাব আসত, সেই ভাবের উপর সেদিন আলোচনা করেছেন। যাঁরা লিখেছেন, তাঁরাও নিজের মত বুঝে নিয়ে লিখেছেন, ফলে অনেক ফাঁক থেকে গেছে। সেখান থেকে স্বামীজী এরপর খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন। দেববাণীর কোন কথাই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কাদের সামনে স্বামীজী বলছেন? তাঁর কয়েকজন বাছাই করা শিষ্যদের সামনে, তাই একটু যে ব্যাখ্যা করে বলবেন, তারও আর দরকার ছিল না। দেববাণী হল কাঠামোরও কাঠামো।

ধর্মভাবকে বিচার-বুদ্ধি দ্বারা কেন নিয়মিত করা উচিত

স্বামীজী বলছেন, Ordinarily speaking, spiritual aspiration ought to be balanced through the intellect; otherwise it may degenerate into mere sentimentality. (*সাধারণতঃ ধর্মভাবকে বিচার-বুদ্ধি দ্বারা নিয়মিত করা উচিত। তা না হলে ঐ ভাবের অবনতি হয়ে ওটা ভাবুকতা-মাত্র হতে পারে।*) আধ্যাত্মিক যে সাধনা, তাতে আধ্যাত্মিক উত্থানকে নিয়ে ভাবা, আধ্যাত্মিক ভাবের কথা নিয়ে চিন্তন করা, এটাকে সব সময় বিচার-বুদ্ধি দিয়ে নিয়মন করতে হয়। যদি না করা হয়, তাহলে ওই ভাব ভাবুকতাতে পর্যবসিত হয়ে সাধককে অধোগামী করে দেবে। আধ্যাত্মিকতাই হোক আর ধর্মের ব্যাপারেই হোক, এটা যে স্বামীজীর কত মূল্যবান কথা, আমরা উপর উপর বুঝতে পারব না। চোখ বন্ধ করে যে কোন ধর্মকে যদি আমরা দেখি, এমনকি যেসব ধর্মকে আমরা শান্তিপ্রিয় ধর্ম বলে জানি, এরা ধর্মের নামে মানুষের উপর এত অত্যাচার করেছে যে কল্পনা করা যায় না। যারা খোলাখুলি মারামারি খুনোখুনি করছে তাদের কথা ছেড়েই দেওয়া যেতে পারে। মারামারি কি নিয়ে করছে? তারা মনে করছে, আমি মানুষের ভাল করব, এরা অন্ধকারে পড়ে আছে, আমি এদের ধর্মের আলো দিয়ে ভাল করব, তাকে আমার ধর্মে এনে তার মঙ্গল করব। এতে যে সব সময় আর্থ-সামাজিকতার কারণ বা রাজনৈতিক কারণ থাকে তা নয়। এরা সত্যিকারের মনে করে ওরা অন্ধকারে আছে। মুসলিম বা খ্রীশ্চানদের সাথে হিন্দু ধর্ম নিয়ে আলোচনা করতে গেলে এই জিনিসটা খুব ভাল বোঝা যায়। ওরা মনে করে হিন্দু ধর্মে যারা আছে তারা যেন অন্ধকারে পড়ে আছে। ওদের ধর্ম ঈশ্বরের ধর্ম আর হিন্দুদের ধর্ম যেন ভুতুড়ে ধর্ম। তার মানে, কোথাও ওদের একটা spiritual aspiration আছে, সেটা নিজেকে নিয়ে না, হিন্দুদের নিয়ে বেশি। নিজেরা কতটা ভাল হবে, নিজেকে কিভাবে উন্নত করবে সেদিকে তাদের দৃষ্টি নেই, কিন্তু হিন্দুকে যদি ভাল করতে পারে, তখন সে যেন বিরাট একটা কাজ করল।

কিন্তু ধর্ম-ভাবকে বিচার বুদ্ধি দিয়ে নিয়মন করে অপরের যদি ভাল করতে যায়, তাহলে সে প্রথমেই ভাববে, আগে আমাকে ভাল হতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, যাকে তুমি ভাল করতে যাচ্ছ, তার ধর্মের ব্যাপারেও তুমি জানো। তাদের ধর্মের কোন শাস্ত্র কি তুমি পড়েছ, তাকে বোঝার চেষ্টা কি তুমি করেছ? তার মানে ব্যালেন্স করছে না। তৃতীয়তঃ, তার এটা দরকার আছে কি নেই; সে যদি নরকে যেতে চায়, তাকে যেতে দাও নরকে। ভল্টায়ার খুব নামকরা ফরাসী দার্শনিক। ফরাসী বিপ্লবকে নিয়ে ঐতিহাসিকরা খুব সুন্দর কথা বলেন, যেখানে যেখানে বিপ্লব হয়েছে সেসব জায়গায় দেখানো হয়, এখানে কামান ছিল, এখানে বন্দুক ছিল, এখানে অমুক ছিল, আর ফরাসীর নামে বলে, France and Voltaire। একা একজন লেখক তাঁর লেখা দিয়ে সমাজে কি রকম বিপ্লব এনে দিতে পারেন, ভল্টায়ার হলেন সেই রকম একজন লেখক।

Jacques Bazrunএর লেখা একটা বই আছে From Dawn to Decadence: 500 Years of Western Cultural life, সেখানে তিনি বর্ণনা করছেন পাশ্চাত্য সভ্যতায় চার্চগুলি কিভাবে মানুষের

মাথায় পা রেখে তাকে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। সেখান থেকে উঠে এলেন প্রোটেস্টান ধর্মের মার্টিন লুথার। প্রোটেস্টান ধর্ম দিয়েও ঠিক জমল না। ইতিমধ্যে বিভিন্ন কারণে free thinking শুরু হয়ে গেছে। ভল্টায়ার খ্রীশ্চান ফাদারদের উপর এত রেগে ছিলেন, সারা জীবন তিনি তাদের আক্রমণ করে গেছেন। তার Zadig নামে একটা বই আছে, সেখানে একটা চরিত্র আছে, কোন একটা জংলী দেশ থেকে তাকে নিয়ে আসা হয়েছে, ওকে এবার খ্রীশ্চান করা হবে। পুরো কাহিনীটা হল, ওকে কিভাবে ভাল খ্রীশ্চান বানানো যায় এই নিয়ে। ভল্টায়ার সেটাকে ব্যঙ্গ করে যেভাবে লিখেছেন, যে কোন গোঁড়া খ্রীশ্চান পড়লে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠবে। পুরোটাই তিনি বাস্তব চিত্র থেকে তুলে নিয়ে আসছেন, বাইবেল থেকে কিছু আনছেন না, নিজের কোন ব্যাখ্যাও দিচ্ছেন না।

ভল্টায়ারের বয়স হয়ে গেছে, তাঁর মৃত্যুর সময় এগিয়ে এসেছে। একজন পাদরী মনে করল, লোকটা সারা জীবন খ্রীষ্ট ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করে নষ্ট হয়ে গেছে, নরকে যাওয়া নিশ্চিত, নরকে যাওয়া থেকে ওকে বাঁচাতে হবে। চার্চ থেকে পাদরী খবর পাঠাচ্ছে, সে ভল্টায়ারের সাথে দেখা করতে চায়। সেক্রেটারী ভল্টায়রকে পাদরীর কথা বলেছে। ভল্টায়ার সেক্রেটারীকে বলছেন, 'ওকে গিয়ে বল, আমি বিছানা থেকে উঠতে পারছি না। যদি বলে তাও দেখা করবে, তাহলে বলবে আমি বেহুঁশ হয়ে গেছি। যদি তাও না মানে, তাহলে বলবে আমি মরে গেছি। এতেও যদি না মানে, বলবে আমি মরে গিয়ে নরকে চলে গেছি, আমাকে খুঁজতে হলে সে যেন ওখানে যায়'। 'তুমি নরকে যাও', না বলে ঘুরিয়ে বলছেন আমাকে খুঁজতে যেন সে নরকে যায়। আমি তো নরকে যাবো গ্যারান্টি, যদি আমাকে বাঁচাতে হয় তুমি আগে ওখানে চলো।

এই সূক্ষ্ম বুদ্ধিটাই আমাদের নেই। কথায় কথায় ভক্তরা বলে, ঠাকুরের ইচ্ছা। কেউ একটু ভেবে দেখে না ঠাকুরের ইচ্ছা কোথায় প্রয়োগ হয়। ঠাকুর আছেন, তিনি দেখবেন! ঠাকুর নিজের কোমরের ধুতি সামলাতে পারতেন না, তিনি নাকি আমাদের দেখবেন! একবারে ভেবে দেখুব, যিনি নিজের ধুতি সামলাতে পারতেন না, তিনি সমগ্র জগৎ সামলাচ্ছেন, এর থেকে আর কত ভাল সামলাবেন। কেউ একটু বুদ্ধি লাগাবে না, 'ঠাকুরের ইচ্ছা' কোথায় বলা হয়, কেন বলা হয়। হিন্দু ধর্মের মনীষীরা জানতেন মানুষ এই ভুল গুলো করবে, সেইজন্য বিশেষ করে বৈষ্ণব ধর্মে বালগোপাল, রামলালা, নাড়ুগোপালের ধারণা নিয়ে এলেন। ছোট্ট গোপাল আমার ইষ্ট, আমাকেই তাঁকে স্নান করিয়ে দিতে হয়, খাইয়ে দিতে হয়, তিনি আমাকে কি সামলাবেন। কৃষ্ণ ভক্ত সুরদাস একবার রাম ভক্ত তুলসীদাসের সাথে দেখা করতে এসেছেন। তুলসীদাস তখন কাশীতে আছেন। সুরদাস ছিলেন অন্ধ, দুজনে রাস্থা দিয়ে যাচ্ছেন, হঠাৎ রব উঠল পাগলা হাতি আসছে। তুলসীদাস বললেন, আমার রাম আছেন, তিনি আমাকে রক্ষা করবেন। সুরদাস বললেন আমার কৃষ্ণ বাচ্চা ছেলে, তাঁকেই আমার রক্ষা করতে হয়, তিনি আমার কি রক্ষা করবেন। এই বলে তিনি তাঁর পুটলিটা নিয়ে এক ছুটে একটা গলি দিয়ে পালিয়ে গেলেন। এই ভাবটাকে পাকা করার জন্য নিয়ে আসা হল বালগোপাল, নাড়ুগোপাল, রামলালা ইত্যাদির ধারণা। আমার যিনি ইষ্ট তাঁকে আমিই সেবা করি, তিনি আমাকে কি রক্ষা করবেন! কিন্তু ঠাকুরের কাছে আমরা শুধু চাই চাই করে যাচ্ছি, আমাদের জীবনকে সহজ করার জন্য বলি, তিনি দেখছেন। বিদেশীরা কিছু হলেই সব সময় বলবে, Don't worry God is incharge, আরে ভাই ভগবান সব সময় inchargeএ আছেন। তোমাকে যখন তিনি মারছেন তখনও He is incharge, এগুলো এদের বোঝার ক্ষমতা নেই। এদিকে বলছেন, যদি spiritual aspiration হয়, এখানে বোকা বোকা কথা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে না।

এটা গেল বৃহত্তর সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে, আর ব্যক্তি স্তরে গেলে আমাদের মনে রাখতে হবে, যদি কেউ আধ্যাত্মিকতায় নামে তখন তার চিন্তা-ভাবনা যদি বিচার-বুদ্ধি দ্বারা নিয়মিত না করা হয়, তাহলে জেনে নিন তার জীবনের সর্বনাশ নিশ্চিত। স্বামীজী এখানে শব্দটা বলছেন, sentimentality, বুদ্ধি দিয়ে যতক্ষণ না চিন্তা-ভাবনাকে নিয়মন না করা হবে ততক্ষণ তার চিন্তা-ভাবনা সবটাই ভাবুকতায় পর্যবসিত হয়ে তাকে অধোগামী করে দেওয়ার সম্ভবনা থেকে যাবে। আমরা নিয়মিত শুনতে পাই, ওই সাধুর পতন হল, সেই বাবাজীর কেলেঙ্কারী ফাঁস হল। এসব ক্ষেত্রে সেই একই জিনিস বাদ চলে গেছে। এনারা যখন ঈশ্বরের পথে এসেছিলেন তখন অন্তর থেকে নিষ্ঠা নিয়েই এসেছিলেন, কাউকে বোকা বানানোর জন্য, নাম-যশের জন্য ভগবানের পথে আসেননি। এবার সাধন-ভজন করে শক্তি হয়েছে, সিদ্ধাই আদি এসেছে। এরপর বিচার-বুদ্ধি

দিয়ে পুরনো ধ্যান-ধারণা গুলিকে যে নিয়মন করে নেওয়ার কথা, সেটা করা হয়নি বলে তাঁদের এই সর্বনাশটা হয়ে গেছে।

এর থেকে আরও মারাত্মক ব্যাপার হল, স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, বুদ্ধি আর হৃদয়ের মধ্যে যদি বিরোধ লাগে তখন হৃদয়ের কথাই শুনবে। কিন্তু এখানে স্বামীজী বিপরীত বলছেন। স্বামীজী হৃদয়ের কথা শোনার যেটা বলছেন, এই কথা সাধারণ মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলছেন। সাধারণ মানুষ স্বভাবে লোভী হয়, কামী হয়, ক্রোধী হয়, এদের জন্য বলছেন, তুমি তোমার হৃদয়কে নিয়ে চল। কিন্তু সত্যিকারের যে মন প্রাণ দিয়ে আধ্যাত্মিক হওয়ার চেষ্টা করছে, করতে করতে যেমনি তার মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাবের স্ফুরণ হবে, তখন তার হৃদয় নিজে থেকেই খুলে যাবে। এবার যদি ওকে ডাঙস মেরে টেনে না আনা হয়, গোল্লায় যাওয়া থেকে ওকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভক্তরা খোল করতাল নিয়ে খুব কীর্তন করে, কীর্তন করার পর অনেকে একটা উচ্চ ভাবে চলে যায়। তন্ত্রেও অনেক কিছু উপাচারাদি অনুষ্ঠান করার পর ওই একই অবস্থা হয়, কিন্তু এরপর বিচার-বুদ্ধি দ্বারা যে ভাবগুলিকে নিয়মন করবে, সেটা করে না বলে নানা রকম ব্যাভিচারের মধ্যে লিপ্ত হয়ে নিজের পতন ডেকে আনে। পতন দুভাবে হয়, একটা হয় stupid mentallyতে চলে যায়, ওর বুদ্ধির ব্যালেন্সটা বিগড়ে যায়। আরেকটা হল, জপ-ধ্যান করে করে হৃদয়ের ভালবাসা এমন বেড়ে যায় যে, মনের মধ্যে জন্মজন্মান্তরের যত রকম ইমোশানস্‌গুলো জমে ছিল, সেগুলো এবার শক্তিশালী হয়ে ওঠে, এই শক্তিশালী ইমোশানগুলিই এবার তাকে সর্বনাশের দিকে নিয়ে চলে যাবে। জপ-ধ্যান করা, spiritual aspiration হওয়া মানেই হল, একটা ঘোড়ার শক্তি বেড়ে যাওয়া। সাধারণ ঘোড়া এবার দুর্দান্ত ঘোড়া হয়ে গেল, ঘোড়া এবার দৌড়াচ্ছে, যদি ঘোড়াকে ভাল ট্রেনিং দিয়ে সামলে না রাখা হয়, তার সর্বনাশ অবশ্যাম্ভি।

কঠোপনিষদে রথের উপমা দিয়ে এই জিনিসটাকে খুব সুন্দর করে বোঝান হয়েছে, ঘোড়া রথ টেনে নিয়ে যাচ্ছে, দুষ্ট ঘোড়া হলে সে রথকে রাস্তা থেকে নেমে কোথায় নিয়ে যাবে আরোহী টেরই পাবে না। কঠোপনিষদে ঘোড়াগুলি হল আমাদের ইন্দ্রিয় সমুদয়। সাধারণ লোকেদের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়গুলি তাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এবার সে ইন্দ্রিয় জগৎ থেকে সরে মনের জগতে এসেছে ঠিকই, কিন্তু মনের জগতে শক্তিশালী হয়ে যাওয়ার জন্য সে লাগাম ছাড়া হয়ে যায়। এমন ভাবপ্রবণ হয়ে যাবে যে তাকে সর্বনাশ করে দেবে। বেশির ভাগ মানুষের ধর্ম সাধনা এখানে এসে শেষ হয়ে যায়। যাদের ভিতরে ধর্মের ভাব আছে, জীবনে আধ্যাত্মিকতার স্তরে উঠতে চায়, তাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। বিভিন্ন শাস্ত্র যদি নিয়মিত অধ্যয়ন করা না হয়, নিয়মিত সাধুসঙ্গ যদি না করা হয়, নিয়মিত যদি ধর্মীয়, শাস্ত্রীয় আলোচনাদির শ্রবণ-মনন না করা হয়, আর যদি তার ভিতরে সত্যিকারের আধ্যাত্মিতার ভাব এসে থাকে, তাহলে ব্যক্তি স্তরে তাকে ধীরে ধীরে নীচে নামিয়ে দেবে আর ব্যষ্টি স্তরে ধর্মান্ধতা, গোঁড়ামিতে নিয়ে গিয়ে হিংস্র জাতি বানিয়ে দেবে। সেইজন্য বিচার-বুদ্ধি দিয়ে ধর্মীয় ভাব ও চিন্তা-ভাবনাকে নিয়মন করার উপর এত গুরুত্ব দেওয়া হয়, মোদ্দা কথা মস্তিষ্কের ব্যালেন্স না থাকলে এই সমস্যাগুলো আসবে।

এই আলোচনা করার পর স্বামীজী বৌদ্ধ ধর্মকে নিয়ে বলছেন। বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপারে আমরা আগেও উল্লেখ করেছি। স্বামীজী যে সময় আমেরিকায় ছিলেন, সেই সময় আমেরিকার লোকেরা হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে বেশি কিছু জানত না। কিন্তু ভগবান বুদ্ধকে নিয়ে কিছু কিছু লেখা তখন আমেরিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলো পড়ে তারা বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপারে কিছু কিছু জানত। এমনকি যাঁরা ভগিনী নিবেদিতাকে নিয়ে পড়াশোনা করেছেন তাঁরা জানবেন, নিবেদিতা খুব ভাল বংশের মেয়ে ছিলেন। যাঁর সাথে নিবেদিতার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল, তিনি হঠাৎ মারা যান। সেই দুঃখে তিনি ধর্মের দিকে চলে যান। ধর্মের দিকে যাওয়ার পর এশিয়ার ধর্ম নিয়ে, বিশেষ করে ভারতবর্ষের ধর্মগুলিকে নিয়ে পড়াশোনা করতে শুরু করেন। স্বামীজীর কাছে আসার পর প্রথম প্রথম স্বামীজীর কথাগুলোতে তিনি খুব বেশি impressed হননি। কারণ অনেকগুলো জিনিস তিনি আগে থাকতেই জানতেন। কিন্তু স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব তাঁকে খুব বেশি impressed করেছিল। যাই হোক, বৌদ্ধ ধর্মকে নিয়ে সেই সময় আমেরিকানদের কিছু কিছু ধারণা ছিল, সেগুলোকে স্বামীজী ব্যাখ্যা করছেন।

ব্রহ্ম বা আত্মাকে বুদ্ধের অস্বীকার

স্বামীজী বলছেন, All the theists agree that behind the changeable there is an Unchangeable, though they vary in their conception of the Ultimate. (*আস্তিকমাত্রেই স্বীকার করেন যে, এই পরিণামী জাগতের পশ্চাতে একটা অপরিণামী বস্তু আছে –যদিও সেই চরম পদার্থের ধারণা সম্বন্ধে তাঁদের মতভেদ আছে।*) যাঁরা ধর্মে বিশ্বাস করেন, ঈশ্বরে যাঁদের বিশ্বাস আছে, তাঁরাই মানেন, বিশ্বের সব কিছুই পরিবর্তনশীল, এই পরিবর্তনের নীচে একটা অপরিবর্তনশীল কিছু আছে। কিন্তু ওই অপরিবর্তনশীল জিনিসটা যে কি এই নিয়ে বিভিন্ন রকম ধারণা আছে। বিশ্বে মোটামুটি আটটি মূল ধর্ম আছে, এই আটটি ধর্মের কেউ এই সংসারকে নিত্য বলছে না, কেউ কেউ সংসারকে কোন মূল্য দেবে না, কেউ একটু মূল্য দেবে, কিন্তু কেউ বলবে না যে, এটাই একমাত্র সত্য। আর সবাই বলবে এই অনিত্যের পিছনে একটা অপরিবর্তনশীল সত্তা আছে। সেই সত্তাকে বিভিন্ন নামে বলছেন।

কিন্তু ভগবান বুদ্ধ এই সংসারকে বলার সময় permanence-impermanence এই শব্দটা নিয়ে আসেন। স্বামীজী বলছেন, Buddh denied this in toto. (*বুদ্ধ এটা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছিলেন।*) ভগবান বুদ্ধের ধর্ম একমাত্র ধর্ম, যেখানে এই অপরিবর্তনশীলকে একেবারেই মানা হয় না। বৌদ্ধরা ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ, শূন্যবাদ এই ধরণের মতবাদ নিয়ে আসেন। তবে ওই অপরিণামী সত্তাকে যদি বৌদ্ধ ধর্মে নিয়ে আসে, তা হলে বৌদ্ধ ধর্ম বেদান্তে পরিবর্তিত হয়ে ওর সাথে মিশে যাবে। কিন্তু আমরা যে অর্থে বলি ভগবান বুদ্ধ এই ধরণের কিছু বলেননি, উনি যেমন এটা বলেননি তেমনি অন্যটাও বলেননি, এবং পরে পরে তাঁর শিষ্যরা দর্শনকে ধরে জিনিসটাকে যেভাবে নিয়ে গেলেন, তারপর থেকে জিনিসটা একটা অন্য রকম হয়ে গেছে। বৌদ্ধ ধর্মের পণ্ডিতদের প্রতিভা এত উচ্চমানের যে, আমাদের এই নিয়ে বলার কোন অধিকার নেই, স্বামীজীর মত একজন যুগাচার্য বলতে পারেন। স্বামীজী এই বলে বলছেন, Buddha says, 'There is no Brahman, no Atman, no soul'. (*বুদ্ধ বলতেন, 'ব্রহ্ম বা আত্মা বলে কিছু নেই'।*) বৌদ্ধরা বলেন, প্রদীপ প্রদীপকে জ্বালিয়ে যাচ্ছে, একটা প্রদীপ জ্বলছে, সেখান থেকে পর পর প্রদীপ জ্বলে যাচ্ছে। অথবা, একটা মশাল জ্বলছে, সেটাকে খুব জোর ঘোরালে মনে হবে একটাই আলোর বৃত্ত যেন ঘুরছে, ওই ঘোরাটা বন্ধ করলে দেখা যাবে কিছুই নেই। এই উপমা দিয়ে ভগবান বুদ্ধ কি বলতে চাইছিলেন, এটা ওদের কারুর কাছেই পরিষ্কার ছিল না। ফলে পরবর্তীকালে তাঁর শিষ্যরা এটাকে নিজের মত ব্যাখ্যা করে গেছেন।

যার জন্য পণ্ডিতরা বৌদ্ধ ধর্মের নাম দিলেন Ethical Idealism, বৌদ্ধ ধর্ম একটা আদর্শবাদ, যেখানে ethics এর বিরাট দাম। তার মানে কোথাও যেন ধর্ম থেকে সরে যাচ্ছে। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে এই ধারণাটাও ভুল, বৌদ্ধ ধর্মকে নিয়ে Ethical Idialism শব্দটা ব্যবহার করাটা মোটেই ভাল নয়। কারণ বৌদ্ধ ধর্ম দেখাচ্ছে ধর্ম জীবনে ধ্যানের কি গভীর প্রভাব রয়েছে। Ethics আর ধর্ম দুটো আলাদা জিনিস, আর ভগবান বুদ্ধ ধর্মকে নিয়েই আলোচনা করছেন। স্বামীজী বলতে চাইছেন, বেদান্তের যে মূল ভাব, ব্রহ্ম, আত্মা, এই জিনিসগুলোকে ভগবান বুদ্ধ নাকচ করছেন। নাকচ করেছেন এই জন্য যে, এগুলো হল technical question। যার জন্য যোগশাস্ত্রে পতঞ্জলি বলছেন, যখন চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয়ে যায় তখন কি হয়? যিনি দ্রষ্টা, যিনি সাধনা করছেন, তিনি নিজের স্বরূপে অবস্থান করেন। নিজের স্বরূপে অবস্থান করা মানে, তখন আমি আমার স্বরূপ নিজেই দেখে নেব, আমার স্বরূপ আত্মা, নাকি ব্রহ্ম, নাকি শূন্য, কি আছে আমি নিজেই দেখে নিতে পারব, তার আগেই সেটাকে নিয়ে এত আলোচনা করার কি আছে! এই অর্থে ভগবান বুদ্ধ বলেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে শিষ্যরা যখন এটাকে নিয়ে কাজে নেমে গেলেন, ওনারা তখন এটাকে যুক্তি দিয়ে, দর্শনের ব্যাখ্যা দিয়ে নিয়ে গেছেন, তখন এই ফাঁকগুলো এসে গেছে।

এরপর স্বামীজী তিনটে চরিত্রকে নিয়ে আসছেন, ভগবান বুদ্ধ, কৃষ্ণ আর যীশু। স্বামীজী প্রথমেই বলছেন, As a character Buddha was the greatest the world has ever seen; next to him Christ. (*চরিত্র হিসাবে জগতের মধ্যে বুদ্ধ সকলের চেয়ে বড় – তারপর খ্রীষ্ট।*) স্বামীজী বলছেন, চরিত্রের দিক দিয়ে ভগবান বুদ্ধ হলেন শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধের পরেই হলেন খ্রাইস্ট। স্বামীজী মাঝে মাঝে এসব কথা কেন বলতেন, বোঝা খুব মুশকিল। এই ধরণের কথার কোন অর্থ হয় কিনা একমাত্র স্বামীজীই বলতে পারবেন। স্বামীজী আবার কোথাও কোথাও যীশুকে এত উঁচুতে রাখতেন যে, ওই জায়গায় গিয়ে এই ধরণের কথার ভুল

ব্যাখ্যা হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা পুরোমাত্রায় থেকে যায়। স্বামীজী যেটা বলতে চাইছেন তা হল, যীশুর তাও কিছু কিছু ঘটনা ছিল যেখানে দেখা যায় যীশু নিন্দা করছেন। তখনকার মন্দিরে যেসব প্রথার প্রচলন ছিল, যীশু সেই সব প্রথাগুলির বিরুদ্ধে আক্রমণ করে অনেক কিছু করছেন। ওদের যাঁরা পণ্ডিতরা ছিলেন, যীশু তাঁদের আক্রমণ করে অনেক কথা বলছেন। ভগবান বুদ্ধ কাউকে আক্রমণ করে কিছু বলেননি। ভগবান বুদ্ধের মধ্যে যখন প্রেমের প্রবাহ চলছে, তখন সেখানে সব সময় একটা শান্ত ভাব বিরাজ করত।

গীতার বাণীর শ্রেষ্ঠত্ব

স্বামীজী সেখান থেকে সরে এসে বলছেন, But the teachings of Krishna as taught by the Gita are the grandest the world has ever known. (*কিন্তু গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যা বলে গেছেন, তার মতো মহান্ উপদেশ জগতে আর নেই।*) আমাদের কাছে ভগবান বুদ্ধও অবতার শ্রীকৃষ্ণও অবতার, যীশুকে ওরা ঈশ্বরের পুত্র বলছে, আমাদের কাছে তিনি অবতার। শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট এই তিনজনই আমাদের কাছে অবতার। তিনজনই যদি ভগবান হন, তাহলে ভগবানের ছোট বড় হয় না। কিন্তু তাঁদের গ্রন্থ থেকে আমরা যে ছবি পাই, সেই ছবিকে আধার করে বিচার করতে গেলে তখন আরেকটা জিনিস এসে যায়, তা হল – যে কোন ধর্মগ্রন্থের দিক দিয়ে যদি যাওয়া যায়, তাহলে আধ্যাত্মিক ভাব, মনের বিস্তার আমরা কোন ধর্মগ্রন্থে থেকে বেশি পাচ্ছি? স্বামীজী তখন সেখানে গীতাকে নিয়ে আসছেন। গীতার যে ভাব, গীতার যে গভীরতা এর ধারে কাছে কোন ধর্মগ্রন্থ নেই, এটা কিন্তু ঘটনা। যদিও নিউ টেস্টামেন্ট আর গীতার মধ্যে তফাৎ করা মুশকিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও গীতা যত রকমের ভাবকে নিয়ে এসেছে, যত রকম দর্শন নিয়ে এসেছে, এনে যেভাবে সেগুলোকে সমন্বয় করে দিচ্ছে, এটা একটা সাংঘাতিক ব্যাপার।

দ্বিতীয়তঃ গীতা সংসারের অনিত্যতাকে যত জোরালো ও স্পষ্ট ভাবে উপস্থাপিত করছে, অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে সেভাবে দেখানো হয়নি, বরঞ্চ একটু কম দেখা যাবে। কিন্তু তাই বলে আমরা কোন ধর্মগ্রন্থকে ছোট, কোন ধর্মগ্রন্থকে বড় বলতে পারি না, বিশেষ করে আমাদের মত লোকেদের পক্ষে কোন ধর্মগ্রন্থকে নিয়ে মন্তব্য করাই উচিৎ নয়। স্বামীজী ছিলেন যুগাচার্য, তিনি একজন আচার্য, একজন প্রফেট, প্রফেট অর্থ যিনি ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার শিক্ষা দেন। আমরা প্রফেট বলতে অবতার মনে করি, কিন্তু প্রফেট শব্দের অর্থ হল preacher of Divine words। প্রফেটরা শিক্ষা দেওয়ার সময় যাদের শিক্ষা দিচ্ছেন, অনেক সময় তাদের কিছু কিছু পুরনো ধ্যান-ধারণা, যেগুলো জগদ্দল পাথরের মত বসে আছে, সেগুলোকে ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে তার অগ্রগতিকে ত্বরাণ্বিত করার জন্য এমন কিছু কথা বলেন, যে কথাগুলো সব জায়গায়, সবার জন্য নয়। যারা শুনছে, তাদের ভিতরে ওই ভাবটা আনার জন্য অনেক সময় কিছু কথা বলতে হয়। এখানেও অনেকটা সেই ধরণের কিছু কথা স্বামীজী বলছেন। থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে যাঁরা স্বামীজীর কথা শুনছেন, তাঁরা ওই ভাবটাকে নেবেন কিনা জানা নেই, ওই ভাবটা দেওয়ার জন্য স্বামীজী এইভাবে বলছেন। কিন্তু স্বামীজীর রচনাবলী পড়ে দেখলে তখন এই পার্থক্যটা আসে না।

মূল যে প্রশ্ন সেটা থেকেই যাচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ব্যক্তিত্ব গীতার মাধ্যমে আমাদের কাছে আসছে। অর্থাৎ গীতার পুরো উপস্থাপনাটাই অসাধারণ। পুরো বেদের আধ্যাত্মিক সার উপনিষদে আসে আর উপনিষদের সার শুধু গীতাতে যে আসছে তাই না, পুরো গুছিয়ে সারটাকে রাখা হয়েছে। স্বামীজী বলছেন, He who wrote that wonderful poem was one of those rare souls whose lives sent a wave of regeneration through the world. (*যিনি সেই অদ্ভুত কাব্য রচনা করেছিলেন, তিনি সেই-সব বিরল মহাত্মাদের মধ্যে একজন, যাঁদের জীবন দ্বারা সমগ্র জগতে এক এক নবজীবনের স্রোত বয়ে যায়।*) এটা একটা খুব অমূল্য কথা, আজকে যদি কোন ভাবে প্রমাণিত হয়ে যায় যে, কৃষ্ণ বলে কেউ ছিলেন না, ব্যাসদেব বলে কেউ ছিলেন না, ব্যাসদেব গীতা লেখেননি, তাতে কিছু আসে যায় না। কারণ আমরা শব্দ দিয়ে যাব, শব্দের পিছনে যে ব্যক্তিত্ব, সেটা গুরুত্ব, ওই ব্যক্তিত্বের পিছনে যে ব্যক্তি, তাঁর কোন দাম নেই। এর আগে আমরা ব্যক্তি, ব্যক্তিত্ব আর সিদ্ধান্তকে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে এসেছি। কৃষ্ণ একজন ব্যক্তি, কৃষ্ণ এক ব্যক্তিত্ব, কৃষ্ণ একটা সিদ্ধান্ত। কৃষ্ণের যে সিদ্ধান্ত, সেটা সব থেকে ভাল বেরিয়ে আসে গীতাতে, ভাগবতেও আসে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু গীতাতে তিনি যে সিদ্ধান্ত রূপে বেরিয়ে আসছেন, অন্যান্য জায়গায় সেই

ভাবে প্রস্ফুটিত হয়ে বের হননি। বিশ্বের অন্যান্য যত ধর্মগ্রন্থ আছে, যে ধর্মগ্রন্থ একজন ব্যক্তির নামকে আধার করে বেরিয়ে এসেছে, আমরা দেখতে পাই, গীতাতে যেভাবে সব কিছুকে গুছিয়ে বিন্যাস করা হয়েছে, সেটা শ্রীকৃষ্ণই বলে থাকুন, সেটাকে ব্যাসদেব সাতশ শ্লোকে আবদ্ধ করে থাকুন, কিংবা পরে কেউ লিখে মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত করে থাকুন, আজ থেকে পাঁচশ বছর আগেও যদি কেউ লিখে থাকেন, যদিও সেটা সম্ভব নয়, তাহলেও আমাদের মানতে হবে, যিনি গীতা লিখেছেন, যিনি সঙ্কলন করেছেন, তাঁর এমন দুর্ধর্শ মন যে, এই গীতা রচনার মাধ্যমে নিজের জাতির মধ্যে একটা নূতন শক্তির সঞ্চার করে দিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণই হন, ব্যাসদেবই হন, তাতে কিছু আসে যায় না, গীতার পর আর কোন ধর্মগ্রন্থ নেই। ফল কিন্তু সেই একই হবে, শক্তির একটা পুরো প্যাকেজ এসে গোটা একটা সমাজ ও জাতিকে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে গেল।

সমাজ মানে কি, সমাজ তো সব সময় এক থাকে না। কিছু দিন আগে বেলজিয়াম থেকে চারজন বয়স্কা মহিলা এসেছিলেন, তাঁরা আবার ইংরাজী জানেন না, ফ্রেঞ্চ ভাষায় কথা বলেন। একজন শুধু ভাঙা ভাঙা ইংরাজীতে কোন রকমে কাজ চালিয়ে যাবার মত কথা বলতে পারেন। ওনাদের মধ্যে একজন যোগ শেখান। মজা করে তাঁদের জিজ্ঞেস করা হল, আপনারা শীর্ষাসন করতে পারেন? ওনারা খুব আনন্দের সাথে জানালেন, খুব সহজেই করতে পারেন। জিজ্ঞেস করা হল, শরীরের দিকেই মন নাকি কিছু শাস্ত্র জানা আছে? শুনে তিনি খুব অবাক হয়ে বললেন, যোগসূত্রের পুরো অধ্যায় গুলো তাঁর মুখস্ত। আর সঙ্গে সঙ্গে সুর ও ছন্দ মিলিয়ে তিনি শোনাতে শুরু করে দিলেন। উচ্চারণে কোন ত্রুটি নেই। বললেন, হৃষিকেশের কোথায় এসে গুরু সঙ্গ করে পুরো যোগসূত্র মুখস্ত করেছেন। এনাদের দেখে মনে হল, কদিন পর দেখা যাবে হিন্দু ধর্মকে বিদেশীরাই ধরে রেখেছে, হিন্দুরা তো গোল্লায় গেছে। কোথায় সেই বেলজিয়াম, ইংরাজী জানেন না, সেখানে পতঞ্জলি যোগসূত্র তাঁর পুরো মুখস্ত। শুধু মুখস্ত করে রাখেননি, সেই যোগ নিজে অনুশীলন করেন, অপরকে যোগসূত্রের দর্শন শেখাচ্ছেন। তার মানে, পতঞ্জলি যে কাজ করে গেলেন, এটা আর যোগের কয়েকজন শিষ্যের মধ্যে আবদ্ধ রইল না, সেখান থেকে হিন্দু ধর্মের একটা যে শাখা, তার মধ্যেও আবদ্ধ থাকল না, হিন্দু ধর্মেও আবদ্ধ রইল না, কারণ এনারা নিজেরা গোঁড়া খ্রীশ্চান। এই যে কথামৃত, কথামৃতও কলকাতার কয়েকজন ঠাকুরের সন্তান ও ভক্তের মধ্যে এখন আর আবদ্ধ নেই। যত সময় যাবে তত কথামৃত সারা বিশ্বে আধ্যাত্মিকতার তরঙ্গ দিয়ে ধাক্কা মারতে থাকবে।

স্বামীজী গীতাকে নিয়ে এই কথাই বলছেন, Human race will never again see such a brain as his who wrote the Gita. (*যিনি গীতা লিখেছেন, তাঁর মতো আশ্চর্য মস্তিষ্ক মনুষ্যজাতি আর কখনও দেখতে পাবে না।*) এটা নিশ্চিত যে গীতা শ্রীকৃষ্ণ রচনা করেননি। আচার্য শঙ্কর পরিষ্কার বলছেন, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যা যা বলেছিলেন, ব্যাসদেব সেটাকে সাতশটি শ্লোকের মধ্যে লিপিবদ্ধ করে দিলেন। খুব ভাল কথা, কেউ না কেউ তো করেছে, এটা তো আর আকাশ থেকে পড়েনি। যদি আকাশ থেকে পড়ত তাহলে আরও মজার জিনিস হত, সরাসরি ঈশ্বরের কথা হয়ে যেত। ধর্মের সমস্ত দিক গুলিকে নিয়ে, এই রকম গুছিয়ে এক জায়গায় নিয়ে আসা, এই মন জগতে আর আসেনি।

ভাল ও মন্দ – একই শক্তির অভিব্যক্তি

স্বামীজী এদিনের কথা শুরু করেছিলেন, Great saints are the object-lessons of the principle, বলার পর ভগবান বুদ্ধের জীবন, যীশুর জীবনকে উল্লেখ করে দেখাচ্ছেন গীতা কিভাবে একটা উচ্চমানের গ্রন্থ। এরপর বিষয়ান্তরে গিয়ে স্বামীজী আবার বলছেন, There is only one Power, whether manifesting as evil or good. (*জগতে একটামাত্র শক্তিই আছে – সেইটেই কখন মন্দ, কখন বা ভাল রূপে অভিব্যক্ত হচ্ছে।*) শক্তি শক্তিই, ওই শক্তিটাই কখন শুভ শক্তি, কখন অশুভ শক্তি রূপে দেখায়। God and the devil are the same river with the water flowing in opposite directions. (*ঈশ্বর আর শয়তান একই নদী –কেবল স্রোতটা পরস্পরের বিপরীত-গামী।*)

স্বামীজী আমেরিকায় যাওয়ার পর বেশ কিছু দিন সেখানে অনেক আশা নিয়ে থেকে গিয়েছিলেন, যদিও তাঁর সেই অনেক আশা নিরাশায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল। স্বামীজীর কয়েকজন খুব ঘনিষ্ট যাঁরা ছিলেন, তাঁরা

স্বামীজীকে খুব আদর যত্ন করে রেখেছিলেন। কিন্তু সমাজের সাধারণ মানুষের কাছ থেকে তিনি লাঞ্ছনা, প্রতারণা, নিন্দা এগুলোই পেয়েছেন। পরে দেখা যাচ্ছে, রাস্তাঘাটে স্বামীজীকে লোকেরা কিভাবে বিরক্ত করছে, লাঞ্ছিত করছে, অপমান করছে, পাগড়ি ধরে টানাটানি করছে। এক জায়গায় একদল লোক তাঁকে মারবার জন্য তেড়ে গেছে, স্বামীজী একটা গলির মধ্যে ঢুকে লুকিয়ে গিয়ে নিজেকে কোন রকমে বাঁচালেন। এসব কারণে স্বামীজী একটা কোথাও কষ্ট পেয়েছিলেন। যে খ্রীশ্চানিটিকে নিয়ে যারা এত কথা বলে, খ্রীশ্চানিটির ভালবাসা, খ্রীশ্চানিটির প্রেম নিয়ে যারা এত কথা বলে, আর একজন অন্য দেশ থেকে, অন্য ধর্ম, অন্য জাতি থেকে এসেছে, তার সাথে তারা অন্য রকম ব্যবহার করছে। স্বামীজীও পরের দিকে থেকে থেকে খ্রীশ্চান ধর্মের এই দ্বিচারিতা এবং খ্রীশ্চানদের দ্বৈতবাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে আক্রমণ করে গেছেন।

খ্রীশ্চান ধর্মে ঈশ্বর আছেন আর শয়তান বা ডেভিল আছে। এই ধারণাগুলো কিন্তু যীশুর নয়, পরের দিকে বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রভাব থেকে কিভাবে এসে গেছে, আর শয়তান খ্রীশ্চান ধর্মে এত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যে, মনে হয় খ্রীশ্চানিটি শয়তান ছাড়া, ডেভিল ছাড়া চলতেই পারবে না। স্বামীজী এদের এই জিনিসটাকে প্রচুর আক্রমণ করতেন। কারণ স্বামীজী কদাপি কোন পরিস্থিতিতেই দ্বৈতবাদী ছিলেন না। তিনি এবারে এখানে, গড্ আর স্যাটার্নকে এক প্ল্যাটফরমে এনে বলছেন, একটা নদী প্রবাহিত হয়ে চলেছে, নদীর প্রবাহে দুটো যেন দুই দিশায় ভেসে যাচ্ছে, একজন আমাদের সংসারের দিকে, আরেক যেন আধ্যাত্মিকতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে, দুটোর মধ্যে যেন কোন তফাৎ নেই। ভগবান আর শয়তান, শুভ আর অশুভকে নিয়ে অতটা বোঝা খুব মুশকিল, তবে ধর্মের প্রতি ভারতীয় যে দৃষ্টিভঙ্গী, ঐ দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখলে বোঝা যাবে। ভগবান আর শয়তানের জায়গায় যদি দেবতা আর অসুরকে নেওয়া যায়, তাহলে এটা বোঝ যাবে। অসুরদের মধ্যে দানব আছে, দৈত্য রয়েছে আর যত দেবতারা আছে, এদের সবারই বাবা এক, কশ্যপ মুনি। তাদের মায়েরা আবার সবাই আপন বোন। দিতি, অদিতি, বিনিতা ইত্যাদি যাঁরা ছিলেন, এনারা সবাই বোন, সবারই স্বামী কশ্যপ মুনি। এদের সন্তানদের মধ্যে সব রকম গুণ ছিল। কিন্তু যাঁরা অদিতির সন্তান, তাঁদের আদিত্য বলা হয়, এদের কাছে আত্মজ্ঞানটাই যেন বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আর দিতি, দনুর যে সন্তানরা ছিল, তাদের কাছে যেন বুদ্ধির শক্তিটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু শক্তি সেই এক। আমরা যেমন বলি, সবটাই মা করছেন, ভালটাও মা করছেন, মন্দটাও মা করছেন, ওই শক্তিটা যেন এক। আরেকটু উপরে যদি আমরা যাই, তখন দেখব, ঠাকুর বলছেন, প্রদীপের আলোতে একজন ভাগবত পড়ছে, আরেকজন নোট জাল করছে, তাতে প্রদীপের কিছু আসে যায় না। প্রদীপ যেমন একটা আলো, শক্তিও সেই রকম, সেই শক্তি দিয়ে ভালও হচ্ছে, মন্দও হচ্ছে। এখন খ্রীশ্চানিটিতে গড আর ডেভিল এত গুরুত্ব পেয়ে গেল যে, শুধু ডেভিল ডেভিল করে যাচ্ছে। স্বামীজী এটাকে আক্রমণ করার জন্য বলছেন, শক্তির যে আধার সেটা সমান, শুধু দুটো দু-দিকে যাচ্ছে, একটা ঈশ্বরের দিকে যাচ্ছে, যেটাকে বিদ্যা শক্তি বলছি, আরেকটা সংসারের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, যেটাকে অবিদ্যা শক্তি বলছি, কিন্তু শক্তি শক্তিই। এই কথা দিয়ে স্বামীজী সেদিনের ক্লাশ শেষ করেন। পরের দিন স্বামীজী সংক্ষেপে ঠাকুরের জীবনী নিয়ে বলছেন।

১লা জুলাই, সোমবার

শ্রীরামকৃষ্ণ

দেববাণীতে স্বামীজী জুলাইয়ের এক তারিখ থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে শিষ্যদের কাছে ঠাকুরের জীবনী নিয়ে খুব সংক্ষেপে আলোচনা করছেন। স্বামীজী হয়ত এর থেকে অনেক বেশি বলে থাকতে পারেন, কিন্তু মিস্ ওয়াল্ডো যতটুকু নোট নিয়েছিলেন, ততটুকুই আমাদের কাছে এসেছে। প্রথম প্যারাগ্রাফে খুব সংক্ষেপে ঠাকুরের পিতৃদেবকে নিয়ে বলছেন। যাঁদের সামনে এই কথাগুলো বলছেন, ভারত সম্বন্ধে তাঁদের কোন ধারণাই নেই, দু চারটে শব্দ খালি জানা আছে। সেই শব্দ দিয়ে যে কি আইডিয়াকে নিয়ে আসতে চাইছেন, সেটার ব্যাপারেও অতটা পরিষ্কার নন।

আগেকার দিনের নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

ঠাকুরের বাবার কথা বলতে গিয়ে বলছেন, Sri Ramakrishna was the son of a very orthodox Brahmin, who would refuse even a gift from any but a special caste of Brahmines; neither might he work, nor even be a priest in a temple, nor sell books, nor serve anyone. (*শ্রীরামকৃষ্ণের পিতা একজন খুব নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন - এমন কি, তিনি সকল প্রকার ব্রাহ্মণেরও দান গ্রহণ করতেন না। পুঁথি বিক্রি করবার বা কারও চাকরি করবার জো তো ছিলই না, এমন-কি তাঁর কোন দেবমন্দিরে পৌরিহিত্য করাবারও উপায় ছিল না।*) 'Ortthodox Brahmin'এর বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে 'নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ'। উনি এমন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন যে, কারুর কাছ থেকে কিছু নিতেন না। আগেকার দিনে এই ধরণের অনেক ব্রাহ্মণ ছিলেন, যাঁরা কোন চাকরি করতেন না, কারুর কাছ থেকে কিছু দান নিতেন না। শাস্ত্র পাঠ করতেন, মন্দিরে বা গৃহে থাকতেন, কেউ যদি কোন দক্ষিণা দিতেন তাই দিয়েই যতটুকু চলার চালিয়ে নিতেন। পরমহংস সন্ন্যাসীদের আচার ব্যবহার অনেকটা এই রকমই। তফাৎ হল, পরমহংস পরিব্রাজকরা এক জায়গায় থাকেন না, নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে থাকেন। কিন্তু এই ধরণের ব্রাহ্মণরা বাড়ি বানাতেন, বিবাহ করতেন, সন্তানাদিও হত, কিন্তু টাকা-পয়সা থাকত না। কোন পরিচিত কেউ কিছু দিয়ে দিল, জমি-জায়গা দিয়ে দিল, সেই জমিতে আবার নিজে চাষ করবেন না। আগেকার দিনে ব্রাহ্মণদের লাঙল ধরা নিষেধ ছিল। এখনও যারা জাতপাত মানে, লাঙল তারা নিজেরা ধরবে না। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, এখন তারা ট্রাক্টর চালায়। ঠাকুরের বাবা ছিলেন পুরোপুরি একজন নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ, স্বামীজী বর্ণনা দিতে গিয়ে বলছেন, তিনি কারুর দান নিতেন না, শুধু তাঁদের থেকে যাঁরা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁদের থেকে দান নিতেন। এসব তখনকার দিনে ছিল। হিন্দীতে একটা কথা আছে, তিন কানোজিয়া তেরহা চুলহা, তিনজন কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণ যদি থাকে সেখানে তেরোটি উনুন লাগবে। তার মানে, ওদের আগুনও অশুদ্ধ হয়ে যায়। একজন যদি উনুন জ্বালাবার পর যদি কেউ ওই উনুনকে ছুঁয়ে দেয়, উনুন অশুদ্ধ হয়ে যাবে, এত গোঁড়া। তাই বলছেন, তিনজন ব্রাহ্মণ এক জায়গায় থাকলে যে তাদের তিনটে উনুন হবে তা না, তেরোটা উনুন লাগবে, ব্যঙ্গ করে বলা হচ্ছে। শুচি বোধটা অতিরিক্ত মাত্রায় ছিল, এর কতটা ঠিক কতটা ভুল, এই আলোচনায় আমরা আর যাচ্ছি না। ঠাকুরের জীবনী থেকে আমরা জানি, ঠাকুরের বাবা ক্ষুদিরাম চট্টোপধ্যায় আগে অন্য গ্রামে থাকতেন, সেখানে জমিদারের হয়ে মিথ্যা সাক্ষী না দেওয়ার জন্য জমিদারের কোপে পড়ে তাঁকে গ্রাম ছাড়তে হয়। সেখান থেকে তাঁর এক বন্ধু তাঁকে কামারপুকুরে কিছু জমি দিয়ে আশ্রয় দিলেন। চিরদিন অভাবেই দিন কাটিয়েছেন।

স্বামীজী বলছেন, neither might he work, nor even be a priest in atemple, nor sell books, nor serve anyone, স্বামীজী এখানে বই বিক্রির কথা বলছেন, বিদেশীদের বোঝানর জন্যই বলছেন, কারণ তখনও আমাদের দেশে বই বিক্রি করার ব্যাপারটা শুরু হয়নি। তার মানে, এমন নিয়ম নিষ্ঠায় তিনি নিজেকে বেঁধে রেখেছেন যে, তাঁর উপরে যাঁরা ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁরা যদি দানটান দেন তাতেই যতটুকু চলার চলবে। যদি এটা না মানা হয়, তাকে জাতিচ্যুত করে দেবে। জাতিচ্যুত হয়ে গেলে তার ছেলেমেয়ের বিবাহ হবে না, এতই গোঁড়ামি ছিল। ঠাকুরের বাবা গোঁড়া ছিলেন না, নিষ্ঠাবান ছিলেন। নিষ্ঠাবান মানে সত্যিকারের একটা উচ্চ জীবন-যাপন করার চেষ্টা করা, যেখানে সংসারে থেকেও তাঁর জীবন সন্ন্যাস-জীবনের মত হয়ে যাচ্ছে। গোঁড়ামিতে ওই আদর্শটা নেই, বাকি সবটাই আছে। গোঁড়ামি মানুষকে নীচের দিকে নিয়ে যায়, নিষ্ঠা উপরের দিকে নিয়ে যায়। গোঁড়ামি আর নিষ্ঠার মধ্যে এই তফাৎটা থেকে যায়।

He could only have 'what fell from the skies'(alms), and even then it must not come through a 'fallen' Brahmin. (*তিনি একরূপ আকাশবৃত্তি অবলম্বন করে ছিলেন, যা অযাচিতভাবে উপস্থিত হত, তাতেই তাঁর খাওয়া-পরা চলত।*) আকাশবৃত্তি বা অজগর বৃত্তি, যেটা নিজে থেকে এসে গেল, যেখানে কিছু পাওয়ার চেষ্টা থাকে না। অজগর বৃত্তি যেটা হবে সেটাও যেন অন্য জাতির থেকে আসা ছেড়েই দিন, যদি কোন নীচু জাতির ব্রাহ্মণ হয়, তার দানও নেবেন না।

বলছেন, Temples have no hold on the Hindu religion; if they were all destroyed, (*হিন্দু ধর্মে দেবমন্দিরের তেমন প্রাধান্য নেই। যদি সব মন্দির ধ্বংস হয়ে যায়, তাতেও ধর্মের*

বিন্দুমাত্র ক্ষতি হবে না।) স্বামীজী ঠাকুরের সম্বন্ধে বলার আগে একটা প্রেক্ষাপট তৈরী করে নিচ্ছেন। বলছেন, হিন্দুধর্মে মন্দিরের কোন গুরুত্ব নেই, যার জন্য হিন্দুদের সব মন্দির যদি গুঁড়িয়ে দেওয়াও হয়, তাতে হিন্দু ধর্মের কিছুই হবে না, হিন্দুধর্ম যেমন আছে তেমনই থাকবে। মূল কয়েকটি ধর্মে যদি দেখা যায়, তাহলে দেখা যাবে, বৌদ্ধ ধর্মেও এর কোন গুরুত্ব নেই, জৈন ধর্মেও কোন গুরুত্ব নেই, শিখদেরও কোন গুরুত্ব নেই। কিন্তু পরে পরে জৈন ধর্মে মন্দিরের খুব গুরুত্ব পেতে শুরু করল, মন্দির ছাড়া ওদের চলে না। মন্দির খুব গুরুত্ব পায় জুহুদের ধর্মে, ওরা মন্দিরকে সিনাগল বলে, সিনাগল জুহুদিদের ধর্মে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

জুহুদিদের একটা খুব মজার ধারণা হল, ওরা ভগবানের সাথে একটা চুক্তি করে, তুমি আমাকে এই এই এই জিনিসগুলি দেবে, তার বদলে আমি তোমাকে এই এই দেব। আমরা যেমন ঠাকুর-দেবতাদের কাছে মানত করে পূজা দিয়ে থাকি। জুহুদিদের ধর্ম ছিল ট্রাইবালদের ধর্ম। ট্রাইবাল ধর্ম মানেই যখন চুক্তি হবে তখন কি দিয়ে হবে? রক্ত দিয়ে। বন্ধুত্ব করার সময় যেমন বন্ধুত্বের অঙ্গীকার করে দুই বন্ধু দুজনের আঙুল কেটে রক্ত নিয়ে মিশিয়ে দিয়ে বলে, আমার রক্ত তোমার রক্ত এক হয়ে গেল। চেঙ্গিস খাঁর এই রকম একজনের সাথে বন্ধুত্ব ছিল। পরে চেঙ্গিস খাঁ বন্ধুকে নিজের অধীনে নিতে চাইল, বন্ধু রাজী হয়নি। ফলে অনেক ঝামেলার সৃষ্টি হয়। পরে শেষে বন্ধুকে এক বিশ্বাসঘাতকের মাধ্যমে ধরতে সক্ষম হয়। চেঙ্গিস খাঁ বন্ধুকে সম্মান জানিয়ে বলল, বল তোমার শেষ ইচ্ছা কি। বন্ধু বলল, 'দেখ, তোমার রক্ত আমার শরীরে আছে'। দুজনের রক্ত মিলিয়ে ছিল কিনা। 'আমার রক্তটা যেন মাটিতে না পড়ে'। আসলে বন্ধু চেঙ্গিস খাঁকে আটকাতে চাইছিল, তুমি এগুলো যা করছ খুব নৃশংসতার পর্যায়ে চলে গেছে। চেঙ্গিস খাঁ মেনে নিল, 'ঠিক আছে তোমার রক্ত জমিতে পড়বে না'। সেইজন্য বড় একটা চাকা নিয়ে তার শরীরটাকে উল্টোকরে চাকাতে বেঁধে দেওয়া হল। তারপর ওকে spine করে মেরে ফেলা হল। রক্ত পড়ল না, কিন্তু ভিতরে শেষ হয়ে গেল। ট্রাইবাল কালচারে রক্তের এত দাম। ওরা নিজের কিছু না কেটে একটা ঘুঘুকে বলি দিত। জুদাইজিমে বলি দেওয়াটা একটা বিরাট কিছু, তাই ওদের এই বলির প্রচলনটা চলে আসছিল।

পার্সিরা অগ্নির উপাসক, ওদের ফায়ার টেম্পলস থাকে, সেখানে ওরা অগ্নির উপাসনা করে, সেইজন্য মন্দির ওদের কাছে খুব গুরুত্ব পেয়ে থাকে। মুসলমানদের অতটা কড়াকড়ি নেই, কিন্তু মসজিদ হল উপাসনার স্থান, সেই হিসাবে মসজিদের অতটা ভূমিকা নেই। কিন্তু খ্রীশ্চানদের কাছে চার্চের খুব দাম, চার্চ হল যীশুর শরীর। স্বামীজী এই কথা যে শিষ্যদের বলছেন, তাঁরা সবাই খ্রীশ্চান, চার্চকে ওরা যীশুর শরীর রূপে দেখে। যীশু নিজের জীবদ্দশাতেই এই কথাগুলো বলতে শুরু করেছিলেন। কয়েকজন শিষ্যকে নিয়ে একজোট করাচ্ছেন, সেখানেও তিনি দেখাচ্ছেন এই যে শরীর, শরীর মানে একজোট হওয়া, আর যীশুর শরীর এক। সেইজন্য চার্চ একটা বাড়ি রূপে, চার্চ একটা আইডিয়া রূপে, চার্চ উপাসনার স্থান রূপে বিরাট গুরুত্বপূর্ণ। ভগবানের পরেই চার্চের স্থান, সেইজন্য খ্রীশ্চান ধর্মে চার্চ একটা সাংঘাতিক গুরুত্ব পায়। এটাকে আক্রমণ করে স্বামীজী বলছেন, হিন্দুদের কাছে মন্দিরের কোন স্থান নেই। অনেকে এখন বলতে পারে, তাহলে হিন্দুরা অযোধ্যার রামমন্দির নিয়ে এত লাফালাফি কেন করছে? কিন্তু হিন্দুরা মন্দির নিয়ে কিছু বলছে না, রামচন্দ্রের জন্মস্থানে মসজিদ থাকা নিয়ে বলছে। হিন্দুদের সম্বন্ধে লোকেদের একটা ধারণা যে, হিন্দুরা পৌত্তলিক, মূর্তি পূজা করে, হিন্দুদের কাছে মন্দির অনেক গুরুত্ব। কিন্তু তা নয়, হিন্দুদের কাছে মন্দিরের কোন গুরুত্ব নেই, থাকলে শাস্ত্রে উল্লেখ থাকত, হিন্দুদের প্রাচীন শাস্ত্র জানেই না মন্দির বলে যে কিছু হয়।

এই কথা বলার পর স্বামীজী বলছেন, A man must only build a house for 'God' and guests', to build for himself would be selfish; therefore he erects temples as dwelling places for God. (*হিন্দুদের মতে নিজের জন্য বাড়ি তৈরী করা স্বার্থপরতার কাজ; কেবল দেবতা ও অতিথিদের জন্য বাড়ি তৈরী করা যেতে পারে। সেই জন্য লোকে ভগবানের নিবাস-রূপে মন্দিরাদি নির্মাণ করে থাকে।*) নিন্দুকরা যখন স্বামীজীর নিন্দা করে, বিশেষ করে কম্যুনিস্টরা, তখন তারা বলে এটা হল, Swami Vivekananda brand of Hinduism, বলতে চাইছে, স্বামীজী যেন নিজের মত করে হিন্দুদের নিয়ে একটা খুব সুন্দর চিত্র অঙ্কন করে দেখাতে চাইছেন। জিনিসটা কখনই তা নয়, স্বামীজী কক্ষণ মিথ্যা কথা বলেননি। একটা ছোট্ট ঘটনার কথা বললে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। স্বামীজী আমেরিকায় যাওয়ার পর

প্রথমের দিকে খ্রীশ্চানরা প্রচুর আক্রমণ করছিল। আর তার আগে থেকে আমেরিকায় প্রচুর ছবি ছাপিয়ে দেখানো হচ্ছিল ভারতে হিন্দুরা কত অসভ্য, বর্বর, নৃশংস জাত। যেমন একটা ছবিতে দেখানো হচ্ছে গঙ্গা নদী, নদীর পারে চিতাদাহ হচ্ছে, সেখানে ছোট ছোট কোলের শিশুকে নদীতে নিক্ষেপ করা হচ্ছে, নদীতে বড় বড় কুমীর ভাসছে। মেরী লুই বার্কের বইতেও এই ধরণের প্রচলিত ছবিগুলো দেওয়া হয়েছে। স্বামীজী খুব মজা করে সেখানে বলছেন, ছবিটা ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখবেন মায়েদের গায়ের রঙ কালো আর শিশুগুলোর গায়ের রঙ ধবধবে সাদা, যাতে করুণা আসে। স্বামীজী এক জায়গায় বক্তৃতা দিতে গেছেন, সেখানে একজন জিজ্ঞেস করছে, 'স্বামীজী আপনাদের দেশে এখনও কি বাচ্চাদের গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হয়'? স্বামীজীও খুব মজা করে বলছেন, 'হ্যাঁ, আমাকেও ফেলে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু আমি মোটাসোটা ছিলাম কিনা, তাই কুমীর আমাকে খায়নি'।

আরেক জায়গায় স্বামীজী বলছেন, 'আমাদের ওখানে গঙ্গায় কুমীর হয় না'। কিন্তু আমরা জানি গঙ্গায় কুমীর হয়, হিন্দু ধর্মের একটা বাজে জিনিসকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য স্বামীজীর মিথ্যা কথা বলার কি দরকার ছিল। এই প্রশ্ন অনেকের মধ্যে আসে। আমরা কখন শুনিনি যে মানুষকে গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হত। তবে অনেক সময় প্লেগ, কলেরা মহামারীতে প্রচুর লোক একসাথে মারা যেত, তখন সবাইকে দাহ করতে পারত না, তাই গঙ্গায় নিয়ে ফেলে দিয়ে আসত। সেটাকেই রঙ চড়িয়ে এরা দেখিয়ে বলছে, আমরা হলাম একটা অসভ্য, বর্বর জাতি, আমাদের বাঁচানো দরকার। এই সব ছবি দেখিয়ে খ্রীশ্চান ফাদাররা টাকা সংগ্রহ করত, সেই টাকা দিয়ে খ্রীশ্চান ধর্মের প্রচার করত। আর হিন্দুরাও এমন ছিল যে, টাকাগুলো নিয়ে নিত, নিয়ে কেউ আর ধর্মান্তরিত হত না। স্বামীজী বলছেন, ছিপ ফেলার পর ছিপের খাবারটা খেতে গিয়ে ছিপটাকেও মাছেরা গিলে ফেলে। কিন্তু হিন্দুরা অনেক চালাক, ছিপের খাবারটা খেয়ে ছিপটাকে ছেড়ে দেয়। আর এটা খুবই সাধারণ একটা কথা, সত্যি হল যে, গঙ্গায় কুমীর হয় না, গঙ্গায় ঘাড়িয়াল হয়। ঘাড়িয়াল গুলো শুধু মাছ আর ছোট ছোট জলজ প্রানী খেয়ে থাকে। কুমীরের বিশাল শরীর ও মাথাটা বিরাট হয়, যেগুলো মানুষকে টেনে নিয়ে যায়। অনেক আগেই গঙ্গায় কুমীর শেষ হয়ে গেছে। রুডিয়ার্ড কিপ্লিং তাঁর একটা গল্পে মুঙ্গেরে গঙ্গার ঘাটে একটা কুমীর একজনকে আক্রমণ করা নিয়ে এমন ভাবে কাহিনীকে চিত্রণ করেছেন যে মনে হবে যেন সারা ভারতবর্ষ জুড়ে গঙ্গানদী আর গঙ্গানদীতে শুধু কুমীর ভেসে বেড়াচ্ছে। কুমীরের একটা বৈশিষ্ট্য হল, ওরা ডাঙাতেও চলতে পারে, ঘাড়িয়াল চলতে পারে না। সমস্যা হল হিন্দীতে ঘাড়িয়ালকে ঘাড়িয়াল বলছে আর কুমীরকে মগরমাছ বলছে, বাংলায় ঘাড়িয়ালকেও কুমীর বলে আর কুমীরকেও কুমীর বলে। ফলে এই ভুল বোঝাবুঝিটা এসে গেছে। সেইজন্য স্বামীজী ঠিকই বলছেন, গঙ্গায় কোথাও মগরমাছ হয় না। আমি বিদেশে আছি, বিদেশীদের কাছে আমার বাড়ির কথা বলার সময় যেটা আমার ভাল জিনিস সেটাকেই নিয়ে বলব। যারা স্বামীজীর নিন্দা করছে তারা একবারও ভেবে দেখছে না যে, যদি তাদের মেয়ের কোথাও বিয়ের কথা বলতে যায়, সেখানে তার মেয়ের ভাল কথাগুলোই বলবে, মেয়ের নিন্দা করবে না। গুণ দুর্গুণ সবারই আছে, সব মানুষেরই থাকে, সব সমাজ, সব ধর্মেই থাকে। কিন্তু যখন বাইরে নিজের দেশ, নিজের ধর্মের কথা বলতে যাব তখন সেখানে আমাদের দুর্বলতার কথা কেন বলতে যাব! আমার বাড়ির দুর্বলতা আলাদা করে আমার বাড়ির লোকেদের কাছে বলব। ভারতবর্ষ এমন উচ্চ আদর্শ, উচ্চ চিন্তা-ভাবনা মানবজাতির জন্য নিয়ে এসেছে, সেগুলোকে নিয়ে না বলে অন্য সব আজেবাজে জিনিসগুলিকে নিয়ে বলে যাচ্ছে।

স্বামীজী এই জায়গায় বলছেন, নিজের জন্য বাড়ি করা, নিজের জন্য ভোগ করাটা স্বার্থপরতা। সেইজন্য কায়দা করে এই ভাবে বলা হত, বাড়ি যদি বানাতেই হয় তাহলে মন্দির নির্মাণ কর আর ধর্মশালা তৈরী কর। বিড়লারা এখনও তীর্থস্থান গুলিতে মন্দির, ধর্মশালা নির্মাণ করে যাচ্ছে। নিজেদের সুখ সুবিধার জন্য, নিজের আত্মরক্ষার জন্য একটা বাড়ি থাকত, কিন্তু আমরা যেভাবে কল্পনা করি একটা বিরাট রাজমহল থাকবে, এতটা করতে নেই। কেউ কেউ করত safety securityর জন্য। অর্থ ও ক্ষমতা থাকলে এখানকার মানুষ ধর্মশালা বানাত আর মন্দির বানাত। এমনকি এখনও অনেক বাড়িতে যে রান্নাবান্না করা হয়, সেটাও এই মনোভাব নিয়ে করা হয় যে, আমি আমার কুলদেবতার সেবার জন্য রান্না করছি, যা কিছু রান্না করা হবে ভগবানের সেবার জন্য, অতিথির জন্য। এই ভাবগুলি দিনে দিনে ভারতবর্ষ থেকে চলে গিয়ে সমাজে একটা

পচন ধরে যাচ্ছে। মানুষ দিন দিন স্বার্থপরতার একেবারে চরম পর্যায়ে চলে যাচ্ছে, মানুষরাও তাই এত কষ্ট পাচ্ছে, আর মরছে।

স্বামীজী ঠাকুরের বাবার কথা বলার পর এবার তাঁর দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমনির প্রতিষ্ঠিত মা কালীর মন্দিরে পুরোহিত রূপে কাজে যোগ দেওয়া নিয়ে বলছেন। Owning to the extreme poverty of his family, Sri Ramakrishna was obliged to become in his boyhood a priest in a temple dedicated to the Divine Mother. (*অতিশয় পারবারিক অসচ্ছলতার হেতু শ্রীরামকৃষ্ণ অতি অল্প বয়সে এক মন্দিরে পূজারী হতে বাধ্য হয়েছিলেন। মন্দিরে জগজ্জননীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল –তাঁকে প্রকৃতি বা কালীও বলে থাকে।*) ঠাকুরের দাদা রামকুমার কলকাতায় এসে টোল খুলে শাস্ত্র পড়াতে শুরু করলেন, সঙ্গে ছোট ভাই গদাইকেও নিয়ে এলেন। কিন্তু গদাইএর পড়াশোনাতে কোন আগ্রহ ছিল না। ইতিমধ্যে দক্ষিণেশ্বর রাণী রাসমনি মা কালীর মন্দির নির্মাণ করলেন, দাদা রামকুমার সেই মন্দিরের পুরোহিত হয়ে এলেন। সঙ্গে ভাই গদাধরও এসেছেন। রামকুমারের মধ্যে কতটা ছিল আমাদের জানা নেই, কিন্তু বাবার সব গুণ গদাইয়ের মধ্যে ছিল, প্রচণ্ড গোঁড়া ছিলেন। ঠাকুরের মাথার মধ্যে আছে, এই মন্দির কৈবর্তের, এখানকার অন্ন কৈবর্তের, ঠাকুর খাবেন না। মাকে অর্পণ করার পর প্রসাদ হয়ে আসছে, তাতেও উনি কৈবর্তের অন্ন ছোঁবেন না। পরের দিকে হৃদয়রামরা আসার পর প্রথম প্রথম তাঁদেরও অস্বস্থি লাগত। এগুলো একশ বছর আগেকার কথা, এই কথাগুলো এখন শুনলে আমাদের মনে হয়, তখনকার দিনে এসব কি হচ্ছিল!

আমাদের সমাজ জাতিপ্রথাকে বরাবর প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে। যদি খুব জাগতিক স্তর থেকে কথা বলা হয়, যেখানে আমাদের নিজের জীবন, নিজের শরীর এগুলোই শেষ কথা, সেখানে সত্যিই মনে হয়, জাতিপ্রথাকে যেন বেশী রকম প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু যাঁরা অন্য স্তরে থাকেন, তাঁদের কাছে ব্যাপারটা অন্য রকম। একজন সন্ন্যাসী, তাঁকে সেমিনার ও অন্যান্য কাজে মাঝে মাঝেই বাইরে বাইরে ঘোরাফেরা করতে হয়। উনি এমনিতে হয়ত খুবই লিবারাল, খোলামেলা। কিন্তু বাইরে গিয়ে কোথাও কিছু খান না। অত ঘন্টা প্লেনে করে বিদেশে যাচ্ছেন, তখনও প্লেনের কিছু খাবার খান না, সঙ্গে তিনি নিজের কিছু খাবার নিয়ে যান। সেমিনার আদিতেও উদ্যোক্তাদের কোন খাবার খাবেন না, খুব জোর বোতলের কোন ঠাণ্ডা জল বা পানীয় কিছু খাবেন। উনি নিজেই সবাইকে বলেন, ভাই আমি দেখেছি বাইরে কিছু খেলেই আমার শরীর খারাপ করবেই করবে। এই রকম একজন দুজন নয়, অনেক সন্ন্যাসী আছেন, বাইরের খাবার খেলেই তাঁদের শরীর খারাপ করে যাবে। এগুলো একটা ভাব, ওই ভাবকে নিয়ে তিনি নিজেকে উন্নত করছেন। আর যারা নীচু মনের, সংস্কৃতিতে যারা অনেক পিছিয়ে আছে, তারা এগুলোর নিন্দা করবে, এটাই তাদের স্বভাব। সংস্কৃতিতে যারা অজ্ঞ, মুর্খ হয় তারা সংস্কৃতি সম্পন্ন উচ্চ মনের লোকেদের নিন্দা করবে। যাঁরা খুব উচ্চ সংস্কৃতিমনস্কতার মানুষ, তাঁরা কখনই তাঁদের থেকে নীচু সংস্কৃতির লোকেদের নিন্দা করবেন না। একজন উচ্চ ব্রাহ্মণ তৎকালীন শূদ্রকে গিয়ে কখন বিদ্রুপ করবেন না, তাকে নিন্দা করে আক্রমণও করবেন না। খুব বেশি হলে বলবেন, তুমি দূরে থাক। এখন যারা নীচু মনের, অসংস্কৃত মানসিকতার লোকেরা ঠাকুরকে নিয়ে বলবেই, ঠাকুর এগুলো কি করতেন, এই রকম লোককে আমরা কেন মানতে যাব, ইত্যাদি। কিন্তু এনারা এই রকমই ছিলেন, এনাদের সবারই শুদ্ধ পবিত্র জীবন, ঠাকুরেরও তাই, ঠাকুরের বাবারও তাই।

রামকুমার ও ঠাকুর কলকাতায় আসার পর দক্ষিণেশ্বরে কালী মন্দির স্থাপিত হল। তখন বলা হত রাসমনির কালীবাড়ি। স্বামীজী বলছেন, it was dedicated to the Divine Mother, also called Prakrity, or Kali, represented by a female figure standing with feet on a male figure, indicating that until Maya lifts, we can know nothing. (*মন্দিরে জগজ্জননীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত –তাঁকে প্রকৃতি বা কালীও বলে থাকে। একটি নারীমূর্তি একটি পুরুষ মূর্তির উপর দণ্ডায়মান –তাতে এই প্রকাশ হচ্ছে যে, মায়ার আবরণ উন্মোচিত হা হলে আমরা জ্ঞানলাভ করতে পারি না।*) স্বামীজী Divine Motherএর বর্ণনা করতে গিয়ে তিনটে শব্দ বলছেন, জগজ্জননী বা মা, প্রকৃতি ও কালী। এর উপর আলোচনা পরেও অনেকবার আসবে। 'মা' যেন ভক্তিমার্গের শব্দ, 'কালী' শক্তিমার্গের শব্দ, আর 'প্রকৃতি' শব্দ আসে সাংখ্য দর্শন ও যোগ দর্শন থেকে। সবটাকে মিলিয়ে বেদান্তে অনেক সময় মায়া বলা হয়। পরের দিকের

শাস্ত্রগুলিতে, যেমন মহানির্বাণতন্ত্রে এই শব্দগুলোকে খুব কায়দা করে মেলানো হয়েছে। প্রথমের দিকে শুনলে বুঝতে সত্যিই খুব কঠিন মনে হবে। স্বামীজী বলছেন, জগজ্জননী, প্রকৃতি, কালী, সব এক। আর এর খুব প্রচলিত রূপ হল, শিব শব হয়ে পড়ে আছেন আর তাঁর উপর মা কালী দাঁড়িয়ে আছেন। এর অর্থ হল, এই যে মায়া, যাঁকে মাতৃশক্তি বা প্রকৃতি বলছেন, ইনি যদি পথ না ছেড়ে দেন, তত দিন আমরা অজ্ঞানে বা মায়ার আবরণে চাপা পড়ে থাকব। এখানে পুরুষ ও নারীর কোন সম্পর্ক নেই। জগতে যত প্রানী আছে, যতক্ষণ তিনি পথ না ছাড়ছেন ততক্ষণ কোন প্রানীরই জ্ঞান আসবে না।

ব্রহ্মা বা ঈশ্বর অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়

এই কথা বলার পর স্বামীজী ব্রহ্ম ও মায়াকে নিয়ে বলছেন, Brahman is neuter, unknown and unknowable, but to be objectified He covers Himself with a veil of Maya, becomes the Mother of the Universe, and so brings forth the creation. (*ব্রহ্ম স্বয়ং স্ত্রী বা পুরুষ নন –তিনি অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। তিনি যখন নিজেকে অভিব্যক্ত করেন, তখন তিনি নিজেকে মায়ার আবরণে আবৃত করে জগজ্জননীরূপ ধারণ করেন ও সৃষ্টিপ্রপঞ্চের বিস্তার করেন।*) হিন্দু ধর্মে শক্তি বা প্রকৃতিকে নারী রূপে দেখানো হয়। নারী রূপে দেখানোর পিছনে যে বিশেষ কোন যুক্তি আছে, তা নয়। কোন বিশেষ যুক্তি নেই ঠিকই, কিন্তু এর উপর একটা দুটো কথা বলা যেতে পারে। পরেও আবার এই বিষয়টা আসবে।

স্বামীজী বলছেন Brahman is neuter, শব্দেরও পুংলিঙ্গ আছে, স্ত্রীলিঙ্গ আছে আবার উভয় লিঙ্গ বা ক্লীবলিঙ্গ আছে, ব্রহ্ম শব্দ ক্লীবলিঙ্গে যায়। কেন পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গে যায় না? বলছেন, unknown and unknowable, আজ পর্যন্ত ব্রহ্মকে কেউ জানতে পারেনি। এই কথাটাই ঠাকুর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বলেছিলেন, সব কিছু উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে, একমাত্র ব্রহ্ম শব্দ উচ্ছিষ্ট হয়নি। কারণ, মন দিয়ে যেটা জানব, সেটাই মুখ দিয়ে বেরোবে। যে জিনিসটাকে আমরা জানি, সেটার ব্যাপারেই আমরা মুখে বলি। যে জিনিসটাকে কেউ জানে না, সেটার ব্যাপারে বলবে কি করে! জহুদিরা ঈশ্বরকে বলে জেহোবা, জেহোবা শব্দের original spelling হল YHWH, যার কোন উচ্চারণ করা যায় না। উচ্চারণ করা যায় না এই অর্থে বলা হচ্ছে যে, ঈশ্বরকে জানা যায় না, যাঁকে জানা যায় না, তাঁকে কোন নামে সম্বোধন করা যায় না। সেইজন্য এই ধরণের অদ্ভূত বানান দিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরে নিজেদের সুবিধার জন্য এর উচ্চারণকে জেহোবা করে দিল। কিন্তু আসলে জেহোবা ওই ভাবে জহুদিদের ভগবান নয়। তেমনি বৌদ্ধ ধর্মে যে নির্বাণের অবস্থার কথা বলা হয়, ওখানে বলছেন sense of nothingness, কোথাও একটা ভুল বোঝাবুঝি থেকে ওটা শূন্যবাদে চলে গেল। আমাদের যেটা মনে হয়, ভগবান বুদ্ধও আসলে বলতে চাইছেন, ওই অবস্থাতে গিয়ে কি হয় সেটা মুখে বলা যায় না। বেদান্তও একই কথা বলছে, ব্রহ্ম কি মুখে বলা যায় না। ব্রহ্মকে চেষ্টা করলেও আমরা জানতে পারব না, কারণ আমরা সাধারণ অর্থে যখন জানা শব্দটা ব্যবহার করে থাকি, অর্থাৎ যে কোন কিছুকে যখন জানা হয়, সেখানে তখন মন আর ইন্দ্রিয় জড়িয়ে থাকে। মন আর ইন্দ্রিয় দিয়ে ঈশ্বরকে জানা যায় না।

ঈশ্বরকে কেন জানা যাবে না? খুব সাধারণ ভাবে এর উত্তর দেওয়া যায়। জগতের যে কোন জিনিসকে জানার সময় আমাদের এই একটি কথাকে খুব ভাল করে মনে রাখতে হবে –যে কোন যৌগিক জিনিসকে সরল জিনিস দিয়ে জানা হয়, কিন্তু যৌগিক জিনিস দিয়ে কখন সরল বা মৌলিক কোন জিনিসকে জানা যাবে না। শরবৎ তৈরী করা হয়েছে, শরবতে কি আছে জানার জন্য জলকে আলদা করতে হবে, চিনি, লবণ, লেবুর রস সব আলাদা করতে হবে। এই ভাবে কিছুটা সরল করে দেওয়া হল। জলকে জানতে হলে আরও সরল করতে হবে, হাইড্রোজেন অক্সিজেনে ভাঙতে হবে। যদি দুইকে জানতে চাই, তাহলে এক'কে জানতে হবে। আমি যদি শুধু দুইকে জানি, এক'কে জানতে পারব না। যে কোন জটিল জিনিসকে জানার জন্য আগে সরলকে জানতে হয়। সরল দিয়ে যৌগিককে জানা হয়, যৌগিককে দিয়ে কখন সরলকে জানা যায় না। এটা একটা খুব সহজ সিদ্ধান্ত, যে সিদ্ধান্ত সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রযোজ্য। আমরা অনেক সময় বলে থাকি, এই জগতে কোন নিয়ম নেই, কদাচিৎ যদি কোন নিয়ম থাকে তাহলে এই একটা নিয়ম সর্বত্র প্রযোজ্য। এক, দুই, তিন দিয়ে আমরা পুরো গণিতকে দাঁড় করিয়ে দিতে পারব। পুরো গণিত যদি জানা থাকে, আর এই কটি সংখ্যা যদি না জানা থাকে তাহলে হবে না। প্লেটোর বই ডায়লগে তিনি সক্রেটিসের অনেকগুলো গল্প রেখেছেন।

সক্রেটিস লোকেদের গিয়ে প্রশ্ন করতেন, আর এত প্রশ্ন করতেন যে, লোকেরা বিরক্ত হয়ে যেত। কিন্তু সক্রেটিসের প্রশ্ন গুলি যদি দেখা হয়, দেখা যাবে প্রশ্নগুলো খুব interesting। সক্রেটিস দেখছেন, লোকেরা যৌগিক জিনিসকে জানে, সরলকে জানে না, সরলকে ধরতে পারছে না। সক্রেটিস ওই সরল জিনিস গুলিকে নিয়ে লোকেদের প্রশ্ন করতেন। আত্মা, ব্রহ্ম, ঈশ্বর হলেন সহজ, একেবারে মৌলিক। মৌলিককে দিয়ে যৌগিককে জানা যাবে, জগৎকে জানা যাবে, জগৎকে দিয়ে কখনই ঈশ্বরকে জানা যাবে না, একেবারেই সম্ভব না, খুবই সরল একটা নিয়ম। এক'কে যদি জানা থাকে তাহলে এক দিয়ে সে দুই, তিন, চার সব জানতে পারবে। কিন্তু দুই, তিন জানে এক জানে না, দুই-তিন দিয়ে কোন দিন সে এক'কে জানতে পারবে না। বোঝাতে গেলে এক'কে আগে নিয়ে আসতে হবে।

এই জিনিসটাকেই স্বামীজী গ্রীক দার্শনিকদের একটা খুব সুন্দর প্রসঙ্গ এনে বলছেন, অনেক আগে গ্রীক দার্শনিকদের একবার এক ব্রাহ্মণের সাথে দেখা হয়েছে, দেখা হওয়ার পর তাঁদের মধ্যে ঈশ্বরকে জানা, জগৎকে জানা নিয়ে কথা চলছে। ব্রাহ্মণ খুব অবাক হয়ে তাঁদের বলছেন, তুমি ঈশ্বরকে না জেনে জগৎকে কি করে জানবে! মুণ্ডক উপনিষদে প্রথমেই খুব নামকরা প্রশ্ন আছে, কোনটাকে জানলে সবটাকে জানা যায়। এর উত্তর দিতে গিয়ে পুরো উপনিষদ দাঁড়িয়ে গেল, কিন্তু মূল কথা, আত্মাকে জানলে সবটাকেই জানা যায়। কিন্তু তুমি সবটাই জানো কিন্তু আত্মাকে জানো না, তুমি কোন দিন আত্মাকে জানতে পারবে না, আত্মাই মূল। যদি মূলকে ধরা হয় তবে যৌগিককে জানতে পারবে, কিন্তু যৌগিককে জানলে সে কোন দিন মূলকে জানতে পারবে না। আমরা জগতের ব্যাপারে বেশি জেনে গেছি, জগতের সব কিছু দিয়ে মাথাকে একেবারে ভরিয়ে রেখেছি, কিন্তু ঈশ্বরকে জানার কোন দিন চেষ্টা করিনি। আর এভাবে জানার চেষ্টা করে আমরা কোন দিন ঈশ্বরকে জানতে পারব না। যে মন বা ইন্দ্রিয় দিয়ে ঈশ্বরকে জানব, আমাদের সেই মন যৌগিক পদার্থ, ইন্দ্রিয়গুলিও যৌগিক পদার্থ।

যে কোন সৃষ্টিতত্ত্ব পড়লে দেখা যাবে যে, সবাই এই একটি কথাই বলছে – complexity is life, simplicity is God। বায়োলজি নিয়ে যারা পড়াশোনা করেন, তাঁরা জানবেন, ইউনিসেলুলার বা single cell দিয়ে জীবন হয় না। মানুষের অর্গান গুলিও আস্তে আস্তে প্রচণ্ড কমপ্লেক্স হয়ে যায়। সেইজন্য জীবনকে চালাবার জন্য সবাইকে প্রচুর complex system দাঁড় করাতে হয়। মানুষকে দেখে যদি কেউ ইউনিসেলুলারকে বুঝতে চায়, কোন দিন বুঝতে পারবে না। বর্তমান কালে উন্নত চিকিৎসা জগতে যে চিকিৎসা করা হয় সেখানেও তারা এটাই করছে, তারা দেখছে সব কিছু ইউনিট লেভেল থেকে কাজ শুরু করে। সমষ্টি থেকে যদি চিকিৎসা করতে যায়, কোন দিন রোগ সারাতে পারবে না। কারণ সমষ্টি অনেক বেশি যৌগিক হয়ে যায়। ঈশ্বরকেও এই জন্যই জানা যায় না, এ পর্যন্ত মন বুদ্ধি দিয়ে তাঁকে কেউ জানতে পারেনি, ভবিষ্যতেও কেউ জানতে পারবে না।

সেইজন্য স্বামীজী বলছেন, unknown and unknowable; আর unknown and unknowable হওয়ার জন্য ঈশ্বর পুরুষ কি নারী বলা যাবে না। ঠাকুর যে গানগুলি করতেন সেই গানের মধ্যেও এই ভাবগুলি অনেক পাওয়া যায়। ঠাকুর মজা করে গল্প বলছেন, একজন মা কালীর গলায় পৈতা পরিয়ে দিয়েছে। আরেকজন মায়ের গলায় পৈতা দেখে তাকে জিজ্ঞেস করাতে, সে বলছে, ভাই, তুমিই ধন্য, তুমি জেনেছ তিনি পুরুষ না নারী। আমরা আমাদের সুবিধার জন্য একটা রূপ দিয়ে দিই, কিন্তু তিনি তো এ রকম নন। আমাদের ভেবে খুব অবাক লাগে, বেদের ঋষিরা এই কথাগুলো কি করে বলেছিলেন, বা ঠাকুর এই কথা কি করে বলেছিলেন। এই যে খুব সহজ ব্যাপার, মৌলিককে দিয়ে যৌগিককে জানা যায়, যৌগিককে দিয়ে মৌলিককে জানা যায় না, ঋষিরা এই সিদ্ধান্ত দিয়ে মৌলিক অবস্থায় পৌঁছাননি। ঋষিরা অন্য ভাবে সেখানে গেছেন, কারণ ওনাদের অনুভূতি সাক্ষাৎ অনুভূতি ছিল, ওনারা দেখছেন, চোখ দিয়ে তাঁকে জানা যাচ্ছে না, চোখ দিয়ে শুধু জগৎকে জানা যাচ্ছে, কোন ইন্দ্রিয় দিয়ে, মন দিয়ে তাঁকে জানা যাচ্ছে না। সেখান থেকে সরে এসে ঋষিরা যেটা পেলেন, সেটা ওনাদের direct experinece। কিন্তু direct experience এর পিছনে যে খুব basic যুক্তি, সেটা এই। শুধু ধর্মের ক্ষেত্রেই নয়, প্রত্যেকটি জিনিসে, যেমন সত্য কি, মূল্যবোধ কি, ভালোবাস কি, এগুলোকে ব্যাখ্যা করা যাবে না, কারণ এগুলো মৌলিক। সক্রেটিস, প্লেটো এনাদের চর্চার

বিষয় ছিল মৌলিক জিনিসগুলো, টেনে টেনে তাঁরা মৌলিককে নিয়ে গেছেন। কারণ ওগুলো আইডিয়ার স্তরে চলে গেছে। আইডিয়ার স্তরে যখন চলে যায়, তখন ওকে ব্যাখ্যা করতে গেলে আর ব্যাখ্যা করা যাবে না।

ঈশ্বরকে জানার জন্য একটা আবরণ দরকার

এই unknown and unknowableকে নিয়ে বলার পর স্বামীজী এবার বলছেন, but to be objectified He covers Himself with a veil of Maya, ব্রহ্মকে তো জানা যাবে না, কিন্তু মানুষ জানবে কি করে, তখন উনি নিজের উপর একটা আবরণ দিয়ে দেন। এই আবরণটাই বেদান্তের ভাষায় মায়ার আবরণ। বিভিন্ন দর্শনে এই আবরণকে কেউ প্রকৃতি বলে, কেউ শক্তি বলে, কেউ মা বলে, আর বেদান্তীরা মায়া বলে। এই জিনিসটা খুব সহজে বোঝা যায়, যদি কোন ধুলিকণা বিহীন ঘরে ঘুলঘুলি দিয়ে ভোরবেলা সূর্যের আলো আসে, আর সেটা একটা দেওয়ালে প্রতিফলিত হলে আলোটা শুধু দেওয়ালেই দেখা যায়। কিন্তু আলোটা কোথা থেকে আসছে ঠিক বোঝা যায় না। এবার ঘরে একটা ধূপ জ্বেলে দিলে যেই ধুয়া তৈরী হবে, ওই ধুয়াতে আলোর একটা রেখা শূন্যে স্পষ্ট দেখা যাবে। ঘরে যদি কোন object না থাকে তাহলে objectতো জানা যাবেই না, আলো যে আছে সেটাও জানা যাবে না, ধুয়োটা এখানে object। Objectকে জানলে আলোকেও জানা যাবে। ঠিক তেমনি ঈশ্বরকে জানার জন্য একটা আবরণ দরকার। এটাকে objectification এই অর্থে বলা হয়, যে ঈশ্বরকে জানা যায় না, সেই ঈশ্বরকে এখন জানা যাচ্ছে, শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধি দিয়ে।

তখন স্বামীজী বলছেন, becomes the Mother of the Universe, and so brings forth the creation, এই ব্রহ্মকে এখন শক্তি রূপে দেখাচ্ছেন, এবার তিনি সৃষ্টিকে নিয়ে আসেন। আমরা সাধারণ ভাবে জানি, ভগবান যখন সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন, তখন তিনি বিষ্ণু রূপে আসেন, সেখান থেকে ব্রহ্মা হন, এগুলো হল যারা যেই মতের তারা সেই মত দিয়ে দেখান। কিন্তু আমরা জানি, যে কোন প্রজাতির মা জন্ম দেন, সেইজন্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে যিনি জন্ম দিয়েছেন, তিনি জগজ্জননী। সেইজন্য গীতায় ভগবান বলছেন, *পিতাহহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ,* শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, আমি এই জগতের মা। জগতের সৃষ্টি যেখান থেকে হচ্ছে, সেটাকে বলছেন মা। যে কোন ধর্মে সৃষ্টির বর্ণনা যেভাবেই করা হয়ে থাকুক, সৃষ্টি হওয়া মানেই এটা শক্তি, শক্তিকে আমরা খুব সহজে মা রূপে সম্বোধন করতে পারি। আমাদের সমস্যা হল, আমাদের মন এত স্থূল, এই জগতে আমাদের মন এত বেশি ডুবে আছে যে, আমরা এই জিনিসগুলো ধারণা করতে পারি না। ধারণা করতে পারছি না বলে, আমাদের মনে হয় একটা কিছু রূপ তো হবে, সূক্ষ্ম রূপই হোক, রূপ তো হবে। আমাদের বোঝান অসম্ভব, রূপ বলে কিছু হয় না, ওটা একটা বিশুদ্ধ শক্তি। সেটাই চৈতন্য শক্তি, তিনি যদি ইচ্ছা করেন, যে কোন রূপে আমাদের দেখা দিতে পারেন। ঠাকুরের ক্ষেত্রেও তাই দেখি, তাঁকে যে কোন রূপে দেখা দিচ্ছেন। আমাদের সমস্যা হল, আমরা ঠাকুরের জীবনী পড়ে দেখছি ঠাকুরের এই সীতার দর্শন হচ্ছে, এই মা কালীকে দিগম্বরী রূপে দর্শন করছেন, আমরা মনে করছি অন্য কোন লোক থেকে সব আলাদা আলাদা হয়ে আসছেন। কিন্তু সেই শুদ্ধ চৈতন্য মায়ার আবরণে তিনিই আলাদা আলাদা রূপে আসেন। যতক্ষণ যে রূপে আসছেন, ততক্ষণ সেই রূপটাই সত্য। সেইজন্য মা সীতা কখনই কালী নন, সীতা আলাদা, কালী আলাদা। কিন্তু আমরা যেভাবে বলছি এই গ্লাশ আর এই টেবিল আলাদা, ওই অর্থে আলাদা নন। সেই শুদ্ধ চৈতন্য দুটো আলাদা আধারে আসছেন, যে শুদ্ধ চৈতন্যের উপর একটা ক্ষীণ আবরণ দেওয়া আছে। কিন্তু এই গ্লাশ আর টেবিল, এই পেনের আবরণগুলো অত্যন্ত স্থূল, সহজে দুটো কখন এক হবে না।

স্বামীজী এটাই বলছেন, The prostrate figure (Shiva or God) has become Shava (dead or lifeless) by being covered by Maya. (*যে পুরুষমূর্তিটি শয়ানভাবে রয়েছেন, তিনি শিব বা ব্রহ্ম, তিনি মায়াবৃত হয়ে শব হয়ে আছেন।*) এবার সেই শুদ্ধ চৈতন্য শব হয়ে আছেন, তিনি ঢাকা আছেন মায়ার শক্তি দিয়ে। এরপর স্বামীজী বলছেন, কিভাবে জ্ঞানী বলেন, আমি আমার নিজের জোরে শিবের অবস্থায় পৌঁছে যাব, যিনি শব হয়ে পড়ে আছেন। কিন্তু ভক্ত সহজ সরল, সে বলে আমি অমনটি পারব না, আমি প্রার্থনা করব, মা, তুমি আমার পথ ছেড়ে দাও। কারণ, মায়া যতক্ষণ পথ না দিচ্ছেন, শক্তি না দ্বার ছেড়ে দিচ্ছেন, এই জগৎ যদি ছেড়ে না দেয়, ততক্ষণ কেউ ওখানে পৌঁছাতে পারবে না। স্বামীজী বলতে চাইছেন,

ওই অখণ্ডের দরজার সামনে শক্তি দাঁড়িয়ে আছে। জ্ঞানীরা, অদ্বৈতবাদীরা মনে করেন, আমরা জয় করে অখণ্ডের ঘরে ঢুকে যাব, আমার নিজের জোরে, পুরুষাকারে এগিয়ে যাব। ভক্তরা বলেন, আমার কি দরকার জয় করে, আমি হাতজোড় করে প্রার্থনা করব। জ্ঞানীরা শক্তির জোড়ে ধাক্কা মেরে বেরিয়ে যায়। গিরিশ ঘোষ বলতেন, স্বামীজী এত বিশাল ছিলেন যে, মায়া তাঁকে যত বাঁধতে যান তত মায়ার দড়িতে কম পরে যায়। অন্য দিকে নাগ মহাশয় নিজেকে এত ছোট করে নিয়েছিলেন যে মায়া তাঁকে দড়ি দিয়ে যত বাঁধতে যান, তত ছোট হয়ে বাঁধনের ফাঁক দিয়ে তিনি বেরিয়ে যান। এবার স্বামীজী ঠাকুরের বর্ণনা করে মা কালীর ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, আর ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে সাধনা করতে এসেছেন, সেখানে মা কালীকে দেখতে কেমন আর তার পিছনে কি সিদ্ধান্ত, এটাকে স্বামীজী বলছেন।

ঠাকুরের সাধনার প্রাথমিক অবস্থা

ঠাকুর খুব নিষ্ঠার সাথে মন্দিরে মা কালীর পূজা করতে শুরু করলেন। পূজা করতে করতে তাঁর এমন ভক্তির ভাব জাগ্রত হয়ে গেল যে, তিনি আর বিধিবাদীয় নিয়মে পূজা করতে পারছিলেন না। ভালবাসাতে আমি আর তুমি এই বোধটা থাকে, আমি ভালবাসছি, আমি ভালবাসা পাচ্ছি। যেমন যেমন এই ভালবাসা গভীর হতে থাকে, ওই বোধটা কমতে থাকে। কমতে কমতে একটা অবস্থায় যাওয়ার পর আমি-তুমি বোধটা মুছে যায়, দুজনে এক হয়ে যায়। ঠাকুরের এখানেও একত্ব ভাবটা আসছে। কিন্তু আরও গভীরে যদি যায়, যেটা মানুষের পক্ষে সম্ভব না, তখন শুধু ভালবাসার ওই গভীরতাটাই থেকে যায়। সেখানে শুধু একটা জ্ঞানের বোধ থেকে যায়, যেটাকে বলছেন, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান এক হয়ে যাওয়া। ঠাকুর এখন যে সাধনা করছেন, এখনও সেই গভীর অবস্থায় যাননি। কিন্তু যেমন যেমন গভীরতা বাড়তে থাকে, আমি-তুমি বোধটা যেমন যেমন ক্ষীণ হয়ে এক সত্তা হয়ে যেতে থাকে, তেমন তেমন সংসারে কাজ করা কঠিন হয়ে যায়। আমরা সাধারণ মানুষ, আমাদের মধ্যে ভালবাসার অত গভীরতা নেই, তাই এই জিনিসটাকে আমরা সেভাবে ধারণা করতে পারি না। কিন্তু প্রায়শই আমরা দেখতে পাই যে, যারা খুব রাগী মানুষ, তার রাগতে রাগতে এমন রেগে যায় যে, তখন ওই লোকটি আর ক্রোধ, এই দুটোকে আলাদা করা যায় না।

আমরা ঠাকুরের জীবনী থেকে জানি যে, তিনি মন্দিরে পূজাদি করতেন আর সন্ধ্যের পর পঞ্চবটীতে গিয়ে ধ্যানাদি করতেন। স্বামীজী পঞ্চবটীর বর্ণনা করে বলছেন, একদিন গঙ্গার জোয়ারে পঞ্চবটীর পাশে বাঁশ ও দড়ি ভেসে এলো, সেটা দিয়ে সেখানে একটা কুঠিঘর তৈরী করা হল। আসলে বলতে চাইছেন, যার মন পুরোপুরি ঈশ্বরের দিকে চলে যায়, জগতের কোন কিছুতে আর মন দিতে পারছে না, তখন ঈশ্বরই তার সব ভার বহন করেন, তার যা যা দরকার ভগবান নিজেই সব পাঠিয়ে দেন। গীতায় ভগবান যেমন বলছেন, *যোগক্ষেমং বহাম্যহম্*। যাই হোক্ ওখানে একটা কুঠি বানিয়েছেন, সেখানে ঠাকুর সাধনা করে যাচ্ছেন। কোন কিছুর দিকে তাঁর আর হুঁশ নেই। লীলাপ্রসঙ্গে ঠাকুরের সাধনার এই দিনগুলির খুব সুন্দর বর্ণনা আছে। দিনরাত মা মা করে যাচ্ছেন, মাটিতে মুখ ঘষে ঘষে কাঁদছেন। লোকেরা মনে করছে, এর নিশ্চয় পেটে শূল বেদনা হচ্ছে, তাই চেঁচাচ্ছে, কিন্তু ঠাকুর মায়ের নামে বিভোর হয়ে ব্যাকুলতায় ছটফট করে যাচ্ছেন।

A relative fed him once a day and watched over him. (*তাঁর এক আত্মীয় এই সময়ে তাঁকে দিনের মধ্যে একবার খাইয়ে যেতেন আর তাঁর তত্ত্বাবধান করতেন।*) স্বামীজী হৃদয়রামের কথা বলছেন, হৃদয়রাম তখন ঠাকুরকে কিভাবে দেখাশোনা করতেন, খাওয়াতেন বলছেন। Later came a Sannyasini or lady ascetic, to help him find his 'Mother'. (*কিছুদিন পর এক সন্ন্যাসিনী এসে তাঁকে তাঁর 'মা'কে পাবার সহায়তা করতে লাগলেন।*) তখনও ঠাকুরের সামগ্রিক জীবনী রচিত হয়ে আসেনি, ঠাকুরের কাছে স্বামীজী যতটুকু শুনেছিলেন, সেটাকেই স্বামীজী নিজের মত করে বলছেন। ঠাকুর ব্যাকুলতার দ্বারাই মা কালীর দর্শন পেয়েছিলেন। এবার সেটাকে শাস্ত্র মতে নিয়ে আসার জন্যই যেন ভৈরবী ব্রাহ্মণীর আগমন। ভৈরবী ব্রাহ্মণী এবার শাস্ত্র মতে ঠাকুরকে সব রকম ক্রিয়া-কর্মাদি করাতে শুরু করলেন।

Whatever teachers he needed came to him unsought; from every sect some holy saint would come and offer to teach him and to reach he listned egerly. But

he worshipped only Mother; all to him was Mother, (*তাঁর যে-কোন গুরুর প্রয়োজন হত, তাঁরা নিজে থেকেই তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হতেন। সকল সম্প্রদায়ের কোন-না-কোন সাধু এসে তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন, আর তিনি আগ্রহ করে সকলেরই উপদেশ শুনতেন। তবে তিনি কেবল সেই জগন্মাতারই উপাসনা করতেন –তাঁর কাছে সবই 'মা' বলে মনে হত।*) প্রত্যেক ধর্মেই প্রচুর সম্প্রদায় আছে। একজন গণিতজ্ঞ হিসাব করে বলছেন, প্রত্যেক ধর্মে তিরিশ বছরে একটা নূতন সম্প্রদায় তৈরী হয়। শুধু খ্রীশ্চানদের মধ্যেই নাকি তিরিশ হাজার সম্প্রদায় আছে। মুসলমানদেরও প্রচুর সম্প্রদায় আছে। আমরা সম্প্রদায় বলতে মনে করি, যিনি যে ইষ্টকে মেনে চলেন। ঠাকুরের কাছে বিভিন্ন সম্প্রদায় থেকে, বিভিন্ন ভাবধারা থেকে সাধু সন্তরা আসতেন, তাঁরা ঠাকুরকে কিছু কিছু ধর্মীয় শিক্ষা দিতেন। ঠাকুর সবারটাই শিখতেন, সব সম্প্রদায়ের ভাব অনুযায়ী সাধনা করতেন, কিন্তু মা কালীর ভাবকে তিনি কখনই ছাড়লেন না, জগতের সব কিছুকে তিনি মায়েরই এক একটা রূপ বলে ভাবতেন। এমনকি অদ্বৈত সাধনার পরেও তিনি মাকে ছাড়লেন না। অখণ্ডের ওই পিঠ আর অখণ্ডের এই পিঠ, এই ভাবটা ঠাকুরের চিরদিনই ছিল।

সাধনা করা মানে, একটা ভাবে ডুবে যাওয়া। একটু আগে যেটা বলা হল, ভালবাসার গভীরে কিভাবে আমি-তুমি ভেদটুকু মিটে গিয়ে শুধু ভালবাসাটুকু থেকে যায়। আমরা যদি একটু কল্পনা করি, ঠাকুর যখন কৃষ্ণকে নিয়ে সাধনা করছেন, তখন কৃষ্ণের সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে শুধু ভালবাসাটুকু থেকে গেছে। শ্রীরামচন্দ্রের সাথেও সেই একই জিনিস হচ্ছে। ফলে ঠাকুর কোন সম্প্রদায়ের নিন্দা করবেন, এই নিয়ে কোন প্রশ্নই উঠবে না। যত তিনি তাঁকে ভালবেসেছেন তত তিনি তাঁর সাথে এক হয়ে গেছেন। যে যাঁর সাথে এক হয়ে গেছে সে কি করে আর তাঁর বা তাঁর লোকেদের নিন্দা করবেন! যেখানেই নিন্দার ভাব, বুঝতে হবে সেখানে দুজনের মনের মাঝখানে বিরাট দূরত্ব আছে। একজন মহিলার স্বামী তার উপর প্রচুর অত্যাচার করত, খুব কষ্টের মধ্যে ছিল। মহিলার পরিচিত একজন সাধু মহিলাকে স্বামীর অত্যাচারের কথা পুলিশকে জানাতে বললেন। মহিলাটি বললেন, দেখুন আমি পুলিশে ডাইরি করতে পারি, কিন্তু করব না, এক সময় ওকে ভালবেসেছিলাম কিনা। তার মানে এই মহিলার মধ্যে কোথাও একটা সত্ত্বগুণের আধিক্য আছে। সত্ত্বগুণ না হলে, এই অত্যাচার সহ্য করার ক্ষমতা থাকে না। একজন মানুষকে ভালবেসেছিল, সে তাকে অত্যাচার করার পরেও যে এই কথা বলতে পারে যে, এক সময় তো ওকে ভালবেসেছিলাম, তাহলে ঈশ্বরকে যে ভালবাসছে, ভালবেসে এক হয় যাচ্ছে, সেখানে কি হতে পারে আমরা ভাবতেই পারি না।

ঠাকুরের প্রকৃতির একটা বৈশিষ্ট্য

স্বামীজী বলছেন, Sri Ramakrishna never spoke a harsh word against anyone. (*শ্রীরামকৃষ্ণ কখনও কাউকে কড়া বা রুক্ষ কথা বলতেন না।*) ঠাকুর কারুকে কখন রুঢ় কথা বলতেন না, কারুর নিন্দা করতেন না। So beautifully tolerant was he that every sect thought that he belonged to them. (*তাঁর হৃদয় এত উদার ছিল যে, সকল সম্প্রদায়ই ভাবত – তিনি তাদেরই লোক।*) এগুলোই হল মানুষের মূল সত্তার সত্যিকারের প্রকাশ, এই প্রকাশ হয়ে গেলে মানুষের সহ্য শক্তি বেড়ে যায়, সে আর কারুর নিন্দা করতে পারে না। আল বেরুনি খুব নামকরা মুসলিম পণ্ডিত ছিলেন, তিনি ভারতবর্ষে এসে হিন্দু ধর্মকে নিয়ে অনেক পড়াশোনা করেছিলেন। তিনি তাঁর বইতে এক জায়গায় বলছেন, হিন্দুরা এমন যে তাদের বাড়িতে যদি কোন মুসলমান চলে আসে, আর যে পাত্রে তাকে জল দেবে, ওই পাত্রটা ওরা বাইরে ফেলে দেবে। এটা উনি দশম শতাব্দীতে লিখছেন। ধুয়ে মুছে, আগুনে দিয়ে যে রেখে দেবে তাও করছে না, অর্থাৎ তাদের কাছে পুরো জিনিসটাই অপবিত্র হয়ে গেছে। স্বামীজী পরের দিকে বলছেন, ভারতবর্ষের সর্বনাশ সেইদিন থেকে শুরু হল যেদিন থেকে তারা 'ম্লেচ্ছ' শব্দটা আবিষ্কার করল। আরেক জায়গায় বলছেন, যেদিন বিদেশীদের সাথে interact করা, মেলামেশা করা ভারত বন্ধ করে দিল, সেদিন থেকে ভারতের সর্বনাশ শুরু হল। Exposure হলে মানুষের মন উদার হয়, exposrureএ সমস্যাও হয় যদি ভিতরে শক্তি না থাকে তাহলে ওই প্রবাহেই ভেসে চলে যাবে। নিজের ভিতরটা যদি সব দিক দিয়ে ঠিক থাকে তবেই exposure সম্ভব, ঠাকুর যেটা বলছেন, চারাগাছ অবস্থায় বেড়া দিয়ে রাখতে হয়, বড় হয়ে গেলে তখন হাতিও বেঁধে রাখা

যাবে। লীলাপ্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দজী বর্ণনা করছেন, ঠাকুর বলতেন, যখন আমার কাছে যে ভাবের লোক আসত, তখন ওই ভাবটাই আমার ভিতর থেকে উঠে আসত।

স্বামীজী বলছেন, He loved everyone. To him all religions are true. He found a place for each one. He was free, but free in love, not in 'thunder'. (*তিনি সকলকেই ভালবাসতেন। তাঁর দৃষ্টিতে সকল ধর্মই সত্য, তাঁর কাছে সকলেরই স্থান ছিল। তিনি মুক্তস্বভাব ছিলেন, কিন্তু সকলের প্রতি সমান প্রেমেই তাঁর মুক্ত স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যেত, বজ্রবৎ কঠোরতায় নয়।*) স্বামীজী ঠাকুরের তুলনা করছেন। সেন্ট পল যেন একটু মিশনারি ছিলেন, তাঁর এই জিনিসটা ছিল, জয়ের পতাকা এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। স্বামীজী এখানে thunder শব্দটা নিয়ে তুলনা করছেন, সেন্ট পল যেখানে যাচ্ছেন সেখানেই জয়ের পতাকা নিয়ে যাচ্ছেন। ঠাকুর ভালবাসা দিয়ে সবাইকে টেনে আনতেন, জয়ের পতাকা নিয়ে না। The mild type create, the thundering type spreads. (*এইরূপ কোমল থাকের লোকেরাই নূতন ভাব সৃষ্টি করেন, আর 'হাঁক-ডেকে' থাকের লোক ঐ ভাব চারিদিকে ছড়িয়ে দেন।*) যাঁরা শান্ত মনের হয় তাঁরাই সৃজনশীল হতে পারেন। আমেরিকাতে একদল লোক গবেষণা করে বার করেছে, যারা সত্যিকারের বুদ্ধিমান, প্রতিভাবান হন, তাঁদের কখন বেশি বন্ধু থাকে না। বেশি বন্ধু আছে, বিরাট সোশ্যাল সার্কেল, বুঝতে হবে সে খুব স্থূল মস্তিষ্কের লোক। যারা সৃজনশীল, সূক্ষ্ম বুদ্ধি যাদের আছে, এরা নিজের চিন্তার জগতে এত ডুবে থাকে যে, ওদের পক্ষে সম্ভব না যে দশজন লোকের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে চলবে। স্বামীজী এটাই এখানে শেষে বলছেন, Paul was the thundering type to spread the light. (*সেন্ট পল এই শেষ থাকের লোক ছিলেন।*)

চৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্মও অত্যন্ত শান্ত মানুষের ধর্ম, অন্য দিকে মহম্মদকে ধর্মের জন্য তলোয়ার নিয়ে নামতে হয়েছিল। যীশু শান্ত ছিলেন, কিন্তু আক্রমণাত্মক ভাব তাঁর মধ্যেও আমরা একটু দেখতে পাই। যেভাবে তীর্থস্থানে গিয়ে পায়রাগুলিকে খুলে ছেড়ে দিচ্ছেন, পয়সাগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছেন, আমার বাবার রাজ্যে বসে তোমরা ব্যবসা করছ! তারপর একটা গাছে ফল নেই সেটাকে কেটে ফেলতে বলছেন, তখন ওই ফলের মরসুম ছিল না, এই ধরণের কিছু কিছু জিনিস যীশুর জীবনে ছিল। আমরা যেভাবে ভগবান বুদ্ধকে একেবারে শান্ত বলে মনে করি, যীশু ওই রকম শান্ত ছিলেন না। তবে এগুলোতে কিছু আসে যায় না, আমরা আমাদের মত করে মহাপুরুষদের মাপতে যাই, এভাবে মাপাটা ভুল। এগুলো ব্যক্তিত্বের একটা ধরণ, সৃষ্টি তত্ত্বে সত্ত্ব, রজো ও তমো তিনটে গুণই আছে, এগুলোর মিশ্রণও আছে। ভগবান অবতার হয়ে আসার সময় তিনটে গুণের কোন একটা গুণকে আশ্রয় করে নিয়ে আসেন। কপিল মুনি, শুকদেব এনারা বিদ্যাকে অর্থাৎ সত্ত্বগুণকে আশ্রয় করে এসেছিলেন, আবার কূর্মাবতারে ঘোর তমোগুণকে আশ্রয় করে এসেছিলেন, বরাহ অবতারও তমোগুণের, নৃসিংহ অবতার, সেটাও তমোগুণের অবতার, হিংসা ভরে আছে কিনা। ভগবান যে গুণের আশ্রয় নিয়ে আসেন, ওই গুণ অনুযায়ীই কাজ হয়। কিন্তু তাই বলে আমরা বলতে পারি না যে, ওই অবতার ভাল, এই অবতার ভাল নয়। যীশু সত্ত্বগুণের কিন্তু রজো মিশ্রিত আবার ভগবান বুদ্ধ একেবারে ঘোর সত্ত্ব, তাই বলে আমরা বলতে পারিনা, উনি ভাল তিনি মন্দ।

সঙ্ঘের প্রয়োজনীয়তা

পরের প্যারাগ্রাফে স্বামীজী ঠাকুরকে নিয়ে কম বলছেন, কিন্তু বর্তমান যুগের ধর্মকে নিয়ে বেশি বলছেন। স্বামীজী এবার যেটা বলছেন, এই ভাবটা স্বামীজীর রচনাবলীতে অনেক জায়গায় বিভিন্ন ভাবে ঘুরে ঘুরে এসেছে। স্বামীজী বলছেন, সেন্ট পলের দিন শেষ হয়ে গেছে। যে ধর্মগুলো তলোয়ারের জোরে, বন্দুকের জোরে চলছিল, সেই দিন আর এখন নেই। কিন্তু তারপরেই স্বামীজী একটা খুব দামী কথা বলছেন, A self-adjusting organization is the great need of our time., (*আমাদের যুগের এখন বিশেষ প্রয়োজন —এমন একটি সঙ্ঘ, যা আপনা হতেই নিজেকে দেশকালের উপযোগী করে নেবে।*) এমন একটা সংগঠন চাই, এমন একটা ধর্ম চাই, যাদের নিজেদের মধ্যে adjust করে নেওয়ার ক্ষমতা থাকবে, সবাইকে নিয়ে চলার ক্ষমতা হবে। স্বামীজী আগে নিজের গুরুভাইদের বলতেন, পরে রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুদের বলেছেন, রামকৃষ্ণ

মিশনের কোন সন্ন্যাসী যদি সাধনা করে কোন নূতন পথ বার করেন, সেটাকেও ঠাকুরের মত বলেই জানা হবে। এটাই ক্যাথলিক দৃষ্টিভঙ্গী, এটাই হিন্দুদের বৈশিষ্ট্য, ক্যাথলিক মানে ধর্মের ব্যাপারে সবাইকে নিয়ে চলা।

বলা হয়ে থাকে যে, হিন্দুধর্ম সবাইকে নিয়ে চলে; তাহলে তো হিন্দুদের এটা আগে থেকেই ছিল। না হিন্দুদের ছিল না, সিদ্ধান্ত আর সাধনা বা অনুশীলনে যে ফাঁক হয়, সেটা অন্যান্য ধর্মের তুলনায় হিন্দু ধর্মে সব চাইতে বেশি। খ্রীশ্চানদেরও সিদ্ধান্ত আর অনুশীলনে ফাঁক আছে, ইসলাম, বৌদ্ধ সব ধর্মেই আছে, কিন্তু হিন্দুদের বিশাল ফাঁক। যেমন জাতিপ্রথা, হিন্দু ধর্মে কোথাও জাতিপ্রথার কোন স্থান নেই, কিন্তু অনুশীলনে, জাতিপ্রথা পুরোদমে অনুশীলিত হয়ে চলেছে। একদিকে মনু বলছেন, যেখানে নারীর পূজা হয় সেখানে দেবতারা বাস করেন, অথচ এখানে নারীদের উপর অত্যাচার হয়েই চলেছে। নারী নির্যাতন শুধু ভারতেই হয় না, সব সমাজেই আছে, যেটা স্বামীজী আগেও বলেছেন। যদিও হিন্দু ধর্ম সবাইকে নিয়ে চলে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে সবাই পৃথক পৃথক একটা করে সম্প্রদায় তৈরী করে হিন্দুধর্মের মূল ভাবকে নষ্ট করে রেখেছে। স্বামীজী চাইছিলেন একটা cohesive ধর্ম হবে, যেমন আজ রামকৃষ্ণ মিশনে যেটা হয়েছে। আজকে লোক যতই সমালোচনা করুক, গালাগালি দিক, আজ অমুক বাবাজীই আসুক, পরশু তমুক গুরুজী আসুক, হিন্দু ধর্ম বলতে যেটা বোঝায়, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, রামকৃষ্ণ মিশন সব থেকে ভাল হিন্দু ধর্মকে প্রতিনিধিত্ব করে। বিদেশীরা হিন্দু ধর্ম বলতে প্রথমে বোঝে এটা একটা সম্প্রদায়। এটা ঠিকই যে, হিন্দু ধর্মের উপর ভাল বই সহজে পাওয়া যাবে না, যারাই হিন্দুধর্মের উপর লেখালেখি করে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তারা নিজের সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করেই লেখে। ফলে কেউ যদি হিন্দুধর্মকে ঠিক ঠিক জানতে চায়, জানতে পারে না।

হিন্দু ধর্ম জিনিসটা ঠিক কি, জানতে হলে রামকৃষ্ণ মিশনের ভাব ও তার ক্রিয়াকলাপ দেখতে হবে। কারণ হিন্দুধর্মকে আজ প্রতিনিধিত্ব করছে রামকৃষ্ণ মিশন। অবশ্য সব সম্প্রদায়ই বলবে, আমরাই হলাম ঠিক ঠিক হিন্দু। সব সোনার দোকানে যেমন লেখা থাকে 'লক্ষ্মীবাবু কি অসলি সোনে-চাঁদিকি দুকান'। তালমিছরি শিশিতে লেখা থাকে 'ছবি ও সই দেখিয়া লইবেন, এটাই আসল', একই কোম্পানির নামে আরেকটা শিশিতে লেখা আছে, 'কোন দিন ছবি ও সই ছিল না, এখনও নেই'। কোনটা আসল, আমরা কি করে বুঝব! সবাই বলছে, আমি আসল। এটা এমনিতে কিছু না, রামকৃষ্ণ মিশন যে সিদ্ধান্তে চলে আর হিন্দু ধর্মের কি সিদ্ধান্ত, দুটোকে অধ্যয়ন করলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। যদি আধ্যাত্মিক সিদ্ধান্তের খুব কাছাকাছি থাকে, তাহলে আগে আসবে রামকৃষ্ণ মিশন। স্বামীজীও এই আইডিয়াকে মাথায় নিয়েই রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যে, ঠিক ঠিক হিন্দু ধর্ম কি, এটা যেন একটা জায়গায় ভাল ভাবে রাখা থাকে। ফলে পরে অন্যান্য যে মত আসবে সেটাকেও যেন নিয়ে নেওয়া হয়। পরে হয়ত একদিন দেখা যাবে রামকৃষ্ণ মিশন আর সেভাবে থাকতে পারল না, কিন্তু এখনও পর্যন্ত একই ভাবে চলছে। স্বামীজী তাই বলছেন, self-adjusting organisation, যা কিছু আসবে সেটাকে নিয়েই এগোতে থাকবে, যেটা হিন্দু ধর্মের বৈশিষ্ট্য। When we can get one, that will be the last religion of the world. (*যখন তা হবে, তখন সেটাই হবে জগতের শেষ ধর্ম।*) স্বামীজী অবশ্য অন্যান্য জায়গায় বলছেন, এটা কোন দিনই সম্ভব নয়। তবে ব্যবহারিক বেদান্ত নিয়ে বলতে গিয়ে স্বামীজী বলছেন, ভবিষ্যতে যদি কোন ধর্ম হয় তা বৈষয়িক ধর্ম হবে, যেটা বেদান্তই হবে। কারণ বেদান্তের যে সিদ্ধান্ত তা কখনই কোন মানুষের উপর নির্ভর করে না, বেদান্তের সিদ্ধান্ত খোলা আর সবাইকে নিয়ে চলে।

ঠাকুরের যে নূতন ভাব, তার রথের চাকা ঘুরবেই

এরপর স্বামীজী যেটা বলছেন, এই ভাব স্বামীজীর রচনাবলীতে ছড়িয়ে আছে, The wheel must turn, and we should help it, not hinder. (*এই চক্র চলবে, আমাদের তাকে সাহায্য করতে হবে, তাকে বাধা দিলে চলবে না।*) এই যে নূতন ধর্ম জগন্নাথের রথের চাকার মত চলছে, যে ধর্ম সবাইকে নিয়ে চলবে, এর চলার পথে আমরা যেন বাধা না দিই। বলা হয় জগন্নাথের চাকা ঘুরবেই, রথের দড়িতে যদি হাত লাগাই আমরা ধন্য হয়ে যাব, যদি রথকে আটকাতে যাই পিষে যাব। ঠাকুরের যে ভাব, সবাইকে নিয়ে চলা, এই ভাবকে ঠাকুরের ভক্তরা, শিষ্যরা এলেমেলো করে দিয়ে একটা সম্প্রদায়ে নামিয়ে দিতে পারে, কিন্তু ঠাকুরের ভাবকে নষ্ট করতে পারবে না। যেমন শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে আগে স্বামীজী বললেন, শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে যে

কেউ একটা সম্প্রদায় বানিয়ে নিতে পারে, কিন্তু গীতার যে openness সেটাকে আর কেউ বাঁধতে পারবে না। গীতার উপর যাঁরা ভাষ্য লিখবেন তাঁরা তাঁদের সম্প্রদায়কে আধার করে লিখতে পারেন, গীতাকে বদ্ধ করতে পারেন, কিন্তু আগামীকাল আরেকজন যখন আসবে, তখন সে যুক্তি দিয়ে দেখিয়ে দেবে, আরে ভাই! গীতার তো খোলা মন। ঠিক তেমনি ঠাকুরকে কোন দিন কেউ কোন সম্প্রদায়ে আবদ্ধ করতে পারবে না। ঠাকুরের এই রথ চলছে, বলছেন, যদি তুমি হাত লাগাতে চাও লাগাও, কারণ জগৎ ওটার দিকেই এগোচ্ছে, আর যাই কর এই রথকে আটকাবার চেষ্টা করো না।

ঠাকুরের ধর্ম বিজ্ঞানভিত্তিক

The waves of religious thought rise and fall, and on the topmost one stands the 'prophet of the period'. (*নানাবিধ ধর্মভাবরূপ তরঙ্গ উঠছে পড়ছে, আর সেই-সকল তরঙ্গের শীর্ষদেশে সেই যুগের অবতার বিরাজ করছেন।*) ধর্মের ভাবগুলো যেন এক একটা ঢেউএর মত চলে, একটা সময় এই ঢেউগুলোর মধ্যে, তখনকার সময়ের, ওই যুগের যিনি অবতার, তিনি উচ্চতম অবস্থায় থাকেন। স্বামীজী যে ঠাকুরকে অবতারবরিষ্ঠায় বলছেন, এই অর্থেই বলছেন। শ্রীরামচন্দ্রও অবতার, শ্রীকৃষ্ণও অবতার, বুদ্ধ, যীশু সবাই অবতার, কিন্তু এই যুগটা হল শ্রীরামকৃষ্ণের। বলছেন, Ramakrishna came to teach the religion of today, constructive not destructive. He had to go afresh to Nature to ask for facts, and he got scientific religion which never says 'believe', but 'see', 'I see, and you too can see'. (*রামকৃষ্ণ বর্তমান যুগের উপযোগী ধর্মশিক্ষা দিতে এসেছিলেন, তাঁর কাছে ধর্ম গঠনমূলক, এতে ধ্বংসমূলক কিছু নেই। তাঁকে নূতন করে প্রকৃতির কাছে গিয়ে সত্য জানবার চেষ্টা করতে হয়েছিল, ফলে তিনি বৈজ্ঞানিক ধর্ম লাভ করেছিলেন। সে-ধর্ম কাউকে কিছু মেনে নিতে বলে না, নিজে পরখ করে নিতে পার; বলেন 'আমি সত্য দর্শন করেছি, তুমিও ইচ্ছা করলে দেখতে পারো'।*) দুটো বাক্যকে যদি একসঙ্গে মিলিয়ে দেখা যায়, তাহলে দেখা যাবে, ধর্মের ইতিহাসের দিকে যদি আমরা যাই, তখন দেখতে পাব, মূল যে ধর্মগুলো রয়েছে, সবাই কিন্তু কোথাও প্রকৃতিতে গিয়ে জ্ঞান পেয়েছেন। হিন্দুদের ঋষিরা প্রকৃতির মধ্যেই থাকতেন, প্রকৃতির যে রহস্যগুলো রয়েছে, প্রকৃতির যে সিদ্ধান্তগুলো রয়েছে, সেগুলোকে ধ্যানের গভীরে আবিষ্কার করেছেন। পাশ্চাত্য ধর্মের জহুদিদের এ্যব্রাহাম ঐ ভাবেই জ্ঞান পেয়েছেন, যীশুও ঐ ভাবেই, জরাথ্রুষ্ট্র, যিনি পার্সি ধর্মকে এনেছেন, তিনিও ঐ ভাবেই, প্রফেট মহম্মদও ঐ ভাবেই পেয়েছেন। এনারা কেউই শাস্ত্র পড়ে কিছু পেয়েছেন তা না, অর্থাৎ এনাদের কোন পরম্পরা ছিল না। যীশু তাও নিজের মাতৃধর্মকে অল্প একটু জানতেন, কিন্তু খ্রীষ্ট ধর্মে তার কোন প্রভাব নেই, তিনি যা কিছু পেয়েছেন সরাসরি নিয়েছেন। ভগবান বুদ্ধ তিনি অনেক কিছু জানতেন, হিন্দু ধর্মে পড়াশোনা করেছেন, কিন্তু তাঁর উপলব্ধি সরাসরি। মহবীর জৈনেরও অনেকটা তাই, অন্য দিকে গুরু নানকও অনেক কিছু জানতেন, কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে দিয়ে গিয়েই তিনি জ্ঞান পেয়েছেন। ঠাকুরেরও অল্প একটু পরম্পরা ছিল, কিন্তু তিনি সরাসরি প্রকৃতিতে গিয়ে (প্রকৃতি বলতে এখানে মা), মায়ের সাধনা যখন করেছেন, উত্তরগুলো সরাসরি সেখান থেকে পেয়েছেন।

আমাদের বৈদিক পরম্পরাতে কাহিনী আছে, ব্যাসদেব বেদের সব কিছুকে গুছিয়ে নিয়ে আনার পর তাঁর চারজন শিষ্যকে চারটে বেদের দায়ীত্ব দিয়ে বলে দিলেন, তোমরা এই বেদের শিক্ষাকে রক্ষা করবে। বৈশাম্পয়ন ব্যাসদেবের একজন শিষ্য, তাঁকে যজুর্বেদ দেওয়া হল। বৈশাম্পয়নের শিষ্য হলেন যাজ্ঞবল্ক্য। যাজ্ঞবল্ক্য খুব তেজস্বী শিষ্য ছিলেন। কোন একটা ব্যাপারে গুরুর সাথে যাজ্ঞবল্ক্যের মতানৈক্য থেকে বিবাদ লেগে গেল। বৈশাম্পয়ন খুব রেগে গিয়ে বললেন, তুমি আমার থেকে যা যা বিদ্যা পেয়েছ, সব বিদ্যা ফেরত দিয়ে দাও। যাজ্ঞবল্ক্য একদিকে তেজী, আবার বড় যোগী ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বমি করে গুরুকে বললেন, এই নিন আপনার সব বিদ্যা। বৈশাম্পয়ন দেখলেন বিদ্যাটা হারিয়ে যাবে, তিনি বাকি শিষ্যদের বললেন, তোমরা তিতির পাখি হয়ে এই বিদ্যাটা খেয়ে নাও। শিষ্যরা ওটা খেয়ে নিল, সেইজন্য ওই বিদ্যার নাম হয়ে গেল কৃষ্ণ যজুর্বেদ। অন্য দিকে যাজ্ঞবল্ক্য এত রেগে গেছেন যে, আমি একটা আহাম্মক গুরু পেয়েছিলাম, আমি আর মানুষ গুরু করব না। তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন নদীর ধারে, তারপর তিনি সেখানে সূর্যের উপাসনা করলেন। সূর্য দেবতা সরাসরি যাজ্ঞবল্ক্যকে যজুর্বেদের বিদ্যাটা দিয়ে দিলেন। এই বিদ্যার নাম হয়ে গেলে শুক্ল

যজুর্বেদ। এখনও ভারতবর্ষে এই দুটি বেদের প্রচলন আছে। এর পিছনে আসল কি ঘটনা আমাদের জানা নেই, তাঁর শিষ্যরা এই কাহিনী দিয়েছেন। কিন্তু পরম্পরাতে যে কাহিনীগুলো থাকে, সেগুলোকে দুম্ করে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, আরে দিতেও নেই। এই কাহিনীর আড়ালে যে তথ্য লুকিয়ে আছে, সেটাকে কোন মতেই প্রশ্ন করা যায় না। শেষমেশ মানুষ যা শেখে তা ধ্যানের গভীরে গিয়ে প্রকৃতির কাছেই শেখে। আমরা যা কিছু শিখছি বই পড়ে শিখছি, আর সাধনাদি করে যদি কিছু পেয়েও যাই তখন এই বিদ্যা যে আমার সরাসরি বিদ্যা, তা হবে না। স্বামীজী এই কথাই বলছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ সরাসরি প্রকৃতির কাছে গিয়ে পেয়েছিলেন, মা তুমি বল তোমার রূপ কি, তোমার স্বরূপ কি। ঠাকুর সরাসরি যে বিদ্যা পেয়েছেন, এটা scientific religion, তার মানে, আমিও দেখেছি, তুমিও দেখতে পার, যদি তুমি এই এই ভাবে সাধনা কর। সমস্ত ধর্ম এই কথাই বলে। আমি ঈশ্বরকে দেখেছি, তুমিও যদি আমার মত জীবন-যাপন কর, মনকে একাগ্র করতে পার, তুমিও ঈশ্বরকে জানতে পারবে।

এটাই এখানে স্বামীজী বলছেন, Use the same means and you will reach the same vision. (*আমি যে সাধন অবলম্বন করেছি, তুমিও সে সাধন কর, তা হলে তুমিও আমার মত সত্য দর্শন করবে।*) ঠাকুরকে পরে আরও অনেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনি কি ঈশ্বরকে দর্শন করেছেন? ঠাকুরও পরে সেই প্রসঙ্গে আবার বলছেন, দেখ এমন যে থিয়েটারওয়ালা, তারাও এসে আমাকে জিজ্ঞেস করছে, ঈশ্বর দর্শন কেমন। ঠাকুরও খুব সহজ করে বুঝিয়ে দিলেন, যেমন থিয়েটারের পর্দা সরে গেলে সবারই দৃষ্টি একবারে মঞ্চে থিয়েটারের উপর চলে যায়, সব কথাবার্তা বন্ধ। এখানে তিনি বুঝিয়ে দিচ্ছেন ঈশ্বর দর্শন কি রকম। একমাত্র নরেনকেই বলছেন, আমিও দেখেছি, তোকেও দেখিয়ে দিতে পারি। ঠাকুর হলেন বর্তমান যুগের অবতার, শক্তি টগবগ করছে, একেবারে তরতাজা।

ঠাকুর হিন্দুধর্মের মূর্তরূপ

স্বামীজী প্রথমে সংক্ষেপে ঠাকুরের জীবনী বলে ঠাকুরের বৈশিষ্ট্য নিয়ে বলছেন। প্রথমেই বলছেন, তিনি এ যুগের অবতার, দ্বিতীয় বলছেন, প্রকৃতির কাছে তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞান সরাসরি পেয়েছেন, তৃতীয়, তাঁর এই জ্ঞান এমন সত্য যে, তিনি যে দেখেছেন তা অপরকেও দেখাতে পারেন। এবারে বলছেন, God will come to everyone, harmony is within the reach of all, (*ঈশ্বর সকলের কাছেই আসবেন –সেই সামঞ্জস্য সকলেরই আয়ত্তের ভিতর রয়েছে।*) কেউ যখন ঈশ্বরকে জেনে নেন, তখন তাঁর জীবনটা harmonise হয়ে যায়। এর অর্থ হল, তাঁর কাছে সবারই জন্য একটা স্থান থাকে। কোন অবতারই ওই অর্থে সরাসরি কারুর নিন্দা করেন না। অবতাররা একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে আসেন, ওই উদ্দেশ্যের পথে যারা বিঘ্ন রূপে দাঁড়িয়ে পড়ে, তাদের তিনি সরিয়ে দেন। ঠাকুর হাজরার নামে মাকে বলছেন, মা হাজরা এখানকার মত উল্টে দিতে চায়, ওকে সরিয়ে দাও। মহম্মদও একই জিনিস করছেন, এরা এখানকার মত উল্টে দিচ্ছে এদের গলা কেটে দাও। যীশুও মন্দিরের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের বিরুদ্ধে বলছেন। ভগবান বুদ্ধ বেদের বিরুদ্ধে বলছেন। নূতন অবতারের কার্যে যারা বাধা দেবে তাদের তিনি ধাক্কা মারবেনই।

বলছেন, Sri Ramakrishna's teachings are 'the gist of Hinduism'; they were not peculiar to him. (*শ্রীরামকৃষ্ণ যা উপদেশ দিয়ে গেছেন, সেগুলি হিন্দুধর্মের সারস্বরূপ, তাঁর নিজের সৃষ্ট কোন নূতন বস্তু নয়।*) হিন্দু ধর্মকে যদি কেউ জানতে চায়, শুধু ঠাকুরের জীবন ও সাধনা এবং অনুভূতির ইতিহাস পড়লে পুরো জেনে যাবে। পরে রোমা রোঁলা এই কথাই ঠাকুরের জীবনীতে লিখেছেন, ভারতের আধ্যাত্মিক সাধনার পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাসের ঘনীভূত রূপ হল শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন। এই কারণে কথামৃত বোঝা খুব কঠিন, যতক্ষণ হিন্দু ধর্মের সমস্ত শাস্ত্র না জানা থাকে, একটুও যদি ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের ধারণা না থাকে, কথামৃত বোঝা অসম্ভব। পুরো হিন্দু ধর্মকে জাল দিয়ে দিয়ে ক্ষীর করে কথামৃতে রাখা হয়েছে। যেমন গীতা হল তৎকালীন হিন্দু ধর্মের ঘনীভূত রূপ, আর গীতার পরেই আসে কথামৃত। কথামৃত আর গীতার মধ্যে তিন হাজার কি পাঁচ হাজার, যত বছরের ফারাক থাকুক না কেন, কোন একটা বই পুরো হিন্দু ধর্মকে এক জায়গায় নিয়ে আসতে পেরেছে, যা কিনা আর কোন শাস্ত্র পারেনি, ঐদিকে গীতা আছে আর তারপরেই কথামৃত।

তার সাথে স্বামীজী বলছেন, they were not peculiar to him, ঠাকুর যেটা বলছেন, সেটা যে তাঁর নিজস্ব, তা না, উনি একটা কিছু দেখেছেন, সেটাকে তিনি লোকেদের ডেকে ডেকে বলছেন না। Nor did he claim that they were; he cared naught for name or fame. (*আর তিনি সেগুলি তাঁর নিজস্ব বলে কখন দাবিও করেননি; তিনি নাম-যশের কিছুমাত্র আকাঙ্ক্ষা করতেন না।*) ঠাকুর কখন বলেননি যে তিনি এটা পেয়েছেন, এটা তাঁর নিজের, তা না। ঠাকুর বলছেন, ঋষিদের ধর্ম সনাতন ধর্ম, ওটাই থাকবে, বাকি সব আসবে যাবে। সনাতন ধর্মই থাকবে, ঠাকুরের ধর্মও সনাতন ধর্ম, উনি নূতন কিছু বলছেন না। অনেক সময় বক্তারা বক্তৃতা দিতে গিয়ে ঠাকুরের বৈশিষ্ট্য আদি নিয়ে বলতে থাকেন। কিন্তু ঠাকুরের কিসের বৈশিষ্ট্য, তাঁর কথার মধ্যে যদি বৈশিষ্ট্য থাকে তাহলে তো তিনি সনাতন ধর্ম থেকে সরে গেলেন। ঠাকুরের আগেও যদি ঠাকুরের কথাগুলো না বলা হয়ে থাকে, তাহলে তো ঠাকুর নূতন কিছু বলে দিলেন, হিন্দুরা কক্ষণ ওই কথা নেবে না। আমরা সনাতনী, সনাতনী মানে, যে জিনিসটা আগে আগেও বলা হয়েছে, ঋষিরা যে ধর্মের কথা বলে গেছেন, সেটাই আসবে। শুধু সময় আর স্থানটা পাল্টে যাবে, কিংবা কোন ফাঁক থেকে গেছে, সেটাকে পূরণ করা হবে অথবা একটা সত্যকে আগে এক ভাবে বলা হয়েছিল, এখন সেই সত্যকে অন্য ভাবে বলা হবে। কিন্তু একেবারে নূতন কিছু কোন ভাবেই আসবে না। এই সনাতনী ভাব খ্রীশ্চান ধর্মেও আছে, ওরা বাইবেলের সাথে সব মিলিয়ে নেয়, কিন্তু সেখানে শুধু মাত্র একজন ঋষির কথা। কোরানের ক্ষেত্রেও তাই, ওই একটি মাত্র ধর্মগ্রন্থ, ওর সাথেই সব কিছু মিলিয়ে মিলিয়ে চলতে হবে। হিন্দু ধর্মে তো একজন ঋষি নেই, প্রচুর ঋষিরা প্রচুর আধ্যাত্মিক সত্যকে দিয়ে গেছেন। ঠাকুরের সময়ে যত বৈদিক সাধক, পণ্ডিতরা দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন, তাঁরা ঠাকুরের যত সাধনা, যত রকম দর্শন হয়েছে, তাঁরা বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে দেখাচ্ছেন, কিভাবে ঠাকুরের সব রকম সাধনা, সমস্ত উপলব্ধি সবটাই শাস্ত্র সম্মত। প্রথমের দিকে প্রাচীন যে মহারাজরা ছিলেন, তাঁরা ঠাকুরের উপর বইটই লিখতে গিয়ে দেখানোর চেষ্টা করতেন, কিভাবে ঠাকুরের সব কিছু শাস্ত্র সম্মত। এখন আর এগুলোর দরকার পড়ে না, এখন শুধু অনুধ্যানের ব্যাপার। এখন সবাই জেনে গেছেন ঠাকুর হলেন পুরো হিন্দু ধর্মের একেবারে ঘনীভূত রূপ। ভাষ্য দিয়ে ওটাকে যখন কেউ বিস্তার করতে যাবেন, তখন পুরো হিন্দু ধর্ম বেরিয়ে আসবে।

খুব সংক্ষেপে ও সহজে স্বামীজী এখানে বলছেন, ঠাকুর যখন শিক্ষা দিতে শুরু করেন তখন তাঁর চল্লিশ বছর বয়স হয়ে গেছে। কিন্তু তিনি কখন বাইরে যেতেন না, লোকেরাই তাঁর কাছে আসত। ঠাকুরও বলতেন, ফুল ফুটলে ভ্রমর নিজে থেকেই আসে। এরপর শ্রীশ্রীমাকে নিয়ে স্বামীজী দু চারটে কথা বলছেন, হিন্দু প্রথা অনুযায়ী তাঁদের বিবাহ হয়েছিল, মা তখন পাঁচ বছরের বাচ্চা মেয়ে। বলছেন, In accordance with Hindu custom, he was married by his parents in early youth to a little girl of five, who remained at home with her family in a distant village, unconscious of the great struggle through which her young husband was passing. (*হিন্দুসমাজের প্রথানুযায়ী তাঁর পিতামাতা তাঁর যৌবনের প্রারম্ভে পাঁচ বছরের একটি ছোট মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেন। বালিকা এক সুদূর পল্লীতে তাঁর নিজ পরিজনের মধ্যেই বাস করতে থাকেন –তাঁর যুবা পতি যে কি কঠোর সাধনার ভিতর দিয়ে ঈশ্বরের পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন, সেই বিষয়ে তিনি কিছু অবগত ছিলেন না।*) মা তখন নিজের বাড়িতে আর অন্য দিকে ঠাকুর কি কঠোর সাধনার মধ্যে দিয়ে চলেছেন, মা টেরও পাননি।

When she reached maturity, he was already deeply absorbed in religious devotion. (*যখন তিনি বড় হলেন, তখন তাঁর স্বামী ভগবৎপ্রেমে তন্ময় হয়ে গিয়েছেন।*) এইসব বলে বলছেন, মা কিভাবে নগ্ন পদে পায়ে হেঁটে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে এসেছিলেন। মা কিভাবে বুঝতে পারলেন তাঁর স্বামীর এটা যেমন তেমন পাগলামি নয়, তিনি দিব্যোন্মাদ, ঈশ্বরে ডুবে আছেন। মা ঠাকুরকে বলছেন, সংসারে টেনে আনার জন্য তিনি আসেননি, ঠাকুরের এই দিব্য কাজে সাহায্য করতেই এসেছেন। স্বামীজী এই বলে শেষ করছেন, Sri Ramakrishna is worshipped in India as one of the great Incarnation, (*শ্রীরামকৃষ্ণ ভারতে মহান অবতারপুরুষগণের মধ্যে একজন বলে পূজিত হয়ে থাকেন।*) ঠাকুরের মহাসমাধির তখন মাত্র নয় বছর হয়েছে, কিন্তু তখনই ভারতে অনেকেই ঠাকুরকে অবতার বলে পূজা

করতে শুরু করে দিয়েছেন, and his birthday is celebrated there as a religious festival। (*তাঁর জন্মদিন সেখানে ধর্মোৎসব-রূপে পরিগণিত হয়ে থাকে।*)

শালগ্রামশিলার ভাব

স্বামীজী খুব সংক্ষেপে ঠাকুরের কথা, ঠাকুরের জীবন, জীবনের কিছু মূল কথা শিষ্যদের কাছে বললেন। আমরা জানি স্বামীজী সকালে দু ঘন্টা তিন ঘন্টা শিষ্যদের বলতেন, তিনি নিশ্চয় আরও কিছু বলেছিলেন, কিন্তু মিস ওয়াল্ডো যতটুকু নোট করতে পেরেছিলেন, ততটুকুই আমরা পেয়েছি। তার থেকেও বেশি হল, যে সিদ্ধান্তগুলিকে আধার করে ঠাকুরের জীবন আর ঠাকুরের সাধনা, সেটাকে বলেছেন। এরপর স্বামীজী ছোট্ট করে শালগ্রাম শিলার কথা বলছেন, A curious round stone is the emblem of Vishnu, the omnipresent. (*একটি বিশিষ্ট লক্ষণযুক্ত গোলাকার শিলা বিষ্ণু অর্থাৎ সর্বব্যাপী ভগবানকে প্রতীক রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।*) আগেকার দিনে হিন্দুদের বাড়িতে, এখনও ব্রাহ্মণদের বাড়িতে শালগ্রাম শিলা বা বিষ্ণু শিলা থাকে। শালগ্রাম শিলার নিত্যপূজা করার প্রথা অনেক আগে থেকেই চলে আসছে। স্বামীজী বলছেন, শালগ্রাম শিলাকে ঠিক মানুষের মতই জীবন্ত বিগ্রহ রূপে দেখা হয়। শালগ্রাম শিলার পূজায় যে মন্ত্রগুলো আছে, তাতে ক্ষমা চাওয়া হয় যে, তুমি সর্বব্যাপী, অনন্তস্বরূপ, নির্গুণ নিরাকার, কিন্তু তোমাকে আমি এভাবে পূজা করছি বলে আমাকে ক্ষমা করে দিও। সেটাই স্বামীজী বলছেন, because he can only conceive of Him through an image or by means of some material object. (*কারণ ঈশ্বর স্বরূপতঃ রূপবর্জিত হলেও ঐরূপ প্রতীক বা কোনরূপ জড়বস্তুর সাহায্য ব্যতীত তাঁর উপাসনা করতে পারছেন না।*) স্বামীজীর এটা একটা খুব মূল্যবান কথা। ঋষিরা, বড় সাধকরা জানেন ঈশ্বর হলেন, unknown and unknowable, যাঁকে মন বুদ্ধি দিয়ে জানা যায় না, জানা যেতে পারে না। ফলে যিনি পূজা করছেন, যিনি সাধনার পথে এগোচ্ছেন, তাঁর পক্ষে সম্ভব না যে তিনি নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের সাধনা করবেন। সেইজন্য একটা বস্তুকে নিয়ে, তার উপর ওই ভাব আরোপিত করা হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রতীকোপসনার কথা বলা হয়েছে, একটা প্রতীক বানিয়ে নেওয়া হল, সে জানে এই প্রতীকটা আসল নয়, কিন্তু ওই প্রতীকের মাধ্যমে আমরা সেই মূলে পৌঁছাতে চাইছি। যেমন কেমেস্ট্রিতে H বললে কেমেস্ট্রির লোকেরা বুঝে নেন কি বলতে চাইছে। এই যে পুরো হাউড্রোজেনের জগৎ, এটা একটা ছোট্ট Hএর মধ্যে আবদ্ধ রয়েছে। এখন মানুষ যেন এই শালগ্রাম শিলাকে ভুল না বোঝে, তাই একটা ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়, যেখানে বলা হয়, যিনি নির্গুণ নিরাকার তাঁকে আমি এই ছোট্ট শিলার মধ্যে পূজা করছি। যিনি পূজারী তিনি নিজের হৃদয়কে শালগ্রাম শিলায় পুরো ঢেলে দিয়ে তাঁকে জীবন্ত করে দেন। যদিও আমরা ঠাকুরের জীবনী পড়ছি, দেখছি ভগবান অবতার হয়ে আসেন, কিন্তু অবতারকে আমরা তো সব সময় পাবো না। ভগবান স্থূল জগতে সব সময় থাকেন না, তখন তাঁর যে প্রতীক, বেলুড় মঠে ঠাকুরের যে বিগ্রহ, ঘরে ঘরে ঠাকুরের যে ছবি, এটাকেই আশ্রয় করে, ঠাকুরের চিন্তন করে, ঠাকুরের পূজা অর্চনা করে এগোনর চেষ্টা করছি। শালগ্রাম শিলাকে স্বামীজী নিয়ে আসছেন এই ভাবটাকে বোঝাবার জন্য।

তিব্বত – এক অজানা রহস্যময় দেশ

ঠাকুরের কথা বলার পর স্বামীজী ওই দিনই তিব্বতের কথাতে ঢুকে গেলেন। ঠাকুরের সন্তানদের মধ্যে একমাত্র স্বামী অখণ্ডানন্দজীই তিব্বতে গিয়েছিলেন। যদিও স্বামীজী তিব্বত যাননি, কিন্তু তিব্বত সম্বন্ধে স্বামীজী খুব ভাল করে জানতেন। তিব্বত তখন একটা অজানা রহস্যময় দেশ ছিল। বৃটিশ নাগরিক ইয়ং হাজবেণ্ড নামে একজন তিব্বত অভিযাত্রী ছিলেন, উনি খুব কায়দা করে তিব্বতে ঢুকেছিলেন। পরিব্রাজক রূপে স্বামীজী উত্তরাখণ্ডে ভ্রমণ করেছিলেন, সেখানে তিনি তিব্বত সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারেন। কিন্তু স্বামীজীর জানার উৎসগুলো আমাদের সঠিক জানা নেই। তবে তিনি যখন যে শহরে থাকতেন, সেখানকার লাইব্রেরিতে গিয়ে প্রচুর বই পড়তেন। যার জন্য স্বামীজীর কথাতে আমরা এমন এমন সব তথ্য পাই, সেগুলো তিনি কোথায় পেয়েছিলেন জানা যায় না। যাই হোক, স্বামীজী এখন তিব্বত নিয়ে বলছেন।

তিব্বতকে বলা হয় roof of the world, এত উচ্চতায় তিব্বতের অবস্থান যে, মনে হয় তিব্বত যেন পৃথিবীর ছাদ। তিব্বতে বলতে গেলে কিছুই উৎপন্ন হয় না। বেশির ভাগ সময় বরফে ঢাকা থাকে আর মাটিতে এ্যলকালির পরিমাণ অনেক বেশি হওয়ার জন্য তিব্বতের মাটিতে সহজে কিছু হতে চায় না। একজন অস্ট্রিয়ার লেখকের লেখা 'Seven Years in Tibet' নামে তিব্বতের উপর একটা নামকরা সিনেমা আছে, এই একটা সিনেমা দেখে নিলে তিব্বতের অনেক কিছুই জানা হয়ে যাবে। অত্যন্ত উচ্চমানের তথ্যসমৃদ্ধ সিনেমা আর সব তথ্যই খুব নির্ভরযোগ্য। লেখক সাত বছর তিব্বতে ছিলেন, বইটাও খুব উচ্চমানের, সিনেমটাও খুব সুন্দর হয়েছে। সিনেমাটা একবার দেখে নিলে তিব্বতের ব্যাপারে অনেকটা আইডিয়া পাওয়া যাবে।

তিব্বতের বেশির ভাগ সীমানা চীন দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আছে। পশ্চিমে কাশ্মীর, আর নীচের দিকে কিছুটা ভারত, নেপাল ও ভুটান। তিব্বতকে তাই বলা হয় land locked country, বিভিন্ন দেশ চারিদিক থেকে তিব্বতকে ঘিরে রেখেছে, তিব্বতের কোন পথই নেই যে কাউকে ফাঁকি দিয়ে বেরোবে। একদিকে ভারতের সাথে তিব্বতের যেমন চিরদিন ভাল সম্পর্ক, অন্যদিকে চীনের সাথে প্রথম থেকেই তিব্বতের ঝগড়া, বিবাদ, মারামারি লেগেই আছে। বেশির ভাগ সময় চীনের কাছে তিব্বত মার খায়। মাঝখানে নেপালের রাজা কোন কারণে একবার তিব্বতকে আক্রমণ করেছিল।

আগেকার তিব্বতের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাতে জানা যায় তিব্বতীরা প্রথমে প্রচণ্ড হিংস্র ছিল, কিন্তু পরের দিকে ওরা খুব শান্ত স্বভাবের হয়ে যায়। চীনে যে বৌদ্ধ ধর্ম গিয়েছিল, তা তিব্বত হয়েই গিয়েছিল। তিব্বত মূলতঃ বৌদ্ধ ধর্মের দেশ, কিন্তু তিব্বত একটা hostile land, খাওয়া-পড়া কিছুর সুবিধা নেই, কষ্টের শেষ নেই। এই ধরণের লোকেরা স্থানীয় দেবী-দেবতা, ভূত-প্রেত বেশি মানে। তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্ম যাওয়ার পর ওরা বৌদ্ধ ধর্মকে নিজের মত করে নিল। অন্য দিকে তিব্বতীরা একটা বিরাট কাজ করল। বৌদ্ধ ধর্মের উপর সংস্কৃতে যত পুঁথি ছিল, ওরা সেগুলিকে তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করে নিল। আর ভারতবর্ষে যে তন্ত্র মত ছিল, তন্ত্রকেও তারা ধরে রাখল। তন্ত্রের এখনও অনেক পুঁথি আছে যেগুলো এখনও ভারতবর্ষে তিব্বতী ভাষা থেকে অনুবাদ হয়নি। এই ধরণের অনেক বইয়ের রেফারেন্স আসে, যেগুলো ভারতবর্ষে পাওয়া যায় না, কিন্তু তিব্বতী ভাষায় পাওয়া যায়। রাহুল সংস্কৃত্যায়ন একজন নামকরা পণ্ডিত ছিলেন, যিনি তিব্বতীদের অনেক গুম্ফাতে ঘুরেছিলেন। সেখান থেকে তিনি অনেক পুঁথি উদ্ধার করে নিয়ে এসেছিলেন। তিব্বতীদেরও রাজারানী ছিল, পরে বৌদ্ধ ধর্মের আগমন থেকে তিব্বতে বৌদ্ধমঠ গুলির প্রভাব অনেই বেড়ে যায়। প্রভাব বেড়ে যাওয়ার ফলে তিব্বতে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের বিরাট সম্মান হয়ে গেল। বৌদ্ধ ধর্মে ছেলেরাও সন্ন্যাসী হয়, মেয়েরাও সন্ন্যাসী হয়। আবার অনেক জায়গায় ওরা একসাথেই থাকে।

অর্থাভাবের জন্য আর সীমিত সম্পদ হওয়ার জন্য তিব্বতীরা অনেক জায়গায় polyandry practice করে, polyandry মানে একই স্ত্রীকে সব ভাই বিয়ে করবে। যার ফলে সম্পদ একটা পরিবারের মধ্যেই থেকে যায়, সম্পদের বিভাজন করতে হয় না। স্বামীজী হিমালয়ে ভ্রমণ করার সময় এই ধরণের কিছু পরিবারের দেখা পেয়েছিলেন। তিব্বতে একদিকে সন্ন্যাসীদের জীবন আবার অন্য দিকে polyandry সমাজ, এটা যেন দেখাচ্ছে, ওরা কোথাও যেন কমিউনিটি লাইফ চালাতে চাইছে। কমিউনিটি লাইফে সম্পদ সবার হয়ে যায়। এক জায়গায় রান্না হচ্ছে, সবাই একসাথে খাচ্ছে, সবারই থাকার জায়গা আছে। যেখানেই চার্চ থাকে, সন্ন্যাসীদের আশ্রম থাকে, সেখানেও একটা কমিউনিটি লাইফ হয়ে যায়। কমিউনিটি লাইফ হওয়া মানেই, সম্পদের মালিকানা সবার হয়ে গেল। এই প্রথা খুব প্রাচীন প্রথা, বলা হয় আগে নাকি গ্রীকদের মধ্যেও এই প্রথা ছিল। কমিউনিটি লাইফ তখনই চলবে, যখন নিজেদের মধ্যে ভালবাসা থাকবে, যৌথ পরিবারে আগে যেমন হত। কমিউনিটি লাইফ এই দুটো জিনিসের উপর চলে, নিজেদের মধ্যে খুব ভালবাসা থাকতে হবে, বা সম্পদের প্রচুর অভাব আছে।

বর্তমান কালের যে সমাজ আমরা দেখছি, সমাজকে নিয়ে কিছু কিছু বই পড়ার পর, সমাজের উপর কিছু কিছু প্রচলিত ধারণার কথা শোনার পর আমাদের মনে হয় মানুষ যেন একটা বস্তু, একটা individual কিছু। আমরা ভুলে যাই, মানুষ মানে একটা মন, মন মানে একটা individualized power। দুটো মন কখন সমান হয় না। একই কোম্পানী থেকে যদি দুটো গাড়ী বেরোয়, তখন দুটো গাড়ীর তফাৎ বোঝা যায় না।

কুম্ভকাররা মাটি দিয়ে চাকতি ঘুরিয়ে কলসি, ঘটি, জালা তৈরী করছে। একই কুম্ভকার একই সময়ে, একই স্টাইলে তৈরী করা প্রত্যেকটা ঘটি আলাদা আলাদা হবে। কেনার সময় আমরা আওয়াজ করে, ভাল করে দেখে নিয়ে বলি, এই কলসিটা নেব। মেশিন থেকে যেটা একই সময় বেরোয়, সবটাকেই এক রকম মনে হয়, আলাদা করার উপায় নেই। সেই রকম উপর থেকে আমাদের মনে হয়, মানুষ সবাই সমান, তা না। প্রত্যেকটি মানুষ আলাদা, তার মন আলাদা, তার শক্তি আলাদা, তার চাহিদা আলাদা, আশা-আকাঙ্খা আলাদা। এই যে সব কিছু আলাদা, ইচ্ছা আলাদা, আকাঙ্খা আলাদা, এরপর মানুষ যখন প্রকৃতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন সে নিজের মত জিনিস ফেরত নিয়ে আসে, সবাই সমান নিয়ে আসতে পারবে না। এখানে প্রকৃতির কথা বলা হচ্ছে। মানুষ যখন বিভিন্ন ভাবে প্রকৃতি বা সংসার থেকে যা কিছু নিয়ে আসে, তাই দিয়ে প্রথমে নিজের প্রয়োজনটা মিটিয়ে নেয়, তারপর সন্তান-পরিবারে জন্য করে, ভবিষ্যতের কথা ভেবে করে। তখনও যখন শান্তি হয় না, তখন নাতি, তার নাতি এই করে চলতে থাকে। এই করে কিছু দিন পরে দেখা যায়, কিছু লোকের কাছে প্রচুর অর্থ এসে গেছে, ধীরে ধীরে অন্যরা নিঃস্ব হতে থাকে। সমাজ শুরু হওয়ার পর প্রথমের দিকে খুব সামান্য তফাৎ থাকত, যে যেমন খাটত তার সেই রকম সঙ্গতি হত। সেখান থেকে চালাকি হতে শুরু হল, অসদুপায়, বাঁদরামি শুরু হয়ে গেল, এই করে করে মানুষে মানুষে বিরাট ফাঁক তৈরী হয়ে গেল।

এই ফাঁক হওয়াটাকে একটা অবস্থা পর্যন্ত মানুষ সহ্য করে, ফাঁকটা বিরাট আকার হয়ে গেলে মানুষের সহ্যের বাইরে চলে যায়, তখন একটা বিপ্লব এসে যায়। এই বিপ্লব আবার বিভিন্ন ভাবে আসে, বিপ্লব কিভাবে আসবে বলা মুশকিল। একটা খুব প্রচলিত বিপ্লব হল অরাজকতার সৃষ্টি, সব কিছু ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও। আরেকটা হল, আমরা যে কমিউনিটি লাইফের কথা বললাম, সেখানে অভাবের জন্যই হোক, আর ভ্রাতৃত্বের জন্যই হোক, কমিউনিটি লাইফের দিকে ঝোঁকটা বেড়ে যায়। আধ্যাত্মিক মহাপুরুষদের জীবনের দিকে তাকালে দেখা যাবে, ওনারাও কোথাও যেন চাইছেন যে একটা কমিউনিটি লাইফ হোক। শ্রীশ্রীমা খুব আহ্লাদ করে বলছেন, 'যদি ভক্তরা সবাই একসাথে বসে খেত। কিন্তু এই পোড়ার দেশ, যেখানে সবাই জাত জাত করে এমন করে যে, এখানে একসাথে কাউকে খাওয়ানো যাবে না'। যার কেন্দ্র ভালবাসা, তার মনে হবে যারা আছে এরা সবাই আমার অঙ্গ। আমার অঙ্গ, তাই সবাই মিলে খাওয়া-দাওয়া করব, যেখানে জাতপাতের কোন ব্যাপার নেই, উঁচু-নীচুর কোন ব্যাপার নেই। যীশুরও ঠিক এই ভাব ছিল, তাঁর শিষ্যদের সাথে তিনি ঠিক এই ভাব রেখেছিলেন। প্রফেট মহম্মদেরও এই ভাব ছিল, যে টাকা-পয়সা আসত, এগুলো সব কমিউনিটির কাজে আসবে। শিখ ধর্মের আগা থেকে গোড়া পুরোটাই কমিউনিটির ধর্ম। আর সন্ন্যাসীদের যে আশ্রম সেটাও পুরোপুরি কমিউনিটি, সন্ন্যাসীদের নিজস্ব কারুর কিছু থাকে না।

রাজনীতিতে গিয়ে এটাই হয়ে যায় কম্যুউনিজম্। কম্যুউনিস্ট আইডিয়া পুরনো আইডিয়া, ফরাসী দার্শনিকরা প্রথম এই আইডিয়াকে নিয়ে এসেছিলেন। সেটাকেই কার্ল মার্ক্স অনেক কিছু করে পুরো কোডিফাইড করে দিলেন। জার্মান থেকে ওনাকে বার করে দেওয়ার পর তাঁর দেখা হল এ্যাঞ্জেলসের সাথে। এটাকেই পুরো একটা পলিটিক্যাল ফিলফজি বানিয়ে দিলেন লেনিন। কম্যুউনিস্টিক ভাব, যার ধারণার কথা আমরা বললাম, একদিকে অভাব বেড়ে যাচ্ছে, অন্য দিকে একটা শ্রেনীর মধ্যে ভোগ বেড়ে যাচ্ছে বলে যে বিপ্লবের কথা বলা হয়, এই ভাবটা তিব্বতীদের মধ্যে মাঝে মাঝে এসেছে। যার জন্য একটা সময় সব ক্ষমতা spiritual leadersদের হাতে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল, এইভাবে দালাই লামা এলেন। অন্য দিকে অভাবও রয়েছে, অশিক্ষাও রয়েছে। তিব্বতে যদিও বেশির ভাগ মানুষ বৌদ্ধ ধর্ম পালন করছে, কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের পিছনে তাদের ভাবনা রয়েছে, কিভাবে আমার জীবনে আমি মসৃণ ভাবে চালাতে পারি। যার ফলে তন্ত্র, মন্ত্রাদি জিনিসগুলো প্রচুর ঢুকে গেছে। এই সব কিছুকে স্বামীজী কয়েকটা বাক্যে বলছেন।

বলছেন, There is a sect which says, 'It is weakness to worship only the good and beautiful, we ought also to love and worship the hideous and the evil'. (*একটি সম্প্রদায় আছে তারা বলে –ভগবানকে কেবল শিব ও সুন্দর-রূপে পূজা করা দুর্বলতা মাত্র, আমাদের অশিব রূপকেও ভালবাসতে হবে, পূজা করতে হবে।*) শুধু শুভ, ভাল জিনিস, সুন্দরের পূজাই কেন হবে, পূজা সবটারই করা হবে; ভয়ঙ্করা, ক্রুঢ়, এদেরও পূজা করতে হবে। মা কালীর পূজা এখন সব জায়গায় হচ্ছে।

আগে মা কালী পূজার অত প্রচলন ছিল না, যদিও অনেক জায়গায় মা কালীর মন্দির ছিল, কিন্তু ঠাকুর আসার পর মা কালীর পূজা ভাল মত প্রচলিত হয়ে গেল। মা কালীরই একটা রূপ তারা, তারা মায়ের পূজা তিব্বতে বিরাট জনপ্রিয় হয়ে গেছে। হিমাচলের নাম দেবভূমি, কিন্তু হিমাচলের প্রত্যেক গ্রাম হল দেবীর ভূমি। হিমাচলের মানালির পরেই ভ্যালি, সেখান থেকে তিব্বত শুরু হয়ে যায়। হিমাচল আর তিব্বতের দেবী এক। তারার রূপ ভয়ঙ্করা, স্বামীজী বলছেন, যারা এই ভয়ঙ্করার পূজা করে, This sect prevails all over Tibet, and they have no marriage, (*এই সম্প্রদায় তিব্বত দেশের সর্বত্র বিদ্যমান।*) তিব্বতের ব্যাপারে এটা অনেক আগেকার কথা, স্বামীজী তিব্বতের ব্যাপারে যেটা জানতেন সেটা ১৮৯০র আগেকার কথা। Young Husbandএর কথা যে বলা হল, তখনও তিনি তিব্বতে ঢোকেননি। স্বামীজী যে বলছেন, they have no marriage, এই ব্যাপারটাতে আমাদের তন্ত্র মতের সাথে অনেক মিল পাওয়া যায়।

এখানে স্বামীজী সন্ন্যাসীদের কথা বলছেন না, একটা sectকে নিয়ে বলছেন। আগেকার দিনে Marriage as an institution অনেক সমাজেই ছিল না। বিবাহ যে অর্থে আমরা নিয়ে থাকি, একজন পুরুষ আর একজন মহিলাকে ধর্মীয় প্রথানুসারে একটা সামাজিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একসঙ্গে এনে একটা বন্ধনে রেখে দেওয়া, যেখানে সমাজের নির্দেশ থাকত পুরুষ আর কোন মেয়ের কাছে যাবে না, মেয়ে আর কোন পুরুষের কাছে যাবে না, এই জিনিসটা সংস্কৃতিতে অনেক উন্নত ও উচ্চ সমাজেই প্রথম আসে। কিন্তু অনেক সময় যখন কোন একটা দর্শন বা মতকে নিয়ে চলছে, তখন জিনিসটা অন্য রকম হয়ে যায়। তখন হয়ে যায়, আমরা সবাই সবারই জন্য দায়বদ্ধ। একটা ট্রাইবালের কথা পাওয়া যায়, তাদের জীবন খুবই কঠিন, জঙ্গলে থাকে। একবার যখন কেউ শিকার করতে গেল, কেউ জানে না সে আর ফিরে আসবে কি আসবে না। সেইজন্য ওদের কোন ছেলের বাবা হয় না, মেয়ের বিয়ে ঠিক ওই অর্থে হয় না। মেয়ে সাবালিকা হয়ে যাওয়ার পর এক সঙ্গে দশটা ছেলের সঙ্গে থাকতে শুরু করে। থাকতে থাকতে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে যাওয়ার পর যে সন্তান হয়, তাদের কেউই জানে না, ওদের বাবা কে। ফলে দশ জনই মনে করে আমার সন্তান। এখন জঙ্গলে শিকার করতে গিয়ে এদের কেউ যদি মারা যায়, তখন বাচ্চার কোন সমস্যা হয় না, কারণ বাকিরা তাকে সামলাবে।

তিব্বতে প্রত্যেকটা জিনিসকে কমিউনিটি রূপে দেখা হয়। সেইজন্য স্বামীজী বলছেন, তাদের ভিতর বিবাহ-পদ্ধতি নেই। তিব্বতের ব্যাপারে যদিও এটি অনেক আগেকার কথা। স্বামীজী বলছেন, In India proper they cannot exist openly, but organize secret socities. (*এই সম্প্রদায়ের ভারতের প্রকাশ্যভাবে থাকবার জো নেই, সুতরাং তারা গোপনে গোপনে সম্প্রদায় করে থাকত।*) এই ধরণের সম্প্রদায় ভারতে প্রকাশ্য ভাবে থাকত না, গুপ্ত ভাবে এরা গোপনে একটা সমাজ তৈরী করে নিত এগুলোকে চালাবার জন্য। No decent men will belong to them except sub rosa. (*কোন ভদ্রলোক গুপ্তভাবে ভিন্ন এই সকল সম্প্রদায়ে যোগ দিতে পারত না*); sub rosa মানে যারা সংস্কৃতির দিকে থেকে নিম্ন শ্রেনীর, তারাই এই জিনিসগুলোকে অনুশীলন করত। মহানির্বাণ তন্ত্রে যা যা করতে বলা হয়েছে, মূলতঃ সেখানে শক্তি পূজার কথাই বলা হয়েছে।

এরপর স্বামীজী বলছেন, Thrice communism was tried in Tibet, and thrice it failed. (*তিব্বত দেশে তিনবার সমাধিকারবাদ কার্যে পরিণত করার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু প্রতিবারই সে-চেষ্টা বিফল হয়।*) থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে স্বামীজী ১৮৯৫এ যে কথাগুলো বলছেন, তখনও কম্যুনিজম বিশ্বে কোথাও রাজনৈতিক ক্ষমতায় আসেনি। তার কয়েক বছর পর, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরেই কম্যুনিজম আসে। ১৮৯৫ নাগাদ বৃটেনে কম্যুউনিজম পপুলার হয়ে সব জায়গায় ছড়াতে শুরু করে। তখন থেকে লোকেদের মধ্যে কম্যুউনিজেমের কথা বলা শুরু হয়। স্বামীজী যে কম্যুউনিজম নিয়ে বার বার বলছেন, বলতে চাইছেন কম্যুউনিজম যে খুব ভাল একটা সিস্টেম সে রকম কিছু না, তবে নূতন একটা জিনিস আসছে, একবার দেখে নেওয়া যাক। মানুষের মন একটা আলাদা জিনিস, কেউ যদি এটাকে নিয়ম দিয়ে, নীতি দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, তা সফল হয় না। যাই করে দেওয়া হোক, মানুষের মনের এমন শক্তি যে, সে ঠিক কায়দা করে ক্ষমতায় এসে যাবে। চীনের কম্যুউনিস্ট প্রধান পুরো ক্ষমতা নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছেন, সারা জীবনের মত রাষ্ট্র প্রধান হয়ে গেলেন, আবার সেই একনায়কতন্ত্রই ফিরে এলো। মানুষের মনকে আটকানো যায় না, ফরাসী

বিপ্লবে বলল রাজারানী থাকবে না, বিপ্লবের যে প্রধান শক্তি বেরিয়ে এলো, সে হয়ে গেল সম্রাট নেপোলিয়ন। মানুষের মনকে কখনই দাবানো যায় না। সেইজন্য যে কোন সমাজ যদি material equalityর কথা বলে, সেটা একটা বোকামো হয়ে যাবে। প্রথমে সবাই একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এগোয়, বলবে আমরা সবাই এক, সবাই সমান, আমরা এক সঙ্গে বড় হব, একসাথে বাঁচব। কিন্তু এগিয়ে যাবার পর যাদের মন চালাকিতায় অন্যদের থেকে এগিয়ে, তারা ঠিক একটা কায়দা করে সবার আগে এগিয়ে যাবে।

স্বামীজী বলছেন Thrice communism was tried in Tibet, and thrice it failed, আমাদের জানা নেই স্বামীজী ঠিক কি অর্থে এটা বলছেন। কারণ তখনও কম্যুউনিজম্ অর্থনীতির দর্শন, রাজনীতির দর্শন রূপে জনপ্রিয় হয়নি। কিন্তু স্বামীজী যখন বলছেন, তখন কিছুটা গ্রাম দেশে সবাই একটা কমিউনিটি করে থাকত সেটাকে নিয়ে বলতে পারেন, বা monasteryকে কেন্দ্র করে যে জীবন চালাত, সেটাকে নিয়েও বলতে পারেন। এখানে হচ্ছে কমিউনিটি লাইফ, একজন স্ত্রী আর তার জন্য চার ভাই, পাঁচ ভাই যত ভাইই থাকুক, সম্পত্তি যাই থাকুক, সেটা সবারই হয়ে গেল। এটাও কম্যুউনিজমের লাইনেই কিছুটা আসছে। স্বামীজী ওই অর্থেও বলছেন কিনা আমাদের জানা নেই। স্বামীজী বিভিন্ন লাইব্রেরিতে গিয়ে কি কি বই পড়েছেন কারুরই জানার কথা নয়। কম্যুউনিজম্ তখনও রাজনৈতিক শক্তি রূপে আত্মপ্রকাশ করেনি, কিন্তু ইডিওলজি রূপে সবে ঘুর ঘুর করতে শুরু করেছে, যেটা স্বামীজী শুনেছিলেন, বুঝেছিলেন। কিন্তু এখানে তিব্বতের প্রসঙ্গ আনার উদ্দেশ্য হল, তিব্বত আর তপস্যাকে নিয়ে বলা। এরপরেই স্বামীজী তপস্যার ব্যাপারে বলবেন। স্বামীজী শেষে বলছেন, They use Tapas and with immense success as far as power is concerned. (*তারা খুব তপস্যা করে, আর শক্তি(বিভূতি) লাভের দিক দিয়ে খুব সাফল্য লাভ করে থাকে।*) একদিকে তন্ত্রের মত কিছু জিনিস অনুশীলন করা হচ্ছে ক্ষমতা পাওয়ার জন্য, অন্য দিকে কমিউনিটি জীবন চালাবারও চেষ্টা করছে ক্ষমতা পাওয়ার জন্য, কিন্তু হচ্ছে না, তখন তারা তপস্যার দিকে খুব জোর দিল, আর তাতে শক্তি (বিভূতি) লাভের দিক দিয়ে খুব সাফল্য লাভ করল। তপস্যাটা কি, স্বামীজী এবার ব্যাখ্যা করছেন।

তপস্যা

যদিও তিব্বতের কথা বলতে গিয়ে তপস্যার কথা বলছেন, কিন্তু তপস্যার এই কথাগুলো সারা বিশ্বেই প্রযোজ্য। স্বামীজী বলছেন, Tapas means literally 'to burn'. (*তপস শব্দের অর্থ তাপ দেওয়া বা উত্তপ্ত করা।*) তাপ থেকে তপ আসছে, সংস্কৃতে তাপ ও তপ দুটোই হয়। আগুন জ্বালালে বাইরে যে তাপের সৃষ্টি হয় সেটাকে তাপ বলা হয়, আর নিজের ভিতর থেকে যে তাপ উৎপন্ন করা হয় সেই তাপকে তপ বলা হয়। It is a kind of penanace to 'heat' the higher nature. (*এটা আমাদের উচ্চ প্রকৃতিকে 'তপ্ত' বা উত্তেজিত করবার সাধনা বা প্রক্রিয়া বিশেষ।*) এর অর্থ যদিও প্রায়শ্চিত্ত হয়, কিন্তু স্বামীজী এখানে একটা প্রয়াস করা বা একটা কিছু নিয়ে সাধনা করাকে নিয়ে বলছেন। এই সাধনা করার উদ্দেশ্য হল, আমাদের ভিতরে যে উচ্চমানের প্রকৃতি রয়েছে সেটাকে তাতিয়ে দেওয়া। যে কোন তপস্যাই হোক, যেমন মায়েরা উপোস করে, এটাও এক ধরণের তপস্যা। মা সন্তানকে জন্ম দেওয়ার পর থেকে লালন পালন করে বড় করছে, এটাও একটা তপস্যা। যে মা সন্তানকে লালন পালন করতে গিয়ে যত নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ, সখ-আহ্লাদ ছেড়ে দিয়ে খেটেছে, তার সন্তান তত শক্তিমান হয়, এতে কোন সন্দেহ নেই। সন্তান যদি কুপথে চলে যায়, বেশি অবাধ্যপনা করে, বুঝতে হবে মা সেই রকম তপস্যা করেনি। একটা শিশুর পিছনে যত মায়েরা খাটবে তত বাচ্চার ব্যক্তিত্ব শক্তিশালী হবে। একটু এদিক সেদিক করবে, কখন বাঁ দিক ডান দিক যাবে, কিন্তু একটা জায়গায় গিয়ে নিজের শক্তিটাকে ফেরত এনে আবার দাঁড়িয়ে যাবে। বলছেন, আমাদের ভিতরে যে উচ্চমানের শক্তিগুলো রয়েছে, সেগুলোকে তপ্ত করে দিচ্ছে, তাপ দেওয়া মানেই energized করে দেওয়া।

আমাদের ভিতরে প্রকৃতির যে শক্তি মজুত আছে, এই শক্তি দুই প্রকার, সাধারণ মানের শক্তি আর উচ্চমানের শক্তি। উচ্চমানের শক্তিকে আমরা বলি আধ্যাত্মিক শক্তি, আমাদের শরীর মন চলে সব আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়ে। তপস্যা অনেক রকমের হতে পারে। তপস্যার একটা ছোট রূপ হয় সাধনা। আমি ঠিক করলাম, আজ থেকে রাত্রে আমি খাবো না। সন্ধ্যেবেলা মুরিটুরি যা খাবার খেয়ে নিলাম, কিন্তু রাত্রে আর খাবো না। কিন্তু

এর পিছনে একটা উদ্দেশ্য থাকতে হবে, আমি আমাকে নিয়ন্ত্রণ করছি। কিছু দিন পর থেকেই তাপ সৃষ্টি হতে শুরু হয়ে যাবে। যখন আমরা মনকে একাগ্র করে কিছু করতে শুরু করি, শরীরে তখন একটা তাপ সৃষ্টি হয়। তপ করা মানেই শরীরে তাপ সৃষ্টি হওয়া। ওই তাপটা এবার আমাদের ভিতরের প্রকৃতিকে গরম করতে শুরু করে, এবার ও ফল দিতে শুরু করবে। It is sometimes in the form of sunrise to sunset vow, such as repeating Om all day incessantly. (*যেমন হয়তো উদয়াস্ত জপ করা –সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ক্রমাগত ওঙ্কার-জপ।*) আমি ঠিক করলাম, সূর্যোদয় থেকে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত, পারলে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এক আসনে বসে জপ করব। বছরে একদিন কেউ চেষ্টা করুক, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এক আসনে বসে জপ করব। তাতে শরীরে এমন তাপ সৃষ্টি হবে, এমন শক্তি আসবে যে ঐ শক্তিকে সামাল দেওয়া মুশকিল হয়ে যাবে। একজন মহারাজকে অনেকে জানতেন, যিনি অনেক ভাল কাজও করতেন আবার নিয়ম বিরুদ্ধ কাজও করতেন। তাঁর অনেক কিছু আশ্রমের কর্তারা পছন্দ করতেন না, কিন্তু কেউ তাঁকে কিছু করতে পারছে না। মহারাজকে নিয়ে অন্যান্য মহারাজদের মধ্যেও অনেক গুঞ্জন হত। একবার একজন মহারাজ অন্য এক মহারাজকে জিজ্ঞেস করছেন, 'ওনার ক্ষমতা আছে জানি, সবই মানছি, কিন্তু এত শক্তি, এত ক্ষমতা উনি পান কোথা থেকে'? যে মহারাজের কাছে জানতে চাইলেন, তিনি বলছেন, 'আপনি জানেন না, বছরে একদিন উনি সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত মন্দিরে সব ভক্তদের নিয়ে জপযজ্ঞ করেন। ভক্তরা মাঝে মাঝে উঠে যায়, জলটল খেতে যায়, কিন্তু উনি সূর্যোদয়ের পর ওই যে আসনে বসলেন, সোজা সূর্যাস্তের পর উঠবেন'। শোনার পর একদিন সেই মহারাজের সাথে ওনার রাস্থায় দেখা হতে একটা সাষ্টাঙ্গ প্রণাম দিয়ে বলছেন, 'সত্যিই মহারাজ, দেখেও ভাল লাগছে, যে আজও আমাদের মধ্যে এমন একজন আছেন, যিনি সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত একটানা জপ করেন'।

ক্ষমতা আসতে বাধ্য। কেউ ঠিক করে নিক, আমি ছটায় জপে বসব আর আটটায় উঠব। এরপর যা হয়ে যাক, ভূমিকম্প হোক আর যাই হয়ে যাক, আমি এই দু-ঘন্টা জপ থেকে উঠব না। ওই তপস্যা যার শুরু হবে, ধীরে ধীরে তাঁর সামনে সাধারণ শক্তিগুলো দমে যাবে। এই যে এখানে আমরা অনেকে মিলে একত্র হয়ে শাস্ত্র কথা শুনছি, গরম হোক, বৃষ্টি হোক, শীত হোক তবুও আমরা আসছি। কখন আমাদের মনের মত কথা হচ্ছে, কখন মনের মত কথা হচ্ছে না, তবুও আসছি, এটাই তপস্যা। এই তপস্যার তাপে শরীরের কোথাও একটা তাপ সৃষ্টি, সেই তাপে আমাদের শরীরের অনেক আবর্জনা পুড়ে যাচ্ছে। শাস্ত্রের এই ক্লাশগুলো কোন মনোরঞ্জের জন্য করা হচ্ছে না, হরে রাম হরে রাম করতে করতে যে একটা সম্মোহনী ভাব এসে গেছে তাও না। অনবরত আমাদের মধ্যে নূতন নূতন ভাব আসছে, কথা আসছে, প্রশ্ন হচ্ছে, তার জন্য প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে, এটাও একটা বড় রকমের তপস্যা, ভিতরের আবর্জনা গুলো পুড়ে যাচ্ছে।

স্বামীজী বলছেন, These actions will produce a certain power that you convert into any form you wish, spiritual or material, (*এই-সকল ক্রিয়া দ্বারা এমন একটি শক্তি জন্মায়, যাকে –আধ্যাত্মিক বা ভৌতিক –যে কোন রূপে ইচ্ছা পরিণত করা যেতে পারে।*) যখনই তপস্যা করা হয় তখন কিছু ক্ষমতা আসে, এটা একটা শক্তি, কি রকম শক্তি? একজন চাকরি করছে, সারা মাস চাকরি করে মাসের শেষে কিছু টাকা পেল। এবার ওই টাকা দিয়ে সে যে কোন জিনিস করতে পারে। টাকা দিয়ে সে কাপড় কিনতে পারে, খাবার-দাবার কিনতে পারে, বাড়ি বানাতে পারে। তপস্যা করাটাও একটা ইনকাম করার মত, সেই ইনকাম দিয়ে সে তার আধ্যাত্মিক উন্নতি বা জাগতিক উন্নতি করতে কাজে লাগাতে পারে।

একটা উদাহরণ দিলে তপস্যা জিনিসটা আরও স্পষ্ট হবে। পর্বতগাত্র থেকে নামার পর নদী আপন বেগে ধেয়ে চলেছে। কোন কারণে যদি কিছু বাধা ওর প্রবাহের সামনে এসে যায়, ও তখন ডান দিক দিয়ে বা বাঁ দিক দিয়ে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু যদি সামনে একটা ড্যাম দিয়ে নদীর গতিবেগকে পুরো রুদ্ধ করে দেওয়া হয়, ওর আর প্রবাহিত হওয়ার কোন পথ থাকবে না। এবার ও একটা জিনিসই করবে, নিজের শক্তি সঞ্চয় করতে শুরু করবে। শক্তি সঞ্চয় করা মানে, নদীর জলের পরিমাণ বাড়ছে। এবার সে ওই ড্যামকে উপচে বেরিয়ে যাবে। যখন আমি দেখছি আমি আর এগোচ্ছি না, এগোতে পারছি না, সব দিক থেকে আমার এগোনো বন্ধ হয়ে গেছে। ডান দিক বন্ধ, বাঁ দিক বন্ধ, সামনে বন্ধ। আমি এখন সেই নদী, যার তিনটে দিকই

বন্ধ। এবার আমার জন্য একটাই পথ, উপচে বেরিয়ে যেতে হবে, এছাড়া আর কোন উপায় নেই। কেউ বলতে পারে, নদীটা যদি শুকিয়ে গিয়ে মজে যায় তাহলে কি হবে? মানুষের ক্ষেত্রে তা কখনই হবে না, কারণ মানুষ মাত্রই ঈশ্বরের সন্তান, ঈশ্বরের অংশ, সে কক্ষণ শুকিয়ে যেতে পারে না। চৈতন্য সত্তা সবার মধ্যে থাকবেই থাকবে, সে এক বেগবান নদী। প্রত্যেকটি মানুষ, তা সে জঘন্য অপরাধীই হোক আর জঘন্য প্রকৃতির চরিত্রেরই হোক, ক্ষমতা সবারই আছে, কিন্তু দমে গেছে। উচ্চতম প্রকৃতি থেকে যোগান দেওয়াটা বন্ধ হয়ে আছে, ওটাকে জাগাতে হবে। জলাশয় গুলি শুকিয়ে গেছে, বৃষ্টি হচ্ছে না, এবার বৃষ্টি নামবে। কিভাবে নামবে? তাপ সঞ্চার করতে হবে। তপস্যায় বসে যাক, তাপ সঞ্চার হতে শুরু হয়ে যাবে।

এর সব থেকে বড় দৃষ্টান্ত হল গান্ধীজী। গান্ধীজীকে যেই বলা হল, আমাদের লোকেরা পারছে না, অনেকের মধ্যেই গলদ ঢুকে গেছে, কারুর এই গোলমাল, সেই গোলমাল। উনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, আমি এবার অনশনে বসলাম। কেন অনশনে বসা? আমি আমার শুদ্ধি করছি। আজ বাকিটা ইতিহাস। থেকে থেকে উনি অনশনে বসে যেতেন। কেন বসতেন? তপস্যা। বাংলায় একটা কথা আছে হত্যে দেওয়া, হিন্দীতে প্রায়োপবেশন বলে। কারুর কোন সমস্যা হলে সে কোন মন্দিরে গিয়ে হত্যে দিয়ে বসে থাকে, যতক্ষণ মা আমার কথা না শুনছেন, আমি এখান থেকে নড়ছি না, ভগবান এবার শুনতে বাধ্য হবেন। আমাদের সমস্যা হল, আমরা এতই সাধারণ মানুষ, শরীরের প্রতি আমাদের এতই আসক্তি যে, এক ঘন্টা বসব ঠিক করে বসে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর ঘড়ি দেখতে শুরু করি। আমি এই সময় চা খেতাম, মাথাটা তাই ধরেছে, ঠিক আছে আরও কিছুক্ষণ বসি। একটু পরে পেটে এমন কামড় দিতে শুরু করবে, এই করে আমরা আর ধরে রাখতে পারি না। কিন্তু যে দেখছে আমার আর কোন উপায় নেই, আমি এটাকে ছাড়ছি না, যাই হয়ে যাক আমি আর উঠছি না। তপস্যায় যখন বসে গেল, এবার তার শক্তি স্ফুরিত হতে থাকবে। যাঁরা ভাল সাধু, ভাল ঋষি, তাঁদের ক্ষমতা এত হয়ে যায় যে, ওই ক্ষমতা শুধু নিজের কাজেই নয়, অপরের কাজেও লাগিয়ে দিতে পারেন। সেইজন্যই লোকের সাধু মহাত্মাদের পাশে পাশে ঘুর ঘুর করতে থাকে, যদি সাধুবাবার আশীর্বাদে কিছু হয়ে যায়। সমস্যা হল, বেশির ভাগ সাধুবাবারা ঠাকুরের ভাষায় পচা কাঠ, কোন রকমে নিজে ভেসে যেতে পারেন, একটা পাখি বসলে ডুবে যায়।

স্বামীজী বলছেন, This idea of Tapas penetrates the whole of Hindu religion. (*এই তপস্যার ভাব সমগ্র হিন্দুধর্মের চালিকা শক্তি।*) পুরো হিন্দু ধর্ম দাঁড়িয়ে আছে তপস্যার উপরে। হিন্দুদের কোন কিছু নেই, যেটা তপস্যা নয়। যেমন, বাচ্চাদের বলছেন, *ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ*, তপস্যা বাচ্চাকেও করতে হবে, তুমি যে পড়াশোনা করছ, এটাই তোমার তপস্যা। একজন সাফাইওয়ালা যখন সমাজের রাস্তাঘাট পরিষ্কার করছে, তখন সেটাই তার তপস্যা, এটাই তাকে নিয়ে যাবে সেই জায়গায়, যে জায়াগায় যোগীরা যোগ তপস্যা করে যাচ্ছেন। বাচ্চাদেরও এই তপস্যাই সেখানে নিয়ে যাবে। ব্রাহ্মণদের বলছেন, না খেয়ে, না দেয়ে, অপরিগ্রহ থেকে, অর্থাৎ তুমি চাকরি করতে পারবে না, দান নিতে পারবে না, এর আগে স্বামীজী ঠাকুরের বাবার সম্বন্ধে যেটা বর্ণনা দিলেন; কি করবে তুমি? কেবল বিদ্যাচর্চা, এটা করেই তুমি সেখানে যাবে, যেখানে সাফাইওয়ালা ঝাড়ু দিয়ে যায়। মনুস্মৃতিকে যারা নিন্দা করে তারা হিন্দুধর্মের basic conceptটাই বোঝে না। মনুস্মৃতিতে মনু বলছেন, তপস্যাই আমাদের জীবন-ধারা, এটা সবারই জন্য। একজন স্ত্রী বিয়ের পর শ্বশুড় বাড়ি গেছ, এবার তার সাধনা শুরু। শাশুড়ী তোমার উপর অত্যাচার করবে, স্বামী হয়ত তোমাকে ভালবাসবে না, তার মধ্যেও তোমাকে নিজেরটা দেখতে হবে।

আমাদের সমস্যা হল যে আমরা ভুলে যাচ্ছি যে, এই যে একটা মানবজীবন আমি পেয়েছি, এই মানবজীবন একটা প্ল্যাটফরম, যে প্ল্যাটফরমের উপর দাঁড়িয়ে আমি উপরের দিকে উঠে আসব। রকেট লঞ্চার যেমন একটা বেস্, যে বেসের উপর রেখে রকেটকে মহাকাশে উৎক্ষেপণ করা হয়, মানব-জীবনটাও সেই রকম একটা রকেট লঞ্চার। রকেট লঞ্চারটার গুরুত্ব বেশি, নাকি রকেটের গুরুত্ব বেশী সেটাই আমরা বুঝতে পারছি না। আমাদের শরীরের ভিতরে যিনি জীবাত্মা আছেন, তাঁর গুরুত্ব শরীরের থেকে অনেক বেশি, শরীরটা হল শুধু লঞ্চার। কিন্তু আমরা সবাই এত স্থূল হয়ে গেছি যে, আমাদের মন, বুদ্ধি, চিন্তা সব শরীর কেন্দ্রিক হয়ে গেছে, শরীরকে আমরা এত বেশি গুরুত্ব দিয়ে ফেলছি। যেখানেই আমরা যাই না কেন, ফেসবুক, হোয়াটসাপ,

টুইটার, সব জায়গায় জড়বাদ, ভৌতিকবাদের রাজত্ব চলছে। যার ফলে যেদিকে তাকাই সেদিকেই দুর্নীতি ছেয়ে আছে, আজ সাধুবাবার নামে কেচ্ছা বেরোচ্ছে, কালকে কোন নেতার নামে কেচ্ছা, তারপরের দিন পুলিশ, তারপরের দিন মিলিটারি, দুর্নীতিই হয়ে গেছে জীবন-ধারা, corruption is the way of life। কিন্তু দুর্নীতি কখনই মানুষের জীবন-ধারা হতে পারে না।

তাহলে তপস্যা কে করছে? কেউই করছে না। ভৌতিকবাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমার জন্ম দিয়ে শুরু আর আমার মৃত্যুর পর সব শেষ, জন্মের আগে কিছু নেই, মৃত্যর পরেও কিছু থাকবে না। গীতায় এটাকেই ভগবান অর্জুনকে ব্যঙ্গ করে বলছেন – *অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। অব্যক্তনিধানান্যেব তত্র কা পরিবেদনা।।* ভৌতিকবাদের এই থিয়োরীকে মেনে নিয়েই আমরা চলছি, মরে গেলে সব শেষ তাই যত দিন বেঁচে আছ লুটেপুটে খেয়ে নাও। কিন্তু জানে না যে, লুটেপুটে খেয়েতো নিচ্ছে, কিন্তু মরার পর একটা পাগল ছাগল হয়ে জন্মাবে। যদি আমরা individualকেও মানি, যদি বলে আমি অত কিছু মানি না, কিন্তু Tapas is way of life। আমি এই জায়গাটায় আছি, I will make best of it, এটাই তপস্যা। লোকে আমাকে কেন সম্মান করে না? আমার তপস্যা নেই তাই সম্মান করে না। একজন মা মেয়েরূপে সম্মান না পেয়ে থাকতে পারে, রূপসী রূপে সম্মান না পেতে পারে, স্ত্রী বা বৌমা রূপে সম্মান না পেতে পারে কিন্তু মা রূপে অবশ্যই সম্মান পাবে। কারণ তপস্যা করেছিল। আজকের দিনে সেটাও উড়ে গেছে। স্বামীজী এটাই বলছেন, Tapas penetrates the whole of Hindu religion, হিন্দুধর্মের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তপস্যা আগাগোড়া ছেয়ে আছে।

আর বলছেন, The Hindus even say that God made Tapas to create the world. (*হিন্দুরা এমনও বলে যে, জগৎ সৃষ্টির জন্য ভগবানও তপস্যা করেছিলেন।*) মুণ্ডকোপনিষদে বলছেন *তপসা চীয়তে ব্রহ্ম*, ব্রহ্ম তপস্যা করেছেন। আর পুরাণাদিতে বার বার বলছেন, ব্রহ্মা প্রথমে তপস্যা করলেন, তপস্যা থেকে এই সৃষ্টি হয়ে হয়েছে। সৃষ্টি তপস্যা দিয়ে হয়, আর জীবনের যা কিছু হয়, সব তপস্যা দিয়ে হয়। কোন একটা দুটো জিনিসকে ধরে যদি আমরা না বলি, আমার এটাই তপস্যা, এটাই আমার সাধনা, তাহলে জানতে হবে মৃত্যুর পর যেখানে ছিলাম সেখান থেকেই আবার প্রথম থেকে শুরু করতে হবে। It is a mental instrument with which to do everything. 'Everything in the three worlds can be caught by Tapas. (*এটা যেন মানসিক যন্ত্রবিশেষ –এ দিয়ে সব করা যেতে পারে। শাস্ত্রে আছে – 'ত্রিভুবনে এমন কিছু নেই, যা তপস্যা দ্বারা পাওয়া যায় না।*) মানুষ যখন কোন বড় কিছু করতে যায় তখন তার কিছু নূতন যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম লাগে। পদার্থ বিজ্ঞানে নিউটনের কত অবদান, উনি কিন্তু পেরে উঠতেন না। ওনার গণিতে একটা টুল দরকার, উনি ক্যালকুলাস আবিষ্কার করলেন। এরপর উনি ওটার সাহায্য নিয়ে এগোলেন। আইনস্টাইনও এগোতে পারতেন না, কিন্তু তখন বিশেষ ধরণের কিছু কিছু জিওমেট্রি আসতে শুরু হল, সেগুলোর সাহায্য নিয়ে এগোতে থাকলেন। কারণ আইনস্টাইন যেটা করেছিলেন, সেটাকে mathematically place করার উপায় ছিল না, যদিও তিনি অন্য গণিতজ্ঞের সাহায্য নিয়েছিলেন। এগুলোকে বলে টুল, বড় কিছু করার জন্য দরকার একটা টুল, ওই টুল না থাকলে কাজে এগোতে পারবে না। তপস্যা হল mental instrument। জীবনে যদি কেউ সাফল্য পেতে চায়, বিরাট কিছু হতে চায়, তার দরকার mental instrument। সেই mental instrument, mental tool হল তপস্যা। তিব্বত আর তপস্যাকে নিয়ে বলার স্বামীজী এবার বলছেন –

People who report about sects with which they are not in sympathy are both conscious and unconscious liars. (*যে-সব লোক এমন সব সম্প্রদায়ের মতামত বা কার্যকলাপ বর্ণনা করে, যেগুলির সঙ্গে তাদের সহানুভূতি নেই, তারা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে মিথ্যাবাদী।*) যখন কোন সম্প্রদায়ের বা ধর্মের নিন্দা করা হয়, এদেরকে স্বামীজী বলছেন conscious and unconscious liars, এরা মিথ্যাবাদী। এদের মধ্যে কিছু আছে যারা অজান্তেই মিথ্যা বলে, কিছু আছে যারা জেনেশুনে মিথ্যা বলে। A believer is one sect can rarely see truth in others. (*যারা সম্প্রদায়বিশেষে দৃঢ় বিশ্বাসী তারা অপর সম্প্রদায়ে যে সত্য আছে, তা বড় একটা দেখতে পায় না।*) মানুষ যদি একটা সম্প্রদায়ে আসক্ত হয়ে

ডুবে থাকে, সে অন্য সম্প্রদায়ের ভাল জিনিসগুলিকে দেখার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। আমাদের মনে হতে পারে, স্বামীজী তিব্বত দিয়ে শুরু করে কোথায় নিয়ে এলেন। কিন্তু স্বামীজী হয়ত এই কথাগুলি loosely বলছিলেন, loosely বলতে বলতে এখানে এসে এই কথাগুলো বলছেন। স্বামীজী হয়ত আরও কিছু কথা বলেছিলেন, কিন্তু মিস্ ওয়াল্ডো যতটুকু পেরেছেন ততটুকু নোট করেছিলেন।

বক্তব্য এখানে তিব্বত আর সাধনা। তিব্বত নিয়ে বলতে গিয়ে বললেন সেখানে কিভাবে নানান রকম সাধনা হয়ে থাকত। কিন্তু তাদের সাধনার মূল ছিল, আমি তপস্যা করে ক্ষমতা অর্জন করতে চাই, যে ক্ষমতা আধ্যাত্মিক আর জাগতিক দুটো দিকেই যাতে আমি কাজে লাগাতে পারি। সেখান থেকে স্বামীজী বলছেন, তিব্বতীরা এই ধরণের তপস্যা করেছিল ঠিকই, তারও অনেক আগে ভারতীয়দের মধ্যে এই জিনিস হয়ে আসছিল। হয়ত এমনও হতে পারে যে, এই কথাগুলোকে অনেকে মনে করতে পারে যে তিব্বতীদের নিন্দা করা হচ্ছে, সেটা যেন কেউ না ভাবতে পারে সেইজন্য হয়ত স্বামীজী এভাবে বলছেন। পুরোটাই আমরা আন্দাজে বলছি, কারণ এখানে অন্য কোন মন্তব্য বা নোট নেই যেটা দিয়ে আমরা ফিলাপ দি গ্যাপ্ করব। যদি কোন সম্প্রদায়ের নিন্দা হয়, যারা নিন্দা করে বুঝবেন তারা conscious and unconscious liars, হয় তুমি তাদের ব্যাপারে জানো না, দ্বিতীয়তঃ জানলেও তুমি জেনেশুনে মিথ্যা কথা বলছ, কারণ যে নিজের সম্প্রদায়কেই শুধু ভালবাসে, সে অন্য সম্প্রদায়কে ভালবাসতে পারে না। স্বামীজী ছোট্ট করে একটু হনুমানের কথা উল্লেখ করছেন, যেটা ঠাকুরও বলছেন, হনুমান বলতেন আমি তিথি জানি না, নক্ষত্র জানি না, বার জানি না, আমি একমাত্র রাম চিন্তা করি। এরপর জুলাইয়ের দু-তারিখ স্বামীজী মাতৃশক্তি বা শক্তিপূজাকে নিয়ে বলছেন।

<u>মঙ্গলবার, ২রা জুলাই</u>

মাতৃশক্তি ও তার সাধনা

হিন্দু ধর্মে ঈশ্বর আর ঈশ্বরের সৃষ্টি বা সৃষ্টি করার যে শক্তি, প্রথমের দিকে সমুদয় শক্তি এক থাকে, কিন্তু পরে যেন আলাদা আলাদা হয়ে যায়। ঈশ্বরকে আমরা দেখি সচ্চিদানন্দ রূপে, সচ্চিদানন্দ মানেই তিনি মন ও বাণীর পারে, নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম। নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের পূজা করা যাবে না, কারণ তিনি সর্বব্যাপী হয়ে আছেন। পূজা করা মানেই আমি আলাদা তুমি আলাদা, কিন্তু যিনি সবর্ত্র বিরাজিত, সর্বব্যাপী তাঁকে কি করে পূজা করা হবে, কি করেই বা তাঁর সাধনা করা হবে, কি করেই বা তাঁর সেবাদি হবে। আরও কঠিন হল, কি করেই বা তাঁর ধ্যান-ধারণা করা হবে, কারণ যিনি নির্গুণ নিরাকার তাঁর ধারণা করা যায় না, ধারণা যাঁর করা যায় না, তাঁর ধ্যান কি করে হবে! মুসলমানরা মনে করে আল্লার কোন রূপ নেই, তিনি নিরাকার। কিন্তু ইসলাম ধর্মে তাদের যে প্রার্থনা আছে তারা সেটা নিত্য প্রার্থনা করে। ওরা আল্লার বেশ কিছু গুণের কল্পনা করে, সেই গুণগুলোকে একটা করে নাম দিয়ে মালাতে সেই নামগুলো জপ করে। শিখরাও এই ধরণের কিছু একটা বার করলেন কিভাবে নির্গুণ নিরাকারের পূজা করা যেতে পারে, ভক্তি করা যেতে পারে। কিন্তু নির্গুণ নিরাকারের সাধনা একমাত্র নেতি নেতি উপায়েই হয়, যে সাধনা বেদান্তমার্গে অনুশীলন করা হয়ে থাকে। যিনি সর্বব্যাপী, সব জায়গায় আছেন, সব কিছুতে আছেন, তাঁকে জানার একমাত্র পথ, সব কিছুকে ত্যাগ করা।

তিনি যে সব জায়গায় আছেন, সর্বব্যাপী হয়ে আছেন, আমরা তো সেভাবে দেখছি না, আমরা দেখছি আমি আছি আর আমার সামনে এই জগৎ আছে। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে আচার্য শঙ্করের দর্শনকে ঠিক ঠিক পাওয়া যায়, সেখানে তিনি এই কথা দিয়েই শুরু করছেন – *যুস্মদ্ অস্মদ্ প্রত্যয়*। মানুষের মনে আমি বোধ আর এই জগতের বোধ সব সময় থাকবেই, আর এই দুই রূপে থাকবে – আমি আলাদা তুমি আলাদা এই বোধ। কি রকম আলাদা? যেমন অন্ধকার আর আলোতে তফাৎ। তিনি চৈতন্যময়, তিনি সর্বময়, সর্ব অবস্থায় আছেন। তাহলে কেন আমরা এই জগৎকে জড় দেখছি আর তার সাথে সাথে জগতের বৈচিত্র দেখছি? সেইজন্য বলা

হয়, যিনি সেই সচ্চিদানন্দ, যিনি নির্গুণ নিরাকার, তিনি ক্রিয়াশক্তিতে পরিবর্তিত হয়ে যান। কেন হন, কবে হন, কিভাবে হন, এসব প্রশ্নের কোন উত্তরই হয় না। উত্তর শুরু হয় ঠিক তারপর থেকে। তাহলে আপনি কি করে জানলেন তার আগে কি ছিল? ধ্যানের গভীরে গিয়ে জানা হয়। যাঁরা ধ্যানের গভীরে গেছেন, তাঁরা যে কথাগুলো বলেন, সেই কথগুলোকেই আমরা মানি এবং বিশ্বাস করে চলি। যারা এগুলোকে মানবে না, বিশ্বাস করবে না, তাদের জন্য এই কথাগুলো নয়। ঋষিদের কথাকেই আমরা কেন নেব, এর উপর আমরা আগেও অনেক আলোচনা করেছি, ওই বিস্তারে আমার আর এখানে যাচ্ছি না।

তার মানে, এবার দুটো জিনিস এসে গেল, এটাকেই ঠাকুর খুব সহজ ভাষায় বলছেন, ব্রহ্ম আর তাঁর শক্তি, অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তি বা দুধ আর তার ধবলত্ব, এই দুটো যেন এক, কিন্তু আবার আলাদা। আলাদা এই অর্থে, যে-কালে সৃষ্টি হয় সেই-কালে আলাদা। তন্ত্র মতে সেইজন্য বলা হয়, শিব আর শক্তি এক, কিন্তু সৃষ্টির যখন সময় হয়, তখন শিব চৈতন্য রূপে আর শক্তি ক্রিয়া রূপে আলাদা হয়ে যান। যেখানে ওই আলাদা হয়ে যাওয়ার লাইন টানা আছে, যে লাইন Absolute আর Relativeকে পৃথক করে দিচ্ছে, ওটাকে কেউ কোন দিন সঠিক ভাবে বলতে পারবে না। যার যে ভাব ভাল লাগে, সে সেই ভাবকে অবলম্বন করে এগিয়ে চলে যাবে। তুমি ভাল করে দেখ, তোমার হৃদয় কি বলছে, সেটাকে নিয়ে এগিয়ে যাও। কিছু দিন যাওয়ার পর যদি তোমার মনে হয় এই ভাব ঠিক জমছে না, তুমি তোমার ভাব পাল্টে নাও। ঠাকুরও পাল্টাচ্ছেন, যেমন কিছু দিন পর বলছেন, আমার ভাব পাল্টাচ্ছে, বা বলছেন, আমার এখন ওটা আলুনি লাগছে। আবার একটা সময় বলছেন, আমার এখন রূপটুপ সব উড়ে যাচ্ছে। কোন জিনিস নেই যে, ঠাকুর ওই একটা জিনিসকে নিয়েই স্থির থাকছেন। যদি সব সময় স্থির থাকতেন, তাহলে বলতে পারতেন এটাই সত্য, ঘুরে ঘুরে এই জায়গাতেই চলে আসছেন। কিন্তু রূপটুপ উড়ে যাচ্ছে, এটাও মানছেন, আবার অখণ্ড আলুনি লাগছে, এটাও বলছেন। তার মানে এই, যে সত্যগুলো রয়েছে, যেখানে অখণ্ড রয়েছে, আবার সৃষ্টিও রয়েছে, সেখানে বিভিন্ন ভাবে থাকা যায়, তার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল ভাব পরিবর্তিত হতে পারে। ভাব পরিবর্তিত মানে, কৃষ্ণ থেকে কালীতে যাচ্ছে না, সেটাকে নিয়ে আমরা আলোচনা করছি না। এখানে আলোচনা হচ্ছে, পাঁচ বছর সাত বছর ধরে আমার হয়ত মনে হচ্ছে, সচ্চিদানন্দই আছেন, সৃষ্টি বলে কিছু নেই। তারপর হয়ত এই ভাবটা আমার পাল্টে গেল, এখানে চিন্তা-ভাবনার কথা বলা হচ্ছে না, ভিতরে সত্যিকারের যে ভাব, সেই ভাব থেকে সত্যিকারের সাধনা। কি সেই ভাব? মা কালী সৃষ্টি করছেন, মা কালীর সাধনা। এই ভাবটাকে একটু বুঝে নেওয়া হল।

এরপর স্বামীজী Divine Mother বা শক্তিসাধনা নিয়ে বলছেন। স্বামীজীর বক্তব্যকে অবলম্বন করে মাতৃ-সাধনা কি, এটাকে আমরা খুব সহজে বুঝে নেব। তন্ত্র আর শাক্তের অল্প একটু তফাৎ আছে, এখানে স্বামীজী শাক্তদের কথা বলছেন, Shaktas worship the Universal Energy as Mother, the sweetest name they know. (*শাক্তেরা জগতের সেই সর্বব্যাপিনী শক্তিকে মা বলে পূজা করে থাকেন – কারণ মা নামের চেয়ে মিষ্ট নাম আর কিছু নেই।*) যিনি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত, যখন তিনি সৃষ্টি করেন, তাঁর সেই সৃষ্টিতে প্রথম যেটা আসছে সেটাকে বলা হয় Universal Energy। Universal Energyর কথা বললেই প্রথমেই আমাদের মাথায় আসবে বিগ্ ব্যাঙ। বিজ্ঞানীদের কাছে সৃষ্টি মানেই বিগ্ ব্যাঙ আর ব্ল্যাকহোল, তবে ফিজিক্সে ওনারা কোনটা ঠিক বলছেন, কোনটা ভুল বলছেন, কারুর বোঝার ক্ষমতা নেই। আজকে একজন বিজ্ঞানী একটা ইক্যুয়েশান নিয়ে আসছেন, কিছু দিন যেতে না যেতেই আরেকজন বিজ্ঞানী এসে বলে দিলেন, সবটাই ভুল। আমাদের বোঝার কোন পথ নেই। ঠিক, ভুল যাই হোক, তাতে কোন কিছু আসে যায় না, যিনি যেটাই বলবেন, তিনি এই পৃথিবীকে নিয়ে বলবেন, সূর্যকে নিয়ে, সোলার সিস্টেমকে নিয়ে, গ্যালাক্সিকে নিয়ে, ফিজিক্যাল ইউনিভার্সকে নিয়ে, সেই ফিজিক্যাল ইউনিভার্সকে নিয়েই বলবেন; যেটাকে আমি চোখ দিয়ে দেখতে পাই, পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে জানতে পারছি আর মন দিয়ে ধারণা করতে পারি। ধারণা করার পর ওটাকে আমি ইক্যুয়েশানে কনভার্ট করতে পারি। সমগ্র বিজ্ঞান এই তিনটে স্তরে চলে – ইন্দ্রিয়, মন আর ইক্যুয়েশানস্, ইক্যুয়েশান তো মনেরই অঙ্গ। কিন্তু যখন এ্যবস্ট্রাক্ট ইক্যুয়েশানে চলে যায়, তখন সেটা সাধারণ লোকের মনের বাইরে চলে যায়, ওই অর্থে ইক্যুয়েশন বলা হচ্ছে।

ভৌতিক জগৎ, সূক্ষ্ম জগৎ ও কারণ জগৎ

কিন্তু এই যে দৃশ্যমান জগৎ, দৃশ্যমান শক্তির খেলা রয়েছে, যেখানে আইনস্টাইনের $E=MC^2$ আদি চলছে, এর পিছনেও তো একটা জগৎ আছে, যেটাকে আমরা পুরোদমে মানছি। কারা মানে? সবাই মানে। যীশুও বলছেন, Kingdom of heaven is inside you। আমরা যে মুখের কথায় বলি, স্বর্গ নরক সব তোমার ভিতরে, ওই অর্থে না। আমরা সূক্ষ্ম শরীরের কথা বলি, কারণ শরীরের কথা বলি, ঠিক তেমনি এই স্থূল জগতের পিছনেও একটা সূক্ষ্ম জগৎ আছে। সূক্ষ্ম জগৎ যদি না হয়, তাহলে সূক্ষ্ম শরীর হবে না। কারণ শরীর আছে মানেই কারণ জগৎ একটা থাকবেই। বেদান্ত পুরোদমে এটাকে নিয়ে বলে। কিন্তু সূক্ষ্ম শরীর, সূক্ষ্ম জগৎ ও কারণ শরীর, কারণ জগৎ, এটাকে ইন্দ্রিয় কোন দিন জানতে পারবে না। ইন্দ্রিয় জানতে পারবে না বলে, মন একটা অন্য অবস্থায় জানতে পারবে, কিন্তু এই অবস্থায় জানতে পারবে না, আর ইক্যুয়েশানসে কোন দিন কনভার্ট হতে পারে না। বিজ্ঞানীরা যা কিছু বলছেন, সেখানে ওনারা সূক্ষ্ম জগৎ, কারণ জগৎকে নিয়ে বলছেন না। কারণ প্রথম কথা, ওনাদের এর উপর কোন ধারণা নেই, কিন্তু তার থেকেও বেশি এটা ওনাদের এলাকা নয়। ওনাদের এলাকা হল, যেখানে ইক্যুয়েশান, মন আর পঞ্চ ইন্দ্রিয় কাজ করব, এর বাইরে নয়। বিজ্ঞানীরা বলেনও তাই, ভাই, আমি যদি মাপতে পারি, আমি ইক্যুয়েশানে দিতে পারি তবেই সেটা আমার কাছে সত্য, এর বাইরে আমি কিছু মানতে পারছি না।

বিজ্ঞান যখন universal energyর কথা বলে, তখন ওরা বলতে চাইছে energy of the universe, কিন্তু আমরা যখন universal energyর কথা বলি তখন আমরা বলতে চাই, ভৌতিক জগৎ, সূক্ষ্ম জগৎ, কারণ জগৎ, সব কটাকে মিলিয়ে যে সমগ্র জগৎ। সূক্ষ্ম জগতে প্রবেশ করে যাওয়া মানেই ভূত প্রেত এসে গেল, স্বর্গলোক এসে গেল, পিতৃলোক আদি এসে গেল। এই জগতে আমরা যেমন আছি, আমি, আপনি, ঘরবাড়ি, গাছ, পশু সব আছে, ঠিক তেমনি সূক্ষ্ম জগতেও সেখানকার বাসিন্দারা আছে। এখানে যেমন ভারত আছে, পাকিস্থান আছে, চীন আছে, বাংলাদেশ আছে, নেপাল আছে আবার আমেরিকাও আছে। আমাদের এখানে যেমন বড়লোক আছে, মধ্যবিত্ত আছে, গরীব আছে, সূক্ষ্ম জগতেও ঠিক এভাবেই সব কিছু আছে। এখানে যেমন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়ার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হয়, সূক্ষ্ম জগতেও চলার জন্য চেষ্টা চালাতে হয়। এখানে যেমন দূরত্ব আছে, সময় আছে, সূক্ষ্ম জগতেও দূরত্ব আছে, সময় আছে। তবে সূক্ষ্ম জগতে দুরত্ব আর সময়ের পরিমাপ অন্য রকম, সেখানে দূরত্ব অতিক্রম করতে এই জগতের থেকে অনেক কম সময় লাগে। কারণ আমরা দেখি ইন্দ্রাদি দেবতারা বিভিন্ন ভাবে চলাফেরা করেন।

আমাদের মনে হতে পারে যে, এতক্ষণ সব র‍্যাশানালি চলছিল, হঠাৎ গালগপ্পে কেন ঢুকে যাওয়া হল। এগুলো কোন গালগপ্প নয়, এটাই সত্য। চৈতন্য মহাপ্রভু তিন রকম অবস্থায় থাকতেন, অন্তর্দশা, অর্ধবাহ্যদশা এবং বাহ্যদশা। বাহ্যদশা অবস্থায় তিনি ঈশ্বরীয় কথাবার্তা বলতেন, অর্ধবাহ্যদশায় ভাবে মত্ত হয়ে উন্মত্তের মত নৃত্য করতেন, কীর্তন করতেন আর অন্তর্দশায় সমাধিতে ডুবে যেতেন। কথামৃতে ঠাকুরের যে বর্ণনা আমরা দেখি সেখানেও ঠাকুরের এই তিনটে অবস্থার কথা বলা হচ্ছে। একদিন ঠাকুর বসে আছেন, অন্তর্দশায় তাঁর মন সাঁ করে উড়ে চলে গেল, উড়ে এমন একটা উচ্চ জায়গায় চলে গেলেন, বলছেন সেখানে দেবতারাও যেতে পারেন না, সাধারণ ঋষিরাও যেতে পারেন না। বলছেন, সেই সপ্তর্ষি মণ্ডলে চলে গেলেন, দেখছেন সেখানে একজন বড় দাড়িওয়ালা ঋষি ধ্যান করছেন। তিনি তঁর গলা জড়িয়ে বলছেন, আমি যাচ্ছি, তুমিও চলো। এটা কি কোন কাহিনী, নাকি কোন কল্পনা, না এটা মাথা খারাপের লক্ষণ, আমরা জানি না। তাহলে এটা কি? কিন্তু আমরা জানি, নরেন্দ্রনাথের জন্ম হল। ঠাকুর যে সপ্তর্ষি মণ্ডলের কথা বলছেন, ঠাকুর আসলে কোথায় গিয়েছিলেন? কুরুক্ষেত্রে মাঝখানে দাঁড়িয়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ছুঁয়ে দিয়ে বলছেন, এই দেখ আমার বিশ্বরূপ। আমরা না হয় মেনে নিলাম ওটা একটা গালগপ্প। কিন্তু আমরা এখনও ঠাকুরের জীবনের এত কাছাকাছি অবস্থান করছি, আর যারা ঠাকুরের ভক্ত, তাদের এখনও বুকের পাটা এতটা বড় হয়নি যে, বলে দেবে ঠাকুরের সপ্তর্ষি মণ্ডলে চলে যাওয়াটা গালগপ্প। কারণ আমরা যদি এটাকে গালগপ্প ভেবে উড়িয়ে দিই, তাহলে ঠাকুরের যত রকম সাধনা আছে, যত রকম তাঁর সিদ্ধি আছে, যত দর্শন আছে, যত উপলব্ধি আছে, ঠাকুরের মা কালীর দর্শন, নির্বিকল্প সমাধির কথা, সবটাই গালগপ্প হয়ে যাবে। তাহলে ঠাকুরের উপর আধার করে রামকৃষ্ণ মঠ ও

মিশনের মত এত বড় যে প্রতিষ্ঠান চলছে, এত কিছু হচ্ছে, সবটাই ধাপ্পা হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা ভাল করে জানি, এগুলো ধাপ্পা নয়। যদি ধাপ্পা হত তাহলে বড় বড় ডিগ্রী পাওয়া ইয়ং ছেলেগুলো ভাল চাকরী করে মোটা টাকা মাইনে নিয়ে সুখের জীবন ছেড়ে সন্ন্যাসী হতে আসতেন না। তাহলে ঠাকুরের মন কোথায় গিয়েছিল, ঠাকুর কি দর্শন করেছিলেন? যেদিন এই প্রশ্নের উত্তর যদি কেউ পেয়ে যায়, সেদিন সে বুঝে নেবে সূক্ষ্ম শরীর কি জিনিস আর সূক্ষ্ম জগৎ কি হয়।

আমাদের মাথার উপরে যে আকাশ, নীচে আমরা আছে, এর উপরে পাখিরা আছে, আরও উপরে যে পাখিগুলি উড়তে পারে, তারা আছে, বেলুন যেগুলো ছাড়া হয়, সেগুলো তারও উপরে যায়, এ্যারোপ্লেন আছে, স্যাটেলাইট আছে। যে যত উপরে, সে চাইলে নীচেও আসতে পারে, উপরেও যেতে পারে, যে যত নীচে সে চাইলেও উপরে যেতে পারবে না। সূক্ষ্ম জগতও ঠিক সেই ভাবেই চলে। সবার নীচে ভূত প্রেতগুলো আছে যাদের একেবারে অসহায় অবস্থা, তার উপরে পিতৃলোক আছে, তার উপরে দেবলোক, দেবলোকের উপরে সিদ্ধদের লোক আছে, তারপরে সপ্তর্ষি মণ্ডলাদি। সব এভাবেই সাজানো আছে, আর এভাবেই কাজ করে। যে যত উপরে তার ক্ষমতা তত বেশি। মৃত্যুর পর আমরা সবাই এই লোকগুলোর মধ্যে কোথাও একটাতে যাব। এখানে যার যত যোগশক্তি আছে, সেই যোগশক্তির সমান হয় যে সূক্ষ্ম জগতে, সেখানেই তার জন্ম হবে। যেমন এখানে বিভিন্ন লোকের অর্থ ও ক্ষমতা আলাদা আলাদা রকমের হয়, বিল গেটসের এক রকম ক্ষমতা, আমেরিকার প্রেসিডেন্টের এক রকম ক্ষমতা, ভারতের প্রধানমন্ত্রীর এক রকম ক্ষমতা। আমি আপনি কোন ভাবেই আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ভবন হোয়াইট হাউসে যেতে পারব না। তবে পয়সা দিলে, বিশেষ দিনের জন্য যখন খোলা হয়, আমাকে কিছুক্ষণের জন্য হোয়াইট হাউসে ঘুরিয়ে আমাকে নিয়ে চলে আসবে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ছুঁয়ে দিলেন, কিছুক্ষণ রাউণ্ড মারিয়ে অর্জুনকে ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিলেন, এবার তুমি এসো। ওখানে যদি স্থায়ী ভাবে থাকতে হয় তোমাকে সেই রকম সাধনা করতে হবে। ঠাকুর প্রথম যখন নরেনকে ছুঁয়ে দিলেন, নরেন চিৎকার করে বলছেন, 'মশাই, আপনি এ-কি করলেন, আমার বাবা আছে, মা আছে, ভাইবোনেরা আছে'। তখন নরেন ওই জগতের সব কিছু দেখছেন। একটা কিছুক্ষণের জন্য কোন সিদ্ধ পুরুষ আমাদের সূক্ষ্ম জগৎটা দেখিয়ে দেবেন, কিন্তু ওটা স্থায়ী নয়। পয়লা জানুয়ারী কাশীপুর উদ্যানবাটীতে ঠাকুর যখন অনেককে ছুঁয়ে দিলেন, তাঁদের অনেকের বিভিন্ন ইষ্ট দর্শনাদি হতে শুরু হয়ে গেল। সূক্ষ্ম জগতেও ক্ষমতা আছে, শক্তি আছে, যেভাবে আমাদের এখানে মানুষের টাকা ও ক্ষমতা থাকে। আমি আপনি চাইলেই বিল গেটস্ হয়ে যেতে পারব না, ঠিক তেমনি যারা সূক্ষ্ম জগতে আছে তারা চাইলে সপ্তর্ষি মণ্ডলে যেতে পারবে না, আর চাইলে ইন্দ্র হয়ে যেতে পারবে না।

এরও উপরে আছে কারণ জগৎ, কারণ জগতে যাওয়া মানে ঈশ্বরের একেবারে কাছে চলে যাওয়া। ভক্তিশাস্ত্রে যেটাকে বলছেন, সাযুজ্য, সামীপ্য, সালোক্য ও সারূপ্য। ঈশ্বর সেখানে ছুঁই ছুঁই অবস্থা, ঠাকুর যেমন বলছেন, লণ্ঠনের আলো দেখা যাচ্ছে, কিন্তু মাঝখানে কাঁচের ব্যবধান আছে, ছুঁতে পারছে না। ভগবান সচ্চিদানন্দ, কারণ জগতে তিনি ঈশ্বর রূপে সরাসরি দেখান। আবার সূক্ষ্ম জগতে তাঁর সূক্ষ্ম রূপ আছে, যেটাকে দেখা যায়। স্থূল জগতে দেখা যাবে, যদি তিনি অবতার হয়ে আসেন। স্থূল জগতে ভগবান অবতার হয়ে যখন আসেন, তখনই তাঁর ওই স্থূল রূপটা দেখা যায়। কিন্তু সূক্ষ্ম জগতে যাঁরা একটু উপরের দিকে আছেন, তাঁরা চাইলে ভগবানের সূক্ষ্ম রূপটা দেখতে পারেন, কিন্তু যেহেতু ভগবানের সূক্ষ্ম রূপ, সূক্ষ্ম রূপটা সাধারণ। কিন্তু ভগবানের যে কারণ রূপ, যেটা ভগবানের ঠিক ঠিক রূপ, ওই রূপ মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র দেখতে পান। ঠাকুর যখন মা কালীর দর্শন করছেন, তখন ঠাকুর কারণ রূপে মা কালীকে দেখছেন। আবার বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন জায়গায় যখন মা কালীকে এই রূপে, সেই রূপে দেখেছেন, তখন ঠাকুর মা কালীর সূক্ষ্ম রূপটাই দেখছেন। কখন আবার স্থূল রূপ ধারণ করে আসছেন। ঠাকুর চার রূপেই দেখতেন। কিন্তু স্থূল রূপ মানেই হয় অবতার হয়ে আসা। তাই ঠিক ঠিক যদি বলা হয় তাহলে হবে, সূক্ষ্ম রূপ, কারণ রূপ আর শেষে মহাকারণ, যেখানে ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ রূপে আছেন।

স্থূল জগৎ, সূক্ষ্ম জগৎ, কারণ জগৎ, প্রত্যেকটি জগতে আলাদা আলাদা কিছু কিছু ক্ষমতা থাকে। যে জগতে যে যত উপরে আছে তার ক্ষমতা তত বেশি। যোগীরা এখানে এই লোকেই সাধনা করে সেই ক্ষমতা

গুলি পেয়ে যান, সেইজন্য মানব শরীরকে এত গুরুত্ব দেওয়া হয়। কেউ যদি চায়, এই মানব শরীর দিয়েই সে ইন্দ্রের সুখ আদায় করে নিতে পারে। মানব শরীরে যদি কেউ চায়, ঋষিরা যা যা দর্শন করেন সেটা আমি দর্শন করব, সেটা সে এখানেই পেতে পারে, যেমন ঠাকুর করেছেন। আর মৃত্যুর পর যে জ্ঞান হয়, সে সচ্চিদানন্দের সাথে এক, সেটাও সে এখানেই পেতে পারে, যেটার উপর বেদান্ত দাঁড়িয়ে আছে, যেটাকে আমরা বলছি *অহং ব্রহ্মাস্মি*। একমাত্র মানবজীবনে চারটে জিনিসই সম্ভব, অন্য জীবনে এটা সম্ভব নয়। মানুষ যখন সূক্ষ্ম জগতে যায়, সেখানে তার কিছু কিছু শক্তি এসে যায়, যেমন ইন্দ্র, ইন্দ্র চাইলেই মানুষ রূপ ধারণ করে নিতে পারত, মানুষ রূপ ধারণ করেই ইন্দ্র গৌতম মুনির স্ত্রী অহল্যার সাথে গোলমাল পাকালো। সব দেবতারা আবার সব রকম রূপ ধারণ করতে পারবে না। ভূত প্রেত গুলোকে কখন সখন একটা strong emotionএর জন্য দেখা যায়, কিন্তু ওরা টিকতে পারে না, টিকতে পারলে আমাদের জ্বালা যন্ত্রণা বেড়ে যেত। বেশিক্ষণ একটা রূপকে ধরে রাখার ক্ষমতা ওদের থাকে না। একমাত্র মানুষই সাধনা করে, স্থূল জগৎ, সূক্ষ্ম জগৎ, কারণ জগৎ আর মহাকারণে যেখানে যা যা ক্ষমতা আছে, সবটাই এখানে অর্জন করে নিতে পারে।

এখানে আমি আপনি যে ক্ষমতা বা শক্তি অর্জন করেছি, মৃত্যুর পর আমি আপনি ঠিক ওখানেই যাব, যেখানে এই শক্তি ও ক্ষমতা আছে। ঠাকুর বলছেন যার আছে হেথা তার আছে সেথা। মৃত্যুর পর সেখানে গিয়ে কি পাবে, সেটা আমরা এখানে বসে বলে দিতে পারি। কেউ সাত দিন জপধ্যান করুক, করে দেখুক তার কত যোগশক্তি হচ্ছে। সেকি অপরের মনের কথা জানতে পারছে? ইচ্ছামাত্র সেকি এখান থেকে সেখানে চলে যেতে পারছে? না, কিছুই না, তাহলে তার মোটামুটি ভবিষ্যত হল, নচিকেতা তার বাবাকে যেটা বলছেন, ধানগম যেমন মাটিতে জন্মায় মাটিতে মরে, আবার জন্মায় আবার মরে। আমার আপনার জন্মমৃত্যু এভাবেই চলতে থাকবে। কিন্তু আমরা আশা করে বসে আছি, ঠাকুর এসে আমাকে নিয়ে যাবেন। যদি ঠাকুর এসে আমাদের নিয়ে যাওয়ার থাকে, তাহলে বুঝতে হবে, ঠাকুরের সূক্ষ্ম রূপের কোন না কোন ভাবে আমাদের এখানে দর্শন হয়েছে। ঠাকুর যে আমাদের নিয়ে যাবেন, সেটাও তিনি কারণ জগতে নিয়ে যাবেন না, মহাকারণে তো কোন মতেই না, সূক্ষ্ম জগতেই নিয়ে যাবেন। সূক্ষ্ম জগতে কিছু দিন থাকার পর আবার এখানে ঘুরে আসবে। কত দিনের জন্য এই আসা-যাওয়া চলবে? যতদিন না অন্য কোন অবতার আসছেন।

মূল কথা হল এটাই, এখানেই তুমি ধ্যান জপ কর, তপস্যা কর; করার পর দেখ তোমার কি কি যোগশক্তি এসেছে, এবার তুমি আন্দাজ কর, ওই যোগশক্তি সূক্ষ্ম জগতে কাদের কাদের থাকে, তাহলে বুঝে যাবে মৃত্যুর পর তুমি কোথায় যাবে। মোটামুটি হলে মৃত্যুর পর ভূত প্রেতেদের লোক, খুব হলে পিতৃদের লোক, যেখানে একটু সুখটুক পাওয়া যায়। কতটা সুখ? এখানে যেটা পাচ্ছিলে, তার থেকে একটু বেশি। দেবলোকে যাওয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই; আর দেবলোকের উপরে ঋষিদের লোক, সিদ্ধলোক, সপ্তর্ষিলোকে যাওয়ার কথা ভুলে যাও। শেষ হল কারণ লোক, যেখানে ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ দেখা যায়, সেটা যার হবে, তার এখানেই হয়ে যাবে। শ্রীশ্রীমা বলছেন, খোলা চোখে ঈশ্বরকে কে দেখেছে? এক ঠাকুর দেখেছেন আর নরেন দেখেছে। কারণ, কারণ জগতেই একমাত্র খোলা চোখে ঈশ্বরকে দেখা যায়। কঠোপনিষদে এর খুব সুন্দর বর্ণনা আছে, *যথাদর্শে তথাত্মনি*, বুদ্ধিতে যে দর্শন হয়, আয়নাতে যেমন দেখায় সেই রকম ছবির মত স্পষ্ট। পিতৃলোকে স্বপ্নে যেমন দেখা যায় সেই রকম, আবছা আবছা। গন্ধর্বলোকে জলে যেমন ছায়া দেখা যায়। সব শেষে বলছেন, *ছায়াতপৌরিব ব্রহ্মলোকে*, ব্রহ্মলোকে আলো আর ছায়া, একবারে পরিষ্কার। কিন্তু আত্মার জ্ঞান সেখানে আলো ছায়াতেই থাকে। পরিষ্কার বলছেন, স্থূল জগতে কিভাবে দেখবে, গন্ধর্বলোকে বা দেবলোকে ও ব্রহ্মলোকে কিভাবে দেখবে। কিন্তু যাদের ক্ষমতা আছে, তাদের এখানেই সেই ক্ষমতা এসে যায়।

ব্রহ্মাণ্ড ও তার শক্তি

আমরা যখন universal energyর কথা বলি, তখন কারণ জগৎ, সূক্ষ্ম জগৎ, স্থূল জগৎ, যাবতীয় যা কিছু আছে, তা সে যে জগতেরই হোক, সবটাই কিন্তু চলছে শক্তিতে। এই যে sum total of energy, এই universal energy, আমাদের এখানে এনার্জি বলতে যেখানে $E=MC^2$ দিয়ে এনার্জি আর ম্যাটার চলে, এভাবে চলে না। সূক্ষ্ম জগতে এনার্জি আরও সূক্ষ্ম হয়ে যায়, সেখানে ম্যাটার রূপে আর থাকে না, এনার্জি এনার্জি ফর্মে থাকে। আরও উপরে গেলে এনার্জি সেখানে মনের এনার্জি হয়ে যায়। কি রকম এনার্জি

হয়ে যায়? কারণ জগতে যিনি আছেন তাঁর সমান, অর্থাৎ ব্রহ্মার সমান সমান হয়ে গেলেন। তিনি তখন ইচ্ছা করলেই একটা জগৎ সৃষ্টি করে দিতে পারবেন। আমরা আমাদের ঘুমটাকেও নিজের ইচ্ছা মত চালাতে পারছি না, এক টুকরো মাংস বেশি খেয়ে নিলে হজম করতে পারি না, হজম করার ক্ষমতা নেই আর আমরা কিনা বলছি কারণ জগতে যাব! সেইজন্য মানব জীবনের এত দাম। ঠাকুর বলছেন, কিছুই না পারলে, দুবেলা হাততালি দিয়ে হরিনাম করবে। ঈশ্বরের নাম করলে ভিতরে শক্তি আসতে শুরু হয়ে যাবে।

স্বামীজী যখন এখানে বলছেন, Shaktas worship the Universal Energy as Mother, স্বামীজী বলতে চাইছেন যে, universal energy বলতে স্টিফেন হকিংএর এনার্জি নয়, বেদান্তের যে ইউনিভার্স, তার এনার্জি। বেদান্তের ইউনিভার্স মানে যেখানে সমস্ত স্থূল জগৎ রয়েছে, যেখানে সূক্ষ্ম জগৎ রয়েছে, যেখানে কারণ জগৎ রয়েছে। মহাকারণ কোন জগৎ নয়, মহাকারণ মানে সচ্চিদানন্দ। ওই মহাকারণ যখন এনার্জি ফর্মে এসে যায়, pure existence যখন এনার্জি ফর্মে এসে যান, তখন প্রথম আসে কারণ জগৎ, সেখান থেকে ধীরে ধীরে সূক্ষ্ম জগৎ আসে, সেখান থেকে আরও পরে স্থূল জগতের আবির্ভাব হয়। স্থূল থেকে আরও স্থূল আছে কিনা আমাদের জানা নেই, কারণ ইন্দ্রিয় দিয়ে আমরা যতটুকু জানতে পারছি, শাস্ত্র দিয়ে যতটুকু জানতে পারছি, তাতে আমরা এই তিন জগতের কথা পাই।

এই যে Divine energy, এটাকে ভক্তরা বলছে, the sweetest name they know; for the mother is the highest ideal of womanhood in India, এই দিব্য শক্তিকে আমরা যে কোন নামে বলতে পারি, কিন্তু শাক্তরা, শক্তির উপাসকরা মা বলে সম্বোধন করে। কারণ মা ডাকের মধ্যে একটা মধুর ভাব, মিষ্টি ভাব রয়েছে, একটা মাধুর্য রয়েছে। এই যে sum total of Divine energy, রামপ্রসাদ তাঁর গানে বলছেন কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড তাঁর উদরে। এর মানেটা কি? এই যে স্থূল জগৎ, সূক্ষ্ম জগৎ, কারণ জগতের কথা বলা হল, কিছু দিন আগে পর্যন্ত আমরা ভাবতাম, আমরা আছি, উপরে আকাশ গঙ্গা আছে, সূর্যটাও ওর মধ্যে আছে, এখান থেকে দেখা যাচ্ছে কত গ্যালাক্সি আছে তার হিসাব কেউ করতে পারছে না। তারপর বলছেন ক্লাস্টারস্, সেটা আরও বলা যায় না, তারপরে বলছেন এর বাইরে কি আছে আদৌ বলা সম্ভব ন। কিন্তু এগুলো সবই হল একটা ব্রহ্মাণ্ড। কোন ব্রহ্মাণ্ড? এরপর যদি কল্পনা করা যায় একটা সূক্ষ্ম জগৎ আছে, যেটা এটাকে ছেয়ে আছে, এর ভিতরে আছে। সূক্ষ্ম জগৎ তো একটা জগৎকে জন্ম দেবে না, আরও কত জগৎ আছে ভগবান জানেন। সেখানে ফিজিক্সের কি নিয়ম চলছে, কেমিস্ট্রির কি নিয়ম চলছে, আমরা কি জানব! এতটুকু আমরা জানি, ওই ব্রহ্মাণ্ড এই ব্রহ্মাণ্ডে কোন দিন ঢুকতে পারবে না। কারণ ঢোকার জন্য আগে ব্রহ্মাণ্ড থেকে সূক্ষ্ম জগতে ঢুকতে হবে, সূক্ষ্ম জগৎ থেকে এসে আবার এই ব্রহ্মাণ্ডে ঢুকতে হবে, যেটা বাস্তবে কখনই সম্ভব নয়। যখন আমরা এ্যলিয়ন বলছি, আমরা মনে করছি এই প্ল্যানেট, এই গ্যালাক্সি লোকের কথা। ব্রহ্মাণ্ডকে আমরা যে অর্থে স্থূল ব্রহ্মাণ্ড বলে মনে করি, ওই সূক্ষ্ম জগতে কত ব্রহ্মাণ্ড আছে আমরা জানি না। সূক্ষ্ম জগৎ সূক্ষ্ম জগৎ রূপে দেবলোক, পিতৃলোক, সেটা আলাদা, সেটা ব্রহ্মাণ্ড নয়। যখন বলছেন, মায়ের উদরে কত ব্রহ্মাণ্ড জন্ম নিচ্ছে, কত কোটি ব্রহ্মাণ্ড লয় হচ্ছে, universal energy বলতে এইটা।

আগেকার দিনে যেভাবে বেদান্ত পড়ানো হত, সেটা খুব complicated system ছিল। প্রথমে ব্যাকরণ পড়িয়ে দেওয়া হত, যাতে সব বুঝতে পারে, তারপর ন্যায় পড়ানো হত, এরপর প্রকরণ গ্রন্থ পড়তে হত। প্রকরণ গ্রন্থ যেমন বেদান্তসার, বিবেকচূড়ামণি, পঞ্চদশী, অন্য দিকে বেদ পুরোটাই পড়ানো হত এবং মুখস্ত করে যেতে হত। এরপর জগৎকে নিয়ে একটা সামগ্রিক জ্ঞান দিয়ে দেওয়া হত। জগৎকে না জানলে একটা কিছু যে করবে, সেটা সম্ভব না। যেমন নল-দময়ন্তীর কাহিনী বা ইদানিং কালে পদ্মাবতী সিনেমাকে নিয়ে প্রচুর বিতর্ক হয়েছে, কারুর মনকে চিন্তা করতে হলে ওর ব্যাপারটা আগে জানতে হবে।

হিন্দীতে একটা খুব সুন্দর কাহিনী আছে। কাহিনীতে একজন ম্যাগাজিনের এডিটর আছেন। সেই এডিটরের কাছে একজন মহিলা একটা কাহিনী রচনা করে পাঠিয়েছে। মহিলার নামটা পড়েই ভদ্রলোক মহিলার প্রেমে পড়ে গেছেন। এরপর দুজনের মধ্যে চিঠির আদান-প্রদান চলতে লাগল, এত চিঠি চালাচালির মধ্যে ভদ্রলোক ছটফট করছেন, একবার আপনাকে দেখতে চাই। মহিলার কাহিনীটা আবার একেবারে নিকৃষ্ট মানের রচনা। উনি আবার এডিট করে ভাল করে সাজিয়ে দিয়েছেন। সব কিছু হয়ে যাওয়ার পর লেখাটা এবার প্রেসে

যাবে, সেই সময় ওই মহিলা ঢুকেছেন, কালো মোটাসোটা চেহারার। মহিলাকে দেখে ভদ্রলোক তো একেবারে ভেঙে পড়েছেন। মহিলাকে চা টা খাইয়ে বিদায় করে তাড়াতাড়ি প্রেসরুমে গিয়ে বলে দিলেন, লেখাটা আটকাও। প্রেসের লোকেরা বলছে, ওটার ছাপা শুরু হয়ে গেছে। শুরু হোক আর যাই হোক, আগে ওটা আটকাও।

আমাদের ঠিক এই সমস্যা হয়, আমি দীক্ষা নিয়েছি ঠিকই, সাধন ভজন করে একটা উচ্চ জীবন-যাপন করার ইচ্ছা আছে ঠিকই। কিন্তু আমরা জগৎকে জানি না। মুণ্ডকোপনিষদে খুব সুন্দর বলছেন, *পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান ব্রাহ্মণো*, এই যে তিনটে লোক, স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল এটাকে ভাল করে বিচার করে দেখ তুমি কোথায় ফিট্ করছ, তোমার যোগ্য জায়গা কোনটা, তারপরে তুমি এগোতে পারবে। জীবনে আমরা যত সাধু সন্ন্যাসী, সাধকদের জীবন দেখি, তাঁরা অনেকেই এদিক সেদিক ফেঁসে যায়, এর প্রধান কারণ তারা কেউই জীবনকে দেখেনি। বেশি ফাঁসে কম বয়সে যাঁরা সন্ন্যাসী হয়ে চলে আসেন, কারণ জগৎকে সেভাবে ভাল করে দেখার সুযোগ পায়নি। আমরা যে এতক্ষণ universal energyকে নিয়ে আলোচনা করলাম, এখানে একটা আইডিয়া দেওয়া হল, জগৎটা এই রকম। মঠে নূতন কেউ জয়েন করতে এলে তখনকার মহারাজরা জিজ্ঞেস করতেন, 'ভগবান যদি তোমাকে ইংল্যাণ্ডের রাজা কিং জর্জের মত করতে চান, তখন তুমি সেটাকে নেবে নাকি এই রকম এক কাঙালী সন্ন্যাসী হয়ে থাকবে? ভাল করে বিচার করে দেখ'। খুব স্নেহ করেই বলা হত, কারণ কেউ সন্ন্যাসী হয়ে মঠে এলে সবাই খুশীই হন। সবাই সঙ্গে সঙ্গে বিচার করে বলে দেয়, 'কোন দিন আমি কিং জর্জ হতে চাইব না, সন্ন্যাসী হয়েই থাকতে চাই'। শুনে মহারাজ খুব খুশি হয়ে যান। দশ বারো বছর পরে মনে হয়, আমি তো জানিই না কিং জর্জ কে। সবাই বলে, আমি স্বর্গ সুখ চাই না, ইন্দ্রপদ চাই না। স্বর্গ সুখ, ইন্দ্রপদের কোন আইডিয়া এদের আছে? তরকারিতে নুন একটু বেশি কম হলে মারামারি হয়ে যায়, এরা নাকি বলে আমি ইন্দ্রপদ ত্যাগ করব।

এতক্ষণ আমরা আলোচনা করলাম, বর্তমান ফিজিক্স, যাঁরা কসমোলজি নিয়ে কথা বলেন, তাঁদের কাছে এনার্জি হল, পুরো ইউনিভার্সকে এক জায়গায় নিয়ে আসার পর তার যে এনার্জি হবে, আইনস্টাইন থেকে শুরু করে স্টিফেন হকিং পর্যন্ত যত বড় বড় বিজ্ঞানীরা আছেন, তাঁদের কাছে এটাই ইউনিভার্সাল এনার্জি, এবং এই এনার্জিই তাঁদের কাছে শেষ কথা। কিন্তু আমাদের কাছে ইউনিভারসাল এনার্জি হল, ঈশ্বর যখন সৃষ্টি করেন তখন তিনি যে এনার্জির সাহায্যে সৃষ্টি করেন, স্বামীজী যেখানে খুব সহজ ভাবে আকাশ ও প্রাণের ধারণা নিয়ে এলেন। সমস্ত প্রাণকে মিলিয়েই ইউনিভার্সাল এনার্জি বলা হচ্ছে। বেদের নাসদীয় সূক্তমে বর্ণনা আছে, প্রাণ যখন প্রাণের উপর আঘাত করতে শুরু করে, সেখান থেকে খুব সূক্ষ্ম ভূতের জন্ম নেয়, সেটাকে বলছেন আকাশ। আকাশ থেকে অন্যান্য ভূতের জন্ম হয়, সেখান থেকে আবার ইলেক্ট্রন, প্রোটন হয়ে এ্যটম বেরোয়। আর সবটাই তিনটে অবস্থায় থাকে – স্থূল, যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি; সূক্ষ্ম, যেখানে জিনিসটা আরও বেশি সূক্ষ্ম হয়ে যায়, মৃত্যুর পর মানুষ সাধারণত যে লোকগুলিতে যায়, সেগুলো সূক্ষ্ম। এরপর হল কারণ জগৎ, মনের শক্তি, যে শক্তি থেকে বাকি শক্তিগুলি বেরিয়েছে, কারণ জগৎ সেই শক্তির রাজ্য। স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ, এই তিনটের যে অবস্থা, যে তিনটেকে নিয়ে যে জগৎ, এর যে sum total energy, আমাদের কাছে সেটাই হল ইউনিভার্সাল এনার্জি। স্বামীজী বলছেন এই universal energyকে মাতৃরূপে আস্বাদ করার জন্যই মায়ের আরাধণা করা হয়।

স্বামীজী আরও বলছেন, mother is the highest ideal of womanhood in India. (*ভারতে মাতাই নারী-চরিত্রের সর্বোচ্চ আদর্শ।*) যে কোন পুরুষকে, যে কোন মেয়েকে অনেকগুলো পরিবর্তনের মাঝখান দিয়ে যেতে হয়। একটা বাচ্চা ছেলে, পাঁচ বছর বয়সে ব্রহ্মচারী হল, বড় হল, গৃহস্থ হল, বাণপ্রস্থী হল, সন্ন্যাসী হল, মাঝখান থেকে চাকরি করতে গিয়ে রাজা হল, এই হল, সেই হল। ভারতে মেয়েদেরও এই রকম অনেক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। প্রথম ছোট খুকী, বাচ্চা মেয়ে, যাকে ভারতের বেশির ভাগ রাজ্যে মা বলে সম্বোধন করা হয়, সেখান থেকে সে যুবতী হয়, তারপর একজন স্ত্রী হয়ে সংসারে প্রবেশ করে এবং এরপর সে মা হয়, মা থেকে ঠাকুরমা, দিদিমা হয়। ঠাকুরমা, দিদিমা বা জ্যাঠীমা, কাকিমা, মাসিমা যে বলা হচ্ছে, 'মা' এই মধুর শব্দটা কিন্তু সবার ক্ষেত্রে জুড়ে আছে। স্বামীজী এর উপর প্রচুর জোর দিয়ে বলছেন, আমাদের কাছে

নারীর আদর্শ হল মা। আজকের দিনে এই কথাগুলি বললে অনেকে নারীদের থেকে আপত্তি আসবে। এটা খুবই সাধারণ যে, একজন মেয়ে যদি খুব রূপসী হয়, তাকে সবাই প্রশংসা করবে, সেই মেয়েই যখন মা হয়ে যায়, তখন তাকে সম্মান করা হয়। শুধু বাড়ির লোকেরাই না, সমাজের লোকেরাও তাকে সম্মান করবে, ভারতবর্ষে এই রেওয়াজ এখনও আছে। বিদেশের যে লেখাগুলো আসে, সেখানেও তারা বলছে, motherhood, এর মত আনন্দ, এর মত একটা sense of fulfillment আর কিছুতে হয় না। ভারতবর্ষে যতগুলো relation আছে, রাজার প্রতি relation, ছেলের প্রতি relation, বাচ্চা মেয়ের প্রতি relation, নারীর প্রতি relation, এর মধ্যে sweetest relation হল মা। এর উপর এখনও খুব সুন্দর সুন্দর লেখা বেরোয়। একজন বলছেন, একজন ভারতীয় নারী, তার নিজের বাড়িতে হয়ত বিরাট সম্মান ছিল, মেয়েকে সব বাড়িতেই সম্মান দেয়, কারণ সবাই জানে কিছু দিন পর আমার মেয়েকে অন্যের বাড়ি চলে যেতে হবে। নিজের বাড়ি থেকে বিয়ের পর স্বামীর বাড়ি এসেছে, প্রথম কয়েক দিন হয়ত খুব সম্মান পাবে, কিন্তু কিছু দিন যেতে না যেতেই তার উপর অত্যাচার শুরু হয়ে যায়। শাশুড়ির অত্যাচার, ননদের অত্যাচার, স্বামীর অবহেলা, সব দিক দিয়ে সবাই নানান ভাবে পীড়ন করতে থাকবে। প্রেমচাঁদের কাহিনীতে এই ধরণের প্রচুর বর্ণনা পাওয়া যাবে। নারী সবটাই সহ্য করে নেয়। এরপর সে মা হল, এই নারী, যে কোন দিন মুখ খোলেনি, সন্তানের জন্য এখনও সব সহ্য করে যাবে, কিন্তু নিজের সন্তানের উপর যদি কোন আঘাত এসে যায়, তখন তার রণচণ্ডী রূপ বেরিয়ে আসে। এটা কিন্তু animal instinct নয়। যে কোন পশুকে অত্যাচার করলে সে একটা প্রতিরোধ করার জন্য পাল্টা আক্রমণ করে খ্যাঁক করে উঠবে, কিন্তু আমাদের ভারতীয় পরম্পরাতে আগেকার দিনে মেয়েরা কখনই খ্যাঁক করে উঠত না। এমনকি, ছেলে হয়ত কিছু অন্যায় করেছে, বাবা বা জ্যাঠা কিংবা কাকা তাকে একটা শাস্তি দিতে যাচ্ছে, মা তখন তাকে যেভাবেই হোক বাঁচিয়ে দেবে। দিনকাল অবশ্য এখন অনেক পাল্টে গেছে। শাস্তি দেওয়া এখন বন্ধ হয়ে গেছে, আর পরিবারও এখন ছোট ছোট হয়ে গেছে। কিন্তু আমরা এখানে স্বামীজীর কথা পড়ছি, এগুলো তাই অনেক আগেকার কথা। কোন নারীর সম্মান মাতৃরূপে, তাঁর পূজা যখন হয় মাতৃরূপেই পূজা হয়, ভারতে কোন সুন্দরীর পূজা হয় না। যার জন্য দেখা যায়, আমাদের পৌরাণিক কাহিনীগুলিতে এত অপ্সরারা আছে, এত সুন্দরী, রূপসী নারী আছে, কিন্তু কোথাও তাদের পূজা হয় না, পূজা হয় একমাত্র মায়ের।

দক্ষিণাচার ও বামাচার

ইউনিভার্সাল এনার্জি থেকে এই যে সৃষ্টি, আর জগতে নারী থেকে সন্তানের জন্ম, সেখান থেকে তার যে মাতৃত্ব, এই মাতৃত্বের মধ্যে মাধুর্য্য, মধুর একটা সম্পর্ক জড়িয়ে আছে, সেই মাধুর্যতাকে আস্বাদ করার জন্য শাক্তরা ইউনিভার্সাল এনার্জিকে বলেন ‘মা’। স্বামীজী বলছেন, When God is worshipped as ‘Mother,’ as Love, the Hindus call it the ‘right-handed’ way, and it leads to spirituality but never to material prosperity. (*ভগবানকে মাতৃরূপে, প্রেমের উচ্চতম বিকাশরূপে পূজা করাকে হিন্দুরা দক্ষিণাচার বা দক্ষিণমার্গ বলেন, ঐ উপাসনায় আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়, মুক্তি হয় –এর দ্বারা ঐহিক উন্নতি হয় না।*) তন্ত্রে বলা হয়, এই যে ইউনিভার্সাল এনার্জি, যেটা creative force, যে force দিয়ে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ তিনটে জগৎ বেরিয়ে আসছে; যতক্ষণ মানুষ এই ইউনিভার্সাল এনার্জিকে অতিক্রম করতে না পারছে, ততক্ষণ কিন্তু সে সচ্চিদানন্দের কাছে পৌঁছাতে পারবে না, একটু আগে আমরা যেটাকে নিয়ে আলোচনা করলাম। ঈশ্বরের কাছে পৌঁছান মানেই এই ইউনিভার্সাল এনার্জিকে পেরিয়ে যাওয়া। আমাদের গানে, লেখায়, বইতে এই ভাবকে খুব ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তা হল ‘ভবসাগরের পারে’ বা ‘ভবসাগরের পারে যাওয়া’। ভবসাগরের পারে যাওয়া মানেই এই ইউনিভার্সাল এনার্জির পারে যাওয়া। কিন্তু ইউনিভার্সাল এনার্জি কখনই চায় না যে কেউ তাঁকে অতিক্রম করে যাক, কাউকেই তাঁকে অতিক্রম করে যেতে দেবেন না। এনার্জি মানেই, সে সবাইকে ধাক্কা মারবে। স্থূল থেকে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম থেকে কারণ, যদিও কারণ জগৎ থেকে সহজে আর নামিয়ে আনা যাবে না, কিন্তু মোটামুটি সূক্ষ্ম জগতে এত বেশি layers রয়েছে যে, ধাক্কা মেরে মেরে স্থূল আর সূক্ষ্মের ওই layersএর মধ্যেই ঘুর ঘুর করাবে। ইউনিভার্সাল এনার্জি হল সেই এলাকা, যে এলাকায় তুমি যত যাই কর, কোথাও তুমি স্থির থাকতে পারবে না। এটাকে যিনি বুঝে নেন, তাঁর কাছে তখন এটাই সত্য হয়ে যায় – *অনিত্যমসুখম্ লোকমিমং* – এই লোকে যত সুখই আসুক সব সুখ অনিত্য,

সুখকে ছাড়তে হবে। যখন কোন সাধক বলেন, আমার আর এসব লাগবে না, উনি তখন স্তব করতে শুরু করেন, সাধনা করতে শুরু করেন, এই ইউনিভার্সাল এনার্জিকে তখন মাতৃরূপে পূজা করতে শুরু করেন।

ইউনিভার্সাল এনার্জিকে মাতৃরূপে পূজা করাকে শক্তি সাধনার দিকে নিয়ে গেলে, যেটাকে আমরা তন্ত্র সাধনা বলছি, এটাই তখন হয়ে যায় দক্ষিণাচার বা দক্ষিণমার্গ। এই দক্ষিণাচার কি করে? It leads to spirituality but never to material prosperity। মাতৃরূপে যখন পূজা করা হয় তখন তিনি তাঁর ভক্ত বা সাধককে আধ্যাত্মিক জ্ঞান দেন, কিন্তু জাগতিক ভালটা দেন না। তন্ত্রে যে বীজমন্ত্র গুলি আছে, যেমন হ্রীং, হ্রীং হল মায়াশক্তির বীজ, হ্রীং এর জপ করা মানে সে বিদ্যাশক্তি, মায়াশক্তিকে প্রণাম করছে, মা তোমার যে এলাকা, এই এলাকার পারে নিয়ে যাও। তন্ত্র মত মানে, সাধক যেমন সঙ্কল্প নেবে সিদ্ধি তার সেই সঙ্কল্প অনুসারেই হবে। হ্রীং বীজমন্ত্রের সঙ্কল্প মানে আমি মায়ার পারে যেতে চাই। এইভাবে শ্রীং, ক্লীং নানান রকমের বীজমন্ত্র আছে। এগুলো সবই বিভিন্ন রকমের বিদ্যা। কিন্তু অন্যান্য যে বীজ আছে সেই বীজ জাগতিক শক্তি অর্জন ও জাগতিক সুখ সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যায়।

এরপরেই স্বামীজী বলছেন, When God is worshipped on His terrible side, that is, in the 'left-handed' way. (*তাঁর ভীষণ রূপের –রুদ্রমূর্তির উপাসনাকে 'বামাচার' বা 'বামমার্গ বলে।*) এখানে দেখার বিষয় হল, 'God'কে 'His' বলে সম্বোধন করছেন। এখানে God, Universal Energy, Divine Mother, সব কিন্তু এক সঙ্গে inter-changeable চলছে। যিনি ঈশ্বর, তিনি ইউনিভার্সাল এনার্জি, এই জাগতিক এনার্জি না, সম্পূর্ণ রূপে ইউনিভার্সাল এনার্জি, আর সেই ইউনিভার্সাল এনার্জি, যিনি ভগবান, তাঁকে মাতৃরূপে উপাসনা করছেন। তিনি যখন নিষ্ক্রিয়, সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কিছুই যখন নেই, তখন তিনি অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। সক্রিয় যখন, তিনি তখন এনার্জি রূপে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হয়ে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ রূপে ভাসছেন। এই এনার্জিকে মাতৃরূপে পূজা করে মায়ার পারে চলে যাওয়া যায়। এই মাতৃরূপকেই যখন ভয়ঙ্করী রূপে পূজা করা হয়, তখন তাকে বামাচার বলছেন। তিব্বতের কালচার নিয়ে আলোচনা করার সময় স্বামীজী তিব্বতীদের এই ভয়ঙ্করী রূপের পূজার কথাই বলছেন, যেটাকে এখানে বামাচার বলছেন।

এবার সেটাকে নিয়ে বলছেন, it leads usually to great material prosperity, but rarely to spirituality. (*সাধারণতঃ এতে সাংসারিক উন্নতি খুব হয়ে থাকে, কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতি বড় একটা হয় না।*) এই যে ইউনিভার্সাল এনার্জির কথা বলা হল, এই এনার্জিকে যখন এক ভয়ঙ্করী রূপে পূজা করা হয়, যেটাকে বলছেন বামাচার, এই বামাচারের প্রথানুযায়ী যে তপস্যা করছে, ভিতরে যে শক্তি আছে সেটাকে এই তপস্যার দ্বারা তাপ দিয়ে তপ্ত করে দেওয়া হল, ফলস্বরূপ এবার সে ওখান থেকে ফল পেতে শুরু করবে। আগে আমরা বললাম, এই তাপ দুই প্রকার, এই তাপ দ্বারা আমি জগৎ থেকে কিছু পেতে চাই, আরেকটা হয়, আমি জগৎ থেকে কিছু পেতে চাই না, আমি জগৎ থেকে বেরিয়ে আসতে চাই। বেরিয়ে যাওয়ার জন্য সে মাতৃরূপে ওই ইউনিভার্সাল এনার্জির আরাধনা করে, তখন সেই আরাধনাকে বলছেন, দক্ষিণাচার। এই আরাধনারই যখন উদ্দেশ্য হয় শক্তি অর্জন করে জগৎ থেকে ভোগ করা, তখন সেটাকেই বলছেন বামাচার। এটাকে কেন্দ্র করে তন্ত্রে অনেকগুলো কাহিনী আছে। বিশেষ করে তিব্বতে তারা আদি দেবীকে নিয়ে তন্ত্র সাধনা করত, তাতে মারণ, উচাটন, বশীকরণ এগুলো বেশি করত। এটা খুবই নিন্দনীয় পথ, এতে অনেক ক্ষতি হয়, যার উপর করছে তার যেমন ক্ষতি হয়, আর যে করছে তার তো আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়ই না, উপরন্তু ঘুরে নিজের উপর এসে ক্ষতি করে। স্বামীজী এটাকেই বলছেন, and eventually it leads to degeneration and the obliteration of the race that practises it, (*কালে ঐ থেকে অবনতি এসে থাকে, আর যারা ঐ সাধন করে, সেই জাতির একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়।*) যদি কোন সম্প্রদায় বা জাতি বামাচার সাধনা করে, তখন থেকেই তার অবনতি হওয়া শুরু হয়ে যায়, আর অন্তিমে ক্ষমতা যেটা এসেছিল সেটাও চলে যায়; শুধু যে চলে যায় তা না, জাতিটাকেই ধ্বংস করে দিয়ে বেরিয়ে যায়।

তিব্বতের একটা নামকরা ঘটনা আছে। মালেরাপ্পা নামে একজন তিব্বতী তন্ত্রের যোগীকে নিয়ে ঘটনা। মালেরাপ্পা তিব্বতের কোন গ্রামে খুব গরীব ঘরে জন্ম নেয়। তার মায়ের উপর ওখানকার জমিদাররা এক সময় খুব অত্যাচার করেছিল। মহিলাটি মালেরাপ্পাকে বাচ্চা বয়স থেকে তাতিয়ে যাচ্ছে, আমার উপর এই

অত্যাচারের বদলা নিতে হবে। মালেরাপ্পা গ্রাম ছেড়ে চলে যায় তন্ত্র বিদ্যা শিখতে। অনেক বছর পর ছেলে তন্ত্র বিদ্যায় অনেক কিছু মারণ উচাটন শিখে গ্রামে ফিরে এসেছে। সেই সময়, গ্রামের ওই জমিদারের বাড়িতে একটা বিয়ের অনুষ্ঠান হচ্ছিল। অনুষ্ঠানে প্রচুর লোকজন এসেছে, উৎসব চলছে। মা ছেলেকে তাতাচ্ছে, এই হল উপযুক্ত সময়, এবার তুমি তোমার বিদ্যাটা কাজে লাগাও, তোমার মারণ মন্ত্রটা নাও। মালেরাপ্পা মাকে খুব ভালবাসে, মায়ের কথা মত সেও মারণ মন্ত্র মেরেছে। বিয়ে বাড়ির অনুষ্ঠানে যে শামিয়ানা করেছিল, সেটাতে আগুন লেগে গেছে। আগুনে প্রচুর লোক অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যাওয়ার পর মা বুকে শান্তি পেল। এরপর থেকে গ্রামের লোকেরা সবাই ওই মহিলাকে দেখলেই আতঙ্কে পালায়, ভয়ে তার কাছে কেউ ঘেষতে চায় না, কেউ কথা বলে না। ইতিমধ্যে এই ঘটনার পর মালেরাপ্পার মনে খুব আত্মগ্লানি হতে শুরু হয়। প্রচণ্ড আত্মগ্লানি নিয়ে একদিন মাকে না বলে, কাউকে কিছু না জানিয়ে মালেরাপ্পা গ্রাম ছেড়ে চলে যায়। গ্রাম ছেড়ে সে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর কাছে আশ্রয় নেয়। তিনি মালেরাপ্পাকে সাধনা করিয়ে করিয়ে শুদ্ধ করেন।

এখানে দুটো জিনিস আসছে, প্রথমটা হল, তন্ত্র সাধনা করে কিভাবে মানুষের ক্ষতি করা যায়, আর সেটা কিভাবে নিজের উপর ঘুরে আসে। যার ফলে ইতিমধ্যে তার মা পাগল হয়ে গেল, কেউ তার খোঁজ নেয় না, একা একা থাকতে থাকতে একটা সময় মহিলা মরেই গেল। অন্য দিকে ভিতরে গ্লানি নিয়ে মালেরাপ্পা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে সাধনা করে করে তার সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে গেল ঠিকই, কিন্তু বৌদ্ধদের এই একটা সমস্যা, বৌদ্ধরা নিজেদের মতকে শ্রেষ্ঠ করার জন্য যখনই কোন তাদের সফলতম চরিত্র পায়, তখনই তারা প্রথমে দেখাবে, এ আগে অত্যন্ত নিকৃষ্ট ছিল। সম্রাট অশোকের যে চরিত্র, তাকে কলিঙ্গতে নিয়ে গিয়ে প্রচুর হিংসা, হত্যা করিয়ে তারপর বৌদ্ধ বানাল। দেখানো যে, লোকটা এত হিংস্র ছিল, কিন্তু আমাদের কাছে এসে ওর পরিবর্তন হয়ে গেছে। ওরা রামচন্দ্রকেও ছাড়েনি, অদ্ভূত রামায়ণে দেখাচ্ছে, রামচন্দ্রকে বিয়ে করিয়ে দিয়েছে সীতার সাথে, যে সীতা নাকি দশরথের অবৈধ সন্তান। অপরকে ছোট করে নিজেকে বড় করা, ধর্মের এই স্বভাব একটা আছে। কিন্তু আজকে এটাই আশ্চর্য লাগে ভাবতে যে, চীন আজ তিব্বতকে দখল করে রেখেছে, বলছে আমরা এদের মানুষ করছি। তিব্বতের একজন নেতা, তিনি নিজেও একজন বৌদ্ধ, খুব দুঃখ করে এক জায়গায় তিনি বলছেন, এক সময় তিব্বত চীনে গিয়ে খুব অত্যাচার করেছিল, তারই পরিণতি স্বরূপ আজকে আমাদের উপর ওদের অত্যাচার নিপীড়ণ সহ্য করতে হচ্ছে। তবে তিব্বতে যে এখনও বামাচার আছে এতে কোন সন্দেহ নেই। আর এই মালেরাপ্পার মত কাহিনী একটু কান পাতলে তিব্বতে প্রচুর শোনা যাবে। তন্ত্রের মারণ উচাটনে অন্যের ক্ষতিসাধন করার যেমন বর্ণনা আছে, তেমনি এর প্রভাব ঘুরে নিজেদের উপর আসে, তারও বর্ণনা আছে।

স্বামীজী ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে বলেছেন, সেই জাতিটাই মুছে যায়। ১৯৫০ সালের পর চীন তিব্বতে ঢুকতে শুরু করল, তারপর দালাই লামাকে পালিয়ে আসতে হল। বেশির ভাগ তিব্বতী বৌদ্ধরা পালিয়ে এখন ভারতবর্ষে আশ্রয় নিয়ে আছে। যদি আমরা ঠিক ঠিক স্বামীজীর এই কথা দিয়ে যাই, তাহলে বলতে হবে, কবে একটা পুরো সমাজ শুধু তন্ত্র সাধনার উপর বেশি জোর দিয়েছিল, শুধু তন্ত্র আর তন্ত্র, তন্ত্রের সাথে মারণমোহন উচাটান, কি আশ্চর্য যে, আজ সেই সমাজ ও জাতিটা কিভাবে শেষ হয়ে গেল। স্বামীজী খুব খোলা মনের মানুষ ছিলেন, কোন দিন মিথ্যা কথা বলতেন না, ঠাকুরের নামে স্বামীজী বলছেন, ঠাকুর কোন দিন কারুর নিন্দা করতেন না। স্বামীজী সন্ন্যাসীদের জন্য যে নিয়মাবলী করে দিয়ে গেছেন, সেটাও খুব খোলা। কিন্তু সেখানে এই একটা জিনিসেরই নিষেধ আছে, তা হল, বামাচার, একেবারে নিষিদ্ধ। পরিষ্কার লিখে দিয়ে গেছেন, কেউ যদি বামাচারকে সাধনা রূপে আনতে চায়, তাকে সঙ্ঘ থেকে বার করে দেবে। ইউনিভার্সাল এনার্জিকে যদি পূজা করতে হয়, ইউনিভার্সাল এনার্জির যদি সাধনা করতে হয়, তাঁকে মাতৃরূপেই সাধনা করতে হবে।

উপরে আলোচনার পর অনেকের মনে হতে পারে যে, ঈশ্বর আর তাঁর শক্তি এক, যদি এক হয়ে থাকে তাহলে শক্তির এলাকাকে পেরিয়ে যাওয়া মানে ঈশ্বরের এলাকাকে পেরিয়ে যাওয়া। আমরা কিন্তু কখন বলছি না যে ঈশ্বর আর তাঁর শক্তি এক। সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কে বেদান্ত দর্শনে, শাক্ত মতে বা এই রকম অন্যান্য যত মত বা দর্শন রয়েছে, সেই সব মতে বিভিন্ন ভাবে দেখা হয়। বেদান্ত দেখে এই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের যে এলাকা এটাই মায়ার রাজ্য, বেদান্তীরা বলেন আমরা মায়ার পারে যাব। কিন্তু শাক্ত বা ভক্তরা বলেন, ওই

মায়াটা কার? মায়াটা ঈশ্বরেরই, কিন্তু ঈশ্বর মায়া নন। ঠিক তেমনি এটা আবার ঈশ্বরীয় শক্তি। ঠাকুর আরও সহজ করে বলছেন, বাবু আর তার বাগান, বাগান বাবুরই বিস্তার, কিন্তু বাবু সব জায়গায় থাকেন না। বাবুকে বৈঠকখানায় পাওয়া যায়। একদিকে বাবুরই বাগান, আবার অন্য দিকে বাবু আর বাগান আলাদা। ঠাকুর বলছেন, বাবুর কাছে যদি একবার পৌঁছান যায় তখন বাবুর বাগান, তাঁর কোম্পানির কাগজ সবই জানা যায়। জগতের যে সমষ্টি শক্তি, এই সমষ্টি শক্তিকে কখনই বলা হচ্ছে না যে এটা ঈশ্বর নয়। স্থূল সূক্ষ্ম কারণ জগতে যা কিছু ঘটছে, এর সমষ্টিকে বলা হচ্ছে শক্তি। এই শক্তির আলাদা কোন অস্তিত্ব নেই। এই তিন জগতে যা কিছু হয় ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই, ঈশ্বরের মায়াতেই হয় আর ঈশ্বরের শক্তিতেই হয়। এই শক্তি ঈশ্বরের থেকে আলাদা কিছু না, কারণ আলাদা হলে ঈশ্বর একটি আলাদা সত্তা আর শক্তি আরেকটা আলাদা সত্তা হয়ে যাবে, যেটা কখনই যুক্তিতে দাঁড়ায় না।

আমরা ঈশ্বর ঈশ্বর বলছি বটে, কিন্তু যিনি ব্রহ্ম তিনিই যখন এই কার্য-কারণ জগতের মাধ্যমে দেখান তখন সেটাকেই আমাদের ঈশ্বর বলে বোধ হয়। যখন কেউ বলে আমি ঈশ্বরের এই রূপ চাই না, তার মানে সে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের রূপকে চাইছে না। ঈশ্বরের কার্য-কারণ রূপকে ছেড়ে ঈশ্বরের আরেকটা যে রূপ, যেটা তাঁর আসল রূপ, যেখানে কোন কার্য-কারণ নেই, সেই রূপকে আমি পেতে চাই, অর্থাৎ সে নির্গুণ নিরাকারে চলে যেতে চাইছে। সবাই যে এই নির্গুণ নিরাকারে চলে যাবে, তা কখনই না। বৈষ্ণব ভক্তরা এই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কে পেরিয়ে যেতে চায় না। তাঁদের কাছে বৈকুণ্ঠ ধামই শেষ লক্ষ্য, বৈকুণ্ঠ ধাম হল সেই উচ্চতম অবস্থা, যেখানে ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ সাকার রূপে দেখা যায়। ভক্তের কাছে জীবনের এটাই উদ্দেশ্য, আমি ঈশ্বরের কাছে থাকব। এরপর ঈশ্বর যদি তাকে নরকে পাঠিয়ে দেয় সে নরকে যাবে, ঈশ্বর যদি তাকে অখণ্ড সচ্চিদানন্দে পাঠিয়ে দেন, অখণ্ড সচ্চিদানন্দে চলে যাবে। কিন্তু যত কেউ স্থূল জগতে চলে যাবে তার তত ঈশ্বরের উপস্থিতি কম অনুভব হবে। মানুষ ঈশ্বরের উপস্থিতিকে যত কাছ থেকে দেখতে পাওয়া যেতে পারে, তত কাছে গিয়ে দেখতে চায়। এর আগে যখন আমরা আলোচনা করছিলাম তখন বলা হয়েছিল, স্থূল জগতে ঈশ্বরের উপস্থিতি শুধু অবতার রূপেই হয়, আর তা নাহলে, তিনি যদি কৃপা করে ধ্যানের গভীরে কাউকে দর্শন দেন তখন হয়। সূক্ষ্ম জগতেও প্রায় একই অবস্থা থাকে, একমাত্র কারণ জগতেই ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ দেখতে পাওয়া যায়।

এটা ঠিক যে, ভক্তিমার্গে ভক্ত ঈশ্বরের ভক্তিকে আস্বাদ করতে চায়, সে কখনই এই ইউনিভার্সাল এনার্জির পারে যেতে চাইবে না। ঠাকুর বেড়াল আর তার ছানার উপমা দিয়ে বলছেন, বেড়াল তার ছানাকে যেখানে রাখবে বেড়াল ছানা সেখানেই থাকব, সে শুধু মিউ মিউ করে মাকে ডাকে। ভক্ত জানে সবটাই ঈশ্বরের, স্বর্গটাও ঈশ্বরের, নরকটাও ঈশ্বরের। যেমন দেবর্ষি নারদ, তিনি কখনই অখণ্ড সচ্চিদানন্দে থাকতে চাইছেন না, এই ইউনিভার্সাল এনার্জির এলাকাতেই বীণা বাজিয়ে ভগবানের নাম করতে করতে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ জগতে ঘুরে বেড়াতেই তাঁর আনন্দ। নারদ কোন দিন এর পারে যাবেন না। কারণ, কারণ জগতের যাঁরা বাসিন্দা, যাঁরা ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ করতে পারেন, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে যেটাকে কয়েকটি শব্দে বলছেন, সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য ইত্যাদী, অর্থাৎ ঈশ্বরের লোকে থাকা, ঈশ্বরের কাছে থাকে, ঈশ্বরেরই রূপ নিয়ে থাকা। বৈষ্ণবদের কাছে এগুলোই উচ্চতম অবস্থা, এর উপরে আর তাঁরা যেতে চাইবেন না।

বেদান্তীরা, বিশেষ করে যাঁরা জ্ঞানমার্গী, তাঁরা বলেন আমার এটা লাগবে না। কারণ তিনি বলেন, এগুলো সবই পরিবর্তনশীল। কেন পরিবর্তনশীল? কারণ এগুলোও সব মায়ার রাজ্যেরই জিনিস, সব শক্তির এলাকার মধ্যে পড়ে। জ্ঞানীরা এই শক্তির এলাকাকে পেরিয়ে যেতে চান, যদিও তাঁরা শক্তি অর্থে মানেন না, শক্তি না বলে বলেন মায়া। কি রকম মায়া? যেমন সমুদ্র আর ঢেউ, জ্ঞানী ঢেউকে চান না, তাঁর কাছে ঢেউ সত্য হোক, মিথ্যা হোক তাতে তাঁর কিছু আসে যায় না, আমি সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দে থাকতে চাই। কেউ তাঁকে বলতে পারে, আরে ভাই ঢেউ কি সমুদ্র থেকে আলাদা কিছু? আলাদা হোক আর আলাদা নাই হোক, আমার ওটা লাগবে না, আমার কাছে এর সবটাই নাম ও রূপের খেলা, এর সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় আছে; যা কিছু পরিবর্তনশীল, পরিণামী আমার এসব কিছু লাগবে না। সেইজন্য শাক্তরা যেমন বলে এটা মায়ের এলাকা, সেই রকম বৈষ্ণব ভক্তদের কাছে এটা ভগবান বিষ্ণুর এলাকা হয়ে যায়। ইদানিং ঠাকুরের ভক্তরা বলছেন, আমি

রামকৃষ্ণলোকে যাব। মায়ের এলাকাই হোক, ভগবান বিষ্ণুর এলাকাই হোক আর রামকৃষ্ণলোকই হোক, সব লোকই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের মধ্যেই থাকছে। স্বামী সারদানন্দজী মহারাজ, এর বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন, যখন ব্রহ্মার জীবন শেষ হয়ে যায়, তখন যাঁরা কারণ জগতে আছেন, অর্থাৎ যাঁরা রামকৃষ্ণলোকে আছেন, তখন তাঁরা সচ্চিদানন্দে লয় হয়ে যাবেন, তাঁদের আর ফেরত আসতে হবে না। কিন্তু যারা সূক্ষ্ম জগৎ ও স্থূল জগতে আছে এদের আবার জন্ম নিতে হবে। এগুলো সবই থিয়োলজিক্যাল প্রশ্ন, কিন্তু মনে রাখতে হবে, যদি কেউ মনে করে ঈশ্বর মানে জগৎ, তা কিন্তু কখনই না। কিন্তু এই জগৎ ঈশ্বরের বাইরে নয়, আর সেই সাথে জগৎ ঈশ্বরেরই লীলা। আমাদের সব শাস্ত্র বলছে, তুমি লীলাকে ছাড়, ছেড়ে যার লীলা তাঁকে পাওয়ার চেষ্টা করে তাঁর কাছে পৌঁছে যাও।

গীতায় বলছেন *একাংশেন স্থিতো জগৎ*, ভগবানের একটা খুব সামান্য ছোট্ট অংশে এই জগৎ, তার মানে এই জগৎ না; স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ মিলিয়ে যে সমগ্র জগৎ, সেটা ভগবানের একটা ছোট্ট অংশ। ওই ছোট্ট অংশটাও তো ভগবানেরই অংশ। কিন্তু ওই sum totalকে কি বলা হবে? বেদান্তীরা ওটাকে মায়া বলে, শাক্তরা শক্তি বা মা বলে, এছাড়া আর কিছু না। কিন্তু ওখানে গিয়ে যে শেষ হয়ে যাচ্ছে তা না, দ্বিতীয়তঃ ওটা যে নিকৃষ্ট কিছু তাও নয়। বাবু আর বাবুর বাগানবাড়ি, বাগানবাড়ি যদি কখন ছোট হয়ে যায় তাতেও বাবু বাবুই থাকবেন। পুরুষসূক্তমেই এই একই কথা বলছেন, *অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্*, সমস্ত সৃষ্টি যেটা আছে, এর থেকে ভগবান দশ আঙ্গুল বড়, দশ আঙ্গুল বড় মানে, সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় নিয়ে যে জগৎ এবং স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ মিলে যে জগৎ, তিনি এর সব কিছুরও পারে। সৃষ্টির এলাকা যতটুকু আছে, ওর মধ্যেই অর্থাৎ ওই sum totalএ গিয়ে ঈশ্বর শেষ হয়ে যান না। যেমন ঘরে আটা আছে, সব আটা দিয়ে রুটি করা হল, আটা আর নেই, রুটি তৈরী করতেই আটা শেষ হয়ে গেছে। সেই রকম ঈশ্বর যা ছিলেন সব সৃষ্টি হয়ে গেলেন, আর কিছু নেই। না, এভাবে আটার মত ঈশ্বর সৃষ্টিতে শেষ হয়ে যান না। ওই sum totalকেই কেউ মা বলে ডাকছে। কিন্তু ওটাতেই তিনি শেষ হয়ে যান না, আর এই সব কিছু যা আছে, এটাও তিনি নিজে।

এখন যদি কেউ মনে করে, জগৎটাও যদি তিনি হন তাহলে আমি এখানেই থাকব। থাকো, কেউ আপত্তি করছে না; তবে জানবে, নরকটাও তাঁর, স্বর্গটাও তাঁর, সুখও তাঁর, দুঃখটাও তাঁর। দুঃখ পেতে যদি তোমার খুব মজা লাগে, তাহলে থাকো। সবাই জানে সিগারেট স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক, লোকেরা তাও খায়। যদি তোমার মনে হয় নরকে গিয়েও সুখ পাওয়া যাবে, যাও তাহলে নরকে, কেউ বারণ করছে না। ঠিক তেমন যদি কারুর মনে হয় এই লীলাতে সুখ আছে, কারণ লীলা ঈশ্বরেরই, তাহলে লীলাকে নিয়েই থাকুক। ঠাকুরকে একজন বলছিল, আমি তো জন্মাতে ভয় পাই না, আমার কোন চিন্তা নেই। ঠাকুর বলছেন, তুমি বলো না যে, তোমার ভোগ করার ইচ্ছে যায়নি। যাদের মনে ভোগ-বাসনা একেবারে গিজগিজ করছে, তারা এই জগতের মধ্যেই ঘুর ঘুর করতে চাইবে। ভোগ করার প্রবৃত্তি যখন শেষ হয়ে যায়, তখন বলবে, আমার আর লীলা লাগবে না। ঠাকুর বলছেন, মা বাচ্চার মুখে চুষিকাঠি দিয়ে দেয়, এরপর মা বাড়ির সব কাজ সারতে থাকে। কিন্তু বাচ্চা যদি একবার চুষণি ফেলে মা মা করে ডাক ছাড়ে, তখন মা যেখানেই থাকুক দৌড়ে এসে বাচ্চাকে কোলে নেয়। তেমনি আমাদেরও বলতে হবে আমার এই লীলার চুষণি, জগতের চুষণি লাগবে না, আমার মাকে লাগবে।

স্বামীজী বলছেন, Mother is the first manifestation of power and is considered a higher idea than father. (*জননীই শক্তির প্রথম বিকাশ-স্বরূপ, আর জনকের ধারণা থেকে জননীর ধারণা ভারতে উচ্চতর বিবেচিত হয়ে থাকে।*) শক্তির প্রথম প্রকাশ মা, শক্তির প্রকাশ পিতা থেকে জননীতে বেশি। আমাদের মনে রাখতে হবে, এই কথাগুলো স্বামীজী খ্রীষ্টানদের সামনে বলছেন, আর খ্রীশ্চান ধর্মে ভগবান হলেন বাবা। জুইস ধর্মে, যেখান থেকে খ্রীশ্চানিটি এসেছে, ওদের কাছেও ভগবান বাবা ঠিকই, কিন্তু বাবার থেকেও বেশি হল তিনি একজন কঠোর শাসনকর্তা। খ্রীশ্চানিটিতে এসে হয়ে গেল my Father is in Heaven। স্বামীজী ১৮৯৩ সালে আমেরিকায় যাওয়ার পর প্রথমের দিকে সর্বধর্মসমণ্বয়, সমভাব নিয়ে অনেক কিছু বললেন। তারপর ওদের আসল রূপ দেখে নেওয়ার পর তিনি সুযোগ পেলেই খ্রীষ্টান ধর্মকে আক্রমণ করতেন, বিশেষ করে স্বামীজীর যাঁরা খুব ঘনিষ্ঠ ও কাছের ছিলেন, তাঁদের সামনেই জোর আক্রমণ করতেন।

কুণ্ডলিনীর জাগরণ

এরপর স্বামীজী কুণ্ডলিনী জাগরণ নিয়ে বলছেন, With the name of Mother comes the idea of Shakti, Divine Energy and Omnipotence, just as the baby believes its mother to be all-powerful, able to do anything. (*মা-নাম করলেই শক্তির ভাব সর্বশক্তিমত্তা – ঐশ্বরিক শক্তির ভাব এসে থাকে, শিশু যেমন নিজের মাকে সর্বশক্তিময়ী মনে করে ভাবে –মা সব করতে পারে।*) প্রত্যেক শিশু নিজের মাকে সর্বশক্তিমান মনে করে এবং জানে যে, আমার মা সব কিছু জানে। ঠিক তেমনি, এই যে ইউনিভার্সাল এনার্জি বলা হল, ডিভাইন মাদার বলা হল, তখন স্বাভাবিক ভাবেই এই ভাব এসে যায়, মা কালী, মা দূর্গা সর্বশক্তিমান, তিনি জগজ্জননী, আর তিনি সবটাই জানেন। শুদ্ধ চৈতন্যকে নিয়ে যেভাবে ভাবা হয়, এখানেও ঠিক সেইভাবে মাকে ভাবা হচ্ছে। এটাকেই এবার স্বামীজী অন্য ভাবে নিয়ে এসে বলছেন, The Divine Mother is the Kundalini sleeping in us, (*সেই জগজ্জননী ভগবতীই আমাদের অভ্যন্তরে নিদ্রিতা কুণ্ডলিনী।*) ইউনিভার্সাল এনার্জিতে যে ডিভাইন এনার্জি রয়েছে, সেটাই আবার মানুষের ভিতরে কুণ্ডলিনী হয়ে ঘুমিয়ে আছে। বলছেন, without worshipping Her we can never know ourselves. (*তাঁকে উপাসনা না করে আমরা কখন নিজেদের জানতে পারি না।*) হিন্দু ধর্মের এটা খুব ব্যতিক্রম ধারণা, কারণ অন্যান্য ধর্মে এই ধারণা পাওয়া যাবে না, সেইজন্য অন্যান ধর্মকে বোঝা খুব মুশকিল। আর হিন্দু ধর্মের যারা যারা একটু নিলেন, সেই ধর্মগুলিও অনেকটাই পূর্ণাঙ্গ ধর্ম হল।

হিন্দু ধর্মে মানুষকে খুব উচ্চস্থান দেওয়া হয়। এইজন্যই দিচ্ছে না যে বিবর্তনে মানুষই শেষ, কিন্তু বিবর্তনে মানুষের থেকেও উচ্চাস্থানে কেউ যেতে পার। তা সত্ত্বেও মানুষকে খুব উচ্চস্থান দেওয়া হয়ে থাকে, কারণ দুটো সাংঘাতিক শক্তি মানুষের মধ্যে আছে, যেটা অন্য কোন প্রজাতিতে কোন দিন আসবে কিনা বলা মুশকিল। প্রথম হল, এই যে আমরা ব্রহ্ম, ঈশ্বর নিয়ে আলোচনা করে যাচ্ছি, তার সাথে ঈশ্বরের শক্তি নিয়ে বার বার আলোচনা করে যাচ্ছি, এখন এই ব্রহ্ম আত্মা রূপে মানুষের মধ্যে আছেন, যিনি ঈশ্বর তিনি অন্তর্যামী রূপে মানুষের মধ্যে আছেন। আবার ডিভাইন মাদার, সেই ইউনিভার্সাল এনার্জি কুণ্ডলীনি হয়ে মানুষের মধ্যে সুপ্ত রূপে আছেন। খুবই আশ্চর্য লাগে ভাবতে, জগতে যে তিনটে জিনিস আছে, সমগ্র চৈতন্য, টোটাল এনার্জি আর সমস্ত জড়; মানুষের শরীরে সমস্ত জড় পদার্থ নেই ঠিকই, তবে পদার্থ অনবরত পাল্টাচ্ছে, শরীরের কোন পার্টিকেলস আসছে আমরা জানি না, কিন্তু ডিভাইন পাওয়ার পুরোটা, অর্থাৎ সমগ্র যে ইউনিভার্সাল এনার্জি তার যে সমষ্টি তার পুরোটাই মানুষের ভিতরে কুণ্ডলীনি হয়ে ঢুকে আছে। আর সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে চৈতন্য সত্তা, তিনি আত্মা রূপে আছেন, সেইজন্য বলে অহং ব্রহ্মাস্মি, ঈশ্বর অন্তর্যামী রূপে আছেন, যিনি সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে চালাচ্ছেন, তিনিও মানুষের মধ্যে রয়েছেন আর সমস্ত বিশ্বের সব শক্তিটাই কুণ্ডলীনি হয়ে প্রত্যেকটি মানুষের শরীরে অবস্থান করছে। মনে হতে পারে এটা কোন গালগপ্প করা হচ্ছে, একটুও গালগপ্প নয়, পুরোপুরি বাস্তব। এই কারণেই বাস্তব, মানুষ যখন সাধনা করতে শুরু করে তখন তার কুণ্ডলীনিও জাগতে শুরু করে। ঠাকুরও বার বার বলছেন, ঈশ্বর দর্শনের একটা লক্ষণ হল, তার কুণ্ডলীনি জাগ্রত হয়, মহাবায়ু উপরের দিকে ওঠে। যেমন যেমন কুণ্ডলীনি জাগবে, তেমন তেমন তার শক্তিও বাড়বে, ঠাকুর যাকে সপ্তভূমির কথা বলছেন।

এই প্রসঙ্গ থেকে সরে গিয়ে আমরা এর আগে যে আলোচনা করেছিলাম সেটার দিকে নজর দিচ্ছি। আমরা বলেছিলাম আমাদের সবাকেই এই স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণের মধ্যেই ঘুর ঘুর করতে হচ্ছে। আগে আমরা এও আলোচনা করেছিলাম যে, এখানে যে শক্তি, যে ক্ষমতা আমি অর্জন করেছি, মৃত্যুর পর আমি সেখানেই যাব যেখানে এই শক্তি ও ক্ষমতা সমান হবে। তাই মৃত্যুর পর আমি যেখানে যাব, সেটা এখানেই আমার যে যৌগিক ক্ষমতা আছে, সেটা দিয়ে বোঝা যাবে। কুণ্ডলীনি জাগ্রত হয়ে যখন আমার হৃদয়ে এসে গেল, তখন আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি জগৎ আলোময় হয়ে গেছে। তার মানে সূক্ষ্ম জগতের সব রহস্য খুলে গেল। হৃদয়রামকে ঠাকুর একটু ছুঁয়ে দিলেন, ছুঁয়ে দিতেই হৃদয়রামের কুণ্ডলীনি জেগে গেল। কুণ্ডলীনি জেগে যেতেই সে দেখছে জগৎ আলোময়, নিজেকেও আলোময় দেখছে। এই দেখে সে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, মামা মামা আমরা এ কি করছি, চল আমরা জগৎকে শিক্ষা দিতে নেমে পড়ি। কুণ্ডলীনি জেগে যেতেই হৃদয়রাম বুঝতে পারছে আমার ভিতরে শক্তি এসে গেছে, আমি এখন জগৎকে শিক্ষা দিতে পারি।

এবার যদি এই কুণ্ডলীনি কন্ঠদেশে চলে আসে, ঠাকুর খুব সহজ ভাষায় বলছেন, তখন ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া অন্য কথা বলতে বা শুনতে ইচ্ছে করে না। এবার এটাকে আমরা যদি সূক্ষ্ম জগতে নিয়ে যাই, তখন সেটা কোথায় হবে? যেটা দেবতাদের অবস্থা, সেই অবস্থাকেও পেরিয়ে গেছে। তার মানে, তার ক্ষমতা এখন কি রকম? তখন সে নরেন্দ্রনাথের মত জগৎকে নাড়িয়ে দেবে। সেখান থেকে কুণ্ডলীনি ভ্রু-মধ্যে চলে এলো, এবার সে একেবারে কারণ জগতে চলে এসেছে, এখন সে জগতের মালিক, ঈশ্বর এখন ছুঁই ছুঁই অবস্থায়। কেমন ছুঁই ছুঁই, যেটা শ্রীশ্রীমা বলছেন, নরেন আর ঠাকুর ছাড়া কে ঈশ্বরকে খোলা চোখে দেখেছে। এই অবস্থায় মৃত্যুর পর সে কারণ জগতে চলে যাবে। কারণ জগতে সে ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ দেখতে পারবে। কিন্তু শক্তি কি হবে? ইচ্ছা করলে ব্রহ্মার মত সে নূতন একটা জগৎ সৃষ্টি করে দিতে পারবে। কারণ, এখানে যে ক্ষমতা হবে, সেখানেও তার ঠিক সেই একই ক্ষমতা হবে। যোগশাস্ত্রও একই কথা বলছে, কারণ সে এখন মনের জগতে বাস করছে; ইউনিভার্সাল এনার্জির পুরোটাই তার মধ্যে এসে যায়।

আমরা বোঝার জন্য কিছুক্ষণের জন্য মেনে নিচ্ছি একমাত্র ঠাকুরের কুণ্ডলীনি ভ্রু-মধ্যে এসেছিল। ঠাকুর কাশীপুর উদ্দ্যানবাটীতে ক্যান্সার রোগে কঙ্কালসার শরীর নিয়ে পড়ে আছেন, বিছানায় তিনি নিজে থেকে পাশ ফিরতেও পারেন না, অন্যের সাহায্য নিতে হয়, আর কদিন পরেই তাঁর শরীর যাবে। সেই সময় একদিন তাঁর শিষ্যরা ঠিক করল খেজুর রস খাবেন। ঠাকুর উপরে দ্বিতলে বিছানায় শুয়ে আছেন, নড়াচড়া করতে পারেন না। হঠাৎ মা দেখছেন ঠাকুর তীরবেগে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন, আবার কিছুক্ষণ পরে তীরবেগে সিঁড়ি দিয়ে তড় তড় করে উঠে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লেন। মা হতবাক্, তিনি এসে ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করলেন। ঠাকুর বললেন, ওরা রাত্রিবেলা খেজুর রস খাবে ঠিক করেছে, খেজুর গাছের ওখানে একটা কালসাপ থাকে সেটাকে তাড়িয়ে দিয়ে এলাম, তা নাহলে ও ক্ষতি করত। এই যে একটা শরীর তৈরী হয়ে গেল, এটা কি করে সম্ভব হল? কয়েক সেকেণ্ডের জন্য আমরা মেনে নিচ্ছি এটা একটা গল্প। কথামৃতে বর্ণনা আছে, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী একদিন এসে বলছেন, ঢাকায় তিনি যেখানে থাকেন, সেই গেণ্ডেরিয়া আশ্রমে তিনি ঠাকুরকে দেখেছেন; আরও বলছেন, গা টিপে টিপে দেখেছেন। কথামৃতে মাস্টারমশাই এটাকে রেকর্ড করছেন। তার মানে, এই ঘটনার দু তিনজন প্রত্যক্ষদর্শি ছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী আবার নরেনকে জিজ্ঞেস করছেন, তোমার কি এগুলো বিশ্বাস হয়? নরেন বলছেন, আমি নিজে যেখানে এত দেখেছি, সেখানে কি করে বলি যে বিশ্বাস হয় না। হৃদয়রামের আবার বর্ণনা আছে, হৃদয়রাম তার দেশের বাড়ি শিহড়ে দূর্গাপূজা করবে, ঠাকুর শুনে বলেছিলেন, তুই পূজা করছিস যখন তখন আমি পূজার সময় আসব। কিন্তু কোন কারণে ঠাকুর যেতে পারবেন না বলে খবর পাঠিয়েছেন। কিন্তু পূজার সময় হৃদয়রাম অবাক হয়ে দেখছেন তিনি এসেছেন। ঠাকুর নিজের ইচ্ছামাত্র একটা তরতাজা শরীর দাঁড় করিয়ে দিচ্ছেন, তাঁকে বাবা-মার গর্ভ দিয়ে আসতে হচ্ছে না। একা শ্রীশ্রীমা যে ওই দৃশ্য দেখছেন তা না, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, নরেন, হৃদয়রাম এনারা এতজনে দেখেছেন। আর সব জায়গায় তিনি সূক্ষ্ম রূপে আলো রূপে হাজির হয়ে যাচ্ছেন, তাও না, একেবারে স্থুল রূপে দেখা দিচ্ছেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী খুব সুন্দর বর্ণনা দিচ্ছেন, আমি টিপে টিপে দেখেছি। এটাই ব্রহ্মার ক্ষমতা, যে ক্ষমতায় তিনি একটা নূতন ব্রহ্মাণ্ড দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন। যোগশাস্ত্রে কায়ব্যুহের বর্ণনা আছে, যোগীরা যখন দেখেন এই শরীর দিয়ে যে সাধনা হবে তাতে এই জন্মের কর্মাশয়ের সমস্ত কর্মকে নাশ করা যাবে না, তখন তাঁরা অনেকগুলো শরীর তৈরী করে নেন, এই শরীরগুলো দিয়ে এবার তিনি সব কর্মকে নাশ করতে থাকেন। ঠাকুর না এলে আমরা জানতেই পারতাম না যে, যোগ, বেদান্তে যে কথাগুলো আছে এগুলো সত্যি নাকি গালগপ্প।

এখান থেকে আমরা আবার অন্য দিকে যাচ্ছি। যীশুখ্রীষ্টকে যখন ক্রুশবিদ্ধ করা হল, তিনি আগেই বলে দিয়েছিলেন আমি আবার আবির্ভূত হব। তিনি জাগলেন, জাগার পর তাঁর অনেক শিষ্যরাই দেখলেন। টমাসের মনে সন্দেহ ছিল তাই তিনি দেখতে পেলেন না, পরে আবার তাঁকে দেখা দিয়েছিলেন। পরে এই কথাটা চারিদিকে ছড়িয়ে গেল। জহুদিরা যীশুকে তো ক্রুশবিদ্ধ করে দিল, এই খবর ছড়িয়ে যেতেই এবার যীশুর শিষ্যদের নিয়ে টানাটানি চলতে লাগল। প্রথম দুশোটা বছর খ্রীশ্চান ধর্মের লোকেরা প্রাণের ভয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াত। যারা যারা যীশুর পুনরোত্থান হতে দেখেছে, এবার তাদের সবার জেল হবে আর সেখান থেকে ফাঁসি হয়ে যাবে। তাঁরাও ফাঁসিকে তোয়াক্কা না করে রীতিমত বুক ফুলিয়ে বলছেন, হ্যাঁ আমরা দেখেছি।

একজন লেখক খুব সুন্দর লিখছেন, যখন লোকেরা যীশুর পুনর্জন্মে সন্দেহ করে কিছু বলে, তখন তাঁরা এটা ভুলে যাচ্ছেন, যীশুর যে শিষ্যরা ছিলেন, তাঁদের কথাকে অবিশ্বাস করা মানে, এনারা যীশুর পুনার্বিভাবকে সত্য প্রমাণ করার জন্য যত রকম ব্যবস্থা করেছে, যত রকম যুক্তির অবতারণা করেছে, যত রকম সাক্ষী সাবুদ জোগাড় করেছে, সব রকম sine create করেছে কেন? যাতে নিজেরা সবাই ফাঁসির দড়ি গলায় পরতে পারে। নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য আমরা সবাই মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে থাকি। আর সেখানে একাধিক শিষ্য সবাই একেবারে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বর্ণনা দিচ্ছেন, এভাবে এভাবে আমরা তাঁকে দেখেছি, তাও কিনা সত্যি বললে তাঁদের সবাইকে ফাঁসিতে ঝোলান হবে। আমরা rationalityর নামে নিজেদের কত নীচে নামিয়ে দিই কল্পনা করা যায় না। আমরা হলাম বিষয়াসক্ত মানুষ, ইন্দ্রিয়ের বাইরে কিছু জানি না, ফলে আমরা মনে করি অন্যরাও কিছু জানে না। যার জন্য কেউ যদি এসে বলে আমার ঈশ্বর দর্শন হয়েছে, তখন তাকে মানুষ জেলে পাঠাতে যাচ্ছে, ফাঁসি দিতে যাচ্ছে, তখনও সে অস্বীকার করছে না যে, আমি কিছু দেখিনি। যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করতে যাচ্ছে, তখনও তিনি নিজের কথা থেকে সরছেন না। তাঁর শিষ্যরাও সেই পথ অনুসরণ করল। সেইজন্য পরে বহু বছর ধরে ওদের লোকেরা পালিয়ে পালিয়ে বেড়াত। অনেক পরে খ্রীশ্চান ধর্ম মাথা তুলে দাঁড়াল, যার জন্য এখনও পর্যন্ত জিউসদের বিরুদ্ধে ওদের বিদ্বেষ।

আমরা যে ইউনিভার্সাল পাওয়ার নিয়ে এত কথা বললাম, আর এই যে বলা হল, এই শক্তি প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে রয়েছে; স্বামীজী তাই আমাদের কোন উৎসাহ দেওয়ার জন্য বলছেন না যে – তোমার মধ্যে অনন্ত শক্তি, অনন্ত জ্ঞান –এটা একেবারে বাস্তব সত্য। অবশ্য জ্ঞান মানেই শক্তি, জ্ঞান আছে বলেই শক্তি আছে। আত্মা ভিতরে আছেন বলেই মানুষের ভিতরে অনন্ত শক্তি আছে, মানুষ মরে যাওয়ার পর তার মধ্যে কুণ্ডলীনি শক্তি আর থাকবে না। কারণ কুণ্ডলীনি তখনই থাকবে যখন আত্মা থাকবেন, শিব আর শক্তি একসাথে থাকবেন, চৈতন্য আর তাঁর শক্তি, ঈশ্বর আর তাঁর শক্তি এক সঙ্গে থাকবেন। একটা মানুষ মরে যাওয়ার পর আর তার ভিতরে কোন শক্তি নেই, এবার এই মৃত শরীর আইনস্টাইনের $E=MC^2$ ফরমুলা দিয়ে চলবে। যতক্ষণ মানুষ বেঁচে আছে ততক্ষণ স্বামীজী যে নিয়মের কথা বললেন, এই নিয়মানুসারে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ আত্মা রূপে, অন্তর্যামী রূপে, সূক্ষ্ম রূপে ভিতরে আছেন, আর মাতৃশক্তি, ইউনিভার্সাল এনার্জি কুণ্ডলীনি হয়ে ঘুমিয়ে আছে। কুণ্ডলীনি রূপে যে ক্ষমতা তাতে একজন একটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে দিতে পারে, যার দৃষ্টান্ত আমরা ঠাকুরের জীবনেই দেখছি, কিভাবে তিনি একটা নূতন শরীর দাঁড় করিয়ে দিচ্ছেন। সেটার জন্য তাঁকে কোন চেষ্টাও করতে হচ্ছে না, অনায়াসে ইচ্ছামাত্র দাঁড় করিয়ে দিচ্ছেন। এই ক্ষমতা শুধু ঠাকুরের একার হবে না, এই ক্ষমতা সবারই হতে পারে, স্বামীজীরও এই ক্ষমতা ছিল। যীশুর পুনার্বিভাব মানেই তাই। এই ক্ষমতা কুণ্ডলীনি জাগ্রত হয়ে ভ্রূর মধ্যে এলে আসে। এরপর কুণ্ডলীনি আরেক ধাপ উপরে সহস্রারে চলে গেলে তখন দেখেন, স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ মিলিয়ে যা কিছু আছে সবটাকে একটা ধুলিকণার মত দেখায়, তিনি আর ওই দিকে মনই দেবেন না। কিন্তু যাঁদেরই এই নির্বিকল্প সমাধি হচ্ছে, তাঁরা সবাই এই ক্ষমতার মাঝখান দিয়ে যান। তাহলে যাঁরা জ্ঞানমার্গী তাঁদের কিভাবে হয়? তাঁরাও এই পথ দিয়েই যান, তাঁরা স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ জগৎকে দৃশ্য মনে করে ফেলে দেন। বেদান্তীরা বলেন, ওটাও মায়া আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির যে ক্ষমতা, এটাও মায়ার জগতের। আমি বলব, আরে মশাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করার ক্ষমতা দূরে থাক, নিজের জন্য একটা বাড়ি বানানোর ক্ষমতাও আমার হচ্ছে না। তার মানে, তোমার কুণ্ডলীনি এখনও জাগেনি।

একটা খুব সাধারণ ম্যাগাজিনে একটা গল্পে ঠাকুরকে নিয়ে খুব সুন্দর বর্ণনা করছেন, সমুদ্রের ধারে একটা জায়গায় একজন চাকরি নিয়ে গেছে। সকালবেলা উঠে দেখছে সমুদ্রের উপর দিয়ে একজন লোক হেঁটে চলে যাচ্ছে। স্বাভাবিক ভাবেই সে দেখে খুব অবাক হয়ে গেছে। আরও সে অবাক হয়ে গেল, যখন সবাইকে গিয়ে এই ঘটনাটা বলতে গেছে সবাই তাকে বলছে, আমরা সবাই জানি। এরপর সে লোকটির সাথে দেখা করে জিজ্ঞেস করছে, ভাই এই বিদ্যাটা তোমার কোন কাজে লাগছে? লোকটি বলছেন, কোন কাজের না। তাহলে তুমি অপরকে শিখিয়ে দাও, যদি কখন জলে টলে পড়ে যায়, সে ভেসে চলে যেতে পারবে। তা হবে না, কারণ এই বিদ্যা যদি আমি কাউকে শিখিয়ে দিই, তাহলে আমার বিদ্যাটা চলে যাবে। সেইজন্য কাউকে সে শিখিয়ে দেয় না, আর সারাদিন জলের উপর দিয়ে হেঁটে বেড়ায়। মানুষ যেমন মাটিতে হাঁটে, সেও তেমন সমুদ্রে হাঁটে। আমরা মনে করছি, আমার যদি কুণ্ডলীনি জেগে যায়, তাহলে আমি একটা ভাল বাড়ি বানাব আর

একটা দামী গাড়ি কিনব। আমাদের এই ইচ্ছাটা আছে বলে আমাদের কুণ্ডলীনি জাগছে না। যেমন যেমন আমাদের কামনা-বাসনা কমবে, তেমন তেমন আমাদের শক্তি বাড়বে। যেমন যেমন শক্তি বাড়ল, তখন মনে হবে এটা আমার কোন কাজে লাগবে না। সেইজন্য ত্যাগ, তপস্যা, শক্তি সব এক, যেমন যেমন ত্যাগ হবে তেমন তেমন তপস্যা করতে পারবে। যেমন যেমন তপস্যা হবে তেমন তেমন ত্যাগ হবে। যেমন তার ত্যাগ তপস্যা হবে তেমনটি তার শক্তিও বাড়ে। একদিকে একটা শক্তি বেড়ে যাচ্ছে, কিন্তু সেই শক্তিকে কোন কাজে লাগাতে পারবে না। একটাই কাজে লাগবে, সেটা হল, ভবসাগরের পারে যাওয়া। যে বলছে আমি ভবসাগরের পারে যেতে চাই না, আমার সাগরটাই চায়। তাহলে তুমি বামাচার কর, তাতেও তুমি অনেক কিছু পাবে। কিন্তু বামাচার করলে, স্বামীজী যেমন বললেন, তুমিও যাবে, তোমার বংশও যাবে, তোমার জাতিটাও শেষ হয়ে যাবে। আর যে সমাজের লোকেরা বামাচার করে, সে সমাজ পুরোটাই হারিয়ে যাবে। এসব না করে, তুমি যদি কুণ্ডলীনি শক্তিকে জাগাতে চাও, মায়ের কাছে প্রার্থনা কর। মায়ের কাছে প্রার্থনা না করলে কি হয়? Without worshipping Her we can never know ourselves. (*তাঁকে উপাসনা না করে আমরা কখন নিজেদের জানতে পারব না।*) মায়ের আরাধনা না করলে কোন দিন তার আত্মজ্ঞান হবে না।

জগজ্জননীর স্বরূপ

সেই মা কে? All-merciful, all-powerful, omnipresent are attributes of Divine Mother. (সর্বশক্তিমত্তা, সর্বব্যপিতা ও অনন্ত দয়া সেই জগজ্জননী ভগবতীর গুণ।) মা হলেন সর্বশক্তিমত্তা, সর্বব্যাপিনী, অনন্ত দয়াময়ী। She is the sum total of the energy in the universe. Every manifestation of power in the universe is ‘Mother’. (*জগতে যত শক্তির বিকাশ আছে, তিনিই তাঁর সমষ্টিরূপিণী।*) ইউনিভার্সের সমস্ত শক্তির সমষ্টি রূপে মা। যেখানে যা শক্তি দেখা যাচ্ছে, ইলেক্ট্রিসিটিতে যে পাখা ঘুরছে, আলো জ্বলছে, এই শক্তি হল মা নিজে, আমরা কথা বলতে পারছি, মা আছেন তাই, একজনের বেশি শক্তি, একজনের কম শক্তি, তাতেও মা। ইউনিভার্সাল যে এনার্জি, তারই প্রকাশ হলেন মা। একজন মহারাজ তাঁর পরিচিত সাধুদের বলতেন, ভাই, জগতে যদি কিছু পেতে চাও, তাহলে মায়ের মন্দিরে গিয়ে মায়ের কাছে প্রার্থনা কর, ঠাকুর তো শিবের মত নির্বিকল্প সমাধিতে ডুবে আছেন, ওখানে প্রার্থনা করলে কিছু পাবে না। বলছেন, She is life, She is intelligence, She is love. (*তিনিই প্রাণরূপিণী, তিনিই বুদ্ধিরূপিণী, তিনিই প্রেমরূপিণী।*) এখানে জীবন বলতে চিজ্জড়গ্রন্থি বোঝাচ্ছে; জীবন মা, বুদ্ধিও মা। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে মায়ের আরও বিস্তারিত ভাবে এই রকম অনেক কিছুর বর্ণনা দিয়ে মার কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে, সেখানেও বলছেন *যা দেবী সর্বভূতেষু বুদ্ধি রূপেণ সংস্থিতা*। জগতে যত ভালবাসা আছে, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালবাসা, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভালবাসা, সন্তানের প্রতি মা-বাবার যে ভালবাসা, বন্ধুর প্রতি বন্ধুর যে ভালবাস, এই ভালবাসা জিনিসটাই মা, সেইজন্য মাকে বলা হয় তিনি প্রেমস্বরূপিণী। আবার স্বামীজী বলছেন, She is in the universe yet separate from it. (*তিনি সমস্ত জগতের ভিতর রয়েছেন, আবার জগৎ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।*) এই জগতে যা কিছু আছে সব তিনিই হয়ে আছেন, আবার এই জগতের পারেও, তার মানে জগতের মধ্যে থেকেও তিনি জগৎ থেকে আলাদা। অন্য দিকে তিনি আবার She is a person and can be seen and known (as Sri Ramakrishna saw and knew Her), (*তিনি একজন ব্যক্তি – তাঁকে দেখা যেতে পারে যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে জেনেছিলেন ও দেখেছিলেন*)। তিনি দেহধারী ব্যক্তি, তাঁকে দেখা যায়, তাঁর সাথে কথা বলা যায়, ঠাকুর যেমন নিজে তাঁকে জানতে পেরেছেন এবং দেখেছেন।

জগজ্জননী, যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি শক্তির মূর্ত রূপ, তিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পারেও, তিনি সচ্চিদানন্দময়ী, সদানন্দময়ী, তিনিই আবার এক ছোট্ট বালিকা হয়ে ঠাকুরের সামনে আসছেন, কি আশ্চর্য! ঠাকুর যদি একশ বছরা আগে না এসে থাকতেন, আমরা নিঃসন্দেহে এগুলোকে গালগপ্প বলে উড়িয়ে দিতাম। যে শক্তি দিয়ে আমরা এগুলোকে বোঝার চেষ্টা করছি, যে শক্তি দিয়ে এইসব গ্রন্থের আলোচনা করছি, এই একই শক্তি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছেয়ে আছে, সেই শক্তিই আবার সচ্চিদানন্দের সাথে এক, সেই শক্তিই ছোট্ট বালিকা হয়ে দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরকে দর্শন দিচ্ছেন। স্বামীজী বলছেন, Established in the idea of Mother, we can do anything. She quickly answers prayer. (*সেই জগন্মাতার ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আমরা যা*

খুশি তাই করতে পারি। তিনি অতি সত্বর আমাদের প্রার্থনার উত্তর দিয়ে থাকেন।) আমাদের ভিতরে যে শক্তি আছে, যেটা কুণ্ডলীনি হয়ে ঘুমিয়ে আছে, এবার সেই শক্তির বহিঃপূজার কথা বলছেন। আমাদের ভিতরে আত্মা যেমন অন্তর্যামী হয়ে আছেন, তেমনি এই অন্তর্যামীই আবার ঈশ্বরের রূপ। আমরা যখন পূজা করছি, তখন আমরা এই অন্তর্যামীরই বিরাটের রূপকে পূজা করছি। ঠিক তেমনি আমাদের ভিতরে যে শক্তি আছে, সেই শক্তি দিয়ে সর্বব্যাপিনী শক্তির পূজা করে আমরা যদি দিব্য শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেতে পারি, তখন আমরা যা খুশি করতে পারব। মায়ের কাছে প্রার্থনা করলে তার উত্তর সত্বর পাওয়া যায়।

ঘোর বেদান্তীদের কাছে শুদ্ধ অদ্বৈত ছাড়া, অর্থাৎ ব্রহ্ম ছাড়া যা কিছু আছে সব নিকৃষ্ট। ঠাকুরও বার বার বলছেন, জ্ঞানীদের জন্য অবতার নয়, জ্ঞানীরা রূপটুপ মানে না। দক্ষিণাচার হোক, বামাচার হোক, যেমনি রূপ এসে যাবে বেদান্তীরা আর সেটাকে মানবে না। তবে তাত্ত্বিক দিক দিয়ে বলা মুশকিল কে শ্রেষ্ঠ আর কে শ্রেষ্ঠ নয়। আবার অন্য দিকে স্বামীজী তাঁর লেকচারের অনেক জায়গায় বলছেন, বিদেশীরা মূর্তি পূজার নিন্দা করে, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ মূর্তি পূজা করেই মহাপুরুষ হয়েছেন, মূর্তি পূজা করে যদি এমন মহাপুরুষ হওয়া যায়, আমি চাইব সবাই মূর্তি পূজা করুক। যদিও স্বামীজী এখানে মাতৃশক্তি নিয়ে বলছেন, কিন্তু মাতৃশক্তির কথা বললেই আমাদের সামনে মায়ের একটা রূপ ভেসে ওঠে, মা কালী, মা দূর্গা, মা চণ্ডী ইত্যাদি। স্বামীজী বলছেন, এই মাতৃশক্তির কাছে প্রার্থনা করলে তিনি আমাদের প্রার্থনায় সাড়া দেন, খুব তাড়াতাড়ি মায়ের সাড়া পাওয়া যায়।

শক্তি যে-কোন রূপে প্রকট হন

এরপর স্বামীজী বলছেন, She can show Herself to us in any form at any moment. (*তিনি যখন ইচ্ছা –যে-কোন রূপে আমাদের দেখা দিতে পারেন।*) এটা শক্তি পূজার খুব প্রচলিত মত। আমরা জানি ভগবান বিষ্ণুই সাধারণ ভাবে অবতার রূপে আসেন, অবতার মানে তাঁকে মায়ের গর্ভ দিয়ে আসতে হয়। কিন্তু শক্তি এভাবে আবির্ভূতা হন না, তিনি যে কোন জায়গায় যে কোন রূপে প্রকট হয়ে যান। সেইজন্য বলা হয় যে, শক্তির অবতার হয় না, শক্তির আবির্ভাব হয়। আমাদের পরম্পরায় পৌরাণিক কাহিনীগুলিতে খুব সুন্দর ভাবে অবতারের বর্ণনা নিয়ে আসা হয়েছে, কিভাবে অবতাররা জন্ম নেন, তাঁর জন্ম দিব্য, তাঁর কর্ম দিব্য। কিন্তু মার্কণ্ডেয় পুরাণে শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেখানো হয়েছে, দেবতারা যখন সমস্যায় পড়ে প্রার্থনা করছেন বা সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য প্রার্থনা করছেন, মা সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সামনে আবির্ভূতা হয়ে যাচ্ছেন। বিশেষ করে দেবতাদের নিয়ে যে কাহিনীগুলি চণ্ডীতে আছে, সেখানে মায়ের আবির্ভাব হচ্ছে। এটাকেই লক্ষ্য করে স্বামীজী বলছেন, মা যে কোন জায়গায়, যে কোন সময় আবির্ভূত হতে পারেন, মা শক্তি কিনা। এগুলোকে নিয়ে অনেকে অনেক রকম কথা বলেন, শিবের অবতার হয় কিনা, অমুকের অবতার হয় কিনা। আমাদের এসবের মধ্যে যাওয়ার দরকার নেই। আমরা সাধারণ ভাবে যেটা নিচ্ছি, ভগবান বিষ্ণু রাম রূপে অবতার, কৃষ্ণ রূপে অবতার। শিবের ক্ষেত্রে কি হয়, কৈলাসাদিতে তাঁর যেন একটা চিরন্তন উপস্থিতি, কিন্তু জগন্মাতার উপস্থিতি ওই অর্থে নেই। অনেকে বলবেন, কেন পার্বতী আছেন তো! পার্বতী এখানে একটা রূপ হয়ে গেলেন। জগন্মাতা যিনি, তাঁর যখন প্রার্থনা করা হয়, তখন তিনি যে কোন রূপে, এখানে 'যে কোন রূপে' এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তিনি কোন রূপে আসবেন বলা যাবে না, যে কোন রূপে তিনি আবির্ভূতা হয়ে যেতে পারেন। যার জন্য বিভিন্ন শাস্ত্রে শক্তির এতগুলো রূপ। শুধু শ্রীশ্রীচণ্ডীতেই, বিশেষ করে অষ্টম অধ্যায়ে, যেখানে রক্তবীজ বধ হবে, সেখানে মা কত রূপে আসছেন। ভগবান কিন্তু এত রূপ নিয়ে আসবেন না। শিব যদি আসেন, তিনি শিব রূপেই আসবেন। মা এই রকম কোন নির্দিষ্ট রূপে নিয়ে আসেন না।

স্বামীজী আবার বলছেন, Divine Mother can have form (Rupa) and name (Nama) or name without form. (*সেই জগজ্জননীর নাম ও রূপ – দুইই থাকতে পারে, অথবা রূপ না থেকে শুধু নাম থাকতে পারে।*) এটা খুবই মজার, জগন্মাতা এমন জিনিস যে, তাঁর নাম থাকবে ও তাঁর রূপ থাকবে; আর এমন হতে পারে, শুধু নাম থাকবে রূপ থাকবে না। রূপ থাকবে কিন্তু নাম থাকবে না, এটা কখন হয় না, তাহলে বেদের মূল সিদ্ধান্তের বিরোধী হয়ে যাবে। বেদান্তের মূল সিদ্ধান্ত হল, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় জিনিস ওম্ থেকে বের হয়। আর কোন সত্তা যদি থেকে থাকে, তা যে কোন সত্তাই হোক, কোন না কোন ভাবে তার নাম

থাকবেই থাকবে। সেইজন্য রূপ নাম ব্যতিরেকে হয় না। তবে একমাত্র অখণ্ড ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ, যাঁর অস্তিত্ব আছে কিন্তু কোন নাম নেই। সেইজন্য কেনোপনিষদে আছে, যেখানে দেবতারা দেখছেন এক যক্ষ, তাঁর রূপ আছে কিন্তু নাম জানা নেই। দেবতারা ওই বিচিত্র রূপী যক্ষের নাম জানার চেষ্টা করছেন। পরে তাঁরা জানলেন, ইনিই ব্রহ্ম। এর বাইরে যা কিছুর অস্তিত্ব আছে, তার একটা নাম থাকবে। কিন্তু মায়ের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায়, তাঁর নাম আছে কিন্তু কোন রূপ নেই। মুসলমানদের যেমন আল্লা, তাঁর নাম আছে কিন্তু কোন রূপ নেই। আর বলছেন, and as we worship Her in these various aspects we can rise to pure Being, having neither form nor name. (*তাঁকে এই-সকল রূপে বিভিন্ন ভাবে উপাসনা করতে করতে আমরা এমন এক অবস্থায় উপনীত হই, যেখানে নাম, রূপ কিছুই নেই, কেবল শুদ্ধসত্তামাত্র বিরাজিত।*) যাঁরা কালী রূপের চিন্তন, পূজন, ধ্যান করছেন, তাঁরাও ধীরে ধীরে উপরে দিকে উঠে যাবেন। আবার কোন নাম, যাঁর কোন রূপ নেই, যেমন মায়ের বীজ মন্ত্র, হ্রীং, ক্লীং, ঐং ইত্যাদি, এর কোন একটা বা একাধিক নামের উপর ধ্যান করা হয় তাতেও সে ধীরে ধীরে উপরে চলে আসবে। উপরে চলে আসবে মানে, rise to pure Being, তাঁর ভিতরে অন্য কোন ধরণের অস্তিত্ব থাকবে না, সচ্চিদানন্দের যে সৎ, শুদ্ধ অস্তিত্বের সাথে এক হয়ে যাবে। যাঁরা শক্তি সাধনা বা তন্ত্র সাধনা করেন, তাঁরা কিভাবে মায়ের নাম জপ করেন, কিভাবে ধ্যান করেন, আর তার পরিণতি কি হবে, এই বিষয়টাকে নিয়েই স্বামীজী এখানে বলছেন। পরেও এই বিষয়টা চলবে। নামজপের এই ফল যে, মানুষ শুদ্ধ পবিত্র হয়ে যায়।

আগে বলা হল, শক্তির অবতার হয় না, শক্তির আবির্ভাব হয়। শ্রীশ্রীমাকে আমরা কি বলব? একটা জিনিস জানতে হবে, পণ্ডিতরা এই ধরণের কথা বলার সময় খুব কৌশলে একটা outlook দিয়ে দেন, এগুলো সবই কথার খেলা। ঈশ্বরের দেহধারণের ব্যাপার যখন আসে তখন আমরা অবতার বলি, যেমন ঠাকুরকে আমরা অবতার বলছি, আবার ঠাকুরের আবির্ভাবও বলছি, কিন্তু সাধারণ ভাবে আমরা বলি ঠাকুর অবতার, শ্রীরামচন্দ্র অবতার, শ্রীকৃষ্ণ অবতার। শ্রীশ্রীমাকেও তাই বলা হয়, শক্তি অবতরিত হয়েছেন। কিন্তু এটা ঠিক না, technically শক্তির অবতার হয় না। তাহলে আমরা এতদিন ধরে কি জেনে আসছি, ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা অবতার? এটা ঠিক না, বলা হয় যে, শক্তির সমষ্টি রূপ বলতে ঠিক ঠিক যেটা বোঝায়, সেটা যে কোন জায়গায়, যে কোন রূপে আবির্ভূত হবেন, যার মধ্যে শ্রীশ্রীমা একটা রূপ, মা কালী একটা রূপ, পার্বতী একটা রূপ। তাহলে ভগবানও কি এই রকম হতে পারেন? হতে পারেন, কিন্তু ধর্মীয় যে পরম্পরা আছে, তাতে শক্তির ক্ষেত্রে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, ভগবানের ক্ষেত্রে বর্ণনা করা হয়নি। ভগবানকে আমরা যদি দর্শন করি তাহলে আমাদের হয় বিষ্ণু রূপে বা নারায়ণ রূপে দর্শন করতে হবে। কিন্তু শক্তির ক্ষেত্রে যে কোন রূপেই দর্শন হতে পারে। বৈষ্ণব ভক্তরা আবার নানা রকম কাহিনী রূপে এনে দেখান যে, ভগবান এক গরীব ব্রাহ্মণ রূপে এসে এই সেই করলেন, এগুলোও আছে। কাহিনীতে যে কোন জিনিসকে যে কোন রূপে বানিয়ে দেওয়া যায়। পুরাণের কোন বিশেষ কাহিনীকে নিয়ে পুরাণের মূল দৃষ্টিভঙ্গীকে বিচার করা যাবে না। পুরাণের মূল দৃষ্টিভঙ্গী হল, ভগবান মানেই তাঁকে অবতার রূপে আসতে হবে, শক্তি মানেই তিনি যখন খুশি, যেখানে খুশি, যে কোন রূপে আবির্ভূতা হতে পারেন। আমাদের যত শাস্ত্র আছে, কোথাও ভগবান কখন বলছেন না যে, তুমি যেমন প্রার্থনা করবে তেমন রূপে আমি তোমার সামনে আবির্ভূত হব। কিন্তু শ্রীশ্রীচণ্ডীতে মা এই কথা বলছেন। আর সত্যিই দেখা যায় যে, দেবতারা যখন যখন বিপদে পড়ে যেমন যেমন প্রার্থনা করেন, মা এসে হাজির হয়ে যান। সেইজন্য বলা হয় যে, মা যে কোন জায়গায়, যে কোন রূপে, যখন খুশি আবির্ভূতা হন। এটাকে এবার স্বামীজী ব্যাখ্যা করছেন।

জীব, জগৎ, ঈশ্বর ও মায়া বা শক্তি

স্বামীজী যেখানে যেখানে যত উপমা আনছেন, সব উপমাকে নিয়ে আমরা যেন সত্যের সাথে মেলাতে না যাই। স্বামীজী উপমা রূপে একটা organismকে নিয়ে আসছেন, যেমন মানুষ, বলছেন, Sum total of all the cells in an orgaism is one person; (*যেমন কোন শরীরবিশেষের সমুদয় কোষগুলি মিলে একটি মানুষ হয়*); একটি ব্যক্তিত্বের কথা ভাবলে, তার শরীরের মধ্যে যতগুলি কোষিকা আছে, সব কোষিকাগুলি মিলিয়ে হয় একটি মানুষ। So each soul is like one cell and the sum of them is

God, and beyond that is the Absolute, (*সেইরূপ প্রত্যেক জীবাত্মা যেন এক একটি কোষস্বরূপ, এবং তাদের সমষ্টি ঈশ্বর –আর সেই অনন্ত পূর্ণতত্ত্ব ব্রহ্ম তারও অতীত।*) স্বামীজী জীব, জগৎ ও ঈশ্বর এই তিনটকে এবার একটা প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসছেন। বিশ্বের যে কোন দর্শনকে মুখ্যত তিনটে জিনিসকে আলোচনা করতে হবে – জীব, জগৎ আর ঈশ্বর। এই তিনটের বাইরে কোন দর্শনের আলোচনা করার কোন সুযোগ নেই। ভৌতিকবাদী দর্শনের কাছে ঈশ্বর বলতে জিরো, জীব বলতে জিরো আর জগৎ বলতে সব কিছু। তারা বলে জীব জগতেরই অংশ, ঈশ্বর বলে কিছু নেই। তাই ভৌতিকবাদ দর্শন একমাত্র জগতের আলোচনা করতেই সব শেষ করে দেয়। কিছু কিছু ধর্মীয় দর্শন আছে, যেমন বৌদ্ধ ধর্মের দর্শন, তারা জগৎ ও জীবকে নেবে কিন্তু ঈশ্বরকে নেবে না। ঠিক তেমনি জৈন ধর্মের দর্শন জীব ও জগৎকে নেবে কিন্তু ঈশ্বরকে নেয় না। অদ্বৈত বেদান্ত দর্শন এই তিনটের সাথে আরও দুটো জিনিস যোগ করেন, ঈশ্বরের একটা উপরের রূপ, আরেকটা ঈশ্বরের নীচের রূপ। ঈশ্বরের উপরের রূপ বলতে আমরা যাঁকে ব্রহ্ম বলছি, স্বামীজী এখানে absolute বলছেন, অখণ্ড বলছেন। আর তার ঠিক নীচে এসে যায় মায়া; ব্রহ্ম, মায়া আর ঈশ্বর। মায়া বা শক্তি না হলে ঈশ্বর হবেন না, তাই বেদান্তের আলোচনায় ব্রহ্ম, মায়া বা শক্তি আর ঈশ্বর; জীব ও জগৎ থাকবেই।

স্বামীজী এই জায়গাতে এসে জীব, জগৎ ও ঈশ্বরের সাথে একটা সংযোগ স্থাপন করে দিচ্ছেন। স্বামীজী বলছেন, ব্রহ্মাণ্ডে যতগুলি জীবাত্মা রয়েছে, এই জীবাত্মার যে সমষ্টি রূপ, এটাই যেন ঈশ্বরের শরীর। বেদান্তসারের যে প্রাথমিক গ্রন্থ আছে, তাতে ওনারা তিনটে অবস্থাকে নেন, স্থূল জগৎ, যেটা আমরা সামনে দেখছি, সূক্ষ্ম জগৎ, যেখানে মন, বুদ্ধি কাজ করে আর কারণ জগৎ, যেখানে জীবাত্মা মায়ার মধ্যে পড়ে আছে। স্বামীজী বলছেন, স্থূল জগতের যেটা সমষ্টি এটাই ঈশ্বরের রূপ, সূক্ষ্ম জগতের যে সমষ্টি, সেটা ঈশ্বরের আরেকটা রূপ, আর সূক্ষ্ম জগৎ, কারণ জগৎ মিলিয়ে যেখানে যত জীবাত্মা আছে, সমস্ত জীবের যে সমষ্টি, এটাই হলেন ঈশ্বর। ঈশ্বর মানেই হল, বেদে যে পুরুষ শব্দ নিয়ে আসা হয়েছে, পুরুষ মানেই সমষ্টি। কিসের সমষ্টি? যেখানে যত জীবাত্মা আছেন, তার সমষ্টি। আমাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে, তাহলে কি নূতন আত্মা জন্ম নিতে পারবে না? না, নিতে পারে না। তাহলে যার মুক্তি হয়ে গেল, একটা জীবাত্মা কি কমে যাবে? ঐ একটা কমে যাবে ঠিকই, কিন্তু কতোর মধ্যে, কোটির উপর কোটির উপর কোটি; সেখান থেকে একটা কমে গেলে কিছু এসে যায় না, আর বোঝাও যাবে না। আমি চোখটা রগড়ে দিলাম, সেখান থেকে চারটে সেল বেরিয়ে গেল, তাতে আমার কি এসে গেল! কিন্তু তাঁর পারে যিনি অখণ্ড, তিনি চাইলেই আবার কোটি কোটি জীবাত্মার জন্ম দিয়ে দিতে পারেন। জীবাত্মাকে জন্ম দিতে হয় না, কারণ ওখানে একটা মায়ার আবরণ থাকে। এই টিউব লাইট আছে, এর উপর একটা মোটা আবরণ দিয়ে দেওয়া হল, তাতে একটা ফুটো রাখা হল, সেই ফুটো দিয়ে টিউব লাইটের একটা আলোর রেখা আসছে। এবার এটা হয়ে গেলে একটা জীবাত্মা। যদি একশটা ফুটো করে দেওয়া হয়, একশ জায়গা দিয়ে আলো আসতে থাকবে, তার মানে একশ খানা জীবাত্মা হয়ে গেলে। সেইজন্য নূতন করে সৃষ্টি করতে হচ্ছে না। টিউব লাইট হল সীমিত, সীমিত জিনিসের উপরেই আমাদের মস্তিষ্ক কাজ করে। সেইজন্য অখণ্ড, অনন্তকে আমরা ধারণা করতে পারি না। যিনি অখণ্ড, অনন্ত, তাঁর ক্ষেত্রে এভাবে চলে না। সেখানে মায়াও অনন্ত, জীবের জন্ম হওয়ার সম্ভবনাও অনন্ত। এটাই যখন একটা সৃষ্টির প্রক্রিয়ার মধ্যে এসে যায়, সৃষ্টি যখন চলতে শুরু করল, সেখানে যে সমষ্টি রয়েছে, সেটাই ঈশ্বর। আর এর পারে হল অখণ্ড, স্বামীজী যেটাকে Absolute বলছেন। ঠাকুর যে উপমা নিচ্ছেন, বেদান্তও সেই একই উপমা নিচ্ছে, নদী আর নদীর ঢেউ আলাদা কিছু নয়।

স্বামীজী সমুদ্রের উপমা এনে বলছেন, The sea calm is the Absolute, the same sea in wave is Divine Mother. (*সমুদ্র যখন স্থির থাকে তখন তাকে বলা যায় 'ব্রহ্ম', আর সেই সমুদ্রে যখন তরঙ্গ ওঠে তখন তাকেই আমরা 'শক্তি' বা 'মা' বলি।*) সমুদ্র যখন শান্ত, স্থির তখন এটাই হল অখণ্ড, সমুদ্রে যখন ঢেউ আসে, ওই ঢেউটাই হলেন মা, ঠাকুর একেই বলছেন, ব্রহ্ম আর কালী অভেদ। সমুদ্র শান্ত থাকলেও সমুদ্র, সমুদ্রে হিল্লোল কল্লোল হলেও সমুদ্র। এই হিল্লোল কল্লোলকেই স্বামীজী বলছেন, Divine Mother। She is time, space and causation. (*সেই শক্তি বা মহামায়াই দেশকাল-নিমিত্ত-স্বরূপ।*) ব্রহ্ম যিনি অখণ্ড, সেখানে না আছে দেশ, না আছে কাল, না আছে কারণ। কারণ অনন্তে কখন কোন movement হতে পারে না, কারণ সেখানে কোন দেশ নেই, আমরা যেখানেই যাব সেটাই অনন্ত। হেলাদোলার জন্য একটা

জায়গা দিতে হবে। অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, তিনি সর্বব্যাপী, সব জায়গাতেই তিনি আছেন, তাহলে তিনি যাবেনটা কোথায়? দেশ নেই তাই কারণও নেই। আর কাল হল, কারণের পরিমাপ, দুটো ঘটনাকে মাপাকে বলা হয় কাল বা সময়। কারণ নেই, কোন ঘটনা নেই, তাই কাল নেই। তাহলে সৃষ্টি কি করে হয়? যিনি অখণ্ড, যিনি সর্বত্র বিরাজ করে আছেন, সেখানে সৃষ্টি কি করে হবে? যাঁরা বলেন সৃষ্টিটা বাস্তব, তাঁদের কাছে এখানে এসে সমস্যা হয়ে যায়। আর বেদান্তীরা বা অদ্বৈতবাদীরা এই জায়গাতে এসে একেবারে বেঁকে বসেন। সেইজন্য সৃষ্টি হল একটা লীলা, এটাই মায়া। আসলে কোন পরিবর্তন হয় না, কিন্তু দেখাচ্ছে যেন পরিবর্তন হচ্ছে, এটাই মায়া। এই যে পরিবর্তনের মত দেখাচ্ছে, অথচ কোন পরিবর্তন হচ্ছে না, এই যে দেশ, কাল, কারণ, ইনিই হলেন শক্তি, জগন্মাতা, পুরাণে তাঁকেই ব্রহ্মা বলা হয়েছে।

God is Mother and has two natures, the conditioned and the unconditioned. (*সেই ব্রহ্মই মা। তাঁর দুটি রূপ – একটি সবিশেষ বা সগুণ, এবং অপরটি নির্বিশেষ বা নির্গুণ।*) স্বামীজী ঘুরে ফিরে মাকে সব কিছু বানিয়ে দিচ্ছেন। এদিকে যে সৃষ্টি চলছে, এটাকে বলছেন conditioned, দেশ, কাল ও কারণে সীমিত। যেটা দেশ, কাল ও ক্রিয়ার মধ্যে বিভাজিত, সেটা মায়েরই রূপ। মায়েরই আরেকটা রূপ হল অবিভাজিত, অখণ্ড। ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ এই রূপকে স্বামীজী ব্রহ্ম না বলে বলছেন শক্তি, জগন্মাতা। মা হলেন ব্রহ্ম, সচ্চিদেকম্ কালী, সেই সচ্চিদেকমকে কেউ কালী বলে, কেউ শক্তি বলে। সেই কালীরই দুটি রূপ, একটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রূপে দেখাচ্ছে, আরেকটা রূপ হল যেখানে তিনি অখণ্ড রূপে দেখাচ্ছেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা নারায়ণকে এভাবেই দেখেন, নারায়ণ একদিকে জগৎ রূপে আছেন, আরেকদিকে তিনি অখণ্ড রূপে আছেন। কিন্তু তন্ত্র মতে এসে একটু তফাৎ হয়ে যায়। তন্ত্রের অনেক কিছু অদ্বৈতের সাথে মেলে, আবার কিছু কিছু বিশিষ্টাদ্বৈতের সাথে মেলে।

যেখানে সব কিছু সীমিত হয়ে যাচ্ছে, যেখান থেকে মায়ার জগৎ শুরু হয়ে যাচ্ছে, সেখানে এসে স্বামীজী বলছেন, As the former, She is God, nature and soul (man). (*প্রথমোক্ত রূপে তিনি ঈশ্বর, জীব ও জগৎ।*) প্রকৃতি, ঈশ্বর ও জীব বা আত্মা, এর সমষ্টি হলেন মা। মা কালী সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে জন্ম দিচ্ছেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে জন্ম দিচ্ছেন মানে, যিনি ভগবান, তাঁকেও তিনি জন্ম দিচ্ছেন। মহানির্বাণতন্ত্রে প্রথমের দিকে আছে, যেখানে শিব পার্বতীকে বলছে, 'হে দেবী পার্বতী তুমিই সব, আর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও আমি তোমার থেকেই জন্ম নিয়েছি। তাই তুমি সবাইকে জানতে পারো, তোমাকে কেউ জানতে পারে না'। শিবের মুখে সব শুনে পার্বতী আবার বলছেন, 'কই! আমি তো এসব কিছু জানি না'। 'তুমি জানো না ঠিকই কিন্তু এটাই তোমার আসল স্বরূপ'। মায়ের উপাসনা কিভাবে হয়, সেটাই আবার শিব পার্বতীকে বলছেন, আর এরপর থেকে শুরু হয় মহানির্বাণতন্ত্র। অখণ্ডে কোন বিভাজন নেই, কিন্তু জগতের এই দিকে তাকালে জীব, জগৎ আর ঈশ্বর এই তিনটের পরিষ্কার দেখা যায়। এই জীব, জগৎ ও ঈশ্বর এই তিনটের সমষ্টি হলেন মা। বলছেন, As the latter, She is unknown and unknowable. (*দ্বিতীয় রূপে তিনি অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়।*) অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে কেউ জানতে পারে না, আমি তাঁর সাথে এক হয়ে যেতে পারি, কিন্তু জানতে তাঁকে পারব না। Out of the Unconditioned came the trinity, god, nature, and soul, the triangle of existence. (*সেই নিরূপাধিক সত্তা থেকেই ঈশ্বর, জীব ও জগৎ এই ত্রিত্বভাব এসেছে।*) Trinity হল খ্রীশ্চান মত, God the Father, God the Son and God the Holy Ghost, এই তিনটে খ্রীশ্চান ধর্মে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এখানে বলছেন, দেবতা, প্রকৃতি আর জীবাত্মা, এই তিনটে মা নিজে হয়েছেন। This is the Vishishtadvaitist idea, আমরা আগে যেটা আলোচনা করলাম, বিশিষ্টাদ্বৈত ঠিক এভাবেই চলে, নারায়ণরই এই দুটি রূপ।

নারী সেই মাতৃশক্তিরই এক একটি স্ফুলিঙ্গ

A bit of Mother, a drop, was Krishna, another was Buddha, another was Christ. (*সেই জগদম্বার এক কণা –এক বিন্দু হচ্ছেন কৃষ্ণ, আর এক কণা বুদ্ধ, আর এক কণা খ্রীষ্ট।*) মহানির্বাণতন্ত্র থেকে যেটা বলা হল, মা থেকেই সব কিছুর জন্ম। মা যেন এক মহাসাগরের মত, সেই মহাসাগরের একটা জলের বিন্দু যেন কৃষ্ণ, তাঁরই একটা বিন্দু বুদ্ধ, তাঁরই আরেকটা জলের বিন্দুতে খ্রাইস্ট।

শাক্ত মতে ঠিক এভাবেই বলা হয়। কিন্তু আমরা যদি গভীরে যাই, সেখানে আমাদের যে দৃষ্টিভঙ্গী, সেই দৃষ্টভঙ্গীকে কেন্দ্র করে ধর্মের বিভিন্ন দর্শন হয়। যাঁরা মাতৃভক্ত তাঁরা এটাকে মাতৃরূপে দেখেন, যাঁরা বিষ্ণুভক্ত তাঁরা এটাকে বিষ্ণু রূপে দেখেন। এসব বলার পর স্বামীজী এবার পুরো আলোচনাকে খুব সংক্ষেপে এনে বলছেন, The worship of even one spark of Mother of our earthly mother leads to greatness. (*আমাদের পার্থিব জননীতে সেই জগন্মাতার যে এক কণা প্রকাশ রয়েছে, তারই উপাসনাতে মহত্ব লাভ হয়।*) যিনি জগন্মাতা, যিনি জীব, জগৎ আর ঈশ্বরের সমষ্টি রূপ, যাঁর আরেকটি রূপ হল অখণ্ডের রূপ, তিনি অখণ্ড রূপে আছেন, আবার তিনিই জগৎ রূপে লীলা করেন। সেই জগন্মাতার যে মাতৃশক্তি, যেখান থেকে সব কিছু বেরোচ্ছে, নিজের যে গর্ভধারিণী মা, বা যে কোন মা, তার মধ্যেও সেই মাতৃশক্তি স্ফুলিঙ্গ আছে। স্ফুলিঙ্গ আর আগুনের মধ্যে কোন তফাৎ হয় না, একটা স্ফুলিঙ্গ যা আগুনও তাই। স্বামীজী বলছেন, যদি কেউ নিজের মাকে সম্মান করে, নিজের মায়ের সেবা করে, পূজা করে, তাহলে জানবে তার মধ্যে মহত্ত্বের স্ফুরণ হবেই হবে। ঠিক এই লাইনটাকে ধরে হিন্দু ধর্ম দাঁড়িয়ে আছে। এই লাইনটাকে ধরেই হিন্দু ধর্ম সমগ্র মাতৃজাতিকে সম্মান করতে শিক্ষা দেয়। হিন্দু ধর্ম সেইজন্য, যেখানেই গর্ভ হয়, একটা গরুর গর্ভ হোক, ছাগলের গর্ভ হোক, কোন গর্ভধারিণীর ক্ষতি সাধন করে না, করতে দেবে না। কারণ সেই মাতৃশক্তিরই একটা স্ফুলিঙ্গ সেখানে প্রকাশ। মা যেমন সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করে আছেন, ঠিক তেমন প্রানী জগতে ওই প্রজাতি তার সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে আছে। ভারতবর্ষ চিরদিনই তাই মাতৃরূপকে সম্মান করে আসছে। হিন্দু ধর্মে প্রথম থেকেই মাতৃজাতির প্রতি সম্মান দেখিয়ে আসছে। সম্মান যদি কাউকে পেতে হয়, তাহলে তাকে মা হতে হবে, সন্তানের জন্ম দিয়ে তুমি মা হও, মানসিকতায় তুমি মা হও, তোমার আচার ব্যবহারে মা হও, তাতে কিছু আসে যায় না। এই মাতৃশক্তি হল সেই অখণ্ড চিৎশক্তিরই একটা স্ফুলিঙ্গ, প্রতিবিম্বও নয়, একটা স্পার্ক। স্পার্ক মানেই, আসল আর ছোটর মধ্যে কোন তফাৎ নেই।

এতক্ষণ যে আলোচনা হল, জীব, জগৎ আর ঈশ্বরের, এই তিনটের যে সমষ্টি রূপ মাতৃশক্তি, তাঁরই একটা সূক্ষ্ম রূপ হল মা, নিজের মা তো অবশ্যই, তার সাথে অপরের মা এবং যে কোন প্রজাতির মা। ইদানিং কাগজ খুললেই চারিদিকে মেয়েদের শ্লীলতাহানির খবর চোখে পড়ে, এগুলো নিয়ে অনেক আইন হচ্ছে, আলোচনা হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু মূল জিনিসটাকে থেকে কোথাও আমরা সরে যাচ্ছি। এই জায়গায় হিন্দুদের দর্শন খুবই উচ্চমানের দর্শন। কিছু কিছু ধর্ম আছে, যেখানে মেয়েদের কারুর সম্পত্তি রূপে দেখা হয়। সেখানে কোন মেয়ের গায়ে হাত দিলে, তার সম্পত্তিতে হাত দেওয়া হয়ে যাবে, তখন একটা আগুন লেগে যাবে। হিন্দুদের ক্ষেত্রে তা হয় না, হিন্দুদের ক্ষেত্রে, কোন মেয়ে হয় সে মা, কিংবা মা হতে যাচ্ছে। জীবনে যদি তুমি শান্তি পেতে চাও, জীবনে যদি শক্তি অর্জন করতে চাও, তাহলে জগন্মাতার ধ্যান কর, জগন্মাতাকে সম্মান করতে শেখ, জগন্মাতার পূজা কর। সেই জগন্মাতারই সূক্ষ্ম রূপ হল যে কোন মেয়ে বা নারী। তাঁকে পূজা করতে শেখ, তাকে সম্মান করতে শেখ। মনুবাবা ঠিক এই কারণেই তাঁর স্মৃতিগ্রন্থে বলছেন, *যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ*। যে বাড়িতে নারীর পূজা হয়, সেই বাড়ি দেবতাদের বাসস্থান। অথচ বলা হয়, মনু নাকি নারী বিরোধী। মূল সিদ্ধান্ত ওই এক, নারীকে এনারা অবলা রূপে দেখছেন না, নারীর যে একটা নিরাপত্তা দরকার, সেই রূপেও দেখছেন না, নারীকে এনারা দেখছেন জগন্মাতারই ছোট্ট রূপ। জগন্মাতা যদি দাবানলের মত দাউ দাউ করে জ্বলার মত হয়, সেখানে একটি নারী সেই দাবানলের একটি স্ফুলিঙ্গ। সেই জগন্মাতার কাছে যদি কেউ যেতে চায়, তাঁর কৃপা যদি কেউ পেতে চায়, তাহলে নিজের গর্ভধারিণীকে দেবীরূপে সেবা, পূজা করতে হবে, তার সাথে সবার মাকেও সম্মান করতে শিখতে হবে। যে বাড়িতে মায়ের সম্মান নেই, মা অবহেলিত হয়ে আছে, সেই বাড়ির সর্বনাশ হতে বেশি দেরী নেই। যে সমাজ মাতৃত্বকে সম্মান করে না, সে সমাজও বেশি দিন চলবে না। হিন্দু সমাজ দাঁড়িয়ে আছে মাতৃত্বের সম্মানের উপর। স্বামীজী বলছেন, Worship Her if you want love and wisdom, যদি চাও আমার জীবনে ভালবাসা আসুক, আমার বুদ্ধি হোক, জ্ঞানবিজ্ঞান হোক তাহলে নিজের মাকে, অপরের মাকে সম্মানের মাধ্যমে মাতৃত্বকে সম্মান করতে শেখ। স্বামীজী এই আহ্বাণ জানিয়ে এই দিনকার লেকচার শেষ করছেন। এবার আমরা ৩রা জুলাই, বুধবার স্বামীজী কি আলোচনা করছেন দেখব।

<u>বুধবার, ৩রা জুলাই</u>

ধর্মে প্রেমের স্থান, এই বিষয়ের উপর স্বামীজী আজকে আলোচনা শুরু করছেন। ভক্তি দুই প্রকার, বৈধী ভক্তি ও প্রেমা ভক্তি। আমি আলাদা, ঈশ্বর আলাদা, এই আলাদা বোধ দিয়ে বৈধী ভক্তি শুরু হয়। সবারই এই আলাদা বোধ থাকে। ঠাকুরের সাধনাও আলাদা বোধ দিয়েই শুরু হয়েছিল। সবাই এইভাবেই শুরু করে, এরপর মানুষ যেমন যেমন এগোতে শুরু করে তেমন তেমন তার ভিতরে পরিবর্তন হতে শুরু হয়। সেখান থেকে ঈশ্বরের প্রতি একটা ভালবাসা আসতে শুরু হয়ে যায়। ভালবাসা এসে গেলে বিধিবাদী উড়ে গিয়ে থাকে শুধু ভালবাসা। এই ভালবাসাকে পরে পরে যাঁরা সাহিত্যাদি রচনা করেছেন, তাঁরা অনেক রকম নাম দিয়েছেন, ব্যাভিচারিণী ভক্তি, অব্যাভিচারিণী ভক্তি, রাগাত্মিকা ভক্তি, প্রেমা ভক্তি ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে ছোট ছোট তফাৎ আছে। এই জায়গাতে স্বামীজী ভক্তিতে যে অনুরাগ, ভালবাসা জড়িয়ে আছে, সেটাকে নিয়ে আলোচনা করছেন।

ঈশ্বর ভীতিই জ্ঞানের প্রারম্ভ

স্বামীজী বাইবেল থেকে আলোচনা শুরু করছেন। বাইবেলের দুটো অংশ, ওল্ড টেস্টামেন্ট ও নিউ টেস্টামেন্ট। খ্রীশ্চানরা বাইবেলের দুটো অংশকেই নেয়, যদিও নিউ টেস্টামেন্টে একটু বেশি জোর দেয়। জুহুদিরা আবার নিউ টেস্টামেন্টকে মানেই না, ওরা শুধু ওল্ড টেস্টামেন্টকে নিয়ে চলে। আমাদের যেমন বেদ, ওল্ড টেস্টামেন্ট ওদের কাছে তাই। ওদের যাঁরা খুব উচ্চমানের ঋষিরা ছিলেন, তাঁরা যে কথাগুলো বলে গেছেন, সেই কথাগুলোকে নিয়ে ওল্ড টেস্টামেন্ট। ওল্ড টেস্টামেন্টের অনেকগুলো কথা অনেক সময় আমাদের সাধারণ হিন্দুরা যেভাবে ধর্মকে বোঝেন, তার সাথে মেলে না। না মিললেও তার একটা বিশেষ দাম আছে। বলছেন, যে খ্রীশ্চান ধর্ম এত শক্তিশালী ধর্ম, সেই ধর্ম ওল্ড টেস্টামেন্টকে নিয়ে চলে, বলা হয় যে বাইবেলে নাকি তিনশবার fear শব্দটা এসেছে। বাইবেলের অনেকগুলো বই আছে, তার মধ্যে একটা নামকরা বই হল Proverbs। বইটির প্রথম অংশে, সাত নম্বরে ওদের যে কথা, তাতে খুব সুন্দর একটা কথা বলছেন, সেটা দিয়েই স্বামীজী শুরু করছেন। 'The fear of the Lord is the beginning of wisdom'। যার অর্থ ঈশ্বর ভীতিই জ্ঞানের আরম্ভ। তার আগে আমাদের এর ব্যাকগ্রাউণ্ড বুঝে নেওয়া দরকার।

ওল্ড টেস্টামেন্টের Proverbsএ বলছেন, The fear of the Lord is the beginning of wisdom। বাইবেলে এইভাবে fearএর অনেকগুলো ধারণা আসে, যার জন্য বাইবেলে শুধু fear আর fear। ইদানিং বেদান্ত ধর্মের দর্শন চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে, দ্বিতীয় হল, যীশু আসার পর fear শব্দটাকে উড়িয়ে দিলেন, দিয়ে শুধু নিয়ে এলেন ঈশ্বরের জন্য ভালবাসাকে। খ্রীশ্চানরা একদিকে ওল্ড টেস্টামেন্টকে নিচ্ছে আবার এদিকে যীশুর ঈশ্বরের জন্য ভালবাসাকেও নিচ্ছে, কোথাও যেন একটা contradiction থেকে গেছে বলে মনে হয়। জন বাইবেলের অনেক সংযোজন করেছেন, জন ফোর্থ চ্যাপ্টারের আঠারো নম্বরে বলছেন, Perfect love casteth out fear, ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা এলে সমস্ত ভয় দূরীভূত হয়ে যায়। স্বামীজী এই দুটি কথাকে একসাথে নিয়ে চলছেন, আরও আশ্চর্য যে, খ্রীশ্চনরাও এই দুটো কথাকে একসাথে নিয়ে প্রচুর আলোচনা করেছে। এক জায়গায় বলছেন, ভয় থেকে ভক্তি, আরও বেশি বলছেন, ভয় থেকে জ্ঞান আসে। ঠাকুর বলছেন, ভালবাসা এলে ভয় কেটে যায়।

আমাদের কাছে যখনই ভয় শব্দটা আসে তখনই মনের মধ্যে জেগে ওঠে, পুলিশের ভয়, ক্রিমিনালের ভয়, অটোক্র্যাসির ভয়, কিন্তু আমরা ভুলে যাই, ভয়ের একটা সূক্ষ্ম অর্থ আছে, যেটা ভাল অর্থেই করা হয়। যেমন বাচ্চাকে মা ভয় দেখায়, বাবাকে বলে দেব। এখানে ভয় হল একটা অনুশাসনে থাকা। আগেকার দিনে, বড় জমিদারের বাড়িতে বংশ পরম্পরায় একজন চাকরি করে যেত, সেখানে তারা মালিককে ভয় করত। কিন্তু ওই ভয়টা একটা ভালবাসার ভয়। মালিক একটা কিছু বলে দিয়েছে, এই রকম করা যাবে না, চাকর ওই রকম করবে না। কিন্তু সচরাচর, সাপের ভয়, চোরের ভয়, বাঘের ভয় যে অর্থে নিয়ে থাকি, সেভাবে কোন চাকর তার মালিককে ভয় পেত না। আবার যুধিষ্ঠির যেমন বলছেন, আমি পাপকে খুব ভয় করি, এইজন্য ভয় করি না যে আমি নরকে যাব, কিন্তু আমি পাপ কর্মে কেঁপে উঠি। আবার কঠোপনিষদে বলছেন,

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর ধাবতি পঞ্চমঃ, ব্রহ্ম অর্থাৎ সচ্চিদানন্দের ভয়ে জগতের সব কিছু চলছে। আবার বলছেন *মহদ্ভয়ম্ বজ্রমুদ্যতং*, এই ধরণের শব্দগুলি নিয়ে আসছেন। তবে এই ভয় চোর-ডাকাত, সাপের বা বাঘের ভয় না, এই ভয় হল একটা অনুশাসনের মধ্যে থাকা। সবাই যে দেশের আইন মেনে চলে, সংবিধানকে মেনে চলে, সেখানে একটা ভয় কাজ করে। কিন্তু ওই ভয়ের মধ্যে কোথাও এটা কাজ করে যে, আমরা এটা নিজেরা স্বেচ্ছায় এই আইন প্রথা মেনে নিয়েছি। যেমন আমরা ভারতের সংবিধানকে মেনে নিয়েছি। আমরা যদি মনে করি এটা ঠিক না, তখন অন্য আইন নিয়ে আসা হবে। কদিন আগে এসসি/এসটি কেসে সুপ্রিম কোর্ট একটা রায় দিলেন। তাতে অনেক রাজনৈতিক দল, নেতারা সবাই এই রায়কে আপত্তি জানিয়ে বললেন, আমরা এটা মানছি না। পুরো দেশ যদি বলে আমরা এই আইন মানছি না, তখন ওই আইনটা পাল্টে দেওয়া হয়। এখানে কোন স্বেচ্ছারিতার ভয় বা অত্যাচারের ভয়ের কথা বলা হচ্ছে না। দেশের এই আইন আমরা স্বেচ্ছায় মেনে নিয়েছি।

এই Proverbaএ বলছেন, 'The fear of the Lord is the beginning of wisdom', ঠাকুরও এক জায়গায় বলছেন, ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া কিছু হয় না। স্বাধীন ইচ্ছা ওইটুকু তিনি মানুষের মধ্যে রেখে দিয়েছেন, তা নাহলে পাপের বৃদ্ধি হত। আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন অনেক রকম দুষ্টুমি করেছি, পরীক্ষায় নকল করেছি, ধরা পড়ে মার খেয়েছি। আর বড়রাও অনেক সময় দুষ্টুমি করে। স্বামীজী বিদেশ থেকে জাহাজে করে ফিরছেন। জাহাজের ডেকে সিগার খাওয়া নিষেধ, স্বামীজী ডেকে দাঁড়িয়ে আরামসে সিগার টেনে যাচ্ছেন। ওটা দেখে ক্যাপ্টেন রেগেমেগে হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে আসছে। উনি তখনও আরামসে সিগার খেয়ে যাচ্ছেন, যখন কাছে এসে গেল টুক করে সমুদ্রের জলে সিগারটা ফেলে দিলেন। এটা একটা ছেলেমানুষী, দুষ্টুমি। মহাপুরুষদের মধ্যেও ছোটখাটো এগুলো একটু থাকে। ঠাকুরও অনেকের পিছনে মজা করে লাগতেন, তখন মনে হয় এনারা আমাদেরই মত মানুষ। বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীদের দেখে অনেকে বলে, আপনাকে দেখে ঠিক সাধু বলে মনে হয় না। কেন মনে হয় না? সাধুবাবা মানে বড় দাড়ি থাকবে, সব সময় ধ্যানে বসে থাকবেন, আর এখানে সাধুরা স্কুল চালাচ্ছেন, হাসপাতাল চালাচ্ছেন, কথা কাটাকাটি করছেন, সাধু রূপে ঠিক যেন জমে না। সাধু মানে বাবাজীদের মত দশ বারোজন চেলাচামুণ্ডা থাকবে। ঠাকুর বা স্বামীজীর দৈনন্দিন জীবনের দিকে তাকালে মনে হবে এনারা কত জীবন্ত, আমাদেরই মত একজন, অথচ কোথাও একটা বিরাট তফাৎ। আমরাও ছোটবেলা অনেক রকম দুষ্টুমি করেছি। কিন্তু একটা বয়সের পর আমাদের ভিতর থেকে কেউ যেন বলে দিচ্ছে, আমাকে আইন মেনে চলতে হবে, শাসনে থাকতে হবে, তখন বুঝতে হবে যে আমাদের পথ খুলে গেল। এই যে ছেলেমানুষী, দুষ্টুমি, বাঁদরামো আর সত্যিকারের বদমাইসি, এগুলো সব বন্ধ হয়ে যায়, যখন মানুষ একটা আইন ব্যবস্থাকে স্বেচ্ছায় মেনে নেয়।

মনস্তাত্ত্বিকরা বলেন যে, ইদানিং কালে একটা রোগ আগে ছিল না কিন্তু এখন ভারতবর্ষে এসেছে, বিদেশে আগে ছিল। এই রোগের নাম, BPD, Borderline Personality Disorder। Personality disorder মানে পাগলামো। নূতন যে প্রজন্ম, এরা কেউ পাগল না, কিন্তু বর্ডারলাইন পাগল। এরা বাড়ির সব সুবিধা নেবে, মা-বাবার সমস্ত সুবিধা নেবে, তার মানে মা-বাবা ঠিক থাকবে, খাওয়া-দাওয়া ঠিক থাকবে, বদলে আমি কিছু দেব না। তোমার কাছ থেকে সব শুষে নেব, বদলে তোমাকে কিছু দেব না। রাত একটা দুটোর সময় বাড়ি ফিরবে। বাবা-মা যদি কিছু বলে দেয়, এত রাত্তিরে ফেরা হবে না। ব্যাস্, এবার ভাঙচুর শুরু হয়ে গেল। এমন ভাঙচুর করবে যে, বাবা-মা ভয়ে বলবে, থাক থাক কিছু বলতে হবে না। একটা কোন অনুশাসন কায়েম করতে গেলে চেঁচামেচি, ফাটাফাটি শুরু করে দেবে। বাইবেল যখন বলছে, ঈশ্বরের যে ভয়, শুধু ঈশ্বরের ভয় না, যে কোন ভয়, পাপের ভয়, আইনের ভয়, চক্ষুলজ্জার ভয়, সমাজের ভয় যখন আসে, মানুষ তখন ধীরে ধীরে উপরে উঠতে শুরু করে। আমাদের সমস্যা হল, আমরা মনে করি আমি সব জানি, বাচ্চা বয়স থেকে আমরা সবজান্তা। যেমনি কিছু একটা জেনে গেলাম, তখন বলি, ও এই জিনিস আগে থেকেই আমার জানা ছিল। কারুর সাথে কথা বলতে গিয়ে দেখি যে সে এই জিনিসটা জানে, তখন আমরা অবাক হয়ে ভাবি, সে এই জিনিসটা জানল কি করে! আরেকটা ব্যাপার হল, আমরা নিজেদের দোষ কোন মতেই মানতে চাইব না। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে একজনের সাথে ধাক্কা লেগে গেল, আমি যদি রেগেমেগে তার দিকে তাকাই, সে বলবে, একটু ধাক্কাই না লেগেছে, আপনি তো পড়ে যাননি। যদি পড়ে যেতেম, তাহলে বলবে,

পড়েই না গেছেন, আপনার হাত পা তো ভেঙে যায়নি। হাত পা যদি ভেঙে যায়, হাতই না ভেঙেছে মরেতো জাননি। ঝগড়া সত্যিকারের এভাবেই হয়, কেউ কারুর দোষ স্বীকার করতে চাইবে না।

মানুষ যখন ভগবানকে ভয় পেতে শুরু করে তখনই তার wisdom হতে শুরু হয়। এটাকে আমরা যদি শাব্দিক অর্থে নিতে যাই তখন দেখা যাবে অর্থগুলো ডানদিক বামদিক হয়ে এলেমেলো হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা এসে যাবে। কিন্তু আসল অর্থ হল, মানুষের মধ্যে যখন পাপের ভয় আসে, সমাজের ভয় আসে, আইনের ভয় আসে, ঈশ্বরের ভয় আসে তখন এবার ওর মধ্যে এতদিন ধরে যে জংলীপনা, পশু স্বভাবের দিকে চলে যাওয়ার প্রবৃত্তি তৈরী হচ্ছিল, দিক পরিবর্তন করে সে এবার অন্য দিকে চলে যাবে। বাঁধ থেকে নদীকে ছেড়ে দিলে চারিদিকে ছড়িয়ে গিয়ে নদীটা শুকিয়ে মরে যাবে। কিন্তু একটা ক্যানেল দিয়ে চ্যানেলাইজ করে যদি নদীকে ছাড়া হয়, তখন ওই নদীর গতিপথ অনেক মসৃন হয় আর তাতে পাঁচজনের উপকার হয়। বাইবেলে এই অর্থে বলা হচ্ছে। বাইবেলের এই কথাকে নিয়ে অনেক নিন্দা সমালোচনা করা হয়, বলা হয় যে, পুরো ভয়ের উপর খ্রীশ্চানিটি দাঁড়িয়ে আছে। আসলে তা নয়, বক্তব্য হল মানুষের মধ্যে যতক্ষণ ভয় না থাকবে ততক্ষণ মানুষের উন্নতি আসবে না। দ্বিতীয় হল, বৈধী ভক্তি, যেখানে আমি তুমি ভেদ আছে সেখানে প্রথমে আচার, অর্চনা, উপাচার দিয়েই ভক্তি শুরু হয়। ওই সময় তার মনে হবে, ঈশ্বরের এই এই বিধান আমাকে মানতে হবে। ঈশ্বরের বিগ্রহের সামনে আমাকে রোজ প্রণাম করতে হবে, না করলে তিনি অসন্তুষ্ট হবেন, হয়তো রেগে যেতে পারেন।

এই রেগে যাওয়ার ব্যাপারটা কতটা সত্য কতটা কাল্পনিক আমাদের জানা নেই। তবে ঠাকুরের মত পুরুষ, যিনি টাকা মাটি, মাটি টাকা করে টাকা আর মাটি দুটোকেই গঙ্গাবক্ষে নিক্ষেপ করলেন, করার পর তাঁরও মনে ভয় হল, টাকাকে গঙ্গায় ফেলে দিলাম, পাছে মা লক্ষ্মী যদি রাগ করেন তাই বললাম, মা তুমি হৃদয়ে বাস কর। একজন ঠাকুরকে বলছেন, এটা তো পাটোয়ারি। ঠাকুরও বলছেন, হ্যাঁ ওইটুকু পাটোয়ারি। ঠাকুরের কথা মিথ্যা হওয়ার না, মা লক্ষ্মী কিন্তু সত্যিই রাগ করলেন, সারাটা জীবন ঠাকুরের অর্থাভাব থেকেই গেল। ঠাকুরের অভাব তো ছিলই, মায়েরও অভাব থেকে গেল, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের মাথায় ঘুরছে, দুধওয়ালার দেনা আছে, অমুকের দেনা আছে, এমনকি শেষ অবস্থায় কাশীপুরে চাঁদা করে অর্থ জোগাড় করতে হয়েছে। শ্রীশ্রীমাকে কত ভেবেচিন্তে হিসাব করে কষ্টে সংসার চালাতে হয়েছে। তবে আলোচনা প্রসঙ্গে এই কথা বলা হল, যিনি অবতার পুরুষ, যাঁর অধীনে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, ইচ্ছামাত্রই তিনি সব কিছু করে দিতে পারেন, তাঁকে নিয়ে এই ধরণের আলোচনা করা যায় না। কিন্তু ঠাকুরের যা যা কথা বেরিয়েছে তার একটি কথাও মিথ্যা হয়নি। অদ্বৈত অবস্থা থেকে নেমে আসার পর যখনই আমি তুমি বোধ আসে তখনই এই ভয়টা থাকতে পারে, এটা সেরকম দোষের কিছু নয়।

কিন্তু এই ভাবটাই যদি চিরস্থায়ী হয়ে থাকে, যেখানে ভগবান একজন কঠোর দোর্দণ্ড শাসক, আর আমরা হলাম তাঁর গোলামের মত, তখন কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতি অবরুদ্ধ হয়ে যাবে। এই জিনিসটাকে যীশু এসে কাটালেন, আর জন এসে বলতে শুরু করলেন, Perfect love casteth out fear। স্বামীজী বলছেন, প্রেম যখন এসে যায় তখন ভয়টয় সব উড়ে গিয়ে শুধু ভালবাসাটুকু থেকে যায়। এর আগেও আমরা আলোচনা করেছিলাম, প্রেম জিনিসটাকে বোঝা খুব কঠিন। আমরা হলাম খুবই নিম্ন প্রকৃতির। বর্তমান কালের ছেলেমেয়েরা যেভাবে এক অপরের প্রতি দৌড়াচ্ছে, এদের পক্ষে এইসব জিনিস বোঝা, বিশেষ করে প্রেম, ভক্তি আদির কথা ধারণা করা অসম্ভব। প্রেমে দুজন এক অপরের কাছে এলো, আমি তুমি বোধ নিয়েই প্রথম এসেছে, আমি তোমাকে ভালবাসি, তুমি আমাকে ভালবাস। সেখান থেকে ধীরে ধীরে যখন ভালবাসার গভীরতা অনেক বেশি বেড়ে যায়, তখন দুজনে নিজেদের এক মনে করে। আমিও যা, তুমিও তাই। সেখান থেকে যখন আরও গভীরে চলে যায়, তখন যে অবস্থা হয়, সেটাকে আমাদের মত নিম্ন প্রকৃতির মনের দ্বারা ধারণা করা সম্ভবই নয়। প্রথম কথা হল আমাদের একত্ব ভাবটাই আসে না। খুব যদি আসে, কিছুদিন আগেও যেটা হত, মায়েদের সন্তানের প্রতি, সন্তানের তৃপ্তিতেই মায়ের তুষ্টি। ইদানিং তো মা আরেকটা বিয়ে করবে বলে আগের পক্ষের সন্তানকে খুন করে দিচ্ছে। যদি একত্ব বোধ একটু হয়, মায়ের সন্তানের প্রতি। কিন্তু যখন প্রেম হয় তখন আমি তুমি এক হয়ে যায়। সেখান থেকে আরেকটু এগোলে তখন একত্ব বোধ, এই বোধটাও চলে যায়,

থেকে যায় শুধু প্রেম, প্রেম ছাড়া আর কিছু থাকে না। তখন এক দুই এই বোধটাও থাকে না, শূন্য এই বোধটাও থাকে না। থাকে শুধু প্রেম, এটাই অদ্বৈত। অদ্বৈত মানে, অহং ব্রহ্মাস্মির আমি, ব্রহ্ম, অস্মিন্ সবটাই চলে যায়, যা আছে তাই আছে। এটাই জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এক হয়ে যাওয়া। জন যখন বলছেন, Perfect love casted out fear, তখন ওই অর্থেই বলছেন। কারণ ভয় কোথায় হয়? যেখানেই দুই সেখানেই ভয়, অদ্বৈতমেব অভয়ম্। যতক্ষণ দুই আছে ততক্ষণই ভয়, যখন এক তখন আর কিসের ভয়! একমাত্র ভালবাসাতেই এক হতে পারে, এছাড়া আর কোন কিছুতে এক হতে পারে না। স্বামীজী এই জিনিসটাকেই এবার ব্যাখ্যা করছেন।

স্বামীজী শুরুতে বলছেন, Generally speaking, human religion begins with fear, সাধারণ ভাবে দেখা যায়, ভয় দিয়েই ধর্মের শুরু হয়। ঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প এগুলোকে আমরা সবাই ভয় পাই। যার জন্য বেশির ভাগ ধর্মে প্রকৃতির শক্তির ভয় থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অনেক কথা বলা হয়। ঠিক তেমনি ঈশ্বর, যিনি sum total of all forces, তাঁকে মানুষ ভয় পায়। এই ভয়কেই Proverbsএ বলছে, 'The fear of the Lord is the beginning of wisdom, মানুষ যখন অনুশাসনে থাকতে শুরু করে তখনই মানুষের মধ্যে wisdom আসে। But later comes the higher idea, কিন্তু ধর্মে যখন এগোতে শুরু করে তখন ধীরে ধীরে এই ভয়, বিধি-নিষেধ, এত জপ করতে হবে, এত পূজা করতে হবে, এগুলো সত্যি সত্যিই খসে পড়ে যায়। খসে গিয়ে কি পড়ে থাকে? যেটা জন বলছেন, Perfect love casted out fear, স্বামীজী প্রথমে ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে শুরু করে জন যে ভালবাসার কথা বলছেন, সেটাতে চলে গেলেন। এখান থেকে এবার বলছেন, Traces of fear will remain with us until we get knowledge, know what God is. (*যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা জ্ঞানলাভ করছি, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা জানতে পারছি – ঈশ্বর কি বস্তু, ততক্ষণ পর্যন্ত কিছু না কিছু ভয় থাকবেই।*) অদ্বৈত বেদান্তে বলছেন, যতক্ষণ ঠিক ঠিক ঈশ্বর জ্ঞান না হচ্ছে, ততক্ষণ একটু ভয় থাকবে। ঠাকুরের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি, অদ্বৈত জ্ঞানের পর ওই বোধটা আসছে, আমি আর মা লক্ষ্মী আলাদা, তখন একটু ভয় থাকবে, পাছে মা যদি রাগ করেন। একমাত্র অদ্বৈত অবস্থায় কোন ভয় থাকে না। অদ্বৈত অবস্থা মানেই জ্ঞান। একটু আগে যেটা বলা হল, কিভাবে আমি তুমি ভেদটা মিটে গিয়ে একত্ব বোধ আসে, তারপর একত্ব বোধটাও মিটে যায়, থেকে যায় শুধু ভালবাসা। যাঁরা জ্ঞান বিচারের পথে যান, তাঁদের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়। জ্ঞাতা আর জ্ঞেয় এক হয়ে যায়, ওই এক হয়ে যাওয়ার পর এক বোধটাও খসে পড়ে গিয়ে শুধু জ্ঞানটুকু থেকে যায়। জ্ঞানও যা ভালবাসাও তাই, ঈশ্বরকে জানা মানে ঈশ্বরের সাথে এক হয়ে যাওয়া। ওই অদ্বৈত ভাবে না পৌঁছান পর্যন্ত একটু ভয় থাকবে।

এরপর বলছেন, Christ, being man had to see impurity and denounced it. (*যীশুখ্রীষ্ট মানুষ ছিলেন, সুতরাং তিনি জগতে অপবিত্রতা দেখতে পেতেন –আর তার নিন্দাও করে গেছেন।*) ঠাকুরও অনেক জায়গায় একে তাকে বকাবকি করছেন। অনেকে বলবে, গীতায় তো এই রকম নেই। গীতাতে না থাকারই কথা, কারণ সেখানে শ্রীকৃষ্ণের যে ব্যক্তিত্ব বা রামায়ণে শ্রীরামের যে ব্যক্তিত্বকে দেখছি, এই রূপগুলো কিন্তু মানুষের রূপ নয়। শ্রীরামের মানব রূপ একমাত্র আসে বাল্মীকি রামায়ণে। শ্রীকৃষ্ণের মানব রূপ কোন শাস্ত্রেই আসে না। আমাদের দুটি মহাকাব্য বাল্মীকি রামায়ণ ও মহাভারতকে যদি পাশাপাশি রেখে দেখা হয় তাহলে দেখা যাবে, বাল্মীকি রামায়ণের যতগুলো চরিত্র আছে, প্রত্যেকটি চরিত্রের এমন আদর্শ যে, সেই আদর্শে আমরা কোন দিন পৌঁছাতে পারব না। শ্রীরামের মত মর্যাদা পুরুষোত্তম হতে পারব না, সীতার মত চিরদুঃখিনী, সর্বত্যাগী ও পতিব্রতা হতে পারব না, লক্ষ্মণের মত ভাই, যিনি সব কিছু ত্যাগ করে দাদার স্বার্থে জীবন উৎসর্গ করে দিচ্ছেন, ওই রকম ভাই হতে পারব না। বদমাইশির দিকে রাবণের মত হতে পারব না, খাওয়া ও ঘুমানোতে কুম্ভকর্ণের মত হতে পারব না। কোন চরিত্রের আদর্শে আমি নিজেকে নিয়ে যেতে পারব না। যেমনি মহাভারতে ঢুকছি, সেখানে যে কোন চরিত্রের দিকে তাকালে মনে হবে, এতো আমারই মত। শ্রীকৃষ্ণ গুচ্ছের গুচ্ছের মিথ্যা কথা বলছেন, আমিও তো মিথ্যা কথা বলি। যুধিষ্ঠিরের জুয়ার নেশা, এমনই নেশা যে নিজের স্ত্রীকেও দানে লাগিয়ে দিয়েছে, সেও যদি সশরীরে স্বর্গ যেতে পারে, তাহলে আমারও সুযোগ আছে। মহাভারতের যে কোন একটা চরিত্র নিলে দেখা যাবে সবাই এক একটা দুর্গুণের পোটলা, আর রামায়ণের যে কোন একটা চরিত্র নিচ্ছি, দেখছি সে একটা সৎগুণের পোটলা, দুর্গুণ কোথাও নেই। রামায়ণের কোন চরিত্রের

দুর্গুণ নেই, সে এমন একটা উচ্চমানে চলে যাচ্ছে, আমরা তাকে পূজা করতে পারি। কিন্তু মহাভারতের প্রত্যেকটি চরিত্র আমাদেরই মত। অন্য দিকে যখন বাল্মীকি রামায়ণের শ্রীরামের সাথে শ্রীকৃষ্ণের তুলনা হয়, তখন অন্য রকম হয়ে যায়। শ্রীকৃষ্ণ সব রকম কর্ম করছেন, কিন্তু এমন অনাসক্ত, আর মানবীয় গুণের বশবর্তী হয়ে যে চোখের জল ফেলা, এই জিনিস শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রে কোথাও পাওয়া যাবে না। বাল্মীকি রামায়ণে শ্রীরাম তাও কোথাও কোথাও একটু চোখের জল ফেলছেন, কিন্তু রামচরিতমানসে, অধ্যাত্ম রামায়ণে চোখের জল ফেলার কোন প্রশ্নই আসে না। বাল্মীকি রামায়ণে শ্রীরাম থেকে থেকে চোখের জল ফেলছেন, আর তার সাথে কিছু কিছু মানবীয় দুর্বলতা দেখা যায়। তুলসীদাস বা ভাগবতাদি প্রণেতারা ভক্তিকে এত উঁচুতে নিয়ে গেছেন যে, তখন দেখে মনে হয় আমাদের দ্বারা হবে না। এই ব্যাপারে বাল্মীকি রামায়ণের পরেই আসে কথামৃত। বাল্মীকি রামায়ণে শ্রীরামের অনেক ইমোশানকে দেখানো হয়েছে, তিনি রেগে যাচ্ছেন, চোখের জল ফেলছেন, তারপরেই আসে কথামৃতে ঠাকুরের চরিত্র। ঠাকুর আর হৃদয়রামের মধ্যে যে ঝগড়া তাতে এক অপরকে এমন এমন গালাগাল দিতেন যে দেখে মনে হত সারা জীবনে পরস্পর আর কথা বলবেন না। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই দেখা যেত, দুজনে গলাগলি। ঠাকুর হৃদয়রামকে বলছেন, ওরে হৃদু আমি রাগলে তুই চুপ থাকবি, তুই রাগলে আমি চুপ থাকব, নাহলে খাজাঞ্চিকে ডাকতে হবে। আর হেন গালাগাল নেই যেটা এক অপরকে দিতেন না। ঠাকুর একদিন হৃদয়রামকে এমন একটা গালাগাল দিলেন যে, শুনে সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়রাম বলছে, তুমি যে আমার মামা হও, এ তুমি কি গালাগাল দিচ্ছ! ঠাকুরও বলছেন, মামা হলাম তো কি হল, গালাগাল তো দিতে হবে।

এটাই স্বামীজী বলছেন, যীশু একজন মানুষ, মানুষ বলেই তিনি মানুষ রূপেই জগতের অপবিত্রতা, দোষগুলো দেখতেন। সেভাবেই তিনি শিক্ষা দিতেন, সেভাবেই তিনি কথাগুলো বলতেন। সেইজন্য তাঁর মধ্যে দোষটা দেখছেন মানুষের, আর ভয় যে ঢোকাচ্ছেন, এটারও খুব দরকার। বলছেন, but God, infinitely higher, does not see iniquity and cannot be angry. (*কিন্তু ঈশ্বর অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ, তিনি জগতে কিছু অন্যায় দেখতে পান না, সুতরাং তাঁর ক্রোধেরও কোন কারণ নেই।*) তিনি এত উপরে যে, কে ভাল কে মন্দ এসবের দিকে তিনি কি আর তাকেবেন! আমরা কে ভাল কে মন্দ নিয়ে এখানে লাফালাফি করছি, কিন্তু যিনি স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণের সমষ্টি সেই ঈশ্বর, তাঁর ভারি বয়ে গেছে দেখতে কে ভাল কে মন্দ। এ্যারোপ্লেনে করে যাওয়ার সময় নীচের দিকে তাকালে একতলা বাড়ি আর তিনতলা, পাঁচতলা বাড়ি সব একই রকম দেখায়। ঠিক তেমনি ভগবানের কাছে উঁচু নীচু কিছুই মনে হয় না।

ঈশ্বরের কাছে হিংসাবাদ, নিন্দাবাদের কোন স্থান নেই

আর বলছেন, Denanciation is never the highest. (*অন্যায়ের প্রতিবাদ বা নিন্দাবাদ কখন সর্বোচ্চ ভাব হতে পারে না।*) সেইজন্য অপরের নিন্দা করাটা কখনই ভাল না। David's hand were smeared with blood; he could not build the temple, (*ডেভিডের হস্ত শোণিতে কলুষিত ছিল, সেই জন্য তিনি মন্দির নির্মাণ করতে পারেননি।*) জহুদিরা তাদের ভগবান জিহোবাকে মানত, জিহোবা তাদের বলেছিলেন, তোমরা আমাকে মানো, আমি তোমাদের একটা অক্ষয় সাম্রাজ্য দেব। এটা তিনি বলেছিলেন মোজেসকে। কিন্তু কিছু লোক এই কথা বিশ্বাস করল না। তাতে ভগবান এতো রেগে গেলেন যে, বলে দিলেন, এরা যত দিন আছে আমি তোমাদের শান্তিতে থাকতে দেব না। এরপর বিভিন্ন দিক থেকে এদের উপর আক্রমণ হতে শুরু হতে লাগল, কেউ ওই আক্রমণে টিকতে পারছে না। ভগবানের কথায় যাদের যাদের সন্দেহ হচ্ছিল, তারা সবাই এক এক করে শেষ হয়ে গেল। এরপর ভগবান তাদেরকে ইজ্রায়লের একটা জায়গায় নিয়ে এলেন। সেই সময় ভগবান সব সময় তাদের সাথে ছিলেন। ওরা যেখানে যেখানে যাচ্ছে দেখছে একটা মেঘের মত ছায়া সব সময় তাদের উপর ছায়া বিস্তার করে সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে। এটা যেন ঈশ্বরের কৃপার চিহ্ন, দেখাচ্ছে ঈশ্বরের কৃপা সব সময় তাদের উপর আছে। মোজেসকে যে ভগবান অঙ্গীকার দিয়েছিলেন, আমি তোমাদের সাথে আছি, এটাই হল তার লক্ষণ। রাত্রিবেলা তারা একটা টেবিল রাখত, তার চারিদিকে বড়রা বসতেন। ডেভিড তখন সাম্রাজ্য স্থাপনা করছে, ডেভিড প্রচুর মানুষের হত্যা করেছিল নিজের লোকেদের বাঁচাবার জন্য। ডেভিডের খুব ইচ্ছে হল ভগবানের একটা মন্দির হোক। ভগবান তখন বলছেন, তুমি মন্দির করবে, কিন্তু

তোমার হাত তো মানুষের রক্তে রঞ্জিত, তুমি মন্দির বানাতে পারবে না। পরে ডেভিডের ছেলে ওই মন্দির নির্মাণ করেছিল। স্বামীজী এটাই এখানে উল্লেখ করে বলছেন, ডেভিড একদিকে জিউসদের রাজা অন্য দিকে জেহোবা অর্থাৎ জিউসদের ভগবানের এত নিষ্ঠাবান ভক্ত, কিন্তু তার হাত রক্ত রঞ্জিত হওয়ায় সে মন্দির তৈরী করতে পারল না। তার মানে, যেখানেই denunciation, যেখানেই এই ধরণের negativity আছে, যেখানে মানুষকে খুন করা হচ্ছে, ছোট করা হচ্ছে, ভগবানের ভক্ত হলেও সে ভগবানের কাজে লাগে না। এখানে স্বামীজীর বক্তব্য খুব স্পষ্ট, ঈশ্বরের নামেও যদি হিংসা করা হয়, ঈশ্বর তাকে স্থান দেবেন না। ডেভিড জহুদি ধর্মের জন্যই মারামারি কাটাকাটি করেছিল, কিন্তু তাও ভগবান তাকে মন্দির নির্মাণের অধিকার দিলেন না, বলছেন, তোমার হাত রক্তে রঞ্জিত।

ঠিক ঠিক অধ্যাত্ম বলতে আমরা সাধারণ ভাবে যা বুঝি, তাতে উপর উপর সব কিছু দেখে মনে হয় অধ্যাত্ম জিনিসটা খুব সহজ সরল। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে যতক্ষণ কেউ এর গভীরে না যাবে, ততক্ষণ অধ্যাত্মকে ধারণা করা খুব কঠিন। অবতার আর আচার্যের মধ্যে একটা মৌলিক তফাৎ আছে। অবতার কখন নিজের মন বুদ্ধিকে শিক্ষা দেওয়ার সময় লাগান না, তাঁরা তাঁদের প্রত্যক্ষ উপলব্ধ সত্যগুলিকেই সামনে রেখে দেন। যেমন ঠাকুর, আধ্যাত্মিক ব্যাপারগুলোকে নিয়ে যখন বলছেন তখন কখনই তিনি তাঁর মন বুদ্ধিকে লাগাতেন না। কিন্তু আচার্য যখন শিক্ষা দেন তখন তাঁকে তাঁর মন বুদ্ধি লাগাতে হবে, লাগাতে বাধ্য। মন বুদ্ধিকে লাগানো জিনিসটা কি? আমি যে পরম্পরায়, যে শিক্ষাদীক্ষায় বড় হয়েছি, আধ্যাত্মিক শিক্ষাতেও সেটার ছাপ পড়ে। কথামৃতে ঠাকুরের যত উপমা আছে, সব উপমার স্থান ও পাত্র হল দক্ষিণেশ্বরের কাছাকাছি অঞ্চলগুলি, কলকাতা আর কামারপুকুর; কামারপুকুরের তো প্রচুর উপমা। তার সাথে গ্রামের লোকেদের যেসব ধারণাগুলো আছে, সেগুলোকে আধার করে সব উপমা আসছে। কিন্তু উপমা উপমা, উপমা আধ্যাত্মিক সত্য নয়। যেমনি আধ্যাত্মিক সত্যে ঠাকুর নামছেন, সঙ্গে সঙ্গে কথাগুলো পুরো পাল্টে যাচ্ছে। জগন্মাতা প্রত্যক্ষ হয়ে ঠাকুরকে যে কথাগুলো বলেছিলেন, শুধু সেই কথাগুলোই থাকছে। দ্বিতীয়তঃ মূল্যবোধ, নৈতিকতার যখন কিছু আসছে, যেগুলো আমাদের করার কথা, সেখান থেকে যে আধ্যাত্মিক সত্যগুলো বেরিয়ে আসে, শুধু সেটাকেই বলছেন। আচার্যকে আমরা খুবই সম্মান করি, কিন্তু তিনি অবতার কিনা, নাকি শুধু আচার্য, এটা বোঝার ক্ষমতা আমাদের নেই। তিনশ চারশ বছর যাওয়ার পর লোকেরা বুঝতে পারবে, ইনি অবতার, নাকি আচার্য। স্বামীজীকে আমরা আচার্য রূপেই দেখি, যদিও শাস্ত্রে অবতারের যেসব গুণের কথা বলা হয়েছে, তার সব গুণই তাঁর মধ্যে আছে। কিন্তু ঠাকুর নিজেই বলছেন, ও এক ঋষি, ঠাকুর সপ্তর্ষি মণ্ডল থেকে স্বামীজীকে নিয়ে এসেছেন। আমরা এখনও এই কথাকে মেনে চলছি। স্বামীজী যখন শিক্ষা দিচ্ছেন তখন সেখানেও আমরা তাঁর নিজস্ব মন বুদ্ধি, তিনি নিজে যা শিক্ষা পেয়েছেন, তার প্রভাব দেখতে পাই। আধ্যাত্মিক ব্যাপারে গিয়ে ঠাকুর যেমন প্রত্যক্ষ করা জিনিসগুলিকেই বলছেন, স্বামীজী একই ভাবে তাঁর প্রত্যক্ষ করা জিনিসগুলিকেই বলছেন আর তার সাথে আমাদের করণীয় কি, সেই ব্যাপারে তিনি যেটা সত্য সেটাকেই প্রাসঙ্গিকতা বজায় রেখে বলছেন। একবার যদি আমরা বুঝে নিতে পারি, কোনটা আধ্যাত্মিক ব্যাপার আর কোনটা ধর্মের সামাজিক রূপ, তখন আমরা ধর্মের সামাজিক রূপ নিতেও পারি, নাও নিতে পারি। হয়ত মনুস্মৃতির মত আজকে প্রাসঙ্গিক নাও থাকতে পারে। কিন্তু আধ্যাত্মিক ব্যাপার গুলিতে ঠাকুরকে, স্বামীজীকে কোন প্রশ্নই করা যায় না। কারণ এগুলো ওনাদের প্রত্যক্ষ করা সত্য। এই জিনিসটাকে মনে রাখলে আমাদের পক্ষে দেববাণী বুঝতে সুবিধা হবে। স্বামীজীর অন্যান্য যা কিছু আছে তার বেশির ভাগটাই হল লেকচারস্, সেখানে তিনি একজন আচার্য। কিন্তু দেববাণীতে তিনি অবতার, অবতার যেভাবে শিক্ষা দেন, দেববাণীতে তিনি ঠিক সেইভাবে শিক্ষা দিচ্ছেন।

এখানে তিনি হিংসাকে নিন্দা করছেন, তা হিংসা যে কোন ধর্মেই হোক। আগে তিনি যে কথা বলেছেন, সেটাকেই তিনি আবার বলছেন, The more we grow in love and virtue and holiness, the more we see love and virtue and holiness outside. (*আমাদের হৃদয়ে প্রেম, ধর্ম ও পবিত্রতার ভাব যতই বাড়তে থাকে ততই আমরা বাইরে প্রেম, ধর্ম ও পবিত্রতা দেখতে পাই।*) যেমন যেমন আমরা পবিত্র হতে থাকি, যেমন যেমন আমাদের ভিতরে ভালবাসা, করুণা বাড়তে থাকবে, তেমন তেমন আমরা বাইরেও এই জিনিসগুলিকে দেখতে পাবো। আমরা দেখি, যখনই কোথাও দাঙ্গা, রায়েট হয়, তখন সেখানে পুলিশ কর্তৃপক্ষ, সরকারের প্রতিনিধিরা মিলে একটা শান্তি কমিটি তৈরী করবে, তারা দুই সম্প্রদায়ের নেতাদের নিয়ে

বসে শান্তির ফিরিয়ে আনার কথা আলোচনা করবে। এভাবে কি কখন শান্তি হয়? প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯১৮ সালে লিগ অফ নেশান স্থাপিত হওয়ার কথা শুনে শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন, ওগুলো সব মুখের কথা। ভিতরে কারুরই শান্তির ভাব নেই, ভিতরে শান্তি হলে তবেই বাইরে শান্তি আনা যাবে। গান্ধীজী সত্য, অহিংসা আগে নিজের ভিতরে নিয়ে এসেছিলেন, তারপরে তিনি সেটাকে বাইরে প্রয়োগ করলেন। আমাদের সমস্যা হল, ভিতর থেকে আমরা ভায়োলেন্ট, ভিতর থেকে চাইছি সামনের লোকেদের আমি দাবিয়ে রাখব, কিন্তু মুখে আমরা বলছি, আমরা শান্তি চাই, সবাই বড় হোক। ঠিক তেমনি পবিত্রতা, করুণা, ভালবাসা এগুলোকে চেষ্টা করে করে আগে হৃদয়ের মধ্যে আনতে হয়।

চেষ্টা বিভিন্ন ভাবে করা যায়, একটা হলে লোকেদের সাথে ব্যবহারের দ্বারা এগুলোকে নিজের ভিতরে নিয়ে আসা, আর দ্বিতীয় হয়, ওই ভাবকে আশ্রয় করে সে সাধনা করছে। ঈশ্বরের চিন্তা করা বা সাধনা করার অর্থই হল, পবিত্রতা, করুণা, ভালবাসা এগুলোকে নিয়েই সাধনা করা। ধীরে ধীরে এবার তার ব্যক্তিত্বে পরিবর্তন আসতে শুরু হয়ে যাবে। এরপর বাইরেও সে পবিত্রতা, করুণা, ভালবাসা, এগুলোই দেখবে। হিন্দু জাতি ধর্মের প্রতি সমর্পিত ছিল, হিন্দু ধর্মের যেটা শেষ কথা, যে কথা স্বামীজী দেববাণীতে বার বার বলছেন, ভারতে বিবেকানন্দ লেকচার গুলিতে বার বার বলছেন, অদ্বৈতই সত্য, Divine Oneness এটাই সত্য। Divine Oneness যদি সত্য হয়, তাহলে ধর্মের নামে এক অপরকে কি করে মারতে পারে, সম্ভবই না। ইতিহাসে তাই কোথাও পাওয়া যাবে না যে, হিন্দুরা অন্য ধর্মের উপর অত্যাচার করেছে। কদাচিৎ দক্ষিণ ভারতে কিছু কিছু রাজা ছিল, যারা শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত এগুলোকে নিয়ে মারামারি করত, কিন্তু সেখানে ধর্ম থেকেও রাজনীতির প্রভাব বেশি যুক্ত থাকত। হিন্দু মনকে সাধারণ ভাবে প্রথম থেকে এই আকারে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে, দেখ ভাই, ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। তার মানে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, এই ভাব, এটাও কিন্তু অবস্তু, তাই সবাইকে বড় হওয়ার সুযোগ দাও, কারুর ক্ষতি করো না। স্বামীজী সেখান থেকে এবার এগোচ্ছেন, যেমন যেমন ভিতরে তোমার ভালবাসা, করুণা বাড়বে তেমন তেমন তুমি বাইরেও দেখতে থাকবে। বাইরে যদি দেখ, সব বদমাইশ, বুঝবে ভিতরে ভিতরে তুমিও একটা বদমাইশ। নিজে মন্দ না হলে বাইরে তুমি কখনই মন্দ দেখবে না, স্বামীজী এই কথা বার বার বলতেন। একটা শিশুর মধ্যে পাপবোধ থাকে না, বাড়িতে যদি একটা চোর ঢুকে যায়, সে তাকে দেখে বুঝবেও না যে লোকটি একটা চোর। আমরা নিজেরা যেমন, জগৎকেও সেইরূপ দেখে থাকি। আমাদের ভিতরে যা, বাইরেও তাই দেখে থাকি।

ব্রহ্মাণ্ডে যা অণুতেও তাই

স্বামীজী বলছেন, All condemnation of others really condemns ourselves. (*আমরা অপরের কার্যের যে নিন্দাবাদ করি, তা প্রকৃতপক্ষে আমাদের নিজেদেরই নিন্দা।*) অপরকে নিন্দা করা মানে আসলে নিজেকেই নিন্দা করা। এই জায়গাতে এসে স্বামীজী একট থিয়োরী নিয়ে আসছেন, যে থিয়োরী স্বামীজী অনেক জায়গায় বলতেন, Adjust the microcosm (which is in your power to do) and the macrocosm will adjust itself for you, (*তুমি তোমার ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডকে ঠিক কর –যা, তোমার হাতে রয়েছে –তা হলে বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডও তোমার পক্ষে আপনা-আপনি ঠিক হয়ে যাবে।*) স্বামীজী হিমালয় ভ্রমণের সময় আলমোড়াতে কিছু দিন ছিলেন। আলমোড়ার কাছেই কাঁকড়িঘাট নামে একটা খুব সুন্দর জায়গা আছে। একটা নদীর ধারে পিপ্পল গাছের তলায় বসে স্বামীজী সেখানে একদিন ধ্যান করছিলেন। পিপ্পল গাছটা এখনও আছে। ধ্যান করতে করতে ধ্যানের গভীরে গিয়ে স্বামীজীর কাছে একটা আধ্যাত্মিক সত্য পরিষ্কার হয়ে গেল। স্বামীজী বলছেন, Microcosm and macrocosm are built on same plan। Microcosm মানে সমষ্টি, সব কিছু মিলিয়ে, আর macrocosm মানে ব্যষ্টি, আমি। এটা স্বামীজীর কোন নূতন কথা না, আমাদের শাস্ত্রেই এই আধ্যাত্মিক সত্যের কথা উল্লেখ আছে – *যৎ ব্রহ্মাণ্ডে তৎ পিণ্ডাণ্ডে*, ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে, একটা ছোট্ট অণুতেও তাই আছে।

এটাই আশ্চর্যের যে, আজ থেকে ঠিক একশ বছর আগে যদি কোন বৈজ্ঞানীককে বলা হত, ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে, একটা অণুতে তাই আছে, তারা আজগুবি মনে করে হাসত। কেন হাসত? আজকেও লোকেরা এসে প্রশ্ন করে, আচ্ছা বিজ্ঞান কি ধর্মে মানে? তখন তাদের এটাই বলতে হয়, আগে দেখ ধর্ম বিজ্ঞানকে মানে

কিনা। বৈজ্ঞানিকরা তো কালকের শিশু, যে কথাগুলো আমাদের ঋষিরা হাজার হাজার বছর আগে থেকে বলে আসছেন, বৈজ্ঞানিকরা এখনও সেই কথাগুলো মানতে পারছে না, কিন্তু ধীরে ধীরে সবাই সেই দিকেই এগোচ্ছে। ডাল্টন নামে একজন বৈজ্ঞানিক ছিলেন, এ্যাটোমিক থিয়োরি তিনি প্রথম দিয়েছিলেন। তাঁর এ্যাটমিক থিয়োরিতে বলা হয়, যাবতীয় যা কিছু আছে, তাতে যে এ্যাটম সেটা indestructable, এটা হল basic unit। আমরা অবাক হয়ে যাব যে, আইনস্টাইন আসার আগে পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকরা এ্যাটমকেও মানত না, ওরা বলত, চোখ দিয়ে আমরা যেটা দেখছি না, সেটাকে আমরা মানব না, এ্যাটম চোখে দেখা যায় না, তাই এ্যাটমকেও মানত না। পরে আইনস্টাইন এসে একটা খুব interesting আইডিয়া দিলেন, সেখান থেকে একটা খুব simple experiment করে দেখানো হল, এ্যাটম আছে। সেটা থেকে তারপর পরিষ্কার হয়ে গেলে যে, এ্যাটম আছে। কিন্তু ডাল্টনের যে এ্যাটমিক থিয়োরি, তাতে এ্যাটমকে আর ভাঙা যাবে না, ওটা হল builting block, ওটাই শেষ কথা। তার মানে দাঁড়ায়, পিণ্ডের শেষ কথা হল এ্যাটম, ওটা একটা মার্বেল বলের মত সলিড।

ব্রহ্মাণ্ডে আমরা যে স্পেস দেখছি, সেই স্পেসের মধ্যে সূর্য আছে, চন্দ্র আছে আর গ্যালাক্সি আছে, নক্ষত্র আছে, একটার পর একটা চলছে তো চলছেই। এই ব্রহ্মাণ্ড আর এ্যাটম কি কখন এক হল? ব্রহ্মাণ্ডে স্পেস আর স্পেসের মাঝে মাঝে ম্যাটার। পিণ্ডের সাথে বা এ্যাটমের সাথে মিলছে কোথায়? অথচ আমাদের ঋষিরা কত হাজার হাজার বছর ধরে বলে আসছেন, ব্রহ্মাণ্ড আর পিণ্ডাণ্ড এক প্যাটার্নে নির্মিত। স্বামীজী যখন এই কথা বলছেন তখনও এ্যাটমের এ্যাটমিক থিয়োরিই চলছে। কি করে যে স্বামীজী বুকের পাটা নিয়ে এই কথা বলেছিলেন, আমাদের ভাবতেই অবাক লাগে। তারপরে এ্যাটম যখন ভাঙল, ভাঙার পর যত দিন যাচ্ছে, এ্যাটম ভেঙেই যাচ্ছে, ভেঙেই যাচ্ছে। বৈজ্ঞানিকরাও এখন বলছেন, ব্রহ্মাণ্ডে যে স্পেস, এ্যাটমেও সেই স্পেস, সেই স্পেসের মধ্যে ইলেক্ট্রন আছে, প্রোটন আছে, নিউট্রন আছে, আর ইলেক্ট্রন প্রোটনের মাঝখানে বিশাল স্পেস, সেই স্পেসে অমুক পার্টিকেল আছে, তমুক পার্টিকেল আছে, রোজই পার্টিকেল বেরিয়েই চলেছে। অনেক বলতে পারে, তোমাদের সংখ্যা তো মিলল না। এখানে কেউ সংখ্যার কথা বলছেন না, প্যাটার্নের কথা বলছেন। এরপর বিজ্ঞানে আরও এগিয়ে গেলে সেখানে নিউটনের থিয়োরিগুলো আর কাজ করবে না। এ্যাটমের ভিতরে যত চলে যাওয়া যাবে, সেখানেও নিউটনের থিয়োরি কাজ করবে না। সৃষ্টি যখন হয় তখন সমষ্টি আর ব্যষ্টির প্যাটার্ন এক।

গণিতে ফ্র্যাক্টালস নামে একটা থিয়োরি আছে, জুরাসিক পার্ক যে বই লেখা হয়েছে, তাতে ফ্র্যাক্টালের একটা থিয়োরি আছে। ফ্র্যক্টাল থিয়োরি হল, যদি ছোটতে চলে যাওয়া যায়, সেখানে সেই একই প্যাটার্ন পাওয়া যাবে, যে প্যাটার্নটা বৃহতেও পাওয়া যাবে। মহাভারতে বা পরে পরে হিন্দুদের যে গ্রন্থগুলো এসেছে, সেগুলো এই ফ্র্যাক্টাল থিয়োরিকে আধার করে আছে। যেমন জন্ম হল, জন্ম হওয়ার পর মৃত্যু হল, আবার জন্ম হল, আবার মৃত্যু হল, জন্ম আর মৃত্যুর মধ্যে সব কিছু ঘুরছে, ঠিক তেমন সৃষ্টিও ওই একই চক্রে ঘুরছে। ছোট যেভাবে ঘুরছে, বৃহতটাও ঠিক সেই ভাবেই ঘোরে। সমষ্টি আর ব্যষ্টি কিভাবে একই প্যাটার্নে তৈরী, এটাকে খুব সংক্ষেপে বলা হল।

ব্যষ্টিকে ঠিক রাখলে সমষ্টি ঠিক থাকবে

স্বামীজী বলছেন, Adjust the microcosm (which is in your ower to do) and the macrocosm will adjust itself for you, তোমার মাইক্রোটা ঠিক কর, তোমার ম্যাক্রোটা ঠিক হয়ে যাবে। এখানে স্বামীজী আরও একটা মারাত্মক থিয়োরিতে নিয়ে যাচ্ছেন, যে থিয়োরিতে বিশ্বের তাবড় তাবড় দার্শনিকদের objectivity theoryটা নস্যাৎ হয়ে যায়। তার মানে, এই পেনটা আমার জন্যও পেন, অন্যের জন্যও পেন, আমরা সবাই বলে দিতে পারি এটা পেন, সবারই জন্য এটা পেন। আমি একটা সুটকেসে সোনা ভর্তি করে নিয়ে ট্রেনে যাব। কুলির মাথায় সুটকেসটা চাপিয়ে দিলাম। সুটকেসটা এখন কুলির কাছে একটা বোঝা, আমার কাছে সোনা, subjectivity এসে যাচ্ছে। একজনের কাছে সোনা, এটা তার প্রাণ, আর কুলির জন্য বোঝা। আমাদের মন এত সাধারণ যে, এই সংসারটা আমাদের কাছে objective, কিন্তু একেবারেই objective না, পুরোপুরি subjective। সংসারে যদি সব কিছু ভাল চলে, তখন বুঝতে হবে আমার মনটা

ভাল। জগতে যদি সব খারাপ চলছে মনে হয়, বুঝতে হবে তখন ভিতরে তার মন খারাপ চলছে। হেডমাস্টার যদি কোন ছাত্রকে অফিসে ডেকে পাঠান, ছাত্রটি প্রথমে খোঁজ নেয় হেডমাস্টারের মুড কেমন আছে। যদি জেনে যায় ভাল মুডে আছেন, তখন বুঝে যায় আমার ভাল কিছু হতে যাচ্ছে। যার মন যেমন তার জগৎ তেমন। স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করে অফিসে এসে তার ব্যবহার পাল্টে যাচ্ছে, ব্যাপারটা তা নয়, পুরো জগৎ যেটা আমার, আমার জগৎ ঠিক সেই রকমই হবে আমি ভিতরে যেমনটি আছি। এখন বাইরের জগৎকে আমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারব না, microcosm আমি কি করে সামলাব! অথচ microcosm পুরোপুরি আমার মনের ভিতরে ঢুকে বসে আছে। কিন্তু macrocosm পুরোপুরি আমার নিয়ন্ত্রণে, যেমনি আমি নিজেকে ঠিক করব, microcosm, এই বিরাট জগৎ নিজে থেকেই ঠিক হয়ে যাবে।

স্বামীজী এবার একটা উপমা দিচ্ছেন। উপমার ব্যাপারে আমরা আগেও বলেছি যে, কোন শাস্ত্র পড়ার সময় একটা জিনিস আমাদের বুঝে রাখতে হবে। শঙ্করাচার্য, ঠাকুর, স্বামীজী, এনারা একটা সিদ্ধান্ত বলে দিতেন, কিংবা সিদ্ধান্ত থেকে একটা সত্যকে উদ্‌ঘাটন করতেন, তাঁরা জানতেন লোকেরা এটাকে ধারণা করতে পারবে না, মানতে চাইবে না, সেইজন্য তাঁরা এই জগৎ থেকেই একটা উপমা নিয়ে আসতেন। উপমা সব সময় একদেশীয় হয়, যে জিনিসটাকে উপমা দেওয়া হচ্ছে, একমাত্র সেটাতেই প্রযোজ্য হয়। দ্বিতীয়তঃ উপমা দিয়ে কখন সত্যে পৌঁছান যাবে না। কখন কদাচিৎ কাউকে দেখা যায়, যিনি এই গোলমালটা করেন না। যেমন, পুরুষ আছে নারী আছে, এরা বিবাহ করে, তাদের সন্তান হয়, এটাই জগতের নিয়ম। তাহলে ভগবানও তাই হবেন। ভগবান আছেন, তাঁর বিবাহ হবে, যদি স্ত্রী না পাওয়া যায়, কোন রকমে একটা জোগাড় করে দিতে হবে, ব্রহ্মাকে যেমন জোগাড় করে দিচ্ছে। বিষ্ণুর কোন দিন কোন স্ত্রী ছিল না, তাঁকেও একটা স্ত্রী জুটিয়ে দেওয়া হল। শিবেরও কোন দিন ছিল না, তাঁকেও একটা বিবাহ দিয়ে দেওয়া হল। এবার তাঁদের সন্তান দিতে হবে। বিষ্ণুকে পুরাণে অনাসক্ত রূপে দেখান হয়েছে, তাই মানসিক একটা সন্তান দিয়ে দেওয়া হল – ব্রহ্মা। শিব আর পার্বতীর সন্তান হলে কি রকম শোনাবে, কিন্তু গণেশ আর কার্তিক এসে সেটাকেও ভেঙে দিল। ঠাকুর বলছেন মূলো খেলে মূলোর ঢেকুর ওঠে। নিজেরা সংসারী, নিজের বিবাহ করেছে, নিজেদের সন্তান হয়েছে, ভগাবনকেও সংসারী বানিয়ে তার বিয়ে দিয়েছে, সন্তানও দিয়ে দিয়েছে। সন্ন্যাসীরা বাড়ি ছেড়ে আসার সময় তাঁদের মা-বাবারা এই একটা কথা বলবেনই বলবেন, তুমি ভগবানকে দেখ, সবাই জোড়া, সবারই স্বামী-স্ত্রী আছে, তুমি বিয়ে না করে সন্ন্যাসী হবে, তা কি করে হবে! নিজেরা এই রকম করেছে, সত্যটাও তাদের ওই রকমই বোধ হয়ে আছে।

স্বামীজী এখানে যে উপমা দিচ্ছেন, এই উপমা দিয়ে তিনি একটা খুব কঠিন জিনিসকে আমাদের কাছে সহজ করে বোঝাচ্ছেন, microcosm balances macrocosm। স্বামীজী hydrostatic paradoxএর কথা বলছেন। লিভারেরও একই নিয়ম, যেমন ঢেকি, ঢেকি লিভারের নিয়মানুযায়ী তৈরী। ঢেকি একদিকে লম্বা থাকে আরেক দিকে ছোট থাকে। লম্বা দিকটাকে নামাচ্ছে আর ওই দিকটা উঠছে, নামিয়ে ছাড়ার সময় ওই দিকের ফোর্সটা বেড়ে যাচ্ছে, কারণ ওই দিকটা সব সময় ভারি থাকে। মানুষের মন এমনই যে, যখনই সে কোন সত্যকে পেয়ে যায়, তখন মনে করে, এটা দিয়ে সব কিছুকে ব্যাখ্যা করে দেওয়া যাবে। অর্কিমেডিস লিভারের নিয়মটা পেয়ে গেলেন, পাওয়ার পর তিনি এত উৎসাহিত হয়ে গেলেন যে, বললেন, আমাকে যদি একটা ঠিক fulcrum দিয়ে দেওয়া হয়, মানে যেখানে ডাণ্ডা রাখা হবে, পোলটা লম্বা দিতে হবে, তাহলে আমি সমস্ত সৃষ্টিকে একটা ডাণ্ডার উপরে ব্যালেন্স করে দেব। Hydrostatic paradoxএ ঠিক ওটাই হয় আর একই নিয়ম, যেখানে বলছে, জলের যে প্রেসার হয় তাতে সেটা সমান ভাবে সম্প্রসারিত হয়। এখনও বড় বড় কারখানায় এর ব্যবহার করা হয়। কোন ভারি জিনিসকে তুলতে হবে, একটা বড় গোল পাত্রে জল ভরে দিয়ে তার উপর একটা ভারি জিনিস রেখে দেওয়া হয়, সেটা আবার সংযুক্ত থাকে খুব ছোট একটা পাতলা সিলিণ্ডারের সাথে, ওখানে একটু ওজন রেখে দিল। আমরা জানি pressure equally distributed হয়, একটু ওজন রেখে দেওয়ার জন্য এটা যত প্রেসার দিয়ে নামতে থাকবে, তাতে ওজন কম মুভ করবে, কিন্তু মুভ করবে। থিয়োরেটিক্যালি যদি বলা যায়, তাহলে হাইড্রোস্ট্যাটিক প্যারাডক্স পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ব্যালেন্স করে দেবে। যদি একটা পাইপকে জুড়ে দেওয়া যায় আর এক ফোঁটা জল যদি দিয়ে দেওয়া হয়, ও পুরোটাকে ব্যালেন্স করে দেবে এটাকে বলে প্যারাডক্স। শুনে মনে হবে না যে এটা সম্ভব, কিন্তু ফিজিক্সের দিক থেকে

mathematically এটা পুরোপুরি সম্ভব। আমাদের এটা বিশ্বাস হয় না যে, একটা বড় হাতিকে এক ফোঁটা জল দিয়ে তুলে দেওয়া যায়। আমরা হচ্ছি সেই জলের ফোঁটা, আমাকেই ঠিক করে নিতে হবে। হাইড্রোস্ট্যাটিক যেমন ব্যালেন্স করে, শুধু আমি ব্যালেন্স হলেই পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যালেন্স হয়ে যাবে। তবে এই ব্যালেন্স শুধু আমার জন্যই হবে, অপরের জন্য হবে না।

একই কথা স্বামীজী বলছেন, We cannot see outside what we are not inside, (*আমার ভিতরে যা নেই, বাইরেও তা দেখতে পাবো না।*) আমার ভিতরে যা আছে, বাইরে আমি তাই দেখব, যেটা নেই সেটাকে কখনই দেখতে পাবো না। কবি যদি বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেন তিনি চাঁদকে ঝলসানো রুটি দেখবেন, কবি যদি প্রেমের স্বপ্ন দেখেন তিনি চাঁদকে প্রেয়সীর মুখ ভেবে কবিতা লিখবেন। আর বলছেন, The universe is to us what the huge engine is to the miniature engine. (*বৃহৎ ইঞ্জিনের পক্ষে তার সদৃশ অতি ক্ষুদ্র ইঞ্জিন যেরূপ, সমগ্র জগতের তুলনায় আমরাও সেইরূপ।*) এবার স্বামীজী মাইক্রো আর ম্যাক্রোকে ইঞ্জিনের উপমা দিয়ে নিয়ে আসছেন, একটা বিশাল মেশিন আছে, সেই মেশিনের মধ্যে আবার ছোট ছোট মেশিনও ঘুরছে। আমরাও ঠিক তাই, পুরো ব্রহ্মাণ্ড একটা বিশাল মেশিন, ওই মেশিনের মধ্যে আমরাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক একটা মেশিন ঘুরে যাচ্ছি, and indication of any error in the tiny engine leads us to imagine trouble in the huge one. (*ক্ষুদ্র ইঞ্জিনটির ভিতর কোন গোলমাল দেখে আমরা বৃহৎ ইঞ্জিনটাতেও কোন গোল হয়েছে, এরূপ কল্পনা করে থাকি।*) এটা একটা হিউমার, গোলমাল হয়েছে একটা ছোট্ট পার্টে, আমরা মনে করছি পুরো যে বিশাল মেশিন চলছে, এতেই গোলমাল আছে। স্বামীজী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে একটা বিশাল মেশিনের মত দেখতে বলছেন, ওই বিশাল মেশিনে আমরা এক একটা মেশিনের ছোট্ট ছোট্ট পার্ট, আমাদের মধ্যে গোলমাল হচ্ছে, মনে করছি এই জগৎটাই গোলমেলে। ঠাকুরকে একজন এসে বলছে, ঈশ্বরে বৈষম্য দোষ আছে। কারণ তিনি কাউকে বড়, কাউকে ছোট করেছেন। ঠাকুর শুনে প্রচণ্ড রেগে গেছেন, তোমার তো ভারি বেণে বুদ্ধি। শালা নিজেদের ভিতরে বৈষম্য বোধ আছে, তাই ঈশ্বরেও বৈষম্য দোষ দেখে। আমরা নিজেরা গোলমাল করি, করার পর আমাদের কিছু হলে বলি, ঈশ্বর আমার এ কি করলেন! কিন্তু যার মধ্যে সাম্য ভাব থাকে, সে সব কিছুকে নিজের উপর নিয়ে নেয়। সমস্ত গোলমাল আমাদের নিজেদের ভিতরে, আর আমরা মনে করি সব গোলমাল বাইরে।

ভালো যা কিছু সব প্রেমের শক্তিতেই হয়

স্বামীজী একদিক থেকে আধ্যাত্মিক সত্যগুলিকে বলে যাচ্ছেন, অন্য দিকে তাঁর খ্রীশ্চান শিষ্যদের মধ্যে খ্রীশ্চান ধর্মের প্রভাবে পাপের যে ভাব থেকে গিয়েছিল, সেটাকে তিনি এইভাবে জোর আক্রমণ করছেন। কাউকে নিন্দা করা, ছোট করা, যে জিনিসগুলো তখন খ্রীশ্চান ধর্মে প্রচুর ছিল, বিশেষ করে যে কোন সেমেটিক ধর্মে, যেখানে দ্বৈত ভাব আছে, তাদের এই সমস্যাটা থাকে। এরা নিজেদের মতটাই ঠিক মনে করে, ওদের মতের বাইরে যত মত আছে, সবাইকে নিন্দা করে। যদি কেউ ঠিক ঠিক সিদ্ধান্তে চলে যায়, শুধু অদ্বৈত বেদান্ত মতের সিদ্ধান্তে না, হিন্দু ধর্মের যে কোন মতের সিদ্ধান্তে যদি যাওয়া যায়, তখন বলছেন, Every step that has been really gained in the world has been gained by love. (*জগতে যথার্থ যা কিছু উন্নতি হয়েছে, তা প্রেমের শক্তিতেই হয়েছে।*) জগতে যা কিছু ভাল হয়েছে, উন্নতি হয়েছে, তা ভালবাসা, প্রেমের শক্তিতেই হয়েছে, অপরের নিন্দা করে হয়নি। কারুর নিন্দা করে কাউকে কোন দিন ঠিক পথে আনা যাবে না। সত্যি সত্যি যদি কারুর ভাল করতে চাই, কারুর নিন্দা করা থেকে বিরত থাকতে হবে। রামকৃষ্ণ মিশনকে কিভাবে দাঁড় করাতে হবে গুরুভাইদের বলতে গিয়ে স্বামীজী বলছেন, কাউকে যদি কোন দোষ করতে দেখ, তাকে আলাদা ডেকে বোঝাবে যে, এটা ঠিক হচ্ছে না। মনুস্মৃতিতে মনু পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছেন, কোন দোষীকে যখন শাস্তি দেওয়া হবে, দেখতে হবে সেই শাস্তিটা যেন দেওয়া হয় তার শুদ্ধিকরণ ও উন্নতি বিধানের জন্য। দ্বিতীয়তঃ এই শাস্তি দেখে অন্যরা যেন ভয় পায়। বদলা নেওয়া, চোখের বদলে চোখ, হিন্দু শাস্ত্র কোন মতেই এর অনুমতি দেয় না। একজনের গাফলতির জন্য কারুর প্রাণ গেছে, ঠিক আছে, হিন্দু ধর্মের স্মৃতিশাস্ত্র অনুযায়ী তাকে শাস্তি দেওয়া হবে যাতে অন্যরা সাবধান হয়ে যায়, আর এই শাস্তি পাওয়ার মাধ্যমে তারও একটা প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যাবে। এমন কিছু কিছু অপরাধ আছে যেটা জপ-ধ্যান করে, তীর্থে গিয়ে খণ্ডন হবে না,

কিন্তু রাজা যখন দণ্ড দিয়ে দেবেন, এটাই তখন প্রায়শ্চিত্ত হয়ে সে দোষমুক্ত হয়ে যাবে। বিচারকরা দণ্ড দেওয়ার সময় বলুন, সত্যিকারের তোমার ভালর জন্য আমি এই দণ্ডবিধান তোমার উপর প্রয়োগ করছি, তা নাহলে তুমি নরকে যাবে। লোকটা হয়ত বলতে পারে, আমি নরকে বিশ্বাস করি না, আপনি আমাকে ছেড়ে দিন। এটাই আজকের সমস্যা, সব মূল্যবোধগুলো এখন একেবারেই চলে গেছে, সেইজন্য সব কিছুতে সবাই বলছে, বদলা চাই, বদলা নিতে হবে। হিন্দু ঐতিহ্যে এই ভাবধারা কখনই ছিল না। যীশু বলছেন, তোমার এক গালে চড় মারলে আরেক গাল বাড়িয়ে দেবে। অথচ খ্রীষ্টান দুনিয়ার দিকে তাকালে, ওদের মত নিষ্ঠুর জাতি কোথাও পাওয়া যাবে না, মুখে বলে এক রকম, কাজে করে আরেক রকম। সমরাসেট মঙ্ক ফাদারদের নিয়ে এমন এমন সব কাহিনী লিখেছেন যে, পড়লে হতবাক হয়ে যেতে হয়। আমাদের এখানে বিচারের মূল উদ্দেশ্য হল ব্যক্তি ও সমাজের ভাল করা। যে অপরাধী সেও ঈশ্বরের সন্তান, আমিও ঈশ্বরের সন্তান, সেদিক দিয়ে আমরা সবাই ভাই, নিজের লোকের প্রতি যে রকম ভালবাসা থাকে, অপরের প্রতিও সেই ভালবাসা থাকবে।

সেইজন্য স্বামীজী বলছেন, criticizing can never do any good, it has been tried for thousands of years. Condemnation accomplishes nothing. (*দোষ দেখিয়ে দেখিয়ে কোন কালে ভাল কাজ করা যায়নি। হাজার হাজার বছর ধরে সেটা পরীক্ষা করে দেখা গেছে। নিন্দাবাদে কোন ফল হয় না।*) হাজার হাজার বছর ধরে দেখা গেছে যে, নিন্দা করে, সমালোচনা করে, শাস্তি দিয়ে ভাল কিছু হয় না, তাই ভালবাসতে শেখ। ভারতীয় যে প্রথা, সেখানে কাউকে শাস্তি দেওয়াটাও ভালবেসেই দেওয়া হয়। সন্তান অন্যায় করলে মা কি তাকে শাস্তি দেয় না? যে মা শাস্তি দেয় না, সেই মা কিন্তু সন্তানের মঙ্গল না করে ক্ষতিই করছে, আর যে মা শাস্তি দেয়, সেই শাস্তিটা ভালবেসেই দেয়, তার মঙ্গল চিন্তা করেই দিয়ে থাকে। এই ভালবাসা যদি ভিতরে না থাকে, তাহলে তুমি নিজেকে আধ্যাত্মিক পথের পথিক বলে ভাবতে যেও না।

দ্বৈতবাদের সমস্যা

এই কথা বলার পর স্বামীজী বলছেন, A real Vedantist must sympathaise with all, (*যথার্থ বৈদান্তিককে সকলের সাথে সহানুভূতি করতে হবে।*) প্রকৃত বেদান্তীর সবারই প্রতি ভালবাসা থাকবে। Monism, or absolute oneness is the very soul of Vedanta. (*কারণ অদ্বৈতবাদ বা সম্পূর্ণ একত্বভাবই বেদান্তের সারমর্ম।*) একত্ব, যেখানে বলা হয় আত্মাই আছেন, এটাই বেদান্তের প্রাণ। হিন্দু ধর্মে যাবতীয় যা কিছু আছে, শিক্ষা ব্যবস্থা, দণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা, জীবন-ধারার কথাই হোক, দর্শন হোক, সবটাই এই একত্বকে নিয়ে চলছে। হিন্দুরা যখন বলে বসুধৈব কুটুম্বকম্, তাতে মুসলমান, খ্রীশ্চানকে বাদ দিয়ে বলে না। কিন্তু এখানে একটা condition আছে। Dualists naturally tend to become intolerant, to think theirs as the only way. (*দ্বৈতবাদীরা সাধারণতঃ গোঁড়া হয়ে থাকে –তারা মনে করে তাদের পথই একমাত্র পথ।*) যেখানেই দ্বৈতবাদ আসে, ঈশ্বর আছেন ও আমি আছি, সেখানেই দ্বৈতবাদীদের সমস্যা হয়ে যায়, আমার ঈশ্বরকে যে মানবে না সে আমার শত্রু। দ্বৈতবাদীদের এটা স্বাভাবিক এবং সর্বত্র এই নিয়ম থাকবে। The Vaishnavas in India, who are dualists, are a most intolerant sect, (*ভারতের বৈষ্ণব সম্প্রদায় দ্বৈতবাদী, আর তারা অত্যন্ত গোঁড়া।*) ভারতে বৈষ্ণবরা প্রচণ্ড অসহিষ্ণু। ইন্দোরে দেশের একটি নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর, তিনি নিজে একজন বৈষ্ণব, গর্ব করে বলছেন, আমাদের গ্রামে এখনও কোন শৈবকে দেখে নিলে গঙ্গা স্নান করে, আমিও করি। তার মানে, শৈবকে দেখে নেওয়াটা পাপ, আর এটা কোন আদিম সমাজের নিয়ম নয়, একবিংশ শতাব্দীর বৈষ্ণবদের এটা বিশ্বাস, এতই তারা গোঁড়া। দক্ষিণ ভারতে যত সমস্যা আছে, তার মূল হল এই শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত এদের লড়াই। স্বামীজী কেরলের গোটা মালাবার এলাকাকে বলছেন, whole Malawar coast is a lunatic assylam। ওদের ক্লাশ সিক্স সেভেনের পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে, Who told that Malawar is a lunatic assylam? উত্তরে লেখে, Swami Vivekananda।

এবার শৈবদের নিয়ে বলতে গিয়ে স্বামীজী ঘন্টাকর্ণের গল্পটা বলছেন। গল্পটা অনেকেই শুনে থাকবেন, সংক্ষেপে হল, ঘন্টাকর্ণ শিবের পরম ভক্ত। এমন ভক্ত যে, সে শিব ছাড়া অন্য কোন দেবতার নাম উচ্চারণ কানে শুনবে না। পাছে অপর দেবতার নাম শুনতে হয়, সেই ভয়ে সে দু-কানে দুটো ঘন্টা বেঁধে রাখত। ভগবান শিব তার প্রগাঢ় ভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে ভাবলেন, শিব ও বিষ্ণুতে যে কোন প্রভেদ নেই, এটা ওকে শিক্ষা দিতে হবে। একদিন অর্দ্ধ বিষ্ণু ও অর্দ্ধ শিব রূপে শিব তার সামনে হাজির হয়েছেন। ঘন্টাকর্ণ এটাকে মানবে বা। ধূপ বাতিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পূজা করছে, দেখছে বিষ্ণুর নাকে ধূপের সুগন্ধ যাচ্ছে। ওর পছন্দ হল না, তাড়াতাড়ি করে বিষ্ণুর নাকে তুলো গুজে দিয়েছে, যাতে বিষ্ণুর নাকে সুগন্ধ না যেতে পারে। ভগবান শিব রেগে গিয়ে বললেন, তোমার মধ্যে অসুরের ভাব, যাও তুমি অসুর যোনিতে গিয়ে জন্ম নাও। এখানে আমাদের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে, ঠাকুরও তো হনুমানের ভক্তির কথা বলছেন, হনুমান দ্বারকায় গেছেন, শ্রীকৃষ্ণ তাড়াতাড়ি করে রুক্মীণিকে বলছেন, শিগ্গিরি তুমি সীতার রূপ ধারণ কর, আমিও শ্রীরামের রূপ ধারণ করে নিচ্ছি। দুটোতে তফাৎ আছে।

ঘন্টাকর্ণের যে কাহিনী বলা হচ্ছে বা ভালবাসার নামে আমরা চারিদিকে যা দেখছি, এটা হল mental illness, দুর্বল চিত্তের লক্ষণ। একনিষ্ঠা ভক্তিতে ভক্তি ভালবাসার শেষ কথা। কথামৃতে ঠাকুর প্রেমাভক্তির কথা বলছেন, প্রেমাভক্তির আরেকটি নাম বলছেন অব্যাভিচারিণী ভক্তি। অব্যাভিচারিণী ভক্তিতে ভক্ত বলেন আমি ভগবানের এই রূপকেই ভালবাসি, এই রূপই আমার শেষ কথা। ব্যাভিচারিণী ভক্তিকে ঠাকুর বলছেন, জ্ঞানমিশ্রিতা ভক্তি। আমি কৃষ্ণকেই ভক্তি করি, সেই কৃষ্ণই সব কিছু হয়েছেন, সবার মধ্যে কৃষ্ণই আছেন, এটা হয়ে যায় জ্ঞানমিশ্রিতা ভক্তি। ঠাকুর বলছেন, ভক্তি পাকলে ভাব হয়, ভাব পাকলে মহাভাব হয়, আর মহাভাব পাকলে শেষে প্রেম হয়। ওই প্রেমের অবস্থায় ভক্ত যদি চলে যায়, তখন সে ওই রূপের বাইরে অন্য কোন রূপ নেবে না। যশোদাকে সবাই বোঝাতে গেছে, তোমার কৃষ্ণ তো সবারই ভিতরে আছেন, শুনে যশোদা সঙ্গে সঙ্গে বলছেন, 'থাক থাক, ওসব কথা শুনে আমার কাজ নেই, আমার কৃষ্ণকেই আমি চাই'। ঠাকুর আবার গোপীদের উপমা এনে বলছেন, গোপীরা দ্বারকা গেছেন, কৃষ্ণ সেখানে রাজার বেশে দেখা করতে এসেছেন। গোপীরা কৃষ্ণকে দেখে বলছেন, 'ও বাবা! এ আবার কে? আমরা তো একে চিনি না, আমাদের সেই ময়ূরপুচ্ছযুক্ত পাগড়ি বাঁধা মোহনরূপী মুরলীধারী কৃষ্ণকে চাই, এই রাজমুকুটধারী পুরুষকে দেখে আমরা নষ্টা হতে চাই না'। এর সাথে ঠাকুর আবার বলছেন, এক পতিব্রতা নারী বাড়ির সবার দেখাশোনা করে, শ্বশুড়, ভাসুর, দেওর সবারই যত্ন করছে, কিন্তু স্বামীর সাথে তার আলাদা সম্পর্ক। যশোদা, গোপী, হনুমান এগুলো সব পৌরাণিক কাহিনী, আক্ষরিক অর্থে সত্য নয়। কিন্তু তাই বলে যশোদা, বা গোপী বা হনুমান কেউই বলবেন না যে, আমি কৃষ্ণকেই মানি, রামকে আমি মানি না বা রামকে আমি মানি, কৃষ্ণকে অস্বীকার করি। তুমি বলছ, যে রাম সেই কৃষ্ণ হয়েছেন, হতে পারে, কিন্তু আমার লাগবে না। যারা fanatic হয়, মানসিক দুর্বল হয়, তারা বলবে, আরেকবার তোমার ভগবানের নাম করেছ তো, তোমার গলা কেটে রেখে দেব।

মনস্তাত্ত্বিক বিজ্ঞানে বলে, প্রতিভাবান আর পাগলের মধ্যে বেশি তফাৎ থাকে না। মনস্তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীরা অবশ্য অনেকেই বলেন যে প্রতিভাবানরা এমনিতেই স্বাভাবিক হন না, তাই বলে আমাদের কাছে গরু ছাগল না। ওদের কাছে একটা প্রচলিত ধারণা আছে, মানুষ মানে এই রকম, বড় হল পড়াশোনা করল, পড়াশোনা করে একটা চাকরি করল, একটা বিয়ে করল, দুটো বাচ্চা হল। কিন্তু বলছেন, যেমনি একটু বেশি বুদ্ধিমান হয়ে গেল, মনস্তাত্ত্বিকদের কাছে এদের সংজ্ঞা হয়ে গেল অস্বাভাবিক। তাদের কাছে প্রতিভাবান মানেই a plain case of abonormality, ওই abonormalityটাই পরে হয়ে গেল insanity। Abnormalityর দুটো রূপ, একটা হল insanity, আরেকটা হল genius। ঠিক তেমনি ভক্তির দুটো রূপ, একদিকে হয়ে যাচ্ছে প্রেমাভক্তি, যেটা genius, আর একটু এদিকে চলে গেলে হয়ে যাবে গোঁড়ামি। স্বামীজী এখানে নিন্দা করছেন গোঁড়ামির। এরপর স্বামীজী মাংস খাওয়া নিয়ে বলছেন।

আমিষ ও নিরামিষ

The meat-eating animal, like the lion, gives one blow and subsides, but the patient bullock goes on all day, eating and sleeping as it walks. (*মাংসাশী প্রাণী –যেমন*

সিংহ –একবার শিকার করেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু সহিষ্ণু বলদ সারাদিন চলেছে, চলতে চলতেই সে খেয়ে ও ঘুমিয়ে নিচ্ছে।) সিংহ প্রচণ্ড শক্তিশালী, কিন্তু শিকার করতে গিয়ে ঝাঁপিয়ে একবার একটা কিছু শিকার করে নেওয়ার পর আর ওদের বেশি ক্ষমতা থাকে না। এগুলোকে নিয়ে প্রচুর গবেষণামূলক লেখা আছে। হরিণ খুব জোরে দৌড়াতে পারে, খরগোশ অত জোর দৌড়াতে পারে না, কিন্তু খরগোশের সাংঘাতিক acceleration, যাচ্ছে ডান দিকে হুট করে বাঁ দিকে চলে যাবে। যে পশুরা ওদের ধাওয়া করছে, ওরা সবাই মাংসাশী, মাংসাশী বলেই হরিণ, খরগোশকে ধাওয়া করছে। হরিণ যদি একবার দূরত্ব বাড়িয়ে নেয় আর একবার যদি রাস্তা পাল্টে নেয়, তখন সিংহই হোক, বাঘ হোক, চিতা হোক, ওরা আর তার নাগাল পাবে না। কারণ ওদের শর্ট পার্সে এনার্জিটা থাকে, আর সেই এনার্জিটা প্রচণ্ড শক্তিশালী, এক থাবাতেই শেষ করে দেবে। কিন্তু কোন রকমে যদি ওদের হাত থেকে বেঁচে যায়, ওকে আর ওরা কিছু করতে পারবে না। অন্য দিকে বলদ, সারাদিন গাড়ি, লাঙল টেনেই যাচ্ছে, কিন্তু ঘাস খায়। নিরামিশাষীরা এই পয়েন্টটাকে তাদের সপক্ষে প্রায়ই বলে থাকে।

স্বামীজী যখনই আমেরিকা আর চীনাদের তুলনা করতেন, সব সময় তিনি চীনাদের উপরে নিয়ে গেছেন। স্বামীজী এসব কথা কি থেকে বলতেন আমাদের জানা নেই। তবে আমরা হলাম, যদিও মজা করে বলা হয়, কর্তাভজা সম্প্রদায়। এর অর্থ হল, যার ক্ষমতা আছে, ক্ষমতবানদেরই আমরা ভজনা করে থাকি। যার ক্ষমতা আছে, যার বন্দুক আছে, টাকা আছে, তার সামনে আমরা ইঁদুর। যার ক্ষমতা নেই, তার সামনে আমরা বুক ফুলিয়ে সিংহ হয়ে যাই। স্বামীজী অন্য রকম ছিলেন। স্বামীজী যেখানেই দেখতেন একটা জাতি, সমাজ পদদলিত হয়ে আছে, তাদের প্রতি তাঁর স্নেহ ভালবাসাটা অনেক বেশি প্রকাশ পেত। স্বামীজী এই দৃষ্টিকোণ দিয়েই হয়ত এই কথা বলছেন – The ‘live Yankee’ cannot compete with the rice-eating Chinese coolie. (*সদাক্রিয়াশীল ইয়াঙ্কি ভাতখেকো চীনা কুলির সঙ্গে পেরে ওঠে না।*) আজকে ওদিক থেকে ট্রাম্প যত জোড়ে হুমকি দিচ্ছেন চীনকে, চীন তার থেকেও জোড়ে হুমকি ছাড়ছে। তখনকার দিনে চীনা লেবাররা আমেরিকাতে যে সার্ভিস দিয়েছে, আমেরিকা যে আজ তৈরী হয়েছে, তার পিছনে চীনাদের বিরাট অবদান। লেবারার রূপে চীনারাই তখন বেশি ছিল, এখনও আমেরিকাতে প্রচুর চীনারা আছে।

স্বামীজী বলছেন, While military power dominates, meat-eating will prevail; but with the advance of science, fighting will grow less, and then the vegetarians will come in but with the advance of science, fighting will grow less, and then the vegetarians will come in. (*যত দিন ক্ষাত্রশক্তির প্রাধান্য থাকবে, ততদিন মাংসভোজন প্রচলিত থাকবে। কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যখন যুদ্ধবিগ্রহ কমে যাবে, তখন নিরামিষাশীর দল প্রবল হবে।*) স্বামীজী বলতে চাইছেন, যত দিন মিলিটারি শক্তি প্রভুত্ব করবে তত দিন মাংস খাওয়াটা থাকবে। এমনিতে দেখলে দেখা যাবে, স্বামীজী মাছ-মাংস খাওয়াকে খুব সমর্থন করেছিলেন, যে কারণে সেই সময় স্বামীজীর, বিশেষ করে রামকৃষ্ণ মিশনের বাইরে খুব নিন্দা হয়েছিল। উনি দেখছেন পুরো দেশ তামসিক হয়ে গেছে, এই তামসিকতা দূর করার জন্য দেশের শক্তি বাড়াতে হবে, যার জন্য খুব করে মাংস খেতে হবে। স্বামীজী যেভাবে মাছ-মাংস খেতে উৎসাহ দিতেন, লোকেরা শুনলে আতঙ্কিত হয়ে যায়। সাধু সন্ন্যাসীরা মাছ-মাংস খাবে! ছি ছি! স্বামীজী হৃষিকেশে গেছেন, যেতে যেতে রাস্তার ধারে দেখছেন ভর দুপুরে একজন সাধু কম্বল মুড়ি দিয়ে ভঁস ভঁস করে নাক ডাকছে। স্বামীজী দেখে এত রেগে গেলেন, বলছেন, দে ব্যাটাকে লাঙলে জুতে। যুদ্ধ রজোগুণের লক্ষণ, রজোগুণকে ধরে রাখার জন্য মাংস দরকার। স্বামীজী বলছেন, বিজ্ঞানের যত উন্নতি হবে তত যুদ্ধ বিগ্রহ কমে যাবে, তখন কিন্তু নিরামিষের দিকে প্রবণতা এসে যাবে।

এখানে মজার ব্যাপার হল, রবার্ট ওপেনহাইমার এ্যটম বোমার প্রজেক্টের চিফ্ ছিলেন, এ্যটম বোমের বিভীষিকা দেখে তিনি নিজেই কেঁপে উঠেছিলেন। তারপর তিনি কয়েকজন বৈজ্ঞানিককে নিয়ে আমেরিকার তদানিন্তন রাষ্ট্রপতির কাছে একটা আর্জি নিয়ে গেলেন। ইতিমধ্যে আমেরিকার কাছ থেকে চুরি করে রাশিয়াও এ্যটম বোম বানিয়ে ফেলেছে, তারপর থেকে আমেরিকা আর রাশিয়ার মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। এখন অবশ্য অনেক দেশের কাছেই এ্যটম বোমা এসে গেছে। যাই হোক, উনি রাষ্ট্রপতির কাছে হাতজোড় করে খুব আকুতি মিনতি করে বলছেন, আমাদের এ্যটমিক প্রজেক্টটা বন্ধ করে দেওয়া হোক। কারণ আমরা যেমন যেমন

এগিয়ে যাচ্ছি, রাশিয়াও সেই ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদেরটা বন্ধ করে দিলে ওরাও থেমে যাবে, তা না করলে বিশ্বের বিনাশকে কেউ আটকাতে পারবে না। রাষ্ট্রপতি সব শুনলেন, উনিও সবাইকে নিয়ে হোয়াইট হাউস থেকে বেরিয়ে এলেন। রাষ্ট্রপতি তাঁর সেক্রেটারিকে ডেকে ওপেনহাইমারের নামে ইংলিশে একটা নোংরা শব্দ ব্যবহার করে গালাগালি দিয়ে বললেন, ওপেনহাইমারকে আর কোন দিন হোয়াইট হাউসে ঢুকতে দেবে না। মানে, সরকার এ্যাটম বোমা তৈরী করা ছাড়বে না। অথচ এটাই আশ্চর্যের যে, ১৯৪৫ সালে এ্যাটম বোমা ফেলা হল, আজ প্রায় পঁচাত্তর বছর হতে চলল, দ্বিতীয় এ্যাটম বোমা আজ পর্যন্ত পড়েনি। এ্যাটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা আরও কত রকমের সব বোমা সবাই এখন বানিয়ে যাচ্ছে, এমন এমন গোপনীয় ভাবে বানাচ্ছে যে আমরা সব কিছু জানিও না। কিন্তু এটা ঠিক যে, একদিকে যেমন টেকনলজির উন্নতি হচ্ছে, অন্য দিকে যুদ্ধের যে বিভীষিকা, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যেটা সবাই দেখেছে, কোথাও সেটা দমে গেছে। কারণ, বলে যে, একজন সবল আর আরেকজন দুর্বল হলে লড়াই হয়, সমানে সমানে কখন লড়াই হয় না। স্বামীজীর এই মত ছিল যে, বিজ্ঞান যখন অনেক এগিয়ে যাবে, তখন মানুষ যুদ্ধ বিগ্রহ থেকে পিছিয়ে আসবে।

আমাদের মনে হতে পারে যে, স্বামীজী গোঁড়ামি নিয়ে বলতে বলতে হঠাৎ উনি আমিষ-নিরামিষ প্রসঙ্গে কেন ঢুকে গেলেন? স্বামীজী ঢুকে যাননি, মিস্ ওয়াল্ডো, যিনি স্বামীজীর ক্লাশ থেকে যখন নোট করতেন, তখন স্বামীজী হয়ত আরও কিছু বলেছিলেন, কিন্তু কোন কারণে হয়ত ওই অংশটা ছেড়ে গেছেন। সেইজন্য সেখান থেকে দুম্ করে এই জায়গায় এসে গেছেন। এরপর স্বামীজী ভক্তির একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে আলোচনা করছেন।

একজন বিদগ্ধ মহারাজ, খুব বড় পণ্ডিত, তিনি একদিন খুব দুঃখ করে বলছিলেন, আমাদের এখানে স্বামীজীর কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও রাজযোগের উপর সবাই এত জোর দিয়েছে কিন্তু দেববাণীর উপর এখনও কেউ জোর দেয়নি, যদিও দেববাণী স্বামীজীর একটা খুবই অমূল্য কাজ। স্বামীজীর কর্মযোগ মানে গীতা, জ্ঞানযোগ মানে কঠোপনিষদ, ভক্তিযোগ মানে নারদীয় ভক্তিসূত্র আর রাজযোগ হল পতঞ্জলির যোগসূত্র। যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্য বা ভোজবৃত্তি যদি কেউ পড়ে নেন, তিনি রাজযোগ বুঝে যাবেন। তবে স্বামীজী হলেন স্বামীজী। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় যেখান থেকে কর্মযোগ শুরু হয়েছে সেখান থেকে তৃতীয় অধ্যায় পড়ে নিলে বোঝা যাবে স্বামীজী তাঁর কর্মযোগে এটাই বলছেন, কিন্তু নিজের মত করে ব্যাখ্যা দিয়ে বলছেন। যেমন স্বামীজী গীতার নিষ্কাম জিনিসটাকে ইংরাজীতে unselfishness বলছেন, এই একটা জিনিসকে ধরতে পারলে, পুরো কর্মযোগটা মাথার মধ্যে বসে যাবে, স্বামীজীর কর্মযোগ মানে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় আর তৃতীয় অধ্যায়কে নিজের মত ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু সব কিছু মিলবে না। যদি কেউ মেলাতে চেষ্টা করে, তাহলে তাকে অনেক খাটতে হবে। স্বামীজীর জ্ঞানযোগ যে কঠোপনিষদ, এটা সবাই জানে। রাজযোগে পরিষ্কার পতঞ্জলির যোগসূত্রের প্রত্যেকটি সূত্রকে স্বামীজী ধরে ধরে ব্যাখা দিয়েছেন। কিন্তু দেববাণী হল স্বামীজী নিজে, এখানে স্বামীজী আর আচার্য নন, তিনি এখন প্রফেট। চারটে যোগে স্বামীজী ওই বিষয়ের মধ্যেই আবদ্ধ থেকে ব্যাখ্যা করে গেছেন, মাঝে মাঝে নিজের মত করে কিছু বলছেন, নিজের মত ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, তবে প্রত্যেকটি বাক্য ওনার নিজস্ব স্টাইলে। দেববাণী স্বামীজী মুক্ত বিহঙ্গ, আধ্যাত্মিক জগতের আকাশে তিনি নিজের বিশাল ডানা বিস্তার করে বিচরণ করছেন। খুব মনযোগ নিয়ে দেখলে দেখা যাবে, দেববাণীত স্বামীজী থেকে থেকে খুব কৌশলে, নিপুণ ভাবে হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বকে প্রমাণ করে দেখাচ্ছেন, তার সাথে ইসলাম, খ্রিশ্চানিটি, জুদাইজিম্ এদের দুর্বলতা গুলিকে একেবারে সামনে টেনে এনে দেখিয়ে দিচ্ছেন, যদিও ভারতে বিবেকানন্দ (Lectures from Colombo to Almorah), যেখানে স্বামীজীর লেকচারগুলো আছে, সরাসরি অনেক কিছু বলেছেন, কিন্তু সেখানে খুব নরম করে বলছেন, আর ওখানেও দেখাচ্ছেন হিন্দু ধর্ম কেন শ্রেষ্ঠ। তফাৎ হল ওখানে তিনি হিন্দুদের মধ্যে বলছে, আর এখানে তাঁর শিষ্যরা সবাই খ্রীশ্চান ছিলেন, কেউ কেউ আবার প্রচণ্ড গোঁড়া খ্রীশ্চান ছিলেন। দেববাণীতে একেবারে সরাসরি দুর্বলতা গুলি দেখিয়ে দিয়ে আক্রমণ করছেন। তবে এটা ঠিক, দেববাণীতে যা কিছু আছে সবটাই খুব condensed ভাবে আছে, একটা কি দুটো বাক্যের মধ্যে একটা বিশাল বিষয়কে রেখে দেওয়া আছে। সেইজন্য দেববাণীকে গভীর শাস্ত্র বলা যেতে পারে, সবার পক্ষে দেববাণীর সব ভাবকে বুঝতে যাওয়াটাও খুব কঠিন মনে হবে। এরপর স্বামীজী ভক্তিকে নিয়ে খুব কঠিণ একটা কথা বলছেন।

আমিই আমার ঈশ্বরকে সৃষ্টি করি

We divide ourselves into two to love God,– myself loving my Self. (*যখন আমরা ভগবানকে ভালবাসি তখন যেন আমরা নিজেকে দু-ভাগ করে ফেলি – আমিই আমার অন্তরাত্মাকে ভালবাসি।*) এখানে 'myself' আর 'my Self', দুটো আলাদা শব্দ। আমরা নিজেরাই ঈশ্বরকে ভালবাসার সময় নিজেকে আমরা এই দুটো ভাগে ভেঙে দিচ্ছি – এক আমি আর আমার আত্মা। God has created me and I have created God. (*ঈশ্বর আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আবার আমিও ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছি।*) We create God in our image; it is we who create Him to be our master, it is not God who makes us His servants. (*আমরা ঈশ্বরকে আমাদের অনুরূপ করে সৃষ্টি করে থাকি। আমরাই ঈশ্বরকে আমাদের প্রভু হবার জন্য সৃষ্টি করে থাকি, ঈশ্বর আমাদের তাঁর দাস করেননি।*) স্বামীজী এই যে প্রথম বাক্যে বলছেন, আমরা ভিতরে নিজেদের দুটো ভাগে ভাগ করে দিয়েছি, এক আমি আর আমার আত্মা, এই ভাবটা আমরা কোন শাস্ত্রেই পাই না, তা সে বাইবেলই হোক, কোরাণ হোক, বেদ হোক, উপনিষদ হোক, পুরাণ হোক, কোথাও আমরা পাই না। উল্টোটা আছে, ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন। এমনকি পুরুষসূক্তমেও বলছেন, তিনিই তাঁর থেকে সব কিছু করলেন, তিনিই যজ্ঞ হলেন, তিনি যজ্ঞ করলেন, তিনি আলাদা আলাদা করে নিজেকে যজ্ঞে আহুতি দিলেন, সেখান থেকে জগতের সব কিছু সৃষ্টি হল। কিন্তু আমি যখন ঈশ্বরের বা ঠাকুরের পূজা করছি, তখন সেটা আমিই এক রূপে হয়ে আছি। আমিই এক রূপে ঠাকুর হয়ে আছি, এটা অত্যন্ত unusual। ঋগ্বেদের বিখ্যাত মন্ত্রে বলছেন, *ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি*, সেখানে ঋষি বলছেন, তুমি নারী, তুমিই পুরুষ, যুবক তুমি, যুবতী তুমি, বৃদ্ধ লাঠি হাতে চলেছে, সব তুমি, আর *বিশ্বতো মুখম্*, এই যে বিশ্বরূপ, এটাও তুমি, কিন্তু আমি এগুলো হয়েছি এভাবে বলি না। দেবীসূক্তমে বলছেন, আমিই এই জগতের সব কিছু হয়েছি, কিন্তু সেখানেও অদ্বৈত ভাব নিয়ে বলছেন।

স্বামীজী এখানে কিন্তু ভক্তি ভাব নিয়ে বলছেন। এই ভাবটা শুধু পাওয়া যাবে কথামৃতে। কথামৃতে ঠাকুর এক জায়গায় বলছেন, এর ভিতরে দুই আছেন, এক তিনি আর তাঁর ভক্ত। এটাই একমাত্র খুব কাছাকাছি আসে, এক তিনি আর তাঁর ভক্ত। এর ঠিক কি অর্থ হয়, এর দ্বারা ঠাকুর কি বলতে চাইছেন, আমাদের জানা নেই। একটা হতে পারে, কথামৃতে ঠাকুর নিজেকে একজন ভক্ত রূপে ভেবে এই কথা বলছেন। কিন্তু নরেন বা রাখালকে যখন শিক্ষা দিচ্ছেন, বা নরেনকে যখন শেষ সময়ে বলছেন, তখন তিনি অবতার রূপে বলছেন। আমরা ঠাকুরের এই দুটো রূপ দেখি, ঠাকুরের যে অবতার রূপ, সেটা কদাচিৎ মুষ্টিমেয় কয়েকজন শিষ্যের সামনে উদ্ভাসিত হতে দেখি। কথামৃতের মাধ্যমে ঠাকুর নিজেকে একজন ভক্ত রূপে আমাদের সবার কাছে আসছেন। ঠাকুর আবার বলছেন, ঈশ্বরের ইতি করা যায় না। কিছু কিছু জায়গায় বলছেন, ঈশ্বর নিজের লীলা আস্বাদ করার জন্য এই সৃষ্টি করেন। এই ভাব শিখ ধর্মেও আছে। বিবর্তন আমরা যেটা দেখছি, বিবর্তনে তিনি লীলা আস্বাদ করছেন।

এক রাজকুমারের ইচ্ছে হল রাজমহলে যে উৎসব হয় সেই উৎসবকে বাইরের একজন সাধারণ নাগরিক রূপে কেমন লাগে দেখতে। রাজকুমার সবার আড়ালে একজন কাঙালীর পোশাকে একটা গোপন দরজা দিয়ে প্রাসাদের বাইরে বেরিয়ে এসেছে। গরীবে বেশে বেরিয়ে এসে নিজের রাজ্য ঘুরে অনেক কিছু দেখে নিয়ে আবার রাজপ্রাসাদে ফিরে এসেছে। রাজপ্রাসাদের প্রধান ফটক দিয়ে রাজকুমার যখন ঢুকতে যাচ্ছে, প্রহরীরা তাকে আটকে দিয়েছে, তারা রাজকুমারকে চেনেই না, তার উপর আবার এই দীন কাঙালীর পোষাকে তো আরও চিনতে পারছে না। প্রহরীরা শুধু বলে যাচ্ছে, ভিতরে এখন আনন্দের হাট বসেছে, বাইরের কাউকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। রাজকুমার এখন মহা বিপদে পড়ে গেছে, নিজের ইচ্ছাতেই বেরিয়ে এসেছে, কিন্তু এখন আর ঢুকতে পারছে না। লোকেদের কাছে গিয়ে বোঝাতে চাইছে, তাদের কাছে সাহায্য চাইছে, লোকেরা রাজকুমারের কথা শুনে হাসছে। একজন বুদ্ধিমান লোক বলল, তুমি এক কাজ কর, একটা রাজকুমারের পোষাক জোগার করে সেই পোষাক পরে যাও। রাজকুমার এখন একটার পর একটা পোষাক পরে যাচ্ছে। প্রথমে একটা সাধারণ পোষাকে গিয়েছিল, ওকে ভাগিয়ে দিয়েছে। এরপর একটা মিলিটারি পোষাকে গেছে, ভাগিয়ে দিয়েছে। এক একটা পোষাকে যাচ্ছে, আর ওকে সব ক্ষেত্রেই ভাগিয়ে দিচ্ছে।

একজন বলল, তুমি রাজার পোষাকে যাও, তোমাকে ঢুকতে দেবে। কিন্তু রাজার পোষাক পাবে কোথায়, খুব দামী জিনিস। বেচারি রাজকুমার এবার খাটতে শুরু করল, যে তাকে রাজার পোষাক নিতে বলেছিল, সেও খাটছে। দুজনে মিলে খেটে খেটে কিছু পয়সা জমিয়েছে, বহু কষ্ট করে পয়সা জমিয়ে রাজার একটা পোষাক সংগ্রহ করতে পেরেছে। রাজার পোশাকে যখন গেছে তখন সঙ্গে সঙ্গে প্রহরীরা তাকে চিনতে পেরেছে, আরে এতো আমাদের হারিয়ে যাওয়া রাজকুমার। রাজকুমারকে খুব আদর করে আপ্যায়ন করেছে। রাজকুমার বলল, এ আমার সাথে আছে, ওকেও আসতে দাও। রাজকুমারের হুকুম, সঙ্গে সঙ্গে তাকেও যেতে দিল। এটা একটা আখ্যায়িকার রূপে বলা হল, কিভাবে সচ্চিদানন্দের ইচ্ছা হল, আমি বাইরে থেকে নিজেকে আস্বাদ করব। ভগবান এই রকম করতে পারেন কিনা জানা নেই, তবে এই রকম মত যে একেবারেই নেই তাও না। যাই হোক, তিনি নিজেকে আস্বাদ করতে গেলেন এনার্জি হয়ে, কিন্তু পারলেন না। ম্যাটার হয়ে চেষ্টা করলেন, পারলেন না। সেইখান থেকে ভাইরাস, ব্যাক্টেরিয়া হয়ে হয়ে এগোচ্ছেন, গাছপালা হয়ে, নানা রকমের পশুপাখি হয়ে হয়ে এগোচ্ছেন, কিন্তু কোথাও তিনি ঠিক নিজেকে পূর্ণ রূপে আস্বাদ করতে পারছেন না। সব কিছু হয়ে হয়ে শেষে যখন মানুষ হয়ে এলেন, তখন এবার যেন আস্বাদটা ভাল হচ্ছে। পুর্ণ রূপে আস্বাদ করার জন্য যে মানুষ, তাকেও ঈশ্বর হতে হচ্ছে। যখন নিজেকে সাক্ষাৎ শিব রূপে দেখবে, তখনই সে পুরোপুরি নিজেকে আস্বাদ করতে পারবে। কাকে আস্বাদ করে? নিজেকেই আস্বাদ করে। কে আস্বাদ করছেন? সেই ভগবানই আস্বাদ করছেন। যাঁরা সিদ্ধ হয়ে যান, তাঁদের যাঁরা সেবা করেছিল, সাহায্য করেছিল, তাঁদেরকেও তিনি উদ্ধার করে নিয়ে যান। এটাও একটা দৃষ্টিভঙ্গি।

আমরা সবাই রাজকুমার, সেই সচ্চিদানন্দ, সেই সচ্চিদানন্দের অংশ, আমরা বিভিন্ন রূপ ধারণ করে নিজেকেই, আমার আসল যে রূপ, সেটাকে আস্বাদ করতে চাইছি। কিন্তু আমরা পারছি না, কারণ মেইন গেটের প্রহরী আমাদের ঢুকতে দেবে না। গেটে তখনই ঢুকতে দেবে, যখন রাজার পোশাকে যাব, অর্থাৎ তিনি শুদ্ধ ব্রহ্ম, যাঁর মধ্যে কোন মলিনতা নেই, যাঁর মনের মধ্যে কোন পাপ নেই। কারণ ঈশ্বরকে যদি আস্বাদ করতে হয় তাহলে oneness আসা চাই, oneness থাকা মানে, ভিতরে যেন কোন ধরণের difference না থাকে। কোন difference না থাকা মানে, নির্গুণ ব্রহ্মের আস্বাদ করার জন্য তাকেও নির্গুণ নিরাকার হয়ে যেতে হবে। মনের মধ্যে কোন রকমের ভাব থাকা চলবে না, তবেই নির্গুণ ব্রহ্মের আস্বাদ হবে। এই ধরণের বর্ণনা কিছু কিছু শাস্ত্রে আছে। ঈশবাস্যোপনিষদে বলছেন, *যোহসাবসৌ পুরুষঃ সোহহমস্মি*, আদিত্যমণ্ডলে অবস্থিত যিনি পুরুষ, সেটা আমি নিজে। কিন্তু এখানে স্বামীজী পুরো জিনিসটাকে উল্টো করে নিয়ে আসছেন। টেকনিক্যালি আমাদের একই মনে হবে, কিন্তু তফাৎ আছে। এখানে স্বামীজী বলছেন, আমি আমি রূপে আছি, আবার আমি আমার ঈশ্বর রূপে আছি। যেমন ঠাকুরের ভক্ত, ঠাকুরের ভক্ত রূপে আমি আছি, আমি যখন ঠাকুরের পূজা করছি তখন আমি আমারই পূজা করছি। কথামৃতে একটা বর্ণনা আছে – ঠাকুরকে একজন ভক্ত জিজ্ঞেস করছেন, আমরা যখন পূজা করি তখন তো আমরা আসলে নিজেদেরই পূজা করছি। ঠকুর তাঁকে বলছেন, ওটা খুব উঁচু কথা। তার মানে, ঠাকুর এটা মানছেন। কিন্তু এই কথা যে কোন দ্বৈতবাদীকে বলতে গেলে তারা কানে আঙুল দেবে, আর বলবে, তোমরা পাপাচরণ করছ। অন্য ধর্ম হলে গলাটাই হয়ত কেটে দেবে।

এখন যে আলোচনা চলছে, এটা খুব উচ্চমানের অদ্বৈতবাদ। স্বামীজী যখন আমেরিকা থেকে দেশে ফিরে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় যে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, যে লেকচার গুলোকে সঙ্কলন করে ভারতে বিবেকানন্দ গ্রন্থ হয়েছে (Lectures from Colombo to Alomorah), সেখানে স্বামীজী একটা লেকচারে ভারতীয় জীবনকে নিয়ে বলতে গিয়ে অনেকগুলো কথা বলছেন, ভাইরা এমন নয় যে তোমরা এগুলো জানো না, তোমরা একটু বেশিই জানো, ওটাই তোমাদের সমস্যার মূল। যতটুকু তোমার জানার, তার থেকে তোমরা বেশি জেনে গেছ, সেইজন্য তোমাদের এত সমস্যা। স্বামীজীর এই কথাটা শুনে একটু অবাক হয়ত লাগবে, তবে ঠাকুর বলছেন, শুনে যেতে হয়, সময় না হলে কিছু হয় না। স্বামীজী এটাকে আরও জোরের সাথে বলছেন, বিশেষ করে ভারতের জন্য যে, তোমার যতটুকু জানা দরকার তার থেকে বেশি জেনে গেছ, আর সেই কারণে তোমাদের এতো সমস্যা। সিদ্ধান্ত বাক্য গুলি আগেই যদি কেউ জেনে যায়, তখন ওই সিদ্ধান্ত বাক্যগুলি তার কাল হয়ে যাবে। এটা শুধু সিদ্ধান্ত বাক্যেই না, সব জায়গাতেই হয়। একজন সাধারণ মানুষের কাছে মেরে

কেটে হাজার টাকাই আছে। তার যদি একটা লটারি লেগে যায়, দেখা যাবে কিছু দিন পরে তার লটারির টাকাটা তো চলেই গেছে, যে সামান্য টাকা ছিল, সেটাকেও নিয়ে বেরিয়ে চলে যাবে। কারণ যেটা তার পাওয়ার নয় সেটে পেয়ে গেছে, টাকাটা সে খেটে পায়নি কিনা। ওই টাকাটা পাওয়ার তার যোগ্যতা ছিল না। যোগ্যতা না থাকার জন্য, যেটা পেয়েছে সেটাতো বেরিয়েই যাবে, তার সাথে যেটা ছিল সেটাও বেরিয়ে চলে যাবে। যাঁরা বিজ্ঞানাদি নিয়ে পড়াশোনা করেন, তাঁরাও জানেন, পরিশ্রম না করে আগে যদি সিদ্ধান্ত বাক্য জেনে যায়, তার আর বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হবে না। যেমন, কোন ছাত্র পড়াশোনা না করে পরীক্ষায় বন্ধুদের খাতা দেখে নকল করে লিখে দিয়েছে। আপাতত নম্বর পেয়ে যাবে, কিন্তু পরে গিয়ে ওর জীবনে অনেক অশান্তি আসে। সিদ্ধান্ত বাক্যের ক্ষেত্রে একই জিনিস হয়। আগেই যদি সিদ্ধান্ত বাক্য জেনে যায়, বিশেষ করে ধর্মের ব্যাপারে, যেমন আজকে ঠাকুরের কথামৃত সবার কাছে পৌঁছে গেছে, উপনিষদ সবারই জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে, গীতাও সবার কাছে আছে। গীতা, উপনিষদ, বেদান্ত, কথামৃতের কথাগুলো সিদ্ধ পুরুষদের কথা, সবটাই সিদ্ধান্ত বাক্য; যাঁরা সত্যিকারের সিদ্ধির জন্য সাধনা করছেন তাঁদের জন্য, সাধারণ লোকেদের জন্য নয়। সাধারণ লোকেরা যদি এগুলো জেনে যায়, তখন তারা ভাববে, আমি তো সব জেনেই গেলাম, আমার আর জপ-ধ্যান করার কি দরকার! আমরা যেমন খুব নামকরা একটা সিদ্ধান্ত বাক্য সব সময় ব্যবহার করি, তা হল, ঠাকুরের ইচ্ছা। ঠাকুরের ইচ্ছা একটা সিদ্ধান্ত বাক্য; এই সিদ্ধান্ত বাক্য ভক্তদের যে কি মারাত্মক ভাবে সর্বনাশ করে দিয়েছে কল্পনাই করা যায় না। মানুষ যখন খেটে খেটে তপস্যার আগুনে জীবনকে পুড়িয়ে দিয়ে যখন দেখে ঠাকুরই সব হয়েছেন, তখন দেখছেন যা কিছু করার সব তিনিই করেন। কিন্তু তার আগেই যদি ঠাকুরের ইচ্ছাকে সব জায়গায় নামিয়ে নেওয়া হয়, তখন দরকচা আমের মত ফল রূপেও ব্যবহার করা যাবে না, আর চাটনি বানানোর কাজেও লাগবে না।

আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনটাও এই রকম হয়ে যায়। এখান ওখান থেকে দুটো কথা শুনে, কয়েকটা ধর্মগ্রন্থ নিজে নিজে পড়ে আমরা আমাদের একটা জীবনদর্শন তৈরী করে নিয়ে সর্বনাশের দরজাটা খুলে দিয়েছি। দেববাণীতে স্বামীজীর বেশির ভাগ কথাই সিদ্ধান্ত বাক্য, এগুলো আমরা শুনছি, আলোচনা করছি, আমরা যেন এই ব্যাপারে সাবধান থাকি যে, যেখানে সেখানে এই কথাগুলোকে লাগাতে যাওয়া চলবে না। এগুলো আধ্যাত্মিক সত্য ঠিকই, কিন্তু যতক্ষণ পরিশ্রম করে কর্মযোগ ঠিক ঠিক করা না হয়, গভীর ভাবে ধ্যান-ধারণা না করা হয়, ততক্ষণ এই কথাগুলো জীবনে সব ক্ষেত্রে চলে না। ঈশ্বর যেমন আমার স্রষ্টা, তেমনি আমিও আমার ঈশ্বরের স্রষ্টা – স্বামীজীর এই কথা কি আমাদের বিশ্বাস হয়? কিন্তু কোন মানুষ নেই যে, নিজের ঈশ্বরকে সৃষ্টি করে না, সবাই নিজের ঈশ্বরকে নিজে সৃষ্টি করে। আমাদের কে সৃষ্টি করেছেন আমরা জানি না, আমরা মুখের কথা হিসাবে বলে দিই ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন। শাস্ত্র বলছে, ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন, আমরাও শাস্ত্রের কথা মেনে নিয়ে বলছি, ঈশ্বর সবাইকে সৃষ্টি করেছেন। এরপর আমার যে ব্যক্তি ঈশ্বর, আমি যাঁকে ভগবান মনে করছি, তিনি কৃষ্ণ হতে পারেন, কালী হতে পারেন, ঠাকুর হতে পারেন, এটা পুরোপুরি আমার মন থেকে বেরিয়ে আসছে। আর তাঁকে কেমন দেখছি? যেমনটি আমার মন, ঠিক সেই-রকমটি দেখছি। যেমন ছাত্রাবস্থায় ভগবান যিনি, তিনি আমাকে স্কুলের মাস্টারদের হাত থেকে বাঁচাবেন, পরীক্ষায় ফেল হওয়া থেকে বাঁচাবেন। আরেকটু বড় হলে, যিনি আমার একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দেবেন, ভাল একটা স্ত্রী জুটিয়ে দেবেন, সন্তান হওয়ার পর তাদের সুস্থ রাখবেন, বাড়ির সব কিছু ঠিকঠাক চলবে।

এই ভগবানকে আমরা সৃষ্টি করে যাচ্ছি, এই সৃষ্টি পুরোপুরি আমার নিজের। অথচ বাইবেল পড়ে যীশুর কথা ভাবলে অবাক লাগে, যীশুর কি বিশাল ব্যক্তিত্ব; ভগবান বুদ্ধের দিকে তাকালে অবাক লাগে, কী প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব আর লীলাপ্রসঙ্গে সাধক ভাবের অংশে ঠাকুরের সাধনার কথা পড়লে ভিমরি খেয়ে যাই। কারণ একশ আটবার জপ করতেই আমাদের দম বেরিয়ে যায়, আর সেখানে ঠাকুর ওই রকম মুণ্ডুকাটা তপস্যা করছেন। সেই ঠাকুরকেও আমরা আমাদের মত করে নিয়েছি। এটাই স্বামীজী এখানে বলছেন, ঈশ্বরকে আমরা আমাদের মতই সৃষ্টি করি। শুধু যে সাধারণ অবস্থায় করি তা না, একজন যোগী বা সাধক যেমন যেমন উপরের দিকে যাচ্ছেন, সেখানেও তাঁর যে ভগবান, তাঁর মনের মতই ভগবান। কারণ দৃশ্য একই থাকে, শুধু আমাদের চশমার রঙটা পাল্টাতে থাকে, আমাদের মনটা হল চশমার মত, যতই উপরের দিকে উঠুক তখনও তার মনের ভাব চশমার রঙের মত পাল্টাতে থাকে। শেষ যে ধাপ, যেখানে চশমার আর কোন রঙ নেই, একেবারে স্বচ্ছ লেন্স,

সেখানেও ভগবান থাকেন, তা বিষ্ণু রূপেই হোক, কালী রূপেই হোক, যে যে রূপকে নিয়ে সাধনা করে এগিয়ে গেছে। ভগবান বিষ্ণুকে একজন সাধনা করে করে সিদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর অন্যরা তো কেউ বলছে না, মুসলমান, খ্রীশ্চানরা কেউ তো বলছে না, ভগবান বিষ্ণুই আছেন, অথচ তিনি বলছেন ভগবান বিষ্ণুই আছেন, কারণ তাঁর মন বিষ্ণুকেই দেখেছে। ঠাকুর মা কালীর সাধনা করেছিলেন বলে তিনি ঈশ্বরকে মা কালী রূপেই দেখছেন। রামানুজ ও তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা ভগবানকে বিষ্ণু রূপেই দেখবেন। ঠিক সেই ভাবে মহম্মদ আল্লাকেই দেখবেন। সবাই শেষ অবস্থায় যে ঈশ্বরকে দেখছেন, যেখানে চশমার কাঁচের আর কোন রঙ নেই, স্বচ্ছ কাঁচই আছে, তখনও তিনি নিজের সৃষ্টি করা ঈশ্বরকেই দেখেন।

তাহলে সত্যিকারের ঈশ্বর কি? সবটাই ঈশ্বর, বাচ্চা ছেলে যে ঈশ্বরকে বলছে, আমি যেন পরীক্ষা পাশ করতে পারি, সেটাও ঈশ্বর আর ঠাকুর যখন মা কালীকে দেখছেন, সেটাও ঈশ্বর। কিন্তু নির্বিকল্প অবস্থায় যাওয়ার পর আর মন বলে কোন কিছু থাকে না, মন নেই তাই মুখ দিয়ে কিছু বলা যাচ্ছে না, সেইজন্য তখন আর বলা যায় না, কে ঈশ্বর। তাই বলছেন, যতক্ষণ আমার ঈশ্বর আছেন ততক্ষণ এই ঈশ্বর আমার নিজের সৃষ্টি। এসব কথা শুনলে আমাদের মত সাধারণ ভক্তদের আতঙ্ক লেগে যাবে, তারা বলবে, এই কথা বলাও পাপ। কিন্তু এটাই সত্য। তাহলে কি ঈশ্বরকে আমি বাদ দিয়ে চলব? কখনই তা করতে বলা হচ্ছে না, ওই ঈশ্বরকে নিয়েই আমাকে চলতে হবে। আমার সামনে একটা উঁচু দেওয়াল আছে, দেওয়ালটা আমাকে লাফিয়ে পেরোতে হবে। লাফিয়ে পেরোবার জন্য একটা লম্বা ডাণ্ডা দরকার, দৌড়ে এসে ওই ডাণ্ডার উপর ভর করে আমাকে ওই দেওয়ালকে পেরোতে হবে। আমাদের মন হল ওই দেওয়াল। ডাণ্ডা যদি না থাকে আমি টপকাতে পারব না, লাফ দেওয়ার পরেও ডাণ্ডাকে যদি ধরে রাখি, তাও দেওয়াল টপকাতে পারব না। ছাড়াও যাবে না, রাখাও যাবে না। রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে যখন স্যাটেলাইট গুলিকে ছাড়া হয় তখন ভারী লঞ্চার দিয়ে না ছাড়লে স্যাটেলাইটকে নিজের কক্ষ পথে নিয়ে যাওয়া যাবে না। কিন্তু কক্ষ পথে যাওয়ার আগে একটা জায়গায় লঞ্চার গুলিকে ছেড়ে দিতে হবে, না ছাড়লে স্যাটেলাইট আর এগোতে পারবে না। পার্সোনাল গডের আইডিয়া কিছুটা এই রকম। আসল জিনিসটা যিনি, তিনিই এভাবে দেখাচ্ছেন, ওটাকে ধরেই লাফ মারতে হবে। নিজের মনকে অতিক্রম করার জন্য ওই সাহায্যটুকু নিতে হয়।

স্বামীজী কিন্তু এটা বলতে চাইছেন না যে, তোমরা যেটা করছ এটা ভুল কিছু। স্বামীজী বলতে চাইছেন, তোমরা জিনিসটাকে বুঝে নাও। যদি আমরা বুঝে নিই যে আমার ঈশ্বর আমারই সৃষ্টি, তাহলে এর পরিণাম কি হবে? তখন আর ধর্ম নিয়ে কোন ঝগড়া মারামারি হবে না, শাক্ত বৈষ্ণবের সাথে, হিন্দ মুসলমানের সাথে, মুসলমান খ্রীশ্চানের সাথে আর ঝগড়া করতে যাবে না। তোমার ঈশ্বর তোমার মনের তৈরী, আমার ঈশ্বর আমার মনের তৈরী। যেমন আমরা বলি, আমার মা আমার মা, তোমার মা তোমার মা। তবে এই জায়গাতে একটা তফাৎ আছে, ঈশ্বরকে মনের বাইরে গিয়ে যখন বোধে বোধ করছে, তখন সেটা কি জিনিস কেউ বলতে পারবে না। কিন্তু এই জগতে যতক্ষণ আমরা আছি ততক্ষণ আমরা মনের এলাকাতেই আছি। আর যতক্ষণ মনের এলাকাতে আছি ততক্ষণ ঈশ্বর ব্যক্তি রূপেই আমার সামনে আসবেন, তার সাথে আমার যেমন যেমন শিক্ষা, যেমন যেমন সাধনা, তেমন তেমন সেই অনুসারেই আমি ঈশ্বরকে দেখবে। তার মানে ঈশ্বর সেটাই, যেটা আমি তৈরী করছি। একদিকে ঈশ্বর আমাকে তৈরী করেছেন, অন্য দিকে আমি আমার মত ঈশ্বরকে তৈরী করি। এখানে যাঁরা আছেন তাঁদের বেশির ভাগ কেন ঠাকুরকে ভক্তি করেন? কারণ তাঁদের মনটাই এমন যে ঠাকুরের সাথে মেলে। আবার অনেকে আছে যারা সাধুদের সাথে ঘোরে যাতে গাঁজা খেতে পারে। আবার অনেকে আছে যারা রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুদের কাছে ঘুরঘুর করে যাতে নরেন্দ্রপুরে ছেলেকে ভর্তি করাতে পারে, সেবাপ্রতিষ্ঠানে রোগীর চিকিৎসা করাতে পারে, ভাল প্রসাদ যাতে পাওয়া যায় আর অতিথি নিবাসে যেন ঘর পাওয়া যায়। যে যার নিজের জগৎকে নিয়ে আছে, সাধুদেরও ওই জগতের মধ্যে হিসেব করে নিয়ে চলেছে। ভগবানকেও আমরা আমাদের মতই করে নিয়েছি, এভাবেই চলছে। কিন্তু স্বামীজী এখানে যে বারোজন শিষ্যদের এই কথা বলছেন, তাঁরাও নিজের নিজের মনের জগৎ নিয়ে এসেছেন, বেশির ভাগই গোঁড়া খ্রীশ্চান, তাঁদের কাছে খ্রীশ্চানিটির মত কোন কিছু হয় না, সেখানে তাঁদের মধ্যে বেদান্তের এই ভাবগুলিকে নিয়ে যাচ্ছেন আধ্যাত্মিক সত্যকে বোঝানর জন্য।

এই যে স্বামীজী বলছেন, We create God in our image; it is we who create Him to be our master, এটা যে আরও কত মারাত্মক কথা ধারণাই করা যায় না। আমরা যে ঈশ্বরকে ঈশ্বর বানাই, এর মানে এই যে, আমি নিজে আমার ঈশ্বরকে ঈশ্বর রূপে তৈরী করেছি। মানুষ কি এত বোকা যে ঠাকুরকে বলবে, হে ঠাকুর এই তোমার হাতে একটা ডাণ্ডা দিলাম, এই ডাণ্ডা দিয়ে আমার মাথায় মারো। অথচ নির্বাচনের সময় আমরা সবাই এটাই করছি, একটা নেতাকে ভোট দিয়ে বেছে নিয়ে তাকে বলছি, আপনি রাজা হন আর তারপর আমাকে লুটতে থাকুন। ভগবানের সঙ্গেও আমরা সেটাই করি। প্রথমে আমরা মনের মধ্যে একটা ভগবান বানিয়ে নিই, তারপর ভগবানের পায়ে পড়ে বলতে থাকি, আমি পাপী, অনেক পাপ করেছি, তুমি আমাকে রক্ষা কর, ভগবান আমি তোমার কাছে রোজ এত প্রার্থনা করলাম, রোজ পাঁচ টাকার সন্দেশ দিলাম, তাও তুমি আমার একটা কথাও শুনলে না, আমার কোন ইচ্ছাই পূরণ করলে না। আমরাই ভগবানকে তৈরী করলাম, তৈরী করে আমরাই আবার ভগবানকে গিয়ে বলছি, আমি তোমার দাস, তুমি আমার মালিক।

তাহলে কি ভগবানকে প্রভু ভেবে নিজেকে দাস মনে করা, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা বন্ধ করে দিতে হবে? এগুলো বন্ধ করলে যেটুকু আছে, সেটুকুও সর্বনাশের পথে চলে যাবে। এভাবেই ঈশ্বরকে ধরে রেখে এগোতে হবে, কোন উপায় নেই। সবাই বলে বিয়ে করে মানুষ নিজের স্বাধীনতা, মালিকানা অন্যের হাতে ছেড়ে দেয়, ছেলেও তাই, মেয়েও তাই। তারপর তাদের লড়াই শুরু হয় কে বেশি ক্ষমতা নেবে, একজন কেউ ক্ষমতা কাড়বেই, তারপর সারা জীবন তার গোলামী করে যায়, তবুও মানুষ বিয়ে করে। যে বিয়ে না করে আছে সে হাহুতাশ করছে, যে বিয়ে করেছে সেও হাহুতাশ করছে, যার ডিভোর্স হয়ে গেছে সেও হা হুতাশ করছে, যার ডিভোর্স হয়নি সে ডিভোর্স দেওয়ার জন্য হা হুতাশ করছে, সবাই হা হুতাশ করে যাচ্ছে, জগৎ এই রকমই। যার ভগবান নেই তার এক রকমের কষ্ট, যার ভগবান আছে তার অন্য রকমের কষ্ট। স্বামীজী এখানে জগৎটাকে খুলে দেখিয়ে দিচ্ছেন, সত্য এই। কিন্তু এখানে যেটা গুরুত্বপূর্ণ, ঈশ্বর তোমাকে কখনই চাকর বানাতে যান না, তুমি নিজেই ঈশ্বরকে তোমার মালিক বানিয়েছ। এসব কথা ধারণা করা খুব কঠিন, এর অপপ্রয়োগ হলে আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। ঠাকুর এক জায়গায় বলছেন, মালিক যদি সন্তুষ্ট হয়ে তার সেবককে বলে, 'তুইও যা আমিও তাই, আয় আমার পাশে এসে বোস', এ-পর্যন্ত ঠিক আছে। কিন্তু সেবক যদি নিজে থেকে বলে, আপনিও যা আমিও তাই, তাহলে সেই সেবকের একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে। এগুলোকে যখন খুব উচ্চ অবস্থা থেকে দেখা হয়, তখনই এভাবে সম্ভব। স্বামীজী কিন্তু নিজেই ঠাকুরের নাম করে বার বার বলছে, আমি তাঁর দাস। মহাবীর হনুমানের মত শক্তিমান বীর বলছেন, আমি শ্রীরামচন্দ্রের দাস। স্বামীজী এই কথাগুলো তাদের উদ্দেশ্যেই বলছেন, যারা কিছু বোকা বোকা ধারণাগুলোকে নিয়ে পোকামাকড়ের মত জীবন যাপন করছে, আর কিছু হলেই বলছে, ঠাকুর আমি তোমার দাস, তুমি আমার এ কি সর্বনাশ করে দিলে, আমাকে বাঁচাও। ঠাকুরের ভারি বয়ে গেছে তোমার মত লোকের কথা ভাবতে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তোমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তিনি ওয়াকিবহাল কিনা তারই কোন ঠিক নেই, তিনি যাবেন তোমার সর্বনাশ করতে!

গীতার ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর বার বার বলছেন, কাজ করে করে আমিত্বটা নাশ করতে হয়। আমিত্বের নাশ হওয়া মানেই আধ্যাত্মিক হওয়া। আমিত্বের নাশ করাটাই মূল, তা সে কর্মযোগ দিয়ে করুক, ভক্তি পথেই করুক, রাজযোগ দিয়েই করুক বা জ্ঞান দিয়েই করুক। আচার্য শঙ্কর কর্মযোগে ভাষ্যে বলছেন, যে কোন কাজ করার সময় এই ভাব নিয়ে কাজ করতে হবে – *অহং কর্তা ঈশ্বরায় ভৃত্যবৎ করোমি* – এই কাজের কর্তা আমি, কিন্তু ঈশ্বরের ভৃত্যের মত তাঁর জন্য আমি এই কাজ করছি। এই কথা বলার কিছুক্ষণ পরেই আচার্য বলছেন, যেই জেনে গেল আমিই সেই শুদ্ধ আত্মা, আমি শ্রীকৃষ্ণের সাথে এক, তখন কে কার চাকর, কে কার মালিক। বেদান্তের দৃষ্টিতে আত্মাই আছেন, আত্মা ছাড়া কিছু নেই, আমি সেই শুদ্ধ আত্মা। কিন্তু আমার মন আমাকে ক্ষুদ্র দেখছে, আমারই আরেকটি রূপ আত্মাকে বিরাট দেখছে, আর ওই বিরাটের সামনে গিয়ে ক্ষুদ্র বলছে, আমি তোমার সেবক।

এটা খুব সাধারণ জিনিস, শাস্ত্র পড়ে পড়ে আমি যদি এই ছোট্ট একটা ধারণা করতে পারি, ওই একটাই বিরাট আছে, সে দুটো আয়না করে নিল, একটা বড় আয়না, আরেকটা খুব ছোট আয়না। আয়নাতে আমারই ছবি প্রতিবিম্বিত হচ্ছে, বড় আয়নাতে বড় দেখাচ্ছে, ছোট আয়নাতে ছোট দেখাচ্ছে, ছোটটা বড়

আয়নাকে থেকে থেকে বলে যাচ্ছে, তুমি কত বিরাট। ঠিকই তো, বড় আর ছোটতে তো তফাৎ থাকবেই। কিন্তু এই তফাৎটা আয়নার, আসলটা একই আছে। এখানে আয়না হল মন, মনের তফাৎ। মনটাকে ঠিক কর, দেখবে দুটোই এক, আয়নাটা ভেঙে দাও দেখবে একটাই আছে। এই আয়নাকে কিভাবে ভাঙা যাবে? আমাদের সমস্ত সাধনা এই একটাকে কেন্দ্র করেই চলে। ওই মন, ওই আমিত্বকে ভাঙতে হবে। ভাঙার জন্য দরকার সাধনা, তপস্যা, জপ-ধ্যান, পূজা। কাকে কেন্দ্র করে জপ-ধ্যান পূজা করবে? ওই বড় আয়নার প্রতিবিম্বকে। শেষে দেখবে ওটাও সত্য নয়। তোতাপুরী ঠাকুরকে বেদান্তের শিক্ষা দিচ্ছেন, অদ্বৈত অবস্থায় নিয়ে যেতে চাইছেন, কিন্তু ঠাকুর পারছেন না, মা কালী বার বার সামনে চলে আসছেন। তাহলে মা কালী কি মিথ্যা? একেবারেই না, মা কালী পুরোপুরি সত্য, ঠাকুর মাকে সাক্ষাৎ দেখছেন, একটা রূপেই দেখছেন না, বাচ্চা মেয়ে রূপে, বড় মেয়ে রূপে, আরও কত কি রূপে দেখছেন। তাহলে ঠাকুর কি দেখছেন?

এই পর্যন্ত আলোচনা শোনার পর আমরা স্বাভাবিক ভাবেই বলব, ঠাকুর মা কালীর মধ্যে নিজের আত্মাকেই দেখছেন। কিন্তু ঠাকুর তাঁর এই কথাগুলো যখন অন্যদের বলছেন, তখন তিনি এত উচ্চস্তর থেকে বলছেন যে, আমাদের মত লোকেদের এর উপর আলোচনা করা একেবারেই শোভা পায় না। এরপর ঠাকুরের অদ্বৈত জ্ঞান হয়ে গেল, ঠাকুর নির্বিকল্প সমাধিতে চলে গেলেন, সমাধি থেকে নেমে আসার পর কি ঠাকুরের মা কালীর দর্শন বন্ধ হয়ে গেল? মা কালী তারপরেও আসছেন, দেখা দিচ্ছেন। তাহলে ঠাকুরের মা কালী আবার কোথা থেকে এসে গেলেন? কারণ জগতে থাকলেই মন থাকবে, আমি বোধ থাকবে, ঈশ্বর থাকবেনই। কোন ঈশ্বর থাকবেন? নির্বিকল্প সমাধিতে যাওয়ার আগে যে ঈশ্বরকে দেখেছিলেন, জগতে নেমে আসার পর সেই ঈশ্বরই থাকবেন। তাহলে ওই অবস্থায় নেমে এসে ঠাকুর কি বলতে পারবেন, মা তুইও যা আমিও তাই? কখনই বলতে পারবেন না। তুইও যা আমিও তাই হবে একমাত্র নির্বিকল্প সমাধিতে। নির্বিকল্প সমাধিতে যাওয়ার আগেও ঠাকুর নিজেকে মায়ের সন্তান রূপে দেখছেন, নির্বিকল্প সমাধি থেকে নেমে আসার পরেও তিনি আবার মায়ের সন্তান রূপেই নিজেকে দেখছেন। কিন্তু মাঝে মাঝে ওই ভাবে চলে যাচ্ছেন, তখন বলছেন রূপটুপ সব উড়ে যাচ্ছে।

খুব কঠিন। কঠিন তো মনে হবেই, কারণ আমরা ধর্মকে সহজিকরণ করে করে এমন অবস্থা করে দিয়েছি যে, কিছু কথা জেনে যাই ঠিকই, কিন্তু ধর্মের আসল জিনিসগুলিকে আর জানা হয় না। আচার্য শঙ্কর বলছেন, যে এতদিন অজ্ঞানে পড়ে থেকে মনে করে আসছিল তুমি প্রভু, আমি তোমার দাস, কিন্তু জ্ঞান লাভের পর যখন জেনে গেল এখানে সেব্য সেবকের কোন সম্পর্ক নেই, এরপর কেন সে কারুর চাকর হতে যাবে! কিন্তু ঠাকুরের মত পুরুষরা মনের যে ডিভাইডিং লাইন, সেখানে মাকে রেখে দিয়েছেন। কিন্তু যাঁরা অদ্বৈত জ্ঞানের সাধনা করে গেছেন, সাধনার পর অদ্বৈত জ্ঞানকে ধরে রেখেছেন, তাঁদের কাছে এটাই হবে, তুমিও যা আমিও তাই। তোতাপুরী দক্ষিণেশ্বরে বসে আছেন, একটা ব্রহ্মদৈত্য এসে তাঁকে ভয় দেখাচ্ছে, তোতাপুরী তাকে বলছেন, 'তুইও যা আমিও তাই, আয় এখানে চুপ করে বোস্, আমার সাথে ধ্যান কর'। তোতাপুরীর কথা শুনে সে পালিয়ে গেল। কিন্তু যদি তোতাপুরীর কাছে মা কালী আসতেন? যদিও মা কালী আসবেন না, আসার সম্ভবনা শূন্যই বলা যায়। তোতাপুরী ছিলেন পুরোপুরি অদ্বৈত বেদান্তের সাধক। কিন্তু ব্রহ্মদৈত্য যে, এটা কিন্তু একটা বাস্তব জীব। মা কালী হলেন যাঁদের মন শেষ অবস্থায় চলে গেছেন, মনের এবার লয় হতে যাচ্ছে, মন আর অ-মনের যে শেষ বিভাজন লাইন, ওই জায়গাকার। এই বিভাজন রেখা যার যেমন তিনি তেমনটি দেখবেন। যিনি মা কালীকে মানেন তাঁর মা কালী আসবেন, যিনি আল্লাকে মানেন তাঁর আল্লা আসবেন।

When we know that we are one with God, that we and He are friends, then come equality and freedom. (*যখন আমরা জানতে পারি, আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে এক, ঈশ্বর আমাদের সখা, তখনই প্রকৃত সাম্যাবস্থা লাভ হয়, তখনই আমাদের মুক্তি হয়।*) যখন ওই অবস্থায় গিয়ে দেখবে, ঈশ্বর আমার মালিক নন, উনি আমার বন্ধু, আমরা এক, তখনই ঠিক ঠিক মুক্তি আসে। সেইজন্য বৈষ্ণবদের যে বৈকুন্ঠ, সেখানেও মুক্তি হয় না, হতেই পারে না। খ্রীশ্চান, ইসলামাদিতেও কিছু কিছু সম্প্রদায় আছে যারা মুক্তিকে বেদান্তের দৃষ্টিতে দেখে, বাকিরা যে মুক্তির কথা বলে, বেদান্ত মতে সেটাও বন্ধন, কারণ সেখানেও ঈশ্বর রাজার মতই থেকে যান। দ্বৈতবাদীরা বলবে, আমি ঈশ্বরের সান্নিধ্যেই থাকতে চাই, এরপর আমার আর

কিছু লাগবে না, আমি জানিও না এরপর কিছু আছে কিনা। এদের কাছে এটাই মুক্তি। যেমন একটা বাচ্চা ছেলে মায়ের কোলে থাকলে সে মনে করে এটাই আমার শক্তির শেষ কথা, শান্তির শেষ কথা, মুক্তির শেষ কথা। পরে বড় হয়ে একটা মেয়ের হাত ধরে হয়ত বলবে, মা ওকে নিয়ে তোমার সাথে থাকা যাবে না, আমি চললাম আমার মত থাকতে। কিন্তু একটা বাচ্চার কাছে মায়ের কোলটাই তার কাছে মুক্তির শেষ কথা। এখানে কেউই ঠিক না, কেউই ভুল না। যখন যার মনের অবস্থা যে রকম তখন তার কাছে সেটাই ঠিক। কিন্তু বেদান্তের দৃষ্টিতে মুক্তি বলতে যেটা বোঝায়, সেই মুক্তি তখনই হবে যখন সে ঈশ্বরের সাথে নিজেকে এক দেখবে।

ভয়ের সম্পূর্ণ নিরসন

So long as you hold yourself separated by a hairs breadth from this Eternal One, fear cannot go, (*সেই অনন্ত পুরুষ থেকে যতদিন তুমি আপনাকে এক চুলও তফাৎ করবে, ততদিন ভয় কখনও দূর হতে পারে না।*) স্বামীজী ভয় নিয়ে বলছেন, ঈশ্বরের সাথে যতদিন এক চুলও যদি নিজেকে আলাদা মনে করে, ততদিন কিন্তু সে ভয় থেকে মুক্ত হবে না। এগুলোকে নিয়ে পুরাণে খুব সুন্দর সুন্দর কাহিনী আছে। জয় আর বিজয় বৈকুন্ঠে ভগবান বিষ্ণুর দ্বারী, ভগবানের দ্বারী মানে ভগবানের একেবারে কাছের লোক তারা। কিন্তু তাদেরও অভিশাপ পেতে হয়েছিল, চার কুমারের অভিশাপে তাদের বৈকুণ্ঠ ধাম থেকে পতন হয়ে অসুর যোনিতে জন্ম নিতে হল। ওই যে একটু তফাৎ ছিল, তাতেই জয় বিজয়ের পতন হয়ে গেল, তার মানে পতন তোমার হবেই। এটাই বেদান্তের মত।

মূল কথা হল, আমরা যে ঈশ্বরকে মানি, যে ঈশ্বরের কাছে আমরা প্রার্থনা করি, সব রকম বিপদে যে ঈশ্বরের কাছে আশ্রয় নিয়ে থাকি, এখানে কোথাও আমাদের মনের বড় একটা অবদান থাকে। সাধনা করে করে মানুষ সিদ্ধির অবস্থায় পৌঁছে যাওয়ার পর তার কাছে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থাকাটাই শেষ কথা। কিন্তু উদ্দেশ্য যদি মুক্তি হয়, উদ্দেশ্য যদি ভয়ের নাশ করা হয়, তাহলে এতে মুক্তি ও ভয় কোনটার কখনই নাশ হবে না। যার জন্য পৌরাণিক কাহিনীতে অনেক সময় দেখা যায়, ভগবান এর ওর উপর রেগে যাচ্ছেন, কখন একে, তাকে, এমনকি নারদকেও বৈকুণ্ঠ থেকে বার করে দিচ্ছেন, এই জিনিসগুলো থাকবে। এগুলো দিয়ে দেখানো হচ্ছে যে, যেখানে দুই আছে, এমনকি যেখানে আমি আছি আর ঈশ্বর আছেন, সেখানেও ভয় থাকবে। কিন্তু ভক্ত ভগবানের লীলা আস্বাদ করতে চায়, ভগবান রেগে গেলেও তার কাছে এটাই একটা মজার আস্বাদ। এগুলো অবশ্য আলাদা জিনিস, কিন্তু যেখানে উচ্চতম মুক্তির কথা বলা হয়, সব কিছুকে পেরিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়, সেখানে যদি একটুও আমি তুমিতে ভেদ থাকে, ওখানে মুক্তি জিনিসটা আর কাজ করবে না। কারণ কোথাও না কোথাও আমার যে ঈশ্বর আমারই সৃষ্টি রূপে থেকে যান।

ঈশ্বর-প্রেমে ডুবে যাও

প্রায়ই লোকেরা সাধু সন্ন্যাসীদের গায়ে পড়ে এসে উপদেশ দেবে, জগতের ভাল করার চেষ্টা করুন। জগতের ভাল করার দায়ীত্ব যেন শুধু সন্ন্যাসীদের, আর কারুর দায় নেই। আবার কেউ এসে বলে, আপনারা যে এত খাটছেন, জগতের কিছু ভাল দেখতে পাচ্ছেন? স্বামীজী এবার এটাকে নিয়েই বলছেন।

Never ask that foolish question, what good will it do to the world? (*ভগবৎ-সাধনা করে –ভগবানকে ভালোবেসে জগতের কি কল্যাণ হবে? – বোকার মত কখনই এই প্রশ্ন করো না।*) যে কোন ব্যাপারে প্রশ্ন করা এতে জগতের কি ভাল হবে, স্বামীজী এই ধরণের বোকা বোকা প্রশ্ন করতে কঠোর ভাবে নিষেধ করছেন। কিন্তু আজও বহু সাধারণ অসাধারণ মানুষরা এই বোকা বোকা প্রশ্ন করে থাকে যে, ঈশ্বরের সাধনা করে, ভগবানকে ভালবেসে জগতের কি কল্যাণটা হবে! কিন্তু স্বামীজী কি বলছেন? Let the world go. Love and as nothing; love and look for nothing further, (*চুলোয় যাক জগৎ, ভগবানকে ভালোবাসো –আর কিছু চেও না।*) জগৎকে নিজের মত চলতে দাও, জগতের প্রতি তুমি তোমার ভালবাসা দিয়ে যাও, প্রতিদানে কিছু প্রত্যাশা করো না, কে তোমাকে ভালবাসল না, কে ভালবাসল, এগুলোর দিকে ফিরে তাকিও না। মনে করা যাক, এক সুন্দরী ভাল মহিলার স্বামী মাতাল। বিয়ের আগে মেয়েটি জানত

সে এই রকমই, কিন্তু আমি আমার ভালবাসা দিয়ে ওকে ভাল পথে নিয়ে আসব। বিয়ের পর সাত দিন হয়ত ঠিক ছিল, আট দিনের মাথা থেকে আবার যে কে সেই। মেয়েটি সব দিক দিয়েই ভাল, সে তাও ভালবেসেই যাচ্ছে। অন্য মহিলারা হয়ত বিরক্ত হয়ে বলে দেবে, আমি আর এর সাথে ঘর করতে পারছি না, আমি চললাম। এখানে আমরা এই ধরণের মেয়েদের আনছি না। এই মেয়েটি ভালবাসা দিয়েই যাচ্ছে। ওর স্বামী হয়ত শোধরাবে না, কিন্তু মাঝখান থেকে মেয়েটি মহৎ হয়ে যাবে।

ফ্লোরেন্স নাইট্যাঙ্গলের নাম আমরা অনেকেই জানি। ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গলের সময় হাসপাতালে রোগীদের অবস্থা খুবই দুর্বিষহ ছিল। রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হত, কেউ দেখার থাকত না, পড়ে থাকতে থাকতে কারুর হয়ত গ্যাংগ্রীন হয়ে যেত। আগেকার দিনে ভিখারীরা যে ভাবে রাস্থায় পড়ে থাকত, হাসপাতাল গুলিতে সেই সময় রোগীদেরও এ-ভাবেই ফেলে রাখা হত। ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গল এসে হাসপাতালের এই চিত্রটা একা হাতে পুরো পাল্টে দিলেন। সেবা ভাবটা তিনি নিয়ে এলেন। প্রথমের দিকে লোকেরা বিশ্বাস করতে পারছিল না, সবাই হাসাহাসি করছে, মজা করছে। কিন্তু নাইটেঙ্গল যে রোগীদের দায়ীত্বে ছিলেন, দেখা গেল তিনি সেবা করতেই রোগীরা সবাই সুস্থ হয়ে উঠতে লাগল। এর মধ্যেই অনেকে তাঁকে মানতে শুরু করেছে, অনেকে বিদ্রুপও করছে। আজকে সমস্ত বিশ্বের হাসপাতালগুলিতে সেবা রূপে যা কিছু হচ্ছে, সেবাই যে হাসপাতালের ধর্ম, এই জিনিসটাকে একা একজন মহিলা এক হাতে প্রতিষ্ঠিত করে গেলেন। অথচ তিনি একজন সাধারণ মহিলা ছিলেন, অপরকে ভালবাসা আর সেবা করার ইচ্ছা ছাড়া কিছুই তার সম্বল ছিল না। পরের দিকে সরকার যখন জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি ও সচেতনতা আনার জন্য যত রকম প্রকল্প নেওয়া হত, তাতে নাইটেঙ্গলকে একজন অন্যতম সদস্যা রূপে রাখা হত। যাদের তিনি সেবা করলেন, তারা অত্যন্ত সাধারণ মানুষ, সুস্থ হয়ে যাওয়ার পর তারা সাধারণ মানুষই থেকে গেল, কিন্তু মাঝখান থেকে সেবা করে নাইটেঙ্গল জগদ্বিখ্যাত হয়ে গেলেন। যে ভালবাসে সে মহাপুরুষ হয়ে যায়, যাকে ভালবাসে সে কোন দিন মহাপুরুষ হয় না। মায়েদের সন্তানের প্রতি যে ভালবাসা, সেবা, আত্মত্যাগ, ভারতে তাই মায়েদের স্থান এত উঁচুতে, তাই তাঁরা এত সম্মান পান। এটাই স্বামীজী বলতে চাইছেন, জগতের দিকে তাকিও না, জগৎ যেমন চলছে চলুক, তুমি তোমার মত ভালবাসা দিয়ে যাও।

Love and forget all the ‘isms’. (*শুধু ভালবাসো –আর সব মত-মতান্তর ভুলে যাও।*) খ্রীশ্চান হোক, মুসলমান হোক, হিন্দু হোক, যে ধর্মের হোক, যে মতবাদেরই হোক, এগুলো তুমি ভুলে যাও, শুধু মানুষকে তুমি ভালবেসে যাও। Drink the cup of love and become mad. (*প্রেমের পেয়ালা পান করে পাগল হয়ে যাও।*) আমরা সবাই জগতে আনন্দ পেতে চাইছি, আনন্দ যদি পেতে চাও তাহলে ঈশ্বরকে ভালবাসো, বা ঈশ্বরকে যে পথে পাওয়া যায় সে পথে ডুবে গিয়ে বুঁদ হয়ে যাও। মানুষ যেমন মদ খেয়ে মদের নেশায় বুঁদ হয়ে যায়, তুমিও ওই ভালবাসায় বুঁদ হয়ে যাও। Say ‘Thine, O Thine for ever, O Lord’! and plunge in, forgetting all else. (*বলো, ‘হে প্রভু, আমি তোমারই –চিরকালের জন্য তোমারই’ – এবং আর সব ভুলে গিয়ে ঝাঁপ দাও।*) সব কিছু ভুলে কেবল ঈশ্বর প্রেমে ডুবে যেতে বলছেন। আর বল, ‘আমি তোমার, চিরকালের জন্য আমি তোমারই’। ঈশ্বরের ভালবাসায় পুরো ডুবে যাবে, খুব কঠিন ঠিকই, কিন্তু স্বামীজী এখানে খুব বাছাই করা কয়েকজনকে উৎসাহ দিচ্ছেন, কিভাবে ঈশ্বরের ভালবাসায় তোমাদের ডুবে যেতে হবে।

The very idea of God is love, ঈশ্বর মানেই প্রেম। ঠাকুর বলছেন, আমাদের সমস্ত শাস্ত্রও বলছে, শেষ অবস্থায় জ্ঞাতা, জ্ঞেয় আর জ্ঞান এক হয়ে যায়, ধ্যাতা, ধ্যেয় ধ্যান এক হয়ে যায়, তার মানে ভাগবত, ভক্ত ও ভগবান এক হয়ে যায়, আর ভক্ত, ভক্তি ও ভগবান এক হয়ে যায়। ভক্তির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে নারদীয় ভক্তিসূত্র বলছেন, *সা তস্মিন্ পরমপ্রেমরূপা।* সেই ভক্তি কি? পরমপ্রেম। ভালবাসা কত রকমের হয়? একটা ভালবাসায় বলে, আমি তোমাকে ভালবাসি আর নাই বাসি, তুমি আমাকে ভালবাসবে, এরা স্বার্থপর। দ্বিতীয় হয়, তুমিও ভালবাস আমিও ভালবাসব। আরেকটা ভালবাসা হয়, যেখানে বলে, আমরা দুজনেই এক অপরকে ভালবাসি। এই ভালবাসায় দুজনের যখন মিলন হল, তখনও ভালবাসায় আমি তুমি বোধটা থাকে। তারপর আরও যখন ভালবাসা গভীরে চলে যায়, তখন আমি তুমি মিলে এক হয়, তারপর ওই একটাও চলে

যায়, থেকে যায় শুধু প্রেম। ঈশ্বরের প্রেমে ঠিক তাই হয়। স্বামীজী এই জিনিসটাকে বার বার বলতে থাকতেন। যাদের এখনও সিদ্ধি লাভ হয়নি, তারা এগুলোর কোন আভাস পাবে না। কিন্তু স্বামীজী সিদ্ধ পুরুষ, তাই খুব সহজে এটা বলতে পারছেন।

Seeing a cat loving her kittens stand and pray. God has become manifest there; literally belive this. (*যদি দেখতে পাও একটা বেড়াল তার ছানাগুলিকে ভালবেসে আদর করছে, ওখানে একটু দাঁড়িয়ে যাও আর ওখানেই তুমি ঈশ্বরের উপাসনা কর। কারণ ঈশ্বর এখানে সাক্ষাৎ রয়েছেন। এটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য, এ-কথা বিশ্বাস কর।*) এর আগেও স্বামীজী বলেছেন, যেখানে ভালবাসা দেখবে সেখানে দাঁড়িয়ে যাবে। ঠাকুর খুব সুন্দর ছবি আঁকতে ও মূর্তি বানাতে পারতেন। একবার তিনি বোনের বিয়ে দেখছেন, বোন স্বামীর সাথে আছে, সেটাকে নিয়ে তিনি একটা খুব সুন্দর ছবি আঁকলেন। এটা কি ছবি? ঠাকুরের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলতেন, প্রেম, ভালবাসার ছবি। যেখানে ভালবাসা দেখা যাবে, তা যে রূপেই হোক আর যেখানেই হোক, বুঝতে হবে ঈশ্বর এই রকম। Repeat 'I am Thine, I am Thine', for we can see God everywhere, Do not seek for him, just see him. (*সর্বদা বলো, 'আমি তোমার, আমি তোমার'; কারণ আমরা সর্বত্র ভগবানকে দর্শন করতে পারি। তাঁকে কোথাও খুঁজে বেড়িও না – তিনি তো প্রত্যক্ষ রয়েছেন, তাঁকে শুধু দেখে যাও।*) ঈশ্বরকে কোথাও খুঁজতে যেতে হবে না, তিনি আমাদের চোখের সামনেই, যেখানেই কোথাও কোন ভালবাসা দেখবে, বুঝবে তিনি ওখানেই আছেন। 'May the Lord ever keep you alive, Light of the world, Soul of the universe'. (*'সেই বিশ্বাত্মা, জগজ্জ্যোতিঃ প্রভু সর্বদা তোমাদের রক্ষা করুন'।*) স্বামীজী এখানে একই ভাবের একটা কোটেশান নিয়ে আসছেন।

মূল হল আমাকে ঈশ্বরের দিকে যেতে হবে। প্রথমে স্বামীজী বললেন, আমরা নিজেদেরই দুটো ভাগ করে নিই, ওই জিনিসটাকেই বলছেন, ভালবাসতে শেখ। ঈশ্বরকে মন্দির, মসজিদ্, গীর্জায় খুঁজতে যেতে হবে না। কোথায় ঈশ্বরকে দেখব? যেখানেই ভালবাসা ও প্রেম দেখবে, কারণ ঈশ্বরের আরেকটা নাম প্রেম বা ভালবাসা। ঈশ্বর আর শক্তিও এক, যেখানেই শক্তির প্রকাশ বুঝতে হবে ওখানে ঈশ্বরের প্রকাশ। ঠাকুরের সময় একজন খুব ভালো বীণা বাজাতেন, ঠাকুর নিজে তাঁর কাছে গেছেন দেখা করতেন। বিদ্যাসাগরের অনেক গুণের কথা শুনে তিনি নিজে তাঁর সাথে দেখা করতে গেছেন। আগে আমাদের ঈশ্বরকে কোন একটা রূপে দেখতে শিখতে হবে, হয় জ্ঞান রূপে, ভালবাসা বা ভক্তি রূপে বা শক্তি রূপে। যে কোন একটা রূপে যদি দেখে থাকি তাহলে যেখানেই ওই রূপের প্রকাশ দেখতে পাবো, বুঝতে হবে সেখানেই ঈশ্বর বিদ্যামান হয়ে আছেন।

ভক্তির শুরু

স্বামীজী এখানে যে ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসার কথা বলছেন, এই ভালবাসা অনেক উচ্চ পর্যায়ের, ঠাকুর যাকে বলছেন প্রেমাভক্তি। ঈশ্বরের পথে প্রথম যে আসছে, ভক্তি তাকে প্রথম থেকেই শুরু করতে হবে। প্রথম দিনেই কেউ ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয় না, ক্লাশ ওয়ান থেকেই তাকে শুরু করে ধাপে ধাপে ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত পৌঁছাতে হয়। এটাকে ব্যাখ্যা করে স্বামীজী বলছেন, The Absolute cannot be worshipped, so we must worship a manifestation, such a one as has our nature. (*নির্গুণ পরব্রহ্মকে উপাসনা করা যেতে পারে না, সুতরাং আমাদিগকে আমাদেরই মত প্রকৃতিসম্পন্ন তাঁর প্রকাশ-বিশেষকে উপাসনা করতে হবে।*) এই আলোচনাটা জুড়ে দিচ্ছে আগের ওই আলোচনার সাথে যেখানে বলা হল, আমরাই আমাদের ঈশ্বরকে সৃষ্টি করি। অখণ্ড, নিরাকারকে প্রথমেই ভালবাসা যায় না, প্রথমেই নির্গুণ নিরাকারের উপাসনা করা যায় না। সেইজন্য প্রথমে বৈধী ভক্তি করার মাধ্যমে ভিতরে একটা নিষ্ঠা তৈরী করতে হয়। বৈধী ভক্তি করে করে প্রস্তুতি না করেই প্রথমেই যদি শেষ অবস্থার কথা বলে দেওয়া হয় বা প্রথমেই যদি সিদ্ধান্ত বাক্যে চলে যায়, তাহলে তার সর্বনাশ কেউ আটকাতে পারবে না। আরম্ভ করতে হয় শুরু থেকে, শেষ থেকে আরম্ভ হয় না। সেইজন্য আগে দরকার বৈধী ভক্তির অনুশীলন।

ভক্তি আমাদের করতে হবে সেই অখণ্ডকেই। কিন্তু কিভাবে করবে? যার যে রকম প্রকৃতি বা স্বভাব, ঠিক সেই স্বভাবের অনুরূপ অখণ্ডের একটা মূর্ত রূপ দিতে হবে, আর সেই মূর্ত রূপটা তাকেই দিতে হবে। সেই রূপ কি রকম হবে? যেমনটি তার স্বভাব, তার প্রকৃতি, তার স্বরূপ বা ঠাকুর যেমন বলে দিচ্ছেন, যে রূপ তোমার ভাল লাগে সেই রূপেই পূজা করবে। হনুমানজী যেমন বলছেন, আমি জানি সবই তাঁর রূপ কিন্তু শ্রীরাম রূপ আমার ইষ্ট। যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ তিনি মূর্ত রূপ ধারণ করেন। যে রূপ তোমার স্বভাবের সাথে মেলে সেই রূপকেই তুমি তোমার ইষ্ট করে নাও। নিম্নস্তরে হয়, যারা পাঁঠার মাংস খেতে ভালবাসে তারা কালী পূজা, দূর্গা পূজা করবে, আর যারা লাড্ডু খেতে ভালবাসে তারা হনুমানের পূজা করবে। কিন্তু উচ্চস্তরে সেই রূপেরই পূজা করবে যেটা তার স্বরূপের সাথে মেলে। ঠাকুর হলেন সাধনার মূর্ত রূপ। সাধনা মানেই ত্যাগ, শ্রীশ্রীমা বলছেন ঠাকুর হলে ত্যাগীর বাদশা। ইন্দিরা গান্ধীর সময় অরুণাচলে একটা স্কুল খোলার চেষ্টা হচ্ছিল। রামকৃষ্ণ মিশনের একজন মহারাজকে দায়ীত্ব দেওয়া হল। অরুণাচলে গিয়ে মহারাজ খোঁজ নিতে শুরু করেছেন কোথায় স্কুল করা যায়। পরে আলং নামে একটা জায়গাকে বেছে নেওয়া হল। ওখানে ওনারা একটা বাড়িতে গেছেন, গিয়ে দেখেন ওদের বাড়ির দেওয়ালে ঠাকুরের একটা ছবি লাগানো। মহারাজ দেখে অবাক, আমরা আসার আগেই ঠাকুর এখানে কি করে পৌঁছে গেলেন। লোকটিকে জিজ্ঞেস করা হল, 'এই ছবি আপনি কোথায় পেলেন'? বলল, 'দেখুন আমি জানি না এই ছবি কার, আমি একবার ডিব্রুগড় গিয়েছিলাম, সেখানে একটা চায়ের দোকানে এই ছবিটা দেখি, দেখে মনে হল খালি গা, হাঁটুর উপর ধুতি তোলা, নিশ্চয়ই ইনি আমাদেরই কোন ট্রাইবাল দেবতা হবেন। চায়ের দোকানদারকে বললাম, ভাই এই ছবিটা আমাকে দেবে, এটা আমাদেরই কোন ট্রাইবাল দেবতার ছবি, আমাকে দাও, সেও দিয়ে দিল। সেই থেকে আমি দেওয়ালে টাঙিয়ে রেখেছি'। ঘটনাটা খুব মজার, কোথায় অরুণাচল, সেখানে একজন ট্রাইবাল মনে করছে রামকৃষ্ণ আমার একজন ট্রাইবাল দেবতা। কেন মনে করছে? তার গায়ে জামা-কাপড় নেই, ইনি আমাদেরই মত। আবার বড় বড় ডিগ্রীধারী, বড়লোকের বাড়ির কোন ছেলে মনে করছে ঠাকুর আমার ইষ্ট। কেন ইষ্ট? ঠাকুর ত্যাগীর বাদশা। সেও সব ভোগ-বাসনা, ঐশ্বর্য, মান-সম্মান ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে যাচ্ছে। এটাই স্বামীজী এখানে বলতে চাইছেন।

একটু আগেই আমরা যে আলোচনা করছিলাম, আমরাই আমাদের ঈশ্বরকে সৃষ্টি করি, এটা কোন কল্পনা নয়, এখানে ভুল বোঝাবুঝির কিছু নেই, এটা সম্পূর্ণ বাস্তব। ঘরে সূর্যের আলো আসছে, আলো আসার জায়গায় একটা কাঁচ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, কাঁচের যে রকম রঙ হবে সূর্যের প্রকাশটাও ঐ রকমই হবে। এটা হল যাঁরা সাধনা করছেন। কিন্তু আমরা যারা প্রসাদ খাওয়ার জন্য, মাংস খাওয়ার জন্য, গাঁজা খাওয়ার জন্য পূজা করছি, এখানে এগুলোর কোন দাম নেই। কিন্তু সাধনা যখন হয়, তখন আমরা তাঁরই সাধনা করি, যাঁর সাথে আমার মনের সাযুজ্য আছে, তা নাহলে হবে না। Jesus had our nature; he became the Christ; so can we, and so must we. (*যীশু আমাদের মত মনুষ্যপ্রকৃতি সম্পন্ন ছিলেন –তিনি 'খ্রীষ্ট' হয়েছিলেন। আমরাও তাঁর মতো খ্রীষ্ট হতে পারি, আর আমাদের তা হতেই হবে।*) যীশু আমাদের মতই ছিলেন, কিন্তু সেখান থেকে তিনি খ্রাইস্ট হয়ে গেলেন। এখানে দুটো মত আসে, একটা হল, ভগবান নিজে তাঁর মায়াকে অবলম্বন করে জীবের মঙ্গলের জন্য অবতার হয়ে আসেন। খ্রীশ্চানিটিতে অন্য ভাবে দেখা হয়। তাঁরা দেখেন, যিনি ঈশ্বর তিনি কিভাবে তিন হয়ে যান, তিনি ঈশ্বর থাকেন, আবার God the Son and God the Holi Spirit। বেশির ভাগ খ্রীশ্চানরা মনে করে, যীশু ঈশ্বরেরই সন্তান, ভগবানই তাঁকে পাঠিয়েছেন। আমরা যেভাবে মনে করি ভগবান নিজে তাঁর মায়া বা শক্তিকে অবলম্বন করে অবতার হয়ে আসেন, খ্রীশ্চানিটিতে সেভাবে না বলে বলা হয়, ভগবান নিজের সন্তানকে জগতের ভালর জন্য পাঠিয়েছেন। ব্যাপারটা একই, কিন্তু মাঝখান থেকে একটা জিনিসকে খ্রীশ্চানরা এড়িয়ে যায়, তা হল, ভগবান যদি অনন্ত হন তাহলে তাঁর সন্তানও অনন্ত হবেন। তাই যদি হয়, তবে এটা কি করে সম্ভব হল যিনি অনন্ত তিনি কি করে একজন দেহধারী হয়ে সীমিতের মধ্যে এলেন, এর processটা কি? এর উত্তর ওদের কাছে নেই, যা উত্তর দেয় সেটাও কখনই সন্তোষজনক হয় না। আমাদের কাছে পরিষ্কার, তিনি নিজের মায়াকে অবলম্বন করে আসেন। যেহেতু সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে না তাই, অনেকে অন্য ভাবে বলে, যীশু যেন আমাদেরই মত, তিনি সাধনা করে খ্রাইস্ট হয়ে গেলেন, যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠের এই মত নয়। ভগবান বুদ্ধকে নিয়েও এই রকম দুটো ভাবনা আছে, অনেকেরই মত হল ঈশ্বর ভগবান বুদ্ধ হয়ে এসেছেন, আবার অনেকের মত হল, যিনি গৌতম

ছিলেন, তিনি সাধনা করে সিদ্ধিলাভের পর ভগবান বুদ্ধ হয়ে গেলেন। পরে ঠাকুরকে নিয়েও এই ধরণের দুটো মত আসবে, গদাধর আমাদের মতই সাধারণ ছিলেন, সাধনা করে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস হয়ে গেলেন, নরেন সাধারণ ছিলেন, পরে তিনি অনেক সাধনা করে স্বামী বিবেকানন্দ হয়ে গেলেন। কিন্তু যাঁরা ভক্ত, অধ্যাত্ম জিনিসটাকে যাঁরা বোঝেন, তাঁরা জানেন এই জিনিস সম্ভব নয়। এনাদের মধ্যে শক্তির যে প্রকাশ দেখা যায়, এই প্রকাশ সাধারণ মানুষে কখনই সম্ভব নয়।

স্বামীজী দুটোকে নিয়েই চলেন, কখন এটাকে নিয়ে, কখন ওটাকে নিয়ে। শিষ্যদের জোর একটা ধাক্কা দিতে হবে তাই তিনি এভাবে বলছেন –যীশু আমাদের মতই ছিলেন, তিনি সেখান থেকে খ্রাইস্ট হয়ে গেলেন, আমাদেরও এই রকম হতে হবে, তিনি যখন পেরেছেন আমরাও পারব, আর এটাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য। বলছেন, Christ and Buddha were the names of a state to be attained; Jesus and Gautama were the persons to manifest it, পরমহংস যেমন একটা অবস্থা, ঠিক তেমনি খ্রাইস্ট ও বুদ্ধও একটা অবস্থা, যে অবস্থায় ঈশ্বর বই আর কিছু জানে না। বুদ্ধও একটা অবস্থা, যেখানে তিনি শুদ্ধ চৈতন্য ছাড়া আর কিছু দেখছেন না, জগৎটা শূন্য দেখছেন। এই অবস্থা যে কেউ পেতে পারে। আমাদের শাস্ত্রও এটাই বলেন, অবতারের যে অবতারত্ব, ঈশ্বরের যে সৃষ্টির ক্ষমতা, এর বাইরে সবাই সবটাই হতে পারে। ঠাকুরের জ্ঞানের যে শেষ কথা, মানুষ চেষ্টা করলে সেখানে পৌঁছাতে পারে, অবশ্য ঠাকুরের অনুভূতির যে বিশাল ভাণ্ডার, ওই ভাণ্ডারের হদিশ অবতার ছাড়া কেউ করতে পারবে না।

ব্রহ্মের প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ –জগন্মাতা

এরপর বলছেন, ‘Mother’ is the first and highest manifestation, next the Christs and Buddhas, আমরা আগেও এর উপর একটু আলোচনা করে এসেছি। জগন্মাতা যিনি, তিনি হলেন প্রথম। এই জিনিসগুলোকে যুক্তির সাহায্যে উপস্থাপিত করা যায় না। সচ্চিদানন্দই আছেন, এখন কোন কারণে সচ্চিদানন্দের উপর একটা ছায়া পড়ে যায়, এটা কিন্তু ঈশ্বরেরই শক্তি, কেউ শক্তি বলেন, কেউ এটাকে মায়া বলেন, কেউ প্রকৃতি বলেন, কেউ আবার মা বলেন, নানান ভাবে সম্বোধন করেন আর শাস্ত্রেও নানান রকম বর্ণনা করা হয়েছে। ওই যে বিভাজন রেখা, যে জায়গাতে সৃষ্টি শুরু হল, ওটারও অনেকগুলো নাম আছে, তার মধ্যে একটা নাম হল ‘মা’, তিনি হলেন প্রথম। তাঁর ঠিক নীচে আসেন তাঁরা, যাঁদের আমরা অবতার পুরুষ মনে করি। শুধু অবতার পুরুষরাই নন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ সবাই। ঠাকুরও বলছেন, অবতার শক্তির আণ্ডারে। যিনি সচ্চিদানন্দ তিনি সচ্চিদানন্দ, কিন্তু একবার যদি ওই বিভাজন রেখা, যেটাকে সমষ্টি মন বলছেন, ওই বিভাজন রেখা হল প্রথম আর তার নীচে চলে আসেন বুদ্ধ, খ্রাইস্ট।

একত্বই প্রেমের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি

এরপর স্বামীজী বলছেন, We make our own environment, and we strike the fetters off. (*আমরাই আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা গঠন করে নিজেদের বদ্ধ করি, আবার আমরাই ঐ শিকল ছিঁড়ে মুক্ত হই।*) যখনই আমরা জগতের কথা ভাবি, আমরা মনে করি সৃষ্টিটা যেন একটা বেদানা, যার মধ্যে আমি একটা বীজ, আপনি একটা বীজ। সৃষ্টি কিন্তু তা নয়, সৃষ্টিটা যেন অনেকটা venn diagramএর মত। সেখানে যদি set of natural number রাখা হয়, এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ ইত্যাদি, সেখান থেকে যদি একটা একটা করে গ্রুপ বানিয়ে নেওয়া হয়, যেমন, দুই, চার, ছয়, আট বা চার, আট, বারো, ধীরে ধীরে তখন দেখা যাবে এক একটা নম্বরের এক একটা স্পেশালিটি, সেই একটা জগৎ বানিয়ে নিচ্ছে। এক একটা নাম্বারকে নিয়ে বড় বড় সার্কেল, এত সার্কেল হয়ে যায় যে, confused হয়ে যাওয়ার জোগাড় হয়ে যায়। আসলে যত মানুষ তত venn diagram, তত ইউনিভার্স। আমার জগৎ আলাদা, আপনার জগৎ আলাদা, তার জগৎ আলাদা। এই যে জগৎ আমার, এরপর আমি আমার নিজের অবস্থা, পরিস্থিতি, পরিবেশ সব নিজের মত বানিয়ে নিচ্ছি, তারপর একটা সময় যে বন্ধনটা আছে সেটাকে ভেঙে দিলাম, আমি বেরিয়ে এলাম। কিন্তু বাকিরা যারা আছে, তারা আগের মতই থেকে যাচ্ছে। আমি ভেঙে বেরিয়ে এলে যে বাকিরাও ভেঙে চলে আসবে, তা কখনই হবে

না। কারণ আমরা আমাদের পরিবেশ নিজের মত তৈরী করে নিই, তারপর একটা ধাক্কা মারলাম, আমি বেরিয়ে এলাম, বাকিরা যেমন ছিল তেমনই থাকবে।

স্বামীজী এটাই আলোচনা করছেন, হে সাধক, তুমি নিজে জিনিসটা বোঝ, এই জগতে তুমি ও তোমার ছাড়া আর কিছু নেই। আরেকটু নীচে যদি যাও, সেখানে তোমার জগৎ আলাদা, তার জগৎ আলাদা। কিন্তু কিছুতেই আমরা এটা মানতে চাই না, বিশেষ করে আমরা যাকে ভালবাসি, স্বামী, স্ত্রী, সন্তান, মা, বাবা, এদের সুখী করার জন্যই আমার যা কিছু করা। বাজার করতে গেলে সবারই জন্য আনাজ কিনতে হয়, পোষাক কিনতে গেলে শুধু নিজের জন্যই কিনছি না, স্ত্রী, সন্তান, বাবা, মা সবারই জন্য কিনতে হয়। জগৎকে নিয়ে যখন ভাবি আমরা ঠিক এভাবেই ভাবি, সবাইকে নিয়ে। জগৎ আমার, মুক্তি আমার, প্রস্তুতি নেওয়াটাও আমার নিজের জন্যই হবে, পরিবেশ আমার নিজের মত হবে, উন্নতি যেটা হবে সেটা আমার নিজের হবে। একই মায়ের চারটে সন্তান, কিন্তু চার রকম তাদের জীবন, তাদের মধ্যে এক সন্তান খুব উঁচুতে চলে গেল, কারণ উন্নতি individual হয়।

স্বামীজী তাই বলছেন, অবস্থা, পরিস্থিতি নিজেকেই বানিয়ে নিতে হয়, সেই অনুসারেই সেখান থেকে তোমার মুক্তি হবে। The Atman is the fearless, (*আত্মা অভয়স্বরূপ।*) এর উপর অনেকবার আলোচনা করা হয়েছে, আত্মা মানে দ্বিতীয় আর কিছু নেই, দ্বিতীয় কিছু যদি না থাকে তাহলে কে কাকে ভয় করবে, কার থেকে কিসের ভয় পাবে। When we pray to a God outside, it is good, only we do not know what we do. (*আমরা যখন আমাদের আত্মার বাইরে অবস্থিত ঈশ্বরের উপাসনা করি, তখন ভালই করে থাকি তবে আমরা যে কি করছি, তা জানি না।*) সেইজন্য বলছেন, আমরা যে বাইরে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি, এটা ভাল, কিন্তু আমরা জানি না যে আমরা কি করছি। এর আগে আলোচনা করা হল, কোথাও না কোথাও এটা আমাদের নিজেদের মনের সৃষ্টি। When we know the Self, we understand. (*আমরা যখন আত্মার স্বরূপ জানতে পারি, তখনই ঐ রহস্য বুঝতে পারি।*) যতক্ষণ আত্মজ্ঞান না হয় ততক্ষণ এই জিনিসটাকে বোঝা যায় না, সেইজন্য এই কথাগুলোকে নিয়ে আলোচনা করা যায় না, মুখে আনা যায় না।

হাজরা মহাশয় দক্ষিণশ্বরের ঠাকুরের ঘরে পাশেই থাকতেন, সেখানে নরেন আর হাজরা দুজন মিলে ঠাকুরকে নিয়ে মজা করে বলছেন, বলে কিনা ঘটিটাও ঈশ্বর, বাটিটাও ঈশ্বর। ঠাকুর বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করছেন, হ্যাঁগা তোমরা কি নিয়ে কথা বলছ। এই যে আপনি বলছেন, সবই নাকি ঈশ্বর, ঘটিও ঈশ্বর, বাটিও ঈশ্বর। ঠাকুর তখন একটা খুব উচ্চ ভাবে এসে নরেনকে ছুঁয়ে দিয়েছেন। ঠাকুর হাজরাকে কিন্তু স্পর্শ করলেন না, হাজরার সেই প্রস্তুতি ছিল না কিনা। ছুঁয়ে দিতেই নরেনের ভাব পালটে গেল, সব কিছু চৈতন্যময় দেখছেন। বাড়িতে গেলেন, মা খেতে দিয়েছেন, দেখছেন থালা, বাটি, গ্লাশ, ভাত, ডাল, তরকারী যা কিছু আছে সব চৈতন্যময়, খেতে পারছেন না। উঠে চলে এলেন হেদুয়া পার্কে। পার্কের রেলিংও দেখছেন চৈতন্য। তিনি রেলিংএর উপর মাথা ঠুকে পরখ করতে চাইছেন, এটা লোহা নাকি সত্যিই চৈতন্য। মাথা ফুলে ঢোল হয়ে গেল, তাও দেখছেন এটা কি।

তাহলে সত্য কি? চৈতন্যই সত্য। তাহলে এই জগৎটা? এর নিজস্ব সত্তা আছে। সেইজন্য বলছেন, মানুষ যখন পুরোপুরি আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই ঠিক ঠিক বুঝতে পারে যে, চৈতন্যই আছে, সেই চৈতন্য আমার মন তৈরী করছে, এই দেহটা মনের তৈরী, দেহটা যখন ধাক্কা লাগছে তখন কপাল ফুলে যাচ্ছে। কিন্তু ভিতরে যে চৈতন্য, সেই চৈতন্য সমস্ত চৈতন্যকেই দেখছে। সেই চৈতন্য থেকে রেলিং বেরোচ্ছে, সেই চৈতন্য থেকে শরীরও বেরোচ্ছে, সেই চৈতন্য চৈতন্যের উপর মাথা ঠুকছে, মাথা ফুলে ঢোলও হচ্ছে, কিন্তু সেই চৈতন্য দেখছে চৈতন্য ছাড়া কিছু নেই। এগুলো কাউকে বুঝিয়ে দেওয়া যায় না, কেউ মুখে বলতেও পারবে না যে আমি বুঝে গেছি। কেনোপনিষদে বলছেন, যে মনে করে আমি বুঝতে পারিনি সেই বুঝেছে।

স্বামীজী সুফি কবিতার কয়েকটা লাইন উল্লেখ করছেন, 'একদিন এমন ছিল যখন আমি নারী ও তিনি পুরুষ ছিলেন। উভয়ের মধ্যে ভালবাসা বাড়তে লাগল – শেষে তিনি বা আমি কেউই রইলাম না। এখন এটুকু মাত্র অস্পষ্ট ভাবে স্মরণ হয় যে, এক সময় দুজন পৃথক ব্যক্তি ছিলাম; শেষে প্রেম এসে উভয়কে এক করে

দিল'। যদিও স্বামীজী সুফি কবিতা নিয়ে আসছেন, তবে এটা কিন্তু অদ্বৈত নয়। কারণ যখন শেষে এক চলে আসে তখন বুঝতে হবে ওটা একেশ্বরবাদের দিকে চলে গেল। অদ্বৈতে এক হয় না, এক আর দুয়ের পারে চলে যায়। ভালবাসাতে প্রথমে দুই থাকে, দুই মিলে এক হয়ে যায়, ওই একটাও শেষে চলে গিয়ে শুধু ভালবাসা থাকে। তাহলে বলবে, ভালবাসা তো আছে। না, ভালবাসা যেটা আছে, ওই ভালবাসাকে আস্বাদ করার জন্য আর কেউ নেই। সেইজন্য বলা যায় না যে, ওটা এক, নাকি দুই, নাকি এক দুইয়ের পারে, নাকি শূন্য? এটাই অদ্বৈতের অবস্থা।

জ্ঞান অনাদি অনন্ত

স্বামীজী এবার অনাদি অনন্ত জ্ঞান নিয়ে বলছেন, Knowledge exists eternally and is co-existent with God. (*জ্ঞান অনাদি অনন্তকাল বর্তমান –ঈশ্বর যতদিন আছেন, জ্ঞানও ততদিন আছে।*) জ্ঞান অনাদি কাল থাকে আছে আর অনন্ত রূপে আছে। এই জ্ঞান যে আজকে আছে আগে ছিল না, কিংবা পরে হয়ত থাকবে না, তা কখনই হবে না। সেলফোন আগে ছিল না, এখন সবাই সেলফোনের ব্যাপারে জানে। কিন্তু জিনিসটা তা নয়, আইডিয়া রূপে সেলফোন চিরদিনই ছিল। যদি না থাকত তাহলে বলতে হবে, ঈশ্বরের বাইরে আপনি কিছু একটা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। ঈশ্বর আর ভালবাসা যেমন এক, তেমনি ঈশ্বর আর জ্ঞান এক, সচ্চিদানন্দের চিৎ মানে চৈতন্য, চৈতন্য মানেই জ্ঞান। ঈশ্বর সব সময়ই আছেন, এই যে অবস্থান করছেন সেটাও ঈশ্বর, যিনি চৈতন্য তিনি ঈশ্বর, আর ভালবাসা ও আনন্দও ঈশ্বর, জ্ঞান সেইজন্য অনাদি অনন্ত। The man who discovers a spiritual law is inspired, and what he brings is revelation, (*যে ব্যক্তি কোন আধ্যাত্মিক নিয়ম আবিষ্কার করেন, তাঁকেই 'Inspirted' বা প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ বা ঋষি এই জ্ঞান যাঁরা পান, তাঁদের ঋষি বলে; তিনি যা প্রকাশ করেন, তাকে 'revelation' বা অপৌরুষেয় বাণী বলে।*) ঋষিরা যখন অনন্ত জগতে বিচরণ করে বেড়ান তখন সেখান থেকে তিনি একটা সত্যকে পেয়ে যান, যেমন বিশ্বামিত্র ঋষি বিখ্যাত গায়ত্রীমন্ত্র পেলেন, এটাও একটা আধ্যাত্মিক সত্য, ঋগ্বেদের প্রথম যে মন্ত্র *অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং*, এটাও একটা আধ্যাত্মিক সত্য। তিনি যখন এই সত্যকে নিয়ে আসলেন তখন আমরা বলছি এটা একটা জ্ঞানরাশি, এটাকে তিনি দেখলেন। তারপর বলছেন, but revelation too is eternal, not to be crystallised as final and then blindly followed. (*কিন্তু এরূপ অপৌরুষেয় বাণীও অনন্ত –এমন নয় যে, এ-পর্যন্ত যা হয়েছে, তাতেই তা শেষ হয়ে গেছে, এবং অন্ধভাবে তার অনুসরণ করতে হবে।*) জ্ঞান অনন্ত, তাই জ্ঞানপ্রাপ্তিটাও অনন্ত। যেমন একজন ঋষি যদি কোন সত্যকে দেখে থাকেন, তাহলে অন্য ঋষিরাও এই সত্যকে দেখতে পারবেন। বলা হয় যে, গায়ত্রীমন্ত্র বহু আগে ছিল, কিন্তু হারিয়ে গিয়েছিল। বিশ্বামিত্র ঋষি পরে ওটাকে উদ্ধার করলেন। স্বামীজী বলছেন জ্ঞান অনন্ত, ঋষি কোন একটা জ্ঞানকে পেলেন। কিন্তু তার মানে এই না যে ঐ জ্ঞান ওখানেই শেষ হয়ে গেল, পরে ওই জ্ঞান আবার আরেকজনও পেতে পারেন। আইনস্টাইনের জীবনীতেও পাওয়া যায় যে, তাঁর আগে অনেকগুলো জিনিস, যেগুলো বৈজ্ঞনিকরা আবিষ্কার করেছিলেন, পরে আইনস্টাইন নিজে আলাদা করে আবার বার করলেন, উনি জানতেন না যে, এর আগে কেউ এর উপর কাজ করে গেছেন।

ইজারাইলের এক মিলিটারি অফিসারের পদার্থ বিজ্ঞানে খুব আগ্রহ ছিল। তিনি পাকিস্থানের বিজ্ঞানী আবদুস সালাম, যিনি পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন, তাঁর কাছে ফিজিক্স শিখতে যান। আবদুস সালাম ওনার সাথে কথাটথা বলে বুঝে নিয়ে বলে দিলেন, 'তোমার দ্বারা ফিজিক্স হবে না, তুমি অনেক পিছিয়ে আছ। তবে এক সময় মুসলমানদের অনেকে জুহুদিদের কাছে অনেক কিছু শিখেছিল, সেইজন্য আমি তোমাকে আমার অধীনে নিচ্ছি'। কাজ করতে শুরু করার পর উনি কিছু দিন পর পর একটা করে থিয়োরী এনে আবদুস সালামকে দেখাচ্ছেন, আবদুস সালামও দেখে টেখে শুধু বলে দেন, এটা অমুক পদার্থ বিজ্ঞানী বার করে দিয়েছেন। যেটাই নিয়ে যান, সেটাকেই বলে দেন, এটা অমুক বিজ্ঞানী দশ বছর আগে বার করে দিয়েছেন, তোমার দ্বারা হবে না। কিন্তু ইজরাইলের মিলিটারি অফিসার ভাবছে, যদি এটা কেউ করে থাকেন তাহলে তো আমি ঠিক পথে আছি। উনি নিজেও জানেন না যে, এটাকে কেউ আগেই করে রেখেছেন, কারণ ইজরাইল তখন সবার থেকে বিচ্ছিন্ন, বিজ্ঞান কত এগিয়ে যাচ্ছে সেই ব্যাপারে এদের কোন আপডেট নেই।

এরপর ধীরে ধীরে যখন গ্রাউণ্ড কভার করতে শুরু করলেন, শেষ পর্যন্ত fundamentalএ পার্টিকেলসের যে গবেষণা, তাতে ভদ্রলোকের বিরাট অবদান আছে। তার মানে বড় বড় বিজ্ঞানীরা নিজের মত কাজ করে যেটা বার করেছেন, স্বাধীন ভাবে কাজ করে যে সত্যগুলি না জেনে যে এগুলো আবিষ্কৃত হয়ে গেছে, তিনি বার করে দিলেন। এনারা অবশ্য স্বামীজীর অনেক পরে এসেছিলেন।

সমস্যা হল যখনই কোন সত্য আবিষ্কৃত হয়, আমরা তখন ওটাকে objectify করে দিই, crystalised করে দিই, আর সেখান থেকে আমরা বলে দিই, এটাকেই পালন করা হবে। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের মা কালীর দর্শন হল, আমরা যদি হিন্দু না হয়ে একটা গোঁড়া ধর্মের হতাম, যেখানে আধ্যাত্মিক অনুশীলন নেই, তখন আমরা বলতাম, এই দেখো ঠাকুর মা কালীকে দেখেছেন, মা কালীই একমাত্র ঈশ্বর, মা কালীকে যে মানবে না, মা কালীর খড়্গ দিয়ে তার গলা কেটে দেওয়া হবে। কিন্তু মা কালীকে ঠাকুরের আগেও অনেকে দেখেছেন, ঠাকুরের পরে আরও অনেকে দেখবেন। মা কালীই আছেন, এটা একটা আধ্যাত্মিক সত্য, আর এর সাথে যদি শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতি না থাকে তাহলে এই সত্যকে কেউ মানবে না। বেদান্ত কখন সত্য হয়? যদি এই কথা বেদে থাকে, তার মানে আগে অনেকে এটাকে অনুভব করেছেন, যুক্তি মানে, logically জিনিসটা এই রকমই দাঁড়ায়, আর শেষ হল এটাকে কেউ অনুভব করেছেন। কেউ অনুভব করলেই যে এটা সত্য হয়ে যাবে তা নয়, বাকি দুটো শ্রুতি ও যুক্তিকেও থাকতে হবে। সমস্যা হল, যে সমাজ ও ধর্মে আধ্যাত্মিক অনুশীলন থাকে না, তারা একটা কোন সত্যকে পেয়ে গেলে মনে করে এটাই শেষ সত্য। এটা খুবই সাধারণ যুক্তি, হিন্দুরা এই জিনিসটা প্রথম থেকেই জানে, দুর্ভাগ্য যে যারা গোঁড়া তারা এই জিনিসগুলো জানত না। সেইজন্য কোন ধর্ম যদি বলে আমাদের প্রফেট বা অবতার হলেন শ্রেষ্ঠতম, এই রকম প্রফেট বা অবতার আর কোন দিন হবে না, তার মানেই হল, তারা ঐ জ্ঞানটাকে crystalised করে দিল। ঈশ্বর অনন্ত, ঈশ্বরের জ্ঞান অনন্ত, আর ঈশ্বরকে পাওয়া বা ঈশ্বরীয় জ্ঞান পাওয়ার বা অনুভূতি করার যে উপায়, যাকে আমরা বলি দ্রষ্টা, ঋষিরা হলেন মন্ত্রদ্রষ্টা, ওটাকে যে দেখার উপায়, সেটাও অনন্ত – অনন্ত ঈশ্বর, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত উপায়।

এরপর যারাই বলবে আমাদের মত ও পথটাই ঠিক, অন্যরা সবাই ভুল, তাদের এই কথা কোন ভাবেই আর যুক্তিতে দাঁড়াবে না, তার মানে এদের ভিতরেই গোলমাল ঢুকে আছে। এই তিনটের কোনটাকে কোন অবস্থাতেই আমরা সীমিত করতে পারি না – ঈশ্বরকে সীমিত করা যাবে না, ঈশ্বরের জ্ঞানকে সীমিত করা যাবে না আর ঈশ্বরের জ্ঞানকে পাওয়ার যে উপায়, সেটাকেও সীমিত করা যাবে না। তার মানে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সন্ন্যাসী বা ভক্তরা যদি কাল থেকে বলতে শুরু করেন, আমাদের ঠাকুরই শেষ অবতার, এরপর আর কেউ অবতার হবেন না, তার মানে আমাদের বোঝাবুঝির ভিতর কোথাও গোলমাল ঢুকে গেছে। ঠাকুরকে স্বামীজী অবতারবরিষ্ঠ বলছেন বিভিন্ন কারণে, তার মানে এই নয় যে, পরে যিনি অবতার হয়ে আসবেন তিনি অবতারবরিষ্ঠ হতে পারবেন না।

হিন্দু ধর্মের শক্তি – হিন্দু ধর্মের দুটো গুরুত্বপূর্ণ দিক

এই কথা বলার পর স্বামীজী বলছেন, The Hindus have been criticized so many years by their conquerors, (*বিজেতারা হিন্দুদের ধর্মকে এতদিন ধরে সমালোচনা করে এসেছে যে,*) বিভিন্ন সময়ে বিশ্বের অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেদের দ্বারা হিন্দুদের উপর প্রচুর আক্রমণ হয়েছে। ভারতে মুসলমান এলো, খ্রীশ্চান এলো, বৌদ্ধদের আবির্ভাব হলো, জৈনদের আবির্ভাব হলো, সবারই একটা কমন প্ল্যাটফরম, যেখানে দাঁড়িয়ে সবাই হিন্দুদের গালাগালি দিয়ে চলে। ভারতবর্ষে শুরু থেকে, সেই ভগবান বুদ্ধের সময় থেকে হিন্দুদের ধর্মকে নিয়ে প্রচুর নিন্দাবাদ শুরু হয়। এত নিন্দা হয়েছে যে, যদি কেউ হিন্দু দর্শন নিয়ে পড়াশোনা করতে যায়, তখন শুরুই করে চার্বাক দর্শন দিয়ে। চার্বাক দর্শন হল ভৌতিকবাদ। ইয়ং ছেলেরা প্রথমেই চার্বাক দর্শন পড়ার পর বলবে, এটাই আমার মনের মত ধর্ম। কিন্তু আজকালকার ছেলেমেয়েরা, এমনকি শিক্ষিত সমাজও জানে না যে, আমরা সবাই জন্মগত ভাবেই চার্বাক, জীবনের বেশির ভাগ সময় আমরা চার্বাক থাকি। মন্দিরে গিয়ে পূজা দেওয়ার সময় যারা বলছে, হে ঠাকুর! আমাকে একটা ভাল চাকরি জুটিয়ে দাও, আমাকে রক্ষা কর, আমার ও আমার পরিবারের সবার শরীর যেন ভাল থাকে ইত্যাদি, এরা সবাই কিন্তু চার্বাক। যার

কাছে ভোগ্য বস্তুই একমাত্র কাম্য, সে চার্বাক। চার্বাক দর্শনে খুব মজার মজার কথা আছে, যেমন বলছে, *ত্রয়ীবেদস্যকর্তার ভণ্ড ধূর্ত নিশাচরাঃ,* যাঁরা বেদ রচনা করেছেন, এই ব্রাহ্মণগুলো সব ভণ্ড, ধূর্ত আর রাক্ষস, অপরের টাকা-পয়সা কেড়ে নিয়ে মাংস মদ খাবে বলে এই রকম সব লিখেছে।

এরপর এসে গেল ইসলাম, এবার আর এক দিকে থেকে না, সব দিক থেকে আক্রমণ আসতে শুরু হয়ে গেল। অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ, রাজক্ষমতা নিয়ে আক্রমণ, ধর্মান্তরণ করার আক্রমণ, শাস্ত্র জ্বালিয়ে দেওয়ার আক্রমণ, মতাদর্শের আক্রমণ। এরপর এলো ইংরেজ, হিন্দু ধর্মের উপর এবার শুরু হয়ে গেল খ্রীশ্চানদের আক্রমণ। আক্রমণ হলে দুটো জিনিস হবে, হয় সে পিষে যাবে, আর তা নাহলে বিরাট শক্তিমান হয়ে যাবে। একটা কাঁচের উপর যদি হাতুড়ি মারা হয়, কাঁচ ওখানেই শেষ, আর লোহাকে আগুনে ভাল করে পুড়িয়ে আচ্ছা করে পেটানো হয়, সেখান থেকে লোহা স্টীল হয়ে যাবে। নির্ভর করবে, আমি কাঁচ নাকি লোহা। আমরা বলতে পারি লোহা তো লোহা, এমনিতেই কঠিন। কিন্তু এই লোহা যখন খনিতে আকরিক অবস্থায় থাকে, তখন লোহা কাঁচের মতই ভঙুর। কাঁচের মত লোহার আকরিককে একটু জোরে মারলেই গুড়ো গুড়ো হয়ে যাবে, লোহাই ইস্পাতে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। কিভাবে হচ্ছে? আগুনে দিচ্ছে, পোড়াচ্ছে, পরিষ্কার করছে, তারপর অবিরাম মারতে থাকে, মারতে মারতে একটা সময় ভঙ্গুর লোহার আকরিক হয়ে যায় ইস্পাত। সেই ইস্পাত দিয়ে যখন তলোয়ার হয়, সেই তরোয়াল যার কাছে থাকবে, তার সামনে আর কেউ দাঁড়াতে পারবে না।

আমরা সবাই আপতদৃষ্টিতে লোহার আকরিক। যখন জীবনের অগ্নিজ্বালায় ফেলে উপর থেকে হাতুড়ি মারবে, সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে বুঝতে হবে, তার ভিতরে দম ছিল। আর যদি টুকরো টুকরো হয়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে, আমরা কাঁচ ছিলাম। হিন্দু ধর্মে ঠিক তাই হয়েছে, তাকে আগুনে দিয়ে হিন্দুদের নিজেদের লোকেরা, যেমন জৈন, বৌদ্ধ ও শিখরা মেরেছে, হিন্দুদেরই বিভিন্ন রকমের যে দর্শনগুলো আছে, আবার বাইরের ধর্মগুলি, কেউ ঘোড়ার পিঠে বসে, কেউ ট্যাঙ্কারের উপর বসে এসে হিন্দুদের মেরে গেছে, আজও তবু হিন্দুরা দাঁড়িয়ে আছে। আম গাছ বা অন্য অনেক গাছ আছে, গাছে যদি একটা কুড়াল দিয়ে ঘা দিয়ে দেয়, কিছু দিন পর দেখা যাবে গাছের ওই জায়গাটা শক্ত হয়ে গেছে। এমন মার মেরেছে, ফলে কি হল, স্বামীজী বলছেন, that the (the Hindus) dare to criticse their religion themselves, and this makes them free. (*এখন হিন্দুরা নিজেরাই নিজেদের ধর্মকে সমালোচনা করতে সাহস করে, আর এর ফলে তারা স্বাধীনচেতা হয়ে গিয়েছে।*)

ভক্তদের মধ্যে অনেকে দেখায় যে তারা যেন একেবারে বিনয়ের মূর্তরূপ। সাধুদের মধ্যেও দেখা যায়, নিজেকে দেখাবেন যেন আমি কত বিনয়ী। কি রকম বিনয়ী? একদিকে বলবে, আমি আমার নিজের সমালোচনা করছি, অন্য দিকে কেউ তার সত্যিকারে কোন দোষকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে, একেবারে ফোঁস করে উঠবে। কিন্তু হিন্দুরা তা নয়, হিন্দুরা এত শক্তিমান, আর তাদের উপর এত অত্যাচার হয়েছে, তা সত্ত্বেও হিন্দুরা নিজেকে নিয়েও মজা করে, কিন্তু সেই মজা করা নিয়ে নিজেদের তাচ্ছিল্য করে না, আলোচনার দৃষ্টিতে, আরও মজবুত হওয়ার দৃষ্টিতে হিন্দু হিন্দুর সমালোচনা করে। এটা অন্য ধর্ম করতে পারে না। যখন অপরের সমালোচনাকে গ্রহণ করার ক্ষমতা থাকবে আর নিজেও নিজের সমালোচনা করতে পারবে, তখন বুঝতে হবে, তার মধ্যে বিরাট শক্তি সঞ্চিত হয়ে আছে। নিন্দা সহ্য করে নেওয়াটা বিরাট ক্ষমতাবানের লক্ষণ। বিজ্ঞান এসে আজ যা যা ধর্মের নামে নিন্দা করছে, এই নিন্দাকে হিন্দুরা হাজার হাজার বছর ধরে মোকাবিলা করে আসছে, সব নিন্দার উত্তর দেওয়া হয়ে গেছে।

আমাদের পরম্পরায় একটা প্রচলিত গল্প আছে, যে গল্প স্বামীজীও বলছেন। একটা ষাঁড় জঙ্গলে বসে আছে, তার শিংএ একটা মশা এসে বসেছে। অনেকক্ষণ বসে থাকার পর মশাটার মনে হল, আমি ষাঁড়ের শিংএ বসে আছি, ষাঁড়ের নিশ্চয়ই অনেক কষ্ট হয়েছে। মশাটা ষাঁড়ের কানের কাছে উড়ে এসে বলছে, 'ভাই! আমি তোমার শিংএ অনেকক্ষণ বসে ছিলাম, তোমাকে আমি খুব কষ্ট দিয়েছি'। ষাঁড়টা বলছে, 'তুমি তোমার পরিবারের সবাইকে, পারলে তোমার রাজ্যের সব মশাকে নিয়ে এসে আমার শিংএ মাসের পর মাস বাস করে যাও, আমার তাতে কিছু হবে না'। হিন্দুরা বাস্তবিক তাই, সবাইকে নিয়েই সে চলতে পারে। সমালোচনাকে হজম করা খুব ক্ষমতা না থাকলে পারবে না। যারা স্বৈরাচারী শাসক, বড় বড় মন্ত্রী বা আমলারা নিজের

সমালোচনা গ্রহণ করতে পারবে না। গণতন্ত্রের আসল শক্তিই হল, রাজশক্তিকে সমালোচনা করতে পারা। কিন্তু তারাও বলে দেয়, যারা সরকারী কর্মচারী তারা সরকারের সমালোচনা করতে পারবে না। তার মানে এদের শক্তি নেই, শক্তি যদি থাকত, তুমি তোমার সমালোচনা এমনিই নিয়ে নিতে।

স্বামীজী আসার অনেক আগে একজন ফরাসী ভদ্রলোক ভারতে এসেছিলেন। পুরো ভারত ভ্রমণ করার পর উনি ফরাসী ভাষায় একটা বই লেখেন। বইটিতে তিনি হিন্দু ধর্মকে নিয়ে একটা মজার ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছেন। বলছেন, হিন্দু ধর্ম যে কি বিচিত্র ধর্ম কাছ থেকে না দেখলে বোঝা যায় না। কল্পনা করুন, ফ্রান্সে একটা বড় ধর্মীয় উৎসব হচ্ছে আর সেখানে কোন ভারতীয় বা চাইনিজ এসে ফরাসীদের ধর্মকে নিন্দা করতে শুরু করল। মক্কাতে গিয়ে কেউ ইসলামের নিন্দা করে দেখুক তো কি হয়। ভ্যাটিক্যান সিটিতে গিয়ে ওদের চার্চের সামনে কেউ খ্রাইস্টের নিন্দা করে দেখুক তো তার কি হয়। এরপর ভদ্রলোক বলছেন, একজন প্রোটেস্টান্ট ফাদার কাশীতে গঙ্গার ধারে বিশ্বনাথ মন্দিরের সামনে একটা ড্রামের উপরে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে হিন্দুদের নামে গালাগাল দিয়ে যাচ্ছে – এই যে তোমরা শিবলিঙ্গের পূজা করছ, এটা একটা কালো পাথর ছাড়া কিছু না। এই পাথর একটা খনি থেকে এসেছে, আমার বাড়িতে যে পাথর আছে তার সাথে এই পাথরের কোন তফাৎ নেই, কেন তোমরা এর পূজা করছ, তোমরা মূর্খ। ফরাসী ভদ্রলোক অবাক হয়ে দেখছেন, লোকেরা সবাই বসে মন দিয়ে শুনে যাচ্ছে, লোকটি কি বলতে চাইছে। মাঝে মাঝে হঠাৎ কেউ একজন হাত তুলে বলছে, আপনি এই যে পয়েন্টটা বললেন এটা ঠিক পরিষ্কার বুঝতে পারলাম না, এটাকে আরেকবার যদি বুঝিয়ে দেন। পরে আরেকজন পাদরিকে এই পাদরি বুকে জড়িয়ে বলছে, ভাই! এই হিন্দুদের আমরা কোনদিন ধর্মান্তরিত করতে পারব না। যাদের নিজের ধর্মে এমন আস্থা, যেখানে ওদের এত নিন্দা, এত সমালোচনা করছি সেখানে তাদের কোন প্রতিক্রিয়া নেই!

আমাদের মনে প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে দেশে যে এত সাম্প্রদিয়কতা, অরাজকতা হচ্ছে, এগুলো কেন হচ্ছে? এর মধ্যে শুধু ধর্মই জড়িত নেই, এতে socio economy যে জড়িয়ে আছে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু তার থেকেও বড় কথা, এরা নিজের ধর্মকে ভাল করে জানে না। যে নিজের ধর্মকে জানে, সে কখনই এত উত্তেজিত হয়ে উঠবে না, আর উত্তেজিত হলেও কখনই বিধর্মীর গলা কাটতে যাবে না। সত্যকে জানলে মানুষ কখনই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে না। এর আগে দেববাণীতে স্বামীজী বলছিলেন, যেখানেই গোঁড়ামি, বুঝতে হবে সেখানে তারা দুর্বল। শুধু যে গোঁড়ামি আর সঙ্কীর্ণ মনোভাবের উর্ধ্বে গিয়ে হিন্দু ধর্ম এতদিন ধরে যে চলে আসছে তা না। গত হাজার বছর ধরে হিন্দুদের হাতে কোন ক্ষমতাই ছিল না। মোঘলরা ভারতে রাজত্ব করছে, হিন্দুদের উপর প্রচুর আক্রমণ হচ্ছে, হিন্দুরা নিজেদের রক্ষা করতে পারছে না। তখন তৈরী হল নাগা সাধু, যারা সব কিছু ত্যাগ করে হাতে ত্রিশুল নিয়ে লড়াই করে হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করার জন্য মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন সময়ে সাধু সন্ন্যাসীরাও এই ধরণের অনেক রকম পদক্ষেপ নিয়েছেন। কিন্তু মূল হল, যেখানে আধ্যাত্মিকতার ব্যাপার আসছে, দর্শনের ব্যাপার আসছে, তার পিছনে যে যুক্তি আছে, সেটার উপর খুব জোর দিয়েছেন। হিন্দুরা কখনই বলবে না যে এই কথা বেদে আছে বলেই সত্য। অন্যান্য ধর্মে যেমন বলা হয়, আমার ধর্মগ্রন্থে এই রকম আছে, তাই আমরা এর বাইরে যাব না। হিন্দুরা সবটাই যুক্তি দিয়ে নিয়ে যাবে। আচার্য শঙ্কর যেমন পুরো যুক্তি দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন যে, আত্মাই ব্রহ্ম। হিন্দু ধর্মের এটাই বৈশিষ্ট্য, কোন কথাকে যে মানতে হবে তা না, তুমি যুক্তি দিয়ে জিনিসটাকে আগে ভাল করে বিচার করে দেখে নাও। ঋষিরাও এই কথা বলছেন, আমি যেটা তোমাকে যুক্তি দিয়ে দেখাচ্ছে, এটাই তুমি ধ্যানের গভীরে গিয়ে পেয়ে যাবে। এখন তোমার মনে হচ্ছে তোমার দেহ সত্য, তোমার জগৎ সত্য, তুমি সেই ভাবেই তোমার জীবন অতিবাহিত করছ। ধ্যান করে যদি তুমি অন্য কোন সত্য দেখতে পাও, তুমি সেটারই পালন করবে। কিন্তু একটা বিশেষ ধর্ম পালন করতে গিয়ে যদি কেউ জানতে চায়, 'যীশু Son of God হতে পেরেছিলেন, আমিও কি হতে পারব'? তাকে তখন এই কথাই বলা হয়, 'না, তা তুমি কখনই তা হতে পারবে না'। 'আচ্ছা না হয় Son of God হতে পারব না, কিন্তু তাঁর যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানগুলি হয়েছিল, সেই জ্ঞান অর্জন করতে পারব'? 'প্রশ্নই উঠছে না'। কিন্তু আমাদের এখানে কোন ব্যাপারই না, ঠাকুরের যে অনুভূতি হয়েছে, সেই অনুভূতি তোমারও হবে, বেদের ঋষিরা যে অনুভূতি পেয়েছিলেন, তুমিও সেই অনুভূতি পেতে

পার যদি তুমি তাঁদের মত তপস্যা ও সাধনা কর। এই ব্যাপারে বিশ্বের কোন ধর্ম, বিশেষ করে সেমেটিক ধর্মগুলি হিন্দু ধর্মের ধারে কাছে আসতে পারবে না।

স্বামীজী এখানে হিন্দু ধর্মকে নিয়ে বলছেন। হিন্দু ধর্মের দুটো খুব গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, একটা হল universal approach আরেকটা হল acceptance। এই দুটো একটা জায়গায় গিয়ে মিশে যায় তা হল, inclusiveness, সবাইকে নিয়ে চলা। আমরা মনে করি সবাইকে নিয়ে চলাটা সামাজিক দৃষ্টিতে বলা হয়, কিন্তু এখানে সামাজিক কিছু বলা হচ্ছে না, আধ্যাত্মিক ভাবে সবাইকে নিয়ে চলা। সমাজে উঁচু-নীচুর শ্রেনী বিভাগ, ধনী-দরিদ্রের ভেদ থাকবেই, সমাজ বলতে হিন্দু মুসলমান আলাদা থাকবেই, সমাজ বলতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আলাদা থাকবে। কিন্তু আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে যখন দেখা হবে তখন বলা হবে, হিন্দু আর মুসলমানের আধ্যাত্মিক জ্ঞানে খুব বেশি তফাৎ নেই, আপত্তিজনকও কিছু নেই। দ্বিতীয় হল, বেদ অধ্যয়ন করে মানুষ যে স্বর্গে যাবে, জুতো সেলাই করে মানুষ একই স্বর্গে যাবে। ইদানিং কালে জাতিপ্রথা নিয়ে কত সোরগোল, কত অশান্তি। জাতিপ্রথা ভারতবর্ষের সমস্যা, হিন্দু ধর্মের সমস্যা নয়। ধর্মে সমস্যা তখনই হয়, যেমন ইসলাম বলে, যারা ইসলাম ধর্মে নেই তারা নরকে যাবে। তার মানে ইসলামের দৃষ্টিতে হিন্দু আর মুসলমান চিরতরে আলাদা হয়ে গেল। ধর্মের দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণ আর শূদ্র যদি আলাদা হয়, হিন্দু ধর্ম কখনই এই রকম বলবে না যে, ভাই তুমি যত ভাল মানুষই হও, মৃত্যুর পর শূদ্ররা সাধারণ স্বর্গে যাবে, ব্রাহ্মণরা উচ্চ স্বর্গে যাবে। বরং বলা হয়ে থাকে, যে জুতো সেলাই করে, পায়খানা সাফাই করে সে একই স্বর্গে যাবে, যে স্বর্গে ব্রাহ্মণরা যাবে। তবে ব্রাহ্মণের বেদ অধ্যয়নে যে নিষ্ঠা আর তার জুতো সেলাইয়ে যে নিষ্ঠা, দুটোই যদি সমান থাকে। নিষ্ঠার তফাৎ থাকলে ফল আলাদা হবে। বর্ণ ব্যবস্থায় এই কথাই বলা হয়, তুমি যে কাজই করো না কেন, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যদি সেই কাজ নিষ্ঠাপূর্বক কর, চিত্তশুদ্ধির জন্য কর, তুমি সেখানেই পৌঁছাবে যেখানে ব্রাহ্মণ বেদ অধ্যয়ন করে পৌঁছাবে।

ইদানিং কালে কোথাও রাজনীতির জন্য বা অন্য কিছু কারণে বা কোন ক্ষমতাবান লোক কাউকে কষ্ট দিয়েছে, তখন তার প্রতিক্রিয়া রূপে কিছু গোষ্টি বা জনজাতি বলে দেয়, আমি তোমাদের থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছি। মাঝে মাঝে নিউজপেপারে খবর আসে, কোন ক্ষমতাবান লোক অতি সাধারণ লোকদের উপর খুব অত্যাচার করেছে। তারা যদি এর বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলার চেষ্টা করে তখন তাদের আরও পিষিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। হঠাৎ দেখা গেল, কোন সোশ্যাল মিডিয়া এটাকে নিয়ে খুব প্রচার করতে শুরু করে দিল, এমন হৈচৈ বাঁধিয়ে দিল যে, শেষে দেখা গেলে ক্ষমতাবান লোকটাকেই সবাই পিষে দিল। এই ধরণের ঘটনা সমাজে বিভিন্ন সময়ে হয়ে থাকে। মানুষ একটু কষ্ট, একটু অবিচার, একটু অত্যাচার সহ্য করে নেবে, কিন্তু একটা সীমার বাইরে চলে গেলে তখন আর সামলানো যাবে না। সমাজে এই জিনিসগুলো সব সময় থাকবে। কিন্তু ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখলে, যারা নিজেদের হিন্দু মনে করেন, হিন্দু মনে করা মানেই হয়, সরাসরি হোক, ঘুরিয়ে হোক, বেদকে প্রাধান্য দেবে। বেদ হিন্দুদের সর্বোপরি গ্রন্থ, এবং পবিত্র গ্রন্থ। অন্য ধর্মের লোকেদের কথা ছেড়েই দেওয়া হচ্ছে, হিন্দুদের তথাকথিত ব্রাহ্মণ যারা তারাও বেদ পড়েনি, যারা মন্দিরে মন্দিরে পূজা করছে তারাও পড়েনি, এমনকি ভারতে যত সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা আছেন, বেশির ভাগ সন্ন্যাসীরাও বেদ পড়েননি। অথচ বেদের বিভিন্ন মন্ত্রগুলি কোন না কোন ভাবে সব জায়গায় ঘুরছে। বেদে যত আধ্যাত্মিক সত্য আছে, প্রত্যক্ষ হোক আর পরোক্ষ ভাবেই হোক তার সবটাই প্রত্যেকটি হিন্দু মানছে। আমরা যখন বলছি সব ধর্ম সমান, আমরা যখন বলছি ঈশ্বর এক, এই কথাগুলো সব বেদ থেকেই এসেছে। বেদের সত্যগুলি কোন না কোন ভাবে সব হিন্দুরাই পালন করে, যদিও সরাসরি তাদের জানা নেই এর শিকড় কোথায়। আবার বেদের এই সত্যগুলিই রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণে কাহিনী রূপে জনগণের মধ্যে ঢুকে আছে।

স্বামীজী ওই জিনিসটাকেই এখানে আলোচনা করে বলতে চাইছেন, ঈশ্বর আর জ্ঞান এক। ঈশ্বরের নামই সচ্চিদানন্দ, ঈশ্বরের সাথে তিন চারটে জিনিস একসাথে চল, যেমন চৈতন্য, মানে জ্ঞান, ভালবাসা অর্থাৎ আনন্দ আর অস্তিত্ব, যেখানেই অস্তিত্ব ব্যাপারটা আসে সেখানেই বুঝতে হবে ঈশ্বরের প্রকাশ। অস্তিত্ব না থাকাটাই অনীশ্বর, অর্থাৎ ঈশ্বর নেই। চতুর্থ আরেকটা জিনিস হল শক্তি। অনেকে বলেন তন্ত্র মত থেকে শক্তির ধারণা এসেছে, কিন্তু আচার্য শঙ্কর বলছেন শক্তি আর শক্তিমান এক। এই চার পাঁচটা জিনিসকে একসাথে নিয়ে

নেওয়ার পর কি হয়? এরপর যেখানেই দেখব ভালবাসা, বুঝব এখানে ঈশ্বরের প্রকাশ হচ্ছে, যেখানেই জ্ঞান, জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ, সেখানেই ঈশ্বরের প্রকাশ, যেখানেই শক্তি, শক্তির প্রকাশ, সেখানেই ঈশ্বর আর যেখানে জীবনের স্পন্দন সেখানে ঈশ্বরের প্রকাশ। এই চারটের মধ্যে শক্তি আর অস্তিত্বের হ্রাস হয়, যেমন বৃদ্ধ বয়সে মানুষের শারীরিক ক্ষমতা থাকে না, অর্থবলও কমে আসে, তাই বৃদ্ধরা সবার কাছ থেকে অবহেলিত হতে থাকেন। তিনিও জানেন, আর তো মাত্র কিছু দিন, আমার অস্তিত্ব এবার শেষ হতে যাচ্ছে। থেকে গেল জ্ঞান ও ভালবাসা। যার মধ্যে বিদ্যার ভাণ্ডার আছে, মানুষ তাঁর কাছে আসবেই, তিনি সম্মান পাবেনই। যার জন্য মঠের প্রাচীন সন্ন্যাসীদের এত সম্মান, কারণ এনারা সবাই অধ্যাত্ম বিদ্যা আর ত্যাগের মূর্তরূপ। আর থাকল ভালবাসা; মঠের প্রাচীন সন্ন্যাসীরা এই দুটোরই মূর্ত রূপ, জ্ঞান ও ভালবাসা। মঠের অধ্যক্ষ মহারাজের কত বয়স হয়ে গেছে, ভাল করে কথা বলতে পারেন না, তবুও মানুষ কত দূর দূর থেকে তাঁকে দর্শন করবার জন্য ছুটে আসছে। বৃদ্ধরা যদি সমাজে সম্মান না পান, তাহলে এনারা কেন সম্মান পাচ্ছেন? এইজন্যই সম্মান পাচ্ছেন, তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের স্বরূপের প্রকাশ অনেক বেশি, কারণ বিদ্যা ঈশ্বরেরই স্বরূপ, ওনারা বিদ্বান। আর ভালবাসা ঈশ্বরেরই স্বরূপ, তাঁদের সবার প্রতি কি ভালবাসা, কি করুণা! ঈশ্বরের এই চারটি প্রকাশ, অস্তিত্ব, বিদ্যা, ভালবাসা আর শক্তি। বয়সের সাথে সাথে অস্তিত্ব আর শক্তি কমতে থাকবে, কিন্তু ভালবাসা আর জ্ঞান, এই দুটো সব সময় থেকে যায়। স্বামীজী এটাই বলছেন, Knowledge exists eternally and is co-existen with God।

স্বামীজী শূদ্রদের নিয়ে অনেক কথা বলেছিলেন, যার মধ্যে একটা কথা হল, শূদ্ররা একদিন তাদের শূদ্রত্বের শক্তি দিয়েই মাথা তুলে দাঁড়াবে। ভাবলে অবাক লাগে, স্বামীজী তার ভাষণে যখন এই কথাগুলো বলছিলেন তখন ভারতবর্ষের কজন এই জিনিসটাকে বুঝতে পেরেছিল যে, এই রকম দিন ভারতে কখন আসতে পারে? আজকে আমরা দেখছি, দলিত এক হও শ্লোগান উঠে গেছে, আমরা এক হব, এক হয়ে আমরা ক্ষমতা দখল করব। আমাদের মনে হতে পারে, স্বামীজী একজন প্রফেট ছিলেন বলে তিনি এগুলো বুঝতে পেরেছিলেন, কিন্তু তা নয় এখানে পুরোপুরি স্বামীজীর অন্তর্দৃষ্টি কাজ করছে। কারণ মানুষের মধ্যে অসীম ক্ষমতা, কোন মানুষকেই বেশি দিন দাবিয়ে রাখা যায় না। কিছু দিন হয়ত দাবিয়ে রাখতে পারবে, কিন্তু একটা সময় এমন আসবে যখন সে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে প্রতিরোধ করবে। যেখানে সঙ্ঘের শক্তি, একতার শক্তি আছে, সেখানে ঐ শক্তি দিয়ে সে সবাইকে পিষে দেবে। স্বামীজী রাশিয়াকে নিয়ে, চীনকে নিয়ে, ভারতকে নিয়ে যা যা বলে গেছেন, আজ দেখছি সবটাই মিলে যাচ্ছে।

স্বামীজী এখানে বলছেন, Their foreign rulers struck off their fetters without knowing it. (*ভারতের বিদেশী শাসনকর্তারা অজ্ঞাতসারে হিন্দুদের পায়ের বেড়ি ভেঙে দিয়েছে।*) বিদেশীরা এসে ভারতের উপর নিপীড়ন চালাতে লাগল, যার ফলে ভারতের লোকেদের পায়ে যে শিকল লাগান ছিল, সেটা অজান্তায় কেটে বেরিয়ে গেল। মারাঠীতে একটা বিখ্যাত উপন্যাস আছে, যেখানে লেখক কর্ণকে মূল চরিত্র তৈরী করে কাহিনী সাজিয়েছেন। সেখানে একটা বর্ণনা আছে, গন্ধর্বরা একবার দুর্যোধনদের আক্রমণ করে তাদের সবাইকে বন্দী করে নিয়েছে। কিন্তু কর্ণকে বন্দী করতে পারল না। কারণ কর্ণকে আক্রমণ করতে গিয়ে দেখছে তার গায়ের চামড়া গণ্ডারের, আসলে কর্ণের শরীরে কবচ লাগানো থাকত। গন্ধর্বরা কর্ণকে তখন লতা-টতা দিয়ে বেঁধে ফেলেছে। এবারে কর্ণের অবস্থাটা কল্পনা করা যাক, কর্ণকে লতা, দড়ি সব দিয়ে খুব ভাল করে বেঁধে রেখেছে। এবার একজন আছে যে কর্ণের কথা জানে না, সে একটা তলোয়ার এনে বলছে, এক্ষুণি আমি কর্ণকে শেষ করে দিচ্ছি। ধাঁই ধাঁই করে কর্ণের উপর তলোয়ার চালিয়ে দিল। মাঝখান থেকে কর্ণের কি হবে? কর্ণকে যে দড়ি, লতা দিয়ে বাঁধা হয়েছিল, সেগুলো সব কেটে বেরিয়ে যাবে, এদিকে কর্ণকে তো সে কিছুই করতে পারবে না, কারণ তার শরীরে দিব্য কবচ লাগানো আছে। কর্ণ এবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। বিদেশীরাও ঠিক এই ভাবে অজান্তায় হিন্দুদের বন্ধনটা কেটে দিয়েছে। তারা অত্যাচার করছিল হিন্দুদের শেষ করার জন্য, মাঝখান থেকে তার বন্ধনটাই কেটে বেরিয়ে গেল। কিসের বন্ধন? খাবার সময় গ্লাশ থালার ডান দিকে থাকবে, নাকি বাম দিকে থাকবে, নুনে যদি লেবুর ছোঁয়া লেগে যায়, তাতে নুন অপবিত্র হল, নাকি লেবু অপবিত্র হল, মাঠ দিয়ে আসার সময় পায়ে এই নোংরা লেগেছে, এখন তিনবার স্নান করতে হবে নাকি দুবার স্নান করতে হবে, রাতে নোংরায় পা দিলে, কবার স্নান করতে হবে, এই বিচার করতে করতেই হিন্দুদের

সব শক্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। এর উপর আছে জাতিপ্রথার কুসংস্কার, শূদ্রের মুখ দেখে নিলে ব্রাহ্মণকে স্নান করতে হবে।

কেরালার নামে স্বামীজী বলছেন whole Malawar coast is a lunatic assylam, চণ্ডাল যদি রাস্থায় এসে যায়, সে হয়ত ব্রাহ্মণের রাস্থাই পরিষ্কার করতে এসেছে, যার জন্য সব চণ্ডালদের ঘন্টা বাজাতে বাজাতে আসতে হত, যাতে ব্রাহ্মণরা ঘন্টার শব্দেই বুঝতে পারে চণ্ডাল আসছে। কারণ ব্রাহ্মণ যদি চণ্ডালকে দেখে নেয় তাকে স্নান করতে হবে। কিছু দিন পর ইংরেজরা এসে রেললাইন পাতলেন, রেলের কামরাকে থার্ড ক্লাশ, সেকেণ্ড ক্লাশ করে দেওয়া হল। আগেকার দিনে থার্ড ক্লাশ মানে, কামরায় কোন ছাদ থাকবে না, বসার ব্যবস্থা ছিল কি ছিল না জানা নেই, কিন্তু থার্ড ক্লাশের কামরাগুলোকে গার্ড এসে তালা মেরে দিত। কারণ লোকেদের ট্রেনের স্পীড সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না, ওই স্পীডে চলতে শুরু করলে যাত্রীরা ছিটকে পড়ে যাবে। ঠাকুরও এক জায়গায় বলছেন, গার্ড সাহেব একবার তালা মেরে দিলে আর বেরোন যাবে না। পয়সা ব্রাহ্মণেরও নেই, শূদ্রেরও নেই। স্টেশনে ঢোকার আগে পর্যন্ত ব্রাহ্মণ আলাদা শূদ্র আলাদা, রেলের কামরায় ঢোকার সময় সবাই একসাথেই ঢুকছে। তালা খুলে দেওয়ার পর আবার সবাই আলাদা। তারপর দেশ স্বাধীন হল, এখন কেউ যদি বলে আমি ওর পাশে বসব না, তার জেল হয়ে যাবে।

ইজরাইল জুহুদিদের দেশ, খুব গোঁড়া দেশ। এখনও ওদের যারা চার্চে কাজ করে, ওদের সংখ্যাও অনেক বেশি, প্লেনে যাওয়ার সময় ওরা কোন মেয়ের পাশে বসবে না। প্লেনের একটা সিটে মেয়ে বসে আছে, তার পাশের সিটেই যদি কোন দাড়িওয়ালা সাধুবাবার থাকে, সে গিয়ে বলবে আমি বসব না। তখন সেই মেয়েটিকে সিট ছেড়ে দিতে হয়। এই নিয়ে ইদানিং অনেক সমালোচনা হচ্ছে, কিন্তু এখনও কোন মেয়ে যদি আপত্তি করে বলে আমি সিট ছাড়ব না, তখন প্লেনের বাকি যাত্রীরা এসে মেয়েটিকে বলবে, তুমি সিটটা ছেড়ে দাও বাছা, তোমার জন্য প্লেন ছাড়তে দেরী হচ্ছে। আমরা মনে করি, এই জিনিসগুলো শুধু ভারতবর্ষেই আছে, কিন্তু তা নয়, সব জায়গাতেই আছে, যেখানে বলে আমি তোমাকে মানি না, তুমি আমাকে মানো না। এই discrimination সব জায়গাতেই থাকবে। যাই হোক, স্বামীজী বলছেন, বিদেশীরা আসার পর নানান ভাবে নিপীড়ন শুরু হল, আমরা সবাই চেঁচিয়ে উঠলাম, মাঝখান থেকে হিন্দুদের সব কুসংস্কারের বন্ধন গুলো কেটে গেল, সব আবর্জনা গুলো পুড়ে ছাই হয়ে গেল। এরপর হিন্দুদের যে মূল ধর্ম বেদান্ত দিনে দিনে উপরে উঠে এলো, আর ধর্মের বাকি জিনিসগুলোর কিছু এই পরিবার পালন করছে, কিছু ঐ পরিবার পালন করে যাচ্ছে, এগুলোর সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই, আর এগুলোর কোন দামও নেই।

হিন্দুরা জানে না ধর্মনিন্দা কি জিনিস

স্বামীজী বলছেন, The most religious people of earth, the Hindus have actually no sense of blasphemy. (*হিন্দুরা জগতের মধ্যে সব চেয়ে ধার্মিক জাতি হয়েও বাস্তবিকই ভগবন্নিন্দা বা ধর্মনিন্দা কাকে বলে জানে না।*) Blasphemy মানে, এমন কোন কথা বলা যা শাস্ত্র বিরোধী বা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কথা বলা। কিছু দিন আগে একজন নামকরা বিদেশী লেখক যীশুকে নিয়ে বলছেন, তিনি মেরী ম্যাকডোনাল্ডকে বিয়ে করেছিলেন। ঠাকুর বলছেন, মূলো খেলে মূলোর ঢেকুর ওঠে, নিজেরা স্ত্রী, মেয়েমানুষ ছাড়া থাকতে পারে না, যীশুকেও তাই একজন মেয়ের সাথে জুড়ে দিয়েছে। এটা খ্রীশ্চান সমাজে হলে ওরা বলত, এটা ধর্ম বিরোধী কাজ। গ্যালিলিও যখন বললেন পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, এটাও তখন খ্রীশ্চানদের কাছে ধর্ম বিরোধী কাজ। কারণ চার্চ বিশ্বাস করে সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে, গ্যালিলিও চার্চের বিরুদ্ধে বলছেন।

হিন্দুদের কাছে blasphemy বলে কিছু হয় না। হিন্দুরা তাদের ভগবান কৃষ্ণকে নিয়ে কত মজার মজার কাহিনী দাঁড় করিয়েছে। শিবকে নিয়েও সংস্কৃতে অনেক সুন্দর সুন্দর মজার শ্লোক আছে। শ্রীরামচন্দ্রকে নিয়ে অতটা মজা করে কিছু নেই, শ্রীরামকে সাধারণ ভাবে আমাদের একজন serious God রূপে মনে হয়। কিন্তু মৈথিলী ভাষায় শ্রীরামচন্দ্র আর সীতাকে নিয়ে মজার মজার অনেক কবিতা, গান আছে। যেমন একটা লম্বা গানে বলছে, শ্রীরামচন্দ্র মজা করে সীতাকে বলছেন, আমি কোন দেশের মেয়েকে বিয়ে করলাম, যে দেশে

মাটি থেকেও মেয়ে জন্ম নেয়। কিন্তু বাকি যত দেবী দেবতা আছেন, বিষ্ণুকে নিয়ে, শিবকে নিয়ে, কালীকে নিয়ে অনেক মজা করা হয়। ঠাকুর নিজেই ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের নামে বলছেন, ডাক্তার বলছে কালী নাকি একজন সাঁওতালী মাগী। অন্যান্য ধর্মে বিশেষ করে ইসলামে আল্লাকে নিয়ে, মহম্মদকে নিয়ে যদি কেউ এই রকম বলতে যায়, সেটা blasphemy হয়ে যাবে, তার জীবন সংশয়ে চলে যাবে।

ইউরোপের খ্রীশ্চান জগৎ আর হিন্দুদের জগতের মধ্যে তফাৎ এটাই। ইউরোপিয়ান সমাজ খ্রীশ্চান ধর্মের উপর আক্রমণ শানিয়েছে, মাঝখান থেকে খ্রীশ্চানিটি ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। যদিও, আমেরিকার অনেক রাজ্যে এখনও শপথ নেওয়ার সময় খ্রীশ্চানিটির নামেই শপথ নেয়, কিন্তু আগেকার মত সেই ক্ষমতা খ্রীশ্চানিটির হাত থেকে চলে গেছে। হিন্দুদের এই সমস্যা নেই, হিন্দুদের উপর প্রতিনিয়ত প্রচুর আক্রমণ আসছে, হিন্দুরাও ছাড়ছে না, তারাও জবাব দিচ্ছে, তা সত্ত্বেও এখনও হিন্দু ধর্ম আগের মতই শক্তিশালী আছে। ইসলামের ক্ষেত্রে ওরা কাউকে ওদের সমালোচনা করতে দেবে না, নিজেরাও নিজেদের সমালোচনা করবে না। স্বামীজী সেইজন্য বলছেন, হিন্দুরা বিশ্বের সব চেয়ে ধার্মিক জাতি হয়েও জানেই না ধর্মনিন্দা কাকে বলে। দুশ তিনশ বছর আগে যে খ্রীশ্চান বা বর্তমান কালের যে ইসলাম, তারা নিজেদের মনে করে ধার্মিক। কিন্তু হিন্দু ধর্মের সব কিছু, ছোট থেকে বড় সব কিছুই ধর্মের নামে করা হয়। চুরি ডাকাতি করবে ঈশ্বরকে সামনে রেখে। ধর্ম সব সময় জীবন স্বরূপ, কখনই বন্ধন স্বরূপ নয়। আর এই ধর্ম হিন্দুদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে আছে। খ্রীশ্চানিটিতে ধর্ম বন্ধন স্বরূপ ছিল, এখানে জীবন স্বরূপ।

সেইজন্য স্বামীজী বলছেন, to speak of holy things in any way is to them it itself a sanctification. (*তাদের মতে ভগবান বা ধর্ম সম্বন্ধে যে-কোন ভাবে আলোচনা করা হোক না কেন, তাতেই পবিত্রতা ও কল্যাণ লাভ হয়ে থাকে।*) যেভাবেই ধর্মের কথা, ঈশ্বরের কথা বলা হোক, হিন্দুদের কাছে সেটা পবিত্র। Nor have they any artificial respect for prophets or books, or for hypocritical piety. (*আর তারা অবতার বা শাস্ত্র বা ধর্মধ্বজিতার প্রতি কোন প্রকার কৃত্রিম শ্রদ্ধা বা ভক্তি দেখাবে না।*) স্বামীজী হিন্দুদের নামে বলছেন, হিন্দুরা কোন অবতারের প্রতি, কোন ধর্মশাস্ত্রের প্রতি, বা কোন ধর্মধ্বজিতার প্রতি কৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করে না। ইসলামে যদি রব ওঠে অমুক জায়গায় কোরানের পাতা জ্বালানো হয়েছে, ওরা সেখানে সরাসরি ফাঁসি দিয়ে দেবে। খ্রীশ্চানদের সামনে তাদের প্রফেটের বিরুদ্ধে যদি কিছু বলা হয়, ওরা এটা সহ্য করতে পারবে না। অন্য ধর্মের লোকেরা হিন্দুদের দেখলে চমকে ওঠে, এরা কোন কিছুই মানে না, কিছুই করে না, তাও বলে আমরা হিন্দু, নাস্তিক সেও নাকি হিন্দু, আস্তিক সেও নাকি হিন্দু, সন্ন্যাসী সেও নাকি হিন্দু আর বছর বছর যে সন্তান জন্ম দিয়ে যাচ্ছে সেও নাকি হিন্দু। একটা সমাজ যখন খুব খোলামেলা হয়ে যায়, জিনিসটা ঠিক সেই রকম।

স্বামীজীর মূল বক্তব্য হল, হিন্দুর মূল আস্থা আধ্যাত্মিক সত্যের প্রতি, এটা কোন মুর্খের আস্থা না। আধ্যাত্মিক সত্য কি? আত্মাই ব্রহ্ম, ঈশ্বরই আছেন। এই সত্যের প্রতি আস্থা মানুষকে একটা বিরাট শক্তি দেয়। আমরা যেমন বাড়ি বানাতে হলে একজন আর্কিটেক্টের কাছে যাই, শরীর খারাপ হলে ডাক্তারের কাছে যাই, ঠিক তেমনি ধর্মের কথা জানার জন্য আমাকে ধর্মের ব্যাপারে যিনি ভাল জানেন, ধর্মের যিনি বিশেষজ্ঞ, তাঁর কাছে যেতে হবে। ওই বিশেষজ্ঞের যদি কেউ নিন্দা করে, তাতে হিন্দুরা কোন গ্রাহ্যই করবে না। এই অর্থে গ্রাহ্য করবে না যে, এনারা এত উচ্চমানের আর এনাদের জ্ঞান এত গভীর, জগতের সব কিছু থেকে এনারা পেরিয়ে চলে এসেছেন, আর বোকা বোকা যে কথাগুলো ছিল, যে বন্ধনগুলো ছিল, সেগুলো সব খসে পড়ে গেছে। ফলে সাধারণ মানুষ জানে ঈশ্বরের সাথে, সন্তান রূপে, দাস রূপে, স্বরূপে, যে রূপেই হোক, আমার সরাসরি সম্পর্ক আর ওই সম্পর্ক হিন্দুদের এমন একটা জেনেটিক স্তরে চলে গেছে যে, এই সম্পর্কজনিত শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে তাদের কোন রকম কৃত্রিমতা থাকে না। ভালবাসা, শ্রদ্ধা এগুলো ভিতরেই থাকে, বাইরে দেখানোর জন্য নয়। কোন অবতারের প্রতি, কোন গ্রন্থের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোটা যখন বাইরে থেকে কোন ধর্ম বাধ্যতামূলক রূপে চাপিয়ে দেয় বা যখন বলে তোমাকে ভাল কাজ, পবিত্র কাজ করতে হবে, তখনই মানুষের মধ্যে ভালবাসা, শ্রদ্ধা এগুলো কৃত্রিম হয়ে পড়ে। স্বামীজী এই কথা তাঁর কয়েকজন বাছাই করা শিষ্যদের কাছে বলছেন। সংক্ষেপে মূল বক্তব্য হল, হিন্দুদের শক্তি অন্যান্য ধর্ম থেকে কিভাবে আলাদা। এই শক্তির পিছনে

বড় অবদান হল, যারা হিন্দুদের উপর নির্যাতন করেছে, নিন্দা ও সমালোচনা করেছে, আখেরে তারা হিন্দুদের মঙ্গল সাধনই করেছে। কারণ হিন্দু ধর্মকে আক্রমণ করতে গিয়ে তারা অজান্তায় হিন্দু ধর্মকে বিরাট শক্তিশালী করে দিয়েছে।

খ্রীষ্টের ধর্মসম্প্রদায় ও খ্রীষ্টীয় জীবনাদর্শ

স্বামীজী মানবজাতিকে যে শিক্ষা দিয়েছেন, মানুষের জীবনের জন্য তিনি যে আদর্শ দিয়ে গেছেন, সেটাকে নিয়ে স্বামীজী এক জায়গায় একটা কথাতে বলে দিচ্ছেন, It can be put in few words, 'man is divine'। বেদান্ত বাক্য 'অহং ব্রহ্মাস্মি', এর অর্থ হল, man is divine। Man is divine এই একটা কথাকে স্বামীজী ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিভিন্ন ভাবে তাঁর ভাষণে বলছেন। আমরা অতি সাধারণ মানুষ, সংসারে বিশ মন বোঝা মাথায় চাপিয়ে আমরা ঘুরছি। যে কোন তরুণ ছেলের মধ্যে বিয়ের আগে পর্যন্ত বিরাট শক্তির আস্ফালন দেখা যায়, কোন কিছুকেই সে পরোয়া করে না, কাউকে ভয় পায় না। তারপর নিজের ইচ্ছাতেই হোক বা বাড়ি ইচ্ছাতেই হোক, সে বিয়ে করল, একটা বিরাট বোঝা চেপে গেল, তারপর সন্তান হল, আরও বোঝা চেপে গেল। তার পুরো শক্তিটাই এখন সারা জীবন এই বোঝা টানতেই চলে যাবে। প্রথম আসে দুশ্চিন্তা, আমার যদি কিছু হয়ে যায় আমার স্ত্রী, আমার সন্তানের কি হবে! হিন্দুদের ক্ষত্রিয় বর্ণের মানুষ এমন ভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে এই আদর্শে তৈরী হয়েছিল যে, ছেলে বা মেয়ে যুদ্ধে যদি মারা যায়, তাদের চোখ দিয়ে জল বেরোবে না। ইদানিং কালে পুলিশ বা মিলিটারি কোন সঙ্ঘর্ষে মারা গেলে চারিদিকে হৈ হৈ শুরু হয়ে যায়। অবশ্যই একটা চিন্তা হয় যে, এদের পরিবারের এখন কি হবে, যদিও সরকার থেকে অনেক রকম সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয় ঠিকই। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে সবাই প্রস্তুত থাকে না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, কোন সৈনিক যুদ্ধে মারা গেলে তার স্ত্রী বলে যে, আমার ছেলেকে দেশের জন্য আমি সেনাবাহিনীতেই পাঠাবো। আবার অনেকে একেবারেই ভেঙে পড়ে। কিন্তু ভিতর থেকে যার মধ্যে ক্ষত্রিয়ের সংস্কার আছে তারা কখনই এভাবে ভেঙে পড়বে না, সে জানে আমি জন্ম থেকে মৃত্যুর জন্য তৈরী। সাধারণ ভাবে দেখা যায়, মানুষ বিয়ে করার আগে ভাবে, আমি একদিন বিয়ে করব, বিয়ে করার পর আমার সন্তান হবে, এরপর আমি নিজেকে এদের জন্য বলিদান করে দেব, এদের জীবনের সুরক্ষার জন্য আমি কোন কিছুই পরোয়া করব না। কিন্তু বিয়ের পর এই মনোবভাবটা চলে যায়। জীবনযুদ্ধ চালাতে গিয়ে এই ধরণের পঞ্চাশটা জিনিস জীবনে চলে আসার পর মানুষের শক্তি ক্ষয় হয়ে যায়। সেইজন্য, man is divine, আমরা সবাই দিব্য, এই সত্যকে আমরা নিতে পারি না।

মানুষ মাত্রই দিব্য, এই সত্যকে আধার করে জীবনে চলা আর এই সত্যকে উপলব্ধি করা সত্যিই খুব কঠিন। কারণ আমরা বিশ্বাসই করতে চাই না যে আমরা সবাই দিব্য। আগে আগে যে আলোচনা হয়েছিল, আমরা স্বরূপতঃ শুদ্ধ চৈতন্য, নিজেরাই শুদ্ধ চৈতন্য হয়ে নিজের স্বরূপকে ভুলে গিয়ে, আমারই সচ্চিদানন্দ স্বরূপের উপর আমারই মন দিয়ে একটা মুখোস লাগিয়ে একজন ভগবান বানিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে বলছি, হে ঠাকুর তুমি কৃপা কর, তুমি রক্ষা কর। স্বামীজী হলেন যুগাচার্য, অবতার পুরুষ, এই কথাকেই তিনি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলছেন। এখানে বাকি যে অংশটা আছে তাতে ঠিক এই জিনিসটাকেই নিয়ে আসছেন। আনার আগে একটা খুব বিচিত্র জিনিস দিয়ে শুরু করছেন। এর পশ্চাৎপটটা আমাদের একটু জানা দরকার।

যীশুর বারোজন শিষ্যরা মিলে যীশুর উপদেশগুলোকে লোকেদের কাছে যে সময় প্রচার করছেন, সেই সময় চারিদিকে খ্রীশ্চানিটির অনুগামীদের উপর খুব অত্যাচার চলছিল। কিন্তু যীশু ভগবানের সন্তান, তাঁর শক্তি আলাদা, সেই শক্তির প্রভাবে খ্রীশ্চান ধর্ম প্রসার লাভ করতে লাগল। দুশ আড়াইশ বছর যাওয়ার পর খ্রীশ্চানরা চার্চ তৈরী করতে লাগলেন। খ্রীশ্চানরা বলে যে, চার্চ হল যীশুর শরীর। যে খ্রীশ্চান ধর্ম প্রথমে খুব অগোছালো অবস্থায় ছিল, এবার সেই খ্রীশ্চান ধর্মকে ওনারা সব কিছুকে এক জায়গায় জড়ো করে Christanity as a systemএ দাঁড় করালেন। দাঁড় করাতে গিয়ে ওনারা কিছু কিছু জিনিসকে বাদ দিলেন। যেমন প্রথমের দিকে খ্রীশ্চান ধর্ম পুনর্জন্মবাদকে মানত। কিন্তু পরে এই নিয়ে খুব অশান্তি হতে লাগল, তখন বড়রা বললেন, একসাথে বসে ঠিক করা হোক। মাত্র কয়েকটা ভোটে পুনর্জন্মবাদ হেরে গেল, সেই থেকে খ্রীশ্চান ধর্মের স্বীকৃত মত হল তারা পুনর্জন্মকে মানে না। এভাবে কোথাও যখন ধর্মের মতকে ঠিক করা হয় বা পাল্টানো হয়, যেটা

অবতারের কথা নয়, ভগবানের কথা নয়, তখন স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগতে শুরু করে। এবার যীশুর সেই কথা গুলোকেই ওদের জোর দিতে শুরু করল, যে কথাগুলো চার্চের মতকে সমর্থন করে। যেমন রামকৃষ্ণ মিশনে, যদিও রামকৃষ্ণ মিশন সঙ্ঘ রূপে খুবই শিশু, সবে একশ বছর হয়েছে; আগামীকাল যদি অনেক কিছু হতে শুরু হয়ে যায় তখন দেখা যাবে কিছু কিছু জিনিস যেটা আগে থেকেই কোথাও ছিল, বড়রা বলছেন, আমরা এটাকে মানব না, আর এরপর থেকে যেন মানা না হয়। একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, একজন ছিলেন যিনি নিজেকে ঠাকুরের শিষ্য বলতেন, মঠের অনেক জায়গায় তাঁর ছবিও ছিল। পরে রামকৃষ্ণ মিশনের কর্তারা বলে দিলেন, উনি ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন না, আর এখন এটাই রামকৃষ্ণ মিশনের official standpoint হয়ে গেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই রকম হয়ে থাকে। যে জিনিসটা ঠিক পরিষ্কার নেই, তখন ওনারা বলেন, সঙ্ঘের মত নেওয়া হোক।

যাই হোক খ্রীশ্চানদের এই মত বারশ তেরশ বছর চলল, ইতিমধ্যে চার্চে আরও অনেক কিছুকে নিয়ে অশান্তি হতে শুরু করে দিল। সেখান থেকে লড়াই করে ধীরে ধীরে চার্চ হয়ে উঠল এক অত্যন্ত ক্ষমতাবান প্রতিষ্ঠান। কত ক্ষমতাবান এই একটা জিনিস দিয়েই বোঝা যায়, দেশের কেউ রাজা হতে পারবে না, যতক্ষণ চার্চ না আশীর্বাদ দিচ্ছে। সমাজে যে যাই করুক, বিবাহ করুক, শ্রাদ্ধ করুক, সব ব্যাপারে চার্চকে টাকা দিতে হবে। যদি না দেওয়া হয়, তার সম্পত্তি, জমি জায়গা চার্চের নামে লিখে দিতে হবে। এই করে চার্চের সম্পত্তির পরিমাণ প্রচুর বেড়ে গেল। সম্পত্তি বৃদ্ধি হলে যা হয়ে থাকে, চার্চগুলো দিনে দিনে দুর্নীতির আখড়া হয়ে গেল। তাছাড়া খ্রীশ্চানদের স্বর্গে না যাওয়ার ব্যাপারটা এমন ভয়ের ছিল যে, কেউ যদি কোন পাপ কাজ করে ফেলত তখন পোপের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলে চার্চ থেকে বলে দেওয়া হত, তুমি যদি এই পরিমাণ টাকা দিয়ে দাও, তাহলে বুঝে যাও যে,তোমাকে এই পাপের জন্য ক্ষমা করে দেওয়া হল। যেমন তুমি চুরি করেছ, পাঁচশ টাকা, তুমি অপরের স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলে, পাঁচ হাজার টাকা, খুন করেছ পঞ্চাশ হাজার টাকা। আগেকার দিনে পোপের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিত, এখন ভ্যাটিকান সিটিতে থোক দরে পোপের সই করা indulgence পাওয়া যায়। ওখানে চার্চের লোকেরা দাঁড়িয়ে দাম ধরে চেঁচাতে থাকে, কেউ পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার করে চেঁচাচ্ছে, কেউ চার হাজার চার হাজার করে চেঁচাচ্ছে।

মার্টিন লুথার কিং ছিলেন একজন খ্রীশ্চান ফাদার, খুব গোঁড়া খ্রীশ্চান ফাদার। বাইবেল খুব ভাল জানতেন। অন্যদিকে কোথাও তাঁর ভিতরে অনেক কাম ভাব ছিল। তখনকার দিনের ফাদাররা নিজেদের অনেক কষ্ট দিয়ে নিজেকে ভোগের জিনিস থেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতেন। বিভিন্ন কাজে তিনি ভ্যাটিকান সিটিতে যাতায়াত করতে গিয়ে সেখানকার এই জিনিসগুলির দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। সব কিছু দেখে তিনি খুব মর্মাহত হন। এর সাথে থিয়োলজিক্যাল ব্যাপার নিয়ে সাথে কর্তাব্যক্তিদের তাঁর মতান্তর হতে শুরু হল। এগুলোকে নিয়ে তিনি লেখালেখি শুরু করে দিলেন। ইতিমধ্যে জার্মানিতে রাজা, জমিদাররা দেখল, মার্টিন লুথার কিংকে যদি আমরা নেতা রূপে মেনে নিই তাহলে চার্চের নাগপাশ থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারব। তারপর থেকে মার্টিন লুথার কিং ধীরে ধীরে শক্তিশালী হতে শুরু হলেন। যা হয়ে থাকে, একটা শক্তি যদি দাঁড়িয়ে যায়, তখন চারপাশ থেকে আরও কিছু কিছু শক্তি এসে ওই শক্তির পাশে দাঁড়িয়ে যায়। এই জিনিসটা সাহিত্যে, সিনেমায়, কলার জগতে সব সময় হয়ে থাকে। যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আজ তাঁকে আমরা বিশ্বকবি বলছি, কবিগুরু বলছি, কত কি বলছি। ভাল করে দেখলে দেখা যাবে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময় কত বড় বড় সাহিত্যিক, কবিরা এসেছিলেন। বর্তমান কালে আমরা সেই মানের কোন নামকরা কবি বা সাহিত্যিক দেখছি না। কারণ, ওর সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এখন পুরো শক্তিটা চলে গেছে সিনেমার জগতে। সিনেমার জগতে এখন ভাল লেখক আছেন, ভাল পরিচালক আছেন, ভাল অভিনেতা আছেন। এটা কিছু না, শক্তির কেন্দ্রটা সরে গেছে।

মার্টিন লুথারের সময়, মার্টিন লুথারকে কেন্দ্র করে তখন অনেক কিছু চলছিল। ধীরে ধীরে তিনি বিদ্রোহ করতে শুরু করলেন, সাথে ছিল তাঁর শক্তিশালী লেখনী। সেখান থেকে এসে গেল প্রোটেস্টান্ট ধর্ম। প্রোটেস্টান্ট ধর্মের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, তারা চার্চকে মানে না। দ্বিতীয় হল, তারা বাইবেলকে রাখলেন, কিন্তু বাইবেলের যেগুলো অযৌক্তিক, অলৌকিক সেগুলোকে মানবে না। একটা ধর্ম দুজনকে দিয়ে চলে, প্রথম হলেন অবতার। দ্বিতীয় হলেন, একজন মহাত্মা, যাঁকে আমরা বলি সম্প্রদায় কর্তা। যেমন চৈতন্য মহাপ্রভু,

তাঁকে বেশির ভাগ লোকই অবতার বলে মনে করেন। কিন্তু যাঁরা তাঁকে অবতার বলে মনে করেন না, তাঁরা বলবেন তিনি একজন সম্প্রদায় কর্তা, তিনি একটা সম্প্রদায়কে দাঁড় করিয়েছেন। যেমন রামানুজ, রামানুজের ভক্তরা তাঁকে অবতার বলছেন, কিন্তু আমরা হিন্দু ধর্মের দিক দিয়ে দেখে বলছি, রামানুজ একজন সম্প্রদায় কর্তা। অবতার আর সম্প্রদায় কর্তার মধ্যে একটা বড় তফাৎ হল শক্তির তফাৎ। মার্টিন লুথার শুধু শক্তির দিক দিয়ে নয়, অপরকে যে প্রভাবিত করবেন, সেটা তিনি তাঁর বাগ্মিতা দিয়ে, বিদ্যা দিয়ে বা অন্যান্য অনেক কিছু দিয়ে করলেন। এই ক্ষেত্রে অবতার অবশ্য সব সময় এই কাজ তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়েই করেন। যীশু যে বারোজনকে শিষ্যকে তৈরী করলেন, তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়েই তাঁদের তৈরী করেছিলেন। মার্টিন লুথার যে শিষ্য বানালেন, সেটা তিনি নিজের বাগ্মিতা দিয়ে বানালেন। পরে চার্চগুলো মার্টিন লুথারের উপর খুব চটে গেল, যার ফলে ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্টদের মধ্যে অনেক লড়াই, যুদ্ধ হয়েছে। ইংল্যাণ্ড পরে পুরো প্রোটেস্টান্ট হয়ে যায়, ওরা ক্যাথলিকদের মানেই না। তাদের আয়ার্ল্যাণ্ড আবার গোঁড়া ক্যাথলিক। এই প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে আমরা দেখব, স্বামীজী তাঁর খ্রীশ্চান শিষ্যদের কি বলছেন।

স্বামীজী বলছেন, The Church tries to fit Christ into it, not the Church into Christ; so only those writings were preserved that suited the purpose in hand. (*খ্রীষ্টের ধর্মসম্প্রদায় খ্রীষ্টকে তাদের নিজের মতানুযায়ী করে গড়ে তোলবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু খ্রীষ্টীয় জীবনাদর্শে নিজেদের গড়বার চেষ্টা করেনি। এজন্যই খ্রীষ্ট-সম্বন্ধে যে-সকল গ্রন্থ উক্ত সম্প্রদায়ের সাময়িক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার সহায় হয়েছিল, কেবল সেগুলিকেই রাখা হয়েছিল।*) প্রথমে চার্চ দাঁড়িয়ে গেল, আর ওদিকে দাঁড়িয়ে গেলেন যীশু। চার্চ তার নিজের মতের সাথে যীশুকে খাপ খাওয়ার চেষ্টা চালাত লাগল। কিন্তু হওয়া উচিৎ ছিল অন্যটা, চার্চকে যীশুর মতানুযায়ী চলার চেষ্টা করা। চার্চ হয়ে গেলে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, যীশুকে কম গুরুত্বপূর্ণ বলাটা শোভা পায় না, কারণ তারা যীশুকে অবতার দেখে। এখানে আমরা একটু অন্য দিকে যাচ্ছি।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বড় বড় বিশ্ববিদ্যালগুলিতে বিজ্ঞান পড়ানো হত, কলা, দর্শনও পড়ানো হত। সাহিত্য, কলাতে যাঁরা খুব নামকরা ছিলেন, তাঁদের তখন বিরাট সম্মান ছিল। কিছু দিন পর থেকে বিজ্ঞান খুব বেশি সম্মান পেতে শুরু করল। ১৯২৫ আসতে আসতে বিজ্ঞানের নানান জিনিস আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে, বিজ্ঞান সম্মান পাওয়ার ক্ষেত্রে সবাইকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল। আরে এ্যটম বোমা আসার পর তো বিজ্ঞান সবার উপরে চলে গেল। বৈজ্ঞানিকদের দর্শনের সাথে কোন সম্পর্ক নেই, সাহিত্য, কলার সাথে কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ দর্শন, সাহিত্য, কলাকে নিয়ে যাঁরা সব সময় চর্চা করেন, বিনা কারণে তাঁরা এই নিয়ে একটা হীনমন্যতায় ভোগেন। তাঁরা এখন সবাই উঠে পড়ে প্রমাণ করতে লেগে যান যে, আমাদের সব কিছু বিজ্ঞান সম্মত। যখনই কেউ বিজ্ঞান ও ধর্ম, বেদান্ত ও বিজ্ঞান নিয়ে প্রবন্ধাদি ও লেকচার দিচ্ছেন, ইদানিং ম্যানেজমেন্ট এণ্ড বেদান্ত, গীতা এণ্ড ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কত লেকচার কত সেমিনার হচ্ছে, বুঝতে হবে এদের ভিতরে কোথাও একটা হীনমন্যতা এসে গেছে। অনেক বলবেন, স্বামীজীও তো বিজ্ঞান নিয়ে কত কথা বলছেন। ঠিকই, কিন্তু স্বামীজী এগুলোকে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বলতে চাইছেন। বিজ্ঞান ও ধর্ম দুটো পুরো আলাদা সাবজেক্ট। বিজ্ঞানকে ধর্মের সাথে কেন ফিট করতে হবে? সাহিত্য জগতে শুরু হল scientific approach of literature, সাহিত্য সাহিত্য, সাহিত্য সাহিত্যের মত চলবে, তাকে কেন scientific approach নিতে হবে? নামকরা এক ইউনিভার্সিটিতে একজন প্রফেসার গ্রীক কাব্যসাহিত্য পড়াতেন। ক্লাশের প্রথম দিন প্রফেসার বলবেন, আজকে আমি তোমাদের সামনে একটা দুর্ধর্ষ গ্রীক কাব্য আলোচনা করব। ছাত্ররা সবাই হাঁ করে শুনছে। প্রফেসারের দ্বিতীয় বাক্য হল, গ্রামারের যত রকমের ভুল হতে পারে, সবটাই এই কবিতায় আছে। ভাই তুমি কবিতা পড়াচ্ছো না গ্রামার পড়াচ্ছো? একটা বই আছে গীতা গ্রামার। আপনার ব্যাকরণ জানতে হলে ব্যাকরণের ঝুড়ি ঝুড়ি বই আছে, সেগুলো পড়ুন, গীতার সাথে ব্যাকরণের কি সম্পর্ক আছে? বিশ্বে যত ভাষা আছে সব ভাষার ব্যাকরণ ভাষা সৃষ্টি হওয়ার পরে এসেছে, ঠিক তেমনি সুরের আগে গান এসেছে। আমাদের জীবনের এটাই ভুল যে, যে জিনিসটা আমাদের জীবনে পরে আসার কথা সেই জিনিসটাকে আগে নিয়ে আসি, যেটা আগে আসার কথা সেটাকে পরে নিয়ে আসি। ইংলিশ পড়তে গেলে আগে ব্যাকরণ শেখাবে, মাঝখান থেকে ব্যাকরণটা শিখে যায়, ইংলিশটা আর শেখা হয় না। রবীন্দ্রনাথের কবিতার কি ভাব, কি গভীরতা, তার অভিব্যক্তি কল্পনাই করা যায় না যে প্রতিটি কবিতা কত উচ্চমানের কবিতা। এখন

রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে যদি ব্যাকরণের নিয়মে ফেলে দিয়ে পড়ানো হয়, ছাত্ররা সেই কবিতার ভাব কি ধারণা করবে! আপনি কবিতা পড়াচ্ছেন, নাকি ব্যাকরণ পড়াচ্ছেন? আপনি কবিতা পড়াচ্ছেন, নাকি বিজ্ঞান পড়াচ্ছেন? সংস্কৃত ভাষা এই কারণে সার্বজনীন হতে পারল না। সংস্কৃত পড়াতে গেলেই পণ্ডিতরা বেত হাতে নিয়ে প্রথমে ধাতু রূপ, শব্দ রূপ মুখস্ত করাতে শুরু করবেন। এদিকে বলছেন, সংস্কৃত ভাষা বিজ্ঞান সম্মত ভাষা। কিসের বিজ্ঞান সম্মত, ভাষা আগে, না ব্যাকরণ আগে? কেউ যদি এসে বলে ধর্ম কি বিজ্ঞান সম্মত? তাকে আগে উত্তর দিতে বলুন, বিজ্ঞান কি ধর্ম সম্মত? এসবে ক্ষেত্রে একটা সাবজেক্টকে আরেকটা সাবজেক্টে জোর করে মেলাবার চেষ্টা করা হয়।

পুরো ইউরোপে যখন চার্চ রাজ করতে শুরু করল তখন তারা বলে দিল, বিজ্ঞানকে চার্চের মত চলতে হবে, সাহিত্যকে চার্চের মত চলতে হবে। যার জন্য ব্রুনোকে পুড়িয়ে মারা হল, গ্যালিলিওকে চার্চের মতের বিরুদ্ধে বলার জন্য জবাবদিহি দিয়ে তাঁর বক্তব্যকে তুলে নিয়ে ক্ষমা চাইতে হল। স্বামীজী এটাই বলছেন, ক্যাথলিকদের এই সমস্যা ছিল, প্রোটেস্টান্টদের আরও বেশি এই সমস্যা হয়ে গেল। প্রোটেস্টান্টরা যীশুর কথাগুলোকে নিজের মত ব্যাখ্যা দিতে শুরু করলেন, এই আইডিয়া নিয়ে স্বামীজী বলছেন, The Church tries to fit Christ into it, not the Church into Christ; so only those writings were preserved that suited the purpose in hand। খ্রীশ্চান ধর্মের ইতিহাস নিয়ে ঘাটাঘাটি করলে এই ধরণের প্রচুর জিনিস পাওয়া যাবে।

গ্রন্থ-উপাসনা সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্টতম পৌত্তলিকা

স্বামীজী আরও মারাত্মক কথা বলছেন, Thus the books are not to be depended upon and the book-worship is the worst kind of idolatry to bind our feet. (*আর এইরূপ গ্রন্থ- বা শাস্ত্র-উপাসনা সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট পৌত্তলিকতা –এটা আমাদের হাত-পা একেবারে বেঁধে রেখে দেয়।*) এখানে স্বামীজী এক সঙ্গে পুরো সেমেটিক ধর্মকে একটা কথা দিয়ে শেষ করে দিলেন। ইসলাম ধর্ম একটি ধর্মগ্রন্থ কোরানের উপর কেন্দ্রিত। হিন্দু ধর্ম কিন্তু বেদের উপর কেন্দ্রিত নয়, শুধু হিন্দু ধর্মই নয়, কোন ভারতীয় ধর্মই কোন গ্রন্থের উপর কেন্দ্রিত নয়। এটা খুবই আশ্চর্যের যে, খ্রীশ্চান ধর্মই হোক, ইসলাম ধর্মই হোক বা জুদাইজিমই হোক, এরা যখন অন্য ধর্মকে আক্রমণ করে তখন তাদের ধর্মগ্রন্থকে আধার করেই করে। তারা বলবে, আমার বাইবেলে এই বলছে, আমার কোরানে এই বলছে, এটাকে তোমাদের মানতে হবে। কিন্তু আমি কেন তোমার বাইবেল বা কোরানকে মানতে যাব? কারণ এগুলো আল্লার কথা, যীশুর কথা। আমি তো তোমার আল্লাকেই মানি না, আল্লার কথা কেন মানতে যাব! এরপর আর কোন যুক্তি নেই।

স্বামীজী এখানে যে যুক্তি দিচ্ছেন, তাতে পুরো জিনিসটাকে তিনি অন্য দিক দিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। গ্রন্থ যখনই আসছে, বিশেষ করে যখন একটা উৎস থেকে আসছে, আমাদের জানা নেই ওটা কতটা সংশোধিত বা, সংযোজিত হয়েছে। সেইজন্য আমাদের ব্রাহ্মণরা কোন দিন গ্রন্থকে বিশ্বাস করতেন না। আর ঠিক এই কারণেই বেদ কখনই লেখা হত না। কারণ কোন কিছু লিখিত হলেই সেই লেখাতে যে লিখছে তার চিন্তা-ভাবনা, বুদ্ধি ওখানে ঢুকে যাবে। তাই আমাদের ছিল শ্রুতি, গুরুর মুখে তুমি যেমন শুনে নিয়েছ, ঠিক সেই রকমটি করার চেষ্টা কর, আর সেটাকে কাউন্টার চেকিং করার অনেকগুলো পদ্ধতি ছিল। হিন্দুদের বলা হয় তারা নাকি পৌত্তলিক। কিছু দিন আগে পাকিস্থানের একজন মুসলিম স্কলার হিন্দুদের নিয়ে লিখতে গিয়ে বলছেন, we know that Hindus are idol worshiper। এরা জানে না যে যারা কোন গ্রন্থকে মানছে তারাও পৌত্তলিক, ওদের কাছে গ্রন্থটাই আইডল। কিন্তু এরা এতই স্থূল যে, এই জিনিসটাকে বোঝার ক্ষমতাও এদের নেই। আগামীকাল যদি রামকৃষ্ণ মিশন বলতে শুরু করে, কথামৃতই আমাদের ভগবান, কথামৃতের বাইরে আর কিছু নেই, তাহলে বুঝতে হবে রামকৃষ্ণ মিশন পুরোপুরি idol worshiperএ নেমে গেল। কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশন যে ঠাকুরের পূজা করছে, এটা কিন্তু idol worshiperএর মধ্যে আসছে না, এগুলোকে নিয়ে আগে আমরা অনেক আলোচনা করেছি। হিন্দুরা আদপেই পৌত্তলিক নয়, পৌত্তলিক তারাই, যারা গ্রন্থকে শেষ কথা

বলে মনে করে আর গ্রন্থই যাদের কাছে একটা পুতুল হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। স্বামীজী এটাই এখানে বলতে চাইছেন, তারাই পৌত্তলিক যারা গ্রন্থকে পূজা করে।

All has to conform to the book, - science, religion, philosophy; it is the most horrible tyranny, this tyranny of the Protestant Bible. (*এদের মতে কি বিজ্ঞান, কি ধর্ম, কি দর্শন –সব কিছুই ঐ শাস্ত্রের মতানুযায়ী হতে হবে। প্রোটেস্টান্টদের এই বাইবেলের অত্যাচার সর্বাপেক্ষা ভয়ানক অত্যাচার।*) একটু আগে আমরা যে কথা বললাম, তোমার বিজ্ঞান, তোমার দর্শন যদি খ্রীশ্চানিটির সাথে না মেলে তাহলে তোমার গলা পর্যন্ত চলে যেতে পারে। এটা ঠিকই যে প্রোটেস্টান্টরা অনেক কিছু খ্রীশ্চান ধর্মে নিয়ে এলেন, খ্রীশ্চান ধর্ম আগের থেকে অনেকটা উদার হল ঠিকই, যার মধ্যে মার্টিন লুথারের ব্যক্তিগত কিছু চিন্তা-ভাবনা ছিল। তিনি যখন ফাদার ছিলেন, তখন তাঁর শরীরের যে ধর্ম, যেটা তাঁকে প্রচুর কষ্ট দিয়েছে, উনি সেগুলো মাথায় রেখে সব কিছু পাল্টে দিলেন। যার জন্য প্রোটেস্টান্ট ফাদাররা বিবাহ করতে পারেন, তাঁদের সন্তানাদিও হয়। কিন্তু যেটাই নেওয়া হোক সেটা বাইবেলের সাথে মিল থাকতে হবে, তাঁরাও সেইভাবে সব কিছু নিয়ে এলেন। তার সাথে আরও বলছেন, Every man in Christian countries has a huge cathedral on his head and on top of that a book, (*খ্রীস্টান দেশসমূহের প্রত্যেকের মাথার উপর একটা প্রকাণ্ড গির্জা চাপানো রয়েছে, আর তার উপরে একখানা ধর্মগ্রন্থ।*) স্বামীজী খ্রীশ্চান ধর্মকে নিয়ে এখানে বলছেন, কিন্তু এই জিনিস অন্যান্য ধর্মেও আছে। প্রত্যেক মানুষের মাথায় যেন একটা ক্যাথিড্রেল চাপানো আছে, আর সেই ক্যাথিড্রেলের মাথায় একটা গ্রন্থ রাখা আছে। স্বামীজী আমেরিকার বুকে দাঁড়িয়ে খ্রীশ্চান ধর্মকে নিয়ে এই কথা বলছেন। আর বলছেন, and yet man lives and grow. (*কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষ বেঁচে আছে, দাঁড়িয়ে আছে, উন্নতিও হচ্ছে।*) Does not this prove that man is God? (*এতেই কি প্রমাণিত হচ্ছে না যে, মানুষ ঈশ্বরস্বরূপ?*)

স্বামীজী বলতে চাইছেন, মানুষকে সব দিক থেকে সঙ্কুচিত করে আবদ্ধ করে দিচ্ছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষ সব বন্ধনকে ছিন্নভিন্ন করে বেরিয়ে আসছে। আমাদের দেশে আগে শূদ্র জাতির উপর কত ভাবে নিপীড়ণ করা হত, কত রকম বিধি নিষেধের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা দেখেছি, শূদ্র জাতিদের ভিতর থেকেও কত বড় বড় মহাত্মারা বেরিয়ে এসেছেন। তার মানেই, মানুষের ভিতর এমন একটা শক্তি আছে, যে শক্তি চাপিয়ে দেওয়া বাহ্যিক শক্তিকে দমিয়ে তেড়েফুড়ে বেরিয়ে আসে। যেমন বৃক্ষের একটা ছোট্ট বীজ, ওই ছোট্ট বীজের মধ্যে জীবনী শক্তি সুপ্ত হয়ে আছে, মাটিতে চাপা দিয়ে অনেক কিছু চাপিয়ে দেওয়ার পরেও সেই জীবনী শক্তি অঙ্কুরিত হয়ে বেরিয়ে এসে কালে মহিরুহতে পরিণত হয়ে যায়। মানুষের মধ্যে যে অসীম শক্তি, এর কি প্রমাণ? এটাই প্রমাণ যে, এই খ্রীশ্চান জগতের লোকগুলোর মাথার উপর চার্চের এত বোঝা, সেই চার্চের উপর আবার একটা গ্রন্থের বোঝা, কারণ গ্রন্থের বাইরে ওরা যেতে পারবে না, তা সত্ত্বেও খ্রীশ্চান দুনিয়ায়, শুধু খ্রীশ্চান দুনিয়াতেই নয়, সমস্ত জায়গায় মানুষ বড় হচ্ছে, আর নূতন নূতন চিন্তাধারা নিয়ে আসছে। মানুষের ভিতরে যে অসীম শক্তি, যে দিব্যত্ব রয়েছে, এটাই তার বড় প্রমাণ।

এখানে স্বামীজীর মূল বক্তব্য হল, যারা গ্রন্থে আবদ্ধ, গ্রন্থই যাদের কাছে সর্বোপরি, এদের থেকে বড় পৌত্তলিক আর কেউ হয় না। এমনকি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এই সমস্যা আছে, বিজ্ঞানের তৎকালীন যত জ্ঞানরাশি আছে, তার বাইরে যেমনি কেউ নূতন কিছু কথা বলে দিল, সব বিজ্ঞানীরা মিলে তাঁকে আক্রমণ করতে শুরু করে দেবেন। এটাই মানুষের স্বভাব, এখানে কিছু করার নেই।

ঈশ্বর সম্বন্ধে মানুষের ধারণা

সেখান থেকে স্বামীজী এবার শুরু করছেন, Man is the highest being that exists, and this is the greatest world, (*জীবের মধ্যে মানুষই সর্বোচ্চ জীব, আর পৃথিবীই সর্বোচ্চ লোক।*) এটা একটা খুব interesting observation, আমরা যে জগতে আছি, এখানে এই পৃথিবীর কথা বলা হচ্ছে না। আমরা পৃথিবীর যেখানেই গিয়ে দাঁড়াই, আমাদের মনে হবে আমাদের পায়ের তলায় পৃথিবীটা curve, আর এই বিরাট বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ছাতার মত আমাদের মাথাকে কেন্দ্র করে ছড়িয়ে আছে। এখান থেকে দশ কিলোমিটার

হেঁটে কোন ফাঁকা মাঠে গেলে মনে হবে এই ছাতাটা আমাদের সাথে চলছে। পাঁচশ কিলোমিটার যাওয়ার পরেও মনে হবে এই আকাশ আমাদের মাথাকে কেন্দ্র করে মেলে দিয়ে চলছে। বিজ্ঞান বলছে, রাতের আকাশের দিকে যখন তাকাচ্ছি, আসলে তখন আমরা ফলের মত পৃথিবী থেকে ঝুলছি আর নীচে বিশাল এক গহ্বরের দিকে তাকাচ্ছি। অথচ তখনও আমরা জানছি যে, আমাদের পায়ের তলায় মাটি curved হয়ে আছে। এই যে আমরা যে জগৎকে জানি, যেখানে গ্রহ আছে, তারা আছে, নক্ষত্র আছে, নক্ষত্র মণ্ডল আছে, যেটা আমাদের দৃশ্য জগৎ, তার সাথে মনের জগতাদি হতে পারে। বলছেন, this is the greatest world, এই জগৎটা মহৎ। অন্যান্য যে ব্রহ্মাণ্ড থাকতে পারে, যেটাকে নিয়ে স্বামীজী নিন্দা করছেন, ঠাকুরও অনেক জায়গায় নিন্দা করছেন। বলছেন, এই জগৎ শ্রেষ্ঠতম, আর তার মধ্যে আমি হলাম highest being। অথচ এর বিপরীত কথা আমরা ঠাকুরের কাছ থেকে, স্বামীজীর কাছ থেকে শুনছি। বিপরীত বলার পিছনে একটা তফাৎ আছে, কারণ সেখানে একটা অন্য ভাবে বলছেন, এখানে অন্য ভাবে বলছেন।

We can have no conception of God higher than man, so our God is man, and man is God. (*আমরা ঈশ্বরকে মানুষের চেয়ে বড় বলে ধারণা করতে পারি না; সুতরাং আমাদের ঈশ্বর মানুষ –আবার মানুষও ঈশ্বর।*) একটা বাচ্চাও নিজেকে মনে করে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সে হল কেন্দ্র। তার সাথে এই দুটো জিনিসকে যদি মনে রাখা হয়, আকাশ আমার মাথার উপর ছাতা ধরে চলেছে। আমি মনে করছি এই আকাশ আমাকে কেন্দ্র করে বিস্তারিত হয়ে নীচের দিকে নেমে এসেছে, আর পৃথিবী আমার পায়ের তলা থেকেই curve হতে শুরু হয়েছে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই এই ভাব – সে এই পৃথিবীর কেন্দ্র, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু আছে সব তাকে কেন্দ্র করে চলছে, সূর্য চন্দ্র তারা সবাই তাকে প্রদক্ষিণ করছে, আর এই জগতে তার মত কিছু নেই। গ্রীক গাণিতজ্ঞরা চিন্তা-ভাবনা ও হিসাব করে জানালেন, এই পৃথিবী হল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র। কানপুরের কাছে বিঠুর নামে একটা জায়গা আছে, যেখানে রানী লক্ষ্মীবাঈ ছিলেন। বিঠুরে গঙ্গার ধারে ওরা একটা বড় লাঠি পুতে রেখেছে, বলে এটা নাকি পৃথিবীর কেন্দ্র। লাঠিকে স্পর্শ করতে গেলে ওরা লোকেদের কাছ থেকে দক্ষিণা নেয়। অবাক লাগে, বিজ্ঞান এত এগিয়ে গেছে, তারপরেও এরা বলছে এটা পৃথিবীর কেন্দ্র আর লোকেরাও বোকার মত সেটাকে টাকার বিনিময়ে স্পর্শ করছে। সবাই ভাবছে এত বড় পৃথিবী, কোথাও তো তার একটা কেন্দ্র থাকতে হবে, এই লাঠিটাই হয়ত সেই কেন্দ্র। কিন্তু আসলে আমরা যেটাকেই বলব কেন্দ্র, সেটাই পৃথিবীর কেন্দ্র হবে।

বিজ্ঞান এখন বলছে, এই বিশাল ছায়াপথের মধ্যে সূর্য একটা খুব সাধারণ তারা, সেই সাধারণ তারার একটা অতি সাধারণ একটা গ্রহ হল এই পৃথিবী, তার মধ্যে আমরা অতি নগণ্য একটা ক্ষুদ্র জীব। এটা যেমন আছে, এর আবার অন্য একটা দিক আছে। বলছেন, এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের আমরা যেখানেই গিয়ে দাঁড়াই না কেন, সেটাই কিন্তু কেন্দ্র। কখন বলা যাবে না যে, এই বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এটাই একমাত্র কেন্দ্র, কারণ সব জায়গাটাই তার কেন্দ্র। আমরা যখন 'আমি' ভাবটাকে নিয়ে আসি, আমি এই দেহ, আমি এই মন, এই দেহ মনকে কেন্দ্র করে আমি ভাবছি আমি মহাপুরুষ, মানবজাতি এক মহৎ জাতি, তখন দার্শনিকরা হাসেন, অন্যরা হাসবে। স্বামীজী কিন্তু পুরো অন্য দিক থেকে বলছেন, we can have no conception of God higher than man। বেদে পুরুষসূক্তমে এক বিরাট পুরুষের কল্পনা করা হয়েছে, তাঁর হাত আছে, পা আছে, জঙ্ঘা ইত্যাদি আছে। পুরাণে দশাবতরে কচ্ছপ নিয়ে আসছেন, মৎস নিয়ে আসছেন, তার থেকে বেশি নিয়ে যাচ্ছেন নৃসিংহ অবতারে, এরপর কল্পনা আর ডানা মেলতে পারছে না। ঘুরে ফিরে সেই বিষ্ণুকে নিয়ে আসতে হচ্ছে, শিবকে নিয়ে আসতে হচ্ছে, আর না হলে রাম ও কৃষ্ণকে নিয়ে আসতে হচ্ছে।

ঈশ্বর কি রকম আমরা জানি না। কেনোপনিষদে আছে, দেবতারা অসুরদের উপর জয়ী হওয়ার পর তাঁদের খুব অহঙ্কার হয়েছে, ভাবছেন আমাদের শক্তিতেই আমরা এই জয় পেয়েছি। সেই সময় দেবতারা একটা বিচিত্র বস্তু দেখতে পেলেন। দেবতারা ভাবছেন কোন যক্ষ হবে হয়ত। যক্ষের কাছে দেবতারা এক এক করে গেছেন তাঁর পরিচয় জানতে। উলটে সেই যক্ষ দেবতাদের ক্ষমতা কি জানতে চেয়ে বললেন, অগ্নি দেবতাকে বললেন তুমি এই তৃণ খণ্ডকে পুড়িয়ে দাও তো, বায়ু দেবতাকে বললেন তুমি এই তৃণের টুকরোকে উড়িয়ে দিয়ে তোমার ক্ষমতাটা দেখিয়ে দাও তো। অগ্নি দেবতা সেই তৃণ খণ্ডকে পোড়াতে পারলেন না, বায়ু

দেবতা ওড়াতে পারলেন না। দেখিয়ে দিলেন তোমাদের কোন ক্ষমতা নেই। তার মানে তুমি 'আমি' ভেবে নিজেকে যে শক্তিমান ভাবছ, আসলে তুমি কিছুই না। এটাই এতক্ষণ বলা হল, তুমি যদি নিজেকে দেহ রূপে কেন্দ্র মনে কর, এই মনে করার কোন দাম নেই। অন্য দিকে কেনোপনিষদে যে যক্ষের কথা বলা হচ্ছে, সেখানে উপনিষদও বলতে পারছেন না, যক্ষ দেখতে কেমন ছিল। তখন উমা হৈমবতী এসে দেবতাদের বললেন, *সা ব্রহ্মেতি হোবাচ*। তোমরা দেবতারাও যাঁকে ধারণা করতে পারলে না, তিনিই ছিলেন ব্রহ্ম। কিন্তু তাঁর কোন বর্ণনাই আমরা পাচ্ছি না। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ ঘুরে ঘুরে একটা কথাই বলছে, মানুষ যখন ঈশ্বরকে সর্বশ্রেষ্ঠ রূপে নিয়ে আসে তখন তাঁকে মানুষের রূপেই নিয়ে আসে। ভগবান মানুষের মত বলে দিলে, এর থেকে বোকা কথা আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু আমরা ঈশ্বরকে মানুষের রূপ ছাড়া অন্য কোন রূপে কল্পনা করতে গেলে অনেক সমস্যা এসে যায়। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে, বিশেষ করে অষ্টম অধ্যায়ে বিভিন্ন রূপ নিয়ে আসছেন, যেখানে দেবী অনেক রূপে দেবতাদের সামনে আবির্ভূতা হচ্ছেন। কিন্তু দেখা গেলে এতগুলো রূপ নিয়ে আসার পরেও ঠিক জমল না, শেষ পর্যন্ত পার্বতীর রূপটাই প্রচলিত হয়ে গেল।

মানুষ নিজের মনের চিন্তা-ভাবনার বাইরে কখনই অন্য কিছু ভাবতে পারে না। নিজের মনের বাইরে যেতে পারে না বলে, ঈশ্বরের সব থেকে কাছের রূপ হয়ে গেল মানুষের রূপ। ঠাকুর যত রকম রূপে দর্শন করছেন, তার বেশির ভাগ রূপই তিনি মানুষ রূপে দর্শন করছেন। আমাদের মস্তিষ্কই বলুন, মনই বলুন, এমন ভাবে গঠিত যে, আমরা ঈশ্বরকে মানুষ রূপেই সহজে বুঝতে পারি। অবতারাদির ধারণা করার জন্য বা যে কোন ভাবকে ধারণা করার জন্য, আমাদের মন যে জায়গাটা সহজে বুঝতে পারে, জিনিসটা এই রকম, ওটা দিয়েই আমাদের বোঝান যায়। ঠাকুর বলছেন, ছোকরা গুলিকে আমি একটু মাছ ধোওয়া জল দিই। মাছ ধোওয়া জল মানে, একটু হাসিমজা, একটু সাংসারিক বিষয়। বেশি দেওয়া যাবে না, দিলে ওর মধ্যেই ডুবে যাবে। মাছ ধোওয়া জল না দিলে এরা বুঝবে না, কারণ ছোকরাদের মন, ওদের চিন্তা-ভাবনা এখনও সাংসারিকতার মধ্যেই ঘুর ঘুর করছে। ঈশ্বরকেও যখন মানব রূপে নিয়ে আসা হয় তখনই আমরা বুঝতে পারব। যার জন্য মীন অবতার, বরাহ অবতারের পূজা কোথাও হয় না। মহাবীর হনুমান একজন হনুমান, কিন্তু তাঁকেও অনেকটাই মানুষ রূপে নিয়ে এসে পূজা করছে। ঈশ্বরকে মানব রূপে দেখার জন্য এর একটা সাংঘাতিক মূল্য এসে গেল। এটাই বলছেন, ওই ঈশ্বরকে আমরা মানব রূপে কল্পনা করি, দর্শন করি। আমরা ঠাকুরকে সাক্ষাৎ দেখছি, তাঁর বেশির ভাগ দর্শন মানব রূপেই হয়েছে।

তবে মানুষ রূপেই যে সব সময় দর্শন হবে তা নয়, যেমন জুদাইজিমের প্রফেট মোজেসের কাছে ভগবান বিভিন্ন রূপে এসেছিলেন, তার মধ্যে একটা হল Burning Bush, একটা ঝোপ জ্বলছে। জ্বলছে, কিন্তু পুড়ে যাচ্ছে না। স্বামীজী এখানে বলছেন, আমরা যদি চিন্তা-ভাবনা করতে যাই তখন ইন্দ্রাদি দেবতাদেরও আমরা মানুষ রূপেই কল্পনা করি, সেইজন ঈশ্বরের মানব রূপই শ্রেষ্ঠ।

জগৎকে না ছাড়লে উচ্চতর জ্ঞানের সাক্ষাৎ হবে না

When we rise and go beyond and find something higher, we have to jump out of the mind, out of body and the imagination and leave this world. (*যখন আমরা মনুষ্যভাবের উপরে উঠে তার অতীত উচ্চতর কোন কিছু সাক্ষাৎ করি, তখন আমাদের এ জগৎ ছেড়ে দেহ-মন-কল্পনা –এ-সবেরই বাহিরে লাফ দিতে হয়।*) সমস্যা হল, যেমনি আমরা এর উপরে যেতে চাইব, তখনই আমাদের জগতের সব কিছুকে ছেড়ে দিতে হবে, দেহকে ছাড়তে হবে, মনকেও ছেড়ে দিতে হবে। যাঁরা ঠিক ঠিক ঈশ্বর দর্শন করেছেন, তা তিনি যীশুই হন, মহম্মদই হন, মোজেসই হন বা ঠাকুরের কথাই বলা হোক, একটা অবস্থায় চলে যাওয়ার পর সবাই জগৎকে ছেড়ে দিচ্ছেন। ছেড়ে দেওয়ার পর যা যা অনুভূতি পাচ্ছেন, সব তাঁরা বোধে বোধ করছেন। ঠাকুর বলছেন, শুদ্ধ বুদ্ধি, শুদ্ধ মন, শুদ্ধ আত্মা এক, এরপর যা অনুভূতি হচ্ছে সব বোধে বোধ হয়। কিন্তু তাঁরা যা কিছু বোধে বোধ করছেন, সেটাকে আমাদের কোন ভাবেই বোঝাতে পারেন না। তিনি যদি বলতেও যান, আমরা তার কিছুই ধারণা করতে পারব না। কারণ আমাদের যে জ্ঞানরাশি, ওই জ্ঞানরাশির এক পা এদিকে, এক পা ওদিকে বুঝতে পারব, তার একটু বেশি এদিক ওদিক হয়ে গেলে আমাদের তা ধারণার মধ্যেই আসবে না।

আমেরিকার একজন দর্শনের অধ্যাপক ছাত্রদের পড়াতে গিয়ে বলছেন, সৃষ্টি একমাত্র ঈশ্বরের। একজন ছাত্র বলছে, 'না, ঈশ্বর সৃষ্টি করতে পারেন না'। 'তাহলে তুমি সৃষ্টি করে দেখাও'। ছাত্রটি বোর্ডে একটা আকৃতি এঁকে দিল, দিয়ে বলছে, এটা একটা creative জিনিস, একটা নূতন জিনিস। অধ্যাপক খুব বিদগ্ধ ছিলেন, উনি সঙ্গে সঙ্গে দেখাচ্ছেন, 'এই দেখ, এই ছবির এই অংশটা যে তুমি নিয়েছ, এটা অমুক প্রানীর, আর ওই অংশটা নিয়েছ অমুক প্রানী থেকে। Creativity তোমার কোথায় থাকল? যে জিনিসগুলো আগে থেকেই কোন না কোন ভাবে কোথাও না কোথাও আছে, সেটাকেই তুমি নিয়ে জুড়ে দিয়েছ'। গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীগুলি খুব উচ্চমানের, কিন্তু সেখানেও যে চরিত্রগুলো আসছে, যেমন হোমারের সাইক্লস, তার একটা চোখ, সেই চোখ মানুষেরই চোখ, দুটো চোখকে একটা চোখ করে দিয়েছে, কপালের নীচে দু-দিকে ছিল সেটাকে মাঝখানে করে দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত নূতন কোন সৃষ্টি হচ্ছে না। যেমনি creativity কিছু হবে, সঙ্গে সঙ্গে কেনোপনিষদের মন্ত্রের ওই শব্দগুলো এসে যাবে, *কিমিদং যক্ষমিতি*, এটা কোন যক্ষ? কারণ এরপর আর সে ধারণা করতে পারবে না। শুধু আধ্যাত্মিক জগতেই নয়, যে কোন জগতে, এমনকি বিজ্ঞানের জগতেও, একটা স্তরে চলে যাওয়ার পর মানুষকে আর বোঝাতে পারে না, তখন equation দিয়ে বোঝাতে হয়। আমাদের সবারই একটা সীমা আছে, ওই সীমার পারে আমরা আর ধারণা করতে পারি না। কারণ আমি, আমিত্ব বলতে যেটাকে বোঝায়, এই আমিত্ব থেকে আগে বেরিয়ে আসতে হবে। কিন্তু আমিত্ব থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারি না। আমিত্ব থেকে বেরোতে গেলে ঠাকুরের ভাষায়, আমি ভাবকে পুরোপুরি মুছে ফেলে দিতে হবে, এরপর মন বাণী পড়ে থেকে যাবে। সেইজন্য কি অনুভূতি হচ্ছে আমরা জানি না। শেষ পর্যন্ত আমরা যেটা অনুভব করি বা সাক্ষাৎ করি, তখন বলি, সেটা মানুষ ছাড়া কিছু হয় না। স্বামীজী বলছেন, When we rise to be the Absolute, we are no longer in this world. (*আমরা যখন উচ্চাবস্থা লাভ করে সেই অনন্তস্বরূপ হই, তখন আর আমরা এ জগতে থাকি না।*) অদ্বৈত জ্ঞান যার এসে গেল, সে জেনে যায় যে সে আর এই জগতের নয়। যদি সেই রকম কিছু অনুভূতি হয়, যা মানবাকৃতি বা এই জগতের যা কিছু আছে তার বাইরে, তাহলে বুঝতে হবে সে আর এই জগতের কেউ নয়, আর তার ভাষা এই জগতের কেউ বুঝবেও না।

Man is the apex of the only world we can ever know. (*আমাদের এই জগৎ ছাড়া অন্য কোন জগৎ জানবার সম্ভবনা নেই, আর মানুষই এই জগতের সর্বোচ্চ সীমা।*) এবার স্বামীজী দৃশ্যমান জগতে মানুষের শ্রেষ্টত্বকে নিয়ে আসছেন, যে জগৎকে আমরা আপাতদৃষ্টিতে জানছি, দেখছি, এই জগতে মানবজাতি হল শ্রেষ্ঠতম। যদি অন্য কোন জগৎ থেকে থাকে, থাকতেই পারে, ঠাকুরের ভাষায় সূক্ষ্ম জগৎ আছে, কারণ জগৎ আছে, কারণ জগতে বড় বড় যোগীরা আছেন। কিন্তু আমরা ওই জগৎকে জানি না, আর আমরা ওই জগৎকে কোন দিন জানতেও পারব না। কারণ আমাদের যে জগতের জ্ঞান, এই জ্ঞান পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে, মন দিয়ে আসে। যে জগতেকে আমরা জানি, যে জগৎকে আমরা জানতে পারি, আমরা সেই জগতের শ্রেষ্ঠ জীব। All we know of animals is only by analogy, we judge them by what we do and feel ourselves, (*পশুদের সম্বন্ধে আমরা যা জানতে পারি, তা কেবল সাদৃশ্যমূলক জ্ঞান।*) স্বামীজী আরও সহজ করে বলছেন, আমরা যখন পশুজগতে বিচরণ করি, বিচরণ করতে গিয়ে আমরা পশুজগৎকে যখন মাপি তখন আমরা আমাদের যে গুণগুলি আছে সেগুলোকে দিয়েই মাপি। আমরা বলি প্রানী জগতে যত প্রানী আছে, সবার মধ্যে আমরা শ্রেষ্ঠ। যারা বায়োলজি সম্বন্ধে ভাল জানে, তারা বলে যে, একটা যে ক্ষুদ্র ভাইরাস, একটা ব্যাক্টেরিয়া, এরা দশ বছরের মধ্যে নিজেদের এমন evolve করে নেয় যে, যত রকমের এ্যন্টিবায়েটিক আছে, কোনটাই আর কাজ করতে পারে না। মানবজাতির যে ইতিহাস আমরা জানি, ডারউনের evolutionary theory যদি পুরোপুরি সত্য হয়, আমরা জানি লক্ষ লক্ষ বছরে আমাদের কোন evolution হয়নি। যে জিনিসটা আমরা লক্ষ লক্ষ বছরে evolve করতে পারলাম না, সেখানে একটা ক্ষুদ্র ভাইরাস, ব্যাক্টেরিয়ে দশ বছরে পুরোপুরি নিজেদের পরিবর্তিত করে দিচ্ছে। কিছু দিন আগে কয়েকজন বিজ্ঞানী plastic eating ব্যাক্টেরিয়াকে নিয়ে একটু নাড়ানাড়ি করছিল, নাড়ানাড়ি করতে গিয়ে কি একটা হয়ে গেল যে, হঠাৎ দেখছেন ওদের গতিবিধি পুরো পাল্টে গেছে, পুরো প্রজাতিটাই পাল্টে গেল। প্রজাতি এমন পাল্টে গেছে যে দুমদাম করে কয়েকটা প্লাস্টিক খেয়ে নিচ্ছে। এখন বিজ্ঞানীরা বলছেন, এটা কোন ব্যাপারই না, ওরা এটাকে

একটু কালচার করে দেবে, জগতে যত প্লাস্টিক আছে ওরা সব প্লাস্টিককে খেয়ে নূতন করে বের করে দেবে। বলছেন যে, নূতন করে আর প্লাস্টিক তৈরী করার দরকারই নেই। তার মানে একটা ক্ষুদ্র প্লাস্টিক ইটিং ব্যাক্টেরিয়াকে নিয়ে একটু নাড়ানাড়ি করল, তাতে তার প্রজাতিটাই পাল্টে গেল, তার শক্তি, তার সব কিছুই পাল্টে গেল। এবার পশু জগতে আসা যাক, যে কোন একটা পশুকে নিয়ে আসা হোক, তার এমন এমন কিছু বিশেষত্ব আছে যা মানুষের মধ্যে নেই। তাও কিন্তু আমরা আমাদেরকে মাপকাঠির স্ট্যাণ্ডার্ড করে মেপে বলি, এই পশু এমন, সেই পশু এমন। আমাদের মন এমন যে, আমরা নীচের দিকেই যাই, উপরের দিকেই যাই, যেখানেই যাই, আমরা আমাদেরকেই স্টাণ্ডার্ড করে পরিমাপ করব। স্বামীজী এখানে শিষ্যদের বোঝাতে চাইছেন যে, মানুষের মনের ক্ষমতা ঠিক না, মানব মনের স্বভাব কি রকম। এবার বলছেন।

জ্ঞান সমুদয়ের সমষ্টি সর্বদা সমান

The sum total of knowledge is ever the same, only sometimes it is more manifested and sometimes less. The only source of it is within, and there only is it found, (*সমুদয় জ্ঞানের সমষ্টি সর্বদাই সমান –কেবল সেটা কখন বেশী, কখন কম অভিব্যক্ত হয় –এই মাত্র। ঐ জ্ঞানের একমাত্র উৎস একমাত্র আমাদের ভিতরে এবং কেবল সেইখানেই ঐ জ্ঞান লাভ করা যায়।*) এটাও স্বামীজীর একটা unusual সিদ্ধান্ত, যেটা উনি প্রায়ই বলতেন। তখনকার দিনে conservation of energy খুব প্রচলিত থিয়োরী ছিল। এখন অবশ্য থিয়োরীটা পাল্টে গেছে, এখন conservation of energy বলে না, এখন বলা হয় conservation of mass energy। কারণ আইনস্টাইনের থিয়োরী আসার পর যে এ্যটম বোমা হল, তাতে ওনারা দেখছেন conservation of energy হয় না। তেমনি sum total of energy এটা ঠিক না, sum total of energy সমান থাকে না। কিন্তু এখন পর্যন্ত যে ইউনিভার্সকে আমরা জানি তাতে sum total of mass energy is same, কারণ energy massএ convert হয় mass energyতে convert হয়। সেইজন্য এনার্জি কখন বাড়বে, কখন কমবে, কিন্তু mass আর energyর dualityকে যদি নেওয়া হয় তাহলে কিন্তু ওটা পালটায় না। স্বামীজীর সময় এই থিয়োরীটা তখনও আসেনি, সেইজন্য স্বামীজী যখন বলছেন sum total of knowledge, তখন এমন কিছু দোষের হয় না। মহাপুরুষরা যখন এই জগতের কোন একটা উপমা নিয়ে আসেন, তখন তাঁরা তৎকালীন জ্ঞানকে আধার করেই বলেন। তাই এগুলোকে নিয়ে সমালোচনা করা যায় না।

এনার্জির মতই স্বামীজী জ্ঞানের উপর একটা সিদ্ধান্ত ছিল, sum total of knowledge is ever the same, আসলে এই জগতে জ্ঞানের যতটা প্রকাশ হয়, সেটাকে স্বামীজী বলছেন, সব সময় এক থাকে। স্বামীজীর একটা থিয়োরী ছিল, একটা জিনিস যদি এক জায়গায় বেড়ে যায়, অন্য জায়গায় সেটা কমে যাবে। যেমন স্বামীজী বলছেন, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও দেখা যায়, যে সমাজ থেকে মহাপুরুষ তৈরী হয়, ঐ সমাজ অনেক নীচে চলে যায়, কারণ মহাত্মারা সমাজের psychic energy অনেকটা টেনে নেন। স্বামীজী তখন মীরাবাঈ, কবীর এনাদের উপমা দিচ্ছেন। এনারা যে সমাজ থেকে এসেছেন, সেই সমাজের শক্তিটাকে এনারা টেনে নিয়েছেন, সেইজন্য এনাদের সমাজটা নীচে চলে গিয়েছিল। স্বামীজীর এটা খুব প্রিয় থিয়োরী ছিল, তাই তিনি বলতেন, মহাপুরুষ আর জনগণের উত্থান এই দুটোর মধ্যে তোমাকে একটা বেছে নিতে হবে। যদি তুমি চাও তোমার সমাজে, তোমার পরিবারে মহাপুরুষ আসুক, তাহলে তুমি ধরে নাও, তোমার বাকিরা নীচে চলে যাবে। আর যদি তুমি চাও সবাই উপরে আসুক, তাহলে কিন্তু মহাপুরুষ হবে না।

স্বামীজীর কোথাও এই চিন্তাটা ছিল যে, ঈশ্বর যখন সৃষ্টি করেন, ঈশ্বর হলেন সেই সচ্চিদানন্দ, তিনি তাঁর জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তিকে ছেড়ে দিয়েছেন। স্বামীজী বলছেন, এই যে জ্ঞান, এর সমষ্টি সব সময় সমান। এই জ্ঞানের প্রকাশ কখনও কম, কখনও বেশি। আর এই জ্ঞান বাইরে কোথাও নেই, জ্ঞান ভিতরেই বিদ্যমান, আত্মারই জ্ঞান, আত্মার জ্ঞান যেটা ভিতরে আছে, সেটারই বহিঃপ্রকাশ হয়। আগে আগে যাঁরা জ্ঞান উপলব্ধি করেছেন, বিজ্ঞানীরা যেমন করেছেন, সেই জ্ঞানরাশি বাইরে আছে ঠিকই, কিন্তু আমরা যখন পড়াশোনা করে ভিতরে নিচ্ছি আসলে তখন আমরা জ্ঞান নিচ্ছি না, তখন ইনফরমেশান নিচ্ছি। একটা বাচ্চাকে যেমন বলা হল, সত্যি কথা বলবে, ওটাও তখন জ্ঞান না হয়ে একটা ইনফরমেশান হয়ে যায়, বাচ্চার কাছে কিছু ইনফরমেশান

গেল। ওই ইনফরমেশানটা থেকে যায়, এমন একটা কিছু পরিস্থিতি আসে, তারপর হঠাৎ দেখে জিনিসটা সত্য, এই যে জ্ঞানটা আসছে, এই জ্ঞান সব সময় ভিতর থেকে আসে। একদিকে বলা যেতে পারে, সেই সচ্চিদানন্দ আত্মা, যিনি সৃষ্টি করছেন, তাঁর যে জ্ঞানরাশি, ওটাই আছে। এটা যে সীমিত, ঠিক সেই অর্থে না, কিন্তু তার বাইরে থেকে যে অনেক কিছু বার করে নেওয়া হবে তা নয়, আর তার সাথে কোন কোন সমাজে জ্ঞানের হঠাৎ বৃদ্ধি হয়ে গেল, কিন্তু কিছু দিন পরে দেখা যাবে সেই সমাজ অনেক নীচে পড়ে গেছে।

যেমন গ্রীক সভ্যতা, এক সময় তারা কত উন্নত ছিল, কিন্তু আজকে বলতে গেলে কিছুই নেই। প্রফেট মহম্মদ আসার পর আরব এক সময় গণিত শাস্ত্রে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে গিয়েছিল, বর্তমানে সেইরকম কিছুই নেই। জ্ঞানরাশির সমষ্টি যেন এক, এই জ্ঞানরাশি এখানে এখন আছে, কিছু দিন পরে এখানে নেই, অন্য কোথাও জ্ঞানরাশির বিস্তার হয়ে গেল। ইতিহাসেও দেখা যায় যে, কোন সমাজে ঢেউয়ের মত জ্ঞানরাশির বিস্তার হয়ে গেল, কিছু দিন পর সেই জ্ঞানরাশি পড়ে গেল, আবার অন্য কোথাও ঢেউয়ের মত উঠতে থাকে। স্বামীজীর এই ধরণের একটা চিন্তাধারা ছিল। এটা যেমন জ্ঞানের ব্যাপারে হয়, সম্পত্তির ব্যাপারেও হয়। আমরা বলি মা লক্ষ্মী চঞ্চলা, এক জায়গায় তিনি স্থির থাকেন না। যার জন্য দেখা যায়, সম্পদরাশি একটা দেশ থেকে আরেকটা দেশে ঘুরছে। এক সময় ইংল্যাণ্ডে সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্য ছিল, এখন সেটা আমেরিকাতে গিয়ে আছে, সেখান থেকে আবার চীনের দিকে নড়ছে। সম্পদের সমষ্টি কোথাও যেন সমান থাকে, কিন্তু দেশে দেশে পাল্টাতে থাকে।

ভাব ও ভাবের অভিব্যক্তি

এখান থেকে এগিয়ে গিয়ে স্বামীজী এবার বলছেন, All poetry, painting, and music is feeling expressed through words, through colour, through sound. (*সমুদয় কাব্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত কেবল ভাষা, বর্ণ ও ধ্বনির মধ্য দিয়ে ভাবের অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।*) কোন পেইন্টিং বা কবিতাকে আমরা বলছি, কি দারুণ পেইন্টিং, কালিদাস কত সুন্দর সুন্দর কবিতা রচনা করেছেন। কিন্তু আমরা এটা ভুলে যাচ্ছি যে, এগুলো ঠিক creativity নয়, এগুলোর সবটাই হল feelings, তার ভিতরে যে feeling রয়েছে, সেটাকেই তিনি শব্দের মাধ্যমে উপস্থাপনা করছেন, কিংবা রঙের মাধ্যমে, কিংবা একটা সুরের মাধ্যমে বাইরে নিয়ে আসছেন। Creativity যে অর্থে হয়, সেই অর্থে নয়। একই feelings আমাদের সবারই হয়, কারুর মধ্যে ওটাকে অভিব্যক্ত করার ক্ষমতা থাকে, কারুর মধ্যে থাকে না। যেমন বাচ্চা ছেলে যদি একটু কষ্ট পায়, তাতে এমন চেঁচাতে শুরু করবে যে পাড়াশুদ্ধ লোক জেগে যাবে। কিন্তু বড় হয়ে যাওয়ার পর তার সেই একই কষ্ট হলে প্রকাশ করে না। Feelings কারুর প্রকাশ করার ক্ষমতা থাকে, কারুর থাকে না। স্বামীজী এটাই শুধু বলতে চাইছেন, আমরা যে পেইন্টিং, কবিতা, গানের প্রশংসা করি, কিন্তু মূলতঃ এগুলো হল যার যার feelingsএর প্রকাশ। লেখনীর ক্ষেত্রে বা পেইন্টিংএর ব্যাপারে, সঙ্গীতের ব্যাপারে, কবিতার ব্যাপারে প্রথমে আসে একটা আইডিয়া। সেই আইডিয়াটা একজনের মনের ভিতরে বীজাকারে এসে প্রবেশ করে ধীরে ধীরে বীজ যেমন মাটিতে পুতে দেওয়ার পর অঙ্কুরিত হয়ে বড় হতে থাকে, তেমনি ওই আইডিয়াটাও সেই ভাবে যাদের feelings খুব শক্তিশালী, যারা খুব অনুভূতি প্রবণ, তাদের ভিতরে বড় হতে শুরু করে। গর্ভবতী নারী যেমন খুব কাছের কয়েকজনকে বলে আমার গর্ভে সন্তান এসেছে, ঠিক তেমনি এর মনে যখন কোন আইডিয়া খেলতে থাকে তখন সেও নিজের খুব কাছের একজন দুজনকে বলে। গর্ভস্থ শিশু এত বড় হয়ে গেছে যে আর তাকে গর্ভে রাখা যাবে না, এবার তাকে জন্ম দিতে হবে। যখন ওই আইডিয়াটাকে আর মনে ধরে রাখতে পারছে না, তখন ওটাই কাগজে শব্দের আকার নিয়ে বেরিয়ে আসে, কিংবা একটা ক্যানভাসে রঙ হয়ে বেরিয়ে আসে, কিংবা একটা গান হয়ে বেরিয়ে আসে। নূতন শিশু হওয়ার পর তার লালন-পালন হতে থাকে, নিজের ঘনিষ্ঠ লোকেদের বাচ্চাকে দেখানো হয়। একটা বয়সের পর শিশুকে যেমন ছেড়ে দেওয়া হয়, প্রথম যেদিন সে একা একা স্কুলে গেল, তখন সেই শিশু আর কেবলমাত্র মায়ের থাকল না, তখন সে জগতের হয়ে গেল। ঠিক তেমনি একটা সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর, এই রচনাগুলি আর রচয়িতার থাকে না, তখন তা জগতের হয়ে যায়। জগৎ তাকে নিয়ে কি করবে, সেটা জগতের

ব্যাপার। মা শুধু দূর থেকে বলবে, আমার সন্তান। সন্তানের উপর আর তার নিয়ন্ত্রণ নেই। দেশে বিদেশে বড় বড় যারা রাষ্ট্রপধান, বড় বড় বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, কজন আর জানে আইনস্টাইনের বাবা-মার কি নাম! ঠিক তেমনি যেগুলো সত্যিকারের সৃষ্টি সেখানে নাম মুছে যায়, থেকে যায় শুধু সৃষ্টি। যেমনি বলা হবে, রবীন্দ্রনাথের কবিতা, বুঝতে হবে এখনও মা-ছেলের সম্পর্ক আছে। যখন আমরা বলছি শ্রীরাম বা সীতা, তখন আমরা কখনই বলি না যে বাল্মীকির রাম বা বাল্মীকির সীতা, এনারা সার্বজনীন হয়ে গেছেন। ছোটবেলা থেকে আমরা মহাভারতের কাহিনী শুনে আসছি, অর্জুনের কাহিনী, ভীমের কাহিনী শুনে আসছি, তখন আমরা জানতামও না যে মহাভারত ব্যাসদেব রচনা করেছেন। মহাভারতের চরিত্রগুলি জনগণের হয়ে গেছে। সত্যিকারের creativity মানেই তাই, ওখানে আর মা-বাবার নাম জড়ানো নেই।

সমত্বং যোগ উচ্যতে

এবার স্বামীজী পুরো অন্য বিষয়ে চলে আসছেন, বলছেন, Blessed are those upon whom their sins are quickly visited, their account is sooner balanced. (*ধন্য তারা, যারা শীঘ্র শীঘ্র পাপের ফল ভোগ করে –তাদের হিসাব শীঘ্র শীঘ্র মিটে গেল।*) এখান থেকে স্বামীজী মনের সমত্বকে নিয়ে আলোচনা শুরু করছেন। স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজকে একবার একজন জিজ্ঞেস করেছিলেন, মহারাজ আপনার সাধনা কি ছিল? মহারাজ বলছেন, *সমত্বং যোগ উচ্যতে*। ওনার কাছে সাধনা ছিল সমত্ব, *সুখেদুঃখে সমে কৃত্বা*। সমত্ব ভাব আমাদের কিভাবে বিঘ্ন হয়? সুখ দুঃখ থেকে বিঘ্ন হয়। সুখ দুঃখ কোথা থেকে আসে? সুখ দুঃখ তো আসে না, আমাদের পাপ-পূণ্য, মানে ভালমন্দ অর্থাৎ আগে আগে যে কর্ম করেছি তার অমৃতফল বা বিষফল রূপে যখন ঘুরে আসে তখন মন যদি ভাল কিছু পায় আনন্দে উদ্বেলিত হয়, আর মনের মত না হলে দুঃখ হয়। যে ভুল কাজগুলো আমরা করেছি, স্বামীজী যেহেতু ইংলিশে বলেছিলেন তাই sin শব্দটা ব্যবহার করছেন, ওই কর্মের শাস্তি পেতেই হবে। খ্রীশ্চান দুনিয়ায় যে পাপের কথা বলা হয়, সেই পাপের ধারণা আমাদের এখানে নেই, আমর বলি ভুল। ভুল বলেও কিছু নেই। আমি যেটা করেছি তার ফল আসবেই আসবে। যেখানে লঙ্কার চারা লাগানো হয়েছে সেখানে লঙ্কা গাছই বেরোবে, যেখানে টমেটো গাছ লাগানো হয়েছে, সেখানে টমেটো গাছই বেরোবে। রান্নার জন্য লঙ্কাও লাগে, টমেটোও লাগে। যেগুলোকে আমরা পছন্দ করি না, চাই না, সেই জিনিসগুলো যখন আসে তখন আমরা দমে যাই। আমাদের এই কাজের ফলগুলি যে সঙ্গে সঙ্গে আসবে তা না, অনেক সময় ফল অনেক পরে আসে। জৈন ধর্মে এর একটা বিরাট লম্বা তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে, কাজ কত রকমের হতে পারে, কোন কাজের ফল সঙ্গে সঙ্গে দেয়, কোন কাজের ফল দেরীতে আসে। যেমন আর্সেনিক যদি একটু একটু করে দেওয়া হয়, আর্সেনিকের বিষের ফল দিতে অনেক দিন লাগবে, কিন্তু সায়ানাইট দিলে সঙ্গে সঙ্গে দেবে। তালগাছের বীজ পুতলে কবে যে গাছ বড় হয়ে তার ফল হবে কোন ঠিক নেই। আর ফুল গাছ লাগালে কদিনের মধ্যেই ফুল হতে শুরু হবে। স্বামীজী বলছেন, আজ দোষ করল কাল তার ফল পেয়ে গেল, এরা কিন্তু ধন্য। প্রকৃতি ওটাকে ব্যালেন্সে রাখছে না, ব্যালেন্সটাকে আউট করে দিচ্ছেন। দুটো জিনিস হয়, ব্যালেন্সে রাখা, আরেকটা হয় ব্যালেন্সটা আউট করে দেওয়া। একটা জিনিস করলাম, প্রকৃতি তার ফল যদি সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দেয়, তাহলে আমার সব পরিষ্কার হয়ে গেল। ফল যদি না দেয়, কবে যে ফল দেবে, কোন সময় ফল দেবে, কিভাবে ফল দেবে তার কোন ঠিক নেই, আর সেটা সর্বনাশের কারণ হবে। কোন দোষ করে বেঁচে গেলে আমরা খুব আনন্দিত হই, যাক খুব জোর বেঁচে গেলাম। কিন্তু আনন্দ করার কিছু নেই, কিছুই বাঁচবে না, ওই দোষের ফল ঘুরে আবার আসবেই আসবে। এবার কিন্তু এতদিন ধরে যে ফলটা জমে ছিল, তত দিনের সুদ সমেত এসে তাকে শেষ করে দেবে।

স্বামীজীর এই কথা কিন্তু পুরোপুরি বাস্তব। স্বামী ব্রহ্মানন্দ মঠের প্রথম অধ্যক্ষ, বেলুড় মঠে প্রথম থেকে নিয়ম আছে যে, সকালবেলা সব সাধুরা অধ্যক্ষকে গিয়ে প্রণাম করবেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজকে সব সাধুরা সকালে একদিন প্রণাম করতে এসেছেন। হঠাৎ রাজা মহারাজ একজন সাধুকে দেখে তিনটে আঙুল দেখাচ্ছেন, ওদিক থেকে সেই সাধু রাজা মহারাজকে একটা আঙুল দেখাচ্ছেন। বেশ কয়েকবার এভাবে চলল, রাজা মহারাজ তিনটে আঙুল দেখাচ্ছেন, এদিকে থেকে ইনি একটা আঙুল দেখিয়ে যাচ্ছেন। অনেকক্ষণ এভাবে চলার পর, রাজা মহারাজ বললেন, ঠিক আছে। ওই সাধু যখন ফিরে আসছেন তখন অন্যান্য সাধুরা তাঁকে আঙুল

দেখানোর রহস্যের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। উনি তখন পরিষ্কার করে বললেন, 'রাজা মহারাজ আমাকে তিনটে আঙুল দেখিয়ে বলছিলেন আমার আর তিন জন্ম বাকি, আমি একটা আঙুল দেখিয়ে বলছিলাম, না এটা আমার শেষ জন্ম। শেষে রাজা মহারাজ বললেন ঠিক আছে'। তারপর সবাই চোখের সামনে দেখেছেন, সেই সাধুর জীবনের উপর দিয়ে এমন ঝড়ঝঞ্ঝা বইতে শুরু করল যে কল্পনাই করা যাবে না। সত্যি সত্যি তিন জন্মে তাঁর যেটা ভোগ করার কথা, সেটা এক জন্মের উপর দিয়ে কাটিয়ে দিলেন। যখনই দেখা যাবে, কেউ ভাল আর মন্দের ফল এক্ষুণি পাচ্ছে না, বুঝতে হবে তার অনেক জন্ম বাকি আছে। সব এখন খাতায় জমা থাকল, চার পাঁচ জন্ম পরে হয়ত খাতা খোলা হবে। কিন্তু দোষ করল, সাত দিন, দশ দিনের মধ্যে তার ফল পেয়ে গেল, তার মানে তাঁকে পরিষ্কার করে দেওয়া হচ্ছে।

পরিষ্কার করে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? সমত্বের দিকে। স্বামীজী বলছেন, account is the sooner balanced, তার হিসাবটা পরিষ্কার করে দিল। Woe to those whose punishment is deferred, it is the greater! (*যাদের পাপের প্রতিফল বিলম্বে আসে, তাদের মহা দুর্দৈব –তাদের বেশী বেশী ভুগতে হবে।*) যদি শাস্তি পেতে দেরী হল, বুঝতে হবে সে কিন্তু প্রথমে যে পরিমাণ শাস্তি পাওয়ার কথা ছিল, পরে সেই শাস্তি আরও বেশি জোরালো ভাবে পাবে। অনেক সময় শাস্তি পেয়ে গেলে পরিষ্কার হয়ে যায়, লোকেদের মধ্যে জানাজানি হয়ে যায়, সবাই সাবধান হয়ে যায়। দোষের শাস্তি যদি না পাওয়া হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে, তার ভবিষ্যত এক ঝঞ্ঝাবর্তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

আমরা বুঝব কি করে যে কোন কাজটা দোষের, কোন কাজটা দোষের নয়? আমি যে দোষ করেছি কি করে বুঝব? ঠাকুর বলছেন, যে কাজ করলে মন খুঁত খুঁত করে, সেই কাজটাই দোষের। কিন্তু বদমাইশ লোক, চোর, গুণ্ডাদের তো মন খুঁত খুঁত করে না। তখন বলবে, অপরের দেখতে হবে। অপরের যখন দেখতে যাব তখন একটা বাচ্চা যদি মিথ্যা কথা বলে তার মন খুঁত খুঁত করে, কিন্তু ইয়ং ছেলেমেয়েরা সাবলিল ভাবে মিথ্যা কথা বলে দেয়, মিথ্যা কথা বলাটা তাদের কাছে কোন ব্যাপারই নয়। সেইজন্য দেখতে হয় যাঁরা গুরুজন, যাঁরা সম্মানিত ব্যক্তি, যাঁরা মহাপুরুষ, তাঁদেরকে দেখতে হয়, তাঁরা কোনটাকে ভুল বলেন। মহাজনরা যে পথে গেছেন সেটাই পথ। শাস্ত্র মানেই তাই, মহাপুরুষদের আচার-আচরণকেই শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। দেখতে হয়, তাঁরা কোনটাকে ভুল বলছেন, কোন কাজকে ঠিক কাজ বলছেন। স্মৃতিশাস্ত্র এগুলোকেই সংগ্রহিত করে লিপিবদ্ধ করেছিল। বিভিন্ন সময়ে বিধি-নিষেধগুলি আবার পাল্টে যায়, নূতন স্মৃতিশাস্ত্র রচিত হয়। সেইজন্য ঠাকুর বারবার সাধুসঙ্গের কথা বলছেন। গুরুজনের কাছে গিয়ে বলল, আমি এই রকম দোষ করেছি, তখন তিনি যেমনটি বলে দেবেন, সেটাই ঠিক। অন্য দিকে গীতাও বলে দিচ্ছে, শাস্ত্র প্রমাণ। কোন শাস্ত্র প্রমাণ? আমরা যে ঐতিহ্যে আছি, সেই ঐতিহ্যে যে শাস্ত্রকে মানা হয়, সেই শাস্ত্রই প্রমাণ। বিভিন্ন স্মৃতিশাস্ত্র ঠিক করে দিয়েছে, কোনটা ভুল, কোনটা ঠিক। কোন কাজটা দোষযুক্ত, আচার্য শঙ্কর কিন্তু এটাকে খুব পরিষ্কার করে দিচ্ছেন। যে কাজ সবার সামনে করা যায়, সেই কাজটাই ঠিক, বাকি কাজ ভুল। ডাকাতরা তো সবার সামনেই ডাকাতি করছে? তাহলে ডাকাতি করাটা কি ঠিক কাজ হবে? ওটা আবার অতিগর্হিত হয়ে যায়। অতিগর্হিত কাজকে হিসাবের মধ্যে নিতে নেই। এই জিনিসগুলো আবার ethicsএ পড়ে যায়, ethics আবার নিজেই একটা খুব জটিল বিষয়। দোষের শাস্তির ব্যাপারে বলার পর, স্বামীজী আসলে যেটা বলতে চাইছেন, সেটাকে নিয়ে এবার বলছেন।

Those who have attained sameness are said to be living in God. (*যাঁরা সমত্বভাব লাভ করেছেন, তাঁরাই ঈশ্বরে অবস্থিত বলে কথিত হন।*) কারণ ঈশ্বর নিজে সমত্ব, *সমত্বং যোগ উচ্যতে*, যোগ মানে ঈশ্বর, যোগ মানে চিত্তবৃত্তি নিরোধ, মনের একটা সাম্য অবস্থা এসে গেলে তখন তার না আছে কোন ওঠা, না আছে কোন নামা, বাস্তবে সে ঈশ্বরে বাস করছে। আমি আপনি কতটা ঈশ্বরের দিকে এগোচ্ছি? আমাদের মন কতটা সমত্বে অবস্থিত? মন কতটা ব্যালেন্সে এসেছে? এই জিনিসগুলো আমরা নিজেরাই বুঝতে পারব। দেখা যায়, বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের ইমোশান অনেক নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। বৃদ্ধরা সময়মত একটু খাওয়া, সময়মত একটু চা পেয়ে গেলে তাঁদের আর কিছু লাগে না। সেইজন্য বয়স্ক মানুষের পক্ষে ঈশ্বরের দিকে যাওয়া খুব সহজ, কারণ সমত্বটা তাদের খুব স্বাভাবিক। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বৃদ্ধ বয়সে যদি

সমত্ব ভাব না থাকে, তাহলে এদের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যাবে। সমত্বে যেতে চাইছে না, তার মানেই হল সে জোর করে ইন্দ্রিয় জগতে থাকতে চাইছে, যেটা তার ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। একটা ইয়ং ছেলে তার মন মত কিছু না হলে, মারামারি করে, গায়ের জোরে সে সেটাকে আদায় করে বেরিয়ে আসবে। বয়স্ক মানুষের পক্ষে এগুলো করার ক্ষমতা চলে গেছে। ভোগের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই, খেতে চাইছে কিন্তু হজম শক্তি নেই। এদের আবার কাম-ক্রোধগুলিও খুব তীব্র হয়, কথায় কথায় অপমানিত হয়ে যায়। ঈশ্বরের দিকে এদের যদি মন না যায়, তাহলে এদের আর দুঃখের শেষ থাকবে না। বাচ্চার মন, তরুণ তরুণীর মন ঈশ্বরের দিকে যাবে না, যদি কারুর যায়, বুঝতে হবে তার উপর ঈশ্বরের সাংঘাতিক কৃপা আছে, অনেক অনেক জন্মের অনেক অনেক পূণ্যের জোরে এই অল্প বয়সে তার মন ঈশ্বরের দিকে যাচ্ছে। বয়স্ক মানুষদের ভিতরে পাশ, লজ্জা, ঘৃণা, ভয় এগুলো খুব জোরালো, আঁকড়ে জগৎকে ধরতে চায়, অথচ তাদের কাছে সমত্ব খুবই স্বাভাবিক।

All hatred is killing the 'Self by the self', (*সকল রকম ঘৃণার অর্থ – যেন আত্মার দ্বারা আত্মার হনন।*) গীতাতে ভগবান বলছেন *উদ্ধরেদাত্মানাং নাত্মানমবসাদয়েৎ*, যার অর্থ, নিজের মনকে দিয়েই নিজের মনকে উদ্ধার করতে হয়। যখন কাউকে আমরা ঘৃণা করছি, তখন আমরা আমাদের আত্মাকে দিয়েই আত্মার ক্ষতি করছি। স্বামীজী ঈশাবাস্যোপনিষদ থেকে এই ভাব নিয়ে আসছেন, যেখানে বলা হচ্ছে *ততো ন বিজিগুপ্সতে*, therefore love is the law of life. (*সুতরাং প্রেমই জীবনের যথার্থ নিয়ামক।*) সমত্ব মানেই সবাইকে ভালবাসা। কারুর নিন্দা করার ভাব, কারুর প্রতি ঘৃণার ভাব নেই। To rise to this is to be perfect, (*প্রেমের এই অবস্থা লাভ করাই সিদ্ধাবস্থা।*) এই অবস্থায় যে চলে গেছে, বুঝতে হবে সে perfect হয়ে গেছে, সে একজন সমদর্শী, একজন ঈশ্বর জ্ঞানী, সে একজন যোগী, যা কিছু বলা যেতে পারে।

রুডিয়ার্ড কিপ্লিং, যিনি জঙ্গলবুকের জন্য বিখ্যাত, কয়েক বছর ভারতবর্ষে ছিলেন। ওনার একটা কালেকশান অফ স্টোরিজ আছে, সেখানে একজনের কথা বলছেন, একজন রাজার প্রধানমন্ত্রী সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন, পুরো কাহিনীটা এই প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে। এত উচ্চমানের বর্ণনা যে কল্পনাই করা যায় না। সেখানে তিনি বলছেন, ভারতবর্ষে সবারই মনে একটা ইচ্ছা থাকে যে, বয়স হয়ে গেলে আমি সন্ন্যাসী হয়ে যাব। প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন তিনি অনেক বড় বড় কাজ করেছিলেন, ইংল্যাণ্ডের রানীর সাথে তার ওঠাবসা ছিল। যাই হোক অনেক দিন দায়ীত্ব পালনের পর তিনি প্রধানমন্ত্রী ছেড়ে দিয়ে, সবাইকে বিদায় জানিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে গেলেন। বেরিয়ে যাওয়ার পর নিজের রাজ্যেরই একটা শহরে গেছেন। শহরের একটা জায়গায় দেখছেন তাঁরই মর্মর মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে, রাস্তাটা তাঁর নামে। এগিয়ে গিয়ে তিনি নিজের মূর্তির দিকে তাকাচ্ছেন। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন বলে, পুলিশ এসে তাঁকে সরিয়ে দিয়ে বলছেন, এখানে বেশীক্ষণ দাঁড়াবেন না, সরে আসুন। তাঁরই মূর্তি, কিন্তু তিনি নির্বিকার ভাবে ওখান থেকে সরে এলেন। রুডিয়ার্ড কিপ্লিং বর্ণনা এখানে অতুলনীয়, তিনি বর্ণনা করছেন, এই প্রধানমন্ত্রী এতদিন ক্ষমতার তুঙ্গে ছিলেন, তিনি সন্ন্যাস নিয়ে বেরিয়ে এলেন, সমত্বের অনুশীলন করছেন। তাঁরই মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে মূর্তি দেখছেন, পুলিশ এসে তাঁকেই বলছে, সর সর এখানে দাঁড়ানো যাবে না। তিনি নির্বিকার ভাবে সেখান থেকে সরে এলেন।

তারপর তিনি হিমালয়ের এক জঙ্গলে গিয়ে থাকতে শুরু করলেন। তারপর দেখা যাচ্ছে, জঙ্গলের সমস্ত হিংস্র প্রানীরা সবাই তাঁর কাছে ঘুর ঘুর করছে। তাঁর কাছে সাপও আসছে, বিছেও আসছে, হরিণও আসছে, বেড়ালও আসছে। এই যে বলছেন, আমার কারুর প্রতি আর রাগ নেই, বিদ্বেষ নেই, ঘৃণা নেই, হিংসা নেই, সবাই আমার কাছে সমান, আমার কাছে সবারই আশ্রয় খোলা। সন্ন্যাসীদের সন্ন্যাসের সময় উপনিষদ থেকে একটা মন্ত্র দেওয়া হয়, *অভয়ং সর্বভূতেভ্য*, আমি সমস্ত প্রাণীকে অভয় দিচ্ছি, কারণ *মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে*, আমার থেকেই সবাই বেরিয়েছে। এটাই সমত্ব, এটাকেই ভেবে ভেবে, অনুশীলন করে করে সমত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে হয়। এটাই সিদ্ধাবস্থা। স্বামীজী বারবার perfection শব্দটা নিয়ে আসতেন। স্বামীজী যখন বলছেন, Education is the manifestation of perfection already in man, তখন স্বামীজী perfection বলতে fulfillment of spiritualityকেই বলতে চাইছেন। স্বামীজীর রচনাবলীর যেখানেই perfection শব্দটা আসছে, সেখানে তার অর্থই হল spiritual perfection, আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পূর্ণতা।

বাক্যের পরের অংশেই স্বামীজী খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন, but the more perfect we are, the less work (so-called) can we do. (*কিন্তু আমরা যতই সিদ্ধির দিকে অগ্রসর হই, ততই আমরা কম কাজ (তথাকথিত কাজ) করতে পারি।*) মানুষ যখনই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দিকে চলে যায় তখন সে আর বেশি কাজ করতে পারে না। কারণ, The Sattvika see and know that all is mere child's play and do not trouble themselves about anything. (*সাত্ত্বিক ব্যক্তিরা জানেন ও দেখেন যে, সবই ছেলেখালামাত্র, সুতরাং তাঁরা কোন কিছু নিয়ে মাথা ঘামান না।*) যখনই মানুষ ওই পূর্ণতার অবস্থায় চলে যায়, সে তিন গুণের পারে চলে যায়। পূর্ণতা মানেই হয়, তিনটে গুণ, সত্ত্বগুণ, রজোগুণ আর তমোগুণের পারে চলে যাওয়া। তমোগুণে মানুষ বেশি ঘুমোয়, আলস্যের মধ্যে থাকে। রজোগুণে মানুষ কাজ করে। যারা সত্ত্বগুণে জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত তাদের সুখ শান্তির প্রতি বেশি স্পৃহা হয়। এই তিন গুণের পারে হল state of perfection। যেখানে এই তিনটে গুণের কোন খেলা চলে না, এটাকেই ত্রিগুণাতীতের অবস্থা বলা হয়। কিন্তু তিনি যখন সমাজে থাকেন, মানুষের সাথে মেলামেশা করেন তখন তিনি সত্ত্বগুণকে আশ্রয় করে থাকেন। এনারা জগতের সব কিছুকে দেখছেন বাচ্চাদের ছেলেখেলা, এরপর ওই দিকে তাঁরা বেশি মন দেন না, যেভাবে সবাই মন দেয়। এখান থেকে স্বামীজী আবার আরেকটা চিন্তাধারাকে নিয়ে আসছেন।

It is easy to strike a blow, but tremendously hard to stay the hand, stand still, and say, 'In Thee, O Lord, I take refuge,' and then wait for Him to act. (*এক ঘা দিয়ে দেওয়া সহজ, কিন্তু হাত গুটিয়ে স্থির হয়ে থেকে 'হে প্রভু আমি তোমারই শরণাগত হলাম' বলা এবং তিনি যা হয় করুন বলে অপেক্ষা করে থাকা খুবই কঠিন।*) কেউ আমাকে একটা আঘাত দিলে উল্টে তাকে আরেকটা ঘা দেওয়া সহজ, কিন্তু নিজের হাতকে আটকে রেখে দেওয়া, আর মনে মনে বলা, 'হে প্রভু! আমি তোমার শরণাগত, তুমিই দেখবে', এটা করা সম্ভব না। ঠাকুর সাপের কাহিনী বলতে গিয়ে বলছেন, ফোঁস করবি বিষ ঢালবি না। স্বামীজী পরে পরে বলতেন, এটা গৃহস্থদের জন্য, সন্ন্যাসী ফোঁসও করবে না। কারণ সন্ন্যাসী ঈশ্বরের উপর সব কিছু ছেড়ে দিয়ে রেখেছেন। মহাভারতে নর-নারায়ণ ঋষির গল্প আছে। তপস্যা করে করে তাঁদের শরীরটা চর্মসার হয়ে গেছে, চেহারাটা একটা পাটকাঠির মত হয়ে গেছে। এক রাজা নিজের ক্ষমতা দেখাবার জন্য নর-নারায়ণ ঋষিদের আক্রমণ করেছে। ঋষিরা রাজার হাতে পায়ে ধরে বলছেন, 'ভাই, আমরা যোদ্ধা নই, আমরা তপস্যা নিয়েই আছি, আমাদের ছেড়ে দিন'। রাজাকে ক্ষমতা দেখাতে হবে, সে ছাড়বে না, যুদ্ধ করবেই। নর ঋষি তখন একটা খড়ের টুকরো নিয়ে মন্ত্রসিদ্ধ করে ছেড়ে দিয়েছেন। খড়ের টুকরোটা এবার যেতে যেতে গুণিতক হারে বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিল, এক থেকে দুই, দুই থেকে চার, চার থেকে আট, আট থেকে ষোল হয়ে গেল, এই করে করে বন্যার জলের মত ধেয়ে আসতে লাগল। আর যেখানে কোন ছিদ্র পাচ্ছে সেখানেই ঢুকে যেতে লাগল। চোখ, কান, নাক, রোমকূপে যত ছিদ্র আছে, কোন ছিদ্র বাকি থাকল না। যত হাতি, ঘোড়া, মানুষ ছিল সবার রোমকূপের ছিদ্রে, চোখে, মুখে, নাকে কানে বাণের মত গিয়ে ঢুকে গেল। সব হাতি, ঘোড়া, মানুষ পাগলের মত চিৎকার শুরু করে দিয়েছে। তখন সেই রাজা ঋষিদের হাতে পায়ে এসে ধরে বলছে, আপনারা আমায় ক্ষমা করুন। একটা সাধারণ খড়, সেটাকে মন্ত্রসিদ্ধ করে দিলেন আর সেটা কি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করল। এনাদেরর আসল ক্ষমতা অন্য কোথাও। শ্রীরামচন্দ্র যখন ব্রহ্মাস্ত্র চালাচ্ছেন, তখন সেটা একটা তীর মাত্র, ওই তীর আমরা চালালে কিছুই হবে না। যেমনি মন্ত্রসিদ্ধ হয়ে গেল, সেটাই ব্রহ্মাস্ত্র হয়ে গেল, এবার ওই ব্রহ্মাস্ত্র সব ধ্বংস করে দেবে। ঠিক তেমনি, যিনি ঈশ্বরের উপর পুরোপুরি নির্ভর করে আছেন, তাঁকে আর কাউকে মারতে হবে না। ঈশ্বর একটা খড়ের টুকরো দিয়েই তাকে শেষ করে দেবেন। ৩রা জুলাইয়ের ক্লাশ এখানেই শেষ হয়ে যায়। পরের দিন ৪ঠা জুলাই কোন ক্লাশ হয়নি। এবার আমরা ৫ই জুলাইয়ের ক্লাশে স্বামীজী কি বলছেন দেখব।

<u>শুক্রবার, ৫ই জুলাই</u>

Until you are ready to change any minute, you can never see the truth; but you must hold fast and be steady in the search of truth. (*যতক্ষণ তুমি সত্যের অনুরোধে যে-কোন মুহূর্তে বদলাতে প্রস্তুত না হচ্ছ, ততক্ষণ তুমি কখনই সত্য-লাভ করতে পারবে না; অবশ্য তোমাকে*

সত্যের অনুসন্ধানে লেগে থাকতে হবে।) মনকে সব সময় প্রস্তুত রাখতে হবে, আমার জীবনে যা যা আসছে, আমি তেমন তেমন পাল্টাতে থাকব। একটা বয়সের পর আমাদের মন একটা পাথরের মত হয়ে যাবে, তখন নূতন কিছু আমাদের মন গ্রহণ করে নিজেকে বদলাতে চাইবে না। সত্য যদি নিতে হয়, মনকে অনেক আগে থেকেই খুলে রাখতে হবে। খোলা মন না হলে সত্য আসবে না। এটা ঠিক কোন প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছিলেন আমাদের জানা নেই, কিন্তু ঠিক এরপরেই স্বামীজী চার্বাক দর্শনের উপর বলতে শুরু করে দিয়েছেন।

চার্বাক, বিজ্ঞানবাদ ও বেদান্তের দৃষ্টিতে মুক্ত ও অমুক্ত

সংক্ষেপে চার্বাক হল ভৌতিকবাদ বা জড়বাদ। স্বামীজী বলছেন, Charvakas, a very ancient sect in India, were rank materialists. They have died out now, and most of their books are lost. They claimed that the soul, being the product of the body and its forces, died with it; that there was no proof of its further existence. (*চার্বাকরা ভারতের একটি অতি প্রাচীন সম্প্রদায় –তারা সম্পূর্ণ জড়বাদী। এখন সে-সম্প্রদায় লুপ্ত হয়ে গেছে, আর তাদের অধিকাংশ গ্রন্থও লোপ পেয়ে গেছে। তাদের মতে আত্মা –দেহ ও ভৌতিক শক্তি থেকে উৎপন্ন বলে দেহের নাশে আত্মারও নাশ হয়ে যায়, এবং দেহনাশের পরও যে আত্মার অস্তিত্ব থাকে, তার কোন প্রমাণ নেই।*) চার্বাক হল যারা জড়বাদকে মানে, আবার অনেকে বলেন চার্বাক নামে কোন ঋষি ছিলেন। যাঁরা ভারতীয় দর্শন, বিশেষ করে যাঁরা হিন্দু ধর্মের দর্শন নিয়ে পড়াশোনা করেন, তাঁদের চার্বাক পড়তে হয়। চার্বাকদের কাছে পঞ্চভূতই শেষ কথা। জন্ম দিয়ে জীবন শুরু হয়, মৃত্যুতে সব শেষ। আত্মা বলতে আমরা যা মনে করি, চার্বকদের কাছে আত্মা পঞ্চভূতেরই খেলা। যেমন পানের পাতায় চুন খয়ের দিলে লাল রঙ বেরিয়ে আসে, ঠিক তেমনি আলাদা আলাদা জিনিস মিলে আত্মার একটা ভাব তৈরী হয়। পঞ্চভূত দিয়ে যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ হয়, তার বাইরে এরা কিছু মানবে না। অনুমান প্রমাণে যেটা বলা হয়, যেটা যুক্তির উপর চলে, সেটাকেও ওরা মানে না, কোন যুক্তিকেই ওরা মানবে না। আগেকার দিনে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানেও rationalistরা এই রকমই ছিলেন, আমি যেটাকে মাপতে পারব, চোখ দিয়ে দেখতে পারব, তবেই গিয়ে আমি সেটাকে মানব। সেইজন্য বিজ্ঞান সেই সময় অনেক পিছিয়ে গিয়েছিল। বিজ্ঞানে ইলেক্ট্রন প্রোটন কেউই দেখেনি, কেউই জানে না, কিন্তু বিজ্ঞানের এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দিক। স্বামীজী বলছেন, পাঁচটি ইন্দ্রিয় দিয়ে যে জ্ঞান আসছে, তার বাইরে তারা কোন কিছু মানতে চাইত না।

জান্তায় বা অজান্তায় আমরা সবাই কোথাও না কোথাও চার্বাক দর্শনকে অনুসরণ করে চলি। ঠাকুরের কাছে যখন প্রার্থনা করে বলছি, হে ঠাকুর আমার অর্থাভাব যেন মিটে যায়, আমার যেন একটা চাকরি হয়, তখন আমরা সবাই চার্বাকপন্থী হয়ে যাই। তার মানে, ভৌতিক সুখের বাইরে আমরা কিছু কল্পনা করতে পারি না, আর ভগবানকেও সেই জায়গায় আমরা নামিয়ে আনি। কিন্তু যারা একেবারে ঘোর চার্বাক, ঈশ্বরকে মানা তো দূরের কথা, আত্মাকেও মানে না, এই দেহ ছাড়া অন্য কোন কিছুকে মানে না। ওরা বলে, মৃত্যুর পর একবার কাউকে পুড়িয়ে দিয়ে ছাই করে দেওয়া হল, এরপর কে দেখেছে যে সে আবার ফিরে এসেছে? বেদের ব্যাপারে ওদের বক্তব্য হল, *ত্রয়ি বেদস্য কর্তার ভণ্ড ধূর্ত নিশাচরঃ*, যারা বেদ লিখেছে, মানে ঋষিরা, এরা সবাই ভণ্ড, ধুর্ত আর নিশাচর, এরা রাক্ষস, শুধু মাংস ভাত খেয়ে বেড়ায়। এরপর স্বামীজী বেদান্তের দিকে এগোচ্ছেন। তার আগে আবার সমত্ব নিয়ে বলছেন।

Samadhi is when Divine and human are is one, or it is 'bringing sameness'. (*সমাধি মানে জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদভাব অথবা সমত্ব লাভ করা।*) দুটো সত্তা আছে, একটা হল মানুষের সত্তা, যেখানে মনের সত্তা কাজ করে আর অন্য সত্তা হল ঈশ্বরীয় সত্তা। শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর তিনি নিজের ভাবে আছেন। মানুষ এই চার্বাকের মত আছে, দুটো মিলন বিন্দু হল সমাধি। যেখানে মানব সত্তা ঈশ্বরীয় সত্তায় চলে যায়, মনের সত্তা আর ঈশ্বরের সত্তা দুটো সত্তা এক হয়ে যায়, সেখানে সমত্ব হয়ে যায়। ঠাকুরের আগমনের পর আমরা অনেক রকম সমাধির কথা শুনতে পাই। আমরা ওর মধ্যে যাচ্ছি না, শুধু সমাধিতেই থাকছি। মন যখন সমত্বে চলে যায়, মন তখন এক জিনিস নিয়ে থাকছে। মন সাধারণ অবস্থা থেকে উঠে সেই অবস্থাতে চলে যাচ্ছে, যেখানে মন ঈশ্বরীয় সত্তার মুখোমুখি হয়ে যায়। ওই অবস্থায় বলা যাবে না যে, মন

এখন মন, নাকি আত্মা। ওর পারে চলে গেলে শুদ্ধ ঈশ্বর, ওর নীচে চলে এলে শুদ্ধ জগৎ, এটা হল মিটিং পয়েন্ট। ঠাকুর বলছেন, মা আমায় বললেন তুই ভাব মুখে থাক। ভাব মুখে থাকাটা একটা মিটিং পয়েন্ট। মন এখন সমত্বে চলে এসেছে, মনের মধ্যে কোন চাঞ্চল্য নেই। হিউম্যান আর ডিভাইন দুটো মিলে এক হয়ে যায়। যেমন শূন্য ডিগ্রী তাপমাত্রায় জলও আছে, বরফও আছে, বরফ জল হয়, জল বরফ হয়। একটু তাপ দিয়ে দিলে বরফ জল হয়ে যায়, তাপ একটু কমিয়ে দিলে জল বরফ হয়ে যায়। শূন্য ডিগ্রীতে নিরেটও থাকে তরলও থাকে। সমাধি হল এই শূন্য ডিগ্রীর অবস্থা। মন এখন ঈশ্বরের ভাবেও আছে, মানব ভাবেও আছে। সেখান থেকে স্বামীজী এবার বলছেন।

Materialism says, the voice of freedom is a delusion. (*জড়বাদী বলেন, আমি মুক্ত বলে আমাদের যে জ্ঞান হয়, সেটা ভ্রমমাত্র।*) যে চার্বাকদের কথা বলা হল, ওদের কাছে মুক্তি জিনিসটা মনের ভ্রম। Idealism says, the voice that tells of bondage is delusion. (*বিজ্ঞানবাদী বলেন, আমি বদ্ধ বলে যে জ্ঞান হয়, সেটাই ভ্রম।*) যাঁরা সত্যিকারের বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদী, যেমন মাণ্ডুক্যকারিকাতে বলছেন, এই যে বন্ধন, এই বন্ধন তোমার মনের কল্পনা, বন্ধন বলে কিছু নেই। Vedanta says, you are free and not free at the same time, (*বেদান্তবাদী বলেন, তুমি মুক্ত ও বদ্ধ দুই-ই।*) কিন্তু ঠিক ঠিক বেদান্ত, যেটা আচার্য শঙ্করের বেদান্ত, তাঁরা বলছেন, তুমি মুক্ত আবার তুমি অমুক্ত। আমরা বন্ধন বলছি না, একসাথে বলছি, তুমি মুক্ত আবার মুক্ত নও। যদি তুমি জগতের অবস্থার দিক থেকে নিজেকে দেখ, তাহলে তুমি কোন ভাবেই মুক্ত নও, কিন্তু যদি তুমি আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখ, তুমি সব সময়ই মুক্ত, নির্ভর করছে তুমি কোথা থেকে নিজেকে দেখছ। মাণ্ডুক্যকারিকা, যাঁরা বিশুদ্ধ অদ্বৈতের কথা বলেন, শঙ্করাচার্যের গুরুর গুরু এই মতেরই ছিলেন। তাঁরা পৃথিবীর অস্তিত্বকেই মানেন না, মানুষের অস্তিত্বকেই মানেন না, সেইজন্য এনাদের মতকে বলা হয় অজাতবাদ, কোন কিছুর জন্মই হয়নি, শুদ্ধ চৈতন্য ছাড়া আর কিছু নেই। তার উল্টো দিকে রয়েছে চার্বাকরা, তাদের কাছে চৈতন্য বলে কিছু নেই। এক মতবাদে বলছেন, চৈতন্যই আছে, চৈতন্য ছাড়া আর কিছু নেই। আরেক মতবাদে বলছেন, চৈতন্য বলে কিছু নেই।

বেদান্তের দৃষ্টিভঙ্গী অন্য রকম। তাঁরা বলেন, তুমি ততক্ষণই বন্ধনে আছ, যতক্ষণ তুমি নিজেকে এই জগৎ বা সংসারের সাথে জুড়ে রেখেছ। যেমনি তুমি নিজেকে আধ্যাত্মিক ভাবের সাথে জুড়ে দেবে, দেখবে তোমার বন্ধন বলে কিছু নেই। স্বামীজী যখন বলছেন, তোমার ভিতরে অসীম শক্তি, তোমার মধ্যে অনন্ত জ্ঞান, তোমার ভিতরে অসীম ক্ষমতা তখন তিনি ওই আধ্যাত্মিক ভাবের সাথে জুড়ে দেওয়ার দৃষ্টিতেই বলছেন। একবার যদি আমরা নিজেকে ভাবতে পারি, আমি সেই শুদ্ধ আত্মা, আমার কিসের জন্ম, কিসের মৃত্যু, আমার কিসের বন্ধন, আমার কিসের মুক্তি, তখন আমাদের মধ্যে সমস্ত ক্ষমতা জেগে উঠবে।

শেষে স্বামীজী তাঁর শিষ্যদের উদ্দেশ্যে বলছেন, Be beyond both freedom and bondage. We are Shiva, we are immortal knowledge beyond the senses. Infinite power is back of everyone; pray to Mother, and it will come to you. (*মুক্তি ও বন্ধন উভয়েরই পারে চলে যাও। আমরাই শিবস্বরূপ, অতীন্দ্রিয়, অবিনাশী জ্ঞানস্বরূপ। প্রত্যেক ব্যক্তির পশ্চাতে অনন্ত শক্তি রয়েছে, জগদম্বার কাছে প্রার্থনা করলেই ঐ শক্তি তোমার মধ্যে আসবে।*)

এইসব বলে স্বামীজী মায়ের কথা নিয়ে আসছেন, মা তুমি সব কিছুতে আছ। আর তার সাথে বাগদেবীর স্তুতি করে বলছেন, 'O Mother, giver of Vak (eloquence), Thou self-existent, come as the Vak upon my lips'. (*হে মাতঃ বাগীশ্বরী, তুমি স্বয়ম্ভূ, তুমি আমার জিহ্বায় বাক্-রূপে আবির্ভূতা হও!*) তার সাথে বলছেন, 'That Mother whose voice is in the thunder, come Thou in me! Kali, Thou time eternal, Thou force irresistible, Shakti, Power'. (*হে মাতঃ, বজ্র তোমার বাণীস্বরূপ –তুমি আমার ভিতর আবির্ভূতা হও। হে কালী, তুমি অনন্ত কালরূপিণী, তুমি অমোঘ শক্তিস্বরূপিণী।*) ভারত পরিক্রমার সময় স্বামীজী ঘুরতে ঘুরতে সিন্ধু নদীর তীরে পৌঁছে গিয়েছিলেন, বর্তমানে সেটা পাকিস্থানে অবস্থিত, সেখানে স্বামীজীর বেদের এক ঋষির দিব্যদর্শন হয়েছিল, যে ঋষির মুখ থেকে স্বামীজী এই মন্ত্রোচ্চারণ শুনেছিলেন। ৫ই জুলাইয়ের ক্লাশ এখানেই শেষ হয়ে যায়।

শনিবার, ৬ই জুলাই

বেদান্তসূত্রের শাঙ্করভাষ্য

৬ই জুলাই স্বামীজী ব্রহ্মসূত্রের উপর আচার্য শঙ্করের ভাষ্যকে নিয়ে আলোচনা শুরু করছেন। মিস্ ওয়াল্ডো এদিনের আলোচনা কতটুকু বুঝেছিলেন আমাদের পুরো সন্দেহ আছে, বোঝার কথা না। কেন বোঝার কথা না, এই ঘটনা থেকে আমরা আন্দাজ করতে পারি। পূজ্যপাদ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী এত বড় পণ্ডিত, উনি ব্রহ্মসূত্র পড়ার চেষ্টা করে কয়েক পাতা পড়ার পর ছেড়ে দিলেন। স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের ব্রহ্মসূত্রের আচার্য শঙ্করের ভাষ্যের উপর একটা মোটা বই আছে, যদিও ইংলিশে, বাংলাতেও অনুবাদ আছে, কিন্তু পড়ে কেউ বুঝতে পারবে না। কিন্তু যাঁরাই মূল বেদান্ত নিয়ে অধ্যয়ন করতে চাইবেন, তাঁদের জন্য ব্রহ্মসূত্রের উপর আচার্য শঙ্করের ভাষ্য খুব জরুরী।

এইদিনের ক্লাশের আলোচনা শুরু করার আগে আমরা খুব সংক্ষেপে বেদান্ত কি, ব্রহ্মসূত্র জিনিসটা ঠিক কি, শঙ্করাচার্য এর উপর ভাষ্য কি এবং তিনি কেন লিখেছেন, এই জিনিসগুলোর উপর একটু আলোকপাত করে নিতে চাই। এই কটি জিনিস যদি স্পষ্ট না হয়, তাহলে বেদান্তের অনেক কিছুই পরিষ্কার বোঝা যাবে না। দুদিন আগে আচার্য শঙ্করের পূণ্য জন্মতিথি ছিল, একদিক থেকে আমরা এই আলোচনার মাধ্যমে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারছি।

বেদান্ত মানে বেদের অন্ত, আর সংস্কৃতে একই শব্দের অনেকগুলো অর্থ হয়। অন্ত শব্দও দুই অর্থে হয়, প্রথম অর্থ হল বেদের শেষে। এর দ্বিতীয় অর্থ হল, বেদের যেটা শেষ কথা। দুই অর্থেই বেদান্ত মানে উপনিষদ। ঋক, সাম, যজু আর অথর্ব এই চারটের বেদের আবার চারটে করে অংশ। প্রথম অংশে যেগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে তাকে বলা হয় মন্ত্র, এর আরেকটা নাম সংহিতা। মন্ত্র বলতে আমরা যেভাবে বুঝি, ওই অর্থে মন্ত্র নয়, এটা একটা শাস্ত্রীয় পরিভাষা। এর মন্ত্রগুলির বেশির ভাগই প্রার্থনা রূপে যজ্ঞে ব্যবহৃত হয়। পরের অংশকে বলা হয় ব্রাহ্মণ, যেখানে যজ্ঞ কিভাবে হবে বলা হয়েছে আর তার সাথে অন্যান্য কিছু জিনিসের বর্ণনা আছে। তৃতীয় অংশ হল আরণ্যক, গৃহস্থ সারা জীবন যজ্ঞ-যাগ করে এসেছেন, বয়স হওয়ার পর বলছেন, এবার আমি বনে গিয়ে থাকব। কিন্তু সারা জীবনের অভ্যাসকে একদিনে ছাড়তে পারবেন না, তাই এতদিন শরীর দিয়ে যে যজ্ঞাদি তাঁরা করে এসেছেন, এবার তাঁরা সেগুলো মনে মনে সম্পাদন করতে শুরু করেন। আগেকার দিনে মৃত্যুর আগে সন্ন্যাস নিতেন, যখন আর জগতের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। তখন তাঁরা শুধু আত্মচিন্তনই করতেন, সেখানে তখন ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু থাকবে না। উপনিষদ বলে দেয় আত্মচিন্তন কিভাবে করবে। এগুলো আমরা কথা-কাহিনী থেকেই শুনে এসেছি, এর কতটা ঠিক, কতটা ঠিক না, আমাদের জানা নেই। পরে পরে এই জিনিসগুলো মিলে মিশে বিভিন্ন আশ্রমের আচার্যরা বিভিন্ন জিনিসের শিক্ষা দিতেন।

উপনয়নের পর যে ব্রাহ্মণ বালকরা আশ্রমে ঋষিদের কাছে যেত, তাদের পুরো বেদই অধ্যয়ন করতে হত, মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ সবটাই অধ্যয়ন করতে হত। উপনিষদ দুই ভাবে অধ্যয়ন করা যায়। বেদে যা কিছু আছে, সবটাকেই মন্ত্র বলা হয়। সেইজন্য উপনিষদে যা কিছু আছে, সেগুলোকে আমরা শ্লোক না বলে মন্ত্রই বলে থাকি। যেসব ঋষিরা উপনিষদকে নিয়ে চিন্তন করতেন, তাঁরা লোকেদের সাথে বেশি মেলামেশা করতেন না। কিছু কিছু ঋষিরা করতেন। যেমন বৃহদারণ্যক উপনিষদ খুব নামকরা উপনিষদ, সেখানে দেখা যায় যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি রাজা জনকের কাছে গেছেন। আবার ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখা যায়, পিতা পুত্রের সাথে আলোচনা চলছে, পরে দুজনেই রাজার কাছে যাচ্ছেন তাঁদের প্রশ্নের সমাধান পাওয়ার জন্য। সাধারণ ভাবে যাঁরা সন্ন্যাসভাবে প্রতিষ্ঠিত, তাঁরাই উপনিষদ নিয়ে চর্চা করতেন। এমনকি মুণ্ডকোপনিষদে প্রথমের দিকে একটা পরম্পরার কথা বলা হয়। আচার্য শঙ্কর বলছেন, যদিও ওই পরম্পরার মধ্যে কিছু নাম আছে, যাঁরা গৃহস্থ ছিলেন, কিন্তু উপনিষদ মূলতঃ সন্ন্যাসীদের জন্যই। এই উপনিষদের অংশকে বলছেন বেদান্ত।

আগেকার দিনে লেখালেখির বেশি প্রচলন ছিল না, শিষ্যদের আর্থিক ক্ষমতা কিছুই ছিল না, এখনকার দিনে কাগজের যে রকম দাম, তখনকার দিনে তালপত্র, ভুর্জ্যপত্রেরও দাম ছিল। ওনারা সেইজন্য এগুলো

মুখস্ত করে নিতেন। কিন্তু কত মুখস্ত করবেন, মুখস্ত করার একটা সীমা আছে। ওনারা তখন একটা পদ্ধতি বার করলেন, যে কোন শাস্ত্রের ওনারা কয়েকটা code words লিখে নিতেন, ওটাকে বলা হয় সূত্র। এক একটা সূত্রে একটি কি দুটি বা চারটে শব্দ থাকবে আর খুব কদাচিৎ পুরো একটা লাইন হয়ত থাকত, লাইন হলেও ওগুলো কয়েকটি শব্দ মাত্র। খুব নামকরা সূত্রধর্মী সাহিত্য হল নারদীয় ভক্তিসূত্র, ব্যকরণ নিয়ে যাঁরা পড়াশোনা করেন তাঁরা পাণিণি সূত্রের নাম জেনে থাকবেন। এই রকম প্রত্যেকটি বিষয়ের উপর সূত্র তৈরী হয়ে গেল। গুরুর কাছে যারাই পাঁচ বছর কি দশ বছরের জন্য বেদ অধ্যয়ন করতে যেত, তাদের পুরো বেদ অধ্যয়ন করতে বত্রিশ বছর লেগে যেত। বেদ তাদের পুরোটাই মুখস্ত করতে হত। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে, যেমন দর্শন, ব্যকরণ ইত্যাদি, সেগুলিকে ওনারা সূত্রাকারে মুখস্ত করে নিতেন।

আমাদের পরম্পরাতে বলা হয় যে, বেদান্তের যে মূল দর্শন, এটাকে ব্যাসদেব সূত্রাকারে সাজিয়ে দিলেন, নাম দিলেন বেদান্তসূত্র, এই গ্রন্থের আরেকটি নাম ব্রহ্মসূত্র। ব্রহ্মসূত্রে সব মিলিয়ে পাঁচশ পঞ্চান্নটি সূত্র আছে। তেমনি যে কটি ষড়দর্শন আছে, প্রত্যেকটিরই নিজস্ব সূত্র রয়েছে। ইতিমধ্যে ব্যাসদেব আরকটা বড় গ্রন্থ রচনা করলেন, যার নাম মহাভারত। মহাভারতে তিনি গীতাকে রেখে দিলেন। গীতা হল বেদান্তের সার। অনেক আগে থেকে আমাদের মধ্যে একটা খুব প্রচলিত কথা চলে আসছে, যাতে বলা হয়, বেদের সার উপনিষদ, উপনিষদের সার গীতা। কিন্তু খুব মন দিয়ে উপনিষদ পড়লে দেখা যাবে, গীতা উপনিষদের সার নয়। কারণ গীতাতে আরও অনেক কিছু আছে, যেমন খুব গুরুত্বপূর্ণ হল, গীতাতে ভক্তির কথা আছে, যেটা উপনিষদে আমরা পাই না। আর সৃষ্টি তত্ত্বগুলো গীতাতে ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে রয়েছে, যেটা উপনিষদে এতটা ঈশ্বর কেন্দ্রিত নয়। ঘুরে ফিরে আমরা দেখছি, বেদান্তের তিনটি বই এসে যাচ্ছে – উপনিষদ, গীতা আর ব্যাসদেবের বেদান্ত সূত্র বা ব্রহ্মসূত্র। এই তিনটে গ্রন্থকে একত্রে বলা হয় প্রস্থানত্রয়। যাঁরাই বেদান্ত অধ্যয়ন করতে চাইবেন, তাঁদের সবাইকে এই তিনটি বই অবশ্যই পড়তে হবে – উপনিষদ, মোটামুটি দশটি উপনিষদ, যে কটির উপর শঙ্করাচার্য ভাষ্য রচনা করেছেন, অনেকে এগারোটি উপনিষদের কথা বলেন, তার সাথে গীতা আর ব্রহ্মসূত্র।

সূত্রের সমস্যা হল, একজন আচার্য তিনি তাঁর গুরুর কাছে অনেক বছর ধরে অধ্যয়ন করলেন, তিনি সূত্রগুলোকে দেখেই বুঝতে পারছেন সূত্রে কি বলতে চাইছে। সেই আচার্য পরে আরও কয়েকজন শিষ্যকে অধ্যয়ন করিয়েছেন। এই ভাবে গুরু-শিষ্য পরম্পরা চলতে চলতে এক সময় স্বাভাবিক ভাবেই সূত্রের সঠিক বক্তব্যটা বা আসল অর্থের ভাবটা আগের মত থাকবে না। অনেক পরম্পরা ধরে চলতে চলতে হাজার বছর চলে গেল। এতদিনে ওই গুরু পরম্পরায় যিনি ওই মূল সূত্রগুলো লিখেছিলেন, সেটা হারিয়ে গেছে। এত বছর পর ওই সূত্রগুলিতে ঠিক কি বলতে চাইছে, সেটা আর এখন জানার কোন উপায় নেই। নূতন করে এবার তাই এই সূত্রের উপর ভাষ্য রচনা করতে হবে। আগে একটা বিষয় ছিল, সেই বিষয়কে সূত্রে নিয়ে আসা হল, ওই সূত্রকে এবার বড় করে নূতন ভাবে দাঁড় করাতে হবে। এটাকে বলা হল ভাষ্য। ব্যাসদেব যে ব্রহ্মসূত্র রচনা করলেন, আমরা জানি শঙ্করাচার্য প্রথম ব্রহ্মসূত্রের উপর তাঁর ভাষ্য লিখলেন। শঙ্করাচার্যের পর রামানুজও ভাষ্য লিখলেন, মাধ্বাচার্যও লিখলেন, পরে আরও অনেকে লিখলেন।

সূত্রের শব্দগুলোকে খুব সংক্ষেপে রাখা হয়। যেমন ব্রহ্মসূত্রের প্রথম সূত্র হল *অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা*, এখানে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে ব্রহ্মের উপর আলোচনা করতে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু এই প্রথম সূত্রের উপর যখন ভাষ্য রচিত হবে তখন, 'অথ', 'অতঃ', 'ব্রহ্ম' ও 'জিজ্ঞাসা', এই চারটে শব্দের কি অর্থ, এর কি reference, কেন reference, লম্বা লম্বা ব্যাখ্যা করে যাবেন। এই শব্দগুলোর উপর আচার্যদের যখন ভাষ্য চলতে থাকে, তখন দর্শন পুরো পাল্টাতে শুরু হয়ে যাবে। শঙ্করাচার্য সেখানে যুক্তি দিয়ে দেখাবেন ব্রহ্মসূত্র অদ্বৈত দর্শনের কথাই বলছেন, অন্য দিকে রামানুজ আবার বিশিষ্টাদ্বৈতকে দেখাবেন। বেদান্তে যে কোন ব্যক্তি যদি বলেন আমি বেদান্তী, তাহলে তাঁকে প্রথমে যুক্তি দিয়ে দেখাতে হবে, ব্রহ্মসূত্রে ওটাই বলছে, যেটা তিনি বলছেন। কিন্তু অন্যান্য দর্শনের লোকেরা তাঁর মতকে গ্রাহ্যই করবে না, তারা বলে দেবে আমরা তোমাকে মানিই না। এনাদের বেদান্তের যে মূল বক্তব্য, সেটাকে আধার করেই তাঁরা তর্ক করবেন, ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য ওনারা পড়বেন না। যেমন ঠাকুরের কথামৃত ঠাকুরের ভক্তরাই মানবে। মাস্টারমশাই ঠাকুরের কাছে যা যা শুনতেন, শোনার পর বাড়ি এসে সেদিনকার মূল কয়েকটি কথা লিখে রাখতেন, পরে পরে তিনি ওই কয়েকটি

কথাকে চিন্তন করে করে কথামৃত লিখেছেন। এখানে এটা কিন্তু তা নয়, এখানে একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে লেখা হয়েছে। এখন বেদান্ত কি বলতে চাইছে? বেদান্তের খুব প্রচলিত কথা হল *অহং ব্রহ্মাস্মি*, বলতে চাইছেন, আমার আসল যে অস্তিত্ব, ওটা পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ। আমি দেহ রূপে ব্রহ্ম নই, মন রূপেও ব্রহ্ম নই, জীবাত্মা রূপেও নই, আমার আসল যেটা সেটাই শুদ্ধ ব্রহ্ম। বেদান্তের আরেকটি প্রচলিত কথা হল, *সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম*, তিনি হলেন সত্য, তিনি জ্ঞানস্বরূপ, তিনি অনন্ত। আবার বলছেন *প্রজ্ঞানাং ব্রহ্ম* বা *অয়মাত্মা ব্রহ্ম*, এগুলোই বেদান্তের খুব নামকরা মহাবাক্য।

এখন এই *অহং ব্রহ্মাস্মি*, বেদান্তের এই একটি কথাকে বোঝা বা ধারণা করা যে কত কঠিন, চিন্তাই করা যাবে না। কারণ আমি জানি, আমি অমুক নামের ব্যক্তি, আমার খিদে পায়, তৃষ্ণা পায়, আমার কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ আদি আছে, অথচ আমি নাকি *প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম* আমি প্রজ্ঞা স্বরূপ। কোথাও তো মিলছে না। তাই না, উপনিষদে ব্রহ্মকে নিয়ে যত রকম ভাবের কথা বলা হয়েছে, তার কোনটার সাথে মেলে না। *সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম*, ব্রহ্ম অনন্ত কিন্তু আমি সীমিত। আমি এখানে একটা চেয়ারে বসে আছি, আমরা সামনে এই জগৎ আছে, আমার মনের উপর নিয়ন্ত্রণ নেই। উপনিষদ যেটাকে সত্য বলছেন, আমি বাস্তবিক যা যা অনুভব করছি, তার সাথে কোন মিল নেই, এটা কখনই হতে পারে না। আমাদের অনেকে মনে করে বৃদ্ধ বয়সে ধর্ম করা যাবে। কারণ ধর্মে তো কোন যুক্তিতর্ক লাগে না, তাই বৃদ্ধ বয়সে যখন কিছু করার থাকবে না, তখন পূজো অর্চনা, ফুল, চন্দন নিয়ে থাকব আর যেমনটি শুনে এসেছি, বসে বসে শ্রীরাম জয়রাম করে যাব।

আচার্য শঙ্কর যিনি ভারতবর্ষের নিঃসন্দেহে greatest intellect, তিনি প্রথমেই যে সিদ্ধান্তকে দাঁড় করালেন, তা হল, যে কোন ধর্মের কথা, উপনিষদ বা বেদের যে কোন কথা, আমার অনুভবের বিপরীত কোন মতেই যেতে পারে না। আমরা মনে করি ধর্ম বিশ্বাসের জিনিস, আচার্য শঙ্কর ঠিক ওই জায়গাতে আক্রমণ করছে। ধর্ম কখনই বিশ্বাসের জিনিস হতে পারে না, ধর্ম যদি যুক্তি সঙ্গত না হয়, ধর্ম যদি আমি যে জগৎকে দেখছি, অনুভব করছি, এর বিরুদ্ধে যদি যায়, ওই কথাকে নেওয়া যাবে না। বেদে, উপনিষদে যদি শত শত কথা থাকে, যেটা আমার অনুভবের বিরুদ্ধে যাচ্ছে, ওই কথাকে নেওয়া যাবে না। শত কথা থাকুক, তাতে কিছু আসে যায় না, আমি যেটা দেখছি, আমি যেটা অনুভব করছি, এটাই শেষ কথা। তাহলে বেদের আমরা কি নেব? অপূর্বতা, যেটা আমার বুদ্ধি দিয়ে কোন মতেই জানা যাবে না, সেই জায়গাতে গিয়ে আমি ওর সাহায্য নেব। কিন্তু যেটাকে আমি সাক্ষাৎ দেখছি, আরও অনেকে দেখছে, যেটা আমি অনুভব করছি, আরও অনেকে অনুভব করছে, সেটার বিরোধী যদি কিছু বলা হয়, আমরা সেটাকে মানব না। তার মানে, যদি কেউ বলে মৃত্যুর পর মানুষ স্বর্গে যায়, এখানে সূক্ষ্ম জগৎকে নিয়ে বলা হচ্ছে। আমরা জানি চোখ দিয়ে আমরা স্থূল জগৎ ছাড়া কিছু দেখতে পাই না। আমরা বলব, ঠিক আছে মেনে নিলাম, মানুষ মৃত্যুর পর স্বর্গে যায়, কারণ আমি স্বর্গের ব্যাপার জানতে পারব না। কিন্তু উপনিষদ বলছে, *অহং ব্রহ্মাস্মি*, ব্রহ্ম আবার *সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্*, মানে আমি অনন্ত, অথচ আমি দেখছি যে আমি দেশ, কাল ও বস্তুর মধ্যে সীমিত হয়ে আছি। এটা তো জমছে না।

এবার এটাকে মেলাতে হবে, কারণ বেদ উপনিষদের কথা ঋষিদের কথা, ঋষিদের কোন কথাকে নাকচও করা যাবে না। এবার আচার্য এই দুটোকে এক প্ল্যাটফর্মে নিয়ে এলেন, কিন্তু এক প্ল্যাটফরমে নিয়ে আসা অসম্ভব। শঙ্করাচার্য বলেই আনতে পেরেছেন, কারুর পক্ষেই সম্ভব না। আচার্য নিয়ে এলেন মায়া শব্দ। তিনি মায়া শব্দকে বলছেন, ব্যবহারিক সত্তা। ব্যবহারিক সত্তার মানে হয়, ওর অস্তিত্ব আছে, আবার অস্তিত্ব নেই। যদিও আচার্যের এই মতের বিরুদ্ধে অনেকে আক্রমণ করেছেন, কিন্তু আচার্যের এটা বিরাট বড় একটা অবদান। অন্য দিকে স্বামীজী এটাকে আক্ষরিক ভাবে নিয়েছেন। তিনি খুব সহজ উপমা দিয়ে বলছেন, এখান থেকে কেউ যদি সূর্যের দিকে এগিয়ে যায়, যাওয়ার সময় সে যদি সূর্যের ছবি নিতে থাকে, প্রথমের দিকের ছবি এক রকম হবে, যেমন যেমন এগোতে থাকবে ছবিগুলি পাল্টাতে থাকবে। স্বামীজীর সময় গ্যালিলিওর টেলিস্কোপ আদি এসে গিয়েছিল, তাও অত পরিষ্কার ছবি আসেনি। কিন্তু তাও মোটামুটি লোকেরা জানত, চাঁদ পৃথিবী থেকে যেটা দেখাচ্ছে, আসলে কিন্তু চাঁদ সেই রকম নয়। আজ মহাকাশযান যাচ্ছে, ছবির মান অনেক উন্নত হয়েছে, আমরাও পরিষ্কার দেখছি এখান থেকে চাঁদকে যেমন দেখছি, ওখানে কিন্তু চাঁদ সেই রকম নয়। বিভিন্ন স্টেজে যদি ছবি নেওয়া হয়, ছবিগুলি পাল্টাতে থাকবে। চাঁদের সব কটা ছবি গুলি সত্য না মিথ্যা?

সত্য, আবার সত্যও নয়। আমি দেখছি সত্য, কিন্তু এটা তার বাস্তবিক স্বরূপ নয়। এটাকে শঙ্করাচার্য বলছেন, মায়া, এটাকে স্বামীজী বার বার জোর দিয়ে বলছেন, relative existence।

এখন যে জিনিসটা আছে, আর যে জিনিসটা নেই, এটাকে আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করব? আমরা বলতে পারি না যে ওটা নেই, আবার বলতে পারি না যে ওটা আছে। একটা উদাহরণ প্রায়ই ব্যবহার করা হয়ে থাকে, যেমন অন্ধকার। যদি কেউ বলে অন্ধকার আছে কি? আমরা কি করে প্রমাণ করব? তুমি অন্ধকার দেখেছ কি? কারণ যে কোন জিনিসকে দেখার জন্য আলোর দরকার। আলো যদি নিয়ে আসা হয়, অন্ধকারকে দেখতে পারব না। অন্ধকারকে অন্ধকার দিয়ে দেখা যায় না, একটা কেমন বিপরীত ভাব এসে যাচ্ছে। মায়ার অস্তিত্ব ঠিক এই রকম। যতক্ষণ আমরা মায়াতে আছি, ততক্ষণ মায়াকে নিয়ে প্রশ্ন করা যাবে না। কারণ যে কোন জিনিসকে জানার জন্য জ্ঞান দরকার। মায়া মানে অজ্ঞান, অজ্ঞান মানে আছে অথচ নেই। কারণ যতক্ষণ আমরা অজ্ঞানে আছি অজ্ঞান দিয়ে আমরা কোন কিছু জানতে পারব না। অন্য দিকে জ্ঞান এসে গেলে তখন অজ্ঞান আর থাকবে না, যেমন আলো নিয়ে এলে আর অন্ধকার থাকে না। অন্ধকারকে দেখা যায় না, অন্ধকার হল আলোর অভাব, তেমনি অজ্ঞান মানে জ্ঞানের অভাব। সেইজন্য আচার্য বলছেন অজ্ঞানই বলা হোক, অবিদ্যাই বলা হোক, মায়া বলা হোক, তাতে কিছু আসে না, এটাকে তিনি তাই একটা নূতন শব্দ দিলেন, অনির্বচনীয়, অর্থাৎ যেটাকে ব্যাখ্যা করা যায় না।

এটা পরিষ্কার যে, পারমার্থিক বলতে যেটা বোঝায়, সত্য বলতে যেটা বোঝায়, সেটা মায়া নয়, কারণ সত্যের জ্ঞান হলে মায়া চলে যাবে। এই কথাগুলো আচার্য এক জায়গায় সংগ্রহ করে এনে বলছেন, কিন্তু আলোচনা করার সময় আমাদের কথাগুলো একটু আগে পিছে হয়ে যাবে। তিনি বলছেন যে, এটা বাস্তবিক হয়, যখন কারুর আধ্যাত্মিক জ্ঞান হয় তখন তার মায়া বলে কিছু থাকে না। এই যে স্বামীজী সমাধির কথা বলছেন, যেখানে সমত্ব এসে যাচ্ছে, তখন সত্যিই দেখেন মায়া বলে কিছু নেই। এই যে আমরা দুটোতে তফাৎ দেখছি, ওই অবস্থায় এই তফাৎটা চলে যায় আর যাঁরা ওই অবস্থায় গেছেন তাঁদের ব্যবহার সমব্যবহার হয়ে যায়। এই যে আমরা বহু দেখছি, বহুর মধ্যে তফাৎ দেখছি, রাজা দেখছি, সাধারণ মানুষ দেখছি, এই বহু আছে অথচ নেই। কিন্তু এটা একেবারে নিশ্চিত যে, এই তফাৎ স্থায়ী নয়, বাস্তব নয়, সত্যও না। সেইজন্য ব্রহ্মের যে পরিভাষা, সেই পরিভাষাতে মায়া থাকতে পারে না। যদি এটা চিরস্থায়ী হয়, বাস্তবিক হয় তবেই সে থাকতে পারত। সেইজন্য এই অবিদ্যা বা অজ্ঞান ব্রহ্মের কখন অংশ হতে পারে না, অঙ্গ হতে পারে না। আর তাই অবিদ্যা বা অজ্ঞানের যে দোষ রয়েছে, এক'কে দুই দেখানো, এক'কে বহু দেখানো বা একটা জিনিসকে ঢেকে দিয়ে জিনিসটাকে ম্যাজিকের মত অন্য জিনিস দেখানো, যাকে আবরণবিক্ষেপ বলছেন, এই দোষগুলো কখনই ব্রহ্মে থাকতে পারে না। এটাকেই ঠাকুর খুব সহজ ভাষায় বলছেন, সাপের মুখে বিষ আছে, সেই বিষে সাপের কিছু হয় না। এই জিনিসটাকে বলার জন্য আচার্য অনেকগুলি লম্বা যুক্তি দিয়েছেন। কারণ যেহেতু আমরা ঠাকুরের ভক্ত তাই আমরা ঠাকুরের কথা মেনে নিচ্ছি, বাইরে যদি ঠাকুরের কথা এভাবে বলতে যাই লোকেরা আমাদের কথা মানতেই চাইবে না, উল্টে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করবে। আর সত্যিই তখন কলকাতায় ঠাকুরকে নিয়ে লোকেরা বলত, পরমহংসের দল চলে প্যাঁক প্যাঁক। তাই আমাদের যুক্তি দিয়ে চলতে হবে, শঙ্করাচার্যও তাই যুক্তি দিয়ে সব কিছু নিয়ে যাচ্ছেন।

তাহলে এই আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান কিভাবে হবে? বলছেন, একটাই পথ, মায়াকে সরাতে হবে। মায়াকে কিভাবে সরাবে? মায়া মানে অজ্ঞান, অজ্ঞানকে সরাবার জন্য জ্ঞান নিয়ে আসতে হবে। যে কোন পথ দিয়ে যদি আমরা এই জ্ঞানকে নিয়ে আসতে পারি, মায়া নিজে থেকেই চলে যাবে। স্বামীজী এটাকে আরও সহজীকরণ করে দিলেন, কর্ম দিয়ে হোক, জ্ঞান দিয়ে হোক, এখানে স্বামীজী জ্ঞান বলতে বিচার বলছেন, ভক্তি দিয়ে হোক বা যোগ দিয়ে হোক, এই চারটেই আমাদের জ্ঞানের অবস্থায় নিয়ে যাবে। এই জ্ঞান মানে আধ্যাত্মিক জ্ঞান, যে জ্ঞান হলে ঈশ্বরের জ্ঞান বা ব্রহ্মের জ্ঞান হয়ে যায়, যে জ্ঞান হলে অজ্ঞানের নাশ হয়ে যায়। যারা ভক্তিমার্গের, বিশেষ করে যারা শক্তিমতে সাধনা করে বা যারা মাতৃভক্ত, তারা বলে, এই মায়া ঈশ্বরেরই শক্তি, সেইজন্য এই মায়ার যদি পূজা করা হয়, তিনি পথ ছেড়ে দেবেন। পথ ছেড়ে দিয়ে তিনি সেই ব্রহ্মেই নিয়ে যাবেন, সেই জ্ঞানেই নিয়ে যাবেন। শেষ পর্যন্ত আমাদের হিন্দু শাস্ত্রে যতগুলো দর্শন আর যত পথ

আছে, সবাই কিন্তু একটা কথাই বলবে, এই শরীর, এই মন, এটা কিন্তু আসল নয়, আসল হল তোমার চৈতন্য স্বরূপ। সেই চৈতন্যকে সবাই বিভিন্ন ভাবে পরিভাষিত করছেন, আর সেই শুদ্ধ পরমচৈতন্যকে বিভিন্ন দিকে দিয়ে ব্যাখ্যা করেন, যেমন কেউ বলবে ব্রহ্ম, কেউ বলবে ঈশ্বর, কেউ বলবে পরমাত্মা, পরমগুরু, ইত্যাদি অনেক কিছু বলবে। আর আমার ব্যক্তি সত্তার সাথে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে সম্পর্ক, এই সম্পর্ককেও আলাদা আলাদা ভাবে ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু কোন হিন্দু দর্শন বলবে না যে, আমি এখন শরীর মন রূপে যেটা আছি এটাই শেষ কথা। বেদান্তকে ব্যাখ্যা করতে যাওয়ার সময় খুব সংক্ষেপে এটাই হল আচার্য শঙ্করের দৃষ্টিভঙ্গী।

আচার্য ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে দুটো গুরুত্বপূর্ণ শব্দ নিয়ে এলেন, মায়া বা অজ্ঞান, আর এই অজ্ঞানকে বলছেন অনির্বচনীয়, মুখে এটাকে বর্ণনা করা যাবে না। আছে অথচ নেই, তাই বর্ণনা করা যাবে না। যদি একেবারেই না থাকত, তাহলে তাকে আমরা অলীক বলে উড়িয়ে দিতাম; সব সময় যদি স্থায়ী রূপে থাকত তাহলে ব্রহ্মকে যেভাবে বলা হয়, সেইভাবে মায়াকেও আমরা পরিভাষিত করতাম, বাস্তবে যা কখনই করা যাবে না। অন্যান্য দর্শন বা মতের বাকি যত পণ্ডিতরা আছেন তাঁরা কি শঙ্করাচার্যকে ছেড়ে দেবেন? আচার্যও খুব ভাল করে জানতেন, এরা কেউ আমাকে ছাড়বে না।

উপনিষদের ক্ষেত্রে আচার্য যেন, যাঁরা উপনিষদকে মেনে চলেন, বিশ্বাস করেন, তাঁদের মত করে তিনি ভাষ্য লিখে গেছেন। যেখানে যেখানে প্রয়োজন বুঝেছেন, সেখানে সেখানে তিনি একটু বৌদ্ধ মতকে, একটু অন্য কোন মতকে আক্রমণ করলেন। গীতাতেও তিনি মোটামুটি তাই করলেন, গীতাতে যেখানে যেমন বলা হয়েছে, সেখানে সেখানে তিনি সেভাবেই ব্যাখ্যা করে গেছেন। যেখানে বলছে ঈশ্বর সৃষ্টি করেন, সেখানে তিনিও বলছেন ঈশ্বরই সৃষ্টি করেন, যেখানে বলা হয়েছে আত্মাই ব্রহ্ম, সেখানেও তিনি বলছেন আত্মাই ব্রহ্ম। কিন্তু যেমনি তিনি ব্রহ্মসূত্রে এলেন, এবার তাঁর বটবৃক্ষের মত বিস্তার হতে শুরু হয়ে গেল। বটবৃক্ষ নিজেকে বিস্তার করার জন্য একটা জায়গার দরকার। এমন একটা পাখির যদি কল্পনা করা যায়, যার ডানা এক কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তার করতে পারে, সেই পাখিকে আকাশ থেকে মাটিতে নামা ও আকাশে ওড়ার জন্য অনেকটা জায়গা দিতে হবে। আচার্য শঙ্কর সেই জায়গাটা পেলেন ব্রহ্মসূত্রে গিয়ে। কারণ গীতা ও উপনিষদে তিনি বাঁধা, যেমনটি আছে ওর মধ্যেই তাঁকে থাকতে হবে। ব্রহ্মসূত্রেও তিনি বাঁধা। কিন্তু আচার্য কোন দিনই মন মত একটা জায়গা পেলেন না, যেখানে তিনি পরিষ্কার করে একটা যে লিখবেন আমার এই মত। আচার্য যে স্তোত্রগুলি রচনা করলেন, এমন উচ্চমানের স্তোত্র রচনা করলেন যে, বাকি সাধকরা বা ভক্তরা যারা স্তোত্রাদি রচনা করেছেন, কেউ তাঁর ধারে কাছে দাঁড়াতেই পারছেন না। আচার্য বেদান্তের উপর যেমন স্তোত্রাদি দিয়েছেন, তেমনি তিনি শক্তির স্তোত্র, শিবের স্তোত্র, অন্নপূর্ণার স্তোত্র, এই ধরণের বহু স্তোত্র রচনা করেছেন। আবার যখন মাণ্ডুক্যকারিকার ভাষ্য লিখছেন তখন দেখাচ্ছেন জগৎ নেই, তিনিই আবার গীতার ভাষ্যে গিয়ে লিখছেন ভগবান এই জগতের সৃষ্টি করলেন, তিনি সনক, সনকাদি চারজনের জন্ম দিলেন, যেখানে যেটা বলা হয়েছে, আচার্য সেখানে সেটাই বলছেন।

বক্তব্য হল অস্তিত্ব দুই প্রকার, Absolute ও Relative। Absolute মানে ব্রহ্ম, যাঁর কোন বিকার নেই। ঠাকুর আগুনের উপমা এনে বলছেন, আগুনের কোন রঙ নেই, যেমন রঙের বড়ি ফেলবে আগুনের তেমন রঙ হবে। তার সাথে আছে আপেক্ষিক জগৎ, যেটা মায়া বা অজ্ঞানের দরুণ হয়, মায়া যেমনি এসে যাবে তখন এক এক করে সবই এসে যাবে। তখন ঈশ্বর আসবেন, সৃষ্টিও হবে, সনক সনন্দন মুনিরাও আসবেন। আচার্যের কোন কিছুতেই আপত্তি নেই। কেউ যদি বলে সাতটি স্বর্গ, আচার্যও বলবেন সাতটি স্বর্গ, কোন পুরাণ যদি বলে ষাটটি স্বর্গ, আচার্যও বলবেন ষাটটি স্বর্গ।

মায়া শব্দটা ইদানিং কালে একটা মিথ্যা অর্থে চলে এসেছে, মায়া কিন্তু মিথ্যা না, মায়া একটা টেকনিক্যাল শব্দ, আর বেদান্তের মায়াকে বোঝা খুব কঠিন। মায়া বুঝে নিলে বোঝা যাবে যে সে বেদান্ত মোটামুটি বুঝে গেছে। মায়া মানে, যদি কোন কিছু দেশ, কাল ও বস্তুতে পরিছিন্ন থাকে, তাহলে সেটা মায়া। আমি এখন এই চেয়ারে বসে আছি, আমি এই জায়গাতে আবদ্ধ, আমার এক সময় জন্ম হয়েছে, আমি মারা যাব, আমি এই শরীরে আছি কিন্তু এই গ্লাশে নেই, তার মানেই এটা মায়া। মায়া মানে কিন্তু মিথ্যা নয়। বৌদ্ধরা এমন ভাবে মায়াকে উপস্থাপনা করে দিয়েছে যে, সবারই সেখান থেকে একটা ধারণা হয়ে গেছে যে,

মায়া মানে মিথ্যা, মায়া মানে ছলনা। বেদান্তে মায়া মানে ছলনা নয়, বেদান্তে মায়া হল relative existence। একটা হল pure existence বা Absolute existence আরেকটা হল relative existence। এখানে আমরা শুনে নিলাম মায়া মানে relative existence, কিন্তু দুদিন পরেই আমাদের মাথায় মায়া মানে ছলনা, এই ভাবটা চলে আসবে।

যদিও সব জায়গায় ব্রহ্মসূত্র পুরোটা পড়ানো হয় না, কিন্তু প্রথম চারটি সূত্র সবাইকে পড়তে হয়, এটাকে বলে চতুঃসূত্রী। বেদান্ত যাঁরা অধ্যয়ন করেন, তাঁদের এই চারটে প্রথম সূত্র পড়ানো হয়। প্রথম সূত্র, *অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা*, দ্বিতীয় সূত্র – *জন্মাদস্য যতঃ*, তৃতীয় সূত্র – *শাস্ত্রযোনিত্বাৎ* আর চতুর্থ সূত্র তত্তু *সমন্বয়াৎ*। এই সূত্রগুলিকে বিভিন্ন দার্শনিক পণ্ডিতরা বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করবেন। এই চারটে সূত্রের উপর আচার্য এত যৌক্তিকতা দিয়ে এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা করেছেন যে, অনেকেরই এই ব্যাখ্যা পড়ে ধারণা করতে দম বেরিয়ে যায়। তিনি সেখানে দেখাচ্ছেন, এই অজ্ঞান আমাদের সবারই ভিতরে আছে। যত ধর্ম আছে, যত রকমের দর্শন আছে, সবারই ভিতরে অজ্ঞানের বোধ আছে। আমাদের সবারই ভিতরে অজ্ঞান আছে, রাত্রে অন্ধকারে যাচ্ছি, রাস্তায় একটা দড়ি পড়ে আছে, দেখে আমি সাপ মনে করছি অথবা, একটা সাপ আছে দেখে মনে করছি দড়ি পড়ে আছে। অন্ধকারে ভাল করে দেখতে পারছি না, একজন লোক আসছে, মনে করছি আমার বন্ধু আসছে, আসলে সে একটা চোর। যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করা হল, *কিমাশ্চর্যম্*, আশ্চর্য কি? যুধিষ্ঠির উত্তর দিচ্ছেন, দেখছে মানুষ রোজ মরছে, কিন্তু মানুষ ভাবে আমি মরব না। এটাই মায়া। কেন মায়া? অজ্ঞান তোমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তুমি জানো তুমি মরবে, কিন্তু তোমার বিশ্বাস যে তুমি মারা যাবে না। এটাকে বিশ্বাস করেই তুমি জীবন চালিয়ে যাচ্ছ।

স্বামীজী এই মায়াকে আবার অন্য ভাবে নিয়ে যাচ্ছেন। এক মা, তার ছেলে টাকা-পয়সা কেড়ে নেয়, মদ খেয়ে বাড়ি এসে রোজ মাকে মারধোর করে, কিন্তু ছেলের প্রতি ভালবাসাকে মা ছাড়তে পারে না, এটাই মায়া। আমরা কাউকে ভালবাসি, সেই ভালবাসা আমি ফেরত পেলাম না, তার জন্য ভিতরে ভিতরে জ্বলতে থাকি, আর ভেবে যাচ্ছি, একদিন না একদিন সে আমাকে ভালবাসবে, এটাই মায়া। মানুষ কাজে করতে নামে, আর ভেবে যাচ্ছে, কোথা থেকে প্রচুর টাকা আয় করা যেতে পারে, টাকা পেলে এই করব, সেই করব। কিন্তু টাকা আসছে না, তবুও মানুষ লড়ে যাচ্ছে, এটাই মায়া। কদাচিৎ কেউ আমার পাশে কোটিপতি হয়ে গেছে, তখন তার দিকে তাকিয়ে আমি বলব, সে যদি কোটিপতি হতে পারে, আমি কেন হতে পারব না, এটাই মায়া। তাহলে ঘুরে ফিরে মায়া কি? কিছুই না, আচার্য শঙ্করের মতে মায়া হল statement of fact। মায়া একটা সত্য, যেটা সবাই অনুভব করে, এটাকে ব্যাখ্যা করার কোন দরকার নেই। এটা হল আচার্য শঙ্করের কোথাও একটা weak link, এই অর্থে যে, আচার্য যখন শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করছেন তখন দুর্ধর্ষ, ব্রহ্মকে যখন ব্যাখ্যা করছেন, তখনো দুর্ধর্ষ, মায়াকে ব্যাখ্যা করার সময় ওই জায়গায় একটা দুর্বলতা এসে যায়, তিনি simply বলে দিচ্ছেন, এটা statement of fact, সবাই মায়াকে অনুভব করে, এইটুকু বলে তিনি বেরিয়ে যাচ্ছেন।

গীতায় একটা খুব সুন্দর আলোচনা আছে, আচার্য ভাষ্য রচনার সময় কল্পনা করে নিতেন, এই ব্যাখ্যার উপর বিরোধীরা এই এই প্রশ্ন তুলে আমাকে আক্রমণ করবে। সেখানে তিনি নিজেই বিরোধীদের হয়ে প্রশ্ন করতেন। এটাকে বলা হয় পূর্বপক্ষ। প্রশ্ন করে নিজেই সেই প্রশ্নের উত্তর আলোচনা করতে করতে হঠাৎ একটা সিদ্ধান্ত দিয়ে দেবেন, সেটাকে বলা হয় পূর্বপক্ষ সিদ্ধান্ত। উনি জানতেন তাঁর বিরোধীরা তাঁকে ছাড়বে না। উনিও তাই নিজেই বিরোধীদের হয়ে নিজের সিদ্ধান্তের উপর প্রশ্ন দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। যেমন প্রশ্ন করা হচ্ছে মায়া কোথায় থাকে? মায়া কার ভিতরে আছে? মজার ব্যাপার হল রামানুজ পরে পরে ঠিক এই জিনিসগুলোকে নিয়েই আচার্যকে আক্রমণ করেছিলেন। যাই হোক, আচার্য বিরোধীদের একটার পর একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন, বিরোধী পক্ষ কি প্রশ্ন করতে পারে সেটা তিনি পূর্বেই অনুমান করে নিজেই প্রশ্ন করে যাচ্ছেন।

মায়াকে নিয়ে বিরোধীদের প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে তিনি বিরোধী পক্ষকেই আবার প্রশ্ন করছেন, 'তোমার এটা জেনে কি হবে'? 'আমি যদি জেনে যাই তাহলে চারটে লোককে বোঝাতে পারব, তাতে তাদের উপকার হবে'। 'তাদের উপকার হবে, কিন্তু ওই উপকার তোমার কি কাজে লাগবে? কোন চারজন আছে যার

এই সমস্যা আছে'? তখন পূর্বপক্ষী যেন রেগেমেগে বলছে, 'আমার কাজে লাগবে, আমি জানতে চাই'। 'তুমি কেন জানতে চাও? তোমার ভিতরে কি অজ্ঞান আছে'? 'হ্যাঁ আমার ভিতরে অজ্ঞান আছে'। 'তুমি যখন জানো তোমার ভিতরে অজ্ঞান আছে, তাহলে তুমি কেন জিজ্ঞেস করছ অজ্ঞান কি'? এই জায়গাতে একদিক থেকে যেন মনে হয় একটু দুর্বল, কিন্তু এটাই আচার্য শঙ্করের বেদান্তের একমাত্র দুর্বল জায়গা। বেদান্তের যত বিরোধী পক্ষ আছে, সবাই এই জায়গাতে এসে বেদান্তীদের মারে।

স্বামীজীও এটাকে ব্যাখ্যা করতে পারবেন না, কেউই পারবে না। কারণ, এখানে একটা খুব সহজ যুক্তি আছে, ঈশ্বরই একমাত্র সত্য, ঈশ্বর ব্যতিরেকে জগতের কোন কিছুই যুক্তিতে সত্য হতে পারে না। এই যে মন, মনটাই মায়া। শুদ্ধ আত্মা ছাড়া কিছু নেই, শুদ্ধ আত্মার বাইরে আমরা যা কিছু দেখছি, শুনছি, ভাবছি, সবটাই মায়া। আচার্য শঙ্কর এটাই দেখাবেন, শুদ্ধ চৈতন্য বাদে যা কিছু আছে বলে মনে হচ্ছে, এর সবটাই মায়া। ঠাকুরও বলছেন অবতারও মায়ার আণ্ডারে। মহানির্বাণতন্ত্রে শিব পার্বতীকে বলছেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, আমি, সবাই আমরা তোমার থেকেই বেরিয়েছি। সবটাই মায়া, ঈশ্বরের যে ধারণা, এটাও মায়া। যে কোন জিনিস যেমনি এই তিনটে বন্ধনে স্থান, কাল ও বস্তুতে নেমে এলো, সেটাই মায়া। ঈশ্বরের সাথে একটা বড় তফাৎ হল, তিনি ওই দিব্য জ্ঞান থেকে কখনই, কোন পরিস্থিতিতে বিচ্যুত হন না। জীব হারিয়ে যায়, জীব আর শিবের এটাই তফাৎ। ঠাকুর বলছেন, মায়ার জগতে এটা থেকে সেটা হবে, সেটা থেকে এটা হবে কখনই বলা যায় না। আবার বলছেন, মা দেখিয়ে দিলেন কলিযুগে এই রকমই হবে। সবটাই গোলমেলে, এই গোলমালকে আচার্য শঙ্কর একটা প্ল্যাটফরমে নিয়ে আসছেন, যেখানে একটা শুদ্ধতা আনা হচ্ছে। এনে বলছেন, অত জানার কি আছে, মায়া একটা statement of facts, সবাই জানেই, তুমিও জান আমিও জানি, মায়াকে নিয়ে আলোচনা করে কি হবে!

এরপরেই আচার্যের ভাষ্যের যুক্তির স্রোত তীব্র বেগ ধারণ করে। ব্রহ্মসূত্রের প্রথম সূত্রের ভাষ্যে আচার্য যতগুলো দর্শন আছে সব দর্শনকে এক জায়গায় নিয়ে আসছেন। বৌদ্ধ দর্শনে কি বলছে, চার্বাকরা কি বলছে, ন্যায় কি বলছেন, সাংখ্য কি বলছে, বৈশাষিকরা কি বলছে আর কর্মকাণ্ডীরা অর্থাৎ পূর্বমীমাংসকরা কি বলছে, সবারই অজ্ঞানের আইডিয়াসগুলিকে একটা একটা করে ধরে প্রখর যুক্তির তরবারি দিয়ে কুচি কুচি করে কেটে রেখে দিচ্ছেন। আচার্যের এত উচ্চমানের ও সূক্ষ্মস্তরের যুক্তি যে পড়লে মনে হবে আচার্যের কত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি কল্পনা করা যায় না।

আমরা এখানে এত সহজ ভাবে বলে যাচ্ছি, কিন্তু ব্রহ্মসূত্র যে কত কঠিন, একটা ঘটনার কথা বললে কিছুটা আমরা ধারণা করতে পারব। যাঁরা দর্শন অধ্যয়ন করেন, তাঁদের বেদান্ত পড়তেই হবে, বেদান্ত পড়তে গেলে তাঁকে ব্রহ্মসূত্র পড়তে হবে। বিহারের মিথিলাতে একটা প্রচলন ছিল, এখনও আছে তবে কমে গেছে, সেখানে বিবাহের সময় যখন বরযাত্রী আসে তখন কনেপক্ষ থেকে বরযাত্রীদের মজা করে নানান রকমের প্রশ্ন করে, তার মধ্যে বেশির ভাগই কূট প্রশ্ন থাকে, একটু কায়দা করে প্রশ্ন করা হয়। সাধারণ ভাবে বাচ্চাদের দিয়ে প্রশ্ন করা হয়। প্রশ্ন করলে উত্তর দিতেই হবে। যেমন বাচ্চারা গিয়ে বরযাত্রীদের প্রশ্ন করল, আপনারা সবাই কত মন? অর্থ হল, পঞ্চাশ জন যে বরযাত্রী এসেছে, সবারই ওজন কত মন। কত মন ওজন যদি উত্তর দেয়, তখন বলবে, আমরা ওই প্রশ্ন করিনি, আপনাদের মানসিকতা কেমন জানতে চাওয়া হয়েছে। আপনার মাছ খাবেন, না মাংস খাবেন, এই রকম। যদি এই উত্তর দেওয়া হয়, তখন বলবে, আমরা এটা জানতে চাইনি, এইটা জানতে চেয়েছি। যাই উত্তর দেওয়া হোক না কেন, সঙ্গে সঙ্গে কনে পক্ষের বড়রা বরযাত্রীদের উপর চেপে বসবে। চেপে বসে এমন তর্কাতর্কি, শাস্ত্রার্থ লাগাবে যে মনে হবে যেন এই বুঝি মারামারি লেগে গেল। কিন্তু এটা একটা মজা। এর আসল উদ্দেশ্য হল, আমরা যে আমাদের কন্যাকে তোমাদের বাড়িতে পাঠাচ্ছি, তা তোমাদের পড়াশোনাটা আছে কিনা যাচাই করে নেওয়া।

বাচস্পতি মিশ্র খুব নামকরা পণ্ডিত, তাঁর বিবাহ হচ্ছে। বিয়ের দিন কন্যার বাড়িতে ঠিক এইভাবে প্রশ্ন করা শুরু হয়েছে। ওখানে নিয়ম হল, বর কোন কিছু বলতে পারবে না। অত বড় পণ্ডিতের বিবাহ, প্রশ্নও সেই রকমের, সব বেদান্তের উপর মারাত্মক মারাত্মক প্রশ্ন করতে শুরু করেছে। বর বাচস্পতি মিশ্র ভেবে যাচ্ছেন, এই প্রশ্নের উত্তর এই রকম হবে, ওই প্রশ্নের উত্তর এটা হবে। যাই হোক প্রশ্ন হতে হতে অনেকক্ষণ পর তার

link হারিয়ে গেছে। এদিকে বাচস্পতি মিশ্র মনে মনে ঠিক করে নিলেন, এরা বেদান্ত নিয়ে যতগুলো প্রশ্ন করছে, বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর এর সব কটার উত্তর দিয়ে একটা বই লিখব। তখনকার দিনে বিয়ে হয়ে গেলেই কন্যার বিদায় হয়ে যেত না, কন্যা বাড়িতেই থাকত। বিয়ে হয়ে গেল, বাচস্পতি মিশ্র ফেরত গেলেন। কিছু দিন পর কন্যাও এসে গেছে। ওইদিকে বাচস্পতি মিশ্র সকাল হলেই একটা কাঠের তক্তা নিয়ে বসতেন, আর একমনে বই লিখতে শুরু করলেন। কিছু দিন পর আচার্যের ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যের ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন। আচার্য শঙ্করের এক একটা বাক্যের উপর তিনি এক পাতা করে ভাষ্য দিচ্ছেন, আর এমন খুব গভীর ভাবে চিন্ত-ভাবনা করে লিখতে লাগলেন যে, এটাকে যেন আর কেউ কোন দিন কাটতে না পারে।

অনেক বছর কেটে গেছে। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যেবেলায় দেখেন একজন মহিলা তাঁর ঘরে একটা প্রদীপ রাখতে এসেছে। বাচস্পতি জিজ্ঞেস করছেন, 'তুমি কে'? দেখছেন মহিলাটি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে আর বলছে, 'আপনি অনেক বছর আগে মিথিলা থেকে আমাকে বিবাহ করে নিয়ে এসেছিলেন, আর আপনি ভুলেই গেছেন আমি কে'! তখন তাঁর টনক এসেছে, তাই তো আমি অনেক বছর আগে মিথিলায় গিয়ে এই মেয়েটিকে বিবাহ করেছিলাম। তখন বই লেখা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তিনি তখন স্ত্রীকে বলছেন, 'আমি আমার চিন্তার জগতে, বিদ্যার জগতে এমন হারিয়ে ছিলাম যে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যে কর্তব্য হয়, সেই কর্তব্য আমি পালন করতে পারিনি, কিন্তু আমি তোমাকে অমর করে দিয়ে যাব। তোমার যেন কি নাম'? 'ভামতী'। বাচস্পতি নিজের বইয়ের নাম স্ত্রীর নামে দিলেন, হয়ে গেল 'ভামতী টীকা'। যাঁরাই বেদান্তে অধ্যয়ন করবেন তাঁদের জন্য ভামতী টীকা বাধ্যতামূলক পাঠ্য। সন্ন্যাসীরাও যখন ব্রহ্মসূত্র পড়বেন, তখন তাঁদের কাছে শঙ্করাচার্যের ভাষ্যের সাথে থাকবে ভামতী টীকা। কিন্তু ভামতী টীকা পড়তে গিয়ে সবারই নাকে মুখে চোখে জল বেরিয়ে আসবে। শুধু ব্রহ্মসূত্র পড়ে কিছুই বঝতে পারবে না, শঙ্করাচার্যকে পড়ার জন্য আলাদা একটা প্রতিভা দরকার, এর উপর আবার ভামতী টীকা পড়তে শুরু করলে দম বেরিয়ে যাবে। এখানে এই প্রসঙ্গটা আনা হল এটা এখানোর জন্য যে, বেদান্তসূত্রের আলোচনা কত সূক্ষ্ম স্তরে চলে ভাবাই যায় না। উত্তম আচার্যের কাছে না পড়লে এর কিছুই বোঝা যাবে না। এটাই ঠিক ঠিক দায়বদ্ধতা, একটা জিনিসের প্রতি যখন দায়বদ্ধ থাকে তখন নিজের স্ত্রীকে পর্যন্ত ভুলে যাচ্ছেন। তবে আগেকার দিনে এগুলো খুব স্বাভাবিক ছিল, লোকেরা তখন এভাবেই থাকতেন। এখন ঠিক কিভাবে ওখানে আচার্য শঙ্কর অজ্ঞান, অবিদ্যাকে ধরছেন, এই জায়গা থেকে আমাদের বেদান্তসূত্রের শুরু হয়।

প্রথম বাক্যে আচার্য শঙ্কর অজ্ঞানকে ব্যাখ্যা করছেন। আমরা বারবার যেটা বলছি, আচার্যের কাছে, অবিদ্যা, অজ্ঞান, মায়া হল statement of fact। কিভাবে statement of fact? স্বামীজী অবশ্য এটাকে বোঝাবার জন্য মা আর ছেলের উপমা নিয়ে আসছেন বা এই ধরণের কিছু নিয়ে আসছে। আমরা এটাকে আরও সহজ ভাবে বোঝার জন্য একটা উপমা নিচ্ছি, যেটা আচার্য শঙ্করও নিয়েছেন। একটা গরুর কাছে যদি কেউ ঘাস নিয়ে যায়, গরু বুঝতে পারে যে এটা আমার খাদ্য, গরু ঘাসের দিকে এগিয়ে আসে। কেউ যদি লাঠি নিয়ে এগিয়ে যায়, গরু বুঝতে পারে যে আমাকে মারতে আসছে, সে ওখান থেকে পালায়। এই যে বোধ, আমি আছি আর এটা আমার খাদ্য, আমি আছি আর এ আমার শত্রু, এই জিনিসটাকে আচার্য ধরলেন।

আচার্য শঙ্করের সময়, এমনকি স্বামীজীর সময়েও আজকের মত বায়োলজির এতটা উন্নতি হয়নি। বর্তমান কালে আমরা জানি, মানুষের মস্তিষ্কের তিনটে স্তর আছে। যদি আমরা কল্পনা করি, একটা ছোট আঙুর আছে, ওই আঙুরের উপর একটা কমলা লেবু আছে, ওই কমলা লেবুর উপর একটা বাতাবি লেবু রাখা আছে, আমাদের মস্তিষ্ক ঠিক এই রকম, সবার নীচে আছে একটা আঙুর, আঙুরের উপর আছে একটা কমলালেবু আর কমলালেবুর উপর আছে একটা বাতাবি লেবু। আঙুরের অংশটা মোটামুটি সব প্রানীর মধ্যে পাওয়া যায়, আর তার মধ্যে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস রয়েছে, তার নাম এ্যামিগডালা। যে কোন প্রানী, যেখানে ঠিক ঠিক প্রাণনক্রিয়া শুরু হয়ে গেল, এটা হল সব থেকে নিম্নস্তরের মস্তিষ্কের আকৃতি। এই নিম্নতম মস্তিষ্কের আকৃতি একমাত্র নিজের অস্তিত্বকে জানে। খাওয়া-দাওয়াটা জানে, মারামারি করতে জানে আর জানে তাকে কার থেকে পালাতে হবে, আর কার সাথে মৈথুন করতে হবে – food, fight, flight and sex এই চারটে ছাড়া ও আর কিছু জানে না। কেউ চুপচাপ বসে আছে, হঠাৎ গিয়ে কেউ যদি তার চোখের সামনে একটা আওয়াজ

করে, সঙ্গে সঙ্গে সে চমকে উঠবে। এই চমকে ওঠাটা এ্যমিগডালার জন্য হয়। যাদের এ্যমিগডালা খুব শক্তিশালী হয়, তারা কোন কাজ করতে পারে না। কারণ সব সময় তাদের fight আর flight লেগে আছে। তাই ওরা ভাল কাজ বা যে কাজে মাথা খাটাতে হয়, সেই সব কাজ করতে পারে না।

মানুষের ক্ষেত্রে মস্তিষ্ক যখন খুব উন্নত হয়ে যায়, তখন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বাইরের যত রকম অনুভূতি গুলি আসতে থাকে, তার শতকরা আটানব্বই ভাগ প্রসেসিং করে মস্তিষ্কের উপরের বাতাবি লেবুর মত অংশটা, সেইজন্য তার প্রতিক্রিয়া করার সময়টা একটু বেশি লাগে। স্বামী সারদানন্দজী মহারাজকে স্বামীজী বলতেন, শরতের শরীরে বেলে মাছের রক্ত, তার মানে ঠাণ্ডা মানুষ, সহজে কোন কিছুতে প্রতিক্রিয়া করেন না। বয়স্ক মানুষরা সহজে প্রতিক্রিয়া করে না, ওদের এ্যমিগডালা এখন অনেক নিয়ন্ত্রণে আছে। ইয়ং ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে উল্টো হয়, ওদের একটা কথা বললে তাকে তিনটে কথা শুনিয়ে দেবে। নিয়ন্ত্রণটা শুরু হয় আঙুরের অংশ থেকে কমলালেবু আর সেখান থেকে ধীরে ধীরে বাতাবি লেবুর অংশে চলে আসে। সাপ অত্যন্ত নিম্নস্তরের প্রানী, কুকুর খুব নিম্নস্তরের প্রানী, এরাও জানে কাকে আমি মারতে পারব, আর কার কাছে আমি মার খেয়ে যাব, তার ব্যবহারটাও সেই অনুসারে হয়ে থাকে। তার মানে সে জানে, আমি আলাদা আর এই জগৎ আলাদা। একটা ক্ষুদ্র প্রানীও জানে এটা আমি আর এটা আমার খাদ্য, এটা আমি আর এ আমার শত্রু। এই যে বোধ, আমি আলাদা জগৎ আলাদা, এই বোধ সমস্ত প্রানীর মধ্যে আছে। গাছাপালাতে কিন্তু থাকে না। উদ্ভিদ জগৎ আর প্রানী জগতের মধ্যে এটাই তফাৎ। প্রানী জগৎ মানেই ওর বোধ আছে, যতটা জেনে-বুঝে হোক বা যতটা না জেনে-বুঝে হোক ওর এই বোধ আছে যে এটা আমার খাদ্য, এটা আমার খাদ্য নয়; এ আমার মিত্র আর এ আমার শত্রু। অনেক সময় ভুল করে বসে, আর ওই ভুলের জন্য কখন সখন সে মারাও যায়। খাবারে বিষ মেশানো আছে, সাধারণ প্রানী বুঝতে পারে এই খাবারে বিষ মেশানো আছে, মানুষ বুঝতে পারে না। কারণ এ্যমিগডালা মানুষের ক্ষেত্রে মাত্র শতকরা এক ভাগ কাজ করে আর শতকরা নিরানব্বই ভাগ আমরা বিচার করে করি। আমি তোমাকে ভালবাসি, তুমি আমাকে ফল খেতে দিয়েছ, আমি বিশ্বাস করে খেয়ে নিলাম। সাপ, বিছে কখন কাউকে বিশ্বাস করে না। কিন্তু তাও আমরা ইঁদুর বা অন্য কিছু প্রানীকে বোকা বানিয়ে দিই।

আচার্য শঙ্কর প্রথমে এই জিনিসটাকে ধরছেন। বেদান্তসূত্রের আলোচনায় আচার্য শুরু করছেন এই বাক্য দিয়ে, *যুস্মদ অস্মদ প্রত্যয় গোচরঃ*, *প্রত্যয়* মানে বোধ, *যুস্মদ্* মানে তুমি অর্থাৎ জগৎ আর *অস্মদ্* মানে আমি। এই আমি বোধ আর তুমি বোধ বা জগতের বোধ সবারই ভিতরে আছে। আর বলছেন বিষয় বিষয়ী, বিষয় মানে যেটাকে ধরা হয়, আর বিষয়ী মানে যে ধরে। এই দুটো –আমি আর বিষয়, বিষয়ের উপর আমাকে লাগতে হবে। বলছেন এই দুটোর বিরুদ্ধ স্বভাব। কতটা বিরুদ্ধ স্বভাব? *তমঃ প্রকাশবৎ*, আলো আর অন্ধকারের যে তফাৎ, বিষয় আর বিষয়ী, আমি আর তুমি বা জগৎ, এর তফাৎ ঠিক ততটা। Most complicated যেটা subject object relationshipএ এই জগতে আসে সেটা হল মা আর সন্তানের relationship। সন্তান তার মায়ের শরীরের অঙ্গ, তার গর্ভে বড় হয়। গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসার পর এবার মা সন্তানকে দেখছে, object হয়ে গেল। কিন্তু মা জানে এ আমার শরীরের অঙ্গ, একদিকে সে আমি, অন্য দিকে সে তুমি। কিন্তু ধীরে ধীরে তুমিটাই চিরস্থায়ী হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও কোথাও একটা আমি বোধ থাকে। সাধারণ ভাবে দেখা যায়, মা যখন বাচ্চাকে খাওয়ায় তখন সে জানে আমি আমার বাচ্চাকে খাওয়াচ্ছি, আমি অস্মদ্ প্রত্যয়, যাকে খাওয়াচ্ছে সে হয়ে গেল যুস্মদ্ প্রত্যয়।

এই যে আমি আর জগতের মধ্যে তফাৎ, এই তফাতের জন্য বলছেন, *ইতরেতর অভাব*, একটাতে অপরটার সম্পূর্ণ অভাব। যেমন আলোতে অন্ধকার নেই, অন্ধকারে আলো নেই, ঠিক তেমনি আমিতে তুমি থাকে না, তুমিতে আমি থাকে না। আমিতে জগৎ নেই, জগতে আমি নেই। যদি এক থাকত তাহলে কোন ক্রিয়াই হবে না। ক্রিয়া হওয়া মানেই, আমি আর তুমির তফাৎ আছে। আর বলছেন, *অভাব অঙ্গপত্তসিদ্ধায়াং তৎ ধর্মানাম্ অপি*। যদি দুটো জিনিস পুরোপুরি আলাদা হয়, তাহলে তাদের যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তাদের যে ধর্ম রয়েছে, সেটাও পুরোপুরি আলাদা আলাদা হবে। একটা উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে, চুম্বক লোহাকে টানবে, সোনাকে টানতে পারবে না। কারণ চুম্বকের যে ধর্ম, যেটাকে চৌম্বকত্ব বলছি, সেই ধর্ম লোহার মধ্যেও আছে বলে লোহাকে টানে, সোনার ভিতরে নেই তাই সোনাকে টানতে পারে না। কিন্তু একটা চুম্বক পাথর আর সোনা

যদি থাকে, দুটোর প্রপার্টি একটা জায়গায় গিয়ে মেশে। দুটোরই ওজন আছে, চুম্বক পাথর দিয়ে আমি কাউকে মারতে পারি, সোনা দিয়েও আমি কাউকে মারতে পারি।

এবার আচার্য ধীরে ধীরে উপরের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। যেখানে আমিত্বের বোধ আসে, সেখানে এই আমিত্ব বোধ কোথা থেকে আসছে? আমিত্বের বোধ *অহং ব্রহ্মাস্মি* থেকে আসে, শুদ্ধ চৈতন্য থেকে আসছে। যাঁকে বলা হচ্ছে *সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্*, তিনিই হলেন বিষয়ী। বিষয় হল, যেটা তিনটে কালে আবদ্ধ, দেশ, কাল ও বস্তুতে বাঁধা। এই দুটোর যে স্বভাব, আমরা সচরাচর যা জানি, যা আমরা শাস্ত্রে দেখছি, দুটো পুরোপুরি আলাদা। সেইজন্য এদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলিও তফাৎ হবে। তার মানে মানুষ, মানুষ রূপে তার মধ্যে স্থায়ীত্ব থাকবে না, জ্ঞান থাকবে না আর অনন্ত কালের জন্য সে কখনই থাকবে না, মানুষকে মরতেই হবে। *সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্* এই বৈশিষ্ট্য বা ধর্মগুলি একমাত্র ব্রহ্মের। কোন মানুষ কখনই সর্বজ্ঞ হতে পারবে না, সর্বজ্ঞ একমাত্র ঈশ্বর। ঈশ্বরের বা ব্রহ্মের যা যা গুণ আছে তার একটা গুণও মানুষের মধ্যে দেখা যাবে না।

আচার্য বলছেন, ওরা যদি এক না হয়, দুজনের প্রপার্টি যদি এক না হয়, তাহলে দুটো মিলছে কি করে? প্রত্যেক পদেই আমি দেখছি চৈতন্যের সাথে জড়ের মিলন হচ্ছে। আমার বোধ আছে এটা আমার দেহ, দেহটা জড়, শাস্ত্রে বলছে আমি আত্মা, তাহলে আমি আর দেহ কোথাও গিয়ে মিলে যাচ্ছে, তাহলে এই মিলনটা কি করে হচ্ছে? আমাদের সব শাস্ত্রই বলছে আত্মা শুদ্ধ চৈতন্য, জগৎটা জড়, দুটোর স্বভাব পুরোপুরি আলাদা, বিষয় আর বিষয়ী পুরো আলাদা। তাহলে মিশে যাচ্ছে কি করে? এই দুটো কখনই মিলতে পারে না, এদের সবটাই আলাদা, এমন কোন একটা স্বভাব নেই যে দুটোর মধ্যেই পাওয়া যাবে। বলছেন, এটা হল অধ্যাস, অধ্যাস মানে, একটার উপর আরেকটার ভাব চাপিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু ওদের বাস্তব মিলন হয় না। যেমন মরীচিকা, মরুভূমিতে যে মরীচিকা দেখা যায়, সেখানে জলের যে স্বভাব, সেই স্বভাব বালির উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু চাপিয়ে দিলেই মরীচিকাতে জল চলে আসবে না, ওই জলে মরুভূমির একটি বালুকণাও ভিজবে না, এরই শাস্ত্রীয় পরিভাষা হল অধ্যাস, ইংরাজীতে বলে super-imposition। গায়ের জোরে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তাহলে ব্রহ্ম আর জগতে কি হয়? বাস্তবিক কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু ব্রহ্মের প্রপার্টিস জগতের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, আর জগতের প্রপার্টিস গুলি ব্রহ্মের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। এটাই হল অধ্যাস, এটাই মায়া। যার ফলে, আমরা দেহকে মনে করি আমি কত সুন্দর, দেহকে মনে করি আমি সব পারি। আর আত্মা, আসলে যিনি চিন্তন করেন, তিনি মনে করেন আজ আমি কত সুখী, আজ আমি কত দুখী। আত্মা সুখ-দুঃখের পারে, কিন্তু ব্যবহার করে জড়ের মত। আর যে জড় নড়তে পারে না, চলতে পারে ন, চিন্তা করতে পারে না, সে নিজেকে মনে করছে আমি বড় বিজ্ঞানী, আমি বুদ্ধিমান, আমি নেতা, আমি অমুক, আমি তমুক, আমার মত কেউ নেই ইত্যাদি ভেবে যাচ্ছে। স্বরূপতঃ সে একটা জড়, পুতুল, পুতুলে চাবি দেওয়া আছে তাই লাফাচ্ছে। আচার্যরা তপ্ত লোহার উপমা দেন, একটা তপ্ত লোহাকে যদি জলে ফেলে দেওয়া হয়, লোহার তাপটা জল নিয়ে নেয় আর জলের শীতলত্ব লোহায় চলে আসে। তপ্ত লোহা আর জলে সত্যি সত্যিই বদলা বদলি হয়, কিন্তু এই জায়গাতে অধ্যাস হয়। অধ্যাস মানে, বাস্তব কোন সম্পর্ক নেই, কিন্তু মনে হয় যেন এর গুণ ওর উপর, ওর গুণ এর উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। দড়িকে সাপ দেখছি, অর্থাৎ সাপকে দড়ির উপর চাপিয়ে দিচ্ছি, এটাই অধ্যাস। কিন্তু তার আগে আমার সাপের জ্ঞান থাকা চাই, তা নাহলে অধ্যাস হবে না।

কিন্তু কে কাকে চাপিয়ে দিচ্ছে? আমি দড়িতে সাপ দেখছি, নাকি সাপকে দড়ি দেখছি? এমনও তো হতে পারে, জগৎটা সত্য আর ঈশ্বর কল্পনা, আবার এটাও হতে পারে ঈশ্বর সত্য, জগৎ কল্পনা। বেদান্তে একটা মজার গল্প আছে, রজ্জুসর্পভ্রম, দড়িকে সাপ মনে করছ, বুকটা ধক্ ধক্ করছে। একজন প্রশ্ন করল, আচ্ছা, এটা যদি উল্টোটা হয়, সাপকে যদি দড়ি মনে করে, তখন কি রকম হবে? তার মানে, তুমি মনে করছ ব্রহ্মের উপর জগৎকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, যদি উল্টোটা হয়? তখন ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা না হয়ে হয়ে যাবে জগৎ সত্য ব্রহ্ম মিথ্যা। এটাই তো অধ্যাস, এটাই মায়া। মিথ্যা জ্ঞান তো দুদিকেই হতে পারে।

কার উপর কে চাপছে, এবার আচার্য শঙ্কর এই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। আমরা যদি জগৎকে আধার মনে করি আর ব্রহ্মকে জগতের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে? তা তোমরা মনে করতেই পার; কিন্তু তার সাথে এই জিনিসটাকেও তোমাদের মনে রাখতে হবে, যেটা আধার হবে সেটাকে চিরন্তন হতে হবে। তার সাথে তোমরা বিচার করে দেখো –বিষয় বিষয়ীকে শাস্ত্রে যখন ব্যখ্যা করা হচ্ছে, শাস্ত্র মানেই ঋষি বাক্য, ঋষিরা প্রত্যক্ষ করেছেন ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, কিন্তু জগৎকে আধার মনে করলে ব্রহ্ম মিথ্যা হয়ে যাবে কোন সন্দেহ নেই। এর ফলস্বরূপ জগৎটা হয়ে যাবে বাস্তব এবং চিরন্তন, কারণ শাস্ত্রও তাই বলছে –যেটা আধার সেটাই বাস্তব এবং চিরন্তন। জগৎ যদি সত্য ও চিরন্তন হয়, তাহলে জগৎ তিন কালেই থাকবে, গতকাল ছিল, আজ আছে, আগামীকালও থাকবে। তার সাথে দেশ, কাল ও বস্তুতে কখনই পরিচ্ছিন্ন হবে না। কিন্তু বাস্তবে আমরা অন্য রকম দেখছি, জগতে সব কিছুই এর উল্টোটা দেখছি। জগতে যাবতীয় যা কিছু আছে, সব দেশ, কাল ও বস্তুতে আবদ্ধ।

গণিত শাস্ত্রে এটাকে বলা হয় proving by negation। গণিত শাস্ত্রে অনেক থিয়োরাম আছে, যে কোন একটা থিয়োরামকে প্রমাণ করার জন্য তাদের অনেক রকম পদ্ধতি আছে, তার মধ্যে একটা মেথড হল negation। যেটাকে প্রমাণ করতে হবে, ওনারা ওটাকে প্রমাণ না করে, তার উল্টোটাকে দেখাতে যান। উল্টোটাকে দেখতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে এটা সম্ভব নয়। যদি এটা সম্ভব নয়, তাহলে এর উল্টোটা যেটা হবে সেটাই ঠিক, এটাকে এনারা বলেন by negation। এখানেই ঠিক তাই করা হচ্ছে, জগতের উপর ব্রহ্ম যে আরোপ হয়েছে, যদি এটা হয় তাহলে জগৎ হয়ে যাচ্ছে বিষয়ী, ব্রহ্ম হয়ে যাবে বিষয়। বিষয়ী হল শাশ্বত, চিরন্তন, কিন্তু বাস্তবে আমরা এই রকম দেখতে পাচ্ছি না। আমরা দেখছি জগৎ প্রতি মুহুর্তে পাল্টাচ্ছে, তাহলে জগৎ কোন মতেই বিষয়ী হতে পারে না। উপনিষদে বার বার বলা হচ্ছে ব্রহ্ম অনন্ত, যদি অনন্ত হয় তাহলে সে কিন্তু কখনই object of perception হবে না। তার মানে আমরা আমাদের চোখ দিয়ে, কান দিয়ে, স্পর্শ দিয়ে ব্রহ্মকে কক্ষণ সীমাবদ্ধ করতে পারব না, সম্ভবই না।

ব্রহ্মকে বলা হচ্ছে *সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্*, আর তুমি বলছে ব্রহ্ম জগতের উপরে আরোপিত হয়েছে, তার মানে ব্রহ্ম বিষয় হয়ে গেল। বিষয় হয়ে যাওয়ার জন্য, আমরা ব্রহ্মকে এবার জানতে পারব, আমি ব্রহ্মকে চোখ দিয়ে, কান দিয়ে জানতে পারব। কোন জিনিসকে যখন জানা হয় তখন সেই জিনিসটা সীমিত হয়ে গেল, ব্রহ্মও তাই সীমিত হয়ে গেল, অনন্ত আর থাকল না। শাস্ত্র যেখানে বলছে ব্রহ্ম অনন্ত, এখানে তার উল্টোটা হয়ে যাচ্ছে। সেইজন্য ব্রহ্ম কোন মতেই আরোপিত হতে পারে না। আসলে জগৎটাই ব্রহ্মের উপর আরোপিত।

আমরা যে জায়গা থেকে শুরু করেছিলাম সেখানে দু মিনিটের জন্য ফেরত যাচ্ছি। আচার্য শঙ্কর দুটো জিনিসকে আনছেন, আমি আর জগৎ, subject আর object। আমি আছি জগৎ আছে, আমি আমার পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে জগৎকে জানছি। শাস্ত্রে বলছে, জড় ও চৈতন্য এই দুটো সত্য আলাদা, আলাদা হওয়াতে তাদের মধ্যে সমানধর্মী কিছু নেই। যদি সমান না হয়, তাহলে তাদের প্রপার্টিসেও কোন মিল থাকবে না, সমান থাকলেই জুড়ে যাবে। অথচ আমরা দিনরাত দেখছি লেজ জুড়ে আছে। এটা তখনই সম্ভব যখন একটাকে আরেকটার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, যেমন মরীচিকাতে চাপিয়ে দেওয়া হয়।

এখন কাকে কার উপর চাপান হয়েছে? তখন বলছেন, জগৎকে যদি আধার মনে করা হয়, তাহলে জগৎ নিত্য হয়ে যাবে। অন্য দিকে ব্রহ্মকে যদি আরোপিত মনে করা হয়, অর্থাৎ বিষয় হয়, তাহলে আমরা ব্রহ্মকে জানতে পারব। ব্রহ্মকে যদি আমি জানতে পারি, তার মানেই হল সীমিত দিয়ে আমি অসীমকে জানছি। কেনোপনিষদে বলছেন, তিনি চক্ষুরও চক্ষু, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তিনি ইন্দ্রিয়, তিনি প্রাণেরও প্রাণ, সেইজন্য কোন মতেই ওটা হবে না। দ্বিতীয় কথা হল, শাস্ত্রে বলছে, ব্রহ্ম সবারই অন্তর্যামী। তার মানে তুমি যে জিনিসটাকে মনে করছ, আমি জানছি বা যে কোন জিনিসকেই যদি বল, আমি জানছি, তাহলে সেটা হয়ে গেল object, যে জানছে সে হয়ে যাচ্ছে subject। শাস্ত্র বার বার বলছে, আত্মাই সব কিছুকে জানে। যখনই বলছি, এটা আমার দেহ, তার মানে আমি আমার দেহকে জানতে পারলাম, তার মানেই দেহ হয়ে গেল বিষয়। বলছি, আমার মন ভাল নেই, তার মানেই মন হয়ে গেল বিষয়। তিনি মারা গেছেন, বা আমি মারা যাব, ওই আমি যে

দেহত্যাগ করে মরে যাবে, সেটা হয়ে গেল বিষয়। তাহলে আত্মা কোনটা? যে জায়গাতে এই জানার ব্যাপারটা থেমে যায়, অর্থাৎ সেই জায়গাতে গিয়ে মন, বুদ্ধি থেমে যায়। সেটা কিন্তু আলাদা।

যদিও আমি আর এই জগৎ পুরো আলাদা, জ্ঞাতা আর জ্ঞেয় সব দিক দিয়ে আলাদা। অথচ ব্যবহারকালে আমরা সব সময় বলছি, আমি অমুক, এটা আমার। অনবরত আমরা এটাকে মিশিয়ে ফেলছি, এই মিশিয়ে ফেলাটাই অধ্যাস। একদিকে আমি অন্য দিকে জগৎ, জ্ঞাতা আর জ্ঞেয়, এই দুটোর মধ্যে চিরস্থায়ী একটা তফাৎ রয়েছে, কিভাবে তফাৎ রয়েছে এটাকে আচার্য প্রথম থেকে দেখাচ্ছেন, জড় আর চৈতন্যের কখন মিলন হতে পারে না, অথচ মিলন হচ্ছে, এটাই অধ্যাস। ঠিকে এটাকে আধার করে এবার আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের প্রথম সূত্র *অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা* থেকে শুরু করে পর পর ৫৫৫টি সূত্রের ব্যাখ্যা দিতে শুরু করবেন। আচার্যের মূল বক্তব্য হল, এই জগতে ব্রহ্মই সত্য, কিন্তু আমাদের কাছে জগৎ সত্য। ব্রহ্ম শুদ্ধ চৈতন্য, জগৎ জড়, চৈতন্য আর জড়ের মিলন হয় না, তাছাড়া এদের ধর্ম অর্থাৎ এদের যত প্রপার্টিস আছে, তাদের কোন মিল নেই। অথচ দিনরাত আমরা এগুলোকি মিলিয়ে যাচ্ছি। শাস্ত্র মতে আমি হলাম শুদ্ধ আত্মা, অথচ আমি বলছি, আমি ভাল নেই, বা আমি খুব ভাল আছি, কিংবা বলছি এটা আমার বাড়ি। জড়ের সাথে মিশে যাচ্ছে। এই যে মিশে যাচ্ছে, চিজ্জড়গ্রন্থি হয়ে যাচ্ছে, এটা আসলে কখনই হতে পারে না। দুটোর প্রপার্টি এক হলে তবেই তো গ্রন্থি হবে। সেইজন্য বলছেন, এটা অধ্যাস। এর ভাব ওর উপর, ওর ভাব এর উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই হল ব্রহ্মসূত্রের উপর আচার্যে ভাষ্যের ভূমিকা।

বাকিরা আচার্যের এই বক্তব্যকে মানবে না। না মানার জন্য বাকিরা এবার তর্ক করতে শুরু করবে, আচার্যও ওদের যুক্তিকে খণ্ডন করবেন। আমরা এর বেশি আর ভিতরে ঢুকব না, আমাদের আলোচ্য বিষয় ব্রহ্মসূত্র নয়, আলোচ্য বিষয় হল স্বামীজীর দেববাণী। স্বামীজী এবার ব্রহ্মসূত্রের উপর শিষ্যদের সামনে বলতে শুরু করছেন। বেদান্তের যেটা মূল, সেটাকে স্বামীজী ব্যাখ্যা করছেন। ব্রহ্মসূত্র ওঁ তৎসৎ দিয়ে শুরু হয়, স্বামীজীও ওঁ তৎসৎ উচ্চারণ করে শুরু করছেন। স্বামীজী তাঁর নিজস্ব শৈলীতে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, তাই একটু তফাৎ মনে হবে, কিন্তু বক্তব্য একই থাকছে।

বেদান্তসূত্রের উপর স্বামীজীর ব্যাখ্যা

বলছেন, According to Shankara, there are two phases of the universe, one is I and the other thou. (*শঙ্করের মতে জগৎকে দু-ভাগে ভাগ করা যেতে পারে – অস্মদ্ আমি ও যুস্মদ্ তুমি*।) যুস্মদ্ প্রত্যয় ইংরাজীতে অনুবাদ করার সময় স্বামীজী বলছেন thou, কিন্তু আচার্য শঙ্কর ওই যুস্মদ্ দিয়ে জগৎকে বলতে চাইছেন। স্বামী গম্ভীরানন্দজীও ব্রহ্মসূত্রের অনুবাদ করার সময় thou বলছেন। কিন্তু তার সাথে স্বামীজী বলছেন, phase of universe। স্বামীজী এটাকে আলাদা দুটো reality না দিয়ে বলছেন, phase of universe, অস্তিত্বেরই যেন দুটো দিক, একটা হল আমির দিক, বিষয়ী, আরেকটা দিক হল বিষয়। সেই তিনি, যিনি এক, তিনিই যেন দুই হয়েছেন, সেদিক থেকে স্বামীজীর এই approachটা একটু আলাদা। আর বলছেন, and they are as contrary as light and darkness, so it goes without saying that neither can be derived from the other. (*আর আলো ও অন্ধকার যেমন সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ বস্তু, ঐ দুটিও সেরূপ; সুতরাং বলা বাহুল্য, এ দুয়ের কোনটি থেকে অপরটি উৎপন্ন হতে পারে না*।) I আর you, এই দুটোর আলো আর অন্ধকারের মত তফাৎ, যেটা আমরা আগে বললাম, *তমঃ প্রকাশবৎ*। সেইজন্য এটা বলা যাবে না যে, এক অপর থেকে বেরিয়েছে, এটা বলা যাবে না যে, এক অপরের সাথে সম্পর্ক আছে।

বলছেন, On the subject, the object has been superimposed. (*এই আমি বিষয়ীর (subjet) উপর তুমি বা বিষয়ের (object) অধ্যাস হয়েছে।*) আচার্য শঙ্করের মতে বিষয়ীর উপর বিষয়কে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে; thus the subject is the only reality, the other a mere appearance. (*বিষয়ী একমাত্র সত্য বস্তু, অপরটি অর্থাৎ বিষয় আপাতপ্রতীয়মান সত্তামাত্র।*) আচার্য শঙ্কর এটাই বলছেন, ভাব চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আর শুধু তাই না, এই যে বোধ যেটা আসছে, এই বোধটা হল শুধু appearance।

পুরো জিনিসটা মরীচিকার মত, কিছু নেই, কিন্তু দেখাচ্ছে। যার জলের বোধ নেই, সে যখন মরীচিকা দেখবে তখন সে জল না বলে অন্য কিছু বলবে, যেটা সে জানে। তার মানে সেই জিনিসটাকে ওখানে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, ওটা হল appearance, বাস্তবিক কিছু না। আচার্য যেমন যেমন ব্রহ্মসূত্রে এগোবেন তেমন তেমন তিনি দেখাতে থাকবেন যে, যেটাকে যুস্মদ্ প্রত্যয় বলা হচ্ছে, এটা পুরোপুরি অধ্যাস, মায়া, appearance। Apperance বলতে স্বামীজী relative existenceএর কথাই বলতে চাইছেন, যেটা পরে পরে আসবে।

The opposite view is untenable. Matter and the external world are but the soul in a certain state; in reality there is only one. (*ইহার বিরুদ্ধ মত অর্থাৎ বিষয় সত্য ও বিষয়ী মিথ্যা –এ মত কখন প্রমাণ করা যেতে পারে না।*) স্বামীজী opposite tenable যেটা বলছেন, যেটা একটু আগে আমরা ব্যাখ্যা করলাম। জগতের উপর কি ব্রহ্মকে অধ্যাস করা হয়েছে? বলছেন, না তা হয়নি। কারণ তাই যদি করা হয় তাহলে জগৎটা হয়ে যাবে চিরস্থায়ী, আর বাস্তবেও আমরা জানি যে, যিনি জ্ঞাতা তিনি কখনই জ্ঞেয় হতে পারেন না। যেমন আমাদের চোখ জগতের সব কিছুকে দেখতে পারে কিন্তু নিজেকে কোন দিন দেখতে পারবে না। আমি চোখ দিয়ে নিজের ছবি দেখতে পারি, আয়নাতে আমার প্রতিবিম্ব দেখতে পারি, কিন্তু চোখকে কোন দিন দেখতে পারব না। Subject কোন পরিস্থিতিতে নিজের উপর কাজ করতে পারবে না। আত্মা কোন দিন নিজেকে জানতে পারবে না। সেইজন্য আত্মা কোন দিন কাউকে মারতেও পারবে না, এটাকে বলে স্বক্রিয়া অভাব। নিজের উপর ক্রিয়ার অভাব। ডান হাত দিয়ে আমি সমস্ত জগৎকে ধরে নিতে পারি, কিন্তু আমি আমার ডান হাতকে ধরতে পারব না। ঠিক তেমনি, আত্মা কোন পরিস্থিতিতে জ্ঞেয় হবেন না, কারণ তিনিই একমাত্র জ্ঞাতা। কোন দিন আত্মা object হবেন না, আর আসলে কোন দিন তিনি subjectও হন না। কারণ পরে দেখা যাবে object বলে কিছু নেই।

এখানে matter and the external worldকে নিয়ে বলতে গিয়ে স্বামীজীর মূল বক্তব্য হল – বহির্জগৎ যেটা দেখছি, চোখের সামনে যে জগৎকে দেখছি, এটা সেই আত্মাই, কিন্তু অন্য রূপে আমাদের সামনে প্রতীয়মান হয়ে আছে, এর বাস্তবিক কোন অস্তিত্ব নেই। আমরা আগেই ব্যাখ্যা করেছি, অস্তিত্ব কেন নেই। অস্তিত্বের অর্থাৎ সৎএর এখানে তিনটে আলাদা শব্দ বলা হয়, সৎ, অসৎ আর অলীক। অলীক মানে যেটা কোন কালেই নেই, যেমন বন্ধ্যাপুত্র, আকাশকুসুম, এগুলো শব্দ মাত্র, শব্দের খেলা। সৎ হল যেটা তিন কালে তিন অবস্থায় আছে। অসৎ হল মাঝা মাঝারি, আছে কিন্তু দেশ, কাল ও বস্তুর মধ্যে আবদ্ধ। এখন বলছেন, অসতের স্বাভাবিক ভাবেই অস্তিত্ব নেই, কারণ অস্তিত্ব থাকলে সেটা সৎ হয়ে যাবে। এরপরে যদি সেটা অসৎ হয়, temporary existence যদি হয়, তাহলে সেটা এলো কোথা থেকে? যে জিনিসটা নেই, যে জিনিসটা হতে পারে না, সেটা এলো কোথা থেকে? মোদ্দা কথা জগৎটা এলো কোত্থেকে? হয় আমাকে বলতে হবে জগৎ আছে, তা নাহলে বলতে হবে জগৎ নেই। জগৎ যদি না থাকে তাহলে অলীক, কিন্তু জগৎকে আমি দিনরাত সামনে দেখছি, আমি কি করে জগৎকে না করে দেব! তাহলে জগৎ আছে। জগৎ যদি থাকে, তাহলে আমাদের পূর্বপুরুষরা আজকেও বেঁচে থাকতেন, কিন্তু কেউই বেঁচে নেই। তার মানে জগৎ পরিবর্তনশীল, জগৎ পরিবর্তনশীল হয়ে গেলে এই জায়গায় এসে গোলমাল লেগে যাচ্ছে। এটাকেই এবার আচার্য যুক্তি দিয়ে দেখাবেন, আসলে যে জিনিসটা পরিবর্তনশীল, আদপে ওর অস্তিত্বই নেই।

গীতায় বলছেন, *নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যত সতঃ*, সৎ যদি হয় তাহলে ওর কখন অভাব হবে না, আর যার অভাব হচ্ছে আসলে সে কোন দিন ছিল না। তাহলে এটা কি দেখছি? যা কিছু আমরা দেখছি সব আত্মারই এক একটা রূপ, এটাই মায়া। ঠাকুর বলছেন, পদ্মলোচন মুখের উপর একটা বাঘের মুখোশ চাপিয়ে সবাইকে ভয় দেখাচ্ছে আর সবাই ভয়ও পাচ্ছে। হঠাৎ একজন পদ্মলোচনকে চিনে ফেলেছে, বলছে, ওরে এ তো আমাদের পোদো। পোদোও হি হি করে হেসে আরেকজনকে ভয় দেখাতে চলে গেল। তার মানে বাঘের মুখোশ পড়ে আছে, বাঘের মত দেখাচ্ছে এটা সত্য, অথচ এখানে কোন বাঘ নেই। জগৎ দেখাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু আসলে জগৎটা নেই। মাণ্ডুক্যকারিকাতে একটা খুব সুন্দর শ্লোক আছে, যেখানে বলা হচ্ছে, যেটা গতকাল ছিল না, আগামীকাল থাকবে না, সে আজকে কি করে থাকতে পারে?

বর্তমানকালে বিজ্ঞানে একটা খুব সুন্দর শব্দ ব্যবহার করা হয়, counter intutive। আমাদের যে normal understanding, counter inutiveএ তার বিপরীতে চলে যায়। এটাকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনা করে কোয়ান্টাম ফিজিক্স। কোয়ান্টাম ফিজিক্সের যতগুলো সত্য আছে, তার সবটাই counter intutive। থিয়োরী অফ রিলেটিভিটিতে যখন বলে বা আলোর গতিকে নিয়ে আইনস্টাইন যে জিনিসগুলো বার করলেন, তার সবটাই counter intutive। ওটাকে মন মানতে চায় না। ইদানিংকালে বিজ্ঞান যে আমাদের অনেক কিছু দিচ্ছে, সবটাই counter intutive। আচার্য শঙ্কর যে দর্শন দাঁড় করালেন, এই জায়গাতে আমরা যেন ভুল না বুঝি যে, আচার্য শঙ্কর এই দর্শনের প্রণেতা। আচার্য শঙ্করের যিনি গুরু ছিলেন, গোবিন্দপাদ, তাঁরও যিনি গুরু গৌড়পাদ, তিনি অনেক আগে মাণ্ডুক্য উপনিষদের উপর খুব নামকরা একটা কারিকা লিখেছেন, যার নাম মাণ্ডুক্যকারিকা। তারও অনেক আগে ব্যাসদেব বেদান্তকে সূত্রাকারে সংগঠিত করে দিলেন। আর বেদান্ত চলছে বেদের সময় থেকে। তার মানে এই বেদান্ত দর্শন অনাদিকাল থেকে চলে আসছে, এটা নূতন কিছু না। আচার্য শঙ্কর শুধু কি করলেন, বেদান্তের সব কিছুকে একটা জায়গায় সাজিয়ে শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতি দিয়ে দেখাচ্ছেন, এই কথাগুলিই বেদে কিভাবে বলা হয়েছে। আচার্য যুক্তি দিয়ে সব কিছু রাখছেন, আর এটাই অনুভবের বিষয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, পুরো জিনিসটাই counter intutive, আমাদের বিশ্বাস হয় না। একটা জিনিস গতকাল ছিল না, আগামীকাল থাকবে না, মাঝখানে দুম্ করে আজকে কোথা থেকে এসে গেল? তার মানেই সৃষ্টি বলে কিছু নেই, এটাই স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ফিজিক্সে যত সিদ্ধান্ত আছে, সাধারণ বুদ্ধিতে যত সিদ্ধান্ত রয়েছে, সব কটাই contradict করছে। আমাদের কাছে বেদান্তের পুরোটাই অযৌক্তি মনে হয়, অযৌক্তিক আমরা, বেদান্ত নয়।

বেদান্ত খুব সহজ যুক্তির কথা বলছে, যে জিনিসটা গতকাল ছিল না, আগামীকাল থাকবে না, মাঝখানে আজকে কোথা থেকে এসে গেল? আমরা এই কথা খুব সহজ ভাবে এখানে বলছি, কিন্তু উপনিষদের ঋষিরাও বলছেন, এই রকমটাই হয়। কি করে হয়? তখন ওনারা বলবেন, কেন হতে পারবে না, রোজই হচ্ছে। একটা মাটির ঘট তৈরী করা হল, ঘট তৈরী হওয়ার আগে প্রাক অভাব ছিল। অভাব, মানে absence, absenceটা বাস্তব। ঘট তো আগে ছিল না, ঘট যখন হয়ে গেল, প্রাক অভাবটা নাশ হয়ে গেল। দুদিন পরে ঘটটা ভেঙে গেল, ভেঙে যাওয়ার পর প্রধ্বংস অভাব, ধ্বংসের পরে যে অভাব, ওই অভাবটা এবার স্থায়ী হয়ে গেল। তার মানে অভাব আগেও স্থায়ী ছিল, পরেও অভাব স্থায়ী হল, মাঝখানে, অভাবটা থাকছে না। এই জিনিস হতেই পারে। আচার্য শঙ্কর তখন দেখাবেন, আত্মজ্ঞানের সাথে প্রাক অভাব, প্রধ্বংস অভাবের কোন মিল নেই। সেইজন্য অভাবকে জানার একটা পদ্ধতি রূপে নিয়ে আসতে হয়। এগুলো আমাদের কাছে ধারণা করা সত্যিই খুব কঠিন। আমরা মনে করি, আমি সত্য, ঠাকুর সত্য, দুবেলা ঠাকুরের নাম করি, এরপর ধর্মের আর কি আছে! এর বেশি আর কি জানার আছে!

ফরাসী বিপ্লবের ঠিক আগে খুব নামকরা সাহিত্যিক ছিলেন ভল্টায়ার, ওনার কাছে বিদ্যার একটা সাংঘাতিক দাম ছিল। তিনি একটা খুব সন্দর কাহিনী লিখলেন, Learned Brahmin। ফরাসী থেকে একজন ভারতে এসেছে, সে ঘুরতে ঘুরতে এক ব্রাহ্মণের কাছে গেছে। ব্রাহ্মণের প্রচুর পাণ্ডিত্য, গভীর পড়াশোনা, ব্রাহ্মণের সাথে কথা বলে ফরাসী ভদ্রলোক খুব খুশি হয়েছেন। ব্রাহ্মণ তাকে বলছেন, 'ভাই আমার এত পড়াশোনা, এত বিদ্যা কিন্তু আমার মনে শান্তি নেই'। হঠাৎ একদিন ভদ্রলোক দেখেছে, এক বিধবা ওই ব্রাহ্মণ দেবতার বাড়ির সামনে প্রণাম করছে। ভদ্রলোক বিধবা মহিলাকে জিজ্ঞেস করছেন, 'তোমার জীবনে কি শান্তি আছে'? বলছে, 'অশান্তি কি জিনিস আমি জানিই না'। 'আচ্ছা কি করে তুমি শান্তি পেলে'? 'তাতো জানি না, আমি গঙ্গাজল পান করি, তুলসীপাতা খাই আর এই ব্রাহ্মণ দেবতাকে প্রণাম করি, আমার জীবনে কোন অশান্তি নেই'। তখন ভদ্রলোক সেই ব্রাহ্মণকে বলছে, 'তোমার কি মনে হয় না, ওই বিধবা তোমার থেকে অনেক ভাল, তার মধ্যে শান্তি আছে'? তখন ব্রাহ্মণ বলছেন, 'ঠিকই, আমি তাকে হিংসা করি, কিন্তু এই জগতে কোন কিছু নেই যার বদলে আমার জীবনের সাথে ওর জীবনের পাল্টাপাল্টি করব, সে একটা জীবন্ত পাথর। আমি কোন মতেই পাথর হতে চাই না'। যারাই মনে করছে, আমি সত্য, ঠাকুর সত্য, দুবেলা ঠাকুরের নাম করছি আর এর বাইরে ধর্ম বলে কিছু হয় না, বুঝে নিতে হবে এরা এক একটা জীবন্ত পাথর। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় কোন ভাল ভাস্করের হাতে পড়লে ঐ পাথরেরই একটা প্রতিমা তৈরী হয়ে যাবে, সেই মূর্তি

মন্দিরে স্থাপন করে প্রানপ্রতিষ্ঠা করা হবে, তারপর সবাই মন্দিরে সেই প্রতিমার বিগ্রহের পূজা করবে। কিন্তু তার আগে পাথরের উপর অনেক ছেনি চলবে, হাতুড়ি চলবে, অনেক লড়ালড়ি হবে, ধ্বস্তাধ্বস্তি হবে, তবে গিয়ে সেই পাথরের মূর্তি তৈরী হবে।

আমরা হয়ত ঠাকুরের মত হতে পারব না ঠিকই, স্বামীজীর মত হতে পারব না ঠিকই, কিন্তু জ্ঞানরাশির ক্ষেত্রে সবাই সমান, ওই জায়গাতে আমার আর ঠাকুর বা স্বামীজীর কোন তফাৎ থাকবে না। স্বামীজী যেমন লাটু মহারাজের নামে বলছেন, ঠাকুরের কি অদ্ভুত লীলা, আমরা এত পড়াশোনা করে যে জায়গায় পৌঁছেছি, নিরক্ষর লাটু সেখানেই পৌঁছে গেছে। ওই জ্ঞান স্বামীজীরও যা, লাটু মহারাজেরও তাই, আর আমাদের সবাইকে সেটাই করতে হবে, ততক্ষণ আমাদের কারুরই মুক্তি নেই। এবার দেখে নিতে হবে, ঠাকুর কি সাধনা করেছেন, স্বামীজী কি সাধনা করেছেন, আমাদেরও ঠিক সেই জায়গাতে পৌঁছাতে হবে। যতক্ষণ বলছে মা আছেন আর আমি আছি, আমার আর ভাবনা কিসের ভাই, বুঝে নিতে হবে সে পাথর ছাড়া কিছু না। কিন্তু মানুষ কিছুই করতে চায় না, একটা কিছু তাও করছে, এটাই করতে দাও। কিন্তু এটা ঠিক যে, সে একটা জীবন্ত পাথর। অহল্যাও পাথর হয়ে পড়েছিলেন, আমরাও মনে করছি, পাথর হয়ে থাকলে ক্ষতি কি, একদিন না একদিন রামচন্দ্র আসবেন। কিন্তু ভুলে যাচ্ছি যে, অহল্যা গৌতম মুনির স্ত্রী ছিলেন, তাঁর প্রচণ্ড সাধন ভজন ছিল। ঠাকুরের নাম নিলে মুক্তি হবে যদি এই আশা করি থাকি, তাহলে সেই রকম মুক্তিই হবে, যোনি মুক্তি হবে। এই রকম না হয়ে একটু ভাল ঘরে জন্ম হবে। আমরা মনে করছি বেদান্তের কচকচানির কোন দরকার নেই, ঠাকুরের নাম কর তাতেই হবে। মাস্টারমশাই বলছেন, ঠাকুর কটা মাছকে তেলে ভাজছেন, কটা মাছ আলাদা রাখা আছে ভাজার জন্য। বেদান্তের কচকচানিতে সবাইকে ভাজা হতে হবে, আমাকেও ভাজা হবে, তোমাকেও ভাজা হবে, শুধু সময়ের একটু তফাৎ। যুস্মদ্ অস্মদ্ প্রত্যয় বিষয় বিষয়ী এই পথ দিয়ে সবাইকে যেতে হবে, আর বিরুদ্ধ স্বভাব এই বোধ, এই জ্ঞান সবাইকেই শেষ পর্যন্ত লাভ করতে হবে। যতক্ষণ না করা হবে, আচার্য শঙ্কর বলছেন, *পুনরপি জননং পুনরপি মরণং, পুনরপি জননী জঠরে শয়নম্*, ততক্ষণ এই জন্মমৃত্যুর চক্র আমাদের চলতেই থাকবে।

আচার্য শঙ্কর যেটাকে মায়া বলছেন, অজ্ঞান বলছেন, সেটাকেই স্বামীজী বলছেন, জগৎ যা আছে আর তিনি যা আছেন, এটা আত্মারই দুটি রূপ, এর উপর আমরা বিস্তারিত আলোচনা করে এসেছি। তাহলে স্বামীজীর মতে আচার্য শঙ্কর কি ভুল? না, ভুল বলছেন না, এবার স্বামীজী এটাকে ধীরে ধীরে পরিষ্কার করছেন। বলছেন, All our world comes from truth, and untruth coupled together, (*আমাদের অনুভূত এই জগৎ সত্য ও মিথ্যার মিশ্রণে উৎপন্ন।*) আমরা যে জগৎকে দেখছি, এই জগৎ সত্য আর অজ্ঞান, এই দুটো যেন মিশে আমাদের কাছে আসছে। Samsara (life) is result of the contradictory forces acting upon us, like the diagonal motion of a ball in a parallelogram of forces. (*যেমন বল-সামান্তরিকে দুই বিভিন্নমুখী বলপ্রয়োগের ফলে একটি বস্তুকে কর্ণাভিমুখী গতির উৎপত্তি হয়, সেরূপ এই সংসারও আমাদের উপর প্রযুক্ত বিভিন্ন বিক্ষুব্ধ শক্তিসমূহের ফলস্বরূপ।*) ফিজিক্সে বলা হয়, একটা বলকে যদি দুদিক থেকেই ঠেলা হয়, এদিক থেকে ঠেললে বলটা সোজা যেদিক থেকে ঠেলা হচ্ছে তার বিপরীত দিকে যাবে, আর অন্য দিক থেকে যদি ঠেলা হয় তাহলে ওই দিকে যাবে। কিন্তু একসাথে যদি দুটো শক্তি বলের পিছনে লাগিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে বলটা diagonally যাবে। Law of parallelogram of forcesএ বলছে, একটা বলের উপর যখন দুদিক থেকে ফোর্স যায়, এর খুব সাধারণ উপমা হল, একটা বলকে ছুড়ে দেওয়া হল, কিছুক্ষণ পরে বলটা মাটিতে নেমে আসবে, কারণ মাধ্যাকর্ষণ তাকে নীচে টেনে নিচ্ছে।

Law of parallelogram of forceএর আরেকটা নাম resultant force। দুটো তিনটে পাঁচটা ফোর্স যখন একসাথে চলে, তখন সব ফোর্সকে হিসাব করে যে তার একটা নিজস্ব ফোর্স হবে, সেটাকেই বলছেন resultant force। সচরাচর আমরা সংসার আর জগৎ এই দুটো শব্দকে এক অপরের সাথে পাল্টে দিই। কিন্তু স্বামীজীর বক্তব্য হল, জগৎ ও সংসার দুটো পুরোপুরি আলাদা। স্বামীজী এই উপমা দিয়ে এটাই দেখাতে চাইছেন, আমাদের সামনে যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জগৎ রূপে আছে, যে জগৎকে আমরা দেখছি, এই জগতের

মধ্যে যে সত্য, আর এর মধ্যে যে অজ্ঞানের মাত্রা, এই দুটো জগৎকে ঠেলে ঠেলে যেখানে পৌঁছে দেয়, সেটাই হয়ে যায় সংসার। আমরা হামেশাই বলি, এই জগতে ভাল কিছু নেই, আবার বলি এই সংসারে ভাল কিছু নেই। স্বামীজী এখানে দুটো আলাদা করে দেখাচ্ছেন, আর সত্যিকারের আলাদা। সংসার হল, আমাদের ভিতরে যখন আমিত্বটা আসে তখন আমরা জিনিসটাকে যেভাবে নিয়ে থাকি। তার মানে এই যে জগৎ যেটা রয়েছে, তার ভিতরে সত্যের শক্তি, সত্য মানে ঈশ্বরের যে শক্তি রয়েছে, আর অন্য দিকে অজ্ঞানের যে শক্তি আছে, এই দুটি শক্তি জগৎকে ঠেলছে, ঠেলার পর resultant forceএর মাধ্যমে যে জিনিসটা আমাদের কাছে আসছে, সেটাকেই স্বামীজী বলছেন সংসার।

তাহলে সংসার কি? যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বা জগৎ আমাদের সামনে রয়েছে, আমরা এটাকে যেভাবে দেখছি। জগৎটা কি? যেমন আছে। আর সংসার কি? জগৎকে আমরা যেমনটি দেখছি, সেটাই সংসার। এই পেন আছে, পেন জগতেরই অংশ, আমরা পেন দেখছি। কিন্তু কখনই আমরা পেন দেখি না। প্রথম কথা হল, এই পেনের পিছনে আরও কয়েকটা সত্তা রয়েছে। যেমন এটা একটা প্লাস্টিক বডি, এটা একটা বস্তু, এটা একটা এনার্জির ঘনিভূত রূপ। এগুলোকে ছেড়ে দিয়ে শুধু যদি পেনের উপরেই আসা হয়, ততক্ষণে পেনের উপর যত বিশেষণ থাকতে পারে সব নেমে আসবে। এটা আমার পেন, এটা তোমার পেন, এটা ভাল পেন, এটা দামী পেন, এটা মন্দ পেন, এটা সস্তার পেন, এটা সবুজ পেন, এটা কালো পেন। আমাদের যত রকমের ভাব থাকতে পারে, যেমন এই পেন আমাকে আমার মামা দিয়েছিলেন, এই পেন দিয়ে মামা অনেক সাহিত্য রচনা করেছেন, আমার কাছে এই পেনের সাংঘাতিক দাম। যাকে আমরা ভালবাসি, সে কিছু দিলে আমরা যত্ন করে সামলে রেখে দিই। আগামীকাল তার সাথে ঝগড়া হয়ে গেলে, তার দেওয়া সব জিনিস বাইরে ডাস্টবিনের ফেলে দিয়ে আসব। তার মানে জগৎকে আমরা কখনই জগৎ রূপে দেখি না, কেউই দেখে না। জগৎকে জগৎ রূপে দেখা যায় না, সম্ভব না। অবতারও যখন আসেন, তিনিও পারেন না, যদিও অবতারের পছন্দ অপছন্দের তালিকাটা ছোট থাকে, কিন্তু একটু থাকবে।

স্বামীজী এটাই বলছেন, The world is God and is real, but that is not the world we see; just as we see silver in the mother-of-pearl where it is not. (*এই জগৎ ব্রহ্মস্বরূপ ও সত্য; কিন্তু আমরা জগৎকে সেভাবে দেখছি না; যেমন শুক্তিতে রজত-ভ্রম হয়, তেমনি আমাদেরও ব্রহ্মে জগৎ-ভ্রম হয়েছে।*) শুক্তিতে আমাদের রজত ভ্রম হচ্ছে, রাতের অন্ধকারে দড়িকে সাপ মনে করছি, এই ধরণের কত কি দিনরাত আমাদের অধ্যাস হয়। বলে যে, মানুষ প্রেমে পড়লে চাঁদে নিজের প্রেমিকার মুখ দেখতে পায়, আর অভুক্ত মানুষ চাঁদকে ঝলসানো রুটি দেখে। এটাই অধ্যাস, এটাই অজ্ঞান, অজ্ঞান বলতে সাধারণ ভাবে মনে করি জিনিসটাকে না জানা। কিন্তু এখানে তো তা হচ্ছে না। মন আমাদের নিজের জগতে নিজেকে নিয়ে এমন মশগুল হয়ে বসে আছে যে, যে চাঁদ একটা পৃথিবীর উপগ্রহ, সূর্যের কিরণ প্রতিফলিত হওয়ার জন্য যাকে উজ্জ্বল দেখাচ্ছে, তাকে কেউ মনে করছে প্রেয়সীর মুখ, কেউ মনে করছে ঝলসানো রুটি। স্বামীজী বলছেন, জগৎ ঈশ্বরেরই অভিব্যক্তি, কিন্তু আমরা যেটাকে দেখছি সেটা নয়। আমরা যেটাকে দেখি, যেখানে অধ্যাস হয়ে যায়, শুক্তিতে রজত ভ্রম যেখানে হয়ে যায়, এই উপমাগুলো দেওয়া হচ্ছে বোঝানর জন্য, ভাই দেখ, এই ভুল বোঝাবুঝিটা সবারই হয়। কারুর ওই জায়গাতে হয়, কারুই এই জায়গায় হয়, হয় সবারই। আর এই জগতের ব্যাপারে একটা সমষ্টি অজ্ঞান রয়েছে। যেটার জন্য, সমাধিবান পুরুষ ছাড়া, জ্ঞানী পুরুষ ছাড়া, সবাই জগৎ যেমন তেমনটি না দেখে জগৎকে সংসার রূপে দেখে, যেমন যে দেখতে চায় সে তেমনটাই জগৎকে দেখে।

This is what is known as Adhyasa or superimposition. (*একেই বলে অধ্যাস।*) এর আগে ব্রহ্মসূত্রের উপর আমরা দীর্ঘ আলোচনা করেছিলাম, আগে যদি আলোচনা করা না থাকত যে আচার্য শঙ্কর অধ্যাস বলতে কি বোঝাতে চাইছেন, এই জায়গায় এসে পরিষ্কার হত না। অধ্যাস মানে একটা জিনিসকে ভুল জানা, রজ্জুতে সর্পের ভ্রম, মরীচিকায় বালিতে জলের ভ্রম, এই ভ্রম যেটা হয়, কোথাও না কোথাও, কোন না কোন ভাবে সবাইকে এই ভ্রমে পড়তে হয়, কেউই এই জগতে নেই যার এই ধরণের ভ্রম হয় না। মুখে আমরা বলে যাচ্ছি, সবাইকে একদিন মরতে হবে, কিন্তু কোথাও না কোথাও আমাদের সবারই

ভিতরে এই ভাব যে আমি মরব না, আর সেইভাবেই আমাদের ক্রিয়াকলাপ চলতে থাকে। এই জিনিসগুলো সব থেকে বেশি দেখা যায় ভালবাসাতে। ভালবাসায় মানুষ এমন অন্ধ হয়ে যায় যে, যাকে ভালবাসি, সে যদি অত্যাচার করে, তবুও মনে করি এটাই শেষ, আর ও আমার উপর অত্যাচার করবে না। অথচ এটাই গোল্ডেন রুল যে, যে লোকটি একবার লক্ষ্মণ রেখা পেরিয়েছে, একবার গোলমাল করেছে, দ্বিতীয়বার সে করবেই করবে, এই ব্যাপারে নিশ্চিত থাকা যায়। কিন্তু আমরা মহা-অন্ধ, ধৃতরাষ্ট্রের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছি। ছেলে বাঁদরামো করে, ছেলে মাকে ঠকায়, ঠকিয়ে ঠকিয়ে আবার সে মায়ের কাছে ফিরে আসে আর বলে, মা তুমি ঠিকই বলেছিলে, আমি কত ভুল করি, আর ভুল করব না। মাও ছেলের কথায় কত খুশি হয়ে যায়। পরের দিনই দেখা যায় যে আবার মাকে ঠকিয়ে কিছু আদায় করার চেষ্টা করতে নেমে গেছে। কিছুক্ষণের জন্য যে মন একটু অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে, এটাই মায়া, এটাই অধ্যাস। আমাদের যে সাধনা হয়, সাধনা মানেই জিনিসটা যেমন, তেমন ভাবে দেখা, সিদ্ধিও তাই হয়। কিন্তু এই জগতে আমরা যতক্ষণ আছি, ততক্ষণ আমাদের প্রিয়-অপ্রিয়, মিত্র-শত্রু থাকবেই। কিন্তু তীব্রতাটা কমে যায়, আপনজনের সংখ্যাটাও কমে যায়, সবাই তার আপনজন হয়ে যায়। ঝগড়া-ঝাঁটি যাদের সাথে করবে তাদের সংখ্যাটাও কমে যায়।

স্বামীজী অধ্যাসকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন, that is, a relative existence dependent upon a real one. (*যে সত্তা একটা সত্য বস্তুর অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে তাকেই অধ্যস্ত সত্তা বলে।*) আসল জিনিসটার উপরে আমরা যখন একটা relative existenceকে সামনে রেখে দিই, এটাই superimposition বা অধ্যাস। অধ্যাস মানে যে পুরো জিনিসটাই মিথ্যা তা নয়। মা যখন নিজের ছেলেকে ভালবাসছে, সে যে আশা করছে, আমার ছেলে যে বদমাইশি করছে, অত্যাচার করছে, এখন করছে ঠিকই, কিন্তু এরপর এসব করা বন্ধ করে দিয়ে একজন ভাল মানুষ হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। তার মানে ভাল গুণ, এটা বাস্তব, আর সেখানে যে বদগুণ সেটাও বাস্তব, ছেলের মধ্যে বদগুণ আছে, মা সেখানে ছেলের উপর ভাল গুণের superimpose করছে, আর ভাবছে যে আমার ছেলে ভাল হয়ে গেছে। ছেলে যে একটুও পাল্টায়নি এটাকে মা কিছুতেই দেখতে চাইছে না, মানতে পারছে না।

স্বামীজী বলছেন, as when we recall a scene we have seen; for the time it exists for us, but that existence is not real. (*যেমন পূর্বে যে দৃশ্য দেখেছি, এখন তার স্মরণ হল। সেই সময়ের জন্য সেটা সত্য বলে বোধ হয় বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সত্য নয়।*) আগে একটা দৃশ্য আমি দেখেছি, বেলুড় মঠে এসেছি, শ্রদ্ধার সাথে ঠাকুরের বিগ্রহ দর্শন করেছি, দেখে মন প্রাণ জুড়িয়ে গেল। অনেক দিন পর আমি একা ঘরে বসে আছি, হঠাৎ তখন বেলুড় মঠের ওই দৃশ্যটা আমার মনের মধ্যে ভেসে উঠল। দৃশ্যটা কি ভুল? কি করে ভুল হতে পারে, আমি তো দেখেছি, আমি সেই দৃশ্যকে আবার নিয়ে এসেছি। কিন্তু ওই দৃশ্যের অস্তিত্ব এখন একেবারেই অস্থায়ী। যখন আমি বেলুড়ে ঠাকুরের বিগ্রহের সামনে ছিলাম, তখন অনিত্য জগতে যতটুকু স্থায়ী হতে পারে ততটুকু স্থায়ী ভাবেই ছিল। এখানে আমরা মুখোমুখি সবাই বসে আছি, আমরা সবাইকে এখানে প্রত্যক্ষ দেখছি, এটাকে নিয়ে কোন প্রশ্ন করা যাবে না। এই দৃশ্যকেই যখন আমি স্বপ্নে দেখছি, বা দৃশ্যটাকে আমি মনে করার চেষ্টা করছি, তখন এটাই relative existence হয়ে যাচ্ছে। কারণ, তখন সেই দৃশ্য আমিই শুধু দেখতে পাচ্ছি, অন্যরা কেউ দেখতে পাচ্ছে না। দ্বিতীয়ত, আমার কাছেও এই দৃশ্যটা পাল্টে যাবে, কিছুক্ষণ পরে এই দৃশ্যটা থাকবে না, ওই দৃশ্য পাল্টে অন্য কোন দৃশ্য চলে আসবে। এর আগে আমরা যে আচার্য শঙ্করের অধ্যাসের উপর ভাষ্য নিয়ে আলোচনা করছিলাম, তাতে তিনি এই রকম পর পর অনেক দৃষ্টান্ত নিয়ে আসছেন। এনে বলছেন, এই মিথ্যা জ্ঞানের আভাস, যেটাকে আমরা অজ্ঞান বলছি, এটা সবারই আছে। কি ভাবে আছে? রজ্জুসর্প ভ্রম রূপে আছে, কোন একটা স্মৃতি রূপে আছে, স্বপ্ন রূপে আছে ইত্যাদি বিভিন্ন দৃষ্টান্ত এনে বোঝাচ্ছেন যে এই অধ্যাস জিনিসটা কি। অধ্যাস জিনিসটাকে প্রমাণিত করার দরকার নেই, এই মিথ্যা জ্ঞানের আভাস সবারই ভিতরে রয়েছে, এটা statement of fact। এটা এমন একটা বাস্তব, যার ব্যাখ্যার কোন দরকার নেই।

স্বামীজী বলছেন, Or some say, it is as when we imagine heat in water, which does not belong to it. (*অথচ অধ্যাসের দৃষ্টান্ত অপরে এইরূপ দেন –উষ্ণতা জলের ধর্ম বা গুণ নয়;*

অথবা আমরা জলে উষ্ণতা কল্পনা করে থাকি।) এখানে স্বামীজী আরেকটা উপমা দিচ্ছেন, যখন একটা পাত্রে জল গরম করা হয়, জল গরম হয়ে গেলে বলি, জল গরম হয়ে গেছে। জল কিন্তু শীতলধর্মী, জল কখন গরম হয় না, অন্য জায়গা থেকে তাপ এসে জলকে গরম করে দিয়েছে। আগুনেই তাপ থাকে, জলে তাপ থাকে না। কোথাও মিলে মিশে এক অপরের ধর্ম নিয়ে নেয়, তাতে আমাদের মনে হয় জলটা গরম। বলছেন, so really it is something which has been put where it does not belong, 'taking the thing for what it is not'. (*সুতরাং অধ্যাস মানে 'অ-তস্মিন্ তদ্‌বুদ্ধি' –যে বস্তু যা নয়, তাতে সেই বুদ্ধি করা।*) তাহলে অধ্যাস কি? একটা সত্তা, যেটা যেখানে থাকার কথা নয়, সেখানে এসে চেপে গেছে। মরুভূমিতে জল থাকার কথা নয়, কিন্তু আমাদের মন কল্পনা করে নেয়, আর বালির উপর জলকে চাপিয়ে দেয়। ওই জল ওখানে থাকার কথা নয়, কিন্তু দেখছি আছে, এটাই অধ্যাস। তার মানে বস্তু আছে ঠিকই, কিন্তু যে জায়গায় থাকার কথা নয়, সেই জায়গায় আছে, তার মানেই হল, ওর অস্তিত্ব আছে, আবার অস্তিত্ব নেই। সেইজন্য আলাদা আলাদা উপমা দিচ্ছেন, রজ্জুসর্প ভ্রম, জলের উষ্ণতা, স্মৃতির মন্থন বা মরীচিকা, এই ধরণের যত উপমা হতে পারে, সব উপমা দিয়ে দেখাচ্ছেন, আমরা দেখছি জিনিসটা এই, আসলে জিনিসটা তা নয়। কারণ এটা তার ধর্ম নয়।

We see the reality, but distorted by the medium through which we see it. (*আমরা যখন জগৎকে দেখছি তখন আমরা সত্যকেই দর্শন করছি, কিন্তু যে মাধ্যমের ভিতর দিয়ে দেখেছি, তার দ্বারা সত্য বিকৃতভাবাপন্ন হয়ে দেখা যাচ্ছে।*) এর আগে স্বামীজী বলছেন, জিনিসটা যেটা নয় আমরা সেটাকে সেই ভাবেই নিয়ে নিই। আমরা অনেক সময় বলি, 'আরে তুই ওই লোকটার কাছে সাহায্যের জন্য যাচ্ছিস, ওই লোকটা তো জীবনে কাউকে সাহায্য করেনি, চিরদিন সবাইকে চুষেই এসেছে'। 'কিন্তু ওতো আমাকে কথা দিয়েছে'। যে জিনিস, যে বস্তু বা যে লোক, যেটা হবার কথা নয়, কিন্তু মনে হচ্ছে সে ওই রকম। জল কখনই উষ্ণ হবে না, জলের মধ্যে উষ্ণতার ভাবকে আরোপ করে দেওয়া হচ্ছে। একটা দুষ্ট লোকের মধ্যে ভাল গুণের আরোপ করে দেওয়া হচ্ছে। রাবণ সীতাকে অপহরণ করার সময় সাধুর বেশে সীতার সামনে এসেছে। রাবণের মধ্যে সাধুর ভাব থাকার কথা নয়, রাবণের উপর সাধুর ভাব আরোপ করে দেওয়া হয়েছে, এটাই অধ্যারোপ। স্বামীজী বলছেন, জিনিসটাকে যখন দেখছি তখন পর্যন্ত ঠিক আছে, কিন্তু মাঝখানে যদি একটা রঙিন কাঁচ থাকে তাহলে জিনিসটার আসল রূপটা পাল্টে যাবে। ঠিক তেমনি আমাদের মনের মধ্যে যখন কিছু আসে তখন মন যে রঙে রাঙিয়ে আছে, যে ভাবে মজে আছে, ঐ রঙ বা ভাব বস্তুকে পাল্টে দেয়।

এরপর স্বামীজী এই অধ্যাস, যেখানে আমরা জিনিসটাকে ভুল ভাবে জানি, এই জিনিসটাকে এবার আত্মজ্ঞানের উপর নিয়ে আসছেন, নিজেকে জানা নিয়ে। আচার্য শঙ্করও ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যের প্রথম দিকে ব্যখ্যা করছেন অধ্যাস জিনিসটা, ভ্রান্তি, ভুল জ্ঞান। সেখান থেকে তিনি নিয়ে আসছেন, যখন এটা নিজের উপর, আত্মার উপর আসে, তখন আমরা আত্মাকে কিভাবে ভুল ভাবে জানি। যার জন্য আমরা বলছি, আমি দেহ, আমি মন, আমি সুখী, আমি দুখী, এই জ্ঞানগুলি সব ভুল জ্ঞান। এই অধ্যাস এই কারণেই হয় যে, এর সবার পিছনে আত্মা আছেন। এটাকেই স্বামীজী এবার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রথমে বলছেন, You can never know yourself except as objectified. (*তুমি নিজেকে বাইরে বিষয়রূপে প্রক্ষেপ না করে কখনও নিজেকে জানতে পার না।*) জানা জিনিসটাকে আমরা যে অর্থে সচরাচর বলে থাকি, তাতে আমাকে থাকতে হবে, এবং বস্তুকে বাইরে থাকতে হবে, আচার্য শঙ্কর বলেছিলেন যেটাকে যুস্মদ্ অস্মদ্ প্রত্যয়। আমি আছি আর বস্তু আছে, এই যে বোধ আর মাঝখানে জানার যে ক্রিয়া – কোন কিছুকে জানার জন্য এই তিনটে জিনিস লাগবে। যে কোন বস্তুকে যদি জানতে হয়, তাহলে কিন্তু ওটাকে objectified না করলে আমরা জানতে পারব না। অর্থাৎ বস্তু রূপে ওটা যতক্ষণ আমার সামনে না আসছে, আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। ঠিক এই একটি কারণে ঈশ্বরকে কোন দিন জানা যায় না। ঈশ্বরকে কেউ কোন দিন জানতে পারবে না, কারণ আমাদের মন শুধু বহির্জগতকেই জানতে পারে। বহির্জগতকে জানা মানে, সেখানে একটা বস্তুকে থাকতে হবে, আমাকে থাকতে হবে আর জানার ক্রিয়া থাকবে, তবেই আমি জানতে পারব। ঈশ্বরকে যদি জানতে হয়, তাহলে ঈশ্বরকেও বস্তু রূপে আসতে হবে। কিন্তু ঈশ্বর বস্তু রূপে কখনই আসতে পারেন না, এই কারণে ঈশ্বরকে কোন

দিন জানা যাবে না, ঈশ্বরকে কোন দিন দর্শন করা যাবে না। কারণ আমরা একমাত্র বাইরের বস্তুকেই জানতে পারি, বাইরের বস্তুকে বোধ করতে পারি। ঈশ্বরকে সেইজন্য বোধে বোধ করা হয়। ঈশ্বরকে তাই বলছেন, শুদ্ধ বুদ্ধি, শুদ্ধ মন আর শুদ্ধ আত্মা। স্বামীজী এটাও বলছেন যে, এমনকি নিজেকে যদি জানতে হয় তাহলেও কিন্তু আমাকে নিজেকে object বানাতে হয়। এর উপর আমরা পরে আলোচনা করব, কিন্তু তার আগে বিষয় থেকে সরে গিয়ে অন্য একটা বিষয়কে নিয়ে আলোচনা করছি, যেটা এই প্রাসঙ্গিকতায় আমাদের খুব জানা দরকার।

মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে খুব ভাল ভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, কোন মানুষ নিজেকে কখনই অপরের থেকে ভাল ভাবে জানে না। আমার আশেপাশে যারা আছে তারাই আমাকে বেশি ভাল ভাবে জানে। আমরা অনেক সময় রেগেমেগে বলি, তুমি আমাকে আমার থেকে বেশি জান! কিন্তু সারা জগৎ আমাকে আমার থেকে বেশি ভাল জানে। কেউ আমার ব্যাপারে কোন নেগেটিভ কথা বললে আমরা দুঃখ প্রকাশ করে বলি, 'তুমি আমাকে আমার থেকে বেশি বুঝেছ'। 'হ্যাঁ, আমি তোমাকে তোমার থেকে বেশি বুঝেছি'। কারণ মানুষ যখন নিজেকে বিচার করে, যখন নিজেকে মাপে, তখন সে ঠিক একই নিয়মে মাপে যে নিয়মে সে জগৎকে মাপে। নিজেকেও যখন বিচার করে তখন সে একই নিয়মে বিচার করে, যে নিয়মে জগৎকে বিচার করে। তার মানে আমি যখন তোমাকে যেভাবে বিচার করছি, সেই ভাবে আমি কিন্তু নিজেকেও বিচার করছি। তোমাকে বিচার করার সময় কিভাবে করি? তোমার কথা দিয়ে, তোমার কিছু ক্রিয়াকলাপ দিয়ে, কিন্তু তার সাথে আরও অনেক কিছু জিনিসকে আমি মাপি, কথা বলার সময় তোমার চোখ কেমন করছে, কথা বলতে গিয়ে তোমার ঘাম বেরোচ্ছে কিনা, তোমার মুখে বিরক্তির ভাব প্রকাশ পাচ্ছে কিনা। কিন্তু যখন আমি নিজেকে বিচার করি তখন শুধু কথা আর ক্রিয়াকে দিয়ে মাপি, কিন্তু তার সাথে যে আমার মুখের অভিব্যক্তি, শারীরিক লক্ষণগুলিকে তো দেখতে পাচ্ছি না, এগুলোকে জগৎ কিন্তু দেখতে পাচ্ছে। মনস্তত্ত্বে তাই এটা শতকরা একশ ভাগ প্রমাণিত যে, কোন ব্যক্তি কখনই কোন দিন নিজের সুবিচারক হতে পারবে না, তাই কোন মানুষ নিজেকে ঠিক ভাবে জানতে পারে না। যদি কেউ নিজেকে জানতে চায়, সে কেমন মানুষ, তাহলে কিন্তু তাকে তার বন্ধুর কাছে, নিজের শত্রুর কাছে গিয়ে নিজের খবর নিতে হবে যে, তারা তার ব্যাপারে কি ভাবছে। ঠাকুর জানতেন তিনি ভগবান, তিনি অবতার, তাও তিনি বলছেন, আমাকে তোমার কিরূপ বোধ হয়। কথাটা অন্য প্রসঙ্গে ঠিকই, কিন্তু আইডিয়াটা এক। কেউ আমাদের অন্য রকম কথা বললে আমরা অনেক সময় অসন্তুষ্ট হয়ে যাই, ঠিক করে নিই যে ওর সাথে আর কথা বলব না। কিন্তু তখন আমরা ভুলে যাচ্ছি যে, সেই লোকটা আমাকে আমার থেকে ভাল বিচার করবে। কবীর দাসের একটা খুব সুন্দর গান আছে, গানের অর্থটা হল, যারা তোমার নিন্দুক তাকে কাছে রাখ, তোমার বাড়ির উঠানে তার জন্য একটা কুঠিয়া বানিয়ে দাও, কারণ নিন্দুকরাই তোমাকে ঠিক রাখবে। এখন একশ জন যদি আমাকে ভাল বলে আর একজনও যদি আমাকে খারাপ বলে, আমি কোন মতেই তার কথাকে উড়িয়ে দিতে পারি না। এটা মনস্তত্ত্বের একটা দিক। স্বামীজী বলছেন, জগতের যে কোন জিনিসকে আমরা জানতে পারি, ঠিক তেমনি নিজেকেও যদি জানতে হয়, আমাকে নিজেকে objectify করতে হবে, আমাকে নিজের জ্ঞানের বস্তু বানিয়ে সামনে নিয়ে আসতে হবে, তবেই আমি নিজেকে জানতে পারব। সেখান থেকে এবার স্বামীজী বলছেন।

When we mistake one thing for another, we always take the thing before us as the real, never the unseen; thus we mistake the object for the subject. (*ভ্রান্তির অবস্থায় আমাদের সামনের বস্তুগুলোকেই আমরা সত্য বলে মনে করি, অদৃষ্ট বস্তুকে আমাদের সত্য বলে বোধ হয় না। এইরূপে আমরা বিষয়কে বিষয়ী বলে ভুল করে থাকে।*) আমাদের চোখের সামনে যে জিনিসটা আসছে সেই জিনিসটাকেই আমরা নিই, চোখের সামনে যে জিনিসগুলো নেই সেই জিনিসগুলোকে আমরা নিই না। আমাদের মস্তিষ্ক এভাবেই কাজ করে, যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রমের কথা বলা হল বা জলের উষ্ণতার কথা বলা হল। চোখের সামনে দেখছি জলটা গরম, জলে হাত দেওয়া যাচ্ছে না, আর তুমি বলছ জল শীতলধর্মী, তোমার কথা কি শুনব! ঠিক বলছ, জল উষ্ণ তুমি চোখের সামনে দেখছ, কিন্তু তার পিছনে যেটা রয়েছে, যার জন্য জলটা গরম হয়েছে, সেই আগুনের কথাটা ভাববে না! ঠাকুর বলছেন, বাচ্চারা বলে আলু পটল লাফাচ্ছে, কিন্তু জানে না যে, নীচে আগুন আছে বলে লাফাচ্ছে। দৃশ্যমান জগৎটা আমাদের কাছে সত্য, কিন্তু জগতের পিছনে যে আরেকটা জগৎ শক্তি দিচ্ছে, কাজ করছে, সেই জগৎকে আমরা দেখতে পাই না। সেইজন্যই

আমাদের এই ভ্রান্তিগুলি হয়ে যায়। আর তার ফলে object subject মিশে যায়, স্বামীজী আচার্য শঙ্কর থেকেই বলছেন। Subjectএর উপরে objectএর ভাব আর objectএর উপর subjectএর ভাব চেপে যায়, আগে এর উপর আমরা আলোচনা করেছি। আমাদের মনকে মনে করছি এই মনটাই আমি, আর আমার যেটা প্রকৃত আমি, তাকে মনে করি ওটা আমার, কিন্তু জিনিসটা পুরো উলটো। আত্মা আসলে subject, কিন্তু আমরা তাকে ভুলে মনে করি object। মন হল একটা object, যার পিছনে আত্মা রয়েছেন, কিন্তু আমরা মনকেই subject মনে করছি। আমাদের চোখের সামনে ইন্দ্রিয় রয়েছে, জগৎ রয়েছে, আমাদের চোখের সামনে আমাদের মন রয়েছে, সব তাই মিলেমিশে যায়, সেইজন্য আমাদের মনে হয়, আমি করছি, যা কিছু আমি করছি জগতের উপরে করছি। কিন্তু সব কিছুর পিছনে যে চৈতন্য সত্তা আছেন, সেটাকে বোধ করতে পারছি না বলে আমরা আত্মাকে জানতে পারছি না। এই কথা বলার পর এবার স্বামীজী মূল কথা বলছেন।

The Atman never becomes the object. (*আত্মা কিন্তু কখনই বিষয় হন না।*) আত্মা কখনই বস্তু নন। এই পয়েন্টগুলি যদি আমাদের বুঝতে হয়, তাহলে আমাদের আগের আলোচনায় ফিরে যেতে হবে। শাস্ত্রে আত্মার ব্যাপারে যা যা বলছে, আচার্য শঙ্কর যেটাকে যুক্তি দিয়ে সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন, তাতে বলা হচ্ছে, যিনি চৈতন্য, বোধ করার ক্ষমতাটা শুধু তাঁর মধ্যেই আছে। সেইজন্য যিনি প্রকৃত বোধকর্তা, তাঁকে কখনই বোধ করা যাবে না। Subject কখনই কোন পরিস্থিতিতে object হতে পারে না, এটাকেই বলছেন স্বক্রিয়া অভাবঃ, আগেই এর আমরা আলোচনা করে এসেছি। আমার ডান হাত দিয়ে আমি জগতের সব কিছুকেই ধরে নিতে পারব, কিন্তু আমার ডান হাতকে কোন দিন ধরতে পারব না। ঠিক তেমনি যিনি সনাতন জ্ঞাতা, তাঁকে কোন দিন জানা যেতে পারে না। যেহেতু জানা যেতে পারে না, সেইহেতু তিনি কোন দিন object হবেন না। আমাদের মন যদি কোন জিনিসকে জানতে চায়, তাহলে কিন্তু তাকে object হতে হবে। Contradiction হয়ে যাবে, একটা জিনিসকে যদি জানতে চাই, তাহলে সেই জিনিসকে বস্তু রূপে আমার সামনে আসতে হবে। আত্মা কখনই কোন দিন বস্তু হতে পারেন না, কারণ আত্মা চিরন্তন জ্ঞাতা, সেইজন্য আমরা আত্মাকে কোন দিন জানতে পারব না। ঈশ্বর হলেন কর্তা, ঈশ্বরের যে মূল পরিভাষা তাতে সব ধর্মেই বলছে, ঈশ্বরই কর্তা, তিনি করাচ্ছেন, তিনিই সব করছেন, তিনিই মালিক। তার মানে সব কিছুর পিছনে তিনি, তাই তিনি কখনই বস্তু রূপে আমাদের সামনে আসতে পারেন না, তা নাহলে iner inconsistency এসে যাবে। তার মানে, আমরা কোন দিন ঈশ্বরকে জানতে পারি না, আমরা কোন দিন আত্মাকে জানতে পারব না। মন একমাত্র সেটাকেই জানতে পারে, যেটা যুস্মদ্ প্রত্যয় হয়ে আসে, তার মানে, বস্তু রূপে যেটা আসছে সেটাকেই মন জানতে পারবে, তার বাইরে আমরা জানতে পারি না। যিনি চিরজ্ঞাতা ঈশ্বর, যিনি eternal subject আত্মা, তিনি কখনই object হয়ে আসতে পারবেন না। সেইজন্য ঈশ্বর বা আত্মাকে কোন দিন জানা যাবে না।

স্বামীজী এটাই বলছেন, Mind is the internal sense, the outer senses are its instruments. (*মন হল অন্তঃকরণ বা অন্তরিন্দ্রিয়, আর বহিরিন্দ্রিয়গুলি তারই যন্ত্রস্বরূপ।*) আমাদের মনটাও ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় দুই প্রকার, বহিরিন্দ্রিয় আর অন্তরিন্দ্রিয়। বহিরিন্দ্রিয় আবার দুই প্রকার, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়। পাঁচ আর পাঁচ এই দশটি ইন্দ্রিয়ের বাইরে একাদশ ইন্দ্রিয় হল মন, এটাকে বলে অন্তরিন্দ্রিয়। মনটাও একটা যন্ত্র, মন আসল কর্তা না। হাতে কাঁচি নিয়ে আমরা কাজ করি, কাঁচিটা একটা যন্ত্র, কর্তা আমি। আমাদের হাতটাও ঠিক সেই ভাবে একটা করণ, একটা যন্ত্র। হাতকে যে কাজ করাচ্ছে মন, সেও একটা করণ, সেও একটা ইন্দ্রিয়।

In the subject is a trifle of the objectifying power that enables him to know 'I am'; but the subject is the object of its own Self, never of the mind or the senses. (*বিষয়ীতে কিঞ্চিৎ বহিঃপ্রক্ষেপশক্তি (objectifying power) আছে –তার দ্বারাই তিনি জানতে পারেন 'আমি আছি'। কিন্তু সেই আত্মা বা বিষয়ী নিজেরই বিষয় –মন বা ইন্দ্রিয়ের বিষয় নন।*) স্বামীজী তাঁর বিদেশী শিষ্যদের সামনে বেদান্তের ব্যাখ্যা করছেন, তাঁরা যাতে বুঝতে পারেন সেইভাবে সহজ করে বলেছেন, আর বর্তমান কালের উপযোগী করে বলছেন, যেটা স্বামীজীর একটা বিরাট বড় অবদান। আত্মা, যিনি কর্তা, আত্মার

একটা বিশেষ ক্ষমতা আছে, স্বামীজী বলছেন trifle, অল্প একটু, কিঞ্চিত পরিমাণ বহিঃপ্রক্ষেপ শক্তি রয়েছে যাতে নিজেকে objectify করে নেন, নিজেকেই বস্তু বানিয়ে নেন। কিন্তু সেই বস্তু বানাচ্ছেন কোথায়? নিজের জন্য বানাচ্ছেন, ওই বস্তু মনের বস্তু কোন দিন হবে না, ওই বস্তু হবে একমাত্র আত্মার। তার অর্থ দাঁড়ায়, subject আত্মা থাকেন, object আত্মা থাকেন। আর এক অপরের জ্ঞান যেটা হয়, সেটা আত্মাই। ঠাকুর যেটাকে শুদ্ধ বুদ্ধি, শুদ্ধ মন, শুদ্ধ আত্মা বলছেন, এটা সেটা। একটা ছোট্ট একটু শক্তি থাকে, সেই শক্তি দিয়ে এই আত্মা, যিনি সনাতন সাক্ষী, যিনি চিরজ্ঞাতা, তিনি একটা যেন object হয়ে চলে আসেন, তখন বোধে বোধ হয়। এই জিনিসটাকে বোঝা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক ভাবেই খুব কঠিন মনে হবে।

পুরাণে এর উপর একটা খুব সুন্দর কাহিনী আছে। সমুদ্র মন্থনের সময় ভগবান কচ্ছপ রূপে সমুদ্রে গিয়ে বসলেন, তাঁর উপর মন্দার পর্বতকে রেখে সমুদ্র মন্থন হল, যেখান থেকে এক এক করে অনেক কিছু বেরোতে শুরু হল, সব শেষে বেরিয়ে আসবে অমৃত। অমৃত মানে আত্মজ্ঞান। প্রথমে হলাহল বেরিয়ে এসেছে, তারপর এক এক করে উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়া, ঐরাবত হাতী, তারপর লক্ষ্মী বেরিয়ে এলেন। লক্ষ্মীর রূপের লাবণ্য, সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য দেখে দেবতা, অসুর, মুনি-ঋষি সবারই মাথা ঘুরে গেছে। সবাই মনে মনে ছটফট করছে, যদি লক্ষ্মীকে আমি পাই। লক্ষ্মী এক এক করে তখন সবাইকে দেখতে লাগলেন। রাক্ষস, অসুরদের দেখলেন, দেখছেন এরা বড় অহঙ্কারী, সর্প, নাগ এরা বড় ক্রুঢ়, দেবতাদের নিয়ে কিছু ভাবলেন, ঋষিরা রুক্ষ, কাউকেই লক্ষ্মীর পছন্দ হচ্ছে না। তারপর লক্ষ্মী দেখলেন ভগবান বিষ্ণুকে, দেখছেন যত জন এখানে আছে সবাই তাঁকে পাওয়ার জন্য ছটফট করছে। একমাত্র ভগবান বিষ্ণু তিনি লক্ষ্মীকে তোয়াক্কাই করছেন না, লক্ষ্মীর ব্যাপারে তাঁর কোন আগ্রহই নেই। লক্ষ্মী গিয়ে তখন ভগবান বিষ্ণুকে বরণ করে নিলেন। এখানে ঠিক এই ভাব। লক্ষ্মী হলেন ভগবান বিষ্ণুর শক্তি। ভগবান বিষ্ণুই আরেক রূপে লক্ষ্মী হয়েছেন। ওই লক্ষ্মীকে সবাই জানতে চাইছে, আমাদের ইন্দ্রিয় জানতে চাইছে, আমাদের মন জানতে চাইছে। কেনোপনিষদে বলছে, যক্ষকে দেখে বিভিন্ন দেবতারা দৌড়ে গেছে এটা কি বস্তু, কেউই জানতে পারল না। জানতে পারলেন কে? তাঁর শক্তি, উমা হৈমবতী ছাড়া কেউ জানতে পারল না।

একই কাহিনী, পুরাণে যে কথা বলছে, উপনিষদেও একই কথা বলছে, বেদান্তেও একই কথা বলছে। কিন্তু এটাকে ধারণা করা এত কঠিন যে, তাই একবার এই ভাবে বলছেন, আরেকবার অন্য ভাবে বলছেন। শিব-পার্বতীর ক্ষেত্রেও একই জিনিস নিয়ে আসা হয়েছে। শিব, তাঁর নিজের যে শক্তি, সেই শক্তিই পার্বতী রূপে সামনে আসছেন। পার্বতীকে আর কেউ চোখে দেখতে পারবে না, একমাত্র শিবের চোখ দিয়েই ধরা যাবে। শ্রীশ্রীমায়ের খুব ছোট্ট একটা কথা, বাচ্চা বয়সে নাকি তিনি যাত্রা দেখতে গেছেন, গ্রামের একজন মহিলা মাকে জিজ্ঞেস করছেন, এখানে এত লোক এসেছে, তুই কাকে বিয়ে করবি? মা তখন তিন চার বছরের বাচ্চা মেয়ে, ছোট ছোট আঙুল তুলে ঠাকুরকে দেখালেন। এটা একটা বাচ্চার কথা, অনেকেই মানতে চাইবেন না, না মানলেও চলবে। কিন্তু ঠাকুরের যখন বিয়ের কথা চলছে, সবাই যখন হন্যে হয়ে চারিদিকে পাত্রী খুঁজে বেড়াচ্ছেন, কোথাও পাত্রী পাওয়া যাচ্ছে না, ঠাকুর তখন ভাবের অবস্থায় বলছেন, জয়রামবাটীতে রামচন্দ্র মুখুজ্জেদের বাড়িতে মেয়ে কুটো বাঁধা হয়ে আছে। আগেকার দিনে গাছে কোন ফল হলে খড় বা অন্য কিছু দিয়ে বেঁধে রাখা হত, তার মানে এই ফল ঠাকুরের জন্য উৎসর্গীকৃত, একমাত্র ঠাকুরের সেবায় যাবে, এই ফলে কেউ হাত দিও না। এটাকে বলে কুটো বাঁধা। এই তত্ত্বগুলি না জানা থাকলে, এই ধরণের কাহিনীর আড়ালে যে সত্যটা রয়েছে, ধরাই যাবে না।

আমরা ভাসা ভাসা মনে করতে পারি যে, একটা বিষ্ণুলোক আছে, একটা রামকৃষ্ণলোক আছে, ঠাকুর ওখান থেকে মাকে নিয়ে এসেছেন। ঠাকুরের পরে না হয় রামকৃষ্ণলোক হয়েছে, ঠাকুর আসার আগে রামকৃষ্ণলোক কোথায় ছিল? ঠাকুর আসার আগে তো রামকৃষ্ণলোক কেউ দেখেনি। এগুলো কিছুই না, সব বোকা বোকা ধারণা। ঠাকুর সাক্ষাৎ ভগবান, তাঁর সেই শক্তি, যে শক্তির ব্যাপারে ভগবান বিষ্ণু লক্ষ্মীকে নিয়ে নির্বিকার। শিব থেকে থেকে পার্বতীকে ছেড়ে ধ্যানে মগ্ন থাকেন। ঠাকুরও সেই রকম, কারণ এটা হল শক্তি। আত্মা আর শক্তি আলাদা কিছু না, শক্তি আত্মারই আরেকটা রূপ। ঠাকুরও বারবার বলছেন ব্রহ্ম আর শক্তি

অভেদ, যেমন অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তি অভেদ। আত্মা যিনি অনন্ত, তিনি তাঁর ওই একটু ছোট্ট ক্ষমতা দিয়ে নিজেকে সামনে নিয়ে চলে আসেন।

এটাকেই রূপক করে নিয়ে আসছেন মনু আর শতরূপার কাহিনীতে। ব্রহ্মা মন দিয়ে প্রথমে সৃষ্টি করতে গিয়ে দেখছেন, সৃষ্টির গতি খুব মন্থর। ব্রহ্ম তখন ঠিক করলেন নিজেই নারী আর পুরুষ হয়ে সৃষ্টিতে গতি নিয়ে আসবেন। ব্রহ্মাই হয়ে গেলেন পুরুষ, সেই ব্রহ্মাই আরেকটা হয়ে গেলেন নারী। আত্মারই ছোট্ট একটা শক্তি, তাহলে কি শক্তি নিকৃষ্ট? দোলের সময় চিনির মঠ তৈরী করা হয়, তাতে বিরাট একটা হাতি আছে, আবার ছোট একটা ইঁদুর আছে। এখানে কে বড় কে ছোট? কিসের বড় কিসের ছোট! দুটোই চিনি, আত্মা আত্মাই, তাঁর আবার ছোট বড় কি! আত্মার এই objectifying power জগৎ হয়ে সামনে আসছে। এই বহিঃপ্রক্ষেপ শক্তিই নিজেকে নিজে জানে।

আমরা বলতে পারি, বহিঃপ্রক্ষেপ শক্তি তো এসে গেল, এবার তাহলে আত্মাকে, ঈশ্বরকে দেখতে পারব। দেখতে পারব, যেমন লক্ষ্মীকে দেখে সবাই লক্ষ্মীকে পাওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল, কিন্তু কিছুই পেল না। আর কেনোপনিষদে অগ্নি, বায়ু, মিত্র দেবতারা বলল ব্রহ্মকে আমরা জানব, কিছুই জানল না, ব্রহ্ম পাত্তা না দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। সমস্ত কাহিনীতে আমরা একই জিনিস পাই, আপাত ভাবে দেখলে মনে হবে, কি সুন্দর কাহিনী, শক্তির কাহিনী। কিন্তু তা না, সব কাহিনীর পিছনে একটাই তত্ত্ব, যিনি আত্মা তাঁর ভিতরে সেই শক্তি থাকে, যে শক্তি দিয়ে তিনি নিজেই যুস্মদ্ অস্মদ্ দুটোই হয়ে যান। আমি যেন আমার ঘরেই আমার আয়না হয়ে গেলাম, সেই আয়নাতে আমি এবার নিজেকে দেখছি। এটা একটা উপমা দেওয়া হল। আত্মা যেটা object হয়েছেন, সেটাকে আত্মাই জানতে পারবেন, মন ইন্দ্রিয় কোন দিন জানতে পারবে না। এটাকে ঠাকুর খুব সহজ ভাষায় বলছেন, একসের ঘটিতে কি তিন সের দুধ ধরে! এগুলো বোঝা বা ধারণা করা খুবই কঠিন, কিন্তু এই জিনিসগুলো না বুঝলে বেদান্ত কোন দিন বোঝাও যাবে না।

You can, however, superimpose one idea on another idea, as when we say, 'The sky is blue', the sky itslf being an idea. (*তবে আমরা একটা ভাবকে আর একটা ভাবের উপর অধ্যাস করতে পারি –যেমন আমরা যখন বল, 'নীল আকাশ' –আকাশটা একটা ভাবমাত্র, আর নীলত্বও একটা ভাব –আমরা নীলত্ব ভাবটা আকাশের উপর আরোপ বা অধ্যাস করে থাকি।*) একটা জিনিস আরেকটা জিনিসকে জানতে পারবে না যতক্ষণ স্বভাবতঃ এক থাকে, তবে আইডিয়া যদি হয় তখন একটা আইডিয়ার উপর আরেকটা আইডিয়াকে চাপিয়ে দেওয়া যায়। যেমন আমরা বলি নীল আকাশ, আকাশ একটা আইডিয়া নীল একটা আইডিয়া, সেইজন্য নীল আকাশ চাপিয়ে দেওয়া যাবে। ঠিক এই যুক্তিকেই আচার্য শঙ্কর পরে নিয়ে আসবেন, সচ্চিদানন্দ যখন আমরা বলি তখন সৎ, চিৎ ও আনন্দের আনন্দটা যদি আইডিয়া হয়, তখন ওটা ঈশ্বরের উপর চাপানো যাবে না, কারণ আনন্দ ঈশ্বরের স্বরূপ। কারণ ঈশ্বর হলেন অস্মদ্ প্রত্যয়, যেখানে ওর সাথে কোন মিল হতে পারে না। সেইজন্য তিনি আনন্দ, আনন্দ তাঁর গুণ নয়, আনন্দটাই তিনি। আমরা যেমন উনি একজন ভাল মানুষ, সেইভাবে ভগবান আনন্দ নন।

স্বামীজী এরপর বলছেন, Science and nescience there are, but the Self is never affected by any nescience. (*বিদ্যা ও অবিদ্যা বা জ্ঞান ও অজ্ঞান –এই দুই নিয়ে জগৎ, কিন্তু আত্মা কোন কালে অবিদ্যায় আচ্ছন্ন নন।*) Science মানে জ্ঞান আর Nescience মানে অজ্ঞান, বলছেন অজ্ঞান কখন কোন কালে আত্মাকে প্রভাবিত করতে পারেনা। Relative knowledge is good, because it leads to absolute knowledge; but neither the knowledge of the senses, nor of the mind, nor even of the Vedas is true, since they are all within the realm of knowledge. (*আপেক্ষিক জ্ঞানও ভাল, কারণ সেটা সেই চরম জ্ঞানে আরোহণ করার সোপান। কিন্তু ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান বা মানসিক জ্ঞান, এমন-কি বেদপ্রমাণজন্য জ্ঞানও কখন পরমার্থ হতে পারে না; কারণ ঐগুলি সবই আপেক্ষিক জ্ঞানের সীমার ভিতর।*) জগৎকে আমরা যেভাবে জানি, এটাকে মুণ্ডকোপনিষদে পরাবিদ্যা আর অপরা বিদ্যা বলছেন। পরাবিদ্যা হল ঈশ্বরের জ্ঞান, আত্মার জ্ঞান বা ব্রহ্মের জ্ঞান, অপরা বিদ্যা জগতের জ্ঞান। বলছেন, জগতের জ্ঞান অবশ্যই ভাল যদি সেই জ্ঞান আত্মার দিকে নিয়ে যায়। স্বামীজী এখানে বলছেন, যত

রকমের জ্ঞান হতে পারে, এমনকি বেদেরও যে জ্ঞান, এগুলো সবই মনের এলাকার। সেইজন্য এই জ্ঞান ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যেতে পারে না।

তাই বলছেন, First get rid of the delusion, 'I am the body', then only can we want real knowledge. (*প্রথমে 'আমি দেহ' এই ভ্রম দূর করে দাও, তবে যথার্থ জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা হবে।*) আমরা জ্ঞান বলতে সচরাচর বুঝি জগতের জ্ঞানকে, কিন্তু আত্মজ্ঞানের যে কথা বলা হয়, এই জ্ঞান একমাত্র আত্মাই জানতে পারেন। যদি কেউ সত্যি সত্যি ঈশ্বরের ভক্তিলাভ করতে চায় জগতের জ্ঞানকে ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে আসতে হবে। ঠাকুর খুব সহজে বলছেন, শুদ্ধা ভক্তি, বলছেন প্রেমাভক্তি, কিন্তু এই ভক্তি কি করে হবে! যতক্ষণ নিজেকে মনে করছি আমি দেহ, ততক্ষণ এই ভক্তি হতে পারে না। সেইজন্য বলছেন, তোমার এই অজ্ঞানতাকে ছাড়। লক্ষ্মীকে যদি তুমি পেতে চাও, তাহলে তোমাকে আগে বিষ্ণু হতে হবে। পার্বতীকে একমাত্র শিবই চাইতে পারেন, কারণ তিনি শিবের শক্তি। তুমি নিজেকেই objectify করে রেখেছে, তুমি যদি নিজেকে জানতে চাও, তাহলে তোমাকে সেই আত্মা হতে হবে। যতক্ষণ না আত্মা হচ্ছ, ততক্ষণ তুমি নিজেকে দেহ রূপে, মন রূপেই জানবে। নিজেকে জানার জন্য তাই আগে তোমার উপর যে অধ্যাসগুলো চাপিয়ে রেখেছ, আমি দেহ, আমি মন, আমার এই আছে, আমার সেই আছে, এই অজ্ঞানকে যতক্ষণ না ছাড়া হয় ততক্ষণ তুমি নিজেকে জানতে পারবে না। আর যখন এই অজ্ঞানগুলিকে দূর করবে তখনই তুমি নিজেকে জানতে পারবে। তখনও কিন্তু বস্তু রূপে জানা যাবে না, বোধে বোধ করবে। শিব আর পার্বতীর মিলন দেহের মিলন নয়, বিষ্ণু আর লক্ষ্মীর যে মিলন এটা দেহের মিলন নয়।

এইসব বলার পর স্বামীজী বলছেন, Man's knowledge is only a higher degree of brute knowledge. (*মানবী জ্ঞান পশুজ্ঞানেরই উচ্চতর অবস্থা।*) এটাই শেষ কথা, এগুলো শুনলে আমাদের আতঙ্ক লেগে যায়। শেষ পর্যন্ত আমাদের যে জ্ঞান হয়, তা সে যত বড় জ্ঞান হোক, রকেট বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান, এ্যস্ট্রো ফিজিক্স, চিকিৎসা বিজ্ঞান, এই ধরণের সমস্ত জ্ঞান পাশবিক জ্ঞানেরই একটু উন্নত জ্ঞান, এর বেশি কিছু না। একটা বন্য পশু যেমন নিজের এলাকাকে জানে, এই জ্ঞানেও মানুষ তার নিজের এলাকাকেই জানতে পারে। জ্ঞানের এই গুণগত মানকে যদি পাল্টাতে হয় তাহলে আমাদের আত্মজ্ঞানে নামতে হবে, নিজেকে জানতে হবে। নিজেকে জানা মানে objectify করা ছাড়া জানা যাবে না, objectification যে অর্থে হয় এখানে সেই অর্থে হয় না, আমি নিজেকে সামনে নিয়ে আসছি, সেটাকে আবার মন জানতে পারবে না, আত্মাই জানবেন। আমি দেহ, আমি মন, এই অজ্ঞান যতক্ষণ না খসে পড়ে যাচ্ছে, ততক্ষণ নিজেকে জানা যাবে না। বেদান্তের সার এটাই। জানা মানেই হয়, বস্তু না হলে, চোখের সামনে না দেখলে জানা যাবে না, কিন্তু আত্মার মধ্যে এই ক্ষমতা আছে, যেখানে তিনি নিজেকেই সামনে নিয়ে আসেন। কিন্তু এটা মন দিয়ে জানা যায় না, ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যায় না, শুদ্ধ আত্মা শুদ্ধ আত্মাকে স্বরূপ রূপে জানে। সমস্ত বেদান্তের এটাই সার।

দেববাণী এমনিতেই একটা কঠিন শাস্ত্র, তার উপর বেদান্তের সার নিয়ে বলছেন। বেদের সার উপনিষদ, উপনিষদের সার গীতা। অথচ মজার ব্যাপার হল, গীতা পড়ার সময় আমাদের সহজ লাগে। যখনই কোন বিষয়কে ঘনীভূত করে শুধু সারটুকু দেওয়া হয়, তখন ওই বিষয়কে বোঝা খুব মুশকিল হয়ে যায়। যখন বিষয়টা অরিজিন্যাল থাকে তখন ওটাকে বুঝতে এত সমস্যা হয় না। বেদের মূল কিছু জিনিস যদি পরিষ্কার হয়ে যায় তখন ওই সূক্তগুলো পড়তে অসুবিধা হবে না। কিন্তু ওটাই ঘন হতে হতে গীতায় আসার পর হাজারটা ভাষ্য বেরোতে শুরু হয়ে যায়। দেববাণী হল ঐ রকম একটি সার সর্বস্ব গ্রন্থ। একেই সমস্ত ধর্মের সার, সেটাকে আবার point formএ ছোট ছোট বাক্যে খুব সংক্ষিপ্তাকারে সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

বেদের কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড

স্বামীজী একই বিষয়ের উপর বলে যাচ্ছেন, তা হল আচার্য শঙ্করের ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য। স্বামীজী যা কিছু বলছেন, সেটাকে মিস্ ওয়াল্ডো নিজের মত করে গুছিয়ে লিখেছেন। দেববাণী পড়তে গেলে বোঝা যায়, হঠাৎ যেন মাঝে মাঝে গ্যাপ এসে যাচ্ছে। গ্যাপ এলেও flowটা ঠিকই থাকছে। এটা বোঝা যায় যে, বিষয় একই, কিন্তু স্বামীজী অনেক ছড়িয়ে ছিটিয়ে বলছেন, কিন্তু লেখার সময় মনে হয় একটু আগে পিছে হয়ে গেছে। এখন

আমরা দেববাণীর যে জায়গা থেকে শুরু করছি, বেদের দুটি অংশ, এখান থেকে শুরু করে ৭ই জুলাইয়ের ক্লাশ শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত, এই এক কি দেড় পাতায় স্বামীজী খুব সংক্ষেপে পুরো বেদান্তকে রেখে দিচ্ছেন। শুরু করছেন এইভাবে, One part of the Vedas deals with Karma, - form and ceremonies. The other part deals with the knowledge of Brahman and discusses religion. The Vedas in this part teach of the Self; and because they do, their knowledge is approaching real knwledge, (*বেদের এক অংশে কর্মকাণ্ড –নানাবিধ অনুষ্ঠান পদ্ধতি, যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতির উপদেশ আছে। অপরাংশে ব্রহ্মজ্ঞান ও যথার্থ আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মের বিষয় বর্ণিত আছে। বেদের এই অংশ আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দেন; সেইজন্য বেদের ঐ ভাগের জ্ঞান যথার্থ পারমার্থিক জ্ঞানের অতি সমপীবর্তী।*) বেদের দুটি অংশ, কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড, এই বলে স্বামীজী শুরু করছেন।

আলোচনা শুরু করার আগে আমরা দুটি কথা বলে নিচ্ছি। আমরা সবাই মনে করছি বেদ একটি গ্রন্থ, যেমন দেববাণীকে আমরা একটা গ্রন্থরূপে দেখছি; কিন্তু বেদকে ঠিক সেইভাবে গ্রন্থ বললে অনেক কিছু না বলা থেকে যাবে। আমাদের পরম্পরায় বেদকে ঐ ভাবে কখনই গ্রন্থরূপে ভাবা হয় না। বেদের প্রথম জিনিসটাকেই বলে শাখা, শাখা মানে কোন স্কুল। বেদের ব্যাপারে জানতে গেলে প্রথমেই জানতে হয় এটা কোন শাখার বেদ। বেদের এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রথম দিক। শাখা অনুসারে বেদ পাল্টে যাবে। প্রথম সংশয়টা এই জায়গাতে আসে। প্রত্যেকটি শাখার বেদ চারটি অংশে বিভক্ত। প্রথমটাকে বলা হয় সংহিতা, সংহিতার আরেকটা নাম মন্ত্র। প্রত্যেক শাখাতে বেদের মন্ত্র বা সংহিতা এক, কোন শাখাতেই মন্ত্রের কোন পরিবর্তন করা হয় না। পতঞ্জলি এক জায়গায় লিখছেন, তাঁর সময়ে সামবেদের নাকি হাজারটা শাখা ছিল। সামবেদের যে সংহিতা অংশ, যেটা যজ্ঞে লাগে, সেটা সব শাখায় এক। বেদের দ্বিতীয় অংশকে বলা হয় ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ অংশে থাকবে যজ্ঞের বিধি, বিভিন্ন রকম বর্ণনা, বিভিন্ন কাহিনী। তৃতীয় অংশ হল আরণ্যক, বার্দ্ধক্যের দরুণ ব্রাহ্মণরা যখন আর যজ্ঞ-যাগ করতে পারতেন না, তখন তাঁরা ধ্যান-ধারণার উপর বেশি জোর দিতেন আর বেদে আগে আগে যে বিভিন্ন মন্ত্র ও যজ্ঞের বর্ণনা করা হয়েছে, আরণ্যকে এসে তাঁরা এবার এগুলোকে চিন্তন করেন। চতুর্থ অংশে আসছে উপনিষদ।

প্রত্যেক শাখার নিজস্ব সংহিতা আছে, ব্রাহ্মণ আছে, আরণ্যক আছে আর উপনিষদ আছে। তার সাথে আছে ছয়টি বেদাঙ্গ। এই সমস্ত মিলিয়ে হয় একটি শাখা। যেমন কঠোপনিষদে বলা হচ্ছে, এই উপনিষদ কঠ শাখার। শাখাতে সংহিতা একই থাকবে, কিন্তু ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ একটু একটু পাল্টে যেতে পারে। অনেক সময় যাঁরা নিষ্ঠাবান ও পণ্ডিত ছিলেন, তাঁরা সব কটাই মুখস্ত করে রাখতেন। আগেকার দিনে সবাই সব কিছু মুখস্ত করেই রাখতেন। এর মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল মন্ত্র অংশ, ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব এই চারটেরই মন্ত্র অংশ কোন শাখাতে কখনই পাল্টাবে না। কিন্তু অন্য তিনটে অংশ একটু একটু পাল্টে যায়। এই কথাগুলো শোনার পর যারা বেদ চোখে দেখেনি, তাদের মনে হবে, একটা বই আছে, তার প্রথম অংশে মন্ত্র, দ্বিতীয় অংশে ব্রাহ্মণ, তৃতীয় অংশে আরণ্যক আর চতুর্থ অংশে উপনিষদ। কিন্তু জিনিসটা কাঁটা কাঁটায় ঠিক এভাবে চলে না। কবে কোন ঋষি, কোন ব্রাহ্মণ বলে দিয়েছেন, এতটা মন্ত্র, ওটা মন্ত্র হয়ে গেল, এটা হল উপনিষদ, স্পষ্ট রূপে কোন বিভাজন নেই। যেমন শ্রুতি ও স্মৃতি, এরও কোন স্পষ্ট রূপে বিভাজন নেই। মনুস্মৃতিতে মনু বলছেন, চারটে বেদ হল শ্রুতি, বাকি গ্রন্থগুলো স্মৃতি। ঠাকুর যেমন বলে দিলেন, ভক্তরা শ্রাদ্ধান্ন খাবে না। ঠাকুরের আগে আমরা কদাচিৎ কখন পাই, মনুস্মৃতিতেও বলছেন শ্রাদ্ধান্ন বেশি যেন না খাওয়া হয়। কিন্তু সাধারণ ভাবে শ্রাদ্ধবাড়ির ভোজের খবরে সবারই আনন্দ হত। ভক্তদের জন্য ঠাকুর এটা একটা বিধান দিয়ে দিলেন। কারণ শ্রাদ্ধের অন্ন পিতৃদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়, ভক্ত ভগবানকে নিবেদন করা অন্নই গ্রহণ করবে। শ্রাদ্ধের অন্য ভগবানকে দেওয়া অন্ন নয়, পিতৃদের দেওয়া অন্ন। সেইজন্য ভক্ত শ্রাদ্ধের অন্ন খাবে না। কিন্তু শ্রাদ্ধবাড়িতে খেতে হবে। এখনও ঠাকুরের ভক্ত ছাড়া সবাই আশায় বসে থাকে কবে কে মারা যাবে, শ্রাদ্ধবাড়িতে গিয়ে ঠেসে খাব। এখনও সারা দেশে এই রেওয়াজ চলে আসছে। ঠিক তেমনি কোন ঋষি বা বড় ব্রাহ্মণ বলে দিলেন, এটা মন্ত্র অংশ, এটা ব্রাহ্মণ, এটা আরণ্যক আর এটা উপনিষদ, সেই থেকে সেভাবেই চলে আসছে।

ঠিক তেমনি বেদের দুটো অংশ, মন্ত্র আর ব্রাহ্মণকে বলা হয় কর্মকাণ্ড, বাকি দুটো আরণ্যক ও উপনিষদকে বলা হয় জ্ঞানকাণ্ড। এর যে কোন কঠোর নিয়ম আছে, তা না। যেমন, বেদের যে প্রথম সূক্ত, অগ্নিসূক্তম্, এই সূক্তমের উপর সহজেই যে কেউ ধ্যান করতে পারে। তার থেকেও নামকরা সূক্তম্ পুরুষসূক্তম্, পুরোপুরি ধ্যানের মন্ত্র। কিন্তু এই দুটোই কর্মকাণ্ডে আসছে। যদি গায়ত্রীমন্ত্রের ভূর্ভবঃ স্বঃ কে সরিয়ে দিয়ে শুধু ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধীয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ, এটাও মন্ত্র অংশে আসে, মন্ত্র অংশে আসা মানে এটা কর্মকাণ্ড রূপে আসছে, কিন্তু আবার ধ্যানের জন্য এটি একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্র। স্বামীজী সৃষ্টিতত্ত্বকে বলতে গিয়ে যে নাসদীয় সূক্তকে নিয়ে আসছেন, অথচ সেই নাসদীয় সূক্ত যজ্ঞের মন্ত্র। যেখানে ধ্যান করার এত বিষয় আছে, যেখানে এত কিছু জানার আছে, যে মন্ত্রগুলি মানবজাতিকে একটা উচ্চস্তরে তুলে দিচ্ছে, সেখানে বলা হচ্ছে কর্মকাণ্ড, মানে জ্ঞানকাণ্ড নয়। এর কোন কারণ নেই, কোন একটা সময় কোন ঋষি বা কোন বড় ব্রাহ্মণ বলে দিলেন, এগুলো কর্মকাণ্ড, যজ্ঞে এগুলো লাগবে। আরণ্যক ও উপনিষদ যেমন কখনই যজ্ঞে ব্যবহার করা হত না ঠিকই, কিন্তু তেমনি আবার আছে, খুব নামকরা উপনিষদ, ঈশাবাস্যোপনিষদ যজুর্বেদের সংহিতাতেই আছে, কিন্তু এটাকে যজ্ঞে ব্যবহার করা হয় না। যজুর্বেদে মোট চল্লিশটি অধ্যায় আছে, ঈশাবাস্যোপনিষদ ওরই চল্লিশতম অধ্যায়। কবে কোন ঋষি বলে দিলেন, এই অধ্যায় মন্ত্র অংশে যাবে না, এটা উপনিষদ, সেই থেকে উপনিষদ রূপে এই অধ্যায়ের ব্যবহার হয়ে আসছে। যজ্ঞের সময় ওনারা উপনিষদের আবৃত্তি করতেন, বলা হয় যে তাতে যজ্ঞের মাহাত্ম্য যেন বেড়ে যেত, যজ্ঞের ফল ভাল হয় ইত্যাদি। কিন্তু সরাসরি *ওঁ ঈশাবাস্যমিদং সর্বং স্বাহা* বলে আহুতি দিতেন না। অন্য দিকে *ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধীয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ স্বাহা* বলে অগ্নিতে যজ্ঞের সময় আহুতি দেবেন, কারণ এটা ঋগ্বেদের মন্ত্র। স্বাহা, নমঃ ইত্যাদি লাগিয়ে অগ্নিতে আহুতি দেওয়াটা ওনারা কর্মকাণ্ডে করতেন। কিন্তু জ্ঞানকাণ্ডে স্বাহা লাগাতেন না।

জ্ঞানকাণ্ড কেন বলছেন? যেখানে আত্মাকে নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে, যেখানে ব্রহ্মকে নিয়ে আলোচন করা হচ্ছে, সেই জায়গার মন্ত্র যজ্ঞে যাবে না। আচার্য শঙ্কর ঈশাবাস্যোপনিষদের ভাষ্যে প্রথমেই বলছেন, ঈশাবাস্যাদি মন্ত্র, এটাকে উনি মন্ত্র বলছেন, কারণ এটা যজুর্বেদের মন্ত্র অংশে আছে, তার মানে ওটা সংহিতা, কিন্তু এর মন্ত্র যজ্ঞে লাগানো হয় না। আচার্য শুরুই করছেন এই বলে যে, এটাকে যে যজ্ঞে লাগানো হয় না, ঠিকই করা হয়। যজ্ঞে এর মন্ত্র লাগানোর কথা নয়, কারণ, ঈশাবাস্য মন্ত্রাদি দিয়ে যে আলোচনা হচ্ছে, এই আলোচনা আত্মাকে নিয়ে করা হচ্ছে। আত্মা মানেই কারকের প্রথমা, দ্বিতীয়া অর্থাৎ কর্তা কর্ম থাকবে না, আর এই দুটো জিনিসকে যেটা জুড়ে দেয় ক্রিয়া, সেটা থাকবে না। কর্তা মানে আমি, কর্ম মানে দ্বিতীয়া, যেটার উপর কাজ করা হয়, আর মাঝখানে থাকছে ক্রিয়া। আমি ভাত খাচ্ছি, আমি প্রথমা, ভাত দ্বিতীয়া আর খাওয়াটা ক্রিয়া। যজ্ঞ করা মানেই সেখানে কর্তা থাকতে হবে, কর্ম থাকতে হবে আর যজ্ঞের ক্রিয়া থাকতে হবে। কিন্তু ঈশাবাস্যোপনিষদে যে আত্মার তত্ত্ব বলা হচ্ছে, তাতে কর্তা, কর্ম আর ক্রিয়ার অভাব প্রস্ফুটিত হয়। সেইজন্য এটা দিয়ে কখনই যজ্ঞ করা যাবে না। ঋষিরা যে তাই যজুর্বেদের মন্ত্র অংশের চল্লিশতম অধ্যায়কে আলাদা করে দিয়েছেন, তাঁরা ঠিকই করেছেন।

তার মানে এই যে বিভাজন, এটা কর্মকাণ্ড, এটা জ্ঞানকাণ্ড, এই বিভাজন ঋষিরা করে গেছেন। এখন কেউ যদি মনে করে, আমি উপনিষদের মন্ত্রে যজ্ঞ করব, তখন কে তাকে আটকাতে যাবে! সে যদি বলতে শুরু করে ঈশাবাস্যমিদং সর্বং স্বাহা, কে তাকে আটকাবে! কিন্তু এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, লোকটি মন্ত্রের মূল তাৎপর্যটা কিছুই বোঝেনি বলেই এই রকম করতে চাইছে। বক্তব্য হল, যদি সমস্ত বেদরাশিকে নেওয়া হয়, কেউ যদি চায়, বেদের যে ঋচা বা মন্ত্রগুলো রয়েছে, সেটার যদি কেউ ধ্যান করে, সহজেই ধ্যান করতে পারবে। যেমন পুরুষসূক্তম্, ধ্যানের বিষয়, নাসদীয় সূক্তম্ ধ্যানের বিষয় বা যে কোন সূক্তের সহজেই ধ্যান করা যেতে পারে। কিন্তু এনারা বলেছিলেন, আমি আছি ভগবান আছেন, আমার চেষ্টা ভগবানের কাছে বা দেবতারা আছেন, তাঁদের কাছে পৌঁছান। পৌঁছাব আমি যজ্ঞ ক্রিয়ার মাধ্যমে, উদ্দেশ্য দেবতা, সেই উদ্দেশ্য আমার জন্য, মাধ্যমটা হল যজ্ঞ ক্রিয়া, সেইজন্য এগুলোকে বলা হচ্ছে কর্মকাণ্ড। এর বেশি যদি ভিতরে ঢুকতে যাওয়া হয়, তখন দেখা যাবে সব কিছু এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। তবে উপনিষদের ক্ষেত্রে এলেমেলো হয়ে যাওয়ার কিছু নেই। যদিও মুণ্ডকোপনিষদে বলছেন, *প্রণবঃ ধনু শরো হ্যাত্মা*, ওঁ হল যেন ধনুষ আর আত্মা হল

যেন তীর, ওই তীরকে যখন লক্ষ্যে ছাড়ছে তখন আত্মা আর পরমাত্মা এক হয়ে যাচ্ছে। তখন আবার মনে হয় আত্মা যেন একটা বস্তু, ক্রিয়া করছে। কিন্তু এটা একটা উপমা মাত্র, বাস্তব কিছু না।

স্বামীজী এই দিন আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমে এটাই বলছেন যে, হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ বেদ, আর মোটামুটি বেদের দুটি অংশ। শব্দ 'মোটামুটি', আর সত্যিই মোটামুটি বলতে যা বোঝায়, বাস্তবিকই এটা মোটামুটি। কারণ কারুর যদি সেই রকম পাণ্ডিত্য থাকে, অধিকার যদি থাকে, লোকেরা যদি তাঁকে মানে, তিনিও বেদের এই বিভাজনগুলিকে খুব সহজেই অন্য ভাবে করে দিতে পারেন। ম্যাক্সমূলারও চেষ্টা করেছিলেন, তিনি আরও সুন্দর ভাবে বেদের সব কিছুকে গোছাতে গিয়ে দেখলেন অন্য দিক দিয়ে জিনিসগুলো আরও এলেমেলো হয়ে যাচ্ছে। তখন উনি বলে দিলেন, ঋষিরা যেমন ভাবে রেখে গেছেন এটাই ঠিক ঠিক। স্বামীজী ঠিক এই জায়গা থেকে শুরু করছেন, জ্ঞানকাণ্ড মানে যেখানে আত্মা ও আত্মজ্ঞানকে নিয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়।

আমরা এতক্ষণ যে আলোচনা করলাম, এটাকেই স্বামীজী একটা বাক্যে বলে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন। স্বামীজী যে কত বড় ঋষি ছিলেন, দেববাণী না পড়লে বোঝা যায় না। যে জিনিসগুলো আমরা জানি, সেগুলোকে স্বামীজী নিজের মত ব্যাখ্যা করে বেরিয়ে যাচ্ছেন। স্বামীজী একটা চিঠিতে লিখছেন, আগেকার ঋষিদের অনেক কথা হারিয়ে গেছে, তোমরা সবাই এক একজন ঋষি হবে, আর তোমাদের যে উপলব্ধি হবে সেই উপলব্ধি আগেকার ঋষিদের শতগুণ ছাড়িয়ে যাবে। এগুলো পড়লে বোঝা যায়, বর্তমান ভারতবর্ষ থেকে তিনি কি প্রত্যাশা করেছিলেন, অবশ্য তার সাথে এটাও যোগ করতে হবে, সত্যিই আমরা কি করছি!

উপনিষদকে বলা হয় জ্ঞানকাণ্ড, কারণ আত্মাকে নিয়ে তাঁরা আলোচনা করেন। জ্ঞান তো সবটাই, চিকিৎসা শাস্ত্রও জ্ঞান, ফিজিক্সও জ্ঞান আর গণিত শাস্ত্রও জ্ঞান, তাহলে এটাকেই কেন জ্ঞানকাণ্ড বলা হচ্ছে? জ্ঞানকাণ্ড এই জন্যই বলা হচ্ছে, তাঁরা আত্মার জ্ঞান দেন। এই বলে স্বামীজী একটা সেমিকোলন দিয়ে বলছেন; and because they do, their knowledge is approaching real knwledge, মুণ্ডকোপনিষদে বলছেন, কোনটা জানলে সবটাই জানা হয়ে যায়? ফিজিক্স, কেমেস্ট্রি, ম্যাথমেটিক্স জানা থাকলে সবটা জানা হয় না। আত্মাকে জানলে সবটাই জানা হয়ে যায়। আত্মার জ্ঞানের কাছাকাছি যেটা যায়, পুরোপুরি না, সেটা হল উপনিষদ। কোন ধর্মগ্রন্থ আত্মার জ্ঞানের ধারে কাছে যায় না। সেইজন্য স্বামীজী বারবার উপনিষদকে বলছেন চূড়ামণি (crown jewel)।

সমস্ত ধর্মের গ্রন্থগুলি হদ্দ আমাদের ঈশ্বরের কাছ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার জ্ঞান দেয়, পূর্ণ ঈশ্বর জ্ঞান কোন ধর্ম কখনই দেবে না, তাদের সাহসই নেই বলার। অন্যান্য ধর্ম স্বর্গ পর্যন্ত নিয়ে যাবে, স্বর্গ বলতে ভোগের স্বর্গ না, ঈশ্বরের কাছেরই স্বর্গ, যেখানে ঈশ্বরের আবাস, যেমন বৈকুণ্ঠধাম। কিন্তু আত্মার জ্ঞান, যেখানে এটাই সত্য যে, তুমিই সেই; যে জ্ঞানে সমস্তকে জানা হয়ে যাবে, একমাত্র আত্মজ্ঞানেই তা সম্ভব, সেইজন্য এটা হল জ্ঞান। স্বামীজী বলছেন, Knowledge of the Absolute depends upon no book, nor upon anything; it is absolute in itself. (*সেই অনন্ত পূর্ণ পরব্রহ্মের জ্ঞান কোন শাস্ত্রের উপর বা অপর কিছুর উপর নির্ভর করে না; এই জ্ঞান স্বয়ংপূর্ণ-স্বরূপ।*) অখণ্ড সচ্চিদানন্দের জ্ঞান একমাত্র নিজের উপরেই নির্ভর করে, কোন কর্ম তাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারবে না, কোন গ্রন্থ তাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারবে না। মুণ্ডকোপনিষদে পরাবিদ্যা আর অপরা বিদ্যার কথা বলছেন। অপরা বিদ্যাতে সমস্ত ধরণের বিষয় জ্ঞানের কথা বলছেন, তার মধ্যে চারটে বেদকেও নিয়ে আসা হয়েছে। বেদ এসে যাওয়াতে তার মধ্যে উপনিষদও ঢুকে গেছে। তার মানে বেদ ও উপনিষদের জ্ঞানও অপরা বিদ্যা। পরাবিদ্যাকে সেখানে বলছেন, *যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে*, যেটা দিয়ে অক্ষরকে জানা যায়, অক্ষর যিনি অবিনাশী।

মনের আয়নাকে পরিষ্কার করা

আসল যে জ্ঞান, ঠিক তার নীচেই থাকে তার শাব্দিক জ্ঞান। শাব্দিক জ্ঞান আর বাস্তবিক জ্ঞানে একটা বিরাট তফাৎ, বিরাট মানে বিরাটই। কিন্তু যদি কেউ এই জ্ঞানের ধারে কাছে থাকে, তা হল শাব্দিক জ্ঞান। বাচ্চাকে চিড়িয়াখানার ব্যাপারে বোঝান হয়েছে, চিড়িয়াখানায় বড় বড় খাঁচা থাকে, তাতে বাঘ থাকে, সিংহ

থাকে, একটা জায়গায় সাপেদের রাখা আছে, জল আছে যেখানে কুমিরদের রাখা হয়েছে। এরপর বাচ্চাকে চিড়িয়াখানায় এনে ছেড়ে দেওয়া হল। চিড়িয়াখানার অনেক কথাই সে শুনে নিয়েছে। এতক্ষণ চিড়িয়াখানার ব্যাপারে যা কিছু শুনেছে, আর বাস্তবে গিয়ে যখন চিড়িয়াখানা দেখছে, তখন দেখছে কোন relationই নেই। যদি চিড়িয়াখানার জ্ঞানের ধারে কাছে নিয়ে আসতে হয়, তাহলে তাকে চিড়িয়াখানার উপর অনেক বইটই পড়তে হবে। চিড়িয়াখানার উপর অনেক ভাল ভাল বই আছে। তখন বলবে, 'তবে কি জানো চিড়িয়াখানা নিজের চোখে না দেখলে কিছুই বুঝতে পারবে না। কিন্তু এই যে শত শত চিড়িয়াখানার উপর বই আছে, তার মধ্যে এই বইটাই হল সব থেকে শ্রেষ্ঠ'। আত্মজ্ঞানকে কারুর সাথে তুলনা করা যাবে না, কোন কিছুই আত্মজ্ঞানের কাছে নিয়ে যেতে পারবে না, আর কোন গ্রন্থ নেই যে আত্মজ্ঞানের ধারে কাছে নিয়ে যেতে পারবে। যদি কোন গ্রন্থ কাছাকাছি নিয়ে যাতে পারে, তা-হল একমাত্র উপনিষদ। যদি কেউ মনে করে থাকে বেদ আর উপনিষদ পড়ে নিলে আমি আত্মাকে, ঈশ্বরকে জেনে যাব। সত্যিই কি জানতে পারবে? না, কোন দিন জানা যাবে না। দ্বিতীয় হল অন্যান্য গ্রন্থের তো কোন প্রশ্নই নেই, কারণ বাস্তবিক অনুভূতি আর শব্দের মধ্যে বিরাট তফাৎ। শব্দের মধ্যে সব থেকে কাছাকাছি যেটা যায়, আত্মার ব্যাপারে সব থেকে ভাল বর্ণনা দিচ্ছে একমাত্র উপনিষদ।

কারণ যিনি Absolute, যিনি অক্ষর, তিনিও যা, তাঁর জ্ঞানও তাই। কারণ সেখানে কর্তা, কর্ম আর ক্রিয়া; জ্ঞান, জ্ঞেয় আর জ্ঞাতা, এই তফাৎটা নেই। এই তফাৎটা যদি থাকত, তাহলে আমরা বলতে পারতাম কোন শাস্ত্র ভাল, কোন শাস্ত্র কম ভাল। ওই জায়গাটায় কোন বিভাজন নেই, বিভাজন না থাকার জন্য বস্তুও যা, তাঁর জ্ঞানও তাই। সেই বস্তু অনন্ত, সেই জ্ঞানও অনন্ত, দুটো অভেদ। সেইজন্য ঐ জ্ঞান কোন গ্রন্থ থেকে পাওয়া যাবে না। No amout of study will give this knowledge; it is not theory, it is realization. (*বহু শাস্ত্রপাঠেও এই জ্ঞান লাভ হয় না; এ কোন মতবিশেষ নয়, এই জ্ঞান অপরোক্ষানুভূতি।*) যেটা আগে বলা হল। অদ্বৈত জ্ঞান, আত্মার জ্ঞান কোন থিয়োরী না, পুরোপুরি অনুভূতির ব্যাপার, যিনি অনুভব করেছেন, তিনি করেছেন, যিনি করেননি তিনি করেননি। কেউ চারটে বই বেশি পড়েছে, কেউ চারটে বই কম পড়েছে, তাতে কিছু আসে যায় না। যে হিমালয়ে গেছে, হিমালয়কে কাছ থেকে দেখেছে, সে এবার সবার থেকে আলাদা হয়ে গেল। কিন্তু হিমালয়ের উপর যে শুধু বই পড়েছে, কেউ চারটে বই বেশি পড়েছে, কেউ চারটে বই কম পড়েছে, তাতে এমন কিছু তফাৎ হয় না, যাহা বাহান্ন তাহা তিপ্পান্ন।

Cleanse the dust from the mirror, purify your own mind, and in a flash you know that you are Brahman. (*নিজের মনকে পবিত্র কর, তা হলেই দপ্ করে তোমার এই জ্ঞানের উদয় হবে যে, তুমি সেই ব্রহ্ম।*) আয়নার উপর প্রচুর নামকরা সব কথা আছে। উর্দুতে একটা বিখ্যাত সায়ের আছে, যার শেষ লাইনে বলছেন, *গর্দ্ চেহেরে পর জমিঁ কি ম্যায় আয়না সাফ্ করতা গয়া*, ধুলো আমার চেহারায় লেগে আছে, আর আমি আয়নাকে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করে যাচ্ছি, আর চেহারাকে কিছুতেই আমি সুন্দর দেখতে করতে পারছিলাম না। দুটো সত্য, একটা চেহারা, আরেকটা আয়না। চেহারার ক্ষেত্রে ধুলো জমে যেতে পারে, আত্মার ক্ষেত্রে ধুলো জমে না, কারণ আত্মা সব সময় শুদ্ধ স্বভাবের। আত্মার আয়না হল মন, ব্যষ্টি মন আর সমষ্টি মন। নিজের চেহারা দেখার জন্য আয়নার দরকার, নিজেকেও দেখার জন্য আয়নার সামনে দাঁড়াতে হবে। মনটাই আয়না। উর্দুর শায়েরে যে বলছেন, চেহারায় ধুলো জমে আছে আর আমি আয়না পরিষ্কার করছি, এখানে তা না চেহারা সব সময় পরিষ্কার, চেহারাটা ঠিক আছে, ধুলো আয়নাতে জমেছে। আয়না পরিষ্কার কর, চেহারা দেখতে পারবে। আয়নাটাই মন। মন আমাকে objectify করে দিচ্ছে। আমি অমুক, আমি সন্ন্যাসী, আমি শাস্ত্র পড়াচ্ছি, আমি, আমি, আমি লেগেই আছে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কতবার যে আমি আমি বলছি, কতবার যে আমি ভাবি, আর কতবার আমিকে নিয়ে অপরকে বলি, তুমি আমাকে কি মনে করেছ! কিন্তু প্রত্যেকবারই আমির যে ছবি মনে গিয়ে পড়ছে, সেই আয়নাটা এত নোংরা যে আমির ছবিটা পরিষ্কার আসছে না। মনকে একবার পরিষ্কার করে দিলে, দেখা যাবে, এই আমি সেই শুদ্ধ আত্মা। আর এই জ্ঞান একটু একটু করে আসে না, স্বামীজী বলছেন, in a flash you know that you are Brahman, দপ্ করে জ্ঞান হয়ে যাবে।

চীন দেশের তাও সম্প্রদায়ে অনেক ভাল ভাল গল্প আছে, একটা গল্পে বলছে, এক জায়গায় একজন তলোয়ারের ওস্তাদ আছে, একটি লোক তার কাছে তলোয়ার শিখতে গেছে। ওস্তাদের কাছে যাওয়ার পর ওস্তাদ তাকে বলছে, 'তোমাকে দেখে তো মনে হচ্ছে তলোয়ার শিখতে তোমার ছয় বছর লাগবে, ছয় বছর হলে তুমি তলোয়ার চালানো একটু শিখতে পারবে'। লোকটি বলল, আমার মাত্র ছ'মাস সময় আছে, আপনাকে ছ'মাসে আমাকে শিখিয়ে দিতে হবে'। ওস্তাদ বলল, 'ঠিক আছে তুমি এখানে সব সময় থাক, আর সারাদিনই তোমাকে ট্রেনিং দিয়ে যাব'। এবার জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে কি কি কাজ করতে হবে'? সব কাজ বুঝিয়ে দেওয়া হল। এবার কি হল, লোকটি হয়ত রান্না করছে, ওস্তাদ হঠাৎ লাফ দিয়ে তার সামনে এসে তলোয়ারের কোপ মারতে গেছে। স্নান করছে, কোথা থেকে দুম্ করে সে তলোয়ার নিয়ে ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। লোকটির এখন আতঙ্ক ধরে গেছে, এই বুঝি গুরু আমাকে তলোয়ারের কোপ মারল। ওস্তাদের কাছে আসল তলোয়ার, তাই ভয়ে সামনে থেকে সরে আসতে হচ্ছে। সব সময় চিন্তা করে যাচ্ছে, এই বুঝি আমাকে মারল, এই করে করে তার সচেতনার মাত্রাটা বেড়ে গেল। এই ভাবে ছয় মাস হতে যাচ্ছে, পুরো মনটা ওর পরিষ্কার হয়ে গেল, তলোয়ার বিদ্যা শিখে গেল। তাও এর গল্প যখনই ওরা বলে সেখানে ওরা এই flash জিনিসটাকে খুব মূল্য দেয়। ফিজিক্স, কেমেস্ট্রি পড়ার সময় আমাদের একটু একটু করে জ্ঞান হয়। অন্ধকার ঘরে আলো জ্বালালে অন্ধকার একটু একটু করে যায় না, একবারে আলো এসে গিয়ে অন্ধকার চলে যায়। আত্মজ্ঞান এই ঝট্ করে আলো আসার মত। কিভাবে আসে? আয়নাকে যদি পরিষ্কার করা হয়, মনের আবর্জনা গুলিকে যদি সব পরিষ্কার করে দেওয়া হয়, মন আর কোথাও, কোন কিছুর সাথে, কারুর সাথে জড়িয়ে নেই আর শেষ অবস্থায় আমিত্বের সাথেও জড়িয়ে নেই। আমিত্ব জিনিসটা এমন বাজে জিনিস যে, কল্পনাই করা যায় না। বলবে, আমি একটু বিশ্রাম করব, একটু শুয়ে নিয়ে করছি। আবার বলছে, শরীরটা ভাল লাগছে না। সব আমির খেলা, আমি শরীর, আমার বিশ্রাম চাই। এটাই সর্বনাশের মূল হয়ে গেল, এরপর আর আত্মজ্ঞান কি করে আসবে! আমাকে কাজ করতে হবে, দায়ীত্ব রূপে এসে আমি নিজেকে গুরুত্ববান মনে করছি। যীশু তাঁর শিষ্যকে বললেন, let the dead burries dead, জগৎ নিজেকে দেখবে, জগৎকে নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না, তুমি নিজের পথ ধরে এগিয়ে চল। কিংবা মনে করছি, খুব জমিয়ে একটু ধ্যান করি, লোকে দেখবে আমি ধ্যান করছি। কোন দিক দিয়ে যে আমি ঢুকবে, দেহরূপী আমি ঢুকবে, মনরূপী আমি ঢুকবে, বুদ্ধিরূপী আমি ঢুকবে, অহঙ্কাররূপী আমি ঢুকবে, বলা অসম্ভব, কিন্তু ঢুকবে। ঢুকে আসল যে জায়গায় আত্মার প্রতিফলন হবে, সেটা হতে দেবে না। একটু বিচার করতে গেলে দেখা যাবে, কিছুতেই আত্মার প্রতিচ্ছবি হতে দিচ্ছে না। আমি বলতে মনরূপী আয়না, ওখান থেকে বেরোতেই দিচ্ছে না। যদি ওখান থেকে বেরিয়ে আসা যায়, যদি আয়নাকে পরিষ্কার করা হয়, আত্মজ্ঞান সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

ঈশ্বর প্রেম জাগলেই জগতের কল্যাণ করা সম্ভব

এরপর স্বামীজী বেদান্তের শেষ কথা বলছেন, God exists, not birth, nor change, nor good nor evil; all is Brahman. (*শুধু ব্রহ্মই আছেন –জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, দুঃখ নেই, কষ্ট নেই, নরহত্যা নেই, কোনরূপ পরিণাম নেই, ভালও নেই, মন্দও নেই।*) এখানে God exists বলতে স্বামীজী বলতে চাইছেন, ঈশ্বরই আছেন। বেদান্তের শেষ কথা হল, যা কিছু আমরা অনুভব করছি, জীবন, জন্ম, মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, ভাল-মন, এগুলো কিছুই না, শুধু ঈশ্বরই আছেন। এটা স্বামীজী নূতন কিছু বলছেন না, আমাদের বেদেই আছে *ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি*, ভগবানই সব কিছু হয়েছেন। আমরা খুন দেখছি, পাপ দেখছি, পূণ্য দেখছি, কিন্তু আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে তিনিই আছেন, তিনি ছাড়া কিছুই নেই। স্বামীজী বলছেন, We take the 'rope for the serpent', the error is ours. (*আমরা সবাই রজ্জুকে সর্প মনে করছি, ভ্রম আমাদেরই।*) রজ্জুতে যে সর্প ভ্রম হচ্ছে তাতে রজ্জুরও দোষ নেই, সর্পেরও দোষ নেই, দোষ রয়েছে আমাদের নিজেদের মধ্যে। আমাদের মনটা এমন যে, আমরা সত্যকে সত্য রূপে দেখতে পাই না বলে দড়িতে সাপ দেখছি। যেখানে ভগবানকে দেখার কথা, সেখানে নানান রকম আলতু ফালতু জিনিস দেখছি।

সেইজন্য স্বামীজী বলছেন, We can only do good when we love God and He reflects our love, (*আমরা তখনই কেবল জগতের কল্যাণ করতে পারি, যখন আমরা ভগবানকে*

ভালবাসি, এবং তিনিও আমাদের ভালোবাসেন।) খ্রীশ্চান চ্যারিটি নিয়ে বলার সময় বিদেশীরা বলে, হিন্দুদের মধ্যে সেবার ভাব কোন কালেই ছিল না, স্বামীজী বিদেশে গিয়ে শিখে এসে ভারতে সেবার কার্য শুরু করেন। একেবারেই ভুল তথ্য, আমাদের এটা খুব পুরনো ভাব। ইষ্টাপূর্ত, এই ধারণাগুলো আমাদের খুব প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। হিন্দুদের বিভিন্ন সময় দান করার রীতি আছে, বিভিন্ন সময় সমাজে জনসাধারণের জন্য কাজ করতে বলা হয়, এগুলো আমাদের এখানে বহু প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। এখান থেকে আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়ে স্বামীজী বলছেন, তুমি যদি ঠিক ঠিক কারুর সেবা করতে চাও, কারুর কল্যাণ করতে চাও, তাহলে তাকে ভগবান রূপে দেখ। আমি যাকে ভগবান দেখছি, আর আমার ভিতরে যে ভালবাসা, সেখান থেকে প্রতিফিলিত হয়ে আমার কাছে আসছে। তা হলেই ঠিক ঠিক সেবা হয়, তা নাহলে সেবা হয় না। ঠাকুরও কথামৃতে বলছেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তোমার অস্তিত্ব হল, বর্ষাকালে গঙ্গায় যে কাঁকড়া হয় তার থেকেও নগণ্য, তুমি কার সেবা করবে! এই সেবা ঠাকুর বলছেন, যেখানে কারুর অহঙ্কার আসে, আমি বোধটা আসে, আমি জগতের উদ্ধার করব, আমি জগতের উপকার করব, আমি তোমার ভাল করব, আমি তোমাদের শিক্ষা দেব, সেখানে এই ভাবগুলির কথা বলছেন।

এই ভাবগুলো আশ্চর্য ভাবে খ্রীশ্চানদের মধ্যে বেশি আছে। মুসলমানরা আবার সবারই ভাল করার জন্য লেগে আছে। খ্রীশ্চানরা বলে, আমি তোমাকে যীশুর কাছে নিয়ে যাব। আমার যীশুকে লাগবে না, আমি যেতে চাই না। মুসলমানরা বলছে, তুমি যদি আল্লার কাছে না আস, তাহলে তুমি জাহান্নমে যাবে। হিন্দুদের কাছে এসব জিনিস নেই। হিন্দুরা বলবে, তুমি যদি কারুর ভাল করতে চাও, তুমি কি তাকে ভগবান রূপে দেখছ, দরিদ্রকে নারায়ণ রূপে, রোগীকে নারায়ণ রূপে দেখছ? যদি না দেখ, তাহলে বুঝবে তোমাকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। আমি যদি না দেখে থাকি তাহলে কি আমি লোকের ভাল করা বন্ধ করে দেব? কখনই বন্ধ করে দিতে হবে না। লোকের ভাল করে যেতে হবে, কিন্তু উদ্দেশ্যটা যেন মাথা থেকে হারিয়ে না যায়। আজকে যে ক্রিকেট খেলতে নামছে, সে একদিনেই শচীন তেণ্ডুলকার হয়ে যাবে না। কিন্তু যদি বলে, আমার তেণ্ডুলকার হওয়ার দরকার নেই, তাহলে তো সে হেরে গেল। দুটোই করতে হবে, চেষ্টা করে যেতে হবে, সাফল্য নাও আসতে পারে, সেটাকে মেনে নিয়ে চলতে হবে, তার সাথে আদর্শকে কখনই ভুলে যাওয়া চলবে না। আদর্শ হল, যার সেবা করছি তাকে ভগবান রূপে দেখা।

কিন্তু তারপরেই স্বামীজী যেটা বলছেন সেখানে আবার আচার্য শঙ্করের superimposition এসে গেল, যেখানে আমিও ভুল দেখছি, সেও ভুল দেখছে। স্বামীজী বলছেন, The murderer is God, and the 'clothing of murderer' is only superimposed upon him. (*হত্যাকারী ব্যক্তিও ব্রহ্মস্বরূপ – তার উপর হত্যাকারীরূপ যে আবরণ রয়েছে, সেটা তাতে অধ্যস্ত বা আরোপিত হয়েছে মাত্র।*) যে খুন করে বেড়াচ্ছে, সেও সেই ভগবান কিন্তু পরিধান করে আছে একজন খুনীর পোষাক। সেইজন্য বলা হয় শাস্ত্রীয় কথা, উচ্চ আদর্শের কথা সাধারণ লোকের কাছে বলতে নেই। সাধারণ মানুষ এই ধরণের উচ্চ আদর্শের কথা সহজে নিতে পারে না। যেখানে যেখানে ইদানিং কালে যে নোংরামি, বদমাইশি দেখা যাচ্ছে, যদি বেদান্তের দৃষ্টিতে দেখা হয় তখন এই ভাবেই দেখতে হবে। সেইজন্য স্বামীজী বলছেন, Take him by the hand and tell him the truth, (*আস্তে আস্তে হাতে হাত ধরে তাকে এই সত্যটা জানিয়ে দাও।*) এই জিনিসটা এই জায়গাতে আসে। এর আগে আমরা একটা লাইন পেরিয়ে এসেছি, যেখানে বলছেন পাপ আর পাপীকে আলাদা করে দেখা যায় না। যেমন লাল রঙ আর লালত্বকে আমরা আলাদা করে দেখতে পারি না, লাল রঙকে আমরা একটা ফুলে বা একটা কাপড়ে দেখছি। লালত্ব, লাল রঙের ভাবকে আমরা আলাদা করে চিন্তা করতে পারবই না, আমাদের মস্তিষ্ক সেভাবে তৈরীই হয়নি। একটু পরেই ব্রহ্মসূত্রে রামানুজের ভাষ্যে স্বামীজী ঢুকবেন, রামানুজ এটাকে আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেলেন, সচ্চিদানন্দের সৎ, চিৎ ও আনন্দকেও তিনি অস্তিত্ব রূপে নিতে পারলেন না, সৎ, চিৎ ও আনন্দকে তিনি সচ্চিদানন্দের উপর গুণ রূপে চাপিয়ে দিলেন। যতক্ষণ গুণ না মিশিয়ে দেওয়া হয়, ততক্ষণ গুণ আর গুণী দুটোকে আলাদা করে দেখা যায় না, আমাদের মস্তিষ্কের সেই ক্ষমতাই নেই। সেইজন্য আমরা এর আগে পাপ আর পাপীকে আলাদা করে দেখার চেষ্টা করেছিলাম। একটা কিছুকে ওর উপর চাপিয়ে দিতে হয়। এই ভাবটাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে স্বামীজী বলছেন, তুমি যখন কোন খুনী

বা পাপীকে দেখলে, যাও তুমি গিয়ে ওর হাতটা ধর, তাকে বল তুমি কেন এমন করছ! তুমি জেনে নাও তুমি হলে নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত আত্মা।

উত্তরাখণ্ডের যে বেদান্ত, অর্থাৎ হরিদ্বার থেকে গঙ্গোত্রী পর্যন্ত যে বেদান্ত আর রামকৃষ্ণের যে বেদান্ত, এই একটা বাক্য দুটোকে পুরো আলাদা করে দিল। প্রচলিত বেদান্ত আর রামকৃষ্ণ-বেদান্ত কিভাবে আলাদা হয়ে গেল, এটাকে ধরা খুব মুশকিল। রামকৃষ্ণ মিশনের ইতিহাস দেখা যায়, স্বামীজী যখন সেবার আদর্শ নিয়ে এলেন তখন অনেক যুবক প্রেরণা পেলেন, প্রচুর যুবক এগিয়ে এসে কাজ করতে নেমে পড়ল। যার প্রেরণাতে স্বামী কল্যাণানন্দজী, স্বামী নিশ্চয়ানন্দজীর মত যুবকরা চলে গেলে উত্তরাখণ্ডে। সেখানে গিয়ে তাঁরা সাধুদের সেবা করতে শুরু করলেন। সাধুরা তাঁদের নাম দিলেন ভাঙ্গী সাধু। কারণ উত্তরাখণ্ডের সাধুদের কাছে বেদান্ত মানে, ত্রিকাল মে জগৎ নহি হ্যায়। সত্যিই তো তাই, জগৎ গতকাল ছিল না, আজ আছে, আগামীকাল থাকবে না। তুমিও তো গতকাল ছিলে না, আগামীকাল থাকবে না, তাই বলে তোমার মুণ্ডুটা কি কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া হবে! দক্ষিণেশ্বরে একজন ছিল যে মুখে বেদান্তের বড় বড় কথা বলত আর অন্য দিকে নোংরামি করে বেড়াত। ঠাকুর তাকে সেই কথা বলাতে বলছে যে, সবটাই মিথ্যা, আমার এই কাজগুলোও মিথ্যা। ঠাকুর রেগেমেগে বলছেন, তোমার এমন বেদান্ত জ্ঞানে আমি ইত্যাদি করি।

একটা জিনিসকে উপর উপর জানা আর ঠিক ঠিক জানাতে একটু তফাৎ থাকে। ওই একটু তফাতের জন্য বিরাট তফাৎ হয়ে যায়। জল একশ ডিগ্রিতে সিদ্ধ করে, ওই একশ ডিগ্রিতে জলও থাকে, বাষ্পও থাকে, কিন্তু জল আর বাষ্পে অনেক তফাৎ হয়ে যায়। ৫৩৬ ক্যালরি তার উপর ধাক্কা মারতে হয় তবে গিয়ে জল বাষ্প হয়, আমাদের ভাষায় একশ ডিগ্রিতে আরও ৫৩৬ ডিগ্রি যোগ করতে হয় তবে গিয়ে তার অবস্থার পরিবর্তন হয়। একজন জানে আর একজন জ্ঞানীর মধ্যে ওই ৫৩৬ ক্যালরির তফাৎ হয়ে যায়। জিরো ডিগ্রিতে বরফও থাকে, জিরো ডিগ্রিতে জলও থাকে। কিন্তু বরফকে জল করার জন্য জিরো ডিগ্রি বরফকে জিরো ডিগ্রি জল করতে গিয়ে ৮০ ক্যালরি দিতে হয়, তার মানে অন্য দিকে ওই ৮০ ক্যালরি দিলে জিরো ডিগ্রিতে জল আশি ডিগ্রি হিটে চলে যাবে।

অনেক আগে লণ্ডনে একজন মার্কেটিংএর উপর সফটওয়ারে একটা খুব সুন্দর প্রোগ্রাম বানিয়েছিল। মার্কেটে একটা কমোডিটি ছাড়া হলে জিনিসটা কতটা চলবে, আর কতটা চলবে না, ওই নূতন প্রোগ্রাম দিয়ে ওরা টেস্ট করত। প্রোগ্রামটার প্রচুর দাম। কিন্তু লোকেরা বুঝতে পারছে না যে এটা সাংঘাতিক কিছু। আমেরিকা থেকে এক বড় কোম্পানি এসেছে প্রোগ্রামের ব্যাপারে জানতে। ওদের চীফ ম্যানেজার কোম্পানির লোকেদের অনেক ভাবে বোঝানর চেষ্টা করছে, কিন্তু সে ওদের কিছুতেই ব্যাপারটা বোঝাতে পারছে না। প্রোগ্রামের আসল যিনি ডিজাইনার ছিলেন, সেদিন তিনি কোন কারণে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁকে গিয়ে জানালো হল, এরা'তো বিরক্ত হয়ে যাচ্ছে, কেনা তো দূরের কথা, কিছুতেই বুঝতে রাজী হচ্ছে না। তিনি একটু সময় নিয়ে বোঝাতে গেলেন। তিনি গিয়ে দু মিনিটের মধ্যে প্রোগামের ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন। আপনি যদি মই বেয়ে কোন ছাদে উঠতে যান, তার আগে আপনি মইটাকে একটু ঝাঁকিয়ে দেখে নেবেন যে মইটা শক্তপোক্ত আছে কিনা। যদি দেখেন মইটা স্টেডি আছে তবেই মই বেয়ে আপনি ছাদে উঠবেন। আপনি মইটা দিচ্ছেন, আর আমার প্রোগ্রাম ওই ঝাঁকুনিটা দিচ্ছে। আমি ওই ঝাঁকুনি দিয়ে টেস্ট করে দিই মইটা স্থির থাকবে কি থাকবে না। সঙ্গে সঙ্গে ওরা প্রোগ্রামটা কিনে নিল। একজন জ্ঞানী আর একজন মাস্টারের মধ্যে এটাই তফাৎ।

এত যে সাধুসঙ্গ, সম্প্রদায় বিদ্যার কথা বলা হয়, তা এই কারণেই বলা হয়। যাঁরাই বেদান্ত পড়াতে যান, তাঁদেরকে প্রথমেই জিজ্ঞেস করতে হবে, আপনি কত দিন, কত ঘন্টা কোন কোন সাধুর সঙ্গ করেছেন? আচার্য শঙ্কর বলছেন, যে গুরুর মুখ থেকে সম্প্রদায় বিদ্যা শোনেনি, যে অসম্প্রদায় আর সে যদি সমস্ত শাস্ত্র জেনে থাকে, তাকে মুর্খের মত ত্যাগ করবে। ঠাকুর এই কারণে বারবার সাধুসঙ্গের কথা বলছেন। নিজে থেকে শাস্ত্র পড়ছে, নিজে থেকে কল্পনা করছে, সেখানে ছোট ছোট অনেক ফাঁক তৈরী হয়ে যায়। ওই ছোট ফাঁকটাই পরে গিয়ে একটা বিভীষিকার আকার ধারণ করে নেবে। বেদান্তের বিভীষিকা দেশকে প্রায় ডুবিয়ে দিয়েছিল, এখন আবার ডোবাচ্ছে, স্বামীজী তার মোড়টা এই একটা বাক্যে ঘুরিয়ে দিলেন।

একটা নামকরা বই আছে যার নাম, Zen and The Art of Motorcycle Maintenance, বইটা লিখতে লেখকের প্রায় বারো বছর লেগেছিল। লেখার পর তিনি যত প্রকাশকদের কাছে নিয়ে গেছেন সবাই তার বইটাকে প্রত্যাখান করে দিয়েছে। শেষে যে প্রকাশক বইটা ছাপল, মাঝখানে থেকে সে বেস্ট সেলার হয়ে গেল। ইদানিং কালে যত বইতে Zen দিয়ে থাকবে, বোঝা যায় যে ওই বইটার কপি করছে। লেখকের দ্বিতীয় বইটা পুরোপুরি ফ্লপ হয়ে গেল। কাহিনীটা হল, দর্শন শাস্ত্রের একজন অধ্যাপকের মনে প্রশ্ন উঠল, প্লেটো যে কোয়ালিটির কথা বলছেন, এই কোয়ালিটি জিনিসটা কি? অধ্যাপক মোটর সাইকেলে একটা বিরাট লম্বা সফরে যাচ্ছেন। যেতে যেতে দর্শন জগতের অনেক কিছু তাঁর মাথার মধ্যে জেগে উঠছে। অত্যন্ত কঠিন বিষয়কে একটা সফরের মধ্য দিয়ে সহজ করার চেষ্টা হচ্ছে। ঘুরতে ঘুরতে অধ্যাপক ভারতে এসেছেন। ভারতের একটা নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক পণ্ডিত অধ্যাপক, যিনি অদ্বৈতের উপর লেকচার দিতেন, তাঁকে গিয়ে জিজ্ঞেস করছেন, ‘এখানে যুদ্ধে এত লোক মারা যাচ্ছে, এই ব্যাপারে আপনার অদ্বৈত কি বলছে’? অদ্বৈতের অধ্যাপক বলছেন, ‘আমাদের কাছে সবটাই মিথ্যা’। উনি লিখছেন, ‘সেই মুহুর্তে আমি ওনার লেকচার শোনা বন্ধ করলাম। প্রথম প্লেন ধরে আমি ভারত থেকে ফেরত চলে এলাম’। এই ঘটনাটা পড়ার পর আমাদের এই ভেবে মনে কষ্ট হবে যে, অদ্বৈত বেদান্তকে এই বইতে কত নেগেটিভ ভাবে প্রেজেন্ট করা হয়েছে! তাও আবার পুরোটাই ভুল ভাবে। প্রথম কথা বইটা চারশ পাঁচশ পাতার হবে। পুরো ভারতের দর্শনকে অদ্বৈতে নিয়ে আসছে। সেখানে এক পাতাও লাগছে না। আর ওইটুকুর মধ্যে ভারতের দর্শনকে পুরো ভুল বলে দিয়ে বেরিয়ে চলে আসছে। অদ্বৈত কখনই বলে না যে, এই যে যুদ্ধ হচ্ছে এটা মিথ্যা, বিধবার চোখের জল মিথ্যা, অনাথ শিশুর কান্না মিথ্যা, আমার দুষ্কর্ম গুলি মিথ্যা। অদ্বৈত বেদান্ত কি বলে, কি করতে হবে, স্বামীজী এটাই বলছেন - Take him by the hand and tell him the truth। পরম করুণা নিয়ে তার হাতটা গিয়ে ধরো, ধরে তাকে বল, ‘তুমি কি জানো তোমার ভিতরে অনন্ত শক্তি আছে’? সে বলছে, ‘আমি জানি না’। ‘তুমি আমার সাথে এসো, আমি তোমাকে সাহায্য করব। তোমাকে আমি সেইখানে নিয়ে যাব, যেখানে তুমি এই কান্না, এই দুঃখ থেকে মুক্তি পাবে’। ‘কি ভাবে’? ‘আমি তোমাকে অন্ন দান করব, আমি তোমাকে বিদ্যা দান করব। তুমি যে মৃত্যুর মুখে পড়ে আছ, আমি তোমাকে সেখান থেকে তুলে এনে জীবন দান করব, তোমাকে ধর্ম দান করব। এই যে বিভিন্ন রকমের দান, মানুষের যে পঞ্চকোষ রয়েছে, যেখানে তোমার শরীরের যা যা দরকার, মনের যা যা দরকার, তোমার আত্মার যা যা দরকার, আমি তোমাকে সমস্ত দান করব’।

রামকৃষ্ণ মিশন এই আদর্শ নিয়েই চলেছে। রামকৃষ্ণ মিশন তো বলতে পারত, ইংরেজদের এই যে দুঃশাসন চলছে, দেশে যে দুর্ভোগ, দুর্ভিক্ষ, বন্যা চলছে, এগুলো সবই মিথ্যা। কিন্তু স্বামীজী এই ধরণের কথা কোথাও বলছেন না। স্বামীজী বলছেন, আমি এমন একটা মেশিন তৈরী করে যাব, যেটাকে অন্তত ভারতে কেউ দাবাতে পারবে না। স্বামীজী মিসেস ব্লজেটের অতিথি ছিলেন, তাঁকে স্বামীজী এই কথা বলেছিলেন। স্বামীজী নূতন কিছু বলেননি, আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আমাদের যাঁরা বেদান্তের পণ্ডিত শিক্ষকরা ছিলেন, তাঁরা যে কি ছিলেন, বড়দের নামে তো কিছু বলা যায় না, আমাদের বাকিটা বুঝে নিতে হবে। আচার্য শঙ্কর সাধারণ লোকেদের বলছেন, ভজ গোবিন্দম্ ভজ গোবিন্দম্ দেয়ম্ দীনজনায় নিত্যম্, তুমি দান দীন কাঙালীদের দান কর। সেখান থেকে পণ্ডিতরা শিক্ষা দিলেন, সবটাই মিথ্যা। রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুরা যখন উত্তরাখণ্ডে সেবাকার্য করছেন, তখন সেখানকার বেদান্তীরা তাঁদের বলছে, ভাঙ্গী সাধু। কোথাও দেশ বেদান্তকে বুঝতে ভুল করেছে।

স্বামীজী বেদান্তকে বলছেন, Be and make। ‘তুমি কি বুঝেছ যে তুমি শুদ্ধ আত্মা’? ‘না বুঝিনি’। ‘খুব ভাল কথা, তাহলে তোমার আশেপাশে যারা আছে, তাদের কাছে গিয়ে তাদের হাতটা ধর, আর বলো, দেখো আমি বইতে পড়েছি, আমি শুদ্ধ আত্মা তুমিও শুদ্ধ আত্মা, চলো আমরা দুজনে এক পথে চলি, আমিও যে পথে চলব তুমিও সেই পথে চলবে। শুদ্ধ আত্মা মানেই হল, তোমার দেহের যতটুকু প্রয়োজন সেটুকুর ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ দেহ যদি ভাল না থাকে, মন যদি সতেজ না থাকে, তুমি কি করে সেখানে পৌঁছাবে’! একটা সাধারণ অঙ্কও যদি কেউ শিখতে চায় তার শরীর মন ভাল থাকতে হবে। ইদানিং সব জায়গার অবস্থা আগের থেকে অনেক ভাল হয়েছে। আগেকার দিনে দেশে অভাব ছিল, তাও তখন যদি বাড়ির কোন ছেলে ভাল পড়াশোনা করছে দেখত, তাকে ভাল পুষ্টিকর খাবার দিত। কারণ বুদ্ধি বিকাশের জন্য ভাল খাওয়া-দাওয়ার দরকার। যারা কায়িক পরিশ্রম করে তাদের সাধারণ খাওয়াটাই বেশি পরিমাণে লাগে। কিন্তু

যাদের কাজে মস্তিষ্কের বেশি পরিশ্রম হয়, যে কাজে বুদ্ধির বেশি খাটনি হয়, তাদেরও পেট ভরাতে হয়, কিন্তু খাদ্য পুষ্টিবর্ধক ও সূক্ষ্ম হতে হবে। যাঁরা আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জনের দিকে যান, তাঁদের খাওয়ারটা আরও পুষ্টিকর ও সূক্ষ্মতা দরকার।

যাঁরা এই শাস্ত্রগুলি পড়েছেন, পড়ে বুঝেছেন, যে খুন করে বেড়ায়, ছিনতাই করে বেড়ায়, শীলহানি করে বেড়ায়, তাঁদের প্রথম কাজ হল তাদের হাতটা গিয়ে ধরা। খুব মিষ্টি করে, আদর করে বলা, তুমি আসলে অন্য রকম, কেন তুমি এসব করছ। সে কি তাঁর কথা শুনবে। অবশ্যই শুনবে না, বলবে বেশ করছি, আপনি উপদেশ দিতে আসবেন না। তাকে বোঝান যে, আমি তোমাকে করতে দেব না, তোমার কিসের সমস্যা? চল আমরা নিজের বসে সমস্যার সমাধান বার করে নেব। যার চোখে জল, তার জন্য তুমি কি করতে পার নিজেই ভেবে দেখ। অনাথ শিশুর মুখে অন্ন কিভাবে জুটবে, তার শিক্ষার ব্যবস্থা কিভাবে করা যাবে, তার পোষাকের কি ব্যবস্থা করা যেতে পারে, সেটা ভেবে দেখ আর সেই অনুসারে সাধ্যমত চেষ্টা করে যাও। স্বামীজীর এই একটি লাইনকে যদি মুছে দিয়ে সরিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে পুরো বেদান্ত মুখ থুবড়ে পড়বে।

কিছু কিছু সন্ন্যাসীরা আছেন, যাঁরা উত্তরাখণ্ডে তপস্যার জন্য যান, কিছু দিন ওখানে থেকে তপস্যা করে ফিরে আসার পর ওখানকার বেদান্তের ভাব বদহজম করে নিজেদের বড় বেদান্তী মনে করতে থাকেন আর স্বপ্নাবস্থা, নিদ্রাবস্থা আর জাগ্রত অবস্থা নিয়ে এমন এমন বড় বড় কথা বলতে থাকেন যে, শুনলে মাথা ঘুরে যায়। অত কি ভাবার আছে, খুব সাধারণ জিনিস, তুমি শুদ্ধ আত্মা, তুমি অনন্ত, তোমার মধ্যে অনন্ত শক্তি, যে কোন ধরণের সীমাবদ্ধতা যদি তোমার মধ্যে আসে যেটা তোমাকে ক্ষুদ্র করে দিচ্ছে, হয় সেটাকে ছুড়ে ফেলে দাও, ছুড়ে যদি না ফেলতে পারো তাহলে বেরিয়ে আসার চেষ্টা কর। আশে পাশে যাদেরই দেখবে যারা নিজেদের সীমিত করে নিচ্ছে, তুমি গিয়ে তাদের পাশে দাঁড়াও, তাকে তুমি বেদান্ত যতটুকু বুঝেছ, সেইভাবে ভালবাসা দিয়ে বোঝাও।

ভালবাসায় মার খেয়ে যে হা হুতাশ করছে, গলায় দড়ি দিতে চাইছে, তাকে বোঝাও, এটা কি ভালবাসা? ভালবাসা মানুষকে বিস্তার করে, উদার করে, শক্তিশালী করে আর সেখানে তোমাকে ভালবাসা কি করে বিমর্ষ করবে, হতাশায় ডুবিয়ে দেবে! এই ভালবাসা কিসের ভালবাসা, যে ভালবাসা চোখের জল নিয়ে আসে সেই ভালবাসা কখনই কোন ভালবাসা নয়। শিশু যখন মায়ের কোলে থাকে তখন তার শক্তি ও সাহস বেড়ে যায়। এই ভালবাসা তোমাকে বিস্তার করার বদলে সীমিত করে দিচ্ছে। তার মানে, এটা আর যাই হোক ভালবাসা কোন ভাবেই হতে পারে না। কারণ ভালবাসার একটাই কাজ, ভালবাসা তোমাকে ডানা বিস্তার করবার জন্য জায়গা দেবে। ছেলে মায়ের কথা শুনতে চাইছে না, ছেলে সব ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে যেতে চাইছে, মা তখন চোখের জলে ভাসিয়ে দিচ্ছে। তার মানে, মায়ের ছেলের প্রতি কোন দিনই ভালবাসা ছিল না, মা নিজেকেও সীমিত করে রেখছে, ছেলেকেও সীমিত করে রাখতে চাইছে।

স্বামীজী এর থেকেও এগিয়ে গিয়ে খুনীকে নিয়ে বলছেন, তুমি তো খুন করতেই পারো না, খুন করতে চাওয়া মানেই তুমি নিজেকে শরীর মনে করছ বা খুব বেশি হলে তুমি নিজেকে মন বলে মনে করছ। মন কেন? কারণ মনের মধ্যে হিংসা বৃত্তিকে প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে তাকে প্রবল করে দিয়েছ, ওকে আমি শেষ করব, শেষ না করা পর্যন্ত আমি শান্তি পাবো না। তুমি নিজেকে তোমার মনের সেই অবস্থার সাথে জুড়ে রেখেছ, ওখান থেকে বেরিয়ে এসো। ঠিক এভাবেই ভগবান বুদ্ধ অঙ্গুলিমালের মধ্যে এক সদর্থক পরিবর্তন এনে দিলেন। অঙ্গুলিমাল ঠিক করে নিয়েছে সে হাজারটা লোকের মুণ্ডু কাটবে, মনের মধ্যে যে একটা হিংসার ভাব, ওই ভাবের সাথে অঙ্গুলিমাল তার আমিত্বকে জুড়ে রেখেছে। ভগবান বুদ্ধ ওই আমিত্বটা, যে আমিত্বটা হিংসার সাথে জুড়ে রয়েছে, সেটা থেকে অঙ্গুলিমালকে সরিয়ে নিয়ে এলেন। নদী দিয়ে নৌকা যেতে যেতে একটা চড়ায় আটকে গেছে, ভগবান বুদ্ধ একটা ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিলেন, নৌকা আবার প্রবহামান হয়ে নিজের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে গেল। যে পথ নির্বাণের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, ভগবান বুদ্ধের একটা ধাক্কাতে অঙ্গুলিমাল সেই পথ ধরে আবার প্রবাহমান হয়ে গেল।

অদ্বৈত বেদান্তে বা যে কোন বেদান্তে বা যে কোন ভক্তিশাস্ত্রে এই একই জিনিস হবে। তুমি ঠাকুরের সন্তান, ঠাকুরের সন্তান কি করে এই কাজ করতে পারে! সে বলতে পারে, আমি ঠাকুর-ফাকুর মানি না, আমি নাস্তিক। তুমি মানো আর নাই মানো, বাচ্চাও রেগে গিয়ে মাকে বলে আমি তোমার ছেলে না। দুদিন আগে হায়দ্রাবাদের একটা খবর সবার নজর পড়েছে, একটা পাঁচ বছরের বাচ্চা সে নিজের ঠাকুরমার নামে থানায় গিয়ে পুলিশ-কেস করেছে। থানায় গিয়ে কেস করে বলছে, আমার ঠাকুরমা সব সময় আমার উপর বসিং করে, আমাকে আমার মত থাকতে দেয় না, আমাকে খেলতে দেয় না ইত্যাদি। পুলিশ আর কি করবে, বাচ্চাটাকে বসিয়ে অনেক কথা বলে ঠাণ্ডা করে একটা দুটো চকলেটা খাইয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। বাচ্চারা টেলিভিশনে দেখেছে, কিছু হলে পুলিশে কেস করতে হয়। ঠাকুরমার প্রতি রাগ হওয়াতে সেও এখন থানায় পৌঁছে গেছে। থানার পুলিশরা দেখছে, পাঁচ বছরের বাচ্চা নিজের ঠাকুরমার বিরুদ্ধে কেস করতে এসেছে। তাই বলে কি ঠাকুরমা আর নাতির সম্পর্ক উড়ে যাবে? কখনই যাবে না।

তুমি নিজেকে ভক্ত মনে কর, তুমি নিজেকে নাস্তিক মনে কর, তাতে কি আসে যায়। যেটা সত্য চিরদিনই সত্য, সন্তান সন্তান, মা সন্তানের সম্পর্ক কোন দিন কখনই শেষ হয়ে যাবে না। ইদানিং কালে সম্পত্তি হাতাবার জন্য মা সন্তানের বিরুদ্ধে, সন্তান মায়ের বিরুদ্ধে অনেক ধরণের মামলা মকোদ্দমা করছে ঠিকই, তাই বলে মা সন্তানের সম্পর্কটা কখনই চলে যাবে না। তুমি ঈশ্বরের সন্তান, তুমি জানো না, কিন্তু আমি জানি। আমি তোমাকে ভালবাসি এই কারণে যে, আমরা দুজনই ঈশ্বরের সন্তান, তুমি আমার ভাই। জেনেটিক্যালি ভাই না, সুপার জেনেটিক, যে ঈশ্বর থেকে আমার সৃষ্টি, সেই ঈশ্বর থেকে তোমারও সৃষ্টি। স্বামীজীর এই একটি বাক্যে এই কথাটাই বলতে চাইছেন, যেখানেই কোন দুঃখ দেখছ, যেখানেই কোন হিংসা দেখছ, শোক দেখছ, ওই জায়গাতে গিয়ে তাকে ধরতে হবে। আমি তোমার জন্য আছি, সত্য বলার জন্য আছি। সত্য দিয়ে কি আমি আচার বানাবো, চাটনি বানাবো? এসবে জন্য কখনই সত্য না, সত্যের ব্যবহারিক দিক হল, আমি তোমাকে সাহায্য করব। যদি সাহায্য করতে না পারো, তাহলে দুটো মিষ্টি কথা বলে তার মনে বল দাও।

সাক্ষীস্বরূপ আত্মার মধ্যে যে জিনিসগুলোর অভাব

সেখান থেকে স্বামীজী বলছেন, Soul has no caste, and to think it has a delusion, (*আত্মাতে কোন জাতিভেদ নেই; আছে –ভাবাটাই ভ্রম।*) আত্মার কি করে জাত হবে! যারা বলে শ্রীরামকৃষ্ণ বাঙালী, শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ ছিলেন, যীশু ইহুদি ছিলেন, মহম্মদ আরব দেশের ছিলেন, এদের থেকে মুর্খ কে হতে পারে! ওনারা ভগবান, ভগবানের কিসের জাতি, কিসের বর্ণ, কিসের ধর্ম। এনারা কোন দেশেরও নন, বিশ্বেরও নন, এনারা হলেন Teachers of humanity, আর তাই না, ব্রহ্মাণ্ডের যেখানে যেখানে যত মানবসভ্যতা এসেছে এনারা হলেন সব মানবসভ্যতার শিক্ষক। তাঁরই একটা রূপ হল শুদ্ধ আত্মা, শুদ্ধ আত্মাতে কোথা থেকে জাতপাত আসবে! আত্মার কিসের জাত, কিসের লিঙ্গ, Soul has no caste, শুধু বর্ণ আর জাত নিয়ে না, এই ধরণের কোন রকম কিছু যদি কেউ ভাবে, সেই ভাবাটা ভ্রম ছাড়া কিছু না।

আর বলছেন, so are life and death, or any motion or quality. Atman never changes, never goes nor comes. It is the eternal Witness of all Its own manifiestation, but we take It for the manifestation; an eternal illusion, without beginning or end, ever going on. (*সেই রকম আত্মার জীবন বা মরণ বা কোন প্রকার গতি বা গুণ আছে –এরূপ ভাবাও ভ্রম। আত্মার কখনও পরিণাম হয় না, আত্মা কোথাও যান না, আসেনও না, তিনি তাঁর সমুদয় প্রকাশগুগুলির অনন্ত সাক্ষিস্বরূপ, কিন্তু আমরা তাঁকে ঐ ঐ প্রকাশ বলে মনে করছি। এ এক অনাদি অনন্ত ভ্রম চিরকাল ধরে চলে আসছে।*) এই জায়গাতে স্বামীজী রামানুজমের মতবাদ থেকে পুরো সরে এসে বলছেন। এরপরেই স্বামীজী অবশ্য রামানুজের ভাষ্য নিয়ে বলবেন। রামানুজের কাছে ঈশ্বর মানেই তাঁর মধ্যে গুণ থাকবে, তিনি করুণাময়, তিনি আনন্দময় ইত্যাদি। স্বামীজী বলছেন, আত্মার জন্ম আছে মৃত্যু আছে, আর তাঁর এই এই গুণ আছে, এই রকম ভাবাটাই বোকামো। যা কিছু ঘটছে, যা কিছু চিন্তা করা যায় যেটা ঘটছে, ভগবান হলেন তাঁর সনাতন সাক্ষী। স্বপ্নে আমরা অনেক কিছুই দেখি, ভাল মন্দ কত কিছু, আমরা হলাম ওই স্বপ্নের সাক্ষী। ঠিক তেমনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে, সূক্ষ্ম জগতে, কারণ জগতে যাবতীয় যা কিছু হচ্ছে সবটারই তিনি

হলেন নিত্যসাক্ষী। তাঁকে কোন কিছু কখন প্রভাবিত করতে পারে না। আর বর্ণ, লিঙ্গ, জাতি, জাতীয়তা এই জিনিসগুলি সব হল এই জগতের, এগুলো কখনই ঈশ্বরের উপরে চাপানো যেতে পারে না।

তারপরে বলছেন, but we take It for the manifestion; an eternal illusion, without beginning or end, or ever going on, এটা আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরাই দোষ করি আর ঈশ্বর, যিনি নিত্যসাক্ষী, যে দৃশ্যগুলো তাঁকে প্রতিনিয়ত পাল্টাচ্ছে, সেই দৃশ্যগুলির সাথে আমরা ভুল ভেবে ঈশ্বরের সাথে জুড়ে দিই। ফলে আমরা ঈশ্বরকে আমাদের মত মনে করি। জুহুদিরা মনে করে তারা ঈশ্বরের বিশেষ লোক, মুসলমানরা মনে করে তাদের আল্লাই আসল ঈশ্বর, আমরা বলছি ঠাকুরের ভক্তরা রামকৃষ্ণলোকে যাবে, বাকিরা কোথায় যাবে জানি না। আমাদের সীমাবদ্ধতাগুলিকেই ঈশ্বরের উপর চাপিয়ে দিচ্ছি। ঈশ্বর আর ঈশ্বরের প্রতিভু, manifestation, ঈশ্বর সব সময় দ্রষ্টা, তিনি সব কিছু প্রত্যক্ষ করছেন, কিন্তু কোন কিছুর কোন প্রভাব তার উপর পড়ে না। যেমন শব্দের কোন প্রভাব আমাদের উপর পড়ে না। কিন্তু আমরা ভুলবশতঃ যে পরিবর্তনগুলি হচ্ছে সেটাকে মনে করছি ঈশ্বর। এটা আমাদের দোষ, আমাদের সেই ক্ষমতা নেই তাই আমরা বুঝতে পারি না।

সেইজন্য কি হয়, The Vedas, however, have to come down to our level, for if they told us the highest truth in the highest way, we could not understand it. (*তবে বেদকে আমাদের ভূমিতে নেমে এসে উপদেশ দিতে হচ্ছে, কারণ বেদ যদি উচ্চতম সত্যকে উচ্চতম ভাবে বা ভাষায় আমাদের কাছে বলতেন, তা হলে আমরা বুঝতেই পারতাম না।*) শুধু বেদ না, পুরাণাদিতেও ঋষিরা ঈশ্বরের যে বর্ণনা করছেন, ঠিক সেই ভাবেই বর্ণনা করছেন যাতে আমরা বুঝতে বা ধারণা করতে পারি। কারণ ঈশ্বর যেমনটি তেমনটি ভাবে যদি বর্ণনা করা হয়, আমরা কোন দিন বুঝতে পারব না। ঈশ্বরের আসল তত্ত্বগুলো অত্যন্ত সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলিকে যদি স্থূল বুদ্ধি সম্পন্ন আমাদের মত মানুষের সামনে সরাসরি রাখা হয় আমরা ধরতেই পারব না।

একটা হাসির জোক আছে, এক চিড়িয়াখানায় ক্যাঙারু ছিল। রোজ সকালে দেখা যায় ক্যাঙারু পাঁচিল টপকে বাইরে চলে এসেছে। কর্তৃপক্ষরা বলল ক্যাঙারু বেশি লাফাতে পারে, তাই পাঁচিলটা আরেকটু উঁচু করে দেওয়া হল। পরের দিন ক্যাঙারু আবার বাইরে চলে এসেছে। এই করে করে বারো ফুট পাঁচিলকে একটু একটু করে কুড়ি ফুট উঁচু করে দেওয়া হল। এক ক্যাঙারু আরেক ক্যাঙারুকে জিজ্ঞেস করছে, এরা পাঁচিলটাকে কত দূর উঁচুতে নিয়ে যাবে? হাজার ফুট তো নিশ্চিত, যতক্ষণ না ওরা শিখে নেয় যে, রাত্রে দরজাটা বন্ধ করে দিতে হয়। দেওয়াল উঁচু করে যাচ্ছে, কিন্তু রাত্রে দরজাটা বন্ধ করতে রোজ ভুলে যাচ্ছে, ক্যাঙারুও সহজে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমাদেরও একই অবস্থা, আমাদের ভিতরে আইডিয়াগুলি যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু দরজাটা খোলা, আইডিয়াগুলো ঢুকে খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। সূক্ষ্ম জিনিস আমরা ধরে রাখতে পারি না, অন্য দিকে পাঁচিলটা উঁচু করে যাচ্ছি। বিধিনিষেধের কঠোরতার প্রাচীর তুলে আমরা নিজেদের আবদ্ধ করে রেখেছি, কঠোর নিয়ম সবই পালন করে যাচ্ছি, কিন্তু মন বুদ্ধিকে যে সূক্ষ্ম করে আইডিয়াগুলোকে ধরে রাখব, সেদিকে কারুর হুঁশ নেই, যার হুঁশ আছে, তার কোন চেষ্টা নেই।

কথামৃতে ঠাকুর যদি শুধু বলতেন, ফোঁস করবি, আমরা মনে রাখতে পারতাম না। কিন্তু ঠাকুর একটা লম্বা কাহিনী নিয়ে আসছেন, যেখানে একটা সাপ আছে, ছেলেদের দিকে তেড়ে যায়, এক ব্রহ্মচারী এসেছেন, এই কাহিনী লম্বা করে যখন আমাদের সামনে রাখা হল, তখন আমাদের মস্তিষ্ক একটু গিয়ে ধারণা করতে পারছে। এটাতো একটা অতি সাধারণ কথা, কারুর ক্ষতি করো না, কিন্তু ভয় দেখাবে, তাতেই এত লম্বা কাহিনী আনতে হচ্ছে। এদিকে স্বামীজী আরাত্রিক স্তবে বলছেন, নির্গুণ গুণময়, নির্গুণ গুণময়ের আমরা কি বুঝব! এখনও ঠাকুরের উপর শাস্ত্র রচনা শুরু হয়নি। হয় আমাদের পুরাণের বর্ণনাগুলি নিয়ে আসতে হবে আর তা নাহলে ঠাকুরকে স্বামীজী যেভাবে বলে গেছেন, এগুলোকে আধার করে আবার নূতন এক পুরাণ রচনা করতে হবে, যাতে আমরা বুঝতে পারি। এখন যে টিয়াপাখির মত শব্দগুলি বলে যাচ্ছি, তখন এগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। এটাই সত্য যে ঈশ্বর সব কিছুর পারে, তিনি নিত্য সাক্ষী, ঈশ্বরের উপর জগতের কোন গুণ, জগতের

কোন ধর্ম খাটে না। অথচ বেদ এভাবেই বলে, তা নাহলে মানুষ নিতে পারবে না। বেদ এক করুণাময়ী মায়ের মত, আমাদের মত করে বলছে, যাতে আমরা একটু ধারণা করতে পারি।

স্বর্গের ধারণা

এই প্রসঙ্গ থেকে সরে এসে স্বামীজী এবার স্বর্গের উপর বলছেন। মানুষ যে স্বর্গের কথা বলে, যে স্বর্গে মানুষ যেতে চায়, সেই স্বর্গকে এবার স্বামীজী আক্রমণ করছেন, তবে এই স্বর্গের নিন্দা করতে গিয়ে তিনি খ্রীশ্চানদের সমালোচনা করছেন। কিন্তু হিন্দুদের যে স্বর্গ সে আরও জঘন্য। খ্রীশ্চান ও মুসলমানদের স্বর্গের ধারণার গভীরে যদি যাওয়া হয়, তখন দেখা যাবে ওদের স্বর্গ মানে ঈশ্বরের কাছে গিয়ে থাকা। বৈষ্ণবদের মতে যেটা সালোক্য সামীপ্য আদি। কিন্তু হিন্দুদের স্বর্গের ব্যাপার যখনই মাথায় আসবে তখন আমরা জানছি, ওখানে ইন্দ্রাদি দেবতারা আছেন, অপ্সরারা সেখানে নাচগান করছে, নানান রকমের খাওয়া-দাওয়া আছে ইত্যাদি। হিন্দুদের স্বর্গে কোন নিয়ম-কানুনও নেই। অর্জুন কিছু দিনের জন্য স্বর্গে গিয়ে যখন ঊর্বশীকে দেখছেন আর ভাবছেন, ইনি হলেন আমাদের বংশের মাতা, যেখান থেকে আমাদের বংশ শুরু হয়েছে। অর্জুন ওই ভাবে ঊর্বশীকে দেখছেন, আর ঊর্বশী ভাবছে, অর্জুন আমাকে ভালবেসে ফেলেছে। ঊর্বশী এখন কাম ভাব নিয়ে অর্জুনের দিকে অগ্রসর হয়েছে। অর্জুন সঙ্গে সঙ্গে বলছেন, আপনি আমার মাতৃস্থানীয়া, আপনি এসব কি বলছেন! ঊর্বশী বলছে, এখানে ওই ধরণের কোন সম্পর্ক হয় না, এখানে যার খুশি যার সঙ্গে থাকতে পারে। স্বর্গে শুধু ভোগেরই বর্ণনা পাওয়া যাবে। ভোগের বাইরে আমরা কিছুতেই যেতে পারব না।

স্বর্গ নিয়ে একটা মজার কাহিনী আছে। একজন মরার পর স্বর্গে গিয়ে দেখছে, পৃথিবীতে যার খুব সুনাম ছিল, কোন নেশাভাঙ করত না, সে স্বর্গে এসে খুব করে মদ খাচ্ছে। আরেকজন চেনা লোকের সাথে দেখা হল, যে পৃথিবীতে খুব চরিত্রবান ছিল, দেখছে এক গাদা মেয়ের সাথে বসে হাসিঠাট্টা করে যাচ্ছে। সব কিছু দেখে দেখে লোকটি তো চমকে উঠছে, কি হচ্ছে কি এখানে এসব! তাকে বলা হল, এটা স্বর্গ, এখানে কোন নিয়ম-কানুন নেই। লোকটি তো আনন্দে একটা ডিগবাজি খেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কেউ কি এইসব স্বর্গে দেখেছে? স্বর্গ কেউ দেখেনি। এখানে যত হতাশা, সীমাবদ্ধতা আছে, এসবের বাইরে গিয়ে এমন একটা ভোগের জায়গা বানিয়ে দিল, যেখানে ঊর্বশী অর্জুনের মাতামহী থেকে প্রমাতামহী হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু অর্জুনকে দেখেই ঊর্বশীর ভিতর কাম ভাব জেগে গেল, অর্জুনকে আমার চাইই চাই। যে যাবে সেই ঊর্বশীর মত অপ্সরাদের পাবে। ইন্দ্রও এদের অনুমতি দিয়ে রেখেছে, কারণ স্বর্গে কারুর বয়স বাড়ে না। স্বর্গটাও একটা ভোগের জায়গা, আরও উচ্চমানের ভোগের জায়গা। ইদানিং কালে ভক্তরা রামকৃষ্ণলোক রামকৃষ্ণলোক বলে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে নেচেই যাচ্ছে। সবাই বলছে, আমরা রামকৃষ্ণলোকে যাব। রামকৃষ্ণলোকে গিয়ে এরা সারাদিন করবেটা কি! ঠাকুরের কথাই আছে, ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানবে। এখানে দিনরাত পরনিন্দা পরচর্চা করে যাচ্ছি, রামকৃষ্ণলোকে গিয়েও তাই করব। এখানে সিএম, পিএম, এমএলএদের নিন্দা করছি, রামকৃষ্ণলোকে গিয়ে ঠাকুর, মা, স্বামীজীর নিন্দাই করব, কারণ ওনারা ওই লোকের সিএম, পিএম। টিয়াপাখির মত আমরা শুধু রামকৃষ্ণলোকের কথা বলে যাচ্ছি, একটুও আমরা বিচার করে দেখছি না, কোন বিচার না করেই রামকৃষ্ণলোকের কথা বলি।

স্বর্গের ধারণা সব ধর্মেই আছে। বৌদ্ধ ধর্মে আগে স্বর্গ ছিল না, কিন্তু ভগবান বুদ্ধের প্রয়াণের পর তারাও স্বর্গ নিয়ে এলো। স্বর্গের ধারণা ছাড়া মানুষ থাকতে পারে না। স্বর্গ হল এই জগতেরই সম্প্রসারিত রূপ। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের কথা যে আমরা বলি, এর মধ্যে অর্থ আর কাম হল এই জগৎকে ভোগ করার জন্য। আর এই জগতেরই যেটা সম্প্রসারিত রূপ, ধর্ম হল যাকে দিয়ে সেই জগৎকে ভোগ করার একটা সুব্যবস্থা করা যায়। আমাদের হিন্দুধর্মে তাও মোক্ষ ব্যাপারটা কিছুটা আছে, কিন্তু খ্রীশ্চান ধর্মে ও অন্যান্য ধর্মে মোক্ষের আইডিয়াটাই নেই, বৌদ্ধে ধর্মের নির্বাণের কথা বলছে। ইদানিং সোস্যাল মিডিয়া হয়ে যাওয়াতে প্রচুর আলোচনা সামনে আসছে, যদিও বেশির ভাগই আলতু ফালতু জিনিসকে নিয়ে হয়। কিন্তু কিছু কিছু ভাল ভাল জিনিসও আলোচনার মধ্যে চলে আসে। প্রশ্নোত্তরের একটা সাইট আছে যেখানে দেখা যায় অনেকেই খুব গভীর প্রশ্ন করে, নিম্ন মানের প্রশ্নতো আছেই, কিছু কিছু গভীর প্রশ্নও মাঝেসাজে আসে। একটা প্রশ্ন যেমন ছিল,

মোক্ষ, স্বর্গ, বৈকুণ্ঠ এগুলোতে কি তফাৎ? তার মানে লোকেদের মনে জিজ্ঞাসা জাগছে। তার সাথে থেকে থেকেই বিভিন্ন ধর্মের তুলনাত্মমূলক আলোচনাকে নিয়ে আসছে।

আগেকার দিনে এত কিছু ছিল না। তখন ছিল হাতে গোণা কিছু সংবাদপত্র, কয়েকটা বই, বই মানে যার পয়সা আছে যে বই কিনতে পারবে, আর কদাচিৎ কখন কোন প্রবচনকার। তৎকালীন প্রবচকরা বেশির ভাগই ছিলেন সাহেবরা, খ্রীশ্চান ফাদাররা, যাঁরা সেই সময়কার ভাষাগুলো শিখে এসেছেন। পণ্ডিতরা কথা বলতেই পারতেন না। পুরো দেশে একটা এলেমেলো জিনিস চলছিল। ঠিক ঠিক গভীরে গেলে দেখা যাবে স্বামীজীই একমাত্র যিনি হিন্দুধর্মকে সঠিক ভাবে রেখেছেন। এখন আমাদের অবাক লাগে ভেবে, আমাদের মত লোকেরা যখন হিন্দুধর্মের উপর পড়াশোনা করছি, তখন আমাদের কাছে ঠাকুরের কথা হল বিরাট গাইডলাইন আর হিন্দুধর্ম কি, হিন্দু সমাজ কি রকম, এর মাস্টার হলেন স্বামীজী। স্বামীজীর রচনাবলী যে ভাল করে পড়ে নেবে, সে জেনে যাবে হিন্দুধর্ম মানবজাতিকে ঠিক ঠিক কি বলতে চাইছে। তার উপর এখন সব গ্রন্থই সহজলভ্য হয়ে গেছে, বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ সবই হাতের কাছে পাওয়া যাচ্ছে। স্বামীজীর সময়েও এত ছাপাছাপি শুরু হয়নি, এত বইও সহজ প্রাপ্য ছিল না। স্বামীজী সাত বছর ধরে সারা ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেছেন। তখনকার রাজারা বা বড়লোকেরা সবাই বাড়িতে একটা বড় লাইব্রেরী রাখতেন। সন্ন্যাসীরা যখনই কোথাও যেতেন বড়লোকেরা তাঁদের বাড়িতে আপ্যায়ন করে রাখতেন। স্বামীজী যেখানেই যেতেন, যাঁর বাড়িতে থাকতেন সেখানে তিনি লাইব্রেরীতে যেতেন, তার উপর সরকারী লাইব্রেরীগুলিতে যেতেন, যেখানে যা যা পড়ার মত বই পেতেন পড়তেন। যেখানে পুঁথি সংগ্রহিত রয়েছে, সেই পুঁথি গুলিকে পড়তেন। এইভাবে প্রচুর পড়াশোনার পর স্বামীজী পুরো জিনিসটাকে এক জায়গায় এনে দাঁড় করালেন। আরও অবাক লাগে, তখন কোন কিছুই এত systematic ছিল না, তা সত্ত্বেও হিন্দুরা সব কিছু কিভাবে রক্ষা করে এসেছেন, আর স্বামীজী কিভাবে এর পুরো সারটাকে ধরেছেন দেখে সত্যিই অবাক লাগে। পরাধীন ভারতবর্ষে তখনকার খ্রীশ্চানরা স্বর্গাদি নিয়ে নিজেদের মত করে অনেক ভুলভাল কথা বলে বেড়াত, স্বামীজী সুযোগ পেলেই এগুলোকে আক্রমণ করতে ছাড়তেন না।

সহস্রদ্বীপে স্বামীজী তাঁর পাশ্চাত্য শিষ্যদের সামনে স্বর্গের ধারণাকে আক্রমণ করে বলছেন, স্বর্গ কি? স্বর্গ আমাদের বাসনাকৃষ্ট কুসংস্কার মাত্র, আর বাসনা চিরকালই বন্ধন, অবনতির দ্বারস্বরূপ। সব রকম ভ্রম থেকে মুক্ত হওয়াই মুক্তি। সব কিছুকে ব্রহ্মদৃষ্টি দিয়ে দেখতে শেখা উচিত। তা নাহলে আমরা জগতে অন্যায় বা মন্দ দেখব। কারণ আমরা যে বস্তুকেই দেখি, তার উপর একটা ভ্রমাত্মক আবরণ প্রক্ষেপ করেই দেখি, তাই জগতে আমরা মন্দ দেখতে পাই। স্বামীজী এইসব ভ্রম থেকে মুক্ত হয়ে পরমানন্দ উপভোগ করতে বলছেন। এরপর স্বামীজী আবার বেদান্তে চলে আসছেন।

‘আমি আছি’ –এর যথার্থ স্বরূপ

এবার স্বামীজী বলছেন, In one sense Brahman is known to every human being; he knows, ‘I am’; but man does not know himself as he is. (*এক হিসাবে সকল মানুষই ব্রহ্মকে জানে; কারণ সে জানে, ‘আমি আছি’; কিন্তু মানুষ নিজের যথার্থ স্বরূপ জানে না।*) আমি বোধ, এই বোধ সবারই আছে। আমি যে শুদ্ধ চৈতন্য, এর একটা ঝাপসা বোধ সবারই আছে, একটা বাচ্চারও আছে। আমরা সব সময় বলছি, ‘আমার শরীর’, ‘আমার মন’, যে আমি দেহকে বুঝতে পারছে, যে আমি মনকে বুঝতে পারছে, সেখানে কিন্তু আসলে সে সেই শুদ্ধ আত্মা, ব্রহ্মকেই নিয়ে আসছে, কিন্তু অজান্তায়। সে নিজেও জানে না, আর এই বিচারটাও ভাল ভাবে করতে পারে না। সেইজন্য কেউ যদি বলে, আপনি যে আত্মার কথা বলছেন, ব্রহ্মের কথা বলছেন, এগুলো সব মনের কল্পনা, এসব কথার মধ্যে কোন সারবত্তা নেই। কিন্তু তা নয়, কোথাও না কোথাও শুদ্ধ আত্মার একটা আবছা, অস্পষ্ট বোধ সবারই আছে। কিন্তু ওই জিনিসটা ঠিক কি, এটা আমাদের কছে কিছুতেই পরিষ্কার হয় না। যত ধর্ম, যত ধর্মশাস্ত্র আছে, এরা সবাই এটাই করে, নিজের ব্যাপারে আমাদের যে বোধ আগে থাকেই আছে, নিজের ব্যাপারে আমি যে জিনিসটা আগে থেকেই জানি, ধর্ম সেটাই আমাদের সামনে এনে পরিষ্কার করে দিচ্ছে। ধর্ম আমাদের নূতন কিছু শেখাচ্ছে না। বিজ্ঞান অনেকটা

তাই করে, যে জিনিসগুলো আমরা জানি কিন্তু systematically জানি না, এটা কেন হয়, কিভাবে হয়, বিজ্ঞান সেটা পরিষ্কার করে দেয়।

বলছেন, We all know we are, but not who we are. (*আমরা সকলেই জানি যে, আমরা আছি, কিন্তু কি করে আছি, তা জানি না।*) সংস্কৃতে দুটো শব্দ আসে, প্রথম আসে *অহমস্মি*, মানে আমিত্বের বোধ। যোগশাস্ত্রে বলা হয়, আত্মা যে প্রকৃতির খপ্পড়ে পড়ে নিজেকে বিস্মৃত হয়ে যায়, এর পাঁচটা ধাপ আছে, পাঁচটা ধাপে আত্মা নীচে নেমে যায়। প্রথমটা হল অবিদ্যা, অবিদ্যা শুদ্ধ চৈতন্যকে ঢেকে দিল। অবিদ্যা প্রথম, অবিদ্যা না ঢেকে দিলে বাকি কোন কিছুই হবে না। অবিদ্যার পরেই আসে অস্মিতা, শুদ্ধ আত্মা যাঁর কারুর সাথে কোন সম্পর্ক নেই, সে নিজেকে প্রকৃতির সাথে জুড়ে নেয়। যেমনি এই দুটো এসে গেল, সঙ্গে সঙ্গে রাগ আর দ্বেষ এসে যায়, কোন কিছু আমার পছন্দের আবার কোন কিছু আমার পছন্দের নয়। রাগ আর দ্বেষ এমন হয়ে যায় যে, তখন নিজের যা কিছু আছে সব কিছুর প্রতি বিরাট আসক্তি তৈরী হয়ে যায়, এই আসক্তি থেকে আসে অভিনিবেশ, আমি মরতে চাই না। যোগ মতে সমস্ত সংসার এই পাঁচটি স্তরে চলে –অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। কোন ভাবে ওই জুড়ে থাকাটা কেটে দেওয়া যায়, অর্থাৎ অস্মিতার যোগ হওয়াটাকে যদি বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়, তখন অনেকটা বোধ হয়ে যায় আমরা কে। এই হল *অহমস্মি*, আর দ্বিতীয় শব্দ হল *অহং ব্রহ্মাস্মি*। *অহমস্মি* আমি আছি এই বোধ সবারই আছে, আমি বোধ এই বোধকে শেষে যখন শরীরের সাথে জুড়ে নেয় তখন আসে অভিনিবেশ, কেউই মরতে চায় না। একটা ক্ষুদ্র পিঁপড়ে কে মারতে গেলে প্রাণ ছেড়ে পালাতে চেষ্টা করে যাতে সে মরে না যায়। ওই পিঁপড়ের ভিতরেও আমি বোধ তাকে জুড়ে রাখছে অভিনিবেশের সাথে, আমার যেন নাশ না হয়। শাস্ত্র বলছে, *অহমস্মি* একটা ক্ষুদ্র থেকে অতি ক্ষুদ্র, এই ক্ষুদ্র থেকে সবাইকে যেতে হবে *অহং ব্রহ্মাস্মিতে*। আমাদের যে জন্মজন্মান্তরের সাধনা, যে সংগ্রাম এই দুটি শব্দের জন্য, *অহংস্মি* এই বাক্যের মধ্যে শুধু একটা ছোট শব্দ ব্রহ্ম জুড়ে দিয়ে *অহং ব্রহ্মাস্মিতে* নিয়ে আসতে কত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি জন্ম লেগে যাচ্ছে।

এই *অহমস্মি* আমাদের দিয়ে পুরো জগৎকে চালাচ্ছে, 'অহম্' আর 'অস্মির' মধ্যে যেমনি ব্রহ্ম এসে গেল, জগৎ থেমে গেল। All lower explanations are partial truths; but the flower, the essence of the Vedas, is that the Self in each of us is Brahman, (*অদ্বৈতবাদ ছাড়া জগতের অন্যান্য নিম্নতর ব্যাখ্যা আংশিক সত্যমাত্র। কিন্তু বেদের তত্ত্ব এই যে –আমাদের প্রত্যেকের ভিতর যে আত্মা রয়েছে, তা ব্রহ্মস্বরূপ।*) সব ধর্মই আংশিক সত্যকে বলছে। যখন ধর্ম, অর্থ ও কাম, তুমি ভাল থাকতে চাইছ, ঠিক আছে টাকা পয়সা যাতে আসে তার চেষ্টা কর, টাকা পয়সা হলে তুমি ভাল থাকবে, এই ধরণের নানান রকম কথা যখন ধর্মগুলি বলছে, কিছু তোমারাও ভাল হোক, আমারও তার সাথে ভাল হোক, এই ভাবগুলি হল আংশিক সত্য। এগুলো যে পুরোপুরি মিথ্যা তা না, মানুষ যদি ভাল হতে চায়, দুটি টাকা যদি চায়, একটু সুখ সাচ্ছন্দ্য চায় তাতে দোষের কিছু না, এমনকি বেদও এর অনুমতি দিচ্ছে। ঠাকুরও বলছেন, স্বদারায় গমনে দোষ নেই। এগুলো সবই আংশিক সত্য, পুরো সত্য নয়। বলছেন, তুমি যে আমি আমি করছ, এটা আসলে সেই শুদ্ধ চৈতন্য ব্রহ্ম, এটাই পূর্ণ সত্য। অপরোক্ষানুভূতির দ্বারা যেদিন তোমার এই সত্যের জ্ঞান হয়ে যাবে, সেদিন তুমি পূর্ণ সত্যে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। এই যে পূর্ণ সত্য, যেখানে প্রত্যেকের মধ্যে যে আমি আমি বোধ হচ্ছে, এটাই শুদ্ধ আত্মা, শুদ্ধ আত্মাই ব্রহ্ম, এটাই সমস্ত বেদের প্রস্ফুটিত পুষ্প। বেদ হল যেন বৃক্ষের মত, এটা হল সেই বৃক্ষের পুষ্প, এটাই শেষ কথা। বেদান্তের সারতত্ত্ব হল আত্মাই ব্রহ্ম।

ষট্‌বিকার

Every phenomenon is included in birth, growth, and death; appearance, continuance, and disappearance. (*জগৎপ্রপঞ্চের মধ্যে যা কিছু সব –জন্ম, মৃত্যু, বৃদ্ধি, উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় দ্বারা সীমাবদ্ধ।*) আচার্য শঙ্কর শুধু ব্রহ্মসূত্রেই না, গীতাতেও এই ভাবটা নিয়ে আসছেন –ষট্‌বিকার। স্বামীজীও এখানে ষট্‌বিকারকে নিয়ে বলছেন। ষড় বিকারে জগৎপ্রপঞ্চের মধ্যে যা কিছু আছে, যে জিনিসের অস্তিত্ব আছে, সে জন্ম নেয়, তার বৃদ্ধি হয়, তার পরিবর্তন হয়, তার ক্ষয় হতে থাকে, আরে শেষে বিনাশ হয়। বলছেন, যেখানে phenomenon রয়েছে, যেখানেই relative existence রয়েছে, যেখানেই

জগৎ আছে সেখানেই এই ষড় বিকার থাকবে। কিন্তু আত্মা আসলে এই ষড় বিকারের বাইরে। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে যেখানে ভগবান আত্মার বর্ণনা করে বলছেন, *ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ*, এই শ্লোকের ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর দেখাচ্ছেন, যে কোন জিনিস যদি এই জগতের হয়ে থাকে, তার মধ্যে এই ছয়টি বিকার থাকতেই হবে। এই ছটি বিকার তো সব সময় দেখা যায় না, একটা প্রাচীন বটবৃক্ষ আমার জন্মের আগে থেকেই আছে আর আমার মৃত্যুর পরেও থাকবে, তার আমরা না দেখছি জন্ম না দেখছি মৃত্যু, কিন্তু পরিবর্তনটা দেখতে পাচ্ছি, দেখছি কিছু দিন পর নূতন পাতা গজাচ্ছে, পুরনো পাতা খসে যাচ্ছে। যে কোন জিনিসের মধ্যে ছটি বিকারের একটা বিকার যদি থাকে, তার মানে ছটি বিকারই তার মধ্যে আছে, এটা হল phenomenon, এটা জগতের, তার মানে এটা আমার নয়, এটাকে আমাকে মন থেকে ত্যাগ করতে হবে।

বিজ্ঞান ও ধর্মগ্রন্থ

এখান থেকে এবার স্বামীজী বলছেন, Our own realization is beyond the Vedas, because even they depend upon that. (*আমাদের অপরোক্ষানুভূতি বেদেরও অতীত; কারণ বেদেরও প্রামাণ্য ঐ অপরোক্ষানুভূতির উপর নির্ভর করে।*) আমাদের নিজেদের যত রকম অনুভূতি হয়, এগুলো সব বেদ বেদান্তের পারে। কারণ বেদ-বেদান্ত নির্ভর করে আমাদের অনুভূতির উপর। স্বামীজীর এই বাক্যটা দু-ভাবে খুব কঠিন একটা বাক্য। আচার্য শঙ্কর বলছেন, যত কিছু আমাদের অনুভূতি হচ্ছে, পাঁচটা ইন্দ্রিয় দিয়ে যত কিছু জিনিসকে আমরা জানছি, যদি কোন কারণে বেদ এই অনভূতির বিরুদ্ধে যায়, আমরা বেদের কথাকে মানব না। কারণ আমরা যে জিনিসটাকে অনুভব করছি, সেটাকে যদি প্রশ্ন করতে শুরু করা হয়, তাহলে আমাদের মনকে প্রশ্ন করা হয়ে যাবে। মনকে যদি প্রশ্ন করা হয় তাহলে কিন্তু বেদকেও প্রশ্ন করা হয়ে যাবে। সেইজন্য বলছেন, কোন জিনিসকে আমরা প্রত্যক্ষ করছি, পরিষ্কার দেখছি যে জিনিসটা এই, এর বিরুদ্ধে বেদে যদি শত বাক্যও থাকে বেদকে নেওয়া যাবে না।

অন্যান্য ধর্মে এটাকে নিয়ে খুব পুরনো একটা বিবাদ চলে আসছে, তাদের ধর্মগ্রন্থ যেটা বলছে সেটাকে নেওয়া হবে, নাকি আমরা যেটা প্রত্যক্ষ দেখছি সেটাকে নেব? যেমন কোন ধর্মগ্রন্থে বলছে, ভগবান ছাতার মত এই আকাশ করেছেন, সেখানে তিনি তারা, নক্ষত্র গুলিকে বসিয়ে দিয়েছেন। অথচ অনেক আগেই মানুষ জেনে গেছে যে জিনিসটা তা নয়। এদের ধর্মীয় স্কুলগুলিতে এখনও এটাই পড়ানো হয়ে আসছে। বিজ্ঞানের নূতন আবিষ্কারগুলিকে এরা মানে না। শুধু যে মানে না তা নয়, বলে এই জিনিসগুলো ডেভিলদেরই সৃষ্টি। বিজ্ঞান আজ অনেক এগিয়ে যাওয়াতে এই সব ধর্মের ধর্মগ্রন্থগুলির পক্ষে অনেক সমস্যা হয়ে গেছে। পাঁচশ বছর আগের ইউরোপেরও এই একই অবস্থা ছিল। বাইবেলে এসব কোন কথা নেই, বিশেষ করে নিউটেস্টামেন্টে জগৎকে নিয়ে কোন কথা নেই; ওল্ড টেস্টামেন্টে প্রচুর কথা আছে। গ্রীক দর্শনকে আধার করে, বিশেষ করে এ্যরিস্টটলের দর্শনকে আধার করে, খ্রীশ্চানদের জগতের ব্যাপারে একটা ধারণা হয়ে গেছে। তাতে বলছে বিশ্বব্রহ্মণ্ডের কেন্দ্র হল এই পৃথিবী, সব কিছু পৃথিবীর চারিদিকে ঘুর ঘুর করছে। যেমনি গ্যালিলিও ও অন্যান্য বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কারের পর এর বিপরীত কথা বলতে শুরু করলেন, তখন খ্রীশ্চানরা ওদের কথাকে কিছুতেই মানবে না, যার জন্য ব্রুনোকে পুড়িয়ে মারা হল, গ্যালিলিওকে তার বক্তব্যকে তুলে নিতে বাধ্য করা হল; এই হল গোঁড়ামি।

একবার এক জুনিয়র ব্রহ্মচারীকে বোঝান হল যে, স্বামীজীর অনেক কথা আছে যেগুলো বিজ্ঞানের সাথে মেলে না। শুনে ব্রহ্মচারী খুব অসন্তুষ্ট হয়ে গেছেন। তাঁকে বলা হল, স্বামীজী চিঠিতে লিখছেন, জলের জন্য ম্যালেরিয়া হয়, জল তোমরা ফুটিয়ে খাবে তাহলে ম্যালেরিয়া হবে না। এখন যদি রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা মনে করেন আমাদের মশারি লাগাতে হবে না, শুধু জলটা ফুটিয়ে খেলেই ম্যালেরিয়ার হাত থেকে রক্ষা হয়ে যাবে। ঠাকুর বলছেন, এই যুগে পাচন চলে না, ওই পাচন আর জল যদি ফুটিয়ে খেতে থাকে ততক্ষণে ম্যালেরিয়া রোগীর হয়ে যাবে। স্বামীজী এই কথা বলছেন ১৯০২ সালে, আর ১৯১১ সালে রোনাল্ড রস এসে ম্যালেরিয়া রোগের উৎসকে ধরলেন। এরপর সাক্ষাৎ সবাই জেনে গেল ম্যালেরিয়া মশা থেকে হয়। কিন্তু স্বামীজী বলে গেছেন জল থেকে ম্যালেরিয়া হয়। স্বামীজীর সময় ওই ধারণাটাই সবার ছিল। তখনকার দিনে সবার যে মত ছিল তিনি সেটাই বলেছেন। আগামীকাল যদি নূতন কোন আবিষ্কার হয়ে নূতন কোন তথ্য

এসে যায়, তখন ওই তথ্য অনুযায়ী আমাদেরকেও আপডেট করে নিতে হবে। স্বামীজীও পদে পদে এই কথা বলছেন। এটা হল প্রথম, যদি আমি বিজ্ঞানের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ দেখে নিই, আর তা যদি আমাদের আগেকার ধারণার বিরুদ্ধে থাকে, তাহলে ওই প্রত্যক্ষ দেখাটাকেই আমাদের মানতে হবে। শ্রীশ্রীমাও বলছেন, অন্য গ্রহে কোন প্রানী নেই। কাল যদি বিজ্ঞান কোন গ্রহে প্রানীর অস্তিত্ব আবিষ্কার করে, তখন কি হবে? স্বামীজীও এক জায়গায় বলছেন, অন্য গ্রহে কেউ নেই, তাহলে আমাদের সাথে যোগযোগ হত। এখন জানা যাচ্ছে যোগাযোগ করার জন্য অনেকগুলো ব্যাপার দরকার।

আমরা বলতে পারি, বিজ্ঞানের এই জিনিসগুলিকে নিয়ে ওনাদের কি দরকার ছিল কথা বলার? দরকার তো থাকবেই, কারণ তাঁরা যে সমাজে আছেন সেখানে সব কিছুর কথা বলতে হয়, আর তৎকালীন যে জ্ঞান ও তথ্য সামনে আছে, সেটাকে আধার করেই তাঁরা বলেন। ঠাকুর একটা মাইক্রোস্কোপের ভিতরে যেখানে চোখ লাগাতে পারছেন না, সেখানে তিনি কোথা থেকে ভাইরাস, ব্যাক্টেরিয়া নিয়ে কথা বলবেন। আমাদের মন কাঁচা, মন আমাদের অপূর্ণ, আমরা মনে করি যদি তিনি ভাইরাস ব্যক্টেরিয়ার কথা নাই জানেন, তিনি তাহলে কিসের ভগবান, কিসের অবতার! কিন্তু আমরা ভুলে যাচ্ছি, তাঁরা হলেন আধ্যাত্মিক জগতের দিকপাল; তাঁদের বিষয় জাগতিক বিজ্ঞান নয়, তাঁদের বিষয় হল আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান। আচার্য শঙ্কর সেইজন্য বারে বারে বলছেন, যে জিনিসটাকে ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যায় না, যুক্তিতর্ক দিয়ে জানা যায় না, বেদ সেটার জন্য। বিজ্ঞান যেমন রেকর্ড, বেদও হল রেকর্ড। আমরা যে ফিজিক্স পড়ছি, ফিজিক্সের যাঁরা বড় বড় বিজ্ঞানী ছিলেন তাঁরা যেমন যেমন দেখেছেন, যেমন যেমন তাঁদের ইক্যুয়েশান উন্নত হতে থেকেছে, তাঁরা সেই রেকর্ডগুলো লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন। বেদ ঠিক তাই, ঋষিরা আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে যে জ্ঞান প্রত্যক্ষ করেছেন, অনুভব করেছেন, সেটারই রেকর্ড তাঁরা বেদে রেখে দিলেন। সেইজন্য ধ্যানের গভীরে যখন কেউ কোন কিছু অনুভব করেন, এটা জেনে নিতে হবে যে তিনি সমস্ত বেদ বেদান্তকে ছাড়িয়ে গেছেন। ঠাকুরও বলছেন, এখানকার অনুভূতি বেদ বেদান্তকে ছাড়িয়ে গেছে। শুধু ঠাকুরের না, যে কোন অনুভূতি, স্বামীজী বলছেন, Our own realization is beyond the Vedas। সমস্যা হল আমাদের কারুরই কোন অনুভূতি হয় না। একটু যদি কারুর অনুভূতি হয়, জানতে হবে সে বেদ বেদান্তকে ছাড়িয়ে গেছে। তবে বেদ বেদান্তে অনেক কথা আছে, যেগুলো আমাদের জানা নেই, সেগুলো বিশ্বাসের দরুণ চলে। কিন্তু যিনি সাক্ষাৎ করে নিলেন, আমি সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, তিনি বেদ বেদান্তকে ছাড়িয়ে গেলেন। কারণ, বেদ বেদান্ত নির্ভর করছে এই রেকর্ডস গুলির উপরে।

বেদকে নিয়ে কিছু বলার সময় প্রথমেই বেদকে বলা হয় বেদ অপৌরুষেয়। হাজার হাজার বছর ধরে, প্রজন্মের পর প্রজন্ম বেদকে প্রথম বাক্য দিয়ে দিল অপৌরুষেয়। কিন্তু কেউ বোঝে না অপৌরুষেয় কি। অপৌরুষেয় দিয়ে বলে দিচ্ছেন, বেদ কোন মানুষের মন, বুদ্ধি দিয়ে রচিত হয়নি। কেন, রামচরিতমানসে তুলসীদাস বর্ণনা করেছেন, ভগবানের নিঃশ্বাসে বেদ বেরিয়েছে। ভাগবতে ঠিক এ-ভাবেই বলছেন, ভগবানের সাথেই তাঁর জ্ঞান থাকে। তাহলে যে বলা হয় অমুক ঋষি অমুক মন্ত্রের দ্রষ্টা, এটা কেন বলা হয়? এই সত্যগুলো কোন মানুষের চিন্তা-ভাবনার উপর নির্ভর করে না, এই সত্যগুলি আধ্যাত্মিক সত্য, এই আধ্যাত্মিক সত্যগুলিকে ঋষিরা ধ্যানের গভীরে গিয়ে প্রত্যক্ষ করেছেন; যিনি প্রত্যক্ষ করলেন, তাঁকে বলছি তিনি ঐ আধ্যাত্মিক সত্যের দ্রষ্টা। সেইজন্য একদিক থেকে এটা জ্ঞান। ফিজিক্সও ঠিক এইভাবেই জ্ঞান। তাহলে ফিজিক্স কি অপৌরুষেয়? অবশ্যই, যদি ফিজিক্সের কোন বাক্য কোন দিন না পালটায়। কিন্তু আজকে আমাদের নিউটনের সিদ্ধান্তগুলিকে সংশোধন করতে হচ্ছে। আইনস্টাইনের থিয়োরী ইউনিভার্সাল না। যদি বিজ্ঞানে ওটা ইউনিভার্সাল সত্য হয়, আগামীকাল যদি বিজ্ঞানের কোন ইউনিভার্সাল সত্য বেরিয়ে আসে, সেটা অপৌরুষেয় হয়ে যাবে। কারণ ওই জ্ঞান একমাত্র ভগবানের কাছেই থাকে। তার নীচে যে জ্ঞান সেই জ্ঞান আমাদের মন ও বুদ্ধির কাজের ফসল। কোন বিজ্ঞানী বুক ঠুকে বলবেন না যে, আমি যেটা বলেছি এটাই শেষ কথা, এটা চিরন্তন সত্য, কারণ তিনি নিজেও জানেন আগামীকাল অন্য কোন বিজ্ঞানী এই থিয়োরীকে ভুল প্রমাণিত করে দিতে পারেন। কারণ বিজ্ঞান যদি বলে এটা শেষ কথা, তাহলে ওটা বিজ্ঞান নয়। কিন্তু আধ্যাত্মিক পুরুষরা বুক ঠুকে বলেন, আমি যেটা বলেছি এটা ইউনিভার্সাল সত্য। বিজ্ঞান আর আধ্যাত্মিকতার মধ্যে এটা একটা বিরাট তফাৎ। এইজন্যই আধ্যাত্মিক সত্যগুলিকে চিরন্তন সত্য বলা হয়, এটাই ঈশ্বরের জ্ঞান।

বাইবেলে যে বলছেন, In the beginning there was word and word was with God and word was God, word মানে জ্ঞান। ঈশ্বর আর তাঁর জ্ঞান, এই দুটো এক। সেই জ্ঞানরাশিকে যিনি দেখতে পান, তিনি ঋষি। আর সেগুলো যেখানে সংগ্রহিত করা হয়েছে, সেটা বেদ। বেদ তাই কোন দিন শেষ হবে না। কিন্তু এই বেদ যখন আমাদের কাছে নেমে আসছে, তখন জ্ঞান রূপে আসছে না, আসছে শব্দ রূপে। ভগবান জ্ঞানস্বরূপ, ভগবানের সাথে জ্ঞান এক। সেইজন্য গায়ত্রী মন্ত্রও ভগবানের সাথে এক। এই গায়ত্রী মন্ত্রকে প্রত্যক্ষ করলেন বিশ্বামিত্র, প্রত্যক্ষ করার পর বেরিয়ে এলো গায়ত্রী মন্ত্র, গায়ত্রী মন্ত্র তাই অপৌরুষেয়। কিন্তু এই গায়ত্রী মন্ত্র আমাদের কাছে যখন আসছে তখন তা পুরোপুরি শব্দ মাত্র। যেমনি কেউ এই গায়ত্রী মন্ত্রকে উপলব্ধি করে নিলেন, এবার তিনি বেদ বেদান্তকে ছাড়িয়ে গেলেন। যেখানে যত গায়ত্রী মন্ত্রের ভাষ্য আছে, ব্যাখ্যা আছে, সমস্ত ব্যাখ্যাকে তিনি ছাপিয়ে গেলেন, কারণ তিনি গায়ত্রী মন্ত্রকে সাক্ষাৎ করে নিয়েছেন। স্বামীজী বলছেন, সমস্ত বেদ বেদান্ত নির্ভর করছে এই অনুভূতির উপরে।

আর বলছেন, The highest Vedanta is the philosophy of the Beyond. (*সর্বোচ্চ বেদান্ত হচ্ছে –প্রপঞ্চাতীত সত্তার তত্ত্বজ্ঞান।*) বেদান্তের যে একেবারে শেষ কথা, যেটা দেশ, কাল, পাত্র, এমনকি মনের জগৎ, এমনকি মায়ার যে জগৎ, সব কিছুর পারে। বেদ যা কিছুই বলুক, কিন্তু বেদান্ত কখনই ধর্ম, অর্থ ও কামের কথা বলবে না, বেদান্ত সব সময় শুধুমাত্র মোক্ষের কথাই বলে। বেদান্ত সব সময় বলে, প্রকৃতির জগৎ, মনের জগৎ, মায়ার জগৎ, সব জগতের পারের কথা। সেটাই স্বামীজী এখানে বলছেন Vedanta is the philosophy of the Beyond, কেউ যদি প্রশ্ন করে, বেদান্ত কি, তার জন্য বেদান্তের এই একটিই সংজ্ঞা, philosophy of Beyond। তাহলে কি ধর্ম philosophy of Beyond নয়? সত্যিই নয়। বেদান্ত ইহকাল পরকাল, দুটিরই পারে। স্বামীজী এর উপরেই আক্রমণ করে বলছেন, স্বর্গ আদি হল মনের যে ভোগ বাসনা তারই সম্প্রসারিত রূপ। এর আগে আমরা যে বললাম, বৈকুণ্ঠলোকে গেলে এই আনন্দ, ইন্দ্রলোকে গেলে এই এই আনন্দ, অমুক লোকে গেলে এই আনন্দ, এই যে কথাগুলো বলা হচ্ছে, এটা হল আমাদের যে ভোগ-বাসনা আছে, এইসব লোকে সেই ভোগ-বাসনা সম্প্রসারিত করে দেওয়া হচ্ছে। ইহলোকের সুখও আমি চাই না, পরলোকের সুখও আমি চাই না, আমি এই দুটো লোকের পারে যেতে চাইছি, তার জন্যই বেদান্ত, আর বেদান্ত সেটারই দর্শন। এরপর স্বামীজী পরের প্যারাগ্রাফে গিয়ে বলছেন।

যে তিনটি জিনিসকে সীমাবদ্ধ করা যায় না

To say that creation has any beginning is to lay the axe at the root of all philosophy, (*'সৃষ্টির আদি আছে' বললে সর্বপ্রকার দার্শনিক বিচারের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়।*) স্বামীজীর এটা একটি খুব শক্তিশালী বাক্য। বিভিন্ন ধর্মের দর্শন সম্বন্ধে যদি কারও জানার আগ্রহ থাকে, তার সাথে বিজ্ঞানও, তাহলে দেখা যাবে হিন্দুদের যে ধর্ম, সেই ধর্মের দর্শনে কল্প চলে, যার অর্থ দাঁড়ায় –এর কোন শেষ নেই। হিন্দু ধর্মে তিনটে জিনিস অনন্ত, ঈশ্বর অনন্ত, ঈশ্বরের শক্তি, যেটাকে আমরা মায়া বলছি, সেটা অনন্ত আর শক্তির যে কার্য অর্থাৎ সৃষ্টিও অনন্ত। ঈশ্বর, ঈশ্বরের শক্তি আর সৃষ্টি, হিন্দুধর্মে এই তিনটে জিনিসকে কখনই সীমাবদ্ধ করা যায়, এই তিনটিই অনন্ত। কিন্তু সেমেটিক ধর্মে যেই ঢোকা হবে, বাইবেলকে আধার করে যে ধর্ম, পরে যেটা কোরানকে প্রভাবিত করেছে, এই ধর্মগুলিতে সৃষ্টি একটা সময় হয়েছে। কোথায় সৃষ্টি হয়েছে? সমস্ত সৃষ্টি গিয়ে দাঁড়ায় আদম আর ঈভের কাহিনীতে। আদম আর ঈভকে যখন স্বর্গ থেকে ভগবান বহিষ্কৃত করে দিলেন, তখন শুরু হয়ে গেলে সৃষ্টি। পরবর্তিকালে বিজ্ঞান সৃষ্টিতে নিয়ে এল বিগ ব্যাঙ তত্ত্ব, বিগ ব্যাঙ দিয়ে বিজ্ঞানীরা কি বলতে চাইছে তারা নিজেরাও জানে কিনা সন্দেহ। বিগ ব্যাঙ থেকে সৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। বিগ ব্যাঙ থেকে সৃষ্টি হোক, কোন আপত্তি নেই, কিন্তু কোন একটা সময়ে তো হয়েছে। নিউটন এত বড় বিজ্ঞানী, তিনি সৃষ্টির আরম্ভকে হিসাব করলেন, হিসাবে দাঁড়াল বিসি ৪০০৪ এই রকম কোন একটা সময় সৃষ্টির আরম্ভ। পরে বিগ ব্যাঙ থিয়োরী এসে বলছে পনের বিলিয়ন বছর আগে সৃষ্টির যাত্রা শুরু। বিজ্ঞানীরা আজকে একটা তথ্য দিচ্ছেন, পরের দিন দেখা যাচ্ছে সেই তথ্যটা পাল্টে গেছে। কদিন যদি নিউজপ্যাপার আর ম্যাগাজিন না পড়া হয়, তাতেই সে আউটডেটেড হয়ে যাবে। ফ্যাশন যত তাড়াতাড়ি পাল্টায় বিজ্ঞান তার থেকেও বেশি তাড়াতাড়ি পাল্টায়। তাতেই বিজ্ঞানীরা নোবেল প্রাইজ নিয়ে বেরিয়ে

যাচ্ছেন। এখানে বিষয়টা তা নয়, বিষয়টা হল, যেমনি বলে দেওয়া হল সৃষ্টি একটা সময়ের পর শুরু হল, এরপর ওল্ড টেস্টামেন্ট যাই বলে থাকুক, বিজ্ঞান যাই বলুক, কোন চিন্তা থেকেই বলা হয়ে থাকুক, স্বামীজী বলছেন সমস্ত দর্শনের শিকড়ে যেন কুঠারাঘাত করে দেওয়া হল।

মন যখন এটাকে হিসাব করতে পারবে না, তখন মন speculationএ চলে যায়, যে জায়গাতে গিয়ে reasoning থেমে যায়। Reasoning সব সময় হল lower জিনিস। কারণ reasoningএ আমি আর এই জগৎ থাকে। Reasoningএর উপরে চলে যায় speculative। আমরা মনে করতে পারি speculative জিনিসটাও তো কল্পনাতে চলে যাচ্ছে, কিন্তু জিনিসটা তা না। Speculatioonএ নিজস্ব একটা reasoning থাকে, তবে খুব high level of reasoning। কান্ট ছিলেন speculative, এমনকি কার্ল মার্ক্স, যাঁর দৌলতে কম্যুনিজম থিয়োরী এসেছে, উনিও speculative philosopher ছিলেন। ওনার অনেকগুলো speculative prediction ছিল, কিন্তু দেখা যাচ্ছে ওগুলো ঠিক। যাদের মন উন্নত, মন যাদের একটু শুদ্ধ হয়, বিশেষ করে মনন, চিন্তন করে যাদের মন শুদ্ধ হয়ে যায়, ওরা speculative হয়ে যান। এই speculative আর শেয়ার মার্কেটে যারা speculate করে দুটো এক নয়। Sepeculative হল, যেখানে একটা intuitive reasoning হয়। ওনারা ঠিক ঠিক নিজেরাও জানেন না যে, ওখানে ওনারা কিভাবে পৌঁছালেন। বিজ্ঞানে যে প্রচুর থিয়োরি আবিষ্কার হয়েছে এগুলোর বেশির ভাগই spculative। বিজ্ঞানীদের মনে হয় জিনিসটা এই রকম হবে, পরে ওনারা ধীরে ধীরে এটার উপর একটা থিয়োরী দাঁড় করান বা পরে experiment করে করে ওই জায়গায় পৌঁছানর চেষ্টা করেন। যেমনি বলে দেওয়া হল সৃষ্টি এই সময় থেকে শুরু হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে যত speculative philosophy আছে, সব নষ্ট হয়ে গেল। তার মানে, যদি সৃষ্টি অমুক দিনে শুরু হয়ে থাকে বলে দেওয়া হয়, তখন না থাকবে কোন ধর্ম, না থাকবে কোন ফিলজফি। সৃষ্টি তাহলে কোন মতে ফিলজফির অঙ্গ হতে পারে না, কারণ সৃষ্টি তখন বিজ্ঞানের এলাকার হয়ে গেল। বর্তমান কালের যে কোয়ান্টাম ফিজিক্স আদি, এর কোথায় যে ফিজিক্স হয়, কোথায় যে এর ফিলজফি হয় আমরা জানি না, যার জন্য inter disciplinary science অনেক আসতে শুরু হয়ে গেছে।

যদি এটাকে ভগবানের স্বভাব বলে দিয়ে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়, তাহলে অনেক সমস্যা এসে যাবে। ঠাকুর যেমন বলছেন, ভগবানের বালকের স্বভাব, কাকে দেবেন, কাকে দেবেন না, জানা নেই। যদি ঠাকুর এই কথা না বলতেন, তাহলে ভগবানের স্বভাবকে fixed করে দেওয়া হত। Fixed মানে, তুমি ভাল কাজ করলে ভগবান তোমাকে ভাল ফল দেবেন। তার মানে ভগবানের প্রকৃতি বা স্বভাব fixed হয়ে গেল, তাহলে তো ভগবানকে ব্যাখ্যা করা হয়ে গেল, a God explained is no God। যে ভগবানকে ব্যাখ্যা করে দেওয়া হল, তিনি আর যাই হন না কেন, ভগবান না। তাহলে তিনি কাজ না করলেও কি ফল দেবেন? দিতে পারেন, নাও দিতে পারেন। আচ্ছা কাজ করলে কি ভগবান ফল দেবেন? দিতেও পারেন, নাও দিতে পারেন। যে ফিলজফিতে স্যাদ্‌বাদ আছে, স্যাদ্ মানে হতে পারে, দিতে পারেন, নাও দিতে পারেন। ওদের সাত খানা এই রকম ধাপ আছে, যেটা খুব important। আমরা সাধারণ মানুষ, আমরা আমাদের জীবনকে সহজ ভাবে চালাতে চাই। ঠাকুরের নাম করে যাও তিনি দেখবেন। যেমনি বলে দিল, ঠাকুরের নাম কর তিনি দেখবেন, সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের স্বভাবকে fixed করে সীমিত করে দেওয়া হল। তবে হ্যাঁ, একজনের ব্যাপারে বলে দেওয়া যেতে পারে, তোমার তো আর কিছু করার নেই, তুমি ঠাকুরের নাম কর, এরপর তিনি দেখার হলে দেখবেন, না দেখার হলে দেখবেন না। এবার সে ঠিক এলাকায় আছে। আমরা যখন বলি, ঠাকুরের ইচ্ছা, ঠাকুরের ইচ্ছা বলে আমরা বুঝিয়ে দিচ্ছি ঠাকুরের কি ইচ্ছা আর কি অনিচ্ছা। তা নয়, ঠাকুরের ইচ্ছা বলা মানে, আমার কাছে উত্তর নেই, আমি চেষ্টা করলেও উত্তর পাবো না। কিন্তু জিনিসটা ঘটছে। আমার কাছে এর কোন ব্যাখ্যা নেই, আর আমি চেষ্টা করেও তোমাকে কোন ব্যাখ্যা দিতে পারব না।

যেমন ঠাকুরকে ব্যাখ্যা করা যাবে না, ঠিক তেমনি মায়াকেও ব্যাখ্যা করা যাবে না। আর ঠিক ওই কারণে সৃষ্টিকেও ব্যাখ্যা করা যাবে না, কারণ এই তিনটেই অনন্ত, ঈশ্বর অনন্ত, তাঁর শক্তি অনন্ত আর তাঁর সৃষ্টি অনন্ত। এই তিনটে জিনিসকে যেমনি কেউ fixed করতে গেল, সাথে সাথে তার speculative philosophy শেষ, ওটা এবার বিজ্ঞানের এলাকায় এসে গেল। যেদিন বিজ্ঞান ধর্মকে ব্যাখ্যা করে দেবে,

তখন আর ধর্ম থাকবে না। আমরা হলাম সাধারণ মনের, কোন বাচ্চা গিয়ে যদি কোন বৈজ্ঞানীককে জিজ্ঞেস করে, 'আপনি যে সারাদিন ল্যাবরটরিতে বসে এত কিছু করছেন, এতে আপনি কি পাবেন? জিঞ্জার কেক পাওয়া যাবে'? জিঞ্জার কেক বাচ্চাদের খুব পছন্দের জিনিস, আগেকার দিনে তো চকলেট পাওয়া যেত না, জিঞ্জার কেক ছিল। এগুলো করে কি চকলেট পাওয়া যাবে? বৈজ্ঞানীক উত্তরে বলছেন, 'না পাওয়া যাবে না'। 'তবে আমার এসব করে কি হবে'! সাধারণ মন এই জিনিসগুলিকে বুঝতে পারে না। যেমনি কেউ ঈশ্বরকে ব্যাখ্যা করে দিল, ঈশ্বরের অনন্ত স্বভাব নষ্ট হয়ে গেল। মায়াকে ব্যাখ্যা করে দেওয়া হল, মায়ার যে অনন্ত স্বভাব, সেটাকে নষ্ট করে দেওয়া হল। সৃষ্টিকে ব্যাখ্যা দেওয়া হল, সৃষ্টির অনন্ত স্বভাব নষ্ট হয়ে গেল। এই তিনটেকে কক্ষণ কোন পরিস্থিতিতে ব্যাখ্যা করা যাবে না। এই একটি বাক্য দ্বারা স্বামীজী ওল্ড টেস্টামেন্টকে জোর আক্রমণ করছেন। সৃষ্টি এইভাবে হয় বলে তুমি সৃষ্টিকে fixed করে দিচ্ছ। নাসদীয় সূক্তে বলছেন, কে জানে সৃষ্টি কিভাবে হয়েছিল, যিনি সৃষ্টি করেছিলেন, তিনিও জানেন কিনা কে জানে। স্বামীজী এরপর আবার মায়া ও মাতৃশক্তিকে নিয়ে বলছেন, কিভাবে এই সৃষ্টির খেলা থেকে বেরিয়ে আসা যায়।

সৃষ্টি থেকে বেরিয়ে আসা

Maya is the energy of the universe, potential and kinetic. Until Mother releases us, we cannot get free. (*জগৎপ্রপঞ্চের অন্তর্গত অব্যক্ত ও ব্যক্ত শক্তিকে মায়া বলে। যতক্ষণ সেই মাতৃরূপিণী মহামায়া আমাদের ছেড়ে না দিচ্ছেন, ততক্ষণ আমরা মুক্ত হতে পারি না।*) আমাদের উদ্দেশ্য হল সৃষ্টি থেকে বেরিয়ে আসা, সৃষ্টি হল পুরোপুরি শক্তির এলাকা। এই শক্তিকে আমরা কি করে পার করব? ঈশ্বরীয় শক্তির পারে যাওয়ার পথ কি? যদি কেউ বলে, জপ-ধ্যান করে, সাধনা করে আমি বেরিয়ে যাবো, তাহলে আবার কিন্তু সে অনন্তকে fixed করে দিল। যেমনি আমরা fixed করে দিচ্ছি, পুরো সিদ্ধান্তটা ভুল হয়ে গেল। অনেকে এসে মহারাজদের জিজ্ঞেস করে, আমাদের ভক্তি কিভাবে হবে? ভক্তি, মুক্তি এগুলো কিভাবে হবে কে জানে! কেউ বলতে পারে না। কিন্তু এটা বলে দেওয়া যায়, মুক্তি মানে সৃষ্টির পারে যাওয়া। সৃষ্টির পারে যাওয়া মানেই মায়ার পারে যাওয়া। মায়ার পারে যাওয়া বোঝায়, ঈশ্বরের যে শক্তি, সেই শক্তিকে অতিক্রম করে যাওয়া। ঈশ্বরের পারে কি করে যাবে! কারণ ঈশ্বর আর ঈশ্বরের শক্তি এক। ঈশ্বরের ঈশ্বরীয় শক্তি হল ঈশ্বরের ইচ্ছা। মুক্তি হতে পারে একমাত্র তাঁর ইচ্ছায়, তাঁর কৃপায়। এই একই কথা কঠোপনিষদে বলছেন, *যমৈবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ*। আত্মা যাকে বরণ করবেন, তাঁকেই নিয়ে যাবেন। কাকে বরণ করবেন জানা নেই। তাহলে আমি জপধ্যান কেন করব? করতে হবে না তোমাকে। জপ-ধ্যান আলু পটল মাপা নাকি!

এর আগে যেখানে পঞ্চকোষের কথা বলা হয়েছিল, সেখানে আমরা আলোচনা করছিলাম, যখনই আমরা নিজেদের নিয়ে ভাবি, আমরা অবশ্যম্ভাবি তখন নিজের শরীরকে নিয়েই ভাবি, নিজেকে মন রূপে ভাবি, নিজেকে বুদ্ধি রূপে ভাবি, আমাকে অহঙ্কার রূপে ভাবি, আর তার সাথে হয় আমরা আপনজনদের বা নিজেদের কাছের লোকদের ভালবাসি। ধর্ম জগতে এসেই অনেকে বলতে শুরু করে দেয়, এই জগতের কোন কিছুই আমার ভাল লাগে না; আমার ভোগ লাগবে না, আমার বিশ্রাম লাগবে না। কিন্তু কারুর যদি এই জগতে এক কণাও মন থাকে, অন্য দিকে যদি তার কোন আপনজন না থাকে, তাহলে তার পাগল হওয়ার সমস্ত রাস্থা খুলে যাবে। সেইজন্য যারা ধর্ম পথে আসে তাদের বেশির ভাগ লোকই কিছু দিন পরে পাগল হয়ে যায়। স্বামীজীই বলছেন, যারা ধর্ম পথে আসে তাদের শতকরা আশি ভাগ ধুর্ত, ধাপ্পাবাজ, পনের ভাগ বদ্ধ পাগল, বাকি পাঁচ ভাগই ঠিক ঠিক এগোয়। যারা জগতের সব কিছু ছেড়ে দেয়, আপনজন বলতেও যদি কাউকে মনে না করে, তখন সে যদি ঠিক ঠিক হৃদয় থেকে বলে ঈশ্বর ছাড়া এই জগতে আমার কেউ নেই, তখন সে ঈশ্বরের চিন্তন করতে শুরু করে। ঈশ্বর চিন্তন এক দিনে হয় না, ঈশ্বর চিন্তনের অনুশীলন শুরু হয় জপাদির দ্বারা। তাই মন যখন সুস্থ থাকে, সংসারে আপনজনদের নিয়ে আছে, কাজকর্মের মধ্যে আছে, তাকেও আজ হোক কাল হোক সব কিছু ছাড়তেই হবে। ছাড়ার সময় যাতে পাগল না হয়ে যাও, তাই আগে থেকে তোমাকে ঈশ্বরকে ধরতে হবে। একদিনে তুমি ঈশ্বরকে ধরতে পারবে না, সেইজন্য সব কিছুর মধ্যে থেকেও জপধ্যান করে যাও, এই কারণেই জপ করতে বলা হয়। একদিকে জপও করে যাচ্ছে, অন্য দিকে এই বিচারও করে যাচ্ছে যে, সংসার থেকে মনকে না তুললে কিছুই হবে না। এই করতে করতে সত্যিই সে একদিন সংসারকে ছেড়ে দেয়। আগে

থেকে জপের অনুশীলন করা আছে, চিন্তন করেছে, সেইজন্য তাকে পাগল হতে দেবে না। কারণ তার মন একটা অবলম্বন পেয়ে গেছে। মনের যদি কোন অবলম্বন না থাকে, আর সে যদি জগৎ থেকে মন তুলে নেয়, আপনজনদের দূরে সরিয়ে দেয়, মন তার পাগলের মত ছটফট করতে থাকবে।

এই যে তার ঈশ্বরের ধ্যানে মন বসতে লাগল, এবার সৃষ্টির বাইরে, শক্তির এলাকার বাইরে এসে নিজের স্বরূপের দিকে তার এগিয়ে চলা শুরু হল। কিন্তু একবারে চলে যেতে পারবে না, যদি চলে যায় তাহলে মুক্তিটাও কর্মের ফল হয়ে যাবে। বেদান্তে বার বার আচার্য শঙ্কর এই একটা জিনিসকে নিয়ে বলে যাচ্ছেন – কর্তা, ক্রিয়া ও কর্মের এই তিনটের নাশ। মুক্তি যদি ক্রিয়ার ফল হয়ে যায়, তাহলে মুক্তিটা কর্মফল হয়ে যাবে। যে জিনিসটার উপর ভিত্তি করে বেদান্ত দাঁড়িয়েছে, সেই ভিত্তিটাই ধুলিসাৎ হয়ে যাবে। সেইজন্য ঈশ্বর জ্ঞান বা আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান কোন কিছুর অপেক্ষা রাখে না, নিজের মত হয়। যে জপ ধ্যান করছে না, তার কি হবে? যদি বলা হয় হবে না। সেখানেও একটা জিনিসকে পিন-পয়েন্ট করে দেওয়া হচ্ছে –ঈশ্বর তাদের কৃপা করেন না। ঈশ্বর তাদের কৃপা করেন না –এই কথা বলে ঈশ্বরকে আবার সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হল। বলতে হয়, হতে পারে, নাও হতে পারে, কে জানে! স্বামীজী পর পর ব্রহ্মের কথা বললেন, শক্তির কথা বললেন, আত্মার কথা বললেন, আত্মাই ব্রহ্ম এই কথা বললেন, বলার পর বলছেন এই জগতে কিভাবে থাকবে।

জগৎ থেকে কোন প্রত্যাশা করতে নেই

৬ই জুলাইয়ের ক্লাশের শেষ প্যারায় স্বামীজী বলছেন, The universe is ours to enjoy, এই জগৎটা মজার কুটি, জগৎটা উপভোগের জন্য আছে। But want nothing, কিন্তু জগতের কোন কিছুই নিজের জন্য চাইবে না। আমরা রাগের মাথায় অনেক কিছু বলে দিই, আমি তোমার কাছ থেকে কোন কিছু আশা করি না, তোমার মুখাপেক্ষী হয়ে আমি থাকতে চাই না। যখন এই কথা বলছি, তার মানেই আমার আশা ছিল, অপেক্ষা ছিল। কারুর কাছে কিছু চেও না, ভগবানের কাছেও না। কথামৃতে ঠাকুর বলছেন, আকবর বাদশার কাছে এক ফকির কিছু চাইতে গেছে, গিয়ে দেখছে বাদশা আল্লার কাছে ধন চাইছে, দৌলত চাইছে। ফকির বাদশাকে বলছে, আপনিই যখন আল্লার কাছে চাইছেন, আমিও আল্লার কাছেই চাই, আপনার কাছে কেন চাইব। সন্ন্যাসী মানেই তাই, কারুর কাছ থেকে কিছু প্রত্যাশা করবে না, কারুর কাছে কিছু চাইবেও না। আর বলছেন, To want is weakness, Want makes us beggars, and we are sons of the king, not beggars. (*অভাববোধ করাটা দুর্বলতা, আভাববোধই আমাদের ভিক্ষুক করে ফেলে। আমরা ভিক্ষুক নই, আমরা রাজপুত্র।*) আমরা ঈশ্বরের সন্তান, আমরা কেন কারুর কাছে চাইতে যাব! আমরা যাঁর সন্তান, তাঁর কাছেই আমরা কিছু চাইছি না, কেন চাইতে যাব! তাও আমরা জগতে সবার কাছে চেয়ে বেড়াচ্ছি। এর পিছনে যদি লম্বা যুক্তি দাঁড় করাতে যায়, তখন বলবে, সমস্ত সৃষ্টিটাই ভগবানের, সবাই ঈশ্বরের সন্তান, আমি যখন চাইছি তখন ঈশ্বরের সন্তান অর্থাৎ আমার ভাই বোনদের কাছেই তো চাইছি। না, কারুর কাছেই চাইবে না, এমনকি ঈশ্বরের কাছেও চাইবে না। বলছেন, যদি তোমাকে এই জগতে থাকতে হয়, আনন্দ কর, কিন্তু কিছু চেও না। কাঙালীর মত বাচ্চা বয়স থেকে আমরা শুধু চেয়েই যাচ্ছি। বাচ্চা বয়সে আমাদের লিখতে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছিল, বড় হয়ে এখন সব কিছুতে আবেদন করে যাচ্ছি। স্কুলে ভর্তি হতে হবে, আবেদন পত্র জমা দাও, কলেজে ভর্তি হবে আবেদন কর, চাকরি করতে চাইছে আবেদন করতে হবে, ট্রেনে করে যাবে সেখানেও এখন টিকিট বুকিংএর জন্য আগে থেকে আবেদন করতে হবে, সব জায়গায় শুধু আবেদন আর আবেদন। আমরা এমনিতেই কাঙালী, তার উপর এই সমাজ ব্যবস্থা আমাদের আরও কাঙালী বানিয়ে দিচ্ছে। কিসের রাজার মত থাকবে! অন্তত যে জায়গাটা তোমার খোলা আছে, সেই জায়গাটায় রাজার মত থাকো।

একটা মজার কাহিনী আছে, এক ভদ্রলোক তার মেয়ের বিয়ে দেবে, এক জায়গায় পাত্র দেখতে গেছে। সেখানে সবাইকে চা দিয়েছে। ছেলের বাবা প্লেটে চা ঢেলে খেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের বাবা মেয়েকে বলছে, চল মা, এখানে আর কিছু দেখার নেই। বলে মেয়েকে নিয়ে চলে গেল। কালচার আসার জন্য দরকার আগে ফ্রিডম, ফ্রিডম না হলে হয় না। টাকা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যেটা আমাদের ফ্রিডম দেয়, আমাদের সময়, আমাদের সব কিছুর উপর নিয়ন্ত্রণ দেয়। অফিসের যে চীফ এ্যক্সিক্যুটিভ তার টাইম নিজের টাইম, কিন্তু অফিসে বাকি যারা আছে তাদের টাইম নিজের টাইম না। টাকা হওয়া মানে, সবার আগে তাকে সময়ের

ফ্রিডম দেয়। বাকি যা বিশেষ কিছু আছে, সেখানেই টাকার কাজ শেষ হয়ে যায়, টাকার আর কোন কাজ থাকে না। তখন বলে, money cannot give you happiness, yes it cannot, but it gives you control over time। বাবুরা যখন চা খেতেন, বাবু মানেই টাইম ছিল, কাপে নিয়ে এক চুমুক খেলেন, কাপ প্লেটে রাখল, আবার দু মিনিট পর হাল্কা করে কাপে চুমুক দিল, তাড়াহুড়োর কিছু নেই তাদের। কেরানি, মজুররা সব কিছুতেই দৌড়াচ্ছে। যেমনি দেখা যাবে প্লেটে চা ঢেলে খাচ্ছে, মানে তার কালচার এখনও grow করেনি, তাড়াহুড়োর ভাব আছে, কাঙালীপনার স্বভাব এখনও যায়নি। কারণ তার টাইমের উপর কন্ট্রোল নেই। বাবু হলে ওই ভাবে খাবে না। পয়সা ছিল না, টাইমের উপর কন্ট্রোল ছিল না। আগেকার দিনে যে ব্রাহ্মণরা ছিলেন, কোথাও তাদের মনের উপর প্রচণ্ড কন্ট্রোল ছিল। স্বামীজীর মূল বক্তব্য হল, আমরা রাজার ব্যাটা, ভিখারী নই। এদিনের ক্লাশ এখানে এসে শেষ হয়ে যায়।

রবিবার, ৭ই জুলাই, প্রাতঃকাল

স্বামীজীর ৭ই জুলাইয়ের ক্লাশ। এদিন স্বামীজী দু ভাগে ক্লাশ নিয়েছিলেন, সকালে একটা ক্লাশ এবং অপরাহ্নে বাকি ক্লাশ। এতদিনের আলোচনায় কতকগুলি মূল জিনিসের মধ্যে একটা হল, যেখানেই দুই দেখছি সেটাই সংসার, যেখানে কোন ভেদ নেই, অভেদটাই ঈশ্বর। সেই ঈশ্বরকে আমরা আত্মা বলতে পারি, ব্রহ্ম বলতে পারি, যাই বলি না কেন তাতে কিছু আসে যায় না, যে কোন ধরণের ভেদ মানেই সংসার আর অভেদ মানেই ঈশ্বর। যে কোন ধর্মশাস্ত্র বোঝার জন্য এটাই মাপকাঠি। কিন্তু ঈশ্বর যিনি অভেদ, যিনি অখণ্ড, সেই অখণ্ড থেকেই তাঁর এই সৃষ্টি, সৃষ্টি হওয়া মানেই নানা রকমের বিভাজন এসে যাওয়া। যিনি অভেদ তাঁর থেকে এত ভেদ কি করে হয়? পূর্ণ থেকে অপূর্ণের সৃষ্টি কিভাবে হয়? এর উত্তর কিছুতেই পাওয়া যায় না। আমাদের আচার্যরা এর উপর উত্তর দিয়েছেন, আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করি সেগুলিকে মাথায় বসিয়ে নেওয়ার, আর চেষ্টা করি যাতে জীবনে আমরা এটাকে নামাতে পারি, কিন্তু আমরা পেরে উঠি না। সেইজন্য বার বার শাস্ত্রের কথা শুনতে হয়, আলোচনা করতে হয়। নিজে পড়তে হয়, নিজে নিজেই চিন্তন করতে হয়, আর নিজেদের মধ্যে এসব জিনিসকে নিয়ে আলোচনা করতে হয়। স্বামীজী এই জিনিসটাকে নিয়ে এবার বলছেন।

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং.....

Infinite manifestation dividing itself in portion still remains infinite, and each portion is infinite. (*অনন্ত জগৎপ্রপঞ্চকে যতই ভাগ করা হোক না কেন, তা অনন্তই থাকে, আর তার প্রত্যেকটা ভাগও অনন্ত।*) ঈশ্বর অনন্ত, এই অনন্ত যখন দ্বিখণ্ডিত হন বা বহু খণ্ডিত হন, তখন যে কটি খণ্ড হল, প্রত্যেকটি খণ্ডই অনন্ত। আর তাই না, যত ওকে খণ্ডিত করে যাওয়া হোক, তার সবটাই অনন্ত হবে। অনন্তের যত টুকরো করে দেওয়া হোক, তাও অনন্ত অনন্তই থাকবে, তার সাথে তার যত টুকরো হবে প্রত্যেকটি টুকরোও অনন্তই থাকবে। ইংরাজীতে এটাকে বলা হয় counter intutive, যা যুক্তিতে দাঁড় করানো যায় না। আমরা যতই বিজ্ঞান পড়ে থাকি, ফিজিক্স পড়ে থাকি, এই সত্যটাকে ধারণা করা খুব কঠিন। একটা সহজ পথ হল মেনে নেওয়া, যেমন কথামৃতে ঠাকুরের সামনে একজন বলছে, উনি যা বলছেন মেনে নাও না। আমরা অকপটে সবটাই মেনে নিই বলে সত্য বলে মনে হয়। কিন্তু একটু ভিতরে ঢুকলে দেখা যাবে, এই ভাব ভারতবর্ষের মূল, আমাদের খুব মৌলিক জিনিস।

শান্তিমন্ত্রে আমরা বলছি, *পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।* পূর্ণ থেকে যখন পূর্ণকে নিয়ে নেওয়া হয় তখন ওটা পূর্ণই থাকে। ওটাই যে পূর্ণ থাকে তা না, যেটা বেরিয়ে এসেছে সেটাও পূর্ণ। আচার্য শঙ্কর এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কার্যব্রহ্ম ও কারণ ব্রহ্মের কথা বলছেন। কারণ ব্রহ্ম নির্গুণ নিরাকার, যেখান থেকে সগুণ সাকারকে দেখা যাচ্ছে সেখান থেকে যখন সৃষ্টি বেরিয়ে এসেছে, সেই সৃষ্টিকেই আমরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রূপে দেখছি, জীব জগৎ রূপে দেখছি, এটাই কার্যব্রহ্ম, এটাও অনন্ত। তার পিছনে যিনি আছেন তিনিও অনন্ত। সগুণ ব্রহ্ম তিনিও অনন্ত, নির্গুণ ব্রহ্ম তিনিও অনন্ত। ইংরাজীতে যে শব্দকে আমরা ব্যবহার করছি (counter intutive), এটা একদিক দিয়ে যেমন মেনে নেওয়া খুব কঠিন, অন্য দিকে আবার এমন কিছু কঠিন না। সমস্যা হল, আমরা যখনই অনন্তের কথা শুনছি, তখন মনে করব হয় আকাশ, নয়তো

বিশাল সমুদ্র। এবার আমরা এমন একটা সমুদ্রের কথা ভাবছি, যা সত্যিই অনন্ত। ধারে কাছে কোন দ্বীপ নেই, কিছু নেই, যেদিকে তাকাই, যত দূর দৃষ্ট যায় শুধু জল আর জল, দেখে অনন্তই মনে হবে। সেখানে দুটো বড় জাহাজ শান্ত সমুদ্রের উপর লম্বা দড়ি টেনে দিল। দড়ির এদিকেও জল ওদিকেও জল। তাহলে জল তো অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক অনন্ত হয়ে গেল। ঠাকুর বলছেন, জলের উপর একটা লাঠি ফেলে দেওয়া হল, জলের এপার আর ওপার, লাঠি তুলে নিলে আবার দুদিকের জল এক হয়ে গেল। তাহলে জলের উপর যে লাঠি ফেলে দেওয়া হল বা দুটো জাহাজ দিয়ে দড়ি টেনে দেওয়া হল, এতে কি জল দ্বিখণ্ডিত হল কি হল না? যদি কেউ দ্বিখণ্ডিত দেখতে চায়, তাহলে তার জন্য দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। কিন্তু সমুদ্র রূপে জল যখন খণ্ডিত ছিল তখনও ওটা অনন্তই ছিল। যদি খণ্ডিত রূপে দেখতে চায়, তখন সে বলতে পারে দড়ির ডান দিকের জল, দড়ির বাম দিকের জল। কিন্তু সমুদ্র রূপে সে-তো সমুদ্রই, সমুদ্রের মধ্যে কোন পরিবর্তন হয়নি।

এর অন্য উপমা হল, সোনাকে যতই ঘষতে থাক, শেষে একটু কণা যেটা থেকে যাবে, সোনা রূপে ঐ কণাটাও সোনা, সেখানে কোন বিভাজন নেই। সোনার কণাও সোনা রূপে সোনা, তার যা যা প্রপার্টি আছে, যাবতীয় যা কিছু আছে সবটাই সোনা। ভাগবতে বলছেন, ভগবান যখন সৃষ্টি করেন, তখন তিনিই নানান রূপে দেখান। সৃষ্টি লীলা তিনিই করছেন, দেব রূপে লীলা তিনিই করছেন, নিম্ন শ্রেনীর যে প্রানীরা আছে সেখানেও তিনিই লীলা করছেন, মানুষ রূপে লীলা তিনিই করছেন, অবতারলীলাও তিনিই করছেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাবতীয় যা কিছু আছে, অণু থেকে অণু, সেটা কলা বা অংশ নয়, সেটা সব সময়ই পূর্ণ। সমস্যা হল আমাদের মস্তিষ্কে, আমরা ওই বিভাজনটাই দেখি। কিন্তু একটু গভীরে গেলে বিভজনটা মুছে যাবে।

দুই মাতাল মদ খেয়ে রাস্তার পাশে ধুলোতে দাগ টেনে বাড়ি বানাচ্ছে। একজন বাড়ি বানিয়েছে, আরেকজন অপরজনের রান্নাঘরের পাশেই বাথরুম বানিয়েছে। এই নিয়ে দুজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে গেল। 'আমার রান্নাঘরের পাশে তুই বাথরুম বানাবি না'। 'আমার বাড়িতে আমি যেখানে খুশী বাথরুম বানাবো, তাতে তোর কি'। কথা কাটাকাটি থেকে হাতাহাতি, হাতাহাতি থেকে মারামারি, মাথা ফাটাফাটি হয়ে গেছে। পুলিশ এসেছে। পুলিশ জিজ্ঞেস করেছে, 'কি নিয়ে তোমাদের মারামারি'? 'আমার রান্নাঘরের পাশে বাথরুম বানিয়েছে'। পুলিশ তাদের বাড়িটা কোথায় জানতে চাইল। দুজনে মিলে এবার মাটিতে খুঁজছে, আর বলছে, এখানেই তো ছিল। এই হল ধুলোতে মাতালের বাড়ি বানানো। এই যে সৃষ্টি, যেটা বহু খণ্ডিত, বেদান্তের গভীরে একটু ডুব মারলেই বলব, এখানেই তো ছিল, দেখা যাচ্ছে না। দুটো কাহিনীর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। জাদুকর যেন লাগ্ ভেলকি লাগ্ লাগিয়ে দিয়েছে। এই যে ভেলকি লাগিয়ে দিয়েছে, পুরোটাই কিন্তু জাদুকর নিজেই, জাদুকরের বাইরে কিছু না।

এটাকে ধারণা করা কঠিন ঠিকই, কিন্তু মূল যেটা স্বামীজী বলছেন, অনন্তের যে কণা সেটাও অনন্ত। কণা রূপে সে অনন্ত নয়, সে যে বস্তু, সেই বস্তু রূপে সব সময় অনন্ত। আমরা যখন বলছি *অহং ব্রহ্মাস্মি*, আমি সেই ব্রহ্ম, এর মধ্যে যে আমি আছে, এই আমি যত রকমের আমি হতে পারে, এটাকে ত্যাগ করার পর ব্রহ্ম হয়। প্রথমে দেখে মনে হবে ছোট, অণু পরিমাণ, কিন্তু অণু বলে কিছু নেই, যা কিছু আছে ব্রহ্মই আছেন, বৃহৎই আছে। ধর্ম জগতে বেদান্তের এটা একটা বিরাট বড় অবদান। যিনি অনন্ত তিনিই খণ্ডিত হয়ে দেখান, অথচ তিনি কখনই খণ্ডিত হন না, তিনি সব সময় পূর্ণই থাকেন, তিনি সব সময় অখণ্ডই থাকেন। কিন্তু আমরা চোখের সামনে অনবরত পরিবর্তন হতে দেখছি, সব খণ্ডিত দেখছি, জগতে আমরা সব সময় বহু দেখছি।

ঈশ্বরই জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান রূপে জগতে প্রতিভাসিত হন

স্বামীজী বলছেন, Brahman is the same in two forms, - changeable and unchangeable, expressed and unexpressed. (*পরিণামী ও অপরিণামী, ব্যক্ত ও অব্যক্ত –উভয় অবস্থাতে ব্রহ্ম এক।*) পরিবর্তন হোক আর পরিবর্তন নাই হোক, ব্যক্ত হোক, অব্যক্তই হোক, সবটাই ব্রহ্ম। আর সর্ব অবস্থায় ব্রহ্ম অখণ্ড। কখন তিনি খণ্ডিত হন না, কখন তাঁর অংশ বা টুকরো হয় না, আর তিনি কখনই অপূর্ণ হন না। আমাদের মনে হচ্ছে অপূর্ণতাটা আমাদের দোষ। এই দোষকে কিভাবে কাটাতে হবে? Know that the knower and the known are one. (*জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়কে এক বলে জানো।*) যিনি জানছেন আর

যেটাকে জানছেন, আসলে দুটো এক। জ্ঞাতা আর জ্ঞেয় যদি আলাদা হয়ে যায়, তাহলে দুটো টুকরো হয়ে যাবে। The Trinity – the Knower, the known, and knowing, is manifesting as this universe. That God the Yogi sees in meditation, he sees through the power of his own Self. (*জ্ঞাতা, জ্ঞেয় আর জ্ঞান –এই ত্রিপুটি জগৎপ্রপঞ্চ রূপে প্রকাশ পাচ্ছে। যোগী ধ্যানে যে ঈশ্বর দর্শন করেন, তা তিনি নিজ আত্মার শক্তিতেই দেখে থাকেন।*) সেই ঈশ্বর, যিনি অখণ্ড, যিনি অনন্ত, যিনি অভেদ, তিনি তাঁর শক্তি দিয়ে বা তাঁর মায়া দিয়ে বা তাঁর লীলাতে, যে শব্দই নেওয়া হোক না কেন, তিনি নিজেকে তিনটে অংশে বিভাজিত করে দেন – কর্তা, ক্রিয়া ও কর্ম (কারকের দ্বিতীয়া)। তিনিই ভোজ্য, তিনিই ভোজন, তিনিই ভোক্তা। তিনিই জ্ঞান, তিনিই জ্ঞাতা, তিনিই জ্ঞেয়। বেদান্তের আলোচনার শুরুতে বলা হয়েছিল, জগতে এই দুটো জিনিস, যুস্মদ্ প্রত্যয় ও অস্মদ্ প্রত্যয়, আর এই দুটোকে সংযোগ করছে ক্রিয়া। এটাই ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য। আমরা যে পরিবর্তন দেখছি, আমি আলাদা, সে আলাদা, এই যে আলাদা দেখছি, এগুলো তাহলে কি? কিছুই না। তিনি নিজের যোগশক্তিতে এক থেকে বহু হয়ে গেছেন। বরফ জল হয়ে হেলছে দুলছে, সেই বরফ বাষ্প হয়ে ভেসে যাচ্ছে। আমরা বলতে পারি, সেখানে একটা শক্তি কাজ করছে বলে তিনটে আলাদা আলাদা দেখাচ্ছে। ঠিকই, ঈশ্বরের ক্ষেত্রে ঈশ্বর আর শক্তি আলাদা কিছু না, তিনিই সেই শক্তি। ঈশ্বর আর ঈশ্বরের সৃষ্টিতে তফাৎ হল, ছিলেন এক হয়ে গেলেন তিন, এই এতটুকু তফাৎ।

পুরাণে এই জিনিসটাকে খুব সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ব্রহ্মা সৃষ্টি করবেন, প্রথমে ধ্যান করে করে তাঁর মন থেকে সৃষ্টি করে যাচ্ছিলেন। সেখান থেকে প্রথমে সনক সনকাদি এবং আরও কিছু ঋষি, সপ্তর্ষির ঋষিদের সৃষ্টি করলেন। ব্রহ্মা দেখছেন, সৃষ্টির এই প্রক্রিয়াতে দীর্ঘ সময় লেগে যাচ্ছে, সৃষ্টির বিস্তারে অনেক বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে। তখন তিনি নিজেকে দু-ভাগে বিভক্ত করে নারী ও পুরুষ হয়ে গেলেন, পুরুষ অংশে হয়ে গেলেন মনু, আর নারী অংশে শতরূপা হয়ে গেলেন। এক অপরকে বিবাহ করলেন, ওখান থেকে সন্তানাদির সৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। সন্তান আগেও ছিল যখন ব্রহ্মা একা ছিলেন। পরে তিনি তিন হয়ে গেলেন, মন, শতরূপা আর দাম্পত্য, তখনও তিনিই। সৃষ্টি আগেও হচ্ছিল, এখনও হচ্ছে। কিন্তু এবার দেখাচ্ছে অন্য রকম। যিনি এক তিনি তিন হয়ে যান। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ ওই রূপে না, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় আর জ্ঞান এই তিনটে আলাদা রূপে। জগৎ মানেই, ঈশ্বর যখন জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান রূপে আলাদা হয়ে যান। তার সাথে স্বামীজী আরও বলছেন, That God the Yogi sees in meditation, he sees through the power of his own self. এর উপর আমরা আগে আগে আলোচনা করেছি। যোগীরা ধ্যানে যে ঈশ্বর দর্শন করেন, আসলে তিনি তাঁর আত্মার শক্তিতেই আত্মার দর্শন করেন। ঈশ্বর দর্শন, আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান, যাই বলি না কেন, সবটারই অর্থ নিজেকে জানা। ফলে কি হয়?

'ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া গাছের পাতাটিও নড়তে পারে না'

What we call nature, fate, is simply God's will. (*আমরা যাকে স্বভাব বা অদৃষ্ট বলি, তা কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছা মাত্র।*) আমরা যখন বলি *স্বভাবস্তু প্রবর্ততে*, যা কিছু হচ্ছে স্বভাবেই হচ্ছে, আমরা যখন বলি কপালে ছিল, যখন আমরা কর্মফলের কথা বলছি, যাই বলি না কেন, কোনটাই কিছু না, সবটাই God's will, ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া কিছু হয় না। কারণ ঈশ্বর ছাড়া দ্বিতীয় কিছু নেই কিনা। ঈশ্বর ব্যতিরেকে কিছু থাকলে তবে না আমরা আর কারুর ইচ্ছা বলতে পারতাম। সাংখ্য বা যোগশাস্ত্রে বলছেন, পুরুষ আর প্রকৃতির খেলা, প্রকৃতি সেখানে জড়, প্রকৃতির কিছু করার ক্ষমতা নেই। তাই যা কিছু করার পুরুষই করবেন, পুরুষ মানে চৈতন্য, ভগবান। আর পুরাণ মত দিয়ে বা বেদান্তের মত দিয়ে যদি যাওয়া হয়, শুদ্ধ ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নেই। সেই শুদ্ধ ব্রহ্ম জ্ঞাতা, জ্ঞেয় আর জ্ঞান রূপে দেখাচ্ছেন। ভগবান ছাড়া কিছু নেই, কিন্তু আমরা যখন দেখছি তখন দেখছি কপাল, আমরা দেখছি কর্মের ফের, জ্ঞানীরা দেখেন, ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া গাছের পাতাটি পর্যন্ত নড়ে না। আমরা মনে করছি ঈশ্বরের সেই ইচ্ছা কর্মফল রূপে আসছে, সেই ইচ্ছা স্বভাব রূপে আসছে, আসলে কিন্তু সেই রূপে কখনই আসে না। স্বভাবই বলি, কর্মফলই বলি, সবটাই ঈশ্বরের ইচ্ছা। আমাদের মন ওটাকে একটা নাম দিয়ে দেয়। আমরা মজা করে বলি, সকলি তোমারি ইচ্ছা মা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি, তোমার কর্ম আমি করি মা, লোকে বলে তুমি কর। আসলে মা'ই সব করছেন, কিন্তু আমরা মনে করি তোমার কর্ম

আমি করছি, আমরা বলিও তাই, আমরা ঠাকুরের কাজ করছি। এইসব জিনিস আমাদের মন থেকেই সৃষ্টি করি। যেমনি ঠিক ঠিক গভীরে যাওয়া যাবে, তখন দেখবে, ঈশ্বর বই কিছু নেই, ঈশ্বরের ইচ্ছা বই কিছু নেই। কিন্তু আমরা এই জগৎ দেখছি, জীব দেখছি, একের জায়গায় আমরা বহু দেখছি। বহু দেখার ফল স্বরূপ আমরা ভাগ্য দেখছি, কর্ম দেখছি, চেষ্টা দেখছি, স্বভাব দেখছি। আসলে কিন্তু সবটাই ঈশ্বরের ইচ্ছা। মানুষ যখন সাধন ভজন করে তখন এই ভাব নিয়েই চলে, সিদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর এটাই দেখে যে, ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই, ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া কিছু হওয়ার জো নেই।

অবিদ্যা, কাম ও কর্ম

এরপর স্বামীজী জগৎকে ব্যাখ্যা করে বলছেন, So long as enjoyment is sought, bondage are remains. Only imperfection can enjoy, because enjoyment is the fulfilling of desire. The human soul enjoys nature. (*যতদিন ভোগসুখের আকাঙ্ক্ষা থাকবে, ততদিন বন্ধনে থাকতে হবে। যতক্ষণ অপূর্ণ থাকা যায় ততক্ষণই ভোগ সম্ভব; কারণ ভোগের অর্থ অপূর্ণ বাসনার পরিপূর্তি। জীবাত্মা প্রকৃতিকে সম্ভোগ করে থাক।*) বেদান্তে তিনটে খুব প্রচলিত শব্দ আছে – অবিদ্যা, কাম ও কর্ম। অবিদ্যা মানে মানুষ তার নিজের স্বভাব ভুলে গেছে, এই যে অনন্তের কথা বলা হচ্ছে, মানুষ যখন ভুলে যায় আমি সেই পূর্ণ, মানুষ যখন ভুলে যায় আমি সেই অনন্ত, মানুষ তখন নিজেকে অপূর্ণ ভাবে। অপূর্ণ ভাবা মানেই অবিদ্যা, মনের উপর অজ্ঞানের একটা পর্দা পড়ে গেছে। অজ্ঞান যখন আসে তখন সে মনে করে আমি অপূর্ণ, অপূর্ণের ভাব যখন আসে তখনই সে পূর্ণ হতে চায়। আমি পূর্ণ হতে চাই, এই চাওয়াটাই তাকে এবার কাজ করাবে। ছোটবেলায় আমাদের জীবন কত সহজ সরল ছিল। আগেকার দিনে মানুষ দুটি দুটি খেত, আর তার মধ্যেই পড়াশোনা করছে, ঈশ্বরের নাম করছে। এখন বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে অনেক কিছুর পরিবর্তন হয়ে গেছে, মানুষের চাহিদা বেড়েছে, দুটো টাকা হয়েছে। ইদানিং একটা হয়েছে আইপিএল, মানুষের মনোরঞ্জনের জন্যই হয়েছে, সমস্ত রাজশক্তি এটাকে ম্যানেজ করতেই চলে যাচ্ছে। আগেকার দিনে রাজশক্তি ব্যয় হত যজ্ঞাদি চালাতে। একটা অশ্বমেধ যজ্ঞ হচ্ছে, সমস্ত রাজশক্তি ওর পিছনে চলে যেত। মানুষের মন যার জন্য উঁচুতে থাকত। এখন কি একটা ক্রিকেট খেলা হয়, কলকাতায় যখন খেলা হচ্ছে পুরো রাজ্যের রাজসত্তা ওটাকে ম্যানেজ করতে লেগে যাচ্ছে। সেটাও আবার কিসের জন্য? লোকেদের মনোরঞ্জনের জন্য। এরাই আবার এসে জিজ্ঞেস করে, এত বড় মন্দির বানাবার কি দরকার? তোমাদের ওই মনোরঞ্জনের জন্য যে থার্ড গ্রেড খেলাগুলো হয়, সেটা আবার মাঝ রাত পর্যন্ত চলে, তার জন্য তোমরা কত লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করতে পারছ। আর মানুষ নিজেকে একটু উন্নত করতে চাইছে, উপরে যেতে চাইছে, সেটার জন্য কোন চেষ্টা চালানো হবে না! মানুষ যত কাজ করে তত টাকা আসে, যত টাকা আসে তত ভোগ বাড়ে। যত ভোগ বাড়ে তত মনে করে, আমি অপূর্ণ। যত মনে করে আমি অপূর্ণ, তত তার কামনা বাড়ে। কামনা যত বাড়ে, কামনা পুর্তির জন্য কাজ তত বাড়ে, এটাই চক্রাকারে চলছে তো চলছেই, আটকানোর কোন পথ নেই। যদি কখন কোন অবতার পুরুষ বা আচার্য কোন ভাবে সমাজে কোন ক্রান্তি এনে দেন তখন মানুষ সহজ সরল জীবনকে অবলম্বন করবে, যদি সহজ সরল জীবন অবলম্বন নাও করে, এই আধ্যাত্মিক চেতনাই তখন হবে মানুষের জীবনের কেন্দ্র। যদি তা না হয়ে থাকে, তখন এটাই চক্রাকারে চলতে থাকে। এরপর স্বামীজী একটা খুব সাধারণ জিনিসকে নিয়ে বলছেন।

ধ্যান ও ধারণার দ্বারা দেহবোধের নাশ

The underlying reality of nature, soul, and God is Brahman; but It (Brahman) is unseen, until we bring It out. (*প্রকৃতি, জীবাত্মা ও ঈশ্বর –এদের অন্তর্নিহিত সত্য হচ্ছেন ব্রহ্ম। কিন্তু যতদিন আমরা তাঁকে বাইরে প্রকাশ না করছি, ততদিন আমরা তাঁকে দেখতে পাই না।*) যেমন কাঠে দাহিকা শক্তি আছে, চন্দনে সুগন্ধ আছে, ঠিক তেমনি আমাদের সবার ভিতরে অজ্ঞাত, অব্যক্ত সেই ব্রহ্ম রয়েছেন, এই ব্রহ্মকে বার করতে হবে। আচার্য শঙ্কর এই জিনিসটাকে বার বার বলছেন। জ্ঞানমার্গ আর ভক্তিমার্গ এই দুটো পথে একটা মূল তফাৎ আছে। জ্ঞানের পথকে আচার্য শঙ্কর বলছেন, যেন চন্দন কাঠ। চন্দন কাঠ যদি বহু দিন জলের সংস্পর্শে থাকে, চন্দন কাঠে দুর্গন্ধ এসে যায়। কিন্তু একটু ঘষে নিলে ওর

দুর্গন্ধটা চলে গিয়ে আবার সে তার স্বাভাবিক সুগন্ধে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। অন্য দিকে ভক্তি হল যেন মূর্তি গড়া। কাঠামো নিয়ে এসো, খড় নিয়ে বাঁধো, মাটি নিয়ে এসে লাগাও, সেখান থেকে ধীরে ধীরে মূর্তি তৈরী হবে। বেশির ভাগ ধর্ম পথে আধ্যাত্মিক ভাবকে তিল তিল করে দাঁড় করাতে হয়, এটাই তাদের দর্শন। বেদান্তে জিনিসটা ঠিক উল্টো হয়; খাটতে এখানেও হবে, কিন্তু নূতন করে কিছু গড়তে হয় না, তোমার ভিতরে এটা আগে থেকেই আছে। লিওনার্দো দা ভিঞ্চির খুব নামকরা কথা আছে। তিনি একটা সুন্দর মূর্তি বানিয়েছেন। সবাই দেখে বলছে, 'তুমি কি সুন্দর মূর্তি বানিয়েছ'। লিওনার্দো বলছেন, 'আমি তো মূর্তি বানাইনি, মূর্তিটা পাথরের মধ্যেই ছিল, আমি শুধু মূর্তির আশেপাশে যে অবাঞ্ছিত পাথর ছিল সেগুলোকে ছেনি দিয়ে সরিয়ে দিয়েছি'। এটাও একটা দৃষ্টিভঙ্গী। কিন্তু আরেকটা দৃষ্টিভঙ্গী হল, পাথর কেটে কেটে আমি এই মূর্তিটা বানালাম। ভক্তিশাস্ত্রে মূর্তি বানানো হয়, জ্ঞানযোগে মূর্তি আগে থেকেই আছে, শুধু ওটাকে বার করে নিয়ে আসতে হবে।

স্বামীজী এখানে অগ্নির উপমা দিয়ে বলছেন, কাঠে অগ্নি আছে, এবার ওটাকে ঘষতে হবে। ঘষাটা কিভাবে হয়? বলছেন, It may be brought out by Pramantha or friction, just as we can produce fire by friction. (*যেমন ঘর্ষণের দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করা যায়, তেমনি ব্রহ্মকেও মন্থনের দ্বারা প্রকাশ করতে পারা যায়।*) ঘষতে ঘষতে কাঠের আগুনটা বেরিয়ে আসে। The body is the lower piece of wood, Om is the pointed piece and Dhyana (meditation) is the friction. (*দেহটাকে নিম্ন অরণি, প্রণব বা ওঙ্কারকে উত্তরারণি বলে কল্পনা কর, আর ধ্যান যেন মন্থন।*) আগেকার দিনে অরণী কাঠকে মন্থন করে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হত। স্বামীজী বলছেন, ওম্ এর সাহায্যে যখন ধ্যান করা হয়, তখন আমাদের শরীর মনে মন্থন হয়। ওম্ এর উপর বা ইষ্টমন্ত্রের উপর ধ্যান করা হলে তখনই একটা সাংঘাতিক friction শুরু হয়। ওই ঝামেলাটা আমরা নিতে চাই না বলে আমরা ধ্যান করতে চাই না, ধ্যান করতে পারি না। কিন্তু যতক্ষণ আমরা ঘর্ষণ না করছি, প্রমন্থন না করছি, আগুন ততক্ষণ বেরোবে না, আমার স্বরূপকে জানতে পারব না। বলছেন, When this is used, that light which is the knowledge of Brahman will burst forth in the soul. (*তা হলে আত্মার মধ্যে যে ব্রহ্মজ্ঞান-রূপ অগ্নি আছে, তা প্রকাশ হয়ে পড়বে।*) যখনই এই প্রমন্থন করা হয়, অর্থাৎ ধ্যানের অবস্থায় ওম্ এর সাধনা করে মনের ভিতরে ঘর্ষণ সৃষ্টি করা হল, প্রমন্থন করা হল, এরপর সেই ব্রহ্মজ্ঞানের আলোটা বেরিয়ে আসে। Seek it through Tapas. (*তপস্যা দ্বারা এইটে করতে চেষ্টা কর।*) এটাই তপস্যা। মন পালাতে চাইছে ভোগের দিকে, মন থাকতে চাইছে সাধারণ জিনিসকে নিয়ে, আমরা তাকে আটকে দিচ্ছি, আটকে দিয়ে ঘষা হচ্ছে। কিভাবে?

যোগে যেভাবে বলছে, Holding the body upright, sacrifice the organs of sense in the mind. (*দেহকে সরলভাবে রেখে ইন্দ্রিয়গুলিকে মনে আহুতি দাও।*) মেরুদণ্ড সোজা করে বসো, ইন্দ্রিয়গুলিকে মনে ঢুকিয়ে দাও। The sense-centres are within, and their organs without; drive them into the mind and through Dharana (concentration) fix the mind in Dhyana. (*ইন্দ্রিয়ের কেন্দ্রগুলি সব ভিতরে, তাদের যন্ত্র বা গোলকগুলি কেবল বাইরে। সুতরাং তাদের জোর করে মনে প্রবেশ করিয়ে দাও। তারপর ধারণা সহায়ে মনকে ধ্যানে স্থির কর।*) গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের একেবারে শেষে গিয়ে ভগবান অর্জুনকে বলছেন, *ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ।। এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মনমাত্মনা। জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্।।* আমাদের শরীর দিয়ে যা কিছু কাজ করা হয়, এই কাজকে আসলে নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের ভিতরে যে ইন্দ্রিয়গুলি আছে, ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে মন, মনকে নিয়ন্ত্রণ করে বুদ্ধি, আর সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করছেন সেই আত্মা বা সেই ব্রহ্ম। যদি তুমি বস্তু লাভ করতে চাও, তাহলে সেই ব্রহ্মে মনকে *সংস্তভ্যাত্মনামাত্মনা*, মনকে ওখানে নিয়ে বসিয়ে দাও, স্তম্ভন করে দাও; তখন বাকি নিত্য কাজগুলো বন্ধ হয়ে যাবে, ধ্যান মানে এটাই। ধ্যান মানে, প্রথমে যে বহিরিন্দ্রিয়গুলি রয়েছে, সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে ধ্যানে বসতে হয়। আসনে বসলে কোন লাভ হয় না, আসনে বসলে একটাই লাভ হয়, এই যে হাত পা চঞ্চল, ঘাড় চঞ্চল, পিঠ চঞ্চল, এই চাঞ্চল্যটা বন্ধ হয়। প্রাণায়াম ধীরে ধীরে মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে। এইভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে করতে সব পিছনে নিয়ে যাও। ইন্দ্রিয় নড়াচড়া করতে চাইছে, কাজ করতে চাইছে, মন দিয়ে

ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ কর, মনকে বুদ্ধি দিয়ে নিয়ন্ত্রণ কর, সব কিছুকে শুদ্ধ চৈতন্যের চিন্তন দিয়ে নিয়ন্ত্রণ কর। এগুলো কোন সহজ প্রক্রিয়া নয়, ধর্ম জীবনও সহজ কিছু নয়।

এই কথা বলার পর স্বামীজী বলছেন, Brahman is omnipresent in the universe as is butter in milk, but friction makes It manifest in one place. (*যেমন দুধের ভিতর সর্বত্র ঘি রয়েছে, ব্রহ্মও সেইরূপ জগতের সর্বত্র রয়েছেন। কিন্তু মন্থন দ্বারা এক বিশেষ স্থানে প্রকাশ পান।*) মাখন পুরো দুধেই আছে, সেই দুধকে যখন মন্থন করা হয় তখন মাখন বেরিয়ে আসে। ব্রহ্ম সব জায়গাতেই আছেন, ধ্যানের মন্থনে ব্রহ্ম প্রস্ফুটিত হয়ে ঈশ্বর রূপে সামনে চলে আসেন। As churning brings out the butter in the milk, so Dhyana brings the realization of Brahman in the soul. (*যেমন মন্থন করলে দুধের মাখন উঠে পড়ে, তেমনি ধ্যানের দ্বারা আত্মার মধ্যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়।*) ধ্যান করা মানে দুধকে মন্থন করা, দুধকে মন্থন করলে যেমন দুধ থেকে মাখন উঠে আসে, ঠিক তেমনি ধ্যান হল মন্থন করা, এই মন্থন থেকে ব্রহ্মোপলব্ধি হয়। ইন্দ্রিয়গুলি সব সময় পালাতে চাইছে, ধ্যানের মাধ্যমে আমি তাদের আটকাতে চাইছি, এতে মন্থন হচ্ছে; এই মন্থনের ফলে মানুষ তখন নিজের ভিতরে সেই ব্রহ্মকে উপলব্ধি করে, নিজের ভিতরেই ব্রহ্মের উপলব্ধি হয়, এই সত্যকে সে উপলব্ধি করতে পারে –*অহং ব্রহ্মাস্মি*। তখন জানে, আমার ভিতরে যে চৈতন্য সত্তা, এই সত্তাই অখণ্ড, অনন্ত, পূর্ণ, চৈতন্য।

All Hindu philosophy declares that there is a sixth sense, the superconscious, and through it comes inspiration. (*সমুদয় হিন্দুদর্শন বলেন, আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয় ছাড়া একটি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে। তাই দিয়েই অতীন্দ্রিয় জ্ঞানলাভ হয়ে থাকে।*) স্বামীজী হঠাৎ topicটা পাল্টে বলছেন, যদিও আমাদের এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে, কিন্তু কোথাও আমাদের একটা তৃতীয় নয়ন আছে, যেটাকে sixth sense বলছেন, যেটা দিয়ে মানুষ আত্মজ্ঞান পায়। এর অর্থ হল, সাধারণ ইন্দ্রিয় দিয়ে, সাধারণ মন দিয়ে ঈশ্বর দর্শন হয় না, ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। আত্মজ্ঞান বা ঈশ্বর দর্শন যে জায়গাতে হয়, সেটাকে বলা হয় superconscious, যে মন দিয়ে সেই জ্ঞান আসে, সেই জ্ঞানকে, সেই অবস্থাকে superconscious বলছেন।

The universe is motion, and friction will eventually bring everything to an end; then comes a rest; and after that all begins again. (*জগৎটা একটা অবিরাম গতিস্বরূপ; আর ঘর্ষণ হতেই কালে সমুদয়ের নাশ হবে; তারপর দিন-কতক বিশ্রাম হয়ে আবার সব আরম্ভ হবে।*) এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছুটছে। কদিন আগেও বিজ্ঞান এটাকে মানত না। কারণ বিজ্ঞানের যাবতীয় যা কিছু আছে, সব এসেছে ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে, বাইবেলে ভগবান সৃষ্টি করে সব কিছুকে ছেড়ে দিয়েছেন, সব নিজের জায়গায় ঘুরছে। আইনস্টাইনের থিয়োরী নিয়ে এলো থিয়োরী অফ রিলেটিভিটি, কিন্তু জেনারেল থিয়োরী অফ রিলেটিভিটির conclusion হল, জগৎ ছুটছে। তাঁর নিজের থিয়োরী অফ রিলেটিভিটি, তাঁরই থিয়োরী থেকে বেরিয়ে এলো জগৎ ছুটছে। আইনস্টাইন খুব চটে গেলেন, তিনি বলছেন, এটা হতেই পারে না; কারণ তিনি গোঁড়া জহুদি। একমাত্র আমাদের ভারতবর্ষেই লোকেরা নিজেদের অহিন্দু বলতে চায়। হিন্দু মানে 'H', হাইড্রোজেন বোমা যেন। মনোরঞ্জন জগতে যারা আছে তারাও নিজেকে হিন্দু বলতে চায় না। যারা রাজনীতিতে আছে তারা হিন্দু বলতে চাইবে না, সাহিত্যে প্রশ্নই নেই। আর যদি সে বুদ্ধিজীবি হয়, তাহলে তো রাম রাম, দূরম্ অপসরৎ রে চণ্ডাল, চণ্ডালকে যেমন আগে দূরে সরিয়ে দিত, এরাও বলছে, হিন্দু দূরে যাও। কিন্তু আইনস্টাইনের মত বড় বড় বিজ্ঞানীরা এই ধরণের ছিলেন না। তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে আসছে বিগ ব্যাঙের থিয়োরী, expanding universeএর থিয়োরী, তিনি নেমে গেলেন cosmological constant বার করতে, যার দ্বারা প্রমাণিত হবে যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড expand করছে না। যিনি নিজে যে থিয়োরী দিয়েছেন, নিজের সেই থিয়োরীকে ভুল সিদ্ধ করার জন্য নূতন থিয়োরী আনতে চেষ্টা করছেন, যদিও পারলেন না। তিনি দেখাতে চাইছেন জগৎ গতকাল যেমন ছিল আজও তেমনি আছে, আগামীকালও তেমনি থাকবে। এখন বিজ্ঞানীরা আবার হিসাব করে দেখছেন আপাতঃ যে গতিতে জগৎ ছুটছে; দেখা যাচ্ছে আসলে জগৎ আরও বেশি গতিতে

ছুটছে। বিজ্ঞানীরা কিছুতেই হিসাব মেলাতে পারছে না। আজকে বিজ্ঞানীদের যে থিয়োরী পড়ে বোঝার চেষ্টা করছি, আগামীকাল দেখছি ওই থিয়োরীর বিরুদ্ধে আরেকটা নূতন থিয়োরী এসে গেছে।

কিন্তু আমাদের কাছে এটা খুব পুরনো সিদ্ধান্ত, জগৎ ছুটছে, ছুটতে ছুটতে নিজের ঘর্ষণেই একদিন পুড়ে ছাই হয়ে নাশ হয়ে গিয়ে শান্তি হয়ে যাবে। এটাকেই আমরা বলছি সংহার। এখানেই কি শেষ? আবার নূতন সৃষ্টি হবে। কারণ আমাদের হিন্দুধর্মে নাশ বলে কিছু হয় না। প্রলয় হবে, মহাপ্রলয় হবে, ভগবান যোগনিদ্রায় যাবেন। যোগনিদ্রা মানে, যখন ভগবান আর কার্য করেন না, সৃষ্টি যখন থাকে না। আবার সৃষ্টি হবে। আমাদের কাছে বিগ ব্যাঙ থেকে ব্ল্যাকহোল দিয়ে সৃষ্টি শেষ, আবার বিগ ব্যাঙ থেকে সৃষ্টি, আমাদের কাছে এটাই চিরন্তন। বিজ্ঞানীরা হঠাৎ এই থিয়োরী আবিষ্কার করে আমাদের জিজ্ঞেস করে, ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের মিল আছে কিনা। এসব না জিজ্ঞেস করে ভাল করে আগে অনুসন্ধান করে নাও, তোমাদের বিজ্ঞানের সাথে আমাদের ধর্মের কোথায় কোথায় মিল, তারপরই তুমি experimentএ নামো। এখনও পঞ্চাশ বছর হল না যে তোমরা expanding universeএর কথা বলছ। অথচ আমরা পাঁচ হাজার বছর ধরে এই কথা বলে আসছি, পাঁচ হাজার অনেক কম হয়ে গেল, এটা আরও পুরনো কথা। তোমরাই ধর্মকে বল অযৌক্তিক, হিন্দু শব্দ উচ্চারণ করতে নাকি তোমাদের লজ্জা হয়, হিন্দু শব্দটা তোমাদের কাছে একটা ঘৃণার শব্দ।

So long as the 'skin sky' surrounds man, that, so long as he identifies himself with his body, he cannot see God, (*যতদিন এই 'ত্বগম্বর' মানুষকে বেষ্টন করে থাকে অর্থাৎ যতদিন সে নিজেকে দেহের সঙ্গে অভিন্ন ভাবছে, ততদিন সে ঈশ্বরকে দেখতে পায় না।*) সমস্যা হল আমি আর ঈশ্বর, এর মাঝখানে এই দেহটা বিভাজন করে রেখেছে। আমরা শুরুতে বলেছিলাম, ঈশ্বর অনন্ত, তাঁর প্রত্যেকটা কণাও অনন্ত, সেখান থেকে এসে বলছেন, মাঝখানে একটা বিভাজন এসে যাচ্ছে দেহ, ত্বক দিয়ে আচ্ছাদিত শরীরটা। ফলে প্রত্যগাত্মা আর পরাগ্ আত্মা আলাদা, ভিতরের আত্মা আর বাইরের আত্মা আলাদা, দুটোকে বিভাজন করছে আমাদের শরীরটা। তাহলে শরীরটাকে মেরে দিলেই হয়। শরীরকে মেরে দিলে কি হবে, মরে তো আমি ভূত হয়ে যাব, ভূত হয়ে আমার সেই শরীরেই মন পড়ে থাকবে। আর যদি আত্মহত্যা না করে স্বাভাবিক ভাবে দেহের নাশ হয়ে যায়, তখন আরেকটা শরীর ধারণ করে নেব। আমাদের চেতনাটা শরীরের সাথে জুড়ে রেখেছি, মৃত্যুর পরেও আরেকটা শরীরের সাথে জুড়ে থাকার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকবে। যতক্ষণ এই শরীরের উপর থেকে মন না সরছে, চেতনা না দেহকে ছেড়ে দিচ্ছে, ততক্ষণ ঈশ্বরই আছেন, এই বোধ আসবে না।

মানুষ যখন ধ্যান করে, মানুষ যখন ওম্ এর চিন্তন করে, তখন আমি দেহ, অন্নময়কোষের সাথে যে আমরা যে জুড়ে রয়েছি, এই জুড়ে থাকাটা কেটে দেওয়া হয়। ধ্যানের গভীর যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, ওই জ্ঞান এই দেহবোধকে পুড়িয়ে দেয়। তখনই মানুষ দেখে যে জগতে যা কিছু আছে, সবটাই ঈশ্বর। বৃহৎকে দেখতে হলে ক্ষুদ্রকে ছাড়তে হবে। শরীর, ইন্দ্রিয়, মন এগুলো ক্ষুদ্র, এই ক্ষুদ্রত্বের সাথে জুড়ে থাকা থেকে বেরিয়ে এসে নিজেকে বৃহতের সাথে জুড়তে হবে। ক্ষুদ্রকে ছাড়ার একটাই পথ হল ধ্যান। ধ্যানে মনের যে ঘর্ষণ হয়, সেই ঘর্ষণে এই আবর্জনা গুলি খসে পড়ে যায়।

তাহলে কর্মফল নিয়ে যে এত কিছু বলা হয়, কর্মবাদটা কি? যখন জগৎকে সত্য রূপে দেখা হয় তখন সবটাই সত্য, কিন্তু তাই বলে যেটাকে সত্য রূপে দেখছি সেটা যে সত্য হবে, তা তো হবার নয়। আসল তত্ত্ব হল, তিনি যখন জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান তিন হয়ে দেখান, তখন কর্তা, ক্রিয়া ও কর্ম থাকবে। ক্রিয়া থাকলে ক্রিয়ার ফলও থাকবে। কিন্তু ওই ক্রিয়াটা কি? ক্রিয়াটা ভগবান, ক্রিয়ার ফলটাও ভগবান। ভগবানের ইচ্ছা ছাড়া কিছু হয় না। এসব কথা একদিকে খুব সহজ, অন্য দিকে কঠিনও বটে। একটু গভীরে গিয়ে মন একাগ্র করে যদি চিন্তা করে করে বোঝার চেষ্টা করা হয়, সঙ্গে সঙ্গে সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। কিন্তু ছোটবেলা থেকে এত কিছু পড়ে, এত কিছু শুনে যে সংস্কার তৈরী হয়ে আছে, সেই সংস্কারগুলো যাবে কোথায়! আমাদের যে মনের জগৎ, যার দ্বারা সমস্ত কিছু চলছে, জগৎ রূপে যেটা দ্বৈত হয়ে ভাসছে, এটা একটা বিশাল গহ্বর। আমরা যতই অদ্বৈত বলি, যতই অখণ্ড, অনন্তের কথা বলি না কেন, সবাই শেষে গিয়ে এই দ্বৈতের বিশাল গহ্বরে গিয়ে পড়ছি। অদ্বৈত ভাব ধারণা করা, ধারণা করে ধরে রাখা, প্রায় অসম্ভব।

ঐ দিন, অপরাহ্ন

৭ই জুলাই এর সকালবেলায় স্বামীজী বেদান্তের কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা করলেন। তিনি দেখালেন, কিভাবে ঈশ্বরই আছেন, আর সেই ঈশ্বরই জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান এই তিন রূপে বিভাজিত হয়ে যান বলে, যিনি অনন্ত, যিনি অখণ্ড, তিনি তখন বহু রূপে আমাদের সামনে আসছেন। সেদিন খাওয়া-দাওয়ার পরেও স্বামীজী ব্রহ্মসূত্র নিয়েই আলোচনা করে যাচ্ছেন। আচার্য শঙ্করকে দিয়ে বেদান্তের শুরু করেছিলেন, স্বামীজী এখনও এর উপরেই চলছেন, চলতে চলতে এবার স্বামীজী ষড়দর্শনের কথা বলছেন।

ষড়্দর্শন

There are six schools of philosophy in India that are regarded as orthodox, because they belive in the Vedas. (*ভারতের ছটি দর্শনকে আস্তিক দর্শন বলে, কারণ তারা বেদে বিশ্বাসী।*) ভারতীয় দর্শনকে দুটো ভাগে বিভাজিত করা হয়, আস্তিক দর্শন ও নাস্তিক দর্শন। আস্তিক দর্শন হল যারা বেদকে পুরোপুরি বিশ্বাস করে, নাস্তিক দর্শন হল যারা পারমার্থিক জ্ঞান রূপে বেদের কথাকে শেষ কথা বলে মনে করে না। নাস্তিক দর্শনে প্রথমে আসে চার্বাক, তারা বলে, আমাদের কাছে দেহ সত্য, পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে আমরা যা কিছু নিচ্ছি এটাই সত্য, এর বাইরে আমরা কিছু মানি না। জৈন দর্শন আধ্যাত্মিক দর্শনের সব দিক থেকে খুবই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু তারা বেদকে শেষ কথা বলে মানে না। অন্য দিকে বৌদ্ধ ধর্ম, ওদের আবার চারটে স্কুল, তারাও বেদকে শেষ কথা বলে মনে করে না। বৌদ্ধদের চার, আর জৈন ও চার্বাক, এই ছয়টিকে বলা হয় নাস্তিক দর্শন। অন্য দিকে আস্তিক দর্শন, যারা বেদকে শেষ কথা বলে মনে করে, এদের মধ্যে প্রথম আসে সাংখ্যদর্শন, সাংখ্যদর্শন কপিল মুনি দিয়েছিলেন। সাংখ্যদর্শনকে সব থেকে প্রাচীন দর্শন বলা হয়। সেইজন্য কপিল মুনিকে সম্মান জানিয়ে বলা হয় Father of philosophy। সাংখ্য মতের সাথে একটু তফাৎ হয়ে আসে যোগদর্শন। যোগদর্শনও খুব প্রাচীন দর্শন, কিন্তু পরের দিকে পতঞ্জলি যোগদর্শনকে তাঁর রাজযোগের মধ্যে codify করে দিলেন। শুধু পতঞ্জলিই নন, আরও অনেকে আছেন যাঁদের যোগদর্শন রয়েছে। কিন্তু বিশেষ করে স্বামীজী আসার পর, পতঞ্জলির রাজযোগ খুব প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে। তৃতীয় দর্শন হল, গৌতম মুনির ন্যায় দর্শন। চতুর্থ হল কাণাদ মুনির বৈশাষিক দর্শন। পঞ্চম দর্শন জৈমিনি মুনির পূর্বমিমাংসা বা মিমাংসা। শেষ দর্শন আসে উত্তর মিমাংসা বা ব্যাসদেবের বেদান্ত। ষড়দর্শনের উপরে ভারতবর্ষে অনেক ভাল ভাল বই আছে, অনেকেই ষড়দর্শনের উপর খুব উচ্চমানের বই লিখেছেন।

সাংখ্যদর্শন ও যোগদর্শন

সাংখ্যদর্শনকে বলা হয় Realism School। দুটো স্কুলের কথা বলা হয় Idealism and Realism। Realism দর্শনে বলা হয়, যা কিছু পরিবর্তন হচ্ছে সব সত্যি। Idealism দর্শনে বলা হয় যে পরিবর্তন গুলো সত্য নয়। সাংখ্য দর্শনে বলে, যে কোন জিনিস যখন হয়, সেটা আগে থেকেই বস্তুর মধ্যে রয়েছে, কিছু ক্রিয়া করা হলে সেই বস্তুটা বেরিয়ে চলে আসে, যার জন্য একে বলা হয় সৎকার্যবাদ, কার্যটা সত্যিকারের হচ্ছে। যেমন মাটির মধ্যে ঘট আগে থেকেই আছে, মাটি থেকে ঘট বেরিয়ে আসে না। আগে থেকেই ঘট মাটিতে আছে, কুম্ভকার নিজের চেষ্টা দিয়ে ঘটকে বার করে নিয়ে আসে। সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্ব, সাংখ্য জগৎকে যেভাবে দেখে, এটাই আবার বেদান্তে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। বর্তমান কালে দুটি দর্শন খুব প্রচলিত, যোগ আর বেদান্ত, এই দুটোরই সৃষ্টিতত্ত্ব সাংখ্য দর্শন থেকে আসছে। সাংখ্যের যে এই মত, যেটা সৃষ্টি হচ্ছে সেটা আগে থেকেই আছে, যেমন ঘট, ঘট আগে থেকেই মাটিতে ছিল। তার মানে, সৃষ্টি বলে নূতন কিছু হতে পারে না, আগে থেকেই আছ। সৃষ্টি হওয়া মানে নূতন কিছু হওয়া। কিন্তু আগে থেকেই যদি থাকে তাহলে নূতন কি করে হবে! কি করে আগে থেকে আছে?

তখন বলছেন, জগতের দুটি সত্তা, পুরুষ বা চৈতন্য এবং প্রকৃতি। পুরুষ হল চৈতন্য, প্রকৃতি জড়। অনাদি কাল থেকে এই দুটো সত্তা রয়েছে, অনাদি কাল থাকবে। সাংখ্য মতে তাই সত্তা দুটি হয়ে যায়, পুরুষ আর প্রকৃতি বা চৈতন্য আর জড়। সেইজন্য সাংখ্য দর্শনই ঠিক ঠিক দ্বৈতবাদ, যেখানে শেষ কথা সত্তা দুটি।

এই দুটি সত্তা, পুরুষ আর প্রকৃতি যখন কাছাকাছি আসে তখনই সৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। পুরুষ অনন্ত, তার মানে আত্মা সংখ্যায় অনন্ত, কিন্তু তার মধ্যে পূর্ণ জ্ঞান আছে। পুরুষ যখন প্রকৃতির কাছে চলে আসে তখন প্রকৃতি নেচে ওঠে। সত্ত্ব, রজো আর তমো এই তিনটে গুণের সাম্য অবস্থা নিয়ে প্রকৃতি জড় হয়ে পড়ে আছে। পুরুষ প্রকৃতির কাছাকাছি এলেই তিনটে গুণের এই সাম্য অবস্থাটা ভেঙে যায়, সাম্য অবস্থা নষ্ট হয়ে যেতেই শুরু হয়ে যায় সৃষ্টি। সৃষ্টি এমন চলতে শুরু করে, পুরুষ যিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, তিনি অবাক হয়ে এই প্রকৃতির দিকে তাকাতে শুরু করেন। এবার প্রকৃতি পুরুষকে নিজের নৃত্য দেখাতে থাকে, প্রকৃতির এই নিত্য অনন্তকাল ধরে চলছে। কিন্তু পুরুষের যে স্বভাব, তাতে প্রকৃতির কোন কিছুতেই তাঁর মুগ্ধ হওয়ার কথা নয়। ফলে আজ হোক, কাল হোক প্রকৃতির খেলাতে তাঁর বিরক্ত এসে যায়। গুরুর কথা যখন শোনে তখনও তার মধ্যে প্রকৃতির ব্যাপারে বিরক্তির ভাব উদয় হয়। বৃদ্ধ হয়ে গেলে ইন্দ্রিয়গুলো নিস্তেজ হয়ে যায়, কিছুই ভোগ করতে পারে না, তখন একটু বিরক্তি আসে। পরের জন্মে আরেকটু বিরক্তি আসে, হতে হতে সে আরও বিরক্ত হয়ে যায়, তখন বলে আমার এসব কিছু লাগবে না। প্রকৃতি তখন আরও নূতন নূতন ধরণের নৃত্য দেখাতে শুরু করে। সেটাতেও তার বিরক্তি আসে, শেষে বলে দেয়, বর্তমান কালের ভাষায় আমার ডিভোর্স চাই। তাও প্রকৃতি প্রাণপন চেষ্টা করে তাকে বাঁধতে, কিন্তু সে আর বন্ধনে পড়তে চাইছে না, এবার সে আলাদা হয়ে গেল। সাধনা মানেই, এই আলাদা হওয়ার চেষ্টা।

একটা পুরুষ মানে একটি আত্মা, সে যদি মুক্ত হয়ে যায় বাকিরা কিন্তু বন্ধনে থাকবে। যতদিন একজনও যদি কেউ বন্ধনে থাকে ততদিন সৃষ্টি চলতে থাকবে। যেদিন সব পুরুষ মুক্ত হয়ে যাবে, সৃষ্টি শেষ হয়ে যাবে। শেষ হলেও কিছু হবে না, কারণ সাংখ্য মতে অনন্ত পুরুষ আছে, প্রকৃতিও অনন্ত, প্রকৃতি একটা রাশির মত, সত্ত্ব, রজো ও তমোর বিরাট একটা ঢিপি। পুরুষ আর প্রকৃতি যেন দুটো নদী, দুটি নদী পাশাপাশি অনন্ত কাল ধরে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, আবার কোথাও দুজনে মিলে যাবে, আবার সৃষ্টি চলতে থাকবে। জগতে যা কিছু আমরা দেখছি, সবটাই পুরুষ আর প্রকৃতির খেলা। মানুষ যখন বিরক্ত হয়ে যায়, তার মধ্যে বৈরাগ্যের ভাব আসে, তখন বলে আমি প্রকৃতির দৃশ্য আর দেখতে চাই না। পুরুষ তখন প্রকৃতি থেকে সরে আসতে শুরু করে। এরপর বিচার করে করে যেটাই দেখে প্রকৃতির এলাকার জিনিস, সেটাকে ছেড়ে বেরিয়ে চলে আসে। শেষ অবস্থায় সে কৈবল্যে, মুক্তির অবস্থায় পৌঁছে যায়।

যোগদর্শন সাংখ্যেরই দর্শন, তফাৎ হল, সাংখ্য ঈশ্বর মানে না, যোগ তার দর্শনে ঈশ্বরকে নিয়ে আসে। যোগের ঈশ্বর আবার সৃষ্টিকর্তা নন। তিনি জ্ঞানীপুরুষ, তিনি কোন কিছুতে জড়ান না। যোগ মতে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার মানে পুরুষ প্রকৃতির মিলন ও আলাদা হয়ে যাওয়া। যোগ মতে আমি সত্য, আমার চিন্তন সত্য। যোগ বিশ্বাস করে মানুষ যদি শরীরের উপর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আসতে পারে, আর মনে যে চিন্তাভাবনা চলছে, এর উপর যদি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আনা হয়, তখন মন ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসে। কেমন শান্ত, স্বামীজী উপমা দিচ্ছেন, জলাশয় পাথর ছোড়ার পর জলে ছোট বড় ঢেউ ওঠে, সেই ঢেউ শান্ত হয়ে গেলে জলের তলদেশে কি আছে দেখা যায়। মন যখন শান্ত হয়ে যায়, তখন তার নিজের ভিতরে কি আছে সে নিজেই জানতে পারবে। এটাই জ্ঞান। এই জ্ঞানে একবার যখন জেনে গেলে আমি এই, তখন কি হয়? যোগ বলছে, *তদাদ্রষ্টু স্বরূপে অবস্থানম্*। সাংখ্যে যেটা বলা হল, প্রকৃতির যে নানা রকমের নৃত্য চলছে, যোগ মতে এই জিনিসগুলো আমাদের মন দিয়ে আসে, সেইজন্য মনের মধ্যে নানান রকমের চিন্তা-ভাবনা, বিচার চলতে থাকে। সাংখ্য মতে বিচার করে এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার কথা বলা হয়, কিন্তু যোগ মতে মুক্তি বিচার করে হয় না, শরীর মনকে নিয়ন্ত্রণে এনে। যোগ মতেও পুরুষ অনন্ত, সাংখ্য মতেও পুরুষ অনন্ত। প্রকৃতির বর্ণনা দুটোতে একই। যে পুরুষ মুক্ত হয়ে গেল, সেই পুরুষই একমাত্র মুক্ত হয়ে গেল, যারা বন্ধনে আছে তারা বন্ধনেই পরে থাকবে।

ন্যায় দর্শন

তৃতীয় দর্শন হল ন্যায় দর্শন। গৌতম মুনি ন্যায় দর্শনের জনক। গৌতম মুনি খুব উচ্চমানের ঋষি ছিলেন, তাঁর চিন্তা-ভাবনাও খুব উচ্চমানের ছিল। সাংখ্য শব্দের অর্থ হয় সম্যক জ্ঞান, ন্যায় দর্শনও বলছে ঠিক ঠিক জানা, সম্যক জ্ঞান। কিন্তু ন্যায় দর্শনের সম্যক জ্ঞান যুক্তি দিয়ে আসে। ন্যায় দর্শন তাদের দর্শনে যে যুক্তিগুলিকে ব্যবহার করে, প্রত্যেকটি যুক্তিই খুব উচ্চমানের। পণ্ডিতদের বক্তব্য হল, পাশ্চাত্য জগতে যত রকম

যুক্তি তারা ব্যবহার করেছে, তার সবটাই আমাদের ন্যায় দর্শনে আছে, আর তা খুবই জটিল। যারা ন্যায় দর্শন নিয়ে অধ্যয়ন করতে যায়, তারা বলে, একটা সূত্রের ব্যাখ্যাই এক মাস ধরে চলে। আর এক মাস পরে কিছুই বুঝতে পারে না কি বলতে চাইছে। ন্যায়ের পণ্ডিতরা ছাড়া কেউ বুঝতেই পারবে না, একমাত্র ওনারাই বুঝতে পারবেন। ন্যায় পণ্ডিতদের সেইজন্য তখন সম্মানও ছিল, কারণ এত কঠিন ও কূট জিনিসগুলিকে পণ্ডিতরা বুঝতে পারেন। ন্যায়ের সবটাই চলে দ্রব্য দিয়ে, আমাদের ভাষায় দ্রব্য মানে বস্তু (substance)। আত্মাকেও ন্যায় দ্রব্য বলছে। এখানে আমরা সহজে বলে যাচ্ছি, কিন্তু এগুলো খুব জটিল জিনিস। ন্যায়ের মতে আত্মা সনাতন, এবং আত্মার ভিতরে সব কিছুই রয়েছে, কিন্তু চেতনা বলতে যেটা বোঝায়, এটা তখনই হয় যখন আত্মার সাথে বুদ্ধির যোগ সাধিত হয়। আত্মার যদি মন বুদ্ধির সাথে সংযোগ হয়, তবেই চেতনা আসবে।

কিন্তু এর সাথে তারা আরেকটা যে মারাত্মক কথা বলেন, তা হল, আত্মার সুখ, দুঃখ, পাপ, পূণ্যের এই বোধগুলি আছে। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যেখানে *ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ* বলছেন, সেখানে কোথাও এগুলোকে ন্যায় দর্শনে ওনারা আত্মার উপরে নিয়ে চলে আসেন। আচার্য শঙ্কর এটাকে খুব জোর আক্রমণ করে পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছেন, এগুলো কখনই আত্মার গুণ হতে পারে না। গৌতম মুনির মতে, আত্মা যখন মনের সাথে জুড়ে যায়, তখনই চেতনার জন্ম হয়। সাধনার উদ্দেশ্য হল আত্মাকে মন থেকে আলাদা করা। আমাদের মনে হতে পারে, কোথাও যেন সাংখ্য আর ন্যায় একই কথা বলতে চাইছে। কিন্তু তফাৎ আছে, সাংখ্য সব কিছুকে জড় বলে নিচ্ছে, ন্যায় কিন্তু পুরোপুরি নিচ্ছে না, এনাদের শ্রেনী বিভাজনের পদ্ধতিটা পুরোপুরি আলাদা। তার সাথে আত্মার সাথে মন জুড়ে গেলে আত্মাকে শুদ্ধ চৈতন্য রূপে ন্যায় দর্শন নেয় না। আত্মা এনাদের কাছে একটা বস্তু, পানের সাথে চুন আর খয়েরের মিলনে যেমন লাল রঙ হয়ে যায়, ঠিক সেই রকম আত্মা আর মনের মিলন হলে চেতনার জন্ম হয়। এই চেতনার উৎসকে যদি কেটে দেওয়া হয়, তখন যে আত্মা সনাতন, সর্বাবস্থায় আছে, নিজের মত আলাদা হয়ে যায়।

বৈশাষিক দর্শন

ন্যায় দর্শনের এর ছোট ভাই হল কণাদ মুনির বৈশাষিক দর্শন। কণাদ মুনি রাস্তা ঘাটে, ক্ষেতে, বাজারে যে চাল, গম, ডালের দানা পড়ে থাকে, সেগুলো তুলে তুলে পনের দিন ধরে জমা করতেন, পনের দিন পর যেটুকু হত ওই এক মুঠোই খেতেন। সেইজন্য তাঁর নাম হল কণাদ। বৈশাষিকের অনেক মত ন্যায়ের সাথে মেলে, যার জন্য ন্যায় আর বৈশাষিক দুটোকে একসাথে নেওয়া হয়। ন্যায়ের কাছে ছাব্বিশটি পদার্থ আছে, যেটাকে দ্রব বলছেন, বৈশাষিকরা কমিয়ে সেটাকে সাতটিতে নিয়ে আসে। এই সাতটার মধ্যে একটা হল ভাব, আরেকটা অভাব। বৈশাষিকদের মতে চার রকমের অণু সব সময় আছে, আর তারা ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই আছে। ঈশ্বরকে তাঁরা মহেশ্বর বলেন। এর মধ্যে আকাশকে ওই গ্রুপে ধরা হয় না। পড়ে থাকল বাকি চারটে – বায়ু, জল, অগ্নি ও পৃথিবী। এই চারটি অণু সনাতন। এনাদের তাই অনেকে গ্রীক এ্যাটমিস্টদের সাথে তুলনা করেন। বর্তমানেও যে ফিজিক্সের এ্যাটম, তার সাথেও তুলনা করেন। কিন্তু এই তুলনাটা সম্পূর্ণ ভুল। ফিজিক্স বা গ্রীক এ্যাটমিস্টদের যে এ্যাটম আর বৈশাষিকদের এ্যাটমের মধ্যে মূল পার্থক্য হল, বৈশাষিকদের এ্যাটম হল ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন। এই এ্যাটমগুলো এত সূক্ষ্ম যে এগুলোকে কোন ভাবেই দেখা যায় না। দুটো অণু মিলে গেলে সেটাকে বলছেন, দুই অণু বা দ্বৈণু, আর ওই দুটো যখন তিনটে করে মিলছে, সেটাকে বলছেন ত্রেণু বা তস্রেণু। তার মানে যেখানে তিনটে এ্যাটম আছে, তিন গুণ দুই ছয় ছয়টি করে এ্যাটম থাকে। বলছেন ত্রেণু যখন হয়ে যায় তখন সেটাকে দেখা যায়। জলে যদি পার্টিকেল থাকে আমরা দেখতে পারব না, দেখা যাবে তখনই যখন ত্রেণু হয়ে যাবে। মূলতঃ বলতে চাইছেন, জিনিসগুলো খুব সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম থেকে স্থূল হয়, সেই স্থূল থেকে আরও স্থূল হয়ে গেল তখন আমরা সেটাকে ইন্দ্রিয়াদি দিয়ে ধরতে পারি। ওনাদের মত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাবতীয় যা কিছু আছে সব পরমাণুর খেলা। পরমাণুর খেলা মানে, অণু, দ্বৈণু, তস্রেণুর খেলা।

একটা মজার ব্যাপার হল, যোগ শাস্ত্রে এই দ্রব্যকে মনের অবস্থায় নিয়ে আসছে, মনের চিন্তা রূপে নিয়ে আসে। সাংখ্যই হোক, যোগ হোক, ন্যায় বা বৈশাষিক হোক, সব কটি দর্শনেই আত্মা বা চৈতন্য আর জড়, কোন না কোন ভাবে এই দুটি সত্তা চলে আসে। বৈশাষিকদের মতে সাধনা মানে, ধীরে ধীরে এই জ্ঞান লাভ করা যে, কিভাবে সব কিছু শুধু এ্যাটম আর এ্যাটম। আমরা খেতে ভালবাসি, খাওয়ার সব কিছুই হল

এ্যটম। কাউকে ভালবাসছি, শেষ পর্যন্ত পুরোটাই কিন্তু এ্যটম। যাবতীয় যা কিছু আছে, সবটাই এ্যটম, এই বিচার করতে করতে কি হয়? ঠাকুর বলছেন, একজন বাঘের মুখোস পড়ে সবাইকে ভয় দেখাচ্ছে। একজন তাকে দেখে বলছে, তোকে আমি চিনে ফেলেছি, তুই অমুক। তখন সে হেসে আরেকজনকে ভয় দেখাতে চলে গেল। ঠিক তেমন যখন কেউ জগতের এই স্বভাবকে জেনে যায়, তখন এই মুখোসটা খসে পড়ে যায়।

পূর্বমীমাংসা

পাঁচ নম্বর দর্শন হল পূর্বমীমাংসা বা মীমাংসা। জৈমিনি মুনি মীমাংসা দর্শন দিয়েছিলেন। মীমাংসা হল সমাধান, জিনিসটাকে বুঝে সামনে নিয়ে আসা। ওনাদের মতে বেদের জ্ঞানই শেষ কথা, যাবতীয় যত জ্ঞান আছে সব বেদেই আছে। তুমি যদি তোমার বুদ্ধিকে ঠিক কর, শুদ্ধ কর্ম যদি কর, তাহলে তুমি ধীরে ধীরে বুঝতে পারবে বেদ কি বলতে চাইছে, বেদের অর্থ কি। বেদের অর্থে তুমি যদি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেতে পারো, আর তার সাথে বেদের কর্ম অর্থাৎ যজ্ঞাদি যদি কর, মৃত্যুর পর তুমি স্বর্গে যাবে। আর শ্রেষ্ঠতম স্বর্গে যাওয়াই জীবনের উদ্দেশ্য। মীমাংসা ঈশ্বর মানে না, বৈশাষিক আর ন্যায় এরা যৌক্তিক, কিন্তু ঈশ্বরকে মানে। মীমাংসাকে বলা হয় বেদের মূল দর্শন। এদের কাছে বেদের বাইরে কিছু নেই, বেদের ঠিক ঠিক অর্থ বার কর। বাকিরাও বেদের অর্থ বার করছে, কিন্তু ন্যায় নিজের মত করছে, বৈশাষিক নিজের মত করছে, সাংখ্যও নিজের মত করছে, কিন্তু মীমাংসা হল একেবারে গোঁড়া। আর অর্থ কি করে বার করতে হবে, তর্ক কিভাবে করতে হবে, সব পূর্বমীমাংকরা পরিষ্কার করে লাইন টেনে দিয়েছেন। সেইজন্য বলা হয়, বেদান্ত যদি বুঝতে হয়, প্রথমে মীমাংসার দর্শনকে ভাল ভাবে বুঝতে হবে। মীমাংসার কাছে ধর্মই শেষ কথা। ধর্ম পালনের জন্য বেদকে মানতে হবে, বেদকে মানার জন্য বেদের যে অর্থ আছে সেটাকে ঠিক ভাবে জানা, মীমাংসা এই ব্যাপারে সাহায্য করে।

উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত

ষড়দর্শনের শেষ দর্শন হল বেদান্ত। বেদান্তের ভূমিকা বলার সময় আমরা এর বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আচার্য শঙ্করের যে বেদান্ত তাতে ব্যষ্টি আর সমষ্টির কোন তফাৎ নেই। ব্যাসদেব উপনিষদকে আধার করে বেদান্ত দর্শন দাঁড় করালেন। উপনিষদ বেদেরই শেষ কথা, পূর্বমীমাংসকরা আবার উপনিষদকে মানবে না। মীমাংসকদের মতে বেদ কি? মীমাংসকদের পরিষ্কার বেদের সংজ্ঞা হল, *মন্ত্র ব্রাহ্মণ বেদ নামধেয়ম্*, বেদ মানে মন্ত্র আর ব্রাহ্মণ। বেদের চারটি অংশ – মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। মীমাংসকরা প্রথম দুটিকেই বেদ বলে মনে করে, বাকি দুটোকে বেদ বলে মনে করে না। মীমাংসকদের সব কথা, সব কিছু যজ্ঞ নিয়ে, যজ্ঞের বাইরে তাদের কিছু নেই। ব্যাসদেবের মত আচার্যরা এবং পরে পরে চিন্তনশীল যাঁরা এসেছেন, তাঁদের মতে উপনিষদ বেদের সার। বেদের যা কিছু বক্তব্য উপনিষদেই দেওয়া হয়েছে। উপনিষদ কি বলতে চাইছে, সেটা যদি কেউ বুঝে নেয়, সে জেনে যাবে বেদ কি বলতে চাইছে, হিন্দু ধর্ম কি বলতে চাইছে। যদিও ব্যাসদেব ৫৫৫টি সূত্রে বলে দিলেন বেদান্ত কি, কিন্তু পরে পরে যাঁরা এলেন দেখা গেল, তাঁরা উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্রের নিজের নিজের মত অনুযায়ী ব্যাখ্যা দিচ্ছেন।

অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈতের মূল পার্থক্য

বেদান্তের অনেক স্কুল রয়েছে, বিভিন্ন শাখা প্রশাখা আছে ঠিকই কিন্তু মূল হল তিনটে – অদ্বৈত, যেটা আচার্য শঙ্করের, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈত আর দ্বৈত হল মাধ্বাচার্যের। বাকি যত স্কুলগুলো থেকে গেল, তাদের মধ্যে একটু একটু তফাৎ। শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, তাতে আমি হলাম ব্যষ্টি আর ব্রহ্ম হলেন সমষ্টি। ব্যষ্টি আর সমষ্টির কি সম্পর্ক, এর উপর নির্ভর করে দর্শন কি হবে। বেদান্ত বলবে, আমি আর ব্রহ্মের মধ্যে কোন তফাৎ নেই, রামানুজ, যিনি বিশিষ্টাদ্বৈত, তিনি বলবেন, আমি আর ব্রহ্ম জুড়ে আছি ঠিকই, কিন্তু যিনি ব্রহ্ম তিনি আসলে নারায়ণ, নারায়ণরই আরেকটা রূপ নির্গুণ নিরাকার। বেদান্ত বলছে, সচ্চিদানন্দই আছেন, সৎ, চিৎ ও আনন্দ, যিনি সৎ তিনিই চিৎ, তিনিই আনন্দ। তিনিই সগুণ সাকার রূপে আমাদের সামনে আসেন। রামানুজ এটাকে পুরো উল্টে দিচ্ছেন। নারায়ণ অনন্ত গুণের আধার, নির্গুণ বলতে বেদ বলতে চাইছে, তাঁর এত গুণ, এত গুণ যে ব্যাখ্যা করা যাবে না। এক নয়, দুই নয়, তিন নয়, তাঁর অনন্ত গুণ, সেইজন্য বেদ তাঁকে নির্গুণ

বলছে। তিনিই আবার অনেক সময় দেখান যেন তিনি এই শরীরে নেই, কারণ পুরাণাদিতে যে বর্ণনা আছে, সেটাকে আধার করে বলছেন। রামানুজ বলবেন, সৎ, চিৎ, আনন্দের যে কথাগুলো বেদে বলা হয়েছে, এগুলো তাঁর স্বরূপ নয়, এগুলো তাঁর গুণ। আচার্য শঙ্কর আর রামানুজের এটা একটা বিরাট তফাৎ। আরেকটা বড় তফাৎ হল, রামানুজ ব্যষ্টি আর সমষ্টি বলতে বোঝান বৃক্ষ আর তার পাতা। পাতা বৃক্ষের সাথে জুড়ে আছে ঠিকই, কিন্তু বৃক্ষ আর বৃক্ষপত্র আলাদা। ঠিক তেমনি আত্মা আর পরমাত্মা আলাদা, কিন্তু আত্মা পরমাত্মার সাথে জুড়ে আছে। রামানুজের মতে মুক্তি মানে প্রপত্তি, ভিতরে যত দুর্গুণ আছে সব দুর্গুণকে পরিষ্কার করা আর মুক্তি দিয়ে ভগবানের শ্রীচরণে সমর্পিত করে দেওয়া। মাধ্বাচার্য আবার গোঁড়া দ্বৈত। তিনি বলেন, এ-জিনিস কল্পনাই করা যায় না যে, আত্মা কোন ভাবে পরমাত্মার সাথে জুড়ে থাকতে পারে। ঈশ্বর মালিক আর আত্মা তাঁর চাকর। অদ্বৈতের কাছে মায়া হল কল্পনা, মিথ্যা, মাধ্বাচার্যের কাছে এটা বাস্তবিক, এটা সত্য। আর ঈশ্বরের কৃপা ছাড়া এই বন্ধন কোন দিন যাবে না, কারণ ঈশ্বরই এই বন্ধন রেখেছেন। উপায় হল, তাঁর শরণাগত হওয়া, তাঁর ইচ্ছা মত কাজ করা, তাঁর সেবাদি করা। যদিও মাধ্বাচার্য বেদকে আধার করেই তাঁর দর্শন তৈরী করেছেন, কিন্তু তিনি অনেক ক্ষেত্রে পুরাণের উপর নির্ভর করতেন। মাধ্বাচার্যের দর্শনে তাই পুরাণের বিরাট গুরুত্ব পায়। আচার্য শঙ্করের কাছে যদিও পুরাণের গুরুত্ব আছে, কিন্তু তাঁর কাছে উপনিষদ ও গীতা বেশি গুরুত্ব পায়। মাধ্বাচার্য এক বিশাল মাপের পণ্ডিত ছিলেন, তাঁর ক্ষুরধার যুক্তি দিয়ে তিনি দেখান, আত্মা সব কিছুতে সব সময় পরমাত্মার উপর নির্ভরশীল। আত্মার কোন স্বাধীনতা নেই, একেবারে গোলামের মত অবস্থা। যদি কোন ভাবে ঈশ্বরের কৃপা পাওয়া যায় তবেই মানুষের মুক্তি হয়। কথামৃত খুব ভাল করে পড়লে দেখা যাবে, ঠাকুর কখন অদ্বৈতের কথা বলছেন, কখন বিশিষ্টাদ্বৈতের কথা বলছেন আবার কখন দ্বৈতের কথা বলছেন। সেই কারণে মানুষের অনেক সময় সংশয় হয়ে যায়। অনেকে আবার জানতে চায়, ঠাকুরের কি ভাব ছিল? আসলে ঠাকুরের ঠিক ঠিক কি দর্শন ছিল, এর উপর এখনও সেই রকম গভীর ভাবে কাজ হয়নি। এই হল খুব সংক্ষেপে ষড়দর্শন। এরপর স্বামীজী এই ষড়দর্শনকে আধার করে বেদান্তকে নিয়ে এগোতে শুরু করবেন, যেখানে উনি মাঝে মাঝে রামানুজের কথাও বলছেন, মাঝে মাঝে মাধ্বাচার্যের কথাও বলছেন। কিন্তু শেষমেশ শঙ্কর থেকে শুরু করে, রামানুজ ও মাধ্বাচার্য এই তিনটে দর্শনকে মিলিয়ে বেদান্ত বাস্তবে যেমনটি হওয়ার কথা, সেটাকে নিয়ে আলোচনা করবেন।

<u>সোমবার, ৮ই জুলাই</u>

এরপর আমরা ৮ই জুলাইয়ের স্বামীজীর ক্লাশের উপর আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছি। স্বামীজী থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে শিষ্যদের সামনে ব্রহ্মসূত্রের উপর তিনটে ভাষ্যকে নিয়ে, অর্থাৎ শঙ্করাচার্য, রামানুজ ও মাধ্বাচার্য তিনজনের ভাষ্যকে নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। শিষ্যরা যাঁরা শুনছিলেন, ধীরে ধীরে দেখা গেল তাঁদের কাছে রামানুজের ভাষ্যটা বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। যদিও এগুলো কথার কথা, এর কোন দাম নেই। স্বামীজী যখন যেটাই বলতেন, তিনি শাস্ত্রের বক্তব্যের সাথে নিজের মন্তব্যকে মিশিয়ে বলতেন। সেইজন্য ধরা খুব মুশকিল হয়ে যায়, কোনটা ওনাদের কথা আর কোনটা স্বামীজীর কথা। আমরা কিন্তু প্রত্যেকটি বাক্যকে সিদ্ধান্ত বাক্য রূপেই নিচ্ছি। যে যে কথা বা মন্তব্য স্বামীজীর পছন্দের নয়, সেখানে স্বামীজীর কথা শুনলেই বোঝা যায় যে স্বামীজী এই ব্যাপারে এক মত নন।

মাধ্বাচার্যের প্রসঙ্গে স্বামীজীর বক্তব্য

৮ই জুলাইয়ের ক্লাশের প্রথমেই স্বামীজী বলছেন, There is no place for reasoning in Madhva's explanation, it is all taken from the revelation in the Vedas. (*মাধ্বাচার্যের ব্যাখ্যার ভিতর বিচারের স্থান নেই –তিনি শাস্ত্রপ্রমাণে সব গ্রহণ করেছেন।*)

এর আগে আমরা মাধ্বাচার্যকে নিয়ে খুব সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। মাধ্বাচার্যের নামে একটা কথা প্রচলিত আছে, আমাদের জানা নেই কথাটা কত সত্যি, মাধ্বাচার্য বলতেন, আমি বায়ুপুত্র, মহাবীর হনুমানের ছোটভাই। শরীর ওনার হাড্ডাগাড্ডা ছিল। তর্কাতর্কি করতে করতে কোন কারণে যদি বিরুদ্ধ পক্ষের সাথে অশান্তি লেগে যেত, তখন দরকার হলে উনি বিরোধীকে তুলে আছাড় মেরে দিতে দ্বিধা করতেন না। মাধ্বাচার্য

চোদ্দশ খ্রীষ্টাব্দের সময়ের, তখন ইসলাম ভারতে পুরোদমে ঢুকে গিয়েছিল। মুসলিমদের সাথে ওনার সম্পর্ক ছিল, উনি ওদের কাছ থেকে এই জিনিসটা ভাল করে শিখে নিয়েছিলেন, যদি দরকার পরে আছাড় মেরে দাও। মুসলিম পণ্ডিতরাও এভাবেই সব রকম বিরোধ মিটিয়ে দিত। তর্ক করতে করতে যদি দেখে যুক্তিতে দাঁড় করাতে পারছে না, তখন তলোয়ার বার করে তর্কটা ওনারা মিটমাট করে নিত। মাধ্বাচার্য যুক্তিতর্ক সবই নিতেন, কিন্তু ওনার একটা রীতি বা কৌশল যাই হোক ছিল, সবাই ওনার এই ব্যাপারটাকে নিয়ে বলে, যদিও মাধ্বাচার্যের অনুগামীরা এটা মানতে চান না; তা হল – উনি শব্দকে নিজের মত ভাঙতেন, রামানুজও একই জিনিস করতেন। গীতা, উপনিষদের যে কোন শব্দকে নিজের মত ভেঙে দিতেন। একটা হয় সমাস আরেকটা হয় সন্ধি। সন্ধিকে তিনি নিজের মত ভাঙবেন, আর সমাসকে উনি নিজের মত করে অর্থ করবেন। গীতার ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর এক জায়গায় বলছেন, এখানে বহুব্রীহি সমাস হবে নাকি এখানে তৎপুরুষ সমাস হবে, এই নিয়ে অনেকের সংশয়। কেউ কেউ এটাকে এভাবে করে, তখন উনি বলছেন, এভাবে করলে অর্থ বেরোবে ঠিকই, কিন্তু গীতার যে সার্বিক মূল ভাব, সেই ভাবের বিরুদ্ধে হয়ে যাবে, সেইজন্য এটাকে নেওয়া যাবে না।

মাধ্বাচার্য ব্যাকরণের তুখোড় পণ্ডিত ছিলেন, ব্যাকরণকে তিনি নিজের হাতে খেলাতেন। নিজের পাণ্ডিত্য দিয়ে তিনি শব্দকে নিজের মত ভাঙতেন। একটা ছোট্ট দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখানো যেত পারে। কালিদাসের খুব নামকরা কথা আছে, *জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতী পরমেশ্বরঃ*। শিব ও পার্বতীকে বন্দনা করা হচ্ছে। পিতরৌ দ্বিবচন, দুজনকে। ওরা আপত্তি করে বলবে, এখানে পার্বতী আছে 'পিতৃ' কি করে হবে? ইংরাজীতে parent শব্দে বাবা আর মা দুজনেই থাকেন, 'পিতৃ' শব্দে এখানেও তাই করা হচ্ছে, মা ও বাবা দুজনকেই সম্বোধন করে বলা হচ্ছে। কিন্তু সংস্কৃতে 'পিতৃ' শব্দে মাকে আনা যাবে না। কিন্তু পরিষ্কার পার্বতী পরমেশ্বরঃ বলছেন। কিন্তু ওদের কাছে এভাবে হবে না, পার্বতীর 'প' এদিকে নিয়ে আসবে আর 'রমাঈশ্বরো' ওই দিকে যাবে, এখানে সন্ধি ভাঙতে হবে। পার্বতীর 'প' যদি লাগিয়ে দেওয়া হয়, তার মানে হবে পতি, পার্বতীপতি হলেন শিব, আর রমাঈশ্বরো মানে বিষ্ণু। দুই ভগবানকে প্রণাম করা হচ্ছে। কোন দুজন ভগবান? শিব আর বিষ্ণুকে। এই হল সংস্কৃতের বিপদ। সংস্কৃত দেবভাষা যাই হোক, কিন্তু দেবতারা কখন এত confused ছিলেন কিনা জানা নেই। কিন্তু সংস্কৃতের পণ্ডিতরা সবাই confused হন। অনেক সময় খবরকাগজের নিউজে আসে, কোন সার্জেন কাঁচি চালাতে গিয়ে রোগীর যেটা কাটার সেটা না কেটে অন্য কিছু একটা কেটে দিয়েছে। এখানেও তাই, পণ্ডিতরা কোন সন্ধির কোনটা কাটবেন, কোথা থেকে কাটবেন, কারটা কাটতে গিয়ে কার কেটে দেবেন জানা নেই। আমরা সাধারণ মানুষ, আমাদের পাণ্ডিত্য নেই, আমরা তর্ক করতে পারব না। দুই হাতির লড়াইয়ে ঘাস মারা যায়, পণ্ডিতদের লড়াইয়ে সাধারণ মানুষ মরে।

স্বামীজী এটাই বলছেন, মাধ্বাচার্য ঠিক ঠিক যে যুক্তিতর্ক দিয়ে চলতে হবে, এটাকে তিনি মানতেন না। শুধু তাই না, উনি পুরাণ থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি নিয়ে আসতেন, পুরাণকে তিনি বেদের মর্যাদা দিয়ে রেখেছিলেন। মহাভারতকেও তিনি প্রচুর মানতেন। ফলে তিনি যখনই কোন কিছুকে প্রমাণিত করার থাকত, উনি পুরাণ থেকে মহাভারত থেকে উদ্ধৃত নিয়ে এসে প্রমাণ করে দিতেন। ঠিক ঠিক যে যুক্তি, যে ব্যাপারে আচার্য শঙ্কর ছিলেন সিদ্ধ, যার জন্য তাঁর এত সম্মান, মাধ্বাচার্য এতটা যুক্তির দিকে যেতেন না।

রামানুজের মত

এটা বলার পর স্বামীজী রামানুজের উপর আসছেন। বলছেন, Ramanuja says, the Vedas are the holiest study. যদি পড়াশোনা করতে হয়, রামানুজের কাছে ছিল, বেদ ছাড়া কিছু পড়বে না। আমাদের মনে রাখতে হবে রামানুজ হলেন একাদশ শতাব্দির। Let the sons of the three upper castes get the Sutras, and at eight, ten, or eleven years of age begin the study, which means going to a Guru and learning the Vedas word for word, with perfect intonation and pronunciation. (*রামানুজ বলেন, বেদই সর্বাপেক্ষা পবিত্র পঠনীয় গ্রন্থ। ত্রৈবর্ণিক অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য –এই তিন উচ্চ বর্ণের সন্তানদের যজ্ঞোপবীত-গ্রহণের পর অষ্টম, দশম ও একাদশ বর্ষ বয়সে বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করা উচিত। বেদাধ্যয়নের অর্থ গুরুগৃহে গিয়ে নিয়মিত স্বর ও উচ্চারণের সহিত বেদের শব্দরাশি অদ্যন্ত কণ্ঠস্থ করা।*) Sutra মানে যজ্ঞোপবীত, যারা দ্বিজ তারা যেন যজ্ঞোপবীত ধারণ করে।

বলা হয় যে, বেদের জ্ঞান ঈশ্বরের সাথেই থাকে, তিনি যখন সৃষ্টি করেন তখন সৃষ্টির সাথে বেদের জ্ঞানরাশিকেও তিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছেড়ে দেন। একটু গভীরে গেলে এর অর্থ হবে, ঋষিরা যখন ধ্যানের গভীরে যান, প্রথমে তাঁর কথাবার্তা ও অন্যান্য জাগতিক সব কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ধ্যান করতে করতে তাঁদের মন এমন শান্ত হয়ে যায় যে, মন তখন যোগের অবস্থায় চলে যায়। ওই অবস্থায় মনের বৃত্তি বন্ধ হয়ে যায়, তখন জ্ঞাতা, জ্ঞেয় আর জ্ঞানের তফাতটা যেন মুছে যায়, তখন সেই ঋষি জ্ঞানস্বরূপ হয়ে যান। জ্ঞানস্বরূপ হওয়া মানেই ঈশ্বরের সাথে এক হয়ে যাওয়া। মননাশ অবস্থায় তাঁদের ভিতর যে জ্ঞানের আবির্ভাব হয়, এরপর ওই জ্ঞানকে আর ঋষিপ্রদত্ত জ্ঞান বলা যাবে না। ঠাকুর বলছেন, মানুষ মানে যার মানে হুঁশ আছে। অর্থাৎ যার মন আছে সেই মানুষ। ইগো জিনিসটা মন থাকলেই থাকবে। মনই যাঁর নাশ হয়ে যায়, তাঁর ইগোটা এমনিতেই নাশ হয়ে যাবে। মনই যাঁর নাশ হয়ে গেছে, যাঁর আর মন নেই, তিনি আর কিসের মানুষ। কথামৃতে ঠাকুর সমাধির অবস্থা থেকে এসে যে কথাগুলো বলছেন, সেই কথাগুলো মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণের কথা নয়, হতেই পারে না। কারণ যে জ্ঞানরাশি তিনি পেয়েছেন, ওই জ্ঞান তাঁর মন বুদ্ধি দিয়ে পাওয়া নয়। এই জ্ঞান সব ঈশ্বরের সাথেই থাকে, আর এই জ্ঞান ঈশ্বরেরই জ্ঞান। সেইজন্য ঠাকুর প্রত্যেক কথাতেই বলছেন, মা আমাকে দেখিয়ে দিলেন, মা আমাকে রাশ ঠেলে দিচ্ছেন, মা আমাকে দিয়ে বলালেন, মা আমাকে বলে দিলেন, সব অবস্থায় শুধু মা আর মা চলছে, মা ছাড়া ঠাকুরের কাছে আর কিছু নেই।

ধ্যানের গভীরে গিয়ে ঋষিরা যে জ্ঞান পেলেন, সেই জ্ঞানে সত্য যেন তাঁর সামনে খুলে গেল। সৃষ্টির সত্য, ঈশ্বরের সত্য, মানুষের সত্য, সংসারের সত্য এই জিনিসগুলো তাঁরা পেয়ে গেলেন। সেই কথাগুলোকে তাঁরা নিজের শিষ্যদের বা নিজের সন্তানদের বলে দিতেন। তখনকার দিনে লেখালেখির প্রচলন ছিল না, আর লিখতে গিয়ে, কপি করতে গিয়ে কি ভুল হয়ে যাবে, কি বাদ চলে যাবে কোন ঠিক নেই; তাই তাঁরা শিষ্যদের বলে দিতেন। ওই শিষ্য পরম্পরায় কেউ যদি ভাল কবি হতেন, তিনি যেমন ভাবে গুরুর কাছ থেকে পেয়েছেন, যেমন তিনি গুরুর কাছে শিখেছেন, তেমন ভাবে তিনি ওটাকে একটা ছন্দে বেঁধে দিতেন। অনেক সময় ঋষি নিজেও ছন্দোবদ্ধ করে দিতেন। এবার পরম্পরায় সেই সত্যটা চলতে শুরু করল। আজকে বেদে যত মন্ত্র রয়েছে, যত প্রার্থনা রয়েছে, যে সূক্তগুলো রয়েছে, সব এভাবেই এসেছে। বেদ তখন লেখা হত না, কবে থেকে ঠিক বেদ লেখা শুরু হয়, এই নিয়ে অনেক রকম মতবাদ ও বিতর্ক আছে। তবে বলা হয় আজ থেকে এক হাজার বছর আগে কাশ্মীরের এক পণ্ডিতের চিন্তা হতে শুরু হল যে, যেভাবে মুসলমানরা ব্রাহ্মণদের গলা কেটে দিচ্ছে, তাতে বেদকে আর বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। উনি তখন নিজের উদ্যোগে বেদের কপি বানাতে শুরু করলেন। এরপর কিছু কিছু লোকেরাও লিখতে শুরু করল ঠিকই, কিন্তু এখনও, আজকের দিনেও প্রচুর গুরুকুল আছে, যাঁরা পুরো বেদকে মুখস্ত পরম্পরায় চালিয়ে যাচ্ছেন।

বেদের পঠণ পাঠনে বেদের উচ্চারণবিধি একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। বলা হয়, বেদের মন্ত্র যদি ঠিক ঠিক ভাবে উচ্চারণ না করা হয়, সেই মন্ত্র ফলে দেবে না। বেদের উচ্চারণ বিধি একটা স্বতন্ত্র বিজ্ঞান, যার নাম শিক্ষা। বেদের ছটি অঙ্গের একটি অঙ্গ হল শিক্ষা। যারাই বেদ অধ্যয়ন করত তাদের চারটে বেদের সাথে বেদের এই ছটি অঙ্গও পড়তে হত – শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ আর জ্যোতিষ। আশ্চর্যের যে, মুসলমানদের একটা নির্দেশ আছে যে, প্রত্যেক মুসলমানকে জীবনে অন্তত একবার ধীরে ধীরে, অর্থ বুঝে সঠিক ভাবে, স্পষ্ট ভাবে উচ্চারণ করে পুরো কোরাণকে পাঠ করতে হবে। ভাল মুসলমান হতে গেলে কি কি করতে হবে, তার মধ্যে এটা একটা। বেদে উচ্চারণবিধিকে খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়। এটাই রামানুজ বলছেন, ছাত্র গুরুর কাছে গিয়ে সেখানে বেদ অধ্যয়ন করবে। কবে গুরুর কাছে যাবে? রামানুজ বলছেন, আট, দশ আর এগারো, এই তিনটে বয়সের যে কোন একটা বয়সে গুরুর কাছে যাবে। বেদ পড়তে মোটামুটি বারো বছর লেগে যেত, সাথে বেদান্ত, বেদাঙ্গ পড়বে, তারপর সে নিজের গৃহে ফিরে আসবে। রামানুজের ব্যাপারে এটা বলার পর স্বামীজী এগিয়ে এসে জপ সম্বন্ধে বলছেন।

Japa is repeating the Holy Name; through this the devotee rises to the Infinite. (*জপের অর্থ –ভগবানের পবিত্র নাম পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ; এই জপ করতে করতে সাধক ক্রমে ক্রমে সেই অনন্তস্বরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হন।*) স্বামীজী বেদের কথা বলতে বলতে জপ নিয়ে বলতে শুরু করে বলছেন,

মানুষ যে জপ করে, এই জপ করতে করতে মানুষ অনন্তে পৌঁছে যায়। শ্রীশ্রীমাও বলছেন, জপাৎ সিদ্ধি, জপ করতে করতেও মানুষ সিদ্ধ হয়ে যায়। এখানেও সেই একই পদ্ধতি, জপ করতে করতে মন একাগ্র হয়, মন যত একাগ্র হতে থাকে, সেখান থেকে ধীরে ধীরে তার কাছে সব কিছু স্পষ্ট হয়ে যায়। বেদের ব্যাপারে বলতে গিয়ে যেমন বলা হয়েছিল, ধ্যানের গভীরের ঋষিদের কাছে আধ্যাত্মিক জগতের সত্যগুলি সব স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল, স্পষ্ট হওয়ার পর তিনি সেই সত্যকে মন্ত্র রূপে আমাদের দিলেন। ঋষির দেওয়া এই মন্ত্রকে কেউ যদি ঠিক ঠিক উচ্চারণ করে যেতে পারে, তাহলে সেও সেইখানে অর্থাৎ ঋষির অবস্থায় পৌঁছে যেতে পারবে। জপেও ঠিক তাই হয়, তবে একটু অন্য ভাবে। জপের সাথে ইষ্টমন্ত্রের অর্থের চিন্তন করতে হয়। যোগশাস্ত্রে বলছেন, *তজ্জপস্তদর্থভাবনম্*, যদি ওঁম এর জপ করা হয়, জপের সাথে সাথে যদি তার অর্থেরও চিন্তন করা হয়, তাহলে মন একাগ্র হয়ে যাবে।

মুক্তি যদি চাও, ক্ষুদ্রকে ছেড়ে বৃহৎকে ধর

উপনিষদ ও বেদান্ত শাস্ত্রে বার বার বলা হয়, বেদে যে যজ্ঞাদির কথা বলা হয়, সেই যজ্ঞাদি করলে মানুষ স্বর্গে যায়, কিন্তু কোন স্বর্গই চিরস্থায়ী নয়। পূণ্য কর্মের কোটা শেষ হয়ে গেলে সেখান থেকে সবাইকে আবার ফেরত আসতে হবে, সেইজন্য সেই জিনিসটাকেই পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে যে জিনিসটা চিরন্তন। স্বামীজী বলছেন, This boat of sacrifice and ceremonies is very frail, we need more than that to know Brahman, which alone is freedom. (*যাগযজ্ঞাদি যেন ভঙ্গুর নৌকা। ব্রহ্মকে জানতে হলে ঐ যাগযজ্ঞাদি ছাড়া আরও কিছু চাই। আর ব্রহ্মজ্ঞানই মুক্তি।*) মুণ্ডকোপনিষদে বলছেন, *প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা*, যাগযজ্ঞ গুলো নড়বড়ে সেতুর মত, যাগযজ্ঞ তোমাকে কোথাও নিয়ে যেতে পারবে না। স্বামীজী ঘুরে ঘুরে মুক্তির কথাতেই নিয়ে আসছেন। মুক্তি হল ব্রহ্মজ্ঞান, মুক্তি মানে আত্মজ্ঞান, তার নীচে কোন কথাতেই আমরা রাজী নই। অনেক সময় নেতারা একটা স্লোগান দিয়ে দেয়, আমাদের এটাই চাই, এর নীচে আমরা কিছু চাই না। গান্ধীজী স্লোগান দিলেন, ইংরেজ ভারত ছাড়ো, আমাদের যা ভাগ্য দুর্ভাগ্য হওয়ার হবে, আমাদের উপরে ছেড়ে দাও, তুমি ভারত ছাড়ো, এর নীচে আর কোন কথা নয়। সমস্ত কংগ্রেস নেতাদের নিয়ে গিয়ে জেলে পুরে দিল। মাঝখান থেকে কংগ্রেসের কোন নেতা বাইরে না থাকাতে মুসলিম লীগ পাওয়ারফুল হয়ে গেল, জিন্না পাওয়ারফুল হয়ে গেল, ফলস্বরূপ ভারত দ্বিখণ্ডিত হয়ে পাকিস্থান এসে গেল।

Liberty is nothing more than destruction of ignorance, and that can only go when we know Brahman. (*মুক্তি আর কিছু নয় –অজ্ঞানের নাশ; একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানেই এই অজ্ঞানের নাশ হয়।*) বেদান্তের মূল হল, মুক্তিই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। মুক্তির নীচে আমাদের আর কিছু লাগবে না। কিসের থেকে মুক্তি? অজ্ঞান থেকে মুক্তি? অজ্ঞান মানে, আমার প্রকৃত স্বরূপ কি, আমি কে, এটা ভুলে গেছি। এই অজ্ঞানতার জন্যই আজ আমাদের এত দুরবস্থা। যদি একবার জেনে নেতে পারি আমি কে, তখনই অজ্ঞান নাশ হয়ে যাবে। বৃহৎ, সব থেকে যিনি বড়, বৃহৎ হলেন ব্রহ্ম, যতক্ষণ ব্রহ্মকে না জানা হয়, বৃহৎকে যতক্ষণ না জানা হয় ততক্ষণ আমরা ছোটর সাথে জুড়ে থাকব, ছোটের সাথে জুড়ে নেওয়াটাই সংসার, বৃহতের সাথে জুড়ে নেওয়াটাই জ্ঞান। ধর্ম সাধনই বলি, বেদান্তই বলি, সবার উদ্দেশ্য একটাই, ছোটকে ছেড়ে বড়কে ধরা। উপনিষদ খুব সুন্দর ভাষায় বলছেন, *যোগৈঃ ভূমা তৎ সুখম্*, বৃহতেই সুখ, ছোটতে সুখ নেই। সব কিছুতে বড়তেই সুখ।

একটা যদি বাড়ি থাকে আমার ভাল লাগবে, বাড়িটা যদি বড় হয় তাহলে আরও সুখ হবে। আর যদি দুটো বাড়ি হয় তাহলে আরও সুখ, চারটে বাড়ি হলে আরও সুখ, যত বড় হবে তত সুখের সীমাও বাড়তে থাকবে। জগতে যত বাড়ি আছে সব আমার, আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত বাড়ি আছে সব আমার, এরজন্য আমাকে আগে সন্ন্যাসী হতে হবে, এছাড়া কোন পথ নেই। রাজার দশটা বাড়ি থাকতে পারে, মহারাজা মানে সব বাড়িই তার, সেইজন্য সন্ন্যাসীদের মহারাজ বলে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত বাড়ি আছে সব সন্ন্যাসীর। সন্ন্যাসী সব কিছু ছেড়ে দিয়ে এসেছে, তার মানে নারী, পুরুষ সবার সাথেই তাঁর সম্পর্ক হয়ে গেল। এরপর ত্যাগের ব্যাপারে সন্ন্যাসী একটু যদি কামিনী-কাঞ্চন, নামযশের সাথে আপোষ করে নেয়, সন্ন্যাসী ওখানেই শেষ। সেইজন্য যমরাজ নচিকেতাকে বলছেন, *ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া*। সন্ন্যাসী যখন সমস্ত জগৎকে বলেছেন, এটা আমার ঘর।

এরপর সামান্যতম একটু যদি কোথাও আপোষ করতে চান, কোন বিশেষ কিছুকে বা কোন ব্যক্তিকে যদি একবার বলেছেন ‘এটা আমার’, বা ‘ও আমার’, তাহলে পাহাড়ের চূড়া থেকে নীচে পড়ার মত অবস্থা হবে।

একজন সংসারীর হয়ত দুটি বাড়ি ছিল, একটা বাড়ির মালিকানা চলে গেছে, সে অনেক কান্নাকাটি করবে, কারণ দুটো বাড়ি থেকে একটা বাড়ি হয়ে গেছে। একজন সত্যিকারের সন্ন্যাসী কোটি কোটি বাড়ির মালিক। এবার কোন নারীর পাল্লায় পড়ে একটা বাড়িকে সেই সন্ন্যাসী আপন করে নিয়েছে। সন্ন্যাসীর এবার কটা বাড়ির মালিকানা চলে গেল? কোটি কোটি বাড়ির মালিকানা চলে গেল। তাঁর দুঃখ কত হবে? কোটি কোটি গুণ। সন্ন্যাসী যদি কাউকে, ছেলে হোক আর মেয়েই হোক, বিশেষ ভাবে ভালবেসেছে, তার সর্বনাশ। সেই কথাই বলছেন, *যোবৈঃ ভূমা*, যদি সুখ চাও, যদি মুক্তি চাও তাহলে বড়কে ধর। বড় মানে এই নয় যে, অনেকটা উপরে গিয়ে একটু ছেড়ে দিলাম, হয় এক না হয় শূন্য। হয় ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞানে সন্ন্যাসী যদি না থাকে, তার নীচে একটাই আছে – ভ্রমজ্ঞান, ভ্রমজ্ঞানে নামতে হবে। হয় ব্রহ্মজ্ঞানে থাকবে, নয়তো ভ্রমজ্ঞানে থাকবে। হয় ব্রহ্ম হয়ে থাকবে, নয়তো ব্রহ্মা হয়ে শেষ হয়ে যাবে। ব্রহ্মা হলেন সৃষ্টিকর্তা, সর্বোপরি ব্রহ্ম না হলে ব্রহ্মা। জগতের সৃষ্টিকর্তা তো হতে পারবে না, কয়েকটা খ্যাপাটে ঘোড়া, গাধা সন্তানের জন্ম দেবে। ধর্ম পথে মাঝামাঝারি কোন স্থান নেই। বেদান্তের এটাই মূল, স্বামীজী বলছেন, you have to know Brahman। আবার বেদের যজ্ঞকে নিয়ে স্বামীজী বলছেন।

যে কর্ম মুক্তির দিকে নিয়ে যায়

It is not necessary to go through all these ceremonials to reach the meaning of the Vedanta. Repeating Om is enough. (*বেদান্তের তাৎপর্য জানতে গেলে যে এই সব যজ্ঞযাগ করতেই হবে, তার কোন মানে নেই; কেবল ওঙ্কার জপ করলেই যথেষ্ট।*) বেদের দুটি কাণ্ড, কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। বেদের কর্মকাণ্ড পড়লে মনে হবে সারা জীবন শুধু যজ্ঞই করে যেতে হবে, এই যজ্ঞ করতে হবে, সেই যজ্ঞ করতে হবে, আর যজ্ঞের আণুষাঙ্গিক ও পদ্ধতিও খুব জটিল। প্রায়শই অনেকে এসে বলে, এখন ধর্ম কি! বুড়ো বয়সে ধর্ম করা যাবে। তারপরে বলবে, আগে ব্রহ্মচর্য কর, গার্হস্থ ধর্ম পালন কর, সব শেষে বাণপ্রস্থ নেওয়ার পর সন্ন্যাস ধর্মে এসো। এগুলো হল, এখন সামর্থ থাকতে থাকতে তুমি ভোগ-টোগ যা কিছু করার সব করে নাও, শেষে ধর্ম করবে। কিছুটা বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে আর আমাদের উপনিষদের কিছু কিছু জায়গায় আছে, ঈশ্বরজ্ঞানের পথে যদি তুমি যেতে চাও, এই লম্বা রাস্থা পেরোতে হবে না, শর্টকার্টে বেরিয়ে যাবার পথ আছে, এটা হল প্রথম। দ্বিতীয় হল, কর্মের দিক থেকে তোমাকে সমস্ত রকম যজ্ঞ করতে হবে না, কর্মকে যজ্ঞ রূপে কর। বেদের সময় সবাইকে নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মগুলি করতে হত। নিত্যকর্ম হল সকাল বিকাল অগ্নিহোত্রাদি কর্ম। নৈমিত্তিক হল, বিশেষ বিশেষ দিনে বিশেষ বিশেষ যজ্ঞাদি কর্ম করা, যেমন আজ পূর্ণিমা, কাল অমাবস্যা, আজ ছেলের উপনয়ন, কাল অন্য কিছু, সারা বছর ধরে শুধু যজ্ঞ আর যজ্ঞ। এত যজ্ঞ যে একজন ব্রাহ্মণ সব সময় ওই যজ্ঞেতেই আটকে থাকত, অন্য দিকে মন লাগাবার সুযোগ থাকত না। যজ্ঞ ছাড়া আর কোন কাজ করত না।

গীতায় এসে এর orientationটাই পুরো পাল্টে গেল। যে কর্মই তুমি কর না কেন, সেই কর্মকে তুমি যজ্ঞ রূপে সম্পন্ন কর। তুমি খাচ্ছ, জঠরাগ্নিতে তুমি আহুতি দিচ্ছ। নিঃশ্বাস নিচ্ছ এটাও যজ্ঞ। লেখাপড়া করছ এটাও যজ্ঞ, যা কিছু করছ সব যজ্ঞ। পুরো চিন্তা-ভাবনাটাই পাল্টে গেল। যেখানে মানুষের মাথায় এক মনের বোঝা, সেখানে সে সম্পূর্ণ ভাবে হাল্কা হয়ে গেল। গাড়ী ভুলে প্রথম গিয়ারে চলছিল, সেটাকে এখন চতুর্থ গিয়ার থেকে পঞ্চম গিয়ারে দিতেই গাড়ী সাঁ করে বেরিয়ে গেল। সেইজন্য আমাদের কাছে ওঁ জপটাই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ। যে কোন মন্ত্রে ওঁ লাগিয়ে দিলে ওই মন্ত্রের জপই যথেষ্ট, এরপর আর কোন যজ্ঞ করার দরকার হয় না। দরকার হল, প্রত্যেকেটি কর্মকে যজ্ঞ রূপে সম্পন্ন করা। কোন কর্ম যদি যজ্ঞ রূপে না করা হয়, ওই একটা কর্মই তার সর্বনাশ করে দেবে। খাওয়াটা যদি যজ্ঞ রূপে করা হয়, তখন খাওয়াতে কোন লোভ করা যাবে না। কিন্তু খাওয়ার সময় পাঁচ রকম আয়োজন, এলাহি ব্যাপার নিয়ে আসা হয়, ওটা আর তখন যজ্ঞ থাকল না, তখন ভোগ হয়ে গেল। প্রসাদ খেতে গিয়ে ভাল ভাল আইটেমের দিকে নজর, খিচুড়িটা গরম আছে কিনা, মিষ্টি কত রকম আছে দেখছে, ওটা তখন আর যজ্ঞ থাকল না, কর্ম হয়ে গেল। খাবার পুষ্টিকর থাকবে

ঠিক আছে, কিন্তু পছন্দ অপছন্দের ব্যাপার যেমনি এসে যাবে, আর ওটা যজ্ঞ থাকবে না। গীতা আসার পর আমাদের চিন্তা-ভাবনা গুলোকে পুরো পাল্টে দিয়েছে। বর্তমান কালের হিন্দু ধর্ম যজ্ঞরূপী কর্ম করে না, কর্মকেই যজ্ঞ রূপে করে।

যদি আমাকে কোন একটা কিছু হতে হয়, আমি যদি কোন রাজকুমার রূপে নিজেকে দেখাতে চাই, আমার পোষাক, আমার হাটাচলা, আমার খাওয়ার স্টাইল, আমার কথাবার্তা সবটাই পাল্টাতে হবে, সবটাই রাজকীয় করতে হবে। আমি আপনি সবাই জন্ম থেকেই মুক্ত। মুক্ত পুরুষ কিভাবে ব্যবহার করে? গীতায় স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ পড়ে নিলেই জেনে যাব। স্থিতপ্রজ্ঞ সব কিছু থেকে অনাসক্ত। আমি কি সব কিছু থেকে অনাসক্ত? আমার মধ্যে অনাসক্তের লেশ মাত্র ভাব নেই। তাহলে আমি মুক্ত নই। তখন বলবে, তাহলে কি করতে হবে? অনাসক্ত হওয়া আমার দ্বারা সম্ভব নয়, তাই সাধনা কর, যজ্ঞ রূপে সাধনা কর। আমি খাওয়া-দাওয়া করছি, যজ্ঞ রূপে করছি, আমি ঘুমোচ্ছি, যজ্ঞ রূপে; আমি যা করছি সব যজ্ঞ রূপে করছি। তার মানে আমার নিজের জন্য আমি কিছু করছি না। মানুষ হয় নিজের জন্য করে, না হলে পরের জন্য করে। জন্মজন্মান্তর ধরে আমরা সব কিছু নিজের জন্য করে আসছি, রাতারাতি পরের জন্য করতে পারব না, চেষ্টা করলেও পারব না। তাহলে উপায় কি? যা কাজ করা হবে সব যজ্ঞ রূপে করতে হবে। দীক্ষার সময় বলে দেওয়া হয়, যতটুকু জপ করবে, ততটুকু জপ করার পর জপের ফল সমর্পণ করবে।

সবটাই তো মনের ব্যাপার। জপ যেটা করলাম সেটাও মনের ব্যাপার, ফল সমর্পণটাও মনের ব্যাপার। মন্দিরে ঠাকুরের সামনে বসে আমরা যে ধ্যান করি, সেখানেও আমরা মনে মনে ঠাকুরের কাছে কত কিছু প্রার্থনা করি, ঠাকুর আমার এটা যেন হয়, ওটা যেন মিটে যায়। তাও হিন্দুদের এই ভাব ছিল যে, কোন মন্দিরে গেলে, যে দেবী বা দেবতার বিগ্রহ আছে, তাঁর স্তুতি করত। ঠাকুর যে এত কাঁচা আমির ত্যাগের কথা বলছেন, ঈশ্বরের নাম করতে বলছেন, এটা রাতারাতি সম্ভব না। এর মাঝামাঝারি ধাপ হল যজ্ঞ রূপে করা। তুমি তো আমিত্ব একদিনে ছাড়তে পারবে না, পাকা আমিতে একদিনে যেতে পারবে না, তুঁহু তুঁহুও একদিনে হবে না, প্রথমে যজ্ঞরূপে সব কিছু করে যাও। এটাতে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়। খাচ্ছি যজ্ঞ রূপে, পোষাক পরছি যজ্ঞ রূপে, কাপড় কাচছি যজ্ঞ রূপে, সন্তানকে ভালবাসছি যজ্ঞ রূপে।

এগুলো থিয়োরেটিক্যাল কিছু না, চেষ্টা করে দেখলেই হয়। কিন্তু মানুষ নিজের নাতির মধ্যে কৃষ্ণ দেখে, অপরের নাতির মধ্যে কৃষ্ণ দেখে না। যেদিন সবার নাতির মধ্যে কৃষ্ণ দেখতে শুরু করবে, এবার যজ্ঞ রূপে করা হচ্ছে। নিজের সন্তানকে সচেতন ভাবে কৃষ্ণ রূপে দেখা, এ আমার কৃষ্ণ। কদিন পর দেখবে, অপরের সন্তান তার সামনে কৃষ্ণ রূপেই আসছে। সবাই একটু করে দেখুক। হিন্দুদের যে সাধন-ভজন যজ্ঞ রূপে সব কিছু করা, এটাই আধার।

স্বামীজী যে এখানে ceremonialsএর কথা বলছেন, ceremonial হল যখন কর্তা, ক্রিয়া আর কর্ম এই তিনটের তফাৎ যখন প্রবল হয়ে যায়। এর একটা গোল্ডেন রুল আছে, এই একটা জিনিসকে আমরা যদি মাথায় রাখি তাহলে আর কখনই সংশয় হবে না। আমরা যে কর্মগুলি সব সময় করছি, স্নান করছি, খাওয়া-দাওয়া করছি, পূজা করছি, জল খাচ্ছি, যা কর্মই করি না কেন, নিজেকে একবার ভেবে দেখতে হবে, এই কর্মের বদলে আমি কি চাইছি। বদলে যদি চাই এই জগতের সুখ আর ওই জগতের সুখ, অর্থাৎ অর্থ ও কাম বা স্বর্গ, তাহলে বুঝতে হবে এই কর্ম আমাকে মুক্তির দিকে নিয়ে যেতে পারবে না। আমি জল খাচ্ছি। কেন খাচ্ছি? আমার শরীর যাতে ভাল থাকে। শরীরকে কেন ভাল রাখতে চাইছি? যাতে এই শরীর দিয়ে ভাল করে ভোগ করতে পারি। তার মানে, জল খাওয়াটা আমার ভোগ হয়ে গেল। কিন্তু যদি বলি, আমি জল খাবো কেন, শরীর ভাল থাকবে, শরীর ভাল থেকে কি হবে, এই শরীর দিয়ে আমি আরও ঈশ্বরের জপধ্যান করতে পারব। ঈশ্বরের নাম করলে কি হবে? আমি আর জন্মমৃত্যুর চক্রে থাকতে চাই না। তখন জল খাওয়াটাই মুক্তির পথ হয়ে গেল।

বারোয়ারী পূজায় কত রকম অনুষ্ঠান হয়। যদি এদের জিজ্ঞেস করা হয়, আপনারা এগুলো কেন করছেন? সঙ্গে সঙ্গে বলবে আমরা নরনারায়ণ সেবা করছি। খুব ভাল, কিন্তু একটু ভিতরটা নাড়িয়ে দেখুন তো।

কি দেখা যাবে? নামযশের জন্য করছি। চোখ বন্ধ করে বলে দেওয়া যায়, আপনাদের কর্মযোগ হচ্ছে না, এই কর্ম আপনাদের মুক্তির দিকে নিয়ে যাবে না। এটাই গোল্ডেন রুল। এই কর্মের ফল তুমি কি চাইছ? যদি এর ফল কোন ভাবে ইহলোক আর পরলোকে গিয়ে শেষ হয়, বুঝে নিতে হবে এর মধ্যে গোলমাল আছে। যদি দুটোর মধ্যে কোনটাই না থাকে, ঠাকুর যেমন বলছেন, ভক্তি কামনা, ঈশ্বর দর্শনের ইচ্ছা, এগুলো কামনার মধ্যে পড়ে না। কেন পড়ে না? যে সত্যিকারের ঈশ্বর দর্শন করতে চাইছে, সে এটা দিয়ে ইহকাল পরকাল চাইছে না, আসলে সে এই দুটোর পারে যেতে চাইছে। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করার সময় আমরা প্রার্থনার মাধ্যমে কি চাইছি ঠাকুরের কাছে? যদি বলি, ঠাকুর আমি বড় কষ্টের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, আমার একটু মঙ্গল কর। খুব ভাল কথা, ঠাকুরের কাছে মঙ্গল কামনা করা যেতেই পারে। সব ভাল হয়ে গেলে তুমি কি করবে? একজন ইয়ং মহারাজের শরীরটা খুব খারাপ যাচ্ছিল। দেখা হলেই মহারাজরা জিজ্ঞেস করেন, 'মহারাজ শরীর এখন কেমন আছে'? উনি বলছেন, 'আমার আর বেঁচে থাকতে ভাল লাগছে না'। 'বেঁচে থাকতে ভাল লাগছে না তো বুঝলাম, কিন্তু তারপরে কোন কামনা আছে'? 'হ্যাঁ আছে, শরীরটা যদি ভাল হত, সুস্থ থাকত, তাহলে যারা আমার কাছে আসে তাদের ঠাকুরের দুটো কথা বলতে পারতাম, এর বেশি কিছু না'। উনি দুটোর মধ্যে একটা চাইছেন, হয় আমার দেহ থেকে মুক্তি হয়ে যাক, দেহ থেকে মুক্তি যদি না হয়, তাহলে দেহটা যেন এমন থাকে যাতে ঠাকুরেরই দুটো কথা বলতে পারি। তৃতীয় আর কোন চাওয়া তাঁর নেই। ঠাকুরের কাছে এখন আমি প্রার্থনা করছি, হে ঠাকুর! সব কিছু যেন ভাল থাকে। কেন ভাল থাকতে চাইছে? ঘুরে ফিরে দেখা যাবে, কোথাও না কোথাও সংসারে গিয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে। কারণ, আগেকার দিনে মানুষের মধ্যে স্বর্গলোক পরলোকের কথা ছিল, সেগুলো এখন মুছে গেছে। লোকেরা এখন স্বর্গলোক পরলোকের খবর জানেও না, মানেও না। ঘুরে ফিরে সবটাই এসে যায় অর্থ আর কামে, নামযশকে এখানে কামের মধ্যেই ধরা আছে। আর তৃতীয় হয় অজান্তায় পূণ্য সঞ্চয়। যে কোন কর্মের শেষ উদ্দেশ্য যদি ইহলোক পরলোকের বাইরে, তখন সেই কর্ম আর কর্মের মধ্যে ধরা হয় না, ওই কর্ম আর কর্ম বন্ধন তৈরী করতে পারে না।

ঠাকুরের কাছে হাজরা মশাই থাকতেন। তিনি সারাদিন বসে মালা জপ করতেন। অন্য দিকে তাঁর বিষয়বুদ্ধি প্রবল ছিল। অনেক দেনা আছে, কিভাবে দেনার দায় থেকে মুক্ত হওয়া যায়, সংসারটা কিভাবে ভাল করা যায়, সব সময় এই চিন্তাতেই থাকতেন। হাজরা মশাই ভক্তি করছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর মনটা নীচের দিকে পড়ে থাকছে। বেদান্তী সন্ন্যাসী ত্যাগ করেন, কিন্তু ত্যাগেরই অহঙ্কার করেন। মনে মনে চাইছেন, লোকেরা আমাকে মানুক জানুক। সেইজন্য কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, সেবাযোগ, রাজযোগ কোনটারই কোন মূল্য নেই। একটাই মূল্য, এর শেষ যেটা, সেটা তিনি কি চাইছেন? শেষ ফল রূপে যদি চান, ইহকাল পরকালের বাইরে যেতে, এটা মুখের কথা যেন না হয়, নিজেকে ঠকানো নয়, বাস্তবিকই চাইছে, আর এই নয় যে শেষের শেষ, এখান থেকে শেষ। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যা কিছু আছে সব, ইহকাল পরকাল দুটোরই পারে, মর্ত্যলোক স্বর্গলোক দুটোরই পারে, তখন ওটা মুক্তির কারণ হয়ে যায়।

মূল কথা হল, স্বামীজী যে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও রাজযোগের কথা বলছেন, এই চারটে যোগের একটি বা একাধিক যোগ দিয়ে মুক্ত হও। এই চারটে যোগই যে আছে তা না, হাজার হাজার যোগ হতে পারে। কিন্তু কেউই মুক্ত করবে না, এরা সবাই আমাদের নিদিধ্যাসন অবস্থা পর্যন্ত নিয়ে যাবে। সব যোগই আমাদের আমিত্ব ত্যাগের দিকে নিয়ে যাবে। আমিত্বের ত্যাগ মানেই কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ, আর কামিনী-কাঞ্চন সম্পর্কিত যাবতীয় যা কিছু কাছে আর নামযশ, সব কটাকে ফেলে দেওয়া। যদি যে কোন কর্মের ফল এই তিনটের মধ্যে যে কোন একটাতে নিয়ে যায়, তাহলে বুঝতে হবে এই কর্ম তাকে মুক্তির দিকে নিয়ে যাচ্ছে না। যদি আমরা ঈশ্বরকোটির হতাম তাহলে অবতারের সাথে জগতের মঙ্গলের জন্য আসতাম। যদি আরও উচ্চকোটির হতাম তাহলে বাচ্চা বয়সে শঙ্করাচার্যের মত বেরিয়ে যেতাম। আমি জন্ম নিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে কেন আশ্রমে এসেছি? তার মানেই, আমার মনে হাজার রকম দুর্বলতা আছে। সব সন্ন্যাসীরাই তো সিদ্ধ পুরুষ নন, দুর্বলতা কম বেশি সবারই মধ্যে আছে। কিন্তু তাই বলে এনাদের কামিনী-কাঞ্চনের কোন কিছুতে সরাসরি যোগ হয়ে আছে, তা তো নেই। এই গরমের মধ্যে কত দূর দূর থেকে পয়সা খরচ করে এখানে সবাই শাস্ত্র কথা শুনতে আসছেন, কেন আসছেন? কোথাও আমাদের মধ্যে একটা ঈশ্বরের ভাব আসছে, তবেই আসছি। এরপর চেষ্টা করে করে আমিত্বের ভাব যত কমান যায়।

হিন্দু ধর্মের কোন শাস্ত্রকে যদি ঠিক ঠিক শাস্ত্র বলা হয়, তাহলে সেই শাস্ত্র হবে মহাভারত। আমাদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যা কিছু চলে, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যা কিছু আমরা করছি, পুরো Hindu way of life হল মহাভারত। মহাভারত হিন্দুরা কিভাবে জীবন চালাবে পুরোপুরি সেই ভাবে বলে দেয়। সেই মহাভারতের জীবন-দর্শন হল, চরম লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য কাউকে ব্রাহ্মণ হতে হবে না, কাউকে পণ্ডিত বা বেদজ্ঞ হতে হবে না, গৃহবধূ থেকে শুরু করে পুরুষ, শূদ্র সবাই যে যেখানে আছে সেখান থেকেই সেই চরম লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে। একমাত্র মহাভারত ছাড়া আর কোন ধর্মগ্রন্থে এই জিনিস পাওয়া যাবে না। বেদ পড়ার জন্য ব্রাহ্মণ হতে হবে, উপনিষদ পড়ার জন্য তাকে সন্ন্যাসী হতে হবে। যে অর্থে কোন শাস্ত্রকে ধর্মগ্রন্থ বলা হয়, গীতা সেই অর্থে ধর্মগ্রন্থ নয়, গীতা আসলে ম্যানুয়াল। মহাভারতের মূল উদ্দেশ্য হল, তুমি মহাপুরুষ, তুমি এখন যেখানে যেভাবে আছ সেখান থেকেই আমি তোমাকে টেনে উপরে নিয়ে যাব। এই যে তুমি ভাল মন্দ খাচ্ছিলে নিজের আনন্দের জন্য, এবার তুমি এই খাওয়া-দাওয়াটাই নির্বিকার ভাবে করো, নিষ্কাম ভাবে করো, আর তা নাহলে ঈশ্বরকে অর্পণ করে করো। এই জায়গা থেকে এবার তোমার চলা শুরু হল। দেশে বিদেশে কত আলোচনা, হিন্দুদের মধ্যে নারী নির্যাতন, বিধবাদের উপর অত্যাচার, এগুলো মহাভারতের কোন ইস্যুই নয়। ইদানিং সাম্য, সবার সমান অধিকারের কথা বলা হচ্ছে, অথচ হাজার হাজার বছর আগে মহাভারতে সবারই জন্য সমান অধিকার দিয়ে রেখেছে, একটা ছোট বাচ্চা থেকে ঋষি, চণ্ডাল থেকে বিশ্বামিত্র, সবাই সমান। কারণ সবাই ঈশ্বর দর্শনের জন্য উপযুক্ত। মহাভারত হিন্দু ধর্মের অন্য কোন শাস্ত্রের বিরোধী কথা কিছু বলছে না। হিন্দুদের সব শাস্ত্র একই কথা বলছে, মহাভারত শুধু বিভিন্ন ধরণের কাহিনী দাঁড় করিয়ে জিনিসটাকে দৃষ্টান্তমূলক জায়গাতে নিয়ে যাচ্ছে –মূল সেই এক।

যাগযজ্ঞাদি কর্ম ভেদভাব বৃদ্ধি করে

এতক্ষণ স্বামীজী কতকগুলি তথ্য দিলেন, যজ্ঞরূপী কর্ম শেষ, এখন কর্মরূপী যজ্ঞের সময় চলছে। আর বললেন, কেউ যদি মন্ত্রের অর্থ চিন্তনের সাথে সাথে জপ করে যায়, তাতেই তার সিদ্ধি লাভ হয়ে যাবে। মাঝখানে রামানুজ ও মাধ্বাচার্যের উপর কয়েকটা তথ্য নিয়ে আলোচনা করলেন। এরপর স্বামীজী বলছেন, Seeing differences is the cause of all misery, and ignorance is the cause of seeing difference. (*ভেদ দর্শনই সমুদয় দুঃখের কারণ, আর অজ্ঞানই এই ভেদ-দর্শনের কারণ।*) ঠাকুর খুব সহজ ভাষায় বলছেন, শুধু নিজের লোকেদের ভালবাসা মায়া থেকে হয়, সবাইকে ভালবাসা দয়া থেকে হয়। নিজের নাতিকে যদি কেউ কৃষ্ণ রূপে দেখে, সে দেখবে নিজের মধ্যে আধ্যাত্মিক উত্থান হচ্ছে। কিন্তু শুধু নিজের নাতিকে কৃষ্ণ রূপে দেখাটা মায়া, সকলের নাতিকে কৃষ্ণ রূপে দেখাটা দয়া, এই দয়া এবার তাকে মুক্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এখানে কোথাও ইন্দ্রিয় সুখের কথা বলা হচ্ছে না, ইন্দ্রিয় সুখকে প্রথমেই ত্যাগ করে দেওয়া হচ্ছে। যে নিজের স্ত্রীকে ভগবতী দেখবে, সে কি আর কোন দিন ইন্দ্রিয় সুখে নামতে পারবে! যখন পারি না তখনই আমরা জগতে ভেদ-দর্শন করি। রাগ আর দ্বেষ থেকেই ভেদ-দর্শন আসে। যাকে ভালবাসি তার প্রতি এক রকম ভাব, যাকে পছন্দ করি না তার প্রতি অন্য রকম ভাব, ভেদ দৃষ্টি এসে গেল। ভেদ দৃষ্টিটাই মায়া, এটাই জগৎ, আর এটাই সমস্ত দুঃখের মূল। আমাদের আত্মজ্ঞান নেই, আত্মজ্ঞান না থাকুক, আগে যে যজ্ঞ ভাবের কথা বলা হল, সেই যজ্ঞের ভাবই আমাদের নেই। ইষ্টের ভাব নিয়ে যদি চলা হয়, আমার সামনে যারাই আছে সবাই আমার ইষ্টেরই এক একটি রূপ, এই ভাবটাকেও এনে দেখার চেষ্টা তো করতে পারি। ভাব যত গভীরে যাবে মন তত পাল্টাবে, তার ভাবও তত পাল্টাতে থাকবে।

That is why ceremonials are not needed, because theye increase the idea of inequality; you practice them to get rid of something or to obtain something. (*এই কারণেই যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের কোন প্রয়োজন নেই; কারণ তাতে ভেদজ্ঞান আরও বাড়িয়ে দেয়। ঐ-সকল যাগযজ্ঞাদির উদ্দেশ্য কিছু (ভোগসুখ) লাভ করা অথবা কোন কিছু (দুঃখ) থেকে নিস্তার পাওয়া।*) উপনিষদ আদিতে যজ্ঞের নিন্দা করা হয়েছে, কেন করা হয়েছে? স্বামীজী বলছেন, যজ্ঞ বৈষম্যের বৃদ্ধি করে। যজ্ঞ অনেক রকম ভাবে করা হয়, তার মধ্যে দুটো হল নিত্য ও নৈমিত্তিক, যার কথা আমরা আগে আলোচনা করেছি। তার সাথে আরেকটা হয় কাম্য কর্ম, মনের মধ্যে কোন কামনা আছে, সেই কামনার পুর্তির জন্য যে কর্ম করার কথা

বলা হয়, সেটাই কাম্য কর্ম। চতুর্থ আরেকটি হয়, প্রায়শ্চিত্ত। ওনারা বলেন, নিত্যকর্ম, নৈমিত্তিক কর্ম ও প্রায়শ্চিত্ত কর্ম সবাইকে করতে হয়, কাম্য কর্ম করতে নিষেধ করা হয়। যেমন অগ্নিহোত্রাদি কর্ম, আজকের দিনে আমরা যে সকাল-বিকাল জপধ্যান করি। জপধ্যানকে যেমন কর্মের মধ্যে ধরা হয় না, ঠিক তেমনি নিত্যকর্মকেও কর্মের মধ্যে ধরা হত না।

কিন্তু যজ্ঞ সব রকমেরই হতে পারে। কিছু পেতে চাইছি, যজ্ঞ কর। কিছু জিনিস থেকে সরে আসতে চাইছি, যজ্ঞ কর। আজকাল যেমন মহামৃত্যুঞ্জয় জপ খুব জনপ্রিয় হয়ে গেছে, কারণ বলা হচ্ছে, প্রচুর দুঃখ-কষ্টের মধ্যে আছে মহামৃত্যুঞ্জয় জপ করলে সব দুঃখ-কষ্ট কেটে যাবে। তার সাথে আছে চণ্ডীযজ্ঞ, অমুক যজ্ঞ, দিনকাল খুব খারাপ চলছে একটা যজ্ঞ করে দিতে হবে। তার মানে এটাই দাঁড়ায়, কোন জিনিস থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে চাইছি, যজ্ঞ করতে হবে; আবার কোন কিছু পেতে চাইছি, তার জন্য যজ্ঞ করতে চাইছি। সব ক্ষেত্রে রাগ আর দ্বেষ থেকেই যাচ্ছে। যজ্ঞ জিনিসটা আমাদের রাগ আর দ্বেষকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। অজান্তায় যজ্ঞ আমাদের ভিতরে বৈষম্য ভাবকে আরও বৃদ্ধি করছে। সেইজন্য আগে এই যজ্ঞ থেকে আমাদের বেরিয়ে আসা দরকার। যে যে জিনিসের জন্য বৈষম্য ভাব বাড়ছে, আমাদের সেই সেই প্রত্যেকটি জিনিস থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। বৈষম্য মানে, ভালমন্দ দেখার ভাব, ভাল জিনিস কাছে পেতে চাই, মন্দ জিনিস থেকে দূরে থাকতে চাওয়া। পরে জ্ঞানের অবস্থায় চলে যাওয়ার পরেও অল্প একটু ভালমন্দের বোধ থাকে, অবতার পুরুষেরও আপনজন থাকে, এটা দোষের মধ্যে আসে না। তাঁরা এমন অবস্থায় চলে যান, তখন এই জিনিসগুলো তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। বেদান্তে এই কারণে পদে পদে যজ্ঞের নিন্দা করা হয়েছে। মূলতঃ দুটো কারণে যজ্ঞের নিন্দা করা হয়। স্বামীজী এখানে বর্তমান প্রজন্মের মানসিকতাকে মাথায় রেখেই বলছেন, রাগ-দ্বেষ রূপী বৈষম্যই সংসার, এর থেকে বেরোনই মুক্তি। যদি দেখা যায় মানুষ বেশি করে যজ্ঞাদি করার দিকে আকৃষ্ট, বুঝতে হবে রাগ-দ্বেষ রূপী বৈষম্যে সে আরও ঘৃতাহুতি দিয়ে যাচ্ছে।

আমাদের প্রচলিত যে বেদান্ত, তাতে বলা হয় কর্তা, ক্রিয়া আর কর্ম, কর্ম বলতে কারকের দ্বিতীয়া বিভক্তি; এই তিনের যে বিভাজন বা কারকের আরও যে বিভক্তি রয়েছে, এগুলো যে কোন যজ্ঞ, যে কোন ক্রিয়াকে আরও বাড়িয়ে দেয়, সবটা মিলে শেষে বৈষম্য ভাব, ভেদ ভাবকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। যেখানে এক হওয়ার কথা সেখানে আরও অনৈক্য, ভেদ ভাব বেড়ে যাচ্ছে। সেইজন্য এই বৈষম্য বৃদ্ধিকারী কর্মগুলির অনুষ্ঠান বন্ধ করতে হবে। কিন্তু সব কর্মের অনুষ্ঠান যদি বন্ধ করে দেওয়া হয়, তাহলে তো মানুষ আরও অলস হয়ে তমোগুণের প্রভাবে চলে যাবে। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে বার বার কর্ম করার কথা বলছেন। বেদান্ত বলছে কর্ম থেকে বেরিয়ে আসতে। তাহলে গীতা কি বেদান্ত বিরোধী কথা বলছে? একেবারেই তা না, গীতাতে কর্ম করতে বলার অর্থ হল, প্রথমে কর্ম করে করে মনকে শুদ্ধ করতে হবে। মন শুদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর, এবার তাকে ধীরে ধীরে কর্ম থেকে সরে এসে ঈশ্বরের দিকে মন দিতে হবে। *আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে। যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে।।* আত্মার জ্ঞানে, ঈশ্বর লাভে প্রতিষ্ঠিত ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্য চিত্তশুদ্ধির উপায়ভূত কর্ম জ্ঞানপ্রাপ্তির কারণ বলা হয়। তিনিই আবার যোগে আরূঢ় হলে তাঁর পক্ষে কর্মত্যাগ জ্ঞান-পরিপক্কতার কারণ বলা হয়। চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্মের দরকার, চিত্তশুদ্ধি হয়ে গেলে দেখতে হবে আর যেন মনে কোন কামনা-বাসনা প্রবেশ না করতে পারে। তখন যে কাজ তার করা দরকার সেই কাজ তাকে অবশ্যই করতে হবে, কিন্তু যজ্ঞের ভাব নিয়ে করতে হবে। এখানে যে যজ্ঞ, এটা চিত্তশুদ্ধির জন্য।

কিন্তু বেদের যজ্ঞ মানে, শত্রুকে মারতে হবে, এই যজ্ঞ কর, সন্তান লাভ করতে চাইছ, তোমার জন্য এই যজ্ঞ, পুত্র সন্তান লাভের জন্য পুত্রেষ্টি যজ্ঞ। ইদানিং তন্ত্রাদিতে যে একে বাণ মারছে, ওকে টোটকা মারছে, মারণ উচাটনাদি, এই জিনিসগুলো বেদের সময় প্রচুর ছিল, বিশেষ করে অথর্ব বেদে এই ধরণের জিনিস প্রচুর পাওয়া যাবে। দ্বিতীয়তঃ, আমার নিজের জীবনে অনেক দুঃখ-কষ্ট চলছে, এই দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমাকে যজ্ঞ করতে হবে। ঠাকুরের কাছে আত্মজিজ্ঞাসুও যায়, যে কষ্টে আছে সেও যায়, যে বিশেষ কিছু পেতে চাইছে সেও যায়। বেদের যজ্ঞগুলির অনুষ্ঠানের জন্য প্রচুর জিনিসের আয়োজন করতে হত, কিন্তু সব যজ্ঞই শেষ পর্যন্ত রাগ আর দ্বেষকে বাড়িয়ে দিচ্ছে, কিছু পেতে চাওয়া আর কিছু জিনিস থেকে বেরিয়ে আসতে চাওয়া। যিনি আধ্যাত্মিকতাকে চাইছেন, বেদান্তকে মেনে যিনি এগোতে চাইছেন, তাঁর জন্য একটাই পথ,

এগুলো থেকে বেরিয়ে আসা। স্বামীজী এটাই এখানে বলতে চাইছেন। রামানুজ আর মাধ্বাচার্যের কথা বলতে গিয়ে, তাঁর এটাই বক্তব্য।

যজ্ঞ আর কর্ম নিয়ে যাতে সংশয় না হয় তাই সংক্ষেপে মূল বক্তব্যকে আবার মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কর্ম আমাদের সবাইকে করতে হয়। কর্ম করলে, তা যেভাবেই কর্ম করা হোক, মনে সেই কর্মের একটা ছাপ পড়বে। যজ্ঞের ভাব নিয়ে যে কর্ম করা হয়, যেমন আমি এই কর্ম আমার চিত্তশুদ্ধির জন্য করছি, যেমনি চিত্তশুদ্ধির ব্যাপার এসে যাবে তখন সেটা আর কাম্য কর্ম হবে না। কাম্য কর্ম মানেই অশুদ্ধি, কাম্য কর্মে আমার এটা চাই, সেটা চাই লেগে আছে, তাই মন অশুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। এর বাইরে শরীর ধারণের জন্য যে নিত্যকর্ম করতে হয়, সেই কর্মগুলিকে যজ্ঞ রূপে করতে হয়। খাওয়া-দাওয়া থেকে চোখের পাতা ফেলা সবটাই যখন যজ্ঞ রূপে করা হবে, তখনই মানুষ উপরের দিকে উঠতে থাকবে। পরেও এর উপর আলোচনা চলবে, তখন আরও স্পষ্ট হয়ে যাবে।

শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও ধ্যান

রাগ আর দ্বেষ বৃদ্ধি পায় বলে স্বামীজী যজ্ঞ থেকে বেরিয়ে আসার কথা বললেন, উপনিষদও তাই বলছে। এরপর স্বামীজী আবার বলছেন, Brahman is without action, Atman is Brahman, and we are Atman; knowledge like this takes off all error. It must be heard, apprehended intellectually, and lastly realized. (*ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, আত্মাই ব্রহ্ম, এবং আমরাই সেই আত্মস্বরূপ – এই প্রকার জ্ঞানের দ্বারাই সকল ভ্রান্তি দূর হয়। এই তত্ত্ব প্রথমে শুনতে হবে, পরে মনন অর্থাৎ নিদিধ্যাসন দ্বারা ধারণা করতে হবে, অবশেষে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করতে হবে।*) ব্রহ্মের কোন ক্রিয়া হয় না, তিনি সুমেরুবৎ, ব্রহ্ম অনন্ত, অনন্ত কোন ক্রিয়া করে না, অনন্তের উপর কোন ক্রিয়া হতেই পারে না, যুক্তিতেই দাঁড়ায় না। নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম আর আত্মা এক। আমাদের যে আসল তত্ত্ব, আমরা সেই আত্মা, এই আত্মাই সেই ব্রহ্ম, যিনি নিষ্ক্রিয়, নির্বিকার, যিনি কোন ক্রিয়া করেন না, যাঁর উপর কোন ক্রিয়া হয় না। সেইজন্য আত্মা রূপে আমিও কোন ক্রিয়া করি না, আমার উপর কোন ক্রিয়া হতে পারে না। গীতাতে ঘুরে ঘুরে ভগবান এই তত্ত্বকে নিয়ে বলছেন, আত্মা কাউকে হত্যা করেন না, আত্মাকেও কেউ হত্যা করতে পারে না। এরপর বৃহদারণ্যক উপনিষদ থেকে খুব নামকর কথা আসে, আর অনেকবারই ঘুরে ঘুরে এই ভাবটা আসে – এই আত্মার ব্যাপারে শুনতে হয়, মনন করতে হয় আর নিদিধ্যাসন করতে হয়।

এখন এসে গেছে পপ স্পিরিচুয়ালিটি, যেমন সঙ্গীতে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ছেড়ে দিলে চলতি গান এসে যাবে, চলতি গানটাই পরে গিয়ে পপ সঙ্গীতে এসে যাবে। আধ্যাত্মিক ভাব এখন চলেই গেছে, সেখান থেকে এরা ধর্মকে এমন এক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে, যেখানে এসে গেল পপ স্পিরিচুয়ালিটি। পপ স্পিরিচুয়ালিটি সাধারণত ফাইভ স্টার হোটেলেই শিক্ষা দেওয়া হয়। কিংবা একটা আশ্রমকেই ফাইভ স্টারের মত তৈরী করে নেওয়া হয়, সেখানে সবাই মিলে বলে যাচ্ছে অহং ব্রহ্মাস্মি, I am Brahman, I am Atman। কিন্তু ভুলে যাচ্ছে যে, অহং ব্রহ্মাস্মিতে যাওয়াটা একটা লম্বা প্রসেস সাপেক্ষ। কতকগুলি প্রচলিত কথা আমরা শুনে নিয়েছি, সেই কথাগুলো আমাদের মাথায় ঢুকে গেছে, তাতেই মনে করছি আমরা বেদান্ত বুঝে গেছি; এভাবে কখনই কোন দিন হয়নি, আর কোন দিন হবেও না।

প্রথম হল শ্রবণ, শুনতে থাক, বছরের পর বছর শুনে যেতে হবে। স্বামীজীর মত ব্যক্তিত্বের মানুষ দক্ষিণেশ্বর আর কাশীপুরে পাঁচ থেকে ছয় বছর ঠাকুরের পায়ের কাছে বসে শুধু ঠাকুরের কথা শুনে গেছেন। দ্বিতীয় হল চিন্তন, দিনরাত যেটা শোনা হয়েছে সেই কথাগুলো মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকবে। এই করতে করতে একদিন ওই জ্ঞানের সাথে সে এক হয়ে গেল। নিদিধ্যাসন একটা টেকনিক্যাল শব্দ, সংস্কৃতে এর অনুবাদ হয় না। নিদিধ্যাসনের ঠিক ঠিক অর্থ হয়, ওই জ্ঞানের সাথে এক হয়ে যাওয়া, কিন্তু এই এক হওয়াটা উপলব্ধি নয়। জিনিসটাকে শুনে যাচ্ছে, সাথে সাথে মনন করছে, মনন করতে করতে এবার সে ওই জ্ঞানের সাথে পুরো এক হয়ে গেছে। এক হয়ে গেলেই যে সব হয়ে গেল তা না, এটা এখনও সম্পূর্ণ হয়নি; এখনও অনেক পথ বাকি। যখন বাস্তবিক দেখবে, আত্মাই আছেন, আত্মা ছাড়া কিছু নেই, এটা হল বিজ্ঞান। কিন্তু তার ঠিক আগের

অবস্থা হল নিদিধ্যাসন, এটাও একটা উচ্চ অবস্থা, আমরা চেষ্টা করে ওই উচ্চ অবস্থাতে পৌঁছাতে পারি। কিন্তু চেষ্টা করে উপলব্ধির অবস্থায় যাওয়া যাবে না।

স্বামীজী বলছেন, এই আত্মাকে জানতে হয়, এই আত্মাই আছেন। বলছেন, Cogitating is applying reason and establishing this knowledge in ourselves by reason. (*মনন অর্থাৎ বিচার করা – বিচার দ্বারা, যুক্তিতর্কের দারা ওই জ্ঞান নিজের ভিতরে প্রতিষ্ঠিত করা।*) ওটাকে নিয়ে মনন করতে হবে, বিচার করতে হবে, যুক্তি তর্ক করতে হয়, সব মিলিয়ে পুরোটাই মনন হয়ে যাচ্ছে, স্বামীজী ইংরাজীতে শব্দটা নিচ্ছেন, cogitating, অর্থাৎ মনন। মনন হতে হতে যখন বসে গেল, তখন কি হয়? Realising is making it a part of our lives by constant thinking of it. (*প্রত্যক্ষানুভূতি বা সাক্ষাৎকারের অর্থ সর্বদা চিন্তা বা ধ্যানের দ্বারা তাঁকে আমাদের জীবনের অঙ্গীভূত করে ফেলা।*) আধ্যাত্মিক জ্ঞান হওয়ার আগে এই জ্ঞান তার ব্যক্তিত্বের অঙ্গ হয়ে যাবে, অর্থাৎ এই জ্ঞানের সাথে সে এক হয়ে গেল।

This constant thought or Dhyan is as oil that pours in one unbroken line from vessel to vessel; Dhyana rolls the mind in this thought day and night and so helps us to attain to liberation. Think always 'Soham, Soham'; this is almost as good as liberation. Say it day and night; realization will come as the result of the continuous cogitation. This absolute and continuous remembrance of the Lord is what is meant by Bhakti. (*এই অবিরাম চিন্তা বা ধ্যান যেন একপাত্র থেকে অপর পাত্রে ঢালা অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার মতো। ধ্যান দিনরাত মনকে ঐ ভাবের মধ্যে রেখে দেয় এবং তাইতে আমাদের মুক্তিলাভ করতে সাহায্য করে। সর্বদা 'সোহহম্, সোহহম্' চিন্তা করা –অহরহ এইরূপ চিন্তার ফলে অপরোক্ষানুভূতি লাভ হবে। ভগবানকে এইরূপ তন্ময়ভাবে সদাসর্বদা স্মরণের নামই 'ভক্তি'।*) ভক্তি আর জ্ঞানকে স্বামীজী এখানে এক জায়গায় নিয়ে আসছেন। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন –শ্রবণের পর প্রথমে মনন হচ্ছে, মনন ও চিন্তন করতে করতে মন ওই ভাবের সাথে এক হয়ে গেল, এটাই এবার নিদিধ্যাসনে চলে গেল।

গীতার ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর জ্ঞানের বিভিন্ন অবস্থার কথা বলছেন। যিনি গীতা উপনিষদ পড়ে বলছেন, আমি এবার আত্মজ্ঞানের দিকে এগোতে চাই, আচার্য শঙ্কর তাঁকেও জ্ঞানী বলছেন। যিনি চিন্তন মনন করছেন তাঁকেও জ্ঞানী বলছেন। আর যিনি নিদিধ্যাসন করে করে শেষ অবস্থায় পোঁছে গেছেন, তাঁকেও আচার্য জ্ঞানী বলছেন। এরপর যিনি প্রত্যক্ষ করে নিলেন, তাঁকেও জ্ঞানী বলছেন। তবে গীতাতে যে জ্ঞানবিজ্ঞান সহিতম্ বলছেন, তাঁর অর্থ হল নিদিধ্যাসন পর্যন্ত যাঁর জ্ঞান হয়ে গেছে, অর্থাৎ তাঁর তাত্ত্বিক জ্ঞানটা হয়ে গেছে। তার সাথে তাঁর বিজ্ঞান আছে, জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ করেছেন, intuitive knowledge of God আর theoretical knowledge of scriptures দুটোই আছে। ভগবান গীতাতে যে *জ্ঞানবিজ্ঞান সহিতম্* বলছেন, তোমাকে জ্ঞান ও বিজ্ঞান দুটোই বলব, তিনি সেখানে বলতে চাইছেন, প্রত্যক্ষে কি হয় সেটাও বলব আর শাস্ত্রে কি বলছে, সেটাও বলছি। উপনিষদেও 'জ্ঞান' আর 'জ্ঞানী' এই দুটো শব্দ বহুবার আসে। যিনি চেষ্টা করছেন, তিনিও জ্ঞানী, যিনি মননের অবস্থায় এসে গেছেন, তিনিও জ্ঞানী, নিদিধ্যাসনের অবস্থায় যিনি চলে এসেছেন তিনিও জ্ঞানী, আর যাঁর প্রত্যক্ষ হয়ে গেছে তিনিও জ্ঞানী। শুধু জ্ঞানমার্গেই এই জিনিস নেই, ভক্তিমার্গেও একই জিনিস চলে; এখানে কিন্তু কোথাও কোন সংশয় হওয়ার কথা নয়। শুধু চরণামৃত আর বাতাসা খেয়ে যাচ্ছে সেও ভক্ত, যে কীর্তন করছে, ভক্ত সম্মেলন করে যাচ্ছে সেও ভক্ত, যে দীক্ষা নিয়ে জপধ্যান করছে সেও ভক্ত আর ঠাকুর, নরেন, রাখাল এনারাও ভক্ত।

স্বামীজী এখানে বলছেন, দিনরাত 'সোহহম্ সোহহম্' বল। অন্য দিকে যার ভাব 'আমি ঠাকুরের সন্তান', দিনরাত তাকে 'আমি ঠাকুরের সন্তান' এই ভাব নিয়ে থাকতে হবে। যত ক্রিয়া করছে, খাওয়া-দাওয়া করছে, লোকেদের সাথে কথাবার্তা করছে, তার মধ্যেও সব সময় 'আমি ঠাকুরের সন্তান', এই ভাবকে মনের মধ্যে জাগিয়ে রাখতে হবে। যারা বেদান্তের পথ অনুসরণ করতে চায়, তাদের মনে রাখতে হবে, আমি সেই শুদ্ধ আত্মা, 'সোহহম্', এই ভাবকে জাগিয়ে রাখতে হবে। তিনটে ধাপ এসে যাচ্ছে, প্রথম ধাপ হল যারা লড়াই করছে, যখন তারা শাস্ত্রের কথা শুনছে, সাধুসঙ্গ করছে তখন কিছুক্ষণের জন্য মনে এই ভাব এসে গেল,

আমি সেই আত্মা, আমি ঠাকুরের সন্তান, আমি ঠাকুরের ভক্ত। দ্বিতীয় ধাপে, চিন্তা করে করে এবার সে ওই ভাবে পুরো প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এখন তার এমন কোন কাজ হবে না, যে কাজ ওর বাইরে যাবে। কিন্তু এখনও তার পতনের ভয় আছে। ঠাকুর তাই বলছেন, জ্ঞানী ভয়তরাসে। যারা নিদিধ্যাসনে বসে আছে, প্রত্যক্ষ হয়নি, তারও পতনের সম্ভবনা আছে। তৃতীয় ধাপ হল যখন আত্মা প্রত্যক্ষ হয়ে গেল। তবে আচার আচরণ, ব্যবহারের দিক থেকে নিদিধ্যাসন অবস্থায় অবস্থিত আর সিদ্ধ পুরুষের বিশেষ কোন তফাৎ থাকে না, দুজনকে আলাদা করে বোঝা যায় না। সিদ্ধ পুরুষের প্রত্যেকটি ক্রিয়াকলাপ আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়েই করেন, নিদিধ্যাসনে যিনি আছেন, তাঁরাও সমস্ত ক্রিয়াকলাপ ওই ভাবকে অবলম্বন করেই হয়। বশিষ্ঠ মুনি, বিশ্বামিত্র এনাদের আচরণ আত্মজ্ঞানী রূপে, কিন্তু ঠাকুর এনাদেরও জ্ঞানী বলছেন। বলছেন, বশিষ্ঠেরও পুত্রশোক হচ্ছে। ঠাকুরের কথাকে আধার করে আমরা যদি এনাদের বিজ্ঞানীর সাথে তুলনা করি, এনাদের অনেক পূণ্য কর্ম করা আছে, যজ্ঞাদি করে করে শুদ্ধ হয়ে গেছেন, কিন্তু কোথাও একটা তফাৎ থেকে যাবে।

এই অনুচ্ছেদে স্বামীজীর বক্তব্য হল, তত্ত্ব কথা শোনার সৌভাগ্য তোমার হয়েছে, এবার এই তত্ত্ব কথাকে নিয়ে মনন কর, দিনরাত শুনতে থাক, আলাপ আলোচনা কর, তোমার ব্যক্তিত্বকে ওই ভাবের মধ্যে ঢালার চেষ্টা কর। তোমার বিশ্বাস হয়ে গেল, যেটা বলা হচ্ছে এটাই সত্য, কিন্তু এই বিশ্বাস সহজে হয় না। একবার যার বিশ্বাস হয়ে গেছে, ঠাকুর আছেন, সে তো ধন্য। এই বিশ্বাস যেমনি হয়ে যাবে, তেমনি নিজের ব্যক্তিত্বকে ওই বিশ্বাসের ছাঁচে ঢালতে হবে। একটা ছোট্ট বাচ্চাকে প্রথম প্রথম দুইয়ে দুইয়ে চার শেখাতে গেলে কিছুতেই তাকে বোঝান যায় না। তাকে কত রকম ভাবে উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে হয়, দুটো চকলেট তোমার আছে আমি তোমাকে আরও দুটো চকলেট দিলাম, হয়ত সে বুঝে নেবে, কিন্তু দুইয়ে দুইয়ে চার কি করে হয় এটা আর সে কিছুতেই বুঝতে চায় না। বাচ্চা বয়সে যেমন দুইয়ে দুইয়ে চার বুঝতে পারি না, ক্লাশ নাইন টেনে এসে তেমনি আমরা ত্রিকোণমিতি, বীজগণিত বুঝতে পারি না। ঠিক সেই ভাবে এই বয়সে এসে আমরা আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলি, অহং ব্রহ্মাস্মি, আমি ঠাকুরের সন্তান, বুঝতে পারি না। বুঝতে পারি না তাই বিশ্বাসও হয় না। তাই বলে ছেড়ে দিয়ে বসে থাকলে হবে না, প্রচুর চেষ্টা করতে হবে। আমরা তো আর নরেন্দ্রনাথ দত্ত নই যে, ঠাকুর ছুঁয়ে দেবেন আর আমাদের জ্ঞান হয়ে যাবে। আমরা হলাম সব মধ্যম অধিকারী। ঠাকুর ভগবান, ঠাকুর আছেন, এই বিশ্বাস হওয়া মোটেই সহজ নয়। আমরা মুখে বলে দিতে পারি, আমি বিশ্বাস করি ঠাকুরই ভগবান, কিন্তু ওটা মুখের কথাই হয়ে থাকে। ঠাকুর ভগবান, ঠাকুর সব দেখছেন, তাও তো আমরা মিথ্যা কথা বলি, অসদাচরণ করছি, অহঙ্কারের ডিপো হয়ে সব জায়গায় নিজেকে জাহির করতে চাইছি, লোকেদের সাথে তর্কাতর্কি করছি, ঝগড়া বিবাদ করছি। ঠাকুরই আছেন, ঠাকুর সব দেখছেন, এটা বিশ্বাস করা কি অত সোজা! যদি সেই বিশ্বাস থাকে, তাহলে সেই বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে নিজের সমস্ত রকম ক্রিয়াকলাপের পরিবর্তন করতে হবে। ওই পরিবর্তন যদি একবার হয়ে যায় কারুর, এবার তার শরীরটা তৈরী হয়ে যাবে।

ক্রিস্টাল তৈরী উপমা আমরা এর আগে অনেকবার দিয়েছি, এখানেও ক্রিস্টালের মত হয়। একটা জলের পাত্রে ক্রিস্টাল দিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু তাতে কিছুই হয় না। এরপর পাত্রের নীচে আগুন দেওয়া হল, তখন দেখা যাবে তাতে আরও ক্রিস্টাল দেওয়া যায়। হয়ে হয়ে যখন সুপারস্যাচুরেটেড সল্যুশান হয়ে গেল, তখন বাইরে থেকে ছোট্ট থেকে ছোট্ট একটা ক্রিস্টাল দিয়ে দিলে, সল্যুশানটা পুরো ক্রিস্টাল হয়ে যাবে। বাইরে থেকে যে ছোট্ট একটা ক্রিস্টাল দেওয়া হল, সেটা শতকরা যত ভাগ পিওর, নূতন ক্রিস্টালটা শতকরা তত ভাগ পিওর। আমাদের মনটাও জলের মত, একটা কোন কথা মনে গিয়ে পড়ল, ঠাকুর ঈশ্বর, প্রথম একটা ক্রিস্টাল পড়ল। কথামৃত পড়ছি, আরও কিছু ক্রিস্টাল পড়ছে। আমাদের মন জলের বালতি বা গামলার মত না, একটা সমুদ্র, তাই দু চারটে ক্রিস্টাল পড়লে বোঝাও যায় না। সমুদ্র অনেক বড় হয়ে গেল, ঠিক আছে, মনটা একটা টালার জলট্যাঙ্কের মত, ওর মধ্যে ক্রিস্টাল ঢেলে যাচ্ছে। এরপর কি হবে? একটু আগে যেটা বলা হল, সব কর্ম যজ্ঞ রূপে করতে হবে। এবার জলের ট্যাঙ্ক গরম হতে শুরু হল। আরও ক্রিস্টাল ঢালা হচ্ছে, হয়ে হয়ে এসে গেল সুপাস্যাচুরেটেডের অবস্থা, এটাই হল নিদিধ্যাসনের অবস্থা। এবার তার মন প্রস্তুত, এরপর তার আর কিছু করার নেই, সব কিছু করা তার হয়ে গেছে। এবার বাইরে থেকে শুধু একটা ছোট্ট ক্রিস্টাল আসার জন্য

অপেক্ষা করে থাকতে হবে। আর ক্রিস্টালাইজেশান যেটা হবার সেটা নিজে থেকেই হবে, তাকে কিছু করতে হবে না। এতক্ষণ পর্যন্ত সব সে নিজে করে এসেছে, কিন্তু এই ক্রিস্টালাইজেশনটা নিজে থেকে হবে।

জ্ঞানের ক্ষেত্রেও ঠিক একই জিনিস হয়, জ্ঞান যেটা হবে সেটা নিজে থেকে হবে, ওখানে কারুর কিছু করার নেই। স্বামীজী এটাই বলছেন, দিনরাত সোহম্ সোহম্ চিন্তা কর, দিনরাত বল আমি সেই শুদ্ধ আত্মা। চিন্তা করে করে যেদিন পুরো বিশ্বাস হয়ে যাবে যে আমি সত্যিই শুদ্ধ আত্মা, তার আচরণ সেই অনুসারেই হবে। যদি ওই বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহলে সারা জীবন টিয়াপাখির মত জয়রাম শ্রীরাম বলবে, আর বেড়ালে ধরলে ট্যাঁ ট্যাঁ করবে। বৃদ্ধ বয়সে ইন্দ্রিয়ের শক্তি চলে যাবে, মনের শক্তি চলে যাবে তখন শুধু ট্যাঁ ট্যাঁই মুখ দিয়ে বেরোবে। তখনও যদি মনে হয়, ঠাকুরই আমাকে কষ্ট দিচ্ছেন, সুখ দিচ্ছেন, তখন বুঝতে হবে যে, তার মুখ দিয়ে সত্যিই হরিনাম বেরোচ্ছে, এটাই জ্ঞান।

This Bhakti is indirectly helped by all good works. (*সব রকম শুভকর্ম এই ভক্তিলাভ করতে গৌণভাবে সাহায্য করে থাকে।*) শুভকর্ম, ভাল কাজ, অপরের সেবা করা, এই সব কর্ম মানুষকে ভক্তির পথে নিয়ে যেতে পরোক্ষ ভাবে সাহায্য করে। Good thought and good works create less differentiation than bad ones; so indirectly they lead to freedom. (*শুভ চিন্তা ও শুভকর্ম – অশুভ চিন্তা ও অশুভ কর্ম অপেক্ষা কম ভেদজ্ঞান উৎপন্ন করে থাকে।*) জপধ্যান, পূজা অর্চনা, সেবাকার্য, এই ধরণের শুভকর্ম করলে আমাদের ভেদ দৃষ্টিটা কমে যায়। আমরা সবাই এখন একটা ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ করে রেখেছি। আমি, আমার ও আমাদের, এবং তুমি, তোমার ও তোমাদের, এই ভেদজ্ঞানের দ্বারা আমরা জগৎকে ফেলে দিয়ে নিজেদের একটা ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছি, শুভকর্ম করতে থাকলে এই ভাবটা ধীরে ধীরে কমে যায়। আমরা বলছি, ইদানিং মানুষ প্রচণ্ড স্বার্থপর হয়ে যাচ্ছে, তার মানে বলতে চাইছি differentiationটা বেড়ে যাচ্ছে। সেবাদি কর্ম, জপধ্যান এগুলো পরোক্ষা ভাবে আমাদের মুক্তির দিকে নিয়ে যায় ঠিকই, সরাসরি কখনই নিয়ে যেতে পারে না, কিন্তু ধীরে ধীরে ভিতরে একটা সমত্বের ভাব তৈরী করে দেয়, সাথে সাথে ভেদভাবটাও কমে আসে।

Work, but give up the results to the Lord. (*কর্ম কর, কিন্তু কর্মের ফল ভগবানে অর্পণ কর।*) যজ্ঞের ভাব নিয়েই যদি কর্ম করা হয়, তবেই ওটা কর্মযোগ হবে, বাকি সব কর্ম বন্ধনের কারণ হবে। সেইজন্য আমরা যদি বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চাই, তাহলে আমাদের কোন কর্মের ফল প্রত্যাশা করা উচিৎ হবে না। কর্মের ফল প্রত্যাশা করা মানেই, আমরা কর্মযোগ করছি না, ভোগের জন্য কর্ম করছি। যদি কর্মে কামিনী-কাঞ্চন, নামযশ, ভোগের বা কোন কামনা যদি থাকে, ওটা কর্ম, কর্মযোগ কোন ভাবেই নয়।

Knowledge alone can make us perfect. He who follows the God of Truth with devotion, to him the God of Truth reveals Himself. (*কেবল জ্ঞানের দ্বারাই পূর্ণতা বা সিদ্ধাবস্থা লাভ হয়। যিনি ভক্তিপূর্বক সত্য-স্বরূপ ভগবানের সাধনা করেন, তাঁর কাছে সেই সত্য-স্বরূপ ভগবান প্রকাশিত হন।*) আত্মাই আছেন, ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু, এই জ্ঞানের দ্বারাই পূর্ণতা আসে। ভক্তিপথে মানুষ নিষ্কাম কর্ম, শুভকর্ম দিয়ে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে সেই সত্যের প্রতি যখন devoted হয়, তখন সেই সত্য তার সামনে নিজেকে অনাবৃত করে দেন। সারা জীবন যে জিনিসের সেবা করে এসেছি, সেই জিনিসটাই আমাকে শেষে ধরে রাখবে। যে ব্রাহ্মণ সারা জীবন সূর্যদেবতার পূজা করে এসেছেন, সেই সূর্যদেবতা ব্রাহ্মণের শেষ সময় বাইরের আবরণকে সরিয়ে নিজের সত্য-স্বরূপকে তাঁর সামনে উন্মোচন করে দেবেন। ঠাকুর বলছেন, কাশীতে মৃত্যু হলে মা এসে বন্ধন কেটে দেন আর শিব এসে বলেন এই দেখ আমার অখণ্ড রূপ। যাঁর সেবা করে এসেছি তিনি তাঁর রূপটা দেখিয়ে দেন, একবার যে ওই রূপ দেখে নেবে, অন্য দিকে তার আর মন যাবে না। যে মিছরির শরবৎ খেয়েছে সে আর চিটে গুড়ের পানা খেতে চাইবে না।

স্বামীজী ভগবান বুদ্ধের উপমা এনে বলছেন, We are lamps, and our burning is what we call 'life', (*আমরা যেন প্রদীপ-স্বরূপ, আর ঐ প্রদীপের জ্বলাটাকেই আমরা জীবন বলি।*) দীপ থেকে দীপ জ্বলে, এক একটা দীপ জ্বলা মানে জীবন। ওই জীবনে যে তেল রয়েছে, ওই তেলটা ফুরিয়ে গেলে তখনই

জীবন শেষ। কিন্তু শেষ হওয়ার আগে আরেকটা প্রদীপ জ্বলে যায়। When the supply of oxygen gives out, then the lamp must go out, অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে দীপ নিভে যাবে। All we can do is to keep the lamp clean, Life is a product, a compound, and as such must resolve itself into its elements. (*আমরা কেবল প্রদীপটাকে সাফ রাখতে পারি। জীবনটা কতকগুলি জিনিসের মিশ্রণে উৎপন্ন, সুতরাং জীবন অবশ্যই তার উপাদান কারণগুলিতে লীন হবে।*) আমাদের আমিত্বের ভাব, অহং ভাব, এটাই অক্সিজেন, যেমনি আমিত্বের নাশ হয়ে যাবে দীপ নিভে যাবে। কিন্তু আমরা অতটা করতে পারি না, আমরা খুব বেশি করতে পারি, তা হল, দীপটাকে রোজ পরিষ্কার রাখতে পারি, তার মানে আমাদের শরীর মনকে পরিষ্কার রাখা।

৮ই জুলাইয়ের ক্লাশে স্বামীজীর মূল বক্তব্য হল –আত্মজ্ঞানই একমাত্র পথ। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য আত্মজ্ঞান, যজ্ঞাদি কর্ম বা যে কোন কর্ম আমাদের আত্মজ্ঞানে নিয়ে যেতে পারবে না। কিন্তু শুভকর্মাদি, সেবাদি কর্ম করলে আমিত্বের ভাবটা কমে যাবে, সমত্বের ভাব দৃঢ় হয়ে ভেদ দৃষ্টিকে ক্ষীণ করে দেবে। এটাই মানুষকে ধীরে ধীরে একটা শুভ বুদ্ধির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তখন ধর্মের কথা শুনলে, শাস্ত্রের কথা শুনলে বিশ্বাস হয়। বিশ্বাস হয়ে যাওয়ার পর ওই বিশ্বাসের অনুরূপ আচরণ করতে হয়। এরপর যে ভাব নিয়ে এতদিন সে সাধনা করে এসেছে, ঠাকুরের ভাব হোক, আত্মার ভাব হোক, শিব বা কৃষ্ণ বা কালী যারই ভাব হোক, তিনি তখন নিজেকে অনাবৃত করে দেন। এরপর সে আর জগতের দিকে ফিরে তাকাবে না। এখানেই স্বামীজীর ৮ই জুলাইয়ের ক্লাশ শেষ হয়ে যায়। এরপর আমরা স্বামীজীর ৯ই জুলাইয়ের ক্লাশে প্রবেশ করছি।

মঙ্গলবার, ৯ই জুলাই

এতদিনে ধরে স্বামীজীর যে কয়েক দিনের ক্লাশের বিবরণ আমরা আলোচনা করেছি তাতে ধর্ম জীবন নিয়ে, সাধনা নিয়ে, ভক্তি নিয়ে, বেদান্ত নিয়ে, যোগ নিয়ে স্বামীজীর যে চিন্তা-ভাবনা ছিল, তার অনেক কিছুই পেয়ে গেছি। পরের ক্লাশগুলিতে এই জিনিসগুলির কিছু কিছু পুনরাবৃত্তি হবে, তাতে অসুবিধার কিছু নেই। গীতাতেও ভগবান বলছেন, *ভুয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ*, তোমাকে আমি আমার পরমাত্মকবিষয়ক কথা আবার বলছি। শ্রীকৃষ্ণের মত আচার্য, অর্জুনের মত শিষ্য, তাও ভগবান বলছেন, আবার বলছি। কারণ এই কথাগুলো এতই উচ্চমানের যে, একবার দুবার শুনলে ধারণা করা খুব কঠিন। স্বামীজীর মত শিষ্যও নিয়মতি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাচ্ছেন, অনেক সময় একই কথা ঠাকুরের মুখ থেকে একাধিকবার শুনছেন। আধ্যাত্মিক তত্ত্বের অনেক কিছু জিনিস যখন বিভিন্ন ভাবে বলা হয়, তখন তার আলাদা একটা মাধুর্য থাকে। আমরা আশা করতে পারি, মূল সিদ্ধান্তগুলো আমাদের পরিষ্কার হয়ে গেছে।

মনুষ্য-শরীর এবং মনুষ্য-মনই শ্রেষ্ঠ শরীর ও মন

৯ই জুলাই স্বামীজী এই বলে শুরু করছেন, Man as Atman is really free; as man he is bound, changed by every physical condition. (*আত্মা-হিসাবে মানুষ বাস্তবিকই মুক্ত, কিন্তু মানুষ-হিসাবে সে বদ্ধ, প্রত্যেকটি প্রাকৃতিক পরিবেশে সে পরিবর্তিত হচ্ছে।*) আগেও আমরা এই ধরণের একটা বাক্য পেয়েছিলাম। আমাদের বিভিন্ন সত্তা আছে, যাকে বেদান্তের ভাষায় কোষ বলা হয়, কোষ মানে শুদ্ধ আত্মার উপর যেন অনেক পোষাক চাপানো আছে, এই পোষাক গুলিকেই কোষ বলা হচ্ছে। আমাদের শরীরে যেমন আমরা অনেক পোষাক চাপাই, ভিতরে গেঞ্জি, গেঞ্জির উপর জামা, জামার উপর কোট চাপাই। ঠিক তেমনি শুদ্ধ চৈতন্যের উপর একটা আমিত্বের ভাব চাপানো আছে, যাকে জীবাত্মা বলছেন, এই রকম ধরণের অনেক কোষ পর পর সাজানো আছে, বেদান্তের ভাষায় যাকে অন্নময়কোষ, প্রাণময়কোষ, মনোময়কোষ, বিজ্ঞানময়কোষ, আনন্দময়কোষ বলছেন। স্থূল শরীরটা হল অন্নময়কোষ। আমরা মনে করছি আমি অন্নময়কোষ, কিন্তু আসল আমি হলেন ভিতরে যিনি শুদ্ধ চৈতন্য আছেন, যিনি আনন্দময়কোষেরও পারে, যেখানে কোন কোষ নেই, তাঁর। শুদ্ধ আত্মাকে আমরা নিজেরা আমি মনে করছি না, শরীরের যে পরিবর্তন তার সাথে আমরা নিজেকে জুড়ে রেখেছি। শরীর একটা নয়, অন্নময় শরীর একটা, প্রাণময় শরীর, মনোময় শরীর বিভিন্ন রকমের শরীর আছে।

এবার বলছেন, As man, he is a machine with an idea of freedom; but this human body is the best and the human mind the highest mind there is. (*মানুষ-হিসাবে তাকে একটা যন্ত্রবিশেষ বলা যায়, শুধু তার ভিতর একটা মুক্তি বা স্বাধীনতার ভাব আছে –এই পর্যন্ত। কিন্তু জগতের সর্বপ্রকার শরীরের মধ্যে এই মনুষ্য-শরীরই শ্রেষ্ঠ শরীর, আর মনুষ্য-মনই শ্রেষ্ঠ মন।*) স্বামীজীর এটা একটা খুব মূল্যবান কথা। স্বাধীন ইচ্ছা আর ঈশ্বরের ইচ্ছাকে নিয়ে আমাদের মধ্যে প্রচুর আলোচনা হয়। মানুষের যে আমি বোধ, আমি বোধরূপী যে মানুষের শরীর, এটা একটা মেশিন। আর মেশিনের মধ্যে ছোট্ট একটা আইডিয়া দেওয়া আছে, তুমি চিরমুক্ত। আসলে তুমি মুক্ত নও, শুধু ওই আইডিয়াটাটুকু দেওয়া আছে, ওই বোধটুকু তিনি দিয়ে রেখেছেন। কারণ শরীর তো জড়, মনও জড়, মুক্তির আইডিয়া পাবে কোথা থেকে? গোলাম কখন রাজা হতে পারে না, গোলাম গোলামই থাকে। বলবেন কেন, কোন রাজা এসে গোলামের গোলামি থেকে যদি মুক্তি দিয়ে দেয়? একদম ঠিক, গোলামের মুক্তি এইজন্যই দিতে পারে, কারণ প্রকৃত অর্থে সে তো গোলাম নয়, আসলে সে মানুষ কিন্তু তাকে গোলাম বানিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু শরীর একটা পদার্থ, পদার্থ কখন স্পিরিট হতে পারবে না। স্পিরিট যতক্ষণ না হয়, তার ইচ্ছাশক্তি হতেই পারে না। ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি যা কিছু আছে সেটা একমাত্র আত্মার, একমাত্র ঈশ্বরের, একমাত্র শুদ্ধ চৈতন্যের। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সব থেকে বড় যে মিথ্যা পালন করি, স্বামীজী অন্য জায়গায় বলছেন, তুমি শরীর, এটা সব থেকে বড় মিথ্যা। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে আমরা সব থেকে বড় মিথ্যা পালন করি, তা হল, আমার স্বাধীন ইচ্ছা আছে। এই শরীর দিয়ে তুমি কিছুই করতে পারো না, এই মন দিয়ে তুমি কিছুই করতে পারো না। কিন্তু স্বামীজী যে বলছেন, মানুষ যে কোন জিনিস করতে পারে। একেবারে ঠিক কথা, কারণ মানুষ আসলে শরীর নয়, মানুষ শুদ্ধ আত্মা, শুদ্ধ আত্মা সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, আত্মা রূপে মানুষ যে কোন জিনিস করতে পারে।

আত্মোপলব্ধির পর যোগীর মধ্যে যে শক্তি আসে

স্বামীজী আবার বলছেন, আমাদের যে মন দেওয়া হয়েছে, এটা best mind। আমাদের যে শরীর আছে, যে শরীর দিয়ে আমরা কাজ করছি, এটা best body। কিন্তু কি হয়, When a man attains to the Atman state, he can take a body, making it to suit himself, he is above law. (*যখন মানুষ আত্মোপলব্ধি করে, তখন সে আবশ্যকমত যে কোন শরীর ধারণ করতে পারে।*) স্বামীজীর এটা একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বাক্য। স্বামীজী এই ধরণের কথা বলতেন না, এটা তিনি rarest of rare বলেছেন। আমরা জানি আমাদের এই শরীরে আত্মা আবদ্ধ, কিন্তু আমরা মনে করছি আমি মুক্ত। মুক্ত আসলে আত্মা, কিন্তু দেহরূপে মনে করছি আমি মুক্ত, এটাই একটা মহা মুর্খামি। আমরা ভাল করেই জানি আমরা মুক্ত নই। সামান্য ক্ষুধা, তৃষ্ণা থেকে আমাদের মুক্তি নেই, দুটি মন্দ কথা কেউ বলে দিলে মনের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হবে, তার থেকে মুক্তি নেই, আর মনে করছি আমি মুক্ত। এই শরীর দিয়ে কিছু হয় না, কারণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত রকম আইন আছে, এই শরীর সেই আইনের মধ্যে বাঁধা। সব আইনের ব্যাপারে আমরা ওয়াকিবহাল নাও থাকতে পারি। মানুষ যখন এক অপরকে ভালবাসে, তখন দুজনের মন একসাথে চলতে শুরু করে, একই রকম চিন্তা ভাবনা করে। যমজ সন্তানদের একই রকম চেহারা, মানসিকতা হয়।

মহারাষ্ট্রে এই বছর বোর্ড পরীক্ষায় যমজ ভাইরা একই নাম্বার পেয়েছে। ওদের বাবা-মা অবাক হয়ে গেছে, দেখতে এক, চিন্তা-ভাবনা এক, কিন্তু পরীক্ষায় নম্বরও সমান হবে ভাবাই যায় না। কি করে হয়, আমাদের জানা নেই। দুটো আলাদা ব্যক্তিসত্তা কিন্তু তাদের মন একসাথে জুড়ে আছে, কি করে হয় বিজ্ঞানীদের কাছে এর কোন উত্তর নেই। জোর করে ওরা কিছু কিছু উত্তর নিয়ে আসে, আর তাতে ওরাও জানে আমি বোকা বানাচ্ছি, আমরাও জানি আমাদের বোকা বানাচ্ছে। ওদের হাতে টাকা আছে, ব্রেন আছে, ইংরাজী জানে, তাই আমাদের মেনে নিতে হয়। যমজের একজন যেটা ভাবছে, অন্যজনও তাই ভাবছে, এই জিনিসটাকে বিজ্ঞান পর্যন্ত ব্যাখ্যা দিতে পারছে না। আমাদের জানা আছে যে, একটা অবস্থার পর আমরা আমাদের শরীরকে strong করতে পারব না, এর বেশি জোরে আমরা দৌড়াতে পারব না। এই ধরণের নানা রকমের আমাদের বন্ধন আছে, যেটা এই জগতের নিয়ম-কানুনকে মেনে চলে।

যদি আমাদের এখন আত্মজ্ঞান হয়ে যায়, শুধু আত্মজ্ঞান না, যেমন যেমন আধ্যাত্মিক জ্ঞানে আমরা সমৃদ্ধ হচ্ছি, তেমন তেমন আমাদের শক্তি বাড়ে। এই শক্তি বাড়লে প্রথম যে জিনিসটা হয়, তা হল, শরীরের পরিবর্তন হতে শুরু করে। কথামৃতে ঠাকুর অনেকবার এই কথা বলছেন, ইন্দ্রিয়গুলো সব পাল্টে যায়। দুটো দৃষ্টান্ত দিলেই আমরা বুঝতে পারব শরীর আর মনের একটা বিচিত্র সম্পর্ক হয়ে যায়। ঠাকুর যখন স্বামীজীকে স্পর্শ করলেন, একবার নয়, একাধিকবার স্পর্শ করেছেন, স্বামীজী অন্য জগৎ দেখতে শুরু করে দিয়েছেন। ভগবান অর্জুনকে ছুঁয়ে দিয়ে বললেন, তোমাকে দিব্যচক্ষু দিলাম। অর্জুন এখন অন্য জিনিস দেখতে শুরু করেছেন। স্বামীজী একবারের জন্যও কোথাও কাউকে বলছেন না যে, যা যা তিনি দেখেছেন এগুলো মিথ্যা, তিনি আমাকে হিপনোটাইজ করেছিলেন। শুধু তাই না, ঠাকুরের কৃপায় যেদিন স্বামীজীর নির্বিকল্প সমাধি হল, স্বামীজী তখন ছটফট করছেন কিভাবে নির্বিকল্প সমাধিতে ডুবে থাকবেন। ঠাকুর বলছেন, ওসব এখন আর হবে না, তোকে মায়ের কাজ করতে হবে। মজার ব্যাপার হল, এই যে ঠাকুর বলছেন, জপধ্যান করতে করতে, সাধনা করতে করতে শরীর, মন, ইন্দ্রিয় পাল্টে যায়, ওই শরীর দিয়ে ঈশ্বরের রূপগুলি দেখা যায়। এই কথা আমাদের ধর্মশাস্ত্রের খুব পুরনো কথা, ঠাকুর নূতন কথা কিছু বলছেন না। কিন্তু ওই শরীর সরাসরি মনের সাথে যুক্ত, তাই শুধু শরীরই পাল্টায় না, মনের সাথে ইন্দ্রিয়গুলিও পাল্টায়। এরপর এই স্থূল শরীরের কোন দাম থাকে না, দাম থেকে মন আর ইন্দ্রিয়ের। সত্যিকারের যিনি আত্মজ্ঞানী হয়ে গেলেন, এবার তাঁর মন বলে কিছু নেই, তিনি এখন সমস্ত মনের রাজা। রাজা যেমনটি চাইবে তেমনটি করবে, যেমন শরীর দরকার সেই রকম শরীর দাঁড় করিয়ে নেবে।

কাশীপুর উদ্যানবাটীতে ঠাকুর ক্যান্সার রোগে শয্যাশায়ী। একদিন শ্রীশ্রীমা দেখছন ঠাকুর হঠাৎ তীরবেগে দোতালা থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বেরিয়ে গেলেন, কিছুক্ষণ পর তীরবেগে ফিরে এসে আবার নিজের বিছানায় শুয়ে পড়লেন। মা দেখে অবাক, যে মানুষ পাশ ফিরে শুতে পারেন না, অন্য কাউকে এসে পাশ ফিরিয়ে দিতে হয়, সেই মানুষ সিঁড়ি দিয়ে ধপ ধপ করে নেমে বেরিয়ে গেলেন, আবার একটু পরে সিঁড়ি দিয়ে তর তর করে উপরে উঠে এলেন। মা ঠাকুরকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে ঠাকুর বলছেন, 'ও তুমি দেখে ফেলেছ! কাউকে আর বলো না। ছেলেরা রাত্রে ওখানে খেজুড় গাছের রস খাবে বলে ঠিক করেছে, কিন্তু দেখলাম ওখানে একটা কালসাপ বাস করে, আমি গিয়ে ওকে চলে যেতে বললাম'। স্বামী সারদানন্দজী কাশীপুরে নিজেও ঠাকুরের সেবায় থাকতেন, তিনি লীলাপ্রসঙ্গে ঠাকুরের এই ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দিচ্ছেন। যিনি ঠাকুরের কোন অলৌকিক ঘটনা, চমৎকারী কোন কিছুর কথা লিখলেন না, তিনি হঠাৎ এই একটা ঘটনার কথা কেন লিখতে গেলেন!

এই যে ঠাকুর একটা শরীর নিয়ে নিলেন, সেই শরীর দিয়ে একটা কাজ করে আবার পুরনো শরীরটা নিয়ে বিছানায় ক্যান্সার রোগ নিয়ে শুয়ে পরলেন, এই রহস্যটা যদি বুঝতে হয়, তাহলে তাকে বেদান্তে ঢুকতে হবে। আর কেউ যদি এই রহস্যটাকে ধরে ফেলে, সে আধ্যাত্মিক জগৎকে পুরো বুঝে নিতে পারবে। যোগশাস্ত্রে ব্যূহকায় বা কায়ব্যূহের কথা আছে। কোন যোগী যদি দেখেন তাঁর ভিতর প্রচুর সংস্কার জমে আছে, যেগুলো এই শরীর দিয়ে সাধনা করে এই জন্মে শেষ করতে পারবেন না, তখন তিনি নিজের যোগশক্তিতে একসাথে কয়েকটা শরীর দাঁড় করিয়ে নেন, যে কটা শরীর দাঁড় করিয়ে নিলেন, সব কটা শরীর দিয়ে একসাথে এবার সাধনা করতে থাকেন। আমরা মনে করছি, দুবেলা একশ আটবার জপ করলে শেষ বয়সে ঠাকুর এসে আমাদের নিয়ে যাবেন; তাই যদি হয়, তাহলে ঠাকুরের এই সব ঘটনা, যোগীদের এত সাধনা, সব বেকার হয়ে যাবে। সবাইকে এই পথ দিয়েই যেতে হবে। শুধু যে পার্বতীই মুণ্ডুকাটা তপস্যা করেছিলেন তা না, মুক্তির পথে, আত্মজ্ঞানের পথে, ঈশ্বর লাভের পথে যেতে হলে আমাদের সবাইকেই মুণ্ডুকাটা তপস্যা করতে হবে, তা আজই করি বা কালই করি। যত শাস্ত্র কথা শুনে যাই না কেন, যতই অপরকে লেকচার দিয়ে বেড়াই না কেন, যখন আপদ বিপদ আসে তখন বেড়াল টিয়াপাখিকে ধরলে যে ট্যাঁ ট্যাঁ করে, আমরাও তাই করি। যোগপথে সাধনার যে লম্বা পদ্ধতির কথা বলে হয়েছে, আমাকে আপনাকে শেষে সবাইকে ওই লম্বা পথ দিয়েই যেতে হবে, আমাকে আপনাকেও ওই ব্যূহকায় করতে হবে। আমাদেরও এমন ক্ষমতা হবে যে আমরাও দশটা শরীর দিয়ে সাধন ভজন করছি। একজন মহারাজ ছিলেন, তিনি মজা করে বলতেন, ঠাকুরের কথামৃত আসার পর, ভক্ত থেকে শুরু করে সন্ন্যাসী পর্যন্ত সবাই কথামৃত পড়ার পর কেউ জীবনমুক্তির নীচে কথা বলেন না, আর

নিজেকেও ঈশ্বরকোটির নীচে দেখেন না। আরে ভাই জীবনমুক্তি, ঈশ্বরকোটি হওয়া হাতের মোয়া নয়, জন্ম জন্ম ধরে প্রচুর খাটতে হয়।

কি করে বোঝা যাবে কেউ খাটছে কি খাটছে না? এই যে স্বামীজী যা যা বলছেন, বা শাস্ত্রে যা কিছুর বর্ণনা আছে, এই ক্ষমতা তার বাস্তবিক থাকতে হবে। কি রকম বাস্তবিক? নিজের মত শরীর দাঁড় করিয়ে নিতে পারবে। যখন যেমনটি দরকার তখন সেই অনুসারে তেমনটি শরীর দাঁড় করিয়ে নেবে। যোগীরা এটা পারেন, যদি না পারেন তাহলে বুঝতে যোগ ক্ষমতা নেই, মুণ্ডুকাটা খাটনিটা করা হয়নি। এই যে কত রকমের সিদ্ধির কথা আমরা শুনছি, দূরের কথা শুনতে পারা, জলের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া, অণিমা, লঘিমা, গরিমা ইত্যাদি, এগুলো যোগীদের স্বাভাবিক। যোগী চাইলেই নিজের শরীরকে ভারী করে নেবেন, চাইলেই তুলোর মত হাল্কা করে নেবেন, ক্ষুদ্র করে নেবেন, এগুলো তাঁদের কাছে স্বাভাবিক। ঠাকুর যে শ্রীকৃষ্ণের কথা বলে বলছেন, অষ্টসিদ্ধির একটা সিদ্ধি থাকলে বুঝবে সেখানে আমি নেই, এর অর্থ হল, এই সিদ্ধিগুলো অর্জন করা যোগীর উদ্দেশ্য নয়, এগুলো নিজে থেকেই আসবে, না চাইলেও আসবে, আসতে বাধ্য।

সেইজন্য স্বামীজী বলছেন, When a man attains to the Atman state, he can take a body, making it to suit himself, he is above law, আত্মার অবস্থায় চলে গেলে, যোগী যেমনটি দরকার, যেটার জন্য দরকার, সেই ধরণের শরীর দাঁড় করিয়ে নেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, তোমাকে দিব্য চক্ষু দিলাম, কেন দিতে পারলেন? কারণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত রকম আইন আছে, সব আইনের উর্ধ্বে চলে গেছেন, স্বামীজী বলছেন he is above law। এই জগৎটা তাঁর নীচে পড়ে থেকে গেছে, তিনি আইনের বাইরে চলে গেছেন, এখন তিনি যখন খুশি, যেমন খুশি আইন বানিয়ে নিতে পারেন। This is a statement and must be proved, এটা এমনি কোন চলতি কথা না, এটাই সত্য, এর এই সত্যকে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে, প্রমাণিত করতে হবে।

যোগ ও তার কার্য

কিন্তু সমস্যা হল, Each one must prove it for himself, we may satisfy ourselves, but we cannot satisfy another. (*প্রত্যেক ব্যক্তিকে কার্যে এটা নিজে নিজে প্রমাণ করে দেখাতে হবে; আমরা নিজের মনকে বুঝাতে পারি, কিন্তু অপরের মনকে বুঝাতে পারি না।*) এই জিনিসগুলো আমাদের নিজেদেরকে সন্তুষ্ট করি এই বলে, হ্যাঁ এগুলো সত্য। কারণ এগুলো অপরকে দেখানোর জন্য নয়, অপরে বুঝবেও না, মনে করবে এটা কোন জাদুবিদ্যা। যীশু এমন কিছু কাজ করেছিলেন যেখানে চমৎকারিত্ব ছিল, কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষে এগুলোকে দেখিয়ে কেউ বাহাদুরী কুড়োতে যান না। কারণ মানুষ তাহলে মূল উদ্দেশ্যকে ভুলে গিয়ে এগুলোতেই আকৃষ্ট হয়ে পড়বে। একজন মহাপুরুষ বা যোগীর মধ্যে সমস্ত ক্ষমতা থাকে, তিনি যে কোন জিনিস করে দিতে পারেন, কিন্তু করেন না। কখন সখন অপরের মঙ্গলের জন্য এক আধটা করে দেন ঠিকই, কিন্তু সচরাচর করতে যান না। আর বলছেন, এটা কোন মুখের কথা নয়, এটাই বাস্তবিক।

মেরি লুই বার্কের বইতে একটা ঘটনার কথা আছে। স্বামীজী একদিন নিজের ঘরে বসে ধ্যান করছিলেন। স্বামীজীকে পরীক্ষা করার জন্য একজন মজা করে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে চলে গেছে। ইতিমধ্যে ক্লাশের সময় হয়ে গেছে। যে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল, সেও দরজা না খুলে ক্লাশে পৌঁছে গিয়ে দেখছে সেখানে স্বামীজী ক্লাশ নিচ্ছেন। সে মারাত্মক ভাবে চমকে গেছে, আমি এটা কি দেখছি! দৌড়ে সে স্বামীজীর ঘরে এসে দেখে বাইরে দিয়ে দরজায় তালা লাগানো। তালা খুলে দেখছে স্বামীজী তখনও ধ্যান করে যাচ্ছেন। আবার নীচে দৌড়ে গিয়ে দেখে, স্বামীজী ওখানে ক্লাশ নিচ্ছেন। যিনি এই কাজ করেছিলেন, তিনি তাঁর নিজের স্মৃতিকথায় এই ঘটনার কথা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। আমাদের পরম্পরায় এই ধরণের প্রচুর ঘটনা আছে, সেইজন্য এগুলোকে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই।

আমাদের সমস্যা হল, আমরা অতি সাধারণ মানুষ, আমরা প্রকৃতির আইনে বাঁধা হয়ে আছি, প্রকৃতি আইন থেকে আমাদের বেরিয়ে আসার কোন পথ নেই। কিন্তু আমরা তো প্রকৃতি প্রদত্ত শরীর নই, শরীরের একটু উপরে গেলে আসছে মন, মন দিয়েই সব কিছু হয়। এই মুহূর্তে যদি আমার কাছে কোন খারাপ খবর

আসে, আমি উল্টে পড়ব। তারপর বলা হল, এই খবরটা আপনার না, সঙ্গে সঙ্গে চাঙ্গা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। যারা ভাল্লুক নাচায়, তারা ভাল্লুককে বলল তোমার জ্বর হয়েছে, ধড়মড় করে মাটিতে শুয়ে পড়ল, একটা কাঠি লাগিয়ে বলল ভাল্লুকের জ্বর ভাল হয়ে গেছে, অমনি উঠে দাঁড়িয়ে গেল। মন আমাদের এই রকম, খারাপ খবর এলো মুষড়ে গেলাম, ভাল খবর এলো আনন্দে লাফাতে লাগলাম। তার সাথে আমাদের শরীরের ভাল-মন্দ নির্ভর করে মনের উপর। আমাদের শরীরটার কোন দাম নেই, দাম হল মনের। ঠিক তেমনি যাঁরা মনের অবস্থায় চলে যান, তাঁরা তখন একটা আধ্যাত্মিক স্তরে চলে যান, তখন তাঁরা জানতে পারেন এই মনটাও আসল না, আসলটা মনেরও পিছনে আছে।

আমাদের মস্তিষ্ক প্রচণ্ড ক্ষমতাবান, মস্তিষ্ক কখনই নিজের উপর কোন ধাক্কা নেবে না। কারণ মানুষের অস্তিত্ব মস্তিষ্কের দ্বারাই চলে। মস্তিষ্ক তাই যে কোন ধাক্কা এলে শরীরের যেটা জোরালো অংশ সেখানে ঠেলে পাঠিয়ে দেয়, সাইকোসোমাটিক মানেই তাই। আসলে এই রোগের কোন কারণ থাকে না। কিন্তু মনে এমন একটা ব্যাথা বা ক্ষোভ আছে যেটা মনকে গিয়ে নাড়াতে থাকে। মন বলে, বাপু তুমি যদি আমাকে এত নাড়া দাও, তাহলে তো তুমি নাশ হয়ে যাবে। এরপরেই সব থেকে শক্তিশালী হল আমাদের কোমড়। মস্তিষ্ক এবার ব্যাথাটা কোমড়ে পাঠিয়ে দেয়। যারই ব্যাকপেইন আছে, বুঝতে হবে সে একটা সাইকোসোমাটিক পেশেন্ট, তার মনে কোন ব্যাথা বা ক্ষোভ আছে। ডাক্তারদের কাছে ব্যাকপেইন বলে কোন রোগ হয় না, ব্যাক ইনজুরি হয়। যদি কোমড় ওটা না নেয়, দ্বিতীয় শক্তপোক্ত অঙ্গ হল স্টোমাক, মস্তিষ্ক তার নিজের ঝামেলাটা স্টোমাকে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেয়। যাদের হজমের গণ্ডগোল, পেটের যে কোন ধরণের রোগ আছে, বুঝতে হবে এরও মনে কোন ব্যাথা বা ক্ষোভ আছে। এরা মনস্তাত্ত্বিক বিশারদদের কাছে যায়, কাউন্সিলিং করে করে ভিতরের কথা বার করে সেইভাবে চিকিৎসার করে ধীরে ধীরে ঠিক করে দেয়। আগেকার দিনে সাধু সন্ন্যাসীরা এই কাজ করতেন, সাধুরা দুটি মিষ্টি কথা, ঈশ্বরের কথা বলে দিয়ে মনের হতাশা ভাবটা দূর করে দিতেন। অনেকের আবার চর্মরোগ হয়। চর্মরোগ ও পেটের রোগ, ফিজিক্যাল কারণেও হতে পারে আবার সাইকোসোমাটিকও হতে পারে। শরীরের এই যে ব্যাথা বা রোগ এটা সত্যি, যার হয় তার কাছে একেবারে বাস্তব, কিন্তু কোন বাহ্যিক কারণ নেই, কারণটা মনের ভিতরে আছে। কোন কারণে এগুলো যদি insufficient হয়, তখন ও শেষ পর্যন্ত মস্তিষ্কে ধাক্কা মারে। মস্তিষ্কে ধাক্কা মারলে হয় পাগল হয়ে যাবে, নয়তো ঘুম উড়ে যাবে আর তা নাহলে নিজের শরীরে ব্লেড চালাবে, ছুঁচ ফোটাবে, অনেক কিছু করবে, আর শেষ পর্যায় গিয়ে গলায় দড়ি দেবে। সেইজন্য মন খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। কিন্তু যাঁরা আত্মজ্ঞানী, আত্মজ্ঞানীই শুধু নন, যাঁরা মনকে শরীর থেকে সরিয়ে একটু মনের স্তরে রাখেন, সৃজনশীলতার স্তরে রাখেন, অপরের সেবায় রাখেন, প্রকৃতি মা তাঁদের দেখবেন। শরীর খারাপ হোক আর যাই হোক, সন্তানের রাত্রিবেলা যদি খিদে পায়, মা রাত্রে উঠে রান্না করা না থাকলে রান্না করে খাইয়ে দেবেন।

যোগ ও স্বজ্ঞা বা স্বতঃলব্ধ জ্ঞান

বলছেন, যেমন যেমন জপধ্যান করেছে, যেমন যেমন তপস্যা করেছে, তেমন তেমন তার যে ক্ষমতা হবে, এটা সে নিজেই জানতে পারবে, অপরকে দেখাবার জন্য না। Rajyoga is the only science of religion that can be demonstrated; and only what I myself have proved by experience, do I teach. (*ধর্মবিজ্ঞানের মধ্যে একমাত্র রাজযোগেই প্রমাণ করে দেখানো যেতে পারে, আমি নিজে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করে যা ঠিক বলে জেনেছি, শুধু তাই শিক্ষা দিয়ে থাকি।*) স্বামীজী এবার রাজযোগের উপর বলতে গিয়ে বলছেন, রাজযোগই একমাত্র ধর্মীয় বিজ্ঞান, যে বিজ্ঞান পরিষ্কার করে সব কিছুকে দেখিয়ে দেয়। তুমি এই ক্ষমতা পেতে চাও, এই এই ভাবে তুমি সাধনা কর, তোমারও মধ্যে এই ক্ষমতা চলে আসবে। স্বামীজী এখানে বলছেন, আমি যেটা নিজে অনুভব করেছি, যেটার অনুশীলন করেছি, সেটাকেই আমি শিক্ষা দিয়েছি। নিজে অনুশীলন না করে থাকলে, সেই শিক্ষার কোন দাম হয় না। রাজযোগের উপর পতঞ্জলির ওই একটাই বই, তারপরেই আসে স্বামীজীর রাজযোগ বই, যে বইতে স্বামীজী যা কিছু লিখেছেন, নিজের অনুশীলন ও অনুভূতিকে আধার করেই লিখেছেন।

The full ripeness of reason is intuition, but intuition cannot antagonise reason. (*বিচার-শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশপ্রাপ্ত অবস্থাই প্রাতিভ জ্ঞান, কিন্তু তা কখন যুক্তিবিরোধী হতে পারে না।*) স্বামীজী এখানে নিজের সব চিন্তা-ভাবনার কথাগুলো বলছেন, কিন্তু বেদান্তকে আধার করেই কথাগুলো বলছেন। মানুষ যখন বিচার করতে করতে, যুক্তি দিয়ে দিয়ে শেষে পৌঁছে যায় যখন বলে এটাই সত্য, তখন তার intuition আসতে শুরু করে। যে মানুষ সব কিছু দেখে নিয়েছে, সব কবিতা পড়ে নিয়েছে, ভিতরটা জ্ঞানরাশি দিয়ে ভরে গেছে, এরপর বলছে, এর এক স্টেপ বাইরে, তবেই creativity আসে। ঠিক তেমনি বিচার করে করে, এদিক থেকে একটা বিচার ধারা টানছে, ওদিকে থেকে আরেকটা বিচার এসে টানছে, এসব করে করে মানুষ যখন একটা জায়গায় স্থির হয়ে বসে গেল, এরপর supper reasoning শুরু হয়, এরপর যুক্তির দ্বারা একটা জায়গায় পৌঁছাতে হবে না, সে তখন intuitive হয়ে যাবে, সে বলে দেবে, এটাই হতে যাচ্ছে। সে নিজেও জানে না কেন বলছে, কি করে বলে দিচ্ছে যে, এটা হতে যাচ্ছে। কিন্তু ওর পিছনেও সাংঘাতিক reasoning রয়েছে। বর্তমান কালে intuitionকে নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হচ্ছে।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরা হলেন deterministic, তার মানে ওনারা A to B, B to C, C to D এভাবে চলে। কোন কারণে যদি A to D চলে যায় তখন ওরা সঙ্গে সঙ্গে link বার করবে, নিশ্চয় A মনে মনে B, C হয়ে Dতে গিয়েছিল। কিন্তু আমরা যদি বিচার করে দেখি, সাধারণ মানুষ A থেকে B, B থেকে C, C থেকে Dতে যেতে একটা সময় নেবে। কিন্তু যারা intuitive, যারা যোগী তাদের বুদ্ধি অনেক এগিয়ে গেছে, তারা A থেকে D সাঁ করে চলে যাবে। আমরা এখানে তিনটে স্টেপ বললাম, ওনারা এক স্টেপে A to Z চলে যাবেন। স্বামীজীর মত মানুষের মন কাজ করে করে, ধ্যান করে করে, চিন্তন করে করে, অধ্যয়ন করে করে এত সূক্ষ্ম হয়ে গেছে যে এক স্টেপে A to Z পৌঁছে যাচ্ছেন। আমরা যে পৌঁছাতে পারব না, তা না, আমরা সবাই পৌঁছাত পারব, কিন্তু আমাদের অনেক সময় নিয়ে নেবে। জিনিয়াস মানেই, অনেক অল্প বয়সে তাঁরা যেটা করেন অন্যরা সেটাই অনেক বেশি বয়সে করে।

এগুলোকে নিয়ে ইদানিং প্রচুর পড়াশোনা হচ্ছে, গবেষণা চলছে। স্বামীজী এখানে এটাই বলছেন, সব কিছুতে যখন একেবারে পরিপক্কতা পেয়ে যায়, তখনই intuition হয়, তবে পূর্ণ intuitive শক্তি যখন আসে তখন কোন যুক্তি তর্কের বিরুদ্ধে যেতে পারে না। তার মানে ঘুরে ফিরে সেই বেদান্ত এসে গেল, বেদে যে সত্যগুলো আছে, এগুলো intuitive, এর অর্থ ধ্যানের গভীরে ঋষিরা এই সত্যগুলিকে দেখেছেন। কোন কারণে এগুলো যদি আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কাজকে contradict করে, তখন আমরা আর ওটাকে মানতে পারব না। রামানুজম্ খুব নামকরা ম্যাথমেটিশিয়ান ছিলেন, তিনি অঙ্কের সমস্যাগুলোকে ওয়ার্ক আউট না করেই সল্যুশান দিয়ে দিতেন। পরে দেখা যাচ্ছে, তার যে কিছু কিছু সল্যুশান আছে সেগুলো ভুল। কিছু কিছু মানুষের এই ধরণের ক্ষমতা আসে, কেন আসে আমরা জানি না। কিন্তু reasoningকে যদি কেউ contradict করে, তাহলে সেই intuitionকে নেওয়া যাবে না। সেইজন্য আমরা অনেক সময় বলি, আমার মনে এই রকম ছিল, সেটা অনেক সময় মেলে, অনেক সময় মেলে না। স্বপ্ন কদাচিৎ কখন মিলে যায়, বেশির ভাগ সময় মেলে না। সেইজন্য reasoningএর একটা সাংঘাতিক দাম আছে, এটাই স্বামীজী বলতে চাইছেন।

কর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি

স্বামীজী এখানে যোগের একটা দিককে নিয়ে বললেন, তার সাথে কর্ম কিভাবে জুড়ে আছে বললেন। বিচার করে দেখলে দেখা যাবে, সাধন ভজন দুই প্রকার, একটা বহিরঙ্গ সাধন, আরেকটিকে বলে অন্তরঙ্গ সাধন। কর্ম বহিরঙ্গ সাধন, জপধ্যান অন্তরঙ্গ সাধন। বেদান্ত কর্মকে কিভাবে দেখে, সেটাকে এবার স্বামীজী ব্যাখ্যা করে বলছেন, Work purifies the heart and so leads to Vidya (wisdom). (*কর্মের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়, সুতরাং কর্ম – বিদ্যা বা জ্ঞানের সহায়ক।*) বহিরঙ্গ সাধন অর্থাৎ কর্ম হল, ফার্নেসে লোহা গলাবার আগুনের তাপের মত। সবাইকে প্রচুর কাজ করতে হবে, কর্মের তাপের ভিতরের আবর্জনাগুলি সব পুড়ে যায়। কিন্তু কথামৃত পড়ার পর বেশির ভাগ ভক্তদের না বুঝে ঠাকুরের কথাগুলো বদহজম হয়ে যায়। আমরা কাজ না করেই নিষ্কাম ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাই। আসলে আমরা সবাই হলাম অলসের ঢিপি। কাজ না করলে মনের অঙ্কট-বঙ্কট গুলি পুড়বে না। স্বামীজী এটাই বলছেন, Work purifies the heart। যত কাজ

করবে তত হৃদয় পরিষ্কার হবে, দরকার পড়লে কাজ সংগ্রহ করে নিতে হবে। তবে সাংসারিক কাজ বা নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কর্ম করতে বলা হচ্ছে না, চিত্তশুদ্ধির জন্য কাজ করতে হবে।

শ্রীশ্রীমায়ের সন্তান স্বামী সারদেশানন্দ একজন খুব উঁচু মাপের মহারাজ ছিলেন, গোপেশ মহারাজ নামেই তিনি বেশি পরিচিত ছিলেন। একটা বয়সের পর থেকে তিনি আশ্রমে কখনই কোন কাজকর্ম করতেন না, কিন্তু প্রচুর তপস্যাদি করতেন। কোন কোন আশ্রমে গিয়ে দু-মাস কি চার মাস কখন এক বছর দুবছর থাকতেন। আর শুধু জপ ধ্যান করতেন। মাঝে মাঝে গিয়ে আশ্রমের মহন্তকে বলতেন – শোন, আমার মধ্যে একটু রজোগুণ জেগেছে, তাই আমি ঠিক করেছি আশ্রমের এটুকু জায়গাতে মাটি কুপিয়ে একটু চাষবাস করব। মহন্তকে আবার হাতজোড় করে বলে দিতেন, তোমার যদি এই জমিতে কোন কাজ করতে হয়, তার জন্য আমি চাষবাস করেছি বলে এগুলো রেখে দিতে যেও না, আমার রজোগুণ জেগেছে বলে কাজ করে রজোগুণটাকে বার করে দেব। গোপেশ মহারাজ খুবই সম্মানিত সাধু ছিলেন, শুধুই জপ-ধ্যান করতেন। এটাই হয়, রজোগুণ জাগা মানে প্রবৃত্তি জেগে গেছে, প্রবৃত্তি জাগা মানে এখন কিছু কাজ করতে হবে, কাজ করে এটাকে বের করে দিতে হবে। ঘুম পেলে যেমন সবাইকে ঘুমোতে হয়, ঠিক তেমনি সাধু-সন্ন্যাসীদের যখন কাজের প্রবৃত্তি জাগে তখন সেটাকে মিটিয়ে দিতে হয়, না মেটালে সর্বনাশ হয়ে যাওয়ার প্রচণ্ড সম্ভবনা তৈরী করে দেবে। ওই রজোগুণ তাকে কাম আর ক্রোধ রূপে পুড়িয়ে দেবে। আমাকে আপনাকেও পোড়াচ্ছে, কিন্তু আমরা বুঝতেও পারছি না। ঠাকুরেরও এই রকম হয়েছিল, মাঝ রাতে তাঁরও একবার ঐ রকম কাজের প্রবৃত্তি জেগে গিয়েছিল, তখনই তাঁকে সেটা মেটাতে হবে। যখনই রজোগুণের প্রবৃত্তি আসবে সেটাকে কাজ করে মিটিয়ে দিতে হয়। উনিও মঠের বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে প্রচুর গাছ লাগিয়ে দিতেন। এখনও সেই সব আশ্রমের সাধুরা বলেন এই গাছগুলো গোপেশ মহারাজের লাগানো। গোপেশ মহারাজ আরেকবার অন্য এক আশ্রমে গিয়ে ভুট্টা চাষ করতে শুরু করেছেন। উনি হলেন সাধু, এখন উনি কাজ করছেন তাঁর রজোগুণ জেগে গেছে বলে। নিজেই বীজ লাগাচ্ছেন, নিজেই জল দিচ্ছেন, গাছের পরিচর্যা নিজের হাতেই করছেন। আশ্রমের সাধুরা এখনও বলেন ভূট্টা গাছে যে সাইজের ভুট্টা হয়েছিল আজ পর্যন্ত ঐ রকম সাইজের ভুট্টা কেউ দেখেনি। কারণ উনি তো নিজের জন্য, বা লোভে পড়ে আসক্তিবশতঃ গাছ লাগাননি, রজোগুণ জেগে গিয়েছে আমাকে এখন এই রজোগুণকে মিটিয়ে দিতে হবে। ফলে তাঁর কার্যদক্ষতা আর সেই কাজের যে ফসল দুটোই বিশাল আকারের হয়ে যেত। কাজের দ্বারা কাম ক্রোধকে নাশ করা হয়। যদি কারুর জীবনের কোন উদ্দেশ্য নেই, কিছুই সে জীবনে চাইছে না, তা সত্ত্বেও তাকে কাজ করতে হবে। এখানে কোন স্বার্থপরতার কথা বলা হচ্ছে না।

আগে আমরা আলোচনা করছিলাম, কাজ মানে, যে জিনিসটা আমাদের কামিনী, কাঞ্চন, নামযশ সরাসরি বা পরোক্ষ ভাবে দেবে। নিষ্কাম কর্ম মনে, যে কর্ম এই তিনটের কোনটাই দেবে না। এখানে যাঁরা শাস্ত্রের কথা শুনছেন, এনারা জানেন, এই কাজের দ্বারা তাঁরা কামিনী, কাঞ্চন, নামযশ কোনটাই পাবেন না। তার মানেই এই কাজ তাঁদের এক উন্নত মানুষ তৈরী করে শ্রেষ্ঠ মানুষ হওয়ার পথে নিয়ে যাচ্ছে, এটাই কর্মযোগ। উপনিষদে তিনটি এষণার কথা বলা হয়, পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণ এবং লোকৈষণা, কর্মযোগ মানে, সে এই তিনটি এষণার জন্য কাজ করছে না। আমরা মুখে বলতে পারি আমার কোন এষণা নেই, আমার কোন কিছু পাওয়ার ইচ্ছা নেই, আমি যা করছি লোকের মঙ্গলের জন্য করছি। কিন্তু ঠাকুর বলছেন, দেখবে হয়তো ভিতরে মানযশের ইচ্ছা আছে। বাইরের লোক এটা বুঝতে পারবে না, আমি জানি আমার মনে কি হচ্ছে। যেমনি মানের ইচ্ছা থেকে কেউ বেরিয়ে আসবে, আমি সংসারে আছি সংসার ধর্ম পালনের জন্য যেটুকু করার করছি, এর বাইরে আমি যা করব ঈশ্বরের জন্যই করব। ঈশ্বরের জন্য করা মানে সেবাকার্য, পূজাকার্য ইত্যাদি। স্বামীজী বলছেন, চিত্তশুদ্ধির জন্য যে কর্ম করা হয়, তখন ওই কর্ম আত্মজ্ঞানের দিকে এগিয়ে দেয়। কর্ম সরাসরি এগিয়ে নিয়ে যায় না, চিত্তশুদ্ধির মাধ্যমেই এগিয়ে নিয়ে যায়। গীতার তৃতীয় অধ্যায়, চতুর্থ অধ্যায়ে এই ভাবটার উপর খুব জোর দিয়ে বার বার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলা হয়েছে। সেখানেও এই কথা বলছেন, *যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোহন্যত্র লোকহয়ং কর্মবন্ধনঃ*, যজ্ঞরূপে যে কর্ম করা হয়, সেটাই ঠিক ঠিক কর্ম, তার বাইরে সব কর্ম কর্ম বন্ধনের কারণ হয়। যদি যজ্ঞ রূপে করা হয়, নিষ্কাম ভাবে করা হয়, ঈশ্বরে অর্পণ করে করা হয়, তখন ওই কর্ম মুক্তির কারণ হয়।

কর্মের উপর তিনটি মত

এবার স্বামীজী তিনটে দর্শনকে এনে বলছেন, The Buddhists said, doing good to men and animals were the only works, (*বৌদ্ধদের মতে মানুষ ও জীবজন্তুর হিতসাধনই একমাত্র কর্ম।*) বৌদ্ধদের মত হল, যদি মানুষের জন্য কাজ করা হয়, জীবজন্তুর জন্য কাজ করা হয়, এই কাজই ঠিক ঠিক কাজ, এই কাজ মুক্তির দিকে নিয়ে যায়। আর বলছেন, and Brahmins said that worship and all ceremonials were equally 'work' and purified the mind, (*ব্রাহ্মণদের মতে উপাসনা ও সর্বপ্রকার যাগযজ্ঞাদি-অনুষ্ঠানও ঠিক সেইরূপ কর্ম এবং চিত্তশুদ্ধির সহায়ক।*) বৈদিক ব্রাহ্মণদের মতে, যজ্ঞ করা, পূজাদি করা, এগুলোই কাজ। যেখানেই আমাদের শরীর মন লাগে, সেটাই কাজ, চিন্তন যে করছে, চিন্তন করাটাও কাজ। কিন্তু বেদান্তে এসে তফাৎ হয়ে যায়, ঘুরে ফিরে কোন কর্ম যদি আমাদের সংসারের দিকে টেনে নিয়ে আসে ওটা কর্ম, আর যে কর্ম সংসারের বাইরে নিয়ে যায় সেটাই হয়ে যাবে কর্মযোগ। ইহকাল ও পরকাল এই দুটোর একটা যদি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে উদ্দেশ্য হয়, জানতে হবে এটা কর্ম। এই দুটোর কোনটা যদি উদ্দেশ্য না হয়, তাহলে বুঝতে হবে এই কর্ম তাকে মুক্তির দিকে নিয়ে যাবে, অবশ্য যদি এই ব্যাপারে তার পরিষ্কার বোধ থাকে। বৈদিক ব্রাহ্মণরা বলতেন, যাবতীয় যা কিছু করা হয় সবটাই কাজ। পূর্বমীমাংসকদের মতে কর্ম করাটাই উদ্দেশ্য। বৌদ্ধদের মতে, মানুষের সেবা করা, পশুর সেবা করাটাই ঠিক ঠিক কাজ, এই কাজ মনকে শুদ্ধ করে মুক্তির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। বৈদিক ব্রাহ্মণদের আরেকটা খুব দৃঢ় মত হল, দেবতাদের উদ্দেশ্য যদি যজ্ঞ করা হয়, ওই যজ্ঞ মনকে শুদ্ধ পবিত্র করে।

এরপর স্বামীজী কর্মের ব্যাপারে আচার্য শঙ্করের কি মত বলছেন, Shankara declares that 'all works, good and bad, are against knowledge'. (*শঙ্করের মতে –শুভাশুভ সর্বপ্রকার কর্মই জ্ঞানের প্রতিবন্ধক।*) কাজ ভাল হোক, কাজ মন্দ হোক, কাজ জ্ঞানের পরিপন্থি। ভাল কাজ মন্দ কাজ বলে কিছু হয় না, কাজ বলতে কাজ। প্রথম প্রথম কথামৃত পড়ার সময়, ঠাকুরের এই কথা, জ্ঞান-অজ্ঞান দুটোই ফেলে দিতে হয়, সুখ-দুঃখ, পাপ-পূণ্য দুটোই ফেলে দিতে হয়, কিছুতেই বুঝতে পারা যায় না। আমরা এই বলে মেনে নিই যে, ঠাকুর যেকালে বলছেন অবশ্যই ঠিক বলছেন। কিন্তু এর অর্থটা কি? বিভিন্ন ধর্মের যাঁরা খুব ভাল মানুষ, নিষ্ঠার সাথে নিজের ধর্ম পালন করেন, আর ঠাকুরকেও মানে, তাঁদের সাথে কথা বললে দেখা যায়, তাঁরা কিছুতেই এই জিনিসটা থেকে বেরোতে পারেন না। একজন খুব পণ্ডিত ব্যক্তি, তিনি অনেকক্ষণ এই ব্যাপার নিয়ে কথা বলার পর খুব বিনয় ভাবে বলছেন, 'ভাল হওয়াই তো জীবনের উদ্দেশ্য, আপনারা কেন বেদান্তে বলছেন, ভালটাকেও পেরিয়ে যেতে হবে'? এই জিনিসটা তাঁকে কেউ বোঝাতে পারবে না। এই যে বেদান্ত বলছে, শুধু অশুভের ত্যাগ না, শুভেরও ত্যাগ, শুধু দুঃখের ত্যাগ না, সুখেরও ত্যাগ, শুধু অজ্ঞানের ত্যাগ না, জ্ঞানেরও ত্যাগ, এই জিনিসটাকে ধারণা করা সত্যিই খুব কঠিন। সেইজন্য খুব সূক্ষ্ম বুদ্ধি না হলে আচার্য শঙ্করকে বোঝার ক্ষমতা কারুর হবে না। কারণ আপাত ভাবে এটা counter intuitive। ঠাকুরও কিন্তু পাতায় পাতায় একই কথা বলছেন। ঠাকুর বেদান্ত বলছেন না, ঠাকুর যেটা সাক্ষাৎ অনুভব করেছেন সেটাই বলছেন। আমাদের পক্ষে ধারণা করা অবশ্যই কঠিন।

তমো ও রজোগুণজনিত কর্মের ফলই পাপ

আচার্য বলছেন, শুভ আর অশুভ কর্ম দুটোই জ্ঞানের পথা কাঁটা। এই জায়গায় এসে পূর্বমীমাংসকদের থেকে উত্তর মীমাংসকরা আলাদা হয়ে যান। পূর্বমীমাংসকদের কাছে যজ্ঞই শেষ কথা। বেদান্তের কাছে যজ্ঞ শেষ কথা final jump মারার জন্য। আচার্য শঙ্কর বলছেন, আগে সাংসারিক কাজ ছাড় তারপর যজ্ঞে নামো, যজ্ঞ করতে করতে সকাম যজ্ঞ থেকে এবার নিষ্কাম যজ্ঞে যাও, নিষ্কাম যজ্ঞ করতে করতে মন শুদ্ধ হয়ে গেলে তোমার জ্ঞান আসবে, তবেই তুমি জ্ঞানী হবে। স্বামীজী বলছেন, Actions tending to ignorance are sins, not directly, but as causes, because they tend to increase Tamas and Rajas. (*যে-সকল কর্ম অজ্ঞানের দিকে নিয়ে যায়, সেগুলো পাপ –সাক্ষাৎসম্বন্ধে নয় কারণস্বরূপে, যেহেতু সেগুলির দ্বারা রজো ও তমো গুণ বেড়ে যায়।*) স্বামীজীর আগের বাক্যের সাথে পিছনের এই দুটো বাক্য মিলে রয়েছে। তিনটে গুণ হল, সত্ত্বগুণ, রজোগুণ আর তমোগুণ। গীতায় সত্ত্বগুণের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে খুব সুন্দর বলছেন,

সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞান সঙ্গেন চানঘ, যে কোন সুখ, সুখ বলতে সুখ, মা সন্তানকে স্নেহ করছে দেখে আমি সুখী হলাম, বুঝতে হবে সত্ত্বগুণ এসে গেছে। একজন নববধূ বা পতিব্রতা স্ত্রী স্বামীকে দেখে সুখী হচ্ছে, এখানেও সত্ত্বগুণের প্রকাশ হচ্ছে। কাউকে দেখে যদি গাত্রদাহ হয়, বুঝতে হবে তার তমোগুণ বেড়ে যাচ্ছে। রজোগুণ বলছে, আমাকে এটা করতে হবে, আমাকে জয়ী হতে হবে। তমোগুণে ঘুম পারিয়ে দেয়, মনের মধ্যে হিংসা বৃত্তি জাগিয়ে দিচ্ছে। রজো আর তমোগুণ সংসারে নামিয়ে দেয়। রজো ও তমোগুণ মানুষকে ধীরে ধীরে নীচের দিকে নিয়ে যায়। সত্ত্বগুণে মানুষের মধ্যে শান্ত ভাব নিয়ে আসে, জ্ঞানের প্রতি স্পৃহা জাগিয়ে দেয়, সুখের প্রতি স্পৃহা আসে।

জগতে সবাই সুখের পিছনে দৌড়াচ্ছে, কিন্তু কেউই সুখ পায় না। আমরা সবাই বলি, জীবনে আমি একটু সুখ পেতে চাই, কিন্তু কেউই সুখ পাই না। সুখ পাবে কোথা থেকে! সুখ সব সময় সত্ত্বগুণে হয়, তুমি রজোগুণ তমোগুণ দিয়ে সুখ পেতে চাইছ। সুখ লাভের জন্য সব সময় প্রথমে চেষ্টা করতে হবে কি করে আমার সত্ত্বগুণটা বাড়ানো যায়। সত্ত্বগুণ লাভের প্রথম প্রচেষ্টা হবে মনকে শান্ত করতে হবে। কিন্তু তা না করে আমরা কাম ক্রোধ লোভ মোহের মধ্যে দৌড়াচ্ছি আর ওর মধ্যে সুখ খুঁজে বেড়াচ্ছি, কিন্তু জানি না যে এগুলোর মধ্যে সুখের গন্ধটুকুও নেই। ঠাণ্ডা আগুন আমি কোথাও পাবো না, গরম বরফ কোথাও পাওয়া যাবে না। সব কটাই বিধর্মী, আগুন কখন ঠাণ্ডা হয় না, বরফ কখন গরম হয় না। রজোগুণ আর তমোগুণ কখনই সুখ দিতে পারে না, কারণ এরা সুখের বিপরীত। সুখ একমাত্র দেয় সত্ত্বগুণ, সত্ত্বগুণ মানে শান্ত, মনের মধ্যে পূর্ণিমার চাঁদের মত একটা পরিপূর্ণতার ভাব বজায় থাকে। ভরা গঙ্গা, ডালে ডালে ফুল ও ফলে ভরা বৃক্ষ, সবুজ ধানের ধু ধু চাষের ক্ষেত দেখলে স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের মনে একটা আনন্দের ভাব আসে। পরিপূর্ণাতাই সত্ত্বগুণ, মন শান্ত হয়ে যায়। সত্ত্বগুণীর ভালবাসা গভীর ভালবাসা, স্বামীজী ও তাঁর গুরুভাইরা সব সময় ঠাকুরের নামে বলছেন, কি গভীর ভালবাসা, মায়ের নামে বলছেন, কী ভালবাসা, ভালবাসা দিয়ে এনারা সবাইকে বেঁধে রেখেছিলেন। কারণ ওনারা সত্ত্বগুণের একেবারে উচ্চ অবস্থায় আছেন, ওখান থেকে এক ফোঁটা ভালবাসা যদি আমাদের উপর বর্ষিত হয়, আমাদের ভিতরটা বন্যায় প্লাবিত হয়ে যাবে। রজোগুণী ও তমোগুণীরা যে ভালবাসতে পারে না তা না, তারাও ভালবাসতে চাইছে, কিন্তু স্বভাবের জন্য যাকে ভালবাসতে যাবে তাকে জ্বালিয়ে দেবে। আগুন যদি এসে বলে আমি তোমাকে ভালবাসতে চাই, আগুন তো পুড়িয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছু দিতে পারবে না। তমোগুণী রজোগুণীও পোড়ান ছাড়া আর কিছু করতে পারবে না।

ভারতের সভ্যতা সত্ত্বগুণকে আশ্রয় করে তৈরী হয়েছিল। সত্ত্বগুণের আশ্রয়কে ছেড়ে এখন শুধু রজোগুণ আর তমোগুণের আশ্রয়ে চলছে, সবাই এখন তাই দৌড়াচ্ছে, কে কাকে লেঙ্গি মেরে এগিয়ে যাবে, প্রাণপন সবাই সেই চেষ্টাই করে যাচ্ছে। যার ফলস্বরূপ, চারিদিকে খুন, আত্মহত্যা, শীলহানি, চুরি, বাটপারি হয়ে চলেছে, যে যেখানে সুযোগ পাচ্ছে লুটেপুটে নিচ্ছে। আগে ভারতের মানুষ যে জিনিসগুলি করার কল্পনা করতে পারত না, এখন সব কিছুই করছে। অনেকে এসে বলে, এসব আগেও ছিল, মিডিয়া ছিল বলে লোকেরা জানতে পারত না। আমরা কি আগে কোন সমাজে ছিলাম না? আগে যদি এসব হয়ে থাকত তাহলে ভারতের ঐতিহ্যকে নিয়ে, ভারতের ঋষি পরম্পরার ইতিহাসকে নিয়ে কেই গর্ব করত না। আসলে আমরা এখন সত্ত্বগুণকে শেকড় শুদ্ধু উপড়ে তুলে ফেলে দিয়েছি।

পাপ কি? স্বামীজী বলছেন, তমোগুণ আর রজোগুণ যে ফলগুলো দেয়, এটাই পাপ। ইংরাজী sin শব্দের ঠিক ঠিক অর্থ হল, ঈশ্বরের আদেশ বা শাস্ত্রের যে নির্দেশ আছে, তার বিরুদ্ধে কোন কিছু করাটাই পাপ। আমাদের কাছে এটা কোন পাপ না, আমাদের কাছে ঈশ্বরের পথ থেকে বিমুখ হয়ে যাওয়াটাই পাপ। সেইজন্য পাপ কোন ভাবেই স্থায়ী হয় না, কারণ যেদিন সে ঘুরে আবার ঈশ্বরের পথে চলে এলো, ওই পাপটা মুছে গেল। ঈশ্বরের দিকে থাকাটাই পূণ্য, ঈশ্বর থেকে বিমুখ হয়ে যাওয়াটাই পাপ। তমোগুণ ও রজোগুণ প্রসুত যে ফল আসে, সেই ফলগুলি আমাদের ঈশ্বরের পথ থেকে সরিয়ে দেয়। সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, এটাও কিন্তু বন্ধন। ঈশ্বর লাভের পথে সত্ত্বগুণও আমাদের বেঁধে রাখবে, ঈশ্বরকে পেতে দেবে না। কি করে সত্ত্বগুণ বাঁধে? *সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ*, সুখ দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে, জ্ঞানের স্পৃহা দিয়ে সত্ত্বগুণ আমাদের

বেঁধে ফেলে। স্বামীজী বলছেন, সত্ত্বগুণের যত আধিক্য হবে তত জ্ঞান আসবে। তখন শাস্ত্র কি বলতে চাইছে জানার স্পৃহাটা আসে।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

সত্ত্বগুণ যখন বেড়ে যায় তখন, Virtuous deeds take off the veil from knowledge, and knowledge alone can make us see God. (*সত্ত্বের দ্বারাই কেবল জ্ঞানলাভ হয়। পূণ্য ও শুভকর্মের দ্বারা জ্ঞানের আবরণ দূর হয়, আর কেবল জ্ঞানের দ্বারাই আমাদের ঈশ্বর দর্শন হয়।*) এইভাবে জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর তখন শুধু একটা ধাপ বাকি থেকে যায়, শেষ একটা আবরণ। কেউ যদি চেষ্টা চালিয়ে যায়, আর তার সাথে যদি তার গুরুকৃপা থাকে, তখন ওই শেষ আবরণটাও সরে যায়। আবরণটা সরে যেতেই জ্ঞানরাশি শ্রাবণের জলধারার মত ঝম্ ঝম্ করে নেমে আসবে। তমোগুণ, রজোগুণ আর সত্ত্বগুণ এগুলো আবরণ। মাথার উপর যেমন নানা রঙের ছাতা থাকে, এখানে তেমন তিনটে রঙের ছাতা, কালো ছাতা, লাল ছাতা আর সাদা ছাতা। কালো ছাতায় সূর্যের আলোকে একেবারে ঢেকে রাখবে, লাল ছাতায় সূর্যের আলো একটু দেখা যাবে, সাদা ছাতায় বোঝা যাবে সূর্যের আলো আসছে, কিন্তু সূর্যের আলো যদি পুরোপুরি চাই, সাদা ছাতাটাকেও ফেলে দিতে হবে। সত্ত্বগুণ শুধু আকার ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেয়, এই দেখো আলো আছে।

বক্তব্য হল কাজ সবাইকে করতে হবে, বৌদ্ধদের মতানুযায়ী মানুষের সেবা ও পশুর সেবা রূপে কাজ করুক বা আমাদের কর্মকাণ্ডীদের মত যজ্ঞাদি করুক আর যাই করুক, শেষমেশ আচার্য শঙ্কর যেটা বলছেন, কাজ শুভ হোক আর অশুভই হোক, দুটোই জ্ঞানের জন্য বন্ধন। অশুভ কর্মের জন্ম তমোগুণ আর রজোগুণের ফল থেকে। প্রথমে তমোগুণ আর রজোগুণকে ছাড়তে হয়, এই দুটো ছাড়ার পর সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে, ঠাকুর বলছেন কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলে ফেলে দিতে হয়, এবার সত্ত্বগুণের কাঁটাটাও ছুড়ে ফেলে দিতে হয়। সত্ত্বগুণের কাঁটা ফেলে দেওয়ার পরেই তার শুভ-অশুভ, জ্ঞান-অজ্ঞান, সুখ আর জ্ঞান এই দুটোকেও ছুড়ে ফেলতে হয়। জ্ঞানকে ছেড়ে দেওয়ার পর কি থাকবে? থাকবে বিজ্ঞান। জ্ঞান আর বিজ্ঞানের মধ্যে যখন পার্থক্য করা হয়, তখন জ্ঞান হল, শাস্ত্রের তত্ত্বকথার তাত্ত্বিক জ্ঞান আর ওই জ্ঞান যখন সাক্ষাৎ করে নেওয়া হয় তখন সেটাকে বলা হয় বিজ্ঞান। ঠাকুর এটাকেই খুব সহজ করে বলছেন, কেউ দুধের কথা শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে আর কেউ দুধ খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে। হৃষ্টপুষ্ট হওয়াটাই বিজ্ঞান।

আমাদের শাস্ত্রে জ্ঞান আর বিজ্ঞান অনেক সময় inter changable হয়, যেখানে অনেক সময় জ্ঞান মানে বিজ্ঞান। কিন্তু পরে ঠাকুরের সময় থেকে আস্তে আস্তে ওটাকে পরিষ্কার করে বিজ্ঞান শব্দ নিয়ে আসা হয়েছে। কিন্তু শাস্ত্রে জ্ঞান শব্দ দুটো অর্থেই হয়, তাত্ত্বিক জ্ঞান হওয়া, অর্থাৎ শাস্ত্র অধ্যয়ন করে পরিষ্কার একটা আইডিয়া তৈরী করে নিয়েছে সেও জ্ঞানী আর ওই জ্ঞানকে যিনি প্রত্যক্ষ করে নিয়েছেন, যাঁর ঈশ্বর দর্শন হয়ে গেছে তিনিও জ্ঞানী, আর যারা ঈশ্বরের পথে সদ্য নেমেছে, তাদেরকেও জ্ঞানী বলা হয়। গীতাতে এই তিনটে অর্থেই জ্ঞানকে নেওয়া হয়েছে। স্বামীজী বলছেন, বেদান্ত মানে বিজ্ঞানী। আচার্য শঙ্করের যে দর্শন তাতে তিনি বলছেন, তুমি বিজ্ঞানী হও, কোন মতেই জ্ঞানী না, কারণ জ্ঞানী হলে তুমি সত্ত্বগুণে ফেঁসে যাবে। ঠাকুরও বলছেন, জ্ঞানী ভয়তরাসে। ঋষি যদি জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, তার মানে তিনি এখনও সত্যকে প্রত্যক্ষ করেননি বা তাঁর আত্মজ্ঞান হয়নি। যাঁরা বেদান্তের ঠিক ঠিক জ্ঞান পেয়েছেন, তাঁরা বিজ্ঞানী। সত্ত্বগুণ জ্ঞান পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে, সত্ত্ব, রজো ও তমোকে ছেড়ে যিনি ত্রিগুণাতীত হয়ে যান, তিনিই বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানী শুভ-অশুভ, জ্ঞান-অজ্ঞান, পাপ-পূণ্য, ধর্ম-অধর্ম সব কিছুর পারে, শুদ্ধ সচ্চিদানন্দের সাথে তিনি নিজেকে এক করে নিয়েছেন।

জ্ঞান আগে থেকেই আছে

স্বামীজী ভারতের মূল ধর্ম অদ্বৈত বেদান্তের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আচার্য শঙ্করকে কেন্দ্রে রেখে রামানুজ ও মাধ্বাচার্যের দর্শনে ঢুকে গিয়ে ওনাদের দর্শনকেও আলোচনায় নিয়ে আসছেন। একটু পরেই আলোচনায় ভগবান বুদ্ধও এসে যাবেন, কোন ভাবে ইসলামও এসে যাবে। কিন্তু তার আগে বলছেন, Knowledge can never be created, it can only be discovered; and every man who makes a great

discovery is inspired. (*জ্ঞান কখন উৎপন্ন করা যেতে পারে না; তাকে কেবল অনাবৃত বা আবিষ্কার করা যেতে পারে; যে কোন ব্যক্তি কোন বড় আবিষ্ক্রিয়া করেন, তাঁকেই উদ্বুদ্ধ বা অনুপ্রাণিত পুরুষ বলা হয়।*) স্বামীজী এই ধরণের কথা সব সময় বলতেন, মানুষ জ্ঞান কখন নিজে থাকে পায় না। জ্ঞান সব সময় আছে, মানুষ কোন ভাবে, হয় হঠাৎ, নয় কোন একটা প্রচলিত পথ ধরে খুঁজতে খুঁজতে জ্ঞানে পৌঁছে যায়। ফিজিক্সের ইতিহাসে দেখা যায়, বৈজ্ঞানিকরা গবেষণা করে যাচ্ছেন, করতে করতে ইক্যুয়েশান দিয়ে একটা জায়গায় পৌঁছালেন। তার মানে ওই জায়গাতে পৌঁছানর জন্য পুরোদমে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ফিজিক্সে আবার অনেক সময় দেখা যায়, বায়োলজি ও কেমেস্ট্রিতেও অনেক সময় দেখা যায়, কোন একটা জিনিসকে নিয়ে কাজ করছিল, কিন্তু হঠাৎ যেটা জানার জন্য কাজ করা হচ্ছিল সেটা না বেরিয়ে বেরিয়ে এলো অন্য কিছু। অন্য যেটা বেরিয়ে এলো, সেটা সে নিজেও আশা করেনি।

ইদানিং অনেকে মাইক্রোওভেনে রান্না গরম রাখছে। মাইক্রোওভেনের জন্য কেউ চেষ্টা করছিল না যে, আমরা মাইক্রোওভেন তৈরী করতে যাচ্ছি। কয়েকজন টেকনিশিয়ান অন্য একটা ইলেক্ট্রিক্যাল প্রজেক্টে মাইক্রোওয়েভ অর্থাৎ রেডিও ওয়েভেসের উপর কাজ করছিল। একজন টেকনক্র্যাট কাজ করতে করতে খিদে পাবে বলে পকেটে চকলেট রেখে দিয়েছিল। হঠাৎ তার মনে হল পকেটটা ভিজে গেছে। হাত দিয়ে দেখছে চকলেটটা পুরো গলে গেছে। কিছুতেই সে বুঝতে পারছে না, চকলেটটা গলে গেল কেন। কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছে না। এরা সবাই অনুসন্ধিৎসু মনের লোক। খুঁজতে শুরু করল হার্ড চকলেট গলে গেল কেন। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে, আর সব দেখেশুনে বুঝতে পারল, যে জায়গা থেকে সে রেডিও ওয়েভ ছাড়ছিল, ওই লাইনে সে দাঁড়িয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে ধরে নিল, এই যে রেডিও ওয়েভ আসছে, নিশ্চয়ই এর মধ্যে কিছু একটা হচ্ছে, যেটা হিট জেনারেট করছে, যে হিট আমাকে পোড়াচ্ছে না, কিন্তু আমার চকলেটকে গরম করে দিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে সেই টেকনিশিয়ান গবেষণা করতে নেমে গেল। সেখান থেকে কিছু দিন পর বেরিয়ে এলো মাইক্রোওভেনের আগুন। তাদের কোন ধারণাই ছিল না যে, এমন কিছু হতে পারে। যিনি মাইক্রোওভেনের প্রপার্টিটা বার করলেন, উনি কি নূতন কিছু বার করলেন? মাইক্রোওয়েভের ওই নিয়মটা আগে থেকেই চলে আসছে, তিনি ওই নিয়মটাকে ধরে নিলেন। অন্য দিকে নিউটন, তাঁর শরীর খারাপ হওয়াতে লণ্ডন ছেড়ে গ্রামের বাড়িতে থাকতে লাগলেন। একদিন বাগানে বসে আছেন, গাছ থেকে একটা আপেল পড়তে দেখলেন, দেখে হঠাৎ তাঁর মনে হল, যে শক্তি আপেলকে মাটিতে নামিয়ে আনছে, সেই একই শক্তিতে পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চলছে। সেখান থেকে নিউটনের কয়েকটা সিদ্ধান্ত বেরিয়ে এলো। কিন্তু এখানে তাও নিউটনের মনের মধ্যে জিনিসটা ঘুরছিল, উনি একটা সমাধান খুঁজছিলেন। এগুলো কেন হয়, কিভাবে হয়?

ঈশ্বর, ঈশ্বরের শক্তি ও সৃষ্টি

আমরা হিন্দুরা মানি, ঈশ্বর যখন সৃষ্টি করেন তখন তিনি কোন এলেমেলো ভাবে উদ্ভট কিছু সৃষ্টি করেন না। যিনি অনন্ত, যিনি সচ্চিদানন্দ রূপে বিরাজ করে আছেন, কেন আর কোন কারণে তাঁর ইচ্ছা হল সৃষ্টি হোক, আমরা জানি না। কিন্তু যখন তাঁর ইচ্ছে হল সৃষ্টি হোক, এটাই হল শক্তি। এই শক্তি, যেটা তাঁরই প্রকৃতি, যেটা আগে থাকেই আছে, কারণ ঈশ্বর আর প্রকৃতি এক, সেই প্রকৃতির মধ্যে যখন একটা ইচ্ছা এসে পড়ে, ওটা যেন একটা ডিম যেন ফার্টিলাইজ হয়ে গেল। প্রকৃতি এবার ফার্টিলাইজ হয়ে গেল, প্রকৃতি থেকে এবার এক এক করে সব বেরোতে শুরু হল। পুরাণে এর অনেক রকম বর্ণনা আছে। প্রকৃতিরূপী ডিম হাজার হাজার বছর ধরে পড়েছিল। কিন্তু নাসদীয় সূক্ত অন্য রকম বলছে, নাসদীয় সূক্ত পড়লে মনে হয় না যে এত কিছু ছিল। কিন্তু সেই সময় ওখানে কেউ ছিল না বলে আমাদের জানার কোন পথ নেই যে, কতদিন সৃষ্টি অব্যক্ত অবস্থায় ছিল। সৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর এসে গেলেন ঈশ্বর, ঈশ্বরের শক্তি আর সৃষ্টি। এই তিনটে ঈশ্বর, ঈশ্বরের শক্তি আর সৃষ্টি ছিল এক, হয়ে গেল পুরো আলাদা। কিন্তু ঈশ্বর ছিলেন, এই কথা বলা যায় না, কারণ দ্রষ্টা আর দৃশ্য এই ভেদ তখন ছিল না। সেইজন্য ঋষিরা ওটাকে নিয়ে আলোচনা করেন না। কিন্তু ঈশ্বর, 'যিনি আমি সৃষ্টি করব', এই ইচ্ছা করেন, এবার তিনি এমন রূপ ধারণ করে নিলেন, যেটা যোগীরা চাইলে দেখতে পারেন। এর আগে শুধু নির্গুণ নিরাকার, নির্গুণ নিরাকারের পরে আর তিনি নির্গুণ নিরাকার থাকবেন না, কারণ তাঁর মধ্যে ইচ্ছাশক্তিটা এসে গেছে। তখন তিনি কি করেন? যেখানে তিনি বীজ প্রদান করলেন, যার

থেকে প্রকৃতি জেগে উঠল, সেখানে তিনি গিয়ে প্রবেশ করে যান। এরপর সৃষ্টি শুরু হয়, সৃষ্টিতে প্রথম আসেন ব্রহ্মা। এই বর্ণনা পুরাণের, আমরা এর বেশি আর ভিতরে যাচ্ছি না।

গুরুত্বপূর্ণ হল, ঈশ্বর আর ঈশ্বরের যে শক্তি, এই জায়গাটাকে আমরা প্রকৃতি রূপে বলছি। সৃষ্টি এগোবার সময় কোন এলোপাতাড়ি চলে না, একটা নিয়মকে সব সময় মেনে চলে, যে নিয়ম চিরন্তন। এই সৃষ্টির আগে আরেক সৃষ্টি ছিল, সেই সৃষ্টির আগে আরেকটা সৃষ্টি ছিল। তিনটে জিনিস তাই সব সময় চিরন্তন, ঈশ্বর, ঈশ্বরের শক্তি আর ঈশ্বরের সৃষ্টি, অর্থাৎ এই জগৎ। সৃষ্টি কখন হয়েছিল, কিভাবে হয়েছিল, এই প্রশ্নগুলো হয় না। ঈশ্বরকে তাই বলা হয় স্বয়ম্ভু, তিনি নিজেই হয়ে আছেন, তিনি অনন্ত, তিনি চিরন্তন। তাঁর শক্তি চিরন্তন। আর সেই শক্তি যখন সৃষ্টি রূপে আসে, তখন সৃষ্টি কখন দেখা যায় আবার কখন দেখা যায় না। কিন্তু এখন যে সৃষ্টি দেখা যাচ্ছে, এর আগেও এই সৃষ্টিটা ছিল। আমরা বলছি, এই সৃষ্টিটা অন্য কল্পে ছিল। কল্প মানে আগের আগের সৃষ্টি। আগের আগের সৃষ্টিতে যে নিয়ম ছিল, সেই নিয়মকে পরের পরের সৃষ্টিও মেনে চলে। যেমন আগের কল্পে যে সাপ ছিল, এখন যেভাবে সাপ চলে তখনও সেইভাবে চলত। তখনও সাপ বিষ ঢালত। যদি কেউ কল্পনা করে, আগের আগের কোন কল্প ছিল যখন সাপেরা মানুষের মত চলত, অথচ তাদের সাপ বলা হয়, এটা কল্পানতেই হতে পারে, বাস্তবে কখনই তা হবে না। আমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মত কোটি কোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আছে, কিন্তু এই প্যাটার্নের যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, এখানে মানুষের যে রকম স্বভাব এখন আছে, আগের আগের কল্পেও এই রকমই ছিল। তখনও পুরুষরা এই রকমই ছিল, নারীরাও এই রকমই ছিল, আচার্যরাও এভাবেই শাস্ত্র অধ্যয়ন করাতেন। স্বামীজী এক জায়গায় শিষ্যদের বলছেন, এভাবে আমি কত বার তোমাদের পড়িয়েছি, তোমরাও এই কথাগুলোই শুনেছিলে। হয়ত সরাসরি এই শিষ্যরাই ছিল না, কিন্তু এই cycleটা চলতেই থাকে।

যতবার বলা হচ্ছে, এই cycleটা চলতেই থাকে, তার মানে এর একটা প্যাটার্ন আছে, আর যে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের খবর আমরা জানি না, সেখানেও অবশ্যই কোন না কোন একটা প্যাটার্ন থাকতে হবে। জগতে আমরা যা কিছু দেখছি, তার নিজস্ব একটা বিধান আছে। স্বপ্নে যেমন আমরা উল্টোপাল্টা জিনিস দেখি, কল্পনায় যেমন আমরা এলেমেলো জিনিস বানিয়ে নিই, জগতের কোন কিছুই সেইভাবে এলেমেলো ও উল্টোপাল্টা চলে না। সমস্যা হল, আমরা সমস্ত বিধানগুলি জানি না। আগুনে জল ঢেলে দিলে আগুন নিভে যাবে, পেট্রলে আগুন লাগলে জল ঢাললে আরও বেশি করে আগুন জ্বলে উঠবে। কারণ আগুনে জল ঢাললে জল আগুনের অক্সিজেন সরবরাহটা কেটে দেয়, পেট্রলে জল ঢাললে, পেট্রল হাল্কা বলে জলের উপরে ভেসে ওঠে বলে অক্সিজেন বেশি পেয়ে যায় বলে আরও জ্বলে ওঠে। একই জল এক জায়গায় আগুনকে নিভিয়ে দিচ্ছে, অন্য জায়গায় আগুনকে আরও তীব্র করে দিচ্ছে। হাল্কা একটু বাতাস লাগলে প্রদীপের আলো নিভে যাবে, বাতাস জোরে চললে দাবানলের আগুন আরও বাড়িয়ে দেবে। প্রদীপের আলোর তাপমাত্রা অনেক কম থাকে, একটু বাতাস চললে প্রদীপের তাপটাকে টেনে নিয়ে চলে যায় বলে প্রদীপের আর জ্বলার ক্ষমতা থাকে না। যখন বড় আগুন জ্বলে, বাতাস যত জোরে চলবে অক্সিজেন বেশি পাবে, আগুনও তত জোরে জ্বলবে।

ঋতম্

ঠাকুর বলছেন, এটা থেকে সেটা হবে, সেটা থেকে এটা হবে বলা যায় না। কারণ যে কোন জিনিসে এত রকমের প্রপার্টি আছে যে আমরা তার অনেক কিছুই জানি না। আমরা অনেক সময় বলি, দেখো কেমন পাগলের মত আচরণ করছে। কোন পাগলামি নেই, তার এত চারিত্রিক গুণ আছে, কখন তার এই গুণটা বেরোচ্ছে, কখন ওই গুণটা বেরোচ্ছে। ঈশ্বর, ঈশ্বরের শক্তি আর ঈশ্বরের এই বিধানগুলো, এই বিধানগুলিকে বেদে একত্রে বলা হয় ঋতম্। এই ঋতমকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না। অন্য দিক দিয়ে বলা যেতে পারে যে, ঋতমকে অতিক্রম করা যায়, কারণ ঋতম্ এই জগতের জিনিস, ঋতম্ ঈশ্বরের সাথে থাকে না। ঈশ্বরকে কেই অতিক্রম করতে পারে না, ঈশ্বরের শক্তিকেও কেউ অতিক্রম করতে পারবে না, কিন্তু ঋতমকে অতিক্রম করা যায়। ঋতমকে আবার অনেক ক্ষেত্রে সত্যের অর্থেও নেওয়া হয়। ঋতম্ হল এই জগতের যত নিয়ম আছে, সব নিয়মের সমষ্টি। স্বামীজী ঠাকুরের স্তবে ঠাকুরকে বলছেন, *ওঁ হ্রীং ঋতম্*। ওঁম্ ঠাকুরের প্রতীক, হ্রীং সেই শক্তির প্রতীক, আর ঋতম্ হল যে নিয়মগুলির দ্বারা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চলছে।

যত নিয়ম আছে, কোথাও কিন্তু এক ধরণের নিয়ম নেই। যে নিয়ম পদার্থ সমূহকে চালিত করছে, তাকে আমরা পদার্থ বিজ্ঞান বা ফিজিক্স বলছি, যে নিয়মের দ্বারা রাসায়নিক উপাদানগুলো চলছে, তাকে আমরা রসায়ন বিদ্যা বা কেমেস্ট্রি বলছি, যে নিয়ম ধর্ম জীবনকে চালাচ্ছে তাকে আমরা অধ্যাত্ম বিজ্ঞান বলছি। একটা জিনিস উপরে যাবে, একটা জিনিস নীচে নেমে আসবে, এগুলো হল বস্তুর স্বাভাবিকতা, এটা বস্তুর স্বভাব। আমরা সেই স্বভাবকে এই বিধান, সেই বিধান-রূপে নানা রকম নাম দিয়ে দিই। এই নিয়ম গুলিকে যিনি বা যাঁরা আবিষ্কার করেন, আমরা তাঁদের বলছি বৈজ্ঞানিক। আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের যে নিয়ম বা বিধান আছে, সেগুলোকে যখন কেউ বার করছেন, তাঁকে আমরা বলছি ঋষি। স্বামীজী বলছেন, যদি কেউ মনে করে সে একটা নূতন কিছু বার করল, টেকনলজির দিক থেকে ঠিক আছে। বাগানের মালি মাটি নিড়ানোর যে খুরপি ব্যবহার করে, সেই খুরপিই কত রকমের হয়। মালি তার প্রয়োজন অনুযায়ী খুরপির আকার দেবে, কিন্তু তার বেসিক প্রপার্টি এক থাকবে। সমস্ত জ্ঞানরাশির যে সমষ্টি, জ্ঞান সমূহ হল ঈশ্বরের। মানুষ যদি নিজেকে শুদ্ধ পবিত্র করে নিতে পারে তাহলে সেই ওই বিধানকে ধরে ফেলতে পারে, আমরা তখন সেই ব্যক্তির পূজা করি, তাঁকে সম্মান জানাই। স্বামীজী এটাই বলছেন, মানুষ যতক্ষণ বর্তমান স্তর থেকে অন্য একটা উচ্চস্তরে না পোঁছাচ্ছে ততক্ষণ সে এই নিয়মগুলিকে ধরতে পারবে না। স্কুল কলেজে আমরা যা কিছু পড়াশোনা করেছি, তার বেশির ভাগ জিনিস আমরা তখন বুঝতে পারতাম না, অনেক কিছু ধরতে পারতাম না। তার কারণ আমাদের মন তখনও ওই স্তরে পৌছাতে পারেনি। কিন্তু একটু চেষ্টা করে, মনকে একাগ্র করে মনটাকে যদি একটু উঁচুতে নিয়ে যাই, তখন জিনিসটাকে ধরে ফেলব। শুধু তাই না, যদি লেগে থাকে তাহলে সে আরও নূতন নূতন জিনিস ধরতে পারবে।

স্বামীজী বলছেন, Only, when it is a spiritual truth he brings, we call him a prophet; and when it is on the physical plane, we call him a scientific man, and we attribute more importance to the former, although the source of all truth is one. (*কেবল যদি তিনি আধ্যাত্মিক সত্য আবিষ্কার করেন, আমরা তাঁকে ঋষি বা অবতার বলি; আর যখন সেটা জড়জগতের কোন সত্য হয়, তখন তাঁকে বৈজ্ঞানিক বলি। যদিও সকল সত্যের মূল সেই এক ব্রহ্ম, তথাপি আমরা প্রথমোক্ত শ্রেণীকে উচ্চতম আসন দিয়ে থাকি।*) যখন কেউ কোন আধ্যাত্মিক সত্যকে নিয়ে আসছেন, তাঁকে আমরা ঋষি বলছি, আর জাগতিক ক্ষেত্রে কোন সত্যকে নিয়ে এলে আমরা তাঁকে বৈজ্ঞানিক বলছি। আমরা সাধারণ ভাবে ঋষি বা প্রফেটকে সম্মান করি, কিন্তু অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের যে নানা রকমের বিধান রয়েছে আর জাগতিক ক্ষেত্রে যে বিধানগুলো রয়েছে, সব জ্ঞানের উৎস কিন্তু এক। জাগতিক স্তরে ঋতম্ আর আধ্যাত্মিক স্তরে ঈশ্বর নিজে। এই ঋতমকেই বৌদ্ধরা ধর্ম বলে। স্বামীজী বলছেন, সত্যি কথা বলতে বিজ্ঞান আর ধর্ম এই দুটোর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। কারণ দুটোর উৎস এক, সেই ঈশ্বর, exploration of knowledge world। এরপর স্বামীজী শঙ্করাচার্যকে নিয়ে বলছেন।

শঙ্করাচার্য ও রামানুজের মতের পার্থক্য

শঙ্করাচার্যকে নিয়ে স্বামীজী যে কথা বলছেন, এগুলোর উপর আমরা আগে অনেকবার আলোচনা করেছি। শঙ্করাচার্যের কাছে ঈশ্বর বলতে যে শেষ কথা, ultimate reality হলেন ব্রহ্ম, তিনি হলেন জ্ঞান, সচ্চিদানন্দের চৈতন্য। বলছেন, Shankara says, Brahman is the essence, the reality of all knowledge, এই টপিকটা ঘুরে ঘুরে আসবে। আমরা এই কলমকে জানছি, আচার্য শঙ্করের বক্তব্য হল, আমরা আসলে জানছি ব্রহ্মকে। কারণ জ্ঞান মানেই ব্রহ্ম, যেখানেই জ্ঞান সেখানেই আমরা ব্রহ্মকে দেখছি। কিন্তু তার সাথে আমরা কোথাও ব্রহ্মকে একটা conditioning করে দিচ্ছি। সেই conditioningটাই হল নাম-রূপের condition। নাম-রূপে জড়িয়ে আছে বলে আমরা এই কলমকে দেখছি। সমুদ্রে অনবরত ঢেউ উঠছে, সমুদ্রের ঢেউ যখন দেখছি আসলে আমরা সমুদ্রকেই দেখছি। কিন্তু আমাদের দৃষ্টি ঢেউএর উপর পড়ে আছে বলে আমরা বলছি, এই ঢেউ বড়, ওই ঢেউটা ছোট। বলছেন, and that all manifestations as knower, knowing, and known are mere imaginings in Brahman. (*শঙ্কর বলেন – ব্রহ্ম সর্বপ্রকার জ্ঞানের সার –তত্ত্বস্বরূপ; আর জ্ঞাতা-জ্ঞান-জ্ঞেয়রূপ যে অভিব্যক্তি, তা ব্রহ্মে কাল্পনিক ভেদমাত্র।*)

আমরা যখনই কোন জিনিসকে জানছি, কোন কিছুকে দেখছি, কোন কিছুর ব্যাপারে শুনছি, তখন প্রত্যেক ক্ষেত্রে ধ্যাতা, ধেয় ও ধ্যান এই তিনটে জিনিস এসে যাচ্ছে, এটাই মায়া; এটাই কল্পনা, এর স্রষ্টা হল মন। আসলে রয়েছেন সেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। কিন্তু আমাদের মন ওই একমেদ্বিতীয়মকে তিনটে রূপে নিয়ে আসে, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান রূপে। জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান রূপে এসে যেটা জানছি তখন সেটা ব্রহ্মজ্ঞান হবে না, আত্মজ্ঞান হবে না, তখন ওটাই বস্তুজ্ঞান হয়ে যাবে। ঈশ্বর জ্ঞান বলতে আমরা যে অবস্থার কথা মনে করি, এটাও কিন্তু বস্তুজ্ঞান। কারণ তখন আমার এই বোধ আছে যে, আমি দেখছি। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য অধ্যয়নের সময় বা গীতার ভাষ্যেও দেখা যাবে আচার্য শঙ্কর এই জিনিসটাকে বার বার বলবেন, যেখানেই জ্ঞান সেটাই চৈতন্যের মহাসমুদ্র, ওই চৈতন্যের মহাসমুদ্রই ব্রহ্ম। ওর উপর যে ঢেউ, ওই ঢেউ যেন সেখানে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানের একটা বিভাজন সৃষ্টি করে দেয়।

এখানে এসে রামানুজের মত পাল্টে যায়, স্বামীজী এবার রামানুজকে নিয়ে বলছেন, Ramanuja attributes consciousness to God. (*রামানুজ ব্রহ্মে জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন।*) এর উপর আমরা আগেও আলোচনা করেছি, রামানুজের মতে এই জ্ঞান ভগবানের গুণ, কিন্তু আচার্য শঙ্কর বলছেন, জ্ঞান এটাই ভগবান নিজে। এই জিনিসটাকে ধারণা করা খুব মুশকিল। লাল গোলাপ ফুল, গোলাপ ফুলের লাল রঙকে আমরা সরাতে পারব না। এখানে দুটো জিনিস, গোলাপ ফুল অনেক রকমের হয়, তার মধ্যে লাল গোলাপও আছে। কিন্তু ওই লাল গোলাপের লাল রঙকে কোন দিন সরানো যাবে না, কারণ ওটাই তার স্বাতন্ত্র। তাহলে ওই গোলাপের গুণ লাল। রামানুজ বলছেন, ঈশ্বরের গুণ হল জ্ঞান। আচার্য শঙ্কর বলছেন, না, এই লাল সেই লাল নয়, এই লাল হল, একটা স্ফটিকের পাশে যদি একটা লাল ফুল রেখে দেওয়া হয়, স্ফটিককে দেখাবে লাল রঙের। স্ফটিকের এই লালকে কিন্তু সরিয়ে দেওয়া যায়। লাল ফুল সরিয়ে দিলে স্ফটিকের কোন রঙ থাকবে না। আবার অপরাজিতা ফুল রেখে দিলে স্ফটিক এবার নীল রঙের দেখাবে। আমাদের মনে প্রশ্ন হতে পারে, আমরা কি করে জানব আচার্য শঙ্কর ঠিক নাকি রামানুজ ঠিক। কিন্তু আচার্য শঙ্কর যুক্ত দিয়ে, ঋষিদের উপলব্ধ জ্ঞানকে আধার করে একটা বলিষ্ঠ জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলছেন, এটাই সত্য। আর আমাদের ঠাকুরও এই মত দিয়েছেন, স্বামীজীও এই মত দিচ্ছেন, সেইজন্য আমাদের কাছে এটাই মত। কি মত? শুদ্ধ জ্ঞানই ব্রহ্ম।

সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্

আমরা অতি সাধারণ মানুষ, আমরা ওই ভাব নিয়ে থাকতে পারি না। আমাদের দরকার এমন একজনের, আমরা যাঁর কাছে আশ্রয় নেব, যিনি আমাদের কৃপা করবেন, করুণা করবেন, যাঁর কাহিনী পড়ে আমাদের হৃদয় বিগলিত হয়ে যাবে। সেইজন্য এলেন সেই ঈশ্বর, যিনি কৃপাময়, করুণাময়, তাঁর জ্ঞানবান, তাঁর অনন্ত গুণ রয়েছে, তাই তিনি গুণনিধি। স্বামীজী এটাকে পরিষ্কার করে দিচ্ছেন, কিছু মানুষ আছে যাদের ভিতর ভক্তির ভাব আছে, যাদের ভিতর প্রচুর ইমোশান আছে আবার কিছু লোক আছে যাদের মন সরাসরি সত্যের দিকে যায়, কোন ডান দিক বাম দিক যাবে না। তাদের কাছে ব্রহ্ম মানে *সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্ ব্রহ্ম*। রামানুজের কাছে এটা অন্য রকম। স্বামীজী বলছেন, the real monists attribute nothing, not even existence in any meaning that we can attach to it. (*খাঁটি অদ্বৈতবাদীরা ব্রহ্মে কোন গুণই স্বীকার করেন না –এমন-কি সত্তা পর্যন্ত নয়, সত্তা বলতে আমরা যাই কেন বুঝি না।*) জ্ঞানের কথা ছেড়ে দিন, তিনি আছেন, এই জিনিসটাও তাঁর উপর লাগানো যায় না। কারণ যেটা সৎ, অস্তি অর্থাৎ আছে, সেটাই ঈশ্বর। সেইজন্য শঙ্করাচার্য দেখাচ্ছেন, যেটা সৎ সেটাই চিৎ, যেটা চিৎ সেটাই আনন্দ, একসাথে আমরা বলছি সচ্চিদানন্দ। তাঁর কোন গুণ নেই, এমনকি তিনি আছেন, এটাও বলা যায় না। কারণ তিনি আছেন বলতে গেলেই জ্ঞাতা, জ্ঞেয় আর জ্ঞানের তফাৎ এসে যাবে। ঠাকুরও তো তাহলে বলছেন, ঈশ্বর আছেন। ঠাকুর বলছেন ঠিকই, কিন্তু ঠাকুর ওখানে অন্য একটা standpoint থেকে বলছেন। যেদিন আমরা গভীরে গিয়ে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অনুসন্ধান করব, সেদিন দেখব যে, তিনি আছেন এটা মুখেও বলা যায় না। ঠাকুরও বলছেন, তিনি আছেন, এই কথা মুখে বলা যায় না। তার মানে ঈশ্বরের ব্যাপারে যেটা মূল জিনিস, ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে, এটাকেও বলা যায় না, আর বাকি জিনিসগুলির তো কোন প্রশ্নই উঠছে না। এটাই ঠিক ঠিক

অদ্বৈত। সেইজন্য গীতা কিংবা কঠোপনিষদে সব কিছু নেতি নেতি করে দিচ্ছেন, এটা নয়, এটা নয়, তখন মনে হয়, আরে এতে তো গোলমাল লেগে যাবে, লোকেরা ভুল ভেবে বলবে, কিছু নেই। তখন বলছেন, না, সব জায়গায় তিনিই আছেন – *সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্*। কারণ যখনই বলা হবে তিনি আছেন, সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের উপর একটা গুণ আরোপ করে দেওয়া হয়ে যাবে। ঈশ্বরের উপর যেমনি গুণ লাগিয়ে দেওয়া হল, তখন আর ওটা অদ্বৈত থাকল না। অনেক সময় মনে হতে পারে, এগুলো বুঝি বাকজাল, শব্দের খেলা, কিন্তু তা না, এটা একেবারে যৌক্তিক জিনিস।

স্বামীজী বলছেন, Ramanuja declares that God is the essence of conscious knowledge. (*রামানুজ বলছেন, আমরা সচরাচর যাকে 'জ্ঞান' বলি, ব্রহ্ম তারই সার-স্বরূপ।*) আমাদের ভিতরে যত জ্ঞান হয়, সব জ্ঞানের আধার হলেন ঈশ্বর। আচার্য শঙ্করের মতে, আমাদের সব জ্ঞানের আধার হলেন সেই ব্রহ্ম। এখানেই তফাৎ হয়ে যাচ্ছে। ঈশ্বর জ্ঞান দিচ্ছেন, তাঁর কৃপাতে জ্ঞান হচ্ছে, কিন্তু আসল যে জ্ঞান, আচার্য শঙ্করের মতে, ওই জ্ঞানটাই শেষ সত্য, সেই জ্ঞানটাই আছে, সেই জ্ঞানই আনন্দ। তার মানে আমরা এই যে কলমটা দেখছি, অদ্বৈত মতে এই কলমটা সেই ব্রহ্ম, যাঁর উপর নাম ও রূপের খেলার জন্য এই কলম রূপে দেখাচ্ছে। রামানুজের মতে, আমাদের এই জ্ঞান ভগবান থেকে আসছে, কারণ ভগবান হলেন সমস্ত জ্ঞানের খনি। Undifferentiated consciousness, when differentiated, becomes the world. (*অব্যক্ত বা সাম্যভাবাপন্ন জ্ঞান –ব্যক্ত বা বৈষম্যাবস্থা-প্রাপ্ত হলেই জগৎপ্রপঞ্চের উৎপত্তি।*) স্বামীজী শঙ্করাচার্যের মত গ্রহণ করে নিজের মত করে বলছেন। সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ যখন খণ্ডিত হয়ে, বিভাজিত হয়ে, বহু হয়ে আমাদের সামনে আসেন, এটাই জগৎ। ঈশ্বর আমাদের কাছে দুই ভাবে আসতে পারেন, ধ্যানের গভীরে অখণ্ড রূপে আর জগৎ রূপে বহু রূপ ধারণ করে। আমরা আগে এর উপর অনেক আলোচনা করে এসেছি।

এই হল জ্ঞানের স্বরূপ, জ্ঞানের স্বরূপকে শঙ্করাচার্য কিভাবে দেখছেন, রামানুজ কিভাবে দেখছেন, আমরা আরও দেখলাম এই দুটোকে নিয়ে স্বামীজী কি ভাবে বলছেন। শঙ্করাচার্যের মতে সমস্ত জ্ঞানের আধার শুদ্ধ ব্রহ্ম, ওই জ্ঞান যখন জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান এই তিনটেতে বিভাজিত হয়ে যায়, তখন জগৎ রূপে আমাদের সামনে আসে। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ বলছেন, সমস্ত জ্ঞান ভগবান থেকে আসে, তিনিই এই জ্ঞান দেন। কেউ বেশি জ্ঞানী, কেউ কম জ্ঞানী, কারণ ভগবান থেকে যেমন আসছে, ভগবানই তাকে এই রকম দিচ্ছেন। ভক্তদের জন্য সগুণ সাকার ঈশ্বর হলেন শেষ কথা, জ্ঞানীদের জন্য নির্গুণ নিরাকার সচ্চিদানন্দই সত্য। এগুলোকে নিয়ে আগেও আমরা অনেকবার আলোচনা করেছি, তবে এগুলো এত কঠিন জিনিস, এতো গভীর তত্ত্ব যে এগুলোকে নিয়ে বারে বারে আলোচনা করা যায়।

কিছুক্ষণের জন্য আমাদের হয়ত মনে হতে পারে, এই যে ব্রহ্ম, এই যে নির্গুণ, সগুণ, এই যে জ্ঞানের আধার ব্রহ্ম, জ্ঞানের আধার ঈশ্বর, এই জিনিসগুলো শঙ্করাচার্য আর রামানুজ অষ্টম শতাব্দী আর একাদশ শতাব্দী এসে আমাদের দিয়ে গেলেন। কিন্তু তাতো নয়, এটা হল আমাদের পূর্বজদের সম্পত্তি। সারা ভারতবর্ষে, বিশেষ করে উত্তর ভারতে পাড়ায় পাড়ায় এই ধরণের ঋষি, এই ধরণের পণ্ডিত ছড়িয়ে ছিলেন, যাঁরা সারাটা জীবন এটাকে নিয়েই ছিলেন, এটাকে নিয়েই চিন্তন করে গেছেন।

গল্পের মাধ্যমে এর একটা খুব সুন্দর উপস্থাপনা করা হয়েছে। আচার্য শঙ্কর জ্ঞান লাভের পর ভাষ্যগুলি রচনা করে দিলেন। এবার তিনি ভাবলেন, আমার এই ভাষ্যের জ্ঞানকে ভারতের সব জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। বেদান্তের প্রধান প্রতিপক্ষ হল মীমাংসকরা, যাদের কর্মকাণ্ডী বলা হয়। তখনকার দিনে কুমারিল ভট্ট ছিলেন সব থেকে নামকরা কর্মকাণ্ডী। কুমারিল ভট্ট বিভিন্ন কারণে অগ্নিতে নিজেকে আহুতি দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে যাচ্ছেন। শঙ্করাচার্য সেই সময় তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হলেন তর্ক করতে। কুমারিল ভট্ট শঙ্করাচার্যকে বলে দিলেন, এইতো দেখছ আমার অবস্থা, এই অবস্থায় আমি আর তোমার সাথে কি তর্ক করতে যাব। এক কাজ কর, তুমি মিথিলায় চলে যাও, সেখানে মণ্ডন মিশ্র আছে, তাকে যদি তুমি হারিয়ে দাও, জানবে তুমি আমাকে হারিয়ে দিয়েছ। কুমারিল ভট্টের কথা মত শঙ্করাচার্য মিথিলার মাহিষ্মতিতে পৌঁছালেন।

সেখানে একজনকে জিজ্ঞেস করছেন, কোন বাড়িটা মণ্ডন মিশ্রের। সে বলে দিল, যে বাড়ির সামনে দেখবে একটা টিয়া আর ময়না বেদ নিয়ে আলোচনা করছে, তর্ক করছে, বুঝবে ওটাই মণ্ডন মিশ্রের বাড়ি।

এটা আমাদের পরম্পরার খুব প্রচলিত একটা কাহিনী, মণ্ডন মিশ্রের বাড়িতে পিঞ্জরাবদ্ধ টিয়া আর ময়না পাখি বেদের মন্ত্র নিয়ে তর্ক করে যাচ্ছে। আজকের দিনে এই কাহিনীর দিকে তাকালে আমাদের নিশ্চ্যই মনে হবে, এই কাহিনী কখনই সত্য হতে পারে না। কিন্তু এই কাহিনীর মাধ্যমে দেখানো হচ্ছে, ওই জায়গার সংস্কৃতি কতটা উন্নত, বিশেষ করে ওই বাড়ির সংস্কৃতি কতটা উন্নত যে, যেখানে বাড়ির পোষা টিয়া পাখি আর ময়না পাখিরাও বেদ নিয়ে আলোচন করছে। আগেকার দিনে একটা জোক ছিল, একজন শেঠজী ব্যবসার জন্য ইংল্যাণ্ডে গেছে। ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরে আসার পর সাংবাদিকরা শেঠজীকে জিজ্ঞেস করছে, বিদেশে আপনার সবচেয়ে অবাক কি লাগল? শেঠজী বলছে, আমার সবচেয়ে অবাক লাগল, ওখানকার ছোট ছোট বাচ্চারাও ইংরাজিতেই কথা বলে। শেঠজী ধরতে পারছে না যে, ইংল্যাণ্ডের ওটাই কালচার, ওই কালচারেই ওরা বড় হচ্ছে। পুরো ভারতবর্ষে এই কালচার ছিল, যেখানে ব্রাহ্মণরা জীবন চালাবার মত দুটো খেয়ে শুধু আলোচনা করে যাচ্ছেন, এই যে চৈতন্য, এই যে জ্ঞান, এটা ঈশ্বরের গুণ নাকি এটা ঈশ্বরের স্বরূপ। অন্য দিকে মীমাংসকরা বলে যাচ্ছেন, যজ্ঞ করে যাও, যজ্ঞ করলেই তোমার স্বর্গপ্রাপ্তি গ্যারান্টি। আরেক দিকে যোগীরা বলে যাচ্ছেন, তপস্যা করতে হবে, শুধু তপস্যা করে শরীরকে একেবারে শুকিয়ে দাও।

ভগবান বুদ্ধের দর্শন

আজ থেকে পঁচিশ'শ বছর আগে এই ভারতবর্ষে আবির্ভাব হল ভগবান বুদ্ধের। নেপালের কপিলাবস্তুতে তিনি জন্ম নিলেন। ছোট থেকে তিনি বাড়িতে যজ্ঞ দেখে এসেছেন, সেখানেও বৈদিক সংস্কৃতির প্রাধান্য চলছে। কিন্তু তাঁর মনে প্রশ্নের পর প্রশ্নের উদয় হচ্ছে। একদিন তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন। বিহার নেপালের সীমানা ধরে তিনি হাঁটতে হাঁটতে পাটনার কাছাকাছি বৈশালীতে এসে হাজির হলেন। সেখানকার রাজা আবার ভগবান বুদ্ধের বাবার বন্ধু, রাজা তাঁকে বোঝাচ্ছেন, তুমি রাজপুত্র এভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ো না। কারুর কোন কথায় কান না দিয়ে তিনি নিজের পথে নেমে গেলেন। কর্মকাণ্ডকে ছেড়েই এসেছেন, এবার তিনি তপস্যা করতে শুরু করলেন। তপস্যা করে দেখছেন, এভাবে হবে না। সেখান থেকে আরেকজন গুরুর কাছে যাচ্ছেন। এই যে সংস্কৃতি, যে সংস্কৃতিতে গুরুরও অভাব নেই, খাওয়ারও অভাব নেই। যদি কেউ বলে আমি ঈশ্বরের নামে ঘর ছাড়লাম, সে খাওয়া পেয়ে যাবে। যদি কেউ বলে আমি ঈশ্বরের সন্ধান করতে চাই, সে গুরু পেয়ে যাবে। তার মানে ঈশ্বরের সন্ধানে কেউ সব কিছু পিছনে ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে এলে, সে অনায়াসে খাওয়া ও গুরু পেয়ে যাবে। ভগবান বুদ্ধ নেমে পড়লেন সেই সন্ধানে, একটা একটা করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছেন, কিন্তু কোনটাই কাজে দিচ্ছে না। শেষে তিনি নিজেই সেই জ্ঞান পেলেন, যে জ্ঞানে এই জ্ঞাতা, জ্ঞেয় আর জ্ঞান এই তিনের বিভাজন নেই।

ভগবান বুদ্ধের জ্ঞান পুরোপুরি উপনিষদের জ্ঞান। উপনিষদের ঋষিরা বন জঙ্গলে থাকতেন, সমাজের সাথে সেভাবে তাঁদের যোগাযোগ ছিল না। সমাজের কিছু কিছু মানুষ তাঁদের কাছে কোন না কোন ভাবে পৌঁছে যেতেন ঠিকই, কিন্তু সঠিক পদ্ধতিতে উপনিষদের শিক্ষা পাওয়া তখন কঠিন ছিল। পরে স্বামীজী যার জন্য বলতে শুরু করলেন বনের বেদান্তকে শহরে নিয়ে আসতে হবে। ভগবান বুদ্ধ হলেন প্রথম, যিনি বেদান্তকে বেদান্ত না বলে বেদান্তের সত্যকে শহরে নিয়ে এলেন। স্বামীজী এবার ভগবান বুদ্ধকে নিয়ে বলছেন।

Buddhism, one of the most philosophical religions in the world, spread all through the populace, the common people of India. (*জগতের উচ্চতম দার্শনিক ধর্মসমূহের অন্যতম বৌদ্ধধর্ম ভারতের আপামর সাধারণ মানুষের ভিতর ছড়িয়ে পড়েছিল।*) যদি আমরা দর্শনের দিকে দিয়ে বিচার করি, যুক্তি, তর্ক, চিন্তা, ভাবনা এগুলো দিয়ে যদি দেখা হয়, তাহলে এই লাইনে মাত্র দুটি ধর্ম পাওয়া যাবে, এক অদ্বৈত বেদান্ত, অন্য দিকে বৌদ্ধ ধর্ম। এই দুটো দর্শন এত পরিষ্কার দর্শন যে, কোন জঞ্জাল নেই, সব আবর্জনাকে দূর করে দিয়েছে। হিন্দু ধর্মের সমস্যা হল, হিন্দুধর্মে যেটাই আসে পাইকারী হারে আসে, খুচরো কিছু এখানে আসে না। যজ্ঞ পাইকারীতে, বেদের মন্ত্র পাইকারীতে, ব্রাহ্মণরা পাইকারীতে,

ঋষিরা পাইকারীতে, স্বর্গ-নরক পাইকারীতে, একটা দুটোর কোন ব্যাপারই নেই, যেটাই আসে পাইকারী হিসাবে আসে। তাই মানুষ ওর মধ্যে হারিয়ে যায়। কেউ যদি একবার কাশী গিয়ে বলে আমি স্বর্গে যেতে চাই, তার জন্য আমাকে কি যজ্ঞ করতে হবে বলুন? প্রথমেই হাজার খানেক ব্রাহ্মণ এসে যাবে, এদের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ বাছতেই তার জীবন বেরিয়ে যাবে। তারপর কত রকম স্বর্গ আছে, আর কত প্রকার নরক আছে তার যে লম্বা লিস্ট দেবে তাতেই সে ঘাবড়ে যাবে। এরপরেও আছে, একটা স্বর্গে যাওয়ার জন্য যজ্ঞের যে বর্ণনা দেবে, তার উপকরণের যে তালিকা দেবে, শেষে দেখা যাবে যজ্ঞের বর্ণনা শুনতে শুনতে আর উপকরণ জোগাড় করতে করতে স্বর্গে যাওয়ার ইচ্ছাটাই মাঝখান থেকে চলে যাবে। ফলে না হবে তার যজ্ঞ, না হবে তার স্বর্গপ্রাপ্তি। হিন্দু ধর্মের সমস্যা হল, problem of excesiveness। হিন্দু ধর্মে যেটাই আছে সেটা এতো বেশি পরিমাণে রয়েছে যে, সেটাতেই মানুষ হারিয়ে যাবে।

ভগবান বুদ্ধ এসে ধর্মের সব কিছুকে কেটে ছেঁটে ফেলে দিয়ে মূল জিনিসটাকে শুধু সামনে রেখে দিলেন। সেইজন্য বৌদ্ধ ধর্ম খুব সহজ আর ধর্মের মধ্যে একটা সৌন্দর্য বোধের আস্বাদ পাওয়া যায়। ভগবান বুদ্ধ চারটে সত্যকে নিয়ে এলেন, আটটা পথ বলে দিলেন, ধর্মচক্রকে ব্যাখ্যা করে দিলেন, আর সবটাই সহজ ভাবে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখলেন। ভগবান বুদ্ধ আলাদা করে কোন দর্শন দেয়ে যাননি, কিন্তু পরে তাঁর শিষ্যরা ভগবান বুদ্ধের জীবন ও বাণী থেকে তাঁদের একটা নিজস্ব দর্শনকে বার করে এনে জগতের সামনে নিয়ে এলেন। যাঁরাই দর্শন অধ্যয়ন করেন, তাঁদের কাছে বৌদ্ধ ধর্মের দর্শন খুবই মর্মস্পর্শি। কিন্তু আচার্য শঙ্কর যেদিন অদ্বৈত বেদান্তকে নিয়ে এলেন, সেদিন থেকে বিভিন্ন কারণে তিনি বৌদ্ধ ধর্মকে একেবারে উপড়ে দিলেন। আচার্যের দর্শনের সামনে বৌদ্ধরা আর দাঁড়াতে পারলেন না। বেদান্তের যুক্তিগুলো অনেক বেশি সূক্ষ্ম। স্বামীজী এসেছিলেন বলে আজকে আমরা বেদান্ত অধ্যয়ন করার একটু সুযোগ পাচ্ছি, বুঝতে পারছি। স্বামীজী এসে বেদান্তের উচ্চতত্ত্ব-গুলি আমাদের মত করে প্রাঞ্জল ভাবে বুঝিয়ে না দিলে বেদান্ত বোঝা সম্ভব ছিল না। যার জন্য আমেরিকাতে এখনও বেদান্ত কিছুই প্রভাব ফেলতে পারতে পারছে না। আমেরিকাতে এখনও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব বেশি, কারণ বৌদ্ধ ধর্মের একটা appealing আছে, একটা simplicity রয়েছে। অন্য দিকে বেদান্তের যুক্তিতর্ক অনেক গভীরে চলে, গভীর জিনিসকে সাধারণ মানুষ নিতে পারে না। শঙ্করাচার্যকে নেওয়া তাই সহজ নয়। অনেক আগেকার বড় বড় মহারাজরাদের কাছ থেকে শঙ্করাচার্যের ভাষ্যের উপর কিছু জিনিস পরিষ্কার করতে চাইলে তাঁরাও বলতেন, দেখো ভাই শঙ্করাচার্যকে তুমি এখন বুঝতে পারবে না। শঙ্করাচার্যকে বোঝার জন্য মানুষকে আগে আধ্যাত্মিকতায় উন্নত হতে হয়। আধ্যাত্মিকতার জন্য বিশেষ করে অদ্বৈত বেদান্তকে বোঝার জন্য সূক্ষ্ম বুদ্ধির দরকার, ওই সূক্ষ্ম বুদ্ধি যদি বিকশিত না হয়ে থাকে, রামানুজকে বুঝে নিতে পারবে, ভগবান বুদ্ধকেও বুঝতে পারবে কিন্তু শঙ্করাচার্যকে সে বুঝতে পারবে না।

স্বামীজী বলছেন, যত অবতার এসেছেন, তার মধ্যে ভগবান বুদ্ধ একমাত্র যিনি অনেক দিন বেঁচে ছিলেন। বৌদ্ধ ধর্ম সারা ভারতে ছেয়ে গেল, আর সব রকম মানুষের মধ্য থেকে সন্ন্যাসী হতে শুরু হয়ে গেল। বড় বড় ব্যবসায়ী, রাজকুমার, তৎকালীন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ থেকে সাধারণ মানুষ, পরে মেয়েদের থেকেও সন্ন্যাস হওয়ার ধুম লেগে গেল। ভগবান বুদ্ধের জীবদ্দশায় হাজার হাজার মানুষ সন্ন্যাসী হতে লাগল। একটা সময় দেখা যেত, তিরিশ হাজার, চল্লিশ হাজার সন্ন্যাসী ভগবান বুদ্ধের সাথে সাথে হাঁটছেন। What a wonderful culture there must have been among the Aryans twenty-five hundred years ago, to be able to grasp ideas! (*ভেবে দেখ দেখি, আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে আর্যদের সভ্যতা ও শিক্ষা কি অদ্ভূত ছিল, যাতে তারা ঐরূপ উচ্চ উচ্চ ভাব ধারণা করতে পেরেছিল।*) এই যে স্বামীজী বলছেন, একবার ভেবে দেখ, আজ থেকে পঁচিশ হাজার বছর আগে ভারতবর্ষে, আমরা ভারতবর্ষ বলতে উত্তর ভারতের কথাই বলছি, সেই সময় সেখানে কি সাংঘাতিক উন্নত সংস্কৃতির চর্চা ছিল, শিক্ষার মান কত উন্নত ছিল, আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি কত দূর উন্নত করেছিল যে, এই উচ্চতম আইডিয়াসগুলিকে তারা গ্রহণ করে নিতে পারছিল। শুধু উত্তর ভারতই পুরোপুরি ঠিক না, মহাবীর জৈন, ভগবান বুদ্ধ উত্তর ভারতেই ছিলেন, সেইজন্য উত্তর ভারতের কথা আমরা বলছি। বেদান্তকে না হয় সাধারণ লোকেরা জানত না, বুঝতে পারত না, কিন্তু তারা ভগবান বুদ্ধের আইডিয়াস গুলিকে নিয়েছে। ভগবান বুদ্ধ যখন সাধারণ মানুষদের কাছে এই আইডিয়াসকে নিয়ে বলছেন, তারা সেটাকে ধরতে পারছে, তারিফ করছে, তাদের হৃদয়কে স্পর্শ করছে, মানুষ বৌদ্ধ ধর্মকে মনে-প্রাণে গ্রহণ

করছে। স্বামীজী এটাই বলছেন, What a wonderful culture there must have been। কত উচ্চমানের সংস্কৃতি থাকলে তবে গিয়ে এই জিনিসগুলিকে তারা ধরতে পারছে।

আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে গ্রীক সভ্যতার দর্শন, তাদের মেথডিস্টরা তখন সবে নিজেদের ডিম্বাশয়ে অবস্থান করে আছে। ভগবান বুদ্ধের দুশ বছর পর জুলিয়াস সিজার এসে রোমকে একটা সম্মানজনক জায়গায় নিয়ে গেলেন। ওই সময় ফ্রান্সকে বারবারিয়ান বলা হত, ইংল্যাণ্ডের লোকেরা ওই সময় গাছে গাছে থাকত আর নীল, লাল রঙ দিয়ে মুখ আর শরীরকে রাঙাতো। ভগবান বুদ্ধের পাঁচশ বছর পর যীশু যখন এলেন, রোম তখন পুরো পচনের অবস্থায় চলে গেছে, ব্রিটেন তখনও গভীর অন্ধকারে। আমেরিকা তখনও বিশ্বের মানচিত্রেই আসেনি, আমেরিকা বলে যে কোন দেশ আছে বিশ্বের লোকেরা জানতই না। ইউরোপ আছে, কিন্তু বর্বর অবস্থায়। ইতালিতে কিছুটা সভ্যতার আলো ছিল, কিন্তু সেটাতেও পচন ধরে গিয়েছিল। গ্রীস তত দিনে দর্শন, বিজ্ঞান, গণিতের দিক থেকে এগিয়ে গেছে। আর সেই সময় ভারতে ভগবান বুদ্ধের এই উচ্চমানের আধ্যাত্মিক দর্শনের আবির্ভাব, ভারত সেই দর্শনকে ধারণা করে নিচ্ছে, সেই ধর্মকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করে নিচ্ছে।

আড়াই হাজার বছর পর, স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পর সেই ভারতের আজ কি দুরবস্থা। আজকে আমরা বেদ, গীতা আদি গ্রন্থকে লাল শালু দিয়ে বেঁধে সিংহাসনে রেখে পূজা করি। কারুর একবারও ইচ্ছে করে না বইগুলির পাতা খুলে দেখি এর পাতায় পাতায় কি আছে, যেখানে মানবজাতির শ্রেষ্ঠ দর্শন লিপিবদ্ধ হয়ে আছে, যে দর্শনকে আমাদের পূর্বজরা দিনের পর দিন, মুষ্টিমাত্র খেয়ে সারা জীবন ধরে চর্চা করে গেছেন। এরও পাঁচ থেকে ছয় হাজার বছর আগে আমাদের মেয়েরা যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিদের মত তুখোড় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের সাথে তর্ক যুদ্ধে নামতেন, আধ্যাত্মিক সত্যকে কেন্দ্র করে বাকযুদ্ধ চালিয়ে যেতেন। আজকের হিন্দুরা চারটে ইংরাজী পড়া লোক হিন্দু ধর্মকে নিয়ে যা লিখছে, যা বলছে সেটাকেই আমরা সবাই কোন বিচার-বিবেচনা না করে গোগ্রাসে গলাধঃকরণ করে যাচ্ছি, আর হিন্দুধর্মকে যা নয় তাই বলে গালিগালাজ করছি। কিছু দিন আগে এই ধরণের একজন লোক মহাবীর হনুমানকে নিয়ে কী নোংরা ভাষায়, জঘন্য রকম কথাবার্তা লিখেছে, মনে হবে কোন অশ্লীল উপন্যাস পড়ছি। তাকে যদি বলা হয়, ভাই এই একই জিনিস তুমি ইসলাম আর খ্রীশ্চান ধর্মকে নিয়ে একবারে লিখে দেখ তো। মহাবীর হনুমানকে নিয়ে যে কথা লিখেছ ওদের নামেও একই কথা খাটে, একবার লিখে দেখো তোমার ঘাড়ে কটা মাথা থাকে। আজকে হিন্দুদের উপর অন্য ধর্ম থেকে যত না আক্রমণ আসে, তার চাইতে বেশি আক্রমণ আসে হিন্দুদের কাছ থেকে। যারা নিজেদের মার্কিস্ট বুদ্ধিজীবি বলছে, তারা মেরে যাচ্ছে, যারা নিজেদের লিবারেল বলছে তার হিন্দু ধর্মকে নিয়ে কত কি বলে যাচ্ছে। শুধু মেরেই যাচ্ছে না, নূতন নূতন শব্দ নিয়ে আসছে।

আগে আমরা হিন্দুত্ব বলে কোন শব্দ জানতাম না, হিন্দু শব্দ শুনেছি, এখন হিন্দুত্ব একটা নূতন শব্দ এসেছে, তার সাথে আছে হিন্দু মৌলবাদী। হিন্দু মৌলবাদী কি শব্দ আমরা জানি না। কেউ যদি গীতা থেকে কোন কথা বলে, সে হয়ে যাবে মৌলবাদী। আরেকটা নূতন শব্দ এসেছে, ইণ্ডিয়া ভারসেস ভারত। ইংরাজী নিয়ে যারা পড়াশোনা করেছে তারা ইণ্ডিয়ার, যারা ইংরাজী জানে না তারা ভারতের। যারা ইণ্ডিয়ার লোক তারা ফাইভ স্টার হোটেলে থাকবে, চারটে বিয়ে করবে, দুটো স্ত্রীকে মেরে ফেলবে, কাউকে বিষ খাইয়ে মারবে, কাউকে গলা টিপে মারবে, না মারতে পারলে এর ওর উপর ডিভোর্সের কেস করবে। এগুলো সব ঠিক আছে, এগুলো লিবারেলের মধ্যে পড়ে। কিন্তু কেউ যদি রাম নাম করেছে, সে হয়ে গেল মৌলবাদী, হিন্দুত্ববাদী। যদি কাউকে হিন্দু বলা হয়, তখন সেটা নাকি তার জন্য একটা গালাগাল হয়ে যাবে! কারণ বটতলার উপন্যাস আর টিভি সিরিয়াল দেখে দেখে বুদ্ধি এমন হয়ে গেছে যে, মানুষের মনে ঈশ্বরের কোন ভাব নেই, ঈশ্বরের সাথে কোন সংযোগ নেই। ঈশ্বরের সাথে যে নিজেকে একটু জুড়বে, যার জন্য মনে হবে আমি গর্বিত যে আমি একজন হিন্দু, সেই ভাব বা বুদ্ধি কোনটাই এখন আমাদের নেই। তার বদলে আমরা বলছি, এদেশে জন্ম নিয়ে আমার লজ্জা বোধ হয়, নিজেকে হিন্দু বলতে আমার ঘৃণা বোধ হয়। প্লেনের প্রথম টিকিট পেলেই আমি আমেরিকায় চলে যাব। এখন আমেরিকার যিনি নূতন রাষ্ট্রপতি এসেছেন, তিনি আবার এখন লাথি ঝাঁটা মেরে

সব বিদায় করছেন। এরা গিয়ে হাতে পায়ে ধরছে, আমাকে একটু থাকতে দিন, প্লিজ আমাকে মেরে তাড়াবেন না, কাঙালী ভিখারীর মত অবস্থা এদের। অথচ এরা সবাই পড়াশোনা করা লোক।

কোথায় গেল তোমার সেই শৌর্য। পঁচিশ'শ বছর আগে ভারতের যে সংস্কৃতি ছিল, স্বামীজী সেই সংস্কৃতিকে বলছেন, what a culture। আজ স্বামীজীর দেববাণী নিয়ে আমাদের যে আলোচনা চলছে এটাকে আমাদের বুঝতে এখন দম বেরিয়ে যাচ্ছে। অথচ আমাদের পূর্বপুরুষরা এই নিয়েই দিনরাত চর্চা করতেন, পড়াশোনা করতেন। যে ভাবকে মণ্ডন মিশ্রের কাহিনীতে খুব সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, টিয়া আর ময়না বেদের মন্ত্র নিয়ে আলোচনা করছে। আমরা আমাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতিকে আজ কোথায় নামিয়ে এনেছি! আমরা মেকলেকে গালাগাল দিচ্ছি, বিদেশীদের গালাগাল দিচ্ছি। ভুলে যাচ্ছি ইংরেজরা এসেছিল বলে আমরা তাও কিছুটা লেখাপড়া শিখতে পেরেছি, মুসলমানরা এসেছিল বলে আমরা সেলাই করা জামা কাপড় পরতে পারছি। কিন্তু আধ্যাত্মিক কালচার তখন একমাত্র এই তিনটি দেশেই ছিল, ইরানে ছিল, চীনে ছিল আর ভারতে ছিল। সেই কালচারকে আমরা কোথায় নামিয়ে এনেছি! আমরা কেউ ভেবে দেখছি না যে, এটা আমাদের নিজস্ব সম্পত্তি, আমাদের পূর্বজরা আমাদের জন্য দিয়ে গেছেন, আজ সময় এসেছে আমাদের এই সম্পত্তি ভাল করে বুঝে নেওয়ার।

স্বামীজী বিদেশীদের সামনে তাই বলছেন, আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে ভারতের সংস্কৃতি এত উন্নত ছিল যে, এই উচ্চমানের সত্যকে সাধারণ মানুষ বুদ্ধি দিয়ে ধরে নিচ্ছে। বেদান্ত তখন জঙ্গলে, হিমালয়ের গুহায় ছিল, কারণ তখন বেদান্ত কেউ বুঝতেই পারত না। স্বামীজী আসার পর লোকেরা এখন বেদান্তকে বোঝার চেষ্টা করছে, না বুঝলেও অন্তত মুখে বলছে আর ভাণ করছে যেন সব বুঝে গেছে, কিছু তো করছে। ভগবান বুদ্ধের সময় ভারতে বৈদিক প্রভাব ছিল, কর্মকাণ্ডের প্রভাব ছিল, সেটাকে ছেড়ে লোকেরা ভগবান বুদ্ধের শরণাপন্ন হয়ে বলছে বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘম্ শরণং গচ্ছামি। সেখানে থেকে স্বামীজী আবার বুদ্ধকে নিয়েই বলছেন।

ভগবান বুদ্ধ ও জাতিপ্রথা

ভগবান বুদ্ধের কথা বলতে গিয়ে স্বামীজী এবার জাতিপ্রথায় ঢুকছেন, বলছেন, Buddha was the only great Indian philosopher who would not recognize caste, and not one of his followers remains in India. (*ভারতীয় শ্রেষ্ঠ দার্শনিকগণের মধ্যে একমাত্র বুদ্ধই জাতিভেদ স্বীকার করেননি, আর এখন ভারতের তাঁর একটিও অনুগামী দেখতে পাওয়া যায় না।*) স্বামীজী বলছেন ভারতে একমাত্র ভগবান বুদ্ধই জাতিপ্রথা মানতেন না। কিন্তু এটা পুরোপুরি ঠিক না, মহাবীর জৈনও মানতেন না। অন্য দিকে শিখ ধর্মও জাতিপ্রথাকে মানে না। শিখ ধর্মের দর্শনের দিক দিয়ে যদি যাওয়া হয়, তাহলেও মহাবীর জৈনকে নাকচ করা যায় না। কিন্তু মহাবীর জৈনের সম্বন্ধে আমেরিকানরা সেভাবে জানত না। ওদের কাছে এগুলো মোটামুটি সমান, আর ধর্মের যে মূল কিছু সিদ্ধান্ত, সেখানেও বৌদ্ধ ধর্মে আর জৈন ধর্মে অনেক মিল পাওয়া যায়।

স্বামীজীর এই বাক্যকে দুটো ভাগে নেওয়া যায়। প্রথম ভাগে বলছেন, ভারতবর্ষে যে কজন মহাপুরুষ এসেছেন, তাঁরা সবাই জাতিপ্রথাকে মেনেছেন, একমাত্র ভগবান বুদ্ধ মানেননি। পরের ভাগে বলছেন, and not one of his followers remains in India, এখানেও মনে হয় স্বামীজী যেন একটু বেশি করে বলছেন, এটা idiomatic use। বক্তব্য হল ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব নেই। স্বামীজীর সময়ে সত্যিই ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম বলে কিছু ছিল না। পরে বি আর আম্বেদকর হিন্দু ধর্মের জাতিপ্রথার বিরুদ্ধে গিয়ে বৌদ্ধ ধর্মের অনেক প্রশংসা করতে শুরু করলেন এবং তাঁর প্রভাবে বর্তমান কালে যাদের দলিত বলা হয়, তারা অনেকেই বৌদ্ধ হয়ে গেল। এর বাইরেও কিছু কিছু বড় বড় পণ্ডিতরা, যাঁদের মধ্যে রাহুল সাংস্কৃত্যায়ন ছিলেন, এনাদের প্রভাবেও অনেকে বৌদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু স্বামীজীর সময় বৌদ্ধ ধর্ম ভারতে একেবারে শেষ অবস্থায় চলে গিয়েছিল। এখন যারা বৌদ্ধ ধর্মে আছে, তারা নামেই বৌদ্ধ বাকি সবই হিন্দুদের মত। দর্শনের দিক দিয়ে দেখতে গেলে ভগবান বুদ্ধই প্রথম, যাঁর কাছে জাতিপ্রথার কোন দাম ছিল না।

জাতিপ্রথা, বৌদ্ধ ধর্ম, দর্শন এবং ধর্ম, এই চারটেকে এক সঙ্গে নিয়ে এলে খুব জটিল হয়ে যায়। আমরা ধর্ম ধর্ম খুব সাধারণ ভাবে বলে যাচ্ছি, কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে অর্থে আমরা হিন্দু, মুসলমান, খ্রীশ্চান ধর্মকে ধর্ম মনে করছি, ধর্ম কিন্তু ওই অর্থে হয় না। ধর্ম একটাই অর্থে ধর্ম হয়, তা হল একজন ঋষির দেওয়া পথকে পালন করা। ধর্মের অনেক রকম পরিভাষা আছে, কিন্তু একজন ঋষি যে পথে গেছেন আমি সেই পথে চলছি, এটাকেই ধর্ম বলে। যারা খ্রীশ্চানীয় ভাবধারায় যীশুর দেওয়া পথকে অনুসরণ করছে তারা খ্রীশ্চান, যারা মহম্মদের পথকে অনুসরণ করছে তারা মহামেডান। ঠিক তেমনি যারা ভগবান বুদ্ধের পিছনে চললেন, তারা বৌদ্ধ। ঠিক তেমনি মহাবীর জৈনকে অনুসরণ করে জৈন ধর্ম হল, পার্সিদের ধর্মের নেতা হলেন জরাথ্রুষ্ট। এদিক থেকে জুহুদিরা আলাদা, ওরা একজন মাত্র ঋষির দেওয়া পথকে অনুসরণ করে না, হিন্দুরাও একজন ঋষির নামে চলে না। গুরু নানক শিখদের পরিষ্কার বলে দিয়েছিলেন এরা শিষ্য, কিন্তু ওই দিক থেকে তারা গুরু নানকেরই অনুগামী। ঠিক ঠিক দেখলে, মাত্র দুটি ধর্ম নৈর্ব্যক্তিক ধর্ম – হিন্দু আর জুহুদিরা। জুহুদিদের একজন ঋষি নেই, একাধিক ঋষি আছেন। হিন্দুদেরও তাই, হিন্দুদের ঋষিরা প্রচুর সংখ্যায় আছেন। কিন্তু জুহুদিরা যখন ধর্ম পালন করে, তখন তারা এক ধর্মগ্রন্থ, এক চার্চকে অনুসরণ করে। হিন্দুরা আবার কোন একজন ঋষিকে বা কোন একজন মহাত্মাকে, কোন সাধুবাবাকে বা কোন গুরুকে মেনে চলে। সেইজন্য বাইরে থেকে যারাই হিন্দু ধর্মের ব্যাপারে জানতে আসে বা পড়তে আসে, তাদের হিন্দু ধর্মকে নিয়ে অনেক সংশয় তৈরী হয়। কারণ হিন্দু ধর্মে এত রকমের জিনিস আছে যে তারা অনেক কিছু মেলাতে পারে না বলে সব কিছু গুলিয়ে ফেলে।

হিন্দুরা মোটামুটি তিন ধরণের ধর্ম পালন করে, বর্তমান কালে অবশ্য একটা চতুর্থ ধর্ম এসে গেছে। হিন্দুরা প্রথম যে ধর্ম পালন করে তাকে বলা হয় কুলধর্ম, যে বংশে জন্ম নিয়েছে সেই বংশের পরম্পরা ধর্মকে পালন করে। সেই বংশের কুলগুরু যা যা বলে দিয়ে গেছেন, তারা তাই তাই অনুসরণ করে সেই কুলগুরুর পরম্পরায় চলে। দ্বিতীয় হল জাতিধর্ম, যে পেশায় বা বৃত্তিতে নিযুক্ত, সেই কাজকে পালন করে যাচ্ছে। যেমন একজন ব্রাহ্মণ, নিজে অধ্যয়ন করছে এবং অধ্যাপনা করছে, এটা হয়ে গেল জাতিধর্ম। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ যখন পূজা অর্চনা করছে তখন কুলধর্ম পালন করে। এই দুটি হিন্দুদের মূল ধর্ম – কুলধর্ম ও জাতিধর্ম। কিন্তু কুলধর্ম ও জাতিধর্মের উৎসে যদি যাওয়া যায়, তখন দেখা যাবে এই দুটি ধর্মের শিকড় রয়েছে বেদে। কিন্তু বেদ থেকে এত পরিশ্রুত হয়ে হয়ে নেমে আসে যে বোঝা যায় না এটা সত্যিই বেদ থেকে আসছে কিনা।

আগেকার ঋষিরা, বিশেষ করে মনু দেখলেন, এতগুলো যদি কুলধর্ম থাকে, যতগুলি বংশ ততগুলি কুলধর্ম, হাজার হাজার জাতি থাকার জন্য জাতিধর্মও হাজার হাজার হয়ে যাবে, এতগুলো ধর্ম হয়ে যাওয়ার ফলে সমস্যা হল যে, লোকেরা বুঝতে পারত না, কি করতে হবে, কি করতে হবে না। সেইজন্য মনু আসার আগেই ঋষিরা যত কুলধর্ম আছে, যত জাতিধর্ম আছে এগুলোকে চারটেতে নামিয়ে দিলেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। লোকেরা আবার এটা মানবে না, লোকেরা মানবে না বলে সেইজন্য অনেকেরই মত হল, বেদের পুরুষসূক্তমে ঢুকিয়ে দেওয়া হল যে, ভগবান বলছেন, ওনার শরীরের অঙ্গ থেকেই এই চারটে বর্ণ বেরিয়েছে। বেদে বা হিন্দুদের কোন শাস্ত্রেই কিন্তু ভগবান কুলধর্ম ও জাতিধর্ম নিয়ে বলছেন না। গীতার প্রথম অধ্যায়ে অর্জুন বলছেন *উৎসন্ন কুলধর্মানাং*, এতে কুলধর্মের উৎসন্ন হয়ে যাবে, যার ফলে বর্ণসঙ্করাদিএর উদ্ভব হবে। মনুর কিছু আগে এবং মনুর পর থেকে ঋষিরা চেষ্টা করলেন, যে করেই হোক সব কুলধর্ম ও জাতিধর্মকে একটা সাধারণ প্ল্যাটফরমে নিয়ে আসতে হবে, তার জন্য ওনারা একটা সাধারণ কোড ঠিক করে বলে দিলেন সবাই এই কোডকে পালন করবে, যার নাম দিলেন বর্ণধর্ম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারটে বর্ণধর্ম হয়ে গেল। এবার যেমনি দেশে কোন বড় ঋষি আসতেন, যাঁর চাপরাশ আছে এবং দেশে যাঁর গভীর প্রভাব আছে, ওনারা একটা জাতিকে বলে দিলেন, তুই আজ থেকে ক্ষত্রিয়, আচ্ছা তুই আজ থেকে ব্রাহ্মণ। ইতিহাসেও পাওয়া যাবে, বিভিন্ন ঋষিরা এক এক সময় বিভিন্ন জাতিকে বিভিন্ন বর্ণে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছেন। এর খুব মজার দৃষ্টান্ত হল, সরকারের বিভিন্ন যে নোটিফিকেশান বিভিন্ন সময় বেরোয়, সেখানে বলে দেওয়া হল, বাংলার এই জাতি আজ থেকে তপশীলি জাতি বলে গণ্য করা হবে। অন্য রাজ্যে কিন্তু সেই জাতি তপশীলি জাতি নয়। যদি জাতিধর্ম আর বর্ণধর্ম স্থির করে দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে বাংলায় একজন তপশীলি হবে আর

তামিলনাড়ুতে গিয়ে সে উচ্চবর্ণের হয়ে যায় কি করে? তার কারণ হল, ঋষিরা বলে দিতেন, তোরা আজ থেকে ব্রাহ্মণ, ওরা ব্রাহ্মণ হয়ে গেল, কিন্তু ওদেরই বাকিরা যারা অন্য রাজ্যে আছে, তারা ওই জাতিতেই থেকে যেত।

আজকে আমরা জানি, ভারতবর্ষ থেকে জাতিধর্ম উঠে গেছে, সবাই সব ধরণের কাজ করছে। ব্রাহ্মণ ঘরের সন্তানরাও স্বচ্ছ ভারত অভিযান চালাচ্ছে, শূদ্রের ছেলেরাও ভারত পাকিস্থান সীমান্তে গিয়ে দেশের জন্য যুদ্ধ করছে, সবাই সব রকমের কাজ করছে। তার মানে জাতিধর্ম উঠে গেল। কুলধর্ম কোন দিনই পুরো নিয়মে চলত না, পারিবারিক চিকিৎসকের মত একজন কুলগুরু থাকতেন, তিনি যেটা বলে দিতেন বাড়ির লোকেরা সেটাই করত। কুলগুরুর প্রথাও আজ মোটামুটি ভাবে উঠেই গেছে। এখন কুলধর্ম হল, বাড়িতে বয়স্ক মহিলারা আছে, বাড়ির বা নিজের কোন আত্মীয়ের কারুর বিয়ের সময় বলে দেয়, আমার মনে আছে আমার বিয়ের সময় এই এই করা হয়েছিল, এখনও এটাই কর। এটা কোন ভাবেই ধর্ম নয়। যেখানে জাতি বলে কিছু নেই, সেখানে বর্ণধর্ম কি করে থাকবে, বর্ণধর্ম চুরমার হয়ে গেছে। ঠাকুর সেইজন্যই এসেছিলেন। যারা ঋষিদের দেওয়া পথ ধরে চলে, তারাই ধার্মিক। সিন্ধু নদীর উপত্যকায় যে একাধিক ঋষিরা ছিলেন, যাঁদের বাক্যকে আমরা বেদবাক্য বলে মানি, সেই ঋষিদের পথ যারা মেনে চলে তারাই হিন্দু। তাঁরাই জাতিধর্ম, কুলধর্ম, বর্ণধর্ম পালন করতেন।

আশ্রম ধর্মটা কিছু না, সামান্য ধর্মও কিছু না, সামান্য ধর্ম মানে মনুষ্য জাতির প্রতি কর্তব্য, এগুলো সব সময় সবার জন্য এক থাকবে, কখনই পাল্টাবে না। ব্যক্তিগত অনুশীলনে জাতিধর্ম, কুলধর্ম ও বর্ণধর্ম, তিনটেই এখন মুছে গেছে। ঠাকুর, মা ও স্বামীজী এসে নূতন ধর্ম দিলেন। যেটা কুলধর্ম থেকে উঠে জাতিধর্মে এসে গিয়েছিল, পার্থক্যের সংখ্যা কমে গেছে, জাতিধর্ম থেকে উঠে বর্ণধর্মে এসে গেল, অর্থাৎ চারটে ছাতার নীচে সে গেল। ঠাকুর আসার পর ইংরেজরা এসে যেভাবে সব ভাঙচুর করে দিল, তারপর স্বাধীন ভারত এসে গেল। আমরা যদি সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিকটা ছেড়ে দিয়ে শুধু যদি ধর্মের দিক দিয়ে দেখি, যেটা আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য, আর জীবনের যে ধারা, যেটাকে ধর্ম ও অধ্যাত্ম বলা হয়, তাহলে সেখানে তখন একটাই ধর্ম, তা হল হিন্দু ধর্ম। সমস্যা হল, এই হিন্দু ধর্মের সাধারণ আচরণ বিধি যে কি, এটা এখনও তৈরী হয়নি। কুলধর্ম চলত কুলগুরুর মুখে মুখে, জাতিধর্ম চলত গ্রামের মোড়ল বা বড়রা যা বলে দিতেন, বর্ণধর্ম চলত মনুস্মৃতি ধর্মগ্রন্থকে আধার করে। কিন্তু আজকে শেষ পর্যন্ত যখন একটা ছাতার নীচে হিন্দু ধর্ম চলে আসছে, যেটা ঠাকুর ও স্বামীজী দিলেন, এর সাধারণ আচরণ বিধি কি হবে, এর difining principle কি হবে, এখনও পর্যন্ত তৈরী হয়নি।

একটু আগেই বলা হল, হিন্দু ধর্ম আর জুহুদি ধর্ম, এই দুটি ধর্ম কোন একজন মাত্র ঋষিকে অনুসরণ করে না, কিন্তু জুহুদের এই সমস্যা নেই, কারণ ওদের একটাই সাধারণ ধর্মগ্রন্থ, সেটাকেই সবাই পালন করে, হিন্দুদের মত তাদেরও পণ্ডিত বা ব্রাহ্মণরা ব্যাখ্যা করে দেন, কি করতে হবে আর কি করবে না। হিন্দুদের ক্ষেত্রে এটা একটা বিরাট সমস্যা হয়ে যায়, তাদের চরিত্রে রয়ে গেছে ঋষিদের অনুসরণ করা। কিন্তু ঋষি একজন দুজন না, ভুরি ভুরি ঋষি। এত ঋষি থাকার ফলে যেমন অনেক সুবিধা পাওয়া যায়, অধ্যাত্ম জগতের অনেক কিছুকে খুলে দেয়। তেমনি এর আবার সমস্যা হল, ধারাটা থাকে না, একটা সময় থিতিয়ে যায়। সেইজন্য হিন্দুদের ভিতরে ধর্ম ভাবকে বজায় রাখা খুব মুশকিল হয়ে যায়। আগেকার দিনে কুলধর্ম ও জাতিধর্মের দরুন মানুষ নিজেকে কুলদেবতা, নিজের ইষ্টের সাথে জুড়ে রাখত, জাতিধর্মের দরুন মানুষ জানত আমাকে কি করতে হবে, কি করতে হবে না। মাঝখান থেকে কুলধর্ম ও জাতিধর্ম দুটোই উঠে গেছে। বর্ণধর্ম তো আরও অনেক আগেই উঠে গেছে। ফলে হিন্দু ধর্মের ধর্ম বলে আজ কিছু নেই। স্বামী স্ত্রীর সাথে যে সম্পর্ক তৈরী হয়, যে সম্পর্ক খুবই নিজস্ব, খুব পবিত্র, বিবাহের সময় যে সম্পর্কের শুরু মৃত্যুতে গিয়ে সেই সম্পর্ক শেষ হয়, ঈশ্বরের সাথে আমাদের যে এই রকম একটা সম্পর্ক হবে, এই জিনিসটা হিন্দুদের শেষ হয়ে গেছে। বাকি সমস্ত ধর্মে এখনও আছে। ইসলাম ধর্মে আজ যে শিশুর জন্ম হল, তাকে ছোটবেলা থেকে শিখিয়ে দেওয়া হয়, এই তোমার পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরান, আর তোমার আল্লা আছেন, এবার সে ধীরে ধীরে ওই ভাবের মধ্যে ফেলে ওই ছাঁচের মধ্যে ফেলে নিজেকে তৈরী করে নিজের জীবনকে চালায়। আমাদের মাণ্ডুক্যকারিকাতে

বলছেন, গুরু শিষ্যকে যে ভাব দেখিয়ে দেন, শিষ্য সেই ভাবকে নিয়েই জীবন চালায়, সেই ভাবই তার জীবনকে রক্ষা করে, মৃত্যুর পরেও সেই ভাব তাকে নিয়ে চলে। আজকে হিন্দুদের কোন ভাব নেই।

আজকে অনেক ক্ষেত্রে যে নানান ধরণের গোলমাল হচ্ছে, এগুলোকে নিয়ে সবাই নিন্দা করছে, আলোচনা করছে, কিন্তু কেউ এটা বলছে না যে, গোলমালটা হচ্ছে কেন। ধর্ম মানে হল আমি একজন ঋষিকে মেনে চলব। কেউ যদি বলে আমার কাছে মহম্মদ সেই ঋষি যাঁকে আমি মেনে চলব, কোন ভুল নেই, কোন সমস্যাও নেই। কিন্তু কেউ যদি বলে আমি হিন্দু ধর্ম পালন করব, তখন তাকে দেখতে হবে সে কোন ঋষি বা কোন অবতার বা কোন গ্রন্থকে সে অনুসরণ করবে। এখানে মনে রাখতে হবে, যেটা বলা হল জুহুদি ধর্ম আর হিন্দু ধর্ম এই দুটো ধর্মই ঠিক ঠিক সমান সমান। অন্যান্য ধর্ম মাত্র একজন ঋষিকে নিয়ে চলে, কিন্তু এই দুটো ধর্ম অনেক ঋষিদের নিয়ে চলে। ফলে একজন হিন্দু এখন অনেক কিছুই করছে। গীতা পাঠ করছে, রামায়ণ কাহিনী শুনছে টিভি সিরিয়ালও দেখছে, আর যখন কোন ভাগবতীর জাগরণ, শিবরাত্রি জাগরণ হয় তখন সারা রাত মাইক চালিয়ে নাচগান করছে, তার জন্য মোটা টাকার চাঁদা লোকেদের কাছ থেকে আদায় করছে, যার কিছু অংশ নাচগানা ও খানাপিনাতে যায় আর কিছু অংশ নিজের পকেটে আসে। মাঝখান থেকে মূল জিনিস যেটা, ঈশ্বরের সাথে যে স্বামী-স্ত্রীর মত একটা ব্যক্তিগত ভাবের সম্পর্ক তৈরী হবে, সেটা আর হয় না। একটা ছেলে আর মেয়ে যখন কলেজে পড়াশোনা করছে, সেখানে তাদের অনেকের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক হয়, কিন্তু সেখানে তাদের সেই ভাব নেই। আসন জিনিসটা হল ভাব, যেখানে একটা বণ্ড তৈরী হয়। আর কি রকম বণ্ড, যে বণ্ড কোন অবস্থাতেই ভাঙবে না।

আগেকার দিনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা বন্ধন তৈরী হয়ে যাওয়ার পর, বিদেশীরাও যেটাকে নিয়ে ভারতীয় দাম্পত্য জীবনের প্রশংসা করে, যদিও এখন অনেক ভেঙেচুড়ে গেছে, ওই বন্ধন হয়ে যাওয়ার কিছু দিন থাকার পর যে ভাব তৈরী হয়ে গেল, আর এই সম্পর্ক কোন পরিস্থিতিতেই ছাড়বে না, একমাত্র মৃত্যুর সময় আলাদা হয়ে যাবে। ঠিক তেমনি ঈশ্বরের সাথে যার ওই ব্যক্তিগত ভাব তৈরী হয়ে যাবে, আর সে ঈশ্বরকে ছাড়বে না। তখন যদি এই কথাগুলো ওঠে, তুমি কি খ্রীশ্চান হয়ে যাবে, তুমি কি মুসলমান হয়ে যাবে, এই প্রশ্নই আর উঠবে না। আমি কি করে খ্রীশ্চান হয়ে যাব, আমার ব্যক্তিগত ঈশ্বরের যে ভাব তৈরী হয়ে গেছে, সেই ভাব তো নষ্ট হয়ে যাবে। অনেক সময় দেখা যায় কম বয়সে একটা ছেলে একটা মেয়েকে ভালবাসল, কিন্তু পরিস্থিতি বশতঃ মেয়েটিকে আরেকজনকে বিয়ে করতে হল। পরে যদি আবার ছেলেটির সাথে দেখা হয়ে যায়, তাকে পরিষ্কার বলে দেবে, আমার এখানে সম্পর্ক তৈরী হয়ে গেছে, আমি আর কিছু করতে পারব না, তোমাকে আগে আমি যতই ভালবেসে থাকি, আর আমি ওদিকে যাব না, আমি ওকে আর ছাড়তে পারব না। এটা তখনই হবে, যখন বন্ধনটা খুব শক্তিশালী হয়ে যাবে। ভালবাসার বন্ধনটা যদি দৃঢ় না হয়, তখন স্বামী স্ত্রীকে ছেড়ে চলে যাবে, স্ত্রী স্বামীকে ডিভোর্স দিয়ে দেবে, তেমনি মানুষ আজকে নিজের ধর্মকে ছেড়ে দিয়ে, নিজের ঈশ্বরকে ছেড়ে অন্য কিছুতে চলে যাচ্ছে। যতক্ষণ এই ভাবকে সৃষ্টির ব্যবস্থা না করা হয়, মানুষের কষ্টের শেষ থাকবে না। আমরা প্রসঙ্গ থেকে অনেকটা সরে এসেছি ঠিকই, কিন্তু বক্তব্য হল জাতিধর্ম, বর্ণধর্ম আর কুলধর্ম এই তিনটে হল মূল। কোন ঋষি, কোন হিন্দু, যে বেদের ধর্ম পালন করছে, সে কিন্তু কখনই এই ধর্মকে ছাড়বে না। স্বামীজী এটাই বলতে চাইছেন।

All the other philosophers pandered more or less to social prejudices; no matters how high they soared, still a bit of the vulture remained in them. As my Master used to say, "The vulture soars high out of sight in the sky, but his eye is ever on a bit of carrion on the earth. (*অন্যান্য দার্শনিকেরা সকলেই সামাজিক কুসংস্কারগুলোর অল্পবিস্তর দালাল ছিলেন; তাঁরা যতই উঁচুতে উঠে থাকুন না কেন, তাঁদের মধ্যে একটু-আধটু 'চিল-শকুনির ভাব' ছিল! আমার গুরুদেব বলতেন, 'চিল-শকুনি এত উঁচুতে ওঠে যে তাদের দেখা যায় না; কিন্তু তাদের নজর থাকে গো-ভাগাড়ে কোথায় এক টুকরা পচা মাংস পড়ে আছে'!*) স্বামীজী এখানে খুব কড়া কথা বলছেন, social prejudice বলতে বলতে চাইছেন জাতিপ্রথা, বর্ণাশ্রম ধর্মকে এনারা মানতেন। ঠাকুর, স্বামীজী এনারা বর্ণধর্মকে রক্ষা করতে আসেননি, কিন্তু শঙ্করাচার্য এসেছিলেন, শঙ্করাচার্য গীতার ভাষ্যের প্রথমেই বলে দিচ্ছেন,

ঈশ্বর যখন অবতার হয়ে আসেন তখন তিনি বর্ণাশ্রম ধর্মের রক্ষা করার জন্য আসেন। কারণ শঙ্করাচার্যের সময় বর্ণাশ্রম ধর্মই ধর্ম ছিল। ঠাকুর স্বামীজী যে সময় এলেন, তখন বর্ণাশ্রম ধর্ম শেষ হয়ে গেছে, এখন থেকে গেছে শুধু হিন্দু ধর্ম। বলছেন, ভগবান বুদ্ধ জাতিপ্রথার বিনাশকে নিয়ে এসেছেন, কিন্তু তখনকার দিনে এই জাতিপ্রথার বিনাশ, বর্ণাশ্রম ধর্মের বিনাশ কল্পনাই করা যায় না। কিন্তু স্বামীজী যেভাবে বলছেন, ভগবান বুদ্ধ এটা করে দেখিয়ে দিলেন, এটা ঠিক ওই অর্থে বলছেন না, কারণ হিন্দুরা, হিন্দু কেন, মানুষ মাত্রই ঋষিকে অনুসরণ করে। কেউ যদি বড় ঋষি হয়ে যান, আজকের দিনেও কোন বাবাজীর একটা নাম হতে না হতেই তাঁর পিছনে হাজারটে লোক জড়ো হয়ে যাচ্ছে, কেউ ধর্মের দুটো ভাল কথা বলছে, তাতেই হাজারটা লোক জুটে যাচ্ছে। মানুষের এটাই স্বভাব। মানুষের ভিতরে যে শুদ্ধ আত্মা আছেন, তিনি সব সময় চাইছেন নিজের স্বরূপের সাথে এক হতে। সেইজন্য যখন তিনি দেখেন এখানে গেলে আমি পারব, কিন্তু যাঁর কাছে যাচ্ছেন দেখছেন তাঁর মধ্যে সেই ক্ষমতাটা নেই। ভগবান বুদ্ধ যখন ভারতের ধর্মের দৃশ্যপটে আবির্ভূত হলেন, মানুষ দেখছে এনার মধ্যেই আমার আধ্যাত্মিক সত্তার বিকশিত রূপকে দেখছি, মানুষ তাঁর পিছনে হাঁটতে শুরু করে দিল। ওনার কাছে বর্ণাশ্রমের কোন দরকারই ছিল না, তাই না, যে কোন ধর্মের কাছে বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রয়োজন নেই। হিন্দুদের কাছে বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রয়োজন চিরদিনই ছিল, কারণ হিন্দুরা বেদকে মানত ঠিকই, কিন্তু তাদের প্রধান ধর্ম হল কুলধর্ম, জাতিধর্ম ও বর্ণধর্ম। এই তিনটে ধর্মকে নিয়ে চলার জন্য হিন্দুদের সবার জন্য তখন এক আচরণ বিধি ছিল না।

স্বামীজী নিজে মোটামুটি ভাবে জাতিপ্রথার বিরুদ্ধে ছিলেন। এক জায়গায় স্বামীজী বলছেন, আমি জাতিপ্রথাকে নিয়ে প্রচুর অধ্যয়ন করেছি, এর ভাল দিকটাও আছে, খারাপ দিকটাও আছে, কিন্তু এখন জাতিপ্রথার দিন চলে গেছে। এই কথা স্বামীজী প্রায় একশ বছর আগে বলেছিলেন, তখনকার দিনে জাতিপ্রথার বিরুদ্ধে বলা কল্পনাতীত ছিল, তা সত্ত্বেও অবাক লাগে স্বামীজী এই কথা কি করে বললেন! কিন্তু আজকে আমরা দেখছি জাতিপ্রথা শেষ। উন্নত কারিগরি বিদ্যা এসে জাতিপ্রথাকে একেবারে ভেঙে দিয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নতি কুলগুরু প্রথা, কুলধর্মকে ভেঙে দিয়েছে, বিশ্বায়ন বর্ণপ্রথাকে ভেঙে দিয়েছি, তিনটেই শেষ। এই মুহূর্তে দরকার হিন্দু ধর্মের নূতন আচরণবিধি তৈরী করা। অনেকে বলবে, হিন্দুদের তো রয়েছে, তাদের বেদ আছে, গীতা আছে, উপনিষদ আছে। ঠিকই, কিন্তু মানুষ সহজ সরল ভাবে জানতে চায় আমাকে ঠিক কি করতে হবে। এই জিনিস জাতিধর্মে ছিল, কুলধর্মে ছিল এবং বর্ণধর্মে ছিল, বর্তমান কালে এই জিনিসটা নেই।

স্বামীজী এখানে খুব কড়া কথা বলছেন, যদিও আমাদের আচার্যরা অনেক উপরে যেতেন, শকুনও অনেক উপরে ওঠে কিন্তু তার নজর থাকে ভাগাড়ে মরা গরু, মরা মোষের দিকে, এদেরও তেমনি মন বর্ণ ব্যবস্থার উপর থাকত। স্বামীজী এত কড়া কথা না বললেও পারতেন, কারণ social prejudiceকে পেরিয়ে যাওয়া খুব কঠিন। শ্রীশ্রীমা যিনি সবাইকে নিজের সন্তান রূপে দেখতেন, তিনিও শেষ অবস্থায় যখন ডাক্তার তাঁকে পাউরুটি খেতে বলছেন, তখন তিনিও বলছেন, এই শেষ অবস্থায় তোমরা আমাকে আর মুসলমানি রুটি খাইয়ো না, কিংবা নার্সরা তাঁর ঘরে যখন আসছে, তখন তিনিও বলছেন, খ্রীশ্চান মেয়েরা আমার ঘরে জুতো পরে খট্ খট্ করে হাঁটাচলা করবে, আমি তা হতে দেব না। মানুষ যে পরিস্থিতিতে বড় হয়, ওটা শেষ অবস্থাতেও থেকে যায়। স্বামীজীরও নিবেদিতাকে নিয়ে একটা ভয় ছিল, শ্রীশ্রীমা নিবেদিতাকে নিতে পারবেন কিন। শেষে যখন দেখলেন, মা নিবেদিতাকে নরেনের মেয়ে বলে 'খুকি' সম্বোধন করে আদর করছেন, সেই দেখে স্বামীজী খুব খুশি হয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। এখানে স্বামীজীর বক্তব্য ভগবান বুদ্ধকে নিয়ে, ভগবান বুদ্ধ উঠে গেলেন, তিনি যখন উঠে গেলেন তাঁর সাথে তখন অনেক কিছু খুলে গেল।

এটা যে শুধু ভগবান বুদ্ধের ক্ষেত্রেই হবে তা না, যে কোন ঋষির ক্ষেত্রেই হবে। চৈতন্য মহাপ্রভু বলে দিলেন, ভক্তের জাত নেই, মহাপ্রভু আসার পর সমস্ত জাতির লোক মহাপ্রভুর ধর্মে গিয়ে এক হয়ে গেল। কিন্তু কিছু দিন পরেই, ভারতের জাতিপ্রথার এমন প্রবল সংস্কার যে, শেষে তাদের গিলে ফেলে দিল। তার কারণ হল তখনও জাতিপ্রথা বিলোপের সময় হয়নি, সময় না হলে কিছুতেই বেরোতে দেবে না। বৌদ্ধরাও আজকাল কোথাও বলছে তাদের তপশীলি জাতির মধ্যে রাখতে হবে, কোথাও বলছে ওবিসিতে রাখতে হবে। ভারতে জাতিপ্রথা থেকে বেরিয়ে আসা প্রায় অসম্ভব। তার কারণ এখনও ওর বিলোপের সময় আসেনি। এবার কিন্তু

ভেঙে গেছে, এখন যে জাতিপ্রথা আছে, এটা শুধু মাত্র একটা সামাজিক মর্যাদা আর অর্থনৈতিক সুবিধা নেওয়ার জন্য। এটাকে কখনই জাতিপ্রথা বলা যায় না। ধর্মের আচার্যরা যখন বলতেন বর্ণাশ্রম ধর্ম হল মূল, বর্ণাশ্রম ধর্মকে আধার করেই ধর্ম জীবন চলবে, তখন তাঁরা আধ্যাত্মিক সত্যকে নিয়ে বলছেন না, বলছেন জীবনধারাকে নিয়ে। ঠাকুরের আগমনের পর সেটা চলে গেল। এখন ধর্ম অনেক মুক্ত হয়ে গেছে। এখন আর ধর্মকে কোন বাঁধাধরা সীমানা দিয়ে বেঁধে রাখার কোন দরকার নেই।

এরপর স্বামীজী শেষ একটা কথা বলছেন, The ancient Hindus were wonderful scholars, veritable living encyclopaedias. They said, 'Knowledge in books and money in other people's hands is like no knowledge and no money at all'. Shankara was regarded by many as an incarnation of Shiva. (*প্রাচীন হিন্দুরা অদ্ভূত পণ্ডিত ছিলেন –যেন জীবন্ত বিশ্বকোষ। তাঁরা বলতেন বিদ্যা যদি পুঁথিগত হয়, আর ধন যদি পরের হাতে থাকে, কার্যকাল উপস্থিত হলে সে বিদ্যা বিদ্যা নয়, সে ধনও ধন নয়। শঙ্করকে অনেকে শিবের অবতার বলে জ্ঞান করে থাকে।*) বলা হয়ে থাকে, *পরহস্তগতং ধনম্*, বিদ্যা যদি পুস্তকে থাকে আর টাকা যদি অপরের হাতে থাকে, *ন সা বিদ্যা ন তদ্ধনম্*, সেটা বিদ্যাও না, সেটা ধনও না। বিদ্যাকে কোথায় রাখতে হবে? মাথায়। এই জিনিসটা হিন্দুদের চিরদিন ছিল। আগে যে এতগুলো কথা বললেন, এগুলোকে যে তিনি নিন্দা করছেন, তা না। স্বামীজী এসেছেন হিন্দুধর্মের সব আবর্জনা মুক্ত করে দিতে। স্বামীজী বলছেন, প্রাচীন ভারতের পণ্ডিতরা ছিলেন জীবন্ত এনসাইক্লোপেডিয়া, পুরো চারটে বেদ মুখস্ত, রামায়ণ, মহাভারত মুখস্ত। কিছু দিন আগেও অনেকেই এমন এমন মানুষ দেখে থাকবেন, যাঁর পুরো মহাভারতের এক লক্ষ শ্লোক মুখস্ত। আর চারটে বেদ মুখস্ত এখনও অনেক পাওয়া যাবে। বেনারসের পণ্ডিতদের সমস্ত কিছু মুখস্ত। চারটে বেদ, রামায়ণ, মহাভারত আর তার সাথে একটা দুটো পুরাণ মুখস্ত এই রকম অনেক পণ্ডিত এখনও পাওয়া যাবে। কাশীতে বলুন, দক্ষিণ ভারতে তো প্রচুর আছে, মিথিলায় প্রচুর আছে, নদীয়া নবদ্বীপের আশেপাশে প্রচুর পাওয়া যাবে। কাশীতে বেলুড় মঠের এক মহারাজ ছিলেন, এখন তিনি গত হয়েছেন। উনি কাশীর এক পণ্ডিতের কাছে পড়তে যেতেন। সেই পণ্ডিতের তখন অনেক বয়স হয়ে গেছে। অনেক আগেকার কথা। মহারাজ যদি তাঁকে কোন প্রশ্ন করতেন, প্রশ্ন শুনে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকতেন, বাড়ির লোকদের কাছে এসে বিরক্ত করতে নিষেধ করতেন। অনেকক্ষণ বসে থাকার হঠাৎ বলতে শুরু করতেন, গুরুজী কহতে থে, একটা মনে পড়ছে, আমার গুরু এই কথা বলতেন, বলেই ঝর ঝর করে সংস্কৃতে কথাগুলো বলতে শুরু করতেন। আচার্য শঙ্করের গীতা ভাষ্যাদি থেকে শুরু করে যত ভাষ্য আছে সব ঝাড়া মুখস্ত। হরিদ্বারেও অনেক মহারাজরা এই ধরণের অনেক সাধু-মহাত্মাদের দেখা পেয়েছেন, যাঁদের শঙ্করাচার্যের গীতা ভাষ্য, উপনিষদের ভাষ্য, ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য সব ঝাড়া মুখস্ত। হিন্দু পণ্ডিতদের এই স্মৃতিশক্তিকে আমরা কল্পনাই করতে পারব না। স্বামীজী এই জিনিসগুলিকে দেখে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। আঠারো ঊনিশ বছর বয়সে ছাত্রাবস্থায় তিনি কলকাতায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তখন তিনি তেমন কিছু না। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দেখলেন, ঠাকুরের আধ্যাত্মিক ভাব দেখে অভিভূত হয়ে গেলেন, তারপর ভারতকে দেখতে শুরু করলেন, ভারতকে দেখে অভিভূত হয়ে গেলেন। তখন তিনি বুঝলেন ভারতের মহত্ত্ব কোথায় নিহিত। এইভাবে স্বামীজী হিন্দু ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মকে তুলনা করে কয়েকটা কথা বললেন। এখানেই ৯ই জুলাইয়ের ক্লাশ শেষ হয়ে যায়। পরের দিন ১০ই জুলাইয়ের ক্লাশে প্রথমে স্বামীজী একটু ইসলামের উপর বলে আবার অদ্বৈত দর্শনে ঢুকে যাচ্ছেন।

বুধবার, ১০ই জুলাই

প্রথমেই স্বামীজী বলছেন, There were sixty-five million Mohamedans in India, some of them Sufis. Sufis identify man with God, and through them this idea came into Europe. They say, 'I am that Truth'; but they have an esoteric as well as an exoteric doctrine, although Mohammed himself did not hold it. 'Hashashashin' has become our word 'assasin', because an old sect of Mohammedanism killed non-believers as a part of its creed. (*ভারতে সাড়ে ছ-কোটি মুসলমান আছে –তাদের মধ্যে কতক সুফী*

আছে। এই সুফীরা জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত অভিন্ন জ্ঞান করে। আর তাদের মাধ্যমেই ঐ ভাব ইউরোপে এসেছে। তারা বলে 'আন্ আল্ হক্' অর্থাৎ আমিই সেই সত্যস্বরূপ। তবে তাদের ভিতর বহিরঙ্গ (বা প্রকাশ্য) এবং অন্তরঙ্গ (গূহ্য) মত আছে। যদিও মহম্মদ নিজে এ মত পোষণ করতেন না। 'হাশাশিন' শব্দ থেকে ইংরাজী 'assasin' শব্দ এসেছে। মুসলমানদের একটি প্রাচীন সম্প্রদায় ধর্মমতের অঙ্গ মনে করে কাফের বা অবিশ্বাসীদের হত্য করত।) স্বামীজী এখানে তিন চারটে কথা বলছেন। একটা কথা বলছেন, তখন ভারতে সাড়ে ছয় কোটি মুসলমান বাস করত। ভারতকে বাদ দিয়ে বর্তমানে বাংলাদেশ ও পাকিস্থান মিলিয়েই একুশ বাইশ কোটি মুসলমানের জনসংখ্যা। দ্বিতীয় সুফি ধর্ম সম্বন্ধে বলছেন, তৃতীয় ইসলামের হাশাশিন শব্দকে নিয়ে বলছেন। দেববাণী বই অনুসারে আমরা দেখছি স্বামীজী এই দিন ইসলামকে নিয়ে বলতে শুরু করেছেন। যদিও দেখে মনে হচ্ছে স্বামীজী ইসলাম নিয়ে বলছেন, কিন্তু আসলে স্বামীজী ইসলামকে নিয়ে কিছু বলছেন না। গত ক্লাশে বা তার আগের ক্লাশে স্বামীজী শুরু করেছিলেন ব্রহ্মসূত্রকে দিয়ে, ব্রহ্মসূত্রই তাঁর আসল ক্লাশ, আর ওটাই চলছে। ব্রহ্মসূত্রের উপর শঙ্করাচার্যের যে ভাষ্য, সেটাকে নিয়েই স্বামীজীর ক্লাশ চলছে। অদ্বৈত বেদান্তের যে ভাব, আমি সেই, এই ভাব বিদেশেও গেছে।

আমেরিকাতে ঊনিশ শতকে transcendentalists movement হয়েছিল, তাতে খুব নামকরা ব্যক্তিরা ছিলেন। মিস্ ওয়াল্ডো, যিনি থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে স্বামীজীর লেকচারের নোট নিয়েছিলেন, তাঁদের পরিবারও এই মুভমেন্টে ছিলেন। তাছাড়া জার্মানের কিছু নামকরা ফিলজফার ছিলেন, যাঁরা অদ্বৈতের এই ভাবটাকে নিয়ে কথা বলছেন। স্বামীজী এর লিঙ্কটা খুঁজে বার করছেন। সেই লিঙ্ক খুঁজতে গিয়ে তিনি দেখাচ্ছেন, কিভাবে আরব দেশ থেকে মুসলমানরা ভারতে এসেছে। মুসলমানদের মধ্যে আবার বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে, সেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা সম্প্রদায় হল, যাদের বলছে সুফি। সুফি সম্প্রদায় কিভাবে হিন্দুদের কাছ থেকে অদ্বৈতের এই ভাবটা নিল। স্বামীজী বলছেন, সুফিদের কাছ থেকেই এই আইডিয়াটা কিভাবে পাশ্চাত্যে গেছে। স্বামীজী আরও বলছেন, সুফিদের ভিতর কিছু কথা আছে যেগুলো তারা বাইরে বলত আবার কিছু গুহ্য কথা ছিল, যে কথাগুলো নিজেদের সম্প্রদায়ের লোক ছাড়া কাউকে বলত না। মহম্মদ নিজে কিন্তু সুফিদের মতের কোন দিন পৃষ্টপোষকতা তো করেনইনি, তিনি মানতেনও না।

তার সাথে স্বামীজী ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে বলছেন, ইংরাজীতে যে 'assasin', শব্দ ব্যবহার হয় এই শব্দ মুসলমানদের 'হাশাশিন' শব্দ থেকে এসেছে। কাফের বা অবিশ্বাসীদের হত্যা করা মুসলমানদের প্রাচীন একটা সম্প্রদায়ের লোকেরা ধর্মের অঙ্গ বলে মনে করত।

স্বামীজী ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে শেষ আরেকটি কথা বলছেন, যেখানে মুসলমানরা উপাসনার সময় তাদের কি ভাব একটা প্রতীকের দ্বারা তারা ব্যক্ত করে, স্বামীজী বলছেন, A pitcher of water has to be present in the Mohammedan worship as a symbol of God filling the universe, উপাসনার সময় মুসলমানরা সামনে এক কুঁজো জল সামনে রেখে উপাসনা করে। এটা একটা প্রতীক উপাসনা। ঈশ্বর সমগ্র জগতে ব্যপ্ত হয়ে আছেন, এই ভাবটাই এখানে ব্যক্ত করা হচ্ছে।

এর পরেই স্বামীজী একটা বাক্যে হিন্দুদের অবতারের কথা বলতে গিয়ে বলছেন, The Hindus believe that there will be ten Divine Incarnations. Nine have been and the tenth is still to come, হিন্দুরা দশাবতারে বিশ্বাস করে, তাদের বিশ্বাস যে দশজন অবতারের মধ্যে নয়জন অবতার এসে গেছেন, দশম অবতার আসার অপেক্ষায় আছেন।

শঙ্করাচার্যের উপর স্বামীজীর মন্তব্য

আমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, আলোচনা চলছে ব্রহ্মসূত্রকে আধার করে। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর যে কথা বলেছেন, সেখান থেকে বেদান্তের আলোচনা করা হচ্ছে। Shankara sometimes resorts to sophistry in order to prove that the ideas in the books go to upohold his philosophy, (*বেদের সকল বাক্য তৎপ্রচারিত দর্শনের সমর্থক –এইটি প্রমাণ করতে শঙ্করকে কখন কখন কূট তর্কের আশ্রয় নিতে হয়েছে।*) স্বামীজী শঙ্করাচার্যের বিরুদ্ধে এই উক্তি অনেকবার করেছেন, আচার্য শঙ্কর

যেন text torture করছেন। কেন স্বামীজী শঙ্করাচার্যের উপর এই অসন্তুষ্টি দেখিয়েছেন আমাদের জানা নেই। এখানে একটা প্রেক্ষাপট বললে ব্যাপারটা আমরা বুঝতে পারব জিনিসটা কি হয়।

আমাদের তিনটি শাস্ত্রকে একত্রে প্রস্থানত্রয় বলা হয় – উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র এবং গীতা। এই তিনটি শাস্ত্র বেদান্তের আধার। হঠাৎ করে কেউ যদি দাঁড়িয়ে বলে 'আমি বেদান্তী', তখনই তাকে বেদান্তী বলা যাবে না। তাকে বলা হবে, 'আপনার বক্তব্য আগে আপনি এই তিনটি গ্রন্থকে আধার করে বলুন। আর আপনি দেখান, এই তিনটি গ্রন্থের প্রত্যেকটি কথা আপনার মতকে পুষ্ট করছে, তিনটি শাস্ত্রের প্রত্যেকটি শব্দের সাথে আপনার কথার মিল আছে কিনা দেখান'। উপনিষদে আমরা অনেক কথা পাই, যেমন কঠোপনিষদ পড়লে মনে হবে এই এই জায়গাতে যেন ঈশ্বরের কথা বলা হচ্ছে, ভক্তির কথা বলছে, এই এই জায়গায় যেন জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে, এই জায়গায় যেন সর্বব্যাপী আত্মার কথা বলা হয়েছে, এই জায়গায় যেন দেহের ভিতরে যে আত্মা, তাঁর কথা বলা হয়েছে। উপনিষদে তাও এই জিনিসগুলো চলে যেতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মসূত্রে এলে আরও মুশকিল হয়ে যায়। ব্রহ্মসূত্র সূত্রাকারে রাখা হয়েছে, ছোট ছোট কয়েকটি শব্দ দিয়ে এক একটা সূত্রকে লিপিবদ্ধ করে রাখা। সেইজন্য এক একটা শব্দ দিয়ে কি বলতে চাইছে, ধরা খুব মুশকিল।

আমরা জানি ভগবান অবতার হয়ে জগতে ধর্মসংস্থাপনের জন্য আসেন। সব থেকে কাছাকাছি আমরা শ্রীরামকৃষ্ণকেই দেখছি, আর সত্যিই খুব কাছ থেকে আমরা ঠাকুরকে জানি। প্রফেট মহম্মদকেও আমরা খুব কাছ থেকে জানি, কারণ তাঁর অনেক স্মৃতিকথা অনেকেই রেখে গেছেন। বাকি অবতার যাঁরা আছেন, তাঁরা কথা ও কাহিনীর মধ্যে হারিয়ে গেছেন। ভগবান বুদ্ধও তাই, অতটা না হলেও চৈতন্য মহাপ্রভুও তাই, যদিও চৈতন্য মহাপ্রভুর অনেক স্মৃতি আমরা পাই, কিন্তু তাও আমাদের কাছ থেকে যেন হারিয়ে যায়। মানুষটা কেমন ছিল, মানুষটাকে যদি আমরা কাছ থেকে না দেখতে পাই, অবতারকে বোঝা যায় না। বাল্মীকি রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রকে অনেকটা পাওয়া যায়। যদি আমরা বাল্মীকির রাম, শ্রীরামকৃষ্ণ ও মহম্মদকে নিই, প্রথম দুজন অবতার, তৃতীয়জন নিজেকে ঈশ্বর বা আল্লার দূত বলছেন, এনাদের আধ্যাত্মিক ভাবকে নিয়ে যাই বলা হোক না কেন, আধ্যাত্মিক কথার যেটা শেষ কথা, ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু, এই ভাব তিনজনেরই আছে। কিন্তু যখনই চিন্তা-ভাবনা, সামাজিক চেতনা, এগুলো আসছে, তখন পুরোপুরি দেখা যাচ্ছে, এনাদের চিন্তা-ভাবনা এবং এনাদের যে নিজস্ব মত, তার মধ্যে তৎকালীন সমাজের শিক্ষা ও সংস্কারের প্রভাব খুব প্রাঞ্জল ভাবে ধরা পড়ে। ঠাকুর বাংলার এক অজগ্রাম কামারপুকুরে জন্ম নিলেন। তিনি ওখানকার সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে বড় হয়েছেন, তাঁর মন কামারপুকুরের সমাজের ধাঁচে তৈরী হয়েছে, শুধু উপমাগুলো নয়, তাঁর চাল চলন ব্যবহার সব কিছুই তৎকালীন কামারপুকুরে যে সমাজ, যে শিক্ষা-সংস্কৃতি, সবটাই সেই ধাঁচের। মহম্মদেরও তাই, শ্রীরামচন্দ্রও অনেকটা তাই, বাল্মীকি রামায়ণে রাম থেকে থেকে ক্ষত্রিয় ধর্ম নিয়ে বলছেন। মহম্মদেরও থেকে থেকে লুঠ আর ভ্রাতৃত্বের বাণী একসাথে চলছে।

তার মানে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব যাই হোক, আধ্যাত্মিক তত্ত্ব তত্ত্বরূপে ঠিক আছে, কিন্তু এই সংসার, সমাজ আর তার সাথে বুদ্ধির ব্যাপারটা যখনই আসছে, সেই জায়গাটায় পুরো; ঠাকুর যেমন বলছেন, অবতারও প্রকৃতির আণ্ডারে, প্রকৃতি মানে মন বুদ্ধির এলাকা; এই এলাকাকে অবতারও অতিক্রম করতে পারবেন না। অতিক্রম সেখানেই করবেন, যেখানে আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলো রয়েছে। এখন শঙ্করাচার্যই হন, রামানুজই হন বা আরও আচার্যরা যাঁরা এসেছেন, সবারই কোথাও এনাদের ছোটবেলা থেকে একটা ট্রেনিং আছে, ওই ট্রেনিংএর বাইরে এনারা কেউ চেষ্টা করেও যেতে পারবেন না। শ্রীশ্রীমা খুব সহজ ভাষায় বলছেন, ঈশ্বর দর্শন হলে কি মাথায় দুটো শিং বেরোয়! আমরা যা আছি তাই থাকব, আমাদের যে জ্ঞান, যে ভাব, ওটাই থাকবে। শুধু ওটাকে আমরা আরও স্পষ্ট ভাবে দেখে নেব। যেমন আমরা বলি, লালকেল্লার কথা এতদিন শুনে এসেছি, আজ সাক্ষাৎ দেখলাম। নূতন করে আমি আর কিছু দেখব না, লালকেল্লার ব্যাপারে যেমন শুনেছি, যেমন পড়েছি, সেটাই দেখব। তবে কেউ যদি লালকেল্লাকে নিয়ে গবেষণার মত প্রচুর পড়াশোনা করে থাকে, সে লালকেল্লার খুঁটিনাটি সবই জানে, কিন্তু যখন সে লালকেল্লার সব কিছুকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবে, তখন সেই জ্ঞানটা পুরো আলাদা জিনিস হয়ে যাবে। ঈশ্বর দর্শনের ক্ষেত্রে ঠিক একই জিনিস হয়, কোন তফাৎ নেই।

ঈশ্বরের প্রতি যে ভাব অবলম্বন করে আমি সাধনা করে এসেছি, অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি আমার যা প্রকৃত ভাব, ঈশ্বর দর্শনে সেই ভাবটাই আমার সামনে প্রত্যক্ষ হয়ে চলে আসবে, ওই ভাবের বাইরে কিছু আসবে না। ঠাকুর মা-কালীর সাধনার সময় মা-কালীকে কিভাবে দেখতে চাইছেন বোঝা যায়, তিনি রামপ্রসাদ বা কমলাকান্তের গানগুলি শুনে শুনে নিজে গাইতে গাইতে এবং বাচ্চা বয়সে যে সংস্কৃতি ও পরম্পরায় বড় হয়ে হয়ে তিনি যে জিনিসগুলিকে শুনেছেন, মনন করেছেন, মা কালীকে যখন প্রত্যক্ষ করছেন তখন ঠিক সেভাবেই প্রত্যক্ষ করলেন। তিনি কিন্তু তখন অদ্বৈত ভাবে প্রত্যক্ষ করতে পারলেন না। তোতাপুরী এসে যখন ঠাকুরের মনকে অদ্বৈত ভাবে তৈরী করে দিলেন, এরপর তিনি যখন সমাধির গভীরে ঢুকছেন তখন অদ্বৈত ভাবে প্রত্যক্ষ করছেন। আবার তার আগে ভৈরবী ব্রাহ্মণী এসে ঠাকুরকে যেভাবে যেভাবে সাধনার পদ্ধতির শিক্ষা দিচ্ছেন, তখন ঠাকুর সেই সত্যকে সেভাবেই দেখছেন।

তাহলে সত্যটা কি? আমাদের মন যে ভাবে, যে অবস্থায় আছে, তার বাইরে আমরা কিছু দেখতে পারব না। আমাদের মন এখন কাম, ক্রোধ, লোভাদি দিয়ে ভরে আছে, ঈশ্বরকেও আমরা দেখব কামধেনু গরুর মত, তিনি আমাদের ইচ্ছা পূরণ করেন। আচার্য শঙ্কর, রামানুজ, মাধ্বাচার্য এনারা বিভিন্ন পরম্পরাতে, বিভিন্ন গুরুর কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছেন, আর গুরু তাঁদের যে ভাব দেখিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা সেই ভাব নিয়েই এগিয়ে গেছেন। বেলুড় মঠ থেকে যাঁরা দীক্ষা নেন, মঠ থেকে তাঁদের ঠাকুরের ভাব, ঠাকুর কে, ঠাকুর কি কি করতেন, সব বলে দেওয়া হয়। এরপর তিনি কথামৃত, লীলাপ্রসঙ্গ, স্বামীজীর রচনবাবলী পড়ে পড়ে, সাধন ভজন করে করে, চিন্তন মনন করে করে নিজের মনকে ঠাকুরের ভাবে নিয়ে যাবেন। এবার ঠাকুর যেদিন তাঁর প্রত্যক্ষ হবে তখন থিয়োরটেক্যালি তিনি যে স্তরে আছেন প্র্যাক্টিকেলি তাই হবে, ওর বাইরে কিছুই হবে না। তিনি যদি মনে করেন এখানে পোঁছে আমি বিরাট কিছু হয়ে গেলাম, সেটা কখনই হবে না, তত্ত্ব জ্ঞান একই থাকবে। এই কারণে আচার্যের মুখে শাস্ত্রের শ্রবণ, শাস্ত্র অধ্যয়ন, সাধুসঙ্গ, শাস্ত্রের আলোচনা করার উপর এত জোর দেওয়া হয়। এগুলো যদি না করা থাকে তাহলে তার মনও খুব সীমিত থাকবে আর তাঁর ঈশ্বর জ্ঞানও সীমিত হবে।

সহজ ভাবে বোঝাবার জন্য আমরা কল্পনা করে নিচ্ছি, আমাদের এখানে সবারই হঠাৎ ঠাকুরের দর্শন হয়ে গেল। এখন এই দর্শনের জন্য আমাদের কি জ্ঞান হবে? ঠিক সেই জ্ঞানই হবে, যে জ্ঞানের অবস্থায় এখন আমি-আপনি আছি। তার মানে দাঁড়ায়, আমার জ্ঞান আলাদা হবে, আপনার জ্ঞান আলাদা হবে, কারণ এই জ্ঞান প্রচণ্ড ভাবে মনের উপর নির্ভরশীল। তাহলে এটাই দাঁড়ায় যে, আমি যদি জপ-ধ্যান, স্বাধ্যায়, তপস্যাদি করে প্রস্তুতি না নিয়ে থাকি, তাহলে এখন আমি যে জ্ঞানে অবস্থিত, এই জ্ঞান আমাকে কোন দিন মুক্তি দিতে পারবে না। এখানে উদ্দেশ্য হল, জ্ঞান, ভক্তি যাই হোক, আমি যেন জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে বেরিয়ে আসতে পারি। জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে বেরিয়ে আসার জন্য ঈশ্বরকে সে-ভাবেই দেখতে হবে, তাঁর জন্ম নেই, জন্ম নেই তাই তাঁর মৃত্যুও নেই, তাঁর কোন ক্ষয় নেই, তিনি অনন্ত, সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ। এই ভাব নিয়ে ঈশ্বরকে দেখার জন্য আমাকে আমার মনকে প্রস্তুতি করে করে সেই জায়গায় নিয়ে চলে যেতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের সেই প্রস্তুতি নেই। কেন নেই? কারণ আমরা যখন ঠাকুরকে দর্শন করতে, প্রণাম করতে মন্দিরে যাচ্ছি তখন এই ভাব নিয়েই যাচ্ছি, ঠাকুর আছেন, ঠাকুর আমাদের দেখছেন, ঠাকুর আমাদের কৃপা করছেন। আর জগৎকে আমরা কিভাবে দেখছি? আমি আছি, সে আছে, ওকে আমি কোন মতেই আমার থেকে বড় হতে দেব না, একে ভালবাসি, তাকে সহ্য করতে পারি না, ইত্যাদি। ঈশ্বরের প্রতি এই ভাব আর জগতের প্রতি এই ভাব নিয়ে যদি চলি, তাহলে আমাদের জ্ঞানও ওই স্তরের জ্ঞানই হবে।

শঙ্করাচার্য, রামানুজ বা এমনকি স্বামীজীও এনারা যে বেদান্তের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন, এই বেদান্ত হল আধ্যাত্মিকতার শেষ কথা। আচার্য শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে অদ্বৈতের এই ভাবকেই সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। কি সেই ভাব? বেদান্তের একমাত্র বক্তব্য ও ভাব হল, *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, অহং ব্রহ্মাস্মি*। এবার আচার্য শঙ্কর ভাষ্য লিখতে শুরু করলেন। বেদান্তের ঠিক এই মহাবাক্য ও ভাবকে আধার করে আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্র, গীতা ও উপনিষদের প্রত্যেকটি কথার, প্রত্যেকটি বাক্যের একটা cohesive meaning দিলেন। Cohesive meaning এর মানে হয়, ছেলে বন্ধুদের সাথে পিকনিকে যাবে, সে গেছে বাবার অনুমতি নেওয়ার জন্য। বাবা তখন বলছেন, 'পিকনিকে যাবে! আচ্ছা যেতে পার, না গেলেই তো হয়; আচ্ছা যাও,

তোমার যাওয়াটা কিন্তু ভাল হবে না’। এভাবে বলে দিলে ছেলে তো পুরো confused হয়ে যাবে। একই লোক, একই সময়ে কাউকে যদি বিপরীত আদেশ দেয়, যাকে আদেশ দিচ্ছে সে বেচারী পুরোপুরি confused হয়ে যাবে। এখানে একটা কথাই তাকে বলতে হয়, আপনি পরিষ্কার করে বলুন তো কি বলতে চাইছেন। ঠিক তেমনি সমগ্র শাস্ত্র নিয়ে একই জিনিস হয়। কোন শাস্ত্র যদি তার মূল বক্তব্যের কোন বিপরীত কথা বলে দেয় তখন সেখানে আপত্তি তোলা হয়। শাস্ত্র যেন একই কথা বলে, আর সেখান থেকে একটা ভাব যেন পরিষ্কার বেরিয়ে আসে। একজন নামকরা জার্নালিস্ট কাউকে বলছিলেন যে, আমি স্বামীজীর রচনাবলী পুরো পড়েছি, আমি শুধু বিপরীত কথাই পেলাম তাতে। ঠিকই বলছেন, মন দিয়ে স্বামীজীকে পড়লে শুধু contradictionsই পাওয়া যাবে, এখানে এক রকম বলছেন, আরেকটা জায়গায় অন্য রকম বলছে। কিন্তু সমস্ত বৈপরিত্যের মাঝখানে পরিষ্কার একটা পরিষ্কার ভাব আছে। কি সেই ভাব? Man is divine, এই ভাবকে স্বামীজী কখনই ছাড়ছেন না। যদি ছাড়েনও, সেখানেও কিন্তু ব্যক্তি মনের যে বাস্তবিক অবস্থায় আছে, সেখানে থেকে তাকে উপরে তোলার জন্য হয়ত বলবেন, কিন্তু ওটা কখনই তাঁর কাছে সত্য হবে না।

আচার্য শঙ্কর ঠিক এভাবেই তাঁর ভাষ্য রচনা করতে শুরু করলেন, যদি কখন কোথাও কোন বাক্যে বা শব্দে মনে হয় এখানে এটা ঠিক যেন খাপ খাচ্ছে না, উনি তখন এর অর্থটাকে স্পষ্ট করার জন্য ব্যাকরণের কিছু নিয়ম এনে এমন ভাবে যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করে দিচ্ছেন যাতে এর একটা coherent অর্থ বেরিয়ে আসে। এই ধরণের কাজ আচার্য শঙ্কর কোথাও কোথাও করেছেন ঠিকই, কিন্তু রামানুজ অনেক বেশি করেছেন, আর মাধ্বাচার্য এই ব্যাপারে তো একেবারে সিদ্ধহস্ত। স্বামীজী এই জিনিসটাকে খুব কড়া ভাষায় বলছেন, তিনি এখানে ‘sophistry’ শব্দ ব্যবহার করছেন, যার অর্থ শব্দজাল সৃষ্টি করে কূটতর্ক দিয়ে নিজের মতকে প্রতিষ্ঠিত করা। এই কথা শুধু যে স্বামীজী এখানেই বলছেন তা না, আরও অনেক জায়গায় বলেছেন। কিন্তু প্রথম যখন রামকৃষ্ণ মিশন থেকে গীতাদির অনুবাদ হচ্ছিল তখন স্বামীজী পরিষ্কার বলে দিয়েছিলেন, আচার্য শঙ্করের যে মত, আমাদেরও সেই মত। আচার্য শঙ্করের মত হল, আত্মা বা ব্রহ্মই আছেন, বাকি যা কিছু আছে সব নাম ও রূপের খেলা, এটাই মায়া।

পরে রামানুজ আচার্য শঙ্করের এই মতের বাইরে গিয়ে অন্য একটা মত নিয়ে এলেন। স্বামীজী নিজের যে মত দিয়ে গেছেন, সেই মত কোথাও যেন ঠাকুরেরই মত। কি সেই মত? দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত আর অদ্বৈত তিনটিই সত্য। আর আমাদের শাস্ত্রগুলোও তিনটে সত্যকেই বলে, সেইজন্য text torture করার দরকার নেই। আমরা আগেও বলেছি, কোন দর্শনকে তখনই দর্শন রূপে গণ্য করা হবে, যদি সেই দর্শনের প্রবক্তা প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য রচনা করে প্রমাণ করে দেখাতে পারেন যে এই নূতন দর্শনে যা বলা হয়েছে প্রস্থানত্রয়ে তাই বলা হয়েছে, তার সাথে পণ্ডিতদের মধ্যে ওই ভাষ্যের বিরুদ্ধে ও পক্ষে প্রচুর যুক্তিতর্ক দিয়ে বিচার হবে, তখনই সেই নূতন দর্শনকে দর্শন রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। কেউ একটা কোন সত্য বলে দিল সেটা সত্যের রূপ হয়ে যাবে না, আর এভাবে কখন দর্শন প্রতিষ্ঠিত হয় না। যিনি কোন নূতন দর্শনকে নিয়ে ভাষ্য রচনা করতে নামবেন, তখন দেখবেন উপনিষদে এমন কিছু মন্ত্র আছে যে মন্ত্রগুলি দিয়ে তাঁর দর্শনকে দাঁড় করানো যাবে না, তখন তাঁকে ডান দিক বাম দিক করতেই হয়। কিন্তু যেহেতু স্বামীজী বলে গেছেন, তিনি আমাদের ইষ্ট, সেইজন্য আমাদের মেনে নিতে হয়। স্বামীজী বলে দিয়েছেন, তিনজনই ঠিক, মাধ্বাচার্যও ঠিক, রামানুজও ঠিক আর শঙ্করাচার্যও ঠিক। কিন্তু ঘোর অদ্বৈত বেদান্তীরা স্বামীজীর এই মতকে ভাবেই গ্রাহ্য করবে না। সেইজন্য স্বামীজী ভাবী প্রজন্মের সন্ন্যাসীদের জন্য বলে গেছেন, এইটাকে আধার করে একটা নূতন ভাষ্য রচনা করতে হবে। আজ একশ বছর হতে চলল, এখনও পর্যন্ত সেই ভাষ্য রচনা করার সাহস কারুর হয়নি। আগে সেই ভাষ্য রচিত হোক তারপর না হয় আলোচনা করা যাবে কারা কারা text torture করেছে, আর শঙ্করাচার্য আদৌ text torture করেছেন কিনা।

আচার্য শঙ্করের মত ছিল যে, গীতা বা উপনিষদের শব্দগুলিকে যদি এভাবে না নেওয়া হয়, তাহলে আগের অর্থের সাথে এর বিরোধ হয়ে যাবে। গীতার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য কয়েক জায়গায় পরিষ্কার বলছেন, এখানে এই শব্দ আছে, এই শব্দকে ব্যাকরণের নিয়মে এভাবে নেওয়া যায়। যদি নেওয়া হয় তাহলে এর অর্থ এই রকম হয়ে যাবে, এই রকম অর্থ হয়ে গেলে গীতার আগে আগে যে কথা বলা হয়েছে সেটার বিপরীত বলা

হয়ে যাবে। সেইজন্য এই শব্দের অর্থ ব্যাকরণের এই নিয়মে চালাতে হবে। ঈশাবাস্যোপনিষদে আরও মজার ব্যাপার আছে, ওখানে *সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ* আছে, আচার্য বলছেন এখান *সম্ভূতিঞ্চ* হবে না, *অসম্ভূতিঞ্চ* হবে। কারণ সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ অক্ষর ধরে যদি অর্থ করা হয় তাহলে ওই মন্ত্রের অর্থটাই এলেমেলো হয়ে যাবে। কিন্তু *অসম্ভূতি* আনলেই মন্ত্রের পুরো অর্থটা খাপে খাপে মিলে যাবে। ছন্দ শাস্ত্রে একটা নিয়ম আছে, যদি কোন কবিতা 'অ' দিয়ে শুরু হয় সেখানে ছন্দ মেলানোর জন্য 'অ' শব্দকে উহ্য রাখা যায়। এখানেও আচার্য শঙ্কর এই নিয়মকে নিয়ে আসছেন, *অসম্ভূতিঞ্চ* যদি না আনা হয় তাহলে এর অর্থটাই মিলবে না, উল্টোপাল্টা অর্থ হয়ে যাবে। সব কটা মন্ত্রের অর্থেই contradiction এসে যাবে। এখন যিনি অন্য মত নিয়ে চলছে, সে তখন বলবে, আপনি কিন্তু এখানে text torture করছেন। এবার যদি তাকে বলা হয়, তাহলে আপনি এবার এর পুরোটা ব্যাখ্যা করে দিন, তখন দেখা যাবে, আচার্য শঙ্কর যেখানে একটা জায়গায় নিয়ম লাগাচ্ছেন, তাঁকে পাঁচটা জায়গায় নিয়ম লাগাতে হচ্ছে। স্বামীজী বিদেশে থাকাকালীন এই কথা বলেছিলেন, ১৮৯৭ সালে ভারতে ফিরে আসার পরেও বলতেন, কিন্তু পরের দিকে আর বেশি বলতেন না। এখানে বিষয়টা তা নয়, স্বামীজী নিজের একটা মত দিলেন। সেখান থেকে ভগবান বুদ্ধের উপর আলোচনাকে নিয়ে এসে বলছেন।

শাস্ত্রের প্রতি, বিশেষ করে বেদের প্রতি বুদ্ধের দৃষ্টিভঙ্গী

Buddha was more brave and sincere than any teacher. (*বুদ্ধ অন্য সকল ধর্মাচার্যের চেয়ে বেশী সাহসী ও অকপট ছিলেন।*) বিভিন্ন কারণে ভগবান বুদ্ধের প্রতি স্বামীজীর একটা উচ্চ ধারণা ছিল। He said; 'Believe no book; the Vedas are all humbug. If they agree with me, so much the better for the books. I am the greatest book; sacrifice and prayer are useless'. (*তিনি বলে গেছেন, 'কোন শাস্ত্রে বিশ্বাস করো না। বেদ মিথ্যা। যদি আমার উপলব্ধির সঙ্গে বেদ মেলে, সে বেদেরই সৌভাগ্য। আমিই সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র; যাগযজ্ঞ ও দেবোপসনায় কোন ফল নেই'।*) স্বামীজী ভগবান বুদ্ধের এই উক্তি কোথায় পেয়েছেন আমাদের জানা নেই। কারণ যতগুলি নামকরা প্রচলিত বৌদ্ধ শাস্ত্র আছে তার কোথাও এই ধরণের উক্তি পাওয়া যায় না। প্রাচীন মহারাজরা বা অনেক জ্ঞানীগুণী মহারাজরাও ভগবান বুদ্ধের এই উক্তির উৎস বলতে পারেননি। স্বামীজী যখন ভাবে এসে যেতেন তখন একটা জিনিসকে খুব জোর দিয়ে বলতে থাকতেন।

আমাদের আগের একটা আলোচনায় বলা হয়েছিল, ভগবান বুদ্ধ হলেন উপনিষদের ঋষি, উপনিষদ মানে সাক্ষাৎ উপলব্ধি, যেখানে কর্মকাণ্ডের কোন স্থান নেই, কর্মের কোন জায়গা নেই। তুমি আছ এটা সত্য, তোমার জীবনকে সংঘটিত করে সেই আধ্যাত্মিক সত্যকে উপলব্ধি করার চেষ্টা কর। ভগবান বুদ্ধও এর বাইরে কোন ভাবেই যাবেন না। উপনিষদের ঋষিরাও এর বাইরে যাননি। উপনিষদের ঋষিদের প্রতি যদি আমরা খুব গভীর ভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তখন আমরা দেখব, উপনিষদের ঋষিরা একই কথা বলছেন। যেমন ঠাকুর গীতা নিয়ে বলতে গিয়ে বলছেন, সন্ন্যাসীর আর কিছু না থাকুক, গীতা একটা থাকবেই। এই ধরণের কথা ঠাকুর একটু আধটু বলছেন ঠিকই, কিন্তু তিনি আবার বলে দিচ্ছেন, মন যখন শুদ্ধ পবিত্র হয়ে যায়, তখন মনই গুরু হয়ে যায়। স্বামীজীও বার বার বলছেন, Be bold, stand on your own feet। রমণ মহর্ষিও এই ধরণের কথা বলতেন। যদিও এখন তাঁর নাম অনেকে জানে না, না জানারই কথা, জে কে কৃষ্ণমূর্তি এই জিনিসটার উপর জোর দিতেন। উনি বৌদ্ধ পরম্পরার ছিলেন, আর অনেকেই তাঁকে ফিলজফার রূপে মানত।

শুধু ভগবান বুদ্ধ বা অন্যান্যরাই যে বেদ এবং বেদের কর্মকাণ্ডের নিন্দা করছেন তা না, হিন্দুদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ গীতাতেও ভগবান বলছেন, *ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন*, অর্জুনকে উপদেশ দিয়ে বলছেন, তুমি বেদের পারে যাও, বেদকে তুমি অতিক্রম করো। এই কথা আমাদের সব আচার্যরাই বলছেন। বেদ তিনটে গুণের মধ্যে বাঁধা, মানে সংসারকে নিয়ে আলোচনা করছে। যদিও গীতা *ত্রৈগুণ্যবিষয়াবেদা* বলছেন, কিন্তু গীতাতে বেদের প্রতি প্রচণ্ড সম্মান রয়েছে, যেটা ভগবান বুদ্ধের ছিল না। আমাদের আচার্যের মধ্যেও দুটো শ্রেনী, যাঁরা পুরো উপলব্ধির দিকে নিয়ে যেতে চাইছেন, তাঁরা আর শাস্ত্রের দিকে দৃষ্টি দেন না। কিন্তু যাঁরা সংসার-জীবন, গৃহস্থ-জীবন, ধর্ম-জীবনকে নিয়ে আলোচনা করছেন, ওনারা সর্বদা শাস্ত্রের উপর নির্ভর করে চলবেন। কারণ সাধারণ গৃহস্থ মানুষ মনকে সম্পূর্ণ ভাবে শুধু ঈশ্বরকে দিতে পারে না, তার পক্ষে

সম্ভবই না। গৃহস্থকে সংসারে অনেক রকম কাজ করতে হয়, ঈশ্বরের আরাধনা করাটাও ওই কাজের মধ্যেই পড়ে। সন্ন্যাসী যেমন সব কিছুকে, সবাইকে ছেড়েছুরে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে, গৃহস্থের পরিবার পরিজন আছে, বন্ধু-বান্ধব আছে, সমাজ আছে, সবাইকে সন্ন্যাসীর মত সব কিছু ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে যাওয়াটা গৃহস্থের পক্ষে সম্ভব না। গৃহস্থরা তাই সাধু সন্ন্যাসীদের কাছে গিয়ে বলে, মহাশয়! আমাকে কি করতে হবে একটু বলে দিন, আমার পক্ষে এর বেশি করা সম্ভব না। আমাদের ধর্মশাস্ত্র ঠিক এই কাজটাই করে, শাস্ত্র তাদেরকে দুটি কথা বলে দিচ্ছে – তুমি এই এই কর, এই এই কাজ করবে না। যদি গৃহস্থকে শেষ কথা বলে দিয়ে বলা হয়, এবার তুমি বুদ্ধি লাগাও। গৃহস্থ বলবে, আমি যে বুদ্ধি লাগিয়ে বিচার করব, এটা ঠিক না, ভুল, সেই ফুসরৎ আমার নেই। যাদের আবার কথা দিয়ে কোন কাজ হয় না, তাদের কাহিনী দিয়ে বলতে হয়। কারণ তারা ওই কথাটা যে বুদ্ধি দিয়ে ধারণা করবে, সেই ক্ষমতাটুকুও নেই।

সেইজন্য শিক্ষাকে এনারা তিনটে ধাপে ঠিক করে দিয়েছেন। প্রথম ধাপে একটা সিদ্ধান্ত বাক্য বলে দেওয়া হল, এরপর বাকিটা তুমি বিচার করে, সাধনা করে বুঝে নাও। দ্বিতীয় ধাপে, পরিষ্কার করে একটা তালিকা দিয়ে দেওয়া হয়, যাতে বলা থাকে, তুমি এটা এটা করবে, এটা এটা করবে না। তৃতীয় ধাপের শিক্ষায় ওই কথাগুলিকেই কাহিনী রূপে বলা হয়। কাহিনী হল একটা বিরাট জাল, যারা সাধনা করে এগোতে চাইছে, তারা যদি ওই কাহিনীর মধ্যে ঢুকে যায় তাহলে তারা আর ওই জাল থেকে বেরোতে পারবে না। বিধি-নিষেধের জাল পুরোপুরি গৃহস্থদের, সংসার ধর্মে যারা আছে তাদের জন্য। যে বলছে, আমার আর কিছু লাগবে না, ঈশ্বর বই আমি আর কিছু চাই না, তাদের পক্ষে এই জিনিসগুলো করা সম্ভব না। যাঁরাই মহান আচার্য হন, যাঁরাই শিক্ষা দেন, তা তিনি উপনিষদের ঋষিই হন, ভগবান বুদ্ধই হন, যীশুই হন, ঠাকুরই হন, যেই হন, তাঁরা বলবেন, তুমি এই সংসার জাল থেকে বেরিয়ে এসো। কিন্তু ভারতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে গীতাকে যদি ছেড়ে দিয়ে বলা হয়, তাহলে বলতে হয় ভগবান বুদ্ধই প্রথম যিনি এভাবে বলছেন। ভগবান বুদ্ধ বেদকে শেষ কথা বলে মানছেন না ঠিকই, কিন্তু ভগবান বুদ্ধের যে শব্দগুলি দিয়েছেন, যা বৌদ্ধদের ত্রিপিটকে লিপিবদ্ধ করা আছে, তার মানে ভগবান বুদ্ধের কথাকে নিয়েই আরেকটা ধর্মগ্রন্থের সৃষ্টি হয়ে গেল, অথচ যেখানে ভগবান বুদ্ধ কোন ধর্মশাস্ত্রকেই বিশ্বাস করতে নিষেধ করছেন। সেইজন্য মানুষ কখনই ধর্মগ্রন্থকে অতিক্রম করে চলে যেতে পারে না। যারা পুরোপুরি ঈশ্বরের দিকে যাচ্ছে, তাদের ব্যাপার আলাদা। কিন্তু সংসারে থেকে যারা ধর্ম পালন করছে, তাদের একটা কোন ধর্মগ্রন্থে বাঁধা হয়ে থাকতেই হবে। স্বামীজী থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে যত কত কথা বলেছিলেন, তার সামান্য অংশ মাত্র মিস্ ওয়াল্ডো খাতায় নোট করেছিলেন, বাকি কত কথা স্বামীজী বলেছিলেন, না বলেছিলেন, আমাদের পক্ষে এখন জানা সম্ভব নয়। সেখান থেকে আমাদের মনে যাতে কোন ভুল ধারণা না হয়ে যায়, সেইজন্য এতগুলো কথা পরিষ্কার করে বলে দেওয়া হল। স্বামীজী তারপর আবার ভগবান বুদ্ধকে নিয়েই বলছেন।

বৌদ্ধ ধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধ

Buddha was the first human being to give to the world a complete system of morality. He was good for good's sake, he loved for love's sake. (*মনুষ্যজাতির মধ্যে বুদ্ধই জগৎকে প্রথমে সর্বাঙ্গসম্পন্ন নীতিবিজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলেন। মঙ্গলের সন্যই তিনি মঙ্গলময় জীবন যাপন করতেন, ভালবাসার জন্যই তিনি ভালবাসতেন; তাঁর জন্য অভিসন্ধি কিছু ছিল না।*) বৌদ্ধধর্মকে অনেক সময় ethical idealism বলা হয়। জৈন ধর্মকে বলা হয় ethical realism। যে কোন ধর্মের তিনটে অঙ্গ থাকে, একটা হল উচ্চ আধ্যাত্মিকতা, যেখানে একমাত্র আত্মজ্ঞান নিয়েই আলোচনা চলে। তার ঠিক নীচে আসে ধর্ম, যেখানে সাধারণ মানুষ ধর্ম পালন করে। তৃতীয় স্তরে থাকে ভদ্রলোকেরা, যারা ওই ধর্মকে পালন করে একজন ভদ্রলোক হয়ে যায়। এদের দিয়েই একটা সভ্য সমাজের আবির্ভাব হয়। সভ্য সমাজ তৈরী করা ধর্মের কাজ নয়। ভগবান বুদ্ধ অষ্টাঙ্গ মার্গের কথা বলছেন, তার মধ্যে সাতটি অঙ্গই আইডিয়ালস, আদর্শের কথা বলছে। কিন্তু শেষে অষ্টম অঙ্গে পরিষ্কার ভাবে মানুষকে জ্ঞানের দিকে যাওয়ার জন্য বলছে। অষ্টাঙ্গ মার্গের অষ্টম অঙ্গে যে কথা বলা হচ্ছে, তাতেই এটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে এটা একটা moral code নয়। Moral codeএ বলা হয়, ভাল মানুষ, ভদ্র ও সভ্য মানুষ হওয়ার জন্য। কিন্তু ধর্মের আঙিনায় প্রবেশ করলে বলা হয়, প্রথমে

তুমি moral হও, তারপর সেখান থেকে তুমি উপরের দিকে উঠে আসবে। এখন বেদ মূলতঃ প্রার্থনা, অন্য দিকে উপনিষদের হল, মনকে তুমি যে করেই হোক আত্মজ্ঞানে লাগাও, আত্মজ্ঞান লাভ কর। ভগবান বুদ্ধ জিনিসটাকে খুব systematically দিয়ে দিলেন, যাতে একজন সাধারণ লোক, একজন গৃহবধূ, একজন যুবকও বুঝতে পারে, আমি কি করব, কিভাবে আমি উপরের দিকে যাব।

এই দুটো বাক্য হল ভূমিকা। স্বামীজী ব্রহ্মসূত্রের আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমে ইসলামকে নিয়ে বললেন, সেখান থেকে চলে গেলেন শাস্ত্রের প্রতি শঙ্করাচার্যের কি দৃষ্টিভঙ্গী, তারপর চলে গেলেন ভগবান বুদ্ধের শাস্ত্রের প্রতি কি দৃষ্টিভঙ্গী। বেদ যা কিনা আমাদের মূল গ্রন্থ সেই গ্রন্থকে শঙ্করাচার্য কত শ্রদ্ধা ও ভক্তি ভাবে দেখছেন, বেদের অর্থ সরল করে বার করার জন্য কোথাও তিনি নিজের মত করে বলছেন। অন্য দিকে ভগবান বুদ্ধ বেদকে পুরোপুরি উড়িয়ে দিলেন, তাঁর কাছে বেদের কোন দাম নেই। তিনি পুরো জিনিসটাকে ethically নিয়ে চলছেন। কিন্তু এটাই দুর্ভাগ্য যে, ভগবান বুদ্ধের কথাগুলোই পরে ধর্মগ্রন্থ হয়ে গেল, সেটাকেই বৌদ্ধরা তাদের শাস্ত্র রূপে মেনে চলছে। খ্রীশ্চানিটিতে যেমন পাপ-পূণ্যের একটা সাংঘাতিক ভূমিকা আছে, তেমনি বৌদ্ধ ধর্ম দাঁড়িয়ে আছে পুরো ethicsএর উপর, Ethics এর অর্থ হল, কোনটা করতে হবে, কোনটা করা চলবে না। এটাকে আধার করে যে ধর্ম চলে, সেই অর্থে বৌদ্ধ ধর্মই ঠিক ঠিক ethical ধর্ম। জ্ঞান লাভের পরে কি হয়, এর বর্ণনা বৌদ্ধ ধর্মের কোথাও নেই। সেইজন্য আমরা etichs, moralityর কথা যখন বলি তখন বৌদ্ধ ধর্মই যেন শেষ কথা। কিন্তু হিন্দু ধর্মের কাছে ethics হল ছাদে ওঠা মইএর মত, একটা অবলম্বন। এই কথা বলার পর স্বামীজী এবার শঙ্করাচার্যের ভাষ্যাকে আধার করে ব্রহ্মসূত্রে ঢুকছেন, যেখানে তিনি ঈশ্বর, জ্ঞান ইত্যাদিকে নিয়ে আলোচনা করছেন। এই প্যারাগ্রাফে ঢোকার আগে আবার একটা জিনিসকে ব্যাখ্যা করা দরকার।

আচার্য শঙ্কর, বিশেষ করে বেদান্ত, তিনটে জিনিসের উপর খুব বেশি জোর দেন – শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতি। এরই আরেকটা দিককে অন্য নামে আমরা এর আগে ব্যাখ্যা করলাম – শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। একটা জিনিস সত্য কিনা, এর পরীক্ষার জন্য এনারা নিয়ে এলেন শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতি; অর্থাৎ এই কথা বেদে আছে কিনা, যুক্তিযুক্ত কিনা আর উপলব্ধি হয়েছে কিনা। ঠিক তেমনি ধর্ম জিনিসটাকে যখন অন্য ভাবে নিচ্ছেন, তখন বলছেন, সেখানেও তিনটে ধাপে চলে – শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। শ্রুতি মানে, যার যার ধর্মের যে যে শাস্ত্র সেই শাস্ত্রকে অধ্যয়ন করা এবং শাস্ত্রের কথাকে বিচার করা, এমন বিচার করতে হবে যে, বিচার করে করে শেষে যখন উপলব্ধি হবে তখন তিনটে যেন এক লাইনে থাকে। শ্রুতি যেটা বলছেন, যুক্তি দিয়ে বিচার করেও একই জিনিস পাওয়া যাচ্ছে আর শেষে যেটা উপলব্ধি হবে সেটাও যেন এক হয়। এর আগে আমরা বলেছিলাম যে, আমি এখন আমার মনের যে অবস্থায় আছি, আমার অতিন্দ্রিয় জ্ঞানও যখন হবে তখন মনের ঠিক সেই স্তরের জ্ঞানই হবে। এইটাকে কাটাবার জন্য এনারা নিয়ে এলেন শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতি – শাস্ত্র অধ্যয়ন কর, শাস্ত্রের বাক্যগুলি নিয়ে বিচার কর, বিচার করে আগে মনটাকে পরিষ্কার কর, এরপর তোমার যখন অনুভূতি হবে, এই তিনটে যেন তখন এক লাইনে থাকে। যদি নিয়মিত শাস্ত্র অধ্যয়ন না করে থাক, বা অধ্যয়ন করেছ কিন্তু বিচার যদি ঠিক ভাবে না করে থাক, তাহলে তোমার যে অনুভূতি হবে সেটা এলেমেলো হবে, শ্রুতির সাথে মিলবে না। স্বামীজী এখন এইটাকে আধার করে বলছেন।

বিচার অতিন্দ্রীয় জ্ঞানের সহায়ক

Shankara says: God is to be reasoned on, because the Vedas say so. (*শঙ্কর বলেন, ব্রহ্মকে যুক্তি দিয়ে বিচার করতে হবে, মনন করতে হবে, কারণ বেদ এইরূপ বলেছেন।*) বৃহদারণ্যক উপনিষদেই শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের কথা বলছেন, অর্থাৎ ব্রহ্মকে যুক্তি দিয়ে বিচার করে মনন করতে হবে। Reason helps inspiration; books and realized reason, or individualized perception – both are proofs of God. (*বিচার অতিন্দ্রীয় জ্ঞানের সহায়ক। বেদ এবং অনুভূত যুক্তি বা ব্যক্তিগত অনুভূতি উভয়ই ব্রহ্মের অস্তিতের প্রমাণ।*) এটাই স্বামীজীর মহত্ত্ব, স্বামীজী এখানে একটা অতি সাধারণ কথা বলছেন, কিন্তু তার মধ্যেই মাঝখানে একটা ঋষি বাক্য বলে দিচ্ছেন; যদি মন সেভাবে তৈরী না থাকে, এই জিনিসটা ধরতে পারবে না।

এখানে inspirationএর অনুবাদ অতীন্দ্রিয় পুরোপুরি ঠিক নয়, সিদ্ধান্তের দিক দিয়ে ঠিক আছে, ঠিকই বিচার উপলব্ধিতে সাহায্য করে। কিন্তু inspiration শব্দটা আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও প্রযোজ্য। সৃজনশীলতা আমাদের সবারই মধ্যে আছে। মায়েরা যে রান্না করেন, সেখানেও সৃজনী শক্তির প্রকাশ হয়। আমরা যখন জামা-কাপড় পরিধান করছি, এই পোষাকে আমাকে ভাল লাগবে কিনা, এখানেও সৃজনশীলতা জড়িয়ে আছে, সৃজনশীল সবাই। কিন্তু এগুলো সবই যার যার নিজের কাছে সৃজনী, অপরের কাছে এর কোন দাম নাও থাকতে পারে। একটা কবিতা লিখে ওই কবিতা আমিই পড়ব, আর প্রিয়জন কেউ থাকলে তাকে জোর করে পড়াবো। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতা সবাই পড়ছে। কারণ রবীন্দ্রনাথ হলেন inspired কবি। শুধু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নন, যে কোন কবি বা লেখক যদি inspired হন, তবেই তাঁর রচনা সবাই পড়তে চাইবে। নিজের সন্তান একটা ছবি এঁকে মাকে দেখাচ্ছে, মা কি খুশী, আমার ছেলে কি সুন্দর ছবি এঁকেছে। কিন্তু বাকিরা কেউ কি ছবির প্রশংসা করছে? কিন্তু সত্যিকারের কিছু একটা করলে লোকেরা তাকে মানবে। সত্যিকারের জিনিসগুলো যে যত বেশি কর করবে, তত বেশি লোকেরা তাকে মানবে। বড় কবি, বড় চিত্রকর, তাঁরা শুধু একটা জিনিসকে নিয়েই বড় করে করেন না, অনেক কিছু জিনিস তাঁরা পারেন। বড় বড় মিউজিসিয়ানরা একটা গানকেই যে সুন্দর ভাবে গাইতে পারেন, তা না, অনেক ভাবে গাইতে পারেন, কারণ তাঁর হাজার হাজারটা রাগের উপর দখল আছে। এই জিনিসটা কিভাবে হয়? স্বামীজী যে reasonএর কথা বলছেন, প্রথমে তাকে ওই বিষয়ের উপর পুরো কর্তৃত্ব অর্জন করতে হবে। আমরা যখনই বলছি creativity, তখন আমরা মনে করছি আমাকে নূতন একটা কিছু করতে হবে, একটা দাগ রেখে যেতে হবে। কিন্তু তার আগে আমাকে ওই বিষয়ের উপর দখল কায়েম করতে হবে, তার সাথে বিচার করে করে বুদ্ধিকে খুব সূক্ষ্ম করতে হবে। সত্যিকারের creativity হল, যে ফিল্ডে সে গেছে তার পুরোটা সে জানে, এরপর সে ওখান থেকে এক পা বাইরে চলে যাচ্ছে। এই এক পা বাইরে যাওয়াটাকে বলে inspiration। এক পা বাইরে যাওয়াতে কি হবে? ওই ফিল্ডের যে এক বিশাল জ্ঞানের ভাণ্ডার আছে, তার মধ্যে তাঁরটাও যোগ হয়ে গেল। এরপর যারাই ওই ফিল্ডে আসবে তখন তাদেরকেও তাঁকে পড়তে হবে।

Reason helps inspiration, স্বামীজী এখানে দুটোকেই একসাথে নিচ্ছেন। জাগতিক ক্ষেত্রে বড় বড় বৈজ্ঞানিকরা তাঁদের নিজের সমস্ত বিষয়টাকে জানেন, না-হলে দেখা যাবে যেটা বার করলেন, সেটা আগেই কেউ বার করে রেখেছেন। তার থেকেও আর জঘন্য হবে, আগেকার বড়রা যে ভুল করে গেছেন, তিনিও সেই ভুল পথে গিয়ে আটকে যাবেন। বুদ্ধিকে খুব সূক্ষ্ম ও ধারালো করলে সেই ক্ষমতাটা আসে, যেখানে সে নূতন কিছু করতে পারবে। আধ্যাত্মিক জগতে যে জ্ঞানরাশি আছে, যেমন ঠাকুরের ভক্তকে হয়ত দশটা বই পড়তে হবে না ঠিকই, কিন্তু কথামৃত তাকে অবশ্যই পড়তে হবে। কথামৃত শুধু পড়ে গেলেই হবে না, খুব বিচার করতে হবে। অধ্যয়ন আর বিচার করতে করতে মনটা এবার সূক্ষ্ম হয়ে গেল। এই দুটো অতীন্দ্রিয় জ্ঞান পাওয়ার পথে আমাদের বিরাট সাহায্য করবে।

আগেকার দিনের ঋষিদের যত অতীন্দ্রিয় জ্ঞান ছিল, সেটাকেই আমরা বেদ বলছি, সেটাকেই এবার স্বামীজী বলছেন, books and realized reason, or individualized perception – both are proofs of God, বেদ হল প্রমাণ, বেদ বলছে ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বর আছেন। ঠাকুর বেদ পড়েননি, কিন্তু তিনি তোতাপুরী বা অনেকের কাছ থেকে শাস্ত্রের কথা শুনেছেন, সেখান থেকে তাঁর অনুভূতি হয়েছে, individualized perception, দুটোই কিন্তু ঈশ্বরের প্রমাণ। যেমন মহম্মদ, তিনি আগেকার কোন বই পড়েননি। মক্কাতে ছিলেন, সেখানে অনেক ধরণের লোক থাকত, জুইসরা ছিল, খ্রীশ্চানরাও ছিল, তাদের কাছ থেকে তিনি অনেকগুলো কথা শুনেছিলেন, কিন্তু মহম্মদের যে perceiption ওটা individualized। দুটোই ঈশ্বরের যে অস্তিত্ব, তার প্রমাণ। বইও প্রমাণ, কারণ আগে আগে যে ঋষিরা ছিলেন তাঁদের জ্ঞান ওই বইতে রয়েছে, ওগুলো নিজে অধ্যয়ন করেই হোক বা কারুর মুখে শুনেই হোক, সেখান থেকে যে উপলব্ধি হবে, সেটাই individualized perception।

শঙ্করের দৃষ্টিভঙ্গীতে বেদ

The Vedas are, according to him, a sort of incarnation of universal knowledge. (*শঙ্করের মত বেদ একপ্রকার অনন্ত জ্ঞানের সাকার বিগ্রহ-স্বরূপ।*) ভগবান বুদ্ধ যেমন বলছেন বেদকে ফেলে দিতে, শঙ্করাচার্যের কাছে তা না, তিনি বলছেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে জ্ঞানরাশি, যার মধ্যে এই সংসার চলছে সেই জ্ঞান, যার দ্বারা ঈশ্বরকে জানা যায় সেই জ্ঞান, আর যতটুকু ঋষিরা জেনেছেন, কারণ ঈশ্বর অনন্ত তাই ঈশ্বরকে কোন দিন জানা যাবে না, সেই জ্ঞান যখন মূর্ত রূপ নেয় সেটাই হয়ে যাবে বেদ। বিদ্যার যদি কোন মূর্ত রূপ হয়, সেই রূপই হয়ে যাবেন সরস্বতী, তেমনি ঐশ্বর্যের মূর্ত রূপ যদি হয়ে যায়, সেই রূপটাই হবেন লক্ষ্মী। ঠিক তেমনি সমস্ত জ্ঞানরাশির মূর্ত রূপ কি হবে? বেদ, বেদ সেইজন্য ভগবান নিজে। অখণ্ড সচ্চিদানন্দের মূর্ত রূপ ভগবান বিষ্ণু। আসলে কিন্তু সবাই নৈর্ব্যক্তিক, কিন্তু আমাদের মস্তিষ্ক নৈর্ব্যক্তিককে নিতে পারে না, তাই সবটারই একটা মূর্ত রূপ এসে যায়, সব কিছুকে আমরা ব্যক্তি রূপে সামনে নিয়ে আসি। স্বামীজী তাই বলছেন, আচার্য শঙ্কর বেদকে জ্ঞানরাশির মূর্ত রূপে দেখতেন।

স্বামীজী তারপরে বলছেন, The proof of God is that He brought forth the Vedas, and the proof of the Vedas is that such wonderful books could only have been given out by Brahman. (*বেদের প্রমাণ এই যে, তা ব্রহ্ম হতে প্রসূত হয়েছে, আবার ব্রহ্মের প্রমাণ এই যে, বেদের মতো অদ্ভূত গ্রন্থ ব্রহ্ম ব্যতীত আর কারও প্রকাশ করবার সাধ্য নেই।*) ব্রহ্মসূত্রের তিন নম্বর সূত্র *শাস্ত্রযোনিত্বাৎ*, এর দুটো ব্যাখ্যা হয়। বেদ ভগবান রচনা করেছেন, আর বেদের এমন জ্ঞানরাশি, তার মানেই ভগবান আছেন। অন্য দিকে বেদ এত উচ্চমানের গ্রন্থ, সেই বেদ যখন বলছে ঈশ্বর আছেন, তার মানে ঈশ্বর আছেন। বেদের মত গ্রন্থ ভগবানের নিঃশ্বাসের সাথে অনায়াসে বেরিয়েছে, সমস্ত জ্ঞানরাশি ভগবান, আর সচ্চিদানন্দই ভগবান। অন্য দিকে আরেকটা অর্থ হতে পারে, বেদে ঈশ্বরীয় কথা বলা হয়েছে, সেইজন্য ভগবান আছেন। কথামৃত যদি কেউ খুব গভীর ভাবে পড়ে থাকেন, তাহলে তাঁর মনে হবে, কথামৃতে যিনি এই ধরণের কথাগুলো বলেছেন তিনি ভগবান ছাড়া আর কিছু হতে পারেন না। অন্য দিকে কথামৃতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ঠাকুর যেন ভগবান। যাঁরা কথামৃতকে সর্বোপরি মেনে চলেন, তাঁরা বলবেন, দেখো কথামৃতের পাতায় পাতায় আছে ঠাকুর ভগবান। অন্য দিকে, যাঁর মুখ থেকে এই কথাগুলো বেরিয়েছে, তিনি ভগবান ছাড়া আর কিছু হতে পারেন না। এই যে আমরা এখানে দেববাণী অধ্যয়ন করছি, আমাদের কাছে খুব কঠিন মনে হচ্ছে, কিন্তু এটা বোঝা যাচ্ছে যে, স্বামীজী একটা বিরাট কিছু। যাঁরা বেদ অধ্যয়ন করেন তাঁরা জানেন বেদ একটা সাংঘাতিক কিছু। বেদ কোথা থেকে এসেছে? বলছেন, ভগবানের নিঃশ্বাস থেকে এসেছে। তাহলে ভগবান সাংঘাতিক কিছু হবেন। সাধারণ মানুষের মুখ থেকে এই ধরণের কথা বেরোতে পারে না। এই যে আমরা দেববাণী পড়ছি, এই একটা বইতেই বোঝা যায় স্বামীজী সাধারণ কিছু নন। এবার এই যুক্তিকে আমরা সরিয়ে দিয়ে অন্য দিক দিয়ে দেখছি।

হিন্দুরা বেদকে সর্বোপরি মনে করে, সেই বেদ যাঁর নিঃশ্বাস থেকে বেরিয়েছে, তিনি ভগবান ছাড়া কেউ হতে পারেন না। ঠিক তেমনি দেববাণীতে যে ধরণের কথা যাঁর মুখ থেকে বেরিয়েছে, তিনি কোন সাধারণ কেউ নন। অন্য দিকে যদি কেউ প্রশ্ন করে, ভগবান আছেন কিনা? হ্যাঁ আছেন, কারণ আমরা বেদ মানি, বেদে বলছে ভগবান আছেন। অনেকে আবার প্রশ্ন করে, বিজ্ঞান কি ভগবান মানে? তার বিজ্ঞানে এত বিশ্বাস যে, বিজ্ঞান যদি ভগবানকে মানে তবে সে ভগবানকে মানবে। একজন এসে ঠাকুরকে বলছেন, মহাশয় গীতা বইটা পড়লুম, খুব ভাল বই। ঠাকুর শুনে বলছেন, তোমাদের খবর কাগজে বেরিয়েছে বুঝি। কারণ খবর কাগজে যদি বেরোয় তবেই সেটাকে মানুষ সত্য বলে মনে করবে, তা নাহলে সত্য হবে না। খবর কাগজ হল তাদের আধার, গীতার খবর যদি খবরের কাগজে বেরিয়ে থাকে, তবে ওটা ঠিক। আমাদের কাছে প্রমাণের একটা আধার থাকবে। হিন্দুদের কাছে প্রমাণের আধার হল বেদ, সেই বেদ হল জ্ঞানের উৎস, সেই বেদ বলছে ভগবান আছেন, তাই ভগবান আছেন।

এই কথা স্বামীজীও বলছেন, They are the mine of all knowledge, and they have come out of Him as a man breathes out air, therefore we know that He is infinite in power and knowledge। (*বেদ সর্বপ্রকার জ্ঞানের খনিস্বরূপ; আর মানুষ যেমন নিঃশ্বাসের দ্বারা বায়ু*

বাইরে প্রক্ষেপ করে, সেইরূপ বেদও তাঁর ভিতর থেকে প্রকাশিত হয়েছে; সেইজন্য আমরা জানতে পারি, তিনি সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ।) তার সাথে বলছেন, He may or may not have created the world, that is a trifle, to have produced the Vedas is more important, (*তিনি জগৎ সৃষ্টি করে থাকুন বা না থাকুন, তাতে বড় কিছু আসে যায় না; কিন্তু তিনি যে বেদ প্রকাশ করেছেন, এইটেই বড় জিনিস।*) স্বামীজী আরও বেশি মূল্যবান কথা বলছেন, ভগবান আদৌ সৃষ্টি করেছেন, কি করেননি, এটা কিছুই না। সৃষ্টি সাধারণ ব্যাপার, মানুষও একটা বাড়ি বানিয়ে দিতে পারে, কিন্তু জ্ঞান লাভ করা অত সহজ নয়। ভগবানের আশ্চর্য কাণ্ড কি? তাঁর নিঃশ্বাস থেকে বেদ বেরিয়েছে।

ছাপড়ার ডিভিশনাল কমিশনার, যিনি একজন সিনিয়র আইএএস অফিসার, তিনি মঠের ভক্ত ছিলেন। ছাপড়ার রামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষকে তিনি বলতেন, যিনি আবার তার বন্ধুও ছিলেন, ‘স্বামীজী সেক্রেটারী হয়ে আপনি সারা জীবনে যত কটা বাড়ি বানাবেন, আমার একজন বিডিও এক বছরে তার থেকে বেশি বাড়ি বানায়। আপনারা কি বিল্ডিং বানাচ্ছেন, সেটা দেখার জন্য আমি এখানে আসি না। আপনি সন্ন্যাসী, আপনার আত্মজ্ঞান হয়েছে কিনা দেখার জন্য আসি। আত্মজ্ঞান যদি নাও হয়ে থাকে, তার থেকে একটু নীচে শাস্ত্রের বক্তব্য আপনি আমার কাছে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিতে পারছেন কিনা’। ওনার বক্তব্য হল, জাগতিক কাজ করাটা এমন আহামরি কিছু না, কঠিন হতে পারে, কিন্তু জ্ঞান অর্জনের কাছে ওটা কিছুই না। টাকা আয় করা আহামরি কিছু না, যুদ্ধের ময়দানে লড়াই করা অনেক কঠিন। সেইজন্য আমাদের এখানে শূদ্রদের স্থান অনেক নীচে দেওয়া হয়েছিল। শরীর দিয়ে অনেকেই কাজ করে দিতে পারে, কিন্তু টাকা রোজগার করা অনেক কঠিন। প্রাণ দেওয়া আর প্রাণ নিয়ে নেওয়া আরও বেশি কঠিন। জ্ঞান অর্জন করা অসম্ভব। সেইজন্য ব্রাহ্মণরা সব সময় শ্রেষ্ঠ, যে কেউ যদি জ্ঞানের প্রতি নিজেকে নিয়ে যায়, সে সব সময় শ্রেষ্ঠ। স্বামীজী তাই বলছেন, হে ভগবান, তুমি ঈশ্বর হয়ে এই জগতের সৃষ্টি করেছ কি করোনি তাতে এমন কিছু চমৎকারিত্ব নেই, কিন্তু তোমার নিঃশ্বাসে বেদে বেরিয়ে আসছে, এটাই তোমার চমৎকারিত্ব। স্বামীজী বেলুড় মঠে কি করেছেন? একটা জমি কিনেছিলেন, বাকি সব কিছু তাঁর পরেই হয়েছে। কিন্তু তিনি যে জ্ঞানরাশি দিয়ে গেছেন, যত দিন যাচ্ছে, যত আমরা ওই জ্ঞানরাশির দিকে এগোচ্ছি তত আমরা অবাক হয়ে যাচ্ছি।

স্বামীজী বলছেন, The world has come to know God through the Vedas; no other way there is. (*বেদের সাহায্যেই জগৎ ব্রহ্ম-সম্বন্ধে জানতে পেরেছে –তাঁকে জানবার আর অন্য উপায় নেই।*) বেদ যদি সত্যিই না থাকত মানুষ ঈশ্বরকে কোন দিন জানতেও পারত না। আমরাও মনে করি, ঠাকুর যদি না আসতেন, কথামৃত যদি রচিত না হত রামকৃষ্ণ মিশনের বেশীর ভাগ সন্ন্যাসী সন্ন্যাসের পথে, অর্থাৎ ত্যাগের পথে আসতে পারতেন না। কেবলমাত্র সন্নাসীরাই না, ঠাকুর না এলে ঈশ্বরীয় কথা, হিন্দু ধর্মের কথা, হিন্দু ধর্মকে ঠিক ঠিক ভাবে বোঝা যেত না, ঠাকুর এলেন তাই আজ জানা গেল হিন্দু ধর্ম কি। ঠিক তেমনি জগৎকে দেখে ঈশ্বরকে বিশ্বাস নাও হতে পারে, কিন্তু বেদ, বেদের জ্ঞানরাশি দেখে মানুষ হতবাক হয়ে বলবে, ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বরকে আমার জানতে হবে।

আমরা অনেকবার আলোচনা করেছি, বেদ কিভাবে হিন্দুদের কাছে শেষ কথা, বেদই আমাদের প্রমাণ। এমনিতেও অনেক প্রাচীন গ্রন্থে ‘বেদপ্রমাণ’, এই শব্দটা প্রায়ই ব্যবহার হতে দেখা গেছে। স্বামীজী এটাকে খুব মজা করে বলছেন, And so universal is this belief, held by Shankara, in the all-inclusiveness of the Vedas that there is even a Hindu proverb that if a man loses his cow, he goes to look for her in the Vedas. (*শঙ্করের এই মত, অর্থাৎ বেদ সমুদয় জ্ঞানের খনি। এটা সমগ্র হিন্দুজাতির এমন মজ্জাগত হয়ে গেছে যে, তাদের মধ্যে একটা প্রবাদ এই যে, কারুর গরু হারালেও বেদে তা খুঁজে পাওয়া যায়।*) বেদপ্রমাণকে এত চরম পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যে, যদি কারুর গরু হারিয়ে গিয়ে থাকে, তাকে বলা হবে, বেদে খোঁজ করে দেখ গরু পেয়ে যাবে। হিন্দুধর্মের লোকেরা যখন জ্ঞানরাশিকে নিয়ে আলোচনা করে, তখন এমন ভাবে দেখানো হয় যে, বেদেই সমস্ত কিছু আছে। এটা একটা বোঝানর জন্য বলা হয়ে থাকে। বেদের জ্ঞান কত গভীর জ্ঞান, এই গভীরতাকে বোঝানর জন্য যখন আমরা জ্ঞানরাশি বলি, তখন ওই গভীরতাটা পাল্টে গিয়ে বিস্তারে চলে যায়। বেদের কোথা থেকে একটা মন্ত্র বার

করে এখন বলা হচ্ছে, আলোর গতি কত সেটাও নাকি বেদে বলা হয়েছে। বলতে চাইছেন, যাবতীয় যা কিছু আছে সব বেদে আগে থেকেই আছে। ঋষিদের বক্তব্য ছিল এটাই, বেদের জ্ঞান গভীর। স্বামীজী বাঙাল ভাষায় মজা করে বলতেন, 'ব্যাদে' কি আছে, আসলে বলতে চাইছেন এই ব্যাপারে বেদের কি বক্তব্য। মনুস্মৃতিও বেদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলছেন, বেদ হল শ্রুতি বাকি সমস্ত গ্রন্থ স্মৃতি। কোন কারণে যদি দেখা যায় বেদ এক রকম কথা বলছে আর স্মৃতি অন্য রকম কথা বলছে, সেখানে বেদের কথাকেই রাখতে হবে। এই হল ব্রহ্মসূত্রের তিন নম্বর সূত্র *শাস্ত্রযোনিত্বাৎ*এর ব্যাখ্যা।

এরপর স্বামীজী বলছেন, Shankara further affirms that obedience to ceremonies is not knowledge. Knowledge of God is independent of moral duties, or sacrifice of ceremonies, or what we think or do not think, just as the stump is not affected when one man takes it for a ghost and another sees it as it is. (*শঙ্কর আরও বলেন, কর্মকাণ্ডের বিধিনিষেধ মেনে চলাই জ্ঞান নয়। ব্রহ্মজ্ঞান কোনপ্রকার নৈতিক বাধ্যবাধকতা, যাগযজ্ঞাদি-অনুষ্ঠান বা আমাদের মতামতের উপর নির্ভর করে না; যেমন একটা স্থাণুকে একজন ভূত মনে করছে বা অপর একজন স্থাণু জ্ঞান করছে, তাতে স্থাণুর কিছু আসে যায় না।*) বেদ হল জ্ঞানরাশি, খুব একটা সহজ উপমা নিলে জিনিসটা বোঝা যাবে। ঠাকুর বলছেন কেউ দুধের কথা শুনেছে, কেউ দুধ দেখছে আর কেউ দুধ খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে। যে দুধের কথা শুনেছে তারও একটা দিকে ভাল হয়েছে, যে দুধ দেখেছে তারও একটা দিকে ভাল হয়েছে, কিন্তু ঠিক ঠিক ভাল হল, যে দুধ খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে। দুধ খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হতে হয়, যার এই ব্যাপারটা জানা নেই, সে কোথাও এক গ্লাশ দুধ পেল, পাওয়ার পর দুধটা সুন্দর করে সাজিয়ে রেখে দিয়ে দুধের গ্লাশকে রোজ সকাল বিকাল ধূপধুনো দিচ্ছে, সন্ধ্যাবেলা আরতি করছে। অনেক আগে বলা হয়েছিল, আমরা যখন বাইরে পূজা করি তখন আমাদের ভিতরে শ্রদ্ধা ভক্তি একটু বাড়ে, তার বেশি কিছু হয় না। অন্য দিকে যে মুর্খ সে সেই মুর্খই থেকে যাবে। বেদ, উপনিষদ, গীতাকে নিয়ে আমরা হিন্দু ধর্মের সবাই ঠিক তাই করে যাচ্ছি। বেদ এখন আর সবার বাড়িতে দেখতে পাওয়া যায় না, আগে যখন থাকত তখন বেদকে লাল শালু দিয়ে মুরে সুন্দর করে বেঁধে রাখত, এখন গীতাকেও সবাই ওভাবেই বাড়িতে রেখে ধূপধুনো দিচ্ছে, ফুল দিচ্ছে। দুধ না খেয়ে দুধের গ্লাশের পূজা করা আর গীতাকে লাল শালু দিয়ে মুরে পূজা করার মধ্যে কোন তফাৎ নেই। পূজা উপাচারেরও একটা সাংঘাতিক দাম আছে, উপাচার আমাদের প্রস্তুতি করিয়ে দেয়। কিসের জন্য প্রস্তুতি? ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্য।

রিচার্ড ফাইনম্যানের একটা সুন্দর বর্ণনা আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আফ্রিকার আদিবাসী অধ্যুষিত প্রত্যন্ত এক দ্বীপে আমেরিকানরা একটা যুদ্ধঘাঁটি বানিয়েছিল। সেখানে একটা এয়ারপোর্ট তৈরী করা হয়েছে, একটা কন্ট্রোল রুম বসানো হয়েছে, কন্ট্রোল রুমে হেডফোন লাগিয়ে বসে থাকে, হেডফোনে এ্যরিয়াল লাগানো আছে, ওখানে এ্যরোপ্লেন নামছে, এ্যরোপ্লেন থেকে বেরিয়ে আসে প্রচুর খাদ্য দ্রব্য, কারণ আদিবাসীদের খুশী রাখতে হবে। আদিবাসীরা অবাক হয়ে সব কিছু দেখে। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল, আমেরিকানরা ফিরে গেল, এয়ারপোর্টটা এখনও পরে আছে, ঝুপড়ির মত কন্ট্রোল রুমটাও পরে আছে, কিন্তু এ্যরোপ্লেন আর ওঠানামা করে না। তখন আদিবাসীদের কয়েকজন বয়স্ক মানুষরা ঠিক করল, ওরা যে রকম করত, আমাদেরও সেই রকম করতে হবে, তাহলেই আমাদের এখানে ওই জিনিসটা (অর্থাৎ এ্যরোপ্লেন) আবার নামবে, আমাদের খাবার আসবে। গ্রামের একজন মোড়ল গোছের লোক দুটো ঢাকনা নিয়ে, একটা কাঠি লাগিয়ে ওখান থেকে বিড় বিড় করে বলে যাচ্ছে। আমেরিকনরা যা যা করত, ওরাও ঠিক সেইভাবে চেষ্টা করছে কবে আবার ওই জিনিসটা এখানে নামবে, তাহলে আমাদের খাবার আসবে। দিনের পর দিন ওরা এটা করে যাচ্ছে, কিন্তু প্লেন আর আসে না। পূজা উপাচার আর উপলব্ধির মধ্যে ঠিক এই তফাৎ। এই ঘটনাটা সত্যি এবং ফাইনম্যান খুব দুঃখ করে এই ঘটনাটা লিখেছেন। এই অর্থে পূজা উপাচার একেবারেই অর্থহীন হয়ে যায়।

স্বামীজী আচার্য শঙ্করের ব্যাখ্যাকে নিয়েই বলে যাচ্ছেন, শঙ্করাচার্য বেদের উপর জোর দিচ্ছেন, বেদ হল জ্ঞানরাশি, পূজা উপাচারের জন্য বেদ নয়। কথামৃত, বেদ, গীতা, উপনিষদ লাল শালু দিয়ে মুরে ফুল-চন্দন, ধূপ দিয়ে পূজা করার জন্য নয়, এর জ্ঞানরাশিকে জীবনে লাগিয়ে ঈশ্বর লাভ করে মানবজীবনকে ধন্য

করার জন্য। অবতারা এসে ঠিক এই কাজই করেন, তাঁরা এসে লোকশিক্ষার জন্য শাস্ত্রকে নিজের জীবনে প্রতিফলিত করে মানুষকে দেখিয়ে দেন, শাস্ত্র ফুল চন্দন দিয়ে পূজা করার জন্য নয়, শাস্ত্রকে যতক্ষণ তোমার জীবনে না লাগাতে পারছ, তত দিন তুমি এই জগতে সংসারের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকবে। শাস্ত্রের বাক্যকে অনুসরণ করে তুমি এই সংসার থেকে বেরিয়ে এসে আত্মা বা ঈশ্বরের সাক্ষাৎ কর। অবতাররা এটাই বলতে আসেন, শুধু চরণামৃত, বাতাসা প্রসাদ আর খিচুরি প্রসাদ খেয়ে গেলেই তোমার সব কিছু হয়ে যাবে না।

কিন্তু গীতাতে যে ভগবান বলছেন, *যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ*, যজ্ঞ যখন হয় তখন তার যে অবশিষ্ট থাকে সেটাকে প্রসাদ রূপে খেলে শরীর শুদ্ধ হয়। এখানে ভগবান বলতে চাইছেন, যা কিছু খাওয়া-দাওয়া করবে সেটা সব সময় ঈশ্বরকে নিবেদন করে গ্রহণ করবে, আর যেটাই খাবে মনে মনে ভাববে, আমার ভিতরে যে জঠরাগ্নি আছে সেখানে আমি আহুতি দিচ্ছি, এই অর্থেই ভগবান গীতাতে এই কথা বলছেন। যদি কেউ মনে করে, আমি যাই করি, তার থেকে অতটুকু দিয়ে দিলেই আমার সব হয়ে যাবে, না তা হবে না। এই জিনিসটাকে স্বামীজী এবার শঙ্করাচার্যের কথা দিয়ে বলছেন, যজ্ঞযাগ করাটা জ্ঞান নয়। বেদে যে বিধিনিষেধের কথা বলা হয়েছে, সেই বিধিনিষেধকে আমি মানছি কি মানছি না, তার সাথে জ্ঞানের কিছু আসে যায় না। আমাদের চিন্তা-ভাবনার উপর, কোন নৈতিক বাধ্যবাধকতার উপর জ্ঞানরাশি নির্ভর করে না। নিউটন যদি মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম না বার করতেন, তাও আপেল গাছ থেকে পড়লে উপরের দিকে না গিয়ে নীচেই পড়ত। অর্কিমিডিস যদি বোয়েনসির নিয়ম বার না করতেন তাও ধুয়ো উপরের দিকেই যেত। রাস্থা দিয়ে যাওয়ার সময় অন্ধকারে একটা ঝোপ দেখছি, ওই ঝোপ দেখে আমি কি ভাবছি, আমি তাকে একটা মানুষ ভাবছি, নাকি চোর ভাবছি তাতে ঝোপের কিছু যায় আসে না, যতক্ষণ না জানছি এটা একটা জঙ্গলের ঝোপ। স্বামীজী এটাই বলছেন, ঝোপটা স্থানু, আমি কি ভাবছি না ভাবছি তাতে ওই স্থানুর কিছু আসে যায় না। আমরা হলাম মন, মন হওয়ার জন্য অপরে আমার ব্যাপারে কি ভাবছে এই ভেবে চঞ্চল হয়ে যাই। কিন্তু যেটা স্থানু, তার কিছু আসে যায় না। আর যিনি স্থানুর মত, তাঁরও কিছু আসে যায় না। ভগবানের একটা নাম স্থানু, স্থানু যেটা নড়াচড়া করতে পারে না, ভগবান সর্বব্যাপী তাই তাঁর নড়াচড়া করার জন্য যে জায়গা দরকার সেই জায়গাটাই নেই। যিনি সর্বব্যাপী তিনি যাবেনটা কোথায়, তাঁর তো কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। কে হিন্দু, কে মুসলমান, কে খ্রীশ্চান তাতে ঈশ্বরের ভারি বয়ে গেছে, তিনি স্থানু, তাঁর কাছে সব এক। জ্ঞানরাশিও ঠিক তেমনি সর্বব্যাপী, আমরা জ্ঞানকে কিভাবে দেখছি তাতে জ্ঞানের কিছু আসে যায় না, জ্ঞান জ্ঞান। সেইজন্য বলছেন এইসব উপাচারের কোন দাম নেই, দাম হল জ্ঞানের, ওই জ্ঞানকে আহরণ করে কাজে লাগাতে হবে।

Vedanta is necessary because neither reasoning nor books can show us God. (*বেদান্তবেদ্য জ্ঞান আমাদের বিশেষ প্রয়োজন, কারণ বিচার বা শাস্ত্রদ্বারা আমাদের ব্রহ্ম উপলব্ধি হতে পারে না।*) এবারে স্বামীজী বেদান্তকে বিজ্ঞান রূপে পরিভাষিত করছেন। যদি কেউ সারা জীবন বেদ অধ্যয়ন করে যায়, বেদ তাকে জ্ঞান দিতে পারবে না। সারা জীবন বিচার করে যাচ্ছে, চিন্তন করে যাচ্ছে, তাও কিন্তু জ্ঞান আসবে না। একমাত্র বেদান্তের সিদ্ধান্ত বাক্যগুলি শেষে গিয়ে যখন টোকা মারে, অর্থাৎ শাস্ত্র অধ্যয়ন করল, চিন্তন-মনন করল, করে মনটা তৈরী হয়ে গেল, তখন বেদান্তের জ্ঞান যখন টপ করে পড়ে তখনই জ্ঞান হয়, সেইজন্যই বেদান্তের দরকার। He is only to be realized by superconscious perception, and Vedanta teaches how to attain that. (*তাঁকে সমাধি দ্বারা উপলব্ধি করতে হবে, আর বেদান্তই ওই অবস্থা লাভের উপায় দেখিয়ে দেয়।*) বেদে যে এত স্তব-স্তুতি রয়েছে কিন্তু বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষদ আর আচার্য শঙ্করের মত যাঁরা এর ভাষ্যগুলি রচনা করেছেন, স্বামীজীর মত পুরুষরা যে ভাষ্যগুলির কথা বলেছেন, এনাদের কথাগুলোই হল practical method, যেটা দিয়ে মানুষ ওই সত্যে পৌঁছাতে পারে। কিন্তু তাই বলে বেদের কোন দরকার নেই বলা যাবে না, অবশ্যই দরকার আছে। কিছু বছর আগে পর্যন্ত প্রত্যেক পরিবারে তার প্রত্যেক সদস্যের ঈশ্বরের সাথে তার নিজস্ব একটা সম্পর্ক থাকত, সেই ভাবটা ইদানিং নেই। আগেকার দিনে একজন স্ত্রী তার স্বামীর সাথে এক বিশেষ সম্পর্ক নিয়ে জীবন চালাত, সেখানে তখন স্ত্রী পরিবারের সবারই সাথে কথা বলত, সবার জন্য সব কিছু করত, কিন্তু স্বামীর সাথে একটা বিশেষ সম্পর্ক। ঠিক তেমনি প্রত্যেক হিন্দুর ঈশ্বরের সাথে তার এক বিশেষ সম্পর্ক থাকে। বিশেষ সম্পর্কটা, কুলধর্ম, জাতিধর্ম ও বর্ণধর্ম

দিয়ে এসে তার নিজস্ব একটা ব্যক্তিগত ধর্ম জীবন তৈরী হয়ে যায়, যেটা তার ভাব। এই ভাবই তাকে ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, আর ওই ভাবই তাকে আপদ-বিপদ থেকে রক্ষা করে।

গীতায় ভগবান বলছেন, *ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে*। তপস্যা কি? ভাবকে শুদ্ধ করা। ভাবটা কি? আমার সাথে ঈশ্বরের যে বিশেষ সম্পর্ক, সেটাকে বলা হয় ভাব। এখন প্রথমে আমাকে বুঝতে হবে, ঈশ্বরের সাথে আমার ভাবটা কি। ঠাকুরও অনেককে জিজ্ঞেস করতেন, তোমার কি ভাব? এই ভাব জিনিসটাই হিন্দু ধর্মকে শক্তিশালী করেছিল, যার জন্য মুসলমানরা, খ্রীশ্চানরা এসে সবাইকে ধর্মান্তরিত করতে পারল না। তখনকার দিনে এই ভাব তৈরী করার জন্য পরিবার থেকে, কুলপুরোহিতদের কাছে থেকে অনেক সাহায্য পাওয়া যেতে। কিন্তু এখন ঘরে ঘরে এই জিনিসটার অভাব হয়ে গেছে। যে জিনিসগুলো হিন্দু ধর্মকে বাঁচাবে সেই জিনিসগুলোই কেউ করছে না, বাকি সব কিছুই করছে। আমাদের এখন একটা কোন systematic methodology নেই যেটাকে অনুসরণ করে আমাদের নূতন প্রজন্ম আসছে তারা ঈশ্বরের সাথে একটা ভাব তৈরী করতে পারবে। ফলে আমাদের সবাইকে ভুগতে হচ্ছে। স্বামীজী বলছেন, He is only to be realized by superconscious perception, and Vedanta treaches how to attain that, বেদান্ত ঠিক এই কাজটাই করে, ঈশ্বরের সাথে এই ভাবটা আমাদের তৈরী করে দেয়। ঠাকুর বলছেন, ভক্তি থেকে ভাব, ভাব থেকে মহাভাব, মহাভাব থেকে প্রেম, উপরে ওঠার কতগুলো ধাপ। একটা সাধারণ যে ভক্তি, যে ভক্তি করতে চাইছে, তাকে ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে দেওয়া হচ্ছে না, ভাব আসবে কোথা থেকে! গ্রাম দেশে একটা কথা প্রচলিত ছিল, গরুকে যদি খেতে না দাও, অপরের ক্ষেতে গিয়ে সে ঘাস খাবেই। তুমি যদি কোন ভাব নিতে না পার, ঈশ্বরের সাথে একটা কোন সম্পর্ক যদি স্থাপন না করতে পার, তখন যেখান থেকে যে ভাব পাবে সে ওদিকে যাবেই। সে তখন আর ঈশ্বরের জন্য যাচ্ছে না, যাচ্ছে অন্য কারণে। মানুষের জন্য বেদান্ত ঠিক এই কাজ করে দেয়, সে ভাব সৃষ্টি করে দেয়, সৃষ্টি করে দিয়ে তাকে উৎসাহিত করে বলে দেয়, সমাধিতে যে জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞান যেন তোমারও আসে।

এবার স্বামীজী খুব জোর দিয়ে বলছেন, You must get beyond personal God (Ishvara) and reach the Absolute Brahman. (*আমাদের সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের ভাব অতিক্রম করে সেই নির্গুণ ব্রহ্মে পৌঁছাতে হবে।*) সগুণ ঈশ্বরকে পেরিয়ে তোমাকে অদ্বৈত জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হতেই হবে। স্বামীজী এখানে আচার্য শঙ্করকে আধার করে বলছেন, কিন্তু ভক্তিশাস্ত্রে এনারা সব সময় এই কথা বলেন, যাঁরা সগুণ ঈশ্বরের আরাধনা করেন, তাঁরা ঈশ্বরকে ভক্তি করে ঈশ্বরের সাথে এক হয়ে যান, আর ঈশ্বরের এই সৃষ্টি যখন শেষ হয়ে যাবে, অর্থাৎ যখন মহাপ্রলয় হয়ে সব কিছুর লয় হয়ে যাবে তখন তাঁদেরও মুক্তি হয়ে যাবে। ততদিন তাঁরা ঈশ্বরের সাথে এক থাকেন। কিন্তু আচার্য শঙ্করের মতকে আধার করে স্বামীজী মাঝে মাঝে বলছেন, সগুণ ঈশ্বরকে ছেড়ে তোমাকে অদ্বৈতে যেতে হবে। মূল বক্তব্য হল, জ্ঞানরাশি আর ঈশ্বর, এই দুটোর মাঝখানে কোথাও একটা যোগ আছে। সেই জ্ঞানরাশি বেদ রূপে আমাদের সামনে আছে। বেদের এই জ্ঞানরাশিকে আমরা যদি যজ্ঞযাগ, পূজা, উপাচারে নামিয়ে আনি, তাহলে কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। আমাদের উদ্দেশ্য হল, ওই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। ঠাকুর বলছেন, সিদ্ধি সিদ্ধি বললে সিদ্ধির নেশা হবে না, গায়ে সিদ্ধি ঘষলেও সিদ্ধির নেশা হবে না। সিদ্ধি আনতে হবে, এনে সিদ্ধিকে বাটতে হবে, তারপর সেই সিদ্ধি খেলে তবে গিয়ে নেশা হবে। এই কথা শুধু স্বামীজীই বলছেন না, আচার্য শঙ্করেরও একই মত। আচার্য শঙ্কর যা বলছেন, ঠাকুরও আবার সেই একই কথা বলছেন।

ব্রহ্মকে আমরা দিনরাত অনুভব করছি

ব্রহ্মসূত্রকে আধার করে স্বামীজী পর পর বলে যাচ্ছেন। ব্রহ্মসূত্র কি, এর উপর আমরা আগে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছি। যে কোন গ্রন্থ দু-ভাবে লেখা হয়, কিছু গ্রন্থ আছে যেখানে কথাগুলিকে পর পর সাজিয়ে লেখা নেই, যেমন কথামৃত সাজিয়ে লেখা নেই, স্বামীজীর রচনাবলীও সাজিয়ে লেখা নেই, কিন্তু স্বামীজীর কর্মযোগ পুরো সাজিয়ে লেখা, স্বামীজীর রাজযোগও সাজিয়ে লেখা। একটা গ্রন্থ সাজিয়ে লেখা, আরেক ধরণের গ্রন্থ হল, যেখানে জ্ঞান ঢেলে দেওয়া হয়েছে। কথামৃতে জ্ঞান ঢেলে রাখা আছে। যেখানে জ্ঞান ঢেলে দেওয়া রয়েছে, সেখানে তখন সব কথাগুলিকে সাজিয়ে উপস্থাপিত করার জন্য আরেকটা বই লিখতে

হয়, যেখানে পুরো জিনিসটাকে গুছিয়ে পাঠকের সামনে রেখে দেওয়া হয়। এরপর একবার যদি কেউ এটা বুঝে নেয়, তখন তার আর কোন কিছু এলেমেলো লাগবে না। প্রথম প্রথম ঠাকুরের কথামৃত পড়ার সময় আমাদের মনে হাজারটা প্রশ্ন ওঠে, এটার সাথে ওটার মিলছে না, ওটার সাথে এটা মিলছে না। তা সত্ত্বেও আমরা পড়ে যাচ্ছি, অনেক দিন লড়াই করতে করতে একটা মাস্টার চাবি যখন পেয়ে গেলাম, তখন দেখছি সবটাই মিলে যাচ্ছে। ব্রহ্মসূত্র হল সেই চাবি, যে উপনিষদকে এক জায়গায় নিয়ে আসছে। সত্যি কথা বলতে, শুধু উপনিষদকেই আনছে না, পুরো হিন্দু ধর্মকে, অর্থাৎ বেদ, উপনিষদ, গীতাকে এক জায়গায় নিয়ে আসছে। ফলে ব্রহ্মসূত্রের আলোচনা মাঝে মাঝে কঠোপনিষদ থেকে চলবে, কখন কেনোপনিষদ থেকে চলবে।

এখন যে আলোচনা চলবে, এটা কেনোপনিষদ থেকে নিয়ে আসা হয়েছে, যেখানে বলছেন, God is the perception of every being; He is all there is to be perceived. That which says 'I' is Brahman, but although we, day and night perceive Him, we do not know that we are perceiving Him. (*সব অনুভূতির ভিতর প্রত্যেক ব্যক্তিই ব্রহ্মকে অনুভব করছে; ব্রহ্ম ছাড়া আর অনুভব করবার দ্বিতীয় বস্তুই নেই। আমাদের ভিতর যেটা 'আমি, আমি' করছে, সেটাই ব্রহ্ম। কিন্তু যদিও আমরা দিনরাত তাঁকে অনুভব করছি, তথাপি আমরা জানি না যে, তাঁকে অনুভব করছি।*) এই ভাবটা পুরো কেনোপনিষদ থেকে আসছে। কেনোপনিষদের প্রথম মন্ত্রের প্রথম শব্দকে আধার করেই উপনিষদের নামকরণ করা হয়েছে। ঈশাবাস্যোপনিষদের নামকরণও এভাবেই করা হয়েছে। কেনোপনিষদের প্রথম মন্ত্রে গুরুকে শিষ্য প্রশ্ন করছেন, *কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ,* আমার মনকে কে বস্তুর দিকে প্রেরিত করছে। কেনোপনিষদ বলতে চাইছে, আমাদের ইন্দ্রিয় দিয়ে যে কোন ক্রিয়া যখন হয়, যেমন চোখ দিয়ে দেখছি, আবার বলছেন, *শ্রোত্রস্য শ্রোত্রঃ আর চক্ষুশ্চক্ষুঃ;* তার মানে আমরা যখন দেখছি বা কোন কিছু শুনছি, তখন তিনটে জিনিস এসে যাচ্ছে। প্রথমে আসছে বহিরিন্দ্রিয়, দ্বিতীয় বাইরের এই চোখ বা কান আসছে, আর তৃতীয় এই কানের পিছনে আরেকটা কান আছে, যেটা হল শ্রোত্রেন্দ্রিয়, যা আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে থাকে। স্বামীজীই প্রথম যিনি এটাকে Brain Centre বলছেন, নিওরোলজির বিজ্ঞানীরাও আজকে ওটাকে Brain Centre বলছে।

ভি এস রামচন্দ্রন খুব নামকরা নিওরোলজিস্ট, 'Phantoms in the Brain' নামে ওনার একটা খুব বিখ্যাত বই। উনি হলেন প্রথম, যিনি দেখালেন কিভাবে আলাদা আলাদা ইন্দ্রিয়ের জন্য মস্তিষ্কে আলাদা আলাদা জায়গা রয়েছে। কোন ইন্দ্রিয় যদি কাজ করা বন্ধ করে দেয়, তখন মস্তিষ্কের অন্য ইন্দ্রিয়গুলি ওই ইন্দ্রিয়ের জায়গাটা টেনে নেয়। যার জন্য দেখা যায় যারা অন্ধ হয়, তাদের কর্ণেন্দ্রিয় খুব শক্তিশালী হয়ে যায়। কারণ চোখের যে brain centre সেটা কাজ করছে না, জায়গাটা খালি হয়ে গেছে, তখন পাশে যে কর্ণেন্দ্রিয়ের সেন্টারটা আছে সেটা ওই জায়গাটাকে টেনে নেয়। এটা হল দ্বিতীয়, কিন্তু এরও পিছনে তৃতীয় একটা থাকে, যিনি আসল শ্রোতা বা দ্রষ্টা। ওই আসলটা হলেন আত্মা। হিন্দু দর্শনে এই তিনটেকে একেবারে আলাদা আলাদা করে বলে দিচ্ছে – গোলক বাইরের দিকের ইন্দ্রিয়গুলি, তার পিছনে ইন্দ্রিয়ের brain centre, এরও পিছনে সেই আত্মা, সেই চৈতন্য সত্তা, যিনি সবাইকে দেখছেন। যেখানেই আমরা কিছু দেখতে চাইছি বা কিছু জিনিস শুনতে চাইছি, সেখানে আত্মার শক্তি যদি না থাকে, আমরা সেটাকে দেখতে পারব না, বা শুনতে পারব না। ক্লাশে শিক্ষক খুব নিষ্ঠা নিয়ে ছাত্রদের পড়িয়ে যাচ্ছেন, ছাত্ররা খুব মন দিয়ে শিক্ষকের দিকে তাকিয়ে আছে, কিন্তু শিক্ষকের একটি কথাও তাদের কানে যাচ্ছে না। এটা শুধু স্কুলের ক্লাশেই যে হবে তা না, কাউকে উপদেশ দেওয়ার সময় শ্রোতা যদি এক দৃষ্টিতে তার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে কোন উপদেশই তার ভিতরে যাচ্ছে না। যার কানে যত কম কথা যায় সে তত বেশি বক্তার দিকে মন দিয়ে তাকিয়ে থাকবে। ওর চোখ বক্তার দিকে আছে কিন্তু তার পিছনের জিনিসগুলো আর কাজ করছে না। সে নিজের মত মনের জগতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কাহিনীর জগতে বা অন্য কোন জগতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমনিতেও বাসে ট্রেনে যাওয়ার সময় আমাদের চোখের সামনে কত জিনিস আসছে আর বেরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সব কিছু আমাদের মনে থাকে না। না থাকারই কথা, কারণ শেষ যিনি, সেই আত্মা সব জায়গায় যান না, বেছে বেছে যান। যেটাতে যাবেন সেটাকে মনে মধ্যে স্মৃতি রূপে ধরে রাখবেন।

এটা গেল প্রথম ধাপ, যেখানে দেখার কাজ হচ্ছে। কিন্তু দ্বিতীয় ধাপে, যেমন আমাদের ইন্দ্রিয়ের পিছনে সেই আত্মসত্তা রয়েছেন, যিনি সব কিছু জানছেন। স্বাভাবিক ভাবে এরপরেই প্রশ্ন আসে, তিনি কাকে জানছেন? উত্তরটা আরও মজার। তিনি নিজেকেই জানছেন, সেই আত্মাকেই তিনি জানছেন। কোন আত্মাকে? যিনি সমস্ত অস্তিত্বের আধার। চোখ দিয়ে আমরা এই পেন দেখছি, সাধারণ ভাবে আমরা জানি, চোখ এই পেনকে দেখছে। কিন্তু কেনোপনিষদে বলছেন, চোখ দেখে না, দেখেন আত্মা। আত্মা কাকে দেখছেন? এক দিক দিয়ে বলা যায় আত্মা পেনকে দেখছেন, কিন্তু শুধু পেনকেই দেখেন না, এই পেনের পিছনে যে সত্তা আছে, সেই সত্তাকে দেখেন। সেই সত্তাটাই আত্মা। কোন মানুষ কখনই কোন শরীরকে ভালবাসে না, ওই শরীরের পিছনে যে সত্তা রয়েছেন, সেই সত্তাকেই মানুষ ভালবাসে। আমরা এটা বুঝতে পারি না বলেই যত সমস্যা। সন্তান যে তার মাকে ভালবাসছে, সে তার মায়ের শরীরটাকে ভালবাসছে না, ভালবাসছে মায়ের পিছনে যে সত্তা রয়েছেন সেই সত্তাকে। শেষ জ্ঞাতা হলেন সেই আত্মা, জ্ঞেয় সেই আত্মা, আত্মা আত্মাকেই জানেন। যখনই যেখানে ইন্দ্রিয়ের কাজ হয়, যখনই যেখানে মনের কাজ হয়, আসলে কিন্তু তখন একটাই কাজ হয়, আত্মা আত্মাকে জানছে। আত্মা তো দুই হতে পারে না, কারণ আত্মাই একমাত্র আছেন। দুই যেখানে নেই, যেখানে এক আছে, সেই এক একের উপর কোন ক্রিয়া করতে পারবে না।

সেইজন্য শাস্ত্র বলছে, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় আর জ্ঞান এক হয়ে যায়। স্বামীজী তাই বলছেন, আমরা যখনই কোন ক্রিয়া করছি, ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই হোক আর মনের দ্বারাই হোক, আমরা বুঝি না, আমরা জানি না, মানি না, কিন্তু সত্য হল প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াতে আমরা তাঁকেই জানছি। এই জিনিসগুলো আমরা শুনছি ঠিকই কিন্তু এগুলোকে ধারণা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব, তাই আমরা মানতে পারি না, কিন্তু এটাই সত্য। সামান্য ফিজিক্স পড়তে গিয়ে আমাদের কত কঠিন মনে হয়, ক্লাশ টেনের পর মাথায় ঢুকতে চায় না, আর ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ মনের অধিকারী সেই ঋষিরা যাঁরা ছিলেন, তাঁরা যে উচ্চাবস্থায় বিচরণ করেছেন, সেগুলোকে আমরা মনে করছি খুব সহজে বুঝে নেব। ঠাকুর আছেন, ঠাকুরকে ভক্তি করতে হবে, ঠাকুরকে ভক্তি করলে আমাদের সব কিছু ভাল ভাবে চলবে, এটা ততটাই ধর্ম, যতটা দুইয়ে দুইয়ে চার এটাই হল অঙ্কের সব কিছু। দুইয়ে দুইয়ে চারে গিয়ে যদি সব অঙ্ক শেষ হয়ে যায়, তাহলে আমাদের এই ধর্মও ওখানে শেষ হয়ে যায়।

দুঃখ-কষ্টের নাশ

স্বামীজী বলছেন, As soon as we become aware of this truth, all misery goes; so we must get knowledge of the truth. (*যে মুহূর্তে আমরা ঐ সত্য জানতে পারি, সেই মুহূর্তেই আমাদের সব দুঃখ-কষ্ট চলে যায়; সুতরাং আমাদের ঐ সত্যকে জানতে হবে।*) ভগবান বুদ্ধ জীবনে তার চারপাশে এত দুঃখ দেখেছেন যে, তিনি যখন চারটে সত্য বলছেন তখন প্রথমেই বলছেন, দুঃখ আছে, এটাই প্রথম সত্য। দুঃখ আমাদের কিভাবে বেহাল করে রেখেছে, কিভাবে আমাদের জীবনকে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে, ভাবতে গেলেই যত রাজ্যের হতাশা এসে আমাদের মনকে গ্রাস করে নেয়। কিন্তু সমস্ত দুঃখের পিছনে ঘুরেফিরে মাত্র দুটি শক্তি কাজ করে, যে দুটি শক্তি দুঃখকে জন্ম দেয় —একটা হল, কোন জিনিস আমাদের হাত থেকে চলে গেছে, সেই চলে যাওয়ার জন্য দুঃখ, আর দ্বিতীয় হল, কোন জিনিস আমি চাইছি, অপরের কাছে সেটা আছে কিন্তু আমি পাচ্ছি না, এরজন্য দুঃখ হচ্ছে। এরই পরিভাষা হল শোক আর মোহ।

শোক হল যেটা আমার কাছে ছিল সেটা চলে গেছে, মোহ হল, একটা জিনিস চাইছি কিন্তু পাচ্ছি না। যে জিনিসটা চলে গেল আর যে জিনিসটা আমি পাচ্ছি না, যেটাকে শোক আর মোহ বলা হচ্ছে, তার মানে জিনিসটা আমার থেকে আলাদা। যে জিনিসটা আমার থেকে আলাদা সেটাই তো চলে যাবে, আর যে জিনিসটা আমার থেকে আলাদা, তাকেই তো আমি পাওয়ার চেষ্টা করব। আমি তো কই কখন কোন দিন আমার হাতকে পাওয়ার চেষ্টা করি না, বা আমার দুটো হাত আছে আরেকটা হাত পাওয়ার চেষ্টা করছি না। যার দুর্ঘটনায় একটা হাত বাদ চলে গেছে তার শোক হবে, তার মানে বোঝা যাচ্ছে সে হাত নয়, ও যদি ওটাই হত, তাহলে ওটা কোন দিন যেত না। মাথা যদি কারুর খারাপ হয়ে যায়, আমরা শোক করি, কারণ সে মাথা নয়। কিন্তু সে যেটা আসল, সেটা সে কোন দিন হারাতে পারবে না, আত্মাই হলেন সেটা, যেটাকে মানুষ কখনই হারায় না। এই আত্মারই কার্য হল, যখনই আমরা কোন কিছু জানছি বা দেখছি, আসলে কিন্তু আত্মাই দেখছে বা জানছে।

আত্মা যাকে দেখছে ও জানছে সেটাও আত্মা। জগতে যা কিছু আছে সব কিছুর আধার সেই আত্মা। আত্মাকে জানার যে আধার সেটাও আত্মা। জীবনের দুঃখ নিবারণের একমাত্র উপায় হল, যদি একবার পিছনের দিকে গিয়ে আমরা বুঝতে পারি, আমি সেই আত্মা, যে দেখছে জানছে আর যাকে দেখছে জানছে সেও সেই আত্মা। এই সত্যটাই স্বামীজী এখানে বলছেন।

Reach unity; no more duality will come. But knowledge does not come by sacrifice, but by seeking, worshipping, knowing the Atman, (*একত্ব অবস্থা লাভ কর, তা হলে আর দ্বৈতভাব আসবে না। কিন্তু যাগযজ্ঞাদি দ্বারা জ্ঞানলাভ হয় না; আত্মাকে অন্বেষণ করা, উপাসনা ও সাক্ষাৎ করা – এ-সবের দ্বারাই সেই জ্ঞানলাভ হবে।*) স্বামীজী বলছেন, এই দ্বৈতভাবকে যদি তুমি না ছাড়ো, বিশেষ করে জগতে যে দ্বৈতভাব আছে, আমি তুমি আলাদা, ততক্ষণ তোমার এই দুঃখ যাবে না। তুমি যে ক্রিয়াই করো না কেন তোমার এই দ্বৈত ভাব চলে যাবে না। যদি তুমি আত্মজ্ঞান পেতে চাও, শুধু যদি আত্মাকে নিয়েই আত্মচিন্তনে থাক, একমাত্র তবেই এই আত্মজ্ঞান পেতে পারো, এছাড়া আর কোন উপায় নেই।

এই আলোচনাকে আমরা যদি সারাংশ করি, তাহলে তা এই রকম হবে – উদ্দেশ্য হল দুঃখ নিবারণ। ভগবান বুদ্ধ যে দুঃখ নিবারণের কথা বলছেন, আমরাও দুঃখ নিবারণের কথা বলছি কিন্তু আমাদের analysis processটা একটু আলাদা। আমরা বলছি সমস্ত দুঃখের মূল শোক আর মোহ। আর এই শোক আর মোহের মূলে হল আমাদের দ্বৈতভাব। আমি আর তুমি আলাদা, তাই আমি তোমাকে পেতে চাইছি, তুমি দূরে চলে গেলে কষ্ট পাই, কাছে থাকলে সুখ পাই। জগৎ যদি সত্য হত তখন আর কিছু করার থাকত না। কিন্তু আমরা যখন বেদান্ত অধ্যয়ন করছি, অধ্যয়ন করে আরও গভীরে গিয়ে দেখছি, যাকে আমি দেখছি তার বাস্তবটা হল আত্মা। আমি দেখছি, আমারও বাস্তবটা হল সেই আত্মা। এই সত্যটা যখন আমার কাছে ফুটে উঠল, তখন আর দ্বৈত থাকবে না, দ্বৈত নেই তাই শোক আর মোহও নেই, শোক মোহ নেই তাই দুঃখও নেই। দুঃখের নাশ একমাত্র অদ্বৈতে গিয়ে হয়। যতদিন দ্বৈত ভাবের নাশ না হয় ততদিন এই দুরবস্থাই চলতে থাকবে।

দোলের সময় চিনির হাতি, চিনির ঘোড়া, চিনির ইঁদুর তৈরী করা হয়, যার প্রচলিত নাম মঠ। বাচ্চাদের মঠ দেওয়ার সময় রীতিমত সমস্যা হয়ে যায়, কেউ ইঁদুর নিতে চাইবে না, বলবে আমাকে ইঁদুর কেন দিলে, সিংহ কেন দিলে না। মা তাকে যতই বোঝাক সবটাই চিনির তৈরী, সে ওটা মানতে চাইবে না। কিন্তু একটা বয়সের পর সে বুঝতে পারে সবটাই চিনি। এই উপমাটা প্রায়ই ব্যবহার করা হয়, একটা মেয়ের কাছে গয়না খুব মূল্যবান বস্তু, সোনার কানের দুল, সোনার নেকলেস, তার কাছে দুলের আলাদা মূল্য, আংটির আলাদা দাম, নেকলেসের আলাদা দাম। কিন্তু চোর বা স্যাঁকরার কাছে এগুলোর আলাদা কোন দাম নেই, তাদের কাছে দাম হল সোনার। খুব সুন্দর কাজ করা নেকলেস স্যাঁকরার কাছে বিক্রি করতে গেলে স্যাঁকরা নেকলেসের কাজ দেখে না, সোনার ওজনটাই দেখে নেয়। মানুষের ক্ষেত্রে এটাই বাস্তব দেখে, কথামৃতে ঠাকুর বলছেন সেই সচ্চিদানন্দই আছেন। বলছেন, লেটো (লাটু মহারাজ) গালে হাত দিয়ে বসে আছে, দেখছি সচ্চিদানন্দই গালে হাত দিয়ে বসে আছেন। গীতায় ভগবান বলছেন, *যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে। হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে*, সে বাস্তব দেখছে তার গলাটা কেটে দিলাম তাতে তার মুণ্ডুটা কাটা গেল কিন্তু ওর আত্মা যেমন ছিল তেমনই আছে। যাঁর কাছে আত্মাই যখন সত্য হয়ে যায়, আত্মার বাইরে কোন কিছুই কিছু না, তখন এটা বাস্তবিকই তাই হয়। আমাদের এত যাঁরা মুনি ঋষিরা ছিলেন, তাঁরা বাস্তবিক এটাই দেখেন, তাঁদের কাছে ত্যাজ্য গ্রাহ্য বলে কিছু থাকে না। বেদান্ত বলছেন, তুমি যদি এটাকে তাত্ত্বিক ভাবেও বুঝে নিতে পার, এরপর চেষ্টা করতে করতে তাঁর কৃপায় বাস্তবটাও তুমি দেখতে পারবে। এই ব্যাপারে বেদান্ত একেবারে দৃঢ়, আত্মজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত মুক্তি হবে না। আত্মজ্ঞান মানে, তোমার যত রকম ক্রিয়া হচ্ছে, সব আত্মাই করছেন, আর যেটার উপর ক্রিয়া হচ্ছে সেটাও আত্মা। প্রথমে এই কথা গুরু বা আচার্যের মুখে শুনবে, শোনার পর বিচার করবে, বিচার করে করে দেখবে, তারপর একটা সময় তোমার মধ্যে একটা দৃঢ় বিশ্বাস এসে যাবে, এই বিশ্বাসের সাথে সাথে তোমার আচার আচরণ এই ভাবানুসারেই হতে হবে, এরপর একদিন তাঁর কৃপাতে এই জ্ঞানটা তোমার ভিতরে দপ্ করে জ্বলে উঠবে। এই জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ, এই কথাই এবার স্বামীজী বলছেন।

মুণ্ডকোপনিষদের ভাব - পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যা - ওঁএর সাধনা

Brahmavidya is the highest knowledge, knowing the Brahman; lower knowledge is science. (*ব্রহ্ম বিদ্যাই পরাবিদ্যা; অপরা বিদ্যা হচ্ছে বিজ্ঞান।*) স্বামীজী জ্ঞান জিনিসটাকে পরাবিদ্যা আর অপরা বিদ্যা দিয়ে বিভাজন করে দিচ্ছেন, ব্রহ্মবিদ্যা হল পরাবিদ্যা আর বিজ্ঞান বা বেদ অপরা বিদ্যা, বিজ্ঞান মানেই বেদ। অধ্যাত্ম বিজ্ঞানকে আমরা আধ্যাত্মিকতা বলছি, আবার ওই বিজ্ঞানই যখন চিকিৎসার ক্ষেত্রে যাচ্ছে তখন আয়ুর্বেদ বলছি। আবার যখন যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাচ্ছে তখন আসছে ধনুর্বেদ, এটাও জ্ঞান, জ্ঞান মানেই বেদ। বলছেন, যে বিদ্যা দিয়ে এই জগতে কামিনী-কাঞ্চন, নামযশ এই তিনটে উদ্দেশ্য সাধিত হয়, এই বিদ্যাই তখন হয়ে গেল অপরা বিদ্যা। এই তিনটে উদ্দেশ্য চলে গিয়ে যখন যে বিদ্যা কেবল শুদ্ধ আত্মার দিকে নিয়ে যাচ্ছে, সেটাই তখন পরাবিদ্যা হয়ে যায়। বিদ্যা দুটোই, অপরা বিদ্যাটাও বিদ্যা, পরা বিদ্যাটাও বিদ্যা। পরাবিদ্যার জ্ঞান বেদ থেকেই আসে, কিন্তু তা বেদের শব্দ দিয়ে আসে না, শব্দের ভিতরে যে জ্ঞানটুকু আছে, সেই জ্ঞানকে নিয়ে যখন সাধনা করা হয়, যে জ্ঞান দিয়ে সাধনার দ্বারা প্রজ্ঞা খুলে যায়, সেটাকে বলছেন পরাবিদ্যা। স্বামীজী বলছেন, ব্রহ্মবিদ্যাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা।

This is the teaching of the Mundakopanishad or the Upanishad for Sannyasins. (*মুণ্ডকোপনিষদ অর্থাৎ সন্ন্যাসীদের জন্য উপদিষ্ট উপনিষদ এই উপদেশ দিচ্ছেন।*) মুণ্ডকোপনিষদ সন্ন্যাসীদের জন্যই, এর নামের মধ্যেই এটা জড়িয়ে আছে, মুণ্ডক মানে যাদের মুণ্ডিত মস্তক, সন্ন্যাসীদের মুণ্ডিত মস্তক হয়। মুণ্ডকোপনিষদে এই দুটো বিদ্যাকে নিয়ে বলা হয়েছে, *দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে পরা চৈব অপরা চ*। জগতে দুটো বিদ্যা, একটা জগতের জ্ঞান বা ব্যবহারিক বিদ্যা আর দ্বিতীয়টা হল পরা বিদ্যা intuitive knowledge of God।

There are two sorts of knowledge, principle and secondary. The unessential is that part of the Vedas dealing with worship and ceremonies, also all secular knowledge. (*দুই প্রকার বিদ্যা আছে – পরা ও অপরা। তন্মধ্যে বেদের যে অংশে দেবোপসনা ও নানাবিধ যাগযজ্ঞের উপদেশ –সেই কর্মকাণ্ড এবং সর্ববিধ লৌকিক জ্ঞানই অপরা বিদ্যা।*) যজ্ঞাদি আর জগতের যে কোন জ্ঞান অপরা বিদ্যার মধ্যে আসে। The essential is that by which we reach the Absolute. It (the Absolute) creates all from Its own nature; there is nothing to cause, nothing outside. (*যে বিদ্যার দ্বারা সেই অক্ষর পুরুষকে লাভ করা যায়, তাই পরা বিদ্যা। সেই অক্ষর পুরুষ নিজের মধ্যে থেকেই সমুদয় সৃষ্টি করছেন – বাইরে অপর কিছু নেই, যা জগৎকারণ হতে পারে।*) মুণ্ডকোপনিষদে আলাদা আলাদা করে উপমা দিচ্ছেন, যেমন জীবন্ত মানুষের শরীর থেকে যেমন লোম বেরোয় বা মাকড়সার শরীর থেকে যেমন জাল বেরিয়ে আসে, ঠিক তেমনি সেই সৎ পুরুষ যিনি, ভগবানের ভিতর থেকে এই সৃষ্টি বের হয়। এটা একটা spontaneous জিনিস, এর জন্য ভগবানকে কোন পরিশ্রম করতে হয় না। কারণ ভগবানের বাইরে কিছু নেই কিনা, তাই কোন কিছু করারও নেই। It is all energy, It is all there is, (*সেই ব্রহ্মই সমুদয় শক্তি, যা কিছু আছে সব ব্রহ্মই।*) ভগবানের ভিতর থেকে যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বেরিয়ে আসে, এটাই তাঁর শক্তি, শক্তি ভগবানের সাথে সব সময় এক হয়ে থাকে। বাইরে থেকে তাঁকে কিছু আনতে হয় না, এটা নিজের মতই ব্যক্ত হয় আবার একটা সময় অব্যক্ত হয়ে যায়।

স্বামীজী খুব সুন্দর বলছেন, He who makes all sacrifices to himself, the Atman, he alone knows Brahman, (*যিনি আত্মযাজী, তিনিই কেবল ব্রহ্মকে জানেন।*) বেদে অনেক রকমের সৃষ্টির বর্ণনা আছে, সব বর্ণনাকে আমরা দুটোতে ভাগ করতে পারি – নৈর্ব্যক্তিক আর ব্যক্তি। নাসদীয় সূক্তে সৃষ্টিকে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, সৃষ্টির আগে তিনিই ছিলেন, সেখান থেকে কিভাবে প্রাণ বেরিয়ে আসে, সেই প্রাণ আকাশের উপর আঘাত করে, আর সেখান থেকে বেরিয়ে আসে পদার্থ, এটাই ঠিক ঠিক নৈর্ব্যক্তিক সৃষ্টির বর্ণনা। দ্বিতীয় আসে পুরুষসূক্তম, সেখানে পুরুষের শরীর থেকে জগতের সমুদয় জিনিসের সৃষ্টি হয়। শুধু এই দুটো বর্ণনাতেই সৃষ্টির বর্ণনা শেষ হয়ে যায় না, আমাদের শাস্ত্রে আরও অনেক সৃষ্টির বর্ণনা আছে। পুরাণে একবার ঢুকে গেলে, বিশেষ করে ভাগবতের প্রথমের দিকেই থেকে থেকে সৃষ্টি প্রসঙ্গ চলেছে। আরও মজার

যে, একটা বর্ণনার সাথে আরেকটা বর্ণনা মিলবে না, মিললেও আরও বিস্তার করে বলে দিচ্ছেন। সেইজন্য হিন্দুদের মধ্যে সৃষ্টিকে নিয়ে একটা পরিষ্কার মত নেই। কেন নেই? কারণ সৃষ্টির সময় কেউ ছিল না, কারও জানা নেই সৃষ্টি কিভাবে হয়েছিল।

তাহলে সৃষ্টির এত বর্ণনা করার কি দরকার ছিল? এগুলো কি ওনাদের কল্পনা ছিল? কল্পনা একেবারেই নয়। এর উদ্দেশ্য একটাই, যদি তুমি সৃষ্টি তত্ত্ব একবার বুঝে নিতে পার, তারপর এই সৃষ্টিতত্ত্বের গভীরে গিয়ে চিন্তন করতে শুরু করবে, তখন ধীরে ধীরে সৃষ্টির ব্যাপারটা তোমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। যেমন নাসদীয় সূক্তে বলছেন, সৃষ্টি সেই ভগবান থেকে এসেছে, পুরুষসূক্তমও তাই বলছে, কিন্তু পুরুষসূক্তম্ আরেক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলছেন, সেই পুরুষ বা ভগবান নিজেকে নিজেতেই আহুতি দিলেন, ওই আহুতি দেওয়াতেই এই সৃষ্টিটা হল। হিন্দুদের কাছে এর একটাই বক্তব্য, কেউ ঈশ্বর থেকে আলাদা কিছু নয়।

আমাদের তিনটে দর্শন, অদ্বৈতবাদ, যেখানে একমাত্র আত্মাই আছেন, দ্বৈতবাদ, যেখানে ঈশ্বর আলাদা, আমি আলাদা, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, যেখানে ঈশ্বরের সাথে আমরা কোন রকমে জুড়ে আছি, কিন্তু আলাদা। আমি যদি ঈশ্বর থেকে পুরোপুরি আলাদা হই, তাহলে আমার জীবনদর্শন পুরোপুরি আলাদা হয়ে যাবে, আমার সাধনা পদ্ধতি পুরো অন্য ধরণের হয়ে যাবে, আমার অস্তিত্বকে নিয়ে যে ভাব, তা পুরো আলাদা হয়ে যাবে। কিন্তু যখন সৃষ্টিতত্ত্বের অনেক গভীরে গিয়ে জানার চেষ্টা করব, এই তত্ত্ব ঠিক কি বলতে চাইছে, তখন দেখব এই আত্মা থেকেই সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, কারণ যুক্তির নিরিখে এটাই স্বাভাবিক। খ্রীশ্চানদের যেমন ধারণা ভগবান মাটি দিয়ে আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তাহলে ভগবান আলাদা আর তাঁর মাটি আলাদা। ভগবানের যে শক্তি, সেই শক্তি কখন ভগবানে যেন ব্যক্ত থাকে, আবার কখন যেন ভগবান থেকে আলাদা হয়ে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রূপে ভাসমান দেখায়।

এই জিনিসটাকে যদি আমরা সূক্ষ্ম বুদ্ধি দিয়ে বোধগম্য করে নিতে পারি, তাহলে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারব যে, কিছু আগে যে আলোচনাটা হল, যিনি জানছেন সেই জানার ক্রিয়াটা আত্মাকে দিয়ে হয়, যিনি জানছেন তিনিও আত্মা, যাকে জানছেন সেটাও আত্মা; সৃষ্টিতত্ত্বেও ঠিক একই জিনিস হচ্ছে। কারণ আত্মার বাইরে কিছু নেই, সেই আত্মারই শক্তি, যেটা তাঁর স্বাভাবিক শক্তি, সেটারই প্রকাশ এই সৃষ্টি। সেইজন্য ঠাকুর বলছেন জল স্থির থাকলেও জল, হেললে দুললেও জল। শক্তি যখন ভগবানের ভিতর অব্যক্ত অবস্থায় আছে তখনও শক্তি, শক্তি যখন প্রকাশিত হচ্ছে তখনও শক্তি। সৃষ্টি কিভাবে হয়, সৃষ্টিতত্ত্বের এই রহস্যটা যদি ঠিক ঠিক বোধগম্য হয়ে যায়, তাহলে প্রথমেই তার যত পূজা-অর্চনা, যত উপাচার সব বন্ধ হয়ে যাবে। এরপর তার শুরু হয়ে যাবে আহুতি, আত্মাই আত্মাতে আহুতি দেবে। খাওয়ার আগে গীতার যে মন্ত্র পাঠ করা হয়, ওঁ *ব্রহ্মার্পণং* করে যে খাওয়া শুরু হয়, তাতে এটাই বলা হচ্ছে, সব কিছুই ব্রহ্ম। ক্রিয়াকে যদি আমরা ব্রহ্ম রূপে নাও দেখতে পারি, তাহলে অন্তত এটাকে ধারণা করতে পারি যে, খাওয়ার এই আহুতিটা আত্মা আত্মাকে দিচ্ছে। নিঃশ্বাস নিচ্ছি, গীতায় বলছেন, *অপানে জুহ্বতি প্রাণং*, আত্মা আত্মাতেই আহুতি দিচ্ছে। আমরা যা কিছু করছি, আত্মা আত্মাতেই আহুতি দিচ্ছে। অদ্বৈত ভাবে যদি সাধনা করতে হয়, যেখানে দ্বৈত ভাব একটু নিয়ে আসছে, সেখানে আলাদা ভাব যদি আনতে হয়, তাহলে ভাব এটাই থাকবে, আহুতি আত্মা আত্মাকে দিচ্ছে। কোন মতে আত্মা আহুতি দ্বিতীয় কাউকে বা আলাদা কাউকে দিচ্ছে, এই ভাব থাকবে না। কেউ যদি এই ভাবে নিয়ে চলে, তাহলে একমাত্র সেই আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে পারবে।

Fools think outside worship the highest; fools think works can give us God. (*মূর্খরাই বাহ্য পূজাকে শ্রেষ্ঠ মনে করে, অজ্ঞানব্যক্তিরাই মনে করে, কর্মের দ্বারা আমাদের ব্রহ্মলাভ হতে পারে।*) আমরা মনে করছি, আমরা এই দেবী, এই ঠাকুরের পূজা করছি আমরা এর ফল পাব, আমরা মনে করছি আমাদের এই পূজাটাই শ্রেষ্ঠ।

আর বলছেন, Only those who go through the Susumna (the ‘path’ of Yogis) reach the Atman. (*যাঁরা সুষুম্নাবর্ত্মে (যোগীদের মার্গে) গমন করেন, তাঁরাই শুধু আত্মাকে লাভ করেন।*) সুষুম্না হল সূক্ষ্ম জ্ঞান, কুণ্ডলিনী জাগরণে সুষুম্না দিয়ে মন উঠে উপরে সহস্রারের দিকে যায়। বলছেন যখন ওই

সুষুম্না, অর্থাৎ সূক্ষ্ম পথ, সূক্ষ্ম জ্ঞান দিয়ে যায় তখন সে পরিষ্কার বুঝতে পারে আত্মা আত্মার ভিতরে আত্মাকে আহুতি দেন, এটাই সুষুম্নার পথ দিয়ে যাওয়া। They must go to a Guru to learn. Each part has the same nature as the whole; all springs from the Atman. (*এই ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করতে হলে গুরুর কাছে যেতে হবে। সমষ্টিতে যা আছে, ব্যষ্টিতেও তাই আছে।*) এই যে এতক্ষণ বলা হল, দ্বৈতভাব থেকে বেরিয়ে না এলে আমাদের দুঃখ নিবৃত্তি কখনই হতে পারে না; এই দ্বৈতভাব থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আমাদের একত্ব-অবস্থা লাভ করতে হবে, যেখান আত্মাই আত্মাকে জানেন, আত্মাই আত্মাতে আহুতি দেন, এই জ্ঞানলাভ হয়, এই বিদ্যালাভের জন্য তাকে একজন গুরুর কাছে অবশ্যই যেতে হবে, মুণ্ডকোপনিষদে গুরু কে হবেন আর কে শিষ্য হতে পারে, তার বিশদ বর্ণনা আছে।

Meditation is the arrow, the whole soul going out to God is the bow, which speeds the arrow to its marks, the Atman. (*ওঙ্কার হচ্ছে যেন ধনু, আত্মা হচ্ছে যেন তীর, আর ব্রহ্ম হচ্ছেন লক্ষ্য। অপ্রমত্ত হয়ে তাঁকে বিদ্ধ করতে হবে। তাতে মিশে এক হয়ে যেতে হবে।*) এটাও মুণ্ডোকপনিষদের মন্ত্র, যেখানে বলছেন, *প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে। অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ।।২/২/৪।।* প্রণব, ওঁ যেন ধনু, জীবাত্মা যেন তীর। *অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং*, তূণের সাহায্য নিয়ে মন স্থির করে তীর মারা হল, *শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ*, লক্ষ্য বস্তু আর তীর যেমন এক হয়ে যায়, তেমনি পরমাত্মা বা ব্রহ্ম আর জীবাত্মা এক হয়ে যায়, আর কোন ভেদ থাকে না। শুদ্ধ জলে শুদ্ধ জল মিশে গেল আর যেমন আলাদা করা যায় না, ঠিক তেমনি, জীবাত্মা আর পরমাত্মার কোন তফাৎ থাকে না।

As finite, we can never express Infinite, but we are the Infinite. Knowing this we argue with no one, (*সসীম অবস্থায় আমরা কখন সেই অসীমকে প্রকাশ করতে পারি না। কিন্তু আমরাই সেই অসীমস্বরূপ। এইটি জানলে আর কারও সঙ্গে আমরা তর্ক করতে প্রবৃত্ত হই না।*) অনন্তকে কোন দিন কেউ কাউকে বলে বোঝাতে পারবে না, express করতে পারবে না, অনন্তকে ধারণা করা সত্যিই খুব কঠিন; কিন্তু এটাও সত্য যে, আমি সেই অনন্ত। যখন নিজেকে অনন্ত রূপে জেনে গেল তখন সে আর কারুর সাথে তর্কাতর্কি করতে যাবে না, কারণ সে জানে যার সাথে তর্ক করতে যাচ্ছে সেও সেই অনন্তেরই রূপ, কিন্তু তার উপর এখন একটা অজ্ঞানের মুখোশ আছে, যেটা তাকে সীমিত করে দেখাচ্ছে। মুণ্ডকোপনিষদেই একটা মন্ত্রে বলছেন, *বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী*; স্বাভাবিক ভাবেই মানুষের মধ্যে জয়ী হওয়ার ইচ্ছেটা খুব প্রবল থাকে, আমি জয়ী হতে চাই, আমাকে সবাই মানুক, জানুক। এই মন্ত্রের উপর ভাষ্য দিতে গিয়ে আচার্য শঙ্কর এটাই বলছেন যিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁর কথা ছেড়ে দাও, যিনি শুধু তত্ত্বতঃ এটুকু বুঝে গেছেন ঈশ্বর এই রকম বা যিনি ঈশ্বরের একটু আভাস পাওয়ার মাত্র চেষ্টা করে বুঝে নিয়েছেন যে, তিনি প্রাণেরও প্রাণ, সমস্ত প্রাণীর মধ্যে তিনি বিভাসিত, মানুষের মধ্যে তাঁর প্রকাশত্মক শক্তি বেশী, তাঁর জীবনটাই পাল্টে যাবে। কিভাবে পাল্টায়? প্রথম বলছেন *ন অতিবাদী*, বেশী বকর্ বকর্ করবে না। বকর্ বকর্ কখন মানুষ করে? আমি তোমার থেকে বেশী জানি বুঝি, এটাকে জাহির করতে।

Divine wisdom is to be got by devotion, meditation and chastity. (*ভক্তি, ধ্যান ও ব্রহ্মচর্যের দ্বারা সেই দিব্যজ্ঞানলাভ করতে হবে।*) মুণ্ডকোপনিষদের মন্ত্র থেকেই স্বামীজী আরও বলছেন, শ্রদ্ধা, সত্য ও ব্রহ্মচর্য এই তিনটে হল পথ। মুণ্ডকোপনিষদ থেকে আবার বলছেন 'Truth alone triumps, and not untruth', '*সত্যমেব জয়তে নানৃতম্*'। Through truth alone the way is spread to Brahman, where alone love and truth are. (*সত্যের ভিতর দিয়েই ব্রহ্মলাভের একমাত্র পথ রয়েছে। কেবল সেখানেই প্রেম ও সত্য বর্তমান।*) ব্রহ্মজ্ঞান মানে কি? সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্, সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্, যেখানে সত্য, যেখানে ভালবাসা, এটাকে স্বামীজী আরেক দিনের ক্লাশে ব্যাখ্যা করবেন। এখানেই আজকের ক্লাশ শেষ হয়ে যায়, এরপর ১১ই জুলাইয়ের ক্লাশ শুরু হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার, ১১ই জুলাই

পদার্থ ও চৈতন্যের পারস্পরিক সম্পর্ক – স্বামীজীর নিজস্ব মত

১০ই জুলাই পর্যন্ত স্বামীজী ব্রহ্মসূত্রকে আধার করে বেদান্তের ব্যাখ্যা করে যাচ্ছিলেন। সেখান থেকে একটু সরে এসে আরেকটু দর্শনের দিকে যাচ্ছেন, যেখানে তিনি বিভিন্ন ধর্মকে নিয়ে আসছেন। Without mother-love no creation could continue. (*মায়ের ভালবাসা ব্যতীত কোন সৃষ্টিই স্থায়ী হতে পারে না।*) সৃষ্টির মূলেই আছে মায়ের ভালবাসা। এই কথা বলার পর স্বামীজী আরও কিছু বলেছিলেন কিনা আমাদের পক্ষে এখন আর জানা সম্ভব নয়, কারণ এই একটা বাক্যের পরেই স্বামীজী পুরোপুরি অন্য দিকে চলে গিয়ে বলছেন, Nothing is entirely physical, nor yet entirely metaphysical; one presupposes the other and explains the other. All Theists agree that there is a background of this visible universe, they differ as to the nature or character of that background. Materialists say there is no background. (*এই পরিদৃশ্যমান জগতের যে একটা ভিত্তি আছে, এ-বিষয়ে সকল আস্তিকই একমত, কেবল সেই ভিত্তিস্থানীয় বস্তুর প্রকৃতি বা স্বরূপ সম্বন্ধেই তাঁদের মতভেদ। জড়বাদীরা জগতের ঐরূপ কোন ভিত্তি আছে বলে স্বীকারই করে না।*) স্বামীজীর এটা একটা নিজস্ব থিয়োরী। এই জগৎটা কি? দর্শনের দিক দিয়ে যদি ঈশ্বরকে একটা বিভাজন রেখা ধরা হয়, তাহলে দেখা যাবে, কিছু দর্শন ঈশ্বরকে মানছে, বাকি দর্শনগুলি ঈশ্বরকে মানে না। যারা ঈশ্বরকে মানে না, তারা পদার্থকেই সত্য বলে মনে করে, এদের বলা হয় Materialists বা ভৌতিকবাদী। অনেক সময় আলোচনা করতে গিয়ে আমরা Materialistকে চার্বাকপন্থী বলে দিই, কিন্তু জিনিসটা ঠিক না। চার্বাকরাও Materialist ঠিকই, কারণ ওদের কাছেও পদার্থই সত্য কিন্তু ওরা বেশি উচ্চ চিন্তা দিয়ে তাদের দর্শনকে উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে না। সেই তুলনায় পাশ্চাত্যের Materialistsরা অনেক উচ্চমানের, অনেক গভীরে যান, এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করার জন্য অনেক কিছু উদ্ভাবন করেন। তাঁদের জীবন-আদর্শকেও অনেক উচ্চমানের বলে গণ্য করা হয়।

বিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যের যাঁরা বড় বড় দার্শনিক ছিলেন, তাঁদের মধ্যে বার্ণার্ড'শও আছেন, তাঁরা সত্যিই সুপারম্যান। তাঁদের কাছে এটাই ছিল, যা প্রমাণ করার আমাকেই প্রমাণ করতে হবে, কিন্তু সেখানে ঈশ্বরের কোন ভূমিকা নেই। তাঁরা মনে করেন, বরফকে ঘষতে ঘষতে শেষে আর কিছুই থাকে না, জল হয়ে গেল, জল বাষ্প হয়ে চলে গেল, আর কিছুই নেই, পদার্থই সত্য। ঈশ্বরকেন্দ্রিক যাঁদের দর্শন, যাঁরা ঈশ্বরকে মানেন, সেটা যেন সোনার মত। ঠাকুর বলছেন, সোনাকে ঘষতে ঘষতে শেষে একটু কণা থেকে যায়, সোনা পুরোপুরি উড়ে যাবে না। এটা উপমার জন্য বলা হল, আক্ষরিক ভাবে নেওয়া যাবে না। যাঁরা ঈশ্বরকে নিয়ে চলেন, এনারা Idealisticও নন, স্বামীজী Theists বলছেন, তাঁরা একটা একটা করে যখন শুরু করে, সরাতে সরাতে শেষ যেখানে হয়, সেখানে তাঁরা একটা চৈতন্য সত্তাকে নিয়ে আসেন। চৈতন্য সত্তাকে কে কি ভাবে পরিভাষিত করবে সেটা তার তার নিজের ব্যাপার। কেউ তাঁকে গড্ বলতে পারে, কেউ আল্লা বলতে পারে, কেউ জেহোবা বলতে পারে, আত্মা, ব্রহ্ম, ঈশ্বর যা কিছু বলতে পারে, কিন্তু চৈতন্য সত্তা অবশ্যই আসবে। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে যাদের দর্শন চলে, আর যারা পঞ্চভূতকেই শেষ কথা মনে করে, অর্থাৎ ভৌদিকবাদীরা, এই দুজনের মধ্যে এটা একটা বড় পার্থক্য।

স্বামীজীর বিশেষত্ব এখানেই, রাজযোগে বা অন্য জায়গায় স্বামীজী যখনই পদার্থ আর মনকে আলোচনায় নিয়ে এসেছেন, সেখানে তিনি তাঁর মতকে স্পষ্ট করে বার বার বলছেন, পদার্থ আর মন বা চৈতন্য সত্তা ও জগৎ এই দুটো যেন একটা শৃঙ্খলের মত মিশে আছে। পাঁকে মাটি আর জল মিশে আছে, জল আছে বলে মাটি আছে, মাটি আছে বলে জল আছে। ঠিক তেমনি, আমাদের এই দৃশ্যমান জগতেও দুটো যেন মিশে আছে। এই পঞ্চভূতের জগৎটা আছে, সেইজন্য আমরা ঈশ্বরকে কোন না কোন ভাবে বুঝতে পারছি। আর ঈশ্বর আছেন, তাই এই জগৎটাও আছে। এই যে মিশে আছে, এই মিশে থাকাটাকে স্বামীজী বলছেন one presupposes the other। পদার্থ আর মনকে নিয়ে স্বামীজী বলছেন, এই দুটো যেন একটা শৃঙ্খল। যদি পদার্থকে আমরা ধরি, পদার্থকে ঠেলতে ঠেলতে শেষ দেখব মনে পৌঁছে গেছি। আর যদি মনকে অনুসরণ করা হয়, এগোতে এগোতে শেষে পদার্থ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। কারুর কাছে পদার্থই সত্য, সে পদার্থকে ঠেলতে

ঠেলতে মন পর্যন্ত পৌঁছে গেল, তার কাছে তখন মনে হবে পদার্থই মনকে জন্ম দেয়। এই মনকে পাশ্চাত্য দর্শন চৈতন্য মনে করছে, তারা দেখায় পদার্থ থেকেই চৈতন্য জিনিসটার জন্ম।

আমরা ঐ চৈতন্যে যাচ্ছি না, মন পর্যন্তই থাকছি। যারা ধর্ম মানে, তারা বলবে চৈতন্যই পদার্থের জন্ম দেয়। এটা খুব পুরনো লড়াই। কিন্তু স্বামীজীর বক্তব্য হল এই দুটো একটা শৃঙ্খলের মত, শৃঙ্খলের যে অংশটা যে আগে ধরবে, তার কাছে পরের অংশটা অন্য আসবে। যে প্রথম মনকে ধরল, সে দেখবে মন থেকে পদার্থের জন্ম হচ্ছে, কিন্তু যে পদার্থকে প্রথমে ধরল, সে দেখছে পদার্থের পরে মন আসছে, সে মনে করছে পদার্থ থেকে মনের জন্ম। স্বামীজীর বক্তব্য হল, মন আগে না পদার্থ আগে বা পদার্থ আগে না মন পরে, এই প্রশ্ন করাটা বৃথা। কারণ দুটো এমন ভাবে মিলে আছে যে, বোঝা যাচ্ছে একজন অপরকে ধরে আছে। ইদানিং অনেকে প্রশ্ন করে মুরগী আগে না ডিম আগে, যে মুরগী আগে ধরেছে সে বলবে মুরগী থেকে ডিম, যে ডিম আগে ধরেছে সে বলবে ডিম থেকে মুরগী। তাহলে আগে আসলে কোনটা এসেছে? বলবেন, এই প্রশ্ন হয়ই না। তবে ডিমটা ছিল ইউনিসেলুলার, যদি একটা সেলের মধ্যে যাওয়া যায় তখন দেখা যাবে ডিমকে আগে হতেই হবে। কিন্তু মুরগি আর ডিমের প্রশ্ন যখন আসে তখন একটার পর আসে না, তখন আসবে এটাই – এটা একটা শৃঙ্খল, আগে মুরগি বললে ডিম পরে, ডিম আগে বললে মুরগি পরে। স্বামীজী ঠিক এই জিনিসটাকেই বলছেন। যাদের দর্শন ধর্মের উপর আধারিত তারা সব সময় দেখে চৈতন্য থেকেই এই জগৎ এসেছে। জগৎকে যদি ঘষতে শুরু করা হয়, ঘষতে ঘষতে সব যখন খসে পরে গেল, শেষে থেকে যাবে শুধু চৈতন্য।

বলছেন, In all religions the superconscious state is identical. Hindus, Christians, Mohammedans, Buddhists, and even those of no creed, all have the very same experience when they transcend the body. (*সকল ধর্মের জ্ঞানাতীত বা তুরীয় অবস্থা এক। দেহজ্ঞান অতিক্রম করলে হিন্দু, খ্রীষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ –এমন-কি যারা কোনপ্রকার ধর্মমত স্বীকার করে না, সকলের ঠিক একই প্রকার অনুভূতি হয়।*) শরীর ও মনকে ছেড়ে দেওয়ার পর যে অনুভূতি হয়, পৃথিবীর সব কটি ধর্মেই তা একই অনুভূতি হয়। উপলব্ধির শেষ অবস্থায় গিয়ে সব ধর্মই বলবে, আমি এই শরীর নই, মন নই, শরীর মন এগুলো সত্য নয়, সত্য অন্য কিছু।

ভারতে খ্রীশ্চান ধর্মের শুরু

স্বামীজী এবার অন্য প্রসঙ্গে সরে এসে বলছেন, The purest Christians in the world were established in India by the Apostle Thomas about twenty-five years after the death of Jesus. (*যীশুর দেহত্যাগের পঁচিশ বৎসর পরে তাঁর শিষ্য টমাস (Apostle Thomas) কর্তৃক জগতের মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধ খ্রীষ্টান সম্প্রদায় ভারতের প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।*) চেন্নাইতে এখনও সেন্ট টমাসের সমাধি আছে। যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশিফিকেশানের পর যারা নিজেদের খ্রীশ্চান বলতে শুরু করল, সেই সময় তাদের উপর খুব অত্যাচার হতে শুরু হল। এই কারণে তারা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে গেল। সেই সময় সেন্ট টমাস ভারতবর্ষে চলে এলেন। সেন্ট টমাসকে নিয়ে প্রচুর মজার মজার কাহিনী আছে। কারণ ভারতবর্ষ কখন ধর্মকে মানে না, ঋষিকে মানে, মহাত্মাকে মানে। যে মহাত্মার যত বড় চমৎকারি হবে, সবাই তারই ভক্ত হবে। চমৎকারি থেকে এখন আরেক ধাপ নেমে গিয়ে হয়েছে, যে যত ভাল ভাল কথা বলতে পারবে, যে যত entertainment সাপ্লাই দিতে পারবে, তার তত চেলা হবে। আবার বলে যে, এখন কলিযুগ, কলিযুগ একজন গুরু দিয়ে কিছু হয় না, তাই তিন চারটে গুরু রাখতে হয়।

সেন্ট টমাস দক্ষিণ ভারতে এসেছেন, সেখানে তখন পূর্বপুরুষদের পিণ্ডদান করার জন্য জল দিত। টমাস ওদের জিজ্ঞেস করেছেন, ‘এগুলো কি হচ্ছে’? বলা হল পূর্বপুরুষদের পিণ্ডদান করার জন্য জল দেওয়া হচ্ছে। ‘জল তো দিচ্ছ কিন্তু সব জল তো নীচে যাচ্ছে’। বলা হল, জল এভাবেই যাবে। টমাস বললেন, ‘দেখ, আমি যখন দেব জল উপরে যাবে’। উনি যখন পিণ্ড দেওয়ার জন্য জল দিলেন, জল বাতাসে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। যীশুর শিষ্য, যোগশক্তি ছিল। ওই চমৎকারি দেখে পুরো এলাকাটাই খ্রীশ্চান হয়ে গেল, খ্রীশ্চান বলাটা

ঠিক না, কিন্তু সবাই টমাসের চেলা হয়ে গেল। সেইজন্য ভারতে প্রথম চার্চ সব কেরল, তামিলনাড়ুতেই। ঋষিদের মধ্যেও প্রচুর যোগশক্তি থাকত, ওই যোগশক্তি দেখে মানুষ তার ধর্মে আকৃষ্ট হত। স্বামীজীও বিদেশে গিয়ে এত কিছু করলেন, যোগশক্তি লাগিয়েছিলেন, যার জন্য তাঁর সংস্পর্শে মানুষ গুলো সব পাল্টে গেল। যোগশক্তি না লাগালে, যোগশক্তি না থাকলে মানুষ convert হয় না।

This was while the Anglo-saxons were still savages, painting their bodies and living in caves. The Christians in India once numbered about three millions, but now there are about one million. (*অ্যাংলো-স্যাক্সনরা তখনও অসভ্য ছিল – গায়ে চিত্র-বিচিত্র আঁকত ও পর্বতগুহায় বাস করত। এক সময় ভারতে প্রায় ৩০ লক্ষ খ্রীষ্টান ছিল, কিন্তু এখন তাদের সংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষ হবে।*) ওই সময়টায় ইংল্যাণ্ড, বিশেষ করে ইংরেজদের উপর স্বামীজীর খুব রাগ ছিল। স্বামীজী কোন সুযোগ ছাড়তেন না, যখনই সুযোগ পেতেন তিনি এই কথা বলতেন, ভারতবর্ষ যখন সভ্য দেশ ছিল তখন তোমাদের দেশের লোকেরা কাপড় পরা শেখেনি, মুখে, গায়ে রঙ মেখে গাছে গাছে ঘুরে বেড়াত বা গুহায় থাকত। যে সময় যীশু এসেছেন, তার তিনশ বছর আগে ভারতে মনুস্মৃতি লেখা হয়ে গেছে। তারও পাঁচশ বছর আগে ভগবান বুদ্ধ উপদেশ দিয়ে চলে গেছেন। তারও হাজার বছর আগে গীতার উপদেশ হয়ে গেছে। তারও ছয় সাত হাজার বছর আগে আমাদের বেদ রচনা হয়ে গেছে। স্বামীজী এটাই বলছেন, টাইম স্কেলে তোমাদের এখনও দাড়ি কামানোর সময় হয়নি, আর তোমরা আমাদের সাথে তর্ক করতে আসছ! স্বামীজী উল্লেখ করছেন আগে ভারতে অনেক খ্রীশ্চান ছিল। কারণ প্রথমেই একটা চমৎকারী দেখিয়ে দিয়েছে, শুধু চমৎকারী দিয়ে কদিন আর ধর্ম চলবে! একজন সেন্ট টমাসকে নিয়ে কত আর লোক ধরে রাখবে! কিন্তু চার্চগুলোর প্রচুর রাজনৈতিক ক্ষমতা আছে, এই সেই করে অনেক দিন এই দেশে থাকল। স্বামীজী আবার বলছেন।

ধর্মান্তরকরণ ও জগতে তিনটি ধর্মের প্রসার

Christianity is always propagated by the sword, (*খ্রীষ্টধর্ম চিরকালই তরবারির বলে প্রচারিত হয়েছে।*) এবার স্বামীজী নিজের তলোয়ারটা বার করে নিয়েছেন। বলেই আবার বলছেন, How wonderful that the disciples of such a great soul should kill so much! (*কি আশ্চর্য, খ্রীষ্টের ন্যায় নিরীহ মহাপুরুষের শিষ্যরা এত নরহত্যা করেছে।*) থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে মিস্ ডাচারের কটেজে স্বামীজী এই কথাগুলো বলছেন। মিস্ ডাচার ছিলেন গোঁড়া খ্রীশ্চান, তিনি স্বামীজীর এই ধরণের কথা শুনে চোখের জল ফেলতে ফেলতে কটেজ ছেড়ে চলে যেতেন। কোন কোন দিন সারাদিন বাইরে কাটিয়ে বিকেলে ফিরতেন। স্বামীজী বলছেন, কি আশ্চর্য! যীশুর মত পবিত্রাত্মা, কিন্তু তার শিষ্যরা শুধু রক্ত বন্যা বইয়ে গেছে। ইদানিং কালে অতটা বলা হয় না, কিন্তু আগেকার দিনে কোন বড় বংশের ছেলে যদি কোন খারাপ কাজ করত, লোকেরা বলত, অমুক বংশের ছেলের এই অধঃপতন! স্বামীজী আরও বিদ্রুপ করে বলছেন, যে লোকটা অপরের জন্য নিজের জীবন দিয়ে দিলেন, তাঁর সন্তানরা এখন সবার গলা কেটে বেড়াচ্ছে।

স্বামীজী বলছেন, The three missionary religions are the Buddhist, Mohammedan, and Christian. (*বৌদ্ধ, মুসলমান ও খ্রীষ্ট ধর্ম –জগতে এই তিনটিই প্রচারশীল ধর্ম।*) এই তিনটে ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, ইসলাম ধর্ম আর খ্রীশ্চান ধর্ম, এরা প্রচার ও ধর্মান্তরের মাধ্যমে নিজেদের ধর্মের দলপুষ্টি করতে চায়। The three older ones, Hinduism, Judaism and Zeroastrianism, never sought to make converts. (*এদের পূর্ববর্তী তিনটি ধর্ম, যথা –হিন্দু, ইহুদী ও জরথ্রুষ্টের ধর্ম কখনও অপরকে ধর্মান্তরিত করে দলপুষ্টি করতে চেষ্টা করেনি।*) স্বামীজী জৈন ধর্ম আর শিখ ধর্মকে এইজন্যই নেননি, কারণ এই দুটো ধর্ম খুব ছোট। ঠিক ঠিক দেখতে গেলে ছয়টি ধর্মই বিশ্বে বড় ধর্ম সম্প্রদায়। স্বামীজী এখানে চারটে ধর্ম নিচ্ছেন মধ্যপ্রচ্য এশিয়া থেকে আর দুটো ধর্ম ভারত থেকে। জৈন আর শিখ ধর্মকে নিলে, চারটে ধর্ম ভারত থেকে আর বাকি চারটে মধ্যপ্রাচ্য এশিয়া থেকে। সমস্ত বিশ্বে যতগুলি ধর্ম আছে, সবারই জন্ম এশিয়াতে। বলছেন, এদের মধ্যে তিনটে ধর্ম ধর্মান্তর করে, তিনটে ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, জুহুদি ধর্ম আর পার্সিদের ধর্ম ধর্মান্তর করে না।

Buddhists never killed, but converted three-quarters of the world at one time by pure gentleness. (*বৌদ্ধরা কখনও নরহত্যা করেনি, তারা শুধু কোমল ব্যবহারের দ্বারাই এক সময়ে জগতের তিন-চতুর্থাংশ লোককে নিজেদের মতে নিয়ে এসেছিল।*) স্বামীজী এখানে একটা ঐতিহাসিক তথ্য দিচ্ছেন। খ্রীশ্চানিটি আর ইসলাম তলোয়ার চালাবার জন্য ওস্তাদ। এখনও করছে কিন্তু খুব কায়দা করে করছে। ইদানিং আমেরিকা খ্রীশ্চানিটির নামে পরিষ্কার করে মারে না, কায়দা করে মারে, মারছে আসলে খ্রীশ্চানিটির জন্যই। আর যত লড়াই সব ইসলাম আর খ্রীশ্চানিটির মধ্যেই চলে। বৌদ্ধ ধর্মই একমাত্র, যারা খুব নরম স্বভাবের। ঐতিহাসিকদের কাছে এটা সত্যিই আশ্চর্যের। বড় বড় ঐতিহাসিক মানেই সব খ্রীশ্চান, খ্রীশ্চান মাত্রেই জানে ইসলাম মানেই শুধু তলোয়ারবাজি, কিন্তু তারাও দেখে অবাক হয়ে যায়, কি করে মানুষকে শুধু নিজেদের ভালবাসা দিয়ে বৌদ্ধ ধর্ম জগৎ জয় করেছিল। এখান থেকে ধীরে ধীরে বৌদ্ধ ধর্মে নেমে স্বামীজী বৌদ্ধ ধর্মের দর্শনের উপর আলোকপাত করছেন।

ব্রহ্মবাদ ও শূন্যবাদ

The Buddhists were the most logical agnostics. You can really stop nowhere between nihilism and absolutism. (*বৌদ্ধরা ছিল সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত অজ্ঞেয়বাদী। বাস্তবিকই শূন্যবাদ ও অদ্বৈতবাদ, এই দুয়ের মাঝখানে সত্যি কোথাও থামতে পারে না।*) Nihilism মানে শূন্যবাদ, অর্থাৎ যারা বলে অন্তিমে সব শেষ, কিছুই অবশিষ্ট থাকে না; absolutism মানে সব আছে। অনন্ত থেকে অনন্ত বিয়োগ করলে কি হবে? এর উত্তর শূন্য হবে, নাকি অনন্ত হবে? যে বলবে অনন্ত থেকে অনন্ত বিয়োগ দিলে অনন্তই থাকবে, সে হয়ে যাবে বেদান্তী। আর যে বলবে অনন্ত থেকে অনন্ত বিয়োগ দিলে শূন্য হবে, সে তাহলে বৌদ্ধ হয়ে যাবে। তার মানে অনন্ত বিয়োগ অনন্ত, এক থেকে শুরু করে অনন্ত বিয়োগ এক, সেখান পর্যন্ত কোন সুযোগ নেই, সুযোগ মাত্র দুটি সংখ্যার আছে, হয় অনন্ত আর তা নাহলে শূন্য। দর্শন শাস্ত্রের উত্তরও হয় অনন্ত না হলে শূন্য। এ-ধরণের কথা শুনলে হয়ত আমাদের খুবই আতঙ্ক লাগবে, কিন্তু ধর্মের দিক দিয়ে যদি আমরা দেখতে যাই, পুরো যুক্তি দিয়ে যদি দাঁড় করানো হয়, তাহলে ধর্ম মাত্র দুটিই হতে পারে, হিন্দু ধর্ম আর বৌদ্ধ ধর্ম।

অনন্ত বিয়োগ অনন্ত কি হবে? ঈশ্বর আর জগতের সম্পর্ক কি? চৈতন্য আর জগতের সম্পর্ক কি? হয় অনন্ত, না হয় শূন্য – একদিকে হতে পারে শূন্যবাদ, আর তা নাহলে ব্রহ্মবাদ। যা কিছু আছে ব্রহ্ম, আর তা নাহলে যা কিছু আছে শূন্য। এর মাঝে যদি কেউ দাঁড়ায়, তাহলে বুঝতে হবে তার গোলমাল আছে। প্রথমের দিকে যখন কোয়ন্টাম ফিজিক্স আসতে শুরু হল, বিজ্ঞানীরা তখন হিসাব মেলাতে পারছিলেন না। পরে ধীরে ধীরে কোয়ান্টাম ফিজিক্সের ধারণা এলো, যেখানে বলছে হয় জিনিসটা এখানে থাকবে, নয়তো ওখানে থাকবে। আগেকার দিনে কিছু মেশিন ছিল, যার মধ্যে কয়েন ফেলে দিলে জিনিস বেরিয়ে আসত। যেমন এক টাকার একটা কয়েন, এক টাকার কয়েন যদি দেওয়া হয় তাহলে সে জিনিস পাবে। আট আনার কয়েন যদি দিয়ে দেয়, আধুলিটা ভিতরেই থেকে যাবে, সে আর কিছুই পাবে না। হয় এক টাকা আরা নয়তো জিরো, অন্য কিছু নেবে না। স্বামীজী এটাই বলতে চাইছেন। ধর্ম মানে, হয় পুরো ষোল আনা, আর তা নাহলে পুরো ফাক্কা। বৌদ্ধদের শূন্যবাদ, নাহলে বেদান্তীদের ব্রহ্মবাদ। মাঝখানে কারুর কোন স্থান নেই।

এর প্রভাব সবার আগে গিয়ে ধাক্কা লাগে ইসলাম আর খ্রীশ্চানিটিতে। ওদের যে একেশ্বরবাদ, ঈশ্বর এক, তিনি আছেন, তিনি রাজ করছেন, বলছেন, ওদের এই ধারণাটা যুক্তি তর্কে কোথাও দাঁড়াবে না। তাহলে কি ইসলাম ধর্ম, খ্রীশ্চান ধর্ম ভুল? একেবারেই ভুল নয়, এইজন্যই ভুল নয়, দর্শনের দিকে খুব শক্তিশালী ধর্ম মাত্র দুটি, একটা হিন্দু ধর্ম, আরেকটা বৌদ্ধ ধর্ম। তার কারণ হিন্দু ধর্মে অনেক ঋষিদের অবদান আছে, যার জন্য আমরা অনেক কিছু পাই, আর বৌদ্ধ ধর্মে ভগবান বুদ্ধ অনেক দিন জীবিত ছিলেন। তিনি মোটামুটি তিরিশ বছর থেকে শুরু করে প্রায় চল্লিশ বছর ধরে শিক্ষা দিয়ে গেছেন। যার জন্য এত লোক এতগুলো জিনিস, এত রকমের ঘটনা শুনেছে আর তারা সেগুলোকে রেকর্ড করে রেখেছে বলে সমস্ত কিছু সবার সামনে চলে এসেছে। অন্য দিকে জৈন ধর্ম তপস্যার নামে এমন বিচিত্র বিচিত্র জিনিস করতে শুরু করল, যার জন্য ওদের অনেক কিছু এলেমেলো হয়ে যায়। জহুদি ধর্মেও প্রচুর প্রফেটস এসেছেন, কিন্তু জহুদি ধর্মের একটা

দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হল, নিজেদের ধর্মগ্রন্থকে ওরা এত বিশ্বাস করত যে, দর্শনের দিকটাকে একেবারেই গুরুত্ব দেয়নি। সেইজন্য সেই রকম ফিলজফারস্‌ও কোন দিন হয়নি। ওদের শুধু ছিল কয়েকজন ব্যাখ্যাতা, ভাষ্যকার। যদি আমরা শঙ্করাচার্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামীজীকে সরিয়ে দিই, তাহলে একবার ভেবে দেখতে হবে হিন্দু ধর্মের কি অবস্থা হবে। আর তার জায়গায় যদি শুধু ভাগবতকাররা বা রামায়ণকাররাই থাকেন আর এটাই যদি হিন্দু ধর্মের পূর্ণাঙ্গ চিত্র হয়ে যায়, তাহলে হিন্দু ধর্ম বলে কিছুই থাকবে না। মানুষ রামকথা, কৃষ্ণকথা ঠিকই জানবে, তত্ত্বকথাও জানবে, কিন্তু হিন্দু ধর্মের উপর যখন আক্রমণ হবে তখন কেউ আর উত্তর দিতে পারবে না। জহুদিদের ঠিক একই সমস্যা হয়েছিল, ওদের ফিলজফারস্ হয়নি। ওদের ধর্মগ্রন্থে শুধু ঈশ্বরের কথা, সেখানে তত্ত্বের কোন স্থান নেই।

এরপর এলেন যীশুখ্রীষ্ট। প্রথমের দিকে খ্রীষ্টানদের উপর অনেক আক্রমণ হল, প্রচুর মার খেল, পরে আস্তে আস্তে খ্রীষ্ট ধর্ম শক্তি লাভ করতে থাকল। এরপর লড়াই শুরু হল খ্রীশ্চান আর জিউসদের মধ্যে। আর যীশুখ্রীষ্টের ছ'শ বছরের মধ্যে এসে গেলো ইসলাম। এরপর ইসলাম আর খ্রীশ্চানরা মিলে জহুদিদের physically আর philosophically এমন মার মারতে শুরু করল যে, ওরা ঠিক করল, ওদের থেকে শিখতে হবে তর্ক কিভাবে করতে হয়। আসলে এখনও আমাদের ভারতবর্ষে তর্কের কৌশলগুলো ন্যায়শাস্ত্র থেকে নেওয়া হয়ে থাকে, পাশ্চাত্যের তর্কের কৌশলগুলো আমরা এখনও রপ্ত করতে পারিনি। জহুদিদের অনেক প্রফেট আছেন, হিন্দুদেরও অনেক ঋষিরা আছেন আর ভগবান বুদ্ধ অনেকদিন বেঁচে ছিলেন বলে বৌদ্ধ ধর্মে অনেক কিছু আছে। বাকিদের সমস্যা হল, যীশুখ্রীষ্ট মাত্র তিন বছর বেঁচে ছিলেন। মহম্মদ বসে থাকতেন কবে আল্লা তাঁকে কি বলবেন এই আশা নিয়ে, পার্সি ধর্মেরও একই অবস্থা, একজনের উপর দাঁড়িয়ে আছে, তাঁর কাছেও ওটার পূর্ণাঙ্গ ছবিটা নেই। আমরা যদি খুব মন দিয়ে, নিরপেক্ষ ভাবি দেখি, তাহলে দেখব সব ধর্মগুলি অসম্পূর্ণ ধর্ম। ধর্ম তখনই পূর্ণাঙ্গ ধর্ম হবে, যদি তার আধ্যাত্মিক ভাব, তার দর্শনের যৌক্তিকতা আর তার ধর্মের অনুশীলন, এই তিনটে দিক থেকে খুব শক্তিশালী ও সাবলীল হয়। ইসলাম ও খ্রীশ্চান ধর্ম আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে দুর্বল হয়ে যায়, কারণ ওরা সেই সুযোগটা পায়নি। শিষ্যরা যাঁরা শিখেছিলেন, তাঁদের সেই talent ছিল না। শিষ্যদের দিয়ে যীশুখ্রীষ্ট বা মহম্মদকে কি মাপা যাবে? কখনই মাপা যাবে না। শিষ্যরা নিজের মত যতটুকু বুঝেছেন লিখে রেখেছেন। এখানে ধর্মের বা যীশুখ্রীষ্টের বা মহম্মদের কোন দোষ নেই। এবার যদি ঠিক ঠিক ধাক্কা মারতে শুরু করা হয়, দেখা যাবে শেষ জায়গায় গিয়ে সব উড়ে যাচ্ছে; ঠাকুর যেমন বলছেন রূপটুপ সব উড়ে যায়। সেইজন্য বলছেন, হয় ব্রহ্মবাদ থাকবে, তা নাহলে শূন্যবাদ থাকবে, মাঝখানে কিছু থাকতে পারে না। বাকিরা কিন্তু কেউই ভুল না, একটু পরে রাবেয়ার কবিতাকে নিয়ে বলবেন, সেখানে ওই অবস্থায় নিয়ে যাচ্ছে। যাঁরা খ্রীশ্চান মরমীয়া সাধক ছিলেন, যাঁরা পুরোপুরি আধ্যাত্মিকতার মধ্যে ডুবে ছিলেন, তাঁদের রচনাগুলো পড়লে মনে হবে যেন উপনিষদ পড়ছি। স্বামীজী ছিলেন খাপ খোলা তলোয়ার, তিনি আঁটঘাট ঢেকে কথা বলতেন না। ঠাকুর তাও আঁটঘাট বাঁধতেন, একটু রেখেঢেকে বলতেন, তবে কম করতেন, কিন্তু বাঁধতেন। স্বামীজীর সেটাও ছিল না।

The Buddhists were intellectually all-destroyers, carrying their theory to its ultimate logical issue. (*বৌদ্ধরা বিচারের দ্বারা সব কেটে দিয়েছিল – তারা তাদের মত যুক্তি দ্বারা যতদূর নিয়ে যাওয়া চলে, তা নিয়ে গিয়েছিল।*) বৌদ্ধদের নামই হল সর্ববৈনাশীক, কারণ ওদের তর্ক যখন চলতে শুরু হয়, বিশেষ করে শূন্যবাদের উপর ওদের যে-সব যুক্তি আছে, সেই যুক্তি দিয়ে ওরা যখন আক্রমণ করবে, সবাইকে আতঙ্কে তর্কের ময়দান ছেড়ে পালাতে হবে। কারণ নিজের অস্তিত্বকেই ভুলে যেতে হয়। The Advaitists also worked out their theory to its logical conclusion and reached the Absolute, one identified Unit Substance out of which all phenomena are being manifested. (*অদ্বৈতবাদীরাও তাদের মত যুক্তির চরম সীমায় নিয়ে গিয়েছিল এবং সেই এক অখণ্ড অদ্বয় ব্রহ্মবস্তুতে পৌঁছেছিল – যা থেকে সমুদয় জগৎপ্রপঞ্চ ব্যক্ত হচ্ছে।*) অদ্বৈতবাদীরা যখন শুরু করল তারাও একই কাজ করল, তারাও সব নেতি নেতি করে ফেলতে শুরু করল, কিন্তু তারা শূন্যবাদে না গিয়ে পৌঁছে গেল সেই একত্বে, যেখানে গিয়ে সব কিছু এক হয়ে যাচ্ছে, যত রকম বিবিধতা, বহুত্ব আছে, সব যেখানে গিয়ে এক হয়ে যায়; সেটাই আত্মা, সেটাই ব্রহ্ম।

Both Buddhists and Advaitists have a feeling of identity and non-identity at the same time; one of these feelings must be false, and the other true. (*বৌদ্ধ ও অদ্বৈতবাদী উভয়রেই একই সময়ে একত্ব ও বহুত্ব (অভেদ ও ভেদ) বোধ আছে। এই দুটির মধ্যে একটি সত্য, অপরটি মিথ্যা হবেই।*) এক আর বহু, এই দুটোকে বৌদ্ধরাও মানছে এবং বেদান্তবাদীরাও মানছে। আমরা যে বহু দেখছি, কোথাও এটা সত্য, আবার কোথাও মনে হচ্ছে, বহুর যে প্রতীতি, এটা সত্য নয়, যুক্তিতে এটা দাঁড়াতে পারে না। তাহলে কি হবে? হয় বহু সত্য, আর তা নাহলে বহু সত্য নয়। The nihilist puts the reality in non-identity, the realist puts the reality in identity; and this the fight which occupies the whole world. This is 'tug of war'. (*শূন্যবাদী বলেন, পৃথকত্ব বা বহুবোধ সত্য; অদ্বৈতবাদী বলেন, একত্ববোধই সত্য; সমগ্র জগতে এই বিবাদই চলেছে। এই নিয়েই ধস্তাধস্তি চলেছে।*) দুটোর মধ্যে একটাকে সত্য হতে হবে। শূন্যবাদীরা, যারা সর্ববৈনাশীক, বিচার করে করে তারা যেখানে নিয়ে যাচ্ছে, সেখানে সব শূন্য হয়ে যাচ্ছে, কিছু নেই। ভৌতিকবাদীরা বৌদ্ধদের মত নয়, কিন্তু তারাও শেষে নিয়ে যাচ্ছে শূন্যে, যেখানে কিছু থাকে না। এর অন্য দিকে আছে Idealistরা, স্বামীজী এদের Idealist বলছেন না, এদের বলছেন, Realist, বাস্তববাদী। বাস্তববাদীরা বিচার করে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যাচ্ছে একত্বে। খ্রীশ্চানিটি ও ইসলামের কাছেও one reality হল সেই ঈশ্বর। শেষ কথা কি? ঈশ্বর। যারা সর্ববৈনাশীক এবং বর্তমান কালের বৈজ্ঞানিকরা, এদের সবার শেষ কথা শেষে কিছু থাকে না। বিজ্ঞান বলছে সব বিগ ব্যাঙ থেকে আসছে, বিগ ব্যাঙ কোথা থেকে এলো? বিজ্ঞানের কাছে কোন উত্তর নেই, সর্ববিনাশ। বৌদ্ধরা শেষে বলে আলাদ্, সব শেষ, শান্তি।

স্বামীজী তখন বলছেন, The realist asks, 'How does the nihilist get any idea of identity?'. (*অদ্বৈতবাদী জিজ্ঞাসা করেন, শূন্যবাদী একত্বের কোন ভাব পান কোথা থেকে?*) ঠিক আছে মানলাম তোমার শূন্যবাদ সত্য, তুমি যা বলছ সব সত্য মানছি, কিন্তু তুমি যে এই বোধ পাচ্ছ –সব কিছুর কোথাও একটা মিল আছে, এই আইডিয়াটা তুমি কোথা থেকে পাচ্ছ? এই যে বহু, এই বহু কোথাও একটাতে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। How does the revolving light appear a circle? A point of rest alone explains motion. (*বৃত্তাকার মনে হয় কি করে? একটা স্থিতি স্বীকার করলে তবেই গতির ব্যাখ্যা হতে পারে।*) আলোকে ঘোরালে মনে হবে যেন একটা আলোর বৃত্ত তৈরী হয়েছে। কিন্তু, স্বামীজী বলছেন, যতক্ষণ একটা স্থিতি বা point of rest স্বীকার না করা হয় ততক্ষণ motionএর ধারণা আসবে না।

আইনস্টাইন যখন থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি লিখতে শুরু করেন, তখন এই জিনিসগুলোকে নিয়ে প্রচুর আলোচনা চলেছিল, What is rest? নিউটনের সময় তাঁর কাছে ছিল একটা পয়েন্ট ফিক্সড্, বাকি গুলো আইডিয়া অফ মোশান। কিন্তু আইনস্টাইন যখন শুরু করলেন, তখন ওনার কাছে দুটোই হয়ে গেলে motion। যাই হোক, আমাদের কাছে জগতে যখনই কোন idea of motion আসে, idea of motion মানেই হয় there is some idea of rest। ইদানিং ফিজিক্স এগুলোকে নিয়ে অনেক গবেষণা করছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত আমাদের general understanding হল, যখন কেউ motionএর কথা বলছে, তখন ধরে নিতে হবে যে, সে restএর কথাও বলবে। তার মানে, বৌদ্ধরা যে বলছে জীবনটা হল আলাদ্, আলাদ্ মানে কোন আলোকে যদি খুব জোরে ঘোরান হয়, তখন যে আলোর বৃত্ত তৈরী হয় সেটাকে আলাদ্ বলছে। আলোকে ঘোরান হচ্ছে, ঘোরান মানেই সেখান motion আসছে, মানে rest, rest যদি না থাকে তাহলে আমরা বুঝব কি করে যে, এটা ঘুরছে! আইনস্টাইন এটাকে চেঞ্জ করে বললেন, relative to each other। ঠিক আছে, relative to each other হোক, কিন্তু relative to each other যখন হচ্ছে তখন আপনি যে motion বলছেন, একটা কোথাও তো আপনি relative বানিয়ে নিচ্ছেন।

মনে করা যাক, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোথাও কিছু নেই, সত্যিকারের কিছু নেই, একটু object আছে। ওটা এখন চলছে কি চলছে না, আপনি কি করে জানবেন, সে নিউটনের ফিজিক্সই আনা হোক আর আইনস্টাইনের ফিজিক্সই আনা হোক, জানার কোন পথ নেই। তাপমাত্রা মাপার সময় থার্মোমিটারে পারদ দিয়ে মাপা হয়। কিন্তু গ্যাস জাতীয় জিনিসের তাপমাত্রা মাপার ক্ষেত্রে average molecular motion থেকে নিয়ে

আসা হয়। তার পুরো স্পীড কি, সেখান থেকে তার velocityকে তাপমাত্রায় ট্রান্সফার করে হিসাব করা হয়। সমস্যা হল, যদি একটাই molecule থাকে তাহলে তখন তার average molecular motion কিভাবে ঠিক করা হবে? ওনারা তখন বলছেন, এটা hypothetical, এই রকম কখন হয় না। যে কোন জিনিসকে মাপতে গেলে আগে তার একটা standard লাগবে। কিন্তু যখন বলছে কিছু নেই, তখন একটা presuppose করে, কিছু একটা আছে। তবে আমরা যেভাবে বলছি, যেভাবে শূন্যবাদকে উড়িয়ে দিচ্ছি, জিনিসটা তত সহজ নয়। স্বামীজী এটাকে এভাবে ব্যাখ্যা করে বলছেন, স্বামীজী আমাদের আচার্য, আমরাও তাই স্বামীজীর কথাকে মেনে নিয়ে চলছি।

স্বামীজী আবার বলছেন, The nihilist can never explain the genesis of the delusion that there is a background; neither can the idealist explain how the One becomes the many. (*সব জিনিসের পশ্চাতে একটা অখণ্ড সত্তা প্রতীয়মান হচ্ছে, সেটাকে শূন্যবাদী বলেন –ভ্রমমাত্র; কিন্তু এরূপ ভ্রমোৎপত্তির কারণ কি, তা তিনি কোনরূপে ব্যাখ্যা করতে পারেন না। আবার অদ্বৈতবাদীও বোঝাতে পারেন না যে এক বহু হলো কি করে।*) Realistরা বলতে পারে না এক কি করে বহু হয়, আর বর্তমান কালের বিজ্ঞান এবং বৌদ্ধদের শূন্যবাদীরাও এটা ব্যাখ্যা দিতে পারছে না, যেটার backgroundএ সব কিছু হচ্ছে, এই backgroundএর তুমি ব্যাখ্যা কর। তার মানে যারা Realists তাদেরও সমস্যা আছে, যারা শূন্যবাদী, তাদেরও সমস্যা আছে। অদ্বৈত বেদান্তের যেমন নিজস্ব সমস্যা আছে, বৌদ্ধ ধর্মেরও নিজস্ব সমস্যা আছে। যারা সবটাই উড়িয়ে দিচ্ছে, তাদেরও সমস্যা আছে, আর যারা সব কিছু মেনে নিচ্ছে, তাদেরও সমস্যা আছে।

সমস্যার সমাধান যে-ভাবে হতে পারে

তখন স্বামীজী বলছেন, The only explanation must come from beyond the sense plane; we must rise to the superconscious, to a state entirely beyond sense-perception. (*এর ব্যাখ্যা কেবলমাত্র পঞ্চেন্দ্রিয়ের অতীত অবস্থায় গেলেই পাওয়া যেতে পারে। আমাদের তুরীয় ভূমিতে উঠতে হবে, একেবারে অতীন্দ্রিয় অবস্থায় যেতে হবে।*) যদি কেউ উত্তর পেতে চায়, তাহলে তাকে এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ, ইন্দ্রিয় জগতের বাইরে সেই চেতনার স্তরে চলে যেতে হবে, যেখানে সে সব কিছু মিলিয়ে দেখতে পারবে। আর, That metaphysical power is the further instrument that the idealist alone can use. (*অতীন্দ্রিয় শক্তি যেন ঐ অবস্থায় যাবার একটি যন্ত্রস্বরূপ, আর তার ব্যবহার অদ্বৈতবাদীদেরই করায়ত্ত।*) এই জায়গাতে এসে সমস্যা হয়ে যায়, এটা এমন একটি শক্তি, যে শক্তি একমাত্র যারা Idealistic, যারা ধর্ম মানে, তারাই এটার ব্যবহার করতে পারে। যারা বৈজ্ঞানিক, তারা এর ব্যবহার করে দূরে থাক, এগুলোকে মানেই না। যখন এগুলো মানে না তখন সে কেন ঈশ্বরের দিকে যাবে, কেন ঈশ্বরের ধ্যান করতে যাবে!

He can experience the Absolute; the man Vivekananda can resolve himself into the Absolute and then come back to the man again. (*তিনিই ব্রহ্মসত্তাকে অনুভব করতে সমর্থ; মানুষ 'বিবেকানন্দ' নিজেকে ব্রহ্মসত্তাতে পরিণত করতে পারে, আবার সেই অবস্থা থেকে মানবীয় অবস্থায় ফিরে আসতে পারে।*) স্বামীজী নিজেকেই দৃষ্টান্ত দিয়ে বলছেন, এই মানুষ 'বিবেকানন্দ' চাইলে সেই অদ্বৈত অবস্থায় চলে গিয়ে, আমার সমস্যা মিটিয়ে দিয়ে আবার আমি এই মানুষ 'বিবেকানন্দে' ফিরে আসতে পারি। আমি, আপনি, সবাই আমরা এটা করতে পারি। সমাধান কিছু নেই, কারণ idealistরা কখনই ব্যাখ্যা করতে পারবে না এক কি করে বহু হল, idealistরা সব কিছুকে উড়িয়ে দেওয়ার আগে কোন দিন ব্যাখ্যা করতে পারে না বহুর ব্যাকগ্রাউণ্ড কি। উপায় একটাই, ওই অতিন্দ্রীয় অবস্থায় নিজে চলে গিয়ে দেখে এসো। অনুভূতি ছাড়া ধর্মের কোন প্রমাণ নেই। যার অনুভূতি হয়নি তার ঈশ্বরে বিশ্বাস কি করে হবে! যাকে তুমি কোন দিন দেখনি, যাকে তুমি কোন দিন স্পর্শ পর্যন্ত করে দেখোনি, যার কথা কোন দিন শোননি, তার কথা তোমার কি করে বিশ্বাস হবে! কেউ তোমাকে বলে দিয়েছে ঈশ্বর আছেন, আমরা তার কথাটাকে কেবল বিশ্বাস করে যাচ্ছি। ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে কিনা তার একমাত্র প্রমাণ হল, তাকে নিজেকে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ করতে হবে।

সেটাই স্বামীজী বলছেন, তুমি যদি সেই Absoluteএর অবস্থায় চলে যাও, তুমি জিনিসটাকে জেনে গেলে, এরপর তুমি ফেরত এলে, তুমি এবার এক নূতন মানুষ।

For him, then, the problem is solved and secondarily for others, for he can show the way to others. Thus religion begins where philosophy ends, Primarily. (*এই ভাবে তার পক্ষে জগৎসমস্যার মীমাংসা হয়ে গেছে, আর গৌণভাবে অপরের পক্ষেও ঐ মীমাংসা হয়ে গেছে; কারণ সে অপরকে ঐ অবস্থায় পৌঁছবার পথ দেখিয়ে দিতে পারে। এইরূপে বোঝা যাচ্ছে, যেখানে দর্শনের শেষ, সেখানে ধর্মের আরম্ভ।*) স্বামীজীর সমস্যা চলে গেল, তিনি সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেন, আর secondarily স্বামীজীর কথা যারা শুনছে তারা তাঁর কথা বিশ্বাস করে, তাঁর দেখানো পথ অনুসরণ করতে চায়, সেইজন্য তাদেরও সমস্যা কিছুটা কমে যায়; বাকিদের জন্য সমস্যা থেকে যাবে, এভাবেই দর্শন থেমে গিয়ে ধর্ম চলতে শুরু করে। The 'good of the world' will be that what is now superconscious for us will in ages to come be the conscious for all. (*আর এইরূপ উপলব্ধির দ্বারা জগতের কল্যাণ এই হবে যে, এখন যা জ্ঞানাতীত রয়েছে, কালে তা সর্বসাধারণের পক্ষে জ্ঞানগম্য হয়ে যাবে।*) সেই দিন আসবে, এখন যেটাকে আমাদের ঈশ্বরের চেতনা বলে মনে হয়, সেদিন মানুষ চেতন অবস্থাতেই সেটাকে দেখতে পারবে। ঠাকুর চেতন সমাধির কথা বলছেন, যেখানে তিনি জগৎকে চৈতন্যময় দেখছেন। স্বামীজীর এই বিশ্বাস ছিল যে, একদিন জীবনমুক্ত পুরুষরা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে। জহরলাল নেহরু যেমন বলতেন, প্রত্যেক পান দোকানে আমি একজন গ্রাজুয়েট দেখতে চাই। বলতে চাইছেন, শিক্ষার এত উন্নতি হবে যে, গ্রাজুয়েটরাই পান দোকান চালাবে। স্বামীজীর মত হল একদিন সবাই জীবনমুক্ত হয়ে যাবে, রাস্থাঘাটে তাঁদের ঘুরে বেড়াতে দেখা যাবে। আচার্য শঙ্কর মণ্ডন মিশ্রের সাথে তর্ক করতে যাচ্ছেন, জিজ্ঞেস করছেন মণ্ডন মিশ্রের বাড়ি কোনটা। বলছে, যে বাড়িতে টিয়া পাখি আর ময়না পাখি শাস্ত্রার্থ করছে। স্বামীজীর এটাই স্বপ্ন, একদিন জীবনমুক্তরাই পানের দোকান চালাবে। কারণ জীবনমুক্ত পুরুষের কাছে কোন কাজ ছোট না, কোন কাজ বড় না।

ধর্মলাভই জগতের সর্বশ্রেষ্ট কার্য

Religion is therefore the highest work of the world has; and because man has unconsciously felt this, he has clung through all the ages to the idea of religion. (*সুতরাং জগতে ধর্মলাভই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ কার্য; আর মানব অজ্ঞাতসারে এইটি অনুভব করেছে বলেই সে আবহমান কাল ধর্মভাবকে আশ্রয় করে রয়েছে।*) ঠাকুর বার বার বলছেন, ঈশ্বর দর্শনই একমাত্র উদ্দেশ্য। আমাদের সবারই একমাত্র কাজ হল ঈশ্বরের সাক্ষাৎ করা। আর যেহেতু আমরা অবচেতন মনেই এটা জানি, সেইজন্য অনেক ভাল-মন্দ থাকা সত্ত্বেও মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে ধর্মকে ধরে আছে। কারণ কোথাও আমরা জানি যে, ধর্মই সত্য, ঈশ্বরই সত্য।

মানুষ তার অবচেতন মনে জানে ধর্ম সত্য, সেইজন্য হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ ধর্মকে ধরে বেঁচে আছে। একটা আমকে মাটিতে পুতে দিলে, আমের যে আঁটি, যার মধ্যে সঞ্জীবনী শক্তি আছে, আবার গাছ হয়ে বেরিয়ে আসবে, তার খোসা আর শাঁস মাটিতে মিশে যাবে। প্রকৃতির এটাই নিয়ম, যে জিনিসের মধ্যে সারবত্তা নেই, সত্যের শক্তি নেই, সেই জিনিস আজ হোক, আগামীকাল হোক, আমের খোসা আর শাঁসের মত মাটিতে মিশে যাবে আর এক আম্রবৃক্ষ দাঁড়িয়ে যাবে। মানুষ যে এতদিন ধর্মকে ধরে আছে, এটাই প্রমাণ যে, ধর্ম সত্য। স্বামীজী তাই বলছেন, Religion, the great milch cow, has given many kicks, but never mind, it gives a great deal of milk. (*ধর্ম যেন বহুগুণশালিনী দুগ্ধবতী গাভি; সে অনেক লাথি মেরেছে, কিন্তু তাতে কি? মনে রেখো সে অনেক দুধও দিয়েছে।*) ধর্মকে নিয়ে এটা স্বামীজীর একটা খুব সুন্দর বক্তব্য। যে গরু দুধ দেয় সে লাথিও মারে, কিন্তু তাও মানুষ তার থেকে দুধ দোহন করে আনে। ধর্মরূপী গরুও অনেক লাথি মেরেছে। কিভাবে ধর্ম লাথি মারে? আমরা যেমন দেখছি হিন্দু ধর্মে জাতিপ্রথা, যদিও ধর্মের এখানে কোন দোষ নেই, কিন্তু ধর্মের নামে মানুষকে শোষণ করা হয়েছে। যুগে যুগে ধর্মের নামে প্রচুর মানুষের জীবন নেওয়া হয়েছে, এগুলো হল ধর্মের লাথি। ধর্মকে যদি ঠিক ভাবে না রাখা হয়, ধর্ম লাথি মারবে। আর

এমন ভাবে মারবে মনে হবে যেন, ধর্ম মারছে। কিন্তু স্বামীজী বলছেন, ধর্ম সেই কামধেনু, সে সব সময় দুধ দেয়, তাকে সামলে রাখতে হবে। কেন রাখতে হবে? কারণ মানবজাতির যাঁরা শ্রেষ্ঠতম মানুষ, তাঁরা সবাই ধর্মকে যুগে যুগে পুষ্টি দিয়ে এসেছেন, সবাই ধর্মকে মানতেন।

আমরা সব কিছু জাগতিক জিনিস দিয়ে মাপি, যার প্রচুর ধনসম্পদ আছে, যার হতে অনেক ক্ষমতা আছে, তাকেই আমরা মান্যতা দিয়ে থাকি। কিন্তু আসল মাপকাঠি হল হৃদয়, তার হৃদয়ের কতটা বিস্তার হয়েছে, পুরো বিশ্বকে নিজের হৃদয়ে স্থান দেওয়ার ক্ষমতা কতটা হয়েছে, তার মধ্যে কতটা দয়ার ভাব, পবিত্রতা আছে, এগুলো হল আসল মাপকাঠি। এই বিশ্বে যতগুলি system এসেছে, ethical system, communist system, democratic system, capitalistic system, যে কোন systemই হোক না কেন, ধর্ম মানুষকে শ্রেষ্ঠতম জিনিস দিয়েছে। ইতিহাসেরা পাতা ওল্টালে আমরা দেখি এক সময় ইউরোপে চার্চগুলি ক্ষমতার শীর্ষে চলে গিয়েছিল, আর এক সময় খ্রীশ্চান ফাদাররা ভোগের মধ্যে ডুবে গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু এটাও সত্য যে, অনেক খ্রীশ্চান ফাদাররা খুব উচ্চমানের মানুষ ছিলেন আর তাঁদের মধ্যে খুব গভীর উচ্চমানের ধর্মতত্ত্ব ছিল, আর তাঁদের তপস্যাদির দিকে তাকালে মানুষ অবাক হয়ে যায়। এগুলো তখনই সম্ভব, মানুষ যখন নিজেকে ধর্মে ঢেলে দেয়। ধর্ম খুব ধীরে ধীরে কাজ করে, সেইজন্য ধর্মের ফল সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যায় না। কিন্তু ধর্ম যখন ফল দেয়, সেটা অমৃত ফল। একটু যে ডানদিক বামদিক হবে না তা নয়, এগুলো মেনে নিতে হয়, যে গরু দুধ দেয় তার লাথিটাও মেনে নিতে হয়। সেটাই স্বামীজী বলছেন, The milkman does not mind the kick of the cow which gives much milk, গোয়লারা জানে কোন দুধ দেওয়া গরু লাথি মারে, তারা একটু সহ্য করে নেয়, লাথি মারে বলে গরুকে লাঠি দিয়ে মারে না। ও জানে এই গরু আমাকে প্রচুর দুধ দেয়। ঠিক তেমনি যারা ধর্ম নিতে চাইছে, নিজের জীবনে ধর্মকে কাজে লাগাতে চাইছে, তাদেরও ধর্মের একটু ডানদিক বামদিক গুলো মেনে নিতে হয়।

চিকাগো ধর্ম সভায় প্রথম ভাষণে স্বামীজী শুরু করলেন, Sisters and brothers of America দিয়ে, শ্রোতৃমণ্ডল থেকে, বিশেষ করে মেয়েরা দৌড়ে এসেছে স্বামীজীকে স্পর্শ করার জন্য। ব্লজেট নামে এক মহিলা সেখানে পিছনের দিকে বসেছিলেন, সেই সময় তিনি ওই দৃশ্য দেখে মনে মনে বলছেন, Youngman, if you resist this temptation then you are God, যদি তুমি এই প্রশংসাকে আত্মসাৎ করে নিতে পার তাহলে তুমি ভগবান। ওই দৃশ্য মিসেস ব্লজেট কোন দিন ভুললেন না, পরে নিজের বন্ধুবান্ধবদের সাথে কথা বলার সময় এই দৃশ্যের কথা বলতেন। তারপর তিনি অন্য শহরে চলে যান, আর স্বামীজীও কয়েকবার ঘুরে ঘুরে মিসেস ব্লজেটের শহরে পৌঁছে যেতেন। মিসেস ব্লজেটের বন্ধুরা তাঁকে বলত, চিকাগো ধর্মসভার একজনের কথা আপনি বলতেন, আপনার মনে আছে তাঁকে? হ্যাঁ হ্যাঁ খুব ভাল মনে আছে। তিনি এই শহরে আছেন। শুনে মিসেস ব্লজেট এমন খুশী হলেন যে, পারলে তখনই স্বামীজীর কাছে গিয়ে দেখা করেন। পরে স্বামীজী মিসেস ব্লজেটের সঙ্গেও কিছু দিন ছিলেন।

একদিন হঠাৎ স্বামীজী মিসেস ব্লজেটকে বলছেন, I have greatest temptation of my life। মিসেস ব্লজেট চোখটা টিপে বলছেন, Who is she? স্বামীজী বলছেন, Its not a she, its an organisation। Finally স্বামীজীর মাথায় এলো একটা organization তৈরী করতে হবে। এরপরেই স্বামীজী একটা নামকরা কথা বলছেন, I know every new organization bring its new kind of evil, but I have no other way. This is what I have to do for India. I have to set a machine in motion, which no force in India can stop। আমাকে এমন একটা মেশিন চালু করে যেতে হবে, ভারতবর্ষের কারুর দম থাকবে না ওই মেশিনকে থামিয়ে দেওয়ার। এরপর তিনি রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্টা করার তোড়জোর করতে শুরু করলেন। কিন্তু এখানে মূল কথাটা স্বামীজী কি বলছেন? I know every new organization bring its new kind of evil, যদি কেউ মনে করে রামকৃষ্ণ মিশনের সব কিছু ভাল, তা কি করে হবে, এর প্রতিষ্ঠাতাই বলে গেছেন গোলমাল হবেই। সবে একশ বছর হয়েছে, এখন সততার তুঙ্গে আছে। ব্রহ্মা যখন সৃষ্টি শুরু করেন, তখন প্রথমে তাঁর মন থেকে সব কিছু সৃষ্টি হয়, আর তখন ব্রহ্মা শুদ্ধ সত্ত্বগুণে প্রতিষ্টিত। সেখানে থেকে বেরিয়ে এলেন সনক, সনাতন, সনন্দন, সনৎকুমারের মত চার

কুমার। ব্রহ্মার সত্ত্বগুণ থেকে সৃষ্টি, ওনারাও জন্ম নিয়েই কমণ্ডুলু হাতে নিয়ে ত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে তপস্যায় বেরিয়ে গেলেন। স্বামীজীও সঙ্ঘের কর্তা, ওনার শুদ্ধ সত্ত্বগুণ থেকে সঙ্ঘের জন্ম, এখন তো ত্যাগ, তপস্যার ভাব থাকবেই। দুশো পাঁচশ বছর যাক, তারপর দেখা যাবে কোথায় দাঁড়ায়। কি ধরণের দোষ তৈরী হবে আমাদের জানা নেই, কিন্তু স্বামীজী বলছেন, যে আদর্শের উপর সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত, যতদিন ওই আদর্শকে সঙ্ঘ ধরে রাখবে, ততদিন ঠাকুর এখানে থাকবেন, স্বামীজী এটা বেলুড় মঠের নামে বলছেন।

যে কোন সংগঠন, বা যে কোন systemএর মূল কেন্দ্রে যে আইডিয়াটা ধরে রেখেছে, ওই মূল আইডিয়াটাই যে কোন সংগঠন বা systemএর শক্তির উৎস। যতক্ষণ ওই আইডিয়াকে ধরে আছে, ওকে কেউ নাড়াতে পারবে না, ওই আইডিয়াকে ছাড়া মানেই তার বিনাশ। ১৮৬০এর দশক ভারতবর্ষের একটা খুব গৌরবময় দশক, এই দশকে তিনজন মহাপুরুষ জন্ম নিলেন। আর তিনজনেই তিনটে সংগঠন তৈরী করলেন – স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতন একটা সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও সংস্কৃতি জগতের মুভমেন্ট, গান্ধীজী নিয়ে এলেন খাদি, স্বদেশী দ্রব্যের আন্দোলন। ভাবলে অবাক লাগে, একটা দশকে ভারতে তিনজন দিকপাল পুরুষের আবির্ভাব হল, ভারতে তিনটে আলাদা আলাদা সংগঠন এসে গেল। এখানে আমরা কংগ্রেসকে নিয়ে বলছি না, গান্ধীজী সাবরমতি, ওয়ার্ধাকে কেন্দ্র করে যে জিনিসগুলো করছিলেন। এখন কোন সংগঠন কোন অবস্থায় আছে মানুষ ভাল জানে। যদি কোন সংগঠনে কোথায় গোলমাল আছে দেখতে যাওয়া হয়, দেখা যাবে যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই সংগঠনকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, সেই উদ্দেশ্যকে এখনও সেই সংগঠনের মূল সদস্যরা ধরে আছেন কিনা। যদি না ধরে থাকেন, তাহলে বুঝতে হবে এদের সময় হয়ে এসেছে। ভারত স্বাধীন হওয়ার সাথে সাথেই গান্ধীজী বলে দিলেন, কংগ্রেস তুলে দেওয়া হোক। কারণ যে উদ্দেশ্য, যে কাজের জন্য কংগ্রেস তৈরী করা হয়েছিল, সেই কাজ হয়ে গেছে। কংগ্রেসের কাজ ছিল বৃটিশদের দৃষ্টিতে আনা, তোমরা ভারতে কি গোলমাল করছ। সেই কাজ হয়ে গেছে, দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে, কংগ্রেসের আর প্রয়োজন নেই। কংগ্রেসের নেতারা দেখলেন, আমরা এতদিন এত খাটলাম আর ভোগের সময়টাতেই সব ছেড়ে দিতে হবে! তার ফল এখন আমরা সবাই দেখছি। স্বামীজী এটাই বলছেন, যে গরু দুধ দেয় সে কিন্তু লাথি মারবে, সংগঠন তা সে গান্ধীজীরই হোক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরই হোক আর স্বামীজীর রামকৃষ্ণ মিশনই হোক, লাথি কিন্তু সবাই মারবে। কিন্তু দুধটা যদি ভাল ভাবে দিয়ে যায়, মানুষ অতটুকু সহ্য করে নেবে। ধর্মও লাথি মারবে, কিন্তু আমাদের মেনে নিতে হবে, না মানলে মানবজাতির আরও দুর্বিষহ অবস্থা হবে।

স্বামীজী বলছেন, Religion is the greatest child to be born, the great ‘moon of realisation’; let us feed it and help it grow and, it will become a giant. (*আমাদের ধর্মসাক্ষাৎকার রূপ মহৈশ্বর্যবান্ পুত্র লাভ করতে হবে, ঐ প্রবোধরূপ পুত্রকে খাইয়ে দাইয়ে মানুষ করতে হবে, তা হলেই সে মস্ত এক বীর হয়ে দাঁড়াবে।*) একটা নামকরা বই আছে, প্রবোধচন্দ্রোদয়, ওখান থেকেই স্বামীজী এই ভাবটা নিচ্ছেন। প্রবোধচন্দ্রোদয় খুব নাটকীয় রচনা, সেখানে একটা কাহিনী আছে, শুরুতেই যার কথা স্বামীজী বলছেন, King of Desire and King of Knowledge fought, and just as the latter was about to be defeated, he was reconciled to Queen Upanishad and a child was born to him, Realisation. (*মহামোহ ও বিবেক এই দুই রাজার লড়াই বেধেছিল। বিবেক-রাজার সম্পূর্ণ জয় আর হয় না। অবশেষে বিবেক-রাজার সঙ্গে উপনিষদ্-দেবীর পুনর্মিলন হয়, এবং তাঁদের প্রবোধ রূপ পুত্রের জন্ম হল।*) দুই রাজা, King of Desire, একজন কামনার রাজা, আর অন্যজন জ্ঞানের রাজা, King of Knowledge। এই দুই রাজা, একদিকে ভোগ অন্য দিকে জ্ঞান, দুজনে মারামারি লেগেই আছে, এই লড়াই হাজার হাজার বছর ধরে চলছে। একটা সময় জ্ঞানের রাজা আর ভোগের রাজার সাথে পেরে উঠছে না, এবার সে মরতে যাচ্ছে, ঠিক সেই মুহূর্তে উপনিষদ নাম্নী রানীর সাথে জ্ঞানের রাজার মিলন হয়ে। স্বামীজী এখানে Knolwedgeএর ‘K’টা Capital ‘K’, ব্যবহার করে এই জ্ঞানকে উচ্চ জ্ঞান বোঝাতে চাইছেন। জ্ঞান যেমন তাঁর উপনিষদ নাম্নী রানীর সাথে মিলন হয়ে গেল, সেখান থেকে জন্ম হল তাঁদের সন্তান ‘আত্মজ্ঞানের’। ওই ‘আত্মজ্ঞান’ নামের সন্তান জন্ম নিতেই সে King of Desireকে হারিয়ে দিল, কাম-

বাসনা চিরদিনের মত শেষ হয়ে গেল। স্বামীজী এই কাহিনীটা প্রবোধচন্দ্রদয় নাটক থেকে নিয়ে আসছেন জিনিসটাকে সুন্দর ভাবে উপস্থাপনা করার জন্য।

মূল বক্তব্য হল, যেখানে ধর্ম আছে সেখানে একটু গোলমাল থাকতে বাধ্য, কিন্তু এই ধর্মই শেষে শ্রেষ্ঠ ফল দেবে। শ্রেষ্ঠ ফল পাওয়ার জন্য একটু গোলমাল মেনে নিতে কোন দ্বিধা থাকা উচিত নয়। একটা খুব মজার ঘটনা আছে, যদিও এর সাথে সবটা মিলবে না, আমেরিকার এক প্রেসিডেন্টের ব্যাপারে পরে জানা গেল নারীঘটিত তার অনেক গোলমাল আছে। সবই প্রমাণিত হল, সবাই ধরে নিল এবার তাকে সরিয়ে দেওয়া হবে। তারপর দেখা গেল, ওই রকম ব্যক্তি ছাড়া আমেরিকাকে চালাবার মত তখন দেশে আর কেউ নেই। তার দেশবাসী তাকে ক্ষমা করে দিল। আমাদের সমস্যা হল, আমাদের ভিতরে কোন দম নেই, আছে শুধু ফাঁকা আওয়াজ, সেই আওয়াজের জোরে আমরা মনে করছি, আমি আমার ন্যায্য পাওনা পাচ্ছি না, আমার ন্যায্য সম্মান পাচ্ছি না। কিন্তু ভিতরে তো কিছুই নেই, কিসের জন্য তোমাকে সম্মান দেওয়া হবে! যার ভিতরে দম আছে, তার পাঁচটা দুর্গুণ থাকলেও তাকে সহ্য করে নেওয়া যায়। ধর্মকেও স্বামীজী এভাবে ব্যাখ্যা করছেন। ধর্ম হল সেই নারীর মত, যার এক একটা সন্তান বীর থেকে বীর্যতম, মহান থেকে মহানতম।

ইদানিং কালের বিবাহ মানে নিজের কাম-বাসনার চরিতার্থ করা। আমরা এখন কত রকম স্লোগান শুনছি, নারী নির্যাতন, নারী শোষণ ইত্যাদি, কিন্তু আগেকার দিনে যাঁদের ভিতর ধর্ম ভাব ছিল, ঠিক ঠিক হিন্দু ভাব ছিল, তাঁরা বিবাহ করতেন এই উদ্দেশ্যে, তোমার কাছ থেকে আমি সন্তান চাই, যে সন্তান আমার বংশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, বংশের সম্মান রক্ষা করবে, শ্রাদ্ধাদি কর্ম করবে এবং পিণ্ডদান করে বংশকে উদ্ধার করবে, হে দেবী এই কাজ একমাত্র তোমার দ্বারাই সম্ভব। আজকের দিনে এসব কথা বলার উপায় নেই, চারিদিকে অশান্তি লেগে যাবে। আমরা এত অশান্তির মধ্যে যাচ্ছি না, আমরা এই পয়েন্টে আসছি যে, মানুষ বলবে, এই স্ত্রী ছাড়া আমার কিছুই চলবে না। সেইজন্য মনু তাঁর বিধান দিয়ে বলে দিলেন, *যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ*, নারীর পূজা যদি না হয় তাহলে তোমার বাড়িতে দেবতার আগমন হবে না। কারণ সেই নারীর দ্বারাই তোমার জাগতিক ও পারলৌকি সর্বপ্রকার মঙ্গল সাধিত হবে। এবার যদি আমরা ধর্মকে নারী রূপে দেখি, তাহলে সেই নারী থেকে সন্তান হয়ে কে জন্ম নেবে? আত্মজ্ঞান। ওই নারী রূপ ধর্ম ছাড়া আত্মজ্ঞান অন্য কোন ভাবে হবে না। কম্যুনিস্টদের চিন্তাধারা আমাদের আত্মজ্ঞান দিতে পারবে না, ধনতান্ত্রিক মতবাদ দিতে পারবে না, সোস্যালিজম্ দিতে পারবে না, কংগ্রেস, বিজেপি, তৃণমূল কেউই দিতে পারবে না। একমাত্র ধর্মই আমাদের আত্মজ্ঞান দেবে। কেউ বলতে পারে আমার আত্মজ্ঞান লাগবে না, এদের নিয়ে আগে আলোচনা করা হয়ে গেছে, সেখানেও বলছেন, আত্মজ্ঞানের মত ফল হয় না। যখন জানা হয়ে গেল, ধর্ম ছাড়া এই শ্রেষ্ঠফল সমাজে আসতে পারে না, তখন আমাদের ধর্মের দোষ, দুর্গুণ সহ্য করতে হবে, আর একটু ওটাকে মেনে নিতে হয়। এখান থেকে স্বামীজী এরপর চলে আসছেন, ধর্মের যে শেষ কথা ভালবাসা, সেই ভালবাসাতে।

ঈশ্বরের প্রতি প্রেমের মহিমা

এতক্ষণ পর্যন্ত স্বামীজী যা কিছু বলেছেন, সব ব্রহ্মসূত্রকে আধার করেই বলেছেন, আর এখন স্বামীজী ঈশ্বরকে ভালবাসা নিয়ে বলতে যাচ্ছেন। জ্ঞানের মহিমা থেকে স্বামীজী ঈশ্বরের প্রতি প্রেমের মহিমাতে এবার আসছেন। স্বামীজী দেখালেন, যুক্তির দিকে দিয়ে গেলে বেদান্তের শেষ কথা *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*, এই সত্যটাই সত্য। ঠাকুরের আগমনের সময় শিক্ষা প্রসার প্রচার খুব একটা ছিল না ঠিকই, আধ্যাত্মিক শিক্ষারও যে বিরাট প্রচার প্রসার ছিল, তাও নয়; কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু কিছু আইডিয়া তখনকার দিনেও মানুষের মাথায় মাথায় ঘুরছিল। এর একটা বড় কারণ হল, হিন্দু ধর্ম কোন একটা কেন্দ্রিয় গাইডলাইন নিয়ে চলে না। তত্ত্বগত ভাবে আলোচনা করার সময় আমরা বলি, হিন্দু ধর্ম বেদের উপর আধারিত। ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে এসে হিন্দু ধর্ম পুরোপুরি চলে কুলধর্ম আর গুরু প্রদত্ত ধর্ম দিয়ে, আর আগেকার দিনে আরেকটা ছিল জাতিধর্ম। অনেক আগে মনু কুলধর্ম, জাতিধর্ম, বিভিন্ন মন্দিরের ধর্মকে মিলিয়ে, আর তার সাথে কিছু সাধারণ জিনিসকে মিলিয়ে হিন্দু ধর্মকে একটা ছাতার নীচে আনার জন্য চেষ্টা করলেন, তার নাম দিলেন বর্ণাশ্রম ধর্ম। মনুস্মৃতি ও অন্যান্য স্মৃতিশাস্ত্র সব কটা ধর্মকে একটা জায়গায় নিয়ে এলেন। কিন্তু যত দিনে মনু নিয়ে এলেন, তার আগেই ওগুলো আবার ছিটকে বেরিয়ে যেতে শুরু করল। লোকেরা মনুস্মৃতি কম পড়তেন, তার যতটুকু দরকার ততটুকুই কাজে

লাগাতেন, বাকি জিনিসগুলো তার নিজস্ব বংশ, জাতি ও নিজের গ্রামে যে ধর্মগুলো প্রচলিত ছিল, সেগুলোই অনুশীলন করত ও পালন করত। যেমন রামায়ণ, মহাভারতের মত কিছু কিছু গ্রন্থকে সবাই মানত। রামায়ণ আবার সমস্যা হল, ভারতের প্রায় বেশির ভাগ রাজ্যে একটা করে স্থানীয় রামায়ণ হয়ে গেছে, যেমন বাংলায় কৃত্তিবাসী রামায়ণ, হিন্দী বেল্টে তুলসীদাসী রামায়ণ, মহাভারতের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। ভাগবত আদি পুরাণ গ্রন্থ এখনও তার নিজস্বতাকে বজায় রেখে চলেছে।

ভারতবর্ষে যে একটা unification আছে, হিন্দুদের মধ্যে যদি একটা common set দেখা যায়, তার একটা কারণ হল পুরাণ। ভাগবত পুরাণের কাহিনীগুলি তারা বিভিন্ন জায়গায় বলতেন, নাটক করতেন, যাত্রা করতেন, কিন্তু এখনও ভাগবত পুরাণ কোন স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ করে নিজের মত করে লেখাটা কেউ করতে পারেনি। বেদ, উপনিষদকে যেমন ভারতের লোকেরা সম্মান দিয়েছে, তেমনি ভাগবত পুরাণাদিকেও সেইভাবে সম্মান দেওয়া হয়েছে। যদি আমরা খুব practical levelএ নেমে বিচার করি তাহলে দেখতে পাবো যে, হিন্দুদের ঠিক ঠিক ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উৎস হল, রামায়ণ, মহাভারত, বিশেষ করে রামায়ণের একটা স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ হওয়ার পরে যেটা আসে সেটা থেকে, আর তা নাহলে ভাগবত থেকে। শিবমহাপুরাণাদি লোকেরা কথা কাহিনী রূপে পড়ত ঠিকই, কিন্তু ভাগবত পুরাণের মত অতটা প্রচলিত নয়। ভাগবত পুরাণে অনেক ধরণের কথাই বলা হয়েছে, এই ভক্তির কথা বলছেন, তারপরেই একেবারে অদ্বৈত জ্ঞানের কথা বলছেন। সাধারণ মানুষ পঞ্চাশটা কাজ করে, সেই কাজের মধ্যে তারা দুটো ধর্মের কথাও বলে। আত্মজ্ঞান, নির্গুণ নিরাকার এত কঠিন জিনিস যে, এগুলোকে নিয়ে আলোচনা করতে তারা উৎসাহ পায় না। সেখানে তাদের মনে হয় জ্ঞান একটা জিনিস, ভক্তি আরেকটা জিনিস। জ্ঞান, ভক্তি, অদ্বৈত, দ্বৈত এই কঠিন জিনিসগুলো পণ্ডিতদের আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। অন্যদিকে পণ্ডিতদের বেশি কিছু করারও থাকত না, সাংসারিক কাজ তাঁরা করতেন না, খেতে পেলে খেলেন, না পেলে খাবেন না, আর চারজন পণ্ডিত বসে হুকো টানতে টানতে শাস্ত্রার্থ করতে থাকবেন। সেখান থেকে সাধারণ মানুষের মনে কোথাও একটা ধারণা এসে গেল, জ্ঞান একটা আলাদা জিনিস, ভক্তি একটা আলাদা জিনিস, কৃষ্ণ একটা জিনিস, কালী একটা জিনিস, শিব একটা জিনিস।

ঠাকুর আসার পর যদিও বিশেষ করে কবিতা, গানে, রচনায় আর আমরাও দিনরাত বলে চলেছি ঠাকুর এসে সব মেলালেন। আসলে ঠাকুর কিছুই মেলাননি, এগুলোর মধ্যে আগে থেকেই মিল ছিল। আমাদের সাধারণ লোকের যে অজ্ঞান, ওটা আলাদা, কিন্তু ঠাকুর কি করলেন, যেটা আসল অধ্যাত্ম, সেটাকে সামনে রেখে দিলেন। যেমনি সামনে রাখলেন, বাকি সব কিছু নিজেই ফেটে বেরিয়ে গেল। ঠাকুর জ্ঞানও যা ভক্তিও তাই বলছেন ঠিকই, কিন্তু যেমনি আসল অধ্যাত্মকে সামনে নিয়ে আসা হবে, তখন যত রকম ভুলভাল ধারণাগুলো ছিল, সেগুলো আপনা থেকেই কেটে যাবে। স্বামীজী যে এখানে ব্রহ্মসূত্রকে আধার করে জ্ঞানের কথা বলতে বলতে হঠাৎ ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসাতে নামছেন, এর মধ্যে অন্য কিছু নেই। ভাগবতেও প্রায়ই দেখা যায়, ভক্তির কথা বলতে বলতে হঠাৎ জ্ঞানের কথাতে ঢুকে যাচ্ছেন। আবার কট্টর জ্ঞানের আলোচনা করতে করতে হঠাৎ ভক্তিতে ঢুকে যাচ্ছেন। এগুলোকে ধারণা করা সত্যিই খুব কঠিন, যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, যিনি মন বাণীর পারে, তিনিই আবার নিজের মায়ার শক্তিতে ঈশ্বর রূপে আমাদের সামনে প্রকটিত হন, আর তাঁকে ভালবাসাই জীবনের উদ্দেশ্য বলা হচ্ছে। এটা কিন্তু যেভাবে ইসলামে বা খ্রীশ্চান ধর্মে একেশ্বরের পূজার কথা বলা হয়, তার সাথে এক নয়। এখানে জ্ঞান আর ভক্তি পুরো এক। যখন মনের ব্যবধান দিয়ে দেখছি তখন ঈশ্বর রূপে তাঁকে দেখছি, তাঁকে ভালবাসছি, আর মনের ব্যবধান যখন মুছে যায়, তখন শুধু শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম।

সেই ভালবাসা নিয়ে স্বামীজী বলছেন, Love concentrates all the power of the will without effort, as when a man falls in love with a woman. (*ভক্তি বা প্রেমের দ্বারা বিনা চেষ্টায় মানুষের সমুদয় ইচ্ছাশক্তি একমুখী হয়ে পড়ে –স্ত্রী-পুরুষের প্রেমই এর দৃষ্টান্ত।*) ইদানিং কালে বড় বড় বাবাজী থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রের বক্তারা এই একটি বিষয়ের উপর প্রচুর বক্তৃতা দেন, সেমিনার করেন, তা হল, মন নিয়ন্ত্রণ করার উপায়, How to Develop Power of Mind ইত্যাদি। কিন্তু আজ পর্যন্ত

কারুরই মন নিয়ন্ত্রণ হয়নি। তার একটা মূল কারণ হল, একটা কোন উদ্দেশ্য যদি না থাকে মন কখনই একাগ্র হবে না। মনের একাগ্রতা হয় কোন একটা কিছুকে নিয়ে, সেই জিনিসটাই যদি না থাকে তাহলে কি করে সে মনকে একাগ্র করবে। একবার এক বইমেলায় অদ্বৈত আশ্রমের বুকস্টলে একজন পুস্তক ক্রেতা এসে স্টলের মহারাজকে বলল, 'স্বামীজী আমাকে এমন একটা বই দিন, যে বই পড়ে আমার এমন হবে যে, যেখানে মন লাগাতে চাইব, সেখানেই মন লেগে যাবে, আর যেখান থেকে মনকে সরাতে চাইব সেখান থেকে মন পুরো সরে আসবে'। মহারাজ তাকে বলে দিলেন, 'তাহলে তো তুমি ভাই রামকৃষ্ণ পরমহংস হয়ে যাবে, সেই রকম বই আমাদের নেই'।

যদি কোন মানুষ কোন কিছুর উপর মনকে একাগ্র না করতে পারে, তাকে তো পাগলা গারদে যেতে হবে। টিভিতে কার্টুন প্রোগ্রাম চালিয়ে একটা বাচ্চাকে বসিয়ে দিলে সে কেমন মন দিয়ে দেখতে থাকবে! পাঁচ থেকে দশ বছরের বাচ্চাকে একটা মারামারি, গোলাগুলি চালাবার কোন ছবি চালিয়ে বসিয়ে দিলে গোগ্রাসে গিলতে থাকবে। ষোল সতের বছরের ছেলেমেয়েরা ভালবাসা, প্রেমের ছবিগুলো কত একাগ্র হয়ে দেখে। সব বয়সের লোকেরা ভারত পাকিস্থানের ক্রিকেট ম্যাচ দেখার সময় কেমন একাগ্র হয়ে দেখবে! তাহলে একাগ্রতা সবারই আছে, একাগ্রতা নিয়ে তো কোন সমস্যা নেই। যে জায়গাতে ওদের ভালবাসা নেই, মনের মত নয়, সেখানে তাদের একাগ্রতা নেই। সেইজন্য ধীরে ধীরে ওটা এমন করতে হয়, ভালবাসাটা যেখানে আছে সেই জায়গাতে গিয়ে ওদের ধরতে হবে। আমরা সাধারণ মানুষ কিনা, এখানে আমরা আলোচনা করছি আধ্যাত্মিক ভাবে, পরীক্ষায় কি করে নম্বর বাড়ানো যাবে, তা নিয়ে আলোচনা করছি না। যদি আধ্যাত্মিক ভাব উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে প্রথমে দেখতে হয়, আমি কাকে বা কোন জিনিসটা ভালবাসি। প্রথমে আমার ভালবাসার জিনিসটাকে বার করতে হবে। বার করার পর ওটাকে ভালবাসো, তারপর আরও জোর ভালবাসো। যখন মনে হবে আমার সব ভালবাসা ওর মধ্যে ঢালা হয়ে গেল, এরপর আরেকটু জোর ভালবাসো। রসগোল্লার রসের মত ভালবাসাও টপ টপ করে পরবে, এবার তুমি রসগোল্লার গোল্লাকে সরিয়ে দিয়ে শুধু রসটুকুকে নাও। মানে, ব্যক্তিকে ধীরে ধীরে রূপান্তর করে ভালবাসা বানিয়ে দাও, ভালবাসাকে ধীরে ধীরে নৈর্ব্যক্তিক করে নাও।

একটা খুব বাজে উপমা নিলে বোঝা যাবে, বিষফোঁড়া হলে একটা জায়গায় বসিয়ে দিলে আরেক জায়গা দিয়ে বেরোবে। ঠাকুর বলছেন, অশ্বত্থ গাছ এখন কেটে দাও, কাল আরেকটা ফেকড়ি বেরিয়ে যাবে। ভালবাসাও ঠিক তাই, ভিতরে যদি ভালবাসা থাকে, আর ওই ভালবাসা যদি একজনের প্রতি থাকে, তাকে সরিয়ে দিলে কাল আরেকজন সেই ভালবাসার মধ্যে ঢুকে যাবে। লোকেরা বলে, ভালবাসা একবারই হয়। যার একবার ভালবাসা হয়েছে, সে ভালবাসার লোকই নয়, অত্যন্ত সাধারণ মানের লোক। আমাদের সমস্যা একাগ্রতায় নয়, সমস্যা ভালবাসায়। Love concentrates all the power of the will, ভালবাসার কোন বস্তুকে সামনে নিয়ে এলে মন বিনা চেষ্টায় ওর দিকে চলে যাবে, কে বলেছে আমাদের মধ্যে will power নেই! আমাদের ভিতরেই কিছু নেই, আমরা ছ্যাবলা। আমরা কি কাউকে ভালবাসি? কাউকেই ভালবাসি না। নিজেকে ভালবাসি? তাও না। শুধু নিজেকে যদি ভালবাসে, তাহলে সে প্রথমে চাইবে, আমাকে শ্রেষ্ঠ হতে হবে, ওটা সে করে দেখাবে, কারণ সে নিজেকে ভালবাসে। যে নিজেকে সত্যিকারের ভালবাসে, সে চাইবে, আমাকে সবাই মানুক, জানুক, পূজা করুক, আমাকেও তাই সেই পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনেক খাটতে হবে, ভিতরে জোর লাগাতে হবে, শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। একজন যদি ভাল ডাক্তার হওয়ার আকাঙ্খা থাকে, সে সব কিছু ভুলে যায়, মা, বাবা, ভাই-বোন, খেলাধূলা, ভাল খাওয়া-দাওয়া, আমোদ আহ্লাদ, সোশ্যাল নেটওয়ার্ক সব ভুলে গিয়ে শুধু ডাক্তারি শাস্ত্রের মধ্যে ডুবে আছে। লোকেরা বলবে, তুই না খুব স্বার্থপর। হ্যাঁ আমি স্বার্থপর, আমি নিজেকে ভালবাসি, আমাকে একজন বড় ডাক্তার হতে হবে। আমাদের মধ্যে কি সেই দমটুকুও আছে? এতটুকুও নেই। হাভাতে লোক, ভিতরে কোন দম নেই, এদের দিয়ে কী হবে! এখানে কোন নিজের উন্নতি নিয়ে বলা হচ্ছে না, শুধু ভালবাসা নিয়ে বলা হচ্ছে। সেই ভালবাসা কি কারুর আছে, যে বলবে তোমার জন্য আমি গলায় দড়ি দিতে রাজী আছি? বলবে, সেই দম তো নেই। আচ্ছা, যাকে ভালবাসত, সে তোমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল, তার গলায় দড়ি দেওয়ার দম আছে? ছিঃ আপনি এসব কি বলছেন, মানুষ খুন করতে বলছেন! তুমি ভালবাসাতে মারতেও পারছ না, মরতেও পারছ না, কিসের ভালবাসার কথা দিনরাত বলছ! এরা আবার বেদান্ত পড়বে!

এ-সব কথা শোনার পর অনেকে বলবে, এগুলো অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক কথাবার্তা। এখানে কিছুই নৈরাশ্যজনক কথা বলা হচ্ছে না, শুধু আয়নাটা সামনে ধরা হচ্ছে, আয়নাতে নিজেকে দেখে বলছ আমার মুখটা বিচ্ছিরি। তোমার চেহারাতে ধুলো পড়ে আছে, আয়নাটা পরিষ্কার আছে। একাগ্র কর, দেখ ভালবাসা জিনিসটা কেমন ফেটে পড়ে। ভালবাসা একটা ধাপ, যেমনি একজনের উপর ভালবাসা আসে, এমনকি যদি নিজের প্রতিও ভালবাসা আসে, সে অদ্বৈতবাদী হয়ে যাবে। নিজের ছোট আমিকে বড় আমিতে দিয়ে দিলে অদ্বৈতবাদী হয়ে যাবে। আর যদি ব্যক্তি রূপে কাউকে ভালবাসো, তাকে সরিয়ে সেখানে ভগবানকে নিয়ে আসো, তুমি ভক্ত হয়ে যাবে। সমস্যা ঈশ্বরের ভক্তিতে নেই, সমস্যা জ্ঞানে নেই, সমস্যা রয়েছে আমাদের ভিতরে, ভিতরে আমাদের কোন সার নেই। যে বলছে, আমি কামান দাগবো, তার ভিতরে কালীপটকার বারুদও নেই, সে আবার বলছে কামান দাগবে! ভিতরে ভালবাসা নিয়ে এসো, ভালবাসতে শেখ।

The path of devotion is natural and pleasant. (*ভক্তিমার্গ স্বাভাবিক পথ এবং তাতে যেতেও বেশ আরাম।*) ভালবাসা মানুষের স্বভাব, এটাই তার স্বাভাবিকত্ব, চারিদিকেই আমরা এই ভালবাসা দেখছি। একটা ছাগল, সেও নিজের বাচ্চাকে ভালবাসে, সিংহ এত হিংস্র পশু, সেও নিজের সন্তানকে ভালবাসে, ভালবাসা অত্যন্ত স্বাভাবিক জিনিস, চেষ্টা করলেই মানুষ নিজের ভিতরে ভালবাসাকে নিয়ে আসতে পারে। আমরা উপদেশ দিচ্ছি ঈশ্বরকে ভালবাসতে শেখ, মানুষকেই ভালবাসতে পারছে না, সে ভালবাসবে ঈশ্বরকে! ঝগড়ার জ্বালায় যাদের বাড়িতে কাক বসে না, তারা নাকি বলে ঈশ্বরকে ভালবাসতে শেখ! আর অন্য দিকে ঠাকুরের জীবনের দিকে তাকালে দেখছি, কাশীপুর উদ্যানবাটীতে তিনি শেষ অবস্থায়, নড়াচড়া করতে পারছেন না। হঠাৎ একদিন শশী মহারাজ (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) দেখছেন ঠাকুর বিছানা থেকে কোন রকমে নেমে হামাগুঁড়ি দিয়ে একট বাক্সের কাছে এসে গরম চাদর বার করছেন। শশী মহারাজ চমকে বলছেন, 'আপনি এ কি করছেন, আমার সেবার ত্রুটি হয়ে গেছে, আপনার শীত করছে আমার আগে বোঝা উচিৎ ছিল'! ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে বলছেন, 'আমার জন্য নয়রে, সকালে খালি গায়ে তোকে কত কাজ করতে হয়, তোর ঠাণ্ডা লাগে, তাই তোর জন্য এই চাদরটা বার করছি'। এই হল ভালবাসা।

জ্ঞানপথ ও ভক্তিপথের একটা তুলনাত্মক দিক

এবার স্বামীজী জ্ঞান আর ভক্তির তুলনা করছেন, বলছেন, Philosophy is taking the mountain stream back to its source by force. (*জ্ঞানমার্গ কি রকম? না –যেন একটা প্রবল বেগশালিনী পার্বত্যনদীকে জোর করে ঠেলে তার উৎপত্তিস্থানে নিয়ে যাওয়া।*) কঠোপনিষদে যমরাজ নচিকেতাকে বলছেন, *কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মনমৈক্ষদ্ আবৃতচক্ষুর্মৃতত্বমিচ্ছন্*। আচার্য শঙ্কর এই মন্ত্রের ভাষ্যে ব্যাখ্যা করছেন জ্ঞান কি আর ধীর পুরুষ কে। ধীর পুরুষ হলেন সেই, যিনি মনে করছেন গঙ্গাকে আমি বঙ্গোপসাগর থেকে ঠেলে গোমুখে পৌঁছে দেব, তিনিই জ্ঞানী হতে পারে। It is a quicker method but very hard. (*এতে সত্বর বস্তুলাভ হয় বটে, কিন্তু বড় কঠিন।*) অব্যক্তোপসনায় অর্থাৎ জ্ঞানমার্গে সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানলাভ হয়ে যায়, কিন্তু প্রচণ্ড কঠিন। গীতাতেও ভগবান বলছেন, *অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরাবপ্যতে*। দেহবোধ আছে কিনা, দেহের সাথে যুক্ত থাকলে অব্যক্ত সাধনাতে শুধু দুঃখই দুঃখ। কিন্তু অব্যক্তোপসনার পথ খুব শর্টকাট। শর্টকাট পথের সন্ধান পেলেই আমরা বলি, এই পথটাই আমার চাই, এটাই আমার পথ। Philosophy says 'check everything'. (*জ্ঞানমার্গ বলে, 'সমুদয় প্রবৃত্তিকে নিরোধ কর'।*) সব কিছু বিচার করে দেখ, আর যেটা ব্রহ্ম বা আত্মা নয়, সেটাকে বাদ দাও, বিচার করে করে বাদ দিতে থাক।

Devotion says, 'Give up all to the streatm, have eternal self-surrender'. It is a longer way, but easier and happier. (*ভক্তিমার্গ বলে, 'স্রোতে গা ভাসিয়ে দাও, চিরদিনের জন্য পূর্ণ আত্মসমর্পণ কর'। এ পথ দীর্ঘ বটে, কিন্তু অপেক্ষকৃত সহজ ও সুখকর।*) ভক্তি বলে, অত কিছু বিচার করতে হবে না, নদীর স্রোতে সব ভাসিয়ে দিয়ে চল, শরণাগতি, শুধু শরণাগতি, কোন কিছুই তোমাকে উপরে নিয়ে যেতে হবে না। পথ লম্বা কিন্তু সহজ ও সুখের। একটা উপমা নেওয়া যেতে পারে, যদিও উপমাটা খুব ভাল নয়, কিন্তু বোঝানর জন্য ঠিক আছে। মনে করা যাক, গোমুখের গঙ্গার উৎসে জলের একটা মলিক্যুল

নামতে নামতে একেবারে সমতল ভূমিতে চলে এসেছে। হঠাৎ তার মনে হল, আরে! আমি কোথায় চলে এসেছি! আমাকে আমার জায়গায় ফেরত যেতে হবে। এবার স্রোতের বিপরীতে ঠেলে ঠেলে গোমুখে পৌঁছাতে তার দম বেরিয়ে যাবে। কিন্তু তাড়াতাড়ি নিজের জায়গায় ফিরে আসতে পারবে। আর যদি সে ঠিক করে নেয়, নাঃ, আমি নদীর শরণাগত হয়ে যাই, পূর্ণ শরণাগতি। এবার সে হরিদ্বার হয়ে কানপুর, বারাণসী, পাটনা হয়ে বেলুড় মঠের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিশে যাবে। সেখানে কত দিন পরে থাকবে জানা নেই, একদিন সূর্যের আলো তাকে আবার বাষ্প করে আকাশে তুলে নেবে, এবার মেঘ হয়ে ভাসতে ভাসতে আবার হিমালয়ে গিয়ে নেমে আসবে। লম্বা পথ, কিন্তু অনেক মজার, কত কিছু দেখবে, শুনবে, জানবে।

'Thine am I for ever, henceforth whatever I do, it is Thou doing it. No more is there any me or mine'. (*ভক্ত বলেন : প্রভো, চিরকালের জন্য আমি তোমার; এখন থেকে আমি যা কিছু করছি বলে মনে করি, তা বাস্তবিকই তুমিই করছ – আর 'আমি' বা 'আমার' বলে কিছু নেই।*) যাঁরা ভক্তি পথে সাধনা করেন, তাঁরা এটাই করেন, ভগবানের উপর সব কিছু ছেড়ে দেন, সবই তোমার, আমি বা আমার বলে কিছু নেই, যা কিছু আমি করছি বলে মনে করছি, আসলে সব তুমিই করছ।

Having no money to give, no brains to learn, no time to practice Yoga, to Thee, O sweet One, I give myself, to Thee may body and mind, ('*হে প্রভো, আমার অর্থ নেই যে, আমি দান করব; আমার বুদ্ধি নেই যে, আমি শাস্ত্র অধ্যয়ন করব; আমার সময় নেই যে, যোগ-অভ্যাস করব; হে প্রেমময়, আমি তাই তোমাকে আমার দেহ-মন অর্পণ করলাম*'।) ভক্তিগীতির যে বিভিন্ন গান আছে, সেই গান থেকে স্বামীজী বলছেন। শঙ্করাচার্যের যে ক্ষমাস্তোত্রম আছে, তারও এই একই ভাব।

ধর্ম মানুষকে যে শিক্ষা দেয়

No amount of ignorance or wrong ideas can put a barrier between the soul and God. (*যতই অজ্ঞান বা ভ্রান্ত ধারণা আসুক, কিছুই জীবাত্মা বা পরমাত্মার মধ্যে ব্যবধান ঘটাতে পারে না।*) কোন মায়া, কোন অবিদ্যা, কোন শক্তি কোন দিন তফাৎ করে দিতে পারে না যেখানে আমি আর তিনি আলাদা হতে পারে, যতই অজ্ঞান ও ভ্রান্ত ধারণা আসুক, কোন কিছুই জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে না। থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে যাঁরা স্বামীজীর এই কথাগুলো শুনছেন তাঁরা সবাই খ্রীশ্চান, খ্রীশ্চান ধর্মে মানুষ আর ঈশ্বরের ব্যবধানটা চিরন্তন, আর সেখানে স্বামীজী বলছেন, জীবাত্মা আর পরমাত্মা এক, কোন শক্তি নেই সে এই দুটোকে আলাদা করে দিতে পারবে।

Even if there be no God, still hold fast to love. (*ঈশ্বর বলে কেউ যদি নাও থাকেন, তবু প্রেমের ভাবকে দৃঢ় ভাবে ধরে থাকো।*) এটাও স্বামীজী একটি অপূর্ব মন্তব্য, তুমি ঈশ্বরকে যদি নাও মানো, তোমার কাছে ঈশ্বর যদি সত্য নাও হয়, তাও তুমি ভালবাসো। ভালবাসা মানেই সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে চলা, যেটাকে আমরা বলছি inclusiveness। Inclusiveness আসলে শেষে হয়ে যায় test of truth of everything। মানুষের আচার আচরণ, তার ধর্ম, তার যে কোন জিনিসকে আমরা inclusivenessএর মাপকাঠি দিয়ে বিচার করে দিতে পারি। যে ধর্ম যত inclusiveness হবে সেই ধর্মই তত ঠিক ঠিক ধর্ম হবে। যে কাজ করলে, যে কথা বললে আমার মধ্যে inclusiveness আসবে, সেই কাজ করা, সেই ধরণের কথা বলাটা তত ঠিক। ভালবাসা মানুষকে inclusiveness বানায়, সেখানে ঈশ্বর থাকুন আর নাই থাকুন, ভালবাসাতে সে নিজেকে উন্নীত করছে। ভালবাসা যত বাড়ছে সে তত inclusive হচ্ছে, আর inclusiveএর শেষ অবস্থা হল যেমন যীশু, সবাইকে নিজের মধ্যে নিয়ে আসছেন; আর বেদান্তে ultimate of inclusiveness হল *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*। একই কথা বিভিন্ন ভাবে আসছে।

স্বামীজী আবার বলছেন, It is better to die seeking a God than as a dog seeking only carrion. (*কুকুরের মতো পচা মাংস খুঁজে খুঁজে মরার চেয়ে ঈশ্বরের অন্বেষণ করতে করতে মরা ভাল।*) যদি মরতে হয় ঈশ্বরের অন্বেষণ করতে করতে মর, কুকুরের মত মরা হাড়, পচা মাংস খেতে খেতে মরতে যেও না। অর্থাৎ, জগতে যে ভোগের সামগ্রী, এই ভোগের পিছনে দৌড়ে দৌড়ে জীবনটা শেষ করে দিও

না, তার থেকে অনেক ভাল হল, ঈশ্বর যদি সত্য নাও হয়, অন্তত তুমি একজন ভাল মানুষ হবে, তোমার হৃদয়ের বিস্তার হবে, যদি তুমি সবার প্রতি, সমস্ত জীবের প্রতি ভালবাসার অনুশীলন করে যাও। অনেক সময় বলা হয়, এত ধর্ম ধর্ম করে কি লাভ। লাভ এটাই, ধর্ম প্রথমে একজন ভদ্র মানুষ তৈরী করে। যে ভদ্র নয় সে কখনই ধর্মের অনুশীলন করতে পারবে না। যার মধ্যে মূল্যবোধ নেই, যার মধ্যে কোন গুণ নেই, সে কখনই ধর্মের অনুশীলন করতে পারবে না। কিন্তু সব থেকে বড় কথা হল, যে সবাইকে ভালবাসতে পারে না, সে কখনই ধার্মিক হতে পারবে না। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে অনেক চিৎকার করে বলে উঠবে, কেন, অমুক ধর্মের লোকেরা অন্য ধর্মের লোকদের নির্বিচারে খুন করে যাচ্ছে। আমরা ওগুলোকে নিয়ে এখানে আলোচনা করতে যাচ্ছি না, সবাই এর উত্তর জানে, আমরাও এই ব্যাপারে কথা বলতে আগ্রহী নই। গীতায় ভগবান সাতশটি শ্লোকের মধ্যে ছয়বার বলছেন, *সর্বভূত হিতে রতাঃ*। এটাই ধর্মের কাজ।

ধর্ম আমাদের শিক্ষা দেয় কিভাবে সবাইকে ভালবাসবে। শুধু ভালবাসলে হবে না, ঘুম থেকে ওঠা থেকে রাত্রে শুতে যাবার আগে পর্যন্ত সমস্ত ভূতের সব রকম মঙ্গলের জন্য লেগে থাকতে হবে। *সর্বভূত হিতে রতাঃ*, তাহলে কি সাপ, বিছেকে কি মারব না, মশা মারব না? এর একটাই শেষ উত্তর – না। তাহলে সাপ, বিছে থেকে আমরা বাঁচব কি করে? এগুলো থেকে বাঁচার জন্য তুমি protection নিয়ে নাও, যাতে ওরা তোমার কাছে না আসতে পারে। জাল লাগাও, মশারি ব্যবহার কর। এদেরও একটা জীবন আছে, এদেরও বেঁচে থাকার অধিকার আছে। এটা কিন্তু শেষ অবস্থা থেকে বলা হচ্ছে, সাধারণ স্তরে আমরা পারব না। সাধারণ স্তর থেকে ওই শেষ অবস্থায় পৌঁছানর জন্য আমাদের অনেক কিছুর অনুশীলনের মাধ্যমে এগোতে হয়।

ধর্ম আমাদের একটা বিরাট হৃদয়ের মানুষ তৈরী করে দেয়, যে হৃদয়ে আমরা সবাইকে স্থান দিতে পারি, সবারই মঙ্গল চাইতে পারি, আর সংসার জ্বালায় যে মানুষগুলো দিনরাত জ্বলেপুড়ে মরছে, তারা আমার কাছে এসে যেন শান্তি লাভ করতে পারে। এই ধরণের ধর্মপ্রাণ মানুষ যে পরিবারে জন্ম নেন, সেই পরিবার ও বংশ তাঁর জন্য গর্বিত হয়, যে সমাজে এই ধরণের মানুষ জন্ম নেন, সেই সমাজের জন্য তিনি একটা গর্ব, এই ধরণের মানুষ যে দেশে আছে সেই দেশের গর্ব, যে ধর্মে আছে সেই ধর্মের জন্য গর্ব। যখন মানুষ নিজের ভোগের জন্য ছুটছে, ভোগের জন্য পাঁচজনকে ঠকাচ্ছে, নিজের আদর্শের নামে, ধর্মের নামে পাঁচজন লোককে খুন করছে, সে মনে করতে পারে সে বিরাট কিছু, কিন্তু সে জানে না, তার নিজের দু চারজন লোকের বাইরে সবার জন্য সে একটা কলঙ্ক, মানবজাতির জন্য সে একটা কলঙ্ক, কারণ সে অন্য মানুষকে নিজের স্বার্থে মারছে। ধর্মের সব থেকে বড় গুণ এটাই, ধর্ম সবাইকে ভালবাসতে শেখায়, শুধু মানুষকে না, সমস্ত ভূতের প্রতি ভালবাসতে শেখায়। Choose the highest Ideal, and giver your life up to this. (*সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ বেছে নাও, আর সেই আদর্শকে লাভ করবার জন্য সারা জীবন নিয়োজিত কর।*) যদি তোমাকে বাছতে হয়, তুমি উচ্চতম আদর্শকে বাছ, ছোট কোন কিছু আদর্শকে নিও না, আর ওই আদর্শের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে ঢেলে দাও। স্বামীজী এই কথা বার বার বলতেন, একটা উচ্চ আদর্শ নাও, আর সেই আদর্শের জন্য বেঁচে থাক, ছোটখাটো জিনিস নিয়ে বাঁচতে যেও না, মারিত গণ্ডার লুটিত ভাণ্ডার। ভাল যদি বাসতে হয় সবাইকে ভালবাসো, দু চারজনকে ভালবেসে কি হবে! 'Death being so certain, it is the highest thing to give up life for a great purpose'. (*মৃত্যু যখন এত নিশ্চিত, তখন একটা মহান উদ্দেশ্যের জন্য জীবনপাত করার চেয়ে আর বড় জিনিস কিছু নেই।*) মৃত্যু তোমার যেখানে নিশ্চিত হয়ে আছে, সেখানে একটা উচ্চ আদর্শের জন্য জীবন দেওয়াটাই ঠিক।

ভালবাসা ও একত্ব – সমার্থক

Love will painlessly attain to philosophy; then after knowledge comes Parabhkati (supreme devotion). (*ভক্তিদ্বারা বিনা আয়াসে জ্ঞানলাভ হয়, ওই জ্ঞানের পর আসে পরাভক্তি।*) ভালবাসা সব কিছুকে পার করে সেই সত্যে নিয়ে যায়, যেখানে সব কিছু এক হয়ে যায়, যেখানে একত্ব আসে। মানুষ তাকেই ভালবাসে যেখানে সে নিজেকে তার সাথে এক মনে করে, এক যদি কাউকে মনে না করে, কি করে সে ভালবাসবে! পনেরো ষোল বছরের ছেলেকেও যদি তার ভালবাসা নিয়ে প্রশ্ন করা হয়, সেও বলবে, যাকে আমি ভালবাসি সে আর আমি এক। মা সন্তানকে ভালবাসে, কারণ মা মনে করে আমি আর

আমার সন্তান এক। যদি কেউ নিজেকে ভালবাসাতে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, ধীরে ধীরে তাকে সবাইকে নিজের একান্ত আপনজন মনে করতে হবে, তবেই একত্ব ভাব আসবে। যখনই একত্ব এসে যায় তখনই ফিলজফি এসে যায়, আর ফিলজফি যখন এসে যায়, তখন পরাভক্তি, ঠাকুর যাকে প্রেমাভক্তি বলছেন, ভক্তির শেষ কথা সেই প্রেমাভক্তি এসে যায়।

Knowledg is critical and makes a great fuss over everything, but Love says, 'God will show His real nature to me' and accept all. (*জ্ঞানী বড় সূক্ষ্ম বিচার করতে ভালবাসে, অতি সামান্য বিষয় নিয়েও একটা হৈ চৈ বাধিয়ে দেয়; কিন্তু ভক্ত বলে, 'ঈশ্বর তাঁর যথার্থ স্বরূপ আমার কাছে প্রকাশ করবেন'; তাই সে সব কিছুই গ্রহণ করে।*) স্বামীজী যখন যেটাকে নিয়ে বলতেন, সেটাকে খুব জোর দিয়ে বলতেন, এখানে ভালবাসাকে নিয়ে বলছেন, ভক্তি নিয়ে বলছেন। ভক্তিকে শুদ্ধা ভক্তিতে নিয়ে চলে যাচ্ছেন। জ্ঞানীকে নিয়ে বলছেন, তারা সব সময় সূক্ষ্ম বিচার করে যাচ্ছে, সামান্য সামান্য বিষয় নিয়েও হৈ চৈ বাঁধিয়ে দিয়ে বলে, সব ফেলে দাও। কিন্তু যে ভালবাসে, সে বলছে, আমি ঈশ্বরকে ভালবেসেছি, বাকিটা তিনিই দেখবেন। বেদান্তের শেষ কথাই হয়, ভালবাসা। ভক্তির শেষ কথা সেই জ্ঞান, যে জ্ঞান মানুষকে ঈশ্বরের সাথে এক করে দেয়। এই কথা বলার পর স্বামীজী রাবাইয়ার একটা কবিতা বলছেন।

রাবাইয়ার সম্বন্ধে খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা যায় যে, মহম্মদ তখন সবে আরবে তাঁর নূতন ধর্ম ইসলামকে নিয়ে এসেছেন। ইসলাম মানে, আল্লার প্রতি শরণাগতির দ্বারা জীবনে শান্তি নিয়ে আসা। ইসলামের তত্ত্বগুলিকে নিয়ে যাঁরা সাধনা করতেন, পালন করতেন, তাঁরা হলেন মুসলমান, ইংরাজীতে তাঁদের মহামেডান বলা হয়, কারণ তাঁরা মহম্মদের দেওয়া পথকে অনুসরণ করে চলতেন। তিনিই মুসলমান, যাঁর জীবনে শান্তি এসেছে, সেইজন্য এই ধর্মকে বলা হয়, Religion of Peace, শান্তির ধর্ম। ঠাকুর বলছেন, চিলের মুখ থেকে মাছ পড়ে গেছে, তারপর চিলের শান্তি। ঠিক তেমনি জীবনের সব কিছুকে আল্লার প্রতি সমর্পণ করে যিনি তাঁর শরণাগত হন, তখন তাঁর জীবনে যে শান্তি হয়, সেটাই ইসলাম, সেই ইসলামকে যাঁরা পালন করেন তাঁরাই মুসলমান। মূল ইসলাম, বর্তমানে যে ধর্মকে আমরা সব জায়গায় দেখছি, এদেরই আরেকটি ধর্ম ছিল, যাঁদের ধর্মকে সুফি ধর্ম বলে, যাঁদের ধর্মকে পরে মুসলমানরা মানতে রাজি হয়নি, ফলে যা হয়ে থাকে, সুফি সম্প্রদায়রা এখন সংখ্যায় অনেক কমে গেছে, এখনও পাকিস্থান ও অন্যান মুসলিম অধ্যুষিত জায়গাতে অল্প কিছু যে সুফি আছে, তারাও খুব নিরাপদে নেই।

প্রফেট মহম্মদের শরীর যাবার একশ বছরের মধ্যে আরবের মরুভূমির খুব গরীব পরিবারে রাবাইয়ার জন্ম। আরবি ভাষায় রাবাইয়া মানে চার, তিনি বাবা-মার চতুর্থ সন্তান ছিলেন, সেইজন্য তাঁর নাম রাবাইয়া রাখা হয়। ছোটবেলা থেকেই রাবাইয়ার ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা জন্মায়, এবং সে আল্লাকে এমন ভালবাসতে শুরু করল যে, আল্লার প্রতি ভালবাসায় সে একেবারে ডুবে গেল; আমাদের মীরাবাঈয়ের জীবনে যেমন দেখা যায়। ভালবাসাতে রাবাইয়া এমন ডুবে গেল যে, শুধু তার ভালবাসাটাই আছে। আমরা এর আগে ভালবাসার উপর অনেক কথা আলোচনা করেছি। ভালবাসা যখন হয় তখন অনেকগুলো ধাপে হয়। আমি তোমার ভালবাসা চাই, বা আমিও তোমাকে ভালবাসবো, তুমিও আমাকে ভালবাসবে, বা তুমি আমাকে ভালবাসো আর নাই ভালবাসো, আমি তোমাকে ভালবেসে যাবো। চতুর্থ হল, আমিও নেই, তুমিও নেই, দুজনে এক। কিন্তু তারপরে শেষে যেটা হয়, আমিও নেই, তুমিও নেই, সেই একও নেই, শুধু আছে ভালবাসা। রাবাইয়া ওই স্তরে চলে গিয়েছিলেন, যেখানে আমিও নেই, তুমিও নেই, আছে শুধু ভালবাসাটুকু। রাবাইয়ার সব নামকরা নামকরা প্রার্থনা আছে, তার মধ্যে একটা আছে, হে আল্লা! নরকের ভয়ে আমি যদি তোমার প্রার্থনা করি, তাহলে অবশ্যই তুমি আমাকে চিরদিনের জন্য নরকে পাঠিও, আর স্বর্গের আশায় যদি তোমাকে প্রার্থনা করি, তাহলে হে আল্লা! আমার কোন দিন যেন স্বর্গে ঠাঁই না হয়।

রাবাইয়ার জীবনে অনেক অলৌকিক কাহিনী আছে, সেগুলোর মধ্যে আমরা আর যাচ্ছি না। একটা ঘটনা আছে যে, রাবাইয়া একদিন হাতে জল আর আগুন নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর বলে যাচ্ছেন, 'আমি নরকের আগুনে জল ঢালব আর স্বর্গের সুখে আগুন লাগাবো'। বলতে চাইছেন, আমি আল্লাকে ভালবাসি ভালবাসার জন্য। রাবাইয়ার জীবনের আরেকটি সুন্দর ঘটনা আছে, একবার একজন এসে রাবাইয়াকে বলছে,

'তুমি এত কিছু কর কিন্তু কখন তো তোমাকে শয়তানের নিন্দা করতে দেখি না'। মুসলমানদের একটা রীতি হল আল্লার গুণগানের সাথে তাদের শয়তানের নিন্দাও করতে হবে। রাবাইয়া তাকে বলছেন, 'আমারও খুব ইচ্ছা করে শয়তানের নিন্দা করি, কিন্তু আমার মন আল্লাতে এমন ডুবে আছে যে, আমি একটুও সময় বার করতে পারি না, যে সময়টাতে শয়তানকে গালাগাল দেব'। কাউকে গালাগাল দেওয়ার জন্য আগে তার চিন্তাটা আনতে হবে, সেই চিন্তা আনার ফুসরৎ রাবাইয়ার নেই। তার মানে রাবাইয়ার ভালবাসা কোন অবস্থায় চলে গেছে!

স্বামীজী সুফি দরবেশ বা সাধুদের খুব সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতেন, আর তাঁদের কবিতা, গান থেকে অনেক কথা উল্লেখ করতেন। এখানে স্বামীজী রাবাইয়ার একটা কবিতা বলছেন। রাবাইয়া তখন বিছানায় শেষ শয্যায় পড়ে আছেন, তিনি মনে করছেন, এই যে আমি বিছানায় পড়ে আছি এটা আল্লার শাস্তি, আল্লাই তাঁকে কষ্ট দিচ্ছেন। রাবাইয়ার কাছে দুজন দেখা করতে এসেছেন, একজন মালিক, আরেকজন হাসান, মালিক খুব পবিত্র আত্মা, হাসান জ্ঞানী। তিনজনে আলোচনা করছেন, এই যে শরীর খারাপ হয়, এগুলো কেন হয়? হাসান তখন বলছেন, যে আল্লাকে ঠিক ঠিক ভালবাসে, সে এই কষ্টকে খুব সহজে সহ্য করে নিতে পারবে। মালিক বলছেন, He who loves his master's choice will in chastisement rejoice. (*প্রভুর যা ইচ্ছা, তাই প্রিয় যার, আনন্দ হইবে শাস্তিতে তাহার।*) আমাদের অনেক ভক্তরা বলেন, হে ঠাকুর তুমি দুঃখ যদি দাও, দুঃখ সহ্য করার ক্ষমতাটাও দিও, হাসান এটাই বলতে চাইছে, আল্লা কষ্ট দিয়েছে সহ্য করে নাও। মালিক বলছেন, না, তিনি কষ্ট দিয়েছেন আমাকে আরও ভাল করার জন্য, আনন্দ কর।

রাবাইয়া দুজনের কথাই শুনলেন। শোনার পর দেখছেন, দুজনেরই কথার মধ্যে কোথাও একটা স্বার্থ জড়িয়ে আছে। প্রথমটাতে, আমি ভালবাসি, তাই সহ্য করে নেব। দ্বিতীয়টাতে, আমি ভালবসি, সে আমাকে আরও ভাল করার জন্য এই কষ্ট দিয়েছেন। ইদানিং বেশীর ভাব ভক্তদের মুখেও এই ধরণের কথা শুনতে পাওয়া যায়। ভগবান কষ্ট কেন দেন? আমার পরীক্ষা নেওয়ার জন্য। ভগবান কষ্ট কেন দেন? আমাকে আরও ভাল করার জন্য। বিরক্ত হয়েই এই ধরণের ভক্তকে বলতে হয়, তুমি নিজেকে এত গুরুত্বপূর্ণ মনে করছ যে, তোমার মত আহাম্মককে ভাল করার জন্য ভগবানকে এত কিছু করতে হবে? কয়েকজন দুর্বল, আহাম্মকদের পাল্লায় পড়ে ধর্ম আজ কোথায় এসে নেমেছে, ভাবলে খুব অবাক লাগে, লজ্জা করে।

রাবাইয়া বলছেন, আপনারা দুজনেই মহাপুরুষ, He who sees his Master's face, will not his prayers recall that he is chastised at all, (*যে জন দেখেছে প্রভুর বদন, আনন্দ-পাথারে হইবে মগন।*) যিনি প্রার্থনার সময় আল্লার মুখ দেখছে তাঁর তো দুঃখের বোধও হবে না। তিনি আল্লার ভালবাসায় এমন ডুবে থাকেন যে, তাঁর যে কষ্ট হচ্ছে, এই বোধটুকুও তাঁর থাকে না। এই হল ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা। এত বড় দুজন সুফি সাধু, তাঁদের একজন বলছেন, ঈশ্বরের দেওয়া কষ্ট সহ্য কর, অন্যজন বলছেন, তিনি কষ্ট দিয়েছেন আমাকে আরও ভাল করার জন্য। রাবাইয়া বলছেন, আল্লাকে যে ভালবাসে, তার কোন বোধই হবে না যে তার কোন কষ্ট আছে।

শুক্রবার, ১২ই জুলাই

বেদের প্রতিপাদ্য

স্বামীজীর এবার ১২ই জুলাইয়ের ক্লাশ শুরু হচ্ছে। আজ আবার স্বামীজী ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্যকে নিয়ে আলোচনা করছেন। ১২ই জুলাই স্বামীজী ব্রহ্মসূত্রের চার নম্বর সূত্রের আলোচনা করছেন, চার নম্বর সূত্র হল – *তৎ তু সমন্বয়াৎ*। এই সূত্রের আক্ষরিক অনুবাদ করলে কিছুই বোঝা যাবে না। আর তার ভাবকে নিয়ে যদি ব্যাখ্যা করা হয়, আমরা আগে যেটা আলোচনা করেছি, বেদান্তেই বিভিন্ন দর্শন আছে, রামানুজ, মাধ্বাচার্য ও শঙ্করাচার্য, তাতে এই সূত্রের ভাবের উপর ওনারা একটু ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। স্বামীজী চার নম্বর সূত্রের অনুবাদ করছেন, Atman is the aim of all, এর ব্যাখ্যা হল, হিন্দুদের যত শাস্ত্র অর্থাৎ বেদ, সমস্ত বেদ একটা জিনিসকেই বলতে চাইছেন, সবার বক্তব্য একটাই – আত্মা। আমাদের মধ্যে প্রচলিত কথা হল,

বেদের নির্যাস উপনিষদ, উপনিষদের সার গীতা। তার মানে গীতা যিনি পড়ে নিয়েছেন তিনি উপনিষদের সব কথা জেনে গেছেন, সেখান থেকে বেদের সব কথা জেনে গেছেন। উপনিষদের বক্তব্য আত্মজ্ঞান, মুক্তি – এই কথা ব্যাসদেব তাঁর ব্রহ্মসূত্রে এইভাবে বলে গেছেন, *তৎ তু সমন্বয়াৎ*, যার অনুবাদ করলে দাঁড়ায় বেদের একটাই বিষয় – আত্মা।

অনেক আগে আমরা ষড়দর্শন নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, তার সাথে বিশিষ্টাদ্বৈত আর দ্বৈতকে নিয়ে নিলে আটটি দর্শন হয়ে যায়। এই আটটি দর্শন বেদের বক্তব্যকে বিভিন্ন ভাবে দেখেন। এর মধ্যে খুব নামকরা দর্শন পূর্বমীমাংসা বা কর্মকাণ্ডীদের বক্তব্য হল বেদের একটাই উদ্দেশ্য – যজ্ঞ করা। কর্মকাণ্ডীরা বেদকে পরিভাষিত করতে গিয়ে বলছেন, *মন্ত্র ব্রাহ্মণ নাম বেদ ধেয়ম্*, মন্ত্র আর ব্রাহ্মণই বেদ। তার মানে মন্ত্র অর্থাৎ যে মন্ত্রগুলি দিয়ে যজ্ঞ হয় সেই মন্ত্রগুলি যেখানে আছে আর ব্রাহ্মণ অর্থাৎ সেই মন্ত্রের ব্যাখ্যা যেখানে আছে সেটাই বেদ, বাকি গুলো বেদ নয়। এবার ব্যাসদেব তাঁর ব্রহ্মসূত্রের চার নম্বর সূত্রে বলছেন, তা না, সমস্ত বেদের একটাই কথা, বেদ একটা জিনিসকেই বলতে চাইছে, সেটা হল আত্মা। আত্মা বা ব্রহ্মই সমুদয় বেদান্তের প্রতিপাদ্য। স্বামীজী এবার এর উপর কিছুটা শঙ্করাচার্যের ভাষ্যকে আধার করে আর কিছুটা নিজের মত করে ব্যাখ্যা করছেন।

Ishwara is to be known from the Vedanta; all Vedas point to Him (who is Cause; the Creator, Preserver and Destroyer). (*ঈশ্বরকে বেদান্ত থেকে জানতে হবে। সমুদয় বেদই জগৎকারণ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্তা ঈশ্বরের কথা বলছে।*) সমস্ত বেদ একমাত্র একটা জিনিসের দিকেই নির্দেশ করে, ঈশ্বর। ঈশ্বরকে নিয়ে বলাই বেদের উদ্দেশ্য। বেদান্তের মূল ঈশ্বর, ঈশ্বরকে জানতে হলে বেদান্তে যেতে হবে। বেদান্ত কোন ঈশ্বরকে নিয়ে বলছেন? যিনি সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা, সৃষ্টির সব কিছুকে যিনি ধারণ করে আছেন আর পালন করছেন, যিনি আবার সব কিছুর বিনাশ করছেন আর যিনি সব কিছুর কারণ।

Ishvara is the unification of the Trinity, known as Brahma, Vishnu and Siva, which stand at the head of the Hindu Pantheon. (*সমুদয় হিন্দু দেবদেবীর উপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই দেবত্রয় রয়েছেন। ঈশ্বর এই তিনের একীভাব।*) হিন্দুদের অনেক সময় বিদেশীরা পৌত্তলিক বলে, যারা হিন্দু ধর্মকে জানে না, তারা হিন্দু ধর্মকে নিয়ে পাঁচটা ভুলভাল কথা বলবে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কিন্তু হিন্দুরা বলে, সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, যাঁকে মন বাণী দিয়ে জানা যায় না, শুধু ধ্যানের গভীরে যাঁকে জানা যায়, সেখানে আত্মা আর পরমাত্মা মিলে এক হয়ে যায়। আত্মাই যদি পরমাত্মার সাথে মিলে এক হয়ে যায়, তখন কে কার পূজা করবে, কে কাকে ভালবাসবে। কিন্তু পূজা না করতে পারলে, ভালবাসা না দিতে পারলে আমাদের জীবন চলবে না। ভিতরে যে একটা ভালবাসার ভাব, এটা মানুষের যায় না। তোতাপুরীও দক্ষিণেশ্বরে থাকার সময় মা কালীর স্তব করেছেন, শঙ্করাচার্যও এত দেবদেবীর স্তব রচনা করেছেন। ভিতরে যা ভাব – তিনিই হলেন ঈশ্বর, সেই পরমাত্মা, সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে মানুষ যখন সরাসরি বোধে বোধ করে, তখন তাঁকে নির্গুণ নিরাকার দেখে। সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দকেই যখন নিজের আমিত্বকে ধরে রেখে বোধ করে, তখন তিনি সগুণ সাকার ঈশ্বর বলে বোধ হন। সেই ঈশ্বর আমাদের কর্মফল দাতা, তিনি বিধাতা, গীতায় বলছেন, *মাতা ধাতা পিতামহঃ*, তিনি আমাদের মা, তিনি ধাতা, আমাদের ধারণ করে আছেন। আবার তিনি পিতামহ, কারণ প্রকৃতি হলেন মা, প্রকৃতির বাবা হলেন ঈশ্বর, সেইজন্য তিনি পিতামহ। মন দিয়ে ঈশ্বরকে দেখার সময়, তাঁকে স্রষ্টা রূপে দেখে, ধাতা রূপে বা পালনকর্তা রূপে দেখে আর সংহার রূপে দেখে, এরই তিনটে রূপকে আলাদা আলাদা তিনটে নামে বলছেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। কিন্তু এই তিনজনই সেই এক মহাবিষ্ণু বা নারায়ণরই তিনটি রূপ। সেই নারায়ণই ঈশ্বর, যাঁকে আমরা ভগবান বলি। তাহলে কি ব্রহ্মা ভগবান নন? অবশ্যই ভগবান, শিবও ভগবান। সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দই ভগবান, কিন্তু অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে মন দিয়ে জানা যাবে না, তাঁকে ভক্তি করা যাবে না, কারণ সেখানে গিয়ে সব এক হয়ে যায়।

স্বামীজী বলছেন, Ishvara is the unification, অন্যান্য ধর্মে বলতে পারে, আমার ঈশ্বর অমুক, কেউ গড বলবে, কেউ আল্লা বলবে, কেউ জেহোবা বলবে। হিন্দুরা বলবে, আমাদের ঈশ্বর সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, কিন্তু সেই ঈশ্বর যখন এটা করেন তখন আমরা তাঁকে এটা বলি, যখন ওটা করেন তখন ওটা

বলি। একই ব্রাহ্মণ যখন পূজা করে তখন পূজারী বলছি, অফিসে যখন কাজ করছে তখন বাবু বলছি, আর কোন কারণে কোথাও যদি রান্না করে তখন বামুন ঠাকুর বলছি, একই ব্রাহ্মণ কিন্তু আলাদা আলাদা কাজের জন্য আলাদা আলাদা নামে সম্বোধন করা হচ্ছে। "Thou art our Father who takest us to the other shore of the dark ocean" (Disciple's words to the Master), সেই ঈশ্বর আমাদের জীবন মৃত্যুর সাগরের পারে নিয়ে যান।

The Vedas cannot show you, you are That already, (*বেদ তোমাকে ব্রহ্ম দেখিয়ে দিতে পারে না। তুমিই তো সেই ব্রহ্ম।*) এই একটা ভাব বার বার আলোচনার মধ্যে আসছে। ঈশ্বর থেকে স্বামীজী এবার আত্মাতে চলে আসছেন, বলছেন, বেদ চাইলেও তোমাকে আত্মজ্ঞান দিতে পারবে না; they can only help to take away the veil that hides the truth from our eyes. (*বেদ এইটুকু করতে পারে, যে-আবরণটা আমাদের চোখের সামনে থেকে সত্যকে আড়াল করে রেখেছে সেইটেকে দূর করে দিতে সাহায্য করতে পারে।*) চোখের উপর অজ্ঞানের পর্দা পরে আছে, সেই পর্দাকে সরিয়ে দিতেই বেদ কেবল সাহায্য করতে পারে। এখানে বেদ বলছেন, কিন্তু শুধু বেদ না, যে কোন শাস্ত্রকে নিয়ে এই একই কথা বলা যায়, সব শাস্ত্র তাই করে, অজ্ঞানের আবরণটুকু সরিয়ে দিতে সাহায্য করে। অন্যান্য ধর্মের শাস্ত্র এই কথাগুলো মানে না, অন্য শাস্ত্রে আমাদের কোন প্রয়োজনও নেই, আমাদের নিজেদেরই এত বিশাল জ্ঞানের ভাণ্ডার থাকতে আমাদের আর কোন শাস্ত্রের প্রয়োজন নেই। বেদ আমাদের নূতন করে কিছু জ্ঞান দিচ্ছে না, বেদ আমাদের সেই জ্ঞানই দেয়, যে জ্ঞান আগে থেকেই আমাদের মধ্যে আছে।

বিয়ে বাড়ি বা কোন পার্টিতে যাবার সময় আমরা খুব মেক আপ দিই, সাজগোজ করে বেরোবার আগে আয়নার সামনে গিয়ে একবার নিজেকে দেখে নিই। আয়না আমার মেকআপ করে দেয়নি, আয়না কাউকেই সুন্দর বানায় না, সুন্দর তাকে আগে থেকেই লাগছে। কিন্তু সুন্দরের যে অজ্ঞান ছিল, আয়না সেই অজ্ঞানটাকে সরিয়ে দিল। পরিষ্কার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুখ দেখছে, মুখে কালি-ঝুলি মাখা, আয়নাতে মুখ কি বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে। জল দিয়ে মুখের কালি ধুয়ে নিলে আয়নায় পরিষ্কার মুখের ছবি ফুটে উঠবে, এখানে আয়নার কোন ভূমিকা নেই। আবার অন্যটাও আছে। চোখের সামনে যে পর্দা, পর্দা যতক্ষণ না সরানো হয় ততক্ষণ তুমি তোমার স্বরূপকে জানতে পারবে না। সমস্যা চোখেরও না, সমস্যা চোখের সামনে যে দৃশ্য রয়েছে, তারও না, সমস্যা হল চোখের সামনে যে পর্দা রয়েছে, সেটার।

একমাত্র অজ্ঞান নিবারণেই সব দুঃখ-কষ্টের অবসান হতে পারে

স্বামীজী বলছেন, The first veil to vanish is ignorance, (*প্রথমে চলে যায় অজ্ঞানাবরণ।*) চোখের সামনে যেন অনেকগুলো পর্দা পড়ে আছে, প্রথম পর্দা হল অজ্ঞানের। কিসের অজ্ঞান? আমি নিজেকে দেহ মনে করছি, মন মনে করছি, দেহ-মন-অহঙ্কারের সংঘাত মনে করছি, আত্মা মনে করছি না। প্রথমে এই অজ্ঞান চলে যায়; and when that is gone, sin goes, (*অজ্ঞান চলে যাওয়ার পর চলে যায় পাপ।*) যেমনি ওই অজ্ঞান চলে গেল, পাপবোধ চলে যাবে; next desire ceases, selfishness ends, and all misery disappears. (*তারপর বাসনা ও স্বার্থপরতা দূর হয়; এইভাবে সব দুঃখ-কষ্টের অবসান হয়।*) ভগবান বুদ্ধ এই জগৎকে দুঃখময় বলছেন, আমরাও চারিদিকে শুধু দুঃখ, কেবল দুঃখই দেখছি, সংসারে শুধু জ্বালাই জ্বালা। টাকা-পয়সা নেই তার জন্য জ্বালা, টাকা-পয়সা আছে কিন্তু খেলে হজম হয় না, শরীরে নানা রকম ব্যাধি, সেই জ্বালা। কোন সময় অভাবে খাওয়া জুটছে না, কোন সময় সময়ের অভাবে খাওয়া জুটছে না, কোন সময় খাওয়া জুটছে কিন্তু শারীরিক ব্যাধির জন্য খেতে পারছে না। দুর্ঘটনায় আমার পায়ে চোট লেগে যেতে পারে, আমার জ্বর হতে পারে, ঠাকুরের ক্যানসার হল, স্বামীজীর কত রকমের রোগ ছিল। অথবা বাড়িতে আগুন লাগতে পারে, চোর এসে বাড়ির অনেক কিছু চুরি করে নিয়ে যেতে পারে। এগুলো আলাদা জিনিস, এর প্রভাব যখন মনের উপর পড়ছে, মনও যখন সেই প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে যায়, তখন সেই প্রভাবটাকে বলে শোক, দুঃখ, সংসার জ্বালা। ক্যানসার একজন সাধারণ লোকেরও হতে পারে, আবার ঠাকুরের মত অবতার পুরুষেরও হতে পারে, কিন্তু ওই রোগের প্রতি তার মন কি প্রতিক্রিয়া করছে, তার উপর নির্ভর করবে শোক, দুঃখ, সংসার জ্বালার মাত্রা কতখানি হবে। যিনি জ্ঞানী তিনি বলবেন, শরীর এভাবেই চলে, এটাই শরীরের

ধর্ম। আর যারা শরীরের সাথে নিজেদের জুড়ে রেখেছে তারা বলবে, 'আমার যে কি কষ্ট কেউ বুঝতে পারবে না, আমারই কেন এই রোগ হতে গেল'!

ইদানিং সোশ্যাল মিডিয়া যেভাবে চারিদিকে মেসেজ ছড়িয়ে দিয়ে জীবনের দামটা এত বেশি বাড়িয়ে দিচ্ছে, যাতে মন হয়, হিন্দু ধর্মের মূল জিনিসগুলোর প্রতিও আমাদের দৃষ্টি নেই। মানুষের শোক, দুঃখ লাঘব করা আমাদের সবারই দায়ীত্ব, কিন্তু এমন ভাবে জোর দিচ্ছে মনে হয় যেন জীবন শেষ হওয়ার সাথে সাথে আমাদের সব কিছুই যেন শেষ হয়ে গেল। কখনই কোন কিছু শেষ হয়ে যাবে না, এই জীবন আমাদের অনেক কিছুর অনুভব দিচ্ছে, অনেক অভিজ্ঞতার সঞ্চয় করিয়ে দিচ্ছে। মৃত্যুর পর আবার জন্ম হবে, তখন আরও অন্য ধরণের নূতন নূতন অনুভব আসবে, অভিজ্ঞতা হবে। এই নিয়ে মাতামাতি করার কি আছে! বিদেশীদের জন্য এগুলো ঠিক আছে, ওদের কাছে এই একটাই জীবন পেয়েছি, মরে গেলে সব শেষ। বিদেশীদের এই ভাবধারা আস্তে আস্তে ভারতেও এসে যাচ্ছে। এখানেও আজকাল RIP লিখে যাচ্ছে, বোঝেও না RIP শব্দের মানে কি, May be soul rest in peace। আমরা কেন rest in peace লিখতে যাব! আমরা খ্রীশ্চান নাকি! খ্রীশ্চানদের মতে মৃত্যুর পর হয় স্বর্গলোকে যাবে নয়তো নরকে যাবে, আর যেখানেই যাবে ওটাই তার চিরদিনের জন্য বাসভূমি হয়ে গেল। আমাদের এখানে তা না, যেমন যেমন পূণ্য কর্ম করেছে, সেই অনুসারে অন্য লোকে গিয়ে সুখ ভোগ করবে, পূণ্যের কোটা শেষ হয়ে গেলে আবার এই পৃথিবীতে এসে অন্য কোন যোনিতে জন্ম নেবে। স্বামীজী এখন ধীরে ধীরে জ্বলন্ত সংসারের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন।

নিজেকে আত্মার সাথে অভিন্ন ভাবা

সংসারের এই যে এত দুঃখ জ্বালা, এর নাশ করার উপায় কি? এবার আমরা যদি এক এক করে পিছনের দিকে যেতে থাকি, প্রথমে আসে স্বার্থপরতা, নিজের সাথে মানুষ এমন জুড়ে রেখেছে যে, নিজের উপর কিছু হলেই মনে করছে, আমি বুঝি শেষ হয়ে গেলাম। আর তার পিছনে রয়েছে যত রকমের কামনা-বাসনা। আর এই কামনা-বাসনার পিছনে শেষে রয়েছে অজ্ঞান, অবিদ্যা। আমরা নিজেকে জানি না, নিজেকে না জানার জন্যই যত রকমের দুঃখ, কষ্ট, জ্বালা, যন্ত্রণার ভোগ। একটা কথা আমরা আগে কয়েকবার আলোচনা করেছি, ভাব নিয়ে আলোচনা করার সময় সেখানে আমরা অনেক কথা বলেছি। গীতাতে যেমন বলছেন, *ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে*, মনের তপস্যা হল ভাবের সংশুদ্ধি। ঠাকুরও বলছেন ভাবের ঘরে চুরি করো না। ভাবকে শুদ্ধ করতে হয়। যদি ভাব না থেকে শুধু অভাব থাকে তখন কি হবে? ঠাকুর তাকে রক্ষা করুন। আমাদের সমস্যা হল, ভাব বলে আমাদের কিছু নেই। আমি এই দেহ, এটাকে কোন ভাব বলে না। ভাব মানেই যখন জিনিসটা ধীরে ধীরে আমাকে দিব্যত্বের দিকে নিয়ে যায়। আমি ঈশ্বরের সন্তান, এটা একটা ভাব, আমি শুদ্ধ আত্মা এটা একটা ভাব। এই ধরণের কোন ভাব নেই, শুধু অভাব আছে বলেই আমরা যত রকমের গোলমাল করে বেড়াই। যে মানুষ নিজেকে শুধু দেহ মনে করে, তার কাছে মনের কোন দাম নেই। আর মনেরও যদি দাম থাকে, তাহলে বলবে, ঠিক আছে এই রকমই হয়। তখন ওই মন চুরি করতে চাইবে, ঘুষ নিতে চাইবে। চুরি করতে যদি ধরা পড়ে যায় তখন ঘুষ দিয়ে ছাড়া পেতে চাইবে, আর দু-পয়সার বাতাসা কিনে মন্দিরে গিয়ে প্রণাম করবে যাতে বেঁচে যাই। কিন্তু যার ভিতরে এই ভাব আছে, আমার ভিতরে অন্তর্যামী আছেন, সেই অন্তর্যামীকে আমরা যেভাবেই নিই না কেন, তাঁকে ঈশ্বর রূপে নিতে পারি, শুদ্ধ আত্মা রূপে নিতে পারি, যিনি সব কিছুতে আছেন, তখন আমরা সাবধান হয়ে যাব। সমস্ত গোলমালের পিছনে রয়েছে ভাবের অভাব। স্বামীজী ওই ভাবটাকে সৃষ্টি করছেন। তুমি দেহ ছেড়ে আত্মার সাথে নিজেকে জুড়ে দাও, তখন দেখবে যে ধীরে ধীরে তোমার মধ্যে ভাব সৃষ্টি হতে শুরু করেছে। এরপর শরীরের সাথে যেটা জুড়ে আছে, সেটা এবার নাশ হয়ে হয়ে আত্মার সাথে এক হয়ে যাবে। আত্মার সাথে এক হয়ে যাওয়ার পর পাপবোধ চলে যাবে, কামনা-বাসনা কমে যাবে, তারপর আসবে শান্তি।

স্বামীজী বলছেন, This cessation of ignorance can only come when I know that God and I are one; in other words, identify yourself with Atman, not with human limitations. Disidentify yourself with the body, and all pain will cease. This is the secret of healing. (*এই অজ্ঞানের তিরোভাব তখনই হতে পারে, যখন আমরা জানতে পারি যে, ব্রহ্ম ও*

আমি এক; অর্থাৎ নিজেকে আত্মার সঙ্গে অভিন্ন বলে দেখ, মানবীয় উপাধিগুলির সঙ্গে নয়। দেহাত্মবুদ্ধি দূর করে দাও দেখি, তা হলেই সব দুঃখ দূর হবে। মনের জোরে রোগ ভাল করে দেওয়ার এই রহস্য।) বেদান্তের এটাই শেষ কথা। যখনই আমরা আমি আমি করছি, তখন দেখতে হয় এই আমিকে আমরা কার সাথে জুড়ে রেখেছি, দেখা যাবে আমরা সবাই দেহ, মন আর অহঙ্কারের সাথে জুড়ে রেখেছি। আমি ঈশ্বরের সন্তান আমি কখনই এই রকম কর্ম বা আচরণ করতে পারি না। মঠের মহারাজরা বাইরে কোথাও গেলে লোকেরা দেখেই বুঝতে পারে, ইনি কোথাকার সন্ন্যাসী। এসে জিজ্ঞেস করে, আপনি কি রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী? তখন মহারাজদেরও একটা এই বোধ হয় যে, লোকটি রামকৃষ্ণ মিশনকে জানে, তাই আমাকে সাবধান হয়ে যেতে হবে। এখানে একটা সংস্থার সাথে identification হয়ে যাচ্ছে। কোন সন্ন্যাসীর ভিতর এই ভাবটা যদি জাগ্রত থাকে, 'আমি রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী, আমি এই রকম জিনিস কখনই করতে পারি না, চিন্তাও করতে পারি না', তখনই তাঁর ভাবসংশুদ্ধি হয়ে গেল। যেমনি এই ভাব কারুর মধ্যে জেগে যায়, আমি ঈশ্বরের সাথে যুক্ত, সন্তান রূপে বা সেবক রূপে বা আত্মা রূপে, যেভাবেই হোক, একটা ভাব জন্ম নিল। এবার এই ভাবের চারাতে ভালবাসার জল, খাটাখাটনির জল সিঞ্চন করতে হবে, যাতে ভাবটা যেন নষ্ট না হয়ে যায়। কোন মাতৃগর্ভে যখন সন্তান আসে, যদি সে খুব নিষ্ঠাবান নারী হয়, তাহলে সে প্রাণপন চেষ্টা করে যাবে যাতে গর্ভের কোন হানি না হয়। যে বাড়ির লোকেরা সন্তান চাইছে, তারা সবাই চেষ্টা করে যাতে আমাদের বৌমার গর্ভের সন্তান ঠিক থাকে। ভাব আর গর্ভ এক। উপনিষদও ঠিক এই কথাই বলছেন, গর্ভিণী যেমন নিজের গর্ভের রক্ষা করে, নিজের আত্মার ভাবকে ঠিক সেই ভাবেই রক্ষা করতে হয়।

স্বামীজী বলছেন, মানব রূপে আমরা সীমিত, এই সংসার, এই জগৎ দেশ, কাল, বস্তু সব দিক দিয়ে সীমিত, কিন্তু ঈশ্বর অনন্ত। কোন রাজা যদি কিছুক্ষণের জন্য ভুলে যায় যে সে দেশের রাজা, আর রাস্থায় যদি কাঙালীর মত ভিক্ষা করতে যায়, তাহলে বাকিরা যারা তাকে জানে, তারা কি ভাববে রাজাকে নিয়ে! আমরা সেই অনন্ত, আমরা ঈশ্বরের সন্তান, ঈশ্বরের সাথে আমরা এক, কিন্তু বিয়ে করেছি এক খেঁদি পেঁচিকে। আমাদের সবারই এই একই দুরবস্থা। আমরা ত্রিলোকের রাজা, ত্রিলোকের অধিপতি, কিন্তু হ্যারি পটারের কাহিনীতে যে ডাইনীর চরিত্র আছে, সেই ডাইনী আমাদের এমন বাণ মেরেছে যে, শরীর রূপী একটা খেঁদি পেঁচির ভালবাসায়, মনরূপী একটা প্রেতনীর ভালবাসায়, আমার বুদ্ধির ভালবাসায়, আমার অহঙ্কারের ভালবাসায় আমরা পাগল হয়ে আছি। বাইরের দিকে এই ভালবাসা না, এই ভালবাসা ভিতরের দিকে। যে কিনা ত্রিলোকের অধিপতি সে একটা এই ক্ষুদ্র শরীরকে জন্ম জন্ম ধরে আপন করে, প্রত্যেক জন্মে সারা জীবন শুধু কেঁদে কেঁদে মরছে। শাস্ত্র মমতাময়ী মায়ের মত, সত্যিকারের বন্ধুর মত আমাদের বার বার বলে যাচ্ছে, তুমি রাজাধিরাজ, তুমি অনন্তের মালিক, কেন তুমি এই সীমিত শরীর, মন, বুদ্ধিকে আপন করে নিয়ে সংসারের জ্বালায় মরছ, ওখান থেকে বেরিয়ে এসে তুমি তোমার অনন্ত সম্পদে অধিকার কায়েম কর! কিন্তু আমরা মুর্খের মত বলে যাচ্ছি, শাস্ত্রের কথা খুবই ভাল মানছি, কিন্তু এখন আমার ভোগের সময়, স্ফুর্তি করার সময়, বয়স হলে যখন ভোগের আর কোন ক্ষমতা ও ইচ্ছা থাকবে না, তখন এগুলো শুনব। কিন্তু আমরা বুঝছি না যে, শাস্ত্রের কথা ধারণা করার এটাই উপযুক্ত সময়, বৃদ্ধ বয়সে জেনে গেলে কোন কাজেই লাগবে না। বৃদ্ধ বয়সে একজন মারা যেতে বসেছে, মৃত্যুর তিন দিন আগে জানা গেল তার নামে একটা উইল আছে, তাতে সে কোটি কোটি টাকার মালিক। বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুর মুখে, যাকে এখন বিছানা থেকে নড়ানও যাচ্ছে না, নূতন কোন হাসপাতালে ভর্তিও করা যাবে না, এখন এই টাকা নিয়ে সে কি করবে! সবাই বলছে, বুড়ো বয়সে ধর্ম করা যাবে। মৃত্যুর সময় যদি সে ধর্ম করেও নেয়, ওই ধর্ম তার কি কাজে লাগবে! এই জগৎ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভোগের জন্য। ভোগের জন্য তাকে মুক্ত থাকতে হবে, জেলের কয়েদিরা ভোগ করতে পারে না, জেলে তাদের হাতে একটা পাত্র দিয়ে দেওয়া হয়, আর তাতে এক হাতা ভাত আর একটু ডাল তরকারি দিয়ে দেয়, এর বেশি কিছু তাদের দেওয়া হয় না। আমরা সবাই এই জগতের কয়েদি, যতটুকু দিয়ে দিচ্ছে ওইটুকুতেই শান্ত হয়ে থাকতে হয়। একবার এই জেলখানা থেকে বেরিয়ে এসে দেখুক, কেমন ভোগ করা যায়!

স্বামীজী বলছেন, This is the secret of healing, জীবনের যত কষ্ট, যত দুঃখ, তার একমাত্র ওষুধ – সত্যকে জানো, তোমার সব কষ্ট ঘুচে যাবে, এটাই মহৌষধ। The universe is a case of hypnotization, dehypnotize yourself and cease to suffer. (*এই জগৎটা একটা সম্মোহনের*

ব্যাপার; নিজের ওপর থেকে সম্মোহনের আবেশটা দূর করে ফেলো, তা হলেই তোমার আর কষ্ট থাকেব না।) আমাদের যত দুঃখ, যত কষ্ট তার মূল হল, আমরা নিজেদের হিপনোটাইজ করে রেখেছি, একমাত্র কাজ হল আমাদের নিজেদের dehypnotize করতে হবে। কম্যুনিস্টরা উল্টোটা বলে, ধর্ম হল আফিং, ধর্ম মানুষকে হিপনোটাইজ করে দেয়। কিন্তু আমরা নিজেকে এই জগতের সাথে, জগতের বস্তুর সাথে হিপনোটাইজ করে রেখেছি, শাস্ত্র শুনতে শুনতে ডিহিপনোটাইজ হবে, তখনই আমরা আমাদের যেটা বাস্তবিক অবস্থা, সেই অবস্থায় আসব। এটা বলার পর স্বামীজী আবার সেই কথাই বলছেন।

In order to be free we have to pass through vice to virtue, and then get rid of both. (*মুক্ত হতে গেলে প্রথমে পাপের মধ্য দিয়ে যেতে হয়, তারপর পূণ্য অর্জন করতে হয়, শেষে পাপপূণ্য দুই-ই ত্যাগ করতে হবে।*) আমাদের ভিতরে যে দুর্গুণগুলো রয়েছে, প্রথমে এগুলোকে ছেড়ে ভাল হতে হবে। তার মানে ভাল হওয়াকে অস্ত্র বানিয়ে প্রথমে মন্দ জিনিসগুলিকে ফেলে দিতে হবে, শেষে ভাল মন্দ দুটোকেই ফেলে দিতে হবে। Tamas is to be conquered by Rajas, both are to be submerged in Sattva; then go beyond the three qualities. Reach a state where your very breathing is a prayer. (*প্রথমে রজঃ দ্বারা তমঃকে জয় করতে হবে, পরে উভয়কেই সত্ত্বগুণে লয় করতে হবে। সর্বশেষে এই তিন গুণকেই অতিক্রম করতে হবে। এমন একটা অবস্থা লাভ কর, যেখানে তোমার প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাস তাঁর উপাসনা-স্বরূপ হবে।*) তমসকে দাবাতে হবে রজোকে দিয়ে, তমো আর রজো দুটোকে নিয়ে সত্ত্বে মিশিয়ে দিতে হবে, সেখান থেকে তিনটে গুণের আশ্রয় ছেড়ে দিয়ে ত্রিগুণাতীত অবস্থায় চলে যেতে হবে। ত্রিগুণাতীত অবস্থা কেমন? নিঃশ্বাস যে নিচ্ছি, প্রতিটি নিঃশ্বাসকে মনে হবে ঈশ্বরের প্রতি প্রার্থনা করা হচ্ছে। তখন নিঃশ্বাসকে নিঃশ্বাস বলে বোধ হয় না, তমো, রজো, সত্ত্বো কোন কিছু থাকবে না, সবটাই হল সেই ঈশ্বরের সাথে একাত্ম বোধ।

দেববাণীতে আমরা স্বামীজীর মুখ থেকে যে কথাগুলি শুনছি, আক্ষরিক অর্থে এগুলো পুরোপুরি বাস্তবিক। এমন এমন কিছু কথা আছে, যে কথা শোনার পর আমাদের মনে একটা জোর ধাক্কা দেয়, মনে হয় স্বামীজী যেন এই কথাগুলো আমার জন্যই বলছেন, এই ধরণের কথাগুলোকে আলাদা করে আমরা একটা কাগজে লিখে রাখতে পারি, কিছু দিন ধরে ওটাকে নিয়েই মাঝে মাঝে চিন্তন মননের অনুশীলন করতে পারি, আর সাথে সাথে ভাবতে হবে, কিভাবে আমি এটাকে আমার ব্যবহারিক জীবনেও নামাতে পারি। একদিন, দুদিন চিন্তন মনন যতটুকুই করি না কেন, তার একটুও যদি দৈনিন্দিন জীবনের আমরা কাজে লাগাতে পারি, সেটুকুই আমাদের অমূল্য লাভ, আমাদের ভিতরে একটা শক্তি জেগে উঠবে। অনেক দিন পর হঠাৎ যখন এই কথাগুলো মনে পড়বে, তখন মনটা একটা দিব্য আনন্দে ভরে যাবে এই মনে করে যে, আরে আমিও তো ওই ভাবের উপর কিছু দিন অনুশীলন করেছিলাম। দেববাণীর প্রত্যেকটি কথা আক্ষরিক ভাবে সত্য এবং পুরোপুরি practical।

অভিজ্ঞতাই আমাদের একমাত্র শিক্ষক

Whenever you learn (gain anything) from another man's words, know that you had the experience in a previous existence, because experience is the only teacher. (*যখনই দেখ যে অপরের কথা থেকে কোন কিছু শিখছ (বা লাভ করছ), জেনো যে পূর্বজন্মে তোমার সেই বিষয় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, কারণ অভিজ্ঞতাই আমাদের একমাত্র শিক্ষক।*) এটাও স্বামীজীর একটা নিজস্ব মত। আত্মা শুদ্ধ চৈতন্য, শুদ্ধ চৈতন্যে প্রকৃতির স্বভাব নেই, সাংখ্য দর্শনও এই কথা বলছে। এই সংসার কেন? বলছেন, ভোগ আর অপবর্গ, প্রকৃতির নানা রকমের যে লীলাখেলা, এই খেলাকে ভোগ করা, সংসার হল এই ভোগের জায়গা। এই ভোগ কতদিন ধরে চলছে? যবে থেকে সৃষ্টি হয়েছে, তবে থেকে চলছে। তাহলে আমাদের অনেক রকমের অভিজ্ঞতা আছে, আবার অনেক কিছুর অভিজ্ঞতা নেই। স্বামীজী এখানে বলছেন, কেউ তোমাকে যখন কোন কথা বলে, আর তুমি যদি তার সব কথা চটপট বুঝে যাও, তাহলে বুঝতে হবে ওই বিষয়ে তুমি আগেই অভিজ্ঞতা অর্জন করে নিয়েছ, কারণ অভিজ্ঞতা ছাড়া শিক্ষা হয় না। এখানে আমরা অনেক কথা শুনছি, অনেক কথাই আমাদের ধারণাতে আসছে না, ধারণা হবে না। কারণ আমাদের পূর্ব

অভিজ্ঞতা নেই। আমাদের পরম্পরায় বলা হয়, সাধন-ভজন করতে হয়, ঠাকুর বলছেন, বাপু খাটতে হয়। খাটা মানে, ওই অভিজ্ঞতা যখন হয়ে গেল, তখন শাস্ত্রের কথা একবার শুনলে মাথায় বসে যাবে। যার জন্য ঠাকুর বলছেন, সময় না হলে হয় না, কিন্তু শুনে রাখতে হয়। শুনে রাখা মানে, ভিতরে একটা তাত্ত্বিক জ্ঞান এলো। কিন্তু নিজের যখন অভিজ্ঞতা হবে, তখন বলবে, এটা আগে শুনেছিলাম, এই দুটো এক। আর আগে যদি শুনে না রাখা হয়, তাহলে যখন অভিজ্ঞতা হবে, হয়ত পরে অভিজ্ঞতাটা ভুলে যাব, পরে কেউ এই বিষয়ে বললে তখন মনের মধ্যে ভেসে উঠবে, ও তাই তো এই জিনিসটাই তো আমার হয়েছিল। হয়ত পাঁচ জন্ম আগে আমার কোন বিষয়ে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, এই জন্মে সরাসরি হয়ত আমার মনে নেই, কিন্তু ওই বিষয়ে কেউ কিছু বললে সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যায়। অন্যরা অবাক হয়ে বলবে, বাঃ তুমি তো সব কিছু চটপট বুঝে ফেল। যার জন্য দেখা যায়, অনেকে অনেক কিছুর ব্যাপারে অন্যদের থেকে অনেক এগিয়ে থাকে।

কিছু দিন আগে আফগানিস্থান ক্রিকেটে টেস্ট খেলার অনুমতি পেয়েছে, ভারত বন্ধু দেশ, ভারতের সাথেই তারা প্রথম টেস্ট খেলতে নেমেছে, পাঁচ দিনের খেলা দু দিনেই ভারত আফগানিস্থানকে হারিয়ে ভূত ভাগিয়ে দিয়েছে। একজন ক্রীড়া সাংবাদিক খুব সুন্দর লিখেছেন, So cruel at the top of the cricket। পাড়ায় এমনি একটা ডাণ্ডা নিয়ে বল মারা খুব সোজা, কিন্তু আন্তর্জাতিক ময়দানে এসো, তখন ক্রিকেট খেলায় তোমার ওস্তাদির মারটা বুঝবে। দুই দেশের খেলোয়াড়রা পরস্পরকে খুব সম্মান জানিয়ে খেলতে নেমেছে। কিন্তু মাঠে নামার পর আফগানিস্থানের প্লেয়াররা ভারতের প্লেয়ারদের ধারে কাছে দাঁড়াতে পারছে না, তাও আবার ভারতের প্রথম সারির প্লেয়াররা খেলেনি। যারা আন্তর্জাতিক স্তরের প্রথম সারির প্লেয়ার, অনেক দিন ধরে ভারতের হয়ে খেলছে, এই টেস্টে যারা খেলতেও গেলো না, তাদের ক্রিকেটা খেলার কত জন্মজন্মান্তরের সংস্কার রয়েছে যে, তারা নিজেরাই জানে না।

হিন্দুরা তাই পুনর্জন্ম, কর্মবাদ এগুলোকে খুব মানে। সেইজন্য জীবনের একটি মুহুর্তও বৃথা যেতে দিতে নেই। কারণ যিনি অপবর্গ চাইছেন, মুক্তি যিনি চাইছেন, বুঝতে হবে তার মধ্যে পূর্ণ বৈরাগ্য এসেছে, এই বৈরাগ্য ভোগের দ্বারাই আসে। যে এখনও মনে করে যে, আমার জীবনের ওই দিনগুলো খুব আনন্দের ছিল, বুঝতে হবে, তাকে ওটা পাবার জন্য আরেকবার আসতে হবে। সাংখ্য মতে জীবের মুক্তি তখনই হবে, যখন মনে হবে, আমার আর কিছু লাগবে না, ভাল দিন আসুক, খারাপ দিন আসুক, আমি কোনটাই চাই না। এই যে বলে দিল, আর না, তখনই ঠিক ঠিক ত্যাগ হয়। আমাদের যে বলা হয়, ঠাকুরের কাছে বিবেক বৈরাগ্যের জন্য প্রার্থনা করতে হয়, এর অর্থ তাই। এখানে স্বামীজী বলছেন, কারুর তখনই জ্ঞান আসে, যখন কারুর পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকে। এটাকেই স্বামীজী আরও টেনে নিয়ে বলছেন।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ

With all power comes further misery, so kill desire. (*যতই ক্ষমতা-লাভ হবে, ততই দুঃখ বেড়ে যাবে, সুতরাং বাসনাকে একেবারে নাশ করে ফেল।*) বাসনা থাকলেই কাজ করতে হবে, কাজ করলেই ক্ষমতা আসবে আর ক্ষমতা এলেই অশান্তির সৃষ্টি। প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রী সবারই অশান্তি লেগে আছে। Getting any desire is like putting a stick into a nest of hornets. (*কোন কিছু বাসনা করা যেন ভীমরুলের চাকে কাঠি দেওয়া।*) মৌচাক, মৌমাছির মৌচাক না, কালো বোলতার মৌচাক, ওই মৌচাকে একটা ডাণ্ডা দিয়ে একবার খোঁচা দিয়ে দেখুক তার কি হাল হয়। কামনা-বাসনা হল ওই রকম একটা মৌচাকের মত। যেমনি মনে একটা কোন বাসনা জন্ম নিল, তার মানে এবার সে মধু বার করতে যাচ্ছে, মৌচাকের সব বোলতাগুলো এবার তার দিকে তেড়ে আসবে। Vairagya is finding out that desires are but gilded balls of poison. (*আর বাসনাগুলো সোনার পাতমোড়া বিষের বড়ি, এইটি জানার নামই বৈরাগ্য।*) বৈরাগ্য মানেই, মানুষ যখন জেনে যায়, যে কোন কামনা-বাসনা, মনের যে কোন ইচ্ছা, এটা হল মিষ্টি বিষ।

আচার্য শঙ্করের কথা উল্লেখ করে বলছেন, 'Mind is not God' (Shankara). (*মন ব্রহ্ম নয়।*) ব্রহ্মসূত্রকে নিয়ে বলছেন, সেখানে আচার্য শঙ্কর বলছেন, মন ঈশ্বর না। 'Tat tvam asi', 'Aham

Brahmasmi' ('That thou art', 'I am Brahman'). When a man realizes this, 'all the knots of his heart are cut asunder, all his doubts vanish'. (*'তত্ত্বমসি' তুমিই সেই, 'অহং ব্রহ্মাস্মি' আমি ব্রহ্ম। যখন মানুষ এইটি উপলব্ধি করে তখন 'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ'।*) মুণ্ডকোপনিষদে বলছেন, *ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে,* আমরা এত শাস্ত্রের কথা, উপনিষদের কথা, গীতার কথা শুনছি কিন্তু কিছুই পরিষ্কার করে ধারণা করতে পারছি না, কারণ হৃদয়গ্রন্থি, আসল জায়গায় হাজার হাজার রকম গিট পড়ে আছে। কিন্তু আত্মজ্ঞান যদি একবার হয়ে যায়, তখন হৃদয়ের সব গ্রন্থি খুলে যাবে, মনের সমস্ত সংশয় নিমেষের মধ্যে চলে যাবে।

অভয় অবস্থালাভ

Fearlessness is not possible as long as we have even God over us; we must be God. (*যতদিন আমাদের উপরে কেউ, এমন কি ঈশ্বর পর্যন্ত থাকবেন, ততদিন অভয় অবস্থালাভ হতে পারে না। আমাদের সেই ঈশ্বর বা ব্রহ্ম হয়ে যেতে হবে।*) যে ভয় করেছে সে মরে গেছে, এমন কি ঈশ্বরকেও যদি নিজের উপরে রেখে দেয়, বুঝতে হবে তার ভয় এখনও যায়নি। এর আগে রাবাইয়াকে নিয়ে আলোচনা করার সময় বলা হয়েছিল, সেমেটিক ধর্মে ঈশ্বরকে ভালবাসে নরকের আগুনের ভয় থেকে রক্ষা পাবার জন্য আর স্বর্গের সুখভোগ করার লোভে। রাবাইয়া প্রার্থনা করছে, হে প্রভু! আমি যদি তোমাকের নরকের ভয়ে প্রার্থনা করি তাহলে তুমি অবশ্যই আমাকে নরকের আগুনে পুড়িও, আর স্বর্গের ভোগ করার লোভে যদি তোমাকে আমি ভালবাসি তাহলে তুমি অবশ্যই আমার জন্য স্বর্গের দ্বার চিরদিনের জন্য বন্ধ করে দিও। সেইজন্য রাবাইয়া একহাতে জল আর অন্য হাতে আগুন নিয়ে রাস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন, জল দিয়ে নরকের আগুন নিভিয়ে দেওয়া হবে, আর আগুন দিয়ে স্বর্গকে পুড়িয়ে দেওয়া হবে। তার মানে, রাবাইয়া বোঝাতে চাইছেন, আমার মনে কোন কামনা-বাসনা নেই, আমার উপর কেউ যেন না থাকে, ঈশ্বর পর্যন্ত না, স্বামীজী বলছেন, be God।

স্বামীজীর শিষ্য স্বামী সদানন্দ, গুপ্ত মহারাজ বলেই সবাই ডাকতেন। বেলুড় মঠে থাকার সময় স্বামীজী খুব মেজাজে থাকতেন। একদিন গুপ্ত মহারাজ স্বামীজীর জন্য ঘরে খাবার নিয়ে এসেছেন। কোন কারণে স্বামীজী তখন খুব রেগে ছিলেন, রেগেমেগে বললেন, 'খাবার নিয়ে চলে যা, আমি খাবো না'। গুপ্ত মহারাজ বলছেন, 'তুমভি মিলিটারি, হামভি মিলিটারি, নেঙ্গ খায়গা তো নেঙ্গ খায়গা'। স্বামীজী পরে অন্যদের বলছেন, This is the right approach। গুরু রূপে ঠিক আছে, কিন্তু তুমভি মিলিটারি, হামভি মিলিটারি, আমিও সন্ন্যাসী তুমিও সন্ন্যাসী, স্বামীজীকেও তাঁর শিষ্য ছাড়ছেন না। স্বামীজী বেলুড় মঠে সন্ন্যাসীদের নিয়ে কথা বলতে গিয়ে সেখানে বলছেন, গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক কি রকম, একজনের প্রতি পুরো শ্রদ্ধা, অন্যজনের পাঁচ সিকে পাঁচ আনা বিশ্বাস, এই দুটো না থাকলে গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক হবে না। তুমি আমার চাকর, তুমি আমার অধীনে, আমি যেমনটি বলব তেমনটি করবে, উঠতে বললে উঠবে, বসতে বললে বসবে, এই ভাব কখনই চলবে না। সিদ্ধান্তের উপর চলবে, সিদ্ধান্ত হল এই, এর উপর চলবে। আর ভালবাসার সম্পর্ক! হে ঈশ্বর তুমি আমার মালিক নও, তুমি রাজা, আমি রাজকুমার। দরকার হলে তোমার বিরুদ্ধে আমি বিদ্রোহ করবই। ঠাকুর বর্ণনা করছেন, মায়ের জমিদারিতে বোঝাই হয়ে মাল যাচ্ছে, ছেলে মাঝ রাস্থা থেকে জোর করে সব মাল কেড়ে নিল। আমি তোমার আপনজন, আমার অধিকার যদি না পাই আমি বিদ্রোহ করব। চাকর আমি কখনই হতে যাবো না, তোমার অনেক লোক আছে তাদের দিয়ে খাটাও, আমি তোমার গোলাম হয়ে কোন খাটাখাটনিতে যাচ্ছি না।

এগুলো এত উচ্চ কথা যে, ধারণাই করা যাবে না। ঠাকুর বলছেন সিংহীনীর দুধ মাটির পাত্রে রাখলে পাত্র ফেটে যাবে। আমরা এতই সাধারণ মানের যে, এই কথাগুলো আমাদের মনের মধ্যে গেলে মনটা ফেটে যাবে, এসব কথা নেওয়ার দম নেই। কিন্তু এটাই দুর্ভাগ্য যে, এগুলো সব সত্য। আমরা যে দুর্বল এটা দুর্ভাগ্য না, দুর্ভাগ্য হল যে এর প্রত্যেকটা কথা সত্য। সেইজন্য হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ করে যাও যে বলা হয়, কারণ এই ভাবগুলোই আমাদের জন্য খাটে। আমরা হাভাতে, আমাদের ধর্মটাও হাভাতে আর আমাদের সাধন-ভজনটাও হাভাতে। এসব কথা পড়লে শুনলে মনে হয়, আমাদেরই পূর্বজরা এইসব জিনিস নিজেরা উপলব্ধি করে

আমাদের জন্য দিয়ে গেছেন, কিন্তু এর এক কানাকড়িও আমরা নিতে পারছি না, করতে পারছি না, বদলে কি সব আলতু ফালতু জিনিসকে নিয়ে এই অমূল্য মানব জীবনটাকে শেষ করে দিচ্ছি!

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ

স্বামীজী আবার বলছেন, What is disjoined will be for ever disjoined; if you are separate from God, then you can never be one with Him, and vice versa. (*যদি এমন কোন বস্তু থাকে যা ব্রহ্ম থেকে পৃথক, তা চিরকালই পৃথক থাকবে; তুমি যদি স্বরূপতঃ ব্রহ্ম থেকে পৃথক হও, তুমি কখনও তাঁর সঙ্গে এক হতে পারবে না; আবার বিপরীতক্রমে যদি তুমি এক হও, তা হলে কখনই পৃথক থাকতে পার না।*) যে কোন জিনিস যদি স্বভাবে এক না হয়, তাহলে ওটা মিশ্র পদার্থ, কোন দিন দুটো এক হবে না, চিরদিনই মিশ্র পদার্থ রূপে থেকে যাবে, disjoined জিনিস চিরদিন disjoined থাকবে। বলা হয়, মিত্রতা, শত্রুতা আর বিবাহ সমানে সমানে করতে হয়। সমানে সমানে বন্ধুত্ব না হলে সব সময় disjoined থাকবে, বিবাহ সমানে সমানে না হলে একই জিনিস হবে, দাম্পত্য জীবনে, পরিবারে সমস্যা লেগেই থাকবে। ঈশ্বরের সাথেও স্বভাবে যদি আমরা এক না হই, আমরাও ঈশ্বর থেকে ছাড়া হয়ে থাকব, ধর্মটর্ম করে কোন রকমে তাপ্পি মারা হয় ঠিকই, কিন্তু তাপ্পি মারা জিনিস বেশি দিন চলে না। আমাদের সবাইকে জেনে নিতে হবে, আমরা যদি ঈশ্বরের সাথে স্বভাবে অর্থাৎ ভিতর থেকে এক না থাকি, ওই ধর্ম চলবে না।

If by virtue you are joined to God, when that ceases, disjunction will come. (*যদি পুণ্যবলেই তোমার ব্রহ্মের সহিত যোগ হয়, তা হলে পুণ্যক্ষয়েই বিচ্ছেদ আসবে।*) পূণ্যের জোরে, সত্ত্বগুণের প্রভাবে, ভাল মানুষ হয়ে যদি আমরা ঈশ্বরকে পেয়েও যাই, তখন সেই পাওয়াটা একটা কর্মের জোরেই পাওয়া হবে, কর্মের শক্তি যত দিন থাকবে তত দিন ঈশ্বরের সাথে জুড়ে থাকবে; শক্তি ক্ষয় হয়ে গেলে, পূণ্য শেষ হয়ে গেলে আবার নীচে পড়ে যাবে। ঠিক এই পয়েন্টটা নিয়ে আমরা আগেও অনেকবার আলোচনা করেছি, সেখানে বলা হয়েছিল, যদি স্বভাবে এক হয় তবেই সর্বদা জুড়ে থাকবে, যার জন্য উপনিষদে খুব সুন্দর উপমা দিয়ে বলছেন, শুদ্ধ জলে শুদ্ধ জল মিশে গেলে এক হয়ে যায়। ঈশ্বর আর আমি স্বভাবে যদি এক না হই, তাহলে যে শক্তি দিয়ে ঈশ্বর পর্যন্ত পৌঁছেছি, তাঁর সাথে জুড়েছি, ওই শক্তি বা পূণ্যটা চলে গেলে আবার আমরা ঈশ্বর থেকে আলাদা হয়ে যাব। গীতাতেও ভগবান বলছেন, *ক্ষীণে পূণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি*। যে ভগবানকে এই ধরছে, এই ছাড়ছে সেই ভগবান কিসের ভগবান!

কিন্তু মনে রেখো, The junction is eternal, and virtue only helps to remove the veil. We are azad (free), we must realize it. 'Whom the Self chooses' means we are the Self and choose ourselves. (*আসল কথা ব্রহ্মের সহিত তোমার নিত্য যোগ রয়েছে, পূণ্যকর্ম কেবল আবরণটা দূর করবার সহায়তা করে। আমরা আজাদ অর্থাৎ মুক্ত, এইটি আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। যমেবৈষ বৃণুতে, যাঁকে এই আত্মা বরণ করেন –এর তাৎপর্য, আমরাই আত্মা এবং আমরাই নিজেদের বরণ করি।*) তেজের চোটে স্বামীজী উর্দু শব্দ নিয়ে আসছেন, আমরা আজাদ। আমার আর ঈশ্বরের সাথে যে জোড়, এটা চিরন্তন, চিরস্থায়ী। তাহলে সত্ত্বগুণের কি দরকার? আমার আর ঈশ্বরের মাঝখানে যে একটা পর্দার ব্যবধান রয়েছে, সত্ত্বগুণ এই পর্দাটা সরিয়ে দেয়, আর দেখিয়ে দেয়, তুমি আর ঈশ্বর চিরদিনের জন্য একসাথে জুড়ে আছ, এক জন্ম বা দুই জন্মের জন্য নয়, চিরদিন তুমি আর তিনি এক ছিলে আর চিরদিন এক থাকবে। তোমার চোখের সামনে পর্দা ছিল বলে তুমি মনে করছিলে তুমি আর ঈশ্বর আলাদা, এই পর্দা সরে গেল, এখন জানো তুমি আর তিনি এক। এই কথা বলতে গিয়ে স্বামীজীর মধ্যে এমন আবেগ এসে গেছে যে, free না বলে বলছেন, we are azad। কঠোপনিষদে যে বলছেন *যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তণূং স্বাম্*, আত্মা যাকে বেছে নেন, সে-ই আত্মাকে জানতে পারে? ঠিকই তো বলছেন, আমিই সেই আত্মা, আমি নিজেকে বেছে নিয়েছি। এটাকেই আরও ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্বামীজী বলছেন।

অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্

Does seeing depend upon our own efforts or does it depend upon something outside? It depends upon ourselves; our efforts take off the dust, the mirror does not change. (*ব্রহ্মদর্শন কি আমাদের নিজেদের চেষ্টা ও পুরুষকারের উপর নির্ভর করছে, অথবা বাইরের কারও সাহায্যের উপর নির্ভর করেছে? আমাদের নিজেদের চেষ্টার উপর এটা নির্ভর করছে। আমাদের চেষ্টার দ্বারা আরশির উপর যে ময়লা পড়ে রয়েছে, সেইটে অপসারিত হয় –আরশি যেমন তেমনি থাকে, পরিবর্তিত হয় না।*) আমরা কোন জিনিসকে দেখছি বা জানছি, কিভাবে জানছি? বলছেন, দেখা জিনিসটা বাইরের কোন জিনিসের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে নিজের উপর। চোখ বন্ধ করে বলছি, আমি দেখতে পাচ্ছি না, জিনিসটা দেখব কি দেখব না আমার উপর নির্ভর করছে। জিনিসটা সব সময়ই আছে। চেহারার উপর ধুলো জমে আছে, চেহারার ধুলো সাফ না করে আয়নাকে মুছলে কিছুই হবে না। চেষ্টা করে করে চেহারা থেকে ধুলো সাফ করে দিলাম, এখানে আয়নার কোন পরিবর্তন হয়নি। তাহলে আমাকে এতো সুন্দর দেখাচ্ছে কি করে? কিছুই সুন্দর দেখাচ্ছে না, তুমি যা ছিলে তাই হলে, তোমার চেহারার উপর থেকে ধুলোগুলো পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে।

স্বামীজী বলছেন, 'There is neither knower, knowing nor known. 'He who knows that he does not know, knows It'. He who has a theory knows nothing. (*জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় –এই তিনের বাস্তবিক কোন অস্তিত্ব নেই। 'যিনি জানেন যে তিনি জানেন না, তিনিই ঠিক ঠিক জানেন। যিনি কেবল একটা মত অবলম্বন করে বসে আছেন, তিনি কিছুই জানেন না'।*) কেনোপনিষদের মন্ত্রে বলছেন, *অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্,* যার কাছে ঈশ্বরের তত্ত্ব আছে, আসলে সে কিছু জানে না, যে জানে সেই জানে যে, আমি জানি না। কারণ ঈশ্বরকে জানার জন্য মন লাগে না। মন দিয়ে কেন ঈশ্বরকে জানা যায় না, এর উপর আমরা আগেও অনেক আলোচনা করেছি। সেখানে আমরা বলেছিলাম, ঠাকুরও যখন মা কালীকে জানছেন, তখন সেখানে তাঁর মন লাগছে না, ওখানে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় আর জ্ঞান এক হয়ে যায়, সেখানে গিয়ে মন খসে পড়ে যায়। আরও সহজ ভাষায় বলা যায়, মন এই জগৎ থেকে যা কিছু নিচ্ছে, এবং যার ফলে মনে যে বৃত্তির ঢেউ উঠছে, এই ঢেউ ওঠাকেই বলছেন জ্ঞান। সেখানে এবার জগৎ থেকে কিছু আসছে না, মন তখন সেই আত্মার সাথে এক হয়ে যায়। আত্মার সাথে এক হয়ে যাওয়ার পর মন আর মন থাকে না, আর সেইজন্য এই জ্ঞানকে জ্ঞান বলা হয় না। তাই যে অর্থে আমরা জ্ঞান বলি, সেই অর্থে ঈশ্বরজ্ঞান হয় না, বোধে বোধ হয়, যার কথা ঠাকুরও বার বার বলছেন, উপনিষদ, বেদও তাই বলছেন। এখানে স্বামীজীও সেটাই বলছেন, যে মনে করছে আমি ঈশ্বরকে জানি, আসলে সে ঈশ্বরকে জানে না। যে বলছে, আমার ঈশ্বর দর্শন হয়েছে, আসলে তার ঈশ্বর দর্শন হয়নি। কেন হয়নি? কারণ সে এই জিনিসটাকে মন দিয়ে বোধ করছে, মন দিয়ে বোধ করছে বলেই সেই বলছে আমি দেখেছি। কেন ঠাকুরও তো তাই বলছেন? তা নয়, কারণ ঠাকুর যাঁদের এই কথা বলছেন, তাঁরা বুঝতে পারছেন না, বিশ্বাস করতে পারছেন না, তাই তাঁদের বিশ্বাস করাবার জন্য ওই ভাবে বলছেন। ঠাকুর যখন বলছেন, আমি মাকে দেখেছি, তখন দক্ষিণেশ্বরে কত পূজারীরা ছিলেন, রানী রাসমণি বেঁচে আছেন, মথুর বাবু বেঁচে আছেন, তাঁদের কজন বুঝতে পেরেছিলেন ঠাকুর কি বলতে চাইছেন! ঠাকুরও তাই নিজেই বলছেন, কাকেই বা বলব, কেই বা বুঝবে। আমরা যেভাবে সামনের দৃশ্যগুলি দেখছি, ঠাকুর সেই ভাবে কিছু দেখছেন না, ওই দেখার ক্ষেত্রে মন সেখানে মাধ্যম নয়। শুদ্ধ মন সেখানে শুদ্ধ আত্মার সাথে এক হয়ে গেছে। কোন কিছুকে জানার জন্য যে বুদ্ধি বৃত্তি লাগে, ঠাকুরের তখন সেই বুদ্ধি বৃত্তি নেই।

ধর্ম চিত্তশুদ্ধির ব্যাপার - নেতি নেতি ছাড়া আত্মার ব্যাপারে কিছু বলা যায় না

The idea that we are bound is only an illusion. (*আমরা বদ্ধ এই ধারণাটাই ভুল।*) স্বামীজী বার বার এই কথা বলছেন, আমরা বদ্ধ, এই বোধটাই মায়া। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আমরা মনে করি আত্মজ্ঞান মনের ভুল, ঈশ্বর মনের ভুল। যাঁরা ঠাকুরকে ভালবেসে বাড়িতে ঠাকুরের জপ-ধ্যান করে, বাড়ির লোকেরা বলে, কি সারাদিন ঠাকুর ঠাকুর করে যাচ্ছে। স্বামীজী বলছেন, Religion is not of this world; it is 'heart-cleansing', and its effect on this world is secondary. (*ধর্ম জিনিসটা জাগতিক নয়; ধর্ম হচ্ছে চিত্তশুদ্ধির ব্যাপার; এই জগতের উপর এর প্রভাব গৌণ মাত্র।*) ঠিক ঠিক ধর্মের একমাত্র

উদ্দেশ্য মানুষকে সেই চৈতন্যের দিকে নিয়ে যাওয়া। এই জগতের সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই, ধর্মের জন্য কারুর কিছু ভাল হয়ে যেতে পারে, সেটা অন্য জিনিস। প্রায়ই লোকেরা বলে, ভাল মানুষের জীবনে কেন এত ঝুট ঝামেলা হয়। কেন হবে না? এই জগতের সাথে অন্য কিছুর কোন সম্পর্ক নেই। জগৎ জগতের মত চলে। রাবাইয়া যেমন প্রার্থনা করে বলছেন, হে প্রভু নরকের ভয়ে আমি যদি তোমার প্রার্থনা করি, তাহলে অবশ্যই আমাকে নরকে পাঠাবে; ঠিক তেমনি, আমরাও প্রার্থনা করতে পারি, 'হে ঠাকুর এই জগতে সুখের আশায় তোমাকে যদি ভালবাসি, দুঃখের ভয়েও যদি তোমাকে ভালবাসি, তাহলে বেশি বেশি করে আমাকে দুঃখ দিও'। কারণ ধর্মের সাথে এই জগতের সুখ-দুঃখের কোন সম্পর্ক নেই। যারা আর্ত, পীড়িত, যারা সাধারণ মানুষ, তারা দুঃখ কষ্ট থেকে পরিত্রাণ আর একটু সুখের আশায় প্রথমে ধর্মের দিকে যায় ঠিকই, কিন্তু একটা সময়ের পর সে দেখে, ধর্মের সাথে এগুলোর কোন সম্পর্ক নেই, ঈশ্বর জিনিসটা পুরো আলাদা। স্বামীজী বলছেন, ধর্ম হৃদয়কে শুদ্ধ করে ('heart-cleansing')।

Freedom is inseparable from the nature of the Atman. (*মুক্তি জিনিসটা আত্মার স্বরূপ হতে অভিন্ন।*) আত্মার যা স্বভাব, মুক্তিও তাই, দুটোর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। This is ever pure, ever perfect, ever unchangeable. (*আত্মা সদা শুদ্ধ, সদা পূর্ণ, সদা অপরিণামী।*) আত্মার গুণ বা স্বভাব হল, আত্মা চিরনিত্য, চিরবুদ্ধ, চিরশুদ্ধ, চিরমুক্ত, আর শুধু মুক্তি বলতেও ঠিক তাই। This Atman you can never know, We can say nothing about the Atman but 'not this, not this'. (*এই আত্মাকে তুমি কখনও জানতে পার না। আমরা এই আত্মার সম্বন্ধে 'নেতি নেতি' ছাড়া আর কিছু বলতে পারি না।*) ঈশ্বরকে যেমন জানা যায় না, যার ব্যাখ্যা করা হল, ঠিক তেমনি আত্মাকেও জানা যায় না, একমাত্র যেটা বলা যায়, নেতি নেতি, এটা নয়, এটা নয়। যখনই 'এটা' বলছি তখনই কিন্তু সেখানে মন এসে যাচ্ছে, মন যেমনি এসে গেল, ঈশ্বর চলে গেলেন। নেতি নেতি করে করে মন যেখানে গিয়ে একেবারে শান্ত হয় গেল, তখন চৈতন্য জ্যোতির উদয় হয়। ঠাকুর অবশ্য বলছেন, তখনে দেখে সবটাই চৈতন্য। যখন চৈতন্য দেখে তখন জগৎ থাকে না, তখনও এটা নয়, এটা নয়, নেতি নেতি সব সময়ই থাকবে। যখন বস্তুকে দেখে তখন ওটাকেও বস্তু রূপে দেখে না, ঠাকুর যেমন নরেন রাখালের নামে বলছেন, ওরে আমি ওদের সাক্ষাৎ নারায়ণ দেখি। বস্তু রূপে, মানুষ রূপে ঠাকুর কখনই কিছু দেখতে পারতেন না, যাঁরা জ্ঞানী তাঁরাও কখনই দেখেন না। সেইজন্য নেতি নেতি প্রথমে সাধনা রূপে চলে, আর পরে সিদ্ধ অবস্থায় ওটা চলে আসে।

'Brahman is that which we can never drive out by any power of mind or imagination',(Shankar). (*শঙ্কর বলেন, 'যাকে আমরা মন বা কল্পনার সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করেও দূর করতে পারি না, তাই ব্রহ্ম।*) আচার্য শঙ্কর বলছেন, এই যে আমি ভাব, এই আত্মজ্ঞান, এই ব্রহ্মকে যদি আমরা নিজের মনের শক্তি দিয়ে, নিজের সমস্ত চিন্তা-ভাবনা লাগিয়ে, কল্পনা দিয়ে সরিয়েও দিতে চাই, কখনই সরাতে পারব না। এই জিনিসটাকে নিয়ে পরে আবার একটু একটু আলোচনা হবে।

কর্মকাণ্ডীদের মতে আমরা সবাই স্রষ্টা

এরপর বলছেন, The universe is thought, and the Vedas are the words of this thought. We can create and uncreate this whole universe. Repeating the words, the unseen thought is aroused, and as a result of seen effect is produced. This is the claim of a certain sect of Karmis. They think that each one of us is a creator. Pronounce the words, the thought which corresponds will arise, and the result will become visible. 'Thought is the power of the word, the word is the expression of the thought,' say Mimamsakas, a Hindu philosophical sect. (*এই জগৎপ্রপঞ্চ ভাবমাত্র, আর বেদ এই ভাবপ্রকাশক শব্দরাশিমাত্র। আমরা ইচ্ছামাত্র এই জগৎপ্রপঞ্চ সৃষ্টি করতে পারি, আবার লয় করতেও পারি। এক সম্প্রদায়ের কর্মী (বা কর্মানুষ্ঠানকারী)দের মত এই যে, শব্দের পুনঃপুনঃ উচ্চারণে তার অব্যক্ত ভাবটি জাগরিত হয়, আর ফলস্বরূপ একটি ব্যক্ত কার্য উৎপন্ন হয়। তাঁরা বলেন, আমরা প্রত্যেকেই এক একজন সৃষ্টিকর্তা। শব্দবিশেষ উচ্চারণ করলেই তৎসংশ্লিষ্ট ভাবটি উৎপন্ন হবে, আর তার ফল দেখা যাবে। হিন্দু*

দর্শনের এক সম্প্রদায় মীমাংসকগণ বলেন, ভাব হচ্ছে শব্দের শক্তি, আর শব্দ হচ্ছে ভবের অভিব্যক্তি।) ষড়দর্শন নিয়ে আলোচনার সময় মীমাংসকদের নিয়ে একটু আলোচনা করা হয়েছিল। নাম আর নামী অভেদ, এটা খুব নামকরা কথা, নূতন কোন কথা নয়। ইংরাজীতে দুটো শব্দ আনা হয়, 'word' আর 'thought'। এই দুটোকে original Englishএ বলা হত শুধু Word, আর আমাদের শাস্ত্রের এর পরম্পরাগত অর্থও হয় শব্দ, 'শব্দ' বলতে বাংলায় আমরা যেটাকে বোঝাই সেটাও, আর চিন্তা বা চিন্তনকেও শব্দ বলা হয়। যেটাকে শব্দ বলা হত, সেটাকেই এখন আমরা নাম বলি। নাম একটা নাম আবার নাম মানে চিন্তন। কৃষ্ণভক্ত যখন কৃষ্ণ বলছে, সেই কৃষ্ণ একটা নাম, আবার কৃষ্ণ একটা চিন্তন, কৃষ্ণ আবার ভগবান। কৃষ্ণ বলাও যা, কৃষ্ণ চিন্তন করাও তাই, আর কৃষ্ণ ভগবানও তাই, নাম-নামী অভেদ।

মীমাংসকরা তাই সৃষ্টিকর্তা রূপে কোন ভগবানকে মানতেন না। আমরা যে অর্থে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ বলি, সেই অর্থে মীমাংসকরা, কর্মকাণ্ডীরা কোন কিছু মানতেন না। তাঁদের কাছে, আমরা সবাই স্রষ্টা। আমরা যদি কোন জিনিসকে খুব গভীর ভাবে চিন্তন করি, তাহলে সেই বস্তুর সৃষ্টি হয়ে যাবে। বেদে যে সৃষ্টিতত্ত্ব রয়েছে, এই চিন্তা ভাবনা থেকেই এসেছে। যদি কেউ বলে ঘট, ঘট শব্দও যা, ঘট চিন্তনও তাই, ঘট বস্তুও তাই। বেদ আরেকটা ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলছেন, এই যে শব্দ, এর যদি ঠিক ভাবে উচ্চারণ করা হয়, ঠিক ঠিক শুধু উচ্চারণেই চিন্তা পুরোপুরি এসে যাবে, সেই চিন্তন থেকে বস্তু আপনা থেকেই হয়ে যাবে। যোগশাস্ত্র এটাকে আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বলছেন, যাদের মনের উপর পুরো নিয়ন্ত্রণ আছে, সেই যোগী কোন কিছুর চিন্তা করলেই সেটা হয়ে যাবে – *সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্*। কোন যোগী যদি সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান, তিনি কোন ক্রিয়া না করেই সেই ক্রিয়ার ফল পেয়ে তাঁর কাছে এসে যাবে। বেদের সৃষ্টিতত্ত্ব, সেখান থেকে মীমাংসকরা, আর যোগের প্রচলিত কাহিনীগুলি এই ভাবনাগুলির মূলে রয়েছে। এখন স্বামীজী বার বার বলছেন, এটা মীমাংসকদের মত। এগুলো কতটা সত্য আমরা জানি না, তবে প্রচলিত কাহিনীতে যখন আছে, তখন অবশ্যই সত্য হবে। সেইজন্য মীমাংসকরা ব্রহ্মা নামে কোন সৃষ্টিকর্তাকে মানে না, তাঁরা মনে করেন, প্রত্যেকটি মানুষই স্রষ্টা। এখানেই ১২ই জুলাইয়ের ক্লাশ শেষ হয়ে যাচ্ছে।

<u>শনিবার, ১৩ই জুলাই</u>

সহজ আর জটিল

সরাসরি ব্রহ্মসূত্র থেকে না হলেও, ব্রহ্মসূত্রকে আধার করেই স্বামীজী কিছু কিছু জিনিসের উপর আলোচনা করে যাচ্ছেন। আজকের ক্লাশে স্বামীজী পুরোটাই মন ও তার স্বাধীন ইচ্ছার উপর বলছেন। ১৩ই জুলাইয়ের ক্লাশ পুরোপুরি এই একটি বিষয়ের উপর চলেছে। এইদিনের স্বামীজীর বক্তব্যের আলোচনায় যাওয়ার আগে, কিছু কথা আমাদের বুঝে নেওয়া খুব দরকার। এই প্রসঙ্গ আমাদের আলোচনায় আগেও এসেছে, আগেও আমরা এর ব্যাখ্যা করেছি এবং এতদিনে অনেক কথা আমাদের মন থেকে হয়ত হারিয়ে যেতে পারে। একটা সিদ্ধান্তকে বোঝার সময় সেই সিদ্ধান্তের পিছনে যে মূল যুক্তিগুলি থাকে, ওই যুক্তিগুলি যদি ভাল ভাবে পরিষ্কার না হয়, আর ভিতরে যদি ভাল করে না বসে থাকে, তাহলে সিদ্ধান্তটা সব সময় কমজোরী হবে। বাড়ির ভিত যদি কমজোরী হয়, বাড়িও নড়বড়ে হবে। দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈতের উপর আমরা অনেকবার আলোচনা করেছি, কিন্তু খুব সহজ যদি কোন প্রশ্ন করা হয়, দেখা যাবে আমরা ঠিক ঠিক উত্তর দিতে পারছি না। যেমন, যদি প্রশ্ন করা হয়, অদ্বৈত কি, আমরা বলব, অদ্বৈত মানে এক। এটা কিন্তু সঠিক উত্তর হল না। যদি প্রশ্ন করা হয় দ্বৈত মানে কি? আমরা বলব, দ্বৈত মানে দুই। কিন্তু দ্বৈতে দুই ঠিক ওই অর্থে হয় না। শৈশব থেকে আমরা জগৎকে দেখে জগতের ব্যাপারে যে বোধ হয়ে আছে, শৈশব থেকে ঈশ্বরকে নিয়ে যে বোধ হয়ে আছে, আর শৈশব থেকে জীবনকে নিয়ে যে বোধ হয়ে আছে, ওটাই সারা জীবন আমাদের মধ্যে ঘুর ঘুর করতে থাকে। যত বই পড়া হোক, শাস্ত্র পড়া হোক, যত আলোচনাই শোন হোক, ছোটবেলা থেকে যে ধারণা বা বোধ আমাদের তৈরী হয়ে আছে, ওই ধারণা থেকে আমরা কিছুতেই বেরিয়ে আসতে পারি না। মূল কয়েকটা জিনিস যদি কোন ভাবে একবার পরিষ্কার হয়ে যায়, স্বামীজী যেমন গুরুভাই ও শিষ্যদের বলছেন, তোমরা যদি মূল কয়েকটা জিনিসকে বুঝে নিতে পারো, এরপর শাস্ত্র বা যে কোন গ্রন্থ পড়তে খুব সহজ হবে।

যে কোন বই, ফিজিক্স হোক, বায়লোজি হোক, কেমেস্ট্রি হোক, ফিলিজফি হোক, ধর্ম হোক, বুঝতে যদি কারুর সমস্যা হয়, তাহলে বুঝতে হবে কিছু কিছু যে মূল সিদ্ধান্তগুলি আছে, সেগুলো তার কাছে পরিষ্কার নেই। ছোটবেলায় পাটিগণিত বীজগণিত পড়তে আমরা ভয় পেতাম, তার প্রধান কারণ মূল সিদ্ধান্তগুলি আমাদের কাছে পরিষ্কার ছিল না। মূল সিদ্ধান্তগুলি পরিষ্কার হলেই সব পরিষ্কার হবে। এখন যে আলোচনা স্বামীজী করতে যাচ্ছেন, তার মধ্যে কয়েকটি জরুরি কথা বার বার আসবে।

প্রথম কথা হল simple আর complex, এই দুটো শব্দ ঘুরে ঘুরে আসবে। ঠাকুর যেমন বলছেন, ঈশ্বর সহজ। সহজের বিপরীত জটিল বা মিশ্র। সহজ বা simple মানে হল যেটাকে আর ভাঙা যাবে না, যেটা উপর থেকে নীচ পর্যন্ত এক। দর্শনে যখন আমরা সহজ বলব বা ব্যবহারিক জীবনে যখন সহজ বলব, সে সহজ সব সময়ই সমান হবে। একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, যেমন চিনি, চিনি আসলে simple নয়, কিন্তু চিনির যেখানেই হাত দিয়ে তুলে মুখে দিলে মিষ্টি লাগবে, চিনির বৈশিষ্ট্য পুরোটাই সমান। ঠিক তেমনি লেবুর রস যেখান থেকে নিয়েই মুখে দেওয়া হোক, সবটাতেই সাইট্রিক এ্যাসিডের ভাব। জল যেখান থেকেই নেওয়া হোক, জল সব সময় simple। জল, লেবু আর চিনিকে মিশিয়ে দিলে হয়ে যাবে শরবৎ, শরবৎ হয়ে গেল মিশ্র পদার্থ। তিনটে simple জিনিস মিলে হয়ে গেল একটা mixture। কিন্তু শরবৎ যেখান থেকে নিয়ে মুখে দেওয়া হোক, একই রকম মনে হবে। এখানে আমাদের মনে প্রশ্ন উঠবে, শরবৎকে কেমেস্ট্রিতে বলছে mixture, এদিকে বলছে element, element মানেই simple, basicএ চলে গেছে। ব্যাখ্যা যখন করা হচ্ছে, তখন বলা হচ্ছে uniformly এক, তাহলে শরবতকেও পুরোটাই এক বলে মনে হয়, চিনিকেও তাই মনে হয়। এরপর যখন রিসার্চ করতে শুরু করা হবে, যদি তার কেমেস্ট্রির জ্ঞান থাকে, তখন দেখবে, চিনিটাও compound, একেবারেই simple নয়, রীতিমত complex। সেই তুলনায় জল অনেকটা সরল, শুধু দুটো element মিলে মিশ্র পদার্থ হয়ে গেল। এবার জলের ক্ষেত্রে এসে গেল হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন। এরপর হাইড্রোজেন পুরো ইউনিফর্ম। কিন্তু কারুর যদি গভীরে যাওয়ার প্রবণতা থাকে, তাহলে সে দেখবে, শরবতকে আমার মনে হচ্ছে এক, ইউনিফর্ম, মানে সরল, কিন্তু দেখা যাচ্ছে শরবতে তিনটে জিনিস মিশে আছে। এরপর জলকে নিলাম, জলকেও প্রথমে মনে হচ্ছিল ইউনিফর্ম, কিন্তু পরে দেখছি জলেও দুটো জিনিস জড়িয়ে আছে। এবার যে হাইড্রোজেন পেলাম, এই হাইড্রোজেন কি একটা element, নাকি কোন mixture, না compound? স্বামীজীর সময়ে হাইড্রোজেনকে মনে করা হত, basic building unit of universe। এটাকে আর নাশ করা যাবে না, এর কোন পরিবর্তন করা যাবে না, পরিবর্তন করলে ওটা আর হাইড্রোজেন থাকবে না। স্বামীজী চলে যাওয়ার কিছু দিন পরেই বলা শুরু হল, হাইড্রোজেনও শুধু একটা ইউনিট, হাইড্রোজেন বলতে, ওটার আর নীচে ভাঙা যাবে না। কিন্তু তারও ভিতরে রয়েছে ইলেক্ট্রন, প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদি। মোটামুটি প্রোটন আদিকে বলা হচ্ছিল basic building block, কিন্তু এখন বলছেন, তারও ভিতরে basic building block হল কোয়ার্কস। যদিও এগুলোকে সরাসরি বা পরোক্ষ ভাবে যাচাই করে দেখা হয়নি, কিন্তু ম্যাথিমেটিক্যালি আর কিছু পরীক্ষার দ্বারা বোঝা যায়।

এবার আমরা মোটামুটি ধারণা করতে পারছি যে, compound বলতে কি বোঝায় আর element বলতে কি বোঝাচ্ছে। যে কোন দুটো জিনিসকে নিয়ে কোন জিনিস তৈরী হলে সেটাকে compound বা mixture বলছি। যে দুটো জিনিসকে দিয়ে মেলানো হল, সেটাকে বলছেন simple বা element, মানে বেসিক জিনিস। কিন্তু যেটাকে আমরা simple মনে করছি, সেটা আদপে simple কিনা, সেটাকে আমরা কি করে জানব? যতক্ষণ আরও গভীরে উন্নত অনুসন্ধানে না যাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ এটা জানা সম্ভব নয় যে, এটা নিজে simple নাকি complex। Complexকে জানতে হলে সব সময় প্রথমে simpleকে জানতে হয়। গণিতের ক্ষেত্রে সবচেয়ে fundamental simple হল এক, এক হল একেবারে বেসিক ইউনিট। ওয়ানকে জেনে গেলে এই ওয়ানকে দিয়ে সমস্ত সংখ্যাকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া যাবে। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে যাবতীয় যা কিছু আছে, যদি এক আর যোগ, এই দুটো জিনিসকে জেনে যাওয়া যায়, সমস্ত সংখ্যা দাঁড়িয়ে যাবে। তার মানে, simple বলতে ওয়ান, এটা set of natural numbersএ।

কিন্তু অঙ্কে নামলে বাইনারি ডিজিট হয়ে যায়, যেখানে দুই এসে যায়, জিরো আর ওয়ান। কম্প্যুটারের পুরো টেকনোলজি শুধু জিরো আর ওয়ান দিয়ে চলে, বাইনারি সিস্টেম। কম্প্যুটারের কাছে সত্য হল দুটি, জিরো আর ওয়ান। কিন্তু ছোটবেলায় আমরা প্রথম যে অঙ্ক শিখেছিলাম, সেখানে সত্য চলছে শুধু ওয়ানকে নিয়ে, গণিতে শূন্যের ধারণা অনেক পরে আসে। ওয়ান হল বেসিক, যেটা দিয়ে বাকি সব কিছু চলে আসে, যোগ হল একটা অপারেশান, অপারেশনটা কখন বেসিক হয় না। পাটিগণিত দিয়ে গেলে বেসিক হল ওয়ান, আর গণিত দিয়ে গেলে বেসিক হবে জিরো ওয়ান, যেখানে বাইনারি সেখানে দুটো সত্য হয়ে যায় জিরো আর ওয়ান। জিরো এর পুরোপুরি নিজস্ব existence, ওয়ানও এর পুরোপুরি নিজস্ব existence। জিরো কখনই ওয়ানের উপর নির্ভর করে না, ওয়ান জিরোর উপর নির্ভর করে না। শুনলে আমাদের মনে হবে খুব জটিল ব্যাপার, কিন্তু খুবই সহজ ব্যাপার। জিরো নিজের উপর দাঁড়িয়ে আছে, ওয়ানও নিজের উপর দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু দুই স্বাধীন নয়, দুই দাঁড়িয়ে আছে একের উপর, এক আর এক এলে তবেই দুই আসবে। জিরো পুরো independent, জিরোকে ডিফাইন করার জন্য ওয়ান মাইনাস ওয়ান করতে হয় না। আর আমরা এখন মাইনাসকে আনছি না। তাই বলা হয় জিরোর পুরো নিজস্ব সত্তা, একের পুরো নিজস্ব সত্তা।

জিরো যখন একের উপর কাজ করতে শুরু করে তখন বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন রকমের জিনিসকে নিয়ে আসে। এবার জিরো আর ওয়ানকে নিয়ে চললে দুইয়ের অস্তিত্ব এসে গেল। পুরো কম্প্যুটার টেকনলজি ম্যাথমেটিক্সের উপর দাঁড়িয়ে আছে, আর ম্যাথমেটিক্সে জিরো আর ওয়ান হল বেসিক, যেটার উপর পুরো জিনিসটা দাঁড়িয়ে আছে। সুইচ অফ আর সুইচ অন, ইলেক্ট্রিসিটি যাচ্ছে কি যাচ্ছে না, ইলেক্ট্রন আছে কি নেই, জিরো আর ওয়ান, এটার উপর দাঁড়িয়ে আছে। এখন একটা জিনিস simple না complex, এটাকে ধরা একজন বিজ্ঞানীর পক্ষে, একজন দার্শনিকের পক্ষে খুব কঠিন। যদি ভুলে বা কোন ভাবে একটা complex জিনিসকে যদি simple মনে করে নেওয়া হয়, পরে গিয়ে এটাই একটা বিরাট ঝামেলা ডেকে নিয়ে আসবে। বিজ্ঞানে অনেক সময় এই সমস্যা হয়েছিল যখন ওনারা complexকে simple বলে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। আর যদি simpleকে complex রূপে নিয়ে নেওয়া হয় তাতেও সমস্যা হয়ে যাবে। আর দুটো যদি স্বাধীন ভাবে simple থাকে, তাকে দ্বৈত বলা হল।

ছোটবেলায় যখন আমরা লাইন টেনে ছিলাম তখন আমরা একটা লম্বা লাইন টেনে নিয়েছিলাম, এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়। ক্লাশ এইট নাইনে এসে প্রথম যখন গ্রাফ করতে শুরু করলাম সেখানে দেখলাম এক্স এক্সিস ওয়াই এক্সিস, দুটো স্বতন্ত্র। এক্স এক্সিস ডান দিকে যায়, ওয়াই এক্সিস উপরের দিকে যায়। জার্মানের নামকরা দার্শনিক ডেকার্ড প্রথম এটা নিয়ে আসেন, যেখান থেকে কার্টোগ্রাফি, মানচিত্রাদির ধারণা আসে। ডেকার্ড বললেন, এই জগতে দুটি সত্তা রয়েছে, একটা এক্স এক্সিস আরেকটা ওয়াই এক্সিস। ঠিকই, দোষের কিছু নেই, যেমন ওয়ান আর জিরোকে আমরা বললাম দুটি সত্তা। ওই এক্স এক্সিসে আর ওয়াই এক্সিসে আমরা কোন কোন জিনিসকে রাখব? যদি দুটো simple জিনিস হয়, তবেই রাখতে পারব। ডেকার্ড simple জিনিস রাখতে গিয়ে নিয়ে এলেন mind and matter। তার মানে মনের স্বতন্ত্র সত্তা, পদার্থেরও স্বতন্ত্র সত্তা, সেইজন্য মন হয়ে গেল simple, পদার্থ হয়ে গেল simple। এর পরিণতি গিয়ে দাঁড়ায়, পদার্থকে আর বিভাজন করা যাবে না, অন্য দিকে মনকেও আর পুনরায় বিভাজন করা যাবে না। সেইজন্য একটা হয়ে গেল এক্স এক্সিস, আরেকটা হয়ে গেল ওয়াই এক্সিস। জগৎ শুরু হয়ে গেল, জগৎ মানে মন আর পদার্থের খেলা।

ঠিক তেমনি নিয়ে আসা হল ঈশ্বর আর জগৎ নামে দুটো সত্তাকে। এক্স এক্সিস হল জগৎ আর ওয়াই এক্সিস হল ঈশ্বর। যেখানে ঈশ্বর আর জগতের মিলন, সেখানেই সৃষ্টি, সেটাই আমার আপনার চেতনা। যে কোন জিনিসকে এক্স এক্সিস আর ওয়াই এক্সিসে ফেলে দেওয়া যায়। কোম্পানি গুলো লাভ লোকসানের হিসাব করে, যেখানে কেনা-বেচার যে ফিগার করে সব এক্স এক্সিস আর ওয়াই এক্সিসেই করে। এক্স এক্সিসে যাবে বছর, মাস আর ওয়াই এক্সিসে যাবে বিক্রি, লম্বা লম্বা চার্ট আসতে শুরু হয়ে যাবে। কিন্তু ভুলে কেউ যদি কম্পাউণ্ডকে simple মনে করে থাকে আর simpleকে কম্পাউণ্ড মনে করে থাকে, আর এক্স এক্সিস আর ওয়াই এক্সিসে নিয়ে যায়, তাহলে কি সমস্যা হবে? তখন সর্বনাশ হয়ে যাবে। কারণ তখন সে simpleকে

complex মনে করেছে আর complexকে simple মনে করেছে, আর সেটা দিয়ে সে জগতের ব্যাখ্যা করছে। ঈশ্বরের ইচ্ছা, স্বাধীন ইচ্ছা, আমার ইচ্ছা, ভাগ্য এই সমস্ত কিছুর সমস্যার সৃষ্টি হল একটা সামান্য জিনিস থেকে, একটা জিনিস সেটা simple না complex। আর কার্টিশান ডায়াগ্রামে এক্স এক্সিসে কোনটা যাবে, আর ওয়াই এক্সিসে কোনটা যাবে? Simple মানে যেটাকে ভেঙে ভেঙে আর simplify করা যাবে না। এক্স এক্সিস আর ওয়াই এক্সিস হল, এই দুটোর কোথাও কোন মিল নেই, আর কোন দিন মিলবেও না, তার মানে দুটো fundamentally simple। যেমন বছর, মাস আর বিক্রি fundamentally simple, বছর ও মাস আলাদা দিকে যাবে, আর বিক্রি পুরো অন্য দিকে যাবে, তবেই তার গ্রাফ তৈরী হবে।

মন, পদার্থ ও ঈশ্বর - ঈশ্বরের ইচ্ছা আর স্বাধীন ইচ্ছা

এবার মন, পদার্থ আর ঈশ্বর, এই তিনটেকে যদি আলাদা সত্তা মনে করা হয়, তাহলে ঈশ্বর আর মন এক্স এক্সিস আর ওয়াই এক্সিস হয়ে যাবে, মন আর পদার্থ এক্স এক্সিস আর ওয়াই এক্সিস হয়ে যাবে, ঈশ্বর আর পদার্থও এক্স এক্সিস আর ওয়াই এক্সিস হয়ে যাবে। কারণ তিনটে আলাদা সত্তা হয়ে গেল, মন, পদার্থ আর ঈশ্বর। দ্বৈতবাদের এটা আরেকটা রূপ। দ্বৈত মানেই দুটি স্বতন্ত্র সত্তা। আমাদের সব থেকে নামকরা দ্বৈত হল সাংখ্য দর্শন। পুরুষ স্বতন্ত্র, প্রকৃতি স্বতন্ত্র, আরামসে আমরা দুটোকে এক্স এক্সিস আর ওয়াই এক্সিসে রেখে দেব। কিন্তু যখন মন, পদার্থ, ঈশ্বর এই জিনিসগুলো আসছে তখন এগুলো এক্স এক্সিস আর ওয়াই এক্সিসে যাবে কি যাবে না? গেলে কি হবে? না গেলে কি হবে? এই জিনিসটাকে নিয়ে স্বামীজী এখন আলোচনা করতে যাচ্ছেন, যেখানে এই স্বাধীন ইচ্ছা আসছে। স্বামীজী এই স্বাধীন ইচ্ছাকে ব্রহ্মসূত্রকে আধার করে বলছেন। যদি দুটো জিনিস পুরোপুরি simple হয়, তাহলে এক্স এক্সিস আর ওয়াই এক্সিসে নিয়ে যেতে কোন সমস্যা হবে না। যেমন জল আর চিনি, জল স্বতন্ত্র আর চিনিও স্বতন্ত্র, দুটো এক্স এক্সিসে আর ওয়াই এক্সিসে ফেলে দেওয়া যাবে। শরবতে যদি জল বেশি দেওয়া হয়, তাহলে শরবৎ পানসে লাগবে, চিনি বেশি দিলে মিষ্টি লাগবে, স্বতন্ত্র হয়ে গেল। মন আর পদার্থ দুটো আলাদা। এই পেন আছে, এটা একটা পদার্থ, আর আমার মন আছে, দুটো আলাদা। যার মন যত শক্তিশালী হবে তত তাকে আমরা বুদ্ধিমান বলব, মন্দ বুদ্ধি মানে তার মনের ক্ষমতা কম। তার মানে, মন আর পদার্থ পুরো আলাদা। ঠাকুর আছেন, ঠাকুরের একটা বিশেষ শক্তি আছে, আমার মন আছে, মন স্বতন্ত্র, ঠাকুর superconsciousness, স্বতন্ত্র, পদার্থ এখানে এক্ষুণি আনছি না।

এবার এক্স এক্সিসে আর ওয়াই এক্সিসে একদিকে ঠাকুর, অন্য দিকে আমি। তাহলে কিছুটা ঠাকুরের ইচ্ছা আর কিছুটা আমার ইচ্ছা হয়ে যাবে। তাহলে স্বাধীন ইচ্ছা আর ঈশ্বরের ইচ্ছা মানে জল আর চিনির সম্পর্ক, জল বেশি থাকলে শরবৎ পানসে লাগবে, চিনি বেশি হলে মিষ্টি বেশি লাগবে। একটা যদি বাড়ে, অন্যটাও যদি না বাড়ে তখন অন্য রকম জিনিস হয়ে যাবে। আমার ভিতরে ঈশ্বরও আছেন আর আমিও আছি, তাহলে কিছুটা ঈশ্বরের ইচ্ছা আর কিছুটা আমার ইচ্ছা থাকবে। কিছুটা ঠাকুরের ইচ্ছা হবে আর কিছুটা স্বাধীন ইচ্ছা হবে। আমাদের ভিতরে দুটি সত্তা, একটা ঠাকুর আর আরেকটা আমি, যখন জল খেতে হবে তখন দুটো সত্তা মিলে ধস্তাধস্তি করবে, ঠাকুর বলছেন জল খেতে হবে না, আমি বলছি আমার ইচ্ছাতে বলছে জল খেতে হবে। যখন জল খেয়ে নিলাম, তখন আমার ইচ্ছাটা জিতে গেল। যদি কোথাও জল পাওয়া না যায়, তার মানে আমার ইচ্ছাটা হেরে গেল, তখন ভাগ্যকে নিয়ে আসছি, আমার ভাগ্যে জল খাওয়া নেই। ঠাকুরও বলছেন, এর ভিতরে দুটো আছে, এক তিনি আর তাঁর ভক্ত। আমার ভিতরে দুজন বসে আছে, আর সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সারাদিন দুজনে কুস্তি করে যাচ্ছে, ঠাকুর মলিক্যুল এটমিক রূপে আর আমার মন এটমিক রূপে। ঠাকুর বলছেন, আজকে দেববাণীর ক্লাশ শুনতে যেতে হবে, আমার মন বলছে, আজ ওয়ান ডে ক্রিকেটের ফাইনাল খেলা, বাড়িতে বসে টিভিতে খেলা দেখব। দুজনে এবার লড়াই শুরু হয়ে গেল, আমি ক্লাশে না গিয়ে টিভির সামনে বসে গেলাম, আমার স্বাধীন ইচ্ছা জিতে গেল। খেলাতে ভারতের অবস্থা খুব খারাপ, মনে হলে ক্লাশে না যাওয়ার জন্যই হয়ত ঠাকুরের ইচ্ছাতে ভারতের অবস্থা খারাপ, ক্লাশে গেলেই ভাল হত। আবার একটু ধস্তাধস্তি হতে টিভি বন্ধ করে কথামৃত নিয়ে পড়তে বসে গেলাম।

এক্স এক্সিস আর ওয়াই এক্সিসে যদি দুটো স্বতন্ত্র সত্তা এসে যায়, তখন ভগবানও সব সময় ক্ষমতাশালী থাকবেন না। স্বতন্ত্র মানেই কেউ কারুর উপর ক্ষমতাশালী থাকবে না। যেমন পুরুষ আর প্রকৃতি,

দুটো স্বতন্ত্র সত্তা, পুরুষ প্রকৃতিকে নাচাচ্ছে, প্রকৃতিও আবার পুরুষকে নাচাচ্ছে। স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কে, বাইরে মুখে ওরা যতই হম্বিতম্বি দেখাক, ঘরের বাইরে সব পুরুষই সিংহের মত, বাড়ির ভিতরে ঢুকলে সব ইঁদুর। ঠাকুর বাইরে যতই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে বেড়ান না কেন, কিন্তু আমাদের মনের ভিতরে যেমনি ঢুকে গেলেন, তিনিও ইঁদুর হয়ে গেলেন। এক্স এক্সিস আর ওয়াই এক্সিসে একটা হল আমার স্বাধীন ইচ্ছা আর আরেকটা হল ঠাকুরের ইচ্ছা। ভোরে বিছানা থেকে উঠব কি উঠব না, ঠাকুর বলছেন উঠে জপ কর, আমি বলছি ভোরেই আমার ঘুমটা গাঢ় হয়, এখন উঠলে সারাদিন আমার ক্লান্তি লাগবে, এখন উঠব না। চব্বিশ ঘন্টা যেন স্বাধীন ইচ্ছা আর ঈশ্বরের ইচ্ছার ধ্বস্তাধ্বস্তি চলছে। কখন আমি জিতে যাচ্ছি, তখন বলছি স্বাধীন ইচ্ছা জিতে গেল, আর আমার ইচ্ছা মত না হলে বলছি, আমার ভাগ্যটাই এই রকম ছিল, ঠাকুরের ইচ্ছায় এই রকম হয়েছে। এর থেকে আহাম্মক ধারণা জগতে আর কিছু হতে পারে না।

কারণ, এই যে fundamental idea of simple আর fundamental idea of এক্স এক্সিস আর ওয়াই এক্সিস, অর্থাৎ দ্বৈত মতবাদ, যেটা প্রথমে বলা হল, এটাই আমাদের ভুল। ছোটবেলা থেকে আজ পর্যন্ত যা কিছু শুনে এসেছি, বুঝে এসেছি, তার বাইরে আমরা যেতে পারি না আর সেইজন্য খুব elementary ধারণাগুলি ও বিশ্বাসগুলিকেই আমাদের কাছে সত্য বলে বোধ হয়, যেটা complex সেটাকে simple বলে বোধ হয়। Simple মানে স্বতন্ত্র এক স্বাধীন সত্তা, independent existence, complex মানে যে সত্তার কোন স্বাধীনতা নেই, not independent existence। যেমন শরবৎ, not independent existence, জল apparently independent existence। যখন আমরা স্বাধীন ইচ্ছা, ঈশ্বরের ইচ্ছা বলি, তার মানে ঈশ্বর একটি স্বতন্ত্র সত্তা আর আমি আরেকটা স্বতন্ত্র সত্তা। দুটো স্বতন্ত্র সত্তা হওয়ার জন্য ভারত পাকিস্থানের মত সব সময় লড়াই চলছে।

একটু বিচার করে দেখ তো, কোন ধর্ম বলছে, মানুষ ঈশ্বর থেকে আলাদা? কোন ধর্মই বলছে না। চৈতন্য রূপে মানুষ সব সময় ঈশ্বরের সাথে এক। যদি এক, তাহলে সত্তা দুই হবে কি করে! আর সত্তা যদি দুই না হয়, তাহলে ধ্বস্তাধ্বস্তি হবে কোথা থেকে! ধ্বস্তাধ্বস্তি যদি নাই হয়, স্বাধীন ইচ্ছা আসবে কোথা থেকে! তাহলে স্বাধীন ইচ্ছা এই শব্দটা এলো কোথা থেকে? ডেকার্ড, যিনি এক্স এক্সিস আর ওয়াই এক্সিসের ধারণা নিয়ে এলেন, তাঁর কাছে ঈশ্বর আর জগৎ পুরো আলাদা, মন আর পদার্থ পুরো আলাদা। ফলে ডেকার্ড এক্স এক্সিসে আর ওয়াই এক্সিস এনে তাতে পুরো ভুল জিনিসগুলিকে নিয়ে রেখে দিলেন। মানুষ মাত্রই মুর্খ হয়, বানর থেকে এসেছি, বানরের মতই আছি। ভুল জিনিসগুলিকে পড়ে নিয়ে, জেনে নিয়ে, যেখানে যে জিনিসটার কোন অস্তিত্বই নেই, সেই জিনিসটাকেই সত্য বলে মনে করে নিয়েছি, আর সেটাই এখনও চলছে। স্বামীজী এবার আমাদের এই ভুল ভাঙছেন।

স্বামীজী বলছেন, Everything we know is a compound, and all sense-knowledge comes through analysis, (*আমরা যা কিছু জানি, তাই মিশ্রণ-স্বরূপ; আর আমাদের সমুদয় বিষয়ানুভূতি বিশ্লেষণ থেকেই এসে থাকে।*) যখনই আমরা কোন জিনিসকে জানছি বা জানলাম, চোখ কান বুঝে জেনে নিতে হবে যে ওটা একটা compound। Simple জিনিসকে কখন জানা যায় না। Simple জিনিসকে দিয়ে compoundকে জানা হয়। আমি বলতে পারি, আমি তোমাকে ভালবাসি, কিন্তু ভালবাসাটা কি জিনিস, সেটা আমি জানি না। ভালবাসাকে জানা যায় না, কারণ ভালবাসা একটা simple, ভালবাসাকে আর নীচে নামানো যাবে না। আমি তোমাকে ভালবাসি, এটাকে আমি বুঝতে পারছি, আমার আর তোমার যে সম্পর্ক, এটা complex relation, যে complexকে ভালবাসা দিয়ে জোড়া লাগানো হচ্ছে, কিন্তু তাই বলে ভালবাসা জিনিসটাকে জানা যাবে না। আমাদের মন সব সময় complex জিনিসকে নিতে পারে, মনের সেই ক্ষমতাই নেই যে সে simple জিনিসকে নিতে পারবে। তার কারণ হল, simple দিয়ে complexকে ধরা হয়, complex দিয়ে কখনই simpleকে জানা যায় না। শরবতের অস্তিত্ব চিনির উপর, চিনির অস্তিত্ব শরবতের উপরে নয়। মন complex জিনিসকে জানে কিন্তু simple জিনিসকে জানতে পারে না। মন ভালবাসা কি, সৌন্দর্য কি, এগুলোর ব্যাখ্যা করতে পারে না। সক্রেটিসের খুব নামকরা কথা, সৌন্দর্য, সত্য, মূল্যবোধ এই জিনিসগুলোকে নিয়ে যে আলোচনা, এগুলো খুব simple। এই জিনিসগুলোকে কখনই জানা যাবে না। যদি

বলা হয় হিউম্যানিটি কি ডিফাইন করুন। কি করে ডিফাইন করবে, হিউম্যানিটি খুব simple। Defination মানে সেখানে মন এসে যাচ্ছে, মন এসে যাচ্ছে মানে complex এসে যাচ্ছে, complex জিনিস কখনই simpleকে ডিফাইন করতে পারবে না, যেমন দুই দিয়ে কখন একককে ডিফাইন করা যাবে না, কিন্তু এক দিয়ে দুইকে ডিফাইন করা যাবে। ভগবান সহজ, সেইজন্য মন ভগবানকে কোন দিন জানতে পারবে না। আর আমরা যখনই কোন জিনিসকে জানছি, কোন বিষয়ের অনুভূতি হচ্ছে, তখন সেটাকে আমরা বিশ্লেষণের মাধ্যমেই জানছি, আমরা উপমান দিয়ে, তুলনা দিয়ে জানি। যেমন বেড়ালকে জানলে বেড়াল জাতীয় যত প্রানী আছে সব প্রাণীকে জানা যাবে, তুলনা দিয়ে জানছি।

To think that mind is a simple, single, or independent is dualism. (*মনকে অমিশ্র, স্বতন্ত্র বা স্বাধীন বস্তু ভাবাই দ্বৈতবাদ।*) Simple মানেই সে স্বাধীন, তার স্বাধীন অস্তিত্ব। মনকে যদি simple বলা হয় তাহলে মনের একটা স্বাধীন অস্তিত্ব এসে যাবে; এটাই হয়ে গেলে দ্বৈতবাদ, কারণ মন হল complex। এই ভ্রান্তি আমাদের ছোটবেলা থেকে চলে আসছে, দর্শনের শুরু থেকে চলে আসছে, যেখানে মনকে আমরা মনে করি simple। যেমনি মনে করব মন simple, সঙ্গে সঙ্গে মন আর ঈশ্বর কার্টিশান প্লেনে এক্স এক্সিস আর ওয়াই এক্সিস হয়ে যাবে, কিন্তু আসলে মন হল complex। অদ্বৈত বাদ বেদান্ত কখনই মনকে independent existence দেবে না, কারণ independent existence দেওয়া মানেই মনকে simple বলা, আর simple বলা মানেই এক্স এক্সিসে আর ওয়াই এক্সিসে পুরুষ প্রকৃতির মত দুটো সত্তা এসে যাবে, আর চিরদিনের মত মন একটা স্বাধীন সত্তা পেয়ে যাবে। তখন বেদান্তের আর কোন দামই থাকবে না, কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই এটা সত্য নয়, কারণ ধ্যানের গভীরেও সবাই তাই দেখেন।

Philosophy is not got by stydying books; the more you read books, the more muddled becomes the mind. (*শাস্ত্র বা বই পড়ে দার্শনিক জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান হয় না, বরং যত বই পড়বে, ততই মন গুলিয়ে যাবে।*) এটা বাস্তবিকই দেখা যায় যে, শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, বই পড়ে দর্শনের জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান হয় না, বরঞ্চ যত শাস্ত্র বা বই পড়বে মন তত সংশায়াত্মক হয়ে সব কিছুকে গুলিয়ে ফেলে। এই কথা বলার পর স্বামীজী বলছেন, The idea of unthinking philosophers was that the mind was a simple, and this led them to believe in free will. (*যে-সব দার্শনিক তত চিন্তাশীল নন, তাঁরা ভাবতেন –মনটা একটা অমিশ্র বস্তু; আর তাই থেকে তাঁরা 'স্বাধীন ইচ্ছা' নামক মতবাদে বিশ্বাসী হয়েছিলেন।*) স্বামীজীর এটা একটি প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ বাক্য। প্রথম কথা স্বামীজী বলছেন, unthinking philosophers, যে দার্শনিকরা গভীরে গিয়ে চিন্তন করতেন না, তাঁরা মনে করতেন মনের একটা নিজস্ব সত্তা আছে, মন অমিশ্র, মনের যদি নিজস্ব সত্তা থাকে তাহলে মনের স্বাধীন ইচ্ছা এসে যাবে। কারণ যে স্বাধীন, যার নিজস্ব সত্তা আছে, নিজস্ব ক্ষমতা আছে, সবটাই আমি আমি আমি হয়ে যাবে। স্বামীজী সেইসব দার্শনিকদের কথা বলছেন, যে দার্শনিকরা গভীরে গিয়ে চিন্তন করেননি। ডেকার্ডের মত দার্শনিকরা, দর্শনের ক্ষেত্রে তাঁদের নাম বিরাট কিছু হতে পারেন, আর বড় নামকরা হলেই যে তিনি সব কিছু ঠিক বলবেন তা তো নয়।

কিছু দিন আগে আইনস্টাইনের ডাইরি বেরিয়েছে, তাতে চীন ভারতকে নিয়ে এমন এমন কথা তিনি লিখেছেন, পড়লেই অবাক হয়ে যেতে হয় যে, আইনস্টাইনের মত এত বড় বিজ্ঞানী ভাবনা চিন্তা করে এইসব কথা লিখতে পারেন কল্পনাই করা যায় না। যেমন বলছেন, ভারতের আবহাওয়া এমন যে, এখানকার মানুষ চিন্তন করতেই পারে না, পনেরো মিনিট আগে আর পনেরো মিনিট পিছনে, এর বেশি তারা কোন কিছুর চিন্তা করতে পারে না। তার মানে তিনি বলতে চাইছেন, ভারতীয়দের চিন্তা করার ক্ষমতাই নেই। ঠিকই বলছেন, তিনি যে সময় ভারতে এসেছিলেন, বিংশ শতাব্দীর দশম শতকে, সেই সময় সত্যিই হয়ত ভারতের চিন্তা করার ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু তিনি জানতেন না, বেদান্তের মত এত উচ্চ দর্শন এই ভারতবর্ষের মানুষের মাথা থেকেই বেরিয়েছে। তিনি পরিষ্কার এও বলছেন যে, এখানকার যা আবহাওয়া, আমরা যদি এখানে থাকি আমরাও হয়ত এই রকমই হয়ে যাব। কিন্তু ওনার হিসাব হল পনের মিনিটের, পনের মিনিট সামনে আর পনের মিনিট পিছনে, এর বেশি ভারতীয়দের চিন্তা করার ক্ষমতা নেই। তাই বলে আইনস্টাইন যে পুরোপুরি ঠিক, তা তো নয়, ভারতের সামগ্রিক চিত্রকে তিনি জানতেন না। এখন অনেকে বলছেন, আইনস্টাইনের এই কথা পুরো

বর্ণবিদ্বেষী প্রসূত মন্তব্য। অথচ পরের দিকে নিজেদের বর্ণের লোকেরা হিটলারের কাছে মার খাওয়ার পর আইনস্টাইন নিজে বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করলেন।

স্বামীজী বলছেন, unthinking philosophers, যে দার্শনিকরা চিন্তনের গভীরে যেতে পারেন না, বা যাননি, তাঁরা মনকে বলে দিলেন, simple, independent, সেইজন্য এসে গেল স্বাধীন ইচ্ছা। তার মানে স্বাধীন ইচ্ছার যে ধারণা, পুরোপুরি false notion। যেমনি কেউ বলছে, আমার স্বাধীন ইচ্ছা আছে, তার মেনে সে মেনে নিচ্ছে তার মন অমিশ্রণ, এটা মিশ্র জিনিস নয়। ঈশ্বরের যেমন একটা স্বাধীন সত্তা আছে, আত্মার যেমন একটা স্বাধীন সত্তা আছে, ঠিক তেমনি তার মনেরও একটা স্বাধীন সত্তা আছে। আমরা যারা এতদিন এখানে শাস্ত্রের আলোচনা শুনছি, এতদিন ধরে ঠাকুরের যারা নামজপ করছি, মনে হয় এত বড় এই ভুলটা আমরা করতে যাবো না যে, যে পর্যায়ে আমরা ঈশ্বরকে রাখছি, মনকেও সেই পর্যায়ে একটা স্বাধীন সত্তা রূপে রেখে দেব। যখনই আমরা বলছি স্বাধীন ইচ্ছা, স্বাধীন ইচ্ছা বলা মানেই আমার মন স্বাধীন, মন স্বাধীন মানেই ঈশ্বর যেমন স্বাধীন, আমাদের মনও ঠিক তেমনি স্বাধীন।

মন একটি মিশ্র ও জড় পদার্থ

স্বামীজী আরও বলছেন, Psychology, the analysis of the mind, shows the mind to be a compound, and every compound must be held together by some outside force; so the will is bound by the combination of outside forces. (*মনোবিজ্ঞানে মনের অবস্থাসমূহের বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছে যে, মন একটা মিশ্রবস্তু; আর যেহেতু প্রত্যেক মিশ্রবস্তু কোন না কোন বাহ্য শক্তিবলে বিধৃত থাকে, সেইহেতু মন বা ইচ্ছার বহিঃস্থ শক্তিসমূহের সংযোগে বিধৃত রয়েছে।*) এটা আসলে একটা খুব জটিল বিষয়, স্বামীজী এখানে পুরোটা বিষয়টাকে নিয়ে বলছেন না; হয়ত বলতে পারেন, মিস্ ওয়াল্ডো অনেক কথা হয়ত ছেড়ে গিয়েছেন। মস্তিষ্ক, মন, চেতনা আর ইচ্ছা এই জিনিসগুলিকে নিয়ে বিদেশীরা এখনও চিন্তা-ভাবনা করেই যাচ্ছে, আমরা অনেক আগেই এগুলোকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে এর মূল সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছি। স্বামীজী এখানে দেখাতে চাইছেন, তৎকালীন মনস্তাত্ত্বিকরা দেখাচ্ছেন মন জিনিসটা কিভাবে একটা compound। বড় বড় কিছু চিন্তাবিদরা, এমনকি Rationalist যাঁরা ছিলেন, তাঁরা এটা অনেক আগেই দেখিয়ে দিয়েছিলেন, মন complex জিনিসকেই ধরে; যেহেতু মন নিজেই complex, কারণ মনকে study করা যায়। যে জিনিসকে study করা যায়, সেই জিনিসটাকে complex হতেই হবে। কারণ simple জিনিসকে study করা যায় না। Simple কে জানার জন্য তার থেকে আরও simple জিনিস দরকার। আমরা আমাদের মনকে সব সময় জানতে পারছি, এই যে আমরা দিনরাত বলে যাচ্ছি, এখন আমার মন ভাল নেই, আজ আমার মন ভাল আছে, তার মানে মনকে আমরা study করতে পারছি, এটাই প্রমাণ করে দিচ্ছে যে মন complex। মনেরই একটা অংশ দিয়ে যদি মনকে জানা যায়, তার মানেই মন simple নয়, simple মানেই, জিনিসটা স্বাধীন, ওকে কোন কিছুকে দিয়ে জানা যাবে না।

বলছেন, Man cannot even will to eat unless he is hungry. Will is subject to desire. But we are free; every one feels it. (*এমন কি, যতক্ষণ না মানুষের ক্ষুধা পায়, ততক্ষণ সে খাবার ইচ্ছা করতেও পারে না। ইচ্ছা বা সঙ্কল্প বাসনার অধীন। কিন্তু তবুও আমরা স্বাধীন বা মুক্তস্বভাব – সকলেই এটা অনুভব করে থাকে।*) আমরা সব সময় বলছি আমার স্বাধীন ইচ্ছা। কিন্তু যখন বলছি আমি খাবো, একটু বিচার করে দেখলে দেখা যাবে, খিদে পেয়েছে বলেই আমি খেতে চাইছি। তোমার খেতে ইচ্ছা তখনই করবে, যখন তোমার মধ্যে ক্ষুধার উদ্রেক হবে। তুমি যে বলছ, আমি খাবো, এই বলাটাও পরিচালিত হচ্ছে অন্য কিছুর দ্বারা। আবার দেখা যায় সব জিনিস সবার খেতে পছন্দ হয় না। বাচ্চারা সব্জির তরকারি খেতে চায় না, সন্ন্যাসীরা মঠের ঝোল ভাত খেয়ে খেয়ে তাঁদের জিহ্বার স্বাদ এমন তৈরী হয়ে গেছে, অন্য ধরণের কোন খাবার দিলে খেতে পারবে না। একটা খাওয়ার জিনিসে অভ্যাস তৈরী করাবার জন্য, ধীরে ধীরে অল্প অল্প করে তার স্বাদটাকে জিহ্বাতে তৈরী করা হয়। তার মানে এত দিন ধরে যে খাদ্য দ্রব্যকে রপ্ত করা হয়েছে, সেটাকে সে এখন নিজের পছন্দের খাদ্য তালিকায় নিয়ে আসছে। সে এখন মনে করছে এটা তার

স্বাধীন ইচ্ছা। কিন্তু তা নয়, ওই অভ্যাস তৈরী করার পিছনে একটা দীর্ঘ সময় তাকে দিতে হয়েছে। আমরা যা কিছুই করি না কেন, যন্ত্রের মত সব কিছু আবদ্ধ হয়ে করি আর মনে করছি আমি আমার স্বাধীন ইচ্ছায় করছি। শেষে স্বামীজী বলছেন, But we are free; every one feels it, বিচার করে দেখলে দেখা যাবে আমরা সবাই কোন না কোন ভাবে একটা বহিঃশক্তি দ্বারা বাঁধা হয়ে আছি, অথচ ভিতর থেকে সবাই মনে করছি আমি স্বাধীন। এই দ্বন্দ্ব, এই যে বৈপরিত্য, এটাই জীবনের মাধুর্য। প্রত্যেক পদে আমরা মনে করছি আমি স্বাধীন, আমি মুক্ত কিন্তু বিচার করে দেখতে গেলেই দেখছি আমাদের কোন স্বাধীনতা নেই। স্বামীজী এবার এই পয়েন্ট থেকে আলোচনা শুরু করছেন, একদিকে দেখছি আমরা একটুও স্বাধীন নই, অথচ প্রতি পদে পদে মনে করছি আমি স্বাধীন। এটা কেন এই রকম হয়, এটাকে নিয়ে স্বামীজী আলোচনা করছেন।

মনকে কেন complex বলা হয়, এটাকে নিয়ে অনেকের মনে প্রশ্ন জাগাটা স্বাভবিক। তাই আলোচনায় যাওয়ার আগে এই প্রশ্নের ব্যাখ্যা হয়ে যাওয়া দরকার। বর্তমান কালে চেতনা, মন, মস্তিষ্ক নিয়ে যত রকম গবেষণা হচ্ছে, এগুলোকে নিয়ে একটু নাড়াচড়া করলে দেখা যাবে সবাই বলছে, আমরা এখনও এগুলোর কিছুই বুঝি না। স্বামীজী এখানে একটা বাক্যে শুধু বলে দিচ্ছেন, মন complex কারণ মনকে study করা যাচ্ছে। যে কোন জিনিস যদি simple হয় তাহলে ওকে study করা যাবে না। তাহলে প্রশ্ন হবে, মন যদি complex হয়, তাহলে মন কোন কোন জিনিস দিয়ে তৈরী? হিন্দু মতে সাংখ্য মত থেকে শুরু করে বেদান্ত পর্যন্ত যেটাকে ব্যাখ্যা করে সেটা খুবই সহজ। ঈশ্বর বা পুরুষই আছেন, ঈশ্বর বই দ্বিতীয় কারুর কোন অস্তিত্ব নেই। ঈশ্বর যখন সৃষ্টির ইচ্ছা করেন তখন মায়া বা প্রকৃতি বা শক্তির জন্ম হয়। মায়া বা প্রকৃতি বা শক্তি এটা ঈশ্বরেরই শক্তি, যেটা সত্ত্ব, রজো আর তমো এই তিনটে গুণ দিয়ে তৈরী। এই তিনটে গুণ যখন ঈশ্বরের সাথে এক থাকে তখন সাম্য অবস্থায় থাকে। কিন্তু যখন সৃষ্টি শুরু হয় তখন এই তিনটে গুণ ক্রিয়াশীল হয়ে যায়, অর্থাৎ এরা নড়তে শুরু করে। সত্ত্ব, রজো আর তমো যখন চলতে শুরু করে, ওটাকেই তখন আমরা সৃষ্টি বলছি। চলা মানেই তিনটে গুণের ভারসাম্যটা ভেঙে গেছে আর অনবরত এক অপরকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু পিছনে রয়েছে ঈশ্বরের চৈতন্য। চৈতন্য আর গুণ দুটো আলাদা, এর উপর আগে আগে আমরা অনেক আলোচনা করেছি, আবার যখন সুযোগ আসবে আবারও আলোচনা করা যাবে, এখানে বিষয়টা অন্য বলে খুব সংক্ষেপে বলা হচ্ছে।

সত্ত্ব, রজো আর তমোর পিছনে যে চৈতন্য, এবার ওই চৈতন্যকে যখন সত্ত্ব, রজো আর তমোর মাঝখান দিয়ে দেখা হয় তখন সেই চৈতন্যকে অন্য জিনিস বলে মনে হয়, সেটাকে বলা হয় বিশ্বমন বা মহৎ। যেমন ভেন্টিলেটার দিয়ে ঘরে সকালবেলার সূর্যে আলো প্রবেশ করছে, ঠিক সেই সময় ঘরে কেউ ঝাড়ু দিতে শুরু করল, এবার ওই ধুলোর কণা গুলো উপরে উঠতেই দেওয়ালে প্রতিফলিত সূর্যের আলো আর ভেন্টিলেটার দিয়ে প্রবেশ করা পর্যন্ত একটা আলোর রেখা স্পষ্টা দেখা যাচ্ছে। এখানে ব্যাপারটা অনেকটা এই রকম। সত্ত্ব, রজো আর তমো এখনও সূক্ষ্ম থেকে স্থূল হতে শুরু করেছে, মহতের পর আরও এগিয়ে গিয়ে আসে অহঙ্কার। এখনও এই গুণগুলি আরও স্থূল হয়ে যাচ্ছে। অহঙ্কার থেকে তখন শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ তন্মাত্রার জন্ম হয়। এই পঞ্চ তন্মাত্র সত্ত্ব, রজো আর তমের মিশ্রণ। এই পঞ্চ তন্মাত্রার যে সত্ত্ব অংশ, এই পাঁচটা তন্মাত্রার সত্ত্বগুণ দিয়ে তৈরী হয় মন। মন মানে, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের সত্ত্বগুণ। সেইজন্য আমাদের মন শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধকে বুঝতে পারে। সেখান থেকে এবার প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গুলির সৃষ্টি হয়, যখন এর উপর আলোচনা হবে, তখন আরও বিস্তারিত ভাবে বলা হবে। তার মানে, বেদান্ত মতে বা হিন্দুদের মতে, মনের মধ্যে পাঁচটি শক্তি আগে থাকতেই কাজ করছে, অর্থাৎ পাঁচটি তন্মাত্রার সত্ত্বগুণগুলি কাজ করছে। মন তাই শুধু complexই না, রীতিমত complex।

'স্বাধীন ইচ্ছা' মানবের বন্ধন কাটাবার সংগ্রাম

কিন্তু যে জিনিসটা মৌলিক, সেটা যদি দুই হয়ে যায়, তাহলে সেটা তখন ঘোর দ্বৈতবাদ হয়ে যাবে। আর complexকে যদি simple বা fundamental বলে দেওয়া হয়, তাহলেও খুব সমস্যা হয়ে যাবে, পুরো ফিলজফিতেই গোলমাল লেগে যাবে। স্বামীজী বলছিলেন, আমাদের ভিতরে এই বোধটা আছে যে আমরা স্বাধীন, তখন বলছেন, The agnostic says this idea is a delusion, যারা অজ্ঞেয়বাদী তারা বলে,

এই ধারণটা ভ্রম মাত্র। আমি যে শুদ্ধাত্মা, আমি যে মুক্ত, অজ্ঞেয়বাদীরা বলছেন এটা তোমার একটা ভ্রম মাত্র। অজ্ঞেয়বাদীরা ঠিক নাস্তিক নয়, এরা বলবে, আমি তোমার কথাকে মানি না। স্বামীজী যখন খুব নামকরা সব যুক্তি দিচ্ছেন, যেটা ইদানিং কালে ভাল ভাল বিজ্ঞানীরা, যাঁরা এগুলোকে নিয়ে অনেক চিন্তা-ভাবনা করেন, তাঁরাও ঠিক এই যুক্তি দেন, স্বামীজীকে না পড়ে এনারা নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা দিয়ে দিচ্ছেন।

Then, how do you prove the world? (*তাহলে জগতের অস্তিত্বের প্রমাণ কিরূপে হবে?*) আপনি তাহলে কি করে প্রমাণ করবেন যে, জগৎ আছে? আমি যে আপনাকে দেখছি, জগৎকে দেখছি, এটা যে সত্য এর কি প্রমাণ? অজ্ঞেয়বাদীরা বলবে, Its only proof is that we all see it and feel it; so just as much we all feel freedom, কারণ আমি জগৎকে দেখছি, পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে জগৎকে বোধ করছি, এটাই প্রমাণ করছে জগৎ আছে। খুব সহজ যুক্তি। তুমি জগৎকে বোধ করতে পারছ সেইজন্য তোমার কাছে জগৎ সত্য, আমিও মনে করছি আমি স্বাধীন, সেইজন্য freedomটাও সত্য। তাহলে বলবে, যে পাগল সেও তো অনেক কিছু বোধ করে। ঠিক কথা, কিন্তু যদি একজন কেউ বোধ করে, বাকি কেউ বোধ করছে না, তাহলে বুঝতে হবে সেখানে গোলমাল আছে। সবাই যদি একই বোধ করে, তাহলে সেটা সত্য। যদি আমি নিজেকে পাগল মনে না করি, কিন্তু সবাই আমাকে বলছে আমি পাগল, তাহলে বুঝতে হবে সবারই বোধ এক হচ্ছে। আর আমি মনে করছি সবাই পাগল, এটাই ভ্রম। যদি সবারই এক রকম বোধ থাকে, সবাই একই জিনিস বুঝছে, সবাই মানে, সাধারণ মানুষ সাধারণ স্তরের, তার সাথে যীশুর মত লোক, ঠাকুরের মত লোকেরাও বলছেন স্বাধীন। সবাই মনে করছে জগৎ সত্য, কিন্তু জ্ঞানী পুরুষরা বলছেন জগৎটা একটা মায়া। ঐ টপিকে আমরা যাচ্ছি না, কারণ একই যুক্তি দিয়ে সব কিছুকে বিচার করা যায় না। এখানে বিচার হল, জগৎকে আমরা কি করে সত্য মনে করছি। কেন, আমি জগৎকে বোধ করছি, দেখছি। ঠিক আছে মানলাম। তার সাথে এটাও সবাই বোধ করছে যে, আমি স্বাধীন। কিন্তু আমরা সত্যিই কেউ স্বাধীন নই। তুমি বলবে, একটা বোধকে মানব, অন্য বোধকে মানব না, তা তো হয় না। নিতে হলে পুরোটাই নিতে হবে। বেলুড় মঠে দীক্ষা নিতে এসে বলছে, আমি ঠাকুরকে মানব কিন্তু শ্রীশ্রীমাকে মানতে পারব না, অথবা আমি স্বামীজীকে মানি, কিন্তু ঠাকুরকে মানতে পারছি না, তা কি কখন হয়? ঠাকুরকে নিতে হলে মাকেও নিতে হবে, স্বামীজীকেও নিতে হবে, ঠাকুরের বাকি সন্তানদেরও নিতে হবে। যদি বোধটাই তোমার সত্যের মাপকাঠি হয়, তাহলে জগৎ যদি সত্য হয়, তার সাথে আমি যে স্বাধীন এটাও সত্য হতে হবে।

If universal consensus affirms this world, then it must be accepted as affirming freedom; but freedom is not of the will as it is. (*যদি সকলে অনুভব করছে বলে জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়, তবে সকলেই যখন নিজেদের মুক্তস্বভাব বা স্বাধীন প্রকৃতি অনুভব করছে, তখন তারও অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়।*) যদিও মুক্তস্বভাবকে নিয়ে বলা হচ্ছে, স্বামীজী এখানে কিন্তু বলছেন ইচ্ছার freedom নেই। কেন নেই? বলছেন, The constitutional belief of man in freedom is the basis of all reasoning. (*তবে ইচ্ছাটাকে আমরা যেমন দেখছি, সেভাবে তার সম্বন্ধে 'স্বাধীন' কথাটা প্রয়োগ করা চলে না। মানুষের নিজ মুক্ত স্বভাব সম্বন্ধে এই স্বাভাবিক বিশ্বাসই সমুদয় তর্কযুক্তি বিচারের ভিত্তি।*) কোথাও আমাদের একটা বোধ আছে যে আমি স্বাধীন, সেইজন্য reasoning হয়। একটা মেশিন বা কম্প্যুটার কখন বিচার করতে পারে না, সে বাঁধা। যখনই কেউ যুক্তি দিচ্ছে, বিচার করছে, তার মানেই একটা কোথাও তার বোধ আছে যে, আমি স্বাধীন।

Freedom is of the will as it was before it became bound. (*'স্বাধীন ইচ্ছা' – বদ্ধভাবাপন্ন হবার আগে যেরূপ ছিল, তাই মুক্ত স্বভাব।*) একদিকে আমরা বিচার করছি, আবার তার সাথে আমি এও বোধ করছি যে আমি স্বাধীন, কিন্তু আগে আমরা দেখালাম যে, আমরা স্বাধীন নই। সেখান থেকে স্বামীজী একটা লাফ দিয়ে এসে এখানে দুটোকে মিলিয়ে একটা সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন, এই স্বাধীন বোধটা আসলে সেই স্বাধীন বোধ, যেটা বদ্ধ হওয়ার আগে তোমার ছিল। আসলে আমরা সবাই প্রকৃতির মধ্যে বদ্ধ, এতে কোন সন্দেহ নেই। প্রকৃতির মধ্যে এসে আমরা যে আবদ্ধ হয়ে গেছি, তার আগে চৈতন্য স্বরূপে আমরা যে স্বাধীন ছিলাম, ওই স্মৃতিটা আমাদের মধ্যে কোথাও কোন ভাবে থেকে গেছে, প্রকৃতির এলাকায় আসার পর ওই

স্মৃতিটাই আমাদের অনবরত খোঁচা দিয়ে যাচ্ছে, আমি স্বাধীন, আমি স্বাধীন। আমি স্বাধীন নই, আমার স্বাধীন ভাব চলে গেছে, মানুষ এটাকে তাই কখন মানতে চায় না।

বলছেন, The very ideal of free-will shows every moment man's struggle against bondage. (*এই যে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার ধারণা –এতেই প্রতিমুহূর্তে দেখাচ্ছে যে, মানুষ বন্ধন কাটাবার চেষ্টা করছে।*) আসলে আমরা কেউই স্বাধীন নই, কিন্তু আমরা যে মনে করছি আমি স্বাধীন, আমি স্বাধীন মনে করাটাই হল বন্ধনের বিরুদ্ধে আমাদের অবিরাম সংগ্রাম। একটা পাখিকেও খাঁচার মধ্যে রেখে দিলে সে অনবরত খাঁচাকে ঠোকরাতে থাকবে, কারণ তার এই বোধ আছে যে আমি একটা সময় স্বাধীন ছিলাম, এখন আমি বদ্ধ। স্বামীজী এখানে তিনটে যুক্তি দিয়ে দেখাচ্ছেন, যেমন সংসারের বোধ মানেই সংসার, ঠিক তেমনি স্বাধীন বোধ মানে কোথাও তার স্বাধীনতার অনুভূতিটা আছে। কিন্তু অন্য দিকে দেখা যাচ্ছে তার স্বাধীনতা নেই। তাহলে কি করে এই স্বাধীন বোধ হচ্ছে? পুরনো স্মৃতির জন্য এই স্বাধীন বোধটা চলছে।

যিনি অনন্ত, যিনি এক তিনিই স্বাধীন; অনন্ত কখনই দুটো হতে পারে না

The free can be only one, the Unconditioned, the Infinite, the Unlimited. Freedom in man is now a memory, an attempt towards freedom. (*একমাত্র বস্তু যা প্রকৃত মুক্তস্বভাব হতে পারে –তা অনন্ত, অসীম, দেশ-কাল নিমিত্তের বাইরে। মানুষের ভিতর এখন যে স্বাধীনতা রয়েছে, সেটা একটা পূর্বস্মৃতিমাত্র –স্বাধীনতা মুক্তিলাভের চেষ্টামাত্র।*) দুটো স্বাধীন সত্তা হতে পারে না, সাংখ্যের যে পুরুষ আর প্রকৃতি, দুটোই যদি স্বাধীন সত্তা হয় তাহলে কিসের স্বাধীন হবে! যেখানে প্রকৃতি আছে সেখানে পুরুষ নেই, যেখানে পুরুষ আছে সেখানে প্রকৃতি নেই। তাহলে তা স্বাধীন নয়, বেদান্ত ঠিক এই জায়গাতেই ঢুকে সাংখ্যকে আক্রমণ করে, স্বাধীন যদি হয় তাহলে এক হতে হবে। ঈশ্বর আর স্যাটার্ন যদি সত্য হয়, তার মানে স্যাটার্নের উপর ঈশ্বরের ক্ষমতা নেই। ঈশ্বর আর জগৎ যদি দুটো আলাদা সত্তা হয়, তাহলে ঈশ্বরের ক্ষমতা জগতের উপর থাকবে না। ভাল মানুষকে ঈশ্বর কেন কষ্ট দেন? এই প্রশ্ন দিয়ে এটাই বলতে চাওয়া হচ্ছে যে, ঈশ্বরের ক্ষমতা এত দূর পর্যন্ত আছে, এরপর নেই। মানে ঈশ্বর খারাপ লোকেদের ভাল করবেন না, শুধু ভাল লোকের ভাল করবেন, ঈশ্বরকে সীমিত করে দেওয়া হল। ঈশ্বর আর জগৎকে নিয়ে বিশ্ব জুড়ে যে কতকগুলি সস্তা ধারণা চলছে, একটু গভীরে গিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে সবটাই এলেমেলো আর ভুলেভালে ভরা। যিনি এক, যিনি অনন্ত, তিনিই স্বাধীন, এর বাইরে কেউ স্বাধীন নয়।

একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়, সাংখ্য দর্শন, যেটা ঠিক ঠিক দ্বৈতবাদের দর্শন, সেখানে বলছে পুরুষ স্বাধীন, প্রকৃতি স্বাধীন। দুটি সত্তা হলে পুরুষ পুরোপুরি স্বাধীন হবে না, কারণ সেতো প্রকৃতির এলাকাতে এসে আবদ্ধ হয়ে আছে! প্রকৃতি বলবে, এটা আমার এলাকা, এখানে আমার ইচ্ছামত সব হবে, আমার এলাকার বাইরে তোমার সাম্রাজ্য, সেখানে তোমার কথা মত সব চলবে। ইংরাজীতে একটা খুব নামকরা কথা আছে, your freedom to swing your feast ends where my nose begins, ঘুষি চালানোর স্বাধীনতা তোমার আছে, কিন্তু যে জায়গা থেকে আমার নাক শুরু হয়, তার বাইরে পর্যন্তই আছে, ওর পর থেকে আমার এলাকা শুরু হয়ে যায়। তার মানে, তুমি স্বাধীন বলে যা খুশি করতে পারো, কিন্তু আমার নাকে ঘুষি মারতে পারো না। তোমার বাক্ স্বাধীনতা আছে, তাই বলে তুমি আমাকে গালাগাল দিতে পারো না। সত্যিকারের স্বাধীনতা মানে, পুরোপুরি অবাধ, যেখানে তোমার নাক সেখানেও আমি যেতে পারব, কিন্তু এটা একমাত্র ভগবানই পারেন, আর কেউ পারে না। সেইজন্য মনের কোন স্বাধীনতা নেই, স্বাধীনতা আছে একমাত্র ভগবানের, যিনি অনন্ত। ঈশ্বরের সেইজন্য একটাই পরিভাষা, ঈশ্বর অনন্ত। ঈশ্বরের অন্য কোন আর পরিভাষা নেই, এই একটাই পরিভাষা। অনন্ত শব্দকে যেমনি নিয়ে আসা হবে, বাকি সব কিছু এমনিতেই চলে আসবে। স্বামীজী বলছেন, মানুষ স্বাধীন নয়, স্বাধীন একমাত্র ভগবান। আর এই যে আমাদের আমি স্বাধীন, এই বোধটা একটা স্মৃতি। কোন এক সময় জমিদার ছিল, অনেক জমিদারী ছিল, ভারত স্বাধীন হয়ে যাওয়ার পর সেই জমিদারী কবেই শেষ হয়ে ভূত হয়ে গেছে। কিন্তু সেই বংশের বংশধরদের মনে জমিদারীর স্মৃতিটা এখনও রয়ে গেছে, যার জন্য বাইরে এখনও লোকেদের সামনে মাঝে মাঝে জমিদারী মেজাজটা দেখাতে গিয়ে সমস্যায়

পড়ে যায়। আমাদেরও ঠিক তাই, অনন্তের সাথে এক থাকার সময় আমরা যে স্বাধীন ছিলাম, সীমিত হয়ে সেই স্বাধীন ভাবের স্মৃতিটুকু থেকে গেছে, বাকি সব ভূত হয়ে গেছে।

নিজের স্বরূপে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা

এবার স্বামীজী বলছেন, Everything in the universe is struggling to complete a circle, to return to its source, to return to its only real Source, Atman. (*জগতে সকল জিনিস যেন ঘুরে ফিরে একটা বৃত্ত সম্পূর্ণ করবার চেষ্টা করছে—তার উৎপত্তি স্থানে যাবার, তার একমাত্র যথার্থ উৎস আত্মার কাছে যাবার চেষ্টা করছে।*) বিভিন্ন বক্তৃতায় স্বামীজী এই কথাকে বার বার করে বলেছেন যে, সব কিছু ঘুরে যেন একটা বৃত্তকে সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় যা কিছু আছে, সব কিছু সংগ্রাম করে চলেছে নিজের উৎসে ফেরত যাওয়ার জন্য। এই যে পাখা ঘুরছে, আলো জ্বলছে, এই মাইক্রোফোন, টেবিল, চেয়ার, আমরা কথা শুনছি, সবাই অনবরত সংগ্রাম করে যাচ্ছে তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়ার জন্য, সবার পূর্বাবস্থা হল, সেই আত্মা।

The search for happiness is a struggle to find the balance, to restore the equilibrium. (*মানুষ যে সুখের অন্বেষণ করছে, সেটা আর কিছু নয়—সে যে সাম্য ভাব হারিয়েছে, সেইটা ফিরে পাবার চেষ্টা করছে।*) মানুষ যে একটু সুখের অন্বেষণে চারিদিকে দৌড়ে বেড়াচ্ছে, আসলে সে তার নিজের সাম্য ভাবকে ফিরে পেতে চাইছে। Morality is the struggle of the bound will to get free and is the proof that we have come from perfection. (*এই যে নীতিপালন, এও বদ্ধভাবাপন্ন ইচ্ছার মুক্ত হবার চেষ্টা আর এই থেকেই প্রমাণিত হয় যে, আমরা পূর্ণব্রহ্ম থেকে নেমে এসেছি।*) আমরা যে নীতিপরায়ণ হওয়ার চেষ্টা করছি, এও সেই বদ্ধাবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার ইচ্ছাকে ফলপ্রসু করার চেষ্টা। আগে যে বলা হল, তমোগুণ থেকে রজোগুণে, রজোগুণ থেকে সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা, মানুষ নীতিপরায়ণ তখনই হতে চায় যখন তার মধ্যে সত্ত্বগুণের আধিক্য হয়। মানুষ সত্ত্বগুণে কেন প্রতিষ্ঠিত হতে চাইছে? কারণ সে বলছে, আমি আর তমোগুণের বন্ধনে থাকব না। তাহলে তো এটাও বলা যেতে পারে, আমি সত্ত্বগুণের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে তমোগুণে থাকব, কিন্তু সেটার জন্য বন্ধন লাগে না, মানুষ স্বভাবেই তমোগুণের দিকে যেতে চায়। কিন্তু সত্ত্বগুণে আসার জন্য তাকে সংগ্রাম করতে হয়। এই সংগ্রামই তাকে আবার ধীরে ধীরে উপরের দিকে নিয়ে যাবে। মানুষ যে সদাচারী হতে চায়, নীতি পালন করে জীবন চালাতে চাইছে, ভাল হতে চাইছে, সব কিছু শুভ হোক চাইছে, তার মানেই হল, একটা কোথাও তার মধ্যে পূর্ণতা ছিল, সেই পূর্ণতা থেকে সে কোন ভাবে অপূর্ণতায় নেমে এসেছে, এখন সে আবার সেই পূর্ণতার দিকে ফিরে যেতে চাইছে।

কাজ করে যাও, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া যেন না আসে

The idea of duty is the midday sun of misery scorching the very soul, (*কর্তব্যের ধারণাটা যেন দুঃখস্বরূপ মধ্যাহ্ন-মার্তণ্ড—আত্মাকেই যেন দগ্ধ করে ফেলছে।*) অপূর্ণতা থেকে আসছে কর্তব্য বোধ। যাদেরই কর্তব্য বোধ আছে, এই বোধ তাদের জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক্ করে দিচ্ছে। সংসারে আমাদের অনেক রকমের বন্ধন আছে, এই বন্ধনের মধ্যে কর্তব্যবোধ এসে তিল তিল করে শেষ করে দেয়। গ্রীষ্মের মধ্য গগনে সূর্যের প্রখর রৌদ্রের তাপ মাথায় নিয়ে খোলা মাঠে কাজ করলে যে দুরবস্থা হয়, কর্তব্য বোধ আমাদের সেইভাবে জ্বালিয়ে মারে। এটা বলার পরেই স্বামীজী বলছেন, 'O king, drink this one drop of nectar and be happy.' ('I am not the doer', - this is the netar). (*'হে রাজন্, এই এক বিন্দু অমৃত পান করে সুখী হও'। আত্মা অকর্তা এই ধারণাই অমৃত।*)

Let there be action without reaction; action is pleasant, all misery is reaction. (*ক্রিয়া হতে থাক, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া যেন না আসে; ক্রিয়া থেকে সুখই হয়ে থাকে, সমুদয় দুঃখ হচ্ছে প্রতিক্রিয়ার ফল।*) কর্তব্য বোধ নিয়ে যে কাজই করা হবে, সেই সব কাজে গোলমাল হবেই। যে কাজে কোন প্রতিক্রিয়ার আশা থাকে না, তখনই সুখ হয়। একটা বাচ্চাকে বল দিয়ে একটা বড় ঘরে ছেড়ে দিলে কত

আনন্দে খেলতে থাকবে, কারণ বলকে সে যেদিকে খুশি মারতে পারে, বল নিয়ে যা খুশি করতে পারে। যখন ফুটবলের কোন বড় টুর্নামেন্ট চলে, সেখানে তখন সব সময় প্লেয়ারদের চিন্তা থাকে বিপক্ষ প্লেয়ারদের কি করে কাটিয়ে বল নিয়ে গোলের দিকে এগিয়ে যাবে। সেখানে হেরে যাওয়ার দুশ্চিন্তা, ভাল খেলতে না পারার দুশ্চিন্তা, ভুল খেলার দুশ্চিন্তা তাকে অনবরত খোঁচা দিয়ে যাচ্ছে। একটা বাচ্চা ছেলে বল খেলে যে আনন্দ পায়, বড় টুর্নামেন্টে তা বিশ্বকাপই হোক বা ইউরোপিয়ান কাপই হোক, বাচ্চাদের মত সেই আনন্দ ওই খেলাতে কোন দিন আসবে না, কারণ সেখানে সেই স্বাধীনতাটা নেই। প্রথম আমার দলকে বা দেশকে জেতাতে হবে, দ্বিতীয় আমি যেন গোল করতে পারি, তৃতীয় আমার স্কিলটা যেন দেখাতে পারি। আনন্দ যদি পেতে হয়, তাহলে ফলের আশা ত্যাগ করে কাজ করে যেতে হবে – *কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন*। শুধু কাজ আর কাজ করে যাও, ফলের আশা করো না, ফলের আশা করেছে কি তুমি আবদ্ধ হয়ে গেলে, কর্মবাদের নিয়মানুসারে তোমার দুর্ভোগ শুরু হয়ে গেল।

The child puts its hand in the flame, that is pleasure, but when its system reacts, then comes the pain of burning. (*শিশু আগুনে হাত দেয় –তার সুখ হয় বলেই; কিন্তু যখনই তার শরীর প্রতিক্রিয়া করে, তখনই পুড়ে যাওয়ার কষ্টবোধ হয়ে থাকে।*) আগুন দেখতে বাচ্চাদের মজা লাগে, কিন্তু একবার হাত দিয়ে দেওয়ার পর যখন হাতে জ্বালা ধরে তখন আগুনের কাছ থেকে পালায়। আমাদেরও ঠিক তাই হয়, যতক্ষণ ক্রিয়া করছি ততক্ষণই আনন্দ, ততক্ষণই মজা, প্রতিক্রিয়া এলেই বিপদ। আজকে জয় এসেছে, কিন্তু একদিন না একদিন পরাজয়ও আসবে। সেইজন্য জীবনে যদি আনন্দ পেতে হয়, মুক্তির দিয়ে যদি এগোতে চায়, তাহলে ক্রিয়া করে যেতে হবে, প্রতিক্রিয়াটা বন্ধ করতে হবে, প্রতিক্রিয়া মানেই ক্রিয়ার প্রতিদানের প্রত্যাশা। When we can stop that reaction, then we have nothing to fear. (*ঐ প্রতিক্রিয়াটা বন্ধ করতে পারলে আমাদের আর ভয়ের কারণ নেই।*) ফলের আকাঙ্খা বা কোন কিছুর প্রত্যাশা বন্ধ করতে পারলে আর ভয়ের কিছু থাকবে না। আমাদের সমস্ত সমস্যা প্রতিক্রিয়াকে নিয়ে। বাচ্চাটা এত বড় ঘরে আনন্দে বলে লাথি মেরে যাচ্ছে, সেখানে ওর কোন কিছুর চিন্তা নেই।

Tom Swayer মার্ক টোয়েনের একটা বিখ্যাত বই, তাতে একটা বাচ্চাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে, একটা পাঁচিলকে পুরো হোয়াইট ওয়াশ করতে হবে, এই হল তার শাস্তি। বাচ্চাটির তো মাথা ঘুরে গেছে। বাচ্চাটি তখন একটা কায়দা করল। গ্রামের বাচ্চাদের গিয়ে বলল চল আমরা মজা করে পাঁচিলটাকে হোয়াইট ওয়াশ করে দিই। সে ওদের এটাকে মজা করে করতে বলে দিল। এখন সারা গ্রামের সব বাচ্চারা এসে হোয়াইট ওয়াশ করতে শুরু করে দিয়েছে। তিনটে কোট দেওয়া হয়ে গেছে, Tom Swayerকে কোন কাজ করতে হল না, আর গ্রামের সব বাচ্চাদের সম্পত্তি, কার মরা ব্যাঙ, কার ভাঙা ব্লেড সব টমস্ অয়ারের পকেটে চলে এসেছে। বন্ধনে পড়ে গেছে মানে, সেখানে একটা প্রতিক্রিয়া আছে। কিন্তু ওটাই যখন খেলা বা মজা করে করা হয় সেখানে কোন প্রতিক্রিয়া থাকে না। যারা আসল জগৎ থেকে বাঁচতে চায়, তারা নকল জগতে চলে যায়। নকল জগতে গিয়ে গল্প, উপন্যাস পড়বে, টিভি সিরিয়াল দেখবে, সিনেমা দেখবে আর জীবনে কোন দিন ফুটবল খেলেনি, সে ফুটবলের বিশ্বকাপ দেখবে, ব্রাজিল কিংবা আর্জেন্টিনাকে সমর্থন করবে, নিজের দল জিতলে রাত জেগে বাজি ফাটিয়ে হৈ হুল্লোড় করবে, আর হেরে গেলে হায় হায় করবে। এগুলো দেখেই বুঝতে হয় যে, সবাই একটা নকল জগতে বাস করছে। কারণ সেখানে প্রতিক্রিয়ার ভয় নেই।

রাজযোগে বলছে সত্য কথা বলতে হয়, চুরি করতে নেই, কারুকে কটু কথা বলবে না, উপহার নেবে না, ইত্যাদি। কিন্তু যারা হিমালয়ে গিয়ে তপস্যা করতে চাইছে, তারা সেখানে এগুলো কি করে অনুশীলন করবে! তাহলে রাজযোগে যে উপদেশগুলো বলা হয়েছে, কার জন্য বলা হয়েছে? যে যোগী হিমালয়ে বসে তপস্যা করবে তার জন্য, নাকি যে সমাজে থেকে সাধনা করবে তার জন্য বলা হয়েছে? আসলে মানুষে পালিয়ে থাকতে চায়, কারণ সেখানে কোন প্রতিক্রিয়ার ভয় নেই। কিন্তু স্বামীজী এই কথা বলছেন না, বলছেন, তুমি তোমার ইচ্ছাতে কাজ করবে, কিন্তু প্রতিক্রিয়ার প্রত্যাশা করবে না। আমরা ঠিক এর উল্টোটা করি, হয় প্রতিক্রিয়ার আশা করি, আর তা নাহলে আসল জগৎ থেকে পালিয়ে নকল জগতে ঢুকে যাই। ভক্তরা এসেই বলে, এখনও তো ঠাকুরের দর্শন হল না! তোমার জ্বালায় বাড়িতে একটা কাক বসে না, তুমি আবার ঠাকুরের

দর্শন পেতে চাইছ! তোমার বাড়ির লোকেদের, পাড়ার লোকেদের ভালবাসতে পারছ না, তুমি ভালবাসবে ঠাকুরকে! সব পলায়নপরায়ণ, যাতে প্রতিক্রিয়ার সামনে পড়তে না হয়, তাই পালিয়ে বেড়াতে চাইছে। স্বামীজী এখানে তা বলছেন না। কাজ তোমাকে করতে হবেই। আমাদের প্রথমেই চেষ্টা থাকে যাতে কাজ করা থেকে কোন রকমে বেঁচে যাই, যাতে প্রতিক্রিয়ার সামনে না আসতে হয়। ভারতবর্ষের মানুষ কাজ করতে চায় না, পলায়নবৃত্তির মনোভাব, কারণ কাজ করলেই প্রতিক্রিয়া আসবে। প্রতিক্রিয়া এলে সেটাকে নিতে পারে না। স্বামীজী বলছেন, তুমি নিজের মধ্যে শক্তি নিয়ে আসো, যাতে প্রতিক্রিয়ার দিকে তোমার মনই না যায়। প্রতিক্রিয়া থেকে বাঁচার জন্য আমরা কাজ করাটাই বন্ধ করে দিচ্ছি। যে কাজ থেকে পালিয়ে থাকতে চাইছে, সে এক ঘোর তামসিক লোক হয়ে যাবে। যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াতে জর্জরিত সে রাজসিক। যে কাজ করছে, কিন্তু প্রতিক্রিয়াকে ছেড়ে দিয়েছে, সে সাত্ত্বিক। উদ্দেশ্য হল সাত্ত্বিক হওয়া, প্রতিক্রিয়া তাকে কিছু করতে পারবে না, আর প্রতিক্রিয়ার দিকে তাকাতেই যাবে না। তখনই সে একজন সাত্ত্বিক বলে গণ্য হবে আর তখনই তার দ্বারা ঠিক ঠিক ধর্ম সাধন হবে।

When we can stop that reaction, then we have nothing to fear, প্রতিক্রিয়া বন্ধ করে দেওয়ার পর আর কিসের ভয়! আমাদের জীবনে যত ভয় শুধু প্রতিক্রিয়ার কারণেই ভয় হয়। Control the brain and do not let it read the record; be the witness and do not react, only thus can you be happy. (*মস্তিষ্ককে নিজের বশে নিয়ে এসো; যেন সে প্রতিক্রিয়ার খবর না রাখতে পারে।*) মনকে প্রতিক্রিয়ার দিকে যেতে দিতে নেই, তুমি কাজ করে যাও, মনকে তাই নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা অর্জন কর। আধ্যাত্মিক গুরুরাও বলেন, তুমি শুধু জপ করে যাও, কবে জ্যোতি দর্শন হবে, কবে মন একাগ্র হবে, ওই নিয়ে বেশি মাথা ঘামিও না। সাক্ষী হয়ে জীবনের সব প্রতিক্রিয়াকে লক্ষ্য করে যাও, কিন্তু প্রতিক্রিয়ার দিকে যেন তোমার কোন ভাবেই মন না যায়। আধ্যাত্মিক জীবন শুরু করার প্রস্তুতির জন্য আগে সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হওয়া মানেই কর্মের প্রতিক্রিয়াকে ভুলে যাওয়া। প্রতিক্রিয়াকে ভুলে যাওয়া মানে, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, লজ্জা, ঘৃণা, ভয় সব খসে পড়ে যাবে। তখন ভিতরে ক্ষমতা আসবে, ক্ষমতা আর সত্ত্বগুণ দুটো একসাথে চলে।

The happiest moments we ever know are when we entirely forget ourselves. (*আমাদের জীবনের সুখকর মুহূর্ত সেইগুলি, যখন আমরা নিজেদের একেবারে ভুলে যাই।*) সিনেমা দেখার সময় আমাদের কত আনন্দ হয়, কারণ তখন আমরা নিজেকে ভুলে যাই; গানে আনন্দ কখন হয়, গান শুনতে শুনতে যখন নিজেকে ভুলে যাই। কাঁচা আমিকে ভুলে যাওয়াটাই ঠিক ঠিক আনন্দ। যে কোন ক্ষেত্রে, মানুষ যখন নিজেকে ভুলে যায়, তখন সেটাই ঠিক ঠিক আনন্দ। Work of your own free will, not from duty. (*স্বাধীন-ভাবে প্রাণ খুলে কাজ করে যাও, কর্তব্যের ভার থেকে কাজ করো না।*) কর্তব্য বোধ যখনই আসে তখন আর সে স্বাধীন থাকে না। আমি আমার নিজের আনন্দে করছি, প্রাণ ঢেলে সব করছি, ওর মধ্যে আমি ডুবে যাব, এই ভাব যদি আসে, তখনই সে স্বাধীন। যাঁরা ছবি আঁকেন, যাঁরা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত চর্চা করেন, তাঁরা ওই গানের মধ্যে, ছবি আঁকার মধ্যে একেবারে ডুবে যান, নিজেকে সম্পূর্ণ ভুলে যান। কারণ সেখানে তাঁর কোন কর্তব্য বোধ নেই। ওটাই যদি কর্তব্য বোধ নিয়ে করতে যান, তখন বন্ধন এসে যাবে, বন্ধন থেকে আসে দুঃখ, যন্ত্রণা। স্বামীজী আগে তাই বললেন, বৈশাখের মধ্যাহ্ন গগনের সূর্যের তাপের মত কর্তব্য বোধ আমাদের জ্বালিয়ে পুড়িয়ে জ্বালা ধরিয়ে দেয়।

এই প্রসঙ্গের আলোচনার শেষ করতে গিয়ে স্বামীজী বলছেন, This world is just a gymnasium in which we play; our life is an eternal holiday. (*এই জগৎ তো একটা খেলার আখড়া –এখানে আমরা খেলছি; আমাদের জীবন তো আনন্দের অবকাশ।*) আমাদের জীবন একটা যেন লম্বা ছুটি, এখানে কোন কর্তব্য নেই, শুধু ছুটির আনন্দ উপভোগ কর। কিন্তু কাজ যেটা করতে হবে সেটাকে ঠিক ঠিক ভাবে করতে হবে, অর্থাৎ কাজে কোন প্রতিক্রিয়া থাকবে না। তখন আনন্দের জন্য আর বাইরে কোথাও যেতে হবে না, যা করা হচ্ছে তাতেই আনন্দ, ছুটির মজা কিনা। আমরা যখন ছুটিতে বেড়াতে যাই তখন সেখানে আমাদের বন্ধন থাকে না, ছুটির আনন্দ উপভোগ করে যাচ্ছি। জীবনটাকেও সেই রকম করে নিতে

হবে। জগৎ একটা খেলার মাঠ, ছুটিতে আমরা সবাই মাঠে নেমে খেলে যাচ্ছি, শুধু আনন্দ আর আনন্দ, বন্ধন এখানে কোথা থেকে আসবে!

জীবনের রহস্য হল নির্ভীক হওয়া

The whole secret of existence is to have no fear. Never fear what will become of you, depend on no one. Only the moment you reject all help are you free. The full sponge can absorb no more. (*জীবনের সমগ্র রহস্য হচ্ছে নির্ভীক হওয়া। তোমার কি হবে –এই ভয় কখনও করো না, কারুর উপর নির্ভর করো না। যে মুহূর্তে তুমি সকল সাহায্য প্রত্যাখ্যান কর, সেই মুহূর্তেই তুমি মুক্ত। যে স্পঞ্জটা পুরো জল শুষে নিয়েছে, সে আর জল টানতে পারবে না।*) আমাদের জীবনের যত জ্বালা, যন্ত্রণা সব ভয় থেকে। সব কিছু থেকে আমরা ভয় পাচ্ছি, মৃত্যুর ভয়, অসুখের ভয়, নিরপত্তাহীনতার ভয়, ভয়ের আর শেষ নেই। সেই কোন ছোটবেলা থেকে চারিদিক থেকে শুধু ভয় আর ভয় আমাদের তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে; বাচ্চা বয়সে বাড়ির বড়দের ভয়, স্কুলে মাস্টারদের ভয়, পাড়ার বড় বড় মস্তান ছেলেদের ভয়, সন্ধ্যে হয়ে গেলে ভূতের ভয়। ছোট থেকে বড় হওয়ার পরেও সারা জীবন এই ভয় আমাদের তাড়া করে যাচ্ছে। স্বামীজী বলছেন, সমগ্র জীবনের রহস্য হল নির্ভীক হওয়া। আর বলছেন, যে মুহূর্তে সব রকম সাহায্যকে তুমি প্রত্যাখ্যান জানাবে, সেই মুহূর্তেই তুমি মুক্ত। যে স্পঞ্জ যতটুকু জল শুষে নেওয়ার ততটুকু শুষে নিলে আর তাতে জল ঢুকবে না। ঠিক তেমনি, জীবনটাকে ঈশ্বরের চিন্তায় যদি ভরিয়ে দেওয়া হয়, তখন এর মধ্যে আর কোন কিছু ঢুকবে না।

ভালবাসা মানেই সমত্ববুদ্ধি

তার সাথে স্বামীজী বলছেন, Even fighting in self-defence is wrong, though it is higher than fighting in aggression. (*আত্মরক্ষার জন্যও লড়াই করা অন্যায়, যদিও গায়ে পড়ে অপরকে আক্রমণ করার চাইতে সেটা উঁচু জিনিস।*) মানুষ যখন লড়াই করে, তখন একটা হল আমার মধ্যে আক্রমাণাত্মক ভাব আছে, যেমন বিভিন্ন জাতি বা ধর্মের লোকেরা লুটপাট করার জন্য অন্য জাতি বা ধর্মের লোকদের উপর আক্রমণ করে, খুন করে, এটাই আক্রমণাত্মক, এটা সব থেকে খারাপ, নিজের আত্মরক্ষার জন্য অপরকে আক্রমণ করছে, সেটাও খারাপ কিন্তু আগেরটার থেকে কম খারাপ। সন্ন্যাসী আত্মরক্ষার জন্যও হাত তুলবে না। স্বামীজী বলছেন, There is no 'righteous' indignation, because indignation comes from not recognising sameness in all things. (*'ন্যায়সঙ্গত ক্রোধ' বলে কোন জিনিস নেই, কারণ সকল বস্তুতে সমত্ববুদ্ধির অভাব থেকেই ক্রোধ আসে।*) ভালবাসা মানেই inclusiveness, যেখানে inclusiveness নেই সেখানে ভালবাসাও নেই। সাধারণ মানসিকতার স্তরের লোকেরা তখন প্রশ্ন করে, আমরা কি করে inclusive হতে পারি, সমাজে বিভিন্ন ধরণের লোক আছে, তার মধ্যে চোর, ডাকাত, বদমাইশও আছে? যারা এই ধরণের কথা বলছে তারা বুঝতে পারছে না যে, এটাই তাদের সাধনা। সাধনা মানেই তাই, ভগবান যীশু, ভগবান বুদ্ধ যেমন সবাইকে নিজের ভিতরে নিয়ে নিয়েছেন। আমরা সাধারণ মানুষ, আমাদের মধ্যে গভীরতা নেই, আমরা হাভাতে, সেইজন্য এখানে এই এই মন্দ, সেখানে এই এই ভাল দেখছি। কিন্তু মানুষ যখন আধ্যাত্মিকতায় উন্নত হতে শুরু করে, ধীরে ধীরে সে সবাইকে নিজের করে নিতে পারে, সাপ বিছে, বাঘ-সিংহ, দুষ্ট লোক, ভাল লোক, সবাইকে নিয়ে চলে। চৈতন্য মহাপ্রভু জগাই মাধাইকেও আপন করে বুকে তুলে নিয়েছিলেন। কিন্তু কোন কারণে যদি এই রকম নাও হয়, তখন দেখা যায় তার উপর যদি আক্রমণ আসে, রাবণ যেমন শ্রীরামের উপর আক্রমণ করলেন, শ্রীরামচন্দ্র তখন সীতাকে রক্ষা করার জন্য প্রতি আক্রমণ করলেন, এটা উচ্চতম থেকে একটু নীচে। কিন্তু সম্পূর্ণ নিজে থেকে আক্রমণে গেলাম, এর থেকে জঘন্য জিনিস আর কিছু হয় না।

স্বামীজী এই কথা কেন বলছেন? খ্রীশ্চানদের এই সমস্যাগুলো ছিল, দুনিয়া জুড়ে তারা আগ্রাসন করে বেড়াত। আগ্রাসন করার জন্য তারা সাফাই গাইত যে, নিজেদের ধর্মকে স্থাপন করবে, মুসলমান ও অন্য ধর্মের লোকদের শিক্ষা দেবে, ওদের মানুষ করার জন্য আমাদের ক্রোধ করতে হচ্ছে। যারা কাউকে মারে বা অঙ্গছেদ

করে তখন তারা বলে, এটা তার ভালর জন্য দরকার ছিল। এভাবে কিছু হয় না। আমাদের এখানে কখন কাউকে শাস্তি দেওয়াটা ন্যায়সঙ্গত ক্রোধ রূপে নেওয়ার কোন ধারণাই নেই। আমাদের দুটো জিনিস, একটা হল ধর্মযুদ্ধ, আমার তোমার মধ্যে একটা জায়গায় এসে মতদ্বন্দ্ব হয়ে গেছে, কোন ভাবেই এর সমাধান করা যাচ্ছে না, সব রকম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে, এখন যুদ্ধ ছাড়া আর কোন পথ নেই। কিন্তু তাই বলে তোমার সাথে আমার কোন শত্রুতা নেই। যেমন কুস্তির লড়াই হয় বা বক্সিং প্রতিযোগিতা হয়, তেমনি এটাও হল একটা killing competition। কিন্তু তোমার সাথে আমার কোন বিরূপ ভাব নেই, তুমি মরলে আমিও কাঁদব। এটা আশ্চর্যের যে, ইসলামেও কাউকে মারার অনুমতি নেই। ইসলামের নিয়ম হল জেহাদ, জেহাদের নিয়ম হল, কোন মৌলবী আগে বলবে, এই ব্যক্তি বা এই গোষ্টি ইসলামের ক্ষতি করছে, ইসলামের রক্ষার জন্য এটা করতে হবে। মৌলবী যদি ফরমান্ দেয় তবেই কেউ লড়াই করতে পারে। এটাকে এরা ন্যায়সঙ্গত ক্রোধ বলছে। স্বামীজী ন্যায়সঙ্গত ক্রোধেরও নিন্দা করছেন।

অন্যায়সঙ্গত ক্রোধ হল যখন তখন রেগে গিয়ে কারুর উপর আক্রমণ করা। মা সন্তানকে রেগে গিয়ে মারছে, সেটার কথা এখানে বলা হচ্ছে না। এখানে বলা হচ্ছে, মানুষ মানুষকে যখন মারতে যায়। মনুস্মৃতিতে যেখানে বিচার ব্যবস্থার কথা বলা হচ্ছে, সেখানে 'এর বদলা নিতে হবে', এই ধরণের কার্যের কোন সুযোগ নেই। এখানে খুব সহজ ভাবে বলে দিচ্ছেন, তুমি যেটা করেছ এটা অন্যায়, এর জন্য আমরা তোমার শুদ্ধির জন্য তোমাকে শাস্তি দেব। তোমাকে এই শাস্তি দেওয়ার পিছনে তোমার প্রতি আমার কোন ক্রোধ নেই। পাশ্চাত্যে শাস্তির যে ধারণাগুলো আছে, চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত, এই জিনিস আমাদের এখানে কোন সময়েই ছিল না, আর নেইও। মূল কথা হল ক্রোধ ক্রোধই, অন্যায় সঙ্গত ক্রোধ, ন্যায়সঙ্গত ক্রোধ বলে কিছু হয় না। স্বামীজী এখানে মূলতঃ খ্রীশ্চানদের বিরুদ্ধেই বলছেন, কারণ খ্রীশ্চানরা এই ধরণের কথা অনেক সময় বলে, anger was justified, স্বামীজী তাই বলছেন justified anger বলে কিছু হয় না, ক্রোধ ক্রোধ, কোন ক্রোধই ন্যায়সঙ্গত হতে পারে না, শুধু ক্রোধই না, every emotion is unjustified।

স্বামীজীর আজকের মূল আলোচনা ছিল আত্মাকে নিয়ে, মনকে নিয়ে। যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় আমি স্বাধীন, এই স্বাধীন ভাবটা মনের স্বাধীনতা নয়, এটা আত্মার স্বাধীনতা, সুদূর স্মৃতি থেকে এই স্বাধীন ভাবটা আমাদের মধ্যে চলে আসছে। যখন আমরা শুদ্ধ আত্মা ছিলাম, ওই সময়ের যে বোধ, আমি পবিত্র, শুদ্ধ ছিলাম, মুক্ত ছিলাম; এই শরীরে আবদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর, ওই স্মৃতিটা কোন ভাবে আমাদের মধ্যে থেকে গেছে। ওই স্মৃতিটাই আমাদের দিয়ে বার বার বলাচ্ছে 'আমি স্বাধীন' 'আমি স্বাধীন'। কিন্তু যতক্ষণ আমরা দেহের মাধ্যমে, মনের মাধ্যমে যে স্বাধীন হতে চাইছি, এটা সেই স্বাধীন ভাব নয়। তার মানে স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছু নেই। মনেরই স্বাধীনতা নেই, তার স্বাধীন ইচ্ছা কোথা থেকে আসবে! আত্মাই একমাত্র স্বাধীন। যদি কেউ নিজেকে আত্মা বলে মনে করে, আর সেই জ্ঞান যদি হয়ে থাকে, তাহলে সে eternally free। যতক্ষণ সে নিজেকে আমি দেহ মনে করছে, আমি মন বা আমি বুদ্ধি মনে করছে ততক্ষণ সে eternally bound। স্মৃতিতে আমাদের সেই আত্মার ভাবটা থেকে গেছে বলে, আমরা মনে করছি আমি সব করছি। উদ্দেশ্য হল কিছু কিছু জিনিস থেকে বেরিয়ে আসা। একটা হল, এই জগৎকে অত গুরুত্ব দেওয়ার কিছু নেই। জগৎকে আমরা এমন গভীর ভাবে সত্য বলে মনে করি বলে জগৎ থেকে আমরা অনেক কিছু পেতে চাইছি। প্রথম হল, আমরা কিছু হারাতে চাই না, সেইজন্য আমাদের কষ্টের শেষ নেই। কষ্ট হলেই ভাবতে থাকি, আমার মনের মত কিছু হল না, হে ঠাকুর! তুমি একি করলে! কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, আসলে জগতে স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছু নেই। আর যতক্ষণ আমরা জগৎ থেকে নিজেদের না সরিয়ে আনছি, ততক্ষণ জীবনে কোন শান্তিও আসবে না। এরপর আসছে স্বামীজীর ১৪ই জুলাইয়ের ক্লাশের উপর আলোচনা।

রবিবার, ১৪ই জুলাই

১৪ই জুলাই স্বামীজী দর্শনের উপর আলোচনা করছেন। ষড়দর্শন নিয়ে আলোচনা করার সময় বলা হয়েছিল, আমাদের এখানে দর্শন মানে, আমি জিনিসটাকে যেমন দেখছি, সত্যকে আমি যেরূপ দেখিয়াছি। আর philosophyর technically অর্থ হয় জ্ঞান, আমি জ্ঞানকে জানার চেষ্টা করছি আর দর্শন মানে আমি

জিনিসটাকে যেমন দেখছি। ফিলজফিতে এখনও আমি speculate করে যাচ্ছি, চিন্তা-ভাবনা করে যাচ্ছি জিনিসটা কেমন যাবে, না যাবে। হিন্দুদের মূল গ্রন্থ বেদের সত্য গুলিকে ঋষিরা যখন দেখছেন, ওই সত্যকে এই জগতে বা জীবনে যখন নামাতে যাব তখন সত্যকে আমি যেভাবে দেখেছি জীবনে সেইভাবেই নামাতে হবে, সেইজন্য এটাকে বলছেন দর্শন। যেমন সাংখ্য দর্শন, সাংখ্য দর্শন যেভাবে বেদকে দেখেছে, বেদকে যেমন বুঝেছে, সেটাকে আধার করে যখন জগৎকে দেখছে, সেই অনুসারে বলছে জীবন এই রকম হবে। স্বামীজী এখান থেকে আজকের ক্লাশ শুরু করছেন।

দর্শন শাস্ত্রের অর্থ

Philosophy in India means that through which we see God, the rationals of religion. (*ভারতের দর্শন-শাস্ত্রের অর্থ হচ্ছে –যে শাস্ত্র বা যে বিদ্যা দ্বারা আমরা ঈশ্বর দর্শন করতে পারি। দর্শন হচ্ছে ধর্মের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা।*) যে কোন ধর্মের উদ্দেশ্য একটাই, আমাদের ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যাওয়া। কথামৃতে ঠাকুর কত রকম ভাবে কত রকমের কথা বলছেন, কত কাহিনী বলছেন, কিন্তু ঘুরে ফিরে একটাই বক্তব্যে গিয়ে দাঁড়ায়, ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু, জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ঈশ্বরের দিকে যাওয়া। স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, আমার সব কার্যের উদ্দেশ্য কয়েকটি শব্দেই রেখে দেওয়া যায়। প্রথম হল মানুষ দিব্য, সে ঈশ্বরের সাথে এক, আর এটারই শিক্ষা দিয়ে যাব। এমনকি স্বামীজী বলছেন, I am voice without form। কেন? কারণ এটাই সত্য, এটা আমার দেওয়া সত্য না, এটাই চিরন্তন সত্য। আর হিন্দু ধর্মই হোক আর খ্রীশ্চান কিংবা ইসলাম ধর্মই হোক, যে কোন ধর্মের উদ্দেশ্য একটাই, মানুষকে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যাওয়া। যারা ধর্ম পালন করছে, তারা যদি বলে, আমরা এত ধর্ম পালন করছি তাও আমাদের এত কষ্ট কেন? তখন তাদের এটাই বলতে হয় – ধর্ম পালন করার আগে এটা জেনে নাও যে, তোমার দুঃখ-কষ্ট দূর করা ধর্মের কাজ নয়। সেইজন্য হিন্দুরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারটে বর্ণ করে দিয়েছিল। ব্রাহ্মণদের কাজ হল, শাস্ত্র অধ্যয়ন ও শিক্ষা দেওয়া; ক্ষত্রিয়দের কাজ হল, সমাজকে রক্ষা করা, ভাল মানুষদের রক্ষা করা, যাতে ভাল মানুষদের কষ্ট না হয়, বৈশ্যের কাজ হল সমাজের অর্থ, সম্পদ এগুলোকে রেগুলেট করা আর শূদ্রের কাজ হল সেবা করা। যদি কেউ মনে করে আমি এত মন্দিরে যাই, এত ঠাকুরের নাম করছি, আমার কেন ভাল উপার্জন হয় না। ভাই, ঠাকুরের সাথে পয়সা কড়ির কোন সম্পর্ক নেই। যেগুলো তুমি শুনেছ, পড়েছ, ওগুলো অর্থবাদ। তোমার মনকে ধীরে ধীরে এদিকে নিয়ে আসার জন্য ওই কথাগুলো বলা হয়েছে, এর বেশি ওসবের কোন দাম নেই। আমাদের জীবনে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে আসা ধর্মের কাজ নয়, ধর্মের একটাই কাজ, আমাদের ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যাওয়া।

স্বামীজী বলছেন so no Hindu would ever ask for a link between religion and philosophy. (*সুতরাং কোন হিন্দু কখনও ধর্ম ও দর্শনের ভিতর সংযোগসূত্র কি, তা জানতে চায় না।* ফিলজফি আমরা যে অর্থে বুঝি, জ্ঞানরাশিকে আবিষ্কার করা, ধর্মের ওটা কাজই না, দর্শন পুরো স্বতন্ত্র। দর্শনের জ্ঞানরাশি তুমি যত চিন্তা-ভাবনা করার করতে পার, এর সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। ধর্মের একমাত্র কাজ, আমাদের ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যাওয়া। তুমি চিন্তা-ভাবনা করছ, চিন্তা-ভাবনা করে তোমার মনের মধ্যে কি হচ্ছে, এর সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। ফিলজফিকে স্বামীজী আরও ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন।

দর্শনের তিনটি সোপান

Concrete, generalized, abstract are the three stages in the process of philosophy. (*দার্শনিক চিন্তাপ্রণালীর তিনটি সোপান আছেঃ (১) স্থূল বস্তুসমূহের পৃথক পৃথক জ্ঞান – concrete; (২) ঐগুলিকে এক এক শ্রেণীতে শ্রেণীভুক্ত করে বা ঐগুলির মধ্যে 'সামান্য' আবিষ্কার করা – generalized; (৩) সেই সামান্যগুলির ভিতর আবার সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা ঐক্য আবিষ্কার করা – abstract।*) Concrete হল, যেমন এই মাইক্রোফোন আছে, এটা concrete। আবার অনেকগুলো জিনিস আছে, সেই জিনিসগুলোর মধ্যে যেগুলোর সামঞ্জস্য আছে সেগুলোকে নিয়ে এক একটা শ্রেনীতে বিভক্ত করে generalized করা হয়। এই generalisationকে নিয়ে একটা মজার কাহিনী আছে। এক জায়গায়

ফিলজফি পড়ানো হচ্ছে, যেখানে যেখানে জল, সেখানে সেখানে মাছ থাকবে, generalization করে দিল জল মানেই মাছ। একজন ছাত্র বলে উঠল, ডাবের জলে তো মাছ হয় না। শিক্ষক ভাবছে, এই হতচ্ছাড়া যখন ডাব নিয়ে এসেছে আর ঠিকই তো ডাবের জলে মাছ হয় না, নিশ্চয়ই এ বাঙালী হবে। শিক্ষক তাকে বলছে, তুই ব্যাটা বাঙালী, চুপ করে বোস্। জল মানেই মাছ, এটাকে generalization করে দিল। মাছ একটা concrete, জলও একটা concrete, এবারে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে আসা হল, যেখানেই জল সেখানেই মাছ। সেখান থেকে আসছে abstract। Abstract জিনিসটা এমন সূক্ষ্ম হয়ে যায় যে, abstractএ মানুষ সচারচর যেতে পারে না। সাধারণ ভাবে আমরা concreteএ থাকি, খুব হলে একটা generalizationএ যাই। কিন্তু abstractএ আমরা যেতে পারি না। কারণ abstract হল জিনিসটার উৎস, যেখান থেকে পুরো জিনিসটা বেরিয়ে আসে।

স্বামীজী এই কথাই বলছেন, The highest abstraction in which all things agree is the One. (*সমুদয় বস্তু যেখানে একত্ব-প্রাপ্ত হয়, সেই চূড়ান্ত বস্তু হচ্ছেন অদ্বিতীয় ব্রহ্ম।*) ওয়ানের 'O'টা ক্যাপিটালে লিখেছেন। Abstraction মানে বলা হল, যেখান থেকে সমস্ত কিছু বেরিয়ে এসেছে। যেমন বাচ্চা বয়সে অঙ্ক শেখানোর সময় বলা হয়, দুটি আম আছে, আরও এই দুটি আম দেওয়া হল, কটি আম হল? বাচ্চারা সঙ্গে সঙ্গে বলে দেবে, চারটি আম। এটা হল concrete। যখন generalisationএ যাবে, তখন শেখানোর সময় বলবে দুই যোগ দুই সমান চার। আর যখন abstractionএ যাবে তখন $x + x$ হয়ে যায়, এটা এখন সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়ে যাবে, সংখ্যায় যা কিছুই নিয়ে আসা হোক না কেন, তাতে কিছু যায় আসে না। স্বামীজী বলছেন, highest abstraction One। প্রথমে শুরু করা হল, দুটো বস্তু + দুটো বস্তু, সেখান থেকে চলে এলো দুই + দুই, সেখান থেকে চলে গেল abstractionএ। যখন সব abstractionকে এক জায়গায় নিয়ে আসা হয়, তারপর ওটাকে যখন দাঁড় করানো হবে তখন ওই abstractionটা হয়ে যাবে এক, সেই এক, এই এক মানে ঈশ্বর।

স্বামীজী বলছেন, In religion we have first symbols and forms; next, mythology; and last, philosophy. (*ধর্মের প্রথম অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন প্রতীক বা রূপবিশেষের সহায়তা গৃহীত হয়ে থাকে; দ্বিতীয় অবস্থায় নানাবিধ পৌরাণিক বর্ণনা ও উপদেশের বাহুল্য; এবং সর্বশেষ অবস্থায় দার্শনিক তত্ত্বসমূহ।*) ধর্মে যদি যাওয়া হয়, সেখানেও তখন ঠিক এভাবেই চলে। শুরু হয় concrete দিয়ে। ছোটবেলা যখন আমাদের অঙ্ক বোঝান হত, আমরা কিছুতেই বুঝতে পারতাম না। কারণ ছোট বয়সে মন পুরো অন্য ভাবে চলে, তখন নানা ভাবে শুধু concrete দিয়ে দিয়ে বোঝান হয়। সেখান থেকে আস্তে আস্তে generalizationএর দিকে নিয়ে আসা হয়, তখন ওটা বাচ্চাদের কাছে কঠিন হতে শুরু হয়ে যায়। Abstraction যেই এসে গেল তখন ব্রেন আর কিছু নিতে পারে না। সেইজন্য অঙ্কে যখন এ্যালজেব্রা, ত্রিগোণমিতি আসে তখন সেগুলোকে আমাদের ব্রেন আর নিতে পারে না। বিজ্ঞান উপরের দিকে গিয়ে abastraction হয়ে যায়, সাধারণ লোকেরা তাই বিজ্ঞানের উচ্চতর তত্ত্বগুলি নিতে পারে না।

ধর্মের ক্ষেত্রে স্বামীজী বলছেন, প্রথমে আসে প্রতীক ও রূপ। যেমন মা দূর্গা আছেন, মায়ের মন্ত্র আছে, ওঁ আছে, এগুলোকে আমরা বুঝতে পারি। ওখান থেকে ধর্ম আরেকটু উপরে উঠে এসে generalization এর দিকে চলে যায় তখন আসে পুরাণ। রামায়ণ, মহাভারতের যে কাহিনী এগুলো ধর্মকে generalize করছে, দেবতারা এই রকম হন, ভগবান এই রকম হন, মা দূর্গা এইভাবে অসুর মেরেছিলেন, মা কালী এই ভাবে অসুর বধ করেছিলেন। পৌরাণিকে একটা সাধারণ রূপ নিয়ে নেয়। শেষে আসে ফিলজফি, এই ফিলজফি হয় ধর্মের, যেটা আমরা উপনিষদ গীতাদিতে পাই। যে কোন মানুষ প্রথম যখন ধর্ম জীবন শুরু করে তখন সে একটা concrete কিছু চায়, আমি অত কিছু জানি না, আমাকে কি কি করতে হবে বলে দিন। যারা দীক্ষা নিতে চায় তারা এসেই প্রশ্ন করবে, বেলুড় মঠ থেকে আমার দীক্ষা হবে, দীক্ষার পর আমাকে কি কি করতে হবে? মঠের প্রেসিডেন্টের দেহত্যাগ হলে, ভক্তরা প্রথমে এসেই মহারাজদের কাছে জানতে চাইবে, আমার গুরুদেবের দেহ চলে গেছে, আমাকে এই কদিন কি কি করতে হবে? মানুষ অতটুকুই জানতে চায়, আমাকে কি কি করতে হবে। এটাকে বলে concretisation।

সেখান থেকে ধীরে ধীরে চলে যায় generalizationএর দিকে আর সেখান থেকে শেষে abstractionএ। ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু, এটাই সব থেকে উচ্চতম অবস্থা, কিন্তু শুরুতেই মানুষ এটা নিতে পারে না। বলছেন, The first two are for the time being; philosophy is the underlying basis of all, and the others are only stepping stones in the struggle to reach the Ultimate, (*এদের মধ্যে প্রথম দুটি শুধু সাময়িক প্রয়োজনের জন্য, কিন্তু দর্শনই ঐ সকলের ভিত্তিস্বরূপ, আর অন্যগুলি সেই চরমতত্ত্বে পৌঁছাবার সোপান মাত্র।*) আমাদের যত শাস্ত্র আছে, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত যত ধর্মগ্রন্থ আছে, সবারই উদ্দেশ্য হলে শেষে উপনিষদে নিয়ে যাওয়া, উপনিষদ আমাদের ফিলজফি। রামকৃষ্ণ মঠের ভক্তরা ঠাকুরের কাহিনী, মায়ের জীবনের অনেক কাহিনী, স্বামীজীর জীবনের মজার মজার ঘটনাগুলো সবাই জানে। কিন্তু স্বামীজীর রচনাবলী, লীলাপ্রসঙ্গ ভক্তরা পড়তে গেলে কয়েক পাতা পড়ার পর ছেড়ে দেয়, কারণ তাদের কাছে এগুলো খুব কঠিন হয়ে যায়। বুঝতে না পারাটা লজ্জার কিছু না, কিন্তু এর বাইরে বাকি যা কিছু করা হচ্ছে এগুলো সবই stepping stones, যদি ঠিক মত এতেই লেগে থাকে তাহলে এটাই আমাদের সেখানে নিয়ে যাবে। একটা জায়গাতে যদি থেমে যায়, তাহলে ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে, পতন হবে না। আবার যখন চলা শুরু হবে, তখন ঐ জায়গা থেকেই সে এগোতে থাকবে।

ফিলজফি মানে যেখানে চরম উপলব্ধি হয়, যেমন ঠাকুর দেখলেন মা কালীই সব হয়েছেন, ঠাকুর দেখলেন ব্রহ্মই সব কিছু হয়ে আছেন, সচ্চিদানন্দই সব, এরপর ঠাকুর যখন বলছেন, ঈশ্বরই বস্তু আর বাকি সব অবস্তু, এটাই তখন ফিলজফি হয়ে গেল। এরপর যাঁরা আসবেন, তাঁদের মধ্যে যাঁরা সত্যিকারের প্রতিভাবান, সচ্চিদানন্দই বস্তু, এটাকে এবারে তাঁরা পুরাণের একটা কাহিনীতে দাঁড় করিয়ে দেবেন। সেই হিসাবে বলা যেতে পারে, রামকৃষ্ণ ভাবধারায় ঠাকুরের জীবনদর্শনকে আধার করে পুরাণ লেখা এখন শুরুই হয়নি। তবে সব ঘটনাগুলো এখনও এত জীবন্ত আর প্রাঞ্জল ভাবে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে যে, একটু এদিক সেদিক কেউ কিছু লিখলেই হৈ চৈ পড়ে যাবে। আবার ঠাকুর হলেন forms and rituals। সচ্চিদানন্দই বস্তু, এটাই যখন কাহিনীতে রূপান্তরিত করা হয় তখন সেটাই হয়ে যায় পৌরাণিক বা মিথলজি, আবার এটাই যখন concrete practiceএ রূপান্তরিত হয়ে যায়, আমরা তখন বলছি পূজা উপাচার, আচরণ বিধি। আত্মাই ব্রহ্ম, সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম এই ধরণের যে কথাগুলো উপনিষদ বলছেন, হিন্দুদের যত অনুশীলন আছে সেগুলো বা ওই সত্যকেই যখন concrete practiceএ নেওয়া হচ্ছে, সেগুলো তখন আমাদের কাছে rituals হয়ে যায়, শুধু আমাদের কাছেই না, সবারই কাছে। ইসলামে আল্লাই একমাত্র আছেন, এটাই ওদের ফিলজফি, আর এটাকেই কেন্দ্র করে ইসলামে সব ধর্মীয় অনুশীলন চলে। দিনে পাঁচবার নমাজ পড়তে হবে, জীবনে একবার হজ করতে হবে, রমজানে রোজা রাখতে হবে, সব কিছুর উৎস কোরাণের ওই ফিলজফি। ঋষিরা যে সত্যগুলিকে দেখেন, সেটাকে যখন চিন্তনের মাধ্যমে রাখা হয় তখন তাকে ফিলজফি বলা হয়, কাহিনীর মাধ্যমে রাখলে সেটাকে মিথলজি বলা হয়, আর আচার আচরণে যখন নামানো হয় তখন rituals বলা হয়। এই ritualএর আবার দুটো রূপ হয়ে যায়, একটা পূজা অর্চনা রূপে, আরেকটা সামাজিক আচরণ বিধি রূপে। ব্যবহারেও আমাদের সেটাই থাকে, ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু, হিন্দুদের আচার আচরণ এই সত্যকে কেন্দ্র করেই চলে।

পাশ্চাত্য জগতে দর্শন যে-ভাবে চলে

স্বামীজী এবার পাশ্চাত্য জগতের ফিলজফি কিভাবে চলে বলছেন। In Western religion the idea is that without the New Testament and Christ there could be no religion. (*পাশ্চাত্য দেশের ধারণা হল – বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্ট ও খ্রীষ্ট ব্যতীত ধর্মই হতে পারে না।*) পুরো পাশ্চাত্য জগতের মানুষের একটা ভাব হল, ধর্ম মানেই নিউ টেস্টামেন্ট আর খ্রাইস্ট। যার জন্য কোন খ্রীশ্চন, বিশেষ করে কোন পাদরির সাথে কথা বললে দেখা যাবে, সব সময় ওরা বলবে, যদি তুমি খ্রাইস্টকে না মানো তাহলে you will be damed, salvation depend only on Christ। আমরা আগেও বলেছি, থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে যে কজন স্বামীজীর শিষ্য ছিলেন, তাঁরা সবাই গোঁড়া খ্রীশ্চান ছিল। গোঁড়া হওয়ার জন্য স্বামীজী মাঝে মাঝেই খ্রীশ্চান ধর্মে কোথায় কোথায় গলদ, কোথায় তাদের ধর্মের দুর্বলতা একেবারে স্পষ্ট করে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতেন। হিন্দু ধর্ম আর অন্যান্য বড় ধর্মগুলির মধ্যে একটা বড় পার্থক্য হল,

খ্রীশ্চান ধর্ম, ইসলাম ধর্ম কয়েকটা শব্দকে নিয়ে চলে, অন্য দিকে হিন্দু ধর্ম সিদ্ধান্তকে নিয়ে চলে। সিদ্ধান্তকে নিয়ে চলা মানেই, পুরো abstractionকে নিয়ে চলা। ইসলাম বলছে, আল্লাই আছেন। আমি কেন মানব আল্লাই আছেন? মানবে কারণ কোরাণ বলছে। ঠাকুর বলছেন, সচ্চিদানন্দই বস্তু। কেন মানব? ভক্তরা বলবে, ঠাকুর বলেছেন তাই মানছি। না এভাবে শুধু মেনে নিয়েই থেমে থাকলে চলবে না, এই সত্য তোমাকেও উপলব্ধি করতে হবে। আমাদের বুঝতে হবে সচ্চিদানন্দ বলতে এনারা কি বলছেন।

সেইজন্য আমাদের ঋষিরা বলেই দিচ্ছেন, সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, এই সত্যকে যে কোন মানুষ উপলব্ধি করতে পারবে। এই সত্য তাই universal। কিন্তু ইসলামে কি বলছে? আল্লাই আছেন, এটা কে উপলব্ধি করবে? মুসলমানরা ছাড়া কেউ উপলব্ধি করতে পারবে না। তার মানেই ইসলাম universal নয়, Islam is not founded on principles, is founded on words। সিদ্ধান্ত কিন্তু সীমিত, তার মানে যে কোন মানুষ যে মুসলমান নয়, সে ইসলামের সত্যকে পাবে না। খ্রীশ্চানদেরও যে সত্যগুলি আছে সেগুলো খ্রীশ্চানদের জন্যই, অন্যদের জন্য নয়। হিন্দুদের যে সত্যগুলো আছে, সেই সত্যগুলি কেবলমাত্র হিন্দুদের জন্য নয়, সবারই জন্য। যে কেউ সাধনা করলে এই সত্যগুলোকে সেও উপলব্ধি করতে পারবে। কিন্তু খ্রীশ্চান ধর্মে হবে না, কারণ ওটা পুরো personalised। স্বামীজী যখনই সুযোগ পেতেন তখনই এই জিনিসটাকে নিয়ে খ্রীশ্চান ধর্মকে প্রচুর আক্রমণ করতেন। খ্রীশ্চান ধর্ম শ্রেষ্ঠ ধর্ম। কেন শ্রেষ্ঠ ধর্ম? কারণ বাইবেল বলে। বাইবেল কি? খ্রাইস্টের কথা। অমুক বাবাজী বলছেন, তিনিই একমাত্র সৎগুরু। কি করে? এই বইতে লেখা আছে। বইটা কে লিখেছেন? উনিই লিখেছেন। তাহলে কি এই কথার কোন দাম আছে? পুরো যুক্তিতেই জিনিসটাকে উড়িয়ে দেওয়া যায়। হিন্দুরা কখনই বলবে না যে, আমি যেটা বলছি সেটাই সত্য। কেন? তুমি নিজেও এটা পেতে পার। স্বামীজী ঠিক এই জিনিসটাকেই বলছেন।

আর বলছেন, A similar belief exists in Judaism with regard to Moses and the Prophets, because these religions are dependednt upon mythology only. (*ইহুদি ধর্মেও মুশা ও প্রফেটদের সম্বন্ধে এই রকম এক ধারণা আছে। এরূপ ধারণার হেতু এই যে, এই-সব ধর্ম কেবল পৌরাণিক বর্ণনার উপর নির্ভর করে।*) এখানে ইসলামকে নিয়ে বলছেন না। কিন্তু মধ্য প্রাচ্যের যে চারটি ধর্ম, চারটে ধর্মেই এই সমস্যা আছে। এর মধ্যে জিউসদের সমস্যা আরও গভীর, কারণ ওদের মোজেস ও অন্যান্য প্রফেটদের কাহিনীগুলো পুরো মিথলজিতে চলে গেছে। ওর মধ্যে কোনটা সত্য কাহিনী আর কোনটা সত্য কাহিনী নয় বোঝা মুশকিল। প্রফেট মহম্মদের জীবনী যদি ভাল ভাবে জানা থাকে, তাহলে দেখা যাবে মহম্মদের জীবনে মিরাকেলস্ নেই, একেবারেই যে নেই তাও না। অনেকগুলো কাহিনী আছে, যেমন হেরোথ নামের এক ঈশ্বরীয় ঘোড়ার উপর বসে তিনি আল্লার কাছে যেতেন। এগুলোও মিরাকুলাস কাহিনী, মিথলজি মানেই মিরাকেলস্। যেমন শ্রীকৃষ্ণ, ছ-দিন বয়স হয়নি, তার মধ্যে পুতনাকে স্তন পান করতে গিয়ে বধ করে দিয়েছেন, এটা মিথলজি, মিরাকেল দেখাচ্ছেন। শ্রীকৃষ্ণের যত কাহিনী সবই মিরাকেলস্। মিরাকেলস্ ছাড়া মিথলজি হয় না, মিরাকেলস্ মানে যেটা আমাদের বাস্তব জীবনের সাথে মেলে না। উপনিষদ আবার মিরাকেলস থেকে দূরে থাকেন। রামায়ণ মহাভারত আবার প্রচুর মিরাকেলস্ নিয়ে চলে। আর পুরাণ তো পুরোপুরি মিরাকেলসের উপর দাঁড়িয়ে আছে। মিথলজি বলতে যেখানে মানুষকেও নিয়ে আসা হয়েছে, সেটাকেও স্বামীজী মিথলজির মধ্যে নিয়ে আসছেন।

কেন এই ধরণের মিরাকেলস্ রাখা হয়? তা নাহলে আমাদের মত স্থূল মস্তিষ্কের লোকেদের বোঝান যাবে না। ছোট পাথর ভাঙার জন্য ছোট হাতুড়ি লাগে, বড় পাথর ভাঙার জন্য বড় হাতুড়ি লাগে। আমাদের মন হল একটা বড় পাথর, এই ধরণের মিথলজি গিয়ে যখন বড় হাতুড়ি হয়ে দুম্ দুম্ করে পড়বে তখন মনটা কয়েকটা টুকরো হবে। তারপর ধীরে ধীরে ছোট ছোট হাতুড়ি নিয়ে আসা হবে। ছোট ছোট হাতুড়ি দিয়ে মেরে মেরে ওই পাথরের টুকরো আরও বালির মত ফাইন হবে। ওই বালিকে পেষার পর কবে ওটা ধুলো হবে, সেই ধুলোতে জল ঢেলে কবে মাটি হবে, সেই মাটি দিয়ে কবে মুর্তি তৈরী হবে, অনেক দীর্ঘমেয়াদী ব্যাপার। মিথলজিতে মিরাকেলসের কাহিনীগুলো হল বড় বড় হাতুড়ি।

বিজ্ঞান প্রকৃত ধর্মের ভিত্তিকে যেভাবে দৃঢ় করেছে

স্বামীজী বলছেন, Real religion, the highest, rises above mythology; it can never rest upon that, (*প্রকৃত সর্বোচ্চ ধর্ম এই-সকল পৌরাণিক বর্ণনাকে ছাড়িয়ে ওঠে; সেই ধর্ম কখনও শুধু এগুলোরই উপর নির্ভর করতে পারে না।*) প্রকৃত ধর্মে, আমি, তুমি, সে, কোন specific হবে না, যেটা আছে সবারই জন্য আছে। আগামীকাল যদি কেউ বলে দেয়, নিউটনের সিদ্ধান্তগুলি ইংল্যাণ্ডে প্রযোজ্য, তার বাইরে কোথাও প্রযোজ্য হবে না, তাহলে এটা আর সত্য থাকল না। প্রকৃতির নিয়মকে সব জায়গাতেই প্রযোজ্য হতে হবে। কিছু দিন আগে সংবাদে একটা খবর এসেছে, যেখানে বলছে, আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের পাশেই যে ব্রহ্মাণ্ড আছে, সেখানেও আইনস্টাইনের থিয়োরী প্রযোজ্য। বিজ্ঞানীরা এই কথা শুনে খুব অবাক হয়ে গেছেন। সাধারণ ভাবে বিজ্ঞানীরা বলে থাকেন, ফিজিক্সের যত সিদ্ধান্ত আছে, এই সিদ্ধান্তগুলি আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডেই চলে। এর পর থেকে যে ব্রহ্মাণ্ডগুলি আছে, সেখানে এই সিদ্ধান্ত গুলি চলবে কিনা, জানার কোন পথ নেই। অবশ্য বিজ্ঞানীরা কখন কি বলেন কোন ঠিক নেই, ওনারা বলেন আর আমাদের মেনে নিতে হয়। কিন্তু একটা কিছু নিয়ম যদি হয়, সেই নিয়ম সব জায়গাতেই প্রযোজ্য হবে। ধর্মকে নিয়ে যদি হয়, ধর্ম মানে ঈশ্বরকে নিয়ে যে সত্যগুলি আছে, যদি এটা সত্য তাহলে সব জায়গাতেই সেটা সত্য হবে। যেমনি একটা সীমার মধ্যে ফেলে দেওয়া হবে, তখন আর সেটা সত্য থাকল না। একমাত্র এই কারণে স্বামীজী মধ্য প্রাচ্যের ধর্মগুলিকে বেশী গুরুত্ব দিতেন না। কারণ এই ধর্মগুলি খুবই সীমিত, মিথলজির উপর আধারিত, আর কোন বিশেষ ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে দাঁড়িয়ে আছে; খ্রাইস্ট, মোজেস্, মহম্মদ, জরাথ্রুস্ট এনাদেরকে আধার করে চলে। আমাদের এখানে person based religion নেই। রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত, তাঁরা ঠাকুরকেই মেনে চলেন, কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনের যে মূল ধর্ম, ওটা ঠাকুর কেন্দ্রিক নয়। ঠাকুর হলেন, সেই যে পরম সিদ্ধান্ত, পরম সত্য, তাঁরই রূপ। রামকৃষ্ণ মিশন কখনই বলে না যে, ঠাকুরই একমাত্র সত্য, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য এনারা সত্য নন। রামকৃষ্ণ মিশন ওই সত্যকেই মানছেন, যার একটা রূপ শ্রীরামকৃষ্ণ। ঠিক এই জায়গাতে এসে হিন্দু ধর্ম অন্যান্য ধর্ম থেকে আলাদা হয়ে যায়।

তারপরেই স্বামীজী বলছেন, Modern science has really made the foundations of religion strong. (*আধুনিক বিজ্ঞান বাস্তবিকই প্রকৃত ধর্মের ভিত্তিকে আরও দৃঢ় করেছে।*) স্বামীজীর সময় বিজ্ঞান খুব শৈশব অবস্থায় ছিল, বর্তমান কালে বিজ্ঞান বলতে আমরা যেভাবে জানছি, সেই সময় বিজ্ঞান বর্তমানের মত এত উচ্চপর্যায়ে ছিল না। স্বামীজী ধরাধামে আসার আগেই ফরাসী বিপ্লব হয়ে গিয়েছিল। ফরাসী বিপ্লবের পর Realismএর ফিলজফি খুব প্রভাবশালী হয়ে গিয়েছিল। এই Realism বিভিন্ন রূপে বিজ্ঞানকে খুব প্রভাবিত করেছিল। ওদের প্রধান মত ছিল, আমরা যে বস্তুকে দেখতে পাই, মাপতে পারি, তুলনা করতে পারি, সেটাই সত্য বাকি সব অসত্য। সেই সময় এলেন জন ডালটন, তিনি দিলেন atomic laws, পরে পরে সেই atomic lawsকে বলা শুরু হল Dalton’s Atomic Laws। প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা থেকে এ্যটমের চিন্তা-ভাবনা চলে আসছে, এই চিন্তা-ভাবনা থেকেই একটা সময় থেকে এ্যটম শব্দটা বিজ্ঞানে এসে গেল। সেই এ্যটমের উপর ডালটন অনেক নিয়ম বার করলেন, আজও সেই নিয়মের উপর অনেক কিছু চলছে। কিন্তু সেই সময় বিজ্ঞানীদের একটা গোষ্টি বলতে শুরু করল, এটা বিজ্ঞান নয়। কেন বিজ্ঞান নয়? কারণ এ্যটমকে আমরা দেখতে পাই না, যেহেতু এ্যটমকে দেখা যায় না, সেইহেতু এ্যটমকে বিজ্ঞানে আনা যাবে না। আইনস্টাইনই প্রথম এসে এ্যটমের অস্তিত্ব প্রমাণ করলেন। উনি অন্য ভাবে একটা পরীক্ষা চালালেন আর তাতে পরিষ্কার হয়ে গেল Atom do exist। স্বামীজী এর অনেক আগেই ধরাধাম ছেড়ে চলে গেছেন। কিন্তু ডালটন যে Atomic Laws গুলো দিয়ে গিয়েছিলেন, সেগুলো স্বামীজী পড়েছিলেন, জানতেন। স্বামীজী যখন এই কথগুলো বলছেন, তখন বিজ্ঞান খুব প্রাথমিক অবস্থায় ছিল। আজকের দিনে স্বামীজী যদি বলতেন, তাহলে তিনি অনেক বেশি জোর দিয়ে, আরও অনেক ভাল ভাবে বলতে পারতেন। স্বামীজী সেই সময় যে সত্যগুলি বলেছেন, তখনও সেই সত্যগুলি পুরোদমে বিজ্ঞানে বা সমাজে আসেনি।

সেটাকে আধার করেই স্বামীজী বলে যাচ্ছেন, That the whole universe is one, is scientifically demonstrable. What the metaphysicians call ‘being’, the physicist call ‘mattar’, but there is no real fight between the two, for both are one. (*সমুদয়*

ব্রহ্মাণ্ড যে এক অখণ্ড বস্তু, তা বিজ্ঞানের দ্বারা প্রমাণ করা যেতে পারে। দার্শনিক যাকে সত্তা বলেন। বৈজ্ঞানিক তাকেই জড় বলে থাকেন, কিন্তু ঠিক ঠিক দেখতে গেলে এদের দুজনের মধ্যে কোন বিরোধ নেই, কারণ তত্ত্বতঃ দুই-ই এক জিনিস।) যাঁরা দর্শন নিয়ে, ধর্ম নিয়ে কথা বলেন, তাঁদের কাছে শেষ সত্তা হল 'being', এটা একটা পরিভাষা, যে কোন জিনিসকে ওরা বলে 'being', বৈজ্ঞানিকরা বলে পদার্থ (matter)। ডালটন যখন এ্যাটমিক থিয়োরি দিলেন, তিনি প্রথম ওটাই বললেন, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এ্যাটম দিয়ে তৈরী। স্বামীজী এখানে একত্বকে বোঝাবার জন্য ডালটনের এই থিয়োরীকে আধার করে বলছেন, তিনি ডালটনের Theory of Atom পড়েছিলেন। একজন সাধারণ মানুষের কাছে আমি আলাদা জগৎ আলাদা, একটা বস্তু থেকে আরেকটা বস্তু আলাদা। ডালটন যেমনি বলে দিলেন, সমস্ত বিশ্বে যাবতীয় যা কিছু আছে সব এ্যাটম দিয়ে তৈরী। তার মানে দাঁড়াচ্ছে, যদি এ্যাটমকে আমরা সত্য বলে নিই, যদি এ্যাটমকে ভগবান মনে করি, তাহলে বিজ্ঞানের অনুসারে সবটাই এ্যাটম। স্বামীজী তখনও জানেন না যে, কয়েক বছর পরে $E= MC^2$ আসছে, যেখানে এ্যাটমকে নিয়ে যে অল্প একটু সন্দেহ আছে সেটাও চলে যাবে, আর শেষ পর্যন্ত সব কিছু এনার্জি। স্বামীজী জানলে তো লাফিয়ে উঠতেন, আরে ভাই কবে থেকেই তো আমরা বলে আসছি, প্রকৃতিই সব কিছু। বিদেশে গিয়ে ওখানকার লোকেদের প্রকৃতি, এনার্জি, কালী নিয়ে বলতে গিয়ে স্বামীজীর দম বেরিয়ে গেছে, কারণ তখন লোকেরা জানেও না এনার্জি আর প্রকৃতির কি সম্পর্ক। অথচ স্বামীজী ১৯০২ সালে চলে গেলেন, আর ১৯০৪ সালে এলো $E= MC^2$, অবশ্য তখনই স্বামীজী বুঝতে পারতেন না, কারণ ওর impact ১৯১৮ সালে বোঝা গেল। স্বামীজী চল্লিশ বছর বয়সে চলে গেলেন, আর যদি ষোল বছর অর্থাৎ আটান্ন বা ষাট বছর বয়স পর্যন্ত যদি থাকতেন, তখন ফিলজফিতে $E= MC^2$ র কি সাংঘাতিক implication হতে যাচ্ছে, সেটা আমরা পেয়ে যেতাম।

স্বামীজী এখানে বলছেন, metaphysics বা দর্শনে যেভাবে 'being' বলে, 'being' মানে অস্তিত্ব, এই অস্তিত্বের স্তরে আমরা সবাই সমান। তোমরা খ্রীশ্চানরা যে বলছ, আমরা খ্রীশ্চানরা আলাদা, হিন্দুরা আলাদা, মুসলমানরা আলাদা, কিন্তু ফিলজফি বা metaphysics বলছে সমস্ত অস্তিত্ব এক। যদি এ্যাটমকে তুমি শেষ সত্য বলে মনে কর, তাহলে কোথায় খ্রীশ্চান আর কোথায় হিন্দু, সবটাই এ্যাটম। এক ধাপ পিছনে তুমি যদি চলে যাও, তাহলে সবটাই এনার্জি। তুমি বৃথাই এই কথা বলে লাফালাফি করছ যে, তুমি খ্রীশ্চান বলে স্বর্গে যাবে আর যারা খ্রীশ্চান নয় তারা নরকে যাবে। আগের দিকে আমরা আলোচনা করেছিলাম, ডেকার্ড কিভাবে মন আর ম্যাটারকে কার্টিশান ডিভিশনে ফেলে ডিভাইড করে দিলেন। স্বামীজী ওই জিনিসটা ভেঙে চুড়মার করে দিচ্ছেন। তোমরা দেখ, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আসলে এক, এই এক আমি বলছি বলে এক নয়, বিজ্ঞান বলছে। ডালটন যে এ্যাটমিক থিয়োরি নিয়ে এলেন, আর যে থিয়োরিকে প্রথমের দিকে বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন কারণে মানতে চাইছিলেন না, সেটাই পরে গিয়ে অন্য রকম হয়ে গেল। খ্রীশ্চানদের যাঁরা সেই সময়কার বড় নেতা ছিলেন, তাঁদের কাছে এ্যাটমিক থিয়োরি তখনও পরিষ্কার ছিল না, কিন্তু এ্যাটমিক থিয়োরি আসার জন্য ভিতরে ভিতরে ধর্মগুলির যে এই exclusiveness, অর্থাৎ বিভিন্ন ধর্ম যে বলে আমরাই একমাত্র স্বর্গে যাব, অন্য ধর্মের কেউ যেতে পারবে না, এই প্রোপাগাণ্ডাটা নষ্ট হয়ে গেল।

আমরা এখন বর্তমান কালে জানি, ফিজিক্সকে যদি পিছনের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন সেখানে দেখা যাচ্ছে এ্যাটমসেরও পার্টিকেলস রয়েছে, আর শেষ পর্যন্ত চলে গেলে থাকছে শুধু এনার্জি বা শক্তি। আমরা শক্তিকেই বলছি প্রকৃতি, আর এই কথা আমরা হাজার হাজার বছর আগে থেকে বলে আসছি। সেইজন্য হিন্দু ধর্ম কখনই বলে না যে, আমি তোমার থেকে শ্রেষ্ঠ, ওই দৃষ্টিতে তারা ভেদ বোধ আনে না। কারণ হিন্দু ধর্ম জানে শেষ পর্যন্ত সব কিছু এক। অন্য ধর্মও বলবে ঠিকই সেই একত্বই আছে। কি রকম একত্ব? ভগবানই একমাত্র শেষ কথা, স্বর্গটাও তাঁর, নরকটাও তাঁর। কিন্তু এই একের মধ্যে খ্রীশ্চানরা হল স্বর্গের লোক, বাকিরা নরকের লোক। স্বামীজী যখন একত্বের কথা বলছেন, তখন তিনি এইভাবে আলাদা করে দেওয়ার পর একত্বকে আনছেন না।

ব্রহ্মাণ্ডের একত্ব

বলছেন, Though an atom is invisible, unthinkable, yet in it are the whole power and potency of the universe. (*দেখ না –পরমাণু অদৃশ্য ও অচিন্ত্য, অথচ তাতে ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় শক্তি ও সম্ভবনা রয়েছে।*) স্বামীজী এই কথা কি করে বলছেন, আমরা ধারণাই করতে পারি না। যে সময়ের উপর দাঁড়িয়ে স্বামীজী এই কথা বলছেন, সেই সময় এই কথার কোন অর্থই হয় না। আজকে আমরা এ্যাটমকে যেভাবে জানি, তখনও এ্যাটমের এই জ্ঞান কারুরই ছিল না। এটা ঠিকই যে ডালটন এ্যাটমের থিয়োরি নিয়ে এসেছিলেন, তার কয়েকটা নিয়মকেও নিয়ে এসেছিলেন, আর সেখানে এও বলছেন, যা আছে তা আছে, তাকে সৃষ্টিও করা যাবে না, নাশ করাও যাবে না। ওরা খ্রীশ্চান মিথলজিতে বড় হয়েছে, খ্রীশ্চানদের মধ্যে এই ধারণাটা আছে, জগৎটা যেমন আছে তেমনিই আছে, it can neither be created nor destroyed। তার কিছু দিন পর আইনস্টাইন যখন $E= MC^2$ নিয়ে এলেন, তখন দেখা গেল, Atom can be created and Atom can be destroyed। সেইজন্য এ্যাটমকে কখনই আত্মার সাথে মিলিয়ে দেওয়া যাবে না। এখন সমস্যা হল, আচার্য শঙ্কর বা উপনিষদ যখন একত্বের কথা বলছেন, সেখানে চৈতন্যের স্তরে একত্বকে দেখাচ্ছেন। স্বামীজী দেখাচ্ছেন, এই যে ভৌতিক জগৎ যেটা আছে, এখানেও কিন্তু একত্ব রয়েছে। আত্মার দৃষ্টিতে যে একত্ব দেখছি, সেখানে অবশ্যই একত্ব আছে, কিন্তু সেই একত্বটা সব জায়গাতেই আছে। কোথায় আছে? এই ভৌতিক জগৎকে যদি এ্যাটমিক দৃষ্টির স্তরে দেখ, তাহলে সেখানেও একত্ব আছে। আর এ্যাটমিক স্তরে যদি তোমার সন্দেহ থাকে, তাহলেও এনার্জির স্তরে গিয়ে সব এক, সেখানে কোথাও দুই নেই।

স্বামীজী এবার একত্বকে এ্যাটম থেকে সরিয়ে আত্মার উপর নিয়ে আসছেন, বলছেন, That is exactly what the Vedantist says of Atman. (*বেদান্তীরাও আত্মা সম্বন্ধে ঠিক এইভাবের কথাই বলেন।*) বেদান্তীরা ঠিক এ-ভাবেই আত্মার সম্বন্ধে এই কথাই বলছেন। ভৌতিক জগতে সব কিছু যেমন এ্যাটম থেকে সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি উপনিষদে এটাই বলে, আত্মা থেকেই সব এসেছে। All sects are really saying the same thing in different words. (*প্রকৃতপক্ষে সব সম্প্রদায়ই বিভিন্ন ভাষায় ঐ এক কথাই বলছেন।*) এটা স্বামীজীর নিজস্ব একটা খুব প্রিয় থিয়োরি ছিল। ফিজিক্সও একত্বের কথা বলছে, কেমেস্ট্রি যখন বলছে, তারাও সেই একত্বের কথা বলছে, আর ফিজিক্স যেদিন সেই উৎসকে আবিষ্কার করে নেবে, যেখান থেকে সমস্ত শক্তি বেরোচ্ছে, সেদিন ফিজিক্স শেষ। কেমেস্ট্রি যেদিন সেই element বার করে নেবে যেখান থেকে সব element বেরোচ্ছে, কেমেস্ট্রির অন্বেষণ শেষ হয়ে যাবে। স্বামীজী যখন অন্যান ধর্মগুলিকে আক্রমণ করছেন, তখন ওদের ভেদ ভাব আর আমাদের একত্বের ভাব, এই দুটোকে নিয়ে আসছেন। হিন্দুদের দৃষ্টি সব সময় একত্বের দিকে, হিন্দু দর্শন ও বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীকে একটা প্ল্যাটফরমে দাঁড় করিয়ে দিলেন। ওদের দৃষ্টি সব সময় divisive। হিন্দুরা প্রথম থেকেই inclusive, ওরা জন্ম থেকেই exclusive, exclusive মানেই divisive। জগতে আমরা যা কিছু দেখছি, স্বামীজী দেখাচ্ছেন, তোমরা দেখ সেই এক থেকে কিভাবে বহু বেরিয়েছে। ফিজিক্সকে নিয়ে আসছেন দেখানোর জন্য, দেখ বিশ্লেষণ দিয়ে বিজ্ঞানও দেখাচ্ছে কিভাবে সব কিছু সেই এক থেকে আসছে। এই কথা আমরা বেদান্তের দিক থেকে বলি, কিন্তু চৈতন্যের দিক থেকে আমরা বলছি আত্মা।

খ্রীশ্চানদের থিয়লজিতে বলবে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন। কিভাবে করেছেন? তিনি অনেক কিছুর রচনা করলেন, অনেক কিছু রচনা করার পর তিনি মানুষ সৃষ্টি করলেন আর মানুষের বুকের হাড় থেকে নারীকে সৃষ্টি করলেন। তার মানেই সব কিছু, স্ত্রী পুরুষ সব আলাদা হয়ে গেল। এটাকে বলে creastmist থিয়োরি, যেখানে ভগবান সব কিছুকে আলাদা আলাদা ভাবে তৈরী করলেন, গরুকে আলাদা তৈরী করেছেন, মানুষকে আলাদা তৈরী করেছেন। গরু এই রকম কেন? কারণ ভগবান এভাবেই সৃষ্টি করেছেন। যেমনি ডারউইন তাঁর বিবর্তনবাদ থিয়োরি এনে বলছেন, এগুলো সব বিবর্তিত হয়ে হয়ে এই অবস্থায় এসেছে, খ্রীশ্চানরা রেগে আগুন হয়ে গেল। বেদান্ত মতে তা হয় না, বেদান্ত মতে *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*, ব্রহ্মই আছেন। হিন্দুদের কাছে একত্বকে নিয়ে কোন সমস্যা হয় না, আমাদের কাছে একটা divine oneness আছে। আগামীকাল যদি কেউ বলে বিবর্তনবাদ সত্য, আমরা বলব সত্য। যদি পরের দিন বলে creastmist থিয়োরিই সত্য, আমরা বলব সত্য। কারণ উপনিষদে ওই রকম আছে, ব্রহ্মা একটা একটা করে এই রকম সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু সব শেষে যে একত্ব, এই একত্বকে হিন্দুরা কখনই ত্যাগ করবে না। আগেকার দিনে যাদের পড়াশোনা ছিল না, যারা

জিনিসগুলো জানত না, তার হয়ত এই রকম বলবে। কিন্তু কেউ যদি হিন্দুদের যে কোন একটা শাস্ত্র পড়ে থাকে, তুলসীদাসের রামচরিতমানসকে নিয়েও যদি কেউ বড় হয়ে থাকে, তাহলে সেও একত্ব জিনিসটাকে অস্বীকার করতে পারবে না। রামচরিতমানসে কিছু না কিছু চৌপাঈ পেয়ে যাবে, যেখানে তুলসীদাস একত্বের কথা বলছেন। যে কোন সাধক যদি কোন শাস্ত্র রচনা করে থাকেন, সেখানে তিনি কিন্তু কখনই একত্বের বিরুদ্ধে যাবেন না। একত্বের এই বোধ, হিন্দুদের এই আধ্যাত্মিকতা তার জিনের মধ্যেই রয়ে গেছে। স্বামীজী বিদেশে একত্বকে নিয়ে বলতে গিয়ে বিভিন্ন জিনিসকে এনে একত্বকে দেখাচ্ছেন, তার মধ্যে একটা হল বিজ্ঞান।

এখন কে ঠিক? বাইবেলের creastmist থিয়োরি ঠিক, নাকি হিন্দুদের একত্বের থিয়োরি ঠিক? স্বামীজী বলছেন, তুমি ফিজিক্সে দেখে নাও, এ্যটমকে নিয়ে তারা বলছে, ভৌতিক জগৎ যেটা সেখানেও একত্ব রয়েছে, সুতরাং, any theory that goes for oneness is the ultimate truth। এই জিনিসটাকে তখন অনেকেই মানতেন না। স্বামীজী একবার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচার দিয়েছিলেন, সেখানে উইলিয়ম জেমস্ তখন প্রফেসর ছিলেন, যাঁর খুব নামকরা সব বই আছে। যদিও উইলিয়ম জেমস্ স্বামীজীকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি স্বভাবে এই একত্ব থিয়োরিকে একেবারেই মানতেন না। যাই হোক, স্বামীজী এখানে খ্রীশ্চানদের দেখাচ্ছেন, তোমাদের চিন্তা-ভাবনাতে কোথায় ভুল আছে। তোমরা যে creastmist থিয়োরিকে নিয়ে মনে করছ, আমি আলাদা, তুমি আলাদা, পুরুষ আলাদা, নারী আলাদা, তা নয়, একমাত্র সত্য হল একত্ব। আর এই একত্বের তত্ত্ব একমাত্র হিন্দুরাই দেয়, আর কোন ধর্ম দেয় না। যদিও বিজ্ঞান তখনও এই আইডিয়াকে নিয়ে আসতে পারেনি যে, ultimately everything is energy, কিন্তু স্বামীজী নাসদীয় সূক্তকে এনে দেখাচ্ছেন কিভাবে আকাশ ও প্রাণ থেকে সমস্ত সৃষ্টি বেরিয়েছে। কিন্তু লোকেদের সামনে এই জিনিসটাকে উপস্থাপন করার সময় তিনি ততটাই বিজ্ঞানের সাহায্য নিতেন, যতটা তখন বিজ্ঞানের থিয়োরিগুলি জনসমক্ষে এসেছে। জগদীশ চন্দ্র বোস যখন বললেন গাছেরও প্রাণ আছে, বিদেশীরা মানলই না। জগদীশ চন্দ্র বোসের মত এত বড় উচ্চমানের বৈজ্ঞানিক বিদেশে সম্মান পেলেন না কেবলমাত্র consciousness of plant বলার জন্য। এখন ধীরে ধীরে ওরাও আজকে consciousness এর দিকে যাচ্ছে। ওদের জন্য জগদীশ চন্দ্র বোস অনেক বেশি এগিয়ে ছিলেন, তাই জগদীশ চন্দ্র বোসের মত একজন এত উচ্চমানের বিজ্ঞানীকে নেওয়ার মত ক্ষমতাই তাদের ছিল না। স্বামীজী একত্ব জিনিসটাকে বলতে গিয়ে দেখাচ্ছেন, আমরা জিনিসটাকে কিভাবে দেখি, খ্রীশ্চানরা কিভাবে দেখে, বিজ্ঞান কিভাবে দেখে, আর বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী কিভাবে আমাদের প্রাচীন ধর্মের দৃষ্টির সাথে মিলে যাচ্ছে।

১৪ই জুলাইয়ের স্বামীজীর সমগ্র আলোচনা কয়েকটা জিনিসকে নিয়ে, যার মধ্যে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, যে কোন জিনিসে প্রথমে আসে generalisation, দ্বিতীয় construction আর শেষে আসে ফিলজফি। সেখান থেকে স্বামীজী পরে যেটাতে আসছেন, তা হল, ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোথায় কোথায় মিল রয়েছে। ধর্ম বলতে স্বামীজী বেদান্তকে বোঝাচ্ছেন, আর বর্তমান বিজ্ঞান কিভাবে ধর্মকে অর্থাৎ বেদান্তকে সমর্থন করছে। বিজ্ঞান মূলতঃ দৃশ্য জগৎকে নিয়ে চলে, দৃশ্য জগৎ মানে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে জগৎকে আমরা জানতে পারছি বা ইন্দ্রিয়কে টেলিস্কোপ, মাইক্রস্কোপের মাধ্যমে সম্প্রসারিত করে জগৎকে জানা যাবে বা যেটা invisible universe যেটাকে quantify করা যাবে, তার মানে কোন না কোন ভাবে quantification, comparison এগুলো যদি হয় তবেই সেটা বিজ্ঞানের এলাকায় আসবে। আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে যে যুস্মদ্ প্রত্যয়ের কথা বলছেন, যার ব্যাপারে আমরা আগে বিস্তারিত আলোচনা করেছি, যুস্মদ্ প্রত্যয় মানে এই জগৎ, যুস্মদ্ প্রত্যয় হল বিজ্ঞানের বিষয়।

বেদান্ত ও বিজ্ঞানের মিল ও অমিল

বেদান্ত দৃশ্যের দিকে তাকায় না, দ্রষ্টার দিকে তাকায়। বেদান্তের তাই কাজ হল দ্রষ্টাকে নিয়ে আলোচনা করা, দ্রষ্টাকে নিয়ে চিন্তন-মনন করা। যুস্মদ্ প্রত্যয় আর অস্মদ্ প্রত্যয়, জগৎ আর আমি। বিজ্ঞানের কাজ হল, quantification, comparisonআদি করে দৃশ্যকে নিয়ে ব্যাখ্যা করা। বেদান্তের আলোচনা একমাত্র দ্রষ্টাকে নিয়ে। এবার মজার ব্যাপার হল, এই দৃশ্য জগৎকে ছেড়ে বেদান্ত দ্রষ্টাকে আলোচনা করছে বলে, জগতের যখন বেদান্ত ব্যাখ্যা করে, তখন দ্রষ্টার দৃষ্টি দিয়েই করে। বিজ্ঞান দৃশ্যকে নিয়ে চলে, সেইজন্য

বিজ্ঞান দ্রষ্টাকেও দৃশ্য রূপে study করতে যায়। এই জায়গাতে এসে দুজনেই গোলমাল পাকিয়ে দেয়। আচার্য শঙ্করও বলছেন দুটো আলাদা, তাই তিনি নিয়ে এলেন যুস্মদ্ প্রত্যয় আর অস্মদ্ প্রত্যয়, দৃশ্য আলাদা, দ্রষ্টা আলাদা। আর দুজনের তফাৎ কি রকম? আলো আর আঁধারের মত। আলো আর অন্ধকারে যেমন কোন কিছুর মিল নেই, ঠিক তেমনি যুস্মদ্ প্রত্যয় আর অস্মদ্ প্রত্যয় এই দুটোর কোন মিল নেই। ব্রহ্মসূত্রের উপর আলোচনার সময় এটার উপর দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছিল। ঠিক তেমনি দৃশ্য আর দ্রষ্টা এই দুটোর কোন meeting ground থাকে না, হতেই পারে না। সেইজন্য বিজ্ঞান আর বেদান্ত কোন দিন মিলবে না। তাই না, বেদান্ত আবার বিজ্ঞানের এলাকাকে দ্রষ্টাকে দিয়ে ব্যাখ্যা করছে। এর থেকে আরও মারাত্মক কাজ বিজ্ঞান করছে, সে দৃশ্যকে যন্ত্র বানিয়ে দ্রষ্টাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছে।

এটা যেমন একটা দিক গেল, আবার অনেকগুলো জায়গায় বিজ্ঞান ও বেদান্তের মিল আছে। দুটোই বৃহৎ বিজ্ঞান। কেন বৃহদাকার বিজ্ঞান? স্বামীজী বার বার বলছেন, ঈশ্বর অনন্ত, ঈশ্বরের সৃষ্টিও অনন্ত, কিন্তু এই অনন্তের মধ্যে তফাৎ হল, সৃষ্টি পুরোপুরি ঈশ্বরের উপর নির্ভর। সেইজন্য ঈশ্বর যেভাবে অনন্ত, সৃষ্টি সেইভাবে পুরোপুরি অনন্ত নয়। দ্বিতীয় হল, সৃষ্টির কোন স্বাধীন সত্তা নেই। সাংখ্য মতে যদিও সৃষ্টির স্বাধীন সত্তা আছে, কিন্তু বেদান্ত মতে নেই। স্বাধীন সত্তা না থাকলেও সৃষ্টি কিন্তু অনন্ত। ঈশ্বর হলেন দ্রষ্টা আর জগৎ দৃশ্য। দৃশ্য যদি অনন্ত হয় আর দ্রষ্টাও যদি অনন্ত হয়, তাহলে এটা তো স্বাভাবিক যে যখন আমাদের এই জগৎ চলছে, তখন এখানে কেউ ছোট নয়, কেউ বড় নয়। আমরা যে জগতে বাস করছি, সেখানে দুটোরই নিজস্ব গুরুত্ব আছে। সেইজন্য গায়ের জোরে বিজ্ঞান যদি এসে ধর্মকে ব্যাখ্যা করতে শুরু করে, তার নিজেরই সর্বনাশ হবে। ঠিক তেমনি, বেদান্ত যদি জগৎকে নিজের মত ব্যাখ্যা করতে শুরু করে, নিজের মত কি রকম, যেমন ত্রিকাল মে জগৎ নহি হ্যায়, সংসার মায়া – আর এগুলোই সাধারণ মানুষের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে আমাদের ব্যক্তি জীবন ও সমাজ জীবনের সর্বনাশ করে দিচ্ছে। জগৎ মায়া, এটা দ্রষ্টার দিক থেকে, দৃশ্যের দিক থেকে একটুকুও মায়া না। ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর সব কিছু চলছে। ঈশ্বরের ইচ্ছাকে যেমনি লাগিয়ে দিচ্ছে, তখনও জগতের সর্বনাশ করে দিচ্ছে। তাহলে বিজ্ঞানের যে এত সিদ্ধান্ত, সব ঈশ্বরের ইচ্ছা। ঈশ্বরের ইচ্ছা একদম ঠিক, কিন্তু এই সিদ্ধান্তগুলি যা আছে? এই সিদ্ধান্তের মধ্যেই টিকে থাকো। দৃশ্য জগৎ আর দ্রষ্টা জগৎ পুরো আলাদা। দুটো যখন মিলে যায়, তখন আমরা এখন যে জগৎকে অনুভব করছি, সেটা ওই জগৎ। কিন্তু ওই দুটো যখন মিলে যাচ্ছে, আর বিজ্ঞান ও বেদান্ত দুজন মিলে যার অনুসন্ধান করছে, আমরা এখানে সেই ঋষির কথা, যিনি উচ্চতম জায়গায় চলে গেছেন, আলোচনা করছি না, আমরা তখন সেখানে বেদান্তকে একটা জ্ঞান আহরণের যন্ত্র রূপে দেখছি, যার সাহায্যে একটা বিদ্যাকে অর্জন করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

প্রশ্ন হতে পারে বিজ্ঞান আর ধর্মের এই তফাৎ কিভাবে এলো? আগেকার দিনে এই তফাৎটা ছিল না, আর ভারতবর্ষে কোন দিনই ছিল না, আজকেও নেই। আমাদের কাছে বিজ্ঞানও একটা বিদ্যা, ধর্মও একটা বিদ্যা। বিদেশীদের কাছেও এই নিয়ে কোন সমস্যা নেই। আমরা অনেকবার আলোচনা করেছি, ডেকার্ড পাশ্চাত্য জগৎকে একটা থিয়োরী দিলেন, যে থিয়োরীতে তিনি ঈশ্বরকে একদিকে আর জগৎকে আরেক দিকে রেখে দিলেন। আর যেখানেই দ্বৈতবাদ আসবে সেখানেই এই সমস্যা অবশ্যই আসবে। বেদান্ত হিন্দুদের মূল ধর্ম, বেদান্ত বলতে উপনিষদের ধর্ম, গীতার ধর্ম। আমরা এখানে শঙ্করাচার্য, রামানুজ ও মাধ্বাচার্য এনাদের আনছি না, আমরা উপনিষদকে আধার করে যে বেদান্ত, তার আলোচনা করছি। স্বামীজী দেখাচ্ছেন, বেদান্ত আর বিজ্ঞানে কিভাবে একটা সাংঘাতিক মিল। প্রথমে অমিলটা ভাল করে জেনে নিতে হবে, কারণ বিজ্ঞান আর বেদান্ত কোন দিনই এক হতে পারবে না, সম্ভবই নয়। কারণ বিজ্ঞান সব সময় আলোচনা করছে দৃশ্য জগৎকে নিয়ে আর বেদান্ত আলোচনা করছে দ্রষ্টাকে নিয়ে। বিজ্ঞান আর বেদান্তের, দুটোরই প্রথম দিক হল এরা অপৌরুষেয়। অপৌরুষেয় কেন? কারণ বিজ্ঞানকে কেউ জন্ম দেয়নি, বেদান্তকেও কেউ জন্ম দেয়নি। দুটোই সিদ্ধান্তের উপর আধার করে চলছে। বিজ্ঞানের কিছু নিজস্ব সিদ্ধান্ত আছে, বেদান্তরেও কিছু নিজস্ব সিদ্ধান্ত আছে। সেই সিদ্ধান্ত গুলি সম্পূর্ণ ভাবে impersonal, অপৌরুষেয়। ঠিক এই জায়গাতে এসে সমস্ত ধর্মে গোলমাল লেগে যায়। সমস্ত ধর্ম একজন পুরুষের বা মানুষের, তিনি অবতার হন, দেবদূত হন, যাই হন, ওই একজনের কথার উপরে, একটা গ্রন্থের উপর দাঁড়িয়ে আছে। বিজ্ঞান কোন বইয়ের উপর দাঁড়িয়ে নেই, বেদান্তও কোন বইয়ের উপর দাঁড়িয়ে নেই, পুরোপুরি সিদ্ধান্তের উপর দাঁড়িয়ে আছে। বিজ্ঞান আর বেদান্তের এটা একটা বিরাট

মিল। বিজ্ঞান পুরোপুরি অপৌরুষেয়, নিউটন কি বলেছেন, গ্যালিলিও কি বলেছেন, বিজ্ঞান তার উপর চলে না, সত্যের উপর দাঁড়িয়ে আছে।

ফলস্বরূপ দুটোই প্রমাণসাধ্য, আমি এই সত্যকে পেয়েছি, তুমিও এই সত্যকে পেতে পার। নিউটন যে সিদ্ধান্তগুলি বার করলেন, সেই সিদ্ধান্তগুলি যে কেউ ল্যাবরটরিতে গিয়ে বার করে নিতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণ যা যা দর্শন পেয়েছিলেন, আমরাও সেই দর্শনগুলি পেতে পারি। ফিজিক্সের ক্ষেত্রে, কেমেস্ট্রির ক্ষেত্রে যেমন একটা ল্যাবরটরি দরকার পরে, তেমনি এই দর্শনগুলির ক্ষেত্রে যে ল্যাবরটরির দরকার হবে, সেই ল্যাবরটরি হল আমার মন। মনকে শুদ্ধ-পবিত্র করলে, একাগ্র করলে, যে কেউ সেই সত্যকে পেয়ে যাবে। বেদান্ত বা হিন্দু ধর্ম ছাড়া এই জিনিস অন্য কোন ধর্মে হবে না। কারণ যদি কোন একজন মহাপুরুষ, তিনি যদি ঈশ্বরের সন্তান হয়ে থাকেন, প্রথমেই সেই ধর্ম বলে দেবে তুমি সেটা হতে পারবে না, সেইজন্য তোমার এই জ্ঞান হবে না। কেউ যদি ঈশ্বরের শেষ পয়গম্বর হয়, তুমি সেটা নও, সেইজন্য এর যাচাই করার কোন পথ নেই। সেইজন্য দেখা যায়, যতগুলি ধর্ম আছে, তাদের বেশির ভাগ কথাই যাচাই যোগ্য নয়। একমাত্র বেদান্ত আর বেদান্তের সাথে বৌদ্ধ ধর্ম প্রমাণসাধ্য। যদিও বৌদ্ধ ধর্ম বুদ্ধকে ভগবান বানিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু original ভগবান বুদ্ধে নেমে যাওয়া যায়, তখন ভগবান বুদ্ধও impersonal হয়ে যাচ্ছেন আর তাঁর সত্যগুলো অপৌরুষেয়, তার সাথে প্রমাণসাধ্য।

এর সাথে আরেকটা দিক হল, বিজ্ঞান আর বেদান্ত দুজনই সেই সত্যের সন্ধানে নিজেকে নিয়োজিত করেছে, যে সত্য সাধারণ মানুষের মনের বোধগম্যের বাইরে। গ্রীক সভ্যতার বৈজ্ঞানিক থেকে শুরু করে বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক পর্যন্ত, সবাই বলবেন, আমরা যে এই জগৎকে দেখছি এটা ভাল, কিন্তু এর পিছনে যে একটা সত্য আছে, সেটা আমার কাছে পরিষ্কার নেই। বেদান্তও তাই বলে, আমি আমার যে জীবনকে দেখতে পাচ্ছি, এই জীবনের পিছনে একটা সত্য আছে, যেটা আমার কাছে পরিষ্কার নেই, আমি সত্যকে জানতে চাই। কোন গ্রন্থের সাহায্যের মুখাপেক্ষি আমি হব না, কারুর মুখের কথায় আমি যাব না, আমি নিজে এই সত্যকে প্রত্যক্ষ করতে চাই। যদিও আগে বলা হল, বিজ্ঞান দৃশ্য জগৎকে নিয়ে আলোচনা করে, বেদান্ত দ্রষ্টার জগৎকে নিয়ে আলোচনা করে। কিন্তু ঈশ্বর আর জগৎ দুটো আলাদা কিছু না, অন্যান্য ধর্মে আলাদা, হিন্দু ধর্মে আলাদা কিছু না। জগৎ পুরোপুরি ঈশ্বরের উপর দাঁড়িয়ে আছে, জগৎ সম্পূর্ণ ভাবে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে আছে। একজন বলছেন আমি জগতের মাধ্যমে সত্যের সন্ধান করছি, আরেকজন বলছেন, আমি জগৎকে মানি না, আমি সরাসরি ঈশ্বরের ভিতর থেকে সন্ধান করছি। আমি যদি দেখি কোন কিছু আমার সত্যের সন্ধানে বাধা সৃষ্টি করছে, সেটা আমার যতই প্রিয় হোক, আমি ওটাকে ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে যাব।

ঠাকুর মা কালী দর্শন পাওয়ার পর চব্বিশ ঘন্টা মা কালীকে নিয়েই আছেন। তারপর যখন তোতাপুরী এসে ঠাকুরকে অদ্বৈত ভাব সাধন করাচ্ছেন, তখন মা কালী বার বার ঠাকুরের মনের সামনে এসে দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন, ঠাকুর মা কালীকেও ছেড়ে দিলেন। সত্যের সন্ধানে, যে জিনিসটা অত্যন্ত প্রিয়, যাঁকে নিয়ে এতদিন ঠাকুরের জীবন চলেছে, সেটাকেও তিনি ত্যাগ করে দিলেন। গীতায় ভগবান অর্জুনকে বলছেন, *ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন*, হে অর্জুন তুমি নির্বেদ হও, বেদের পারে চলে যাও। উপনিষদও বার বার বলছেন, *তত্র বেদা অবেদা ভবতি*, সত্যের সন্ধানে বেদও খসে পড়ে যায়। সত্যের সন্ধানে এর আগে যে সত্য গুলি ছিল, সেই সত্য বাধা রূপে কখনই দাঁড়াতে পারবে না। অন্যান্য ধর্মে কি হয়? প্রত্যেকটি ধর্মে তার আচার্য আর তার ধর্মগ্রন্থ বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, কোন দিনও তাকে অতিক্রম করে যেতে পারবে না। কোন খ্রীশ্চান কখনই খ্রাইস্টকে ছাড়তে পারবে না, বাইবেলকে ছাড়তে পারবে না। হিন্দুরা বলবে সত্যের সন্ধানে আমি আমার বেদকেও ছাড়তে রাজী আছে। বিজ্ঞান বলবে, সত্যের সন্ধানে আমি নিউটনকে, আইনস্টাইনকে ছাড়তে রাজী আছি। স্বামীজী এটাই বলছেন, বেদান্ত পুরো জিনিসটাই আলাদা। আমরা যে ধর্ম ধর্ম বলে যাচ্ছি, এটা আমাদের জেনে রাখতে হবে, বেদান্ত ওই ধর্মগুলির সাথে এক স্তরে কখনই অবস্থান করে না। বেদান্ত সব দিক দিয়ে এই ধর্মগুলি থেকে আলাদা। বেদান্ত বলে সত্যের সন্ধানে তোমার সমস্থ অবলম্বন সমূহ ছেড়ে দাও, কোন কিছুই তোমার লাগবে না। আমরা যে জিনিসগুলিকে নিয়ে বড় হয়েছি, আমরা যেখানেই যাই না কেন, ওই জিনিসগুলিকে আমরা কখনই ছাড়তে চাই না। একমাত্র বেদান্ত আমাদের বলছেন, যে জিনিসগুলিকে অবলম্বন

করে এই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছ, যখন সময় আসবে, এ-গুলোকেও তোমায় ছাড়তে হবে। তুমি না ছাড়তে চাইলেও তোমাকে ছাড়তে হবে আর যদি না ছাড়, তুমি দেখবে তুমি নিজেই বন্ধনে পড়ে গেছ।

এরপর আরেকটা দিক হল, বিজ্ঞান আর বেদান্ত দুজনই যুক্তির উপর খুব জোর দেয়। সত্যের পরীক্ষার জন্য বেদান্ত এই তিনটি বিষয় –শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতির কথা বলছেন; তার সাথে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের কথা বলছেন, যার দ্বারা যুক্তি ও বিচার পরিষ্কার হয়। ইদানিং কালে সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের গুরুর জায়গা নিয়েছে, যা কিছু সোশ্যাল মিডিয়াতে আসছে সেটাই আমাদের কাছে সত্য। সোশ্যাল মিডিয়াতে বলছে, 'ধর্ম কি নিজের বিশ্বাসকে ছাড়তে রাজি আছে'? তোমার এটা কি বলছ! যে জিনিসটা বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে আছে, সেই জিনিসটা কি কখন সত্য হয়! সত্য মানেই হল, তুমি এই সত্যকে পেয়েছ, আমিও অনুসন্ধান করে এই সত্যকে পাবো। এটা আশ্চর্য লাগে যে, যে কোন সত্যিকারের বেদান্তী কক্ষণ কোন জিনিসকে বিশ্বাস করে না, ওনারা নিজেরা নিজের পথ বার করে নেন। সেই তুলনায় বিজ্ঞানীরা অনেক গোঁড়া, তাঁরা বিশ্বাসের দিব্যি খায়। কোন বৈজ্ঞানিক যদি একটু ডানদিক বামদিক কিছু বলে দিল, সব বৈজ্ঞানিকরা কাকের মত তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে তাকে শেষ করার জন্য। এমনকি আইনস্টাইনের মত মানুষও কোয়ন্টাম ফিজিক্সকে যখন নিয়ে আসা হল, সেটাকে ভুল প্রমাণিত করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লেন, কোয়ান্টাম ফিজিক্স হতেই পারে না, এটা মিথ্যা। ঠিক ঠিক ধর্মের লোকেরা গোঁড়া হয় না, বিজ্ঞানের লোকেরা বরঞ্চ অনেক বেশি গোঁড়া হয়। কিন্তু সত্যের সন্ধান কিনা, সত্যের সন্ধান বলে, বিজ্ঞানে যিনি সেই সত্যের সন্ধান পেয়েছেন, তিনি আর পিছিয়ে যাবেন না। পরে ওই প্রজন্মটা চলে গিয়ে যখন নূতন প্রজন্ম আসে তখন নূতন যে সিদ্ধান্ত এসেছে, সেটা নিজে থেকেই দাঁড়িয়ে যায়। বেদান্তে এই সমস্যা হয় না। বেদান্ত কাউকে মারতে আসে না, যেমনি কেউ নূতন কিছু নিয়ে আসে, ওরা শুধু বলবে, আচ্ছা এগুলো সত্যি, তার চরিত্রেও এটা দেখাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে সবাই তার শিষ্য হয়ে যাবে। ভগবান বুদ্ধ এসে বললেন, বেদকে আমি মানি না। কিন্তু ভারতবর্ষ ভগবান বুদ্ধের পিছন পিছন হাঁটতে শুরু করল। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে লোকটি ধর্ম জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত।

দুটো খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের মধ্যে একটা হল, যেটা স্বামীজী ১৪ই জুলাইয়ের ক্লাশে বলছেন, জগতের এই বিশাল বহুত্বের পিছনে একটা সামগ্রিক একত্বকে বিজ্ঞানও মানে, বেদান্তও মানছে। স্বামীজীর সময়ে বিজ্ঞানের কাছে ম্যাটারই ছিল শেষ কথা। আমরা বলতে পারি, এটা আর নূতন কথা কি হল। বর্তমান কালের যে জ্ঞান, বিশেষ করে ইংরাজী বিদ্যার জ্ঞান, এটা পুরোপুরি এসেছে বাইবেলকে আধার করে। যখন আমরা বাইবেলকে আধার করে ইংলিশ পড়ছি, তখন কিন্তু সমস্ত জিনিসগুলো আলাদা, ভগবান আলাদা, যীশু ভগবানরই রূপ কিন্তু আলাদা, আর সৃষ্টি পুরোপুরি আলাদা। সৃষ্টি আলাদা, সৃষ্টির মধ্যে প্রথম আসে পুরুষ আর তারপরে আসে নারী, কারণ পুরুষের বুকের হাড় থেকে নারীর সৃষ্টি। পুরুষ আর নারীর সৃষ্টির পর থেকে অন্যান্য সব কিছু সৃষ্টি হয়েছে, পশু, পাখি, গাছপালা সব আলাদা। তার মানে একত্ব জিনিসটা এদের মধ্যে একেবারেই নেই। বর্তমান কালে বিজ্ঞান এত ধাক্কা মারছে, ওরা বেচারিরা বাইবেলের creastmist থিয়োরির উপর আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। কিন্তু বিজ্ঞান বিজ্ঞান, সত্যের সন্ধানে উৎসর্গীকৃত, ওরা কারুর বিশ্বাসকেই গ্রাহ্য করে না।

স্বামীজী যখন বলছেন তখনও আইনস্টাইন আসেননি, স্বামীজীর দেহ চলে যাবার পর ১৯০৪ সালে আইনস্টাইনের $E=MC^2$ আসার পর ম্যাটার শেষ সত্য না হয়ে এনার্জি শেষ সত্য হয়ে গেল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা একই দাঁড়ায়, কোথাও গিয়ে একটা একত্ব হয়ে যাচ্ছে, ম্যাটারের জায়গায় এনার্জি লেভেলে হচ্ছে, কিন্তু একত্বটা হয়ে যাচ্ছে। আগে যে বহুত্ব ছিল, ওই বহুত্ব ছিল দিব্যি খাওয়া বহুত্ব, ঈশ্বর আলাদা, জগৎ আলাদা, পুরুষ আলাদা, নারী আলাদা, পশু পাখি, গাছপালা সব আলাদা। আর পশু পাখি, গাছাপালার আত্মা বলে কিছু নেই। প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা সত্তা হয়ে গেল, এই যে এতগুলি সত্তা, এই অন্ধ বিশ্বাসের উপর দিয়ে বিজ্ঞান বুলডোজার চালিয়ে একটাই সত্তাকে নিয়ে এলো, সেটা হল ম্যাটার। ফিজিক্স এখন প্রতিদিন evolve করছে। এখন আবার তাঁরা বলছেন, সেদিন আসছে যেদিন এমন একটা থিয়োরি আসবে, যে থিয়োরি থেকে সমস্ত থিয়োরি বেরিয়ে আসবে। স্বামীজীর আগে পর্যন্ত সবাই জানত তাপ জিনিসটা আলাদা, মেকানিক্যাল এনার্জি আলাদা জিনিস, আলো আলাদা জিনিস, ইলেক্ট্রিসিটি আলাদা জিনিস, চৌম্বকত্ব আলাদা জিনিস।

স্বামীজী আসার কিছু দিন আগে থেকে সব কিছু combined হতে শুরু হয়ে গেল। তারা দেখালেন heat আর motion একই জিনিস, যার প্রয়োগ পরে আমরা স্টীম ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে দেখতে পাই। অন্য দিকে বিজ্ঞান লিঙ্ক করে দিচ্ছে ইলেক্ট্রিসিটি আর ম্যাগনেটিজমকে। আর সেখান থেকে লিঙ্ক হয়ে গেল, হিট জিনিসটাও ওই রিলেশানের মধ্যেই পরে, তার মানে সবটাই এক। স্বামীজীর সময় ফিজিক্সের অনেক থিয়োরিই এসে গিয়েছিল, স্বামীজী তার কতটা জানতেন আমাদের জানা নেই, কিন্তু একত্বের কথা স্বামীজী পুরোদমেই বলতে শুরু করে দিয়েছিলেন। আর আইনস্টাইন আসার পর সব কিছুই ইউনিফাইড হয়ে গেল।

ইউনিফাইড হয়ে যাওয়ার পর আবার বেরোল যে, কিছু কিছু আলাদা ফোর্সেস আছে। সেখান থেকে ওনারা চার রকম ফোর্সের কথা বললেন। এখন আবার চেষ্টা চলছে একটা ফোর্সকে বার করার, যেখান থেকে এই চারটে ফোর্স বেরিয়েছে। চারটে ফোর্স যদি স্বাধীন হয় তাহলে কিন্তু দ্বৈতবাদ হয়ে যাবে, স্বামীজীর কথা সত্য হবে না। মানুষের অজ্ঞতাকে দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়, তারা এখন এই theory of everythingকে নিয়ে ধর্মকে আক্রমণ করছে, এখনও এরা বুঝতে পারছে না, theory of everything যদি প্রমাণিত হয়ে যায়, তাহলে সবার আগে বেদান্ত সত্য প্রমাণিত হবে। কারণ আমরা সাত হাজারেরও বেশী বছর ধরে বলে যাচ্ছি, জগতে যা কিছু আছে, সব এক জায়গা থেকে বেরিয়েছে। তুমি যতক্ষণ চারটে ফোর্সের কথা বলবে ততক্ষণ তুমি বেদান্তকে contradict করছ, বরঞ্চ তুমি খ্রীশ্চানিটির বাইবেলের কাছাকাছি আছ, কারণ অনেকগুলো সত্তা এসে যাচ্ছে। ফিজিক্স থেকে যদি Grand Unified থিয়োরি (GUT) বেরিয়ে আসে, theory of everything যদি বেরিয়ে আসে, তুমি জানো না যে, তুমি অজান্তায় প্রমাণ করে দেবে বেদান্ত আক্ষরিক ভাবে সত্য। এখন যেটাকে বিজ্ঞান বলছে ম্যাটার, যেখানে গিয়ে সব একত্ব প্রাপ্ত হচ্ছে বা এনার্জি যেখানে গিয়ে সমস্ত এক হচ্ছে, আগেকার দিনে সেটা ছিল না, তখন এনার্জি পুরো আলাদা একটা জিনিস, ম্যাটার পুরো আলাদা একটা জিনিস। এনার্জি যখন ম্যাটারের উপর কাজ করে তখন ম্যাটার মুভ করে। নিউটনের সময় এনার্জি আর ম্যাটার লিঙ্কড্ ছিল, কিন্তু আইনস্টাইন এসে বললেন, এনার্জিই ম্যাটার, ম্যাটারই এনার্জি। বিজ্ঞানে এই যে পার্থক্য গুলি ছিল, ম্যাটার আলাদা এনার্জি আলাদা, কিন্তু তখনও তাঁরা দেখলেন কাইনেটিক এনার্জি, পোটেনশিয়াল এনার্জি, সব কটা সেই একই এনার্জি, আর একটা আরেকটার মধ্যে পরিবর্তিত হতে থাকে। এই যে একত্ব, যেটাকে বিজ্ঞান দিনে দিনে বুঝতে পারছে, আমরা এটাকে চিরদিন বুঝে রেখেছি।

সব শেষে বিজ্ঞান আর বেদান্তের যে মিল, তাতে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, বিজ্ঞান কোন জিনিসের বাহ্যিক কোন কারণকে অনুসন্ধান করে না। বিজ্ঞান বলে, যদি কোন কিছু ঘটে, তার কারণটা তুমি ওই জিনিসের ভিতরেই অনুসন্ধান কর। যেমন গাছ থেকে আপেল পড়ল, আপেল ঈশ্বরের ইচ্ছায় পড়ছে না, অলৌকিক কোন প্রানী আপেলকে পৃথিবীতে টেনে নিয়ে আসছে না। এই পড়ার পিছনে, আপেলের যে স্বভাব, তার মধ্যেই রয়েছে, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি পদার্থের মধ্যেই রয়েছে। নিউটন যে মাধ্যাকর্ষণের নিয়মাদি নিয়ে এলেন এখনও এই নিয়ম চলছে। অথচ বিজ্ঞান দিনে দিনে এগিয়ে যাচ্ছে। যে কোন কার্যের কারণ যদি খুঁজতে হয়ে, ওই কার্যের মধ্যেই খুঁজতে হবে, বাইরে যেতে হবে না। এই জিনিসটাকে বেদান্ত অনেক আগে থেকেই বলে আসছে। মাটি থেকে যে ঘট তৈরী হচ্ছে, ওই ঘট আগে থেকেই মাটিতে আছে, কুম্ভকার নিজের কুশলতা ও শক্তি দিয়ে মাটি থেকে ওই ঘটকে বার করে আনছে। ওই ঘট যদি মাটিতে না থাকত, কোন দিন ঘট বেরোত না। বেদান্ত পুরোদমে বলে যাচ্ছে, যে কোন কার্যের কারণ ওই কার্যের মধ্যেই ঢুকে আছে। অন্যান্য ধর্মের কাছে বেদান্তের এই সিদ্ধান্ত পুরো নূতন। অন্যান্য যত ধর্ম আছে, বিশেষ করে খ্রীশ্চান, ইসলাম, জুদাইজিম, ওখানে সব কাজ ঈশ্বরের ইচ্ছায় হয়। তার মানে, আমি ফল কেন খেলাম, এখানে আমার আর ফলের সাথে কোন সম্পর্ক নেই, এখানে একটা তৃতীয় শক্তি এসে যায়, ঈশ্বরের ইচ্ছা। আমি ফল খেলাম, কারণ আমার ভিতরে সেই ইচ্ছাটা রয়েছে বা ফলের স্বাদটা এমন, যার ফলে আমার আর ফলের মধ্যে সম্পর্ক হয়ে যাচ্ছে। তুমি নিয়ে এলে ঈশ্বরের ইচ্ছা, বাইরে থেকে একটা আলাদা শক্তিকে নিয়ে আসছ। বিজ্ঞান কখনই তা করবে না, বিজ্ঞান যখনই এক পা এগোয়, ওরা তখন প্রথমেই বাহ্যিক কারণগুলোকে আগে বাদ দিয়ে দেয়, ভিতরের কারণটাকে খোঁজ কর, বেদান্তও পুরোপুরি এই পদ্ধতিকে নিয়েই চলে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু আছে, সব আমার ভিতরেই আছে, যা গোলমাল আমার ভিতরেই আছে। এই সৃষ্টির সব রহস্য সৃষ্টির ভিতরেই রয়েছে। কার্য ও

কারণ, এই দুটোর যে একটা inviolable relations আছে, এটাকে একমাত্র শুদ্ধ বিজ্ঞান স্বীকার করে আর শুদ্ধ বেদান্ত করে। অন্য কোন ধর্ম এর ধারে কাছে আসে না। থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে স্বামীজী তাঁর কয়েকজন শিষ্যদের বার বার এটা দেখানোর চেষ্টা করছেন, বেদান্ত হল যৌক্তিকতার নিরিখে পুরোপুরি একটা যুক্তি সঙ্গত ধর্ম।

যুক্তিবাদীরা এসে বলে, এটা কি বিজ্ঞান সম্মত? বিজ্ঞান সম্মত কেন হবে! তোমরা অনেক inferior, তোমরা এখনও দৃশ্য জগৎকে নিয়ে ফাটাফাটি করছ, আমরা দ্রষ্টাকে নিয়ে করছি। আর এই দৃশ্য দ্রষ্টা থেকেই এসেছে। তুমি অনেক inferior কাজ করছ, আমি কেন বিজ্ঞান সম্মত হতে যাব! তুমি আগে দেখ তুমি বেদান্তিক কিনা। উন্মত্ত জনতার মাঝে একজন যদি একটা যুক্তি সম্মত sensible কথা বলে, ওই উন্মত্ত জনতা তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলবে। ঠিক ঠিক শুদ্ধ বিজ্ঞান যেখানে, যেখানে সত্যের অনুসন্ধান করা হয়, সত্যের অনুসন্ধানে কজন আর যায়, কিন্তু বেদান্ত হল সেই সত্যের অনুসন্ধানী। এই ভাবটাকে এবার স্বামীজী আলোচনা করছেন।

জগৎ সৃষ্টির কারণ জগতের মধ্যেই নিহিত

আমরা সাধারণ ভাবে যেভাবে ধর্মকে দেখি বা মনে করি, ধর্ম তা নয়, এই জিনিসটাকেই স্বামীজী এখানে বলতে চাইছেন। শিক্ষার দিক দিয়ে, কর্মক্ষেত্রের দিক দিয়ে যারা হোমড়া চোমড়া মানুষ, তাদের অনেকের কাছেও ধর্ম হল, আমি ধর্মের সব জানি, ধর্মের সব কিছুই মানি, অন্যায় কাজ করি না, মঙ্গলবার হনুমানজীর মন্দিরে যাই, পূজা চড়াই, প্রসাদ খাই, এরপর ধর্মের আর কি জানার আছে। এদের কাছে ধর্ম মানে এটাই, আমি চুরি-চামারি করি না, তবে বেশির ভাগ লোকই সুযোগ পায় না বলে করে না, মঙ্গলবার হনুমান মন্দির যাই, কলকাতার বাবু হলে বলবে, ঠনঠনে কালীবাড়ি নয়ত কালীঘাটে যাই। প্রসাদ অবশ্যই খাওয়া চাই, বিশেষ দিনে খিচুরিও পাওয়া যাবে, ধর্মের সব কিছু ওখানেই শেষ। বলবে, এরপর ধর্মের আর কি জানার আছে! এইসব লোক যদি দেববাণীর মত গ্রন্থ পড়তে যায়, দু তিন পাতা পড়ার পর বলবে, যত সব আবোল তাবোল আজগুবি কথা বলছে, কিছুই বোঝা যায় না। আগেকার দিনে শ্রেষ্ঠ মস্তিষ্কের যাঁরা ছিলেন তাঁরাই ধর্মে আসতেন, বর্তমান কালে নিকৃষ্ট মস্তিষ্কের লোকেরাই ধর্মে আসে, স্বাভাবিক ভাবেই তাই ধর্ম বর্তমান কালে এই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। সংসারে যারা আছে, অর্থ আর কাম, কামিনী-কাঞ্চন, এটাই তাদের জগৎ। নিজের কার্য পরিধির মধ্যে তারা একটা জীবন তৈরী করে নিয়েছে। আর সেখানে এই ধরণের ৪৪০ ভোল্টের হাই ভোল্টেজ যদি যায়, তখন তারা কিছুই নিতে পারে না।

স্বামীজী দেখাচ্ছেন, কিভাবে বেদান্ত বা ধর্ম একত্বের দিকে নিয়ে যায়, আর দেখাচ্ছেন এই একত্বটাই কিভাবে সত্য। স্বামীজীর সময় থেকে বিজ্ঞান ধীরে ধীরে সম্মান পেতে শুরু করেছিল। স্বামীজী যখন ছিলেন, তার বেশ কিছু দিন আগে পর্যন্ত যাঁরা আর্ট আদি নিয়ে থাকতেন তাঁদের সম্মান অনেক বেশি ছিল, সেই সময় বিজ্ঞান এত সম্মান পেত না। পরে ধীরে ধীরে বিজ্ঞানের সম্মান বৃদ্ধি হতে শুরু করে। পরে যারা আর্ট, ফিলজফি নিয়ে থাকতেন, তাঁরা দেখছেন বিজ্ঞান বেশি সম্মান পাচ্ছে। বিজ্ঞান সম্মান পাবেই, মানুষের সুখ সুবিধা দিচ্ছে, টেকনলজি দিচ্ছে, রিসার্চের জন্য তাই বিভিন্ন সংস্থা বিজ্ঞানীদের অর্থ দিচ্ছে, দেশে বিদেশে ঘোরাচ্ছে। ইংলিশ লেখক হলে বেশি সম্মান পায়, বাংলার লেখক হলে কম সম্মান পায়, সংস্কৃতের লেখক হলে আরও কম সম্মান পায়, এটা নূতন কিছু না। এই সমস্যা আছে, আপনি আপনার নিজের সম্মান নিয়ে থাকুন, কার বেশি সম্মান, কার কম সম্মান এগুলোকে নিয়ে বিচারে আপনার কি দরকার! স্বামীজী যাদের কাছে বলছেন, তাঁরা বিজ্ঞানের ভাষা বোঝেন। স্বামীজী দেখাচ্ছেন বেদান্ত কিভাবে উচ্চমানের ধর্ম আর কিভাবে যুক্তি সঙ্গত। শুধু তাই না, বেদান্ত বিজ্ঞানকেও ছাড়িয়ে যায়।

স্বামীজী বলছেন, Vedanta and modern science both posit a self-evolving Cause. In itself are all the causes. (*বেদান্ত ও আধুনিক বিজ্ঞান উভয়ই জগতের কারণস্বরূপ এমন এক বস্তুকে নির্দেশ করছেন, যা হতে অন্য কিছুর সাহায্য ব্যতীত জগতের প্রকাশ হয়েছে। সেই এক কারণই নিমিত্ত-কারণ আবার সমবায়ী ও অসমবায়ী উপাদান-কারণ সবই।*) বিজ্ঞান আর বেদান্ত, দুটোই self-evolving cause,

দুটোর কোন বাহ্যিক কারণের দরকার পরে না, ঈশ্বর এসে বাইরে সৃষ্টি করবেন, তা না, যেটা আছে নিজে থেকেই evolve করে যাচ্ছে। ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বে বানর থেকে যে মানুষ হচ্ছে, ওখানে নিজে থেকেই evolve করছে। কোন ভগবান এসে বলছেন না যে, তুই এতদিন বানর ছিলি এবার চল মানুষ হবি। বিজ্ঞান এটা মানে না, বেদান্তও মানে না। The potter is the pirmal cause, the clay the material cause, and the wheel the instrumental cause; but the Atman is all three. (*যেমন কুম্ভকার মৃত্তিকা থেকে ঘট নির্মাণ করছে –এখানে কুম্ভকার হচ্ছে নিমিত্ত-কারণ, মৃত্তিকা হচ্ছে সমবায়ী উপাদান-কারণ, আর কুম্ভকারের চক্র অসমবায়ী উপাদান-কারণ। কিন্তু আত্মাই এই তিন।*) ঘট তৈরী করতে তিনটে জিনিসের প্রয়োজন, মাটির প্রয়োজন, চাকার প্রয়োজন - যেটার উপর ঘোরান হয় আর কুম্ভকার দরকার। আমাদের শাস্ত্র বলে, যে কুম্ভকার, সে হল মূল কারণ, চাকাটা instrument আর মাটি হল উপাদান কারণ, যেখান থেকে জিনিসটা বেরোচ্ছে। কিন্তু বেদান্তে চলে গেলে বেদান্ত বলবে, আত্মাই এই তিনটে হয়েছে। আত্মাই মাটি, আত্মাই সেই চাকা আর আত্মাই কুম্ভকার। ওই এক জায়গা থেকে তিনটে জিনিসের জন্ম, সেই একই এই তিন হয়েছে। তিনটে যে আলাদা জিনিস তা না, তিনটে আলাদা সত্তা না।

আমরা হলাম বালবুদ্ধি সম্পন্ন, তাই আমরা বলি ঈশ্বর আছেন, জগৎ আছে, তার মধ্যে আমি আছি, ঈশ্বর তাঁর ইচ্ছাতে এই রকম করেছেন ইত্যাদি মনে করছি। কিন্তু তা না, তিনিই সব কিছু হয়েছেন। এখন বিজ্ঞানের যে থিয়োরি, এই থিয়োরি স্বামীজীর সময় ছিল না, সেই এনার্জিই আছে, এনার্জিই এক সময় ম্যাটার হয়ে যায়, আর ম্যাটার হয়ে যাওয়ার পর সেই এনার্জিই আবার ম্যাটারের উপর কাজ করে, সেখান থেকে সব কিছু চলছে। কিন্তু এটা আশ্চর্যের যে, স্বামীজী যখন নাসদীয় সূক্তের ব্যাখ্যা করতে শুরু করেছেন সেখানে তিনি আকাশ ও প্রাণকে নিয়ে বলছেন। আকাশ মানে ম্যাটার আর প্রাণ মানে এনার্জি, নাসদীয় সূক্ত এটাই বলছে, এনার্জিটাই ম্যাটার হয়, এনার্জিই আবার ম্যাটারের উপর কাজ করে। গত আট হাজার, দশ হাজার ধরে এই সিদ্ধান্তের মূল্যকে কেউ ধরতে পারেনি, কিন্তু বিজ্ঞান বলার পর এখন একটু বুঝতে পারছে যে, এনার্জি ছাড়া কিছু নেই। স্বামীজীর সময়েও কিন্তু বিজ্ঞানের কাছে এনার্জি আর ম্যাটার আলাদা। ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়, সেই সময় স্বামীজী কি করে এই কথাগুলো বলতে পেরেছিলেন!

আর বলছেন, এটাই সত্য, তোমার বিজ্ঞান মানছে কি মানছে না তাতে আমার কিছু আসে যায় না। আজ মানছে না ঠিকই কিন্তু কোন একদিন মানবে। বলছেন, Atman is cause and manifestation too. (*আত্মা কারণও বটে, আবার অভিব্যক্তি বা কার্যও বটে।*) কার্যব্রহ্ম ও কারণ ব্রহ্ম দুটোই সেই, কারণও তিনি, কার্যটাও তিনি। *ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎপূর্ণমুদচ্যতে,* কার্যব্রহ্ম কারণ ব্রহ্ম থেকেই বেরিয়েছে, কার্যব্রহ্মও অনন্ত, কারণ ব্রহ্মও অনন্ত। আত্মাই আছেন, সেই আত্মা থেকে জগতের সৃষ্টি, জগৎ রূপে সেই আত্মাই ভাসমান। আমরা জগৎ রূপে যে জগৎকে দেখছি, এটা আমরা ভুল দেখছি, এটাই মায়া। আত্মা রূপে যখন দেখব তখনই ঠিক ঠিক দেখব। কেউ যদি মনে করে জগৎ বলে কিছু নেই, কিন্তু সেটাও ঠিক না, কারণ এটা কার্য ব্রহ্ম এটাও সত্য, আবার কারণ ব্রহ্ম, যেটা আত্মা, সেটাও সত্য। আবার কেউ যদি মনে করে জগতের একটা নিজস্ব সত্তা আছে, সেটাও পুরোপুরি ভুল। কারণ তখন সত্তা দুটো হয়ে যাবে। এই জিনিসটাকেই স্বামীজী এই একটা বাক্যে বোঝাতে চাইছেন। আর বোঝাতে চাইছেন, বেদান্ত আর বিজ্ঞান, দুজনেই সেই একত্বের উপর বিশ্বাস করে চলে।

অদ্বৈত মতে জগৎ

The Vedantist says the universe is not real, it is only apparent. (*বেদান্তী বলেন, এই জগৎটা সত্য নয়, আপাতপ্রতীয়মান মাত্র।*) আমরা যে জগৎকে দেখছি, এর বাস্তবিক সত্তা নেই। যেমন আমার ডান হাত আলাদা বাম হাত আলাদা, সেই রকম ঈশ্বর আলাদা জগৎ আলাদা কখনই হবে না, আসলে সেই আত্মাই আছেন, আত্মাকেই এই জগৎ রূপে দেখাচ্ছে। জলই আছে, জলকেই এখন বরফ রূপে দেখাচ্ছে, সেই জলকেই এক সময় বাষ্প রূপে দেখাচ্ছে। বরফ, বাষ্প সবটাই জল। জগৎ রূপে আমরা যে অবস্থার পরিবর্তন দেখছি, আসলে কিন্তু কোন পরিবর্তন হয় না, এটাই মায়া। জগৎ আছে অথচ নেই, এটাকেই

বেদান্তীরা বলছেন, এই জগৎ সত্য নয়, আপাতপ্রতীয়মান মাত্র। এরপর স্বামীজী কয়েকটা আলাদা ফিলজফিকে নিয়ে বলছেন।

Nature is God seen through nescience. (*প্রকৃতি আর কিছুই নয়, অবিদ্যাবরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত ব্রহ্মমাত্র।*) ঈশ্বরকে যখন শুদ্ধ মন, শুদ্ধ জ্ঞান দিয়ে দেখছে তখন ঈশ্বর রূপেই দেখে, যখন মনের মাধ্যমকেও ছেড়ে দেয় তখন তিনি ব্রহ্ম রূপে দেখান, তিনি মন-বাণীর পারে। আর যখন অশুদ্ধ মনের মাধ্যমে, মানে অজ্ঞান দিয়ে বা অবিদ্যা দিয়ে, মানে আমাদের এই মন দিয়ে যখন ঈশ্বরকে দেখছে, তখন জগৎ রূপে দেখায়। কারণ আমাদের মনের মধ্যে অনেক কিছুই আছে, মনের মধ্যে সব থেকে শক্তিশালী যে বোধ রয়েছে, সেটা হল দ্বৈত বোধ, আমি আছি তুমি আছ। ওই আমি-তুমি বোধ থেকে কোন কিছুকে পেতে চাইছি, কোন কিছুকে ছাড়তে চাইছি অর্থাৎ রাগ আর দ্বেষের ব্যাপার এসে যায়, এটাই অজ্ঞান বা অবিদ্যা। অজ্ঞানের একটাই পরিভাষা, যেখানে দুই বোধ সেখানেই অজ্ঞান। চোখে চশমা লাগিয়ে দিলে সামনের দৃশ্য পাল্টে যায়। সেই ভগবান সর্বদা সর্বত্র বিরাজমান, অজ্ঞানের চশমা লাগিয়ে দেওয়ার জন্য সেই ভগবান এবার জগৎ রূপে সামনে এসে গেলেন। স্বামীজী এটাকেই নিজের ভাষায় বলছেন, অজ্ঞানের মাধ্যমে যখন ভগবানকে দেখছি, তখনই এসে যায় জগৎ। এই যে আমরা জগৎ দেখছি, যা কিছু দেখছি, মাইক্রোফোন দেখছি, সবাইকে দেখছি, নিজের শরীরকে দেখছি, কাকে দেখছি? আসলে ভগবানকেই দেখছি। কই, আমরা তো বুঝতে পারছি না যে, আমরা ভগবানকেই দেখছি? বুঝতে না পারার কারণ হল, মাঝখানে অজ্ঞানের আবরণ রয়েছে। সূর্যের আলোকে নীল চশমা পরে দেখলে, সূর্যের আলো অবশ্যই নীল দেখাবে। আমাদের মনটা দ্বৈত, দ্বৈতের চশমা দিয়ে ভগবানকে দেখছি, সঙ্গে সঙ্গে বহু এসে যাবে।

সর্বেশ্বরবাদী মতে জগৎ

The Pantheists say, God has become nature of this world. (*সর্বেশ্বরবাদীরা বলেন, ঈশ্বর – প্রকৃতি বা এই জগৎপ্রপঞ্চ হয়েছেন।*) Pantheist হল একটা মতবাদ, এই মতে বলে তিনিই সব কিছু হয়েছেন। আসলে হিন্দুরা Pantheist নয়। যেমন এখানে এই গ্লাশ আছে, ভগবানই এই গ্লাশ হয়েছেন। হিন্দুদের কাছে জিনিসটা তা নয়, আমরা ঠিক ওই ভাবে নিই না। তিনিই সব কিছু হয়েছেন আমরা বলি ঠিকই, কিন্তু তার সাথে আমরা বলি তিনি সত্তা রূপে সব কিছুতে আছেন। এই ছোট্ট একটা তফাৎ আছে। যেমন মাটি দিয়ে আমি অনেকগুলো খেলনা বানালাম, ওই যে বিভিন্ন জিনিস হয়ে গেল, সবটাই কিন্তু মাটি। এখন সেইভাবে যদি মনে করা হয়, সেই ভগবান এটা হলেন, সেটা হলেন, তাহলে কিন্তু ভগবানের সত্তা ধীরে ধীরে কমছে, কারণ যতটুকু তিনি হবেন, ততটুকু তিনি কমে যাবেন। সেইজন্য Pantheismটা খুব ভাল থিয়োরি নয়। আমরা যখন বলছি, তিনিই সব কিছু হয়েছেন, তখন আমরা সেটা ভক্তিশাস্ত্রের দিক থেকে বলছি, কিন্তু তার অর্থ হয়, যা কিছু দেখাচ্ছে, সত্তা রূপে তিনিই আছেন, উপরে যেটা দেখাচ্ছে এর কোন দাম নেই। অদ্বৈতবাদীরা বলেন, আত্মা ছাড়া কিছু নেই, আত্মার বাইরে যা কিছু দেখছ এটা মিথ্যা। ভক্তরা এটাকে মিথ্যা রূপে না নিয়ে ঈশ্বর রূপেই নেন। সত্য রূপে নিচ্ছেন, কিন্তু পরিবর্তনটাকেও সত্য রূপে নেন। একসের আটা আছে, সেই আটা থেকে কিছু রুটি বানানো হল, রুটি বানাতে গিয়ে একসের আটা শেষ হয়ে গেল, বদলে এতগুলি রুটি হয়ে গেল। Pantheismএ হল, সেই ভগবানই প্রকৃতি হয়ে গেছেন, প্রকৃতি হয়ে যাওয়ার পর প্রকৃতিতে যা কিছু এসেছে, সব তিনিই হয়ে গেলেন। এবার কিন্তু এটা ওজনে কম পরে যাবে।

কিন্তু তারপরেই স্বামীজী বলছেন, Advaitists affirm that God is apperaring as this world, but He is not this world. (*অদ্বৈতবাদীদের সিদ্ধান্ত হল, ঈশ্বর এই জগৎরূপে প্রতীয়মান হচ্ছেন বটে, কিন্তু তিনি এই জগৎ নন।*) অদ্বৈত বা বেদান্ত বার বার বলে, যিনি ভগবান, তিনি জগৎরূপে দেখাচ্ছেন বটে, কিন্তু তিনি এই জগৎ নন।

স্বামীজীর ঠিক আগে যাঁরা ছিলেন, যাঁদের মধ্যে ম্যাক্সমূলারের মত কিছু পণ্ডিতরাও ছিলেন, তাঁরা কোথাও একটা বোঝালেন যে হিন্দু ধর্ম হল Pantheistic, এর বাংলা অর্থ হয় সর্বেশ্বরবাদ, যাঁরা বলেন ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন। আমরা কিন্তু কক্ষণ ওই ভাবে ঈশ্বরকে নিই না। এগুলোর মধ্যে খুব সূক্ষ্ম তফাৎ

থাকার জন্য লোকেরা ঠিক জিনিসটাকে ধরতে পারে না। আমাদের মধ্যেও অনেকে এই ধারণা নিয়ে চলেন, আমরা যতই বলি না কেন, তাদের মনকে এই ধারণা থেকে পরিষ্কার করা যাবে না। কিন্তু একটু চিন্তা করলে তফাৎটা পরিষ্কার ধরা যায়। বেদান্ত মতে সেই আত্মাই আছেন, সেই আত্মার উপর নাম রূপের খেলা চলছে, মানে জগৎটা আপাতপ্রতীয়মান, জগৎ সত্য নয়। সর্বেশ্বরবাদে ভগবান পরিবর্তিত হয়ে এই জগৎ হয়েছেন। যেমন জল, কোথাও বরফ হয়ে গেছে, কোথাও বাষ্প হয়ে গেছে, আছে কিন্তু জল, কোথাও গিয়ে সত্তা যেন কমে যাচ্ছে। ভক্তিশাস্ত্র দেখে, সমস্ত সত্তা যত রয়েছে, এই সত্তা আত্মার নয়, এটা ঈশ্বরের। ঈশ্বরের সৃষ্টি কখন মিথ্যা হতে পারবে না, ভগবান যদি সৃষ্টি করবেন সেই সৃষ্টি সত্য। তার মানে আমি যে তোমাকে দেখছি এটা সত্য, কিন্তু 'তুমি' রূপে সত্য না, ঈশ্বর রূপে সত্য। সেইজন্য Pantheistsরাও তাই বলবে, 'তুমি' ঈশ্বর রূপে সত্য নও, কিন্তু যেহেতু তুমিই সেই ঈশ্বর, তাই 'তুমি' ঈশ্বর রূপে সত্য।

বেদান্তে 'তুমিই সেই ঈশ্বর' যত বার বলা হয়, ওটা সর্বেশ্বরবাদের অর্থে বলা হয় না, বলা হয়, তোমার যে এই নাম ও রূপ, এটা অদ্বৈতের দৃষ্টিতে মিথ্যা। ভক্তিশাস্ত্রের মতে, সত্তা যেটা রয়েছে, সেটা ভগবানের। কিন্তু 'তুমি' রূপে কখনই সত্য নয়, অন্তর্যামী রূপে তুমি সত্য। অন্তর্যামী কে? ভক্তিশাস্ত্র নির্বিশেষ আত্মাকে অন্তর্যামী বলে না, ভগবানকে বলেন। কিন্তু তুমি যেমনটি, এটা কখনই বেদান্ত সত্য রূপে নেবে না, সর্বেশ্বরবাদীরা নেয়। এই পেন আছে, ভৌতিকবাদীরা এই পেনকে বলবে পেন, ঠিক কথা। অদ্বৈতবাদীরা বলবে, এই পেন আত্মার উপরে নাম ও রূপের খেলা, ওরা নাম রূপকে মানবে। কৃষ্ণভক্ত বলবে কৃষ্ণ। কৃষ্ণ যখন বলছে তখন কি তারা এই পেনকে কৃষ্ণ বলছে? এই জায়গাতে সবাই ভুল করে। অদ্বৈতবাদীরা এটাকে আত্মা বলছেন, দ্বৈতবাদীরা এটাকে কৃষ্ণ বলছেন। যিনি অদ্বৈতবাদী তিনি বলবেন, সৎ, চিৎ ও আনন্দ, সচ্চিদানন্দ। পেনের সত্তা আছে, পেনের পিছনে যে সত্তা সেই চৈতন্যরই সত্তা, এর পিছনে রয়েছে সেই ব্রহ্মেরই সত্তা। ভক্তরা এটাকেই বলবে, কৃষ্ণেরই সত্তা। সর্বেশ্বরবাদীরা, যারা Pantheists, যেটা ভারতবর্ষে নেই, কিন্তু বিদেশীরা গায়ের জোরে আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে, তারা বলবে কৃষ্ণই এই পেন হয়েছেন। পেনকে ধরছি মানে কৃষ্ণকে ধরেছি। কিন্তু আমাদের ভক্তিশাস্ত্রও এই কথা বলবে না, অদ্বৈত তো বলবেই না। মা যখন ছেলেকে খোকা বলে ডাকছে, মা কি বলতে চাইছে? অদ্বৈতবাদী হলে বলবে, আসলে ছেলে আত্মা, এখানে শব্দটা কিন্তু 'আসলে', ভক্ত যদি হয় সে বলবে, আসলে ছেলে হল কৃষ্ণ। সর্বেশ্বরবাদী হলে বলবে, ছেলের যে এই রূপ, রূপটা পুরোটাই ভগবান নিজে, ছেলের হাত, পা, মুখ সবটাই ভগবান নিজে।

হিন্দুদের এটা মত নয়। হিন্দুদের মত হল, তার আসল সত্তা যেটা সেটাই ঈশ্বর। তাহলে প্রকৃতি কি হবে? গীতাতে ভগবান বলছেন আমার দুটো প্রকৃতি, একটা আত্মা, আরেকটা জগৎ। ওটাকে যদি টানতে টানতে আমরা নিয়ে যাই, তাহলে প্রকৃতিটা হয়ে যাবে ঈশ্বর, আর প্রকৃতিতে তখন যাবতীয় যা কিছু হচ্ছে, সব কিছু হয়ে যাবে ঈশ্বর। তাহলে মায়ের ছেলেও হয়ে যাবে ঈশ্বর। এটা বেদান্তের মত নয়। সেইজন্য নবম অধ্যায়ে এসে ভগবান আবার ওটাকে ব্যাখ্যা করে বলছেন, এরা সবাই আমার মধ্যেই আছে, আমি কিন্তু এদের মধ্যে নেই। আমি মায়ের ছেলে হইনি, ছেলের যে সত্তা সেটা আমি। যেমন মরীচিকা নির্ভর করে মরুভূমির উপর, কিন্তু মরীচিকা আর মরুভূমির কোন সম্পর্ক নেই। সর্বেশ্বরবাদীরা বলবে, মরুভূমিটা বাস্তবে মরীচিকা হয়ে গেছে। বেদান্ত বলবে, মরুভূমি আছে বলে মরীচিকাকে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু বাস্তবে এটা কিছু না। ওই মরীচিকাতে যে জল দেখা যাচ্ছে, ওই জলে মরুভূমির একটা বালিকণাও ভিজবে না। এরা বলবে, ঈশ্বর যিনি তিনিই এটা হয়েছেন। সমস্যা হল ঈশ্বর আর জগতের সম্পর্ক বোঝাতে গিয়ে আমরা যে উপমা দিচ্ছি, কিন্তু উপমা তো দেওয়ার কথা নয়, কারণ উপমার সব কিছু মিলবে না। তখন আমরা সোনার উপমা এনে বলছি সোনা থেকে সোনার গয়না হয়ে যাচ্ছে, এখানে তো সত্যিকারের পরিবর্তন হচ্ছে। তাহলে ঈশ্বর যখন জগৎ হচ্ছেন, তখন সেখানেও সত্যিকারের পরিবর্তন হচ্ছে। বেদান্তে বার বার এটাকে আটকানো হচ্ছে। সোনা আর গয়না উপমা দিয়ে তোমাকে একটা জিনিসকে বোঝান হচ্ছে, আসল পরিবর্তন কখনই হয় না। আমি ঠাকুর নই, কিন্তু আমার যে আসল সত্তা, সেটা ঠাকুরের, আমি আমি। এই জিনিসগুলো বুঝতে সময় লাগবে। একটু নিয়মিত জপ-ধ্যান, একটু তপস্যা করার পর শান্ত মনে একটু চিন্তন-মনন করলে তবে গিয়ে এই জিনিসগুলোর ধারণা হয়। এগুলো বোঝা বা ধারণা করা যদি সহজ হত, তাহলে এত গ্রন্থ রচনা হত না, এত সাধু মহাত্মাদেরও আবির্ভাব হত না।

মন আর মস্তিষ্কের সম্পর্ক

স্বামীজী বলছেন, We can only know experience as a mental process, a fact in the mind as well as a mark in the brain. We cannot push the brain back or forward, but we can the mind; it can stretch over all time, past, present and future; and so facts in the mind are eternally preserved. All facts are already generalized in mind, which is omnipresent. (*আমরা অনুভূতি-বিশেষকে একটা মানসিক প্রক্রিয়ারূপেই জানতে পারি –একে মানসিক একটি ঘটনারূপে এবং মস্তিষ্কের মধ্যে একটা দাগরূপে জানতে পারি। আমরা মস্তিষ্ককে সম্মুখে বা পশ্চাতে চালাতে পারি না, কিন্তু মনকে পারি। মনকে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান –সমুদয় কালেই প্রসারিত করা যেতে পারে; সুতরাং মনের মধ্যে যা যা ঘটে অনন্তকালের জন্য তা সঞ্চিত থাকে। মনের মধ্যে সব ঘটনা পূর্ব থেকেই সংস্কারের আকারে রয়েছে, মন সর্বব্যাপী কি না।*) এবার স্বামীজী মন আর মস্তিষ্ক এই দুটোর মধ্যে কি সম্পর্ক, এই জিনিসটাকে আলোচনায় নিয়ে আসছেন। আগের অনুচ্ছেদে সর্বেশ্বরবাদ আর অদ্বৈতের তফাৎকে নিয়ে বললেন, যেটা বুঝতে গিয়ে আমাদের ঘাম ছুটে গেল, মন আর মস্তিষ্কের সম্পর্কের ব্যাপারটাও বুঝতে একটু সমস্যা হবে। ধর্মের দিকগুলিকে বোঝা সত্যিকারের কঠিন। আর এই কারণেই আগেকার দিনে ব্রাহ্মণদের এত সম্মান দেওয়া হত। ব্রাহ্মণরা ধর্মের সব কিছুকে সত্যিকারের বুঝতেন, মানুষের কাছে ব্যাখ্যা করতেন। বিদ্যার সম্মান যে সমাজ দেয় না, সেই সমাজের বিনাশ হতে বেশি সময় লাগে না।

যদি কখনও এই বিষয়টা আসে তখন আমরা আরও মন জিনিসটা কি বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করব। খুব সংক্ষেপ, সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনার সময় আমরা বলেছিলাম, সেই ভগবান সৃষ্টি করতে যখন শুরু করেন, তখন প্রথমেই যেটা হয় তা হল, সত্ত্ব, রজো আর তমো এই তিনটে একেবারে শুদ্ধ গুণ, যে তিনটে গুণ ভগবানের মধ্যেই সাম্য অবস্থায় থাকে, এবার এদের সাম্য অবস্থাটা ভেঙে গিয়ে চলতে শুরু করে। যেমনি তিনটে গুণ চলতে শুরু করল, ভগবানকে যদি আলো রূপে আমরা ভাবি, সেই আলোর উপর যেন একটা আবরণ এসে গেল। সত্ত্ব, রজো ও তমোর আবরণের মধ্য দিয়ে এবার যদি ব্রহ্মের দিকে তাকায় তাহলে ব্রহ্মকে ঈশ্বর রূপে দেখাবে, আর ওই আলোকে দিয়ে যখন প্রকৃতিকে দেখা হয়, তখন তিনি সমষ্টি মন রূপে দেখাবেন। প্রকৃতি থেকে আসছে সমষ্টি মন। শুদ্ধ চৈতন্য এবার যখন প্রকৃতির মধ্যে চলে এলেন, তখন তিনি আর ভগবান থাকলেন না, এবার তিনি মন রূপে দেখাবেন। প্রজেক্টরে যে আলো থাকে, যেমনি ওখানে প্লাস্টিক এসে গেল, প্লাস্টিক সাদা হতে পারে, কিন্তু আলো আর শুদ্ধ আলো থাকল না। আর ওই প্লাস্টিকের উপর যেমন যেমন ছবি আসবে তেমন তেমন সিনেমার দৃশ্যগুলি চলতে থাকবে। ঈশ্বর যেন আলো আর ওই প্লাস্টিকটা যেন প্রকৃতি, আর ছবিগুলো যেন সৃষ্টি।

প্রথম যেটা দেখা যায়, এটাই বিশ্বমন বা সমষ্টি মন, এটাকেই বলা হয় মহৎ। মহৎ থেকে আসে অহঙ্কার, এই অহঙ্কার হল সমষ্টি আমিত্ব। অহঙ্কার থেকে আরও যখন একটু স্থূল হয় তখন তন্মাত্রাতে আসে, তন্মাত্রা থেকে ইন্দ্রিয়াদি আসে, সেখান থেকে হয়ে হয়ে এই স্থূল শরীর তৈরী হয়। সবার শেষে আসে এই স্থূল শরীর। কিন্তু সৃষ্টির সব কিছু সৃষ্টি হল সেই সমষ্টি মন থেকে। সমষ্টি মন বা বৈষয়িক মন ঠিক প্রকৃতির নীচে। সমষ্টি মনকে জানার কোন পথ নেই। সমষ্টি মনকে যদি জানতে হয়, তাহলে আমি যে এই শরীরের মধ্যে, ইন্দ্রিয়ের মধ্যে আবদ্ধ, এটাকে ছাড়তে ছাড়তে যখন উপরের দিকে যাওয়া হবে, তখন ওই শেষ অবস্থায় গিয়ে মনের সাথে এক হয়ে যাবে, তখনই সমষ্টি মনকে জানা যাবে। কিন্তু এখন আপাততঃ সমষ্টি মনের একটা ছোট্ট অংশকে আমরা জানতে পারি আমাদের নিজের মস্তিষ্ককে দিয়ে।

যদি মনে থাকে, আগে আমরা বলেছিলাম, বিজ্ঞান দৃশ্যকে ব্যাখ্যা করে, আর দৃশ্যকে দিয়ে দ্রষ্টাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছে। বিজ্ঞান সব সময় চেষ্টা করছে মস্তিষ্ককে দিয়ে মনকে বোঝার। বেদান্ত সব সময় দ্রষ্টার দিকে দৃষ্টি রাখে, আর দ্রষ্টার মাধ্যমে দৃশ্যকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। আমরা মস্তিষ্কের সব কার্যকে মনের দিক থেকে ব্যাখ্যা করব, বিজ্ঞান সব সময় মনের ব্যাখ্যা করবে মস্তিষ্কের দিক থেকে। এই জায়গাতে এসে সমস্যা তৈরী হয়। শিশু জন্ম নেওয়ার পর তার মস্তিষ্কে কিছুই নেই, একটা সেল মাত্র। সেখান থেকে

evolve করে করে ওর sensation গুলো আসতে শুরু করে। Sensation আসা মানে, তার যে জীবাত্মা, সে কোন একটা instrumentকে ধরে সমষ্টি মনকে বোঝার চেষ্টা করে। আমার আপনার যে মস্তিষ্ক, এই মস্তিষ্ককে দিয়ে সে সমষ্টি মনকে জানার চেষ্টা করে যাচ্ছে। অর্থাৎ আমরা আমাদের দেহ, ইন্দ্রিয় দিয়ে এই জগৎকে জানার, বোঝার চেষ্টা করছি। মানুষ যদি কোন জলাশয়ে, সমুদ্রে হোক, পুকুরে হোক, পড়ে যায় আর সে যদি সাঁতার না জানে তখন হাবুডুবু খেতে থাকে। আমরাও এই সমষ্টি মনে হাবুডুবু খাচ্ছি। হাবুডুবু খেয়ে বোঝার চেষ্টা করছি, জগৎটা কি। শরীর দিয়ে এক রকম বুঝছি, ইন্দ্রিয় দিয়ে আরেক রকম বুঝছি। কিন্তু আমাদের যে মস্তিষ্ক, এই মস্তিষ্ক হল best instrument যেটা ওই সমষ্টি মনকে জানতে পারে। আমাদের মস্তিষ্ক দুটো কাজ করে, একদিকে মস্তিষ্ক যেমন সমষ্টি মনকে ধরে, তেমনি যে জিনিসগুলিকে ধরে নিল, সেই জিনিসগুলির একটা ছাপ ছাড়ে সমষ্টি মনের উপর। যেমন যেমন ছাপ ছাড়ল, তেমন তেমন মস্তিষ্ক উন্নত হতে থাকে। আর ওই মস্তিষ্ককে কেন্দ্র করে আমাদের নিজস্ব মন চলে।

আমরা সাধারণ মানুষ, শরীরের সাথে নিজেকে জুড়ে রেখেছি, সেখান থেকে নিজের মস্তিষ্কের সাথে জুড়ে রেখেছি। মস্তিষ্ক সীমিত জিনিস, একটা জড় পদার্থ, সেখানে আমরা জুড়ে রেখেছি, সেখান থেকে আবার জুড়ে রেখেছি সীমিত মনের সাথে। ফলে সমষ্টি মনকে আমাদের জানার কোন পথ নেই। আমাদের আসল সত্তা কিন্তু সেই সীমিত মন, যে মস্তিষ্ককে দিয়ে কাজ করছে, মস্তিষ্ক কাজ করছে শরীর দিয়ে। ফলে আমাদের জ্ঞানও সীমিত। সাধন-ভজন করে, তপস্যা করে, যোগের সাহায্যে যেমন যেমন এই সীমিত মনকে আমরা উন্নত করতে থাকব, তেমন তেমন আমাদের জানালাটা খুলতে শুরু করবে। জানালা যত খুলবে তত মস্তিষ্কের উপর ধাক্কা পড়বে। মস্তিষ্কে ধাক্কা পড়া মানে, নিউরোন কানেকশানস, অর্থাৎ মস্তিষ্কে যত কোশিকা গুলি রয়েছে তার কানেকশানস্ গুলো তত বাড়তে শুরু করে। স্বামীজীর সময় মস্তিষ্কের নিউরোনাদির কথা, আর তার কার্যাবলীর ব্যাপারে জানা ছিল না, তিনি বলতেন, মস্তিষ্কের উপর ছাপ পড়ছে। কিন্তু আমরা এখন জানছি মস্তিষ্কের কোশিকাগুলির কানেকশানস্ বাড়ছে। আমরা মনে করছি, যত মস্তিষ্কের কানেকশানস্ বাড়ছে তত আমাদের জ্ঞান বাড়ে। কিন্তু জিনিসটা ঠিক উল্টো হয়, যত আমাদের জ্ঞান বাড়তে থাকে তত মস্তিষ্কের কোশিকা গুলির কানেকশানস্ বাড়ে। অন্যরা বলতে পারে, আপনি বেদান্তী, তাই দৃশ্যকে দ্রষ্টা দিয়ে ব্যাখ্যা করছেন। অবশ্যই তাই, আমরা জানি আমরা ঠিক। বিজ্ঞান চেষ্টা করছে দ্রষ্টাকে দৃশ্য দিয়ে ব্যাখ্যা করার। বিজ্ঞান চেষ্টা করবে, মস্তিষ্ক দিয়ে মন, মন দিয়ে সূক্ষ্ম শরীর, সূক্ষ্ম শরীর দিয়ে চেতনা জিনিসটাকে ব্যাখ্যা করার। আমরা জানি, বিজ্ঞানের এই approachটা ভুল, সীমিত।

স্বামীজী বলছেন, সবচেয়ে বড় তফাৎ হল, মস্তিষ্ক সামনে পিছনে যেতে পারে না, মস্তিষ্কের উপর যা ছাপ পড়ছে সে সেখানেই পড়ে আছে। তার মানে, আমরা যদি জানতে চাই পূর্বজন্মে আমি কি ছিলাম, আমরা তা কোন দিন জানতে পারব না, কারণ মস্তিষ্ক সীমিত। এই জন্মের মস্তিষ্ক এই জন্মের কথা ছাড়া কিছু জানতে পারবে না। মস্তিষ্ক আরও সীমিত, কারণ আমার মস্তিষ্ক আলাদা, আপনার মস্তিষ্ক আলাদা। আপনার মনে কি হচ্ছে, আমি কোন দিন জানতে পারব না, আপনিও আমার মনে কি হচ্ছে জানতে পারবেন না। তাহলে সাধুরা কি করে অন্যের মনের খবর জানতে পারেন? কারণ তাঁরা মস্তিষ্কের ক্ষমতা থেকে বেরিয়ে আসেন। যেমন সেলফোন, সেলফোন আসল না, আসল হল ফোনের নেটওয়ার্ক, টাওয়ারস্। ফলে, স্পাইং এজেন্সি থেকে যদি কারুর উপর লক্ষ্য রাখতে চায়, সঙ্গে সঙ্গে তার বাড়ির পাশে একটা টাওয়ার লাগিয়ে সব কিছুকে ট্যাপ করে নেবে, সে জানতেও পারবে না। ফোনটা গুরুত্ব নয়, গুরুত্ব হল সিগনালের, সিগনাল যদি না থাকে ফোন বেকার। তাই না, ওই সিগনাল কেউ যদি চায়, ট্যাপিং করে নিতে পারে, ট্যাপিং ক্রিমিনালরাও করতে পারে, পুলিশও করতে পারে। ট্যাপিং করে ইন্টেলেজিন্সি ব্রাঞ্চের লোকেরা টেররিস্টদের সব কথা টেপ করে নিচ্ছে। ঠিক তেমনি মনেরই গুরুত্ব বেশি। আমার ফোনের নাম্বারকে সেন্টার করে যে সিগনাল গুলো ঘুর ঘুর করছে, ওটা হলাম আমি। ঠিক তেমনি আমার মস্তিষ্ককে সেন্টার করে, মন যতটুকুর মধ্যে ঘুর ঘুর করছে, সেটা হলাম আমি। ওটা দিয়ে যাদের সাথে আমার সম্পর্ক আছে তাদের সাথে লিঙ্ক করতে পারি, সবারটা আমি করতে পারব না। সবার সাথে লিঙ্ক করতে গেলে আমার এই সেলগুলোকে ছেড়ে পুরো টাওয়ারকে ধরতে হবে, টাওয়ারকে ছেড়ে পুরো কোম্পানিকে ধরতে হবে। মানুষ তার মস্তিষ্কের কার্যাবলীর মধ্যে সীমিত। যেমন আমরা আমাদের নিজস্ব সেলফোনে আবদ্ধ, অন্য সেলফোনে কি হচ্ছে আমরা কোন দিন জানতে পারব না। কিন্তু

যাদের কাছে মেশিনের সরঞ্জাম আছে তারা পারবে। ঠিক তেমনি, যারা নিজের মস্তিষ্ককে outgrow করে যায়, তারা সরাসরি মনের উপর চলে যেতে পারে। যারা ট্যাপিং বা হ্যাকিং করে, তারা ওই সেলফোন নিয়ে হ্যাকিং করে না, তাদের যন্ত্রপাতি গুলো আলাদা। ঠিক তেমনি ঠাকুর স্বামীজী অন্য ভাবে অপর মনের খবর জানতে পারতেন।

স্বামীজী এটাই বলছেন, সমষ্টি মন বা আমাদের নিজেদেরও মনের মধ্যে আমার সৃষ্টির পর আমি যা যা করেছি, সব কিছু চিরদিনের মত ধরা আছে। একটা সিমকার্ড নিয়ে ফোন যদি কেউ পাল্টে দেয়, তার সমস্ত রেকর্ড চলে যাবে। কিন্তু টেলিফোন কোম্পানির কাছে তার সমস্ত রেকর্ড ধরা আছে। ফেসবুকে একবার বলে দেখুক, যেদিন থেকে জয়েন করেছে, সেখান থেকে আজ পর্যন্ত সে কি কি করেছে সবটাই বলে দেবে। গুগুলকে একবার দিয়ে দেখুক, আমরা আঁৎকে উঠব, যত নোংরা কাজ, ভাল কাজ করেছি, আমার কর্মফল রূপে সব বেরিয়ে আসবে। ক্রিমিনালরা কত কায়দা করে, ফোন ভেঙে ফেলছে, সিম নষ্ট করে দিচ্ছে। কিন্তু পুলিশ যখন তদন্তে নামে, একটা শুধু তথ্য নিয়ে, ওখান থেকে ধীরে ধীরে ওর সমস্ত কিছু বার করে আদালতে বিচারকের সামনে বিরাট ফাইল রেখে দেবে, এই লোকটা এই এই করেছে। আমরা মনে করছি, আমাকে কেউ দেখেনি, আমি বেঁচে গেলাম। পাপকর্ম করে ঠাকুরের কাছে মাথা ঠুকে বলছি, ঠাকুর আর কোন দিন করব না, আর ভাবছি সব পাপকর্ম পরিষ্কার হয়ে গেল। কিছুই পরিষ্কার হবে না, মনে সব রেকর্ড হয়ে আছে, সময় মত ঠিক বেরিয়ে আসবে। এমনকি যে মারা গেল, তার মস্তিষ্ক তো নষ্ট হয়ে গেল, কিন্তু মন তো নষ্ট হচ্ছে না, মনটাই তো আসল। এবার এই মন জীবাত্মার সঙ্গে বেরিয়ে যাবে, আরেকটা শরীর তৈরী করবে। শরীর তৈরী করে মনটা ওখান থেকে আবার আগের মত করতে শুরু করবে। কিন্তু সমস্যা হল, মনের কাছে কত জিনিস আছে? যবে থেকে সৃষ্টি হয়েছে সেখান থেকে আজ পর্যন্ত যা কিছু মন করেছে, তার সব কিছু মনের মধ্যে রেকর্ড হয়ে আছে। ঐ নূতন শরীরে মন আবার একটা নূতন মস্তিষ্ক তৈরী করতে শুরু করবে।

এটাই বাস্তব ঘটনা, আমরা মানি আর নাই মানি, তাতে কিছু আসে যায় না। এখন যে শরীর পেয়েছি, যেমন শরীর পেয়েছি, যাদের বাড়িতে শরীর পেয়েছি, মন ততটুকুই ছাড়বে, এরপর সমষ্টি মন থেকে আরও কিছু টানবে, কিছু সমষ্টি মনের উপর ছাড়বে, এইভাবে মস্তিষ্ক উন্নত হবে, মৃত্যুর পর আবার সেই মস্তিষ্ক নষ্ট হয়ে যাবে। এর পুরো পদ্ধতির মধ্যে আমি কি করছি? আমি, মানে জীবাত্মা, যেটা আসল আমি, যে আমি প্রকৃতির সাথে নিজেকে জুড়ে নিয়েছে, সে এই শরীর আর মস্তিষ্ককে দিয়ে আর তার যে টর্চলাইট, যেটা মন, সেটাকে দিয়ে সমষ্টি মনকে ধরার চেষ্টা করছে। আমি যা কিছু করেছি, সেটাও সমষ্টি মনে আছে, আপনি যা করছেন সেটাও সমষ্টি মনে আছে, আমি এবার বোঝার চেষ্টা করছি ওর সমষ্টি মনে কি আছে। আমি কোন দিন সমষ্টি মনে পৌঁছাতে পারব না, কারণ মন সীমিত। পারব, যদি আমার মস্তিষ্কের সাথে আমি যে একাত্ম হয়ে আছি, এই একাত্ম বোধকে ছাড়তে পারি। আমার মনের সাথে যে একাত্ম বোধ, এটাকে কমিয়ে ধীরে ধীরে যদি আমাকে বৃহৎ মনের দিকে নিয়ে যেতে পারি। মস্তিষ্ক কোন দিন তা পারবে না, আমার মস্তিষ্ক আপনার মস্তিষ্ককে কোন দিন পড়তে পারবে না।

স্বামীজী এটাই বলছেন, we cannot push the brain back or forward। মস্তিষ্ক কখন, কোন দিন কোন অবস্থাতেই সামনে পিছনে যেতে পারবে না। But we can the mind, মন তো ইউনিভার্সাল, দশ বারো দিন মন শান্ত করে জপধ্যান করলেই অপরের মন সহজেই পড়তে পারবে। সমস্যা হল, যারা জপধ্যান আদপেই করে না, তারা কী অশান্ত থাকে কল্পনা করা যায় না। আর যদি জপধ্যানে বসে, মন তাদের এত অশান্ত হয়ে যায় যে, তখন মনে করে, এর থেকে কাজ করা অনেক ভাল। দিনে এক আধঘন্টা মন শান্ত করতে পারলে, তাতেই মনের প্রচণ্ড ক্ষমতা বেড়ে যাবে, টর্চলাইট থেকে সার্চলাইট হয়ে যাবে। আধ ঘন্টা তো অনেক বেশি হয়ে গেল, চার পাঁচ মিনিট মন শান্ত করতে পারলে তাতেই হয়ে যাবে, আধ ঘন্টা করতে পারলে তো মহাপুরুষ হয়ে যাবে। এমন কিছু কঠিনও না, একটু আসনে বসতে হবে, কিছুক্ষণ একটা দুটো প্রাণায়াম করতে হবে, মনে যা যা চিন্তা আসছে সরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু আমরা চেষ্টাই করতে চাই না, চেষ্টা করব না, অন্য দিকে গালাগাল দেব, সব ধাপ্পাবাজ, বুজরুকি দেখাচ্ছে। মন একটু শান্ত করলেই বুঝতে পারবে, আর যা চাইবে তাই হবে। আমরা কি চাইছি?

মা সরস্বতী, মা লক্ষ্মী, কুবের সবাই আমাদের পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন জ্ঞান, শ্রী, সম্পদ দেওয়ার জন্য, কি চাই তোমার বল। মা সরস্বতী, মা লক্ষ্মীর আরাধনা করতে হয় না। সমস্যা হল, আমাদের কম গেজের তার, ৪৪০ ভোল্ট দিলে ফিউজ উড়ে যাবে। যেমনি মা সরস্বতীর হাঁস আর মা লক্ষ্মীর পেঁচা বসতে যাচ্ছে, ফিউজ উড়ে যাচ্ছে। এটাই বাস্তব, আর এই জিনিস শুধু আমার আপনার ক্ষেত্রেই না, সবারই ক্ষেত্রে। আমাদের কি সেই ক্ষমতা আছে যে, আমরা লক্ষ্মী দেবী, সরস্বতী দেবীকে সন্তুষ্ট করব! খবরের কাগজে পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন থাকে, অমুক পাত্র চাই, অমুক পাত্রী চাই বলে। মা সরস্বতী, মা লক্ষ্মী অনবরত বিজ্ঞাপন দিয়ে যাচ্ছেন পাত্র চাই, পাত্রী চাই বলে। বিদ্যা দেবী বলছেন, আমি তোমার এখানে অবতরণ করতে চাই, আমি শ্রী, সম্পদদাত্রী লক্ষ্মী দেবী, আমি তোমার এখানে অবতরণ করতে চাই। কিন্তু আমাদের মন এত ক্ষুদ্র যে মা সরস্বতী, মা লক্ষ্মী ওইটুকু জায়গায় অবতরণ করতে পারছেন না। বড় বড় উড়োজাহাজ ছোট এ্যারোড্রামে নামতে পারে না। আমাদের মনের পরিধিটা এত ছোট যে ওখানে হেলিকপ্টারও নামতে পারবে না। মনের পরিধি, মনের শক্তি বাড়াবার জন্য প্রস্তুতি নিতে হয়, সেই প্রস্তুতিটাই আমরা নিচ্ছি না। প্রস্তুতি তপস্যা দিয়ে হয়। কিন্তু এখন কোন কিছুতেই আমাদের তপস্যা নেই, না বিদ্যার্জনে, না অর্থোপার্জনে। এমনকি মায়েরাও সন্তানের জন্য তপস্যা করে না। মা যদি সন্তানের জন্য তপস্যা করে, বৃদ্ধ হলে সেই সন্তান সম্মানের সাথে মা-বাবার আদর যত্ন করবে। সেখানে সরস্বতী দেবী, যিনি সুপার জেট, তিনি নিজের বিদ্যার প্রসার প্রকাশ চাইছেন। ঠাকুর বলছেন, যে ভগবানের ঐশ্বর্য নেই, যে ভগবানের ভক্ত নেই, সেই ভগবান কিসের ভগবান, যে বাবুর বাগান নেই, বাড়ি নেই, গুণগ্রাহী ভক্ত নেই, সেই বাবু কিসের বাবু! মা সরস্বতীরও ভক্তের দরকার আছে। কিন্তু আমাদের মন এত সংকীর্ণ, এত ক্ষুদ্র যে মা সরস্বতীর হাঁস আর মা লক্ষ্মীর পেঁচা দরজা দিয়ে ঢুকতেই পারছে না। চেষ্টা করে আমরা কিছু অর্জন করতে পারি না, চেষ্টা করে শুধু আমাদের পাত্রতা আনতে হয়। ঠাকুর যেমন দক্ষিণেশ্বরে কুঠি বাড়ির ছাদ থেকে চিৎকার করে ডাকছেন, ওরে আমার ত্যাগী ভক্তরা কোথায় আছিস, তোরা এবার আয়। আমরা কি ভগবানকে খুঁজব, ভগবানই আমাদের পাওয়ার জন্য ছটফট করছেন, আর আমরা ভগবানকে দোষ দিচ্ছি, তিনি আমাদের কৃপা করছেন না। আমরাই ভগবানকে কৃপা করছি না। তিনি কৃপা নিয়ে আমাদের জন্য বসে আছেন। ভগবান তাঁর ভক্তই পাচ্ছেন না, গুরু অনেক পাওয়া যায়, চেলা পাওয়া যায় না। এখানে স্বামীজী মন আর মস্তিষ্ককে নিয়ে বলছেন। আমরা মনকে এত সংকীর্ণ, সীমিত করে রেখেছি যে, বৃহৎ জিনিস আমাদের মধ্যে আসতেই পারছে না। এরপর স্বামীজী আরেকটু গভীরে যাচ্ছেন।

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস

এরা আগে আমরা আলোচনা করেছি স্বামীজী concrete, generalization আর abstraction এই তিনটে স্তরের কথা বলতে গিয়ে কি বলতে চাইছেন। এই জিনিসগুলো কত গভীর আর কঠিন বিষয় যে, একটা দিনের একটা পাতাকে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা ওর মধ্যেই ঘুর ঘুর করে যাচ্ছি। যাদের সামনে এই কথাগুলো বলছেন, তাঁরা পড়াশোনা করা মানুষ ছিলেন আর স্বামীজীর সঙ্গ করে করে তাঁদের একটা প্রস্তুতি হয়ে গিয়েছিল। আগের আলোচনায় আমরা প্রধানতঃ বিজ্ঞান আর বেদান্তের কয়েকটি বিষয়কে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তার সাথে মস্তিষ্ক ও মনের পারস্পরিক সম্পর্ককে নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। স্বামীজী বলতে চাইছেন, আমরা জগৎকে যেভাবে দেখি, সেখান থেকে আমরা generalize করি, সেখান থেকে আসে ফিলজফি, ফিলজফি থেকে আসে abstraction। এই প্রসঙ্গ থেকে সরে এসে স্বামীজী এখন কান্টের মতকে নিয়ে বলছেন, Kant's great achievement was the discovery that 'time, space and causation are modes of thought', but Vedanta taught this ages ago and called it 'Maya', (*'দেশ-কাল-নিমিত্ত যে চিন্তারই প্রণালিবিশেষ' –এই আবিষ্কারই কান্টের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব; কিন্তু বেদান্ত বহু পূর্বেই এই তত্ত্ব শিক্ষা দিয়েছে, আর একে 'মায়া' বলে অভিহিত করেছে।*) মূল বিষয়ে যাবার আগে সবার আগে আমাদের বুঝতে হবে কান্টের এই বাক্যের অর্থ কি। তারও আগে আমাদের দর্শনের ইতিহাসকে সংক্ষেপে জানা দরকার, বিশেষ করে পাশ্চাত্য দর্শনের।

গ্রীক দার্শনিকদের হাত ধরে পাশ্চাত্য দর্শনের যাত্রা শুরু, যার মধ্যে প্রাচীন কালের বড় বড় গ্রীক দার্শনিকরা ছিলেন। কিন্তু পরের দিকে প্লেটো আসার পর, প্লেটোর গুরু সক্রেটিস আর প্লেটোর শিষ্য এ্যরিস্টটল, এই তিনজন, বিশেষ করে প্লেটো আর এ্যরিস্টটল, এই দুজনের চিন্তা-ভাবনা ও রচনা দিয়েই শেষ পর্যন্ত পাশ্চাত্য জগৎ দর্শনে নিজেদের ধ্যান-ধারণাগুলো তৈরী করে। প্লেটোকে বলা হয় Idealist, যেখানে মন, চিন্তা, ভাবনা এই জিনিসগুলোকে বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এটাই আশ্চর্যের যে, প্লেটোর শিষ্য এ্যরিস্টটল ছিলেন Realist আর Experimentalist, উনি সব কিছুকে আগে experiment করে দেখতে চাইবেন। এ্যরিস্টটল প্লেটোর শিষ্য, যদিও তিনি প্লেটোকে কোথাও negate করছেন না, কিন্তু তিনি সব কিছুতে objectivism দেখতেন, জিনিসটা যেমন আছে তাকে সেইভাবে পর্যবেক্ষণ করে সেটাকে দাঁড় করাতে চাইতেন। প্লেটো যেহেতু Idealist ছিলেন, সেইজন্য তাঁর সব কিছুই ছিল subjectivism, যেখানে মানুষের চিন্তা-ভাবনাকে কেন্দ্র করে চলে। এর আগে আমরা দৃশ্য ও দ্রষ্টাকে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। বৈজ্ঞানিকদের কাছে দৃশ্যেরই গুরুত্ব, আর দৃশ্যকে দিয়েই সব কিছুর ব্যাখ্যা করেন। যাঁরা Idealist বা যাঁরা Subjectivist, তাঁদের কাছে দ্রষ্টাই সব কিছু, আর দ্রষ্টাকে দিয়েই সব কিছুকে বোঝার চেষ্টা করেন। আমরা যত সহজে এই কথাগুলো বলে যাচ্ছি, জিনিসটা তত সহজ নয়। প্লেটো আর তাঁর সময়ের দার্শনিকদের পড়তে গেলে আমাদের মাথা ঝিম ঝিম করতে শুরু করবে।

ইতিমধ্যে ইউরোপে খ্রীশ্চান ধর্ম এসে গেল, খ্রীশ্চান ধর্ম আসার পর বাইবেলই হয়ে গেল সর্বোপরি। বাইবেল সব কিছু হয়ে যাওয়ার পর খ্রীশ্চানদের সাথে জুহুদিদের লড়াই শুরু হল। তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দী আসতে আসতে বাইবেল হয়ে গেল শেষ কথা। ইতিহাসে যা হয়ে থাকে, যে কোন দেশের রাজা যা বলবে, রাজা যে ধর্ম মতকে সমর্থন করবে সেটাই জনগণের ধর্ম হয়ে যাবে। খ্রীশ্চানিটিও সেইজন্য হয়ে গেল জনগণের ধর্ম, বাইবেল হয়ে গেল একমাত্র ধর্মগ্রন্থ, চার্চ হয়ে গেল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। এখন যা কিছু হবে, একমাত্র সেটাই হবে যেটা বাইবেল ও চার্চ বলবে। তার সাথে বাইবেল আর চার্চ নিজস্ব একটা দর্শন দাঁড় করাতে গিয়ে অনেক কিছু এ্যরিস্টটল থেকে নিয়ে এলো আর কিছু জিনিস প্লেটো থেকে নিয়ে এলো। এইভাবে প্রায় হাজার বছর চলল। এর মধ্যে বড় বড় দার্শনিকরা যাঁরা এলেন, তাঁরা বাইবেলে যে কথাগুলো আছে সেগুলোকে কেবল ব্যাখ্যা করে যেতে লাগলেন।

যেমন আমাদের ভারতবর্ষ, শঙ্করাচার্য বলুন, রামানুজ বলুন, মাধ্বাচার্য বলুন, গীতার কোন একটা শ্লোকের এনাদের দেওয়া ভাষ্যানুযায়ী এভাবে দেখবে, নাকি সেইভাবে দেখবে, এই করতে করতেই পণ্ডিতরা সমস্ত শক্তি লাগিয়ে দিয়েছিলেন। এই ধারাকে প্রথম এসে ভাঙলেন স্বামীজী, ভেঙে তিনি ওখান থেকে বেরিয়ে এলেন। কিন্তু এখনও ভারতে সেই অন্ধকার চলছে, নিজস্ব স্বাধীন চিন্তা-ভাবনা ভারতে কোথায়! আসলে স্বাধীন চিন্তা-ভাবনা এমনিতে হয় না ঠিকই, স্বাধীন চিন্তা কয়েকটি হয়। স্বামীজী বার বার বলছেন, কটি আর independent thought আছে! ঠিক ঠিক চিন্তা ভাবনা যদি হয়, মুষ্টিমাত্র, খুব জোর আট-দশটা আছে। বাকি সব কিছু ওর মধ্যেই ঘুর ঘুর করছে। তা হলেও, কেউ যখন নিজে স্বাধীন ভাবে চিন্তা-ভাবনা করে নিজের মতকে সামনে রাখছে, মানুষকে সেটা নাড়া দেয়।

বিহার ইউপিতে সব জায়গায় 'শ্রীরাম জয়রাম জয় জয় রাম' চলছে, বাংলায় 'হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ' চলছে, আর ঠাকুরের ভক্তরা যেখানে আছে, সেখানে 'শরণাগতোহম শরণাগতোহম' করে চলছে। শরণাগত করে করে, শুধু recycle করে করে এমন একটা অটো-হিপনোসিসে চলে যায় যে, মস্তিষ্ক একটা পাথর হয়ে যায়, ওই মস্তিষ্ক নূতন করে আর কিছু ভাবতে পারে না, আর ওই আশায় বেঁচে থাকে যে, মৃত্যুর সময় ঠাকুর এসে আমাকে নিয়ে যাবেন। ঠাকুর আমাদের জন্মের সময় যে পাথরের মস্তিষ্ক দিয়ে পাঠিয়ে ছিলেন, মরার সময় ওই পাথরের মস্তিষ্কটাই ঠাকুরকে আমরা ফেরত দেব, ঠাকুর তুমি যেমনটি দিয়েছিলে আমি তেমনটিই তোমাকে ফেরত দিলাম। ঠাকুর আমাদের সবাইকেই নিয়ে যাবেন ঠিকই, কারণ ঠাকুর ছাড়া তো কিছু নেই। স্বর্গটাও তাঁর নরকটাও তাঁর, গাছপালাও তাঁর আর সাপ-বিছেও তাঁর। কোথায় রাখবেন আমাদের জানা নেই। বুদ্ধিটা পাথরের মত হলে, পাথর হয়েই জন্মাতে হবে, কঠোপনিষদও যেমন বলছে মৃত্যুর পর স্থাণুর মধ্যেও জন্ম নেয়, *স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম যথাশ্রুতম্*।

বাইবেলও ঠিক একই অবস্থা, কোন independent thinking নেই, independent thinking হলেই চিতা সাজিয়ে পুড়িয়ে মেরে দেবে। এমনি মরলে কবরে দেবে, আর স্বাধীন চিন্তা-ভাবনা করলে চিতায় তুলে দেবে। প্রাচ্যের লোকেরা মারা গেলে চিতায় দেয়, আর যার সাথে ঝগড়া হবে তাকে বলে 'পুতে দেব', উল্টোটা হয়। মোটামুটি হাজার বছর পর পাশ্চাত্য জগৎ স্বাধীন ভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে শুরু করল। বৈজ্ঞানিকরা অনেক এগোতে শুরু করলেন, গ্যালিলিও স্বাধীন ভাবে পর্যবেক্ষণ করে কিছু সত্যকে সামনে আনতেই তাঁর নিজের উপর বিপদ ডেকে নিয়ে এলেন। মানুষ তখন দেখলো কোথাও কিছু একটা ভুল হয়ে যাচ্ছে। কারণ এ্যরিস্টটল যে চিন্তা-ভাবনাগুলি রেখে দিয়েছিলেন, যেগুলোকে চার্চরা মেনে চলছিল, আর তার মধ্যেই কোপার্নিকাস, গ্যালিলিওরা দেখছেন জিনিসগুলো ঠিক না।

স্প্রিংকে যদি গায়ের সব শক্তি দিয়ে দাবিয়ে রাখা হয়, ছাড়ার পর স্প্রীং সব সময় উল্টো দিকে যাবে। চার্চ এতদিন যত কিছুকে গলা টিপে রেখেছিল, সেগুলো উল্টোদিকে গেল, আর সবাই বলতে শুরু করল, আমরা সবাই রাজা রাজার রাজত্বে, আমরা আর কাউকে মানব না। আমরা চোখে যা দেখব, কানে যা শুনব, পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে আমরা যেটা জানব সেটাকেই আমরা সত্য বলে মানব, এর বাইরে আমরা কোন কিছু মানব না। এতদিনের ফরমান – বাইবেল ছাড়া কিছু মানতে পারবে না, এর এবার প্রতিক্রিয়া হল, তাতে বাইবেলকে ছেড়ে দাও, কোন চিন্তা-ভাবনাকে আমি মানব না, যতক্ষণ না আমি আমার পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে ওটাকে অনুভব না করছি। এটাকে ওনারা নাম দিলেন Empericism সেই সময়ের খুব নামকরা দর্শন বা Objectivism, যদিও দুটোর মধ্যে খুব সূক্ষ্ম তফাৎ আছে, ওর মধ্যে আমরা যাচ্ছি না। Empericism হল, জিনিসটা যেমন আছে আমি তেমনটাই নেব। যদি আমি চোখে না দেখে থাকি, আমার ইন্দ্রিয় দিয়ে যদি না অনুভব করে থাকি, আমি জিনিসটাকে মানব না। বিজ্ঞান পুরো দমে, বিশেষ করে ফরাসী বিপ্লবের পর থেকে এই দর্শনের উপর চলতে শুরু করল।

আমরা কল্পনা করতে পারি না, এই Empericism কি ক্ষতি করে গেছে। কারণ যে জিনিসকে আমি দেখিনি, সেই জিনিসকে আমরা মানব না, এর প্রথম ধাক্কা গিয়ে লাগল কেমেস্ট্রি বিজ্ঞানী ডাল্টন ও অন্যান্য বিজ্ঞানীদের উপর। ডাল্টন ও অন্যান্য বিজ্ঞানীরা যখন মলিক্যুলস থিয়োরী, এ্যটোমিক থিয়োরী দিতে শুরু করলেন, তখন বৈজ্ঞানিকরা বলতে শুরু করলেন, এ্যটমকে তো কেউ দেখেনি, এ্যটমের কোন প্রমাণ নেই, সেইজন্য এ্যটমকে আমরা মানব না। সেইজন্য যে সিদ্ধান্তগুলি এ্যটমকে নিয়ে চলছে, সব মিথ্যা। যেমন সবাই বলে, ভগবান আছেন কিনা প্রমাণ চাই, ভগবানকে আমি দেখিনি কেন ভগবানকে মানতে যাব! ভাই তোমরা তো ইলেক্ট্রনকেও দেখোনি, মানছ কেন? এ্যটমের তো তাও প্রমাণ এসে গেছে, ইলেক্ট্রনের তো কোন প্রমাণ আসেনি, তাও মানো কেন? যাই হোক তা সত্ত্বেও Empericism রাজ করতে শুরু করল।

Empericismএর প্রতিক্রিয়াতে এলো Rationalism। বা অনেক সময় এটাকে Realismও বলে। ওনারা বললেন, এটা ঠিক না, জ্ঞান লাভের জন্য চিন্তা-ভাবনা হল আসল। সবাই এখানে how to be know, এটাকে নিয়ে বলতে শুরু করলেন। শাস্ত্র অধ্যয়নের সময় আমরা বার বার প্রমাণ শব্দটা পাই, *স যৎ প্রমাণং কুরুতে*, গীতায় যেমন বলছেন।

প্রমাণের অর্থ হল, method of knowledge, কোন জিনিসকে আমরা কিভাবে জানি? বা একটা জিনিস ঠিক না ভুল, আমরা কিভাবে জানব? কোন কিছুকে জানার জন্য আমাদের পরম্পরায় ষট্ প্রমাণ, ষট প্রমাণ মানে ছয় রকম প্রমাণ। ছটি প্রমাণের মধ্যে এটাও বলা আছে, গুরুজন যেটা বলে দেন, সেটাও প্রমাণ। যেমন মা বলে দিয়েছেন, উনি তোর বাবা, বাচ্চা জানে উনি তার বাবা। এখন সবাই মিলে যদি সব রকম প্রশ্ন করতে শুরু করে, সমস্ত সন্তানরা কালকেই দরখাস্ত পেশ করবে আমার বাবার ডিএনএ টেস্ট করা হোক। এভাবে আর যা কিছু চলুক, জীবন কখনই চলতে পারে না। মা বলে দিয়েছেন উনি তোমার বাবা, উনি আমার বাবা। বিশ্বাসের উপর চলে। এগুলোকে কিছুটা শব্দ প্রমাণ বলা যেতে পারে। কিন্তু বেদান্তে যখন শব্দ প্রমাণ বলা হয়, সেখানে তখন আধ্যাত্মিক সত্যকে নিয়ে বলা হয়। এখানে অনেক সময় এটাকে ঐতিহ্যও বলা হয়, যেমন গ্রাম দেশে বহু কাল থেকে অনেক রকম কথা চলে আসে, যেমন বলে এই গাছে ভূত থাকে। এখন গ্রামের পরম্পরায় চলে আসছে, এই গাছে ভূত থাকে, সেটাকে নিয়ে কেউ আর প্রশ্ন করতে যায় না। আবার

আমরা এক অপরকে বিশ্বাস করি, তাই তার কথাকে মেনে নিই। ওনাদের কাছে সমস্যা হল, জ্ঞান কিভাবে হয়। যারা Objectivist তারা বলে দিল, আমরা কারুর মুখের কথায় কিছু মানতে যাব না, পঞ্চ ইন্দ্রিয় ছাড়া আমরা কিছু মানব না।

আমাদের চার্বাকরাও তাই বলে। সেখান থেকে নৈয়ায়িকরা নিয়ে এলেন যুক্তি বিচার, যুক্তি তর্ক করে আমরা যেটা পাব, সেটাকেই মানব। তার মানে, শেষমেশ একটা জিনিস সত্য কিনা কিভাবে জানা যাবে? একজন বলছে, ইন্দ্রিয় দিয়ে, আরেকজন বলছে যুক্তি দিয়ে। এখন নৈয়ায়িকরা বলছেন, তাঁদের কিছু কিছু সিদ্ধান্ত ম্যাথামেটিক্সে আছে, ম্যাথামেটিক্সে সব জিনিসকে দেখানো যায় না, যেমন এ্যলজেব্রার যে ইক্যুয়েশান গুলি আছে, আর উচ্চ পর্যায়ের ম্যাথামেটিক্সে গেলে সব জিনিসকে দেখানো যায় না। তার সাথে বলছেন, যেমন লজিক আছে, এথিক্স আছে, মেটাফিজিক্স আছে, এই সব জিনিসের ক্ষেত্রে objectivism চলে না। এতগুলো জিনিসের ক্ষেতে যদি না চলে, তার মানেই objectivism পুরো সত্য নয়। আমরা মানছি এনারা সবাই সত্যের সন্ধানেই লেগে আছেন। এখন সত্যের সন্ধানে গিয়ে যদি দেখা যায়, একটা জায়গায় তুমি সত্য, বাকি চারটে জায়গায় তুমি সত্য নও, তাহলে তোমার সত্য সার্বভৌমিক সত্য হল না। Rationalistরা বলছেন, আমরা বিচার করে যে অনুভবগুলো পেয়েছি, সেটাকেও যদি আমরা নিয়ে নিই, আর সেটাকে যদি আমরা বিচার করতে শুরু করি, তাহলে আমরা এই সব কটা সাবজেক্টকে পুরো ব্যাখ্যা করে দিতে পারি, সেইজন্য এনারা হলেন Realist, যদিও Rationalist নামে বেশি প্রচলিত। এভাবেই সব জিনিসগুলো চলছিল, আর এখনও চলছে।

ইম্যানুয়াল কান্টের দর্শন

যদি কেউ বলে, ঈশ্বর আছেন এর কি প্রমাণ আছে? তাদের তখন এটাই বলতে হবে, এটাই প্রমাণ, যেমন তোমার বাবাই তোমার বাবার প্রমাণ, একই প্রমাণ ঈশ্বর আছেন কিনা। আধখানা মানবে, আধখানা মানবে না, এই জিনিস তো চলতে পারে না। এই ধরণের প্রশ্ন যারা করে, বেশির ভাগেরই ভিতরে কিছু সার নেই, কিন্তু অজান্তায় এরা সবাই Objectivist বা Empericist, সেইজন্য এদের কিছু বলা যায় না। এই জন্য বলা যাবে না, ওদের ভিতরে তো কোন জ্ঞান নেই, দু চারটে জিনিসকে নিয়ে শুধু হৈ হল্লা করার জন্য কিছু কথা বলে দেয়। কিন্তু প্রমাণ ছাড়া আমি কিছু মানব না, পুরোপুরি এর উপর যদি দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে স্কুলে ভর্তি হতে গিয়ে হেডমাস্টারকে প্রথমে জিজ্ঞেস করতে হবে, 'আপনি কি এই স্কুলের হেডমাস্টার'? 'হ্যাঁ'। 'আমি কি করে মানব যে এই এই ডিগ্রী আপনার আছে? আপনার সব সার্টিফিকেট গুলো দেখান'। এখন হেডমাস্টার সব সার্টিফিকেট বার করে দেখাবেন। শিক্ষক ক্লাশে পড়াতে এসেছেন, সে বলবে, 'দাঁড়ান, আপনি পাশ করেছেন? আপনার সব সার্টিফিকেট দেখান'। কেউ যদি ঠিক ঠিক Objectivist হয়, তাহলে তাকে ঠিক এভাবেই যেতে হবে। প্রত্যেকটি কথার প্রমাণ চাই। তার মারাত্মক একটা এ্যক্সিডেন্ট হয়েছে, ডাক্তার এসেছে তাকে দেখতে, ডাক্তারকে বলবে, 'দাঁড়ান আগে আপনার মেডিক্যাল সার্টিফিকেটটা দেখান। আগে আপনার সার্টিফিকেট দেখব তারপর আপনি কথা বলবেন'। চিকিৎসা করাতে গিয়ে কেউ তো ডাক্তারকে বলে না, 'আপনি ডাক্তার কিনা প্রমাণ চাই'। পাঁচজন মেনে নিয়েছে তখন সেটাই প্রমাণ। কিন্তু ভগবান আছেন কিনা, তার বেলায় সব প্রমাণ লাগবে। এই সময় জার্মানে এলেন ইম্যানুয়াল কান্ট। ১৭২৪ সালে তাঁর জন্ম, আর ১৮০৪ সালে, অর্থাৎ স্বামীজীর শরীর যাবার একশ বছর আগে তিনি চলে গেলেন। কিন্তু তিনি অনেক দিন জীবিত ছিলেন। তখনকার দিনে জার্মানই ছিল দর্শনের পীঠস্থান।

কান্ট এসে বললেন, আমরা সব কিছুকে যুক্তিতর্ক দিয়ে বিচার করতে শুরু করি। কান্টের যত বই আছে তার মধ্যে সব থেকে নামকরা বইয়ের নাম 'Critic of Pure Reason'। সেখানে তিনি শুধু reasoning জিনিসটাকে বিশ্লেষণ করছেন। তাঁর বই এত কঠিন যে সারা বিশ্বের কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্টসরাও কিছুই বুঝতে পারে না, তারাও মানে যে কান্টকে পড়ে কিছু বোঝা যায় না। কান্টের রচনার উপরে যাঁরা বই লিখেছেন, তাঁরাও কিছু বোঝেন না। কারণ কান্ট নিজের শব্দাবলী দাঁড় করিয়ে নিতেন। একটা শব্দ বললেন, যেমন বললেন thinks in, এরপর তিনি thinks in শব্দ দিয়ে কি বলতে চাইছেন, সেটাকে তিন চার পাতা ধরে ব্যাখ্যা করতে থাকবেন। ওই ব্যাখ্যা যতক্ষণ আমরা পড়ব ততক্ষণে আমাদের ধৈর্য হারিয়ে

যাবে। এরপর ওনার সারা লেখায় thinks in থাকবে। আমরা যদি কোন বস্তুর সার বলতে চাই, উনি বস্তুর সার বলবেন না, বদলে একটা নূতন শব্দ নিয়ে আসবেন thinks in। তাহলে কি essence বলে দিলেই হবে? না, হবে না। Essence আর thinks in তার থেকে একটু তফাৎ থাকবে। ওই তফাৎকে বোঝানর জন্য তিনি এবার তিন চার পাতা লাগাবেন। এখানে আমরা একটা শব্দকে নিয়ে বললাম। ইম্যানুয়াল কান্টের যত বই শুধু নূতন শব্দগুলিকে নিয়ে, যার জন্য ওনার লেখা কিছু বোঝা যায় না।

উইল ডুরাণ্ডের একটা খুব নামকরা বই আছে, The Story of Philosophy, তাতে উনি খুব সুন্দর করে কান্টের ফিলজফিকে নিয়ে লিখেছেন। একটা জায়গায় উইল ডুরাণ্ড লিখছেন, 'আমার এই বই পড়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক বললেন, অনেক বছর ধরে ছাত্রদের কান্টকে পড়াচ্ছি, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারিনি; আপনার এই লেখাটা পড়ার পর শেষ পর্যন্ত মনে হচ্ছে একটু যেন বুঝতে পারছি'। কান্ট কিন্তু একটুও confused নন, ওনার কাছে সব পরিষ্কার ও স্পষ্টম্। কিন্তু অপরকে যখন দিতে যাচ্ছেন, তখন তাঁর ঠাকুরের মত বলতে হচ্ছে, কাকেই বা বলব আর কেই বা বুঝবে। উনি এখন বোঝানর জন্য নূতন শব্দ নিয়ে আসছেন, যার অর্থ বোঝা অসম্ভব।

স্বামীজী এখানে কান্টের যে কথা বলছেন, আমরা তার বিস্তারে যাচ্ছি না। কান্ট একটা নূতন পথ বার করলেন যেটা Empericismও না, Realism বা Rationalismও না। তিনি দুটোর মাঝামাঝি একটা পথ বার করলেন, যেটাকে বলা হয় কান্টের Trascendental Idealism। যারা বলছে ইন্দ্রিয় দিয়ে যে জিনিসকে আমরা জানতে পারি শুধু সেটাকেই মানব, কান্ট দেখাচ্ছেন এটা পুরোপুরি ভুল। যারা শুধু reasoningকে নিয়ে চলে, যারা Rationalistic, তাদেরও কান্ট ছাড়ছেন না, পুরো লজিক দিয়ে দেখাচ্ছেন কোথায় তারা ভুল করছে। কোন কোন সন্ন্যাসী আছেন যাঁরা বলেন, 'Mathmatics is my religion, 'Reasoning is my religion' ইত্যাদি; এঁদেরকেই logically কান্ট দেখাচ্ছেন, তুমি যেটাকে reasoning বলছ, একটা জিনিসকে তুমি যখন study করছ, তুমি যতই চেষ্টা কর, ওর মধ্যে তোমার মন ঢুকে যাবে; কোন পথ নেই যে ওর মধ্যে তুমি মন ছাড়া ঢুকতে পার। যেখানে pure Objectivism আছে, মানে আমরা ইন্দ্রিয় জ্ঞান ছাড়া অন্য কিছু মানব না, এদের মতকে যুক্তিবাদীরা অনেক আগেই খণ্ডন করে রেখে দিলেন। তোমাদের মানা যাবে না। কেন মানা যাবে না? কারণ আমরা যখন higher mathmaticsএ যাচ্ছি, লজিকে যাচ্ছি তখন এগুলো ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যায় না। তখন ওনারা একটা নূতন শব্দ বার করলেন, Logical Realism। তার মানে, লজিককে ওর মধ্যে একটু ঢোকালেন। কিন্তু যারা ঠিক ঠিক Rationalistic, তারা পুরো অন্য, যা কিছু হচ্ছে সব আমাদের মাথায় হচ্ছে, মাথা দিয়েই সব কিছু করা যায়। আসলে এটা একটা খুব লম্বা বিষয়, সংক্ষেপে এর বেশি কিছু আমরা বলতে পারি না।

কান্ট তাঁর দর্শনকে যেভাবে লজিক্যালি দেখালেন, সত্যি কথা বলতে কি, কান্টের ওই দর্শন আসার পর পুরো পাশ্চাত্য দর্শনই পাল্টে গেল। যদিও আমরা বলছি কান্টকে বোঝা খুব কঠিন কিন্তু ওর যে impact, সাংঘাতিক। কি রকম impact? বলছেন, যেমন নিউটন আসার পর পুরো ফিজিক্স পাল্টে ইক্যুয়েশানসে চলে গেল, ঠিক তেমনি দর্শনের জগৎ কান্ট আসার পর পুরো পাল্টে গেল। তিনি এমন এমন সব লজিক ঢুকিয়ে দিলেন, যেখান থেকে বেরোবার কোন পথ নেই। আর লজিককেও লজিক দিয়ে বিচার করে দেখাচ্ছেন, তুমি যে যুক্তি যুক্তি করে যাচ্ছ, জগতে কোন কিছু নেই যেখানে তোমার মন ঢুকবে না। একমাত্র ম্যাথমেটিক্স যেখানে দুইয়ে দুইয়ে চার, সেখানে তোমার মন ঢোকার প্রশ্ন নেই। তিনি দেখালেন, জগতে একটা দুটো জিনিস আছে, যেটাতে মানুষ প্রভাবিত না হয়ে বিচার করতে পারে। যখন আমরা বলছি, ঠাকুর কৃপা করবেন, আমরা জানি আর নাই জানি, এর মধ্যে আমার আপনার মন ঢুকে আছে। যখন সৌন্দর্যের কথা বলা হচ্ছে, সেখানে আমাদের মন পুরো ঢুকে আছে। তেমনি ভালবাসা, আমাদের মন পুরো ঢুকে আছে। কান্ট ওটাকে টেনে নিয়ে দেখাচ্ছেন, যখন দেশ ও কালের ব্যাপার আসছে, সেই দেশ ও কালও আমাদের মনের দ্বারা রাঙিয়ে যাচ্ছে। কেউ যদি মনে করে কাল বা সময় একটা abstract জিনিস, এটা তার ভুল ধারণা। যদি কেউ মনে করে দেশ একটা জিনিস, এটাও একটা তার ভুল ধারণা। বিজ্ঞান যখন চলে বা কোন চিন্তা-ভাবনা যখন করছি, তখন দেশ ও কাল হল শেষ কথা। দেশ ও কালকেও তিনি দেখাচ্ছেন, দেশ ও কাল তোমার মন দিয়ে রঙে রয়েছে।

আমরা একটা স্থূল উপমা দিতে পারি, যদিও এটা সরাসরি খাপ খাবে না, কিন্তু বোঝার জন্য সুবিধা হবে। যেমন আমি কারুর জন্য অপেক্ষা করছি, বার বার ঘড়ি দেখে যাচ্ছি আর ভাবছি এত সময় চলে গেল এখনও এলো না, কিন্তু আসলে তখন মাত্র দু পাঁচ মিনিট হয়েছে। পাঁচ মিনিটকেই তখন মনে হচ্ছে যেন এক ঘন্টা সময় চলে গেছে। আবার কোন আনন্দের মুহূর্তে এক ঘন্টা সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে, কিন্তু মনে হবে যেন পাঁচ মিনিটেই সব শেষ হয়ে গেল। এটা বোঝাবার জন্য বলা হল। কান্ট পুরো যুক্তি দিয়ে দেখাচ্ছেন, দেশ ও কালও মনের রঙে রাঙিয়ে আছে।

উনি একটা জায়গায় বলছেন, Space is not something objective and real। একেবারে পরিষ্কার করে বলছেন, space জিনিসটা objective নয়। Objective মানে, যেমন এই কলম, এটা object, একটা বস্তু, বাস্তব। যদি আমরা মনে করি দেশ একটা বাস্তব বস্তু বা সত্যিকারের তার অস্তিত্ব আছে, real, কিন্তু তা নয়। Not a substance, এটা যে কোন দ্রব্য তাও নয়, nor an accident nor a relation, মন যত রকমের সম্পর্ক দিয়ে মাপতে পারে, কোন spaceএর কোন সম্পর্ক নেই, instead it is subjective and ideal। আমরা যেভাবে spaceকে দেখছি, space সেই রকম। ইদানিং কালে বিজ্ঞান যখন মাপামাপিকে নিয়ে অনেক কিছু করছে, কান্ট সেখানে অনেকগুলো জিনিস আগেই বলে দিয়েছিলেন, যেমন distance gallaxyকে নিয়ে।

শুধু বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে কান্ট অনেকগুলো কথা বলেছিলেন। যেমন বলছেন, It is subjective and ideal and originates from mind’s nature, in accordance with stable law as a skin, আমাদের মনের ভিতরে laws আছে, সেই lawsকে আধার করে sense of spaceএর জন্ম হয়। তার মানে, আমরা যখন spaceকে দেখছি, তখন space নিজের মত আছে, তার আইনগুলিকে আমাদের মস্তিষ্ক ধরছে, মন ধরছে। কিন্তু তা হচ্ছে না, উল্টোটা হচ্ছে। আমাদের সবার মনের ভিতরে কিছু নিয়ম আছে, সেই নিয়মের অনুসারে আমরা spaceকে বুঝছি, ভাবছি। As it where for coordinating everything externally, আমাদের মনের ভিতরেই সব আইনকানুন, বিধানগুলি রয়েছে, সেই বিধানকে আধার করে এই বহির্জগৎ দেখাচ্ছে, সেই বহির্জগতকে তখন আমরা আবার বহির্জগতে দেখে অবাক হয়ে দেখছি। এখন বড় বড় দার্শনিকরা বলছেন, কান্টের ওই একটা বাক্য থেকে চার রকমের থিয়োরী বেরিয়ে আসে, কান্ট আসলে কি বলতে চাইছেন।

এনসাইক্লোপেডিয়াতে ফিলজফির ভাল ভাল বইগুলি সার্চ করলে দেখা যাবে, শুধু একটা বাক্যের উপর পাঁচটা আলাদা interpretation থেকে পাঁচটা আলাদা থিয়োরি বেরিয়ে আসবে। আর সত্যিকারের তাই হয়েছে, কান্টের বক্তব্যকে ফিলজফাররা নিজের নিজের মত ব্যাখ্যা করেন, সেইজন্য কান্টের ঠিক কি বক্তব্য কেউই ঠিক মত ধরতে পারছে না। কিন্তু এই জায়গাতে তিনি পরিষ্কার বলে দিতে চাইছেন, দেশ ও কালকে আমরা যেভাবে দেখছি, জিনিসটা কিন্তু তা নয়। দেশ ও কালের আইডিয়া আর দেশ ও কালের যে রেগুলেশানস্ হচ্ছে যে আইন দিয়ে, সেগুলো আমাদের মনের ভিতরেই রয়েছে, মনের মধ্যেই সে ওটাকে তৈরী করে, বাইরেও সেই ওই রকমই দেখবে। অনেক আগে আমাদের একটা আলোচনাতে World as externalized thoughtএর ব্যাপারে বলা হয়েছিল, তখন জিনিসটা আমাদের বেশ কঠিন মনে হয়েছিল। হিন্দুরা অনেক দিন ধরে যে জিনিসগুলোকে মানছে, এখনও যেগুলোকে নিয়ে বলে আসছে, সেগুলোর সাথে কান্টের বক্তব্য অনেক বেশি মিলে যায়।

কান্ট আবার আরও এগিয়ে বলছেন, Reason itself is structured with forms of experience and category that give a phenomenal logical structure to any possible object of imperial experience, তুমি যে যুক্তিবাদী যুক্তিবাদী বলে যাচ্ছ, rationalismকে নিয়ে যে এত কথা বলে যাচ্ছ, কিন্তু তুমি এটা জানো না যে, যে যুক্তিটা তুমি নিজের জন দাঁড় করিয়েছ, সেই যুক্তিটা নিজেই হল – বহির্জগৎ থেকে তুমি যে অনুভব করেছ, সেই অনুভবকে তোমার মন নিয়েছে, মন সেই অনুভবগুলিকে নিজের মত বিচার করে, যাচাই করে করে নিজের মত একটা যুক্তি দাঁড় করিয়েছে। একটা অত্যন্ত সাধারণ দৃষ্টান্ত নেওয়া যেতে পারে, যদিও এই লেভেলে গিয়ে মেলে না, একই প্রকার মিষ্টি দুজনকে

খেতে দেওয়া হল, একজন বাচ্চা ও আরেকজন তার দাদু। বাচ্চা মিষ্টি খাওয়ার পর বলবে, আঃ অমৃত খেলাম। তার পাশেই দাদুকে দেওয়া হল, দাদুর ডায়বেটিস্, দাদু দেখেই বলল এটা বিষ। এবার যুক্তি এসে যাচ্ছে। যুক্তি দাদুকে বলছে, তুমি মিষ্টি খেও না। বাচ্চাকে যুক্তি বলছে, তুমি মিষ্টি খাও। দাদুর যে যুক্তি চলছে, দাদুর মনের যা যা ভাব, সে ভাবে পুরোপুরি রঙে গিয়ে যুক্তি সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে। যুক্তিবাদীরা বলবে, আমরা তো এটাই বলতে চাইছি – মিষ্টি মিষ্টিই, মিষ্টিতে আমার মনকে জড়াতে চাইছি না। তাহলে ওটা empericismএ চলে যাচ্ছে, বস্তু যেমন তাকে তেমন দেখ। না, এভাবে কখনই হয় না। যখনই আমরা জিনিসটাকে দেখতে যাচ্ছি, তুমি বলছ মিষ্টি মিষ্টিই, এই মিষ্টিতে এত পরিমাণ সুগার আছে, তখন ওই মাপটুকু পর্যন্ত থাকছে। কিন্তু reasoningএ, যেটা আগে বলা হল, যারা reasoning দিয়ে চলে তারা আগেই দেখিয়ে দিয়েছে empiricism শেষ কথা হতে পারে না।

কান্ট এসে দেখালেন, তুমি যে এত দিন যুক্তি যুক্তি করছ, তুমি যে যুক্তিকেই নিয়ে আসো না কেন, unless it is based entirely on mathematics। যার জন্য পরে ব্রার্ট্রাণ্ড রাসেল এসে একটা নূতন থিয়োরি দাঁড় করালেন, যেখানে তিনি বললেন, একমাত্র ম্যাথম্যাটিক্স হল পিওর লজিক, ম্যাথমেটিক্স ছাড়া লজিক হয় না। হিডিল্ নামে একজন নামকরা ম্যাথম্যাটিক্যাল ফিলজফার ছিলেন, তিনি আবার ম্যাথিম্যাটিক্যালি প্রমাণ করলেন, ম্যাথম্যাটিক্সের ভিতরে থেকে ম্যাথম্যাটিক্স যে ঠিক এটা প্রমাণ করা যায় না। ব্রার্ট্রাণ্ড রাসেলের থিয়োরি ওখানেই শেষ হয়ে গেল। কান্টের এটাই সব থেকে বড় অবদান, তা হল, যদি পুরোপুরি বস্তুকে নিয়ে চলা হয়, কোন দিন জগৎকে বোঝা যাবে না। যুক্তির কথা শুনতে ভাল লাগে, আমি যুক্তিবাদী এটাও বলতে ভাল লাগে, আর সব থেকে বেশি সংখ্যায় যুক্তিবাদী এই বাংলাতেই পাওয়া যায়, সব কিছুতে ওরা যুক্তিবাদী। এরা জানে না যে, তিনশ বছর আগে কান্ট এসে দেখিয়ে দিলেন, তোমার যত যুক্তি আছে, সব যুক্তি তোমার মনের রঙের গামলায় চুবিয়ে রাঙানোর পর সেটাই যুক্তির মানদণ্ড তৈরী হচ্ছে। তোমার রঙিন চিন্তা-ভাবনা দিয়ে সবাইকে মেপে যাচ্ছ, আর সেই কারণেই তোমার যুক্তি চিরদিনই ভুল হবে।

কিন্তু স্বামীজী যে জিনিসটাকে নিয়ে এখানে বলছেন, যেটাকে নিয়ে আমাদের এখন এগোতে হবে, তা হল, দেশ ও কাল পুরোপুরি মনের ব্যাপার। স্বামীজী কান্টের দর্শনে অবশ্যই প্রভাবিত ছিলেন, কান্ট আর হেগেল দুজনকেই তিনি পড়েছিলেন আর শোপেনহাওয়ারকে তো পড়েই ছিলেন, তাঁকে পছন্দও করতেন। কিন্তু স্বামীজীর আইডিয়াগুলি কান্টের বেশি কাছাকাছি চলে, সেইজন্য কান্টের মত স্বামীজীকেও বোঝা অনেক কঠিন হয়ে যায়। স্বামীজী কান্টের একটা বাক্যকে নিয়ে বলছেন, Kant's great achievement was the discovery that 'time, space and causation are modes of thought'। কান্টের মূল বক্তব্য হল, দেশ ও কালের জন্য তোমার মনের ভিতরেই কিছু বেসিক নিয়ম, বেসিক আইডিয়া আছে, সেটাকে দিয়ে তুমি দেশ ও কালকে তৈরী করে নিচ্ছ, তৈরী করে সেটা দিয়ে মেপে আবার ভিতরে নিয়ে আসছ। বেরোচ্ছে তোমার থেকে, বেরিয়ে বাইরে যাচ্ছে, আবার তুমি ওটাকে বড় মনে করে তুমি তোমার ভিতরে নিয়ে নিচ্ছ, নিয়ে সেটাকেই আবার বাইরে দিচ্ছ। কান্ট যে তাঁর মাথায় একটা চিন্তা-ভাবনা এসেছে আর সেটাকে তিনি সামনে ছেড়ে দিলেন তা না, উনি একেবারে লজিক্যালি জিনিসটাকে step by step দেখিয়েছেন। আমরা বলতে পারি যে, ওনারও চিন্তাগুলি মনের রঙে রঙেছিল। ঠিকই ওনারও coloured thoughts রয়েছে, কিন্তু বাকিদের তুলনায় ওনার colouringটা কম। কান্ট দেখিয়ে দিচ্ছেন, শুদ্ধ চিন্তা, শুদ্ধ যুক্তি হতে পারে না, দেশ কাল তুমি যেটাকে বলছ, সেটাও তোমার হতে পারে না, দেশ ও কাল সরাসরি তোমার মন থেকেই আসছে।

এবার স্বামীজী থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কের তাঁর শিষ্যদের কাছে আসল জিনিসটাকে নিয়ে আসছেন। বলছেন, but, Vedanta taught this ages ago and called it 'Maya'। এখানে স্বামীজীর উদ্দেশ্য কান্টকে বড় করা বা তাঁর দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করা না, আর স্বামীজী কোন একজন পাশ্চাত্য দার্শনিককে অনুসরণ করতেন না। যদি প্রশ্ন করা হয়, স্বামীজী ঠিক ঠিক কোন পাশ্চাত্য দার্শনিককে মানতেন? তার উত্তরে বলা হবে, কাউকেই না। স্বামীজী ছিলেন বেদান্তের অনুগামী, আর বেদান্তের মধ্যেও মূলতঃ শঙ্করাচার্য্যকে বেশী মানতেন। বেদান্তের সিদ্ধান্তগুলি বোঝানর জন্য, যদি কোন ফিলজফারকে নিতে হয় তিনি সেই ফিলজফারকে ততটুকুই নেবেন, যতটুকুতে বেদান্তের বক্তব্যকে বোঝান যাবে। স্বামীজীর কাছে একটাই দর্শন, বেদান্ত।

বেদান্তকে বোঝানর জন্য যখন যাকে নিতে হবে তখন তাকে ঠিক ততটুকুই নিতেন, যেটুকুতে তাঁর কাজ চলে যাবে। শঙ্করাচার্যের ক্ষেত্রেও স্বামীজী একই জিনিস অনুসরণ করেছেন, আর শঙ্করাচার্যও নিজে ঠিক একই জিনিস করেছেন।

উপনিষদ, গীতা, ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্য পড়ে আমরা কিছুই বুঝতে পারব না যে, শঙ্করাচার্যের ঠিক ঠিক কি মত। ওনার কাছে একটাই সত্য আছে, ব্রহ্ম সত্য, আত্মাই একমাত্র সত্য, বাকি সব কিছু বেকার। আত্মাই একমাত্র সত্য, এটাকে প্রমাণিত করার জন্য, যখন যে বইকে ধরবেন, সেই বইতে যা আছে সেটাকেই মেনে নেবেন। সৃষ্টি ব্রহ্মা করেছেন, আচার্যও বলছেন ব্রহ্মা করেছেন। ভগবান করেছেন, আচার্যও বলবেন ভগবান করেছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ আছেন, আচার্যও বলবেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ আছেন। দেবতাদের জন্ম হল, অসুরদের জন্ম হল, তিনিও বলবেন দেবতা ও অসুরদের জন্ম হল। তাহলে ব্রহ্ম সত্য কোথায় হল? আচার্য বলে দিলেন, এগুলো সব ব্যবহারিক সত্য, এগুলো আসল সত্য নয়। স্বামীজীও যখন পাশ্চাত্যের কোন নামকরা দার্শনিককে নিয়ে আসছেন, সেখানেও তাঁর বক্তব্য এটাই, বেদান্তে এই কথা হাজার হাজার বছর আগে থেকেই আছে, আজকে এটা পড়ে তোমরা অবাক হয়ে তাকাচ্ছ।

এই যে মায়া, বিশ্ব মন, সমষ্টি এর থেকে আরও অনেক নীচে। আমাদের কাছে, দেশ ও কালের যে আইডিয়া, এটা মায়া। এই কথা আমরা হাজার হাজার বছর আগে থেকে বলে আসছি, হাজার হাজার বছর আগে থেকে আমাদের আচার্যরা এই শিক্ষাই দিয়ে এসেছেন। তুমি যেটাকে দেশ কাল মনে করছ, আসলে এটা মায়ার ভিতরেই রয়েছে। ভগবান এই মায়ার বাইরে, তিনিই Absolute, ব্রহ্ম। বলছেন, Schopenhauer stands on reason only and rationalizes the Vedas. (*শোপেনহাওয়ার শুধু যুক্তির উপর দাঁড়িয়ে বেদান্ত তত্ত্বগুলির যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করছেন।*) এখন মজার ব্যাপার হল, কান্ট হলেন Transcendental Idealist, আর কান্টের জীবদ্দশাতেই শোপেনহাওয়ার এসে যান আর শোপেনহাওয়ার থাকতে থাকতেই হেগেল এসে গেলেন। শোপেনহাওয়ারের খুব নামকরা সব বই আছে, কিন্তু উনি যখন লেখালেখি করতে শুরু করলেন, তখন ওনাকে সবাই নৈরাশ্যবাদী বলতেন, ওনার লেখার মধ্যে কেমন একটা নৈরাশ্যের ভাব ফুটে উঠত। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে শোপেনহাওয়ারের চিন্তা-ভাবনা সম্মান পেতে শুরু করে। শোপেনহাওয়ারের সময় হেগেল একজন রকস্টারের মত প্রসিদ্ধ ছিলেন।

দুজনে একই ইউনিভার্সিটিতে পড়াতেন, হেগেল যখন লেকচার দিতেন তখন ওনার ক্লাশ রুমে জায়গা হত না, লোকেরা বাইরে দাঁড়িয়ে নোট নিত। শোপেনহাওয়ারের ক্লাশে মেরে কেটে দশ থেকে পনেরজন আসত। সেই শোপেনহাওয়ার পরে হেগেলের নামে বলছেন, He stands as monument of German stupidity। সেই হেগেলের থিয়োরিকে বেস করে পরে কম্যুনিস্ট থিয়োরি বেরিয়েছে। শোপেনহাওয়ার প্রথমের দিকে একটা দুটো উপনিষদ পড়েছিলেন, আর পড়ে তিনি এত প্রভাবিত হয়ে গেলেন যে, পরে তিনি উপনিষদ, বেদ, গীতা সব পড়েছিলেন। আর উনি বলতেন, আমার জীবনের এটাই সার্থক, আমি উপনিষদ পড়েছি, আমি যখন মারা যাব তখন উপনিষদের বাণীই আমাকে শান্তি দেবে। এখন উনি উপনিষদের কথাকে আক্ষরিক ভাবে নিতে শুরু করলেন। কিন্তু শোপেনহাওয়ার ছিলেন কান্টের একেবারে কট্টর অনুগামী, ইম্যানুয়াল কান্ট যেন শোপেনহাওয়ারের ভগবান। উনি বলতেন কান্ট Trascendental Idealismকে যেখানে ছেড়ে দিয়েছেন, সেখান থেকে আমি শুরু করেছি। অন্য দিকে কান্ট আর হেগেলের দর্শন বিপরীত, কেউ কারুর সাথে মেলে না। শোপেনহাওয়ার বেদ উপনিষদকে এতটাই আক্ষরিক ভাবে নিতেন যে, বেদে বলছে মানুষের আয়ু একশ বছর, ওনারও বিশ্বাস ছিল আর সবাইকে বলতেনও যে আমি একশ বছর বাঁচব। কিন্তু তিনি একশ বছর পর্যন্ত বাঁচেননি, এটাকে নিয়ে তাঁর দর্শনকে অনেকে মজা করে বিদ্রুপ করতে ছাড়ে না। স্বামীজী বলছেন, উনি শুধু যুক্তির উপর দাঁড়িয়ে বেদের তত্ত্বগুলির যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করে গেছেন। শোপেনহাওয়ার ইম্যানুয়াল কান্টের ট্রাডিশানেই গেছেন।

এরপর স্বামীজী শঙ্করাচার্যকে নিয়ে আসছেন, বলছেন, Shankara maintained the orthodoxy of the Vedas, এই জায়গাতে এসে বইতে ডট্ ডট্ দেওয়া আছে। তার মানে ওর পরে আরও কিছু কথা স্বামীজী বলেছিলেন, যেটা মিস্ ওয়াল্ডো নোট নিতে পারেননি, তাই আমাদের মনে হতে পারে স্বামীজী যেন

হঠাৎ শঙ্করাচার্যের উপরে এসে গেলেন। কান্টের reason থেকে এসে গেল শোপেনহাওয়ারের reason আর বেদ, সেখান থেকে এসে গেল শঙ্করাচার্যের বেদ আর orthodox। এই পুরো আলোচনা যেটা আমরা করে যাচ্ছি, স্বামীজী এটাকে আরও নিয়ে যাবেন। এই যে generalization শব্দটা আমরা বার বার ব্যবহার করছি, generalization হল empericism। বিজ্ঞান এই empericismএর উপর কাজ করে।

ফিলজফিকে নিয়ে বলতে গিয়ে স্বামীজী, concrete, generalize আর abastract, চিন্তা-প্রণালীর এই তিনটি সোপানের কথা বলছেন। Concrete হল যেটা ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান দিয়ে আসে, বিজ্ঞান যেভাবে কাজ করে। Generalise philosophy হল যারা Rationalist। Abstract হল যারা Idealistic। এই তিনটে ফিলজফি। এর একটা ভাল উদাহরণ দেওয়া যায়, একটা জঙ্গল আছে, সেই জঙ্গলে কেউ কোন দিন যায়নি। জঙ্গলে একটা গাছ আছে, সেই গাছ থেকে একটা পাতা পড়ল। গাছ থেকে পাতা পড়ে সবাই জানে। এখন গাছ থেকে পাতা পড়ল কি পড়ল না? যারা Empericist, একমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুকেই যারা মানে, তারা বলবে, পাতা পড়েনি কারণ কেউ দেখেনি। Rationalistরা বলবে, পাতা পড়েছে, কারণ গাছ থাকলে গাছ থেকে পাতা পড়বেই, তাই পাতা পড়েছে। কান্টের যে Idealism, যেখানে abstractএ চলে যায়, তারা বলবে, পাতা পড়েছে। কারণ, বিশ্বমন, যিনি ঈশ্বর, দ্রষ্টা রূপে তিনি সেখানে আছেন। কান্ট এটা দুটোর মাঝামাঝিতে নিয়ে আসছেন। ইন্দ্রিয় দিয়ে জানার কেউ নেই, তাও পাতা পড়েছে, এটা Rationalist হয়ে গেল। আর অন্য দিকে দ্রষ্টা রূপে বিশ্বমন রয়েছে, সেইজন্য Empericist পুরোপুরি বাদ গেল না। কিন্তু এটা পুরোপুরি Empericismও হল না, Rationalismও হল না। এটাই খুব ভাল উপমা, জঙ্গলে গাছ থেকে পাতা পড়ল, পাতা পড়েছি কি পড়েনি? যারা ইন্দ্রিয়কে নিয়ে চলে তারা বলবে, কেউ দেখেনি তাই পড়েনি। Rationalistরা বলবে গাছ থেকে পাতা পড়ে, সেইজন্য পাতা পড়েছে। কান্ট নিয়ে এলেন abstract, idialismকে, তিনি বলবেন, পড়েছে, কারণ বিশ্বমন সেখানে আছে বা ঈশ্বর দেখছেন। স্বামীজী পুরোপুরি এই abstract জিনিসটাকেই মানেন।

একত্বের চরম জ্ঞান

কান্ট থেকে একটু সরে গিয়ে স্বামীজী ওই বিষয়টাকে নিয়েই বলে যাচ্ছেন। বলছেন, 'Treeness' or the idea of tree, found out among trees is knowledge, and the highest knowledge is One. (*সকল বৃক্ষের মধ্যে যে এক বৃক্ষত্ব রয়েছে, সেইটি জানার নামই 'জ্ঞান'। আর সর্বোচ্চ জ্ঞান হচ্ছে –এই একত্বের জ্ঞান।*) স্বামীজী এখন ধীরে ধীরে আরও practicalএ নিয়ে এসে তাঁর শিষ্যদের বোঝাবার চেষ্টা করছেন। একটা আম গাছকে জেনে যাওয়া মানে, বিশেষ ভাবে একটা গাছকে জেনে যাওয়া, 'আম গাছ'। আবার যখন আম গাছ, লিচু গাছ, জাম গাছ, কলা গাছ দেখছি, তখন অনেকগুলো গাছ দেখে গাছ জিনিসটাকে জেনে গেলাম, তখন আমি বোটানিস্ট হয়ে গেলাম। কিন্তু এর উপরে আরেকটা ধাপ হয়, abstract, যার ব্যাপারে আগে বলা হল। একটা গাছকে জানা মানে concrete। আরেকটু উপরে গাছের ব্যাপারে অনেক কিছু জেনে গেল, সে বোটানিস্ট হয়ে গেল। বৃক্ষের বৃক্ষত্বকে জেনে যাওয়াটা হয়ে গেল abstract। বোটানিস্টরা কখনই সমস্ত বৃক্ষকে জানতে পারবে না, তারা শুধু এই পৃথিবীর বৃক্ষকে জানতে পারবে, অন্য গ্রহে, অন্য পরিবেশে বৃক্ষ কিভাবে হয়, কি রকম হয়, জানতে পারবে না। কিন্তু যিনি বৃক্ষত্ব জিনিসটাকে জেনে গেলেন, তিনি বৃক্ষের পুরো জিনিসটাকে জেনে যাবেন।

ঠিক তেমনি, যিনি humanness জেনে গেলেন, যদিও এই শব্দটা হয় না, তিনি মানবজাতির essenceকে বুঝে গেলেন। এটাকে বিজ্ঞানে যখন আরও টেনে নিয়ে যাবে, তখন আসবে ম্যাটার বা existenceকে যেভাবেই বিজ্ঞানে আমরা নিই না কেন, আমরা ওর সারকে বুঝে যাব। কিন্তু যখন বেদান্তে আসবে, তখন ওনারা যাবে সৎএ। সৎকে জেনে গেলে সমস্ত existenceকে জেনে যাবে। সৎ বলতে ঠিক ঠিক কি বোঝায়? স্বামীজী বলছেন, বৃক্ষের বৃক্ষত্বকে জানা, এটাই জ্ঞান, আর উচ্চতম জ্ঞান। জ্ঞানের শেষে যখন যাবে, তখন সেই এক, ওই এক থেকে বৃক্ষও বেরোচ্ছে, মানুষও বেরোচ্ছে। ট্রেন কত রকমের হয়, মেল ট্রেন, লোকাল ট্রেন, গুডস্ ট্রেন, এ্যক্সপ্রেস ট্রেন, কিন্তু আমরা বলি অমুক ব্যক্তি ট্রেন আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু ট্রেন চিরদিনই ছিল, কারণ ট্রেন একটা আইডিয়া, এই আইডিয়াই হল ভগবানের মন। এই আইডিয়াকে প্রকাশ

করার সময় যখন হয়ে যায়, তখন নানা রকম হয়ে, প্রথমে জেমস ওয়াট্, তারপর স্টিফেনসন হয়ে বেরিয়ে আসবে স্টীম ইঞ্জিন ট্রেন। এরপর আইডিয়া চলে আসার পর ভগবানকে আর কিছু করতে হবে না, কারণ ভগবানের মনেই ওই আইডিয়াটা ছিল। তেমনি বৃক্ষও একটা আইডিয়া, যখন সৃষ্টি হয় তখন বৃক্ষত্বটা পরিণত হয়ে যায় বৃক্ষে। বৃক্ষে রূপান্তর হয়ে যাওয়ার পর এবার সেখান থেকে নানা রকমের বৃক্ষ হয়ে গেল। এই যে বৃক্ষত্ব, শুধু treenes না, যেটা ness, এটাকে জানাই হল ultimate জ্ঞান।

আমরা যদি এবার generalize করতে যাই, কিভাবে আমরা generalize করব? যেমন এই টেবিলে মাইক্রোফোন আছে, গ্লাশ আছে, বোতল আছে, বই আছে, এগুলোকে আমরা কি হিসাবে generalize করব? ম্যাটার হিসাবে। এর মধ্যে সলিড আছে, লিক্যুইড আছে, লিভিং আছে, ডেড আছে, সব রকম জিনিস আছে; এগুলোকে একটা জায়গায় যদি নিয়ে আসতে হয়, তখন ম্যাটার হিসাবেই নিয়ে আসা যাবে, কিন্তু ম্যাটার আর কোন ভাবে করা যাবে না। আমরা আগে আলোচনা করলাম, ম্যাটারকে যখন generalize করা হয় তখন ম্যাটার এনার্জিতে চলে যায়। কিন্তু যাঁরা সাধনা করেন, সাধকরা যখন ধ্যান করছেন তখন তাঁরা এই পদ্ধতিতে যান না। ধ্যানে যখন ধীরে ধীরে ইউনিফিকেশান হতে শুরু হয়, তখন এভাবে ইউনিফিকেশান হয় না। ওনাদের ইউনিফিকেশানের প্রথম হয় পঞ্চ মহাভূতে, পঞ্চ মহাভূত থেকে আসে পঞ্চ তন্মাত্রায় – শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধে, সেখান থেকে আসে অহঙ্কারে, এভাবে হয়ে থাকে। বিজ্ঞান যদি একত্বের দিকে এগোতে শুরু করে, তাহলে ম্যাটার বা এনার্জিতে গিয়ে থেমে যাবে। যোগী যখন generalize করতে শুরু করবে, তখন বিজ্ঞান যেখানে গিয়ে শেষ করছে, ওখান থেকে তাদের ইউনিফিকেশান শুরু হয়।

যোগী হয়ত কোন ফুলকে ধ্যান করছে, প্রথমে ফুলকে ধ্যান করবে, তারপর দেশ ও কালকে বাদ দিয়ে ফুলত্বকে ধ্যান করবে। তারপর দেখবে ফুল কি দিয়ে তৈরী, পঞ্চ তন্মাত্রা দিয়ে তৈরী। এবার পঞ্চ তন্মাত্রার উপর ধ্যান করবে, পঞ্চ তন্মাত্রাকে দেশ ও কাল থেকে সরিয়ে শুদ্ধ তন্মাত্রার উপর ধ্যান করবে। যেমন যেমন এগোতে থাকবে, তেমন তেমন বিশেষ সমাধি বলা হয়। শেষ generalisation কি হয়? ব্যক্তি ঈশ্বরে গিয়ে শেষ generalization হয়। ঠাকুর যখন মা কালীর দর্শন করছেন, তখন এটা হল শেষ generalisation। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাবতীয় যা কিছু আছে সব ওখানে গিয়ে ইউনিফিকেশান হয়ে যাচ্ছে। আচার্য শঙ্কর বার বার বলছেন, ভগবান কে? যিনি ভক্তের মনোস্কামনা পূর্ণ করেন। ভগবান কে? যেখান থেকে সৃষ্টি, স্থিতি, লয় হয়। ভগবান কে? যাঁর মধ্যে ষড়ৈশ্বর্য্য সব সময় থাকে।

স্বয়ং প্রকাশেই একত্ব

স্বামীজীও বলছেন, Personal God is the last generalization of the universe, only hazy, not clear-cut and philosophic. (*সমুদয় জগৎপ্রপঞ্চের চরম সামান্য ও সাধারণ ভাবই সগুণ ঈশ্বর, কেবল সেটা অস্পষ্ট, এবং সুনির্দিষ্ট ও দার্শনিক-বিচারসম্মত নয়।*) শেষ যে generalization হচ্ছে, সেটাও পুরোপুরি দর্শন হয়নি, তবে হয়ে গেছে কিন্তু আবছা। ঠাকুর যেমন বলছেন, লণ্ঠনের আলোতে সবই দেখা যাচ্ছে, সবই করা যাচ্ছে, কিন্তু আলো আর আমার মাঝখানে একটা কাঁচের ব্যবধান রয়ে গেছে। ঠাকুর নিজেও যখন তোতাপুরীর কাছে অদ্বৈত সাধনা করছেন, ঠাকুর এগোতে পারছেন না; মা কালী ব্যবধান হয়ে আসছেন, মা কালী এগোতে দেবেন না। কারণ এই জগতের শেষ generalisation হলেন সেই মা কালী। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ, ঈশা, মুশা, আল্লা, গড্ যাঁরাই আছেন, এনারা সবাই শেষ generalisaion। তারপরে যেটা আসে সেখানেই গিয়ে আসল একত্ব হয়। কিন্তু তার আগে পর্যন্ত দুই থেকে যাচ্ছে, আমি আছি আর আমার ঈশ্বর আছে, এখনও generalisation পুরো হয়নি। স্বামীজী বলছেন, Unity is the self-evolving out of which everything comes. (*সেই এক তত্ত্ব স্বয়ং অভিব্যক্ত হচ্ছে, তা থেকেই যা কিছু সব হয়েছে।*) আবার স্বামীজী তাঁর পুরো ক্লাশের যেটা central theme, সেই জায়গায় নিয়ে আসছেন, ইউনিটি কোথাও হবে, যেখানে self-evolving হবে।

আমরা যেখানে বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করছিলাম সেখানেও স্বামীজী বলেছিলেন, ইউনিটি মানে self-evolving। পার্সোনাল গড্ self-evolving নয়, পার্সোনাল গড্ যদি self-evolving হয়, তাহলে মারাত্মক জিনিস হয়ে যাবে। ঠাকুর যদি evolve করেন, তার মানে ঠাকুর পরিবর্তি হয়ে যাচ্ছেন। Pantheism নিয়ে বলার সময় বলা হয়েছিল, ঠাকুর যদি পরিবর্তিত হয়ে এই মাইক্রোফোন হয়ে যান, ফোন থেকে শুরু করে আমি, আপনি সব কিছু যদি ঠাকুর হয়ে যান, এটা কি কখন সম্ভব? কখনই তা সম্ভব নয়। সেইজন্য ঠাকুর আলাদা, সৃষ্টি আলাদা, আলাদা হতেই হবে, কোন উপায় নেই। যতগুলো ধর্ম আছে, তারা যখন সবাই বলছে ঈশ্বর আর জগৎ আলাদা, তাহলে তো সেখানে self-evolving হল না। Generalisation মানে self-evolving হবে, self-evolving তখনই হবে যখন সত্য সব সময় এক থাকবে, আত্মাই একমাত্র সত্য, আত্মাই evolve করছে। কিভাবে? আমরা যেভাবে নিতে চাইব। অদ্বৈত বেদান্তের কাছে শেষ কথা হল, এই সৃষ্টির কোন evolution নেই, সৃষ্টিটাই মায়া। কিন্তু evolution আছে, কারণ জগৎ রূপে সৃষ্টি যেটা দেখা যাচ্ছিল না, সৃষ্টিটা এখন দেখা যাচ্ছে। ঠাকুর এটাকেই অন্য ভাষায় বলছেন, জল শান্ত থাকলেও জল, হেললে দুললেও জল, সাপ কুণ্ডুলি পাকিয়ে থাকলেও সাপ, আর তির্যক গতিতে যখন চলে তখনও সাপ। সাপ আর তার তির্যক গতি যেমন এক, তেমনি আবার আলাদাও। তির্যক গতিটা সাপ নয়, সাপ আছে বলে তার তির্যক গতিটা আছে। ঠিক তেমনি ব্রহ্ম আছেন বলেই এই সৃষ্টি আছে, সৃষ্টির উপর ব্রহ্ম নির্ভর নয়। তার মানে, একত্ব সেখানেই হবে, যেখানে self-evolving আছে।

তাহলে বিজ্ঞান আর বেদান্তের মিল কোথায় হল? বিজ্ঞানের কাছে এনার্জি self-evolving, ওই এনার্জিকে চালানোর জন্য আলাদা কোন সত্তার দরকার হয় না। ঠিক তেমনি ঈশ্বর যদি হন, তিনি self-evolving নন। কারণ ঈশ্বর যদি self-evolving হন, তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে, ধর্ম বলে আর কিছু থাকবে না। ভগবানকে সব সময়, লীলা, মায়া, জগৎ কোন ভাবে এগুলো করতে হবে। ব্রহ্ম যখন আছেন তখন এই সমস্যা নেই, ব্রহ্ম evolve করছে। তার মানে, একটা সিঙ্গল জিনিস যখন থাকছে, যেখান থেকে সব কিছু হচ্ছে। স্বামীজী এটাই বলছেন, Unity is self-evolving out of which everything comes। যখনই আমরা ইউনিটি বলতে চাইছি, তখন আমাদের মনে রাখতে হবে, ওটা এমন এক অবস্থা, যেখান থেকে সমস্ত কিছু আসছে। যদি ওখান থেকে সব কিছু না আসতে থাকে, তাহলে ওটার এখনও ইউনিটি হয়নি। স্বামীজীর সময়েও বিজ্ঞানে ইউনিটি আসেনি, তখনও ম্যাটার আর এনার্জি আলাদা ছিল। বিজ্ঞানের যে বিভিন্ন ফোর্স গুলি ছিল, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, নিউক্লিয়ার শক্তি, এগুলোও তখন সব আলাদা ফোর্স। এখনও ইউনিফিকেশান যদিও হয়নি, তবে হয়ে যাবে, বিজ্ঞান ঠিক বার করে নেবে।

এরপর স্বামীজী বলছেন, Physical science is to find out facts, metaphysics is the thread to bind the flowers into a boyquet. Every abstracrtion is metaphysical; even putting manure at the root of a tree involves a process of abstraction. (*পদার্থ বিজ্ঞানের কাজ ঘটনাবলী আবিষ্কার করা, আর দর্শন যেন ঐ বিভিন্ন ঘটনারূপ ফুলগুলি নিয়ে তোড়া বাঁধবার সুতো। চিন্তাসহায়ে ঐক্য আবিষ্কারের চেষ্টামাত্রই দর্শনের এলাকায়। এমন কি, একটা গাছের গোড়ায় সার দেওয়ার ব্যাপারেও এইরূপ একটা প্রণালীর সহায়তা নিতে হয়।*) বিজ্ঞানের কাজ হল সমস্ত কিছুর facts বার করা। এখনও স্বামীজীর মন কান্টের উপর আছে মনে হয়। কান্ট observation, knowledge, ethics আর metaphysics, এই কটি জিনিসের উপর প্রচুর আলোকপাত করেছিলেন, আর সব কিছুতেই যখন তিনি ethics নিয়ে বলছেন তখনও reasoning রাখছেন, যখন metaphysics নিয়ে বলছেন তখনও তিনি reasoning রাখছেন। যাই হোক, আমরা আগে দৃশ্য ও দ্রষ্টাকে নিয়ে আলোচনা করার সময় বলেছিলাম, দৃশ্য হল বিজ্ঞান, দ্রষ্টা হল ধর্ম। এখানে স্বামীজী একটা শব্দ metaphysics নিয়ে বলছেন। Metaphysics হল, আমাদের যে ইন্দ্রিয় ভিত্তিক জ্ঞান, এটা তার পারে। স্বামীজী বলছেন, বিজ্ঞান যেন ফুল গুলিকে নিয়ে আসে, আর metaphysics সেই ফুল গুলিকে একটা সূত্রের মধ্যে গেঁথে মালা তৈরী করে। তার মানে পুরোপুরি যদি আমরা ফিজিক্সের দিক দিয়ে যাই, তাহলে আমরা যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে দেখছি, এর মধ্যে ইউনিটি আসবে না। আর এমনিতেও তাদের কাছে ইউনিটি নেই। খুবই সাধারণ জিনিস, এই পৃথিবী আছে যেটা ডেড ম্যাটার, তার উপর আমরা আছি জীবন্ত, আমরা তাহলে কোথা থেকে এলাম? ওদের কাছে কোন উত্তর নেই।

বৈজ্ঞানিকরা এখন এর জন্য নানা রকমের থিয়োরি নিয়ে আসছেন, কিন্তু ওনারাও জানেন থিয়োরিগুলি সম্পূর্ণ নয়, আর কোন দিনই সম্পূর্ণ হবে না। কারণ জগৎ আর মানুষকে যদি মেলাতে হয়, তাহলে Metaphysicsকে, বেদান্তকে আমাদের আনতেই হবে। বৈজ্ঞানিকরা যতই বিগ ব্যাঙ, ব্ল্যাকহোল আর প্রবাবিলিটি, এই থিয়োরি, সেই থিয়োরি নিয়ে আসুক, জেনে রাখুন আপনারা কোন দিন জগৎ আর মানুষকে মেলাতে পারবেন না। কারণ এই দুটো আলাদা ফুল, আপনারা যেটা করতে পারেন, মালা গেঁথে দিতে পারেন। গাঁদা ফুল আর চন্দ্রমল্লিকা, এই দুটো ফুলকে কেউ কোন দিন মেলাতে পারবে না, দুটো আলাদা। মেলানো তখনই যাবে, যখন সুতো দিয়ে একটা মালা গেঁথে দেওয়া হবে। এই কাজ একমাত্র ধর্মই পারে। প্রত্যেকটি abstractই metaphysical। কান্টের যে আইডিয়ালিজম্, পিওর abstractionএ চলে গেলেন। ওটা আর বিজ্ঞান থাকল না, ওটা ধর্ম বিজ্ঞান হয়ে গেছে।

১৪ই জুলাইয়ের ক্লাশ স্বামীজী শুরুই করেছিলেন এইভাবে – concrete রয়েছে, generalize রয়েছে আর তার সাথে abstraction আছে, তার মানে বিজ্ঞান, ফিলজফি আর আধ্যাত্মিকতা। Ultimate truth, এমনকি গাছে যখন সার দেওয়া হয় সেখানেও কিন্তু abstraction দরকার পরে। আমরা এটা বুঝতে পারি না, আমরা মনে করি এই গাছে এই সার দিতে হবে। একবার এক আশ্রমে প্রচুর জিনিয়া ফুল লাগানো হয়েছিল, কিন্তু ফুল যখন হতে শুরু করল, ভাল সাইজের ফুলই হচ্ছিল কিন্তু সব ফুল গুলিই কুঁকড়ে যাচ্ছে। একজন মহারাজকে বলা হল, যিনি বাগানের তত্ত্বাবধান করেন। শুনেই তিনি বলে দিলেন গোবর সার বেশি দেওয়া হয়েছে। কেউ বিশ্বাসই করতে চাইল না। তারপর পরীক্ষা করে দেখা গেল তিনি ঠিকই বলেছিলেন। গোবর সার সমস্ত ফুলের গাছকে সতেজ করে, কিন্তু জিনিয়া গাছে দিলেই ফুল কুঁকড়ে যাবে। তার মানে, এই গাছে এই সার দেওয়া যাবে না, এটা হয়ে গেল বিজ্ঞান। সার দিলে ভাল হয়, এটা আরেকটু উপরের দিকে চলে গেল। কিন্তু ভোজ্য ভোক্তার সম্পর্ক, ultimate যেটা এটা হল abstraction। আমরা অবশ্য ওই উচ্চস্তরে যাই না, কিন্তু যাঁরা খুব উচ্চমানের মালী, তাঁরা কোথাও এটা বোঝেন, পুরো সৃষ্টিতে কোথাও একটা একত্ব রয়েছে। কি রকম একত্ব, এই সারটাই বিপরিবর্তিত হয়ে গাছ হবে, আবার এই গাছটাই পরে সার হবে। এই যে একটা abstraction আছে, ওখান থেকেই এই আইডিয়া আসছে, যেখানে সার আর গাছের সম্পর্ক, তার এক ধাপ নীচে এই গাছে এই সার।

স্বামীজী বলছেন, Religion includes the concrete, the more generalized and the ultimate, the generalized and the ultimate unity. (*ধর্মের ভিতর –স্থূল, অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও চরম একত্ব –এই তিনটি ভাবই আছে।*) স্বামীজী আরও practicalএ নামছেন, যখনই আমরা ধর্মের কথা বলি, তখন তিনটে স্তরে ধর্ম এসে যায় – concrete, generalize and ultimate unity। Do not stick to particularizations. Get to the principle, to the One. (*কেবল স্থূল বা বিশেষ নিয়েই পড়ে থেকো না। সেই চরম সূক্ষ্ম তত্ত্বে –সেই একত্বে চলে যাও।*) ধর্মে concrete মানে যখন আমরা পূজা অর্চনাদি করছি। সন্ধ্যারতির সময় ঘন্টা নাড়াতে হবে, এটা হয়ে গেল concrete। ধর্মে আমরা যখন generalisationএ যাচ্ছি, তখন আধ্যাত্মিক যে সত্যগুলো আছে, দর্শন বলতে আমরা যা বুঝি, সেই জায়গাটায় চলে আসবে। কিন্তু ultimate unity, আত্মাই আছেন, এটা হল শেষ কথা, এটা হল ধর্মের আসল। সেইজন্য স্বামীজী বলছেন, particularএর দিকে দৃষ্টি দিও না। আমি মা কালীর পূজা করি, ও কৃষ্ণের পূজা কেন করছে, আমি শিবকে পূজা করি, মা কালিকে পূজা করি না, এগুলোকে নিয়ে মাথা ঘামিও না, দৃষ্টি দিও না। পূজা কর, এটা হল আরও generalised। আর এই পূজায় তুমিই তোমাকে পূজা করছ, আগে আমরা দেববাণীতে এর আলোচনা করেছি, এটা হল শেষ কথা, অন্ততঃ এতটুকু তুমি জেনে রাখো। যদি তুমি আধ্যাত্মিক হতে চাও, তাহলে সব সময় ultimate unityকে মাথায় রাখবে।

মানুষই একমাত্র মুক্তির সাধনা করতে পারে

স্বামীজী বলছেন, Devils are machines of darkness, angels are machines of light; but both are machines. Man alone is alive. (*অসুরেরা তমঃপ্রধান যন্ত্র, দেবতারা সত্ত্বপ্রধান যন্ত্র; কিন্তু দুই-ই যন্ত্র। একমাত্র মানুষই চেতন, জীবন্ত।*) স্বামীজী আমেরিকানদের সামনে এই কথাগুলো বলে

যাচ্ছেন, যাদের ধর্মে ডেভিলস আছে, এঞ্জেলস আছে। খ্রীশ্চানরা বড্ড বেশি ডেভিল আর এঞ্জেলকে নিয়ে মাথা ঘামায়, ওদের কাছে ডেভিল হল অন্ধকারের মেশিন আর এঞ্জেলরা হল আলোর মেশিন। এই দুটো মেশিনে সব সময় লড়াই চলছে, কিন্তু দুটোই মেশিন। Man alone is alive, ডেভিল এসে আমাদেরকেই মারছে, আমাদের ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে, এ্যঞ্জেলসরাও আমাদেরকেই নিয়ে যাচ্ছে, অবশ্য ভাল পথে। আমরাই হলাম জীবন্ত, ডেভিল আর এ্যঞ্জেলরা বাঁধা। খ্রীশ্চানদের মনের যে ভ্রান্ত ভাবগুলো রয়েছে, ওই ভাবগুলিকে ভাঙার জন্য স্বামীজী এই ধরণের অনেক কথা বলে খ্রীশ্চানদের পুরনো ধ্যান-ধারণাকে আক্রমণ করতেন।

ওরা সবাই মেশিন, কেন মেশিন? ডেভিল ডেভিলই থাকবে, এ্যঞ্জেল এ্যঞ্জেলই থাকবে। একমাত্র মানুষই ডেভিলও হতে পারে, এ্যঞ্জেলও হতে পারে। তাহলে মুক্ত কে? অবশ্যই মানুষ। বদমাইশ বদমাইশই থাকবে, সে এর বেশি কিছু করতে পারবে না, বা হতে পারবে না। আর যে ভাল সে চিরদিন ভালই থাকে, সেও এর বাইরে কিছুই করতে পারবে না। দেবতারা দেবতাই থাকবে, ওরা অসুরের মত ব্যবহার করতে পারবে না। আর অসুর অসুরই থাকবে, ওরা কোন দিন দেবতাদের মত হতে পারবে না। কিন্তু মানুষ অসুরের মত অসৎ আচরণও করতে পারে, আবার দেবতাদের মত সদাচারও করতে পারে। সেইজন্য মানুষই একমাত্র জীবন্ত, এবং যার জন্য বলা হয়, এই মানবজীবনেই সব কিছু হয়। এই মানুষ যদি দেবযোনীতে চলে যায়, সে দেবতা হবে ঠিকই, কিন্তু ওখানে গিয়ে আর কিছুই করতে পারবে না, চেঁচামেচি করতে পারবে না, কোন হৈ হুল্লোর করতে পারবে না, কোন রকম বদমাইশি করতে পারবে না। দেবযোনীতে তোমার যে স্বভাব, ওই স্বভাবই তোমাকে ওখানে বেঁধে রাখবে, তুমি ওখানেই শেষ, এখন তুমি একটা মেশিন হয়ে গেছ। অসুর হয়ে যাওয়া মানেও তুমি একটা মেশিন হয়ে গেলে।

স্বামীজীর এই ধরণের কথাবার্তাতে দেখাচ্ছে, স্বামীজীর চিন্তা-ভাবনা কত উচ্চমানে চলত। খ্রীশ্চানদের মধ্যে যারা খুব ভক্ত মানুষ, তাদের কাছে ডেভিল যত গুরুত্বপূর্ণ, এ্যঞ্জেলও তত গুরুত্বপূর্ণ। ওদের কাছে ভালরও গুরুত্ব আছে, মন্দেরও গুরুত্ব আছে। যার জন্য স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, তুমি ভাল, এটাকে নিয়ে তোমার গর্ব করার কিছু নেই, কারণ এর অন্যথা করার ক্ষমতাই তোমার নেই। আমাদের কাছেও দেবতারা কত উচ্চস্তরের, কিন্তু দেবতারা ভাল ছাড়া মন্দ কিছু করতেই পারবে না, সেই ক্ষমতাই তাদের নেই, সবাই মেশিন। একমাত্র মানুষই ভালও করতে পারে, মন্দও করতে পারে, তাই greatness মানুষের মধ্যে রয়েছে। তাই স্বামীজী বলছেন, Break the machine, strike the balance, and then man can become free. (*যন্ত্রবৎ ভাবটাকে দূর করে দাও; ধারণা কর, তুমি যন্ত্র নিয়ে কাজ করছ –তুমি যন্ত্র নও, তবেই মুক্ত হতে পারবে।*) মেশিনেরও দরকার আছে, একজন শ্রমিক একটা মেশিনে কাজ করছে, শ্রমিকের সাথে মেশিনের যে একটা সম্পর্ক আছে, সেই সম্পর্কটাকে বুঝতে হয়। এই যে জগৎ আছে, দেহ আছে, মন আছে, এগুলোকে তুমি বোঝার চেষ্টা কর, এটাকে বুঝে, এই মেশিনকে কাজে লাগিয়ে এগুলো থেকে বেরিয়ে এসে উপরের দিকে চলে এসো। আর বোঝার চেষ্টা না করে এগুলোকেই যদি বেশি গুরুত্ব দিতে থাক, তুমি শেষ। আর যদি একেবারেই কোন গুরুত্ব না দাও, সেও তখন বিদ্রোহ করে তোমাকেই বসিয়ে অকেজো করে দেবে। বেরিয়ে আসার চেষ্টা তোমাকে সব সময় করে যেতেই হবে, সাথে সাথে এগুলোকে তোমার সম্মানও দিতে হবে। যেমন একটা ট্যাক্সিতে এখান থেকে হাওড়া স্টেশন যাচ্ছি। ট্যাক্সি না থাকলে আমি হাওড়া স্টেশন যেতে পারব না। হাওড়া স্টেশন পৌঁছে যাওয়ার পর ট্যাক্সির গুরুত্ব আমার কাছে পুরোপুরি শেষ হয়ে গেল। ট্যাক্সির একমাত্র গুরুত্ব হল, এখান থেকে আমাকে হাওড়া স্টেশন নিয়ে যাওয়া। এই ব্যালেন্সটা যদি আমার জানা না থাকে, আর যদি ট্যাক্সিকে আমি ভালবেসে ফেলি, তাহলে আমার সব প্রোগ্রামই ভণ্ডুল হয়ে গেল।

আমি ট্রেনে হাওড়া স্টেশন থেকে দিল্লী যাচ্ছি, চব্বিশ ঘন্টা লাগছে, ওই সময়টুকুতে একটা ভালবাসা জন্মে যায়। কিন্তু আগেকার দিনে জাহাজে করে কোথাও যেতে ছমাস লেগে যেত, ছমাস ঘুরলে ওই জাহাজের প্রতি আমার পুরোপুরি ভালবাসা জন্মে যাবে। ওই ভালবাসাকে উপেক্ষা করে আমি জাহাজ থেকে বেরোতেই পারব না। আর যখন আশি নব্বই বছর একটা শরীরে জীবন কাটাচ্ছি, তখন দেহের সাথে স্বাভাবিক ভাবেই একটা গভীর ভালবাসা, একাত্ম বোধ জাগবেই। আমার দেহের মত আর দেহ হয় না, আমার মনের মত মন আর কোথাও পাওয়া যাবে না, তার মানে আমার ব্যালেন্সটা পুরো বিগড়ে গেল। মানুষ আর মেশিনের যে

সম্পর্ক, যেখানে ওই ব্যালেন্সটা থাকার কথা, সেই ব্যালেন্সটা এবার পুরো নষ্ট হয়ে গেল। This is only world where man can work out his salvation. (*এই পৃথিবীই একমাত্র স্থান, যেখানে মানুষ নিজের মুক্তিসাধনা করতে পারে।*) স্বামীজী বলছেন, সেইজন্য মানুষই একমাত্র তার মুক্তির উপায় বার করে নিতে পারে, মানুষ ছাড়া আর কেউ মুক্তির পথ বার করতে পারে না।

এরপর স্বামীজী কঠোপনিষদের খুব নামকরা মন্ত্র, *যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ,* নিয়ে আসছেন, 'Whom the Self chooses' is true. Election is true, but put in within. As an external and fatalistic doctrine, it is horrible. (*'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ' –এই আত্মা যাকে বরণ করেন, এ কথাটা সত্য। বরণ বা মনোনীত করাটা সত্য, কিন্তু ভিতরের দিক থেকে এর অর্থ করতে হবে। বাইরে থেকে কেউ বরণ করছে –কথাটার যদি এইরূপ অদৃষ্টবাদমূলক ব্যখ্যা করা হয়, তবে তো এটা ভয়ানক কথা হয়ে দাঁড়াবে।*) আত্মা যাকে বরণ করেন একমাত্র সেই মুক্ত হয়, উপনিষদের এই কথা পুরোপুরি সত্য। আত্মা যে বেছে নেন, এটাও একেবারে সত্য। কিন্তু তাই বলে মনে করো না যে বাইরে থেকে তোমাকে কেউ বরণ করছে, ধরছে তোমার ভিতর থেকেই, কারণ তোমার আত্মা তোমার ভিতরেই বিদ্যমান। যদি তুমি মনে কর বাইরে থেকে কোন শক্তি এসে তোমাকে ধরবে, কি রকম – জপ-ধ্যান কেন করছো না? ঠাকুর করাচ্ছেন না তাই করতে পারছি না। আপনি মঠে আসেন না কেন? ঠাকুর আনছেন না। আপনি ভাল হচ্ছেন না কেন? ঠাকুর আমাকে ভাল হতে দিচ্ছেন না। এখানে তুমি সব বাইরের কারণগুলিকে নিয়ে এসেছ, তোমার মধ্যে fatalism এসে গেছে, এবার তুমি শেষ, তোমার বিনাশকে আর কেউ আটকাতে পারবে না।

যারাই ঠাকুরের ইচ্ছাকে এইভাবে বাইরের দিক থেকে প্রয়োগ করে, তাদের উদ্দেশ্যে স্বামীজী বলছেন, As an external and fatalistic doctrine, it is horrible, fatalistic মানেই হয় যেখানে তুমি অসহায় হয়ে গেছ, আর তোমার বাঁচার পথ নেই। ওটাকেই তুমি তোমার ভিতরে নিয়ে আসো, ঠাকুর আমার ভিতরে থেকে আমাকে দিয়ে করাচ্ছেন, এবার যদি তুমি প্রস্তুতি নাও তবেই এই optimistic থিয়োরি, একটা শক্তিশালী থিয়োরি, যেটা তোমাকে মুক্তির দিকে নিয়ে যাবে। কিন্তু যদি তুমি এটাকে বাইরের কোন সত্তার সাথে জুড়ে দাও, বাইরে কোন সত্তা আছে, যে আমাকে ভাল বানাবে, আমাকে দিয়ে ভালো কিছু করাবে, তুমি তাহলে শেষ।

স্বামীজী ১৪ই জুলাইয়ের ক্লাশের মূল বক্তব্যে concrete, generalization আর abstract এই তিনটে শব্দকে নিয়ে বলছেন। এই তিনটেকে নিয়ে লম্বা একটা ক্লাশের মধ্যে বিজ্ঞানও ঢুকছে, যেখানে ইম্যানুয়াল কান্ট, শোপেনহাওয়ারও ঢুকছেন, বেদান্তের 'অস্তিত্ব'কে নিয়ে আসছেন। ঘুরে ফিরে মূল বক্তব্য হল, জীবনে যদি তুমি উপরের দিকে উঠে আসতে চাও, তাহলে, concrete জিনিসগুলোর যদিও একটা দাম আছে, কিন্তু খুব নিম্নশ্রেনীর, এটাকে ছেড়ে তুমি যখন আরেকটু উপরে generalisationএ যাবে, কিন্তু এটাও কিছু না। ঠাকুর জ্ঞানীদের কথায় বলছেন, জ্ঞানীরা ভয়তরাসে। বশিষ্ট মুনি, বিশ্বামিত্র ঋষি, এনাদের সমস্ত জ্ঞান ছিল, জ্ঞানের খুব উচ্চ অবস্থায় চলে গিয়েছিলেন, কিন্তু ওই যে, ultimate abstraction, ultimate oneness, সেই জায়গাটায় পৌঁছাননি। ঠাকুর তাই বশিষ্ট মুনিকে নিয়ে বলছেন, যার জ্ঞান আছে তার অজ্ঞান আছে। এটা কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান নয়, জ্ঞান আছে অজ্ঞান আছে মানে, এখনও তার ultimate unity হয়নি। যতক্ষণ এই ultimate unity না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার কপালে কিন্তু বিপদ অপেক্ষা করে থাকবে। যতক্ষণ আমরা মনে করছি আমি আলাদা, জগৎ আলাদা, আমি আলাদা, আমার শত্রু আলাদা, ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আমাকে বিপদে থাকতে হবে। আমিও যা আমার শত্রুও তাই, আমার মিত্রও তাই, এই ভাব যতক্ষণ না আসছে, ততক্ষণ কিন্তু আমাদের বিপদের মধ্যেই থাকতে হবে, আর ততক্ষণ আমরা সব সময় সব কিছুর জন্য একটা বাহ্যিক কারণ খুঁজতে থাকব। কান্ট বলছেন, বাহ্যিক কারণ তো দূরের কথা, দেশ ও কাল দুটোই তোমার মনের তৈরী, সেখানে অন্যান্য জিনিসকে নিয়ে বলার আর কোন প্রশ্নই থাকছে না। আমার আপনার যত শত্রু মিত্র আছে, এরা তো সবাই দেশ ও কালের মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে আছে। আর যেখানে দেশ ও কালেরই কোন সত্তা নেই সেখানে আমাদের শত্রু আর মিত্রের সত্তা কোথা থেকে আসবে। নিরালায় বসে

এগুলোকে নিয়ে একটু গভীর ভাবে চিন্তা ভাবনা করলে সবটাই নিজে থেকে পরিষ্কার হয়ে যাবে। পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত আমরা যে তিমিরে আছি, সেই তিমিরেই অবস্থান করতে থাকব।

সোমবার, ১৫ই জুলাই

বহুপতি প্রথা –মালাবারের নারীজাতি –সংস্কৃত ভাষা –দ্রাবিড়ীয় সভ্যতা

আমরা এখন স্বামীজীর ১৫ই জুলাইয়ের ক্লাশের লেকচারে আসছি। এদিন অন্য কোন টপিক হয়ত চলছিল, যেটা মিস্ ওয়াল্ডোর খাতায় নোট ছিল না, হয়ত সেখান থেকে হঠাৎ স্বামীজী ভারতের নারীদের নিয়ে কিছু কথা বলছেন। স্বামীজী বলছেন, Where there is polyandry, as in Tibet, women are physically stronger than the men., যেখানে polyandry আছে, অর্থাৎ বহুপতি প্রথা আছে, যেমন তিব্বতে, সেখানে মেয়েরা শারীরিক ভাবে পুরুষদের থেকে বেশি শক্তিমান হয়। এমনকি, When the English go there, these women carry large men up the mountains. (*যখন ইংরেজরা ঐ দেশে যায়, এই স্ত্রীলোকেরা জোয়ান জোয়ান পুরুষদের ঘাড়ে নিয়ে পাহাড় চড়াই করে।*) স্বামীজী যদিও এখানে তিব্বতকে নিয়ে বলছেন, কিন্তু পাহাড়ের সব জায়গায় এই জিনিস দেখা যাবে। উত্তরাখণ্ড, গাড়োয়াল, হিমাচল অঞ্চলে, মেঘালয়, অরুণাচলের পাহাড়ী মেয়েদের শারীরিক শক্তি পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি। সারাদিন কাজ করেই যায়, প্রচুর কাজ করে। স্বামীজী কেন polyandry নিয়ে বলছেন জানা নেই।

এই কথা বলার পরেই আবার নারীদের নিয়েই বলছেন, In Malabar, although of course polyandry does not obtain there, the women lead in everything. (*মালাবার দেশে অবশ্য বহুপতি প্রথা নেই, কিন্তু সেখানে সব বিষয়ে মেয়েদেরই প্রাধান্য।*) কেরালার একটা অংশ মালাবারে যদিও ওখানে polyandry নেই, কিন্তু ওখানকার মহিলারা সব কিছুতে এগিয়ে থাকে, সব ক্ষেত্রে মেয়েদেরই প্রাধান্য। Exceptional cleanliness is apparent everywhere and there is the greatest impetus to learning. (*সেখানে সর্বত্রই বিশেষভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবার দিকে নজর দেখা যায়, আর বিদ্যাচর্চায় যারপরনাই উৎসাহ।*) স্বামীজী যদিও মালাবারকে নিয়ে অনেক বিদ্রুপ করেছেন, এমনকি এও বলেছেন যে, whole Malabar is a lunatic asylum, কারণ ওখানকার জাতিপ্রথা এমন একটা অবস্থায় চলে গিয়েছিল আর নিম্ন বর্ণের লোকেদের সাথে এমন জঘন্য দুর্ব্যবহার করা হত যে, স্বামীজী এই কথা বলেছিলেন। কিন্তু সাধারণ ভাবে মালাবারের মেয়েদের প্রতি স্বামীজীর খুব সম্মান ছিল। মালাবারের মেয়েরা সব সময় নজর রাখত যাতে সর্বত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, আরে তাদের বিদ্যাচর্চার প্রতি খুব উৎসাহ।

স্বামীজী বলছেন, When I myself was in that country, I met many women who spoke good Sanskrit, while in the rest of India not one woman in a million can speak it. (*ঐ দেশে দেখেছি – অনেক মেয়ে ভাল সংস্কৃত বলতে পারে, কিন্তু ভারতের অন্যত্র দশ লক্ষের মধ্যে একটি মেয়েও সংস্কৃত বলতে পারে কি না, সন্দেহ।*) মালাবারে এখনও এই পরম্পরা আছে, এখানকার মেয়েরা সংস্কৃত ভাল জানে, এবং সংস্কৃতেই কথাবার্তা চালাতে জানে। রামকৃষ্ণ মঠে কেরলের একজন ব্রহ্মচারী আছেন, ওনাদের গ্রামে এখনও সবাই সংস্কৃতেই কথা বলে। মালায়ালম্ জানে, কিন্তু সংস্কৃতেই ওরা সরাসরি কথা বলে। হিন্দু ধর্মের ঐতিহ্যগুলি দক্ষিণ ভারতে এখনও খুব দৃঢ় ভাবে সংরক্ষিত হয়ে চলেছে। উত্তর ভারতে তো ধর্মটা এখন খিচুরি হয়ে গেছে। দক্ষিণ ভারতই হিন্দু ধর্মকে ঠিক ঠিক ভাবে ধরে রেখেছে। স্বামীজী বলছেন, ওখানকার মহিলারা সংস্কৃতে কথা বলে, কিন্তু বাকি ভারতে দশ লক্ষের মধ্যে একটি মেয়ে দেখা যাবে না, যে সংস্কৃতে কথা বলতে পারে।

স্বামীজী সংস্কৃত ভাষাকে সব সময় প্রচণ্ড সম্মান দিতেন আর এর প্রসারের ব্যাপারে তাঁর খুব আগ্রহ ছিল। সংস্কৃত ভাষা নিয়ে তিনি অনেক উচ্চমানের কথা বলেছেন, যেমন একটা হল, যাঁরাই সংস্কৃত জানেন তাঁদের একটা আলাদা সম্মান আছে। আবার জাতিপ্রথা নিয়ে বলতে গিয়ে স্বামীজী শূদ্রদের উদ্দেশ্য করে বলছেন, যখন ব্রাহ্মণরা সংস্কৃত শিখছিল, সেই সময় তোমরা কেন পিছিয়ে গেলে! কারণ হাজার হাজার বছর ধরে সংস্কৃত ছিল ভারতের রাজভাষা, সমস্ত কাজ সংস্কৃতে হত কিনা। যারা সংস্কৃত শিখল না, তারা পিছিয়ে

গেল। যেমন বর্তমান কালে ইংরাজী, ইংরাজী ভাষা যারা জানে না তারা ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে। ভারতের প্রাদেশিক ভাষাগুলি থাকবে, কিন্তু কাজকর্ম, তা সরকারী ক্ষেত্রেই হোক আর বড় বড় কোম্পানির ক্ষেত্রেই হোক, সব জায়গায় ইংরাজী ভাষাই রাজ করবে। গুগুল, মাইক্রোসফটের জন্য কম্প্যুটারের পুরো সিস্টেম ইংরাজী ভাষাতেই চলছে, যার ফলে ইংরাজীটা ভাল জানা না থাকলে কম্প্যুটার দুনিয়ার সাথে পা মিলিয়ে চলতে পারবে না।

আর বলছেন, Mastery elevates, and servitude debases. Malabar has never been conquered either by the Portuguese or by the Mussulmans. (*স্বাধীনতায় উন্নতি হয়, আর দাসত্ব থেকে অবনতিই হয়ে থাকে। পর্তুগীজ বা মুসলমান কারও দ্বারাই মালাবার কখনও বিজিত হয়নি।*) মানুষ স্বাধীন না থাকলে উন্নতি করতে পারবে না, দাসত্বের শৃঙ্খল তাকে আরও অবদমিত করে দেবে। বলছেন, মালাবারের ওই এলাকাটা পর্তুগীজরা এবং পরে মুসলমানরা কখনই জয় করতে পারেনি। ঔরাঙ্গজেবের মত প্রতাপশালী মোঘল সম্রাটও মালাবারে দাঁত ফোটাতে পারেনি। পরে ইংরেজরা প্রথম ওদের সবাইকে একটা ছাতার তলায় নিয়ে আসে।

এরপর স্বামীজী একটা অন্য প্রসঙ্গে গিয়ে বলছেন। তখনকার দিনে স্বামীজী যখন এই কথাগুলো বলছেন, তখনও আর্য-অনার্যের ব্যাপারটা খুব পরিষ্কার ছিল না, আর এখনও খুব পরিষ্কার নেই। বলছেন, The Dravidians were a non-aryan race of Central Asia who preceded the Aryans, and those of Southern India were the most civilized. (*দ্রাবিড়ীরা মধ্য-এশিয়ার এক অনার্যজাতি –আর্যদের পূর্বেই তারা ভারতে এসেছিল, আর দাক্ষিণত্যের দ্রাবিড়ীরাই সব চেয়ে সভ্য ছিল।*) একটা মত অনেক দিন ধরে চলে আসছে, এখনও অনেকের এই মত আছে, ওয়েভ চলেছে। আমরা এই থিয়োরিকে মানি না, আবার মানিও। কারণ এর থেকে আর ভাল থিয়োরি এখনও পর্যন্ত আমাদের কাছে নেই। কিন্তু কোথাও এই থিয়োরির মধ্যে এমন অনেক কিছু আছে, যেগুলো বোঝা যায় না। তবে বিজ্ঞান বর্তমানে জেনেটিক আদিকে নিয়ে তথ্যাদির দ্বারা এমন ভাবে বলছে, আমরা না মেনে থাকতে পারি না; যত দিন অন্য কোন থিয়োরী এটাকে কাউন্টার করছে, ততদিন মেনে যেতে হবে। ওদের বক্তব্য হল, মানব প্রজাতি প্রথম আফ্রিকার কোথাও জন্ম নিয়েছিল। তখন গ্লোবাল ড্রিফট, কন্টিনেন্টাল ড্রিফট, এগুলো ছিল না। যেখানে যেখানে সমুদ্র ছিল সেখানে জল খুব কম ছিল, হেঁটে পেরিয়ে যাওয়া যেত বা ছোট নৌকা বা ডিঙি দিয়ে পেরিয়ে যাওয়া যেত। কিন্তু ধীরে ধীরে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ হতে শুরু হল, তখন কিছু লোক মনে করল এই কষ্ট করে বেঁচে থাকা যাবে না, তারা সেই অঞ্চল থেকে বেরিয়ে চলে গেল। এগুলোকে নিয়ে খুব সুন্দর সুন্দর ম্যাপিং করা হয়েছে। আফ্রিকার একটা গ্রুপ মধ্য এশিয়াতে চলে এল, আরেকটা গ্রুপ অস্ট্রেলিয়া চলে গেছে, একটা গ্রুপ কিভাবে ঘুরে ঘুরে ভারতবর্ষে এসেছে। এখন প্রথম যে গ্রুপ চলে এলো, তারা হাজার হাজার বছর ধরে আছে। ওরা নিজেরাও ভুলে গেছে, আমরা কোত্থেকে এসেছি, যেমন আমরা ভুলে গেছি, আমরা ভগবানের ঘর থেকে এসেছি। এমনিতে বলা হয়, পাঁচ থেকে ছয় প্রজন্ম যেতে যেতেই মানুষ তার আদি বাসস্থানকে ভুলে যায়। ভাষার মিল থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু সেটাও অনেক দিন হয়ে গেলে হারিয়ে যায়।

এইভাবে আরও হাজার হাজার বছর অতিবাহিত হয়ে গেল। আবার জন বিস্ফোরণ হল, ওদের কিছু লোক ওখান থেকে বেরিয়ে এলো। এত দিনে এরাও জানে না, ওদিকে ওরাও জানে না যে আমরা একই গ্রুপের। তখন এক অপরের সাথে লড়াই ঝগড়া লাগে। থিয়োরি তৈরী করা আর তাকে জনগণের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়াতে ইংরেজরা ছিল ওস্তাদ কারিগর। ইংরেজরা এই এই থিয়োরিটাকে নিজের স্বার্থে এবার কাজে লাগাতে শুরু করল। ওদের উদ্দেশ্যই ছিল, divide and rule। ইংরেজরা যেখানেই যেত সেখানেই তারা বলত, তুমি তো সব কিছুতেই এদের থেকে আলাদা, এদের সাথে কেন তুমি এক হয়ে থাকতে চাইছ। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র নিয়ে কোন দিন কোন ঝামেলা ছিল না। ইংরেজরা এসে এই বর্ণ ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে নিম্ন বর্ণের লোকেদের এমন তাঁতিয়ে দিল যে এখনও ভারত এখনও বর্ণব্যবস্থা, জাতিভেদ প্রথা থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না। আর ইংরেজদের মত এখনও আমাদের নেতারা ভোট ব্যাঙ্ক ঠিক রাখার জন্য একটা বিশেষ জাতি বা ধর্মকে এমন ভাবে তাঁতিয়ে যাচ্ছে যে, জাতিগত সংঘাত কিছুতেই থামতে চাইছে না।

ঔরাঙ্গজেবের পর থেকে হিন্দু মুসলমানরা মোটামুটি শান্তিতে বাস করছিল, ইংরেজরা এসে আবার এদের তাঁতিয়ে দিল। এখনও হিন্দু মুসলমানের ঝগড়া চলছে, ব্রাহ্মণ আর নিম্ন বর্ণের লড়াই চলছে। ইংরেজদের এটাই বিশেষত্ব, যেখানেই যাবে সেখানেই প্রথমে ভেদ বুদ্ধি ঢুকিয়ে দেবে। হিন্দু ঋষিরা সব কিছুকে এক জায়গায় নিয়ে এসেছিলেন, তোমরা সবাই এক ঈশ্বরের সন্তান, যে যেখানে আছ সেখানে থেকে তোমার সেই কাজ করতে থাক, ওতেই তোমার সিদ্ধি লাভ হয়ে যাবে। ইংরেজরা এসে নর্দান লাইন, সাদার্ন লাইন, এই ধরণের নানা রকম থিয়োরি এনে সব কিছুকে ভেঙে দিল। এমন এমন সব থিয়োরি বানিয়ে দিয়ে গেছে যে আমরা জানিও না যে আদৌ ওই ধরণের কোন থিয়োরি হতে পারে কিনা, কিন্তু মেনে নিতে হয়, যতক্ষণ ওদের বুকে বসে ওদের contradict না করা যাবে ততক্ষণ এগুলোই মেনে নিয়ে চলতে হবে।

স্বামীজী এটাই এখানে বলছেন, ভারতে আগে যারা এসে গিয়েছিল তাদের মধ্যে দক্ষিণ ভারতের লোকেরা সব থেকে সভ্য ছিল, আর বলছেন, Women with them stood higher than men, এটা স্বামীজীর একটা মত যে, দ্রাবিড় সভ্যতায় পুরুষদের থেকে নারীদের অবস্থা অনেক উন্নত ছিল, আর সমাজে তাদের সম্মান পুরুষদের থেকে বেশি ছিল। যেমন মেঘালয়ে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ চলে, বিয়ের পর ছেলেরা স্ত্রীর বাপের বাড়ি চলে যায়, সেখানে মেয়েদের সম্মান বেশি। তিব্বতেও মেয়েদের সম্মান বেশি। স্বামীজী বলতে চাইছেন, যে সমাজে মেয়েদের সম্মান বেশি, সেই সমাজ অনেক বেশি উন্নত হয়। আর বলছেন, They subsequently divided, some going to Egypt, other to Babylonia, and the rest remaining in India. (*পরে তারা ভাগ হয়ে গেল; কতকগুলি গোষ্ঠি মিশরে, কতকগুলি ব্যবিলোনিয়ায় চলে গেল, অবশিষ্টরা ভারতেই থেকে গেল।*) একটা সময় দ্রাবিড় সভ্যতায় আবার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে গেল, তখন তাদের কিছু লোক ঈজিপ্টের দিকে গেল, কিছু লোক ব্যবিলিয়নের দিকে গেল। বাকিরা ভারতবর্ষেই থেকে গেল। এটাও একটা জনসংখ্যার উপর থিয়োরি, তবে এই থিয়োরিগুলি পাল্টাতে থাকে। সোমবার দিন ১৫ই জুলাইয়ের ক্লাশে শুধু মাত্র এইটুকু মিস্ ওয়াল্ডো লিখেছেন। আমাদের মনে হয় না, সেদিন স্বামীজী এত অল্প কথা বলবেন।

মঙ্গলবার, ১৬ই জুলাই

সেখান থেকে আমরা চলে আসছি ১৬ই জুলাই, মঙ্গলবারের ক্লাশে। এইদিন স্বামীজী শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতের উপর বেশ কিছু কথা বলছেন। দেববাণীর প্রথম দ্বিতীয় দিনের ক্লাশে আমরা আলোচনা করেছিলাম, যাঁরা স্বামীজীর ক্লাশ শুনছিলেন তাঁদের কাছে রামানুজ যেন বেশি প্রিয়। কিন্তু বেদান্ত যে জায়গাতে সম্পূর্ণ রূপে যুক্তি দিয়ে চলে, সেই জায়গাটা পুরো অদ্বৈত বেদান্তের এলাকা, অদ্বৈতের এলাকা মানেই শঙ্করাচার্যের এলাকা। স্বামীজীর যত কথাবার্তা, লেকচার, লেখা বেশির ভাগই শঙ্করাচার্যকে আধার করে। তাই বলে স্বামীজী ভক্তিকে কোথাও বাদ দিচ্ছেন না, শঙ্করাচার্যও কোথাও ভক্তিকে বাদ দেননি। ফিলজফিতে কিছু কিছু টেকনিক্যাল পয়েন্ট আছে, যেখানে রামানুজ আর শঙ্করাচার্যের দৃষ্টিভঙ্গীতে তফাৎ হয়ে যায়। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে এই তফাৎ গুলো বোঝা যায় না।

ডারউইনের বিবর্তনবাদ এবং হিন্দুদের বিবর্তনবাদ

আজকের আলোচনা স্বামীজী শরীর আর ইন্দ্রিয়কে নিয়ে করছেন, শরীর, ইন্দ্রিয় আর আত্মা – এই তিনটের কি সম্পর্ক। এর মধ্যে স্বামীজী যেটা আলোচনা করতে যাচ্ছেন, খুব সহজ ভাবে দেখলে এটাকে আমরা evolution বলতে পারি। হিন্দুরা evolutionকে দুই ভাবে দেখে, প্রথমটা হল evolution of the body or species, evolutionএর উপর খুব নামকরা থিয়োরি হল ডারউইনের Theory of Evolution। ডারউইন একটা সমুদ্র যাত্রায় ছিলেন, অনেক কিছু দেখতে দেখতে তাঁর হঠাৎ মনে একটা চিন্তা এলো, সবটাই যেন এক অপরের সাথে সংযুক্ত, তখন উনি Evolution of species, খুব নামকরা থিয়োরি লিখলেন। বর্তমান কালে ডারউইনের বেশির ভাগ থিয়োরিকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোন বিষয়ের উপর প্রথম যিনি কিছু অবদান রাখেন তাঁর নামটা থেকে যায়। আর দ্বিতীয় কথা হল, ডারউইনের থিয়োরিতে

পরে যে পরিবর্তনগুলি আনা হল, সেগুলিও খুব সূক্ষ্ম স্তরে। ডারউইনের মূল যে আইডিয়া, সব কিছু যে evolve করছে, এর বিরুদ্ধে কেউ বলছে না, আর হিন্দুরা তো কখনই এর বিরুদ্ধে বলবে না।

আমাদের কাছে সবটাই motion, আমরা যখন বলছি জগৎ, জগৎ শব্দটাই এসেছে গম্ ধাতু থেকে, গম্ মানে চলা। জগতে কোন কিছুই স্থির নেই। তেমনি সংসার শব্দ এসেছে সৃপ্ ধাতু থেকে, সাপ যেমন পিছলে পিছলে চলতে থাকে, সংসারটাও তেমনি সব সময় স্লিপ করে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে। জগতের সমস্ত কিছু চলছে, সূর্য চলছে, পৃথিবী চলছে, গ্রহ নক্ষত্র সবই চলছে। কোন কোন ধর্মে বলা হয়, আকাশে সূর্য, চন্দ্র তারাগুলিকে ভগবান বসিয়ে দিয়েছেন, এরা কেউ নড়াচড়া করে না। কিন্তু ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, গ্রহ নক্ষত্রাদিও নড়ছে, কিন্তু খুব ধীরে। আমাদের কাছে, অর্থাৎ হিন্দুদের কাছে সব কিছুই চলছে। সব কিছুই যদি চলে, তার মানে এমনিতেই জিনিসটা evolve করছে, পরিবর্তন হচ্ছে। ডারউইন বললেন, পুরো প্রজাতিটাই evolve করে। তবে ওনার সময় এর আনুষাঙ্গিক জিনিসগুলির কোনটাই পরিষ্কার ছিল না। কিন্তু বর্তমান কালে জেনেটিক বিজ্ঞানের উন্নতি হওয়াতে অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, শরীরের যে basic building block, DNA গুলোর কোন ভাবে একটা কিছু পরিবর্তন হয়, যার জন্য দেখা যায় প্রজাতির কোন একটা প্রানীর মধ্যে একটু যেন পরিবর্তিন হয়ে যায়, এরপর তার সাথে অন্য অন্য প্রানীর যে মিলন হয়, তাতে সেখান থেকে ধীরে ধীরে পরিবর্তন হতে শুরু করে; আর এই ভাবেই বানর থেকে শিম্পাঞ্জী, বনমানুষ হয়ে মানুষ প্রজাতি আসছে – এটাই ডারউইনের Theory of Evolution।

খুব গভীরে গেলে দেখা যাবে, ডারউইনের এই থিওরি খ্রীশ্চানদের বিশ্বাসের ভিতকে একেবারে দুমড়ে মুচড়ে দিয়েছে। খ্রীশ্চানদের বিশ্বাস হল, ভগবান জগতের এক একটা জিনিসকে আলাদা আলাদা ভাবে সৃষ্টি করেছেন, তিনি গাছপালা সৃষ্টি করলেন, জীবজন্তু সৃষ্টি করলেন, বানর, হনুমান, শিম্পাঞ্জী সৃষ্টি করলেন, আর সবার শেষে মানুষ সৃষ্টি করলেন, মানুষ সৃষ্টি করে নিজের আত্মাকে (spirit) মানুষের মধ্যে ফুঁ মেরে দিলেন। তার মানে মানুষের মধ্যেই আত্মা আছে, আর কোন প্রানীর মধ্যে আত্মা নেই। এখন ভগবান যদি সৃষ্টি করে থাকেন, আর ভগবান কোন বাচ্চা নন, কোন পাগল নন, তাঁর নিশ্চয় কোন লক্ষ্য বা কোন একটা উদ্দেশ্য আছে। কারণ বিনা কারণে কেউ কোন কিছু করে না। ভগবান যে সৃষ্টি করেছেন, শুধু এটা খ্রীশ্চানদের সমস্যা নয়, পুরো বাইবেলের সমস্যা। এই জিনিসটা আসলে আসে ওল্ড টেস্টামেন্টে, যেটা জুহুদি, খ্রীশ্চান ও ইসলাম ধর্মের উৎস। যার ফলে তিনটে ধর্মেই এই সমস্যা থেকে গেছে। ভগবান এক একটা জিনিসকে আলাদা আলাদা ভাবে সৃষ্টি করেছেন, এই বিশ্বাসকে নিয়ে যারা চলবে তারা কখনই evolution theoryকে মানতে পারবে না। প্রথমের দিকে যখন ডারউইনের থিয়োরি এলো, তখন যেন এই ধর্মগুলিতে ভূমিকম্প হতে লাগল। গ্যালিলিওর সময়ের হলে ডারউইনকে চার্চ থেকে পুড়িয়েই মেরে ফেলে দিত। যদিও ডারউইন খুব সুন্দর একটা থিয়োরি নিয়ে এলেন, তা সত্ত্বেও গভীরে গেলে দেখা যাবে, বাইবেলের মূল বিশ্বাসের যে জায়গাটা, ভগবান আছেন, ভগবান সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি যখন করেছেন তখন তাঁর একটা উদ্দেশ্য আছে, সবাই সেই উদ্দেশ্যের দিকে এগোচ্ছে – এটা থেকেই যাচ্ছে। তার মানে, এই যে ক্রমবিবর্তন হচ্ছে, নিম্ন প্রজাতি থেকে উচ্চ প্রজাতিতে, সেখান থেকে মানুষ, আর মানুষ থেকে আরও উঁচুতে হয়ত যাবে। এটাই ওদের মূল ধারণা, কিছুটা observation থেকে এসেছে, কিছুটা খ্রীশ্চান ধর্মের বিশ্বাস থেকে এসেছে।

হিন্দুদের কাছে evolution হল মূলভূত, একেবারে fundamental theory। কিন্তু হিন্দুদের কাছে evolution of consciousness হয়, evolution of spirit হয়, evolution of body হয় না। আমাদের কাছে আত্মাই একমাত্র সত্য, আমাদের মূল বাক্য হল, *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*, ঠাকুর যেমন বলছেন, ঈশ্বরই বস্তু, বাকি সব অবস্তু। ঈশ্বরই আছেন, ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই। সেই ঈশ্বর বা ব্রহ্ম থেকে যে এই স্থূল জগৎ আসছে, কিভাবে আসে, কেন আসে, এর উত্তর কেউ জানে না। ঘোর অদ্বৈতীরা সেইজন্য বলেন সৃষ্টি আদপেই হয়নি, এবং তাঁরা তাঁদের এই মতকে পুরো যুক্তিতর্ক দিয়ে ব্যাখ্যাও করে দেন। অদ্বৈত বেদান্তে বলে, ঈশ্বরের যে বিশেষ শক্তি, যেটা মায়া, যেটা আবরণ বিক্ষেপ, এই শক্তি বা মায়া সেই ঈশ্বর বা ব্রহ্মকে ঢেকে দেয়, ঢেকে দিয়ে যেটা নেই সেটাকে দেখিয়ে দেয়, এটাই মায়া। মায়া মানে মিথ্যা না, মায়া একটা টেকনিক্যাল পরিভাষা, যেটা নেই সেটাকে সত্য রূপে দেখায়, সত্য রূপেই আমাদের ইন্দ্রিয়ের গোচর হয়; তার

সাথে যেটা আছে সেটাকে ঢেকে দেয়। এর উপর আমরা আগেও অনেকবার আলোচনা করেছি, আবার যখন সুযোগ আসবে তখন আবার আমাদের আলোচনা করতে হবে, কারণ এই জিনিসগুলো একদিন দুদিন শুনলে ধারণা করা যায় না।

পবিত্রতা – অনাসক্ত – একত্ব ভাব

যে অবিদ্যা এই জগৎকে সৃষ্টি করে, সেই অবিদ্যাই মন বুদ্ধিতে একটা অজ্ঞানের আবরণ তৈরী করে দেয়। যার ফলে আমরা জিনিসটা যেমন তেমনটি দেখতে পারি না। আত্মা যিনি পূর্ণ তিনি নিজেকে অপূর্ণ মনে করেন, অপূর্ণ যখন মনে করেন তখন পূর্ণ হওয়ার জন্য বিভিন্ন রকম ক্রিয়াদি করেন। বেদান্তেরই খুব নামকরা কথা হল – অবিদ্যা, কাম, কর্ম। আমার মধ্যে অবিদ্যা আছে, তাই আমার ভিতরে কামনা আছে, কামনার পুর্তির জন্য আমি কাজ করি। যেমনি কর্ম করতে যাচ্ছে, তখন আবার রাগ দ্বেষ এসে যাচ্ছে। কিছু জিনিস আছে যেটা আমার প্রিয়, যেটাকে পেলে আমি ভাবছি আমি পূর্ণ হব, কিছু জিনিস আবার আমার অপ্রিয়, যেটাকে মনে হয় আমাকে সব দিক দিয়ে সঙ্কুচিত করে দিচ্ছে। যে জিনিসটাকে আমি মনে করছি এটা আমাকে ছোট করছে, যেটা আমার কাছে বন্ধন মনে হয়, সেগুলো থেকে আমি দূরে থাকতে চাই, বা সেগুলো থেকে পালাতে চাইছি। এই যে রাগ ও দ্বেষ, এটাই attachment, কিছু জিনিসের প্রতি attachment, কিছু জিনিসের প্রতি aversion। যে যে জিনিসগুলি আমাদের ভাল লাগে, সেগুলোর সাথে আমরা নিজেকে জুড়ে ফেলি, চুম্বকের মত না, জোঁকের মত। যত জিনিসের প্রতি, যত মানুষের সাথে যার যত attachment, জানতে হবে সে তত impure। Impurity মানেই attachement, attachement ছাড়া কোন impurity নেই।

হিন্দু ধর্মকে যাঁরা খুব ভাল করে জানেন, হিন্দু ধর্মের গ্রন্থগুলো মন দিয়ে পড়েছেন, তাঁরা জানবেন হিন্দু ধর্ম সব সম একটা মূল্যবোধকে নিয়েই চলে, সেটা হল, আমরা পূর্ণ ছিলাম, আমরা পবিত্র ছিলাম। কারণ আমরা সেই শুদ্ধ আত্মা, আমরা পবিত্রতম, কিন্তু কোন এক কারণে, যে কারণ আমরা কেউ জানি না, আমরা অপবিত্র হয়ে গেছি। খ্রীশ্চানরা বলে original sin। অপবিত্র মানে কি? মানে একটাই, জগতের কোন কিছুর প্রতি সে attached হয়ে গেছে। Attachmentটাই impurity, detachmentটাই purity। পুরো হিন্দু ধর্মের একটাই সাধনা – purity through detachment। Detachment মানেই purity, purity মানেই detachement। দুটো আলাদা কিছু না, Detachment is purity, purity is detachment। যদি কেউ বলে আমি পবিত্র হতে চাইছে, মূলতঃ সে অনাসক্ত হতে চাইছে। যখনই আমরা আসক্ত হয়ে পড়ছি, তখন আমরা কিছু জিনিসকে ভালবাসি, কিছু জিনিসকে আমরা অপছন্দ করি। অপছন্দ থেকে আমরা পালাতে চাইছি, পছন্দ বস্তুর দিকে আমরা দৌড়ে যাচ্ছি, এটাই অপবিত্রতা। অপবিত্রতা থেকে কিভাবে বেরোন যাবে? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাবতীয় যা কিছু আছে, ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নেই, সেই অবস্থায় আমি পৌঁছাতে চাইছি, এটাই inclusiveness। Inclusive মানে সবাইকে গ্রহণ করা।

Purity, detachement এবং inclusiveness এই তিনটে শব্দ যদি আমরা মনে রাখি, তাহলে সবটাই আমাদের কাছে পরিষ্কার থাকবে। হিন্দু ধর্ম মানে inclusive, inclusive আধ্যাত্মিক স্তরে, আর ওটাকেই আমাদের অনুশীলন করার চেষ্টা করতে হবে mental এবং physical levelএ। ঈশাবাস্যোপনিষদে বলছেন, যাঁর আত্মজ্ঞান হয়ে গেছে তাঁর আর কিসের জন্য শোক হবে আর কিসের জন্যই বা মোহ হবে – *তত্র কো মোহ কঃ শোক!* কারণ তিনি একত্বম্ দেখছেন, একত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়ে তিনি দেখছেন সেই এক আত্মা ছাড়া কিছু নেই। একত্ব নেই বলে আমরা অপবিত্র, অপবিত্র হয়ে যাওয়া মানে, আমরা exclusive হয়ে যাই, inclusive আর থাকছি না। Exclusive হওয়া মানেই কিছু জিনিসের প্রতি তার আসক্তি আছে। এই তিনটে শব্দের একই অর্থ, exclusive যা, detachmentও তাই, impurityও তাই।

ব্যবহারিক স্তরে নামলে পবিত্রতা হয়ে যাবে শরীর, মন ও বাণীর। শরীরকে পবিত্র রাখতে হয়, মনকে পবিত্র রাখতে হয় আর বাণীকে পবিত্র রাখতে হয়। আমাদের স্মৃতি আদি শাস্ত্রে যে এত এত কথা বলা হয়েছে, ষোড়শ সংস্কারের কথা বলছেন, দশটি সংস্কারের কথা বলছেন, এগুলো একই কথা – inclusiveness,

detachment and purity। আমরা যখন বলছি বড়দের সম্মান করবে, আর ছোট বড় যাই হোক, সবাইকে ভালবাসবে, সবই আসলে inclusiveness। কিন্তু আমরা বলি, ওকে কেন সম্মান করতে যাব, আপনি জানেন না লোকটা কি ধরণের বদ লোক। বদ লোক হোক, সৎ লোক হোক, মুসলমান হোক, খ্রীশ্চান হোক, বড়দের পা ছুঁয়ে প্রণাম করবে, আর সবাইকে তুমি ভালবাসবে। সে দুষ্ট বদমাইশ লোক হতে পারে, কিন্তু ভালবাসবে, কিন্তু ক্ষতি যদি করতে আসে তখন অন্য জিনিস হবে। ঠাকুর বলছেন, ফোঁস করবে কিন্তু বিষ ঢালবে না।

আমরা ডারউইনের থিয়োরির কথা বললাম, যেখানে প্রজাতিগুলো evolve করছে, তাদের শরীরটা পাল্টে যাচ্ছে। আমাদের এখানেও evolve করে কিন্তু species evolve করে না, আমাদের এখানে individual evolve করে। Unlike Darwin’s theory of evolution বৈদান্তিক হল individual consciousness। এখানে আমি evolve করব, আপনি evolve করবেন, তিনি evolve করবেন। তাই বলে পুরো মানবজাতি evolve করবে, তা হবে না। একটা সময় হতে পারে সব মানুষ evolve করে করে একটা হয়ে গেল। কিন্তু evolution is always of the individual instead of species। বেদান্তের evolution আর ডারউইনের evolutionএর মধ্যে এটা একটা মৌলিক তফাৎ। আমাদের এখানে ব্যক্তি সত্তার চৈতন্যের বিকাশ হতে থাকে, individual consciousness evolve করে, ভারতে এই থিয়োরি গত দশ হাজার বছর ধরে চলে আসছে, আমরাও জানি এভাবেই চলে। কিভাবে চলে? আমি যত অনাসক্ত হব আমি তত পবিত্র হব। যত আমি পবিত্র হত তত আমার শরীরের পরিবর্তন হবে। আজকে আমি মানব শরীরে আছি, আমি যদি আরও পবিত্র হয়ে যাই, আরও যদি অনাসক্ত হয়ে যাই, তাহলে আমার দেবতাদের শরীর হবে। আরও পবিত্র হয়ে গেলে ঋষিদের শরীর হয়ে যাবে, সিদ্ধদের শরীর হবে। আরও পবিত্র, আরও অনাসক্ত হয়ে গেলে ব্রহ্মার শরীর হয়ে যাবে। অপবিত্র থেকে যত পবিত্র হতে থাকবে শরীর তত ক্রমাগত পাল্টাতে থাকবে। ইন্দ্র দেবতাদের রাজা, তার মানে তিনি detached, তিনি pure। কিন্তু ইন্দ্রও আবার impure হয়ে যেতে পারে। গৌতম মুনির স্ত্রী অহল্যাকে দেখে ইন্দ্র প্রলুব্ধ হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর লেভেল নেমে গেল, শরীরটা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে অন্য রকম হয়ে গেল। এটা একটা continous process। কাল থেকে মাংস খেতে শুরু করল, দুদিন পর থেকে তার শরীরটা পাল্টে যেতে থাকবে। মাছ বেশি খেতে শুরু করলে শরীর অন্য রকম হয়ে যাবে। আবার শাক সব্জী, দুধ ঘি ফল খেতে থাকলে শরীর আবার অন্য রকম হয়ে যাবে। যে জিনিসের প্রতি যার যে রকম আসক্ত তার শরীরও সেই রকম হবে।

যোগ সাধনার দ্বারা শরীর পবিত্র হয়, তাই যোগ সাধনা যত করবে শরীর তত পবিত্র হতে থাকবে, তত detached হবে, তত উপরের দিকে যাবে। শরীর থাকা মানেই ইন্দ্রিয় থাকবে, শরীর মানেই ইন্দ্রিয়। শরীর আর ইন্দ্রিয় থাকলেই সেখানে কিছু ক্রিয়া হবে। কর্ম করা মানেই, তুমি যদি বাপু এই ধরণের শরীর চাও, তাহলে তুমি এই এই ধরণের কর্ম করবে, এই এই ধরণের কর্ম করবে না। কোন ধর্ম যখন বিধি নিষেধ বলে দিচ্ছে, এটা করবে, এটা করবে না, সব সময় তখন ধর্মীয় ক্রিয়ার ব্যাপারে বলছে। ক্রিয়া করতে গেলে শরীর আর ইন্দ্রিয় লাগবে। যেখানেই শরীর, যেখানেই ইন্দ্রিয়, সেখানেই ক্রিয়া, যেখানেই ক্রিয়া সেখানেই বিধি আর নিষেধ।

ভাগবতে একটা বর্ণনা আছে, যদিও এটা একেবারেই ঠিক না, ব্রহ্মা যখন সৃষ্টি করলেন, তখন তিনি দেবী সরস্বতীর সৃষ্টি করলেন। সরস্বতীর রূপ এত সুন্দর যে, ব্রহ্মা নিজেই নিজের সৃষ্টিকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। সরস্বতী দেবী নাকি ব্রহ্মার কাছ থেকে সরে গেলেন, আর যেদিকে গেলেন ব্রহ্মা নাকি আবার সেই দিকে মুখ করে দিলেন, এই করে ব্রহ্মার চারটে মুখ হয়ে গেল। তখন ব্রহ্মার সন্তানরা, ঋষিরা সবাই বললেন, বাবা! আপনি কি পতিত কাজ করলেন, এর আগের আগের কোন কল্পে কোন ব্রহ্মা নিজের মেয়ের দিকে এভাবে তাকায়নি। ছেলেদের কথা শুনেই ব্রহ্মার খুব লজ্জা হল, তিনি সঙ্গে সঙ্গে দেহত্যাগ করে দিলেন। এগুলো কাহিনী, ব্রহ্মার ওই রকম অবস্থা হওয়া কখনই সম্ভব না। তবে গ্রীস মিথলজিতে আছে, স্রষ্টা নিজের সৃষ্টি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছেন। স্রষ্টা নিজের সৃষ্টির প্রতি মুগ্ধ হতেই পারে। ব্রহ্মা সেইজন্য সরস্বতীকে দেখে মুগ্ধ হতেই পারেন। Theoratically হতে পারে, practically কখনই হতে পারে না। কিন্তু ব্রহ্মার ওই কাহিনীকে যদি আমরা সত্য মেনে নিই, ব্রহ্মা সরস্বতীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন, তার মানে ওই শরীর আর

ওনার জন্য চলবে না, শরীরটা ত্যাগ করে দিতে হল। শরীরকে যেমনি ত্যাগ করলেন, ওই ত্যাগের জন্য চারিদিকে কুয়াশা হয়ে গেল। আমরা যে সকালে বা সন্ধ্যায় যে কুয়াশা দেখি, এটা হল ব্রহ্মার ত্যাক্ত শরীর।

আত্মজ্ঞানে গিয়ে বিবর্তনের পরিসমাপ্তি

দেহ আর ইন্দ্রিয় থাকলেই কর্ম হবে, কর্ম থাকলে বিধি আর নিষেধ থাকবে, ভাল মন্দ, পাপ পূণ্য, শুভ অশুভ থাকবেই। শাস্ত্রে যত বিধির কথা বলা হয়েছে সেগুলো করলে শুভ, না করলে অশুভ। কিন্তু করে করে যখন ব্রহ্মারও পারে চলে গেল, এরপর কোথায় যাবে? ভক্তরা বলবে বিষ্ণুলোকে যাবে, কিন্তু বিষ্ণুলোক থেকেও পতন হয়, জয় আর বিজয়ের বিষ্ণুলোক থেকেই পতন হয়েছিল। বেদান্তে শেষ কথা বলছেন, আত্মজ্ঞান। যে কোন উপনিষদেই আমরা যাই না কেন, সব উপনিষদ যখন আত্মার কথা বলে, তখন বার বার একই কথা বলে, আত্মার না আছে শরীর, না আছে মন, না আছে প্রাণ, না আছে ইন্দ্রিয়। আত্মা শুদ্ধ চৈতন্য ও অনন্ত, তাঁর শরীর নেই, মন নেই, প্রাণ নেই, সেইজন্য তাঁর ক্রিয়া নেই। আত্মা তাই কখন ক্রিয়া করতে পারে না। আত্মার কোন ক্রিয়া হয় না বলে তাঁর শুভ নেই, অশুভও নেই। আত্মার উপর কোন আইন চলে না। বিধি-নিষেধ, এই জিনিসগুলি ততক্ষণই চলে যতক্ষণ দেহের এলাকায় আছে। আমরা যে নৈতিকতা, অনৈতিকতা, মূল্যবোধের কথা বলছি, এই জিনিসগুলো ততক্ষণই চলবে, যতক্ষণ আমরা এই সংসারে থাকছি। যে নিজেকে সংসারে আবদ্ধ করে রেখেছে, যার শরীর আছে, ইন্দ্রিয় আছে, যে শুভ-অশুভ কর্ম করছে, নৈতিকতা, মূল্যবোধ এগুলো একমাত্র তাদের জন্য। আত্মজ্ঞানের অবস্থায় যেমন দেহ, মন, ইন্দ্রিয় নেই, ঠিক তেমনি নৈতিকতা, অনৈতিকতা বলে কিছু নেই, পাপ-পূণ্য বলে কিছু নেই।

এটাই ঠিক ঠিক Idea of evolution। যেমন যেমন ভিতরে purity আসছে, purity মানে একটাই জিনিস, detachment, অন্য কোন কিছু নেই। Detachment মানেই unselfishness, গীতার নিষ্কাম কর্মযোগ শুধু detachment, unselfishness, purityর কথা বলছে। হিন্দু ধর্মের যত শাস্ত্র, শুধু ওই একটা simple purityর কথা বলছে। ভগবানের চরণে যত তুমি মাথা ঠুকে যাও, যত যাই কর, জপ কর, ধ্যান কর, যদি তুমি detached না হও, এমনকি শেষ অবস্থায় তোমার যে ইষ্ট, তাঁর থেকেও যদি তুমি detached না হও তোমার আত্মজ্ঞান হবে না, ঠাকুর যেটা নিজে সরাসরি করে দেখাচ্ছেন। তার আগে পর্যন্ত তুমি যত বড় জ্ঞানী হয়ে যাও না কেন, ঠাকুর বলছেন জ্ঞানীও ভয়তরাসে, যে কোন মুহূর্তে তোমার পতন হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা থাকবে, আর নৈতিকতার দিক থেকে তুমি বাঁধা হয়ে থাকবে, সংসারের আইনের মধ্যে তোমাকে আবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে, আইনের বাইরে তুমি যেতে পারবে না। একমাত্র যিনি আত্মজ্ঞানী, আত্মাতে যিনি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন, তিনি এই সব কিছুর পারে। এই মত শঙ্করাচার্যের, স্বামীজী সহজ করে বলছেন। এবার আমরা দেখব এটাকেই স্বামীজী নিজের ভাষায় কিভাবে বলছেন।

Evolution শব্দের অর্থ হল আমি যে শরীরে আছি, এই শরীরটা ক্রমাগত ধীরে ধীরে পাল্টাতে থাকছে। যেমন একটা প্রজাপতি, প্রজাপতি একটা individual being, প্রথমে ছিল ডিম, ডিম থেকে হয়ে গেল গুটিপোকা, গুটিপোকা থেকে হয়ে গেল শুঁয়োপোকা, সেখান থেকে হয়ে গেল প্রজাপতি, এখানে evolve করছে। কিন্তু আমাদের কাছে evolve করে না। বীজ থেকে যেভাবে ধীরে ধীরে অঙ্কুর হয়, অঙ্কুর থেকে চারা হল, চারা থেকে বৃক্ষ হল, ক্লাশ ওয়ান থেকে ক্লাশ টুতে এলো, তারপর থ্রীতে এলো, এটাকে evolution বলে। স্বামীজী এই theory of evolutionকে মানছেন না, তিনি বলছেন manifestation, সমস্ত শক্তি তার ভিতরেই ছিল। Evolution মানে তোমার পরিবর্তন হচ্ছে আর manifestation মানে সমস্ত শক্তি তোমার মধ্যেই আছে, ওর উপর যে আবরণ আছে, আবরণগুলো সরে যাচ্ছে। এখন যিনি যেভাবে দেখছেন, সেইভাবে তিনি হয় বলবেন evolution, নয়তো বলবেন manifestation। যদি নীচের দিক থেকে দেখেন তাহলে বলবেন evolution হচ্ছে, উপর থেকে যদি দেখেন তাহলে বলবেন manifestation হচ্ছে।

Detachment অর্থাৎ বৈরাগ্য কিভাবে আসবে? একটা নামকরা গল্প আছে, একজন লোক খেটেখুটে প্রচুর টাকা উপার্জন করেছে। কিন্তু তার ছেলেগুলো কিছু করে না, বেচারির মন খুব খারাপ। সব সময় দুশ্চিন্তা, আমি মরে গেলে ছেলেগুলোর কি হবে! ছেলেগুলোর প্রতি এত আসক্ত যে, লোকটি মরার পর ওই বাড়িতেই

বলদ হয়ে জন্ম নিল। বলদ হয়ে সে এখন নিজের ছেলেদের দুটো পয়সা যাতে হয় সেইজন্য অন্য বলদের থেকে বেশি খাটে। তাতেও তার মনে শান্তি আসছে না। খাটতে খাটতে বলদটা একদিন মরে গেল। লোকটি কিছু টাকা বাড়িতে একটা কুঠুরি ঘরে লুকিয়ে রেখেছিল, এবার মরার পর লোকটি কালসর্প হয়ে ওই সম্পদ রক্ষা করছে। একজন যোগী সব জানতেন, লোকটি এই যে শরীর পাল্টাচ্ছে, সন্তানদের মোহে পড়ে লোকটির কি দুরবস্থা! ছিল একটা ভাল মানুষ, সেখান থেকে বলদ, সেখান থেকে এখন তির্যক যোনিতে নেমে এসেছে। যোগী একদিন ছেলেগুলিকে গিয়ে বলল, 'তোমাদের বাবা মারা যাওয়ার আগে অনেক টাকা-পয়সা লুকিয়ে রেখে গেছেন, সেটা তোমাদের জন্যই রাখা আছে'। 'বলেন কি সাধুবাবা'! বলছেন, 'নীচে ওই ছোট্ট ঘরের মেঝের তলায় আছে। তবে ওখানে একটা কালসাপ আছে, খুব সাবধান'। ছেলেরা সঙ্গে সঙ্গে লাঠিসোটা নিয়ে গিয়ে দেখে সেই সাপ পাহারা দিয়ে যাচ্ছে। ওরাও সাপটাকে পিটিয়ে মেরে দিল। সাপটা তখন ভাবছে, হে ভগবান! আমার ছেলেরাই আমাকে এভাবে মারল! তখন তার বৈরাগ্য হল।

বৈরাগ্য এমনি এমনি আসে না, নিজের আপনজনদের থেকে যখন প্রচুর মার খাবে, যাকে বলে রামধোলাই, ওই বেদম মার না খাওয়া পর্যন্ত বৈরাগ্য আসবে না। এখনকার দিনে ওয়াশিং মেশিন আসাতে বোঝাই যায় না ধোলাই কাকে বলে। মার্ক টোয়েন বর্ণনা করে গেছেন, বম্বেতে ধোবি ঘাটে গিয়ে দেখেন ধোপারা কাপড় দিয়ে পাথর ভাঙার চেষ্টা করছে। ওই রকম কাপড় কাচা জগতে আর কোথাও হয় না। আগেকার দিনে ধোপাকে কাপড় দিলে, দুবার ওয়াশ হয়ে আসতে না আসতেই জামার সব বোতামগুলি চলে যেত, চার বার দেওয়ার পর জামাটাই ছিঁড়ে যাবে। সংসার যখন এই রামধোলাই দেবে, তখন একটু বৈরাগ্য হবে। যতক্ষণ সবাই ভালবাসবে, সুখের সংসার চলতে থাকবে, ততক্ষণ তার কোন সুযোগ নেই উপরে আসার। আপনজন সুখের সংসারে আগুন লাগাবে, আগুন দাউ দাউ করে জ্বলবে, তখন সে পকেট থেকে একটা বিড়ি বার করবে, ওই আগুনে বিড়ি ধরাবে তারপর শালার বাড়ি বলে বেরিয়ে যাবে। এই detachment না হওয়া পর্যন্ত purity আসবে না, এই purity না আসা পর্যন্ত সবাইকে এই সংসারের নিয়মের মধ্যে বাঁধা হয়ে হাঁসফাস করতে থাকতে হবে। কিন্তু একবার আত্মজ্ঞান হয়ে যাওয়ার পর সব কিছুর পারে চলে যাবে।

কর্মের কারণ অদৃশ্য কিন্তু কর্মের ফল দৃশ্য

স্বামীজী এই দিনের ক্লাশে (১৬ই জুলাই) শুরুতে বলছেন, Adrishtam, the 'unseen cause', leads us to sacrifice and worship, which in turn produce seen results; but to attain liberations we must first hear, then think or reasons, and then meditate upon Brahman, (*অদৃষ্ট (অর্থাৎ অব্যক্ত কারণ বা সংস্কার) আমাদের যাগযজ্ঞ উপাসনাদি করায়, তা থেকে ব্যক্ত ফল উৎপন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু মুক্তি লাভ করতে হলে আমাদের ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রথমে শ্রবণ, পরে মনন, তারপর নিদিধ্যাসন করতে হবে।*) অদৃষ্টকে স্বামীজী ইংরাজীতে বলছেন, 'unseen cause', আসলে আমরা জানি না কেন এখন আমরা এই রকম করছি, কেন আমার আজ এই অবস্থা। আমাদের ভিতরে একটা পুরো প্যাকেজ রয়েছে, কেউ এটাকে বলছে ঠাকুরের ইচ্ছা, কেউ বলছে সংস্কার, কেউ বলছে আমাদের আগের আগের জন্মের সঞ্চিত কর্ম, কেউ বলছে অদৃষ্ট। মূল বক্তব্য হল, আমরা জিনিসটাকে জানি না, যে শক্তি দিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি, এটাকেই স্বামীজী বলছেন, 'unseen cause'। আমরা একে অদৃষ্ট বলতে পারি, আরও অনেক কিছু বলতে পারি, কিন্তু অজানা কারণটাই ঠিক ঠিক শব্দ, যদিও দর্শনে অজানা কারণ বলে কোন শব্দ হয় না, দর্শনে অদৃষ্ট, অপূর্বতা এই ধরণের শব্দের প্রচলন আছে। বলছেন, এগুলো আমাদের ঠেলে নিয়ে যায় যাতে আমরা ধর্ম কার্য করি।

ধর্ম কাজ কিভাবে হয়? হিন্দুদের পরম্পরায় মূল ধর্ম কাজ হল যজ্ঞাদি আর পূজা। যার যেমন সংস্কার, সে সেই অনুসারে যজ্ঞাদি করে, পূজাদি করে। কিন্তু এটাই আশ্চর্যের যে, আমরা যখন এই সংস্কারগুলিকে কাজে লাগাই, যেগুলো আমাদের কাছে অদৃশ্য, অদৃষ্টও বলা যায়, কিন্তু ফল তার হয়ে যায় দৃশ্য। যেমন আমরা জানি রাজা দশরথ যজ্ঞ করলেন, তাঁর মধ্যে যজ্ঞাদির সংস্কার আছে, তিনি পুরোহিত এনে যজ্ঞ করালেন, ফলে তাঁর চার পুত্র, রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন হল। যেটা আমাদের ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, পিছনে সেটা অদৃশ্য, অদৃষ্ট যাই বলি না কেন, যখন ক্রিয়া করা হচ্ছে, তখন তার ফল সরাসরি সামনে পেয়ে যাচ্ছি।

অর্থ হল, যে কোন কারণই আমাদের ঠেলে নিয়ে যাক, কার্য কারণ সম্পর্ক এসে যায়, কর্ম ও কর্মফলের সম্পর্ক হয়ে যায়। কর্মের কর্তাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, তা সে সংস্কারের জন্যই হোক, ঈশ্বরের ইচ্ছার জন্যই হোক, কোন কামনার জন্যই হোক, যে কোন কারণে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, যজ্ঞ পূজাদি করাচ্ছে, আমাকে একটা ফল দিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু আমি যদি ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক হতে চাই, যদি আত্মজ্ঞান পেতে চাই, তাহলে তা এই কর্ম দিয়ে কখনই পাওয়া যাবে না। এর একমাত্র পথ হল, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। প্রথমে উপযুক্ত গুরুর কাছে শাস্ত্রের কথা শ্রবণ করতে হবে, শ্রবণ করার পর সেটাকে চিন্তন-মনন করতে হবে, সেটাকে নিয়ে তাকে ধ্যান ধারণা করতে হবে। যখন ওটার সাথে তার শরীর মন এক হয়ে যাবে, তখন তার সেই জ্ঞান আসবে। সেই জ্ঞান আসার পরই সে এই সংসার চক্র থেকে বেরোতে পারবে। এরপর শঙ্করাচার্যকে আধার করে স্বামীজী ব্যাখ্যা করছেন। একটু আগে আমরা যে লম্বা আলোচনা করলাম, তার উপর এবার স্বামীজী বলছেন।

The result of works and the result of knowledge are two different things, (*কর্মের ফল আর জ্ঞানের ফল সম্পূর্ণ পৃথক।*) মানুষ যে কর্ম করে তার ফল এক রকম হয়, জ্ঞানের ফল পুরো অন্য রকম হয়। ইদানিং যেমন বিভিন্ন মতের উপর ফিলজফারসরা আছেন, লিবারেলরা আছেন, কমুনিস্টরা আছেন আবার ধর্মীয় নেতারা আছেন, সব ধরণের চিন্তক আছেন। এনাদের বেশির ভাগরাই হলেন অগোছাল, যাঁর মস্তিষ্কে যে ভাব আসছে সেটাই লিখে দিচ্ছেন। বিশেষ করে এখন টুইটার, ফেসবুকে কিছু একটা লিখে দিলে সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চাশটা কমেন্টস এসে যাবে, যার কোন যুক্তিতর্ক নেই। যার মনে যখন যেটা আসছে সেটাই লিখে দিচ্ছে। এই ভাব অনেক আগেও ছিল, কিন্তু তাঁরা সবাই ছিলেন গোছাল। ব্রাহ্মণরা শুধু পঠন-পাঠন নিয়েই থাকতেন। মনু আবার বলে দিয়েছেন, যে ব্রাহ্মণ পড়াশোনা ছেড়ে অন্য কিছু করছে, তাকে ব্রাহ্মণ রূপে গণ্য করবে না। ব্রাহ্মণরা সামান্য কিছু খেতেন আর সারাটা দিন বেদ চর্চায় ডুবে থাকতেন। ব্রাহ্মণদের বুদ্ধিটা পরিষ্কার ছিল, হাজার হাজার বছর ধরে জেনেটিক্যালি একটা রিফাইণ্ড জাতি। ওনারা যখনই কোন আইডিয়া দিতেন তখন সেটাকে পুরো যুক্তিতর্ক দিয়ে উপস্থাপন করতেন। এইভাবে হাজার হাজার বছর ধরে নানান রকম দর্শনের জন্ম হয়েছে। আজকের দিনে আমাদের এগুলো আবর্জনা। আচার্য শঙ্কর এসে এই আবর্জনাগুলি পরিষ্কার করতে শুরু করলেন। তিনি সমস্ত কিছুকে শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতি এই তিনটে মাপকাঠির মধ্যে নিয়ে এলেন। তোমার এই আইডিয়া যদি বেদের সাথে মিল থাকে, দ্বিতীয় যদি বাস্তবে এই আইডিয়াকে যে কেউ অনুভব করতে পারে আর তার সাথে এটা যদি পুরো যুক্তিসম্মত হয়, তবেই আমরা তোমার কথা নেব, এর অন্যথা হলে নেওয়া যাবে না। এরপর শঙ্করাচার্য এমন জোর সবাইকে আক্রমণ করেলন, প্রথমে লিবারেল, অর্থাৎ চার্বাকদের ফুঁ মেরে উড়িয়ে দিলেন, এদের সাথে যারা যুক্তিবাদীরা ছিল তাদেরও সবাইকে উড়িয়ে দিলেন। সবাইকে উড়িয়ে দিয়ে তিনি তাঁর একটা নামকরা কথা বলে দিলেন – কর্মের ফল এক রকম, জ্ঞানের ফল আরেক রকম। আমাদের উপনিষদও এই কথা বার বার বলছেন। কর্মের ফল হলে, সেই কর্ম একটা ছাপ রেখে দেয়, যেটার জন্য মানুষ পরে আবার কর্ম করে। জ্ঞান কোন ছাপ ছাড়ে না, জ্ঞান যেন কর্পূরের আলো, কর্পূর জ্বালালে আলো দিয়ে পুরোটাই নিঃশেষে পুড়ে শেষ হয়ে যায়, ওর অবশিষ্ট কিছু পড়ে থাকে না। জ্ঞান আসার পর মানুষ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যায়।

শরীরের দ্বারাই সমস্ত সুখদুঃখের ভোগ হয়

এরপর স্বামীজী বলছেন, ‘Do’ and ‘Do not do’ are the background of all morality, but they really belong only to the body and the mind. (*সর্বপ্রকার নীতি-ধর্মের মূল হচ্ছে বিধিনিষেধ –‘এই কাজ করো’ এবং এই কাজ করো না’। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেহমনের সঙ্গেই এগুলির সম্বন্ধ।*) বিধি আর নিষেধ, তুমি কোনটা করবে আর কোনটা করবে না, এই ব্যাপারটা পুরোপুরি শরীর আর মনের মধ্যেই ঘুরপাক করতে থাকে। এর আগে আমরা যে দীর্ঘ আলোচনা করলাম, সেখানে বলা হয়েছিল, শুদ্ধ আত্মাই সত্য, সেখান থেকে অজ্ঞানের একটা আবরণ এসে যায়। অজ্ঞান এসে যাওয়ার ফলে আমরা কিছু জিনিসের প্রতি আকর্ষিত হয়ে যাই। ধর্মশাস্ত্র গুলি আমাদের বলে দেন, তুমি কোনটা করবে আর কোনটা করবে না। যে কাজগুলো করতে বলছেন, তার মানে বলা হচ্ছে, এই কাজগুলো তুমি করে যাও, করতে করতে তোমার মন শুদ্ধ পবিত্র হবে, শুদ্ধ মন দিয়ে তুমি আধ্যাত্মিক সত্যগুলি ধারণা করতে পারবে, ধারণা করতে

পারলে তুমি মুক্তির দিকে এগোবে। স্বামীজী এটাই এখানে বলছেন, যেখানে যত বিধিনিষধের গ্রন্থ আছে, অর্থাৎ যত আইনের বই আছে, যত সংবিধান আছে, যে কোন ধর্মের বা দেশের যত সংবিধান আছে সবারই বক্তব্য বিধিনিষেধ। সংবিধান শব্দটাই এসেছে বিধি বা বিধান থেকে, কোনটা তুমি করবে, কোনটা করবে না। কিন্তু একটু ভিতরের দিকে তাকালে দেখা যাবে, এই ধরণের গ্রন্থগুলি সবাই শরীর, মন আর ইন্দ্রিয়কে নিয়েই সব বলে।

All happiness and misery are inextricably connected with the senses, and body is necessary to experience them. (*সর্বপ্রকার সুখদুঃখ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত; সুতরাং সুখদুঃখ ভোগ করতে গেলেই শরীরের প্রয়োজন।*) যে কাজই আমরা করছি, ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই করছি, কিন্তু কর্মের ভাল-মন্দের ফল সুখদুঃখ রূপে ভোগ হয় শরীরকে দিয়ে। শরীর আর ইন্দ্রিয়ের এটা একটা বিচিত্র সম্পর্ক। একটু ভাবলেই কী আশ্চর্যের লাগবে, জগৎ আমাদের কাছে পৌঁছায় পাঁচটি পোস্টবক্স দিয়ে। বড়লোকদের বাড়ির সামনে একটা লেটার বক্স থাকে। আমাদের পাঁচটা লেটার বক্স, এই পাঁচটা লেটার বক্সে জগৎ অনবরত চিঠি ড্রপ করে যাচ্ছে। পাঁচটি লেটার বক্স হল, চোখ, কান, নাক এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়। ঠাকুর খুব সুন্দর বর্ণনা করছেন, চিঠি এলো, চিঠি হারিয়ে গেল, সবাই মিলে খুঁজছে। চিঠি পাওয়ার পর দেখা গেল চিঠিতে পাঁচ সের সন্দেশ আর কাপড় পাঠাতে বলছে। খবর এসে গেল, এবার সবাই কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে কাজ করতে শুরু করল। পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে কাজ করা হল, সেই কাজের ভাল হোক মন্দ হোক, একটা ফল হবে। এই ভোগটা হয় সব সময় শরীর দিয়ে। যে কোন শরীরকে দেখলে বোঝা যায়, হাত, পা ইত্যাদি যে পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় আছে, এই কর্মেন্দ্রিয়ের ব্যবহার কেমন হয়েছে, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় কেমন ছাপ তার উপর ছেড়েছে। গার্হস্থ জীবন যদি সুখী থাকে, তার শরীরটা এক রকম হবে, গার্হস্থ জীবন যদি হতাশাগ্রস্ত হয়, তার শরীর অন্য রকম হবে। যোগীদের বলা হয় আহার, নিদ্রা আর মৈথুন তিনটেকেই কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে। মৈথুন মানে যেখানে দশটা ইন্দ্রিয়কেই কাজে লাগানো হয়, সেখানে আহারে পাঁচটি ইন্দ্রিয় লাগে, নিদ্রাতে দশটা ইন্দ্রিয়কেই silent করে দেওয়া হয়। পাঁচটি ইন্দ্রিয় হল লেটার বক্স, আর পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় হল পোস্ট বক্স, পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্রিয়ে লেটার ঢুকছে, আর পাঁচটা কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে আমরা লেটার ছাড়ছি। সব কটার ভোগ হয় আমাদের এই শরীর দিয়ে, এটাই আশ্চর্যের। স্বামীজী বলছেন, body is necessary to experience them, যেদিন সৃষ্টি হয়েছিল, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত যা কিছু কর্ম করেছে তার সমস্ত ভোগ এই শরীরের উপর দিয়ে যাচ্ছে, আর যে ভোগটা বেরোচ্ছে না, সেটা জমে থাকছে, এর পরের জন্মে যে শরীর পাবে, বাকিটা সেই শরীর দিয়ে বেরোবে। ইন্দ্রিয়গুলির এখানে কোন যোগ নেই, পাঁচটি ইন্দ্রিয় লেটার বক্স দিয়ে শুধু নিয়ে যাচ্ছে, নিয়ে ভিতরে সৃষ্টি থেকে যে সংস্কারগুলি সঞ্চিত হয়ে আছে, সেগুলিকে অন্ করছে, ভিতরের কম্প্যুটার অন্ হল, এরপর সে পোস্ট বক্সে গিয়ে পোস্ট করতে শুরু করল।

স্বামী ভূতেশানন্দজীকে একবার একজন সন্ন্যাসী হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলেন, মহারাজ আপনি সব সময় কত নরম শান্ত মিষ্ট আর হাসিখুশী থাকেন, মহারাজ আপনি জীবনে কোন দিন রেগে গিয়েছিলেন? মহারাজও হাসি মুখে বলছেন, একবার রেগে গিয়েছিলাম। বলার পর উনি খুব মজার একটা ঘটনা বললেন, অবশ্য এই ঘটনার সাথে আমাদের এই প্রসঙ্গের কোন সম্পর্ক নেই। ঘটনাটা বলার পর আবার বললেন আরেকবার রেগে গিয়েছিলাম, সেবার আমি মার খেয়ে গিয়েছিলাম। এরপর তিনি অনেক আগেকার একটা ঘটনার কথা বললেন, তখনও ভারত স্বাধীন হয়নি, সেই সময় অনেক বাঙালী দেওঘরে থাকত। মহারাজ তখন দেওঘরে ছিলেন। সেই সময় একদিন তিনি অন্য একজন সাধুর সাথে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। দুই সাধুকে দেখে বিনা কোন প্ররোচনায়, কোন কারণ নেই হঠাৎ একজন বাঙালী এসে দুজনকে খুব করে গালাগাল দিতে শুরু করেছে। তখন মহারাজের সঙ্গে যিনি ছিলেন, তিনি শুধু ওই বাঙালী বাবুকে বললেন, 'আপনি এভাবে কেন গালাগালি দিচ্ছেন, একটু ভদ্রলোকের মত ব্যবহার করুন'! সঙ্গে সঙ্গে লোকটি বলতে লাগল, 'আপনি আমাকে অভদ্র বললেন'! বলেই ওনাকে ধরে মারতে শুরু করেছে। মহারাজ নিজের সঙ্গের সাধুকে বাঁচাতে গেলেন, তিনিও বেদম মার খেয়ে গেলেন। মার খেয়ে দুজন আর কি করবেন, মন খারাপ করে চলে এলেন। পরে লোকটির আত্মীয়রা কিভাবে জানতে পেরে ক্ষমাটমা চাইল। এখানে দেখার বিষয়টা হল, অকারণে গালাগাল দিয়ে যাচ্ছে। মহারাজ শুধু এটুকু বললেন, একটু ভদ্রলোকের মত ব্যবহার করুন! তাতেই ক্ষিপ্ত হয়ে মারতে

শুরু করে দিয়েছে। তার মানে এর আগের আগের জন্মের হিংস্র স্বভাবের সংস্কারটা কত প্রবল। আর এই হিংস্র সংস্কার যদি চলতেই থাকে, তাহলে মৃত্যুর পর এই শরীর দিয়ে হিংস্র স্বভাবটা পুরোপুরি বার করতে পারবে না। সবাই তো আর হিটলার হয়ে জন্মাবে না, কোথাও বাঘ সিংহ হয়ে জন্মাবে বা সাপ বিছে হয়ে জন্মাবে, ভাল করে হিংস্র সংস্কারটা বার করতে থাকবে। আমাদের ভিতরে যত রকমের ভাব সমুদয় আছে, ওই ভাবগুলিকে প্রকাশ করার জন্য শরীর দরকার। কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা যা যা কাজ করতে চাইছি, বা যে কাজগুলো করেছি তার ঠিক ঠিক ভোগ একমাত্র এই শরীর দিয়েই হয়। আজকে আমার যে শরীর আছে, এই শরীরটা আমাদের ভিতরে যে সংস্কারগুলি আছে, যে সংস্কারগুলো রিসিভ করছি লেটার বক্স দিয়ে আর ছাড়ছি পোস্টবক্স দিয়ে, সেগুলোর জন্য পুরোপুরি উপযুক্ত। ইন্দ্রিয়ের ইনপুট আর আউটপুট দিয়ে যেমন আমাদের মন হবে, শরীর তেমনই হবে।

সেইজন্য বলছেন, The higher the body, the higher the standard of virtue, even up to Brahma; but all have bodies. (*যার দেহ যত উন্নত, তার ধর্ম বা পূণ্যের আদর্শও তত উচ্চ; এই রকম ব্রহ্মা পর্যন্ত, কিন্তু এ পর্যন্ত সকলেরই শরীর আছে।*) স্বামীজী বলছেন, শরীর আর ধর্ম বা পূণ্যের আদর্শ পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত। কিন্তু এখানে স্বামীজী উল্টোটা বলছেন, শরীর যত উন্নত হবে তার ধর্মও তত উচ্চ হবে। কুকুরের স্বভাবেই আছে ঘেউ ঘেউ করা, কারণ ওর শরীরটা বিবর্তনের মাপে নীচে। মানুষ তার থেকে অনেক উপরে। আর যদি আরও নীচে ভাইরাস, ব্যাক্টেরিয়াতে যাওয়া যায়, তাদের আচরণ অনেক নীচের, তারা কিছু বোঝে না। কুকুর তাও তার প্রভুর আদেশ মানে, তার থেকে নিম্ন প্রজাতি আদেশও মানে না, তারা বোঝেও না। আমাদের কাছে ধর্ম বা পূণ্যের যে আদর্শ তার গুরুত্ব অনেক বেশি। কুকুরের আহার, নিদ্রা, মৈথুনে কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, মানুষের আহার, নিদ্রা, মৈথুন নিয়ন্ত্রিত। এটাই যখন দেবতার স্তরে যায়, তাদের আহার, নিদ্রা, মৈথুন, যেটা জীবনকে signify করে, আরও নিয়ন্ত্রিত। ব্রহ্মার স্তরে গিয়ে ওটা আরও নিয়ন্ত্রিত হয়ে যাবে। যে যত উন্নত হবে তার ধর্ম ভাব তত উন্নত হবে। আগে বলা হল, ধর্ম হিন্দুদের একটাই, সেটা হল পবিত্রতা, পবিত্রতা মানেই নিঃস্বার্থপরতা, বৈরাগ্য। বৈরাগ্য মানেই, সে আহার, নিদ্রা ও মৈথুন থেকে বেরিয়ে এসেছে। যে যত পবিত্র তার শরীর তত উন্নত, তার কাছে আমরা আশা করি তার ধর্ম, মূল্যবোধ এগুলো তত উন্নত হবে।

একজন সন্ন্যাসীকে দেখা মাত্রই আমরা ধরে নিই, ইনি হলেন কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী সন্ন্যাসী। শরীরের দিক থেকে তিনি হয়ত এখনও উন্নত হননি, কিন্তু পোষাক-আশাক এমন নিয়ে নিয়েছেন যে, তাঁর বক্তব্য হল, চৈতন্যের যে ক্রমবিবর্তন হবে এবং তার পরের যে ধাপ, আমি সেখানকার প্রস্তুতি নিয়ে নিয়েছি। আমি এই জগতেই আছি, কিন্তু আমি তোমাদের থেকে আলাদা হয়ে গেলাম। সন্ন্যাসীর এটাই ভাব, আমি তোমাদের থেকে আলাদা হয়ে গেলাম, এবার আমার শরীর, মন, কার্য, ক্রিয়া, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের আউটপুট, ইন্দ্রিয়ের ইনপুট সব তোমাদের থেকে আলাদা। ফলে সাধুদের অন্য রকম আচরণ করতে দেখলে লোকেরা পছন্দ করে না। যেমন ব্রহ্মার সন্তানরা নিজের কন্যা সরস্বতীর দিকে ব্রহ্মার কুদৃষ্টিতে তাকানোকে পছন্দ করলেন না। এই বলে স্বামীজী বলছেন, even up to Brahma; but all have bodies। আচার্য শঙ্করেরও এই রকম তাঁর নিজের একটা প্রিয় কথা আছে, আব্রহ্মস্তম্ভপর্যন্ত, ঘাসের যে একটা ডগা, তারও একটা শরীর আছে আর যিনি ব্রহ্মা, তাঁরও একটা শরীর আছে। আচার্য শঙ্কর তাই বলছেন, ঘাসের একটা টুকরো থেকে ব্রহ্মা পর্যন্ত শরীর সবারই আছে। ব্রহ্মা স্রষ্টা হতে পারেন, তিনি বিধাতা হতে পারেন, কিন্তু তিনি একজন দেহবান।

দেহভাব থেকে মুক্ত হতে হবে

বলছেন, As long as there is a body, there must be pleasure and pain; only when one has got rid of the body can one escape them. The Atman is bodiless, says Shankara. (*যতক্ষণ শরীর আছে, ততক্ষণ সুখদুঃখ থাকবেই। কেবল দেহভাব থেকে মুক্ত হলেই সুখদুঃখ অতিক্রম করা যেতে পারে। শঙ্কর বলেন, আত্মা দেহ-বিহীন।*) যতক্ষণ শরীর আছে ততক্ষণ সুখ দুঃখ থাকবে, সুখ দুঃখের সাথে আমরা বাঁধা, পাপ-পূণ্যে আমরা বাঁধা, ধর্ম-অধর্মে বাঁধা। যদি সুখ-দুঃখের পারে যেতে হয়, যদি ধর্ম-অধর্ম, পাপ-পূণ্যের পারে কেউ যেতে চায়, তাকে শরীরের বাইরে যেতে হবে। শরীরের বাইরে যাওয়া মানেই, শরীর, মন, ইন্দ্রিয় সব একই, সবটার পারে যাওয়া। একমাত্র আত্মাই হলেন দেহাতীত,

তাঁর শরীর নেই। তাঁর দেহ নেই, দেহ নেই তাই ইন্দ্রিয় নেই, মন নেই। ইন্দ্রিয় নেই, মন নেই, দেহ নেই, তাই আত্মার সুখও নেই দুঃখও নেই, ধর্ম নেই অধর্ম নেই, পাপ নেই পূণ্যও নেই। যদি কেউ দুঃখকে ভয় পায়, তার জেনে রাখা উচিৎ সুখ আর দুঃখ মিলেমিশে আছে। যদি কেউ সুখ পেতে চায়, তাহলে তার জেনে রাখা দরকার, জগতে যত পরিমাণ সুখ আছে তত পরিমাণ দুঃখও আছে। সুখ থাকলে দুঃখও থাকবে, দুঃখ থাকলে আবার একটু কম হলেও সুখ থাকবে। যদিও আচার্য শঙ্কর এক জায়গায় বলছেন, এই জগতে সুখের গন্ধ মাত্র নেই। ঠাকুর বলছেন, এই সংসার হল আমড়া, আটি আর চামড়াই সার, খেলে আবার অম্লশূল। কিন্তু ওর মধ্যেও আমরা মেনে নিতে পারি, অল্প একটু সুখ আছে। এই সুখ আর দুঃখের পারে যেতে হলে শরীরটা ছাড়তে হবে। শরীর ছাড়া মানে আত্মহত্যা করে নেওয়া না। আমরা তাই ভাবি, দুঃখ আর এই অভাব আর সহ্য হচ্ছে না, যাকে ভালবাসি সে আমাকে ছেড়ে চলে গেছে, তার অভাব আমি নিতে পারছি না। আমার জীবনটা অপূর্ণ, জীবনটা নিরানন্দ, এর থেকে বেরোতে চাই। এই দেহকে কি ত্যাগ করে দিতে হবে? দেহ তো তুমি ত্যাগ করে দেবে, কিন্তু তোমার মন আর ইন্দ্রিয় তো সূক্ষ্ম রূপে থেকে যাচ্ছে, এই দেহ ত্যাগ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে সে আরেকটা শরীর নিয়ে নেবে। তুমি বলছ এই শরীরে আমি আর ভোগ করব না, খুব ভাল কথা, এই শরীর চলে গিয়ে আরেকটা নূতন শরীর এসে যাবে। যখন ওই শরীরটাও চলবে না, তখন আরেকটা শরীর নিয়ে নেবে। শরীরকে ছেড়ে দেওয়াতে কোন দাম নেই, আসল শরীরটা তো থেকেই গেল। যারা আত্মহত্যা করে তারা এটা বুঝতে পারে না। সে মনে করছে, তার শরীরে যে দুঃখ যন্ত্রণার ভোগ হচ্ছে, এই শরীরটা ছেড়ে দিলে সে বেঁচে যাবে। কিন্তু তাতো হচ্ছে না, সে আগে আগে যা কিছু করেছে তার ভোগ এই শরীরে আসছে। দোষ এই শরীরের নয়, দোষটা রয়েছে ভিতরে, বাইরের দেহটা ত্যাগ হয়ে যাওয়ার পরে ভিতরটা থেকেই গেল, যে সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা শরীর নিয়ে নেবে আর মন ওই শরীরের সাথে জুড়ে দেবে। ওই ভোগটা এবার এই দেহে হতে থাকবে। সেইজন্য স্বামীজী আবার বলছেন।

No law can make you free, you are free. Nothing can give you freedom, if you have it not already. The Atman is self-illumined. (*কোন বিধি-নিষেধের দ্বারা মুক্তিলাভ হতে পারে না। তুমি সদা মুক্তই আছ। যদি তুমি পূর্ব হতেই মুক্ত না থাকো, তবে কিছুই তোমায় মুক্তি দিতে পারবে না। আত্মা স্বপ্রকাশ।*) আত্মা সব সময়ই মুক্ত। এখানে Law বলতে ধর্ম বলছেন, কোন ধর্ম, কোন ক্রিয়া তোমাকে মুক্ত করতে পারবে না, যদি তুমি আগে থেকেই মুক্ত না হয়ে থাক। এগুলো আমরা অনেকবার আলোচনা করেছি। Cause and effect do not reach there, and this disembodiedness is freedom. (*কার্যকারণ আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে না –এই দেহশূন্য ভাব বা বিদেহ অবস্থার নামই মুক্তি।*) আগে যে বলা হল, কর্মের ফল আলাদা, জ্ঞানের ফল আলাদা, তার মানে কর্মের যে কার্য কারণ সম্পর্ক এটা আত্মাতে পোঁছাতে পারে না, কারণ আত্মার শরীর নেই, ইন্দ্রিয় নেই। Beyond what was, or is, or is to be, is Brahman. (*ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান –সব কিছুর পারে ব্রহ্ম।*) এই দেহ, মন, ইন্দ্রিয়ের অতীত যা ছিল, যেটা আছে, যেটা থাকবে, এটাই সেই সর্বব্যাপী ব্রহ্ম।

As an effect, freedom would have no value; it would be a compound, and as such would contain the seeds of bondage. (*যদি মুক্তি কোন কর্মের ফল হত, তবে তার কোন মূল্যই থাকত না, সেটা একটা যৌগিক বস্তু হত, সুতরাং তার ভিতর বন্ধনের বীজ নিহিত থাকত।*) যদি মনে করা হয় কর্মের ফল মুক্তি, তার মানে যারা ভাবছে আমি মন্ত্র জপ করে মুক্তি পেয়ে যাব, ধ্যান করে আমি মুক্তি পেয়ে যাব, পূজা অর্চনা করে আমি মুক্তি পেয়ে যাব, তাদের জানা উচিৎ যে, যদি এই ধরণের কর্ম দিয়ে মুক্তি হয়, তাহলে জানবে ওই মুক্তিতে বন্ধনের বীজটাও পড়ে আছে, তার মানে তুমি আবার বন্ধনে পড়বে। কারণ কর্ম আর কর্মের ফল এমন ভাবে সম্পর্ক যুক্ত হয়ে আছে যে, যে কোন জিনিস যদি compound হয়ে যায় তখনই কর্ম হবে, শব্দটা হল বিকারী আর simpleকে বলে অবিকারী। যে জিনিসটা বিকারী, তার উপরেই কর্ম হয়, সেখানেই কর্মফল উৎপন্ন হয়, আর বিকারী হলে কিছু দিন পরে তার মধ্যে কিছু না কিছু বিকার আসবেই। মূল বক্তব্য হল, মুক্তি যদি কর্ম দিয়ে হয়, তাহলে জানবে যে ওর মধ্যে বন্ধনের বীজ রয়েছে, আবার সে বন্ধনে পড়বে। It is the one real factor, not to be attained, but the real nature of the soul. (*এই মুক্তিই আত্মার একমাত্র নিত্যভাব, তাকে লাভ করতে হয় না, যেটা আত্মার যথার্থ স্বরূপ।*)

চেষ্টা করে যে মুক্তি পেয়ে যাওয়া, এটা তা না, মুক্তি আত্মার স্বভাব, এটাই তিনি, আত্মা শুদ্ধ, পবিত্র, বন্ধনবিহীন।

এরপর স্বামীজী পর পর বলছেন, মানুষ কিভাবে জ্ঞানের দিকে এগোয়। আমাদের সমস্ত শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হল মানুষের দুঃখ মোচন করা, কিন্তু দুঃখ সব সময় শরীরের। ইন্দ্রিয় দুঃখ পায় না, মনও দুঃখ পায় না, দুঃখ আসলে পায় শরীর। শরীর দুঃখ পায় কারণ সে নিজেকে ইন্দ্রিয় আর মনের সাথে জুড়ে রেখেছে। আর যত রকমের মরালিটি শরীর থেকেই আসে। যদি কেউ মনে করে, আমি ভাল মানুষ হয়ে যাব, নৈতিকতায় প্রতিষ্ঠিত থাকব, আর তাতে আমার মুক্তি হয়ে যাবে, কিন্তু তা হবে না। তুমি যদি খুব ভাল মানুষ হও, মৃত্যুর পর হয়ত তুমি একটা ভাল যোনিতে জন্মাবে, এর বেশি কিছু হবে না। যেমন যেমন জ্ঞান হবে তেমন তেমন তার শরীর উন্নত হবে। স্বামীজী এখানে খ্রীশ্চানদের সামনে বলছেন, ওদের বোঝানর জন্য বলছেন, খ্রীশ্চানিটিতে যে মরালিটির আইডিয়া রয়েছে তাতে বলা হয়, be moral, morality is religion, কিন্তু স্বামীজী বলতে চাইছেন, morality is not whole of religion, is a part of religion।

মুক্তি কোন ক্রিয়ার ফল নয়

জ্ঞান আর মুক্তির সম্পর্ককে নিয়ে কিছু প্রশ্ন মানুষের মনে জাগে। জ্ঞান আর মুক্তি নিয়ে এর আগে অনেকবার আলোচনা হয়েছে। ক্রিয়া করলে তার একটা ফল হবে, ওই ফল কতক্ষণ থাকবে? ওই ক্রিয়ার প্রভাব যখন শেষ হয়ে যাবে, তখন ওই জিনিসটা আবার স্বাভাবিক অবস্থায় চলে আসবে। তর্কে এর অন্য রকম জিনিসকেও নিয়ে আসা হয়। যেমন দাঁত মাজা হল, দাঁত পরিষ্কার হয়ে গেল। কিন্তু একটা সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর আবার দাঁত মাজতে হবে। অদ্বৈত বেদান্ত, আচার্য শঙ্কর বলছেন, যদি আত্মজ্ঞান ক্রিয়ার ফল হয়, তাহলে আত্মা আবার অজ্ঞানের অবস্থায় চলে যাবে। আত্মা এই অজ্ঞানের অবস্থায় চলে যাবে, আবার এই জ্ঞানের অবস্থায় চলে আসবে। আত্মার ব্যাপারে শাস্ত্র কিন্তু এই রকম কথা কখনই বলে না। আচার্যের বক্তব্য, যেটা তিনি পুরো যুক্তি দিয়ে আনছেন, উপনিষদ, শ্রুতি থেকে এনে বলছেন, এটাই মানুষ অনুভব করে, শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতিও তাই বলছে, আসলে বাস্তবিক যেটা তুমি, এটা শুধু আত্মার। অজ্ঞানের পরে তুমি এটা ভুলে গেছ, সেইজন্য তোমার এত শোক দুঃখ। কোন ক্রিয়া দিয়ে এর থেকে মুক্তি হতে পারে না। কারণ ক্রিয়া দিয়ে যদি মুক্তি হয়, তাহলে ওই ক্রিয়ার প্রভাব যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ মুক্ত থাকবে ঠিকই, কিন্তু ক্রিয়ার প্রভাব শেষ হয়ে গেলে আবার মুক্তি থেকে বন্ধনে চলে আসবে, এটা খুবই সাধারণ যুক্তি।

তাহলে তো শাস্ত্রের সাথে মিলছে না। মেলানোর জন্য বলছেন, আসলে তুমি নিত্য, বন্ধন বন্ধন যেটা আমরা বলছি, আসলে এটা অজ্ঞানের বন্ধন। যা কিছু করা হয় শুধু এই অজ্ঞানকে সরানোর জন্য করা। অজ্ঞান কি দিয়ে সরবে? জ্ঞান দিয়েই সরবে। সেইজন্য জ্ঞান ছাড়া মুক্তি হতে পারে না। তার সাথে প্রশ্ন হল, আমাদের জ্ঞান কেন হয় না? জ্ঞান কি এক সেকেণ্ডে হতে পারে? জ্ঞান সব সময় এক সেকেণ্ডেই আসে। অজ্ঞান, অপবিত্রতা জিনিসটা কি? এর আগে আমরা এর উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছি। অজ্ঞান বা অপবিত্রতা হল attachment। অজ্ঞান মানে আমি নিজের স্বরূপকে ভুলে গেছি, ভুলে গিয়ে নিজেকে জুড়ে রেখেছি দেহের সাথে, মনের সাথে, নিজের পরিজনদের সাথে, আর যাদের অপছন্দ করি তাদের থেকে দূরে থাকার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করি। আমরা নিজেদের বানিয়ে নিয়েছি exclusive, আমি এতটুকু, এর বাইরে আমি নই। এই দেহটা আমি, বাকি দেহ গুলো আমি নই, এই মনটা আমি, বাকি মন গুলি আমি নই। আমি হিন্দু, হিন্দুর বাইরে আমি নই, আমি ভারতীয়, ভারতের বাইরে আমি নই। আর আমি মানুষ, আমি জীবজন্তু নই – এটা exclusive।

Exclusive হওয়া মানে নিজেকে সীমিত করে দেওয়া, বেদান্ত বলছে তুমি সীমিত নও। যখন বলা হয় exclusive cell, তার মানে কিছুক্ষণের জন্য আছে, নিয়মিত নয়। নিয়মিত যদি হয়, ওটা হবে inclusive, সবারই জন্য, সব সময়ের জন্য। হিন্দু ধর্ম হল inclusive religion, inclusive মানে কাউকে বাদ দেয় না। কাউকে বাদ না দেওয়ার অর্থ হয়, আমি, তুমি সবাই অজ্ঞানে পড়ে আছি, যে নিজের এই অজ্ঞানকে ছাড়বে সেই মুক্ত। অজ্ঞানে মানে, আগে যেমন বলা হল, attachment, attachment

মানেই রাগ আর দ্বেষ। রাগ মানে যতটুকুর মধ্যে আমি নিজেকে বেঁধে রেখেছি, আর দ্বেষ মানে যেটাকে আমি বাইরে রেখেছি। রাগ আর দ্বেষের বাইরে চলে যাওয়া মানে inclusive হয়ে যাওয়া, inclusive হয়ে যাওয়া মানেই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়া, জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়া মানে, শোক, মোহের পারে চলে যাওয়া। তার মানে আধ্যাত্মিক অবস্থায় সে বাস্তবিক একত্ব দেখছে, সেই চৈতন্যই আছে। যখন ওই অবস্থাটা মনের স্তরে আসে, তখন দেখে তার কোন শোক মোহ হয় না। আর ব্যবহার কালে শত্রুতা মিত্রতা থাকে না। এই তিনটে অবস্থায় চলে। ওর যে পুরো জীবনদর্শন, যেটা তার সব কিছুকে চালিত করে, সেটা হল একত্ব, inclusiveness। মন, তার ইমোশান শোক মোহের পারে চলে যায়। সমাজে ব্যবহারকালে তার শত্রু মিত্র কেউ থাকে না। সবাই তার আপনজন, কারুর সাথে তার শত্রুতা থাকে না। শত্রুতা এই অর্থে, কাউকে সে আপন করে নেয় না। সবাইকে সে নিজের মধ্যে রেখেছে, কিন্তু কেউই তার আপন নয়।

অনেক সময় বলা হয়, সাধু সন্ন্যাসী, স্বামীজীর মত লোকেরা স্বার্থপর। যারা সাধু-সন্ন্যাসীদের এভাবে নিন্দা করে, তারা জানে না যে, আজকে যদি কেউ বিদেশে একটা ভাল চাকরি পায়, সে বাবা-মাকে ছেড়ে বিদেশে চলে যায়। সেই সময় এরা তাকে স্বার্থপর বলবে না, বলবে, লেখাপড়ায় কত ভাল ছেলে, বিদেশে থাকে। বাবা-মা না খেয়ে থাকুক, বাবা-মা কেঁদে কেঁদে মরে যাক, তাতে ওদের কিছু আসে যায় না। কিন্তু কেউ সন্ন্যাসী হয়ে গেলে আমাদের ঐতিহ্যে, আমাদের পরম্পরায় বলা হয়, কুল পবিত্র হয়ে যায়, সমাজ ধন্য হয়ে যায়, সেখানে এরা সন্ন্যাসীকে বলছে স্বার্থপর। এক স্বামী বিবেকানন্দ যা করে গেলেন, তাতে হাজার হাজার মানুষের মঙ্গল হচ্ছে, সেই স্বামী বিবেকানন্দ নাকি স্বার্থপর। এই দেশ মুর্খের দেশ, বিদ্বানরা কখন গলা ফাটিয়ে বলে না, মুর্খরাই বলে। যে যত মুর্খ সে তত বেশি সোস্যাল মিডিয়াতে চেঁচায়, তত বেশি এই ধরণের কথাগুলি বলে। কোকিলকে আমরা যেমন দোষ দিতে পারি না, সে কেন বাবা-মাকে ছাড়ল। কোকিল থাকে কাকের বাসায়, প্রকৃতিতে কোকিলের জন্ম শুধু গান করার জন্য। কোকিলের সেই জেনেটিক ট্রেনিং নেই যে সে নিজে একটা বাসা বানাবে আর নিজের বাচ্চাকে লালন পালন করে বড় করবে। ঠিক তেমনি যাঁরা সন্ন্যাসী হন, জগতের মঙ্গল করার জন্য যাঁরা সন্ত মহাত্মা হন, তাঁদের বাবা-মা হল কাক, এনারা হলেন কোকিল। কোকিলকেও একটা বাসায় থেকে বড় হতে হবে, সেইজন্য কোকিল কাকের বাসায় গিয়ে থাকে। সময় হলে কোকিল সেই বাসা ছেড়ে বেরিয়ে চলে আসে।

মানুষ মুক্ত অবস্থায় থাকতে পারে না

মূল কথা হল, জন্মজন্মান্তর থেকে, যবে থেকে এই সৃষ্টি হয়েছে, সেইদিন থেকে নিজেদেরকে আমরা শরীরের সাথে জুড়ে রেখেছি, মনের সাথে জুড়ে রেখেছি আর আপনজনদের সাথে জুড়ে রেখেছি। সেইজন্য আমরা যদি কোন ভাল কথা শুনি, আমরা ওই কথা সহজে মেনে নিতে পারব না। এ্যলবে ক্যামু একজন খুব নামকরা লেখক ছিলেন। ওনার একটা বিখ্যাত উপন্যাস 'দি প্লেগ'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বিভিন্ন দেশে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, সেটাকে আধার করে তিনি এই উচ্চমানের উপন্যাসটা লেখেন। কাহিনীতে তিনি একটা কাল্পনিক পরিস্থিতি নিয়ে আসছেন, যেখানে তিনি দেখাচ্ছেন, একটা প্রজাতি কোন ভাবে হাজার হাজার বছর ধরে গুহায় বাস করছে, গুহাটাই তাদের জীবন। গুহার মধ্যে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্য তারা গরমের ব্যবস্থা রাখে। সব কিছু অবাধ, সেইজন্য নানা রকমের ফ্যাক্টরি আছে, যেখানে সবার খাবার তৈরী হয়। এক সময় ওখানকার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেছে, ইলেক্ট্রিসিটি নেই, গরম হতে পারছে না, ফ্যাক্টরি সব বন্ধ, খাওয়াও পাচ্ছে না, সব কিছুর অভাব হয়ে গেছে। একজন লোক ভাবছে, আমাদের কেন এত কষ্ট, একটু চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে এই কষ্ট থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারি কিনা। সে অনেক খেটে খুটে পথ পালটে অন্য একটা জায়গায় পৌঁছে দেখে, এই রাস্তাটা তো অন্য দিকে যাচ্ছে। সে গুহার বাইরে যাওয়ার একটা পথ খুঁজে পায়। সেই পথ দিয়ে গুহার বাইরে বেরিয়ে এসে দেখে, আরে এখানে সূর্যের অপর্যাপ্ত আলো, স্বাভাবিক উষ্ণতা বিরাজ করছে, এখানে সব কিছু প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই হয়।

সে সঙ্গে সঙ্গে গুহার ভিতরে ঢুকে নিজের লোকদের কাছে পৌঁছে সবার সামনে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে যেন বলছে, *শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্যাপুত্রা,* যদিও এই কথা সে বলছে না। যারা তার কথা শুনছিল, বেশির ভাগ লোকেরা বলতে লাগল, লোকটা বদ্ধ পাগল। শেষ দুজন লোক তার কথা শুনতে রাজি হয়েও যায়, তারা

বলবে, তোমার কথাগুলো শুনতে ভালই লাগছে, খুব লজিক্যাল মনে হচ্ছে, কিন্তু একটু আগে খবর এসেছে যে, অনেক দিন পর রেশনের দোকান খুলছে, ওখানে পাউরুটি পাওয়া যাবে। আগে তাই লাইনে গিয়ে পাউরুটিটা নিয়ে আসি, তারপর আপনার কথা শুনছি। কারণ পরে আবার কবে রেশনে পাঁউরুটি আসবে আমরা জানি না। তারা শুনছে, কিন্তু তাদেরও ওই অবস্থা। আমরা হলাম ওই লোকগুলো, যারা তাকে বলছে একটা বদ্ধ পাগল। আমাদের মধ্যে যারা একটু উন্নত, তারা বলছে, আপনার কথাগুলো ভাল, সব শুনবো কিন্তু দোকান থেকে একটু পাঁউরুটি নিয়ে আসি, তা নাহলে পরে আর পাঁউরুটি পাওয়া যাবে না, পরে আবার কবে রেশন আসবে আমরা জানি না।

বর্তমান যুগের পৃথিবীর বাসিন্দাদের অবস্থা ওই গুহার বাসিন্দাদের মত। ঠাকুর, স্বামীজী, যীশু, বুদ্ধ এনাদের কথাগুলো সাধারণ লোকেদের কাছে পাগলের প্রলাপ বলেই মনে হয় আর পাগলের প্রলাপ বলে মনে হওয়ারই কথা। কদাচিৎ কেউ যদি থাকে, যার একটু চৈতন্য জাগ্রত হয়েছে, সেও বলবে, আমি সব করতে রাজী, কিন্তু আমার ঘরবাড়ি আছে, আমার দেশ আছে, সমাজ আছে, তাদের প্রতি আমার কর্তব্য আছে, আর নিজেরও দশটা কাজকর্ম আছে; আগে আমার পরিবারটা একটু সামলে নিই, তারপর দেখছি আমি কতটা কি করতে পারি। সেইজন্য নিন্দুকরা যে বলবে স্বামীজী একটা স্বার্থপর ছিলেন, এগুলো কিছু না। নিজের চৈতন্য যখন জাগে তখন মানুষ এই জিনিসগুলো এমনিতেই বুঝতে পারবে। আমরা কেন পারি না? কারণ এত বছর ধরে এই অমূল্য জিনিসগুলিকে উপেক্ষা করে করে, আর সংসারের কাজ করে করে ওতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছি। কোন মানুষ কি আছে যে বন্ধন ছাড়া থাকতে পারে? বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা দিনরাত নিজেদের মধ্যে খিটির-মিটির করেই যাচ্ছে, কিন্তু থাকবে একসাথে, একজন একজনকে ছাড়া এক ঘন্টা থাকতে পারবে না। কাউকে যদি বলা হয়, তোমাকে সব কিছু থেকে মুক্ত করে দেওয়া হচ্ছে, লোকটা দুদিনেই পাগল হয়ে যাবে। প্রশান্ত মহাসাগরের গভীর জলের মাছকে যদি পুকুরে ছেড়ে দেওয়া হয়, তার শরীরটা কিছুক্ষণের মধ্যেই ফেটে যাবে, গভীর জলে ওই চাপের মধ্যে থাকাতেই সে অভ্যস্ত।

মিলিন কুন্দরা নামে আরেকজন খুব নামকরা লেখক ছিলেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে চেকস্লোভাকিয়ার ঘটনার উপর আধার করে তাঁর খুব বিখ্যাত বই 'The Unbearable lightness of Being'। নিজের যে সত্তা, ওটা এত হাল্কা যে সহ্য করা যাবে না। সংসারে কী জ্বালা! কত কষ্ট! এই জ্বালা ও কষ্টের যন্ত্রণা থেকে মুক্ত যদি হতে পারতাম, এসব কথা মুখে বলতে আমাদের খুব ভাল লাগে, শুনতে খুব ভাল লাগে। সন্ন্যাসীদের দেখে লোকেরা বিদ্রুপ করে বলে, 'বাবাজী বেশ আছেন, মঠর খাউছি খটর শোইছি, মঠে খাচ্ছেন আর খাটে শুচ্ছেন, আপনাদের তো আমাদের মত কোন চিন্তা-ভাবনা করতে হয় না'। ভাই তুমি এসে একদিনের জন্য মঠে বাস করো না কেন, কয়েক ঘন্টার মধ্যেই পাগল হয়ে যাবে। আবার সন্ন্যাসী হওয়ার কথা বললে বলবে, 'আমরা কি escapist নাকি, আপনি escapist হয়েছেন বলে আমাকেও কি escapist হতে হবে'! বাপু! তুমি দুটোর মধ্যে একটা বল, escapist হওয়ার জন্যও তো দম লাগে, তোমার সেই দম আছে escapist হওয়ার? পারবে না, সেই দমই নেই। ঠাকুর বলছেন না, গোবরের পোকাকে ভাতের হাড়িতে রাখলে হেঁদিয়ে হেঁদিয়ে মরে যাবে। আঁশ চুপড়ির গন্ধ না হলে সংসারীরা থাকতে পারবে না। সন্ন্যাসীরা যেন দু হাত তুলে নাচে। সংসারীরা বগলে, ঘাড়ে, কোমরে সব জায়গায় সুতোর গোলা লুকিয়ে রেখেছে, নাচতে বললে কি আর নাচ দেখাবে! কোন রকমে একটা হাত তুলে একটু নাচছে আর দুশ্চিন্তা যদি একটা দুটো গোলা পড়ে গিয়ে ধরা পড়ে যাই তো কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। দু হাত তুলে নাচার ক্ষমতা সংসারীদের কোথায়! সেইজন্য সন্ন্যাসীদের গালাগাল দেয়।

সেইজন্য ওদিকে তাকাতে নেই, নিজের শোক মোহ কিভাবে কম করা যায়, সেই চেষ্টায় লেগে থাকতে হয়। আমাদের দৈনন্দিন সাধারণ যে প্রয়োজনগুলো আছে, খাওয়া, থাকা, পড়া, আহার, নিদ্রা, মৈথুন, সব হাতের মুঠোয় থাকবে, এর সাথে একজন দুজন সঙ্গী থাকবে যার সাথে মনের মত কথা বলতে পারবে, যাকে আমার ভালবাসার কথা বলতে পারব, যে আমাকে গালাগাল দেবে তাকে আমি গালাগাল দিতে পারব, এগুলো ছাড়া সংসারীরা থাকতে পারবে না, এর একটা কম পড়ে গেলে আমরা পাগল হয়ে যাব। অনেক আগে এক আশ্রমে একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী থাকতেন, সব ইয়ং সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীরা ওই বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে নিয়ে সব সময়

মজা করতেন। একদিন আশ্রমের সেই সময়কার অধ্যক্ষকে গিয়ে বৃদ্ধ সন্ন্যাসী অভিযোগ করলেন, ‘এরা সবাই আমাকে নিয়ে মজা করে’। এটা অনেক আগেকার কথা। অধ্যক্ষ মহারাজ আদেশ করলেন, ‘এটা খুব ভুল হচ্ছে, বয়স্ক মহারাজ, অনেক সিনিয়র মহারাজ, ওনার সাথে কেউ যেন ঠাট্টা মজা না করে’। আদেশ মানে আদেশ, সবাই এখন বৃদ্ধ মহারাজের সাথে ঠাট্টা মজা করে কথা বলা ছেড়ে দিয়েছেন। এইভাবে একদিন গেল, দুদিন গেল, তিনদিন গেল। চতুর্থ দিন এক ব্রহ্মচারী ওনার সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন, ওনার হাতে যে লাঠিটা ছিল, উনি ব্রহ্মচারীরা পায়ের মধ্যে সেই লাঠিটা ঢুকিয়ে দিয়েছেন, যাতে উল্টে পড়ে যায়। সেই ব্রহ্মচারী ওনাকে আর কিছু বললেন না। সোজা গিয়ে অধ্যক্ষ মহারাজকে গিয়ে বলছেন, ‘দেখুন আমি আসছিলাম, আমি ওনাকে কিছুই বলিনি, কিন্তু উনি এমন ভাবে লাঠিটা আমার পায়ে ঠেকিয়ে দিলেন যাতে আমি উল্টে পড়ে যাই’। অধ্যক্ষ মহারাজ তখন ব্রহ্মচারীকে কিছু বললেন না। দুপুরে খাওয়ার সময় হাতজোড় করে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের বলছেন, ‘আপনারা আগে যেমন ওনার সাথে ব্যবহার করছিলেন, তেমনই ব্যবহার করবেন। বৃদ্ধ মহারাজ আর পারছিলেন না, ওনার পিছনে যদি না লাগা হয়, উনি পাগল হয়ে যাবেন। কিন্তু ওই কমপ্লেনটাও ওনার করতে হবে।

ফ্রাঙ্কফ্রুটে জন্ম, Erich Fromm, পেশায় একজন psychoanalyst, তাঁর একটা নামকরা বইয়ের নামই হল ‘The Fear of Freedom’। মানুষ ফ্রী থাকতে পারে না, থাকতেও চায় না। ফরাসীরা এত বড় বিপ্লব ঘটাল, আমরা রাজা-রানী চাই না, তাদের গলা কাটা গেল। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে সেই ফরাসীরাই নেপোলিয়নকে রাজার জায়গায় সম্রাট বানিয়ে তাদের মাথার উপর বসিয়ে দিল। আমরা ভারতীয়রা দিনরাত বলে যাচ্ছি, আমাদের দেশের যা অরাজকতা, দুর্নীতি চলছে, কয়েকদিন মিলিটারি শাসন হলে ভাল হত। মানুষ থাকতে পারে না, তার উপর চাপ যদি না থাকে স্বাভাবিক থাকতে পারবে না। মুখে বলে ঠিকই, ফ্রীডম চাই, ডেমোক্র্যাসি চাই। কিন্তু যারাই ডেমোক্র্যাসি ডেমোক্র্যাসি করে চেঁচিয়ে যাচ্ছে, তাদের যদি ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া হয়, কিছু দিন বাদেই মানুষ দেখবে তাদের মত ডিক্টেটর সারা দুনিয়ায় পাওয়া যাবে না। সেইজন্য এই ধরণের নিন্দার দিকে নজর দিতে নেই। স্বামীজী এই মুক্তি জিনিসটাকে নিয়েই আলোচনা করছেন। আচার্য শঙ্কর যেভাবে সব কিছু যুক্তি সম্মত করে বলছেন, স্বামীজীও ওটাকেই আধার করে নিজের মত করে বলছেন।

স্বামীজী এই কথাগুলো খ্রীশ্চান সংস্কার ও পরম্পরা থেকে আসা তাঁর কয়েকজন শিষ্যদের বোঝাচ্ছেন, খ্রীশ্চানদের কাছে morality হল শেষ কথা। প্রায়ই লোকেরা এসে জিজ্ঞেস করে, একজন সন্ন্যাসী আর একজন ভদ্রলোকের মধ্যে কি তফাৎ? ভদ্রলোক ভদ্রলোক, সাধু হলেন যিনি ঈশ্বরের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছেন। সাধু প্রথমে একজন ভদ্রলোক, ভদ্রলোক সব সময় সাধু হয় না, কিন্তু সাধু সব সময় ভদ্রলোক হবেন। কারণ সাধু মানেই তিনি সব সময় সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত থাকবেন। স্বামীজী বলছেন, মূল্যবোধ, বিধি নিষেধ, এই জিনিসগুলো কখনই তোমাকে আত্মজ্ঞানের দিকে নিয়ে যাবে না, কিন্তু এগুলোর দরকার আছে।

কর্ম ও উপাসনার প্রয়োজনীয়তা

Work and worship, however, are necessary to take away the veil, to lift off the bondage illusion. They do not give us freedom; but all the same, without effort on our own part we do not open our eyes and see what we are. (*তবে আত্মার উপর যে আবরণ পড়ে রয়েছে সেইটা সরাবার জন্য –বন্ধন ও ভ্রম দূর করবার জন্য কর্ম ও উপাসনার প্রয়োজন; এরা মুক্তি দিতে পারে না বটে, কিন্তু তথাপি আমরা যদি নিজেরা চেষ্টা না করি, তা হলে আমাদের চোখ ফোটে না, আমরা আমাদের স্বরূপ জানতে পারি না।*) বন্ধনটাও একটা ভ্রম, আমরা আমাদের নিজেদের উপর বন্ধনকে ডেকে এনেছি। আগেকার দিনে ছেলেরা দুঃখ করে বলত, বাবা-মা বিয়ে দিয়ে দিল, তাই এত ভুগছি। বর্তমান কালে সবাই প্রেম করে বিয়ে করে। বিয়ে জিনিসটা যদি এতই ঝামেলার ব্যাপার হয়ে থাকে, তুমি যদি জেনেই থাকো ভালবাসা মানে বন্ধনে পড়ে যাওয়া, তাহলে তুমি বন্ধনে পড়তে যাচ্ছ কেন? কারণ, এটা তোমার স্বভাবেই আছে। আর বারবার বলা হচ্ছে ভালবাসা তোমার ভিতরে, তুমি ভালবাসা বাইরে কোথায় খুঁজতে যাচ্ছ! আচার্য শঙ্কর থেকে শুরু করে ঠাকুর, স্বামীজী, সব শাস্ত্র বলে যাচ্ছেন জগতে সুখের গন্ধ মাত্র নেই, তাহলে কি আশায় সুখ পাওয়ার জন্য দৌড়াচ্ছ! একদিকে হল ভ্রম, মরীচিকা, অন্য দিকে হল বন্ধন। মরীচিকা

আর এই বন্ধন, একদিকে বন্ধনে পড়ে আছে আর বলছে একটু তো সুখ কোন দিন পাবো। বাচ্চার আধো আধো কথা শুনতে কত মিষ্টি লাগে, তারপর বড় হওয়ার সাথে সাথে যত তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ হতে শুরু করে, তখনও বাবা-মা মনে করে, আহা কি মিষ্টি মিষ্টি কথা বলত, কত ভালবাসত, এখন কেমন হয়ে গেল আমার বাছা! কেমন হয়ে যাওয়ারই কথা, কেমন হয়ে যদি না যেত আর এখনও যদি মায়ের আঁচল ধরে ঘোরে আর আধো আধো কথা বলে, তাহলে বুঝতে হত, ওর মানসিক বিকাশ হওয়ার বদলে মানসিক বিকার হয়েছে। বাবা-মা যদি মনে করে, আগে কেমন করত, তাহলে তাদেরও বুদ্ধির বিকাশ হয়নি বুঝতে হবে। কম্যুনিস্টদের নামে বলে যে, তুমি কুড়ি বছর বয়সে যদি কম্যুনিস্টা না হও, তাহলে তোমার হৃদয়টা একটা পাথর। আর চল্লিশ বছর বয়স হয়ে যাওয়ার পরেও তুমি যদি কম্যুনিস্ট থাক, তাহলে তোমার মাথাটা একটা পাথর। কুড়ি বছর বয়সে তুমি যদি কাউকে ভাল না বাসো, তাহলে তোমার হৃদয়টা একটা পাথর, আর চল্লিশ বছর বয়সেও তুমি যদি কাউকে ভালবেসে যাও, তাহলে তোমার মাথাটা একটা পাথর।

এই যে বন্ধন, এই যে মরীচিকা, এই ভ্রমকে ভাঙার জন্য স্বামীজী বলছেন দরকার পরে কর্ম ও উপাসনার। পূজো যদি করা হয়, নিষ্কাম কর্ম যদি করা হয় তবেই গিয়ে এই জিনিসগুলো ভাঙবে। They do not give us freedom, শ্রীশ্রীমাকে একজন জিজ্ঞেস করছে, আমি তো এত কিছু করলাম, কই কিছুই তো হল না। মা তাকে বলছেন, ঠাকুর কি আলু পটল যে, পয়সা দিয়ে যেমন কেনা যায়, তেমন করে তুমি ঠাকুরকে কিনবে! নিষ্কাম কর্ম যখন করা হয়, কর্মযোগ যখন করা হয় বা পূজা, অর্চনা, জপধ্যান যে করা হয়, এতে সরাসরি মুক্তি হয় না। কিন্তু এই যে exclusivenessএর কথা বলা হল, নিজেকে একটা ছোট্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছে, এই আবদ্ধটা ভেঙে যায়। আর যে ভ্রম জিনিসগুলির মধ্যে পড়ে আছে, সেই ভ্রমগুলি কাটতে সাহায্য করে, তার মানে বুদ্ধি পরিষ্কার হতে শুরু হয়। ভ্রম মানেই বুদ্ধি পরিষ্কার নেই।

তার সাথে বলছেন, but all the same, without effort on our own part we do not open our eyes and see what we are, আমি যদি চেষ্টা করি তবেই আমার চোখ খুলবে। অল্প বয়সে ছেলেমেয়েরা যদি বন্ধুদের সাথে স্ফুর্তি করার জন্য টাকা-পয়সা demand করে তখন বাবা-মায়েরা বলে, নিজে দুটো পয়সা রোজগার কর তখন বুঝবে পয়সা রোজগার করা কত কঠিন। বাচ্চা বয়সে যতই এটা চাই সেটা চাই বলে demand করে, বড় হয়ে তারাও বোঝে দুটো পয়সা রোজগার করতে কিভাবে দম বেরিয়ে যায়। ঠিক তেমনি আধ্যাত্মিক জীবনে কেউ যখন চেষ্টা শুরু করে, তখন ধীরে ধীরে চোখ খুলতে শুরু হয়। তখন বুঝতে পারে, আরে তাই তো আমি তো এখানে বন্ধনে পরে আছি। যখন এটা বুঝে যায়, তখন এটাও বুঝতে পারে যে, এই বন্ধনটাও তো আমার ভ্রম। এরপর একদিন সে নিজের স্বরূপকে বুঝতে পারে, নিজের স্বরূপ হল, সে চিরমুক্ত।

Shankara says further that Advaita-vedanta is the crowning glory of the Vedas; but the lower Vedas are also necessary, because they teach work and worship, and through these many come to the Lord. Others may come without any help by Advaita. Work and worship lead to the same result as Advaita. (*শঙ্কর আরও বলেন, অদ্বৈতবাদই বেদের গৌরব-মুকুট; কিন্তু বেদের নিম্নতর ভাবগুলিরও প্রয়োজন আছে, কারণ তারা আমাদের কর্ম ও উপাসনার উপদেশ দিয়ে থাকে আর এইগুলির সাহায্যেও অনেকে ভগবানের কাছে গিয়ে থাকে। তবে এমন অনেকে থাকতে পারে, যারা কেবল অদ্বৈতবাদের সাহায্যেই সেই অবস্থায় যাবে। অদ্বৈতবাদ যে-অবস্থায় যায়, কর্ম এবং উপাসনাও সেই অবস্থাতেই নিয়ে যায়।*) স্বামীজী এখানে বলতে চাইছেন, বেদের দুটি অঙ্গ, একটাকে বলা হয় কর্মকাণ্ড, আরেকটাকে বলা হয় জ্ঞানকাণ্ড। কর্মকাণ্ড মানে, যেখানে বলা হয়েছে যজ্ঞ, পূজা, স্তুতি এই জিনিসগুলো কিভাবে করতে হবে। আচার্য শঙ্কর পদে পদে বলছেন এগুলো দিয়ে জ্ঞান হবে না। তাহলে কি যজ্ঞ, পূজা, উপাসনা এগুলোর দ্বারা যদি জ্ঞান লাভ না করা যায়, তাহলে এগুলোকে বাদ দিতে হবে? এগুলোকে বাদ দিয়ে দিলেই তো হয়। একেবারেই না, এগুলোরও অত্যন্ত দরকার আছে। চাকরি করার জন্য কলেজের ডিগ্রী দরকার, তাই বলে কি সব প্রাইমারি স্কুল বন্ধ করে দিতে হবে! প্রাইমারি আর সেকেণ্ডারি স্কুল থেকে ডিগ্রী না নিয়ে কেউ কখনই কলেজের চৌকাঠে পা দিতে পারবে না। যজ্ঞাদি কর্ম মানেই

নিষ্কাম কর্ম, ওর মধ্যে সকাম ভাব থাকলেও, কিছু একটু ত্যাগ হয় বলে কিছুটা নিষ্কাম হয়ে যায়। পূজা, অর্চনা, যজ্ঞাদি করতে করতে মন ধীরে ধীরে শুদ্ধ, পবিত্র হতে শুরু হয়। শুদ্ধ পবিত্র হতে শুরু হওয়া মানেই, নিজের আমিত্ব থেকে সরতে শুরু হওয়া। কর্ম মানে বেদের যজ্ঞাদি কর্ম। সেইজন্য বলছেন, যতক্ষণ এই যজ্ঞ না কর, যতক্ষণ পূজা অর্চনা না কর, যতক্ষণ জপধ্যান না কর, ততক্ষণ তোমার কোন সুযোগই নেই যে তোমার জ্ঞান হবে।

ইদানিং থিয়োরেটিক্যালি সবাই অদ্বৈত বেদান্তের উপর লেকচার দিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু আসল জিনিসটাকে কেউ বলছেন না। একটা দুটো উপনিষদ যদি কেউ পড়ে নেয়, তাতে সে একটা ঢপের শাঁক হয়ে যাবে, খালি ভো ভো আওয়াজ করবে। ফিল্ডে যখন নামছে দেখছে তখন কিছুই হচ্ছে না। একজন মহারাজকে ইন্টারভিউতে এক সাংবাদিক প্রশ্ন করলেন, 'মহারাজ আপনার সন্ন্যাস জীবন কত বছরের'? মহারাজ বললেন, 'চল্লিশ বছর হয়ে গেছে'। সাংবাদিক তখন আবার জানতে চাইলেন, 'মহারাজ! চল্লিশ বছর পর আপনি এই সন্ন্যাস জীবনে নিজেকে কোথায় দেখতে চাইছেন'? মহারাজ খুব সুন্দর বললেন, 'এতদিনে আমার বোধ হয়েছে যে আমি বন্ধনে পড়ে আছি। যাঁরা মনে করছেন তাঁরা জপধ্যানের জন্য, লেকচার দেওয়ার জন্য প্রস্তুত, তাঁরা সৌভাগ্যবান। আমি অতটা ভাগ্যবান নই। তবে এতদিনে শাস্ত্র পড়ে এবং পড়িয়ে মনে হচ্ছে এগুলো সব সত্য'। স্বামীজী যখন সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করে গেলেন, বা বেদের ঋষিরা যে বিধান দিয়ে ব্রাহ্মণদের বলে দিলেন, তুমি শুধু যজ্ঞ করবে, বেদ পড়বে, বেদ পড়াবে, এর বাইরে তুমি কিছু করতে পারবে না। এইভাবে তাঁরা কয়েকজনকে তৈরী করে দিলেন যাতে তারা ঈশ্বরের পথে এগোতে পারে। এখন কোন কিছু নেই, সব কিছু শুধু নিজের জন্য করা। জগতে যা কিছু করার সব নিজের জন্য, আমি, আমি শুধু আমি, আমি ছাড়া কিছু নেই। মাঝখান থেকে ইউটিউবের একটা লেকচার শুনবে, বেদান্তের একটা বই পড়বে, আর বলবে আমি সেই ব্রহ্ম। তা কি কখন হয়! ঠাকুরের কাছে এসে একজন বলছে, মশাই! আমাকে সমাধিটুকু শিখিয়ে দিন তো।

শাস্ত্রের ভূমিকা

প্রথম দিকে স্বামীজী বিধিনিষেধ, নৈতিকতা নিয়ে বললেন, দ্বিতীয় কর্ম ও পূজা অর্চনাকে নিয়ে বললেন। সেখান থেকে এবার স্বামীজী বেদাদি গ্রন্থে নেমে আসছেন। গ্রন্থগুলি কিছুটা বিধি ও নিষেধ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করে দিচ্ছে, আর কিছুটা ঋষিদের কথাগুলিকে লিপিবদ্ধ করে রেখেছে। গ্রন্থগুলি একটা জিনিসকে ইঙ্গিত করছে, তুমি ওই দিকে এগিয়ে যাও। কিন্তু আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে, সবটাই আমাদের কাছে উল্টা বুঝলি রাম হয়ে গেছে। একজন লোক রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে খুব পরিশ্রান্ত হয়ে গিয়ে একটা জায়গায় বসেছে। সে রামকে বলছে, রাম আমি খুব থোকে গেছি আমাকে একটা ঘোড়া দাও। ঠিক সেই সময় ওখান দিয়ে জমিদার নিজের দলবল নিয়ে যাচ্ছিল। যেতে যেতে তার একটা ঘোড়িও ছিল, সেটা একটা বাচ্চা দিয়েছে। বাচ্চা ঘোড়াটা চলতে পারছে না। তখন লোকটি সামনে বসে থাকতে দেখে জমিদারের লোকেরা ওর কাঁধের উপর ঘোড়ার বাচ্চাটা চাপিয়ে দিল। লোকটি এখন মুট বাহক হয়ে চলতে লাগল। তখন লোকটি অসহায় হয়ে বলছে, উল্টা বুঝলি রাম। আমি চাইছিলাম একটা ঘোড়া, যাতে ওর পিঠে চেপে যেতে পারি, হাঁটতে যেন না হয়। তুমি ঘোড়া দিলে ঠিকই, কিন্তু আমাকে পিঠে নেওয়ার বদলে ওকেই আমাকে কাঁধে করে নিয়ে যেতে হচ্ছে। গ্রন্থ গুলি হল আমাদের মুক্তির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে এই গ্রন্থই আমাদের বন্ধন স্বরূপ হয়ে যায়, কারণ গ্রন্থকে আমরা আক্ষরিক ভাবে নিতে থাকি। বড় বড় যত আচার্যরা আসেন, তাঁরা বার বার আমাদের এই ভুলটাকে ধরিয়ে দেন। কিন্তু আমরা এতই অভাগা যে আমরা এই ভুলকে শোধরাতে পারি না।

Books cannot teach God, but they can destroy ignorance; their action is negative. (*শাস্ত্র ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছু শিক্ষা দিতে পারে না, কেবল অজ্ঞান দূর করে দিতে পারে। শাস্ত্রের কার্য নেগেটিভ।*) আমরা বার বার বলে আসছি যে, আমাদের যে অজ্ঞান, এই অজ্ঞানকে আমরা আহ্বাণ করে এনেছি। বেদাদি গ্রন্থ আমাদের সেই অজ্ঞানটাকে ঘুচিয়ে দেন। ফিজিক্স যখন পড়ছি, তখন ফিজিক্স আমাদের জ্ঞান দিচ্ছে, একটা তথ্য দিচ্ছে। কিন্তু বেদ উপনিষদ গ্রন্থাদি যখনই কোন তথ্য দিচ্ছেন বা কোন কথা বলছেন, তখন তাঁর উদ্দেশ্য হল আমাদের সচেতন করে দেওয়া, তুমি আগে থেকেই পূর্ণ জ্ঞানী, তুমি নিজের উপর যে

অজ্ঞানটা চাপিয়ে রেখেছ এটাকে ফেলে দাও। To hold to the books and at the same time open the way to freedom is Shankara's great achievement. (*শঙ্করের প্রধান কৃতিত্ব এই যে, তিনি শাস্ত্রও মেনেছিলেন, আবার সকলের সামনে মুক্তির পথও খুলে দিয়েছিলেন।*) আচার্য শঙ্করের এটাই বিউটি, তিনি গ্রন্থকেই ধরে রাখলেন আর অন্য দিকে মুক্তির পথও খুলে দিলেন। কারণ গ্রন্থ হল বন্ধনের কারণ, মানুষ শাস্ত্রাদি ও গ্রন্থ সমূহে যদি একবার নেমে যায় তখন ওখান থেকে সে আর বেরিয়ে আসতে পারে না, গ্রন্থাদির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে থাকে। আচার্য শঙ্করের বক্তব্য হল, যদি মুক্তি কোন ক্রিয়ার ফল হয়, তাহলে মুক্তি অস্থায়ী হবে। বই পড়ে যদি জ্ঞান হয়, তখন সেটাও ক্রিয়ার ফল হবে, সেইজন্য সেটাও অস্থায়ী হবে। আচার্য সেটাকে ঘুরিয়ে বলছেন, ধর্মগ্রন্থ জ্ঞান দেয় না, অজ্ঞানকে নাশ করে। স্বামীজী এটাকে খুব পরিষ্কার বলছেন, But after all, it is a kind of hair-splitting, (*কিন্তু যাই বলো, তাঁকে ঐ নিয়ে চুলচেরা বিচার করতে হয়েছে।*)

এবার স্বামীজী পুরো জিনিসটাকে শেষ করছেন এই বলে, আধ্যাত্মিক জীবন বা অদ্বৈত জ্ঞান, যেটাকে এখানে উচ্চতম জ্ঞান বলছেন, সেই জ্ঞানের অবস্থায় পৌঁছানর জন্য সাধারণ স্তরে কিভাবে চলতে হবে। Give man first the concrete, then raise him to the highest by slow degrees. (*প্রথমে মানুষকে একটা স্থূল অবলম্বন দাও, তারপর ধীরে ধীরে তাকে সর্বোচ্চ অবস্থায় নিয়ে যাও।*) প্রথমে তাকে স্থূল অবলম্বন দিতে হবে, তাকে পূজা করতে শেখাতে হবে, তাকে মন্দিরে যাওয়ার অভ্যাস তৈরী করাতে হবে, জপধ্যান করার ব্যাপারে আগ্রহ তৈরী করতে হবে। গীতায় ভগবান বলছেন, *ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞনং কর্মসঙ্গিনাম্। জোষয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান যুক্তঃ সমাচরন্।।* সাধারণ মানুষ যে জিনিসটাকে ভালবাসে, তাকে ওটাই আগে ধরাতে হবে। ওখান থেকে তাকে ধীরে ধীরে উপরের দিকে নিয়ে যেতে হবে। যে লোক যে কাজ করতে ভালবাসে এবং যে কাজে সে দক্ষ, তাকে গিয়ে বলতে হয়, এই কাজের দ্বারাই তোমার জ্ঞান হবে। মহাভারতে ব্যাধের কাহিনীতে এটাই বলছেন, তোমার জন্ম ব্যাধের বংশে হয়েছে, মাংস বিক্রি করেই তোমার জ্ঞান হবে। যে মুচির কাজ করছে, যে মেথরের কাজ করছে, তারাও ওই কাজ দিয়ে চরম জ্ঞান লাভ করতে পারবে, যদি তার উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করা হয়। সন্ত রুইদাস মুচি ছিলেন, কিন্তু তিনি একজন বিরাট সন্ত হয়ে গেলেন। এদের সামাজিক স্তরে পরিবর্তন হবে না, আর ধর্মগ্রন্থও সামাজিক ব্যাপার নিয়ে কথা বলেন না। এটা সমাজশাস্ত্রের কাজ, উপনিষদের কাজ না। মহাভারত, উপনিষদ বলছেন, তুমি যেখানে আছো সেখান থেকেই তোমার ঈশ্বর লাভ হবে, তুমি যেখানে আছো সেখান থেকেই তোমার আত্মজ্ঞান হবে।

এটাকে নিয়েই দুষ্ট লোকেরা বলে, দেখছ তো শাস্ত্রই বলছে, তুমি যেখানে আছ সেখান থেকেই তোমার হবে, তুমি তাই জাত পাল্টে নিও না। শাস্ত্র কখনই তা বলতে চাইছে না, আসলে এরা বদমাইশি করছে। শাস্ত্রের বক্তব্য হল, তোমাকে কিছু পাল্টাতে হবে না, তুমি যেমন আছ, খুব ভাল আছ, এখানে থেকেই তোমার জ্ঞান হবে। এখন কেউ যদি এটাকে পাল্টে দিয়ে বলে, এই দেখো শাস্ত্র বলেই দিয়েছে তোমার জ্ঞান হবে, তুমি মুচি মুচিই থাকবে, তুমি তোমার কাজ পাল্টাবে না। সেখান থেকে শুরু হবে জুলুম, তুমি কাজ পাল্টাতে পারবে না। সেখান থেকে হবে, তুমি মুচি তুমি অস্পৃশ্য। সমাজ এবার শোষণের উদ্দেশ্যে এদের সাথে প্রতারণা করছে, এর সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। হিন্দু ধর্ম inclusive religion, কারণ হিন্দু ধর্ম বলছে, সবাই এক, সবাইকে এক কর। কিছু মানুষ সেখানে অসৎ উদ্দেশ্যে বদমাইশি করছে, দোষ চলে আসছে পুরো হিন্দু ধর্মের উপরে, দোষ চলে আসছে মনুস্মৃতির উপরে।

স্বামীজী বলছেন, তাকে একটা স্থূল অবলম্বন ধরিয়ে দাও, যে জুতো বানাচ্ছে তাকে গিয়ে বল, এই জুতো সেলাই করেই তোমার আত্মজ্ঞান হবে। মন্দিরে গিয়ে তুমি পূজা করো আর নাই করো তোমার জ্ঞান হবে। এরপর এনারা একটার পর একটা বলে যাবেন, কিভাবে তুমি উপরে উঠবে। স্বামীজী বলছেন, This is the effort of the various religions and explains their existences and why each is suited to some stage of development, (*বিভিন্ন প্রকার ধর্ম এই চেষ্টাই করছে, আর এ থেকে বোঝা যায় –কেন এই সকল ধর্ম জগতে এখনও রয়েছে এবং কি করে প্রত্যেকটি মানুষের উন্নতির কোন না কোন অবস্থার উপযোগী।*) বিভিন্ন ধর্ম তাই বলে, তাদের ধর্মগ্রন্থও তাই বলে। কিছু মানুষ একটা অবস্থায় আছে

তাদের জন্য এক ধরণের জিনিস উপযুক্ত, কিছু জিনিস আছে যেটা অন্যদের জন্য উপযুক্ত। সবাইকেই যে খোল করতাল নিয়ে হরিবোল করতে নেমে যেতে হবে, তা নয়। বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীদের গিয়ে বলবে, ঠাকুর এত কীর্তন করতেন, নৃত্য করতেন, আপনারা তো করেন না। সবার জন্য সব কিছু নয়। ঠাকুর করেছেন বলে আমাকেও কেন করতে হবে! যার পেটে যা সয়। বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ বিভিন্ন লোকের জন্য, সব জিনিস সবার জন্য নয়।

The very books are a part of the ignorance they help to dispel. Their duty is to drive out the ignorance that has come upon knowledge. (*শাস্ত্র অজ্ঞান নাশ করতে সাহায্য করে, কিন্তু শাস্ত্রও ঐ অবিদ্যার অন্তর্গত। শাস্ত্রের কাজ হচ্ছে জ্ঞানের উপর যে অজ্ঞানরূপ আবরণ এসে পড়েছে, তা দূর করা।*) শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, যে গ্রন্থ রচিত হয় মানুষের অজ্ঞান নাশ করার জন্য, সেই গ্রন্থগুলিই পরে মানুষের জন্য বন্ধনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মনুস্মৃতি এলো মানুষকে অজ্ঞান থেকে জ্ঞানের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। স্বামীজী পরিষ্কার বলছেন, সামাজিক দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ হল ব্রাহ্মণ, সব থেকে নীচে হল চণ্ডাল, উদ্দেশ্য হল চণ্ডালকে চণ্ডালত্ব থেকে টেনে ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণত্বের দিকে নিয়ে আসা। এটাই মনুস্মৃতির কাজ। কিন্তু এটাই হয়ে গেলে বন্ধনের কারণ। চণ্ডালকে চণ্ডালত্বে বেঁধে রাখল, ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণত্বে বেঁধে দিল, আর বর্তমান কালের সংবিধান ব্রাহ্মণদের নামিয়ে চণ্ডালে নিয়ে যাচ্ছে। এই দেশের যে কি হবে, ভগবান জানেন। যেমন বাইবেল, মুক্তির আলো নিয়ে এসেছে, আর ওটাই বন্ধনের কারণ হয়ে গেল। আরবিয়ান দেশগুলিতে কোরাণ মুক্তির আলো নিয়ে এসেছে, আজ ওটাই বন্ধনের কারণ। তুমি যদি বাইবেল, কোরাণ না মানো, তোমার জীবন সংশয় হয়ে যাবে, এর থেকে বড় বন্ধন আর কি হতে পারে! বলছেন, 'Truth shall drive out untruth', সত্য অসত্যকে দূরে সরিয়ে দেবে, এটাই তার কাজ। You are free and cannot be made so, তুমি সব সময়ই মুক্ত। যে মুক্ত, তাকে নূতন করে আর মুক্ত করা যায় না। তোমাকে কেউ বন্ধনে রাখতে পারবে না।

So long as you have a creed, you have no God. (*যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি ধর্মমত বিশেষ অবলম্বন করে আছ, ততক্ষণ তুমি ব্রহ্মকে লাভ করনি।*) ফলে কি হয়, যখনই আমি জানব, আমি এই সম্প্রদায়ে আছি, আমি ওই সম্প্রদায়েই আবদ্ধ থাকব, আমার দ্বারা কোন দিন আর ঈশ্বর লাভ হবে না। ঈশ্বর মানেই মুক্তি, ঈশ্বর মানেই inclusive, ঈশ্বর মানেই সবাইকে নিয়ে চলতে হবে। যদি তুমি মনে করে, আমি হলাম রামকৃষ্ণ কথামৃতের অবলম্বি, বুঝবে, তোমার দ্বারা কিছু হবে না। যেমনি আপনি বলছেন, আমি খ্রীশ্চান, আমি মুসলমান, জানবেন, আপনার দ্বারা কোন দিন ঈশ্বর লাভ হবে না। উপনিষদ, বেদ, গীতায় বার বার বলছেন, বেদকেও ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হবে, কোন কিছুর বন্ধনে থাকা যাবে না। Moralityর বন্ধনে থাকবে না, কর্ম ও পূজার বন্ধনে থাকবে না, আর যে গ্রন্থ তোমাকে সেই অবস্থা পর্যন্ত নিয়ে গেছে, শেষে সেই গ্রন্থকেও ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হবে। অনেক জায়গায় আমরা পোল ভল্টের উপমা নিয়ে থাকি। পোল ভল্টে একটা লম্বা ডাণ্ডা নিয়ে দৌড়ে আসে, ওই ডাণ্ডার সাহায্যে একটা বিরাট উচ্চতাকে লাফিয়ে অতিক্রম করে। ডাণ্ডা যদি না থাকে লাফ দেওয়া যাবে না, ডাণ্ডাকে যদি সব সময় ধরে রাখে তাহলেও লাফ দিয়ে ওই উচ্চতাকে অতিক্রম করতে পারবে না। সমস্ত ধর্মগ্রন্থ হল পোল ভল্টের পোলের মত। ধর্মগ্রন্থ আমাদের লাফ মেরে ওই উচ্চ অবস্থায় পৌঁছাতে সাহায্য করে, ধর্মগ্রন্থকে শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত যদি ধরে রাখে, ধর্মগ্রন্থ কোন দিন তোমার বর্তমান অবস্থা থেকে উচ্চতর অবস্থায় লাফ মারতে দেবে না। যতক্ষণ আমরা বলতে থাকব, আমি মুসলমান, আমি খ্রীশ্চান, আমি হিন্দু, আমরা স্বর্গে যেতে পারি, সব হতে পারি, মুক্তি কোনদিন আমাদের হবে না।

তাই বলে কেউ যেন মনে না করে যে, খুব ভালই হল আমাকে আর কোন শাস্ত্র পড়তে হবে না। শাস্ত্র অধ্যয়ন আমাদের সবাইকেই করতে হবে, আর পুরোটাই অধ্যয়ন করতে হবে। কারণ গ্রন্থ ছাড়া আমাদের কোন জ্ঞানই আসবে না। ঠাকুর বলছেন, আমি পড়িনি কিন্তু শুনেছি কত। শাস্ত্র পড়া মানে ঋষিরা যে শুদ্ধ মন দিয়ে এই আধ্যাত্মিক সত্যগুলো লিপিবদ্ধ করেছেন, আমরা যখন মন দিয়ে সেই লেখাগুলো পড়ছি, তার মানে ঋষিদের মন তখন আমাদের মনের মধ্যে শব্দের মাধ্যমে প্রবেশ করছে। শাস্ত্র মানেই, সেই মনের সাথে আমরা interact করছি। ওই interactionটা গ্রন্থের মাধ্যমে হতে পারে আবার সরাসরি কথার মাধ্যমে হতে পারে।

তাই যাঁরা বই পড়েননি তাঁরা শুনেছেন প্রচুর। এখনকার প্রজন্ম শাস্ত্রও পড়ে না, শাস্ত্রের কথা শুনতেও চায় না। গ্রন্থের সুবিধা হল, উপনিষদ যখন পড়ছি তখন আমরা সেই ঋষিকে পাচ্ছি না, সেইজন্য পড়তে হবে। বই পড়া মানেই, একজন ভাল আচার্যের ব্যাখ্যাকে পড়বে বা শুনবে। বই পড়া মানেই, ধরে নেওয়া হচ্ছে একজন আচার্য ওখানে আছেন। নিজে থেকে পড়ে আমরা কিছুই বুঝতে পারব না, আচার্য ছাড়া বেদ উপনিষদের কথা আমাদের বোঝার কথাই না। যখনই শাস্ত্র অধ্যয়নের কথা বলা হয়, এর অর্থই হল, একজন আচার্যের সমীপে গিয়ে পড়া। পড়ার পর বিষয়টা বুঝে নিয়ে ওটাকে নিয়ে ধ্যান চিন্তন করছে বা আবৃত্তি করে যাচ্ছে।

জ্ঞাতা কখনই জ্ঞেয় হন না - জগৎ ও ঈশ্বরকে একসাথে দেখা যায় না

স্বামীজী কেনোপনিষদ থেকে বলছেন, He who knows he knows nothing, *যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ*, যে মনে করে আমি জানি, আসলে সে জানে না। Who can know the knower? যিনি জ্ঞাতা তাঁকে কে জানবে? এটাকে নিয়েই স্বামীজী বলছেন, There are two eternal facts in existence, God and the universe, the former unchangeable, the latter changeable. (*দুটি চিরন্তন বস্তু আছে – ব্রহ্ম ও জগৎ। প্রথমটি অর্থাৎ ব্রহ্ম অপরিণামী, দ্বিতীয়টি অর্থাৎ জগৎ পরিণামী।*) ঈশ্বর আর জগৎ, ঈশ্বর অপরিবর্তনশীল, জগৎ পরিবর্তনশীল। এই ক্লাশে স্বামীজী এই বিষয়ের উপর খুব বেশি কিছু বলছেন না, পরের ক্লাশে স্বামীজী ঠিক এই জিনিসটাকেই আরও পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করবেন। The world exists eternally. Where your mind cannot grasp the amount of change, you call it eternally. You can see the stone or the bas-relief on it, but not both at once; yet both are one. (*জগৎ অনন্তকাল ধরে চলছে। যেখানে পরিণাম কতখানি হচ্ছে, মন তা ধরতে পারে না, তোমরা তো তাকেই অনন্ত বলে থাকো। জগৎ ও ব্রহ্ম এক বটে, কিন্তু একই সময়ে তো তোমরা দুটো দেখতে পাও না – একখানা পাথরের উপর একটা ছবি বা মূর্তি খোদাই করা রয়েছে; যখন তোমার পাথরের দিকে খেয়াল থাকে, তখন খোদাই-এর দিকে নজর থাকে না; আবার যখন খোদাই-এর দিকে মন দাও, তখন পাথরের খেয়াল থাকে না; অথচ দুই-ই এক।*) ঈশ্বর আর জগৎ, একটার মধ্যে কোন পরিবর্তন নেই, আরেকটার মধ্যে পরিবর্তন হয়, সমস্যা হল দুটোকে একসাথে দেখা যায় না। যেমন একটা পাথর থেকে মূর্তি তৈরী করা হল, আমরা হয় ওটাকে পাথর দেখব, নয়তো মূর্তি দেখব, পাথর আর মূর্তি দুটো এক সঙ্গে দেখা যায় না। দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর মন্দিরে গিয়ে আমরা মায়ের দর্শন করার পর বলি, মায়ের বিগ্রহ দেখলাম, তখন আমরা পাথর দেখছি না। যারা পাথর দেখছে, তারা আবার মায়ের বিগ্রহ দেখে না। যীশু বলছেন, You cannot serve God and mammon at the same time। এক সঙ্গে দুটো বিপরীত চিন্তা থাকে না। তাই জগৎ আর ঈশ্বর একসাথে থাকে না। স্বামীজী এই কথাগুলো শঙ্করাচার্যের বেদান্তকে আধার করে বলছেন।

তোমার মনের আবর্জনা তুমি নিজেই পরিষ্কার কর

বেদান্ত দর্শন থেকে সরে এসে স্বামীজী এরপর দু-লাইনের একটা প্যারাগ্রাফে মনকে শান্ত করা নিয়ে বলছেন, Can you make yourself at rest even for a second? All Yogis say you can. (*তুমি কি এক মুহূর্তের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণ স্থির শান্ত করতে পারো? সকল যোগীরাই বলেন, এটা করা সম্ভব।*) আমাদের মনকে নিয়ে যদি বিচার করা হয়, আমরা দেখি মন কখনই শান্ত হয় না। একমাত্র যোগীরাই বলেন, মনকে শান্ত করা যায়। যোগশাস্ত্রেও বলছেন, যোগ মানে চিত্তবৃত্তি নিরোধ। এরপর স্বামীজী দুর্বলতা নিয়ে বলছেন। এর উপর আগেও আমরা একটা লম্বা আলোচনা করেছি। স্বামীজীর এই ছোট্ট প্যারাগ্রাফের আলোচনা করার আগে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল, এটা যদি আমরা ব্যবহারিক জীবনে নামাতে যাই, তখন জিনিসটা কেমন হয় সেটাকে একটু দেখে নেওয়া যাক।

আমরা কিছুক্ষণের জন্য একটু ভেবে দেখতে পারি, দেববাণীতে স্বামীজীর মুখ থেকে বেদান্তের যে কথাগুলি আমরা শুনে যাচ্ছি, তাতে কি কি বিশেষ কথা আমাদের মনে ভেসে আসছে? একটা কথা যেটা স্বামীজী বার বার বলছেন, ঈশ্বর সত্য, জগৎ সত্য। যখনই আমরা জগৎ সত্য শব্দ আনছি তখন মন সত্য হয়ে

যাচ্ছে, মনটা তাই খুব গুরুত্বপূর্ণ। তার মানে, যিনি চৈতন্য সত্তা, যিনি ঈশ্বর, তিনি আত্মা রূপে সবার ভিতরে রয়েছেন, তিনিই আছেন; তিনি আবার জগৎ রূপে দেখাচ্ছেন। জগৎটাই কিনা মন রূপে দেখাচ্ছে। সেখান থেকে সরে আমরা যদি এবার নিজের জায়গায় চলে আসি, তখন খুব বিচিত্র দেখছি। বেদান্তের গভীরে গেলে দেখা যাবে, সেখানে ওনারা বলছেন, জগৎটা হলে মনেরই অভিব্যক্তি। এর আগে বা যখন ইমান্যুয়াল কান্টকে নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছিল, সেখানে বার বার বলছেন, এই জগতে কোথাও মনের একটা বিরাট বড় ভূমিকা রয়েছে। খুব সহজ ভাষায়, যদি নিজের দিকে তাকাই, আমি আছি, আমার এই দেহ আছে, আমার মন আছে আর শাস্ত্রে বলছে আমার শুদ্ধ আত্মা আছে, সেই আত্মাই আমি। সেই আত্মা সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান আর সর্বব্যাপী। শাস্ত্রে এই কথগুলো বলা হচ্ছে।

তাহলে এই জগৎ কেন? এই জগৎ সেই ঈশ্বরেরই প্রতিবিম্ব। ঈশ্বর যখন ভাবছেন, সৃষ্টি হোক, বা যখন বলছেন, *একোহম্ বহুস্যাম্ প্রজায়িনি*, আমি এক আমি বহু হব, তখন একটা ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ড সামনে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। আমি কে? আমি সেই আত্মা, ঈশ্বরের সাথে আমি এক। এবার খুব সহজ যুক্তি দিয়ে বলা যায়, যিনি ঈশ্বর, যিনি শুদ্ধাত্মা, তিনি ভাবলেন আমি এক আমি বহু হব, হয়ে গেল এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। যিনি ভাবলেন আমি বহু হব, সেই ঈশ্বরীয় সত্তাটা তাহলে আমার ভিতরেই আছে, তার মানে আমিই সেই। এবার আমি যদি ভাবি আমি এক আমি বহু হব, তাহলে থিয়োরেটিক্যালি কি হবে? সেটাই হওয়ার কথা, কারণ একই সত্তা রয়েছে, একই প্রসেস রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে আমরা অতটা বহু হতে পারি না, কারণ আমার ভিতরে যিনি আত্মা বিরাজমান, তাঁর উপর অনেক আবরণ রয়েছে। কিন্তু একেবারেই যে পারি না তাও না। আমি যখন যা চিন্তা করব, যা কিছু ভাবব, বিশেষ করে ইমোশানালি চার্জড হয়ে যদি চিন্তা করা হয়, তাহলে সেই জিনিসটা আমার ব্যষ্টি মন থেকে বেরিয়ে সমষ্টি মনের জগতে ঘুরে ঘুরে, এই জগতে ঠোক্কর খেয়ে খেয়ে, একটা মূর্ত রূপ ধারণ করে বা যে মূর্ত রূপ রয়েছে, সেটাকে আশ্রয় করে আমার কাছেই ফেরত চলে আসবে। আগের আগের অনেক জন্মে একটু একটু করে শুভ চিন্তা কিছু করেছি, শুভ কিছু কাজ করেছি, কোথাও দান করেছি, কোথাও সেবা করেছি। সেই শুভ চিন্তাগুলো ঘুরে যাচ্ছে, ঘুরে ঘুরে আমারই এক যোগ্য পাত্রকে খুঁজে যাচ্ছে, তারপর কোন একজন ভাল সাধু বা কোন মহাত্মাকে আশ্রয় করে আমার সামনে দাঁড় করিয়ে, আমাকে ধর্ম উপদেশ দিয়ে দিচ্ছেন। এর পুরো বক্তব্য এটাই, আমরা যেটা ভাবছি, সেই জিনিসটাই একটা মূর্ত রূপ ধারণ করে সাকার হয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে।

কেউ আমার ক্ষতি করেছে, সেই থেকে আমার মধ্যে একটা প্রতিহিংসার ভাব জন্ম নিয়েছে – আমি ওকে শেষ করে দেব। এবার কি হবে? ওই হিংসার ভাব এবার আমার ভিতর থেকে বেরিয়ে ঘুরতে থাকবে, ভাল একটা আশ্রয় খুঁজবে, ওই আশ্রয়টা এবার আমার কাছে এসে দুম্ করে ফেটে পড়বে। হয় আমার কোন এ্যাক্সিডেন্ট হবে, তাতে আমার একটা পা হয়ত বাদ যাবে, এ্যাক্সিডেন্টে হয়ত আমি মারা যেতে পারি বা কোথাও একটা ফায়ারিং হবে সেখানে এ্যাক্সিডেন্টালি আমি মারা যাব বা ট্রেনে যাওয়ার সময় একটা ডাকাতি হয়ে আমাকে গুণ্ডাদের হাতে মার খেতে হবে, একটা অঘটন আমার ঘটবেই, কেউ আমাকে বাঁচাতে পারবে না। কারুর ভিতরে যদি প্রচুর কাম-বাসনা থাকে, সেই কাম-বাসনার চিন্তাগুলো তার ভিতর থেকে বেরিয়ে মনের জগতে বন্ বন্ করে ঘুরবে। ঘুরে একটা ভাল পাত্রকে আশ্রয় করার জন্য খুঁজবে, কোন পাত্রকে আশ্রয় করলে তার কাম-বাসনাগুলি মিটাতে পারবে। কারণ আমাদের মন যেমন তেমনই হবে, যে ইমোশান খুব পাওয়ারফুল, যেমন প্রতিহিংসার ইমোশান, প্রতিহিংসার ইমোশান খুব পাওয়ারফুল হয়। সেইজন্য আমাদের জীবনে হিংসার ভাব অন্যান্য ভাবের থেকে অনেক বেশি দেখা যায়। ভালবাসার ভাব খুব ছোট্ট থাকে। ভালবাসা যদি খুব গভীর থাকে, লায়লা-মজনুর মত, ওই ভালবাসা ঠিক একটা পাত্র খুঁজে নেবে, পাত্রকে খুঁজে নিয়ে তাকে তার সামনে এনে হাজির করিয়ে দেবে। তার সঙ্গে ওই প্যাকেজটাও আসবে। প্যাকেজ আসা মানে, জীবনের বিনাশ, ওইটা সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। কাম যখন চলে তখন সে বিনাশের প্যাকেজকে সঙ্গে নিয়েই চলে।

দুর্বলতা যদি কারুর মধ্যে থাকে, যেমন ভয়, যে কোন জিনিসকে নিয়ে যদি ভয় করে, যেমন কেউ যদি ভয় করে আমার বাড়িটা হাতাছাড়া হয়ে না যায়; জানবেন, আজ হোক আর কাল হোক, কোন একটাকে আশ্রয় করে ওই জিনিসটা এসে তার বাড়ি ভেঙে ছাড়বে। সমস্যা হল, যদি আশ্রয় ভাল না পায়, তার মনের

মত যদি না পায়, তাহলে ওই চিন্তাটা বসে অপেক্ষা করতে থাকবে কবে তার কাছে আসবে বলে। সেটা দশ জন্ম পরেও আসতে পারে, একুশ জন্ম পরেও আসতে পারে। আজকে আমার সাথে শুভ অশুভ যা কিছু ঘটছে, আমাকে এটা জানা দরকার যে, আমারই চিন্তা এবার মূর্ত রূপ ধারণ করে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আমি মনে করছি, আমি তো ওর কোন ক্ষতি করিনি, কেন সে আমার সাথে এই রকম খারাপ ব্যবহার করছে! হয়ত ওর সাথে এই জন্মে বা আগের আগের জন্মে আমি কিছু করিনি, কিন্তু আমরাই চিন্তা, যে চিন্তা-ভাবনা গুলি ছেড়ে রেখেছি, সেই চিন্তাগুলি ঠিক ঠিক জিনিসকে আশ্রয় করে, যেমন শ্রীরামচন্দ্র তাঁর ব্রহ্মাস্ত্রকে একটা খড়ের টুকরোর উপর আশ্রয় করিয়ে ইন্দ্রের পুত্র জয়ন্তের উপর ছেড়ে দিলেন, ঠিক তেমনি আমারই চিন্তাগুলি একটা পাত্রকে খুঁজে নিয়ে তাকে আশ্রয় করে আমার সামনে এসে বুম্ করে ফেটে পড়বে। আমি মনে করছি, আমার সাথে কেন সে এমনটা করল। কারণ আগের আগের জন্মে আমি যে চিন্তাগুলি ছেড়ে রেখেছি, সেগুলো এতদিন অপেক্ষা করে করে এই জন্মে এসে উপযুক্ত আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে। আর এই জন্মে ওই চিন্তাই ফল দেবে যেটা প্রচণ্ড পাওয়ারফুল। যদি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, হিংসা এই জিনিসগুলি খুব পাওয়ারফুল থাকে, ও এই জন্মেই খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমাকে এসে মারবে।

এর কারণ খুব সাধারণ, আত্মা শুদ্ধ, আত্মার কারুর সাথে কোন লেনাদেনা নেই। আত্মা এখন মনের সাথে জুড়ে গেছে, মনের সাথে আত্মার জুড়ে যাওয়া মানেই এই পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি হয়ে গেল। মন মানেই প্রকৃতি, পুরুষ আর প্রকৃতির মেলবন্ধন মানেই সৃষ্টি। শুদ্ধ আত্মা প্রকৃতির সাথে জুড়ে গেছে, এবার মনের সাথে জুড়ে গেছে। মাটি আর জল মিশে গেলে কাদা হয়, আত্মা আর মন মিলে এখন কাদা হয়ে গেছে, হয় মন ওই কাদাকে পরিষ্কার করবে, আর তা নাহলে আত্মা বাইরের আশ্রয় নিয়ে কাদাকে পরিষ্কার করবে। ছেলে যদি পাড়াতে বদমাইশি করে বেড়ায় তখন পাড়ার লোকেরাই বাবাকে গিয়ে বলে, 'আপনার ছেলেকে ঠিক করুন, নাহলে আমরাই ঠিক করে দেব'। আত্মাও মনকে বলে, তুমি নিজেকে পরিষ্কার কর, 'নাহলে আমি ব্যবস্থা নিচ্ছি'। মনের মধ্যে কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-হিংসা এগুলো যদি এসে যায়, এগুলো নিজেকেই পরিষ্কার করে নিতে হবে। যদি না করা হয়, তাহলে কিন্তু আত্মা নিজেই পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করে নেবে। কোথায় নিয়ে করবে? আত্মা ওই বিশ্বমনে যাবে, ওখান থেকে একটা পাত্র খুঁজে এমন ধাক্কা তাকে মারবে যে, তার হিংসার শিকড়টা উৎপাটিত করে দেবে। ভিতরে প্রচণ্ড প্রতিহিংসায় জ্বলছে আর মুখে বলছে, ওই লোকটার মুখ আমি সহ্য করতে পারি না, আমি ওর শেষ করে দিয়ে ছাড়ব। যে লোকটার প্রতি তার প্রতিহিংসার ভাব আছে তার কিছু হবে কিনা আমাদের জানা নেই, হতেও পারে, নাও হতে পারে। কিন্তু তার নিজের এবার একটা অঘটন ঘটবেই, হয় তাকে এক জনের কাছে অপমানিত হতে হবে বা ফিজিক্যালি মার খেতে হবে বা ক্যান্সার, হার্ট এ্যাটাকের মত মারাত্মক কোন রোগ হয়ে যেতে পারে, বা কোন বড় ধরণের একটা দুর্ঘটনা হয়ে শারীরিক ভাবে মারাত্মক ভাবে জখম হতে পারে, যে কোন জিনিস হয়ে যেতে পারে, বাইরে থেকে এ্যটাক হয়ে ওটাকে শেষে বার করবেই, এটা নিশ্চিত। মানে একটা লেভেলের উপর যদি চলে যায়, তবেই হবে। আর লেভেলের উপর যদি না যায়, যদি কম থাকে, তাহলে আরামসে এক জন্ম, দু-জন্ম চুপচাপ বসে থাকবে, আর একটা কোন আশ্রয় পেলে সেটা এসে তখন তাকে ধাক্কা মারবে।

জীবনে যত জোর ধাক্কা আসছে, বুঝতে হবে তিল তিল করে, আর নাহলে খুব ইমোশানালি চার্জড্ হয়ে সে ওই ভাবটাকে কোন না কোন এক সময় মনের মধ্যে নিয়ে এসে পুষছিল। মনের কোন ভাব কিভাবে এসে মনের আবর্জনা পরিষ্কার করবে আমাদের কারুরই জানা নেই। তার মানে মনের দুর্বলতাকে কাটাতে সবল কোন কিছুকে এনে করবে তা না, যদি দুর্বলতা থাকে, মনে যদি ভয় থাকে, ওই দুর্বলতা বা ভয়টাই এসে তাকে মারবে। প্রবাদ আছে, যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধ্যা হয়, এগুলো এমনি সাধারণ গ্রাম্য ছড়া হতে পারে, কিন্তু বাস্তবে একেবারে সত্যি। যে জিনিসকে আমরা ভয় পাই বা যে জিনিসের প্রতি আমার দুর্বলতা আছে, ওই ভয় দুর্বলতাটাই ঠিক একটা কোন আশ্রয় খুঁজে নেবে, নেওয়ার পর একটা জোর ধাক্কা মেরে তার মনের দুর্বলতা ও ভয়ের ইমোশানগুলিকে পরিষ্কার করবে। জিম করবটের জীবনে এই ধরণের অনেক ঘটনার বর্ণনা আছে। পাহাড়ী অঞ্চলে যারা বাঘকে খুব ভয় পায়, বাঘ ঠিক এসে ওই লোকটাকেই খুঁজে নেয়, যত লোকের মধ্যেই থাকুক বা লুকিয়ে থাকুক, ঠিক ওকেই ধরে নিয়ে চলে যাবে। সেইজন্য বলা হয় তোমার নিজের আবর্জনা নিজেই পরিষ্কার কর।

যে কোন ইমোশানকে যদি আমরা ভিতরে পুষে রাখি, লালন পালন করতে থাকি, আর ওটা যদি পাওয়ারফুল হয়ে যায়, এবার যে তার কি হতে যাচ্ছে কেউ কল্পনাই করতে পারব না। আমরা অনেক সময় বলি, আচ্ছা এত লোক থাকতে আমার সাথেই কেন এই রকম হয়। আমার সাথে এই জন্যই হয়, কারণ আমি এই জন্মে আর আগের আগের জন্মে এটা নিয়েই চিন্তা-ভাবনা করে এসেছি; সেইজন্য আমার সাথেই এই রকম হয়। ইদানিং কালে খবর কাগজে চারিদিক থেকে কত শ্লীলতাহানির খবর আসছে, এমন এমন সব ঘটনা হচ্ছে যে, আমাদের লজ্জায় মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়তে হয়। কিছু দিন আগেই গুরগাঁও শহরে একজন তার মেয়ের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু, আঠারো বছরের মেয়ের শ্লীলতাহানি করেছে। নিজের মেয়েই শেষে থানায় গিয়ে বাবার নামে অভিযোগ দায়ের করে এসেছে। বুঝতে হবে যে কোথাও মানুষের মধ্যে কাম ভাবটা প্রবল হয়ে গেছে, আর বর্তমান কালে সিনেমা, টিভি, ইন্টারনেট দেখে দেখে মানুষের আরও কাম ভাব বাড়ছে। প্রবল কাম ভাব, হিংসার ভাব এই জিনিসগুলো এমনিতে কখনই যাবে না, খুব জোর বাইরে থেকে বিরাট একটা মার না খেলে যাবে না।

ঠাকুর খুব সহজ উপায় বলে দিলেন, তোমার কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ এগুলিকে মোর ঘুরিয়ে দাও। মোর না ঘুরিয়ে দিলে আবর্জনার স্তুপ জমতে থাকবে, ওই আবর্জনা যদি নিজে পরিষ্কার না কর, আত্মা পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করে নেবে। স্বামীজী এটাই বলতে চাইছেন, তুমি যা চিন্তা-ভাবনা করছ, এই চিন্তা-ভাবনাগুলিই ঘুরে ঘুরে তোমার কাছে আবার ফিরে আসবে। শুধু চিন্তাগুলিই আসবে না, ওই চিন্তা একটা মূর্ত রূপ ধারণ করে তোমার জীবনের আঙিনায় মারণরূপে এসে দাঁড়াবে। যিনি যত পবিত্র তার কাছে ওটা তত শক্তিশালী হয়ে আসবে। যে যত অপবিত্র তার কাছে তত দেরীতে আসবে। কারণ আগের আগের এত কিছু জমে আছে যে, ঢোকার জায়গা পাচ্ছে না। সরকারি অফিসে এত এত ফাইল জমে আছে যে, আজকে যে ফাইলটা দেওয়া হল সেটা অপেক্ষা করতে থাকবে, যতদিন না আগের ফাইলগুলো ক্লিয়ার হয়। এই জন্মে যা চিন্তা-ভাবনা করছে, এগুলো কোন জন্মে ফিরে আসবে জানা নেই, আজ হোক কাল হোক ফিরে আসবেই, বাঁচার কোন পথ নেই।

বাঁচার একটাই পথ, প্রত্যেক দিন নিজের মনকে পরিষ্কার রাখতে হবে। তাহলে যারই ক্যান্সার হয়, ডায়বেটিস হয় আর ওই তিন বছরের বাচ্চার যে হার্টের সমস্যা, এদের সবারই ভিতরে কি হিংসার ভাব ছিল? কোথা থেকে তাদের মধ্যে এই মারণ রোগ এলো? এগুলোর ব্যাখ্যা সত্যিই আমাদের কাছে নেই। সে হয়ত আগের জন্মে কিছু করেছিল; কি করেছিল, কি করেনি, এগুলোও আমাদের জানা নেই। কিন্তু তাড়াতাড়ি সারানোর ব্যবস্থা আমাদের নিজেদের উদ্যোগেই করতে হবে। সদ্বসৎ বিচার, সাধুসঙ্গ, জপ-ধ্যান, সেবা, তপস্যা, নিষ্কাম কর্ম করে করে এগুলো থেকে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে। তার সাথে এটাও আমাদের জানতে হবে, রোগ-ব্যাধি, বিপদ, দুর্ঘটনা এগুলো কেন হয়, এর ব্যাখ্যা নেই। কিন্তু কোন ইমোশান যদি খুব পাওয়ারফুল থাকে তাহলে তার উপর আঘাত আসবেই আসবে। ঠাকুর একজনকে জানতেন সে সবারই নিন্দা করে বেড়াত, বলছেন, শেষ বয়সে তার পায়ের খিল ভেঙে এমন পচন হল যে, দুর্গন্ধের জন্য তার কাছে কেউ যেত না। ভিতরে সবারই প্রতি নিন্দার ভাব তার ভিতরে এত জমে আছে যে, এবার ওটাকে পরিষ্কার করতে হবে। এবার ওই পরনিন্দার ভাব একটা মূর্ত রূপ হয়ে তার পা ভাঙিয়ে, পচিয়ে এমন দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে দিল যে, কেউ আর তার কাছে আসতে পারছে না। এরপর সে শিক্ষা পেতেও পারে, আবার নাও পেতে পারে। শিক্ষা না পেলে আরও মার খেতে হবে। আমরা যে কর্মফলের কথা বলি, তারও বক্তব্য এটাই, ভিতরে যে ইমোশান যত পাওয়ারফুল, ওটা ঘুরে একটা মূর্ত রূপ ধারণ করে তার সামনে আসবে। হয় তাকে তাড়াতাড়ি নিজের চেষ্টাতে পরিষ্কার করে নিতে হবে, না হলে আত্মাই পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করে নেবে।

বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত নেহরু পরিবারের একজন সদস্যা ছিলেন, তাঁর সাথে গান্ধীজীর একটা ঘটনা আছে। বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের স্বামী মারা যাওয়ার পর তাঁর শ্বশুড় বাড়ির লোকেরা সমস্ত সম্পত্তি থেকে তাঁকে বঞ্চিত করে সব কিছু থেকে বার করে দেয়। সম্পত্তির অধিকার নিয়ে কিছু একটা হয়েছিল। বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত অনেক আইনী লড়াই লড়লেন, গান্ধীজীই বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের হয়ে ফাইল করেছিলেন, কিন্তু পেরে উঠলেন না। সমস্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে উনি প্রতিহিংসায় ভরে গেছেন। সেই সময় ইউনাইটেড নেশনে একটা ডেলিগেশানে

মিসেস পণ্ডিত ডেলিগেট হয়ে আমেরিকায় যাবেন। যাওয়ার আগে উনি গান্ধীজীর সাথে দেখা করতে গেছেন। কথায় কথায় গান্ধীজী জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার শ্বশুড় বাড়ির সাথে সব মিটমাট হয়ে গেছে'? এই প্রশ্ন করতেই বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের পুরো রাগটা গান্ধীজীর উপর দিয়ে বেরিয়েছে। 'কোন মতেই আমি মিটামাট করব না, আপনি বললেও করব না'। গান্ধীজী তাঁকে খুব মিষ্টি করে বললেন, 'দেখো! তোমার ভিতরে অনেক বিষ ভরে আছে, তোমার কোন অঘটন না ঘটে যায়, তোমার দুর্ঘটনা হয়ে যেতে পারে। এত বিষ নিয়ে এত দূরে আমেরিকায় যাচ্ছ, একট অঘটন ঘটবেই'। গান্ধীজী বেশি কথা বলতেন না, একটা দুটো কথা হয়ত আরও বললেন। বাড়ি ফিরে ভাবছেন কি করবেন, গান্ধীজীর সামনেই ফোঁস ফোঁস করে এসেছেন, গান্ধীজীর সামনেই চেঁচামেচি করে এসেছেন, আর ঠিক এই ভাষাতে, 'আপনি বললেও মিটমাট করব না'।

তারপর মিসেস পণ্ডিতের মনে হল, ঠিক আছে গান্ধীজী যখন বলেছেন, যাই ঘুরে আসি। গেলেন, শ্বশুর বাড়ির লোকেরাও খুব স্বস্তি পেয়েছিল। সব কিছু মিটে যাওয়ার কিছু দিন পরে উনি ইউনাইটেড নেশনসের ভারতের পার্মানেন্ট এ্যম্বাসেডর হন। সেই সময় আফ্রিকার কিছু নেশনস্ মিলে কোন একটা ইস্যুতে বিজয়লক্ষ্মীর উপর প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করে। সেখান থেকে সরে এসে এরা সবাই মিলে বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে খুব খারাপ খারাপ কথা বলতে থাকে। উনিও খুব রেগে গেছেন, উনিও প্রচুর রিপ্লাই দিলেন। তারপর অনেক কিছু হওয়ার পর ভারত ইউনাইটেড নেশনসে এই ইস্যুর উপর জিতে গেল। কিন্তু তারপরই বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের গান্ধীজীর কথাটা মনে পড়ল। দেখছেন আমার ভিতরে হিংসা জমে গেছে। পরে করিডরে আফ্রিকান ডেলিগটসদের সাথে দেখা হতে হাত মিলিয়ে ক্ষমা চেয়ে নিলেন। ওরাও সবাই খুব খুশি হয়ে গেল। এর জন্য পরে ভারতের সাথে আফ্রিকা সহ অন্যান্য দেশের সম্পর্ক খুব ভাল হয়ে গিয়েছিল। গান্ধীজীও ইমোশান কি ক্ষতি করতে পারে ভাল করে জানতেন আর এটাকে খুব মানতেনও, যার জন্য তিনি বিজয়লক্ষ্মীকে সাবধান করে দিতে পেরেছিলেন, আর ভারতেরও সম্মান বৃদ্ধি হয়। চিন্তা ভাবনা যদি খুব শক্তিশালী হয়ে যায় সেটাই তখন ইমোশান হয়ে যায়, আবার ইমোশান যখন খুব পাওয়ারফুল হয়ে যায় তখন চিন্তা ভাবনা হয়ে যায়।

এই জিনিসটাকে এখন স্বামীজী অন্য ভাষায় বলছেন, The greatest sin is to think yourself weak, নিজেকে দুর্বল ভাবাটাই সব থেকে বড় পাপ, কারণ যেমনি নিজেকে দুর্বল ভেবেছে এইবার এটাই ঘুরে গিয়ে একটা লোক এনে এমন মার মারবে আর ততদিন মারবে যত দিনে তার ওই দুর্বলতার ভাবটা না চলে যায়। আমরা বলতে পারি, কেন তা হবে, আমার দুর্বলতা আছে, কোন শক্তিমান, ক্ষমতাশালী লোক এসে আমাকে সাহায্যও তো করতে পারে। কিন্তু তা হবে না, জগতের নিয়মই হল সে মেরে শিক্ষা দেয়, জগৎ কখন ভালবেসে শিক্ষা দেবে না।

আমাকে আঘাত করার শক্তি আমিই অপরকে দিই

স্বামীজী বলছেন, No one is greater. Realise you are Brahman. (*তোমার চেয়ে বড় আর কেউ নেই; উপলব্ধি কর যে, তুমি ব্রহ্মস্বরূপ।*) যোগশাস্ত্র প্রতিপক্ষ ভাবনার কথা বলছেন। যদি আমার ভিতরে কোন অশুভ চিন্তা বা ভাব এসে থাকে, তখন আমাকে বুঝে নিতে হবে যে আমাকে এটা পরিষ্কার করতে হবে। পরিষ্কার করার সব থেকে উত্তম উপায় হল প্রতিপক্ষ ভাবনা – সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ভাবতে হবে, আমি সেই শুদ্ধ আত্মা, আমি সর্বশক্তিমান, আমি সর্বজ্ঞ, আমি সর্বব্যাপী, আমার মধ্যে কোন দুর্বলতা নেই। এইভাবে কয়েকদিন চিন্তন-মনন করলে দুর্বলতার ভাব কেটে গিয়ে ভিতরে একটা শক্তি এসে যাবে। যদি না কাটানো হয়, ওই দুর্বলতার ভাব ঘুরে একটা কাউকে আশ্রয় করে আমাকে মার দিয়ে দুর্বলতাকে কাটিয়ে দেবে।

Nothing has power except what you give it. (*যে কোন বস্তুতে তুমি যে শক্তির বিকাশ দেখ, সে-শক্তি তোমারই দেওয়া।*) এই জগতে কারুর ক্ষমতা নেই যে, আমার কোন ক্ষতি করবে। আমাকে যে ক্ষতি করছে, আমাকে যে অপমানিত করছে, আমাকে যে কষ্ট দিচ্ছে, আমাকে যে দুঃখ দিচ্ছে, আমিই সবাইকে আমার ওই শক্তিটা দিয়ে রেখেছি। কিভাবে দিয়েছি? চিন্তা দিয়ে। যদি আমি কাউকে কষ্ট দিয়ে থাকি, আমি সবাইকেই কষ্ট দেব। কিন্তু আমি তো শুধু আপনাকেই কষ্ট দিলাম, আর কাউকে তো কষ্ট দিইনি। তাহলে

আপনাকেই কেন আমি শুধু কষ্ট দিলাম? কারণ আপনি যে চিন্তাগুলি ছেড়ে ছিলেন, সেই চিন্তাগুলি ঘুরে ঘুরে আমাকে আশ্রয় করেছে, আমি এখন হয়ে গেলাম সেই ব্রহ্মাস্ত্র, আপনার কাছে গিয়ে দুম্ করে ফেটে পড়লাম। ভিতরে যদি আমার মারার স্বভাব থাকত, তাহলে আমি সবাইকেই মারতাম। যেমন কাঁটা সবারই পায়ে ফুটবে, সেই রকম মানুষ তো সবাইকে ফুটছে না, শুধু আপনারই কেন ফুটছে? কারণ আপনি আমাকে সেই শক্তিটা দিয়ে রেখেছেন, বাকিদের তাই ফুটছে না।

স্বামীজী বলছেন, We are beyond the sun, the stars, the universe. Teach the Godhood of man. Deny evil, create none. Stand up and say, I am the master, the master of all. We forge the chain, and we alone can break it, (*আমরা সূর্য চন্দ্র তারা অতিক্রম করে রয়েছি, আমরা জগৎপ্রপঞ্চেরও উপরে। শিক্ষা দাও, মানুষ ব্রহ্মস্বরূপ। মন্দ বলে কিছু আছে – এটি স্বীকার করো না, যা নেই –তাকে আর নূতন করে সৃষ্টি করো না। সদর্পে বলো –আমি প্রভু, আমি সকলের প্রভু। আমরাই নিজেদের শৃঙ্খল নিজেরা গড়েছি, আর আমরা কেবল ঐ শিকল ভাঙতে পারি।*) আমার উপর আমি নিজেই শৃঙ্খল তৈরী করেছি, শৃঙ্খলে তালা মেরে নিজেকে বন্ধনে রেখেছি, আমি ছাড়া এই তালা, এই শৃঙ্খল কেউ খুলতে পারবে না। তাই এই শৃঙ্খল আমাকেই ভাঙতে হবে, অন্য কেউ ভাঙতে পারবে না। আমার জীবনে যে দুঃখ-কষ্ট আছে, যে দুর্বলতার ভাব আছে, যে ভয় আছে, যে কাম ভাব আছে, যে ক্রোধ আছে, যে হিংসা আছে, সব আমিই সৃষ্টি করেছি। যারা এসে আমাকে মারছে তারা হল পুতুলনাচের যে পুতুল হয় সেই পুতুল, আর ওই পুতুলের পিছনে যে কলকাঠি আছে, যেটা দিয়ে পুতুলকে নাচায়, সেই কলকাঠি হল আমার চিন্তা। এই জিনিসগুলিকে প্রতিপক্ষ ভাবনম্ দিয়ে নিষ্ক্রিয় করতে হবে, অর্থাৎ বিপরীত চিন্তা দিয়ে। ভিতরে হিংসার ভাব থাকলে সবার প্রতি ভালবাসার ভাব আনতে হবে, ভিতরে কাম ভাব থাকলে, কামের যে ভয়ানক পরিণতি তার কথা ভেবে কাম ভাবকে নিষ্ক্রিয় করতে হবে। এর একটা লম্বা তালিকা আছে, যেখানে বলছেন কোন ইমোশানকে কোন ভাব দিয়ে নিষ্ক্রিয় করতে হবে। এ্যলকালিকে এ্যসিড দিয়ে আর এ্যসিডকে এ্যলকালি দিয়ে যদি না শেষ করা হয়, তাহলে কিন্তু আমাদের মরতে হবে।

দেহ বা মনের সাথে আত্মার কোন সম্পর্ক নেই - জ্ঞান অপ্রতিরোধ্য

তার সাথে স্বামীজী বলছেন, No action can give you freedom; only knowledge can make you free. (*কোন প্রকার কর্ম তোমায় মুক্তি দিতে পারে না, কেবল জ্ঞানের দ্বারাই মুক্তি হতে পারে।*) এর উপর আগে অনেকবার আলোচনা করা হয়েছে। Knowledge is irresistible; the mind cannot take it or reject it, (*জ্ঞান অপ্রতিরোধ্য, মনের কোন ক্ষমতা নেই যে তাকে গ্রহণ করবে বা ছাড়বে।*) জ্ঞান জিনিসটা হল আত্মা, আত্মা এত শক্তিশালী যে, মনের কোন ক্ষমতা নেই যে তাকে নেবে বা ছাড়বে। মন চাকরের মত, সে শুনতে বাধ্য। ঠিক তেমনি, মনের ভিতর যেমনি ওই ইমোশানগুলি, আবর্জনা এসে গেল, আত্মা নিজের ঘরে নোংরা আবর্জনা বরদাস্ত করবে না। মনকে আত্মা সর্বক্ষণ বলে যাচ্ছে আবর্জনা সব পরিষ্কার করে দাও। মন যদি পরিষ্কার না করে, আত্মা নিজেই অন্য ভাবে কাউকে দিয়ে পরিষ্কার করিয়ে দেবে। When it comes the mind has to accept; so it is not a work of the mind; only, its expression comes in the mind. (*যখন জ্ঞানোদয় হবে, মনকে তা গ্রহণ করতেই হবে। সুতরাং এই জ্ঞানলাভ মনের কার্য নয়, তবে মন ঐ জ্ঞানের প্রকাশ হয়ে থাকে বটে।*) জ্ঞান যখন আসে, আত্মা যখন নিজের majestyতে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সেখানে মনের আর কিছু করার থাকে না। কারণ ওটা মনের এলাকার বাইরে, অসহায় হয়ে মনকে তাই মেনে নিতে হয়। চেঙ্গিজ খাঁ, কুবলাই খাঁরা যখন ক্ষমতায় এসেছিল, তাদের যত সাপোর্টার ছিল, ওদের শুধু বলছে, তোমরা আমার দাসত্বকে স্বীকার কর আর তা নাহলে মৃত্যু বরণ কর। ওখানে ছেড়ে দেওয়া, গ্রহণ করার কোন ক্ষমতা নেই, তোমাকে চুপচাপ yes sir বলে মাথা পেতে মেনে নিতে হবে। একনায়কতন্ত্রে কোন সুযোগ দেওয়া হয় না। এরপর স্বামীজী জীবনমুক্তির বর্ণনা করছেন, যেটা আমরা আগে আলোচনা করলাম।

Work or worship is to bring you back to your own nature. It is an entire illusion that the Self is the body; so even while living here in the body, we can be

free. The body has nothing in common with the Self. Illusion is taking the real for the unreal not 'nothing at all', (*কর্ম উপাসনার ফল এইটুকু যে, ওতে তোমার যে-স্বরূপ ভুলে ছিলে, তা ফিরে পাও। আত্মা যে দেহ, এইটা মনে করাই সম্পূর্ণ ভ্রম; সুতরাং আমরা এই শরীরে থাকতে থাকতেই মুক্ত হতে পারি। দেহের সঙ্গে আত্মার কিছুমাত্র সাদৃশ্য নেই। মায়ার অর্থ 'কিছু না' নয়, 'অসৎ'কে 'সৎ' বা 'সত্য' বলে গ্রহণ করা।*) এই স্থূল দেহের সাথে আত্মার কোন সম্পর্ক নেই, মনেরও আত্মার সাথে কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু আত্মা যখন নিজের majestyতে এসে যান, তাঁর আসল রূপ যখন এসে যায়, তখন ওটা মনের মধ্যে প্রকাশ পায়, মনকে দেখলে বোঝা যায় এই রকম কিছু হয়ে গেছে। সেইজন্য আমরা যে ভাবছি, আমরা বন্ধনে আছি, আমাদের মধ্যে কামক্রোধাদি আছে, এগুলোই আমাদের ভ্রান্ত ধারণা। একবার এগুলোকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে দেখে নেওয়া যাক জিনিসটা ঠিক কি। কিভাবে করা যাবে? যদি আমি শুধু দিনরাত চিন্তা করি যাই, আমি সেই নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা, তখন আমার সব ইমোশানগুলো চলে যাবে। যদি আমরা মনে করি আমি ঠাকুরের সন্তান, তখন এই ইমোশান গুলি ধীরে ধীরে চলে যাবে।

মূল কথা হল, ইমোশানকে কোন পরিস্থিতিতে থাকতে দেওয়া যাবে না, আমরা নিজেরা যদি পরিষ্কার না করি, আত্মা ইমোশানগুলিকে নিজে পরিষ্কার করে ছাড়বে। একটা ধাক্কা খাইয়ে, কিছু একটা করে পরিষ্কার করে ছাড়বে। এখানে স্বামীজীর বক্তব্য ইমোশান ওই অর্থে না, স্বামীজীর উদ্দেশ্য একটাই, মানুষকে কিভাবে মুক্তির পথে নিয়ে যাওয়া যায়। মুক্তির পথে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হল নানা রকমের বন্ধন, নানা রকমের ভ্রম, মরীচিকা, তার মধ্যে ইমোশান একটা খুব বড় ভূমিকা পালন করে। ইমোশন মানেই হয়, নানা রকমের চিন্তা ভাবনা, আমরা একটা জিনিসকে ভেবে নিচ্ছি, সেই জিনিসটাকে ভেবে ভেবে চিন্তাটা বিরাট বড় আকার ধারণ করে নিচ্ছে, সেটাই এবার মনের ভিতরে একটা ফোঁড়ার মত হয়ে গেল। ফোঁড়াকে এবার অপারেশন করতে হবে। কিভাবে অপারেশন হবে? বাইরে ওই চিন্তাটা বেরিয়ে একটা মানুষকে নিয়ে এসে, ছুরি হয়ে মনের উপর চালাবে, সব পুঁজ বার করে পরিষ্কার ফোঁড়াকে চামড়ার সাথে মিলিয়ে দেবে। এরপরে যদি ওই পাড়ায় আর পা না মাড়ায়, খুব ভাল। যদি মাড়ায়, বিষফোঁড়ার মত আরেকবার হবে, আবার অপারেশন করবে। যাঁরা এটাকে বুঝে নিয়েছেন, তাঁরা ধীরে ধীরে নিজেকে সমস্ত চিন্তা থেকে সরিয়ে আনবেন এই চিন্তা করে যে, আমি সেই শুদ্ধ আত্মা, চিদানন্দরূপম্ শিবোহহম্ শিবোহহম্। এই চিন্তা করা যে, আমি এই ধরণের চিন্তাগুলির বাইরে, আমি এগুলো থেকে সম্পূর্ণ রূপে আলাদা আর তার সাথে সব সময় নিজেকে শুদ্ধ পবিত্র রাখা। এই কথা বলে স্বামীজী ১৬ই জুলাইয়ের ক্লাশের ইতি টানছেন। এরপর ১৭ই জুলাইয়ের ক্লাশে স্বামীজীর বক্তব্যকে নিয়ে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি।

<u>বুধবার, ১৭ই জুলাই</u>

আজকে স্বামীজী যে বিষয়ের উপরে বলবেন, এই বিষয়টা আমাদের বুঝতে একটু কঠিন মনে হতে পারে। স্বামীজী আচার্য শঙ্করের বেদান্তকে নিজের মত করে ব্যাখ্যা করছেন। অদ্বৈত বেদান্ত ধারণা করা খুব কঠিন। কিন্তু কেউ যদি একটু ধারণা করে নিতে পারে, তার জীবন পুরো পাল্টে যাবে। একটা প্রবাদ বাক্যে বলে, কালকের যোগী ভাতকে বলে অন্ন। জীবনে যদি কোন পরিবর্তন হয় তখন তার একটা প্রভাব আমাদের পরবর্তি জীবনে গিয়ে পড়ে। এখন যে কথাগুলো স্বামীজী বলতে যাচ্ছেন, এই ধরণের কথা শুনলে জীবনে একটা প্রভাব ফেলে। সুখে, দুখে, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সব সময় এই ভাবকে আমরা হয়ত ধরে রাখতে পারব না, আবার অনেক সময় সক্ষম হব। আমি যে হাজার বার অসফল হচ্ছি এর কোন দাম নেই, কিন্তু একবার যে সাফল্য পেয়েছি, সেটাই সাংঘাতিক। জীবনে একবার যদি জয়ী হওয়া যায়, তার মানে সিংহদুয়ার খুলে গেল। একবার যখন জয়ী হওয়া গেছে তখন দ্বিতীয়বারও জয়ী হব, তৃতীয়বারও জয় আসবে, এইভাবে হয়ে হয়ে একদিন জীবনমুক্তের মত সর্বাবস্থায় জয়ী হব। আমরা যদি চেষ্টা করে একটু গভীরে যাই, সেখান থেকে আরও যদি গভীরে যাওয়া যায়, তখন দেখব আমিই আছি আর আমার চিন্তা ভাবনা আছে, সত্যি কথা বলতে এর বাইরে আর কিছু নেই।

আমার এই শরীরটাও একটা চিন্তা, আর আমার পরিচিতজনরাও আমার চিন্তা, জগতে যা কিছু আছে সবটাই আমার চিন্তা। স্বপ্নে যেমন আমি অনেক কিছু দাঁড় করিয়ে দিই, স্বপ্নে যা কিছু দেখি আমিই সব কিছু হয়ে যাই, আমার চিন্তাতেই স্বপ্নে সব কিছু ভাসমান হয়ে যায়; বহির্জগতেও ঠিক তাই হয়। আমাদের চিন্তা ছাড়া কিছু নেই, যিনি শুদ্ধ চৈতন্য তিনি তো আনন্দে বুঁদ হয়ে ডুবে আছেন, চিন্তার চিনিও তাঁর ভিতর নেই। ভাঙ খেয়ে ভোলানাথ ডুবে আছেন, শুদ্ধ চৈতন্যের কোন চিন্তা নেই। সেই শুদ্ধ চৈতন্যই মনের সাথে জুড়ে গিয়ে চিন্তা-ভাবনাতে ঢুকে গেল। চিন্তা ভাবনাকে বাস্তবে নামাতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে কিছু একটা হয়ে যাবে। ঠাকুর একবার মথুরবাবুর সাথে গাড়ি করে কোথাও যাচ্ছিলেন। যেতে যেতে ঠাকুরের হঠাৎ সীতার ভাব হল, সীতার ভাবে ভাবছেন সীতার অপহরণ হচ্ছে, রাবণ এবার সীতাকে নিয়ে চলল। সেই সময় জটায়ু রাবণকে আক্রমণ করেছে। তিনি এত জোর ভেবেছেন, সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার গাড়ির এ্যক্সিডেন্ট হয়ে গেল। এ্যক্সিডেন্ট হতেই ঠাকুরের হুঁশ এসে গেছে। পরে ঠাকুরের ভাবের কথা শুনে মথুরবাবু বলছেন, 'বাবা আপনার সাথে আর বাইরে যাওয়া যাবে না। আপনি কখন কি ভাবে ডুবে যাবেন, মাঝখান থেকে আমাদের প্রাণ যাবে'। ঠাকুরের মত মানুষ, ভাবছেন সীতার অপহরণ হচ্ছে, আর ভাব এত গভীর, সেই গভীর ভাবের মধ্যে জটায়ু আক্রমণ করেছে, আর দুম্ করে গাড়ির এ্যক্সিডেন্ট, সবাই ছিটকে পড়ল। ঠাকুরের এই ঘটনাকে যদি আমরা মাথায় রাখি, বাকিটা আমরা বুঝে নিতে পারব, এটাই বাস্তব। ঠাকুর মন অত্যন্ত পাওয়ারফুল, তাই তিনি ভাবলেন আর যা হওয়ার কথা হয়ে গেল। আমাদের ক্ষেত্রে তৎক্ষণাৎ না হয়ে একটু পরে হবে।

যাই হোক ১৭ই জুলাইয়ের ক্লাশে স্বামীজী আচার্য শঙ্করের অদ্বৈত বেদান্তকে নিয়ে আলোচনা করছেন। আচার্য শঙ্কর জগৎকে কিভাবে দেখছেন, জগতের সাথে ব্রহ্ম, সৃষ্টি, মায়াকে কিভাবে দেখছেন, সেটাকেই স্বামীজী খুব সংক্ষেপে বলছেন। অদ্বৈতের প্রসঙ্গ যখনই এসেছে, সেই সময় আমরা অনেকবার অদ্বৈতের ব্যাখ্যা করেছি। তবে অদ্বৈত বেদান্ত অত্যন্ত কঠিন বিষয়, সেইজন্য অদ্বৈতের বিষয়ে বার বার শুনতে হয়। আচার্য শঙ্করও জানেন এটা খুব কঠিন, সেইজন্য যেমন যেমন উপনিষদ, গীতার ভাষ্য লিখছেন, তেমন তেমন তিনি অদ্বৈতের ব্যাখ্যা করে গেছেন। স্বামীজীও জানেন অদ্বৈত একটা খুব কঠিন বিষয়, সেইজন্য থেকে থেকে শিষ্যদের কাছে অদ্বৈতের কথাগুলো বলছেন। আমরাও যেখানে যেখানে অদ্বৈতের কথা আসছে, সেটাকে আমরা সেভাবেই ব্যাখ্যা করতে থাকব, যাতে আমরাও একটু অদ্বৈতের ধারণা করতে পারি।

রামানুজ ও শঙ্করাচার্য - দুজনের মতপার্থক্য

প্রথমে স্বামীজী রামানুজকে নিয়ে বলছেন। রামানুজের ইতিহাস নিয়ে আমরা এর আগে আলোচনা করেছি। রামানুজ হলেন ঠিক ঠিক ভক্তিমার্গের আচার্য। যদিও মাধ্বাচার্য ঘোর দ্বৈতবাদী, কিন্তু ভারতের বেশির ভাগ ভক্তি পরম্পরাতে এবং বেশির ভাগ গৃহাদি ও মন্দিরাদিতে যে পূজা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় সবই রামানুজের দেওয়া। রামানুজের অনুগামীরা অদ্বৈতের নাম শুনলেই লাঠি নিয়ে তেড়ে আসে। ওদের বক্তব্য হল রামানুজকে অনেকবারই মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল। রামানুজের গুরু ছিলেন অদ্বৈতবাদী। রামানুজ নিজেও একজন বড় পণ্ডিত ছিলেন, তিনি আচার্য শঙ্করকে পড়লেন, বেদ পড়েছেন, পরে তিনি অনেক গ্রন্থও রচনা করেছেন। গুরুর কাছে শোনা উপনিষদের কিছু কিছু মন্ত্রের ব্যাখ্যা রামানুজের পছন্দ হয়নি। গুরু তাঁকে বলছেন, তুমি কেন মানতে চাইছ না? তখন উনি এমন ভাবে মন্ত্রের সন্ধি আদি ভাঙলেন, যার ফলে মন্ত্রের অর্থ অন্য রকম হয়ে গেল। শেষে তিনি গুরুকে ত্যাগ করলেন এবং যমুনাচার্যি সম্প্রদায় থেকে সন্ন্যাস নিলেন। রামানুজের জীবনের কাহিনী বিরাট লম্বা, তার কতটা সত্য আর কতটা অলৌকিক ব্যাপার জানা যায় না। কিন্তু তাঁর বইগুলি খুব নামকরা। নূতন একটা দর্শন দিলেন, যেটা ওনার নিজের দেওয়া না, ওই দর্শন ওনাদের পরম্পরাতে আগে থেকেই চলে আসছিল। যেমন আচার্য শঙ্করও নূতন করে কিছু বলেননি, তিনি যা যা বলেছেন সবই পরম্পরাতে চলে আসছিল। রামানুজের যে দর্শন, যাকে বিশিষ্টাদ্বৈত বলা হয়, তাতে তিনটে সত্তা, চিৎ, অচিৎ এবং ঈশ্বর। ঈশ্বর, তিনি ভগবান সর্বশক্তিমান, চৈতন্য হল, আমাদের সবার ভিতরে যে সত্তা রয়েছে, বাকি সব কিছু জড়। তিনটে সত্তা, এই মত যেন কিছুটা, পুরোটা না, খ্রীশ্চানদের মতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

স্বামীজী বলছেন, Ramanuja divides the universe into Chit, Achit and Ishvara; man, Nature, and God; conscious, subconscious, and superconscious. (*রামানুজ*

জগৎপ্রপঞ্চকে চিৎ (জীবাত্মা বা প্রাণী), অচিৎ (জড়প্রকৃতি) এবং ঈশ্বর –এই তিন ভাগে ভাগ করেছেন; অথবা চেতন, অবচেতন ও অতিচেতন –এই তিন ভাগ।) স্বামীজীর তিনশ বছর আগে এসেছিলেন শঙ্করাচার্য, স্বামীজী নিজের মত করে রামানুজ ও শঙ্করাচার্যের দর্শনের তুলনা করে বলছেন, Shankara, on the contrary, says that Chit, the soul, is the same as God. (*শঙ্কর কিন্তু বলেনঃ জীবাত্মা বা চিৎ এবং পরমাত্মা বা ঈশ্বর বা ব্রহ্ম এক বস্তু।*) আত্মাই ব্রহ্ম এই জিনিসটা *তত্ত্বমসি, অহং ব্রহ্মাস্মি* এই মহাবাক্য গুলোর মাধ্যমে উপনিষদে বার বার ঘুরে ঘুরে আসছে। আচার্য শঙ্করের এটাই বৈশিষ্ট্য, তিনি এটাকে পুরো যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করে দিলেন। যাঁকে সম্মান করি তাঁর মুখে একটা কথা শুনে আসছি, বা তিনি যে কথাগুলো বলছেন আমি শ্রদ্ধাবশতঃ মেনে নিচ্ছি, এখানে সে-রকম কিছু হচ্ছে না। যুক্তি দিয়ে যদি দেখিয়ে দেওয়া হয়, যখন মানামানির কোন ব্যাপারই আসে না, জিনিসটা এই রকমই, তখন পুরো অন্য রকম হয়ে যায়। আচার্য শঙ্কর এটাই দেখালেন, আমাদের ভিতরে যেটা চৈতন্য বস্তু, আত্মা বলতে যেটাকে বোঝায়, সেটা ঈশ্বরের সঙ্গে এক, যদিও উনি বলছেন ব্রহ্মের সাথে এক।

স্বামীজীও আচার্যের কথাতেই বলছেন, God is truth, is knowledge, is infinity; those are not qualities. (*ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ; ঐ সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত তাঁর গুণ নয়।*) ঈশ্বর সত্য বা সৎ, তিনিই চৈতন্য বা চিৎ, তিনিই অনন্ত। ঈশ্বরের একটাই পরিভাষা, God is infinite, ঈশ্বর অনন্ত, সেখান থেকে বাকি সব কিছু বেরিয়ে আসে। তার সাথে আচার্য বলছেন, সৎ, চিৎ ও অনন্ত এই তিনটে ঈশ্বরের গুণ নয়। এই জায়গাতেই আচার্য শঙ্কর আর রামানুজের মূল পার্থক্য এসে যায়। এই যে বলা হয় ঈশ্বর চৈতন্য, এই চৈতন্য কি ঈশ্বরের গুণ নাকি এটাই তিনি? লাল ফুল বললে বোঝায় এই ফুলের রঙ লাল, লাল রঙটা ফুলের একটা গুণ। এইজন্যই গুণ, কারণ এই ফুল নীল রঙেরও পাওয়া যায়। গোলাপের যেমন অনেক রঙ হয়, সাদা গোলাপ আছে, লাল গোলাপ আছে আবার হলুদ রঙের গোলাপাও পাওয়া যায়। তার মানে গোলাপের যে রঙ, এই রঙ জিনিসটা গোলাপের গুণ। আমরা ঈশ্বরকে নিয়ে যে কথাগুলো বলি, ঈশ্বর দয়াময়, ঈশ্বর করুণাময়, ঈশ্বর চৈতন্য, ঈশ্বর অনন্ত এগুলো কি তাঁর গুণ? আচার্য শঙ্কর বলবেন, এটাই তিনি। লাল ফুল বললে ফুলের রঙ লাল বোঝাচ্ছে। কিন্তু শুধু লাল রঙ জিনিসটা, যেটাকে বলছি লালত্ব, লালত্বটা আর গুণ নয়, ওটা বস্তু হয়ে গেল। এর উপর আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনায় যাব।

স্বামীজী বলছেন, Any thought of God is a qualification, and all that can be said of him is 'Om tat sat'. (*ব্রহ্মকে চিন্তা করতে গেলে তাঁকে বিশিষ্ট করা হয়; তাঁর সম্বন্ধে বড় জোর বলা যেতে পারে 'ওঁ তৎ সৎ' –অর্থাৎ তিনি সত্তাস্বরূপ, তিনি অস্তিস্বরূপ –এই মাত্র।*) ঈশ্বরকে যেমনি কোন উপাধি লাগাচ্ছি, যেমন বলছেন, সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্, ঈশ্বর সত্য, ঈশ্বর হলেন জ্ঞান আর ঈশ্বর হলেন অনন্ত, যেমনি কোন গুণ লাগিয়ে দেওয়া হল, কোথাও ঈশ্বরকে যেন বেঁধে দেওয়া হল। গুণ দেওয়া মানে উপাধি চাপিয়ে দেওয়া, উপাধি দেওয়া মানে তাঁকে সীমিত করে ছোট করে দেওয়া হল, তিনি এটাই, এর বাইরে আর নেই। হিন্দু মুসলমানে লড়াই লেগেছে, যখন হিন্দু বলছি তখন হিন্দু একটা কোয়ালিফিকেশান, আমরা তাঁকে কোয়ালিফাই করে দিচ্ছি, কোয়ালিফাই করা মানে সীমিত করা। হিন্দু হওয়ার আগে সে একজন মানুষ, তুমি যেই হও, তুমি হিন্দু হও, মুসলমান হও, খ্রীশ্চান হও, মানুষ রূপে তুমি কাউকে মারতে পারো না।

আমাদের সমস্যা হল, আমরা জেনারেলটা ছেড়ে দিয়ে কোয়ালিফাইকে ধরি, তার আসল স্বরূপটাকে না ধরে তার উপাধিকে বেশি গুরুত্ব দিই। দেশের প্রধানমন্ত্রী, তিনি অনেক কিছু, তিনি একজন মানুষ, তিনি একটা রাজ্যের লোক, তিনি একটা কমিউনিটির লোক, তার সাথে তিনি একজন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীটা তাঁর একটা কোয়ালিটি, কোয়ালিটি তাঁকে বেঁধে দিচ্ছে। কোয়ালিটি কখন কাউকে বড় করে না; আমরা মনে করছি উপাধি দিয়ে তাঁকে বড় করছি। কিন্তু তা হয় না, উপাধি দেওয়া মানে, তাঁকে সীমিত করে দেওয়া হল। যেই বলছি ঈশ্বর দয়াময়, ঈশ্বরকে সঙ্গে সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হল। তিনি শুধু দয়াময় না, তিনি বিধান দেন, তিনি ন্যায় করেন, তার মানে এক সময় তিনি দয়া করেন আবার অনেক সময় মারেনও। মা কালীর বরাভয় মুদ্রা, কখন তিনি অভয় দিচ্ছেন, বর দান করছেন, আবার কখন রণচণ্ডী হয়ে অসুর দলন করছেন, দুটোই তিনি। যে গুণই আমরা ঈশ্বরের নিয়ে আসি না কেন, আমরা তাঁকে সীমিত করে দিচ্ছি। যেমনি বলছি, ঠাকুর আমাকে দেখবেন,

আমি কিন্তু ঠাকুরকে সীমিত করে দিলাম। কারণ আমি মনে করছি, ঠাকুর আমাকে দেখবেন। একটা মোকদ্দমা লড়ছি, ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছি, ঠাকুর মোকদ্দমায় যেন আমার জয় হয়, তার মানে ঠাকুরকে আমি সীমিত করে দিলাম। এখান থেকে স্বামীজী আবার বলছেন।

বস্তু ও সত্তাকে একসাথে না দেখার কারণ

Shankara further asks, can you see existence separate from everything else? (*শঙ্কর আরও জিজ্ঞাসা করেন, তুমি সত্তাকে আর সব বস্তু থেকে পৃথক করে দেখতে পারো?*) এখানে মাইক্রোফোনটা আছে, 'আছে' যখন বলে দিচ্ছি তার মানে মাইক্রোফোনের একটা সত্তা আছে। তাহলে সত্তাকে আলাদা দেখছি আর মাইক্রোফোনকে আলাদা দেখছি, তা কি কখন আমাদের মনে হয়? কখনই দেখি না। আমার বন্ধুকে দেখার সময় আমি তাকে যখন মানুষ রূপে দেখি, তখন কি বন্ধু রূপে দেখি? আবার বন্ধু রূপে যখন দেখছি তখন কি মানুষ রূপে দেখি? কখনই দেখি না। এই যে আমরা বার বার আলোচনা করছি *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*, সবই ব্রহ্ম, এই মাইক্রোফোনকে আমরা ব্রহ্ম রূপে দেখছি? দেখছি না। আমাদের যদি বলা হয়, এখানে যে কজন পুরুষ আছেন তাঁদের সবাইকে কিছুক্ষণের জন্য যদি ঠাকুর রূপে আর যে কজন মহিলা আছেন তাঁদের শ্রীশ্রীমা রূপে দেখতে বলা হয়, কিছুক্ষণের জন্য হয়ত দেখব, কিন্তু দু-এক মিনিটের মধ্যেই যে যেমন তাঁকে সেই রূপেই দেখতে থাকব। কিছুক্ষণ পর আবার যদি দেখতে বলা হয়, আমরা আবার দেখব। তার মানে এই যে দুটো জিনিস, ঠাকুর রূপে সবাইকে দেখছি, আর একসাথে মানুষ রূপেও দেখছি, এই দুটো একসাথে দেখা কখনই হয় না। হয় ঠাকুর রূপে দেখছি, নয় মানুষ রূপে দেখছি। হয় ব্রহ্ম রূপে দেখছি, নয়তো বস্তু রূপে দেখব, দুটো এক সঙ্গে হয় না। গাছকে যখন গাছ রূপে দেখি তখ ব্রহ্ম রূপে দেখি না, আর যখন ব্রহ্ম রূপে দেখছি তখন গাছ রূপে দেখছি না। তার মানে সত্তা, একটা যে ultimate existence, সৎ বলতে যেটা বোঝায়, সেটাকে কি বস্তুর বাইরে দেখা যায়? না, দেখা যায় না, আমরা এভাবে কখনই দেখতে পারি না। তাহলে এই মাইক্রোফোন আর এই গ্লাশ, দুটো বস্তুতে তফাৎ কোথায়? এটা কেন মাইক্রোফোন আর এটা গ্লাশ কেন? আর আমি 'আমি' কেন, আপনি 'আপনি' কেন? অথবা আমি কেন মাইক্রোফোন না, আমি কেন 'আপনি' না? এই তফাৎ কোথা থেকে আসছে? হিন্দু ধর্মই হোক, ইসলাম হোক বা খ্রীশ্চান হোক, সবারই প্রশ্ন শেষ সত্য কি? যে যে ধর্মের লোক, সে বলবে আমার কাছে শেষ সত্য আমার ভগবান। হিন্দুরা, বিশেষ করে যাঁরা বেদান্ত মতের, তাঁদের কাছে শেষ কথা হল, ব্রহ্মই আছেন। ব্রহ্মই যদি সত্য হয়ে থাকেন, তাহলে আমি যে এতগুলি জিনিস দেখছি, এগুলো কোথা থেকে এসে যাচ্ছে। এই সমস্যাটা থেকেই যাচ্ছে।

আচার্য শঙ্কর ঠিক এই জায়গাটাকে ধরছেন, এই তফাৎটা কোথা থেকে আসছে? ব্রহ্মই যদি শেষ সত্য হন, ঠাকুরই যদি এই সব কিছু হয়েছেন, তাহলে এই তফাৎটা কোন জায়গাতে হচ্ছে? যে কোন জিনিসকে দেখার সময় তিনটে জিনিস আসে – প্রথম আসছে বস্তু, যেমন এই মাইক্রোফোন একটা বস্তু, দ্বিতীয় ইন্দ্রিয়, কারণ ইন্দ্রিয় দিয়ে জ্ঞান আসছে আর তৃতীয় হল আমার মন, যেখানে জ্ঞানরাশি জমা হচ্ছে। তাহলে এই তিনটে জায়গার কোন একটা জায়গায় গোলমালটা হচ্ছে। এই মাইক্রোফোন আসলে ব্রহ্মেরই একটা রূপ, উপনিষদও তাই বলছে, *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*, যা কিছু আছে সব ব্রহ্ম, যা কিছু আছে সব নারায়ণ, হাতি নারায়ণ, মাহুত নারায়ণ, সবই নারায়ণ। কিন্তু দেখার সময় আমি হাতিকে হাতি দেখছি, মাহুতকে মাহুত দেখছি আর মাইক্রোফোনকে মাইক্রোফোন দেখছি। এই যে সব কিছুকে আলাদা আলাদা দেখেছি, তাহলে গোলমালটা এই তিনটে জায়গার কোন একটা জায়গায় হচ্ছে। হয় বস্তুর মধ্যে গোলমাল আছে, না হয় আমার ইন্দ্রিয়ের মধ্যে গোলমাল আছে আর নয়তো আমার মনের মধ্যে গোলমাল আছে।

ইন্দ্রিয়ের মধ্যে এই কারণেই গোলমাল নেই, যদি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে এই ক্ষমতা থাকত, তাহলে ইন্দ্রিয় সব কিছু এক সঙ্গেই নিয়ে নিত। ইন্দ্রিয় একটা যন্ত্র, ক্যামেরা চালু থাকলে সে সব কিছুকেই ক্যামেরাতে ধরে রাখবে। মাইক্রোফোনের যে সত্তা, তার যে existence, যেটা সৎ, এই যে ব্রহ্ম, যদি আলাদা দেখাটা চোখে থাকত, অর্থাৎ আসল জিনিসটা যদি চোখে থাকত, তাহলে চোখ একসাথে সব কটাকে ধরে নিত। ক্যামেরা যেমন রানিং, চোখটাও রানিং। ক্যামেরার ছবি যখন পরে দেখব তখন বলব, এটা ফুল, এটা প্রজপতি, ক্যামেরা

যেমনটি সামনে থাকবে তেমনটিই ভিতরে ধরে নেবে। ইন্দ্রিয়ও যেমনটি আছে তেমনটিই নিয়ে নেয়। তার মানে ইন্দ্রিয়ের গোলমাল হচ্ছে না।

এবার থাকল বস্তু আর মন। তার মানে হয় বস্তুতে গোলমাল, নয়তো আমার মনে গোলমাল। স্বামীজী বলছেন, Where the differentiation between two object? Not in sense-perception, else all would be one in it. We have to perceive in sequence. (*দুটি বস্তুর মধ্যে 'বিশেষ' বা পার্থক্য কোনখানে? ইন্দ্রিয়-জ্ঞানে নয়, কারণ তা হলে সব জিনিসই এক রকম বোধ হত। আমাদের বিষয়জ্ঞান একটার পর আর একটা, এই ক্রমে হয়ে থাকে।*) বস্তুকে যেমনটি আমরা দেখছি, এই মাইক্রোফোনের সাথে যে সৎ জিনিসটা আছে, pure existenceকে মাইক্রোফোনের সাথে এক সঙ্গেই দেখতাম, ইন্দ্রিয়ের এই ক্ষমতা আছে দেখে নেওয়ার, কিন্তু তা তো কখনই হয় না। আমরা জিনিসগুলি একটার পর একটা নিয়ে থাকি, ঠাকুরকে ঠাকুর রূপে দেখার সময় মানুষ রূপে দেখছি না, ঠাকুরকে মানুষ রূপে দেখার সময় ঠাকুরকে ভগবান রূপে দেখছি না। একসাথে ঠাকুরও আসবেন, মানুষও আসবেন, সেটা আসছে না।

In getting knowledge of what a thing is, we get also something which it is not. (*একটা বস্তু কি, তা জানতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে জানতে হয়, সেটা কি নয়।*) ফলে কি হয়, যখন আমরা একটা কোন বস্তুর জ্ঞান নিয়ে থাকি, তার সঙ্গে আরও অনেক কিছুর জ্ঞান নিই, যেটা আমরা বুঝতেও পারি না, সেটা হল –যে জিনিসগুলো সেই বস্তুটি নয়। যেমন, লাল গোলাপ দেখছি, লাল রঙ দেখছি, গোলাপ দেখছি, তার সাথে আরও অনেক কিছু দেখছি, এটা নীল নয়, এটা দোপাটি নয়। এও জিনিসগুলোকে নিয়ে অত খেয়াল রেখে আমরা কাজ করি না, কিন্তু সৎ আর অসৎ দুটোর perception একসাথেই আসে, আমরা এটা বুঝতেও পারি না। লাল গোলাপ দেখার সময় বুঝতে পারছি না যে, এটা যে অনেক কিছু নয়, এই জ্ঞানটা একসাথে আসছে। কিভাবে আসে?

স্বামীজী বলছেন, The differentiae are in the memory and are got by comparison with what is stored there. (*দুটি বস্তুর মধ্যে পার্থক্যগুলি আমাদের স্মৃতির মধ্যে অবস্থিত, আর চিত্তে যা সঞ্চিত রয়েছে তারই সঙ্গে তুলনা করে আমরা এগুলি জানতে পারি।*) আসল তফাৎটা কোথা থেকে আসে? আমাদের মনের মধ্যে সমস্ত স্মৃতিগুলি সঞ্চিত করা আছে, বাচ্চা বয়স থেকে আজ পর্যন্ত যা কিছু করে এসেছি, আগের আগের জন্ম থেকে এখানে আসবে না, আগের জন্মের থাকে সংস্কার, স্মৃতি থাকে না, এই জন্মে থাকে স্মৃতি, বাচ্চা বয়স থেকে আমরা যা কিছু শিখে এসেছি, সেই স্মৃতিগুলি আছে। যেমনি বস্তু থেকে একটা সিগনাল ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে মনের ভিতর গেল, গুগুলসে যেমন সার্চ করে সেকেণ্ডের মধ্যে তার রেজাল্ট দিয়ে দেয়, মস্তিষ্কও ঠিক তেমনি সেকেণ্ডের মধ্যে রেজাল্ট দিয়ে দেয়, এটা গোলাপ, এটা নীল নয়, হলুদ নয়। মস্তিষ্ক এত দ্রুত গতিতে এই কাজটা করে যে, যার ফলে কি কি জিনিস এটা নয়, এই ব্যাপারটা আমাদের চেতনাতে ধরা পড়ে না। কারণ যে যে জিনিস এটা নয়, এই বোধ যদি না থাকে তাহলে আমাদের মনের মধ্যে সংশয় উৎপন্ন হবে। বেদান্তের খুব প্রচলিত উপমা, অন্ধকারে একটা দড়ি দেখে ভাবছি, এটা দড়ি না সাপ। মস্তিষ্ক দুটোরই সিগন্যাল দিচ্ছে, দড়িও হতে পারে, সাপও হতে পারে। তার মানে যে জিনিসটা এটা নয়, সেটাকে পুরো আটকাতে পারছে না। কিন্তু আরও পাঁচটা জিনিস যদি থাকে, যেমন শরবৎ, শরবতে অনেক কিছু জিনিস মেশানো আছে, খাওয়ার পর বুঝতে পারছি, এতে চিনিও আছে, লেবুও আছে, নুনও আছে। তবে আসলে আমরা যখন একটা জিনিসকে নিয়ে থাকি, সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্ক জানিয়ে দিচ্ছে, এটা আছে, বাকি জিনিসগুলি নেই। অনেক কিছু যখন মেশানো থাকে, মস্তিষ্ক তখন যেগুলো আছে সেগুলোকেও জানায়, যেগুলো নেই সেগুলোকেও ধরে, সেখান থেকে আমরা বলছি, এটা ওই জিনিস। এই কাজ ইন্দ্রিয় করতে পারে না, আগে যেটা বলা হল, যদি পারত তাহলে সমস্ত জ্ঞান এক সঙ্গেই আসত। আমাদের এখানে জ্ঞান গুলো ধীরে ধীরে এক এক করে আসে।

এরপর স্বামীজী আবার একটা খুব মৌলিক সত্যকে নিয়ে বলছেন। Difference is not in the nature of a thing, it is in the brain. (*বস্তুর স্বরূপের মধ্যে ভেদ নেই, সেটা আমাদের মস্তিষ্কে রয়েছে।*) তফাৎ কখন বস্তুতে হয় না, তফাৎ সব সময় হয় আমাদের মনে। যখন কেউ কাউকে ভালবাসছে, ওই

ভালবাসাটা যাকে ভালবাসছে তার মধ্যে নেই, ভালবাসাটা যে ভালবাসছে তার মনের মধ্যেই আছে। আবার কাউকে অপছন্দ করছে, অপছন্দটাও ওই ব্যক্তিতে নেই, অপছন্দটাও তার মনের মধ্যে রয়েছে। আমি বলছি ওই লাল গোলাপটা আমাকে দাও, লাল আর গোলাপ ওই বস্তুতে নেই, ওটা আমার মনে আছে। যে জিনিসটা তফাৎ করে, চুম্বকের মত এটা লোহা আর এটা লোহা নয়, তুলোর মত হাল্কা আর লোহার মত ভারি, এই যে আলাদা করে দিচ্ছে, এটা বস্তুর গুণ নয়। জ্ঞানের তিনটে এলাকা, বস্তু, ইন্দ্রিয় আর মন। ইন্দ্রিয়কে প্রথমে বাদ দিয়ে দেওয়া হল, ইন্দ্রিয় সবটা একসাথে নিতে পারে না, আমরা এক সঙ্গে একাধিক জ্ঞান নিতে পারি না, একটার পর একটা জ্ঞান নিই, সেইজন্য এটা ইন্দ্রিয়ের কাজ নয়। থেকে গেল বস্তু আর মন। আচার্য শঙ্কর মনকে এক ভাবে আলোচনা করেন, বস্তুকে অন্য ভাবে আলোচনা করেন। স্বামীজী প্রথমে মনকে গুরুত্ব দিচ্ছেন, তাই মনকে নিয়ে আলোচনা চলছে। এই যে তফাৎ যেটা আসছে, যার জন্য বলছি, এটা অমুক ওটা তমুক, এই তফাতটা বস্তুতে নেই, তফাতটা রয়েছে তোমার মনে। আর বলছেন, বাইরে যা কিছু আছে, এটা হল, one solid homogeneous, এক অখণ্ড ও সম্পূর্ণ, কিন্তু আমরা এটাকে খণ্ডিত দেখি, আমরা এটাকে গুণের সাথে দেখি। এই কথা স্বামীজী আচার্য শঙ্কর থেকে নিয়ে আসছেন।

কার্য সব সময় কারণে নিহিত

আচার্য প্রথমে শুরু করেন এই বলে, কার্য সব সময় কারণের মধ্যেই থাকে। যেমন একটা ঘট, ঘট সব সময় আগে থেকেই মাটিতে আছে। যদি জিনিসটা আগে থেকে মাটির মধ্যে না থেকে থাকে, তাহলে শত চেষ্টা করে নিলেও মাটি থেকে ঘট আসবে না। মাটিতে ঘট আগে থেকেই আছে বলে ঘটটা বেরোল। গীতায় ভগবান বলছেন, *নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ*, অসৎ বস্তুর কখন ভাব হয় না, যদি হয়ে যেত তাহলে আমরা মাটি থেকে সরষের তেলও বার করে নিতে পারতাম। তেল বার করার জন্য আমরা সরষের বীজকেই পেষাই করি। কারণ ওর মধ্যে তেল আছে বলেই তেল বের হয়। যদি সত্যিই এমন হত, যে জিনিসটা নেই সেই জিনিসটা বেরোতে পারে, ঘট মাটিতে নেই অথচ মাটি থেকে ঘট বেরিয়ে এসেছে, যদি এটাই সত্য হত যে একটা সৎ বস্তু থেকে অসৎ বস্তু এসে যাচ্ছে, কারণ মাটি আমরা দেখতে পাচ্ছি, তাই মাটি সৎ। মাটির মধ্যে ঘট আছে বলে ঘট বেরোল। যদি এটা সত্য না হত, যে কোন জিনিস যেখান থেকে খুশি বেরিয়ে আসত, তাহলে মাটি থেকে তেল বেরিয়ে আসত। তাহলে আমাদের জীবনে যে এত রকমের সমস্যা, কোন সমস্যাই আর থাকত না। যার যেটা দরকার, যেখান থেকে খুশি বার করে নিয়ে আসত পারত।

এ্যটম বোমা ফাটানোর সময় ওর মধ্যে একটা এ্যটম রয়েছে আগে সেটাকে ফাটিয়ে দেওয়া হয়। এ্যটমকে ভেঙে দেওয়ার পর সেখান থেকে এনার্জি রিলিজ হয়। যখন অনেকগুলো এ্যটমকে ভেঙে দেওয়া হবে তখন সব এনার্জি মিলে একটা এ্যটম বোমা হয়ে যায়। এ্যটম বোমা মানে আর কিছু না, যে কোন একটা এ্যটমকে ভেঙে দেওয়া। কোন মা হয়ত বলতে পারে, ‘এর জন্য এতো কাঠখড় পোড়ানোর কি আছে, আমার বাচ্চা ছেলেকে পাঠিয়ে দিলেই ভেঙে দিয়ে আসতো, ওতো দিনরাত সব কিছু ভেঙে বেড়াচ্ছে’। কিন্তু এভাবে এ্যটম বোমা হয় না। যখন এ্যটম বোমা ফেটে গেছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়ে গেছে, সব কিছু হয়ে যাওয়ার পর আমেরিকার সব বিজ্ঞানীদের মনে হল, আমাদের এত কিছু সাইন্টিফিক আইডিয়া আছে সব কটাকে নোট করে পেটেন্ট করিয়ে নেওয়া হোক। তা নাহলে অন্যান্য দেশ যদি এগুলো করতে যায়, তখন আমরা পিছিয়ে যাব। আমেরিকানদের এটা একটা খুব ফেভারিট জিনিস, যেখানে যা আইডিয়া পাবে সেটাকে প্রথমেই পেটেন্ট করিয়ে নেবে আর সব কিছুই পেটেন্ট করাতে থাকবে। আর ওরা বলল, পেটেন্ট হল ওয়ান ডলার, তারপর এ্যক্সামিন করা হয়।

একজন একটা আইডিয়া দিয়েছে, যুদ্ধের জন্য যখন ট্যাঙ্ক যাবে তখন ট্যাঙ্কে একটা মেশিন লাগানো থাকবে, মেশিন রাস্তার ধুলো গুলিকে সাক্ করবে, ধুলোর এ্যটম গুলিকে ফাটাবে আর পিছনে থেকে শুধু এ্যটম বোমা ছাড়তে থাকবে। যদি এটাকে বাস্তবে রূপ দিয়ে তৈরী করে নেওয়া হয়, তাহলে আমরা যে এত অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করছি, এগুলো আর কিছু করতে হবে না। একটা পোড়ো বাড়ি, যেটা নড়বড়ে হয়ে আছে, সেটাকেই ভাঙতে গিলে কত কিছু লাগে, সেখানে একটা সলিড বাড়ি ভাঙতে আরও কত কিছু লাগবে, আর হিমালয়কে ভাঙে কত কি লাগবে আমরা কল্পনাই করতে পারব না। রিচার্ড ফাইনম্যান খুব মজা করে বললেন, একটা

unstable এ্যটমকে ভাঙতে কত শক্তি লাগে আপনাদের জানা আছে? আর ধুলো যেটা পুরোপুরি stable, একেবারে গ্যাঁট হয়ে বসে আছে, ওই ধুলোকে ভাঙতে গিয়ে কি হবে আপনাদের জানা আছে? দুম্ করে এই ধরণের কিছু আইডিয়া নিয়ে এলো, লোকেরাও তাতে ঝাপিয়ে পড়ল।

এদের ধারণা যে, যেখান থেকে যে কোন জিনিস বেরিয়ে আসবে। বুঝতে পারছে না যে, এ্যটম বোমা ধুলোতে পোটেনশিয়ালি রয়েছে, ওকে বার করা যায় না। আচার্য শঙ্কর এটাই বলছেন, যে জিনিসগুলো যতক্ষণ না লাগালে একটা জিনিস বেরোবে না এটা ঠিক, কার্য কারণ আমরা বলছি যেখানে সরাসরি যেটা লেগে আছে। তুমি বলবে ধুলো উড়ছে, ট্যাঙ্ক যাচ্ছে, ট্যাঙ্ক ওই ধুলোকে তুলবে আর বুম্ বাম্ করে ফাটাবে আর সেই এনার্জি দিয়ে গাড়ি চলবে, আর তেলের সমস্যা থাকবে না। এভাবে কখনই হয় না। আচার্য শঙ্কর বলছেন, সাধারণ ভাবে আমরা যে জিনিসগুলো দেখি সেটা যেন খুব সহজে বেরিয়ে আসে। কিন্তু বেরিয়ে আসুক আর নাই আসুক, জানতে হবে কার্য সব সময় কারণের মধ্যে রয়েছে। কার্য ও কারণ যদি এক অপরের মধ্যে থাকে তাহলে নূতন জিনিস আমরা কি করে দেখি?

সৎ ও অসতের তফাৎ

আচার্য শঙ্কর তখন তাঁর ভাষ্যের অনেক জায়গায় বলছেন, দুটি বস্তু যদি সমানধর্মী না হয় তাহলে এই দুটো কখনই মিশবে না। এক অপরের সাথে মেশানোর জন্য কোথাও না কোথাও তাদের সমান থাকতে হবে। যদি সমানধর্মী না হয়, তাহলে তৃতীয় একটা জিনিসকে নিয়ে আসতে হবে, যে ওই দুটোকে মেলাবে। আর ওই ঘটক যদি সমানধর্মী না হয়, তখন ওই ঘটককে ওখানে মেলানোর জন্য আরেকজনকে লাগবে। আমরা চোখ দিয়ে যে দৃশ্য দেখছি, দৃশ্য যে জিনিস দিয়ে তৈরী, চোখ যদি সেই জিনিস দিয়ে তৈরী না হয়ে থাকে, তাহলে একটা তৃতীয় জিনিস লাগবে। যেমন ঘোড়া আর গাড়ি, ঘোড়া আলাদা গাড়ি আলাদা, দুটো বিষম ধর্মী, ঘোড়া আর গাড়িকে মেলানো যায় না। মেলানোর জন্য আরেকটা তৃতীয় সত্তা লাগবে, তখন মানুষকে লাগবে। মানুষ গিয়ে ঘোড়া আর গাড়িকে মিলিয়ে দিয়ে করে দিল ঘোড়ার গাড়ি। পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, যে কোন পরিবর্তন, মাটি থেকে ঘট হচ্ছে, বুঝতে হবে সেই জায়গায় আসলে কোন পরিবর্তন হয় না, শুধু অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে। অবস্থান পরিবর্তন না হয়ে যদি পুরো অন্য জিনিস হত, আর সমানধর্মী যদি না হয়, তাহলে একটা তৃতীয় জিনিস লাগবে। তৃতীয় জিনিসের অভাব, তার মানেই হল, যখনই কোন জিনিসের পরিবর্তন হয়, তখন বুঝতে হবে যে, আসলে কোন পরিবর্তন নেই, শুধু একটা অবস্থান পরিবর্তন হয়েছে। তার মানে, ঘটের মধ্যে মাটি সব সময় আছে আর মাটি যখন আছে, মাটির ভিতরে ঘট সব সময়ই আছে।

সাংখ্য দর্শন বলে, এই যে মাটি থেকে ঘট, এখানে বাস্তব পরিবর্তন হয়। কিন্তু আচার্য শঙ্কর সাংখ্যের এই মতবাদের বিরুদ্ধে খুব জোরালো যুক্তি রাখছেন। বাস্তব পরিবর্তন মানে তার ধর্ম পাল্টে গেছে। ধর্ম যদি পাল্টে গিয়ে থাকে, তাহলে ধর্ম পাল্টানোর জন্য আরেকটা সত্তা লাগবে, তার মানে ধর্ম পাল্টাচ্ছে না। বেদান্ত আর সাংখ্যে ঠিক এই জায়গাতে দ্বন্দ্ব হয়। সাংখ্য বলে মাটি থেকে ঘট যখন হয় তখন এই পরিবর্তনটা বাস্তবিক। বেদান্ত বলে এটা বাস্তবিক নয়, কারণ বাস্তবিক যদি হয় তাহলে ধর্মটা পাল্টে গেছে, ধর্ম পাল্টে গেছে মানে একটা তৃতীয় সত্তা এসে গেছে। তৃতীয় সত্তা এলে তার পিছনে আরেকটা চতুর্থ সত্তাও আসবে, এরপর পঞ্চম, ষষ্ঠ চলতেই থাকবে, থামবে না। এটা একটা বিরাট লম্বা যুক্তি। এটাকেই সংস্কৃতে বলে অনবস্থাদোষ। কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে কোন ঠিক নেই। তার মানে, যত রকম আমরা পরিবর্তন দেখছি, নূতনত্ব যা কিছু দেখছি, আসলে কোথাও কোন পরিবর্তন নেই, শুধু অবস্থা পাল্টাচ্ছে, জিনিসটা যেমন তেমনই আছে। যেমন স্বপ্নে দেখছি এখান থেকে আমি দিল্লী গেলাম, দিল্লী থেকে বোম্বে গেলাম, আসলে আমি কোথাও যাইনি, যেখানে ছিলাম সেখানেই আছি।

বাস্তব জগতে ঠিক এটাই হয়। আগেও আমরা আলোচনা করেছি, আমরা যখন কোন বস্তু দেখি, তখন বস্তুতে আমরা সব সময় দুটো জিনিস একসাথে দেখি। আমরা এই মাইক্রোফোন দেখছি, আমাদের মন সব সময় দুটো জিনিসকে নেয়, মাইক্রোফোনকেও নিচ্ছে, আর 'আছে' এই জিনিসটাকেও নিচ্ছে। এবারে এই মাইক্রোফোনকে যদি ভেঙে দেওয়া হয়, তাহলে গ্লাশ আছে, 'আছে' জিনিসটা থেকে যাচ্ছে। এবার

মাইক্রোফোনটা ছিল আর গ্লাশ আছে। মাটিটা ঘট হয়ে গেছে। মাটি কোথায়? মাটি নেই, ঘট আছে। মাটিটা হয়ে গেল ঘট, ‘আছে’টা হয়ে গেল কমন্, এই ‘আছে’কে বলে অস্তি, সংস্কৃতে বলে সৎ। যখনই আমরা কোন জিনিসকে পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে নিচ্ছি, তখন দুটো জিনিস সব সময় ঘটছে, একটা জিনিস যেটা ছিল সেটার পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে, আরেকটা জিনিস কোন অবস্থায় পরিবর্তিত হচ্ছে না। এই যে একটা জিনিসের পরিবর্তন হচ্ছে না, এটাই সৎ। আমরা অনেক সময় কিছু জিনিস দেখি যার দুটো গুণ আছে, যেমন লাল গোলাপ, লাল গোলাপের গোলাপ একটা জিনিস আর লাল আরেকটা জিনিস। মাটি বা ঘট আছে, মাটি একটা আলাদা বস্তু আর ‘আছে’ একটা আলাদা কিছু, এটা কিন্তু তা নয়।

এই যে বলা হল, অবস্থার শুধু পরিবর্তন হচ্ছে, এর আরও গভীরে গিয়ে চিন্তা করলে দেখা যাবে, আগে যে সৎ জিনিসটার কথা বলা হল, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় যা কিছু আছে, সব কিছুর পিছনে এই সৎ জিনিসটা সব সময় থাকছে। যেমন ঘট আগে ছিল না, আগে ছিল মাটি; মাটিটা পাল্টে হয়ে গেল ঘট, মাটি পাল্টে ঘট হওয়ার পরেও কিন্তু সৎ বা ‘আছে’ জিনিসটা কোন অবস্থাতেই চলে গেল না। যখন মাটি ছিল তখনও ছিল, মাটি পাল্টে ঘট হয়ে গেল তখনও ‘আছে’ জিনিসটা থাকছে, ঘট যখন ভেঙে টুকরো হয়ে যাবে তখনও ‘আছে’ থাকবে, আর যখন সমস্ত মাটিকে নাশ করে দেওয়া হবে তখন অন্য কোন জিনিসে থাকবে। আমরা বলছি বিগ ব্যাঙ হল, তখনও কিন্তু আছে, অস্তি ভাবটা এসে যাচ্ছে। যখন কোন কিছুই ছিল না, তখনও কিন্তু এই অস্তি ভাবটা ছিল।

ঠিক তেমনি মনের দিক দিয়ে দেখলে, মনে আমরা যা কিছু চিন্তা ভাবনা করছি, যখন কল্পনা করছি, ভুলভাল ভাবছি বা দেখছি, তখনও দেখা যাচ্ছে একটা বোধ ভাব সব সময় থেকে যাচ্ছে। মনে মনে ভাবছি, ওই ভাবার মধ্যেও একটা বোধ থাকছে, তার সাথে ওই চিন্তা। ওই যে বোধ হচ্ছে, যে একটা কিছু আছে, যেমন আমি মনে মনে গরুর কথা ভাবছি, গরুর পরে কল্পনার মধ্যে একটা ছাগল এসে গেল। এই অস্তি বোধ, চিন্ত-ভাবনাতে বোধ, বহির্বস্তুতে বোধ, ওই অস্তি বোধটা সব সময় থাকছে। তার মানে, মনের চিন্তার জগৎই হোক, বাইরের দৃশ্যমান জগৎই হোক, অস্তি, যেটাকে আমরা সৎ বলছি, ওটা সব সময় চলছে। এই যে সৎ, এটাই হল বস্তু, এটা দিয়েই সমস্ত কিছু তৈরী হচ্ছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু, মনের জগতের যা কিছু, সব এটা দিয়েই তৈরী হচ্ছে।

মনের জগতে আরও মজার কি হয়, কোন কিছু আমরা তখনই বোধ করি, যখন একটা বস্তু নিজেকে স্বপ্রকাশ হয়ে সামনে দেখিয়ে দেয়। এখানে মাইক্রোফোন আছে, মাইক্রোফোনকে জানার জন্য অন্য কোন বস্তু লাগবে না, মাইক্রোফোনটা স্বপ্রকাশ। বলছেন, যে জিনিসটা নেই, সে কখন নিজেকে দেখাতে পারে না। একটা জিনিস যে অসৎ, একটা জিনিস যে নেই, এর একটাই প্রমাণ সে নিজেকে দেখাতে পারে না। তাহলে যখন মিথ্যা কল্পনা হয়, দড়িকে যখন সাপ দেখি তখন কি হয়? এই ব্যাপারে বলছেন, পুরনো কোন স্মৃতি আছে, এই জায়গাতে এসে ওই স্মৃতিটা ঢুকে যায়, তখন দড়িতে সাপ দেখছি। দড়ি আছে, দেখছি সাপ, সাপটা হয়ে গেল আমার পিছনের স্মৃতিতে কিছু আছে, সেই স্মৃতি এসে বাস্তবিক জ্ঞানকে আটকে দিচ্ছে, আর অবাস্তবিক জ্ঞানকে সামনে নিয়ে আসছে। কিন্তু বহুর যে জ্ঞান, যেটা আমাদের মনের ভিতরে রয়েছে, এই বহুর জ্ঞান এসে অখণ্ডের জ্ঞানকে আটকে দেয়, ফলে আমরা ব্রহ্মকে জানতে পারি না, ঈশ্বরকে দেখতে পাই না, ঈশ্বরের জায়গায় আমরা সব সময় জগৎকে দেখছি।

নৈরন্তর্য আর বিপর্যয়, এটাই সৎ আর অসতের তফাৎ। যেমন এই মাইক্রোফোন আছে, এটা গতকালও মাইক্রোফোন ছিল, আজও মাইক্রোফোন আছে আর আগামীকালও মাইক্রোফোন থাকবে। ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ তিন কালেই থাকবে, সব জায়গায় সমান ভাবে থাকেবে, তবেই এটা সৎ বস্তু হবে। কোন বস্তু তবেই সৎ হবে, যেটা দেশ, কাল ও বস্তুতে সমান ভাবে অবারিত ভাবে চলে। অসৎ হল, যেমন এই গ্লাশ আছে, গ্লাশের মধ্যে মাইক্রোফোন নেই। গ্লাশ বা মাইক্রোফোন কারখানায় তৈরী হয়েছে, তৈরী হওয়ার আগে গ্লাশ বা মাইক্রোফোন ছিল না, ভবিষ্যতে দুটোই কালের নিয়মে বিনাশ প্রাপ্ত হবে। একটা বস্তুকে আমরা তখনই সৎ বলব, যেটা সদা, সর্বদা, সর্বত্র, সর্বকালে আছে। অসৎ, বা যেটা মায়াতে অবিচ্ছিন্ন হবে, এটা তখনই হবে যখন সীমিত করে দেওয়া হচ্ছে। আমি যখন বহু দেখছি, যখন আমি কল্পনা করছি, যখন মিথ্যা কিছু দেখছি,

সব ক্ষেত্রেই কিন্তু দেখার ভাবটা থেকে যাচ্ছে। দেখার ভাবের মধ্যে একটা সৎ ভাব রয়েছে, তার মানে কিছু একটা আছে, তা যে রূপেই থাকুক, একটা বস্তু কিছু আছে, এটাকে নাকচ কখনই করা যাবে না। এরপর আমার মনের ভিতরে যে জিনিসগুলো আছে, সেগুলো গিয়ে ওটাকে আলাদা করে দেয়। এই হল সংক্ষেপে আচার্য শঙ্করের বক্তব্য।

স্বামীজী এবার এর উপর বলছেন, তিনি বলছেন, আসলে কিন্তু সমস্ত কিছু সেই এক, homogeneous one, তফাৎটা বাইরে কোথাও নেই। আচার্য শঙ্করের দৃষ্টিতে কারণটা কার্য হয়ে যায়, কারণ যদি কার্য না হত, তাহলে আমরা যে কোন জিনিস থেকে যে কোন জিনিস বার করে নিতাম। আর কারণ আর কার্য যদি আলাদা হত, দুটোর পরিবর্তন যদি বাস্তব হত, তাহলে ওটাকে এক জায়গায় আনার জন্য একটা তৃতীয় একটা সত্তার দরকার হত। তৃতীয় জিনিসটা যদি আবার সমানধর্মী না হয় তাহলে চতুর্থ আরেকটা বস্তু লাগবে। এইভাবে এটা চলতেই থাকবে, যার ফলে অনবস্থাদোষ এসে যাবে, যাকে দর্শনের নিয়মে অনুমতি দেওয়া হয় না। তার মানে দেখা যাচ্ছে, এই মাইক্রোফোনটা আগে কোন জিনিসের ভিতরে ছিল, কারিগররা নিজেদের স্কিল দিয়ে ওটাকে ওখান থেকে বার করেছে। এই গ্লাশকে যদি পিছনের দিকে ঠেলে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হয়, শেষে সমস্ত কিছু একটা পদার্থের একত্বে গিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। পদার্থের একত্ব গিয়ে দাঁড়ায় এনার্জিতে।

আচার্য শঙ্কর এটাকে আবার লিঙ্ক করিয়ে দিচ্ছেন, আমরা যে চিন্তা ভাবনা করছি, সেখানেও সেই একটা বোধ আছে। কি সেই বোধ? আমরা যে বলছি আত্মা আছেন, ভগবান আছেন, এনার্জি আছে, প্রকৃতি আছে, চৈতন্য আছে, অচৈতন্য আছে, এখানেও কিন্তু ওই 'আছে' জিনিসটা চলছে, 'আছে' জিনিসটা থেকেই যাচ্ছে। আচার্য শঙ্কর বলছেন, ওই যে 'আছে' জিনিসটা, যেটা কখনই 'না আছে'তে যাবে না, ওটাই একমাত্র সেই জিনিসটা, যার সত্তা আছে। আরও বড় ব্যাপার হল, ওই সত্তা নিজেকে দেখাতেও পারে। কারণ যে জিনিসটা বাস্তবে কখনই নেই, সেই জিনিস নিজেকে কখনই দেখাতে পারে না। তার মানে আমরা যখনই কোন বস্তুকে, কোন কিছুকে দেখছি, আমি আপনাকে দেখছি, আপনি আমাকে দেখছেন, এইজন্যই দেখছি আমি আছি, আপনি আছেন। আর একমাত্র ওই সৎই আছে। আগে যেমন বলা হল, যখন চিন্তা ভাবনা হচ্ছে সেখানেও যে একটা সৎ থেকে যাচ্ছে, ওই সৎ আর এই সৎ এক। যিনিই চৈতন্য তিনিই আছেন, যিনিই আছেন তিনিই চৈতন্য স্বরূপ। স্বামীজী এটাকে আরও ব্যাখ্যা করবেন। স্বামীজী বলছেন, এই যে তফাৎ, কারণ এটা আমাদের স্মৃতিতে আছে, স্মৃতিতে আছে বলে আমরা সব কিছুকে আলাদা আলাদা দেখছি।

স্বামীজী যে বলছেন তফাৎটা আমাদের মনে, তার মানে, এখানে আমাদের বেশি কিছু বুঝতে হবে না, শুধু এটুকু বুঝতে হবে, আমরা যে বহু দেখছি, এই বহু কি বস্তুর মধ্যে, নাকি আমাদের মস্তিষ্কে? বস্তু আর ইন্দ্রিয়কে অনেক আগেই বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। জিনিসটা খুবই সহজ, আমরা যদি একটা ফাঁকা মাঠে একসাথে অনেকগুলি কাক দেখি, আমরা কোন কাককেই তফাৎ করতে পারব না। একজন মহারাজ ছিলেন, উনি পাখি খুব ভালবাসতেন, দেখা যেত উনি একটা কাকের সাথে অনেক কথা বলতেন, একটা কাককে দেখে উনি বলতেন, কিরে তোকে অনেকদিন দেখিনি। কাকটাও কা কা করে সাড়া দিত। মহারাজকে জিজ্ঞেস করা হত, কাকটা কি আপনার কথা বুঝতে পারে? উনি থেকে থেকে কাককে বিস্কুট খাইয়ে যাচ্ছেন আর বলছেন, আমি কাককে কখন খাওয়াই না, কিন্তু কিভাবে কিভাবে এই কাকটার সাথে একটা সম্পর্ক হয়ে গেছে। আপনি তফাৎ করতে পারেন যে, এই কাকটা সেই কাকই? উনি বললেন, তোমরাই দেখে নাও। যতক্ষণ ওখানে বসে থাকলেন ততক্ষণ কাকটার সাথে কথা বলে গেলেন, আর কাকটা শুধু কা কা করে যাচ্ছে। এখন অত কাকের মধ্যে মহারাজ ওই কাকটাকেই চেনেন। আমাদের কাছে সব কাকই এক। দুজন চীনা লোক যদি কথা বলে, শুনলে আমাদের মনে হবে কৌটাতে কয়েকটা পয়সা দিয়ে নাড়াচ্ছে। ইমোশান গুলি আমরা বুঝতে পারব, কিন্তু টানা বলে গেলে আমাদের কাছে ওদের কথাগুলো একটা শব্দ মাত্র মনে হবে। কিন্তু যারা চীনা ভাষা জানে, তারা সমস্ত কথার তফাৎ বুঝতে পারবে। এই তফাৎটা যদি ওই শব্দের মধ্যে থাকত, তাহলে আমি, আপনি সবাই বুঝতে পারতাম, কিন্তু যাদের চীনা ভাষার ট্রেনিং আছে তারাই একমাত্র সমস্ত শব্দের তফাৎটা বুঝতে পারে। একটা হাতি আছে, আরেকটা ছাগল আছে, আমাদের চিনে নিতে কোন অসুবিধা হয় না, এটা হাতি আর

এটা ছাগল। চীনা ভাষায় কখন হাতি বলছেন, কখন ছাগল বলছে আমরা বুঝতে পারছি না। কারণ আমাদের মস্তিষ্ক এখনও ওই তফাৎটা আনতে পারেনি। কিন্তু চাইনিজদের কাছে সমস্ত শব্দগুলিই আলাদা।

তাহলে আসল তফাৎটা কোথায় আছে? বলা হয় যে, সমস্ত শব্দ সেই ওঁ থেকে বেরিয়েছি, সমস্ত শব্দ সেই এক। আসল যে জিনিসটা একটা থেকে আরেকটাকে পুরো আলাদা করে দেয়, সেটা সবটাই মস্তিষ্কে। আমরাও যে একটা হাতি আর ছাগলকে আলাদা দেখি, ওই তফাৎটাও আমাদের মস্তিষ্কে বসানো আছে। যদি না বসানো থাকত, তাহলে আমরা কোন একটা জেনেরিক টার্ম নিয়ে নিতাম। এক পাল গরু যাচ্ছে, আমার কাছে যেটা এক পাল গরু, কিন্তু গোয়ালা তার প্রত্যেকটা গরুকে আলাদা করে জানে, তাদের চরিত্রকে আলাদা করে জানে। গোয়ালা কখনই এক পাল গরু বলবে না। ছেলেদের দল যাচ্ছে, যিনি মাস্টার, যিনি ছেলেদের পড়ান, তিনি কখনই বলবেন না, এক গাদা ছেলে বা ছেলেদের দল যাচ্ছে। এটাকেই স্বামীজী আচার্য শঙ্করের বক্তব্যকে নিয়ে বোঝাচ্ছেন যে, আসল তফাৎটা রয়েছে মস্তিষ্কে।

বলছেন, Differentiae become qualities when they are separate but joined in one object. (*এই 'বিশেষ'গুলিই গুণপদবাচ্য হয় –যখন তারা পৃথক পৃথক থাকে, অথচ কোন একটি জিনিসের সঙ্গে জড়িত থাকে।*) এই যে আলাদা আলাদা ফ্যাক্টর, যেমন আমরা বলি লম্বা, বেঁটে, রোগা, মোটা, বড়, ছোট এগুলো আলাদা আলাদা গুণ। তার মানে, এই গুণগুলো একটা জিনিসকে আরেকটা জিনিস থেকে আলাদা করে দিচ্ছে। কিন্তু যেমনি এটা কোন বস্তুতে লেগে যায়, তখন আমরা বলি গুণ। খাবারটা একটু বেশি হয়ে গেছে, বা বলছি খাবার কম হয়ে গেছে, এই বেশি আর কম এটা হল বিশেষণ। বড় হাতা নিয়ে এসো, ছোট হাতা নিয়ে এসো, লোকটা মোটা, লোকটা রোগা, বড়, ছোট, মোটা, পাতলা এগুলো সব গুণ। বস্তুতে এগুলো লেগে গেলে তখন এগুলো হয়ে যায় ওই বস্তুর বিশেষণ। আসলে এগুলো ওদের পুরো আলাদা একটা entity, যেটা একটা বস্তুকে আরেকটা বস্তু থেকে পৃথক করে দিচ্ছে। বলছেন, We cannot say positively what differentiation is. (*এই 'বিশেষ' জিনিসটা কি, তা আমরা ঠিক করে বলতে পারি না।*) বিশেষণকে পরিষ্কার করে যে বলা হবে, বড় বস্তুটা কি, ছোট বস্তুটা কি, অর্থাৎ আলাদা করে বিশেষণ জিনিসটাকে বোঝান যায় না। কিন্তু যেমনি বস্তুর সাথে মিশে যায় তখন আমরা বুঝতে পারি।

আমরা সব কিছুর মধ্যে সেই সৎ পদার্থকেই দেখি

সেইজন্য কি হয়? All that we see and feel about things is pure and simple existence, 'is-ness'. All else is in us. (*আমরা বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে দেখতে পাই ও অনুভব করি কেবল সত্তা বা একটি 'অস্তি'ভাব। আর যা কিছু সব আমাদের মধ্যে রয়েছে।*) আমরা যাবতীয় যা কিছু দেখছি, আসলে দেখছি সেই সৎ পদার্থকে। স্বামীজী এই সৎকে, 'is-ness'কে আরও ব্যাখ্যা করবেন। সত্তা, সৎ, যাই বলা হোক, আসলে আমরা দেখি শুধু 'আছে'। ওর পিছনে রয়েছে মস্তিষ্ক, ওই মস্তিষ্কেই ওই তফাৎটা রয়েছে বলেই আলাদা আলাদা দেখছি। একটা সহজ উপমা দিলে আমরা বুঝতে পারব। সমুদ্রের জলরাশি সবটা মিলে এক জল। সূর্যের তাপে সমুদ্রের জল বাষ্প হয়ে মেঘ সৃষ্টি হল। সেই মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়ে সমুদ্রের ওই জলরাশি সব আলাদা আলাদা হয়ে গেল। আলাদা জলধারা হয়ে বিভিন্ন নদীতে মিশে প্রবাহিত হতে লাগল। ওই জলধারাই আলাদা হয়ে গঙ্গার মাধ্যমে বেলুড় মঠের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হল। সেই গঙ্গার জল পাইপের সাহায্যে স্টোরেজ গিয়ে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট হয়ে আমাদের ঘরে ঘরে ট্যাপ কলে এলো। এবার সেই ট্যাপের জল থেকে হয়ে গেল, এটা খাবার জল, এটা স্নানের জল, বেসিনেরর জল, বাগানের জল, সব আলাদা আলাদা জল হয়ে গেল। ওই ট্যাপের জল নিয়ে আমরা বরফ বানাবার জন্য ডীপ ফ্রীজে কিউবের মধ্যে দিয়ে দিলাম। বরফ জমার পর বাইরে এনে বরফের আলাদা আলাদা কিউব বেরিয়ে এল। ছিল সমুদ্রের এক জলরাশি, এখন হয়ে গেল বরফের আলাদা আলাদা টুকরো। ইতিমধ্যে উত্তরাখণ্ডে জলকে নিয়ে কেউ হয়ত আলাদা কিছু করে দিল। এরপর দু জায়গার বরফের জলের যদি দেখা হয়, তখন বলবে তুমি কে ভাই? আরে ভাই আমার অনেক বিরাট লম্বা ইতিহাস, আমি হিমালয় থেকে বেরিয়ে ঘুরে ঘুরে গঙ্গা হয়ে বেলুড় মঠে এসে পড়লাম। তোমার কি পরিচয়? আমিও হিমালয়ের বাসিন্দা।

নরেন্দ্রপুর থেকে একজন বেলুড় মঠে ফোন করেছে। ফোন ধরতেই জিজ্ঞেস করছে, 'আপনি কি সেক্রেটারি মহারাজ বলছেন'? 'না'। 'আপনি কি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মহারাজ'? 'না'। 'ও আপনি স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল মহারাজ'? 'না'। 'তাহলে'? 'আমি বেলুড় মঠের একজন সাধু'। ভক্তরা যখন দেখে এই মহারাজ বড় কিছু, তখন সেই মহারাজকে খুব সম্মান দেয়। এমনি সাধু মানে যেমন তেমন। সমতলের বরফ যে আছে, সে বলবে, আমি এমনি বরফ, গঙ্গাজল পিউরিফাইড হয়ে ট্যাপে এই বিবেকানন্দ ইউনিভার্সিটির ফ্রীজে বরফ হয়েছি। তার মানে এই বরফের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। আরে ভাই তুমি যে কলু সেই কলু। তোমরা সবাই সেই এক, কোন তফাৎ নেই। সমস্ত তফাৎ হয় মস্তিষ্কে এসে, আসলে কোথাও কোন তফাৎ নেই। আমরা যাবতীয় যা কিছু দেখছি সেই ব্রহ্মকেই দেখছি, সেই সৎ বস্তুকে দেখছি। যা কিছু তফাৎ বলে বোধ হয়, সব এই মস্তিষ্কে হয়।

Being is the only positive proof we have of anything. (*কোন বস্তুর সত্তা সম্বন্ধেই শুধু আমরা নিঃসংশয় প্রমাণ পেয়ে থাকি।*) একটু আগে যেটা বলা হল, যে কোন সত্তা যেটা স্বয়ংপ্রকাশ সেটাই আমাদের দেখিয়ে দেয়, যে জিনিসটা দেখিয়ে দেয়, একমাত্র এটাই তার প্রমাণ। ভূত কেন নেই? কারণ সবাই ভূত দেখে না। ঠিক এই জিনিসটাকেই নিয়ে এসে বলে যে, ঈশ্বর কেন নেই? কারণ ঈশ্বরকে সবাই দেখতে পায় না। এই কথা শোনার পর যাঁরা ঈশ্বর দর্শন করেছেন, তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে বলবেন, তুমি এই এই জিনিসগুলো এই ভাবে করতে থাক, তুমিও ঈশ্বরকে দেখতে পারবে। তোমার মন বহুর মধ্যে এমন হারিয়ে গেছে বলেই তুমি দেখতে পারছ না। ত্যাগ, বৈরাগ্য অবলম্বন করে ধ্যান ধারণা কর, তুমিও একদিন ঈশ্বর দর্শন করতে পারবে।

পারমার্থিক সত্তা ও ব্যবহারিক সত্তা সব সময় থাকবে

স্বামীজী আবার বলছেন, All differentiation is really 'secondary reality', as the snake in the rope, because the serpent, too, had a certain reality, in that something was seen although misapprehended. (*বিশেষ বা ভেদগুলি প্রকৃতপক্ষে গৌণভাবে সত্য –যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান, কারণ ঐ সর্পজ্ঞানেরও সত্যতা আছে; ভুলভাবে হলেও একটা কিছু তো দেখা যাচ্ছে।*) আমরা যে কোন জিনিসকে যে দেখছি, ওটা secondary, primary নয়। Primary জিনিসটাকে বলা হচ্ছে পরমার্থ বস্তু, secondary জিনিসটাকে বলা হয় ব্যবহারিক সত্তা। পারমার্থিক সত্তা কক্ষণ কোন অবস্থায় পরিবর্তিত হবে না, যেমনটি আছে তেমনটিই ছিল আর তেমনটিই থাকবে। আমাদের কাছে পূজা আলাদা, কাজ আলাদা, যখন পূজো করছি তখন সেটাকে কাজ দেখি না, যখন কাজ করি সেটাকে পূজো দেখছি না। এটাই আগে বলা হয়েছিল, যখন একটা ভাবনা থাকে তখন অন্য ভাবনা বা চিন্তা থাকে না। যেমন একজন কম্প্যুটারে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। তার কাছে কম্প্যুটার একটা পূজার মত জিনিস। সে কম্প্যুটার চালাবার সময় হার্ডডিস্ক, সিপিকে প্রণাম করে কম্প্যুটার অন্ করে। আগামীকাল কোন কারণে কম্প্যুটার যদি পুরো খারাপ হয়ে যায়, বাড়িতে আগুন লেগে কম্প্যুটার যদি পুড়ে গিয়ে নষ্ট হয়ে যায়, তখন সে কি করবে? একটু চোখের জল ফেলবে ঠিকই, কিন্তু কম্প্যুটারটা নিয়ে ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে আরেকটা নূতন কম্প্যুটার নিয়ে আসবে। এবার কার পূজা হবে? নূতন কম্প্যুটারের। তাহলে এই যে এতদিন কম্প্যুটারের পূজা করছিল, সেটা কোথায় গেল? কম্প্যুটারটা টেম্পোরারি, পূজাটা পার্মানেন্ট। কেমেস্ট্রির ইক্যুয়েশান গুলিতে একটা কনস্ট্যান্ট আছে আর একটা ভ্যারিয়েবেল আছে। ভালবাসা জিনিসটা কনস্ট্যান্ট আর ভালবাসার পাত্র বা পাত্রী হল ভ্যারিয়েবেল। এখানে এটাই বলা হচ্ছে, সৎ জিনিসটা কনস্ট্যান্ট, আকারটা ভ্যারিয়েবেল। কম্প্যুটার আর কম্প্যুটারের যে পূজা, পূজাটা কনস্ট্যান্ট আর কম্প্যুটারটা ভ্যারিয়েবেল। এই জিনিসটাকেই এখানে বোঝান হচ্ছে। শুনলে প্রথমে আমাদের মনে হবে জিনিসটা খুব কঠিন, কিন্তু খুব কঠিন নয়, একটু চিন্তা করলেই খুবই সিম্পল মনে হবে।

স্বামী যতিশ্বরানন্দজী তাঁর 'ধ্যান ও আধ্যাত্মিক জীবন' বইতে বলছেন, মানুষ মরে যাবে তাও চিন্তা ভাবনা করবে না। এখানে স্বামীজীর দেববাণীর আলোচনা বন্ধ করে আমরা যদি খোল করতাল নিয়ে কীর্তন করতে শুরু করি, তখন এখানে আর ভক্তদের ভিড় সামলানো যাবে না। কারণ উচ্চ চিন্তার দিকে গেলে মস্তিষ্ক বিদির্ণ হতে শুরু করে। হিমালয়ের যত উপরে উঠতে থাকবে তত যেন দম বন্ধ হয়ে আসে, ঠিক তেমনি যত

উচ্চ চিন্তনে মানুষ যাবে তত সে হাঁফাতে শুরু করবে, কারণ মানুষ উচ্চ চিন্তন নিতে পারে না। কিন্তু আমরা একটু যদি চিন্তা ভাবনা করি, দেখতে পাবো এগুলো এমন কিছু কঠিন নয়। বলতে চাইছেন, দুটো সত্তা সব সময় থাকবে, পার্মানেন্ট, যেটা কনস্ট্যান্ট আর ভ্যারিয়েবেল।

বস্তু জ্ঞান ও স্মৃতি

When the knowledge of the rope becomes negative, the knowledge of the snake becomes positive, and vice versa; but the fact that you see only one does not prove that the other is non-existent. (*যখন রজ্জুজ্ঞান বাধিত হয়, তখনই সর্পজ্ঞানের আবির্ভাব হয়, আবার সর্পজ্ঞানের লোপে রজ্জুজ্ঞানের আবির্ভাব। কিন্তু তুমি একটা মাত্র জিনিস দেখছ বলে প্রমাণিত হয় না যে, অন্য জিনিসটা নেই।*) দিনরাতই আমাদের কিছু না কিছু অধ্যাস হয়ে যায়। দড়ি পড়ে আছে, আমরা মনে করছি সাপ। বাচ্চারা সাপকে মনে করে দড়ি, বড়রা দড়িকে মনে করে সাপ। বড়দের মনে ভয় ঢুকে যায়। বাচ্চাদের মনে এখনও সাপের ভয় ঢোকেনি। সাপের নিজস্ব একটা সত্তা আছে, সেটা আমাদের মস্তিষ্কে স্টোর হয়ে আছে। দড়িরও একটা সত্তা আছে, সেটাও মস্তিষ্কে স্টোর হয়ে আছে। অন্ধকারের জন্য দড়ির মধ্যে কোন সত্তা যে ঢুকবে ঠিক নেই। আমরা যে সব সময় দড়ি দেখে ভয় পাই তা না, যেমন এই ঘরে ইলেক্ট্রিক্যাল এই তার গুলো মেঝেতে রাখা আছে। অন্ধকারে যদি আমরা এখানে এসে যাই, আমরা জানি এখানে তার আছে, আমরা দেখে ভয় পাবো না। কিন্তু এমন জায়গায় যাচ্ছি যেখানে কোন কিছু পড়ে থাকার কথা নয়, কিন্তু হঠাৎ দেখছি কিছু একটা পড়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্ক থেকে সিগন্যাল এসে গেলো সাপ এই রকম ভাবে আসে। তার মানে, যে কোন জ্ঞান কখনই জ্ঞান রূপে আসে না, আমাদের মেমরিগুলিই জ্ঞান রূপে আমাদের কাছে আসে। বস্তুর সেনসেশান গুলো গিয়ে মস্তিষ্কে টোকা মারে, আমাদের যে জ্ঞানরাশি মজুত আছে সেখান থেকে জ্ঞান বেরিয়ে আসে।

জ্ঞান যদি আগে থেকে না থাকে তাহলে কি হবে? কেনোপনিষদে যেমন বলছেন, ইন্দ্র, অগ্নি আর বায়ু দেবতারা দেখছেন একটা বিচিত্র জিনিস, *কিমিদং যক্ষমিতি*, এই বিচিত্র যক্ষ কি হতে পারে? জ্ঞান বেরোতে পারছে না, সব এলেমেলো হয়ে যাচ্ছে। তখন উমা হৈমবতী এসে বলছেন, ইনিই ব্রহ্ম। এবার একটা তথ্য এসে স্টোর হয়ে গেল। এরপর যদি ওই রকম কিছু দেখে, তখন বলবে, এটা সেই ব্রহ্ম। জীবনে আমাদের যে শিক্ষা হয়, সেখানে এটাই হয়, শৈশবকাল থেকে বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত আমরা প্রচুর ইনফরমেশান নিতেই থাকি। সেইজন্য দেখা যায়, যাঁরা দেশে বিদেশে প্রচুর ঘোরাঘুরি করেছেন, প্রচুর বই পড়েছেন, এনারাই জ্ঞানী হন। বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে, বিভিন্ন বই পড়ে, বিভিন্ন রকম মানুষের সাথে মেলামেশা করে জ্ঞানের প্রকাশ হয়। যাঁরা উপন্যাসাদি লেখেন তাঁদের মধ্যে জ্ঞানের অনেক রকম প্রকাশ থাকে। সন্ন্যাসীরা কোন উপন্যাস লিখতে চাইলে লিখতেই পারবেন না, তাঁদের সমাজ, জগতের ব্যাপারে অভিজ্ঞতা বা ধারণা সীমিত। যারা সংসারে আছে সন্ন্যাসীদের থেকে তারা অনেক বেশি অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। সন্ন্যাসীরা আবার কল্পনাও করতে পারেন না যে – নেতারা এই রকম চুরি করতে পারে, অপরকে নিন্দা গালাগাল করতে পারে, বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, সন্ন্যাসীদের কাছে এই জিনিসগুলো খুব অবাক লাগে, মানুষ এই ধরণের হতে পারে? কারণ সমাজ, রাজনীতির ব্যাপারে তাঁদের কোন অভিজ্ঞতা নেই। লোকের সাথে মেলামেশা, পড়াশোনা এইজন্যই দরকার, তা নাহলে অনেক কিছু জানতে পারবে না। দেশে-বিদেশে ঘোরাঘুরি, মানুষের সাথে মেলামেশা, প্রচুর পড়াশোনা এই জন্যই দরকার, একগাদা ইনফরমেশান ডাটা মস্তিষ্কের মধ্যে বসে যাচ্ছে।

দেববাণীর কথাগুলো আমরা শুনছি, আমাদের কাছে খুব কঠিন মনে হচ্ছে, কারণ এই আইডিয়াগুলো আমাদের মস্তিষ্কে নেই। ঈশ্বর জ্ঞানকে এই জন্যই সত্য বলা হয়, কারণ যখন একজনের মনে এই ঈশ্বর জ্ঞান হয়েছে, তার মানে আগে থেকে ওই জ্ঞান রয়েছে। কিন্তু আগে তো কখন ঈশ্বরকে দেখেনি, ঠাকুরও আগে মা কালীকে দেখেননি, তা সত্ত্বেও তিনি দর্শন করেছেন। তার মানে মা কালীর সত্ত্বা কোথাও তাঁর ভিতরে আগে থেকেই ছিল। ঠাকুরের ভিতরে যদি থাকতে পারে তাহলে আমার আপনার ভিতরেও মা কালীর সত্ত্বা থাকতে বাধ্য। তার মানে আমরা চেষ্টা করলে আমরাও ঈশ্বরের জ্ঞানটা পেয়ে যাব। তাহলে ভূতের ব্যাপারটা কি হবে? ভূত জিনিসটা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই একটা অধ্যাস, মিথ্যা একটা জ্ঞান হয়ে যায়, যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রম।

আরও কিছু ভূতের যেসব ব্যাপার আছে, আমাদের কাছে ওগুলোর কোন গুরুত্ব নেই, আর আমাদেরও ওগুলো উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু একজনও যদি কখন ইতিহাসে কেউ দেখে থাকে, তাহলে জানতে হবে এটা সত্য, আর সবাই এটা দেখে থাকবে, কারণ তার সত্তা আছে। ঠাকুরের যদি মা কালীর দর্শন হয়ে থাকে তাহলে আমাদেরও দর্শন হতে বাধ্য। ঠাকুরের যদি নির্বিকল্প সমাধি হয়ে থাকে, তাহলে আমাদেরও হতে বাধ্য, কারণ ওই জ্ঞানটা আগে থেকেই আমাদের সবারই ভিতরে রয়েছে। বন্ধ্যাপুত্র, মানুষ কল্পনায় বলতে পারে, কারণ সবাই বন্ধ্যা কি সেটাও জানে আর পুত্র কি সেটাও জানে। দুটোকে মিলিয়ে বলে দিল বন্ধ্যাপুত্র। কিন্তু বন্ধ্যাপুত্র বলে কিছু হয় না, কেউ দেখেনি, কেউ কোন দিন দেখবেও না। আমরা আলোচনা করছি যদি কোন জ্ঞান আমাদের ভিতরে আগে থেকে না থাকে আমরা ওই জ্ঞান কোন দিনই পাব না।

তাহলে মিথ্যা জ্ঞানগুলো কেন হয়ে থাকে? আচার্য শঙ্কর এই জায়গায় অধ্যাসকে নিয়ে আসেন। বলছেন, অনেকগুলো কারণে আমরা একটা জিনিসকে দেখতে পারি না। তার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল obstruction। চোখের সামনে যদি একটা এক টাকার কয়েন রেখে দেওয়া হয়, আমরা তখন হিমালয়কেও সামনে দেখতে পারব না। কয়েনটা হল কাঞ্চন, চোখের সামনে কামিনী-কাঞ্চন, লোভ, হিংসা, নামযশের আকাঙ্খা রয়েছে, ভগবানকে দেখবে কি করে! স্বামীজী এখন বলছেন, The idea of the world is an obstruction covering the idea of God and is to be removed, but it does have an existence. (*জগৎ-জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়ে তাকে আবরণ করে রেখেছে, তাকে দূর করতে হবে, কিন্তু তার যে অস্তিত্ব আছে, এ-কথা স্বীকার করতেই হবে।*) এই যে আমরা সামনে জগৎ দেখছি এর সত্তা আছে, যেমন সাপের সত্তাও আছে, দড়িরও সত্তা আছে। সমস্যা হল এই জগৎকে আমরা চোখের সামনে নিয়ে আসছি, সেইজন্য ঈশ্বরকে আমরা দেখতে পারছি না। চোখের সামনে থেকে এই জগৎকে যতক্ষণ না সরানো হচ্ছে, ততক্ষণ ঈশ্বরকে দেখা যাবে না। কিন্তু যদি বলা হয় এই জগতের কোন সত্তা নেই, এটা কিন্তু সম্পূর্ণ ভুল, কারণ এর ব্যবহারিক সত্তা পুরোদমে রয়েছে। এরপর আরেক ধাপ এগিয়ে সৎ, চিৎ সেই একই জিনিসকে নিয়ে বলছেন।

অনুভূতি - চৈতন্য - চেতনা

Shankara says again, perception is the last proof of existence, (*শঙ্কর আরও বলেন যে, অনুভূতিই অস্তিত্বের চরম প্রমাণ।*) একটা জিনিসকে আমি সামনে দেখছি, স্বয়ংপ্রকাশ, আমার সামনে যদি প্রকাশিত হয়, তার মানেই বুঝতে হবে ওটা আছে। It is self-effulgent and self-conscious, because to go beyond the senses we should still need perception, (*অনুভূতি স্বয়ংজ্যোতি ও আত্মসচেতন, কারণ ইন্দ্রিয়জ্ঞানের বাইরে যেতে গেলে আমরা তাকে ছাড়তে পারি না।*) যদি কোন অতিন্দ্রিয় জ্ঞান প্রাপ্ত করতে হয়, তাহলে তখন কিন্তু আমাদের ইন্দ্রিয়কে ছাড়তে হবে। ইন্দ্রিয়ের সাহায্য নিয়েই শেষ অবস্থায় পৌঁছাতে হবে, সেখানে যাওয়ার পরেই ইন্দ্রিয় থেকে বেরোতে পারব। সেইজন্য জ্ঞান বলতে আমরা যেটা বুঝি, ইন্দ্রিয়জ্ঞান, যেটাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলা হয়, প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর কোন অবস্থাতেই কোন প্রশ্ন করা যাবে না। কারণ প্রত্যক্ষ প্রমাণের বাইরে যখন যাচ্ছি, যখন অনুমান প্রমাণে যাচ্ছি, তখনও কোথাও একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকছে, তবেই গিয়ে সেটা অনুমান প্রমাণ হয়। যেখানে শব্দ প্রমাণের কথা বলা হয়, বেদ উপনিষের যে জ্ঞানের কথা বলা হয়, সেখানেও প্রত্যক্ষ প্রমাণ একটা বড় ভূমিকা পালন করে। লোকেরা মনে করে ধর্ম মানে বিশ্বাস, একেবারেই তা নয়, ধর্ম মানে পুরোদমে প্রত্যক্ষ প্রমাণ। পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে যে জ্ঞান আসে, এটাই শেষ কথা। ঠাকুরের কথা, বেদের কথা, উপনিষদের কথা, গীতার কথা, সমস্ত কথাই যে বাস্তব, একেবারে সত্য, কারণ তার একটা প্রমাণ এগুলো সবটাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। যখন ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞান হচ্ছে, তখনও কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রিয়কে ধরে রাখে, ওই জায়গায় গিয়ে ইন্দ্রিয়কে ছাড়ছে, আবার যখন ওই অবস্থা থেকে ফেরত আসছে তখন সেই ইন্দ্রিয়তেই এসে নামতে হয়। কিন্তু তখনও তার বোধ হয় আমি এই প্রত্যক্ষকে ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু প্রত্যক্ষ থাকবেই। বলছেন যে, সমস্ত জ্ঞান স্বয়ংপ্রকাশ, এই জ্ঞান কাউকে দেখিয়ে দিতে হয় না। জ্ঞান হল জ্ঞান, কারণ ইন্দ্রিয় দিয়ে আসছে। এই জ্ঞানকে কোন প্রশ্ন করা যাবে না। যদি প্রশ্ন করা যায়

তাহলে জগতে যা কিছু আছে সব কিছুই প্রশ্নের মধ্যে এসে যাবে, আমার যে নিজের সত্তা, এই সত্তাও প্রশ্নের মধ্যে এসে যাবে। সেইজন্য আচার্য শঙ্করও বলছেন, প্রত্যক্ষ প্রমাণকে কোন দিন প্রশ্ন করা যাবে না।

এই যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ, mental state, যাকে perception বলছেন, এটাকে নিয়েই আবার বলছেন, Perception is independent of the senses, of all instruments, unconditioned, (*অনুভূতি কোন ইন্দ্রিয় বা কারণ-সাপেক্ষ নয়, সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ।*) বোধ বা অনুভূতি হওয়া জিনিসটা কোন ইন্দ্রিয় বা কোন কারণের উপর নির্ভর করে না, অনুভূতি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। There can be no perception without consciousness. (*চেতনা ব্যতীত অনুভূতি হতে পারে না।*) যতক্ষণ চেতনা না থাকছে, ততক্ষণ একটা বস্তুর বোধ হতে পারে না; perception has self-luminosity, which in a lesser degree is called consciousness. (*অনুভব স্বপ্রকাশ, তারই নিম্নতর মাত্রার প্রকাশকে 'চেতনা' বলে।*) আমাদের যা কিছু বোধ হয়, এই বোধ স্বয়ংপ্রকাশ। বোধ, স্বয়ংপ্রকাশ মিলিয়ে আমরা বলি consciousness। আমরা অনেকবার আলোচনা করেছি বিদেশীরা consciousness জিনিসটাকে ধরতেই পারছে না, আর এই নিয়ে তারা সারাদিন মাথা খারাপ করে যাচ্ছে। চৈতন্য আর চেতনা এই দুটোকে নিয়েও আমরা আগে আগে অনেক আলোচনা করেছি। বিদেশীরা consciousnessকে নিয়ে অনেক কিছু বলে যাচ্ছে, আমাদের কাছে consciousness মানে চৈতন্য। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় consciousness মানে হয় চেতনা। একটা বস্তুর যখন বোধ হয়, বস্তুর সাথে স্বয়ংপ্রকাশ যে জ্ঞানটা ভেসে ওঠে, এটাকে আমরা সাধারণ ভাবে মনে করি consciousness, বা চেতনা।

স্বামীজী আরও বলছেন, Not one act of perception can be unconscious; in fact, consciousness is the nature of perception. (*কোনপ্রকার অনুভব-ক্রিয়াই চেতনারহিত হতে পারে না, প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক অনুভূতির স্বরূপই হচ্ছে চেতনা।*) যা কিছু আমরা বোধ করে থাকি, এই বোধ জিনিসটাই consciousness। বিদেশীরা ঠিক এই জিনিসটাকে নিয়ে গবেষণা করে, কিন্তু আমাদের কাছে consciousness আলাদা। Existence and perception are one thing, not two things joined together. (*সত্তা আর অনুভব এক বস্তু, দুটি পৃথক ভাব এক সঙ্গে জোড়া নয়।*) এর আগে আমরা দেখেছি সৎ আর চিৎ এই দুটো একই জিনিস। সমস্ত বস্তুর নীচে একটা সত্তা রয়েছে, যা কিছু জিনিস বা বস্তুকে আমরা জানছি, সেখানে একটা সত্তা রয়েছে। আর যে জিনিসটা আছে, একমাত্র সেই জিনিসটাই স্বয়ংপ্রকাশ হয়। যে জিনিসটা আছে সেই জিনিসটাই নিজেকে দেখাতে পারে, যে জিনিসটা নেই সেই জিনিসটা কখনই নিজেকে দেখাতে পারবে না। বন্ধ্যাপুত্র কোন দিন নিজেকে দেখাতে পারবে না, কারণ সে আদপেই নেই। ফলে এই consciousness জিনিসটাই হল বোধ আর এই consciousness জিনিসটা স্বয়ংপ্রকাশ। কারণ মনের মধ্যে যে বোধ আসছে, এটাকে জানার জন্য তৃতীয় কোন কিছু লাগে না, এই সৎ জিনিসটা স্বয়ংপ্রকাশ। সৎও যা চৈতন্যও তাই। আমরা মনে করি এই গ্লাশ, গ্লাশের চেতনা আমার মনের মধ্যে জুড়ে আছে, কিন্তু তা না। এই গ্লাশটাই আমার কাছে mental state হয়ে, perceiption হয়ে আসে, কিন্তু শেষ কথা হল সৎ অর্থাৎ যে জিনিসটা আছে, সৎ মানে সচ্চিদানন্দের সৎ, সৎও যা চৈতন্যও তাই।

অনুভূতি অনন্ত স্বরূপ, স্বসংবেদ্য

That which needs no cause is infinite; so, as perceiption is the last proof of itself, it is eternal. (*যার কোন কারণ বা প্রয়োজন নেই, তাই অনন্ত; সুতরাং অনুভূতি যখন নিজেই নিজের চরম প্রমাণ, তখন অনুভূতিও অনন্ত স্বরূপ, অনুভূতি সর্বদা স্বসংবেদ্য।*) যেটা অনন্ত তার আর কোন প্রমাণ লাগে না, কারণ তাকে কেউ সৃষ্টি করেনি। আর perception, এই যে প্রমাণ, এই বোধ, এটাই শেষ কথা। আমরা যখন জেগে থাকি, স্বপ্ন যখন দেখছি, যখন গভীর নিদ্রায় আছি, সব অবস্থায় আমি বোধটা সব সময় থাকছে। It is always subjective; perceiption itself is its own perceiver. (*অনুভূতি নিজেই নিজের জ্ঞাতাস্বরূপ।*) বোধটা সব সময় হয় নিজের ব্যাপার, বাইরে থেকে বোঝা যায় না। আমরা যে মনে করি, আমি দেখছি, আমি জানছি, আমি শুনছি, আসলে তা হয় না। আমি দেখছি বা শুনছি, এই যে বোধটা হয়, আসলে এই বোধটা নিজেকেই বোধ করে। ওর পিছনে আরেকজন কেউ আছে, সে দেখছে, তা

না। স্বয়ংপ্রকাশ মানেই তাই, স্বয়ংপ্রকাশ মানে নিজেকেই নিজে দেখে। এগুলো বোঝা কঠিন, কিন্তু বোঝার একটু চেষ্টা তো করতে হয়।

মনে যখন একটা চিন্তা উঠল, যেমন এই গ্লাশ দেখলাম, মনে গ্লাশের একটা জ্ঞান উদয় হল, এই যে জ্ঞান উদয় হল, এই জ্ঞান নিজেকেই জানে, এই নয় যে, এই গ্লাশ জ্ঞানকে দ্বিতীয় কোন জিনিস জানছে। আমাদের একটা ভুল ধারণা হয়ে আছে যে, আমাদের মনের মধ্যে যে বৃত্তিগুলি অবিরাম উঠছে আমরা মনে করছি ওই বৃত্তিগুলিকে অন্য কেউ দেখছে। জলাশয়ের উপমা অনেকবার নেওয়া হয়েছে, জলাশয়ে একটা পাথর ছুঁড়ে ফেললাম, জলে ঢেউ উঠল। ওই ঢেউটা কে দেখছে? আমি দেখছি বলে ঢেউটা আছে। চিন্তা-ভাবনার জগতে তা হয় না, চিন্তা-ভাবনার জগতে যে বৃত্তিগুলি ওঠে, ওই বৃত্তিটাই জ্ঞান, যেটা জ্ঞান আসলে সেটাই জ্ঞাতা; জ্ঞান আর জ্ঞাতা আলাদা কিছু না। যেমন জলাশয়ের ঢেউগুলিকে সবাই দেখছে, তেমনি আমরা মনে করি চিন্তা-ভাবনার জগতেও কেউ আছে, যে এই বৃত্তিগুলিকে দেখছে, আমি দেখছি মনে করছি। কিন্তু তা কখনই হয় না, বৃত্তিটা স্বয়ংপ্রকাশ, ওটাই জ্ঞান, ওটাই জ্ঞাতা। মন মানেই সমস্ত চিন্তা-ভাবনাকে এক সঙ্গে নিয়ে যেটা সেটাই মন।

মন ও মনের চিন্তা-ভাবনা আলাদা নয়

স্বামীজী এখানে এটাই বলছেন, Perception is not in the mind, but perception brings mind. (*অনুভূতি মনের ধর্ম নয়, কিন্তু তা থেকেই মন হয়েছে।*) আমরা তখন থেকে যে মন মন বলে যাচ্ছি, আসলে মন কখনই perceive করে না, perception জিনিসটাই মন। আমরা সব সময় বলি, আমার মনে এখন অনেক চিন্তা-ভাবনা চলছে, তখন মনে করছি, আমার মন একটা আলাদা বস্তু আর চিন্তা-ভাবনাগুলি আলাদা বস্তু, আসলে কিন্তু তা নয়, চিন্তা ভাবনাটাই মন। স্থূল জগৎকে দেখে দেখে আমাদের এমনটা হয়ে গেছে। আচার্য শঙ্কর যেমন বলছেন যুস্মদ্ অস্মদ্ প্রত্যয়, আমি আলাদা, যাকে জানছি সে আলাদা, ফলে যেখানেই যাচ্ছে সেখানেই মনে করছে আমি আলাদা তুমি আলাদা। এমনকি আত্মার ক্ষেত্রেও তাই মনে করছি, আমার আত্মা যখন বলছি, তখনও মনে করছি আমি একজন আলাদা আমার আত্মা আরেকজন আলাদা। আরে ভাই আত্মাই তো সব কিছু জানছে। ঠিক তেমনি আমাদের মনের ভিতরে যে চিন্তা ভাবনাগুলি উঠছে দেখছি, আসলে মনের ভিতরে কিছু উঠছে না, চিন্তা ভাবনাগুলিই মন। চিন্তা ভাবনাগুলিও ঠিক মন নয়, চিন্তা ভাবনার যে জ্ঞান, আমার মনে চিন্তার উদয় হল, এই যে বোধ করছি, বোধ যে জায়গাটায় হচ্ছে, সেই বোধটাই আসলে মন। যখন বলছি আমি মাইক্রোফোনকে দেখছি, মাইক্রোফোনের জ্ঞানের যে বোধটা আমার ভিতরে এলো, এই বোধটাই হল মন। যত বোধ হতে থাকবে মন তত চঞ্চল ও জটিল হবে। বোধ যত কমবে, তার মানে আইডিয়া তত কমে যাচ্ছে, তখন মন খুব শক্তিশালী হয়ে যাবে। মা তার সন্তানকে যখন খুব ভালবাসছে, তখন মায়ের মনে একটাই ভাব থাকে, সন্তানের ভালবাসা, ফলে ওই ভাবটা খুব গভীর হয়।

যখনই বলা হয় খুব গভীরে গিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে, তার মানেই হয় ওই একটা জিনিসের ভাব ছাড়া মনে আর অন্য কিছুর ভাব যেন না থাকে। কিন্তু জপধ্যানে বসতে গেলেই জগতের সব রকম চিন্তা ভাবনা হাজির হয়ে যায়। জপের সময় ঠাকুরকেও ভাবছি, মাছ কেনার কথা, সব্জি কেনার কথাও ভাবছি, ওকে গালাগাল দিতে হবে, তাকে এই শিক্ষা দিতে হবে, ফোনের রিচার্জ করতে হবে, সব চিন্তাই হুড়মুড় করে চলে আসে। এরপর কি করে ঠাকুরের ধ্যান হবে! ধ্যান করা মানে এই নয় যে, ঠাকুরের ছবিতে মনকে একাগ্র করা। ধ্যান করা মানে, এই যে এত রকমের চিন্তা ভাবনা, যেগুলো কিছু বাইরে থেকে আসে, কিছু আমার স্মৃতির ভিতর থেকে আসে, সব চিন্তা-ভাবনাকে ছেড়ে দিয়ে একমাত্র একটা ভাবকে নিয়ে অনেকক্ষণ থাকা। এই যে এত রকমের চিন্তা ভাবনার ঢেউ, নিজে থেকেই যে ঢেউগুলি উঠছে, বাইরে থেকে কিছু ঢিল পড়ছে, সেখান থেকে আবার ঢেউ উঠছে। দরজা জানলা বন্ধ করে, মশা মারার তেল জ্বালিয়ে, পাখার আওয়াজ যাতে বেশি না হয়, সব কিছুকে ঠিক করে চোখ, কান বন্ধ করে ধ্যান করতে বসলাম, আশা করছি পাঁচটি ইন্দ্রিয় আর বাইরের দিকে যাবে না। কিন্তু স্মৃতির তলদেশে যে স্মৃতিগুলি পড়ে আছে, কল্পনা যেগুলো আছে, সেগুলো কোথায় যাবে? ধ্যান মানেই, যেমনি কোন ঢেউ উঠল, ওকে বলতে হয়, শান্ত হও। সমস্যা হল, শান্ত হতে বলা

মানে, আমি আলাদা আর ওই চিন্তার ঢেউটা আলাদা। জিনিসটা কিন্তু তা নয়। ব্যাপারটা প্রচণ্ড একটা জটিল পদ্ধতি।

আমাদের মনে যত চিন্তা উঠছে, প্রত্যেকটি চিন্তা, যেটা আমাদের মনে একটা বোধ তৈরী হচ্ছে, ওই বোধের সাথে যে চিন্তা, আর চিন্তার যে বোধ, অর্থাৎ বোধ আর চিন্তা একসাথে চলে। বোধ যেটা করে, তা হল, ধীরে ধীরে যে চিন্তাগুলোর বেশি গুরুত্ব নেই সেগুলোকে ছেড়ে দেয়। শেষে শুধু বোধটুকু থেকে যায়, চিন্তাগুলি চলে যায়। সব বোধ চলে গেলেও কিন্তু একটা বোধ থেকে যাবে, তা হল ঈশ্বর চিন্তা। কিন্তু নির্বিকল্প সমাধিতে সেই বোধটাও চলে যায়, কোন কিছুরই বোধ থাকে না। কিছুই থাকে না তাও বলা যায় না, যেটা থাকে সেটাকে আর মুখে বলা যায় না। এরপর তার গলা কেটে দেওয়া হোক, আর যাই করা হোক না কেন, তার কোন বোধই হবে না, কারণ তখন তার বোধটাও চলে গেছে। মনে একটাও যদি চিন্তা থাকে, শুধু ঈশ্বরকে নিয়েই ভেবে যাচ্ছি, তখন ঈশ্বরও আছেন আর বোধও আছে। এরপর, যেমন ঠাকুর ওই অবস্থায় জ্ঞান অসি দিয়ে মা কালীকে দ্বিখণ্ডিত করে দিলেন, মা কালীও চলে গেলেন, মা কালীর বোধও চলে গেল, নির্বিকল্প সমাধিতে চলে গেলেন। আমাদের ক্ষেত্রে সমস্যা হল, যখনই আমাদের কোন চিন্তন থাকবে তখন তার বোধও থাকবে। ফলে সেকেণ্ডের মধ্যে আমাদের হাজার হাজার চিন্তা ঢুকছে আর হাজার হাজার চিন্তা বেরিয়ে যাচ্ছে, মনটাও তাই একটা উদ্বেলিত সমুদ্রের মত হয়ে আছে, কোথা থেকে আর ধ্যান হবে!

পূর্ণই একমাত্র জ্ঞাতা, বোধটাই আত্মা কিন্তু অহংশূন্য

বলছেন, চৈতন্যই বলি আর মনই বলি, দুটো আলাদা কিছু নয়। বলছেন, It is absolute, the only knower, so perception is really the Atman. (*পূর্ণই একমাত্র জ্ঞাতা, সুতরাং প্রকৃতপক্ষে অনুভূতিই আত্মা।*) এই যে চৈতন্য, যার জন্য চেতনা হয়, আসলে ওটাই আত্মা, এই আত্মা যেন চেতনার বোধ সৃষ্টি করে, চেতনার বোধের জন্যই নানা রকমের চিন্তা ভাবনা চলতে থাকে, জগৎ থেকে অনেক কিছু এসে ভিতরে ঢেউ সৃষ্টি করছে, সব কিছু মিলিয়ে বিরাট তোলপাড় হয়ে যাচ্ছেতাই অবস্থা হয়ে যায়। একটু ধ্যানে গেলে এই জিনিসগুলো টের পাওয়া যায়।

আবার বলছেন, Perception itself perceives, but the Atman cannot be a knower, because a 'knower' becomes such by the action of knowledge, but, Shankara sayas, 'This Atman is not I', because the consciousness 'I am' (Aham) is not in the Atman. We are but the reflections of that Atman; and Atman and Brahman are one. (*অনুভূতি স্বয়ং অনুভব করে, কিন্তু আত্মাকে 'জ্ঞাত' বলা যেতে পারে না; কারণ আত্মা বললে জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার কর্তাকে বুঝায়। কিন্তু শঙ্কর বলেন, আত্মা 'অহং' নন, কারণ তাঁতে 'আমি আছি' এই ভাবটি নেই। আমরা (অহংভাব) সেই আত্মার প্রতিবিম্বমাত্র, আত্মা ও ব্রহ্ম এক।*) আত্মাকে আমরা প্রায়ই জ্ঞাতা বলছি, কিন্তু 'জ্ঞাত' নন। কারণ 'জ্ঞাত' হলেই আত্মা আলাদা হয়ে যাবে, বস্তু আলাদা হয়ে যাবে। জ্ঞান যেটা হয়, এটাই জ্ঞাতা, এটাই জ্ঞান আর এটাই জ্ঞেয়। আমি যে মাইক্রোফোনকে দেখছি, এখানে আমি জানি, আমি আছি, মাইক্রোফোন আছে, মাইক্রোফোনকে আমি দেখছি বলে জানছি, অর্থাৎ ক্রিয়াও আছে। কিন্তু আরও গভীরে গেলে দেখা যাবে, এই যে আমার মাইক্রোফোনের বোধ, এই বোধটাই দাঁড়াচ্ছে আমি জ্ঞাতা রূপে, মন দাঁড়াচ্ছে জ্ঞেয় রূপে আর জ্ঞান ওই রূপে ওই জিনিসটাকে নিয়ে দাঁড় করাচ্ছে। কথামৃতে আছে, এক জাদুকর এসে রাজার সামনে আঙুল ঘোরাতে শুরু করল আর লাগ ভেলকি লাগ বলতে থাকল, রাজাও দেখছে ঘোড়া দৌড়াচ্ছে, সৈন্যরা দৌড়াচ্ছে, কত কিছু হয়ে বেরিয়ে গেল। আসলে কিছুই হচ্ছিল না, জাদুকর শুধু আঙুল ঘোরাচ্ছিল। এখানেও কিছু হচ্ছে না, শুধু একটা বোধ আছে। ওই বোধ ছাড়া কিছু নেই, ওই বোধ আমিকেও সৃষ্টি করে দিচ্ছে, মাইক্রোফোনকেও সৃষ্টি করে দিচ্ছে আর আমি মাইক্রোফোনকে জানছি, এই জানার বোধটাও সৃষ্টি করছে। আসলে কিছুই নেই, আছে শুধু ওই বোধটুকু। ওই বোধ ত্রিপুটি হয়ে তিনটের মধ্যে ভেঙে গিয়ে একদিকে হয়ে যায় subject, অন্য দিকে হয়ে যায় object, মাঝখানে হয়ে যায় verb। এগুলো আমাদের কারুর কাছে মনে হবে আবোলতাবোল কিছু বলা হচ্ছে, কারুর কাছে মনে হবে খুব উচ্চ কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু

আসলে একেবারেই কিছু না, খুবই simple জিনিস, একটু বোঝার চেষ্টা করলেই বুঝতে পারবে, জিনিসটা অত্যন্ত সহজ।

পুকুরে ঢেউ উঠছে, ঢেউ দুটো কারণে উঠতে পারে, পুকুরে মাছ আছে, মাছগুলো ঘাই মারছে পুকুরে ঢেউ উঠছে, আর বাইরে থেকে পুকুরে ঢিল ফেলছে আরও ঢেউ উঠছে। আমি দেখছি ঢেউ উঠছে বলে আমার মনে হচ্ছে, আমি আছি ঢেউ আছে, মাছ আছে, ঢিল আছে, ফলে এতগুলো তফাৎ হয়ে যাচ্ছে। যখন মনকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করি তখন মনে করছি মনটা যেন একটা পুকুর, সেখানে ঢেউ উঠছে আর আমি সেখানে দেখছি ঢেউ উঠছে। এখানে তা নয়, প্রত্যেকটি যে ঢেউ উঠছে, ওটা হল একটা বোধ, আর সমস্ত বোধ যেটা মিলছে, এটা হল মন। আমার বোধ আলাদা, আপনার বোধ আলাদা, তাই আমার মন আলাদা, আপনার মন আলাদা।

প্রথম থেকে আমরা আলোচনা করে আসছি, আমরা যে বহু দেখছি আসলে এটা এক, ঠিক তেমনি আমরা মনে যেটা বহু ভাবছি, জানছি, আসলে সেটাও এক। সেই একই যুক্তি এখানেও নিয়ে আসা হয়। স্বামীজী এটাই তাই এখানে বলছেন, আমরা যেটাকে মন বলছি, আমরা যেটাকে চেতনা বলছি, আসলে ওই বোধ যেটা হয়, ওইটাই আছে, আর ওই বোধটাই এই তিন হয়ে দেখায়। কিন্তু আমরা মনে করছি, আমার আত্মা দেখছে, আমি আলাদা, আত্মা আলাদা, এই জগৎ আলাদা, এই জ্ঞান আলাদা। কিন্তু তা একেবারেই না।

এরপর স্বামীজী বলছেন, When you talk and think of the Absolute, you have to do it in the relative, so all these logical arguments apply. (*যখনই তুমি সেই পূর্ণব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছু বলো বা ভাবো, তখনই আপেক্ষিক ভাবে ঐ কাজগুলি করতে হয়, সুতরাং সেখানে এই সকল যুক্তিবিচার খাটে।*) সমস্যা হল, আত্মাকে যখন আমরা জানতে যাই, তখন এই ব্যবহারিক জগতে নেমে আসতে হয়, তখন সেইজন্য আমাদের এই সমস্ত যুক্তিগুলিকে নিয়ে আসতে হয়। কিন্তু যেখানে Absolute, যেখানে অখণ্ড, সেখানে এগুলোর কোনটাই চলে না।

সাংখ্য, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈতের একত্ব

এরপর বলছেন, In Yoga, perception and realization are one, (*কিন্তু যোগাবস্থায় অনুভব ও অপরোক্ষানুভূতি এক হয়ে যায়।*) যোগে বলা হয় চেতনা আর জ্ঞান দুটো একই জিনিস। Vishishtadvaita, of which Ramanuja is the exponent, is seening partial unit and is a step toward Advaita. Vishista means differentiation. Prakriti is the nature of the world, and change comes upon it. Changeful thoughts expressed in changeful words can never prove the Absolute, (*রামানুজব্যাখ্যাত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ আংশিকভাবে একত্ব-দর্শন এবং অদ্বৈতাবস্থার অভিমুখে একটি সোপানস্বরূপ। 'বিশিষ্ট' মানেই ভেদ বা পৃথককরণ। 'প্রকৃতি' মানে জগৎ, আর তার সদা পরিণাম বা পরিবর্তন হচ্ছে। পরিবর্তনশীল চিন্তারাশি –পরিবর্তনশালী শব্দরাশি দ্বারা অভিব্যক্ত হয়ে কখনও সেই পূর্ণস্বরূপকে প্রমাণ করতে পারে না।*) স্বামীজী এখানে সাংখ্য, যোগ, বিশিষ্টাদ্বৈত আর অদ্বৈত চারটে দর্শনকে নিয়ে আসছেন। স্বামীজী দেখাচ্ছেন, এই যে perception, *তদাদ্রষ্টু স্বরূপে অবস্থানম্*, যোগ হল চিত্তবৃত্তি নিরোধ। চিত্তবৃত্তিকে যখন দেখছে আর চিত্তবৃত্তির যখন নিরোধ হয় যাচ্ছে, এই যে perception, এই perceptionটাই হল realisation, শেষ জ্ঞান। বেদান্ত এভাবে নেবে না, বেদান্ত বলে বোধের নাশ। যোগে বোধটা থেকে যায়, কিন্তু বেদান্তের ক্ষেত্রে শেষ অবস্থায় বোধ থাকে না। আর বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অর্থাৎ রামানুজ ওটাকে যখন নিয়ে যাচ্ছেন, তিনি অনেকটাই একত্ব করেন কিন্তু অনেক কিছু তাঁর বাকি থেকে যায়।

কিন্তু স্বামীজী বলছেন, Changeful thoughts expressed in changeful words can never prove the Absolute, আমাদের মুশকিল হল, আমাদের মনের সব সময় পরিবর্তন হয়ে চলেছে, সেইজন্য আমাদের শব্দগুলিরও পরিবর্তন হয়। যারা এই পরিবর্তনশীল জগতের মধ্যে রয়েছে, তারা কোন দিন সেই অখণ্ড, অনন্তকে জানতে পারবে না, বুঝতেও পারবে না, তাই বোঝাতেও পারবে না। বলছেন, You reach only something that is minus certain qualities, not Brahman Itself, (*ঐরূপ করে*

তোমরা শুধু এমন একটা বস্তুতে উপনীত হও, যা থেকে কতকগুলি গুণ বাদ দেওয়া হয়েছে; কিন্তু যা স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ নয়।) প্রথমে যে বলা হল আমরা কিছু গুণকে দেখছি, কিছু গুণকে দেখছি না। এবার শব্দ দিয়ে যখন নিয়ে যাবে, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বা মাধ্বাচার্যরা যখন অনন্তের কাছে নিয়ে যান, তখন সেখানেও একটা দুটো গুণকে রেখে দিলেন, বাকি সব গুণকে সরিয়ে দিলেন। বলছেন, only a verbal unification, the highest abstraction, but not the non-existence of the relative. (*ওতে আমরা কেবল শব্দগত একত্রে পৌঁছাই, তার চেয়ে আর চরম ঐক্য বার করা যায় না, কিন্তু তাতে আপেক্ষিক জগতের বিলোপ-সাধন হয় না।*) রামানুজাদিরা যখন যুক্তিতর্ক দিয়ে নিয়ে যায়, তখন তাঁরা অনেক উপরে নিয়ে চলে যাচ্ছেন, জগৎকে ফেলে দিচ্ছেন। কিভাবে ফেলে দিচ্ছেন? বহুকে উড়িয়ে দিচ্ছেন। বহুকে উড়িয়ে দিয়ে নিয়ে আসছেন, যেটা রামানুজ প্রথমে বললেন চিৎ অচিৎ ঈশ্বর। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে এক করে নিয়ে এসে অচিৎ অর্থাৎ প্রকৃতি বলে ছেড়ে দিলেন। মনের সমস্ত অবস্থাকে এক করে এক জায়গায় নিয়ে এসে চৈতন্য বলে দিলেন, আর তার সাথে ঈশ্বর থাকলেন। স্বামীজী বলছেন, আপনি অনেক উপরে নিয়ে এসেছেন ঠিকই, কিন্তু Absolute মানে সেখানে আর কোনও গুণ থাকবে না, কোন differentiation থাকবে না, শব্দের কোন differentiation থাকবে না, বস্তুরও কোন differentiation থাকবে না, এক বহু তো হবে না, দুই, তিন এগুলোও হবে না, এটাই ঠিক ঠিক অদ্বৈত।

আসলে বস্তু এক, কিন্তু আমাদের মনের গঠনটা এমন যে, ওই এক বস্তুকে এক না দেখে ওর মধ্যে কিছু গুণ সংযোজিত করে দিই আর কিছু গুণ বিয়োগ করে দিই। তাহলে আমরা যেটা দেখছি, সেটা কি ভুল দেখছি? কোন ভুল দেখছি না, সবটাই ঠিক দেখছি। তার সাথে আমরা এই রকম কথাও বলে থাকি – তুমি তাকে শুধু এই রকমই দেখছ, তার এই দিকটাও দেখ। যেমন আগুন, আগুনের দাহিকা শক্তি আছে, সেই দাহিকা শক্তিকে কাজে লাগিয়ে রান্নাও করা যায় আবার হাতও পুড়ে যায়। বাচ্চারা দেখে আগুনে হাত পুড়ে যায়, মায়েরা দেখে আগুন দিয়ে রান্না হয়। গুণের সমষ্টিকে নিয়ে দেখলে জিনিসটা তখন অন্য রকম দেখায়। প্রায়ই বলা হয় যে, মানুষের এভাবে শুধু দোষ দেখতে নেই, তার গুণও আছে, তার মানে দোষ গুণ মিলিয়েই মানুষ। সব কিছুকে মিলিয়ে দেখলে মানুষকে অন্য রকম দেখাবে। শুধু গুণ দেখলে এক রকম দেখাবে, শুধু দোষ দেখলে আরেক রকম দেখাবে। বস্তুর ক্ষেত্রে একই ব্যাপার হয়, বস্তুর কিছু গুণাগুণ দেখলে এক রকম দেখাবে, কিছু দোষ নজরে এলে তখন আরেক রকম দেখাবে। আবার সব মিলিয়ে দেখলে অন্য রকম দেখাবে। কিন্তু যদি সত্তা রূপে দেখা হয়, যা কিছু আছে সব কিছু সত্তা, তখন কি রূপে দেখাবে? তখন পুরো জিনিসটাই অন্য রকম হয়ে যাবে। তাতেও কিন্তু এই জগৎ বাধা হয়ে দাঁড়ায়, যে কথা স্বামীজী শেষের দিকে বলছেন। একটা বস্তুর সামনে যদি আরেকটা বস্তু রেখে দেওয়া হয় তাহলে ওই বস্তুকে দেখা যায় না। জগৎ ঈশ্বরেরই রূপ কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু ঈশ্বরের যে পূর্ণ রূপ, সেই রূপকে এই জগৎই ঢাকা দিয়ে রাখে, জগৎটাই তখন বাধক হয়ে যায়। সেইজন্য আমরা ঈশ্বরকে দেখলে জগৎকে দেখতে পাই না, জগৎকে দেখলে ঈশ্বরকে দেখা যাবে না। কিন্তু এটা অনেক উঁচু কথা। আমরা অতি সাধারণ বলে একটা জিনিসকে সমস্ত গুণ বা শুধু সত্তা রূপে দেখতে পারি না। ঠাকুরের জীবন থেকে এর একটা খুব সহজ দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

ঠাকুর ঘোড়ার গাড়ি করে হৃদয়রামের সাথে কলকাতায় আসছেন। যেতে যেতে হৃদয়রাম হঠাৎ বলে উঠলেন, 'মামা এটা হল লাট সাহেবের বাড়ি'। ঠাকুর পরে বলছেন, মা তখন দেখিয়ে দিলেন একটা ইটের ঢিপি। এটা যেমন লাট সাহেবের বাড়ি আবার ইটের ঢিপিও, দুটোই। যে ইটের ঢিপি দেখবে সে লাট সাহেবের বাড়ি দেখবে না, যে লাট সাহেবের বাড়ি দেখবে সে ইটের ঢিপি দেখবে না। যত পরিবর্তন হচ্ছে, এই পরিবর্তন যদি বাস্তবিক হত, তখন ওটার একটা দাম থাকবে।

আলোচনাতে আমরা দেখলাম কার্য দ্বারা আসলে কোন কিছুর পরিবর্তন হয় না। সাংখ্য মতে পরিবর্তনগুলি বাস্তবিক, কিন্তু অদ্বৈত একেবারে যুক্তি দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে ওগুলো পরিবর্তন নয়, প্রাতিভাসিক। প্রাতিভাসিক মানে, ওই রকম দেখাচ্ছে, ভাসছে, আসলে কিছুই পরিবর্তন হচ্ছে না। তাহলে মাটিও যা ঘটও তাই, বিরিয়ানিও যা ঘাসও তাই, ধানও যা আর সোলার এনার্জিও তাই? একেবারেই না। একটা সিস্টেম যেটা চলছে, ওই এক সিস্টেমেই চলবে, সমানধর্মী যেখানে থাকবে সেখানেই চলবে। কিন্তু এই জিনিসটা জানা

দরকার যে, যা কিছু হচ্ছে সব কিছু ওখান থেকেই হয়। এটাকে মাথায় রাখলে কি হয়? ঠাকুর বলছেন সন্দেশ কতটুকু আর, গলার নীচে চলে গেলেই সব শেষ। এই এতটুকুও যদি আমরা ধারণা করে নিতে পারি, যে খাবারের আমরা এত দাম দিচ্ছি, গলার নীচে চলে গেলে সেই খাবারের আর কোন দাম নেই। সেই খাবারের জন্য এত মারামারি, এত কাড়াকাড়ি। মানযশ, সম্মান, কামিনী-কাঞ্চনের জন্য মানুষ এত লড়াই করছে, এত দৌড়ঝাঁপ করছে, দুদিন পর মরে গেলে সব শেষ। তাহলে আমাদের মনের শান্তি এত বিঘ্নিত হচ্ছে কেন? কারণ পরিবর্তন গুলিকে আমরা প্রচণ্ড দাম দিই। পরিবর্তনগুলি যদি বাস্তব হত, তাহলে দাম দেওয়াতে কোন দোষ হত না। কিন্তু আমাদের মন এমন ভাবে তৈরী হয়ে আছে যে, কখনই পরিবর্তনগুলি অবাস্তব রূপে নিতে পারব না, সম্ভবই না। ঠিক এই কারণেই ধর্মের দরকার। ধর্ম আমাদের ক্রমাগত হাতুড়ির ঘা মেরে যাচ্ছে, আঘাত খেতে খেতে একটা সময়ে গিয়ে আমরা কোনটা বাস্তব আর কোনটা অবাস্তব একটু ধারণা করতে পারব।

<u>বৃহস্পতিবার, ১৮ই জুলাই</u>

প্রথমেই অদ্বৈত বেদান্তের সিদ্ধান্তের ধারণা করা যে কারণে কঠিন

এর আগে আমরা দেখলাম আচার্য শঙ্কর কিভাবে যুক্তি দিয়ে শুদ্ধ অদ্বৈত বেদান্তকে নিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের অনেক সময় মনে হতে পারে, আচার্য শঙ্কর যখন একবার পুরো যুক্তি দিয়ে সব কিছুকে নিয়ে গেছেন, স্বামীজীও শঙ্করাচার্যকে নিয়ে যখন এত কথা বলছেন, তখন সেখানে রামানুজ, মাধ্বাচার্য বা অন্যান্য মতগুলি কি করে এলো, আর দাঁড়ালই বা কি করে? আচার্যরা যখন বলেন, তখন ওনারা মোটামুটি নিজের সময়ের মত করে পরিষ্কার করে বলে দিয়ে চলে যান। তাঁর আশেপাশে যাঁরা থাকেন তাঁরাও খুব উচ্চমানের হন, তাঁরা সহজে ওগুলো বুঝে নেন। কিন্তু পরে পরে ওই পরম্পরাতে যাঁরা আসবেন তাঁরা যে সবটাই বুঝে নিতে পারবেন, তা কখন হয় না। দ্বিতীয়তঃ তাঁদের হয়ত সেই প্রতিভা ও ক্ষুরধার বুদ্ধি নেই। ফলে বিরোধী পক্ষ থেকে কেউ যদি ওই দর্শনের বিরুদ্ধ দাঁড়িয়ে যায়, তখন ওই দর্শনে কোথাও কোথাও যে ফাঁকগুলো থেকে গিয়েছিল, সেই ফাঁকগুলোকে ধরে ওনারা আক্রমণ করেন বা যে জিনিসটাকে অদ্বৈতীরা হাইলাইট করেনি, এনারা ওই জিনিসটাকে গিয়ে আক্রমণ করেন। পরম্পরায় যে শিষ্যরা আছে, তাদের ওই ট্যালেন্ট না থাকাতে এদের যুক্তিকে খণ্ডন করতে পারে না। সেইজন্য আচার্য রূপে রামানুজ, মাধ্বাচার্য এনারা মহাপুরুষ ছিলেন।

কিন্তু আচার্য শঙ্করের পরম্পরায় পরবর্তি কালে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা রামানুজ বা মাধ্বাচার্যের সমতুল্য ছিলেন না। তৃতীয়তঃ আরেকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, আচার্য শঙ্করের শিষ্যরা কোথাও আচার্য শঙ্করকে ভুল বুঝে, অদ্বৈতকে জ্ঞানমার্গে নিয়ে গিয়ে শুষ্ক বানিয়ে দিলেন। সাধারণ মানুষ এই শুষ্ক কচকচানি জ্ঞান নিয়ে কি করবে! তার নিজের ভগবান চাই, যেখানে তার ভালবাসাকে নিয়ে গিয়ে ঢালতে পারবে, যাঁর কাছে নিজের আর আপনজনের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করতে পারবে। রামানুজ এদের জন্য সেই জিনিসটাকে নিয়ে এলেন। তিনি দুটো জিনিসকেই নিয়ে এলেন, তাঁর নিজস্ব দর্শনকে তিনি যুক্তির উপর রাখলেন, আর তার সাথে তিনি ভক্তিকে এত বিরাট প্রাধান্য দিলেন যে, আজকে দেশে যদিও আমরা বলি দর্শনের দিক থেকে অদ্বৈতই প্রধান দর্শন, যেটা স্বামীজী আসার পর বেশি জোর পেয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও রামানুজের যে ধর্ম, বিশিষ্টাদ্বৈত, এটাই হল ভারতের ঠিক ঠিক ধর্ম। অনেক পূজা-পদ্ধতি বা প্রথা, যেটা আজও হিন্দুরা অনুশীলন করছে, এগুলো সবই রামানুজের অবদান। অনেক মহারাজরা ছিলেন, যাঁদের অভিমত ছিল, ঠাকুরের ভাবও বিশিষ্টাদ্বৈত। আমাদের মত সাধারণ লোকের পক্ষে এগুলোকে বিশ্লেষণ করা খুব কঠিন যে, ঠাকুর অদ্বৈত ছিলেন, নাকি বিশিষ্টাদ্বৈত ছিলেন। তবে শ্রীশ্রীমা বলে গেছেন, তোমাদের ঠাকুর অদ্বৈতী ছিলেন, তোমরাও অদ্বৈতী।

লোকেরা আরেকটা ব্যাপারে শঙ্করাচার্যকে বুঝতে ভুল করে – তা হল আচার্য ভক্তি, কর্মকে একেবারেই বাদ দিয়ে গেছেন। এটি সর্বৈব অসত্য, আচার্য হিন্দুধর্মের কোন কিছুই বাদ দেননি। বরঞ্চ আচার্য শঙ্করের অদ্বৈত হিন্দুধর্মের পুরোটাকে নিয়েই চলে। রবীন্দ্রনাথের সব কবিতাই উচ্চমানের হবে তা তো নয়, কিছু কবিতা সাধারণ মানেরও হবে। বলে সেক্সপিয়ারের যত রচনা আছে, তার মেরে কেটে তিরিশ শতাংশ ভাল, বাকিগুলো

নাকি জঘন্য। তবে একজন লেখক বা কবিকে তাঁর শ্রেষ্ঠতম রচনা দিয়েই মাপা হয়। গাছে ফল হওয়ার পর কিছু ফল কাঁচা অবস্থাতেই পরে যায়, কিছু ফলে পোকা লাগে, কিছু ফল পচে যায়, কিন্তু এই ফলগুলি দিয়ে গাছকে বিচার করা হয় না, তার উৎকৃষ্টতম ফলগুলি দিয়েই গাছকে বিচার করা হয়। ঠিক তেমনি মানুষের যেটা শ্রেষ্ঠ গুণ, তার শ্রেষ্ঠ যা যা কীর্তি আছে, সেগুলো দিয়েই তাকে মাপা হয়। আচার্য শঙ্করেরও তাই, তাঁর শ্রেষ্ঠতম হল শুদ্ধ অদ্বৈত। মানুষ তাই আচার্যের শুদ্ধ অদ্বৈতেই আকর্ষিত হয়ে যাচ্ছে, তিনি যে বাকিদেরও স্থান দিচ্ছেন, ওটাকে ভুলে যাচ্ছে। তিনি দেবদেবীর এত স্তব রচনা করলেন, যেখানে যেখানে মঠ স্থাপনা করলেন, সেখানে সেখানে একজন করে অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন, এই জিনিসগুলির দিকে মানুষ কোথাও দৃষ্টিপাত করতে ভুলে যায়। তাদের কাছে জগৎ যেন একটা প্রপঞ্চ হয়ে যায়, মূর্তি পূজা যেন বেকার হয়ে যায়। আচার্য শঙ্কর কিন্তু সবাইকে নিচ্ছেন। আচার্য শঙ্কর ব্যবহারকালীন অবস্থায় দ্বৈতকেও নিচ্ছেন, বিশিষ্টাদ্বৈতকেও নিচ্ছেন। সেইজন্য বার বার 'ব্যবহারকালে' শব্দটা বলছেন।

এনাদের আসল বিবাদ হল শেষ সত্যটা কি, এই নিয়ে। ব্যবহারকালে যদি যাওয়া হয়, তখন শ্রীমন্নারায়ণ নারায়ণ করবে নাকি হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ করবে, নাকি রামাকৃষ্ণ শরণম্ রামকৃষ্ণ শরণম্ করবে তাতে আচার্য শঙ্করের কোন সমস্যা নেই। কিন্তু শেষ সত্য যদি বলা হয়, ঠাকুর তুমিও যা, আমিও তাই, তখন আবার ওই কথা শুনলেই আমাদের বুক ধড়মড় করতে শুরু করে দেবে। কিন্তু *অহং ব্রহ্মাস্মিই* শেষ কথা, গীতায় থেকে থেকে আচার্য শঙ্কর বলছেন, সেই আত্মাই ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মই বসুদেবের পুত্র কৃষ্ণ হয়ে যেন জন্ম নিয়েছেন। তার মানে আমরা কৃষ্ণকে জানি, তাই আমরা বলে দিতে পারি আমিও যা, কৃষ্ণও তাই। কিন্তু যারা ঠাকুরের ভক্ত, যেমনি বলবে, আমিও যা ঠাকুরও তাই, তখন তার দম বন্ধ হয়ে যাবে, বলবে অত দূর এখন নয়। তার মানে আমরা এখনও সত্যে যেতে পারছি না, একটা ধর্মীয় আবেগে চলে যাচ্ছি। রামানুজ ঠিক তাই করলেন, তিনি পুরোপুরি ইমোশানসে চলে গেলেন। তিনি এটাকে নিয়েই শঙ্করাচার্যকে আক্রমণ করলেন, উনি বলে দিলেন, যে বলবে আমি আর ঈশ্বর এক, সে এক মহাপাতক, সে অবশ্যই নরকে যাবে। এইভাবে তিনি জিনিসটাকে ইমোশানসে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

আর এটা ঠিকই যে, এই ভাব মানুষ নিতেই পারবে না, আমি ঠাকুরের মন্ত্র নিয়েছি, ঠাকুরের মন্ত্র জপ করছি, ঠাকুরের ধ্যান করছি, আমাকে যদি বলা হয় তুমিও যা ঠাকুরও তাই, আমার দম বন্ধ হয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। আর মুর্খ লোকেরা বুঝতেও পারবে না যে, আচার্য শঙ্কর কোন উচ্চতায় গিয়ে ওই সত্যকে নিয়ে আসছেন। আমাদের মত সাধারণ লোকেদের পক্ষে ওই উচ্চতায় পৌঁছান তো অসম্ভব, ধারণা করাও অসম্ভব। সেইজন্য রামানুজ নিয়ে এলেন, হে প্রভু তুমি মালিক, আমি তোমার দাস। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে বার বার আচার্য শঙ্করও এই কথা বলছেন, *অহং কর্তা ঈশ্বরায় ভৃত্যবৎ করোমি*। এই জগতে তুমি তোমার দৈনন্দিন সব রকম কাজ কিভাবে করবে? কর্তা আমি, আমিই সব কিছু, কিন্তু ঠাকুরের ভৃত্যবৎ আমি এই কাজ করছি। তাহলে তফাৎ থাকল কোথায়! মহাবীরের হনুমানের যে ভাব, শঙ্করাচার্য বলছেন সবাইকে এভাবেই কাজ করতে হবে। কর্তা নিজেকেই মনে করবে, কিন্তু তার সাথে মনে করবে তুমি ঈশ্বরের দাস। তাহলে অহং ব্রহ্মাস্মি কোথায় থাকল? ওটা তত্ত্ব, ওর সাথে কখনই আপোষ হবে না, যতক্ষণ তোমার কাছে ওই সত্য সত্য বলে বোধ না হচ্ছে, ততক্ষণ তুমি দাস, ঠাকুর মালিক। রামানুজ যখন এই জিনিসটাকে হাইলাইট করছেন, তখন উনি একটা শেষ কথায় থেমে যাচ্ছেন, ওর পরে উনি আর বলবেন না; এরপরে বললে কানে আঙুল দিতে হবে, ছি ছি এসব কথা বলতে নেই, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল। খ্রীশ্চানরা বলবে, আমিও যা, ঈশ্বরও তাই, এই কথা বলা মহা পাপ।

স্বামীজী এর আগে আলোচনা করলেন, তুমি যত উপরেই নিয়ে যাও, ওখানে স্বামীজী শব্দটা বলছেন, it is a verbal unification, শব্দ দিয়ে তুমি জুড়ে দিচ্ছ, কিন্তু আসলটা নয়। আসলে ওই জায়গাতে সবাইকে এক হতে হবে, কিছু করার নেই। ঠাকুরও অদ্বৈত সাধনায় বাস্তবে করে দেখছেন উনি এগোতেই পারছেন না। বার বার মা কালী এসে যাচ্ছেন, তারপর উনি জ্ঞান অসি দিয়ে মা কালীকে দ্বিখণ্ডিত করে দিয়ে উড়িয়ে দিলেন, এরপর কি হল আমরা কেউ জানি না। এখন কেউ যদি বলে, 'আমি মানছি আপনার অদ্বৈত ভাল, কিন্তু আমার ওই ভাব নয়, ঠাকুর আছেন আর আমি আছি, আমার আর কিছু লাগবে না'। তোমার

কোথাও কোন ভুল নেই, ঠিকই আছে, আচার্য শঙ্করও কোথাও কোন আপত্তি করছেন না। কিন্তু তুমি যদি মনে কর এটাই শেষ কথা, এটাই শেষ সত্য আর সবার জন্য এটাই ঠিক, তাহলে তোমার এই কথা পুরোপুরি বেদ বিরোধী কথা হয়ে যাবে। তোমার ভাব নিয়ে তুমি থাক, এর সাথে কোন বিরোধ নেই, কিন্তু তত্ত্বের দিক থেকে যদি তুমি বিচার কর, তাহলে তোমার এই ভাব শেষ সত্য হতে পারে না। এই জিনিসটাকেই লোকেদের কিছুতেই বোঝান যায় না।

একজন পণ্ডিত বলছিলেন, অদ্বৈত বেদান্ত পড়ার সময় খুব ভাল লাগে, কিন্তু আমি একমত নই। একমত হবেন কি করে? বাচ্চা বয়স থেকে আমরা দ্বৈত ভাব অবলম্বন করে বড় হয়ে এসেছি। কি রকম দ্বৈত ভাব? আমি আলাদা আমার মা আলাদা। এই ভাব অবলম্বন করে আজ যেখানে এসে পোঁছেছে, সেখানে আমি আলাদা, ঠাকুর আলাদা হবেই, কিছু করার নেই। আমিও যা, ঠাকুরও তাই ভাবলেই আমাদের মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার জোগাড় হবে। আর আমাদের না আছে সেই পাত্রতা, না আছে সেই পবিত্রতা, তাই এটা বলা তো দূরের কথা, ভাবাও যায় না, ধারণাই হয় না। হয় না বলে যেটা শেষ সত্য, যেটা উচ্চতম তত্ত্ব, তার সাথে আপোষ করে নেবে, সেটা চলবে না। আমার দ্বারা হবে না বলে আমি সব জিনিসকে নীচে নামিয়ে দেব, তা কি কখন হয়! আমি তোমার মত বাড়ি বানাতে পারলাম না, আমার সেই ক্ষমতা নেই, তাই বলে আমি তোমার বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেব, সেটা কখন হয় না। স্বামীজী শ্রীশ্রীমাকে বলছেন, মা! রূপটুপ সব উড়ে যাচ্ছে। শ্রীমা বলছেন, বাবা! আমাকেও উড়িয়ে দিও না। স্বামীজীর মত লোক বলছেন, যে জ্ঞান গুরুর চরণ উড়িয়ে দেয়, সেই জ্ঞান তো জ্ঞান নয়, অজ্ঞান। ইমোশান যেখানে এসে যায়, ওখানে আর জ্ঞান চলে না।

সাংখ্যের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে শঙ্করাচার্যের যুক্তি

স্বামীজী যখন আচার্য শঙ্করকে নিয়ে চলেন তখন সেখানে বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈত কোনটাই নেই। আচার্য শঙ্করের সময় যে কটি দর্শন অদ্বৈত বেদান্তের বিরোধী ছিল, তাদের মধ্যে সাংখ্য ছিল নামকরা আর খুব শক্তিশালী বিরোধী। পূর্বমীমাসংকরা, বৌদ্ধরাও খুব শক্তিশালী বিরোধী ছিল। সাংখ্য দর্শন তখন একটা খুব প্রভাবশালী পদ্ধতি ছিল। যদিও সাংখ্য মতে ও বেদান্ত মতে অনেক মিল আছে, কিন্তু তার সাথে ছোট ছোট অনেক তফাৎও আছে, আর ওই তফাতের জন্য সাংখ্য আর দাঁড়াতে পারল না। তারমধ্যে স্বামীজী একটা বলছেন, The Sankhyas say that consciousness is a compound, and beyond that, the last anyalysis gives us the Purusha, Witness, but that there are many Purushas, each of us is one. (*সাংখ্যরা বলেন, চৈতন্য একটি মিশ্র বা যৌগিক পদার্থ, আর তারও পরে বিশ্লেষণ করতে করতে শেষে আমরা সাক্ষিস্বরূপ পুরুষের অস্তিত্ব অবগত হই। এই পুরুষ সংখ্যায় বহু; আমরা প্রত্যেকেই এক-একটি পুরুষ।*)

খুব সংক্ষেপে সাংখ্য দর্শন হল, সাংখ্য মনে করে দুটো সত্তা চলছে, পুরুষ আর প্রকৃতি। পুরুষ আর প্রকৃতি যেন দুটো আলাদা নদী অনন্তকাল ধরে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। প্রকৃতি হল জড় পদার্থ, এনার্জি আর পুরুষ হল অসংখ্য। কত পুরুষ? পুরুষের সংখ্যা অনন্ত। যখনই এই দুটো নদীর মিলন হয়, তখনই সৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। সাংখ্য আত্মা বলে না, ওরা পুরুষ বলে, পুরুষ হল বেদের শব্দ, বেদে যার অর্থ আত্মা। এই অনন্ত আত্মা যখন অনন্ত প্রকৃতির সাথে মেলে, এটাই সৃষ্টি। তার মানে, আমার ভিতরে যে পুরুষ, সেটা আলাদা, আপনার ভিতরে যে পুরুষ, সেটা আলাদা। বেদান্তকে সাংখ্য এখানেই আক্রমণ করে, যখন একজনের মুক্তি হয়ে যায়, তখন তো বাকিদের মুক্তি হয় না। যদি আত্মা সেই এক হত, তাহলে সব আত্মারই মুক্তি হয়ে যেত। এগুলো খুব সহজ ব্যাপার, বেদান্ত এর উত্তরও খুব সহজ ভাবে দিয়ে দেয়, এবং এই উত্তর দেওয়ার পর সাংখ্যের এই কথার আর কোন দাম থাকে না। দ্বিতীয় হল, আমাদের ভিতরে যে চৈতন্য, যেখান থেকে চেতনা আসছে, এই চৈতন্য হল একটা মিশ্র বা যৌগিক পদার্থ। পুরুষ আর প্রকৃতির যখন মিলন হয় তখন এই চৈতন্যের সৃষ্টি হয়।

স্বামীজী তখন বলছেন, Advaita, on the contrary, affirms that Purushas can be only One, that Purusha cannot be conscious, unconscious, or have any qualification,

(*অদ্বৈত বেদান্ত কিন্তু এর বিরুদ্ধে বলেন, পুরুষ কেবল একটিই হতে পারেন, সেই পুরুষ চেতন, তিন অচেতন বা কোন গুণ-সম্পন্ন হতে পারেন না।*) কিন্তু অদ্বৈত বলে, পুরুষ একটাই, আগে আগে আমরা এর যুক্তিগুলিকে নিয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করে এসেছি। এগুলো খুবই technical জিনিস, খুব সহজে বোঝা যায় না, বুঝলে ধারণা করা যায় না। কিন্তু তারপরেই বলছেন, যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, for either these qualities would bind, or they would eventually cease; so the one must be without any qualities, (*কারণ গুণ থাকলেই সেগুলি তাঁর বন্ধনের কারণ হবে, পরিণামে সেইগুলির লোপও পাবে। অতএব সেই এক বস্তু সর্বপ্রকার গুণরহিত।*) পুরুষ বা আত্মা চেতন নয়, অচেতন নয় আর এর মত আর কোন কিছু নেই। মাণ্ডুক্য উপনিষদে বলছেন *নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্*, আমরা যে পিন পয়েন্ট করে বলে দেব এটা চৈতন্য, এভাবে কখনই বলা যাবে না। আমরা যখন বলছি, সচ্চিদানন্দ, এটা সৎ, সেই অর্থে বলা হয় না। যেমনি বলছে এটা সৎ, ওখানেই ওটা শেষ হয়ে গেল, কারণ এটা আর ওটা আলাদা হয়ে গেল। সেইজন্য আত্মা চৈতন্য বলাটা ভুল, আত্মা চৈতন্যস্বরূপ এটা বোঝানর জন্য বলা হয়। যেমনি কেউ আত্মাকে পিন পয়েন্ট করে দেবে, ওটা তখন আর কিছু থাকল না, পুরো তালগোল পাকিয়ে দিল। আমরা অনেক সময় বলি, তোমাকে আমি আগে কত ভাল লোক বলে জানতাম। তার মানে আগে ভাল লোক ছিল, এখন গোলমেলে হয়ে গেছে। তার মানে একটা গুণ থাকতেও পারে আবার নষ্টও হয়ে যেতে পারে। রেসে অনেক ঘোড়া আছে, তার মধ্যে একটা ঘোড়া রোজ সব রেস জিতে যায়। কিন্তু চিরদিন কি সব রেস জিততে পারবে? একদিন আসবে যখন ওর বয়স হবে, তখন অন্য ঘোড়া তার থেকে এগিয়ে যাবে। গুণ মানেই একদিন না একদিন এই গুণটা চলে যাবে। কিন্তু স্বরূপ কোন দিন যাবে না।

একদিন আমরা একটা দীর্ঘ আলোচনা করেছিলাম, যেখানে বলা হয়েছিল, গান্ধীজী সত্য অহিংসার ব্রত নিয়েছিলেন, তিনি সত্যবাদী, তিনি অহিংস, এটা তাঁর গুণ। কিন্তু সত্য অহিংসার অনুশীলন করে করে এই দুটো গুণকে এমন জায়গায় তিনি নিয়ে গেছেন যে, এখন গান্ধীজী বলতে অহিংসা হয়ে গেছে, গান্ধীজী আর অহিংসা দুটো এক হয়ে গেছে। হরিশ্চন্দ্র এখন আর সত্যবাদী নন, হরিশ্চন্দ্র আর সত্যবাদী এক হয়ে গেছে। তার মানে বিশেষণটা পাল্টে স্বরূপ হয়ে গেছে, স্বরূপ হয়ে গেলে আর ওটা চলে যাবে না। গান্ধীজীর ক্ষেত্রে আমরা বোঝানর জন্য স্বরূপ বলছি, কিন্তু ঠাকুর বলছেন জ্ঞানী ভয়তরাসে, যতক্ষণ এই শরীর ধারণ করে আছেন, এটা বলা অসম্ভব, যে কোন গুণ বা বিশেষণকে যতই উপরে নিয়ে যান না কেন, সত্যিই সেই গুণটা তাঁর স্বরূপ হয়ে যাবে কিনা। গান্ধীজীর ক্ষেত্রে আমরা বোঝানর জন্য বলছি যে, সত্য আর অহিংসা গান্ধীজীর আর গুণ থাকল না, ওটাই তাঁর স্বভাব, ওটাই তাঁর স্বরূপ হয়ে গেছে। আমরা ঈশ্বরকে বলছি, তিনি দয়াময়। দয়াময় যদি ঈশ্বরের গুণ হয়, তাহলে আজ হোক কাল হোক এই গুণটা ঈশ্বরের থেকে চলে যাবে।

এটা গেল এক নম্বর, দু-নম্বর হল, গুণ বন্ধন তৈরী করে। আগেকার দিনে ব্রাহ্মণ কোন অন্যায় কাজ করলে লোকেরা বলত, তুমি ব্রাহ্মণ হয়ে এই রকম কাজ করছ! তার মানে, ব্রাহ্মণের গুণ ব্রাহ্মণকে বেঁধে দিল। রাণী রাসমণি এত বড় মন্দির তৈরী করে দিলেন, কিন্তু তিনি জাতিতে কৈবর্ত, তাই মন্দিরে পূজা করতে পারবেন না। শূদ্রত্বটাও একটা গুণ, এই গুণ তাঁকে বেঁধে দিচ্ছে। গুণ মানেই সে বেঁধে ফেলবে, আর গুণ মানেই আজ হোক কাল হোক ওই গুণ চলে যাবে। আত্মা যদি চৈতন্য হয়, চৈতন্য যদি মিশ্র পদার্থ হয়, তাহলে আজ হোক কাল হোক ওটা চলে যাবে, আর না হলে ওটা বেঁধে দেবে। স্বামীজী বলছেন, so the One must be without any qualities, আত্মার স্তরে গিয়ে আত্মাকে qualify করতে পারে না।

স্বামীজী বলছেন, Even knowledge, and It cannot be the cause of the universe or of anything. 'In the beginning, existence only, One witout a second', says the Vedas. (*এমন কি –জ্ঞান পর্যন্ত তাঁতে থাকতে পারে না, এবং সেই পুরুষ জগৎ বা আর কিছুর কারণ হতে পারে না, বেদ বলেন, 'সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্' –হে সৌম্য, প্রথমে সেই এক অদ্বিতীয় সৎই ছিলেন।*) স্বামীজী এখানে ছান্দোগ্য উপনিষদের একটা মন্ত্রের উল্লেখ করে দেখাচ্ছেন, এমন কি জ্ঞান, যখন সত্যম্ অনন্তম্ বলা হচ্ছে, জ্ঞান, সত্য, অনন্ত এগুলোকে যদি কোয়ালিটি রূপে নেওয়া হয়, ঈশ্বর সর্বজ্ঞ,

এটাকে যদি কোয়ালিটি রূপে নেওয়া হয়, আর ঈশ্বর যদি সত্যিই সর্বজ্ঞ হন, তাহলে আজ হোক কাল হোক ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা চলে যাবে, আর তা নাহলে তাঁকে বেঁধে দেবে।

পাশ্চাত্য দর্শনে একটা খুব নামকরা প্রশ্ন করা হয়, ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, তিনি যদি সর্বশক্তিমান হন তাহলে তিনি কি এমন একটা পাথর তৈরী করতে পারবেন, যে পাথরটা তিনি তুলতে পারবেন না? যদি ওই রকম পাথর না বানাতে পারেন, তাহলে তিনি শক্তিমান নন। এই প্রশ্ন তখনই হবে, সর্বশক্তিমানটা যদি ঈশ্বরের গুণ হয়। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের বিশেষণ নয়, ঈশ্বরের এটাই স্বরূপ। ঈশ্বর যদি স্বরূপ হন, তখন বলা হবে, ওই জায়গাটা তিনি কোথায় পাবেন, যেখানে দাঁড়িয়ে তিনি পাথরটা তৈরী করবেন। আর সেই জায়গাটা কোথায় পাবেন যেখানে দাঁড়িয়ে তিনি পাথরটা তুলবেন? এই সমস্যাগুলো হয় খ্রীশ্চান ফিলজফিতে গিয়ে। কারণ তাঁদের কাছে ঈশ্বরের এগুলো স্বরূপ না হয়ে এগুলো সব গুণ হয়ে আছে, যেমনি মন আসবে ওকে বেঁধে দেবে, এরপর তর্কযুক্তি সব কিছুতেই ফেঁসে যাবে। স্বামীজী দেখাচ্ছেন সাংখ্যের সিদ্ধান্তগুলি, আচার্য শঙ্কর যার দোষ বার করলেন, সেখানে কিভাবে কত serious fallacies এসে যায়। সারা বিশ্বে যে কটি প্রধান ধর্ম আছে, যেখানেই কেউ পার্সোনাল গডকে নিয়ে আসে, যেমন জহুদিরা নিয়ে আসছে, খ্রীশ্চানরা নিয়ে আসছে, মুসলমানরা নিয়ে আসে, সেখানে তাদের কত রকম সমস্যা এসে যায় যে, কল্পনাও করা যাবে না। ওদের সাথে তর্ক করতে গেলে কায়দা করে এড়িয়ে যাবে, না হলে তলোয়ার বার করে গলা কেটে সব সমস্যার সমাধান করে দেবে।

হিন্দুদের মাধ্বাচার্যও ঘোর দ্বৈতবাদী, কিন্তু তিনি খুব সুন্দর ভাবে এই সমস্যাগুলিকে কেটে বেরিয়ে চলে গেছেন। ইসলাম ধর্মের যে আপত্তি ও সমস্যাগুলি আসে, সেই আপত্তিগুলি কিন্তু দ্বৈতবাদে আসে না। অবশ্য সবই এনাদের শব্দজাল। কিন্তু যতই শব্দজাল বিস্তার করুক, সবাইকেই জেনে রাখতে হবে, ঈশ্বরের মধ্যে যদি কোন গুণ দিয়ে দেওয়া হয়, তার মানেই হবে ঈশ্বরকে বেঁধে দেওয়া হল। আর ওই গুণ ঈশ্বর থেকে ভবিষ্যতে একদিন চলে যাবে। শ্রীকৃষ্ণ অবতার, মহাভারতের যুদ্ধে তিনি কথা দিয়েছেন যে তিনি যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবেন না। কথা দেওয়াটাও একটা গুণ। কিন্তু ভীষ্মকে মারার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অস্ত্র তুলে নিলেন। কথা দেওয়ার যে বাধাটা ছিল, এতে ওই বাধাটা ভেঙে গেল। শ্রীকৃষ্ণের ওই গুণ নষ্ট হতে বাধ্য, কারণ ওটা বিশেষণ। কিন্তু ভগবান, যিনি সর্বশক্তিমান, তাঁর ওখানে বিশেষণ থাকে না, ওটাই তাঁর স্বরূপ। এতটা বলার পর স্বামীজী ওখান থেকে সরে এসে সত্ত্বগুণকে নিয়ে বলছেন।

সত্ত্বগুণের সাথে জ্ঞানের সম্পর্ক

গীতায় একটা শ্লোক আছে, যেখানে ভগবান সত্ত্বগুণকে ব্যাখ্যা করে বলছেন, সেখানেও তিনি বলছেন, গুণ মানেই তাকে বেঁধে ফেলেছে। আমরা যে বলছি, তিনি অনেক গুণী মানুষ, গুণী সাধু, তার মানে সাধুকে বেঁধে দেওয়া হল। স্বামীজী সেইজন্য তাঁর রচিত ঠাকুরের আরাত্রিক স্তবে বলছেন নির্গুণগুণময়। নির্গুণগুণময় যে বলছেন, দেখাচ্ছেন কিভাবে contradiction এসে যায়, একদিকে তিনি নির্গুণ, আবার দেখাচ্ছেন তিনি গুণময়। গুণগুলি এইজন্যই দেখাচ্ছেন, কারণ ওই গুণগুলি না থাকলে আমরা তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে পারব না। আর এই গুণ যদি সত্য হয়, তাহলে ঠাকুর হয় এই গুণে বাঁধা পড়ে যাবেন, নয়তো গুণগুলো তাঁর বেরিয়ে চলে যাবে, সেইজন্য তিনি নির্গুণ। আমরা নিত্য খণ্ডন ভববন্ধন করে যাচ্ছি, কিন্তু ওর মধ্যে যে কত উচ্চ দর্শন আছে, আমাদের চিন্তায় আসে না। না পড়ারই কথা, ভগবানের সব ভক্তরা যদি বুদ্ধিমান হয়ে যায়, তাহলে ভগবানের সৃষ্টি চলবে কি করে।

তা নয়, আসলে মানুষ মরে যাবে কিন্তু কিছুতেই গভীরে একটু চিন্তা-ভাবনা করতে চাইবে না। সত্ত্ব, রজো আর তমো এই তিনটে গুণ, সত্ত্বগুণও মানুষকে বাঁধে। আমরা যখন কাউকে ভাল মানুষ বলি, তখন সে কি রকম হবে? ঠাকুরের ভাষায় একটা ঢ্যামনা সাপ। কোন কাজে লাগে না, তাই ভাল মানুষ। ঠাকুর আরও বলছেন, হাটে গরু কেনার সময় গরুর লেজে হাত দিলে যে গরু শুয়ে পরে, সে গরু কেনে না। ভাল মানুষ মানে, লেজে হাত দিলে ওরা শুয়ে পড়বে। হিন্দু শাস্ত্রে ভালকে পরিভাষিত করছে, যার ভিতর সত্ত্বগুণ আছে। সত্ত্বগুণকে গীতায় ভগবান বলছেন, *সুখ সঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞান সঙ্গেন চানঘ*, জ্ঞান আর সুখ এই দুটো জিনিস

সত্ত্বগুণীর সব সময় থাকবে। এখানে সুখ মানে, জ্ঞান থেকে যে সুখ উৎপন্ন হয়, তার অর্থ হল, যদি জ্ঞানী না হয়, সে কখনই সত্ত্বগুণী হবে না। মিথ্যা কথা না বলতে পারা, চুরি করতে না পারা, এগুলো সত্ত্বগুণীর লক্ষণ নয়, এটা আবার ঘোর তমোগুণীর লক্ষণ। যাদের চুরি করার দম আছে, মিথ্যা কথা বলার দম আছে, পাঁচটা গোলমাল করার দম আছে, আগুন লাগিয়ে দেওয়ার দম আছে, ওই দম থাকার পর যে উঠে বলতে পারে, আমি এর কোনটাই করব না, এবার সে রজোগুণ আর সত্ত্বগুণ মিলে একটা ভাল লোক হল। সেখান থেকে যখন, জ্ঞান ও জ্ঞান থেকে যে সুখ উৎপন্ন হয়, ওই জ্ঞান আর সুখে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তখন সে একজন সত্ত্বগুণী মানুষ। সত্ত্বগুণ আর জ্ঞান দুটো পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত। যার মধ্যে জ্ঞানের প্রতি স্পৃহা বেড়ে যায়, বুঝতে হবে তার মধ্যে এখন সত্ত্বগুণের আধিক্য হয়েছে।

স্বামীজী এবার বলছেন, The presence of Sattva with knowledge does not prove that Sattva is the cause of knowledge; (*যেখানে সত্ত্বগুণ, সেখানেই জ্ঞান দেখা যায় বলে প্রমাণিত হয় না যে, সত্ত্বই জ্ঞানের কারণ।*) সত্ত্বগুণ আর জ্ঞান একসাথে চলে, সেইজন্য আমরা যখন ঈশ্বরকে দেখি, ঈশ্বরকে আমরা সত্ত্বগুণে দেখি। ঈশ্বরকে সত্ত্বগুণে দেখি বলে, ঈশ্বরকে আমরা জ্ঞানমূর্তি রূপে দেখি। তার মানে, সত্ত্বগুণ আর জ্ঞান এক সঙ্গে চলে, তার মানে সত্ত্বগুণের আধিক্য হওয়া মানে, তার জ্ঞান হল। স্বামীজী বলছেন, জিনিসটা তা নয়, on the contrary, Sattva calls out what was already existing in man. (*তার মানে এই নয় যে সত্ত্বগুণ থেকেই জ্ঞান আসছে, বরং মানুষের ভিতর জ্ঞান পূর্ব হতেই রয়েছে, সত্ত্বের সান্নিধ্যে সেই জ্ঞান উদ্বুদ্ধ হয় মাত্র।*) সত্ত্বগুণ জ্ঞান দেয় না, আমাদের ভিতরে যে জ্ঞান আবৃত হয়ে আছে, সত্ত্বগুণ ওই গুণকে অনাবৃত করে দেয়। তাহলে আমরা অদ্বৈতের কঠিন কঠিন তত্ত্বগুলি বুঝতে পারছি না কেন? কারণ আমাদের ভিতরটা তমোগুণ আর রজোগুণে ভরে আছে। সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত থাকলে, ঠাকুর বলছেন, চটপট বুঝে নেয়। স্কুলে যারা ব্রিলিয়েন্ট ছাত্র হয়, তাদের মধ্যে সত্ত্বগুণের আধিক্য আছে। স্কুলে তাই ফিজিক্যাল এডুকেশান বাধ্যতমূলক কর হয়েছে। তার কারণ প্রচুর দৌড়ঝাঁপ করালে, কুস্তি লড়াইয়ে নামালে, খেলাধূলা করলে রজোগুণটা বাড়ে। তমোগুণ রজোগুণে পরিবর্তিত হয়ে গেলে তখন মাঝে মাঝে সত্ত্বগুণ উঁকি মারতে শুরু করে। এই সত্ত্বগুণ উঁকি মারা শুরু করলে তখন বিষয়গুলিকে চটপট বুঝে নেওয়ার ক্ষমতাটা বেড়ে যায়। যারা সব সময় মুখ গুজে বই পড়েই যাচ্ছে, এদের শতকরা নিরানব্বই জন একেবারে তমোগুণী। কারণ বাচ্চা বয়সে যতক্ষণ ওকে রজোগুণে খেলাধূলা, দৌড়ঝাপের মধ্য দিয়ে না নিয়ে যাওয়া হয়, ওর মধ্যে সত্ত্বগুণ আসবেই না।

সত্ত্বগুণ হলে কি হয়? স্বামীজী খুব সুন্দর বলছেন, as the fire heats an iron ball placed near it by arousing the heat latent in it, not by entering into the ball. (*যেমন আগুনের কাছে একটা লৌহগোলক রাখলে ওই আগুন লৌহ-গোলকটার ভিতর পূর্ব হতেই যে তেজ অব্যক্তভাবে ছিল, তাকে ব্যক্ত করে গোলকটাকে উত্তপ্ত করে দেয় –তার ভিতরে প্রবেশ করে না, সেই রকম।*) একটা আগুন জ্বলছে আর তার পাশে একটা লোহার বল রেখে দেওয়া হয়েছে। এতে লোহাটা গরম হয়ে যায়। লোহাটা কিভাবে গরম হয়? তাপের যদি ক্ষমতা থাকত তাহলে সে সব কিছুর ভিতরে ঢুকে গিয়ে তাপ তৈরী করে দিতে পারত। কিন্তু লোহার এ্যটমিক গঠন এমন, যেমনি আগুনের কাছে যায় তেমনি ওর এ্যটমসের নড়াচড়াটা অন্য রকম হতে শুরু হয়ে যায়। ওর ভিতরের গঠনটাই এমন, যেমনি আগুনের কাছে যাবে ওর ভিতরের জিনিসগুলো তেতে উঠবে। কোন গরুর লেজে হাত রাখলেই তিড়িং বিড়িং করে উঠবে, কারণ ওর ভিতরে দম আছে। যার দম নেই সে লেজে হাত দিলেই শুয়ে পরবে। কাঠের বল, লোহার বল আলাদা আলাদা করে আগুনের কাছে রেখে দিলে, যেগুলো ব্যাড কণ্ডাক্টর তার কিছুই হবে না, কারণ তার ভিতরের মলিক্যুলস গুলির নড়ার ক্ষমতাই নেই। ইলেক্ট্রিসিটির ক্ষেত্রে আমরা বলি ব্যাড কণ্ডাক্টর, গুড কণ্ডাক্টর। যাদের মধ্যে ইলক্ট্রনিক স্ট্রাকচার এমন ভাবে আছে যাতে ইলেক্ট্রিসিটি ফ্লো করতে পারবে, সেগুলিকে আমরা বলি গুড কণ্ডাক্টর। যেগুলোর মধ্যে নেই, ইলেক্ট্রিসিটি ফ্লো করতে পারে না, সেগুলোকে বলি ব্যাড কণ্ডাক্টর। জলের যে ধর্ম, তাতে জল চলে, যেখানেই ফুটো পাবে সেখান দিয়েই জল যাবে, তা লোহার পাইপ দেওয়া হোক, এ্যলুমিনিয়ামের পাইপ দেওয়া হোক, কাঠের পাইপ হোক, জল সবটা দিয়েই যাবে। হিট, ইলেক্ট্রিসিটি এরা যায় না। কারণ ওর ভিতরের ওই গঠনটাই নেই। সত্ত্বগুণ ঠিক তাই, সত্ত্বগুণ মানুষের মধ্যে আসে, আসার পর ওর ভিতরের জ্ঞান তেতে ওঠে।

ক্লাশে শিক্ষক এত কিছু সবাইকে শিখিয়ে যাচ্ছে, কয়েকজন ওটাকে ধরতে পারে, বেশির ভাগ ধরতে পারে না। যারা ধরতে পারে, আমরা বলি, কি বুদ্ধিমান ছেলে। স্বামীজীর বক্তব্য হল, সত্ত্ব আর জ্ঞানের একটা সম্পর্ক আছে বলার পর বলছেন, সত্ত্বগুণের জন্য জ্ঞান আসে না, সব জ্ঞান ভিতরেই আছে, সত্ত্বগুণ সেই জ্ঞানকে জাগিয়ে দেয়।

জ্ঞান-বল-ক্রিয়াই ঈশ্বর

সত্ত্বগুণ আর জ্ঞানের সম্পর্ক বলা হল। এবার আচার্য শঙ্কর বলছেন, Shankara says, knowledge is not a bondage, because it is the nature of God. The world ever is, whether manifested or unmanifested; so an eternal object exists. Jnana-bala-kriya (knowledge, power and activity) is Got (*শঙ্কর বলেন –জ্ঞান একটা বন্ধন নয়, কারণ জ্ঞান সেই পুরুষ বা ব্রহ্মের স্বরূপ। জগৎ ব্যক্ত বা অব্যক্তরূপে সর্বদাই রয়েছে, সুতরাং চিরন্তন জ্ঞেয় বস্তু একটা আছেই। জ্ঞান-বল-ক্রিয়াই ঈশ্বর।*) জ্ঞান জিনিসটা কিন্তু নিজে বন্ধন নয়। জ্ঞান যদি গুণ হয়, তাহলে কিন্তু বন্ধন হয়ে যাবে। কিন্তু জ্ঞান হল স্বরূপ, ভগবানকে যে আমরা সৎ, চিৎ ও আনন্দ বলছি, এই সৎ, চিৎ ও আনন্দ হল তাঁর স্বরূপ, চিৎ অর্থাৎ জ্ঞান ভগবানের স্বরূপ। ভগবানকে যখন সর্বজ্ঞ বলছি, তখন গুণ রূপে বলা হচ্ছে না, স্বরূপ রূপে বলা হয়। স্বরূপ হওয়ার জন্য তাঁর জ্ঞান কখন নাশ হবে না, গুণ হলে নাশ হয়ে যেত এবং ভগবানও বন্ধনে পরে যেতেন। বলছেন, এই জগৎ সামনে আছে কি সামনে নেই বলা যায় না, কিন্তু রয়েছে ভগবানের সাথে। জগৎ যখন ব্যক্ত হয়ে যায় তখন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সামনে এসে গেল, জগৎ যখন আবার অব্যক্ত হয়ে যাবে, তখনও ভগবানের সাথে এক থাকবে। সেইজন্য ঈশ্বরের মধ্যে জ্ঞান সব সময়েই আছে। কিন্তু এই জ্ঞান বস্তু জ্ঞান নয়, আর এই জ্ঞান ভগবানের কোন গুণ নয়।

আমরা এর আগে আলোচনা করেছিলাম কিভাবে একটা বস্তুতে সত্তা থেকে যায়। একটা বস্তু আছে কিনা তার প্রমাণ কি? বলছেন, স্বয়ংপ্রকাশ, বস্তু নিজেই দেখিয়ে দেয়, সৎ মানেই নিজেকে দেখাচ্ছে। যেমন মাইক্রোফোন আছে, মাইক্রোফোন দেখাচ্ছে, মাইক্রোফোন আছে বলে দেখাচ্ছে; মাইক্রোফোন নাশ হয়ে গেলেও 'আছে' জিনিসটা অন্য বস্তুতে থাকবে। ঠিক তেমনি চৈতন্যের যে বোধ হয়, যে জিনিসটা আছে সেই জিনিসটারই বোধ হয়। শেষ পর্যন্ত দেখছি সৎটাই আছে, যেটা স্বয়ংপ্রকাশ সেটাই চৈতন্য। সেখান থেকে বলছেন, এই জগৎ আর জগতের যে জ্ঞান ঈশ্বরের সঙ্গেই আছে, কখন ব্যক্ত কখন অব্যক্ত। যখন ব্যক্ত হয়ে যায় তখন জগৎকে এক রকম বলা হয়, যেখান থেকে জগৎ বেরিয়ে এসেছে, তাঁকে আরেক রকম বলা হয়। এরপর স্বামীজী ঈশ্বরকে নিয়ে বলছেন, ঈশ্বরকে অনেক ভাবে পরিভাষিত করা হয়। তার মধ্যে একটা সংজ্ঞা হল, জ্ঞান-বল-ক্রিয়া, ভগবানের মধ্যে এই তিনটে জিনিস সব সময় থাকে। জ্ঞান সব সময় তাঁর সঙ্গে, শক্তিও সব সময় আছে আর ক্রিয়া তাঁর সাথে সব সময় আছে। এই তিনটে জিনিস আছে বলেই তিনি ভগবান।

জ্ঞানলাভের জন্য ঈশ্বরের জীবের মত কোন শরীর দরকার হয় না

জ্ঞান-বল-ক্রিয়া এই তিনটেকে নিয়ে বলার পর স্বামীজী বলছেন, Nor does He need form, because finite only needs for to interpose as an obstruction to catch and hold infinite knowledge. (*জ্ঞানলাভের জন্য তাঁর দেহেন্দ্রিয়াদি কোন আকারেরই প্রয়োজন নেই; যে সসীম, তার পক্ষে সেই অনন্ত জ্ঞানকে ধরে রাখবার জন্য একটা প্রতিবন্ধকের (অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদির) প্রয়োজন আছে বটে।*) এটা খুব interesting sentence। আমরা রামকৃষ্ণ মিশনের কেউ সন্ন্যাসী, কেউ ভক্ত, আমরা যদি ঠাকুর, স্বামীজীর নামে কিছু ভাল ভাল কথা বলি, লোকেরা বলবে, উনি এই সম্প্রদায়ের লোক বলে বাড়িয়ে বলছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি আমরা খুব নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করে দেখি, তখন দেখতে পাই, পাশ্চাত্য জগতে অনেক চিন্তাবিদরা মিলে চিন্তার জগতে যত অবদান দিয়েছেন, স্বামীজী একাই ধর্মজগতে তার থেকে অনেক বেশি দিয়েছেন। এটা একেবারেই বাড়িয়ে কিছু বলা হচ্ছে না, এই কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। এই যে একটা বাক্য, যাতে স্বামীজী ঈশ্বরকে পরিভাষিত করছেন, তাতে তিনি বলছেন ঈশ্বরের কোন রূপের দরকার পরে না। রূপ কেন দরকার? বলছেন, finite only needs for to interpose as an obstruction to

catch and hold infinite knowledge। সমুদ্রে বা নদীতে বা পুকুরে জাল ফেলা হয় যাতে মাছ ধরতে পারে। নদীতে বা সমুদ্রের জলে মাছ এমনিতে ধরা যাবে না, মাছকে ধরার জন্য একটা obstruction দরকার, জাল হল সেই obstruction। জাল obstruction তৈরী করে মাছের গতিবিধিকে আটকে দিচ্ছে। ঠিক তেমনি আমাদের বুদ্ধি এত সীমিত, ক্ষমতা আমাদের এত কম বলে আমরা জ্ঞান নিতে পারি না, সেইজন্য আমাদের একটা শরীর দরকার পরে, একটা মন দরকার পরে। শরীরা আর মন হল জাল, এই জাল দিয়ে অনন্ত জ্ঞানরাশিকে ধরছে।

এই জালটা কার? আমার, আমার বলতে জীবাত্মার। আমি আত্মা রূপে সেই ব্রহ্মের সাথে এক, কিন্তু আমি নিজেকে শরীর ও মনের সাথে জুড়ে রেখেছি বলে আমি জীবাত্মা। এখন এই জীবাত্মা চাইছে অনন্ত জ্ঞান, এই জ্ঞানে আমার জন্মগত অধিকার। আমার বড় পুকুর, পুকুরের মাছও আমার। কিন্তু মাছ ধরার জন্য চাই জাল। জাল না হলে মাছ ধরা যাবে না। জাল যদি সূক্ষ্ম হয়, মাছ ধরার সময় তত ছোট মাছ ধরা পড়বে। জালের ফোকর যত বড় হবে, তত ছোট মাছ বেরিয়ে যাবে। এই শরীর, ইন্দ্রিয়, মন দিয়ে আমরা ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানকে অর্জন করছি। মন যাদের অতি প্রাকৃত, খুব স্থূল, তাদের গরু মোষের শরীর হলেও চলবে, সেই গরু মোষের শরীর দিয়েই ভোগ করবে। আমরা বলছি ভোগ করছে, আসলে সব রকম ভোগের মাধ্যমে অজান্তে সে কিন্তু জ্ঞান গ্রহণ করে যাচ্ছে। আমরা কথায় কথায় বলি এই শরীর দিয়ে ভোগ করছি, কিন্তু কোন মানুষ শরীর দিয়ে ভোগ করে না। কোন প্রাণীই শরীর দিয়ে, ইন্দ্রিয় দিয়ে ভোগ করে না। আসলে এই শরীর, এই ইন্দ্রিয় দিয়ে সবাই সেই ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানরাশিকে ধরার চেষ্টা করে যাচ্ছে, বোঝার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

যার শরীর যত অনুভূতি প্রবণ, সে তত সূক্ষ্ম জিনিসকে বোঝার চেষ্টা করবে। খুব সূক্ষ্ম মনের কবি যদি হন, খুব সূক্ষ্ম চিন্তাবিদ যদি হন, তাঁদের শরীরের ত্বক খুব নরম হবে। লুচি খেতে গেলে ঠাকুরের হাত কেটে রক্ত বেরিয়ে আসত। রামকৃষ্ণ মিশনের এক সেন্টারে একজন বিদেশী মহারাজ ছিলেন, খুব উচ্চমানের সাধু ছিলেন। তিনি ব্রহ্মচারীদের বলতেন, 'তোমরা যখন বেলুড় মঠে ট্রেনিং নিতে যাবে, তখন সবাইকে বেলুড় মঠে থাকতে হবে, বেলুড় মঠের যে জীবনধারা, তাতে কিছুদিন পর থেকেই দেখবে তোমাদের সব কিছুই নরম হয়ে যাবে। তোমাদের শরীর নরম হয়ে যাবে, কথাগুলো নরম হয়ে যাবে, তোমাদের দাড়ি পর্যন্ত নরম হয়ে যাবে। শেভিং করার সময়ে পরিষ্কার দেখবে দাড়িগুলো নরম হয়ে গেছে'। একজন সিনিয়র মহারাজ ইয়ং ব্রহ্মচারীদের এই কথাগুলো বলছেন, যাদের এখনও কোন অভিজ্ঞতাই হয়নি, ব্রহ্মচারীরা একজন সিনিয়র মহারাজের সামনে সামনে হাসাহাসি করতেও পারছে না। শুধু ব্রহ্মচারীদেরই নয়, যে শুনবে তারই অবাক লাগবে। আর ঠিক তাই হয়। বেলুড় মঠের সাধুদের চেহারা দেখলেই বোঝা যায় তাঁদের শরীর কত নরম। সাধুর চেহারা যদি রুক্ষ থাকে, তাহলে বুঝতে হবে কিছু গোলমাল আছে।

আমাদের পরম্পরায় যখনই অসুর রাক্ষসদের দেখানো হয় তখনই তাদের চেহারা মধ্যে একটা রুক্ষ ভাব আনা হয়। আর দেবতাদের শরীর দেখানোর সময় একটা মিষ্টি নরম ভাব নিয়ে আসা হয়। একজন রাক্ষসের চেহারা আর একজন দেবতার চেহারায় খুব একটা তফাৎ থাকার কথা নয়, কিন্তু এইজন্যই তফাৎ থাকবে, যাঁরা সূক্ষ্ম ও উচ্চ চিন্তন করেন, চেহারায় তাঁদের ওই ছাপটা এসে যায়। একটা মানুষ কতটা refined, আর কতটা crude, চেহারা দেখলেই পরিষ্কার বোঝা যায়।

আমাদের সমস্ত শাস্ত্র বলছেন, মানবজীবন এক দুর্লভ জীবন। সাধু সন্তরা আমাদের বলে থাকেন, এই শরীর পেয়েছ কি শুধু ভোগ করার জন্য, ভোগের দ্বারা এই শরীরকে বৃথা নষ্ট করো না! স্বামীজী কিন্তু এখানে এই কথা একবারও বলছেন না, কল্পনাই করা যায় না যে স্বামীজীর এই বাক্যটা কি প্রচণ্ড revolutionary। Revolutionary এই অর্থে নয় যে, তিনি যা কিছু আছে সব উল্টে দিচ্ছেন, তিনি জিনিসটাকে দেখিয়ে দিচ্ছেন যে আসলে জিনিসটা এই। মুণ্ডকোপনিষদে দুটি পাখির বর্ণনা আছে, এক বৃক্ষে দুটি পাখি বসে আছে, একটা পাখি বৃক্ষের নীচের ডালে, আরেকটি পাখি বৃক্ষের একেবারে উপরের ডালের শাখায় বসে আছে। নীচের পাখিটি বৃক্ষের কখন তিক্ত ফল, কখন মিষ্ট ফল ভক্ষণ করছে। মিষ্ট ফল খাওয়ার পর পাখিটার খুব আনন্দ হয়, তিক্ত ফল খেলে বিমর্ষ হয়ে ফল খাওয়া থেকে বিরত হয়ে যায়, বিরত হয়ে আরেকটা উপরের ডালে উঠে যাচ্ছে। ঈশ্বর অনন্ত, তাঁর জ্ঞানও অনন্ত, এই অনন্ত জ্ঞান সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে রয়েছে, আমরা এই শরীর,

এই মন দিয়ে ওই জ্ঞান গ্রহণ করে যাচ্ছি। যখন ওই জ্ঞান খুব ভাল লাগে তখন ওই জ্ঞানের মধ্যেই পড়ে থাকি। যখন জ্ঞান তিক্ত লাগে তখন ওই জ্ঞানকে ছেড়ে দিচ্ছি। যে জ্ঞানকে ছেড়ে দিচ্ছি, ওই জ্ঞানকে নেওয়ার জন্য যে শরীর, যে মন দরকার ছিল, সেই শরীর আর সেই মন এখন আর লাগবে না। স্বাভাবিক ভাবেই তখন ওই শরীরটা পাল্টে যাবে। এর খুব স্থূল উপমা হল, একটা মেয়ে স্কুলে বা কলেজে পড়ছে, সারাদিন তিড়িং বিড়িং করে লাফিয়ে বেড়ায়, এখন তার এক রকম জীবন। হঠাৎ সে কোন ছেলের প্রেমে পড়ল, এবার ওর সাজগোজ, হাঁটাচলা, কথা বলা সব অন্য রকম হয়ে যাবে। ওর কাছের লোকেরাও বুঝতে পারে, মেয়েটা কেমন পাল্টে যাচ্ছে, নির্ঘাৎ কারুর প্রেমে পড়েছে। একটা সামান্য ব্যাপার, কিন্তু তাতেই সব পাল্টে যাচ্ছে। যখন আমরা যে অবস্থায় থাকব, যে ভোগে থাকব, শরীর নিজেই সেই ভোগের উপযোগী করে পুরো পাল্টে দেয়।

যে মহারাজের কথা বলা হয়েছিল, যিনি ব্রহ্মচারীদের বলেছিলেন, তোমাদের দাড়ি পর্যন্ত নরম হয়ে যাবে, সত্যিই তা হয়, যদি কেউ নিয়মিত ধ্যানজপ, শাস্ত্র অধ্যয়ন, সাধু সঙ্গ করতে থাকে। আগেকার দিনে ব্রাহ্মণদের দেখলেই বোঝা যেত, তাঁর মধ্যে একটা তেজ আছে। কি করে তেজ এলো? শাস্ত্র অধ্যয়ন করছেন, করাচ্ছেন, তার মানে জাগতিক ভোগের ইচ্ছা তাঁদের কল্পনাতেই আসতে পারে না। হিন্দুরা মদ খেত না, কোন নেশা করত না, যে খাবার শরীরকে গরম করে দেয়, সেই খাবার তারা খেত না, সেইজন্য পেঁয়াজ রসুন খেত না, গরুর মাংস খেত না। হিন্দুদের এই ভাবটাই ছিল, একটা উচ্চ জ্ঞানের জন্য তোমার জন্ম, জগৎ ভোগের জন্য নয়, তাই এসব জিনিস তোমার লাগবে না। এখন আমরা যে জ্ঞান নিচ্ছি, এই জ্ঞান না চাইলেও আমাদের নিয়ে যেতে হবে। কারণ যতক্ষণ আমরা না নিচ্ছি, নেওয়ার পর যতক্ষণ মার না খাচ্ছি, ততক্ষণ ভিতর থেকে আমরা ওটাকে ছাড়ব না। আমরা যেমন বলি, কেউ শুনে শেখে, কেউ দেখে শেখে, আর কেউ ঠেকে শেখে। আবার কেউ ঠেকেও শেখে না। কেন? কারণ তার জ্ঞান এখনও পুরো হয়নি। যে জ্ঞানে এখন পড়ে আছে, সেখানে যতক্ষণ না মার খায় ততক্ষণ বুঝতে হবে ওই জ্ঞান তার এখনও পুরো হয়নি, এখনও সে ওই জ্ঞান নিয়ে যাচ্ছে। মার না খাওয়া পর্যন্ত ওই জ্ঞান থেকে সে কিছুতেই বেরিয়ে আসবে না।

স্বামীজী বলছেন, এই যে শরীর, এই যে মন, এর একটাই কাজ। কি কাজ? এই শরীর মন হল একটা জাল। কার জাল? জীবাত্মার। জীবাত্মা এই জাল কিসের জন্য রেখেছে? পুকুরে নানা রকমের মাছ আছে, যার যে রকম জাল সে সেই রকম জাল দিয়ে সেই রকম মাছ ধরবে। এখন আমাদের শরীর মনের যা গঠন, এই জাল দিয়ে কামিনী-কাঞ্চন, নামযশ ছাড়া কিছু আসবে না। যখন বলবে, আমার আর এইসব লাগবে না, ঠাকুর যেমন বলছেন, মিছরির শরবৎ খেলে চিটেগুড়ের পানা আর ভাল লাগে না, আমার আর এই কামিনী-কাঞ্চন, নামযশ রূপ চিটেগুড়ের পানা লাগবে না, এবার সে অন্য ধরণের জ্ঞানের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল।

সমস্ত জ্ঞান আসে একমাত্র শরীরের মাধ্যামে, মনের মাধ্যমে আর ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। কিন্তু ভগবানের এই শরীর, মন, ইন্দ্রিয় লাগে না, কারণ তিনি বিশুদ্ধ আত্মা, আমরা জীবাত্মা। জীবাত্মা পরমাত্মা কখনই এক হয় না, আত্মা পরমাত্মা এক। জীবাত্মা মানে, যে ঠিক করে নিয়েছে জগৎ থেকে আমার মত জ্ঞান পেতে হবে। এবার তাই সে শরীর, মন, ইন্দ্রিয় নিয়ে খেলতে শুরু করল। স্বামীজী শরীর মনকে এখানে 'obstruction' বলছেন, obstruction মানে জাল যেমন হয়। তারপরেই স্বামীজী বলছেন, but God really needs no such help. There is no 'moving soul', there is only one Atman. (*কিন্তু ঈশ্বরের ঐরূপ সহায়তার আদৌ কোন আবশ্যকতা নেই। বাস্তবিক এক আত্মাই আছেন, বিভিন্ন-লোকগামী 'সংসারী' জীবাত্মা বলে স্বতন্ত্র আত্মা কিছু নেই।*) আমরা যে এত কিছু করছি, আমাদের প্রতিনিয়ত যে অবস্থার পরিবর্তন হয়ে চলেছে, আমরা মনে করছি আত্মা এই অবস্থা থেকে সেই অবস্থাতে যাচ্ছে, সেই অবস্থা থেকে অন্য এক অবস্থায় যাচ্ছে, বাস্তবে আত্মার এই রকম কোন নড়াচড়া হয় না।

Jiva (individual soul) is the conscious ruler of this body, in whom the five life principles come into unity, and yet that very Jiva is the Atman, because all is Atman, (*পঞ্চ প্রাণ যাঁতে একীভূত হয়েছে –এই দেহের সেই চেতন নিয়ন্তাকেই 'জীবাত্মা' বলে, কিন্তু সেই জীবাত্মাই পরমাত্মা, যেহেতু আত্মাই সব।*) এই জীব, যাকে জীবাত্মা বলা হচ্ছে, সে হল এই শরীরের নিয়ন্ত্রণ

কর্তা, এই জীবই শরীর, মন, ইন্দ্রিয় দিয়ে জ্ঞান অর্জন করছে। যে জ্ঞান থেকে যখন সে বিরক্ত হয়ে যায়, তখন সে বলে আমার আর এটা লাগবে না। যেমনি বলে আমার এটা লাগবে না, তেমনি তার শরীর, মন, ইন্দ্রিয় আরেকটু সূক্ষ্ম হয়ে যায়। আমাদের শরীর এত রুক্ষ কেন? দেবী দেবতাদের শরীরের মত নয় কেন? দেখলেই সবাই আকর্ষিত হয়ে যায় না কেন? শরীর দেখলেই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে না কেন? কারণ আমরা এখন যে জ্ঞানে আছি, এই জ্ঞানেই খুশি আছি। গুবরে পোকাকে নারদ বলছেন, 'বৈকুণ্ঠে যাবি'? গুবরে পোকা বলছে, 'যেতে তো পারি কিন্তু বৈকুণ্ঠে গেলে কি আরও ভাল গোবর পাওয়া যাবে'? আমাদেরও যদি নারদের মত কোন মহাপুরুষ এসে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যান, সেখানে গিয়ে আমরা আমাদের মতই লোক খুঁজব। কাঠখোট্টা কোন রাজনৈতিক নেতাকে যদি কোন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে নিয়ে যাওয়া হয়, পাঁচ মিনিটের বেশি ওখানে টিকতে পারবে না। কারণ তার শরীর, মন, ইন্দ্রিয় ওই উচ্চমার্গের কোন কিছু নেওয়ার জন্য প্রস্তুতই নয়। যার জন্য শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সবাই নিতে পারে না, তার রুচিটা এখনও স্থূল হয়ে আছে। খুব ভাল সংস্কৃতির মানসিকতা না থাকলে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত নিতে পারবে না। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত মানেই ওটা রিফাইনড্ জিনিস, রিফাইনড্ জিনিসকে নিতে পারছে মানে, শরীর, মন, ইন্দ্রিয়ও রিফাইনড্ হয়ে গেছে, শরীরের গঠনটাই তখন অন্য রকম হয়ে যাবে। কোন কারণে যদি কোন উচ্চ কিছুর আস্বাদ পেয়ে যায়, আর বর্তমান অবস্থায় যদি প্রচুর মার খায়, তখন বলবে আমার আর এটা লাগবে না।

একমাত্র আত্মার উপাসনাতে মুক্তি আসে - হিন্দুরা পৌত্তলিক নয় - সব পথই ঈশ্বরের দিকে নির্দেশ কর - ভগবদ্‌গীতা

আসলে সেই জীবাত্মাই আত্মা, কিন্তু যেহেতু শরীর দিয়ে জ্ঞান নিতে চাইছে তাই তখন তাকে জীব বলছি। What you think about it is your delusion and not in the Jiva. (*তুমি তাঁকে যে অন্যরূপ বোধ করছ, সে ভ্রান্তি তোমারই, জীবে সে ভ্রান্তি নেই।*) আমরা জীবাত্মাকে নিয়ে যা কিছু ভাবছি, এগুলো আমাদের নিজস্ব অজ্ঞান, জীবের মধ্যে এগুলো কিছু নেই। You are God, and whatever else you may think is wrong. You must worship the Self in Krishna, not Krishna as Krishna. (*তুমিই ব্রহ্ম, আর তুমি নিজেকে আর যা কিছু বলে ভাবছ, তা ভুল। কৃষ্ণকে কৃষ্ণ বলে পূজা করো না, কৃষ্ণের মধ্যে যে আত্মা রয়েছেন, তাঁরই উপাসনা কর।*) স্বামীজী এখানে বলতে চাইছেন, তুমিই সেই ঈশ্বর, ভগবানের সাথে তুমি এক, এছাড়া যা কিছু তুমি ভাবছ সবটাই তোমার ভুল। কৃষ্ণকে যখন পূজা করবে, তাঁকে আত্মা রূপেই পূজা করতে হবে, কৃষ্ণকে কৃষ্ণ রূপে না।

আমরা এই আলোচনা আগে আগে অনেকবার করেছি, যে কোন অবতার, তিনি শ্রীরাম হন, শ্রীকৃষ্ণ হন, ঠাকুর হন, শ্রীরামকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণ কখনই ভগবান নন, যিনি ভগবান তিনিই রামকৃষ্ণ বা কৃষ্ণ রূপ ধারণ করেছেন। খুব সহজ কথা, শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবান নন, যিনি ভগবান তিনিই রামকৃষ্ণ রূপ ধারণ করেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের যখন পূজা হবে, তখন ভগবান রূপেই পূজা হয়, রামকৃষ্ণ রূপে না। আমরা মনে করছি, ঠাকুর জিলিপি খেতে ভালবাসতেন, ঠাকুরকে জিলিপি ভোগ দিলাম, ওখান পর্যন্ত ঠিক আছে, এর বেশি না। ভাগবতের কাহিনীতে শ্রীকৃষ্ণ মাখন চুরি করে খাচ্ছেন, শ্রীকৃষ্ণের যিনি ভক্ত, তিনি বালকৃষ্ণকে মাখন মিছরি দিলেন, ঠিক আছে, কিন্তু তারপরে আর না। নিন্দুকরা হিন্দুদের নামে বলে, হিন্দুরা পৌত্তলিক, তারা তেত্রিশ কোটি দেবী দেবতাকে মানে। কিন্তু এরা ভুলে যায় যে, ইসলাম জগতে, খ্রীশ্চান জগতে পৌত্তলিক বলতে বোঝায় ওই সত্তাকে। একটা যে দেবী দেবতার মূর্তি আছে, পৌত্তলিকদের কাছে এটাই শেষ কথা। হিন্দুদের মধ্যে এই ভাব নিয়ে কিছু করা হয় না। হিন্দুদের কাছে, যিনি পরম সত্তা, তিনি এই মূর্তি রূপে আমার সামন আবির্ভূত হয়েছেন। আর তা নাহলে, পরম সত্তার কোন একটা বিশেষ গুণ, বিশেষ শক্তিকে এই আকারে একটা মূর্ত রূপ দেওয়া হয়েছে। পরম সত্তা যিনি, তাঁকে পরমপিতা, পরমাত্মা, যে শব্দেই বলা হোক না কেন, তাঁর একটা গুণ হল অনন্ত জ্ঞান। সেই অনন্ত জ্ঞানকে আমরা মা সরস্বতী রূপে পূজা করি। কারণ সরস্বতীকে যদি নিরাকার ব্রহ্ম রূপে পূজা করি, তাহলে আমি যে বিদ্যার্থি, বিদ্যা অর্জন করতে চাইছি, আমি তাঁকে আমার ভক্তি ও ভালোবাসা নিবেদন করতে পারব না। অমূর্ত কোন কিছুকে ভালবাসা দেওয়া যায় না।

লোকে বলতে পারে, একদিকে বলে নিরাকার আবার অন্য দিকে তার দশটা নাম আছে, কিন্তু যিনি নিরাকার, তাঁর দশটা নাম কোথা থেকে আসছে? যিনি নিরাকার তাঁর কখন রূপ হবে না। কিন্তু নিরকারকে

যখন আমরা ভজনা করি, তখন তাঁর কোন একটা গুণ নিয়ে ভজনা করি। ইসলামে আল্লার নিরানব্বইটা নাম আছে, এক-একটা নাম তাঁর এক-একটা গুণ। ঠিক তেমনি হিন্দুরা ঈশ্বরের যে নানান শক্তি, নানান গুণ, তাঁর এক-একটা রূপ দিয়ে দেয়। ভগবানের সমস্ত শক্তি আছে, তাঁর সমস্ত ধন সম্পদ আছে, তিনি শ্রীমান, শ্রী মানে ঐশ্বর্য, এই শ্রীমানের রূপকে যখন হিন্দুরা নিয়ে আসে, তারা তখন সেই শ্রীকে লক্ষ্মীদেবী রূপে আরাধনা করে। সেই ভগবান আবার সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করেন। ভগবান যখন সংহার করেন, তখন ভগবানের সেই শক্তিকে হিন্দুরা মা কালী রূপে আরাধনা করে। কিন্তু হিন্দুদের কেই কখনই বলবে না যে, কালীই শেষ কথা, কেউ বলবে না লক্ষ্মী মানে লক্ষ্মীই শেষ। সবাই জানে, সেই পরমাত্মা, সেই যে ব্রহ্ম, তাঁর যে শক্তি, তাঁর যে গুণ এটা তাঁরই মূর্ত রূপ, আর এটা আমি কল্পনা করছি, তিনি নন। ওই রূপে বাস্তবিক কেউ একজন আছেন, তা নয়। আমি পরমাত্মাকে এই রূপে, এই গুণে দেখতে চাইছি, কারণ আমার মন সীমিত, সীমিত মন সীমিত জিনিসকেই ধরতে পারে। এই ভাবে বিচার করার পর এটাই পরিষ্কার হয়ে যায় যে, হিন্দুরা কোন ভাবেই পৌত্তলিক না, একেবারেই না।

পৌত্তলিক মানে হয়, যখন ওই সত্তাটাই শেষ কথা, যেখান পর্যন্ত, যতটুকু আমি দেখছি ওটাই শেষ কথা। একটা আদিম সমাজ আছে, সেখানে একটা মূর্তি আছে, সেই মূর্তির মধ্যে তারা মানুষের গুণগুলিকে আরও বড় করে দেখছে, এটাকেই পৌত্তলিক বলে। আমরা হিন্দুরা ঠিক সেই অর্থে মূর্তি পূজা করি না, মূর্তিপূজার কথা হিন্দু ধর্মের নিন্দুকরা বলে, আমরা সব সময় বলি বিগ্রহ। বেলুড় মঠের মন্দিরে যে ঠাকুরের মূর্তি রয়েছে, এটা আমাদের কাছে মূর্তি না, এটা বিগ্রহ। বিগ্রহ মানে, পরমাত্মা যিনি, যিনি অনন্ত, যাঁকে আমরা চিন্তা করতে পারি না, মন দিয়ে ধারণা করতে পারি না, আমার চিন্তনের জন্য আমি তাঁর এই রূপটা দিলাম, বাস্তবে তিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, বাস্তবে তিনি সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্। সেইজন্য হিন্দুদের পূজার ব্যাপারটাই পুরো অন্য রকম, এই পূজা কোন মতেই পৌত্তলিক উপাসনা হতে পারে না। স্বামীজী বলছেন, কৃষ্ণকে তুমি যে পূজা করছ কৃষ্ণ রূপে করছ না। কৃষ্ণ রূপে পূজা করলে পৌত্তলিক হয়ে যাবে। সেই আত্মাই কৃষ্ণ, সেই আত্মাই রামকৃষ্ণ রূপে পূজিত হচ্ছে।

স্বামীজী বলছেন, Only by worshipping the Self can freedom be won. (*শুধু আত্মার উপাসনাতেই মুক্তি লাভ হয়।*) যদি মুক্তি পেতে হয়, যদি তুমি মুক্তি কামনা কর, তাহলে সেই আত্মারই পূজা করতে হবে। কৃষ্ণকে কৃষ্ণ রূপে, ঠাকুরকে ঠাকুর রূপে পূজা করলে কোন দিন মুক্তি হবে না। যে যার চিন্তা করে সে তার সত্তা পায়। গীতাতেও ভগবান বলছে, *যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ......*, যে দেবতাকে দেবতা রূপে দেখছে সে ওই দেবতার ভাব পাবে, ভূতপ্রেতের যদি পূজা করে তাহলে মরে ভূতপ্রেতই হবে। আর পরমাত্মা রূপে যদি ভগবানকে পূজা করা হয়, তাহলে সে পরমাত্মার সাথে এক হয়ে যাবে। পরমাত্মার সাথে এক হয়ে যাওয়াটাই মুক্তি।

সেইজন্য স্বামীজী বলছেন, Even personal God is but the Self objectified. (*এমন কি, সগুণ ঈশ্বর পর্যন্ত সেই আত্মার বহিঃপ্রকাশমাত্র।*) সগুণ সাকারের যে পূজা করা হয়, সেই সগুণ সাকার রূপটাও ওই আত্মারই মূর্ত রূপ। নির্গুণ নিরাকার যিনি, যিনি পরমাত্মা, তাঁরই সগুণ সাকার রূপ, অন্যান্য ধর্মে যাঁকে ঈশ্বর বলছেন, আমরা যখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর রূপের উপাসনা করছি, সেটাও সেই আত্মারই মূর্ত রূপ। স্বামীজী আচার্য শঙ্করের একটি অমূল্য বাক্যের উদ্ধৃতি দিচ্ছেন, যে বাক্য দিয়ে আচার্য ভক্তির সংজ্ঞা নিরুপণ করছেন, 'Intense search after my own reality is Bhakti', says Shankara. (*শঙ্কর বলছেন, 'স্বস্বরূপানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে' –নিজ স্বরূপের আন্তরিক অনুসন্ধানকেই ভক্তি বলে।*) মানুষ যখন নিজের মনকে আত্মার প্রতি লাগিয়ে দিয়ে আত্মার অনুসন্ধানে নিমগ্ন হয়ে যায়, এটাই ভক্তি।

All the means we take to reach God are true; it is only like trying to find the pole star by locating it through the stars that are around it. (*আমরা ঈশ্বরলাভের জন্য যত বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে থাকি, সে সব সত্য। যেমন ধ্রুবতারাকে দেখতে হলে তার আশপাশের নক্ষত্রগুলির সাহায্য নিতে হয়, এও তেমনি।*) শিশুকে কোন বস্তুকে দেখাবার সময় যেমন আঙুল দিয়ে দেখানো হয়, এও ঠিক তেমনি যে – ঈশ্বরলাভের জন্য মানুষ যে কোন পথই নিক না কেন, সব পথ কিন্তু ঈশ্বরের দিকেই অঙ্গুলি

নির্দেশ করে যাচ্ছে। স্বামীজী বলছেন, যেমন ধ্রুবতারাকে দেখার জন্য আশপাশের তারার সাহায্য নিতে হয়, এটাও ঠিক তাই। একটু আগে যেটা বলা হয়, এই শরীর, মন, ইন্দ্রিয় হল জ্ঞান পাওয়ার ফল, জালের মত obstruction create করে, জাল দিয়ে যেমন মাছ ধরা হয়, ঠিক তেমনি এগুলো দিয়ে ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানকেই ধরা হয়।

স্বামীজী ১৮ই জুলাইয়ের ক্লাশ এই বলে শেষ করছেন, The Bhagavat Gita is the best authority on Vedanta. (*বেদান্তের উপর ভগবদ্গীতা শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ।*) স্বামীজী এখানে বেদান্ত বলতে, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত আর দ্বৈত তিনটেকেই নিয়ে আসছেন। বেদান্তে যখন তিনটেকে নিয়ে আসা হয় তখন ভগবদগীতা হল the greatest authority। বেদান্ত যদি জানতে হয়, তাহলে গীতা হল সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র। বেদান্তের তিনটে গ্রন্থকে একসাথে প্রস্থানত্রয় বলা হয়; এই তিনটে গ্রন্থ হল, উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র এবং গীতা। প্রস্থানত্রয়ের মধ্যে গীতা আবার সমন্বয় শাস্ত্র। সমন্বয় শাস্ত্র মানে, যে জিনিসগুলি উপনিষদে নেই, সেই জিনিসগুলি গীতাতে এসে গেছে, যেমন ভক্তি; উপনিষদে ভক্তির কথা নেই, কিন্তু গীতায় এসে গেছে। বেদান্তকে যদি ঠিক ঠিক বুঝতে হয় তাহলে সব থেকে বেশি দরকার গীতা। আর গীতাই হিন্দুদের ঠিক ঠিক ধর্মগ্রন্থ। কারণ বেদ সবাই বুঝতে পারবে না, আর বেদ সবাই পড়েও না। আর হিন্দুদের দর্শন বেদান্ত থেকে আসে, সেই বেদান্তের সমস্ত কথা গীতায় রাখা আছে। গীতা হল হিন্দুদের জন্য একেবারে শেষ কথা। সেইজন্য যারা নিজেদের হিন্দু মনে করে, তাদের পুরো গীতা না হলেও, স্নানের পর অন্তত গীতার একটা অধ্যায় নিয়মিত পাঠ করা উচিৎ। হিন্দু ধর্মে মৃত্যুর সময় পাশে গীতা রাখা হয়, শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে গীতা পাঠ করা হয়, গীতা দান করা হয়। এই বলে স্বামীজী ১৮ই জুলাইয়ের ক্লাশ শেষ করছেন।

শুক্রবার, ১৯শে জুলাই

ঈশ্বর-জীব-জগৎ মিলিয়ে ত্রিকোণ

দেববাণীর ১৯শে জুলাই, শুক্রবারের ক্লাশ। অদ্বৈত বেদান্ত, সাংখ্য দর্শনের আলোচনা করতে করতে এবার স্বামীজী দৈনন্দিন জীবনে নামছেন। কথামৃতের পাঠকদের ভাষায় স্বামীজী যেন জ্ঞান থেকে ভক্তিতে নামছেন। জ্ঞান সব সময় উপমান দিয়ে হয়। উপমান মানে, আমাদের জানা জিনিসের বাইরে কোন জিনিসের কথা যদি বলা হয়, আমরা চটপট তখন ওটাকে আমাদের পুরনো জ্ঞানের সাথে মেলাতে থাকি। যেটুকু মিলল, তাতেই আমি বুঝে নিই যে জিনিসটা কি, আর তার থেকে যতটুকু বেশি এলো সেটাকে আমরা অতিরিক্ত হিসাবে রেখে দিই। সহজ পদ্ধতিতে বাচ্চাদের অঙ্ক শেখাবার সময় বুঝিয়ে বলে দেওয়া হয়, একটা মিষ্টি ও আরেকটা মিষ্টি মিলিয়ে দুটো মিষ্টি হয়। পদ্ধতিটা সহজ হলেও এই জিনিসটাই বাচ্চাদের শেখানো অত্যন্ত কঠিন। এই জগতে সব থেকে ছোট সংখ্যা হল জিরো, এটাকেও আমাদের বাচ্চারা কিছুতেই বুঝতে পারে না। যতই ওদের বোঝান হোক, ওরা সব সময় ছোট সংখ্যা বলবে 'এক', শূন্যতে কিছুতেই যাবে না, শূন্য যে একটা সংখ্যা, এটা ওরা ধারণাই করতে পারে না। ব্রহ্মগুপ্ত, আর্যভট্ট প্রমুখ বিখ্যাত ঋষিরা শূন্যকে নিয়ে গবেষণা করে দেখালেন, শূন্যও একটা সংখ্যা এবং সব থেকে ছোট সংখ্যা। বাচ্চাদের মাথায় শূন্যের কোন আইডিয়া নেই, ওদের কাছে এক, এটাই ওদের আইডিয়া। শিক্ষকরাও বাচ্চাদের শূন্যের আইডিয়াটা দিতে পারেন না। যার কাছে কোন একটা জিনিস যদি পরিষ্কার হয়ে যায়, এরপর যখন নূতন কোন জিনিস শুনল, সঙ্গে সঙ্গে ওটার সাথে তুলনা করে করে নূতন জ্ঞান নিয়ে আসে। যে কোনদিন সিংহ দেখেনি, ছবিও দেখেনি, সে যদি চিড়িয়াখানা দেখতে যায়, তার বন্ধুরা তাকে আগে থেকে বলে দেবে, ওখানে দেখবে বেড়ালের মত হলুদ, ঘাড়ে বড় বড় চুল আছে, এই ভাবে তাকে বেড়ালের সাথে তুলনা করে এবং অন্য আরও কিছু বলে সিংহের একটা আইডিয়া দিয়ে দেবে। এবার যেমনি চিড়িয়াখানায় গিয়ে সিংহ দেখবে, সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নেবে, ও এটাই তাহলে সিংহ। এখন শূন্যের আইডিয়া দেওয়ার সময়, শূন্যকে কিসের সাথে উপমান করে বোঝাবে? সিংহের ক্ষেত্রে অনেক কিছু দিয়ে উপমান করা যায়, শূন্যের ক্ষেত্রে সেভাবে কিছুই নেই। সেই কারণে শূন্যের আইডিয়া দেওয়া খুব কঠিন।

আমাদের এখন এমনই দুর্ভাগ্য হয়ে গেছে যে, সোশ্যাল মিডিয়া, হোয়াটস আপ, ফেসবুক, ইন্টারনেটে এসে এমন হয়ে গেছে যে, ঠিক ঠিক জ্ঞান বলে কিছু নেই। ফলে সোশ্যাল মিডিয়াতে যেমনি কোন ইনফরমেশান আমাদের কাছে আসছে, ওটাকে যে তুলনা করব, relate করব তার কোন উপায় নেই। তাই ওটাই সত্য বলে মনে হয়। ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিক্যাল সাইন্সে সরাসরি তার ফল দেখা যায় বলে ওখানে কেউ কিছু করতে পারে না। কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে সবাই সবাইকে উপদেশ দিয়ে যাচ্ছে। এক বিন্দু শাস্ত্রের জ্ঞান আমাদের নেই, তাই যে যা বলে যাচ্ছে সেটাকেই সত্য বলে মনে করছে। কিন্তু ধর্ম তা নয়, ধর্মের একটা বিশাল ব্যাপ্তি আছে, একটা বিশাল বিষয়, আর ধর্ম একটা পুরো বিজ্ঞান। ধর্ম শুধু থিয়োরেটিক্যাল নলেজ নয়, ধর্ম মানুষের জীবনকে পুরো পাল্টে দেয়। আমরা সবাই দেখছি, ধর্মের একটা ছোট্ট কথা জীবনে নামাতে গেলে কত কাঠখড় পোড়াতে হয়, দম বেরিয়ে যাওয়ার অবস্থা হয়, সেখানে আমরা পুরো জীবনকে পাল্টে ফেলব, এটা কখনই সম্ভব নয়।

কথামৃতে ঠাকুরের একটা দুটো কথা নিয়ে আমরা জ্ঞান ভক্তি কি জিনিস বুঝে নিই। যদিও ঠাকুর বলছেন, জ্ঞানও যা ভক্তিও তাই। আমরা আসলে জ্ঞানও বুঝি না, ভক্তিও বুঝি না, ঠাকুর বলে দিয়েছেন, সেটাকেই টিয়া পাখির মত যখন যেখানে পারছি সেখানেই বলে দিচ্ছি। এতক্ষণ আচার্য শঙ্করের অদ্বৈতের যে ব্যাখ্যা পড়লাম, যেখানে তিনি দেখাচ্ছেন, এই জগতে আমরা যা কিছু অনুভব করি, সব অনুভবই সময়ের সীমাতে বাঁধা; গতকাল ছিল, আজ আছে, আগামীকাল থাকবে না। কিন্তু কোন জিনিস নাশ হয়ে গেলেও সেটা আরেকটা কিছুতে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। এই যে সত্তা, অস্তিত্ব বোধ, এই ভাবটা আমাদের মনের ভিতরে থেকে যায়। সেখান থেকে আচার্য শঙ্কর দেখাচ্ছেন, কিভাবে এই অস্তি বোধটাই শেষ কথা। আর এই অস্তি বোধটা স্বপ্রকাশ, এটাই আনন্দ। কিন্তু জিনিসগুলো মনে হয় যেন কোন অন্য জগৎ থেকে আসছে। কারণ আমরা সাধারণ মানুষ, আমরা আমাদের দেহ, মন, ইন্দ্রিয়ের সাথে নিজেদের জুড়ে রেখেছি। আমরা চাইছি, আমার ভাল হোক, আমার মনের মত সব কিছু হোক, আর আমি যাদের ভালবাসি, আমার পরিবার, আমার বন্ধু, সবারই সব কিছু যেন ঠিক ঠাক চলে। আর আমি যাদের পছন্দ করি না, তাদের জীবনে যেন সব সময় ঝামেলা আসতে থাকে। নিজের জন্য শুভ চিন্তন, আর অপরের জন্য অশুভ চিন্তন, এটা মানুষের স্বভাবেই আছে। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি, হে ঠাকুর আমার থেকে আমার প্রতিবেশীর যেন বেশি সুখ, সম্পদ না আসে, আর আমার যেন সব কিছু ভাল হতে থাকে। তাই এই কথাগুলো আমাদের কাছে অন্য রকম মনে হয়।

যে কোন ধর্মে, বিশেষ করে এই অর্থে সবচেয়ে নামকরা ধর্ম হল বৌদ্ধ ধর্ম, যেখানে ভগবান বুদ্ধ তাঁর শিষ্য আনন্দকে শেষ শিক্ষা দিয়ে গেলেন, আত্মদীপো ভব। কিন্তু ভগবান বুদ্ধের শরীর চলে যাওয়ার পরে পরেই তাঁর অনুগামীরা ভগবান বুদ্ধের মূর্তি এনে তাঁর পূজা শুরু করে দিল। এখন সব দেশেই ভগবান বুদ্ধের মূর্তি পাওয়া যাবে, যারা ভগবান বুদ্ধকে মানে না, তারাও ভগবান বুদ্ধের মূর্তি নিজের বাড়ির ড্রয়িং রুমে সাজিয়ে রাখে। আর বৌদ্ধরা তো তাঁকে রীতিমত অর্ঘ্য দিচ্ছে, ধুপধুনো দিচ্ছে, পূজা করছে। মানুষ স্বভাবে নিজের মনকে নিয়েই থাকে। যখনই মনকে নিয়ে থাকবে, তখন তার জন্য ঈশ্বর সত্য। আচার্য শঙ্কর যাঁকে সচ্চিদানন্দের সৎ বলছেন, আমাদের ভাষায় যিনি নির্গুণ নিরাকার, যারা মনের এলাকায় আবদ্ধ, তাদের কাছে তিনি ভগবান। নির্গুণ নিরাকার, সগুণ সাকার এই শব্দগুলো আমরা প্রায়ই শুনে থাকি। আর ঠাকুরের আগমনের পর আমরা এটাও জেনে গেছি যে দুটোর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। প্রথম দিনেই ঠাকুর মাস্টারমশাইকে জিজ্ঞেস করছেন, তোমার নিরাকারে বিশ্বাস, না সাকারে বিশ্বাস? ঠাকুর মাস্টারমশাইয়ের উত্তর শোনার পর বলছেন, খুব ভাল, তবে জানবে তিনি সাকারও।

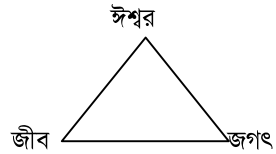
মনের এলাকায় মনের কারাগারে আমরা চিরবন্দী। ঘরের ভিতর থেকে জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকালে আকাশ এক রকম দেখায়, ঘরের বাইরে এসে আকাশের দিকে তাকালে আকাশ অন্য রকম দেখায়। বড় বড় জাহাজের কেবিনে ছোট ছোট জানালা থাকে, কেবিনের ভিতর থেকে ওই ছোট্ট জানালা দিয়ে তাকলে সমুদ্রকে এক রকম দেখাবে, কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে ডকে দাঁড়ালে অন্য রকম দেখাবে। জন্ম থেকে আমরা কয়েদী, এই কয়েদীরা যখন অনন্তকে দেখে, তখন তাকে ঈশ্বর রূপে দেখে। কোন কারণে যদি মনের এলাকা থেকে বেরিয়ে চলে আসে, তখন সেই ঈশ্বরকে নির্গুণ নিরাকার দেখবে। যে মনের এলাকা থেকে ঈশ্বরকে

দেখে, তাকে আমরা বলি ভক্ত। আর যে মনের এলাকার বাইরে গিয়ে দেখে, আমরা তখন তাকে বলি জ্ঞানী, জ্ঞান আর ভক্তি এছাড়া কিছু না। স্বামীজী এবার এই জ্ঞান ও ভক্তিকে এক প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসছেন।

So long as I say 'you', I have the right to speak of God protecting us, (*যতদিন আমার 'আমি তুমি' এইরূপ ভেদজ্ঞান রয়েছে, ততদিন একজন ভগবান আমাদের রক্ষা করছেন –এ-কথা বলবার অধিকারও আমার আছে।*) ঠাকুর নিত্য মা কালীর দর্শন পাচ্ছেন, মা কালীর ভাবে ঠাকুর গরগর মাতোয়ারা, সেই সময় তোতাপুরি দক্ষিণেশ্বরে হাজির হলেন। তোতাপুরি ঠাকুরের চোখ-মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছেন, আরে! এতো অদ্বৈত বেদান্ত জ্ঞানের আধার। যাই হোক ঠাকুরকে তিনি অদ্বৈত ভাবে সাধনার শিক্ষা দেওয়ার জন্য এগিয়ে এলেন। ঠাকুর তাঁকে বলছেন, আমাকে পুরো অদ্বৈত বেদান্ত না শিখিয়ে তুমি এখান থেকে যেতে পারবে না। যে তোতাপুরি কোথাও তিন দিনের বেশি থাকতেন না, সেই তোতাপুরি দক্ষিণেশ্বরে এগারো মাস থেকে গেলেন। এরপর নির্বিকল্প সমাধি, অদ্বৈত জ্ঞান সবই ঠাকুরের হয়ে গেল, কিন্তু তখনও তিনি মা কালীর গান করে যাচ্ছেন। একদিন সন্ধ্যাবেলা ঠাকুর হাততালি দিয়ে মায়ের নাম করছেন, তোতাপুরি এসে ব্যঙ্গ করে ঠাকুরকে বলছেন, ক্যায়া তুম্ রোটি ঠোকতে হো! ভারতের উত্তরাঞ্চলে মোটা মোটা রুটি হয়, এত মোটা হয় যে ওই রুটি বেলা যায় না, ওটাকে দু হাতের তালুতে চাপড় মেরে মেরে বড় করতে হয়। ঠাকুরের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই, তোতাপুরির কথাকে তিনি ধর্তব্যের মধ্যেই আনছেন না, তাঁরা কাছে নির্গুণ নিরাকার, সগুণ সাকার দুটোই সত্য। এই কথা যে ঠাকুরই বলেছেন তা না, কবীর দাশ ও অন্যান্য অনেকেই বলেছেন। কিন্তু এই কথা কথামৃতে ঠাকুর পাতায় পাতায় বলছেন।

স্বামীজী এবার এটাকে ব্যাখ্যা করে বলছেন, যদি আমি বলি 'তুমি', আমরা যেখানে যুস্মদ্ অস্মদ্ প্রত্যয় নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সেখানেও এটাই বলা হয়েছিল, যতক্ষণ আমি 'তুমি', বলছি, যতক্ষণ জগৎকে সামনে দেখছি, জগতের ব্যাপারে যতক্ষণ আমি সচেতন আছি, তোতাপুরিও যতক্ষণ শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখছেন 'শ্রীরামকৃষ্ণ' রূপে, ততক্ষণ আমাদের মানতে হবে ঈশ্বর আছেন, তিনি আমাদের বিধাতা, তিনি আমাদের জন্ম দিয়েছেন, তিনি আমাদের রক্ষা করছেন, তিনি আমাদের পালন করছেন, তিনিই আমাদের সংহার করবেন। এই যে ভাব, যতক্ষণ আমাদের এই জগতের বোধ আছে, আমি তুমি বোধ আছে, তার মানেই হল আমরা সবাই এখন মনের এলাকার কয়েদী। যাঁদের নির্বিকল্প সমাধি হয়ে গেছে, তাঁরা জেনে গেছেন যে, আমি আর মনের এলাকাতে নেই, তাঁদেরও নির্বিকল্প সমাধি থেকে নেমে মনের এলাকাতে এসে ব্যবহারিক জীবন চালাতে হয়। ঠাকুরকে মা বলছেন, তুই ভাব মুখে থাক। ঠাকুরও তাই এই মনের এলাকাতে থাকছেন, আবার যখন তখন মনের এলাকার বাইরে চলে যাচ্ছেন। মনের এলাকার বাইরে বেশিক্ষণ থাকলে আবার শরীর থাকবে না। কারণ মন না থাকলে শরীর ভেঙে যাবে। সেইজন্য তিনি জোর করে মনের এলাকায় নেমে আসছেন। এটাই স্বামীজী বলছেন, যতক্ষণ আমি তুমি বোধ থাকবে ততক্ষণ ঈশ্বরও থাকবেন। ঠাকুরও কথামৃতে বার বার এই কথা বলে যাচ্ছেন।

When I see another, I must take all the consequences and put in the third, the ideal, which stands between us; that is the apex of the triangle. (*যতদিন আমার এইরূপ ভেদবোধ রয়েছে, ততদিন এই ভেদবোধ থেকে যে-সকল অনিবার্য সিদ্ধান্ত আসে, সেগুলিও নিতে হবে; 'আমি তুমি' স্বীকার করলেই আমাদের আদর্শস্থানীয় আর একটি তৃতীয় বস্তু স্বীকার করতে হবে যা আমি-তুমির মাঝখানে আছে, সেইটিই ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দুস্বরূপ।*) এটা একটা খুব বিচিত্র জিনিস, যেমনি বলছি 'আমি', সঙ্গে এসে যায় জগৎ, অস্মদ্ প্রত্যয় যেমনি এসে গেল, তেমনি জগৎ চলে আসবে। যেমনি জগৎ চলে আসে, তখন জগৎ একা আসে না; আমার আর জগতের মাঝখানে একটা তৃতীয় সত্তা এসে যায়, যেটা আদর্শ, যেটাকে আমরা ভগবান বলতে পারি। ঈশ্বর, জীব ও জগৎ, একটা ত্রিকোণ।



আমিটা যদি কোন কারণে নাশ হয়ে যায়; এখানে আমরা বেহুঁশ অবস্থা, গুণের অবস্থার কথা বলছি না, জ্ঞানের যে অবস্থায় যেখানে আমি নাশ হয়ে যায়; একমাত্র তখনই জগৎটাও চলে যাবে, জগৎ চলে গেলে ঈশ্বরও চলে যাবে। এই সত্যকে ধারণা করা আমাদের মত সাধারণ মানুষের পক্ষে খুবই মুশকিল। আমরা যে ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ করেছি, তা তো নয়, বড়দের কাছে, গুরু মুখে, আচার্যদের মুখে শাস্ত্রের কথা শুনে যেটুকু ধারণা হয়েছে তাই নিয়ে সব কিছু বিচার করছি। কিন্তু যতটুকু আমরা শিখেছি, সেটাকে লজিক্যাল, যুক্তিসঙ্গত, স্বাভাবিক মনে হয়েছে।

গোলমাল ঈশ্বরে নেই, গোলমাল জগতে নেই, গোলমালের মূলে রয়েছে মন। মন মানেই প্রকৃতি, মন মানেই মায়া, মায়া মানেই ঈশ্বর খেলা করে যাচ্ছেন। মন আছে মানে আমি থাকবেই, মন আছে মানেই জগৎ থাকবে, মন থাকা মানেই, যিনি মন দিয়েছেন তিনি ঈশ্বর রূপে দেখাবেন। স্বামীজী এটাই বলছেন, আমি বোধ থাকলে তুমি বোধ থাকবে, আমি-তুমি থাকলে দুটোর মধ্যে একটা আদর্শ বোধ থাকবে – ঈশ্বর। আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, আমি, তুমি আর ঈশ্বরকে কোন ভাবেই বাদ দিতে পারি না। আগেকার দিনে বাজারে বেশি পরিমাণে আনাজ কিনলে একটু ফাউ দিত, এখনও কোথাও কোথাও দেয়, অনেক আনাজ কিনলে একটু লঙ্কা বা ধনে পাতা ফাউ দিয়ে দিল। ফাউটা একটা শব্দ, কিন্তু ফাউকে আমরা না করতে পারি, আমার লাগবে না। আরেকটা হয়, যেটা আগেকার দিনে ছিল না, ইদানিং খুব প্রচলিত হয়ে গেছে, সেটা হল প্যাকেজ ডিল। প্যাকেজ ডিল, আমি যদি এটা নিই, তাহলে আমাকে এটাকেও নিতে হবে। এক বুড়ি মা, তার একটা সুন্দরী মেয়ে আছে, একটা ছেলে মেয়েটিকে বিয়ে করতে চাইছে। বুড়ি মা বলছে, আমার মেয়েকে বিয়ে করতে পার, কিন্তু তার সাথে আমাকেও নিতে হবে, আমি তোমার বাড়িতে গিয়ে থাকব। এটা হল প্যাকেজ ডিল। ছেলেটা যদি বলে ছুড়ি চাই, বুড়ি চাই না, তা হবে না; ছুড়ি নিলে বুড়িও নিতে হবে।

বেদান্তও এটাই বলে, 'আমি' যদি রাখো, 'তুমি'টাও থাকবে, 'ঈশ্বর'ও থাকবেন, এটা প্যাকেজ ডিল। 'আমি'টাকে ছেড়ে দাও, তিনটেই চলে যাবে। তুমি যদি মনে কর, 'তুমি' নেব 'ঈশ্বর' নেব না, তা বললে হবে না। কিছু কিছু জনপ্রিয় বক্তারা ইদানিং অদ্বৈতকে তাঁদের ভাষণে এমন করে প্রচার করে দিয়েছেন যে, কলেজের ইয়ং ছেলেরাও আজকাল এসে বলে, I believe in formless God। ঠাকুরের ভাষায়, একদিকে তাঁতি আবার লম্বা লম্বা কথা। এটা বোঝারই ক্ষমতা নেই যে, যেমনি বলেছ আমি, প্যাকেজ ডিল হিসাবে ঈশ্বর ঢুকবেন, জগৎ ঢুকবে। আমি মানেই জগৎ আছে, জগৎ মানেই ঈশ্বর থাকবেন। সেইজন্য formlessএর কথা যে বলছ, এটা শুধু লম্বা লম্বা কথা। ঠাকুর নরেনাদি কিছু পার্ষদদের নিয়ে যে বলছেন, এর নিরাকারের ঘর, তার মানে কিছু কিছু সাধক আছেন, তাঁরা সাকার সাধনা করলে সহজে জ্ঞান লাভ করবে, আবার কিছু কিছু সাধক আছেন, নিরকার সাধনা করলে তাঁরা সহজে জ্ঞান পেয়ে যাবেন। আধ্যাত্মিক জগতে কখনই একটা মাত্র পথ থাকে না, অন্যান্য ধর্ম আর হিন্দু ধর্মে এটাই তফাৎ। আমরাও তাই জানি, সবার জন্য এক পথ নয়, পথ সবারই আলাদা। আর যাঁদের এটাই শেষ জন্ম, এই শেষ জন্মে যাঁরা শেষ সাধনা করছেন, তাঁদের মধ্যে কিছু সাধকের জন্য নিরাকার, কিছু সাধকের জন্য সাকার।

স্বামীজী এবার উপমা নিয়ে আসছেন। সত্যি! ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়, কোথায় আমেরিকা, আমেরিকার কোথায় একটা থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্ক, সেখানে দশ এগারোজন শিষ্যকে স্বামীজী আপন করে মন-প্রাণ উজার করে বেদান্তের কঠিন কঠিন তত্ত্বের শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের সত্ত্ব, রজো, তমোর কথা বলছেন, ইষ্টের কথা বলছেন, অদ্বৈত বলছেন, গুরুর কথা বলছেন। আর বোঝানর জন্য উপমা নিয়ে আসছেন গঙ্গাকে। আমেরিকার নদী উপমা নিচ্ছেন না। বড়রা আমাদের প্রায়ই বলে এসেছেন, তোমাকে যদি শিক্ষা পেতে হয় তাহলে তোমাকে আচার্যের ভাষায় শিক্ষা নিতে হবে, আচার্য তোমার ভাষায় শিক্ষা দিচ্ছেন, তাহলে বুঝে নাও তুমি আর শিক্ষা পেলে না। স্বামীজীর ভাষা, সত্ত্ব, রজো, তমোর ভাষা, গঙ্গা-যমুনার ভাষা, শিব-কৃষ্ণ-কালীর ভাষা, সাকার-নিরাকার-অদ্বৈত-বিশিষ্টাদ্বৈতের ভাষা। স্বামীজী কোন অবস্থাতেই ওদের ভাষা, ওদের উপমা নিচ্ছেন না, যীশু, গড্ মাঝে মাঝে ছুঁয়ে যাচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু ভাষাটা তাঁর নিজের ঐতিহ্যের ভাষা। ফলে ধীরে ধীরে শিষ্যদের ভাবও ওই ভাষাতে রাঙায়িত হয়ে যাচ্ছে।

শিক্ষার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে স্বামীজী বেশ কয়েক জায়গায় বলছেন, শিক্ষককে প্রথমে ছাত্রের স্তরে নেমে এসে শিক্ষা দিতে হয়, সেখান থেকে তাদের উপরে তুলে আনতে হয়। সেইজন্য প্রথমের দিকে ঠিক আছে, একটা দুটো ক্লাশে তাদের মত করে বলে দেওয়া হল, তারপর কিন্তু ওখান থেকে তাদের তুলে নিয়ে আসতে হবে। কারণ এর সব কিছুই হল টেকনিক্যাল, এক একটা শব্দকে নিয়ে আমরা যে আলোচনা করছি, এর সবটাই টেকনিক্যাল। একটু আগে যেমন আমরা জিরোর কথা বললাম, জিরো হল সব থেকে ছোট্ট সংখ্যা, এটা একটা টেকনিক্যাল আইডিয়া, বাস্তবিক জগতে এভাবে জিরো হয় না। বাস্তবিক জগতে বলার সময় আমরা বলি কিছু নেই। টেবিলে অনেক কিছু রাখা আছে, সব কটাকে সরিয়ে দেওয়া হল। এবার কটি জিনিস টেবিলে থাকল? কিছু নেই, টেকনিক্যালি গণিতের ভাষায় শূন্য। যারা ম্যাথমেটিক্স শিখতে চাইছে, তার 'কিছু নেই' বলবে না, বলবে জিরো। যারা ম্যাথমেটিক্স জানে না, তারা বলবে 'কিছু নেই'। ঠিক তেমনি যাঁরা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, শাস্ত্র বুঝতে চাইছেন, ধর্ম, আধ্যাত্মিকতাকে যাঁরা বুঝতে চাইছেন, তাঁদের কাছে সব কিছু টেকনিক্যাল হয়ে যায়। যতক্ষণ এই টেকনিক্যাল জিনিসগুলো না শেখা হয়, ততক্ষণ ধর্মের শিক্ষা লাভ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সংস্কৃত ভাষা আমি নাই বা জানলাম, ঠাকুরও বলছেন, সংস্কৃত নাই বা জানলাম, কিন্তু যে শব্দগুলিতে টেকনিক্যালিটি রয়েছে, সেটাকে জানতে হয়।

স্বামীজী এবার বলছেন, The vapour becomes snow, then water, then Ganga; but when it is vapour, there is no Ganga, and when it is water, we think of no vapour in it. (*যেমন বাষ্প তুষার হয়, তুষার থেকে থেকে জল হয়, সেই জল আবার গঙ্গাদি নানা নামে প্রসিদ্ধ হয়; কিন্তু যখন বাষ্পাবস্থা, তখন আর গঙ্গা নেই; আবার যখন জল, তখন তার মধ্যে বাষ্প চিন্তা করি না।*) স্বামীজীর সময়ে তখনও গঙ্গাকে গঙ্গা বলা হত না, গ্যাঞ্জেস বলা হত, ইদানিং অবশ্য সবাই গঙ্গাই বলে। কিন্তু স্বামীজী তখনকার দিনেই গঙ্গা বলে যাচ্ছেন। সমুদ্রের জল বাষ্প হয়ে মেঘ হল, সেই মেঘ ভাসতে ভাসতে চলেছে। হিমালয়ে বরফ হয়, সেই বরফ গলা জল গঙ্গা হয়ে নেমে আসে। বলছেন, গঙ্গাও যা মেঘও তাই, বাষ্পও তাই। কিন্তু যখন আমরা গঙ্গা দেখি তখন জলের বাষ্পকে দেখি না, আর যখন জলের বাষ্পকে দেখি তখন গঙ্গা দেখি না। ঈশ্বরের সাথে সৃষ্টির ঠিক একই সম্পর্ক, ঈশ্বর দেখলে সৃষ্টি দেখা যায় না, সৃষ্টি দেখলে ঈশ্বর দেখা যায় না।

জগৎ কি আমাদের মস্তিষ্কের সৃষ্টি?

বলছেন, The idea of creation or change is inseparably connected with will. *সৃষ্টি বা পরিণামের ধারণার সঙ্গে ইচ্ছাশক্তির ধারণা অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।*) যেমনি আমরা সৃষ্টিকে নিয়ে আসছি, জগতে যা দেখছি যেমনি সেগুলো নিয়ে এলাম, সঙ্গে সঙ্গে একটা ঈশ্বরের ইচ্ছা আসবেই। কারণ আমরা যে কাজই করি না কেন, আগে আমরা ইচ্ছা করি, তারপর সেই কাজ হয়। ঠিক তেমনি সৃষ্টিকে যখন আমরা দেখছি তখন একটা divine will, God's will মাঝখানে ঢুকবেই ঢুকবে, না ঢুকে যাবে না। So long as we perceive this world in motion, we have to conceive will behind it. (*যতদিন পর্যন্ত আমরা জগৎকে গতিশীল দেখছি, ততদিন তার পশ্চাতে ইচ্ছাশক্তির অস্তিত্ব আমাদের স্বীকার করতে হয়।*) আমরা যে জগৎকে দেখছি, এখানে সূর্য ছুটছে, তারা ছুটছে, পৃথিবী ঘুরে যাচ্ছে, গ্যালাক্সিস গুলো ছুটছে, সবই ছুটছে, এই জিনিসটা আমাদের মানতে বাধ্য করাচ্ছে –এর পিছনে ঈশ্বরের ইচ্ছা, তিনি ইচ্ছা করলেন –এটা আসবেই। ঘোর অদ্বৈত বেদান্তীরা বলবে ইচ্ছা বলে কিছু নেই, ঠিকই ইচ্ছা বলে কিছু নেই, কিন্তু তাদের কাছে জগৎ বলেও কিছু নেই। ঠাকুর যেমন উপমা দিচ্ছেন, জ্ঞানীর হাত কেটে দরদর করে রক্ত বেরোচ্ছে, বলছেন, 'আমার তো কিছু হয়নি, আমি তো শুদ্ধ আত্মা। এটা একটা শরীরের অঙ্গ, অঙ্গের কেটেছে তাই রক্ত বেরোচ্ছে, আমি তো এই শরীর নই'। যাঁরা এই রকম অবস্থায় অবস্থিত, তাঁরাই একমাত্র বলতে পারেন, ঈশ্বরের ইচ্ছা বলে কিছু নেই। কারণ তাঁর কাছে এই জগৎই নেই।

এবার বলছেন, Physics proves the utter delusion of the senses; nothing really is as we see, hear, feel, smell, taste it. Certain vibrations producing certain results affect our senses; we know only relative truth. (*ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান যে সম্পূর্ণ ভ্রম, পদার্থবিজ্ঞান তা*

প্রমাণ করে দেয়; আমরা কোন জিনিসকে যেমন দেখি, শুনি, স্পর্শ, ঘ্রাণ বা আস্বাদ করি, স্বরূপতঃ জিনিসটা বাস্তবিক তা নয়। বিশেষ বিশেষ প্রকারের স্পন্দন বিশেষ বিশেষ ফল উৎপন্ন করছে, আর সেইগুলি আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপর ক্রিয়া করছে; আমরা কেবল আপেক্ষিক সত্যই জানতে পারি।) স্বামীজী ওখান থেকে সরে এসে বলছেন, আমার যে এই রকম ঈশ্বরের ইচ্ছা বলছি, কিন্তু আমরা যদি বিচার করে দেখি; জগৎ আমরা যেমন দেখছি, এই আলো আছে, আলো আপনার উপর পড়ছে, সেখান আলো প্রতিফলিত হয়ে আমার চোখে আসছে, আসলে তো আলো আসছে। সেই আলো আমাকে একটা অনুভূতি দিচ্ছে, সেখান থেকে আমার অনুভূতির স্নায়ুগুলি মস্তিষ্কে পাঠাচ্ছে, মস্তিষ্ক একটা ইমেজ তৈরী করে নিচ্ছে। তাহলে তো এই জগৎ মস্তিষ্কেরই সৃষ্টি হয়ে গেল। এসব জিনিস বেশি ভাবলে আমাদের মাথা খারাপ হয়ে যাবে। বাচ্চা বয়সে প্রথম যখন সিনেমা দেখে তখন তার দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, এগুলো সব সত্য। মুভি ক্যামেরার আইডিয়া নিয়ে একটা ছোট্ট সিনেমা প্রথম তৈরী হয়। তাতে একটা দৃশ্য আছে যাতে কয়েকটা ঘোড়ার গাড়ি ছুটে আসছে। হলে এই সিনেমাটা এবার দেখানোর জন্য ঠিক হল। ঘোড়ার গাড়ি ছুটে আসার দৃশ্যটা যখন এসেছে তখন ওই ছোট্ট হলের লোকগুলো চেঁচিয়ে হল থেকে পালাতে শুরু করেছে, ভাবছে ঘোড়াগাড়িগুলোর তলায় তারা সবাই পিশে যাবে। আমাদেরও ছোটবেলায় মনে হত সিনেমার সব কিছু সত্য। আমাদের বোঝানো হত সিনেমা মানে আলোছায়ার খেলা, এগুলো সত্য না। আজকের দিনে আমরা যখন হলে বা মোবাইল ফোনে ইউটিউবে সিনেমা দেখছি, আমরা জানি এগুলো সব সিনেমা, আলোছায়ার খেলা। কিন্তু একবারও কি আমরা বিশ্বাস করতে পারব, জগতে আমরা যা কিছু দেখছি, যাদের দেখছি, যা খাচ্ছি, সুগন্ধ দুর্গন্ধ যা কিছু নিচ্ছি, সবটাই আলোছায়ার খেলা? রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ এই পঞ্চ তন্মাত্রার কম্পনের খেলা?

কিন্তু এটাই সত্য, আলোছায়ার খেলা ছাড়া আর আছেটা কি! আমাদের মাথার উপর টিউবলাইট জ্বলছে, সেই আলো আপনার মাথায় পড়ছে, ওই আলো আমার চোখে প্রতিফলিত হচ্ছে, আমি আপনাকে দেখছি। আপনি তো আর আমার ভিতর ঢুকছেন না, ঢুকছে শুধু আলোর একটু কম্পন। কম্পনটা কি রকম? ঠিক সেই একই কম্পন, যে কম্পন মোবাইল ফোনে থাকে। ফোনে যে পদ্ধতিতে ছবি আসছে, আপনার ছবিও ঠিক একই পদ্ধতিতে আমার কাছে আসছে। আর আমার চোখে চশমা থাকলে আরও অবস্থা খারাপ। চশমা খুলে আপনার দিকে তাকালে তাও আমি সরাসরি আপনাকে দেখছি; কিন্তু চশমার ক্ষেত্রে আরও মুশকিল হয়। ফিজিক্স যাঁরা জানেন, তাঁরা জানবেন চশমা একটা ইমেজ তৈরী করে। তার মানে, চশমা দিয়ে আপনাকে যখন দেখছি তখন আপনার ইমেজকে দেখছি না, আপনার ইমেজের ইমেজকে দেখছি। আয়না যেমন প্রতিবিম্ব দেয়, চশমাও প্রতিবিম্ব দেয়, তাছাড়া আর কিছু না।

নাটক নভেলের ডায়লগে বলে, তোমাকে আমার চাই, তোমার ছবি নিয়ে আমার কি হবে! একটু বিচার করে দেখলে বুঝতে পারবো, ছবিটা যেমন একটা কম্পন, তুমিও একটা কম্পন। শুধু যে দেখার ক্ষেত্রেই এই জিনিস হচ্ছে তা নয়, যা শুনছি, যা খাচ্ছি, যা গন্ধ নিচ্ছি সবটাই তাই। যে জিনিসগুলিকে নিয়ে আমরা এত কিছু করছি, শেষ পর্যন্ত কিন্তু সব কিছুই যা হচ্ছে সব ভিতরে হচ্ছে, বাইরে কিছু নেই। এই যে বিভিন্ন ধরণের কম্পন, আলোরই হোক, শব্দেরই হোক, গন্ধেরই হোক, এগুলো ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমাদের ভিতরে এসে কিছু অনুভূতির সৃষ্টি করে। আমরা জানছি কিছু কম্পনকে, কিন্তু আমরা বলছি, আমি তোমাকে হাড়ে হাড়ে চিনি, আমি তোমাকে খুব ভাল করে জানি, আমি তোমাকে দেখে নেব, এই ধরণের যে অভিব্যক্তি আমরা প্রকাশ করছি, তখন একবারও আমাদের মাথায় আসছে না, এই যে আমি চিনি, জানি, বুঝি বলছি, এগুলো কিছুই না, কিছু কম্পন, এদিক ওদিক থেকে যা কিছু আসছে, আলো, শব্দ, সব ওয়েভ লেন্থ। যার জন্য ইন্দ্রিয়গুলি সক্রিয় হয়ে উঠছে, সেটাকেই আমরা আসল জ্ঞান মনে করছি। কিন্তু এই জ্ঞান কখনই আসল জ্ঞান হতে পারে না। কারণ কিছু কম্পন এসে কিছু ইন্দ্রিয়গুলিকে উত্তেজিত করে দিচ্ছে, সেটা কখনই জ্ঞান না। বাচ্চারা প্রথম যদি হারমোনিয়ামের বাজনা শোনে, ওরা মনে করে হারমোনিয়ামের ভিতরে কয়েকটা বেড়ালের বাচ্চা আছে, বেলো টানছে তাতে বেড়ালগুলো ওই রকম আওয়াজ করছে। খুলে যখন দেখিয়ে দেওয়া হয় তখন বাচ্চারা হতাশ হয়ে যায়। ঠিক তেমনি একটু বিচার করলে, জগৎটা একটা বিরাটা হতাশার মনে হবে। যা কিছু আমাদের হচ্ছে, এগুলো কিছুই না, বাইরে থেকে কিছু উত্তেজনা আসছে, সেই উত্তেজনা এসে ইন্দ্রিয়গুলিকে উদ্বেলিত করে দিচ্ছে। এবার স্বামীজী আসল জ্ঞান নিয়ে বলছেন।

The Sanskrit word for truth is 'isness' (Sat). (*'সত্য' শব্দ থেকে 'সৎ' এসেছে। যা 'সৎ' অর্থাৎ 'আছে' যেটি 'অস্তিত্বস্বরূপ' সেটিই সত্য।*) আমরা আগে এর উপর বিরাট আলোচনা করে এসেছি। আর বলছেন, From our present standpoint this world appears to us as will and consciousness. (*আমাদের বর্তমান দৃষ্টি থেকে এই জগৎপ্রপঞ্চ ইচ্ছা ও জ্ঞান শক্তির প্রকাশ বলে বোধ হচ্ছে।*) আসল জিনিস হল সৎ, আমরা দেখছি কিছু sensation, জগৎটা আসলে হল শুদ্ধ অস্তিত্ব, যার সংস্কৃত শব্দ হল সৎ। কিন্তু আমি আপনাকে দেখছি, আলো দেখছি, বাতাস অনুভব করছি, তখনই মনে হয়, এই জিনিসগুলো, যেগুলো আমরা প্রতিনিয়ত দেখছি, অনুভব করছি, এতে ইচ্ছা ব্যাপারটার যোগদান আছে, তার সাথে মনও ভালমত জড়িয়ে আছে, এখানে চেতনা বা consciousness বলতে মনকে বোঝান হচ্ছে। যেখানে will থাকবে সেখানে mind থাকতে বাধ্য। কিন্তু একবারও আমরা ভাবি না, যেটা দেখছি, শুনছি, অনুভব করছি এটা কিছুই না।

জিনিসটা এমন কিছু কঠিন নয়, এটা কোন রকেট সাইন্স না যে, বুঝতে কঠিন হবে। একটু বুদ্ধি লাগালেই আমরা ধরতে পারব। আমরা যেটাই দেখছি – ভাল দেখছি, মন্দ দেখছি, ভাল খাচ্ছি, মন্দ খাচ্ছি, শেষ পর্যন্ত সবটাই হল কিছু অনুভূতি, যেগুলো আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে উদ্বেলিত করছে। ইন্দ্রিয়গুলি সেখান থেকে উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছে, আর তাতে আমরা মনে করছি, আঃ কি দারুণ খেলাম, আঃ কি দারুণ গান শুনলাম। কিন্তু একবারও এটা ভাবছি না যে, এগুলো শুধু কতকগুলি ওয়েভ লেন্থ। ঠাকুর বলছেন, রাজার দরবারে এক জাদুকর এসে আঙুল ঘোরাচ্ছে আর তাতে কত কি হয়ে যাচ্ছে। ওখানে কিছুই হচ্ছে না, শুধু আঙুল নড়ছে। এখানেও কিছুই হচ্ছে না, কিন্তু আমরা এত কিছু দেখছি। সেইজন্য জগৎকে আমাদের বিস্ময়কর মনে হয়, আর মনে হয় এর পিছনে একটা ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি রয়েছে।

'আমি'র অস্তিত্ব যতটুকু সত্য, সগুণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব ততটুকু সত্য

Personal God is as much an entity for Himself as we are for ourselves, and no more. (*আমাদের কাছে আমাদের অস্তিত্ব যতটুকু সত্য তাঁর নিজের কাছে সগুণ ঈশ্বরের অস্তিত্বও ততটুকু সত্য, তদপেক্ষা অধিক সত্য নয়।*) এবার যদি আমরা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে তাকাই, তখন দেখব, আমরা এখন জগৎকে যেভাবে দেখছি, আমার অস্তিত্ব আমার কাছে যেভাবে আছে, ঠিক তেমনি সগুণ সাকার ঈশ্বরের অস্তিত্ব তাঁর কাছে ঠিক সেই ভাবেই আছে। আমি যেভাবে আমার কথা ভাবছি, আমি যেভাবে আমিত্বকে বোধ করছি, সগুণ সাকার ঈশ্বর ঠিক সেই ভাবে নিজেকে বোধ করছেন। এটা খুবই revolutionary কথা, একটু পরের দিকে জিনিসটা আরও পরিষ্কার হবে। God can be seen as a form, just as we are seen. (*আমাদের রূপ যেমন দেখা যায়, ঈশ্বরকেও তেমনি সাকারভাবে দেখা যেতে পারে।*) সেই ঈশ্বরকে আমরা সাকার রূপেও দেখতে পারি, ঠাকুর যেমন বার বার দেখছেন।

As men, we must have a God; as God, we need none, (*মানুষ হিসাবে আমাদের একটি ঈশ্বরের প্রয়োজন; আত্মস্বরূপে আমাদের ঈশ্বরের প্রয়োজন থাকে না।*) এই জায়গাতেই দ্বন্দ্ব এসে যায়। যতক্ষণ আমি আছি, যতক্ষণ এই জগৎ আছে, ততক্ষণ ঈশ্বরও আছেন; ঈশ্বর ঠিক সেই ভাবেই আছেন, যেভাবে আমি আছি, আপনি আছেন। যদিও বেদান্ত ঈশ্বরকে খুব সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করে বলছেন, তিনি সমষ্টি আত্মা, যত জীবাত্মা আছে সব জীবাত্মার তিনি সমষ্টি। কিন্তু এখানে একটু গভীরে গিয়ে যদি চিন্তা করা হয়, তাহলে দেখা যাবে, একটা জিনিস যদি সত্য হয়, অন্য জিনিসটাকেও সত্য হতে হবে। যেমন আমরা বেলুড় মঠে থাকি, এখানে বেলুড় স্টেশন আছে, এই বেলুড় স্টেশন আমার জন্যও, আপনার জন্যও বেলুড় স্টেশন, তার জন্যও এটা বেলুড় স্টেশন। তেমনি ঈশ্বর যদি সত্য হন, তিনি আমার জন্যও ঈশ্বর, তার জন্যও ঈশ্বর, আপনার জন্যও ঈশ্বর। যতদিন আমার 'আমি' বোধ আছে, যতদিন এই জগৎ আছে, ততদিন এই ঈশ্বরও আছেন। কিন্তু যে মুহূর্তে আমি ঈশ্বরের সাথে এক হয়ে গেলাম, অর্থাৎ সমাধির অবস্থায় চলে গেলাম, তখন আর সেই ঈশ্বর নেই। তার মানে দাঁড়ায়, ঈশ্বরের সত্তা ঠিক ততটাই অস্থায়ী, যতটা এই জগতের সব কিছু অস্থায়ী। এসব কথা শুনলে মাথা খারাপ হয়ে যাবার জোগাড় হয়, ভক্তিটক্তি সব উড়ে যায়। কিন্তু ঠাকুরও কথামৃতে বহু

বার এই কথা বলছেন, যতক্ষণ আমি বোধ ততক্ষণ তিনি বোধ থাকবে। ঠাকুর অবশ্য জগতের কথা সেখানে বলছেন না। কিন্তু এটা পরিষ্কার যে, যতক্ষণ আমি বোধ আছে ততক্ষণ তিনি বোধ আছেন, তিনি বোধ মানে ঈশ্বর বোধ আছে। কিন্তু যেমনি ঈশ্বরের সাথে এক হয়ে গেল, তখন আমি নেই, আমি নেই বলে তিনিও নেই, কারণ সে ঈশ্বরের সাথে এক হয়ে গেছে।

This is why Sri Ramakrishna constantly saw the Divine Mother ever present with him, more real than any other thing around him; but in Samadhi all went but the Self. (*সেই জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ সেই জগজ্জননীকে সদাসর্বদা তাঁর কাছে বর্তমান দেখছেন –তাঁর চারপাশের অন্যান্য সকল বস্তু অপেক্ষা তাঁকেই বেশী বাস্তব বলে দেখতেন। কিন্তু সমাধি অবস্থায় তাঁর আত্মা ব্যতীত আর কিছুর অনুভব থাকত না।*) রোজ যদি আমরা এক পাতা, দু পাতা কথামৃত পড়ি, আর সারা জীবন যদি এভাবে পাঠ করে যাই, আর মাঝে মাঝে যদি প্রতিজ্ঞা করে দু মাসের মধ্যে কথামৃত শেষ করতে পারি, এটা যেমনি হয়ে গেল, তারপর আবার শুরু করলাম, দু পাতা তিনি পাতা নিত্য পড়ে যাওয়া, এই ভাবে পড়লে ধীরে ধীরে কথামৃত ভিতরে ঢুকতে থাকবে। আমাদের যত শাস্ত্র আছে, তার মধ্যে কথামৃত সব থেকে একটি কঠিন শাস্ত্র। কারণ অন্যান্য গ্রন্থগুলি একটা কি দুটো ভাবকে নিয়ে চলে, একমাত্র গীতাতে অনেক ভাবকে নিয়ে আসা হয়েছে। কিন্তু গীতার তুলনায় কথামৃতে অনেক বেশি ভাবের সমাবেশ ঘটেছে। ঠাকুর সেই কথামৃতে মাঝে মাঝে বলছেন, এখন রূপটুপ সব উড়ে যাচ্ছে। যে মা কালী ঠাকুরের সমস্ত সাধনার কেন্দ্রবিন্দু, মা কালী তাঁর সব কিছু, একটা সময় সেই মা কালীর মন্দিরে যেতেও তাঁর আলুনি লাগছে, ভক্তির গানগুলিও যেন তাঁর জমছে না, আলুনি লাগছে।

জীবনে যা কিছু হয় সব মনকে নিয়েই হয়। মন যখন একই অবস্থায় থাকে, যখন আমিত্ব ভাবটা খুব প্রবল থাকে, তখন জগতের ভাবটাও প্রবল ভাবে আসবে, তখন তার জন্য ঈশ্বরের ভাবটাও প্রবল ভাবে থাকা দরকার। অহঙ্কার কার খুব প্রচণ্ড হয়? যার কাছে জগৎটা খুব জোরালো ভাবে জায়গা করে নিয়েছে। জগতের যে সুখ, তোমার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, নাম-যশ এই জিনিসগুলো তোমার কেমন মনে হয়? এগুলো খুব জোরালো মনে হয়, এগুলো আমার দরকার। তাহলে বুঝবে তোমার অহঙ্কারটাও জোরাল, এই অহঙ্কারটা লাগবে। যেমন যেমন জগতের প্রতি তোমার আসক্তি ও আকর্ষণ কমতে থাকবে, তেমন তেমন তোমার অহঙ্কারও কমতে থাকবে। ঠাকুর বলছেন, মাইরি বলছি আমার আমি খুঁজে পাই না। ঠাকুর আমি এইজন্যই খুঁজে পাচ্ছেন না, কারণ তাঁর জগৎটাও চলে গেছে। জগৎ যা আমিও তাই, জগৎ আর আমি আলাদা কিছু নয়। আমার কাছে জগৎ যত জোর সত্য, তত জোর সত্য আমি নিজে। কেউ যদি বলে, ভাই আমার কিন্তু অহঙ্কার নেই। খুব ভাল কথা, কারণ যে বলছে তার অহঙ্কার নেই, তার মানে সে সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত, সত্ত্বগুণে যে যত প্রতিষ্ঠিত সে তত ঈশ্বরের কাছে।

যে বলছে আমার অহঙ্কার নেই, তাকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখুক, 'তোমার কাছে জগৎটা কি রকম মনে হয়'? 'আহা জগতে কত কষ্ট, মানুষের কত দুঃখ, মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর করতে হবে'। 'তার মানে তোমার কাছে জগতের দুঃখ-কষ্টটা সত্য? কতটা সত্য'? 'আরে ভাই পুরোটাই সত্য'। 'তাহলে তুমি যে বলছ তোমার কোন অহঙ্কার নেই, তার মানেই তুমি মিথ্যা কথা বলছ'। ঠাকুর বলছেন, যদি জানতাম জগৎ সত্য তাহলে কামারপুকুরকে সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিতাম। অবশ্য এতে লোকেরা জানবে যে, তিনি সোনা দিয়ে কামারপুকুর বাঁধাতে পারতেন। কিন্তু আমরা ধরে নিলাম, যে কারণে তিনি জগৎকে সত্য বলে ধরছেন না, ঠিক সেই কারণে তিনি নিজের আমি খুঁজে পাচ্ছেন না। যিনি নিজের আমি খুঁজে পান না, তিনি জগৎকেও খুঁজে পাবেন না। যার কাছে জগৎ যতটা সত্য, তার কাছে তার আমিও ততটা সত্য। আর যার কাছে জগৎ যত সত্য, তার কাছে ঈশ্বর তত জোরাল দরকার। যদি অতটা ঈশ্বরের জোরাল দরকার না থাকে, তাহলে সে বিপদে পরবে। যেমন যেমন আমরা ঈশ্বরের দিকে এগোব, তেমন তেমন জগতের ভাবটা আমাদের কমতে থাকবে; জগতের ভাব কমতে থাকলে আমির ভাবটাও কমতে থাকবে। আমি আর জগৎ এই দুটো related, ঈশ্বর আপনা থেকেই এর মধ্যে ঢুকে পরে। সমস্যা হল, জগৎ আর ঈশ্বর দুটোই বিপরীত, জগৎ যত থাকবে ঈশ্বর তত কম থাকবেন, তার মানে সাধনা তাকে তত জোর করতে হবে; কারণ জগৎকে এখন তার মেরে

তাড়াতে হবে কিনা। ঘরে যত বেশি আবর্জনা জমবে, তত জোরে ঘরে ঝাঁটা মারতে হবে। কিন্তু একটা অবস্থার পর জগৎ যখন খসে পরে গেল, তখন চেষ্টাটা আর তত জোরাল দরকার হয় না। ঠাকুর বলছেন নদীর বাঁক ধরে যাওয়ার সময় মাঝি খুব শক্ত করে হাল ধরে রাখে, তারপর মূল নদীতে এসে গেলে তখন আর হাল ধরে থাকতে হয় না, নিজে নিজেই নৌকা এগোতে থাকে।

এখানে জগতের প্রতি আমার attachment কেমন সেটার বিশেষ গুরুত্ব নেই, জগতের সত্যতা, তার বাস্তবিকতা আমার কেমন মনে হচ্ছে, এটারই গুরুত্ব। Attachment সব সময় বোঝা যায় না, কিন্তু realityটা সব সময় থাকে। একজন সাধু সব কিছু থেকে আলাদা হয়ে তপস্যা করে যাচ্ছেন, এক সময় তাঁর দৃষ্টি চলে গেল দুটো পাখির উপর, তারা তখন মৈথুন করছে। ওটা দেখেই সাধুর সব তালগোল পাকিয়ে গেল। এখন তিনি পাগলের মত একটা মেয়েকে খুঁজে বেড়াতে শুরু করে দিয়েছেন। সাধুর তো কোন attachment ছিল না, আমরা বলতে পারি, মনের গভীরে ছিল। ঠিকই, থাকতে পারে, কিন্তু আমরা যা দেখছি সেখানে তো তাঁর কিছু নেই। এবার পাখির মৈথুন দেখল, তার মানে জগৎটা তাঁর কাছে সত্য হয়ে গেল, পাখিটা real, মৈথুনটা real, এবার খপ্ করে তাঁকে ধরে নিল। মহাভারতে এই ধরণের অনেক কাহিনী আছে। আবার আছে কোন ঋষি বলছেন, আমরা সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসীর বস্ত্রে আমরা রমণ করতে পারি না, তখন ঋষি পশুর রূপ ধারণ করে রমণ করছেন, মাছ রূপে করছেন, পাখি রূপে করছেন, বিভিন্ন রূপ ধারণ করে করছেন। কোথাও তাঁর কাছে জগৎ সত্য রূপে থেকে যাচ্ছে। আমরা বলতে পারি, attachment না হলে এটা কি করে হবে? ঠিকই, কথাটা ভুল কিছু না। কিন্তু একজন সাধু বা সন্ন্যাসীকে দেখব, তাঁর সাথে কথা বলব, আমরা তো তাঁর কোন জিনিসে attachment আছে কিনা জানতে পারছি না, কিন্তু একটু কথা বললেই বোঝা যাবে, জগৎটা তাঁর কাছে কতটা সত্য। জগৎটা যদি তাঁর কাছে একটুও সত্য বলে মনে হয়, তার মানেই একটা কিছু ইশারা পেলেই জগৎটা তাঁর কাছে পুরোপুরি সত্য হয়ে চলে আসবে; আর তারপরেই attachment এসে যাবে।

Hermann Hesse একজন নামকরা জার্মান লেখক, তাঁর লেখা 'সিদ্ধার্থ' বিশ্ব সাহিত্যের একটা নামকরা উপন্যাস; বিশ্বের শ্রেষ্ঠ একশটি সাহিত্যের মধ্যে এই বইটিকে ধরা হয়। 'সিদ্ধার্থ' উপন্যাসকে নিয়ে সিনেমাও হয়েছে, তবে মূল বইয়ের তুলনায় সিনেমার মান অতি সাধারণ। সংক্ষেপে কাহিনীটা হল, এক ব্রাহ্মণ ছেলের ইচ্ছা হল সে সন্ন্যাস নেবে। সময়টা ভগবান বুদ্ধের জীবিত কাল। সে আর তার বন্ধু মিলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে সাধনা করতে শুরু করল। ভগবান বুদ্ধ এদের একজনের তীব্র বৈরাগ্য দেখে ঠাকুরের মত বলছেন, এ ছোকরা আবার আমড়া খাবে। দেখা গেল একজন খুব জোর তপস্যা, সাধনা করে যাচ্ছে, অন্যজন খুব বিনয়শীল, শান্ত, নম্র, কিন্তু তার বন্ধুর মত জোর তপস্যা করছে না, পরে সে একজন ভিক্ষু হয়ে গেল।

সেই ছেলেটি তখনও বিরাট সাধনা করে যাচ্ছে, করতে করতে হঠাৎ একদিন তার মনে হল এই জগতের রহস্য তো আমার কিছুই জানা হল না। সেখান থেকে তার দ্রুত পতন হয়ে গেল, পরে এক নর্তকীর কাছে গিয়ে মজে গেল। পনের কুড়ি বছর তপস্যা করেছে, হাতে একটিও পয়সা নেই। নর্তকী তাকে বলছে, 'তোমার কাছে কোন কানাকড়ি নেই, তোমার কাছে থাকার আমার কোন অর্থই হয় না, তোমার কি গুণ আছে যে তোমার কাছে আমি যাব'! তখন ছেলেটি বলছে, 'আমি না খেয়ে থাকতে পারি, আমি অপেক্ষা করতে পারি আর আমি চিন্তন করতে পারি'। সন্ন্যাসীর গুণতো তার মধ্যে আছেই, এত বছর তপস্যার ফল যাবে কোথায়! নর্তকী শুনবে না, 'তুমি আগে নিজে ধন সম্পদ উপার্জন করে দেখাও'।

ছেলেটি সেখান থেকে এক বিরাট ধনশালী বণিকের কাছে গেল। সন্ন্যাসীর গুণ তার মধ্যে রয়েছে, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে পারে, না খেয়ে থাকতে পারে, একাগ্র ভাবে চিন্তন করতে পারে। বণিকের সহায়তায় সে একটা ব্যবসাতে নেমে যায়, ব্যবসাও কিছু দিনের মধ্যেই বিশাল আকারে ফুলে ফেঁপে উঠেছে। কারণ তার মধ্যে সন্ন্যাসীর গুণগুলো আছে কিনা; ঠাকুর বলছেন অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা খুশি করতে পার। অদ্বৈত জ্ঞান তার আঁচলে বাঁধা, খুব দ্রুত উন্নতি করে ফেলল। এবার নর্তকী তার হয়ে গেছে। সেখান থেকে এবার তার মনে ধীরে ধীরে আরও পতনের দিকে এগোচ্ছে। এমনই তার পতন হচ্ছে যে বাড়ি চাকর-বাকরদের সাথে অত্যন্ত রূঢ় ও খারাপ ব্যবহার করতে শুরু করেছে, তার মানে, অহঙ্কার, লোভ, ঈর্ষা সবই তার মধ্যে এসে গেছে। বিরাট লম্বা কাহিনী, যাতে শেষে তার একটি সন্তান হয়। তারপর একদিন নর্তকী তাকে ছেড়ে চলে

যায়। বিরাট হতাশার মধ্যে সে ডুবে গেছে। পরে একজন মাঝির সাথে কিভাবে পরিচয় হয়, ওই মাঝিই তাকে শেষ জ্ঞান দেয়।

এত বড় যোগী, সে এমন তপস্যা করেছে যে সব কিছুর পারে চলে গেছে। তারপর ওই একটা জিনিসের জন্য নিজেকে নামিয়ে আনছে, কাছ থেকে নারীর শরীর দেখবে। ওই একটা ইচ্ছা তাকে দ্রুত বেগে নামিয়ে নিয়ে গেল। জগৎটা তার কাছে মিথ্যা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু জগতের একটা খুব ছোট্ট জিনিস তার কাছে সত্য হয়ে থেকে গিয়েছিল। ওই একটা ছোট্ট সত্য পুরো জগৎকে সত্য রূপে তার কাছে নিয়ে এলো। ঠাকুর বলছেন, সুতোর একটা আঁশ যদি থাকে, ছুঁচের মধ্যে যাবে না। একটু যদি বাকি থেকে যায়, ওই একটুই সমস্ত জগৎকে টেনে নামিয়ে আনবে। অনেকে বলতে পারে এটা attachment, ঠিকই বলছে, গভীর স্তরে এটা attachmentই। কিন্তু সহজ ভাবে দেখলে, প্রথম যখন সিদ্ধার্থ নর্তকীর কাছে গেছে, তখন ওর কোন attachment নেই, কিন্তু জগৎ তার কাছে সত্য, মেয়েটির সৌন্দর্য তার কাছে সত্য, তার নৃত্য তার কাছে সত্য। বাকি জোটপাট হতে আর বেশি সময় লাগল না।

ঠাকুর সগুণ, নির্গুণ, সাকার, নিরাকার সব ভাবেই ঈশ্বরের অনুভব করে নিয়েছেন, যিনি অনুভব করে নিয়েছেন তাঁর আর ঈশ্বর থাকার কথা নয়, কিন্তু ঠাকুর সব সময় মা মা করে যাচ্ছেন; কেবল তাই না, তিনিই শুধু মা কালীর সঙ্গ করছেন না, মা কালীও তাঁর সঙ্গ করছেন। তোতাপুরীর কাছে এটাই এক আজব জিনিস, ঠাট্টা করে তাই বলছেন, কেয়া তুম রোটি ঠোকতা হ্যায়। এখানে এসেই তোতাপুরীর জ্ঞানের উপর একটা প্রশ্ন চিহ্ন পরে যায়। ঠাকুর বলছেন, হাজরা বলত, তোতাপুরী তেমন কিছু না। আমাদের সেই অধিকার নেই, পাত্রতাও নেই তোতাপুরীকে নিয়ে কিছু বলার। কিন্তু যার আছে হেথা তার আছে সেথা, যার আছে নিরাকার তার আছে সাকার। যেমনি আমি মনের জগতে এসে যাবো, তা আমি কয়েদী হয়েই আসি আর স্বেচ্ছায় আসি, ঈশ্বরকে এখন আমাকে মানতেই হবে। আমি শ্রীকৃষ্ণই হই, শ্রীরামচন্দ্রই হই, ভগবান বুদ্ধই হই, রামকৃষ্ণই হই, মনের জগতে আসা মানে ঈশ্বর আমার কাছে সত্য। তবে হ্যাঁ, যদি কোন কারণে আমি এমন অবস্থায় আছি, যেখানে আমার কাছে জগতের কোন দাম নেই, আর আমার স্বভাবেও সেই রকম নেই, তাহলে অন্য ব্যাপার। কিন্তু ঠাকুর অনেক ধরণের ভাবকে নিজের ভিতরে রেখেছিলেন, তাই নির্বিকল্প সমাধির পরেও তিনি ঈশ্বরকে নিয়ে থাকছেন। থাকারই কথা, আমি আছে, জগৎ আছে, ঈশ্বর থাকতে বাধ্য। ঠাকুর নিজের শরীর দেখিয়ে ভক্তদের বলছেন, এর ভিতর এক তিনি আছেন আর তার ভক্ত আছে। যেমনি এই জগতে ঢুকে গেলেন, তিনি আর তাঁর ভক্ত থাকবেই। শ্রীকৃষ্ণ তিনিও পূজা করবেন, তা এই শক্তির পূজা করুন আর সেই শক্তির পূজা করুন, পূজা তিনি করবেনই। কিন্তু সমাধির গভীরে যেমনি চলে গেলেন, তখন মা কালীও থাকবেন না, শিবও থাকবেন না, থাকবেন সেই শুদ্ধ আত্মাই। এটাকেই স্বামীজী পরের বাক্যে পরিষ্কার করে বলছেন।

শেষ অবস্থায় আমিও থাকে না, সগুণ ঈশ্বরও থাকেন না

Personal God comes nearer and nearer until He melts away, and there is no more Personal God and no more 'I', all is merged in Self. (*সেই সগুণ ঈশ্বর ক্রমশঃ আমাদের কাছে এগিয়ে আসতে থাকেন, শেষে তিনি যেন গলে যান, তখন 'ঈশ্বর' ও থাকেন না, 'আমি' ও থাকে না –সব সেই আত্মায় লীন হয়ে যায়।*) ঠাকুর উপমা দিয়ে বলছেন, দূর থেকে সমুদ্রের আওয়াজ শুনে এক রকম মনে হয়, সমুদ্রের কাছে গিয়ে দেখলে আরেক রকম মনে হয়, আরও যত কাছে যাচ্ছে জলের রঙ পাল্টাচ্ছে, আর শেষে হাতে জল নিয়ে দেখছে কোন রঙ নেই। ঠাকুর আবার বলছেন, মা প্রথমে সহস্রভুজা, তারপর দশভুজা, তারপর চতুর্ভুজা, তারপর দ্বিভুজা, তারপর দেখে তাঁর কোন রূপ নেই। যাঁরা দূর থেকে ঈশ্বরের সাধনা করেন, তাঁরা সগুণ সাকারকে এক রকম দেখেন। যেমন যেমন কাছে যাচ্ছেন, তাঁর রূপ পাল্টাতে থাকে, ক্রমশ আরও সূক্ষ্ম হতে হতে শেষে যখন এক হয়ে যাচ্ছেন, তখন ঈশ্বরের কোন রূপ নেই, যিনি সাধনা করছিলেন তিনিও আর তখন নেই। কেউ যদি এসে বলে আমি নির্গুণ নিরাকার দেখলাম, আমি ভাই নির্বিকল্প সমাধি কি জিনিস দেখলাম, বুঝে নিতে হবে সে ডাহা মিথ্যা কথা বলছে। কারণ যে বলছে, আমি নির্গুণ নিরাকারকে অনুভব করেছি, সেই সময় ভাই তুমিও তো নেই। তোমার 'আমি' যদি তখন না থাকে তাহলে তুমি কি করে বলছ যে, আমি নির্গুণ নিরাকার কি দেখলাম, নির্বিকল্প সমাধিতে কি হয় আমি

জানলাম? যদি তোমার 'আমি' থাকত তাহলে অবশ্যই তুমি বলতে পারতে। মাতৃসঙ্গীতে বলছে, কে জানে কালী কেমন। কিন্তু যাঁরা মা কালীর দর্শন পান, তাঁদের জন্য কালী কেমন তাও কিছুটা বলা যায়। কিন্তু নির্গুণ নিরাকারে কিছু বলা যাবে না, কারণ সেখানে 'আমি'র পুরো নাশ হয়ে যাচ্ছে, আমিটা নির্গুণ নিরাকারে লয় হয়ে যাচ্ছে। ঠাকুর এরই নুনের পুতুলের উপমা দিয়ে বলছেন, নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিয়ে যেই নেমেছ গলে গেল, তার আর খবর দেওয়া হল না।

সগুণ সাকার, নির্গুণ নিরাকার, personal God, impersonal God এগুলোর সম্পর্ক কি? মনের জগৎ দিয়ে যখন দেখছি তখন সগুণ সাকার। যত তাঁর দিকে এগোবে তত জগৎ খসে পরবে, জগৎ যত খসে পরবে, আমিত্বটাও তত খসে পরতে থাকবে, আমিত্বের নাশ হওয়াও যা, মনের লয় হওয়াও তাই। ঠাকুর সাধনা করছেন, পরনের ধুতি, চাদর, পৈতে সব খুলে সাধনা করছেন, কুল, শীল, মান সব ছেড়ে সাধনা করছেন। এখানেও সেই আমিত্বটা কমছে, শেষ অবস্থায় যখন যাচ্ছেন, তখন তাঁর ইষ্টও নেই, তিনিও নেই। সেখান থেকে আবার যখন জগতে নেমে আসছেন, তখন তাঁর আমিত্বও চলে আসছে, যদিও সেটা পাকা আমি, সাথে সাথে তাঁর ইষ্টদেবী মা ভবতারিণীও সগুণ সাকার রূপ নিয়ে ফেরত চলে আসছেন, আর স্বাভাবিক ভাবে জগৎও চলে আসছে।

চেতনার বোধটাও একটা বন্ধন

নির্গুণ নিরাকার, সগুণ সাকার নিয়ে বলতে বলতে স্বামীজী আরেক ধাপ এগিয়ে বলছেন Consciousness is a bondage, এখানে স্বামীজী consciousness বলতে চেতনাকে বোঝাচ্ছেন। দুটো শব্দ হয়, চৈতন্য আর চেতনা, চৈতন্য হল সচ্চিদানন্দের চৈতন্য, যেটা শুদ্ধ চৈতন্য, ওই চৈতন্য যখন জীবের মধ্যে আসে তখন চেতনা রূপে আসে, এটাকে consciousness বলা হয়। ইদানিং বিজ্ঞানে চেতনাকে নিয়ে প্রচুর চিন্তা-ভাবনা চলছে, চেতনাকে নিয়ে প্রচুর গবেষণাদিও হচ্ছে। এই consciousnessএর চেতনা আর আমরা যখন conscious বা চৈতন্য বলি, এই চেতনা আর চৈতন্যতে অনেক তফাৎ। কেনোপনিষদে চেতনা আর চৈতন্যের উপর খুব গভীর ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। স্বামীজী বলছেন, এই চেতনাও একটা বন্ধন। কেন বন্ধন, পরে বলছেন। তার আগে বলছেন The argument from design claims that intelligence proceedes form; but if intelligence is the cause of anything, it itself is in its turn an effect. It is Maya. (*'সৃষ্টি দেখে স্রষ্টার কল্পনা'-রূপ এক মত আছে, তাতে রূপাদি-সৃষ্টির পূর্বে বুদ্ধির অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়। কিন্তু বুদ্ধি যদি কিছুর কারণ হয়, তবে তা আবার অপর কিছুর কার্যস্বরূপ। একেই মায়া বলা হয়।*) ডিজাইন থিয়োরী মানে, সৃষ্টির উপর খ্রীশ্চানদের একটা মত আছে, শুধু খ্রীশ্চানরাই মনে করে না, সমস্ত সেমেটিক ধর্মেই এই মত আছে, যেখানে মনে করা হয় যে ঈশ্বর সৃষ্টি করলেন। কিভাবে করলেন? তিনি এটা সৃষ্টি করলেন, তিনি ওটা সৃষ্টি করলেন। আমাদেরও এই ধরণের মত আছে, জগতে যত রকমের সৃষ্টির থিয়োরী আছে, সব রকম থিয়োরীই বেদ, উপনিষদ, পুরাণাদি শাস্ত্রে আগে থেকেই দেওয়া আছে। কিন্তু নাসদীয় সূক্তম্ ও পুরুষ সূক্তমে সৃষ্টির যে তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে, সেটাই আমাদের ঠিক ঠিক সৃষ্টি তত্ত্ব।

ডিজাইন থিয়োরীতে এটাই হয় যে, তিনি এটা সৃষ্টি করলেন। বাইবেলে নামকরা সৃষ্টি তত্ত্বে বলছেন, ভগবান প্রথম দিন এই এই জিনিস সৃষ্টি করলেন, দ্বিতীয় দিন এই এই, তৃতীয় দিন এই এই সৃষ্টি করলেন, সপ্তম দিন তিনি বিশ্রাম নিলেন। সৃষ্টি যখন করলেন, তিনি নিশ্চয়ই ভেবে ছিলেন যে, আমি সৃষ্টি করব, পাগল বা বাচ্চাদের মত খামখেয়ালীতে তিনি কিছু করেননি। তার মানে, তাঁর মনে কোন চিন্তা-ভাবনা ছিল। চিন্তা-ভাবনা যখন ছিল, তাহলে ধরে নিতে হবে যে, ওই চিন্তা-ভাবনার পিছনে আরেকটা চিন্তা-ভাবনা ছিল। কারণ কোন একটা কিছু দরকার থাকলেই তবেই না কিছু হয়। একটা কোন স্পৃহা থাকতে হবে, ওই স্পৃহাটা একটা ইচ্ছায় পরিণত হয়, সেই ইচ্ছাই পরে কার্যে পরিণত হয়। ডিজাইন থিয়োরীতে বলছে, ঈশ্বর এটা রচনা করলেন, সেটা রচনা করলেন, আমাকে রচনা করলেন, তোমাকে রচনা করলেন, তার মানে ঈশ্বরের কোথাও একটা স্পৃহা আছে। স্পৃহা যদি না থাকে, কোন একটা কামনা যদি না থাকে, তাহলে কোথা থেকে কার্য হবে। তার মানে এই যে চেতনা, আমি এটা করব, এটাও একটা effect, effect মানেই এটা একটা বন্ধন।

আমরা এটা মানি না, আমাদের নামকরা কথা হল, *আপ্তকামস্য কা স্পৃহা*। ভগবান তিনি আপ্তকাম, তাঁর সমস্ত কামনা পূর্ণ, তাঁর মধ্যে কামনা কেন আসবে? কারণ কামনা যদি থাকে, তার মানেই তিনি এখনও বন্ধনে আছেন। সেইজন্য ডিজাইন থিয়োরীতে যেভাবে বলা হচ্ছে, এটা ভুল। স্বামীজী ঘুরে ঘুরে খ্রীশ্চানদের আক্রমণ করে যাচ্ছেন। স্বামীজী কিন্তু ভগবান যীশুর আধ্যাত্মিক কথাগুলোকে নিয়ে কোন প্রশ্ন করছেন না। খ্রীশ্চানদের যে প্রচলিত বিশ্বাস, সেগুলিকে খোলাখুলি আক্রমণ করছেন। এইভাবে স্বামীজী যে শুধু আক্রমণ করছেন তা না, পাশ্চাত্য দুনিয়ায় নামকরা যত দার্শনিকরা রয়েছেন, তাঁরাও ঠিক এই জিনিসগুলিকে নিয়ে খ্রীশ্চানদের আক্রমণ করেছেন। স্বামীজী যাঁদের বলছেন, তাঁরা সবাই খ্রীশ্চান ধর্মের, তাঁদের মন ওখানে রয়েছে, তিনি দেখাচ্ছেন এভাবে হয় না, যেভাবে আমরা বলে দিই, তিনি ইচ্ছা করলেন। ইচ্ছা এভাবে হয় না, ঈশ্বর কোন পাগল বা শিশু নন। আমরা বলতে পারি, কেন ঠাকুরও তো বলছেন, শ্রীমাও বলছেন, ঈশ্বর এই রকম, ঠাকুর এই রকম। আমাদের মত বাচ্চাদের বোঝানর জন্য বলছেন, হায়ার লেভেলে সেটা হয় না।

সেইজন্য যে কোন ধর্মের অনেকগুলো স্তর থাকে। সাধারণ লোকেদের জন্য ধর্মের কিছু কথা থাকে, সেখান থেকে আরেকটু উপরের লোকেদের জন্য ধর্মের অন্য কিছু কথা থাকে, তাদের থেকে আরও কিছু উপরের লোকেদের জন্য থাকে ধর্মের কিছু কথা। ধর্মের আসল কথাগুলো মুষ্টিমেয় কয়েকজনের জন্য হয়। আধ্যাত্মিকতা সেই জন্য জনসাধাণের জন্য হয় না। যদি দেখা যায়, কারুর প্রচুর চেলাচামুণ্ডা আছে, প্রচুর নামযশ, বুঝতে হবে, সেখানে আর যাই শিক্ষা দেওয়া হোক, আধ্যাত্মিকতার শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে না। জনগণের জন্য কখনই আধ্যাত্মিকতা হয় না, জনগণের জন্য সব সময় popular talks থাকে। আধ্যাত্মিকতার মূল সত্যগুলিকে জনগণ কখনই নিতে পারে না। জনগণের জন্য হল, ঠাকুর আছেন, তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। কেন সৃষ্টি করলেন? তাঁর ইচ্ছা হল, তিনি ইচ্ছাময়, তিনি যে কোন জিনিস করতে পারেন। কিন্তু দর্শনের উচ্চস্তরে গেলে যুক্তিতে এই জিনিসগুলো দাঁড়াতে পারবে না, আর উপনিষদও এই ধরণের কথা বলেন না। কিন্তু সাধারণ লোকেদের জন্য প্রাথমিক স্তরে এই জিনিসগুলোর দরকার আছে।

ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেন, আমরা ঈশ্বরকে সৃষ্টি করি

স্বামীজী বলছেন, যেখানেই কার্য-কারণের ব্যাপার আসে, বুঝতে হবে এটাই মায়ার এলাকা। ঈশ্বর যদি ইচ্ছা করেন, 'এই রকম হোক', এই ইচ্ছার পিছনে কামনা আছে। তার মানে God's will এটাও একটা effect। Effectএর পিছনে আছে কার্য কারণ সম্পর্ক, যেখানেই কার্য কারণ সম্পর্ক, সেটাই মায়ার এলাকা। ভগবান, যিনি ত্রিগুণাতীত, যিনি সর্বশক্তিমান, অজান্তায়, আমাদের বোকামোর জন্য তাঁকে মায়ার জগতে ঢুকিয়ে দিলাম। আমরা বুঝতেও পারছি না যে আমরা অজান্তায় কত বড় অন্যায় করছি। কিন্তু আমরা যে স্তর থেকে ভাবছি, সেখানে কি হয়? স্বামীজী বলছেন, God creates us, and we create God, and this is Maya. (*ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেন, আবার আমরা ঈশ্বরকে সৃষ্টি করি –এটি হল মায়া।*) এই মায়ার দরুণ ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করছেন আর আমরাও ঈশ্বরকে সৃষ্টি করছি। কারণ আমার যেমন মানসিকতা, আমার মন যেমন, সেই অনুরূপ আমি আমার ঈশ্বরকে ভেবে নিই, সেইজন্য যে ঈশ্বর আমার ঈশ্বর, সেই ঈশ্বর আমারই ঈশ্বর। ইদানিং কালে ধর্মান্ধতার জন্য যারা বলে, কৃষ্ণই একমাত্র সত্য, আল্লাই একমাত্র সত্য, তার বুঝতে চায় না যে, সত্য একটাই, যিনি মন বাণীর পারে। এরপর তুমি যেটাই করছ, যেটাই ভাবছ, সেটা সত্য নয়, কারণ সেটা তোমার মনের ফসল। যে কোন ঈশ্বর, এই ধর্ম, সেই ধর্ম, যে ধর্মেরই ঈশ্বরকে নিয়ে আসা হোক না কেন, সব ঈশ্বর হলেন এই মন থেকে সৃষ্টি, ঈশ্বরের জন্ম তোমার মনে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব যাঁকেই নিয়ে আসছে, সব তোমার মন থেকে তৈরী। তাহলে কি এগুলো সব কল্পনা? একেবারেই না, সেই যিনি শুদ্ধ ব্রহ্ম পরাৎপর রাম, যিনি নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম, তাঁকে যখন মন দিয়ে দেখছি, তখন তিনি ঈশ্বর। ব্রহ্ম কিন্তু তোমার মনের জিনিস না, মনের পারে তিনি ব্রহ্ম। মনের ছিদ্র দিয়ে যখন সেই ব্রহ্মকে দেখছি তিনি এবার ঈশ্বর। এই ঈশ্বর তোমার মনের মায়ার সন্তান, তা সে যে কোন ঈশ্বরই হন না কেন, সেই ঈশ্বর হলেন, তোমার নিজের মন, মন মানে মায়া, এই মায়ার সন্তান।

The circle is unbroken; mind creates body, and body creates mind; the egg brings the chicken, the chicken the egg; the tree the seed, the seed the tree. (*সর্বত্র এইরূপ চক্রগতি দেখা যায় : মন দেহ সৃষ্টি করছে, আবার দেহ মন সৃষ্টি করছে; ডিম থেকে পাখি, আবার পাখি থেকে ডিম। গাছ থে বীজ, আবার বীজ থেকে গাছ।*) যেমন গাছ থেকে বীজ হয়, আবার বীজ থেকে গাছ, চক্রাকারে এটা চলছে, ঠিক তেমনি শরীর মনকে জন্ম দেয়, মন ঈশ্বরকে জন্ম দেয়, ঈশ্বর আবার শরীরকে জন্ম দেন, এটাই চলছে, unbroken circle, কোন দিন শেষ হবে না।

The world is neither entirely differentiated nor yet entirely homogeneous. (*এই জগৎপ্রপঞ্চ একেবারে বৈষম্যে পূর্ণ নয়, আবার পুরোপুরি সমভাবাপন্নও নয়।*) এই জায়গায় নোট নেওয়ার সময় অনেক ফাঁক থেকে গেছে, স্বামীজী এর আগে পরে হয়ত আরও কিছু বলেছিলেন। বলছেন, জগৎকে যদি আমরা দেখি, মনে হবে এটা পুরোপুরি এক, শুদ্ধ চৈতন্য, কিন্তু তাও নয়। যদি বলি জগতের সব কিছুই আলাদা, আমি আলাদা আপনি আলাদা, কিন্তু তাও না। এটাই মায়া, জগৎ একও নয় আবার বহুও নয়, এখানে একও আছে বহুও আছে। যখন এক দেখব তখন বহু দেখব না, যখন বহু দেখব তখন এক দেখব না। আগের আলোচনায় যেমন বলা হয়েছিল – যখন গঙ্গা দেখছি তখন জলের বাষ্প দেখব না; জলের বাষ্পকে যখন দেখছি, তখন গঙ্গা দেখব না। মন কক্ষণ দুটো জিনিসকে এক সঙ্গে দেখতে পারে না, মন একটার পর একটা চিন্তাকে নিয়ে আসে। সেইজন্য যখন ঈশ্বরকে দেখছি তখন জগৎ দেখব না; যখন জগৎ দেখছি তখন ঈশ্বর দেখতে পারব না।

যথার্থ সত্য – অস্তি-স্বরূপকে লাভ করতে হবে

স্বামীজী বলছেন, Man is free and must rise above both sides. Both are right in their place; but to reach truth, 'is-ness', we must transcend all that we no know of existence, will, consciousness, doing, going, knowing. (*মানুষ স্বাধীন –তাকে এই দুই-ভাবে উপরে উঠতে হবে। এই দুটোই নিজ নিজ প্রকাশভূমিতে সত্য বটে, কিন্তু সেই যথার্থ সত্য –সেই অস্তি-স্বরূপকে লাভ করতে গেলে আমরা এখন যা কিছু অস্তিত্ব, ইচ্ছা, চেতনা, করা, যাওয়া, জানা বলে জানি, সে-সব অতিক্রম করতে হবে।*) যত রকমের ক্রিয়াকে আমরা জানি, তা যে কোন ক্রিয়াই হোক না কেন, যে শব্দগুলি আমরা ঈশ্বরের সাথে জুড়ে রেখেছি, কি কি শব্দ, যেমন, existence, আমার আপনার existence, আর তার সাথে will, consciousness, doing, going, knowing যতক্ষণ আমরা এগুলোর পারে না চলে যাচ্ছি, ততক্ষণ আমরা সৎএ, 'is-ness'এ পৌঁছাতে পারব না। অধ্যাত্ম রামায়ণে প্রথমের দিকে সীতা হনুমানকে বলছে, রাম কিছুই করেন না, তিনি কোথাও যান না, তিনি কোথাও বসেন না। সচ্চিদানন্দের সৎ, যিনি সর্বাবস্থায় আছেন, ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সর্ব কালে আছে, ওইটাতে যাওয়ার জন্য, যেখানে বহু জিনিসটা রয়েছে, যেখানে আমরা বহুকে জানছি, অনেক কিছু করছি, ক্রিয়া, কর্ম, কারণ ও কর্তার সম্পর্ক আছে; আমাদের বুঝতে হবে এটা অনেক নীচের অবস্থা, যা কিনা সব মায়ার রাজ্যে চলে। যেখানেই কোন ক্রিয়া হচ্ছে, জানবেন এটা মায়ার রাজ্য। যেখানে এক অপরকে জানছে, মায়ার রাজ্য। যেখানে সব এক, সেখানে কে কাকে জানবে? এই যে 'is-ness', যেটা সৎ, এটাকে জানার জন্য আমাদের আগে মায়ার রাজ্যকে অতিক্রম করতে হবে।

There is no real individuality of the Jiva (separate soul), eventually it, as a compound, will go to pieces. Only that which is beyond further analysis is 'simple', and that alone is truth, freedom, immortality. (*পৃথক বা স্বতন্ত্র জীবাত্মার প্রকৃত ব্যক্তিত্ব নেই –ওটা মিশ্র বস্তু হলে তো কালে খণ্ড খণ্ড হয়ে নষ্ট হয়ে যাবে। যাকে আর কোনরূপে বিশ্লেষণ করা যায় না, কেবল সেই বস্তুই অমিশ্র এবং কেবল সেইটিই সত্যস্বরূপ, মুক্তস্বভাব, অমৃত ও আনন্দস্বরূপ।*) জীবাত্মা যতক্ষণ জীবাত্মা রূপে আছে ততক্ষণ তার বহু জ্ঞান থাকবে। সৃষ্টির ব্যাখ্যা করার সময় বেদান্ত বলে, সৃষ্টিতে আত্মাই আছেন, আত্মা ছাড়া আর কিছু নেই। সেই আত্মার উপর যখন দৈবী মায়া এসে যায়, তখন এক বহু রূপে দেখায়। যেমন একটা হাজার ওয়াটের বালব্ জ্বলছে, তার উপর একটা ধাতুর চাদর দিয়ে ঢেকে দেওয়া

হয় আর সেই চাদরে অনেক ছিদ্র যদি করে দেওয়া হয়, তখন বালবের আলো ওই অনেক ছিদ্র দিয়ে আসতে থাকবে। কিংবা সূর্যের আলোতে অনেকগুলো আয়না রেখে দেওয়া হল, এবার অনেকগুলো সূর্য দেখাবে। মানুষের ক্ষেত্রে আমরা এটাকে বলি কারণ শরীর।

এই কারণ শরীর যখন মন আর ইন্দ্রিয়ের সাথে জুড়ে যায়, তখন তাকেই জীবাত্মা বলা হয়। আর এই জীবাত্মা যখন কোন দেহ ধারণ করে নেয় তখন মনে করে এই দেহটাই আমি। সেইজন্য যখনই বলছি 'আমি', 'আমি' বলতে আমরা সব সময় বোঝাই এই দেহকে। কিন্তু আমি বা আপনি বলতে দেহকে বোঝায় না, আমি বা আপনি বলতে সব সময় জীবাত্মাকেই বোঝায়। ধর্মের সব কিছু এই জীবাত্মাকে নিয়েই চলে। মানুষ মারা গেলে জীবাত্মা ওই দেহটা ছেড়ে দেয়। যখন বিভিন্ন লোকে যায়, পাতাল লোকে যাচ্ছে, স্বর্গলোকে যাচ্ছে, এই জীবাত্মাই তখন এই লোক থেকে সেই লোকে যাতায়াত করে। ঈশ্বরের কাছে যখন যায়, তখন এই জীবাত্মাটা খসে যায়, তখন ওই কারণ শরীর যেটা আছে, সেটাই একমাত্র থাকে। মানুষ যখন কারণ শরীরে থাকে, তখনই সে বৈকুণ্ঠলোকে, শিবলোকে, রামকৃষ্ণলোকে যায়। এসব লোকে জীবাত্মাকে নিয়ে যেতে পারবে না। ওই কারণ শরীরটাও যখন ভেঙে যায়, তখন মহাকারণ, আত্মার সঙ্গে এক হয়ে যায়। স্বামীজী এখানে বলছেন, জীবাত্মা যতক্ষণ আছে, আমি, আপনি, আমরা যতই মনে করি আমরা শুদ্ধ আত্মা, মাঝেসাঝে যদি মনে করি আমরা কারণ শরীর, কিন্তু আসলে আমরা সবাই সেই জীবাত্মা। জীবাত্মা এই শরীরকে ধারণ করে আছে, শরীর সব সময় পাল্টাচ্ছে, মরে গেলে জীবাত্মা আরেকটা শরীর ধরে নেবে।

স্বামীজী বলছেন, জ্ঞান হওয়া মানে, জীবাত্মা টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া, মৃত্যু হয়ে গেলে যেভাবে এই শরীরটা মাটি বা ছাই হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায়, ঠিক তেমনি জ্ঞান হয়ে গেলে এই জীবাত্মাটা টুকরো টুকরো হয়ে যায়। কারণ শরীর যেটা, ও টুকরো টুকরো হওয়াও যা, না হওয়াও তাই। কারণ সে যখন কারণ শরীরে থাকে তখন সে ঈশ্বরের সাথে এক থাকে। যাঁরা ভক্ত তাঁদের কারণ শরীর ভাঙবে না, জ্ঞানীদের কারণ শরীরটা ভেঙে যায়। গুরুত্ব এই শরীরের না, কেউ যদি আত্মহত্যা করে নেয়, তার এই দেহটা চলে গেল, কিন্তু জীবাত্মা যেমন ছিল তেমনই থাকবে। উদ্দেশ্য হল জীবাত্মার নাশ করা। জীবনের উদ্দেশ্য মরে যাওয়া নয়, জীবাত্মাকে খুন করা, নিজের তো অবশ্যই, পারলে আরও চারজনের জীবাত্মাকে খুন করা। খুন যদি করতে হয়, জীবাত্মাকে খুন করতে হবে। এই দেহাত্মার কোন দাম নেই, মৃত্যুর পর দেহ থেকে আত্মা বেরিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা স্থূল দেহ ধরে নেবে।

অমিশ্র বস্তু - ভ্রমাত্মক স্বাতন্ত্র্য - পাপ - ধর্ম বা পূণ্য ও নৈতিকতা

এই কথা বলার পর স্বামীজী বলছেন, Only that which is beyond further anyalysis is 'simple', and that alone is truth, freedom, immortality, bliss. (*যাকে আর কোনরূপে বিশ্লেষণ করা যায় না, কেবল সেই বস্তুই অমিশ্র এবং কেবল সেইটিই সত্যস্বরূপ, মুক্তস্বভাব, অমৃত ও আনন্দস্বরূপ।*) আমরা যে বিশ্লেষণ করে যাচ্ছি, বিশ্লেষণ করতে করতে যেখানে শেষ গিয়ে দাঁড়ায় সেটা হল সহজ, ঈশ্বরের আরেক নাম সহজ। বলছেন, All struggles for the preservation of this illusive individuality are really vices, (*এই ভ্রমাত্মক স্বাতন্ত্র্যকে রক্ষা করবার জন্য যত চেষ্টা, সবই বাস্তবিক পাপ।*) সমস্যা হল, আমাদের জীবাত্মা জোঁকের মত আঁকড়ে এই শরীরটাকে ধরে রেখেছে, শরীরকে জীবাত্মার এই ধরে রাখার যে চেষ্টা, এটাই সমস্ত পাপের মূলে, সমস্ত সমস্যার মূলে। সিনেমার ডায়লগে বলে পাপী পেট কা সওয়াল, পাপী পেট কা কঈ সওয়াল নেহি হ্যায়, এ পাপী জীবাত্মা কা সওয়াল হ্যায়, যে জীবাত্মা মন, ইন্দ্রিয়কে জুড়ে রেখেছে। শুদ্ধ আত্মা কারণ শরীরে অজ্ঞানের মাধ্যমে যখন মন ইন্দ্রিয়ের সাথে জুড়ে যায়, এটাই হল আসল পাপী। আর সে বলে, তুমি যাই করে নাও, আমি মরব না। মানুষ মরে গেলে জীবাত্মা এই দেহটা ছেড়ে দেয়, ঠাকুর যদি ছুঁয়ে দেন, তাও জীবাত্মাটা থাকবে, যাই করা হোক না কেন জীবাত্মা সহজে যাবে না। জীবাত্মার সহজাত প্রবণতা এটাই, আমি থাকব। এই যে জীবাত্মা নিজেকে সর্বপ্রকারে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে, এটাই হল exclusiveness।

স্বামীজী বলছেন, All struggles to lose this individuality are virtues. (*আর ঐ স্বাতন্ত্র্যকে নাশ করবার সমুদয় চেষ্টাই ধর্ম ও পূণ্য।*) জীবাত্মার নাশ কিভাবে করা যেতে পারে, এই চেষ্টা যখন করা হচ্ছে, এটাই তখন ধর্ম হয়ে যায়। তার মানে, জীবাত্মাকে ধরে রাখার চেষ্টাটা অধর্ম, জীবাত্মাকে নাশ করার চেষ্টাটা ধর্ম। জীবাত্মা চাইছে আমি ছাড়া আর কেউ থাকবে না। কিন্তু মনকে বুঝিয়ে বলা হল, দেখ আমরা যারা আছি সবাই আমরা ঠাকুরের ভক্ত, আমরা এক, তোমার দুঃখ আমার দুঃখ। এবার এই ভাবটাই যদি দৈনন্দিন জীবনে আচরণের মধ্যে নিয়ে আসে, তখন ওটাই হয়ে যাবে ধর্ম। তখন জীবাত্মার exclusive existence আর থাকছে না।

আমরা পাপ আর পূণ্যকে কিভাবে পরিভাষিত করব? যে জিনিস জীবাত্মার জন্য করা হচ্ছে সেটাই পাপ। আমরা খুব সহজ ভাবে বলে থাকি যে, দেহের জন্য যেটাই করা হয় সেটাই পাপ, আসলে তা দেহের জন্য না, জীবাত্মার জন্য যা কিছু হয়, ওটাই পাপ। জীবাত্মার যে exclusiveness, সেটাকে ভাঙার জন্য যখন চেষ্টা করছে, বৃহতের সাথে নিজেকে যখন এক করে নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে, তখন সেটাই পূণ্য, সেটাই ধর্ম। বলছেন, All morality is based upon the destruction of separateness or false individuality, because that is the cause of all sin, (*এই জগতে সব-কিছুই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এই স্বাতন্ত্র্যকে ভাঙবার চেষ্টা করছে। নৈতিকতার ভিত্তি হচ্ছে –এই পার্থক্যজ্ঞান বা ভ্রমাত্মক স্বাতন্ত্র্যকে ভাঙবার চেষ্টা, কারণ এইটিই সকল প্রকার পাপের মূল।*) সমস্ত পাপ হল এই exclusiveness, স্বাতন্ত্রবোধ, আমার এই জীবাত্মা কিছুতেই অন্যকে নিজের বলে গ্রহণ করতে চাইবে না। তাই না, অন্য জীবাত্মাকে যদি মারতে চায়, জীবাত্মা তো জীবাত্মাকে মারতে পারবে না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা দেহ ধারণ করে নেবে। জীবাত্মা যেমন দরকার তেমন শরীর ধারণ করে নেয়। জগতে যত পাপ, যত দোষ, যত হীনতা, নীচতা, সব হল জীবাত্মার বদমাইশি, জীবাত্মাই মালিক কিনা, পুরো জগতের জন্য সে একটা ডিক্টেটর, আর অন্য জীবাত্মার জন্যও ডিক্টেটর। ওই জীবাত্মাও যদি কিছু করতে চায়, তাকেও ওই শরীর দিয়েই করতে হবে। এই যে বোধ, আমি আর তুমি আলাদা, কিন্তু কিসের আলাদা! শুদ্ধ আত্মা তো সেই এক, অজ্ঞানের জন্য কারণ শরীর আলাদা হয়ে গেছে, আর ওই কারণ শরীর থেকে এখন জীবাত্মা আলাদা হয়ে গেছে।

বলছেন, Morality exist first; later, religion codifies it. Customs come first, and then mythology follows to explain them. While things are happening, they come by a higher law than reasoning; that arises later in the attempt to understand them. (*নৈতিকতা আগে থেকেই রয়েছে, ধর্মশাস্ত্র পরবর্তী কালে নীতি প্রণয়নের দ্বারা নৈতিকতাকে বিধিবদ্ধ করেছেন মাত্র। প্রথমে সমাজে নানাবিধ প্রথা স্বভাবতই উৎপন্ন হয়ে থাকে, সেগুলোকে ব্যাখ্যা করার জন্য পরে পুরাণের উৎপত্তি। যখন ঘটনাসমূহ ঘটে যায়, তখন সেগুলো যুক্তি-বিচারের চেয়ে উচ্চতর কোন নিয়মেই ঘটে থাকে, যুক্তিবিচারের আবির্ভাব হয় পরে –ঐগুলি বোঝাবার চেষ্টায়।*) Morality মানে সবাইকে নিয়ে চলা, প্রথমেই এটা দরকার, পরে ধর্ম এটাকে কোডিফাই করে, সেটাকে বোঝানর জন্য মিথোলজি তৈরী হয়। Morality first, যেমন বলা হয় যে, সত্য কথা বলবে। সত্য কথা কেন বলতে বলছেন? সবাই এক, কার কাছ থেকে তুমি লুকোতে চাইছ, কাকে তুমি ঘৃণা করছ? এবার সেটাকে কোডিফাই করা হচ্ছে, সত্য কথা সদা বলিবে। তাতেও হচ্ছে না। এবার রাম রাবণের গল্পগুলিকে নিয়ে আসছেন লোকেদের বোঝানর জন্য। Morality সবার আগে, কারণ এটা আধ্যাত্মিক সত্য। সেখান থেকে যখন নামানো হয় তখন আসে code of conduct। সেখান থেকে আরও যখন নামায়, তখন আসে মিথোলজি, এভাবে চলে।

যুক্তি বাস্তবিক সত্য থেকে অনেক নীচে

Reasoning is not the motive power, it is 'chewing the cud' afterwards. Reason is the historian of the actions of the human being. (*যুক্তি-বিচারের কোন কিছু ঘটাবার শক্তি নেই, এ যেন ঘটনাগুলি ঘটে যাবার পরে সেগুলির জাবরকাটা। যুক্তি-তর্ক যেন মানুষের কার্যকলাপের ঐতিহাসিক।*) আমার যেটাকে reason বলছি, যুক্তি যেটা বলছি, স্বামীজী বলছেন যুক্তি জিনিসটা অনেক নীচে, বাস্তবিক সত্য তার অনেক উপরে। বাস্তবিক সত্য কি? আমরা এক। ওই সত্যকে ধরার জন্য,

ধারণা করার জন্য যুক্তি আদির দরকার হয়। স্বামীজীর ভাষা খুব কাব্যিক ভাষা, সেই কাব্যিক ভাষায় বলছেন, যুক্তি কি? যুক্তিতর্ক যেন মানুষের কার্যকলাপের ঐতিহাসিক। জীবাত্মা যেভাবে কাজ করে, তার থেকে শুরু করে তার স্বার্থ পর্যন্ত, এই জিনিসগুলির যে রেকর্ড সংরক্ষণ করছে, এটাই হল reasoning, সেইজন্য reasoning অনেক নীচে।

স্বামীজীর এই বাক্যটাকে নিয়ে একটু চিন্তা করলে খুবই অবাক লাগে। একজন মানুষ নিয়মিত ধ্যান ধারণা করলে তার বুদ্ধি লেজারের মত সূক্ষ্ম হয়ে যায়, এমন সূক্ষ্ম হয়ে যায় যে, যেখানে যে জিনিসটা যেমনটি আছে, ঠিক তেমনটি সেই জিনিসটাকে বার করে নেয়। ভগবান হলেন সত্যস্বরূপ, ঠাকুর সেইজন্য বলছেন সত্য হল কলির তপস্যা। সত্যকে পরিভাষিত করতে গিয়ে বলা হয় যথাবৎ, জিনিসটা যেমন আছে, যেমনটি হয়েছিল, ঠিক তেমনটি বলা, এটাই সত্য। আমাদের মন মিথ্যার জালে এমন ডুবে আছে যে, আমরা অপরকে বলতে পারি, আমি মিথ্যা কথা সহ্য করতে পারি না, কিন্তু বিচার করে দেখলে দেখা যাবে সে নিজেই সারাদিনে কত বার মিথ্যা কথা বলছে। এটাও গুরুত্বপূর্ণ নয়, তার থেকেও গুরুত্ব হল মিথ্যার যে মহাজাল, যেটা মায়া, আর আমাদের শরীর মন ওই মিথ্যার মহাজালে ডুবে আছে, আর ওই ডুবে থাকা অবস্থায় আমরা সমস্ত কাজ করছি, সত্য যেন তার মধ্যে একটা ছায়ার মত অল্প একটু থাকে, বাকি সবটাই মিথ্যা, মায়া। তিনজনকে যদি আমরা অধ্যয়ন করি, ব্যাসদেব, শঙ্করাচার্য এবং স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামীজী মানেই ঠাকুরও, তাহলে দেখা যাবে, এনাদের কাছে মায়া বলে কিছু ছিল না। মায়া নামে কোন পদার্থ না থাকার জন্য, এনারা হাজারো রকমের আবৃতে ঢাকা পড়ে থাকা সত্যকে নিমেষের মধ্যে বার করে আনতেন। আরও অনেক সাধু মহাত্মারা ছিলেন, কিন্তু তাঁদের বই আমরা অত পাই না, সেইজন্য তাঁদের নাম নিচ্ছি না। থাইল্যাণ্ডের একটা গুহার মধ্যে স্কুলের কয়েকটি ছেলে আটকে গেছে, বার করার জন্য কত রকম পরিকল্পনা চলছে। যে তিনজনের আমরা নাম করলাম, এনাদের ব্যক্তিত্ব কি রকম? গুহার মধ্যে ছেলেরা আটকে আছে? আমাদের কি করতে হবে? ওই গভীর গুহায় যাওয়া যাবে না? এনারা যেন সাঁ করে মুহূর্তের মধ্যে চলে গেলেন, পুরোটা দেখে চলে এলেন। যথাবৎ, জিনিসটা যেমনটি তেমনটি তাঁরা আমাদের জানিয়ে দেবেন। আমরা যদি ওই গুহায় যেতে চাই কি করব? গুহার মধ্যে গভীর জল, সেই জলের ভিতর দিয়ে যাওয়ার জন্য কত রকমের ব্যবস্থা নিতে হবে, অক্সিজেনের ব্যবস্থা, ডুবুরির ব্যবস্থা, ডাক্তারের ব্যবস্থা, লাইটের ব্যবস্থা, কত কিছু করতে হবে। কিন্তু ওনাদের কাছে কিছু না, সাঁ করে যাবেন, ঠিক ওখানে গিয়ে সবাইকে উদ্ধার করে নিয়ে চলে আসবেন। এনারাও মায়ার মহাজাল থেকে এইভাবে সত্যকে বার করে আনেন।

স্বামীজী এই যে যুক্তিকে নিয়ে বললেন, পরে আরও বলবেন। যুক্তি খুব ভাল, কিন্তু আধ্যাত্মিক উপলব্ধির কাছে কিছুই না। স্বামীজী আমেরিকানদের কাছে বলছেন, তাঁদের কাছেও যুক্তি জিনিসটা বিরাট কিছু। আমরা প্রায়ই মনে করি, আমরা যা কিছু করি যুক্তি দিয়ে করি। ইদানিং কালের তথাকথিত যুক্তিবাদীরাও মনে করে, তারা সব যুক্তি দিয়ে করে। কিন্তু যুক্তি হল জাব কাটা, গরু ঘাস খায়, খাওয়ার পরেই ঘাস পাকস্থলিতে চলে যায় না, গরুর আরেকটা থলি থাকে, ঘাস প্রথমে সেখানে যায়। ফাঁকা সময় গরু ওখান থেকে ঘাসকে বার করে চিবোতে থাকে, এটাই জাব কাটা। আমরা যা কিছু করি, পুরোটাই আমরা সহজাত প্রবৃত্তি থেকে করি। কেউ যখন আমাকে গালাগাল দেবে, হয় আমি তাকে পাল্টা গালাগাল দেব, তা নাহলে চুপ থাকব। যদি গান্ধীজীর মত ভাল মানুষ হই, তাহলে আমার ক্ষমতা থাকলেও আমি কিছু করব না। কিন্তু আমাদের প্রতিক্রিয়া instinctive হয়। যা কিছু আমরা করি, খাওয়া দাওয়া করছি, কাজ করছি, সবের পিছনে একটা না একটা যুক্তি লেগে থাকবে।

একটা খুব সাধারণ ব্যাপার নিয়ে বললে ভাল বোঝা যাবে। আমি খাচ্ছি, খেতে খেতে বললাম, মা একটু নুন দাওতো। মা নুন এনে দিলেন। যদি আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তুমি নুন কেন চাইলে? এবার আমি যখন পুরোটা ভাবতে শুরু করব, তখন দেখব এই নুন চাওয়ার পিছনে পর পর যুক্তি এসে যাবে। আমি খেতে গিয়ে আমার নুন কম লাগল, আর আমি বিচার করে দেখলাম আমার রক্তচাপ নেই, রক্তচাপ নেই তাই অতিরিক্ত নুন নেওয়া যাবে, এই রকম পর পর অনেক যুক্তি পাওয়া যাবে। সব যুক্তিগুলো একত্রিত হয়ে সাঁ করে একটা স্টেজে চলে এসেছে। একটা নামকরা গল্প আছে, এক ভদ্রলোক অফিসে যাওয়ার আগে খেতে

বসেছে, তাড়াতাড়ি করে খাচ্ছে, খেতে খেতে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মাকে বলছে, ‘মা, তুমি কি ডাল করেছ, নুন দাওনি, আর এই তরকারিটা খাওয়া যায়! একেবারে পুড়িয়ে দিয়েছ’। পিছন থেকে তার গিন্নি বলছে, ‘আজ মা রান্না করেননি, আমিই সব করেছি’। সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক বলছে, ‘ও তাই, কিন্তু খেতে খেতে ভালই লাগছে’। এখানেই যুক্তি কিভাবে আসছে দেখা যায়, খেতে গিয়ে আর বিচার করছে না যে কি রকম স্বাদ লাগছে, জানে গিন্নীর সাথে ঝগড়া করা যাবে না।

আমরা মনে করছি, আমরা সবাই যুক্তিতে চলি, কিন্তু যুক্তিতে আমরা চলি না, আমরা চলি instinctive। যদি বিচার করা হয়, ‘তুমি মায়ের নামে এত কথা বললে, গিন্নীর নামে কেন বলছ না’? তখন বলবে, ‘ওরে বাবা, গিন্নীর রান্না নিয়ে কিছু বলা যাবে না, মা আপনজন, গিন্নীতো জ্বালামুখি, সব জায়গায় সবাইকে সব কথা বলা যায় না, সামলে সব কথা বলতে হয়’। যুক্তি, বিচার এগুলো পরে আসে। যে যত বড়ই চিন্তক হোক, যদি বলে আমি সব যুক্তি দিয়ে করি, ও মিথ্যাবাদীও না, মায়ার মহাজালে এমন ফেঁসে আছে যে, নিজে যে কত বড় আহাম্মক সেটাও জানে না যে সে কত বড় আহাম্মক। একটা প্রবাদ বাক্যে বলছে, দেবদূতরা যেখানে যেতে ভয় পায়, মুর্খরা সেখানেও ঝাঁপিয়ে পড়ে। এটা মানুষের স্বভাব। ঠিক তেমনি যারা যুক্তিবাদী তাদের এটারও বোঝার ক্ষমতা নেই যে, এরা নিজেরা যা কিছু করে কোনটাই যুক্তি দিয়ে করে না, সবটাই instinctএ করে। আমরা যে সব কাজ খুব ভেবে চিন্তে সব সময় করছি, তা কখনই না, সব কাজ আমরা instinctly করে যাচ্ছি, নূতন কোন পরিস্থিতি বা নূতন কোন কাজ এসে গেলে তখন একটু ভাবনা চিন্তা করি, বাকি সব কাজ instinctly হয়। স্বামীজী এটাই বলছেন, পরে যখন আমরা বিচার করতে বসি, তখন দেখি যে, তাই তো আমার করার পিছনে এই এই যুক্তি ছিল। কিন্তু যখন করছে, তখন ওই যুক্তিগুলো থাকে না, তখন সব instinctly খুব fast করে দিচ্ছে। এরপর স্বামীজী ভগবান বুদ্ধের উপর বলছেন।

ভগবান বুদ্ধ একজন মহান বৈদান্তিক

ভগবান বুদ্ধকে আমরা দশাবতারের মধ্যে নবম অবতার রূপে মানি। কারণ হিন্দুরা যখনই কোন বিরাট আধ্যাত্মিক পুরুষের আবির্ভাব দেখে, তারা তাঁকে অবতার রূপেই গণ্য করে। ভগবান বুদ্ধকে আমাদের ভাষায় বলা হয় সম্প্রদায় কর্তা। ভগবান বুদ্ধ যদি এভাবে এই নূতন সম্প্রদায় না নিয়ে আসতেন, তাহলে উনি একজন ঋষি হয়ে থাকতেন। উপনিষদে যেমন আমরা অনেক ঋষির নাম পাই, ভগবান বুদ্ধও সেই রকম উপনিষদের কোন এক ঋষি হতেন আর বেদান্ত পরম্পরার ঋষি হতেন, কারণ বৌদ্ধ ধর্ম একেবারে খাঁটি বেদান্ত। কিন্তু তিনি বেদ মানলেন না, বেদের সব দেবী-দেবতাদের উড়িয়ে দিলেন; যে কারণে অনেক হিন্দুরাও তাঁকে মানতে চাইলেন না। কিন্তু ভগবান বুদ্ধের কথাগুলো, দেবী-দেবতা মানবে না, ভগবান মানবে না, এগুলোকে যদি সরিয়ে দেওয়া হয় আর ভগবান বুদ্ধের বাকি সব কিছুকে যদি উপনিষদ বলে চালিয়ে দেওয়া হয়, তখন কারুর ক্ষমতাই হবে না যে তফাৎ করে বলতে পারবে, এটা উপনিষদ আর এটা উপনিষদ নয়। লেখার ভাষা ও তাঁর সিদ্ধান্তগুলি সামান্য একটু অন্য রকম হতে পারে, কিন্তু তাতেও যে কোন উপনিষদ যদি নেওয়া হয়, যেখানে নিজের উপর জোর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, যেখানে আত্মজ্ঞানের দিকে যাওয়ার জন্য বলা হয়, তা সে কঠোপনিষদেই দেখা হোক আর গীতাতেই দেখা হোক, দেখা যাবে ভগবান বুদ্ধও ঠিক একই জিনিস করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, ভগবান বুদ্ধের এই দিকটাকে বেশি হাইলাইট করা হয় না।

স্বামীজী কিন্তু বলছেন, Buddha was a great Vedantist (for Buddhism was really only an offshoot of Vedanta), and Shankara is often called a ‘hidden Buddhist’, (*বুদ্ধ একজন মহা বৈদান্তিক ছিলেন। কারণ বৌদ্ধধর্ম প্রকৃতপক্ষে বেদান্তের একটি শাখা মাত্র, আর শঙ্করকেও কখন কখন ‘প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ’ বলা হয়।*) শঙ্করাচার্যকে বলা হয় প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ, কারণ ভগবান বুদ্ধের কথাগুলো, বিশেষ করে যে কথাগুলো শূন্যবাদের দিকে নিয়ে যায়, এমনকি যেগুলো ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদের দিকে নিয়ে যায়, আর আচার্য শঙ্কর যেখানে অদ্বৈত বেদান্তকে নিয়ে যাচ্ছেন, দুটো যেন প্রায় এক হয়ে যায়। আগেও আমরা বলেছি, আচার্য শঙ্কর নূতন কিছু বলছেন না, তিনি উপনিষদেরই ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, গীতারই ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। তাহলে হঠাৎ কেন এই রকম বলছেন? এইজন্যই বলছেন, ঋষিরা যাঁরা বেদান্তের অনুশীলন করতেন, তাঁরা বনে, জঙ্গলে, পাহাড়ের কোন গুহায় সব কিছু করতেন। শঙ্করাচার্য সেটাকেই সারা ভারত ঘুরে ঘুরে প্রখর

যুক্তিতর্ক দিয়ে সাধারণের মধ্যে নামিয়ে আনলেন। যদিও আচার্য শঙ্কর বেদান্তকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার দিকে নিয়ে গেলেন না, অন্য দিকে স্বামীজী বেদান্তকে পুরোপুরি ব্যবহারিক করে দিলেন। কিন্তু বনের বেদান্তকে টেনে প্রথম শহরে নামিয়ে আনলেন শঙ্করাচার্য।

এখন শ্রাবণ মাস চলছে, বোল ব্যোম লোকেরা দলে দলে তারকেশ্বর চলেছে বাবার মাথায় জল ঢালতে। তাদের অনেকে যাওয়ার পথে বেলুড় মঠে সকালে ঠাকুরের মন্দিরে এসে বসে, ঠাকুরের কাছে নিজেদের ভাষায় মিষ্টি করে, করুণামাখা সুরে প্রার্থনা করে, হে ভগবান! আপনার দরবারে এলাম, আমার পরিবারের সবাইকে ভাল রাখবেন। সাধারণ মানুষের কাছে ধর্ম মানে এটাই। আমি আছি, পরিবার রূপে আমার যে বিস্তার, আমার যারা আপনজন আমার শরীর তারা, স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, বাবা, মা এরা সবাই তার শরীরেরই বিস্তার। মানুষ নিজেকে ছাড়া কাউকে তো ভালবাসে না, ভালবাসতে পারে না। যার মধ্যে সে নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পায়, তাকেই কেবল ভালবাসে। যার জন্য স্বামী স্ত্রী যদি নিজেদের এক মনে না করে, তাহলে দাম্পত্য জীবন কলহপূর্ণ হয়ে যায়। সন্তান যখন ঘর ছেড়ে অন্য কারুকে পাওয়ার জন্য বেরিয়ে যায়, সেও তখন মনে করছে এখানে আমার আমিত্ব নেই। যে দেশের মানুষ ভগবানের কাছে এসে প্রার্থনা করে, আমি যেন ভাল থাকি, আমার নিজের আপনজনরা যেন ভাল থাকে, সেই দেশের লোকেদের মাঝখানে এসে হঠাৎ শঙ্করাচার্য বলছেন, তুমিই সেই ব্রহ্ম। তার মানে, আমার যত রকম অন্যায়, পাপকর্ম সব আমার কাঁধে চেপে গেল, আর ভাল করার দায়ীত্ব আমার উপর এসে গেল। যে আমি এতদিন ভগবানকে একটা ডাস্টবিন বানিয়ে তাঁর মাথায় ঠাকুরের ইচ্ছা বলে আমার সব বাঁদরামো কাজ, পাপকর্ম চাপিয়ে দিচ্ছিলাম, শঙ্করাচার্য এসে সেই আমির উপর সব কিছু চাপিয়ে দিয়ে পুরনো সমস্ত ধ্যানধারণাকে দিলেন উড়িয়ে।

স্বামীজীর সময়ে ধর্ম ও সামাজিকতার ক্ষেত্রে দেশের পরিস্থিতি অনেক পাল্টে গিয়েছিল বলে ভারতবর্ষ তাঁকে গ্রহণ করলেন, কিন্তু শঙ্করাচার্যকে গ্রহণ করতে গিয়ে ভারতের দম বেরিয়ে গিয়েছিল। তার আরেকটা কারণ হল, শঙ্করাচার্যের সময় বিভিন্ন দর্শনের এত তাবড় তাবড় পণ্ডিতরা ছিলেন যে, তাঁরা কেউই শঙ্করাচার্যকে সহজে পথ ছেড়ে দিতে রাজী হলেন না। ওই অর্থে স্বামীজীর সময় কোন বাধা ছিল না, কিন্তু পাশ্চাত্য দর্শনের পণ্ডিতদের সংখ্যা ও প্রভাব অনেক বেড়ে গিয়েছিল। অন্য দিকে সংস্কৃতের পণ্ডিতরা নিজেদের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে ওর মধ্যেই সেঁদিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁদের কেউ যে স্বামীজীকে গিয়ে চ্যালেঞ্জ করবে সেই দুঃসাহস কারুর ছিল না, শঙ্করাচার্যের মত ওই রকম কোন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি স্বামীজীকে হতে হয়নি। স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব, প্রখর জ্ঞান, পাণ্ডিত্যের প্রখর ঔজ্জ্বলতায় এরা চাপা পরে গিয়েছিল। যাই হোক, হঠাৎ করে শঙ্করাচার্য এসে ওই রকম কথা বলা শুরু করতেই সব পণ্ডিতরা রে রে করে তেড়ে গেলেন, কেউ কেউ তাঁকে আবার গালাগাল দিতে শুরু করলেন। অনেক রকম গালাগালের মধ্যে একটা হল, শঙ্করাচার্য প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ।

আগে কয়েকবার আলোচনা করা হয়েছে, সংক্ষেপে আবার বলে নেওয়া হচ্ছে, ভগবান বুদ্ধ বেদ মানতেন না, বেদ না মানলে সে হিন্দু হবে না। অথচ ভগবান বুদ্ধকে হিন্দুরা নবম অবতার বলছে। কারণ হিন্দুদের স্বভাবই হল, যাঁরাই আধ্যাত্মিকতায় একজন বিরাট মহাত্মা, তাঁকেই হিন্দুরা বলবে, এনার মধ্যে ভগবানের বিশেষ প্রকাশ। কিন্তু তিনি বেদের বিরোধী, তাহলে কি করে গ্রহণ করা হবে? তখন বলা হতে লাগল যে, রামায়ণ মহাভারতের সময় যে অসুরগুলো মারা গিয়েছিল, তারা সবাই আবার মানুষ রূপে জন্ম নিয়ে আমাদের মধ্যেই বিচরণ করছে, কিন্তু তাদের চিহ্নিত করা যাচ্ছে না। তখন ভগবান বুদ্ধ এসে সব অসুরগুলিকে একটা ভুলভাল ধর্ম শিখিয়ে তাদেরকে হিন্দু ধর্ম থেকে টেনে বার করে বিনাশের দিকে নিয়ে চলে গেলেন। এইভাবে ভগবান বুদ্ধ হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করলেন। হিন্দুরা বৌদ্ধ ধর্মকে কখনই বলবে না যে, এটা ঠিক ধর্ম, বলবে, বুদ্ধ এই জন্যই অবতার, কারণ তিনি অসুরগুলিকে হিন্দুধর্ম থেকে টেনে বৌদ্ধ ধর্মে নিয়ে গিয়ে হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করলেন। এই যে একটা বিচিত্র ধারণা, যেখানে ভগবান বুদ্ধকে অবতার বলা হচ্ছে, কিন্তু তাঁর ধর্মকে মানছে না; আর তাই না, ওই আঘাতটা এত জোর লেগেছে যে, শঙ্করাচার্য যখন অদ্বৈত বেদান্তের কথা বলতে শুরু করলেন, তখন তাঁকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলে হিন্দুদের থেকে সরিয়ে দিচ্ছে।

স্বামীজী বলছেন, Buddha made the analysis, Shankara made the synthesis out of it, (*বুদ্ধ বিশ্লেষণ করেছিলেন, শঙ্কর সেইগুলি সংশ্লেষণ বা সমন্বয় করলেন।*) ধর্ম যখন চলে তখন দুটো পথে

চলে –একটা নেতি নেতি, আরেকটা ইতি ইতি। ভগবান বুদ্ধ নেতি নেতি করে সব কিছুকে কেটে বাদ দিয়ে দিলেন। সব কিছু বাদ দিয়ে দেওয়ার পর শেষে দেখা গেল কিছুই নেই। ঠাকুর যেমন পেঁয়াজের খোসা ছাড়াবার কথা বলছেন, পেঁয়াজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে দেখা যাবে শেষে কিছুই নেই। ভগবান বুদ্ধ ওই জায়গাতে নিয়ে গেলেন। শঙ্করাচার্য ওই জিনিসটাকেই synthesisএ নিয়ে এলেন, *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*, যা কিছু আছে, সবই ব্রহ্ম। আমরা যদি গভীরে যাই, তাহলে দেখতে পাবো যে, ভগবান বুদ্ধের যে দৃষ্টিভঙ্গী আর শঙ্করাচার্যের যে দৃষ্টিভঙ্গী, দুটোর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। একজন বিশ্লেষণ করে করে এগোচ্ছেন, আরেকজন সমন্বয় করে করে এগোচ্ছেন। সেইজন্য আচার্য শঙ্কর যা কিছু দেখছেন, সবটাই তাঁর কাছে সেই ব্রহ্মেরই প্রকাশ। ভগবান বুদ্ধের কাছে যা কিছু আছে সবটাকেই নেগেট করে দেওয়া হচ্ছে, এটা বেদান্তের নেতি নেতি মার্গ। ভগবান বুদ্ধ সমস্ত কিছু মিথ্যা বলে বলে অহং ব্রহ্মাস্মিতে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিলেন, তাঁর ভাষায় বলছেন, আত্মদীপো ভব, তুমি নিজের জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হও। তার মানে ভগবান বুদ্ধ, বেদকে কেটে বাদ দিলেন, দেবতাদের ফেলে দিলেন, ভগবানকে বাদ দিয়ে দিলেন, সব কিছুকে ফেলতে ফেলতে যে জায়গাতে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে সেটাই থাকল।

আচার্য শঙ্কর কোন কিছুই ফেলে দেননি, তিনি সব কিছুকে নিয়েই চলেছিলেন, ব্যাসদেবও সবটাই নিয়েছেন, ঠাকুরও কোনটাই ফেলে দেননি। ব্যাসদেব, শঙ্করাচার্য, ঠাকুর তিনজনই বেদকে পুরো মেনে চলেছেন, দেবী দেবতাদের মানছেন, ঈশ্বরকে তো পুরোদমে মানছেন। ঠাকুর তো আরও এগিয়ে, টিকিটিকি, হাঁচি সব কিছু মানছেন। শ্রীশ্রীমা বলছেন, বাবা, তিনি তো আর ভাঙতে আসেননি, গড়তে এসেছেন। ভগবান বুদ্ধ তা না, তিনি সব কিছু ভেঙে দিলেন। তাহলে কে ঠিক? দুজনই ঠিক, আমার আপনার মানসিকতা কি রকম, সেই অনুসারে বিচার করলে এক একজনের কাছে এক-এক রকম মনে হবে। সন্ন্যাসী যখন চলে, তখন সে ঠিক বুদ্ধের মত চলে, সন্ন্যাসী কিন্তু শঙ্করাচার্যের মত চলে না। সন্ন্যাসী সব কিছু ভেঙে বেরিয়ে যায়। ঠাকুর তাই শঙ্করাচার্যকে অবতার বলছেন, অবতার কখনই কিছু ভেঙে নিয়ে যাবেন না, উনি synthesise করেন। Synthesise মানেই তাই, সবটাকে নিয়ে চলা। বুদ্ধের পথ আলাদা। দুজনেই ঠিক, আমাকে ঠিক করতে হবে, আমি কি চাইছি। হিন্দু ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে শঙ্করাচার্য ঠিক। কিন্তু হিন্দু ধর্মের যাঁরা কট্টর বেদান্তী, ঈশ্বর ছাড়া আমার আর কিছু লাগবে না, এই ভাব নিয়ে ঠাকুর যখন সাধনা করছেন, তখন তিনি কিন্তু শঙ্করাচার্যের পথের নন, ভগবান বুদ্ধের পথের, তিনি সব ফেলে দিয়েছিলেন।

স্বামীজী আবার বলছেন, Buddha never bowed down to anything, neither Veda, nor caste, nor priest, nor custom. He fearlessly reasoned so far as reason could take him. (*বুদ্ধ কখনও কারও কাছে মাথা নোয়াননি; বেদ, জাতিভেদ, পুরোহিত বা সামাজিক প্রথা –কারও কাছে নয়।*) ভগবান বুদ্ধ কোন কিছুর কাছে মাথা নত করবেন না, তা বেদই হোক, জাতিভেদ হোক, পুরোহিত ব্রাহ্মণ হোক, এর সাথে তিনি কোন কিছুর সাহায্য বা সম্বল নেবেন না। শ্রী জে কৃষ্ণমূর্তির কথা এর আগে একবার উল্লেখ করা হয়েছিল, বেদে-টেদ সব কিছুকে ভগবান বুদ্ধ আগেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন, তাই কৃষ্ণমূর্তির জন্য আর কিছু বাকি থাকল না। উনি কি ওড়াবেন? সেইজন্য তিনি বেছে বেছে গুরুবাদকে উড়িয়ে দিলেন। কৃষ্ণমূর্তি বলেই দিলেন যে, গুরুর কথা নেওয়ার দরকার নেই। কিন্তু কৃষ্ণমূর্তি ভুলে গেলেন, তাঁর অনুগামীরা ওনার কথাকে পুরো মেনে নিয়েই চলছে। একবার উনি এক জায়গায় গেছেন, সেখানে অনেক লোকের সমাগম হয়েছে। সেখানে কৃষ্ণমূর্তিকে বলা হল, These people are your admirer। তখন কৃষ্ণমূর্তি বলছেন, It means that they have not understood me। তুমি যদি আমার ভক্ত হও, তার মানে তুমি আমাকে কিছু বোঝনি। কৃষ্ণমূর্তি গুরুবাদ মানতেন না, কারুর কথা কেউ মানবে, কেউ কারুর গুরু হবে, কারুর কথায় কারুর সত্যিকারের ভাল হতে পারে, উনি মানতেন না।

ভগবান বুদ্ধকে নিয়ে স্বামীজী বলছেন, He fearlessly reasoned so far as reason could take him. Such fearless search for truth and such love for every living thing the world has never seen. (*যতদূর পর্যন্ত যুক্তিবিচার চলতে পারে, ততদূর নির্ভীক ভাবে তিনি যুক্তিবিচার করে গেছেন। এরূপ নির্ভীক সত্যানুসন্ধান, আবার সকল প্রাণীর প্রতি এমন ভালবাসা –জগতে কেউ কখনও*

দেখেনি।) ভগবান বুদ্ধের মত এই রকম একজন ব্যক্তিত্ব যিনি সত্যের কাছে পৌঁছানর নিরন্তর সমস্ত রকম চেষ্টা করে যাচ্ছেন, আবার অন্য দিকে সমস্ত প্রানীর প্রতি ভালবাসার আবিলতা, বিশ্ব আগে দেখেনি। বৌদ্ধ ধর্মকে যদি আমরা গভীর ভাবে কাছ থেকে দেখি, দেখতে পাবো কিভাবে সব কিছুকে তিনি কেটে কেটে বাদ দিয়ে দিচ্ছেন। বাদ দিয়ে দিয়ে শেষে কিন্তু একটা জায়গায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, সেটা হল 'আমি'। আমি, আপনি যে সত্য, এই জায়গাটাকে উনি নেগেট করছেন না, আবার ওটাকে হ্যাঁও করছেন না। ঠিকই, একটা জিনিস যদি না থাকে আর বাকি সব জিনিসকে বাদ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, সেই জিনিসটা না থাকলে তো এই কথা হয় না। কিন্তু বাদ দিচ্ছেন মানে এই নয় যে, আমি বলছি বলে বাদ দিয়ে দেওয়া, যেমনি বিচার করতে শুরু করা হবে, তখন অন্য রকম মনে হবে। ঠাকুর অনেকবার বলছেন, আচ্ছা বিচার করে দেখ তুমি কে? যেমন শঙ্করাচার্য বলছেন, *মনোবুদ্ধ্যহংচিত্তানি নাহং*, আমি মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার নয়, ভগবান বুদ্ধ এই জিনিসটাকে অন্য ভাবে নিয়ে গেছেন।

তার সাথে বলছেন, Buddha was the Washington of the religious world; (*বুদ্ধ যেন ধর্ম-জগতের ওয়াশিংটন ছিলেন।*) স্বামীজী জর্জ ওয়াশিংটনের কথা বলছেন। প্রথমের দিকে আমেরিকাতে বৃটেন থেকেই লোকেরা গিয়েছিল, আমেরিকা বৃটেনের কলোনি ছিল। খবর ছড়িয়ে যাওয়ার পর আশেপাশের দেশের লোকেরাও আমেরিকাতে যেতে শুরু করে। এইভাবে জার্মান থেকে, ফ্রান্স থেকে এবং আরও অনেক দেশের অনেক ধরণের লোকেরা গেছে; কিন্তু মূল নিয়ন্ত্রণ ছিল বৃটিশদের হাতে। পরে ধীরে ধীরে ওদের একটা স্বাতন্ত্রতা চলে আসে, নিজস্ব পরিচয় শুরু হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে ওরা দেখছে, এই দেশটা আমাদের কিন্তু বৃটিশরা আমাদের লুট করছে। যারা মনে করছে তারাও এক সময় তাদের ঠাকুর্দার আমলে ইংরেজ ছিল, যদিও অন্যান্য দেশ থেকেও প্রচুর লোকেরা এসেছিল। এমনকি যখন আমেরিকার রাষ্ট্রভাষা কি হবে এই নিয়ে ভোটাভুটি হল, তখন জার্মান ভাষা অল্প কয়েকটা ভোটে হেরে গেল। তখন যদি জার্মান ভাষা জিতে যেত, তাহলে আজকে বিশ্বের ইতিহাস অন্য রকম হয়ে যেত। যাই হোক, সেই সময় জর্জ ওয়াশিংটন হয়ে গেলেন ওদের বিখ্যাত নেতা। তাদের কাছে অস্ত্র নেই, কিছু নেই, কিন্তু তাও জর্জ ওয়াশিংটন তাঁর ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের ক্ষমতা দিয়ে সবাইকে এক কাট্টা করে দিলেন। তিনি ছিলেন সত্যিকারের একজন নেতা, অথচ তিনি একজন সাধারণ মানুষ ছিলেন। জর্জ ওয়াশিংটন আর এ্যব্রাহম লিঙ্কন এই দুজন ছিলেন আমেরিকার মহান নেতা, যাঁরা আমেরিকাকে একত্রিত করেছিলেন। জর্জ ওয়াশিংটন অনেক লড়াই চালিয়ে শেষে বৃটিশকে আমেরিকার উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ সরিয়ে নিতে বাধ্য করলেন এবং শেষ পর্যন্ত বৃটিশরা আমেরিকা ছাড়তে বাধ্য হল।

আমরা সাধারণ ভাবে মনে করি, যাঁরা এ-ভাবে জয়ী হন তাঁরাই রাজা হয়ে বসে যান, জর্জ ওয়াশিংটন কিন্তু তা করলেন না। তিনি ওই রকম গেঁয়ো আনপোর লোকদের নিয়ে লড়াই করলেন এবং জয়ী হলেন, জয়ী হওয়ার পর তিনি ক্ষমতা নিজের কাছে না রেখে ছেড়ে দিলেন। স্বামীজী বলছেন, he conquered a throne only to give it to the world, as Washington did to the American people. He sought nothing for himself. (*তিনি সিংহাসন জয় করেছিলেন শুধু জগৎকে দেবার জন্য, যেমন ওয়াশিংটন মার্কিন-জাতির জন্য করেছিলেন। তিনি নিজের জন্য কিছুর আকাঙ্খা করতেন না।*) ভগবান বুদ্ধ বোধিবৃক্ষের নীচে জ্ঞান লাভের কাছাকাছি চলে এসেছেন, তখন মাড় অর্থাৎ প্রলোভন এসে তাঁকে বোঝাচ্ছে, 'তোমার তো জ্ঞান হয়ে গেল, তুমি কেন আর শিক্ষা দিতে যাচ্ছ? যারা মুক্তির জন্য প্রস্তুত, তাদের এমনিতেই মুক্তি হয়ে যাবে, যারা বন্ধনে আছে, তারা তোমার কথা শুনবে না'। মাড় অনেক দিন ধরে, অনেক ভাবে প্রলোভন দেখিয়ে তাঁকে ফাঁসানোর চেষ্টা করে যাচ্ছিল, কিন্তু ভগবান বুদ্ধকে কিছুতেই বাঁধতে পারছিল না। কিন্তু এখানেই ভগবান বুদ্ধের মধ্যে একটু দুর্বলতা এসে গেল, তাঁর মনে হল, 'ঠিকই তো বলছে, জগৎ তো এই রকমই, যারা মুক্তির পথে আছে তারা মুক্ত হয়ে যাবে, যাদের জ্ঞানের আলো আছে তাদের আছে, যাদের নেই তাদের নেই'। ভগবান বুদ্ধ ওখানেই আটকা পড়ে যাচ্ছিলেন।

জ্ঞানী আর অবতারের মধ্যে, একজন সন্ত মহাত্মা আর অবতারে মধ্যে এটাই তফাৎ। ঠাকুর এরই উপমা দিচ্ছেন, বাহাদুরী কাঠ আর সাধারণ কাঠ। সাধারণ পচা কাঠ কোন রকমে ভেসে ভেসে চলে যায়, একটা কাকও যদি ওই কাঠে এসে বসে, কাঠ ডুবে যাবে। বাহাদুরী কাঠ নিজেও ভেসে যাবে সাথে আরও

দশজনকেও নিয়ে চলে যাবে। অবতাররা হলেন এই বাহাদুরী কাঠ, আর সাধু, মহাত্মা এনারা হলেন সাধারণ কাঠ। কিন্তু ভেসে যাবে সবাই। জলের ধারা যেদিকে নিয়ে যাচ্ছে তাতে বাহাদুরী কাঠও যাবে, সাধারণ কাঠও যাবে। তফাৎ হল, বাহাদুরী কাঠ অনেককে নিয়ে যেতে পারবে, সাধারণ কাঠ পারবে না। সাধারণ ভাবে দেখা যায়, সন্ত মহাত্মারা সাধারণ কাঠ, কোন রকমে নিজে ভেসে চলে যাবেন। ভগবান বুদ্ধ ঠিক সেটাই হতে যাচ্ছিলেন। তখনই তাঁর মধ্যে করুণার উদয় হল। জগতের প্রতি করুণা, আহা এরা সবাই অজ্ঞানে পরে আছে। ঠাকুর যেমন শ্রীশ্রীমাকে বলছেন, তোমাকে থাকতে হবে লোকেদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য। মা বলছেন, আমি মেয়ে মানুষ, আমি পারবো না। ঠাকুর বলছেন, মানুষগুলো অজ্ঞান অন্ধকারে পরে আছে, তুমি পারবে না মানে! এটা হল করুণা, অবতাররা যা কিছু করেন, করুণার বশবর্তী হয়ে করেন।

ভগবান বুদ্ধ এবার শিক্ষা দিতে এগিয়ে গেলেন। শিক্ষা দিতে গিয়ে তিনি কোন কিছু লুকিয়ে রাখলেন না। ঠাকুর এর খুব সুন্দর উপমা দিচ্ছেন, কেউ আম খেয়ে লুকিয়ে মুখ মুছে নেয়, তাদের আম খাওয়া হয়ে গেল, সন্তুষ্ট হয়ে গেল। কেউ আবার আম পেলে পাঁচজনকে দিয়ে খায়। ভগবান বুদ্ধের মহত্তকে বোঝানর জন্য স্বামীজী আমেরিকান ভক্তদের কাছে ওয়াশিংটনের সাথে তুলনা করছেন, একটা দেশকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ওয়াশিংটন যেভাবে নেতৃত্ব দিয়ে লড়াই করলেন, ভগবান বুদ্ধও সেভাবেই করলেন। এটা কিন্তু শুধু ভগবান বুদ্ধের ক্ষেত্রেই নয়, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণের যে জীবনী, মিথলজিতে হারিয়ে গেছে বলে আমরা জানি না, কিন্তু যেমন আমরা ঠাকুরকে দেখছি, ঠাকুরও একই জিনিস করলেন, চৈতন্য মহাপ্রভুও একই জিনিস করলেন। কিন্তু সচারচর সন্ত মহাত্মারা এটা পারেন না। যাই হোক ১৯শে জুলাই শুক্রবার, ১৮৯৫ সালে একটা প্রসঙ্গে যেখানে ভগবান বুদ্ধের কথা এসেছিল, সেখানে স্বামীজী এই জিনিসটা আলোচনা করলেন। এরপর স্বামীজী শনিবার ২০শে জুলাই ক্লাশে বক্তব্য রাখবেন।

<u>শনিবার, ২০শে জুলাই</u>

ধর্ম বা জ্ঞান মানে প্রত্যক্ষানুভূতি

১৯শে জুলাই স্বামীজী ভগবান বুদ্ধ এবং বেদান্তের কি সম্পর্কে বললেন। আজ স্বামীজী ধর্মকে নিয়ে বলছেন। Perception is our only real knowledge or religion. (*প্রত্যক্ষানুভূতিই যথার্থ জ্ঞান বা যথার্থ ধর্ম।*) আমাদের মধ্যে ধর্ম সম্বন্ধে একটা প্রচলিত কথা হল, ধর্ম মানে বিশ্বাস। মানুষের কাছে প্রমাণ বলতে একটাই, সত্য বলতে একটাই, তা হল, আমি যদি অনুভব করি। আমরা প্রায়শই কথায় কথায় চাক্ষুস প্রমাণের কথা বলি, চাক্ষুস প্রমাণ না, যেটা প্রত্যক্ষ করেছি (স্বামীজী বলছেন perception) সেটাই আমাদের কাছে প্রমাণ। ধর্মের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই, যদি প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে তবেই প্রমাণ, তা নাহলে প্রমাণ নয়। যদি কেউ বলে ঠাকুরের ইচ্ছায় সব হচ্ছে, তাহলে বুঝতে হবে সে ধাপ্পা মারছে। যদি কেউ বলে ঠাকুর সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করছেন, তাহলেও বুঝতে হবে সে ধাপ্পা মারছে। যে এই কথা বলছে, সে কি দেখেছে যে ঠাকুর সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করছেন? ঠাকুর কি তাকে এসে বলে গেছেন যে, আমার ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে? যদি না বলে থাকেন, তাহলে সে নিজেকেও বোকা বানাচ্ছে, অপরকেও বোকা বানাচ্ছে। সবাই এসে বলছে, আমার ধর্মগ্রন্থে এই এই কথা বলেছে, আরেকজন এসে বলছে, আমার ধর্মগ্রন্থ বলছে, যে আমার কথা মানে না তার গলা কেটে দাও। এভাবে ধর্ম হয় না, ধর্ম মানে প্রত্যক্ষ।

কি রকম প্রত্যক্ষ? শঙ্করাচার্য এই কথা খুব ব্যবহার করতেন, *হস্তামলকবৎ*। হাতে যদি আমলকি থাকে, সেটার আর কোন প্রমাণ লাগে না, আমার হাতেই তো আছে, আমার আর কোন প্রমাণ লাগবে না। ধর্ম বা জ্ঞানও তাই, যদি প্রত্যক্ষ হয় তবেই ওটা সত্য, বাকি কোন কিছুর কোন দাম নেই। প্রত্যেকটি ধর্মে দেখা যায়, যিনি খেটেখুটে ধর্মকে প্রত্যক্ষ করেছেন, তার জীবনটা পুরো অন্য রকম হয়ে গেছে। তিনি যখন কথাগুলো বলছেন, যারা শুনছে তারা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনতে থাকে, তার পায়ে এসে লুটিয়ে পড়ছে। কিছু মানুষ তাঁরা বিরোধিতা করছে ঠিকই, কিন্তু তাতে তাঁর কিছু আসে যায় না। কারণ সেই অমৃতকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। কথামৃতের পাতায় পাতায় ঠাকুর বার বার করে বলছেন, অত বিচার করে কি হবে, অত বই পড়ে কি হবে। বলার পর ঈশ্বরের ভাব কত ভাবে হয় তার আলোচনা করে বলছেন, তাঁর সাথে আলাপ যদি নাই হয়, কথা

নাই যদি বলা হল, তাহলে আর হলটা কি! কেউ যদি বলে ধ্যানের গভীরে আমি ঠাকুরের দর্শন পেয়েছি, এগুলোর কোন দাম নেই। ঠাকুরের প্রত্যক্ষ যখন হবে, যেখানে তিনি স্পর্শ করছেন, কথা বলছেন, তবেই সেটা সত্য হবে, বাকি আর কিছু সত্য না। এর বাইরে আমরা যা কিছু বলছি সবই শব্দ মাত্র, যার কোন দাম নেই। পুরো এই জিনিসটার উপরেই স্বামীজী এখন বলতে যাচ্ছেন।

Talking about it for ages will never make us know our soul. (*অনন্ত যুগ ধরে আমরা ধর্ম সম্বন্ধে যদি কেবল কথা বলে যাই তাতে কখনই আমাদের আত্মজ্ঞান হতে পারে না।*) জুহুদিদের ধর্ম, পার্সিদের ধর্ম আর হিন্দুদের ধর্ম, এই তিনটে ধর্ম একটা দলকে লাগিয়ে দিল ধর্মকে রক্ষা করার জন্য। তারা ধর্মকে রক্ষা করবে, ধর্মকে লোকেদের কাছে ব্যাখ্যা করবে, জরুষ্ট্রিয়ানদের সেইজন্য priest রয়েছে, আর জিউসদেরও priest ছিল আর হিন্দুদের এই কাজ করত ব্রাহ্মণরা। হিন্দুদের ব্রাহ্মণদের সাথে ওদের অনেক তফাৎ আছে। ব্রাহ্মণরা বংশ পরম্পরায় ওই বিদ্যার জন্য নিজেদের উৎসর্গিকৃত করে দিয়েছিল। সমস্যা হল, ধর্ম পুরোপুরি চলে প্রত্যক্ষ, ব্রাহ্মণ জাতিদের বলে দেওয়া হল, এই যেগুলো প্রত্যক্ষ হয়েছে, সেগুলোকে ধরে রাখ। যারা মাঝামাঝারি, যাঁদের প্রত্যক্ষ হয়নি, কিন্তু অন্যদিকে এনারা যে পুরোপুরি জাগতিক বিষয়ে লিপ্ত হয়ে আছেন, তাও না। এনারাও একই জিনিসকে ব্যাখ্যা করতে শুরু করে দিলেন। অন্ধ যেমন হাতির বর্ণনা করে, যে কোন পণ্ডিত যখন ধর্মের ব্যাখ্যা করেন, এনারাও ঠিক সে-ভাবেই করেন। প্রত্যক্ষ যতক্ষণ না করা হয়, ততক্ষণ যেটাই তাঁরা বলুক না কেন, কোনটাই কিছু নয়, অন্ধের হস্তি দর্শনের মত। সারা জীবন ধর্মের কথা নিয়ে আমরা তর্কের পর তর্ক করে যেতে পারি, কিন্তু কিছুই হবে না তাতে। রোদে যদি এক হাড়ি জল রেখে দেওয়া হয়, আর হাজার হাজার বছর যদি রেখে দেওয়া হয়, জল কোন দিন টগবগ করে ফুটবে না; ওতে চাল দিয়ে দিলে কোন দিন সেই চাল ভাত হবে না। কিন্তু ওই জলকে প্রেসার কুকারে দিয়ে চাল দিয়ে ওভেনে চাপিয়ে দিলে পাঁচ মিনিটের মধ্যে ভাত হয়ে যাবে।

ধর্ম মানেই, চালকে ভাত বানাতে হবে। ধর্মকে নিয়ে আলোচনা করে যাওয়া মানে, রোদের মধ্যে জল রেখে দেওয়া। যেমনি একটু গরম হতে শুরু হল, আমরা খুব খুশি হয়ে যাচ্ছি, এই তো গরম হচ্ছে, আরও গরম হয়ে গেছে। জল ফুটছে কি? এক্ষুণি ফুটবে। কিন্তু চাল দিয়ে দিলে সেই চাল আর ভাত হচ্ছে না। চাল দিয়ে বসে থাকো, বছরের পর বছর বসে থাকো, তুমি আর এগোবে না। ধর্মকে যতক্ষণ প্রত্যক্ষ চেষ্টা না করা হয়, ততক্ষণ ধর্ম কোন কাজে আসবে না। ধর্মের যত রকম উপাচার আছে, সব উপাচার করে গেলেও ধর্ম লাভের পক্ষে কিছুই হবে না। উপাচার মানে, তুলসি পাতা খাওয়া, মন্দিরে যাওয়া, গঙ্গা স্নান করা, তীর্থ করা, এগুলো হল সেই সূর্যের তাপ। স্বামীজীও এই কথাই বলছেন, এভাবে আমরা যদি অনন্ত কাল ধরে করে যেতে থাকি আমাদের কিছুই হবে না। সবাই প্রত্যক্ষ করার কথা বলে যাচ্ছেন, কথামৃতে ঠাকুর পাতায় পাতায় এই কথা বলতে গিয়ে ছটফট করছেন, শঙ্করাচার্য গীতার ভাষ্যে বার বার বলছেন, শাস্ত্রের কোন আলস্য নেই, শাস্ত্র হল মায়ের মত, আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন কিভাবে মানুষকে উপরে নিয়ে আসবেন। আমরা যে উপরে উঠছি না তা নয়, সূর্যের তাপে আমরা গরম হচ্ছি ঠিকই, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে দেখা যাচ্ছে যে আমরা ওই তাপ নিতে পারছি না, যতক্ষণ তাপ, ততক্ষণই তাপ, সন্ধ্যে হয়ে গেলে সব তাপ শেষ। আগুনের সাথে সকাল কিংবা সন্ধ্যের কোন সম্পর্ক নেই, সেকেণ্ডের মধ্যে জল ফুটন্ত অবস্থায় চলে যাবে।

আস্তিকের তুলনায় নাস্তিক অনেক খাঁটি

There is no difference between theories and atheism. In fact, the atheist is the truer man. (*কেবল মতবাদে বিশ্বাসী হওয়া ও নাস্তিকতায় কিছু তফাৎ নেই। মানুষ-হিসাবে এই দুয়ের মধ্যে নাস্তিকই বেশী খাঁটি।*) স্বামীজীর এই কথাগুলি সত্যিই লাখ টাকার কথা। Theism মানে শাস্ত্রে বিশ্বাস থাকা, atheism মানে শাস্ত্রে বিশ্বাস না থাকা। আমাদের এখানে বলা হয় আস্তিক আর নাস্তিক। কিন্তু এখানে এই দুটো শব্দকে নিয়ে অনেক জটিলতা তৈরী হয়। কারণ ভারতবর্ষে আস্তিক দর্শন ও নাস্তিক দর্শন এই দু-রকম দর্শনের কথা বলা হয়; তাতে আস্তিক দর্শন মানে, যে দর্শন বেদকে শেষ কথা বলে মানে, আর নাস্তিক দর্শন মানে যে দর্শন বেদকে মানে না। সেদিক থেকে বৌদ্ধ, জৈন, ইসলাম, খ্রীষ্টান সব ধর্মই নাস্তিক ধর্ম, কারণ এরা কেউই বেদকে মানে না। ইংরাজীতে আস্তিক আর নাস্তিক হয়ে যায় theism মানে বিশ্বাসী আর

atheism মানে নাস্তিক। পাশ্চাত্যে বাইবেলের বিশ্বাসীকে নিয়ে কিছু না, তাদের কাছে বাইবেল যে মানে না সে গোল্লায় গেল। Theism মানে যে বাইবেলকে বিশ্বাস করে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক শব্দের অর্থ পাল্টে যায়, theism শব্দের অর্থও ধীরে ধীরে 'বাইবেলকে যে বিশ্বাস করে' থেকে ধীরে ধীরে হয়ে গেল যার ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে। ঈশ্বর বিশ্বাসীর অর্থে নিয়ে গেলে আমাদের আস্তিক দর্শনের শাব্দিক অর্থের সাথে মিলবে না। কারণ আমাদের বেশ কয়েকটি দর্শন আছে যাঁরা ঈশ্বরকে মানেন না। যেমন কর্মকাণ্ড, এত নামকরা দর্শন, ঈশ্বরকে মানে না, সাংখ্য, যোগ এরাও ঈশ্বরকে মানে না।

এখানে স্বামীজী যে আস্তিক নাস্তিকের কথা বলছেন, তিনি পাশ্চাত্যের অর্থেই আস্তিক নাস্তিক বলছেন। ঈশ্বরে যার বিশ্বাস নেই মানে, ঈশ্বর, ধর্ম, পরলোক সব মিলিয়ে বলা। স্বামীজী বলছেন, একজন সত্যিকারের নাস্তিক মানুষ একজন আস্তিক মানুষ, যাঁরা অনেক থিয়োরি নিয়ে আসেন, তাঁদের থেকে অনেক খাঁটি। আমরা হলাম সেই ধরণের আস্তিক, যারা ধর্মের থিয়োরি দাঁড় করিয়ে যাচ্ছি। কি রকম থিয়োরি? ঠাকুর আছেন, ঠাকুর দেখবেনই দেখবেন। মঠের একজন পরিচিত ভক্ত ছিলেন, তিনি বড় এক কোম্পানির ম্যানেজার। ভদ্রলোকের ভাই মৃত্যুশয্যায় চলে গেছেন। ভাইয়ের বেশি বয়স নয়, চল্লিশের কাছাকাছি। ভাইয়ের একটা ছোট বাচ্চা, স্ত্রী খুব কান্নাকাটি করছে। ভদ্রলোকের ঈশ্বরে বিরাট বিশ্বাস। তিনি খুব জোর দিয়ে বলে যাচ্ছেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভাই ঠিক বেঁচে উঠবে, তোমরা দুশ্চিন্তা করো না, ভাই ঠিক হয়ে যাবে, ওর কিছু হবে না। ভদ্রলোক খুব চেঁচিয়ে বলে যাচ্ছেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ভাই মারা যায়। ভাই মারা যাওয়াতে ভদ্রলোকের ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসে জোর একটা ধাক্কা লেগেছে। এমন ধাক্কা লেগেছে যে, ভদ্রলোক একেবারে ভেঙে পড়েছেন। ভাই মারা যাওয়ার কিছু দিন পর এক মহারাজের কাছে খুব দুঃখ করে তাঁর নিজের অবস্থার কথা বলছেন, 'আমার এত বিশ্বাস, কিন্তু কি হয়ে গেল'! মহারাজ তাঁকে বললেন, 'আপনাকে কে বলেছে যে উনি বেঁচে উঠবেন, আর আপনি হঠাৎ বলতে শুরু করলেন ও বেঁচে উঠবে? আপনি ভগবান যীশু নন যে, যীশু বললেন আর ল্যাজারাস উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল'।

ঈশ্বরের ব্যাপারে উপনিষদের মূল ভাব হল, সূর্যের আলোর মত। ঠাকুর আরও সহজ করে বলছেন, প্রদীপের আলোতে কেউ টাকা জাল করছে, কেউ ভাগবত পড়ছে, তার জন্য প্রদীপকে কোন দিন দোষ দেওয়া যাবে না। ইদানিং কালে চারিদিকে সবাই যে হারে এর ওর নামে নানান ধরণের কেস ঠুকে দিচ্ছে, দেখা যাবে এটাকে নিয়েই কেউ একদিন কেস ঠুকে দিয়ে বলবে, এই লোকটা ঘরে দরজা বন্ধ করে আলো জ্বালিয়ে টাকা জাল করছিল, এই লাইটের আলো সিইএসসি সাপ্লাই করেছিল, তাই এই টাকা জালের জন্য সিইএসসি দায়ী, বলে সিইএসসির নামে একটা কেস ঠুকে দিল। আরেক জায়গায় এক চোর একটা টর্চ নিয়ে চুরি করতে ঢুকেছিল, সেইজন্য ওই টর্চ যে কোম্পানি বানিয়েছে, সেই কোম্পানির সিইওর নামে একটা কেস ঠুকে দেওয়া হল। তোমার কোম্পানি এই টর্চ বানিয়েছ, সেই টর্চের আলোর সাহায্যে চুরি হয়েছে। দেশ জুড়ে যা হচ্ছে, এই ধরণের কেস হওয়াটা বিচিত্র কিছু না। কিন্তু আমরা জানি টর্চ অন্ধকারে আমাদের পথ দেখায়। একজন ভাল মানুষ অন্ধকারে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে, টর্চ তার আলো দিয়ে তাকে ঠিক পথে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। যে চোর রাতের অন্ধকারে চুরি করতে যাচ্ছে, সেও এই টর্চের আলোর ভরসাতেই চুরি করতে এগিয়ে যায়। এই চুরির সাথে আলোর কোন সম্পর্ক নেই, টর্চের কোন সম্পর্ক নেই, টর্চ যে কোম্পানি বানিয়েছে, তারও কোন সম্পর্ক নেই। বন্দুক তৈরী হয়েছে আত্মরক্ষার জন্য, সেই বন্দুক দিয়ে কেউ আত্মরক্ষার কাজে লাগায়, কেউ আবার মানুষ খুন করে, তাতে বন্দুকের কোন দোষ নেই। অথচ বন্দুকের নাম শুনলেই আমরা ঘাবড়ে যাই।

ঈশ্বরের আলো দিব্য আলো। আর সবটাই ঈশ্বরের, ব্রহ্মলোকটাও ঈশ্বরের, পৃথিবী লোকটাও ঈশ্বরের, স্বর্গলোকটাও ঈশ্বরের, পাতালও ঈশ্বরের, প্রেতলোকও ঈশ্বরের, নরকটাও ঈশ্বরের; তুমি কোনটা চাইছ ঠিক কর। তুমি যদি বল নরকটাও তো ঈশ্বরের, আমি নরকেই থাকব, কোন আপত্তি নেই। কিন্তু তুমি বলছ, আমি নরকে থাকতে চাই না। একটা বড় বাড়ি আছে, যে বাড়িটা মায়ের নামে। বাড়ির যে ঘরেই থাকুক, মায়ের ঘরেই থাকছে। মায়ের এক বাচ্চা বলছে, মা আমি তোমার সাথে ঘুমোব। মা বলছে, এখন তুমি বড় হয়ে গেছ, তুমি অন্য ঘরে গিয়ে শোও। কিন্তু বাচ্চা এমন বায়না ধরেছে, এমন চেঁচামেচি করছে যে মাকে শেষে বাচ্চাকে তার কাছে শোয়াতে হল। ঈশ্বর দর্শন ঠিক তাই। আমি পৃথিবীতে আছি, নাকি স্বর্গে আছি, না প্রেতলোকে

আছি, নাকি নরকে আছি, তাতে ঠাকুরের কিছু আসে যায় না, কারণ ঠাকুরের কাছে সব সমান। আমি কি চাইছি সেটা আমাকেই ঠিক করতে হবে। ঠাকুর কোন দিন কাউকে কাছে ডেকে নিয়ে আসবেন না, কারণ সবটাই তো তাঁর।

আমরা ধর্মের নানা রকমের থিয়োরি দিয়ে যাচ্ছি; যার মধ্যে একটা খুব প্রচলিত থিয়োরি হল – ঠাকুর আমাকে দেখবেন। ঠাকুর কেন আমাকে দেখতে যাবেন, ঠাকুর তো আমাকে দেখছেনই। নরকে যদি চলে যাই, তখনও ঠাকুরই আমাকে দেখছেন, পাতালে গেলে তিনিই আমাকে দেখছেন। গরীব কাঙালী করে যদি রাখেন সেখানেও তিনিই দেখছেন। আর আমি যদি বেশি ভেঙে গিয়ে ঠাকুরের কাছে কান্নাকাটি করে বলি, 'ঠাকুর তুমি আমাকে দেখছ না, আমি যে কত কাঙাল হয়ে গেছি'! ঠাকুর তখন বলবেন, 'আমার যত শ্রেষ্ঠ সন্তান সবাই তো কাঙাল। ভগবান বুদ্ধ রাজসিংহাসন ছেড়ে ভিখারী হয়ে গেলেন, সে আমার একজন শ্রেষ্ঠ সন্তান, চৈতন্য মহাপ্রভু আর রূপ সনাতনের মত তাঁর শিষ্যরা সবাই কাঙাল'। 'ঠাকুর আমি যে মরে যাচ্ছি'। 'তাতে হলোটা কি, আমার সব শ্রেষ্ঠ সন্তানরাই মরে। এই দেখো যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করে মারা হল'। 'প্রভু আমার ঘর বাড়ি সব চলে গেছে'। 'তাতে হলোটা কি! আমি নিজে যখন তোমাদের মত হয়ে আসি, তখন আমি শ্রেষ্ঠতম, তখন আমারাও তোমার মত সব ঘরবাড়ি চলে যায়। রাম রূপে আমাকে রাজাপ্রাসাদ ছেড়ে বনে জঙ্গলে চোদ্দ বছর ফলমূল খেয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে'।

যাঁরাই শ্রেষ্ঠ তাঁদেরই কষ্ট। কষ্ট আর ঈশ্বর কখনই পরস্পর বিরোধী নয়। লাটু মহারাজ ঠাকুরের একজন শ্রেষ্ঠ সন্তান, তিনি প্রার্থনা করছেন, ঠাকুর আমি যা খাই সব যেন হজম হয়ে যায়। এটা কোন বর হল! আবার এর অন্য দিকটাও আছে, ঠাকুর খুব সুন্দর বর্ণনা করছেন, একজন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছে, প্রভু আমি যেন সোনার বাটিতে নাতির সাথে দুধ ভাত খেতে পারি। কিন্তু লাটু মহারাজ আপন ভাবে প্রার্থনা করছেন, হে ঠাকুর যা খাই যেন সব হজম হয়ে যায়। কোথায় কোথায় ভিক্ষার জন্য ঘুরে বেড়াতে হবে, ভিক্ষায় কোথায় কি পচা বাসি হাবিজাবি খাবার খেতে হবে কোন ঠিক নেই, শরীর খারাপ হলে কোথায় ডাক্তার দেখাতে যাবেন! তার চাইতে বরং যা খাবার জুটবে সেটা খেয়ে নেবেন আর শুধু ঈশ্বরের নাম করে বেড়াবেন।

আমরা সবাই কিছু কিছু জিনিসের থেকে পালাতে চাইছি। কিসের থেকে আমরা পালাতে চাইছি? দুঃখ দৈন্যতা থেকে পালাতে চাইছি। দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা থেকে পালাতে চাইছি। গীতায় ভগবান বলছেন, কারা আমার সব থেকে প্রিয়? যারা আমার জন্য সব কিছু ছেড়ে দিয়েছে। ঈশ্বরের কোন ভক্ত কোন দিন বড়লোক হয় না, সবাই গরীব হয়। আমরা মৃত্যু থেকে পালাতে চাইছি। এদিকে যীশু হাসি মুখে আরমসে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে গেলেন, তার জন্য কাউকে দোষারোপ পর্যন্ত করলেন না। শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামকৃষ্ণ এনাদের জীবনটা দেখ, দুঃখ, দুর্দশা, অশান্তি ছাড়া জীবনে কিছু পাননি, এ-রকমই সবার হয়। এত কথা বলা এই জন্যই যে, ঠাকুর কখন বলছেন না যে, আমি যাকে ভালবাসব তার টাকা-পয়সা হবে। কিন্তু উল্টোটাই দেখা যায়, ঠাকুর যাকে ভালবাসেন, শেষে দেখা যায় তার কিছুই থাকে না। আমাদের মনের প্রতিচ্ছবিতে আমরাই থিয়োরি বানিয়ে নিচ্ছি – ঠাকুর আমাকে দেখবেন।

সকালে বিকালে পার্কে গেলে বা রাস্তাঘাটেও দেখা যায় বড়লোকেরা তাদের পোষা কুকুর নিয়ে ঘুরতে বেরোয়। কুকুরটা চেন দিয়ে বাঁধা থাকে, মালিকের হাতে চেন থাকে। কুকুরটা সব সময় এগিয়ে এগিয়ে যায়, মালিক তার পিছন পিছনে চলতে থাকে। মাঝে মাঝে মালিক চেনটা ছেড়ে দিলে কুকুরটা বেশি এগিয়ে অন্য দিকে চলে যায়, মালিক তখন শিস্ দিয়ে বা কুকুরের নাম ধরে ডাকে। অনেক সময় কুকুর অনিচ্ছা সহকারে নিজের জায়গায় চলে আসে, আবার অনেক সময় আরও দূরে চলে যেতে থাকে। আমাদের মনটাও কুকুরের মত, এগিয়ে এগিয়ে চলে। মন ধরেই নিয়েছে তিনি এই পথেই যাবেন; কিন্তু সংসারের পরিস্থিতি মেরে আমাদের অন্য দিকে নিয়ে যায়। তখন মনকে বলতে হয়, মন ওদিকে নয়, এদিকে চল। আমার একটা কাজ করাতে হবে, একজন এসে বলল, আপনার এই কাজ আমি করে দেবই দেব। এবার আমার মন এগিয়ে ভবিষ্যতে গিয়ে ওখানে বসে গেছে যে, আমার এই কাজটা হয়ে গেছে। কিন্তু আসল পরিস্থিতি আমার শরীরকে নিয়ে, সে এখনও ওখানে পৌঁছাতে পারেনি। হঠাৎ দেখা গেল, যে কোন কারণেই হোক সে সেই কাজটা করে

দিতে পারল না। আমার মন হতাশায় ভরে গেল। কেন হতাশা এলো? কারণ মনের কাজ ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে বেরিয়ে যাওয়া; মন কখনই বর্তমানে থাকে না।

মনের কাজই হল, হয় সামনের দিকে দৌড়ে যাবে নয়তো পিছনের দিকে দৌড়ে যাবে। মালিকের সাথে কুকুর কক্ষণ হাঁটবে না, হয় এগিয়ে যাবে, নয়তো পিছিয়ে উল্টো দিকে যাবে। মালিক তাকে ডেকে ডেকে নিয়ে আসে তখন মাথা গুঁজে চলে আসে। মাথা গুঁজে যখন চলে আসে তখন ওটা তার ভাল লাগে না। কিছুক্ষণ থাকবে, আবার দৌড়াতে শুরু করবে। মন ঠিক তাই করে। যার কাছে মার খেল, তাকে বলে, আমি তো আর জীবনে তোমাকে বিশ্বাস করতে পারব না। দুদিন পর আবার সেই লোককেই সে বিশ্বাস করবে, করতে বাধ্য হবে। কেউ এর থেকে বাঁচতে পারে না, ঠাকুরও বাঁচতে পারেননি। কিন্তু ঠাকুর জানেন কিভাবে মনকে বর্তমানে ফিরিয়ে আনা যায়। বাল্মীকি রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র থেকে থেকে চোখের জল ফেলছেন, তিনিও ওই জিনিস নিতে পারছেন না। থেকে থেকে লক্ষ্মণকে বলছেন, সীতার সাথে কত সুখে দিন কাটছিল, আর থেকে থেকে নিজের অসহায় অবস্থার কথা বলছেন, আমার এটা হলো না, সেটা হলো না, ইত্যাদি। সমস্যা পরিস্থিতিকে নিয়ে না, সমস্যা আমাদের মনকে নিয়ে, মন সব সময় এগিয়ে এগিয়ে যায়, ওকে টেনে টেনে ফিরিয়ে আনতে হয়। আমরা ঠিক এই ভাবে থিয়োরিজ গুলো বানিয়ে নিই, ঠাকুর আমাদের দেখছেন, ঠাকুরের এই রকম রূপ, ঠাকুর এই রকম করবেন, এই পূজা দিলে তিনি আমার জন্য এই এই করবেন ইত্যাদি।

স্বামীজী বলছেন, এই ধরণের থিওরি নিয়ে যারা জীবন চালায়, এদের থেকে নাস্তিক হওয়া অনেক ভাল, কারণ নাস্তিকের নিজের উপর জোর আছে, নিজের উপর বিশ্বাস আছে, নিজের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে। এদের তো সেটাও নেই। বলবে, কেন, আমার তো ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস আছে। এক আধজন খুব সিনিয়র সন্ন্যাসী ছাড়া আজ পর্যন্ত কাউকে দেখা যাবে না যে, যাঁর পুরোপুরি ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে। আমাদের সবাইর selective বিশ্বাস। কথাগুলি শুনলে আমাদের হয়ত মনে কষ্ট হবে, কিন্তু কিছু করার নেই, এটাই বাস্তব, আর এভাবেই আমরা নিজেদেরকে ধাপ্পা মেরে যাচ্ছি। কেউ অপরকে থোরাই ধাপ্পা মারতে পারে, ধাপ্পা মারে নিজেই নিজেকে। নিজের মত যখন সব কিছু হয়, তখন বলি, আহা ঠাকুর তুমি কত কৃপালু, যখন মনের মত হয় না, তখন বলি, হায় হায় ঠাকুর, তুমি কি সর্বনাশটাই না আমার করলে। একটু বিচার করে দেখ, ঠাকুর নিজের মতই সব কিছু করছেন, তুমি বিচার করে বলছ সর্বনাশ, কিন্তু কিসের সর্বনাশ!

আমাদের কারুর যদি সত্যিকারের মন থেকে বিশ্বাস থাকে, আমাকে মুক্তির দিকে এগোতে হবে, আধ্যাত্মিক জগতে আমাকে বড় হতে হবে, আমি জানি জগতের প্রতি আমার দুর্বলতা আছে, সুখ ভোগের প্রতি দুর্বলতা আছে, টাকা-পয়সার প্রতি দুর্বলতা আছে, কিন্তু আমি ঈশ্বরকে চাই, আমি দু হাতে খুব জোরে ঠাকুর আঁকড়ে ধরে আছি, ঠাকুর আমার জগতের সব কিছু কেমন যেন গোলমাল লাগছে, তুমি যে করেই হোক আমাকে পার করে দাও, তাহলে বুঝতে হবে সেও কিন্তু একজন জ্ঞানী হয়ে গেল। আচার্য শঙ্করও গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে তাঁর ভাষ্যে বলছেন, এরাও জ্ঞানী। তিনি বলছেন, যাদের মধ্যে এই বোধ এসে গেছে, আমার ভিতরে আগের আগের যে সংস্কারগুলি আছে, সেই সংস্কারগুলি আমাকে দিয়ে এখনও আমাকে প্রলোভনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, আজেবাজে কাজ করাচ্ছে, মনটাকে ভোগের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, কিভাবে আমি এর থেকে বেরোতে পারি। শঙ্করাচার্য বলছেন, এরাও জ্ঞানী, কারণ এদের বিবেক বোধ, জ্ঞানের স্পৃহা জেগে গেছে। যাদের জ্ঞানের স্পৃহা জেগে গেছে, তাহলে জানতে হবে, এরপর থেকে তাদের জীবনে যা কিছু হচ্ছে, সবটাই সে তখন মনে করে আমার ভালর জন্যই হচ্ছে, সাধারণ লোকেদের সেটাও হয় না।

সাধারণ মানুষদের প্রকৃতি মারে। একজন বড়লোক, এই যেমন বিজয় মালিয়া, গোলমাল করল, দিল তাকে দেশ ছাড়া করে। তাকে ভগবান মারছে না, যদিও সবটাই ভগবানের। প্রকৃতিই তাকে একেবারে হিরো থেকে জিরো বানিয়ে দেবে। কিন্তু যার সংসারের সুখভোগে মন একেবারে ডুবে আছে, সে যে মার খায় মনে হয় যেন সংসার মারছে, প্রকৃতি মারছে, এরা তখন বলে আমি শেষ। কিন্তু যারা খুব গভীরে দু হাতে ঈশ্বরকে ধরে আছে, যদিও বাইরে তার কাজে কর্মে অনেক রকম গোলমাল দেখা যাচ্ছে, কিন্তু ভিতর থেকে আঁকড়ে ধরে আছে আর প্রার্থনা করে যাচ্ছে, 'ঠাকুর, আমি এগুলো করছি কারণ আমার স্বভাব আমাকে দিয়ে এসব করাচ্ছে। যদি এগুলো আমার মন থেকে চলে যায় আমি সত্যিই খুব খুশি হব'। এবার তার জীবনে নাশ হয়ে

যাওয়া, শেষ হয়ে যাওয়া বলে আর কিছু থাকবে না, *নেহাভিক্রমনাশোহস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে*। তার ভাল যখন হচ্ছে তখন যেমন সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, যখন মার খাচ্ছে, তখনও তাকে সামনের দিকে এগিয়ে দিচ্ছেন।

হিমালয়ের পথে চলার সময় কখন মনে হবে নীচের দিকে যাচ্ছে, কখন মনে হবে উপরের দিকে যাচ্ছে, কিন্তু যতক্ষণ চলছে ততক্ষণ সে এগিয়েই চলেছে। শ্রেয়োর পথ, ঈশ্বরের পথকে যে বরণ করে নিয়েছে, সে এবার কখন ভাল থাকবে, কখন মন্দ থাকবে, কখন মনে হবে আমি বুঝে বিনাশের দিকে চলে যাচ্ছি; কিন্তু এখন আর বিনাশ বলে কিছু নেই। তাকে এখন আর কিছু করতে হবে না, শুধু ঈশ্বরকে ধরে রাখতে হবে। যে মনে প্রাণে বলছে, হে প্রভু আমি তোমার দিকে এগোতে চাই, কিন্তু আমার কামনা-বাসনা গুলি যাচ্ছে না, সেতো এটা মেনে নিয়েই এগোচ্ছে, তার আর কিসের নাশ হবে! ঠাকুর বলছেন, হাসপাতালে যে একবার নাম লিখিয়েছে, রোগ ভাল না হওয়া পর্যন্ত তার আর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার উপায় নেই। আমরা বলতে পারি, সংসারী আর যারা আধ্যাত্মিক পথে যাচ্ছে তারা আলাদা। আসলে সংসারীরাও আলাদা না।

আমাদের সবারই একটা comfort zone থাকে, অর্থাৎ যে জায়গাতে আমি নিজেকে ভাল মনে করছি, সুখি মনে করছি। মুক্তি সব সময় জ্ঞান থেকে হয়, জ্ঞানই মুক্তি। জ্ঞান সব সময় হয় অনুভব থেকে, অভিজ্ঞতা অর্জন থেকে। অভিজ্ঞতা অর্জন হয় যখন ওই comfort zoneটা ভেঙে যায়। Comfort zoneটা যতক্ষণ না ভাঙছে, ততক্ষণ কোন অভিজ্ঞতা হবে না। ঠাকুরের গল্প আছে, পাহাড়ের উপর একজনের বাড়ি ছিল, একদিন জোরে বাতাস দিতে শুরু হয়েছে, সে প্রার্থনা করছে, হনুমানের বাড়ি, বায়ুদেবতার বাড়ি, লক্ষ্মণ সীতার বাড়ি, বাড়িটা যখন ভেঙে গেল তখন বলছে শালার বাড়ি। ওর কাছে comfort zone হল, আমার একটা বাড়ি আছে, এটা তার comfort zone। কিন্তু সে ভক্ত, একটা আশ্রয় তার যখন ভেঙে গেল, সে এখন মুক্ত। ওই জায়গা থেকে মুক্ত হল, কিন্তু আবার যখন আরেকটা জায়গায় যাবে তখন সেটাই আবার একটা তার comfort zone হয়ে যাবে। আমাদের মনে যখন এটা এসে এছে, আমরা মুক্তির দিকে এগোতে চাইছি, এবার আমরা chosen one হয়ে গেলাম। আমরা সবাই এক একটা comfort zone আছি, যতক্ষণ মনে করছি আমি বেশ সুখে আছি, ঠাকুর বলছেন, পায়ে পা দিয়ে বসে গোঁফ চাপড়াচ্ছে আর বলছে আমি বেশ আছি, বুঝবে এদের দ্বারা কিছু হবে না।

যতক্ষণ আমি comfort zoneএ আছি, সব কিছু ভাল ভাল চলছে, তার মানে আমার এখন কিছুই হচ্ছে না, এই পথে নামতে আমাকে অনেক দিন অপেক্ষা করে থাকতে হবে। কারণ কোন রকম experience হচ্ছে না, experience সব সময় হয় adversityতে। Adversity gives you experience, experience gives you knowledge, knowledge gives you free। এই হল চারটে ধাপ, বিষম পরিস্থিত যখন আসে তখন আমরা কাঁদি, কপাল চাপড়াই, কিন্তু অনুভব ওখান থেকেই আসবে। যারা সংসারে থেকে ভোগ করছে, তাকেও কিন্তু ভগবান সেটাই করছেন, সমস্যা হল, এরা হাজার বার মার খেলেও সেখান থেকে বেরোবে না। ওদের তাই লক্ষ লক্ষ বার মার খেতে হবে। ঠাকুর যেমন বলছেন, সংসারী মানুষগুলো আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা হয়ে আছে, আবার স্ক্রুপ দিয়ে মারা। যখন প্রচুর মার খাবে, এই জন্মে লক্ষ বার তো মার খাওয়ার সময় হবে না, কিন্তু ভেবে যদি দেখা হয়, এর আগের আগের জন্ম আমরা কত মার খেয়ে এসেছি আমাদের জানা নেই। এই কল্পে যে সৃষ্টি হয়েছে, তারও আগের আগের কল্প থেকে, সৃষ্টিতে যবে থেকে আমি একটা শরীর ধারণ করে প্রবেশ করেছি, তবে থেকে মরছি আর জন্মাচ্ছি, জন্মাচ্ছি আবার মরছি আবার জন্মাচ্ছি, কিন্তু আমাদের একবারও মনে এই চেতনার উদয় হচ্ছে না যে আমি *পুনরপি জননং পুনরপি মরণং পুনরপি জননী জঠরে শয়নম্*, এর বাইরে চলে যাই। লক্ষ কোটি এগুলো কোন সংখ্যাই না, ওর উপর যতগুলো শূন্য বসিয়ে দেওয়া হবে ততগুলি জন্ম, আর প্রত্যেক জন্মে আমরা মরছি, আবার জন্ম নিচ্ছি, আবার মরছি, কিন্তু তাও দেহের প্রতি আসক্তি যাচ্ছে না।

অবশ্য যে জিনিসটার সাহচার্যে যত দিন বেশি থাকা হয়, সেই জিনিসের প্রতি আসক্তি তত গভীর হয়। যে জিনিসের সঙ্গ যত কম হবে, সেই জিনিসের প্রতি আসক্তি তত কম হয়। জীবনের প্রতি এই আসক্তি, সৃষ্টি যবে থেকে হয়েছে তবে থেকে চলছে। সেইজন্য এই আসক্তি সহজে যাবে না, জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত আসক্তি

থাকবে। বাকি জিনিসগুলো, কামিনী-কাঞ্চন, নামযশ এগুলো অনেক short, ফলে এগুলোকে অনেক সহজে ছাড়া যায়। সেইজন্য যারা আধ্যাত্মিক জীবনে আসতে চাইছে, তাদেরকে বলা হয় স্থূল জিনিসের ভোগগুলিকে আগে ত্যাগ করতে হয়। যদি মনে হয় এটা আমার ভাল লাগে, এই ভাল লাগার জন্য বন্ধনে পড়ছে, বন্ধনে যদি না পড়ে তাহলে তো কোন দরকার নেই। একজনের মিষ্টি ভাল লাগে, তাতে কিছু আসে যায় না। ঠাকুর বলছেন, ভবনাথ বলছে সে পান, মাছ ত্যাগ করেছে, সেটা আর কী ত্যাগ! কারণ এগুলোও বাহ্যিক, কিন্তু কামিনী-কাঞ্চনের মত আষ্টেপৃষ্ঠে আমাকে সেভাবে বেঁধে দিচ্ছে না। কামিনী-কাঞ্চন বেঁধে দেয়। সেইজন্য আমাদের দেখতে হয় কোন কোন জিনিসগুলো আমাদের বেঁধে দিচ্ছে, আর যে জিনিসগুলো খুব স্থূল। তারপর ধীরে ধীরে ভিতরের দিকে যেতে হয়। কোন কাজ করার সময় যদি বলে, ঠাকুরের ইচ্ছা, বুঝতে হবে সে একটা comfort zone তৈরী করে রেখেছে, আর ওই comfort zoneএ সে থাকতে চাইছে। কিন্তু ওই ঠাকুরের ইচ্ছা তাকে এমন মার মারবে যে তার comfort zoneকে ভেঙে দেবে। যারা ওই রকম একটা কোন থিওরি বানিয়ে নেয়, তারা থিওরি বানিয়ে নিয়ে চেষ্টা করাটা ছেড়ে দেয়। কারণ যার সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করে, তাঁর ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে, তার আর ভাল মন্দ কোনটাতেই কিছু আসে যায় না। আমাদের আসে যায়, কারণ আমরা একটা সুখের সংসার তৈরী করে নিয়েছি বা স্বপ্নে বা মনে মনে একটা সুখের সংসার কল্পনা করে বলছি, আমি এটাই চাইছি।

আমরা সবাই comfort zone তৈরী করে নিই, comfort zone মহাপুরুষদের একটাই, ঈশ্বর চিন্তনের বাইরে কোন comfort zone নেই। আর ঈশ্বর চিন্তনটা তাঁদের স্বভাবে, সেইজন্য কেউ কোন দিন ওটা তাঁর থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। মানুষ তাঁকে জেলে দিয়ে দিতে পারে, তাঁর উপর অত্যাচার করতে পারে, কিন্তু তাঁর ঈশ্বর চিন্তনটা কেড়ে নিতে পারবে না। একজন কালী ভক্তকে জোর করে মুসলমান বানিয়ে দিয়েছিল। লোকটি থেকে থেকে কালী কালী করে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানগুলো তার দিকে তেড়ে আসে, সেও তাদের বলতে থাকে, 'দোহাই শেখজী আমাকে কিছু করবেন না, কালী আমার ভিতর থেকে ঠেলে ঠেলে আল্লাকে বার করে দিচ্ছে, যা করার কালীকে করুন'। কালী ভক্তকে তলোয়ারের জোরে ধর্মান্তরিত করে দেওয়া যাবে, কিন্তু তার কালী যাবে কোথায়, তার ভিতরেই থাকবে, কালী চলে যাবে না। আমরা দুর্বল, আমরা অজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, ফাঁকিবাজ, ঘোর তামসিক। যেদিন আমরা বুঝে যাব ধর্মের ব্যাপারে আমরা মহা ফাঁকিবাজ, চেষ্টা তখন শুরু হবে। তার আগে পর্যন্ত আমরা লম্বা লম্বা থিওরি দিয়ে যাব। এই লম্বা লম্বা থিয়োরি দেওয়ার থেকে নাস্তিক হওয়া অনেক ভাল, কারণ নাস্তিক জানে, আমি জন্মেছি, আমি মরে যাব, আমার কাহিনীও ওখানেই শেষ। নাস্তিক যে সে এদিক থেকে অন্তত সৎ, যে নিজেকে আস্তিক বলছে আর শুধু লম্বা লম্বা থিওরি দিয়ে যাচ্ছে তার মধ্যে সততা নেই।

এই honesty আর integrityই একমাত্র প্রধান। যার জীবনটা honesty আর integrityকে নিয়ে চলে, তাকে আরে কেউ আটকাতে পারবে না। তুমি অন্তত বলো যে, আমার জানা নেই ঠাকুরের ইচ্ছা আছে কিনা, ঠাকুরের কৃপা আছে কিনা, আমাকে এই করতে হবে এটাই আমি জানি, আর আমি তাই করছি। এটাই স্বামীজী বলছেন, perception যতক্ষণ না হয়, প্রত্যক্ষ যতক্ষণ না হয়, ধর্ম ততক্ষণ শুরু হয় না; ততক্ষণ থিওরি আর নাস্তিকে কোন তফাৎ নেই, বরঞ্চ নাস্তিকরা এদের থেকে খাঁটি।

স্বামীজী এরপর বলছেন, Every step I take in the light is mine for ever. (*সেই প্রত্যক্ষানুভূতির আলোকে আমি যে কয় পা অগ্রসর হবো, তা থেকে কিছুই আমাকে কখনও হটাতে পারবে না।*) সারা জীবন ধরে কথামৃত পড়ছি, শুনছি, এতে কিছু হয় না; যেদিন প্রথম আমি পা ফেলব, যে পা ফেলব সেটা আমার নিজের। এই যে আমরা এখানে যে আলোচনা শুনছি, এই আলোচনায় আমরা যা যা শুনলাম, এটাকে শুধু এক পাতা যদি বাড়িতে গিয়ে লিখি, এক পাতাও না, যেটুকুই লিখি না কেন, সেটুকু আমার, এবার এই জ্ঞানটাও আমার। যতক্ষণ শুনছি এটা বেকার, যতক্ষণ হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ করছি এটাও বেকার, কোন কাজে লাগবে না। Work out আমকে নিজে করতে হবে। এখানে যে লাইট বলছেন, এটা হল জ্ঞানের আলো, জ্ঞানের আলোতে আমি যে কটা পা ফেলেছে সেটাই আমার নিজের অগ্রগতি। আর যতক্ষণ থিওরি আউড়ে যাচ্ছি ততক্ষণ আমরা অন্ধকারে চক্কর মেরে যাচ্ছি।

When you got to a county and see it, the it is yours. (*কোন দেশ যখন তুমি স্বয়ং গিয়ে দেখলে, তখনই তোমার তার সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান হবে।*) বইয়ে দিল্লী, আমেরিকা, ইংল্যাণ্ডের যতই বর্ণনা পড়ে থাকি না কেন, কোনটার কোন দাম নেই। একবার ওই জায়গায় নিজে গিয়ে হাজির হলাম, দেখলাম, ঘুরলাম, জানলাম, এরপর ওই জ্ঞানটা আমার নিজের হয়ে যাবে, ওই জ্ঞান কোন দিন আমার থেকে কেউ নিয়ে নিতে পারবে না। যতক্ষণ থিওরেটিক্যালি জানছি, ততক্ষণ আমার জ্ঞান হয়নি। তবে একটা তফাৎ হল, যারা সত্যিকারের খুব বুদ্ধি সম্পন্ন হন, অনেক সময় দেখা যায় তাঁরা একটা জিনিসকে এত গভীর ভাবে আগাগোড়া অধ্যয়ন করেছেন, তাঁদের সেই বিষয়ের উপর একটা দখল এসে যায়, তাও কিছু ফাঁক থেকে যায়। তিনি থিওরেটিক্যালি সব জানেন, কিন্তু অনেক কিছু আছে যেটা তিনি জানেন না। ঠাকুর যেমন বলছেন, পড়ার থেকে শোনা ভাল, শোনার থেকে দেখা ভাল। যতক্ষণ না জিনিসটাকে দেখে নিচ্ছি ততক্ষণ জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না, তা যত বই পড়ুক না কেন, বেদ উপনিষদ যতই পড়া থাক, এর সাথে কোন সম্পর্ক নেই। সেইজন্য ঠাকুর বলছেন, এখানকার জ্ঞান বেদ বেদান্তকে ছাড়িয়ে গেছে। শুধু যে ঠাকুরেরই ছাড়িয়ে গেছে তা না, যে কোন মানুষ, যিনি প্রত্যক্ষ করে নিলেন, তাঁর জ্ঞান বেদ বেদান্তকে ছাড়িয়ে যায়।

We have each to see for ourselves; teachers can only 'bring the food', we must eat it to be nourished. Argument can never prove God save as a logical conclusion, (*আমাদের প্রত্যেককে নিজে নিজে দেখতে হবে। গুরু কেবল আমাদের কাছে 'আধ্যাত্মিক খাবার' এনে দিতে পারেন —ঐ খাদ্য থেকে পুষ্টিলাভ করতে গেলে আমাদের তা খেতে হবে। তর্কযুক্তি কখনও ঈশ্বরকে প্রমাণ করতে পারে না, কেবল যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তরূপে তাঁকে উপস্থাপিত করে।*) গুরু যেন আমাদের জন্য আধ্যাত্মিক খাবার তৈরী করে দেন, খেতে হবে আমাদেরকেই, খেয়ে আমাদেরকেই পুষ্টি লাভ করতে হবে। আর যুক্তিতর্ক দিয়ে কখনই ঈশ্বরকে প্রমাণিত করে দেওয়া যায় না। নানান ভাবে যে যুক্তিতর্ক নিয়ে আসা হয়, তখন একটা যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত রূপে উপস্থাপিত হয়ে যায়। যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত মানেই ওটা সত্য নয়। যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত মানে, এটাই হওয়ার কথা। কিন্তু যেটা হওয়ার কথা সেটাই যে হবে তা নয়। ওইটাকে প্রমাণিত করার জন্য আমাকে প্রত্যক্ষ করতে হবে। বেদ বেদান্ত অধ্যয়ন করে, যুক্তিতর্ক দিয়ে বিচার করে, বড় বড় ভাষ্যকারদের অধ্যয়ন করে আমি আমার যে সিদ্ধান্তে পৌঁছালাম, প্রত্যক্ষে সেটাই আমি পাচ্ছি কিনা দেখতে হবে। সেইজন্য প্রত্যক্ষ যতক্ষণ না করা হয়, ততক্ষণ ধর্মের কোন দাম নেই।

ভগবানের শ্রেষ্ঠ মন্দির

স্বামীজীর দেববাণীর উপর আমাদের আলোচনা অনেক বিস্তারিত ভাবে চলছে, সেইজন্য একই কথার পুনরাবৃত্তি হয়ে যাওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। প্রথমের দিকে কিছু কিছু বিষয় আমাদের কাছে নূতন ছিল, এখন তারই কিছু কিছু বিষয় আবার ঘুরে স্বামীজী আলোচনায় নিয়ে আসছেন। তবে এই বিষয়গুলো এত জটিল, সূক্ষ্ম ও কঠিন যে, এগুলোকে বার বার আলোচনা করতে হয়। দ্বিতীয়ত, ঠাকুর, স্বামীজীর মত লোকেরা যদি একই কথা পাঁচবার বলেন, তাঁরা পাঁচবার পাঁচ রকম করে বলবেন, একই রকম করে বলবেন না, কিছু না কিছু নূতনত্ব তার মধ্যে থাকবে। স্বামীজী এবার বলছেন, It is impossible to find God outside of ourselves. Our own souls contribute all the divinity that is outside of us. We are the greatest temple. The objectification is only a faint imitation of what we see within ourselves. (*ভগবানকে আমাদের বাইরে পাওয়া অসম্ভব। বাইরে যা ঈশ্বরতত্ত্বের উপলব্ধি হয়, তা আমাদের আত্মারই প্রকাশমাত্র। আমরাই হচ্ছি ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির। বাইরে যা দেখা যায়, তা আমাদের ভিতরের জিনিসেরই অতি অস্পষ্ট অনুকরণ মাত্র।*) মূল বক্তব্য হল, যা কিছু ঈশ্বরের ভাব আছে, সব ভাব আমাদের ভিতরেই রয়েছে। বাইরে objectification সেটারই হয় যেটা আমি নিজের ভিতরে দেখছি। এই ধরণের বিষয়ের উপর আগেও আমাদের আলোচনা হয়েছে।

গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ে ভগবান বলছেন, পূজা যখন করা হয় তখন মানুষের ভিতরে যেমন ভাব থাকে, সেই ভাব নিয়েই পূজা করে। ঠাকুরও বলছেন, মানুষ সাত্ত্বিক হয়, রাজসিক হয়, তামসিক হয়, তারা যখন পূজা করে তারা তখন সে-ভাব নিয়েই পূজা করে। ঠাকুর খুব humorous ছিলেন, স্বামীজীও ছিলেন, কিন্তু

ঠাকুরের কাছে কিছুই না। একটা কিছু ভাল করে বোঝানর জন্য ঠাকুর প্রায়ই ব্যঙ্গরস নিয়ে আসতেন, কাউকেই ছাড়তেন না। একজন আগে ধুমধাম করে দূর্গাপূজা করত, এখন বন্ধ করে দিয়েছে। 'এখন আর দূর্গাপূজা করেন না কেন'? 'দাঁত পড়ে গেছে। পাঁঠা খেতে পারি না'। বাড়িতে দূর্গাপূজা করা একটা সাংঘাতিক গ্ল্যামারের জিনিস। বড় বড় যে মন্দিরগুলো আছে, সেখানে মহন্ত যাঁরা আছেন, অন্য দিন তাঁরা কিছু করবেন না। কিন্তু যেদিন বিশেষ পূজা থাকবে, প্রচুর লোকজন আসবে, সেদিন মহন্ত নিজে মন্দিরে এসে আরতি করবেন। কেউ হয়ত বলতে পারে যে, বিশেষ দিনে বিশেষ লোকেরই তো পূজা করার কথা, তাতে দোষের কি আছে। কোন দোষ নেই, আর সত্যিই, তাঁরই তো করা উচিত, তিনি অভিজ্ঞ, তিনি সম্মানীয় সবই। কিন্তু সত্যিকারের তিনি যদি আধ্যাত্মিক সাধক হতেন, তাহলে তিনি ওইদিন বিশেষ দিন বলে ঘরে বসে বেশি করে জপ করতেন, নূতনদের পূজা করার সুযোগ দিতেন। অন্য দিনে পূজার কাজ মানে বেগার খাটা, কিন্তু বিশেষ দিনের পূজা মানে, লোকজন থাকবে, সবাই বলবে উনি পূজা করছেন, উনি আরতি করছেন। সব জায়গাতেই এই সমস্যা আছে। ওরা কি ওই ভাব নিয়ে করছে, আহা আজকে বিশেষ দিন, আমি পূজা করব! ঠাকুর তো একদিনও করছেন না, বিশেষ দিনে স্বামীজী একটা দিনের জন্যও করছেন না। আসলে সবাই হল গ্ল্যামার প্রত্যাশী; নিজের ভিতরে গ্ল্যামারটাই সত্য, বাইরে পূজার মাধ্যমে সেই গ্ল্যামারটাই বার করতে হবে। ভিতরে এরা ঈশ্বরকে ঐশ্বর্য রূপে দেখে, বাইরেও ঐশ্বর্য রূপেই দেখে। তামসিক লোকেরা মা কালীর পূজা ওই ভাবেই করে। কিন্তু ঠাকুর শুদ্ধসত্ত্বের আধার, মা কালীর পূজা করছেন, ব্রহ্ম-শক্তি অভেদ, এই বোধে পূজা করছেন। স্বামীজী এটাই বলছেন, বাইরে, মন্দিরের বিগ্রহে কোন dignity নেই।

আমাদের মধ্যে প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে কি মন্দিরের বিগ্রহের কোন দাম নেই? না, তা নয়, মন্দিরের বিগ্রহকে খুব দাম দিতে হবে। মন্দিরে বিগ্রহ পূজার ভাবটা নিয়ে এসেছেন কিছু বৈষ্ণব সম্প্রদায়, বিশেষ করে রামানুজ সম্প্রাদায়, তারা মন্দিরে বিগ্রহের পূজার উপর বেশী জোর দিলেন, বিগ্রহ মানে ঈশ্বর সেখানে সাক্ষাৎ বিরাজমান। স্বামীজী কিন্তু এদের কথাই বলছেন, যেখানে বলছেন সাক্ষাৎ আছেন, সেখানেও কিন্তু তার ভিতরের যে দিব্যত্ব, যে আধ্যাত্মিক ভাব, সেটাকেই ওই বিগ্রহের মধ্যে নিয়ে আসছে। ঠাকুর যখন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে মা ভবতারিণীর পূজা করছেন, অন্য দিকে সাধনা করে যাচ্ছেন, তখন মথুরবাবুর মত, রানী রাসমণির মত বিষয়ী লোকেরাও বুঝতে পারছেন এখানে একটা কিছু পরিবর্তন হয়ে গেছে। যদি পরিবর্তন হয়ে থাকে, তাহলে ঠাকুরের পরে কি ওই ভাবটা মন্দির থেকে চলে গেল নাকি? তা কি করে হবে। মা যেমন ছিলেন তেমনই আছেন। আমার আপনার আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ হচ্ছে। ঠাকুরের সঙ্গে যাঁরাই থাকছেন, ঠাকুরের সাথে যাঁরা ঘুরছেন, ঠাকুর বলছেন, কলাগাছ বাদে সব গাছই চন্দন হয়ে যায়। একটু যাদের ভিতরে সার আছে, তারা ঐ জিনিসটা বুঝতে পারছে। এই জিনিসটা আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে, যেমন যেমন আমাদের মন উন্নত হতে থাকবে, তেমন তেমন সে সত্ত্বগুণের দিকে এগোচ্ছে। মানসিক ভাবে এগিয়ে যাওয়া মানেই সাত্ত্বিক হওয়া, এগিয়ে যাওয়া মানেই সত্ত্বগুণে যাচ্ছে, সত্ত্বগুণ মানেই হয় ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। সাংসারিক জীবনে এগিয়ে যাওয়া মানে হয় আরও রাজসিক হওয়া, আরও জড়াচ্ছে; ওদের কাজ হল আরও বিষয় সম্পদ সংগ্রহ করা। আর আধ্যাত্মিক জীবনে এগিয়ে যাওয়া মানে সাত্ত্বিক হয়ে যাওয়া, আর ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়া, দুটো পূব পশ্চিমের মত বিপরীত। তামসিকদের দ্বারা কিছু হয় না, আর এমনিতে আমরা সবাই তামসিক। আমরা যতই ঠাকুর ঘরে যাই না কেন, যতই জপধ্যান করি না কেন, যতই শাস্ত্র পাঠ করি না কেন, ভিতর থেকে সবাই তামসিক। সাত্ত্বিক হলে ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, ভিতর থেকেই ত্যাগের ভাব এসে যাবে। আর সাত্ত্বিক পুরুষদের কর্ম ক্ষমতা সাংঘাতিক থাকে, কিন্তু কাজ করবেন না, কারণ ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত।

যদি আমরা এগোতে শুরু করি, আমরা দেখতে পাবো যে ঠাকুরের প্রতি আমাদের ভাব পাল্টাতে শুরু করেছে, একটা মাধুর্য আসতে শুরু হয়ে যায়। বেলুড় মঠে মঙ্গলারতির সময় ঠাকুরকে একটু বালভোগ দেওয়া হয়, সেই সময় ঠাকুরকে বালগোপাল রূপে একটু মিছরি ও মাখন নিবেদন করা হয়। অনেক আগে একজন মহারাজ বলতেন, দেখো, আমি যখন মঙ্গলারতিতে মন্দিরে যাই, তখন ঠাকুরকে আমি দেখছি তিনি এক ছোট্ট শিশুটি, বালগোপালের ভাবে বসে আছেন। সেই বিগ্রহ যাকে আমি দেখছি, আপনি দেখছেন, কিন্তু তিনি দেখছেন একটা ছোট্ট শিশু। লীলাপ্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দজী এর খুব সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন, দক্ষিণেশ্বরে আমরা সেই রামলালার বিগ্রহ দেখছি, দেখছি একটা অষ্টধাতুর মূর্তি, আর এই রামলালাকেই ঠাকুর কিনা খাওয়াতেন,

নাওয়াতেন, আমি তো অষ্টধাতুর একটা মূর্তি দেখছি, উনি এসব কি করে দেখতেন! ঠিক সেই ভাব, আমরা সবাই মন্দিরে সকালবেলায় বিগ্রহ দেখছি আর উনি একই ঠাকুরকে ছোট্ট শিশু দেখছেন। আবার বেলার দিকে যখন যাচ্ছেন, তখন বিগ্রহ যেমন, তেমনটাই দেখছেন। মঙ্গলারতির সময় ভোর চারটেতে প্রকৃতি খুব শান্ত থাকে, মনটাও এত শুদ্ধ ও পবিত্র থাকে যে তখন ঠাকুরকে একেবারে আপন বলে মনে হয়। একটু বেলা হয়ে যাওয়ার পর রোদ উঠে গেলে রজোগুণ জেগে উঠবে, তখন ঠাকুরের কাছে গেলে রজোগুণ নিয়েই যাবে, ঠাকুরের প্রতি তখন অন্য ভাব আসবে। আমাদেরই ভাব ঠাকুরকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে দেখে। এটা কিভাবে হয়? তখন বলছেন।

মনের শক্তিগুলির একাগ্রতা - প্রত্যাহার

Concentration of the powers of the mind is our only instrument to help us see God, (*আমাদের মনের শক্তিগুলির একাগ্রতাই আমাদের ঈশ্বর-দর্শনে সহায়তা করবার একমাত্র যন্ত্র।*) মন যত একাগ্র হওয়ার শক্তি অর্জন করবে, তত মনের শক্তিগুলি ঈশ্বর-দর্শনের সহায়ক যন্ত্ররূপে তৈরী হয়ে যাবে। কিন্তু মন একাগ্র থাকতে চায় না, মনকে একাগ্র রাখা খুব মুশকিল। If you know one soul (your own), you know all souls, past, present, and to come, (*যদি তুমি একটি আত্মাকে নিজ আত্মাকে জানতে পারো, তাহলে তুমি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সকল আত্মাকেই জানতে পারবে।*) আত্মা নিত্য, আত্মা সর্বব্যাপী, আত্মা গতকালও ছিল, আজও আছে, আগামীকালও থাকবে। একবার যদি আমি আমার আত্মাকে জেনে নিতে পারি, দেখে নিতে পারি, তাহলে আমি সমস্ত আত্মাকে জেনে যাব। যারা আছে, যারা ছিল, যারা আসবে, সবাইকে জানা যাবে, কারণ সবটাই সেই চৈতন্য। যখন আমরা জগৎকে নিয়ে, পদার্থকে নিয়ে থাকছি তখন আমরা পারব না, কারণ একটা পদার্থ আরেকটা পদার্থ থেকে আলাদা, চৈতন্য সব এক সমান, সেইজন্য চৈতন্যের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত সব জানা যায়। আর এটা তখনই সম্ভব হয়, যখন মনের সব শক্তি একাগ্রতা লাভ করবে। এই পয়েন্টটা আবার আসবে।

The will concentrates the mind, certain things excite and control this will, such as reason, love, devotion, breathing. (*ইচ্ছাশক্তি দ্বারাই মনের একাগ্রতা-সাধন হয় –যুক্তি, বিচার, ভক্তি, ভালবাসা, প্রাণায়াম ইত্যাদি বিভিন্ন উপায়ের দ্বারা এই ইচ্ছাশক্তি উদ্বুদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত হতে পারে।*) জীবনে যদি কেউ সাফল্য পেতে চায়, সংসারেই হোক বা আধ্যাত্মিক জীবনেই হোক, লেখালেখিতে হোক, যে কোন ক্ষেত্রে হোক, পয়েন্টেড আলো দিয়ে সাফল্য আসবে না, লেজার বীমের মত তাকে যেতে হবে। মন যে লেজার বীমের মত একাগ্র হবে, এর জন্য দরকার ইচ্ছাশক্তি, আমি এটা করব। ইচ্ছাশক্তি দু প্রকারে আসে, একটা করব, আরেকটা করব না। যোগের অষ্টাঙ্গ মার্গের একটা মার্গকে বলা হয় প্রত্যাহার, প্রত্যাহারের পর আসে ধ্যান, ধারণা ও সমাধি। প্রত্যাহার মানে একটা কিছু থেকে মনটাকে টেনে সরিয়ে নিয়ে আসা।

মনের একাগ্রতাকে আমরা সাধারণ ভাবে মনে করি, ছড়ানো মনকে কুড়িয়ে নিয়ে আসা। একাগ্রতাকে আমরা মনে করি, মনকে একটা জায়গায় নিয়ে গিয়ে সেখানে মনকে ধরে রাখা। একাগ্রতা মানে তা নয়। লেজারের ক্ষেত্রে সব কিছুকে যে একটা পয়েন্টে নিয়ে আসা হচ্ছে তা না, তার থেকে বেশি গুরুত্ব হল, অনেক কিছু থেকে সরিয়ে নেওয়া। ঠিক তেমনি, যে মন দশটা জায়গায় ছড়িয়ে যাচ্ছে, সেই মনকে ওই দশ জায়গা থেকে তুলে নিয়ে আসা। মনের একাগ্রতা অনুশীলনের ক্ষেত্রে প্রত্যাহারটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যাহার করার জন্য ইচ্ছাশক্তি দরকার। বাচ্চাকে বলছি পড়ায় মন দাও, আমরা যে শুধু পড়ার জন্য বলছি তা না, আমরা বলছি, তোমার মনটা যে আরও দশটা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেখান থেকে মনকে তুলে নিয়ে আসো; এটাই প্রত্যাহার। স্বামীজীও তাই এক জায়গায় বলছেন, সবাইকে মনের একাগ্রতা শেখানো হয়, প্রত্যাহার করতে কখনই শেখানো হয় না।

যে লোক মনকে একাগ্র করতে শিখে গেল, কিন্তু প্রত্যাহার করতে শেখেনি, সে অবশ্যই একটা রাবণ হবে। অসুরদের মনের একাগ্রতা শক্তি দেবতাদের সমান, কিন্তু প্রত্যাহার করার ক্ষমতা নেই। একাগ্রতার ক্ষমতা দেবতা আর আসুরিক ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তি দুজনেরই আছে, সাফল্যও তাই দুজনেরই আছে, অসুরদের ভোগ

সাধন দেবতাদের থেকে তাই অনেক বেশি। কিন্তু দেবতাদের একটা আছে, যেটা অসুরদের নেই, সেটা হল প্রত্যাহারের ক্ষমতা। তমোগুণ ও রজোগুণ থেকে নিজেকে তুলে নিয়ে আসার ক্ষমতা অসুরদের মধ্যে থাকে না, দেবতাদের থাকে। সাধু, মহাত্মা, বাবাজীদের নামে নিয়মিত খবরের কাগজে ছাপা হচ্ছে, ওই বাবাজীর স্ক্যাণ্ডাল, ওই বাবাজীর নামে শীলহানির মামলা, সেই বাবাজী এখন হাজতে আছে, ইত্যাদি। আমরা মনে করছি সব বাবাজীরা এক একজন প্রতারক। কিন্তু কেউই প্রতারক নয়, সত্যিই যদি প্রতারক হত কোন দিন সে ধরা পড়ত না, যদি প্রতারক হত, কোন দিন এত টাকা কামাতে পারত না, আর এত মানুষকে নিজের দিকে আকর্ষিত করতে পারত না। এদের সমস্যা হল, এরা সবাই একাগ্রতাটা শিখে গেছে, কিন্তু প্রত্যাহারটা শেখেনি। ফলে, যেই নামযশ, অর্থ, নারী সব আসতে শুরু হয়ে গেল, ওখান থেকে আর নিজেকে প্রত্যাহার করতে পারছে না। একাগ্র মন, যার উপর যাচ্ছে সেখানে গিয়ে এঁটে যাচ্ছে, আর বেরোতে পারছে না।

গাড়ী চালানো শেখার সময় প্রথমে ব্রেকে পা রাখতে শিখতে হয়, ব্রেকে পা রাখা মানেই সে গাড়ির স্পিড থেকে প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। তাই এক্স্যালেটার ছেড়ে আগে ব্রেকে পা রাখতে শিখতে হয়। সাধু জীবনে, আধ্যাত্মিক জীবনে ব্রেকে পা রাখা যদি না শেখা হয়, প্রত্যাহার যদি না শেখা থাকে, তার গাড়ি এবার ফুল স্পিডে গিয়ে জোর ধাক্কা মারবে। টেররিস্টরা যেমন হাতে একে-ফর্টি-সেভেন পেয়ে গেছে, ট্রিগার থেকে আর আঙুল সরাতে পারে না। মিলিটারি টেনিংএ শুধু বন্দুক চালানোই শেখানো হয় না, কিভাবে প্রত্যাহার করবে সেটাও শেখানো হয়। এখানে স্বামীজী যে ইচ্ছাশক্তির কথা বলছেন, এই ইচ্ছাশক্তি যেটা ট্রেনিং দিচ্ছে, আর যে ইচ্ছাশক্তি প্রত্যাহার করা শেখাচ্ছে, দুটো একসাথে চলে। শুধু ইচ্ছাশক্তি দিয়ে দিলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

এই ইচ্ছাশক্তি কোথা থেকে আসে? স্বামীজী বলছেন, Reason, love, devotion, breathing, এই ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম আর যোগ দিয়ে আসে, এখানে breathing মানে প্রাণায়াম। The concentrated mind is a lamp that shows us every corner of the soul. (*একাগ্রমন যেন একটি প্রদীপ –এর দ্বারা আত্মার স্বরূপ তন্ন তন্ন করে দেখা যায়।*) মন একবার একাগ্র হয়ে গেলে, আত্মার যত লুকানো এলাকা রয়েছে, সব কটাকে এলাকাকে সে বার করে আনবে। অন্ধকারে আলো ফেললে যেমন যা যা লুকনো জিনিস আছে সব দেখিয়ে দেয়; ঠিক তেমন একাগ্র মন সব কিছুকে খুলে দেখিয়ে দিতে পারে। যাঁরা বড় বৈজ্ঞানিক হন, তাঁরা একাগ্রতা দিয়েই বড় হন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতার কোলাহল থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন শান্তিনিকেতনের শান্ত, নির্জন পরিবেশে, তাঁর লেখনী কালজয়ী হয়ে গেল। আইনস্টাইনও শহর থেকে দূরে একা একা দু বছর কাটিয়েছেন, তবেই তিনি আইনস্টাইন হলেন। যে কোন মানুষ যাঁরা বড় হয়েছেন, তাঁরা কোন একটা সময় জনমানবের কোলাহল থেকে নিজেকে দূরে নিয়ে গিয়েছেন। নির্জন পরিবেশে থেকে মন একাগ্র হয়ে যায়, আর ওর জোরেই তাঁর সারা জীবন চলে। জীবনে যদি কেউ কিছু করতে চায়, একান্ত বাস তাকে করতেই হবে। ঠাকুরও নির্জনবাসের কথা বার বার বলছেন, এক মাস হোক, সাত দিন হোক, তিন দিন হোক, এক দিন হোক, একান্ত বাস করা চাই। নির্জনবাস আমরা মনে করছি, এ আর কী! কিন্তু অত সহজ নয়। নির্জনবাস একাগ্রতার শক্তি বাড়িয়ে দেয়, মনের বিভিন্ন শক্তিগুলি খুলতে শুরু করে। তখন চিন্তা-ভাবনা, জপধ্যান অন্য মাত্রায় চলে যায়, পড়াশোনাতে সহজে সব কিছু ধরে নিতে পারবে। কারণ আমরা যা কিছু করছি শেষ পর্যন্ত মন দিয়েই সব হয়। বাঁদরামি মন দিয়ে হয়, জীবনে সাফল্য মন দিয়ে হয়, বন্ধনটাও মনের, মুক্তিও মনের। একাগ্র মন সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়, অস্থির মন, চঞ্চল মন, ছড়ানো মন বিনাশের দিকে নিয়ে যায়, খুব সহজ ব্যাপার।

একপ্রকার সাধণপ্রণালী সবার জন্য নয় - প্রথমে নিজের যুক্তিবিচারকে ধরে থাকা

No one method can suit all. (*একপ্রকার সাধনপ্রণালী সকলের উপযোগী হতে পারে না।*) এবার স্বামীজী চারটে যোগের সমন্বয় করছেন। কোন একটা যোগ বা সাধন প্রণালী সবার জন্য হতে পারে না। These different methods are not steps necessary to be taken one after another. Ceremonials are the lowest form; next God external, and after that God internal. (*কিন্তু এই সকল বিভিন্ন সাধনপ্রণালী যে সোপানের মতো একটার পর একটা অবলম্বন করতে হবে তা নয়। ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠানাদি সর্বনিম্ন সাধন, তারপর ঈশ্বরকে আমাদের বাইরে দেখা, তারপর অন্তর্যামী রূপে দেখা।*)

এমনিতে আমরা যে বলব, আগে উপাচার করতে হবে, বিধি পালন করতে হবে, একটার পর একটা করতে হবে, সেরকম কিছু না, তবে ক্রিয়াকলাপাদির অনুষ্ঠান সব থেকে নীচু স্তরের সাধন, তারপর ঈশ্বরকে আমাদের বাইরে দেখতে হয়, আমরা যেমন এখন বেলুড় মঠে ঠাকুরকে দেখতে যাই। সেখান থেকে ঠাকুরকে নিজের ভিতরে অন্তর্যামী রূপে দেখতে হয়। ঈশ্বর আমার ভিতরে, তিনিই আমার অন্তর্যামী এই ভাব যতক্ষণ না আসে, এই ভাব শুধু আসা নয়, দিনরাত যদি এই ভাব অনুভব না হয়, ততক্ষণ আধ্যাত্মিক জীবন শুরু হয় না।

In some cases gradation may be needed, but in many only one way is required. (*স্থলবিশেষে, একটার পর আর একটা –এরূপ ক্রম আবশ্যক হতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে কেবল একটা পথেই প্রয়োজন।*) কিছু কিছু ক্ষেত্রে একটার পর একটা ক্রম আবশ্যক হয়। যারা জপধ্যান করে, তাদের অনেক সময় বলতে হয়, কিছু দিন এটা কর, তারপর এটা করবে। মন যাদের খুব চঞ্চল, তাদের কিছু কাজ দিয়ে দেওয়া হয়। যাঁরা খুব ভাল গুরু, তাঁরা অনেক সময় আমাদের একটা বিশেষ কাজের মধ্যে ঠেলে দেন, যাতে ছড়ানো মনটা কুড়িয়ে নিয়ে আসতে পারে। কিন্তু সাধারণ ভাবে গুরু একটা যে পথ, জপধ্যানের পথ বলে দিয়েছেন, তাতেই সব হয়ে যায়।

It would be the height of folly to say to everyone, ‘You must pass through Karma and Bhakti before you can reach Jnana’. (*‘জ্ঞানলাভ করতে হলে তোমাকে কর্ম ও ভক্তির পথ দিয়ে প্রথমে যেতে হবে’ –সকলকেই এই-কথা বলা চরম মুর্খতা।*) এর আগে আমরা আলোচনা করেছিলাম, বিষম পরিস্থিতি থেকে মানুষ কিভাবে অভিজ্ঞতা অর্জন করে, সেই অভিজ্ঞতা থেকে সে জ্ঞানের দিকে এগোয়, ওই জ্ঞান ভক্তিতে পরিণত হয়। আমরা যখন আধ্যাত্মিক জীবন থেকে সরে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের মধ্যে নিয়ে যাই, তার যতগুলো আধ্যাত্মিক পথ হতে পারে, স্বামীজী সব পথগুলিকে খুব সুন্দর ভাবে কর্ম, ভক্তি, যোগ ও জ্ঞান এই চারটে থাকে নিয়ে এসেছেন। কেউ যদি বলে আগে তোমাকে কর্ম করতে হবে, তারপর ভক্তি করতে হবে, তারপর তোমার জ্ঞান হবে, কারণ বেদান্ত মতে জ্ঞান ছাড়া মুক্তি নেই। নিজেকে জানা, এটাই জ্ঞান, এই জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত মুক্তি নেই। রামানুজ বলছেন, ভক্তিতেই সব কিছু হয়। এগুলো খুব টেকনিক্যাল জিনিস, স্বামীজী ওই উচ্চস্তরের টেকনিক্যালিটিজ নিয়ে বলছেন না, উনি পথ নিয়ে বলছেন। এরপর স্বামীজী বলছেন, আধ্যাত্মিক জীবনে মন যখন একাগ্র হতে শুরু হয়, তখন মনের একটার পর একটা ধাপ কিভাবে খুলতে থাকে।

Stick to your reason until you reach something higher; and you will know it to be higher. (*যতদিন না যুক্তিবিচারের অতীত কোন তত্ত্বলাভ করছ, ততদিন তুমি তোমার যুক্তিবিচার ধরে থাকো, আর ঐ অবস্থায় পৌঁছালে তুমি বুঝবে যে, সেটা যুক্তিবিচারের চেয়ে শ্রেষ্ঠ জিনিস।*) স্বামীজী বলছেন, যতক্ষণ একটা উচ্চ অবস্থায় না পৌঁছে যাচ্ছে, ততক্ষণ নিজের যুক্তিকে ধরে রাখতে হবে। যুক্তিবাদীদের কাছে ধর্ম মানে অন্ধ বিশ্বাস, কিন্তু তারা এটা জানে না যে, ধর্ম পুরোপুরি যুক্তির উপর চলে। আর আমি যেটাকে যুক্তি মনে করছি, ওই যুক্তিটাকেই আমাকে ধরে রেখে এগোতে হবে যতক্ষণ না উচ্চ অবস্থায় পৌঁছাতে পারছি। যদি তোমার মনে হয় ঠাকুরের ইচ্ছাতেই সব হয়, তাহলে ওটাকেই তুমি ধরে এগিয়ে চল। ওটাকে ধরে রেখে যত তুমি এগোতে থাকবে, নূতন নূতন সত্য যখন আসতে শুরু হবে তখন কি হবে? and you will know it to be higher, because it will not jar with reason. (*কারণ ওই অবস্থা তোমার যুক্তির বিরোধী হবে না।*)

বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন, বাড়ির লোকেদের থেকে কেউ কেউ জানতে চায়, ভাই তুমি তো দীক্ষা নিয়েছ, এই যে কুড়ি বছর, তিরিশ বছর ধরে জপধ্যান করছ, তোমার মধ্যে কি কিছু পরিবর্তন হয়েছে, যা তুমি বুঝতে পারছ? ঠাকুর বলছেন, কেশব সেনের ওখানে একজন লেকচার দিচ্ছে, হ্যাঁরে ভাই! আগে আমি কত মদ খেতুম রে। ঠাকুর শুনে বলছেন, শালা বলে কী! আমরা যদি ওই রকম বলতে শুরু করি, যেদিন আমি দীক্ষা নিলাম, তার আগে পর্যন্ত আমার যত লম্পটগিরি ছিল, বাঁদরামো ছিল, সেদিন থেকে সব কমে গেছে। ধর্ম আধ্যাত্মিকতায় এগুলোর কোন দাম নেই; মানুষ আগে ভদ্রলোক হয়, তারপর ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেখান থেকে তার আধ্যাত্মিক যাত্রা শুরু হয়। ঠিক ঠিক ভদ্রলোক যদি না হয়ে গিয়ে থাকে, ধর্ম জীবনের শুরুতে আচার-

সংহিতার সব কিছু পালন যদি না করে থাকে, অধ্যাত্ম তার দ্বারা হবে না। সে হয়ত অনেক কিছুই করছে, অনেক কিছুকে নিয়ে আছে, আর যদি মনে করে থাকে এতেই বিশেষ কিছু হয়ে যাবে, কখনই তা হবে না। যখনই জিজ্ঞেস করছে, আপনি এতদিন ধরে জপধ্যান করছেন, এত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন, এতে আপনার কি লাভ হল? আপনার মানসিক স্তরে কি কি বিবর্তন হয়েছে? আসলে জানতে চাইছে, জীবনদর্শনের ব্যাপারে, ঈশ্বর ও আধ্যাত্মিকতার ব্যাপারে তার দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে কোন পরিবর্তন হয়েছে কিনা। ঠাকুরও বলছেন, আমার আগে এই রকম মনে হত, কিন্তু মা দেখিয়ে দেওয়ার পর অন্য রকম দেখছি। ঠাকুর অবতার ঠিক আছে, কিন্তু যখন তিনি জগতে আছেন, তখন ওনারও মন এক সময় জিনিসটাকে এক রকম দেখছেন, অন্য সময় আরেক রকম দেখছেন।

আসলে যেটা দেখার তা হল, জীবনের ব্যাপারে, নিজের ব্যাপারে, ঈশ্বরের ব্যাপারে, আধ্যাত্মিকতার ব্যাপারে কতটা সে উন্নত হয়েছে। বিবর্তন মানেই সে নিজেকে কত সঙ্কীর্ণতা থেকে বার করে বৃহতের সাথে যুক্ত করতে পেরেছে, কতটা inclusiveness তার মধ্যে এসেছে। ধর্ম মানেই, *যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্*। ভূমা মানে, যত হৃদয় বড় হচ্ছে, মন যত উদার হচ্ছে, যত মানুষকে নিয়ে সে চলতে পারছে, এটাই evolution। একটা গভীর ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সবাইকে নিয়ে সে চলছে। এই দিকটাতে যেমন যেমন এগোবে, তত সে দেখতে পাবে যে আগে আমি শাস্ত্র অধ্যয়ন করে যে যুক্তিগুলি নিতাম, কারণ শাস্ত্র পড়েই যুক্তিটা ঠিক ঠিক তৈরী হয়, এখন সেই যুক্তিগুলো কোন বিরোধ সৃষ্টি করছে না। তথাকথিত যারা যুক্তিবাদী, যারা কথাবার্তায়, চালচলনে নিজেদের বিজ্ঞানমনস্কতার অধিকারী রূপে পরিচয় দিয়ে থাকে, তারা জানে না যে যারা আধ্যাত্মিক জীবনের দিকে যাচ্ছেন, তারা কেউই আহাম্মক নয়, অন্ধ বিশ্বাসী নয়। সাধারণ লোক অন্ধ বিশ্বাসী হতে পারে। শাস্ত্র পড়ে, আচার্যের ভাষ্যাদি অধ্যয়ন করে চিন্তা-ভাবনাগুলি পরিষ্কার হয়, চিন্তা-ভাবনাগুলি পরিষ্কার হলে বুদ্ধি একটু তীক্ষ্ণ হয়, বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হলে জীব, জগৎ, ঈশ্বর সম্বন্ধীয় তত্ত্বগুলি বুঝতে ও ধারণা করা সহজ হয়। এরপর যখন তার জপধ্যান বা সাধনা শুরু হবে, তখন তার সামনে নূতন নূতন সত্য উদ্‌ঘাটিত হতে শুরু হবে। ওই সত্যগুলি সত্য কিনা কি করে বুঝবে? শাস্ত্র পড়ে, গুরু বা আচার্যদের কাছে শুনে আগে যে সত্যগুলি তৈরী হয়েছিল, আর এখন জপ-ধ্যান ও সাধনা করতে করতে যে সত্যগুলি সামনে আসছে, এই দুটো সত্যের মধ্যে কোন বিরোধ সে পাবে না।

ঠাকুরের ইচ্ছা নিয়ে যারা আছেন, তাঁরাও যখন ঠাকুরের মত অবস্থায় যাবে তখন দেখবে ওই সত্যের সাথে কোন বিরোধ হচ্ছে না। এই ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে ওই ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যে একটা বড় তফাৎ আছে। এটা আগে তাঁর মুখের কথা ছিল, কিন্তু বিচার করে এখন দেখছে, সত্যিই তো সবই তাঁর ইচ্ছাতেই হয়। কিন্তু যাঁরা এসে বলছে, ঠাকুর কি বিউটিফুল ফুল করেছেন, ওসব কথা দিয়ে কিছু হয় না।

যুক্তিবিচার বা জ্ঞানের অতীত অবস্থা - Inspiration

স্বামীজী বলছেন, The stage beyond consciousness is inspiration; (*যুক্তিবিচার বা জ্ঞানের অতীত এই ভূমি হচ্ছে সমাধি।*) বিচার করে করে শেষে যখন চেতনার একটা স্তরে একেবারে শেষ চলে গেল, এরপর তাকে আর ভেবেচিন্তে বিচার করে কিছু বুঝতে হবে না। ঠাকুর যেমন বলছেন, মা যেন রাশ ঠেলে দেন, ঠিক তেমনি আইডিয়াসগুলো তখন আসতে থাকবে, তাকে আর ভাবতে হবে না। কোন কিছু বলার আগে বই ঘাটতে হচ্ছে, লম্বা লম্বা নোট তৈরী করতে হচ্ছে, এখন এসব কিছুই করতে হবে না, কারণ সবটাই তখন inspired। আগে যেমন কোন কিছু বলতে গেলে অনেক ভেবে চিন্তে বলতে হত, কিন্তু এখন inspired, এখন তার কথাগুলো শুনে সবাই থ হয়ে যাচ্ছে। আমরা প্রায়ই বলি, তিনি আমাকে inspired করলেন, বা তাঁর কথাগুলি কেমন inspiring, বা স্বামীজীর দেববাণী বইয়ের নাম Inspired Talks, এখানে এই inspire মানে তা নয়, এর অর্থ আরও ব্যাপক।

আমাদের সমস্ত কর্মের পিছনে একটা শক্তি থাকে। গর্ভ থেকে জন্ম নেওয়ার পর প্রথম কাজ হল নিঃশ্বাস নেওয়া। জন্ম নেওয়ার পর শিশুর প্রথম কাজ নিঃশ্বাস নেওয়া; কিন্তু শিশু ওই প্রেসারটা নিতে পারে না বলে জন্ম নিয়েই সে কাঁদতে শুরু করে, তারপরেই তার খিদে পায়। তখনও কি করে খেতে হয় সে জানে না,

যে করেই হোক তাকে দুধ খাওয়ানো হয়, এটাকে বলে instinct। শিশুর তখন কোন কিছুরই বোধ নেই, তার আমিত্বের বোধ নেই, কোন জ্ঞানের বোধ নেই। একটা ক্রিমি বা তারও নীচে একটা এ্যমিবা অবস্থায় যেভাবে হয়, এখানেও ঠিক সেইভাবেই হয়। আমরা যে খাচ্ছি, নিঃশ্বাস নিচ্ছি, সহজাত ভাবে যা কিছু করছি, বিজ্ঞান বলছে, আমাদের শরীরে যাবতীয় যা ক্রিয়া হচ্ছে, আমাদের শরীরের একটা অতি সাধারণ কেমিক্যাল প্রসেস দিয়ে হয়, যার নাম অসমোসিস (Osmossis)। যেমন একটা কাপড়ে নুনের পুটলি করে যদি জলের মধ্যে রেখে দেওয়া হয়, কিছুক্ষণ পর দেখা যাবে, জল কাপড়ের পুটলির মধ্যে ঢুকে গেছে আর নুন বেরিয়ে জলের দিকে চলে এসেছে। প্রেসার যেখানে বেশি হয়, সেখানে হাই প্রেসার থেকে লো প্রেসারের দিকে চলে যায়। লো প্রেসার সাক্ করে, হাই প্রেসার পুশ্ করে। আমাদের শরীরের রক্ত চলাচল, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া, খাওয়া-দাওয়া, সব কিছু সেই অসমোসিস দিয়ে হচ্ছে। একটা এ্যমিবা যে খাওয়া-দাওয়া করে, সেও ওই একই পদ্ধতিতেই করে। একটা শিশু জন্ম নিয়ে যা কিছু করে, ওই পদ্ধতিতেই করে। ধীরে ধীরে শিশুর চেতনা আসতে শুরু হয়, তখন জানে যে এ আমার ফুড সোর্স, এইভাবে সে মাকে চিনতে পারে। মার সাথে শিশুর যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়, এটা পুরোপুরি instinct। যদি আমরা বিচার করি, আজ পর্যন্ত আমরা যা কিছু জানি, যা কিছু জেনেছি, সবটাই কিন্তু instinct থেকে এসেছে। এমনকি আমরা যখন ইষ্টমন্ত্র জপ করছি, ঠাকুরের উপর ধ্যান করছি, এগুলো সব আসে একমাত্র instinct থেকে। একটা বেড়াল যেভাবে ইঁদুরের দিকে instinct থেকে দৌড়ে যায়, আমাদের সব কাজ ওই ভাবেই চলে। তফাৎ হল, যেহেতু আমরা উন্নত প্রজাতি, তাই অনেক বেশি জিনিস আমাদের মেমরিতে এসে যায়, সেখান থেকে আমরা বেছে নেওয়ার সুবিধাটা পেয়ে যাই। Knowledge bank থেকে বেছে নিই কোনটা কখন আমার কাজে লাগবে। ওই গুলিকে যখন সুন্দর ভাবে গুছিয়ে নেওয়া হয়, তখন সেখানে হয়ে যায়, এ আমার কাজে লাগবে, এ আমার কাজে লাগবে না, এটাকে আমরা বলি reasoning।

এ আমার কাজে লাগবে, এ আমার কাজে লাগবে না, এর উপর একটা মজার ঘটনা আছে। এক আবাসিক স্কুলের প্রধানশিক্ষকের কাছে শোনা। প্রধানশিক্ষক একদিন স্কুলের ক্যাম্পাসে রাস্থা দিয়ে যাচ্ছেন, ওনার আগে আগে হোস্টেলের একটা ছাত্র তার বাবার সাথে হোস্টেলের দিকে যাচ্ছে। ছাত্র আর বাবা দেখতে পায়নি যে তাদের পিছন পিছন হেডস্যার আসছেন। সামনের দিক থেকে একজন শিক্ষক মহারাজ আসছেন। পিছন থেকে হেডস্যার শুনছেন, বাবা ছেলেকে জিজ্ঞেস করছে, 'হ্যাঁ রে এই মহারাজকে তোর কোন কাজে লাগবে'? ছেলে বলছে, 'না'। 'ঠিক আছে চল'। ওই মহারাজ বাবা ও ছেলেকে ক্রস করে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর উল্টোদিক থেকে আরেকজন শিক্ষক মহারাজ আসছেন। বাবা ছেলেকে জিজ্ঞেস করছে, 'এনাকে তোর কাজে লাগবে'? ছেলে বলল, 'হ্যাঁ, উনি আমাদের ক্লাশ টিচার'। সঙ্গে সঙ্গে বাবা ওই মহারাজের প্রণাম করে বলতে শুরু করে দিল, 'মহারাজ আর বলবেন না, আমার ছেলে যখন বাড়ি যায়, তখন শুধু আপনারই সুখ্যাতি করে, কি বলব সব সময় আপনার কথাই বলেন। আপনি যে ওর উপর কি প্রভাব বিস্তার করেছেন'! ছেলে বলে দিয়েছে, এ আমার কাজে লাগবে, বাবাও যত পেরেছে মহারাজকে তেল মেরে গেছে। কপাল এমন যে, পিছিনে থাকার জন্য হেডস্যার দুটোই শুনেছিলেন। উনি আবার পরে মহারাজকে হাসতে হাসতে ঘটনাটা বলে দিয়েছেন। শুনে তো সেই মহারাজের মাথায় হাত।

আমাদের সবটাই instinct দিয়ে চলে। ওই instinct গুলিকে যখন সুন্দর করে গুছিয়ে নেওয়া হয়, তখন আসে –এ আমার কাজে লাগবে, এ আমার কাজে লাগবে না – এটাকে আমরা বলি reasoning। Inspiration হল যেটা instinct দিয়ে আসেনি, reasoning দিয়ে আসেনি। মন পবিত্র, শান্ত, কোথাও কোন স্বার্থ নেই, এই মন দিয়ে একটা উচ্চ চিন্তন করছে, যেমন নিউটন; সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবীর গতি নিয়ে ভাবছেন, ঠাকুর মা কালীর চিন্তন নিয়ে আছেন, রবীন্দ্রনাথ চিন্তার জগতে গিয়ে একটা কবিতার ভাবকে নিয়ে ডুবে আছেন, তখন তথ্যগুলি ভেসে আসে। সেটা instinct থেকে আসছে না, reasoning থেকেও আসছে না, ওটা নিজে থেকেই চলে আসে। ঋষিরা শান্ত, পবিত্র, নিঃস্বার্থ মনে ধ্যানের গভীরে গিয়ে যে আধ্যাত্মিক সত্যের মুখোমুখি হন, এটাই inspiration। Inspiration যে সব সময় শুধু ঋষিদেরই হবে, বৈদিক মন্ত্রের ক্ষেত্রেই হয়েছে তা নয়, যে কোন জিনিসেই হতে পারে। নিউটন যখন দেখলেন, যে শক্তিতে আপেল গাছ থেকে আপেল মাটিতে পড়ল, ওই একই শক্তি চাঁদ পৃথিবীর চারিদিকে, পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে, এটাই

inspiration। আবার বলা হচ্ছে – Inspiration মানে, কোন instinct ছিল না, instinctকে আধার করে সুন্দর সুন্দর যে যুক্তি দাঁড় করিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে তাও না, অর্থাৎ এই reasoningও ছিল না। শুদ্ধ পবিত্র মনে, যে মনে কোন স্বার্থগন্ধ নেই, সেই মন যখন শান্ত হয়ে বসে তখন নিজে থেকে একটা চিন্তা ভেসে উঠল। এই চিন্তা আমার আপনার সবারই আসতে পারে আর যিনি যত জপধ্যান করেন, মন যার যত শান্ত তার তত আসে। স্বামীজীর মত মহাপুরুষরা যে সত্যগুলিকে প্রত্যক্ষ করেছেন, সেই সত্যকে আধার করে যখন কোন কথা একজন প্রস্তুত বা অর্দ্ধ প্রস্তুত মনকে বলা হয়, তখন দেখা যায় তার জীবন হঠাৎ পাল্টে গেছে। তখন আমরা বলি, তিনি আমাদের inspired করেছেন। কিন্তু শিক্ষক যখন কোন ছাত্রকে কিছু করতে বলে, তখন আমরা সেটাকে inspiration বলি ঠিকই, এইজন্যই বলি ওই কথাটা ছাত্রের আয়ত্তের বাইরে ছিল। কিন্তু শিক্ষক ছাত্রকে এমন একটা কথা বললেন, তুমি চেষ্টা করলে অনেক দূর যাবে। শিক্ষক যে ওকে কোন বাজে কথা বলছেন তা না, he needs it। শিক্ষক কিন্তু এই কথাটা reasoningকে আধার করে বলছেন; তিনি এতদিন যত ছাত্রদের দেখেছেন, instinctive তাঁর যে study, সেখান থেকে তিনি reasoning করে কথা বলেছেন। যাকে বলেছেন, সেই কথাটা তার কাছে ওটা inspired, তার কাছে এটা একটা unusual কথা। আমরা সেইজন্য বলি সে শিক্ষকের কথাতে inspired হয়েছে। স্বামীজী এখানে যে inspirationএর কথা বলছেন, এটা হল শুদ্ধ পবিত্র মনের চিন্তার জগৎ থেকে কোন চিন্তা এসে যখন তার মনে নামে, যে কথা সে কখন কল্পনাও করতে পারে না যে, এই রকম একটা জিনিস আছে, এটাকে স্বামীজী inspiration বলছেন।

জীবনের উদ্দেশ্য instinct নয়, reasoning কোন মতেই না, inspired জিনিসগুলোকে জীবনে নিয়ে আসা। স্বামীজীর এই বইএর নামই Inspired Talks, আমরা কি তাহলে inspired হচ্ছি? কখনই না, আমাদের মন ওই ভাবে শান্ত নেই, এই ভাব আমরা নিতেই পারব না। আমাদের কাছে এর কথাগুলো instinctএর মতই যাচ্ছে, কোন instinct, যে instinct নিয়ে সাপ ব্যাঙের পিছনে ধাওয়া করছে। যতক্ষণ মানুষ ধ্যানের গভীরে না গিয়ে থাকে, ধ্যানের গভীরে না চিন্তন করে থাকে, মন শান্ত না হয়ে গিয়ে থাকে, তখন যে এক একটা কথা গিয়ে পড়বে, তাতে জীবনের পরিবর্তন হয়ে যাবে। এর খুব সুন্দর একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে, যদিও এই ঘটনা আমরা আগেও অনেকবার বলেছি; দক্ষিণেশ্বরে বৈষ্ণব গ্রন্থের উপর আলোচনা চলছিল, সেখানে ঠাকুর শুনলেন জীবে দয়ার কথা। ঠাকুর শুনে বলছেন, তুমি জীবে দয়া করার কে, ঈশ্বর জ্ঞানে জীবের সেবা। কি দারুণ কথা, সবাই শুনলেন। কিন্তু নরেন ওখান থেকে উঠে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে বলছেন, আজ একটা দারুণ কথা শুনলাম, যদি সুযোগ পাই জীবনে আমি এটা করে দেখাব। এটা হল inspired, ঠাকুর যেটা বলছেন এটাই inspired। স্বামীজী যেটা নিলেন ওটা হল inspired, বাকিরা যেটা নিচ্ছে ওটা হল instinct।

কিন্তু তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হল, but never mistake hysterical trances for the real thing. (*কিন্তু স্নায়বীয় রোগের তাড়নায় মুর্ছা-বিশেষকে সমাধি বলে ভুল করো না।*) ঠাকুরের মহাসমাধির পর কিছু কিছু ভক্তরা ঠাকুরের সমাধি অবস্থায় যা যা হত, সেগুলোকে নকল করতে শুরু করল, এই রকম করলে বুঝি আমাদেরও সমাধি হবে। সমাধি অবস্থায় ঠাকুরের হাত পা বেঁকে যেত। ভক্তরাও পরবর্তি কালে নৃত্য করছে, গান করছে আর ভাবছে ঠাকুরের সমাধিতে যদি এই রকম হাত পা বেঁকে যেত, তাহলে এই রকম করলে আমাদেরও সমাধি হয়ে যাবে। এভাবে কখনই কারুর সমাধি হয় না। ঠাকুরের ভাব সমাধি হলেই যে হাত বেঁকে যেত, তা না, আসলে ভাব সমাধিতে ওনার সমস্ত ইন্দ্রিয় কাজ করা বন্ধ করে দিত, সেই কারণে যেখানে যে অবস্থায় হাত আছে, পা আছে, সেখানেই আটকে যেত। যদি আমরা মনে করি, হাত আর পা এভাবে রাখলে সমাধি হবে, তা কি কখন হয় নাকি! ওর জন্য আমাদের ইন্দ্রিয়ের কাজ করা বন্ধ করতে হবে, মনকে রুদ্ধ করতে হবে, তবেই সমাধি হবে। সমাধি হলেই ইন্দ্রিয় আর মন আটকে যায়, কিন্তু অঙ্গ বিকৃতির সাথে সমাধির কোন সম্পর্ক নেই। সাধারণ মানুষ এগুলো বুঝতে পারে না। মনে করছে, চৈতন্য মহাপ্রভু হরিনাম করছেন, নৃত্য করছেন, সেইজন্য তাঁর ঈশ্বর দর্শন, আমিও হরিনাম আর নৃত্য করলে আমারও ঈশ্বর দর্শন হবে। কিন্তু চৈতন্য মহাপ্রভুর ওই প্রেমা ভক্তিটা তোমার কোথায়! তার জন্য আগে ভক্তির সাধনা করে করে ভক্তিকে ওই পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে।

Coincidence আর corelation দুটো আলাদা জিনিস। আমরা ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলি, যে পোজে আছে, সেই পোজেই ছবি উঠবে, এটা coincidence। সমাধি হলে ইন্দ্রিয়ের কাজ বন্ধ হয়ে যায়, মন স্তব্দ হয়ে যায়, এটা corelation। সেইজন্য স্বামীজী বলছেন, স্নায়বীয় রোগের জন্য মুর্ছা যাওয়াকে সমাধি মনে করে ভুল করো না। একেই তো মন ভোঁতা, নাচ গান করতে করতে মনটা আরও ভোঁতা হয়ে যায়, ফলে সব কিছু থেমে যায়, চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে আর মনে করে আমার বিরাট কিছু হল। একটা হল মুর্খতা, আরেকটা হল spiritual entertainment, এই দুটোর প্রভাব থেকে কিছুতেই লোকেদের আটকানো যাবে না। স্বামীজী বলছেন, যারা ধর্মের পথে আসে, তাদের শতকরা আশিজন ধুর্ত হয়ে যায়, শতকরা পনের জন পাগল হয়ে যায়, বাকি পাঁচ জন ঠিক থাকে। স্বামীজী তো কোন হিসাব করে বলছেন না, উনি আশি বলেছেন, অন্য কেউ নব্বই বলবেন। ধুর্ত কিভাবে হয়? হয় তারা stupid হয়ে যায় আর তা নাহলে spiritual entertainmentএ চলে যায়। নিজের মনের মধ্যে কিছু ভাব আসছে, ওই ভাবগুলির জন্য মনে করে আমি একজন বিরাট কিছু হয়ে গেছি। আর তা নাহলে নাচ গান করছে, মজার মজার কাহিনী বলছে, আর ভগবানকে নিয়ে পৌরাণিক কাহিনী বানিয়ে যাচ্ছে।

স্বামীজী বলছেন, It is a terrible thing to claim this inspiration falsely, to mistake instinct for inspiration. (*অনেকে মিছামিছি সমাধি হয়েছে বলে দাবি করে থাকে, স্বাভাবিক বা সহজ জ্ঞানকে সমাধি-অবস্থা বলে ভ্রম করে থাকে—এ বড় ভয়ানক কথা।*) এমনকি অনেক সময় আমরা instinctএ কাজ করি। যারা খুব ভাল খেলোয়ার তাদের সাংঘাতিক instinct থাকে। বড় বড় ডাক্তার আছেন, রোগীকে দেখলেই মাথায় ওষুধের নাম এসে যায়, রোগী মুখ না খুলতেই বুঝে যান এর কি ওষুধ দরকার। পরে রোগীকে যে প্রশ্ন করেন, ওটা verificationএর জন্য। এই instinct আর inspiration, এই দুটোর মধ্যে তফাৎ করা সাধারণ মানুষের পক্ষে খুব মুশকিল। অনেকে এই instinct দেখে মনে করে এটা inspiration, আর মনে মনে ভাবতে থাকবে, তার উপর ঠাকুরের কত কৃপা, কিন্তু না, দুটো আলাদা।

এই তিনটে জিনিস চলে, instinct, intelligent আর inspiration। বেড়াল যখন ইঁদুর ধরে, instinct দিয়ে ধরে। বড় বড় ক্রিকেটাররা, ওরা instinctএর উপর চলে, প্র্যাক্টিস করে করে instinct develop করে গেছে। শিকারী যখন শিকার করে তখন ওটা instinct আর তা নাহলে জন্মগত। সেখান থেকে ধীরে ধীরে আসে intelligence। Intelligenceকে culture করতে হয়। Intelligence যত বাড়ে instinct তত কমে। আমাদের মস্তিষ্কে এ্যমিগডালা আছে, এ্যমিগডালার কাজ instinctকে নিয়ে চলে। যত টিকটিকি, সাপ জাতীয় প্রাণী আছে, এদের মস্তিষ্ক বলতে এ্যমিগডালা। যেমন যেমন প্রজাতিগুলি বিবর্তনের মাধ্যমে এগিয়ে যায় তেমন তেমন এ্যমিগডালার ভূমিকা কমতে থাকে। এ্যমিগডালা শুধু জানে, আমাকে খেতে হবে আর আমাকে বাঁচতে হবে, আর জানে এ আমার শত্রু, এ আমার থেকে দুর্বল, একে আমি মেরে ফেলতে পারব। বিপরীত ভাবে, এ আমার শত্রু কিন্তু এর সাথে পারব না, এর থেকে আমাকে পালাতে হবে। আরেকটা তার জানা আছে, এর সাথে মেটিং করলে আমার সন্তান হবে। খাদ্য, পালানো, লড়াই করা আর সন্তান উৎপাদন, এই চারটে ছাড়া এমিগডালার কাছে আর কিছু নেই। পঞ্চম বলে এদের কিছু নেই, নিজের সন্তানের পরিপালন করার ক্ষমতাও এদের নেই।

ক্রমবিবর্তনে উন্নতির সাথে সাথে এ্যমিগডালার ভূমিকাটা কমতে থাকে, যেমন গরু, মোষ, এরা কিছু দিন সন্তান পালন করতে পারে। মানুষের ক্ষেত্রে যত রকম অনুভূতি তার কাছে আসছে, তার শতকরা সাতানব্বই ভাগ উচ্চ মস্তিষ্কে যায়, বিচার করে করে সব কিছু করে, শতকরা এক ভাগের মত এ্যমিগডালাতে যায়। কিন্তু এ্যমিগডালা যদি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়, মানুষ মরে যাবে। মানুষের আয়ুর সাথে এ্যমিগডালার একটা সম্পর্ক আছে। আয়ু যত কমতে থাকে এ্যমিগডালার সাইজটাও ক্রমশ ছোট হতে থাকে। যেদিন পুরোপুরি এ্যমিগডালা মিলিয়ে যাবে, মানুষও সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে। হঠাৎ কেউ যদি এখানে সাপ সাপ বলে চেঁচিয়ে ওঠে, আমরাও সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে চমকে উঠব, এটা এ্যমিগডালার জন্য হয়। হঠাৎ বোমা ফাটলে আমরা চমকে উঠি, আসলে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছি, এই চেষ্টাটা এ্যমিগডালার জন্য হয়। মিলিটারিতে যারা কাজ করে, তাদের এ্যমিগডালা খুব তীক্ষ্ণ হয়, তা নাহলে ওরা অনেক পরিস্থিতিতে লড়াই

করতে পারবে না। Instinct মানে এ্যমিগডালা সক্রিয়, intelligence মানে হায়ার ব্রেন সক্রিয়। Inspirationএ যখন যায় তখন এই দুটোই চাপা পড়ে যায়, এ্যমিগডালাও চলে যায়, হায়ার ব্রেনটাও চলে যায়। বিজ্ঞানে প্রানীদের তিনটে মস্তিষ্কের কথা বলা হয়, একটা হল এ্যমিগডালা, যারা দ্বারা বেসিক ফাংশানগুলো হয়ে থাকে, তারপরে যেটা থাকে একটু ছোট অংশ, সাধারণ ভাবে কুকুর, গরু, মোষ এদের থাকে, আর মানুষের ক্ষেত্রে থাকে বড় অংশ। মানুষের তিনটে মস্তিষ্কই থাকে, বিবর্তনের মাধ্যমে উন্নত হয়ে মানুষ হয়েছে বলে তাদের তিনটে ব্রেনই থাকে। কিন্তু আধ্যাত্মিকতায় যখন চলে যায়, তখন আজকের দিনে নিউরো বিজ্ঞান বলতে যেটা জানি, সেটাকে পার করে যায়। নামকরা ব্যাটসম্যান যখন খুব ভালো ক্রিকেট খেলছে, বুঝতে হবে তার এ্যমিগডালা খুব শার্প –অনুশীলনের মাধ্যমে করা হয়েছে। যিনি খুব সুন্দর কবিতা লিখছেন, এনাদের intelligence খুব superior।

আমরা সাধারণ মানুষ, আমরা intelligenceকে ভাবি ঈশ্বর প্রদত্ত প্রতিভা, সবটাই ঈশ্বরের দেওয়া, আমার প্রতিভা নেই, সেটাও ঈশ্বরেরই দেওয়া, যার প্রতিভা আছে সেটাও ঈশ্বরেরই দেওয়া। ঈশ্বর কমন, তাহলে ঈশ্বরের নাম নেওয়ার দরকার কি! আমি হয়ত কবিতা লিখতে পারি না, আমি হয়ত এই কাজ করতে পারি না, ফলে আমাদের মনে হয় এই জিনিসটাই inspiration, এই বিরাট ভুলটা আমাদের হয়ে থাকে। অনেক সময় দেখা যায়, আমার সাথে কেউ দেখা করতে এলো, সে হয়ত কিছু বলেনি, কিন্তু হঠাৎ আমার মুখ থেকে কিছু কথা বেরিয়ে গেল, তখন দেখা গেল যে, সত্যিই তার এই ধরণের একটা সমস্যা চলছে। এই ধরণের কিছু instinct একটা প্রায়ই হয়ে যায়, আমরা এটাকে মনে করি inspiration, কিন্তু inspiration আলাদা জিনিস। স্বামীজী এখন এগুলোকে নিয়ে পর পর বলবেন।

বলছেন, There is no external test for inspiration, we know it ourselves; our guardian against mistake is negative, -the voice of reason. (*বাইরের কোন লক্ষণ দেখে নির্ণয় করবার উপায় নেই –যথার্থ সমাধি হয়েছে কি না, নিজে নিজেই তা টের পাওয়া যায়। তবে যুক্তিবিচারের সাহায্য নিলে ভুলভ্রান্তি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, সুতরাং একে ব্যতিরেকী পরীক্ষা বলা যেতে পারে।*) বাইরের কোন লক্ষণ দেখে inspirationকে বোঝার কোন পথ নেই, অন্য দিকে instinct ধরা পড়ে যাবে, ব্যাটসম্যানের বয়স হয়ে গেলে আর আগের মত খেলতে পারে না, কারণ instinct ধীরে ধীরে কমে আসে, আর intelligencকে সব সময় ধরা যায়, এর লেখা ভাল, এর লেখা খারাপ। কিন্তু inspirationকে ধরার কোন পথ নেই, যার হয় একমাত্র সেই জানে আমার inspiration কেমন আছে। আর inspiration ভুল হচ্ছে না ঠিক হচ্ছে, বাইরের লোকের পক্ষে এটাকে যাচাই করারও কোন পথ নেই। যিনি পারেন, তিনি পারেন যুক্তি দিয়ে।

ঠাকুর বলছেন, সময় না হলে কিছু হয় না, কিন্তু শুনে রাখতে হয়। কারণ যে কোন জ্ঞান মানুষের ভিতর থেকেই আসে, বাইরে থেকে কিছু আসে না। আমরা সমগ্র বেদ পড়ে নিতে পারি, সব উপনিষদ পড়ে থাকতে পারি, তার সাথে এই বাবাজীর, এই স্বামীর যতই লেকচার শুনে থাকি না কেন, কিছুতেই কিছু হবে না। ভাল ভাবে একটু সময় কাটানো ছাড়া আর কিছু হবে না। জ্ঞান সব সময় আসবে ভিতর থেকে, তার জন্য খাটতে হবে আমাদের। খেটে খেটে জ্ঞান আসার পর দেখতে হবে এই জ্ঞানটা ঠিক কি ভুল। এর যাচাই হবে এতদিন আমরা যা শুনে এসেছি, পড়ে এসেছি সেটা দিয়ে। ওখান থেকে আসছে যুক্তিবিচার করার রসদ। আগেকার দিনে স্কুলগুলিতে কম ছাত্র থাকত, ক্লাশে মাস্টার একটা অঙ্ক করতে দিলেন। অঙ্ক করে ছাত্র দৌড়ে গিয়ে মাস্টারকে দেখাত, মাস্টার দেখে বলে দিতেন ঠিক না ভুল। আধ্যাত্মিক জীবনে ঠিক এইভাবে অঙ্ক কষার মত, আর মাস্টারের কাছে গিয়ে বলতে হবে এটা ঠিক না ভুল। এই মাস্টারমশাই হলেন যুক্তিবিচার। যুক্তিবিচার আসে স্বাধ্যায়, অর্থাৎ শাস্ত্র অধ্যয়ন থেকে, আর আচার্যদের কাছে যত শাস্ত্রের কথা শুনেছি, যত সাধুসঙ্গ করেছি, সেখান থেকে। মাস্টারমশাই তখন হয়ত বলবেন, বাপু, তোমার যে অনুভূতি হয়েছে, এই ধরণের অনুভূতি তো আগে কোথাও হয়নি, তাই কিছু গোলমাল আছে। যুক্তিবিচার ঘোড়ার লাগাম, দুর্দান্ত ঘোড়াকে তার লাগাম টেনে রাখে। বেদ বেদান্ত আর আমাদের যত শাস্ত্র আছে, এরা ওই লাগামটাকে টেনে রাখে, যাতে আমাদের কোন গোলমাল না হয়ে যায়।

যারা কোন শাস্ত্র বা বই পড়েননি, তারা কি করে বুঝবে, যেমন ঠাকুর? ঠাকুরকে বলছেন, মশাই আপনি কি জানেন, আপনি তো কিছুই পড়েননি। ঠাকুর বলছেন, আমি শুনেছি কত। ঠাকুরে যেখানে বড় হয়েছেন, সেখানে ভক্তির চর্চা ছিল, শাক্ত মতে সাধনা ছিল, তিনি এগুলো সবই জানতেন। কিন্তু বেদান্তের কিছুই জানতেন না, কিছুই শোনেননি। এবার তাঁর হয়ে গেল নির্বিকল্প সমাধি। এরপরে তাঁর যে অনুভূতিগুলি আসবে সেগুলো তিনি কি করে জানবেন যে এটা ঠিক না ভুল? এরপর তিনি তোতাপুরীকে এগারো মাস দক্ষিণেশ্বরে আটকে রাখলেন, যতক্ষণ আমাকে বেদান্ত না শেখাচ্ছ, আমি তোমাকে যেতে দেবো না। ভৈরবী এসে তন্ত্র মতে যত রকম সাধনা হতে পারে, সব সাধনার রহস্য হাতে কলমে করিয়ে জানিয়ে দিলেন। আমরা মনে করছি ভৈরবী, তোতাপুরীরা এসে ঠাকুরকে দিয়ে সাধনা করাচ্ছেন, কিন্তু তা কখনই নয়, সাধনা ঠাকুর নিজেই করছেন। কিন্তু ওই সাধনাগুলি ঠিক কিনা, যে অনুভূতিগুলি আসছে, সেগুলো ঠিক কিনা, সেটা শাস্ত্র বর্ণিত হতে হবে। তোতাপুরী, ভৈরবী ব্রাহ্মণী, বিশেষ করে তোতাপুরী এসে ওই জিনিসগুলোর যোগান দিয়ে দিলেন। পরে ঠাকুর যা কিছু অনুভূতি পাবেন, সব কিছু ওই দিয়ে যাচাই করে নিতে পারবেন। এই যুক্তিবিচার যদি না থাকে, জ্ঞান যদি না থাকে, তাহলে সব কিছু এলেমেলো হয়ে যাবে, হতে বাধ্য। গ্রামে কোথায় কোন মনসতলায়, শিবের থানে, মেয়েরা নাচ করছে, ভর হচ্ছে, ভরে করে থাকার সময় একে তাকে কত কথা বলে দিচ্ছে। আমাদের কোন শাস্ত্রে এইসব ভরের কথা আছে? কোথাও নেই। তাহলে কোথাও একটা মারাত্মক ভুল হয়ে যাচ্ছে। ঠাকুরকে কোথাও দেখছি না যে তাঁর ভর হচ্ছে, শ্রীমার কোথাও ভর হতে দেখছি না। কিন্তু ঠাকুর, মা, স্বামীজী কোন কিছুকে ভাঙতে আসেননি, ভাঙতে শুরু করলে সবটাই ভাঙা হয়ে যেত। যেমন আছে তেমনই থাক, পরে যার যেমন যুক্তিবিচার, যার যেমন understanding ওটাকে নিয়ে নেবে। তখন বুঝবে এগুলোতে কিছু একটা গোলমাল আছে।

ওই গোলমালটা যাতে নিজের জীবনে না হয়ে যায়, সেইজন্য শাস্ত্র পড়া। আর যাদের ভর হচ্ছে তাদের এটা এক ধরণের স্নায়বিক বিকার, স্বামীজীও ক্লাশে বলছেন, hysterical trance। যার হচ্ছে সেও ভাবছে, আমার বিরাট কিছু হচ্ছে। কিন্তু তার যদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করা থাকত, গুরুসঙ্গ করা থাকত, এই ভুল তার হত না। সেইজন্য স্বামীজী বলছে, এই voice of reasoningই আমাদের রক্ষা করে। All religion is going beyond reason, but reason is the only guide to get there. (*ধর্মলাভ মানে যুক্তিতর্কের বাইরে যাওয়া, কিন্তু ঐ ধর্মলাভ করবার পথ একমাত্র যুক্তিবিচারের ভিতর দিয়ে।*) ধর্মকে কক্ষণ কোন যুক্তিতর্কে দাঁড় করানো যাবে না, ঠাকুরের অনুভূতিগুলিকে কখনই কোন যুক্তিতর্ক দিয়ে দাঁড় করানো যাবে না। স্বামীজীকে একজন খ্রীশ্চান ফাদার এসে বলছেন, 'বাইবেলে যে এই মিরাকেলটা আছে, it has a scientific explanation'। স্বামীজী হেসে বলছেন, 'যদি scientific explanation থাকে তাহলে মিরাকেল থাকল কোথায়! মিরাকেল মানেই তার কোন explanation নেই, আপনি তো নিজেই নিজেকে contradict করছেন, একদিকে বলছেন এটা মিরাকেল, অন্য দিকে এর scientific basisএর কথা বলছেন'। একদিকে বলছেন ধর্ম, অন্য দিকে বলছেন scientific, ধর্ম কি করে scientific হবে। যে জিনিসটা যুক্তিতর্কের পারে চলে গেছে, সেটা কিসের scientific! সূর্যে যেমন দিন আর রাত হয় না, ঠিক তেমনি ধর্মে যুক্তি অযৌক্তিক বলে কিছুই হয় না। আমরা যখন বলছি ধর্ম যুক্তির উপর চলে না, তার মানে ধর্মকে কখনই অযৌক্তিক বলা যায় না, ধর্ম যুক্তি অযৌক্তিকের পারে। যেমন সূর্যে রাত হয় না, রাত হয় না বলে দিনও হয় না। অন্ধকার নেই বলে আলোও নেই। আমরা মনে করছি সূর্যে সব সময় আলো আছে। সূর্যে যদি কেউ বাসিন্দা থেকে থাকে, সে শুনলে অবাক হয়ে যাবে, আলো মানে? আলোটা আবার কি জিনিস। ওটাতেই সব সময় সে থাকছে, তার কাছে আলোও যা, অন্ধকারও তাই। ঠিক সেই রকম ধর্মে যুক্তি অযৌক্তিক বলে কিছু হয় না। কিন্তু ধর্মে যাওয়ার জন্য যুক্তিবিচারকে ধরে ধরেই এগোতে হবে। বেদান্ত শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতির কথা বলা হচ্ছে, সেখানেও যুক্তিকে বাদ দেওয়া হচ্ছে না, যুক্তিকে রাখতেই হবে, যুক্তি ছাড়া কিছু হবে না। একটা স্তরে গিয়ে এই যুক্তি বিচারকে ছেড়ে দিতে হবে, আগে আমরা যেমন পোলভল্টের উপমা দিয়েছিলাম। লাফ দেওয়ার জন্য একটা লাঠির সাহায্য নিতে হয়, কিন্তু শেষ মুহূর্তে লাঠিটাকে ছেড়ে দিতে হয়।

দেহ ও মনের পৌর্বাপর্বিকতা - এই ক্রমটাও মায়া - এই দুটোরই পারে যাওয়াটাই উদ্দেশ্য

এবার বলছেন, Instinct is like ice, reason is the water, and inspiration is the subtlest form or vapour; one follows the other. (*সহজাত জ্ঞান যেন বরফ, যুক্তিবিচার যেন জল, আর অলৌকিক জ্ঞান বা সমাধি যেন বাষ্প –সবচেয়ে সূক্ষ্ম অবস্থা। একটার পর একটা আসে।*) আমরা intelligence যেটা বললাম সেটাকে স্বামীজী reasoning বলছেন, intelligenceকে যখন apply করা হয় তখন ওটা reasoning হয়ে যায়। Instinct, intelligence আর inspiration, এই তিনটেকে বোঝানর জন্য স্বামীজী বরফ, জল ও বাষ্পের উপমা দিচ্ছেন, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়ে যাচ্ছে।

Everywhere is this eternal sequence, unconsciousness, consciousness, intelligence; matter, body, mind; and to us it seems as if the chain began with the particular link we first lay hold of. (*সব জায়গাতেই এই নিত্য পৌর্বাপর্ব বা ক্রম রয়েছে –যেমন অজ্ঞান, সংজ্ঞা বা আপেক্ষিক জ্ঞান ও বোধি; জড় পদার্থ, দেহ ও মন। আর আমরা এই শৃঙ্খলের যে পাবটা প্রথম ধরি, সেইটা থেকেই শিকলটা আরম্ভ হয়েছে –আমাদের কাছে এই রকম বোধ হয়। অর্থাৎ কেউ বলে – দেহ থেকে মনের উৎপত্তি, কেউ বা বলে থাকে মন থেকে দেহ হয়েছে।*) আমাদের জীবনে intelligence, matter, consciousness, এগুলো সব chainএর মত চলছে। স্বামীজীর এটা খুব favourite থিওরি, রাজযোগেও তিনি এই থিওরি এনেছেন। আমরা এই শৃঙ্খলের প্রথম যে লিঙ্কটাকে ধরছি, মনে করছি এখান থেকে শিকলটা শুরু হয়েছে। যেমন পদার্থ ও মন এই দুটোর একটা শিকল চলছে, যে পদার্থকে প্রথম ধরবে সে তারপর দেখবে মন আসছে, তখন সে বলবে পদার্থ থেকে মন এসেছে। যে মনকে প্রথম ধরবে, সে মনে করবে মন থেকে পদার্থের সৃষ্টি। বিজ্ঞানীরা পদার্থ নিয়ে পড়াশোনা করেন, তাঁরা বলবেন পদার্থ থেকে মন এসেছে। সেইজন্য স্বামীজী বলছেন, এগুলোর কোন শেষ নেই, যিনি যেটাকে প্রথম ধরবেন, তিনি মনে করবেন তাঁর কাছে মনে হবে পরেরটা এর থেকে এসেছে। বৈজ্ঞানিকদের কাছে তাই প্রথমে পদার্থ, সেখান থেকে intelligence, সেখান থেকে super conscious, ঈশ্বর। কিন্তু যাঁরা ঈশ্বরের ভক্ত, যেমন ঠাকুর, তিনি বলবেন, ঈশ্বর সবার আগে, সেখান থেকে intelligence, সেখান থেকে পদার্থ। আমি আগে কোনটাকে ধরছি, সেই অনুসারে পরেরটা আসবে।

কিন্তু যদি বলি, এর sequenceটাই এই রকমই, এটা তাহলে ভুল বলা হবে। চিন্তনের জগতে এটা স্বামীজীর একটা বিরাট অবদান। স্বামীজী বলছেন, Arguments on both sides are of equal weight, and both are true. (*উভয় পক্ষেই যুক্তির সমান মূল্য, আর উভয় মতই সত্য।*) যারা বলে ঈশ্বর থেকেই সমস্ত কিছুর সৃষ্টি হয়েছে, বা যারা বলে মন থেকেই মানুষ ভগবানের দিকে যায়, এর উপর যখন এরা যুক্তি দেয় তখন সবার সব যুক্তিরই একই রকম ওজন। সেইজন্য আমরা কখনই বলতে পারব না, এ বেশি ঠিক, ও কম ঠিক। কিন্তু স্বামীজী বলছেন, We must reach beyond both, to where there is neither the one nor the other. These successions are all Maya. (*আমাদের দুটোরই পারে যেতে হবে –এমন জায়গায় যেতে হবে, যেখানে দেহ বা মন কোনটিই নেই। এই যে ক্রম –এও মায়া।*) আমাদের এই দুটোরই পারে যেতে হবে, যেখানেই দুই আছে, এই দুইএর পারে যেতে হবে। দুইএর পারে কি এক? না, দুইএর পারে এক হয় না। কারণ এক বললেই দুইএর বোধ থাকবে। এই এক-দুইএর পারে, ওই অবস্থায় যাওয়াটাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য। এই ক্রমটাও মায়া।

স্বামীজী আসলে আমাদের বলতে চাইছেন, কিভাবে আমরা আধ্যাত্মিক হব। মনকে একাগ্র কর, একাগ্র মন দিয়ে শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করার পর তার intelligence বাড়ল, যুক্তিবিচার ব্লেডের মত তীক্ষ্ণ হয়ে গেল, এরপর যে আবর্জনাগুলো আছে, সেগুলোকে কেটে পরিষ্কার করে দেবে। সেখান থেকে তুমি এবার আরও সূক্ষ্ম জগতে ঢুকে যাবে, যেটা আধ্যাত্মিকতা। ওখানে পৌঁছে গিয়ে দেখতে পাবে, আরে! এখান থেকেই তো সব কিছু বেরিয়েছে। সেইজন্য অচেতন, চেতন, অতিচেতন যা কিছু আছে, সেই অতিচেতন থেকেই চেতন বেরিয়েছে, সেই চেতন আরও গাঢ় হয়ে গেলে অচেতন হয়ে যায়। এত কিছু বলা এই জন্যই, সবটাই এক অপরের সাথে জুড়ে আছে। উদ্দেশ্য এই সব কিছুর পারে গিয়ে সেই অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, যেটা এক দুইয়ের পারে। কারণ অদ্বৈত ছাড়া যাবতীয় যা কিছু আছে, এমনকি ঈশ্বরের পূজা, যেখান থেকে স্বামীজী

আজকের ক্লাশ শুরু করলেন, সেটাও মায়া। এই মায়ার পারে যাওয়াটাই জীবনের উদ্দেশ্য। মায়ার পারে যে সবাই চলে যাবে, তা নয়, যার ভোগের ইচ্ছা আছে, সে বলবে আমার আবার জন্ম নিতে কোন আপত্তি নেই, তার মানেই তার এখনও ভোগের ইচ্ছা আছে। ঠাকুরকে একজন বলছে, আমার তো পুনর্জন্মে ভয় নেই। ঠাকুর তাকে বলছেন, তুমি বলো না, তোমার ভোগের ইচ্ছা আছে। যে বলছে আমার আর ভোগের ইচ্ছা নেই, সেই বলতে পারে, আমি মায়ার পারে যেতে চাই। মায়ার পারে যাওয়াটাই ঠিক ঠিক ধর্ম, এটাই আসল আধ্যাত্মিকতা। এই জায়গা থেকে অগ্রসর হয়ে স্বামীজী আবার বলছেন –

Faith আর beliefএর তফাৎ

Religion is above reason, supernatural. (*ধর্ম যুক্তিবিচারের পারে, ধর্ম অতি-প্রাকৃত।*) যেটা আগে বলা হল, আধ্যাত্মিক জ্ঞান মানে এগুলোর পারে চলে যাওয়া, ধর্ম অতি-প্রাকৃত। Faith is not belief, it is the grasp on the Ultimate, an illuminiation, (*বিশ্বাস-অর্থে কিছু মেনে নেওয়া নয়, বিশ্বাসের অর্থ –সেই চরম পদার্থকে ধারণা করা, বিশ্বাস হৃদয়-কন্দর উদ্ভাসিত করে দেয়।*) স্বামীজী যখন প্রথমের দিকে ঠাকুরের কাছে আসছিলেন, তখন অন্ধ বিশ্বাস নিয়ে কথা হতে ঠাকুর বলছেন, চোখ খোলা বিশ্বাস আর অন্ধ বিশ্বাস হয় নাকি! Faith আর belief, দুটোতে তফাৎ আছে। Faith হল, চিন্তা-ভাবনা করে করে একটা জিনিসকে জানল, যেমন আমরা ঠাকুরের কাছে এসেছি, বইটই পড়ে, গুরু ও মহারাজদের কাছে ঠাকুরের কথা শুনে শুনে আমাদের ঠাকুরের প্রতি একটা বিশ্বাস হয়ে গেছে। এই বিশ্বাসটা belief না, এই বিশ্বাসটা faith। কিন্তু সাধারণ মানুষরা, গ্রামগঞ্জের লোকেরা পরিবারের লোকদের দেখে দেখে ভিতরে একটা সংস্কার তৈরী হয়ে গেছে, সেখান থেকে তারা ঠাকুর দেবতা মানছে, মনে করছে, তিনি আমাদের ভাল করবেন, এটা হল belief। বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা দুটোতে এই তফাৎ হয়ে যায়। শ্রদ্ধাটাও বিশ্বাস, কিন্তু শ্রদ্ধার পিছনে একটা যুক্তিবিচার থাকে, কিন্তু বিশ্বাসের ক্ষেত্রে না জেনে, না শুনে এমনিই বিশ্বাস করে নিচ্ছে। দুটোই অন্ধ বিশ্বাস, এই অর্থে অন্ধ বিশ্বাস কারণ দুটোর মধ্যে কোনটাতেই কিন্তু জ্ঞান হয়নি।

এরপরেই স্বামীজী আবার বলছেন, First hear, then reason and find out all that reason can give about the Atman; let the flood of reason flow over It, then take what remains, (*প্রথমে সেই আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে শোন, তার পর বিচার কর –বিচার দ্বারা উক্ত আত্মতত্ত্ব কতদূর জানতে পারা যায় তা দেখ; এর উপর দিয়ে বিচারের বন্যা বয়ে যাক –তারপর বাকি যা থাকে সেইটুকু গ্রহণ কর।*) স্বামীজী শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতি বা শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের কথা বলছেন। আগে আত্মতত্ত্বের কথা শুনে যাও, শুনে বিচার কর, বিচার করে করে যখন একেবারে ছাপিয়ে যাবে, এরপর যা থাকবে সেটাই আসল। If nothing remains, thank God you have escaped a superstation, (*যদি কিছু বাকি না থাকে, তবে ভগবানকে ধন্যবাদ দাও যে, তুমি একটা কুসংস্কারের হাত থেকে বেঁচেছ।*) শাস্ত্র পড়ে, শাস্ত্র শুনে তোমার যদি মনে হয় সবটাই মিথ্যা, তাতেও কোন দোষ নেই, অন্তত তুমি superstation থেকে বেঁচে গেলে। আমেরিকাতে একজন মহারাজের ক্লাশে ওখানকার একজন মহিলা আসতেন। উনি অনেক দিন ধরে মহারাজের ক্লাশ শুনেছেন, হঠাৎ উনি ক্লাশে আসা বন্ধ করে দিলেন। মহারাজ ভাবছেন, মহিলাটির কি হল। অনেক দিন পরে মহিলাটি একটা চিঠি লিখেছেন, আমি তো ঠাকুরের কাছে শ্রদ্ধা ভক্তি নিয়েই এসেছিলাম, কিন্তু আপনার কথাগুলো শোনার পর আমার মনে হল, যীশুই সত্য, আমি তাই আবার আমার মাতৃধর্মে ফেরত চলে এসেছি। ঠিকই আছে, কোন ভুল নেই এতে, এটাই স্বামীজী এখানে বলতে চাইছেন। যদি শাস্ত্র আদি পড়ে তোমার মনে হয়, এগুলো সব ভুল, তাও অনেক ভাল। কারণ তা নাহলে তুমি একটা অন্ধ বিশ্বাসকে ধরে থাকতে, তুমি একটা দুর্বল মনের মানুষ হয়ে যেতে। একজন সত্যিকারের বলিষ্ঠ মনের নাস্তিক হওয়া অনেক ভাল, একটা দুর্বল আস্তিক হওয়ার থেকে।

আত্মার ব্যাপারে জেনে নিয়ে আত্মাকেই দৃঢ়ভাবে ধরে রাখো

When you have determined that nothing can take away the Atman, that It stands every test, hold fast to this and teach it to all. (*আর যখন তুমি স্থির সিদ্ধান্ত করবে যে,*

কিছুই আত্মাকে উড়িয়ে দিতে পারে না, যখন আত্মা সর্বপ্রকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে, তখন তাকে দৃঢ়ভাবে ধরে থাকো এবং সকলকেও ঐ আত্মতত্ত্ব শিক্ষা দাও।) বিচার করে করে যখন বুঝে গেলে আত্মাই সত্য, এবার ঝাঁপিয়ে পড়, আমি এটাই চাই, আর অপরকেও এই ব্যাপারে শিক্ষা দাও, যাতে তারাও বলতে পারে, আমি এটাই চাই। যদি মনে হয় এগুলোতে কিছুই নেই, তাহলে ছেড়ে দাও, ভালই হল, দুর্বল হওয়া থেকে তুমি অন্তত বেঁচে গেলে। স্বামীজী কত বড় মাপের আচার্য হতে পারেন, এগুলো না পড়লে বোঝা যাবে না, তাঁর ধারে কাছে কেউ যেতে পারবে না। যিনি খোলাখুলি বলে দিচ্ছেন, তুমি শাস্ত্র পড়, পড়ে বিচার কর, বিচার করে যদি তোমার মনে হয় সবটাই ফাঁক্কা, ছেড়ে দাও, খুব ভাল হল যে, তুমি একটা অন্ধ বিশ্বাস থেকে বেঁচে গেলে। একটা মানুষের কোন মাপের শাস্ত্রে conviction হতে পারে, যখন এই ধরণের কথা বলতে পারেন।

Truth cannot be partial; it is for the good of all. Finally, in perfect rest and peace meditate upon It, concentrate your mind upon It, make yourself one with It, (*সত্য কখন পক্ষপাতী হতে পারে না, এতে সকলেরই কল্যাণ হবে। সবশেষে স্থিরভাবে ও শান্তচিত্তে তাঁর উপর নিদিধ্যাসন কর বা তাঁর ধ্যান করে। তোমার মনকে তাঁর উপর একাগ্র কর, ঐ আত্মার সঙ্গে নিজেকে একভাবাপন্ন করে ফেলো।*) স্বামীজী ওটাই বলছেন, যদি সত্য হয়, তাহলে তুমিও পাবে, অন্যেও পাবে। অনেক ধর্ম আছে, যেমন জুহিদিরা বলে, we are the chosen of God, খ্রীশ্চানরা বলে, আমরা স্বর্গে যাবো, অন্যরা যাবে না, ইসলাম ধর্ম বলে, ইসলাম ধর্মের বাইরে যারা আছে তারা সবাই নরকে যাবে। তাহলে তো তোমার ধর্মে গোলমাল আছে, তার মানে তোমাদের সত্যটা সবার জন্য নয়। যে সত্য সবার জন্য নয়, ওই সত্য সত্যই নয়। একবার যখন বুঝে গেলে আত্মাই সত্য, এবার আত্মার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়। যখন জেনে গেলে আত্মা সত্য, যখন জেনে গেলে ঠাকুর সত্য, এবার সব ছেড়ে ওতে নেমে পড়, ওখানে বসো, শরীর, মন, প্রাণ সব সংযত করে ওই একটি মাত্র চিন্তায় মনকে একাগ্র করো, ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু।

Then no speech is needed; silence will carry the truth, (*তখন আর বাক্যের কোন প্রয়োজন থাকবে না; তোমার ঐ মৌনভাবই অপরের ভিতর সত্য তত্ত্ব সঞ্চার করবে।*) তোমার আর কথাও বলতে হবে না, চুপচাপ মৌন হয়ে থাকলেও লোকেরা এটা জেনে যাবে। আমাকে আর কারুর সাথে কথা বলতে হবে না, জ্ঞান নেওয়ার জন্যও না, জ্ঞান দেওয়ার জন্যও না। তুমি এবার নিজের শক্তিকে বাঁচাও, Do not spend your energy in talking, but meditate in silence; and do not let the rush of the outside world disturb you, (*বৃথা বাক্যালাপ করে শক্তিক্ষয় করো না, চুপচাপ ধ্যান কর। আর বহির্জগতের গণ্ডগোল যেন তোমাকে বিক্ষুব্ধ না করে।*) এখন স্মার্ট ফোন, ইন্টারনেট, ফেসবুবক, হোয়াটস্ আপের যুগ, এগুলোই হল rush of the outside world, এই যত rush of the outside world আসবে, তত আমরা লক্ষ্যে পৌঁছানো থেকে পিছিয়ে যাব। খুব সহজ ব্যাপার, দুধকে দই হবার জন্য বসানো হয়েছে, আর কিছুক্ষণ পর পর গিয়ে আমি বার বার দুধকে নাড়িয়ে দিচ্ছি, এরপর কি করে দই জমবে! একাগ্র মন হল, দই জমানো, একেবারে শান্ত, কোন রকম নড়াচড়া নেই, rush of the outside world, দইকে জমতে দেবে না।

When your mind is in the highest state, you are unconscious of it. Accumulate power in silence and become a dynamo of spirituality, (*যখন তোমার মন সর্বোচ্চ অবস্থায় উপনীত হয়, তখন তুমি তা জানতে পার না। চুপচাপ থেকে শক্তিসঞ্চার কর, আর আধ্যাত্মিকতার বিদ্যুদাধার হয়ে যাও।*) আগেও স্বামীজী পবিত্রতা ও মৌনতাকে নিয়ে বলেছিলেন, এখানে আবার নিয়ে আসছেন। যদি কেউ নিজের এবং সমাজের মঙ্গল করতে চায়, তাহলে আগে তাকে শাস্ত্র পড়তে হবে, পড়ার পর দৃঢ় বিশ্বাস আনতে হবে, ঠাকুরই বস্তু আর বাকি সব অবস্তু, আর এরপর মৌন হয়ে গিয়ে শুধু চিন্তন করুক, ধীরে ধীরে সে একটা শক্তির আধার হয়ে যাবে। এবার তাকে তার শক্তি কাউকে দেখাতেও হবে না, যারাই তার কাছে আসবে বুঝতে পারবে, এই জায়গাতে একটা জমাট শক্তি আছে।

What can a beggar give? Only a king can give, and he only when he wants nothing himself. (*ভিখারী আবার কি দিতে পারে? রাজাই কেবল দিতে পারে—সেও আবার তখনই দিতে*

পারে, যখন সে নিজে কিছু চায় না।) ইদানিং আমরা সবাইকে উপদেশ দিতে চাইছি, সবাইকে শিক্ষা দিতে চাইছি। কি করে দেবে! কাঙালী কখন কি কাউকে কিছু ভিক্ষা দিতে পারে! এক রাজা যদি পারে, তাও সে যদি নিজে কিছু না চায়। সেই ব্যক্তিই অপরকে শিক্ষা দিতে পারবেন, যদি তিনি ওই শক্তি ও জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন।

এই সংসারে তুমি ভগবানের অছি মাত্র

Hold your money merely as custodian for what is God's. Have no attachment for it. Let name and fame and money go; they are a terrible bondage. Feel the wonderful atmosphere of freedom. You are free, free, free! Oh, blessed am I! Freedom am I! I am the Infinite! In my soul I can find no beginning and no end. All is my Self. Say this unceasingly, (*তোমার যা টাকাকড়ি, তা তোমার নিজের মনে করো না, নিজেকে ভগবানের ভাণ্ডারী বলে মনে কর। ধনের প্রতি আসক্ত হয়ো না। নামযশ টাকাকড়ি সব যাক, এগুলি সব যাক, এগুলি সব ভয়ানক বন্ধন। মুক্তির অপূর্ব পরিবেশ অনুভব কর। তুমি তো মুক্ত, মুক্ত, মুক্ত; অবিরত বলো –আমি ধন্য, আমি আনন্দময়, আমি মুক্তস্বরূপ, আমি অনন্তস্বরূপ, আমার আত্মাতে আদি নেই, অন্ত নেই; সবই আমার আত্মস্বরূপ।*) যদি কারুর কাছে টাকা পয়সা থাকে, ঠাকুরও বলতেন, তুমি এর অছি মাত্র, এই টাকা-পয়সা তোমার না। টাকা-পয়সা ঠাকুরই তোমাকে দিয়েছেন, তোমার যে আদরের সন্তান, সেটাও ঠাকুরই তোমাকে দিয়েছেন, বিদ্যা, সেটাও তোমাকে ঠাকুরই দিয়েছেন। আমরা অনেকবার বলেছি, বিদ্যা, সম্পদ, সেবা ও ত্যাগ, এই চারটে জীবনের আদর্শ – আমি যে বিদ্যা পেয়েছি, এটা ঠাকুরই আমাকে দিয়েছেন। জগতে যা কিছু আছে, একজন পুরুষকে স্ত্রী দেন, একজন নারীকে স্বামী দেন, সব ভগবানই দিচ্ছেন। সেইজন্য স্ত্রীকে ভগবতী রূপে দেখতে হয় আর স্বামীকে পরমেশ্বর রূপে দেখতে হয়, তবেই মানুষ উঁচুতে যেতে পারে। আমার ভিতরে আত্মা আছেন, আমার ভিতরে ঈশ্বর আছেন – আমার ভিতরে যদি ঈশ্বর থাকেন, তাহলে অপরের ভিতর কি ঈশ্বর নেই? কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর যখন কথা চালাচালি হয়, তখন তো মারামারির অবস্থায় পৌঁছে যায়। তখন সেই ঈশ্বর ভাবটা কোথায় গেল! আজগে সবাই হিন্দু ধর্মের এত নিন্দা করছে, বলা হয়, পতি পরমেশ্বর বলে নারীদের দাবিয়ে রাখা হয়েছে। তা কেন করবে? তোমার যদি আধ্যাত্মিকতা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে পতি পরমেশ্বর, আর সন্তান বালগোপাল, সাক্ষাৎ নারায়ণ। পুরুষদের বলছেন, তোমার স্ত্রী ভগবতী। ঠাকুর একেবারে ব্যবহারিক জগতে করে দেখাচ্ছেন, মাতৃরূপে তিনি নিজের স্ত্রীকে পূজা করছেন। ঠিক তেমনি, টাকা-পয়সা, সম্পদ, বিদ্যা, সব ঠাকুর দিয়েছেন, আমি হলাম অছি। মথুরবাবু জমিদার ছিলেন, তাঁর জমিদারীতে লোকেরা অভাবে কষ্ট পাচ্ছে। ঠাকুর বলছেন, তুমি জমিদার ঠিক, কিন্তু এই জমিদারী তোমার না, এটা মায়ের, তুমি মায়ের অছি মাত্র, মায়ের সন্তানদের জন্য তুমি জমিদারীর টাকা খরচ করে ওদের কষ্ট দূর কর। যাঁরা একটু উচ্চমানের মানুষ, তাঁরা মনে করেন, আমার কাছে যা কিছু আছে, এর সবটাই আমাকে ঈশ্বর দিয়েছেন, আমি এর অছি মাত্র। এই ভাব নিয়ে চললে তখন আর কোন কষ্ট থাকবে না। তখন টাকা এলেও উৎফুল্ল হবে না, টাকা চলে গেলেও কোন কষ্ট হবে না।

একটা খুব নামকরা ঘটনা ওই সময়েই হয়েছিল, বা তার একটু আগে বা পরে হয়ে থাকতে পারে, ওই ঘটনাটা এই পরিপ্রেক্ষিতে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। রকফেলার আমেরিকার খুব নামকরা একজন ধনী ব্যক্তি। স্বামীজী যে সময়ে ছিলেন, তখনও উনি বড়লোক হননি, আর এতটা ডাকসাইটে ব্যবসায়ী হননি। রকফেলার প্রচণ্ড গোলমেলে লোক ছিলেন। আর হেন ক্রাইম নেই যেটাতে উনি জড়িত থাকতেন না। রেল আর রোড ছিল তাঁর প্রধান ব্যবসা, তারপর তেলের ব্যবসাতে ঢুকলেন। যা হয়, নানান রকমের দুর্নীতি, জাল কারসাজিতে জড়িয়ে থাকতেন। এসব করে তাঁর এত টাকা হল যে, রকফেলারকে নিয়ে আমেরিকাতে লোকগীতি তৈরী হয়ে গেল। এই রকফেলার একবার খুব খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন। রকফেলারকে স্বামীজীর কথা বলা হল। স্বামীজী তখন ওখানেই ছিলেন। তিনি স্বামীজীর সাথে দেখা করতে এসে ধড়মড় করে স্বামীজীর ঘরে ঢুকে পরেছেন। বড়লোক, কাউকে পাত্তা দেওয়া তাদের ধাতে নেই। স্বামীজী তাঁকে বসতেও বললেন না। ঘরে ঢুকে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল। স্বামীজী ওর দিকে তাকালেনও না। না তাকিয়ে,

রকফেলার যত কেচ্ছা কুকীর্তি আছে, যে কথাগুলো ও ছাড়া কেউ জানে না, সব স্বামীজী বলতে লাগলেন। একটু আগে যে inspiredএর কথা বলা হল, এটা হল inspiredএর লক্ষণ, মন পরিষ্কার কিনা, ওর মনে কি আছে, এর মন ধরে নেবে। রকফেলার তো শুনে হতবম্বিত। আসলে সেই সময় উনি চুরি, চামারি, জালসাজি, অনেক কিছুতে জড়িয়ে ছিলেন। বলার পরেই স্বামীজী বলছেন, তোমার কাছে যে সম্পদ, অর্থ আছে, এটা তোমার না, ঈশ্বরের জিনিস, তুমি এর ট্রাস্টি, এই অর্থ ঈশ্বরের সন্তানদের কাজে লাগাও, দান কর। রকফেলার কিছু না বলে ধড়মড় করে বেরিয়ে চলে গেলেন। কিছু দিন পর আবার রকফেলার স্বামীজীর কাছে এসে তাঁর সামনে একটা রসিদ ফেলে বলছেন, এই দেখো, আমি এত বড় একটা ডোনেশান দিয়েছি, now you can thank me। স্বামীজী আবার মাথা না তুলেই বললেন, You should thank me that I make you realize that you are not owner of your wealth। তারপর আর রকফেলারের সাথে স্বামীজীর কোন যোগাযোগ হয়নি। এই ঘটনার মধ্যে অনেকেই প্রচুর নাটকীয়তার রসদ ঢুকিয়ে দিয়েছে। এখানে নাটকীয়তার কিছু নেই, সেই রকম কিছু হলে তো রকফেলার স্বামীজীর একজন ভক্ত হয়ে যেতেন; কিন্তু স্বামীজীর ভক্ত কোন দিন তিনি হননি। পরে দেখা যায়, রকফেলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রচুর টাকা ডোনেট করেছেন, রকফেলার ইনস্টিস্ট্যুটস এখনো আমেরিকাতে খুব নামকরা ইনস্টিস্ট্যুটস।

এখানে এই ঘটনা এইজন্যই বলা হল, স্বামীজী রকফেলারকে এই কথাই বলেছিলেন, তুমি একজন অছি মাত্র। আমার আপনার কাছে যাবতীয় যা কিছু আছে, আমাদের জানতে হবে, এ-সবই ঈশ্বর দিয়েছেন, সেইজন্য সব কিছু সামলে রাখতে হয়। আমাদের দুর্ভাগ্য হল, যে জিনিসটাকে কাজে লাগানোর কথা, সেই জিনিসটাকে আমরা সামলে রেখে দিই, আর যে জিনিসটাকে ঈশ্বরের কাজের জন্য সামলে রাখার কথা, সেগুলোকে আমরা নিজেদের কাজে লাগিয়ে দিয়ে শেষ করে দিই। কামিনী-কাঞ্চন, নামযশ, এগুলো ঈশ্বরই দেন আবার ঈশ্বরই নিয়ে নেন। কিন্তু আমরা ওগুলোকেই নিজেদের কাজে লাগাই, টাকা-পয়সা নিজের জন্য খরচ হয়, নামযশ নিজের জন্য করা হয়। ভগবান বুদ্ধি দিয়েছেন উচ্চ চিন্তন করার জন্য, ভগবান মন দিয়েছেন ঈশ্বরের নামগুণগান করার জন্য, এই মন বুদ্ধিকে আমরা সামলে রেখে দিই। মন বুদ্ধি ঠাকুরের দেওয়া, তাই সামলে রাখছি যাতে খরচ না হয়ে যায়।

বাইবেলে খুব সুন্দর কাহিনী আছে। একজন বড়লোক তার দুজন সেবক, খুব ভাল সেবক, দুজনকে ২০ ট্যালেন্টস করে দিলেন, তোমাদের কাছে রাখো, পরে নেব। এক বছর পর তিনি দুই সেবককে ডেকে পাঠিয়েছেন। একজন সেবক বলল, হুজুর আপনি যে টাকাটা দিয়েছিলেন, সেটাকে আমি বিজনেসে খাটিয়েছি, আজকে সেটা দ্বিগুণ হয়ে গেছে, এই নিন। মালিক খুশি হয়ে বললেন, তুমি পুরোটাই রেখে দাও। আরেকজন বলল, হুজুর আপনি দিয়েছিলেন, তাই আমি খুব সামলে আমার সিন্দুকে রেখে দিয়েছিলাম। হুজুর রেগে গিয়ে বলছেন, তুমি একটা অপদার্থ, অলস, এক্ষুণি ওই টাকা ফেরত দাও। যীশু তখন বলছেন, ভগবান যেটা আমাদের দিয়েছেন সেটাকে কাজে না লাগালে, ভগবান যেটা দিয়েছিলেন সেটাকেও কেড়ে নেবেন। ভগবান আমাদের যে মন, বুদ্ধি, যে গুণ ও ক্ষমতা দিয়েছেন, সেটাকে কাজে না লাগালে, এভাবেই সব নষ্ট হয়ে যাবে। এই বলে স্বামীজী বলছেন, নামযশ, টাকাকড়ি এগুলোকে ঈশ্বরের কাজে লাগিয়ে শেষ করে দাও, কারণ এই নামযশ, টাকাকড়ি হল ভয়ানক বন্ধন। এগুলোকে শেষ করে মুক্তির পরিবেশ তৈরী করে নাও। আর তুমি তো চিরন্তন মুক্ত, অবিরাম বলে যাও – আমি ধন্য, আমি আনন্দস্বরূপ, আমি মুক্তস্বরূপ, আমি অনন্তস্বরূপ, আমার আত্মার আদি অন্ত কিছু নেই, যা কিছু আছে সব আমারই স্বরূপ। এই বলে স্বামীজী ২০শে জুলাইয়ের ক্লাশ শেষ করছেন। এরপর আমরা ২১শে জুলাইয়ের ক্লাশে প্রবেশ করছি।

রবিবার, ২১শে জুলাই

স্থুল শরীর ও সূক্ষ্ম শরীর

এই দিন স্বামীজী খুব সংক্ষেপে পতঞ্জলি যোগের উপর বলছেন, পতঞ্জলি যোগ দর্শনকে স্বামীজী এক পাতায় বলে দিয়েছেন। ঠাকুর বলছেন, যোগ মানে ছড়ানো মনকে একাগ্র করে পরমাত্মার সাথে এক করে দেওয়া। এখানে তিনটে জিনিস আসছে, মন, পরমাত্মা আর একত্ব। ঠাকুরই আবার বলছেন, যোগীরা ধানের

গভীরে পরমাত্মার সাথে এক হয়ে যান। এখানে কে এক হয়ে যায়? পেঁয়াজের যেমন একটা খোসার পিছনে আরেকটি খোসা, সেই খোসার পিছনে আরেকটি খোসা। একটা খোসাকে ছাড়িয়ে দিলে দেখা যাবে ওর পর আরেকটি খোসা আছে। হায়দ্রাবাদে এক ধরণের খেলনা বাক্স পাওয়া যায়, একটা বাক্স খুলে দিলে সেই বাক্সের ভিতর থেকে আরেকটা বাক্স বেরিয়ে আসে, যত বাক্স খুলতে থাকবে দেখা যাবে তার মধ্যেও একটা বাক্স আছে, বাক্সের ভিতরে বাক্স চলতে থাকে। আরব্য উপাখ্যানের কাহিনীটা সেখানেই শুরু হয়, একটা জীন কাঁধে একটা সিন্দুক নিয়ে যাচ্ছে, সেই সিন্দুকটা খুলল, তার ভিতর থেকে আরেকটা সিন্দুক বেরিয়ে এলো, ওটাকে খুলল আরেকটা সিন্দুক এসে গেলো, এই করে করে সাতটা সিন্দুক বেরিয়ে এলো, সব কটাতেই তালা দেওয়া। শেষ সিন্দুক থেকে একটি মেয়ে বেরিয়ে এলো।

আমাদের জীবনটাও ঠিক তাই, আমাদের যে শরীরকে দেখছি, চোখ, কান, নাক দেখছি, এটা একটা সিন্দুক। এই সিন্দুকটাকে ভেঙে দিলে এর পিছনে আরেকটা সিন্দুক আছে, যাকে আমরা সূক্ষ্ম শরীর বলছি। এই সূক্ষ্ম শরীরের পিছনে যে শক্তি আছে, তাকে জীবাত্মা বলা হয়। কেউ মারা গেলে আমরা বলি, অমুক ব্যক্তি চলে গেলেন। কে চলে গেলেন? সূক্ষ্ম শরীরটা চলে গেল। স্থূল শরীর থেকে সূক্ষ্ম শরীরের গুরুত্ব অনেক বেশি। কারণ যেমন যেমন খাওয়া-দাওয়া করা হবে, তেমন তেমন শরীরের গঠন পাল্টে যাবে। কয়েকদিন শুকরের মাংস খেলে শরীর এক রকম হয়ে যাবে, কয়েকদিন শাক লতাপাতা খেলে শরীর আরেক রকম হয়ে যাবে। আমরা চাইলে স্থূল শরীরের ওজন বাড়াতে পারি, চাইলে ওজন কমাতে পারি। গীতাতেও ভগবান সাত্ত্বিক আহার, রাজসিক আহার, তামসিক আহারের কথা বলছেন, যেমন যেমন আহার গ্রহণ করবে, শরীরটাও তার তেমন তেমন হয়ে যাবে।

সূক্ষ্মশরীরে মনের প্রভাব

এই স্থূল শরীরের পিছনে রয়েছে সূক্ষ্ম শরীর। সূক্ষ্ম শরীর পুরোপুরি চলে আমাদের চিন্তন-মনন অনুযায়ী, যে কর্মগুলো করা হয়েছে সেই কর্মের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী কেমন ছিল, আগে আগে যত কথা বলেছি, সেই কথাগুলোর পিছনে আমার আপনার ভাব কেমন ছিল, সেই অনুযায়ী। কোন ক্ষমতাবান লোকের কাছে গিয়ে তাকে কটূ কথা বললে সে হয়ত রেগেমেগে আমাকে মারতে শুরু করবে, তখন ওই মার এই শরীরকে ধারণ করতে হবে। কিন্তু বলার সময় তার কি ভাব ছিল দেখতে হবে, আর ওই ভাবটাই সূক্ষ্ম শরীরে ছাপ পড়বে। আমাদের জীবনে সবারই এমন কিছু কিছু ঘটনা আছে, যেটা করার আমার হয়ত কোন ইচ্ছাই ছিল না, কিন্তু পরিস্থিতি আমাকে দিয়ে করিয়েছে। সমাজ আমাদের মারবে, যাদের সঙ্গে আছি তারা মারবে, কিন্তু আমি জানি আমি দোষী নই। কারণ কিছু জিনিস আমাকে পরিস্থিতিবশতঃ করতে হয়েছে। বেশ কিছু কাল যাবৎ সুপ্রিম কোর্টে বিবাহিতা মহিলার পরপুরুষের সাথে সম্পর্ক নিয়ে একটা কেস চলছে। এই জিনিসটাকে নিয়ে চারিদিকে প্রচুর আলোচনা চলছে। পুরনো আইনানুযায়ী কোন পুরুষ যদি অন্য কোন বিবাহিতা স্ত্রীর সাথে জড়ায়, তার তিন বছর জেল হবে। সুপ্রিম কোর্ট বলছে, এই আইন চলতে পারে না, কারণ কোন স্ত্রী যদি বিবাহের পর দুঃখে থাকে, কষ্টে থাকে, সে যদি নিজের মনের শান্তি পাওয়ার জন্য কোন পরপরুষের সাথে জড়ায়, এর জন্য কেন তাকে শাস্তি পেতে হবে! এগুলো হল হায়ার মরালিটির বিষয়; আমরা সেখানে নামছি না। আমরা নামছি ওই জায়গাটায়, যেখানে পরিস্থিতি মানুষকে দিয়ে অনেক কিছু করিয়ে নেয়, সমাজ কিন্তু ওই কাজের জন্য তাকে রেহাই দেবে না। সমাজ বলবে, তোমার মত bad example চাই না, কিন্তু আসলে দেখা যাবে বাস্তবে সেই লোকটি দোষী নয়। আমরা কিন্তু বলি ঠাকুর আছেন, ঠাকুর দেখবেন। কারণ তোমার ক্ষমতা আছে, ক্ষমতার জোরে তুমি জয়ী হয়ে গেলে। কিন্তু পিছনে যে সূক্ষ্ম শরীরটা আছে, যেটা আসল, আমরা কি করছি সেটা দিয়ে সে চলে না, আমার মানসিকতা কেমন, আমার প্রবণতা কি, এর উপর চলে।

এই যে সূক্ষ্ম শরীর, এর মালিক হল মন। আমাদের মনে হতে পারে যে, আমার যে স্থূল শরীর চলে, এরও তো মালিক মন। ঠিকই, স্থূল শরীরের মালিকও মন। এই জিনিসটাকে বোঝানর জন্য আমরা গাড়ি ও তার ড্রাইভারের কল্পনা করি, গাড়িকে ড্রাইভার চালাচ্ছে। গাড়িটা হল স্থূল শরীর, আর ড্রাইভার হল সূক্ষ্ম শরীর। মন, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ এগুলোকে মিলিয়ে সূক্ষ্ম শরীর। মন হল যেন সূক্ষ্ম শরীরের একটা আভ্যন্তরীন অংশ, যেমন যেমন মন পাল্টায় তেমন তেমন সূক্ষ্ম শরীর পাল্টায়। স্থূল শরীরে অতটা প্রভাব পড়ে না, তারও

প্রভাব পড়ে কিন্তু সূক্ষ্ম শরীরের মত অতটা নয়। গাড়ি আর ড্রাইভারের উপমা যদি মনে রাখা যায়, তাহলে স্থূল শরীর ও সূক্ষ্ম শরীরের ব্যাপারটা কিছুটা বোঝা যাবে। কিন্তু শুধু ড্রাইভার হলেই হবে না, ড্রাইভারেরও একজন মালিক আছে। সেই মালিক হলেন আত্মা। এটা একটা উপমা, আত্মা আর শরীরের সম্পর্ক বোঝাবার জন্য আরও অনেক ধরণের উপমা ব্যবহার করা হয়। তবে জগতের অধিকাংশ মানুষই মুখে বলে কিছু, কিন্তু মনের ভাব অন্য কিছু। একজন বড় বৈজ্ঞানিকের কথা জানা যায়, তিনি অত্যন্ত ভদ্রলোক ছিলেন, কাউকে কোন কটূ কথা বলতেন না। কিন্তু ওনার ল্যাবরটরিতে এ্যসিস্ট্যান্ট যদি অসাবধনতায় কোন এ্যাপারেটাস ভেঙে ফেলত, দামী এ্যাপারেটাস ভেঙে দিলে রাগ, কষ্ট হওয়াটা স্বাভাবিক, উনি সঙ্গে সঙ্গে মুখে বলতেন, God bless you। কিন্তু ভিতরে রাগে ফুঁসছেন, আর রেগে গিয়ে মনে মনে বলছেন, God bless you with seven children and you have nothing to feed them, ভগবান তোমাকে কৃপা করুন যাতে তোমার সাতটা বাচ্চা হয়, যাদের তুমি খাওয়াতে না পারো। রাগটা ভিতরে ফোঁসাফাস করছে, কিন্তু মুখে বলছে, God bless you, এ্যসিস্টান্ট মনে করছে, যাক বাবা! বস্ আমাকে আর কিছু বলবেন না। এখন এই ভিতরের রাগটা কোথায় যাবে? রাগটা মনে গিয়ে আশ্রয় নেবে, মন আবার সূক্ষ্ম শরীরের integral part, তার মূল জিনিস।

আমাদের জীবনের বেশির ভাগটাই চলে সূক্ষ্ম শরীরকে দিয়ে, স্থূল শরীর এমন আহামরি কিছু না, যদিও আমরা স্থূল শরীর দিয়েই সব কাজ করি। কিন্তু আমরা যে কাজগুলো করছি, যে ধরণের চিন্তন করছি, যেসব কথা বলছি, এই সব কিছুই আমাদের স্থূল শরীরের একটা রূপ দেয়। কিন্তু সূক্ষ্ম শরীরকে যেটা দেয় সেটার গুরুত্ব অনেক বেশি। আমি মিথ্যা কথা বলি, লোকদের বোকা বানাই, কিন্তু সবার সাথে মিষ্টি করে কথা বলি, লোকেরা আমার প্রশংসা করে বল, 'বাঃ! আপনি তো খুব মিষ্টি কথা বলেন'! কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় জিনিসগুলো উল্টো হয়ে যায়। ঠাকুর মোসায়েবী করাকে একেবারেই পছন্দ করতেন না। সাধু সন্ন্যাসীদের মধ্যে বলা হয়, যে সাধু মিষ্টি কথা বলে, সেই সাধুকে মোটেই বিশ্বাস করবে না। সাধু আর মিষ্টি কথা দুটো পরস্পর বিরোধী। সাধু সব কিছু ত্যাগ করে দিয়েছে, কারুর থেকে কোন প্রত্যাশা নেই তাঁর। মিষ্টি কথা বলা মানে, আমি তোমাকে খুশি রাখতে চাইছি, কিন্তু সাধু আবার কাউকে কটূ কথাও বলবেন না। কোন সন্ন্যাসী যদি কটূ কথা বলে, বুঝতে হবে তার ভিতরে হতাশার ভাব জমে আছে। কাউকে আঘাত দিয়ে কথা বলবেন না, কিন্তু মিষ্টি কথা, polished কথা যদি বলে তাহলে সেই সাধুকে সন্দেহ করতে হবে। সন্ন্যাসী যদি কাউকে তোয়াজ করতে যায়, কাউকে খুশি করার জন্য যদি মিষ্টি কথা বলে, তার মানে তাঁর মধ্যে কোন কিছু পাওয়ার ইচ্ছা আছে। সন্ন্যাসী সব ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে এসেছেন, তিনি কাউকে কেন তোয়াজ করতে যাবেন! কিন্তু যারা সমাজে আছে, তাদেরকে এগুলো করতে হয়। সেইজন্য সন্ন্যাসীর সাধন-ভজন, ঈশ্বর চিন্তন অনেক সহজ হয়ে যায়। কারণ তিনি বাইরেও যা, ভিতরেও তাই, ভিতরে এক রকম আর বাইরে অন্য রকম, এই জিনিসটা থেকে সন্ন্যাসী মুক্ত। কিন্তু সমাজে থাকতে গেলে, না চাইলেও তাকে এগুলো করতে হয়। ছেলে স্কুলে দুষ্টুমি করেছে, ছেলের বাবাকে এবার ওর ক্লাশ টিচারের কাছে হাতজোড় করে বলতে হবে, ছেলে অন্যায় করে ফেলেছে, এবারের মত মাফ করে দিন। বাবা জানে টিচার যে, সে অত্যন্ত ধুরন্ধর, অনেক বদনাম আছে, কিন্তু ছেলের স্বার্থের জন্য সেই শিক্ষকের সাথে মিষ্টি মিষ্টি করে কথা বলে তোয়াজ করতে হবে।

যোগের কাছে মন আর মনের বৃত্তিই মূল

পেঁয়াজের উপমা নিতে গিয়ে আমাদের তিনটে সত্য হয়ে যাচ্ছে, স্থূল শরীর, সূক্ষ্ম শরীর আর শুদ্ধ আত্মা। বেদান্ত এটাকে বিভিন্ন ভাবেন নেন, অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ ও আনন্দময় কোষ। ভক্তিশাস্ত্র আবার এই শরীরকে অন্য ভাবে দেখেন। যোগের যে সৃষ্টির বর্ণন, তা পুরোপুরি সাংখ্য দর্শন থেকে নেওয়া হয়েছে। বেদান্তে যে পাঁচটা শরীরের কথা বলা হয়, সাংখ্য বা যোগ এই পঞ্চকোষকে মানে না, ওদের দরকারও পড়ে না। পঞ্চকোষের ধারণা এমন একটা ধারণা যে, ওটাকে যদি ঢোকাতে চায় ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে, যদি না ঢোকাতে চায়, তাতেও কিছু হেরফের হয়ে যাবে না। যোগ স্থূল শরীর, কারণ শরীর, এগুলোতেও যায় না, ওরা সরাসরি একটা জিনিসকেই নেয়, সেটা হল মন, মন ছাড়া ওরা আর কোন কিছুর আলোচনা করে না, যদিও কিছু কিছু জায়গায়, যেমন যোগসিদ্ধির কথায়, সেখানে সূক্ষ্ম শরীর একটা ভূমিকাকে নিয়ে বলে। তবে ওনারা ওটাকে নিয়ে বেশি আলোচনা করেন না। যোগের একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ

হল আমার আপনার স্বরূপ, মানে আত্মা আর আমাদের মন। আত্মা আর পরমাত্মা, এই অভিন্ন দুই বন্ধুর মিলন কিভাবে ঘটবে, যোগের এটাই মূল বিষয়। মিলন যখন আনছি, সেটা যেন আমরা ভক্তিমার্গ দিয়ে নিয়ে আসছি। যোগ সাধন দুটো পথেই হয়, ভক্তিমার্গ দিয়ে হয় আর জ্ঞানমার্গ দিয়েও হয়। ভক্তিমার্গ দিয়ে হয় আত্মা আর পরমাত্মার মিলন। দুই বন্ধু, কিন্তু একটা সাধারণ প্রাচীর দুই বন্ধুর মিলনকে আটকে রেখেছে। এই প্রাচীরটা কে? মন, মন হল সেই প্রাচীর, যে আত্মাকে পরমাত্মার সাথে মিলন হতে দিতে চায় না। জ্ঞানমার্গে অন্য ভাবে নেওয়া হয়, তাঁরা বলবেন, আত্মাই আছেন। তোমার আমার ভিতর যে আত্মা, এটা সেই পরমাত্মাই। নিজেকে আমি দেখতে পারছি না বলে অনেক রকমের গোলমাল হচ্ছে। কেন দেখতে পারছি না? তাঁরাও সেখানে মনকেই দায়ী করছেন।

মন বলতে আমরা সবাই জানি, যার দ্বারা আমাদের চিন্তা ভাবনা থেকে শুরু করে সব কার্য চলছে। মন হল প্রেসার কুকারের মত, সব সময় বাষ্প তৈরী করে যাচ্ছে, আমরা যখন কথা বলছি, কাজ করছি, সেগুলো যেন প্রেসার কুকার সিটি মারছে। প্রেসার কুকারে বয়েলিং যেটা হয়, এটা বিভিন্ন কারণে হয়। আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয় দিয়ে সব জিনিসগুলো ইন্ধন যোগানের মত ভিতরে ঢুকছে। এর আগে যে instinctএর কথাগুলো বলা হল, ওগুলো সব জুটছে। সেগুলো ভিতরে গিয়ে আরামসে বসে থাকছে, মন কিন্তু কিছু ভুলে যাবে না। পুকুরে কিছু ফেলে দিলে মনে হব, আর জিনিসটা নেই, চলে গেল। পুকুরের জল যদি কোন দিন শুকিয়ে যায়, সব জিনিসগুলো বেরিয়ে আসবে। নরেন্দ্রপুর আগে পুরোটাই গ্রাম ছিল। গ্রামে অনেকের ঘরবাড়ি ছিল। শোনা যায় আগে ওখানে অনেক মারামারি, খুনোখুনি হত। সেখানে আশ্রম হওয়ার পর মহারাজরা পুকুর সংস্কার করছেন, জল ছেঁচে ফেলে দিতেই পাঁক থকে বাঁশ দিয়ে বাধা তিনটে কঙ্কাল বেরিয়ে এসেছে। মনেও আমরা যত ডেডবডি, আবর্জনা পুতে রেখেছি, সব একদিন না একদিন বেরিয়ে আসবে, যখন জল ফাঁকা করা হবে। আমরা বলতে পারি, আমার দরকার নেই বাবা, আমি জল ফাঁকা করব না। না, জল ফাঁকা সবাইকে করতে হবে। কেন? প্রেসার কুকারের যে উপমা দেওয়া হল, যে জিনিসগুলি ভিতরে গেছে, সেই জিনিসগুলো ভিতরে গিয়ে টগবগ করতে থাকছে। যখন ঘুমোচ্ছে, সেই সময় সারা দিনে যত রকম চিন্তা ভাবনা করেছে, যে আইডিয়াসগুলো ভিতরে গেছে, সেগুলো এবার টগবগ করতে শুরু করবে। মিথ্যা কল্পনা, পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে যে জিনিসগুলো ভিতরে আসছে সেগুলো সব টগবগ করছে। ফলে প্রেসার কুকার সর্বোচ্চ তাপমাত্রায় চলে যাচ্ছে। আগেকার দিনে গঙ্গোত্রী, উত্তরকাশীতে সাধুদের সব সময় পেট খারাপ হত। কারণ ওখানে টেম্পারেচার উঠতে চায় না, তাই ভাত, ডাল, সব্জী কিছুই সিদ্ধ হতে চায় না, আধসেদ্ধ সব খেয়ে খেয়ে সাধুদের পেট খারাপ হয়ে যেত। প্রেসার কুকার আসার পর সাধুদের যে কী মঙ্গল হয়েছে ভাবাই যায় না। গঙ্গোত্রীতে আশি ডিগ্রীতে জল বয়েল হয়, ওই আশি ডিগ্রীতে ডাল, ভাত সেদ্ধ হবে কী করে! প্রেসার কুকার জল বয়েল করে একশ কুড়ি ডিগ্রীর কাছাকাছি, পাঁচ মিনিটে ডাল, ভাত সেদ্ধ করে দেবে।

এখন মনের পাঁচ দিক থেকে আগুন দিচ্ছে বা প্রেসার কুকারে গ্যাসের ফ্লেমকে একেবারে হাই করে দেওয়া হয়েছে, তখন প্রেসার কুকার হুসহাস করে স্টীম ছেড়েই যাচ্ছে। মনে করছি খুব ডিস্টার্ব করছে। ওয়েট যেটা থাকে, সেটাকে সরিয়ে একটা আরও ভারি ওয়েট চাপিয়ে দিলাম। এবার আর হয়ত ডিস্টার্ব করবে না। কিন্তু টেম্পারেচার এবার যেটা একশ কুড়ি ডিগ্রীতে বয়েল হচ্ছিল, সেটা এবার একশ চল্লিশ, একশ ষাট ডিগ্রীতে বয়েল করবে। তাতেও ঘন ঘন সিটি দিয়ে যাচ্ছে। এরপর আরও বড় একটা ওয়েট চাপিয়ে দিলাম। এবার তো ফাটাফাটির ব্যাপার শুরু হয়ে গেল। শেষে আমি বললাম, ব্যাটা প্রচণ্ড জ্বালাচ্ছে, নে এবার একটা পাথর চাপিয়ে দিলাম, দেখি আর কত জ্বালাতে পারিস! এবার কি হবে? প্রেসার কুকারটা বার্স্ট করবে। তার মানে ভিতরের আবর্জনাগুলি স্টীম আকারে যদি না বেরিয়ে যায়, মস্তিষ্কটা বার্স্ট করবে আর আমিও পাগল হয়ে পাগলা গারদে চলে যাব। কোন মেন্টাল হাসপাতালের ডাক্তার আমাকে সারাতে পারবে না। আমরা যদি মনে করি, যে জিনিসগুলো ভিতরে এসে জমছে, অর্থাৎ যত ঝুট ঝামেলা আসছে, মনের উপর যত প্রেসার আসছে, ভাবছি সব এড়িয়ে চলব, আর সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু সবটাই ওখানে ভিতরে গিয়ে স্টীম তৈরী করে যাচ্ছে। প্রেসার কুকারে যে সেফটি ভালব্ রয়েছে, ওটাকে যত কম ওজনের রাখা হয় তত মঙ্গল। কারণ যত স্টীম বেরিয়ে যাবে আমরা তত শান্তিতে থাকব। মানুষের সেবা করছে, দান করছে, ধর্ম পালন করছে, বুঝতে হবে যে এবার স্টীমগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ ভিতরের আবর্জনাগুলো পরিষ্কার হচ্ছে।

দত্তা দমিতা দানম্, দেবতারা কেন দেবতা হয়েছেন? বলছেন, ‘দ’ ‘দ’ ‘দ’, দান কর, দমন কর (নিজের ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা) আর দয়া কর, সবার উপর করুণা কর। যেমনি এগুলো করা হবে, ভিতর থেকে স্টীমগুলো বেরিয়ে যাবে, তুমি পরিষ্কার হয়ে যাবে, তুমিও দেবতা হয়ে যাবে। যদি না করা হয়, যদি চেপে রাখা হয়, তাহলে জেনে নিতে হবে যে, তুমি প্রেসার কুকারে আরও ওজন চাপিয়ে যাচ্ছ, আর যেদিন ফাটবে, সেদিন সবাই মিলে তোমাকে পাগলা গারদে ঢুকিয়ে দিয়ে আসবে। আর অতিরিক্ত ওজন যদি প্রেসার কুকারে নাও দেওয়া হয়, স্টীম যদি কমিয়েই রাখা হয়, এবার থেকে থেকে যে স্টীম বেরোবে, আর ওই স্টীম আশি কি নব্বই ডিগ্রী স্টিম না, একশ তিরিশ, একশ চল্লিশ ডিগ্রী; ওই স্টীম গায়ে যেমনি লাগবে এমন জ্বালাবে যে, লোকেরা বলবে, তোমার কথাগুলো এত রূঢ় ও কঠোর কেন? কারণ ভিতরে প্রচুর তাপ আছে, ওইজন্য কথাগুলো অপরের জ্বালা ধরিয়ে দেয়।

যোগসূত্র ঠিক এই জিনিসটাকে নিয়ে চলে। মন কি করে এত উত্তপ্ত হয়? এই উত্তাপকে কিভাবে নাশ করা যাবে? পতঞ্জলির সময়ে প্রেসার কুকার ছিল না, তাই ওনারা অন্য উপমা নিচ্ছেন, থাকলে প্রেসার কুকারের উপমাই নিতেন। পতঞ্জলি উপমা নিচ্ছেন বৃত্তি, বৃত্তি মানে ঢেউ। এই ঢেউকে আমরা সমুদ্রের ঢেউ মনে করতে পারি, পুকুরের বা কোন জলাশয়ের ঢেউ মনে করতে পারি। সমুদ্র আর সমুদ্রের ঢেউ, সমুদ্র যা সমুদ্রের ঢেউও তাই, আলাদা কিছু না। কিন্তু আমরা যখন ঢেউকে দেখি তখন সমুদ্র দেখি না, যখন সমুদ্র দেখি তখন ঢেউকে দেখি না। যোগ শেখায় তোমাকে আলাদা করে দেখার দরকার নেই, বেদান্ত শেখায়, তুমি ঢেউ দেখাটা বন্ধ কর আর সমুদ্রকে দেখ। ভক্তিশাস্ত্র বলবে, আমার কাছে সমুদ্রও যা, ঢেউও তাই, তুমি ভক্তি নিয়ে থাক। যোগ বলবে, তোমার দ্বারা এগুলো হবে না, তুমি ঢেউটাকে শেষ করে দাও, তাহলে তোমার আর কোন ঝামেলাই থাকবে না। তখন সমুদ্র আছে, তার ঢেউ আছে, ঢেউ আছে তো সমুদ্রও আছে, এগুলো আর করতে হবে না, কারণ ঢেউটাকেই থাকতে দেওয়া হবে না। যোগসূত্র মানে এটাই।

যোগের যে দ্বিতীয় সূত্র, *যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ*, এই সূত্র যোগকে পরিভাষিত করে দিচ্ছে। চিত্তবৃত্তির আমরা যেমন প্রেসার কুকারের উপমা নিলাম, এনারা সেই জায়গায় উপমা নেন জলাশয়ের। একটা শান্ত পুকুর, বড়লোকেদের যে সুইমিং পুল হয়, একেবারে স্বচ্ছ জল, জলের তলা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। বিহারে কোশী নদের জলও একেবারে স্বচ্ছ, পরিষ্কার বা গঙ্গোত্রীর যে গঙ্গা, তার জলও একেবারে স্বচ্ছ, নীচের পাথর থেকে সব কিছু একেবারে পরিষ্কার দেখা যায়। মন হল এই রকম একটা স্বচ্ছ পুকুর, আর তার তলায় কিছু একটা রাখা আছে, ওটাকে এখন দেখতে চাইছে। কে দেখতে চাইছে? আত্মা দেখতে চাইছে, আত্মা সর্বব্যাপী কিনা, মনের তল দেশেও সেই আত্মাই আছেন। তিনি ওখান থেকে বেরিয়ে পুকুরের উপর এসে এবার নিজেকে দেখতে চাইছেন। যেমন আমরা আয়নাতে নিজেদের দেখি। এটাকে আমরা কল্পনা করে নিচ্ছি, শুদ্ধ আত্মা চৈতন্য স্বরূপ, পুকুরের জলের তলায় বসে আছেন, তাঁর ইচ্ছা হল, দেখিতো আমি দেখতে কেমন। সাঁ করে একটা ফোটন পাঠিয়ে দিলেন, সেই ফোটনটা এবার উপর থেকে নিজেকে দেখতে চাইল।

সুমিত্রানন্দন পন্থ খুব নামকরা হিন্দি কবি, ছায়াবাদী কবি ছিলেন। স্বামীজীর কিছু কবিতা তিনি অনুবাদ করেছিলেন। ওনার একটা খুব সুন্দর কবিতা আছে, পাহাড়ে খুব বৃষ্টি হয়েছে, পাহাড়ের নীচে জল জমেছে, জল জমে যেন একটা ঝিল হয়ে গেছে। সেই ঝিলের জলে পাহাড়টা খুব স্পষ্ট হয়ে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। ওই পাহাড় অবাক হয়ে নিজের ছবিকে দেখছে, আমি কত বিশাল, কত বিরাট আমার আকার। যে উপমাই আমরা নিই না কেন, আত্মা বেরিয়ে এসে দেখছেন, কিংবা এই পাহাড় নিজের ছবি দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছে বা আমি পুকুরের পারে দাঁড়িয়ে জলে নিজের ছবি দেখছি। নার্সিসাসের কাহিনীও তাই, তাকে দেখতে খুব সুন্দর ছিল, পুকুরের জলে নিজের ছবি দেখে নিজেকে এতো ভালবেসে ফেলেছে যে, সে আর জলাশয়ের ধার থেকে নড়ছে না। দিনের পর দিন না খেয়ে না ঘুমিয়ে শুধু নিজের ছবি দেখে যাচ্ছে, আস্তে আস্তে সে ওখানেই অনাহারে মরে গেল। যেটারই আমরা উপমা নিই, আইডিয়া সেই এক।

পুকুরটা হল মন, যিনি দেখছেন তিনি আত্মা। এবার পুকুরের জলটা অনবরত নড়ছে। নার্সিসাসের ক্ষেত্রে লোকেরা জলটাকে নাড়িয়ে দিয়েছিল, তাও সে বসে আছে জলটা কখন শান্ত হবে, আবার সে নিজের

ছবি দেখতে পাবে। এই পুকুরের জল নড়ছে, জল নাড়ানোর জন্য পুকুরে পাথর ফেলা হচ্ছে, পাথরগুলি হল বৃত্তি। যোগসূত্র পাঁচ রকম বৃত্তির কথা বলছেন, প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা আর স্মৃতি। প্রমাণ হল, ইন্দ্রিয় দিয়ে, শাস্ত্র দিয়ে, যুক্তি দিয়ে যে জিনিসগুলি আসছে এগুলোকে বলা হয় প্রমাণ। যেগুলো কোন শব্দ মাত্র, কোন অস্তিত্ব নেই, যেমন বন্ধ্যাপুত্র। আবার কত রকম কল্পনা মনে উঠছে, তার সাথে আছে পুরনো স্মৃতিগুলি আর তার সাথে আছে স্বপ্ন। এই পাঁচ রকমের বৃত্তি, যেগুলো মনে চলছে, এগুলো একেবারে আলোড়িত করে রেখেছে, এমন আলোড়িত করে রেখেছে যে শুধু উদ্বেলিত না, একেবারে ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে। আমার আপনার সবার মন ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ হয়ে আছে, সুনামী বা আয়লার মত।

স্বামীজী তাঁর বিখ্যাত রাজযোগ গ্রন্থে মনের বৃত্তিগুলিকে পুকুরে জলের ঢেউয়ের সাথে উপমা দিচ্ছেন, উপমা দিয়ে পুকুরের জলে পাথর ছোঁড়ার কথা বলছেন। আমাদের মন আসলে কিন্তু পুকুরের বিক্ষুব্ধ জলের মত না, সমুদ্রে সাইক্লোন চলাকালীন যে পরিস্থিতি হয়, আমাদের মন ঠিক সেই রকম। এর মধ্যে এবার আত্মা দাঁড়িয়ে বলছেন, আমি আমার ছবি দেখতে চাই। ওই সাইক্লোনে জলের উপর কি ছবি দেখবে! ছবি দেখবে, কিন্তু distorted ছবি। ওই distortion যখন হচ্ছে, তখন যিনি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা, তিনি আমার আপনার রূপে, এই মাইক্রোফোন রূপে, ঘড়ি রূপে, ঘরবাড়ি রূপে, সব রূপে নিজেকে দেখছেন। যোগ বলছে, তুমি এই distortionটা বন্ধ কর। বন্ধ করবে কি করে, সমুদ্র বলে কথা! কিন্তু সমুদ্র সমুদ্র, তুমি তুমি, এই দুটোর কোন সমস্যা নেই। আয়নাতেও কোন দোষ নেই, তোমার চেহারতেও কোন দোষ নেই, দোষ হল আয়নার উপর যে পুরু ধুলো জমে আছে, ওই ধুলো পরিষ্কার করতে হবে। যাই হোক এটা আরেকটা উপমা। মূল কথা হল, তরঙ্গ, মনে যে বিক্ষুব্ধ বৃত্তিগুলি উঠছে, এটাকে শান্ত করা। শান্ত করে দেওয়ার পর তুমি তোমার নিজের ছবি দেখতে পাবে, *তদাদ্রষ্টু স্বরূপে অবস্থানম্*। তখন বুঝবে তুমিই সেই নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা। যোগশাস্ত্র শুধু এটাকে নিয়ে আলোচনা করে।

এতক্ষণ আমরা যোগ জিনিসটা কি খুব সংক্ষেপে দেখলাম, স্বামীজীও খুব সংক্ষেপেই এই দিন যোগের উপর আলোচনা করছেন। মনের যে নানা রকমের চাঞ্চল্য, এই চাঞ্চল্যকে নিয়ন্ত্রিত করে যখন মনে একটি মাত্র বৃত্তি থাকে, এটা তখন প্রায় শেষ অবস্থায় চলে এসেছে; কিন্তু একেবারেই শেষ অবস্থা নয়, শেষ অবস্থায় ওই একটা মাত্র বৃত্তিও চলে যাবে। পতঞ্জলি যা কিছু বলতে চাইছেন বা যোগশাস্ত্র যাবতীয় যা কিছু বলতে চাইছেন, সব কথাকে একটা দুটো বাক্যে রেখে দেওয়া যায়। তা সত্ত্বেও আমাদের জেনে রাখা দরকার, যে কোন বড় কাজ, যে কোন বড় লেখা, বিজ্ঞানের যে কোন বড় গবেষণার যা বক্তব্য একটা দুটো বাক্যে রেখে দেওয়া যায়। যে কোন মানুষের কাহিনী একটা কি দুটো বাক্যে বলে দেওয়া যায়। কিন্তু যে কোন জিনিসের যদি বিস্তার করা হয়, যেমন আইনস্টাইনের পুরো জীবন ওই একটা ইক্যুয়েশান $E=MC^2$এ রাখা আছে, কিন্তু ওখানেই সব শেষ হয়ে যাওয়ার কথা নয়। ওই ইক্যুয়েশানের পরিণতি কি, ওর প্রভাব কত সুদূর প্রসারিত, সেটাকে জানার জন্য ফিজিক্স। সমস্ত যোগশাস্ত্রের একটাই বক্তব্য, চিত্তবৃত্তি নিরোধ হলে মানুষ নিজেকে দেখতে পায়, *তদাদ্রষ্টু স্বরূপে অবস্থানম্*। কিন্তু চিত্তবৃত্তি কি, দ্রষ্টা কে, স্বরূপ কি, এবার এগুলোকে জানার জন্য অনেক বিস্তারে যেতে হবে। শুধু চিত্তবৃত্তি কি জেনে নেওয়ার পর এবার বৃত্তিসমূহকে নিরোধ করতে পারলে দ্রষ্টা তাঁর স্বরূপে অবস্থান করেন, এটা হল চিত্তবৃত্তি নিরোধের ফল। এখন এর পুরো পদ্ধতিতে কি কি হয়, কিভাবে হয়, কেন হয়, এগুলোকে যেখানে বিস্তারে বলা হয়েছে, সেটাই যোগশাস্ত্র। দেববাণীতে স্বামীজী যোগের উপর যে যে জিনিসগুলিকে উল্লেখ করেছেন, সেগুলোকে নিয়েই আমরা আলোচনা করছি।

যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ

Yoga is the science of restraining the Chitta (mind) from breaking into Vrittis (modification), (*চিত্ত বা মন যাতে বৃত্তিরূপে বিভক্ত না হয়ে পড়ে, যোগশাস্ত্র তাই শিক্ষা দিয়ে থাকে –'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ'।*) একটা সমুদ্র আছে, আর সমুদ্রে ঢেউ চলছে। সমুদ্র, সমুদ্রের ঢেউ, শান্ত সমুদ্র, উদ্বেলিত সমুদ্র সব এক, পরিণতি আলাদা। এখন সমুদ্রের যদি চেতনা থাকত, তাহলে সমুদ্র হয়ত চাইত, অনেকক্ষণ যাবৎ ঢেউ চলছে, এবার ঢেউ ওঠাটা বন্ধ করা হোক। ঢেউ ওঠা বন্ধ হয়ে গেল, সমুদ্র এখন শান্ত। এই শান্ত অবস্থাটা যেন সমাধির একটা অবস্থা, সচ্চিদানন্দের অবস্থা। সমুদ্রে যখন ঢেউ চলছে, তখন এটা

যেন সংসার। ব্রহ্ম যখন নিষ্ক্রিয় তখন তিনি স্বরূপে অবস্থান করেন, সেই ব্রহ্ম যখন নিজের শক্তিকে ব্যক্ত করেন, সমুদ্রে যেন এবার ঢেউ উঠল, এটাই সংসার। শান্ত সমুদ্র যেমন সত্য, তেমনি ঢেউ নিয়ে যে সমুদ্র, সেটাও সত্য। তেমনি সংসার সত্য, সংসার ছাড়া সচ্চিদানন্দও সত্য। আমি শান্ত হয়ে বসে আছি, এটাও আমি, আর আমি কাজ করছি, চঞ্চল আমি, এটাও সত্য। আমি যখন রেগে যাই, রেগে গিয়ে কটূ কথা বলে ফেললাম, আমার কাছের লোকেরা আমাকে হয়ত বলবে, তুমি আর সেই তুমি নও। তার মানে অনেক বেশি বলা হয়ে গেছে। কিন্তু আমি যে আমি নই, সেটা এরও অনেক আগে থেকেই হয়ে আছে। যে মুহূর্তে আমি শরীর ধারণ করে নিয়েছি, সেই শরীর দিয়ে যখন কাজ করতে লেগে গেছি, তখনই আমি আর সেই আমি নই; কারণ আমি তো আসলে সেই শুদ্ধ আত্মা। চঞ্চল হয়ে গিয়ে, একটা শরীর জুটিয়ে, একটা মন জুটিয়ে নদের হাট খুলে বসেছি।

ঠাকুর বরাহ অবতারের কথা বলছেন, ভগবান বরাহ অবতার হয়ে মর্ত্যলোকে গিয়ে সব কাজটাজ করার পর বৈকুণ্ঠে যাওয়ার কথা ভুলেই গেছেন। শিবকে বলা হল, শিব গিয়ে দেখছেন ভগবান বরাহ হয়ে ছানাপোনাদের মাই খাওয়াচ্ছেন। ঠাকুর এই গল্প কোথায় পেয়েছিলেন আমাদের জানা নেই, কারণ বরাহ অবতারকে তো পুরুষ হতে হবে, কিন্তু তিনি ছানাপোনাদের মাই খাওয়াচ্ছেন। যাই হোক ছানাপোনা নিয়ে বেশ আনন্দে আছেন। শিব গিয়ে ত্রিশূল দিয়ে ভগবানের শরীরটা ভেঙে দিতেই ভগবান বরাহ শরীর ছেড়ে হি হি করে হাসতে হাসতে বৈকুণ্ঠে ফেরত চলে গেলেন। এগুলো কাহিনী ঠিকই, কিন্তু আমি আপনি সবাই তাই। আমরা সবাই ভগবান বিষ্ণুর অংশ, ভগবানের সাথে এক। সবাই ছানাপোনা নিয়ে বসে আছি। ভগবানকে যখন বলে তখন বরাহ অবতার বলে, আর মানুষকে যখন বলে তখন বলে শূয়োরের মত। কিন্তু মানুষকে শূয়োর বলাটা গালাগাল হয়ে যায়, বরাহ বললে ওটা সম্মানের হয়ে যায়। আমাদের তো সম্মান দেবে না, বলবে শূয়োরের মত ছানাপোনা নিয়ে সংসারের পাঁকে পড়ে আছে। কদাচিৎ কাউকে পান চিবোতে চিবোতে বলতে দেখা যায়, 'আমার জীবনে কোন দিন কোন কষ্ট হয়নি, মাইরি বলছি জীবনে আমি কোন কষ্ট ভোগ করিনি'। এরাও সংসারের পাঁকে পড়ে আছে, কিন্তু সুখের আমেজে মজে আছে বলে সেই চেতনাটা আসেনি। কিন্তু যে খুব দুঃখ-কষ্ট ও জ্বালা-যন্ত্রণায় জর্জরিত হয়ে আছে, সে বলবে, 'কী পাঁকে যে পড়ে আছি'!

ভগবান বুদ্ধ যখন সিদ্ধার্থ ছিলেন, তখন তাঁর বাবা ছেলের জন্য এমন ব্যবস্থা করে রেখেছেন যাতে সে জগতের কোন দুঃখকে বুঝতে না পায়। বর্ণনা আছে যে, যে সখীরা সিদ্ধার্থকে সঙ্গ দিত, তাদের একজনের বোন মারা গেছে। সেই সখীর চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়ছে। সিদ্ধার্থ বলছেন, 'এটা আবার কি নূতন ধরণের খেলা? চোখ থেকে জল বেরোবার খেলা তো আমি কোন দিন দেখিনি, আমাকে এই খেলাটা একটু শিখিয়ে দাও'। একটু বাড়িয়ে বলা হচ্ছে ঠিকই, কারণ বাচ্চা বয়সে সবাই একটু না একটু কাঁদে। কিন্তু আইডিয়াটা ঠিক তাই, তাঁকে এমন সুখে, স্বাচ্ছন্দে রাখা হয়েছে, যাঁর কাছে দুঃখে চোখের জল ফেলাটাও একটা খেলা মনে হচ্ছে। তখন সখীটি কোন রকমে বলছে, 'আমার বোন মারা গেছে'। সিদ্ধার্থ জিজ্ঞেস করছেন, 'মৃত্যুটা কি জিনিস'? সিদ্ধার্থ কিছুই বুঝতে পারছেন না। কাহিনী এভাবেই বানানো হয়, তবে গিয়ে ছাপ ফেলে। কোন মানুষকেই এই জগতে পাওয়া যাবে না, যে বলবে আমার সংসারটা পাঁক নয়। মিল্টন, গ্যেটে বা যে কোন কবিই যখন সুখের বর্ণনা দেন, তখন সেই বর্ণনা এমন কিছু আহামরি লাগবে না। কিন্তু যখন দুঃখের বর্ণনা করেন, তা সে ইলিয়ড ওডিসি থেকে শুরু করে প্যারাডাইস লস্ট হয়ে বর্তমান যুগের সাহিত্য, উপন্যাস, কবিতায় যে দুঃখের বর্ণনা করা হয়, তখন মনে হবে আহা কি অপূর্ব চিত্রণ! সমগ্র গ্রীক ড্রামা, তাতে শুধু ট্রাজেডি আর ট্রাজেডি, কারণ দুঃখের বর্ণনা খুব সহজে চিত্রণ করা যায়। মানুষের মুখে হাসি কম, কান্না বেশি। আর সত্যিকারের একজন সন্ন্যাসী, যাঁর মন ভিতর থেকে একেবারে ঈশ্বরে ডুবে আছে, তাঁকে ছাড়া হাসি মুখে থাকা কারুর সম্ভব নয়।

আমরা বলি সুখ দুঃখ মিলিয়ে সংসার, কিন্তু আসলে দুঃখেরই সংসার। সংসার একটা পাঁক, ওই পাঁকে আমরা ছানাপোনা নিয়ে শূয়োর হয়ে ঘঁৎ ঘঁৎ করছি। আমি আমার জায়গায়, আপনি আপনার জায়গায় সবাই ঘঁৎ ঘঁৎ করছি। কানপুর হল শূয়োরের শহর, যেখানেই যাওয়া যাবে সেখানেই শূকর শূকরীর বিষ্ঠা। ওই বিষ্ঠার মধ্যে থেকে মনে করছি আহা সংসারটা কত আনন্দের পীঠস্থান। অথচ আমরা সবাই এই সংসার থেকে

আলাদা, আমাদের মনের বৃত্তিগুলি এই সংসার পেতে রেখেছে। বৃত্তি মানে মনের চিন্তন, সেখান থেকে বলছি এটা আমার সংসার, এ আমার স্বামী, এ আমার স্ত্রী, এরা আমার সন্তান, এরা আমার ভাই-বোন, বন্ধু, এরা আমার শত্রু। কোন একটা দিন আমার আপনার মনে হয়, নাঃ, এই শূয়োরের মত আর ঘঁৎ ঘঁৎ করব না? বললেই তো আর ছানাপোনাদের ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া যাবে না! কিন্তু শিব এসে যখন ত্রিশূল মারবে তখন হি হি করে বেরিয়ে যাবে। সংসারের তীব্র দুঃখ, কষ্ট হল শিবের ত্রিশূল, ওই ত্রিশূল দিয়ে আমাদের যখন বিধবে, ক্ষত বিক্ষত করে দেবে, তখন গিয়ে যদি চেতনা আসে।

দুঃখ কষ্ট মানে, যে জিনিসটাকে ধরে রেখেছি, সেই জিনিসটা ভেঙে গেল। আমি আমার বাড়িটাকে ভালবাসি, বাড়িটা ভেঙে গেলে আমার দুঃখ হবে। সন্তানের সাথে আমি একটা বন্ধনে জুড়ে রয়েছি, সন্তান মারা গেলে দুঃখ হবে। কথা গুলো শুনলে মনে হবে নৈরাশ্যজনক, কিন্তু এটাই বাস্তব। দুঃখ কষ্ট যখন হয়, শিবের ত্রিশূল এসে যখন বিদ্ধ করে, তখনই নারায়ণ আমাদের এই দেহ থেকে হি হি করে বেরিয়ে আসেন। সেইজন্য বলা হয়, দুঃখ কষ্ট না পেলে মানুষের চেতনার উন্মেষ হবে না, দুঃখ, জ্বালা যন্ত্রণা, লাঞ্ছনার মধ্য দিয়ে মানুষের চেতনার উন্মেষ হয়। ঠাকুর বলছেন, যে মনে করছে আমি খুব সুখে আছি আর পায়ের উপর পা রেখে গোফে তা দিয়ে যাচ্ছে, এদের অনেক দেরী আছে, এরা তো নরকে বাস করছে। এই শূকরের পাঁক এক রকম, ওই শূকরের পাঁক আরেক রকম, আর এই শূকর ওই শূকরকে বলে আমার পাঁক তোর পাঁকের চাইতে অনেক ভাল। কিন্তু সে ভুলে যাচ্ছে যে দুটোই পাঁক, দুটোই নোংরা। এই শূকর বলছে, এই পাঁক বড়লোকের বাড়ির জল বেরিয়ে হয়েছে, তোর ছোটলোকদের বাড়ি থেকে জল বেরিয়ে পাঁক হয়েছে। কিন্তু সবটাই তো পাঁক।

জগতে যখন কোন শিশু আসে, তখন তার কাঁধে একটা ব্যাগ থাকে, ওই ব্যাগের মধ্যে জমা আছে ওর সব unexplored possibilities। সমস্ত possibilitiesগুলি এক এক করে বেরিয়ে শেষ হয়ে যাওয়ার পর, মানুষ পেসিমিস্ট হয়ে মৃত্যুর অপেক্ষা করতে থাকে, আর শুধু হা হুতাশ করে যায়। অভিমন্যুর তাই হয়েছিল, চক্রব্যূহতে প্রবেশ করে যুদ্ধ করতে করতে সব অস্ত্র নিঃশেষ হয়ে গেল, কোন support system নেই, এবার সে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। আমাদেরও তাই হয়, সব শেষ হয়ে যাওয়ার পর হতাশ হয়ে বসে পড়ি। *বৃদ্ধস্তাবৎ চিন্তা মগ্নঃ*, বৃদ্ধ অবস্থায় মানুষ চিন্তা করতে থাকে, সারাটা জীবন কি করলাম, কেন করলাম, আর বসে থাকে সেই অপেক্ষায়, কবে ওই মৃত্যু এক্সপ্রেস আসবে, আমাকে তুলে নিয়ে যাবে। তুলে নিয়ে যাওয়ার পর আবার যে স্টেশনে নামবে, সেখানে আবার আগে যে কর্মগুলি করা হয়েছিল, সেগুলো unexplored possibilities হয়ে আসবে। প্রত্যেকটা জন্ম এভাবেই চলতে থাকবে। যখনই হা হুতাশ শুরু হয়, বুঝতে হবে, তখনই মন বহির্মুখী থেকে অন্তর্মুখী হতে শুরু করে।

কঠোপনিষদে নচিকেতাকে যমরাজ বলছেন, *কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মনমৈক্ষদ্ আবৃতচক্ষুর্মৃতত্বমিচ্ছন্*, মানুষ এভাবেই বহির্মুখী হয়ে থাকে, কদাচিৎ কোন ধীর পুরুষ তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে আবৃত করে অন্তর্মুখী হয়ে যান। জীবনে দুঃখ কষ্ট যখন প্রচুর আসতে থাকে, তখন আমরা অন্তর্মুখী হয়ে যাই; সেখান থেকেই শুরু হয় ধর্ম। মানুষ তখন দেখে, এই যে এতক্ষণ আমি শূকর হয়ে পাঁকের মধ্যে ঘঁৎ ঘঁৎ করছিলাম, আমি যেটাকে সুখ মনে করছিলাম সেটাও পাঁকে ঘঁৎ ঘঁৎ, আমি যেটার জন্য চোখের জল ফেলছিলাম, সেটাও পাঁকে ঘঁৎ ঘঁৎ। এগুলো সব আমার মন থেকে আসছে, মনের যে চিন্তা-ভাবনা, বিভিন্ন ভাবে মনের যে ভাব উদয় হয়, ওটাই জগৎ। এবার এই সব জিনিসটাকে আমায় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে হবে। নিয়ন্ত্রণে আনার অনেকগুলো পথ আছে, নিষ্কাম ভাবে সেবা করলেও নিয়ন্ত্রণে আসবে, ঈশ্বরের প্রতি যদি ভালবাসা আসে তাও নিয়ন্ত্রণে আসে, যোগশাস্ত্র বলছেন, আসন প্রাণায়ামাদি করে এবং একটি মাত্র বৃত্তিকে অবলম্বন করে মনকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা যায়। মন যত নিয়ন্ত্রিত হতে থাকবে, তত সংসার তার কাছে থেকে দূরে সরে যাবে। যোগ এটাই বলছেন, চিত্তের বৃত্তিগুলি যত নিবৃত্ত হতে থাকবে, বহির্জগৎ তত তার গুটিয়ে আসবে। একজন সত্যিই ধর্মপ্রাণ কিনা নিজে বুঝতে পারবে, সচেতন ভাবে সে নিজেকে কতটা বহির্জগৎ থেকে গুটিয়ে নিয়ে আসছে। যার সামাজিক পরিধি এখনও বিরাট বড়, হোয়টস্ আপ, ফেসবুক এখনও বড় মাপের, আর সমাজের অনেকের সাথে নিজেকে জড়িয়ে রেখে বিভিন্ন পার্টিতে যাচ্ছে, তাদের বাড়িতে ডেকে পার্টি দিচ্ছে, বুঝতে হবে এখনও তার ধর্মজীবন শুরু হয়নি। তাহলে যারা হতাশা আর নৈরাশ্যে নিজেকে সবার থেকে গুটিয়ে রেখেছে তারা ধার্মিক? একেবারেই

না, কারণ তারা নিজেরা তাদের এই পরিস্থিতিকে ভালবেসে সচেতন ভাবে বেছে নেয়নি। যারা হতাশাগ্রস্ত হয়ে আছে, তারাও দশজনের সাথে মিশতে চাইছে, কিন্তু তার বর্তমান মানসিকতার জন্য পারছে না। সন্ন্যাসীও ভিখারী, আবার ভিখারীও ভিখারী। ভিখারীকে লোকেরা অবজ্ঞা করে, গালাগাল দেয়। সন্ন্যাসীকেও অনেকে গালাগাল দেয়, আবার অনেকে প্রণামও করে।

একবার এক বড় কোম্পানীর মালিকের সাথে দেখা করতে একজন সন্ন্যাসী তার বাড়ির ফটকের সামনে দাঁড়াতেই দারোয়ান শুধু লাঠি দিয়ে মেরে তাড়ায়নি, কিন্তু বাকি সব কিছুই করেছে। যাই হোক অনেক ভাবে বোঝানর পর সন্ন্যাসী ভিতরে গেছেন। কোম্পানীর মালিক ওই সন্ন্যাসীর কাছে অনেক ভাবে কৃতজ্ঞ ছিলেন। কথাবার্তার পর মালিক নিজে সন্ন্যাসীকে ছাড়তে এসেছে, মালিক এসেছে বলে সাথে আরও পাঁচজন এসেছে। দাড়োয়ান তো দেখে হতবম্ব। কারণ তার কাছে সাধু মানেই ভিখারী। তাহলে সাধু আর ভিখারীতে তফাৎ কোথায়? ভিখারী দায়ে পরে ভিখারী হয়েছে, আর সাধু নিজের সদিচ্ছাতেই ভিখারী হয়েছেন। নিজের ইচ্ছাতে যখন করা হয়, তখন সে রাজা, বাধ্য হয়ে যখন করে তখন সে কাঙালী। প্রধানমন্ত্রীর চারিদিকে যে পুলিশরা থাকে, প্রধানমন্ত্রী যেদিকে যেতে চাইবেন পুলিশদের সেদিকেই যেতে হবে, আর একজন ক্রিমিনালের সাথে যে পুলিশরা থাকে, পুলিশ যেদিকে যেতে বলবে ক্রিমিনাল সেদিকেই যেতে বাধ্য। সমাজ, সংসার থেকে যত সরে আসতে চাইছে, তার মানে তার মনের বৃত্তিগুলি এবার শান্ত হতে চাইছে, অবশ্য যদি ওটা তার অপশান্ হয়ে থাকে। মন যদি সত্যিই নিয়ন্ত্রণে আসে, সে স্বাভাবিক ভাবেই দেখতে পাবে যে জাতে উঠে যাচ্ছে, ছিল শূদ্র, হয়ে গেল ব্রাহ্মণ। যোগ মানেই জাতে উঠে যাওয়া, অন্য ভাবে জাতে উঠে যাওয়া মানে তার বৃত্তিগুলি অনেক নিয়ন্ত্রণে এসেছে। স্বামীজী বলছেন –

যোগ ও বেদান্তের সমন্বয়ে অখণ্ডের ব্যাখ্যা

Mind is a mixture of sensation and feeling or action and reaction; so it cannot be permanent. (*মন বিষয়-সমূহের ছাপ ও অনুভূতির, অর্থাৎ ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার মিশ্রণস্বরূপ, সুতরাং তা নিত্য হতে পারে না।*) এবার স্বামীজী আত্মার সাথে তুলনা করে মনকে ব্যাখ্যা করছেন। জগতে স্থায়ী বলতে কি? কিছুই জগতে স্থায়ী নয়, একমাত্র আমিই স্থায়ী, স্থায়ী আত্মা রূপে, মন রূপে নয়। মন রূপে কেন স্থায়ী নয়? কারণ আমরা দেখছি মন সব সময় পাল্টাচ্ছে, মন এই ভাল আছে, পরক্ষণে আবার মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। মনের এই বিরূপ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, একটু পরেই ভাল প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, এই বাইরে থেকে কোন অনুভূতি হল, একটু পরেই অনেক দিনের ভাল বা মন্দ কোন স্মৃতির কথা মনে উদয় হতেই মনের বিভিন্ন ধরণের প্রতিক্রিয়া হতে শুরু করে দিল। যেখানে এত ঝড় ঝঞ্ঝা চলতে থাকে, সেটা কখনই স্থায়ী হতে পারে না। আগেকার দিনে, এখনও অনেক ফর্মে একটা কলম থাকে পার্মানেন্ট এ্যাড্রেস, তার নীচে থাকে প্রেজেন্ট এ্যাড্রেস। প্রেজেন্ট এ্যাড্রেস যে কোন সময় পাল্টে যেতে পারে, কিন্তু পার্মানেন্ট এ্যাড্রেসটা আশা করা যায় সহজে পাল্টাবে না। যেমনি অন্য ধরণের কিছু খাবার খেতে শুরু করল শরীরটা পাল্টে যেতে শুরু করল, আর মন অনবরত ভাল মন্দের মধ্যে দোল খেয়ে যাচ্ছে, সেইজন্য শরীর মন কখনই পার্মানেন্ট এ্যাড্রেস হতে পারে না। তাই আমি যে আমার মনের সাথে নিজেকে জুড়ে রেখে মনটাই আমি মনে করছি, কোথাও কিন্তু আমার একটা ভুল হয়ে যাচ্ছে। ভুল থাকুক আর নাই থাকুক, আমি যে আমাকে বড় করার চেষ্টা করছি, নিজেকে ঠিক করার চেষ্টা চালাচ্ছি সেখানে আমি এমন একটা অস্থায়ী জিনিসকে নিয়ে কি করব! যে মানুষ সুখে আছে, যার সব কিছু ভাল চলছে, সে একটা স্থায়ী জিনিসকে ছেড়ে অস্থায়ী জিনিসের দিকে কখনই যাবে না। আমি একটা ভাল চাকরি করছি, মোটা মাইনে পাচ্ছি, সেখানে আমাকে এসে যদি কেউ বলে, চলুন এক মাসের জন্য এর থেকে মোটা মাইনের একটা ভাল চাকরি আছে। সেখানে কেন আমি যাব? সবাই আমরা একটা স্থায়ী জিনিস চাইছি, স্থায়ী চাকরী, স্থায়ী বাসস্থান, স্থায়ী শান্তি। কিন্তু মন আমাদের স্থায়ী কিছু দিতে পারবে না, তার সহজ কারণ হল, মন নিজেই সব সময় পাল্টাচ্ছে।

এর আগে আমরা স্থূল শরীর, সূক্ষ্ম শরীর, কারণ শরীর আর শুদ্ধ আত্মা আছেন, এগুলোকে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম। শরীরের দিক থেকে স্থূল শরীর আর সূক্ষ্ম শরীর। কারণ শরীরটা ঠিক শরীর নয়, ওটা আত্মারই একটা অবস্থান, যেখানে অজ্ঞানের একটা ক্ষীণ আবরণ রয়েছে। স্থূল শরীরের প্রধান যেমন

আমাদের মাথা, সূক্ষ্ম শরীরের প্রধান হল মন। The mind has a fine body and through this it works on the gross body. (*মনের একটা সূক্ষ্ম শরীর আছে, সেই শরীর দ্বারা মন স্থূল দেহের উপর কার্য করে থাকে।*) আমাদের স্থূল শরীরের পিছনে যে সূক্ষ্ম শরীর আছে, সমস্ত কাজ ওই সূক্ষ্ম শরীরই করে। যেমন আমি হাত নাড়লাম, আমরা মনে করছি, আমার ইচ্ছা হল আমি হাতটা নেড়ে দিলাম। কিন্তু তা কখনই হয় না। ইচ্ছে যখন হয়, ওই ইচ্ছার পিছনে কোন কারণ আছে বা কোন শক্তি আছে, যা কিনা আমরা ধরতে পারি না। একটু গভীরে গিয়ে অনুসন্ধান করলেই ইচ্ছার পিছনের কারণ বা শক্তিকে ধরা যায়। সেই কারণ বা শক্তি মনের ভিতরে দুটো কারণে হতে পারে, একটা বাইরে থেকে আমি কোন সংকেত পেলাম, বা ভিতরে স্মৃতি আদি থেকে কোন সংকেত এসে মনকে নাড়া দিল, মনের পাশেই ইন্দ্রিয় থাকে, যেটা মনের ভিতরে, এটা হল আমাদের ফিজিক্যাল ব্রেন সেন্টার। আগেকার দিনে এই জিনিসগুলো বোঝা যেতো না।

ভি এস রামচন্দ্রন একজন বড় নিওরোলজিস্ট, তিনি প্রথম অনেকগুলো জিনিস আবিষ্কার করে দেখালেন কিভাবে আমাদের মস্তিস্কে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সেন্টারগুলি রয়েছে এবং এই সেন্টারগুলো কিভাবে আমাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। কোন কারণে একটা কোন অঙ্গ যদি নষ্ট হয়ে যায়, তখন সেই অঙ্গ দিয়ে কোন সংকেত আসবে না, তাতে ব্রেন সেন্টারের ওই ইন্দ্রিয়ের জায়গাটা ফাঁকা হয়ে যায়, তখন ওর পাশে যে ইন্দ্রিয়ের ব্রেন সেন্টারটা আছে সেটা ওই জায়গাটা টেনে নেয়। যেমন একজন অন্ধের চোখ না থাকাতে চোখ দিয়ে কোন কিছু impulse ব্রেন সেন্টারে যাচ্ছে না, তার মানে চোখের ব্রেন সেন্টারটা ফাঁকা পড়ে আছে। আশ্চর্যের যে আমাদের ব্রেন সেন্টার যখন কাজ করে, তখন ব্রেনের শতকরা আশি ভাগ অংশ চোখ নিয়ে নেয়, বাকি কুড়ি ভাগের মধ্যে চারটি ইন্দ্রিয় কাজ করে। আশি ভাগ ফাঁকা অংশটা এবার বাকি চারটে ইন্দ্রিয় ভাগ করে নেয়। সেইজন্য যারা অন্ধ হয় তারা কানে ভাল শুনতে পায় বা স্পর্শ দিয়ে অনেক কিছু বুঝে নিতে পারে। মূল কথা এটাই, সূক্ষ্ম শরীর এই স্থূল শরীরকে চালায়। আমি যে ঘাড় নাড়ছি, হাত তুলছি, ঝগড়া করছি, কথা বলছি, আমার চিন্তা-ভাবনা, আমার শরীরের সমস্ত রকম ক্রিয়া, সব এই সূক্ষ্ম শরীর দিয়ে হয়; তাই সূক্ষ্ম শরীরের এতো গুরুত্ব। সূক্ষ্ম শরীরের মূল জিনিসগুলো হল, মন, দশটি ইন্দ্রিয়, যেটা ব্রেন সেন্টারস, তার সাথে আছে পঞ্চপ্রাণ।

বলছেন, Vedanta says that behind the mind is the real Self. It accepts the other two, but posits a third, the Eternal, the Ultimate, the last analysis, the unit, where there is no further compound. (*বেদান্ত বলেন, মনের পশ্চাতে যথার্থ আত্মা আছেন। বেদান্ত অপর দুটিকে –অর্থাৎ দেহ এবং মনকেও স্বীকার করে থাকেন; আর একটি তৃতীয় পদার্থ স্বীকার করেন –যা অনন্ত, চরমতত্ত্ব-স্বরূপ, বিশ্লেষণের শেষ ফলস্বরূপ এক অখণ্ড বস্তু –যাকে আর ভাগ করা যেতে পারে না।*) স্বামীজী যোগের উপর বলতে পারেন, সাংখ্যের উপর বলতে পারেন, কিন্তু স্বামীজী বেদান্তের আচার্য, অবতারের সঙ্গী, তাঁর কাছে বেদান্তই সব। কারণ শরীরকে যোগ মানে না, তাই আলোচনাও করে না; যোগ মানে স্থূল শরীর আর তার সাথে মন বা মনের সাথে সূক্ষ্ম শরীরকে। স্বামীজী বলছেন, যোগের যা বক্তব্য বেদান্ত তার সবটাই মানে, কিন্তু বেদান্ত শরীরকেও স্থায়ী মনে করে না, মনকে স্থায়ী মনে করে না, এই দুটোর পিছনে যেটা স্থায়ী, সনাতন, যেটা কোন ভাবেই আর compound নয় –বেদান্তের চরম লক্ষ্য এই এক অখণ্ড বস্তু।

গীতা, উপনিষদের ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর বার বার একটা জিনিসকে তুলে আনছেন, যে জিনিসটা মিশ্রণ সেই জিনিসটা কখনই স্থায়ী হতে পারে না, চরম সত্য হতে পারে না। সেটাই সত্য যেটা সরল। ঠাকুর বলছেন, ঈশ্বরের এক নাম সহজ, সহজ না হলে ঈশ্বরকে জানা যায় না। মানুষের মধ্যে যাঁদের ব্যবহার খুব সরল, মনটা সরল, তাঁদের আমরা খুব সম্মান করি। কারণ ভগবান নিজে সব সময় সহজ সরল। তিনি যেমন আমাকে ভালবাসেন, সবাইকেও ভালবাসেন, তিনি যেমন দেবতাদের ভালবাসেন, ঠিক তেমনি তিনি অসুরদেরও ভালবাসেন। তিনি যেমন ভালকে ভালবাসেন, তেমনি মন্দকেও ভালবাসেন। গীতায় বলছেন, আমার কারুর প্রতি দ্বেষও নেই, কেউ আমার প্রিয়ও নয়। কারণ ভগবান আলোর মত, এই আলোতে কেউ ভাল কাজ করছে, কেউ শাস্ত্র অধ্যয়ন করছে, কেউ নোট জাল করছে, কেউ নোংরা বই পড়ছে। আলোর তাতে কোন সম্পর্ক নেই, আলো আলোই। আমি আপনি কি করব, সেটা আমাদের ইচ্ছা। আমি কি করব, আমি কি করছি, উদ্দেশ্য

এটাও না; উদ্দেশ্য হল ওই আলোর সাথে এক হয়ে যাওয়া। বেদান্ত মানেই তাই, এই জিনিসটাকে বুঝে নেওয়া যে, আমি যা কিছু করছি, সেই আলো আছে বলে করছি, শুদ্ধ সচ্চিদানন্দই সেই আলো। সেই আলোতে আমি কি করছি সেটা আমার ব্যাপার, কিন্তু আমি আমার কিছু করতে চাই না, আমি সেই আলোর সাথে এক হয়ে যেতে চাই। ওই আলো কোন কিছুর compound নয়, simple, সহজ সরল, ওটাই এক দুয়ের পার, ওই আলোই সব কিছুর আধার।

আর বলছেন, Birth is recomposition, death is de-composition, and the final analysis is where Atman is found, there being no further division possible, the perdurable is reached. (*জন্ম হচ্ছে পুনর্যোজন, মৃত্যু হচ্ছে বিয়োজন, সব কিছু বিশ্লেষণ করতে করতে শেষে আত্মাকে পাওয়া যায়। আত্মাকে আর ভাগ করা যায় না, সুতরাং আত্মাতে পৌঁছালে নিত্য সনাতন তত্ত্বে পৌছানো গেল।*) বলছেন, জন্ম হল পুনর্যোজন, মৃত্যু হল বিয়োজন, এইভাবে বিশ্লেষণ করতে করতে, চিন্তন করতে করে আমরা যখন শেষ অবস্থায় পৌঁছাই, তখন দেখি আত্মাই একমাত্র সত্য; perdurable মানে যেটা শেষ সত্য, চিরস্থায়ী।

কঠোপনিষদে আত্মাকে পরিভাষিত করতে গিয়ে যমরাজ বলছেন, *নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনাশ্চেতনানাম্ একো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্*, অনিত্যের মধ্যে যিনি নিত্য, চেতনার মধ্যে যিনি চেতনা, যিনি এক অথচ বহু হয়ে দেখান, যিনি সমস্ত কামনার পুর্তি করেন –আত্মাকে নিয়ে বলার সময় এই ভাবটা বারবার ঘুরে ঘুরে আসে। যদি আমরা মনের চিত্তবৃত্তিকেও নিয়ে ভাবি, যখন মনে কোন ঢেউ ওঠে তখন ওই একটা ঢেউ অনেকগুলোর মধ্যে পরিবর্তিত হয়ে যায়। মনে যদি কোন চিন্তাও আসে, ওই একটা চিন্তা অনেকগুলো চিন্তার মধ্যে, অর্থাৎ বৃত্তির মধ্যে পরিবর্তিত হয়ে যায়। উদ্দেশ্য হল, বাকি বৃত্তিগুলিকে আটকে দিয়ে, অনেক থেকে একে যাওয়া, তার ওই একের পরে, এক আর দুইয়ের পারে যাওয়া, শূন্যতে না। কারণ শূন্য বলে কিছু হয় না, বেদান্তেও হয় না, যোগেও হয় না। শূন্য যখনই বলি তখনই কিন্তু এক এসে যাবে, আমাদের উদ্দেশ্য এই এক দুইয়ের পারে যাওয়া। চিত্তবৃত্তি নাশ করতে করতে সব বৃত্তি নাশ হয়ে গেলে কটা বৃত্তি থাকবে? আমরা প্রচলিত ভাব অনুযায়ী বলি শূন্য বৃত্তি। কিন্তু তা না, কারণ এই প্রশ্নটা তখন আর হয় না। যদি সহজে বলতে হয়, তখন বলবে কোন বৃত্তি নেই। তাহলে কি শূন্য বৃত্তি? না, শূন্য বৃত্তি বলা মানে আরেকটা বৃত্তি আসবে। উদ্দেশ্য হল, যোগ সাধনা করে বা বেদান্ত সাধনা করে বা যে সাধনা করেই হোক, উদ্দেশ্য হল মনের ভিতরে যে বৃত্তিগুলি উঠছে, এগুলোকে নাশ করা। মনের মধ্যে বৃত্তি বা যে চাঞ্চল্য উঠছে, বহির্জগতে এটাই আমাদের শূকর বানিয়ে পাঁকের মধ্যে ঘঁৎ ঘঁৎ করাচ্ছে। বহির্জগতে কিছু নেই, যা আছে সব মনের ভিতরে। মনের বৃত্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করলে বহির্জগতও মুঠোয় চলে আসবে, বহির্জগতকে নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে মনের বৃত্তির নিয়ন্ত্রণ কখনই হবে না। মন হল রক্তবীজ, একটা বৃত্তিকে আটকাতে গেলে আরও হাজারটা বৃত্তি উঠে আসবে। অশ্বত্থ গাছ আজ কেটে দিলে, কাল ওখান থেকে আবার একটা ফেকড়ি বেরিয়ে আসবে। স্বামীজী এখানে যোগ আর বেদান্তকে মিলিয়ে বলছেন, উদ্দেশ্য হল সেই আত্মাতে পৌঁছান, যেটা এক দুইয়ের পারে, এবং স্থায়ী।

আলোচনার সারাংশ

সংক্ষেপে যোগ জিনিসটাকে আরেকটু ঝালিয়ে নেওয়া যাক। যোগ সাধনার দুটো পথ। একটা হল যখন ঈশ্বরের অবস্থা থেকে অর্থাৎ উপর থেকে দেখা হয়, আরেকটা হয় নীচের অবস্থা থেকে দেখা। সৃষ্টি, সৃষ্টির সাথে যে নানান রকমের সাধনা, সেখানে সব সময় এই রকমই বলা হয়, ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন। সেখান থেকে ধীরে ধীরে নিয়ে যান, কিভাবে মানুষ আবার ঈশ্বরের কাছে যেতে পারে। সাধারণ ভাবে এটাকে আমরা বলি talk down approach, ওপরটাকে আগে বলছেন, নীচেরটা পরে বলছেন। যোগ হল, bottom of approach line, বাস্তব যেমন সেটাকে আগে ধরবে, সেখান থেকে ধীরে ধীরে উপরে নিয়ে যাবে। মন সব সময় চঞ্চল, মন স্থির থাকতে পারে না, মানে স্থির থাকতেই পারবে না, মন মানেই চাঞ্চল্য, চাঞ্চল্য মানেই মন। আমরা কাউকে যখন বলি, মনটাকে একটু শান্ত কর, তখন আমরা বলতে চাইছি, মনে যে ঘূর্ণি ঝড় চলছে সেটাকে একটু শান্ত করে ঢেউএর অবস্থায় নিয়ে এসো। আমরা যাকে চঞ্চল মন বলছি, তার মানে এর মনে হাজার হাজার চিন্তা ভাবনা উঠছে। হাজার হাজার চিন্তা ভাবনা ওঠা মানে, মনে একটাই চিন্তা থাকে, দুটো চিন্তা

থাকে না। ঠাকুর যখন সমাধিতে, তখনও একটাই চিন্তা আছে। যে পাগল বা যার বিক্ষিপ্ত মন, তারও কিন্তু একটাই চিন্তা থাকে। তফাৎ হল ওই একটা চিন্তা মনে কতক্ষণ স্থায়ী থাকছে। আমরা যাকে খুব চঞ্চল মন বলছি, ওই মনে এক সেকেণ্ডে পঁচিশ থেকে তিরিশটা চিন্তা এসে বেরিয়ে যায়। আমার আপনার মত লোকেদের এক সঙ্গে পাঁচ থেকে সাত খানা চিন্তা যাচ্ছে। যাঁরা শান্ত মনের, গান্ধীজীর মত যাঁরা, তাঁদের একটা চিন্তা এক সেকেণ্ড, দু সেকেণ্ড করে থাকে। সমাধি অবস্থায় একটা চিন্তা অনেকক্ষণ ধরে চলতে থাকে। আর ঠিক ঠিক সমাধির অবস্থায়, যেটাকে পতঞ্জলি define করছেন, সংযমাদি করে যে সমাধি হয়, সেখানে একটা চিন্তাতে যখন থাকে তখন মনের মধ্যে ওই একটা চিন্তাই এক ঘন্টার উপরে চলতে থাকে। আমরা যে চিত্তবৃত্তির কথা বলছি, যেখানে নির্বিকল্প সমাধি হয়, সেখানে কোন বৃত্তি থাকে না, সেটাকে নিয়ে তাই এখানে আলোচনা করে লাভ নেই।

যাঁরা ঠাকুর বা নিজের ইষ্টদেবতাকে নিয়ে সাধনা করেন, তাঁদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, যেমনি জপে বসে জপ করতে শুরু করবে, দুনিয়ার সব রকম চিন্তা সেই সময় মনের মধ্যে আসতে আরম্ভ হয়ে যাবে। ওই চিন্তাগুলো কি জপের সময়ই শুধু আসছে? একেবারেই না, ওটা আমাদের সব সময়ই আসে। একটা জিনিস কত জোরে ঘুরছে, ওটাকে বোঝানর জন্য যদি একটা সেট জিনিস না রাখা হয়, আমরা কখনই বুঝতে পারব না, ওটা কত স্পীডে ঘুরছে। দুটো ট্রেন সমান গতিতে যদি পাশাপাশি চলতে থাকে, পাশের ট্রেনের দিকে তাকালে আমরা বুঝতে পারব না যে, ট্রেন আস্তে যাচ্ছে নাকি জোরে যাচ্ছে। কিন্তু পাশে যদি কোন স্থির বস্তু থাকে, একটা লাইটপোস্ট বা গাছ থাকলে তখন আমরা বুঝতে পারি। আমরা যখন কাজ করি, কথা বলি, তখন সেখানে সব কিছুই চঞ্চল, তাই আমরা বুঝতেও পারছি না যে, আমাদের মন কত চঞ্চল। কিন্তু যেমনি জপ করতে বসছি, ধ্যানের কথা ছেড়েই দেওয়া হল, তখন ওই একটা চিন্তা নিয়ে আসছি 'ওঁ নমঃ শিবায়', ওটা স্থির, তখন দেখছি ওর চারিপাশে ঝড়ের বেগে সব কিছু ঘুরতে শুরু হয়ে যায়। তখন মনে হয়, আমার তো এমনি অবস্থাই ভাল ছিল। কিছুই ভাল না, জপের বাইরে যেমন, জপেতেও তেমন হচ্ছে। আট দশ বছরের বাচ্চাদের মন আরও অনেক বেগে চলে, পাগলদের মনও অনেক বেগে চলে। সেইজন্য কোন চিন্তা ভাবনাকে ওরা ধরতে পারে না, কারণ মন এত দ্রুত চলছে যে, মনের মধ্যে এত ঢেউ উঠছে যে, মোটামুটি যদি তিন মিনিট সময় বাচ্চাদের দেওয়া হয়, ওই তিন মিনিটের মধ্যে কত চিন্তা এসেছে আর চলে গেছে, ওরা নিজেরাও বুঝতে পারে না। স্কুলে যে এত রকমের ডিসিপ্লিনের মাধ্যমে ছাত্রদের অনুশাসনে রাখা হয়, এর একটাই উদ্দেশ্য, জোর করে ছাত্রদের মনকে শান্ত করতে শেখানো। ক্লাশের পিছনের দিকের ছাত্রগুলো একটা খাতা খুলে মাস্টারের মুখের ছবি আঁকবে, পাখির ছবি আঁকবে, কিংবা কিছু একটা করতে থাকবে। এরা শান্ত হতে পারে না, বৃত্তি মানে ওই চাঞ্চল্য।

বৃত্তি সবারই থাকে। ঠাকুরও যখন মা কালীর ধ্যান করছেন, তখন তাঁরও এই একটা বৃত্তি আছে, মা কালীর বৃত্তি। কিন্তু ওই একটা বৃত্তি অনেকক্ষণ সময় ধরে চলতে থাকে। আমাদের মনকে যে শান্ত করতে বলা হয়, তার মানে, সেকেণ্ডে আমাদের যে কুড়ি থেকে পঁচিশটা চিন্তা মনের মধ্যে ঢুকছে আর বেরিয়ে যাচ্ছে, সেটাকে কমিয়ে তিন চারটে বৃত্তিতে নিয়ে আসতে বলা। যাঁরা মনকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন, ভিতরে সত্যিকারের ভক্তি আছে, তাঁরা খুব একাগ্র হয়ে যদি অনেকক্ষণ জপ করেন, তাহলে দেখা যাবে তাঁর একটা চিন্তা দুই থেকে তিন সেকেণ্ড থাকছে। মন যত স্থির হবে, তত তার শক্তি কিন্তু বাড়বে। সমস্ত শক্তি আত্মা থেকেই আসে, মনের কোন শক্তি নেই, শরীরের কোন শক্তি নেই। মন স্থির হওয়া মানে, এবার আত্মার সাথে তার দূরত্ব কমছে বা আত্মার উপর মনের যে কপাট আছে, সেই কপাটটা এবার যেন বেশি করে খুলতে শুরু করেছে। ওখান থেকেই সমস্ত শক্তি ও জ্ঞান বেরিয়ে আসে।

সব তরঙ্গই স্বরূপতঃ সমুদ্র, কিন্তু তরঙ্গ রূপে অংশমাত্র

কিন্তু আমরা যে জ্ঞানের কথা বলছি, এই জ্ঞান যখন বুদ্ধিতে নামে তখন আমরা তাকে মন, মনের বৃত্তি আদি বলছি। আসলে সেই এক বিশ্বমন, আমরা মনে করছি আমার মন, তার মন; কিন্তু তা না, সেই এক মন, ওরই এগুলো বিভিন্ন ছোট ছোট রূপ। স্বামীজী সেইজন্য বলছেন, The whole ocean is present at the back of each wave, (*প্রত্যেক তরঙ্গের পশ্চাতে সমগ্র সমুদ্রটা রয়েছে।*) সমুদ্রে বা গঙ্গায় আমরা যে ঢেউ

দেখছি, আমরা দেখছি ঢেউ রূপে, কিন্তু ওই ঢেউএর পিছনে রয়েছে সমগ্র সমুদ্র। আগেকার দিনে ভোজ একটা বিরাট সম্মানের ব্যাপার ছিল, ইদানিং ভোজ উঠে গিয়ে এসেছে পার্টি। কেউ মারা গেলে, বাড়িতে বিবাহ, অন্নপ্রাশন হলে, লোকজনদের ডেকে খাওয়ানো হত। জমিদারের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে, জমিদার নিজের আসতে পারবে না, সে তার নাতিকে ভোজে পাঠিয়ে দিল। নাতি নিমন্ত্রণ বাড়িতে এলে তাকে সেই সম্মানই দেওয়া হবে, যে সম্মান জমিদার নিজে এলে দেওয়া হত। কারণ নাতি কিছু না, নাতির পিছনে যে শক্তি, সেটাই আসল।

সেই রকম একটা ঢেউয়ের পিছনে রয়েছে সমস্ত সমুদ্র আর সমুদ্রের সেই শক্তি; and all manifestations are waves, some very big, some small; yet all are the ocean in their essence, the whole ocean, but as waves each is a part. (*যত কিছু অভিব্যক্তি, সবই তরঙ্গ, তবে কতকগুলি খুব বড় আর কতকগুলি ছোট এইমাত্র। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ-সব তরঙ্গ স্বরূপতঃ সমুদ্র —সমগ্র সমুদ্র; কিন্তু তরঙ্গ-হিসাবে প্রত্যেকটি অংশমাত্র।*) আমি, আপনি, সে, আমরা সবাই এক একটা ঢেউ, কিন্তু এর পিছনে রয়েছে অনন্ত সচ্চিদানন্দ সাগর। সাগর রূপে দেখলে সমস্ত ঢেউ এক, ঢেউ রূপে দেখলে সমস্ত ঢেউ আলাদা। ঢেউ রূপে আমি, আপনি সবাই আলাদা, ঢেউ রূপে আমার শরীর, আমার মন, আমার ইন্দ্রিয় আলাদা। কিন্তু সমুদ্র রূপে কোথাও আলাদা বলে কিছু নেই, সমুদ্র রূপে আমিও যা, আপনিও তাই। সমুদ্রের একটা ঢেউ যদি আরেকটা ঢেউকে বলে, দ্যাখ্ আমি তোর থেকে কত বড়। ঠিকই, বড়তো বটেই, কিন্তু সমুদ্র রূপে আমি আর তুমি সমান। যদি দেখা যায় কারুর জীবনে দুঃখ চলছে, কষ্ট ভোগ করছে, তার মানে, সে নিজেকে সমুদ্রের সাথে জুড়ে রাখতে পারছে না, নিজেকে বেশি করে ঢেউ রূপেই দেখছে। সব দুঃখ-কষ্টের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে, যদি বৃহত্তর সত্যের সাথে নিজেকে জুড়ে দেয়।

অনেক আগে বিদেশ থেকে কিছু পুলিশ অফিসার এসেছিলেন, কলকাতায় পুলিশরা কিভাবে কাজ করে দেখার জন্য। বিদেশ থেকে আসা পুলিশের লোকেরা দেখতে চাইলেন, আপনার বিশাল লোকের জমায়েতকে কিভাবে সামলান। ওই সময় ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের একটা খেলা চলছিল। বিদেশী পুলিশ অফিসারদের নিয়ে যাওয়া হল। খেলা শেষ হতেই ষাট সত্তর হাজার লোক মাঠ থেকে বেরিয়ে এসেছে। বিদেশিরা জানতে চাইলেন, কতজন পুলিশের লোক এখানে ডেপুট করা হয়েছে এই ভিড় সামলাবার জন্য। বলা হল পাঁচ থেকে সাতজন পুলিশ। শুনে ওরা থ হয়ে গেল। তার কারণ, একজন লিকলিকে চেহারার পুলিশ একটা ডাণ্ডা নিয়ে যদি এখানে দাঁড়িয়ে যায়, সেই পুলিশও জানে আর লোকেরাও জানে, পুরো রাজসত্তা ওই একটা পুলিশের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে।

একজন অশিক্ষিত, গেঁয়ো লোক একটা রাজ্যের যদি কোন মন্ত্রী হয়, তার সামনে বড় বড় আইএএস, আইপিএস অফিসাররা মাথা ঝুঁকিয়ে রাখে, কারণ রাজ্যের যে জনগণ, সব জনগণের তিনি মুখোস। ওই সমগ্র জনসমূহের সম্মিলিত শক্তির একজন প্রতিনিধির সামনে আইএএস ও আইপিএসরা মাথা নত করছে, এখানে ব্যক্তি কিছু না। এমএলএ, এমপিরা হলেন জনগণের প্রতিনিধি, জনগণের সেবার জন্য তাঁদের মানুষ নির্বাচিত করেছে, তাই কোন অফিসার, তা সে যত বড় অফিসারই হন না কেন, এমএলএ, এমপিকে অসম্মান করে কোন কিছু বলতে বা করতে পারে না। আমরা নিজেদের সীমিত মনে করে মারাত্মক ভুল করছি, আমরা কেউ ঢেউ না, আমরা আসলে সেই সমুদ্র। আমাদের শিক্ষার অভাব, ট্রেনিংএর অভাব, সেইজন্য আমরা নিজেদের সীমিত বলে মনে করছি।

যোগের এটাই শিক্ষা, যেমন যেমন তুমি চিত্তবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে পারবে, তেমন তেমন তুমি জানতে পারবে, তুমি ঢেউ নও, তুমি সমুদ্র। যেদিন এই জ্ঞান তোমার মধ্যে পূর্ণ হয়ে জেগে উঠবে, তখন তুমি নিজেই অবাক হয়ে ভাববে, আরে! তাই তো, এতদিন আমি কাকে ভয় করছিলাম, কার জন্য আমি এতো উতালা হয়েছিলাম, কি করে আমি শূকরের পাঁকের মধ্যে পড়ে ঘঁৎ ঘঁৎ করে আনন্দ পাচ্ছিলাম! যতদিন আমরা নিজেদের শরীর মনে করছি, মন মনে করছি, আর যতদিন শরীর দিয়ে মন দিয়ে চেষ্টা চালাচ্ছি, তখনও আমাদের সাফল্য যে আসবে না তা নয়, আসতে বাধ্য। সাফল্যের উপর কত বই লেখা হচ্ছে, বইগুলি বিক্রী হচ্ছে বলেই তো লোকেরা বই এর পর বই লিখেই যাচ্ছে। ম্যানেজমেন্টে এত এত ডিগ্রী দেওয়া হচ্ছে, আর

সবচেয়ে বেশি ম্যনেজমেন্ট ইনস্টিট্যুট আমেরিকাতে, আর ইদানিং কালে আমেরিকা হল অর্থনীতির ক্ষেত্রে সব থেকে ব্যর্থ দেশ। তারা নিজেদেরই সামলাতে পারছে না, এরাই আবার ভারতে ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ম্যানেজমেন্ট স্টাডি খুলে পাড়ায় পাড়ায় ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিট্যুট তৈরী করছে। তাও তো লোকেরা পড়তে যাচ্ছে, কোথাও একটা সাফল্য অবশ্যই পাচ্ছে। বিশ্বের পাঁচজন শ্রেষ্ঠ ধনীর কারুরই ম্যানেজমেন্ট ডিগ্রী নেই। বিশ্বের দশজন শ্রেষ্ঠ উদ্যোক্তাদের কারুরই ম্যানেজমেন্ট ডিগ্রী নেই। আশ্চর্যের, অথচ ম্যানেজমেন্ট ডিগ্রীর জন্য কত সংস্থা, কত বই, কত লোক যুক্ত। প্রকৃত সাফল্য আসে অন্য জায়গা থেকে, কিন্তু ওই সাফল্য আর কজনের জীবনে আসবে! তাই বাকিদের এই সব সংস্থায় ট্রেনিংএর মাঝখান দিয়ে যেতে হয়। যীশু, বুদ্ধ, শ্রীরামকৃষ্ণের মত মহাপুরুষদের মধ্যে প্রকৃত শক্তির বিকাশ হয়, কারণ তাঁরা শরীর, মনকে ছেড়ে আত্মাকে ধরে এগিয়েছেন। বাকিরা শরীর দিয়ে চেষ্টা করছে, মন দিয়ে চেষ্টা করছে। এটাকে মনে রাখা যে, আমি ঢেউ না, আসলে আমি সমুদ্র, আমাতে আর তোমাতে এই যে তফাৎ, এটা ঢেউয়ের তফাৎ ঠিকই, কিন্তু সমুদ্রের দিক থেকে কোন তফাৎ নেই।

তদাদ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্

শাস্ত্রে এই কথাগুলিই ঘুরে ঘুরে আসে। When the waves are stilled, then all is one 'a spectator without a spectacle', says Patanjali, (*তরঙ্গসমূহ যখন শান্ত হয়ে যায়, তখন সব এক –পতঞ্জলি বলেন, 'দৃশ্যবিহীন দ্রষ্টা'।*) স্বামীজী এখানে যোগশাস্ত্রের তিন নম্বর সূত্রকে নিয়ে বলছেন, *তদাদ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্*, দ্রষ্টাও নেই দৃশ্যও নেই, কারণ দ্রষ্টা নিজেই তাঁর স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন। আমরা আগেও অনেকবার আলোচনা করেছি, যে কোন জ্ঞান যখন হয় বা যে কোন ক্রিয়া যখন হয়, তখন তার চারটে জিনিস থাকে, একটা হল কর্তা (subject), আরেকটা থাকে কর্ম (object), তৃতীয় হয় ক্রিয়া, যেটা এই দুটোকে জুড়ছে, আর চতুর্থ হল তার ফল। কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া ও ফল, সংস্কৃতে কর্তা হল প্রথমা, কর্ম হল দ্বিতীয়া, ইংরাজীতে যদি বলতে হয়, তখন হবে – Subject, Object, Verb and Result। ঢেউগুলো আলাদা হওয়ার জন্য এই চারটে জিনিস চলে। ঢেউ আলাদা, মানে আমি আলাদা তুমি আলাদা, তাই আমার সাথে তোমার টক্কর হবে, টক্কর হলে আরেকটা ঢেউ হবে। কিন্তু সমস্ত ঢেউ যখন শান্ত হয়ে গেল, তখন কে কার সাথে লড়াই করবে! তখন না আছে কর্তা, না আছে কর্ম, যার ফলে কোন ক্রিয়া হবে না, ক্রিয়া না হওয়ার জন্য কোন ফলও হবে না। সেইজন্য এটাকে টেকনিক্যাল ভাষায় বলা হয় স্বরূপে অবস্থানম্। জ্ঞানের দিক থেকে বলা হয় স্বরূপ জ্ঞান। কারণ তখন কোন জ্ঞান হয় না, জ্ঞান সব সময় একটা ক্রিয়ার ফল যেখানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় আছে, একজন জানছে আর আরেকটা বস্তু আছে, যেটাকে জানা হচ্ছে, আর তার সাথে জ্ঞান। কিন্তু যখন বৃত্তি শান্ত হয়ে যায়, তখন এই জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান এই তিনটেও শান্ত হয়ে যায়, *তদাদ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্*। স্বরূপে অবস্থান, তার স্বরূপ কি, বেদান্তের আলোচনায় আমরা এর উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তখন আর বৃত্তি জ্ঞান থাকে না, শুদ্ধ জ্ঞান, শুধু আনন্দ। এরপর আর সে এখানে সেখানে আনন্দ পাওয়ার জন্য, সুখের জন্য দৌড়ে বেড়াবে না। কারণ তখন সে আনন্দস্বরূপ হয়ে যায়, জ্ঞানস্বরূপ হয়ে যায়, সত্তামাত্রম্ হয়ে যায়।

When the mind is active, the Atman is mixed up with it. The repetition of old forms in quick succession is memory. (*যখন মন ক্রিয়াশীল থাকে, তখন আত্মা তার সঙ্গে মিশিয়ে থাকেন। অনুভূত পুরাতন বিষয়গুলির দ্রুত পুনরাবৃত্তিকে 'স্মৃতি' বলে।*) যেমনি ঢেউ উঠল তখন সমুদ্র আর ঢেউ কোথায় যেন মিশে যায়, এমন ভাবে মিশে যায় যে, সমুদ্রকে ভুলে গিয়ে আমরা ঢেউকেই দেখতে থাকি। আগেও বলা হয়েছিল, মানুষ সমুদ্র আর ঢেউ একসাথে দেখতে পারে না, হয় সে সমুদ্র দেখবে, নয় ঢেউ দেখবে। জাহাজে যারা থাকে, তারাও আর সমুদ্র দেখে না, দেখে ঢেউ। সমুদ্রে জাহাজ সাত দিন দশ দিন ধরে যাচ্ছে তো যাচ্ছে, পুরো ঢেউএর মধ্যে পড়ে আছে। অনেক দিন পরে সব কিছু ভুলে যাবে, পড়ে থাকবে শুধু ঢেউ আর ঢেউ। সমুদ্র আর ঢেউ মিলে এক হয়ে যাচ্ছে, তখন সমুদ্র আর থাকছে না, শুধু ঢেউ থেকে যাচ্ছে, ঠিক সেই ভাবে আত্মা বৃত্তিজ্ঞানের সাথে আত্মা আর থাকছে না, আত্মাই মন হয়ে যায়। সেইজন্য আমরা সব কিছু মন দিয়ে করছি, মন খারাপ, মন ভাল, মন দুর্বল, মনে জোর এসেছে, সব সময় মন আর

মন করে যাচ্ছি। কারণ আত্মা মনের সাথে মিশে গেছে, অথচ মনের কোন অস্তিত্ব নেই। সমুদ্র এখন সক্রিয় হয়ে গেছে, এসে গেল ঢেউ, আত্মা সক্রিয় হয়ে গেছে, হয়ে গেছে মন। ফলে আত্মা মনের সাথে মিশে যায়, আর কোন জ্ঞান হয় না।

ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ মনকে শান্ত করার দুটো পথ - অনাসক্ত হওয়া আর জ্ঞানলাভ করা

স্বামীজী বলছেন, repetition of old forms in quick succession is memory, আগে আগে পুরনো ঢেউ যেগুলো উঠেছিল, মনে হয় সেই ঢেউগুলো যেন এখন আর নেই, সব মুছে গেছে; কিন্তু মুছে যাওয়া ওই ঢেউগুলিকে মনের অতল প্রদেশ থেকে তুলে আমরা যখন ঘুরিয়ে নিয়ে আসছি, সেটাকে আমরা বলছি স্মৃতি, স্মৃতিও একটা গুরুত্বপূর্ণ বৃত্তি। যোগশাস্ত্র বলছে, মনে চাঞ্চল্য শুধু সামনে প্রবহমান ঘটনাবলী বা দৃশ্য দেখছি সেখান থেকেই হয় না, স্মৃতিতে যে পুরনো বৃত্তিগুলি জমা আছে, সেগুলোও মনের মধ্যে ভেসে উঠে মনের চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে দেয়। ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নেও বৃত্তি আসতে থাকে আবার বিপর্যয় থেকেও বৃত্তি আসতে থাকে। মনের চাঞ্চল্য সৃষ্টির পিছনে এক রকম সমস্যা হলে এতো ঝামেলা হত না। সমুদ্রের ঢেউ শুধু এক দিক থেকেই আসে না, বিভিন্ন দিক থেকে আসতে পারে, যেটা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। আমাদের মনটাও তাই, একটা ঘুর্ণি ঝড়ের আবর্ত। পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে আসছে, চিন্তা করছি, কল্পনা করছি, মিথ্যা কল্পনা করছি, স্বপ্ন দেখছি, আর স্মৃতি থেকে রোমন্থন করছি। স্মৃতি আর কল্পনাই একা আমাদের মনকে নাচিয়ে ছেড়ে দিতে পারে, কি ভাল হয়েছিল, কি ভাল হতে পারে, কি মন্দ হয়েছিল, কি মন্দ হতে পারে, কি কি হতে পারে, কি কি হয়েছিল, এই ধরণের নানা রকমের বৃত্তি এসে মনকে একেবারে উদ্বেলিত করে রেখে দেবে, সেইজন্য মন শান্ত থাকতে পারে না। স্বামীজী একদিন কিছুক্ষণ যোগ নিয়ে বলেছিলেন, যিনি নোট নিয়েছেন তিনি হয়ত এর বেশি কিছু নোট নিতে পারেননি। কিন্তু যেটুকু নিয়েছেন, তাতেই যোগের অনেক কিছু জিনিস বেরিয়ে এসেছে।

এই ঝঞ্ঝা বিধ্বস্ত অশান্ত মনকে কিভাবে শান্ত করা যাবে? স্বামীজী বলছেন, মনকে শান্ত করার অনেকগুলো পথ আছে। তার মধ্যে একটা পথ হল, Be unattached, কোন কিছুর সাথে নিজেকে জুড়ে দিও না। আর বলছেন, Knowledge is power, and getting one you get the other. By knowledge you can even banish the material world. When you can mentally get rid of one quality after another from any object until all are gone, you can at will make the object itself disappear from your consciousness. (*অনাসক্ত হও। জ্ঞানই শক্তি আর জ্ঞানলাভ করলেই তোমার শক্তিও বাড়বে। জ্ঞানের দ্বারা —এমন-কি এই জড় জগৎটাও তুমি উড়িয়ে দিতে পারো। যখন তুমি মনে মনে কোন বস্তু থেকে একটা একটা করে গুণ বাদ দিতে দিতে ক্রমে সব গুণই বাদ দিতে পারবে, তখন তুমি ইচ্ছা করলেই সমগ্র জিনিসটাকে তোমার জ্ঞান থেকে দূর করে দিতে পারবে।*) বক্তব্য হল, যা কিছু আছে সব চিন্তার জগতেই আছে। আর জ্ঞান জিনিসটাই শক্তি, যে জ্ঞান পেয়ে যায়, সে শক্তিও পেয়ে যায়। বস্তু জ্ঞানেও তাই, যে ঠিক ঠিক বস্তুর জ্ঞান পেয়ে যায়, সে সেই শক্তিও পেয়ে যাবে। ঠিক ঠিক জ্ঞান যদি কেউ পেয়ে যায়, সে তখন চাইলে এই জগৎকে উড়িয়ে দিতে পারে। পুরো যোগদর্শন এটাকেই নিয়ে চলে। যোগদর্শন শেষ অবস্থায় এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে উড়িয়ে দেয়, থিয়োরেটিক্যালি না, বাস্তবেই উড়িয়ে দেয়। কোথা থেকে উড়িয়ে দেয়? আমাদের চেতনা থেকে উড়িয়ে দেয়।

চেতনা আর চৈতন্যের মধ্যে কি তফাৎ? আত্মা হলেন চৈতন্যস্বরূপ, ব্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপ, ঈশ্বর চৈতন্যস্বরূপ। আমরা অনেকবার টিউবলাইটের উপমা নিয়েছি। ইলেক্ট্রিসিটি একটা জিনিস, ওই ইলেক্ট্রিসিটি যখন টিউবলাইটের গ্যাসের মধ্য দিয়ে যায়, তখন ওটা আরেকটা জিনিস। টিউবলাইটের নিজস্ব কোন আলো নেই; ইলেক্ট্রিসিটি টিউবলাইটের গ্যাসের মধ্য দিয়ে গেলে গ্যাসটা চার্জড হয়ে গিয়ে আলোর সৃষ্টি করে, আমরা তখন আলো দেখছি। মনকে ঠিক সেইভাবে তখন চেতন মনে হয়। চেতন ও চৈতন্য এই দুটো এক অপরের সাথে পাল্টাপাল্টি হয়ে যায়। শুদ্ধ চৈতন্য হল consciousness, ধার করা consciousness হল চেতনা, মন চেতন, আত্মা চৈতন্যস্বরূপ। এখানে স্বামীজী বলছেন, জগৎটা কোথায়, আমি যাকে ভালবাসি, সে কোথায়? আমি যাকে পছন্দ করি না সে কোথায়? আমি যে জগতের সুখ পেতে চাইছি, সেই সুখ কোথায়? আর আমার

যে এত দুঃখ, বেদনা; যে দুঃখে মানুষ কবিতা লিখতে শুরু করে, বড় কবিরা নোবেল প্রাইজ পাচ্ছেন, সেই দুঃখ কোথায়? সব কিছুই মনের মধ্যে, চেতনার মধ্যে অবস্থিত, চৈতন্যের মধ্যে এসব কিছু থাকতে পারে না। তার মানে, আমার যত হাসিকান্না, আমার সব সুখদুঃখ, সমস্ত এই জগৎ থেকে আসছে। আরে এই জগৎটা কোথায়? আত্মাতে থাকতে পারে না, কারণ আত্মা চৈতন্যস্বরূপ, সেখানে কোন পদার্থ নেই। আমরা সেই শুদ্ধ আত্মা, কিন্তু আমরা দেখছি আমার সুখ আছে, দুঃখ আছে, আমরা দেখছি, আমার জয় আছে, পরাজয় আছে, আমার হাসি আছে, কান্না আছে, আমি আছি আর এই জগৎ আছে। স্বামীজী বলছেন, জ্ঞানই শক্তি। জ্ঞান এসে গেলে শক্তিও এসে যাবে। শক্তি এসে গেলে কি হবে? পুরো জগৎটাকে আমি উড়িয়ে দিতে পারি। কোথা থেকে? আগে বলে দেওয়া হয়েছে, চেতনা থেকে, আমার মন থেকে। চৈতন্য থেকে আগেই উড়ে আছে, চৈতন্যের মধ্যে এগুলো নেই, রয়েছে চেতনার মধ্যে। জগতের যা কিছু, হাসিকান্না, সুখদুঃখ, আনন্দ নিরানন্দ আমার আসছে, সব আমার মনে আসছে; তার মানে জগৎ বলতে যা কিছু আছে সব আমার মনেই আছে।

আগে আগেও আমরা দেববাণীতে এই বিষয়ের উপর অনেকবার আলোচনা করেছি। জগতে যা কিছু আছে আর জগৎ নিজেও ঢুকে আছে আমাদের চেতনার মধ্যে। সচ্চিদানন্দ নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম, তিনি শুদ্ধ চৈতন্য, সেখানে তো জগৎ নেই, জগতের হাসিকান্না, সুখদুঃখ এগুলো থাকার কোন প্রশ্নই নেই। আমরা সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের সাথে এক। শাস্ত্র কখনই বলছে না যে তুমি শ্রীরামকৃষ্ণ। স্বামীজী কোথাও কোথাও ব্যাখ্যা করার জন্য এই রকম কথা নিয়ে আসছেন ঠিকই, কিন্তু স্বামীজী আসলে বলছেন, আত্মাই ব্রহ্ম। আত্মস্বরূপে তুমি ব্রহ্ম, তখন জগৎও নেই, তুমিও নেই, ঈশ্বরও নেই, আছে সেই শুদ্ধ চৈতন্য, যে চৈতন্যের সাথে তুমি এক। তুমি যীশু নও, তুমি বুদ্ধ নও, তুমি শ্রীরামকৃষ্ণ নও, কারণ যখন তুমি বলছ, আমি শ্রীরামকৃষ্ণ, তখন আমি বলতেই তোমার মন এসে যাচ্ছে; এই মন আর শ্রীরামকৃষ্ণ কখনই এক নয়। আমরা যে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি, সেখানে আমি মনে করছি, আমি আলাদা, তিনি আলাদা। আসল ফল দেন শুদ্ধ আত্মা, যিনি ব্রহ্ম, যিনি শ্রীরামকৃষ্ণ।

কঠোপনিষদে বলছেন, *নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনাশ্চেতনানাম্ একো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্*, সেই আত্মা অনিত্যের মধ্যে নিত্য, তিনি চেতনারও চেতনা, তিনি এক তিনিই বহু হয়েছেন, তিনি সবার কামনার পুর্তি করেন, অর্থাৎ প্রার্থনার ফল দেন। শুদ্ধ আত্মার মধ্যে এগুলোর কোন কিছু নেই, আমিই সেই শুদ্ধ আত্মা, সেই শুদ্ধ আত্মাই ব্রহ্ম। কিন্তু সেই শুদ্ধ আত্মাকে যখন মন দিয়ে দেখা হচ্ছে, একটু আগে যেমন বলা হল সমুদ্র আর ঢেউ, যখন ঢেউ দিয়ে দেখছি তখন দেখব, আমি একটা ছোট্ট ঢেউ, শ্রীরামকৃষ্ণ একটা বড় ঢেউ। এখন আমি শ্রীরামকৃষ্ণকে সমুদ্র রূপে দেখছি না, নিজেকেও আমি সমুদ্র রূপে দেখছি না। যখন সমুদ্র রূপে দেখব, তখন ছোট ঢেউও নেই বড় ঢেউও নেই, তখন আমিও নেই শ্রীরামকৃষ্ণও নেই, তখন শুধু সমুদ্র। অহং ব্রহ্মাস্মি যখন বলা হয়, তখন এই নয় যে, আমি আলাদা আর ব্রহ্ম আলাদা, তখন আমিও নেই ব্রহ্মও নেই, শুদ্ধ চৈতন্য ছাড়া কিছু নেই। সেইজন্য যা আছে সেটাকে মুখে বলা যাবে না।

কিন্তু যেমনি বলছি, আমিই সেই ব্রহ্ম, তখন তো 'আমি' এসে গেলো। 'আমি' এসে গেলে তখন ব্রহ্ম আর থাকবে না, তখন এসে যান সগুণ সাকার ঈশ্বর। সগুণ সাকার ঈশ্বর এসে গেলে তাঁর অনেক উপাধি এসে যাবে, তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি স্রষ্টা, তিনি নিয়ন্তা, তিনি ভাগ্যবিধাতা। তাঁর কাছে প্রার্থনা করলে তিনি ফল দেন, একমাত্র তিনিই ফল দেন, কর্মফলের মাধ্যমে ফল দেন। স্বামীজী বলছেন, জ্ঞানই শক্তি। যিনি জ্ঞান পেয়ে গেলেন, তাঁর শক্তি এসে গেল, তিনি তাঁর চেতনা থেকে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে উড়িয়ে দিতে পারেন, সৃষ্টিকেও উড়িয়ে দেওয়া যাবে। *তদাদ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্*, তখনই যিনি ধ্যান করছেন তিনি আত্মার স্বরূপে অবস্থিত হয়ে যান। একমাত্র জ্ঞানেই আত্মা নিজের স্বরূপে বাস করেন। সেইজন্য জ্ঞানই একমাত্র শক্তি, জ্ঞান ছাড়া কোন শক্তি আসবে না। সন্ন্যাসীদের কাছে ব্রহ্মজ্ঞান থাকত, তাই সন্ন্যাসীদের এত সম্মান করা হত। ব্রাহ্মণরা ওই ব্রহ্মজ্ঞানকে থিওরেটিক্যালি রক্ষা করতেন, তাই ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণদের এত সম্মান করা হত। এখন জ্ঞানেরও কোন ব্যাপার নেই, সম্মানেরও কোন ব্যাপার নেই, সবাই লাঠি, বন্দুক নিয়ে এক অপরকে শেষ করে দিতে মারামারি করে যাচ্ছে।

স্বামীজী প্রথম বাক্যে বলছেন, Be unattached, unattachment মানে কি হয়? একটা ঘটনার কথা বললে জিনিসটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। একজন ব্রহ্মচারী তাঁর মনে কোন প্রশ্ন বা সংশয় এলে, কিছু জানতে চাইলে, নিয়মিত একজন সিনিয়র মহারাজের কাছে যেতেন, মহারাজ খুব জ্ঞানী ও উচ্চমার্গের। ব্রহ্মচারী স্বভাবে খুব ইমোশানাল, কারুর প্রতি খুব ভালবাসা দেখিয়ে ফেলেন আবার কারুর প্রতি রেগে গেলে ক্ষোভ প্রকাশ করে দিতে ছাড়েন না। এখন তিনি নিজেকে কিভাবে সামলাবেন। একজন ইয়ং ছেলে এসে যদি বলে, 'আমার অমুকের প্রতি প্রচণ্ড টান, আমি ওখান থেকে বেরোতে পারছি না, আমি কি করব'? ছেলেটাকে ছেড়ে আসতে বলাটা হয়ত খুব কঠিন হবে। কিন্তু যিনি ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী, যিনি সাধন পথে নেমেছেন, যিনি সাধনা করছেন, তাঁদের পক্ষে এই জিনিসটাকে বোঝা অত কঠিন হবে না। সেই মহারাজের কাছে গিয়ে বলাতে, মহারাজ ব্রহ্মচারীকে বললেন, 'তোমার চিন্তা ভাবনাগুলিকে অবজার্ভ কর। যেমন তোমার মনে ক্রোধ আসছে, তুমি আলাদা, ক্রোধটা আলাদা, সাক্ষী হয়ে শুধু দেখতে থাক। কারুর প্রতি আসক্তি জন্মে গেছে, ওই আসক্তি বৃত্তিকে অবজার্ভ করতে থাক'।

কিভাবে আমি আর আমার বৃত্তি আলাদা, এটাকে নিয়ে একটু আগে আমরা আলোচনা করলাম। এক সেকেণ্ডের মধ্যে অনেক বৃত্তি আসছে, এসে বেরিয়ে যাচ্ছে। ট্রেনিং দিয়ে ওটাকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে হয়। প্রথম বৃত্তি আসছে আমার কাম ভাব, দ্বিতীয় বৃত্তি আসবে আমি দেখছি। কাম ভাব আর আমি দেখছি, দুটো একটার পর একটা হচ্ছে। কিন্তু এত দ্রুত আসছে আর যাচ্ছে, মনে হবে যেন দৌড়াচ্ছে। সিনেমাতে যেমন সব স্টীল ছবি, রীলটা স্পীডে ঘুরছে বলে মনে হচ্ছে সব দৌড়াচ্ছে। চিন্তা বা বৃত্তি যেগুলো আসছে, সেগুলোও স্টীল ক্যামেরার ছবির মত, কিন্তু মনে হয় যেন দৌড়াচ্ছে। চিন্তাগুলো কিছুই যায় না, একটা সময় একটাই চিন্তা, একটা যেন ঢেউ, ঢেউ গুলো যখন পর পর চলতে থাকে তখন মনে হয় যেন জল চলছে। পুকুরে পর পর পাথর ফেললে এক এক করে ঢেউ তৈরি হতে থাকে, তখন মনে হয় যেন জল চলছে। কিন্তু কিছুই চলছে না, পর পর ঢেউ তৈরী হচ্ছে। ফিজিক্সের নিয়মে বলে, ঢেউএর মধ্যে কোন কিছু চলে না, জলের পার্টিকেলস্‌গুলি শুধু উপর নীচ করে। জলের উপর একটা disturbance হয়ে গেছে। ফিজিক্সে খুব সুন্দর বলে, জলের উপর একটা কাগজের টুকরো বা শুকনো পাতা ফেলে দেওয়া হল, এরপর পাথর ছোঁড়া হল, দেখা যাবে ঢেউগুলো সাঁ সাঁ করে চলছে, শুকনো পাতাগুলি এক জায়গাতেই শুধু ওঠানামা করতে থাকে। তার মানে জল চলে না, ঢেউ চলে, ঢেউ অর্থাৎ disturbance চলে। আমাদের মনেও কোথাও কিছু চাঞ্চল্য হয় না, একটা জায়গাতেই নড়ানড়ি হয়, স্টীল ছবি। স্টীল ছবিকে যদি জোরে ঘোরান হয় তখন ওটাকে মুভি বলে মনে হয়। ঠিক তেমনি, একটা বৃত্তি বা চিন্তা আসবে, আমি তার উপর রেগে গেছি, দ্বিতীয় বৃত্তি আসবে, আমি আমার রাগ হওয়াটাকে দেখছি। পর পর চলতে চলতে ধীরে ধীরে রাগ বৃত্তিটা থেমে আসবে। বৃত্তির এটা ধর্ম, বৃত্তি তখন থেমে যায়, নিজেই থেমে যায়। যত রাগ হয়ে থাকুক, কিছুক্ষণ ধরে দেখতে থাকলে রাগটা থেমে যাবে। এটাকে বলে detachment।

আমি আলাদা হয়ে গেছি, বৃত্তি আলাদা হয়ে গেছে। এরপর আসছে থার্ড পার্ট, অবজারভেশান, বৃত্তি এবং তার পরিণতি। আমি ভাবলাম, যদি কিছু গোলমাল ঘটে যায়, তাই গিয়ে দুটো কথা তাকে শুনিয়ে দিয়ে এলাম। মহারাজ ব্রহ্মচারীকে বলছেন, 'আরে তুমি এটা কি করে করলে, তুমি সন্ন্যাসী! তুমি এই রকম করতে পারো না'। তার মানে, প্রথম ধাপ হল, যাই হয়ে যাক, ফিজিক্যাল লেভেলে কোন মতেই যাওয়া চলবে না। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ যাই থাকুক, প্রথমে ওটাকে আটকাও, ফিজিক্যাল লেভেলে একেবারেই না। দ্বিতীয় ধাপে, বৃত্তিগুলিকে দেখতে থাকা, দেখতে দেখতে একটা সময় ওটা শান্ত হয়ে যাবে। এটাই একমাত্র পথ। যার মনের মধ্যে প্রচুর কামভাব আছে, লোভ আছে, ক্রোধ আছে, একমাত্র পথ হল, প্রথমতঃ ফিজিক্যালি কিছু করা চলবে না, সেইজন্য বার বার শম দম এই দুটোর কথা বলে যাচ্ছেন, যোগশাস্ত্রে বার বার যম নিয়মের কথা বলছেন, তার কারণ এটাই। প্রথমে ফিজিক্যালি ওটাকে বন্ধ করতে হবে, দ্বিতীয়, যখন বৃত্তি স্তরে আসবে, ওটাকে অবজার্ভ কর। এটাই হল detached হয়ে যাওয়া। স্বামীজী যে বলছেন, be detached, attachment মানে আমি আর আমার বৃত্তি এক। তোমাকে আমি দেখে নেব, চলছে চলবে, যো হামসে টক্‌রায়গা চুড় চুড় হো জায়েগা, তার মানে, বৃত্তির সাথে পুরো এক হয়ে গেছে। এর থেকেও বাজে অবস্থা হল, যখন বলছে, ভেঙে দাও গুড়িয়ে দাও, হয়ত বোমা মেরে উড়িয়ে দিল। কিন্তু পিছনের দিকে গেলে কি হবে?

আমার ভিতর প্রচণ্ড রাগ আসছে, আমিই রাগটা হয়ে গেলাম, আমি দেখছি, এই সময় আমি যদি তাকে পাই ওকে আমি শেষ করে দেব, সবটাই আমি দেখে যাচ্ছি, আমি রেগে আছি। দেখতে থাকুন, আমরা যখন বলছি, তখন রাগটাও চলছে, আমি দেখছি, সেটাও চলছে। এর আগে ব্যাখ্যা করা হল, সেকেণ্ডসের মধ্যে চারটে পাঁচটা করে বৃত্তি চলছে, একটা বৃত্তি হল আমি রেগে আছি, আরেকটা বৃত্তি হল আমি দেখছি। বাস্তবিকই তাই হয়, স্টীল ফটোগ্রাফীর মত। কিছুক্ষণ পরে দেখছি রাগটা ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে গেল। কিন্তু একটা ছাপ, রাগের একটা বোধ রেখে দেবে। এরপর যদি সামনা সামনি দেখা হয়ে যায়, তখন হয়ত ভিতরে একটু রাগ গুজরে উঠল। আগেত মত অতটা না হলেও, একটু রাগ হয়েও যেতে পারে। কিন্তু তাকে দেখার পর আবার যদি আগের মত রাগ আসতে শুরু হয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে আবার ওটাই করতে হবে, আমার রাগ হচ্ছে, আমার শরীর গরম হয়ে আসছে। কিন্তু আমি আর আমার ইমোশানের বিশেষ বৃত্তি থেকে আলাদা হয়ে যেতে হবে। এটা হল detachementএর প্রথম ধাপ। দ্বিতীয় ধাপ হল, জ্ঞান, স্বামীজী যেটা বলছেন, জ্ঞানই শক্তি, যেখান থেকে জগৎকে উড়িয়ে দেওয়া যায়।

বৃত্তি জ্ঞান ও ঈশ্বর জ্ঞান

স্বামীজী বলছেন, When you can mentally get rid of one quality after another from any object until all are gone, you can at will make the object itself disappear from your consciousness, আগে আমরা এর ব্যাখ্যা করেছি, এখানে আরেকটু বোঝার আছে। একটা একটা করে আমরা যদি বস্তুর কোয়ালিটিকে সরাতে শুরু করি, একটা সময় এমন আসবে যখন ওই বস্তুকে আমরা আমাদের চেতনা থেকে উড়িয়ে দিতে পারব। যোগশাস্ত্রে এটা একটা খুব নামকরা কথা। যোগশাস্ত্রে নানা রকম সমাধির কথা বলতে গিয়ে বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্মিতা ইত্যাদি কয়েক প্রকার সমাধির কথা বলা হয়। বলছেন, মন যখন একাগ্র হয়, তখন কোন জিনিসকে নিয়ে একাগ্র হচ্ছে, কিভাবে একাগ্র হয় সেটা কিছু না, যোগের মতে সেই একাগ্র মানেই সমাধি। এই সমাধি অনেক প্রকার হয়। কথামৃত পড়ে পড়ে আমরা জেনে গেছি সমাধি দুই রকমের, সবিকল্প সমাধি আর নির্বিকল্প সমাধি, কিন্তু তা না। যোগশাস্ত্র সবিতর্ক সমাধি, নির্বিতর্ক সমাধি, সবিচার সমাধি, নির্বিচার সমাধি, এই রকম সাত আট প্রকার সমাধির কথা বলছেন। ভাষ্যকাররা নিজেদের মত করে ওটাকে আরও বাড়ান বা কমান। এনাদের সব কিছুর অর্থ একটাই, মনের ভিতরে যে জগৎটা বসে আছে বা বস্তু বাস করছে, সেটাকে উড়িয়ে দেওয়া। এটাকে যদি ঠিক ঠিক বুঝতে হয়, বিশেষ করে হিন্দু ধর্মের দিক থেকে, তখন এর ব্যাখ্যাটাও একটু বিস্তারে হয়ে যায়।

হিন্দু ধর্ম বা যে কোন ধর্মকে নিয়ে আলোচনা করার সময় প্রায় সবাই বলে থাকে যে, ধর্ম সত্য কি মিথ্যা আমরা জানি না। ধর্ম সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের এই অজ্ঞতার জন্য ধর্মের নিন্দুকরা, বিশেষ করে কম্যুনিস্টরা বলে ধর্ম হল সমাজের আফিং। নিন্দুকরা ধর্মকে নিয়ে নানা রকমের কথা বলে থাকে। তারা যে কারণে বলে, সেটা কিন্তু ভুল না। বিশ্বের সমস্ত ধর্ম দাঁড়িয়ে আছে মুষ্টিমাত্র কয়েকজন মানুষ, আমরা যাঁদের ঋষি বলি, নিন্দুকরা যাঁদের সাধারণ মানুষ বলে মনে করে, তাঁদের কথার উপরে। সেই ঋষিরা এই জিনিসটাকে আবিষ্কার করে আমাদের সামনে রেখে দিলেন; জিনিসটা এই রকম – বহির্বস্তু যখন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ভিতরে আসছে, তখন একটা তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, তরঙ্গ মানেই জ্ঞান। বাইরের বস্তু থেকেই যে সব সময় জ্ঞান আসতে হবে তা না, আমাদের নিজেদের যে স্মৃতি রয়েছে, যে কল্পনাগুলি রয়েছে, যে স্বপ্ন রয়েছে, সেখান থেকেও জ্ঞান আসে। কিন্তু মনকে যদি কোন ভাবে শান্ত করে দেওয়া যায়, তখন কিন্তু জ্ঞান পুরো অন্য রকমের হয়, তখন বৃত্তি জ্ঞান থাকে না, ওই জ্ঞান পুরো অন্য ধরণের; যেটাকে মুখে ব্যাখ্যা এইজন্যই করা যায় না যে, মন তখন পুরো শান্ত হয়ে যায়। মন শান্ত মানে, মন মৃত, মন শান্ত হওয়াও যা, মন মরে যাওয়াও তাই; মৃত মন তাই কোন খবর আনতে পারে না। তখন যে জ্ঞান হয়, ওই জ্ঞানকে কখনই বৃত্তি জ্ঞান বলা যায় না, ওটাই আধ্যাত্মিক জ্ঞান। জ্ঞানের ওই অবস্থায় স্রষ্টা, সৃষ্টি ও সৃষ্টির যে বিধান, এই তিনটে জিনিস আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়।

একটা হল বৃত্তি জ্ঞান, আরেকটা সৃষ্টি জ্ঞান। বৃত্তি জ্ঞান তখনই হয়, যখন মন জগৎকে নিতে থাকে। কোন রকমে মনকে যদি শান্ত করে দেওয়া যায়, তখন সৃষ্টি ও স্রষ্টার অর্থাৎ ঈশ্বরের জ্ঞান এসে যায়। তার

সাথে তাঁদের বিশেষ ক্ষমতাও এসে যায়, কারণ ওনারা এখন আত্মজ্ঞানী। সেই ক্ষমতার দরুণ ওনারা দুটো জিনিস করেন, একজন নিজের আনন্দে এমন বুঁদ হয়ে যাবেন যে, উনি আর কারুর সাথে কথা বলতে চাইবেন না, সংসারকে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে ওই আনন্দে ডুবে থাকেন। দ্বিতীয় ওনারা যেটা করেন, কিছু উপযুক্ত অধিকারী শিষ্য জোগাড় করেন, শিষ্যরা তাঁর আপনজন, অন্তরঙ্গ হয়ে থাকেন। এই শিষ্যদের ট্রেনিং দিয়ে দিয়ে তৈরী করে দেখিয়ে দেন, দেখো বাপু! এটাই সত্য, এটাকে তুমি জেনে নাও। আমরা জানি, ঠাকুর শিষ্য করেছিলেন, ভগবান বুদ্ধ করেছিলেন, যীশু, মহম্মদ সবাই শিষ্য করেছিলেন। ধর্ম প্রচার ঋষিদের বা প্রফেটদের দিয়ে কম হয়, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাঁদের এই ধরণের শিষ্যরাই ধর্ম প্রচারের দায়ীত্বটা নিজেদের কাঁধে তুলে নেন। ঠাকুরের জীবনেই আমরা দেখছি, তিনি ধর্ম প্রচার করেননি, স্বামীজীই ধর্ম প্রচার করেছিলেন।

যাঁদের আমরা অবতার বা প্রফেট বলে জানি, এনাদের লেভেল থেকে আরেকটু নীচে কিছু ঋষিরা হন, কিন্তু তাঁরাও বুঝে নিয়েছেন সত্যটা কি, সেইজন্য এনারাও সাধারণ লোক নন। শেষ সত্য একমাত্র শুদ্ধ চৈতন্যই আছেন, যাঁর কথা ঋষিরা বা অবতাররা বলে গেছেন। শুদ্ধ চৈতন্যই আছেন, সংসার বলে কিছু নেই বা সংসারের কোন গুরুত্ব নেই। প্রথমের দিকে আমরা বললাম আমরা মানছি নিন্দুকেরা এসব মানে না। তাহলে ওই সত্যকে কি করে মানা যাবে? এইজন্যই মানতে হয়, যেহেতু আমরা জগতে চলার সময় চারজনের কথাই মেনে চলি। খবরের কাগজ পড়ছি, তার মানে অপরের কথাগুলোকে বিশ্বাস করছি বলেই পড়ছি। খবরের কাগজে বিশ্বাস আছে, কিন্তু কথামৃতে বিশ্বাস নেই। নিউটনের কথায় আমাদের বিশ্বাস, কিন্তু গীতার কথায় বিশ্বাস নেই। বর্তমান ফিজিক্সে আইনস্টাইন কি বলেছেন, সেটার উপর অন্যান্য বিজ্ঞানীরা কি বলছেন, সেটাতে আমাদের বিশ্বাস, কিন্তু যীশু কি বলছেন সেটাতে আমাদের বিশ্বাস নেই। এতো দু-নম্বরী হয়ে গেল। যদি তুমি বিশ্বাস না করো তাহলে কাউকেই বিশ্বাস করবে না, আর যদি বিশ্বাস কর, আর ওটাকে contradict যদি করতে হয়, তোমাকেও তাহলে সেই স্তরে যেতে হবে। যদি ফিজিক্সে নিউটনকে contradict করতে হয়, তাহলে তাকে বিজ্ঞানে নিউটনের সেই লেভেলে পৌঁছাতে হবে, যেখানে সে অবজারভেশান ইক্যুয়েশান দিয়ে প্রমাণ করে বলতে পারবে নিউটন পুরোপুরি ঠিক নন। আইনস্টাইন যেমন করে দেখালেন। আবার আইনস্টাইন যা যা করলেন, নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে তাঁরা অবজারভেশন ইক্যুয়েশান দিয়ে দেখিয়ে দিলেন আইনস্টাইন পুরোপুরি ঠিক নন। পৃথিবীতে কাউকে যদি ভুল প্রমাণিত করতে হয়, তাহলে তাকে অবজারভেশান, ইক্যুয়েশান আর যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করে দেখাতে হবে যে, আপনি ভুল।

ঠিক তেমনি ধর্মকে যদি ভুল প্রমাণিত করতে হয়, তাহলে তাকে সেই লেভেলে যেতে হবে, যে লেভেলে গিয়ে ঋষি মনকে একাগ্র করে দিয়ে পুরো মনটাকে ডেড করে দিয়েছিলেন, তবে সে বলতে পারে, আমি আপনার লেভেলে গিয়ে এই এই করে দেখলাম, আপনি যেটা বলেছিলেন সেটা ঠিক নয়। তুমি সেই লেভেলে যাচ্ছ না, না গিয়ে ইনক্লাব জিন্দাবাদের মত দাঁড়িয়ে গলা ফাটিয়ে বলে যাচ্ছ, আমি বিজ্ঞানকে মানি না, আমি আইনস্টাইনকে মানি না, আমি রামকৃষ্ণকে, বুদ্ধকে মানি না, লোকেরা তোমাকে পাগলা গারদে ঢুকিয়ে দিচ্ছে না কেন, এটাই আশ্চর্যের। ঠাকুরকে না মানলে, যীশুকে না মানলে, তাও লোকেরা মেনে নেবে, কিন্তু নিউটন, আইনস্টাইনকে মানি না বললে অবশ্যই তোমাকে পাগলা গারদে ঢুকিয়ে দেবে। চেঁচামেচি করে কোন সত্যতে পৌঁছান যায় না। ইনক্লাব জিন্দাবাদ দিয়ে সত্তা পাল্টানো যায়, কিন্তু তাতে কোন ক্রান্তি আসে না। ক্রান্তি যদি আনতে হয়, তাহলে ওই সিস্টেমের সাথে আগে তাকে এক হতে হবে, এক হয়ে গিয়ে তারপর এক পা এগিয়ে পরিবর্তন করতে হবে। ধর্মেও তাই, সমাজেও তাই, বিজ্ঞানেও তাই, এর অন্যথা কক্ষণ কোথাও হয় না। যীশু, বুদ্ধ, শ্রীরামকৃষ্ণের অবস্থায় যেহেতু আমি যেতে পারছি না, সেইহেতু আমার বলার কোন অধিকার নেই, এনারা ভুল।

দ্বিতীয় হল, যাঁরা এই সত্যগুলিকে দিয়েছেন, তাঁদের জীবনের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, তাঁদের জীবনে স্বার্থ বলে কোন কিছু ছিল না। আর তাঁদের মন ছিল শুদ্ধ পবিত্র, কামিনী-কাঞ্চনের গন্ধ পর্যন্ত তাঁদের নেই, মান-যশের ইচ্ছা লেশ মাত্র নেই। এনাদেরকে মানব না, আর যারা কামী, লোভী, অহঙ্কারী, সত্তা পাওয়ার জন্য যারা মা-বাবাকে বিক্রী করে দেয়, সত্তা ধরে রাখার জন্য, অর্থের জন্য যে কোন জিনিস করতে পারে, তাদের কথা আমরা কি করে মানতে পারি!

জ্ঞান, ভক্তি ও যোগ যেভাবে সংসারকে উড়িয়ে দেয়

এই ঋষিদের থেকে যে ঋষিরা এক ধাপ নীচে, তাঁরা দেখলেন শেষ কথা হল, কিভাবে মানুষের মন থেকে সাংসারিকতাকে সরানো যায়। সংসার সরবে ধ্যানের গভীরে, নির্বিকল্প সমাধি ছাড়া সংসার যাবে না। কিন্তু সাংসারিকতাকে মন থেকে সরানো যায়। সংসার আর সাংসারিকতা দুটো আলাদা জিনিস। সংসার হল, যেখানে আমরা বাস করছি, যেখানে আমরা জন্ম নিচ্ছি, যেখানে আমরা মরব, যেখানে আমাদের পুনর্জন্ম হবে, যেখানে আমরা বিভিন্ন যোনিতে যাতায়াত করছি, এটা হল সংসার। সাংসারিকতা হল, এই জিনিসটাকে আঁকড়ে ধরে রাখা, এই জিনিসটার প্রতি আসক্তি। সংসারকে আঁকড়ে ধরতে গিয়ে কিছু জিনিস থেকে আমরা পালিয়ে যাচ্ছি, কিছু জিনিসকে ধরতে চাইছি, এটাকে বলে সাংসারিকতা। সংসার আর সাংসারিক হওয়া দুটো আলাদা, কিন্তু পরস্পরকে জুড়ে আছে। ঋষিরা বলছেন, মানুষের কাছে তার দেহ প্রিয়, তার মন প্রিয়, তার আপনজনরা প্রিয়, মানুষ ভোগ করতে চাইছে, সুখে শান্তিতে থাকতে চাইছে, এরা কেন সংসার ত্যাগ করতে যাবে! কথামৃতে পাতায় পাতায় ঠাকুর বলছেন, তোমাদের সংসার কেন ত্যাগ করতে হবে! সংসারত্যাগী মানে, আধ্যাত্মিক; আধ্যাত্মিকতা কদাচিৎ কখন কারুর হয়। ঠাকুর আসার পর মনে হয় যেন সবাই আত্মজ্ঞানের দিকে, মুক্তির দিকে এগোচ্ছে। যে কোন সমাজে, যে কোন সময় মুষ্টিমাত্র কয়েকজন থাকেন, যাঁরা ঠিক ঠিক ঈশ্বরের দিকে থাকেন। ঠাকুরও জানেন, সবাই ঈশ্বরের দিকে যেতে পারবে না। সেইজন্য কথামৃতে দুই ধরণের শিক্ষা দিচ্ছেন। একটা হল সংসার সরানোর শিক্ষা, যেটা তিনি মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে দিতেন। নরেনাদি কয়েকজন যুবক অন্তরঙ্গদের তিনি ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে গোপনে প্রাইভেটলি এই শিক্ষা দিতেন। প্রাইভেটলি তিনি যে কথাগুলি বলেছিলেন, সেই কথাগুলোই আমরা ঠাকুরের সন্তানদের কথা যেখানে আছে সেখান পাই আর স্বামীজীর রচনাবলীতে পাই। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বলছেন, মনের ভিতর যে সংসারটা ঢুকে আছে, সেটাকে কিভাবে সরানো যায়।

ঠাকুরের কথামৃত পড়ে structured wayতে আমাদের জানার কোন পথ নেই। এই জায়গায় ব্যাসদেবের বিরাট অবদান, তিনি তিনটে জিনিসকে নিয়ে এলেন। যদিও এই জিনিসটা কোথাও পাওয়া যায় না, আর এর দোষ বলুন, ক্রেডিট বলুন সবাই মনুকে দেয়, কিন্তু মহাভারত পড়লে বোঝা যায় এটা ব্যাসদেবের কাজ। ব্যাসদেব তিনটে জিনিস, যার প্রত্যেকটিতে চারটে চারটে করে জিনিস রেখে দিলেন। প্রথমে তিনি নিয়ে এলেন চারটে পুরুষার্থ, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। চারটে বর্ণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। আর চারটে আশ্রম, ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। এই বারোটা যে স্ট্রাকচার ব্যাসদেব নিয়ে এলেন, এই বারোটা স্ট্রাকচারে সমস্ত সাংসারিকতাকে ফেলে দেওয়া যায়। আর তিনি বারোটা জিনিসকে নিয়ে এলেন, যাতে সাংসারিকতাকে নিয়ন্ত্রণ করে ধীরে ধীরে সাংসারিকতাকে কমানো, কমিয়ে কমিয়ে এমন জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন, যেখানে সংসারটাকেই ফেলে দেওয়া যেতে পারে। কথামৃতে আমরা ওই স্ট্রাকচারটা পাই না, তবে এটা ঠাকুরের কাজ নয়; ঠাকুরের পরে যারা আসবেন এটা তাঁদের কাজ। কারণ যে ঋষিরা অবতারদের থেকে এক ধাপ নীচে, তাঁরা এই কাজটা করেন।

ব্যাসদেব এই যে চার চার করে নিয়ে এলেন, সাংসারিকতাকে কিভাবে কমানো যায়, সেখানে ধর্ম, অর্থ, কাম, আর মোক্ষকে যদি অন্য ভাবে রাখা হয়, তাহলে তখন হবে অর্থ, কাম, ধর্ম ও মোক্ষ। অর্থ মানে জীবন চালানোর জন্য যে টাকা-পয়সা লাগবে। সেখানে বলে দিচ্ছেন, তুমি টাকা উপার্জন কর, কিন্তু টাকা উপার্জন তোমার ভোগের জন্য নয়। টাকা উপার্জন হল যাতে তুমি, তোমার যে শারীরিক চাহিদা রয়েছে, তোমার উপর যে একটা বন্ধন রয়েছে, বন্ধনটা কেটে যাবে। ঠাকুর যখন বলছেন, টাকায় কি হয়, দুটো খাওয়া হয় আর থাকার জায়গা হয়, অর্থাৎ আমাদের উপর যে শারীরিক একটা বন্ধন আছে, টাকা দিয়ে ওই শারীরিক বন্ধনকে ভেঙে দেওয়া যায়। অর্থের এটাই কাজ, অর্থ তুমি সঞ্চয় কর, তোমার উপর যে বন্ধন, এই বন্ধনটাকে তুমি ভেঙে দিতে পারবে মুক্তির দিকে এগিয়ে গেলে। কোন মুক্তি? শারীরিক মুক্তি।

পরে নিয়ে আসছেন কাম, কাম হল একটা ইমোশানাল বন্ধন। মানুষের ভিতর এই কাম সব সময় নাড়া দিয়ে যাচ্ছে। যখনই মানুষ ভালবাসার জিনিস পেয়ে যায়, তখন ভালবাসা, যে কোন ভালবাসা তাকে মুক্তির পথ দেখিয়ে দেয়। শিশু যেমন মাকে ভালবাসে, মা যেমন শিশুকে ভালবাসে, ছেলেরা যখন বন্ধুকে

ভালবাসে, সহপাঠীদের ভালবাসে, সেখান থেকে শুরু করে যেমন যেমন সে এগোবে, স্বামী যেমন স্ত্রীকে ভালবাসে, স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসে, যে কোন ভালবাসা তার জন্য একটা ইমোশানাল স্পেস তৈরী করে দেয়, ওই স্পেস তাকে মুক্তি দেয়।

আর ধর্ম এইজন্যই পালন করতে হয়, যাতে মৃত্যুর পর আমরা কোন নিম্ন যোনিতে না চলে যাই। নিম্ন যোনিতে চলে যাওয়া মানে একটা আরও বাজে ও অপেক্ষকৃত কঠিন বন্ধনের মধ্যে পরে গেল। ধর্ম পালন করলে, ভবিষ্যতে আমাদের যে খারাপ কিছু হতে পারে, সেই খারাপ হওয়াটাকে আটকে দেয়।

আর মোক্ষ হল, সমস্ত রকম, সব রকমের মুক্তি দিয়ে দেয়। সন্ন্যাসীকে বলে দিচ্ছেন, তোমার তো শারীরিক বন্ধন থেকে মুক্তির দরকার নেই, দু মুঠো অন্ন পেয়ে গেলে তোমার কাজ চলে যাবে, সেইজন্য তোমাকে অর্থ সংগ্রহ করতে হবে না। তোমার এখন আর সন্তানের অভিলাষা নেই, তোমার আর কোন ইমোশানাল মুক্তির দরকার নেই, কারণ তোমার ইমোশান এখন ঈশ্বর থেকে আসছে। সেইজন্য তুমি কোন কামিনীতে অনুরক্ত হতে যেও না। আর তুমি এমনিতেই এত উচ্চ অবস্থায় চলে গেছ, এরপরে মৃত্যুর পর তোমার পোকামাকড় হয়ে জন্মাবার কোন সম্ভবনা নেই, সেইজন্য ধর্মটা তোমার ইস্যু নয়। তুমি মোক্ষ মার্গের, মোক্ষ ছাড়া আর কিছুর দিকে তাকাবে না।

আসলে আমরা বলি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য, ও শূদ্র, কিন্তু এখানে বলা হয়, যারা বর্ণাশ্রম মানে, যারা হিন্দু ধর্মকে মানে, বৈদিক ধর্মকে যারা মানে, আর ধর্মে যারা এগোতে চাইছে, এই বর্ণাশ্রম তাদের জন্য। এর বাইরে আরেকটা হয় সামান্য, যারা কোন কিছুকে মানে না। আজকের দিনে ভারতবর্ষে বর্ণাশ্রমের যে বর্ণ, সেটা সামান্য ধর্ম, যারা কোন ধর্মই মানে না। এনারা বলছেন, তুমি যেখানে আছ, যে অবস্থায় আছ, সেখান থেকেই তুমি উপরে উঠে চলে আসতে পারো। তুমি যে বর্ণে, যে জাতিতে জন্ম নিয়েছ, সেই জাতিগত কর্ম করলে ধীরে ধীরে তোমার উপর যে বন্ধনগুলি আছে, সেই বন্ধনগুলিকে ছাড়িয়ে তুমি অর্থ, কাম ও ধর্ম, এই তিনটে থেকে তোমার freedom হয়ে যাবে। যেমন যেমন তোমার অগ্রগতি হবে, তেমন তেমন বন্ধনগুলি মুক্ত হয়ে যাবে।

আশ্রমের যে প্রথা, সেখানেও সেটাই বললেন। পাঁচ বছর পর্যন্ত বাচ্চাদের সমস্ত ফ্রিডম দাও। এরপর তাকে ওই বয়সের যে ছেলেমানুষি, যে ছটফটানি আছে, সেটা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, আর সেখান থেকে তাকে মুক্তি পেতে হবে। তার প্রধান মুক্তি হল অর্থ, কাম, ধর্ম ও মোক্ষ থেকে। সন্তানকে এবার অর্থ, কাম, ধর্ম ও মোক্ষের জন্য প্রস্তুত করতে হবে। সেইজন্য প্রথমে তাকে ব্রহ্মচর্য রূপে গুরুগৃহে থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। সেখান থেকে গার্হস্থ্য আশ্রমে থেকে দান, দয়া, ধর্ম এগুলোতে প্রতিষ্ঠিত হবে। এই করে করে প্রত্যেককে এগোতে হবে। এই পুরো যে বিশাল পরিকাঠামো, এর প্রধান উদ্দেশ্য, যাতে মানুষের মন থেকে সাংসারিকতাটা কমে। অর্থ আর কাম ভোগের জন্য নয়। ধর্ম ভাব ছেড়ে যারা ভোগের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে, তার মানেই এরা কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত হয়ে আছে। শাস্ত্র যেটাকে অর্থ আর কাম বলছেন, ঠাকুর সেটাকেই কামিনী-কাঞ্চন বলছেন। উপরে যাওয়ার উদ্দেশ্য যখন অর্থ ও কামকে ধর্ম দিয়ে নিয়ন্ত্রিত করা হচ্ছে, তখন ওটাই হয়ে যায় অর্থ ও কাম। উদ্দেশ্য যদি ভোগ করা, তখন অর্থ ও কামটাই কামিনী-কাঞ্চন হয়ে যায়। ধর্ম একটা বড় রকমের বন্ধন, আচার্য শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে বার বার বলছেন, ধর্ম আরও বড় বন্ধন, কারণ যখন শুভকর্ম করে, তখন সে চায় আমি অমুক স্বর্গে যাব, আমি এই রকম জন্ম চাই, এতেই মানুষ বন্ধনে পরে যায়। উদ্দেশ্য হল মুক্তি, মুক্তির একেবারে শেষের অবস্থা।

অর্থ, কাম ও ধর্ম তার সাথে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, কিছুটা বাণপ্রস্থ আর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারটে বর্ণ, বর্ণাশ্রম এবং তার সাতে চারটে পুরুষার্থের সব কিছু যখন করা হয়ে গেল, এবার তার ভিতর থেকে সাংসারিকতা চলে যাবে। এবার তুমি সংসার ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলে। সংসার ত্যাগের জন্য মনস্থির করার আগে দেখতে হবে এই জিনিসগুলো তার যেন মোটামুটি হয়ে গিয়ে থাকে। যার মন থেকে সাংসারিকতা যায়নি, যার মনে এখনও ভোগের ইচ্ছা আছে, তারা কিন্তু কোন দিন সাধনায় নামতে পারবে না। ঠাকুরও বলছেন, যার মন এখনও সংসারে আসক্ত, সে এগুলো করতে পারবে না। আরও বলছেন, কামিনী-কাঞ্চনে

আসক্ত মন যেন ভিজে দেশলাই। এই যে বর্ণাশ্রম ধর্ম, আর তার সাথে এই যে চারটে পুরুষার্থ, এগুলো জোঁকের মত মানুষ সংসারকে যেভাবে আঁকড়ে আছে, এই আঁকড়ে থাকাটা একটু আলগা করে দিল।

এরপর এনারা দুটো আদর্শ দিলেন, একটা জ্ঞানের আদর্শ, আরেকটা ভক্তির আদর্শ। জ্ঞানের আদর্শ যারা নিচ্ছে, তারা বলে, শুদ্ধ চৈতন্যকে ছাড়া আমি আর কিছুকে ধরব না। ভক্তির আদর্শ যার নেয়, তারা বলে, ঈশ্বর ছাড়া আমি আর কোন কিছুর চিন্তা করব না। দুটো ক্ষেত্রেই সংসারটা নাশ হয়ে যায়। কারণ যে বলছে, আমি শুদ্ধ চৈতন্য ছাড়া আর কোন কিছুর চিন্তা থাকতেই দেব না, তার মানে বাকি যা কিছু আছে সব মন থেকে নেমে গেল। একজন ভক্ত রাধা আর শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কিছু জানে না, তার মানে সংসার তার মন থেকে নেমে গেল। এইটা করার জন্য আবার দুটো বড় পথ, কর্ম অর্থাৎ বহিরঙ্গ সাধন এবং আরেকটা হল যোগ, যেটাকে অন্তরঙ্গ সাধন। বহিরঙ্গ সাধনে, যখন সব কর্ম নিঃস্বার্থ ভাবে করে এবং কর্মের ফল ঈশ্বরকে অর্পণ করে; এর ফলে মানুষ তার সঙ্কীর্ণতা, স্বার্থপরতা থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয় আর সংসারকে যেভাবে আঁকড়ে ধরে আছে, এই ধরে রাখাটা ছাড়তে শেখে।

জ্ঞান ও ভক্তির যে পথ বলা হল, আমরা খুব সহজে বলে দিলাম যে, শুদ্ধ চৈতন্যকে ধরে রাখবে, ঈশ্বরকে ধরে রাখবে, ঈশ্বর চিন্তন করবে, এটা অত্যন্ত ভেক্ টার্ম। যোগশাস্ত্র সেটাকে systemetise করে দিল। যোগ শাস্ত্র পর পর স্টেপ দেখিয়ে দিয়ে বলে দিচ্ছেন, এই এই ভাবে করতে হবে। তার মানে কারুর যদি সংসার ত্যাগ করার ক্ষমতা না থাকে, যদি জ্ঞানী না হয়, ভিতরে যদি ভক্তি না থাকে, কিন্তু কোথাও বই পড়ে বা শুনে তার ধর্মের প্রতি আগ্রহ জন্মেছে, অন্য দিকে সে ত্যাগের পথেও যেতে চাইছে না; তাহলে এখন তার জন্য কি পথ হতে পারে? তখন যোগশাস্ত্র বলবেন, একটু শুদ্ধি তো তোমার দরকার, কারণ একটু শুদ্ধি যদি না থাকে, তুমি বিরাট সমস্যায় পড়ে যাবে। তোমার যদি শুদ্ধি একটু বেশি হয়ে থাকে, তাহলে তুমি এই এই ভাবে সাধনা কর। জিমে যেতে শুরু করলেই সে রাতারাতি বিরাট বডিবিল্ডার হয়ে যাবে না, একটা লেভেল পর্যন্ত তাকে নিয়ে যাবে। কিন্তু তারপরেও যদি সে চায় আমি আরও এগোতে চাই, তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ারও ব্যবস্থা আছে। যোগ তখন বলে দিচ্ছে, কিভাবে তুমি সাধনা করবে।

যোগ প্রথমেই সংসার ছেড়ে বেরিয়ে আসতে বলে না, অন্য দিকে জ্ঞান আর ভক্তি প্রথমেই সংসার ত্যাগের কথা বলে, সংসার ত্যাগ করে তোমার মনকে পুরোপুরি ঈশ্বরে দাও। কিন্তু যোগ সংসারকে ধারে কাছেই আনবে না, যোগ বলবে, সংসার সংসারের জায়গায় থাকুক, তুমি তোমার মনকে নিয়ন্ত্রণ করো। কিভাবে করবে? যে কোন একটা বস্তুর উপর মনকে কেন্দ্রিত কর। আমি এবার একটা ফুলের উপর মন একাগ্র করে ফুলের চিন্তা করছি। আমি ঈশ্বরকে দেখিনি, ব্রহ্ম কি জিনিস আমি জানি না। যাকে দেখিইনি, তাকে ভালবাসব কি করে! শুদ্ধ চৈতন্য আমার কাছে একটা শব্দ মাত্র, কি করে আমি নেতি নেতি করব। এই পেন আছে, পেন একটা সলিড বস্তু, এর উপর আমি ধ্যান করতে পারি।

যখনই আমি ধ্যান করতে শুরু করছি, এবার দুটো জিনিস হয়ে যাচ্ছে। পরিষ্কার দেখছি পেন বাইরে আছে, কিন্তু পেনের যে চেতনা, এটা আমার মনের ভিতরে আছে। এই জিনিসটাকে নিয়ে আমরা আগেও কয়েকবার আলোচনা করেছি। স্বামীজীও বলছেন, সমস্ত চেতনা, সমস্ত জ্ঞান ভিতরে। ওই চেতনাগুলি আমাদের ভিতরে থেকে যায়, আর পরে যখন পর পর আসতে শুরু করে, তখন ওটাই স্মৃতি রূপে আসে, কল্পনা রূপে আসে। এই পেন দেখছি, এটা লেখার কাজে লাগে, আর এটা নীল রঙের পেন, পেন একটা বস্তু নীল একটা গুণ। এবার যদি আমরা গুণটাকে সরিয়ে দিতে পারি, ভাল পেন, মন্দ পেন, সরু পেন, মোটা পেন, দামী পেন, সস্তা পেন, এগুলো সব গুণ, সব গুণকে সরিয়ে দিলে থেকে যাবে শুধু পেন। একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কাগজে আমাকে সই করতে হবে তখন আমি চাইব একটা দামী ভাল পেন দিয়ে সই করব। আবার তাড়াহুড়ো করে এক্ষুণি আমাকে ব্যাঙ্কে কোন কাগজে একটা সই করতে হবে, আগে থেকে যে সই করতে হবে আমার মনে ছিল না, এদিকে দেখছি আমি পেন নিয়ে আসতে ভুলে গেছি। তখন এর ওর কাছে থেকে পেন চাইছি, ওদিকে ব্যাঙ্কের কাউন্টার থেকে ভদ্রলোক বলে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি সই করুন, তখন আমি আর দামী পেন, সস্তা পেন, ভাল পেন, খারাপ পেন এসব কিছু বিচার করতে যাবো না, আমার এক্ষুণি একটা পেন দরকার। কিন্তু যখন আমার সময় আছে, সুযোগ আছে, তখন বলব, এটা খুব দামী পেন, ভাল পেন, নূতন পেন। যোগ বলছে,

আগে তুমি বিচার কর পেন কোনটা, পেনের গুণ কোনটা। এরপর তুমি গুণটাকে ছেড়ে দাও, শুধু পেনের উপর মনকে একাগ্র কর। এটাই বস্তু আর বস্তুর উপাধির তফাৎ।

ঠাকুর কলকাতায় গেছেন, হৃদয়রাম লাট সাহেবের বাড়ি দেখিয়ে বলছে, 'মামা! এটা লাট সাহেবের বাড়ি'। ঠাকুর বলছেন, 'মা আমাকে দেখিয়ে দিলেন ইটের ঢিপি'। বস্তু আছে, বস্তুর উপাধিগুলো এমন পাল্টে গেছে যে, ওটা লাট সাহেবের বাড়ি হয়ে গেছে। আমরা যখন রসমালাই পছন্দ করছি, অন্য কেউ যখন রসগোল্লা পছন্দ করছেন, কিন্তু রসমালাইও যা রসগোল্লাও তাই। দুটোই দুধ আর চিনির খেলা। দুধ আর চিনিকে একভাবে ব্যবহার করলে রসগোল্লা হয়ে যাচ্ছে, অন্য ভাবে ব্যবহার করলে রসমালাই হয়ে যাচ্ছে। দুধকে আধার করে মিষ্টির দোকানে যত প্রকার মিষ্টি আছে, সব হল দুধ আর চিনির খেলা। দুধ আর চিনি খাওয়াও যা, রসগোল্লা খাওয়াও তা। তার উপাধিগুলি পাল্টে যাচ্ছে। সবাই বলবে, সংসারে তো এটারই দাম। ঠিকই, কিন্তু তুমি আর সংসারের নও। কারণ এই যে চারটে পুরুষার্থের কথা, চারটে বর্ণাশ্রমের কথা বলা হল, যেখান থেকে তোমার সাংসারিকতা অনেক কমে গেছে। এবার তুমি বলছ, আমি এখন অন্দরমহলের অনেক গভীরে যেতে চাই। সমাধিবান হতে চাইছি না, মোক্ষও চাইছি না, শুধু অন্তর্জগতের ভিতরে একটু ঢুকতে চাই।

তখন বলবেন, তাহলে তুমি জিনিসটাকে জিনিস রূপে দেখতে শেখো। যোগীরা যখন ধ্যান করতে শুরু করেন, প্রথমে তাঁরা এটারই ধ্যান করেন। যে কোন বস্তু দুটো রূপে আসে, বস্তু আর তার উপাধি বা তার গুণ বা বিশেষণ। যোগ বলবে, সংসারকে এখুনিই তুমি উড়িয়ে দিতে পারবে না, বস্তুকেও উড়িয়ে দিতে পারবে না; কিন্তু বস্তুর উপাধিগুলি, গুণগুলিকে আগে উড়িয়ে দাও, আর শুধু মাত্র পেনের চিন্তন কর। যখন গোলাপের উপর ধ্যান করছ, তখন লাল গোলাপ, সাদা গোলাপ, হলুদ গোলাপ ছেড়ে শুধু গোলাপের উপর ধ্যান কর। এবার ধ্যান শুরু হয়ে গেল, তুমি এরপর আরও গভীরে চলে গেলে। আরও গভীরে চলে যাওয়ার পর তুমি দেখবে ওই গোলাপ আর এই পেন, দুটোই এ্যটম দিয়ে তৈরী। এখন তুমি আর পেন দেখছ না, দেখছ শুধু এ্যটমস্। একদিনে এই অবস্থায় যাওয়া যাবে না, এই জিনিসটা ভাবতে সময় লাগবে। সেখান থেকে আরও গভীরে গেলে দেখবে, তখন তোমার একাগ্রতা এই বস্তুর উপর আর থাকছে না। প্রথমে হচ্ছিল, এই বস্তু যেমনটি, এই বস্তুরই ধ্যান হচ্ছে।

ঠাকুরের উপর প্রথম ধ্যান যখন হয় তখন কেউ ঠাকুরের উপর ধ্যান করে না, ঠাকুরের ছবির ধ্যান করে। কিন্তু গুরু একবারও বলেননি যে, ঠাকুরের ছবির উপর ধ্যান করতে, বলে দিয়েছেন ঠাকুরের উপর ধ্যান করতে, সবাই ছবির উপর ধ্যান করে। ধীরে ধীরে ঠাকুরের ছবি সরে যাওয়ার পর থাকবেন শুধু ঠাকুর। এবার ঠাকুরের উপর যখন ধ্যান হবে, ঠাকুরের যে স্থান, কালের বাধন যেটা রয়েছে, সেটাকেও সরিয়ে দেওয়া হল। ধীরে ধীরে তাঁর উপর যে উপাধি সমূহ জুড়ে দেওয়া হয়েছে, সেই উপাধিগুলিকেও সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। যোগশাস্ত্র প্রথম যে ধ্যান করতে বলেন, সাধারণ ভাবে আমরা যে জিনিসগুলিকে ভাল করে জানি, কোন ফুল, যেমন পদ্ম ফুল, উদীয়মান সূর্য, বা কোন আলো, এই ধরণের কিছু জিনিসকে নিয়ে ধ্যান করতে বলেন। প্রথমে ওই বস্তুকে নিয়ে ভাবতে হবে। বেশ কিছু দিন সাধনা করার পর যখন বস্তুটা একেবারে পরিষ্কার হয়ে যাবে, এরপর বস্তুর গুণগুলিকে উড়িয়ে দিতে হবে। গুণগুলিকে উড়িয়ে দেওয়ার পর, এবার বস্তু যে উপাদান দিয়ে তৈরী সেই জিনিসগুলির ধ্যান করতে হবে। তারপর ওটাকেও সরিয়ে দেওয়া হল, এই করে করে এমন একটা অবস্থা হবে, যে অবস্থায় তোমার চেতনা থেকে বস্তুতো উড়ে যাবেই, সংসারটাও উড়ে যাবে। তখন কি থেকে যাবে? থেকে যাবে শুধু শুদ্ধ মন।

আমরা আলোচনার মধ্যে সমুদ্র, ঢেউ, পুকুর, পাথর ছোঁড়ার পর ঢেউ উঠছে এই জিনিসগুলিকে নিয়ে আলোচনা করছি, তাতে ঢেউ মানে বস্তুর জ্ঞান, বস্তুর জ্ঞানকে বলা হয় বৃত্তি জ্ঞান। প্রথমে সাংসারিকতা ছাড়তে হয়। সাংসারিকতা ছাড়ার উপায় রূপে অনেক রকম কথা বলা হয়, যেমন আগে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের কথা বলা হল, বর্ণাশ্রম ধর্ম বা যোগশাস্ত্রে যম নিয়মাদির কথা বলছেন, বেদান্তে শম, দম, তিতিক্ষার কথা বলা হয়। বিভিন্ন ভাবে ওনারা একই জিনিস বলেন, তোমার সাংসারিকতার ভাব কমাও। সাংসারিকতার ভাব কমলে এবার তুমি বস্তুর উপর ধ্যান কর। বস্তুর উপর ধ্যান করলে বস্তুর উপর যে গুণগুলি রয়েছে, সেগুলিকে তুমি উড়িয়ে দিতে পারবে। গুণগুলি উড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়ে যাওয়ার পর এবার তুমি বস্তু যে জিনিস দিয়ে তৈরী,

সেটার উপর ধ্যান করতে থাক। আর যখন ওটাকেও উড়িয়ে দিতে পারবে তখন শেষ যেটা রয়েছে, সেটাই থেকে যায়; তখন সংসার উড়ে যায়। কিভাবে উড়ে যায়? ঠিক সেই ভাবে উড়ে যায়, জ্ঞানীরা যেভাবে নেতি নেতি করে সচ্চিদানন্দ ছাড়া যাবতীয় যা কিছু আছে, সব কিছুকে উড়িয়ে দেয়। ভক্তিতে বলা হয়, তোমার ইষ্ট বাদে যাবতীয় যা কিছু আছে, সবটাই উড়িয়ে দাও।

জ্ঞান, ভক্তি আর যোগ একই জিনিস করে, সংসারকে উড়িয়ে দেয়। কর্ম একটু অন্য ভাবে যায়, ওটা আলাদা বিষয়, এখানে সেটা আমাদের আলোচ্য নয়, সেইজন্য ওটাকে নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে না। সংসার কোথা থেকে উড়িয়ে দেবে? সংসার যেমন ছিল তেমনই থাকবে; কিন্তু তোমার চেতনা থেকে সংসার উড়ে যাবে। তখন তুমি দেখবে সবাই সেই মানুষ, সেই হিউম্যানিটি। অথবা তুমি দেখবে, এগুলো হল সচ্চিদানন্দ রূপে সাগরের উপর নামরূপের খেলা, বা তুমি দেখবে ঈশ্বর নিজে এই সব কিছুর রূপ ধারণ করেছেন। যেভাবেই দেখে থাকো না কেন, এতদিন পর্যন্ত সংসার যেভাবে ছিল, ওটা আর সেভাবে থাকে না, ওই ভাবটা উড়ে চলে যায়। স্বামীজী যখন এখানে বলছেন, When you can mentally get rid of one quality after another from any object until all are gone, সমস্ত গুণগুলি, সব উপাধি উড়ে গেল, এরপর you can at will make the object itself disappear from your consciousness, এরপর তোমার চেতনায় আর কেউ আসবে না। এই যে বলা হয়, out of sight out of mind, তখন এরও দরকার পড়ে না, তখন যদি insightয়েও থাকে বা তোমার সামনেও থাকে, তখনও ওটা আর থাকবে না। কিন্তু যোগীরা এটাকে আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যান, যাঁরা খুব উচ্চমানের যোগী ওনারা ইচ্ছামাত্রই কোন জিনিসকে আমাদের সামনে থেকে ভ্যানিশ করে দেবেন বা আমাদের সামনে এনে হাজির করিয়ে দেবেন। তবে এগুলো কতটা সত্যি, কতটা এর মধ্যে জাদুবিদ্যা আছে আমাদের জানা নেই। কিন্তু চেতনা থেকে যে উড়ে যায়, আমরা এই জিনিস ঠাকুরের জীবনে পদে পদে দেখতে পাই। শাস্ত্রের কথা যদি ধারণা করতে হয়, বুঝতে হয়, এর একমাত্র প্রমাণ হল ঠাকুরের জীবন। এটাই স্বামীজী এখানে বলছেন। এই সাধনার পথে যখন এগোতে শুরু করে, তখন কিভাবে এগোয়, কে কত তাড়াতাড়ি এগোবে, এগুলোকে নিয়ে এরপর বলছেন।

যোগের উত্তম অধিকারী

Those who are ready, advance very quickly and can become Yogis in six months. (*যারা উত্তম অধিকারী, তারা যোগে খুব শীঘ্র শীঘ্র উন্নতি করতে পারে –ছ-মাসে তারা যোগী হতে পারে।*) স্বামীজী এটা প্রায়ই বলতেন, ছ-মাসে যোগী হয়ে যাওয়া যায়। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন স্বামী হিরন্ময়ানন্দজী, খুবই ভাল মানুষ ছিলেন, ওনার ছিল ইচ্ছামৃত্যু। ওনার যখন মৃত্যুর সময় হয়ে গেছে তখন উনি সন্ধ্যের দিকে তাঁর সেবককে ডেকে বললেন, আমি চলে যাব, আমার হাতে জপের মালা দাও, আর আমাকে একটু বসিয়ে দাও। সেবকও একটু অবাক হয়ে গেলেন। যাই হোক ওনাকে উঠিয়ে বসিয়ে দেওয়া হল, জপের মালা হাতে নিলেন, ঠাকুর নাম করতে করতে চলে গেলেন। মঠের অনেক মহারাজদের অনেকেই এভাবে হঠাৎ বললেন, আমাকে বসিয়ে দাও, আর জপ করতে করতে দেহ ছেড়ে দেন। কোন সাধু যদি স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজীকে গিয়ে নিজের উপলব্ধি বা অনুভূতি নিয়ে কিছু বলতেন, উনি ব্যঙ্গ করে, ওনার বলার নিজস্ব একটা স্টাইল ছিল, সেই স্টাইলে বলতেন, আমার এত বছর হয়ে গেল, আমি মঠের জেনারেল সেক্রেটারি, আমার এখনও কোন অনুভূতি হলো না, তোমার অনুভূতি হচ্ছে! উনি সামনের বক্তাকে একটু দাবিয়ে দেওয়ার জন্য এ-ভাবে বলতেন যাতে এখানেই সন্তুষ্ট হয়ে সব প্রচেষ্টা বন্ধ না করে দেয়। কিন্তু স্বামীজী এই কথা অনেকবার বলেছেন, ছ-মাসে যোগী হয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু তার সাথে condition দিয়ে দিচ্ছেন, those who are ready, তার মানে সাংসারিক ভাব অর্থাৎ আমরা প্রথমে যেটা দিয়ে শুরু করেছিলাম, যাদের মধ্যে সাংসারিকতার ভাব আছে, তারা হতে পারবে না। যাদের কামিনী-কাঞ্চন, দেহসুখ, জগৎ থেকে চাওয়া-পাওয়ার ভাব আছে, তাদের হবে না।

আমরা অনেক সময় মনে করি, আমাদের মধ্যে এগুলো নেই, মনে করছি সব চলে গেছে। কিন্তু কিছুই যায় না, গ্যাঁট হয়ে বসে থাকে। যাঁদের এই জিনিসগুলো সত্যিকারের কমে গেছে, তাঁরা কিন্তু সত্যি সত্যিই উন্নতি করেন। পবিত্র মন মানে সব সময় অনাসক্ত। অনাসক্ত মন কিভাবে পবিত্র মন হয়, শ্রীকৃষ্ণের জীবন

দিয়ে দেখানো হয়েছে। তাঁর ষোল হাজার একশ আটটি স্ত্রী, কিন্তু তাঁর কোন কিছুতেই কিছু না, অনাসক্ত। *পদ্মপত্রমিবাম্ভসা*, পদ্ম পাতায় জল থাকলে জল পদ্ম পাতাকে সিক্ত করতে পারে না, একটু নাড়া দিলেই জল গড়িয়ে চলে যাবে। এটাই অনাসক্ত মনের উপমা। ঠাকুরও এই ধরণের অনেক উপমা দিচ্ছেন। কেউ হয়ত বলতে পারে, 'কেন, আজকালকার ছোকড়ারাও তো এই রকমই, কত রকমের বাঁদরামো করে বেড়াচ্ছে, ওরাও তো কোথাও জড়িয়ে পড়ছে না'। কিন্তু না, আসলে ওরা এগুলো experiment করছে, they are in search of right one। একজন তার বন্ধুকে বলছে, 'হ্যাঁরে তুই বাইরে তো খুব সিংহের মত ঘুরে বেড়াস, অফিসে সিংহের মত থাকিস, বাড়ি গিয়ে কি হয়ে যাস'? বন্ধুটি বলছে, 'বাড়িতেও আমি সিংহই থাকি, তবে আমার স্ত্রী দূর্গা হয়ে আমাকে পায়ের তলায় রেখে দেয়'। যারা এই সিংহের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওটা কিছুই না, ঠিক দূর্গা এলেই পায়ের তলায় চলে আসবে। এরা একেবারেই অনাসক্ত নয়, ঘোর আসক্ত। কিন্তু ঠিক জায়গায় বসছে না।

স্বামীজী এটাই বলছেন, যারা সত্যিকারের অনাসক্ত, যারা কিছুই চাইছে না; আর মন থেকেও পরিষ্কার, তার মানে মনে কোন আসক্তি নেই। যেটা চলে গেছে সেটার জন্য কোন শোক নেই, যেটা পেতে চাইছে, সেটাকে নিয়েও কোন মোহ নেই। সংসারে আছে বলে কর্তব্যগুলি তাকে করে যেতে হচ্ছে। যিনি সন্ন্যাস নিয়ে নিয়েছেন, তাঁরও একটা ধর্ম আছে, তাঁরও একটা ভাব আছে, এই ভাবকে ধরে নিয়েই তাঁকে থাকতে হবে। মানুষ যখন এই ভাবে থাকে, তখন অন্তত যে কর্তব্যগুলি তাকে করতে হচ্ছে, সেই কর্তব্য করবে কি করবে না? যেমন ছাত্ররা, ইদানিং এগুলোকে নিয়ে অনেক আলোচনা হয়, politics in educational campus, কলেজে, ইউনিভার্সিটিতে কি রাজনীতি করতে দেওয়া যায়? বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতারা বলেন, ছাত্রদের ভবিষ্যত তো এখান থেকে বেরোবে, তাদেরও তো রাজনীতি শেখা দরকার। কিন্তু একেবারেই না, আমাদের শাস্ত্র নিষেধ করে রেখেছেন, *ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ*, ছাত্রদের একমাত্র তপস্যা হল অধ্যয়ন, শিক্ষা ক্ষেত্র রাজনীতি করার জায়গা নয়। আগামীকাল আপনারা বলবেন, ছাত্ররা তো ভবিষ্যতে বিবাহ করবে, এখন থেকেই প্র্যাক্টিস করা দরকার। আপনারা এর অনুমতি দিতে যেমন পারবেন না, তেমনি রাজনীতি করার অনুমতিও দেওয়া যেতে পারে না। অনাসক্ত মানে তাই, যেটা তোমাকে করতে বলা হয়েছে, তোমাকে সেটাই করতে হবে। এটা করতে হবে বলে করছে, এর বাইরে সে যাবে না, সম্পূর্ণ ভাবে ওতেই লেগে আছে, এর বাইরে একটুও যাচ্ছে না, এটাকে বলে অনাসক্ত, অনাসক্ত মানে পবিত্র। স্বামীজী আগের প্যারাগ্রামে বলছেন, Be unattached, সেখান থেকে এসে বলছেন, those who are ready, ready মানে পিওর, detachment leads to purity and purity is detachment, পবিত্রতার আর অন্য কোন সংজ্ঞা নেই। আমরা ভাবি এই কাজটা নোংরা কাজ, এই কাজ করলে অপবিত্র হয়ে যাবে। কিন্তু না, কাজ কখনই নোংরা হয় না। ঠাকুর বলছেন, দেখো এই কামের কত শক্তি, এর থেকেই সন্তান উৎপত্তি হয়, আর এটা দিয়েই সংসার চলে। কাম খারাপ নয়, কামে আসক্ত কিনা, সেটাই সমস্যা।

যিনি যোগের উত্তম অধিকারী নন

The less developed may take several years; and anyone by faithful work and by giving up everything else and devoting himself solely to practice can reach the goal in tweleve years. Bhakti will bring you there without any of these mental gymnastics, but it is a slower way. (*যারা তদপেক্ষা নিম্নাধিকারী, তাদের যোগে সিদ্ধিলাভ করতে কয়েক বৎসর লাগতে পারে, আর যে-কোন ব্যক্তি নিষ্ঠার সঙ্গে সাধন করলে, অন্য সব কাজ ছেড়ে দিয়ে কেবল সদাসর্বদা সাধনে রত থাকলে দ্বাদশ বর্ষে সিদ্ধিলাভ করতে পারে। এইসব মানসিক ব্যায়াম না করে কেবল ভক্তি দ্বারাও ঐ অবস্থায় যেতে পারা যায়, কিন্তু তাতে কিছু বিলম্ব হয়।*) স্বামীজী ছ-মাস থেকে সোজা বারো বছরে নিয়ে চলে গেছেন। এটা আসলে স্বামীজী বলছেন না, পতঞ্জলিও বলছেন, যার যেমন চেষ্টা, আধ্যাত্মিক জগতে যদি চেষ্টা মৃদু হয়, তার ফলও মৃদু হবে, চেষ্টা যত তীব্র হবে ফলও তত শীঘ্র পাবে। ঘাস কাটার মত, বেশি ঘাস কাটলে বেশি ঘাস পাবে, কম ঘাস কাটলে কম ঘাস পাবে। এইসব কারণে যোগকে বলা হয়, science of spirituality। যাঁরাই ধর্মকে বুঝতে চাইবেন, তাঁদেরকে যোগ একটু বুঝতে হয়।

রাজযোগ যদি না বুঝে থাকে, তাহলে ধর্ম বোঝা যাবে না। বাকিগুলো সব ইমোশানাল হয়ে যায়, স্বামীজীও বলছেন emotionalism হয়ে যায়, যার কোন দাম থাকে না।

যারা less devoloped, তখন তাদের দুটো এক সঙ্গে চলে। যেমন যেমন তুমি ধ্যান আদি করছ, প্রাণায়াম করছ, তার সাথে অনাসক্তেরও অনুশীলন করছ, দুটো এক সঙ্গে চলে। এরপর বারো বছর কেন, বারো জন্ম লাগলেও কিছু আসে যায় না, মোদ্দা কথা হল, তুমি কতটা পবিত্র আর কতটা চেষ্টা করছ। পবিত্রতা যদি কম হয়, চেষ্টা যদি কম থাকে, তাহলে সময় বেশি লাগবে। এরপর টাইম ফ্রেমে কত সময় লাগবে, বলা মুশকিল।

পতঞ্জলি রাজযোগে বলছেন, *তজ্জপস্তদর্থভাবনম্* আর বলছেন *তস্য বাচকঃ প্রণবঃ*। প্রত্যেক জিনিসের প্রতি ভারতের যে approach, এটা হল inclusive approach, ভারতে যদি কোথাও দেখা যায় exclusive approach আসছে, পরিষ্কার তখন বুঝতে হবে এটা ভারতীয় চিন্তা-ভাবনা থেকে আসেনি। যেমন আয়ুর্বেদ, আয়ুর্বেদ যখন আমাদের চিকিৎসা করবে, তখন আমাদের পুরো শরীরের চিকিৎসা করার চেষ্টাই করবে। ইদানিং কালে আমরা চেষ্টা করছি, আমাকে নিজেকে বড় করতে হবে, ভারতের যে চিন্তাধারা, ওই ধারাতে এটাকে কখনই অনুমতি দেবে না। তুমি একা বড় হতে পারো না, তোমাকে তোমার পরিবার, তোমার জাতি, তোমার সমাজ এদের সবাইকে একসাথে নিয়ে তোমাকে চলতে হবে। যে কোন সমস্যার যে সমাধান আসবে, সেটাকে এনারা সব সময় একটা Holistic approach নিয়ে চলতেন। পতঞ্জলি চিত্তবৃত্তির কথা বলছেন, মনকে নিয়ন্ত্রণ করার কথা বলছে, কিন্তু সাথে সাথে তিনি ভক্তিশাস্ত্রকেও নিয়ে আসছেন, বলছেন যদি ঈশ্বরের ধ্যান করা যায়, বলছেন, *ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা*, ঈশ্বরে যদি মনকে কেন্দ্রিত করা হয়, তাহলেও হবে। পতঞ্জলি এটাও বলছেন, *তজ্জপস্তদর্থভাবনম্*, ইষ্টের নাম জপ করলে তখন আর এই যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, এগুলো কোনটাই করতে হবে না। স্বামীজী শুধু এর সাথে যোগ করে বলছেন, but it is a slower way। এটা স্বামীজীর নিজস্ব ব্যাখ্যা, স্বামীজী নিজে রীতিমত যোগ সাধনা করেছিলেন, এই কথাগুলো ঋষিবাক্য। কিন্তু যোগশাস্ত্রে এই কথা নেই, যোগশাস্ত্র অবশ্য সূত্রাকারে রাখা হয়েছে। তাতে যদি কোন জিনিস বলা থাকে তার দাম আছে, যদি বলা নাও থাকে তাতে দোষের কিছু নেই।

আমরা হিন্দুরা যেভাবে ঈশ্বরকে দেখি, যোগশাস্ত্র সেভাবে ঈশ্বরকে দেখে না। যোগ ঈশ্বরের সংজ্ঞা এইভাবে দিচ্ছেন – *স পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ*, তিনি গুরুরও গুরু, তিনি এমন একজন, যাঁকে দেশকালে বাঁধা যায় না। কিন্তু তিনি সৃষ্টি, স্থিতি, পালন কোনটাই করেন না। গুরুর উপর যেমন ধ্যান করা যায়, তেমন ঈশ্বরের উপরেও ধ্যান করা যায়, তাঁর জপ করা যায়। ঈশ্বরের ধ্যান বা জপ করলেও মন এদিকে সেদিক যাবে না, মন নিয়ন্ত্রিত হয়ে যাবে।

এরপর বলছেন, Ishvara is the Atman as seen or grasped by mind. (*মনের দ্বারা সেই আত্মাকে যেভাবে দেখা বা ধরা যেতে পারে, তাকেই 'ঈশ্বর' বলে।*) দেববাণীতে স্বামীজীর প্রিয় টপিক সেই যিনি শুদ্ধ চৈতন্য সচ্চিদানন্দ, উপনিষদ যাঁকে ব্রহ্ম বলছেন, আত্মা বলছেন; অনেক সময় তফাৎ করার জন্য আমার ভিতরে যিনি তাঁকে আত্মা বলছেন, সমষ্টিকে ব্রহ্ম বলেন। তার সাথে বলা হয় দুটোর মধ্যে কোন তফাৎ নেই, যিনি আত্মা, তিনিই ব্রহ্ম। শান্ত সমুদ্রে যদি একটাও ঢেউ উঠে থাকে, তখন ওটা আর সমুদ্র নয়, ওটা ঢেউ। আমরা আগেও বলেছি, আমরা ভাবছি আমরা সব কিছু continuous দেখছি, স্বপ্নও আমরা continuous দেখি না, স্টীল ফটোগ্রাফির মত দেখি। আমরা হয় সমুদ্র দেখব, নয়তো ঢেউ দেখব, দুটো জিনিস এক সঙ্গে দেখা যায় না। একটাও যদি ঢেউ থাকে, তার মানে মন আছে। আর ওই একটাও যদি ঢেউ থাকে, ঠাকুরের যেমন মা কালী ছিলেন, একটা ঢেউ থাকা মানে, সেই সচ্চিদানন্দকে আমরা দেখছি মনের মাধ্যমে, ঢেউএর মাধ্যেম।

Samuel Taylor Coleridgeএর বিখ্যাত কবিতা The Rime of the Ancient Marinerএ বলছেন, Water water everywhere, And all the boards did shrink; Water water, everywhere, Nor any drop to drink যেখানে বর্ণনা করছে, যখন এ্যালবার্ট্র্সকে মেরে দিয়েছে, সেই

পাপে তখন সমুদ্র একেবারে শান্ত হয়ে গিয়েছে, ওদের জাহাজ যে সমুদ্রের উপর দিয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে, like painted on a canvas। কারণ কোন reference point নেই, জাহাজ চলছে কি চলছে না বোঝা যাচ্ছে না; কারণ কোন ঢেউ নেই, like a sheet of glass। ঢেউ বিহীন সমুদ্র, এটাকে কবি খুব সুন্দর বর্ণনা করছেন। আর ঢেউবান সমুদ্র। যদি একটাও ঢেউ থাকে, সেটা হল ঈশ্বর, দুটো ঢেউ মানে ঈশ্বর আর আমি, তিনটে ঢেউ মানে ঈশ্বর, আমি আর জগৎ। যদি মনে করি তাহলে সমুদ্রে তিনটে ঢেউই আছে, তা হবে না। ঢেউ হয় একটা থাকবে আর নয়তো কোন ঢেউ নেই, সেইজন্য বলা যাবে না যে কিছু আছে। সেইজন্য হয় একটা ঢেউ, আর তা নাহলে দুটো ঢেউ, আর তা নাহলে অসংখ্যা ঢেউ। আমি আছি তুমি আছো, এই পর্যন্ত বোধ আছে। কিন্তু এরপরে যদি আরেকটা ঢেউ থাকে, তাহলে বুঝতে হবে অসংখ্য ঢেউ। অসংখ্য ঢেউকে শান্ত করে প্রথমে আসে আমি আর তুমি, সেখানে আমি যদি তুমির মধ্যে এক হয়েও যায়, তাহলেও একটা বোধ থাকবে একটা ঢেউয়ের। প্রজেক্টর থেকে আলো যখন পর্দার উপর পড়ছে, আমরা তাকে ঈশ্বর বলছ। সেই আত্মাকে যখন ঈশ্বর রূপে দেখায় তখন তাঁকে আমরা মন দিয়ে দেখছি।

ওঁম্-এর তাৎপর্য এবং ওঙ্কার জপ

His highest name is Om; so repeat it, meditate on it, and think of all its wonderful nature and attributes. Repeating the Om continually is the only true worship. It is not a word, it is God Himslef. (*তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ নাম 'ওঁ', সুতরাং ঐ ওঙ্কার জপ কর, তার ধ্যান কর, তার ভিতর যে অপূর্ব অর্থসমূহ নিহিত রয়েছে, তার চিন্তন কর। সর্বদা ওঙ্কার-জপই যথার্থ উপাসনা। ওঁম্ সাধারণ শব্দমাত্র নয়, স্বয়ং ঈশ্বর-স্বরূপ।*) সেইজন্য উপনিষদে বলছেন, যে ওঁ জপ করে সে তিন লোককে জয় করে নেয়। এই ঘরে আমরা বসে আছি, সব আলো নিবিয়ে দেওয়া হল। অল্প একটু যে আলো আসছে, তাতে আমরা এক উপরের মুখ দেখতে পাচ্ছি; যদিও আগের মত ভাল দেখাচ্ছে না। জানালার পর্দাটা একটু সরানো হল। এবার মুখগুলো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। পর্দাগুলি আরও ভাল করে খুলে দেওয়া হল, এবার আমরা লেখাপড়া করতে পারছি। এবার দেওয়ালটাকেও যদি ভেঙে দেওয়া হয়, তখন ওই আলোতে আমরা সমস্ত কিছু করতে পারব। জানালার পর্দাগুলি চেষ্টা করে যে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যেমন যেমন পর্দা সরছে আর প্রার্থনা করা হচ্ছে, হে প্রভু আলো দাও। কিন্তু আলো তো ওখানে আগে থেকেই আছে। ওই যে প্রার্থনা করা হচ্ছে, প্রার্থনা করা মানে সে জানালাটা খুলছে। জানালা যদি না খোলে, আলো কোন দিন আসবে না। আলো চিরদিনই ছিল, কিন্তু সেই আলো ভিতরে আসতে পারছে না, কারণ সে জানালাগুলো বন্ধ করে রেখেছে। পর্দা সরিয়ে দিলে সূর্যের আলো ভিতরে এসে যাবে, সেই আলোতে আমরা সব কিছু করতে পারব। ঠিক তেমনি আত্মার স্বরূপই হল জ্ঞান, তাঁর স্বরূপই হল শক্তি। সূর্যের আলোর স্বভাবই হল আলো আর উষ্মা। সূর্যের আলোকে নিয়ে এলে সব আলোকিত হয়ে যাবে, সূর্যের আলোকে নিয়ে এলে সব গরম হয়ে যাবে। ঠিক তেমনি, মনের বাঁধন, ইন্দ্রিয়ের বাঁধনরূপ জানালার পর্দা যত সরিয়ে দেওয়া হবে, আত্মার জ্ঞান তত প্রকাশ হবে, আত্মার শক্তির তত বিকাশ হবে। ঈশ্বরের কাছে যে প্রার্থনা করা হয়, ওই প্রার্থনার দ্বারা আমরা ওই বাঁধনকে সরিয়ে দিচ্ছি। কি ভাবে? আমাদের মন যে সাংসারিকতার মধ্যে আসক্ত হয়ে আছে, প্রার্থনা করার জন্য পর্দাটা কিছুক্ষণের জন্য খুলে যাচ্ছে। ওই যে একটু খুলে যাচ্ছে, তাতে আত্মার যেটুকু জ্ঞান ও শক্তি আসছে, তাতেই সব কাজ হয়ে যাবে। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা না করা হলে, ওই জানালাটা কোন দিন খোলা হবে না। জানালা খোলাও যা, ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করাও তাই। এগুলো উপমা, উপমা দিয়ে বোঝানর চেষ্টা করা হচ্ছে।

তার মানে, সব প্রার্থনার সমস্ত উত্তর আমাদের ভিতর থেকেই আসে। আমরা প্রার্থনা করছি জগতের জন্য, জগৎ এই মনে, মন যতক্ষণ আছে ততক্ষণ আত্মা ঈশ্বর রূপে দেখান, ফল সেইজন্য ঈশ্বর দেন। ঈশ্বর আর আত্মা এক, সেইজন্য ফল আসলে আত্মা দেন, সেই আত্মা আমি নিজে। কিন্তু তাই বলে আমরা বলতে পারি না যে, ঠাকুর তুমিও যা আমিও তাই। ঠাকুর বলবেন, ঠিকই আমিও যা তুমিও তাই, আমি কোমড়ের ধুতি সামলাতে পারতাম না, তুমিও আজ থেকে তোমার কাপড় বগলে নিয়ে ঘুরতে থাক, আর সবাই তোমাকে পাগলা গারদে ঢুকিয়ে দিক। আমিও কিছু খেতে পারতাম না, কাল থেকে তোমারও খাবার জুটবে না। দুদিন

পরে তুমি বলবে, না ঠাকুর, তুমি মালিক আমি গোলাম। একজন শিবের ভক্ত, সে শক্তি মানে না। দূর্গাপূজার সময়ে একজনের বাড়িতে দূর্গা পূজা হচ্ছে দেখতে গেছে, দূর্গা প্রতিমার সামনে দাঁড়িয়ে বলছে, 'নমস্কার বৌদি'। যার বাড়িতে গেছে, সে খুব রেগে গেছে, কিন্তু মুখে কিছু বলল না। কিছু দিন পর লোকটিকে নিমন্ত্রণের নামে ডেকে পাঠিয়েছে। নিমন্ত্রণ খেতে এসেছে। 'আসুন খেতে বসুন'। নিমন্ত্রণ খেতে বসেছে, ধুতরা, গাঁজা, ভাঙ এগুলো পিষে লোকটির সামনে রেখে দেওয়া হয়েছে। বাড়ির মালিক লাঠি নিয়ে লোকটির সামনে বসে আছে। 'শিব তোমার দাদা, তুমি তাঁর ছোট ভাই, দাদা যা খান, ভাইও তাই খাবে, আর যদি না খেয়েছ এই লাঠি তোমার পিঠে ভাঙা হবে; মা দূর্গাকে বৌদি বলা'! এগুলোই সমস্যা, আমরা হলাম ধাপ্পাবাজ, সব কিছুতেই ধাপ্পা মেরে যাওয়াটাই আমাদের স্বভাব।

ধর্ম নূতন কিছু দেয় না - যোগের বিঘ্ন - হতাশার ভাব

স্বামীজী খুব উঁচু স্তর থেকে বলছেন, Religion gives you nothing new, it only takes off obstacles and lets you see your Self. (*ধর্ম তোমায় নূতন কিছুই দেয় না, কেবল প্রতিবন্ধকগুলি সরিয়ে তোমার নিজের স্বরূপ দেখতে দেয়।*) সাধনা করে করে যখন অনেক উচ্চস্তরে চলে যাবে, সিদ্ধি হয়ে গেলে মুণ্ডকোপনিষদের ঋষি যেভাবে বলছেন, প্রথম অবস্থায় তুমি আর ঈশ্বর আলাদা, উচ্চ অবস্থায় চলে যাওয়ার পর দেখবে, তুমি আর তিনি এক, *দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে*। ধর্ম আমাদের নূতন কোন কিছু দেয় না, আমাদের ভিতর যে আবরণগুলো আছে, সেগুলোকে সে শুধু সরিয়ে দেয়, আবরণগুলো সরে গেলে আমি যা আমি তাই। উপরে যে পাখিটা বসেছিল, আদপে কোন পাখিই ছিল না, আমিই আমাকে দেখছিলাম, আবরণ থাকার জন্য আমি অন্য কিছু দেখছিলাম। জপধ্যান, শাস্ত্রপাঠ, ধর্ম সাধন, এগুলো আবরণ গুলিকে সরিয়ে দেয়।

এরপর স্বামীজী যোগবিঘ্নের কথা বলছেন, Sickness I the first great obstacles, a healthybody is the best instrument. (*ব্যাধিই প্রথম মস্ত বিঘ্ন –সুস্থ শরীরই সেই যোগাবস্থা লাভ করবার সর্বোৎকৃষ্ট যন্ত্রস্বরূপ।*) যোগশাস্ত্র বলে, ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, উদ্যমরহিত, বিষয়তৃষ্ণা ইত্যাদি জিনিসগুলো যোগের বিঘ্ন। ধর্ম জীবনে সুস্থ শরীর রাখা খুব দরকার। Melancholy is an almost insuperable barrier. (*'দৌর্মনস্য' বা মন খারাপ হওয়ারূপ বিঘ্নটিকে দূর করা এক-রকম অসম্ভব বললেই হয়।*) হতাশা থেকে, দুঃখ থেকে মনের মধ্যে যারা সব সময় বিষাদ ভাব বহন করে চলে, এদের দ্বারা কোন দিন ধর্মসাধন হবে না। বিষাদ ভাব ধর্ম জীবনের সব থেকে বড় বিঘ্ন। লোকেরা প্রায়ই এসে বলে, 'আমি খুব ডিপ্রেসানের মধ্যে আছি, আমি ধ্যান করতে চাই আমাকে একটু ধ্যান শিখিয়ে দিন'। কিন্তু শাস্ত্র প্রথমেই আমাদের বলে দেন যে, 'তুমি যদি ধ্যান করতে চাও, তোমার মনে যেন কোন ডিপ্রেসান না থাকে'। একজন সর্দারজীর জীবনে পর পর অনেক অঘটন ঘটছিল, যা হয়, প্রচণ্ড ডিপ্রেসান এসে গেছে। একজন তাকে ধ্যান করতে শিখিয়ে দিয়েছে। ভাগ্যক্রমে একজন সন্ন্যাসীর সাথে তার দেখা হয়ে যায়। সন্ন্যাসী শুনেই বলে দিলেন, 'আপনি এক্ষুণি ধ্যান বন্ধ করুন, ধ্যান বন্ধ করে সময় সুযোগ পেলেই কোন গুরুদ্বারাতে যান, আর ওদেরকে বলে ওখানকার বড় বড় হাণ্ডাগুলি মাজতে থাকুন'। লোকেরা মনে করে ধ্যান করলেই ডিপ্রেসান চলে যাবে, কখনই যাবে না। যে জিনিসটার জন্য ডিপ্রেসান হয়েছে, তার উল্টোটা করতে হবে। রাজযোগে একটা সূত্রই আছে, *বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্*, টাকার অভাব, মাঠে নেমে পরিশ্রম করে টাকা আয় কর। যদি মনে কর ঠাকুর ঠাকুর করলে তোমার টাকা এসে যাবে, তবে তোমার গোল্লা আসবে। যাদের ডিপ্রেসান আছে, যাদের মন সব সময় খারাপ, যাদের মুখ গোমড়া থাকে, এদের দ্বারা ধ্যান তো দূরের কথা, ধর্ম সাধনও হবে না। ধ্যান করলে তার যে হতাশার ভাব রয়েছে, ওই হতাশার ভাবটা আরও বেড়ে যাবে। কারণ ধ্যান মনকে আরও পাওয়ারফুল বানিয়ে দেয়, যদি ডিপ্রেসান থাকে তাহলে তাকে আরও ডিপ্রেসানে নিয়ে যাবে। ভিতরে রাগ নিয়ে ধ্যান করলে, রাগটা অনেক গুণ বাড়িয়ে দেবে। ম্যাগনিফাই লেন্সের মত, যা করছে ওটাকে ম্যাগনিফাই করে আরও বড় করে দেখিয়ে দেবে।

এরপর স্বামীজী এই কথা বলে এই বিষয়টা শেষ করছেন – If you once known Brahman, never after can you be melancholy. Doubt, want of perseverance, mistaken, ideas

are other obstacles. (*তবে একবার যদি তুমি ব্রহ্মকে জেনে যাও, পরে আর তোমার মন খারপ হবার সম্ভবনা থাকবে না। সংশয়, অধ্যবসায়ের অভাব, ভ্রান্ত ধারণা –এগুলো অন্যান্য বিঘ্ন।*) স্বামীজী এখানে যোগের সাধারণ বিঘ্নগুলির কথা বলছেন, যে বিঘ্নগুলির কথা পতঞ্জলিও বলেছেন। পতঞ্জলি যোগসূত্রে যেভাবে বলেছেন, কিভাবে যোগ সাধনা হয়, কিভাবে সিদ্ধি হয়, আর জগৎ কিভাবে মন থেকে উড়ে যায়, স্বামীজী এতক্ষণ এই বিষয়গুলিকে নিয়ে বললেন।

প্রাণের আধ্যাত্মিক রূপ

স্বামীজী এইদিন অনেকগুলো জায়গা থেকে রেফেরেন্স এনে অনেক রকম কথা বলছেন, সেইজন্য এদিনের ক্লাশটা যেন একটু দীর্ঘ হওয়ারই কথা। স্বামীজী যোগশাস্ত্রের উপর বলে যাচ্ছেন। যোগের যেমন যেমন পয়েন্টসগুলো আসছে, সেগুলোকে স্বামীজী যেমন নিজের মত করে ব্যাখ্যা করছেন, তেমনি আবার কখন কখন অন্য বইতেও ঢুকে যাচ্ছেন। স্বামীজী ২১শে জুলাই রবিবারের ক্লাশ শেষ করার আগে প্রাণ আর গুরুর প্রসঙ্গ নিয়ে আসছেন। গুরুর কথা সরাসরি যোগশাস্ত্রে বেশি বলা হয়নি, কিন্তু তাঁরা ঈশ্বরকে যোগগুরু রূপে দেখাচ্ছেন। গুরুর প্রসঙ্গ শুরু করার আগে স্বামীজী প্রাণকে নিয়ে বলছেন।

যোগশাস্ত্রে প্রাণের উপর আশ্চর্যজনক ভাবে খুব বেশি আলোচনা করা হয়নি, কিন্তু প্রাণায়ামকে নিয়ে বলছেন। অষ্টাঙ্গ যোগের চতুর্থ অঙ্গ প্রাণায়মকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। পতঞ্জলি যোগসূত্রে প্রাণায়ামকে নিয়ে খুব বেশি কিছু বলছেন না, কিন্তু প্রাণায়াম নিজের মধ্যেই পুরো একটা বিজ্ঞান হয়ে গেছে। উচ্চমানের গ্রন্থকার বা লেখকদের এটাই বৈশিষ্ট্য। ওনারা একটা বাক্য বলে গেছেন, গভীর মনযোগ দিয়ে না পড়লে পাঠক ওই বাক্যটাকে ধরতেও পারবে না যে, এখানে একটা বাক্য আছে। যাঁরা বাক্যটা ধরতে সক্ষম হন, পরের দিকে তাঁরা ওই একটা বাক্যের উপর পুরো একটা আলাদা গ্রন্থ দাঁড় করিয়ে দেন, একটা বিজ্ঞান বার করে নিয়ে আসেন। যেমন যম, নিয়ম, আসন; আসনকে একটা সূত্রে খুব সহজ করে পতঞ্জলি বলে দিলেন, সুখে স্থির ভাবে যে আসনে অনেকক্ষণ বসতে পারবে, সেটাই আসন। কিন্তু আজকে ওটাই একটা পুরো আলাদা বিজ্ঞান হয়ে গেছে। অথচ পতঞ্জলি আসনকে যেন কোন গুরুত্বই দিতে চাইছেন না, ওনার কাছে আসন স্রেফ যোগের একটা ধাপ; যতক্ষণ শরীরকে স্থির না করে বসা হবে ততক্ষণ উচ্চ চিন্তন আসবে না। আমরা চেয়ারেই বসি, মাটিতেই বসি, যেখানেই বসি না কেন, মেরুদণ্ড একেবারে সোজা রাখতে হবে। মেরুদণ্ড সোজা নেই, বেঁকে আছে, তার মানে, তার দ্বারা কোন উচ্চ চিন্তন সম্ভব নয়। উচ্চ চিন্তন আসা মানেই মেরুদণ্ড সোজা থাকবে। শরীর খারাপ ছাড়া কোন সন্ন্যাসীকে, যে বয়সেরই হয়ে থাকুন, দেখা যাবে না যে তাঁরা একটুও কুজো হয়ে বসেছেন। শুধু আসনে বসেই যে মেরুদণ্ড সোজা থাকছে তা না, যখন হাঁটছেন তখনও মেরুদণ্ড সোজা, একটুও কুজো হয়ে হাঁটতে দেখা যাবে না। আর মাঝে মাঝে না, চব্বিশ ঘন্টা, অবশ্য যদি তাঁর শারীরিক কোন ব্যাধি বা অন্য কোন সমস্যা না থাকে। শিরদাঁড়া সোজা না থাকলে কখনই উচ্চ চিন্তন আসবে না। আর জপধ্যানের সময় কুজো হয়ে যাচ্ছে, চিন্তা-ভাবনা উচ্চ হওয়ার কোন প্রশ্নই নেই, মনের একাগ্রতাও হবে না। স্বামীজী তাঁর রাজযোগ গ্রন্থে যোগসূত্র ব্যাখ্যা করার আগে প্রাণের উপর কয়েকটা অধ্যায়ে অনেক কথা বলেছেন। স্বামীজীর একটা নামকরা বই আছে, 'Six Lessons of Rajyoga', সেখানেও তিনি বিশেষ করে প্রাণের উপর অনেক কথা বলেছেন। দেববাণীতে স্বামীজী খুব সংক্ষেপে প্রাণ নিয়ে বলছেন।

Pranas are subtle energies, sources of motion. There are ten in all, five inward and five outward. One great current flows upwards, and other downwards. Pranayama is controlling the Pranas through breathing. Breath is the fuel, Prana is the steam, and the body is the engine. Pranayama has three parts, Puraka (in-breathing, Kumbhaka (holding the breath), Rechaka (out-breathing). (*প্রাণ হচ্ছে দেহস্থ অতি সূক্ষ্ম শক্তি –দেহের সর্বপ্রকার গতির উৎস। প্রাণ সর্বসুদ্ধ দশটি –তন্মধ্যে পাঁচটি অন্তর্মুখ আর পাঁচটি বহির্মুখ। একটি প্রধান প্রাণপ্রবাহ উপরের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে, অপরগুলি নীচের দিকে। প্রাণায়ামের অর্থ শ্বাসপ্রশ্বাস-নিয়মনের দ্বারা প্রাণসমূহকে নিয়মিত করা। শ্বাস যেন ইন্ধন, প্রাণ বাষ্প এবং শরীরটা যেন ইঞ্জিন।*

প্রাণায়ামে তিনটি ক্রিয়া আছেঃ পূরক –শ্বাসকে ভিতরে টান, কুম্ভক –শ্বাসকে ভিতরে ধারণ করে রাখা, আর রেচক –বাইরে শ্বাস নিক্ষেপ করা।)

আমরা জেনেই হোক আর না জেনেই হোক, কেউ মারা গেলে আমরা বেশির ভাগ সময় বলে থাকি, তার শরীর থেকে প্রাণ বেরিয়ে গেল। যোগশাস্ত্রে এমন কি বেদান্তেও, বিশেষ করে বেদান্তসারে এই প্রাণকে অনেক ভাবে বিভাজন করা হয়েছে। একবার একজন এসে বলছেন, 'শাস্ত্রের সব কথা মানা যায় না'। তিনি সেখানে প্রাণের দৃষ্টান্ত নিয়ে এলেন। 'প্রাণের কথা বলতে গিয়ে শাস্ত্র কোথাও পাঁচটি প্রাণের কথা বলছে, আবার কোথাও দশটি প্রাণের কথা বলছে; এগুলো বিজ্ঞানের সাথে মেলে না'। তাঁকে যদি বোঝানর চেষ্টা করা হয়, প্রাণের ব্যাপারে বিজ্ঞান কত অবৈজ্ঞানিক আর প্রাণের ব্যাপারে শাস্ত্রের কথা কত বিজ্ঞান সম্মত, তিনি বুঝতে পারবেন না। এটাকে ব্যাখ্যা করার আগে একটা ছোট কথা বলে নেওয়া দরকার। একজন মানুষ আর একটা মেশিনের মধ্যে তফাৎ কোথায়?

খুব সহজ একটা দৃষ্টান্ত হল কোদাল বা খুরপি, কোদাল বা খুরপি যে কাজ করতে পারবে, মানুষের হাত সেই কাজ করতে পারবে না। তাহলে কোদাল ও খুরপি আমার হাত থেকে দামী হয়ে যাচ্ছে। আমরা বলতে পারি, কোদাল ও খুরপির ডিজাইন তো আমরাই করেছি। ডিজাইন করি, আর যাই করি, আমার হাত যে কাজ করবে, কোদাল তার থেকে অনেক ভাল কাজ করবে। আমরা সব সময় সবাইকে বলতে শুনি, খবরের কাগজেও এমন অনেক খবর আসে, যেখানে বলা হয়, বিজ্ঞান এখন কত এগিয়ে গেছে, artificial intelligence কত এগিয়ে যাচ্ছে। বলছেন যে, আগামী দিনে এমন মেশিন তৈরী হবে, যে মানুষের থেকেও বেশি উচ্চ চিন্তন করতে পারবে; তার নিজেকে ঠিক করে নেওয়ার ক্ষমতা থাকবে। Artificial intelligencএর এখন এমন ক্ষমতা এসে গেছে যে, নিউজ রিপোর্টিং ওরা পুরোটাই নিজেরা করছে। ওকে শুধু চারটে ডাটা দিয়ে দিতে হবে, সেগুলোকে তারা মাইনিং করে নেয়। স্পোর্ট, ফিল্ম রিভিউ বার করে দিচ্ছে। ওনারা পরীক্ষা করার জন্য একজন বাস্তবিক রিপোর্টারের লেখা আর একটা রোবটের লেখার মধ্যে তফাৎ করা যায় কিনা দেখতে গিয়ে দেখছেন, কোন তফাৎ করা যায় না। এসব খবর আসার পর চারিদিকে লোকেরা ঘাবড়ে যাচ্ছে, এরপর তাদের চাকরি থাকবে কিনা। সব কাজ রোবট নিয়ে নিচ্ছে। ওনারা বলছেন, ভবিষ্যতে সিনেমার চরিত্রগুলিতে রোবটরাই সব কাজ করবে। তাতে সিনেমা প্রডিউস করতে অনেক কম পয়সা লাগবে আর অনেক বেশি effective হবে। তার মানে কোন এমন এরিয়া নেই, যেখানে artificial intelligence ঢুকে যাচ্ছে না। Artificial intellignceএ ইদানিং বিজ্ঞানে যে রিসার্চ হচ্ছে আর তার যে রেজাল্ট আসছে, এবং যে জায়গায় বিজ্ঞান artificial intellignceকে নিয়ে যাচ্ছে, সব পড়ার পর মানুষের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়ে যাবে। তখন এই প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক, মানুষ কি মেশিনের থেকে নীচে চলে যাবে, মেশিন কি কোন দিন মানুষ হয়ে যাবে?

এই প্রশ্নের আলোচনা করলে প্রাণ জিনিসটা আমাদের কাছে আরেকটু পরিষ্কার হবে। আমরা এই জিনিসটাকে ফিলজফিক্যালি দেখছি, সেইজন্য একটা দুটো বাক্যে এই প্রশ্নের সমাধান করে দেওয়া যাবে না। কারণ এখন অনেক উন্নত ধরণের রোবট, artificial intelligence আসছে, মানুষ আর মেশিনের যে ডিভাইডিং লাইন, কোথাও গিয়ে ধোঁয়াশে হয়ে যায়, বোঝা যায় না, ওটা মানুষ না মেশিন। তফাৎ করার জন্য আমরা যে জিনিসটাই নিয়ে আসি না কেন, কোন কিছু দিয়েই স্পষ্ট করে বলে দেওয়া যাবে না। আমরা যদি বলি ইমোশানে তফাৎ, কিন্তু ইমোশান তো শব্দ মাত্র। আজকালকার ছেলে আর মেয়ে দুজনে সারাদিন এসএমএস করে যাচ্ছে, আই লাভ ইয়ু; রোবটও পাঠাবে, পঞ্চাশটা আই লাভ ইয়ু ভরে দিন, রোবটও পাঠাতে থাকবে, তখন বলবে রোবটেরও ইমোশান আছে। ঠাকুর বলছেন, হাতি এত বড় জন্তু কিন্তু সে ঈশ্বর চিন্তা করতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বর চিন্তা বলতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আমি যেটা বলছি সেটা দিয়েই বুঝবে। রোবট এই পাখা, মাইক্রোফোনের মত, কিন্তু তা তো নয়। এখন যে রোবট, যেসব artificial intelligence আসছে, এগুলো প্রচণ্ড উন্নত, আমরা চিন্তাই করতে পারি না। অনেক কিছু জিনিস, যেটা মানুষ চিন্তা ভাবনা করে, তার থেকেও ওরা উন্নত হয়ে গেছে, ইতিমধ্যে ওরা সব রকম রিপোর্টিং করছে, দেখে সবারই আতঙ্ক হয়ে গেছে, ভবিষ্যতে মানুষের চাকরি থাকবে কি থাকবে না।

কিন্তু একটা জায়গায় গিয়ে তফাৎ হয়ে যায়, এর আগেও আমরা একবার আলোচনা করেছিলাম, যে কোন বস্তুকে দেখার পিছনে দুটো দর্শন আছে, একটাকে বলে হোলিইজম্, আরেকটাকে বলে রিডাকশানইজম্। রিডাকশানিস্টদের বক্তব্যের অর্থ হল, একটা বস্তুকে যদি টুকরো টুকরো করে দেওয়া হয়, তাহলে সমস্ত টুকরো গুলো মিলে যা হবে, বস্তুটা তাই। মেশিন সব সময়ই রিডাকশানিস্ট। গাড়ির একটা চাকা খারাপ হয়ে গেলে ওটাকে আমরা রিপ্লেস করে দিতে পারি। একটা গাড়ির চাকা, বডি, সিট, ইঞ্জিন, স্টিয়ারিং সব পার্টস যদি আলাদা করে দেওয়া হয়, এরপর সব পার্টসকে আবার যদি জুড়ে দেওয়া হয়, তখন সেই আগের গাড়িটাই দাঁড়িয়ে যাবে। যাদের চিন্তা ভাবনা এখনও উন্নত হয়নি, যে জিনিসকে সে ভালবাসে, যেমন বাচ্চা মেয়ে, বাচ্চা মেয়ে তার পুতুলকে জীবন্ত দেখে, তার সাথে কথা বলে, তাকে খাওয়াবে, বিছানায় নিজের পাশে নিয়ে ঘুম পাড়াবে। ইদানিং আবার অনেক জায়গায় ভারচুয়াল পেটস্ পাওয়া যায়। তাকে দেখাশোনা থেকে শুরু করে সব করছে। যারা নিতে যায়, ইচ্ছে করলে তারা মানুষের বাচ্চা নিতে পারে, কুকুরের বাচ্চাও নিতে পারে। আর এমন ভাবে প্রোগ্রামিং করা আছে, ঠিক টাইমে যদি না খাওয়ানো হয়, চেঁচাতে শুরু করবে। ঠিক সেই রকম, কোন মানুষ কল্পনা করে নিতে পারে, এই বস্তুটার একটা indivudality আছে, যেমন এই পেনটা আমার কাছে আছে। কোথাও যদি এই পেনটা কেউ দেখতে পায়, সে বলবে 'আরে এই পেনটা আমাদের মহারাজের পেন, এখানে কি করে এলো'? তার মানে, এই পেনে slight একটা individuality এসে গেল। এই পেন দিয়ে যদি আমি প্রচুর কাজ করে থাকি, তখন কোথাও আমার মনে হবে, এই পেনটা আমার ব্যক্তিত্বের একটা অংশ। আমি ধীরে ধীরে এই পেনের মধ্যে আমার সত্তাকে যোগ করে যাচ্ছি, কিন্তু আসলে এটা একটা মেশিন; কারণ এটাকে reduce করা যায়। এর ক্যাপ যদি ভেঙে যায়, এই ধরণের একটা ক্যাপ রিপ্লেস করে দিলে কেউ বুঝতে পারবে না। যার মন এই পেনের সাথে জুড়ে আছে, সে হয়ত বলে দেবে, এই পেনটা তা না। আমরা ওর মধ্যে যাচ্ছি না। এখানে বলা হচ্ছে, তার ব্যক্তিত্ব পাল্টাবে কি পাল্টাবে না?

Holism তার ঠিক উল্টো। Holism মানে, সমস্ত পার্টস্ গুলিকে যদি আমি এক জায়গায় করে দিই, তার যে sum total হবে, সেটা সব সময় equal of its parts থেকে বেশি হবে। বাচ্চাদের খেলনা যদি ভেঙে যায়, ড্রইং খাতা যদি ছিড়ে যায়, এমন কান্নাকাটি শুরু করে দেবে যে, আরেকটা ওই রকম খেলনা বা খাতা এনে দিলেও মানবে না। কারণ ওরা ওই খেলনা বা খাতার সাথে নিজেকে জুড়ে দিয়েছে। ওই খেলনাটা তার কাছে কোন বস্তু না, more than an object। আমরা যখন মানুষের উপর আসছি বা মানুষের মত আরও অনেক কিছুর উপর যখন আসছি বা আমরা যেটাকে জীবন বলি, এখন প্রশ্ন হয়, এগুলো কি reduction এলাকার মধ্যে পড়ছে নাকি holism এলাকার মধ্যে পড়ে? কিছু বৈজ্ঞানিক আছেন যাঁদের মতে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে সব কিছুকে reduce করা যায়। আবার কিছু বৈজ্ঞানিক আছেন তাঁরা বলেন, কিছু জিনিস ওই গ্রুপের মধ্যে আসবে, কিন্তু মানুষ বা জীবন ওই গ্রুপের মধ্যে আসবে না। এখানে আসছে sum is more than of its parts; হাত, পা, কান, নাক, এটাই আমি নই, এর সব কিছুর যে সমষ্টি হবে, আমি তার থেকে বেশি।

এই দৃষ্টিভঙ্গী কেন নেওয়া হয়, এর অনেকগুলো কারণ আছে। এর মধ্যে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল, মেশিন কখন evolve করে না, মেশিন সব সময় improve করে। মানুষ বা যে কোন প্রানী কখনই improve করে না, সব সময় evolve করে। ডারউইন নিয়ে এলেন theory of evolution, যেখানে তিনি বলছেন, evolution of species। যেমন বলছে, বানর থেকে আমরা মানুষ হয়ে গেছি। আমরা বানর থেকে improve করিনি, আমাদের একটা qualitative change হয়ে গেছে। কিন্তু আমরা যখন কোন বস্তুকে নিচ্ছি, যেমন রেডিও, যখন প্রথম বৈজ্ঞানিকরা রেডিওর উপর কাজ করতে শুরু করলেন, তখন রেডিওর যে basic concept ছিল, আজকেও কিন্তু রেডিওর basic concept এক, কিছু পরিবর্তন হয়নি, কিন্তু এখন টেকনলজিটা পুরো পাল্টে গেছে। যে কোন মেশিনের দিকে তাকালে দেখা যাবে, তার টেকনলজির improve হবে, কিন্তু qualitative change হবে না। কিন্তু মানুষ evolve করে, আর একই জন্মে আমরা মানুষকে দেখতে পাই, সে একটা দানব থেকে মানব হয়ে যেতে পারে, আবার মানব থেকে দেবতা হয়ে যেতে পারে। এই যে evolution, যেখানে তার কোন similarity থাকে না। সন্ন্যাসীদের অনেকে এসে প্রশ্ন করে, আচ্ছা আপনি সন্ন্যাসী কেন হলেন? তার মানে, ওর মনের বেসিক প্রশ্ন হল, সন্ন্যাসীর মধ্যে একটা এমন পরিবর্তন

হয়েছে, যেটাকে আমরা improvement বলতে পারি না, evolution বলতে পারি। আজকে যে শুঁয়োপোকা দেখছি, কাল এটা প্রজাপতি হয়ে যাবে আমরা দেখে বিশ্বাস করতে পারি না, কিন্তু হয়ে যাচ্ছে। এখানে শুঁয়োপোকা evolve করে যাচ্ছে। মেশিন এভাবে কখন চেঞ্জ করে না।

তার থেকেও আরও গুরুত্বপূর্ণ হল, বিজ্ঞানের ভাষায় এটাকে বোঝান খুব কঠিন, ধর্মের ভাষায় বোঝা অতটা কঠিন হবে না। গীতায় ভগবান বলছেন, *উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্। বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ।।* যাঁদের জ্ঞানচক্ষু খুলে গেছে, তাঁরা পরিষ্কার দেখতে পান, মানুষ যা কিছু করছে, খাচ্ছে, ঘুমোচ্ছে, মরছে, ভিতরে সেই জীবাত্মা রয়েছে; এই যে জীবাত্মাকে দেখতে পাওয়া, এর ভিতরে জীবাত্মা আছেন, এটা যোগীরা খুব সহজেই দেখতে পান। ঠাকুর বলছেন, আমার সামনে যারা আসে, তাদের ভিতরটা আমি সব দেখতে পাই, কাঁচের আলমিরার ভিতরের জিনিস যেমন স্পষ্ট দেখা যায়, সেই রকম স্পষ্ট দেখতে পাই। এবার আমরা কল্পনা করে নিচ্ছি, আজ থেকে দু হাজার বছর পরে, ঠাকুরও আছেন, একটা রোবটও আছে আর আমিও আছি। রোবটটা বিরাট উন্নতমানের, ঠাকুর ওই রোবটের ভিতরে কি দেখবেন? ঠাকুর কি রোবটের ভিতরে জীবাত্মার খেলা দেখতে পাবেন? কখনই দেখবেন না। ঠাকুর বলবেন, এটা মেশিন, এই মেশিন evolve করবে না, আমি একে যীশু খ্রিষ্টের দলেও দেখিনি, কীর্তনের দলেও দেখিনি। শুধু ঠাকুরই না, যে কোন যোগী, ভিতরটা দেখার যাঁর ওই ক্ষমতাটা আছে, তিনি পরিষ্কার দেখে বলে দেবেন, এটা যন্ত্র, মানুষের ভিতরে জীবাত্মা আছে। আত্মা সবারই ভিতরে আছেন, একটা যে খড়কুটো, সেটাও আত্মার উপরে একটা ঢেউএর মত। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর ছাগ বলি দেখছেন, সেখানে তিনি দেখছেন ছাগ, খড়্গ, যে বলি দেবে, বলির কাঠ যার উপর ছাগকে রেখে বলি দেওয়া হবে, সবটাই তিনি ব্রহ্ম দেখছেন, সচ্চিদানন্দের উপর ঢেউ। কিন্তু তখনও ঠাকুর বলির কাঠ ও খড়্গের মধ্যে জীবাত্মাকে দেখবেন না। কোথা থেকে দেখবেন, জীবাত্মা তো সেখানে নেই।

জীবাত্মা ছাড়া জীবন আসবে না, যেখানেই প্রাণের স্পন্দন দেখা মিলবে, সেখানেই জীবাত্মাকে থাকতে হবে। কিন্তু আমার আপনার মত সাধারণ লোকেরা, যাদের জীবাত্মাকে দেখার ক্ষমতা নেই, তাদের কি হবে? এতক্ষণ উচ্চস্তর থেকে বলা হল, এবার নিম্নস্তর থেকে যদি দেখা যাক – আমরা যে এখানে বসে আছি, আমরা সবাই শক্তির এক মহা সমুদ্রের মধ্যে বসে আছি। সূর্যের আলো থেকে এনার্জি আসছে, বাতাস চলছে, সেখান থেকে এনার্জি আসছে, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস চলছে, সেখান থেকে এনার্জি আসছে। সব রকম এনার্জি এই বাড়ির উপর সব সময় আঘাত করে যাচ্ছে, যার ফলে বাড়িটা ধীরে ধীরে কমজোরি হতে হতে একদিন নষ্ট হয়ে যাবে। বাড়ির স্থায়িত্বকে ধরে রাখার জন্য, মাঝে মাঝে বাড়ির দেওয়াল থেকে শুরু করে অনেক কিছু মেরামত করাতে হয়, বাইরের দেওয়াল রঙ করাতে হয়, যাতে সব কিছু ঠিক থাকে। বাইরে যে এনার্জির সমুদ্র, এটা unpattern energy, এই unpattern energyকে সেখান থেকে টেনে নিয়ে ওটাকে একটা patternএর মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়। যেমন সূর্যের আলো পড়ছে, ওটা unpattern। যে কোন জিনিসকে কিছুক্ষণ রেখে দিলে সূর্য সেটাকে নষ্ট করে দেবে। ডাল ভাত রান্না করে সূর্যের আলোতে রেখে দিলে, কিছুক্ষণ পর খাবারটা পচে যাবে। খেজুরের রস রেখে দিলে গ্যাঁজলা হয়ে যাবে। কিন্তু বাড়িতে সোলার প্যানেল লাগালে, ওই সূর্যের আলো ইলেক্ট্রিসিটি তৈরী করে দেবে। Unpattern energyকে patternএ পাল্টে দেওয়া হল, এটা হল মেশিন। যে কোন মেশিনের কাজ, unpattern energyকে pattern energyতে convert করে দেওয়া।

মানুষের দিক থেকে দেখলে, আমরাও তাই করি, lower form energyকে আমরা higher form energyতে convert করি। যেমন আমরা রোজ ভাত ডাল মাছ ইত্যাদি খাচ্ছি, এটা lower form of energy, সেটাকে আমরা কাজে লাগাই একটু হায়ার লেভেলে, চিন্তন করে, এই সেই করে। মেশিন চালানোর জন্য একটা এনার্জি দরকার, মানুষেরও চলার জন্য এনার্জি দরকার। মেশিন সব সময় একটা বিশেষ কাজ করে, ওই কাজের বাইরে অন্য কোন কাজ সে করতে পারে না। যেমন কোদাল, ও একটা specific কাজ করে, ওর বাইরে যেতে পারবে না। মেশিন এনার্জির একটা ফর্ম থেকে এনার্জির আরেকটা ফর্মে পরিবর্তিত করতে পারে। যেমন সোলার প্যানেল, একটা ফর্ম থেকে আরেকটা ফর্মে পাল্টিয়ে দেয়। ওই যে একটা ফর্ম

থেকে আরেকটা ফর্মে পাল্টে দিচ্ছে বা একটা specific task করছে, যত উন্নতমানের রোবট হোক, যতই ভাল কাজ করুক, যে তাকে বানিয়েছে সে বলে দেবে, আমার রোবট এই এই করতে পারে।

প্রানী এখানেই মেশিন বা রোবট থেকে আলাদা হয়ে যায়। প্রানী মুক্তি পেয়ে যেতে পারে, মেশিন কোন দিন মুক্তি পেতে পারবে না, মেশিন বাঁধা। রোবটকে যতই উন্নতমানের প্রযুক্তি দিয়ে তৈরী করা হোক, সে সব সময় একটা গণ্ডীর মধ্যে ছকেবাঁধা হয়ে আছে। একটা যে পিঁপড়ে, সেও জানে আমি মুক্ত, সেখানে মানুষ তো অবশ্যই মুক্ত। কিন্তু সমস্যা হল, আমরা যখনই এই মুক্তিটাকে ব্যাখ্যা করতে যাব, তখন জিনিসটা পুরো instinctive হয়ে যায়। Instinctive কি রকম, যারা বোঝে তাকে বোঝান যাবে, যাকে বোঝান যাবে না, তাকে কখনই বোঝান যাবে না। একজন বৈজ্ঞানিক বলবে, একটা পিঁপড়ে যা যা করতে পারে, আমার রোবট তার থেকে বেশি অনেক কিছু করতে পারে। ইদানিং যে চালক বিহীন গাড়ি বেরিয়েছে, তারা বলছে, এমন একদিন আসবে মানুষ যে রকম গাড়ি চালাতে পারে, তার থেকে ভাল গাড়ি চালাতে পারবে। কিন্তু তা হয় না, কারণ মানুষ যে পরিস্থিতিতে আছে, চেষ্টা করে সেই পরিস্থিতি থেকে সে চিরদিনের মত বেরিয়ে আসতে পারে, কিন্তু একটা মেশিন কোন দিন পারবে না। তাকে যে চয়েস দিয়ে রেখেছে, এই রকম পরিস্থিতি হলে তুমি এই ভাবে বেরিয়ে আসবে, সেখানেও মেশিন কিন্তু বাঁধা।

এর আগে স্বামীজীর একটা ক্লাশের আলোচনায় আমরা এই জিনিসটাকে নিয়ে আলোচনা করেছিলাম যে, মানুষ মেশিন নয়, মানুষ যে কোন পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। মেশিনে যত রকম এনার্জি যাচ্ছে, হয় সে ওই এনার্জিতে কাজ করবে, নয়তো এনার্জির ফরমেট পাল্টে দিয়ে অন্য প্যাটার্ন দিয়ে দেবে। একমাত্র মানুষের আসল উদ্দেশ্য কাজ করা না, সমস্ত মানুষ যা কিছু করে, তার মাধ্যমে সে মুক্তির আস্বাদ করে। আমরা যে খাওয়া-দাওয়া করছি, এমনিতে আমাদের মনে হবে কাজ করার জন্য খাচ্ছি বা খাওয়ার মাধ্যমে রসাস্বদন করছি; কিন্তু তা না। মানুষ খায় তার ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য, ক্ষুধার যে বন্ধন, ওই বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মানুষ খাওয়া-দাওয়া করে। মানুষ যে ভালবাসে সেখানেও সে একটা মুক্তির আস্বাদ পেতে চাইছে। তার মধ্যে সীমাবদ্ধতা আছে, যে সঙ্কীর্ণ ভাব আছে, ওই সীমাবদ্ধতা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সে কাউকে ভালবাসে। মানুষ যা কিছু করে, এমনকি সুইসাইড পর্যন্ত যে করে, তার এমন একটা পরিস্থিতি হয়ে গেছে, যে পরিস্থিতিকে সে আর নিতে পারছে না, ওই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তখন আত্মহত্যা করে। মানুষের যত ক্রিয়া, সব ক্রিয়ার পিছনে একটাই উদ্দেশ্য, মুক্তির আস্বাদ করা। এমনকি একটা যে এ্যমিবাও যে খাওয়া-দাওয়া করে, instinctএ করে না, তার কোথাও খাওয়ার একটা চাহিদা এসে গেছে বলে খায়। আমরা বলতে পারি, মেশিনগুলো যখন উন্নত হবে, তারাও তখন এই রকম করবে। না, করবে না, তার সিস্টেমটা এমন ভাবে করা আছে, সে নিজেকে অনেক improve করে নেবে, কিন্তু যে অর্থে আমরা evolve করা জানি, সেভাবে কখনই করবে না, এই জিনিসটা আমরা instinctively জানি। সেইজন্য প্রথমে যে কথা বলা হল, মানুষ আর মেশিনের ডিভাইডিং লাইনটা কোথাও গিয়ে যেন হারিয়ে যায়, তখন বোঝা মুশকিল, এটা মানুষ না মেশিন। কিন্তু যাদের বোঝার দৃষ্টি আছে তারা বুঝতে পারবে, দুটোর মধ্যে একটা তফাৎ আছে।

এর মূল তফাৎটা হলো, ইংরাজীতে যে লিভিং শব্দের ব্যবহার করা হয়, আমরা লিভিং শব্দ বলি না। অর্থাৎ যাদের মধ্যে জীবন আছে, যারা লিভিং, তাদের আমরা জীবিত বলি না, তাদের আমরা বলি প্রানী। প্রানী মানে যার প্রাণন ক্রিয়া আছে। সংস্কৃতে বা আমাদের যত ভাষা আছে, সব ভাষাতে প্রানীকে যদি মেশিনের থেকে তফাৎ করতে হয়, তখন বলবে, প্রানীরা মুক্তির দিকে যাচ্ছে ঠিকই, সে মুক্তির দিকে evolve করছে ঠিকই সংজ্ঞা, কিন্তু সেটা সব সময় প্রানী একটা জিনিস দিয়ে করে, তা হল প্রাণনক্রিয়া। সে খাবে, সে নাও খেতে পারে। সে সন্তানোৎপত্তি করতে পারে, নাও করতে পারে, জীবন যেখানে আছে সেখানে যে কোন কাজ সে করতেও পার, নাও করতে পারে, কিন্তু একটা জিনিস সে সব সময় করবে, তা হল প্রাণনক্রিয়া। আমরা বলতে পারি, উইণ্ডমিল গুলো তো প্রাণনক্রিয়া করছে, তারাও বাতাসকে নিয়ে কিছু করছে। ওখানে একটা specific কাজ হয়, একটা এনার্জি ফরমেটকে আরেকটা এনার্জি ফরমেটে পাল্টে দেয়। এই যে অনন্ত প্রাণশক্তি রয়েছে, মানুষ এই প্রাণশক্তিকে নিজের ভিতরে নিয়ে, নিজেকে মুক্তির দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

এখন এই প্রাণ, যে প্রাণকে আমরা নিঃশ্বাসের সাথে নিচ্ছি, প্রশ্বাসের সাথে ছাড়ছি, এটাই রেচক পূরক, নিঃশ্বাস ভিতরে গেলে পূরক বলছেন, নিঃশ্বাস বাইরে গেলে রেচক বলছেন। আর দুটোর কোনটাই না করে বাইরে শ্বাস ফেলে বা ভিতরে শ্বাস টেনে আটকে রাখলে কুম্ভক বলা হয়। আমরা যে নিঃশ্বাস নিচ্ছি, মূলতঃ এটা বাতাস, কিন্তু এই বাতাসের উপর চেপে প্রাণ, যেটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এনার্জি, সেটা আমাদের ভিতরে ঢুকছে। ইন্দ্রের পুত্র জয়ন্ত একবার কাক রূপে এসে সীতাকে বিরক্ত করছিল। শ্রীরামচন্দ্র জানতে পেরে একটা ঘাসের টুকরোকে ব্রহ্মাস্ত্র রূপে অভিষিক্ত করে জয়ন্তের উপর ছেড়ে দিলেন। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এনার্জি যে কোন ভাবে আমাদের ভিতরে ঢুকতে পারে। কিন্তু সব থেকে সহজ উপায়ে ঢোকার মাধ্যম হল বায়ু। যে প্রাণ ইউনিভার্সাল এনার্জি, সেই প্রাণ আমাদের শরীরের মধ্যে চলে গেল, এই প্রাণ কিন্তু আমাদের শরীরের কোন এনার্জি না।

এই জায়গাতে এসে আমরা ভুল করি, আমরা বলি, কেন বিজ্ঞান তো এখন সব পরিষ্কার করে দিয়েছে, আমরা খাচ্ছি, খাওয়াটা হজম হয়ে শরীরে রক্ত হচ্ছে, রক্ত নিঃশ্বাসের থেকে অক্সিজেন নিয়ে, কার্বনডোক্সাইডকে প্রশ্বাসের মাধ্যমে ছাড়ছি ইত্যাদি। খাওয়াকে কে হজম করায়? কেন, এ্যনজাইম আছে, এ্যসিড আছে। তাহলে আমাদের শত শত ঋষিরা যাঁরা এগুলো করে গেছেন, তাঁরা কি এসব জানতেন না? জ্ঞানের এমন কোন বিষয় নেই, যেটাকে আমাদের ঋষিরা জানতেন না। জিরোর প্রপার্টি যাঁরা বার করে বসে আছেন, তাঁরা কি এই জিনিসগুলো জানতেন না? সবই জানতেন, তাঁরাও জানতেন শরীরের জন্য খাদ্য দরকার, জল দরকার, কিন্তু এই জিনিসগুলো দরকার শুধু প্রাণনক্রিয়াকে ঠিক ভাবে চালানোর জন্য। প্রাণ হল সেই ফ্লাইহুইল, গাড়ি স্টার্ট করার সময় ওর ভিতরে একটা বড় চাকা থাকে, আগে সেটা ঘুরতে শুরু করে। ওইটা এবার যখন বিভিন্ন দিকে যেতে শুরু করে, তখন মেকানিক্যাল এনার্জি হয়ে চাকাকে ঘোরায়, ওটাই আবার ইলেক্ট্রিক্যাল এনার্জি হয়ে ডায়নামোকে ঘুরিয়ে ব্যাটারি হয়ে লাইট হয়ে যায়, সেটাই অন্য ভাবে ঘুরে হর্ন হয়ে যায়, সেটাই আবার অন্য ভাবে ঘুরে ব্রেক হয়ে যায়। একই জিনিস, আসলে একটা ফ্লাইহুইল। এটাতো আমরা একটা উপমা দিচ্ছি। বড় বড় ফ্যাক্টরিতে, বিশেষ করে আগেকার দিনে যখন স্টীম ইঞ্জিন দিয়ে সব চলত, সেখানে একটা বিশাল বড় ফ্লাইহুইল ঘুরত।

নিঃশ্বাসের মাধ্যমে প্রাণ ভিতরে যায় ঠিকই, কিন্তু ভিতরে গিয়ে অনেক রকমে ভেঙে যায়। শরীরের যে বিভিন্ন রকম ক্রিয়া, যেটাকে আমরা সচরাচর মনে করি, রক্ত চলাচল করা, বিভিন্ন স্নায়ুর কার্যাবলী, ইদানিং কালের বিজ্ঞানে যে বিষয়গুলো সবাইকে পড়ানো হয়, এনারা বলবেন, তার তো একটা ফিজিক্যাল আছে, কিন্তু ওই ফিজিক্যালের পিছনে যে জিনিসটা চালিকা শক্তি রূপে কাজ করে, সেটা হল প্রাণ। ঋষিরা বলেন প্রাণ যে কাজ করে, মূলতঃ প্রাণ পাঁচ ভাবে পাঁচ রকম কাজ করে, এই পাঁচটি প্রাণের নাম –প্রাণ, অপান, সমানা, উদানা ও ব্যান। প্রাণ বুকের উপরে থাকে, বুকের উপরের যত রকম ক্রিয়া, এটা প্রাণ দিয়ে সম্পন্ন হয়। অনেকের দেখা যায় তাদের বুদ্ধি কাজ করে না, বুঝতে হবে এদের প্রাণ গোলমেলে। পেট ও কোমরের নীচের দিকে অংশে যত ক্রিয়া হয়, সেই ক্রিয়া ব্যান দিয়ে হয়। ব্যান সমস্ত শরীরের ছড়িয়ে থাকে, যার জন্য রক্ত চলাচল আর অন্যান্য যত কাজ সব ঠিক ভাবে হয়। উদানের মূল বাস কণ্ঠ দেশে। এগুলো এক একটা শক্তি, যে শক্তি দিয়ে শরীরের উপরের অংশ চলছে, যে শক্তি দিয়ে শরীরের নীচের অংশগুলি চলছে, যে শক্তি সারা শরীরে ছড়িয়ে আছে আর যে শক্তি দিয়ে প্রাণবায়ু শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। মানুষ যে মারা যায়, তার জন্যও একটা শক্তি দরকার, আত্মহত্যা করার জন্যও শক্তি দরকার। জীবাত্মা যে শরীর থেকে বেরিয়ে আসবে, তার জন্য জীবাত্মারও একটা শক্তি দরকার, এই শক্তির টেকনিক্যাল নাম উদানা। মৃত্যুর সময় উদানা কোথা দিয়ে বেরোবে বলা মুশকিল। সাধারণ ভাবে কণ্ঠ দেশে থাকে আর ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়ে বেরিয়ে যায় বা তালু দিয়ে বেরিয়ে আসে, ওই শক্তি ফুটো করে দেয়। সমানা সাধারণ ভাবে পেটে বাস করে, ওর কাজ হল হজম করানো। যার খাওয়া হজম হয় না, বুঝতে হবে ওর সমানা দুর্বল হয়ে গেছে। সে যত এ্যনজাইম্ খেয়ে নিক, ভিটামিন খাক, হজম ঠিক হবে না, কারণ সমানা গোলমাল হয়ে গেছে। ইদানিং প্রাণের দুর্বলতা দূর করার জন্য তাই প্রাণিক হিলিং করা হয়, এখানে আইডিয়াটা একই।

আবার কিছু কিছু পণ্ডিতরা আরও পাঁচ রকম প্রাণের কথা বলেন। যেমন তার মধ্যে একটা প্রাণের নাম নাগ। বমি হওয়া, ঢেকুর তোলা, এর জন্যও একটা বিশেষ শক্তি দরকার, এই শক্তির নাম নাগ। আরেকটা হল কুর্ম, চোখের পাতা বন্ধ ও খোলা, চোখ পিটপিট করা, এর জন্য যে আলাদা একটা শক্তি লাগে সেই শক্তির নাম কুর্ম। আরেকটা প্রাণের নাম ক্রিকল, মানুষের যে হাঁচি হয়, সেটার জন্যও শক্তি দরকার, সেটাও একটা প্রাণ, যার নাম ক্রিকল। হার্টের ভালভ্‌গুলি যে সব সময় বন্ধ হচ্ছে আবার খুলছে, এর জন্য যে প্রাণশক্তির দরকার তার নাম ধনঞ্জয়। আর শেষ হল দেবদত্ত, হাই তুলতেও আলাদা একটা শক্তি লাগে, গা ম্যাজম্যাজ কাটানোর জন্য যে আড়মোরা ভাঙা হয়, এগুলো যে শক্তিতে হয় তার নাম দেবদত্ত।

মোদ্দা কথা, শরীরে যত রকম ক্রিয়া হয়, এই মূল প্রাণ যখন বিভিন্ন ভাবে এই ক্রিয়াগুলো করছে তখন এই প্রাণিক শক্তিগুলিকে বিভিন্ন নামে বলছেন। যোগশাস্ত্রে বলছেন, যদি তুমি যোগ পথে এগোতে চাও, প্রথমে তোমার মধ্যে যে প্রাণ যাচ্ছে, এই প্রাণকে তোমার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। প্রাণকে যদি নিয়ন্ত্রণ না করা হয়, তাহলে কোন প্রাণ যে এলেমেলো হয়ে যাবে ঠিক নেই। যেমন জপে বসলে বেশির ভাগ সময় আমাদের হাই উঠতে থাকে, তার মানে দেবদত্ত প্রাণটা গোলমাল করছে। প্রাণ শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার সব থেকে ভাল পথ হল প্রাণায়াম। নিয়মিত সঠিক পদ্ধতিতে প্রাণায়াম করলে, এই যে দশটি প্রাণের কথা বলা হল, সব কটাকে নিয়ন্ত্রণ করে দেবে। যতক্ষণ প্রাণায়াম না করা হবে, ততক্ষণ দশটি প্রাণের কোন না কোন প্রাণ উপদ্রব করতে থাকবে। একমাত্র উদানাটা এখন কোন উপদ্রব করবে না, কারণ উদানা একটা সময়ই কাজ করে, শুধু মৃত্যুর সময় ওর কাজ; কিন্তু বাকিগুলো উপদ্রব করতে থাকবে। এই কারণে পতঞ্জলি প্রাণায়ামকে এত গুরুত্ব দিচ্ছেন। এরপর স্বামীজী গুরুকে নিয়ে বলছেন। সিদ্ধির পথে এগোবার জন্য গুরু একটা সাংঘাতিক ভূমিকা পালন করেন।

গুরুর প্রয়োজনীয়তা

The Guru is the conveyance in which the spiritual influence is brought to you. (*গুরু হচ্ছেন সেই আধার, যাঁর মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক শক্তি তোমার কাছে পৌঁছায়।*) স্বামীজী খুব সুন্দর বলছেন, গুরু হলেন সেই গাড়ি, যে গাড়িতে করে ঈশ্বরীয় শক্তি, ঈশ্বরের ভাব আমাদের কাছে নিয়ে আসা হয়। Anyone can teach, but the spirit must be passed on by the Guru to the Shishya (disciple), and that will fruetify. (*যে কেউ শিক্ষা দিতে পারে বটে, কিন্তু গুরুই শিষ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চার করে থাকেন, তাতেই আধ্যাত্মিক উন্নতিরূপ ফল হয়ে থাকে।*) যোগশাস্ত্রে প্রাণ বা প্রাণায়াম সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে, একটু আগে আমরা তার আলোচনা করলাম। প্রাণায়ামের দ্বারা প্রাণের যেমন নিয়ন্ত্রণ হয়, ঠিক তেমনি ঈশ্বরকে নিয়ে যখন কোন আলোচনা করা হয় তখন গুরুকে নিয়ে অনেক কথা বলা হয়। যদিও যোগশাস্ত্রে সরাসরি গুরুকে নিয়ে কিছু বলা হয় না; কিন্তু ঈশ্বরকে নিয়ে আলোচনা করার সময় বলছেন, তিনি গুরুরও গুরু, তার মানে গুরুর একটা সাংঘাতিক দাম আছে।

আজ থেকে দু হাজার, তিন হাজার বছর আগে inter disciplinary study ছিল না। যারা পঞ্চাশ বছর আগেও কলেজে পড়াশোনা করেছেন, তখনও inter disciplinary study ছিল না, ফিজিক্স মানে ফিজিক্স, কেমেস্ট্রি মানে কেমেস্ট্রি। কিন্তু এখন দুটো সাবজেক্ট, তিনটে সাবজেক্ট সব মিশে যাচ্ছে। যোগশাস্ত্রে গুরুর ভূমিকাকে এত বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় না, গুরুর ভূমিকা সব থেকে বেশি ভক্তিশাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে, তারপরেই বেদান্তে। যোগশাস্ত্রেও গুরুর ভূমিকাকে সহজেই নিয়ে আসা যায়, স্বামীজী এখানে ঠিক সেটাই করছেন। সেটা করতে গিয়ে স্বামীজী বলছেন, ঠিক ঠিক ঈশ্বরীয় ভাব একমাত্র গুরুই দিতে পারেন।

The relation between Shishyas is the of brotherhood, and this is actually accepted by law in India. (*শিষ্যদের মধ্যে পরস্পর ভাই-ভাই সম্বন্ধ, আর ভারতের আইন এই সম্বন্ধ স্বীকার করে থাকে।*) একই পরম্পরায় যারা শিষ্য হয়, তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধটা খুব দৃঢ় হয়। আমাদের এখানে গোত্রের প্রচলন আছে, গোত্র মানে এটাই, আমাদের ঐতিহ্যে এই প্রথাকে মেনে চলা হয়, শিষ্য মানে একটা গোত্র। গোত্র তিন প্রকার, যে বংশে জন্ম নিয়েছে সেটা তার গোত্র, মেয়েদের ক্ষেত্রে বিবাহের পর

তাদের গোত্র পাল্টায়, আর কাউকে যদি গুরুরূপে বরণ করে নেওয়া হয়, তখন সে চাইলে গুরুর গোত্রটাও নিতে পারে। গোত্র কিন্তু কোন একটা সময় একটাই থাকবে। আমি যে গোত্রে আছি, আমার আধ্যাত্মিক সাধনা ওই গোত্রকে আধার করেই চলবে, এটাকে স্বামীজী বলছেন, spiritual brotherhood। যাদের দীক্ষা হয়নি, তাদের বাড়ির যে কুলগুরুর পরম্পরা, সেই পরম্পরাকে আধার করে তার ধর্মীয় জীবন ও সাধনা চলবে।

The Guru passes the thought power, the Mantra, that he has received from those before him; and nothing can be done without a Guru. In fact, great danger ensures. (*গুরু তাঁর পূর্ব পূর্ব আচার্যদের কাছ থেকে যে মন্ত্র বা ভাবশক্তিময় শব্দ পেয়েছেন, তাই শিষ্যে সংক্রমিত করেন –গুরু ব্যতীত সাধনভজন কিছু হতে পারে না, তাতে বরং বিপদের আশঙ্কা যথেষ্ট আছে।*) গুরু তাঁর আগের আগের আচার্যদের কাছ থেকে যে মন্ত্র বা ঈশ্বরীয় ভাব বা ঈশ্বরীয় শক্তি সম্পন্ন শব্দ পেয়েছেন সেটাকেই তিনি শিষ্যের মধ্যে সংক্রমিত করেন। গুরুর আদেশ মত না চলা হলে অনেক সমস্যা হয়ে যায়। Usually without a Guru, these Yoga practices lead to lust; but with one, this seldom happens. (*সাধারণতঃ গুরুর সাহায্য না নিয়ে এই-সকল যোগ অভ্যাস করতে গেলে কামের প্রাবল্য হয়ে থাকে, কিন্তু গুরুর সাহায্য থাকলে প্রায়ই এটা ঘটে না।*) গুরু ছাড়া যোগের অনুশীলন করতে গেলে অনেক রকম আপদ বিপদ হয়ে যেতে পারে, গুরু থাকলে এই আপদ বিপদ গুলো তিনি আটকে দেন। টেররিস্টদের হাতে একটা একে-৪৭ রাইফেল আর একজন সৈনিকের হাতে একে-৪৭, তফাৎ অবশ্যই থাকবে। টেররিস্ট indiscriminate ফায়ারিং করে, সৈনিক discriminate ফায়ারিং করে। সৈনিককে যে ট্রেনিং দেওয়া হয়, তাতে তাকে যেমন গুলি চালানোর ট্রেনিং দেওয়া হয়, তেমনি তাকে ট্রেনিং দেওয়া হয় নিজেকে আটকে রাখার। কিন্তু যে নিজে থেকে রাইফেল চালানো শিখে নেয়, সে নিজেকে আটকাতে শেখে না। অশ্বত্থামা ব্রহ্মাস্ত্র চালানোটা শিখে নিয়েছিল, কিন্তু ফেরত আনাটা শেখেনি। ঠিক ঠিক গুরু না থাকলে এই সমস্যা হয়।

Each Ishta has a Mantra. The Ishta is the ideal peculiar to the particular worshipper, the Mantra is the external word to express it, (*প্রত্যেক ইষ্টদেবতার এক একটি মন্ত্র আছে। ইষ্ট অর্থে বিশেষ উপাসকের বিশেষ আদর্শ বুঝিয়ে থাকে। মন্ত্র হচ্ছে ঐ বিশেষ ভাব-ব্যঞ্জক শব্দ।*) আমরা আগে আগে অনেকবার আলোচনা করেছি যে, প্রথম হল আধ্যাত্মিক ভাবের উপর কয়েকটা জিনিস বলে দেওয়া, প্রথম হল ইষ্ট, ইষ্টের যে শব্দ (word equivalent), সেটা হয় মন্ত্র, তাঁর একটা রূপ হয়, সেটাকে বলা হয় বিগ্রহ, অনেক সময় ডায়াগ্রাম করা হয়, দেবীদের ক্ষেত্রে যাকে যন্ত্র বলা হয় আর এর পুরো জিনিসটার সাধনা চলে গোত্রকে আধার করে, গোত্র চলে গুরুকে নিয়ে। গোত্র, গুরু, ইষ্ট, মন্ত্র, যন্ত্র, বিগ্রহ, লিঙ্গ বিগ্রহও হতে পারে, বিগ্রহ শিলা হতে পারে, মূর্তি হতে পারে, সব কটা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। হিন্দুদের মূর্তি পূজা নিয়ে যারা নিন্দা করে, তারা ভুলে যান যে, এগুলোর একটা পারস্পরিক যোগসূত্র রয়েছে।

স্বামীজী বলছেন, Constant repetition of the word helps to fix the ideal firmly in the mind. This method of worship prevails among religious devotees all over India. (*মন্ত্রের ঐ শব্দের ক্রমাগত জপের দ্বারা আদর্শটিকে মনে দৃঢ়ভাবে রাখবার সহায়তা হয়ে থাকে। এইরূপ উপাসনাপ্রণালী ভারতের সকল সাধকের মধ্যে প্রচলিত।*) পতঞ্জলি বলছেন, *তজ্জপস্তদর্থভাবনম্*। সিদ্ধি কিভাবে হয়? ওই ইষ্টমন্ত্র যদি জপ করা হয়, তাতেও হয়, শ্রীশ্রীমা অনেকবার এই কথা বলছেন, জপাৎ সিদ্ধি। কিন্তু মূল হল, মন্ত্রের যে অর্থ, সেই অর্থের উপর ধ্যান করা। লক্ষ লক্ষ জপ করতে করতে ধীরে ধীরে মন কেন্দ্রিত হয়ে যায়। মন্ত্র আর মন্ত্রের যিনি ইষ্ট এক, তিনিই ভগবান, নিষ্ঠার সাথে জপ করে গেলে তিনি তখন কৃপা করে মন্ত্রের অর্থটা দেখিয়ে দেন। বেদান্তের পরম্পরাতেও মন্ত্রজপ আছে, কিন্তু তার থেকেও বেশি গুরুত্ব হল, মন্ত্রের যে অর্থ, সেই অর্থের উপর ধ্যান করা, ধ্যান করলে অর্থটা খুলে যায়। ভক্তি আর জ্ঞানের পথটা পুরো আলাদা, কিন্তু কিছু মিলও আছে, আর দুটোর ফলও এক হয়ে যায়। ভক্তিতে জপ করে যাচ্ছে, জপ করতে করতে অজপা জপ, অজপা জপের পর তিনি কৃপা করে অর্থটা স্পষ্ট করে দেবেন। অন্য দিকে মন্ত্রের অর্থের উপর ধ্যান করে গেলে, আধ্যাত্মিক সত্য নিজে থেকেই খুলে যায়। পতঞ্জলি এই জিনিসগুলিকে অনেক

দাম দিয়েছেন। পতঞ্জলির যোগসূত্র বলতে আমরা অনেক কিছু মনে করি, কিন্তু তাঁর কাছে জপ করা, ধ্যান করা, ঈশ্বরের প্রতি সমর্পিত হওয়া আর তার সাথে ঈশ্বরের সাথে এক হওয়া, সব কটাকেই পতঞ্জলি দাম দিয়েছেন। এদিনের ক্লাশ এখানেই শেষ হয়ে যায়।

বৃহস্পতিবার, ২৩শে জুলাই

প্রাণ ও গুরুকে নিয়ে কিছু মূল্যবান কথা বলার পর স্বামীজী বুধবারের ক্লাশ শেষ করেন। এরপর আসছে বৃহস্পতিবার ২৩শে জুলাইয়ের ক্লাশের লেকচার। এইদিন স্বামীজী শ্রীমদ্ভাগবত গীতার কর্মযোগ নিয়ে বলছেন। কিন্তু তাঁর আলোচনা সরাসরি যুক্ত মুক্তির সাধনায়। স্বামীজীর কর্মযোগ বই-এর বেশির ভাগটাই গীতার তৃতীয় অধ্যায় আর কিছুটা চতুর্থ অধ্যায়কে আধার করে রচিত হয়েছে। তবে স্বামীজী একজন ঋষি, কর্মযোগকে গীতার তৃতীয় অধ্যায় যেমন একভাবে গুছিয়ে উপস্থাপিত করা হয়েছে, আর স্বামীজী যখন কর্মযোগের উপর বলছেন, সেখানেও তিনি একই কথা বলছেন, তবে অন্য ভাবে গুছিয়ে অন্য আঙ্গিকে উপস্থাপিত করছেন। কর্মযোগে স্বামীজী যে কথাগুলো বলেছেন, ওই একই কথাকে আরও সংক্ষেপে দেববাণীর ২৩শে জুলাই-এর এক পাতার মধ্যে বলে দিয়েছেন।

গীতার কর্মযোগ প্রসঙ্গে

দেববাণীতে স্বামীজীর কথাগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করে যাচ্ছি ঠিকই, কিন্তু সব ভাব ও তত্ত্বকে মনে রাখা আমাদের পক্ষে কঠিন, অনুশীলনে নামানো আরও কঠিন। তবে একবার যদি স্বামীজীর এই কথাগুলো মনে ঠিক ঠিক বসে যায়, তখন আমাদের ধর্মশাস্ত্রগুলি বুঝতে অপেক্ষাকৃত ভাবে খুব সহজে বোঝা যাবে। আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য মুক্তি, বেদান্তের দৃষ্টিতে মুক্তির একটাই পথ জ্ঞান। জ্ঞান মানে নিজের জ্ঞান, আমি কে? আমি কে, এই জ্ঞান কখন বাইরে থেকে আসবে না। আমি যা, তা আমি আগে থেকেই হয়ে আছি। অজ্ঞান আমাকে আবৃত করে রেখেছে বলে আমি আপনি কেউই নিজেকে জানতে পারছি না। আমাদের সব রকম সাধন-ভজন, সংসারে আমরা যা কিছু করছি, সেবাকার্য, পূজা অর্চনা, পড়াশোনা যাই করে থাকি না কেন, সব কিছু করা হয় অজ্ঞান নিবারণের জন্য; কোন কিছু পাওয়ার জন্য নয়। এটা ঠিকই যে, কিছু করার সময় আমাদের সব সময় মনে হয়, এটা করে আমি কিছু একটা পাবো, পাই যে না তাও না, পাইও, কিন্তু সব কিছু করার উদ্দেশ্য অজ্ঞান নিবারণ। ভক্তিমার্গের সাধকরা, ভক্তিমার্গ মানে যেখানে নিজের আমিত্বটাকে একটু রেখে দেয়, ভক্ত আমিকে ছাড়বে না, তারা বলবে, আমি চিনি হতে চাই না, চিনি আস্বাদ করতে চাই; তাঁরা মনে করেন, আমি ফাঁকা আমাকে ভরতে হবে। এগুলো কেন হয়, কি হয় আমরা জানি না, এগুলো এত উঁচু স্তরের যে, আমাদের মত মানুষের পক্ষে এসব জিনিসের ব্যাখা করা তো দূরের, বোঝাও সম্ভব না। ঠাকুর বলছেন, বাবার দুই ছেলে গুরুর কাছে বেদান্ত শিখতে গেছে। শেখার পর দুজনেই বাবার কাছে ফিরে এসেছে। বাবা এক ছেলেকে ঈশ্বরের কথা জিজ্ঞেস করেছে, সে ফরর ফরর করে ঈশ্বর তত্ত্ব বলে যাচ্ছে, দ্বিতীয় ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করাতে সে চুপ মেরে গেল, সে জানে যে ঈশ্বরকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। ফরর ফরর করে যখন ব্যাখ্যা হয়, তখন বুঝতে হবে কিছু একটা গোলমাল আছে। এই জিনিসগুলি এত উচ্চস্তরে চলে যায় যে, আধিকারিক পুরুষ না হলে, ঠাকুরের কথায় চাপরাশ না থাকলে ধর্ম বা ঈশ্বরের কথা বলতে পারবেন না। তার মানে, হয় আমি ঈশ্বরের আদেশ প্রাপ্ত, তাই আমি বলছি, তা নাহলে আমি শুধু ঢাক পিটিয়ে যাচ্ছি। মাঝামাঝারি কিছু হয় না, মাঝখান থেকে আমি আমার অজ্ঞানরাশি বাড়িয়েই চলেছি। বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীদের শাস্ত্রের ক্লাশ নেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়, তাঁরাও তাই ক্লাশ নিচ্ছেন, এখানে তাঁদের উদ্দেশ্য লোকেদের উপদেশ দেওয়া না। শাস্ত্রের আলোচনা করাটাও সাধনার একটা বিধি।

যাই হোক, জ্ঞানী মনে করে, আমার ভিতরটা অনেক আলতু-ফালতু জিনিসে ভরে আছে, আমি যেটা আছি, তার বাইরে যা কিছু আছে, সবটাকে ফেলে দিতে হবে। ভক্ত মনে করে আমার ভিতরে কিছুই নেই, আমার না আছে ভক্তি, না আছে ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা, আমাকে তাই অনেক জপ করতে হবে, ঈশ্বরের নামগুণগান করতে হবে, অর্থাৎ জপ করে, পূজা করে, সেবা করে, তীর্থ করে আমার ফাঁকা জায়গাটা পূরণ

করতে হবে। বেদান্তীরা বলবে, তুমি যেটাকে মনে করছ, আমি ভরছি, আসলে সেখানেও তুমি সরাচ্ছ। ঈশ্বর তোমার স্বরূপ, তোমার অন্তর্যামী, তোমার ভিতরেই তিনি বিদ্যমান। তুমি জপধ্যান করে মনে করছ তুমি ভরছ, আসলে তুমি কিছুই ভরছ না, এই জিনিসগুলো করে করে তোমার ভিতরে যে সাংসারিক ভাব আছে, তোমার মধ্যে যে অজ্ঞানের আবরণ আছে, সেগুলোকে সরাচ্ছ। আমরা সবাই জানি গীতা হল সমন্বয় শাস্ত্র। ব্যাসদেবের সময় পর্যন্ত হিন্দু জাতি ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা নিয়ে যা কিছু চিন্তা ভাবনা করে এসেছিল, ব্যাসদেব সমস্ত চিন্তা-ভাবনাকে এক জায়গায় এনে মাত্র আঠারোটি অধ্যায়ে সাতশটি শ্লোকে সাজিয়ে এমন সুন্দর একটা খসড়া তৈরী করে দিলেন, যেখান থেকে আমরা যত খুশি শাস্ত্র তৈরী করে নিতে পারি। এই কারণে গীত অত্যন্ত কঠিন শাস্ত্র, ধারণা করা অসম্ভব প্রায়। কেন প্রায় অসম্ভব? এক একটা শ্লোক যখন পড়ছি তখন মনে হবে সব পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু পুরো পিকচারটাকে যখন নিতে যাবো, তখন দেখা যাবে এটার সাথে ওটা মিলছে না, ওটার সাথে এটা মিলছে না। কিন্তু আরও উপরে, শঙ্করাচার্যের স্তরে চলে গেলে, তখন দেখা যাবে সবটাই মিলে যাচ্ছে। যতক্ষণ ওই অবস্থায় আধ্যাত্মিক বিকাশ না হয়, ততক্ষণ বোঝা সম্ভব না। স্বামীজী ওই জিনিসগুলিকেই আরও গুটিয়ে এনে কর্ম, যোগ, ভক্তি ও জ্ঞান এই চারটের মধ্যে সুন্দর ভাবে সাজিয়ে রেখে দিলেন।

যোগ নিয়ে আমাদের অনেক কিছু আলোচনা করা হয়েছে, আলোচনাতে বলা হয়েছিল, যোগ মানে মনে কোন বৃত্তি রাখব না, একটাই বৃত্তি থাকবে, ঈশ্বর বৃত্তি। হয় সব বৃত্তির নিবৃত্তি, আর তা নাহলে একমাত্র ঈশ্বর চিন্তনই থাকবে। ভক্তিকে নিয়ে স্বামীজীর অনেক থিয়োরির উপর আমরা অনেক আলোচনা করেছি, পরে আরও ভক্তির কথা আসবে, তখন আবার আলোচনা করা যাবে। আর জ্ঞানযোগ, দেববাণীতে জ্ঞান নিয়েই কথা চলছে, স্বামীজী বোঝাচ্ছেন, কিভাবে তুমি সেই শুদ্ধ আত্মা, তোমরই স্বরূপের এত ভাবে প্রকাশ। স্বামীজী এখানে যাবতীয় যা কিছু আলোচনা করছেন, জ্ঞানকে কেন্দ্র করেই করছেন। আমাদের ভাষাতে বলতে পারি, নিত্য-অনিত্য-বিবেক। যেটা ঈশ্বর সেটাকে ধরে রাখা, যেটা ঈশ্বর নয় সেটাকে ফেলে দেওয়া। থেকে গেল কর্মযোগ। স্বামীজী এই দিনের ক্লাশে সেই কর্মযোগের কথা বলছেন।

সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আমরা যে কাজ করছি, আচার্য শঙ্কর বলছেন, এই কাজ দু-ভাবে করা যায়; প্রথমটা হয় অনাসক্ত বুদ্ধিতে কাজ করা। আমি কিছু করছি না, কারণ আমি শুদ্ধ আত্মা আমি কেন কাজ করতে যাব। ইন্দ্রিয় এই জগতের উপর কাজ করছে; হয় এই অনাসক্ত বুদ্ধিকে ধরে সব কাজ করতে হবে, আর তা নাহলে দ্বিতীয়টা – কর্মফলের কোন আকঙ্খা না করা, হে প্রভু, আমি যা কিছু করলাম, এর সব ফল তোমার চরণে সমর্পণ করলাম। *অনাসক্ত বুদ্ধ্যা* আর *ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধ্যা*, এই দু ভাবে কাজ করা। আমাদের যে মূল আলোচনা চলছিল জীবনের উদ্দেশ্য মুক্তি, তাহলে সেই মুক্তি কিভাবে হবে? মুক্তি কিভাবে হবে, জ্ঞান প্রাপ্তি কিভাবে হয়, আসলে ওটা কেউ জানে না।

কিছু মানুষ মনে করে জ্ঞান বিচারের অনুশীলন করে, মানে বিবেক বিচার করে করে অনিত্য জগৎকে ফেলে দিতে হবে। কিছু মানুষ আছে যারা ভালভাবে জানে না, কিন্তু শঙ্করাচার্যকে জানে, শঙ্করাচার্যের দুটো কথা শুনেছে, তারা মনে করে, শঙ্করাচার্য যেন বার বার বলতে চাইছেন জ্ঞান না হলে মুক্তি হয় না, আর কর্ম দিয়ে কখনই মুক্তি হয় না। কিন্তু বেশির ভাগ লোক ভুলে যায় যে, আচার্য শঙ্কর যখন জ্ঞান না হলে মুক্তি হবে না বলছেন, তখন তিনি জ্ঞান বলতে জ্ঞানযোগের কথা বলছেন না, উনি আত্মজ্ঞানের কথা বলছেন। আর কর্ম যখন বলছেন, সেখানেও তিনি কর্মযোগের কথা বলছেন না, কর্মের কথা বলছেন। স্বামীজী যখন জ্ঞান বলছেন, তখন বেশির ভাগ সময় তিনি জ্ঞানযোগের কথা বলছেন। ঠিক তেমনি যখন কর্মের কথা বলছেন, তখন তিনি কর্মযোগের কথা বলছেন। একই ভাবে স্বামীজী ভক্তিযোগ ও রাজযোগের কথা বলছেন।

স্বামীজী জ্ঞানযোগ, কর্মযোগের কথা বলছেন আবার আচার্য শঙ্কর জ্ঞান আর কর্ম পরস্পর বিরোধী বলছেন। তাহলে স্বামীজী ও আচার্য শঙ্কর পরস্পর বিরোধী কথা বলছেন? প্রথমের দিকে অনেকেই এখানে এসে সংশয়ের মধ্যে চলে যায়, কারণ তাদের কাছে দুটো কথা পরস্পর বিরোধী হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু না, দুজন একই কথা বলছেন। শঙ্করাচার্য কর্ম করে করে মন শুদ্ধ হয়ে যাওয়ার কথা বলছেন, বোঝাবার জন্য আচার্য নির্মলীর উপমা দিচ্ছেন। আগেকার দিনে জলে নির্মলী ফল দিয়ে দিত, ওটা দেওয়া যা, জলটা পরিষ্কার হওয়াও তাই। তখনকার দিনে ওনারা পুরো পদ্ধতিটা জানতেন না, কিভাবে জল পরিষ্কার হয়। কিন্তু হয়,

কিভাবে হয় এটা কারুর কাছে জানা নেই, আমরাও জানি না কিভাবে হয়। আসলে এই চারটের যোগের কোনটা দিয়েই ঈশ্বর লাভ হয় না, এই চারটে দিয়ে কোনটাতেই জ্ঞান হয় না। অথচ এই চারটে যোগ একই কাজ করে, মনের মধ্যে যে আমিত্বটা রয়েছে, ওটাকে নাশ করে দেয়, সাংসারিকতাকে সরিয়ে দেয়, সংসারের প্রতি আসক্তি থেকে কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে। এগুলো তো সরিয়ে দেওয়া হল, এগুলো আমাদের হাতে; কিন্তু তারপরে জ্ঞান জিনিসটা আমাদের হাতে নেই, ওটা যে কার হাতে আছে কেউ জানে না। ঠাকুর, যিনি সব রকম সাধনা করেছেন, সমস্ত কিছু করেছেন, তিনিও যোগীদের কথা বলতে গিয়ে বলছেন, যোগীরা সেই নাদ ভেদ করে তাঁর ইচ্ছায় পরমাত্মার সাক্ষাৎ করেন।

তিনি তাঁর ইচ্ছায় কাকে করবেন, কখন করবেন কেউ বলতে পারবে না। কিন্তু সাধারণ ভাবে আমরা জানি, যাঁর মন শুদ্ধ হয়ে গেছে, তা ভক্তি দিয়েই হোক, জ্ঞান পথ দিয়েই হোক, যোগ দিয়েই হোক বা কর্ম দিয়েই হোক, ওই শুদ্ধ মন যাঁর হয়ে গেছে তিনি যে তাঁর উপর কৃপা করবেন, এই সম্ভবনাটা অনেক বেশি থাকে। আর সত্যিকারের যিনি ঈশ্বরকে চাইছেন, তাঁর ভারি বয়ে গেছে, তিনি তাঁকে জ্ঞান দিলেন, কি নাই দিলেন। আমি তোমাকে ভালবাসি, তুমি আমাকে ভালবাস কি বাসো না, তাতে আমার কিছু আসে যায় না। যাঁদের এই ভাব, ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু জানেন না, তাঁদের মন শুদ্ধ। হঠাৎ ঠাকুরের হয়ত মনে হলো, নাঃ, একে আমি আমার স্বরূপটা দেখিয়ে দিই। সাধক যে রূপকে এতদিন চিন্তন করে এসেছেন, যে রূপের তিনি এতদিন পূজা অর্চনাদি করে এসেছেন, তখন হঠাৎ বাস্তব যেটা, সেটা তাঁর সামনে এসে যাবে। কর্মেও ঠিক তাই হয়। অনাসক্ত হয়ে কর্ম করলে, কিংবা ভক্তি ভাবে কর্ম করলে মন পরিষ্কার হয়ে যাবে। মন শুদ্ধ হওয়া মানে, আমিত্ব চলে যাবে, সংসার চলে যাবে, আসক্তি চলে যাবে। এরপর তিনি যদি চান, তখন হয় ব্রহ্মরূপে বা ঈশ্বর রূপে আত্মজ্ঞানটা দিয়ে দেবেন। স্বামীজী এবার এই কর্মযোগকে ব্যাখ্যা করছেন। প্রথম বাক্যেই স্বামীজী অনাসক্ত দিয়ে শুরু করছেন।

To attain liberation through work, join yourself to work but without desire, looking for no result. (*কর্মের দ্বারা মুক্তিলাভ করতে হলে নিজেকে কর্মে নিযুক্ত কর, কিন্তু কোন কামনা করো না –ফলাকাঙ্ক্ষা যেন তোমার না থাকে।)* খুব নামকরা কথা, যদি মুক্তি চাও, অনাসক্ত কর্ম কর। উচ্চস্তরের জ্ঞান বা উচ্চ ভাব কখন সাধারণ লোকেদের জন্য হয় না। আজকে ছাপাখানা হয়ে, আর বিশেষ করে ঠাকুর, মা ও স্বামীজী আসার ফলে আধ্যাত্মিক জগতের খুব উচ্চ ভাবগুলি সবার কাছে সহজলভ্য হয়ে গেছে। ঠাকুরও বলছেন, কাকেই বা বলি, কেই বা বুঝবে। শুধু ঠাকুর বলছেন বলে না, এই জিনিসগুলো ধারণা করা সত্যিই কঠিন। কারণ আমরা যতটুকু জানি ততটুকুই বুঝি, এটা সত্যিই প্যারাডক্স। আমরা অতটুকুই বুঝব, যতটুকু আগে থেকে জানি, তার বাইরে আমরা বুঝতে পারব না। খুব ভাল কোন আচার্য যদি আমার জন্য লেগে থাকেন, আমি যতটুকু জানি তার থেকে এক স্টেপ আমাকে বাউণ্ডারি পার করিয়ে দেবেন। আমাদের ব্রেন যেন একটা ফ্রেম, যখনই বাইরে থেকে কোন জিনিস আসে, চট চট করে আমরা ফ্রেমে ভরে নিই। তাহলে জ্ঞান জিনিসটা কি? কোন জিনিসকে জানা মানে সেই জিনিসটা যখন ফ্রেমের খাপে খাপে ভরে গেল। ওই ফ্রেমের বাইরে কোন জিনিস যদি চলে আসে, আমরা তখন ওটাকে কোন খোপের মধ্যে ঢোকাতে পারছি না, তখন মন ছটফট করতে শুরু করে। এটা তো মিলছে না, এট তো বোঝা যাচ্ছে না, এই ভেবে ভেবে মনটা খুঁত খুঁত করতে থাকে। এরপর আরও কয়েকটা যদি এই রকম এসে যায়, তখন মানুষ যে জিনিসগুলো মিলল না, সেগুলোর জন্য আরেকটা ফ্রেম বানিয়ে নেয়। এবার সে হয়ে গেল জ্ঞানী। বড় বড় বৈজ্ঞানিকরা, চিন্তাবিদরা, দার্শনিকরা এভাবেই জ্ঞান লাভ করেন। যখনই নূতন কোন আইডিয়া আসে, প্রথমের দিকে ফ্রেমে ফিট না করলে ওটা নিজের মত পড়ে থাকবে। এই ভাবে দশটা আইডিয়াস এলে, নটা পড়ে থাকবে, একটা ফ্রেম তৈরী করে নেবে। আবার যদি ওই নটা আইডিয়াস এসে যায়, তখন ধীরে ধীরে ওগুলোর জন্য আরেকটা করে ফ্রেম তৈরী করে নিল। সাধনা মানে তাই, আগেকার দিনে ব্রাহ্মণ সন্তানরা যে গুরুগৃহে গিয়ে তপস্যা করত, সাধনা করত বা আমরা যে এত পড়াশোনা করি, এটাই করি। প্রচুর লেগে থাকলে, থাকতে থাকতে ব্যক্তি হিসাবে আমি যা আছি, তখন এক ধাপ আমি এগিয়ে গেলাম। এক ধাপ এগোবে, তার বেশি এগোবে না। যে কোন আইডিয়াকে যদি আমাদের ফ্রেমে বা নলেজ ব্যাঙ্কে নিয়ে আসতে হয়, তাহলে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে।

স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, ভারতের অবনতি সেদিন থেকে শুরু হয়, যেদিন ভারত ম্লেচ্ছ শব্দ নিয়ে এসেছে। মানে, আমি বিদেশে যাব না, বিদেশীদের সাথে মিশব না, তার মানে, আমার মনে যে আইডিয়াসগুলি আছে, তার বাইরে আমি যাব না। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা অন্য রকম, ভগবান চাইছেন না, অন্যান্য অনেক জাতি প্রজাতি যেভাবে নাশ হয়ে গেছে, কারণ সেই সব সমাজে জ্ঞানের কোন অনুসন্ধান ছিল না বলে নষ্ট হয়ে গেল, ঠিক সেইভাবে হিন্দু জাতি নাশ হয়ে যাক। পর পর বিদেশীদের ভারতে পাঠিয়ে ধাক্কা মেরে গেছেন। প্রথমে এলো মুসলমানরা, ওদের সাথে আমাদের কিছু মিলছে না, ম্লেচ্ছ বলে আলাদা করে দিলাম। তারপর এলো ইংরেজরা, ওরা আরও ক্ষমতাবান। মুসলমানরা তলোয়ার নিয়ে এসেছিল, এরা কামান নিয়ে এসেছে। এদের সাথেও আমাদের কিছু মিলছে না, এদেরকেও আমরা ম্লেচ্ছ করে দিলাম। এরপর আবার আমাদেরই কেউ কেউ পড়াশোনা করার জন্য বিদেশে যেতে শুরু করেছে, তখন আবার অন্য রকম মনে হল। এরপর এলো স্বাধীনতার আন্দোলন, স্বাধীনতা আন্দোলনের সামনের সারির যে কজন নামকরা নেতা ছিলেন, সবাই বিদেশ থেকে পড়াশোনা করা লোক। গান্ধীজী, নেতাজী বিদেশে পড়াশোনা করা, নেহরু, প্যাটেল, ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, আম্বেদকর সবাই বিদেশে পড়াশোনা করা। বিদেশে গেছেন, ওখানে সব দেখেছেন, ব্রেন পাল্টে গেছে, এসে বলছেন, আমাদের স্বাধীনতা চাই। যাদেরকে ম্লেচ্ছ বলেছিল, সেই ম্লেচ্ছদের দেশে গিয়ে ম্লেচ্ছ জল খেল, তারপর গিয়ে এদের বুদ্ধিটা খুলল। আমাদের সব থেকে বড় দুর্গুণ হল, গোঁড়ামি ও কুসংস্কার। আজকে বৃটিশ সরকারের জন্য আর আমাদের কিছু লোকের বিদেশে যাওয়ার জন্য এটা চিরদিনের জন্য ভেঙে গেল, আজকে আমরা ফ্রি। ডিম থেকে ছানা বেরিয়ে এসেছে। যে ডিমকে এমন ভাবে সিমেন্ট দিয়ে বেঁধে দিয়েছিল, যাতে কেউ বেরোতে না পারে, সেই ডিম থেকে হিন্দু জাতি, হিন্দু ধর্ম বেরিয়ে এসেছে।

মানুষের ক্ষেত্রে একই সমস্যা, আমাদের মন কিছু আইডিয়াসকে ধরে রেখে দিয়েছে, কিছুতেই আমরা ওখান থেকে বেরোতে পারব না, এগুলোকে ধারণা করাও খুব মুশকিল। খুব সহজ ভাবে আমরা বলে দিতে পারি, মানবসেবাই ঈশ্বরের সেবা। কিন্তু যেমনি আমরা বুঝতে যাব, এগুলো কেন হয়, কিভাবে হয়, তখন ভাবতে ভাবতে এমন একটা উচ্চ স্তরে যেতে শুরু হয়ে যায়, এত সূক্ষ্ম হতে শুরু হয়ে যায় যে, ধারণা করা মুশকিল। আর রামানুজ যাই বলুন, মাধ্বাচার্য যাই বলুন, চৈতন্য মহাপ্রভু যাই বলুন, শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে উপনিষদই শেষ সত্য। উপনিষদে যে কথাগুলো বলেছেন, যে কারণে বলেছেন, এগুলোকে যেখানে খুশি প্রয়োগ করলে সব দরজা খুলে যাবে, উপনিষদ হল সব দরজার master key।

উপনিষদে বলছেন, *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*, ব্রহ্মাই আছেন, ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নেই। সত্য একটাই, ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নেই, তুমিই সেই ব্রহ্ম। যদি কেউ প্রশ্ন করে হিন্দু ধর্মের সত্য কি? তাহলে আমরা একটা বাক্যে বলতে পারি, *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*। দুটো বাক্যে বলার যদি সুযোগ থাকে, তাহলে তখন বলা হবে, *অহং ব্রহ্মাস্মি*, সেই ব্রহ্মই আমি। এই দুটো বাক্যেই হিন্দু ধর্ম শেষ, হিন্দু ধর্মে আর কিছু নেই। আসলে যে কোন ধর্মকেই একটা বাক্যে রেখে দেওয়া যায়, ওটাই সেই ধর্মের মূল। হিন্দু ধর্মের মূল, *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*। এরপর এর ভিতর থেকে টেনে টেনে সব যখন বার করা শুরু করতে যাবে, তখন দেখবে এর কোন শেষ নেই, একের পর এক বেরিয়ে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। এর মধ্যে একটা যেটা হয়, তা হল, যে কোন ক্রিয়ার জন্য অনেক জিনিস দরকার। যেমন, আমি একটা কাগজে লিখছি, এখানে আমি দরকার, কাগজ দরকার, পেন দরকার, পেনের কালি দরকার, কাগজকে রাখার জন্য টেবিল দরকার, আলো দরকার, কত কিছু দরকার। কিন্তু ব্রহ্ম ছাড়া তো কিছু নেই। তাহলে পেনটা ব্রহ্ম, কাগজটা ব্রহ্ম, টেবিল ব্রহ্ম, আলো ব্রহ্ম, আমিও ব্রহ্ম – গীতায় এই ভাবকে নিয়েই বলছেন, যে মন্ত্র আমরা রোজ খাওয়ার সময় পাঠ করি, *ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্*। কর্তা ব্রহ্ম, কর্মটাও ব্রহ্ম, ক্রিয়াটাও ব্রহ্ম, তাহলে ক্রিয়ার যে ফল, সেটা কি হবে? সেটাও ব্রহ্ম। এটাকেই বেদান্তে বলে, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় আর জ্ঞান এক, ধ্যাতা, ধেয় ও ধ্যান এক।

এই জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানকে আমরা যদি আরেকটু টানি, তখন বলবে, *ফলরূপত্বাৎ*, ক্রিয়া আর তার ফল এক। যে কোন ক্রিয়া যখন করা হয়, তখন ওটাই ওই ক্রিয়ার ফল, যেটা ফল সেটাই ক্রিয়া। যখন খাচ্ছি তখন খাওয়াটাই ফল। খাই কেন, যাতে পেট ভরে। খাই কেন, যাতে মন ভরে। খাই কেন, একজনকে খুশি করার জন্য। একটা খাওয়াতেই কত রকমের ফল। ঠিকই, যখন খাওয়াতে অনেকগুলো ফল পাচ্ছে, তখন

বুঝতে হবে সে সংসারী। কিন্তু যখন বুঝবে, খাওয়া ক্রিয়াটাই খাওয়ার ফল, তখন বুঝতে হবে সে এবার আধ্যাত্মিক হল। কারণ আধ্যাত্মিকতাতে ক্রিয়া যা, ফলও তাই। কর্মযোগের মূল সত্য এখানেই দাঁড়িয়ে আছে, ক্রিয়া যা ফলও তাই। ক্রিয়া করাটাই ফল, ক্রিয়া আলাদা কিছু আর ফল আলাদা কিছু নয়। গীতায় বলছেন, *কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন*, কর্ম কর, ফলের চিন্তা করবে না। তুমি এইজন্যই ফলের চিন্তা করবে না, কারণ ক্রিয়াটাই আসলে ফল। এখন তুমি বুঝতে পারছ না ঠিকই, কিন্তু যখন তোমার সমাধি হবে, তখন তুমি বুঝতে পারবে কর্মটাই ফল, এখন অনুশীলন করতে থাক।

সাধনা মানেই তাই, যখন মানুষ সাধনা করে, যেটা সিদ্ধি তখন সেটারই সাধনা করা হয়। তোমার সিদ্ধি যেটা হবে, সাধনা সেটারই হয়। জীবনে আধ্যাত্মিক স্তরে তুমি কি পেতে চাইছ? এখন তো ভক্তদের এই প্রশ্ন করলে কেউ আত্মজ্ঞানের নীচে কথা বলবেন না, খুব বেশি হলে বলবেন, ঠাকুরের দর্শন। পিসি সরকার তো রুমাল থেকে সিংহ বার করে দেন, রুমাল থেকে উনি ঠাকুরকে এমনিই বার করে দেবেন, ওখানে ঠাকুরকে প্রণাম করে এলেই হয়ে গেল, পিসি সরকার আপনার গুরু হয়ে যাবেন। ঠাকুরের দর্শন পাওয়া মানে তা নয়, ঠাকুরের দর্শন মানে ঠাকুরই আছেন, ঠাকুর ছাড়া আর কিছু নেই। এটাই যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহলে ওই ভাবেই সাধনা করুন, ঠাকুরই আছে, ঠাকুর ছাড়া আর কিছু নেই, সিদ্ধি হয়ে গেলে আপনি তাই দেখবেন; সিদ্ধি আর সাধন এক। সিদ্ধি মানে ফল, সাধন মানে ক্রিয়া, সিদ্ধি ও সাধন এক; ঠিক সেই ভাবে ক্রিয়া আর ফল এক। ক্রিয়া আর ফল যদি এক হয়, তখন এটাই হবে কর্মযোগ। কর্মযোগ মানে কর্ম আলাদা আর কর্মের ফল আলাদা নয়। যে কর্ম ও কর্মের ফল আলাদা দেখে সে কৃপণ, সাধারণ মানুষ, যিনি দেখেন কর্ম আর ফল এক, বুঝতে হবে এবার তিনি সিদ্ধির পথ নিয়ে নিয়েছেন। আর যিনি সিদ্ধিও যা সাধনাও তাই, ক্রিয়াও যা ফলও তাই, এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন, তিনি পরমহংস অবস্থায় পৌঁছে গেছেন।

স্বামীজী *কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন* গীতার এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করছেন। আমরা কবে থেকে গীতার এই শ্লোক শুনে আসছি, কিন্তু এর ফিলজফিটা আমরা জানতাম না, এর ফিলজফি এই। কিন্তু আমাদের মন এখন ভাবছে, আমি কাজ করব, আমার ফল চাই, আমার সাফল্য চাই, আমি চাই সবাই আমার সুখ্যাতি করুক, চারজন লোক আমাকে মানুক জানুক। সেখান থেকে হঠাৎ কর্মযোগের উচ্চতম আদর্শে নেমে বলছি, আমি কর্মযোগী হব, তা কি কখন হয়! বেড়াল বলে আমি মাছ খাবো না, কাশী যাবো। এরা বলছে, আমি কৃপণ থাকব না, আমি কর্মযোগী হব, তা কি কখন হয়! অনুশীলনের কথা দূরে থাকুক, ধারণাই করতে পারবে না ক্রিয়াই কর্মফল কি জিনিস, কিভাবে হয়। ক্রিয়াই ফল, ফলই ক্রিয়া, এটা শুধু কর্মযোগেই হয় না, ভক্তিযোগেও তাই হয়।

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন, তোমার কর্তব্য হল কর্ম করা, ফলের কোন আশা করো না, এটাকেই স্বামীজী নিজের মত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললেন, To attain liberation through work, join yourself to work but without desire, looking for no result, কাজ করে যাও, এক মুহূর্ত ফাঁকা বসে থাকবে না, তার সাথে ফলেরও কোন আকাঙ্ক্ষা করবে না। ঠাকুর যদিও ঈশ্বর চিন্তন করতে বলছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও দক্ষিণেশ্বরে যখনই কাউকে দেখতেন এর কাঁধে দায়ীত্ব আছে, পালন না করে এখানে পড়ে আছে, খুব অসন্তুষ্ট হতেন। সমগ্র ভারত পরিক্রমা করে স্বামীজী দেখছেন, তাঁর সনাতন ভারতবর্ষ এক মহা তামসিকতায় নিমজ্জিত হয়ে আছে, ভারতবাসীদের ভিতরে প্রথমে রজোগুণ বৃদ্ধি করতে হবে, সমস্ত ভারতবাসীকে তিনি তাই কাজ করতে বললেন। কাজ না করলে রজোগুণ আসবে না; রজোগুণ বাড়াবার জন্য তিনি সেবাকার্যের প্রবর্তন করলেন। আমরা স্বভাবেই অলস, কিছু করতে চাই না, দীক্ষা নিয়েছে মানে আরও সে অপদার্থ হয়ে গেল, এবার সব দায় ঠাকুরের উপর চাপিয়ে ঠাকুরের ইচ্ছা বলে চালিয়ে যাবে। ঠাকুরের ভক্তকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে যে, তাঁকে দেখে আরও চারজন ঠাকুরের কাছে আসবে। কর্মযোগ মানে intense work, কিন্তু কোন আসক্তি থাকবে না, কাজ করাটাই উদ্দেশ্য। কি রকম কাজ করবে? এক পাগল সকালবেলা একটা লাঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়ত, সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত রাস্তার পাশে যত চায়ের দোকান আছে তার আশেপাশে যে চায়ের ভাড়গুলো পড়ে থাকত, সেগুলো ভেঙে বেড়াত। নিষ্কাম ভাবে মাটির খুড়ি ভেঙে যাচ্ছে, আর দিনের শেষে বলত, 'মা আর তো পারি না'! কর্মযোগ কি এই ধরণের কর্ম করার কথা বলছেন?

না, পাগলের কর্ম না, এই কর্ম intelligent কর্ম, efficient কর্ম, intensed কর্ম আর detached কর্ম – এখান থেকেই কর্মযোগের শুরু।

কর্মযোগের কর্ম অনেকটা লটারির মত। লটারির টিকিট যদি কোন দিন না কেনে, কোন দিন লটারিতে টাকা পাবে না। কাজ যদি না করা হয়, কোন দিন কর্মযোগী হওয়া যাবে না। লটারির টিকিট কিনলেই যে লটারিতে টাকা উঠবে, তার কোন গ্যারান্টি নেই; কাজ করলেই যে কর্মযোগী হয়ে যাবে, তার কোন গ্যারান্টি নেই। তফাৎ আছে, লটারি হল পুরো চান্স বা ফ্রড; কর্মযোগ হল অনুশীলন, যত অনুশীলন করা হবে তত অনাসক্ত ভাব আসবে। অনাসক্ত হওয়া মানে নিঃস্বার্থপর হওয়া। কর্মযোগ কর্মফল থেকে অনাসক্ত হতে বলে, কিন্তু আমাদের কর্ম থেকেই অনাসক্ত হয়ে যায়। আমাদের ভারতের এটাই সমস্যা, we detached from work। আজকের দিনে ভারতবর্ষের দিকে তাকালে আমরা কোন একটা প্রফেশান খুঁজে বার করতে পারব না, যেখানে বলতে পারব, এনারা পুরো নিষ্ঠার সাথে কাজ করে। পঞ্চাশ বছর আগেও এই সমস্যা ছিল না; যারা সরকারি অফিসে কাজ করত, বেসরকারি অফিসে কাজ করত বা নিজের কাজ করত, সব ক্ষেত্রে তারা নিষ্ঠা নিয়ে কাজ করত। বর্তমান শতাব্দীতে এসে আমাদের মানসিক গঠনটাই পাল্টে গেছে। সবার আগে ভাঙন ধরল সরকারি কাজে, 'এটা আমার কাজ নয়' –এই মনোভাব দিয়ে শুরু। সেখান থেকে ধীরে ধীরে প্রাইভেট অফিসগুলিতেও হতে শুরু হয়ে গেল, সবাই কাজে ফাঁকি মারতে শুরু করল। ফাইনালি এটা এখন নেমে এসেছে বাড়ির ভিতরে; যেখানে স্ত্রী স্বামীকে বলছে, বা স্বামী স্ত্রীকে বলছে, ছেলে কি শুধু আমার! এগুলোই দেখিয়ে দেয় আমাদের বর্তমান মানসিক গঠন কেমন, আর নিষ্ঠার কত অভাব।

যে নিষ্ঠাবান হয়, সে সব জায়গাতেই নিষ্ঠাবান হয়। অনেক আগে কোন এক স্কুলের কয়েকজন শিক্ষক বলছিলেন, স্কুলের শিক্ষকদের মাইনে খুবই কম। তখন একজন প্রাচীন শিক্ষক বললেন, কাজের প্রতি নিষ্ঠার সাথে মাইনের কোন সম্পর্ক নেই, যে নিষ্ঠাবান, সে সব জায়গায় নিষ্ঠাবান। টাকা দিলে যে নিষ্ঠাবান হয়, সেই লোককে কোন দিন ভরসা করা যায় না, এরা খুব বিপজ্জনক লোক। কথায় বলে, you can purchase loyality, কিন্তু তা না, অসহায় হয়ে আছে বলে সে তার দিকে loyal আছে। যাদের loyality থাকে, তাদের পয়সা দিলেও loyality থাকবে, না দিলেও loyality থাকবে; নিষ্ঠা, আনুগত্য এগুলো যার থাকে তার চরিত্রের মধ্যেই থাকে; যাদের আছে তাদের আছে, যাদের নেই তাদের নেই। যাদের এগুলো নেই, তারা মৃত্যুর পর পোকা মাকড় হয়ে জন্মাবে। নচিকেতা তাঁর বাবাকে বলছেন, *সস্যমিব মর্ত্যঃ পচ্যতে সস্যমিবজায়তে পুনঃ*, বাবা! আপনি বলে দিয়েছেন, আমাকে যমরাজকে দান করেছেন, আপনি আমাকে এবার অনুমতি দিন যমরাজের কাছে যাওয়ার জন্য। যারা নিজের কথা রাখে তারাই মানুষ আর যারা কথা দিয়ে কথা রাখে না, তারা ধান গমের মত জন্মায় আর মরে। দুজনকে বোকা বানাতে পেরে আমরা মনে করছি আমরা খুব চালাক। আমরা মনে করছি ফাঁকি মেরে আমরা খুব চালাকির কাজ করেছি। কিন্তু আমরা কাকে ফাঁকে মারছি? ভিতরে অন্তর্যামী বসে আছেন, সব খবর তাঁরা জানা আছে। ফলে অন্তর্যামীও আমাদের সেই রকম জায়গায় নিয়ে যাবে, যেখানে আরও বড় মাপের ফাঁকিবাজ হতে পারব, পশু, পাখির যোনিতে নিয়ে যাবেন, নিজের খাওয়াটুকু হয়ে গেলেই হল।

এরপর স্বামীজী বলছেন, Such work leads to knowledge, which in turn brings emancipation. (*এইরূপ কর্মের দ্বারা জ্ঞানলাভ হয়ে থাকে –ঐ জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি হয়।*) কাজ যদি এভাবে করা হয়, একমাত্র তবেই আমরা জ্ঞান প্রাপ্তির অধিকারী হতে পারব। স্বামীজী বলছেন, leads to knowledge, আগে আমরা যেটা আলোচনা করলাম, কর্ম করলাম বলে সরাসরি আমাদের জ্ঞান হয়ে যাবে, তা না। কারণ তখন কর্মযোগের যে basic principle, সেটাই ভুল হয়ে যাবে। প্রথমের দিকে আমরা আলোচনা করলাম, কিভাবে ক্রিয়া আর তার ফল দুটো এক। ক্রিয়া আর ফল এক হওয়া মানেই, একটা জিনিস অন্য জিনিসকে জন্ম দিতে পারবে না। কর্ম কখনই জ্ঞানকে জন্ম দিতে পারবে না। এ-কথাই শঙ্করাচার্য বার বার বলছেন, কর্ম কখনই জ্ঞান দিতে পারবে না। যত ভাল কর্ম হোক, যত ভাল পূজা অর্চনা করি না কেন, যতই মন দিয়ে জপধ্যান করি না কেন, ঈশ্বর দর্শন কখনই এতে হবে না। একজন ভক্ত শ্রীশ্রীমাকে চিঠিতে লিখছেন, 'আমি এত জপধ্যান করলাম, কই ঠাকুরের কৃপা তো হল না'। তার উত্তরে মা জানালেন,

'ঠাকুর কি আলু পটল বাবা যে, দরদাম করে কিনে নেওয়া যাবে'। জপধ্যান করে যদি ঈশ্বর দর্শন হয়, তাহলে ব্ল্যাকমানি অর্জন করে ওই টাকা মন্দিরে দান করলে, তাতেও ঈশ্বর দর্শন হবে।

তাহলে কি হয়? যারা নোংরা কাজ করে তাদের মনটা নোংরা হয়ে যায়, মন যত নোংরা হবে তত সে ঈশ্বরের কৃপা থেকে দূরে চলে যাবে। আয়নার উপর বেশি ময়লা পড়লে ভাল প্রতিবিম্ব হবে না। জপধ্যান করলে সাংসারিক ভাব থেকে বেরিয়ে চলে আসে, মন তাদের পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। জপধ্যান করেছেন বলে ঈশ্বরের কৃপা হবে, তা হয় না। ঈশ্বরের কৃপা সব সময় রয়েছে, সূর্যের আলো সব সময় আছে, যার আয়না যত পরিষ্কার, প্রতিবিম্ব তার তত পরিষ্কার হবে। জপধ্যানাদি প্রত্যক্ষ কারণ নয়, পরোক্ষ কারণ। প্রত্যক্ষ কারণ হলে যে কোন জিনিস প্রত্যক্ষ কারণ হয়ে যাবে। আমরা বলছি বটে জ্ঞানেই মুক্তি, কিন্তু জ্ঞান মুক্তি দেয় না, জ্ঞানটাই মুক্তি। এগুলোকে নিয়ে আমরা অনেকবার আলোচনা করেছি, আবারও করা হবে। যখন শুনছি তখন মনে করছি বুঝে গেলাম, শুনতে খুব ভাল লাগছে। কিন্তু যেমনি আলোচনা শেষ হয়ে যাবে, বাড়ি যেতে না যেতে আবার ভুলে যাব। জ্ঞান মানেই মুক্তি, জ্ঞান মুক্তির দিকে নিয়ে যায় না। কর্ম আমাদের মনকে শুদ্ধ করে। যদি বলি কর্ম মুক্তির দিকে নিয়ে যায়, তাহলে জানতে হবে যে কর্ম মানে জ্ঞান, সেই কর্ম হলে তবেই হবে। যেখানে ক্রিয়া আর ফল আলাদা, সেখানে কখনই মুক্তি হতে পারে না। একটা কর্মের জন্য বা কর্মের দরুণ যদি মুক্তি হয়, তাহলে কিছু দিন পর ওই কর্মের ফল যখন ক্ষীণ হয়ে ক্ষয় হয়ে যাবে, তখন আবার ওই বন্ধনটা এসে যাবে। ঘর ঝাড় দিয়ে পরিষ্কার করলাম, একদিন পর আবার ঘর অপরিষ্কার হয়ে যাবে। যে কোন একটা শক্তিকে লাগানো হল, যতক্ষণ ওই শক্তি ওর উপর কাজ করবে, ততক্ষণই ওটা থাকবে, তারপর আর থাকবে না। কোন কর্মের দরুন যদি মুক্তি হয়, তাহলে ওই কর্মের শক্তি যেদিন শেষ হয়ে যাবে, শেষ একদিন হবেই, আবার সে বন্ধনে পরে যাবে। সেইজন্য মুক্তি হল স্বাভাবিক অবস্থা, জ্ঞান আর মুক্তি এক; জ্ঞান মুক্তির দিকে নিয়ে যায় না, জ্ঞানই মুক্তি। এই জ্ঞান হল আত্মজ্ঞান। আর জ্ঞানযোগ যখন বলা হয়, তখন সেটা হল নিত্যানিত্যোবস্তু বিবেক বা ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু, এই বোধ।

এরপর বলছেন, To give up work before you know, leads to misery. (*জ্ঞানলাভ করবার পূর্বে কর্মত্যাগ করলে তাতে দুঃখই এসে থাকে।*) গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান বার বার এই জিনিসটাকে নিয়ে বলছেন – *নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ*, বা চতুর্থ, পঞ্চম অধ্যায়েও এই ধরণের কথা বার বার বলছেন। এখনও যে উচ্চ অবস্থায় পৌঁছে যায়নি, সে যদি কর্ম ত্যাগ করে দেয়, সে কিন্তু মহা কষ্টের মধ্যে পড়বে। মাঝে মাঝে এই কথাগুলোকে নিয়ে ভাবলে আমাদের অবাক হয়ে যেতে হয়। স্বামীজী আসার পর কোথাও আমাদের ভারতবর্ষ জেগে উঠেছিল। যাঁরা ইতিহাস জানেন, বোঝেন, তাঁরা জানেন যে, স্বামীজী দেশের শক্তিকে জাগিয়ে দিলেন। কিন্তু ভাবলে দুঃখ হয়, গীতা তো হিন্দুদের মূল গ্রন্থ, নিজেকে যে হিন্দু মনে করে, তাকে নিয়মিত গীতা পাঠ করতে হয়। শুধু পাঠ করেই ছেড়ে দিয়ে রাখা যাবে না, গীতার বক্তব্য, গীতার ভাব বোঝার চেষ্টা করতে হবে। এত বড় ভুল দেশ কি করে করতে পারল, সত্যিই ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। যে ধর্মের মূল গ্রন্থ বলছে, যে বাইরে থেকে সব ত্যাগ করেছে, কিন্তু মনে মনে ভোগ করছে, সে একজন মিথ্যাচারী। যে ধর্মের মূল গ্রন্থ বলছে, যা কিছু খাওয়া-দাওয়া করছে, যা কিছু ভোগ করছে, সেটা যদি সে দেবতাদের না দিয়ে ভোগ করে, সে একটা চোর। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে তো আছেই, তৃতীয়, চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান বলে যাচ্ছেন, তুমি কর্ম কর, শুধু কর্ম করে যাও। বলতে গিয়ে ভগবান রাজা জনকের দৃষ্টান্ত নিয়ে আসছেন, *কর্মণৈব হি সংসিদ্ধমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।*

অথচ ভারতবর্ষ, যার মাটিতে গীতার মত আদর্শের জন্ম, আজও কেমন তমোগুণে আচ্ছন্ন। কাজ যে করছে না তা না, কোন রকমে পেট চলে গেলেই হল। কাঁচা মন যাদের, যাদের প্রস্তুতি নেই, যাদের সাধনা নেই, যারা খাটেনি, তারা যদি জ্ঞান বা কোন উচ্চ ভাব পেয়ে যায়, তখন এই সমস্যা হয়। সাধনা যদি না থাকে, পরিশ্রম যদি না করে থাকে, যে কোন একটা কিছুকে জয় করার ক্ষমতা যদি ভিতরে না জন্ম নিয়ে থাকে, আমি যে জিনিসটা করতে চাই, পেতে চাই, আমি করে দেখাব এবং পেয়ে দেখাব, এই ক্ষমতা যদি না এসে থাকে, সে কি কখন ধর্ম বুঝবে, না কোন শাস্ত্রের কথা বুঝতে পারবে! কিছু করে দেখাতে পারবে না, কিন্তু মুখে লম্বা লম্বা কথা, হিন্দুদের এটাই সমস্যা; নিজের ধর্মকেই হিন্দুরা ভাল করে জানে না।

একজন সন্ন্যাসীকে একবার কোন এক ইন্টারভিউতে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'আপনার এতদিনের সন্ন্যাস জীবনে কি বুঝলেন'? উনি সঙ্গে সঙ্গে দ্বিধাহীন চিত্তে বললেন, 'এতদিনে বুঝেছি যে ধর্ম আদি নিয়ে যা কিছু আছে, এগুলো সব সত্য'। 'এতদিন সময় লেগে গেল এটা বুঝতে'? 'ইয়েস। সঙ্ঘ যখন যে যে কাজের দায়ীত্ব দিয়েছি, নিষ্ঠা নিয়ে করে দিয়েছি, এই করে করে আমার মনের আবর্জনাগুলি কিছুটা পরিষ্কার হল। আগাছাগুলো পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পর এবার মাটিটা দেখা যাচ্ছে। এবার কবে মাটি কোপান হবে, কবে চাষ করবে, কবে বীজ ফেলবে, কবে গাছ হবে, কবে ফল দেবে, ভগবান জানেন। যাঁরা মনে করেন ঠাকুরের নাম করে অনেক এগিয়ে গেছেন, নিজেকে প্রস্তুত মনে করছেন, তাঁরা ভাগ্যবান; আমি সেই ভাগ্যবান নই। আমার সেই প্রস্তুতি নেই, বাকিদের প্রস্তুতি আছে কি নেই, আমি কি করে বলব, সেটা তাঁরা নিজেরাই জানবেন'! কারণ, এই যে স্বামীজী বলছেন, To give up work before you know, leads to misery। সন্ন্যাসীও যদি নিজেকে প্রস্তুত মনে করে সব কিছু করা ছেড়ে দেয়, তিনিও কিন্তু গভীরে depressionএ চলে যাবেন, এবং যাচ্ছেনও। সন্ন্যাসী, কিন্তু ভিতরে depression, বুঝতে হবে, সন্ন্যাসী কাজ করেননি, কাজ না করেই সব ছেড়ে দিয়ে বসে আছেন। কাজ না করে যদি সব ছেড়ে দেয়, তাহলে একটা ফাঁকা ড্রাম হয়ে যাবে, শুধু আওয়াজ আর আওয়াজ। ড্রামকে যদি ভারী না করা হয়, স্টেডি না করা হয়, ততক্ষণ হবে না, শুধু ফাঁকা আওয়াজই হবে। কাজ মানে এই নয় যে, বিয়ে করে দুটো ছানাপোনার জন্ম দিয়ে নদের হাট বসাবে।

স্বামীজী সেইজন্য নিয়ে এলেন সমাজসেবার আদর্শ। সমাজসেবার আদর্শকে সামনে রেখে যেমনি এবার সে সেবা করতে নামবে, তখন তার চার পাঁচটা ধাক্কা লাগবে। স্বামী ধীরেশানন্দজী মহারাজ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের খুব প্রাচীন ও বিদগ্ধ সন্ন্যাসী ছিলেন। ওনার কাছে এক নূতন ব্রহ্মচারী মহারাজ থাকতেন। নূতন ব্রহ্মচারী, ভিতরে এখন খুব তেজ, যা হয়, একদিন স্বামী ধীরেশানন্দজী মহারাজকে খুব উৎসাহিত হয়ে বলছেন – 'মহারাজ! জপ, ধ্যান, তপস্যা, একান্ত বাস এগুলোই জীবনের উদ্দেশ্য'। মহারাজ নূতন ব্রহ্মচারীকে নিরুৎসাহিত না করে বললেন, 'ঠিকই'। তারপরেই তিনি একটা গল্প বললেন, যে গল্পটা নূতন ব্রহ্মচারীর মনের ভিতরে একেবারে গেঁথে গিয়েছিল। সেই নূতন ব্রহ্মচারী বর্তমানে মঠের একজন বিদগ্ধ শাস্ত্রজ্ঞ সন্ন্যাসী; তিনিও যখন যেখানে সুযোগ পান এই গল্পটা সবাইকে বলে থাকেন। গল্পটা হল, কুকুরের গায়ে যখন ঘা হয় তখন কুকুর নিজে ওটাকে চেটে চেটে সারিয়ে নেয়। কদাচিৎ কখন কুকুরের মাথায় আঘাত লেগে বা অন্য কোন কারণে মাথায় ঘা হয়ে যায়। মাথার ঘা-টাকে কুকুর চাটতে পারে না। চাটতে না পারার জন্য কুকুরটার অনেক সমস্যা হয়ে যায়। বাইরে রোদের আলোতে গিয়ে বসলে মাছিগুলো ভন্ ভন্ করতে করতে ঘায়ে কামড়াতে থাকে। মাছির জ্বালায় সে ছায়াতে অন্ধকারে এসে বসে। অন্ধকারে যেতেই মাছিগুলো সরে যায়, কিন্তু ঘায়ের ভিতরের পোকাগুলো অন্ধকারে সক্রিয় হয়ে কুটুস কুটুস করে কামড়াতে থাকে। নিরুপায় হয়ে সে আবার রোদের আলোতে চলে আসে, রোদের আলোতে পোকার কুটকুটানি বন্ধ হয়ে গিয়ে শান্ত হয়ে যায়, কিন্তু মাছিগুলো কামড়াতে শুরু করে। মাছির কামড় থেকে বাঁচার জন্য আবার ভিতরে যায়, ভিতরে যেতেই পোকাগুলো কুট্ কুট্ করতে শুরু করে দেয়। এই করতে করতে একটা সময়ের পর কুকুরটা পাগল হয়ে যায়। নিজে তো পাগল হলই, এরপর যাকে কামড়াবে সেও মরবে। কোন ভাল মানুষ, একজন সৎ পুরুষের নজরে যদি কুকুরটা পড়ে যায়, দেখছেন কুকুরটা বার বার পালাচ্ছে, দৌড়াচ্ছে, একটা জায়গাতে স্থির হয়ে থাকছে না। তিনি বুঝে যান, এর মাথায় ঘা হয়েছে। তখন কুকুরটাকে ধরে ভাল করে বেঁধে নিয়ে মাথায় ফিনাইল দেন, ওষুধ দিয়ে একটা ব্যাণ্ডেজ করে দেন। ব্যাণ্ডেজ হয়ে গেছে, মাছির উপদ্রব বন্ধ হয়ে গেছে। ওষুধ দেওয়াতে ভিতরের পোকাগুলো মরে যায়। এরপর ধীরে ধীরে ঘাটা শুকিয়ে গিয়ে কুকুরটা সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক হয়ে যায়।

এই গল্পটা বলার পর মহারাজ ওই নূতন ব্রহ্মচারীকে বলছেন, 'সন্ন্যাসীর জীবন ঠিক এই রকম। সন্ন্যাসী যখন কাজের মধ্যে নেমে পরে, তখন চারজনের সাথে মতান্তর, মনোমালিন্য, খ্যাটামেটি লাগে, এগুলো হল মাছি। তখন মনে হয়, আমাকে শেষ করে দিচ্ছে। তখন বলে, কাজ করার জন্য আমি তো সন্ন্যাসী হইনি, আমি ঈশ্বরের নামে ডুবে যাবো। তখন বৈরাগী হয়ে চলে যায় হরিদ্বার, হৃষিকেশ, উত্তরকাশীতে তপস্যা করার জন্য। কিছু দিন ওখানে থাকার পর ভিতরে যে কামনা-বাসনাগুলো রয়েছে, সেগুলো এবার কুট্ কুট্ করে কামড়াতে শুরু করে। তখন বলে যে, আমি সমাজসেবা করব। দৌড়ে নেমে যায় কাজের মধ্যে, সমাজসেবায়

যেমনি নেমে গেল, আবার এর ওর সাথে খটাখটি শুরু হয়, তখন আবার পালাবে হৃষিকেশ, উত্তরকাশীতে। এই অবস্থা শুধু সন্ন্যাসীর হয় না, গৃহস্থদেরও তাই হয়। বিয়ের পর স্বামীর সাথে ঝগড়া হল, রেগেমেগে বলল, চললাম বাপের বাড়ি। বাপের বাড়ি গিয়ে স্বামী-সুখের অভাবটা ভিতরে কুট্ কুট্ করতে থাকে। আবার ফেরত চলে আসে স্বামীর কাছে। সংসার এইভাবেই চলছে। সত্যিকারের যিনি গুরু, তাঁর কাছে গিয়ে দুটো কথা বলতেই গুরু বুঝে যান, এই রে, এতো ফাঁকি মেরে কাটিয়েছে, জীবনে কোন কাজ করেনি। কাজ করলেই মাছিগুলো আসবে, কাজ করা মানেই পাঁচজনের সাথে টক্কর লাগা।

রাজযোগে যম নিয়মাদিতে অহিংসা, অস্তেয়, সত্য বচন ইত্যাদির কথা বলছেন। যে নির্জন কোন পাহাড়ের গুহায় বা জঙ্গলে বসে আছে ওখানে সে কিসের অহিংসার অনুশীলন করবে, সে তো এমনিই একা। জঙ্গলে, পাহাড়ে কার সাথে কথা বলবে, কথা বলার তো কেউ নেই, কিসের সত্য কথা বলার অনুশীলন করবে! অস্তেয়, চুরি করবে না, জঙ্গলে, গুহায় কার কি চুরি করবে! যোগশাস্ত্র জঙ্গলে, পাহাড়ের গুহায় বসে যোগ প্র্যাক্টিস করতে শেখায়নি। সমাজে যারা আছে তাদের জন্যই যোগশাস্ত্র। এই যে বলছেন, মৃদু ভাষী, মধুর কথা বলবে, যে জঙ্গলে একা থাকছে সে কিসের মধুর কথা বলবে! অনেক সময় অন্য ধর্মালম্বীরা এসে সন্ন্যাসীদের বলে, আপনারা ভাল মানুষ ঠিকই, কিন্তু ইদানিং যেসব নামকরা সাধুবাবাদের কথা আলোচিত হয়, ওনারা আলাদা থাকের। ঠিকই বলছে, ওই চালবাজী করা, লোকেদের বোকা বানানোটা সন্ন্যাসীদের কাছে কিছুই না। কিন্তু একবার ফিল্ডে নেমে দেখুক, একবার সেবার আদর্শ লক্ষ্য রেখে কাজে নামুক, তখন এই যে ভাঁওতা মারছেন, I am great, ওই যে ভাঁওতা মারছে, I am so sweet, ওই যে ভাঁওতা মারছে, my heart is full for all, একবার একটু মাঠে নামিয়ে এগুলো দেখাও না, তারপর কি রকম কথা বলে! মঞ্চে বসে এই ধরণের বড় বড় ভাষণ দেওয়া সোজা, ফিল্ডে নামলে দু দিনেই বোঝা যাবে ভিতরে কত দম। ফলে একটা ধাক্কা যেমনি লাগবে, God উড়ে যাবে, পরের দিন থেকে depression, suicidal হয়ে যাবে, এরপর জগৎ অনিত্য বলে বোধ হতে শুরু হয়। এই অনিত্য বোধে জগতেরও কিছু হয় না, তারও কিছু হয় না। যেটা আসলে হয়, তা হল, কাজ করতে গিয়ে যখন বুঝে নিল, আমার তো কিছু পাওয়ার নেই। যেই মহুর্তে বলে দিল, এই কাজ থেকে আমার কিছু পাওয়ার নেই; তার মানে সে দৃঢ় যে এই জগৎটা অনিত্য, আমার কিছু লাগবে না, তাই আমি এই কাজ করছি।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বর্তমান অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী স্মরণানন্দ খুব সুন্দর বলতেন, স্বামীজী বলছেন সপুচ্ছবাদ। পুচ্ছ মানে লেজ, এই জগৎটা হল কুকুরের লেজ। কুকুরের লেজকে যতই সোজা করার চেষ্টা করা হোক, কোন দিন সোজা হবে না। সপুচ্ছবাদের এটা দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত। প্রথম সিদ্ধান্ত হল, জগৎটা কুকুরের লেজ। তৃতীয় সিদ্ধান্ত, সোজা করার চেষ্টা তোমাকে করতেই হবে। তুমি ভাল করেই জানো জগৎ শোধরাবে না, তাও তোমাকে জগতের জন্য কাজ করে যেতে হবে। চতুর্থ সিদ্ধান্ত, জগৎ সোজা হোক আর নাই হোক, তাতে তুমি কিন্তু সোজা হয়ে যাবে। সপুচ্ছবাদের এটাই বক্তব্য, এখানে উদ্দেশ্য নিজেকে সোজা করা, অপরকে ভাল করা না। এই জিনিসটাকে ভাল করে বুঝে নিয়ে যারা জগতের উপকার করার জন্য কাজে নামেন, তারাই আসলে কর্মযোগী। যারা এটাকে না বুঝে নামে, তারা কর্মযোগী না। জগতের ভাল করা যাবে না ভেবে যারা কাজ করা ছেড়ে দিয়েছে, তারা কর্মযোগী না। যারা মঞ্চের উপর বসে বেদান্তের বড় বড় কথা বলে যাচ্ছে, এখন তো বেদান্তের নীচে কেউ কথাই বলে না, ঠাকুর যখন এসেছিলেন তখন কেউ ঈশ্বরকোটির নীচ কথাই বলত না, এরাও কর্মযোগী না। মানুষের মধ্যে নেমে আগে খাটতে হবে, আর যখন জানবে, আমার নিজের কিছুর নেওয়ার নেই, আমি এই কাজ করছি যাতে আমি সোজা হই। ওই সোজা না হয়ে যদি কেউ মনে করে আমার কর্ম করার দরকার নেই, এমনিতেই আমার জ্ঞান হয়ে যাবে, তাদের জন্য স্বামীজী তখন বলছেন To give up work before you know, leads to misery। গীতার তৃতীয়, চতুর্থ অধ্যায়ে এই কথাগুলোই ভগবান বার বার ঘুরে ঘুরে বলছেন।

আর বলছেন, Work done for the Self gives no bondage. (*'আত্মা'র জন্য কর্ম করলে তা থেকে কোন বন্ধন আসে না।*) যখন আত্মজ্ঞানের উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখে কাজ করা হয়, ওই কাজ কোন বন্ধন সৃষ্টি করতে পারে না। আমি কেন এই কাজ করছি? কর্ম আমাকে আত্মজ্ঞানের দিকে নিয়ে যাবে। এটাকে নিয়ে

স্বামীজী পর পর আরও অনেক কিছু বলবেন। আমার আত্মকল্যাণের জন্য আমি কাজ করছি, জগতের সুখ ভোগ করার জন্য না, কারুর মঙ্গল করার জন্য না। কোন ইণ্ডাস্ট্রিতে যখন অনেক উৎপাদন হয়, সেখানে কিছু উৎপাদিত জিনিসকে বলা হয় বাইপ্রোডাক্ট। লোকের মঙ্গল হওয়াটা একটা বাইপ্রোডাক্ট। সন্ন্যাসীরা যে কাজই করুন না কেন, তাঁরা কখনই অপরের মঙ্গল হবে ভেবে কিছু করেন না, কিন্তু বাইপ্রোডাক্ট হিসাবে চারজনের মঙ্গল হয়। লোকের মঙ্গল করা উদ্দেশ্য না। সন্ন্যাসীরা স্কুল চালাচ্ছেন, হাসপাতাল চালাচ্ছেন, তাঁরা যদি মনে করেন এতে আমি চারজনের মঙ্গল করছি, তাহলে বুঝতে হবে, তুমি সংসারীদের মতই ডুবে গেলে। সন্ন্যাসীকে কাজ করতেই হবে, যদি না করে তাহলে তাঁর মঙ্গল হবে না।

স্বামীজীর ৯ই জুলাইয়ের লেকচারের আলোচনায় আমরা খুব নামকরা মহারাজ স্বামী সারদেশানন্দজীর নাম উল্লেখ করেছিলাম। তিনি গোপেশ মহারাজ নামে সবার কাছে পরিচিত ছিলেন। খুব উচ্চমানের তপস্বী সাধু ছিলেন, সারা জীবন তপস্যা করে গেছেন। তিনি বিভিন্ন আশ্রমে চলে যেতেন, বেশ কিছু দিন থেকে ওখানে তপস্যা করতেন, আর হঠাৎ হঠাৎ করে আশ্রমের মহন্তকে বলতেন, দেখো আমার ভিতরে একটু রজোগুণ জেগে গেছে, আমাকে এই রজোগুণটা বার করার জন্য কাজ করতে হবে। উনি তারপর কোদাল, খুরপি নিয়ে আশ্রমের কোন ফাঁকা জমিতে চাষ করতে নেমে যেতেন। মহন্তকে আবার বলে দিতেন, তোমার যখন দরকার হবে তখন এই গাছগুলো তুমি কেটে দিও, আমাকে রজোগুণটা বার করতে হবে তাই এই কাজ করছি, আমি করেছি বলে রেখে দিতে হবে না। ভাল ফসল হওয়াটা বাইপ্রোডাক্ট, ওনার উদ্দেশ্য তা নয়, উদ্দেশ্য হল, রজোগুণের আবর্জনাটা পরিষ্কার করা। মনের চাঞ্চল্য কর্ম দিয়েই যায়। মানুষ যদি জেনে যায়, আমি যা কিছু করছি, চাকরি করছি, রান্না করছি, সন্তান লালন-পালন করছি, আমার ভিতরে যে বিষ জমে আছে, এই বিষকে বার করছি, আমার উদ্দেশ্য আত্মজ্ঞান। কাজ করে আমি কোন সুবিধা পাব এই আশা নিয়ে কাজ করছি না, আমি আমার আত্মজ্ঞানের দিকে এগিয়ে যাবার জন্য কাজ করছি।

স্বামীজী বলছেন, Neither desire pleasure nor fear pain from work. (*কর্ম থেকে সুখের আকাঙ্ক্ষাও করো না; আবার করলে কষ্ট হবে –এ ভয়ও করো না।*) কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা করে যে আমি কাজ করছি তাও না, আবার কর্ম করলে অনেক পরিশ্রম হবে, পরিশ্রম হলে শরীরের কষ্ট হবে, ঝামেলা হবে, সেই ভয়েও কাজ করা থেকে বিরত থাকছি না। ফল পেলে আমার যে আনন্দ হবে, সেটার দিকেও আমার দৃষ্টি নেই, আর কাজ করতে গেলে যে কষ্ট, সেটার দিকেও দৃষ্টি নেই – এটাকে বলে নিষ্কাম কর্ম। মানুষ ফাঁকি মারে কেন? কাজ করতে গেলে খাটতে হয়। আর মানুষ কাজ করে কেন? কাজের ফল আনন্দ দেয়। এই দুটোই তোমাকে ছাড়তে হবে। স্বামীজী বার বার বলছেন, Avoid not seek not; কোন কিছু ছাড়বেও না, কোন কিছুকে ধরতেও যাবে না। এই জন্য ধরতে যাবে না, কারণ ওর ফল তোমাকে আনন্দ দেয়। কাজ করা ছেড়ে দিই কেন? কারণ কাজ করাটা আমাদের কষ্টদায়ক।

It is the mind and body that work, not I. Tell yourself this unceasingly and realize it. Try not to know that you work. (*দেহ-মনই কাজ করে থাকে, আমি করি না। সদাসর্বদা নিজেকে এই কথা বলো এবং এটি প্রত্যক্ষ করতে চেষ্টা কর। চেষ্টা কর –যাতে তোমার বোধই হবে না যে, তুমি কিছু করছে।*) জানবে কাজ শরীর করে, ইন্দ্রিয় করে, মন করে, জানবে কাজ করতে যে শক্তির দরকার তা প্রাণ যোগান দেয়; তুমি শুদ্ধ আত্মা, তুমি কি করে কাজ করবে! আমি শুদ্ধ আত্মা, আমি কখন কাজ করি না, আমি কখন কাজ করবও না, এই কথা নিজের মনকে দিনরাত বলতে থাকো, দিনরাত এই কথা বলতে বলতে পুরো শরীর মনে ছড়িয়ে যাবে গীতার সেই বাণী, *ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ,* ইন্দ্রিয়গুলি তাদের বিষয়ের উপর কাজ করে যাচ্ছে। আমি যখন কোন কিছু দেখছি, তখন চোখ দিয়ে দেখছি। এই চোখের আবার স্বাভাবিক attachment রয়েছে দৃশ্যের উপরে। ফলে চক্ষু ইন্দ্রিয় স্বাভাবিক ভাবেই দৃশ্যের দিকে ধাবিত হয়। আমি কোথাও যাই না।

স্বামীজী বলছেন, Tell yourself this unceasingly, যে কোন কাজ করছি, সব সময়, অবিরত ভাবে এই বোধটা মনে রাখা, আমি কিছু করছি না, ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ের বস্তুর উপর কাজ করছে। আর সেখান থেকে একটা ধাপে এমন নিয়ে আসতে হবে যে, Try not to know that you work, আমি কাজ করছি,

এই ভাব থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আমাদের সব সময় এই ভাবটাই থাকে, আমি করছি। যদি এই ভাব না আনা যায়, তখন ভক্তি ভাব নিয়ে আসতে হয়। ভক্তি ভাবকে আচার্য শঙ্কর খুব সুন্দর বিশ্লেষণ করে বলছেন, *অহং কর্তা ঈশ্বরায় ভৃত্যবৎ করোমি*। যারা ওই ভাবটা সরাতে পারে না, তারা ভাববে এই কাজের আমি কর্তা, কিন্তু আমি ঈশ্বরের জন্য চাকরের মত কাজ করছি। তার মানে, আমিত্বটা সেখানেও থাকছে না। যারা কর্মকে কর্মযোগে নিয়ে যেতে চায়, তাদের উদ্দেশ্য একটাই, আমিত্বের নাশ, সাংসারিক ভাবের নাশ। সাংসারিক ভাব মানেই হয়, আলস্যের জন্য কাজ না করা, লোভের জন্য কাজ করা। আলস্য ত্যাগ করে কাজে লেগে থাকা, আর কাজ করে যে ফল পাবো, তাতে যে আনন্দ হবে, এই আনন্দ পাওয়ার লোভকেও ত্যাগ করা। স্বামীজী তাই বলছেন, এটা মাথায় সব সময় রাখার চেষ্টা করবে, তুমি কাজ করছ না। কথামৃতে এই ভাব নিয়ে অনেক কথা আছে আর শাস্ত্রেও আছে। এই ভাবকে সব সময় আমরা ধরে রাখতে পারি না ঠিকই, না পারারই কথা, আধ্যাত্মিক পথ, ধর্মজীবন যাপন করা তো সহজ কিছু নয়। কিন্তু লেগে থাকতে হয়, লেগে থাকতে থাকতে ওই ভাব ধীরে ধীরে ভিতরে বসতে থাকে।

এখানে স্বামীজী কর্মযোগ নিয়ে একটা কথা বলছেন। এই কথাটাকে ধরার আগে আবার একটা আলোচনা করে নেওয়া দরকার। একটা শব্দ আমরা প্রায়ই শুনে থাকি, অনুবাদ, আবার অনেক সময় বলা হয় ভাবানুবাদ। ইংরাজীতে বলছেন, translation আর trancreation। আমরা এর একটা নূতন শব্দ দিতে পারি, নূতন শব্দটা হল – cultural transference। Transference শব্দটা সাইকলজি থেকে আসে, যার অর্থ হল একটা ভাব এক জায়গা থেকে তুলে, সেই ভাবকে যখন আরেকটা জায়গায় চাপিয়ে দেওয়া হয়। সাত আট বছরের একটা ছেলে তার বাবাকে খুব ভালবাসত। ছেলেটির কম বয়সেই বাবা মারা যায়। পনের কুড়ি বছরে সেই ছেলেটি এখন বড় হয়ে গেছে। হঠাৎ একজন ভদ্রলোককে দেখে ছেলেটির মনে হল ওর বাবার সাথে ভদ্রলোকের অনেক কিছুর মিল আছে। জামা পরার স্টাইলে, হাঁটাচলার স্টাইলে, অনেক মিল আছে। হঠাৎ ছেলেটির তার বাবার প্রতি যে ভাব, সেই ভাব পুরোটা নেমে বেরিয়ে সেই লোকটার প্রতি গিয়ে পড়ল। বিশেষ করে যাদের মনে প্রচুর দুঃখ থাকে, তাদের মধ্যে এই জিনিসটা খুব বেশি হতে দেখা যায়। কাউকে ভালবাসত, সে ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে, বা যাকে ভালবাসত, সে মরে গেছে। হঠাৎ কারুর সাথে তার ভালবাসার জনের কোন একটা মিল, নামের মিল, হাসির মিল, মুখের মিল, কোন একটা মিল যদি সে দেখতে পায়, পুরো ভাবটা গিয়ে এবার ধুপ্ করে ওর উপর গিয়ে পড়ল।

ওরহান্ পামুরের বিখ্যাত বই 'My Name is Red', যে বই তাঁকে নোবেল প্রাইজ এনে দিয়েছে, সেই বইয়ের যে প্রধান চরিত্র সে একটা মেয়েকে ভালবাসত, কিন্তু বিয়ে হবে না। তার জন্য যেখানে যেখানে যত মেয়ের সাথে তার আলাপ হতে লাগল, সবাইকে ভালবেসে যাচ্ছে। এই জিনিসটার জন্য সাহিত্যে অনেকগুলো শব্দ আছে, কিন্তু সাইকলজিতে সাধারণ ভাবে এটাকে বলে, transference। এমন কিছু একটা মিল থাকে, যেখানে এই ভাবটাকে নিয়ে গিয়ে পুরোটা ঢেলে দিল। যাঁরা শাস্ত্রাদি ভাল জানেন, স্বামীজীর বাণী ও রচনাবলী পড়া থাকলে তাঁরা দেখে থাকবেন যে, স্বামীজী একজন ঋষি; কারণ স্বামীজীর মুখ থেকে যে কথা বেরোচ্ছে সেটাই বেদ। এর মধ্যে অনেকগুলো কথা স্বামীজীর নিজের। স্বামীজী মানবজাতিকে অনেক কিছু দিয়ে গেছেন, যেগুলো একেবারে তাঁর নিজস্ব। কিন্তু তাঁর বেশির ভাগ কথাই হল, শাস্ত্রের কথাগুলোকে নিয়ে তিনি নিজের মত করে বলা। এই রকমই একটা খুব নামকরা কথা হল, Arise awake and stop not till the goal is reached। কঠোপনিষদের বিখ্যাত মন্ত্র *উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত* স্বামীজী এর ইংরাজী অনুবাদ করলেন Arise awake and stop not till the goal is reached। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত এর সাথে Arise awakeএর এত মিল রয়েছে যে আমরা সহজেই বুঝে নিতে পারি। কিন্তু stop not till the goal is reached, এটা কিন্তু মন্ত্রে নেই। মন্ত্রে আছে প্রাপ্য বরান্ নিবোধত, ওঠ জাগো এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুকে লাভ করে সেই আত্মাকে প্রাপ্ত হওয়ার চেষ্টা কর। কিন্তু স্বামীজী পুরো পাল্টে দিলেন।

পাল্টে দেওয়াতে অনেকগুলো জিনিস হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বক্তব্যটা সেই একই থাকছে। তোমার আত্মার শক্তিকে জাগাও, তুমি ভিতরে কোথাও নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে আছ। স্বামীজী বেদান্তের কথাই বলছেন, বেদান্তের কথা বলতে গিয়ে উপনিষদের কথা বলছেন, আর বার বার বলছেন সমস্ত শক্তি উপনিষদে। ভারতের

বিবেকানন্দ গ্রন্থে, যেখানে স্বামীজীর ভারতের বিভিন্ন জায়গার বক্তৃতাগুলিকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, সেখানে তিনি বার বার বলছেন, go back to Upanishad, আর বলছেন মাভৈঃ মাভৈঃ। স্বামীজী বলছেন, উনি সব উপনিষদ থেকেই নিচ্ছেন। কিন্তু উপনিষদের বেশির ভাগ কথাই তাদের জন্য, যারা আধ্যাত্মিক ভাবে এগোতে চাইছেন। ওই কথাগুলিকেই স্বামীজী যখন নিজের মত করে বলছেন, তখন কথাগুলি সবারই জন্য হয়ে যাচ্ছে। যেমন *উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধিত*, এই মন্ত্র আধ্যাত্মিক সাধকদের জন্য, এটাকেই স্বামীজী যখন বলছেন, Arise awake and stop not till the goal is reached, তখন এটা একজন ছাত্রের জন্যও প্রযোজ্য হয়ে যাচ্ছে, একজন গৃহবধূর জন্যও প্রযোজ্য হয়ে যাচ্ছে, একজন ফিল্মস্টার, একজন রাজনৈতিক কর্মির জন্য প্রযোজ্য, ভারতে প্রযোজ্য, পাকিস্থানে প্রযোজ্য, সার্বজনীন একটা সত্য হয়ে গেল। অথচ এর মূল উৎস রয়েছে কঠোপনিষদে। স্বামীজী কঠোপনিষদের এই মন্ত্রের অনুবাদ করছেন না, ভাবানুবাদও করছেন না, কারণ ভাবানুবাদ হলে গুরু আর আত্মজ্ঞান থাকবে। এখানে গুরুর কোন স্থানই থাকছে না। আর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের কথা কিছু বলছেন না, সবার জন্য এই বাক্য প্রযোজ্য।

তেমনি স্বামীজীর আরেকটি খুব বিখ্যাত উক্তি – Education is the manifestation of the perfection already in man, এটা তিনি নিচ্ছেন সরাসরি *সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে* এই মন্ত্র থেকে, উপনিষদের খুব নামকরা কথা, বিদ্যা সেটাই যে বিদ্যা মুক্তি প্রদান করে। মুক্তিকে স্বামীজী বলছেন, perfection, মুক্তি শব্দের জন্য স্বামীজীর এটা খুব favorite term ছিল। মুক্তিকে উনি বলতেন freedom, freedomকে বলতেন perfection। আবার যেমন বলছেন, Each soul is potentially divine, এটাও তিনি সরাসরি নিচ্ছেন *অয়মাত্মা ব্রহ্ম* এই মন্ত্র থেকে। এই ধরণের স্বামীজীর প্রচুর কথা আছে, যেগুলোকে আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে স্বামীজীর নিজের কথা, কিন্তু নিজের নয়, সরাসরি উপনিষদ থেকে নিয়ে আসছেন। কিন্তু উপস্থাপনাটাই পুরো আলাদা, কোন মিল নেই। এখন অনেক সময় স্বামীজী যেখানে ভাষণ দিচ্ছেন বা ক্লাশ নিচ্ছেন, কোথাও তিনি অনুবাদ করে বলছেন, যেমন রাজযোগে তিনি পতঞ্জলির সূত্রগুলিকে অনুবাদ করছেন। বক্তৃতা দেওয়ার সময় কোথাও ভাবানুবাদ করে বলছেন, কিন্তু স্বামীজীর বিশেষত্বই হল transference, এটা যদিও সাইকলজির একটা শব্দ, আর সাইকলজিতে যে অর্থে নেওয়া হয়, এখানে ঠিক সেই অর্থে নয়। স্বামীজী এখানে যেটা বলছেন, এগুলো তিনি যে সোর্স থেকে নিয়েছেন, তার সাথে অতটা মিলবে না, কিন্তু আবার মিলছে না তাও না। এটা ঠিক বাবা ও ছেলের যে উদাহরণ দেওয়া হল, একেবারেই যে মিলছে না, তাও না, নব্বই শতাংশ মিলছে, তাও না, হয় এক শতাংশ মিলছে, ভাবটা কিন্তু একই থেকে যাচ্ছে। বাবাকে যে রকম ভালবাসত, এই লোকটাকেও ঠিক সেইভাবে ভালবাসছে, অর্থাৎ ভাবটা একই থাকছে। স্বামীজীর ভাষণগুলিতে এর একটা সাংঘাতিক প্রভাব আছে ঠিকই। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রের সাথে স্বামীজীর কথাগুলোর সংযোগ থাকে, তখন অনেক সময় মনে হয় স্বামীজী যেন নিজের মত করে বলছেন। কিন্তু সব সময় স্বামীজী যে নিজের মত বলছেন, তা না। এখানেও স্বামীজী যে কর্মযোগের কথা বলছেন, এই কথাগুলির সাথে গীতার তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ের বিরাট মিল পাওয়া যাবে, বিশেষ করে তৃতীয় অধ্যায়ের সাথে। কিন্তু তিনি নিজের মত বলেছেন, মূলটা এক থেকে যাচ্ছে। কিন্তু মূলের উপর যে আইডিয়াস গুলির নৃত্য, creativityর যে নৃত্য, সেটা পুরো আলাদা। সেইজন্য অনেক জায়গায় এগুলোর উপর ব্যাখ্যাটা একটু বেশি করতে হয়। স্বামীজী এবার বলছেন।

Do all as a sacrifice of offering to the Lord. (*সমুদর কর্ম ভগবানে অর্পণ কর।*) এর আগের অনুচ্ছেদে স্বামীজী বলেছিলেন, To give up work before you know, leads to misery. Work done for the Self gives no bondage, এর উপর আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। পরের লাইনে বলছেন, Be in the world, but not of it, like the lotus leaf whose roots are in the mud but which remains always pure. (*সংসারে থাকো, কিন্তু সংসারের হয়ে যেও না –যেমন পদ্মপত্রের মূলগুলি পাঁকের মধ্যে থাকে, কিন্তু পত্রটি সদাই শুদ্ধ থাকে।*) এখানে আবার নিয়ে আসছেন পঞ্চম অধ্যায় থেকে, *পদ্মপত্রমিবাম্ভসা*। স্বামীজী এখানে যে কথাগুলি বলছেন, আর গীতাতে কর্মযোগ নিয়ে ভগবান যে কথা বলছেন, এগুলোকে যদি আমরা সামনে সাজিয়ে রাখি, তাহলে মোটামুটি চার রকমের কর্ম দাঁড়াবে। এই চার রকম কর্মকেই কর্মযোগ বলা হয়। প্রথম হল জ্ঞানমার্গের কর্ম, যেখানে আমরা বলছি, কাজ কর কিন্তু

ফলের চিন্তা করবে না, এটাই অনাসক্ত কর্ম। অনাসক্ত কর্ম জ্ঞানমার্গের সাধনা হয়ে গেল। ভক্তিমার্গে হল, কাজ কর, কাজের সব ফল ঈশ্বরে সমর্পণ করে দাও। তৃতীয় হল, পূর্বমীমাংসকরা বলেন, আমাদের মত হল যজ্ঞাদি দিয়েই সব কিছু পাওয়া যায়; আর যজ্ঞে যত মন্ত্রের ব্যবহার করা হয়, সেই মন্ত্র দিয়ে দেবতাদিদেরও নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

ঠিক এই ভাবের উপর আধার করে মহাভারতে একটা সুন্দর কাহিনী আছে, পরীক্ষিৎ তক্ষকের দংশনে মারা গেলেন। পরীক্ষিতের ছেলে জনমেজয় পিতার মৃত্যুকে সহজে মেনে নিতে পারল না, ঠিক করল আমি সর্পযজ্ঞ করে জগতের সব সর্পের বিনাশ করে দেব। তক্ষক ভয়ে ইন্দ্রের অঙ্গবস্ত্রের মধ্যে লুকিয়ে গেল। জনমেজয় ব্রাহ্মণদের বললেন, ইন্দ্র সমেত তক্ষককে নামিয়ে নিয়ে আসুন। হঠাৎ ইন্দ্র দেখছেন স্বর্গ থেকে তিনি সোজা যজ্ঞের অগ্নিকুণ্ডে পতিত হয়ে যাচ্ছেন। তখন ইন্দ্র তাড়াতাড়ি করে নিজের অঙ্গবস্ত্রটা ফেলে দিলেন। দেবতারা কেমন হয় মহাভারত দেখাচ্ছেন, তাঁদের কাছে আশ্রয় নিলে কি দুরবস্থা হয়, তক্ষকের অবস্থা দেখেই বোঝা যায়। সেইজন্য কখন বড়লোকদের আশ্রয় নিতে নেই। আশ্রয় একমাত্র ভগবানের কাছেই নিতে হয়, হাজার বিপদ এলেও তিনি কখনই ছেড়ে পালাবেন না। গীতা পূর্বমীমাংসকদের এই যজ্ঞকে নামিয়ে দিলেন কর্মযোগে, যা কিছু তুমি সারাদিন ধরে করে যাচ্ছ, যে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছ, সব কিছু যজ্ঞ রূপে কর। *অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে*, এই যে নিঃশ্বাস ভিতরে নিচ্ছ, আহুতি দেওয়া হচ্ছে, এটাও যজ্ঞ; খাচ্ছ, এটাও যজ্ঞ; পড়াশোনা করছ, এটাও যজ্ঞ; দান করছ, এটাও যজ্ঞ।

আর চতুর্থ হল, যেটা একটু বোঝা মুশকিল, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে একটা কর্মযজ্ঞ চলছে। যেমন ভগবান যে সৃষ্টি করছেন, এটাও একটা কর্ম, এটাও একটা যজ্ঞ। সমস্ত সৃষ্টির মূল যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত, তৃতীয় অধ্যায়ে বলছেন, *কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্। তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্।।* এই যজ্ঞ আমরা বেদ থেকে জানি, সেইজন্য সমষ্টি কর্ম যে চলছে, এর বিরুদ্ধে যেতে নেই, নিজেকে এর মধ্যে ছেড়ে দিতে হয়। সেইজন্য কর্ম থেকে কখন বিরত হতে নেই। মোটামুটি এই একটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে সমষ্টি কর্মের কথা বলছেন, যজ্ঞ রূপে কর্মের কথা বলছেন, ত্যাগ রূপী কর্মের কথা বলছেন আর ভক্তি রূপে কর্মের কথা বলছেন। স্বামীজী এখানে যে বলছেন, কর্ম ত্যাগ করবে না, জগতে পদ্মফুলের মত থাক, ইত্যাদি, তার সাথে যে কথাগুলো বলছেন, যেটা আগে আলোচনা করা হল আর এখন যেটা বলছেন, Do all as a sacrifice or offering to the Lord, যজ্ঞ রূপে কর, নাহলে পূজা রূপে কর, তাও যদি না সম্ভব হয়, অনাসক্ত রূপে কর। এগুলোকেও যদি ছেড়ে দাও, তাহলে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে যে এক বিরাট কর্মযজ্ঞ চলছে, সেই কর্মযজ্ঞের সাথে নিজেকে এক করে দাও। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের অবস্থান কালে একজন সাধুবাবা এসেছিলেন, তিনি সকাল থেকে শুধু গাছপালা, ঘরবাড়ি, গঙ্গা, আকাশের দিকে তাকাচ্ছেন আর বলে যাচ্ছেন, বাঃ কেয়া সৃষ্টি হ্যায়। আবার ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে বড় বড় গাছগুলিতে যে ফুল ফুটে আছে, সেই ফুলের দিকে তাকিয়ে বলছেন, বিরাটের পূজায় ফুলের অর্ঘ্য দেওয়া হয়েছে। জগতে যা কিছু চলছে, মহাজাগতিক স্তরে একটা কর্ম চলছে, এই ভাবটাকে নিয়ে নিজেকে ওই কর্মের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া।

গীতায় মোটামুটি এই চার রকম কর্মের কথা বলা হয়েছে। স্বামীজী এখানে তার মধ্যে তিনটের উপর বলছেন। প্রথমটায় বলছেন, কাজ তোমাকে করতেই হবে, কাজ যদি না কর তাহলে কিন্তু তোমার জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠবে। এর উপর আমরা বিরাট আলোচনা করেছি। এখানে বলছেন, হয় তুমি যজ্ঞ রূপে সমস্ত কর্ম কর আর তা নাহলে ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কর্ম কর, যা কিছু করছি ঈশ্বরকে তার সব ফল অর্পণ করে দিচ্ছি। বেদে তো আছেই, উপনিষদ আদিতেও আছে, আসলে উপনিষদ সবার সামনে বলা হত না, সবাইকে পড়তে দেওয়া হত না, তাতে বলছেন – পুরুষ নারীর যে সম্পর্ক সেটাকেও যজ্ঞ রূপে নেওয়া হয়। সাধারণ মানুষ এগুলো বুঝতে পারে না, অসৎ লোক, বিষয়ী লোকের হাতে এসব জিনিস গেলে নিন্দা করার পাঁচটা কারণ বার করে নেবে। অপাত্রের হাতে উচ্চ ভাবনা, উচ্চ আদর্শ চলে গেলে সব ভুলভাল হয়ে অপপ্রয়োগ হয়ে জগতে অমঙ্গল ডেকে আনা ছাড়া আর কিছু হবে না। ভারতবর্ষে যা কিছুই করা হত, সবটাই যজ্ঞ রূপে করা হত, ছোটবেলা থেকে সেভাবেই ট্রেনিং দেওয়া হত। আমাদের কাছে জাগতিক, সাংসারিক বলে কিছু নেই, যা কিছু করা হবে সবটাই যজ্ঞ। পদ্মফুল পাঁকে থাকলেও সব সময় সে পবিত্র।

পবিত্রতা, অপবিত্রতা সব আমাদের ভিতরে - সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শন

এই কথা বলার পর স্বামীজী বলছেন, Let your love go to all, whatever they do to you. (*লোকে তোমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করুক না কেন, তোমার ভালবাসা যেন কারও প্রতি কম না হয়।*) এটাই কর্মযোগ। হিন্দু ধর্ম হল inclusiveness, সবাইকে নিয়ে চলে। জীবনের উদ্দেশ্য সাফল্য পাওয়া না, জীবনের উদ্দেশ্য বড়লোক হওয়া না। শাস্ত্র আমাদের শিখিয়ে দেয় বুদ্ধ কিভাবে হওয়া যায়, যীশু কিভাবে হওয়া যায়, রামকৃষ্ণ কিভাবে হওয়া যায়, অর্থাৎ কিভাবে তোমার সমস্ত মনটা ঈশ্বরে লাগিয়ে রাখবে। বিল গেটস্ কিভাবে হওয়া যায়, কোন বই শেখায় না, কারণ বই পড়ে আজ পর্যন্ত কেউ বিল গেটস্ হয়নি। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দশজন বড়লোক যাঁরা আছেন, তাঁদের কেউই ম্যানেজমেন্ট গ্রাজুয়েট না। যারাই বই লিখছে, লেকচারে বলে দিচ্ছে, How to be successful in life ইত্যাদি, এরা সবাই লোককে বোকা বানাবার বিদ্যাটা রপ্ত করে নিয়েছে। কারণ লোকেরা আকৃষ্ট হয়ে কিনবে, কিনে পড়বে, কিন্তু শিখবে কিছুই না, সম্ভবই না। মাঝখান থেকে এদের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স বাড়বে। কারণ কর্ম করাটা শেখানো যায়, ফল পাওয়াটা কারুর হাতে নেই। কর্ম করা মানেই, কর্ম করার সাথে কত লোকের সাথে আমরা জড়িয়ে যাচ্ছি, কত লোককে আমি আমার মধ্যে জায়গা করে দিতে পারছি। সেই কর্মের ফল মানেই হল, যেটা শুধু আমিই ভোগ করব। সেইজন্য কোন শাস্ত্র কখনই শেখায় না, তুমি কিভাবে exclusive হবে। যারা শেখাচ্ছে, তারা বোকা বানাচ্ছে, কারণ exclusiveness জীবনধারার বিপরীতে যায়। সবাইকে ভালবাসা, এটাই জীবনধারা। যার জন্য যীশু ক্রুশিফাই হচ্ছেন আর তখনও বলে যাচ্ছেন, প্রভু তুমি এদের ক্ষমা কর, এরা জানে না কি করছে। যারা আমার ক্ষতি করছে, আমাকে যারা সহ্য করতে পারে না, তাদেরকেও ভালবাসা, এটাই জীবনের উদ্দেশ্য। এই কথাগুলো আমরা শুনে যাচ্ছি ঠিকই, কিন্তু মন একটু অনুভূতিপ্রবণ না হলে, এই কথাগুলোকে গ্রহণ করা মুশকিল। বিশেষ করে এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের বলতে গেলে কিছুই বুঝবে না। খবরে দেখা গেল, তামিলনাড়ুর এক জায়গায়, বাবা মেয়ের জন্মদিনে স্মার্টফোন কিনে দেয়নি, মেয়েটি গিয়ে আত্মহত্যা করে নিয়েছে। বাবা একজন দিনমজুর, কোথায় পয়সা পাবে স্মার্টফোন কেনার। এই হল মানসিকতা, এতটুকু sensitivity ছেলেমেয়েদের মধ্যে জন্মাচ্ছে না। মরে গিয়ে সে কার ভাল করল। যদি হিন্দু হয়, হিন্দু ধর্মে যদি বিশ্বাস থাকে, তাহলে মরে গিয়ে এখন প্রেতযোনিতে যাবে। বাবা-মা যত দিন বেঁচে থাকবে শুধু হা হুতাশ করবে। কেন সে এই কাজ করল, শুধু সে চাইছে আমি exclusive হব, আমি এই, আমার স্মার্টফোন চাই। সীতা বললেন আমার সোনার হরিণ চাই, হয়ে গেল এক লঙ্কাকাণ্ড, exclusive হয়েছে কি মরেছে, একেবারে সহজ ব্যাপার। কিন্তু আমাদের স্বভাবই এমন যে, আমরা এর থেকে বেরোতে পারি না। মহাপুরুষরা এসে, অবতার পুরুষরা এসে আমাদের এই শিক্ষাই দেন – Don’t be exclusive, love all, যে তোমার ক্ষতি করছে, যে তোমাকে সহ্য করতে পারছে না, যে তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে তাকেও ভালবাসো, সবারই জন্য তোমার মনের দরজা খুলে রাখো। কিন্তু আমরা পারি না।

A blind man cannot see colour, so how can we see evil unless it is in us. (*যে অন্ধ, তার রঙের জ্ঞান নেই; আমার নিজের ভিতর দোষ না থাকলে অপরের ভিতর দোষ দেখব কি করে?*) চোখ দুটো অন্ধ, সেইজন্য সে রঙ দেখতে পারে না। ভিতরটা বন্ধ, সেইজন্য বাইরেরটা দেখতে পারছে না। ভিতরে আমার যে জিনিসের বোধ আছে, সেই জিনিসকেই আমি বাইরে দেখি। আমার ভিতরে গোলমালের বোধ আছে তাই বাইরেও আমি গোলমাল দেখছি। এগুলো শুনলে আমরা অবাক হয়ে যাই, বিশ্বাস হতে চায় না। ঠাকুরের গর্ভধারিণীর একটা ঘটনা আছে। একদিন একজন এসে মাকে বলছে, ‘আরে ও তোমাকে মিথ্যে কথা বলেছে’। ঠাকুরের মা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করছেন, ‘মিথ্যে মানে কি’? উনি জানেনই না মিথ্যা জিনিস বলে কিছু আছে। তিন চার বছরের বাচ্চাকে যে শব্দই বলা হোক, ও বুঝতে পারবে না, তারাও তাই জানে না মিথ্যা জিনিসটা কি। কারণ এখনও তার মিথ্যার বোধটা আসেনি। আমাদের training process এমন, আমরা ওকে মিথ্যা কি জিনিস শিখিয়ে দিই, চুরি কি জিনিস শিখিয়ে দিই, তারপর আমরা বলি, সৎ হও। বাচ্চাদের প্রথমে শেখানো হয়, how to walk আর how to talk। কয়েক দিন পরেই শেখানো হয়, চুপ করে বসো, তার মানে হাঁটা চলবে না, কথা বলা চলবে না।

স্বামীজী এটাই বলছেন, দোষ আমাদের ভিতরে আছে বলে আমরা অপরের দোষ দেখি। ভাল-মন্দ যা কিছু আছে, সব আমাদের ভিতরেই আছে। সেইজন্য ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতে হয়। অশান্তি বাইরে নেই, অশান্তি আমাদের ভিতরে। যাদের ভিতরে অশান্তি, তারা বাইরেও অশান্তি দেখে। যে দেশের নেতারা বিশ্বশান্তি নিয়ে বড় বড় কথা বলে, দেখা যাবে তারা সব থেকে বেশি অশান্ত দেশ। যারা শান্তির উপদেশ দিয়ে যাচ্ছে, তারা সব থেকে বেশি অশান্ত, শান্তি বাইরে কোথাও নেই, শান্তি ভিতরে। যারা বেশি সম্প্রীতি ও সহিষ্ণুতার কথা বলে, তাদের ভিতরেই প্রচণ্ড অসম্প্রীতি ও অসহিষ্ণুতার ভাব। যেসব জিনিসের কথা আমরা অল্প বয়সে কোন দিন শুনিনি, কল্পনাই করে পারতাম না, যত আমরা বড় হচ্ছি, আজকে দেখছি সেই জিনিসগুলিই এখন জলভাত হয়ে গেছে; মুখে সেই কথাগুলো আবার বলাও যায় না।

ঠাকুরের কাছে সেইজন্য প্রার্থনা করতে হয়, হে ঠাকুর এই যে আমি অপরের মধ্যে দোষ দেখছি, এই দোষদৃষ্টিটা যেন আমার চলে যায়। কর্মযোগ মানেই, act is seen as act, আমরা যখন জিনিসটাকে দেখি তখন আমরা আমাদের যে বিচার, সেই বিচারকে লাগিয়ে দেখি। মন মানেই, সে নিজের judgment লাগিয়ে দেবে। কর্মযোগ যিনি করছেন, যিনি যোগী, যিনি সবাইকে ভালবাসেন, তিনি কাজকে কাজ রূপে দেখেন। পাড়ার ছেলেরা বদমাইশি করছে, একজন এসে বলবে, ছেলেগুলো কি বদমাইশ হয়ে গেছে। তার মা বলবে, এই বয়সের ছেলেরা এ-রকম একটু দুষ্টুমি করেই থাকে। মায়েদের কাছে এটা স্বাভাবিক। যেখানে ভালবাসা সেখানে এক রকম দেখি, যেখানে ভালবাসা নেই সেখানে আরেক রকম দেখি। ভিতরে বদ মতলব থাকলে এক রকম দেখি, বদ মতলব না থাকলে আরেক রকম দেখি। নদীর ধারে একজন লোক ভোরবেলা শুয়ে আছে, যে মাতাল সে ভাবছে ব্যাটা প্রচুর মদ খেয়ে এখানে উল্টে আছে। যোগী মনে করছে, সারা রাত ধ্যান করে এখন ঘুমিয়ে পরেছে। যার মনে যেমন ভাব, সে তেমনই জগৎকে দেখবে।

বলছেন, We compare what we see outside with what we find in ourselves and pronounce judgment accordingly. (*আমরা আমাদের নিজেদের ভিতর যা রয়েছে, তার সঙ্গে বাইরে যা দেখতে পাই, তার তুলনা করি এবং তদনুসারেই কোন বিষয়ে আমাদের মতামত দিয়ে থাকি।*) যে জিনিস আমাদের ভিতরে রয়েছে, বাইরে যখন কিছু দেখি, তখন তার বিচার আমরা আমাদের ভিতরের ওই জিনিসগুলি দিয়েই করে থাকি। বেদান্তে বলা হয় উপমানও একটা প্রমাণ, তুলনা করে করে একটা জিনিসকে জানা। উপমান প্রমাণের উপর আমরা এর আগেও অনেকবার আলোচনা করেছি। যেমন, আমি চিড়িয়াখানায় এসেছি, আমি আগে কখন সিংহ দেখিনি; কিন্তু একজন আমাকে বলে দিয়েছে সিংহ দেখতে এই রকম, বেড়ালের মত লম্বা বড়, মুখটা হাঁড়ির মত, গায়ের রঙ হলুদ, ঘাড়ে লম্বা লম্বা লোম ইত্যাদি কিছু কিছু জিনিস বলে দেওয়া হয়েছে যা দিয়ে সিংহের ব্যাপারে একটা জ্ঞান হয়েছে, সত্যিকারের সিংহ যখন দেখছি, তখন দেখে মনে হচ্ছে ও এটাই তাহলে সিংহ। উপমানে ভুলও হতে পারে, একই রকমের অন্য জিনিস যদি থাকে, ওই জায়গাতে ভুল হয়ে যাবে। বাজে জিনিস দেখার ক্ষেত্রেও আমাদের তাই হয়। আমাদের ভিতরে যে নোংরা জিনিসগুলো আছে, সেই নোংরা জিনিসগুলো আমরা বাইরেও দেখি। আমার ভিতরে যে গোলমাল আছে, আমার সামনের লোকটার ভিতরে যে ঠিক সেই রকম গোলমাল থাকবে তাতো নয়; কিন্তু বাকিটা আমরা কল্পনা করে ওখানে বসিয়ে দিই। স্বামীজী এটাই বলছেন, বাইরে একটা কিছু দেখলাম, দেখার পর আমার ভিতরে যা ভাব আছে ওই ভাব দিয়েই সেটাকে বিচার করতে শুরু করে দিই, বিচার করার পর সেই অনুসারেই আমরা একটা judgment দিয়ে দিলাম।

যীশুও বাইবেলে বলছেন, Judge not that you will be judged, অপরকে বিচার করতে যেও না, আগামীকাল তোমাকেও কেউ বিচার করবে। যখনই আমরা কাউকে ভাল বলি বা মন্দ বলি বা যাই বলি, জানতে হবে, আমি যা সেটা দিয়ে আমি অপরকে মাপছি, সে কি সেটা বোঝা আমার পক্ষে কঠিন। যদি নাই করতে হয়, যীশুই আবার বলছেন, জগতে যখনই কারুর সাথে মিশবে, সব সময় হাঁ হাঁ না না করে যাবে, এর বাইরে আর কিছু interact করবে না। কিন্তু এগুলো হল খুব উচ্চমানের সাধু সন্ন্যাসীদের জন্য। কিন্তু আমাদের মত সাধারণ লোকেরা যখন সংসারে মেলামেশা করছি, তখন এই লেভেলে আমরা যেতে পারি না। তাহলে কি করতে হবে? তখন শুধু ভালটুকু দেখতে হয়। একটা হাসির গল্পে বলছে, একবার এক শেখজী কাঁঠাল খেতে

গিয়ে তার দাড়িতে কাঁঠালের আঠা জড়িয়ে যায়। শেষে এমন অবস্থা হল যে দাড়ি কামিয়ে ফেলতে হল। গ্রাম থেকে বেরিয়ে এবার যখন শহরের দিকে গেছে, গিয়ে দেখছে সবারই আমার মত দাড়ি কামানো। দেখেই বলছে, বাবাঃ সবাই দেখছি এখানে কাঁঠাল খায়। Wisdomএর প্রথম ধাপ হল, অপরকে বিচার করতে যেও না। দ্বিতীয়, তা সত্ত্বেও যদি বিচার এসে যায়, তখন তুমি ভালো করে বুঝে নাও যে, গোলমালটা তোমার ভিতরে আছে। তখন ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতে হয়, হে ঠাকুর আমার মধ্যে যে এই দোষদৃষ্টি রয়েছে, এটা যেন চলে যায়।

স্বামীজী বলছেন, If we are pure, we cannot see impurity. It may exist, but not for us. See only God in every man, woman and child; see it by the antorjyotis, ‘inner light’, and seeing that, we can see naught elese. (*যদি আমরা নিজেরা পবিত্র হই তবে বাইরে অপবিত্রতা দেখতে পাবো না। নরনারী, বালক-বালিকার ভিতর ব্রহ্মকে দর্শন কর, ‘অন্তর্জ্যোতিঃ’ দ্বারা তাঁকে দেখ; যদি সর্বত্র সেই ব্রহ্মদর্শন হয়, তবে আমরা আর অন্য কিছু দেখতে পাবো না।*) ভিতরে পবিত্রতা থাকলে তার দৃষ্টিতে কখনই কোথাও অপবিত্রতা আসবে না। সেইজন্য মানুষকে যদি আমরা মানুষ রূপে না দেখে ঈশ্বর রূপে দেখা শুরু করি, আসলে এগুলো একটা খেলা মাত্র, তখন সব কিছুই অন্য রকম হয়ে যাবে। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের শেষের দিকের বর্ণনা, তখন তিনি সব কিছুকে সচ্চিদানন্দ রূপে দেখছেন, তিনি বলছেন, ঢেউএর উপর যেন বালিশের খোল গুলো ভেসে যাচ্ছে। সেই সময় সিঁড়ির উপর লাটু মহারাজ গালে হাত দিয়ে বসে আছেন। ঠাকুর বলছেন, দেখিছ সেই তিনি গাল হাতে দিয়ে বসে আছেন। আমরা যদি খেলার ছলে, মজা করার জন্য ঠিক করে নিই, মাত্র পাঁচ মিনিট আমি সব কিছুকে ঈশ্বর রূপেই দেখব, বা ঈশ্বরের যে রূপ আমার ভাল লাগে সেই রূপে দেখব। সামনে যে বসে আছে, দেখছি ঠাকুরই বসে আছেন, ঠাকুরই ঘাড় নাড়ছেন, গালাগাল ঠাকুরই দিচ্ছেন। ঠাকুর তো দক্ষিণেশ্বরে গালাগাল দিতেনই, নরেনকেও পর্যন্ত গালাগাল দিতেন, হৃদয়রামের সাথে ঝগড়া শুরু হলে এমন গালাগাল দিতেন যে, যারা দেখত তারা বলত, এদের দুজন দুজনের সাথে কেউ আর কোন দিন কথা বলবে না; কিন্তু আবার কিছুক্ষণ পরেই দেখছে, দুজনে গলায় গলায় ভাব। পাঁচটা মিনিট মাত্র, এই পাঁচ মিনিট যা কিছু দেখব, সবটাই ঈশ্বর রূপে দেখব। বদমাইশি করছে, গালাগাল দিচ্ছে, তখনও ঈশ্বর রূপে দেখছি, লুচ্চররূপী নারায়ণ।

এরপর কি হবে? এরপর সময়টাকে আরও কিছুক্ষণ টানা হল, তখন ইমোশানের সাথে যে বিষটা ঢালা হয়, সেই বিষ আর ঢালা যাবে না। কারণ নারায়ণ যিনি, তিনিই তো এই দুষ্টুমি করছেন। ধর্মের কথা খুবই সহজ, কিন্তু জীবনে নামাতে গেলে দম বেরিয়ে যায়, অসম্ভব মনে হয়। ঠাকুর বলছেন তবলার বোল মুখে বলা সহজ, কিন্তু হাতে নামানো অনেক কঠিন। অথচ এটাই আশ্চর্যের, আজই হোক, আগামীকালই হোক বা পরের জন্মেই হোক, করতে হবে আমাদের সবাইকে এটাই। ইদানিং কিছু কিছু খুব জনপ্রিয় প্রচলিত কথাগুলি বাড়ির দেওয়ালে, দোকানে, হাটে-বাজারে দেখতে পাওয়া যায়, গীতার নামে এই কথাগুলো চালানো হয়, যার নাম ‘গীতার সার’, গীতার সারে যে কথাগুলো লেখা আছে, তার একটা কথাও গীতার কোথাও নেই। যেমন বলছে ‘যো কুছ হো রহা হ্যায় ঠিক হো রহা হ্যায়’, গীতার কোথাও এই কথা নেই। ওরাও বলবে, যো কুছ হো রহা হ্যায় ঠিকই হো রহা হ্যায়, তা কি কখন হয়! একজন সদ্য বিবাহিতা যুবতী মেয়ে বিধবা হয়ে গেল, ঠিক হো রহা হ্যায়? একটা বাচ্চা ছেলে অনাথ হয়ে গেল, ঠিক হো রহা হ্যায়? মনে কিছু একটা উদ্ভট চিন্তা এলো, অমনি সেটাকে গীতার নামে চালিয়ে দিলেই হল। গীতার নামে বলে দেওয়াতে সুবিধা হল, গীতা বেশির ভাগ লোক পড়ে না, ভাসা ভাসা যাও কয়েকজন পড়ে তারাও জানে না, গীতাতে কি বলছে। আর সবাই বলবে, ‘মহাত্মাজীনে কিতনা সুন্দর বোলা’। আসলে আমরা যে পরিস্থিতিতে আছি, আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, এই পরিস্থিতিকে আমরা পাল্টাতে পারব না। পরিস্থিতিকে যদি আমরা পাল্টে নিই, অন্য যে জায়গায় যাব, সেখানেও কিন্তু আমাদের পরিস্থিতি সেই রকমই হয়ে যাবে।

যেমন Law of gravitation আছে, তেমনি Law of buoyancy আছে। Gravitation জিনিসকে টেনে নীচে নামায়, buoyancy জিনিসটাকে উপরে নিয়ে যায়। বেলুনে যে রকম গ্যাস ভরা হবে, সেই অনুসারে বেলুন উপরে যাবে, গ্যাস কমে গেলে বেলুনটা আস্তে আস্তে নীচে নেমে আসবে। জীবনেও ঠিক

তাই হয়; এখন আমরা যে পরিস্থিতিতে আছি, বুঝতে হবে এই মুহুর্তের জন্য এই পরিস্থিতিরই আমার যোগ্য। ঠিক হচ্ছে কি ভাল হচ্ছে তা না, আমি এটারই যোগ্য। এটা ঠিক যে, কখন সখন দেখা যায়, এমন কিছু একটা হয়ে যায়, যার জন্য একজন মানুষ ভুল পরিস্থিতিতে পড়ে যায়। ভুল পরিস্থিতিতে যদি পড়েও যায়, সে কিন্তু বেশিক্ষণ সেখানে থাকবে না। একজন অযোগ্য যদি কোন ভুল পরিস্থিতির কারণে রাজা হয়ে যায়, দেখা যাবে কিছু দিন পরেই গদিচ্যুত হয়ে রাজা থেকে প্রজা হয়ে গেল। প্রত্যেকটা জিনিস ঠিক ঘুরে নিজের যোগ্য পরিস্থিতিতে চলে যায়। আজকে যারা সংসারে যে পরিস্থিতিতে আছে, তারা যদি বলে, আর পারছি না; কেউ তাদের পারবে না ওই পরিস্থিতি থেকে বের করে নিয়ে আসতে। ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে দেখুক, যেখানে যাবে, কিছু দিন পরে দেখা যাবে তার পরিস্থিতি ঠিক আগের মত হয়ে গেছে, কিছুই পাল্টালো না। কিছুতেই কিছু পাল্টাবে না।

পাল্টাবে, যদি কোন জীবন-দর্শন থাকে। জীবন-দর্শন যদি থাকে, আমি এটা করতে চাইছি। আমরা অনেকবার বিদ্যা, সম্পদ, সেবা ও ত্যাগের উপর আলোচনা করেছি। আমি জ্ঞান অর্জন করতে চাইছি, মানুষের সেবা করতে চাইছি, দেশ ও সমাজের সম্পদ বৃদ্ধি করতে চাইছি আর সব ছেড়ে আমি ঈশ্বরকে পেতে চাইছি। এই চারটি ছাড়া পঞ্চম কোন জীবনের উদ্দেশ্য হয় না। কর্ম যা কিছু করা হয়, এই চারটের মধ্যে কোন একটাই হয়, বাকি যা কিছু হয় সব এই চারটের মধ্যেই ঘুর ঘুর করে। পরিষ্কার যদি কোন উদ্দেশ্য থাকে, আমি এটা করতে চাইছি, তখন দেখা যাবে, সে পরিস্থিতি থেকে আস্তে করে বেরিয়ে চলে গেছে। তার বাড়ির লোকেরা, পরিচিতরা সেখানেই পরে থেকে যাবে, মাঝখান থেকে সে বেরিয়ে চলে যাবে। আমাদের সমস্যা হল, আমাদের জীবনের কোন আদর্শ নেই, জীবনের কোন উদ্দেশ্য নেই, আমরা কি করতে চাইছি সেটা পরিষ্কার নেই, কিন্তু পরিস্থিতিকে পাল্টাতে চাইছি। পরিস্থিতি সবাই পাল্টাতে চাইছে, ফল সবাই চাইছে, কিন্তু কর্ম কেউ করবে না। আমরা যেখানেই যাই না কেন, আমাদের পরিস্থিতি একই থাকবে, যদি না থাকে বানিয়ে নেব। ঠাকুর রাজার ছেলের গল্প বলছেন, ধোপার ছেলে মরে রাজার ব্যাটা জন্ম নিয়েছে, বন্ধুদের সাথে খেলার সময় বন্ধুদের বলছে, 'আমি উপুড় হয়ে শুই, তোরা আমার উপর হুশ হুশ করে কাপড় কাচ'। কিছুই পাল্টাবে না, সংস্কার আমাদের তাই থাকবে।

উদ্দেশ্য হল সর্বভূতে ঈশ্বরকে দেখা। এই উদ্দেশ্যকে পাওয়ার জন্য যেমনি চেষ্টা করতে শুরু করবে, তখন পরিস্থিতি পাল্টাক, আর নাই পাল্টাক, তার সাথে পরিস্থিতির আর কোন সম্পর্ক নেই। পরিস্থিতিকে কখনই পাল্টানো যাবে না, আদর্শকে পাল্টানো যায়। যেমনি আদর্শের উপর চলতে শুরু করবে, তখন হয় পরিস্থিতি পাল্টাবে, না হলে পরিস্থিতি থেকে সে আলাদা হয়ে যাবে। কেউ আদর্শের জন্য কোন চেষ্টা করছে না, সবাই পরিস্থিতি পাল্টাতে চাইছে। 'আমার ভাল হোক', 'আমার দুঃখ লাঘব হোক', কোন দিন তোমার দুঃখের লাঘব হবে না, যতক্ষণ না আদর্শের জন্য কিছু চেষ্টা করছ। বলবে, 'এক কোটি টাকা দিয়ে দেখুন না, কি করে দুঃখ লাঘব করা যায় দেখিয়ে দেব'। কোটি টাকা আজ দিয়ে দিলে, দু-দিনেই জুয়া খেলে, ইয়ার বন্ধুদের সাথে স্ফুর্তি করে সব টাকা খুইয়ে বসে থাকবে। ঠাকুর সেই জন্য হাসপাতালের কথা বলছেন, হাসপাতালে নাম লিখিয়েছ, রোগ না কসুর হওয়া পর্যন্ত ছাড়া পাবে না। এই সংসারটা একটা হাসপাতাল। হাসপাতালে রোগীকে কখন আইসিসিইউতে রাখে, কখন স্পেশাল ওয়ার্ডে রাখে আর কখন জেনারেল ওয়ার্ডে রাখে, গোলমাল হলে আবার আইসিসিইউতে নিয়ে যাচ্ছে। সংসারে ঠাকুর আমাদের ঠিক এভাবেই রাখেন। যখন ত্যাগ করার ক্ষমতা থাকে না, তখন মারতে শুরু করেন। এমন মার মারেন যে চোখের জলে ভেসে যায়, তখন বলে ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। কারণ ultimate goal একটাই, ultimate goal হল সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শন। আমরা তা করছি না, তাই কখন তিনি আমাদের হেঁসেলে রাখছেন, কখন বিছানায় রাখছেন, বেড়ালের মা কিন্তু তাকে ঠিক সময় এসে খাইয়ে দিয়ে যাবে। কিন্তু আমরা এত অজ্ঞ, আর এত স্বার্থপর যে আমরা ওইদিকে নজর দিতে পারি না। ঈশ্বর যে নিজের হাতে ধরে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যের দিকে সবাইকে নিয়ে যাচ্ছেন, এটা আমরা বুঝতেই পারছি না।

জীবনের উদ্দেশ্য একটাই, ঈশ্বর লাভ করা। একদিনে তো পারফেকশান হয় না। সেইজন্য বলছেন, এই যে আমি চারিদিকে দোষ দেখছি, আসলে আমি বাজে পরিস্থিতিতে আছি। যারা ভাল পরিস্থিতিতে থাকে

তারা দোষ দেখে না। যে ছেলে পরীক্ষায় একটা বিরাট রেজাল্ট করেছে, আইআইটি পাশ করেছে বা আইএএস পাশ করেছে, সে আর কোন দিকে কিছু দেখবে না, নিজের মনে আনন্দে এমন ভাসছে যে জগতের চারিদিকে ভাল, শুধু ভালই সে দেখে। যে ছেলে মার খেয়েছে, রেজাল্ট খারাপ করেছে, সেই ছেলে চারিদিকে শুধু হতাশা দেখে বেড়াবে। জগৎটা তাই, যে খুশি সে এক রকম দেখে, যে অখুশি সে আরেক রকম দেখে। ধর্মশাস্ত্র এই কথাই বলে, জগত এই রকমই থাকবে। তুমি সর্বভূতে ঈশ্বরকে দেখার চেষ্টা কর, তোমার আদর্শটা পাল্টে গেল, এবার ধীরে ধীরে তোমার দোষদৃষ্টিটা চলে যাবে। শেষ পর্যন্ত সবাইকে এটাই করতে হবে।

স্বামীজী বলছেন, see it by the antorjyotis, 'inner light', and seeing that, we can see naught elese একটা বদমাইশ লোক আমাকে কষ্ট দিচ্ছে, তাকে আমি কি করে ঠাকুর রূপে দেখব, অসম্ভব। বলছেন, তা কেন হবে, তার বাইরের রূপটাকে ঠাকুর রূপে দেখতে বলা হচ্ছে না। ঠাকুর যখন লাটু মহারাজকে দেখছেন তখন তিনি তাঁর ভিতরে সেই সচ্চিদানন্দকে দেখছেন। ঠিক সেইভাবে, ওই লোকটাকে দেখ, তার সাথে ওর যে আসল স্বরূপ যেটা, যেটা অন্তর্জ্যোতি, সেই নারায়ণ তার ভিতরে আছেন, এইভাবে তুমি দেখ। গীতায় ভগবান বলছেন, *বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।।* বিদ্যা, বিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণ হোক, চণ্ডাল হোক, যেই হোক, যিনি জ্ঞানী তিনি দেখেন সবারই ভিতরে সেই শুদ্ধ আত্মা।

যে মতবাদই নিয়ে আসা হোক না কেন, সংসারে কোন দিন equality হবে না, হাতের পাঁচ আঙুল সমান হবে না। শরীরে কোন অঙ্গ সমান হয় না, কোন মানুষের দুটি পা সমান হয় না। সেখানে সংসারে কি করে equality হবে! মরাতেও equality নেই। মমতাজ মরল, শাজাহান তার জন্য তাজমহল বানিয়ে দিল। আর সাধু মরলে শুধু ছাই উড়বে। একমাত্র ঈশ্বর দর্শনে equality আসে। মানুষ যখন দেখে সবার ভিতরে সেই অন্তর্জ্যোতি জ্বলজ্বল করছে, যে দুষ্ট তার ভিতরেও সেই অন্তর্জ্যোতি আছে, যে শিষ্ট তার ভিতরেও সেই এক অন্তর্জ্যোতি বিদ্যমান; তখনই equality আসে। মানুষ যখন এটা দেখতে শুরু করে, তখন ধীরে ধীরে তার সব পাল্টাতে থাকে।

একমাত্র ঈশ্বরকে ছাড়া আর কিছু পাওয়ার ইচ্ছা করো না

Do not want this world, because what you desire you get. (*এই সংসারটাকে চেও না, কারণ যে যা চায়, সে তাই পায়।*) আবার স্বামীজী তাঁর favorite topicএ চলে আসছেন। যেমনি তুমি জগতে কিছু আকাঙ্খা করেছো, সেটা তোমার কাছে আসবেই। এর আগে আমরা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছিলাম যে, আমাদের মনে যে ইমোশানস্‌গুলি, যে চিন্তাগুলি আসে, সেটাই external form হয়ে আমার কাছে ফিরে আসে। মনে যদি কোন ইচ্ছা থাকে, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতম কোন বাসনা যদি থাকে, তা পূর্ণ হবেই। শুদ্ধ আত্মা সর্বশক্তিমান, তুমি চেয়েছ, সেটা হবেই। আজকে যদি নাও হয়, আগামীকাল হবেই, এই জন্মে না হোক, দশ জন্ম পরে হবে। আর যে যত শুদ্ধ পবিত্র, যত শক্তিমান, তার তত তাড়াতাড়ি হতে বাধ্য। কিন্তু তার জন্য তোমাকে মূল্যটাও চোকাতে হবে, এমন মূল্য দিতে হতে পারে যে, তোমার গর্দানও যেতে পারে। সেটাকে নিয়ে কেউ ভাবছে না। ঠাকুর বলছেন, সমুদ্রের তীরে এক যোগী বসে আছে, সমুদ্রে ঝড় উঠল, যোগী বলে দিল ঝড় থেমে যাও, ঝড় থেমে গেল। ঝড়ের হাওয়ায় পাল তুলে একটা নৌকা আসছিল, ঝড় থামতেই নৌকাটা ডুবে গেল, সব লোক মরে গেল, এত লোকের মারা যাওয়ার পাপ এখন যোগীর উপর লেগে গেল। এগুলো কাহিনী, কাহিনী দিয়ে কোন তত্ত্ব বা সত্যকে প্রমাণিত করা যায় না, ব্যাখ্যা করা হয়। যদি আমি কিছু প্রত্যাশা করেছি, সেই প্রত্যাশা আজ হোক কাল হোক পূর্ণ হবে, এবং তার ফলটাও আমাকে নিতে হবে। আর ফলটা এমন বাজে হবে যে, তখন মনে হবে আমি কেন চাইতে গেলাম। প্রত্যেক যোগীর শেষ অবস্থায় ঠিক এটাই হয়। ভগবান বুদ্ধ সিদ্ধির শেষ দরজায় চলে গেছেন, শেষ রাত্রিতে মার এসে তাঁকে কত কিছুর প্রলোভন দেখাচ্ছে। ঠাকুরও বলছেন, বেলতলায় যখন সাধনা করছেন, তখন গোরা রূপে এসে কত রকম প্রলোভন দেখাতে লাগল, কত রকমের ভয় দেখাতে থাকল। প্রত্যেক যোগীর অন্তিম ধাপে এই অবস্থা আসবে, আমার, আপনার সবারই হবে। মনে যে বাসনাগুলো, যে কামনা, যে চিন্তাগুলো রয়েছে, সব কটা external form

নিয়ে সামনে আসবে, আর প্রলোভন দেখাবে, ভয় দেখাবে। যে কাম ভাব আছে সেটাও আসবে, যে ক্রোধ রয়েছে সেটাও আসবে, যে ভয় রয়েছে সেটাও আসবে।

ফরাসী সাহিত্যে বালজাক্ একজন খুব উচ্চমানের সাহিত্যিক ছিলেন। যে কজন বিখ্যাত ঔপান্যাসিকের নাম নেওয়া হয়, তাঁদের মধ্যে বালজাক একজন। ওনার একটা উপন্যাসের কাহিনীতে দেখাচ্ছেন, একজন ইয়ং ছেলে হতাশার চূড়ান্ত অবস্থায় এসে আত্মহত্যা করতে গেছে। যেতে যেতে সে একটা antique shop দেখতে পায়, দোকানে ঢুকেছে। দোকানদার ছেলেটির হাবভাব দেখে বুঝতে পেরেছে, ব্যাটা মরতে যাচ্ছে। দোকানদার কাছে এসে ছেলেটিকে বলছে, 'তুমি কেন মরতে যাচ্ছ, আমার দোকানে ভারত থেকে একটা ম্যাজিক্যাল জিনিস এসেছে'। বিদেশে বরাবরই ভারতবর্ষকে নিয়ে একটা ম্যাজিক্যাল ভাব ছিল। জিনিসটা হল একটা জংলী গাধার চামড়া। এই চামড়ার মালিক যা ইচ্ছা করবে, সেই ইচ্ছাই তার সঙ্গে সঙ্গে পূরণ হয়ে যাবে। তবে যেমন যেমন চামড়ার মালিক ইচ্ছা করবে, তেমন তেমন তার আয়ু কমে যাবে। ছেলেটি তো কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইছে না। ঠিক আছে আমি চাইছি, আমার মৃত্যুর সময় আমি এক সুন্দরীর কোলে মাথা রেখে মরতে চাই, আমার মুখ লাল থাকবে, ঠোঁটের কোণে হাসি থাকবে, চোখে জীবনের আলো থাকবে। যেমনি বলা আর সঙ্গে সঙ্গে গাধার চামড়াটা সাইজে অনেকটা ছোট হয়ে গেছে। আর ঠিক তাই হল, মরার সময় তার এক পরিচিত মেয়ের কোলে শুয়ে আছে, আর টিবি রোগে সে মারা গেল। টিবিতে মরার সময় মুখটা লাল হয়ে যায়। চামড়াটা হাতে আসার ছ মাসের মধ্যে ছেলেটি মারা যায়, খুব করুণ মৃত্যু। যে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল, সে এখন বাঁচার জন্য ছটফট করে যাচ্ছে, কিন্তু বাঁচার কোন পথ নেই। কারণ ওই চামড়ার সাথে ওর জীবন বাঁধা, চামড়া ছোট হয়ে হয়ে শেষ হয়ে গেছে।

যাই হোক, ছেলেটি ওই দোকান থেকে বেরিয়ে এসে একটা রেস্তোরাঁয় গিয়ে বন্ধুদের দেখিয়ে চেঁচিয় চেঁচিয়ে বলে যাচ্ছে, 'এই চামড়ার যদি দম থাকে তাহলে পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমাকে এখানে এক লক্ষ ফরাসী মুদ্রা দিয়ে যাবে'। হঠাৎ একটা লোক উঠে এসে বলছে, 'আমি অনেকক্ষণ তোমাদের কথা শুনছি, তুমি কি অমুকের ছেলে'? 'হ্যাঁ'। 'আচ্ছা তোমার কাকা কি ইণ্ডিয়াতে ছিল'? 'হ্যাঁ ছিলেন'। 'তোমার কাকা মারা গেছে, তুমি তার উত্তরাধিকারী, তোমার জন্য এই এক লক্ষ টাকার চেক রেখে গেছে'। চামড়ার সাইজটা আরও ছোট হয়ে গেল। এরপর সে যা ইচ্ছা করছে, টাকা পয়সা, ফুর্তি, সব হয়ে যাচ্ছে কিন্তু চামড়ার সাইজটাও ছোট হয়ে আসছে। এরপর ওই অবশিষ্ট চামড়াটাকে প্রাণপন ভাবে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে। যত ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে, কোন না কোন ভাবে আবার ঘুরে তার কাছে চলে আসছে। আতঙ্কে সে পাগল হয়ে যাবার উপক্রম। সব সময় চেষ্টা করে যাচ্ছে কোন ইচ্ছা না করে, কিন্তু কিছু না কিছু এমন হয়ে যাচ্ছে যার জন্য তার ইচ্ছা এসে যাচ্ছে, আর চামড়াটা আরও ছোট হয়ে যাচ্ছে। যে ছেলে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল, সেই এখন মৃত্যু ভয়ে কাঁপছে।

স্বামীজী যে desireএর কথা বলছেন, এটা এক জন্মে হবে না। যতগুলি আমার desire আছে, বুঝতে হবে সেগুলো কয়েক জন্ম এখন আমাকে ঘোরাবে। খুব মাংস খাবার ইচ্ছা, কয়েক জন্ম এবার শকুন হয়ে ঘোরাবে। খুব মাছ খেতে ভাল লাগে, এবার মাছরাঙা পাখি হয়ে খাল বিল পুকুরের ধারে ধারে ঘুরে ঘুরে খুব করে মাছ খেয়ে যাবে। তাতেও যদি না হয় তিমি মাছ হয়ে শুধু মাছ খেয়েই জীবন ধারণ করবে। পরনিন্দায় খুব রুচি, পিশুনিবৃত্তি যার প্রবল, আগামী জন্মে ছারপোকা হয়ে জন্মাবে, সবার পিছনে কামড়ে রক্ত খেতে থাকবে। মনে ইচ্ছা হয়েছে, ওই ইচ্ছা যে শরীরের মাধ্যমে ভাল ভাবে মিটাতে পারবে, এবার ওটাকে মিটানোর জন্য ওই ধরণের উপযুক্ত শরীর দেবে। কারণ এই শরীরের মাধ্যমে সব ইচ্ছা তো পূরণ করা যাবে না। খুব সহজ ব্যাপার, হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের ঋষিরা বলে গেছেন, কিন্তু আমরা মানতে চাইছি না। আমরা সেই লোভ করব, আমরা সেই ক্রোধ করব, আর এই ইচ্ছা, সেই ইচ্ছা করতেই থাকব। ভগবানের এতে অনেক সুবিধা, তিনি জানেন আমাকে বার বার সৃষ্টি করতে হবে না। ঠাকুর যেমন বলছেন, মা রান্না করছে, ওদিকে ছেলের মুখে চুষনি দিয়ে রেখেছে; মা জানে ছেলে এখন চুষনি নিয়ে মজায় আছে। আর সবটাই ভগবানের, তিমি মাছটাও তাঁর, ছারপোকাটাও তাঁর, ভগবানের বাইরে তো কেউ যেতে পারবে না। তিমি মাছ

মরে গেলেও সমুদ্রের, বেঁচে থাকলেও সমুদ্রের। তিমি মাছ বেঁচে আছে কি মরে গেছে তাতে সমুদ্রের কিছু আসে যায় না। আমি মানুষ হয়ে আছি না ছারপোকা হয়ে আছি, তাতে ভগবানের কিছু আসে যায় না।

এরপর বলছেন, Seek the Lord and the Lord only. The more power there is, the more bondage, the more fear. (*ভগবানকে –কেবল ভগবানকেই অন্বেষণ কর। যত অধিক ক্ষমতালাভ হবে, ততই বন্ধন আসবে, ততই ভয় আসবে।*) যেমনি আমরা ইচ্ছা তৈরী করে শক্তিকে নিয়ে আসছি, আর এই শক্তি যত আসবে, তত আমাদের উপর বন্ধনটা জোর হবে, যত বন্ধন আসবে তত ভয় জন্ম নেবে। সেইজন্য একমাত্র ঈশ্বরের অনুসন্ধান কর। হিটলার এত ক্ষমতা পেয়ে গেল, যা চাইছে বৃটেন তাকে দিয়ে যাচ্ছে, আর এত ক্ষমতা হয়ে গেল যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ করাল। ওই ক্ষমতাটাই তার বন্ধন হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু শেষে কি হল? ১৯৪৫ সালে যুদ্ধ যত এগিয়ে যাচ্ছে, জাপানে এ্যটম বোমা পড়ল। ওর জেনারেল খবরও দিচ্ছে না যে, আপনার এক একটা রেজিমেন্ট, এক একটা ইউনিট সব শেষ হয়ে যাচ্ছে। আর যখন শুনল জোট সৈন্যরা সামনে এসে গেছে, নিজের প্রিয় এ্যালেসেসিয়ান কুকুরকে সায়নাইড খাইয়ে দিল, তারপর নিজেকে গুলি করে মেরে দিল। সেইজন্য স্বামীজী বলছেন, কেবল ভগবানকে পাওয়ার ইচ্ছাই কর, ভগবান ছাড়া আর কিছু পেতে ইচ্ছা করো না।

জগতে দুটি সত্য, ব্রহ্ম সত্য আর শক্তি সত্য। জীবনে দুটি জিনিসই পাওয়ার মত আছে, এক ব্রহ্ম আর শক্তি। হয় ঈশ্বরের দিকে পুরো মন দিতে হবে, না হলে শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। মাঝামাঝারি থাকলে কেউ তাকে বাঁচাতে পারবে না, তার কষ্টের আর শেষ হবে না। কিন্তু শক্তি যদি বেশি অর্জন করে, যত শক্তি বাড়বে বন্ধনও তত বাড়বে। যত বন্ধন বাড়বে তত ভয় বৃদ্ধি পাবে, কারণ সে ওই শক্তিটা ছাড়তে চাইবে না, শক্তিটা চলে যাবার ভয় আসবে। ক্ষমতার এমনই আকর্ষণ যে, কেউ ক্ষমতা ছাড়তে চায় না। সে আর এখন ক্ষমতা দিচ্ছে না, ক্ষমতা এখন তাকে ধরে রেখেছে। সেইজন্য ওইদিকে যেতে নেই, ক্ষমতার একটু আস্বাদ করে জেনে নিল ক্ষমতাটা এই, এবার শক্তির এলাকা ছেড়ে নিজের যে স্বভাব, ব্রহ্ম, সেইদিকে চলে যেতে হবে। How much more afraid and miserable are we than the ant. (*একটা সামান্য ক্ষুদ্র পিঁপড়ের চেয়ে আমরা কত অধিক ভীত ও দুঃখী।*) একটা পিঁপড়েরও অত ভয় নেই, একটা সাধারণ মানুষ, একটা কাঙালী ভিখারীরও অত ভয় থাকে না, একজন ক্ষমতাবান লোক যে ভয়ের মধ্যে থাকে। যে ক্ষমতাবান হয়, তারই হাজার রকমের ভয় এসে জোটে।

সেইজন্য, Get out of it all and come to the Lord. Seek the science of the maker and not that of the made. (*এই সমস্ত জগৎ-প্রপঞ্চের বাইরে ভগবানের কাছে যাও। সৃষ্টার তত্ত্বকে জানবার চেষ্টা কর, সৃষ্টিকে জানার চেষ্টা করো না।*) কথামৃতে ঠাকুর বলছেন, সবাই ঐশ্বর্যকেই চায়, ঈশ্বরকে কে আর চায়! ঐশ্বর্য মানেই শক্তি, স্বামীজী এটাই বলছেন, স্রষ্টাকে জানার চেষ্টা কর, সৃষ্টিকে না। স্বামীজী একবারও সব ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে যেতে বলছেন না, স্বামীজী চাইছেন, তোমরা একবার জিনিসটাকে বোঝার চেষ্টা কর। একবার বুঝে নিলে, তোমার মনই তোমাকে বলে দেবে কোন দিকে যেতে হবে। আমরা যা কিছু করি অজ্ঞান থেকে করি, যা কিছু করি অবিদ্যা থেকে করি; সেইজন্য আগে জেনে নাও, বুঝে নাও জিনিসটা কি, তারপর না হয় করবে।

তার আরেকটা কারণ বলছেন, ‘I am the doer and the deed’. ‘He who can stem the tide of lust and anger is a great Yogi’. (*‘আমিই কর্তা ও আমিই কার্য’। ‘যিনি কামক্রোধের বেগধারণ করতে পারেন, তিনি মহাযোগী-পুরুষ’।*) আমিই কর্তা, আমিই ক্রিয়া, আমিই সৃষ্টি করি, আমিই স্রষ্টা। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের শেষের দিকে ভগবান বলছেন, *কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ,* কাম আর ক্রোধ রজোগুণ থেকে আসে, এগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না, কিন্তু কাম, অর্থাৎ কিছু পাওয়ার ইচ্ছা, আর ক্রোধ, কাম প্রতিহত হলে যেটা হয়; এই কাম আর ক্রোধের বেগকে যিনি প্রতিহত করতে পারেন, তিনিই বড় যোগী।

‘Only by practice and non-attachment can we conquer mind’, (*অভ্যাস আর বৈরাগ্যের দ্বারাই কেবল মনকে নিরোধ করা যেতে পার।*) গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভগবান অর্জুনকে বলছেন,

অভ্যাসেন কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন তু গৃহ্যতে, বৈরাগ্য, সব কিছুকে ছাড়, আর নিরন্তর সাধনা চালিয়ে যাও, তবে গিয়ে তুমি মনকে বশে নিয়ে আসতে পারবে।

হিন্দু মস্তিষ্ক

এরপরে স্বামীজী খুব সুন্দর কথা বলছেন, Our Hindu ancestors sat down and thought on God and morality, and so have we brains to use for the same ends; but in the rush of trying to get gain, we are likely to lose them again. (*আমাদের পূর্বপুরুষরা ধীর স্থির হয়ে ধর্ম ও ঈশ্বর সম্বন্ধে চিন্তা করে গেছেন, ফলে আমাদেরও ঐ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবার জন্য মস্তিষ্কটুকু রয়েছে। কিন্তু এখন লাভের আশায় আমরা যে রকম ছুটোছুটি আরম্ভ করেছি, তাতে সেটি নষ্ট হবার জোগাড় হয়েছে।*) খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন। আমরা একটু আগে বলছিলাম স্বামীজী একজন ঋষি, তিনি অনেক এমন এমন ঋষি বাক্য দিয়ে গেছেন, আমরা এগুলো পড়ি, মুখস্ত করি, বক্তৃতায় ব্যবহার করি; বড় বড় বক্তারা এই ধরণের কথাগুলিকে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, প্রচুর হাততালি পান, কিন্তু অনুশীলন করার সময় কেউ নেই।

স্বামীজীর সময় genetics আসেনি, genetic term অনেক পরে এসেছে। স্বামীজী বলছেন, আমাদের পূর্বজরা ঈশ্বরের উপর, মরালিটির উপর দিনের পর দিন, বছরের পর বছর ধ্যান করেছিলেন, করে করে ওনাদের যে ব্রেন তৈরী হয়েছিল, সেই ব্রেনটাই আমরা ভারতীয়রা genetic সূত্রে আজকে পেয়েছি, আমাদেরও তাই এমন ক্ষমতা আছে, আমরাও ঈশ্বরের উপর ধ্যান করতে পারি, উচ্চ চিন্তন নিয়ে ধ্যান করতে পারি, অন্য জাতির যেটা নেই। স্বামীজী মূলতঃ geneticsএর কথা বলছেন। এই কথা বলার পরেই বলছেন, but in the rush of trying to get gain, we are likely to lose them again, হঠাৎ করে এখন ভোগবাদ প্রচণ্ড আকারে এসে গেছে; আমাদের মনে রাখতে হবে স্বামীজী এই কথা ১৮৯৫ সালে বলছেন, তখন কিছুই ছিল না, তাতেই তিনি এই কথা বলছেন, আর আজকে তো আমরা কল্পনাই করতে পারি না। ভোগসর্বস্ব জীবনধারার দরুন চারিদিকে এমন তাড়াহুড়ো পরে গেছে যে, সবাই চাইছে আমারই যাতে বেশি বেশি ভোগ্যসামগ্রী হয়, আমিই শুধু লুটেপুটে খাবো। এতে করে আমাদের যে বিশেষ ফ্যাকাল্টি বা মস্তিষ্কের বিশেষ যে ক্ষমতাটা আছে, সেটা হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা এসে গেছে। এইভাবে কিছু দিন চললে একদিন এই ফ্যাকাল্টিটা হারিয়ে যাবে। যদি ভারত এই বিদ্যাকে হারিয়ে ফেলে, জগৎ থেকে এই বিদ্যাটা চলে যাবে।

হিন্দুরা যার জন্য পুরো একটা জাতিকে নিযুক্ত করে দিয়েছিল এই বিদ্যার সংরক্ষণ কাজে। সেই জাতিটা হল ব্রাহ্মণ, যাঁদের একটাই কাজ ছিল, শাস্ত্র ও ঈশ্বরকে নিয়ে চিন্তন করা। ব্রাহ্মণদের বলাই ছিল, দেখো বাপু, তোমাকে আমরা শ্রেষ্ঠ সম্মান দেব, কিন্তু বিনিময়ে তোমার খাওয়া-পড়া হয়ত জুটবে না, সাধারণ ভাবে যতটুকু চালানো যায় ততটুকুই পাবে। কিন্তু তোমাকে থাকতে হবে শুধু শাস্ত্র ও উচ্চ চিন্তন নিয়ে। ঠিক তাই, যত ইতিহাস পড়ব, কাহিনী পড়ব, সব জায়গায় শুরুই হয়, 'কোন এক সময়ে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিল………'। ব্রাহ্মণদের কাজই ছিল শাস্ত্র নিয়ে চিন্তন করা, ঈশ্বরকে নিয়ে চিন্তন করা। ভোগের মাধ্যমে ঈশ্বর চিন্তন কখনই হবে না, ঈশ্বর চিন্তন সব সময় ত্যাগের মাধ্যমেই হয়। স্বামীজী বলছেন, আমরা যে এই বিদ্যাটা পেয়েছিলাম, তাঁর কারণ আমাদের পূর্বজদের কঠোর ত্যাগ ও তপস্যার জন্য আমাদের মস্তিষ্কটাই জেনেটিক সূত্র অন্য রকম। ভোগের পথে চলে গেলে, মস্তিষ্কের এই স্ট্রাকচারটাই নষ্ট হয়ে যাবে।

এখানে দুটো খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা আমাদের মাথায় রাখা উচিৎ। দেববাণীর প্রথম আলোচনায় বার বার হাইলাইট করা হয়েছিল, অবতাররা যখন সপার্ষদ আসেন, ওনারা তখন ঠিক কি করেন। অবতারের ক্ষেত্রে পরিষ্কার যে তিনি ব্রহ্মবিদ্যা দিতে এসেছেন, তা তিনি যীশুই হন বা যে কোন অবতারই হন না কেন, ওনাদের কাছে ব্রহ্ম বলতে তা নির্গুণ নিরাকার হোক, সগুণ সাকার হোক বা দুটোই হোক, এই বিদ্যাকে আবার একটা প্রাণ সঞ্চার করে দেন। যে দেশের মাটিতে ব্রহ্মবিদ্যা একবার ফলেছে, এই বিদ্যা সেই দেশ থেকে পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যাবে না। কখন জোরাল থাকবে, কখন ঢিমে তেতালা হয়ে যাবে। স্বামীজীর বাণী ও রচনাবলীকে যদি আমরা খাপে খাপে গুছিয়ে রাখি, দেখা যাবে ঘুরে ফিরে স্বামীজী পাঁচটা জিনিসকে নিয়ে বলছেন। যে কোন আধ্যাত্মিক পুরুষ ব্রহ্মবিদ্যা ছাড়া কিছু বলেন না। স্বামীজীর রচনাবলীর উপর আধার করে কেউ হয়ত নিজের

মত করে একটা ব্যাখ্যা নিয়ে আসতে পারেন, যেমন, 'স্বামীজীর লেখায় সাহিত্য' বা 'সহাস্য বিবেকানন্দ', কেউ রিসার্চ করে, নিজের চিন্তা-ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে এই ধরণের কিছু রচনা করে দিতে পারেন। কিন্তু মূল জিনিস সব সময় থাকবে, ব্রহ্মবিদ্যা।

স্বামীজীর দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, তিনি আরেক ধাপ এগিয়ে গেছেন। প্রফেট মহম্মদ ইসলামের ক্ষেত্রে এটাই করেছিলেন। মহম্মদ ইসলাম ধর্মকে আনার পর দেখলেন, ইসলামকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ইসলামিক স্টেট করতে হবে, সেখানে সবাই শুধু ধর্মের প্রতি না, রাজনৈতিক পরিণামের প্রতিও সমান ভাবে অনুগত থাকবে। এতে ভাল মন্দ কি হবে, সেটাতে আমরা যাচ্ছি না। স্বামীজী দেখলেন, এই ব্রহ্মবিদ্যা, আর ব্রহ্মবিদ্যার যে শেষ কথা *অয়মাত্মা ব্রহ্ম, তত্ত্বমসি*, তুমিই সেই, এই জিনিসটা বিশ্বের আর কোন জাতির কাছে নেই। সবাই বলবে আমার ধর্ম বড়, আমিও বলব আমার ধর্ম বড়, কারণ আমি যে সিস্টেমে বড় হয়েছি, আমার কাছে সেই সিস্টেমটাই মহৎ। ইসলাম, খ্রীশ্চান, বৌদ্ধ সব ধর্মই বলবে আমার ধর্ম মহৎ। এবার যদি জিজ্ঞেস করা হয়, আপনি একটা বাক্যে বলে দিন, কিসের জন্য আপনার ধর্মকে মহৎ বলা হবে? সবাই নিজের নিজের ধর্মের মহত্ত্বকে অনেক কথা বলবে। হিন্দুরা একটাই কথা বলবে, man is God। এটা সত্য হোক মিথ্যা হোক, লোকেরা এটাকে নিয়ে argue করতে পারবে। বেদ থেকে শুরু করে, হিন্দুদের উচ্চমানের ঋষিদের থেকে শুরু করে শ্রীরামকৃষ্ণ, রমণ মহর্ষি পর্যন্ত সবাই পর পর একই কথা বলবেন, *অয়মাত্মা ব্রহ্ম*, তুমিই সেই। আশ্চর্য যে, এই সত্যটা আর কোন ধর্মে নেই।

তিনটে যে মূল সেমেটিক ধর্ম, জুহুদিদের ধর্ম, খ্রীশ্চানদের ধর্ম আর ইসলাম ধর্ম, এই কটি ধর্মের যে ভগবান, তাঁকে যদি এই তিনটে সেমেটিক ধর্মের মধ্যে inter change করে দেওয়া হয়, আর নামগুলি যদি সরিয়ে দেওয়া হয়, কেউ ধরতে পারবে না, এই কথা কোন ধর্ম থেকে বলা হয়েছে। এটা কি জহুদিদের কথা, নাকি খ্রীশ্চানদের কথা, না ইসলামের কথা বলা খুব মুশকিল হয়ে যাবে। আরেকটু খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে, জহুদিদের ভগবান একটু কড়া, খ্রীশ্চানদের ভগবান যেন loving father, মুসলমানদের ভগবান হলেন একজন moral ভগবান, কারণ যে সময় প্রফেট মহম্মদ এসেছেন, সেই সময় আরব দেশে morality বলে কিছু ছিল না, সেইজন্য ওনার মূল দৃষ্টিটা ছিল সেইখানে। হিন্দুরা একেবারে absolute freedom, total freedom; যখন জীবন দর্শনে নিয়ে আসছে, সেখানেও total freedom।

এই জিনিসটাকেই স্বামীজী কবে উপলব্ধি করলেন বলা মুশকিল। কিছুটা সম্ভবনা হতে পারে, ঠাকুরের মহাসমাধির পর স্বামীজী ভারত ভ্রমণ করতে করতে গুজরাতে পৌঁছালেন, সেখান থেকে নেমে আরও দক্ষিণে কন্যাকুমারী গেলেন। স্বামীজীর ভারত ভ্রমণের বিভিন্ন জায়গার যে বর্ণনা আছে, তার মধ্যে বিশেষ করে দ্বারকা আর কন্যাকুমারির যে বর্ণনা আছে, তাতে মনে হয় ওই সময় যেন স্বামীজীর কাছে পুরো পিকচারটা পরিষ্কার হয়ে যায়। আধ্যাত্মিক অনুভূতি আমাদের হয়ে যেতে পারে, আমি জেনে যেতে পারি যে আমি সেই ব্রহ্ম। যেমন ত্রৈলঙ্গস্বামী, তাঁর জ্ঞান হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তার যে ব্যবহারিক প্রয়োগ হতে পারে, এই জিনিসটা সব সময় সবার মাথায় আসে না। আমাদের উপনিষদ জ্ঞানের খনি, কিন্তু ওই জ্ঞানকে যে দৈনিক জীবনে নামানো যাবে, একটা মুচিও যে ওই জ্ঞানকে প্রাত্যহিক কাজে লাগাতে পারবে, আর একজন রাজা সেও নিজের কাজে লাগাতে পারবে, একজন ছাত্র সেও নিজের কাজে লাগাতে পারে, একজন ফিল্মস্টারও যে নিজের কাজে লাগাতে পারে, এই জিনিসটা কারুরই জানা ছিল না। স্বামী বিবেকানন্দ আসার পর প্রথম জানা গেলে যে, উপনিষদের জ্ঞানকে, বেদান্তকে দৈনন্দিন জীবনে নামানো যায়, যার নাম স্বামীজী দিলেন Practical Vedant।

আর বললেন, তুমি সর্বশক্তিমান, সমস্ত শক্তি, সমস্ত জ্ঞান তোমার মধ্যেই আছে। এটা থিওরেটিক্যাল কিছু না, এটাই সত্য। দুর্ভাগ্য আমাদের, কারণ আমরা এটাকে মানতে পারছি না, জীবনে লাগাতে পারছি না, কিন্তু এটাই সত্য। আমিও সর্বশক্তিমান, তুমিও সর্বশক্তিমান, সমস্ত জ্ঞান আমার ভিতরে আছে, সমস্ত জ্ঞান তোমার ভিতরেও আছে। ঠাকুর বলছেন, সাপের মাথায় মণি, কিন্তু সাপ ব্যাঙ খেয়ে মরে। আমাদের ভিতরে সেই অনন্ত জ্ঞানরাশি, অথচ জগতের ছোট্ট ছোট্ট জিনিসকে নিয়ে আমরা মারামারি করে যাচ্ছি, কিছু করার নেই, কারণ এটাই মায়া।

স্বামীজী দেখলেন এই ব্রহ্মবিদ্যা একমাত্র হিন্দু জাতির কাছে আছে। হিন্দুরা থাকে ভারতবর্ষে। সেইজন্য স্বামীজীর কাছে প্রথমে এই তিনটে জিনিস অত্যন্ত মূল্যবান হয়ে গেল, ব্রহ্মবিদ্যা, হিন্দু জাতি আর ভারতবর্ষ। বর্তমান কালে এই ব্রহ্মবিদ্যাকে জাগালেন ঠাকুর। সর্বধর্মসমন্বয় করা, জাতিভেদ দূর করা, নারী জাতির বন্ধন মুক্ত করা, এসব ঠাকুরের কাজ না। শ্রীশ্রীমাকে একজন জিজ্ঞেস করছেন, ঠাকুরের বৈশিষ্ট্য কোনটা। মা বলছেন, ঠাকুর হলেন ত্যাগের বাদশা। ত্যাগের বাদশা মানেই ব্রহ্মবিদ্যা। ঠাকুর তাঁর ইষ্ট, সগুণ সাকার রূপ, মা কালীকেও ত্যাগ করে দিচ্ছেন। অবশ্য আমরা আরও বড় ত্যাগী, ত্যাগ জিনিসটাকেই আমরা ত্যাগ করে দিয়েছি, যার জন্য আমাদের এই দুরবস্থা। আমেরিকার মহিলা মিসেস ব্লজেটকে স্বামীজী বলেছিলেন, ভারতে এমন একটা মেশিন আমি দাঁড় করাতে যাচ্ছি, যে মেশিনকে অন্তত ভারতে কেউ দাবাতে পারবে না। জন্ম হল রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের, বেলুড় মঠ যার প্রাণকেন্দ্র। ঠাকুর, ব্রহ্মবিদ্যা, ভারতবর্ষ, হিন্দু ধর্ম আর রামকৃষ্ণ মিশন, এই পাঁচটি ভাবকে স্বামীজী রেখে দিলেন। স্বামীজী যেখানে যা যা কথা বলেছেন, যেখানে যত লেকচার দিচ্ছেন, যা কিছু করছেন, এই পাঁচটার মধ্যে কোন একটা খাপে গিয়ে বসে যাবে। এই পাঁচটার বাইরে ষষ্ঠ আর ইডিওলজিক্যালি কিছু নেই।

যারা হিন্দু পরিবারে জন্ম নিচ্ছে, তাদের কাঁধে একটা বিরাট দায়ীত্ব চেপে গেল। মুশকিল হল, আদর্শ জিনিসটাকে যদি আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি, জীবনের সব কিছু এলেমেলো হতে শুরু হয়ে যাবে। হিন্দু ধর্মের একটি সত্যকে যদি কেউ বুঝে নেয় – সত্য এই – জীবনটা তোলপাড় করতে লাগবে। যদি ব্রহ্মবিদ্যা সত্য হয়, তার মানে ঈশ্বর সত্য। ঈশ্বর যদি সত্য হন, তাহলে আমি আপনি সবাই সেই ঈশ্বর থেকে এসেছি, সবাই ঈশ্বরের দিকে আবার ফেরত যাচ্ছি। ঈশ্বরের দিকে ফেরত যেতে গিয়ে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হচ্ছে। যে ক্রিকেট খেলে জীবন চালাচ্ছে, সেও সেই ঈশ্বরের দিকে যাচ্ছে, যে জুতো সেলাই করে জীবিকা নির্বাহ করছে, সেও ঈশ্বরের দিকে চলেছে। জন্মজন্মান্তরে নানা রকমের অনুভব সঞ্চয় করছি, জন্মজন্মান্তরে অনেক কর্ম ক্ষয় করছি, এইভাবে সবাই আমরা এগিয়ে চলেছি। কারুর এই জন্মে হবে, কারুর কয়েক জন্ম বেশি লাগবে। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমাদের আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। এর আগেই স্বামীজী বললেন, সাংসারিক শক্তি যত বাড়বে, বন্ধনও তত বাড়বে। বন্ধন যত বাড়বে ভয়ও তত জেঁকে বসবে। আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চয় করে করে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। হিন্দুদের দায়ীত্ব হল, নিজের ভিতরে সেই আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চয় করে অন্যদেরকেও এদিকে নিয়ে আসা।

স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ বার বার সব জায়গায় বলতেন, 'তোমরা সবাই ঠাকুরের ভক্ত, তোমাদের দেখে নূতন ভক্তরা ঠাকুরের কাছে আসবে; সেইজন্য তোমাদের জীবনধারা এমন হবে যাতে তোমাদের দেখে লোকেরা প্রভাবিত হয়'। হিন্দুদের এটাই দায়ীত্ব, আগে নিজের ধর্মকে তাদের ভাল করে জানতে হবে, হিন্দু ধর্মের আধ্যাত্মিক সত্যগুলিকে বুঝতে হবে, বুঝে ধারণা করতে হবে, তারপর তার কথা শুনে অন্য ধর্মের লোকেদের মনেও ছাপ পড়বে। এটা হল প্রথম পয়েন্ট, একজন হিন্দুর দায়ীত্ব হল, আগে নিজেকে একজন মহৎ হতে হবে, তারপর তাকে দেখে অন্যদেরকেও সেই আদর্শের পথে আসার জন্য অনুপ্রাণিত করতে হবে। আমাদের অনেক সময় মনে হতে পারে, এই কাজ কিভাবে সম্ভব! আসলে আমরা সবাই অলস, ফাঁকিবাজ, যোগশাস্ত্রেও বলছেন আলস্য সব থেকে বড় শত্রু। আমরা মনে করি সময় হলে হবে। ঠাকুর এই ধরণের লোকেদের উপর খুব রেগে যেতেন। আর তা নাহলে বলবে, 'ঠাকুরের কাজ ঠাকুরই দেখবেন, তুমি কে করার'! যতক্ষণ তোমার বোধ আছে আমি খাচ্ছি, যতক্ষণ তোমার দেহবোধ আছে, ততক্ষণ এই বোধটাও রাখতে হবে, আমাকে এই কাজ করতে হবে। নিজের বেলায় আঁটিসাটি পরের বেলায় দাঁতকপাটি। খাওয়া-দাওয়ার সময়, ভোগ করার সময় আমি করছি, আর যখনই উচ্চ একটা আদর্শকে নিয়ে জীবন চালানোর কথা বলা হয়, তখনই ওটা ঠাকুরের উপর ছেড়ে দেওয়া, এটাই দ্বিচারিতা, এভাবে কিছুই হয় না। দ্বিতীয় হল, আচ্ছা ঠিক আছে, চেষ্টা করা যাক, এটাও মন্দের ভাল।

কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, আর স্বামীজীও এর আগে বললেন, আমাদের সত্যিকারের যে ফিজিওলজিক্যাল ব্রেন রয়েছে, আর আমাদের ব্রেনের যে স্ট্রাকচার হয়ে গেছে, আমাদের পক্ষে উচ্চ চিন্তন, উচ্চ আদর্শকে নিয়ে চলাটা সহজ। আমাদের ব্রেনের স্ট্রাকচারের ব্যাপারটা আগেকার দিনের লোকেরা জানতেন না,

আর স্বামীজী যখন এটা বলছেন তখনও এখনকার মত কিছু জানা ছিল না। আমরা এখন ব্রেনের স্ট্রাকচার কি রকম হলে কি কি হতে পারে পুরো জানি, যাঁরা গণিতে দক্ষ তাঁদের ব্রেণ এক রকম হয়, যাদের intuitive তাদের ব্রেন অন্য রকম হয়, শুধু তাই না, ব্রেনের স্ট্রাকচারটাই অন্য রকম হয়। স্বামীজী কি করে সেই সময় এটা বার করেছিলেন ভগবান জানেন। কারণ তখনকার দিনে ব্রেনকে নিয়ে এত স্টাডি করা শুরুই হয়নি। স্বামীজী এটাই বলছে, জেনেটিক্যালি আমাদের ব্রেন স্ট্রাকচার এমন হয়ে গেছে যে, আমাদের পক্ষে উচ্চ চিন্তন করা সহজ। কিন্তু আমরা যদি এটা না করে ভোগের মধ্যে ডুবে যাই, ব্রেনের এই স্ট্রাকচারটাই ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যাবে। একবার যদি এই শক্তিটা হারিয়ে যায়, নূতন করে দাঁড় করাতে অনেক সময় লাগবে। একটা নামকরা কথা আছে, Rome was not built in a day, সেই সময়কার ইতিহাস একদিনে তৈরী হয়নি, কিন্তু নষ্ট হয়ে যায় এক প্রজন্মে। রোম নষ্ট হতে মাত্র এক প্রজন্ম লেগেছে। তারপর দ্বিতীয় প্রজন্ম এসে ভাবছে, এটা কারা করেছিল, কিভাবে করেছিল। যে সভ্যতা তৈরী হতে চারশ পাঁচশ বছর লাগল, যার জন্য প্রবাদই দাঁড়িয়ে গেল, Rome was not built in a day। কত উচ্চমানের সভ্যতা ছিল, রোমকে নিয়ে কত প্রবাদ আছে, All roads lead to Rome। আমেরিকাকে নিয়ে এত নেই, লণ্ডনকে নিয়ে এত নেই, প্যারিসকে নিয়ে এত নেই, রোমকে নিয়ে যত প্রবাদ আছে। সেই রোম এক প্রজন্মেই শেষ। স্বামীজী এটাই বলছেন, আমরা যদি এখনই সাবধান না হই, আমাদের এই শক্তিটা নষ্ট হয়ে যাবে। ভোগবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজনীতি ইত্যাদি করে করে ভিতর থেকে আমরা এত ফোঁপড়া হয়ে যাচ্ছি যে, একবার যদি চীন আক্রমণ করে, আর চীন আক্রমণ করবার জন্য তৈরী হয়েই আছে, শুধু সুযোগের অপেক্ষায় আছে, ভারতের সংস্কৃতিটাই তখন শেষ হয়ে যাবে।

আমেরিকা থেকে এত কিছু করে স্বামীজী ভারতবর্ষে এলেন; কলম্বো থেকে আলমোড়া, লাহোর থেকে কলকাতা, কত জায়গায় তিনি লেকচার দিয়ে বেড়ালেন। প্রত্যেকটা সভায় হাজার হাজার লোক স্বামীজীর লেকচার শুনতে আসত। কিন্তু কজন সন্ন্যাসী হল? আট দশজন। কজন স্বামীজীর কথা শুনে নিজেকে এদিকে সমর্পিত করে দিলেন? মুষ্টিমে কয়েকজন। কিন্তু বাকিরা? স্বামীজীর স্টেনোগ্রাফার জে জে গুডউইন তিনি তাঁর মাকে চিঠি লিখছেন – এই ভারতীয়দের দ্বারা কোন দিন কিছু হবে না। স্বামীজী যখন বলেন তোমাদের ধর্ম ঢুকে গেছে রান্নাঘরে, খাওয়ার সময় গ্লাশ যদি বাটিতে লেগে যায় তখন বাটি অশুদ্ধ হল, না গ্লাশ অশুদ্ধ হল এই বিচার করতে করতেই তোমাদের হাজার বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে, তখন কত হাততালি যে কানে তালা লেগে যায়। বাড়িতে গিয়ে তারা ঠিক ওই একই জিনিস আবার করে। এরা ভারতীয়রা একটুও শোধরাবে না। গুডউইন ঠিকই বলছেন, কিন্তু এর মধ্য থেকেই লোকেরা বেরিয়ে আসে। যে কোন সমাজের দিকে তাকালে দেখা যাবে, সমাজ তখনই হয়, যখন পাঁচজন লোক বলে, ভাই তোমরা ভোগ কর চিন্তা নেই, আমি নিজেকে ঈশ্বরের নামে সমর্পিত করে দিলাম। কেন ওই পাঁচজন আসে, এটা কেন হয়, কাদের হয়, আমরা কেউ জানিনা, বিরাট রহস্য।

স্বামীজী একটা খুব মারাত্মক কথা বলছেন, তোমরা আগের আগের অনেক জন্ম তো ভোগ করেছ, না হয় এর পরেও অনেক জন্ম ভোগ করবে, শুধু এই জন্মটা তুমি আমাকে দিয়ে দাও। অতি সাধারণ কথা, কিন্তু কী উচ্চমানের কথা। আমরা রাস্থাঘাটে থাকলে, কেউ এসে বলল, দাদা আমি আপনার দু মিনিট সময় নিতে পারি? স্বামীজী ঠিক সেই ভাবে বলছেন, তোমার এই জন্মটা কি আমি নিয়ে নিতে পারি? কেন? প্রথমে যে তিনটে বলা হল, ব্রহ্মবিদ্যা, হিন্দু ধর্ম আর ভারতবর্ষ, এই তিনটে মূল আদর্শ; তার সাথে ঠাকুর আর রামকৃষ্ণ মিশন, এই পাঁচজনের সেবার জন্য। কারণ, ব্রহ্মবিদ্যা যদি ঠিক থাকে তবেই ভারত ঠিক থাকবে, ব্রহ্মবিদ্যা যদি ঠিক থাকে তবেই মানবজাতি ধরণীতলে স্বমহিমায় বিরাজ করবে।

আমরা বাচ্চা বয়স থেকে যে শুনে আসছি *বসুধৈব কুটুম্বকম্*, এটা তখনই হতে পারে যখন আধ্যাত্মিক দর্শনের মূল সত্য হবে *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*, ব্রহ্মই সব কিছু হয়েছেন। বাইরের যে কোন ধর্মকে যদি সত্য বলা হয়, তখন হবে এই ধর্মের বাইরে যারা আছে তাদের গলা কাটতে হবে। যে কোন ধর্ম যদি সত্য হয় তাহলে যে ওই ধর্ম মানবে না তার গলাটা কাটা যাবে, যে মানে সে কাটবে। যেমনি হিন্দু ধর্মকে সত্য বলে মেনে নেওয়া হবে, সবাই বেঁচে যাবে, কারণ হিন্দু ধর্ম কখনই বলে না যে, আমার ধর্ম যে মানে না তার গলা কেটে

দিতে হবে। কারণ সে জানে ব্রহ্মই সত্য, ব্রহ্মই সব। আল্লাকে যারা মানছে, সেই আল্লা ব্রহ্মেরই রূপ, গডকে যারা মানছে, সেটাও ব্রহ্মেরই রূপ। ইসলাম ধর্মের আল্লা যখন সত্য হন, তার পরিণাম হল ইসলামিক স্টেট; কি হচ্ছে সবাই দেখছে। হিন্দু ধর্ম যখন বলছে *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*, তার ব্যবহারিক রূপ হবে *বসুধৈব কুটুম্বকম্*, বিশ্বের প্রতিটি জীব আমার নিকট আত্মীয়। এখন এত কিছু শুনে, এত কিছু জেনেও যদি কিছু না করে, তখন এর থেকে দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে! কিন্তু ভারতের কপালে এটাই আছে, কারুর কিছু করার নেই। আমরা আমাদের ছোট ছোট অহঙ্কার, ছোট ছোট বাসনা, এর বাইরে আমরা কিছুতেই যেতে পারি না। এটাই স্বামীজী বলছেন। এরপর স্বামীজী অন্য বিষয়ের উপর বলছেন।

শরীরের ব্যাধির সাথে যোগী ও ভোগীর সম্পর্ক

হিন্দু ব্রেন নিয়ে স্বামীজী যেটা বলছেন, এটা স্বামীজী কথা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছেন। যদিও এর আগে স্বামীজী কর্মযোগ নিয়ে বলেছিলেন, কিন্তু এখন স্বামীজীর আলোচনার মূল থিম হল যোগ। যোগের কথাই বলে যাচ্ছেন, The body has in itself a certain power of curing itself and many things can rouse this curative power into action, such as mental conditions, or medicine, or exercise etc. (*শরীরের নিজেরই নিজেকে আরোগ্য করবার একটা শক্তি আছে – আর মানসিক অবস্থা, ঔষধ, ব্যায়াম প্রভৃতি নানা বিষয় এই আরোগ্য-শক্তিকে জাগিয়ে দিতে পারে।*) সরাসরি এর যোগের সাথে সম্বন্ধ নেই, কিন্তু ভারতের একটা প্রাচীন চিন্তাধারাকে নিয়ে স্বামীজী বলছেন, শরীরে যে ব্যাধি হয়, শরীর নিজেই এই ব্যাধিকে সারিয়ে নেয়। কুকুর, বেড়াল বা অন্যান্য পশুদের ঘা বা কিছু ক্ষত হলে, ওরা চেটে চেটে সারিয়ে নেয়। ব্যাধি সারানোর সব ক্ষমতা আসলে শরীরের ভিতরেই আছে। শরীরের ব্যাধি সারাবার এই ক্ষমতা, এই শক্তিকে শরীরের মধ্যে জাগানোর জন্য কিছু কিছু জিনিস লাগবে। তার মধ্যে একটা হল ওষুধ। আমরা মনে করি ওষুধ খেলে রোগ সেরে যায়, কিন্তু ওষুধে কখন রোগ সারে না, সারে শরীরের নিজস্ব একটা সারাবার ক্ষমতাতে। ওষুধ গিয়ে শুধু একটা ধাক্কা মারে। মনের একাগ্রতা শরীরের রোগকে সারিয়ে দেয়। তার সাথে বলছেন, ব্যায়াম, আসন, প্রাণায়াম এগুলো শরীরের রোগ সারাবার ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়।

As long as we are disturbed by physical conditions, so long we need the help of physical agencies. (*যতদিন আমরা প্রাকৃতিক অবস্থাচক্রের দ্বারা বিচলিত হই, ততদিন আমাদের জড়ের সহায়তা প্রয়োজন।*) স্বামীজী in passing কিছু কিছু মন্তব্য করছেন, এটাও সেই রকম একটা। শারীরিক কোন অবস্থায় যদি কখন আমরা বিচলিত হয়ে যাই, একটু কিছু হলেই আমাদের শরীর মন যদি অস্বস্থি বোধ করে, তখন বুঝতে হবে বাইরে থেকে তার সাহায্য একটু বেশি দরকার। যেভাবে হোক, যা কিছু করা হোক, শেষ পর্যন্ত কিন্তু সারাবার ক্ষমতা শরীরেরই রয়েছে। মানুষ যদি এটা বুঝে নেয় যে, ultimate curative power আমার শরীরের রয়েছে, তাহলে কিন্তু শরীর নিয়ে অনেক সমস্যা লাঘব হয়ে যাবে। Not until we have got rid of bondage to the nerves, can we disregard them. (*আমরা যতদিন স্নায়ু-সমূহের দাসত্ব কাটাতে পারছি, ততদিন জড়ের সাহায্য আমরা উপেক্ষা করতে পারি না।*) যাঁরা যোগের পথ অবলম্বন করে সাধনা করছেন, তাঁদের জন্য রোগ একটা বিরাট বড় সমস্যা। যারা যোগী নয়, তারা ভোগী, হয় যোগী নয়তো ভোগী, আর ভোগী মানেই রোগী। যোগী, ভোগী আর রোগী তিনটে একসাথে চলে। এখন বলছেন, তুমি যদি রোগী হও তাহলে বিচার করে দেখ তুমি স্বভাবে ভোগী নাকি স্বভাবে যোগী? স্বভাবে যদি তুমি ভোগী হও, তার মানে খাওয়া-দাওয়া তোমার ভাল লাগে, সাজ-পোষাক খুব ভাল লাগে, লোকেদের সঙ্গ ও মেলামেশা তোমার ভাল লাগে, তার মানে, তোমার রীতিমত ওষুধ লাগবে, আসন, ব্যায়াম, প্রাণায়াম এগুলো নিয়মিত করতে লাগবে। আর যদি তোমার ভোগের ইচ্ছা না থাকে, বিষয়ী মানুষের সঙ্গ থেকে দূরে থাকতে চাইছ, শুধু ধ্যান-জপ, স্বাধ্যায় নিয়ে থাকতে চাইছ, তাহলে তুমি যোগী। তাহলে তুমি আসনে বসে ধ্যান করেই তোমার রোগ সারিয়ে নিতে পার। এটা কিন্তু পুরোপুরি সত্য।

স্বামীজী এখানে প্রাণায়াম করা, আসন করা নিয়ে বলছেন না। যোগসূত্রেই আছে যোগে কি কি বিঘ্ন আসে, তার মধ্যে ব্যাধি একটা বিঘ্ন। আলস্য, নিদ্রা যেমন বিঘ্ন, ব্যাধিও তেমন বিঘ্ন। অনেকে নিজেকে একজন যোগী মনে করে আর বলবে আমার ওষুধ লাগবে না, অনেক সাধু সন্ন্যাসীরাও মনে করেন, আমার ওষুধ

লাগবে না, এমনিতেই সেরে যাবে। তারপর দেখা যায় রোগটা বেড়ে গেছে। সেইজন্য স্বামীজী বলছেন, আগে দেখ external জিনিসগুলো তোমাকে কতটা affect করছে, যদি affect করে, তাহলে কিন্তু এখন তোমার চিকিৎসা ও ওষুধ দরকার। কিন্তু যে স্নায়ুর বন্ধন থেকে বেরিয়ে গেছে, যার স্নায়ুগুলো পুরো নিয়ন্ত্রণে আছে, তার মানে কেউ তাকে অপমানিত করে কিছু কথা বললে অপমান বোধ করে না, তার উপর রাগ বা অভিমান হয় না। আবার কেউ একটু প্রশংসা করলে আহ্লাদে আটখানা হয়ে যায়, বুঝতে হবে তার স্নায়ুগুলো নিয়ন্ত্রণে নেই। সেইজন্য হঠযোগীরা প্রথমেই নাড়িশুদ্ধি করার কথা বলে, নাড়িশুদ্ধি মানে nervesগুলিকে purify করা। রাজযোগের যারা সাধনা করেন, তাদের অসুখ হওয়াটা বাঞ্ছনীয় নয়, ওষুধ খাওয়ারও কোন প্রয়োজন হয় না। যদিও স্বামীজীর অনেক রকম রোগ ছিল। ইটি স্টার্ডি ছিলেন, উনি পরে স্বামীজীর খুব সমালোচনা করেছিলেন, আপনি যোগী হয়েও আপনার এত রোগ কেন। স্বামীজী চাইলেই তাঁর সব রোগ সারিয়ে নিতে পারতেন, কোন সন্দেহই নেই। কিন্তু তিনি সারাবার চেষ্টাই করতেন না, আর শরীর, শরীরের রোগ ব্যাধির ব্যাপারে ওনার কোন নজরই ছিল না। স্বামীজী এখানে সাবধান করে দিচ্ছেন, তুমি নিজেকে যোগী মনে করতে পার, আর তার জন্য তুমি বলতে পারো, আমার এটা লাগবে না, সেটা লাগবে না; কিন্তু তার আগে বিচার করে দেখ তোমার nerves গুলো কেমন। বাইরের কোন পরিস্থিতি তোমার উপর কোন প্রভাব ফেলে কিনা, যদি করে তাহলে তোমার ওষুধ, আসন, প্রাণায়াম এই জিনিসগুলো লাগবে। ওষুধ রোগ সারিয়ে দেবে, আসন ও প্রাণায়াম তোমার শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে দেবে।

মন ও চেতনাকে নিয়ে পাশ্চাত্যের চিন্তা-ভাবনা

এরপর স্বামীজী ধর্মকে নিয়ে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন, যেটা আগে আমরা অনেকবারই আলোচনা করেছি। যে কোন আচার্যের কাছে বেশি কথা বলার থাকে না, গুটি কয়েক কথাকেই ওনারা বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেন; কিন্তু যতবার বলবেন, উপস্থাপনটা পুরো আলাদা হয়ে যায়। বাড়িতে মায়েরা রান্না করেন, কয়েকটি রান্নার মশলা, তেল, নুন, ফোড়ন, লঙ্কা, জিরা, কিন্তু ওই কটি দিয়েই কত রকমের রান্না দাঁড় করিয়ে দেন, এটাই তাঁদের বিশেষত্ব। স্বামীজীও একই কথা বিভিন্ন ভাবে বলছেন, ফলে আমাদের যে মন বেশি কিছু নিতে পারে না, পাঁচ ভাবে এলে তখন ওই কথার একটা ধারণা করতে পারে।

স্বামীজী এখানে খুব সুন্দর একটা কথা বলছেন, যে কথাকে পরে বিখ্যাত সাইকলজিস্ট সিগমেন্ট ফ্রয়েড একটা ধারণা নিয়ে এলেন। মন জিনিসটা কি আমরা এখনও জানি না, সাইকলজিস্ট বলুন, নিওরলজিস্ট বলুন, কেউ মনের একটা প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা দিতে পারছে না। পরের দিকে আবার মনকে consciousnessএর সাথে লিঙ্ক করে দেওয়া হয়েছে। লিঙ্ক করে দেওয়ার পর রজার পেনরোজের মত বড় বড় পদার্থবিদরাও এর মধ্যে নেমে গেলেন। এখন consciousness জিনিসটা আসার পর কোন ফিল্ডে consciousness থেকে গেছে আমরা জানি না। এর মধ্যে সাইকলজিস্টরাও আছেন, নিওরোলজিস্টরাও আছেন, সাথে সাথে পদার্থবিদরাও এর মধ্যে ঢুকে গেছেন, বায়োলজিস্টরাও ঢুকে গেছেন, আর কারা কারা যে ঢুকে গেছেন আমাদের জানা নেই। কিন্তু একটা জিনিস জানা আছে যে, কেউই মনের এখনও ব্যাখ্যা দিতে পারছেন না। যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, এর একটা নাম Phenomenology, যে জিনিসগুলিকে দেখা যাচ্ছে, সেগুলোকে আধার করে একটা ব্যাখ্যা করা হয়, তখন বলে Phenomenology। বেশির ভাগ সাইকলোজি এখনও এটা পুরোপুরি Phenomenologyতেই দাঁড়িয়ে আছে। Evolutionary Psychology, Evolutionary Biology, এই subject গুলি সবই Phenomenology। ওরা নিজের সাবজেক্টকে বিজ্ঞান বলে, কিন্তু এটা কোন বিজ্ঞান নয়, কিছু জিনিসকে নিয়ে একটা সুন্দর থিয়োরি দাঁড় করিয়ে, তার সাথে কয়েকটা এমন কিছু terms নিয়ে আসে, যেগুলো কেউ কোন দিন শোনেনি, মনে হবে বিরাট কিছু করে দিয়েছে। ন্যায়ের পণ্ডিতরা আগেকার দিনে ঠিক এটাই করত, পাঁচটা এমন নূতন শব্দ দাঁড় করিয়ে দেবে যে, কেউ কিছু বুঝবে না, মনে হবে বিরাট পণ্ডিত।

ফ্রয়েড যে ধারণাটাকে এনে জনপ্রিয় করে দিলেন, তাতে উনি বলছেন, মনের তিনটে থাক। তিনি মনকে একটা আইসবার্গের সাথে তুলনা করছেন। আইসবার্গের কিছুটা রয়েছে উপরে, বেশির ভাগটা রয়েছে জলের তলায়, ফ্রয়েড বলছেন, আমরা যে দৈনন্দিন জীবন চালাই, এটা হল আমাদের মনের একটা ছোট্ট

অংশ। আসল মন কখন সামনে আসে না। মনের তিনটে স্তরকে উনি নাম দিলেন, ID, Ego, Super Ego, এগুলো ওনার টেকনিক্যাল টার্ম। ইগো বলতে আমরা যে ইগো বলি, সেটা না। ওনার মতে বাচ্চা বয়স থেকে বা মায়ের গর্ভ থেকে আমরা যা কিছু experience করে আসছি, সেগুলোকে নিয়ে আমাদের মনে একটা বিরাট বড় ভাণ্ডার তৈরী হয়ে যাচ্ছে। ওই ভাণ্ডারের তিনি নাম দিলে ID। ফ্রয়েডের বিচিত্র ধরণের থিয়োরি। যাই হোক লোকেরা এখন প্রমাণ করে দিয়েছে, ফ্রয়েডের থিয়োরি ভুল। কিন্তু উনি যা যা আইডিয়া গুলো দিয়ে গেছেন, সেগুলো কোন না কোন ভাবে থেকেই গেছে। ওনার হল sex drive আর violence। সেখান থেকে বলছেন, ID এর থেকে যখন আরও উপরে চলে আসে, তখন হয় ego। তখন কিছু কিছু যুক্তিপূর্ণ বিচার আসে, যেমন আমি যদি আমার sex desire বার করতে যাই, লোকটা আমাকে মেরে দেবে, সেইজন্য নিজেকে চেপে রাখতে হয়। যখন চাপছে, তখন সেটা হয়ে যায় repression। ওই repressionটাই চলে যাচ্ছে IDতে। সেটা আবার বেরোবে গিয়ে স্বপ্নে, বিচিত্র সব থিয়োরি। কিন্তু পুরো পাশ্চাত্য দর্শন দাঁড়িয়েছে ফ্রয়েডের এইসব থিয়োরিকে অবলম্বন করে। পাশ্চাত্য দর্শনে শুধু ফ্রয়েডরই অবদান নেই, ওনার আগেও কিছু সাইকলজিস্টরা ছিলেন, যাঁরা সবাই ডাক্তার ছিলেন; নিজেদের রোগীদের থেকে শুনে শুনে সব রেকর্ডস রেখেছিলেন, পরে ফ্রয়েড তাঁর নিজস্ব কিছু রোগীদের কথাবার্তার রেকর্ডস, সব মিলিয়ে তিনি এই থিয়োরী দাঁড় করালেন।

Egoর উপরে আসে Super Ego, যেটাকে নিয়ে আমরা চলি। সুপার ইগো বললে আমাদের মনে হবে বিরাট অহঙ্কার, কিন্তু তা না। সুপার ইগো মানে, যেটাকে নিয়ে আমাদের জীবন চলে; যেখানে মরালিটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। ID leveleএ কোন মরালিটি নেই, কোন যুক্তি বিচার নেই, সেটা কখনই উপরে আসে না, সব সময় চাপা থাকে। কদাচিৎ কখন এগুলো স্বপ্নে ভেসে ওঠে। দ্বিতীয় ইগো, এটা হল প্রধান চালিকা শক্তি, এখানে যুক্তি বিচারাদি রয়েছে। সুপার ইগো দিয়ে আমাদের জীবন চলে, সেটাকে ফ্রয়েড ডিফাইন করছেন দুটো জিনিসকে দিয়ে, conscious আর unconscious। সাইকলোজি এখনও এই দুটোকে নিয়ে চলে, conscious আর unconscious।

এরপর এলেন কার্ল জুঙের মত বিখ্যাত সাইকলজিস্ট, যিনি আরেকটা পরিভাষা যোগ করলেন, যার নাম দিলেন collective conscious। ফ্রয়েডের থিয়োরি হল individual unconscious, আমাদের মনের ভিতরে অনেক কিছু জিনিস আছে, যে জিনিসগুলো সামনে আসে না, কিন্তু সেটা হল চালিকা শক্তি, যার দ্বারা সব কিছু হয়। কার্ল জুঙ বলছেন, একটা পুরো জাতির collective unconscious থাকে, যেটা জীবনকে চালায়। এর খুব নামকরা দৃষ্টান্ত হল; ইদানিং যত স্তন্যপায়ী প্রানী আছে, শিম্পাজী থেকে শুরু করে মানুষ পর্যন্ত, এরা সবাই সাপকে ভয় পায়। যার জন্য বাচ্চা যদি আগে কখনও সাপ নাও দেখে থাকে, সেও সাপ দেখলে ভয় পাবে। পরে পরে এনারা আরও জেনেটিক আইডিয়া দিয়ে এই জিনিসটাকে প্রমাণিত করতে চাইলেন। ফ্রয়েড প্রথম পাশ্চাত্যের চিন্তন জগতে conscious আর unconscious এই থিয়োরী নিয়ে এলেন। ফ্রয়েড স্বামীজী থেকে সাত থেকে আট বছরের বড় ছিলেন, ফ্রয়েড ১৮৫৬, আর স্বামীজীর আবির্ভাব ১৯৬৩। পাশ্চাত্য চিন্তা জগতে ফ্রয়েডের প্রচুর অবদান, আর উনি বেঁচেও ছিলেন অনেক দিন।

স্বামীজী এখন conscious ও unconscious নিয়ে বলছেন, ফ্রয়েড তখনও তাঁর থিয়োরি দেননি, কিন্তু এর ঠিক দু থেকে পাঁচ বছর পরেই তিনি conscious ও unconsciousর উপর ওনার থিয়োরি নিয়ে এলেন। কিন্তু ফ্রয়েড যখন idea of conscious and unconscious নিয়ে বলতে শুরু করেছেন, যদিও তখনও ফ্রয়েডের নাম কেউ জানত না; তার দু বছর পর স্বামীজী বলছেন। আর পাঁচ বছর পর ১৯০০ সালের মধ্যে ফ্রয়েডের নাম আসতে শুরু হয়ে গিয়েছিল। স্বামীজী যখন এনার্জি আর ম্যাটার দুটোকে একসাথে লিঙ্ক করছেন, তার কয়েক বছরের মধ্যে আইনস্টাইনের $E=MC^2$ এলো, আর স্বামীজী যখন conscious আর unconsciousএর কথা বলছেন, তার কয়েক বছরের মধ্যে ফ্রয়েডের এই থিয়োরি আসে। স্বামীজী যখন স্পেস নিয়ে বলছেন, bound but infinite, তার পনের বছরের মধ্যে general theory of relativity আসে, যেখান থেকে exapanding universeএর concept আসে যেখানে ইউনিভার্স হয়ে যায় infinite but bound। যেমন আমাদের পৃথিবী surfaceএর দিক থেকে infinite but bound।

স্বামীজীর মধ্যে একটা intuitive power ছিল; এর আগে যেখানে আমরা cultural transference নিয়ে আলোচনা করছিলাম, যেখানে স্বামীজী consciously জিনিসগুলিকে transference করছিলেন, এই transference শব্দটাও ফ্রয়েড এনেছিলেন। স্বামীজী যখন একটা জিনিসকে বর্তমান সমাজের জন্য নিয়ে আসছিলেন তখন এটা এক রকম, কিন্তু তার সাথে ঋষিরা যে সত্যগুলিকে ধ্যানের গভীরে প্রত্যক্ষ করে আমাদের জন্য লিপিবদ্ধ করে গেছেন, সেই সত্যগুলিকেই বর্তমান চিন্তাধারায় কিভাবে স্বামীজী spontaneously place করছেন, যার impact ওই সময়েও কেউ বোঝেনি আর এখনও যখন আমরা বলছি তখন আমাদের অবাক লাগে। আবার অনেকে বলছে, স্বামীজীর কাছ থেকে পরে সবাই ধার করেছে। একজন তো বলেই দিলেন, স্বামীজীর এনার্জি ম্যাটারের কথা একজন শুনেছিল, সে আবার নাকি আইনস্টাইনের স্ত্রীর সাথে আলোচনা করেছিল, সেখান থেকে আইনস্টাইন তাঁর থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি দিলেন। এর থেকে মুর্খের মত কথা, ফালতু কথা কিছু হতে পারে না। সত্যিই আমাদের দেশ এমনই এক মুর্খের দেশ, যখন আইনস্টাইনের মত একজন মানুষ যিনি বিজ্ঞানকে বিরাট অবদান দিতে যাচ্ছেন, সেখানেও আমরা বলছি উনি স্বামীজীর কাছ থেকে ধার নিয়েছেন। আইনস্টাইন বেচারি জানতেনও না, আর এই জিনিসগুলো কোন দিন শোনেনওনি, তিনি নিজের মত চিন্তা ভাবনা করে যাচ্ছেন। দেশ যখন অন্ধকারে থাকে, তখন এরা এইভাবেই আলো দেখার চেষ্টা করে। বর্তমানের মধ্যে যারা থাকতে চায় না, তারা ভূতকালের দিকে তাকিয়ে থাকে।

স্বামীজী conscious ও unconsciousকে রাজযোগ থেকে আনছেন। রাজযোগে একটা খুব important concept রয়েছে, unlike ফ্রয়েড, ফ্রয়েডের ক্ষেত্রে জন্ম থেকে আসছে, কার্ল জুঙের ক্ষেত্রে ওটা প্রজাতি থেকে আসছে। রাজযোগ ফ্রয়েড, কার্ল জুঙ কাউকেই মানে না, রাজযোগ বলে, এটা তোমার নিজের, যোগের পরিভাষায় বলছেন কর্মাশয়। কিন্তু এটাই আশ্চর্যের যে, কর্মাশয়ের যে concept, আর unconscious এর যে concept, পুরোটাই এক। কিন্তু একটা তফাৎ আছে, unconsciousটা একটা জন্মে সীমাবদ্ধ, আর কর্মাশয় যবে থেকে সে সৃষ্টিতে এসেছে তবে থেকে। দ্বিতীয় আরেকটা তফাৎ হল কর্মাশয় থেকে কিছু জিনিস বেরিয়ে এসেছে, সেটা দিয়ে আমাদের জীবন চলছে, কিন্তু ফ্রয়েডের unconsciousএ এই রকম কিছু হয় না, unconscious তাকে impel করতে থাকে। স্বামীজী সেখান থেকে টেনে নিয়ে আসছেন।

অবচেতনভূমি-চেতনভূমি-অতিচেতনভূমি এবং দর্শন-ধর্ম-অধ্যাত্ম

স্বামীজী বলছেন, There is the unconscious mind, but it is below consciousness, which is just one part of the human organism. (*আমাদের সাধারণ জ্ঞানভূমির নীচে মনের আর এক ভূমি আছে –তাকে 'অজ্ঞানভূমি' বা 'অবচেতন মন' বলা যেতে পারে; আমরা যাকে সমগ্র মানুষ বলি, জ্ঞান তার একটা অংশ মাত্র।*) স্বামীজী আইসবার্গের উপমাটা হাল্কা করে আনছেন, ফ্রয়েড কিন্তু আরও অনেক পরে এনেছেন। স্বামীজীকে মনে হবে তিনি ফ্রয়েড থেকে কপি করছেন, অথবা মনে হবে ফ্রয়েড স্বামীজী থেকে কপি করছেন, হুবহু এক জিনিস। অথচ ফ্রয়েড স্বামীজীকে জানতেন না, স্বামীজীর সময় ফ্রয়েড তখনও আসেননি, মাত্র পাঁচ বছরের তফাৎ। এটাকে আমরা Law of spontinity বলতে পারি, যে আইডিয়ার প্রসব হওয়ার সময় হয়ে এসেছে, সেই আইডিয়া মানুষ খোঁজে, আর একই সাথে পাঁচজনের মাথায় ও আইডিয়াটা নামবে। এটা খুব ভাল দেখা যায়, যাঁরা বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নোবেল প্রাইজ পান, দেখা যাবে, যেটার উপর কাজ করে উনি নোবেল প্রাইজ পেলেন, সেটার উপর আরও পাঁচজন কাজ করছিলেন। যিনি আগে শেষ করেন, তিনি নোবেল প্রাইজটা পেয়ে যান। বড় বিজ্ঞানীদের সাথে কথা বললে জানা যায় যে, তাঁদের কাছে যারা রিসার্চ করতে আসে, ওনারা তাদের বলে দেন, তুমি যে প্রজেক্টের উপর কাজ করতে যাচ্ছ, তুমি জানো আর নাই জানো, তোমার অজান্তায় এই প্রজেক্টের উপর আরও পাঁচজন কাজ করছে। যে আগে যাবে তার প্রজেক্ট স্বীকৃতি পাবে। আর পাঁচজন যদি একই সাথে কোন আইডিয়ার উপর কাজ না করে থাকে, তাহলে জেনে নাও, এটা কোন আইডিয়াই না। কারণ যে আইডিয়া বেরোবে, একসাথে পাঁচজনের কাছে আসবে। যার জন্য দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময় বাংলা সাহিত্যে তখন কত নামকরা সাহিত্যিকদের আবির্ভাব হয়েছিল। তখন অনেকেই কবিতা লিখছেন, অনেকেই সাহিত্য রচনা করছেন।

এগুলো কিছুই না, আইডিয়াস গুলো মূর্ত হতে চাইছে, যে এগিয়ে আসবে, আইডিয়া তাকে নিয়ে এগিয়ে যাবে। কে ওই আইডিয়াকে প্রথম ধরবে, বলা অসম্ভব। যখন বলা হয়, অবতার যখন আসেন তখন তিনি বিবর্তনে একটা ধাক্কা দেন। ঠিক এই জিনিসটাই হয়। আমাদের যে নিষ্ঠার মান, ওই মান নিয়ে এগুলোকে ধরা সম্ভবই না। কিন্তু কেমন একটা মিল, ওদিকে আইনস্টাইন যেটা করছেন, তার কয়েক বছর আগে স্বামীজী সেটাকে বলে দিচ্ছেন; ফ্রয়েড যেটা বলছেন, পাঁচ বছর আগে স্বামীজী সেই আইডিয়াকে নিয়ে বলছেন। এনারা হলেন সবাই নামকরা চিন্তাবিদ। যাঁরাই করছেন তাঁরাই স্বতন্ত্র ভাবে করছেন, উনি তাঁকে জানেন না, তিনি ওনাকে জানেন না, কিন্তু একই আইডিয়াকে নিয়ে বলছেন। স্বামীজী যা বলছেন, তিনি আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্যের জ্ঞানকে আধার করে বলছেন। ওনারা এটা স্বতন্ত্র ভাবে বার করছেন। যাই হোক, এখান থেকে স্বামীজী conscious, unconscious এগুলোকে নিয়ে ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা ও দর্শনকে এক জায়গায় নিয়ে আসছেন। আগেও তিনি এই জিনিসটাকে এনেছেন, এখানে অন্য ভাবে আনছেন।

এখানে তিনি একেবারে অন্য একটা পরিভাষা দিচ্ছেন, বলছেন, Philosophy is guess work about the mind. Religion is based upon sense contact, upon seeing, the only basis of knowledge. (*দর্শনশাস্ত্র মন সম্বন্ধে কতকগুলি আন্দাজ-মাত্র। ধর্ম কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শন বা প্রত্যক্ষানুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত –প্রত্যক্ষদর্শন জ্ঞানের একমাত্র ভিত্তি।*) দর্শন আর ধর্ম এই দুটোকে স্বামীজী differentiate করছেন। আমরা যখনই ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের উপর কোন আলোচনা শুরু করি, তখন সব সময় প্রথমে ব্যাখ্যা করা হয়, আমরা জ্ঞান কিভাবে পাই। যোগশাস্ত্রে যেমন বলছেন, ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বহির্জগৎ থেকে যা কিছু আমাদের কাছে আসছে, তাতে আমাদের অনুভূতি হয়, আমাদের মন সেটাকে জানতে পারে, এটাকে বলছেন বৃত্তি। বৃত্তি যখন শান্ত হয়ে যায়, তখন আমরা সেটাকে বলি আধ্যাত্মিক জ্ঞান।

এই জিনিসটাকেই আবার আমরা অন্য ভাবে বলে থাকি। সাধারণ ভাবে দেখা যায় শব্দ শব্দকে জন্ম দেয়। আমরা আমাদের জানা শব্দগুলিকেই আওড়াতে থাকি। ক্লাশ ফাইভ সিক্সের কথা যদি আমাদের মনে থাকে, তাহলে দেখতে পাই, ক্লাশে একটা রচনা লিখতে দেওয়া হয়েছে। রচনাটা ভাল করে মুখস্ত করে প্রস্তুতি নিলাম, তাতে কিছু শব্দ ভিতরে গেল, সেই শব্দগুলিই পরে বেরিয়ে চলে আসে। যার জন্য আমাদের সেই সময় পরীক্ষাতে একটা ভীতি থাকত। জ্ঞান কোন অবস্থাতেই থাকে না, যখন মুখস্ত করছে তখনও থাকে না, যখন লিখছে তখনও থাকে না। শব্দের এলাকাকে পার করে চলে যাওয়ার পর আমরা ভাবরাজ্যের এলাকায় চলে যাই। যাঁরা ভাবরাজ্যের এলাকায় চলে গেছেন, তাঁরাই বড় লেখক হন, বড় বৈজ্ঞানিক হন, বড় চিন্তাবিদ হন। সেখান থেকেও আরও গভীরে চলে যাওয়ার পর শব্দের জগৎ শান্ত হয়ে গেল, ওই যে নৈঃশব্দ, ওই নৈঃশব্দের পর আসে মনের নৈঃশব্দতা। মনটাও শান্ত হয়ে যাওয়ার পর তিনি অন্য ধরণের এক সত্যের মুখোমুখি হয়ে যান। শব্দ এক রকমের সত্য দেয়, মৌনাবস্থা আরেক রকমের সত্য দেয় আর মনের মৌনতা আরেক ধরণের সত্যকে নিয়ে আসে। স্বামীজী দর্শন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ওটাই বলছেন, philosophy is guess work about the mind।

স্বামীজী এখানে মন বলতে শুধু এই মন না, মনের পুরো এলাকাকে নিয়ে বলছেন। আমরা আগে কান্টকে নিয়ে আলোচনা করেছি, এক্ষুণি ফ্রয়েড নিয়ে কথা বললাম, এনারা সবাই philosophers। কিন্তু শঙ্করাচার্যকে philosopher বলা যায় না। ইমান্যুয়াল কান্ট, ফ্রয়েড, শ্যপেনহাওয়ার, প্লেটো এনারা যে অর্থে philosopher, আচার্য শঙ্কর সেই অর্থে কোন মতেই philosopher নন, স্বামীজী কোন মতেই সেই অর্থে ফিলজফার নন। অনেক বড় বড় মহারাজদেরও বলতে দেখা যায় যে, ওনারা বলছেন, ইণ্ডিয়ান ফিলজফি যখন লেখা হয় তখন সেখানে স্বামীজীর নাম থাকে না। স্বামীজী কোন মতেই ফিলজফার নন। স্বামীজী হলেন বেদ, স্বামীজীকে আধার করে ফিলজফার আসবে। শঙ্করাচার্য, স্বামীজী, এনাদের থেকে ফিলজফারসরা অনেক নীচে থাকবেন। পরের বাক্যেই স্বামীজী আপ্ত ঋষিদের কথা বলবেন, ঋষিরা হলেন শ্রেষ্ঠ, বেদ হল শ্রেষ্ঠ। তাঁদের নীচে তাঁরাই আসেন, যাঁরা সেই বেদকে অনুশীলন করছেন। ফিলজফি, যেখানে guess work চলছে, এটা হল সবার নীচে। তারও নীচে সাধারণ মানুষ, সাধারণ মানুষকে নিয়ে আমরা কথা বলছি না। মনের এলাকা যতটা, ব্যষ্টি মন, সমষ্টি মন, সব মন মিলিয়ে তার যতটা এলাকা হয়, ওই এলাকায় যখন guess work

চলছে, ওটাই ফিলজফি। যে কোন ফিলজফি যদি আমরা পড়ে দেখি, মাথা ঝিমঝিম করতে শুরু করবে। এক ফিলজফার যখন আরেক ফিলজফারকে contradict করে, তখন আরও মাথা ঝিমঝিম করবে। শ্যপেনহাওয়ার একটা খুব মারাত্মক কথা বলছেন হেগেলের নামে, He stands as monument of German stupidity। সেই হেগেলের দর্শনকে আধার করে আজকের কম্যুনিজম্ দাঁড়িয়েছে। জার্মান ফিলজফারসরা সেই সময় খুব নামকরা ফিলজফার ছিলেন; গ্রীক ফিলজফারসদের ছেড়ে দিলে তারপরেই আসবেন জার্মান ফিলজফারসরা। বাকি ইংল্যাণ্ড আমেরিকা কিছুই না। ফিলজফারসদের পড়তে গেলেই মাথা গুলিয়ে যাবে, কারণ সবটাই guessing works। স্বামীজী পরে আবার বলবেন, যত মারামারি হয় সব guess work between guess work। সৌভাগ্য যে ভারতীয় রাজনৈতিক দলের কোন ফিলজফি নেই, অল্প যদি একটু থাকে, তাহলে দেখা যাবে fight between guess work and guess work। যারা রাজনীতিতে আছে, বা ওই লেভেল ঘোরাফেরা করে, তারা যে সবাই সত্যিই মানুষের ভাল চাইছে না, তা নয়। যদি আমরা মেনেও নিই, মানুষের ভাল চাইছে, সেখানেও fight between guess work and guess work।

স্বামীজী বলছেন, ওই জিনিসটা যখন আরেকটু এগিয়ে যায়, সত্যিকারের যখন অনুশীলনে থাকে, তখন তাকে বলে ধর্ম, বলছেন, Religion is based upon sense contact, upon seeing, the only basis of knowledge। সত্যিকারের যখন sense contact হচ্ছে, আমাকে এটা করতে হবে, আমি এটা পারছি, এই জায়গাতে ধর্ম আসে, আর ধর্ম ফিলজফির অনেক উপরে। বলছেন, What comes in contact with the superconscious mind is fact. (*মন যখন জ্ঞানেরও অতীত ভূমিতে চলে যায়, তখন সে যথার্থ বস্তু –যথার্থ বিষয়কেই উপলব্ধি করে।*) স্বামীজী আগে unconscious, পরে consciousকে নিয়ে বললেন, এবার বলছেন superconsciousকে নিয়ে। Unconsciousএ যখন চলছে, যখন guess work করছে, তখন সে হয়ে যাবে ফিলজফার। যখন conscious worldএ চলছে তখন হয়ে গেল ধর্ম। যার জন্য আমরা ফ্রয়েডকে নিয়ে এলাম, ফ্রয়েড একটু অন্য রকম ভাবে বলছেন, আর তিনি এই জগৎকে নিয়েই বলছেন। কারণ ফ্রয়েডের কাছে ধর্ম হল livido mortido, based on sex and violence। স্বামীজী define করছেন unconscious, conscious and superconscious। যে জায়গাকে আমরা জানি না, সেই জায়গাকে নিয়ে যখন guess work করছে, তখন ওটা ফিলজফি হয়ে যায়। যে জায়গাকে আমরা জানছি, যে জায়গাকে নিয়ে আমরা জীবন চালাচ্ছি, সেটা হয়ে যাচ্ছে ধর্ম। আর যিনি শব্দের নৈঃশব্দকে অতিক্রম করে গেছেন, তারপর মনের সমস্ত বৃত্তিকে শান্ত করে তিনি পেরিয়ে এসেছেন, এরপর যেটা তাঁর কাছে আসছে, তা হল superconscious; স্বামীজী বলছেন, superconscious mind is fact।

তাহলে what is fact? Fact হল, যেটা একমাত্র superconscious mind জানে। এই superconsciousএর এলাকায় বিজ্ঞান কোন দিন যেতে পারবে না, সম্ভবই না। কোন চিন্তা ভাবনাই সেখানে যেতে পারবে না, কারণ মন সেখানে মৌন হয়ে যায়। মন মৌন হয়ে গেলে তখনই মানুষের আধ্যাত্মিক উপলব্ধি হয়। অনেকে আবার বোকার মত প্রশ্ন করে, আপনারা বলছেন there is no mind সেটা নাকি হল আধ্যাত্মিকতা, তাহলে একজন mindless পাইলটের প্লেনে কি আপনি চাপতে চাইবেন? কিন্তু মুর্খরা জানে না যে, no mind আর mindless দুটো এক কথা নয়। No mind হল যেখানে মনে হচ্ছে জিনিসটা নেই, আর mindless মানে যার ব্রেনটাই কোন কাজ করতে পারছে না। কোন ভাষায় বলছে no mind আর mindless এক জিনিস? Having no mind, তার মানে, you go beyond mind। শাস্ত্র অধ্যয়ন না করলে, আচার্যের সঙ্গ না করলে, চিন্তন না করলে এই হয়। স্রষ্টা আর সৃষ্টিকে নিয়ে তত্ত্বগুলি একমাত্র উপলব্ধি হয়ে ধ্যানের গভীর থেকে গভীরতম অবস্থায়। তখন সেখান শব্দ শান্ত, মন শান্ত। সেখানে মন আছে কিনা বোঝা যায় না। কথামৃতে মাস্টারমশাই ঠাকুরের সমাধির অবস্থা যেখানে বর্ণনা করছেন, সেখানে বলছেন সব কিছু যেন স্তম্ভিত হয়ে গেছে; নিঃশ্বাস প্রশ্বাসকে নিয়ে বলছেন, নিঃশ্বাস বইছে কি বইছে না বোঝা যাচ্ছে না। ঠিক তেমনি সমাধির গভীরে মন আছে কি নেই বোঝা যায় না। কারণ মনে তখন যদি দুটো বৃত্তি থাকে তাহলেই মন জগতে চলে আসবে। একটা বৃত্তি যদি থাকে, ঈশ্বরকে দেখবে আর কোন বৃত্তি যদি না থাকে, নির্গুণ ব্রহ্মের

সঙ্গে এক হয়ে যাবে। আমাদের পক্ষে এই জিনিসগুলোকে ধারণা করা মুশকিল, কিন্তু আধ্যাত্মিক উপলব্ধি এভাবেই হবে।

Aptas are those who have 'sensed' religion. (*'আপ্ত' তাঁদের বলে, যাঁরা ধর্মকে প্রত্যক্ষ করেছেন।*) আমাদের ভাষায় আমরা বলি তিনি তত্ত্ব জেনেছেন, কিন্তু তত্ত্বকে জানা যায় না, তত্ত্বকে বোধে বোধ হয়। আপ্ত তাঁদেরকেই বলা হয়, যাঁরা তত্ত্বকে বোধে বোধ করেছেন। যিনি জানেন তিনিই জানেন, অপর কেউ জানতে পারবে না, বুঝতে পারবে না। কারণ সাধারণ মানুষের কাছে গিয়ে বললে, তারা সবাই মিলে তাঁকে ক্রুশিফাই করে দেবে, তাঁর নামে লোকেরা বলবে, পরমহংসের দল চলে প্যাঁক প্যাঁক। কারণ এদের বোঝার ক্ষমতাই নেই। ফিলজফি সবচেয়ে বেশি পপুলার হয়, যার জন্য ফিলজফারস্‌দের মানুষ অনেক বেশি সম্মান দেয়, ধর্মের লোকেদের সম্মান তাঁদের তুলনায় একটু কম হয়, ঋষিরা নিজের সময়ে সব থেকে কম জনপ্রিয় ছিলেন। কিন্তু যত সময় অতিবাহিত হতে থাকে ঋষিরা ধীরে ধীরে সম্মানের শিখরে উঠে যান। সেদিক থেকে ঋষিরা সবার উপরে, সাধু মহাত্মারা তার থেকে নীচে, ফিলজফারসরা সব থেকে নীচে। প্লেটো, সক্রেটিস এনাদের সময় গ্রীসে তাঁদের কী সম্মান, কত নাম, সেখানে যীশুকে তাঁর নিজের সময়ে কে জানত! আজকে সক্রেটিস, প্লেটো ফিলজফির বইতে হারিয়ে আছেন, যীশু ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছেন।

ঋষিদের কথার প্রমাণ কি?

স্বামীজী এখানে একটা ছোট্ট বর্ণনা দিচ্ছেন, The proof is that if you follow their method, you too will see. Each science requires its own particular method and instruments. An astronomer cannot show you the rings of Saturn by the aid of all the pots and pans in the kitechen. He needs a telescope. So, to see the great facts of religion, the methods of those who have already seen must be followed. The greater the science the more varied the means of studying it. Before we came into the world, God provided the means to get out; so all we have to do is to find the means. (*তাঁরা যে উপলব্ধি করেছেন, তার প্রমাণ এই যে, তুমি যদি তাঁদের প্রণালী অনুসরণ কর তুমিও প্রত্যক্ষ করবে। প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই নিজস্ব বিশেষ প্রণালী ও বিশেষ যন্ত্রের প্রয়োজন। একজন জ্যোতির্বিদ রান্নাঘরের সমস্ত হাঁড়িকুড়ির সাহায্য নিয়ে শনিগ্রহের বলয়গুলি দেখতে পারেন না, তার জন্য দূরবীক্ষণযন্ত্র প্রয়োজন। সেই রূপ ধর্মের মহান সত্যসমূহ দেখতে হলে, যাঁরা পূর্বেই সেগুলি প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁদের প্রণালী-গুলি অনুসরণ করতে হবে। যে বিজ্ঞান যত বড়, তার শিক্ষা করবার উপায়ও তত নানাবিধ। আমরা সংসারে আসবার পূর্বেই ভগবান এ থেকে বেরুবার উপায়ও করে রেখেছেন; সুতরাং আমাদের চাই –শুধ সেই উপায়টাকে জানা।*) স্বামীজীর বক্তব্য হইল, যে কোন বিজ্ঞানে যদি তুমি প্রমাণ চাও, তাহলে ওই বৈজ্ঞানিক যে মেথডলজির কথা বলছেন, যে ইনস্ট্রুমেন্টের কথা বলছেন, তোমাকে সেই ভাবে সেটাকে নিয়ে হাতেকলমে করতে হবে। তুমি যদি চাঁদকে জানতে চাও, স্বামীজী Saturnএর কথা বলছেন, তাহলে তোমাকে টেলিস্কোপ নিতে হবে। রান্নাঘরের হাতা খুন্তি নিয়ে চাঁদকে বা জুপিটর বা স্যাটার্নকে study করতে পারবে না। ঠিক তেমনি ধর্মকে তুমি যদি জানতে চাও, তাহলে আপ্ত ঋষিরা যে মেথডে সব কিছু করেছেন, তোমাকেও সেইভাবে সব কিছু করতে হবে, in fact আপ্তদের এটাই প্রমাণ; আমি পেয়েছি, তুমিও ঠিক এইভাবে কর তুমিও পাবে।

উঁই পোকারা একবার বিদ্রোহ করেছে, তাদের মূল বক্তব্য হল মানুষ কেন সবার থেকে এতো এগিয়ে গেছে। ওরা অনেক রিসার্চ করে বার করল, মানুষরা পড়াশোনা করে বলে এগিয়ে আছে। তাহলে আমাদেরও মানুষের মত পড়াশোনা করতে হবে, চেষ্টা করে দেখা যাক। সবাই মিলে লাইব্রেরীতে গেল পড়াশোনা করতে, মানুষ সব বই চেটে ফেলে, আমরাও সমস্ত বই চেটে ফেলব। লাইব্রেরীর সমস্ত বইকে উঁই পোকারা কয়েক দিনের মধ্যে চেটে সাফ করে দিল। বলল কেমন লাগল? বাজে টেস্ট, কোন স্বাদ নেই। নলেজ কেমন? Bad taste, উঁই পোকারা সব বই খেয়ে নিয়েছে। ওই বই পড়ে মানুষ মানুষ হয়, সেই বইকেই খেয়ে উঁই পোকা উঁই পোকাই থেকে যায়। বিজ্ঞান যখন ধর্মকে জানতে আসে, তখন ওটা উঁই পোকার বই পড়ার মত হয়। যখন

বিজ্ঞান, যুক্তিবাদীরা ধর্মকে নিয়ে জানতে আসে, উপদেশ দিতে আসে, তখন এটাই মনে রাখতে হবে, উঁই পোকা বই চাটছে। দেখতে চাইছে, কি পড়ে ভগবান বুদ্ধ, যীশু, রামকৃষ্ণের মধ্যে এই আকর্ষণী শক্তি এসেছে যে, বিশ্বের সমস্ত মানুষকে নিজেদের দিকে এত আকর্ষণ করে নিয়ে আসছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের কথাগুলোকে সত্য বলে কেন মানব? কি করে জানবে যে শ্রীরামকৃষ্ণ fraud নন? ঠাকুর যা যা করেছেন তুমিও তাই তাই কর, শ্রীরামকৃষ্ণের কথাগুলি সত্য না মিথ্যা তখন নিজেই বুঝতে পারবে। ঋষিরা যা করেছেন, এটা স্বতঃপ্রমাণ, স্বতঃসিদ্ধ, নিজেই প্রমাণ, এগুলোকে প্রমাণ করার জন্য আর কিছু লাগবে না। ঠাকুর যদি বলতেন, আমি পেয়েছি তোমরা পাবে না, আমি পেরেছি, তোমরা পারবে না। তখন হিন্দুরা বলবে, হে প্রভু! আপনি মহাপুরুষ, আপনি নিজের মত থাকুন, আপনাকে আমাদের লাগবে না। শুধু হিন্দু ধর্মই না, যে কোন ধর্মের প্রাণপুরুষের দিকে যদি তাকাই, যেমন যীশু, তিনি যেভাবে প্রার্থনা করেছেন, প্রাণ, মন সমস্ত ঢেলে দিচ্ছেন, মাই ফাদার ইন হেভেন্ ছাড়া কিছু জানেন না। ঠিক এই ভাবে কেউ করে দেখুক, যীশুর মত সর্বস্ব ত্যাগ করে প্রার্থনা করুক, করে দেখুক ফল পায় কিনা।

আমরা আগে আলোচনা করেছিলাম, কোন জিনিসকে যদি ভুল প্রমাণিত করতে হয়, তাহলে ওই জিনিসটা যিনি দিয়েছেন, তাকেও তাঁর লেভেলে নিজেকে নিয়ে যেতে হবে, তারপর বলতে হবে এটা ভুল। নিউটনের সিদ্ধান্তকে ভুল প্রমাণিত করার জন্য আইনস্টাইন প্রথমে নিউটনের ওই লেভেলে গিয়ে, তারপর সেখান থেকে ম্যাথমেটিক্সে করে দেখছেন, এটা ঠিক নয়। ভগবান বুদ্ধকে, শ্রীরামকৃষ্ণকে যদি ভুল প্রমাণিত করতে হয়, আগে তাকে সাধনা করে ওনাদের ওই অবস্থায় যেতে হবে। গিয়ে বলবে, দেখো, আমি শব্দের এলাকা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলাম, মনের এলাকা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলাম, তারপর দেখলাম সত্যটা কিন্তু তা নয়, অন্য রকম। তখন সবাই তার কথা শুনবে। আরএসএসের মোটো হল, সঙ্ঘই শক্তি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলছেন একলা চলো রে, অবশ্য তার আগে বলছেন, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে। আরএসএস বলছে, আমাদের ডাক শুনে প্রচুর লোক আসছে। এটা অন্য জিনিস। একজন ঋষি এক রকম কথা বলছেন, আরেকজন ঋষি আরেক রকম কথা বলছেন। এর মধ্যে কোথায় contradict করছে সেটাকে আগে বোঝার চেষ্টা করতে হবে। এখন এই ফিলজফি গুলিকে আমরা যদি contradict করতে চাই, রবীন্দ্রনাথ ভুল বলেছেন যদি প্রমাণিত করতে হয়, আগে তাঁর মত মৌনের অবস্থায় যেতে হবে, তারপর দেখতে হবে জিনিসটা কি রকম। তার আগে কারুরই contradict করার কোন ক্ষমতা নেই। গ্যালিলিও যখন বললেন, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, তখন ক্ষমতার শীর্ষে ছিল খ্রীশ্চান পাদরিরা। তারা বলল গ্যালিলিও খ্রীশ্চান ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলেছে, ওকে ফাঁসি দিয়ে দেওয়া হোক। গ্যালিলিও তাড়াতাড়ি করে ক্ষমা চেয়ে নিলেন, হ্যাঁ আমি ভুল বলেছি। বেরিয়ে আসার সময় গ্যালিলিও বলছেন, এটাই কিন্তু সত্য, সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী ঘুরছে। উনি জানেন, আমি ঠিক বলছি।

এখান থেকে আবার স্বামীজী বলছেন, But do not fight over methods. Look only for realization and choose the best method you can find to suit you. (*তবে বিভিন্ন প্রণালী নিয়ে মারামারি করো না; কেবল যাতে তোমার অপরোক্ষানুভূতি হয় তার চেষ্টা কর; আর যে সাধনপ্রণালী তোমার পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী হয়, তাই অবলম্বন কর।*) যত ঝগড়া বিবাদ সব পথকে নিয়ে হচ্ছে, তোমার যে পথটা তোমার জন্য ঠিক, তুমি সেই পথটা বেছে নিয়ে এগিয়ে যাও এবং উপলব্ধি কর। Eat the mangoes and let the rest quarrel over the basket. See Christ, then you will be a Christian. All else is talk; the less talking the better. (*তুমি আম খেয়ে যাও, অপরে ঝুড়িটা নিয়ে ঝগড়া করুক। খ্রীষ্টকে দর্শন কর, তবে তুমি যথার্থ খ্রীশ্চান হবে। আর সবই বাজে কথামাত্র –কথা যত কম হয় ততই ভাল।*) তুমি আমি খেয়ে যাও, অন্যরা আমের ঝুড়ি নিয়ে ঝগড়া করুক। আগে খ্রাইস্টের দর্শন লাভ কর, দর্শন লাভ করাটাই তোমার সাধনা, কিন্তু মারামারিতে যদি নামতে চাও, তাহলে তোমার মত মুর্খ আর কে হতে পারে! যদি এই নিয়ে বিবাদ করতে যাও, খ্রাইস্ট বড় না রামকৃষ্ণ বড়, তাহলে এর মত মুর্খের কাজ কি হতে পারে! তোমরা কেউ খ্রাইস্টকেও দেখোনি, কৃষ্ণকেও দেখোনি, কি নিয়ে তোমরা ঝগড়া করছ?

একজনকে অন্তত আগে দেখো। আর যদি তুলনা করতে চাও, তাহলে আগে দুজনেরই সাক্ষাৎ কর। See Christ, then you will be a Christian.

স্বামীজী এক জায়গায় একটা খুব নামকরা কথা বলছেন, I don't consider a Hindu a Hindu, unless he is spiritual। অধ্যাত্ম মানে, আমাদের একটাই কথা, *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, অহং ব্রহ্মাস্মি*। যতক্ষণ তুমি *অহং ব্রহ্মাস্মি* উপলব্ধি করোনি, ততক্ষণ তুমি হিন্দু নও। তুমি হিন্দুত্বের ভাব নিয়ে ভোট দিতে পার, ভোট চাইতে পার, গোমাতার পূজা করতে পার, গোমাতাকে বাঁচানোর জন্য কাউকে খুন করতে পার, যাই তুমি কর, তুমি কিন্তু হিন্দু নও। স্বামীজী যেমন খ্রীশ্চান ধর্মালম্বীদের বলছেন, See Christ, then you will be a Christian। যার উপলব্ধি নেই সে হিন্দু হলেও যা, মুসলমান হলেও তাই, কোনটারই কোন দাম নেই। All else is talk; the less talking the better, কারণ সবটাই শব্দ মাত্র, কথার কথা মাত্র; কথা যত কম হয় তত মঙ্গল।

ঈশ্বরের বার্তাবহ

The message makes the messenger. The Lord makes the temple; not vice versa. (*জগতে যার কিছু বার্তা বহন করবার বা শিক্ষা দেবার থাকে, তাকেই 'বার্তাবহ' বা 'দূত' বলা যেতে পারে; দেবতা থাকলে তবেই তাকে মন্দির বলা যেতে পারে, এর বিপরীতটা সত্য নয়।*) যে কোন দূত কি ধরণের সংবাদ বহন করে যাচ্ছে, ওর messageটা কি; সেই অনুসারে আমরা messenger বলি। ধর্ম নিয়ে মানুষের পুরো সংশয়, ঠাকুর আসাতে আমাদের অনেক সুবিধা হয়ে গেছে। এখন আমরা অনেক কিছু এই প্রথম জানছি, যার ফলে বিশ্বাস করাটা অনেক সহজ হয়ে গেছে। কিন্তু কথামৃত পড়েও আমরা ঠাকুরের কি ভাব, ঠিক ঠিক বুঝতে পারি না। একজন নূতন ব্রহ্মচারী এসে মহারাজদের প্রশ্ন করছেন, ঠাকুর বলছেন, যে অবতারকে মানবে, প্রণাম করবে, সে মুক্ত। আমি তো ঠাকুরকে অবতার মানি, আমি ঠাকুরকে প্রণাম করলাম, আমি তো মুক্ত হয়ে গেছি। অবশ্যই তুমি মুক্ত হয়ে গেছ। কিন্তু ঠাকুর অবতার বলতে তুমি কি বোঝ? তুমি যেমনটি বুঝবে, তোমার মুক্তিটাও তেমনই হবে। গীতাতে ভগবান অনেকবার বলছেন, যে আমার শরণাপন্ন হয় সে মায়াকে অতিক্রম করে যায়। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে জগন্মাতা বলছেন, যে আমার শরণাপন্ন হয় সে শক্তিমান হয়, তার শরণ নিলে মানুষ উদ্ধার হয়ে যাবে। ভক্তিসূত্রেও ঠিক একই কথা বলছেন, যিনি ঈশ্বরের ভক্ত, তাঁর হৃদয়ে ভগবান বিরাজ করেন, ওই রকম ভক্তের শরণ নিলে মানুষ উদ্ধার হয়ে যায়।

একবার এক সন্ন্যাসী বলছিলেন, 'আরে আমি তো বাচ্চা বয়স থেকেই জানি ঠাকুর অবতার, নূতন করে জানার আর কি আছে'! এগুলোই খুব কাঁচা কথা হয়ে যায়। ঠাকুরই বলছেন, খুড়ি জ্যেঠির কোঁদল শুনে বাচ্চারা বলে, তোর ঈশ্বরের দিব্যি। ঠাকুর অবতার, ঠাকুর উদ্ধার করবেন, ঠাকুর আমাদের দেখছেন, এগুলো সব খুড়ি জ্যেঠির কোঁদল করা কথা, এসব কথার কোন দাম নেই। যখন বলা হচ্ছে ঠাকুরের শরণাপন্ন হও, তখন এটাই বলতে চাইছে, ঠাকুরের ভাবের শরণ নাও। ঠাকুরের ভাবের শরণ নেওয়া মানেই হয়, তোমার ভিতরে সেই ভাব আসবে। ভাবের শরণ নেওয়া মানে এই নয় যে, হে প্রভু আমি তোমাকে মানি। ঠাকুরকে যে ভাব নিয়ে দেখছ, সেই ভাব যেন তোমার ভিতর থাকে। মা বলছেন, ঠাকুর হলেন ত্যাগের বাদশা। তার মানে ত্যাগটা ঠাকুরের ভাব, সেই ভাবটা যেন তোমার ভিতরেও থাকে, পূর্ণ ত্যাগ। যদি না থাকে, তাহলে তুমি ঠাকুরের ভাবের প্রতি সমর্পিত নও। তাই তুমি যে ভাবছ তুমি মুক্ত, কোন দিন তোমার মুক্তি হবে না।

ভারতবর্ষে সাধুর বেশ ধারণ করে অসাধু কাজ করার রেওয়াজ চিরদিনই ছিল, রাবণও সাধুর বেশে এসে সীতাকে অপহরণ করেছিল। ইদানিং ভারতে কত সাধুর আবির্ভাব হয়েছে, সবাই নিজের নিজের সংস্থা খুলছে, কেউ ট্রাস্ট খুলছে, কেউ ইণ্ডাস্ট্রি খুলছে, খুলেই যাচ্ছে। সবার একটাই ট্রেড, সবাই আমাদের ধর্ম পথকে সহজ করে দিচ্ছে, মুক্তি আমাদের হাতের মুঠোয় এনে দিচ্ছে। ঠিকই, মুক্তিটা আমাদের মুঠোয় এসে যাচ্ছে আর আমাদের পকেটের সব টাকা বাবাজীদের পকেটে ঢুকে যাচ্ছে। সবাই যেন মানুষকে বোকা বানাবার

এক একটা ফ্যাক্টরি খুলে দিয়েছে। শাস্ত্রে কোথাও বলছেন না যে, আধ্যাত্মিক জ্ঞান সহজে হয়ে যাবে। বলছেন, *ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া*, ক্ষুরের ধারের উপর চলা যতটা কঠিন, ধর্ম পথে চলা ততটাই কঠিন। আর এখন সবাই হাতের মুঠোয় মুক্তি নিয়ে আসছে। তাহলে বেদের কথা কি মিথ্যা হয়ে গেল? যে বেদের কথার উপর এখনও হিন্দু ধর্ম দাঁড়িয়ে আছে, এদের একটা কথায় বেদের সব কথা মিথ্যা হয়ে যাবে! ধর্ম পথ সহজ নয়, প্রচুর খাটতে হয়। কোন পথটাই বা সহজ! শিক্ষার একটা ডিগ্রী নিতে গেলে কত খাটতে হয়, দুটো টাকা উপার্জন করতে গেলে কত খাটতে হয়। একটা পরিবারকে চালানো কি সহজ কথা, একটা সন্তানকে বড় করে তোলা কি সহজ, জগতের কোন কিছুই পাওয়ার জন্য শর্টকাট মেথড নেই। উল্টে লোকেরা মনে করে ধর্মের পথটাই সহজ। জগতে কোন কিছু পাওয়ার জন্য সব ব্যাপারে ট্রেনিং দিচ্ছে, শুধু ধর্মের ব্যাপারে আমরা বাচ্চা বয়স থেকে সবজান্তা হয়ে বসে আছি। ধর্ম এভাবে কোন দিন হয়নি, কোন দিন হবেও না।

কি message তুমি দিতে চাইছ, সেটার উপর নির্ভর করে তোমার দাম। একটা যে মন্দির নির্মিত হয়, মন্দির একটা ভাব, সেটা ঈশ্বরের জন্য হয়েছে, মন্দিরে দেবতার বিগ্রহ আছে, তাই মন্দির হয়েছে, বিগ্রহটাও একটা ভাব। শুধু বার্তাবহ হলেই দূত হবে না, ওর বার্তাটা কি! এক গুপ্তচরকে ধরে এনেছে, কিন্তু তার কাছে কোন তথ্য নেই, এই গুপ্তচরকে দিয়ে কি হবে! ঠাকুর খুব সুন্দর বলছেন, একটা গ্রামে একটা পোড়ো মন্দির ছিল। পদ্মচরণ নামে একটা ছেলে হঠাৎ একদিন ভোঁ ভোঁ করে শাঁক বাজাতে শুরু করেছে। গ্রামের সব লোক দৌড়ে এসেছে, ভেবেছে কেউ বিগ্রহ বসিয়ে পূজা শুরু করেছে। গিয়ে দেখছে কিছুই নেই, কোন বিগ্রহ নেই, চামচিকাতে হানা দিচ্ছে। এরপর একটা লম্বা গান, যেখানে বলছে, ওরে পোদো শাঁখ ফুঁকে তুই করলি গোল। কোন বার্তা নেই, বার্তাবাহক দাঁড়িয়ে আছে। মন্দির আছে বিগ্রহ নেই। মাথায় সেইজন্য রাখতে হয়, আগে ঠাকুর তারপর মন্দির, মন্দির দিয়ে ঠাকুর হয় না। আগে ঠাকুর তবে শাস্ত্র, শাস্ত্র দিয়ে ঈশ্বর হয় না; ঈশ্বর আছেন বলেই শাস্ত্র। সব বই সেইজন্য শাস্ত্র হয় না, সব মন্দির তাই ঈশ্বরের বাসস্থান হয় না। যেমন সমস্ত বার্তাবাহকের কাছে বার্তা থাকবে তা নয়, যে গতকাল বার্তাবাহক ছিল, সে যে আজকেও বার্তাবাহক থাকবে তা নয়। সেইজন্য আমরা কাউকে যখন গুরু রূপে সম্মান জানাচ্ছি, আচার্য রূপে সম্মান করছি, সম্মান করছি অবতার রূপে, আগে দেখতে হবে তাঁর বার্তাটা কি। বার্তা যদি ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার হয়, তবেই তিনি ঠিক ঠিক ঈশ্বরের বার্তাবাহক, এর বাইরে নয়।

শ্বেতকেতু ও সত্যকাম

এরপর বলছেন, Learn until ‘the glory of the Lord shines through your face,’ as if shone through the face of Shvetaketu. (*ততদিন পর্যন্ত শিক্ষা কর, যতদিন পর্যন্ত না তোমার মুখ ব্রহ্মবিদের মতো প্রতিভাত হয়, যেমন সত্যকামের হয়েছিল।*) এই বিষয়টাই পরে স্বামীজী টেনে নিয়ে গেছেন সেইখানে, যেখানে তিনি ওই দিনেই দুপুরে যেটা আলোচনা করেছিলেন, এখানে তিনি ব্রহ্মজ্ঞান আর তত্ত্ব জ্ঞানকে নিয়ে বলছেন, শ্বেতকেতুর কাহিনী নিয়ে আসছেন, *তত্ত্বমসি শ্বেতকেতু*।

এইদিন সকালের দিকে স্বামীজী অনেকগুলো কথা বলেছেন। স্বামীজীর কথা মানেই ঋষি বাক্য, তাই ধারণা করতে কঠিন হয়ে যায়। তার উপর তিনি গভীর তত্ত্বগুলিকে গভীর ভাবেই রাখছেন। যাঁরা স্বামীজীর ক্লাশের নোট নিচ্ছিলেন, ওনারা পুরো বিস্তারিত ভাবে লিখতে পারেননি, লেখা সম্ভবও না। একটা জিনিস কি হয়, আচার্যের মুখোমুখি হয়ে যখন শোনা হয়, সেখানে আচার্যের একটা শক্তি থাকে, যে শক্তি থাকার জন্য কথাগুলো শ্রোতাদের মনকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করে। খুব উচ্চমানের শিক্ষকের সামনে থেকে কিছু শুনলে সেইজন্য মনে হয় সব পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। আমেরিকাতে স্বামীজীর একটা ঘটনাই আছে। একদিন স্বামীজী লেকচার দিচ্ছিলেন, খুব উচ্চমানের লেকচার দিচ্ছিলেন। বলতে বলতে হঠাৎ স্বামীজী মাঝখানেই লেকচারটা থামিয়ে দিলেন, কোন রকমে লেকচারটা শেষ করে বেরিয়ে চলে গেলেন। স্বামীজীর যিনি গাইড ছিলেন, তিনি রাস্তায় যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনি এত ভাল বলছিলেন, কিন্তু মাঝ পথে থেমে গেলেন কেন স্বামীজী’? স্বামীজী তখন বলছেন, ‘লেকচার দিতে দিতে আমি এমন অবস্থায় চলে গিয়েছিলাম যে, শ্রোতারা যারা বসে শুনছিলেন, তাঁদের সবার মনকে দেখছি যেন ভেজা মাটি, আমি যেমন চাইব আমি তাঁদের মনকে আকার দিয়ে দিতে পারি; উদ্দেশ্য আমার তা নয়। আমার উদ্দেশ্য হল যার যেমন প্রকৃতি, সংস্কার, সেই

অনুসারে সে ধীরে ধীরে উপরে উঠবে’। টিভিতে, ইউটিউবে কারুর লেকচার শোনার সময় কোন দিন এই ধরণের impact হবে না। আচার্য যেখানে সশরীরে এসে বসছেন, ওখানে তাঁর দিব্য শক্তিটা ছড়িয়ে যায়, ওই শক্তিটা তখন কিছুক্ষণের জন্য শ্রোতাদের উপরে তুলে নেয়। তখন সবারই কাছে স্বামীজীর বক্তব্য পরিষ্কার মনে হবে, কিন্তু বাইরে পরিষ্কার হচ্ছে না।

এখানেও একই জিনিস হচ্ছে, স্বামীজী গভীর তত্ত্বগুলি বলছেন, শ্রোতাদের মনটাও উপরে উঠে আসছে। ফলে তাঁদের কাছে সব স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। একজন উপলব্ধিবান আচার্য আর একজন সাধারণ আচার্যের মধ্যে এই তফাৎটা সব সময় থাকবে। দুজনে হয়ত একই কথা বলছেন। একজন গুলি হাত দিয়ে ছুঁড়ছেন, আরেকজনের গুলি রাইফেল দিয়ে বেরোচ্ছে। এটা যে শুধু আধ্যাত্মিকতার বা ধর্মের ক্ষেত্রেই হবে তা না, এমনকি ফিজিক্স, গণিত, কেমেস্ট্রি সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আমরা যে সব সময় সব কিছু বুঝতে পারি না, এর পিছনে শিক্ষকদের বিরাট বড় অবদান থাকে। এই জিনিস সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মায়ের কথা সন্তান যদি না শোনে, শিক্ষকের কথা ছাত্ররা যদি না শোনে, সন্ন্যাসীর কথা ভক্তরা যদি না শোনে, পুলিশের কথা সমাজ যদি না শোনে, বুঝতে হবে তার শক্তি কমে গেছে; তপস্যা করলেই শক্তি বেড়ে যাবে। এই কথাগুলো স্বামীজী বলে যাচ্ছেন, স্বামীজীর শক্তিতে তাঁদের মন উপরে চলে আসছে।

স্বামীজী একটা ছোট্ট বাক্যে বলে চলে গেলেন, Learn until ‘the glory of the Lord shines through your face,’ as if shone through the face of Shvetaketu, কিন্তু এর ব্যাকগ্রাউণ্ডটা বিরাট লম্বা। শ্বেতকেতু নামে অনেকগুলো বর্ণনা আমরা যেমন উপনিষদে পাই, তেমনি মহাভারতেও পাওয়া যাবে। উদ্দালক নামে এক ঋষি ছিলেন, তাঁর ছেলে হলেন শ্বেতকেতু। শ্বেতকেতু গুরুর আশ্রমে বেদ অধ্যয়ন করতে গেছেন। অধ্যয়ন শেষ করে বাড়ি এসেছেন। তাঁর বাবা জিজ্ঞেস করলে শ্বেতকেতু বললেন, ‘আমার সব জানা হয়ে গেছে’। বাবা তখন জিজ্ঞেস করলেন, ‘যেটা জানলে সব জানা হয়, সেটাকে কি জেনেছ’? শ্বেতকেতু অবাক হয়ে গেছে, ‘আমি তো এটা জানি না’। বাবা বললেন, ‘তুমি যদি ওটাই না জেনে থাক, তাহলে গুরুগৃহে কি শিখলে’? সেখান থেকে ধীরে ধীরে শ্বেতকেতুর অহঙ্কারটা একটু কমে যায়। উঁচু জায়গায় জল জমতে পারে না, নীচু জায়গায় জল জমে। অহঙ্কার হল উঁচু জায়গা, অহঙ্কার, কাম, ক্রোধ থাকলে বিদ্যা প্রবেশ করতে পারে না। শ্বেতকেতু এখন শান্ত হয়ে গেলেন।

বাবা এবার নিজেই নানা রকমের উপমা এনে শ্বেতকেতুকে ব্রহ্মতত্ত্ব বোঝাতে শুরু করলেন। যেমন, তিনি জলের মধ্যে লবণ মিশিয়ে দিয়ে, জলের মধ্যে লবণ কোথায় জানতে চাইলেন, অথচ জলের যেখানেই হাত দেবে সেখানেই লবণ আছে; ব্রহ্ম এভাবেই সব কিছুতে ওতপ্রোত হয়ে মিশে আছেন। অশ্বত্থ বীজ এনে ভেঙে দেখাচ্ছেন, দেখ এর মধ্যে কিছু কি বোঝা যাচ্ছে? অথচ এর মধ্য থেকেই বিশাল বৃক্ষ বেরিয়ে আসবে। ঠিক সেই রকম ব্রহ্ম অণু থেকে অণু, কিন্তু সেখান থেকেই সব কিছু বেরিয়েছে। ছেলে পড়াশোনা করে এসেছে, তপস্যা করেছে, সত্ত্বগুণে ভরপুর হয়ে আছে, বাবা তাঁকে শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছেন, আর বলছে *তত্ত্বমসি শ্বেতকেতুঃ*। এই যে ব্রহ্মের বর্ণনা করা হল, এটা তুমিই সেই। সঙ্গে সঙ্গে শ্বেতুকেতুর সব পরিষ্কার হয়ে গেল। পরিষ্কার হতেই ওর চেহারাটাই অন্য রকম হয়ে গেছে। রামকৃষ্ণ সাহিত্যে পড়লে দেখা যাবে, রাজা মহারাজ এবং অন্যান্য মহারাজরা প্রায়ই বলতেন, ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মজ্ঞানীকে চিনতে পারেন। ইদানিং মাঝে মাঝে সোশ্যাল মিডিয়া গুলিতে সাধু সন্ন্যাসীদের নিন্দা করে গালাগাল দেওয়ার জন্য বলে সব ব্রহ্মজ্ঞানী। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানীকে তো ব্রহ্মজ্ঞানীই চিনতে পারেন, আর কেউ চিনতে পারে না। যাঁরা শিক্ষকতা করেন বা করেছেন, তাঁরা এটা ভাল বুঝতে পারবেন যে, বাচ্চাদের যখন কোন সাবজেক্ট বা অন্য কিছু বোঝান হয়, সেখানে কোন বাচ্চা যদি ঘাড় নাড়ে বুঝতে হবে বোঝেনি, খুব জোর যদি ঘাড় নাড়ে তাহলে বুঝতে হবে কিছুই বোঝেনি। যখন সত্যিই বোঝে তখন তার চোখে একটা দ্যুতি এসে যায়। ঠিক তেমনি, যিনি আত্মাকে জেনেছেন তাঁর চোখের দৃষ্টিটাই অন্য রকম হয়ে যায়।

সত্যকামের কাহিনীও খুব নামকরা, রবীন্দ্রনাথও সত্যকামকে নিয়ে খুব সুন্দর কবিতা লিখেছেন। সত্যকামের কাহিনীতেও একই জিনিস, গুরু কয়েকটা গরু দিয়ে সত্যকামে পাঠিয়ে দিলেন, আর বলে দিলেন, যখন হাজারটা গরু হবে তখন তুমি আমার কাছে ফেরত আসবে, তখন তোমাকে আমি উপদেশ দেব। কাজ না

করলে মনের অঙ্কট বঙ্কট কোন দিন পরিষ্কার হবে না। সঙ্ঘ স্থাপনা করে স্বামীজী সাধু সন্ন্যাসীদের জন্য কর্মের বিধান করে দিলেন। কাজের জন্য সঙ্ঘের অনেক সমস্যা হয় ঠিকই, কিন্তু কাজ যদি না থাকে সঙ্ঘের আরও অনেক বেশি সমস্যা দাঁড়িয়ে যাবে। রমণ মহর্ষির মত মহাপুরুষদের কথা আলাদা, কিন্তু ভারতে কোন সন্ন্যাসীকে এক পয়সা বিশ্বাস করা যাবে না, যদি সন্ন্যাসী কাজ না করে থাকে। কর্মের দ্বারা আগাছা গুলি পরিষ্কার হয়। কাজ না করে যদি আধ্যাত্মিক জ্ঞান হয়ে থাকে, তাহলে আধ্যাত্মিক জ্ঞান থাকবে কিন্তু তার সাথে আগাছা গুলিও থাকবে। ওর মধ্যে যখন ফুল ফুটছে, তখন কোনটা আগাছার ফুল, কোনটা ভাল ফুল দিচ্ছে, আমাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব না। আমাদের প্রাচীন বৈদিক পরম্পরাতে কাজ করার কথাই বলা হয়, আগে তুমি কাজ করে তোমার আগাছা গুলিকে সাফ কর। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে এই জিনিসটা আমাদের পরম্পরা থেকে কখন, কিভাবে হারিয়ে গেল। বেদের সময়কার ঋষি বা আচার্যদের কাছে যখন শিক্ষা লাভের জন্য শিষ্যরা আসতেন, ওনারা প্রথম দিন থেকেই তাদের সবাইকে কাজে লাগিয়ে দিতেন। যাও জঙ্গল থেকে কাঠ নিয়ে এসো, যাও গুরুমার সাহায্য কর, যাও গরু চড়িয়ে এসো, যাও ভিক্ষা করে নিয়ে এসো। শিষ্যরাও দিনের পর দিন, বছরের পর এ-ভাবেই কাজ করে যেতেন। সকাল সন্ধ্যা শুধু বেদ অধ্যয়ন করছেন, বেদ মুখস্ত করেছেন আর কদাচিৎ কখন গুরু হয়ত একটা কথা বলে দিলেন। গৃহীরা প্রায়ই এসে সন্ন্যাসীদের বলে, আপনারা আর গৃহীদের জ্বালা কি বুঝবেন! সন্ন্যাসীরা তখন বলে, এখানে এসে কাজ করে দেখুন, তখন বুঝবেন সন্ন্যাসী হওয়া কি জ্বালার। সবাই মনে করে, সামনের লোক আমার থেকে বেশি সুখে আছে। যার ভিতরে যত বেশি আবর্জনা, তাকে তত বেশি কাজ করতে হয়। যার ভিতরে কোন আবর্জনা নেই, তাকেও কাজ করতে হয় যাচাই করে নেওয়ার জন্য, আমি ঠিক আছি কিনা। একবার যখন জেনে গেল আমার ভিতরটা পরিষ্কার, আবর্জনা কিছু নেই, এবার সে প্রস্তুত হয়ে গেল ব্রহ্মবিদ্যার জন্য। ব্রহ্মবিদ্যার জন্য প্রস্তুতি একমাত্র হবে, গরু খাটা পরিশ্রম করে যখন সব আবর্জনা পরিষ্কার করে দেওয়া হবে।

সত্যকামকেও গুরু কয়েকটা ঘাটের মড়া গরু দিয়ে বলে দিলেন, 'এই কটা গরু থেকে যেদিন হাজারটা গরু হয়ে যাবে তখন আমার কাছে চলে আসবে'। সত্যকাম এরপর কিভাবে সাধনা করলেন, কোথায় গেলেন, কোথায় তপস্যা করলেন, কোন বর্ণনা নেই। হঠাৎ একদিন প্রধান ষাঁড় এসে বলল, 'সত্যকাম আমরা হাজারটা হয়ে গেছি, এবার চল'। এই বলে, ষাঁড় সত্যকামকে ব্রহ্মবিদ্যার একটা উপদেশ দিলেন। বলার পর বললেন, 'বাকিটা সন্ধ্যাবেলা অগ্নি তোমাকে বলবে'। অগ্নি বলল, একটা পাখি বলল, চারজন গুরু সত্যকামকে ব্রহ্মবিদ্যার মূল চারটে কথা বললেন, ওই চারটে বাক্যেই সত্যকামের ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে গেল। সত্যকাম এবার গুরুর আশ্রমে ফিরে এসেছে। গুরুর সামনে এসে সত্যকাম দাঁড়িয়েছেন, গুরু সত্যকামের দিকে তাকিয়েই বলছেন, 'এ কি সত্যকাম! তোমার চেহারা যে ব্রহ্মজ্ঞানীর মত ঝকঝক করছে, তুমি কার কাছে শিক্ষা পেলে'? সত্যকাম বলছেন, 'আমি আপনাকে ছাড়া অন্য কাউকে গুরু জানি না'। 'কিন্তু তুমি যা জানার জেনে গেছ। কিছু দিন আশ্রমে থাক, তোমার সাথে ব্রহ্মবিদ্যা নিয়ে আলোচনা করব, কিন্তু যেটা জানার তুমি জেনে গেছ'। অথচ অবাক লাগে, বাচ্চা ছেলে জঙ্গলে গরু চড়ালো, কোন গুরুসঙ্গ নেই, শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি কি করেনি আমাদের জানা নেই; করার কথা নয়, কিন্তু সে একজন ব্রহ্মজ্ঞানী হয়ে গুরুর কাছে ফেরত এলো। ইদানিং কালে ভক্তরা এসে বলে, আমি মঠ থেকে দীক্ষা নিয়েছি, কিন্তু আমার তো গুরুসঙ্গ হয় না। আরে ভাই, সত্যকাম ব্রহ্মজ্ঞানী, কোন দিন গুরুসঙ্গ করেনি। আসলে সমস্ত জ্ঞান ভিতর থেকেই আসে, বাইরে থেকে কিছু আসে না। যাঁরা গুরুর কাছে থাকেন, থাকার সুযোগ হয় ভাল, কিন্তু যদি নাও সুযোগ থাকে, তাতেও কিছুই আসে যায় না। সত্যকাম হলেন এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। অন্য দিকে শ্বেতকেতু এত গুরুসঙ্গ করলেন, কিন্তু কিছুই হল না, শেষে তাঁর বাবাই তাঁকে ব্রহ্মবিদ্যার শিক্ষাটা দিলেন। কিন্তু তার থেকে বড় হল, গুরুর আশ্রমে থেকে শ্বেতকেতু তত্ত্ব জ্ঞানটাকে আহরণ করেছিল, কাজ করেছিল, মনটাকে অনেক তৈরী করে নিয়েছিল।

আনুমানিক জ্ঞান ও প্রত্যক্ষানুভূতি জ্ঞান –দুটো দু-রকম

সত্যিকারের যদি আত্মজ্ঞান না হয়ে থাকে, মন যদি তৈরী না হয়ে থাকে, চেহারা দেখে যদি না বোঝা যায়, তার মানে, এর আগে আমরা যে বললাম, দর্শন মানে অন্ধকারে হাতড়িয়ে বেড়ানো, নিজের মত যেটা আসছে সেটাকেই নিচ্ছি, আর সবটাই guess work। একটা হাতি গ্রাম দিয়ে চলে গেছে, গ্রামের রাস্থায়

হাতির বড় বড় পায়ের ছাপ পড়তে পড়তে গেছে। গ্রামের লোকেরা কোন দিন হাতি দেখেনি। অত বড় বড় ছাপ দেখে গ্রামের সবাই চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে, কিসের ছাপ এটা। লালবুঝক্কর হিন্দিতে একটা শব্দের ব্যবহার হয়, এর অর্থ হল, যে কিছুই জানে না, কিন্তু সবটাই বুঝিয়ে দেবে। বড় বড় ছাপ দেখে অনেকক্ষণ ধরে ভেবে-টেবে হঠাৎ একজন চেঁচিয়ে বলে উঠল, বুঝে গেছি, আমি বুঝে গেছি। কি বুঝে গেছে? রাত্রিবেলা কোন লোক দুষ্টুমি করে পায়ে উখল বেঁধে হেঁটেছে। হাতি সেও দেখেনি, কিন্তু উখলটা দেখেছে। যাদের জ্ঞান নেই, যারা ধর্মকে যুক্তি দিয়ে মাপতে চাইছে, ধর্মকে মনে করে সঙ্কীর্ণ আর নিজেদের লিবারাল মনে করে, তাদের কি হয়? Guess against guess makes fight।

আমাদের যে ধর্ম নিয়ে তর্ক, দর্শনের দুটো কথাকে নিয়ে যে তর্ক, এগুলো কেন হচ্ছে? তুমিও guess work করছ আমিও guess work করছি। যাদেরকে আমরা intellectual মনে করছি, অবশ্য একটা সময়, বিশেষ করে কম্যুনিস্টদের প্রভাব ভারতে যবে থেকে শুরু হয়েছে, তখন থেকে intellectual হওয়াটা একটা ফ্যাশানে দাঁড়িয়ে গেছে। এরা নিজেরাই যে শুধু guess work করছে তা না, যাদেরকে আধার করে guess করে, তারা নিজেরাও কিন্তু guess workএ ঢুকছে। *অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ*, মানে তার পরেরটাও অন্ধ। আমি যখন ওদের পড়ছি আমি তৃতীয় প্রজন্ম অন্ধ হয়ে গেলাম। একটা অন্ধ আরেকটা অন্ধকে চালিত করে নিয়ে যাচ্ছে, আমি তাদের অনুসরণ করে যাচ্ছি। এই দক্ষিণেশ্বর ঠাকুর থাকতেন, কিন্তু কজন বাঙালী কথামৃত পড়ে, কজন পড়ে বোঝার চেষ্টা করেন! কিন্তু পাবলো নেরুদার নাম ক্লাশ এইটের ছেলেও বলে দেবে। জগতের যে আধ্যাত্মিক ইতিহাস, সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের কোন parallel নেই, অথচ সেটার সম্বন্ধে কলকাতার লোকেদের কোন ধারণাই নেই, এরপর ভারত আর সমগ্র বিশ্বের কথা ছেড়েই দিলাম। ঠাকুর বলছেন, কলকাতার লোকগুলো শুধু লেকচার আর হুজুগে।

এটাকেই স্বামীজী বলছেন, Guess against guess makes fight; but talk of what you have been, and no human heart can resist it. Paul was converted against his will by realisation। (*আনুমানিক জ্ঞানের বিরুদ্ধে আনুমানিক জ্ঞান নিয়ে কথা বললেই ঝগড়া বাধে। কিন্তু যা প্রত্যক্ষ দর্শন করেছ, তারই সম্বন্ধে কথা বলো দেখি –কোন মনুষ্য হৃদয়ই তাকে স্বীকার না-করে পারবে না। প্রত্যক্ষানুভূতি করাতেই সেন্ট পলকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করতে হয়েছিল।*) যেখানে তর্ক হচ্ছে, বুঝতে হবে, একজন অন্তত আছে, যে জানে না। দুজনেই যদি জানে, সেখানে কোন দিন তর্ক হবে না। স্বামীজী সাবধান করে দিচ্ছেন, যখন কথা বলবে, যেটা ঠিক ঠিক যতটা জানো তার বাইরে কোন কথা বলবে না। ভাল বক্তা, সবাই তার বক্তৃতা শুনতে চায়, তার মানে উনি যেটা জানেন, সেটাই বলেন। যীশু প্রথম যখন বলতে শুরু করেছেন, গ্রামের মেয়েরা কুয়োর পারে জল ভরছিল, তাদেরকেই বলছেন। জহুদিদের মধ্যে প্রফেটের ধারণা ছিল, প্রফেটরা ঘুরে ঘুরে লোকেদের শিক্ষা দিয়ে বেড়াতেন। মেয়েরা প্রফেটদের মুখের কথাও শুনেছে, কিন্তু যীশুর কথা শোনার পর বলছে, He talks with authority। যীশু যা বলছেন, তিনি সেটা জানেন, বোঝেন। যে জানে, সে যখন বলে, তখন তার বিরুদ্ধে কেউ কিছু বলতে পারবে না। অশুভ শক্তি তাকে বিরক্ত করবে ঠিকই, যেমন যীশুকে ক্রুশিফাই করে দিল; তাতে কি হল, খ্রীশ্চানিটি যীশুর সময় যা ছিল, আজকে তার তুলনায় হাজার গুণ বেশি।

পলের আসল নাম ছিল সল। তিনি প্রচণ্ড খ্রীশ্চান বিরোধী ছিলেন। চারিদিকে খ্রীশ্চানদের শায়েস্তা করে বেড়াত। একবার ঘোড়ার পিঠে চেপে দামাস্কাস যাচ্ছেন, ওখানে খ্রীশ্চানদের মারবেন। ঘোড়ায় চেপে নিজের সৈন্যদল নিয়ে দৌড়াচ্ছেন। হঠাৎ রাস্তার মাঝখানে দেখছেন যীশু দাঁড়িয়ে আছেন। যীশু বলছেন, 'সল! তুমি আমার সন্তানদের কেন মারতে চাইছ'? রাস্তার মধ্যে ওই দৃশ্য দেখে সল ওখানে মুর্ছা খেয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন। বলে যে, তিনি নাকি ওই ভাবে তিন দিন পড়েছিলেন, দেখছে ওনার চোখ দিয়ে জল বেরোচ্ছে, ক্ষমা চাইছেন। সন্ন্যাসীরা যেমন নাম পাল্টে নেয়, সলও তার নাম পাল্টে নিলেন, সল থেকে হয়ে গেলেন পল। এই যে পল, সে তো খ্রীশ্চান হতে চায়নি, কিন্তু এমন একটা শক্তি যে সলকে পাল্টে পল করে দিলেন। যাদের বাড়িতে বাচ্চা আছে, এই জিনিসটা তারা দিনরাত দেখতে পান। বাচ্চা স্কুল থেকে ভুলভাল কিছু একটা শিখে

এলো, সবাইকে এবার বলতে থাকবে। বাবাকে বলতে গেলে বাবা কিছু বলে না, একটু শুধু হাসে। মানুষ যখন সত্যকে জানে, তখন এরা তর্ক করে না, শুধু একটু হাসে; সে জানে যে লোকটা ভুলভাল বলছে।

ভ্রমই ভ্রমকে সৃষ্টি করে - 'ছেড়ে দাও রজ্জু –যাহে আকর্ষণ'

সেদিনই রাত্রিবেলা খাওয়ার পর স্বামীজী আবার এই জিনিসটাকে নিয়েই বলছেন, কিন্তু জটিল। Delusion creates delusion. Delusion creates itself and destroys itself, such is Maya. (*ভ্রমই ভ্রমকে সৃষ্টি করে থাকে। ভ্রম নিজেকেই নিজে সৃষ্টি করে, আবার নিজেকেই নিজে ধ্বংস করে। একেই বলে মায়া।*) যে কোন জীব নিজের মতই সন্তানসন্ততির জন্ম দেয়, সিংহ সিংহের বাচ্চাই জন্ম দেয়, মানুষ মানুষের বাচ্চাই জন্ম দেয়, ঠিক সেই রকম অজ্ঞান অজ্ঞানকেই জন্ম দেয়। একবার যে অজ্ঞানে পড়ে যাবে, অজ্ঞান তার বাড়তেই থাকবে, বাঁচার কোন পথ নেই। ফলে কি হয়, All knowledge (so called), being based on Maya, is a vicious circle, and in time that very knowledge destroys itself. (*যেহেতু তথাকথিত সমুদয় জ্ঞানেরই ভিত্তি মায়া, ঐ জ্ঞান 'অন্যোন্যাশ্রয়দোষদুষ্ট'। এমন এক সময় আসে যখন ঐ জ্ঞান নিজেই নিজেকে নষ্ট করে।*) যে কোন বিদ্যা, ফিজিক্সের বিদ্যা, কেমেস্ট্রির বিদ্যা, সাহিত্যের বিদ্যা, দর্শনের বিদ্যা, এগুলো সব মায়ার রাজ্যের, মায়ার রাজ্যের বিদ্যার এমন বৈশিষ্ট্য যে, এগুলো সবটাই অজ্ঞান থেকে। কেন অজ্ঞান থেকে? যেখানেই দ্বৈত থাকে সেখানেই অজ্ঞান বলা হয়। এই অজ্ঞান, আমরা যে অর্থে lack of knowledge বলি, এগুলো ঠিক সেই অর্থে অজ্ঞান না, এগুলো technical knowledge। আর যখনই আমরা কোন সত্যে পৌঁছে যাচ্ছি, যেমন নিউটন, তিনি laws of motion দিলেন, আইনস্টাইন এসে বললেন, এর সংশোধন দরকার। কোয়ান্টম ফিজিক্স আসার পর তারা আবার বলল, আইনস্টাইনের সংশোধন দরকার। তাহলে আমরা কি অজ্ঞান থেকে জ্ঞানে যাচ্ছি? আপাতদৃষ্টিতে, হ্যাঁ। কিন্তু গভীরে গেলে দেখা যাবে, একটা অজ্ঞান আরেকটা অজ্ঞানের জন্ম দেয়, সেই অজ্ঞান আরেকটা অজ্ঞানকে জন্ম দেয়। মানুষ বিবাহ করে শান্তি আর সুখ পাওয়ার জন্য, কিন্তু বিবাহের পর এমন যন্ত্রণা পায় যে আর সামলাতে পারে না। তারপর দুটো সন্তানের বাবা-মা হয়ে গেল, তারপরও আরও যন্ত্রণা এসে মারতে শুরু করে। কোথায় সুখ! কোথায় শান্তি! ফলে এটাই একটা vicious cycle হয়ে যায়। এমন vicious cycle হয়ে যায় যে, আমরা ওটা বুঝতেও পারি না।

এক অজ্ঞান আরেক অজ্ঞানকে নাশ করতে থাকে। আমরা যখন বেদ, উপনিষদ অধ্যয়ন করে আত্মজ্ঞান লাভ করার চেষ্টা করছি, তখন ওটাও একটা অজ্ঞান হয়ে যায়। আমরা যে জপধ্যান করছি, এটাও অজ্ঞান, ইষ্ট চিন্তন করছি, সেটাও অজ্ঞান। কিন্তু ওই অজ্ঞানকে দিয়েই এই অজ্ঞানকে নাশ করা হয়। তারপর দুটোকেই নাশ করা হয়। ঠাকুরের অদ্বৈত সাধনা চলছে, বার বার তাঁর ইষ্টদেবী মা কালী তাঁর সামনে চলে আসছেন। ঠাকুর বলছেন, তখন জ্ঞান অসি দিয়ে তাঁকে দ্বিখণ্ডিত করে দিলাম। তার মানে, এতদিন ঠাকুর যা কিছু করেছিলেন, ওগুলোও অজ্ঞান। অজ্ঞান, জ্ঞান এই শব্দগুলি এতো টেকনিক্যাল যে, এর ভাব ঠিক ঠিক ধারণা না করতে পারলে অন্য রকম এর অর্থবোধ হয়ে যাবে। যেখানেই দুই বোধ সেটাকেই অজ্ঞান বলা হয়, দুই থেকে তিন, চার, পাঁচ, ছয় যত সত্য মনে হয়, যেমন আমি সত্য, লোকজন সত্য, জগৎ সত্য, ফিজিক্স সত্য, ঈশ্বর সত্য; সত্যের সংখা ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছে, সত্যের সংখ্যা যত বাড়ছে তত অজ্ঞানের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। সত্যের সংখ্যা কমিয়ে কমিয়ে যখন শুধু মা আছেন আর আমি আছি, তখন দুইতে চলে এলো। অজ্ঞানের সংখ্যাটা এক লহমায় কমে গেল, কিন্তু এখনও অজ্ঞানেই আছে।

সব শেষে যখন ওটাকেও ছেড়ে দেওয়া হয়, যেখানে দুটো কাঁটার কথা বলা হয়, পায়ে কাঁটা ফুটলে আরেকটা কাঁটা এনে এই কাঁটাকে তোলা হয়, তোলা হয়ে গেলে দুটো কাঁটাকেই ফেলে দিল। আমরা যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের কথা বলছি, এটাও অজ্ঞান; কিন্তু এই অজ্ঞান কাঁটা দিয়ে ওই অজ্ঞানকে বার করে দুটোকেই ফেলে দিতে হয়। এটাকে স্বামীজী আবার পরে বলবেন। বলছেন, 'Let go the rope', delusion cannot touch the Atman. (*'ছেড়ে দাও রজ্জু –যাহে আকর্ষণ'। ভ্রম কখনও আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে না।*) অজ্ঞান কোন অবস্থাতেই আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে না, সেইজন্য দড়িটাকে ছাড়ো, মায়া হল দড়ি, অজ্ঞান হল দড়ি। আমার নিজেকে ছাড়া আমি যা কিছু মনে করছি, এটাই সেই দড়ি, যাকে ধরে আমি আমার

জীবন চালাচ্ছি। যা কিছু ধরে আছি, গুরুকে ধরে আছি, এটাও অজ্ঞান; ইষ্টকে ধরে আছি, এটাও অজ্ঞান। এসব কথা শুনলে আমরা আঁৎকে উঠব, কিন্তু কিছু করার নেই, এগুলো এতই উচ্চমানের অদ্বৈত কথা যে, ভুলভাল ধারণা হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা সব সময় থাকে।

তাহলে কেন আমরা গুরুর আশ্রয় নিচ্ছি, কেন ইষ্টের পূজা করছি? কারণ, গুরুর আশ্রয় না নিলে, ইষ্টের আরাধনা না করলে তুমি শেষ, তোমার অজ্ঞান নাশের আর কোন সম্ভবনাই থাকবে না। গুরুর আশ্রয় না নিল, ইষ্টের আরাধনা না করলে, সত্য তখন তোমার আর দুই থাকবে না, সত্য তখন তোমার হাজার ছাড়িয়ে যাবে। স্বামীজী আগে বললেন Delusion creates delusion, তুমি যেটা সত্য মনে করছ, আসলে ওটা তোমার অজ্ঞান, তোমার ভ্রম। একজন স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসে, এটা অজ্ঞান, স্বামীও অজ্ঞান, ভালবাসাটাও অজ্ঞান। যদি সে সাধনা করে শেষ অবস্থায় পৌঁছাতে পারে, তখন সে দেখবে, সেই সচ্চিদানন্দই তার স্বামী হয়েছেন, সন্তান হয়েছেন; সেই সচ্চিদানন্দই ভালবাসাটা হয়েছেন। সচ্চিদানন্দ যিনি, তিনিই সৎ, তিনিই চিৎ, তিনিই আনন্দ; আগে আগে আমরা আলোচনা করেছি, যিনি সৎ তিনি কি করে চিৎ হন। জগতে যে জিনিসটা আছে সেটাকেই আমরা জানতে পারি, জিনিসটাকে জেনেই আমাদের আনন্দ হয়, সেইজন্য জানাও যা, বস্তুও তাই, আনন্দও তাই, তিনটের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যখন কেউ কাউকে ভালবাসে, তুমি আমাকে ভালবাসো, 'আমি' রূপে তুমি যে ভালবাসছ এটাই অজ্ঞান। যখন জ্ঞান হবে তখন দেখবে সচ্চিদানন্দ ছাড়া কিছু নেই, কখনই কিছু ছিল না, ভালবাসা জিনিসটাও সচ্চিদানন্দ ছাড়া কিছু ছিল না। যে কোন ভালবাসা, যে কোন জ্ঞানকে অবলম্বন করে আমরা যখন নিজেকে উন্নত করছি, সবটাই দড়ি। আত্মার মধ্যে কোন অজ্ঞান নেই। কারণ, আত্মা হলেন অখণ্ড চৈতন্য। অখণ্ড চৈতন্য বলতে কখনই এক অর্থে বলা হয় না, ওটাই আছে। সেখানে আমিও নেই, তুমিও নেই, আমিই সেই আত্মা হয়ে যাচ্ছি, তখন শুধু বোধে বোধটুকু থাকে।

When we lay hold of the rope, - identify ourselves with Maya, she has power over us. (*যখনই আমরা সেই দড়িটাকে ধরি, মায়ার সহিত নিজেদের এক করে ফেলি, তখনই মায়া আমাদের উপর শক্তি বিস্তার করে।*) স্বামীজী দড়িকে বলছেন, identify ourselves with Maya, আমি নিজেকে সব কিছুর সাথে জড়িয়ে ভাবছি, আমি শরীর, আমি মন, আমি অমুক, তার মানেই আমি মায়াকে আঁকড়ে আছি। যতক্ষণ দড়ি অর্থাৎ এই শরীর, মনকে না ছাড়ছে, অর্থাৎ মায়াকে না ছাড়ছে, মায়ার রাজ্য থেকে বেরোতে না পারছে তত দিন আত্মজ্ঞান হবে না। আমি খুব ভাল লেকচার দিতে পারি, ভাল ভাল বই, প্রবন্ধ সব লিখতে পারি, বিখ্যাত হয়ে যেতে পারি, কিন্তু আমারও আত্মজ্ঞান নেই, যাদের বলছি তাদেরও নেই। ঠাকুর সহজ করে বলে দিলেন, আমি মলে ঘুঁচিবে জঞ্জাল। আমি, এই আমিত্ব বোধটাই মায়ার দড়ি, এই মায়ার দড়িকে যতক্ষণ ধরে আছে, ততক্ষণ সে অজ্ঞানের রাজ্যে বিচরণ করছে।

যে আমার খুব ভালবাসার জন, খুব কাছের, তাকে আমি সব কিছু দিয়ে দিতে পারি। ভিখারীকে আমরা এক টাকা কি দু-টাকা পর্যন্ত দিতে পারি, ভালবাসার জনকে দরকার হলে লাখ টাকাও দিয়ে দিই। কিন্তু যখন উচ্চ অবস্থায় চলে যাবে, তখন দেখবে সেই ভিখারিও *ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং উত বা কুমারী*, নারায়ণই এই ভিখারী হয়েছেন, নারায়ণই আমার ভালবাসার জন হয়েছেন। আর তাই না, যিনি নারায়ণ তিনিই আনন্দ, তিনিই কার্য, তিনিই কারণ, ভিক্ষা দেওয়া কার্যটাও নারায়ণ, ভালবাসাটাও নারায়ণ। আমরা প্রায়ই বলি আর মনেও করি যে, ভগবান মায়ের মধ্যে স্নেহ ভালবাসা দিয়েছেন সন্তানকে লালন পালন করার জন্য, কিন্তু তা নয়। উচ্চ অবস্থায় দেখে, যিনি ভগবান তিনিই ভালবাসা, যিনি ভগবান তিনিই আমার চৈতন্য, যা কিছু আছে ওটা ভগবান নিজে। উপনিষদে এই একই কথা বলছেন, যেহেতু তত্ত্বের দিক থেকে বলছেন, তাই সবার পক্ষে বোঝা যায় না।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর পঞ্চম অধ্যায়ে একেবারে সরাসরি বলে দিচ্ছেন, *যা দেবী সর্বভূতেষু বুদ্ধি রূপেণ সংস্থিতা*, ইত্যাদি করে করে সব কিছুকে নিয়ে আসছেন। সবার ভিতর যে বুদ্ধি কাজ করে, এই বুদ্ধিটা কে? বুদ্ধিটা মা স্বয়ং। ঠিক তেমনি, লজ্জাটা কে? মা দূর্গা নিজেই লজ্জা। মা দূর্গা কিন্তু আমাদের মধ্যে বুদ্ধিও দিচ্ছেন না আর লজ্জা বোধটাও দিচ্ছেন না। আমাদের যে টাকা-পয়সা সেটাও কিন্তু মা দূর্গা দিচ্ছেন না, স্বয়ং তিনিই সেটা। আমাদের যে দারিদ্রতা, তিনিই এই দারিদ্র। গৃহে শিশুর জন্ম হল, এবার দুটো জিনিস হয়ে গেল, একজনের

জন্ম হল, জীবনের আবির্ভাব হল, বাচ্চাটাও তিনি, জীবনটাও তিনি। শ্রীশ্রীচণ্ডীর পঞ্চম অধ্যায়কে মাথায় রাখলে আমাদের সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। ওখানে মায়ের যে স্তুতি করা হচ্ছে, তাতে এটাই বলছেন, আমাদের ভিতরে যা কিছু শুভ জিনিস আছে, সেগুলো মা কিন্তু আমাদের কৃপা করে দিচ্ছেন না, ওগুলো সব মা নিজে। কেন মা নিজে? কারণ অদ্বৈত মতে, যেটা হিন্দুদের শেষ কথা, তাতে ঈশ্বর মানে সচ্চিদানন্দ – সৎ, চিৎ ও আনন্দ। যিনি সৎ তিনিই চিৎ তিনিই আনন্দ। যত গুণ সব তিনি, আর গুণের যে অভাব, সেটাও তিনি। জীবনটাও তিনি, মৃত্যুটাও তিনি। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বলছেন, *যা দেবী সর্বভূতেষু স্মৃতি রূপেণ সংস্থিতা*, আমাদের যে স্মৃতি, যারা দ্বারা শাস্ত্রের কথা, গুরুর কথাকে ভিতরে ধরে রাখছি, এটা মা নিজে। গীতায় যখন বলছেন, *মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ*, স্মৃতির বিলোপ হয়ে যাওয়াটা আমার থেকে হয়, ভগবান তখন ভক্তদের বোঝনর জন্য এভাবে বলছেন। শ্রীশ্রীচণ্ডীতেও বলছেন, বিস্মৃতি মায়ের জন্যই হয়, কিন্তু ওটা মা নিজে। যতক্ষণ আমরা মায়ার দড়িটা ধরে আছি, ততক্ষণ এই উচ্চ অদ্বৈত ভাবকে আমরা ধারণা করতে পারব না। স্বামীজী তাই বলছেন, মায়ার দড়িটা ছেড়ে দাও, এই যে তফাৎ তুমি দেখছ, যেখানে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান আলাদা হয়ে যাচ্ছে, যেখানে ভালবাসা, ভালবাসার বস্তু আর তুমি ভালবাসছ, এই তিনটে বস্তু আলাদা হয়ে যাচ্ছে, এটাকে ছেড়ে দাও, এটাই মায়া। জ্ঞান মানেই তিনটে এক হয়ে যাওয়া।

আর শেষে বলছেন, Let go of it, be the Witness only, then you can admire the picture of the universe undisturbed. (*মায়াকে ছেড়ে দাও, কেবল সাক্ষিস্বরূপ হয়ে থাকো। তা হলেই অবিচলিত থেকে জগৎপ্রপঞ্চ-রূপ ছবির সৌন্দর্যের উপভোগ করতে পারবে।*) এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তোমরা যদি আনন্দ পেতে চাও, তাহলে এই যে আমরা এত বিভাজন করে নিচ্ছি, আমি দ্রষ্টা, এটা দৃশ্য আর আমি দেখছি, এই তিনটে যদি আলাদা হয়ে যায় তাহলে দৃশ্য দেখার আনন্দ কি করে করবে! যেমনি আমিত্ব ছেড়ে দিলে, তখন দ্রষ্টার ভাব, এটা আমার পছন্দের, এটা পছন্দের না, এই জিনিসগুলো সব চলে যাবে। জগতে যদি আনন্দ পেতে চাও, তাহলে তোমার এই তিনটে থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, তোমার আমিত্বটা ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হবে। তখন তুমি মুক্ত, মুক্ত মানে, তুমি শুধু সাক্ষীস্বরূপ থাকবে। সিনেমার স্ক্রীনে সিনেমা চলছে, আমি আলাদা, সিনেমার পর্দা আলাদা, সিনেমার পর্দায় খেলা চলছে, সেখানেও আমি আলাদা। কিন্তু আমরা এতই আহাম্মক যে, সিনেমার পর্দার দৃশ্যের সাথে নিজেদের একাত্ম করে চোখের জল ফেলতে থাকি। আর নিজের জীবনের সাথে যখন চলছি তখন তো আরও চোখের জল পড়বে। টিভি সিরিয়াল, যেগুলো সব বস্তপচা কাহিনী নিয়ে তৈরী, সেগুলো দেখে যারা চোখের জল ফেলে, তারা এইসব কথা শুনে বা পড়ে কি বুঝবে! বেগুনওয়ালার কাছে হীরা বিক্রি করার মত; ন'সের বেগুন হীরার বদলে দিতে পারি, তাও আমরা কেনা দামটুকুও থাকবে না। হিন্দু জাতি, বেদান্ত আর তার আধ্যাত্মিক সত্যের যে অমূল্য রত্নখোচিত মুকুট, বেগুনওয়ালার দরেই সবাই দিয়ে যাচ্ছে। এখানে এসে ২৩শে জুলাইএর ক্লাশ শেষ হয়ে যায়। এরপর আমরা ২৪শে জুলাই, বুধবারের ক্লাশে প্রবেশ করব।

বুধবার, ২৪শে জুলাই

যোগসিদ্ধি

স্বামীজী এখনও পর পর যোগের উপরেই বলে যাচ্ছেন। এই দিনকার ক্লাশে তিনি যোগসিদ্ধি নিয়ে বলছেন। যোগসিদ্ধির উপর আলোচনা শুরু করার আগে আমাদের একটা ছোট্ট ভূমিকা বলা দরকার। জগৎ কি, সত্য কি, আমরা জানি না, কিন্তু সাধারণ বোধে আমরা জানি, আমি আছি আর জগৎ আছে, তার সাথে এও জানি, পদার্থ জগৎ পদার্থ দিয়ে তৈরী। যখন পদার্থ দিয়ে তৈরী হওয়ার ব্যাপারটা এসে যায়, তখন যে আইন, বিধানগুলি পদার্থকে চালায়, সেগুলো চলে যাবে নিউটনের laws of motionএ, তেমনি তরল পদার্থ হলে সেটা আবার আরেক আইনে চলে, গ্যাস হলে তার আরেকটা বিধান হবে, সাধারণ ভাবে আমরা এগুলোকে বলি পাশ্চাত্য বিজ্ঞান। পাশ্চাত্যের মন হল বিশ্লেষাত্মক মন, স্বামীজীও বলছেন analytical mind। গ্রীকরা দেবতাদের মানত, সব কিছু করত, কিন্তু ওরাও খুব analytical ছিল, যার জন্য বেশ কিছু দর্শন, বেশ কিছু বিজ্ঞান আছে, যার উৎস হল গ্রীস দেশ। খ্রীশ্চানরা ক্ষমতায় আসার পর থেকে এই জিনিসগুলো অনেকটা চাপা

পরে গেল। পরে গ্যালিলিও আসার পর থেকে এগুলো আবার খুলতে শুরু করে। একটা জিনিসকে, বিশেষ করে সত্যকে, অনেক দিন যদি চেপে রাখা হয়, আর ওই চাপাটা কোন কারণে যখন সরে যাবে, তখন স্প্রীং এর মত একটা তীব্র প্রতিক্রিয়া দেবে। বিজ্ঞান একটা সত্য, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষমতার জোরে বিজ্ঞানের সত্যগুলিকে চেপে রাখা হয়েছিল, কিন্তু একবার যখন খুলে যেতে সক্ষম হল, তারপর এমন সে violent reaction দিয়েছে যে, ধর্মকেই মেরে শেষ করে রেখে দিয়েছে, বিশেষ করে পাশ্চাত্যে।

ধর্ম আর বিজ্ঞান দুটো পুরোপুরি আলাদা ক্ষেত্র, দুটোর মধ্যে কোন সম্পর্কই নেই। যেমন সাহিত্য আর বিজ্ঞান, দুটো পুরো আলাদা, কোন সম্পর্কই নেই। ইদানিং কালে বিজ্ঞানের অনেক গ্ল্যামার হয়ে গেছে, সেইজন্য সাহিত্যিকরা, দার্শনিকরা এখন scientific literature, scientific philosophy দাঁড় করানোর চেষ্টা করে যাচ্ছেন। মানুষের মন এমনই যে, সে সব সময় তার সব কিছুর স্বীকৃতি পেতে চায়, শুদ্ধ জিনিসকে নিয়ে কে থাকতে চায়! ইদানিং বড় বড় বক্তা থেকে শুরু করে উঠতি বক্তা, সবাই যখনই বেদান্তের উপর লেকচার দিতে যাবে তখনই তারা শুরু করে scientific approach to Vedantকে দিয়ে। বিজ্ঞানের সাথে বেদান্তের কোন সম্পর্কই নেই, কিসের scientific approach! বেদান্ত নিজের majestyতে আছে, বিজ্ঞান নিজের majestyতে আছে। মন নিয়ে যখন তাঁরা কাজ করতে শুরু করলেন, তখন সব কিছু ওদের কাছে এলেমেলো হতে শুরু হয়ে গেল। কারণ মনকে তারা পদার্থ রূপেই দেখছে, পদার্থের যে আইনগুলো আছে, যেভাবে পদার্থ আচরণ করে, সেভাবে মনও আচরণ করছে; কিন্তু সব কিছু প্রায়ই মিলবে না। এখনও পর্যন্ত পাশ্চাত্য দুনিয়া জানে না, মন কি জিনিস। মনস্তত্ত্ববিদরাও জানেন না, নিওরোলজিস্টরাও জানেন না, বায়োলজির লাইনেও কেউই জানেন না, মন নামক বস্তুটা কি। এক-এক জন এসে মনকে নিয়ে এমন সব বিচিত্র বিচিত্র থিয়োরি দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে, দুদিন চলার পর আর চলে না। একটা ছোট্ট গল্প বললে আমাদের কাছে পরিষ্কার হবে, মন আর ম্যাটার কিভাবে চলে।

সারা বিশ্বের ধারণা হল, যোগী, ম্যাজিক, পাওয়ার, এগুলো হল ভারতের বিশেষত্ব। বেদেরই একটা মন্ত্র আছে, যেখানে বলা হচ্ছে, *ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে*, ইন্দ্র তাঁরা মায়ার শক্তিতে অনেক রূপ ধারণ করে ঘুরে বেড়ান। সেখান থেকে এনারা নিয়ে এলেন 'ইন্দ্রজাল' শব্দ। মাঝখান থেকে দেখা গেল, অনেক যোগীদের ভিতর অনেক রকম শক্তি আছে। যেমন একটা নামকরা খেলার কথা অনেকে শুনে থাকবেন, রোপট্রিক। গত হাজার বছর ধরে যত নামকরা বিদেশী পণ্ডিত আছেন, যাঁরা রোপট্রিক দেখছিল, তাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করে গেছেন। এর মধ্যে নামকরা পরিব্রাজক ইবনবতুতাও আছেন, তিনি লিখেছেন যে তাঁর চোখের সামনে এই ম্যাজিক দেখানো হয়েছিল। একটা দড়ি ছুড়ে দিলে, দড়িটা উধাও হয়ে গেল, আশেপাশে আর কিছু নেই। কিন্তু একটা বাচ্চা উপরে চড়ে গেল, সেখানে লড়াই হচ্ছে, বাচ্চাটার হাত, পা কেটে দিতে মাটিতে পরে গেল। তারপর কিছুক্ষণ পরে দেখা যাচ্ছে বাচ্চাটা অডিয়েন্স থেকে বেরিয়ে আসছে। খেলাটা দেখতে গিয়ে ইবনবতুতা নার্ভাস হয়ে গিয়ে কাঁপতে শুরু করে দিয়েছেন। একজন লোকাল মন্ত্রী ইবনবতুতার হাত ধরে বলছে, আপনি ঘাবড়াবেন না, দড়িও নেই, কেউ দড়ির উপর চড়েওনি, কিছুই হচ্ছে না। তার মানে এটা এক প্রকার সম্মোহনী বিদ্যা। এই চার ধরণের জিনিস ভারতে চলে, এক হল যোগ, যেখানে সত্যিকারের যোগশক্তি কাজ করে, সেখান থেকে এসে যাচ্ছে সম্মোহন, তৃতীয় সেখান থেকে হয়ে যাচ্ছে, মানে কিছুই নেই, শুধু এজেন্টকে লাগিয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে এই রকম হয়েছিল, যেটা আদপেই হয়নি আর শেষে চতুর্থ হল ম্যাজিক। পিসি সরকারের মত কিছু লোক ম্যাজিক দেখাতে শুরু করলেন।

ভারতকে নিয়ে একটা নামকরা কথা আছে, যেখানে বলা হয় যোগের সিদ্ধিগুলিকে ম্যাজিসিয়ানরা কপি করে আর ম্যাজিককে যোগীরা কপি করে। যোগ আর ম্যাজিকের সম্পর্ক ভারতবর্ষে খুব পুরনো। এগুলো দেখে দেখে রামস্বামী নামে একজন ছিলেন, তিনি ইংল্যাণ্ডে গিয়ে ম্যাজিক্যাল পাওয়ার দেখাতে শুরু করলেন। রামস্বামীর দেখানো ম্যাজিক নিয়ে এখনও রহস্য, উনি কি সত্যিই ম্যাজিক জানতেন, নাকি তাঁর সিদ্ধাই ছিল। পাশ্চাত্যের টেকনলজি অনেক উন্নত, তারা টেকনলজিকে কাজে লাগিয়ে ম্যাজিককে নিজের মত করে নিয়ে নিল, যার দ্বারা নানা রকমের চালবাজি করতে থাকল। ইতিমধ্যে খোদা বক্স নামে একজন ছোটবেলায় বাড়িঘড় ছেড়ে অনেক জায়গায় ঘুরে ঘুরে সিদ্ধাই, মনের শক্তি, এগুলো অর্জন করেছেন, আর পরে বিদেশে গিয়ে

নিজের শক্তিগুলিকে দেখাতে শুরু করলেন। কোন ম্যাজিক নেই, কিছু নেই, কিন্তু উনি অনেক অলৌকিক কিছু করে দেখাতেন। তার মধ্যে প্রথম যেটা উনি করলেন, পরে যেটা পিসি সরকার নকল করেন; এর জন্য উনি আট বছর কি দশ বছর একটা বিশেষ সাধনা করেছিলেন। সাধনা করে ওনার চোখটা পুরো এক্সরের মত হয়ে গেছে। চোখে আটার গুলি লাগিয়ে কাগজ আর কাপড় দিয়ে বেঁধে দেওয়া হত, ওই অবস্থায় ওকে যা করতে বলা হত সব করে দিতেন। একশ জনের মত বিজ্ঞানীরা ওকে পরীক্ষা করেছে, চোখে আচ্ছা করে আটার গুলি লাগিয়ে দিত, যাতে চোখ খুলতেই না পারে। তার থেকে আরও আশ্চর্যের ছিল, যেটা বলার জন্য এত কথা বলা হল, তা হল ফায়ার ওয়াকিং।

খুদা বক্স ফায়ার ওয়াকিং করলেন under srticked scientific tempars। বিজ্ঞানীরা আছে, বড় বড় নিউজপেপারের সাংবাদিকরা আছে। খুদা বক্স শুধু বললেন, আমার আগুনটা এই রকম চাই। বিজ্ঞানীরা তাপমাত্রা মাপল, আসল জায়গার আগুনের তাপমাত্রা মেপে দেখল প্রায় ১৫০০ ডিগ্রী, সারফেস তাপমাত্রা প্রায় চারশ ডিগ্রী। পায়ের তাপমাত্রা মাপল। তারপর খুদা বক্স দুবার তিনবার আগুনের উপর দিয়ে হাঁটলেন। তারপর যখন ওর পায়ের তাপমাত্রা মাপল, দেখছে পায়ের তাপমাত্রা পয়েন্ট ওয়ান ডিগ্রী কমে গেছে। পরের দিন নিউজপেপারে বেরোতেই সারা ইংল্যাণ্ডে হৈচৈ পড়ে গেল। পরের বার আরও বেশি বিজ্ঞানীরা এলো। খুদা বক্স আবার হাঁটলেন। একজন সন্দেহ করে নিজে নেমে হাঁটতে গেল, সেকেণ্ডের মধ্যে পা পুড়ে যেতেই সে লাফিয়ে ফেরত চলে এসেছে। এমন পা পুড়ল যে তাকে হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করে দিতে হল। তারপরেই হঠাৎ খুদা বক্স বলছে, আপনারা এই যে এত কিছু আয়োজন করেছেন, এতে আমার মন চঞ্চল হয়ে গেছে, আমি যদি এখন হাঁটতে যাই, আমি কিন্তু পুড়ে যাব; আমি তাই আর আজ হাঁটব না। আমাদের এখানে যেমন যুক্তিবাদীরা আছে, সব জায়গাতেই যুক্তিবাদীরা থাকবে, ওখানেও একজন যুক্তিবাদী উপস্থিত ছিল। সে এসে বলল, আসলে হাঁটার সময় এত সেকেণ্ড আগুনের তাপে পা পড়ে, এই কারণে কিছু হয় না। লোকের বলল, তুমি যখন সব কিছু বুঝে গেছ, একবারে হেঁটে দেখাও না। সেখানে একজন একটা খুব নামকরা কথা বলেছিলেন, খুদা বক্স প্রকৃতির কোন আইনকে ভাঙছেন না। প্রকৃতির এমন কোন একটা শক্তি, যেটা আমরা জানি না, সেটাকে নিজের জন্য খুলে দিয়েছে। স্বামীজীও ঠিক এই কথাই বার বার বলতেন, মিরাকেল বলে কিছু হয় না, সিদ্ধাই বলে কিছু হয় না। এগুলো হল, প্রকৃতির অনেক এমন এমন অজানা শক্তি আছে, যে শক্তির সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণা নেই, সেই শক্তিগুলিকে এনারা ধরে নেন। যারা ফ্রড করে, ম্যাজিক দেখায়, এখানে আমরা তাদের কথা বলছি না। ওনাদের শেষ সিদ্ধান্ত হল, খুদা বক্স নিজের মনকে এমন তৈরী করে নিয়েছেন যে, তাঁর শরীরের উপর তাঁর মনের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা হয়ে গেছে। মন বলে দিচ্ছে, এই শরীরটা যেন না পোড়ে। এবার তিনি আরামসে হেঁটে চলে যাচ্ছেন।

লেগেটের বাড়িতে স্বামীজীর একটা খুব নামকরা ঘটনা আমরা অনেকেই জেনে থাকতে পারি। লেগেটের বাড়িতে স্বামীজী বেশ কয়েক দিন ছিলেন। লেগেটের বাড়িতে একটা গলফ কোর্স ছিল। স্বামীজী একদিন সকালবেলা লেগেটের গলফ কোর্সে হাঁটছেন, সেখানে লেগেটের ছেলে গলফ খেলছে। স্বামীজী গলফ্ খেলা কি জিনিস জানতেন না। লেগেটের ছেলেকে জিজ্ঞেস করে জানতে চাইলেন এটা কি ধরণের খেলা। দূরে একটা ঝাণ্ডা মাটিতে পোতা আছে। স্বামীজী জিজ্ঞেস করলেন, ওখানে ঝাণ্ডাটা কিসের। বলা হল, ওখানে একটা হোল আছে, এখান থেকে স্টিকের সাহায্যে বল মেরে ওই হোলে ফেলতে হয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউই একবারে বল হোলে ফেলতে পারেনি, কারুর পক্ষে সম্ভবও না। স্বামীজী বলছেন, আমি যদি একবারে বল হোলে ফেলে দিতে পারি? লেগেটের ছেলে বাচ্চা বয়স, সে বলল, তোমাকে তাহলে আমি এক ডলার দেব। ইতিমধ্যে মিঃ লেগেটও এসে হাজির হয়েছেন। তিনি ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কি নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে? সব শোনার পর বললেন, স্বামীজী তাহলে আমার তরফ থেকে দশ ডলার বাজি রইল। স্বামীজী জীবনে গলফ্ দেখেনইনি, জানেনও না গলফ কি জিনিস। তিনি স্টিকটা নিলেন, বলটাকে দেখে নিলেন, নির্দিষ্ট জায়গায় বসালেন, দূরত্বটা দেখে নিলেন, ঠাক্ করে মারলেন, বল গিয়ে সোজা হোলের মধ্যে ঢুকে গেল। মিঃ লেগেট তখন জিজ্ঞেস করছেন, স্বামীজী আপনি যে যোগের কথা বলেন, এর সাথে কি যোগের কোন সম্পর্ক আছে? লেগেট সিদ্ধাইয়ের কথা বলতে চাইছেন। স্বামীজী আরও মজার কথা বলছেন, We don't apply Yoga in such small things, এত সাধারণ জিনিসে আমরা যোগকে লাগাই না। আমি আমার মনকে

বলে দিলাম, মন, লেগেটের পকেটে দশ ডলার আছে, ওটা আমার পকেটে আসা চাই, যা করার তুমি করে দাও। মন তখন শরীরকে আদেশ দিল, শরীর পেশী গুলিকে বলে দিল কতটা জোর লাগাতে হবে, কি কি করতে হবে; এরপর বাকি কাজ পেশী নিজেই করে দিয়েছে। স্বামীজী কখন এই ঘটনাটা কাউকে বলেননি, এই ঘটনার বিবরণ লেগেটের স্মৃতিকথাতে আছে। আর একটা না, এই ধরণের ঘটনা স্বামীজীর জীবনে প্রচুর আছে।

তার মানে, মন যে শরীরকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখে, আমরা তার কিছুই জানি না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের জন্য আমাদের আজকে দুর্ভাগ্য যে, আমরা মনে করি শরীর মনকে নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু তা একেবারেই না। মন শুধু শরীরকেই নিয়ন্ত্রণ করে না, আরেকটা মনকেও নিয়ন্ত্রণ করে। মন শরীরকে বলে দিয়েছে, আগুনের উপর দিয়ে তোমাকে হাঁটতে হবে, কিন্তু পুড়বে না। কিন্তু ওরা যখন এত কিছু করছে, এটার তাপমাত্রা দেখছে, সেটার তাপমাত্রা দেখছে, আগের তাপমাত্রা, পরের তাপমাত্রা, এত কিছু করার জন্য খুদা বক্সের মনটা চঞ্চল হয়ে গেছে, মন যেমনি চঞ্চল হয়ে গেছে, নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাটাও চলে গেছে। এটাই ঠাকুর খুব সুন্দর গল্পাকারে বলছেন, বিশ্বাসের কত জোর বোঝাবার জন্য বলছেন, একজন গুরু বলে দিয়েছেন ঈশ্বরের নাম করলে নদীও পেরিয়ে যাওয়া যায়, সেই মেয়েটি বিশ্বাসের জোরে পেরিয়ে আসছে। বিভীষণ একটা পাতায় রাম নাম লিখে বলে দিলেন, এটা হাতে করে তুমি সমুদ্রের উপর দিয়ে হেঁটে চলে যেতে পারবে, কিন্তু পাতা খুলে দেখতে যেও না। লোকটিও সেই বিশ্বাসের জোরে বেশ আরামসে পেরিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ তার সন্দেহ হল পাতায় কি এমন আছে যে এই ভাবে সমুদ্রের উপর দিয়ে চলে যেতে পারছি। তখন সে পাতাটা খুলে দেখে ওতে শুধু রাম লেখা। 'আরে শুধু রাম নাম'! ভাবতেই টুপ করে সমুদ্রে ডুবে গেল। ঠাকুর এগুলো কাহিনী বলছেন, এগুলো সত্য না। যেগুলো সত্য, যেমন খুদা বক্সের কাহিনী, স্বামীজীর কাহিনী যে কাহিনীগুলো আমরা আগে বললাম।

ভিএস রামচন্দ্রন নামে একজন বড় নিওরো বিজ্ঞানী, নিজে একজন ডাক্তার, 'ফ্যান্টমস ইন দা ব্রেন' নামে ওনার একটা নামকরা বই আছে। এই জিনিসগুলিকে নিয়ে তাঁর প্রচুর রিসার্চ আছে, আর ওনার বইয়ে অনেক মজার মজার ঘটনার বর্ণনা আছে। তার মধ্যে এক মহিলার বর্ণনা আছে। ভদ্রমহিলা বাঙালী, ব্রেন ডেড হয়ে দিল্লীর কোন এক হাসপাতালে, আজ মরছে কি কাল মরছে, এই অবস্থায় ভর্তি হয়ে আছে। ওর ঘরে যে নার্স দেখাশোনা করে সেও বাঙালী। একদিন নার্স রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটা গান করছিল, প্রথম লাইনটা গাওয়ার পর দ্বিতীয় লাইনটা অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও মনে করতে পারছিল না। হঠাৎ ওই মহিলা বিছানায় সোজা উঠে বসল, আর গানের পরের লাইনটা বলে দিল, দেওয়ার পর আবার কাত হয়ে শুয়ে পড়েই মারা গেল। ডাক্তাররা যারা অবজার্ভ করছিল, তারাও ভেবে কোন কুলকিনারা পাচ্ছিল না, যার ব্রেন বলে কিছু নেই, সে গানটা শুনছে, হঠাৎ উঠে বসল, দুম্ করে পরের লাইনটা বলে দিয়েই মরে গেল। আমাদের কাছে এগুলো ম্যাজিক্যাল মনে হয়।

অনেক বছর আগে মঠের কলকাতার এক সেন্টারে সুন্দরবন এরিয়া থেকে একটা ছেলে কাজ করতে এসেছিল। কয়েক মাস কাজ করার পর ছুটি নিয়ে বাড়িতে গেছে। সেখানে গিয়ে সবাইকে বলছে, আমাদের ওখানে একটা বাক্স আছে যার মধ্যে জিনিস রাখলে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। আরেকটা বাক্স আছে যাতে জিনিস রাখলে গরম হয়ে যায়। ছেলেটি আসলে ফ্রীজ আর আর হটকেসের কথা বলতে চাইছে। গ্রামের লোকেরা তার কথা বিশ্বাসই করতে চাইছে না, গাঁজাখুরির গপ্পো বলে উড়িয়ে দিচ্ছে। আমাদের কাছে ফ্রীজ, হটকেস এগুলো সাধারণ জিনিস, কিন্তু যারা ইলেক্ট্রিসিটির প্রপার্টিকে জানে না তাদের কাছে এটা ম্যাজিক। স্বামীজীর মত পুরুষরা মনের শক্তিকে খুব ভাল করে জানেন, আমরা জানি না। আমাদের সবারই কিছু না কিছু অভিজ্ঞতা আছে যে, একটা কিছুকে নিয়ে ভাবছিলাম, দেখছি হঠাৎ ওটা হয়ে গেল। পরে আমরাই অবাক হয়ে ভাবি, কি করে এটা হয়ে গেল। কারুর কথা ভাবছি, সেই লোকটা হঠাৎ এসে গেলো। আমরা নিজেরাই চমৎকৃত হয়ে উঠি। শ্রীশ্রীমায়ের জীবনে অনেকগুলো ঘটনা আছে, যারা বর্ণনা করছে তারা বলছে, মা যেটা ভাবছেন সেটাই হয়ে যাচ্ছে। এগুলো কোনটাই অস্বাভাবিক কিছু না।

কেউ যদি কিছু দিন মনকে শান্ত করতে পারে, কিছু দিন যদি কোন মিথ্যা কথা না বলে, কাউকে যদি কোন কটূ কথা না বলে, কারুকে যদি না ঠকায়, দেখা যাবে, নিজে থেকেই তার ভিতরে একটা শক্তি এসে

যাবে। দিনে দুবেলা যদি নিষ্ঠার সাথে, একাগ্র মনে হাজার করে জপ করে, দৈনন্দিন জীবনটা যদি ঠিক রাখে, এক মাসের মধ্যেই তার এই ক্ষমতা এসে যাবে। তার পাশের লোকটা কি ভাবছে, আগেই বুঝে যাবে। এগুলো এমন কিছু না। কিন্তু সমস্যা হল, আমরা এমন এক সমাজে আছি, যে সমাজে টিকে থাকার জন আমাদের মিথ্যে কথা বলতে হয়, চালবাজি করতে হয়, লোককে ঠকাতে হয়, অনেক কিছু করতে হয়। আর জপ যখন করা হয় তখন ফুটন্ত জলের মত জপ করা হয়, জল যেমন টগবগ করতে থাকে, আমাদের মনটাও ওই রকম টগবগ করতে থাকে, জপের মন্ত্রটাও টগবগ করতে করতে এগিয়ে যায়। পুরো শান্ত মনে যে জপ করবে, সেটা আর হয়ে ওঠে না। ফলে কোন শক্তিই আমাদের মধ্যে আসে না। কিন্তু তার মধ্যেও এক মাস যদি সে একটু এভাবে চেষ্টা করে, তার ভিতরে কিছু না কিছু একটা সিদ্ধি এসে যাবে। এই যোগসিদ্ধিকে নিয়েই স্বামীজী এখন বলতে যাচ্ছেন, আমরা এখন তার আলোচনা করছি।

স্বামীজী বলছেন, The powers acquired by the practice of Yoga are not obstacles of the Yogi who is perfect, but are apt to be so for the beginner, through the wonder and pleasure excited by their exercise. (*যিনি যোগে সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করেছেন, তাঁর পক্ষে যোগসিদ্ধিগুলি বিঘ্ন নয়, কিন্তু প্রবর্তকের পক্ষে সেগুলি বিঘ্নস্বরূপ হতে পারে, কারণ ঐগুলি প্রয়োগ করতে করতে ঐ-সবে একটা আনন্দ ও বিস্ময়ের ভাব আসতে পারে।*) পবিত্র জীবন, মিথ্যা কথা না বলা, কাউকে না ঠকানো আর সকালে হাজার ও বিকালে হাজার জপ, এক মাস থেকে তিনি মাস কেউ এভাবে রুটিন অনুসরণ করে চলুক, তার শক্তিটাই অন্য রকম হয়ে যাবে। যোগীরা যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়ামাদি পুরোদমে অনুশীলন করে করে মনের আবর্জনাগুলো পরিষ্কার করে নিয়েছেন, তাতেই তাঁদের শক্তি এসে যায়। সিদ্ধাই বলে কিছু আছে নাকি! আমি যে ঘরে বাস করি, সেই ঘরের দরজা জানলা সব বন্ধ, জানলার কাচ রঙ করা, সেই জানলার কাচে আবার ময়লা জমে আছে, তার উপর পর্দা দেওয়া, এরপর আমি বাইরের দৃশ্য দেখতে চাইছি। বাইরের কোন দৃশ্যই দেখা যাবে না। যেমন যেমন আমি পর্দা সরাবো, ধুলো পরিষ্কার করব, তেমন তেমন পরিষ্কার দেখতে পাবো। সমস্ত ধুলো, কালি, ময়লা মুছে সাফ করে দেওয়ার পর, তখন কাঁচ আছে কি নেই বোঝা যাবে না। বাইরে যা কিছু আছে সব আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। এই সংসার পদার্থ দিয়ে চলে না, সংসার চলে মন দিয়ে। মন আমাদের একটাই, এই একটা মন দিয়েই পুরো জগৎ চলছে।

আমেরিকাতে ইদানিং একটা নূতন থিয়োরি এসেছে, তবে আমেরিকানদের কোন থিয়োরিকেই বিশ্বাস করা যায় না। আজ যে থিয়োরির কত বলে দিল, আগামীকাল আরেকটা অন্য থিয়োরি এনে আগের থিয়োরিটাকে বাতিল করে ডাস্টবিনে ফেলে দেবে। যাই হোক, নতুন থিয়োরিতে ওরা বলছে যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যেমন এনার্জির জন্মও হয় না, নষ্টও হয় না, ঠিক তেমনি universal intelligenceএরও জন্ম হয় না, নাশও হয় না, আমাদের সাংখ্যে মহৎ বলছেন। কিন্তু ওরা ওদের থিয়োরিগুলিকে নিজের মত করে রাখে। বলছে, জনসংখ্যা বেড়ে গেলে মানুষের আইকিউটা কমে যায়, কারণ তখন সবার মধ্যে ওটা ডিভাইড হয়ে যায়। বিচিত্র বিচিত্র ওদের সব থিয়োরি। এখানে আইডিয়াটা থেকে যাচ্ছে, মন একটাই। যোগসূত্রে মহৎটাই universal mind, যাকে আমরা সমষ্টি মন বলছি। সেই সমষ্টি মনের মধ্যে, আমার, তোমার, সবার মনকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রূপে দেখাচ্ছে। ক্ষুদ্র দেখাচ্ছে কারণ, আমার মস্তিষ্ক ওটাকে সীমিত করে দিচ্ছে। ফ্রীজের বরফের ট্রেতে কত বরফের টুকরো, কিন্তু ওটা একটাই জল, খোপে খোপে আলাদা হয়ে আছে, বিশ্বমন এক। এবার আমি খাঁচা থেকে বেরিয়ে এলাম, এখন আমি পুরোটাই দেখতে পাবো। ওই খাঁচার মন, সেই খাঁচার মন, বিশ্বমন, সব মনকেই এখন জানতে পারব, নির্ভর করবে আমার মন কতটা পরিষ্কার। প্রথম হল, মন যত পরিষ্কার হবে তত পরিষ্কার দেখবে।

দ্বিতীয়, যত মন পরিষ্কার হতে থাকবে, তত তার শরীরের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বাড়বে। কতটা বাড়বে? প্রথমের দিকে সব বুঝতে পারবে কি হচ্ছে, কি হতে যাচ্ছে, তারপরের ধাপে নিজেরই আরেকটা শরীর দাঁড় করিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা হয়ে যাবে, তারপরের ধাপে ব্রহ্মার শক্তি এসে যাবে, নিজেই একটা ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করে দিতে পারবে; কারণ শেষ পর্যন্ত সব কিছু মন দিয়েই হয়। হৃদয়রাম আর ঠাকুরের একটা ঘটনা আছে, হৃদয়রামকে ঠাকুর ছুঁয়ে দিয়েছেন, হৃদয়রাম দেখছে পুরো জগৎটা জ্যোতির্ময়। হৃদয়রাম চিৎকার করে বলছে,

মামা! মামা! চলো আমরা জগৎকে শিক্ষা দিয়ে বেড়াই। যখনই কোন সাধু বাবাজীর নাম পেপারে আসতে শুরু করেছে, বুঝতে হবে তার সিদ্ধাই এসেছে আর বেচারি এবার ফেঁসেছে, পতনের আর বেশি দেরী নেই। আমাদের পরম্পরায় অনেক আগেকার একটা ঘটনার কথা খুব প্রচলিত হয়ে আছে। একজন বড় সাধু এক জায়গায় গেছেন, সেখানে তিনি একজন সাধককে দেখেছেন। সাধককে দেখে উনি বলছেন, এই রে! এর তো সাধনা আছে, কিন্তু সিদ্ধাইয়ের জালে ফেঁসে গেছে। এর সিদ্ধাইটা আমি নিয়ে নিচ্ছি, তা নাহলে এ মরবে। ওর মধ্যে যে সিদ্ধাই এসেছে সেটা যদি আমি নিয়ে নিই, তাহলে ওর সিদ্ধাইটা চলে যাবে, এবং ও আবার ঈশ্বরের পথে এগোতে থাকবে। সেই সাধকের মা জানতে পেরে দৌড়ে এসে 'সেই সাধুর পায়ে পড়ে বলছে, আপনি এটা করতে যাবেন না, এই করেই আমার ছেলে খাবে'। সাধু মায়ের কথা রাখলেন। পরে ঠিক তাই হল, নিজের সময়ে তার খুব নাম যশ হল, প্রচুর ভক্ত, জন সমাগম হতে লাগল। যত দিন যাচ্ছে তত তার জালিয়াতি বেড়েই চলেছে। স্বামীজী এটাই বলছেন, যারা ওস্তাদ, ছয় বললে ছয় পড়বে, দুই বললে দুই পড়বে, এদের কাছে সিদ্ধাই কোন ব্যাপারই না, সিদ্ধাইকে এরা কোন কাজেও লাগাতে যান না। কিন্তু যোগের পথে নবাগতরা চমকে ওঠে।

পতঞ্জলি তাঁর যোগসূত্রে পর পর অনেক রকম যোগ সিদ্ধির কথা বলে গেছেন। যেমন বলছেন, সত্যে যদি কেউ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, যোগী কোন কাজ না করেও কাজের ফল পেয়ে যাবে। কাউকে যদি বলে দিল, যাও তোমার টাকা হবে, এবার সে যদি কোন কাজ নাও করে, তাও তার টাকা আসবে। তেমনি যিনি অহিংসায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান, তাঁর সামনে সিংহেরও হিংস্র ভাব চলে যাবে, শুধু সিংহই না, যে কোন প্রানীর হিংসার ভাব চলে যাবে। শৌচে যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তার নিজের শরীরের প্রতি বিতৃষ্ণা তো এসে যাবেই, অপরের শরীরের প্রতিও আকর্ষণ চলে যাবে, কেউ স্পর্শ করলেই সারা শরীরটাই ঘিন্ ঘিন্ করতে থাকবে। যোগীরা যদি অপরের শরীরের আকর্ষণ থেকে না বেরিয়ে আসতে পারে, তাহলে একের পর এক ঝামেলা আসতেই থাকবে। এই ভাবে পর পর অনেক সিদ্ধির কথা বলে গেছেন।

স্বামীজী এরপর বলছেন, Siddhis are the powers which mark success in the practice; and they may be produced by various menas, such as the repetition of a Mantra, by Yoga practice, meditation, fasting, or even by the use of herbs and drugs. (*সিদ্ধি বা বিভূতিগুলি –যোগসাধনার পথে যে ঠিক ঠিক অগ্রসর হওয়া যাচ্ছে তারই চিহ্নস্বরূপ; কিন্তু সেগুলি মন্ত্রজপ, উপবাসাদি, তপস্যা, যোগসাধন, এমন-কি ঔষধ-বিশেষের ব্যবহারের দ্বারাও আসতে পারে।*) সিদ্ধি কি কি ভাবে হতে পারে বলতে গিয়ে পতঞ্জলি বলছেন, ঔষধ ও ভেষজাদির দ্বারাও হতে পারে। আর কি কি ভাবে হতে পারে? মন্ত্র জপের দ্বারা, যোগ অভ্যাসের দ্বারা, ধ্যানের দ্বারা আর বলছেন উপবাসের দ্বারাও সিদ্ধি হয়। কেউ যদি বলে আজ থেকে আগামী তিন মাস আমি রাত্রে খাবো না, তিন মাসের মধ্যেই তার যোগসিদ্ধি এসে যাবে। যদি কেউ ঠিক করে রবিবার দিন করে আমি লবণ খাবো না, তাতেই সিদ্ধি এসে যাবে, একটু কম আসবে। সপ্তাহে একদিন আমি একশ ভাগ উপাস থাকব, বাপ বাপ বলে সিদ্ধি আসবে। তেমনি মন্ত্র জপ করলে, একটু আগেই সকাল বিকাল এক হাজার করে জপ করার কথা বলা হল, তাতেও সিদ্ধি এসে যাবে। আসলে এই যোগসিদ্ধি পাওয়াটা বিরাট কিছুই না। ঠাকুরকে অধর সেন জিজ্ঞেস করেছেন, মহাশয় আপনার কি কিছু সিদ্ধাই-টিদ্ধাই আছে? অধর সেন ছিলেন তখনকার দিনের একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট; ঠাকুর বলছেন, যে ডেপুটির ভয়ে সবাই কাঁপে, আমি সেই ডেপুটিকে ঘুম পাড়িয়ে রাখি।

ধর্মমেঘ সমাধি

The Yogi, who has conquered all interest in the powers acquired and who renounces all virtue arising from his actions, comes into the 'cloud of virtue' (name of one of the states of Samadhi) and radiates holiness as a cloud rains water. (*যে যোগী যোগসিদ্ধিসমূহকেও বৈরাগ্য অবলম্বন করেন, সমুদয় কর্মফল ত্যাগ করেন, তাঁর 'ধর্মমেঘ' নামে সমাধি লাভে হয়। যেমন মেঘ বৃষ্টি বর্ষণ করে, তেমনি তিনি যোগাবস্থা লাভে করেন, তা চারিদিকে ধর্ম বা পবিত্রতার প্রভাব বিস্তার করতে থাকে।*) এই জায়গাটা মনে হচ্ছে মিস্ ওয়াল্ডো ঠিক মত নোট নিতে পারেননি,

ধর্মমেঘ সমাধি বুঝতে হলে আমাদের যোগশাস্ত্রের মাধ্যমেই বুঝতে হবে। মনকে বহির্মুখ থেকে ঘুরিয়ে অন্তর্মুখী করে জপধ্যান করছে, তপস্যা করছে, সাধনা করছে, সাথে উপোসাদিও করছে আর মন পরিষ্কার ভাবে জানে যে, আমি যোগ সাধনা করছি; এবার সিদ্ধাই আসতে শুরু হয়ে যাবে। কিন্তু সে বলছে, আমার সিদ্ধাই লাগবে না। এবার সে আরও হাল্কা হয়ে গেল, আরও উপরে চলে গেল। আমাদের মনটা শরীরের সাথে বাঁধা, একটা বড় গ্যাস বেলুনকে দড়ি দিয়ে একটা বড় পাথরের সাথে বেঁধে দিলে বেলুন যেমন উড়তে পারবে না, ওই বেলুনের মত মনও উড়তে পারে না, শরীরের সাথে বাঁধা আছে। যেমনি মন্ত্র, জপ, ধ্যান, তপস্যাদি করা শুরু হল, মন এবার শরীরের থেকে আলগা হতে থাকল, বেলুন এবার উড়তে শুরু করল। মন ভারী থেকে ক্রমশ হাল্কা, হাল্কা থেকে আরও হাল্কা হয়ে হয়ে শেষ বিঘ্ন হয় এর যোগসিদ্ধিতে এসে। যোগসিদ্ধিকেও উপেক্ষা করে যখন এগিয়ে যায়, তখন মন সমাধির একটা অবস্থাতে পৌঁছে যায়, যোগের ভাষায় সেই সমাধিকে বলছেন, ধর্মমেঘ সমাধি।

স্বামীজী এখানে ধর্মমেঘ সমাধির ইংরাজী শব্দ নিচ্ছেন cloud of virtue। পতঞ্জলি যে ধর্মমেঘ সমাধির কথা বলছেন, তাতে কি হয়, বাদল খুব ঘন হয়ে এমন হয়ে আছে যে, এই ঝম ঝম করে বৃষ্টি পড়ল বলে। এই অবস্থায় যোগীর মন এই রকম ধর্মমেঘ হয়ে যায়, যেমনি বৃষ্টি নামবে, তখন তাঁদের কাছ থেকে শুধু ধর্মই বেরোবে। এখানে স্বামীজী খুব সুন্দর বলছেন, he radiates holiness। যোগী এখন ধর্মমেঘ হয়ে গেছেন, তার মানে পবিত্রতা, জ্ঞান, ধর্মের একেবারে ঘনীভূত মূর্তরূপ। জমাট বাঁধা ঘন মেঘ থেকে যেমন ঝম ঝম করে বৃষ্টি অঝোড়ে ঝরে পড়ে, এনাদের মন থেকে তেমনি অঝোরে শুধু ধর্ম, জ্ঞান, পবিত্রতা, আনন্দ এই গুণগুলি বর্ষিত হতে থাকে।

খুব সংক্ষেপে তিনটে ধাপ, সাধনা, সিদ্ধি বা সিদ্ধাই আর তৃতীয় ধাপ আসে ধর্মমেঘ সমাধি। ধর্মমেঘ সমাধির পরেই নির্বীজ বা নির্বিকল্প সমাধি হবে। ধর্মমেঘ সমাধি হয়েছে মানে, আসল জ্ঞান এখনও হয়নি, আসল জ্ঞান হবে নির্বীজ সমাধিতে। আমরা বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ঋষিদের কথা জানি, যে কোন সন্ত মহাত্মারা সবাই আধ্যাত্মিক বিবর্তনের বিভিন্ন ধাপে আছেন। এমনকি যাদের আমরা ভণ্ড সাধু মনে করছি, তাঁরাও মহাপুরুষ। আমরা সাধারণ মনের লোক, আমরা সাধু সন্ন্যাসীদের দেখে কি বুঝব! যিনি সংসার ছেড়ে ঈশ্বরের পথে নেমে পড়েছেন, এতেই তিনি কত উঁচুতে চলে গেলেন, জাতটাই তাঁর আলাদা হয়ে গেল। যাই হোক, ধর্মমেঘ সমাধি যোগের একটা খুব উচ্চ অবস্থা। অনেক সাধু মহাত্মা আছেন, যাঁরা একটু জগৎ থেকে আলাদা থাকেন তাঁদের এই ধর্মমেঘ সমাধি হয়ে যায়।

একাগ্রতা ও ধ্যান

আর বলছেন, Meditation is on a series of objects, concentration is on one object. (*যখন একরূপ প্রত্যয়ের ক্রমাগত আবৃত্তি হতে, তখনই সেটা ধ্যানপদবাচ্য, কিন্তু সমাধি এক বস্তুতেই হয়ে থাকে।*) মনকে যখন একটা বস্তুতে স্থির করার চেষ্টা করা হয় তখন তাকে মনের একাগ্রতা বলা হয়; আর একটার পর একটা বস্তুর উপর যখন একাগ্রতা চলতে থাকে তখন তাকে ধ্যান বলছেন। যেমন একটা ফুলের উপর আমি মনকে একাগ্র করছি, তারপর ফুল থেকে সরে এবার ফুল যে উপাদান বা যে তন্মাত্রা দিয়ে তৈরী, সেই তন্মাত্রার একটা স্তরে মনকে একাগ্র করার পর, তার উপরের তন্মাত্রার উপর একাগ্র করা হচ্ছে, এটাকে বলছেন Meditation। Concentration একটা বস্তুতে হয়, Meditation একটা seriesএ হয়। Meditation আর Concentration আবার অনেক সময় inter changeable হয়ে যায়। খুব মন দিয়ে একটা বই পড়ছি, ওটা তখন meditation হয় না, আসলে তখন concentration হয়। বেশির ভাগ লোকেরা এসে বলে আমরা meditation শিখতে চাই, আসলে সবাই কিন্তু concentration শিখতে চাইছে। Meditation হল পর পর একটা থেকে আরেকটায় series of objects চলতে থাকে, এই meditationই যোগীকে সিদ্ধাই এনে দেবে, ধর্মমেঘ সমাধিতে নিয়ে যাবে, শেষে সমাধিতে, সেখান থেকে আত্মজ্ঞানের অবস্থায় নিয়ে যাবে।

আত্মা ও মন বা পুরুষ ও প্রকৃতি

হিন্দু শাস্ত্রে বা স্বামীজীর লেকচারে কয়েকটা জিনিস ঘুরে ঘুরে আসবে, তারমধ্যে একটা হল আত্মা, আরেকটা হল মন। দর্শনের দিক থেকে কোথাও কোথাও শব্দগুলি পাল্টে পুরুষ আর প্রকৃতি হয়ে যায়। পুরুষ হলেন চৈতন্য আর প্রকৃতি হল জড়। মনের এলাকা মানেই প্রকৃতির এলাকা, চৈতন্যের এলাকা মানে পুরুষ – এটা সাংখ্যের মত। প্রথম প্রথম শুনলে এগুলো ধারণা করা যায় না, শুনতে শুনতে ধারণা হয়। ধ্যানের গভীরে যাঁদের জ্ঞান লাভ হয়, তাঁরা এগুলোকে জানতে পারেন। ভেবে চিন্তে এগুলোকে ধারণা করতে গেলে হবে না। যদি শুনে শুনেও পুরুষ আর প্রকৃতির ব্যাপারটা একটু বুঝে নেওয়া যায়, তাহলেও কিন্তু বুঝতে হবে তার অনেক কাজ এগিয়ে গেল। আমরা যেমন নিত্য অনিত্য বিচারের কথা বলি বা ঠাকুর যেমন বলছেন ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু, তার মানেই দাঁড়ায় চৈতন্যই বস্তু, চৈতন্য বাদে যা কিছু আছে, ওটা মনের এলাকা। মনটা ত্যাজ্য, চৈতন্যই একমাত্র যেটাকে আমাদের ধরতে হবে। অনেক দিন ধরে শুনতে শুনতে হঠাৎ বিশ্বাস হতে শুরু হয়ে যায়, শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের যে কথা বলা হয়, এটাই হল সেই শ্রবণ।

আমি বই-এর পর বই পড়ে যাচ্ছি, কিন্তু এভাবে বই পড়ে কোন দিন আমার কিছু হবে না। ঠাকুরও কতবার বলছেন, বই পড়ে কিছু হয় না। তাহলে রামকৃষ্ণ মিশন এত বই ছেপে যাচ্ছে কেন? যেটা করতে হয়, তা হল, শাস্ত্র-অধ্যয়নের সাথে সাথে শাস্ত্রের চিন্তন করতে হয়। চিন্তন দুই প্রকার হয়, কোন একটা কথা শুনলাম, আমার খুব ভাল লাগল, এবার সেই কথাটাকে আমি পনের দিন, এক মাস ধরে জাবর কেটে যাচ্ছি। দ্বিতীয় হল আবৃত্তি করে যাচ্ছি। বলাই হয়, *আবৃত্তি সর্বশাস্ত্রানাম্ বোধাদপি গরীয়সী*। একজন আছে যে সমস্ত শাস্ত্রের অর্থ বুঝে নিয়েছে, কিন্তু শাস্ত্র আবৃত্তি করে না। আরেকজন আছে সে হয়ত শাস্ত্রের অর্থ অত বোঝে না, কিন্তু প্রত্যেক দিন শাস্ত্রের পারায়ণ করে যায়; পারায়ণ মানে রোজ ধারাবাহিক ভাবে শাস্ত্র আবৃত্তি করে যাওয়া। এখানে প্রথমজন অপেক্ষা দ্বিতীয়জনকে শ্রেষ্ঠ বলা হচ্ছে। একটা বই আমি বার বার পড়ছি, কিংবা একটা তত্ত্বকথা বার বার শুনছি, শুনতে শুনতে এরপর কোন তত্ত্ব বাক্য, শাস্ত্র বাক্য কোন কারণে আমার উপর যদি কৃপা করেন, তখন তাঁর প্রতি আমার একটা দৃঢ় বিশ্বাস এসে যাবে। কারণ শাস্ত্রের কোন স্তোত্র বা মন্ত্র এগুলো নিছক শব্দ মাত্র না, প্রত্যেকটি মন্ত্র চৈতন্য ও মূর্তময়; যে কোন ধর্মের সত্য হল চৈতন্য। মঠের বরিষ্ঠ মহারাজরা সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারীদের বলেন, গ্রন্থগুলো ঘরে রাখবে, রোজ ঝাড়বে, মুছবে, তাতেই শাস্ত্রের কৃপা হবে। ঘরে ঠাকুর দেবতার ছবি যেখানে রাখা হয়, সেই জায়গাটা যেভাবে রোজ পরিষ্কার করা হয়, পূজা করা হয়; ঠিক সেইভাবে শাস্ত্রাদি গ্রন্থকেও শ্রদ্ধার সাথে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হয়, তাতে একদিন তাঁর কৃপায় তাঁর প্রতি আমাদের বিশ্বাস এসে যাবে। বিশ্বাস যদি একবার হয়ে যায়, এরপর সেই বিশ্বাসের যে উচ্চ অবস্থা শ্রদ্ধা, সেই শ্রদ্ধাও উৎপন্ন হয়ে যাবে।

এখান আমরা যা কিছু পড়ছি, শুনছি, আমাদের সেই বিশ্বাসও নেই, শ্রদ্ধাও নেই। অধ্যয়ন ও শ্রবণ করতে করতে যেমনি শ্রদ্ধা বিশ্বাস হয়ে যাবে, তখন জিনিসটাকে জানতে ইচ্ছা হবে। তখন শুরু হয় মনন। শ্রবণ এই তিনটে ধাপে চলে, শোনা হল, বিশ্বাস জন্মাল, শ্রদ্ধা জন্মাল, এরপর মনন করার ইচ্ছা আসে। ঘুমোতে যাচ্ছে, অনেক পরিশ্রম করার পর শুয়ে বিশ্রাম করছে, একটু যে সময় পেল, তখন বহির্চৈতন্য অন্তর্চৈতন্য হয়ে যায়, শুভ সংস্কার থাকলে ওই সময় ঈশ্বর চিন্তন স্বাভাবিক ভাবেই আসবে। বাড়িতে তাই ঠাকুর দেবতার ছবি এমন ভাবে রাখা দরকার, যাতে যখন যে অবস্থায় থাকছে, যেখানে থাকছে, ছবিতে যেন নজর চলে যায়। এইভাবে মনন চলতে থাকে।

সংসার মানেই মন, মনের পারে যে চৈতন্য, এটাকে ধারণা করা খুব কঠিন। যবে থেকে এই সৃষ্টি চলছে, সেই জন্মজন্মান্তর আমরা মনকেই সত্য বলে ধরে রেখেছি, মনের পারে যে কিছু থাকতে পারে আমরা ধারণাই করতে পারি না। এখন আমাদের আচার্যরা এসে বলছেন, মন নয় চৈতন্যই সত্য। কিন্তু আমরা বিশ্বাসই করতে চাই না, মেনে নেওয়া সম্ভবই না। স্বামীজী, পুরুষ ও প্রকৃতি এবং আত্মা আর মন, এই দুটোকে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলছেন। সবাইকে এই প্রকৃতির পারে যেতে হবে। কিভাবে যেতে হবে, কেন যেতে হবে স্বামীজী বলছেন। আর আমাদের সমস্ত শাস্ত্রও এগুলোকে নিয়েই বলে যাচ্ছেন। এই পয়েন্টগুলির উপর আমরা আগেও আলোচনা করেছি। তবে স্বামীজী যেটারই পুনরাবৃত্তি করবেন, সেটাকে নূতন ভাবে বলবেন।

বলছেন, Mind is cognized by the Atman, but it is not self-illuminated. (*মন আত্মার জ্ঞেয়, কিন্তু মন স্বপ্রকাশ নয়।*) হিন্দুরা অনেক আগে থেকেই বলে আসছে, আত্মাই চৈতন্য। চেতনা বলতে যেটা বোঝায়, যেখানে বোধ করার ক্ষমতা থাকে, এটা একমাত্র আত্মারই থাকে, মনের বোধ করার ক্ষমতা নেই। কেনোপনিষদে এই জিনিসটাকে, মন কেন চৈতন্য নয়, খুব সূক্ষ্ম যুক্তি দিয়ে দেখানো হয়েছে। কিন্তু এই জিনিসগুলি পুরোপুরি যুক্তির উপর চলে না, নিজের নিরন্তর গভীর সাধনা না থাকলে এই জিনিসগুলিকে জানা যায় না, ধারণাই করা যাবে না। যাঁকে আমরা সম্মান করি, তিনি বলে দিয়েছেন বলে আমরা মেনে নিই, তা নাহলে আমাদের জীবন এগোবে না। আমি যদি বলি, যুক্তিতে আমি যতক্ষণ না বুঝতে পারছি ততক্ষণ আমি মানছি না, তাহলে সারা জীবন আমাকে বসেই থাকতে হবে, কোন দিন আমি জানতে পারব না। কারণ ওটাকে বোধ করার জন্য যে সাধনার দরকার, ওই সাধনা আমার আপনার পক্ষে করা সম্ভব না। আচার্যের প্রতি যাদের বিশ্বাস আছে, শ্রদ্ধা আছে, আচার্য যেমন বলেছেন তারা সেটা মেনে নেয়। তারপর সাধনা করে করে শেষ অবস্থায় পৌঁছে দেখে, তাই তো! এনারা যেটা বলছেন সেটাই সত্য।

যিনি শুদ্ধ চৈতন্য, যিনি মুক্ত, যাঁর মধ্যে সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত শক্তি বিদ্যমান, সে কেন মিছিমিছি কারুর সাথে জড়াতে যাবে। যে বিরাট ক্ষমতাবান রাজা, যেমন আলেকজাণ্ডার বিশ্বজয় করতে বেরিয়েছিল, সেও কয়েকটা বিয়ে করেছিল। সে শক্তিশালী, ক্ষমতাবান, বিশ্বজয়ী হতে পারে, কিন্তু মনের দিক থেকেও কোথাও সে দুর্বল থেকে গিয়েছিল। হিটলার, এত বড় ক্ষমতাবান, সে বিয়েও করেনি, কিন্তু তারও প্রেয়শী ছিল, দুর্বলতা কোথাও থেকে যাচ্ছে। আমরা সব সময় মনে করি, এই ধরণের জিনিস হতেই পারে। কিন্তু না, কারণ এরা absolute power নন, absolute power হল আত্মা। যাঁর কোন কিছুর অভাব নেই, যিনি আপ্তকাম। যাঁর কোন কামনা নেই, তিনি করুণাবশাৎ করতে পারেন। কিন্তু কার উপর করুণা করবেন? যে আত্মার থেকে আলাদা তাকেই তো করুণা করবেন। কিন্তু আত্মা ছাড়াতো কিছু নেই, কার উপর করুণা করবেন! কিসের করুণা করবেন! সেইজন্য সাংখ্য দর্শন ও যোগ দর্শন আত্মা বা পুরুষের সাথে প্রকৃতির মিলনে যে কথা বলে, স্বামীজী যদিও যোগ নিয়েই কথা বলছেন, তিনিও বলছেন, এটা কখনই সম্ভব না। যিনি সত্যিকারের পূর্ণকাম, তাঁর কিসের জন্য প্রকৃতিকে লাগবে! সেইজন্য পুরুষ বা আত্মা বা ব্রহ্ম কোন জিনিসের কারণ হতে পারেন না। কোন পরিস্থিতিতেই তিনি প্রকৃতির সঙ্গ করবেন না।

সেটাই স্বামীজী এখন বলছেন, The Atman cannot be the cause of anything. How can it be? How can the Purusha join itself to Prakriti (nature)? It does not; it is only illusively thought to do so. (*আত্মা কোন কিছুর কারণ হতে পারে না। কিরূপে হবে? পুরুষ প্রকৃতিতে যুক্ত হবে কিরূপে? পুরুষ প্রকৃতপক্ষে কখনও প্রকৃতিতে যুক্ত হন না, অবিবেকের দরুন বোধ হয় – পুরুষ প্রকৃতিতে যুক্ত হয়েছে।*) এই যুগে ঠাকুর, মা, স্বামীজীর আগমন হয়েছে, তাঁরা অনেক কথা বললেন; সেই কথাগুলো বই-আকারে ছাপাও হয়ে গেল। এমন যুগে এলেন, ফটোগ্রাফি এসেছে, ছবিও তোলা হল, তাঁদের ফটোগ্রাফিও পাওয়া যাচ্ছে। তাঁদের দৌলতে বেদান্ত আজ ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে। যে জিনিসগুলো ঋষিরা ব্রাহ্মণদেরও জানতে দিতেন না, সেগুলো আজ সবার মুখে মুখে। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, আমরা আগে শ্বেতকেতুর আলোচনা করছিলাম, সেই শ্বেতকেতু প্রচুর তপস্যাদি করার পর রাজার কাছে হাজির হয়ে বলছেন, আমি জ্ঞানী। রাজাও শ্বেতকেতুকে পাঁচটা প্রশ্ন করেছেন। শ্বেতকেতু কোন উত্তর দিতে পারলেন না। ফিরে এসে বাবার কাছে পাঁচটা প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইলেন। বাবা বললেন, আমিও এই পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর জানি না। বাবা আর ছেলে দুজনে মিলে এবার রাজার কাছে গেছেন। রাজা পরিষ্কার বলে দিলেন, এই বিদ্যা কোন দিন ব্রাহ্মণদের কাছে ছিল না। রাজা আসলে বলতে চাইছেন, এটা হল ব্রহ্মবিদ্যা, এই বিদ্যা পুরো আলাদা জিনিস। বেদের ভাল পুরোহিত হওয়া, বেদের যজ্ঞের সব কিছু জানা, বেদ মুখস্থ রাখা, এগুলোর সাথে বেদান্তের অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যার কোন সম্পর্ক নেই। বেদ পুরো মুখস্থ থাকতে পারে, বেদের সব কিছুর সুন্দর ব্যাখা করে দিতে পারে, তাই বলে সে বেদান্ত জেনে যাবে, তা হবে না, বেদান্ত পুরো আলাদা জিনিস। তাহলে কি এই বিদ্যা ব্রাহ্মণদের কাছে নেই? ব্রাহ্মণদের কাছে অবশ্যই ছিল, নচিকেতা ব্রাহ্মণ ছিলেন। ব্রহ্মবিদ্যা কার কাছে থাকবে, কার কাছে নেই, এটা বলা অসম্ভব। শ্রীকৃষ্ণ জাতে গোয়ালা, খুব বেশি হলে ক্ষত্রিয় হবেন, তাঁর

কাছে ব্রহ্মবিদ্যা আছে। কিন্তু তখনকার দিনের ব্রাহ্মণরা, যাঁরা কৃষ্ণের আশেপাশে থাকতেন, তাঁদের ছিল না। ব্রহ্মবিদ্যা পুরো জিনিসটাই আলাদা।

স্বামীজী এসে বললেন, ব্রহ্মবিদ্যাকে পর্বতের গুহা ও বন থেকে শহরে নিয়ে আসতে হবে, এবং তিনি নামিয়ে দেখিয়ে দিলেন। তাঁরই নামাঙ্কিত বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন গৃহবধূরাও কঠোপনিষদ, কেনোপষিদ অধ্যয়ন করছেন। তাই বলে কি সবাই বেদান্ত বুঝে নিতে পারবে? সন্ন্যাসীরাই ঠিক মত বুঝতে পারেন না। বেদান্ত পড়ার জন্য মস্তিষ্কের গঠনটাই আলাদা রকমের হতে হয়। ব্রেনের স্ট্রাকচারটা আলাদ করা যায়, কিন্তু সমস্যা হল, আমরা আলাদা করব না, আলাদা করার জন্য যে খাটনি দরকার, সেই খাটনি আমরা খাটব না। আমরা জানি, আমি আছি, ঠাকুর আছেন, ঠাকুর আমাদের কৃপা করবেন। তার মানে আমাদের কাছে ঠাকুর একটা আলাদা বস্তু , আমি একটা আলাদা বস্তু। একটা গরুও জানে যে, আমি আলাদা আর ঘাস আলাদা। গরুকে না হয় বাদ দিলাম, একটা এ্যমিবা যে, সেও জানে, এটা আমার খাদ্য, আর আমি এর থেকে আলাদা। তাহলে এই দ্বৈত বোধ, ঠাকুর আলাদা, আমি আলাদা, এই একটা খুব মামুলি সত্যকে জানার জন্য পাঁচ হাজার বছর ধরে ব্রাহ্মণরা বেদ মুখস্ত করে আসছেন? যেটা সবাই সব সময় দেখছি, খাওয়ার সময় আমি আলাদা আর আমার খাবার আলাদা, দ্বৈতটাই স্বাভাবিক জিনিস, আমি তুমি আলাদা এটা সবাই জানে, আর এটাকে জানার জন্য আমাকে কেন এত জপ ধ্যান করতে হবে! দ্বৈতই যদি সত্য হয়, তাহলে এতো কাঠখড় পোড়ানোর কি দরকার! এই দ্বৈত বোধটাই যখন আরেকটু দর্শনের দিকে চলে যায় তখন বলে পুরুষ আছে প্রকৃতি আছে, জড় আছে, চৈতন্য আছে। এটাকে জানার জন্য আমাদের আলাদা করে দর্শন কেন পড়তে হবে?

বেদান্ত বলছে, পুরুষ প্রকৃতির মিলন হতেই পারে না। যিনি আপ্তকাম, তাঁর মধ্যে কোথা থেকে স্পৃহা আসবে, কেন তিনি প্রকৃতির কাছে আসতে ইচ্ছা করবেন! সাংখ্যের পুরুষ, যাঁকে সাংখ্যে চৈতন্য মনে করা হয়, আমরা যাঁকে আত্মা বলছি, এই কথা দিয়ে আমরা অজান্তায় আত্মাকে সীমিত করে দিচ্ছি। সাংখ্য বলছে প্রকৃতি কেন? ভোগ আর অপবর্গের জন্য। আমরা সবাই এই সংসারে আছি ভোগের জন্য, নূতন নূতন অনুভূতির ভিতর দিয়ে যাচ্ছি, আর এসবের থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য, অপবর্গ। যিনি সচ্চিদানন্দ তাঁর আবার ভোগের অনুভূতি পাওয়ার কি দরকার, তিনি তো তাঁর ইচ্ছাতেই সব ভোগ করে নিতে পারেন। তার জন্য তিনি খাটতে যাবেন কেন! যখনই কোন কাজ হয়, ওই কাজ হওয়ার আগে কত রকমের জিনিস থাকে, প্রথমে একটা ইচ্ছা হবে, তার জন্য কত রকমের প্ল্যান হবে, তারপর জিনিসপত্রের সংগ্রহ করতে হবে। ভগবানও কি এই রকম? বাইবেলে বলছেন, ভগবান বললেন, Let there be light, there was light। ভগবান বলবেন সৃষ্টি হোক, বলাও যা সৃষ্টি হওয়াও তাই। যাঁর এই রকম ক্ষমতা, তাঁকে কিনা প্রকৃতির সাহায্য নিয়ে চলতে হবে! স্বামীজী বলছেন এই রকম হয় না। এই যে সাংখ্য বা যোগ বলছেন, পুরুষ প্রকৃতির কাছে আসছে, সেখান থেকে এই সৃষ্টি চলতে শুরু করল; সংসার মানে চিজ্জড়গ্রন্থি, চৈতন্য আর জড়ের গ্রন্থি। যারা সাধারণ বুদ্ধির, যারা আমি তুমি বোধের বাইরে যেতে পারে না, যাদের কাছে সংসার জীবন, বিবাহিত জীবন শ্রেষ্ঠ জীবন তাদের জন্য পুরুষ প্রকৃতির মিলন ঠিক আছে, কারণ তাদের পক্ষে বোঝা সহজ। কিন্তু ঠেলতে শুরু করলে, পেঁয়াজের খোসা ছাড়াতে শুরু করলে, শেষে আর কিছু থাকবে না। স্বামীজী এটাই বলছেন, আসলে কোথাও কোন সংযোগ হয় না। কপিল মুনি আমাদের সব দর্শনের পিতা, তিনি সাংখ্য দর্শন দিয়েছেন, সব ঠিক আছে। কিন্তু যখন loose system থাকে তখন ওটাকে দাঁড় করিয়ে রাখা যায়।

যাঁরা এখানে গীতার কোর্স করেছেন, তাঁদের যদি গীতার কোন শ্লোকের ব্যাখ্যা করতে দেওয়া হয়, সংস্কৃতের বাংলা মানেটা একটু দেখে নিলে আধ ঘন্টা ব্যাখ্যা করে দিতে পারবেন। কিন্তু যদি বলা হয় গীতার এই শ্লোকে এক রকম বলছেন, তার কয়েকটা শ্লোকের পরে সেই আগের শ্লোকের বিরোধী কথা বলছেন, এটাকে একটু মেলান তো। তখন আর তাঁরা মেলাতে পারবেন না। যেমন একটা শ্লোকে বলছেন, আত্মার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই কিন্তু তার কয়েকটা শ্লোক পরেই বলছেন, *জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ*, যে মরেছে সে জন্মাবে, যে জন্মাচ্ছে সে মরবে, দুটোকে মেলান তো। মেলাতে পারবে না, এটাই সমস্যা। যুক্তিবাদীরা খুব সুন্দর সুন্দর ফিলজফি দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে, কোন সন্দেহই নেই। এবার যুক্তিবাদীদের যদি জিজ্ঞেস করা হয়, তাহলে ভগবান বুদ্ধ কি চালবাজ, ঠগবাজ ছিলেন। তখন উঁ আঁ করতে শুরু করবে। আচ্ছা

প্রফেট মহম্মদ কি ফ্রড ছিলেন? গলাকাটার ভয়ে সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে যাবে। আর এত মহাপুরুষদের একই রকম অনুভূতি হচ্ছে এগুলো কি? সবটাকেই মেলাতে হবে। সাধু সন্ন্যাসীরা ঢপবাজ হয়, মানলাম, ফ্রড হয়, মানলাম। সবাই কি ঢপবাজ? যখন সব কিছুকে মেলাতে যাওয়া হবে তখন কাঁকড়া আর ব্যাঙকে দাড়িপাল্লায় মাপার মত অবস্থা হবে, দাড়িপাল্লায় একটা ব্যাঙ রাখতে না রাখতে আরেকটা ব্যাঙ লাফিয়ে বেরিয়ে যাবে। চারটে তর্ক নিয়ে আসবে, পঞ্চম তর্কটা লাফিয়ে বেরিয়ে যাবে। আচার্য শঙ্কর, স্বামীজী এনাদের বিশেষত্ব এটাই, সব কটা ব্যাঙকে ধরে একটা জায়গায় নিয়ে আসছেন, এমন পাত্রতে রেখে দিচ্ছেন আর কোন ব্যাঙ পালাতে পারছে না। তখন এই বোধটাই হয়ে যায়, পুরুষ প্রকৃতিকে দেখে মনে হচ্ছে যেন মিলন হচ্ছে, আসলে কখনই মিলন হয় না। আর এটাই অদ্বৈত। স্বামীজী সেইজন্য বলছেন, সাংখ্য বেদান্ত থেকে মাত্র একটা ধাপ পিছনে থেকে যায়। সাংখ্য একটা ধাপ গেলেই বেদান্ত হয়ে যাবে। তাহলে আবার সাংখ্য দর্শন আর থাকবে না। কিন্তু সাংখ্য দর্শনেরও দরকার আছে, কারণ মানুষ সব আলাদা আলাদা দেখছে এটা জড়, এটা চৈতন্য, এই দেখাটাকে নিয়ে দর্শন চলছে।

স্বামীজী বিশেষ করে খ্রীশ্চানদের কাছে এই কথাগুলো বলছেন, খ্রীশ্চানদের কাছে, চৈতন্য, জড়, সংসার, ঈশ্বর এগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেইজন্য স্বামীজী ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছেন সাংখ্যরা কিভাবে বলছেন, কিন্তু আসলে জিনিসটা এভাবে হয় না। ওখানে সিদ্ধান্তটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, যদি জড় ও চৈতন্যের মিলন না হয়, পুরুষ আর প্রকৃতির মিলন না হয়ে থাকে, তাহলে আমরা সংসারে যে অনেক কিছু করতে চাইছি, এত কিছু করার কতটা প্রয়োজনীয়তা আছে? আমি বিরাট বড় কিছু হতে চাইছি, আমি চারজন লোকের ভাল করতে চাইছি, আমরা খারাপ জিনিসে যাচ্ছি না, ভাল জিনিসেই থাকছি, কিন্তু এর কোন দাম নেই। আমি যদি সেই নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা হয়ে থাকি, তাহলে প্রকৃতি থাকুক আর নাই থাকুক, আমার তার সাথে কখন মিলন হতে পারে না। যদি মিলন নাই হতে পারে, তাহলে আমি যে মনে করছি, আমি বিরাট কিছু হতে চাইছি, চারজনের ভাল করতে চাইছি, তখন আমার তাহলে কি হবে?

জগতে কেউ তোমার করুণার পাত্র নয়

স্বামীজী তখন বলছেন, Learn to help without pitying or feeling that there is any misery. Learn to be the same to enemy and to friend; then when you can do that and no longer have any desire, the goal is attained. (*লোককে করুণার চক্ষে না দেখে, অথবা তারা অতি হীন দশায় পড়ে আছে –এ-রকম মনে না করে অপরকে সাহায্য করতে শিক্ষা কর। শত্রু-মিত্র উভয়ের প্রতি সমদৃষ্টি হতে শিক্ষা কর; যখন তা হতে পারবে, আর যখন তোমার কোন বাসনা থাকবে না, তখন তোমার চরমাবস্থা লাভ হয়েছে –বুঝতে হবে।*) আমার যে অস্তিত্ব, আমার যে জীবন, এই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হল নিজের স্বরূপকে জানা বা আমি আত্মা বা আমি ঈশ্বরের সন্তান, এটাকে জানা; এছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। কি করে জানব যে আমি সেই আত্মা? মনের মধ্যে যত অশুদ্ধিগুলি আছে, সব অশুদ্ধিকে পরিষ্কার করে। অশুদ্ধি কি? Exclusiveness, আমি ও আমার, এটাই অশুদ্ধি, এটাই মায়া। Inclusiveness, সবাই আমার আপন, সবাই আমারই এক একটি রূপ, এই বোধকে নিয়ে চলা, এটাই পবিত্রতা, এটাই সাধনা। জপধ্যান যেমন আধ্যাত্মিক পথে এগোতে সাহায্য করে, ঠিক তেমনি অপরের প্রতি সেবা ভাবও এগোতে সাহায্য করে। জপধ্যানের দ্বারাও মানুষ অন্তর থেকে inclusive হয়ে যায়, অপরকে সেবা করেও মানুষ ধীরে ধীরে inclusive হয়ে যায়। কিন্তু অপরকে সেবা করার সময় এই মনোভাব যেন কখনই না থাকে –আমি তাকে দয়া করছি, আমি তাকে করুণা করছি, আমি তাকে কৃপা করছি। আমিও সিদ্ধির পথে চলেছি, তুমিও সিদ্ধির পথে চলেছ। আমি কিছু দুর্বলতাকে জয় করতে পেরেছি, তুমি এখনও কিছু দুর্বলতা জয় করতে পারোনি। আমি তাই তোমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি, যাতে তুমিও সব দুর্বলতাকে কাটিয়ে উঠতে পারো, এবার তুমিও এগিয়ে যেতে থাকবে, আমিও এগোতে থাকব।

গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী যেতে অনেক হাঁটতে হয়, আর পথ খুব দুর্গম। আমিও হাঁটছি, আরও অনেক হাঁটছে। হঠাৎ একজন পাশের তীর্থযাত্রী স্লিপ করে পড়ে গেল। আমি কি তার দিকে হাত বাড়িয়ে দেবো না? যদি না এগিয়ে দিই, তাহলে আমার মত লোকের কখন গঙ্গোত্রী যমুনোত্রীর মত তীর্থে যাওয়াই উচিৎ নয়।

তীর্থে যারা যায়, তারা অন্য তীর্থযাত্রীর প্রতি এই ভাব নিয়েই যায়। ধর্মপথ যিনি নিয়ে নিয়েছেন, তাঁরা হলেন, আগেকার দিনে ঠিক ঠিক তীর্থযাত্রীরা যেমন হতেন, শ্রদ্ধা, ভক্তিতে ভরপুর, যে কোন আধ্যাত্মিক পথের মানুষ ঠিক সেইভাবে এগোয়। এখানে কেউ কাউকে কৃপা বা করুণা করছে না, আগামীকাল সে যখন পড়বে তাকেও আরেকজন সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে। কিন্তু আমরা মনে করছি এই সংসার ঈশ্বরের সৃষ্টি, এখানে আমরা সবাই আলাদা, তুমি আলাদা, সে আলাদা। তুমি বড়লোক, আমি সাধারণ একজন, তোমার পতনে আমার তাই কি আনন্দ। আর ওই যে কাঙালী, সে তার কর্মের দোষে আজ কাঙালী হয়ে আছে, ভালই হল, কর্মগুলি তার ক্ষয় হচ্ছে। এই মানসিকতা নিয়ে যদি তুমি চলো, তোমার জীবনের পুরো দর্শনটাই ভুল, তাই তোমার এত সমস্যা। তাহলে কি করতে হবে? তুমি জেনে রাখো, তুমি যে পথে যাচ্ছ, সেও সেই পথে এগোচ্ছে। তুমি অনেক কিছু থেকে মুক্ত হয়ে গেছে, সে এখনও মুক্ত হতে পারেনি, তার দিকে তোমার সাহায্যের হাতটা বাড়িয়ে দাও। যার অর্থের দরকার, তাকে তোমার সামর্থ অনুসারে অর্থ দাও, যার শিক্ষার দরকার তাকে শিক্ষা দাও, যার ধর্মের দরকার তাকে ধর্ম দাও। তুমি তোমার নিজের মত এগিয়ে যাও, এগুলোর সাথে তোমার কোন সম্পর্ক নেই, তোমার চলার পথে এগুলো বাইপ্রোডাক্ট। কারণ, তীর্থে গিয়ে তীর্থ দর্শন করাটাই উদ্দেশ্য, কাঙালী, ভিখারীদের খাওয়ানো নয়। মনুস্মৃতিতে মনু বলছেন, যে দান দিচ্ছে সেও নিজেকে ধন্য মনে করবে, যে নিচ্ছে সেও ধন্য মনে করবে। তুমি আমাকে তোমার দান গ্রহণের পাত্র মনে করেছ বলে আমি ধন্য, যে দান দিচ্ছে, তার মনের ভাব হবে, আহা, তুমি আমার দান গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছ, আমি তাই কৃতার্থ। সবাই দান নেবেন না, অনেক সন্ন্যাসী আছেন, যাঁরা অপরের দেওয়া কিছু স্পর্শই করবেন না।

কখন কখন সম্মানের জন্য দান করা হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে রৈক্ক মুনির কাহিনী আছে, রৈক্ক মুনি ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন। দুটো পাখি নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, যত পূণ্য সব রৈক্কের কাছে চলে যাচ্ছে। এটা একটা ধারণা। সেই দেশের রাজা এলেন, দেখছেন গরুগাড়ির ছায়াতে রৈক্ক মুনি বসে আছেন। উনি রাজা ও রাজার লোকেদের কোন গ্রাহ্যই করলেন না। রাজা ফিরে গেলেন, এবার নিজের সুন্দরী মেয়ে রাজকন্যাকে নিয়ে এলেন। রাজা রৈক্ক মুনিকে হাতজোড় করে বললেন, এই আমার মেয়ে, আপনার সেবার জন্য ওকে আপনাকে দিতে চাইছি। রৈক্ক মুনি একটু তাকালেন মাত্র। তার মানে, আপনি যদি আমার এই দান গ্রহণ করেন আমি ধন্য হব। রৈক্ক মুনি রাজী হলেন। এবার রাজা আত্মজ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন করার সাহস পেলেন। এই যে দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপার, আমাদের সমস্যা হল, আমরা সব সময় মনে করছি আমি তাকে দয়া করলাম। গরীব লোককে দুটো টাকা দিয়ে মনে করছি, আমি ওকে কৃতার্থ করলাম। যেটাই করি না কেন, হয় আমাকে ঈশ্বরের পূজা রূপে করতে হবে, আর তা নাহলে, ভাই আমরা একই পথের পথিক; আমি তোমার হাত ধরলাম, অন্য কেউ আমার হাত ধরবে, আগে আগে অনেকেই আমার হাত ধরেছে।

স্বামীজী এই ভাবকে অবলম্বন করে বিদেশে, বিশেষ করে আমেরিকানদের উদ্দেশ্যে অনেক কথা বলতেন। খ্রীশ্চানদের মধ্যে চ্যারিটি জিনিসটা ভাল ভাবে আছে। চ্যারিটি শব্দটা কখনই ভাল শব্দ নয়, যেখানে একজন শ্রেষ্ঠ আরেকজন যে নীচে, তাকে দান করা হচ্ছে। বিভিন্ন সার্বজনীন পূজাতে যে দান করা হয়, বস্ত্র বিতরণ, কম্বল বিতরণ হয়, এগুলো ভাল, কিছু না করার থেকে ভাল। আমাদের মনে রাখতে হবে স্বামীজী এই কথা বলছেন থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে কয়েকজন বাছাই করা শিষ্যদের কাছে। তুমি যদি ঠিক ঠিক ধর্মপথে চলে থাক, তুমি যদি ঈশ্বর-পথের পথিক হও, তাহলে যখন কাউকে দান করবে তখন তোমার মনে এই বোধটা যেন কক্ষণ না হয় যে, তুমি তাকে দয়া করছ। আর এখানে শত্রু মিত্রের কোন তফাৎ থাকবে না। আগে যে উদাহরণ দেওয়া হল, যমুনোত্রীতে যাচ্ছে, একজন পড়ে গেছে, তাকে আমি হয়ত চিনি না, আমার একজন নিন্দুক পড়ে গেছে, তাকে তুলে নেব। যদি তাকে না তুলি, তাহলে আমি আর যাই হয়ে থাকি না কেন, তীর্থযাত্রী নই। কলকাতায় যদি পড়ে যায়, তখন আমার বেশ আনন্দ হবে, সারা পাড়া বলে বেড়াব, ব্যাটা জব্দ হয়েছে, তার মানে আমি তীর্থযাত্রী নই, সাধারণ মানুষ। যদি ধর্মপথে এগিয়ে যাই, তখন আমি আর সাধারণ মানুষ নই। ধর্মপথে এর পরের ধাপ হল, নিজের কামনা-বাসনার উচ্ছেদ করা।

স্বামীজী ধীরে ধীরে inclusiveness জিনিসটাকে দেখিয়ে দিচ্ছেন। প্রথমে তুমি বোঝ, তুমি শুদ্ধ আত্মা, এই জগতের সাথে তোমার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু জগতে যতক্ষণ তোমাকে থাকতে হচ্ছে, ততক্ষণ

কিছু কিছু জিনিস তোমাকে অবশ্যই করতে হবে, যাতে তোমার বোধ ধীরে ধীরে জগৎ থেকে ঘুরে শুদ্ধ আত্মার দিকে চলে আসে।

সংসারবৃক্ষের ছেদন

স্বামীজী গীতার পঞ্চদশোধ্যায়ের প্রথম শ্লোক দিয়ে শুরু করছেন। *উর্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্*, শ্লোকের মূল বক্তব্যই হল, এই সৃষ্টি ঈশ্বর থেকেই এসেছে, সৃষ্টি সব মূল বা শিকড় ঈশ্বরের মধ্যেই প্রথিত। মহারাষ্ট্রের সন্ত জ্ঞানেশ্বর মারাঠীতে জ্ঞানেশ্বরী নাম দিয়ে গীতার উপর একটা সুন্দর ভাষ্য রচনা করেছেন। পঞ্চদশোধ্যায়ের প্রথম শ্লোকের যতগুলো বর্ণনা আছে তার মধ্যে জ্ঞানেশ্বরী ভাষ্য সব থেকে কাব্যিক। জ্ঞানেশ্বরী গীতার ভাষ্য ঠিকই, কিন্তু পুরো নূতন ধরণের। আচার্য শঙ্কর বড় দার্শনিক ছিলেন, তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন, উপলব্ধিবান ছিলেন, তার সাথে তিনি একজন বড় কবি ছিলেন। তিনি দর্শনের তত্ত্বগুলিকে প্রখর যুক্তি দিয়ে নিজস্ব ভাষায় লিখছেন ঠিকই, কিন্তু পুরোটাই ছন্দে ছন্দে আলোড়িত। স্বামীজীও নিজস্ব আঙ্গিকে *অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা*, এটাকে বলছেন, Cut down the banyan tree of desire with the axe of non-attachment, and it will vanish utterly. It is all illusion. (*বাসনারূপ অশ্বত্থ বৃক্ষকে অনাসক্তিরূপ কুঠার দ্বারা কেটে ফেল, তা হলেই তা একেবারে চলে যাবে – ও তো একটা ভ্রমমাত্র।*) গীতা একাধারে ধর্মশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র আবার মাঝে মাঝে খুবই উচ্চমানের কাব্যিকতাকে তুলে আনছে। পঞ্চদশোধ্যায়ের প্রথম শ্লোক পুরোপুরি গীতার না, এটা কঠোপনিষদ থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। সংসারকে একটা বৃক্ষের সাথে তুলনা করার এই ভাবটা কঠোপনিষদের। আর তার সাথে বলছেন, অসঙ্গ, অর্থাৎ detachment, যার উপর আগে আগে আমরা অনেক আলোচনা করেছি। যেটাতে প্রকৃতির ভাব আছে, যে জায়গাটাকে প্রকৃতির এলাকা বলে মনে হচ্ছে, যেটাকেই মনে হবে এটাকে মন দিয়ে ধরা যাচ্ছে, ওখান থেকে বেরিয়ে আসাটাই detachment। কোন কিছু থেকে সরে আসা, এরও অর্থ detachment, কিন্তু স্থূল স্তরের অর্থে। ঠিক ঠিক অর্থ হল, মনের এলাকা বলতে যা কিছু আছে, মনের এলাকা মানে, যে যে জিনিসকে আমি মন দিয়ে ধরতে পারছি, সেটাকে ছেড়ে দেওয়া। ঠাকুরের ধ্যান করছি, মন দিয়ে ঠাকুরকে ধরছি, মন দিয়েই ঠাকুরের জপ করছি, শেষ অবস্থায় এর সবটাকেই ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হবে। কারণ ঠাকুরের ধ্যানও মনের এলাকা, ঠাকুরের জপও মনের এলাকা। ঠাকুর একদিকে হিন্দু পরিবারে, আবার ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম নিলেন, সংস্কার অনুযায়ী তাঁরও ইচ্ছা হল পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে জল দিয়ে তর্পণ করবেন। গঙ্গায় নেমে হাতে জল নিয়ে তর্পণ করতে যাচ্ছেন, আঙুলের ফাঁক দিয়ে সব জল পড়ে যাচ্ছে। তর্পণ আর করতেই পারছেন না, ঠাকুর চোখের জল ফেলছেন। এটাই গলিতহস্ত, যাঁরা আত্মার জ্ঞান পেয়ে গেছেন, তাঁদের মনের এলাকায় কোন রকমে এক আধটুকু কিছু কিছু চলে, সেইজন্য ওনাদের দ্বারা কোন উপাচার হবে না, কোন জপ, মন্ত্রপাঠ, শাস্ত্রপাঠ এগুলো হবে না।

কথামৃতে প্রথমেই আছে, মাস্টারমশাই প্রথম দিন এসে বৃন্দে ঝিকে জিজ্ঞেস করছেন, 'উনি কি অনেক বইটই পড়েন'? বৃন্দে বলছে, 'আর বই পড়া! সবই ওনার মুখে'। উপাচার, পূজা, পাঠ, অধ্যয়ন এগুলো থেকে ওনারা বেরিয়ে গেছেন। তার সাথে যে code of conduct আছে, ভদ্রলোক হলে এভাবে থাকতে হবে, এভাবে আচরণ করতে হবে, এগুলোকেও তাঁরা পেরিয়ে গেছেন। তিনটে 'R' থেকে তাঁরা বেরিয়ে গেছেন – Ritual, Recital and Righteousness। থেকে গেছে শুধু Realisation। যে কোন ধর্মে এই চারটে 'R' থাকে – Ritual, Recital and Righteousness and Realisation। যাঁর Realisation হয়ে যাবে তাঁর বাকি তিনটে 'R' স্বাভাবিক ভাবেই খসে যাবে। ঠাকুরও মাঝে মাঝে বলছেন, এখন আমার রূপটুপ সব উড়ে যাচ্ছে, সত্যিই উড়ে যায়। তাহলে আমাদের কেন জপ করতে, ধ্যান করতে বলা হয়? কারণ, যতক্ষণ এগুলো না করা হবে, ততক্ষণ বুঝতে পারবে না যে, ওগুলোকেও এক সময় ছেড়ে দিতে হবে। এই উপমাটা আমরা অনেক সময় নিয়ে থাকি, এ্যথলেটিকের পোল ভল্টের ইভেন্টে একটা লম্বা ডাণ্ডা সহ দৌড় এসে সেই ডাণ্ডার সাপোর্ট নিয়ে লাফ দেয়। ওই পোল না থাকলে লাফ দেওয়া যাবে না, পোলকে ধরে রাখলে লাফাতে পারবে না। জপ, ধ্যান, তপস্যা সবটাই হল ওই পোল, লম্বা ডাণ্ডা, যেটাকে ধরে লাফ মেরে একটা উঁচু প্রাচীর ডিঙোতে হবে, কিন্তু শেষ অবস্থায় ওই পোলকে না ছাড়লে প্রাচীরটা পেরোতেই পারবে না। বোকারা বলবে, পোলকে যদি ছাড়তেই হবে, ওটাকে ধরার কি প্রয়োজন।

এর আগে আমরা যখন আলোচনা করছিলাম তখন এই টপিকটা এসেছিল, সমস্ত বিদ্যাই অজ্ঞান থেকে এসেছে, জপধ্যানটাও ignoranceএর product। অথচ বিদ্যার্জন আমাদের করতে হবে। আবার অনেকে বলবে, অন্ধকারকে তো অন্ধকার দিয়ে কাটানো যায় না! এখানে অন্ধকারটা উপমার জন্য বলা হচ্ছে। ভাল উপমা হল, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। স্বামীজী বলছেন, 'He from whom blight and delusion have fallen, he who has conquered the evils of association, he alone is azad (free)', (*'যাঁর মোহ ও শোক চলে গেছে, যিনি সঙ্গদোষ জয় করেছেন, তিনিই কেবল আজাদ বা মুক্ত'।*) এটাও স্বামীজী গীতা থেকে বলছেন, যার মন থেকে শোক মোহের সব ভাব কেটে গেছে, কাম-ক্রোধের ভাব চলে গেছে, কারুর প্রতি কোন রকম আসক্তি নেই, কোন অজ্ঞান বোধ নেই, সেই মুক্ত। গীতার পঞ্চদশোধ্যায়ে এই ভাবটাকে নিয়ে বেশি বলা হয়েছে, অবশ্য গীতাই এই ভাবকে নিয়ে বেশী বলেছে।

সবাইকে সমান ভাবে ভালবাসো

সমস্যা হয় ব্যক্তি বিশেষে আসক্তি নিয়ে, সেটাই স্বামীজী এখানে বলছেন, To love anyone personally is bondage. Love all alike, then all desires fall off. (*কোন ব্যক্তিকে বিশেষভাবে –ব্যক্তিগত ভাবে ভালবাসা হচ্ছে বন্ধন। সকলকে সমান ভাবে ভালবাসো, তা হলে সব বাসনা চলে যাবে।*) এই টপিকটা আমরা আগে অনেকবার আলোচনা করেছি। তাই সংক্ষেপে বলা হচ্ছে। ঠাকুর যেমন বলছেন, শুধু নিজের সন্তানকে ভালবাসা মায়া থেকে হয়, সবার সন্তানকে ভালবাসা দয়া থেকে হয়। গ্রাম দেশে কিছু দিন আগে পর্যন্ত যে লাইফস্টাইল ছিল তাতে গ্রামের লোকেদের মধ্যেই স্বাভাবিক দয়ার ভাব থাকত। দয়া বলতে এখানে বাংলা দয়া না, ঠাকুর যে অর্থে দয়া বলছেন, এখানে দয়া মানে inclusiveness। আগেকার দিনে দেখা যেত, কার খেতে ভাল ভুট্টা হয়েছে, সেখান থেকে আমি একটা ভুট্টা তুলে শেঁকে খেয়ে নিলাম, এর জন্য কেউ কিছু মনেও করত না।

কিছু দিন আগে কানাডার এক সর্দারজী পুলিশ অফিসারের একটা খুব সুন্দর লেখা বেরিয়েছিল, যাতে তিনি দেখাচ্ছেন বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের মধ্যে এত ড্রাগ আসক্তি এসে গেছে যে, দিনে দিনে ক্রাইম বেড়েই চলেছে। তিনি আবার এটাকে নিয়ে এক গুরদুয়ারে লেকচার দিয়েছিলেন। ওনার লেকচারের হেডিং হল, আমাদের ধর্মস্থানগুলো ইয়ংদের সেবা করে না, ধর্মস্থানগুলি তাদের জন্য নয়। উনি পুরো স্ট্যাটিস্টিক্স দিয়ে দেখাচ্ছেন, মন্দির হোক, গুরদুয়ারা হোক, মসজিদ হোক, চার্চ হোক সব ধর্মস্থলগুলোর কি দুরবস্থা, যেখানে শুধু বৃদ্ধ বৃদ্ধারাই যায়, যাদের আর কোথাও যাওয়ার নেই। বেলুড় মঠে তাও ইয়ংরা আসে, কারণ পুরো হাওড়াতে বেড়ানোর আর কোন জায়গা নেই। কিন্তু যে কোন মন্দির, মসজিদ বা চার্চের প্রধান কাজই হল, সেখানে এমন এমন লোকজনরা থাকবে, যাঁদের কাছে ইয়ং ছেলেমেয়েরা আসবে, তাঁর সাথে খোলাখুলি কথা বলতে পারবে, কথা বলে অনুপ্রেরণা পাবে, নিজেদের সীমাবদ্ধতা, দুর্বলতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে; আর আগেকার দিনে যৌথ পরিবারগুলিতে যেমন একজন আরেকজনকে দেখত, বন্ধুবান্ধবের পরিধিটাও যেখানে বড় ছিল, সেখানে জীবন এখন এত সঙ্কীর্ণ আর স্বার্থকেন্দ্রিক হয়ে গেছে যে, এখন খেলাধূলা করার জন্যও কোন ক্লাবের মেম্বারশিপ নিতে হয়। সাঁতার কাটবে, মেম্বারশিপ দরকার, নাচগান করবে, মেম্বারশিপ দরকার, মোদ্দা কথা যাই করতে চাও টাকা লাগবে। যেখানে শুধু নিঃশ্বাস প্রশ্বাস কিভাবে নেব শেখানোর জন্য বাবাজীরা কোটি কোটি টাকা আয় করছে, সেখানে বাকি আর থাকবে কি। মানুষ এখন তার বাচ্চাকে কি কি শেখাবে! কিন্তু ধর্মস্থানগুলো যাঁরা পরিচালনা করেন, এটা তাঁদের কাজ।

ভদ্রলোক বলছেন, আফ্রিকান একটা কমিউনিটিতেও কোন শিশুর জন্ম হলে তাকে মানুষ করে গড়ে তোলার জন্য পুরো কমিউনিটি ওই বাচ্চার জন্য লেগে থাকে। একটা বাচ্চাকে বড় করে তোলার জন্য শুধু বাবা-মা আর তার পরিবার দিয়ে হবে না, পুরো গ্রামের দরকার পড়ে। আর এই প্রজন্মে মা চাকুরীরতা, বাবা চাকরী করছে, এরাই তাদের সন্তানকে বড় করছে। আবার বলবে, I treat my son as my friend। আরে ভাই ছেলে ছেলেই হবে, ফ্রেণ্ড হয় না, সান মানে পুত্র, সান মানে ফ্রেণ্ড নয়, তাহলে ডিকশানারি থেকে সান শব্দটা সরিয়ে দিয়ে বলুন ফ্রেণ্ড। Son is my friend, যদি জিজ্ঞেস করে, তুমি কোথায় ছিলে? I was

with my friend। এবার কেউ বুঝতেই পারবে না, সে তার বাবার সাথে ছিল, নাকি মায়ের সাথে ছিল, নাকি ছেলের সাথে ছিল, নাকি বরের সাথে ছিল, নাকি সত্যিকারের কোন বয়ফ্রেণ্ডের সাথে ছিল; কিছুই জানা যাবে না। এভাবে কোন সন্তানই জীবনে বড় হতে পারবে না। স্বামীজী এখানে to love anyone personallyর কথা বলছেন, anyoneএর কথা দূরে থাক, বর্তমান যুগে নিজেকে ছাড়া কেউ কাউকে ভালবাসে না। সেইজন্য স্বামীজী বলছেন, Love all alike, then all desires fall off। আজকের যুগে যেখানে আজকে বিয়ে করছে, কাল ডিভোর্স করছে, কেউ তিনটে করে বিয়ে করছে, এরা এই বাক্যের অর্থ বুঝবে! বোঝার ক্ষমতা আছে! অবাক লাগে, একশ বছর আগে স্বামীজী এই ঋষি বাক্যগুলি বলে গেছেন, আর একশ বছরের মধ্যেই সমাজের আজ এই দুরবস্থা।

কালের গ্রাস থেকে কেউ বাঁচবে না

Time, the 'eater of everything', comes and all has to go. Why try to improve the earth, to paint the butterful? (*সর্বভক্ষক কাল এলে সকলকেই যেতে হবে; অতএব পৃথিবীর উন্নতির জন্য –ক্ষণস্থায়ী প্রজাপতিকে রঙচঙে করবার জন্য কেন চেষ্টা করছ?*) স্বামীজী প্রকৃতি ও পুরুষকে নিয়েই চলেছেন। এখানে কালের কথা বলছেন, কালও প্রকৃতির অন্তর্গত, যখন চলে তখন সে কাউকেই রেহাই দেয় না। জগতের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করাটা একটা ভাল ছবি আঁকার মত। কিন্তু কিসের আমরা ভাল করার চেষ্টা করছি, কাকে ভাল করার চেষ্টা করছি? ভাল থাকুক, মন্দ থাকুক, কাল একদিন এসে সবাইকে গ্রাস করে নেবে, কালের হাত থেকে কারুর পরিত্রাণ নেই। It all has to go at last, সবই তো শেষে একদিন চলে যাবে, কিছুই এই জগতে চিরস্থায়ী হতে থাকবে না। এই কথাগুলো শুনলে মনে হবে নৈরাশ্যজনক, কিন্তু এটাই কঠোর ভাবে সত্য।

সেইজন্য স্বামীজী বলছেন, Do not be mere white mice in ta treadmill, working always and never accomplishing anything. (*সাদা ইঁদুরের মতো খাঁচায় বসে কেবল ডিগবাজি খেও না; সদাই ব্যস্ত, অথচ প্রকৃত কাজ কিছুই হচ্ছে না।*) স্বামীজী নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছেন। ছোটবেলায় স্বামীজী শখ করে কিছু সাদা ইঁদুর রেখেছিলেন। ইঁদুরগুলিকে একটা চাকাওয়ালা রডের মধ্যে রেখে দিয়েছেন, ইঁদুরগুলো ওর মধ্যেই সারাদিন ঘুরছে, ওর মধ্যেই ঘুরে যাচ্ছে এক চুলও এগোচ্ছে না। বর্তমান কালে যে treadmill গুলি হয়েছে, ওর মধ্যেই সবাই দৌড়াচ্ছে। সবাই জিমে গিয়ে ওর মধ্যে দৌড়াচ্ছে, কি দরকার জিমে যাওয়ার। নিজের বাড়ির ঘরের মেঝে রোজ ন্যাতা দিয়ে মুছলেই তো হয়, তা করবে না, জিমে গিয়ে দৌড়াচ্ছে। আর treadmillএ দৌড়াতে হবে কেন, রাস্তায় দৌড়াও না! রোজ বাড়িতে বাসন মাজুক, গ্রাইণ্ডার ছেড়ে শিলনোড়ায় মশলা বাটুক, ওয়াশিং মেশিন ফেলে হাত দিয়ে কাপড় কাচুক, দু দিনে শরীরের সব সমস্যা দূর হয়ে যাবে। যখনই শরীর খারাপ হচ্ছে, মারাত্মক শারীরিক কোন সমস্যা যদি না থাকে, তাহলে বাড়ির কাজকর্ম করলে, ঘরদোর মোছামুছি করলে, নিজের হাতে কাপড় কাচলে, বাসন মাজলে পা থেকে শুরু করে, পেট থেকে শুরু করে কোমড়, মাথা পর্যন্ত যত শারীরিক সমস্যা হচ্ছে সব সেরে যাবে। তাতে পয়সাও বাঁচবে, আর সেই পয়সা ব্যাঙ্কে না রেখে একটু দান করতে পারি, তীর্থে ঘুরে আসতে পারি। কিন্তু আমরা কিছুই করব না, কিন্তু ওই কাজই করব যে কাজের ফল জিরো।

কিন্তু স্বামীজী এখানে তাঁদের উদ্দেশ্য করেই এই কথা বলছেন, যাঁরা সত্যিই অপরের মঙ্গল করাটা জীবনের উদ্দেশ্য করে নিয়েছে। স্বামীজী তাঁদেরকে বলছেন, ওটাকে উদ্দেশ্য করতে যেও না। অপরের মঙ্গল করতে কেউ নিষেধ করছে না, বাইপ্রোডাক্ট রূপে অবশ্যই ঠিক আছে, কিন্তু জীবনের উদ্দেশ্য কখনই অপরের মঙ্গল করা না। তোমার একমাত্র উদ্দেশ্য হল কিভাবে নিজের মুক্তি পাওয়া যায় তার চেষ্টা করতে হবে। তার আগে তুমি ভাল করে জেনে নাও, আত্মাই সত্য, প্রকৃতিটা মিথ্যা, মন মিথ্যা। কিন্তু এই মনের সাহায্য নিয়েই তোমাকে মনের এলাকার বাইরে যেতে হবে, ব্যস্! এই এতটুকু। সামনে যেটা এসে গেলো, সেটাকে ভাল করে করে দাও, কিন্তু পা এগিয়ে এগিয়ে ভাল করতে যেও না। বলে, কাঙালী ভোজন করাতে হবে, গরীবকে দান

করতে হবে। অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যাণ্ডে গিয়ে যদি হিন্দু বলে, আজ আমার বাবার মৃত্যু বাৎসরিক পাঁচটা কাঙালীকে আমার ভোজন করাতে হবে। ওসব জায়গায় কোথায় গরীব কাঙালী পাবে! এগুলো থেকে বেরিয়ে এসো, আগে জানো যে তোমার একমাত্র উদ্দেশ্য আত্মজ্ঞান। বাকি সব কিছুই তোমাকে করতে হবে, তোমাকে তোমার কাজকর্ম করতে হবে আর তোমার প্রত্যেকটি কাজকর্ম প্রোডাক্টিভ হতে হবে। কোন কিছুই passive হবে না, এমনকি বিনোদন, আমোদ-আহ্লাদ, সেটাও passive হওয়া চলবে না।

বাসনা মাত্রই মনের বৃত্তি

স্বামীজী বলছেন, Every desire is fraught with evil, whether the desire itself be good or evil. (*বাসনা ভালই হোক আর মন্দই হোক, বাসনা জিনিসটাই খারাপ।*) অনেকবারই আমরা এটাকে নিয়ে আলোচনা করেছি, মন্দ হোক, ভাল হোক, বাসনা জিনিসটাই খারাপ। অপরকে ভাল করার ইচ্ছাটাও বন্ধন। উদ্দেশ্য হল আমাদের মনের পিছনে যে চৈতন্য সত্তা বা পুরুষ আছেন তাঁর সাক্ষাৎ করতে হবে। কিন্তু মন আমাদের সব সময়ই চঞ্চল, মন ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মত হয়ে আছে। মনের সমস্ত বৃত্তিকে শান্ত করতে হবে। অপরের ভাল করতে হবে, এটাও একটা বৃত্তি, এই বৃত্তিকেও থামিয়ে দিতে হবে। আমি ভাল হব, এটাও একটা বৃত্তি; আমি ধর্মপ্রাণ হব, এটাও একটা বৃত্তি; আমাকে পূণ্য সঞ্চয় করতে হবে, এটাও একটা বৃত্তি। যেহেতু আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে এগুলোও মনের বৃত্তি, আর যেহেতু মনে কোন বৃত্তি বা চাঞ্চল্য থাকলে স্বরূপ জ্ঞান কখনই হতে পারবে না, সেইহেতু, সব বৃত্তিকে শান্ত করতে হবে। প্রথমে যে অশুভ বৃত্তিগুলি, নোংরা বৃত্তিগুলি মনের মধ্যে উঠছে, যে বৃত্তিগুলি প্রচণ্ড জোরাল হয়, সেগুলোকে শান্ত করতে হয়। তার মানে তমোগুণ ও রজোগুণ থেকে উঠে সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। তারপর ধীরে ধীরে সত্ত্বগুণের বৃত্তিগুলিকেও শান্ত করতে হয়। স্বরূপের জ্ঞান হয়ে যাওয়ার পর যা খুশি করুক না কেন, তাতে আর কিছু আসবে যাবে না। জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত সংসারের কোন কিছুতে যাওয়া যাবে না।

It is like a dog jumping for a piece of meat which is ever receding from his reach, and dying a dog's death at last. Do not be like that. Cut off all desire. (*এ যেন কুকুরের মতো মাংসখণ্ড পাবার জন্য দিনরাত লাফানো, অথচ মাংসের টুকরোটা ক্রমাগত সামনে থেকে সরে যাচ্ছে, আর শেষ পর্যন্ত কুকুরের মত মৃত্যু। ও-রকম হয়ো না। সমস্ত বাসনা নষ্ট করে ফেলো।*) কুকুরের সামনে দড়িতে এক টুকরো মাংস ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, কুকুর সারাদিন লাফিয়েই যাচ্ছে, কিন্তু মাংসের নাগাল পায় না। বাসনা মানেই তাই, কুকুরের মতো মাংসখণ্ড পাওয়ার আশায় দিনরাত লাফানো, অথচ মাংসের টুকরোটা ক্রমাগত সামনে থেকে পিছিয়েই যাচ্ছে, নাগাল আর পায় না, শেষে কুকুরের মত মৃত্যুকে প্রাপ্ত করে। মায়াকেও ছাড়তে পারছে না, আর বাসনাও মিটছে না। স্বামীজী কত কঠোর কথা বলছেন, আর বলছেন তাঁর বাছাই করা বারোজন শিষ্যকে, Do not be like that. Cut off all desire, এসব কথার ব্যাখ্যা করলে বলবে, নৈরাশ্যবাদকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। কত কঠোর বাক্য – সবাই কুকুরের মত লাফিয়েই যাচ্ছে। স্কুলের স্পোর্টসে কমলালেবুর রেস, জিলিপির রেস হয়, সেখান জিলিপি ধরার জন্য সব দৌড়ে যায়।

টলস্টয়ের খুব সুন্দর একটা কাহিনী আছে। একটা গাছে মধুর চাক হয়েছে, চাক থেকে টপ্ টপ্ করে একটা পাত্রের উপর মধু পড়ছে। আর ঠিক পাত্রের উপর একটা কাঠের ভারী পাটা ঝোলানো আছে। একটা ভাল্লুক গেছে মধু খাওয়ার জন্য। পাত্রের উপর ঝুলন্ত কাঠকে সরিয়ে মুখ দিতে যাচ্ছে আর কাঠের পাটাটা এসে তার মাথায় আঘাত করছে। পাটাটা সেইজন্যই এমন ভাবে রাখা আছে যাতে ভাল্লুক এসে মধু না খেয়ে যেতে পারে। ভাল্লুকটা বার বার সরাচ্ছে, মুখ দিতে গেলেই বার বার এসে মাথায় মারছে, মধু খেতে পারছে না। শেষে কাঠের পাটাটা এমন জোরে সরালো যে, পাটাটা অনেক দূর সরে গেছে। ভালুকটাও শান্তিতে মধু খেতে শুরু করেছে। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে কাঠের পাটাটাও ঠিক ততটাই এসে জোরে মেরেছে যতটা দূরে সরিয়ে দিয়েছিল, মাথায় লাগতেই ভাল্লুকটা ওখানেই মরে গেল। আমাদের জীবনটাও ভাল্লুকের মত। সমস্যাগুলিকে আমরা একটু সরিয়ে দিয়ে চটপট করে ভোগ করে নিতে যাই। সমস্যাগুলিকে এমন জোর ধাক্কা মারি যে, সমস্যাগুলো দূরে সরে যায়। কিন্তু ওই সমস্যাটাই আরও বড় আকার ধারণ করে এমন মার মারবে যে, ওখানেই আমাদের সব শেষ হয়ে যায়। এটাই স্বামীজী এখানে বলছেন। ভোগ, বাসনা, তোমার থেকে

ক্রমশ পিছিয়েই যাচ্ছে, তুমি এটাকে ভাল করে বোঝ। প্রকৃতির সাথে তোমার কোন মিল নেই, তুমি হলে সেই শুদ্ধ আত্মা, যার ভিতরে সমস্ত আনন্দ, সমস্ত পরিপূর্ণতা রয়েছে, অনন্ত শক্তির ভাণ্ডার রয়েছে, সেখান থেকে সরে এসে তুমি কিসের জন্য এত ছুটোছুটি করছ। এটাকে বোঝার চেষ্টা কর। এরপর স্বামীজী একটা নূতন বিষয়ের উপর বলতে যাচ্ছেন।

পরমাত্মা-মায়া-মায়াধীশ বা ঈশ্বর-মায়াধীন বা জীবাত্মা

Paramatman as rulling Maya is Ishvara; Paramatman as under Maya is Jivatma. (*পরমাত্মা যখন মায়াধীশ, তখন তিনি ঈশ্বর; যখন মায়ার অধীন, তখনই তিনি জীবাত্মা।*) এর ব্যাখ্যা করার আগে দুটো কথা বলা নেওয়া দরকার। ভারত পরিক্রমা শেষ করার পর স্বামীজী বিদেশ গেলেন। স্বামীজী তখন হৃদয়ে একটা বেদনা নিয়ে ঘুরছেন। যে দেশে বিশাল আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ভাণ্ডার রয়েছে, আধ্যাত্মিকতার ব্যাপারে যে দেশ বিশ্বকে পথ দেখাবে, তার ধর্মটা আজ কোথায় চলে গেছে! আজ তার এই দুরবস্থা কেন? বিংশ শতাব্দীর শেষে আমরা যদি ভারতের দিকে তাকাই, তখন দেখতে পাই, অবস্থার আরও কত অবনতি হয়ে গেছে। স্বামীজীর সময় একশ বছর আগে ভারতের মানুষ অনেক ধর্মপ্রাণ ছিল, যদিও কিছু মানুষ আছেন যাঁরা বিভিন্ন মঠ ও আশ্রমের মাধ্যমে বেদান্ত জেনে গেছেন, কিন্তু সাধারণ জনসাধারণ আগে যে একটা নিয়মশৃঙ্খলার ভিতর দিয়ে জীবন চালাচ্ছিল, আজ সেটাও চলে গেছে।

এই প্রসঙ্গে এখানে একটা মজার ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। ইংরেজরা ভারতের আসার সময়, তারা তাদের সাথে চিকিৎসা বিজ্ঞানকেও নিয়ে আসে। প্রথম দিকে এদিক সেদিক কিছু কিছু ওষুধপত্র দিতে শুরু করে, এতেই তাদের খুব নাম হয়ে গেল, তখন সবাই মনে করত ইংরেজ ডাক্তার মানেই বিরাট কিছু। একজন অর্থোডক্স ভদ্রলোক শরীর খারাপ নিয়ে ইংরেজ ডাক্তারের কাছে গেছে। ডাক্তার তাকে দেখে ওষুধ দিয়ে বলে দিল কিভাবে খেতে হবে। সাত দিন পর আবার এসেছে, ডাক্তার দেখছে ওর অবস্থা আরও খারাপ হয়ে গিয়েছে। ডাক্তার খুব অবাক, বললেন, 'আপনাকে যে ওষুধ দিয়েছিলাম ঠিক মত নিয়েছিলেন'? 'হ্যাঁ নিয়েছি'। 'না, আপনি নেননি'। 'না, নিয়েছি'। তর্কাতর্কি হল। এবার ডাক্তার জানতে চাইল, 'কখন কখন নিয়েছেন'। 'কেন, সব সময় নিচ্ছি'। 'সব সময় নিচ্ছেন মানে'? তখন দেখা গেল, ওষুধটাকে তাবিজ বানিয়ে গলায় ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তখনকার দিনে শরীর খারাপ করলে, শিকড়-বাকড় দিয়ে একটা তাবিজ বানিয়ে হাতে গলায় ঝুলিয়ে রাখার একটা সিস্টেম ছিল। এটা কোন কাহিনী না, সত্যিকারে ঘটনা। আমরা ভারতের লোকেরা এই রকমই। আমরা শুধু তাবিজ পড়তে জানি, তাবিজ পড়াতে জানি। জীবন্ত মানুষকে সম্মান দিতে জানি না, মৃত্যুর পর আমরা তার মূর্তি বানাই। ভারতের ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতাকেও আমরা তাবিজ বানিয়ে সুন্দর করে গলায় ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কিন্তু এটা যে তাবিজের জিনিস নয়, এটা যে একটা ওষুধ, যাকে সেবন করে আমাদের ভাল হতে হবে, এই বোধটুকুও আমাদের নেই।

স্বামীজী বাণী ও রচনাবলীকে আমরা তিনটে শ্রেনীতে ভাগ করতে পারি। একটা হল পত্রাবলী, পত্রাবলীতে আবার ভারতীয়দের কাছে লেখা চিঠি আছে আবার বিদেশী ভক্ত, অনুরাগী ও বন্ধুদের লেখা পত্র আছে। ভারতীয়দের কাছে লেখা চিঠি এবং লেকচারস ফ্রম কলম্বো টু আলমোড়াকে, যার বাংলা অনুবাদ গ্রন্থের নাম ভারতে বিবেকানন্দ, যদি আলাদা করে নেওয়া হয়; আর বিদেশীদের কাছে লেখা চিঠিগুলি এবং বিদেশে দেওয়া লেকচারগুলোকে আলাদা করে দিলে, এই দুটো পুরো আলাদা থাক হয়ে যায়। ভারতের যে জাগরণ, স্বদেশী আন্দোলনের নেতাদের দেশের প্রতি যে প্রেম, এই জিনিসগুলোতে স্বামীজীর ভারতে দেওয়া লেকচারগুলো এবং ভারতীয়দের লেখা চিঠিগুলির প্রভাব খুব বেশি মাত্রায় রয়েছে। স্বামীজী ভারতে যে যে জিনিসগুলি চাইছিলেন তার অনেক কিছু হয়ে গেছে। তবে ঋষি বাক্য কিনা, এটা একটা রত্নভাণ্ডার, তাই কোন দিনই এর দাম কমবে না। কিন্তু আজকে ভারতের কি দরকার, এই দৃষ্টিতে যদি আমরা দেখতে যাই, তাহলে একশ বছর আগে দরকার ছিল লেকচারস্ ফ্রম কলম্বো টু আলমোড়া। ঠাকুরের আশীর্বাদে ভারতবর্ষ সেই দিনগুলি থেকে বেরিয়ে এসেছে। ১৯৬০ বা তারও একটু পরের দিকের কয়েকটা সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের বেশির ভাগ লোক একবেলা খেত বা একদিন ছেড়ে ছেড়ে খেতে হত। বাংলার দুর্ভিক্ষে কত হাজার হাজার মানুষ মারা গেছে। জহরলাল নেহরু, ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী, তিনি সেই সময় অনুষ্ঠিত বিজ্ঞানীদের এক সমাবেশে

বলেছিলেন –আমার কিছু লাগবে না, আগে আমার দেশের লোকেরা, যারা আমার আপনজন, দুবেলা এক মুঠো ভাত, ডাল, রুটি খেতে পায়, আপনারা আগে এর ব্যবস্থা করুন। ইন্দিরা গান্ধী সবুজ বিপ্লব আনার পর থেকে দেশের অবস্থা ধীরে ধীরে পাল্টে যায়। আজকে দেশের মানুষ খেয়ে পরে বাঁচতে পারছে, অনাহারে কাউকে থাকতে হয় না। ভারতের অর্থনীতিকে অন্যান্য দেশের সাথে যদি তুলনা করতে যাওয়া হয়, যেমন চীনে বুলেট ট্রেন আছে, আরও অনেক কিছু আছে, কিন্তু ভিতরটা পুরো ফাঁপা। তৃণমূল স্তরে ভারতের যে উন্নতি হয়েছে, এটা কোন দেশে নেই।

অনেকেরই জানার কথা নয়, কিভাবে আমেরিকা ও ইউরোপিয়ান দেশগুলি প্রাণপন চেষ্টা করে যাচ্ছে যাতে কিছুতেই ভারত এগোতে না পারে। ৯০এর দশকে এস নাম্বি নারায়ণন একজন নামকরা ইসরোর বিজ্ঞানী ছিলেন। পরে কিভাবে তাঁকে একজন গুপ্তচর রূপে চিহ্নিত করা হয়, জেলেও রাখা হয়েছিল। পরে সিবিআই এনকোয়ারির রিপোর্টের ভিত্তিতে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তিনি জেল থেকে বেরিয়ে একটা মামলা করলেন। কিছু দিন আগে সুপ্রিম কোর্ট তাঁর অনুকূলে রায় দানের পর তাঁকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আদেশ দেন। তিনি খুব দুঃখ করে বলছেন, এটা বিরাট বড় একটা চক্রান্ত ছিল, ভারতের একটা বড় গবেষণাকে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য, ওই ফিল্ডে ভারত যেন দশ বছরের মত পিছিয়ে যায়। তার জন্য একটাই কাঁটা, নাম্বি নারায়ণনকে পথ থেকে সরিয়ে দাও। সরানোর কোন পথ নেই, তাই মিথ্যা কতকগুলি অভিযোগ সাজিয়ে, কিছু বিজ্ঞানী, পুলিশ, বিদেশী শক্তি কেরালা সরকারের সাথে হাত মিলিয়ে তাঁকে ফিল্ড থেকে সরিয়ে দিল। যত দিনে সব অভিযোগ খারিজ হল, তত দিনে ওই ফিল্ডে ভারত অনেক পিছিয়ে গেল। এই ঘটনাই ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, বিশ্ব জেনে গেছে যে ভারত জাগছে। লেকচারস্ ফ্রম কলম্বো টু আলমোড়াতে স্বামীজী তখন ভারতকে জাগাচ্ছেন। বেদের কতকগুলি অর্থহীন উপাচার, বেদ ভিত্তিক ইতিহাস, বেদ ভিত্তিক বিজ্ঞান নিয়ে এতদিন ভারত চলছিল। মেকলে এসে সেগুলো ভেঙে দিলেন, ইংরাজী শিক্ষা এনে দিলেন। ভারতের বৌদ্ধিক সমাজ একটা বদ্ধ জল পচে ফুলে ফেঁপে উঠেছিল। ভারতে বিবেকানন্দের লেকচারসে স্বামীজী এই কথা বলছেন। তখন সব কিছু খুলে গেছে।

ভারত এখন জাগছে। এখন যে নানা রকম বাজে জিনিস, আবর্জনা আমরা দেখছি, এটা হল তমোগুণ থেকে রজোগুণে আসার লক্ষণ। তমোগুণ থেকে যখন রজোগুণে আসে তখন এভাবেই হয়। এখান থেকে ভারত সত্ত্বগুণে যাবেই, কেউ আটকাতে পারবে না। তার নূতন ধর্মগ্রন্ত হবে এই দেববাণী। তখন স্বামীজীর লেকচারস্ ফ্রম কলম্বো টু আলমোড়াও চলবে না, কর্মযোগ, রাজযোগ চলবে না, এই একটাই থাকবে দেববাণী। বর্তমান যুগের ধর্মগ্রন্থ হবে দুটি, কথামৃত আর দেববাণী। কর্মযোগে যে কথাগুলো আছে, দেববাণীতে স্বামীজী খুব সংক্ষেপে বলে বেরিয়ে গেছেন। বাকিগুলো হল তার ব্যাখ্যা। আমরা দেববাণীর যে কথাগুলো আলোচনা করছি, আমরা সবাই নূতন বেদ শুনছি। আগামী হাজার পনেরশ বছর এটাই বেদ হয়ে থাকবে। যাঁরা এই আলোচনা শুনছেন, তাঁদের সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে, এটা তাবিজ করে গলায় ঝুলিয়ে রাখার জন্য নয়, খাওয়ার জন্য, খেয়ে হজম করার জন্য আর বৌদ্ধিক, মানসিক ও দৈহিক স্তরে সুস্থ থেকে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও ভৌতিক জগতের তাপকে নাশ করার জন্য এই নূতন বেদ। আমরা যে জিনিসগুলো আগে আগে আলোচনা করেছি, আজকে যেটা আলোচনা করছি, জিনিসগুলোকে শুনলে আতঙ্ক লাগে। কারণ এর প্রত্যেকটি কথায় আমাদের শৈশব থেকে ধর্ম নিয়ে, ঈশ্বর নিয়ে যে ধারণাগুলি নিয়ে আমরা বড় হয়েছি, সব ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। মহাপুরুষদের সঙ্গ করে, শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, দেববাণীর কথা শোনার পর মনে হচ্ছে, এতদিন আমরা যা জানতাম সব ভুল জানতাম। বুঝতে পারছি, দেববাণীর প্রত্যেকটা কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কিন্তু আমাদের নেওয়ার ক্ষমতা নেই। ঠাকুরে কথায়, সময় না হলে কিছু হয় না, তবে শুনে রাখতে হয়, শুনে রাখা ভাল। আজকের বিষয় আলোচনা করার আগেও ভাবতে হচ্ছে, বলাটা ঠিক হবে কিনা।

জীবাত্মা ও পরমাত্মা, আমি আর ঠাকুর, এই দুটোর সম্পর্কের স্বামীজী ব্যাখ্যা করছেন। Paramatman as rulling Maya is Ishvara; Paramatman as under Maya is Jivatma, দ্বৈতবাদীরা, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা কোন মতেই স্বামীজীর এই বাক্যকে মানবে না। রামানুজ বা মাধ্বাচার্যের অনুগামীরা থিয়োরেটিক্যালি অনেকগুলো কথা বলে দিতে পারেন, কিন্তু প্র্যাক্টিক্যাল লেভেলে যখন যাবেন তখন

এই কথাগুলি বললে তারা কানে আঙুল দিয়ে দেবেন, এই কথা শোনাটাই পাপ। পরমাত্মা বলতে এখানে সচ্চিদানন্দকে বলছেন, যাঁকে ব্রহ্ম বলা হয়, স্বামীজী পরমাত্মা বলছেন। আর এখানে মায়া বলতে সমষ্টি মন। মায়া শব্দ শুনলেই আমরা মনে করি একটা কোন ম্যাজিক, ভ্রান্তি, কিন্তু মায়া তা নয়। ঈশ্বর শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ; সেই চৈতন্যস্বরূপ যদি কোন কারণে চিন্তা-ভাবনা করেন; চৈতন্য আর ভাবনা দুটো আলাদা জিনিস। আমরা যেমন বলি, শুয়ে শুয়ে বা বসে বসে আমি ভাবছি; এটাকে যদি আমরা কল্পনা করি, কারণ এখানে কল্পনা ছাড়া আর কোন ভাবে ব্যাখ্যা করার উপায় নেই, কারণ ওই স্তরে কোন মন যেতে পারে না, থিয়োরেটিক্যালি এটা সম্ভব না। কেন এটা হয়, কিভাবে হয়, আমরা জানি না। সেই সচ্চিদানন্দ যখন ভাবেন, উপনিষদে যার অনেক রকম বর্ণনা আছে, তার একটা বর্ণনা হল, *একোহম্ বহুস্যাম্ প্রজায়িনি*, আমি এক আমি বহু হব। সচ্চিদানন্দের চিন্তা করাও যা, আর ওটা বাস্তবে হয়ে যাওয়াটাও তাই। তাহলে সৃষ্টিটা কি? কিছুই না, পরমাত্মার মন। সৃষ্টিও তাই পরমাত্মা থেকে আলাদা কিছু না। সেই পরমাত্মা নিজের মনের ভিতরে গিয়ে যে রকম, তখন তিনি এক রকম। সেই পরমাত্মা যখন সেই মনের মালিক হয়ে থাকেন, তখন তিনি আরেক রকম।

খুব একটা স্থূল উদাহরণ দিলে আমরা কিছুটা বুঝতে পারব, যদিও সবটা মিলবে না। আমি শুয়ে শুয়ে আমার মনের জগতে দুজন বন্ধুর কথা ভাবছি। এবার ওই দুই বন্ধু তখন দেশের যে রাজা তাকে নিয়ে ভাবছে। তখনকার মত ওই মনের রাজ্যে সেই রাজা আমার অধীনে এসে গেল। আমি হলাম ওই চিন্তনের রাজা। ওই চিন্তার জগতে দেশের যে রাজা, সে আমারও অধীনে। কিন্তু ওই দেশের রাজা, যাকে আমি চিন্তা করব, সে আমার থেকে আলাদা কিছু নয়। এই আমি আর আমার চিন্তার জগৎটাও আমি। চিন্তার জগতে গিয়ে যদি আমি যাই হয়ে থাকি না কেন, সেটাও আমি, চিন্তার জগতে আমি যাদের কথা ভাবছি, তারাও কিন্তু আমি। এই উপমা সরাসরি মিলবে না, কিন্তু একটা জায়গায় বিরাট মিল আছে। এখানে বোঝানর জন্য বলা হচ্ছে। আমি আছি, আমার চিন্তা ভাবনা আছে, সেই চিন্তা-ভাবনাতে আমিও ঢুকছি, সেই চিন্তা-ভাবনাতে আমি আরও চারজনকে তৈরী করছি। আমার চিন্তা-ভাবনার জগতে আমি রাজা, চিন্তা-ভাবনা দিয়ে আমি যা খুশি করতে পারি, আর যাকে খুশি যা ইচ্ছে হবে আমি করতে পারি, এর সবটাই আমার সৃষ্টি। ঋষিরা বলছেন, ব্রহ্ম, ঈশ্বর, জীব, জগৎ, মায়া অনেকটা এই রকমই।

এর কি প্রমাণ আছে? আমরা অনেকবার বলেছি, এর কোন প্রমাণ নেই। ঋষিরা শুদ্ধ মনে ধ্যানের গভীরে দেখেছেন। প্রথম একজন ঋষি যা দেখেছেন, দ্বিতীয় ঋষিরাও একই জিনিস দেখেছেন। দ্বিতীয় ঋষি যা জানলেন, তৃতীয় ঋষিও তাই জানলেন। সেইজন্য কোন কারণই নেই যে তাঁদের আমি প্রশ্ন করতে যাব। তাঁদের কোন স্বার্থ ছিল না, টাকা আয় করার কোন উদ্দেশ্য ছিল না, চেলা বানাবার কোন স্বার্থ ছিল না, আর যেসব নামকরা ঋষিদের আমরা দেখছি, যীশু বলুন, বুদ্ধ বলুন, ঠাকুর বলুন, এনারা সবাই সুখের সংসারকে ছেড়ে দিয়ে অকিঞ্চনের সংসার বেছে নিলেন। নিন্দুকদের এটাই ক্ষমতা, তারা তাদের বাবা-মাকেও নিন্দা করতে ছাড়বে না। একটু গভীরে গিয়ে দেখলে, এরা কারুরই জন্য নয়, দেশের জন্যতো একেবারেই না, নিজেকে আবার লিবারেলস বলছে, সবটাই দেশ বিরোধী কাজ। এরা ধর্মকে মানবে, কোন প্রশ্নই নেই, মানতেই পারবে না। এরা যদি ভুলেও এই মহাপুরুষদের চিনেও নেয়, তখন না চেনারই ভাণ করবে; এদের কথা বাদ দাও। যদি একটু কোথাও মন খুলে থাকে, যেমন ঠাকুর ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারকে খুব সম্মান করতেন। ডাঃ সরকারও ঠাকুরের সাথে অনেক তর্ক করতেন। একটা কোন কথাতে বিরোধ হওয়াতে ডাঃ সরকার ঠাকুরকে বলছেন, 'তুমি আমার কথা শোন'। ঠাকুর খুব রেগে গেলেন। রেগে ঠাকুর বলছেন, তোমার কথা আমি কি শুনব! তুমি কামী, লোভী, অহঙ্কারী। ধর্মকে যারা নিন্দা করে, তারা অতি সাধারণ স্তরের, তাদের কথা আমি কি শুনতে যাব। যদি কেউ বলে, এই সত্যগুলিকে আমাদের ঋষিরাই দেখেছিলেন, অন্য ঋষিরা দেখেননি। না, অন্য ঋষিরাও তাই দেখেছিলেন, তাঁরাও একই কথা বলছেন। তবে তিনি যেভাবে রেকর্ড করে গেছেন, পরে সেগুলো যখন pass on হয়েছে, সেখানে তখন কিছু কিছু ফাঁক এসে গেছে, সেখানে ঠিক একই ভাবে আসেনি কিন্তু বোঝা যায় যে জিনিসটা তাই।

আমি আর আমার ঈশ্বর, এর কি সম্পর্ক? বলছেন, সেই পরমাত্মা, সেই ব্রহ্ম যখন মায়াধীশ তখন তাঁকে আমরা বলছি ঈশ্বর। আর যখন মায়ার অধীন হয়ে যান, তাঁকে আমরা বলছি জীব। আর বলছেন,

Maya is the sum total of manifestation and will utterly vanish. (*সমুদয় জগৎপ্রপঞ্চের সমষ্টিই মায়া, একদিন সেটা একেবারে উড়ে যাবে।*) সচ্চিদানন্দ বাদে, শুদ্ধ আনন্দ বাদে, বিশুদ্ধ চৈতন্য, যেখানে কোন রকম চাঞ্চল্য নেই সেটা বাদে যাবতীয় যা কিছু আছে তার sum total যদি নেওয়া হয়, এটাই মায়া। আমরা এখানে বসে সবাই কথা বলছি, আমরা এখন জাগ্রত অবস্থায় আছি, এটা মায়া। যখন স্বপ্নে চলে যাচ্ছি, সেটাও মায়া। জাগ্রত অবস্থাটাও মায়া, স্বপ্নাবস্থাটাও মায়া। সুষুপ্তি অবস্থায় যেখানে কিছু থাকছে না, কিন্তু সুষুপ্তি অবস্থাতেও একটা স্মৃতি থেকে যায়। সেইজন্য বেদান্তের দৃষ্টিতে সুষুপ্তি অবস্থাকেও মায়ার মধ্যেই রাখা হয়। বোঝানর সুবিধার্থে আমরা কল্পনা করতে পারি, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উড়ে গেল, কোথাও কিছু নেই, এক ঈশ্বর আছেন আর তাঁর একটি ভক্ত আছেন। ভক্ত ঈশ্বরের চিন্তা করছেন, এটাও মায়া। ঈশ্বর প্রথম সৃষ্টি করলেন ব্রহ্মাকে, কোথাও কিছু নেই, শুধু ব্রহ্মাই আছেন, আর তিনি ধ্যান করছেন, সেটাও মায়া। আচ্ছা ব্রহ্মাও নেই, কারণ জল বলেও কিছু নেই, শুধু আছেন ভগবান; তিনি আনন্দস্বরূপ। সেই তিনি ভাবলেন সৃষ্টি হোক। শুদ্ধ আনন্দের বাইরে একটা চিন্তন এসে গেল, মায়া এসে গেল, শক্তি এসে গেল। যেখানেই কোন পদার্থ থাকবে, যেখানেই কোন চিন্তা থাকবে, ওটা মায়া। আমি ঈশ্বর চিন্তন করছি, মায়া। ঈশ্বরের ধ্যান করছি, সেটাও মায়া। ভাল কাজ করছি, মায়া। মন্দ কাজ করছি, ঘোরতর মায়া। মায়ার বাইরে যাওয়া মানেই হবে, sum total of universe, যত রকমের ইউনিভার্স হতে পারে, ফিজিক্যাল, মেন্টাল, স্পিরিচুয়াল যত রকমের ইউনিভার্স হতে পারে, সমস্ত ইউনিভার্সের পারে যেটা, সেটাই পরমপদ। Sum total of universe, sum total of creation, creation বলতে ছোট্ট থেকে ছোট্ট চিন্তাও যদি থাকে, সেটাও মায়া। ঠাকুর সমাধিতে যখন যেতেন তখন জল খাবো, সন্দেশ খাবো, এই অল্প একটু চিন্তা রেখে দিতে হত, যাতে সচ্চিদানন্দের সঙ্গে একেবারে মিলে না যান। ওই একটা ছোট্ট চিন্তা যে থেকে গেছে, ওটাই মায়ার একটু দড়ি, ঠাকুরকে ঠিক টেনে আবার নিয়ে আসবে। যদি না নিয়ে আসা হয়, জগৎ আর শিক্ষা পাবে না। ঠাকুর না এলে আমরা জানতেই পারতাম না যে, বেদ উপনিষদের প্রতিটি কথা, শাস্ত্রের প্রত্যেকটি কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

বলছেন, Tree-nature is Maya, it is really God-nature which we see under the veil of Maya. (*বৃক্ষের বৃক্ষত্বটা মায়া –গাছ দেখবার সময় আমরা প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মস্বরূপকেই দেখছি, মায়া-আবরণে ঢাকা।*) আমরা এই জিনিসটাকে নিয়ে আগেও আলোচনা করেছি। আমরা যে বৃক্ষকে দেখছি, যে প্রকৃতিকে আমরা দেখছি, বৃক্ষত্বকে যেটা দেখছি, এটাই মায়া। আসলে এটা God nature, tree nature। এই গ্লাশ দেখছি, গ্লাশটা কি? Glass nature। আসলে এটা কি? God nature। কেন আমরা এই রকম দেখছি? এটাই মায়া। কারণ, সেই তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি বলছেন, সৃষ্টি হোক। বলাও যা আর আমি তুমি এই জগৎ এসে যাওয়াও তাই। সিনেমায় অভিনেতা একজনকে মেরে দিল, বাচ্চারা দেখে কাঁদতে শুরু করে। বাবা-মা বলেন, ওটা কিছু না, আসলে কেউ কাউকে মারছে না। জ্ঞানী পুরুষ জানেন, কোথাও কিছু হচ্ছে না। আগে রোপট্রিকের কথা বলা হয়েছিল, যেটাকে দেখে লোকেরা প্রথমের দিকে ঘাবড়ে যেত। যারা ভয় পেয়ে ঘাবড়ে যেত, তাদের স্থানীয় লোকেরা বলে দিত, কিছু হয়নি, দড়িও নেই, কেউ উপরে যায়নি, কেউ নীচে পড়েও যায়নি।

এখান থেকে স্বামীজী এবার নিয়ে আসছেন ‘why’ কে। The ‘why’ of anything is in Maya. (*কোন ঘটনা সম্বন্ধে ‘কেন’ –এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসাটাই মায়ার অন্তর্গত।*) কোন কিছুকে নিয়ে, বা কোন ঘটনার ব্যাপারে ‘কেন’ – এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা বৃথা, কারণ মায়ার মধ্যে বাস করে মায়া কিভাবে এলো, এর উত্তর কখন দেওয়া যাবে না। স্বামীজী যে সময় আমেরিকা গিয়েছিলেন, সেই সময় আমেরিকায় রবার্ট ইঙ্গারসোল একজন খুব নামকরা লোক ছিলেন। নিজেকে নাস্তিক না বলে তিনি অজ্ঞেয়বাদী বলতে বেশি পছন্দ করতেন। উনি বেছে বেছে আমেরিকার সব বড় বড় পাদরীদের চ্যালেঞ্জ করতেন আর পাব্লিকের সামনে তাদের প্রশ্নজালে বিধ্বস্ত করে এমন নাজেহাল করতেন যে, সব পাদরীরা তাঁর নামে ভয়ে কাঁপত। স্বামীজীও গেলেন ইঙ্গারসোলের সাথে দেখা করতে। ইঙ্গারসোলের তখন বয়স হয়ে গেছে। ইঙ্গারসোল স্বামীজীর সামনে একটা কমলালেবুকে নিয়ে বলছেন, আমার কাছে এই কমলালেবু আছে, আমার কাছে এটাই যথার্থ, এর রস পান করাই আমার উদ্দেশ্য। তাঁর বক্তব্য হল, আমার সামনে এই জগৎটা আছে, এর রস পান কর, আর কি দরকার! স্বামীজীও সঙ্গে সঙ্গে বলছেন, আমি আপনাকে পুরোপুরি সমর্থন করি, যেহেতু আমি একজন ভারতীয়

সেইজন্য আমার ফল কমলালেবু না হয়ে আম হবে। আমিও আমের রস পান করতে চাইছি, কিন্তু আমার তাড়াহুড়ো কিছু নেই। কারণ আমি জানি আমি অনন্ত আর আমি অনন্ত হয়েই থাকব। আর তাই আমের রসের যে শেষ বিন্দুটা থাকবে, সেই বিন্দু পর্যন্ত চুষে চুষে পান করে যাব। আপনার তাড়া থাকতে পারে, কারণ আপনি জানেন আপনার এই জীবনটাই শেষ জীবন। বক্তব্য হল, যারা জানে মৃত্যুতেই সব শেষ, তাদের সব কিছুতেই তাড়াহুড়ো থাকবে। কিন্তু যারা জানে, আমার এই জীবনটাই শেষ নয়, আমি আবার জন্মাব, আবার ভোগ করতে পারব, সেইজন্য আমার তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই।

'Why' and 'How'

স্বামীজী এরপর ইঙ্গারসোলকে খুব নামকরা কথা বলছেন, We don't care for the 'how', we care for the 'why. We leave 'how' for childish people, আমরা ভারতীয়রা 'how' গুলির দিকে তাকাই না, এই 'how' গুলিকে আমরা বালবুদ্ধি সম্পন্ন লোকেদের জন্য ছেড়ে দিই, আমাদের দৃষ্টি সব সময় 'why'এর দিকে। আমরা সব সময় ইলেক্ট্রিসিটি ব্যবহার করে যাচ্ছি। আমরা কি জানি, ইলেক্ট্রিসিটি কোথা থেকে আসছে? জিজ্ঞেস করলে আমরা বলি, ঠাকুর বলেছেন আম খেতে এসেছ আম খাও, অতশত জানতে চেও না। ইয়ং প্রজন্মের সবাই ওরা howটা জানে। বিজ্ঞানও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে howটা জানে, কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক আছেন, যাঁরা whyএর দিকে যান। ভারতবর্ষের সব কিছুতে বিশেষত্ব হল why। 'Why' মানে, মূল কারণে যাওয়া। মূল কারণে যখন পৌঁছে গেলেন, এরপর সেখান থেকে সমস্ত উত্তর এসে যাবে। শ্বেতকেতুর বাবা তাঁকে এটাই জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তুমি কি জানো, যে জিনিসটাকে জানলে সমস্ত কিছুকে জানা যায়'? শ্বেতকেতু বললেন, 'আমি তো তা জানি না'। মুণ্ডকোপনিষদের শুরু এই একই প্রশ্ন দিয়ে, কোন জিনিসকে জানলে সমস্ত কিছুকে জানা যায়। এই প্রশ্নের উত্তরে ঋষি যা বললেন, সেটাই মুণ্ডকোপনিষদ। এখানে স্বামীজী যে whyকে নিয়ে বলছেন, এই whyটা both ways। সাধারণ অর্থে আমরা যেটাকে reasoning মনে করি সেটাকেও why বলছেন, আর বেদ বেদান্তে যখন পরম সত্তাকে নিয়ে জিজ্ঞাসা ওঠে, তখন সেই 'why'টাও আসে।

স্বামীজী বলছেন, To ask why Maya cme is a useless question, because the answer can never be given in Maya, and beyond Maya who will as it? (*সুতরাং 'মায়া কিরূপে এল'? –এ প্রশ্ন করা বৃথা, কারণ মায়ার মধ্য থেকে ওর উত্তর দেওয়া যেতে পারে না; আর মায়ার পারে কে ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে?*) আমরা অনেক দিন ধরে দেববাণীর উপর আলোচনা করে যাচ্ছি, সেইজন্য অনেক কিছু পুনরাবৃত্তি হওয়াটা স্বাভাবিক, আর আমাদেরও অনেক কিছু মনে থাকার কথা নয়, তাই পুনরাবৃত্তি হলে অসুবিধারও কিছু নেই। ভারতবর্ষে তিনজন হলেন, যাঁরা হিন্দু ধর্মে ঠিক ঠিক একটা জায়গায় নিয়ে এসে দাঁড় করিয়েছেন – ব্যাসদেব, শঙ্করাচার্য আর শ্রীরামকৃষ্ণ। ব্যাসদেব তাঁর সময়ের যত শাস্ত্র ছিল, ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার উপর যত ভিন্ন ভিন্ন মত ছিল, তিনি সব কিছুকে এক জায়গায় এনে মহাভারতে দাঁড় করিয়ে দিলেন, আজকে তাই হিন্দু ধর্ম মানে মহাভারতের ধর্ম। মহাভারত যে ঈশ্বরকে মেনেছে, আজ আমরা সেই ঈশ্বরকে মানছি, মহাভারত যে জিনিসগুলিকে বাদ দিয়ে দিয়েছে, সেগুলোকে আমরাও বাদ দিয়ে রেখেছি। আজকে বলতে খুব করে হলেও পঞ্চাশ বছর আগে পর্যন্ত। শঙ্করাচার্য এসে হিন্দু ধর্মে একগাদা যে দর্শন ছিল, সেগুলোর সব কটাকে কেটে বাদ দিয়ে, যেগুলো নিতান্ত দরকার, সেগুলোকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিলেন। ঠাকুর এসে সমস্ত চিন্তা-ভাবনা, সমস্ত ধর্মকে এক জায়গায় নিয়ে এলেন। জগতের বৈচিত্র্যকে নিয়ে যখন প্রশ্ন করা হয়, এত বৈচিত্র্য কেন? ঠাকুর বলছেন মায়ের ইচ্ছা। ঠাকুর যেকালে বলে দিলেন, এটা তাঁর ইচ্ছা, মায়ের ইচ্ছা, তার মানেই, এর উত্তর দেওয়া যায় না। ঠাকুর যেটাকে বলছেন, মায়ের ইচ্ছা, তাঁর ইচ্ছা; শঙ্করাচার্য এটাকেই বলছেন মায়া। ব্যাসদেবের ফিলজফি বলতে তিনি ব্রহ্মসূত্র রচনা করলেন ঠিকই, কিন্তু যার ব্যাখ্যা আমরা শঙ্করাচার্যের মাধ্যমেই পাই। কিন্তু ব্যাসদেবও মায়া জিনিসটাকে নিয়ে আসছেন। ঠাকুর সব রকম ভক্তদের সামনে মায়া না বলে ঈশ্বরের ইচ্ছা, তাঁর ইচ্ছা, মায়ের ইচ্ছা, এই শব্দগুলো আনছেন। কিন্তু মায়ের

ইচ্ছা আর মায়া, দুটো একই জিনিস। দুটোরই অর্থ হল, এর উত্তর আমার কাছে নেই। কেন নেই? কারণ আমরা যতক্ষণ মায়াতে আছি, ততক্ষণ কোন 'why' এই প্রশ্ন হতে পারে না, মায়াকে নিয়ে কোন 'why' হতে পারে না। কারণ 'why' জিনিসটাই মায়ার।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল প্রচুর গ্রন্থ রচনা করেছেন আর জগৎকেও প্রচুর চিন্তা-ভাবনার রসদ দিয়ে গেছেন। তিনি নিজে একজন গণিতজ্ঞ ছিলেন। উনি একবার ঠিক করলেন একটা দর্শনের বই লিখবেন যাতে তিনি এমন একটা পদ্ধতি দাঁড় করাবেন, যে পদ্ধতি পুরোপুরি যুক্তির উপর দাঁড়িয়ে থাকবে, তাতে যুক্তি ছাড়া কিছু থাকবে না আর যেটাকে কেউ কোন দিন আর কোন প্রশ্ন করতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত উনি লিখলেন। উনি যখন লিখছিলেন ঠিক সেই সময় আমেরিকাতে একজন গণিতজ্ঞ Kurt Fredric Gödel স্বাধীন ভাবে কাজ করছিলেন। সেই সময় তিনি প্রমাণিত করে দিলেন, বার্ট্রাণ্ড রাসেলের এই মেথড কখনই বাস্তবে সম্ভব হতে পারে না। ওনার দুটো খুব নামকরা theorems আছে, ওনার দ্বিতীয় থিয়োরমসটা খুব জটিল গাণিতিক থিয়োরী যার নাম হল Gödel's incompleteness theorems। উনি তাতে দেখাচ্ছেন completeness and consistency এই দুটো থিয়োরী এক সঙ্গে চলে না। যদি কোন প্রণালীকে মনে হয় complete আর ওর মধ্যে নিজেকে বেঁধে নেন আর সেই প্রণালীর মধ্যে থেকে আপনি যদি কোন কিছুকে প্রমাণিত করে দিতে পারেন তাহলে সেটা সব সময় incomplete হবে। কারণ কোন জিনিসকে প্রমাণিত করার জন্য আপনাকে ঐ জিনিসের বাইরে থেকে আসতে হবে। কিন্তু বাইরে থেকে আসা মানেই হবে জিনিসটার নিয়মকে ভেঙে দেওয়া। বার্ট্রাণ্ড রাসেল তাঁর নূতন থিয়োরিতে এক দুই করে কয়েকটি খুব সাধারণ পরিভাষা নিয়ে এলেন, তার মানে তিনি একটা প্রণালী তৈরী করে দিলেন। Gödel গাণিতিক নিয়মে প্রমাণিত করে দিলেন, যদি এই রকম হয় তাহলে ঐ নিয়মের মধ্যে থেকে তাকে কখনই প্রমাণিত করা যাবে না, তার মানে জিনিসটা কখনই complete হবে না। Complete কিনা বোঝার জন্য আপনাকে ঐ সিস্টেমের বাইরে আসতে হবে। যেমনি বাইরে এসে গেলেন তাহলে প্রথমে তিনি যে সিদ্ধান্ত গুলি দিয়েছিলেন সেই সিদ্ধান্তের আর কোন দাম থাকল না। সেই থেকে বার্ট্রাণ্ড রাসেলের এত নামকরা Mathematical Philosophy চিরদিনের মত ওখানেই শেষ হয়ে গেল। তিনি যে ভেবেছিলেন বিশ্বে আর কোন দিন কোন দর্শনকে প্রশ্ন করার সমস্যা থাকবে না, সব দর্শনকেই যাচাই করে নেওয়া যাবে, এই ভেবে তিনি যেটা দাঁড় করিয়েছিলেন সেটাই আঁতুর ঘরেই মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

রামকৃষ্ণ মিশনের কোন সন্ন্যাসী যদি বলে, রামকৃষ্ণ মিশন best organisation, এটা যুক্তিতে দাঁড়াবে না। কারণ তুমি ওই সিস্টেমের ভিতরে দাঁড়িয়ে সিস্টেমের ভালকে বিচার করছ, এভাবে হয় না। একজন হিন্দু যদি বলে হিন্দু ধর্ম শ্রেষ্ঠ ধর্ম, সে এই কথা বলতে পারে না, তার সহজ কারণ হল, হিন্দু ধর্মের ভিতরে থেকে হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বকে নিয়ে বলা যায় না। Gödel এই জিনিসটাকে গাণিতিক ভাবে দেখাচ্ছেন। খুব জটিল, আমাদের মত লোকেদের পক্ষে বোঝা সম্ভব না। মায়ার ভিতরে থেকে মায়াকে নিয়ে কোন প্রশ্ন করা যায় না। রামানুজ খুব বুদ্ধিমান লোক ছিলেন, তিনি মায়াকে বেছে নিয়ে মায়াকে আক্রমণ করলেন। যেমন বলতে শুরু করলেন, মায়া কোথায় থাকে? মায়া কি? মায়ার অবস্থান কি? মায়ার উৎপত্তি কোথা থেকে? আচার্য শঙ্করের তিনশ বছর পর রামানুজ এসেছেন, অথচ তিনশ বছর পর রামানুজ যে প্রশ্ন করবেন, আচার্য শঙ্কর নিজেই প্রশ্ন সরাসরি তুলে রেখে গেছেন। আচার্যের গীতার ত্রয়োদশোধ্যায়ের ভাষ্যে আলোচনা চলছে সেখানে আচার্যের বিরোধীতা করে একজন প্রশ্ন করছে, 'এই মায়াটা কোথায় আছে? কার কাছে আছে'? আচার্য তখন লম্বা যুক্তি দিয়ে বলছেন, 'তোমার এটা জেনে কি হবে? কারুরই জেনে কি হবে'? 'না, সে জেনে গেলে তার পক্ষে জ্ঞানের দিকে এগিয়ে যেতে কত সুবিধা হবে'। আচার্য তাকে বলছেন, 'যার সমস্যা সে এসে বলুক, তাকে আমি বলে দেব, তুমি কেন এত ভাবছ'! সে বলছেন, 'না, আমারই মায়া আছে, আমাকে বলুন'। 'তাহলে তুমি তো জেনেই গেলে তোমার মায়া আছে, তাহলে আর প্রশ্ন করছ কেন'।

স্বামীজী এটাকে আরও সহজ করে বলছেন, Maya is a statement of fact। আমাদের সামনে এই মাইক্রোফোন আছে, একে কি প্রমাণিত করব! আমার দুটো হাত আছে, আমি তোমাকে এর কি প্রমাণ দেব, এই তো সামনেই দেখা যাচ্ছে। ঠাকুরও একজনকে খুব অসন্তুষ্ট হয়ে বলছেন, আমি এমনটি দেখেছি,

আমি তোমার কথা কি শুনব! মায়ার ভিতরে থেকে মায়া সম্বন্ধিত কোন 'why' জিজ্ঞেস করা যায় না, 'why'টাই মায়। এই জিনিসটাকে বোঝাবার জন্য আমরা খুব সহজ একটা উপমার ব্যবহার করি, অন্ধকারের মধ্যে থেকে আমি বলছি, আমি অন্ধকারকে দেখতে চাই। অন্ধকারকে দেখা যায় না। যে কোন জিনিসকে দেখার জন্য আলো দরকার। আলো নিয়ে এলে আবার অন্ধকার থাকে না। যে অন্ধকার দেখতে চাইছে, সে জীবনে কখন অন্ধকারকে দেখতে পারবে না। কারণ যে কোন জিনিসকে দেখার জন্য আলো লাগবে, আলো আর অন্ধকার বিপরীত ধর্মী। 'Why' মানেই অজ্ঞান, অজ্ঞান মানেই মায়া। মায়ার মধ্যে থেকে, মায়া কেন, এই প্রশ্ন হয় না। আর যেমনি মায়ার বাইরে চলে গেল, তখন তো আর মায়া নেই, মায়াকে নিয়ে আর কি প্রশ্ন করবে! কে প্রশ্ন করবে, কাকে প্রশ্ন করবে! বহুত্ব হল মায়ার রাজ্যের।

স্বামীজী বলছেন, Evil creates 'why', not 'why' the evil, and it is evil that asks 'why'. (*মন্দ বা মায়া বা অসদ্দৃষ্টিই 'কেন' –এই প্রশ্নটি সৃষ্টি করে, কিন্তু 'কেন' প্রশ্ন থেকে মায়া আসে না –মায়াই ঐ 'কেন' জিজ্ঞাসা করে।*) মায়া জিনিসটাই evil, অজ্ঞান, এই অজ্ঞানটাই দুষ্ট। আমরা যা কিছু অশুভ জিনিস দেখছি, আমাদের যে অশুভ চিন্তা হচ্ছে, এগুলো অজ্ঞানের জন্য করছি। অশুভ কাজ বা চিন্তা করছি বলে অজ্ঞান হচ্ছে তা না, অজ্ঞান আছে বলেই এই জিনিসগুলো হচ্ছে। যে মানুষ তার নিজের স্বভাব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে গেছে, যে জানে আমি এদের থেকে আলাদা, সে কখনই তাদের মত কাজ করবে না। আর বলছেন, আমাদের মনের ভিতরে যে দুর্বলতা আছে, যে পাপ আছে, অপূর্ণতার বোধ হচ্ছে, এই জিনিসগুলোই বারে বারে মায়াকে জানতে চায়, মায়াকে বুঝতে চায়, অজ্ঞানকে বুঝতে চায়। কিন্তু কেউ কোন দিন জানতে পারবে না, কারণ ওই সিস্টেমের মধ্যে থেকে মায়াকে কোন দিন জানতে পারবে না, 'why' কে জানতে পারবে না।

তারপরেই স্বামীজী বলছেন, Illusion destroys illusion. Reason itself, being based upon contradiction, is a circle and has to kill itself. (*ভ্রমই ভ্রমকে নষ্ট করে দেয়। যুক্তি-বিচার নিজেই একটা বিরোধের উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং এটা একটা চক্রস্বরূপ, কাজেই যুক্তি নিজেই নিজেকে ধ্বংস করবে।*) এগুলো একটু উচ্চমানের যুক্তি। যখনই কোন illusion বা ভ্রম এসে যায়, তখন এই ভ্রমকে আরেকটা ভ্রমই কাটবে। আমরা এর আগেও আলোচনা করেছি, একটা কাঁটাকে আরেকটা কাঁটা দিয়ে তুলতে হবে। মনের মধ্যে ভয় দানা বেঁধে আছে, তাকে শক্তির চিন্তন করতে হবে, ভয়টাও মায়া, শক্তিটাও মায়া। যোগশাস্ত্রেও একই কথা বলছেন, *বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্*। মনের মধ্যে ইমোশানগুলি খুব প্রবলাকার ধারণ করে আছে, সেটাকে কাটাবার জন্য তার বিপরীত ইমোশানসগুলিকে নিয়ে আসতে বলছেন। মেয়েদের প্রতি প্রচণ্ড দুর্বলতা আছে, ঠাকুর বলছেন, নারীর শরীরের অঙ্গগুলিকে দ্বিগুণ করে দেখ। কোন মেয়েকে যদি দ্বিগুণ করে কেউ দেখে, তখন সেই মেয়ে তার কাছে রাক্ষসীর মত লাগবে, আতঙ্ক হয়ে যাবে। Illusion নাশ করার একটাই পথ, তার ঠিক বিপরীত অন্য আরেকটা illusionকে নিয়ে আসতে হবে। আর বলছেন, Reason itself, being based upon contradiction, is a circle and has to kill itself, যে কোন যুক্তি, যুক্তিবাদীরা যে যুক্তির পর যুক্তি নিয়ে আসছে, তার মানে যুক্তিবাদীরা contradictionএর উপর দাঁড়িয়ে আছে। পরের লাইনে আরও পরিষ্কার করে দিচ্ছেন, Sense-perception is an inference, and yet all inference comes from perceiption, (*ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি একটা আনুমানিক জ্ঞান, আবার সব আনুমানিক জ্ঞানের ভিত্তি অনুভূতি।*)

ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি- আনুমানিক জ্ঞান- উপলব্ধি

স্বামীজী এই জায়গাতে তিনটে জিনিসকে নিয়ে বলছেন, reason, inference আর perception। প্রথম আসে যুক্তি, দ্বিতীয় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যা কিছু জানছি, আর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জ্ঞান লাভ করে আমরা যে জ্ঞানটা অর্জন করি। দর্শনে কোন কিছু জানার পদ্ধতির প্রচুর আলোচনা চলে, পাশ্চাত্য দর্শনে এটাকে বলছেন Methods of knowledge, আমরা একটা জিনিসকে কিভাবে জানছি। পাশ্চাত্যে খুব নামকরা কথা হল 'logic', এটা আবার দুই প্রকার, detuctive logic আর inductive logic। পাশ্চাত্য দুনিয়ায় একটা আলাদা পদ্ধতিতে যুক্তি চলে, ভারতবর্ষে এটাকে অন্য ভাবে বিভাজন করেছেন। যে কোন ফিলজফিকে প্রথমে তাকে তার সত্যগুলিক বলতে হয়, আমি কোন কোন জিনিসকে মানি। যারা ঘোর জড়বাদী, বর্তমান কালে যারা

superficial মানুষ, তার বলে, আমি আমার ইন্দ্রিয় দিয়ে যা কিছু প্রত্যক্ষ করেছি, সেটাকেই মানব, এর বাইরে আমি কিছুকে বিশ্বাস করি না। আবার অনেকে বলে, আমি সেটাকেই মানব যেটাকে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা যাবে আর যেটাকে আমি আমার ইন্দ্রিয় দিয়ে জানছি, আমার কাছে এই দুটোই সত্য, বাকি কোন কিছুই আমার কাছে সত্য নয়। হিন্দু ধর্ম এই দুটো জিনিসকে নিয়েই চলে। কিন্তু এই দুটোর সাথে তারা আরও কয়েকটা জিনিসকে যোগ করেন, তার মধ্যে প্রথমটা হল প্রত্যক্ষ প্রমাণ আর দ্বিতীয়টা হল অনুমান প্রমাণ। অনুমানের ইংরাজী শব্দ হল inference, আর inferenceএর আরেকটা শব্দ হয়, একটা জিনিসকে infer করা বা conclusion draw করা। এরপর আরও কিছু প্রমাণ আছে, যেমন শব্দ প্রমাণ আছে, উপমান আছে, অভাব প্রমাণ আছে ইত্যাদি। এই জায়গাতে আমরা শুধু inferenceকে নিয়ে আলোচনা করছি।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ হল, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমরা যে জ্ঞান পাচ্ছি সেটাই প্রমাণ, প্রমাণ মানে সত্য। আমি দেখেছি, আমার আর এই ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। আমরা অনেক সময় কোন জিনিসকে চ্যালেঞ্জ করে বলি, আপনি কি এটা নিজে দেখেছেন? হ্যাঁ দেখেছি। এই জিনিসটাই যখন দর্শনে যাবে তখন ওনারা বলবেন, কেন সত্য হবে, দেখলেই যে ওটা সত্য হয়ে যাবে তা তো নয়। যেমন প্রত্যেক দিন আমরা দেখছি সূর্য উদয় হচ্ছে, সূর্য অস্ত যাচ্ছে, কিন্তু আজকে বিজ্ঞান বলছে সূর্যোদয়ও হয় না, সূর্যাস্তও হয় না, পৃথিবী সূর্যের চারিপাশে ঘুরছে। তাই দেখলেই যে ওটা সত্য হয়ে যাবে, তা তো হচ্ছে না। তাহলে কোথাও একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। ইসলাম ধর্মে বলা হয়, আমাদের মাথার আকাশটা হল একটা চাঁদোয়া, ওই চাঁদোয়ার মধ্যে তারাগুলো সব বসানো হয়েছে, এটাই আল্লার সৃষ্টি। কিন্তু আজকে আমরা জানছি, মাথার উপর কোন কিছু নেই, অনন্ত আকাশ, সেই আকাশে শুধু তারা নেই, অনেক কিছু আছে, গ্যালাক্সি রয়েছে, ধুমকেতু আছে, বড় বড় গ্রহ আছে, নক্ষত্র আছে। তার মানে ইসলামে তারা যেমনটি দেখেছিল, তেমনটি ব্যাখ্যা করেছে। বিজ্ঞান যেমন যেমন এগিয়ে যাচ্ছে, ধর্মের দেখা জিনিসগুলো তেমন তেমন পাল্টে যাচ্ছে। দুটো ট্রেন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে, একটা ট্রেন চলতে শুরু করল, পাশের দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনের বাচ্চা পরিষ্কার দেখছে তাদের ট্রেনটা পিছনের দিকে চলতে শুরু করেছে। আবার যে ট্রেনটা চলতে শুরু করেছে, সেই ট্রেনের বাচ্চা মনে করছে, তাদের ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে আর পাশের ট্রেনটা চলতে শুরু করেছে। তার মানে, আমরা নিজের চোখকে যে পুরোপুরি বিশ্বাস করব, তাতো করা যাচ্ছে না। যদি এই দুটোকে, সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত আর ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকা আর ট্রেনের চলাকে সামনে নিয়ে আসা হয়, তাহলে তো বলা মুশকিল হবে, কোথায় গিয়ে জিনিসটা দাঁড়াবে!

তখন এনারা নিয়ে এলেন যুক্তি। যুক্তি, যেটাকে আমরা অনুমান প্রমাণ বলছি। অনুমান প্রমাণের খুব আশ্চর্য জিনিস হল – আমরা যতই গভীরে যাই না, আর আমরা জানি না স্বামীজীর এটা নিজের কথা কিনা, কারণ স্বামীজী নিজেও প্রচুর পড়াশোনা করেছিলেন, সেইজন্য কোন ফিলজফারের কথা কিনা জানি না, কিন্তু যুক্তিটা একেবারে পুরোপুরি ঠিক। আমরা যেটাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে মনে করি আসছি, আসলে সেটা inference, অনুমান, যদিও এটা একটা টেকনিক্যাল টার্ম। ঠাকুর বলছেন, মা ছেলেকে বলে দিয়েছে; ও তোর দাদা। আর সে ষোল আনা জানে সে ওর দাদা। কিংবা মা বলে দিয়েছে, উনি তোমার বাবা। এখন সবাই যদি সবার বাবার জেনেটিক টেস্ট করতে শুরু করে, আমি দেখতে চাই উনি আমার বাবা কিনা, তখন কি হবে? কিন্তু আমরা ওদিকে যাই না, মা একজন ভদ্রলোককে দেখিয়ে বলে দিয়েছেন উনি তোমার বাবা, আমরা আর কোন প্রশ্ন করি না। আমি যখনই ওই ভদ্রলোককে দেখছি তখনই জানছি উনি আমার বাবা, কিন্তু পুরো জিনিসটা দাঁড়িয়ে আছে inferenceএর উপর। কেন inferenceএর উপর? কারণ ওই জ্ঞানটা এমন জায়গা থেকে এসেছে, আর ওই জ্ঞানটা এমন যুক্তির উপর আধারিত যে, যেখানে আর কোন প্রশ্ন করা যায় না। কি সেই যুক্তি? মা বলে দিয়ছেন।

প্রথমে এই জ্ঞানটা এলো একটা যুক্তি দিয়ে, তারপর সেটা আবার আমাকে কেউ শিখিয়ে দিয়েছে, এই জিনিসটা এই। আমি জীবনে প্রথম একটা আম গাছ দেখলাম। বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, বাবা এটা কি গাছ? বাবা বলে দিলেন আম গাছ। বাবার তো ভুলও হতে পারে। যারা অশিক্ষিত সমাজে বড় হয়েছে তারা জানবে, যেখানে লোকেদের অশিক্ষা, অজ্ঞান অনেক বেশি, সেখানে তারা জিনিসগুলিকে কিভাবে দেখে। কিছু দিন আগে একটা মজার লেখা বেরিয়েছিল। কয়েকজন বলছে, বাবা-মায়েরা তাদের বাচ্চাদের সামলে রাখার জন্য,

বোঝানর জন্য, ভয় দেখিয়ে রাখার জন্য, অনেক রকম মিথ্যা কথা বলে। বাচ্চারা বড় হয়ে যতদিন তারা বাস্তবটা না বুঝতে পারছে, ততদিন সেটা সত্য হয়ে থাকে; এর উপর অনেক রকমের মজার মজার ঘটনা আছে। আমরা যা কিছু শুনছি, দেখছি, সেটা মনের ভিতরে গিয়ে একটা ছাপ ফেলে, ওই ছাপটা পরে একটা আইডিয়া হয়ে যায়। নূতন কিছু যতক্ষণ না আমরা জানছি বা পড়ছি, ততক্ষণ আগে থেকে যেটা চলে আসছে (inference), সেটার সঙ্গে এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান গিয়ে মিলছে, সেটাকে আমরা বলছি জ্ঞান। তাই মজার ব্যাপার হল, প্রথমে একটা inference আসে, সেখান থেকে আমরা যেগুলো experience করছি, সেটার সাথে মিলিয়ে আমরা বলি, জিনিসটা এই রকম। ফলে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা যা কিছু দেখছি, বা করছি, সেগুলো দিয়ে আমাদের অনুমান বাড়াতেই চলে যায়, অনুমান এখানে টেকনিক্যাল টার্ম, আমরা বলতে পারি যুক্তির স্টোরহাউইস, inferences।

আর সমস্ত inferences দাঁড়ায় direct perceptionএর উপর। যেমন, একজন লোক সন্ধ্যেবেলা রাস্থা দিয়ে টলতে টলতে যাচ্ছে। আমাকে কেউ বলে দিল, লোকটা মদ খেয়েছে বলে টলতে টলতে যাচ্ছে। ওখানে আমার একটা জ্ঞান হয়ে গেল। এরপর আরেকজনকে দেখছি টলতে টলতে যাচ্ছে, তার যে পায়ে চোট আছে আমার জানা নেই। ওই inferenceকে আধার করে এবার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হয়ে গেল, যেহেতু সে টলতে টলতে যাচ্ছে সেইজন্য সে মাতাল। এর ফল কি হবে, একটা যদি আমার ভুল ইনফরমেশান থাকে, একটা যদি ভুল inference থাকে, একটা ভুল perception যদি আমার থাকে, তাহলে আমার সমস্ত জ্ঞানটাই ভুল হয়ে যাবে। একটু বিচার করে দেখলে দেখতে পাবো, আমার মনের ভিতরে যে জ্ঞানের ভাণ্ডার আছে, সেই জ্ঞানের ভাণ্ডার দিয়ে যা দেখছি, তাতেই তার সত্যতা প্রমাণিত হয়। আর যে সত্যগুলো আমি দেখছি, অনুভব করছি, সেটা দিয়ে এই যে inferenceগুলো রয়েছে, সেটা প্রমাণিত হয়। একটা প্রসঙ্গ নিয়ে এলে জিনিসটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। অযোধ্যা কাণ্ড নিয়ে বিরাট ঝামেলা চলছিল। নিম্ন আদালতে মামলার শুনানির পর যে রায় দেওয়া হল, যেটাকে পরে সুপ্রিম কোর্ট সরাসরি নাকচ করে দিলেন। এখানে আমরা মন্দির মসজিদ প্রসঙ্গ নিয়ে বলছি না, আমাদের আলোচ্য জিনিসটা কিভাবে চলে বোঝানর জন্য বলা হচ্ছে। মজার জিনিস হল, নিম্ন আদালতে যখন হেয়ারিং চলছিল তখন মন্দিরের বিরোধিতা করে যে কথাগুলো বলা হচ্ছিল, তখন সবাই বলছে কি দারুণ কথা বলছেন। ভাসাভাসা যখন শুনছে, তখন বলবে, কি দারুণ কথা বলেছে। মন্দিরের বিরোধিতা যারা করছে, তাদের একজন বলল, অমুক ঐতিহাসিক মিস্টার এক্স এই রকম কথা বলেছেন। সেই ঐতিহাসিক মিস্টার এক্সকে যখন জিজ্ঞেস করা হল, আপনি এই তথ্যটা কোথায় পেলেন। আমি এই তথ্যটা মিস্টার ওয়াইয়ের অমুক বইতে। মিস্টার ওয়াইও একজন নামকরা ঐতিহাসিক। মিস্টার ওয়াই আপনি এই তথ্য কোথা থেকে পেয়েছেন? মিস্টার ওয়াই আরেকজন ঐতিহাসিকের নাম নিয়ে বললেন, আমি মিস্টার জেড্এর অমুক বইতে পেয়েছি। মিঃ জেড্ আপনি কোথায় এই তথ্য পেলেন? আমি তো মিস্টার এক্সের বই থেকে পেয়েছি। অযোধ্যার মামলার শুনানি চলার সময় এই জিনিসটা বাস্তবিক এভাবেই হয়েছে। চক্রাকারে তথ্য ঘুরছে, কেউ জানতেই পারছে না সত্যটা কি। সেটাই বলছেন, Reasoning based on inference, inference is based on perception and perception is based on inference।

যারা নিজেদের লিবারেল বলে, আর যুক্তিবাদীরা যারা সব সময় বলছে 'যুক্তি, আমরা যুক্তি চাই', তারা এই যুক্তিটা বুঝবেও না যে এখানে কি যুক্তি চলছে; reasoning depends entirely on inference and perception। বিজ্ঞানে যা কিছু হয়, ওদের সবটাই চলে, তুমি জিনিসটাকে কি রকম দেখলে, সেখান থেকে চলে যাবে conclusionএ। এরপর ওনারা reasoning দিয়ে একটা pattern দাঁড় করাবেন। কিন্তু আরো গভীরে গেলে দেখা যাবে, ওদের অবজারভেশান যেটা, inference বলতে অবজারভেশনেই আছে, মানে perception যেটা, সেই percepetion depends on observartion, observation itself depends on observation। আগে আগে আমরা যেটা জেনেছি, সেটার উপর নির্ভর করবে আমার perception, যেমন কারুর কিছু হলেই আমরা বলি, ও আমার জানা আছে লোকটা ওই রকমই। কবে সে কি করেছিল, সেখান থেকে আমরা সব সময়ের জন্য ধরে নিচ্ছি লোকটা ওই রকমই। আগে কি একটা inference আমি করে রেখেছি, সেখান থেকে perception এসে যাচ্ছে। আর perception

এগিয়ে নিয়ে যায় inferenceকে। আর perception ও inference দুটো মিলে জন্ম দেয় reasoningকে। এই reasoning যেখানে আছে সেটাই বুদ্ধির এলাকা, বুদ্ধিটাই মায়ার এলাকা।

সেইজন্য স্বামীজী বলছেন, Reasoning itself, being based upon contradiction। কি contradiction? Perception আর inference, দুটো মূলতঃ contradiction। কেন? কারণ perception inferenceকে জন্ম দেয়, inference perceptionকে জন্ম দেয়। চোরে চোরে মাসতুতো ভাই। দুটো চোরকে ধরা হয়েছে, এই চোর বলবে, ও চুরি করেনি, অন্য চোর বলবে, ও চুরি করেনি, মাসতুতো ভাই কিনা; perception inference চোরে চোরে মাসতুতো ভাই, এক অপরের সঙ্গে কাজ করে। আমরা perception থেকে infer করে নিই, ওখান থেকে আমরা conclusion করে নিই। আগে থেকে যে জ্ঞানগুলিকে আমরা বহন করে আনছি, সেই জ্ঞানগুলির সাথে মিলিয়ে নূতন জ্ঞানকে আমরা আধার বানিয়ে নিই। আমি বেড়াল দেখেছি, কিন্তু সিংহ কি রকম জন্তু জানি না। আমাকে একজন সিংহের বর্ণনা দিয়ে দিল, সেটা থেকে বেড়ালের সাথে মিলিয়ে যখন চিড়িয়াখানায় সিংহ দেখছি, তখন বুঝে যাচ্ছি এটাই সিংহ। এই যে inference এটা partly observation আর partly perceptionএর উপর দাঁড়িয়ে আছে। তার মানে inference আর perception এক অপরের সাহায্য নিয়ে চলে। এবার কোন কারণে ওই perceptionকে আধার করে যদি আমার inferenceএ ভুল হয়ে থাকে, অর্থাৎ আমি যেটা সিংহ মনে করছি, আসলে ওটা সিংহ নয়, হয়ত অন্য কোন জন্তু, তাহলে কি হবে? পুরো জিনিসটাই collapse করে যাবে। গভীরে গিয়ে দেখলে দেখা যাবে, inference, perceiption আর reasoningকে কখনই আমরা শেষ সত্য বলতে পারছি না।

কিন্তু আমাদের কাঁচা মন, বুদ্ধির দম নেই, আমরা সেইজন্য জানতে চাই, এই ব্যাপারে বিজ্ঞান কি বলে। কিন্তু কজন বিজ্ঞানকে জানে বা বোঝে? হ্যাঁ, টেকনলজিটা সবাই জানে ও বোঝে, তাই টেকনলজিই সম্মান পায়, টেকনলজির সাথে বিজ্ঞানের কোন সম্পর্ক নেই। অনেক ক্ষেত্রেই টেকনলজি আগে হয়ে গেছে, তার অনেক পরে বিজ্ঞান তার অনুসরণ করেছে। একজন উচ্চমানের সাহিত্যিক বা কবি, তাঁর উচ্চমানের কোন রচনার একটা চ্যাপ্টার বা একটা কবিতা বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের এক একটা পিএইচডির সমান। বৈজ্ঞানিকরা একটা আইডিয়াকে নিয়ে এক্সপ্লোর করেন বা একটা গাণিতিক কোন ইক্যুয়েশানের রিজিনিং দিয়ে বা এক গুচ্ছ অবজারভেশনস্ আর এক গুচ্ছ ইনফারেনসেস্ এনে একটা conclusionকে এনে দাঁড় করাচ্ছেন, তাঁর বক্তব্যটা একটা প্যারাগ্রাফে দিয়ে দেওয়া যাবে। যে কোন বড় লেখকরা ঠিক এটাই করেন। তাঁদের এক একটা প্যারাগ্রাফ বিজ্ঞানের এক একটা পিএইচডির সমান। আর ঠিক এই কারণে বড় বড় লেখকদের উপর পরে অনেকি পিএইচডি করে ডক্টরেট হয়ে যাচ্ছে। আইনস্টাইন বা নিউটন এনারা ব্যতিক্রম, মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া কোন বিজ্ঞানীদের উপরে কেউ পিএইচডি করেন না। আমরা যাদের বিজ্ঞানী বলে মনে করি, যারা পিএইচডি করছেন, মূলতঃ তারা খুব সাধারণ মনের লোক।

সমস্যা হল, তুলনামূলক ভাবে বৌদ্ধিক জগতে বিজ্ঞানের বিরাট সম্মান। বিজ্ঞানের এত সম্মান কেন? টেকনলজির জন্য। বিজ্ঞান তো কেউ বোঝে না; বিজ্ঞানের যুক্তি কতটুকু বুঝবে! আমরা বলছি পিএইচডি ইন সাইন্স, পিএইচডি ইন ফিজিক্স, পিএইচডি ইন কম্প্যুটার সাইন্স। আসলে এরা একটা আইডিয়াকে ধরে, দশটা observations, দশটা inferences, দশটা reasoning এনে দাঁড় করাচ্ছে। যদি পিএইচডি বলতে আমরা মনে করি, আইডিয়ার জগতে এক্সপ্লোর করছে, তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে, যে কোন উচ্চমানের সাহিত্যিক তাঁর একটা পাতাতে আইডিয়ার জগতে এক্সপ্লোর করার সেই একই গভীরতা থাকে। যে কোন রচনা যদি আমাকে দ্বিতীয়বার পড়তে হয়, যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা কতবার পড়ছি, বুঝতে হবে এটা একটা মাস্টারপিস। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা হলাম বালবুদ্ধি সম্পন্ন, আমরা যেটাকে reasoning বলছি, আমরা ভুলে যাচ্ছি সেটা আসলে inference আর perceptionএর উপর দাঁড়িয়ে আছে। Inference perceptionএর উপর দাঁড়িয়ে আছে, perception inferenceএর উপর দাঁড়িয়ে আছে, আর আমরা খোল করতাল নিয়ে যুক্তির বন্যা বইয়ে বলে যাচ্ছি আমরা যুক্তিবাদী, আমরা যুক্তিবাদী।

Reasoning দাঁড়িয়ে আছে inference আর perception এই দুই ঠ্যাংএর উপরে, এই দুই ঠ্যাং আবার এক অপরের উপর দাঁড়িয়ে আছে। তর্কশাস্ত্রে এটাকে বলে টটোলজি (tautology), যার অর্থ হল আমি 'A' দিয়ে 'B' প্রমাণ করছি আর 'B'কে প্রমাণ করছি 'A'কে দিয়ে, which is considered to be very wrong form of logic। আর স্বামীজী এখানে ওই লজিকের সীমাবদ্ধতাকে দেখিয়ে দিচ্ছেন। আমরা এখানে খুব বেসিক তথ্য নিয়েই আলোচনা করছি, ধারণাতেও গেলাম না। যেমন বলা হল, মা বলে দিয়েছেন, উনি তোমার বাবা হন; এখন এই একটা বাক্যের উপর সব কিছু চলছে। এখানে একটা তথ্য রয়েছে, যেটাকে সবাই inferentially conclude করে নিয়েছে। ঠিক এই রকমই, ঠাকুর বলছেন, বাবা-মা মনে করে ছেলের বিয়ে দেব, রোদে জ্বলেপুড়ে তেতে এলে একটা ছায়ার তলায় জিরোবে। এই ভেবে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হল। কিছু দিন যেতে না যেতেই বাবা-মা দেখছে, ছেলে আমার জ্বালামুখীর গহ্বরে জ্বলছে। মানুষ যখন কারুর সাথে প্রেম করে, কাউকে ভালবাসে তখন ভাবে আমি ভাল থাকব। তারপর তার থেকে যখন আঘাত পায় তখন চোখের জল ফেলে।

মার্কস অরিলিয়াস একজন খুব নামকরা রোমান দার্শনিক ছিলেন, তিনি আবার ১৬১ থেকে ১৮০ সাল পর্যন্ত রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট ছিলেন। তাঁর স্ত্রী যে পুরুষকেই কাছে পেত, তাকে টেনে বিছানায় নিয়ে যেত। যদি অরিলিয়াসকে যুদ্ধ করতে হত, উনি দিনের বেলায় যুদ্ধ করে এসে রাত্রিবেলা ফিলজফি লিখতে বসে যেতেন, আর তাঁর নামকরা নামকরা সব ফিলজফির বই আছে, সব কটা বই খুব উচ্চমানের। এদিকে তাঁর স্ত্রী কোন পুরুষকেই ছাড়ত না। সব খবরই রাজার কাছে আসে, রাজা সব শুনে বলেন, 'না না, এরকম কাজ ও করতেই পারেনা, she is pure' কিন্তু সবাই জানে তাঁর স্ত্রী কি করে বেড়ায়। মহিলাটি ভাগ্যিস অরিলিয়াসের অনেক আগেই মারা গেল। স্ত্রী মারা যেতে তিনি চোখের জলে ভেসে গেলেন, কোন দিন আর কাউকে বিয়ে করলেন না, কাউকে ভালবাসলেন না। তিনি একজন ফিলজফার, নিজের চিন্তার জগতে ডুবে থাকতেন। সেই চিন্তার জগতে একটা inference করে নিয়েছেন, perception যেটা হচ্ছে, কানে যে খবর আসছে উনি সেটাকে মানতে চাইছেন না।

ঈশ্বর ব্যতিরেকে সব শূন্য - আনন্দের প্রকাশভঙ্গিটাই প্রমাণ

স্বামীজী এরপর বলছেন, Ignorance reflecting the light of God of is seen; but by itself it is zero. The cloud would not appear except as the sunlight fall on it. (*অজ্ঞানে যখন ব্রহ্মজ্যোতিঃ প্রতিফলিত হয়, তখনই অজ্ঞান দৃশ্য হয়। স্বতন্ত্র ভাবে ধরলে সেটা শূন্য ছাড়া কিছুই নয়। মেঘে সূর্যকিরণ প্রতিফলিত না হলে মেঘকে দেখাই যায় না।*) মায়াকেই স্বামীজী ব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন। অজ্ঞান ততক্ষণই আছে যতক্ষণ ঈশ্বরের শক্তি তার পিছনে আছে। ঈশ্বরের শক্তি যদি না থাকে, অজ্ঞান জিরো। আমরা এই মাইক্রোফোনকে দেখছি, এই পেনকে দেখছি, কারণ এর পিছনে ঈশ্বরের সত্তা রয়েছে। এর পিছনে ঈশ্বরের সত্তা যদি না থাকত আমরা এগুলো দেখতে পারতাম না। পুরাণাদি শাস্ত্রে বার বার বলা হয় যে, প্রভু সব কিছুতেই আপনি আছেন, সৎএ আছেন, মন্দতে আছেন, ভালতে আছেন, দুষ্টতে আছেন, শিষ্টতে আছেন। কারণ আপনি যেটাতে থাকবেন না, সেটা হয়ে যাবে অনীশ্বর। ঈশ্বরের একটা নাম সৎ, সৎ মানে সত্তা। ঈশ্বর যেখানে নেই, সেখানে সত্তা নেই। এই মায়ারও সত্তা আছে। কতক্ষণ সত্তা আছে? যতক্ষণ ঈশ্বরের আলো আছে। কিভাবে? যেমন মেঘ, যদি আলো না থাকে, আমরা জানতেও পারব না যে মেঘ আছে। সূর্যের আলো আছে বলে মেঘকে দেখা যায় ও জানা যায়। স্বামীজী একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন। জগতে আমরা এত কিছু দেখতে পারছি, ঈশ্বরের আলো আছে বলেই দেখতে পারছি। মায়ার নিজের কোন অস্তিত্ব নেই, মায়া by itself zero। বেদান্তের এটা একটা খুব শক্তিশালী মত যে, মায়ার নিজের একটুও অস্তিত্ব নেই, ঈশ্বর আছেন বলে মায়ার অস্তিত্ব আছে। ঠাকুর খুব সুন্দর বলছেন, শূন্যের কোন দাম নেই, কিন্তু শূন্যের প্রথমে যদি এক বসিয়ে দেওয়া হয়, তখন ওই শূন্যগুলির দাম দশ গুণ করে বেড়ে যায়। ঈশ্বর হলেন সেই এক, বাকি সব শূন্য। মায়া নিজে শূন্য, কিন্তু তার যে দাম, ওই এক আছেন বলে।

এই কথা বলার পর, স্বামীজী ঠাকুরের খুব নামকরা গল্প বলছেন। চারজন বন্ধু একটা জায়গায় গেছে, সেখানে একটা উঁচু প্রাচীর। প্রাচীরের ওপারে বিরাট আনন্দের হাট চলছে। একজন বন্ধু কোন রকমে প্রাচীরের

উপর উঠে সেই আনন্দের হাট দেখে হাঃ হাঃ করে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে গেল। সে এসে আর কোন খবর দিতে পারল না। দ্বিতীয় জনও তাই, তৃতীয় জনও তাই করল। চতুর্থ জন দেখছে, যে ওদিকে যাচ্ছে সে আর ফিরে আসছে না, ওদিকেই থেকে যাচ্ছে। সেই চতুর্থ জন নিজে এবার প্রাচীরের উপর উঠে দাঁড়িয়ে দেখল, দেখার পর নেমে এলো, নেমে এসে এপারের সবাইকে খবর দিচ্ছে, ওপারে কী আনন্দের হাট! এই কাহিনীটা বলার পর স্বামীজী বলছেন, The sign to us that there is something beyond is the laugh that rings back from those great ones who have plunged from Maya's wall, (*এই সংসার-প্রপঞ্চের বাইরে যে কিছু আছে, আমাদের কাছে তার প্রমাণ হচ্ছে –যে-সকল মহাপুরুষ মায়ার দেয়াল বেয়ে ভিতরের দিকে পড়েছেন, তাঁরা পড়বার আগে যে আনন্দে হাঃ হাঃ করে হেসে উঠেন, সেই হাস্য।*) খুব মূল্যবান কথা। মায়ার পারে যে বিরাট এক আনন্দের হাট, সেটাকে আমরা কি করে জানব? জানার কোন পথ নেই। কারণ মায়ার পারে বুদ্ধি আর কাজ করে না। কিন্তু কি থাকে? যাঁরা মায়ার পারের ওই জ্ঞান, অর্থাৎ সচ্চিদানন্দের জ্ঞান পেয়েছেন, তাঁদের সেই আনন্দের আভাসটুকু থাকে। ঠাকুর, ক্যানসার রোগাক্রান্ত হয়ে একটা হাড়গোড় বার করা জীর্ণ শরীর নিয়ে পড়ে আছেন, কিন্তু তিনি আনন্দে ভাসছেন। যীশু ক্রুসিফাইড হচ্ছেন, তাও আনন্দে ভাসছেন। ভগবান বুদ্ধ আনন্দের হাট খুলে বসে আছেন। এই যে তাঁদের ভিতরে আনন্দের জোয়ার, এই আনন্দ দিয়েই বোঝা যায় যে, তাঁরা মায়ার পারে রয়েছেন। এছাড়া মায়ার পারের আনন্দের হাট সম্বন্ধে জানার কোন পথ নেই। যাঁর নির্বিকল্প সমাধিতে ডুবে লীন হয়ে আছেন, সেটা দিয়ে কিছু বোঝা যায় না। কিন্তু ঠাকুরের মত পুরুষরা, যাঁরা মায়ার পারের খবর দিচ্ছেন, তাঁদের মুখে যে হাসি, সেই হাসির দিকে তাকালেই মনে হয় আরে, এই রকম ফুটি ফাটা হাসি তো কারুর মুখে দেখা যায় না। শাস্ত্র, বেদ, উপনিষদ অধ্যয়ন করে বুঝতে পারছে, আরে এইতো সেই আনন্দের আভাস, তখন মানুষ এইদিকে আকর্ষিত হয়। বাকিরা কেউ বিশ্বাস করবে না।

আমরা প্রথমের দিকে আলোচনা করেছিলাম যে, আচার্য শঙ্কর বেদান্তের উপর অর্থাৎ গীতা, উপিনষদের উপর ভাষ্য লিখলেন, ভাষ্যে *অহং ব্রহ্মাস্মি, তত্ত্বমসি* আদি উপনিষদের আধ্যাত্মিক মূল ভাবগুলিকে নীতিশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্রের সব নিয়মকে বহাল রেখে প্রখর যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করে বলে দিলেন এটাই সত্য। এই জিনিসগুলো এমন explosive জিনিস যে, যে হিন্দুরা হাজার হাজার বছর ধরে উপনিষদ পড়ে আসছে, অথচ আচার্য শঙ্কর যেমনি বললেন এটাই সত্য, দেশে আগুন লেগে গেল। মানুষ স্বভাবে বর্বর, তর্ক করবে, একটা তর্ক, দুটো তর্ক করার পর তৃতীয় তর্কতেই গালাগালিতে নেমে পড়বে। আচার্য শঙ্করকে এবার সবাই গালাগাল দিতে শুরু করল। আচার্য শঙ্করকে বিধবা পুত্র বলে সবাই গালাগাল দিতে নেমে পড়ল। কারণ তাঁর জন্মের আগে বাবা মারা গিয়েছিলেন। বিধবার পুত্র মানে বাস্টার্ড চাইল্ড। আচার্য শঙ্কর কি করলেন? যুক্তি দিয়ে দেখিয়ে দিলেন *অহং ব্রহ্মাস্মি*, এটাই সত্য। দেশ এই সত্যকে নিতে পারল না। বারশ তেরশ বছর পড়ে থাকল, এর মধ্যে রামানুজ, মাধ্বাচার্য এলেন, গেলেন। এরপর এলেন স্বামীজী; *অহং ব্রহ্মাস্মি*, যে সত্য এতদিন দর্শনে আবদ্ধ হয়ে ছিল, সাধারণ লোকেরা এই সত্যকে জানত না, সেই সত্যকে স্বামীজী ঘরে ঘরে নামিয়ে দিলেন। শুধু ঘরে ঘরে ঢুকিয়ে দিলেন না, তিনি দেখিয়ে দিলেন এটাই কিভাবে বাস্তব, এটাকেই কিভাবে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করা যায়। যদি এই সত্যকে অনুশীলনে নামানো যায়, তাহলে আমাদের শক্তি, আমাদের শান্তির কোন দিন অভাব হবে না। *অহং ব্রহ্মাস্মি*, আমিই সেই, এই সত্যের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখে নিজেকে এবং অপরকে এবার জাগাতে হবে।

জ্ঞান আমাদের হাতে নেই, এর আগে আমরা ধর্মমেঘ সমাধি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। ধর্মমেঘ সমাধিতে তাঁর ধর্মভাব, তাঁর পূণ্যভাব, সব কিছু একেবারে উচ্চাবস্থায় চলে গেছে, কিন্তু তখনও তাঁর চরম উপলব্ধি হবে না। উপলব্ধি তখনই হবে, যখন *যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ*, আত্মা যখন বরণ করবেন, তখনই হবে। দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে ঠাকুর ছটফট করে যাচ্ছেন, মা দেখা দে, মা দেখা দে বলে কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছেন, কিন্তু কিচ্ছু হল না। মা যখন দেখা দিলেন, তখন দেখা পেলেন, তাঁর ইচ্ছা। সেই জ্ঞানের ঠিক নীচে আরেকটা জ্ঞান আছে, সেটা হল থিয়োরেটিক্যাল কনভিকশান্, অর্থাৎ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে আমি শুদ্ধ আত্মা, শুদ্ধ আত্মা সর্বব্যাপী। সর্বব্যাপী মানেই, না আমি জড়, না আমি পদার্থ, না আমি বস্তু। সর্বব্যাপী মানেই, আমার নাশ ভগবানও করতে পারবেন না, অন্যদের কি আর কথা। সর্বব্যাপী মানেই, আমার ভিতরে সমস্ত শক্তি, আমার

ভিতরে সমস্ত জ্ঞান। স্বামীজী আরও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নামিয়ে বলছেন, যখন একজন মুচি এই ভাব নিয়ে জুতো সেলাই করবে, সে আরও ভাল একজন মুচি হবে। আর স্বামীজী যে বলছেন, নূতন ভারত বেরিয়ে আসুক ধীবরদের কুটির থেকে, চাষীদের কুটির থেকে, মুচিদের কুটির থেকে, এই কথাগুলো স্বামীজী একেবারেই ইমোশানালি বলছেন না; স্বামীজী এখানে একটা আধ্যাত্মিক সত্যকেই সামনে নিয়ে আসছেন। কি সেই সত্য? দেশের যিনি রাজা, তাঁর সত্তার যে মূর্তরূপ, সেই একই সত্তার মূর্তরূপ তুমি, আমি সবাই। তফাৎ শুধু শক্তির তারতম্যে। ঠাকুর বার বার বলছেন, শক্তি মানতে হয়। শক্তিটা কার? সেই যে সত্তা, যাঁর মূর্তরূপ আমরা সবাই, শক্তিটাও তাঁরই। সেই সত্তা কোথাও মনে করেছেন, আমি শক্তিমান, একজন শক্তিমান রূপে দাঁড়িয়ে গেলেন। ছোটবেলা থেকে বাড়ির বড়দের কাছ থেকে আমরা শুনে আসছি, তুই একটা অপদার্থ, তোর দ্বারা কিছু হবে না। আমরাও বিশ্বাস করে নিয়েছি, আমি অপদার্থ, আমার দ্বারা কিছু হবে না। তেমনি শূদ্র জাতিদের বলে দিল, তোমরা জন্ম থেকেই শেষ। ওরাও মেনে নিল, আমরা শেষ। স্বাধীনতার পর হঠাৎ যখন সব খুলে গেল, তখন দেখছে, আমি তো ওই কাজই করতে পারি, যেটা অন্য লোকেরা করতে পারে। নেতারা দেশে আইন এনে যেটা বলছে, ইমোশানালি যেটা বলছে, স্বামীজী সেটাকে একশ বছর আগে আধ্যাত্মিক সত্যকে আধার করে বলে গেছেন।

দেববাণী যদি কেউ নিজে থেকে পড়তে যায়, আগে তার আইডিয়াস গুলি যদি পরিষ্কার না থাকে; স্বামীজী এই কথা কিসের উপর ভিত্তি কর বলছেন, যদি ধরতে না পারে, সে কোন দিন দেববাণী বুঝতে পারবে না। স্বামীজী যাবতীয় যত কথা বলছেন, শুধু একটা কথা *অহং ব্রহ্মাস্মি* বা *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*, ব্রহ্মই আছেন আর তুমিই সেই ব্রহ্ম, এই দুটো কথাকে যদি একটি কথায় মিলিয়ে দেওয়া হয়, এই একটি কথারই ব্যাখ্যা হল পুরো দেববাণী। পুরো বেদান্ত বলতেও তাই, এই একটা বাক্য। ঈশ্বরই আছেন, তুমি সেই ঈশ্বরের সন্তান, বেদান্ত বলছে, ব্রহ্মই আছেন আর তুমি সেই ব্রহ্ম। সমস্ত শাস্ত্র এই একটি কথারই বিস্তার। কিন্তু তাতে কি হল! ভাববার কথায় স্বামীজী বলছেন, সব কথা বলার পর তার শুনে খুব ভাল লাগল, বাঃ বাঃ খুব সুন্দর কথা, বলেই পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল। সমস্যা আমাদের এটাই, আমাদের ভাণ্ডারে অনেক উঁচু উঁচু কথা আছে, আমরা সেই সব কথা বলছি, শুনছি, কিন্তু শোনার পর আবার পাশে ফিরে যেমনটি ছিলাম তেমনটি হয়ে যাই। উচ্চ আদর্শ, উচ্চ কথা, উচ্চ ভাব নেওয়ার মত ক্ষমতা আমাদের নেই, নিতে পারলেও ধরে রাখতে পারি না। এই কথা বলার পর স্বামীজী এবার ঈশ্বর কে বলছেন।

আমার আপনার 'ঈশ্বর' কিভাবে এলেন

Separating ourselves from the Absolute and attributing certain qualities to It give us Ishvara. (*আমরা যখন সেই পূর্ণ সত্তা থেকে নিজেদের পৃথক করে তাতে কতকগুলি গুণের আরোপ করি, তখন তাঁকেই 'ঈশ্বর' বলি।*) শিব কে, বিষ্ণু কে, শ্রীরামকৃষ্ণ কে? সেই যে অনন্ত, সেই যে ব্রহ্ম, প্রথমে তুমি নিজেকে জোর করে সেখান থেকে আলাদা করে নিয়েছ, তারপর তোমার মন থেকে দশ খানা গুণ তাঁর উপর চাপিয়ে দিচ্ছ, আর বলছ তুমি বড়, তুমি ঈশ্বর। কিন্তু আসলে তুমি তো সেটাই। তাঁর উপর দশ খানা গুণ চাপিয়ে দেওয়ার পর তুমি বলছ, হে প্রভু কৃপা কর, দয়া কর, প্রভু আমাকে নাশ করে দিও না। স্বামীজির এসব কথা ভক্তিমার্গের লোকেরা শুনলে আগুন লাগিয়ে আমাদের জ্বালিয়ে শেষ করে দেবে। দ্বৈতবাদীরা তাই আচার্য শঙ্করকে সহ্য করতে পারত না। আচ্ছা, স্বামীজী যা বলছেন, এগুলোকে না হয় আমরা কিছুক্ষণের জন্য ছেড়ে দিলাম; গীতার পঞ্চম অধ্যায়ে ভগবান অর্জুনকে বলছেন, *নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ। অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।।* সর্বব্যাপী সেই ভগবান তোমার পাপও গ্রহণ করেন না, তোমার পূণ্যও গ্রহণ করেন না। এই শ্লোকের ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর নিজেই প্রশ্ন উত্থাপন করছেন, তাহলে পূজাদিতে যা কিছু অর্পণ করা হয়, সেগুলো কে গ্রহণ করেন? নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তরে আচার্য বলছেন, তোমার অজ্ঞানই নেয়, এছাড়া আর কেউ নেয় না। তোমার অজ্ঞানই গ্রহণ করছে তোমার পাপ, তোমার অজ্ঞানই গ্রহণ করছে তোমার পূণ্য, তোমার অজ্ঞানই পূজা করছে, ওই অজ্ঞানই তোমাকে বলছে, তিনি ফল দিচ্ছেন, ওই অজ্ঞানই তোমাকে বলছে, তিনি আমাকে কৃপা করছেন, ইত্যাদি। এই ধরণের কথা বেশি বলাও

যায় না, শুনলে আতঙ্ক ধরে যায়, কিন্তু এটাই সত্য। খ্রীশ্চানদের দেশে বসে ওদেরকে স্বামীজী এই ধাক্কাটা মারছেন।

সেই অনন্ত ব্রহ্ম, সেই অনন্ত ঈশ্বর, এর বাইরে কিছু নেই, কিন্তু তুমি নিজেকে সেখান থেকে আলাদা করে নিয়েছ। যিনি সর্বব্যাপী অনন্ত ব্রহ্ম, শুদ্ধ চৈতন্য, যেটা আমি নিজে। আমার মধ্যেই অনন্ত শক্তি, আমার মধ্যেই অনন্ত জ্ঞান। কিন্তু আমি নিজেকে ওখান থেকে আলাদা করে নিয়েছি, আলাদা করে তাঁর উপরে কয়েকটা গুণ চাপিয়ে দিয়েছি। প্রথম গুণ হল, প্রভু তুমি স্রষ্টা, প্রভু তুমি পালনকর্তা, প্রভু তুমি সংহার কর্তা; এরপর আরেকটা উপাধি দিলাম – জগৎ। ওর মধ্যে আরও এক গুচ্ছ উপাধি চাপিয়ে দিলাম, আমি, আপনি, তিনি, পশু, পাখি, কীট পতঙ্গ সব কিছু। কোথাও কিছু নেই, একমাত্র শুদ্ধ আলোই আছে, শুদ্ধ আলোর উপর জালি, সেই জালির উপর আরেকটা, তার উপর আরেকটা জালি, এই করে করে হাজারটা জালি চাপানো আছে; এরপর জালিগুলোর ফোঁকরের মাঝখান দিয়ে শুদ্ধ চৈতন্যের যে আলো আসছে, তাতে সব অন্য রকম দেখাচ্ছে; আসলে কিছু নেই।

তাহলে স্বামীজী কি বলতে চাইছেন, ঈশ্বরের পূজা, আরাধনা, প্রার্থনা না করেই তোমরা ওখানে পোঁছে যাবে? না, স্বামীজী কখনই তা বলতে পারেন না, কারণ এভাবে কোন দিন আমরা ওখানে পোঁছাতে পারব না। আমরা এর উপর আগেও আলোচনা করেছি, যেখানে বলা হয়েছিল, অজ্ঞান নাশের জন্য প্রথমে অজ্ঞানরই দরকার হয়, তাই প্রথমে সেই ঈশ্বরেরই পূজা করতে হবে। আর সমস্ত ভ্রান্তি, দুর্বলতা, অপবিত্রতাকে counter করে করে আগে ওই অবস্থায় যেতে হবে, তখন শেষে ওই অজ্ঞানের জালটা ছিঁড়ে যায়। কিন্তু কাঁচা অবস্থাতেই কেউ যদি বলতে শুরু করে, আমিই শ্রীরামকৃষ্ণ, বুঝতে হবে তার সর্বনাশের আর বাকি নেই। অথচ সত্য ওটাই, সেই সত্যে পোঁছানর জন্য, যে মিথ্যা বা অজ্ঞান সৃষ্টি করা হয়েছে, সেই মিথ্যাকে নাশ করার জন্য, আরেকটা মিথ্যার সাহায্য নিয়ে মিথ্যার নাশ করতে হবে। শুনলে মনে হবে খুব জটিল ব্যাপার, কিন্তু যুক্তি খুবই সাধারণ। বাংলায় যেটাকে বলা হয় কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা, কন্টকৈব কন্টকম্, একটা কাঁটা দিয়ে আরেকটা কাঁটাকে তোলা। তুমি প্রথম মিথ্যা তৈরী করেছ ঈশ্বরকে সৃষ্টি করে, দ্বিতীয় মিথ্যা এই জগতের সৃষ্টি, তৃতীয় মিথ্যা জীব সৃষ্টি। মিথ্যার সৃষ্টি তুমিই করেছ, তুমিই আগুন লাগিয়েছ, তোমাকেই আগুন নেভাতে হবে। কিভাবে নেভাবে? যাকে যেভাবে সৃষ্টি করেছ, সেইভাবে। এবার তুমি পিছনের দিকে নিয়ে ঢুকিয়ে দাও। আসলে এটা যোগশাস্ত্রেরই পদ্ধতি, গাছ বীজ থেকে বেরিয়েছে, এবার ওই কার্যকে কারণে ফেরত নিয়ে যেতে হবে। আরবদের বা মুসলমানদের জিন নিয়ে অনেক কাহিনী আছে। একটা বোতলের মধ্যে একটা জিন বন্দি ছিল। কিভাবে বোতল থেকে জিন বেরিয়ে এসে বলছে, এত দিন আমি বোতলে বন্ধ ছিলাম, বোতল থেকে এবার আমি ছাড়া পেয়েছি, আমি তোমার ঘাড় মটকে তোমাকে খাবো। লোকটি ভয়ে আতঙ্কে অস্থির হয়ে উঠেছে। সেই সময় ওখান দিয়ে একজন যাচ্ছিল, দেখছে লোকটি তো খুব সমস্যায় পড়েছে। সব শুনে লোকটি বলছে, এত বড় জিন এই ছোট্ট বোতলের মধ্যে থাকত, হতেই পারে না, তুমি মিথ্যা কথা বলছ। এই করে করে দুবার তিনবার তাঁতাতেই জিনকে বলছে, তুমি আগে করে দেখাও। জিন শাঁ করে বোতলে ঢুকে গেল, লোকটি সঙ্গে সঙ্গে বোতলে ছিপি লাগিয়ে বোতলটা আবার সমুদ্রে ফেলে দিল। সমস্ত জীব, জগৎ, ঈশ্বর যা কিছু আমরা দেখছি, সব বোতল থেকে জিনটা বেরিয়ে এসেছে। এই জিনকে এবার সেই বোতলে ঢোকাতে হবে। কিভাবে ঢোকাবে? সবারই পথ আলাদা।

এই কথা বলার পর স্বামীজী বলছেন, It is the Reality of the universe as seen through our mind. (*ঈশ্বর হচ্ছেন –আমাদের মনের দ্বারা দৃষ্ট এই জগৎপ্রপঞ্চের মূল সত্তা।*) বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে সত্য, সেই সত্যকে আমি যখন মন দিয়ে দেখছি, তখনই ঈশ্বর আসেন। যখন মন দিয়ে দেখছি না, তখন নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম। Personal devil is the misery of the world seen through the minds of the superstitious. (*জগতের সমুদয় মন্দ ও দুঃখরাশিকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন যে ভাবে দেখে, তাকেই 'শয়তান' বলে।*) নিজের ভিতর অনেক দুর্গুণ রয়েছে, নিজের ভিতরে অনেক দুর্বলতা রয়েছে, অনেক কাপুরুষতা রয়েছে, এগুলো পার্সোনাল। এটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস, আগেও একবার বলা হয়েছিল, জগৎটা যে কতটা অনিত্য। যখন জ্ঞান হয়, তার খুব সুন্দর বর্ণনা আছে ভগবান বুদ্ধের। জ্ঞানের ঠিক আগে মাড় এসে ভগবান বুদ্ধকে ভয়

দেখাচ্ছে, প্রলোভন দেখাচ্ছে। যীশুর জীবনেও একই জিনিস হয়েছিল। ঠাকুরও বর্ণনা করছেন, তাঁকে কত রকমের ভয় দেখাচ্ছে, প্রলোভন নিয়ে আসছে। বর্ণনা কিন্তু কারুর সাথে কারুর মিলছে না। মিল না থাকতে পারে, কিন্তু একটা জিনিস সবারই ক্ষেত্রে আসছে, প্রলোভন। এই প্রলোভনকে বৌদ্ধ ধর্মে মাড় বলে; ঠাকুর এর জন্য কোন শব্দ দেননি। খ্রীশ্চান ধর্মে এটাকে ডেভিল বলে। যত কটা ডেভিল আছে, এটাও তোমার সৃষ্টি করা। যতগুলো নরক আছে, সব তোমার সৃষ্টি করা। তোমার মধ্যে যে ভয় আছে, কুসংস্কার বশতঃ তোমার মধ্যে যে ভ্রান্ত বিশ্বাসগুলো আছে, ওগুলোকেই মন দ্বারা বাড়িয়ে বাড়িয়ে বড় করে দেখছে, তখন ওটাই নরক দেখাচ্ছে। আমাদের মনটাই সব, এই মনই শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে ঈশ্বর রূপে দেখিয়ে দিচ্ছে, আর নিজের ভিতরে যে দুর্বলতা, কাপুরুষতা, ভয়-ভ্রান্তিগুলো আছে, সেগুলোকে মন যখন বড় করে দেখছে, এগুলোই তখন জগতের যত দুঃখ-কষ্টের কারণ হয়ে যায়; স্বামীজীও তাই বলছেন, Personal devil is the misery of the world seen through the minds of the superstitious।

প্যারাডাইস লস্টে নরকের বর্ণনা আছে, দান্তে বর্ণনা করছেন, মিল্টন করছেন, আমাদের পুরাণ নরকের বর্ণনা করছেন। দুটো চারটে কথা দিয়ে স্বর্গের বর্ণনা হয়ে যায়, সুন্দর বাগান, নদী দিয়ে জল প্রবাহিত হয়ে চলেছে, ইসলামে বাহাত্তর জন হুড়ি এক একজনকে সেবা করছে, খাওয়ার আইটেম এত রকমের, পেয় এত রকমের, এখানেই স্বর্গের বর্ণনা শেষ হয়ে যায়। হিন্দুদের স্বর্গে রম্ভা, মেনকা, তিলোত্তমা সব অপ্সরা আছে, একই রকমের নারী, তার বেশি কিছু নেই। কিন্তু যেমনি নরকের বর্ণনা করতে নামে, ওই বর্ণনা পড়লেই আতঙ্ক লেগে যাবে। আর দু-এক রকমের নরকের বর্ণনা নেই, হাজার হাজার রকমের নরকের বর্ণনা। স্বামীর সাথে স্ত্রী ঝগড়া করলে এই রকম নরকে যাবে, স্ত্রীর সাথে স্বামী ঝগড়া করে এই রকম নরকে যাবে, মিথ্যা কথা বললে এই রকম নরক, চুরি করলে এই রকম নরক তার জন্য অপেক্ষা করে আছে। আর সেখানে কি কি না করছে, দাঁড় করিয়ে করাত দিয়ে চিড়ছে, আগুনের কড়াইতে ভাজছে, মানে হাজার হাজার রকমের নরকে হাজার রকম নিপীড়ন চলছে। জগতে বেশি সুখ নেই বলে স্বর্গের বর্ণনা করতে পারে না। কিন্তু যেহেতু জগতে শুধু দুঃখই আছে, চারিদিকে শুধু দুঃখ আর দুঃখ, সেইহেতু এই দুঃখ-কষ্টকে বিরাট আকার দিয়ে যখন মনের একটা স্তরের বাইরে নিয়ে চলে গেল, তখন তৈরী হয়ে গেল একটা নরক। নরকের যে মালিক, এগুলোকে যে সৃষ্টি করেছে, সে হয়ে গেল ডেভিল।

স্বামীজী তাঁর খ্রীশ্চান শিষ্যদের বোঝাচ্ছেন গড্ আর ডেভিল দুজনই তোমার মনের সৃষ্টি। খ্রীশ্চান ধর্মে গড আর ডেভিল, এই দুটো শব্দ বার বার আসে। গড্ কে? তোমার মন দিয়ে যে সচ্চিদানন্দের উপর গুণের পর গুণ চাপিয়ে দিচ্ছ, তিনিই তোমার গড্, তার বাইরে কিছু নেই। ডেভিল কে? জগতের দুঃখ কষ্টকে তোমার মন দিয়ে যখন বড় করে দেখছ, ওটাই ডেভিল। তুমি যদি মনে কর গড্ কোন একজন ব্যাক্তি, বা তুমি যদি মনে কর ডেভিল একজন কোন ব্যক্তি, তুমি ভুল করছ; গড্ বল, ডেভিল বল, সবটাই তোমার মনের প্রোডাক্ট। ডেভিল যদি সত্য হত, তাহলে ঠাকুরের কাছে, যীশুর কাছে, ভগবান বুদ্ধের কাছে একই জিনিস, একই রূপে যেত। এর মধ্যে মজার ব্যাপার হল, যার মধ্যে যে দুর্বলতাগুলো রয়েছে ঠিক সেই জিনিসগুলোকে নিয়ে হিট্ করে। আমি যাকে ভালবাসি, যে জিনিসকে ভালবাসি, যে জিনিসকে ভয় পাই আর আমার চেষ্টায়, সাধনায় সেই অবস্থায় যদি পৌঁছে যাই, তখন আমার শেষ প্রলোভন ঠিক ওই ধরণের কোন রূপ ধারণ করে আসবে। যারা বেশি চিন্তা-ভাবনা করে না, তারা এই ধরণের যত স্বর্গ নরকের বর্ণনা গুলো আছে সেগুলোকেই সত্য বলে মনে করে নেয়।

সেইজন্য সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে খ্রীষ্টান ধর্মে গডকেও মানে, আবার ডেভিলকেও মানে। আর আমরা যমরাজকেও মানি, ভগবান বিষ্ণুকেও মানি, ভগবান শিবকেও মানি, তাঁর ভুতপ্রেতদেরও মানি, স্বর্গ মানি, রম্ভা, মেনকাকেও মানি। আসলে রম্ভা, মেনকা এরা কারা? আমাদের মধ্যে যে সৌন্দর্য বোধ আছে, সেই সৌন্দর্য বোধকে মন দিয়ে যখন প্রজেক্ট করছি, তখন রম্ভা, মেনকা হয়ে যাচ্ছে। তাহলে রম্ভা, মেনকা বলে আসলে কি কেউ নেই? আবশ্যই আছে, যেমন আমি আছি, আপনি আছেন। আপনি কে? আপনিও আমার মনের প্রজেকশন্, তাছাড়া আর কিছু না। একটু যদি বিচার করে দেখি, এই যে আমি আপনাকে দেখছি, আপনি আমাকে দেখছেন; আসলে আমরা কি দেখছি? ওখান থেকে একটা আলো আসছে, আমার চোখ দিয়ে

সেই আলো আমার নার্ভ সেন্টারসে যাচ্ছে, ব্রেনে একটা ছোট্ট ইমেজ তৈরী হচ্ছে, ওটাই আমার টোটাল নলেজ। নলেজ তো আপনি নন, নলেজ ব্রেনে। কুকুর রাতের বেলা যখন দেখছে, সে তখন জিনিসটাকে এক রকম দেখছে, বেড়াল আরেক রকম দেখছে, আমি অন্য রকম দেখছি। কে কেমন দেখছে? যার অপটিকাল নার্ভস যেমন, যার অপটিকাল সেন্টার যেমন, ব্রেন যেমন, সে তেমন দেখছে। তাহলে সত্য কি? যেমনটি তুমি দেখতে চাও, তার বেশি সত্য নেই। ডেভিল কে? জগতের যে দুঃখ-কষ্ট, সেটারই মূর্ত রূপ। গড্ কে? তোমার মন দিয়ে সচ্চিদানন্দের মূর্ত রূপ। আমার মন আর তোমার মন এক না, সেইজন্য তোমার ঈশ্বর আর আমার ঈশ্বর কোন দিন এক হবে না। ঠিক সেইভাবে তোমার পাপ আমার পাপ, তোমার পূণ্য আমার পূণ্য কোন দিন এক হবে না। এটাকে বুঝে নেওয়াটাই জ্ঞান, এটাই wisdom।

একটা গল্প আমরা অনেকবার বলেছি। শাশুড়ি রোজ ভাগবত শুনতে যায়। একদিন শাশুড়ি কোন কারণে যেতে পারেনি, সেদিন বৌমাকে ভাগবত শুনতে পাঠিয়েছে। রাত্রিবেলা খাওয়ার সময় মাছ কোথায় শাশুড়ি জিজ্ঞেস করেছে। বৌমা বলল 'বেড়ালে মাছ খেয়ে নিয়েছে'। 'তুমি বেড়ালকে মেরে তাড়াতে পারলে না'? 'না, আজকে ভাগবতে শুনতে গিয়েছিলাম, ভাগবতে বলল কোন প্রানীকে হিংসা করতে নেই; তাই আমি মারতে পারলাম না'। 'বলো কি বৌমা! আমি এতদিন ভাগবত শুনছি, একদিনও আমি ভাগবতকে বাড়ি আনলাম না, আর তুমি একদিন শুনেই ভাগবতকে বাড়িতে নিয়ে চলে এলে'। *অহং ব্রহ্মাস্মিকে*ও আমরা যদি বাড়িতে নিয়ে চলে যাই সমস্যা হয়ে যাবে। এর অর্থ হল, গুরু আমাকে যে মন্ত্র জপ করতে বলে দিয়েছেন, যা যা করতে বলেছেন, প্রথমের দিকে এগুলোই করে যেতে হবে, এর বাইরে আমাদের যাওয় চলবে না। *অহং ব্রহ্মাস্মি*কে যদি সাধনা রূপে নিতে হয় তাহলে ওই রকম আচার্যের কাছে ওই রকম শিষ্য আসবে।

এখানে যে জিনিসগুলোকে নিয়ে আমরা আলোচনা করছি, এগুলো এত উচ্চমানের যে, এই মুহুর্তে আমরা এগুলোকে জীবনে নামানো দূরে থাক, সাধনাতেও চলবে না। তাহলে আমরা আলোচনা করছি কেন? ঠাকুর বলছেন, সময় না হলে কিছু হয় না, তবে শুনে রাখা ভাল। আমাদের শুনতে হবে, শুনে যেতে হবে। শুনতে শুনতে একটা প্রস্তুতি হয়। আমরা শুনছি, যে ব্রহ্মের কথা উপনিষদে বলছে, যে ব্রহ্মের কথা স্বামীজী বলছেন, বেদান্তে যেখানে বলছে আমিই সে ব্রহ্ম; ঠাকুর সেই ব্রহ্ম, তার মানে কোথাও আমি ঠাকুরের সাথে জুড়ে রয়েছি, ঠাকুরের সাথে কোথাও আমার একটা নাড়ির সম্পর্ক আছে। আগেকার দিনে সন্ন্যাসী ছাড়া কাউকে উপনিষদ পড়ানো হত না। মুণ্ডকোপনিষদে পরিষ্কার বলেই দিচ্ছেন, এক আধটা নাম যা আছে ঠিক আছে, কিন্তু এই পরম্পরায় সন্ন্যাসী ছাড়া আসতে পারে না, হতে পারে না।

ঠাকুরকে গৃহীরা এসে জিজ্ঞেস করছে, সংসারে থেকে কি হবে না? ঠাকুর বলছেন, কেন হবে না! কিন্তু তারপরই যা যা শর্ত লাগিয়ে দিচ্ছেন, যে শর্তগুলি পালন করা গৃহীদের পক্ষ অসম্ভব। ভাগবত বাড়িতে ঢোকাবে না, তার মানে, গুরু যে নির্দেশ দিয়েছেন, সেই নির্দেশ গুলিকেই প্রথমে পালন করে যেতে বলছেন। এগুলো শুনলে শ্রদ্ধা বাড়বে, বিশ্বাস দৃঢ় হতে থাকবে আর এসব কথা শুনলে জ্ঞানরাশি বাড়বে। জ্ঞানরাশি যত বাড়বে, শক্তি তত বাড়বে, তত জীবনে শান্তি আসবে আর ইষ্টের প্রতি শ্রদ্ধা তত বাড়বে। দেববাণীতে আমরা বেদান্তের অত্যন্ত উচ্চস্তরের জিনিসগুলোকে নিয়ে আলোচনা করে যাচ্ছি, এই আলোচনা শুনতে শুনতে আমাদের কি কোথাও মনে হচ্ছে না যে, এতে ঠাকুরের প্রতি আমার ভালবাসা আরও বাড়ছে, বাড়বেই। আমরা কোন স্তরে আলোচনা করছি ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়, সচ্চিদানন্দের উপর উপাধি চাপিয়ে দিয়ে আমি আলাদা হয়ে গেলাম। এই কথা শুনে মনে হবে যেন আমাকে ডাউন করে দেওয়া হল। না, ডাউন করা হচ্ছে না, এই কথাটা আরও তোমাকে গভীরে নিয়ে যাচ্ছে। যদি গভীরে না নিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে, তুমি গুরুর দেওয়া মন্ত্র বোঝোনি, আর তা নাহলে তুমি আচার্যের কথাগুলো বুঝতে পারোনি। এরপর আসছে স্বামীজীর ২৫শে জুলাইয়ের ক্লাশ, যেখানে স্বামীজী পুরোপুরি যোগে চলে যাচ্ছেন।

বৃহস্পতিবার, ২৫শে জুলাই

কর্মযোগের একটি মৌলিক নিয়ম

স্বামীজী যম, নিয়ম, আসন এই জিনিসগুলোকে নিয়ে বলছেন। তার আগে বলছেন 'Things may be done, caused to be done, or approved of', and the effect upon us is nearly equal, (*কার্য তিন প্রকারের হতে পারে –কৃত যা তুমি নিজে করছ, কারিত যা অপরের দ্বারা করাচ্ছ, আর অনুমোদিত অপরে করেছে –তাতে তোমার অনুমোদন আছে, কোন আপত্তি নেই। আমাদের উপর এই তিনপ্রকার কার্যের ফল প্রায় একরূপ।*) এখানে স্বামীজী কর্মকে নিয়ে বলছেন। তার আগে আমাদের একটা ছোট্ট আলোচনা করে নেওয়া দরকার। কর্মবাদ কতটা ঠিক, কতটা ভুল, আমরা জানি না। যারা ভক্ত তারা সব কিছুতেই ঠাকুরের ইচ্ছা দিয়ে চালিয়ে দেয়। যারা কর্মি তার সবটাই কর্মের উপর নিয়ে ফেলেন। হিন্দু ধর্মের জীবনদর্শন পুরোপুরি কর্মবাদের উপর চলে। অপ্রত্যাশিত কিছু হয়ে গেলে হিন্দু ধর্ম বলবে, এটা তোমার আগের জন্মের কোন কর্মের ফল। ঈশ্বরের কৃপাকেও কর্মের মধ্যে নিয়ে আসবে। কর্ম এমন একটা বিরাট অদৃশ্য জিনিস, যেখানে আমরা যে কোন জিনিসকে ঢুকিয়ে দিতে পারি। কর্মযোগকে নিয়ে বলার সময় স্বামীজী কর্মের উপর প্রচুর জোর দিচ্ছেন। আর শুধু কর্মের উপরেও যখন স্বামীজী বলতেন, তখনও তিনি কর্মের উপর প্রচুর জোর দিতেন। সেখান থেকে আমাদের কোথাও একটা ধারণা হয়ে গেছে যে, কর্মকে কখনো কেটে বেরিয়ে আসা যায় না। ঠাকুরও কর্ম সম্বন্ধে কখন এটা বলছেন, কখন সেটা বলছেন, শ্রীমাও কর্মকে নিয়ে এভাবেই বলতেন। তার কারণ, কখনই বলা যাবে না যে, কর্ম বলতে এটাই। লঙ্কা খেলে ঝাল লাগবে, এটাই ঈশ্বরের বিধান হয়ে আছে, এটাই কর্ম, এটাই cause and effect। লঙ্কা খেলে ঝাল লাগবে, এটা কেন এই রকমই হয়? ভক্ত বলবে, ঠাকুর এই রকমই করেছেন। জ্ঞানী বলবে, cause and effectএর relationএর জন্য হয়।

আমরা ঈশ্বরকে যেভাবে পরিভাষিত করি বা মনে করি, পতঞ্জলি যোগসূত্রে সেই ঈশ্বরের কোন স্থান নেই। যোগ বলবে, তুমি আছ আর জগৎ আছে, তোমাকে এই জগৎ থেকে বেরোতে হবে। এখানে পুরুষ আছে প্রকৃতি আছে, পুরুষ প্রকৃতির পাল্লায় পড়ে গেছে, প্রকৃতি থেকে পুরুষের ডিভোর্স চাই। এই ডিভোর্স পাওয়ার জন্য প্রচুর খাটাখাটনি করতে হবে। ওই খাটাখাটনির মধ্যে কোন ঘটকের দরকার লাগে না, ঈশ্বর এসে যাবেন, গুরু এসে যাবেন, গুরু এসে কৃপা করবেন, ঈশ্বরের কৃপা লাগবে, এগুলো কোন ভাবেই এখানে লাগবে না, কোন প্রয়োজনই নেই। কর্মবাদ সত্য হোক, সত্য নাই হোক, কর্মবাদ একটা মডেল হোক, কর্মবাদ একটা থিয়োরী হোক, কর্মবাদ যাই হোক, কর্মবাদের একটা বিশেষত্ব হল, কর্মবাদ মানুষকে প্রচণ্ড শক্তি দেয়। কর্মবাদে মানুষ সমস্ত দায়ীত্ব তার নিজের কাঁধে নিয়ে নেয়। ভাল কিছু করলে আমরা বলি, এটা আমি করেছি আর খারাপ কিছু হলে আমরা খুঁজতে থাকি কার উপর এই দোষটা চাপিয়ে দেওয়া যায়। ছেলে বোর্ডের পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করলে বলবে, 'দেখতে হবে না, কার ছেলে'! ছেলে খারাপ হলে বলবে, 'দেখো তোমার ছেলে কি সব করে বেড়াচ্ছে'! ছেলে ভাল করলে নিজের আর খারাপ করলে অপরের ছেলে হয়ে যায়, এটাই আমাদের স্বভাব। কর্ম পুরো এই জিনিসটাকেই পাল্টে দেয়, ভালটা তোমার নিজের, মন্দটাও তোমার নিজের, আগামীকাল যেটা হবে সেটাও তোমার নিজের, গতকাল যেটা ছিল সেটাও তোমার নিজের, বন্ধনে পড়ে আছ তুমি নিজের জন্য, মুক্তি হবে তোমার নিজের জন্য, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কোন জায়গায় তুমি ছাড়া কেউ নেই, না আছে তোমার গুরু, না আছে তোমার ঈশ্বর; এটাই যোগদর্শন। যোগদর্শন যে সবাই পালন করছে তাতো নয়, আমরা সেই দর্শনই পালন করি, যেটা আমাদের গুরু বলে দিয়েছেন। মাণ্ডুক্যকারিকাতে বলছেন, গুরু যাকে যে ভাব শিখিয়ে দেন, শিষ্য সেই ভাব নিয়েই জীবন যাপন করে, তাকে সেই ভাব নিয়েই জীবন যাপন করতে হয়। তবে এগুলো পড়লে, যোগদর্শন, বেদান্তের উচ্চ তত্ত্বগুলির আলোচনা শুনলে বুদ্ধির বিকাশ হয়, নিজের ইষ্টের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি আরও গাঢ়ো হয়, ভিতরে একটা শক্তি আসে। কারণ পড়াশোনা, গভীর চিন্তন করলে মস্তিকের নিস্তেজ কোষিকাগুলো সতেজ হয়ে আরও শক্তি পায়, তাতে বোঝার ক্ষমতা, ধারণা করার ক্ষমতা বেড়ে যায়। সেইজন্য সব রকম শাস্ত্র পড়তে হয়। কিন্তু পালন করতে হবে সেটাই, যেটা গুরু পালন করতে বলে দিয়েছেন, তার বাইরে না। তার বাইরে পালন করতে গেলে সব কিছু এলেমেলো হয়ে যাবে। একজন এয়ার হোস্টেস দিনে হয়ত পাঁচশ লোকের দেখাশোনা করে, কিন্তু স্বামী তার আলাদা। আমার আধ্যাত্মিক স্বামী আমার ইষ্ট। বাকি যত শাস্ত্র পড়া, লেকচার শোনা, দর্শন নিয়ে চিন্তা করা ওটা হল এয়ার হোস্টেসের দিনে পাঁচশ লোকের দেখাশোনা করার মত। উত্তরাখণ্ডে একজন বড় মহাত্মা ছিলেন। একজন

মহারাজ একবার তাঁকে একটা ভাল বই পড়তে দিলেন। তিনি বইটা হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে একটু দেখার পর বললেন, 'আমি এখন এই ভাবে আছি, এই মুহুর্তে আমি এই বই পড়তে পারব না'।

অনেক আগেকার কথা, বেলুড় মঠে উপনিষদ পড়ানো হচ্ছে, সেখানে অদ্বৈত বেদান্তের উপর আলোচনা চলছে। বেলুড় মঠে সেই সময় একজন মহারাজ ছিলেন, উনি ঘোর বৈষ্ণব বংশের, আর তিনি নিজেও ঘোর বৈষ্ণব, মঠে তিনি ওই রকম ধারাতেই জীবন যাপন করতেন। কিন্তু অদ্বৈত বেদান্তের ক্লাশ যখন হত তখন উনি খুব নিষ্ঠার সাথে শুনতে যেতেন। একজন মহারাজ তাঁকে একদিন জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার মনের গঠনটা তো বৈষ্ণব মতে তৈরী, তাও আপনি কেন অদ্বৈত বেদান্ত শুনতে যান'? উনি খুব স্পষ্ট করে বলে দিলেন, 'আমি তো ওই ভাব নেওয়ার জন্য যাচ্ছি না, জ্ঞানের জন্য শুনছি, আমি দেখছি অদ্বৈত বেদান্তে কি আছে'। এখানে আমরা এই জিনিসগুলো যখন আলোচনা করছি, এগুলো জানার জন্য। ঠাকুর পিঁপড়ে আর চিনির পাহাড়ের গল্প বলছেন, একটা পিঁপড়ে চিনির পাহাড়ের চিনির একটা দানা মুখে নিয়ে যাওয়ার সময় মনে মনে বলছে, পরে এসে পুরো পাহাড়টা নিয়ে যাব। আমাদের একটি চিনির দানা দরকার, সেই দানাটি গুরু দিয়ে দেন। আর এগুলো হল চিনির পাহাড়। সমস্ত শাস্ত্রে যা কিছু আছে, সেটাকে বেদান্ত কিভাবে দাঁড় করিয়েছে, সেটাই এখানে রাখা আছে।

পতঞ্জলি এবার কর্মকে ব্যাখ্যা করে বলছেন, তুমি নিজে যদি কর, কাউকে দিয়ে যদি করাও আর করার জন্য কাউকে অনুমোদন যদি করে থাক, তিনটেই তোমার নিজের করা। তিনটের মধ্যে কোন একটাও যদি হয়ে থাকে, তার ছাপ তোমার মনের মধ্যে পড়বে। স্বামীজী কর্মবাদকে আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে চলে গেলেন, তিনি বলছেন, যখন চিন্তা ভাবনা করা হয় বা কাজ যখন করা হয়, মনের উপর তার একটা সংস্কার পড়ে। সাধারণ ভাবে আমরা কর্ম বলতে মনে করি, তুমি যদি আমাকে গালাগাল দাও, এক সময় আসবে আমিও তোমাকে গালাগাল দেব। স্বামীজী কর্মকে এভাবে ব্যাখ্যা করছেন না। যোগশাস্ত্রেও কর্মের এই সংজ্ঞা নেওয়া হয় না। যোগশাস্ত্র বলে, যখনই তুমি কিছু করলে, তখন তার একটা সংস্কার বা ছাপ মনের উপর পড়ে যায়। ওই ধরণের ছাপ যদি বার বার পড়তে থাকে, পাথরের উপর একটা কিছু রাখতে রাখতে পাথরের উপর একটা গর্ত হয়ে যায়, মনের উপর ওই রকম একটা গভীর দাগ পড়ে যায়। মনের উপর যে দাগটা পড়ে গেল, এর পর জীবনটা তার ওই দাগ অনুসারে চলবে। তার ভাল, তার মন্দ, মনের উপর তার কি কি দাগ আছে, সেই অনুসারে চলে। যেগুলো খুব হাল্কা দাগ, সেগুলো হয়ত অতটা প্রভাব ফেলবে না, কিন্তু থাকবে, সাধারণ বীজ রূপে থাকবে। উদ্দেশ্য হল এটাকে উৎখাত করা।

ব্রহ্মচর্য - দেহের যত্ন নেওয়া, দেহ চেতনা ভুলে যাও

স্বামীজী এবার যোগশাস্ত্রের যম ও নিয়মের কথা বলছেন। যম হল, সত্য, অহিংস, অস্তেয়, অপরিগ্রহ ও ব্রহ্মচর্য। সত্য কথা বলবে, হিংসা করবে না, চুরি না করা, দান না নেওয়া আর ব্রহ্মচর্য পালন করা, এই পাঁচটা ব্রত। এই পাঁচটা জিনিস না করলে মনের উপর কর্মের জোর ছাপ পড়ে। স্বামীজী এখন পর পর এগুলোকে ব্যাখ্যা করছেন। যে যোগ অনুশীলন করতে চাইছে, তাকে প্রথমে মন পরিষ্কার করতে হবে। মন যদি পরিষ্কার করতে হয়, তাহলে তাকে এই পাঁচটা ব্রতে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। কারুর কাছ থেকে কোন উপহার নেওয়া যাবে না। কেউ হত বলতে পারে, 'তাহলে আমার সংসার চলবে কি করে, আত্মীয়-বন্ধুদের সাথে সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাবে'! ঠিকই, যোগ তাই আপনার জন্য নয়।

কর্মবাদের মৌলিক জিনিসটা বলে দেওয়ার পর স্বামীজী পাঁচটা মূল্যবোধের কথা বলছেন – সত্য, অহিংসা, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ। ব্রহ্মচর্যকে নিয়ে স্বামীজী দুবার বলছেন। হিন্দুদের একটা মতে বলা হয়, যৌন ভোগের ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করে নিতে পারলে মেধা নাড়ী খুলে যায়। মেধা নাড়ী খুলে গেলে মানুষ তখন ঈশ্বরীয় তত্ত্বগুলি ধারণা করতে পারে, যার ফলে সে ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। এটাকে নিয়ে অনেকে আবার আপত্তি করেন। এই কারণে আপত্তি করেন, যেমন যাজ্ঞবল্ক্য দুজন স্ত্রীকে নিয়ে থাকতেন, ভগবান বুদ্ধের স্ত্রী ছিল, তাঁদের সন্তানও ছিল, শ্রীকৃষ্ণও এই রকম ছিলেন, শ্রীরামচন্দ্রের সন্তান ছিল, কিন্তু এনারা সবাই মহাপুরুষ। সাধারণ মানুষ নিজের ছোটখাটো বাসনা, ইচ্ছা, নিজের সামান্য ইমোশানকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে

না, সেখানে সে যোগশক্তিকে কি করে সামলাবে, মনকে কিভাবে পরিচালিত করবে! সেইজন্য বলা হয়, ব্রহ্মচর্য তাদের জন্য খুবই জরুরী। ব্রহ্মচর্যকে নিয়ে স্বামীজী বলছেন, Complete continence gives great intellectual and spiritual power. (*পূর্ণ ব্রহ্মচর্যের দ্বারা মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি খুব প্রবল হয়ে থাকে।*) হিন্দুরা চিরদিন এটা মেনে এসেছে যে, সম্পূর্ণ রূপে ব্রহ্মচর্য পালন করলে মানুষের মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি প্রবল হবে। আর বলছেন, The Brahmacharin must be sexually pure in thought, word, and deed. (*ব্রহ্মচারীকে কায়মনোবাক্যে মৈথুনবর্জিত হতে হবে।*) ব্রহ্মচারীর চিন্তন, কথা বলা আর তার কর্ম তিনটেই পরিষ্কার থাকতে হবে, বক্তব্য হল তাকে কায়মনোবাক্যে পবিত্র থাকতে হবে।

Lose regard for the body, get rid of the consciousness of it so far as possible, (*দেহটার যত্ন নেওয়ার কথা ভুলে যাও। যতটা সম্ভব, দেহচেতনা ভুলে যাও।*) ব্রহ্মচারীকে নিয়ে আসল কথাটা বলছেন। ব্রহ্মচর্য কি, ব্রহ্মচর্যের ফল কি বললেন, কিন্তু শেষ লাইনে যেটা বলছেন এটাই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। যৌন চিন্তা তা সে যে রূপেই হোক, একটা বলছেন, যৌন উত্তেজনা তৈরী হয় ব্রেনে, কিন্তু তার থেকেও বেশি হয়, ওই ইচ্ছাকে তারা যখন কোন অস্বাভাবিক ভাবে মেটাতে চেষ্টা করে, কোথাও একটা বিকৃত যৌন ক্ষুধা তাকে গ্রাস করে নেয়। মহাভারতে বা রামায়ণ আদিতে আমরা বর্ণনা পাই, অনেক সময় যোগীদের মধ্যে এই ধরণের উত্তেজনা তৈরী হয়ে যায়, ওই সময় ওনারা কিছু কিছু unnatural জিনিস করে বসেন। বিশ্বামিত্র আর মেনকার কাহিনী সবারই জানা। বিশ্বামিত্র-মেনকার ঘটনায় দুটো দিক – একটা হল, ইন্দ্র মেনকাকে দিয়ে বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মচর্য ভঙ্গ করাতে চাইলেন। কারণ ইন্দ্রের মনে ভয় ঢুকে গেছে, বিশ্বামিত্রের তপস্যার জোরে আমার ইন্দ্রত্ব যদি চলে যায়। বিশ্বামিত্র আগেই রাজা ছিলেন, আগেই তাঁর কত কি করা ছিল। বলছেন, তা না, এখন যে ব্রহ্মচর্যের শক্তি সঞ্চিত হয়েছে সেটাকে নাশ করতে হবে। মেনকা এসেছে, বিশ্বামিত্র মেনকাকে দেখলেন, দেখার পর মেনকার শরীরের প্রতি আকর্ষণ এসে গেছে। আমরা যে এত আলোচনা করে যাচ্ছি, এখানে আমরা দেখাচ্ছি মনটাই আসলে গুরুত্বপূর্ণ, বাকি কোন কিছুরই তেমন গুরুত্ব নেই। যারা ক্লীব তারা কি ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে? কখনই তা হবে না। এই জায়গায় এসে আমরা অনেক সময় ভুল করে বসি। একটা হল, ধর্ম পথে যৌন শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা খুবই দরকার এই জন্য যে, যৌন ক্ষুধা এমন একটা ক্ষুধা যেটাকে নিয়ন্ত্রণ করা খুবই কঠিন। কিন্তু যে কোন ক্ষুধাকে নিয়ন্ত্রণ করা কি খুব কঠিন? যেমন একজন একটা মন্দ কথা আমাকে বলল, আমি তার উপর প্রচণ্ড রেগে গেলাম, তার মানে আমার মন এখন একটা বৃত্তিতে চলে গেল। দেখা যায় যারা যৌন সংযমের ব্যাপারে দুর্বল হয়, মন যাদের খুব চঞ্চল হয়, তাদের অন্যান্য জিনিসেও নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

স্বামীজী এখানে যেটাতে গুরুত্ব দিচ্ছেন তা হল, disregard for the body, নিজের দেহের যত্ন ভুলে যাও; যতটা সম্ভব নিজের দেহচেতনা ভুলে যাও। যোগশাস্ত্রে বলা হয় ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সহজ উপায় শৌচে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, সব সময় নিজেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা। যোগশাস্ত্রে বলছে, *শৌচাৎ সাঙ্গজুগুপ্সা পরৈরসংসর্গঃ*, মানুষ যদি সব সময় নিজেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে, একটু চা খাওয়ার পরে হাত ধুচ্ছে, সব সময় শৌচ শৌচ, পূজা করার সময় কথা বলে ফেললে আচমন করে আবার পূজা শুরু করছে, এই রকম শৌচ করতে করতে এমন হয়ে যায় যে, কারুর শরীরের সাথে কোন রকম স্পর্শ যদি হয়ে যায়, তখন তার সমস্ত শরীরটা ঘিন্ ঘিন্ করতে থাকে, হয়ত আবার সব কিছু তাকে ধুতে হবে। বেশির ভাগ মহারাজরা বাইরে বাসে ট্রেনে ঘুরে এলে গায়ে গঙ্গা জল ছিটাবেন। শুচিবাঈ অত্যন্ত বাজে জিনিস ঠিকই, কিন্তু কেউ যদি শৌচে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তখন তার এই জিনিসটা কেটে যায়। কিন্তু এই জিনিসগুলো ইয়ংদের জন্য, কারণ বৃদ্ধ বয়সে এমনিই কিছু হয় না। কারণ তাদের মাথায় গ্যাঁট হয়ে সব বসে আছে। কি বসে আছে? নিজের দেহের প্রতি ঘোর আসক্তি। কোন বৃদ্ধ পাওয়া যাবে না, যে নিজের দেহকে নিয়ে পুরো আত্মকেন্দ্রিক হয়ে নেই। সব সময় শরীর নিয়ে অভিযোগ, আমার শরীর খারাপ আমার ছেলে দেখছে না, আমার বৌমা দেখছে না! আমার প্রেসারটা চেক করাল না, আমার ইসিজি করাল না; মরার সময় হয়ে গেছে, কোথায় হরিনাম করবে, কিন্তু এখনও শরীর নিয়ে ভেবে যাচ্ছে। শাস্ত্রে বাণপ্রস্থের কথা বলছে, বাণপ্রস্থে তো যাবেই না, উপরন্তু একটু কিছু থেকে কিছু হলে বাড়ির লোকেদের গালাগাল দিয়ে অস্থির করে তুলবে। তুমি তো তোমার সব আমোদ

আহ্লাদ করে নিয়েছ, এবার তোমার সন্তানদের, বৌমাদের একটু আমোদ আহ্লাদ করতে দাও! তা না, সব সময় তার ফাইফরমাশ খেটে যেতে হবে।

যোগশাস্ত্রে ব্রহ্মচর্যটা গুরুত্ব নয়, গুরুত্ব হল, disregard for the body। আগে অপরের শরীরের প্রতি আকর্ষণটা বন্ধ কর, তারপর নিজের শরীরের প্রতি আসক্তিটাও যেন না থাকে, মূল কথা হল দেহচেতনা থেকে সরে আসতে হবে। মানুষ এই দিকটায় নজর দেবে না, চলে যাবে সোজা ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত হতে। শুধু ব্রহ্মচর্য করেলেই যদি সব কিছু হয়ে যেত তাহলে, ট্রেনে যে নপুংসকরা যাত্রীদের থেকে পয়সা আদায় করে বেড়ায়, তারা সবাই ব্রহ্মজ্ঞানী হয়ে যেত। একেবারেই তা নয়, ইস্যুটা হল, নিজেকে যখন নিয়ন্ত্রণ করা হয়, দেহের প্রতি আসক্তিকে যখন প্রশমিত করা হয়, তখন মনের শক্তি বেড়ে যায়। যত রকমের ক্ষুধা আছে, যৌন ক্ষুধা সব থেকে শক্তিশালী। নিজের এই যৌন ক্ষুধাকে যে নিয়ন্ত্রণ করে নিতে পারবে সে একজন মহৎ। কিন্তু বিশ্বামিত্রের ব্যাপারে কি বলবেন? তাঁর তো মেনকার সাথে গোলমাল হয়ে গেল, শকুন্তলার জন্ম হল, তারপর কি হল? তারপর যা শুরু করলেন তাতে ইন্দ্র আবার ভয় পেয়ে গেছেন, এবার রম্ভাকে পাঠালেন। রম্ভা যেতেই বিশ্বামিত্র এমন উগ্র দৃষ্টি নিয়ে রম্ভার দিকে তাকালেন যে, রম্ভা প্রাণ ভয়ে ওখান থেকে পালিয়ে গেল, এই বুঝি আমাকে ভস্ম করে দিল। এরপর বিশ্বামিত্র হয়ে গেলেন ব্রহ্মজ্ঞানী। আমাদের শাস্ত্রের এই জিনিসগুলিকে নিয়ে অনেক রকম ব্যাখ্যা করা হয়।

স্থিরসুখামাসনম

সেখান থেকে স্বামীজী সোজা আসন নিয়ে বলছেন। স্বামীজী হয়ত আরও অনেক কিছু বলেছিলেন। ব্রহ্মচর্যকে নিয়ে বললেন, পরে আবার অহিংসাকে নিয়ে বলবেন। কিন্তু তার আগে আসন নিয়ে বলছেন, যোগশাস্ত্রে আসন নিয়ে বলছেন, *স্থিরসুখামাসনম্*, যে আসনে স্থির হয় অনেকক্ষণ বসে থাকা, কোন কষ্ট যেন না হয়। কারণ শরীর আর মনের সরাসরি সম্পর্ক, শরীর নড়াচড়া হওয়া মানেই মন নড়েছে। মন যতক্ষণ না নড়বে, শরীর ততক্ষণ নড়বে না। বাচ্চাদের আমরা কত কষ্ট করে চলতে শেখাই; কিন্তু যেমনি একটু বড় হয়ে গেল, তখন বলছি, চুপ করে বসো। কারণ যখন দৌড়াচ্ছে, দাপাদাপি করছে, তার মানে তার মন এখন চঞ্চল। তাকে চুপ করে বসানো মানে, চঞ্চল মনকে শান্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। মন তার শান্ত হতে চায় না, সারা বিশ্বে মন ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেইজন্য তাদের অনেক খেলাধূলা করতে দেওয়া হয়। খেলাধূলা করে অনেক এনার্জি বেরিয়ে গেলে মন কিছুটা শান্ত হয়। খেলাধূলা না করলে ওই এনার্জিটা ভিতরে থেকে যায়, ওই এনার্জি মনকে অশান্ত করে রাখে বলে শরীরটাও অশান্ত থাকে। মনুস্মৃতিতে খুব বিস্তারিত ভাবে বলছেন, যাদের হাত নড়ে, পা নাচায়, চোখ পিট পিট করতে থাকে, দাঁত দিয়ে নখ কাটে, এদের সাথে কথা বলতে নেই, এর অর্থ এগুলো চঞ্চল মনের। আসন নিয়ে স্বামীজী বলছেন, Asanas (posture) must be steady and pleasant; and constant practice, identifying the mind with the Infinite, will bring this about, (*যে অবস্থায় স্থিরভাবে ও সুখে অনেকক্ষণ বসে থাকতে পারা যায়, তাকেই আসন বলে। সর্বদা অভ্যাসের দ্বারা মনকে অনন্তভাবে ভাবিত করতে পারলে এটি হতে পারে।*) স্থিরভাবে আমরা অনেকক্ষণ বসে থাকতে পারি না, কারণ মন আমাদের সব সময় চঞ্চল। স্বামীজী সেইজন্য বলছে, একটা চিন্তন যদি করা যায়, আমি অনন্তের সাথে এক। প্রথমেই মনকে অনন্তের সাথে এক করা যাবে না, কিন্তু সব সময় চিন্তন করে যেতে হবে, আমি সর্বব্যাপী, আমি অনন্তের সাথে এক; এই ভাবে চিন্তন করতে করতে একদিন আসন স্বাভাবিক ভাবেই দৃঢ় হয়ে যাবে।

মনের স্বভাব

এরপর স্বামীজী খুব সংক্ষেপে ধারণাকে নিয়ে বলছেন, Continual attention to one object is contemlation। (*একটা বিষয়ে সর্বদা চিত্তবৃত্তি প্রবাহিত করার নাম ধারণা।*) ধারণা হল, একটা জিনিসের উপর অনেকক্ষণ মনকে ধরে রাখা। এখানে এগুলো খুব সংক্ষেপে দেওয়া আছে, রাজযোগে স্বামীজী আরও বিস্তারিত ভাবে বলেছেন। এর পরের প্যারাগ্রাফে মনের স্বভাবকে নিয়ে বলছেন। মন মানে চিত্তবৃত্তি, মন বলতে আমরা তখনই বুঝি যখন বৃত্তির দ্বারা মন চঞ্চল হয়। বৃত্তি যদি শান্ত হয়ে যায়, ওটা তখন আর মন থাকছে না।

স্বামীজী এখানে যে উপমা নিচ্ছেন, এই উপমা তিনি অনেক জায়গায় নিয়েছেন, আর আমরাও অনেকবার এই উপমার কথা বলেছি। কোন জলাশয়ে যদি পাথর ছোড়া হয় জলাশয়ে ছোট ছোট ঢেউ ওঠে। আমরা যদি নিজেরা পরীক্ষা করবার জন্য পুকুরে একটা ভারী পাথর ছুড়ে ফেলে দিই, তাতে জলের উপর যে ঢেউগুলো তৈরী হবে, সেই ঢেউগুলি একটার পর একটা আসতে থাকবে। ঢেউগুলো একটার পর একটা চলছে। এখানে কে চলছে? আমরা ফিজিক্সের দৌলতে জানি জল চলে না, disturbance চলছে। আর একটা দুটো disturbance না, অনেকগুলো। প্রত্যেকটি disturbance, অর্থাৎ ঢেউগুলো সব আলাদা, অথচ প্রত্যেকটি ঢেউ একটার সাথে আরেকটা সম্পর্কযুক্ত। ঠিকই, disturbance এক ঢেউ থেকে আরেক ঢেউয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে, তার মানে এক অপরের সাথে জুড়ে আছে, অথচ দেখছি ঢেউগুলো প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা চলছে।

স্বামীজী বলছেন, When a stone is thrown into still water, many circles are made, each distinct but all interacting. (*স্থির জলে যদি একটা প্রস্তরখণ্ড ফেলা যায়, তা হলে জলে অনেকগুলি বৃত্তাকার তরঙ্গ উৎপন্ন হয় –বৃত্তগুলি সব পৃথক পৃথক, অথচ পরস্পরের উপর কার্য করছে।*) পাথর ছোঁড়ার জন্য শান্ত জলে যে ঢেউ উঠল, একটা ঢেউ এগিয়ে গেল, সে নিজের disturbanceকে আরেকটা ঢেউকে দেয়, সেই ঢেউ আরেকটাকে দেয়, সব ঢেউ পরস্পরের সাথে জুড়ে আছে, কিন্তু সব কটার অস্তিত্ব আলাদা। পুরীর সমুদ্রে কত ঢেউ দেখছি, আর সমস্ত ঢেউগুলো আলাদা; কিন্তু দুই ভাবে জুড়ে রয়েছে। ঢেউ রূপে তার disturbance এক অপরকে জুড়ে রেখেছে, আর জল রূপেও এক অপরকে জুড়ে রেখেছে।

আর বলছেন, so with our minds; only in us the action is unconscious, while with the Yogi it is conscious. (*আমাদের মনের ভিতরেও এইরূপ বৃত্তিপ্রবাহ চলছে; তবে আমাদের ভিতর সেটি অজ্ঞাতসারে হচ্ছে, আর যোগীদের ভিতর ঐরূপ কার্য তাঁদের জ্ঞাতসারে হয়ে থাকে।*) প্রত্যেকের মনের মধ্যে যে চিন্তা-ভাবনাগুলি অবিরাম উঠছে, প্রত্যেকটি চিন্তা-ভাবনা আলাদা; কিন্তু প্রত্যেকটি চিন্তা-ভাবনা অন্য চিন্তা-ভাবনার সাথে জুড়ে রয়েছে। আমরা যে অনবরত চিন্তা-ভাবনা করছি, চিন্তা-ভাবনগুলির দিকে আমরা অত নজর দিই না বা লক্ষ্য করি না, কিন্তু প্রত্যেকটি চিন্তা-ভাবনা এক অপরের সাথে জুড়ে রয়েছে। একটা চিন্তা আরেকটা চিন্তাকে জন্ম দিচ্ছে, সেই চিন্তা আরেকটা চিন্তাকে জন্ম দিচ্ছে, একটা মুহূর্ত আমরা কেউ চিন্তা-ভাবনা থেকে বিরত থাকছি না, সারাদিন ভেবে যাচ্ছি, এই ব্যাপারটা আমরা চিন্তা-ভাবনা করার সময় বুঝতেও পারি না। আরও মজার হল, ভেবে যাচ্ছি, হঠাৎ একটা ফোন এলো, আরেকটা যেন পাথর পড়ল, ফোনে কথা বলতে বলতে সেখান থেকে আরেকটা চিন্তা এসে গেল, ফোনের অপর প্রান্ত থেকে আরেকটা কি কথা বলল, সেখান থেকে আরেকটা চিন্তা এসে ঢুকে গেল। একটা চিন্তা ঢুকছে, আরেকটা চিন্তা বেরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমাদের এই ব্যাপারে কোন হুঁশ থাকে না। যোগীদের এই জিনিসটা হয় না। যোগী বলতে এখানে জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ, যে কোন মার্গে যিনি ঈশ্বরের জ্ঞান লাভ করেছেন, তাঁকেই এখানে যোগী বলা হচ্ছে। সেই যোগীদের যে চিন্তা-ভাবনা হয়, খুব স্লো মোশানে চলে, আর তিনি সব চিন্তার ব্যাপারে সচেতন। বর্তমান কালের কিছু কিছু আধ্যাত্মিক আচার্যরা এর নামে দিয়েছেন awareness। তুমি যেটাই করবে, চেষ্টা করবে ওই করার সময় নিজেকে ওই কাজের ব্যাপারে সচেতন থাকা। সারাদিনে আমরা যা কিছু করছি, লক্ষ্য করলে দেখা যাবে আমরা কোন সময় সচেতন থাকি না। যখন খাচ্ছি, তখন প্রত্যেকটি গ্রাস মুখে দেওয়ার সময় কি আমি সজাগ থাকছি যে, এই আমি একটা গ্রাস মুখে দিলাম, এবার দ্বিতীয় গ্রাসটা মুখে দেব? থাকি না। কিন্তু যোগীরা সব সময় সব কাজে, সব চিন্তায় সজাগ।

আমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, আমি কি সব কিছু লক্ষ্য রাখছি? কিছু দিন আগে মুম্বাইতে একটি উনিশ বছরের মেয়ে ব্রীজের উপর দিয়ে যাচ্ছিল, সেখান দিয়ে একজন মুসলিম ভদ্রলোক যাচ্ছিলেন। উনি কি করে বুঝে গেলেন, মেয়েটি সুইসাইড করতে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে উনি নিজের মোটর বাইকটা দাঁড় করালেন, আর ঝাঁপ মেরে মেয়েটিকে পা টেনে ব্রীজের উপর থেকে নামিয়েছেন। ঘটনার বিবরণ দিয়ে খবর কাগজে খুব সুন্দর লিখেছে, আমরা যখন রাস্তা দিয়ে যাই আমাদের চোখে কিছু পড়ে না; কিন্তু এই ভদ্রলোকের একটা অভ্যাস হয়ে গেছে যে, তাঁর চোখে সব পড়বে। যে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে, ব্রীজের রেলিংএর উপর ওঠার সময় সে চটি বা জুতা খুলে উঠবে। ভদ্রলোক যেমনি ব্রীজে কোথাও দেখেন চটি জুতা খোলা, সঙ্গে সঙ্গে তিনি মোটর

সাইকেল দাঁড় করিয়ে তাকে টেনে নামিয়ে আনেন। বলছেন যে, তিনি এই ভাবে অনেককে আত্মহত্যা করা থেকে বাঁচিয়েছেন। এই ক্ষেত্রে আরও তিনি করলেন, ছয় ঘন্টা ধরে মেয়েটিকে বোঝালেন। যাই হোক মেয়েটিকে তিনি মোটর সাইকেলে বসিয়ে বাড়িতে পৌঁছে দিলেন, যদিও মেয়েটি কিছুতেই রাজী হচ্ছিল না। পৌঁছে দিয়ে আসার পর ভদ্রলোকের হঠাৎ কি মনে হল, মেয়েটির বাড়িতে গিয়ে একবার দেখিতো। গিয়ে দেখেন দরজা বন্ধ। লোকজন ডেকে দরজা ভাঙলেন, দেখছেন মেয়েটি দড়ি দিয়ে ঝুলছে, ছয় ঘন্টার মধ্যে দ্বিতীয়বার আত্মহত্যা করার জন্য দড়িতে ঝুলে পড়েছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে দড়ি কেটে দৌড়ে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন, মেয়েটিকে কোন রকমে বাঁচালেন। ভদ্রলোক যখনই রাস্থা দিয়ে যান, উনি সব সময় সচেতন।

যদি observation power খুব গভীর না হয়, তার মানে তার সচেতনতা নেই, সে যোগী হতে পারবে না। যখনই ইষ্টের ধ্যান করতে বসছি, সেকেণ্ডের মধ্যে সারা বিশ্বে মন ঘুরে বেড়াতে শুরু করে দেবে। আবার অনেক কষ্ট করে মনকে ঘুরিয়ে ইষ্টে মনকে নিয়ে বসাতে যাচ্ছি, সেকেণ্ডের মধ্যে মন ইষ্ট থেকে সুরুৎ করে বেরিয়ে একই জিনিস হয়ে যাচ্ছে। একটা জিনিসের উপর মনকে ধরে রাখা সম্ভব নয়। এই যে একটা ঢেউ আরেকটা ঢেউকে জন্ম দিচ্ছে, যোগীর ক্ষেত্রেও তাই হয়, কিন্তু আমরা ওটা বুঝি না, যোগীরা পুরোটা বোঝেন। কারণ যোগী সব সময় সজাগ, কাজের সময় সজাগ, ধ্যানের সময় সজাগ, চিন্তা-ভাবনা করার সময় সজাগ, কথা বলার সময়েও সজাগ।

এই কথা বলার পর স্বামীজী বলছেন, We are spiders in a web, and Yoga practice will enable us like the spider to pass along any strand of the web we please. Non-yogis are bound to the particular spot where they are. (*আমরা যেন মাকড়সার মতো নিজের জালের মধ্যে রয়েছি, যোগ-অভ্যাসের দ্বারা আমরা মাকড়সার মতো জালের যে অংশে ইচ্ছা যেতে পারি। যারা যোগী নয়, তারা যেখানে রয়েছে, সেই নির্দিষ্ট স্থল-বিশেষেই আবদ্ধ থাকতে বাধ্য।*) স্বামীজী মাকড়সার জালের উপমা দিয়ে দেখাচ্ছেন – মাকড়সা যেমন জাল তৈরী করে, আমরাও আমাদের মনে একটা জাল তৈরী করে রেখেছি, সেই মনের জালে আমার ঈশ্বর আছেন, জগৎ আছে, জীব আছে, রাগ আর দ্বেষ রয়েছে; পছন্দ আর অপছন্দের লম্বা তালিকা আছে, কারুর ভাল চাই, কারুর সর্বনাশ চাই। মাকড়সার জাল তৈরী করে জালের একটা অংশে আমরা নিজেরাই আটকে আছি, এগোতে আর পারছি না। মাকড়সার বড় জাল, ওই জালের মধ্যে মাকড়সা কিন্তু এদিক থেকে ওদিকে সাঁ সাঁ করে দৌড়াচ্ছে। যোগীরা হলেন এই মাকড়সার মত, তাঁর যেটা মনের জগৎ, জগৎ মানেই মনের জগৎ, মনের বাইরে তো কিছু নেই, যা কিছু আছে সব মনেই আছে, যোগী যে কোন চিন্তার উপর সাঁ সাঁ করে দৌড়াবেন। যোগী এখানে মুক্ত, ঠাকুরের ভাষায়, বলল এক, বার করল এক, বলল ছয়, বার করে দিল ছয়। মাকড়সা যে কোন সুতো ধরে জালের যে কোন জায়গায় যেমন চলে যেতে পারে, যোগীরাও যে কোন চিন্তাকে ধরে যে কোন জায়গায় চলে যেতে পারেন। আমরা সাধারণ মানুষ, আমরাও জাল তৈরী করেছি, যোগীও জাল তৈরী করেছেন। কিন্তু আমরা একটা জায়গায় আটকে আছি, নড়চড়া করতে পারছি না; চাইলেও নড়াচড়া করতে পারি না। কারণ, আমাদের যে বিশ্বাসগুলো রয়েছে, আমার যে ভালবাসা রয়েছে, আমার যে ষড়রিপুগুলি আছে, কাম, ক্রোধাদি রয়েছে, সেগুলো আমাকে কামরাবন্দী করে রেখেছে। শেয়াল রাত্রিবেলা চোখে দেখতে পায়, কিন্তু রাস্তা পার হওয়ার সময় তার চোখে যদি ট্রাকের বা গাড়ির আলো পড়ে যায় শেয়াল আর নড়তে পারে না, সে আটকে যায়। খরগোশের একই সমস্যা। আলো এত বেশি এসে যায় যে, তার চোখ ধাঁদিয়ে যায়, কিছু দেখতে পায় না, যার ফলে মারা পড়ে যায়। হাইওয়েতে অনেক শেয়াল এভাবে মারা পড়ে। আমরাও ঠিক তাই, সংসারের আলো এমন জোর আমাদের চোখের উপর এসে পড়ে যে, আমরা হতচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ি। সংসারের স্নেহ, মমতা, ভালোবাসার সৌন্দর্যে আমরা বাঁধা পড়ে যাই, আবার সংসারের দাবানলের জ্বালাতেও আমরা আটকে যাই। আশা, দুঃখ, যন্ত্রণা এগুলোকে নিয়ে আমরা একটা সঙ্কীর্ণ জায়গার মধ্যে বেঁচে থাকি। যিনি সত্যিকারের যোগী, যম, নিয়মাদি অনুশীলন করে যিনি নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছেন, তিনি সাঁ সাঁ করে চলছেন, কোন কিছুতেই তিনি আটকাবেন না। আমার সাথে কথা বললেন, আমি মনে করলাম উনি বুঝি আমারই লোক। কিন্তু যোগী কারুরই লোক নন, আরেকজনের সাথে কথা বলছেন, তখনও সেই একই রকম তাঁর অভিব্যক্তি। যোগী জগতে মুক্ত, চিন্তায় মুক্ত, সব কিছুতে মুক্ত। সেইজন্য বলা হয়, ত্যাগী সাধুপুরুষদের দেখে তাঁদের কিছু কিছু জিনিসকে আমাদের জীবনে নামাতে হয়।

আসল হল অনাসক্ত, সম্পূর্ণ রূপে অনাসক্ত। স্বামীজী যে মাকড়াসার জালের উপমা আনছেন, এটা অনাসক্তির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছেন। সংসারী মানুষ একশ ভাগ অনাসক্ত হতে পারবে না, কিন্তু কিছুটা তো ছাড়তে হবে। এরপর স্বামীজী অহিংসা আর দানকে নিয়ে বলছেন।

আমাদের সবারই নিজস্ব একটা সংসার আছে, সেই সংসারে আমরা সবাই আবদ্ধ হয়ে আছি। যাঁরাই ঠিক ঠিক ধর্মের অনুশীলন করেন, ঈশ্বর জ্ঞানের দিকে যাঁরা এগোচ্ছেন, সংসারের ওই identification থেকে তাঁদের মন সরে আসে। ঠাকুর গুটিপোকার কথা বলছেন, গুটিপোকা চাইলেই গুটি কেটে বেরিয়ে আসতে পারে, আমরাও চাইলেই আমরা সংসার থেকে বেরিয়ে আসতে পারি, কিন্তু আমরা বেরোতে পারি না। এগুলোকে নিয়ে আমরা আগেও আলোচনা করেছি। এরপর স্বামীজী এই দিনের ক্লাশের বাকি অংশে যোগের যম আর নিয়মের মূল জিনিসগুলিকে, অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ এগুলোকে নিয়ে আলোচনা করছেন, স্বামীজী নিজের মত ব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন, যদিও তাঁর রাজযোগ গ্রন্থে তিনি আরও বিস্তারিত ভাবে বলেছেন। স্বামীজীর বক্তব্যে যাওয়ার আগে খুব মূল দুটো তিনটে জিনিসকে আমাদের বোঝা দরকার। স্বামীজী এই দিনের ক্লাশ শেষ করার আগে যে কথা বলছেন, ওই জিনিসটাকে আগে নিয়ে এলে এখনকার ব্যাখ্যাটা বুঝতে সুবিধা হবে।

শেষ প্যারাগ্রাফে প্রথম লাইনে স্বামীজী বলছেন, What we need today is to know there is a God and that we can see and feel Him here and now. (*আজকাল আমাদের বিশেষ প্রয়োজন এই যে, আমাদের জানতে হবে, একজন ঈশ্বর আছেন, আর এখানে এবং এখনই আমরা তাঁকে অনুভব করতে –দেখতে পারি।*) ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বরকে জানা যায়, ঈশ্বরকে দেখা যায়, ঈশ্বরের সাথে বাক্যালাপ করা যায়, এই সত্যটাকে আমাদের জানতে হয়। আমরা পরে আবার এই লাইনটা নিয়ে আলোচনা করব। কিন্তু এই লাইনটাকে আগে নিয়ে আসার পর যদি আলোচনা করা হয়, তখন পুরো জিনিসটাই খুব সহজ হয়ে যাবে। আমরা যদি বিশ্বের সমস্ত মানুষকে এই তিন শ্রেনীতে শ্রেনীবদ্ধ করি, এক যাঁরা জানেন, যাঁরা কিছু জানেন, যাঁরা কিছুই জানেন না, তাহলে পরিষ্কার দু-রকম মানুষ বেরিয়ে আসবে। যাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস, যাঁরা জানেন ঈশ্বর আছেন। যেমন ঠাকুর, ঠাকুর বার বার বলছেন, মাইরি বলছি আমি ঈশ্বর বই কিছু জানি না। সেখানে আর ঈশ্বর আছেন এই বিশ্বাসটুকু নেই, ঈশ্বরই আছেন, এর বাইরে তিনি আর কিছু জানেন না। দ্বিতীয় থাক হল, যাঁরা ঈশ্বর আছেন বলে মানেন না। আমরা সবাই এই দ্বিতীয় থাকের লোক।

আমরা বলি ঠিকই যে, আমাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে, ঈশ্বরকে মানি, কিন্তু ঈশ্বরে আমাদের কারুরই বিশ্বাস হয় না। যে ঈশ্বরকে আমি দেখিনি, জানি না, যে ঈশ্বরের সাথে আমি কোন দিন কথা বলিনি, আমার কি করে ঈশ্বরে বিশ্বাস হবে! তিনি যত বড় সন্ন্যাসী হন, আর যাই হন, যদি ঈশ্বর দর্শন করেননি, ঈশ্বরের সাথে মুখোমুখি বাক্যালাপ করেননি, আর যদি বলেন আমার ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে, তাহলে বুঝতে হবে তাঁর মধ্যে কিছু একটা মিথ্যাচার আছে, থাকতে বাধ্য, এর মধ্যে অন্যথা কিছু নেই। মাঝখানে তৃতীয় থাক একটা থাকেন, যাঁদের আমরা fence sitter বলতে পারি, আসলে এনারাও অবিশ্বাসী। কিন্তু যাঁরা ঈশ্বরকে মানেন, তাঁদের সঙ্গে যখন এনারা থাকে, তাঁদের মনটা তখন শক্তিশালী হয়ে যায়; কিছুক্ষণের জন্য বিশ্বাস হতে শুরু হয়ে যায় যে, ঈশ্বর আছেন।

তাহলে ঈশ্বরের ব্যাপারে সব কিছু কারা জানেন? যাঁরা স্পষ্ট বলে দিতে পারেন জিনিসটা এই এই। কে বলতে পারেন অবশ্যই ঈশ্বর আছেন? ঈশ্বরকে একমাত্র অবতার পুরুষরা জানেন, অবতারের বিশেষ সঙ্গীরা জানেন আর কিছু উচ্চকোটির মহাত্মারা জানেন। স্বামীজী কিছু পরেই বলবেন, একশ বছরে কদাচিৎ এই রকম মহাত্মা হন; যাঁরা জানেন ঈশ্বর আছেন। যেমনি কেউ মেনে নিচ্ছেন ঈশ্বর আছেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কিছু কিছু লক্ষণ বা outcome চলে আসে। ঈশ্বরকে তিনি কিভাবে মানছেন, সেটা কোন গুরুত্ব নয়। তিনি ঈশ্বরকে বিরাট পুরুষ রূপে, যিনি আমাদের উপরে অবস্থান করে আমাদের শাসন করছে, বা অন্তর্যামী রূপে মানছেন বা সর্ব ঘটে, সব জায়গায় তিনি আছেন এই রূপে মানছেন, বা ভগবান বুদ্ধের ক্ষণিক বিজ্ঞান মতে ভগবানকে যদি নেন, যেখানে সংসারটা খসে পড়ে গেল, ঈশ্বরের ব্যাপারে যাই ধারণা থাকুক, ঈশ্বর অনন্ত এতটুকু থাকলেই হয়, এর বেশি আর কিছু লাগে না; যদি পুরুষ রূপেও নিয়ে থাকেন, সগুণ সাকার রূপেও যদি নিয়ে থাকেন

আর যদি তাঁর বিশ্বাস যে তিনি অনন্ত, তাতেই যথেষ্ট। এরপর অনন্ত শক্তিমান, অনন্ত জ্ঞানময়, অনন্ত প্রেমময়, কৃপাময় ইত্যাদি যত খুশি উপাধি আমরা লাগিয়ে যেতে পারি, তাতে কিছু আসে যায় না। এরপর তাঁর দৈনন্দিন জীবনের দিকে যদি তাকাই, তাঁর দৈনন্দিন জীবনে কি প্রভাব পড়ছে, সেটা দেখে বোঝা যাবে যে, তিনি সত্যিই ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, নাকি মিথ্যাচার করছেন। যিনি ঈশ্বরকে জেনেছেন, যাঁর সত্যিকারের বিশ্বাস আছে যে ঈশ্বরই আছেন, তিনি সৃষ্টিকে কখনই ঈশ্বর থেকে আলাদা দেখবেন না। ধর্ম বা ঈশ্বরের নামে যারা চারিদিকে মানুষ খুন করে যাচ্ছে, তার মানেই তাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই। যার ঈশ্বরে বিশ্বাস এসে গেছে, সে কখনই এই ধরণের কাজ করতে পারবে না। যদি কাউকে শাস্তি দিতে হয় ঈশ্বরই তাকে যে কোন রকম শাস্তি দিয়ে দেবেন, আমাদের সেটা নিয়ে ভাবতে হবে না।

যিনি ঈশ্বরকে জেনেছেন, প্রথম যে লক্ষণ তাঁর জীবনে দেখা যাবে তা হল, জগতের গুরুত্বটা তাঁর কাছে একেবারে নীচের দিকে চলে গেছে। আমাদের কাছে জগতের যে মূল্য, তাঁর কাছে জগতের সেই রকম কোন মূল্যই থাকে না। এটা হল সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ। জগতে যত মানুষ আছে, যত প্রানী আছে, এতদিন এদের প্রতি তাঁর যে দৃষ্টিভঙ্গী ছিল, সেই দৃষ্টিভঙ্গীটা পুরোপুরি সরে গিয়ে অন্য এক দৃষ্টিভঙ্গী এসে যাবে। তিনি তখন দেখেন, এরা সবাই ঈশ্বরেরই সৃষ্টি বা যিনি ঘোর বেদান্তী, যাঁর কাছে সৃষ্টি বলে কিছু নেই, তিনি তখন দেখবেন, ঈশ্বরই সমস্ত প্রাণীদের সৃষ্টি করেছেন, এরা সবাই আমার ভাই। মূল ভাব হল, নিজের প্রতি যে গুরুত্ব আর অপরের প্রতি যে তাচ্ছিল্য ভাব, এই ভাবটা তাঁর পুরোপুরি চলে যাবে। জগতে সবাই নিজেকে সব থেকে important মনে করে, আর তার সামনের লোককে insignificant মনে করে। কখনই এমন কোন লোক পাওয়া যাবে না, যে এই দুটো ভাব থেকে আলাদা, নিজেকে important মনে করবে, অপরকে insignificant মনে করবে। আমরা যদি কারুর সাথে মিষ্টি করে কথা বলি, ভাল ব্যবহার করছি, সেখানেও এই ভাবটাই কাজ করে, আমি যেন importance পাই। এই যে বলা হয়, ভাল ব্যবহার করুন, ভাল ব্যবহার পাবেন, তার মানে এখানে আমি important, আমি চাই না যে কেউ আমার সাথে খারাপ আচরণ করুক। অন্য দিকে এও আছে যেখানে বলে, শক্তির উৎস হবে বন্দুকের নল থেকে, এদের ভদ্র ব্যবহার করার দরকার নেই, গুলি চালিয়ে তারা আমাদের থেকে ভদ্র ব্যবহার আদায় করে নেবে। তার মানে আমি important, সামনের লোকটা insignificant। এই ভাব মানুষের সব সময় থাকবে।

ঈশ্বরকে যিনি জেনে গেছেন, তাঁর কাছে সামনের লোক হয় বেশি importance হয়ে যাবে, আর তা নাহলে অন্তত সমান importance হয়ে যাবে, insignificant কখনই কেউ হবে না। সাধারণ মানুষ যারা ঈশ্বরকে মানে না বা যারা ঈশ্বরকে মানে, এরা যখন এই ধরণের যোগীদের পাশে থাকে, বা তাঁদের সংস্পর্শে আসে, তখন তাদের ঈশ্বরের ব্যাপারে বিশ্বাস জন্মায়। কিন্তু তখন তাদের বলে দেওয়া হয়, দেখো বাপু তুমি একদিনে ঈশ্বরকে জানতে পারবে না। তুমি বলছ, আমি ঠাকুরের ভক্ত, তুমি বলতে পারো, শ্রীশ্রীমা বলেছেন, ঠাকুর নিয়ে যাবেন; খুব ভাল, এই বিশ্বাস নিয়ে চলো। কিন্তু তুমি যখন ঠিক ঠিক এই পথে নামার পর এগোতে শুরু করবে, তখন তোমাকে তাঁরা বলে দেবেন, ঈশ্বরের ব্যাপারে জানতে হলে তোমাকেও কিছু করতে হবে। স্বামীজীর ভাববার কথা পড়লে এই জিনিসটা আরও পরিষ্কার হয়। ওনারা তখন বলবেন, তোমার শরীর মনের মধ্যে যে অনেক রকম দুর্বলতা রয়েছে, যে কামনা-বাসনাগুলো বাসা বেঁধে আছে, সেগুলো থেকে আগে বেরিয়ে আসার চেষ্টা কর। এই চেষ্টা তোমাকে নিজেই করতে হবে, অন্য কেউ তোমার হয়ে এই কাজ করে দিতে পারবে না। এই জায়গাতে এসে যায় ধর্ম ও অধর্ম বা অনুশীলনাদি।

আমরা যদি ঋষিদের দিকে তাকাই, তখন দেখতে পাই যে, বিভিন্ন ঋষিরা তাঁদের নিজেদের দেশ-কালকে মাথায় রেখে বা অন্যান্য বিভিন্ন কারণে কিছু কিছু বিধান দিয়ে গেছেন। যেমন ইসলাম ধর্মে বলে দিয়েছে, এই এই জিনিসগুলি তোমরা করবে আর এই এই জিনিসগুলো যেন কেউ না করে। এই বিধি-নিষেধগুলিই খ্রীশ্চানিটিতে গেলে অন্য রকম হয়ে যাবে, জুদাইজিমে অন্য রকম হয়ে যাবে। তাদের উদ্দেশ্য হল, তুমি নিজেকে যে খুব important মনে করছ, আর সামনের লোককে খুব insignificant মনে করছ, তোমার এই দৃষ্টিভঙ্গীটা পাল্টাতে হবে। নামকরা কবি দান্তে, একটা কবিতায় সাতখানা পাপকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন, তার মধ্যে কয়েকটা হল খাবার প্রতি লোভ, ঈর্ষা, হিংসা এই ধরণের জিনিসগুলিকে পাপ বলছেন।

ঠাকুর যেমন ষড়রিপুর কথা বলছেন, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদি। যোগশাস্ত্র এগুলোকে পাঁচটাতে নিয়ে এসেছেন। আচার্য শঙ্করের বেদান্তে গেলে দেখা যাবে, তিনি শোক আর মোহ এই দুটোতেই সব কিছুকে নামিয়ে এনেছেন। বেদান্তের কাছে শোক আর মোহ এটাই রিপু। এই দুটোকেও আমরা যদি একটাতে নামিয়ে আনি, তখন তা হয়ে যাবে exclusiveness। যেখানেই exclusiveness, সেটাই অধর্ম, যেখানেই inclusiveness, সেটাই ধর্ম। শুধু ধর্মই না, যে কোন জিনিসের যদি righteousnessকে কেউ বিচার করতে চায়, inclusiveness আর exclusiveness দিয়ে ওটার বিচার করে দিতে পারবে। যেটাকেই মনে করছি এটা exclusive, বুঝতে হবে ওটাই পাপ।

এর সব কিছুর উদ্দেশ্য হল, মানুষের মধ্যে যে সঙ্কীর্ণতার ভাব, যেমন আগের আলোচনা যেখানে শেষ হয়েছিল, মাকড়সা নিজের জালে একটা জায়গায় আটকে রেখেছে, ওকে এখন পুরো জালের উপর দৌড় করাতে হবে। একটা জায়গায় কে তাকে আটকে রেখেছে? এগুলোই হল সেই জিনিসগুলো যেগুলো তাকে একটা জায়গায় আটকে রেখেছে। যেমন ষড়রিপুর কথা বলা হল, বা দান্তে যে সাতটি পাপের কথা বলছেন, যোগশাস্ত্র পাঁচটির কথা বলছেন, বেদান্তে শোক আর মোহ, আমরা এখানে সব কটাকে এক জায়গায় এনে exclusiveness বলছি, যোগশাস্ত্রে এনারা পাঁচটাতে নিয়ে আসেন। আমরা যে বলব এনারটা ঠিক, ওনারটা ভুল, তা কখনই বলা যাবে না। উদ্দেশ্য সবার একটাই, গুটিপোকা হয়ে তুমি যে একটা জায়গায় সঙ্কীর্ণ হয়ে আটকে আছ, বা তুমি মাকড়সা হয়ে জালের একটা পয়েন্টে যে বসে আছ, ওখান থেকে তোমাকে কিভাবে নড়ানো যেতে পারে। বিভিন্ন শাস্ত্র বিভিন্ন রকম ভাবে বলছে। মনুস্মৃতিতে মনু যে বিধানগুলি দিয়ে রেখেছেন, সেখানে একটা জায়গায় গিয়ে idea of justice আসে। মনু যে বিধানগুলি দিচ্ছেন, এই দোষ করলে এই শাস্তি, সেই দোষ করলে এই শাস্তি, সেখানে মনু পরিষ্কার বলছেন, শাস্তি বা দণ্ড দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিশোধ নেওয়ার মনোভাবটা যেন কখনই না থাকে, উদ্দেশ্য হল সাজাপ্রাপ্ত মানুষটাকে উপরের দিকে নিয়ে যাওয়া। কেউ যখন চুরি করছে, মিথ্যা কথা বলছে, হিংসা করছে, তার মানে সে তখন exclusive হয়ে যাচ্ছে, মোদ্দা কথা একটা জায়গায় সে আটকে যাচ্ছে। ফলে সে ক্রমশ আরও নীচের দিকে চলে যেতে থাকে। মনু বলছেন, মানুষ যদি ধর্মকর্ম করে তাহলে তার এই ভাবনা গুলি চলে যাবে। প্রায়শ্চিত্ত যদি করে নেয়, এগুলো চলে যাবে। কিছু জিনিস আছে, নিজে তপস্যা করলেও যায় না, জপধ্যান করলেও যায় না। এই পৃথিবীতে যিনি রাজা, যিনি ভগবানের প্রতিনিধি, তিনি যদি তাকে দণ্ড দিয়ে দেন, সেখানেই তার প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেল। প্রায়শ্চিত্তের ক্ষেত্রে মনু বলছেন, যে একবার সাজা পেয়ে গেছে, তাকে কোন পরিস্থিতিতে, কোন অবস্থাতে কেউ যেন তাকে পুরনো দোষের কথা না বলে, কারণ সে এখন ওই দোষকর্ম থেকে মুক্ত। সাপ এখন নিজের খোলস থেকে বেরিয়ে এসেছে, সাপ এখন মুক্ত। যে কোন ধর্মের উদ্দেশ্য হল, ওই একটা জায়গার মধ্যে যে সে আটকে আছে, ওখান থেকে তাকে বার করে আনা।

আমাদের দুর্ভাগ্য হল, ঈশ্বরে আমাদের এক আনাও বিশ্বাস নেই, মানুষ আরশোলাকে ভয় পায়, কুকুরকে ভয় পায়, ভগবানকে ভয় পায় না। সব জায়গায় লেখা থাকে কুকুর হইতে সাবধান, কিন্তু শাস্ত্র বার বার বলছে, ভগবান থেকে সাবধান, তাও আমরা কুকুরকেই ভয় পাই, ভগবানকে এক বিন্দুও ভয় পাই না। যে ঈশ্বরকে মানে, ঈশ্বরকে যে ভয় পায়, সে কি জীবনে একটিও মিথ্যা কথা বলতে পারবে? সে কি জীবনে কাউকে কষ্ট দিতে পারবে? ঈশ্বরে যার সত্যিকারের বিশ্বাস এসে গেছে, সে কি ঈশ্বরকে ছেড়ে কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত হতে চাইবে? কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য আর তার সাথে কামিনী-কাঞ্চন, নাম, যশ এই জিনিসগুলোর ঘুনাংশও যদি, পয়েন্ট জিরো জিরো জিরো ওয়ান পার্সেন্টও যদি কারুর মধ্যে থাকে, বুঝতে হবে তার এখনও হয়নি। কারণ ঈশ্বরে তোমার নিষ্ঠা হয় আছে, নয়তো নেই; হয় সত্য নয়তো মিথ্যা, multiple choice এখানে নেই। কাউকে কষ্ট দেওয়ার সামান্যতম ইচ্ছে যদি কারুর থাকে, তাহলে বুঝতে হবে একত্ব ভাব তার মধ্যে এখনও আসেনি। কেউ হয়ত বলতে পারে, কেন, শ্রীকৃষ্ণ এত লড়াই করলেন, এত লোক নিধন করলেন। কিন্তু না, ওনার মনে এসব কিছু থাকত না, ওটা আলাদা টপিক, যখন সুযোগ আসবে তখন আমরা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করব। কিন্তু এটা সত্য, যিনি ঈশ্বর দর্শন করেছেন, তিনি all inclusive হয়ে যান। একটুও যদি কারুর মধ্যে exclusiveness থাকে, তাহলে এটা সত্য যে, সে ঈশ্বরকে জানে না। ধর্ম পথে যাওয়া মানেই, চেষ্টা করে করে যত inclusive হওয়া যায়। বিভিন্ন ধর্ম থেকে যে অনেকগুলো value

system বলা হল, এগুলো মানুষকে inclusive বানায়। শ্রীশ্রীচণ্ডীর যে কাহিনী, তার উদ্দেশ্য হল, মার যে স্তুতি করবে সে সংসারের ভোগ আর সংসার থেকে মুক্তি, যেটাই চাইবে সেটাই পাবে। সুরথ আর সমাধির কাহিনীর মাধ্যমে মা সাক্ষাৎ সামনে এসে বলছেন, যা করার আমিই করি। এতে মানুষ জোর পায়, জোর পাওয়ার জন্য সে ঠাকুরের কাছে চার পাঁচবার প্রার্থনা করবে, কোনটা পূরণ হয়ে যাবে, কোনটার কিছুই হবে না। তারপর একটা সময় আসবে, যখন সে বলবে, আমার এসব কিছুই লাগবে না, আমি শুধু ঠাকুরকেই চাই। তখন সে সংসারের সব কিছু ফেলে দেবে। ধর্ম মানেই তাই, সবারই জন্য কিছু না কিছু উপায় থাকবে। ধর্ম হল বড় বড় মলের মত, যেখানে সবারই জন্য কিছু না কিছু জিনিস থাকবে। বৌদ্ধ ধর্মে যদি ঠিক ঠিক নামা যায়, সেখানে সংসারীদের জন্য কিছু নেই। জৈন ধর্মেও তাই, সংসারীদের জন্য কিছু নেই। বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম হল খুব উচ্চমানের সন্ন্যাসীদের ধর্ম। অন্য দিকে ইসলামে কট্টর সন্ন্যাসীদের জন্য কিছু নেই। খ্রীশ্চানিটিতে গৃহস্থদের জন্য কিছু নেই, যেটা আছে সেটা হল সন্ন্যাসীদের ধর্ম। হিন্দু ধর্ম হল একমাত্র ধর্ম, যে ধর্মে গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী দুজনের জন্য সমান ভাবে সব কিছু দেওয়া হয়েছে। সেইজন্য হিন্দু ধর্ম highly inclusive religion। যোগশাস্ত্র সব কিছুকে পাঁচটাতে নামিয়ে আনছেন – অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ, যেগুলোকে নিয়ে আমরা আগে একটু আলোচনা করেছি। স্বামীজী এবার অহিংসাকে নিয়ে বলছেন।

হিংসা বন্ধন আনে - মায়াকে জয় করলে মায়াই আমাদের অনুসরণ করে

To injure another creates bondage and hides the truth, (*অপরকে হিংসা করলে বন্ধন হয়, ও আমাদের সামনে থেকে সত্য ঢাকা পড়ে যায়।*) যেমনি তুমি কাউকে হিংসা করলে, তোমার একটা বন্ধন এসে গেল, সত্য আড়ালে চলে গেল। Negative virtues are not enough; we have to conquer Maya, and then she will follow us, (*শুধু নিষেধাত্মক ধর্মসাধনই যথেষ্ট নয়। মায়াকে আমাদের জয় করতে হবে, তা হলে মায়াই আমাদের অনুসরণ করবে।*) জীবনে যদি আমরা কিছু হতে চাই, তখন ওই জিনিসটাকে ত্যাগ করলাম, সেই জিনিসটাকে ত্যাগ করলাম; এভাবে কখনই হবে না, পুরো মায়াকে আমাদের জয় করতে হবে। মায়াকে যে জয় করে নেবে, মায়া তার পিছন পিছন চলবে। খুব নামকরা উপমা হল, সূর্যকে যদি আমি পিছনে রেখে চলি, তখন আমার ছায়া এগিয়ে এগিয়ে যাবে। ছায়াকে যত আমি ধরতে চেষ্টা করব, ছায়া ততই এগিয়ে যাবে। একবার যদি ঈশ্বরের দিকে মুখ করে নেওয়া যায়, অর্থাৎ একবার যদি সূর্যের দিকে মুখ করে নেওয়া যায়, ছায়া আমার পিছনে পিছনে চলবে। এটা একেবারে আক্ষরিক ভাবে সত্য। ঈশ্বরকে আমরা আমাদের পিছনে রেখে দিয়ে চলছি, আমাদের ছায়াটাও লম্বা হয়ে চলছে। ছায়াকে যত ধরতে যাচ্ছি, ছায়া তত এগিয়ে যেতে থাকে। একটা সময় আসবে, যখন আমরা বলি, আমার আর লাগবে না, এই লাগবে না বলাটা মুখের কথা না, একেবারে আন্তরিক ভাবে মনে করছি, আমার সত্যিই কিছু লাগবে না। ছায়া তখন আমাদের পিছন পিছন ঘুরতে শুরু করবে। আমি মায়া থেকে দৌড়াচ্ছি, আমার লাগবে না, মায়াও তখন আমার পিছনে এমন দৌড়াতে থাকবে যে, আমাকে পাগল করে দেবে। সাধু সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রে ঠিক এটাই হয়, ঠিক ঠিক মন থেকে যখন সব কিছুকে সরিয়ে দেন, কদিন পরেই দেখা যাবে, একদল ভক্ত, ভক্তানি তাঁর পিছন পিছন দৌড়াচ্ছে, বাণ্ডিল বাণ্ডিল টাকা আসতে শুরু হয়ে গেল। আমরা তাই দেখছি, কোন বাবাজির দশ হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি, কারুর বারো হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি। আচ্ছা ঠিক আছে একটু দেখে নেওয়া যাক, তারপর ওখানেই বসে গেল। দু-তিন জন্ম এভাবেই চলতে থাকবে। যেহেতু ভগবানের দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে, আবার সে ঘুরে দাঁড়াবে। আবার তার পিছনে মায়া চলতে শুরু করবে, আবার এক জায়গায় গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়বে। এভাবেই জীবন চলতে থাকবে। যখনই কারুর প্রচুর নাম যশ আসছে, কিন্তু সে ওদিকে ঘুরে তাকাচ্ছে না, বুঝতে হবে ঈশ্বরের দিকে তার মনটা পুরোপুরি চলে গেছে।

যে বস্তুকে জয় করা হয়, সেই বস্তু আর তাকে বাঁধতে পারে না

We only deserve things when they cease to bind us. When the bondage ceases, really and truly, all things come to us. Only those who want nothing are masters of nature. (*যখন কোন বস্তু আমাদের আর বাঁধতে পারে না, তখনই আমরা সেই বস্তু পাবার যোগ্যতা লাভ করি। যখন ঠিক ঠিক বন্ধন ছুটে যায়, তখন সবই আমাদের নিকট এসে উপস্থিত হয়। যারা*

কোন কিছু চায় না, শুধু তারাই প্রকৃতিকে জয় করেছে।) স্বামীজী যখনই কোন কিছু ব্যাখ্যা করেন, তখন জিনিসটাকে পুরো অন্য ভাবে ব্যাখ্যা করেন। যদি একটা জিনিস আমাকে না বেঁধে নিতে পারে, বুঝতে হবে তবেই ওই জিনিসটাকে আমি রাখার যোগ্য। যদি ওই জিনিসটা আমাকে বাঁধে, তাহলে আমি ওই জিনিসটা রাখার যোগ্য নই। যেমন টাকার প্রতি আমাদের আসক্তি, তার মানে টাকা রাখার এখনও আমরা যোগ্য হইনি। সেইজন্য চোর এসে চুরি করে নিয়ে যায়, ট্যাক্সওয়ালারা এসে নিয়ে যায়। যে জিনিসের বন্ধন থেকে আমি পুরো বেরিয়ে গেছি, জানব, আমি ওটার মাস্টার; সেই জিনিসটা আমাকে আর ছুঁতে পারবে না।

জে আর আর টলকিনের খুব নামকরা ফ্যান্টাসি উপন্যাস 'দা লর্ড অফ দা রিংস', সিনেমাটা সে-রকম উচ্চমানের না, বইটা খুবই উচ্চমানের সৃষ্টি, হ্যারি পটার তাঁর কাছে শিশু। অবশ্য আজকাল মানুষের ধৈর্য নেই অত মোটা বই পড়ার। উপন্যাসে পাঁচটি আংটি আছে, তার মধ্যে একটা আংটি বাকি চারটে আংটির মাস্টার। যার হাতে ওই আংটি আছে সে সবারই মাস্টার, কিন্তু ওই আংটির সাথে কিছু অশুভ শক্তিও জড়িয়ে আছে। এখন ঠিক হল, এই আংটিটাকে ধ্বংস করে দিতে হবে। পুরো কাহিনীটাই হল, ওই আংটিকে নিয়ে যাওয়াকে নিয়ে, যেখানে আংটিটাকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে। আংটির বিশেষত্ব হল, যার কাছে থাকে সে মনে করছে আমার কাছে আংটিটা আছে, কিন্তু আংটি তার কাছে থাকে না, আংটি তাকে ধরে বেঁধে রেখেছে। যার জন্য সমস্ত অশুভ শক্তিকে নাশ করার জন্য শেষে যখন ওই স্পটে পৌঁছে গেছে, সে আর আংটিটা ছাড়তে পারছে না। আংটি তাকে ছাড়তে দেবে না। ওর মধ্যে একটা কাহিনী আছে, একটা স্পটে জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে সবাই ভাবছে আংটিকে কার কাছে রাখা যেতে পারে। কারণ যার মধ্যে একটুও জাগতিক ইচ্ছা আছে, আংটি তাকে ধরে নেবে। একজন লোক, যে আংটির ব্যাপারটা জানে, কিন্তু এই লোকটার মধ্যে কোন ইচ্ছা নেই, এর কাছে রাখা যেতে পারে। তখন সবাই বলছে, এই লোকটি এই ব্যাপারে একেবারেই নিরাপদ নয়। কারণ, আংটির ব্যাপারে ওর কোন আগ্রহই নেই, আংটি কোথায় পড়ে থাকবে, অশুভ শক্তি এসে ততক্ষণে আংটিটা চুরি করে নিয়ে চলে যাবে। সেইজন্য এর কাছে আংটি রাখা যাবে না। যিনি যেটাকে জয় করে নিয়েছেন, তিনি সেটাকে বেঁধে রাখেন না, তার বন্ধনেও থাকেন না। ফলে তাকে ওই জিনিসটা দেওয়াটা খুব বিপজ্জনক হয়ে যায়। কারণ, ওটা যদি কেউ নিয়ে চলে যায় তাতে তাঁর কিছু আসে যায় না। আমি সেটারই যোগ্য যেটাকে আমি জয় করেছি। যে জিনিসকে আমি জয় করিনি, ওটার আমি যোগ্য নই। আমি যখন গাড়ি বাড়ি করছি, তখন আমি মনে করছি, আমি কত খেটে এগুলো করেছি, আমার রক্ত জল করা পয়সা। কিন্তু আমি বুঝতেও পারছি না যে, আমি এগুলোর যোগ্য নই। কারণ আমি যদি এগুলোর যোগ্য হই, এগুলো নিজে থেকেই আসত, আর আমি কোন গ্রাহ্যই করতাম না। আমরা ওই জিনিসটাকেই ধরে রাখি, ওই জিনিসটাকেই অর্জন করার চেষ্টা করি, যেটার আমরা যোগ্য নই।

ঈশ্বরের শরণাগত হওয়াই সব থেকে উচ্চভাব

এরপর স্বামীজী বলছেন, কিভাবে জীবনে তুমি এগোবে, সেখানে তিনি গুরুর মহিমা নিয়ে বলতে গিয়ে বলছেন, Take refuge in some soul who has already broken his bondage, and in time he will free you through his mercy. (*এমন কোন মহাত্মার শরণাগত হও, যিনি নিজের বন্ধন ছিন্ন করেছেন, কালে তিনিই কৃপাবশে তোমায় মুক্ত করে দেবেন।*) যিনি সব বন্ধন, হিংসা দিয়ে শুরু করা হল, তার সাথে নিজের মায়ার বন্ধনকে ভেঙে দিয়েছেন, এই রকম মানুষের শরণাপন্ন হয়ে গেলে তিনি কৃপা করে তোমার বন্ধনকে ভেঙে দিয়ে তোমাকে মুক্ত করে দেবেন। Higher still is to take refuge in the Lord (Ishwara), but it is the most difficult; only once in a century can one be found who has really done it. (*ঈশ্বরের শরণাগত হওয়া –এর চেয়ে উচ্চভাব, কিন্তু অতি কঠিন। প্রকৃতপক্ষে এটি কার্যে পরিণত করেছেন –এমন লোক শতাব্দীর ভিতর বড়জোর একবার দেখা যায়।*) যদিও যোগশাস্ত্রে ঈশ্বরের সেই রকম মাহাত্ম্য নেই, কিন্তু ঈশ্বরে প্রণিধান বা ঈশ্বরে মন সংযোগ করার উপর প্রচুর জোর দেওয়া হয়েছে। বলছেন, গুরুর উপর নির্ভর করার থেকে অনেক শ্রেষ্ঠ হল ঈশ্বরে নির্ভর করা। শুধু ঈশ্বরে নির্ভর করে জীবন চালানো, একশ বছরেও এই রকম মানুষ দেখা পাওয়া যায় না। একশ বছরটা একটা সংখ্যা, কিন্তু বেদের সময় আমরা দেখছি; ব্যাসদেব সব বেদ সংগ্রহ করে চারটে ভাগে ভাগ করে তাঁর চারজন শিষ্যকে

দিলেন। তার মধ্যে যজুর্বেদ, যেটা দিয়ে যজ্ঞ হয়, সেটা তিনি দিলেন বৈশাম্পয়নকে। বৈশাম্পয়নের শিষ্য হলেন যাজ্ঞবল্ক্য। একদিন গুরুশিষ্যের মধ্যে তুমুল বিবাদ লেগে গেল। একটা যজ্ঞ করার কথা হচ্ছিল, বৈশাম্পয়ন অন্য শিষ্যদের যজ্ঞের দায়ীত্ব দিতে চাইলেন, যাজ্ঞবল্ক্য এসে বললেন, 'অন্য শিষ্যদের দেওয়ার দরকার নেই, কোথায় কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে যাবে, মাঝখান থেক পুরো যজ্ঞটাই পণ্ড হয়ে যাবে। আপনি ভাববেন না, আমি একাই সব জোগাড় যন্ত্র করে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি'। বৈশাম্পয়ন তাঁকে বললেন, 'তোমার খুব অহঙ্কার হয়ে গেছে দেখছি, তুমি আমার বাকি শিষ্যদের ছোট করতে চাইছ, তোমার সব বিদ্যা আমাকে ফেরত দিয়ে দাও'। এই কথা শোনার পর যাজ্ঞবল্ক্যও খুব রেগে গেছেন, 'আপনার মত আমার গুরু লাগবে না, আমি আপনারই ভালর জন্য বলেছিলাম'। এই বলে যাজ্ঞবল্ক্য ওয়াক্ থু করে বমি করে সমস্ত বিদ্যা ফেলে দিলেন। বৈশাম্পয়ন দেখছেন, এই বিদ্যাটা এভাবে নষ্ট হয়ে যাবে, আর বমি করা জিনিস কেউ নেবেও না। তিনি বাকি শিষ্যদের তিতির পাখি বানিয়ে দিলেন, তিতির পাখি হয়ে শিষ্যরা ওই বমি করা বিদ্যাটা খেয়ে নিল, সেটা হয়ে গেল কৃষ্ণযজুর্বেদ। আমরা যেমন রেগে গিয়ে বলি, জীবনে আমি আর কাউকে বিশ্বাস করতে পারব না; ঠিক তেমনি যাজ্ঞবল্ক্যও রেগে গিয়ে বলে দিলেন, জীবনে আর কোন গুরুকে বিশ্বাস করব না, মানুষ গুরু আমি আর করবই না। এরপর তিনি তপস্যা করতে বসে গেলেন এক নদীর ধারে। সূর্যদেব তখন ঘোড়ার রূপে এসে যাজ্ঞবল্ক্যকে বেদের সমস্ত শিক্ষা দিয়ে দিলেন; সেখান থেকে এসে গেল শুক্লযজুর্বেদ। এখন যে যজুর্বেদ পাঠ হয়, ওটা বেশির ভাগ জায়গায় শুক্লযজুর্বেদ থেকেই করা হয়, বিনা কোন গুরু ছাড়া এই বিদ্যা। সেইজন্য যারা শুক্লযজুর্বেদ অনুসরণ করে, তারা বলে, আমাদের বেদ সরাসরি ভগবান থেকে এসেছে।

Feel nothing, know nothing, do nothing, have nothing, give up all to God, and say utterly, 'Thy will be done'. (*কিছু অনুভব করো না, কিছু জেনো না, কিছু করো না, নিজের বলে কিছু রেখো না –সব কিছু ঈশ্বরে সমর্পণ কর আর সর্বান্তঃকরণে বলো 'তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক'।*) আদিম কাল থেকে কিছু মানুষের কাছে সুবিধাবাদী দর্শনটাই (philosophy of convenience) সব থেকে গ্রহণযোগ্য দর্শন হয়ে আসছে, যেটুকু আমার সুবিধা ততটুকু আমি নেব, যেটাতে আমার সুবিধা হবে না, সেটা আমি নেব না। এতটুকু আমার এরিয়া, অতটুকু ভগবানের এরিয়া, বেশির ভাগ ভক্ত এই থিয়োরী নিয়েই চলে। ঠিক ঠিক ঠাকুরের ইচ্ছা কেমন? ঠাকুরের প্রতি সমর্পণের ভাব – এটাই স্বামীজী বলছেন, যিনি সব কিছু সত্যিকারের ঈশ্বরের উপর ছেড়ে দিয়েছেন, তাঁকে কেউ এসে গালে দুটো চড় মারলেও কিছু বলছেন না, তিনিই একমাত্র বলতে পারেন, ঠাকুরের ইচ্ছা। বাকি সব কিছু ঢপবাজী। যখন মানুষ সব কিছু ঈশ্বরকে দিয়ে দেয়, আর বলে যে, ঈশ্বরের কৃপা পাওয়ার জন্য আমি এতটুকু করছি, আমি তাঁরই সেবাপূজা করছি। আর সংসার থেকে আমার উপর যে ক্রিয়াগুলো হচ্ছে, তার প্রতি আমার প্রতিক্রিয়া শূন্য। সব কিছুতে আমাদের প্রতিক্রিয়া হয়, একজন লোক দুটো মন্দ কথা বলল, আমি তাকে চারটে মন্দ কথা শুনিয়ে দিলাম, আর হিংসার জ্বালায় সবাই জ্বলছে। কিছু অনুভব করতে চেয়ো না, কিছু জানার জন্য উদগ্রীব হয়ো না, কিছু করো না, নিজের বলে কিছু রেখো না, সব কিছু ঈশ্বরে সমর্পণ করে দাও, তবেই তার বলার অধিকার হবে, ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

We only dream this bondage. Wake up and let it go. Take refuge in God, only so can we cross the desert of Maya. 'Let go thy hold, Sannyasin bold, say, Om tat sat, Om!'. (*আমরা বদ্ধ –এই ভাব আমাদের স্বপ্নমাত্র। জেগে ওঠ –বন্ধন চলে যাক। ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও, এই মায়া-মরু অতক্রম করবার এই একমাত্র উপায়। "ছেড়ে দাও রজ্জু, বলো হে সন্ন্যাসী, ওঁ তৎ সৎ ওঁ।*) স্বামীজী তাঁর রচিত সন্ন্যাসী গীতির একটা লাইন বলছেন, সমস্ত কিছু ছেড়ে দিয়ে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে চল।

স্বামীজী শুরু করলেন যোগশাস্ত্রের একটা মূল্যবোধ অহিংসাকে নিয়ে। যোগশাস্ত্রের অষ্টাঙ্গ সাধনে প্রথম শুরু হয় যম দিয়ে, যমের পাঁচটির মধ্যে প্রথম আসে অহিংসা। অহিংসাকে নিয়ে বলতে শুরু করে দুটো কি তিনটে বাক্য আসতে না আসতেই স্বামীজী শেষ কথাতে নিয়ে চলে যাচ্ছেন; এটাই হল সত্যিকারের একজন শ্রেষ্ঠ আচার্যের পরিচয়। সাধারণ আচার্যরা হলে, ধাপে ধাপে একটা একটা করে নিয়ে যেতেন। কিন্তু স্বামীজীর

মত আচার্য ক্লাশ ওয়ানের ছাত্রকে একটা দুটো কথা বলে বলে একেবারে মাস্টার ডিগ্রিতে নিয়ে চলে যাবেন। সেখান থেকে আবার ওই জায়গাতে ফেরত নিয়ে আসছেন, দান কেন করতে হয়, অপরিগ্রহ কি, দান কেন নিতে নেই, এবার এখান থেকে আবার শুরু করছেন। প্রথমে অহিংসার উপর বলার পর ঈশ্বর প্রণিধানে চলে গেলেন, সেখান থেকে নিয়ে গেলেন পূর্ণ শরণাগতিতে, ওখান থেকে এবার আবার ফেরত আসছেন অপরিগ্রহে।

দান কেন করতে হবে - দোষদৃষ্টিকে নাশ করতে হবে

It is our privilege to be allowed to be charitable, for only so can we grow. (*অপরের যে আমরা সেবা করতে পারছি, এ আমাদের একটা বিশেষ সৌভাগ্য –কারণ ঐরূপ অনুষ্ঠানের দ্বারাই আমাদের আত্মোন্নতি হবে।*) দান করা মানেই inclusive হওয়া। জগতে যত বিধান আছে, সব বিধানই দুই প্রকার হয়। বিধানের কোথাও না কোথাও একটা সিদ্ধান্ত থাকে। সুপ্রীম কোর্ট একই দিনে পাঁচখানা বিধান দিয়ে দিলেন। কয়েকদিন আগেও এনারা মনে করছিলেন জিনিসটা এই রকম হবে, কিন্তু এখন বলছেন, সিদ্ধান্ত হিসাবে জিনিসটা এই রকম হবে। কিছু দিন পর আরেকজন কেউ বলবে, সিদ্ধান্ত এই রকম। হামমুরবীর code of conduct খুব নামকরা। হামমুরবী খুব বিখ্যাত রাজা ছিলেন, রাজা হয়ে তিনি কিছু code of conduct দিয়েছিলেন। সেখান থেকে জুইস্ ট্র্যাডিশানের নামকরা প্রফেট মোজেস কমাণ্ডমেন্টসগুলি দিয়েছেন। এনারা যে কমাণ্ডমেন্টসগুলো দেন, যেমন চোখের বদলে চোখ, কেউ যদি কারুর হাত কেটে দেয় তার হাতটাও কেটে ফেল, এগুলোর পিছনে একটা সিদ্ধান্ত আছে। ওরা বলে Law of natural justice। Law of natural justice নামে, আসলে ট্রাইবাল জাস্টিস, তুমি আমাকে মেরেছ, আমিও তোমাকে মারব, সিদ্ধান্ত সেখানেও আছে।

হিন্দুদের সিদ্ধান্ত হল, আমাকে আধ্যাত্মিক ভাবে মুক্ত হতে হবে, আমার আশেপাশে যারা আছে তাদেরকেও আমি আধ্যাত্মিক ভাবে মুক্তির দিকে নিয়ে যাচ্ছি। হঠাৎ কারুর মনে একটা বিচার এলো, বা কোন খামখেয়ালী মত একটা আইন হয়ে গেল, বা আজকে জজ সাহেবের মুড ভাল থাকাতে জামিন পেয়ে গেল, কিংবা আইনকে পাল্টে দিলেন, এভাবে এখানে হয় না। হিন্দু ধর্মের পরিষ্কার সিদ্ধান্ত, অবশ্য বেশির ভাগ ধর্মেরই সিদ্ধান্ত inclusiveness। কেন inclusiveness আগে আগে আমরা ব্যাখ্যা করেছি। স্বামীজী বলছেন, দান করে আমি কাউকে ধন্য করছি না, দান যে করে সে নিজেকে যেন ধন্য মনে করে, কারণ সে এই দান করার সুযোগ পেল। কোন ভিখারী যদি আমাদের কাছে ভিক্ষা চায়, বা কেউ যদি ডোনেশান নিতেও আসে, সাধারণ ভাবে দেখা যায়, যতটুকু না দিলেই নয়, আমরা ততটুকু দায়সারা ভাবে দিয়ে রেহাই পেতে চাই। কিন্তু যার জীবনের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন করা, যার উদ্দেশ্য ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, সে শুধু নিজের শরীরটুকু চালানোর জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু রেখে সব ছেড়ে দেয়। খ্রীশ্চানদের মধ্যে ত্যাগের ভাব এত উচ্চমানের ছিল যে, এক সময় খ্রীশ্চানদের যাঁরা saint ছিলেন, তাঁরা বলতেন ভিখারীরা যে বস্ত্র পরিত্যাগ করে দিয়েছে, শুধু সেই বস্ত্র তুমি ধারণ করবে। পরে সেন্ট ফ্রান্সিস আসার পর তিনি এগুলো পাল্টে দিলেন, একটা রুচি সম্মত জীবন তাঁদের চালাতে হবে। হিমালয়ে আমরা যে সন্ন্যাসীদের কথা বলি, আগেকার খ্রীশ্চান সেন্টরা একই রকম ছিলেন। সেইজন্য তাঁদের জ্ঞান, ধ্যান, ক্ষমতাও সেই রকমই ছিল। আগে এখানে সন্ন্যাসীদের কাছে কেউ ভিক্ষা চাইত না, কিন্তু এখন সন্ন্যাসীদের জীবন ধারার স্টাইল অন্য রকম হয়ে গেছে, তাই এখন চাইতে শুরু করেছে। যদি কেউ আমাদের কাছে কিছু চাইছে, বা তীর্থাদীতে গিয়ে দান করতে পারছি, বুঝতে হবে এটা আমাদের সৌভাগ্য। একটা ইয়ং ছেলে চাকরি চাইছে, চাকরির জন্য সে ছটফট করছে। একজন এসে বলল, ওহে আমি তোমাকে একটা চাকরি দিতে চাই। আর এই চাকরিটা ও যে রকম চাকরি প্রত্যাশা করছিল তার থেকেও ভাল চাকরি। এখন সে নিজেকে ধন্য মনে করবে কিনা? ছেলেটি বলবে, আমি তো এটাই চাইছিলাম, আপনি আমার কি উপকার যে করলেন, বলে বোঝাতে পারব না। মানুষ যখন দান করে, তখন বুঝতে হবে, ভগবান তার সুবিধা করে দিলেন যাতে সে inclusivenessএ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, এটাই সিদ্ধান্ত। দানের ক্ষেত্রে মানুষ নিজের মত পরিভাষিত করে নেয়, আমি আমার উপার্জনের পাঁচ শতাংশ বা তিন শতাংশ দান করতে থাকব। একশ টাকা দিয়ে যে কাজ হয়, পঁচানব্বই টাকাতে সেই একই কাজ হবে। আয়ের পাঁচ শতাংশও যদি মানুষ দানের জন্য রেখে দেয়, বাকি যা থাকবে তাতেই সংসারের খরচ

চালিয়ে জমাবার মত অনেক টাকা থাকবে। মুখে আমরা অনেক কথা বলি বটে, কিন্তু অনুশীলনের সময় সেটাকে নামানো আর হয়ে ওঠে না।

স্বামীজী বলছেন, The poor man suffers that we may be helped; let the giver kneel down and give thanks, let the receiver stand up and permit. (*লোকে যে কষ্ট ভোগ করছে, তার কারণ তার উপকার করে আমাদের কল্যাণ হবে। অতএব দাতা দান করার সময় গ্রহীতার সামনে হাঁটু গেড়ে বসো এবং তাকে ধন্যবাদ দাও, গ্রহীতা সামনে দাঁড়িয়ে থেকে দান করতে অনুমতি দিক।*) এটা হল মনুস্মৃতির ভাব। ঠাকুরকে একজন জিজ্ঞেস করছেন, পাপ কেন? ঠাকুরও তাঁর ব্যাখ্যা করছেন। আমরা অনেক সময় বাচ্চাদের মত প্রশ্ন করি, জগতে এটা কেন আছে, সেটা কেন আছে, এই রকম কেন হয় ইত্যাদি। তার মধ্যে একটা হল গরীব কেন আছে? অনেক ভাবেই এর উত্তর দেওয়া যেতে পারে। যারা খুব কঠোর পুরুষ, তারা বলবে, বাজে কর্ম করেছিল বলে আজকে তার এই দুরবস্থা হয়েছে। স্বামীজী বলছেন, যারা গরীব, কষ্টে যারা আছে, যাতে তুমি তাদের দান করে ধন্য হয়ে আধ্যাত্মিক ভাবে আরও প্রতিষ্ঠিত হতে পার। কিন্তু আমরা যে নিজের ভিতর মাকড়সার জাল তৈরী করে সেই জালের মধ্যে একটা জায়গায় আবদ্ধ হয়ে বসে ভাবছি আমি শ্রেষ্ঠ বাকিরা নিকৃষ্ট, এই ভাব থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারি না। কাঙালি ভিখারী দেখলে তাদের সাথে দুর্ব্যবহার আমরা করবই, কিছু চাইলে 'না' বলবই। এগুলোর জন্য দরকার ছোট বয়স থেকে ট্রেনিং। ঠাকুরকে এসে একজন জিজ্ঞেস করছে, সংসারে থেকে কি হবে না? ঠাকুরও বলছেন, হবে না কেন! বলেই আরও চারটে কথা বলে দিচ্ছেন, যেটা কারুরই পক্ষে পালন করা সম্ভব না। খুবই সহজ, তুমি দানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আগে দেখিয়ে দাও তো। মাত্র পাঁচ শতাংশ, আমার সারা মাসের যা উপার্জন, তার পাঁচ শতাংশ থেকে কিছুটা যাবে সাধুসেবায়, কিছু যাবে গরীব সেবায়, কিছু যাবে নরনরায়ণ সেবায়। কিন্তু আমরা পারব না। যখন দেখবে ওই ফাণ্ডে অনেক টাকা জমে গেছে, তখন ওই টাকা এমন আকর্ষিত করে দেবে যে, আমাকে দান করতে দেবে না। সেইজন্য বলছেন, কাউকে যখন কিছু দান করবে, তখন হাতজোড় করে গ্রহীতার সামনে গিয়ে বল, আমি ধন্য হলাম আপনি যে আমার এই দান গ্রহণ করলেন। মনু বলছেন, দাতা ও গ্রহীতা দুজনই যেন ধন্য মনে করে। দাতা মনে করবে, উনি আমার দান গ্রহণ করে সুযোগ দিলেন যাতে আমি আধ্যাত্মিক জীবনে আরও এগোতে পারি। যিনি গ্রহণ করছেন, তিনি এই মনে করে নিজেকে ধন্য মনে করবে, আপনি আমাকে দানের যোগ্য পাত্র বলে বিবেচিত করেছেন। গীতায় ভগবানও বলছেন, দান সব সময় সৎপাত্রে করতে হয়। আপনি যে আমাকে সৎপাত্র মনে করেছেন, সেইজন্য আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।

See the Lord back of every being and give to Him. When we cease to see evil, the world must end for us, since to rid us of that mistake is its only object, (*সবার মধ্যে সেই প্রভুকে দেখে তাঁকেই দান কর। জগতে কোন কিছুতে আমরা যখন আর মন্দ কিছু দেখতে পাব না, তখন আমাদের পক্ষে জগতপ্রপঞ্চই থাকবে না, কারণ প্রকৃতির অস্তিত্বের উদ্দেশ্যই হল এই ভ্রম থেকে আমাদের মুক্ত করা।*) সব কিছুর মধ্যে তুমি ঈশ্বরকে দেখতে শুরু করলে তুমি আর পাপ দেখবে না। আমরা গোলমাল কেন দেখছি? কারণ আমরা সেখানে ঈশ্বরকে দেখছি না। এখন আমাদের কাছে জগতের খুব দাম, কিন্তু যেমনি আমরা জগতের দোষ দেখা বন্ধ করার চেষ্টা শুরু করব, এই জগতের কোন দাম আমাদের কাছে থাকবে না। স্বামীজী সেটাই বলছেন, When we cease to see evil, the world must end for us, since to rid us of that mistake is its only object, মা যখন বলছেন, কারুর দোষ দেখ না, এখানে কেউ পর নয়, দোষ দেখ নিজের। পর কি করে হবে! *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*, ব্রহ্মই সব কিছু হয়েছেন, যা কিছু দেখছি সব ঈশ্বরই হয়েছেন, তাই পর বলে কেউ নেই। জগতে দোষ দেখা কেউ যদি বন্ধ করে দিতে পারে, বুঝতে হবে, তার জন্য জগৎ শেষ। জগৎ শেষ হয়ে যাওয়া মানেই, এবার সে আধ্যাত্মিক হয়ে গেল।

এই সংসারে সবাইকে থাকতে হয়। ভগবান যখন অবতার হয়ে আসেন, তাঁকেও সংসারে থাকতে হয়, কিন্তু সংসারে থেকেও তিনি সংসারী নন। সন্ন্যাসীও এই সংসারেই আছেন, কিন্তু তিনিও সংসারী নন। কারণ সংসারের বন্ধন তাঁকে বাঁধতে পারে না। যত রকম বন্ধন হতে পারে, তার মধ্যে দোষ দেখাটা খুব শক্তপোক্ত বন্ধন। তাই দোষদৃষ্টি নাশ হয়ে গেলে বুঝতে হবে, জগতের বন্ধন থেকে সে মুক্ত হয়ে গেছে। To think

there is any imperfection creates it, (*অপূর্ণতা বলে কিছু আছে – এই ভাবনাটাই অপূর্ণতার সৃষ্টি করে দেয়।*) যেমনি আমরা ভাবছি এখানে দোষ আছে, বুঝতে হবে ওখানে দোষ সৃষ্টি হয়ে গেল, ওখানে কম হলেও আমাদের মধ্যে দোষ সৃষ্টি হয়ে গেছে। আমরা আগেও এর উপর আলোচনা করে এসেছি।

শুভকর্মেও একটু অশুভ থাকবে - কর্মে ঠিক ভাব - বিনয়ের ভাণ

Thoughts of strength and perfection alone can cure it. Do what good you can, some evil will inhere in it; but do all without regard to personal result, give up all results to the Lord, then neither good nor evil will affect you, (*আমরা ঈশ্বরের সন্তান, পূর্ণস্বরূপ ও ওজঃস্বরূপ, এই একটি চিন্তাই ওটাকে দূর করে দিতে পারে। তুমি যত ভাল কাজই কর না কেন, সব কাজেই কিছু না কিছু মন্দ থাকবে। তবে সমুদয় কার্য নিজের ব্যক্তিগত ফলাফলের দিকে দৃষ্টি না রেখে করে যাও, সব ফল ঈশ্বরে সমর্পণ কর, তাহলে ভাল মন্দ কিছুই তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না।*) আগুন জ্বালালে ধুয়ো উঠবেই, ঠিক তেমনি যখনই কোন ভাল কাজ করা হয়, জানতে হবে, ওই ভাল কাজের সাথে একটু মন্দ হবেই। ঠাকুর গল্প বলছেন, কোথায় তিনি এই গল্প পেয়েছিলেন জানা নেই। সীতা বলছেন, অযোধ্যার সবারই যেন কষ্ট দূর হয়ে যায়। শ্রীরামের এমনই মায়া যে, সবারই টাকা পয়সা এসে গেল। শ্রীরামের এমনই মায়া যে, সীতারই বাড়ির ছাদ দিয়ে জল ঘরে পড়তে লাগল। রাজমিস্ত্রিদের ডাকা হল। তাদের এখন অনেক টাকা-পয়সা হয়ে গেছে, বৃষ্টির মধ্যে কে আর কষ্ট করে ছাদ সারাতে যাবে। কেউ রাজী হল না। তখন সীতা বলছেন, যেমনটি ছিল তেমনটিই থাক।

আমরা সবাই চাই equality, কিন্তু আমার equalityর উপর যদি প্রশ্ন এসে যায় তখন equalityর নিয়মটা একটু পাল্টে যাবে। রাশিয়া এবং অন্যান্য কম্যুনিস্টদের দেশে সবাই equal, কিন্তু যারা পার্টি মেম্বারস তারা more equal than others। সমান কোথাও হয় না। সেইজন্য স্বামীজী বলছেন, ভাল কিছু তুমি করলে তার সাথে মন্দ কিছু হবেই। একশ ভাগ ভাল কোন কাজে কখনই হবে না। শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কায় এত কাণ্ড করলেন, তাতে ভাল হয়েছে ঠিকই, কিন্তু মন্দও কিছু হয়েছে। তাই ওই মন্দের দিকে তাকাতে নেই। ভালটাকে নিয়ে বাকি সব কিছুকে ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে যেতে হয়। শুধু দেখতে হবে, নিজের আমিত্বটাকে আলগা করা যাচ্ছে কিনা, নিজের লোভকে শিথিল করা হয়েছে কিনা, মোদ্দা কথা exclusive থেকে বেরিয়ে এসে একটু একটু করে inclusiveএর দিকে এগিয়ে যেতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ কত কিছু করছেন, কোথাও কিন্তু তার আমিত্ব বলে কিছু নেই; নিজের জন্য তিনি কিছু চাইছেন না। রাবণ বধ হয়ে যাওয়ার পর শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে বলছেন, 'সীতা তুমি জেনে রাখো, তোমার ভালবাসার জন্য এত কিছু আমি করিনি, আমি ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম আমি পালন করেছি'। নিন্দুকরা অনেক কথা বলে, ওদের কথা ধরতে নেই। ঠাকুরও বলছেন, ওগুলো নিন্দুকদের কথা, নিন্দুকদের দিকে তাকাতে নেই। অবতার পুরুষ এবং কোন মহাপুরুষের কোন স্বার্থ থাকে না। অনেক সময় দেখে মনে হতে পারে, এটা তিনি নিজের বন্ধু বা কাছের লোকের জন্য করছেন, তা নয়, আসলে তিনি আমিত্ব থেকে মুক্ত। জীবনে বড় হওয়ার জন্য এটাই বলা হয়, কাজ কর, অপরের ভালর জন্য কাজ কর। কাজ করতে গিয়ে কিছু মন্দ হতে পারে কোন সন্দেহ নেই, তাও তুমি কাজ করে যাও, স্বার্থ যেন না থাকে। সূক্ষ্ম স্বার্থ, আমার নাম যশ হবে, সেটাও যেন না থাকে। এটা বলার পর স্বামীজী বলছেন।

Doing work is not religion, but work done rightly leads to freedom. (*কাজ করাটা ধর্ম নয়, কাজ ঠিক ভাবে করলে সেই কাজ মুক্তির দিকে নিয়ে যায়।*) এটা খুব নামকরা কথা। কাজ করা, পূজা করা, সেবা করা, এগুলো ধর্ম না; কিন্তু ঠিক ভাব নিয়ে কাজ করলে তখনই কর্ম মানুষকে মুক্তির দিকে নিয়ে যায়। কর্ম সব সময় বন্ধন তৈরী করে, সেই কর্মের ভাবকে যদি পাল্টে দেওয়া যায়, তখন ওই কর্মই বন্ধন তৈরী না করে মুক্তির দিকে নিয়ে যাবে। শ্রীমদ্ভাগবতে খুব সুন্দর কথা আছে, বিষের ওষুধ বিষ, বিষকে যদি পরিমিত ভাবে প্রয়োগ করা হয়, তখন ওটাই বিষের ওষুধের কাজ করবে। সেই রকম, কর্ম বন্ধন তৈরী করে ঠিকই, কিন্তু কর্মের ভাবটাকে যদি ঠিক করে নেওয়া হয়, তখন ওই কর্মই মানুষকে মুক্তির দিকে নিয়ে যাবে। In reality all pity is darkness, because whom to pity? Can you pity God? And is there anything else? (*অপরকে করুণা করা, করুণার দৃষ্টিতে তাকানো অজ্ঞান থেকেই হয়ে*

থাকে। আমরা কাকে করুণা করব? তুমি ঈশ্বরকে করুণার চোখে দেখতে পারো কি? এই জগতে ঈশ্বর ছাড়া কিছু আছে কি?) তুমি কাকে দয়া করছ? কাকে করুণা করছ? কাকে কৃপা করছ? কাকে ঘৃণা করছ? তুমি একবার ভেবে দেখ, জগতে ঈশ্বর ছাড়া কিছু আছে কি! কিন্তু তা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত জগতে এমন লোক দেখা যাবে না, যাদের কোথাও না কোথাও এই মনোভাব থাকবে না যে, কোন উপকার করে মনে মনে ভাববে বা মুখেও বলে দিতে পারে – আমি তোমাকে কৃপা করলাম। কয়েকজন অপদার্থ আছে, যারা একটা বিনয়ের ভাণ করে থাকে, কিন্তু ভিতরে অহংকারের ঢিপি। তোমার ভিতরের অহঙ্কারকে সামনে নিয়ে এসো, তারপর দুটো ধাক্কা খাবে, তখন সোজা হয়ে যাবে। কিন্তু অহঙ্কারকে সুন্দর করে ঢেকে রাখবে। বেশির ভাগ সাধু সন্ন্যাসীদের সময় চলে যায় শুধু পোজ্ মারতে। সবাই পরকে ঠকায়, নিজেকেও ঠকায়। কত বিনয়ের ভাব, আবার এই অহঙ্কারও আছে যে আমি অমুকের থেকে বেশি বিনয়ী। অহঙ্কার থেকে মানুষ বেরোতে পারে না, অসম্ভব।

কথামৃতে আমরা দেখছি, ঠাকুর কাউকে ছেড়ে কথা বলতেন না; যাকে বলছেন, তার গায়ে যেন আগুন লেগে যেত। তিনি কাউকে ছাড়ছেন না, নরেনকেও ছাড়ছেন না, মাস্টারমশাইকেও ছাড়ছেন না। ঠাকুর অবতার কোন সন্দেহ নেই, তিনি আমাদের ইষ্ট, আদর্শ ঠিক আছে, কিন্তু ঠাকুরের মধ্যে আমরা একটা জিনিস দেখছি – তা হল, ঠাকুরের মধ্যে কোথাও কোন হিপোক্রেসি নেই, দুই রকম কিছু নেই। যার জন্য তিনি কারুর হিপোক্রেসি সহ্য করতে পারতেন না; এক সেকেণ্ড দেখেই বুঝে যাচ্ছেন এই জায়গাতে চালাকি চলছে। নরেনকেও যদি দেখছেন চালাকি মারছে তাকেও ছাড়ছেন না। অনেক কিছুতেই ভাণ করা যায়, ভাণ করা খুব সহজ। ভক্তরা মঠের কোন সেন্টার থেকে ঘুরে আসার পর বলবে, 'মহারাজরা কি খাতির করলেন, ওখানকার দুধ কি সুন্দর, কি ভাল খাওয়া দাওয়া'! বাড়িতে যেন খেতে পায় না, আর তুমি কি আশ্রমে গেছ দুধ আর ভাল মন্দ খাওয়ার জন্য? আবার বলবে, 'ওখানকার অধ্যক্ষ কি প্রেমিক সাধু'। মানুষ এই জিনিসগুলো থেকে কিছুতেই বেরোতে পারে না। স্বামীজী ঠিক এই জিনিসটাকেই এখানে বলছেন, এখানে যে pityর কথা বলছেন, এই pity এক ভাবে না, সমস্ত ভাবে দেখাবে। আমরা একবারের জন্যও বোঝার চেষ্টা করি না যে, সামনে যিনি আছেন তিনি ঈশ্বরেরই একটা রূপ। আর আপনিও আমার না, কারণ আপনিও ঈশ্বরের রূপ।

আমরা কেউ ভগবানের গোলাম নই, সবাই আমরা ভগবানের সাথে জুড়ে আছি। ঠাকুরের সামনে তাই আমাদের কিভাবে গিয়ে দাঁড়াতে হবে? একজন রাজার সামনে গিয়ে রাজকুমার যেভাবে দাঁড়ায়। তুমি রাজাধিরাজ, আর আমি রাজকুমার, কারণ আমি তোমারই সন্তান। যেদিন ঠাকুরের সামনে তুমি এভাবে দাঁড়াতে পারবে, সেদিন বুঝবে, এবার তোমার কিছু হয়েছে। সেখানে কোন অহঙ্কার নেই, এটাই সত্য। আর রাস্থা ঘাটে যে কাঙালীরা ঘুরে বেড়ায়, তারাও সেই ঠাকুরেরই এক একটা রূপ, তাদের সাথে আমাদের সেই ভাব নিয়েই ব্যবহার করতে হবে, যেভাবে আমরা ঠাকুরের বিগ্রহের সামনে ব্যবহার করি। দুটো যখন এক হবে, তখন বুঝতে হবে, এবার কিছু হচ্ছে।

এই কথা বলার পর স্বামীজী বলছেন, And is there anything else? ঈশ্বর ছাড়া কি এই জগতে কিছু আছে? আমাদেরই দুর্ভাগ্য যে, আমরা নিজেরা ঠিক করে নিয়েছি, এতটুকু ঈশ্বর, এতটুকু আমি, এতটুকু সংসার, এতটুকু আমার শত্রুরা। মানুষ এই বিভেদিকতা থেকে কিছুতেই বেরিয়ে আসতে পারে না, চেষ্টাও নেই। সেইজন্য এসব কথা বার বার শুনতে হয়, বার বার আলোচনা করতে হয়, বার বার মনন চিন্তন করতে হয়। অনেকদিন এভাবে করতে করতে তবে যদি গিয়ে অহঙ্কার যায়। স্বামী ভূতেশানন্দ মহারাজ খুব মজা করে কথা বলতেন, আর ওনার মত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি খুব কম লোকের মধ্যে দেখা যায়। মহারাজরা এসে একদিন ওনাকে মজা করে বলছেন, 'মহারাজ! আপনি শুধু বলেন তোমরা ঠাকুরের উপর বিশ্বাস করো না, খালি নিজের উপর বিশ্বাস কর; এইতো আমাদের সেক্রেটারীরা কত সুন্দর বলেন, ঠাকুরের ইচ্ছায় এই মন্দির শেষ হল'। সঙ্গে সঙ্গে মহারাজ বলছেন, 'হ্যাঁ বলে, কিন্তু তারপরেই বলে, ঠাকুরের ইচ্ছায় আমার সময়ে এই মন্দিরটা শেষ হল'। ঠাকুরের ইচ্ছা আনবেন ঠিকই, কিন্তু নিজেকেও তার মধ্যে নিয়ে আসবেন। আবার বলবেন, ঠাকুরের ইচ্ছায় এই শরীরকে দিয়ে এটা করানো হল। পরিষ্কার করে বলতে পারছেন না যে, আমি করেছি। এরপর চার পাঁচটা ট্রান্সফার হয়ে গেলে আমিটা কাটবে। তখন মনে হবে, শালার বাড়ি। যারা এই রকম ভিতরে এক রকম, মুখে আরেক রকম বলে, তাদের আরও দুরবস্থা হয়।

জগৎটা একটা নৈতিক ব্যায়ামশালা

Thank God for giving you this world as a moral gymnasium to help your development, but never imagine you can help the world. (*ঈশ্বরকে তোমরা ধন্যবাদ দাও যে, তিনি তোমাকে তোমার আত্মোন্নতির জন্য এই জগৎরূপ একটা নৈতিক ব্যায়ামশালা দিয়েছেন, কিন্তু কখনও ভেবো না – তুমি এই জগৎকে সাহায্য করতে পারো।*) মানুষ যেমন জিমে গিয়ে শরীরের স্নায়ু ও পেশীকে শক্তপোক্ত করে শক্তি বৃদ্ধি করে, ঠিক সেই রকম এই জগৎটাও একটা জিমনাসিয়াম, যেখানে আমাদের নৈতিক শক্তি বাড়িয়ে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। এখানে যদি তোমার শক্তি না বেড়ে থাকে, তাহলে একটা পাথর হয়ে পড়ে থাকবে। কাউকে অপমান করার সব থেকে খারাপ কথা হল, 'আপনাকে পঁচিশ বছর পর দেখছি, আপনি কিন্তু একটুও পাল্টাননি, একই রকম আছেন'। পঁচিশ বছর আগে যেমনটি ছিল, এখনও তেমনটি আছে, তার মানে সে তো একটা পাথর। এর থেকে বেশি অপমান আর কি হতে পারে! কিন্তু সবাই একই রকম হয়ে থাকতে চায়, নিজের যৌবনকে সবাই ধরে রাখার জন্য কত কিছু করছে, বুড়িরা ছুড়ি সেজে রাস্তায় বাসে ট্রেনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ যদি তার রূপ নিয়ে প্রশংসা করে, কত খুশি হয়ে যাবে, কিন্তু এটা বুঝছে না যে, এটা কত বড় অপমান। জগৎরূপী এই জিমনাসিয়ামে এসে আপনার শক্তি বৃদ্ধি হল না, আপনার আধ্যাত্মিক পেশি তৈরী হল না, নৈতিক পেশি তৈরী হল না, আপনি এখানে এসে করলেনটা কি! যখনই আমরা এই জগতে কোন কাজ করছি, এটা আমাদের জানতে হবে যে, এতে সব সময় শুধু আমাদেরই কল্যাণ হয়। বাইপ্রোডাক্ট রূপে কিছু মানুষের কল্যাণ হতে পারে। এখানে সব কাজে আগে নিজের এই স্বার্থটা সব সময় দেখতে হবে। আমার আত্মন্নোতি যদি না হয়, আমার নৈতিক পেশি যদি তৈরী না হয়, আধ্যাত্মিকতায় আমার যদি অগ্রসর না হয়, কেন আমি কাজ করতে যাব! আগে নিজের স্বার্থ দেখ, এটা সবারই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

স্বার্থ হল একমাত্র আধ্যাত্মিকতায়, আধ্যাত্মিক উন্নতি মানেই inclusive, তার মানে আমরা দশজনকে সঙ্গে নিয়ে চলতে পারছি। একজনও যদি কেউ আধ্যাত্মিক ভাবে উন্নত হয়ে যায়, তার আশেপাশে সবাই শান্তি পাবে, তাকে দেখে সবাই আরও উন্নত করবে। আর যদি তুমি মনে কর, মঠে ভক্তদের খিচুড়ি খাইয়ে আমি সবাইকে কৃতার্থ করলাম, তাহলে কিন্তু তুমি সেই exclusive হয়ে থাকলে। খিচুড়ির চালটাও তোমার না, ডালটাও তোমার না, যে ক্ষেতে চাল-ডাল উৎপন্ন হয়েছে সেই ক্ষেতটাও তোমার না, খিচুড়ির চাল-ডাল কেনার জন্য টাকা সংগ্রহ করা হয়েছে সেটাও তোমার না, কারণ ভক্তরা ঠাকুরের নামে ওই টাকা দিয়েছে, কিসের তুমি কৃতার্থ করছ!

তার সাথে স্বামীজী বলছেন, Be grateful to him who curses you, for he gives you a mirror to show what cursing is, also a chance to practise self-restraint; so bless him and be glad. (*তোমাকে যে অভিশাপ দিচ্ছে তার প্রতি তুমি কৃতজ্ঞ হও, কারণ অভিশাপ জিনিসটা কি তা দেখবার জন্য সে যেন তোমার সামনে একটা আয়না ধরেছে, আর তোমাকে আত্মসংযম, তিতিক্ষার অনুশীলন করার সুযোগ দিচ্ছে। সুতরাং তাকে আশীর্বাদ কর ও সুখী হও।*) যে সত্যিকারের আধ্যাত্মিক হতে চাইছে তাদের এটা বুঝতে হয়, কেউ যখন আমাকে কষ্ট দিচ্ছে, কোথাও হয়ত আমারও কোন দোষ আছে, ঠিক আছে। কিন্তু তাই বলে তোমার যে স্বভাব, আমি সেই রাজাধিরাজের সন্তান রাজকুমার, ঈশ্বরের সাম্রাজ্যের আমি একজন উত্তরাধিকারী, ওই স্বভাবকে ছাড়া যাবে না, কোন অবস্থাতেই আমি নিজেকে দীন হীন কাঙালীর মত দেখাবো না। আমার সামনে তুমি আয়না তুলে ধরছ, আমি কৃতজ্ঞ; কিন্তু তাই বলে তুমি আমাকে পোকামাকড় মনে করে পদদলিত করবে, তা কখন হবে না। বেলুড় মঠে দুই ব্রহ্মচারী একই ঘরে থাকতেন, একজন জাপানী অন্যজন এখানকার। জাপানী মহারাজ নিজের মত বই পড়ে যাচ্ছেন, অন্য মহারাজ অন্য এক মহারাজের সাথে খুব জোরে জোরে কথা বলে যাচ্ছেন। জাপানী মহারাজ দুবার তিনবার ওই মহারাজকে অনুরোধ করে বললেন, 'প্লীজ একটু আস্তে কথা বলুন, কথা বলতে হলে বাইরে গিয়ে কথা বলুন'। ওই মহারাজ খালি বলে যাচ্ছেন, 'I am teaching you titikshya'। জাপানী মহারাজ যখন আর সহ্য করতে পারলেন না, তিনি উঠে এসে ওই মহারাজের ঘাড় ধরে টেনে এনে দরজার বাইরে জোরে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলেন, ব্রহ্মচারী ছিটকে অনেক দূরে গিয়ে পড়েছেন, দিয়ে বলছেন, 'Now you practice titikshya'।

ভগবান যীশু বলছেন, তোমাকে এক গালে চড় মারলে তার দিকে আরেকটা গাল বাড়িয়ে দাও। এটাকে কেন্দ্র করে খুব নামকরা একটা কাহিনী আছে, একজন খুব বিখ্যাত পালোয়ান খ্রীশ্চান হয়ে গেছে। সেই পালোয়নাকে একজন এসে এক চড় মেরে বলছে, যীশু বলেছেন, তোমার এক গালে কেউ চড় মারলে দ্বিতীয় গালটা বাড়িয়ে দেবে। পালোয়ান আরেকটা গাল বাড়িয়ে দিয়েছে। লোকটি এক চড় মারল। এরপর পালোয়ান বলছে, ‘আমার তো দুটোই গাল, তৃতীয় গাল নেই যে তোমাকে এগিয়ে দেব; এবার বাকিটা আমিই তোমাকে দিচ্ছি’। বলেই লোকটিকে উদুম মার মারতে লাগল। এগুলো হল খুব খেলো কথা, সত্যিকারের আধ্যাত্মিকতা এখানে নেই। আমার মধ্যে হাজারটা দুর্গুণ থাকতে পারে, আমি একটা ক্রিমিনাল হতে পারি, চোর, বদমাইশ হতে পারি, একটা গুণ আমার আছে, যেটা তোমার মধ্যে নেই। তা হল – আমি জানি আমি ঈশ্বরের সন্তান, তুমি সেটা জানো না। ঠাকুর বার বার বলছেন, ছেলে যখন মায়ের কোলে থাকে তখন সে মনে করে আমি সর্বশক্তিমান। ওই একটা জ্ঞান যার মধ্যে আছে, তার সমস্ত দুর্গুণ পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। আয়না ধরিয়ে দিয়ে যে বলছেন, মূলতঃ বলতে চাইছেন, তুমি এভাবে দেখ – আমি ঈশ্বরের সন্তান হয়ে নিজেকে কিভাবে এই সংসারের সন্তান বলে মনে করছি। যে নিজেকে ঈশ্বরের সন্তান মনে করছে, সে এবার আরও এগিয়ে যাবে, সে কখন নিজেকে পদদলিত মনে করবে না। জিমে যে মানুষ যায়, সেখানে শক্তি অর্জন করতে যায় না, কিছু জিনিসের সে অনুশীলন করবে তাতে তার ভিতরের শক্তিটা ফুটে বেরিয়ে আসবে। জগৎ হল নৈতিক জিমনাসিয়াম, তোমার ভিতরে ওই শক্তিটা আছে, আজেবাজে জিনিস দিয়ে শক্তিটা চাপা পড়ে আছে, জিমনাসিয়ামে যাওয়া মানে, ওই আজেবাজে জিনিসগুলিকে পরিষ্কার করা। বলছেন, Without exercise, power cannot come out; without the mirror, we cannot see ourselves. (*অনুশীলন না করলে, অভ্যাস না করলে শক্তির বিকাশ হতে পারবে না, আয়না সামনে না ধরলে আমরা নিজের মুখ নিজে দেখতে পারব না।*) শক্তি আমাদের মধ্যেই আছে, নৈতিক জিমনাসিয়ামে গিয়ে অভ্যাস করলে শক্তি বেরিয়ে আসবে। ঠিক তেমনি আমার দোষ যখন কেউ দেখিয়ে দিচ্ছে, তখন তার উপর রাগ করতে নেই, তখন বুঝতে হবে, সে আমার সামনে আরশিটা তুলে ধরছে।

স্বামীজী এইদিনের ক্লাশের প্রথম দিকে বলেছিলেন, আমরা তখনই সেই জিনিসটা পাওয়ার যোগ্য হই, যখন সেই জিনিসটা আমাদের আর বাঁধতে পারে না। স্বামীজীর এই বক্তব্যের অর্থ ও তাৎপর্যের উপর আমাদের আলোচনা অনেকের কাছে পরিষ্কার হয়নি, তাই আরেকটু পরিষ্কার করে বলা হচ্ছে। উপর থেকে দেখতে গেলে এই কথাগুলো খুব সহজ কথা মনে হবে, গভীরে গেলে দেখা যাবে খুব গভীর কথা; শাস্ত্রের দিকে তাকালে আমরা দেখি এটাকে নিয়ে কত আলোচনা রয়েছে, কত কাহিনী রচিত হয়েছে। পুরাণে সমুদ্র মন্থনের কাহিনীতে দেখাচ্ছেন, প্রথম হলাহল বেরিয়ে এলো, তারপর আরও অনেক কিছু এক এক করে বেরিয়ে এলো, তারপর লক্ষ্মী বেরিয়ে এলেন। লক্ষ্মী বেরিয়েই দেখছনে সবাই তাঁকে চাইছেন, দেবতারা চাইছেন, অসুররা চাইছেন, দানবরা চাইছেন, সেখানে ঋষিরা আছেন, সিদ্ধরা আছেন, নাগরা আছেন, গন্ধর্বরা আছেন; সবাই লক্ষ্মীকে চাইছেন। লক্ষ্মী চারিদিকে ঘুরে ঘুরে তাকাচ্ছেন, দেবতাদের দিকে তাকালেন, দেখছেন দেবতারা অহঙ্কারী, অসুর দানব এরা আরও অহঙ্কারী আবার হিংস্র, নাগরা ক্রুঢ়, ঋষিরা রুক্ষ, কিন্তু সবাই লক্ষ্মীকে চাইছেন। লক্ষ্মী কারুর কাছে যেতে চাইলেন না। ঘুরতে ঘুরতে তিনি বিষ্ণুর কাছে গেলেন, দেখছেন বিষ্ণু নির্বিকার। লক্ষ্মী এলেন আবার চলে গেলেন, বিষ্ণু ঘুরেও দেখলেন না, লক্ষ্মীর প্রতি কোন আগ্রহই প্রকাশ করলেন না। লক্ষ্মী তখন ঠিক করে নিলেন, আমি এনার কাছেই থাকব। তার মানে, লক্ষ্মীকে ঠিক ঠিক deserve করেন ভগবান বিষ্ণু। বাকিরা সবাই লক্ষ্মীকে চাইছেন, তাঁদের সবার মধ্যে আবার কিছু দুর্গুণও আছে, যে দুর্গুণগুলো থাকার জন্য কোথাও তাঁদের কিছু ঘাটতি থেকে যাচ্ছে।

আমরা প্রায়ই শুনে থাকি যে, ভাল মানুষের উপর বদমাইশ মহিলা কিংবা বদমাইশ মানুষ সতী নারীর উপর অত্যাচার করতে শুরু করে। কোথাও দুজনে একটা বন্ধনে পড়ে আছে, এক অপরকে বাঁধতে চাইছে। দুর্বল হলে বাঁধবে, দুর্বল না হলে বাঁধতে পারবে না। বাঁধার চেষ্টা করছে মানেই দুর্বল; অন্যজন সহ্য করতে থাকে। বাঁধার চেষ্টা করা মানেই, কোন ভাবে তার some kind of emotional turbulence আসছে। সহ্য করতে করতে একটা সময় আসে যখন সে বলেই ফেলে, তুমি আমার যোগ্য নও। ডিভোর্সের বেশির ভাগ ক্ষেত্রে একজন ঠিক এই ভাষা ব্যবহার করে, You don’t deserve me। তুমি আমার যোগ্য নও – এই

বাক্যের দুটি ধাপ পিছনে যদি যাওয়া যায় তখন দেখা যাবে, সে অবহেলিত হচ্ছে, আর নয়ত তার উপর কোন ভাবে অত্যাচার হচ্ছে। অত্যাচারের পিছনেই খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস থাকে, সেটা হল নিজের দুর্বলতা। নিজের দুর্বলতা মানুষকে কোন ভাবে বেঁধে নেয়, emotionally volatile করে রাখে। যে মানুষ কোন জিনিসকে নিয়ে emotionally volatile নয়, তাকে ওই জিনিস বাঁধতে পারে না। একটা কাঙালী যদি কোন ভাবে একটা একশ টাকার নোট পেয়ে যায়, সে প্রাণপনে সেটাকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইবে। কিন্তু একজন কোটিপতি অত হিসাব রাখতে যায় না, ওরা ওই অবস্থাকে পেরিয়ে গেছে। একটা সময় যখন আমরা পেরিয়ে যাই, তখনই বোঝা যায় আমি ওই জিনিসটার ঠিক ঠিক যোগ্য হয়েছি। তখন আমরা ওই জিনিসটার সম্মানও দেব। যেমন শ্রীশ্রীমা, ঝাঁটাকেও বলছেন, তারও একটা সম্মান আছে। ছোট জিনিস, কিন্তু সম্মান আছে। তোমার দরকার আছে, কিন্তু তুমি আমাকে বাঁধতে পারো না। এদের তফাৎ গুলি অত্যন্ত সূক্ষ্ম। আমরা সেইজন্য চার রকমের উদাহরণ দিয়ে থাকি, যাতে যে উদাহরণটা যার খাপ খাবে সে সেই উদাহরণটা দিয়ে বুঝতে পারবে।

বয়স হয়ে গেলে, বয়স্ক দম্পতিদের emotional turbulence অনেক কমে যায়, তবেই দুজন দুজনকে সাহায্য করে; তখন বুঝতে হবে এবার এই জোড়টা ঠিক হয়েছে। এগুলোকে নিয়ে একটু বিচার করলে দেখা যাবে, emotional turbulence যখন খুব বেশি হয়ে যায় তখন আজ হোক কাল হোক এই বাক্যটা আসবে, তুমি আমার যোগ্য নও। আর emotional turbulence কখনও বাড়ছে কখনও কমছে, তার মানে বুঝতে হবে সে এখনও তার বন্ধনে রয়েছে। বন্ধনে যদি না থাকে তাহলে তার ওই emotional turbulence আসবে না। আর যতক্ষণ emotional turbulence আসছে, ততক্ষণ বুঝতে হবে সে এখনও ওটার জন্য ঠিক ঠিক যোগ্য হয়নি। নূতন প্রজন্মের কাঁচা মন, তারা মনে করছে ওর জন্য উদ্‌গ্রীব হচ্ছি, একজন আরেকজনকে ছাড়া এক মুহূর্ত থাকতে না পারা, এটাই ভালবাসা, এগুলো মোটেই ভালবাসা নয়। অন্য দিকে আমরা যদি ঠাকুর আর মায়ের দিকে তাকাই, দুজনের মধ্যে সম্পর্ক আছে কিন্তু কোন emotional turbulence নেই। সব সময় এক অপরের জন্য ভাবছেন, ঠাকুর মায়ের জন্য চিন্তা করছেন, মা ঠাকুরের জন্য চিন্তা করছেন, চব্বিশ ঘন্টা করছেন। ঠাকুর সমাধির মধ্যে ডুবে আছেন, সমাধি থেকে নেমে আসার পর ভাবছেন, শরীর চলে যাওয়ার সময়ও ভাবছেন শ্রীশ্রীমায়ের সংসার কিভাবে চলবে, কিন্তু কোথাও emotional turbulence নেই।

মনের পাপ

পঁচিশে জুলাইয়ের ক্লাশের শেষ দুটো প্যারাগ্রাফের আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি। স্বামীজী বলছেন, Unchaste imaginationis as bad as unchaste action. (*অপবিত্র চিন্তা ও কল্পনা অপবিত্র ক্রিয়ার মতই সমান দোষযুক্ত।*) ঠাকুরের খুব নামকরা কথা আছে, কলিতে মনের পাপ পাপ নয়। স্বামীজী এখানে ঠিক উল্টো কথা বলছেন, অপবিত্র চিন্তা বা কল্পনা, অপবিত্র ক্রিয়ার সমান, তার মানে মনের পাপ শরীরের পাপের সমান। ধর্মীয় আলোচনাতে সন্ন্যাসী, গৃহস্থ, সংসারী এই শব্দগুলোকে নিয়ে অনেক আলোচনা চলে। গৃহস্থ হলেন যিনি সংসারে বিবাহাদি করে বসবাস করছেন। সংসার কিন্তু মনকে নিয়ে। আপনজনের প্রতি বা নিজের প্রতি emotion, identification এই জিনিসগুলো যখন চলে, এটাই তখন সংসার। আর এই জিনিসগুলোই যখন ঈশ্বরের প্রতি চলে যায়, তখন এটাই হয়ে যায় সন্ন্যাস। টেকনিক্যালি যদি বলা হয়, perfect সন্ন্যাসী কেউ হন না, আর perfect সংসারীও কেউ হয় না। যারা সংসারে আছে, বিশেষ করে ভারতবর্ষে, তারাও ঈশ্বর চিন্তন করে, আর যাঁরা সন্ন্যাসী তাঁদেরও টাকা-পয়সার চিন্তা থাকে। ঠাকুর বলছেন, পাছে ভয় হল, মা যদি খ্যাঁট বন্ধ করে দেন, তখন বললুম, মা লক্ষ্মী তুমি হৃদয়ে বাস কর। আর সব সন্ন্যাসী রামকৃষ্ণ পরমহংস নন, সব সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ নন। একবার এক জায়গায় দুজন লোক মঠের একজন সন্ন্যাসীকে দেখে বলছে, ‘সন্ন্যাসীতো বিবেকানন্দ থে, বাকি তো এইসে যেইসে’। সন্ন্যাসী দেখলেন এর একটা জবাব দেওয়া দরকার। তিনি তখন বলছেন, ‘গৃহস্থ তো মহাত্মা গান্ধী থে, বাকি সব মুঝে পাজামা লাগতে হ্যায়’। দুজন সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে গেল, আর মুখ খুলল না। সন্ন্যাসীকে নিয়ে সবাই বিচার করতে আসবে, আর তোমার বিচার করতে গেলে তোমার গায়ে আগুন লেগে গিয়ে জ্বালা ধরে যায়। তুমি একজন সন্ন্যাসীকে যীশু, ভগবান বুদ্ধ, রামকৃষ্ণ

পরমহংস আর বিবেকানন্দকে দিয়ে মাপছ, সন্ন্যাসীও তো তোমাকে মাপবে রাজা জনক আর মহাত্মা গান্ধীকে দিয়ে, তখন তুমি কোথায় দাঁড়াবে ভেবে দেখ। সংসার মনকে নিয়ে, আর সারাদিন মন কতক্ষণ ঈশ্বরে থাকছে, কতক্ষণ সংসারে থাকছে, সেটা দিয়ে নির্ভর করে একজন কতটা সন্ন্যাসী বা কতটা গৃহস্থ।

স্বামীজী এখানে সর্বসাধারণকে বলছেন না, স্বামীজী এখানে বাছাই করা কয়েকজনকে, সংখ্যা কখন বারো, কখন দশ, কখন এগারো হত; তাঁদেরকে বলছেন। তাঁরা যোগী হতে চাইছেন। ঠাকুর বলছেন, ভবনাথ পান মাছ ত্যাগ করেছে তো কি হল, আসল ত্যাগ কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ। আবার ঠাকুর এক জায়গায় বলছেন, সব সুখ বুঝি তোমরাই ভোগ করবে, সাধুরা কি ভোগ করবে না! তাহলে আমরা বলতে পারি, ঠাকুর তাহলে কামিনী-কাঞ্চন নিয়ে এত কথা কেন বলছেন? কারণ কামিনী-কাঞ্চন জিনিসটা অত্যন্ত স্লিপারি, বাকি জিনিসগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে নেওয়া যায়। পান মাছের প্রতি আসক্তি থাকা মানে, সোজা রাস্তায় চলার মত, যখন খুশি ফেরত চলে আসা যায়। কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি মানে, পাইপ বেয়ে নামা, যে পাইপে আচ্ছা করে তেল মাখানো আছে, স্লিপ করে নেমে এলে এরপর ওঠার চেষ্টা করলে দম বার করে দেবে। এছাড়া অন্য কোন সমস্যা নেই। আর নামে যখন তখন মনটা ওর মধ্যেই ঘুর ঘুর করে।

আমাদের মন তিনটে আকারে কাজ করে, প্রথমটা হয় চিন্তা, দ্বিতীয়টা হয় বাক্ আর তৃতীয়টা হয় কর্ম। ভাল মন্দ যে কোন জিনিস মানুষ যখন করে, ভাল জিনিসকে আমরা আমাদের ভাষায় বলি পূণ্য, বাজে জিনিসকে বলি পাপ; পাপ হোক, পূণ্য হোক, সুকর্ম হোক দুষ্কর্মই হোক, আসলে তো সবটাই কর্ম, কর্ম ছাড়া কিছু না, যিনি দেখছেন উনি বিচার করে বলেন এটা ভাল কর্ম না এটা বাজে কর্ম। এখানে শব্দটা হল পাপ, আমরা পাপকে নিয়েই আলোচনা করছি। কিন্তু ব্যাপারটা একই, পাপও যা, পূণ্যও তাই, কর্মও তাই। যে কোন কারণেই হোক, হাজারটা কারণ থাকতে পারে, মানুষের মনে প্রথমে একটা চিন্তা আসে, আমি এটা করব। সাধারণ ভাবে দেখা যায়, মনে যখন কোন পাপ চিন্তা উঠল, এরপর সে মুখে বলতে শুরু করে। বাল্মীকি রামায়ণে বাল্মীকি এর খুব সুন্দর বর্ণনা করেছেন। মানুষ যখন কোন পাপ কাজ করতে চায়, তখন সে প্রথমে মনে ভাবে, তারপর অপরকে বলতে শুরু করে। বলে দিয়ে সে একটা পরিবেশ তৈরী করে নেয়। চুম্বক যেখানে থাকে সেখানে চুম্বক একটা ফিল্ড তৈরী করে নেয়। এরপর এবার যেটা ওখানে আসবে, সেটাকে সাঁ করে টেনে নেবে, লোহাকে চুম্বক টেনে নেবে।

ঠাকুর যে বলছেন মনের পাপ পাপ নয়, এ-কথা তিনি গৃহস্থদের জন্য বলছেন। কারণ গৃহস্থ সব সময় ভোগের মধ্যে থাকে, যার ফলে মনের মধ্যে তাদের এই চিন্তা, সেই চিন্তা সব সময় আসতেই থাকে। ভাগবতেও ওনারা বলছেন, মনের পাপ পাপ নয়। খুব সুন্দর বলছেন, সত্য যুগে মনের পাপ পাপ, মনের পূণ্য পূণ্য নয়; কলিতে উল্টো হয়ে যায়, মনের পাপ পাপ নয় আর মনের পূণ্য পূণ্য। মানুষকে একটু উৎসাহিত করার জন্য এই ধরণের কিছু কথা বলা হয়। তবে এসব হল কাহিনী, কাহিনী দিয়ে তো তত্ত্ব বিচার হয় না, তত্ত্বকে বোঝানর জন্য কাহিনী বলা হয়। যাঁরা যোগী, যাঁরা সন্ন্যাসী, যাঁরা ধর্ম সাধন করছেন, যাঁরা এগোতে চাইছেন, তাঁদের মনের পাপ পাপ, পুরো দমে পাপ। কারণ তাঁদের শরীরকে নিয়ে এত কিছু হয় না, শরীরটা তাঁদের খুব সেকেণ্ডারি হয়ে যায়, মনটাই তখন সব হয়ে যায়। মহাভারতে যার জন্য অনেক কাহিনী দেওয়া হয়েছে যেখানে দেখাচ্ছেন, কোন ঋষি, তিনি খুব ভাল ভাবে জীবন যাপন করছেন, হঠাৎ কোন দৃশ্য তাঁর চোখে পড়ে গেল, বিশেষ করে কাম সংক্রান্ত, সাথে সাথে তাঁর মনে একটা ভাব জন্ম নিয়ে নিচ্ছে। মনে ভাব আসাও তাঁর কাছে যা, আর ওই অবস্থা থেকে চ্যুতি হয়ে যাওয়াটাও তাই।

যাঁরা সত্যিকারের সাধন ভজন করছেন, সাধন ভজন অনেক রকম হয়, একটা হয় নিয়ম রক্ষার জন্য, গুরু বলে দিয়েছেন দিনে দুবার একশ আটবার করে জপ করতে, সেটাই নিয়মমত করে যাচ্ছে; কিন্তু কেউ যদি জোর সাধন করতে চান, যেখানে ঈশ্বর দর্শন উদ্দেশ্য, সেখানে ষোল আনা মন না দিলে হবে না। ঠাকুর বলছেন, সুতোর একটু আঁশ যদি বেরিয়ে থাকে ছুঁচের মধ্য দিয়ে যাবে না। এখানে আলোচনা চলছে, অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহকে নিয়ে, যোগের অনুশীলন করার জন্য যে পাঁচটা গুণের দরকার, এই পাঁচটাকে নিয়ে। এখানে ব্রহ্মচর্যকে নিয়ে বলছেন। বলছেন মনে মনে যদি অশুভ চিন্তা করে, শুধু ব্রহ্মচর্যের ক্ষেত্রে না, যে কোন জিনিসে, যদি মনে মনে কোন কিছুর জন্য লোভ হয়ে থাকে বা মনে মনে যদি কারুর

উপরে রাগ উৎপন্ন হয়ে থাকে, সেটা ততটাই খারাপ যতটা কার্যে পরিণত করলে হবে। রেগে গিয়ে মনে মনে বলছি, সামনে পেলে এক ঘুষি লাগিয়ে দেব, আমি তখন সেই পাপটাই করে বসলাম। সেইজন্য সাধারণ মানুষের জন্য এগুলো নয়, তারা যোগ অনুশীলন করার জন্য প্রস্তুতও নয়। যাঁরা যোগ সাধন করেন তাঁদের ক্ষেত্রে তাঁদের চিন্তা-ভাবনাটাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। জর্জ অরওয়েল খুব নামকরা লেখক, এ্যনিমাল ফার্ম তাঁর খুব নামকরা বই। আরেকটা খুব নামকরা বই হল, '1984', যেখানে উনি একটা টোটালিটেরিয়ান স্টেটের কথা বলছেন, সেখানে উনি থট পুলিশের একটা ধারণাকে নিয়ে এসেছেন, এমন একটা কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র যেখানে চিরাচরিত পুলিশ নেই, থট পুলিশ আছে। ওরা কায়দা করে লক্ষ্য রাখছে মানুষরা কি চিন্তা করছে, ওই চিন্তা করাকে নিয়েও পুলিশ তাকে গ্রেফতার করতে পারে।

স্বামীজী একবার তাঁর দুজন শিষ্যকে জিজ্ঞেস করছেন? 'তোরা যদি আমার থেকে কোন শ্রেষ্ঠ গুরু পাস, তাহলে আমাকে কি ছেড়ে দিবি'? একজন শিষ্য বললেন, 'কোন প্রশ্নই নেই, ছিঃ আপনাকে ছেড়ে দেব, এই কথা মনেও ভাবতে পারছি না'। আরেকজন শিষ্য বলছেন, 'হ্যাঁ স্বামীজী, আমি আপনাকে ছেড়ে দেব'। এই কথা শোনার পর ওখানে যারা ছিল সবাই খুব আশ্চর্য হয়ে গেল, এ কী বলছে! তখন সেই শিষ্য বলছেন, 'যেদিন আমি আপনার থেকে কাউকে বড় দেখব, সেদিন তো আপনাকে মন থেকে ছেড়েই দিলাম, এরপর ফিজিক্যালি ছাড়ার আর কি দাম আছে'! যে কোন সম্পর্ক যখন খারাপ হয়, বন্ধুত্ব হোক, দাম্পত্য হোক, গুরু-শিষ্য হোক, আগে দেখতে হবে মনের অবস্থায়। মনের অবস্থায় যখন সম্পর্ক খারাপ হয়ে গেল, আর একবারের পর যেই সেকেণ্ড থট এসে গেল, বুঝতে হবে ওটা এবার শরীরে নামতে আরে বেশি দেরী নেই। প্রথম থটটা তাও ঠিক আছে, কিন্তু যাঁরা সত্যিকারের যোগী, তাঁদের জন্য সেটাও নিষেধ।

কামশক্তিকে আধ্যাত্মিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা

এরপর স্বামীজী বলছেন, Controlled desires leads to the highest result. (*কামনা বাসনাকে দমন করলে সেখান থেকে উচ্চতম ফল লাভ হয়।*) মানুষের মধ্যে কামনা বাসনা, ইচ্ছা এগুলো থাকবেই, কিন্তু ওগুলোকে যদি নিয়ন্ত্রণ করা হয় তবেই এই রিপুগুলি উপরে নিয়ে যাবে। এই যে পাঁচটা যমের কথা বলা হল, সেখানেও তাই। এই জগতে যখন আছি তখন শরীর থাকবেই, শরীর থাকলে শরীরের অনেক রকম চাহিদা থাকবেই, চাহিদা থাকলেই কিছু কিছু ভোগের দরকার থাকবেই। সন্ন্যাসীকে বলছেন, জীবন ধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন তার বাইরে তুমি যাবে না। গৃহস্থকে বলছেন, ভোগ তুমি অবশ্যই করবে, কিন্তু একটা সীমার মধ্যে বেঁধে রেখে যতটুকু ভোগ করা দরকার ততটুকুই করবে। শাস্ত্র লাগাম ছাড়া ভোগে কখনই প্রশয় দেয় না। ইদানিং কালে যে তথাকথিত লিবারেল সোসাইটি হয়েছে, যারা বিভিন্ন রকম স্বাধীনতার কথা বলছে, আমার এই রকম চাই, সেই রকম চাই; এই ধরণের ভোগের স্বাধীনতা কখনই মানুষকে উপরে নিয়ে যাবে না, বদলে মানুষকে পশু স্তরে নামিয়ে আনে। যে কোন কামনা, বাসনা, ইচ্ছা নিয়ন্ত্রণে যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণই সে এগুলো থেকে উচ্চতম ফল লাভ করবে।

আর বলছেন, Transform the sexual energy into spiritual energy, but do not emasculate, because that is throwing away the power. (*কামশক্তিকে আধ্যাত্মিক শক্তিতে রূপান্তরিত কর, কিন্তু নিজেকে কখনই পুরুষত্বহীন করে ফেলো না, ওতে শুধু শক্তির অপচয় হয়।*) এটাকে বেশি ব্যাখ্যা করার দরকার নেই। বলতে চাইছেন যে, নিজের যে কাম বাসনাদি পূরণের আকাঙ্খা থাকে ওটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। The stronger this force, the more can be done with it. Only a powerful current of water can do hydraulic mining, *(এই শক্তি যত প্রবল থাকবে তত এর দ্বারা বেশি কাজ করার সম্ভবনা থাকবে। জলের প্রবল স্রোত যেখানে থাকবে, তবেই সেই জলশক্তির সাহায্যে খনির কাজ করা যেতে পারে।)* আমরা এর আগেও আলোচনা করেছি, নারীসঙ্গের দুটো দিক থাকে, একটা ইমোশানাল আর আরেকটা দৈহিক। ইমোশানাল জিনিসটা বিপজ্জনক বটেই, দৈহিক দিকের উপরেও প্রচুর জোর দেওয়া হয়েছে, এর উপরে আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

যে কোন সমাজে মূল্যবোধের ভিত্তি

এরপর স্বামীজী আবার ফিলজফিতে নেমে বলছেন। What we need today is to know there is a God and that we can see and feel him here and now. (*আজকে আমাদের বিশেষ দরকার হল, আমাদের জানতে হবে একজন ঈশ্বর আছেন, আর এখানে এবং এখনই আমরা তাঁকে অনুভব করতে, দেখতে পারি।*) স্বামীজীর এই বাক্যকে দিয়ে আমরা আজকের আলোচনা শুরু করেছিলাম। ঈশ্বর যদি সত্য না হন, আর ঈশ্বরের উপলব্ধি যদি না করা যেতে পারে, ঈশ্বর দর্শন যদি না হতে পারে, ঈশ্বর যদি একটা ভ্রান্ত মাত্র বা কল্পনা মাত্র হয়ে থাকে, তাহলে কিন্তু value systemএর কোন দাম নেই। এগুলোকে নিয়ে স্বামীজীও বিভিন্ন সময় প্রচুর আলোচনা করেছেন, আর বিশেষ করে valuesকে নিয়ে – সত্য কথা বলা, সৎ জীবন যাপন করা ইত্যাদি। সক্রেটিসও valuesকে নিয়ে প্রচুর আলোচনা করেছেন। কিন্তু কেন আমরা এই valuesকে এত গুরুত্ব দেব? সক্রেটিসের কাছে ভাল হওয়াটাই উদ্দেশ্য, আমি ভাল হব, এটাই আমার লক্ষ্য। কিন্তু এই জিনিসটা অতটা appealing হয় না। পরের দিকে উনিশ শতকের মধ্যভাগে ইউরোপে যখন অনেক চিন্তাবিদদের আগমন হতে শুরু হল, তাঁরা সক্রেটিসের এই দৃষ্টিভঙ্গীকে নিজেদের মত করে ঘুরিয়ে বিভিন্ন ভাবে সামনে রাখতে শুরু করলেন। যেমন বলছেন, সেই জিনিসটাই ভাল, যেটাতে সবার মঙ্গল হয়। নিজেরই মঙ্গল হচ্ছে না, সেখানে আমি অপরের কেন মঙ্গল করতে যাব! এগুলো খুবই বিতর্কিত বিষয়। যখন বলা হয়, দেশের জন্য তুমি এই কাজ কর, এই জিনিসগুলো ত্যাগ কর; তখন প্রথমেই প্রশ্ন আসবে, দেশ আমার জন্য কি করেছে?

বর্তমান কালে আমরা দেখছি সারা দেশ জুড়ে কেমন একটা অরাজকতা হতে শুরু হয়ে গেছে। এই অরাজকতা বাড়তেই থাকবে, এটাকে কেউ থামাতে পারবে না। তার কারণ আমাদের value systemএর কাঠামোটাই এখন ভেঙে গেছে। অন্য দিকে আমাদের সংবিধান বলছে, সবার জন্য সমান, কোথাও কোন বৈষম্য থাকবে না। কিন্তু আমাকে তো বাঁচতে হবে। চিকিৎসার খরচা বেড়ে যাচ্ছে, জিনিসের দাম বেড়ে যাচ্ছে, আমি কোথায় টাকা পাবো? তাই সৎ উপায়েই হোক বা অসৎ উপায়েই হোক আমাকে টাকা জোগাড় করতে নামতে হবে। সমান হতে হবে, টাটা, বিড়লা, আম্বানি ওদের সমান আমাকে আগে হতে হবে, যে করেই হোক আমাকে টাকা আনতে হবে। এই জিনিসটাই সর্বনাশের দিকে নিয়ে যায়। একটা তিন চার বছরের শিশুকে আমরা খাওয়াতে পারব না, যতক্ষণ না ওর মন মত কিছু না করা হয়। খুব নামকরা ঘটনা, শিশু কৃষ্ণকে মা যশোদা দুধ খাওয়াতে চাইছেন, কৃষ্ণ খাবে না। তখন মা যশোদা তাঁকে ভোলাবার জন্য বলছেন, বাবা দুধটা খেয়ে নাও, তাহলে তোমার চুল বড় হবে। কৃষ্ণ একটু করে দুধ খাচ্ছে আর মাথায় হাতে দিয়ে চুলের গোছা টেনে দেখছে আমার চুল কতটা বড় হল। আবার অন্য জায়গায় আছে, মা বলছে, দুধ খেলে তুমি ফরসা হবে। রাধা ফরসা ছিলেন, আমাকেও রাধার মত ফরসা হতে হবে। বাচ্চারাও যখন কিছু করে, একটা মুর্খও যখন কাজ করে তখন সে নিজের স্বার্থ দেখে। মানুষ যদি নিজের স্বার্থ না দেখে, আর সেখানে স্বার্থসিদ্ধি যদি না হয়, তাহলে সে কেন কাজ করতে যাবে? সেইজন্য যেখানে জনসাধারণের স্বার্থে যারা কাজ করে, সরকারি অফিসই হোক আর বেসরকারি অফিসেই হোক, প্রথমেই বলবে ঘুষ না দিলে কাজ হবে না। চাকরি আমি করছি, কারণ আমার ডিগ্রি আছে তাই আমি চাকরি পেয়েছি, কিন্তু আপনার কাজ করার জন্য আমাকে ঘুষ দিতে হবে। এর পরিণতি কি হতে পারে? যদি ধরা পরে তাহলে চাকরি যাবে, কিন্তু ভিতর থেকে যে মূল্যবোধ আসবে, সেটা একেবারেই নেই।

স্বামীজী এখানে বলছেন, What we need today is to know there is a God, আর সেই ঈশ্বরকে এখানেই এবং এখনই জানা যায়; এই বিশ্বাস এলে তবেই জীবন এগোবে। এই যে এতক্ষণ আমরা value systemকে নিয়ে লম্বা আলোচনা করলাম, সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু পর পর খাপে খাপে বসে যাবে। লুটপাট কেন করব না? কারণ তাহলে তুমি ঈশ্বর থেকে দূরে সরে যাবে। আমাকে কেন সত্য, অহিংসা এগুলো পালন করতে হবে? তাহলে তুমি ঈশ্বরের বেশি কাছে চলে যাবে। কাউকে কেন কষ্ট দিতে নেই? কারণ তুমি ঈশ্বর থেকে দূরে চলে যাবে। এগুলো কোন কথার কথা নয়। ভারতবর্ষে যে অনেক ঋষি মহাত্মাদের আবির্ভাব হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে, যাঁরা সব সময় বলে যাচ্ছেন, এর প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য, সেইজন্য প্রথম থেকে ভারতবর্ষ এত ধর্মপ্রাণ দেশ। কিন্তু ইউরোপের দেশগুলোতে এসে গেল চার্চ, চার্চ এসে যাওয়া মানেই একটা সিস্টেমে দাঁড়িয়ে গেল। সিস্টেমে যদি কিছু দাঁড়িয়ে যায়, সেটা দিয়ে যে সব সময়, সব কিছু

স্পিরিচুয়াল হয়ে যাবে, তা কিন্তু হবে না। কোন সমাজে একশ বছরেও সত্যিকারের একজন যদি কেউ এসে থাকেন, যিনি কোন রকম ছলচাতুরি না করে বুকে হাত রেখে বলবেন, ঈশ্বরই সত্য, জানতে হবে তিনি এই সমাজকে রক্ষা করে দিলেন। যে কোন চার্চ মানেই হল organized body, রামকৃষ্ণ মিশনও একটা organized body, শুধু organized bodyর জোরে কোন ধর্ম চলে না, ধর্ম সব সময় মানুষকে দিয়ে চলে। আমরা যাকে পবিত্র চার্চ বলছি, যেমন রামকৃষ্ণ মিশন, এখানে ভাল সাধুর সংখ্যা অনেক বেশি। প্রথমের দিকে খ্রীশ্চানদের যে চার্চগুলি ছিল, তাদেরও ভাল মহাত্মার সংখ্যা অনেক বেশি ছিল, যার ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে 'ঈশ্বর সত্য' ধর্মের এই ভাবটা ছড়িয়ে গিয়েছিল। আমি আপনি ঈশ্বরকে না দেখে থাকতে পারি, কিন্তু ঈশ্বর সত্য, এই বিশ্বাস সমাজে যতদিন না আসতে পারছে, আর এই বিশ্বাস চাবুকের জোরে বা ভয় দেখিয়ে না, নিজে থেকেই বিশ্বাস হয়েছে, হ্যাঁ এটাই সত্য, ততদিন সেই সমাজে মূল্যবোধ আসবে না। মাস্টারমশায় ঠাকুরের কাছে আসতে শুরু করেছেন, কিছু দিন পর থেকে মাস্টারমশায়ের বিশ্বাস বাড়তে শুরু হয়েছে যে, ঈশ্বর বলে কেউ আছেন। এই বিশ্বাস যখন ছড়িয়ে যায় তখনই একটা মানুষ, একটা সমাজ, একটা জাতি মহৎ হতে শুরু হয়।

স্বামীজী বলছেন, A Chicago professor says, 'Take care of this world, God will take care of the next', (*চিকাগোর একজন অধ্যাপক বললেন, এই জগতের তুমি দেখভাল কর, পরলোকের খবর ঈশ্বর নেবে*)। যে যেমন বুঝেছে সে সেইভাবে সমালোচনা করছে। যে যেমন বুঝেছে সে তেমন বলছে। সেইজন্য ঝগড়া লাগবেই, কারণ আমি আমার মত বুঝছি, অন্যরা অন্যদের মত বুঝছে। কিন্তু এগুলোকে নিয়ে ঝগড়া বিবাদ করার কোন অর্থ হয় না। আমাদের ঋষিরা তাই নিয়ে এলেন শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতি। আপনি যেটা বলছেন, সেটাও যুক্তিসঙ্গত, কোন সন্দেহ নেই তাতে, আর আমি যেটা বলছি সেটাও যুক্তিসঙ্গত। তাহলে কে ঠিক বলছে? ওনারা তখন বলছেন, আগে পিছনে দেখ। যে ঋষিরা ত্যাগ তপস্যায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁরা কি এটাকে মানেন। কারণ ঈশ্বরের ব্যাপারটা একমাত্র ঋষিদের কাছ থেকে আসতে পারে, বিজ্ঞানী বা সিনেমার হিরো হিরোইনদের কাছ থেকে আসবে না। কোন সিনেরমার স্টার, কোন ক্রিকেট স্টার ঈশ্বরকে মানে, সেটা দিয়ে ঈশ্বরকে বিচার করা হয় না। ঈশ্বরকে সব সময় বিচার করা হয় ঋষিরা কি বলেছেন। যুক্তির পর তৃতীয় হল, এটাকে কি আমিও অনুভূতি করতে পারব? যদি পারি তবেই ওটা সত্য, যদি তুমি পেরেছ আর কেউ পারবে না, তাহলে ওটা সত্য নয়। যাদের বুদ্ধি আছে, পাণ্ডিত্য আছে, তারা যুক্তি দিয়ে খুব সুন্দর একটা জিনিসকে দাঁড় করিয়ে দেবেন, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তার বাইরেও যে কিছু হতে পারে, যে জিনিসগুলো দেববাণীর পাতার পর পাতায় আমরা দেখতে পাচ্ছি, সে ব্যাপারে এদের কোন ধারণাই নেই।

স্বামীজী বলছেন, What nonsense! If we can take care of this worl, what need of a gratuitous Lord to take care of the others! (*কি আহাম্মকের কথা! আমরা যদি জগতের সব কিছুর বন্দোবস্ত করে নিতে পারি তাহলে পরলোকের জন্য আরেকজন ঈশ্বরের কি দরকার!*)। সেমেটিক ধর্মগুলির এই সমস্যা, তাদের কাছে জগৎ এতটুকু, ঈশ্বর এতটুকু, জগৎ আলাদা, ঈশ্বর আলাদা। আর আমাদের মন অতি সাধারণ, আমরা সব কিছু আলাদা দেখি বলে, ঈশ্বরকেও তাই আমরা সব সময় আলাদা দেখি। এই জগতের ভালমন্দ আমাকে ঠিক করে নিতে হবে, ওই জগতের ভালমন্দ ঈশ্বর দেখবেন। এভাবে কোন দিন হয় না। ঠাকুর বলছেন, যার আছে হেথা তার আছে সেথা; যার এখানে আছে তার সেখানেও আছে। স্বামীজী তাই বলছেন, যদি এই জগৎকে আমরা ঠিক করে নিতে পারি, তাহলে পরের জগতে ঈশ্বরের কি দরকার আছে। আমার এখানেই সব কিছু ঠিক হয়ে গেল, এর ঠিক পরের জগতেও আমার তাই চলতে থাকবে, সেইজন্য মিছিমিছি সেখানে ঈশ্বরকে নিয়ে আসার কোন দরকার নেই। কঠোপনিষদের বেশির ভাগ মন্ত্রই খুব উচ্চমানের, সেই রকম একটি মন্ত্রে যমরাজ বলছেন, *যদেবেহ তদমুত্র যতমুত্র তদন্বিহ*, যা এখানে আছে সেটা ওখানেও আছে, যেটা ওখানে আছে সেটা এখানেও আছে। যে এই দুটোকে আলাদা দেখে সে মৃত্যুর পর মৃত্যুতেই ঘুরতে থাকে। সুন্দর শব্দ, সুন্দর যুক্তি দিয়ে যারা সস্তা কথাগুলো বলছে, মিষ্টি মিষ্টি কথা, এগুলো দিয়ে ধর্ম হয় না। এসব কথা জনসভায় বলা যেতে পারে, রাজনৈতিক বক্তব্যে লাগানো যেতে পারে, এগুলোকে দিয়ে কখনই ধর্ম হয় না।

ধর্ম সব সময় দুই প্রকার, একটা হয় popular religion, আরেকটা হল core religion। যেখানে core religion সেখানে এই জিনিসগুলো চলে না। Popular religion কোন religion না। তবে popular religion হল স্টেডিয়ামের গেটের মত, গেট আছে বলে সবাই স্টেডিয়ামে ঢুকতে পারছে। আধ্যাত্মিক জগতে যাঁরাই এগিয়ে গেছেন, তাঁরা সবাই popular religionএর মাঝখান দিয়েই এসেছেন, আমাদেরও এর মাঝখান দিয়েই যেতে হচ্ছে। এগুলো আছে বলেই আমরা ধর্মের গভীরে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছি। কিন্তু একটা জায়গায় গিয়ে এই ধরণের popular religionকে ছেড়ে দিতে হয়। একজন ভক্তের কথা আমরা জানি, উনি খুবই ভাল লোক, কিন্তু ভারতের কিছু কিছু নামকরা ধর্মীয় সংগঠন গুলির সাথে জড়িয়ে আছেন। ওনার একজন খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু একবার থাকতে না পেরে ওনাকে জিজ্ঞেস করেই ফেললেন। 'আপনি এই লোক ঠকানো সংগঠন গুলিকে কি করে সম্মান দেন'? উনি তাঁকে বলছেন, 'সে আমিও জানি ওরা ঠগ। কিন্তু এই যে ওরা দশজন লোকের ভাল করছে, দশজনের মধ্যে ধর্মের কথা নিয়ে যাচ্ছে, এটাও এক ধরণের সেবা'। 'ঠিকই বলছেন, এ ব্যাপারে আমার কোন আপত্তি নেই, সাধারণ লোক ওদের সাথে জড়াচ্ছে ঠিক আছে, কিন্তু আপনি কেন ওদের সাথে জড়াচ্ছেন? আপনি রামকৃষ্ণ মিশনকে জানেন, মহারাজদের সাথে আপনার খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, তারপরেও আপনি কেন জড়াচ্ছেন'? এই সমস্যা গুলি আছে, থাকবেও। ওনারা তখন বলবেন, আপনার অহঙ্কার আছে বলে আপনি জড়াতে চাইছেন না। অপরকে মারতে হলে দশ খানা বাহানা বেরিয়ে আসে, যার কোন দাম নেই।

স্বামীজী শুরু করেছিলেন অহিংসা দিয়ে আর শেষে নিয়ে এলেন ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাসে। ঈশ্বরে বিশ্বাস মানেই, যাঁদের ঈশ্বর দর্শন হয়েছে, তাঁদের কথা বিশ্বাস করে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এইদিনের ক্লাশ এখানেই শেষ হয়ে যায়। এরপর আসছে ২৬শে জুলাইয়ের ক্লাশ।

শুক্রবার, ২৬শে জুলাই

আত্মা দিয়ে, আত্মার জন্যই সব কিছুকে ভালবাসা

স্বামীজী এই দিন বৃহদারণ্যক উপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ী সংবাদ থেকে বলছেন। যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ীর কাহিনী খুব প্রচলিত কাহিনী, অনেকেই জানেন। যাজ্ঞবল্ক্য খুব উচ্চমানের একজন ঋষি ছিলেন। এত বড় ঋষি যে, পুরো একটা বেদ তাঁর নামে, যেটা অন্য কোন ঋষির নামে নেই। আমরা পরম্পরাতে পাই যে, ধ্যানের গভীরে গিয়ে ঋষিরা যে সত্যগুলিকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সেগুলিকে ওনারা ঋচা রূপে বেদে রেখে দিয়ে গেছেন, যেগুলো বিভিন্ন আশ্রম ও পরিবারে সংরক্ষিত হয়ে আসছিল। ব্যাসদেব প্রেক্ষাপটে আসার পর দেখলেন, একটা পরিবার যদি শেষ হয়ে যায় তাহলে বেদের এই জ্ঞানতো হারিয়ে যাবে। উনি তখন সব ঋচাগুলিকে সংগ্রহ করে বিশেষ ভাবে সাজিয়ে ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব এই চারটে বেদকে দাঁড় করালেন এবং তাঁর চারজন শিষ্যকে চারটে বেদের দায়ীত্ব দিয়ে বলে দিলেন, তোমরা এই চারটে বেদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে। তোমাদের অধ্যয়ন করতে হবে, চারটে বেদকেই, কিন্তু এই একটা বেদ তোমার দায়ীত্বে দিয়ে দেওয়া হল, যাতে কোন রকম ডান দিক, বাম দিক না হয়। সেইজন্য চারটে বেদ সবাই জানতেন, কিন্তু তার সাথে একটা বেদকে বিশেষ করে দায়ীত্ব নিয়ে রক্ষণবেক্ষণ করতে হত।

বৈশাম্পয়নের উপর অর্পিত হয়েছিল যজুর্বেদের সংরক্ষণ কার্য। তিনি ব্যাসদেবের শিষ্য ছিলেন, তাঁরও আবার অনেকজন শিষ্য ছিল। ভারতে তখন ব্রাহ্মণদের এটাই কাজ ছিল, বেদ মুখস্ত করা, আর যাঁরা উচ্চমানের ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁরাই যজ্ঞাদি করাতেন। তাঁদের থেকে একটু নীচে যাঁরা, বেদ অল্প একটু জানতেন, তাঁরা পূজারী ব্রাহ্মণ হতেন। কোন কারণে এখন বৈশাম্পয়নের একটা দোষ হয়ে গেছে, দোষ কাটাবার জন্য তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য বৈশাম্পয়নকে একটা যজ্ঞ করতে হবে, সেই যজ্ঞের আয়োজন ও সুষ্টু রূপে সমাধান করা নিয়ে আলোচনা চলছে। আলোচনার মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্য হঠাৎ বলে বসলেন, 'আপনি বাকি শিষ্যদের ছেড়ে দিন, আমার উপর পুরো দায়ীত্ব ছেড়ে দিন, আমি একাই সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি'। যাজ্ঞবল্ক্য বলতে চাইছেন, প্রায়শ্চিত্তের জন্য যজ্ঞ করা হবে, খুব গুরুত্বপূর্ণ যজ্ঞ, সেই যজ্ঞের ব্যবস্থা আদি করতে গিয়ে কোন শিষ্য কি ভুল ত্রুটি করে বসবে কিছু ঠিক নেই, তার থেকে বরং আমার উপর

সব ছেড়ে দিন, আমিই পুরো ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। যাজ্ঞবল্ক্যের কথা শোনার পর বৈশাম্পয়ন খুব রেগে গেলেন, 'তুমি নিজেকে খুব চালাক মনে করছ, আর বাকিদের সব মূর্খ মনে করছ, তোমার খুব অহঙ্কার হয়ে গেছে। আমার কাছে তুমি যা কিছু শিক্ষা পেয়েছ, সমস্ত বিদ্যা ফেরত দিয়ে দাও'। এই কটূ কথা শোনার পর, যাজ্ঞবল্ক্যও গুরুর উপর রেগে গেলেন, 'আমি আপনার ভালর জন্য বললাম আর আপনি আমাকে অহঙ্কারী বানিয়ে দিলেন! ঠিক আছে, আপনার মত গুরু আমিও আর চাই না'। এই কথা বলে যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর যোগশক্তি দিয়ে যা উনি শিক্ষা পেয়েছিলেন, সব বমি করে উগড়ে দিলেন। বৈশাম্পয়নও তাঁর যোগশক্তি দিয়ে বাকি শিষ্যদের তিতির পাখি বানিয়ে দিলেন, তারা এবার যাজ্ঞবল্ক্যের বমিটা খেয়ে নিল, এইভাবে যজুর্বেদের রক্ষা হয়ে গেল। যাজ্ঞবল্ক্য এরপর বলে দিলেন, 'আমি আর কোন মানুষ গুরুকে বিশ্বাস করি না, আমি সাক্ষাৎ ঈশ্বরের কাছ থেকে বিদ্যা অর্জন করব'। এই বলে তিনি চলে গেলেন এক নদীর তীরে, সেখানে তপস্যা, ধ্যান করে করে খুব গভীরে চলে গেলেন। তখন সূর্য দেবতা ঘোড়ার রূপ ধারণ করে এসে যাজ্ঞবল্ক্যকে নূতন করে বেদের শিক্ষা দিলেন। নূতন বেদের নাম হয়ে গেল শুক্ল যজুর্বেদ। আগেরটা হয়ে গেল কৃষ্ণ যজুর্বেদ, কারণ বমি করে বিদ্যাটা ফেলে দিয়েছিল। যজুর্বেদের এই ভাবে দুটো শাখা হয়ে গেল।

কাহিনী বানাতে ভারতবর্ষ মাস্টার, যে কোন জিনিসকে নিয়ে একটা কাহিনী বানিয়ে দিতে ভারতের মত ওস্তাদ দুনিয়ারে আর কেউ নেই। এই কাহিনীর পিছনের ইতিহাস কি আমাদের জানা নেই। কিন্তু পরের ইতিহাস আমাদের জানা, গুরুর সাথে যাজ্ঞবল্ক্যের বিবাদ হল, তিনি নিজের মত করে বেদকে সাজালেন, যদিও পরম্পরায় বেদ অন্য ভাবে সাজানো ছিল। তবে কৃষ্ণ যজুর্বেদ আর শুক্ল যজুর্বেদের এমন কিছু তফাৎ নেই। কিন্তু অধ্যায়গুলো আগে পরে হয়ে গেছে। শুক্ল যজুর্বেদের নামকরা উপনিষদ হল ঈশাবাস্যোপনিষদ, যেটা শেষ অধ্যায়, চল্লিশ নম্বর অধ্যায়। যাজ্ঞবল্ক্য ছিলেন তখনকার দিনের খুব নামকরা ব্রহ্মজ্ঞানী, তাঁর আবার দুজন স্ত্রী। একটু আগেই আমরা ব্রহ্মচর্যের উপর আলোচনা করলাম, আর এখন দেখছি একজন শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞানীর দুজন স্ত্রী, কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ী। এরপর যাজ্ঞবল্ক্য একদিন বলে দিলেন, আমি এবার বাণপ্রস্থে চললাম। সব ছেড়ে চললেন জঙ্গলে, তার মানে উনি ঋষি কিন্তু সন্ন্যাসী না, সন্ন্যাসী হলে সব কিছু ছেড়ে দেন। উনি তখন তাঁর দুজন স্ত্রীকে ডেকে বললেন, আমি সমস্ত সম্পত্তি তোমাদের ভাগ করে দিচ্ছি। যাজ্ঞবল্ক্যের কনিষ্ঠ স্ত্রী মৈত্রেয়ী এসে তখন স্বামীকে জিজ্ঞেস করছেন, আপনার এই সম্পত্তি পেয়ে আমি কি অমৃতত্ব লাভ করতে পারব? স্ত্রীর কথা শুনে যাজ্ঞবল্ক্য খুব খুশি হলেন, বলছেন, 'দেখো মৈত্রেয়ী চিরদিনই আমি তোমাকে ভালবাসতাম, তোমার এই প্রশ্ন শুনে আমি আরও খুশি হয়ে গেলাম'। এরপর যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে অনেক উপদেশ দিলেন, মাঝে মাঝে মৈত্রেয়ীও কিছু প্রশ্ন করছেন, যাজ্ঞবল্ক্য সেগুলোকেও আলোচনার মধ্যে এনে বুঝিয়ে দিচ্ছেন; এইভাবে তৈরী হল বৃহদারণ্যকের যাগবল্ক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদ।

আমাদের যত উপনিষদ আছে, সবার একটাই বক্তব্য – ব্রহ্মই সব কিছু হয়েছেন, আত্মাই ব্রহ্ম। আসল অস্তিত্ব হল আত্মার, আর জগতে যা কিছু হচ্ছে সব আত্মার সত্যকে আধার করেই হচ্ছে। যাজ্ঞবল্ক্যের এখানে বক্তব্য হল, যে কোন প্রানী নিজেকে ভালবাসে। আচার্য শঙ্কর যখন পরে বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভাষ্য লিখছেন, উনিও সেখানে ঠিক এই ভাবটাকে কেন্দ্রে রেখে তাঁর ভাষ্য রচনা করে গেছেন। ভালবাসাকে নিয়ে যে যাই বলুক, সবাই কিন্তু নিজেকেই ভালবাসে, ঈশ্বরও শুধু নিজেকেই ভালবাসেন। ভক্তকে ঈশ্বর নিজের আত্মা মনে করেন, সেইজন্য তিনি তাঁর ভক্তকে ভালবাসেন। যিনি জ্ঞানী, যিনি উচ্চমানের ভক্ত, তিনিও ঈশ্বরের আত্মা, সেইজন্য ঈশ্বর তাঁকেও ভালবাসেন। ঈশ্বরের কোন পক্ষপাত বা বৈষম্য দোষ কিছু নেই। শেষ পর্যন্ত সবাই নিজের আত্মাকেই ভালবাসে। যাজ্ঞবল্ক্য ঠিক এই জিনিসটাই বলছেন; মানুষ যখন কোন জিনিসকে ভালবাসে তখন সে মনে করে এটা আমার আত্মা, এটা আমি। যে টাকা ভালবাসে, সেও মনে করছে এটা আমি। আমাদের ভাষায় সে ওই বস্তুতে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে। অন্য একটা উপমা নিলে আরো পরিষ্কার হবে। এই ঘরে মনে করা যাক অনেকগুলো বিভিন্ন রকমের আয়না লাগানো আছে, কোন আয়নাতে ময়লা জমে আছে, কোন আয়না পরিষ্কার, কোনটা কনকেভ, কোনটা কনভেক্স, কোনটা একটু ভাল, কোনটা বেশি খারাপ, তার মধ্যে এক একটা আয়নার সামনে দাঁড়ালে নিজের প্রতিবিম্বটা খুব সুন্দর লাগছে। কারণ কারুরই চেহারা, কারুরই শরীর perfect হয় না। কিন্তু আয়নার দোষের জন্য আমাকে এবার হয়ত সুন্দর দেখাবে। আয়নার দোষের জন্য আমার চেহারার দোষগুলো দূর হয়ে যায়, সেইজন্য আমাকে সুন্দর দেখায়। ইতিমধ্যে আমার

শরীরটা পাল্টে গেছে, কিন্তু আয়নার ওই দোষটা থেকে গেছে, এবার আমাকে আর আয়নাতে দেখতে ভাল লাগবে না। আমি সরে গিয়ে এবার অন্য আয়নার সামনে যাব।

বাচ্চা বয়সে খেলনা খুব ভাল লাগে। আমরা বলি খেলনা হল বাচ্চাদের প্রাণ। কিন্তু প্রাণ না, আসলে খেলনটাই তার আত্মা। নিজের ছবি খেলনাতে বাচ্চারা ভাল দেখে। বড় হতে হতে নিজের ছবি দেখাটা পাল্টাতে থাকে। আমরা অনেক সময় বলি, তুমি কেমন পাল্টে গেলে, আগে তোমার সাথে কত বন্ধুত্ব ছিল। কিছুই পাল্টায়নি, তুমি একটি আয়না, ও তখন যেমন ছিল তোমার কাছে ওর ভাল মনে হত বলে তোমার কাছে ছিল। এখন ওর ওই দোষগুলো চলে গেছে, এবার সে ভাল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গেছে, এখন সে ভাল প্রতিবিম্ব পাচ্ছে। আর ওই লোকটা হল আয়না আর তুমি হলে তার দ্রষ্টা। তার কাছে তুমি নিজের ভাল ছবি দেখছ। একবার যদি আমরা অত্যন্ত সহজ সরল এই ব্যাখ্যা বুঝতে পারি, আমাদের জীবনের শতকরা নিরানব্বই পয়েন্ট নয় ভাগ সমস্যা মিটে যাবে। আমি যাকেই ভালবাসি না কেন, আমি টাকা ভালবাসি, আমার বাড়িকে ভালবাসি, আমার একটা কুকুর আছে তাকে ভালবাসি, এগুলো আসলে একটা আয়না, যে আয়নাতে আমার ছবি খুব সুন্দর প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। বাড়ি ফিরলাম, আমার কুকুরটা এসে দৌড়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল, আমার বাড়ির লোক কখন জড়িয়ে ধরবে না। আমি ভালবাসা চাইছি, আমারই সেই ভালবাসা কুকুরের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়ে আমার কাছেই আসছে। কারণ আমি ভালবাসার কাঙাল। প্রতিফলিত করছি এমন একটা আয়নায়, যেখানে ভালবাসাটা প্রতিফলিত হয়ে আমার কাছে আসবে। কুকুর, বেড়াল, ছাগল হল সেই আয়না। আমার জীবন থেকে যে সরে যাচ্ছে, তখন বুঝতে হবে, আমি তার কাছে যে আয়না ছিলাম, সেই আয়নাটা আর তার দরকার নেই। এখন যেখানে ভাল প্রতিবিম্ব পাচ্ছে, সেখানে সে চলে গেছে।

এটা দু দিকেই হয়, নীচেও যায়, উপরেও যায়। একজন লোক খুব ভাল মানুষ ছিল, হঠাৎ মদ গাঁজা খেতে শুরু করেছে, একটা অন্য দিকে যেতে শুরু করেছে। ঠাকুর বলছেন, গাজাখোঁড় গাঁজাখোঁড়কে খোঁজে, দেখা হলে দুজনে গলাগলি করে। তার মানে, শেষ পর্যন্ত আমি যেখানে প্রতিবিম্ব পাবো, সেই প্রতিবিম্বে গিয়েই আমি বসব। আমি খেদ করছি এই কারণে, আমি ওর জন্য এত সুন্দর আয়না ছিলাম, সে কিনা এই সুন্দর আয়নাকে ছেড়ে দিল! সমস্যা হল, আমি এখনও ওই আয়নাতেই আমার ভাল ছবি দেখছি, কারণ আমি পাল্টাইনি। চার পাঁচ বছর আগে ওর যে দোষযুক্ত আয়না ছিল, তাতে আমার ছবি এত সুন্দর আসত যে এখনও ওই আয়নাকে আমি ছাড়তে চাইছি না। আসলে সেতো বাস্তব আয়না নয়, সে একজন মানুষ, মানুষের ধর্ম অনুযায়ী সে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ করেছে, তাই আমাকে ছেড়ে অন্য আয়নাতে চলে গেছে। এইখানেই আমাদের সমস্ত দুঃখের মূল। যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলছেন, মানুষ কখন স্ত্রীকে স্ত্রীর জন্য ভালবাসে না, স্বামীর জন্য স্বামীকে ভালবাসে না, সোনার জন্য সোনাকে ভালবাসে না, কোন জিনিসকেই ওই জিনিসের জন্য সেই জিনিসটাকে ভালবাসে না, ভালবাসে নিজের জন্য।

Love all things only through and for the self. (*সব কিছুকে ভালবাসো, একমাত্র আত্মার ভিতর দিয়ে এবং আত্মার জন্য।*) যখনই কিছুকে ভালবাসবে তখন আত্মাকে দিয়ে ভালবাসো, আর আত্মার জন্য ভালবাসবে। যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে এই একই জিনিস বলছেন। 'Through that Atman we know all things', ('*আত্মার দ্বারাই আমরা সব জিনিস জানতে পারছি।*') বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই একই জিনিস ঘুরে ঘুরে আসে। আমাদের সমস্ত জ্ঞান আত্মা দিয়েই আসে। The Atman can never be the object of knowledge, nor can the Knower be known. (*আত্মা কখন জ্ঞানের বিষয় হতে পারে না – যে নিজে জ্ঞাতা, সে কি করে জ্ঞেয় হবে!*)। যিনি বিজ্ঞাতা তাঁকে কি করে জানবে? যে জ্ঞাতা তাকে জানা যায় না, যেটা জ্ঞেয় তাকেই জানা যায়। He who knows he is the Atman, he is law unto himself. He knows he is the universe and its creator, (*যিনি নিজেকে আত্মা বলে জানেন, তাঁর পক্ষে আর কোন বিধিনিষেধ থাকে না। কারণ তিনি জানেন, তিনিই এই জগৎ আবার এর স্রষ্টাও বটে।*) এই যে একটা বাক্য, যে জানে সে আত্মা, তার উপর আর কোন নিয়ম চলে না, সে জানে সে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, সে জানে সে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, সে জানে সেই সৃষ্টি, সেই স্রষ্টা, প্রত্যেকটি উপনিষদে ঠিক এই একই কথা বলছে, কেউ অন্য রকম কিছু বলছেন না। স্বামীজী সেটাকে ইংলিশে এমন ভাবে বলছেন, যাতে আমরা বুঝতে পারি,

পড়লেই আমাদের মাথা ঘুরে যায়। আর যখন এই ভাষা আমেরিকানদের কাছে বলছেন, তখন ওদের শুনে মনের কি অবস্থা হচ্ছে ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। এই ভাবটাকেই এবার স্বামীজী পর পর এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন; যদিও এই দিনে ক্লাশের নোট খুব ছোট করে দেওয়া হয়েছে।

Perpetuating old myths in the form of allegories and giving them undue importance fosters superstition and is really weakness. Truth must have no compromise. Teach truth and make no apology for any superstition; neither drag truth to the level of the listner, (*পুরাতন পৌরাণিক ব্যাপারগুলিকে রূপকের আকারে চিরস্থায়ী করবার চেষ্টা করলে এবং তাদের নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করলে কুসংস্কারের জন্ম হয়, আর এটা বাস্তবিক দুর্বলতা। সত্যের সঙ্গে যেন কখন কিছুর আপস না করা হয়। সত্যের উপদেশ দাও, আর কোন প্রকার কুসংস্কারের দোহাই দিতে চেষ্টা করো না, অথবা সত্যকে শিক্ষার্থীর ধারণা শক্তির উপযোগী করবার জন্য নামিয়ে এনো না।*) আগেও আমরা আলোচনা করেছি। সত্য সত্যই, যখনই আমরা সত্যগুলিকে কাহিনীর মাধ্যমে উপস্থাপিত করি, তখন ওখান থেকে যত রকম কুসংস্কারগুলি জন্ম নেয়। যত ধরণের অযৌক্তিক কাহিনী আছে, যেগুলোকে নিয়ে তথাকথিত যুক্তিবাদীরা যে আক্রমণ করে, তারা কাহিনীর মাধ্যমে যে সত্যকে সামনে নিয়ে আসছে, সেখানে তারা সেই সত্যকে আক্রমণ করতে যাবে না, সত্যকে কেন্দ্র করে যে কাহিনীগুলো তৈরী হয়েছে, সেগুলোকে আক্রমণ করে। কাহিনীর মধ্যে মানুষ যখন পুরোপুরি ডুবে যায় তখন সত্যটা কখন কোথায় হারিয়ে গিয়ে কাহিনীগুলিকেই সত্য করে দেয়, জানতেও দেয় না। শ্রীরামচন্দ্রকে নিয়েই কত মিথস্ তৈরী হয়েছে। অযোধ্যার মন্দির, রামসেতু, এই ধরণের কত কি রয়েছে। কিন্তু বাল্মীকি যখন রামায়ণ রচনা করছিলেন, তখন ওনার উদ্দেশ্য পুরো আলাদা ছিল। ওই উদ্দেশ্যকে আমরা হারিয়ে ফেলেছি। তার জায়গায় নিয়ে এসেছি বিচিত্র বিচিত্র কাহিনী, যদিও কাহিনীগুলোকে একটা বাচ্চাকে, সাধারণ মানুষকে মিষ্টি করে বোঝানর জন্য বলা হয়, সেগুলোই আমাদের কাছে সত্য হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে।

স্বামীজী একজন ঋষি, ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর আগমন, যাঁরা ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য আসেন, তাঁরা সত্য ছাড়া কিছু বলবেন না। কাহিনীও যখন বলবেন, পরিষ্কার বোঝা যায় এই জায়গাতে কাহিনী চলছে। স্বামীজী খুব সুন্দর বলছেন, neither drag truth to the level of the listner, যারা শুনছে, শ্রোতা সব সময় বক্তার স্তরে থাকে না, শিষ্য সব সময় গুরুর স্তরে থাকে না, তাই বলে শ্রোতাকে বোঝাবার খাতিরে তুমি কোন ভাবে সত্যটাকে নামিয়ে দিতে পারো না; এ-জিনিস কখনই করা যাবে না। এটাকে বলে politically correct, politically correct statement যারা দেয়, তারা শিক্ষক হতে পারে না, তারা গুরুও হতে পারে না। এটা সত্য, আর এটাই সত্য; এই সত্য যদি তোমার নিতে হয় তাহলে আমার কথা শোনার জন্য বসো, আর যদি তা না হয়, তাহলে এটা তোমার জন্য নয়। স্বামীজী এক জায়গায় বক্তৃতা দিচ্ছেন, একজন উঠে আপত্তি করে বলল, I don’t agree with you, উনি সঙ্গে সঙ্গে বলে দিলেন, then it is not meant for you। সত্যকে বোঝানর জন্য এমন ভাবে present করা হল যাতে শ্রোতা বুঝতে পারে, কিন্তু তার জন্য সত্যকে কখনই ছোট করে দেওয়া চলবে না, সত্যের সাথে কোন আপস চলবে না। এমন কোন কোন সম্প্রদায় আছে, যারা এমন একটা বিচিত্র জিনিসকে মানে, যেটা কখনই সত্য নয়। আমিও জানি ওটা সত্য না, কিন্তু ওই সম্প্রদায়কে আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, তাদের সাপোর্ট দরকার, সেইজন্য ওই মিথ্যাটাকে সত্যের সাথে আপস করে দিলাম; এই জিনিস কখনই করা যাবে না। দুটো প্যারাগ্রাফেই ২৬শে জুলাইয়ের ক্লাশের নোট শেষ হয়ে যায়।

শনিবার, ২৭শে জুলাই

একমাত্র উপলব্ধিবানের কাছেই আত্মতত্ত্ব শুনতে হয়

স্বামীজী এই দিন কঠোপনিষদকে আধার করে বলছেন। কিন্তু দেববাণীর এটাই বৈশিষ্ট্য যে, স্বামীজী একটা করে শাস্ত্র বা উপনিষদকে ধরছেন, আর বলে যাচ্ছেন নিজের মত। রাজযোগ খুব systematic wayতে বলেছেন, কিন্তু সেটাও উনি নিজের মত বলেছেন। কোন বাক্যটা কোন মন্ত্র এইভাবে যদি আমরা

এখানে মেলাতে যাই, আমরা মেলাতে পারব না। স্বামীজী এখানে সরাসরি কঠোপনিষদ থেকে বলছেন না, কঠোপনিষদকে আধার করে নিজের মত ব্যাখ্যা করে বলছেন। Learn not the truth of the Self save from one who has realized it; in all other it is mere talk, (*অপরোক্ষানুভূত সম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়া অপর কারও কাছে আত্মতত্ত্ব শিক্ষা করতে যেও না; অপরের কাছে তা কেবল কথার কথা মাত্র*)। *অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ*, কঠোপনিষদের খুব নামকরা কথা। আমরা বলে থাকি, ঠাকুরের কথামৃত হল জীবন্ত শাস্ত্র। এর অর্থ হল, অন্যান্য শাস্ত্রগুলি হল sanitized version, যার অর্থ হয়, একটু ধুয়ে মুছে সামনে রাখা হয়েছে। আসলে sanitized versionটাই ঠিক, তার কারণ হল, আচার্যরা অনেক বুঝে সুঝে অনেক কিছু বলেন, যে কথাগুলো যে সব সময় মনঃপূত হবে তা না। ঠাকুরের কথামৃত আমরা যখন পড়ি, তখন মনে হয় যে আমরা যেন প্রত্যেকটি আধ্যাত্মিক সত্যের সাথে হাঁটছি, দৌড়াচ্ছি, বসছি। অন্যান্য শাস্ত্রে এই রকম আমাদের মনে হবে না। একটা pure form আরেকটা sanitized version দুটো আলাদা হয়ে যায়। গরু থেকে দোহন করা দুধ এক রকম হয়, আর প্যাকেটের দুধ আরেক রকম হয়, দুটোর নিজস্ব আলাদা বৈশিষ্ট রয়েছে। তবে এই কথা বলা যাবে না যে, এটা ভাল আর এটা খারাপ, এখানেও অনেকটা এই রকম।

কথামৃতে এক জায়গায় বর্ণনা আছে, একজন ঈশ্বরীয় তত্ত্ব নিয়ে কিছু বলছেন, ঠাকুর তখন বিরক্ত হয়ে বলছেন, তোমার কথা আমি কি শুনব! আমি যে এই রকম দেখেছি। 'আমি যে এই রকম দেখেছি', এই একটা বাক্য যখন আমরা শুনছি, তখন হঠাৎ মনে হয় যে, এই ঈশ্বরীয় কথাগুলো গীতার না, ভাগবতের না, বেদের না, উপনিষদের না, কিন্তু তাও মনে হয়, সত্যিই তো ঈশ্বর সত্য। ঠাকুর এই রকম দেখেছেন, যখন আমি আপনি দেখব, তখন আমরা হয়ত অন্য রকম দেখব, তাতে কিছু আসে যায় না। যিনি ঠাকুরকে ঈশ্বরীয় তত্ত্বের কথা বলছেন, তিনি শাস্ত্র থেকে কোন কথা বলছেন বা নিজের মনের মত বুঝে নিয়ে বলছেন, ঠাকুর পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন, আমি দেখেছি এই রকম। যিনি উপলব্ধিবান, যিনি এই রকম জীবন যাপন করেছেন, তাঁর কাছে জিনিসটা তখন অন্য রকম আসে। ঠিক এই রকম একটা ঘটনা আছে। স্বামীজী তখন আর এই দেহে নেই। মঠের একটা প্রাচীন পরম্পরা চলে আসছে, মন্দিরে বসে শাস্ত্রের ক্লাশ হয়। একজন সংস্কৃতের পণ্ডিত এসে কঠোপনিষদের ব্যাখ্যা করতেন, স্বামী শুদ্ধানন্দজীও ব্যাখ্যা করতেন। লাটু মহারাজ বসে বসে শুনতেন। শোনার পর লাটু মহারাজ বলছেন, স্বামী শুদ্ধানন্দের যে ব্যাখ্যা, এটাই ঠিক ঠিক ব্যাখ্যা। সংস্কৃতের পণ্ডিত হলেই যে তিনি আধ্যাত্মিকতাকে বুঝে যাবেন, তা না। প্রচুর শব্দ নিয়ে আসবেন, শব্দ বৈখরী দিয়ে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করে দেবেন। সন্ন্যাসী কখন শাস্ত্রের ব্যাখ্যানে নামেন না, পণ্ডিতরা নামেন। সন্ন্যাসী ততটুকুই বলবেন, গুরুর কাছে শুনে, নিজে স্বাধ্যায়, নিদিধ্যাসনাদি করে যতটুকু তিনি ঠিক ঠিক অনুভব করে বুঝেছেন। তাহলে আমরা মনে করতে পারি পণ্ডিতরা তো সন্ন্যাসীদের থেকে অনেক বড়। ঠিকই, তফাৎ হল, পণ্ডিতরা আরও পাঁচটা বই পড়েছেন, সন্ন্যাসীর থেকে তাঁর জ্ঞান আরও অনেক বেশি, কিন্তু একটা কথাও পণ্ডিতকে স্পর্শ করে না। একজন সন্ন্যাসী এত কিছু পড়েননি, কিন্তু তিনি যেটা বলছেন, তাঁকে সেটা স্পর্শ করেছে। সন্ন্যাসীর হয়ত এখনও উপলব্ধি হয়, উপলব্ধি হওয়া অত সহজ নয়। কিন্তু স্বামীজী যে বলছেন, যদি শিখতে হয় তাহলে উপলব্ধিবান ব্যক্তির কাছেই শিখতে হবে। এটা হল, যাঁরা উপলব্ধিবান, তাঁদের লেখা বই পড়লে তখন ওই অনুভূতিটা আসে। যখন বিশেষ করে ঠাকুরের কথামৃত পড়ছি, তখন আমরা ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে চলছি। স্বামীজী রচনাবলী অতটা না, কারণ এটা অনেকটা sanitized version। বরং মেরি লুই বার্কের নিউ ডিসকভারি যদি পড়া হয়, সেই জায়গাটায় মনে হবে স্বামীজীর সঙ্গে সঙ্গে চলছি। কিন্তু ওখানে তিনি স্বামীজীর লেকচারগুলি পুরোটা দেননি, সেইজন্য ওই জিনিসটা পাওয়া যায় না। স্বামীজীর জীবনের নূতন নূতন ডিসকভারিজ গুলিকে নিয়ে সাজিয়েছেন। কথামৃতের মত নয়, কথামৃত হল আগাগোড়া শাস্ত্র। কথামৃত সরাসরি পড়ার সময় আমরা ঋষির সাথে থেকে সেই ঋষির কথা শুনছি। স্বামীজী কথা যখন পড়ছি, তখন ঋষির কথা পড়ছি; উপনিষদ যখন পড়ছি, ঋষির কথা পড়ছি। বেলুড় মঠে একজন মহারাজকে এসে একজন জিজ্ঞেস করছেন, আচ্ছা 'মহারাজ! আপনার কি ঈশ্বর দর্শন হয়েছে? মহারাজ তখন বলছেন, দেখুন মশাই, আপনি নরেন্দ্রনাথও নন, আর আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসও নই যে আপনার প্রশ্নের উত্তরটা দেব। এক নরেন ঠাকুরকে এসে প্রশ্ন করেছিল, মশাই আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করেছেন? আর আমি যদি দেখে থাকি আপনাকে বলতে যাব কেন'?

বেলুড় মঠে একজন খুব উচ্চমানের প্রাচীন মহারাজ ছিলেন। ওনার কাছে মহারাজরা অনেক কিছু শিখতে যেতেন। অনেক দিন ধরে মহারাজরা ওনার কাছে যাতায়াত করছেন, কিন্তু কেউ কোন দিন জিজ্ঞেস করেননি যে, মহারাজ আপনার কি অনুভূতি হয়েছে? অনেক সঙ্গ করার পর অনেক দিন পরে একজন মহারাজ ওনাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা মহারাজ! আপনার নিশ্চয়ই অনেক অনুভূতি আছে'? উনি তাঁকে বলছেন, 'দেখো ভাই, আমি যদি তোমাকে না বলি, তুমি ঘরে গিয়ে মনে মনে ভাববে, আহা উনি কত বিনয়ী, নিজের অনুভূতির কথা বললেন না, আমাকে ঠকিয়ে দিলেন। আর যদি বলি হ্যাঁ, তুমি খুশি হয়ে ঘরে যাবে, পরে মনে করবে, উনি এত অহঙ্কারী'! তিনি নিজের কথা বলে দিলেন যে, তাঁর অনুভূতি হয়েছে! কারণ তুমি এখনও ইমোশানালি ভোলাটাইল। ইমোশানাল স্ট্যাবিলিটি এত সহজে হয় না, সে সংসারীই হোক, সন্ন্যাসীই হোক। একটু ভাল বললেই ফুলে যাবে, একটু খোঁচা দিলেই ফুস করে চুপসে যাবে। এরাই এসে জিজ্ঞেস করবে, মহারাজ আপনার কি আত্মজ্ঞান হয়েছে? ঠাকুর যেমন বলছেন, ইত্যাদি গুরুর ইত্যাদি চেলা। তাহলে তো আমাদের কিছু শেখাই হবে না। সেইজন্য দরকার সোর্স বুক। যদি একটু নিষ্ঠা থাকে, আমি জানতে চাই শাস্ত্র কি বলতে চাইছে। প্রথমে তাকে সোর্স বুকে যেতে হবে। রামকৃষ্ণ পরম্পরায় সোর্স বুকের ব্যাপারে বলা হয়, উপনিষদ, গীতা, ব্রহ্মসূত্র সবাই বুঝতে পারে না, সেইজন্য এই দুটো, কথামৃত, স্বামীজীর রচনাবলী আর তার সাথে মায়ের কথা ও লীলাপ্রসঙ্গ। এগুলো হল সোর্স বুক। এসব বই ছেড়ে আমরা যে কি কি ধরণের বই পড়ছি, ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। পঞ্চদশী, বিবেকচূড়ামণি, এগুলো আমাদের জন্য নয়। এগুলো প্রকরণ গ্রন্থ, সোর্স বুক নয়। বলবেন, কেন বিবেকচূড়ামণি তো শঙ্করারচার্যের রচনা। অবশ্যই আচার্যের রচনা হতে পারে, কিন্তু সব কথা শুনলে তো মনে হয় না যে, আচার্যের লেখা, শঙ্করাচার্যের approachটাই আলাদা। কিন্তু তাঁর যে গীতার ভাষ্য, উপনিষদের ভাষ্য আছে, যেগুলো authentic, সেগুলো না পড়ে আমরা পড়তে যাচ্ছি বিবেকচূড়ামণি। স্বামীজী এটাই এখানে বলছেন, focus on realized person, অন্যদের কথাতে যেও না।

মনের কাছে আছে শুধু চিন্তা –ভাল-মন্দ বলে কিছু নেই

কারণ, Realisation is beyond virtue and vice, beyond future and past; beyond all the pairs of opposites. (*প্রত্যক্ষানুভূতি হলে মানুষ ধর্মাধর্ম, ভূতভবিষ্যৎ - সমস্ত রকম দ্বন্দ্বের পারে চলে যায়।*) দেববাণীতে আমরা এই জিনিসগুলিকে নিয়ে অনেকবার আলোচনা করেছি। সংক্ষেপে হল, যদি কারুর জীবনের লক্ষ্য ভাল মানুষ হওয়া হয়, তাহলে সেই মানুষ কোন দিন বেদান্তী হতে পারবে না। বেদান্ত হল সেই অবস্থা, যেখানে মন পূর্ণ শান্ত হয়ে যায়। ভাল আর মন্দ, দুটোই চিন্তা, চিন্তা মানেই তরঙ্গ, বেদান্তে কোন তরঙ্গ রাখা চলবে না। যেমন একজন এসে বলল, বাড়িটাকে ভেঙে গুড়িয়ে দাও, আমরা নূতন করে তৈরী করব। এরপর বাড়ির ভাল মন্দ যা কিছু সব ভেঙে বুলডোজার দিয়ে পরিষ্কার করে দেওয়া হল। এখন ওর মধ্যে কি ছিল, কি না ছিল তাতে কিছু আসে যায় না। এই উপমাগুলো আমরা যেগুলো বলছি, এই উপমার মাঝখানে আমাদের মন সাধারণ হওয়ার জন্য নিজের মত কিছু বার করে নেওয়ার চেষ্টা করি। আমাদের শুধু মনে রাখতে হবে পুকুরে ঢেউ ওঠে, প্রত্যেকটি ঢেউ এক একটি চিন্তন, ভালটাও একটা চিন্তন, মন্দটাও একটা চিন্তন। মনের কাছে ভাল আর মন্দ বলে কিছু নেই, মনের কাছে সবটাই হল চিন্তন। চিন্তন মানেই মনের কাছে একটা চোর। ঠাকুর যেমন বলছেন, সত্ত্ব, রজো ও তমো তিনটেই ডাকাত। মনে যদি কোন চিন্তার তরঙ্গ ওঠে, সেটাই হবে আপত্তিকর। মন কোন তফাৎ করে না, মীরাবাঈ তাঁর ভজনে খুব সুন্দর বলছেন, লোহা পূজার ঘরেও রাখা হয়, আবার লোহা মন্দ জায়গাতেও থাকে; কিন্তু পরশমণি যখন স্পর্শ করে তখন দুটোই সোনা হয়ে যায়, কোন ভেদ সে করে না। মন ঠিক তেমনি ভাল মন্দতে কোন বিভেদ করে না, তাঁর কাছে সব চিন্তা। এখানে একটা কাহিনী বলা যেতে পারে, যদিও পুরো মিলবে না।

আমেরিকাতে এক শহরে প্রচণ্ড গরম পড়েছিল। এত গরম পড়েছে যে পৌরসভা থেকে বলে দেওয়া হল, জঞ্জাল সংগ্রহের গাড়ি গেলে গাড়ির ড্রাইভারকে যেন একটু ঠাণ্ডা জল পান করতে দেওয়া হয়। একজন ভদ্রমহিলা জঞ্জালের গাড়ি এলে এক হাতে গারবেজের বাস্কেট আরেক হাতে ফ্রিজের এক বোতল ঠাণ্ডা জল নিয়ে এসেছে। ড্রাইভার গারবেজ গুলো নিয়ে নিয়েছে, ওই ভদ্রমহিলা তার হাতের বোতলটা দেখিয়ে বলছে, এই ঠাণ্ডা জল তোমার জন্য। ড্রাইভার গাড়ির ইঞ্জিনের আওয়াজে কিছু শুনতে পারছে না, দেখিয়ে দিচ্ছে

ট্রাকের পিছনে ফেলে দিতে। ভদ্রমহিলা বার বার বলে যাচ্ছেন এটা তোমার জন্য। ড্রাইভার তখন ভদ্রমহিলার হাত থেকে বোতলটা নিয়ে ট্রাকের পিছনে গারবেজের মধ্যে ফেলে দিল। ড্রাইভার ভাবছে সব গারবেজ, ট্রাকের পিছনে ফেলে দিয়েছে, কিন্তু কোন কারণে বোতলটা থেকে গেছে। ড্রাইভার তখন হাতে নিয়ে তার পিছনের ফাঁক দিয়ে গারবেজের মধ্যে ফেলে দিল। গারবেজ কালেক্টরের কাছে ঠাণ্ডা জল নিয়ে এসেছে, সেটাও তার কাছে গারবেজ, ওর কাছে ওটা ভাল কিছু জিনিস না। মনের কাছে ঠিক তাই, মনের কাছে যাই আসে ওর কাছে গারবেজ, মন্দটাও গারবেজ, ভালটাও গারবেজ, ধর্মটাও গারবেজ, অধর্মটাও গারবেজ, মনের কাছে সবটাই আবর্জনা। এসব কথা শুনলে আমাদের শরীরে আতঙ্ক লেগে যায়, কিন্তু এটাই সত্য। মন হল সময়, সময় বিভাজন করে দেয়, অতীত কি, বর্তমান কি, ভবিষ্যত কি। মনই নেই, তার আবার ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যত কিসের! সেইজন ভগবানের আরেক নাম কালাতীত, ক্রান্তদর্শি, তিনটে কালকে এক সঙ্গে দেখেন। ঋষিরাও তিনটে কালকে এক সঙ্গে দেখেন। মনই নেই, কোথা থেকে দেখবেন! সেইজন্য বলা হয় যাদের মনে কোন পাপ নেই; পাপ নেই বলতে কি হয়, যে জিনিসগুলিকে নিয়ে শরীর, মন, ইন্দ্রিয় জড়িয়ে আছে, সেই জিনিসগুলির প্রতি আকর্ষণটা যেন জোরালো থাকে। ভাল জীবন চালাবার জন্য, শুভ কাজ করতে গেলে প্রচুর খাটুনি হয়, মন একেবারেই খাটতে চায় না। কিন্তু যখনই বলা হয়, বিগতকল্মষঃ, ক্ষীণদোষ, যে কোন শাস্ত্র পড়ার সময় আমাদের মনে রাখতে হবে, প্রথমের দিকে যদিও বলা হয় যাঁরা তমোগুণ আর রজোগুণকে পেরিয়ে এসেছেন, কিন্তু শেষ কথা এটা সব সময় বোঝায়, যাঁরা সত্ত্বগুণকেও পেরিয়ে এসেছেন। কারণ ওই স্তরে সত্ত্বগুণটাও দোষযুক্ত। কল্মষহীনের অর্থ হল, যিনি ধর্ম দিয়েও বাঁধা নন, সত্ত্ব দিয়েও বাঁধা নন। এই জিনিসগুলিকে নিয়ে আমরা আগেও আলোচনা করেছি।

মনে তরঙ্গ ওঠা মানে সংসার, তরঙ্গশূন্য মন মানে ঈশ্বর

স্বামীজী এবার বলছেন, Talking, arguing, and reading books, the highest flights of the intellect, the Vedas themselves, all these cannot give knowledge of the Self, (*লেকচার দিয়ে, লেকচার শুনে, বিচার করে, শাস্ত্রপাঠ করে ও বুদ্ধির চূড়ান্ত পরিচালনা করে, এমন কি বেদ পর্যন্ত মানুষকে সেই আত্মজ্ঞান দিতে পারে না।*) খুব নামকরা কথা এবং খুব পুরনো কথা। কারণ আমরা অনেক দিন ধরে গভীর ভাবে দেববাণীর আলোচনা করে যাচ্ছি। একগুচ্ছ তথ্য ভিতরে গেলে মন শুধু সংশয়াচ্ছন্নই হয়ে যাবে। সব সময় আমাদের মাথায় রাখতে হবে মনের চাঞ্চল্যকে। মন চঞ্চল হচ্ছে, বা মন চঞ্চল হচ্ছে না। কম্প্যুটারকে নিয়ে আমরা এখন কত কি করছি। যারা কম্প্যুটারের ব্যাপারে জানে, তার জেনে থাকবে যে, কম্প্যুটার শুধু জানে সুইচ অন্ আর সুইচ অফ্, এর বাইরে কম্প্যুটার কিছু জানে না। তার যে একটা সুইচ আছে, সেটা দিয়ে ইলেক্ট্রিসিটি যাচ্ছে কি যাচ্ছে না; যাচ্ছে না মানে জিরো, যাচ্ছে মানে ওয়ান। জিরো আর ওয়ানের খেলার বাইরে কম্প্যুটারের কাছে কিছু নেই। কম্প্যুটারে আমরা আজকে যা কিছু দেখছি, চাঁদে রকেট যাচ্ছে, মঙ্গল গ্রহে রকেট চলে যাচ্ছে, কোথায় কোথায় চলে যাচ্ছে, আমি গান শুনছি, সিনেমা দেখছি, খেলা দেখছি, সব কিছুর পিছনে মাত্র একটা simple principle, একটা সার্কিট দিয়ে কারেন্ট যাচ্ছে, কি যাচ্ছে না, সুইচ অন্ আর সুইচ অফ্। এর বাইরে কম্প্যুটার কিছু বোঝে না; সুইচ অফ্ জিরো আর সুইচ অন্ ওয়ান। এবার জিরো আর ওয়ানের কম্বিনেশান চলতে থাকবে, ওটাকে ওরা কাউন্টিং ম্যানুপিলেশান করে করে, অর্থাৎ টেকনলজি শুরু হয়ে যায়। পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের খেলা একটা জিনিসকে নিয়ে চলে, মন চঞ্চল, কি চঞ্চল নয়। মন যদি চঞ্চল হয়, একটাও যদি তরঙ্গ মনে উঠে থাকে, তার মানে সংসার এসে গেলো। মনে কোন তরঙ্গ নেই, ঈশ্বর এসে গেলেন। এই সহজ সত্যটাকে যদি আমরা মাথায় রাখি, তাহলে সমস্ত শাস্ত্র পরিষ্কার হয়ে যাবে। সুইচ অন্ আছে, সুইচ অফ্ আছে, এইটুকু যদি বোঝা থাকে তাহলে এবার দেখতে হবে, আমার মনটা অন্ আছে, নাকি অফ্ আছে। পুকুরে ঢেউ আছে, পুকুরে ঢেউ নেই, ঢেউ আছে মানে অন্, ঢেউ নেই মানে অফ্। ঢেউ অন্ মানেই জগৎ, ঢেউ অফ্ মানে ঈশ্বর; এর বাইরে আর কিছু নেই। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যত ধর্ম আছে, সব ধর্ম শুধু এই একটা সামান্য সত্যের মধ্যে ঘুরঘুর করছে; মনে চাঞ্চল্য আছে, না মনে চাঞ্চল্য নেই; চাঞ্চল্য হওয়া মানে সংসার, চাঞ্চল্য না হওয়া মানে ঈশ্বর।

এই যে স্বামীজী একটা লম্বা তালিকা দিলেন, তুমি যুক্তি বিচার করছ, আলোচনা করছ, বেদ মুখস্ত করছ, এগুলো করতে গেলে তোমার ব্রেন তো অন্ থাকবে, ব্রেন অন্ না থাকলে তো এগুলো করা যাবে না। আমি কথা বলে যাচ্ছি, আমার ব্রেন অন্, আপনি শুনে যাচ্ছেন, ব্রেন অন্। আমি চিন্তা করছি, ব্রেন অন্, ঠাকুরের উপর ধ্যান করছি, ব্রেন অন্, ঠাকুরের মন্ত্র জপ করছি, ব্রেন অন্, ব্রেন অন্ মানেই সংসার, তার মানে সবটাই সংসার। আমরা এর আগেও অনেকবার বলেছি, জপধ্যানও সংসারের মধ্যে পড়ে। আমরা যেটাকে শুভ সংস্কার বলি, সেটা অবশ্যই শুভ। বাইরে গিয়ে মদ খাওয়ার থেকে, বাইরে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা মারার থেকে, সর্বক্ষণ পরনিন্দা পরচর্চার মধ্যে ডুবে থাকার থেকে, বাইরে নোংরামির মধ্যে না জড়িয়ে ঘরে বসে জপধ্যান করা অনেক ভাল। জপধ্যান করলে আরেকটা মস্ত বড় উপকার হয় তা হল, মনের মধ্যে যে হাজার রকমের তরঙ্গ উঠছে, সব তরঙ্গকে কমিয়ে কয়েকটা তরঙ্গের মধ্যে নিয়ে আসা যায়। এবার ওখান থেকে লড়াই শুরু হয়, একটা মাত্র তরঙ্গে নিয়ে আসা, আর শেষ ওই একটা তরঙ্গকেও শেষ করে দেওয়া। স্বামীজী এখানে অত্যন্ত একটা খুব simple কথা বলছেন। তোমার সুইচ অফ্ নাকি সুইচ অন? মনে ঢেউ আছে, নাকি মনে ঢেউ নেই? ঢেউ আছে মানেই সংসার, জপধ্যান, পূজা অর্চনা, শাস্ত্র আবৃত্তি করা, শাস্ত্র ব্যাখ্যা করা, ঈশ্বরকে নিয়েই ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা করে যাচ্ছি, শুনতে শুনতে আহা আহা করে করে চোখের জল বেরিয়ে আসছে, সাধুসঙ্গ করে যাচ্ছি, সবটাই সংসার। যদি বেদান্তকে ভালবাসতে চাও, জীবনে যদি কিছু অর্জন করতে চাও, প্রথমে দেখ মনকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এই আলোচনাও পরে আসবে।

প্রথমে ওই আবর্জনা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আবর্জনা থেকে বেরিয়ে এসে খুব করে সাধুসঙ্গ করে শাস্ত্রের প্রতি ভালবাসা নিয়ে আসতে হবে। গুরু বা আচার্যের কাছে শাস্ত্রের কথা শুনে নিয়ে তার অর্থকে মনন, নিদিধ্যাসন করে করে বুঝতে হয়, অর্থটাকে বুঝে নিয়ে চুপ মেরে যেতে হয়। যে কোন শাস্ত্রেই ওনারা এই কথাই বলেন। মুণ্ডকোপনিষদ শুরুই হয় এটা দিয়ে *দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে পরা চৈবাপরা চ*। অপরা বিদ্যা কোন গুলো? চারটে বেদ, বেদের ছটি আনুষাঙ্গিক বেদাঙ্গ সব অপরা বিদ্যা। জ্যোতিষ শাস্ত্র, গণিত শাস্ত্র, ধনুর্বেদ, ফিজিক্স, কেমেস্ট্রি আর বেদ, সব কটাকে একসাথে রেখে দিয়েছেন। প্রথমবার যারা এই কথা শুনবে তারা আতঙ্কিত হয়ে যাবে। সেইজন্য ট্রাডিশানাল ব্রাহ্মণরা উপনিষদকে মানতে চাইতেন না। আত্মজ্ঞানের দিক থেকে, আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দিক থেকে দেখলে, বটতলার উপন্যাস আর বেদে কোন তফাৎ নেই। কারণ, বটতলার উপন্যাসও মনে চাঞ্চল্য তৈরী করে, বেদও মনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। এটা হায়ার লেভেল থেকে বলা হল। একটু লোয়ার লেভেলে যেমনি আসবে, তখন সত্ত্বগুণ যেটা, এটা হল বেদ। বটতলার উপন্যাস কোন দিন কাউকে সত্ত্বগুণে নিয়ে যেতে পারবে না, বেদ নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু যখন চরম জাম্প মারতে হবে, তখন দুটোকেই নীচে ছেড়ে দিয়ে আসতে হবে। আর বলছেন।

In us are two, - the God-soul and the man-soul. The sages know that the latter is but the shadow, that the former is the only real Sun. (*আমাদের ভিতরে পরমাত্মা আর জীবাত্মা – দুইই আছেন। জ্ঞানীরা জীবাত্মাকে ছায়াস্বরূপ, আর পরমাত্মাকে যথার্থ সূর্যস্বরূপ বলে জানেন।*) বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ও দ্বৈতবাদীরা জীবাত্মাকে সত্য বলে মনে করেন আর পরমাত্মাকে আলাদা মনে করেন। বেদান্তীরা বলেন, তা নয়, জীবাত্মা পরমাত্মারই প্রতিবিম্ব। সূর্য আর তার প্রতিবিম্ব, পরমাত্মা আর জীবাত্মা। পরমাত্মা যখন মনের ভিতর দিয়ে প্রতিবিম্বিত হন, তখন তাকে বলছেন জীবাত্মা। তাই যতক্ষণ মন থাকবে ততক্ষণ জীবাত্মা সত্য। মন যখন থাকবে না, জীবাত্মাও তখন থাকবে না। উপনিষদের এটাই মত, আচার্য শঙ্কর এই কথাই বলছেন, এখানে স্বামীজীও একই কথা বলছেন। কিন্তু সব আচার্যরাই যে এটাকে মানবেন, তা নয়। তাঁরা বলেন, জীবাত্মাও সত্য, পরমাত্মাও সত্য; পরমাত্মা আর জীবাত্মার সম্পর্ক বৃক্ষ আর তার পাতার, মালিক ও সেবকের। এগুলো এক একজনের এক এক রকম approach। আমাদের তো সেই ধৃষ্টতা নেই, অধিকারও নেই যে বলব, রামানুজ ভুল, শঙ্করাচার্য ঠিক। রামানুজ জগৎকে একভাবে দেখেছেন, শঙ্করাচার্য আরেক ভাবে দেখেছেন। স্বামীজী শঙ্করাচার্যের মতকে অবলম্বন করেই তাঁর শিষ্যদের বলছেন। স্বামীজী আজকের ক্লাশ শুরু করলেন কঠোপনিষদকে দিয়ে, কিন্তু সেখান থেকে ধীরে ধীরে তিনি সরে যাচ্ছেন সেখানে, যেখানে কঠোপনিষদে যোগের বর্ণনা আছে। মূল তত্ত্ব কঠোপনিষদ থেকে নিয়ে স্বামীজী তাঁর নিজের মত ব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন।

মন যুক্ত হলেই ইন্দ্রিয়গুলি কাজ করবে

স্বামীজী বলছেন, Unless we join the mind with the senses, we get no report from eyes, nose, ears etc. The external organs are used by the power of the mind. Do not let the senses go outside, and then you can get rid of body and the external world. (*আমরা যদি মনকে ইন্দ্রিয়গুলির সাথে সংযুক্ত না করি, তা হলে আমরা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা কোন জ্ঞানই লাভ করতে পারি না। মনের শক্তি দ্বারাই বহিরিন্দ্রিয়গুলিকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ইন্দ্রিয়গুলিকে বাইরে যেতে দিও না, তা হলে দেহ এবং বহির্জগৎ - এই উভয়েরই হাত থেকে মুক্তি পাবে।*) আগেও এই ধরণের একটা টপিক এসেছিল, যেখানে আমরা ভি এস রামচন্দ্রনের বই ফ্যান্টাসি ইন দা ব্রেন উল্লেখ করেছিলাম। এই আইডিয়াটা স্বামীজী পরে আবার নিয়ে আসবেন। ব্রেনের যেখানে ইন্দ্রিয়গুলি কাজ করে, সেখানে চক্ষু ইন্দ্রিয় প্রায় আশি শতাংশ জায়গা নিয়ে নেয়, দশ শতাংশ নেয় কর্ণেন্দ্রিয়, বাকিটা নেয় নাসিকা, ত্বক আর জিহ্বা। জিহ্বাতে খাদ্যকে না রাখা পর্যন্ত জিহ্বা কিছু বুঝতে পারে না। জিহ্বা আর স্পর্শ প্রায় কাছাকাছি, এক শতাংশ করে দুটো নেয়। বাইরের কোন উত্তেজনা বা সংকেত এলেই যে আমরা ওটাকে জানতে পারব তা নয়। কোন তথ্য আমাদের কাছে এলে মন যতক্ষণ তার সাথে নিজেকে না জুড়ে দেয়, ততক্ষণ ইন্দ্রিয় কোন খবর দিতে পারবে না।

নিউরো বিজ্ঞান খুবই স্পেশালাইজড্ সাবজেক্ট হয়ে গেছে, আমাদের জ্ঞান এই ব্যাপারে খুবই ভাসা ভাসা, অবশ্য আমাদের এটা সাবজেক্টও না। কিন্তু এটা খুবই simple জিনিস, স্বামীজীও পরে বলবেন, যখন একটা জিনিসকে নিয়ে আমরা খুব একাগ্র হয়ে মজে থাকি, যেমন বাচ্চা ছেলে বন্ধুদের সাথে খেলাতে মগ্ন হয়ে আছে, মা তাকে ডেকে যাচ্ছে, কিন্তু শুনছে না। গভীর মনযোগ দিয়ে আমরা যখন কিছু করি, তখন এমন ডুবে থাকি যে জোর একটা ধাক্কা যদি না দেওয়া হয়, মন ততক্ষণ ওটা নিতে পারে না। কথামৃতে ঠাকুরের কাহিনী আছে, একজন ছিপ ফেলে মাছ ধরছে, তার পাশ দিয়ে বরকন্দাজ চলে গেল সে বুঝতেও পারল না। এই ধরণের কিছু কিছু ঘটনা সবারই হয়ে থাকে। কখন সখন মন এমন প্রচণ্ড একাগ্র হয়ে যায় যে, যে জিনিসটাকে নিয়ে একাগ্র হয়ে আছে, ওর বাইরে বাকি ইন্দ্রিয়গুলো অকেজো হয়ে যায়। কিন্তু চোখ এমন একটা ইন্দ্রিয় আর ব্রেনের আশি শতাংশ সে নিয়ে নেয় বলে চোখ একটা বিরাট বড় বাধা। রাতের অন্ধকারে মারাত্মক কিছু হতে যাচ্ছে, যদি শুনে বোঝার চেষ্টা করতে হয় তাহলে আমাকে চোখটা বন্ধ করতে হবে। যেমনি চোখ বন্ধ করা হল, ব্রেনে চোখ অনেক জায়গা জুড়ে যে প্রসেসিং করছিল সেটা বন্ধ হয়ে গেল। তখন মন কানের উপর ফোকাস করতে পারে, তখন কানে বেশি ভাল শুনতে পারে। সেইজন্য জপধ্যান করার সময় প্রথমেই বলে দেওয়া হয় চোখ বন্ধ করতে। চোখ বন্ধ না করলে ধ্যান হবে না, কারণ ব্রেন প্রচুর জায়গা নিয়ে নেবে। কিন্তু আমাদের মন এমনই যে, যতক্ষণ মন ওই ইন্দ্রিয়ের মাঝখানে না আসছে ততক্ষণ আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো টেলিস্কোপ, মাইক্রোস্কোপ, ক্যামেরার মত। ছাদে একটা টেলিস্কোপ লাগিয়ে দেওয়া আছে, কিন্তু কেউ দেখছে না। কিন্তু তাই বলে কি টেলিস্কোপে কোন ইমেজ আসবে না? সব সময় ইমেজ আসতেই থাকবে, কিন্তু ওই ইমেজ কোন কাজে লাগবে না। যদি কেউ দেখে তবেই কাজে লাগবে। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো কোন কাজের না, যতক্ষণ ওই ইন্দ্রিয়গুলি দিয়ে না দেখা হয়। আমরা কিন্তু উল্টোটা ভাবি, এটাই স্বামীজী এখানে উল্লেখ করছেন। আমরা মনে করি চোখ, কান, নাক এরা খবর দিচ্ছে বলে আমরা জানতে পারি। কিন্তু তা হয় না, বরং উল্টোটাই হয়, ভিতরে যে মন আছে, সেই মন যখন নিতে শুরু করে তখনই আমরা জানতে পারি। আমরা যখন ঘুমিয়ে থাকি তখনও আমাদের কান খোলা কিন্তু আমরা কিছুই শুনতে পাই না। কারণ মন ওখানে ইন্দ্রিয়ের সাথে যুক্ত থাকছে না। বাড়িতে অনেক কিছু হয়ে গেছে, কিন্তু আমি ঘুমিয়ে ছিলাম বলে কিছুই জানতে পারিনি। মূল কথা হল মন যতক্ষণ না যায় ততক্ষণ ইন্দ্রিয়গুলো কাজ করে না।

জন্ম-মৃত্যু, বিভিন্ন লোকে গতায়াত –এর রহস্য

পরের প্যারাগ্রাফে স্বামীজী বলছেন, তাহলে ইন্দ্রিয়গুলি থেকে মনের গুরুত্ব বেশি। গীতাতেও এর উপর শ্লোক আছে, আর কঠোপনিষদে তো এর উপর খুবই জোর দেওয়া হয়েছে যে, ইন্দ্রিয় থেকে মন বেশি

গুরুত্বপূর্ণ, মন থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল আত্মা বা আত্মার যে চৈতন্য, এই জিনিসটাকে নিয়ে স্বামীজী আলোচনা করছেন। বলছেন, This very 'X' which we see here as an external world, the departed see as heaven or hell according to their own mental states. (*এই যে অজ্ঞাত বস্তুটাকে আমরা বহির্জগৎ বলে দেখছি, মৃত্যুর পর নিজ নিজ অবস্থানুসারে কেউ একে স্বর্গ, কেউ বা নরক বলে দেখে।*) স্বামীজীর এই বাক্যের ব্যাখ্যা করা প্রায় অসম্ভব। সমাধিতে কি হয় আমরা জানি না। ঠাকুর নিজে বলছেন, সমাধিতে গিয়ে নরেনকে সপ্তর্ষি মণ্ডল থেকে নিয়ে এলাম। ঠাকুর কি বলতে চাইছেন? মৃত্যুর পর মানুষ স্বর্গে যাচ্ছে, নরকে যাচ্ছে। আবার স্বর্গে কিছু দিন থাকার পর পুনর্জন্ম হচ্ছে। কি বলতে চাইছেন? অন্যান্য ধর্ম পুনর্জন্ম না মানতে পারে, কিন্তু আমরা মানি, আর হাজার হাজার এর প্রমাণও রয়েছে। কোন হিন্দু যদি বলে, আমি পুনর্জন্ম মানি না, তাহলে বুঝতে হবে হয় সে এখনও শিশু, বুদ্ধি পাকেনি, আর তা নাহলে ঘোর নাস্তিক। আমাদের কাছে পুনর্জন্ম স্বাভাবিক জিনিস। তাহলে হচ্ছেটা কি? এই যে বলা হচ্ছে মৃত্যুর পর কেউ স্বর্গে বা নরকে যাচ্ছে, আবার পুনর্জন্ম হয়ে সেখান থেকে বিভিন্ন লোকে বা যোনিতে জন্ম নিচ্ছে, অথচ বেদান্ত বলছে, আত্মার কোন যাওয়া-আসা নেই - স্বামীজী এই জিনিসটার উপর এক সময় কাজ করেছিলেন। এখানে যখন স্বামীজী বলছেন, তখনও স্বামীজী এর উপর চিন্তা ভাবনা করছেন, তাঁর থিয়োরীগুলো তখনও তৈরী হয়নি। আরও পরে স্বামীজী এর উপর থিয়োরী গুলিকে তৈরী করলেন, যেটা তিনি মিঃ স্টার্ডিকে পরিষ্কার করে চিঠিতে লিখে জানালেন।

এই যে জগৎ, যেখানে জন্ম আছে, মৃত্যু আছে, বিভিন্ন লোকে যাওয়া আসা রয়েছে। ঠাকুর যেমন বলছেন, সমাধিতে একদিন মন চলে গেল সপ্তর্ষি মণ্ডলে। অন্য দিকে ঠাকুর নিজের কথা বলতে গিয়ে চৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তর্দশ, অর্ধবাহ্যদশা, বাহ্যদশা এই অবস্থাগুলির বর্ণনা করছেন। বেদান্তে জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির কথা বলছেন। এই ধরণের কত রকমের অবস্থার কথা আছে, কিন্তু মূলতঃ একটা জিনিস আছে, যেটা তিনটের মধ্যেই ঘুর ঘুর করে। যদি কেউ বলে আপনি এটাকে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে দাঁড় করান, আমরা তা পারব না। এর ব্যাখ্যা একটাই হতে পারে। সাধারণ মানুষরা মনে করে, মরে গেলে সব শেষ। এটা গেল একটা ধারণা। দ্বিতীয় ধারণা হল, অন্যান্য ধর্ম বলে মারা গেলে শুদ্ধির পর স্বর্গে চলে যাবে। তার মানে, তারা এটা মানছে যে কেউ একজন স্বর্গে যাচ্ছে। তৃতীয় ধারণা হিন্দুদের, হিন্দুরা বলে মৃত্যুর পর হয় সে স্বর্গে যাবে, বা নরকে যাবে, বা বিভিন্ন যোনিতে যাবে, বা বলে কিছু দিনের মধ্যে পুনর্জন্ম হবে। সবাই একটা কোথাও না কোথাও যাচ্ছে। অদ্বৈত বেদান্ত আবার বলছে আত্মার জন্মও নেই মৃত্যুও নেই; কিন্তু তার সাথে জন্ম মৃত্যুকেও দেখাচ্ছে। অদ্বৈত বেদান্ত বলছে, এই জন্ম মৃত্যু দেহের। কিন্তু দেহেরই হোক আর যারই হোক, একটা কিছু হচ্ছে। স্বামীজী পুরো জিনিসটাকে মেলাচ্ছেন, আসলে মেলানোটা যে স্বামীজী নিজের তা না, বেদান্তের গভীরে যখন ওনারা নিয়ে যান, সেখানে তাঁরা জন্ম, মৃত্যু ও মুক্তিকে, আবার স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ, আবার জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এগুলোকে সব কিছুকে মিলিয়ে দেখেন।

এর ব্যাখ্যা একটাই হতে পারে, পুরো জিনিসটাকে যদি নিয়ে বলা হয় আমি এর একটা খুব যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে চাই, তখন বলা হবে, আত্মাই একমাত্র আছেন যাঁর চেতনা আছে। তিনি যখন কোন চিন্তন করেন না, তখন তিনি নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম। যেমনি কোন একটা চিন্তন করলেন, সঙ্গে সঙ্গে সেটা মন রূপে দাঁড়িয়ে গেল, যেটাকে আমরা শক্তি বা প্রকৃতি বলছি। এটাকে আমরা যে কোন ভাষায় বলতে পারি, খ্রীশ্চানরা বলে, Let there be light and there was light। তার মানে সৃষ্টি হয়ে গেল। কারণ এটা সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের চিন্তন। তাঁর চিন্তন করাও যা, সৃষ্টি হয়ে যাওয়াও তাই, তিনি চিন্তন করলেন, আমি এক আমি বহু হব, সৃষ্টি হয়ে গেল। কিন্তু সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম অনন্ত, সব জায়গায় তিনিই আছেন, তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। তাহলে সৃষ্টিটা কোথায় হবে? এগুলো ধারণা করা সত্যিই খুব কঠিন। তার মানে মনের মধ্যেই একটা জগৎ তৈরী হয়ে যায়। আত্মার চৈতন্য পেয়ে সেই মন মনের জগতে নিজের মত জিনিসগুলিকে সৃষ্টি করে নেয়। সেই মন যখন পাঁচটি ইন্দ্রিয় দিয়ে এই জিনিসগুলিকে দেখে, তখন সে স্থূল জগৎ রূপে দেখে। মৃত্যুর সাথে সাথে তার বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলি আর থাকে না, অন্তর ইন্দ্রিয়গুলি থেকে যায়। সেইজন্য দুটোকে আলাদা করার জন্য বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলিকে গোলক বলা হয়, গোলক মানে ছিদ্র। মানুষ বা কোন প্রানী মারা গেলে তার এই গোলক গুলি থাকে না, নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু তার আসল ইন্দ্রিয়গুলি থেকে যায়। সেইজন্য হিন্দু ধর্মে সৃষ্টিতত্ত্বে পুরুষ নারীতে

কোন ভেদ নেই। কেন ভেদ নেই? ওনাদের একটা common term হল জননেন্দ্রিয়, যেখানে সৃষ্টি হয়। পুরুষদের ক্ষেত্রে এক রকম, নারীদের ক্ষেত্রে অন্য রকম। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের দিক থেকে পুরুষ নারী এক, কোন তফাৎ নেই। আর দেহে যখন আসে, বেদান্ত তখন দেহের ব্যাপারে থেমে যায়, কারণ দেহের ব্যাপারটা বেদান্তের নয়। দেহ হল medical science, ওটা বেদান্তের কাজ না। সেই আত্মা এখন তাঁর চৈতন্যের আলো দিয়ে মনকে আলোকিত করে রেখেছেন, মন তাই সব কিছু অনুভব করছে। আলোকিত মন স্থূল শরীরের ইন্দ্রিয়গুলি দিয়ে যখন দেখে তখন সেটাই মনে হয় জগৎ। এই জগতে ভাল আছে, মন্দ আছে, এই খুশি, এই আনন্দ, এই দুঃখ, এই কষ্ট; দেহটার নাশ হয়ে গেলেও মন থেকে যাচ্ছে, মন তো কোথাও যাচ্ছে না, মূল ইন্দ্রিয়গুলিও আছে, তারাও কেউ যায়নি। কিন্তু এতক্ষণ মন যে ছিদ্রগুলি দিয়ে দেখছিল, সেই ছিদ্রগুলি চলে গেছে। ইন্দ্রিয়গুলি দিয়ে এবার সেই মন অন্য পদ্ধতিতে দেখছে, তখন সে স্বর্গ দেখে, নরক দেখে। তাহলে এখন যে স্বর্গ দেখছে, সেটা কি সত্য না মিথ্যা? অতটাই সত্য যতটা এই জগৎ সত্য। জগৎ যদি আমার কাছে সত্য বলে মনে হয়, তাহলে স্বর্গটাও সত্য। জগৎ যদি আমার কাছে মিথ্যা মনে হয়, তাহলে স্বর্গটাও মিথ্যা।

ঠাকুর সচ্চিদানন্দ, তাঁরই চারটে রূপ, তিনি নির্গুণ নিরাকার, সগুণ সাকার যখন হন তখন তিনি মহাবিষ্ণু বা শ্রীরামকৃষ্ণ। যখন তিনি সূক্ষ্ম রূপে আসেন, স্বামীজী বলছেন, তিনি সুক্ষ্ম রূপে এখনও আছেন, যাঁরা গভীর ভাবে ধ্যান ধারণা করেন, তখন তাঁরা ঠাকুরকে সূক্ষ্ম রূপে দর্শন করেন। মৃত্যুর পর তিনি সেই সূক্ষ্ম রূপ দর্শন করে তাঁর কাছে যাবেন। স্থূল শরীরে তিনি আর আসবেন না। স্থূল শরীরে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ হয়ে কামারপুকুরে জন্ম নিলেন, কাশীপুরে দেহত্যাগ করলেন, ওটা তাঁর স্থূল শরীর। আবার যখন অবতার হয়ে আসবেন, তখন অন্য একটা স্থূল শরীর হবে। আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ রূপেই আবার তাঁকে অবতার রূপে পেতে চাই, সেটা আর হবে না, ওটা শেষ হয়ে গেছে।

এটা আমরা উপর থেকে দেখে একটা বললাম। নীচ থেকে দেখলে একই জিনিস হয়। আমি, আপনি, সবাই যারা আছি, বেদান্ত মতে আমরা সবাই পূর্ণ ব্রহ্ম। কিন্তু পূর্ণ ব্রহ্মের বা আত্মার বা চৈতন্যের আভাস পর্যন্ত আমার মধ্যে নেই, আভাসটা রয়েছে আমার মনের। সেই মন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে, শরীরের মধ্য দিয়ে এই জগতে ঘুর ঘুর করে যাচ্ছে। মরে যাওয়া মানেই এই শরীরটা পড়ে গেল, এই ছিদ্রগুলো নাশ হয়ে গেল; কিন্তু মন থেকেই যাচ্ছে। একটা টর্চ জ্বালিয়ে আমি জগতে ঘুরছি। টর্চের কাঁচে আমি একটা রঙ লাগিয়ে দিলাম, তখন জগৎটা এক রকম দেখাবে। মরে যাওয়া মানে আমি ওই জিনিসটাকে সরিয়ে দিলাম। এবার অন্য ফিল্টার লাগিয়ে দিলাম, এবার দৃষ্টিটা অন্য রকম হয়ে যাবে, এর বেশি কিছু না।

পুনর্জন্ম হওয়া একই জিনিস। সেই একই মন, মন মানেই সূক্ষ্ম শরীর। মন যখন দেখল এই সূক্ষ্ম শরীরে আমার চলছে না, আমাকে ভোগ করতে হবে। মন এখন যে ধরণের ভোগ করতে চাইছে, সেই ধরণের উপযুক্ত একটা স্থূল শরীর নিয়ে নেবে। ঋষিরাও এটাই বলেন। মর্ত্যলোক, এই পৃথিবীটা হল কর্মভূমি, এখানে কাজ করার অনেক সুযোগ ও সুবিধা পাওয়া যায়। দেবতা, অসুরদের স্থূল শরীর নেই বলে, তাদের ভোগ সেই রকম হয় না। ভোগ করতে গেলে স্থূল শরীর দরকার। স্বর্গসুখের কথা বলা হয় ঠিকই, কিন্তু ভোগ জিনিসটা এই পৃথিবীতেই হবে। মন যদি চায় আমি ভোগ করব, আমি স্থূল শরীর ধারণ করব, তখন ওই দিকটা ছেড়ে এদিকে স্থূল জগতে চলে আসে। এর মধ্যে কতটা সত্য, কতটা কল্পনা, কতটা ভুল, আমরা সত্যিই জানি না। যতক্ষণ এই জিনিসটাকে পুরো যুক্তির উপর না দাঁড় করানো যাবে, ততক্ষণ তাবড় তাবড় পণ্ডিতরা তুলোধুনো করে, কুচি কুচি করে কেটে রেখে দেবে। তখন এটা আর সিদ্ধান্ত হবে না। স্বামীজীও যখন এই কথাগুলো বলছেন, তখন এগুলো একটা proposition। কিন্তু তফাৎটা হল, স্বামীজী একজন ঋষি, অন্তত আমাদের দৃষ্টিতে তিনি একজন ঋষি। এনারা সত্যকে সাক্ষাৎ করেছেন। তিনি আত্মাকে আত্মা রূপে দেখেছেন। আমরা যদি একটা খুব পাওয়ারফুল সার্চ লাইটের কথা কল্পনা করি। এবার কোন কারণে আমি ওই সার্চ লাইটের ক্ষমতা, তার প্রতিফলন শক্তি, তার জোরালো আলো সবটাই আমি দেখেছি। বাকিরা যারা এই সার্চ লাইট দেখছে, তাদের ক্ষেত্রে সেই সার্চ লাইটের উপর পুরো একটা আবরণ দিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেই আবরণের মাধ্যমে আলোটাকে দেখে বেড়াচ্ছে। তাদের ধারণা এক রকম হবে, আমার আবরণ নেই বলে আমার ধারণা আরেক রকম হবে। ঠাকুর, স্বামীজী এনারা দেখছেন, শুদ্ধ চৈতন্য এই রকম, আত্মা এই রকম। ফলে তিনি

দেখতে পারছেন, সূক্ষ্ম জগৎটা এই রকম, স্থূল জগৎটা এই রকম। উপনিষদের ঋষিরাও একই জিনিস দেখেছেন, সেইজন্য তাঁরাও একই কথা বলছেন। ওটাকেই স্বামীজী খুব পরিষ্কার করে গুছিয়ে এনে বলছেন, This very 'X' which we see here as an external world, the departed see as heaven or hell according to their own mental states.

যে জিনিসটাকে আমি আজকে জগৎ রূপে দেখছি, যেমন এই মাইক্রোফোন, মাইক্রোফোনটা এখানে 'X', এই মাইক্রোফোন আমি যেটা দেখছি, এটা আমার কাছে স্থূল জগৎ। আমি যদি এখানে মারা যাই, এবার আমি এই মাইক্রোফোনকেই দেখব, কিন্তু এই মাইক্রোফোনকে এখন যেভাবে দেখছি তখন এই ভাবে দেখতে পারব না। কারণ এই মাইক্রোফোনকে দেখার জন্য লাগবে এই স্থূল চোখ, কিন্তু এই চোখ তো আর নেই। আমি এবার এটাকে অন্য ভাবে দেখব। এটাই আমার কাছে হয় স্বর্গ, নাহলে নরক মনে হবে। আমরা সারা জীবন যে নানান রকমের দুঃখ অনুভব করছি, যারা মরে গেছে তারাও এই দুঃখ অনুভব করে, সেটাই তাদের কাছে নরক। যে সুখগুলো আমরা অনুভব করছি, মানুষ এখানে নিজের স্ত্রী বা স্বামীর সাথে বা প্রেমিকার সাথে সুখ ভোগ করেছে, সেটাই তারা স্বর্গে গিয়ে অপ্সরা রূপে দেখে। একই জিনিস, তফাৎ কিছু নেই। এখানে যে ভাল ভাল খাবার খেয়েছে, সেটাকেই স্বর্গে ইন্দ্রের খাবার রূপে দেখে। স্থূল জগৎ আর সূক্ষ্ম জগতের আসলে কোন তফাৎ নেই, তফাৎ রয়েছে আমাদের দেখার মধ্যে। স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, এই যে আমি আপনি আছি আমাদের মাঝখান দিয়ে হাজার হাজার ভূতেরা ঘুরে যাচ্ছে। কিন্তু তাদের ইন্দ্রিয়গুলি আমাদের দেখতে পায় না, আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো তাদের দেখতে পায় না। আমরা কল্পনা করে নিচ্ছি, এখানে একটা ভূত বসে আছে। এখানে দেববাণীর উপর ক্লাশ হচ্ছে, আমরা সবাই বসে আছি, ঘরে টেবিল, ফ্যান, মাইক্রোফোন, টেবিলে মোবাইল ফোন আছে, ভয়েস রেকর্ডারস গুলো রাখা আছে। সে এখন এখানে কি দেখবে? আমরা যা কিছু দেখছি, সেটা ও দেখবে না। কারণ ওর ইন্দ্রিয়গুলি আছে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের ছিদ্রগুলি নেই। বস্তুগুলিকে দেখার জন্য ঠিক এই চোখেরই দরকার লাগবে। এর পিছনে যে ইন্দ্রিয়গুলি আছে, সেগুলো দেখে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। তার মানে রূপ জিনিসটাকে ধরার জন্য ইন্দ্রিয়ের দরকার, সেটা কিন্তু তার কাছে আছে। এই যে পেন, এই পেনের একটা রূপ আছে, যেটাকে আমরা রূপ তত্ত্ব বলছি, সৃষ্টি থেকে রূপ তত্ত্ব আসছে, তার সাথে তার একটা ভৌতিক জিনিসও আছে। ভূত এখন পেনের যে রূপ তত্ত্ব আছে, মানে আলো জিনিসটাকে দেখবে, কিন্তু পেনটাকে দেখতে পারবে না। ঠিক তেমনি আরেকটা কোন প্রানী যদি এখানে এসে যায়, সে পেনটাকে দেখবে কিন্তু অন্য রকম দেখবে। যাদের চোখে ইনফ্রা রে থাকে, যেমন বেড়াল রাত্রিবেলা যেভাবে দেখে, মানুষ সেভাবে দেখে না। বেড়াল, কুকুর এরা পুরো অন্য ভাবে দেখে। কারণ তাদের চোখের গঠনটাই অন্য রকম। রূপ তত্ত্বকে সবাই দেখছে, বেড়ালাও দেখছে, কুকুরও দেখছে, আমরাও দেখছি, কিন্তু লক্ষ্য বস্তুকে সবাই আলাদা আলাদা দেখছে। এই ঘরে যদি কোন ভূত থেকে থাকে, আমরা যেভাবে সব কিছু দেখছি, ভূত সেভাবে দেখবে না, বস্তুটাকে দেখবে ঠিকই। যদি তাদের কাছে মনে হয় এখানে ভাল কিছু হচ্ছে তখন তাদের কাছে এটাই স্বর্গ মনে হবে, খারাপ কিছু হচ্ছে, সেটাই তখন নরক মনে হবে। ঠাকুর কামারহাটিতে গোপালের মার বাড়ি গেছেন, সেখানে দেখছেন কয়েকটা ভূত, যেখানে ভূতেদের একটা জগৎ তৈরী হয়ে আছে, সেখানে হঠাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন হয়ে গেছে। ভূতেরা বলছে, তোমার গায়ের গন্ধ আমরা সহ্য করতে পারছি না, তুমি এখান থেকে চলে যাও। অনেক আগেকার কথা, একজন মহারাজ পূর্বাশ্রমে গ্রামের দিকে ছিলেন। কোথাও তিনি গেছে, সেখানে তাঁকে এক কাপ কফি দেওয়া হয়েছে। কফিতে চুমুক দিয়েই বলছেন, ইস্ চা'টা পুড়ে গেছে। কফির স্বাদ তাঁর কাছে পোড়া চায়ের মত মনে হচ্ছে। স্বাদের তারতম্য আছে, ঠিক তেমনি ভূতেদের perception অন্য রকম। স্বামীজী এভাবেই জিনিসটাকে দেখেছেন, ব্যাখ্যাটাও সেইভাবে করেছেন। আমরা এখানে স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গীকে কেন্দ্র করে আলোচনা করলাম।

ইহলোক ও পরলোক দুটোই স্বপ্ন

বলছেন, Here and hereafter are two dreams, the latter modelled on the former, get rid of both, all is omnipresent, all is now. Nature, body, and mind go to death, not we; we never go nor come. (*ইহলোক আর পরলোক – দুটোই স্বপ্নমাত্র, পরেরটি আবার*

প্রথমটির ছাঁচে গড়া। ওই দুই প্রকার স্বপ্ন থেকেই মুক্ত হও, জানো – সবই সর্বব্যাপী, সবই বর্তমান। প্রকৃতি, দেহ ও মনেরই মৃত্যু হয়, আমাদের মৃত্যু হয় না; আমরা যাইও না, আসিও না।) Here মানে এই জগৎ, hereafter মানে মৃত্যুর পরে। বলছেন, দুটোই কিন্তু স্বপ্ন। কার কাছে? সেই আত্মার দৃষ্টিতে। পরলোকের আমরা যে মডেলে তৈরী করেছি, সেই মডেল কেমন? যেমন ইহলোককে নিয়ে মডেল তৈরী করেছি। আমরা যখন মরে যাব, তখন এটাই থাকবে। একটা খুব মজার ব্যাপার, যেমন ঠাকুর বলছেন, এই এত বড় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তুমি একটা ক্ষুদ্র প্রানী; বিশেষ করে বিজ্ঞান আদিকে কেন্দ্র করে এই কথা প্রচুর বলা হয়। কিন্তু এটা ভুলে যাচ্ছেন যে, স্থূল জগতেই অবতার আসেন। স্বামীজী এখানে বলছেন, আমরা যাকে স্বর্গ বলছি, এর মডেলিং হয়েছে ইহজগৎকে আধার করেই। পাঁচটি ইন্দ্রিয় দিয়ে আমরা যা কিছু দেখছি, এটাকেই অন্য ভাবে দেখলে তখন সেটাই পরলোক; পরলোক বলতে স্বর্গ, নরক সবটাই। ইহলোক আর পরলোক দুটোই আমাদের কাছে স্বপ্ন, দুটোকেই আমাদের সরাতে হবে। কিন্তু সরানো যাবে না।

ইহলোক আর পরলোককে কেন সরানো যাবে না? কারণ ইন্দ্রিয়গুলি আছে, ইন্দ্রিয় যত দিন আছে তত দিন সরানো যাবে না। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কাজই হল, যেখান থেকে সে জন্ম নিয়েছে তার সাথে থাকা। পঞ্চ তন্মাত্রা, পঞ্চ মহাভূতের সাথে ইন্দ্রিয়ের যে সম্পর্ক হয়ে আছে, এই সম্পর্ক কখনই যাবে না। ইন্দ্রিয় যেমন যেমন পাল্টাবে, আমাদের perception তেমন তেমন পাল্টাবে। তাতেও কিন্তু সূক্ষ্ম তন্মাত্রা আর স্থূল তন্মাত্রার সাথে ইন্দ্রিয়ের সম্পর্কের ছেদ কোন দিন হবে না। ইন্দ্রিয় সব সময় তন্মাত্রাগুলির সাথে আঠার মত এঁঠে থাকবে। যতক্ষণ না জগৎকে আমরা ত্যাগ করতে পারছি, অর্থাৎ জগৎ ত্যাগ হয়ে গেলে পদার্থ ত্যাগ হয়ে যাবে, বস্তু ত্যাগ হয়ে যাবে, তন্মাত্রা, যেটা দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে, সেটার ত্যাগ হয়ে গেলে তখন ইন্দ্রিয়গুলি নাশ হয়ে যাবে। দুটো একটা জিনিস দিয়েই সব কিছু তৈরী, যেমন অগ্নি তত্ত্ব দিয়েই বস্তুর রূপ আসে, চক্ষু ইন্দ্রিয়ও অগ্নি তত্ত্ব দিয়ে তৈরী, আর সেই জন্য ইন্দ্রিয় বস্তুকে ধরার ক্ষমতা পায়। দুটোকেই নাশ করতে হবে। তার মানে ইহলোক আর পরলোক এই দুটো যতক্ষণ না আমরা নাশ করছি, ততক্ষণ এই স্বপ্ন চলতে থাকবে। ইন্দ্রিয়কে নাশ করা হল প্রথম পদক্ষেপ। আমি যদি আমার চোখ দুটো নষ্ট করে দিই তাতে কিছুই হবে না, কিন্তু আসল চক্ষু ইন্দ্রিয়, যেটা ব্রেনে রয়েছে, সেটা তো থেকেই যাবে। মানুষ মরে যাওয়ার পরেও ইন্দ্রিয়গুলো থাকবে, ইন্দ্রিয়গুলো কোথাও যাবে না। একটা লোক বদমাইশি করে বেড়াচ্ছিল, স্ত্রীকে সব সময় জ্বালিয়ে মারছিল। স্বামীর জ্বালায় স্ত্রী এবার গলায় দড়ি দিয়ে দিয়েছে। স্ত্রী ভেবেছিল, আমি মরে গেলে স্বামী বুঝবে কত ধানে কত চাল, কি করে তুমি সংসারের ঝক্কি সামলাও দেখা যাবে। স্ত্রী মরে যাওয়াতে স্বামীর ভালই হল, তার বদমাইশি করার রাস্থা আরও খুলে গেল। স্ত্রী মরে কোথায় গেল? কোথায় আর যাবে, ওকে তো ওখানেই থাকতে হবে। এখন সে দেখছে স্বামী আরও আনন্দ স্ফুর্তি করে বেড়াচ্ছে, স্ত্রী আরও জ্বলে পুড়ে মরবে, তার মানে নরকে ঢুকে গেল। নরকটা সে আগে থেকেই নিজের মনের মধ্যে সৃষ্টি করে রেখেছে। সেইজন্য মারতে হবে ইন্দ্রিয়গুলিকে।

জপধ্যান, সাধন-ভজন করা হয় ইন্দ্রিয়গুলিকে মারার জন্য। আমরা মন নিয়ে সব সময় বলছি ঠিকই, কিন্তু মন অতটা বদমাইশি করে না, বদমাইশি করে ইন্দ্রিয়। কারণ সৃষ্টিতে প্রকৃতির পরেই আসে মহৎ, মহৎ মানে সমষ্টি মন, সেইজন্য মন ঈশ্বরের সাথে এক। মন তাই কখন শত্রুর মত আচরণ করে না, আমরা কথায় কথায় বলি বটে, পাজি মনকে ঠিক কর; আসলে মন কিন্তু পাজি না, পাজি হল ইন্দ্রিয়, সেইজন্য আগে মারতে হবে ইন্দ্রিয়কে।

স্বামীজী বলছেন, The man Swami Vivekananda is in nature, is born, and dies; but the self which we see as Swami Vivekananda is never born and never dies. It is the eternal and unchangeable Reality. (*এই যে 'স্বামী বিবেকানন্দ' – এর সত্তা প্রকৃতির ভেত, সুতরাং এর জন্মও হয়েছে এবং মৃত্যুও হবে। কিন্তু আত্মা – যাঁকে আমরা স্বামী বিবেকানন্দ রূপে দর্শন করছি – তাঁর কখনও জন্ম হয়নি; তিনি কখন মরবেনও না – তিনি অনন্ত ও অপরিণামী সত্তা।*) স্বামীজী এখান থেকে আরও গভীরে টানতে শুরু করেছেন; দুই বিবেকানন্দের কথা বলছেন। এক বিবেকানন্দ প্রকৃতির মধ্যে

অবস্থিত, আরেক বিবেকানন্দ প্রকৃতির বাইরে। প্রকৃতির মধ্যে বিবেকানন্দের জন্ম হয়েছে, প্রকৃতির মধ্যে বিবেকানন্দ মারা যাবেন।

স্বামীজী এখন বোঝানর চেষ্টা করছেন, আমাদের সবারই দুটো রূপ, একটা প্রকৃতির মধ্যে। প্রকৃতির মধ্যে থাকা মানে, আমরা প্রথমে যেমন বললাম – শুদ্ধ ব্রহ্ম যখন চিন্তা করেন তখন ওটা মন হয়ে গেল, মন মানেই প্রকৃতি, প্রকৃতির মধ্যেই সে রয়েছে। প্রকৃতির মধ্যে যেটা রয়েছে সেটা জন্মেছে, মারা যাবে, ভাল করবে, মন্দ করবে, অনেক কিছুই করবে। কিন্তু যেটা প্রকৃতির বাইরে আছে, স্বামীজী নিজেকে দেখিয়ে বলছেন, এই বিবেকানন্দ সব কিছুর পারে, তার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, সে জন্মও নেয়নি, মরবেও না। তাহলে এগুলো হচ্ছে কোথা থেকে? কোথা থেকেও হচ্ছে না, উনি খালি ভেবেছেন, আমি এক আমি বহু হব। ব্রহ্ম চিন্তা করলেন, প্রকৃতি হয়ে গেল। প্রকৃতি হয়ে যাওয়ার পর এক এক করে সব কিছু এসে গেল। এর মধ্যে প্রথম কাজ হল ইন্দ্রিয়গুলিকে নাশ করা। ইন্দ্রিয়ের নাশ না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত প্রকৃতির বাইরে যাওয়া যাবে না। আসলে প্রকৃতির এলাকার বাইরে যাওয়া মানেই মনের এলাকার বাইরে যাওয়া। কিন্তু মনের বাইরে যাওয়া যায় না, যেতে হয় প্রথমে ইন্দ্রিয়ের পারে। কঠোপনিষদের মন্ত্রে বলছেন, *ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ*, বিষয়বস্তুর থেকে ইন্দ্রিয়গুলি শ্রেষ্ঠ কারণ ইন্দ্রিয়গুলি তাদের জানতে পারে, ইন্দ্রিয় থেকে শ্রেষ্ঠ মন, মন ইন্দ্রিয়কে ধরতে পারে, মন থেকে সূক্ষ্ম হল বুদ্ধি, বুদ্ধির পরেই আত্মা। বুদ্ধি হল সমষ্টি মন, এটাই প্রকৃতি, এটাই মন, এর মধ্যেই মানুষ জন্ম নেয়, মারা যায়, ভোগ করে, এর মধ্যেই পৃথিবীলোক আছে, স্বর্গলোক আছে, পাতাললোক আছে।

তাহলে নরকে কে যাবে? যে এই লোকে শুধু দুঃখই দেখতে থাকে। স্বর্গে কে যাবে? যে এই লোকে সব সুখ দেখে। তাহলে শুভ কর্ম করলে মানুষ কেন স্বর্গে যায়? শুভ কর্ম করছে মানে, সে এখন শুভ জিনিসের প্রতি আকর্ষিত হয়ে আছে। আমি ওই কর্ম করেছি বলে স্বর্গে যাচ্ছি না। যার মন সব সময় সৎচিন্তন নিয়ে আছে, মৃত্যুর পরেও সে সৎ চিন্তন নিয়েই থাকবে। যে সৎ চিন্তন করার জন্য আমাকে এখানে ভাল মানুষ বলছে, সেই সৎ চিন্তন দিয়ে ওটাকে পরে স্বর্গ বলবে। স্থূল জগতও যা, দৃশ্য জগতও তা, স্বর্গও তাই, নরকও তাই। সেইজন্য যিনি ঠাকুরের প্রতি বা ঈশ্বরে পুরোপুরি সমর্পিত, তাঁর আর কিছু লাগে না, ওই কারণেই লাগে না। যাঁর মন পুরোপুরি ঈশ্বরের দিকে চলে গেছে, তিনি ভালও দেখেন না, মন্দও দেখেন না। সেইজন্য তাঁর জন স্বর্গও নেই, নরকও নেই। ঠাকুর বলছেন, ঢেকি স্বর্গে গেলে কি করব, ধানই ভানবে। আমরা মনে করছি নরক বলে একটা কোন জায়গা আছে, স্বর্গ বলে আলাদা কোন জায়গা আছে, এখান থেকে ওখানে যাচ্ছে, ওখান থেকে এখানে আসছে, ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। এগুলো কাহিনী, কুসংস্কারের জন্মদাতা। আমি ছাড়া জগতে কিছু নেই। স্বপ্নে যেমন আমরা অনেক কিছু সৃষ্টি করি, সেগুলোকে দেখে কখন হাসছি, কখনও কাঁদছি, কখনও ভয় পাচ্ছি; ঠিক তেমনি এই মর্ত্যলোকের সৃষ্টি করে এখানে আমরা কখন হাসছি, কখন কাঁদছি। ব্রেন ডেড হয়ে গেলেও মন থাকবে, ওই মন এখন আরেকটা অন্য রকম সৃষ্টি করে দেবে – এটা স্বর্গ, এটা নরক ইত্যাদি। এরপর জন্ম নিয়ে আবার যখন এই জগতে এসে গেল, ব্রেনের সাথে আইডেন্টিফাই করল, এবার ব্রেনের প্রপার্টির মত ওটাকে ভোগ করবে। মানুষ কেমন রাস্তা দিয়ে দিব্যি হাঁটাচলা করে বেড়ায়, হঠাৎ তার ইচ্ছে হল একটা দোলনা বানিয়ে তার মধ্যে দোল খাবে। এবার সে নিজের মত দোল খেয়ে যাচ্ছে, কখন সেই দোলনা, কখন ওই দোলনা। সেই রকম দিব্যি নিজের মত আছে, কিন্তু সৃষ্টি করে দিচ্ছি, এই মর্ত্যলোক, এই স্বর্গলোক।

মনের শক্তি সব সময়ই এক থাকে - যোগী হওয়ার জন্য প্রথম যে কাজটি দরকার

এবার আগের প্যারাগ্রাফ আর এই প্যারাগ্রফের সাথে স্বামীজী মেলাচ্ছেন, The power of the mind is the same whether we divide it into five senses or whether we see only one. (*মনের শক্তিকে আমরা পাঁচটা ইন্দ্রিয়শক্তিতেই ভাগ করি বা একটা শক্তি রূপেই দেখি, মনঃশক্তি এক রকমই থাকে।*) স্বামীজী বলতে চাইছেন, মনের শক্তিকে তুমি পাঁচটা ইন্দ্রিয় দিয়েই বার কর বা একটা দিয়ে কর, মনের শক্তি একই থাকে। যেমন বলছেন, A blind man says, 'Everything has a distinct echo, so I clap my hands and get that echo, and then I can tell everything that is around

me’. (*অন্ধ ব্যক্তিরা বলে, ‘প্রত্যেক জিনিসের ভিন্ন ভিন্ন রকমের প্রতিধ্বনি আছে, সুতরাং আমি হাততালি দিয়ে বিভিন্ন জিনিসের প্রতিধ্বণি দ্বারা আমার চতুর্দিকে কোথায় কি আছে, ঠিক ঠিক বলে দিতে পারি’।*) অন্ধ যদি হাতে তালি দেয় সে তার হাততালির শব্দের ইকো দিয়ে সবটাই বুঝতে পারে। So in a fog the blind man can safely lead the seeing man. Fog or darkness makes no difference to him. (*সুতরাং ঘন কুয়াসার ভিতর একজন অন্ধ একজন চক্ষুষ্মান লোককে অনায়াসে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারে, কারণ তার কাছে কুয়াসা বা অন্ধকারে কিছু তফাৎ হয় না।*) একটা প্রবাদে বলে যে, অন্ধের কিবা দিন কিবা রাত, কিন্তু স্বামীজী যেটা বলছেন সেটা পুরো অন্য রকম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একটা কাহিনী আছে, একটা গ্রামে এক অন্ধ ছেলে রোজ পাহাড়ে মেষ চড়াতে নিয়ে যায়। মেষগুলোর আওয়াজে ছেলেটি পাহাড়ের পুরো রাস্থাটাকে জানে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এক দল সৈন্যকে ওই রকম একটা পথ দিয়ে নিয়ে যেতে হবে, কিন্তু কেউ ওখানকার রাস্থাঘাটের ব্যাপারে কিছু জানে না। ছেলেটির বাবা কোন ভাবে সৈন্য বাহিনীর সাথে যুক্ত ছিল। ছেলেটির বাবা গিয়ে বলল, ‘আমার ছেলে ওদিকে মেষ চড়াতে নিয়ে যায়, ও নিশ্চয় রাস্থাঘাটের ব্যাপারে জানতে পারে’। ছেলেটিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলা হলে, সে রাজী হয়ে যায়। এরপর শুধু ওর কানের জোরে এমন পথ দিয়ে সৈন্য দলকে নিয়ে যাচ্ছে দেখে বাবা ঘাবড়ে গিয়ে বলছে, ‘বাবা তুমি রোজ এই রকম জায়গায় মেষ চড়াতে আসো? আমি আগে জানলে তোমাকে এত দূর আসতে দিতাম না’। ছেলেটি মনে মনে বলে যাচ্ছে, ‘বাবা আমি জীবনে এতটা দূরে কোন দিন আসিনি; এখন শুধু আমার কানের জোরে আমি এই রাস্থাটা বার করছি তোমরা যাতে পুরো পথটা পার করে দুষমনদের ঘাঁটি পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারো’। কাহিনীটা খুব দাগ কাটে। একদিকে বাবা আতঙ্কিত যে, আমার অন্ধ ছেলে এই রকম দুর্গম জায়গায় কি করে রোজ মেষ চড়াতে আসে! ছেলেটিও জানে সে কোন দিন এখানে আসেনি, কিন্তু ভাণ করে যাচ্ছে যে সে এখান দিয়ে নিয়মিত যাতায়াত করে, তা নাহলে বাকিরা আসতেই চাইবে না। সেনা বাহিনীর লোকেরা ভাবছে, অন্ধ ছেলেটি রোজ এই রকম জায়গা দিয়ে চলাচল করে, সেটা দেখে তারাও সাহস পাচ্ছে। ঠিক তেমনি যদি কুয়াসা থাকে, অন্ধ লোক আরামসে চলে যাবে, কিন্তু আমাদের কাছে সমস্যা হবে।

এখানে প্রথম লাইনটা গুরুত্বপূর্ণ, The power of the mind is the same whether we divide it into five senses or whether we see only one, একটু আগে বলা হল, ব্রেনের আশি শতাংশ চোখ নিয়ে নেয়, সেখান থেকে সোজা দশ শতাংশে চলে আসে, যেটা কান নিয়ে নেয়, চোখ আর কানের মধ্যে এতটা তফাৎ। বাকিগুলি কোনটা দুই শতাংশ, কোনটা এক শতাংশ করে নেয়। সেইজন্য যারা অন্ধ হয়, তাদের কান বা ত্বকের সাংঘাতিক শক্তি বেড়ে যায়। স্বামীজী এখানে তিনি তাঁর observation দিয়ে বলছেন। কারণ তখনও পর্যন্ত এর কোন scientific ব্যাখ্যা ছিল না। বিদেশীরাও, যারা পড়াশোনা করেছেন, তারা এটা থিয়োরেটিক্যালি জানতেন, এমনিতেও সবাই জানে যে যারা চোখে দেখতে পায় না, তাদের অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলি খুব শক্তিশালী হয়। ইদানিং কালে ওনারা এর পুরো মেকানিজিমটাকে বার করে নিয়েছেন, আমাদের ব্রেনে নিওরোনসগুলি এমন ভাবে সজানো রয়েছে যে, যদি কোন ইন্দ্রিয় না থাকে, বা ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার যদি না করা হয়, তখন ব্রেনের যে অংশটা ওই ইন্দ্রিয়ের জন্য রাখা আছে, সেই অংশটা পাশের ইন্দ্রিয়গুলি টেনে নেয়। যেমন রমণ সুখে মানুষ সব থেকে বেশি সুখ পায়; এবার যদি ব্রহ্মচর্য পালন করা হয়, তখন আস্তে আস্তে ব্রেনের ওই অংশটা ডেড হয়ে যাবে। তখন ওই অংশটা অন্য ইন্দ্রিয়গুলি টেনে নেবে। যেখানে আশি আর কুড়ির তফাৎ, আশি শতাংশ একটা ইন্দ্রিয় নিয়ে নিচ্ছে। যদি কানকেও বাদ দিয়ে দেওয়া হয়, আসলে ওটা হয় তিরাশি আর দশ, মানে তিরানব্বই শতাংশ বেরিয়ে যাচ্ছে। চোখ আর কান বাদে বাকি ইন্দ্রিয়গুলোর জন্য থাকছে মাত্র সাত শতাংশ। সেইজন্য নাক, জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করলে ব্রেন প্রসেসিংএ বিরাট কিছু কন্ট্রোল হয় না। ঠাকুর বলছেন, ভবনাথ পান, মাছ ত্যাগ করেছে, তাতে হলোটা কি! আসলে নিওরো বিজ্ঞানের দিক থেকে ভবনাথ আহামরি কিছু করে ফেলেনি। কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগটাই আসল ত্যাগ, এখানে এসে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, সত্যিই এই রকমই হয়। জলের ট্যাঙ্ক একটাই, ওই ট্যাঙ্কে আমি পাঁচটা ট্যাপই লাগাই আর একটা ট্যাপই লাগিয়ে থাকি, জল অতটাই বেরোবে। বেশি ট্যাপ লাগালে বেশি জল বেরোবে না, কম ট্যাপ লাগালে কম জল বেরোবে না। তবে চারটে ট্যাপ বন্ধ করলে একটা ট্যাপ দিয়ে বেশি জোরে জল বেরোবে। এই উপমাটা ব্রেনের সাথে ঠিক ঠিক মিলে যায়। ব্রেনের মধ্যে যে মনঃশক্তি রয়েছে,

ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে সেই শক্তি বাইরে এসে সব কিছুকে ধরে। চারটে ইন্দ্রিয়কে যদি বন্ধ করে দেওয়া হয়, তখন ওই শক্তি একটার মধ্য দিয়ে যাবে। এখান পর্যন্ত চলল সাইকলোজি আর নিওরোলজি। এরপর স্বামীজী চলে আসছেন আসল কাজ যেটা করতে হবে, তাতে।

Control the mind, cut off the senses, they you are a Yogi; after that, all the rest will come. (*মনকে সংযত কর, ইন্দ্রিয়গুলিকে নিরোধ কর, তা হলেই তুমি যোগী; তারপর বাকি যা কিছু হওয়ার, সব হবে।*) যোগী হতে গেলে তোমাকে কি করতে হবে? মনরূপী জলের ট্যাঙ্ক আছে, ট্যাঙ্কের সাথে ইন্দ্রিয়রূপী পাঁচটা ট্যাপস্ লাগানো আছে। তোমাকে কি করতে হবে? প্রথমে পাঁচটা ট্যাপসকে বন্ধ করে দাও। এরপর জলের জায়গায় জল থাকবে, কোথাও লিকেজ নেই, মন মনের মধ্যে থাকবে। ইন্দ্রিয় জিনিসটাই খুব জটিল, আমরা আগেও আলোচনা করেছি। পাঁচটা ইন্দ্রিয় দেয় শুধু ইনপুটস, বাইরে থেকে সব জিনিস এনে ভিতরে জড়ো করছে। সেগুলিকে নিয়ে আমাদের কোন সমস্যা হয় না, সমস্যা হয় মন যখন ওগুলোর সাথে জড়িয়ে পড়ে। মন যেই জড়িয়ে গেল, মন তখন প্রতিক্রিয়া দেয়, মন দুই রকম প্রতিক্রিয়া করে। একটা ভিতরে ভিতরে ফোঁসফাস করে, আর দ্বিতীয় করে, বাকি যে পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়গুলো আছে সেখান দিয়ে বেরোতে শুরু করে। একটা কিছু মন্দ কথা বলল, চট্ করে সে অমনি তার গালে একটা চড় মেরে দিল। কথাটা ঢুকল কান দিয়ে, বেরিয়ে এলো হাত দিয়ে বা মুখ দিয়ে একটা পাল্টা কোন খারাপ কথা বেরিয়ে আসবে।

আর যদি ক্ষমতাবান লোক হয়, ভিতরে রাগটা পুষে রাখল, পুষতে পুষতে দেখা গেল তার কোন মানসিক বিকার থেকে নানান রকম রোগ হতে শুরু হয়ে গেল, প্রথমে হয়ত চর্ম রোগ দিয়ে শুরু করল, তারপর এক এক করে ডায়বেটিকস হয়ে গেল, হার্টের সমস্যা দেখা গেল, আর এগুলো যদি না হয়ে আরও যদি খারাপ হওয়ার থাকে, তাহলে মাথাটি খারাপ হয়ে গেল। যারা সৌভাগ্যবান, তাদের চর্মরোগাদি দিয়ে বেরিয়ে যায়, আরও যারা কম সৌভাগ্যবান তাদের হার্টের রোগ হয়ে যায়। আর ভাগ্য যদি খুবই খারাপ থাকে, মাথাটা পুরোপুরি খারাপ হয়ে যাবে। সেইজন্য নিয়ন্ত্রণের দরকার আছে, কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু নিয়ন্ত্রণের বাইরে একটু যদি না ছাড়া হয়, তাহলে এই ধরণের বিপদ ডেকে নিয়ে আসবে। তাহলে কি যার উপর রেগে যাবো, তাকে আচ্ছা করে কয়েকটা কথা শুনিয়ে দেব? তা কেন করতে হবে, অনেক উপায় আছে। একটা কাগজে তার নামে খুব করে গালাগালি লিখে, দুবার পড়ার পর ছিঁড়ে ফেলে দিন। এরপর মাথাটা শান্ত হয়ে যাবে। মাথার মধ্যে পুঁজ জমতে দিতে নেই। মাথায় যদি পুঁজ জমেছে, ওই পুঁজ তাকে শেষ করে দেবে। যার জন্য দেখা যায়, যাঁরা লেখালেখি করেন, কবি, সাহিত্যিক, এনারা খুব শান্ত প্রকৃতির হন। কারণ লেখালেখিতে ওনাদের ইমোশানগুলি বেরিয়ে যায়।

এরপর বলছেন, Refuse to hear, to see, to smell, to taste; take away the mental power from the external organs. (*শোনা, দেখা, ঘ্রাণ বা স্বাদ নেওয়া থেকে বিরত হও; বহিরিন্দ্রিয়গুলি থেকে মনঃশক্তিকে সরিয়ে নাও।*) ট্যাপ দিয়ে যে জলের ট্যাঙ্ক থেকে জল বেরিয়ে যাচ্ছে, এই ট্যাপগুলিকে আগে বন্ধ কর। You continually do it unconsciously as when your mind is absorbed; so you can learn to do it consciously. (*তুমি তো অজ্ঞাতসারে এটি সদাসর্বদাই করছ – যেমন যখন তোমার মন কোন বিষয়ে মগ্ন থাকে; সুতরাং তুমি জ্ঞাতসারেও এটি করবার অভ্যাস করতে পারবে।*) শুধু এই একটি কথা বলার জন্য স্বামীজী এত কথা বললেন। স্বামীজী বলতে চাইছেন, উদ্দেশ্য হল যোগী হওয়া; তুমি যদি যোগী হতে চাও তাহলে তোমার ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ কর। মন তার শক্তি হয় সে নিজের মধ্যে রেখে দেবে, আর তা নাহলে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বার করে দেবে। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় মনকে যত দেয়, সেটাই আবার পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে বেরোতে থাকে। যোগী যদি হতে চাও, তাহলে এই ইন্দ্রিয়গুলি দিয়ে মনের শক্তি বেরিয়ে যাওয়াকে বন্ধ কর। বললেই তো ইন্দ্রিয় বন্ধ হয়ে যাবে না। কিন্তু তারপরেই স্বামীজী বলছেন, অজ্ঞাতসারে তুমি কিন্তু সদাসর্বদা এটাই করছ। এটাকেই এবার তুমি জ্ঞাতসারে কর। টিভিতে ভারত-পাকিস্থানের ওয়ান-ডে ক্রিকেট ম্যাচ দেখাচ্ছে। টিভির সামনে সবাই হুমড়ি খেয়ে বসে বসে দেখে যাচ্ছে, কোন দিকে হুঁশ নেই, খেলার মধ্যে এমন মন ডুবে গেছে যে, বাকি সব ইন্দ্রিয়গুলি ডেড হয়ে গেছে। খুব আপনজন বা কোন সম্মানীয় ব্যক্তি সেই সময় এসে গেলে ভিতরে ভিতরে বিরক্ত অনুভব করবে। যাঁরা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের

রসিক, যখন কোন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শুনতে বসবেন, একটু শুনতে শুনতেই তাঁর চোখ দুটো বন্ধ হয়ে যাবে। সেই সময় গায়ে মশা বসলেও কোন হুঁশ থাকবে না। যাঁরা খুব গভীর ভাবে পড়াশোনা করেন, চিন্তন করেন, বিজ্ঞানীরা যখন ল্যাবরটরিতে কোন একটা পরীক্ষাকে নিয়ে ভেবে যেতে থাকেন, তখন তাঁদের জগতের ব্যাপারে কোন হুঁশ থাকে না। নিউটনের নামে কাহিনী আছে যে, একদিন কোন একটা বিষয়কে নিয়ে তিনি এমন চিন্তায় ডুবে ছিলেন যে, ডিম বয়েল করতে গিয়ে নিজের ঘড়িটাই গরম জলে ফেলে দিয়েছেন।

তার মানে অজ্ঞাতসারে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ আমরা সব সময়ই করছি। কোন মানুষ নেই যে, দিনে কখন না কখন কিছুক্ষণের জন্য মনকে একটা জায়গাতে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেয়, যেখানে তখন একটাই ইন্দ্রিয় কাজ করে, কিংবা পাঁচটা ইন্দ্রিয়ই বন্ধ হয়ে যায়। যাঁরাই চিন্তনের জগতে বিচরণ করেন, তাঁদের পাঁচটা ইন্দ্রিয়ই ডেড হয়ে যায়। কিন্তু এটা অজ্ঞাতসারে হচ্ছে। ঘুমোবার সময় আমাদের পাঁচটা ইন্দ্রিয়ই বন্ধ হয়ে যায়, শুধু ব্রেন কাজ করে। সারাদিনে ব্রেন কোন সময় সব থেকে বেশি সক্রিয় থাকে? মানুষ যখন ঘুমোয়। সারাদিনে ব্রেনে যত আবর্জনা এসেছে, ঘুমের সময় ব্রেন সব পরিষ্কার করতে থাকে। সেইজন্য সাধু সন্ন্যাসীদের বাইরে, যাঁরা প্রচুর জপধ্যান করেন, তাঁদের ছাড়া বাকি সবাইকে কম করে সাত থেকে আট ঘন্টা ঘুমনোর দরকার, তা নাহলে ব্রেনের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। কারণ সারাদিনের আবর্জনাগুলিকে তাকে পরিষ্কার করতে হবে। ঠাকুর বলছেন, মানুষ ঘুমিয়ে থাকলে কুকুর এসে মুখে প্রস্বাব করে দিলে সে বুঝতেও পারে না, তার আবার এত অহঙ্কার। সব ইন্দ্রিয়গুলো বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু এটা হচ্ছে অজ্ঞাতসারে। এবারে তোমাকে এই জিনিসটাই জ্ঞাতসারে করতে হবে। যার বসে বসে পা নাড়তে থাকে, অনবরত পা নাচিয়েই যাচ্ছে, এটা সে অজ্ঞাতসারে করছে। ওকে যদি বলা হয়, ভাই তুমি গুণে গুণে পা'টা নাচাও তো। দু মিনিটের মধ্যেই বেচারি হাঁপিয়ে উঠবে। যে কোন কাজ সচেতন ভাবে করতে গেলে দম বেড়িয়ে যাবে। মানুষ যে জিনিসটা দেখতে ভালবাসে, কেউ গঙ্গানদী দেখতে ভালবাসে, অজ্ঞাতসারে অনেকক্ষণ দেখেই যাচ্ছে, বুঝতেও পারবে না কত সময় চলে গেল। হিমালয়ের সৌন্দর্য দেখে যাচ্ছি, কত সময় চলে গেল বুঝতেই পারব না। কিন্তু যেমনি বলা হল সচেতন ভাবে একাগ্র মনে আধ ঘন্টা ঠাকুরের ধ্যান করতে হবে। তখন পাঁচ মিনিট না যেতে যেতেই মনে হবে, বাবাঃ সবে পাঁচ মিনিট, আমি ভাবলাম কুড়ি মিনিট হয়ে গেছে। এটা আমাদের নিত্যকার ব্যাপার। অজ্ঞাতসারে কোন কিছুই মনে হবে না, কিন্তু জ্ঞাতসারে করতে গেলেই দম বেরিয়ে যাবে।

কিন্তু সাধনা যখন শুরু হবে তখন নিজেকে সচেতন ভাবেই তা করতে হবে, জ্ঞাতসারে করতে করতে একটা সময় ওটাই ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে যায়। সাধনাটাই গুরুত্বপূর্ণ; যোগ সাধনা, জপধ্যান, তপস্যা, এই জিনিসগুলোই হল কিভাবে ইন্দ্রিয় আর মনের যে বিবাহ হয়ে আছে, মন আর ইন্দ্রিয়ের বিবাহ বিচ্ছেদ করিয়ে দেওয়া। কিভাবে? নিজের ইচ্ছাশক্তি দিয়ে বলতে হবে, মনকে আমি তুলে নিলাম। কোন ছেলে যেমন তার পুরনো প্রেয়সীকে বলে, আমি তোমার থেকে আমার মন তুলে নিয়েছি; ঠিক তেমনি কানকে বলতে হয়, হে কান, তোমার কাছ থেকে আমার মন তুলে নিয়েছি। বাগবাজারে মায়ের বাড়ির নীচের তলার ঘরে বসে স্বামী সারদানন্দজী মহারাজ লীলাপ্রসঙ্গ লিখে যাচ্ছেন, অন্য দিকে উপরের ঘরে শ্রীশ্রীমা আছেন, সেখানে রাধু, মাকু, নলিনীদি এরা সবাই আছেন, ওরই মধ্যে ভক্তদের আসা যাওয়া চলছে, কত হৈ চৈ, এর কোন কিছুই মহারাজের লেখাতে বিঘ্ন করতে পারছে না। মহারাজ বলতেন, আমি কানকে বলে দিয়েছি, এগুলো কিছু শুনবে না। আমাদের এই ক্ষমতা এক দিনে হবে না, কিন্তু চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আমরা রেগে গেলে মুখে বলে দিই, তোমার থেকে মন আমি সরিয়ে নিয়েছি। কিন্তু যদি কেউ তার ইন্দ্রিয়গুলি থেকে মনকে একবার সরিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা পেয়ে যায়, তাহলে কোন দিন কাউকে তার মুখে বলে দিতে হবে না যে, তোমার থেকে আমার মন সরিয়ে নিচ্ছি।

The mind can put the senses where it pleases. (*মন যেখানে খুশি ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রয়োগ করতে পারে।*) বাস্তবিকই মনের এই ক্ষমতা আছে, মন যেখানে চাইবে সেখানেই ইন্দ্রিয়গুলিকে লাগাতে পারে। অনেকেই আছে, যারা সব জায়গায় বিফল হয়ে সাধুদের কাছে এসে বলে, একটা কিছু শিখিয়ে দিন যাতে মন যেখানে লাগাব সেখানেই যেন মন আঠার মত আটকে থাকে। যারা বোকা বানাতে চায়, তারা এই ধরণের মুর্খদের একটু প্রাণায়াম শিখিয়ে দিল, হাত পা নাড়া দেখিয়ে দিল। স্বামীজী বলছেন, Get rid of the

fundamental supersition that we are obliged to act through the body. We are not. (*দেহের সাহায্যেই যে আমাদের কাজ করতে হবে, এই মুল কুসংস্কারটি একেবারে ছেড়ে দাও। তা তো করতে হয় না।*) এটাই আমাদের সত্যিকারের সমস্যা, যতই আমরা যোগশাস্ত্র পড়ি না কেন, স্বামীজীর রচনাবলী সব পড়ে নিই না কেন, আমরা এই বিশ্বাস থেকে বেরিয়ে আসতে পারব না। এর আগে যেমন একটা বাক্যে বলা হয়েছিল যে, belive that God is true, ঠিক তেমনি, believe that your body is a superstition, হাজার হাজার কোটি কোটি জন্মে আমাদের এই বিশ্বাস জন্মে গেছে যে, আমাকে যা কিছু করতে হবে আমার এই দেহের মাধ্যমেই করতে পারব। এটাই আমাদের মূল কুসংস্কার। আমরা দেহ দিয়ে যা যা করছি, সবটাই আমরা মন দিয়েই করে দিতে পারি, যদিও ইন্দ্রিয় দিয়েও করা যায়। মনে করা যাক, একজন নামকরা গায়কের গান আমার খুব পছন্দ। আমি তার প্রোগ্রাম শুনতে যাব। উনি অমুক তারিখে এখানে ফাংশান করবেন, সাইনবোর্ড দেখলাম, টিকিট সংগ্রহ করলাম, এটুকু করেই ভিতর ভিতর আমার কত আনন্দ হচ্ছে। এবার প্রোগ্রামে গিয়ে গায়কের গান শুনলাম, আনন্দ পাওয়া গেল ঠিকই, কিন্তু ফাংসানে আসার আগে যে আনন্দটা ছিল, সেটা অনেক বেশি ছিল। ইঞ্জিকেশান দেওয়ার আগে আমাদের কী আতঙ্ক লাগে, বাচ্চারা তো ইঞ্জিকেশান দেওয়ার আগেই রীতিমত কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। এবার সিরিঞ্জের ছুঁচটা যেই ভিতরে ঢুকে গেল, তখন কিন্তু ব্যাথাটা অনেক কম হয়। উইলিয়ম জেমস্ খুব নামকরা লেখক, স্বামীজীর সাথেও তাঁর দেখা হয়েছিল। সাইকলোজির উপর তাঁর প্রচুর কাজ আছে, তাঁর একটা কথা আছে, Anticipation of pain or pleasure is more intense than actual pain or pleasure, আসলে এখানে ওনার থিয়োরীটা পুরো ভুল। কারণ মন দিয়ে যখন কোন ব্যাথা বা আনন্দের ভোগ করা হয় তখন সেটার তীব্রতা অনেক বেশি হবে, যখন ওটা শরীরের মাধ্যমে হয়, তখন সেই তীব্রতা থাকবে না। মন যখন আনন্দ পায়, বা ইন্দ্রিয় যখন নিজে থেকে আনন্দ পায়, তার intensity অনেক বেশি হবে। শরীর দিয়েও আসে ঠিকই, কিন্তু অতটা না। ঠিক তেমনি যে ক্ষমতাগুলি রয়েছে, এই যেমন আমি এই মাইক্রোফোনকে হাত দিয়ে সরালাম, হাত হল কর্মেন্দ্রিয়, এই কর্মেন্দ্রিয় এটাকে সরাচ্ছে। আসলে এই কাজটা মন নিজে সরাসরি হাত না লাগিয়ে করে দিতে পারে, মনের সেই ক্ষমতা আছে। যোগীরা ঠিক এই জিনিসটাই করেন। এ্যাডমণ্ড হিলারী যিনি এ্যভারেস্ট চূড়া প্রথম জয় করেছিলেন, তিনি সত্তর দশকে ভারতে এসে ঠিক করলেন, গঙ্গাসাগর থেকে হাই স্পীড বোটে গঙ্গোত্রী যাবেন। তিনি যাচ্ছেন, গঙ্গাসাগর থেকে গঙ্গোত্রী। গাজীপুরে সেই সময় একজন হঠযোগী ছিলেন। গাজীপুর দিয়ে যাওয়ার সময় হিলারী সাহেবের সাথে দেখা হয়েছে, হঠযোগী শুনে তিনি বলছেন, 'দেখি আপনার কেমন ক্ষমতা'। ওই হাই স্পীড বোটের সাথে একটা দড়ি বেঁধে সেই দড়ির অন্য প্রান্ত হঠযোগীর কোমড়ে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। হিলারী কিছুতেই বোটকে নাড়াতে পারলেন না, ইঞ্জিনটা শুধু গোঁ গোঁ করে যাচ্ছে, প্রপেলারও ঘুরে যাচ্ছে কিন্তু বোট এগোতে পারছে না। সে তো কোন বডিবিল্ডারও না, হঠযোগী, মনকে বলে দিয়েছে বোট নড়তে পারবে না, নড়ছে না। যে জিনিসগুলো আমরা শরীর দিয়ে করি, সবটাই সরাসরি মন দিয়ে করা যায়।

সব ধর্মগ্রন্থ তোমার ভিতরেই - বন্ধু মন ও শত্রু মন

স্বামীজী এবার বলছেন, Go into your own room and get the Upanishad out of your own Self. (*যাও নিজের ঘরে গিয়ে বসো, আর নিজের অন্তরাত্মার ভিতর থেকে উপনিষদের তত্ত্বগুলি আবিষ্কার কর।*) যোগ পর্যন্ত তাও এক রকম চলছিল, এরপর স্বামীজী আরও মারাত্মক কথা নিয়ে আসছেন, নিজের ঘরে যাও, দরজা বন্ধ কর, আর তোমার ভিতরে যে উপনিষদ আছে, সেটাকে বার কর। কঠোপনিষদ, কেনোপনিষদ, স্বামীজীর রচনাবলী, কথামৃত কিছু পড়তে হবে না, সমস্ত শাস্ত্র তা কথামৃতই হোক, বেদ উপনিষদই হোক সব তোমার ভিতরেই আছে; এই বইটাকে তোমার ভিতর থেকে বার কর। যে কোন ধর্মগ্রন্থ, তা যে ধর্মেরই গ্রন্থ হোক না কেন, আর যে ধর্ম যাই বলুক না কেন, সব ধর্মগ্রন্থ আমাদের ভিতরেই আছে। কারণ ধর্মগ্রন্থ মানেই তা কোন না কোন এক মানুষের শুদ্ধ মন থেকে বেরিয়েছে। যে কোন মানুষ যখন ভিতর থেকে শান্ত হয়ে যায়, শুদ্ধ হয়ে যায় তখন তাঁর কাছে সত্যটা স্পষ্ট হয়ে যায়। ওই সত্যটাই বেদ, ওই সত্যটাই উপনিষদ, ওই সত্যটাই অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ। স্বামীজী তাই বলছেন, তোমরা কত দিন আর অপরের উচ্ছিষ্ঠ খেয়ে যাবে, তোমার মনকে শুদ্ধ পবিত্র কর, তারপর দেখ সত্যটা কি। এবার তোমার নিজের উপনিষদ রচনা করো। বিচার বুদ্ধি দিয়ে না, নিজের ঘরে যাও, গিয়ে নিজের মনকে আগে শান্ত কর, আগে ইন্দ্রিয়গুলিকে ইন্দ্রিয়ের

বিষয় থেকে আলাদা করে দাও, তারপর মনকেও ইন্দ্রিয়গুলি থেকে আলাদা করে দাও এবং শেষে আত্মাকে মন থেকে আলাদা করো। তরপর এক এক করে নূতন নূতন উপনিষদ আসতে শুরু করবে। তাই বলে এই কথা শোনার পর কেউ গিয়ে কোন মহারাজকে যেন প্রশ্ন না করে, মহারাজ, আপনি কটি উপনিষদ রচনা করেছেন?

এরপর স্বামীজী বলছেন, You are the greatest book that ever was or ever will be, the infinite depository of all that is. (*তুমি সকল বিষয়ের অনন্ত খনি-স্বরূপ, ভূত-ভবিষ্যৎ সকল গ্রন্থের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।*) সমস্ত জ্ঞানের রাশি আমাদের মধ্যেই আছে। আমার থেকে ভাল গ্রন্থ আজ পর্যন্ত হয়নি, আমার থেকে ভাল বই জীবনে আর কোন দিন হবে না। কারণ আমরা হলাম সেই শুদ্ধ আত্মা। এখানে আমার জীবনকে বলা হচ্ছে না, জীবনটা কিছু না, আত্মা রূপে যে আমি, সেই 'আমি'র কথা বলা হচ্ছে, আত্মা রূপে আমি শ্রেষ্ঠ। ঠাকুর বলছেন, এখানকার অনুভূতি বেদ-বেদান্তকে ছাড়িয়ে গেছে। শুধু ঠাকুরের না, সবারই অনুভূতি বেদ-বেদান্তকে ছাড়িয়ে যাবে। ধ্যানের গভীরে যেই চলে যাবে, তখন সেখানে দেখবে সমস্ত শাস্ত্র পড়ে থেকে গেছে, তুমিই তখন শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রূপে থাকবে। এসব কথা শুনলে আমাদের অবাক লাগে।

আর বলছেন, Until the inner teacher opens, all outside treaching is in vain. It must lead to the opening of the book of the heart to have any value. (*যতদিন না সেই ভিতরে অন্তর্যামী গুরুর প্রকাশ হচ্ছে, ততদিন বাইরের উপদেশ সব বৃথা। বাইরের শিক্ষা দ্বারা যদি হৃদয়রূপ গ্রন্থ খুলে যায়, তবে তার কিছু মূল্য আছে বলা যেতে পারে।*) যত বই আছে, যত শাস্ত্র আছে, যে কোন গুরু, যে কোন আচার্য, এনাদের উদ্দেশ্য হল আমাদের জ্ঞানের যে দরজাটা বন্ধ হয়ে আছে, সেই বন্ধ দরজাকে খুলে দেওয়া। কঠোপনিষদে যমরাজ নচিকেতাকে তৃতীয় বরের বদলে কত কিছু দিতে চাইলেন, কিন্তু নচিকেতা যমরাজের সব কিছু প্রত্যাখ্যান করে দিলেন। তখন যমরাজ নচিকেতার প্রশংসা করতে গিয়ে বলছেন, *বিবৃতং সদ্ম নচিকেতসং মন্যে*, সেই অট্টালিকা, যেটা হল সমস্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার, আমি মনে করছি নচিকেতা জ্ঞান-ভাণ্ডারের সেই অট্টালিকার সিংহদুয়ারের কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেছে। যমরাজ এবার এক এক করে আত্মতত্ত্ব বলতে থাকবেন, আর নচিকেতার সব খুলতে থাকবে, নচিকেতা সেই জ্ঞানের সাথে এক হয়ে যাবে। সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত চিন্তন, সমস্ত আলোচনার উদ্দেশ্য হল ওই সিংহদুয়ার পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া। *যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি – ওমিত্যেতৎ*, সমস্ত সাধনা, সব কিছুর একটাই উদ্দেশ্য, ওঁ, সেই ঈশ্বর। আমি মনে করছি নচিকেতা সেইখানে পৌঁছে গেছে। ওই পর্যন্ত যদি না নিয়ে যায়, তাহলে সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়নই বৃথা। এবার এখান থেকে স্বামীজী নিয়ে আসছেন, মানুষের ভিতরে যে পাকা আমি আছে সেটা কিভাবে আত্মার সাথে এক, কাঁচা আমি কিভাবে মনের সাথে এক।

The will is the 'still small voice', the real Ruler who says 'do' and 'do not'. It has done all that binds us. The ignorant will leads to bondage, the knowing will can free us. (*আমাদের ইচ্ছাশক্তিই সেই ক্ষুদ্র মৃদু বাণী; সেই যথার্থ নিয়ন্তা, যে আমাদের বলছে – এই কাজ করো, এই কাজ করবে না। এই ইচ্ছাশক্তি আমাদের যত বন্ধনের মধ্যে এনেছে। অজ্ঞ ব্যক্তির ইচ্ছাশক্তি তাকে বন্ধনে ফেলে, আর সেইটাই জ্ঞানপূর্বক পরিচালিত হলে আমাদের মুক্তি দিতে পারে।*) কঠোপনিষদ আমাদের মনকে দুষ্ট অশ্ব আর সৎ অশ্বের সাথে তুলনা করছেন। মন আমাদের সবারই শত্রু আবার মনই আমাদের সবার মিত্র। মন বলে এটা করো, এটা করো না। মন যখন আমাদের মুক্তির দিকে নিয়ে যায়, তখন সেই মন আমাদের বন্ধু; আবার মন যখন বন্ধনের দিকে নিয়ে যায়, সেই মন তখন হয়ে যায় আমাদের শত্রু। মুক্তির দিকে নিয়ে যাওয়া মানেই হয়, মন যখন আরও বেশি আত্মচিন্তন, আরও বেশি ঈশ্বর চিন্তনের দিকে নিয়ে যায়। আজকে আমি যে বন্ধনের পড়ে আছি, আজকে যে আমার জীবনে এত শোক, তাপ, দুঃখ; সব আমার মনের জন্য, মনের বাইরে কিছু নেই।

The will can be made strong in thousands of ways; every way is a kind of Yoga, but the systematized Yoga accomplishes the work more quickly. Bakti, Karma, Raja, and JnanaYoga get over the ground more effectively. (*ইচ্ছাশক্তিকে হাজার হাজার রকম উপায়ে দৃঢ় করা যেতে পারে, প্রত্যেক উপায়ই এক এক প্রকার যোগ। তবে প্রণালীবদ্ধ যোগের*

দ্বারা এটা খুব শীঘ্র সাধিত হতে পারে। ভক্তিযোগ, কর্মযোগ, রাজযোগ ও জ্ঞানযোগের দ্বারা খুব নিশ্চিত রূপে কৃতকার্য হওয়া যায়।) এখানেও সেই একই জিনিসকে নিয়ে আলোচনা চলছে, আমাদের মন রয়েছে, ইন্দ্রিয় আছে আর জগৎ আছে। প্রথমে জগৎকে ছাড়ো, তারপর ইন্দ্রিয়গুলিকে ছাড়ো, এরপর মনের উপর দৃষ্টি দাও। মন কখন বন্ধুর মত আচরণ করবে, কখন শত্রুর মত আচরণ করবে; মন কখন আমাদের জগতের দিকে নিয়ে যাবে, কখন ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যাবে। ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য মনকে শক্তিশালী তৈরী করতে হবে। কঠোপনিষদের মন্ত্রে বলছেন, *কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদ্ আবৃতচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্*, যদি তুমি ঈশ্বরের দিকে যেতে চাও তাহলে আগে ইন্দ্রিয়গুলিকে আবৃত কর। চাইলেই তুমি ইন্দ্রিয়কে আবৃত করতে পারবে না, কারণ তার আগেই বলছেন, *কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদ্*, কোন কোন ধীর বিবেকী বীর পুরুষ পরম জ্ঞানের বা মুক্তির অভিলাষী হয়ে বলেন, আমি আমার ইন্দ্রিয়গুলোকে আবৃত করে দেব। গঙ্গার স্বাভাবিক গতি হল, গঙ্গোত্রী থেকে সে সাগরের দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলা, কিন্তু গঙ্গাসাগর থেকে যে জলকণা গঙ্গোত্রীর দিকে যাত্রা শুরু করে, সে হল ধীর, তার জোর আছে, বুকের পাটা আছে, আঁট আছে। যারা ঢিমে তেতালা, হচ্ছে হবে, গয়ংগচ্ছ ভাব, এরা ধীর পুরুষ না। মনকে শক্ত করা, মনের শক্তি বৃদ্ধির অনেকগুলো উপায় আছে, আর যেটাই উপায়, সেটাই যোগ। হাজার হাজার রকম উপায় আছে। কিন্তু প্রণালীবদ্ধ ভাবে যদি করা হয়, তবে তার শীঘ্র ফল লাভ হবে।

এখান থেকে স্বামীজী কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি ও যোগের কথা বলতে শুরু করলেন। এই চারটে যোগই যে আছে তা না, আমাদের শাস্ত্রে আরও অনেক যোগের কথা আছে, তবে এই চারটেই প্রধান আর খুব প্রণালীবদ্ধ। Put on all powers, philosophy, work, prayer, meditation; crowd all sail, put on all head of steam, reach the goal. The sooner, the better. (*মুক্তিলাভের জন্য তোমার যত প্রকার শক্তি আছে, সব প্রয়োগ কর; জ্ঞানবিচার, কর্ম, উপাসনা, ধ্যান – সব পথই অবলম্বন কর, সব পাল এক সঙ্গে তুলে দাও, সব কলগুলি পুরদমে চালাও, আর গন্তব্যস্থানে উপনীত হও। যত শীঘ্র পারো, ততই ভাল।*) পালতোলা নৌকাগুলো যেমন সব পাল তুলে দিয়ে হাওয়ার টানে তর্ তর্ করে এগিয়ে যায়, তুমিও একসাথে তোমার সব পাল তুলে দাও। স্টীম ইঞ্জিনের পুরো স্টীম খুলে দিয়ে প্রেসার তৈরী করে দাও। মূল লক্ষ্য হল যত তাড়াতাড়ি পারো এগিয়ে যাও, যত তাড়াতাড়ি যেতে পারবে, তত তোমার শান্তি। কঠোপনিষদের পর স্বামীজী খ্রীশ্চানিটির দুটো ট্রাডিশান, ব্যাপ্টিজম্ আর ইউক্যারিস্টকে নিয়ে আলোচনা করছেন, খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়।

ব্যাপ্টিজিম সংস্কার

Baptism is external purification symbolizing the internal. It is of Buddhist origin. (*খ্রীষ্টানদের ব্যাপ্টিজম্ সংস্কার একটা বাহ্যশুদ্ধি-স্বরূপ – এটি অন্তঃশুদ্ধির প্রতীক। বৌদ্ধধর্ম থেকে এর উৎপত্তি।*) স্বামীজী এই কথা কেন বলেছেন আমাদের জানা নেই, কারণ ব্যাপ্টিজম্ প্রথা বৌদ্ধদের অনেক আগে থেকেই জহুদিদের মধ্যে আছে। স্বামীজী কেন বলছেন জানা নেই। এব্রাহাম্ ছিলেন মোটামুটি ২০০০ বিসি, অর্থাৎ ভগবান বুদ্ধের প্রায় পনেরশ বছর আগে। এব্রাহামের সময় থেকেই ব্যপ্টিজম্ প্রথা হয়ে আসছিল, ওনার নিজের যাঁরা ছিলেন, তাঁরা সবাই এক ঈশ্বর জেহোবাকে মানতে শুরু করলেন। পরের দিকে অন্যান্য যেসব উপজাতিরা ছিল, তাদেরকেও যখন তাঁরা জুহুদি ধর্মে নিয়ে আসতে শুরু করলেন, তখন তাঁরা ভাবলেন, এদের কিভাবে জুহুদি করা হবে? তখন ঠিক হল শুদ্ধিকরণ করে। পবিত্র জল ছিটিয়ে তাদের শুদ্ধিকরণ করা হত। পরের দিকে এসে এটাই একটা উপাচার হয়ে দাঁড়ায়। আর খুব নামকরা কথা, জন দা ব্যাপ্টিস্ট যীশুকে জর্ডন নদীর জল দিয়ে ব্যাপ্টাইজ্ করলেন। সেখান থেকে এরা সবাই যখন খ্রীশ্চান হয়ে গেলেন, তখন থেকে এই ব্যাপ্টিজম্ প্রথা আরও জোর হয়ে গেল। এখন কোন খ্রীশ্চান পরিবারে কোন শিশুর জন্ম হলে, চার্চে নিয়ে গিয়ে তার ব্যাপ্টিজম্ হয়, তোমার সমস্ত পাপ ধুয়ে গেল। এখন এই প্রথাগুলো কোন কোন ট্রাডিশানস থেকে আসে, সত্যিই বলা খুব মুশকিল। আর জন দা ব্যাপ্টিস্ট যখন যীশুকে ব্যাপ্টিজম্ করেছিলেন তখন তাঁরা ভগবান বুদ্ধের কথা আদৌ জানতেন কিনা সন্দেহ। স্বামীজী হয়ত তখনকার কোন বই পড়ে থাকতে পারেন, নিজেও কিছু অবজার্ভ করে এই কথা বলেছিলেন কিনা বলা মুশকিল।

ইউক্যারিস্ট হল, ভগবান যীশুকে ক্রুশিফাইড করার আগে শিষ্যরা মিলে সবাই খাওয়া-দাওয়া করেছিলেন। তখন উনি বলেছিলেন, তোমাদের ওই ব্রেড আমার শরীর আর ওয়াইন হল আমার রক্ত, এই ব্রেড আর ওয়াইন তোমাদের একসূত্রে বেঁধে রাখবে। এই জিনিসটাকে প্রতীক করে খ্রীশ্চানরা এখনও পর্যন্ত চার্চে ইউক্যারিস্টের প্রসাদ রূপে ব্রেডের টুকরো আর ওয়াইন পান করে। তার মানে যীশুর শরীর আর যীশুর রক্ত তোমার শরীরের ভিতরে ঢুকে গেল। স্বামীজী এটাকে আদিবাসীদের একটা প্রথা বলছেন, যেখানে আদিবাসীরা তাদের প্রধান নেতা মারা গেলে তাকে কেটে খেয়ে নিত, এতে নেতার শক্তি তাদের মধ্যে চলে আসত। স্বামীজীর সময়ে এই ধরণের অনেক বই, প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। বিদেশীরা যথারীতি সবজান্তা, সব কিছুর ব্যাখ্যা তাদের কাছে আছে। এমনকি স্বামীজী এক জায়গায় নিন্দা করছেন, মা যখন শিশুকে চুম্বন করে, পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের কাছে আসলে এটা ক্যানিবাল ইনস্টিংট, মানুষ মানুষকে যেমন খায়, ওটাও যেন টেস্ট করে দেখছে তোমার টেস্ট কেমন খাওয়ার জন্য। কিন্তু খাওয়াটা আর হয় না, টেস্টটা করে নেয়। স্বামীজী বলছেন, কোথা থেকে যে এরা এই উদ্ভট থিয়োরী গুলি নিয়ে আসে। বিদেশীরা এই রকম বিচিত্র বিচিত্র সব থিয়োরী নিয়ে আসে। স্বামীজী অনেক সময় এগুলোকে নিয়ে কিছু বলেছেন, আমরা আর এর মধ্যে যাচ্ছি না।

যেটাই আমি করব, সেটাই আমার স্বভাব

এরপর স্বামীজী বলছেন, Say, ‘it is my nature’, never say, ‘it is my duty’ – to do anything whatever. (*কোন কাজ করবার সময় বলো না, ‘এটা আমার কর্তব্য’; বরং বলো ‘এটা আমার স্বভাব’।*) কখনই কোন কাজকে কর্তব্য নেওয়া যাবে না। আমরা এটার উপর অনেকবার আলোচনা করেছি। *কর্মণ্যেবাধিকারেস্তু মা ফলেষু কদাচন*, আমি কেন এটা করছি? এটাই আমার স্বভাব। কর্তব্য রূপে আমি কখনই করছি না, এটাই আমার স্বভাব। আমাদের আলোচনায় অনেকবার বিদ্যা, সম্পদ, সেবা ও ত্যাগ এই চারটে আদর্শের উপর অনেক কথা বলা হয়েছে। এগুলো কেন আমি করব? কারণ এটাই আমার স্বভাব। নদীর কোন কর্তব্য নেই, বৃক্ষের কোন কর্তব্য নেই। গ্রাম, শহর, বনাঞ্চলের মাঝখান দিয়ে নদী নিজের স্বভাবে সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়ে যায়। বৃক্ষ তার স্বভাব বশতঃ ফুল, ফল, পাতা, ছায়া দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা যখন কোন কাজ করি, কেউ যদি জিজ্ঞেস করে কেন আপনি এই কাজ করছেন? কেন, এই কাজ করাটা আমার কর্তব্য তাই করছি। কত কিছুর প্রতি আমাদের কর্তব্য, নিজের প্রতি কর্তব্য, পরিবারের প্রতি কর্তব্য, সমাজের প্রতি কর্তব্য, দেশের প্রতি কর্তব্য, ভগবানের প্রতি কর্তব্য। কিন্তু তা নয়, যেটাই আমরা করব, সেটাই আমার স্বভাব, এটাই আমি। আমি কেন ভাল হব? বাবা-মা বলে দিয়েছে ভাল হতে, তাই আমাকে ভাল হতে হবে। কিন্তু তা নয়, ভাল হওয়াটাই আমার প্রকৃতি। গান্ধীজী কেন সত্য অহিংসা পালন করছেন? এটা তাঁর স্বভাব। তিনি কোন দেশের প্রতি, জাতির প্রতি কর্তব্য রূপে সত্য অহিংসার পালন করছেন না। যতক্ষণ একটা গুণ আমাদের স্বভাব না হয়ে যায়, ততক্ষণ জীবনে আমরা উপরের দিকে যেতে পারব না। এরপর স্বামীজী সত্যকে নিয়ে বলছেন।

Truth alone triumphs, not untruth.’ Stand upon Truth, and you have got God. (*সত্যমেব জয়তে নানৃতম, - সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার হয় না। সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হও, তা হলে তুমি ভগবানকে লাভ করবে।*) তুমি কি ভগবানকে পেতে চাও? সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও তাহলেই তুমি ভগবানকে পেয়ে যাবে। স্বামীজী পরের প্যারাগ্রাফে ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণদের নিয়ে বলছেন। স্বামীজী ব্রাহ্মণদের প্রচুর সম্মান করতেন, কারণ ব্রাহ্মণরাই ত্যাগ তপস্যার দ্বারা জাতির সংস্কৃতি ও ধর্মকে রক্ষা করে রেখেছিলেন। কিন্তু পরে পরে যখন ব্রাহ্মণরা জিনিসগুলিকে ঠিকমত ধরে রাখতে পারলেন না, অন্য দিকে সব রকম সুবিধাগুলো পুরোদমে নিতে ছাড়লেন না, তখন স্বামীজী খুব বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলেন।

ব্রাহ্মণ্যবর্গদের সম্বন্ধে স্বামীজীর চিন্তা-ভাবনা

সেটাকে নিয়েই স্বামীজী বলছেন, From the earliest times in India the Brahmin caste have held themselves beyond all law, they claim to be gods. They are poor, but their weakness is that they seek power, (*অতি প্রাচীনকাল থেকে ভারতে ব্রাহ্মণজাতি নিজেদের সমস্ত বিধিনিষেধের অতীত বলে ঘোষণা করেছেন, তাঁরা নিজেদের ভূদেব বলে দাবী করেন। ভারতে ব্রাহ্মণরা*

খুব দরিদ্র ভাবে জীবন যাপন করতেন। তবে তাঁদের দোষ যে, তাঁরা আধিপত্য ও প্রভূত্ব খোঁজেন)। ভারতের ব্রাহ্মণদের নিয়ে স্বামীজী একটা কথা সব সময় বলতেন, ব্রাহ্মণরা খুব দরিদ্র ভাবে জীবন যাপন করতেন। মনুস্মৃতি আদি গ্রন্থে বলেই দিয়েছেন, ব্রাহ্মণদের কাছে যদি টাকা থাকে, সেই ব্রাহ্মণকে বিশ্বাস করবে না। ত্যাগীদের একটা সমস্যা থাকে, ত্যাগীরা প্রচণ্ড ক্ষমতাপ্রিয় হয়ে যায়। যার জন্য ঠাকুরও বলছেন, সাধু সব ত্যাগ করে কিন্তু সাধুত্বের যে অহঙ্কার, ওটা ত্যাগ করতে পারে না। সাধুত্বের অহঙ্কার মানে, লোকেরা আমাকে মানুক যে, আমি সবার উপরে। এরা খুব তাই প্রচণ্ড ক্ষমতাকাঙ্খী হয়। ব্রাহ্মণদের এই সমস্যাটা ছিল। এই সমস্যা এখনও আছে, যে ব্রাহ্মণের একটু বিদ্যা আছে, সমাজে তারা মনে করে আমি মহান। একদিকে গরীব, অন্য দিকে ক্ষমতার লোভ।

স্বামীজী বলছেন, Here about sixty millions of peole who are good and moral and hold no property, and they are what they are because from their birth they are taught that they are above law, above punishment, (*সেই সময় ভারতে প্রায় ছয় কোটি ব্রাহ্মণের বাস। তাঁদের কোন প্রকার বিষয়-আশয় নেই, তাঁরা সবাই ভাল লোক, নীতিপরায়ণ। তার কারণ হল, বাল্যকাল থেকেই তাঁরা শিক্ষা পেয়ে আসছেন যে, তাঁরা বিধিনিষেধের অতীত, তাঁদের কোন প্রকার শাস্তির বিধান নেই।)* স্বামীজীর সময়ে ভারতে ব্রাহ্মণদের সংখ্যা প্রায় ছ-কোটি ছিল। এরা সবাই ভাল, এদের সব গুণ আছে, কিন্তু মনে করে আমরা সব কিছুর ঊর্ধ্বে, আমাদের কেউ ছুঁতে পারে না। যার জন্য দেখা যায়, পরের দিকে যত স্মৃতিশাস্ত্র রচিত হয়েছে, সেখানে ব্রাহ্মণদের বেশি শাস্তি দেওয়ার বিধান দেওয়া হয়নি। আমরা ওর মধ্যে যাচ্ছি না, কারণ ওটা পুরো আলাদা একটা বিষয়। সেইজন্য স্বামীজী বলছেন, They feel themselves to be 'twice-born', to be sons of God, (*তাঁরা নিজেদের 'দ্বিজ' বা ঈশ্বরতনয় জ্ঞান করে থাকেন*)। যে কোন ধর্মের সংস্কৃতি যদি খুব উন্নত হয়ে ওঠে, তখন ওদের কোন শিশুর জন্ম হলে ওরা মনে করে শিশু এখন অশুদ্ধ। শিশুকে শুদ্ধ করার জন্য কিছু পূজা ও উপাচারের অনুষ্ঠান করা হয়, যার মাধ্যমে তাকে ঈশ্বরের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়। খ্রীশ্চানদের মধ্যে যেমন ব্যাপটিজম্ আছে, ঠিক তেমনি ব্রাহ্মণদের সন্তানের যজ্ঞ উপবীত হয়ে যাওয়ার পর মনে করা হত, এবার সে ঈশ্বরের সাথে জুড়ে গেল। এটা স্বামীজী কথা প্রসঙ্গে উল্লেখ করছেন এবং ২৭শে জুলাইয়ের ক্লাশ এখানেই শেষ হয় যায়।

রবিবার, ২৮শে জুলাই

প্রসঙ্গঃ অবধূত গীতা

স্বামীজী এই দিন অবধূত গীতার উপর আলোচনা করছেন। অবধূত গীতা রূপে আমরা যে গ্রন্থকে জানি, এটাই ভাগবতে অবধূত প্রসঙ্গ নামে উল্লেখিত হয়েছে। অবধূত প্রসঙ্গে অবধূতের কাহিনীগুলি আছে আর তার সাথে সেখানে অবধূতের চব্বিশ গুরুর কথা বিস্তারিতে ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ঠাকুরও অবধূতের চব্বিশ গুরুর কথা মাঝে মাঝেই কথামৃতে বলেছেন। অবধূত তাঁদেরই বলা হয়, যাঁরা আত্মজ্ঞান পেয়েছেন, অর্থাৎ নিজেকে জেনে গেছেন। নিজেকে জেনে গেছেন বলে তাঁদের এই সংসারে সাথে কোন সম্পর্ক থাকে না। ঠিক ঠিক পরমহংস বলতে বোঝায়, যদিও আমরা জানি একমাত্র ঠাকুরের নামের সাথেই পরমহংস এসে গেছে, কিন্তু অবধূত যাঁরা তাঁদের সাথেই 'পরমহংস' উপাধি ব্যবহার করা হয়। জগৎ থেকে পুরো নির্বিকার, জামা কাপড় খুব একটা পরিধান করেন না, খুব হলে একটা কৌপিন পরে থাকেন আর যদৃচ্ছালাভার্থে ঘুরে বেড়ান। ভাগবতে অবধূতের উপর খুব সুন্দর বর্ণনা আছে। নিমি রাজার কাছে অবধূত দত্তাত্রেয় ঋষি এসেছেন। রাজা তাঁকে খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। 'মানুষ যে কাজকর্ম করে, সেই কাজকর্ম করতে করতে তার অনুভব হয়, সেই অনুভবটাই তার জ্ঞান। কিন্তু আপনাকে দেখে তো মনে হয় না যে আপনি কখন কাজকর্ম করেছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনার এত জ্ঞান কি করে হল'? কারণ নিমি দেখেই বুঝতে পারছেন, জ্ঞান তাঁর চেহারাতেই প্রকাশ পাচ্ছিল। তখন অবধূত বলতে শুরু করলেন, কিভাবে তিনি এই জগৎ থেকেই শিক্ষা পেয়েছেন। সেখানেও তিনি অদ্বৈত জিনিসটাকে নিয়েই বলছেন। পরের দিকে ভাগবত থেকে সরে গিয়ে আরেকটি গ্রন্থ রচনা করা হয়, যার নাম অবধূত গীতা। আর আমাদের যা হয়ে থাকে, রচয়িতা ঋষি বা মুনির অনেক শিষ্যাদি যদি না থাকে

তাহলে জানা যায় না, কে এই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, কবে রচনা করেছিলেন, তাঁর জীবনী, এগুলো কিছুই জানা যায় না। সাহিত্যের পণ্ডিতরা গ্রন্থের ভাষা, শব্দের ব্যবহার, ভাবের প্রকাশ দেখে অনেক কিছুর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেন, কিন্তু সব সময় যে এগুলো সঠিক হবে তা না। গোরক্ষনাথ সম্প্রদায় বা পরে যে নাথ সম্প্রদায় এসেছে, তাঁরা নিজেদের অবধূত সম্প্রদায়ের সাথে এক করে দেন। পণ্ডিতরা বলেন, ওনাদেরই কেউ অষ্টম বা নবম শতাব্দীতে অবধূত গীতা রচনা করেছেন।

অবধূত গীতা কট্টর অদ্বৈত গ্রন্থ। এতটাই কট্টর অদ্বৈত যে, অদ্বৈতের কোন স্তরে নিয়ে চলে যায়, কারুর পক্ষে কাউকে বোঝানটাও অসম্ভব। অবধূত গীতার কাছাকাছি একমাত্র ঘোর অদ্বৈত গ্রন্থ হল মাণ্ডুক্যকারিকা। মাণ্ডুক্যকারিকাও শুনতে ভাল লাগবে, কিন্তু প্রস্তুতি না থাকলে ভিতরে কিছু যাবে না। স্বামীজী একজন অদ্বৈতী, তাঁর লেকচার গুলিতে আগাগোড়া কোথাও যেন অবধূত গীতার প্রভাব ছিল। কিন্তু আমরা যে বলছি অবধূত গীতার প্রভাব স্বামীজীর উপর ছিল, এটা যেন অনেকটা সেই রকম মনে হতে পারে যে – যাঁরা সাহিত্য পড়েন তাঁরা যেমন বলেন, অমুকের লেখাতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছায়া, কি বঙ্কিমচন্দ্রের বা শরৎচন্দ্রের ছায়া, কিন্তু স্বামীজীর উপর অবধূত গীতার প্রভাব এভাবে নয়। এটা হল, স্বামীজী যে ধরণের সাধনা করেছিলেন, যে ধরণের অনুভূতি স্বামীজীর ছিল, সেগুলো অবধূত গীতাতে যে ধরণের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তার সাথে মিল আছে। এই অংশের আলোচনা শুরু করার আগে একটা ছোট ব্যাখ্যা দেওয়া দরকার, তাহলে এই আলোচনাটা বুঝতে সুবিধা হবে।

আমরা এর আগে আলোচনা করেছি যে, আমাদের যাবতীয় জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আসে, স্মৃতি থেকে আসে, স্বপ্ন থেকে আসে আর কল্পনা থেকে আসে বা মিথ্যা জ্ঞান থেকে আসে। তার মানে দাঁড়ায়, সমস্ত জ্ঞান মন থেকে আসছে। মন যেন একটা পুকুরের জল, যে জল চঞ্চল হয়ে আছে, শুধু যে চঞ্চল হয়ে আছে তাই না, তার সাথে কাদা, বালি মিশে আছে। পুকুরের জলকে খুব করে নাড়িয়ে দেওয়াতে নীচের কাদা, পাঁক মিশে জল ঘোলা হয়ে গেছে। এখন কিছুই বোঝা যাবে না যে, জলের নীচে কি আছে। হিন্দুরা বলে, জ্ঞান নির্ভর করে তোমার মন কতটা শান্ত, তার উপর। আমরা বুদ্ধি বলতে বুঝি, যারা চটপট সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেয়, আমরা বলি বিজ্ঞানীদের কত বুদ্ধি, নেতাদের কত বুদ্ধি। কিন্তু বুদ্ধি মানে, জিনিসটা যেমন তেমনটি দেখা, সূক্ষ্ম বুদ্ধি। স্কুল কলেজে আমরা পড়াশোনা করার সময় খেটেখুটে বইপত্র মুখস্ত করে পরীক্ষার খাতায় সব উগড়ে দিচ্ছি, এটা কিন্তু আদপেই বুদ্ধি নয়। চঞ্চল মন, চঞ্চল ভাবেই সে সব কিছু গ্রহণ করেছে, উত্তরটাও চঞ্চল ভাবে দিচ্ছে। চঞ্চল মন যখন শান্ত হতে শুরু করে, তখন সে বুঝতে পারে জিনিসটা কি। একবার জিনিসটাকে যখন বুঝে গেল, এরপর ওটাকে আধার করে যত প্রশ্ন আসবে, সব প্রশ্নের উত্তর সে দিয়ে দেবে। কিন্তু একটা সমস্যার উত্তর যদি জানা থাকে, তাহলে সে ওই সমস্যার ওই উত্তরের বাইরে যেতে পারবে না। লেকচার শুনে, বই পড়ে জ্ঞান হয় না, কোন ভাবেই জ্ঞান হয় না। জ্ঞান লাভের পদ্ধতি একটাই, সেটা হল মন যখন শান্ত হয়। বাচ্চাদের বড়রা যখন বলেন, মন দিয়ে পড়াশোনা কর, আসলে তখন বলা হয় মনকে শান্ত করে একটা জায়গায় মনকে একাগ্র কর।

এই একাগ্র মন যখন আরও গভীরে যায়, তখন সেখান থেকে কবিতা বেরিয়ে আসে, সেখান থেকে আরও গভীর যখন যায়, তখন কি হয় বলা খুব মুশকিল। মন একবার শান্ত হয়ে গেলে সেটাকে আর মন বলা যায় না, কারণ মনের সংজ্ঞাই হল চাঞ্চল্য। আমরা অনেকবার এই জিনিসটাকে নিয়ে আলোচনা করেছি, সেইজন্য আর বিস্তারে যাচ্ছি না। মন যখন শান্ত হয়ে যায় তখন ঋষিরা বা আমরা যাঁদের অবতার বলি, তাঁরা যে কি দেখেন, এটা জানার কোন পথ নেই। বেদ হোক, উপনিষদ হোক, কথামৃতই হোক, বা অন্যান্য ধর্মের কোন শাস্ত্র কোন দিন বলতে পারবে না, তাঁরা কি দেখেন। এর খুব সহজ কারণ হল, সেখানে মন থাকে না। জ্ঞান সব সময় হয় মন দিয়ে, আগেও আমরা আলোচনা করেছি, এটা নূতন কিছু না। জ্ঞান সব সময় যদিও মন দিয়েই হয়, কিন্তু আত্মজ্ঞান তখনই হয় যখন মনের নাশ হয়ে যায়। তাহলে আত্মাকে কিভাবে আমরা পরিভাষিত করব? এটা খুব simple contradiction। যাঁরা ধর্ম নিয়ে অনেক কথা বলেন, ধর্মের যাঁরা প্রচারক, তাঁরা কতটা এই জিনিসটা বোঝেন, সন্দেহ আছে। আমাদের ভাষায় যে কোন জ্ঞান তখনই হবে, যখন মন গিয়ে ওটাকে ধরবে। আমি কোন বন্ধুর কাছে কিছু জিজ্ঞেস করতে এলাম। বন্ধু বলল, আমি

তোমাকে বলব, কিন্তু তার আগে দিব্যি দিয়ে বলো যে, তুমি কাউকে কোন দিন বলবে না। এখন এই জানার আমার কি মূল্য! একজন সাংবাদিক একজন নেতাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করছে, আচ্ছা এই ব্যাপারট ঠিক কি, একটু প্লীজ বলবেন? নেতা সাংবাদিকের খুব কাছে এসে ফিস্‌ফিস্ করে বলছে, 'আমি তোমাকে বলছি, কিন্তু দিব্যি দাও যে তুমি এটা কাউকে বলবে না'। সাংবাদিক দিব্যি দিল এবং খবরটাও পেল, কিন্তু একজন সাংবাদিকের কাছে ওই খবরের কোন দাম আছে কি? কোন মূল্যই নেই। আমাকে একজন এক কোটি টাকা দিয়ে বলল, এই টাকাটা আপনাকে দিলাম, কিন্তু একটা শর্ত, আপনি এই টাকা কোন দিন খরচ করতে পারবেন না। ওই টাকা নিয়ে আমি কি করব! মন থাকলে আত্মাকে জানতে পারা যাবে না। আত্মাকে জানলে মন থাকবে না, সেইজন্য আত্মার ব্যাপারে আর কেউই জানতে পারবে না। তার মানে কি দাঁড়ায়? জ্ঞান শব্দটা আমরা যে অর্থে বলি, ওই অর্থে জ্ঞান কারুরই হয় না, ভগবানরও সেটা হয় না। তাহলে কি হয়?

ঠাকুর এর খুব সুন্দর উপমা দিচ্ছেন। কেউ দূর থেকে সচ্চিদানন্দ সাগরের হিল্লোল কল্লোল শুনেছে, কেউ কাছে গিয়ে দেখেছে, কেউ সচ্চিদানন্দ সাগরের জল স্পর্শ করেছে আর যোগেশ্বর শিব সেই সাগরের জল তিন চুমুক পান করে শব হয়ে পড়ে আছেন। আদৌ শিব তিন চুমুক পান করেছিলেন কিনা, আর শব হয়ে পড়ে ছিলেন কিনা আমাদের জানা নেই। ঠাকুর একটা উপমা দিচ্ছেন, সেই সচ্চিদানন্দ যিনি ভগবান, যিনি অনন্ত, তাঁর হিল্লোল কল্লোল এই পর্যন্ত শোনা যায়, খুব হলে তাঁকে কাছ থেকে দেখা যায়, কিন্তু কোন দিনই তাঁকে জানা যাবে না, সম্ভব না। শুকদেব আদি এনাদের ঠাকুর বলছেন, হৃদ্য স্পর্শ করেছেন। এর উপমা আগেও আমরা নিয়েছি, খুব গভীর নিদ্রায় যাওয়ার পর ঘুম ভাঙলে আমরা প্রায়ই বলে থাকি, আমি এমন ঘুমিয়েছিলাম যে আমার কিছুই মনে নেই, কিন্তু বুঝতে পারছি আমি খুব সুখে ছিলাম। আগেকার দিনে এ্যানাস্থেসিয়া ছিল না বলে, ওনারা এই উপমা নেননি। কিন্তু ইদানিং সুষুপ্তির ভাল উপমা হল এ্যানাস্থেসিয়া। এ্যানাস্থেসিয়া করার পর বেহুঁশ হওয়ার আগে পর্যন্ত সব মনে থাকবে, বেহুঁশ হয়ে যাচ্ছি তখনও কিছু কিছু জিনিস মনে থাকবে, তারপরে কি হল কোন হুঁশ নেই। এ্যানাস্থেসিয়ার প্রতিক্রিয়া যখন কমতে থাকে তখন ধীরে ধীরে চেতনা আসতে থাকে। ঠাকুরের সমাধির যে বর্ণনাগুলি আছে, সেখানেও আমরা দেখছি ঠিক তাই হয়। এ্যানাস্থেসিয়াতে ব্রেনের চেতনার সব কাজ যেমন বন্ধ করে দেওয়া হয়, সমাধিতেও ব্রেনের সমস্ত কার্যকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু এ্যানাস্থেসিয়া আর সমাধিতে অনেক তফাৎ আছে। এ্যানাস্থেসিয়ার বেহুঁশ অবস্থা থেকে ফেরত আসার পর ভিতরে একটা দুঃখ, ব্যাথার অনুভব হয়, কোথায় পড়ে আছে বুঝতে পারে না। কেউ যদি কোন কারণে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গিয়ে থাকে, তখন body system fail করে যায়। আর মানুষ ওই অবস্থায় অবশ্যই প্রস্বাব করে দেবে। গভীর নিদ্রাভঙ্গের পর এই ধরণের কিছু হয় না; আমার কিছু মনে নেই, কিন্তু আমি খুব সুখে ছিলাম। সমাধি অবস্থা লাভ করলে, তাঁর চেহারাটাই অন্য রকম হয়ে যায়। সমাধিলব্ধ ব্যক্তি বলেন, আমি পরম সুখে ও পরম শান্তিতে ছিলাম। আর বলেন, আমি সচ্চিদানন্দকে জেনেছি। কিভাবে জানলেন, তখন তো মন ছিল না? বোধে বোধ করেছেন। ওই বোধ থেকে যখন ফেরত আসছেন, অর্থাৎ ওই জায়গাটাকে ছাড়ছেন আর একটু একটু করে জগতের বোধকে ধরছেন, সেই সময়েও সমাধি অবস্থার যে আনন্দের বোধ, তার রেশ থেকে যায়; এর বেশি কোন অনুভূতি কারও থাকতে পারে না। শুকদেবাদিদের প্রসঙ্গ করতে গিয়ে ঠাকুর বলছেন, সচ্চিদানন্দের কৃপায় সমাধি থেকে ফেরত আসার সময় তাঁরা যেন আরেকটু বেশি যেন চেতন থাকতে পেরে ছিলেন। তার মানে মনোলয় থেকে আবার মন যখন জগতে ফেরত আসতে শুরু করে, তখন ওই চেতনার অনেকাংশই তিনি বহন করে নিয়ে আসতে সক্ষম হচ্ছেন। ঠাকুর, স্বামীজীদের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। সবার ক্ষেত্রে এই জিনিস হয় না।

এখন অনন্ত সমুদ্রের কিনারায় আমি দাঁড়িয়ে আছি, কিনারায় দাঁড়িয়ে থেকে কতটুকু আর আমার অনন্ত সমুদ্রের জ্ঞান হবে! ঠিক তেমনি মহাপুরুষদের সমাধির অবস্থায় বোধে বোধ হবে, সচ্চিদানন্দের জ্ঞান হবে, কিন্তু মনের জগতে ফেরত আসার পর তিনি কিছু বলতে পারবেন না। এই কারণেই বলতে পারবেন না, তখন ওই অবস্থায় তাঁর মন ছিল না। মন ওটাই বলবে, যেটা মনের কাছে আছে। যেমন, মোবাইল ফোনে বা ভয়েস রেকর্ডারে কারুর কথা রেকর্ডিং করছি। কথা বলছে, রেকর্ডিং হয়ে যাচ্ছে, হতে হতে ফোনটা বন্ধ হয়ে সাইলেন্ট হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর আবার রেকর্ডিং অন্ হল। মাঝখানে যে সাইলেন্ট হয়ে গেল, ফোনকে আমি যত চালাই, ওর সাউণ্ড যতই বাড়িয়ে দিই না কেন, ফোনে ওই সময়কার কোন কথাই শোনা যাবে না, কারণ ফোন

তখন ডেড হয়ে গিয়েছিল। মন হল সেই রেকর্ডারের মত, যেখানে সমস্ত কিছু এসে ঢুকছে, কিন্তু মন ওই অবস্থায় পুরোপুরি ডেড। তাহলে ওই অবস্থাকে আমরা কি বলব, যেখানে বোধ বোধ হচ্ছে? ঈশ্বর জ্ঞান লাভ বলতে পারি, অদ্বৈত অবস্থা বলতে পারি। কিন্তু এগুলো বলা মানে তো মনেরই খেলা। মনেরই খেলা যদি হয়, তাহলে আমি তো আমার কথাকেই খণ্ডন করছি। কারণ আমি বলছি, তখন মন ছিল না। ঈশ্বর জ্ঞান, অদ্বৈত, এগুলো তো শব্দ, শব্দ মানেই মনের জগৎ। মনের জগৎ এসে যাওয়া মানেই, সব আবার এলেমেলো হয়ে যাওয়া। জহুদিরা তাই ঈশ্বরের নাম দিলেন YHWH, পরে এর উচ্চারণ দাঁড় করালো জেহোবা। কিন্তু আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, YHWHএর উচ্চারণ করা যায় না। হিব্রু ভাষায় জেহোবার বানান এটাই, এর ঠিক ঠিক উচ্চারণ করা যায় না। এর তাৎপর্য হল, ঈশ্বর যে কি, তা মুখে বলা যাবে না। কিন্তু আমাদের ঈশ্বরের কথা বলতে হবে, তা না হলে অপরকে আমি জানাবো কি করে। জহুদিরা তাই ঈশ্বরের নাম দিলেন জেহোবা, যার বানান YHWH। আমরা যখন ঈশ্বরের সত্তাকে অদ্বৈত বলি, তখনও আমরা এটাই বলতে চাই। তিনি এক নন, তিনি দুই নন, তিনি শূন্য নন। তাহলে তিনি কি? তাই ঈশ্বরের কথা বলতে গেলে চুপ হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন রাস্তা নেই।

ঠাকুর এটাকে বোঝানর জন্য খুব সুন্দর সুন্দর উপমা নিয়ে বা কাহিনী রূপে কথার ছলে বলছেন। ব্রাহ্মণের দুই ছেলে গুরুর কাছে শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে গেছে। অধ্যয়ন শেষ করে বাড়ি আসার পর, ওদের বাবা ঈশ্বরের ব্যাপার তারা কে কি জেনেছে জিজ্ঞেস করলেন। একজন ছেলে শাস্ত্র থেকে ফরর ফরর করে অনেক সংস্কৃতের শ্লোক বলে বোঝাতে লাগল। দ্বিতীয় জনকে জিজ্ঞেস করতে সে চুপ মেরে গেল। বাবা তাকে বলছেন, ‘বাবা তুমিই ঠিক ঠিক বুঝেছ’। অবধূত গীতা ঠিক এই ভাবকে নিয়ে আসছে। সচ্চিদানন্দই আছেন। আমরা যে এতক্ষণ যাবৎ বলে যাচ্ছি, সাধক, সাধকের মন, সচ্চিদানন্দের সাগর, শিব, শুকদেব, এগুলো সব উপমা, এনারা সবাই সেই সচ্চিদানন্দ সাগরের এক একটা ঢেউ; কোনটা ছোট ঢেউ, কোনটা বড় ঢেউ। যেমন কোন ঢেউই সমুদ্রকে জানতে পারবে না, ঠিক তেমনি কেউই সচ্চিদানন্দকে জানতে পারে না। ওনারা তাই খুব কাছাকাছি যে শব্দ নিয়ে আসেন, যেটা গীতা, উপনিষদেও নিয়ে আসা হয়েছে, তা হল, অদ্বিতীয়ম্, তাঁর মত আর কিছু নেই। তাঁর মত কিছু থাকলেই তো আমরা কিছু বুঝতে পারব। আবার যখন একম্ বলছেন, তখন প্রায়ই এর অনেকে অনুবাদ করেন ‘এক’। কিন্তু তিনি এক নন, তিনিই আছেন, তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। ঈশ্বর ছাড়া যদি আর কিছু নাইই থাকে, তাহলে আমরা যে তাঁর এতগুলো নাম বলছি, জ্ঞানের কথা বলছি, অজ্ঞানের কথা বলছি, সিদ্ধ পুরুষের কথা বলছি, বড়লোকের কথা বলছি, সাধারণ লোকেদের কথা বলছি, এগুলো কি? বলছেন, তোমার এই কথাগুলো শব্দের খেলা ছাড়া আর কিছু না। আমরা যাকে ভালবাসি, তার প্রশংসা করে তাকে আমরা কত কথাই না বলি। কোন কারণে তার উপর যদি রেগে যাই, তখন কত রকমের গালমন্দ করতে থাকি। তাহলে আগে যে কথাগুলো বলা হচ্ছিল, সেগুলো কি? শব্দের খেলা। ঈশ্বরের ব্যাপারে যা কিছু বলা হয়, সবটাই শব্দের খেলা। আর সংসারের ব্যাপারে যা কিছু বলা হয়, সেটাও শব্দের খেলা। এই মাইক্রোফোন আছে, আমি শাস্ত্রের কথা বলে যাচ্ছি, সবাই শুনে যাচ্ছে, সবই শব্দের খেলা, শব্দের খেলা ছাড়া কিছু নেই। এটাকেই অন্য ভাবে বলছেন মায়া। কেন মায়া? কারণ এগুলোর কোন অস্তিত্বই নেই, ঈশ্বর, সচ্চিদানন্দ ছাড়া কিছু নেই। অথচ দেখছি, আমি বলছি, তুমি শুনছ; এটাই মায়া। এখানেই কত ভালবাসা, কত রাগ, অভিমান। মানুষ মারার জন্য এ্যটম বোমা তৈরী হচ্ছে, কত দুশ্চিন্তা, কত চিন্তা, কত আবদার, কত কিছু হয়ে চলেছে। বলছেন, *বাচারম্ভনং বিকারো নামধেয়ম্*, সেই সচ্চিদানন্দই যেন একটা রূপ ধারণ করেছেন, সেই রূপটা হল বিকার।

এর অনেক কিছু আমরা আগে আগে আলোচনা করে এসেছি। কিন্তু এর মধ্যে যেটা মূল কথা, যেভাবে আমরা সচ্চিদানন্দ সাগরের বর্ণনা করলাম, এবার এটাকে নিয়ে আমরা যেমনি ভাবব, তখন কি হবে? তিনিই আছেন। তিনিই যদি থাকেন, তাহলে ভগবানকে বন্ধনে কে দেবে? কেউ বন্ধন দেওয়ার নেই। তাহলে বন্ধনটা মিথ্যা, মায়াটাও মিথ্যা। বন্ধনটাই যদি মিথ্যা হয়, তাহলে মুক্তিটাও মিথ্যা। মুক্তি মিথ্যা হয়ে গেলে, অজ্ঞানটাও মিথ্যা, জ্ঞানটাও তাহলে মিথ্যা। তাহলে সত্য কি? সচ্চিদানন্দই সত্য। সচ্চিদানন্দ কি? তিনি যা, তিনি তাই, মুখে বলা যাবে না। চুপ মেরে যাওয়া ছাড়া কোন পথ নেই, কোন শব্দ নেই। ঈশ্বরের তাই আরেকটা নাম মৌন বা নৈঃশব্দ। অবধূত গীতা ঠিক এই ভাবকে নিয়ে বলছেন। স্বামীজী এখানে পুরো অবধূত গীতাকে নিয়ে

আলোচনা করছেন না, কয়েকটা নির্বাচিত শ্লোকের উপর বলছেন। আমরা আগেও বলেছি যে, অবধূত গীতা একেবারে ঘোর অদ্বৈত। আধ্যাত্মিক জীবনের একটু প্রস্তুতি না থাকলে অবধূত গীতার আলোচনা শুনলে জীবনটা পুরো এলেমেলো হয়ে যাবে। সাধু সন্ন্যাসীদের মধ্যে যাঁরা অবধূত গীতা পড়েন, তাঁদের বেশির ভাগেরই মাথা খারাপ হয়ে যায়, আর তা নাহলে লম্পট হয়ে যায়। এই অর্থে লম্পট বলা হচ্ছে, চারিদিকে ভোগ করে বেড়াবে, কেউ কিছু বললে বলবে, সব মায়া হ্যায়।

স্বামীজী বলছেন, All knowledge depends upon calmness of mind, (*মনের স্থিরতার উপর সমুদয় জ্ঞান নির্ভর করে।*) মন কেমন শান্ত, তার উপর নির্ভর করবে আমার জ্ঞান কেমন হবে। কোন একটা বিষয় আমি বোঝার চেষ্টা করছি, বা চিন্তা করে যাচ্ছি, কিন্তু বুঝতে পারছি না, মনটাকে তখন শান্ত করতে হয়। সত্যিকারের যাঁরা বড় কবি বা সাহিত্যিক, বা দার্শনিক, বা বড় বিজ্ঞানী, স্বাভাবিক ভাবে তাঁরা শান্ত প্রকৃতির হন, মন তাঁদের স্বভাবেই শান্ত থাকে। এনারা এমন ভাবে জীবন-যাপন করে থাকেন যাতে কোন কিছু থেকে তাঁদের মনের শান্তি বিঘ্নিত না হয়। সেইজন্য যোগীরা হিমালয়ের নির্জন গুহা বা জনপদশূন্য বনে বা কোন নদীর নিরালা তটে থাকতেন, তার একটাই কারণ মনের শান্তিতে যেন কোন বিঘ্ন না আসে। বাহ্যিক বিঘ্নগুলি মনকে এমনিতেই প্রচুর চঞ্চল করে দেয়, আর লোকজনদের সাথে কথা বলা বা মেলামেশা করলেই মনের শান্তি ভঙ্গ হবে। বাহ্যিক বিঘ্ন ছাড়া মনের ভিতরে যে ঝড় চলছে, সেটা তো আছেই। বেশি কথা বলা মনকে চঞ্চল করে, বেশি শুয়ে থাকা মনকে চঞ্চল করে, বেশি খাওয়া-দাওয়া করা মনকে চঞ্চল করে। শরীরের যে কোন ইন্দ্রিয়ের প্রতি একটা বিশেষ যদি আসক্তি থাকে, মনকে চঞ্চল করবে। কিছু মানুষ স্বভাবেই একটু বেশি চঞ্চল হয়। প্রচুর শারীরিক ও মানসিক প্রশিক্ষণ যদি না পেয়ে থাকে, মন চঞ্চল থাকবে। জ্ঞান লাভের জন্য দরকার, মনকে একেবারে স্থির হয়ে যেতে হবে। কতটা স্থির? এই যে বলা হল, আত্মজ্ঞান পাওয়ার জন্য, স্থির হতে হতে মন আর নেই। পুকুরের জল যদি একেবারে স্থির হয় থাকে, মনে হবে যেন একটা কাঁচের আবরণ দেওয়া আছে। কাশ্মীরে বা অমরনাথ যাত্রায় শেষনাগে যে জলাশয় আছে, ঠাণ্ডার সময় মনে হবে যেন কাঁচ রাখা আছে, একেবারে শান্ত জল।

সেখান থেকে স্বামীজী এবার আত্মার উপর চলে আসছেন, অবধূত গীতা থেকে বলছেন, He who has filled the universe, He who is Self in self, how shall I salute Him! (*যিনি সমস্ত জগতপ্রপঞ্চ জুড়ে পূর্ণভাবে বিরাজ করে আছেন, যিনি আত্মার মধ্যে আত্মস্বরূপ, তাঁকে আমি নমস্কার করি কিরূপে?*) আমি ঈশ্বরকে প্রণাম করতে চাইছি। কিন্তু কোথায় তাঁকে আমি আমার প্রণাম নিবেদন করব? কারণ তিনি তো সব জায়গায় ব্যপ্ত হয়ে আছেন, তিনি তো আত্মারও আত্মা। গুরু নানকের নামে একটা কাহিনী আছে, গুরু নানক একবার মক্কা গেছেন। সরাইখানায় তিনি ঘুমোবার জন্য শুয়েছেন, সেই সময় তাঁর পা ছিল কাবার দিকে। ওখানকার সেবাদাস দেখে বলছে, 'এ তুমি কিভাবে শুয়েছ? দেখছো না, তোমার পা কাবার দিকে'। গুরু নানক বলছেন, 'আমি খুব ক্লান্ত, তুমি আমার পা'টা ঘুরিয়ে দাও'। সে পা ঘুরিয়ে অন্য দিকে করে দেখছে, কাবা সেইদিকেই আছে। ওখান থেকে ঘুরিয়ে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার পর দেখছে, কাবা সেইদিকে আছে। যেদিকে গুরু নানকের পা ঘুরিয়ে রাখছে, দেখছে কাবা সেইদিকে আছে। তিনি সব দিকে, সব জায়গায়, সর্বত্র বিরাজ করে আছেন। লীলাপ্রসঙ্গে খুব সুন্দর বর্ণনা আছে। মা কালীর দর্শনের পর ঠাকুর দেখছেন, চারিদিকে শুধু চিন্ময়, চৈতন্যের জ্যোতি বিরাজ করে আছে। পূজো করতে বসে ঠাকুর চারিদিকে ফুল ছুড়ছেন, মাকে যে তিনি চারিদিকে দেখছেন। কোন একটা বিশেষ বিগ্রহে যে ফুল দেবেন, তা তো দেওয়া যাচ্ছে না, দেখছেন চারিদিকে তিনি বিরাজমান হয়ে আছেন।

To know the Atman as my nature is both knowledge and realization. 'I am He, there is not the least doubt of it'. (*আত্মাকে আমার নিজের স্বভাব – নিজের স্বরূপ বলে জানাই পূর্ণজ্ঞান এবং প্রত্যক্ষনুভূতি। 'আমিই তিনি; এই বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নেই'।*) জ্ঞান আর বিজ্ঞান, অর্থাৎ একটা জিনিসকে জানা আর সেই জিনিসটাকে অনুভব করা দুটো আলাদা জিনিস। যেমন দুধ জিনিসটা কি আমি জানলাম, আর আমি দুধ পান করলাম, দুটো আলাদা ব্যাপার। কিন্তু আত্মার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা উল্টো হয়ে যায়, আত্মাকে জানা, আত্মার অনুভূতি আর তার ফল, সব কটি জিনিস একসাথে হয়। যেমন আমি দুধ খেলাম,

এখানে দুধ আলাদা, আমি আলাদা। দুধ খাওয়ার ফলস্বরূপ যে সন্তুষ্টি বা পুষ্টি হবে, সেটাও আলাদা। তার মানে কর্তা, আমি আলাদা, যার উপর ক্রিয়া হচ্ছে, অর্থাৎ দুধ আলাদা, ক্রিয়া জিনিসটা নিজেও, অর্থাৎ পান করা হচ্ছে, এটা আলাদা, দুধ পান করে যে ফল হচ্ছে, মানে পুষ্টি, আলাদা; সবটাই আলাদা। আত্মজ্ঞানে তা হয় না। যিনি দেখছেন, যাঁর জ্ঞান হচ্ছে, তিনি আত্মা; যেটাকে জানছেন, সেটাও আত্মা। আর জ্ঞান যেটা হচ্ছে, সেটাও আত্মা, ক্রিয়া যেটা হচ্ছে, সেটাও আত্মা। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের চব্বিশ নং শ্লোকে, *ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্* ঠিক এই ভাব নিয়েই বলছেন। যখন আত্মাই আছেন, আত্মা ছাড়া যখন কিছু নেই, তখন কে কার উপর ক্রিয়া করবেন! আত্মাই আত্মার উপর ক্রিয়া করেন, তার ফলটাও আত্মা। প্রথমের দিকে আমরা যেখানে শুকদেবের উপর আলোচনা করছিলাম, তখন মনে হচ্ছিল শুকদেব আলাদা, সচ্চিদানন্দ সাগর আলাদা। কিন্তু জিনিসটা তো তা নয়। যিনি ঠিক ঠিক আত্মজ্ঞানী, তিনি আত্মা ছাড়া কিছু দেখেন না। গীতার পঞ্চমোধ্যায়ে তাই এই ধরণের আত্মজ্ঞানীর ব্যবহার কেমন হয় বলছেন – *বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।।* যিনি ঠিক ঠিক জ্ঞানী তিনি বিদ্যা ও বিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গরু, হাতি, কুকুর, চণ্ডাল সবার ভিতরে আত্মাকেই দেখেন।

কিন্তু এখানে যে আত্মজ্ঞানের কথা বলা হচ্ছে, তাতে তিনি সেটাও দেখেন না। তিনি দেখেন, আত্মাই আছেন, আত্মা ছাড়া কিছু নেই। যেমন মোমের পুতুল, ম্যাডাম তুষোর মোমের পুতুলের যে মিউজিয়াম, সেখানে মোমের কত আকৃতি বানিয়ে রাখা আছে। সবটাই মোম, শুধু আকৃতি গুলি আলাদা আলাদা। সোনার দোকানে কত রকমের গয়না সাজানো থাকে, কিন্তু সবটাই সোনা। কিন্তু আকৃতির হেরফেরের জন্য কোনটাকে আমরা নেকলেস বলছি, কোনটাকে কানের দুল বলছি, কোনটাকে আংটি বলছি, কোনটাকে অন্য কিছু বলছি। সবারই আলাদা আলাদা আকৃতি আর আলাদা আলাদ নাম, কিন্তু সবটাই সোনা। উপমাটা শোনার পর অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন, তা কেন হবে, সোনা আর স্বর্ণকার আলাদা, সোনাতে যে খাদ মেশানো হবে, সেটা আলাদা। কিন্তু আত্মার ক্ষেত্রে তা হয় না। আরেকটু ভাল উপমা যদি নেওয়া হয়, উত্তরমেরু আর দক্ষিণমেরুর সাগরের জল ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে বরফের নানা রকমের আকৃতি তৈরী হয়েছে, কিন্তু সবটাই জল। সেখানেও আমরা বলতে পারি, জল আলাদা, ঠাণ্ডা আলাদা। উপমাগুলো একটা সত্যকে বোঝানর জন্য বলা হচ্ছে। আত্মার অবস্থান আর সংসারের অবস্থান, দুটোতে এত বেশি তফাৎ যে, বোঝানর জন্য খুব কাছাকাছি এমন উপমা নিয়ে আসতে হয়, যাতে মানুষ আত্মার ব্যাপারটা একটু ধারণা করতে পারে। এরপর বোঝার হলে বুঝে নেবে, না বুঝলে কিছুই আর করার থাকে না। মূল বক্তব্য হল, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় আর জ্ঞান, তিনটেই এক, সেই এক তিন রূপ হয়ে আমাদের সামনে আসে। সেইজন্য কি হয়?

স্বামীজী বলছেন, No thought, no word, no deed, creates a bondage for me. I am beyond the senses, I am knowledge and bliss. (*কোন চিন্তা, কোন বাক্য বা কোন কর্ম আমার বন্ধন উৎপন্ন করতে পারে না। আমি ইন্দ্রিয়াতীত, আমি চিদানন্দস্বরূপ।*) সেই যুগের অবধূতের মুখের কথা এই যুগের অবধূত স্বামীজীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে। আমিই আছি, আমি ছাড়া কিছু নেই, আত্মা ছাড়া তো কিছু নেই। কিসের বন্ধন, কিসের পূণ্য, কিসের পাপ, কে আমাকে বাঁধবে আর কেই বা আমাকে মুক্ত করবে! বন্ধনে ফেলতে হলে আরেকটা কিছু দরকার পড়ে। আমি যে পূণ্য করব, তার জন্যও দ্বিতীয় কিছু একটা লাগে। কিন্তু আত্মা ছাড়া তো কিছু নেই, তাই আত্মার জন্য দ্বিতীয় কিছু নেই যে বন্ধন তৈরী করবে।

বলছেন, There is neither existence nor non-existnece, all is Atman. (*'অস্তি নাস্তি' কিছুই নেই, সবই আত্ম-স্বরূপ।*) আমরা যে সচ্চিদানন্দ সাগরের কথা বললাম, সেখানে সত্তা নেই, সত্তা যে নেই তাও বলা যাবে না। একটা জিনিস আছে, এটা বলার জন্য 'আছে' এই ভাবটা মনের মধ্যে থাকা দরকার। তার মানে যে জিনিসটা আছে মন সেটাকে উপলব্ধি করে। যেমন এখানে মাইক্রোফোন আছে, তার মানে আমার মন দেখছে যে, এখানে মাইক্রোফোনটা আছে, তার মানে এটা আছে। আর এই ঘরে ইঁদুর নেই, হাতি নেই, এটাকেও মন দেখছে যে এই জিনিসগুলো নেই। তার মানে মন এক সঙ্গে দুটো জিনিসকে ধরছে, মাইক্রোফোন আছে আর হাতি নেই। আত্মা বা সচ্চিদানন্দের ওখানে মন নেই, সেইজন্য আত্মার অস্তিত্ব নেই, আবার আত্মা যে অনস্তিত্ব, সেটাও বলা যাবে না। নাসদীয়সূক্তে ঠিক একই কথা বলছেন, *নাসদাসীন্ ন*

সদাসীৎ, সেটা যে আছে বলা যাবে না, সেটা যে নেই তাও বলা যাবে না। কেন বলা যাবে না? কারণ, এই যে বলা হল, এখানে মাইক্রোফোন আছে, এখানে হাতি নেই। কেন? মন দেখছে এখানে মাইক্রোফোন আছে, মন দেখছে এখানে হাতি নেই। কিন্তু মনের দৌড় আত্মা পর্যন্ত যেতে পারে না; যেটা আমরা প্রথমের দিকে আলোচনা করেছিলাম।

বলছেন, Shake off all ideas of relativity; shake off all superstations, let caste and birth and Devas and all else vanish. Why talk of being and becoming? (*সবই আপেক্ষিক ভাব। সমুদয় দ্বন্দ্ব দূর করে দাও, সব কুসংস্কার ঝেড়ে ফেলো, জাতি, কুল দেবতা – আর যা কিছু আছে – সব চলে যাক। ব্রহ্ম হওয়া বা হয়ে যাওয়া, কেন বলছ?*) এখানে মনে রাখতে হবে, অবধূত গীতা অনেক আগেকার গ্রন্থ, সেই সময় জাতি, বর্ণ, এগুলোর প্রভাব অনেক শক্তিশালী ছিল। সেইজন্য বলছেন, জাতি, কুল, দেবতা সবটাই কুসংস্কার, সবটাই অজ্ঞান। ঈশাবাস্যোপনিষদে বলছেন, যাঁর আত্মজ্ঞান হয়ে গেছে, যিনি দেখে নিয়েছেন আত্মাই আছেন, *তত্র কো মোহঃ কঃ শোক*, তাঁর আর কিসের শোক আর কিসেরই বা মোহ। শোক মানে, আমার কাছে ছিল কিন্তু এখন চলে গেছে, মোহ মানে, একটা জিনিসকে পেতে চাইছে। কিন্তু *একত্বমনুপশ্যতি*, সেই একই আছেন দেখছেন, ঈশ্বর বই আর কিছু নেই, আত্মা ছাড়া আর কিছু নেই, সেখানে আমি কাকে ধরব আর কাকে ছাড়ব। যাকে আমি বন্ধু মনে করছি, সেও আত্মা, আর যাকে শত্রু মনে করছি, সেও আত্মা। যে বেঁচে আছে সেও আত্মা, যে মরে গেছে সেও আত্মা। তাহলে থাকলটা কি? আমাদের মত লোকের জন্য থাকল অন্ধ বিশ্বাস। কি অন্ধ বিশ্বাস। তুমি আমার কত কাছে আছো, অন্ধ বিশ্বাস। তুমি আমার কাছে নেই, অন্ধ বিশ্বাস। তোমাকে ভালবাসি, অন্ধ বিশ্বাস। তোমাকে পছন্দ করি না, অন্ধ বিশ্বাস। আমি পড়ছি, আমি পড়াচ্ছি, সবটাই অন্ধ বিশ্বাস। এসব কথা আমাদের মত লোকেদের বেশি না শোনাই ভাল, প্রথম কথা ধারণা করতে পারব না, দ্বিতীয় কথা, ধারণা করতে গেলে মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার জোগাড় হয়।

বলছেন, Give up talking of dualism and Advaitism! (*দ্বৈত বা অদ্বৈতবাদের কথা ছেড়ে দাও!*) কিসের দ্বৈত, কিসের অদ্বৈত! অদ্বৈত যখন বলছি, তখনও তো একটা নাম লাগিয়ে দিয়ে বলছি। নাম লাগিয়ে দিলেই তো শেষ। কিসের মুক্তি, কিসের জ্ঞান! সবটাই তো একটা করে নাম, শব্দ মাত্র। When were you two, that you talk of two or one? (*তুমি কবে দুই ছিলে যে, দুই ও একের কথা বলছ?*) তুমি কি কখন দুই ছিলে যে, তুমি বলবে দুই নেই! The universe is this Holy One and He alone. Talk not of Yoga to make you pure; you are pure by your very nature. None can teach you. (*এই জগৎপ্রপঞ্চ সেই নিত্যশুদ্ধ ব্রহ্মমাত্র, তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। যোগের দ্বারা শুদ্ধ হব – এই-কথা বলো না, তুমি স্বয়ং যে শুদ্ধ-স্বভাব। কেউ তোমায় শিক্ষা দিতে পারে না।*) যোগ দ্বারা তুমি যে দেহমনের শুদ্ধির কথা ভাবছ, কিসের শুদ্ধি! তুমি তো সেই আত্মা, আত্মা নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত। আত্মা শাশ্বত, চিরন্তন শুদ্ধ, অনন্ত চৈতন্যস্বরূপ এবং আত্মা নিত্য মুক্ত। তাই কিসের বন্ধন, কে কাকে শুদ্ধ করবে, কে কাকে শিক্ষা দেবে। আমি পাপী, আমি অপবিত্র, এটাও তোমার অজ্ঞানপ্রসূত চিন্তা। আমি আমার পাপকে বিধৌত করব, এই ভাবাটাও তোমার অজ্ঞান। আমি আমার পাপকে পরিষ্কার করছি, এই যে ক্রিয়া, এটাও তোমার অজ্ঞান। পরিষ্কার করে আমি শুদ্ধ পবিত্র হয়ে গেলাম, এটাও তোমার অজ্ঞানজনিত ভাবনা।

এইসব কথা সাধারণ মানুষদের শুনতে নেই, গভীর সাধনা ও ত্যাগ তপস্যাশূন্য লোকেরা শুনলে মাথার বিকৃতি হয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের জীবনের সত্যিকারের দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, এটাই সত্য। দক্ষিণেশ্বরে একজন বেদান্তী ছিল, যে অনেক রকম নোংরামি করে বেড়াত। ঠাকুর তাকে জিজ্ঞেস করাতে বলছে, সবটাই তো মিথ্যা, এটাও মিথ্যা। শুনে ঠাকুর বলছেন, তোমার এই বেদান্ত জ্ঞানে আমি ইত্যাদি করি। যিনি অদ্বৈত জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, একত্ব বোধ যাঁর হয়ে গেছে, তিনি তো তাঁর সামনের লোকের মধ্যেও নিজেকে দেখবেন। এই ধরণের মানুষ নিজের স্ত্রীর সাথে কি করে সংসার ধর্ম পালন করবেন? কখনই সম্ভব নয়। তাহলে তিনি কাজ কেন করবেন? কারণ কাজ করাটা যেমন অজ্ঞান, কাজ করব না, এটাও অজ্ঞানপ্রসূত। সেইজন্য গীতা আদি গ্রন্থে এই জিনিসগুলিকে খুব সুচারু রূপে সমন্বয় করা হয়েছে। স্বামীজী এরপর দত্তাত্রেয়কে নিয়ে বলছে।

Men like him who wrote this song are what keep religion alive. (*যিনি এই গীতা লিখেছেন, এনাদের মত লোকেরাই ধর্মকে জীবন্ত করে রেখেছেন।*) স্বামীজী বলছেন, যাঁরা এই ধরণের কথা বলতে পারেন, এনারাই সনাতন ধর্মকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। আমাদের সামনে কথামৃত আছে, কথামৃত হল জীবন্ত শাস্ত্র, কথামৃতে ধর্ম জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ধর্মটা শুধু কোন আচার আচরণ করে যাওয়ার জন্য নয়; ধর্মটা কোন বিশ্বাস বা অন্ধ বিশ্বাস নয়। আমরা যখন কথামৃত পড়ি তখন মনে হয়, ঈশ্বরের সঙ্গে সঙ্গেই আমি আছি। ঠাকুরকে যদি অবতার রূপে নিই, তখনও শুধু অবতার নন, সাক্ষাৎ ঈশ্বর যেন আমার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছেন, কথা বলছেন। শাস্ত্র জীবন্ত হয়ে উঠছে। অবধূত গীতা যখন পড়া হয়, তখন বোঝা যায়, আহা ইনিই ঠিক ঠিক বোধে বোধ করেছেন। They have actually realized; they care for nothing, feel nothing done to the body, care not for heat and cold or danger or anything. They sit still and enjoy the bliss of Atman, while red-hot coals burn their body, and they feel them not. (*তাঁরা বাস্তবিকই সেই ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করেছেন। তাঁরা কোন কিছু গ্রাহ্য করেন না, শীত-উষ্ণ বা বিপদ-আপদ বা অন্য কিছু – মোটেই গ্রাহ্য করেন না। জ্বলন্ত অঙ্গার তাঁদের দেহকে দগ্ধ করতে থাকলেও তাঁরা স্থির হয়ে বসে আত্মানন্দ সম্ভোগ করেন, গা যে পুড়ছে, তা তাঁরা টের পান না।*) অবধূত পরমহংসরা এই রকমই, এনারা চুপচাপ এক জায়গায় স্থির হয়ে পড়ে থাকেন। জ্বলন্ত কয়লা যদি তাঁদের অঙ্গে রেখে দেওয়া হয়, গা পুড়তে থাকবে, কিন্তু উনি নির্বিকার। স্বামীজী যেখানে যোগশক্তি নিয়ে বলছিলেন, সেই জায়গাতে আমরা আলোচনায় বলেছিলাম, যোগী জ্বলন্ত কয়লার উপর দিয়ে হেটে চলে যাচ্ছেন কিন্তু তাঁর পা পুড়ে যাচ্ছে না। কারণ সেই সময় তাঁদের মন অন্য জায়গায় চলে যায়, যার জন্য পা পুড়ে যায় না। এই একটা যোগশক্তিতে মনটাকে অন্য জায়গায় সরিয়ে দিয়ে জ্বলন্ত কয়লার উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন, আর যেখানে যাঁর মন সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাথে এক হয়ে আছে, তাঁর কাছে এগুলো দেখানোরই বা কি প্রয়োজন আর করারই বা কি প্রয়োজন! তাঁর গলা যদি কেউ কেটে দেয় তাতেও কিছু আসে যায় না, আর তিনি যদি কারুর গলা কেটে দেন, তাতেও তাঁর কিছু আসে যায় না – *হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান ন হন্তি ন নিবধ্যতে*। তিনি সমস্ত সৃষ্টির নাশ করে দিলেও, উনি কাউকে নাশ করেন না, ওনাকেও কেউ নাশ করে না। সোনার দোকানে এই গয়না গলিয়ে সেই গয়না বানাচ্ছে, সেই গয়না গলিয়ে আবার অন্য গয়না বানাচ্ছে, তাতে সোনার তো কোন ঘাটতি হচ্ছে না, সোনা সোনাই থাকছে, নাম আর আকৃতিটা পাল্টে যাচ্ছে। আত্মা ছাড়া যেখানে কিছু নেই, সচ্চিদানন্দ ছাড়া যেখানে কিছু নেই, সেখানে কিসেরই বা মৃত্যু আর কিসেরই বা জন্ম।

অবধূত গীতা থেকে আবার বলছেন, When the threefold bondage of knower, knowledge, and known ceases, there is the Atman. (*জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়-রূপ ত্রিবিধ বন্ধন যখন দূর হয়ে যায়, তখনই আত্মস্বরূপের প্রকাশ হয়।*) আমাদের যে জীবন, এই জীবন মানেই ত্রিপুটি, কর্তা, ক্রিয়া ও কর্ম, কর্ম এখানে দ্বিতীয়া। জগৎ যখন চলে, তখন সেখানে আমি আছি, তুমি আছ আর আমি ও তুমিকে জুড়ে দেওয়ার ক্রিয়া – এটাই সংসার। স্বামীজী বলছেন এই তিনটেই বন্ধন, এই তিন যখন এক হয়ে যায়, সেটাই তখন হয় দিব্যত্ব, অমরত্বে উত্তরণ। এই যে জগৎ, যেখানে আমি আছে, তুমি আছে, আমি আর তুমির যে সম্পর্ক তৈরী হয়, তার ক্রিয়া আছে। ঈশ্বর মানেই আমি নেই, তুমি নেই, যেখানে আমি-তুমি নেই সেখানে সম্পর্ক গড়ে ওঠারও কোন ক্রিয়া নেই – তিনটে মিলে এক হয়ে গিয়ে থাকে শুধু আত্মা। ধর্ম আর সংসারে এটাই তফাৎ। সংসার মানে কর্তা, কর্ম আর ক্রিয়া তিনটে আলাদা, আধ্যাত্মিকতায় কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়া তিনটে এক হয়ে যায়। আমরা একটা খুব সহজ উপমা দিয়ে এটাকে বুঝতে পারি। সাধারণ ভালবাসায় আমি তোমাকে ভালবাসি, তুমিও আমাকে ভালবাস। আবার অন্য রকমও আছে, তুমি ভালবাস আর নাই ভালবাসো, আমি তোমাকে ভালবাসব। কিন্তু এরও উপরে যখন যায়, তখন আমি আর তুমি মিলে এক হয়ে যায় – তুমিও যা আমিও তাই, আমিও যা তুমিও তাই। এরও উপরে আরেকটা ধাপে গিয়ে 'আমি আর তুমি এক', এটাও খসে যায় – থেকে যায় শুধু ভালবাসা। অনেক আগে এর উপর আমরা লম্বা একটা আলোচনা করেছিলাম।

সুফি সাধকরা এটাকে নিয়েই আলোচনা করেন, হিন্দুদের পুরো সাধনা শুধু এটাকে নিয়েই চলে – ভক্তি মানে এটাই। ভক্তিতেও ঠিক তাই হয়। প্রথমের দিকে আমি আছি আমার ইষ্ট আছেন, ইষ্টের প্রতি আমার ভালবাসা আছে। ভালবাসা বাড়তে বাড়তে আমি আর ইষ্ট দুটো মিলে এক হয়ে যায়। কিন্তু একটা স্তরে গিয়ে

ওটাও খসে পড়ে যায়, থেকে যায় শুধু ভক্তি, ভালবাসা। অদ্বৈত সাধনাতেও তাই হয়। প্রথমে আমি আছি, জগৎ আছে, হয়ে হয়ে অদ্বৈতে চলে যায়, তারপর ওটাও চলে যায়, থেকে যায় শুধু আত্মা। আত্মাও যা, ভক্তিও তাই, দুটোর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। কারণ তখন না আছে এক, না আছে দুই, না আছে শূন্য। ভক্ত ভক্তি দিয়ে শুরু করেছিল বলে বলা হয়, শুধু ভক্তি থেকে যায়। জ্ঞানীরা আত্মাকে দিয়ে শুরু করেন বলে বলা হয়, শুধু আত্মাই থেকে যান।

Where the delusion of bondage and freedom ceases, there the Atman is. (*যখন বন্ধন ও মুক্তি-রূপ অজ্ঞান চলে যায়, তখনই আত্মস্বরূপের প্রকাশ হয়।*) একই জিনিস হচ্ছে, ওই জায়গাতে কিসের বন্ধন, কিসের মুক্তি! ওখানে না আছে বন্ধন, না আছে মুক্তি, না আছে পাপ, না আছে পূণ্য; না আছে ধর্ম, না আছে অধর্ম।

অবধূত গীতা থেকেই স্বামীজী বলে যাচ্ছেন, What if you have controlled the mind, what if you have not? What if you have money, what if you have not? You are the Atman ever pure. Say, "I am the Atman. No bondage ever came near me. I am the changeless sky; clouds of belief may pass over me, but they do not touch me". (*মন-সংযম করে থাকো তাতেই বা কি, না করে থাকো তাতেই বা কি? তোমার অর্থ থাকুক তাতেই বা কি, আর নাই থাকুক তাতেই বা কি? তুমি নিত্যশুদ্ধ আত্মা। বলো – আমি আত্মা, কোন বন্ধন কখনও আমার কাছে ঘেঁষতে পারেনি। আমি অপরিণামী নির্মল আকাশ-স্বরূপ; নানাবিধ বিশ্বাস বা ধারণারূপ মেঘ আমার উপর দিয়ে চলে যেতে পারে, কিন্তু আমাকে তারা স্পর্শই করতে পারে না।*) আমার কাছে কিছু জিনিস আছে, কিছু জিনিস নেই, তাতে কোন কিছুই আমার আসে যায় না। অবধূত এখানে একটা উপমা নিচ্ছেন, আকাশ আছে, আকাশের উপর দিয়ে মেঘ ভেসে যাচ্ছে, কিছুক্ষণের জন্য আকাশ মেঘে ঢাকা পড়ে গেল। মেঘ সরে গেল, আকাশ আবার সেই আকাশ। সেই যে শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ, যিনি চৈতন্য, জ্ঞানস্বরূপ। জ্ঞানস্বরূপ কিনা, তিনি একটা কিছু চিন্তা করলেন। স্বপ্নে বা কল্পনায় আমরা যেমন কত কিছু তৈরী করে নিই, অনেকটা যেন ঠিক সেই রকম, তিনি চিন্তা করলেন, সৃষ্টি হোক, সৃষ্টি হয়ে গেল। সেই সৃষ্টিটাই যেন একটা কল্পনার মেঘ, মেঘটা ভেসে চলে গেল। তফাৎ শুধু, আকাশের মেঘ দশ মিনিটে ভেসে চলে যায়, আর ভাগবত পুরাণের মতে এই সৃষ্টির মেঘ তিনের উপর তেরোটা শূন্য দিলে যত সংখ্যা দাঁড়ায়, মোটামুটি সৃষ্টি তত বছর চলতে থাকে। সৃষ্টির মেঘ সরে গেল, তিনি আবার চিন্তা করলেন, আবার সৃষ্টি চলতে শুরু করল। এই কথাগুলো শুনলে আমাদের অবাক লাগবে ঠিকই, আতঙ্ক লাগে ঠিকই, কিন্তু এটাই সত্য। সবটাই তো স্বপ্ন।

স্বামীজী সেইজন্য বলছেন, স্বপ্নই যদি দেখতে হয়, তাহলে আমি চিরমুক্ত, এই স্বপ্নই দেখ না কেন! বাচ্চাদের একটা হাল্কা রসের গল্প আছে, দুই বন্ধু জঙ্গলে হারিয়ে গেছে। রাত্রিবেলা কোথায় যাবে, একটা গাছের উপর আশ্রয় নিয়েছে। এক বন্ধু বলছে, 'ইস্ এই খিদের সময় যদি একটু রুটি তরকারি পাওয়া যেত'। অন্য বন্ধু বলছে, 'রুটি তরকারি কেন, একটু যদি বিরিয়ানি আর তার সাথে পায়েস, মিষ্টি দই পাওয়া যেত'। বন্ধুটি তাকে বলছে, 'কি বলছিস! রুটি তরকারিই জুটছে না, তুই আবার বিরিয়ানির কথা ভাবছিস'। অন্য বন্ধুটি তখন বলছে, দুটোই তো কল্পনা, কল্পনাই যদি করতে হয় তাহলে ভাল ভাল জিনিসের কল্পনা করলেই হয়'। জগৎটাই কল্পনা, তাই জগতের দুঃখটাও কল্পনা, সুখটাও কল্পনা, সবটাই কল্পনা, কল্পনাই যদি করতে হয় তাহলে আমি মুক্ত, আমি অপাপবিদ্ধ কল্পনা করাই শ্রেয়। নিজেকে জন্মগত পাপী কল্পনা করার থেকে আমি চিরপূণ্য, এই কল্পনা করা অনেক ভাল। আমাদের সমস্যা হল, সব কিছু সমস্যার মূলে এই একটাই চিন্তা – এই জগৎ আর জগতের ব্যবহার এই দুটো জিনিস আমাদের কাছে বড্ড বেশি সত্য। অল্প একটু বিচার করে দেখলে আমরা দেখতে পারব যে, কিছুই কিছু না। এখানে জিনিসগুলো নিজের মত আসছে, নিজের মতই আবার চলে যাচ্ছে; মাঝখান থেকে আমরা এগুলোকে সত্য মনে করে সব কিছুর সাথে নিজেদের জড়িয়ে নিয়ে এই কাঁদছি, এই হাসছি।

অবধূত গীতায় দত্তাত্রেয় বলছেন, Burn virtue, burn vice. Freedom is baby talk. I am that immortal Knowledge. I am that purity. (*ধর্মাধর্ম, পাপপূণ্য সব পুড়িয়ে ফেলো। মুক্তি*

ছেলেমানুষি কথামাত্র। আমি সেই অবিনাশি জ্ঞান-স্বরূপ, আমি সেই পবিত্রতা-স্বরূপ।) কিসেরই বা পাপ, কিসেরই বা পূণ্য, সবই তো কল্পনা, পাপ পুড়ে যাক, পূণ্য পুড়ে যাক। মুক্তির কথাতো ছেলেমানুষি কথা, তুমি তো চিরমুক্ত, আমি সব সময় মুক্ত ছিলাম, মুক্ত আছি, মুক্ত থাকব। আমি সব সময় পবিত্র ছিলাম, পবিত্র আছি, পবিত্র থাকব। আমি যে বন্ধনে আছি, এটা কল্পনা মাত্র; আমি যে পাপ করেছি, এটাও কল্পনা মাত্র, নিজেকে দুর্বল ভাবাটাও কল্পনা।

একজন মানসিকরোগগ্রস্ত লোকের কি করে মাথায় ঢুকে গিয়েছিল, আমি একটা ইঁদুর। একজন সাইকাট্রিস্টের কাছে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ডাক্তার তাকে অনেক বুঝিয়ে, ওষুধ দিয়ে লোকটাকে ভাল করে দিয়েছে। শেষবারের মত চেক-আপ করাবার জন্য চেম্বারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ডাক্তার সব দেখেশুনে বললেন, এখন উনি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গেছেন। চেম্বার থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় দেখে একটা বেড়াল আসছে। সঙ্গে সঙ্গে লোকটি একটা কোণে লুকিয়ে গেছে। ডাক্তার দেখতে পেয়ে গেছেন। বলছেন, 'তুমি তো বুঝে গেছ তুমি ইঁদুর নও, তাও কেন ভয় পাচ্ছ'। লোকটি বলছে, 'আমি তো জেনে গেছি আমি ইঁদুর নই, কিন্তু বেড়ালটা তো জানে না যে, আমি ইঁদুর নই, সেইজন্য লুকিয়ে গেছি'। বেদান্তের কথা শুনতে শুনতে কিছুক্ষণের জন্য সবারই মনে হয়, আমি সিংহ হয়ে গেছি। কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে নামতে না নামতেই সবাই আবার কেঁচো হয়ে যায়।

তাহলে উপায় কি? দিনরাত শুনতে হয়; একদিন দুদিন শুনলে কিছু হয় না। সেইজন্য যেসব গুরুরা একটা মন্ত্র দিয়ে বলে দেন, এই মন্ত্র জপ করে যাও, তোমার সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে; এই ধরণের গুরুদের কাছে লাইন পড়ে যায়। শ্রাবণ মাসে তারকেশ্বর, বৈদ্যনাথ ধামে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ লোক বোল ব্যোম, বোল ব্যোম্ করতে করতে পায়ে হেঁটে পৌঁছে যাচ্ছে। লোকেদের কাছে এগুলো খুব সহজ কিনা, একটা রাত সবাই মিলে স্ফুর্তি মজা করতে করতে বোল ব্যোম করে করে হেঁটে চলে গেল। কিন্তু সারা জীবন ধরে একটা জিনিসে লেগে থেকে, একটা জিনিসকেই দিনের পর দিন ঘষে যাচ্ছে, যাচ্ছে তো যাচ্ছেই, একটু একটু করে এগোতে থাকছে – মানুষ পারে না। যারা লেগে আছে, তাদের জীবনের পরিবর্তন খুব ধীরে ধীরে হয়। আর বাকিরা সহজ একটা পদ্ধতি নিয়ে নিচ্ছে, গুরুরা বিজ্ঞাপন দিচ্ছে, নানা রকম মন্ত্রের কৌশল শিখিয়ে দিয়ে সাত দিনের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান পাইয়ে দিচ্ছে। কঠোপনিষদে যমরাজ এদের বলছেন, *অন্ধেনৈব নিয়মানা যথান্ধাঃ*, অন্ধ অন্ধকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। গুরুরাও যেমন তাঁর চেলারাও তেমন। কিন্তু এই ধরণের গুরুরাই পপুলার। হোক পপুলার, পপুলার হওয়াতে কোন দোষ নেই। পপুলার হওয়াও দরকার, কারণ চেলা যেমন তার গুরুও তেমনই পাবে। ওই রকম চেলারা তো আর ঠাকুরের মত গুরু পাবে না। গুরু যেমন হয় চেলা তেমন হয় না। চেলা যেমন হয়, গুরু তার তেমনই জোটে। প্রজারা যদি মুর্খ হয়, তাদের রাজাও সেই রকম মুর্খ হয়। আগেকার দিনে রাজা যেমন হত, প্রজারাও তেমন হত। এখনকার দিনে প্রজা যেমন, রাজা তেমন। চেলা যেমন গুরু তেমন। বেদান্ত যদি অনুশীলন করতে হয়, তাহলে বুঝে নিতে হবে যে, আমাকে সারা জীবন এই একটা জিনিসকে নিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে পড়ে থাকতে হবে।

আগেকার দিনে বিবাহ হয়ে যাওয়া মানে, সারা জীবন এই একজনকে নিয়েই কাটাতে হবে। ঠিক তেমনি, যেমনি কেউ বেদান্তকে ধরে নিল, সে জেনে গেল এটাই আমার জীবন। এরপর কোন কিছুই তার কাছে কিছু না। কারণ বেদান্তকে যদি বিশ্বাস করে এগিয়ে যায়, সে জেনে গেছে এর আগে আগে আমার কত জন্ম হয়েছে, মুক্তি না হলে আরও কত জন্ম হবে, না হয় একটা জীবন বেদান্তের জন্যই দিলাম। স্বামীজী বলছেন, তোরা একটা জন্ম আমাকে দিয়ে দে। আমরাও না হয় একটা জন্ম বেদান্তকে দিয়ে দিলাম। যবে থেকে সৃষ্টি হয়েছে, যত দিন এই সৃষ্টি চলবে, ততদিন আমাদের এই সৃষ্টির মধ্যে জন্মাতে হবে, মরতে হবে। তার মধ্যে বেদের হিসাবে মোটামুটি আমরা একশ বছর আয়ু নিয়ে জন্ম নিয়েছি। প্রথম কুড়ি বছর আমার কোন বোধ নেই, ষাট বছরের পর খাওয়া হজম হবে না। চল্লিশ থেকে ষাটে যাওয়ার পর ভাবতে থাকব, জীবনে কি পেলাম আর কি হারালাম। কুড়ি থেকে চল্লিশ হল মোটামুটি ভোগের সময়, খুব জোর হলে পয়তাল্লিশ। বিয়ে হয়ে থাকলে, পয়তাল্লিশ বছরের মধ্যে ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে উঠবে, তাদের দুশ্চিন্তায় মরতে হবে। মোটামুটি পঁচিশটা বছর ঠিক ঠিক ভোগের সময়। ফিজিক্স মতে পনেরশ কোটি বছর আগে এই সৃষ্টি শুরু হয়েছে, আর

আরও পনেরশ কোটি বছর সৃষ্টি চলবে। তার মধ্যে একটা জন্মের মাত্র পঁচিশ বছরের ভোগ, টাইম-স্কেলে লাগালে মাইক্রোস্কোপে খুঁজে পাওয়া যাবে না। সেটাকে নিয়ে এত আহামরি করার আছেটা কি! আর যদি পুনর্জন্ম সত্য হয়, আমি জন্মাচ্ছি মরছি, আবার জন্মাচ্ছি, মরছি, তখন আর ফিজিক্সের হিসাব চলবে না, তখন হিন্দুদের মতে তিনের পিছনে তেরোটা শূন্য আসবে, এত বছর সৃষ্টি চলবে। এর মধ্যে কত লক্ষ লক্ষ বার আমাদের জন্মাতে হবে আর মরতে হবে কোন হিসাব নেই, তার মধ্যে একটা জন্মের পঁচিশটা বছর যদি ত্যাগ করে দিই, তাতে কি এমন ক্ষতি হবে। আমি যদি ঠিক করে নিই, এই জন্মটা আমি বেদান্তকে দিয়ে দিলাম, এখন থেকে আমি যা যা স্বপ্ন দেখব, সেখানে কোন ভোগের স্বপ্ন দেখব না। আমার স্বপ্ন হবে, আমি শুদ্ধ, আমি পবিত্র, আমি নিত্য, আমি আছি, আমার চিন্তাগুলোও এই রকম হবে। আমাকে যদি ভাবতেই হয়, আমি ভাবব, আমি হলাম সর্বব্যাপী সেই আত্মা, আমার থেকেই সমস্ত সৃষ্টি, যা কিছু দেখছি সব আমার থেকেই বেরিয়েছে।

আমাদের সব শাস্ত্র এই কথাই বলছে। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে মা বলছেন, *একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা*, আমি ছাড়া এই জগতে দ্বিতীয় আছেটা কে! নিজেকে কিছুতো আমরা মানছি, নিজেকে হয় শরীর মানি, নাহলে নিজেকে বুদ্ধি মানি, নাহলে আত্মা মনে করি, ভক্তি করি, হয় মা চণ্ডীকে ভক্তি করি, না হয় কোন নেতা বা নেত্রীকে ভক্তি করি, কিছু তো একটা সবারই আছে। যেদিক দিয়েই যাওয়া যাবে, দেখা যাবে আমরা এই যে নিজেকে ভাবছি, আমার সুখ, আমার দুঃখ, আমার শোক, আমার মোহ, এর থেকে ফালতু জিনিস এই জগতে আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু এতেই আমাদের সুখ। জগতের সুখ, দুঃখ, আনন্দ, নিরানন্দ যাদের কাছে অমৃত মনে হয়, তাদের অমৃত মনে হোক, কিন্তু যাঁরা জ্ঞানের আলো দেখতে চাইছেন, তাঁরা কেন এর মধ্যে থাকবেন!

'No one was ever bound, none was ever free. There is none but me. I am the Infinite, the Ever-free. Talk not to me! What can change me, the essence of knowledge! Who can teach, who can be taught? (*কেউ কখন বদ্ধ হয়নি, কেউ কখন মুক্তও হয়নি। আমি ছাড়া কিছু নেই। আমি অনন্তস্বরূপ, নিত্যমুক্তস্বভাব। আমাকে আর শেখাতে এসো না – আমি চিদ্‌ঘনস্বভাব, কিসে আমার এই স্বভাব বদলাতে পারে? কাকেই বা শেখানো যেতে পারে? কে শেখাতে পারে?*) আমি ছাড়া তো কিছু নেই, কিসের বন্ধন, কিসের মুক্তি! একবার যখন জেনে গেল আত্মা ছাড়া কিছু নেই, তখন কিসের শিক্ষা দেওয়া, আর কে কাকে শেখাবে। রাজা জনক শুকদেবকে বলছেন, তুমি বাপু আগেই আমার দক্ষিণাটা দিয়ে দাও, কারণ একবার যেই তোমার অদ্বৈত জ্ঞান হয়ে যাবে, তখন কে কার আচার্য আর কে কার গুরু, দুজনই এক হয়ে যাবে। মাঝখান থেকে আমার দক্ষিণাটাই মার যাবে, সেইজন্য দক্ষিণাটা আগেই দিয়ে দাও।

বলছেন, Throw argument, throw philosophy into the ditch. (*তর্কযুক্তি, জ্ঞানবিচার, এগুলো আস্তাকুঁড়ে ছুড়ে ফেলে দাও।*) 'Only a slave sees slaves, the deluded delusion, the impure impurity'. (*বদ্ধস্বভাব লোকই অপরকে বদ্ধ দেখে, ভ্রান্ত ব্যক্তিই অপরকে ভ্রান্ত মনে করে, যে অপবিত্র, সেই অপবিত্রতা দেখে থাকে।*) তুমি কেন অপরকে পাপী দেখছ, কারণ তুমি নিজে পাপী। তুমি কেন অপবিত্র দেখছ? কারণ অপবিত্র তুমি নিজে। যে চুরি করে বেড়ায় সে মনে করে, জগতে আমি একাই চোর নই, সবাই চোর। কারণ তার মধ্যে চোরের ভাব আছে। আমরা মৃত্যুকে কেন এত দাম দিয়ে থাকি? কারণ আমাদের মধ্যে মৃত্যুর ভাব আছে। জীবনকে আমরা কেন এত মূল্য দিই? কারণ জীবনকে আমরা আঁকড়ে ধরে আছি। একজন এসে ঠাকুরকে বলছে, কেন আমি তো জন্মাতে ভয় পাই না। ঠাকুর শুনে তাকে বলছেন, পরিষ্কার করে বলো না, তোমার এখনও ভোগের ইচ্ছা আছে। যার ভোগের ইচ্ছা আছে, সে জন্মাতে চাইবে, যার ভোগের কোন ইচ্ছা নেই, সে কেন আবার জন্ম নিতে চাইবে।

Place, time causation are all delusions. It is your disease that you think you are bound and will be free. You are the Unchangeable. Talk not. Sit down and let all things melt away, they are but dreams. There is no differentiation, no distinction, it is all superstiation, therefore be silent and know what you are. (*দেশ-*

কাল-নিমিত্ত – এ-সবই ভ্রম। তুমি মনে করছ তুমি বদ্ধ আছ মুক্ত হবে – এটাই তোমার রোগ। তুমি অপরিণামী সত্তা। কথা বন্ধ কর, চুপ ক'রে বসে থাকো – সব জিনিস তোমার সামনে থেকে উড়ে যাক – ওগুলি স্বপ্নমাত্র। পার্থক্য বা ভেদ বলে কোন কিছু নেই, ও-সব কুসংস্কার মাত্র। অতএব মৌনভাব অবলম্বন কর, আর নিজের স্বরূপ অবগত হও।) যা কিছু তুমি দেখছ, এই যে দেশ-কাল-নিমিত্ত, সবটাই স্বপ্ন। যার মন যত চঞ্চল, সে তত বেশি বেশি স্বপ্ন দেখে। যার ভিতরটা দুঃখময়, সে দুঃখের স্বপ্ন দেখে। যে সুখের সাগরে ভাসছে, সে সুখের স্বপ্ন দেখে। যার ভিতরটা পাপে গিজগিজ করছে, সে চারিদিকে কেবল পাপ দেখে। এগুলোকে যদি বন্ধ করতে চাও, তাহলে সব কিছু বন্ধ করে দাও, বন্ধ করে আসনে স্থির হয়ে বসো, ধ্যান কর, ধ্যানে মনকে শান্ত করে দাও। কিভাবে মনকে শান্ত করবে? যোগের পদ্ধতিতে বা গুরু যেভাবে করতে বলে দিয়েছেন, ইষ্টের উপর ধ্যান করে একটা জায়গায় মনকে একাগ্র কর। মন যেমন যেমন শান্ত হবে, তোমার কাছে জগতের স্বরূপ তেমন তেমন পাল্টাতে শুরু হবে। যে স্বপ্নের মধ্যে আমরা বাস করছি, যে অজ্ঞানতা, কুসংস্কারে আমরা আচ্ছন্ন হয়ে আছি, সব ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। তখন তুমি দেখবে, তুমিই আছো, তুমি ছাড়া আর কিছু নেই।

'I am the essence of bliss'. Follow no ideal, you ar all there is. (*'আমি আনন্দ-স্বরূপ'। কোন আদর্শের অনুসরণ করার দরকার নেই – তুমি ছাড়া আর কি আছে?*) এসব কথা শুনলে আমাদের গা শিউড়ে ওঠে। কোন আদর্শ পালন করতে হবে না, কোন গুরুর আদেশ, কোন ইষ্টের কথা পালন করতে হবে না। কারণ, একমাত্র তুমিই আছ। ভগবান বুদ্ধের শিক্ষার ধরণও একই ছিল। সেইজন্য অবধূত গীতা জনমানসে সেই রকম সমাদৃত হয়নি। তার কারণ, অবধূত গীতার যে ধরণের উচ্চ অদ্বৈত ভাব নিয়ে এখানে আলোচনা চলছে, যা মাণ্ডুক্যকারিকারও ভাব, অত্যন্ত মুষ্টিমেয় কয়েকজনের জন্য, সবার জন্য নয়। কিন্তু তাই বলে সত্যটা কি, সেটা কেউ জানবে না, জানানো হবে না, তাতো হতে পারে না। আর তাই যাঁরা সাধারণ লোকের মনের মত করে অন্যান্য অনেক কিছুর সাথে একটু মিশিয়ে বলছেন, তাঁরা ভুল কিছু করছেন না। তাতেই অনেকে শুনে আঁৎকে ওঠেন। গীতাতেই ভগবান সাবধান করে দিয়েছেন, *ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্*, কারুর বুদ্ধিভেদ করতে নেই। লোকেদের যেমন বিশ্বাস আছে, তেমন বিশ্বাসকে নিয়েই তাদের চলতে দিতে হয়। অবধূত গীতা যিনি রচনা করেছেন, যাঁরা তাঁর খুব ঘনিষ্ঠ ও অধিকারী শিষ্য তাঁদের জন্য তিনি এই সব কথা বলছেন। সব গুরু সবার জন্য নয়, সব কথাও সবার জন্য নয়। তবে এগুলো একশ ভাগ সত্য। এসব কথা যে একেবারেই কাউকে জানানো হবে না, তাও ঠিক না। কিন্তু সাধনা কিভাবে হবে? গুরু যেভাবে করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন, কঠোর ভাবে সেই নির্দেশ অনুসারে সাধনা হবে। শেষে কোথায় পৌঁছাবে? স্বামীজী বা অবধূত গীতা যা যা বলছেন, সেখানে।

Fear naught, you are the essence of existence. Be at peace. Do not disturb yourself, (*কিছুতে ভয় পেও না। তুমি সারসত্তাস্বরূপ। শান্তিতে থাকো – নিজেকে ব্যতিব্যস্ত করো না।*) কিসের ভয়, কাকে ভয়। তুমিই তো সব কিছু, তুমিই তো আছ। আমাদের সমস্যা হল, অসংখ্য ছোটখাটো জিনিসের সাথে আমরা নিজেদের জুড়ে রেখেছি। ঠাকুর এক সময় দক্ষিণেশ্বর থেকে গিয়ে কামারপুকুরে আছেন। রোজ সকাল হলেই তিনি জিজ্ঞেস করতেন, আজ তোদের কি রান্না হবে বা ডালের ফোড়ণ দেওয়ার আওয়াজটা পেলুম না তো বা বলছেন, এমন সম্বার দিবি যে ঝাঁজ লেগে যায়। দুদিন না যেতে যেতেই ঠাকুর বলছেন, এ আমার কি হল! সকাল থেকেই দুপুরে কি খাব এই চিন্তা মাথায় ঘুরছে! নাঃ! আজ থেকে তোমরা যা রান্না করবে সেটাই আমি খাবো। আমরা ছোট ছোট এই ধরণের জিনিসগুলিকে আমাদের জীবনের কেন্দ্র করে রেখেছি। কোন কাজ নেই, তবুও আমরা কাজ তৈরী করে নিয়ে ওর মধ্যে নেমে পড়ি; এটাই আমাদের সমস্যা। আগাথা ক্রিস্টির খুব নামকরা কথা আছে – Man have to invent work, so as not to be insane, উন্মাদ হয়ে যাওয়া থেকে বাঁচার জন্য মানুষ কাজ বার করে নেয়। যাদের দুঃখের ভাব আছে, তারা দুঃখ আবিষ্কার করে নেয়, চোখের জল ফেলার জন্য একটা কারণ দরকার। যারা মদ খায়, তার মদ খাওয়ার একটা কারণ বার করে নেয়। খুশী হলে মদ খায়, দুঃখ পেলে মদ খায়, বৃষ্টি হলে মদ খায়, বৃষ্টি না পড়লে মদ খায়, কারুর বিয়ে হলে মদ খায়, কেউ মারা গেলে মদ খায়। যার যেটা স্বভাব, সেটা করার জন্য একটা

না একটা বাহানা বার করে নেবে। এগুলো থেকে তুমি বেরিয়ে এসো। আর যাই করো, তুমি নিজেকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলো না, মনের শান্তিকে বিঘ্নিত করো না, মনের শান্তিটাই সব।

You never were in bondage, you never were virtuous or sinful. Get rid of all these delusions and be at peace. Whom to worship? Who worships? All is Atman. To speak, to think is superstition. Repeat over and over, 'I am Atman,' 'I am Atman.' Let everything else go. (*তুমি কখনও বদ্ধ হওনি। পূণ্য বা পাপ তোমাকে স্পর্শ করেনি। এই সমস্ত ভ্রম দূর করে দিয়ে শান্তিতে থাকো। কাকে উপাসনা করবে? কেই বা উপাসনা করে? সবই তো আত্মা। কোন কথা কওয়া, কোন রূপ চিন্তা করাটাই কুসংস্কার। বার বার বলো – 'আমি আত্মা'। আর সব উড়ে যাক।*) দিবারাত্র বলো 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বা যাঁর ইষ্ট শিব, দিবারাত্র বলো ওঁ নমঃ শিবায়, শিবই সব, শিব ছাড়া কিছু নেই। এর বাইরে বাকি যা কিছু আছে, সবটাই শব্দ মাত্র, সবটাই বন্ধন, সবটাই কুসংস্কার। সব কিছুকে ছাড়ো আর বলো 'অহং ব্রহ্মাস্মি', শান্তিতে থাকো। এই হল অবধূত গীতার সারমর্ম।

<u>সোমবার, ২৯শে জুলাই; প্রাতঃকাল</u>

এইদিন স্বামীজী অনেক কিছু বলেছিলেন। সকালে এক প্রস্থ আবার দুপুরে আরেক প্রস্থ তিনি লেকচার দিয়ে গেছেন। দেববাণীর উপর আমরা অনেক দিন ধরে অনেক কিছু নিয়ে আলোচনা করে যাচ্ছি। এখন আমরা আশা করতে পারি, আধ্যাত্মিক জগতের অনেক আইডিয়াই আমাদের পরিষ্কার হয়ে গেছে। এদিনের ক্লাশেও স্বামীজী মূলতঃ অদ্বৈত বেদান্ত নিয়েই বলছেন। অদ্বৈত বেদান্ত ধারণা করা একটু কঠিন ঠিকই। কিন্তু কিছু কিছু জিনিস একবার যদি ধারণা করে নেওয়া যায়, তাহলে অন্যান্য জিনিসগুলো বুঝতে অনেক সহজ হয়ে যাবে। অনেকে বলেন, এসব কথা তো অনেক দিন যাবৎ শুনছি, কিন্তু জীবনে তো কিছুই হয় না। কিছু না হওয়ারই কথা, কারণ ধর্মজীবন শুনে হয় না, ধর্মজীবন অনুশীলনের মাধ্যমে তৈরী হয়। যতই আমরা বই পড়ি, যতই লেকচার শুনে যাই, ধর্মজীবন তৈরী হবে না, তবে আমাদের ভিতরে ক্ষীণ একটা সংস্কারের ছাপ পড়ে। ওই ক্ষীণ হাল্কা সংস্কারকে কাজে লাগাবোর জন্য জপ, ধ্যান, ত্যাগ, তপস্যার অভ্যাস করতে হয়। অভ্যাস যত জোর হবে, সংস্কারগুলো ততো শক্তিশালী ও গাঢ় হতে শুরু হবে। অবধূত গীতার কট্টর অদ্বৈতবাদের আলোচনা করার পর স্বামীজী আবার ঈশ্বর তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করছেন।

হিন্দু ধর্মে ঈশ্বরের নামকরণ

ঠিক ঠিক হিন্দু পরম্পরাতে হিন্দুরা ঈশ্বরকে বলেন সচ্চিদানন্দ। হিন্দুদের মধ্যে বিভিন্ন রকম ঈশ্বরের অবধারণা পাওয়া যাবে। কখন ঈশ্বরের গুণগুলিকে আধার করে তাঁর একটা নামকরণ হয়ে যায়। ইসলাম ধর্মে আল্লার নিরানব্বইটি নাম আছে। ওদের যে জপের মালা আছে, যাকে তসবী বলে, জপের মালাতে ওরা আল্লার নিরানব্বইটি নামের জপ করে। ইসলাম ধর্ম মূলতঃ ভক্তিমার্গের ধর্ম, শরণাগতির ধর্ম। বিভিন্ন ধর্মে যখন ঈশ্বরের নাম দেওয়া হয়, প্রত্যেক নামে পিছনে একটা ভাব থাকে। আমরা মানুষের যেভাবে নামকরণ করি, ওই ভাবে ঈশ্বরের নাম দেওয়া হয় না। কোন একটা ভাবকে মাথায় রেখে ঈশ্বরকে সেই ভাবানুযায়ী একটা নাম দেওয়া হয়। যখন রাম বলছি বা কৃষ্ণ বলছি, এগুলো কিন্তু ঈশ্বরের নাম নয়। যিনি ঈশ্বর তিনি রাম বা কৃষ্ণ হয়ে দেহধারণ করেছেন, যিনি ঈশ্বর তিনি রামকৃষ্ণ হয়ে দেহধারণ করেছেন। কিন্তু রাম বলতে কখন ঈশ্বর হতে পারে না, কারণ রাম একটি নাম। ঈশ্বরকে যদি কোন নাম দিতে হয়, তখন তাঁর যে গুণ, যে গুণ দিয়ে তিনি ঈশ্বর হন, তাঁর নামের ভাব ও অর্থও সেই গুণের কাছাকাছি যেতে হবে। যেমন বেদে ঈশ্বরের খুব প্রচলিত নাম পুরুষ। পুর মানে নগর, নগরে যিনি বাস করেন তাঁকে পুরুষ বলা হয়। জগতে যত প্রাণী আছে, সব প্রাণীর হৃদয়ে তিনি বাস করেন, সেইজন্য তিনি পুরুষ। ঈশ্বরের আরেকটি সব থেকে প্রচলিত নাম নারায়ণ। যখন সৃষ্টি হয় তখন সমস্ত যে কারণ জগৎ রয়েছে, সেই কারণ সলিলে তিনি অয়ন করেন, অর্থাৎ শয়ন করে, সেইজন্য তাঁর নাম নারায়ণ। ঈশ্বর মানে, যিনি সব কিছুর নিয়ন্তা, সব কিছুকে তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন। যেমন ভগবানের একটা নাম বিষ্ণু, তাঁর আবার হাজারটা নাম আছে, বিষ্ণুসহস্রনাম স্তোত্র অনেক হিন্দু নিত্য পাঠ করেন। তাতে দোষের কিছু নেই। কারণ বিষ্ণুকে একটা আকার দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আকার দিয়ে

বিষ্ণুকে দিয়ে অনেক কিছু করানো হয়েছে। যেমন শ্রীশ্রীচণ্ডীতে ভগবান বিষ্ণুকে দিয়ে মধুকৈটভের নাশ করানো হয়েছে, সেখান থেকে তাঁর নাম হয়ে গেল মধুসূদন। তাঁর যে একটা চরিত্র, যে চরিত্রে তিনি মধুকৈটভকে বধ করেছে। মধুসূদন কখন ঈশ্বরের নাম হতে পারে না। মধুসূদন নাম বিষ্ণুর।

তাহলে বিষ্ণু কি ঈশ্বরের নাম হতে পারে? হ্যাঁ, হতে পারে; কারণ বিষ্ণু শব্দের যে ব্যুৎপত্তি, যার অর্থ হল যিনি সবার মধ্যে বাস করেন। 'বিশ' ধাতু থেকে বিষ্ণু আসে, যার অর্থ সবার হৃদয়ে যিনি বাস করেন। সেইজন্য বিষ্ণু ঈশ্বরের নাম। কিন্তু মধুসূদন নামটা ঈশ্বরের নাম নয়, মধুসূদন বিষ্ণুর নাম। তাহলে আমরা বলতে পারি মধুসূদনও ঈশ্বরের নাম। না, ঈশ্বরের নাম হবে না, এটাই এখানে বোঝান হচ্ছে। কিন্তু যিনি বিষ্ণু ভক্ত, তিনি যখন হাজারটা নাম করবেন, তখন মধুসূদন নামটাও আসবে। আবার ভগবানের নাম শিব, উপনিষদেই বলছেন, শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্। শিব মানে শুভ, শিব মানে অদ্বৈত, শিব ভগবানের নাম। ব্রহ্মা কিছু অর্থে এইজন্যই ভগবানের নাম বলা যাবে, বৃ ধাতু থেকে ব্রহ্মা আসছে; বৃ মানে বৃহৎ, তিনি সবচেয়ে বৃহৎ, সেইজন্য ব্রহ্মা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিনটিকেই তাই ঈশ্বরের নাম বলা যাবে। কিন্তু যেমনি মহেশে আসবে তখন সমস্যা হয়ে যায়। মহা + ঈশ্ মহেশ, তার মানে গুণ দিয়ে কোথাও তাঁকে সীমিত করে দেওয়া হচ্ছে। তেমনি রামকৃষ্ণও একটা নাম, ঠাকুরের যে গুণ, এই নাম দিয়ে সেটা বোঝায় না।

ঠিক ঠিক ঈশ্বরকে বোঝানর জন্য সচ্চিদানন্দ সব থেকে উপযুক্ত নাম। কারণ পুরুষ বা বিষ্ণু নামের থেকেও এই নাম ঈশ্বরকে আরও বেশি প্রকাশ করে। আর জেহোবা নামটা খুব সুন্দর নাম। জহুদিদের ঈশ্বরের নাম জেহোবা, জেহোবার অর্থ যাঁর নাম উচ্চারণ করা যায় না। কিন্তু জেহোবা নাম ঈশ্বরের কোন গুণকে ইঙ্গিত করছে না। কারণ সবটাই যদি নেতি নেতি করে চলে, তখন কোথাও গিয়ে একটা সন্দেহ উঁকি মারবে, ঈশ্বর আছেন কি নেই। ঈশ্বরকে বোঝার জন্য যদি কোন শব্দ আমরা আনতে চাই, তাহলে ওই শব্দের আকার ইঙ্গিতে এমন কোন ভাব ও অর্থ থাকবে, যার দ্বারা তাঁর কোন বিশেষ গুণকে আমরা ধরতে পারি। অথবা পৌরাণিক কাহিনীতে ঈশ্বরকে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে তাঁর যে চরিত্র ফুটে উঠছে, ঘুরে ফিরে সেই চরিত্রই চলে আসছে, ঈশ্বরের নাম সেই চরিত্রকে আকার ইঙ্গিতে মনে করিয়ে দেবে। কিন্তু রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ বা শ্রীরামকৃষ্ণ, যাঁরই নাম আমরা নিই না কেন, ওই নাম কিন্তু কখনই ঈশ্বরকে ইঙ্গিত করে না। কারণ এনারা এই পৃথিবীতে দেহধারণ করে জন্ম গ্রহণ করেছেন এবং তাঁদের বাবা-মা বা পরিজনরা বা ভক্তরা যে নামকরণ করেছেন, একজন মানুষ হিসাবেই সেই নামকরণ করা হয়েছে। গৌতম বুদ্ধের নাম সিদ্ধার্থ ছিল; পরে তিনি যখন আত্মজ্ঞান বোধে বোধ করে নিলেন, তখন তিনি হয়ে গেলেন বুদ্ধ। সেইজন্য ওনারা সব সময় বলেন, বুদ্ধ কোন নাম না, বুদ্ধ একটা অবস্থা। ঠিক তেমনি ঈশ্বর কোন নাম না, ঈশ্বর একটা অবস্থা; সচ্চিদানন্দ কোন নাম না, ওটা একটা অবস্থা – একটা চারিত্রিক গুণ। এই জিনিসটাকে স্বামীজী এবার আলোচনা করছেন। মন, ইন্দ্রিয় দিয়ে যে জানার ব্যাপারটা আসে, তাতে শুধু এই সংসারের জিনিসকেই জানা হয়। মন ইন্দ্রিয়ের পারে গেলে তবেই ঈশ্বরকে বোধ বোধ করতে পারে, আর তখন তাঁর কোন নাম হতে পারে না।

স্বামীজী বলছেন, We sometimes indicate a thing by describing surroundings. (*আমরা কখন কখন কোন জিনিস নির্ণয় করতে হলে তার পরিবেশ বর্ণনা করে থাকি।*) ন্যায়শাস্ত্রে একটা খুব সুন্দর সূত্র আছে, বলছেন *ছত্রীন্যায়*। আগেকার দিনে খুব কম লোক ছাতা ব্যবহার করত। রাজা, জমিদার বা খুব বড় গণ্যমান্য পুরুষরাই ছাতা নিয়ে চলতেন। যে ছাতা নিয়ে যাচ্ছে, তার সাথে সাথে অনেকেই যাচ্ছে। তখন বলা হয় ছত্রী যাচ্ছে। ছাতা তো যায় না, যাচ্ছে মানুষ। কে যাচ্ছে? যার মাথায় ছাতা আছে। একটা পরিবেশকে নিয়ে যে একটা পরিস্থিতির চিত্র ফুটে উঠেছে, সেই পরিস্থিতিকে আধার করে একটা নামকরণ করে দেওয়া হয়। গ্রাম দেশে একটা সাদা গরু, তার নামকরণ করা হল ধবলী। When we say 'Sachchidananda' (Existence-Knowledge-Bliss), we are merely indicating the shores of an indescribable Beyond, (*আমরা যখন বলছি 'সচ্চিদানন্দ' সৎ-চিৎ-আনন্দ, প্রকৃতপক্ষে তখন আমরা সেই অনির্বাচ্য সর্বাতীত সত্তারূপে সমুদ্রের তটের কিছু কিছু বর্ণনা করছি মাত্র।*) কথামৃতে ঠাকুর বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলছেন, ব্রহ্ম শব্দ কখন উচ্ছিষ্ঠ হয়নি। এখানে যুক্তিটা খুব সহজ। যে কোন জিনিসকে বর্ণনা করতে গেলে কিছু শব্দের দরকার, এরপর তার নামকরণ করার সময়, সেটাকে কেন্দ্র করে যা কিছু হয়ে

গেছে, তাকে আধার করে নামকরণ হবে। এখানে সন্তানের নামকরণের কথা বলা হচ্ছে না, বস্তুর নামকরণের কথা বলা হচ্ছে। বাজারে যে জিনিসগুলো কেনাকাটা করছি, সব সময় যে জিনিসগুলো ব্যবহার করছি, সব কিছুরই নাম আছে, আর কোথাও না কোথাও সেই দ্রব্যের একটা গুণ রয়েছে, সেই গুণের সঙ্গে সম্বন্ধ করে তার নাম আসছে। তার মানে, নামের আগে আসে তার বর্ণনা। বর্ণনার আগে মন পুরোপুরি বুঝে নিয়েছে এই জিনিসটা কি। যার জন্য অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, একটা নামকরণ করা হয়েছিল, কিন্তু পরে দেখা গেলে জিনিসটা তা নয়, অনেক সময় তখন নামটা একটু পাল্টে যায়। স্বামীজীর সময় আকাশে যে বিদ্যুৎ চমকাতো তখন সবাই মনে করত, এটা এক ধরণের আগুন, তার নামই ছিল electrical fire। স্বামীজীও কয়েক জায়গায় electrical fire শব্দটা ব্যবহার করেছেন। কিন্তু স্বামীজীর বেশ কিছু আগেই বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন দেখালেন, বিদ্যুৎ যে চমকায় এটা আগুন না, এটা static electricity। পরে electrical fire শব্দটা চলে গিয়ে ধীরে ধীরে নাম হয়ে গেল, static electricity আর current electricity, নাম পাল্টে গেল। সেখান থেকে নাম হয়ে গেল alternative current, direct current। এই নামগুলির সাথে বস্তুর চরিত্রের সরাসরি সম্বন্ধ রয়েছে। এখন আমরা ঈশ্বরকে বলছি সচ্চিদানন্দ। ঈশ্বরের যতগুলো নাম হতে পারে, তার মধ্যে সচ্চিদানন্দ খুব সুন্দর ও উপযুক্ত নাম, কারণ এই নাম দিয়ে ঠিক ঠিক ঈশ্বরের বর্ণনা করা হচ্ছে। পুরুষ নামটাও তাই, ঈশ্বর নামটাও তাই, যিনি সব কিছুকে ঈশন্ অর্থাৎ শাসন করেন।

বলছেন, ঈশ্বর যিনি অনন্ত সমুদ্র, সেই সমুদ্রের কিনারা পর্যন্ত আমি পৌঁছে গেছি। তাঁর কিনারা দেখে ওই সমুদ্রের একটা নামকরণ করে দেওয়া হচ্ছে। ঈশ্বরকে যে আমরা সচ্চিদানন্দ বলছি, তার মানে এই নয় যে, ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ, তার মানে এই নয় যে ঈশ্বর সৎ, তার মানে এই নয় যে ঈশ্বর চিৎ, তার মানে এই নয় যে ঈশ্বর আনন্দ। কিন্তু তাঁর যে তটভূমি, যেখানে এসে সবাই থেমে যাচ্ছে, ঠিক ওই অবস্থায় ওই জিনিসটাকে দেখে পুরো জিনিসটার একটা নামকরণ করে দেওয়া হচ্ছে। এটাই স্বামীজী শুরুতে বললেন, surroundingsকে আধার করে নামকরণ করে দেওয়া হয়। যেমন, সঙ্গীতের একটা সুরের নামকরণ করা হচ্ছে, পাহাড়ী ধুন, পাহাড়ী অঞ্চলে কেউ এই রকম কোন সুর শুনেছে। কোন সিদ্ধপুরুষ সমাধিতে গিয়ে যখন ডুবে যান, তখন তাঁর মন নেই। মন থাকে না বলে জানারও কোন পথ নেই, কিন্তু যখন ওখান থেকে ফেরত আসেন, তখন তাঁর একটা আনন্দের বোধ থাকে, একটা চৈতন্যের বোধ, তিনি আছেন এই বোধ থাকে। কিন্তু এই জিনিসগুলো তিনি ওখান থেকে বেরিয়ে এসে বুঝছেন। ঘোর নেশায় মানুষ কত কিছু করে বেড়ায়, কিন্তু সেই সময় তার কোন হুঁশ থাকে না। হুঁশ যখন একটু একটু করে আসতে থাকে, তখন তার একটা খুব আবছা আবছা মনে হয় যে, কিছু একটা হয়েছিল। তুলনাটা পুরোপুরি ঠিক নয়, বোঝানর জন্য বলা হল।

কেনোপনিষদে শিষ্য গুরুকে বলছেন, *নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ। যস্তদ্বেদো তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ।।* আমি এটা মনে করি না যে, আমি আত্মজ্ঞান ভাল করে বুঝে গেছি, এটাও বলতে পারছি না যে, এটা আমি জানি না। ঠাকুর সেইজন্য বার বার বলছেন, অস্তি নাস্তির পারে। একটা জিনিসকে জানা মানে অস্তি জ্ঞান, যখন জানছি জিনিসটা নেই, তখন সেটা নাস্তি জ্ঞান। এই ঘরে হাতি নেই, এটা নাস্তি জ্ঞান। জ্ঞান এই দুটি – নাস্তি জ্ঞান আর অস্তি জ্ঞান। ঈশ্বরের ব্যাপারে অস্তি জ্ঞান বলা যাবে না, নাস্তি জ্ঞান, সেটাও বলা যাবে না। সেইজন্য যখনই ঈশ্বরের ব্যাপারে বলা হয়, তখন হাল্কা ইতি জ্ঞান দিয়ে আর বাকিটা নেতি জ্ঞান দিয়েই বলা হয়। বেদান্তে সেইজন্য যখনই ঈশ্বরের বর্ণনা করা হয় তখন সব সময় নেতি নেতি করে বর্ণনা করা হয়। আর ইতি করে যদি বলা হয়, তাহলে খুব অল্প করে সচ্চিদানন্দ, পুরুষ, ঈশ্বর এই ধরণের একটা নাম দেওয়া হয়, যেটা হল surroundings, সমুদ্রের কিনারা, ওইটাকে আধার করে বলা হচ্ছে। কারণ ঈশ্বর ইতি-নেতির পারে, এক-দুইয়ের পারে, সব কিছুর পারে। কেন সব কিছুর পারে? কারণ মন ওটাকে ধরতে পারে না, মন সান্ত, তিনি অনন্ত। যার জন্য তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলছেন, *যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ*। মন তাঁকে ধরতে পারে না, একসের ঘটিতে তিন সের দুধ বা জল ধরবে না, মন হল একসের ঘটি। মন ধরতে পারে না, তাই বাণী দিয়েও তাঁকে ব্যক্ত করা যায় না।

একমাত্র যেভাবে ঈশ্বরের বর্ণনা করা যেতে পারে

সেইজন্য বলছেন, Not even can we say 'is' about it, for that too is relative. (*আমরা এ-কে 'অস্তি' বলতে পারি না, কারণ 'অস্তি' বলতে গেলেই তার বিপরীত 'নাস্তি'র জ্ঞানও হয়ে থাকে, সুতরাং তাও আপেক্ষিক।*) আমরা যখন 'আছে' বলছি, ওটা তখন আপেক্ষিক হয়ে যায়, একটা জিনিস নেই, সেটার সাথে তুলনা করে বলা হচ্ছে – এটা আছে। কিন্তু ঈশ্বরের ক্ষেত্রে কোন তুলনাত্মক কিছু থাকে না বলে সেটা বলা যায় না। Any imagination, any concept is in vain. Neti, neti ('Not this, not this') is all that can be said, for even to think is to limit and so to lose. (*তাঁর সম্বন্ধে কোন ধারণা, কোন প্রকার কল্পনা ঠিক ঠিক হতে পারে না। কেবল 'নেতি, নেতি' – এ নয়, ও নয় – এই বলেই তাঁকে বর্ণনা করা যেতে পারে, কারণ তাঁকে চিন্তা করতে গেলেও সীমাবদ্ধ করতে হয়, সুতরাং চিন্তা দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় না।*) এই প্যারার শেষ লাইনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। দেববাণীতে বার বার এই ভাবটা ঘুরে ঘুরে আসে। ঈশ্বর অনন্ত, যিনি বাণীর মধ্যে ঈশ্বরকে বেঁধে দিলেন, তিনি বলতে চাইছেন, তাঁর মন সেটাকে ধরতে পেরেছে। মন ধরতে পেরেছে মানে, তাঁকে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হল। যেমনি তাঁকে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হল, তার মানে তিনি হারিয়ে গেছেন, তিনি আর ওটাকে ধরতে পারেননি। যদি ধরতে পারতেন, তাহলে তিনি বুঝতেন যে তিনি অনন্ত। যিনি অনন্ত তাঁকে সীমাবদ্ধ করা যায় না। যাঁকে সীমাবদ্ধ করা যায় না, তাঁকে নিয়ে কোন ধরণের চিন্তা-ভাবনাও করা যায় না।

ফিজিক্সে হাইজেনবার্গের uncertainity principle আছে, তাতে বলা হয় যে, ইলেক্ট্রন আদি যে পার্টিকেলস থাকে, তাতে দুটো জিনিস জুড়ে থাকে। এই দুটোর একটাকে আমরা যত ভালভাবে জানব, দ্বিতীয়টার ব্যাপারে তত কম জানব। ধরা যাক, একটা ইলেক্ট্রন কোথায় আছে আর কি স্পীডে ঘুরছে আমরা জানতে চাইছি। এখন যদি ও কত স্পীডে ঘুরছে যত ভাল জানব, যদিও পুরো সঠিক স্পীড কেউ জানতেই পারবে না; কারণ যদি পুরো ঠিক ঠিক জেনে নেয়, তাহলে ওই ইলেক্ট্রন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে কোন জায়গায় থাকতে পারে, এটাকে বলা হয় uncertainity principle। দুটো জিনিস যেটা জুড়ে আছে, তার একটা জিনিসকে যতটা সঠিক ভাবে জানব, তাহলে দ্বিতীয়টাকে তত কম ভাবে জানব। দুজন বন্ধু, দুজনকে আমরা ইলেক্ট্রনের তুলনা করছি। তখন জিনিসটা এই রকম হবে – এই বন্ধুটি কোথায় আছে? এই ঘরের ভিতরেই কোথাও আছে। তাহলে দ্বিতীয় বন্ধু কোথায় আছে, মোটামুটি এই ঘরের কোথাও আছে। এবার যদি ওকে ধরতে যাওয়া হয়; এ কোথায় আছে? এই এক মিটারের মধ্যেই কোথাও আছে। তাহলে সে কোথায় আছে? সারা কলকাতা জুড়ে আছে। আর যদি বলা হয় এ কোথায় আছে? তিরিশ সেন্টিমিটারের এদিক সেদিকের মধ্যে আছে। তাহলে সে কোথায় আছে? সারা ভারতবর্ষের যে কোন জায়গায় থাকতে পারে। দুটোর inter-dependent এমন রয়েছে যে, একটাকে যত ধরব, দ্বিতীয়টা তত দূরে পালাবে। ইদানিং ফিজিক্সের খুব সাধারণ স্তরে এই জিনিসগুলো পড়ানো হয়।

মনকে যেমনি বেঁধে দেওয়া হল, অর্থাৎ জ্ঞান এই জায়গাতে বেঁধে দিলাম, ঈশ্বর অনন্ত হয়ে গেলেন, তাই তাঁকে জানা সম্ভব না। আসলে ঈশ্বর সব সময়ই অনন্ত। যেমনি আমি মনে করছি আমি ঈশ্বরকে বেঁধে নিয়েছি, তাহলে বুঝতে হবে আমি অজ্ঞানের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছি। যিনি মনে করেন, মন দিয়ে, যুক্তি দিয়ে আমি ঈশ্বরকে জেনেছি, বুঝতে হবে তিনি অজ্ঞানের শেষ অবস্থায় চলে গেছেন। সেইজন্য ঈশ্বরের যে কোন নাম যখন দেওয়া হয়, আমরা তাঁকে ভগবান বলি, পুরুষ বলি, সচ্চিদানন্দ বলি, অর্থটা সব সময় হল; সেই অনন্ত মহাসমুদ্র, তার যে কিনারা, সেই কিনারাটা মোটামুটি আমি বুঝতে পেরেছি। ওই কিনারার আমি একটা নামকরণ করলাম, সেই নামকরণ দিয়ে আমার সামনে যে বিস্তীর্ণ সমুদ্র, ওটারই নামকরণ হয়ে গেল। কিন্তু তাই বলে যে, এটা ঈশ্বর গুণ হবে, তা নয়। রামানুজ যখন বলছেন, সৎ, চিৎ ও আনন্দ এই তিনটে ঈশ্বরের গুণ, অদ্বৈত বেদান্ত এই জিনিসটা কখনই মানবে না। জপ-ধ্যান, পূজা করার সময় আমরা দ্বৈত হতে পারি, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী হতে পারি, কিন্তু দার্শনিক সত্য যেটা, সেটা এটাই যে, ওই জায়গার আর কোন নামকরণ করা যায় না; তার কারণ ওর কোন গুণ নেই। গুণ হওয়া মানেই কোন জিনিসের সাথে তাকে তুলনা করতে হবে। তুলনা করতে গেলেই মন ওই জায়গাতে নাক গলাবে, মন নাক গলানো মানে, তাঁকে সীমিত করে দেওয়া হল। অসীমকে কখন সীমিত করা যায় না। স্বামীজী এই কথা ঈশ্বরের ব্যাপারে বলছেন। এগুলো আগে আমরা অনেকবার আলোচনা করেছি। আর যে কোন উপনিষদে এই জিনিসটাই ঘুরে ঘুরে আসবে।

ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয় যে, আজকের দিনে আমরা নিজেদের এত বুদ্ধিজীবি মনে করি, কথায় কথায় আমরা সব কিছুকে scientific করতে বলি। কিন্তু আমাদের পূর্বজরা আজ থেকে পাঁচ হাজার, ছয় হাজার বছর এই জিনিসগুলিকে এত সুন্দর পদ্ধতিতে সাজিয়ে রেখে দিয়ে গেছেন যে, কোন উপনিষদের সাথে কোথাও কোন দ্বন্দ্ব নেই। এরপর ইন্দ্রিয়গুলি যে কত সীমিত, সেটাকে নিয়ে বলছেন।

The senses cheat you day and night. (*ইন্দ্রিয়গুলি দিবারাত্র ভুল জ্ঞান দিয়ে প্রতারিত করে যাচ্ছে।*) ইন্দ্রিয়গুলি দিনরাত আমাদের বোকা বানিয়ে চলেছে। Vedanta found that out ages ago, modern science is just discovering the same fact. (*বেদান্ত অনেককাল আগে এটা আবিষ্কার করেছে। আধুনিক বিজ্ঞান সবেমাত্র ঐ তত্ত্বটি বুঝতে আরম্ভ করেছে।*) যেমন আমাদের সামনে এই টেবিল রয়েছে। দিনরাত আমরা এই টেবিলকে ব্যবহার করছি, কিন্তু এই টেবিলকে আমরা কতটুকু জানি? টেবিলকে দেখে বলছি, টেবিলটা খুব smooth। যেমনি একটা লেন্স নিয়ে দেখতে যাচ্ছি, তখন দেখছি টেবিলটার উপরটায় অনেক উঁচু নিচু রয়েছে। লেন্স দিয়ে দেখলে রঙটাও পাল্টে যাচ্ছে। যখন মাপতে যাব, তখন মাপার যন্ত্র যত সূক্ষ্ম হবে, তত তার মাপ পাল্টে যাবে। স্বামীজী বলছেন, A picture has only length and breadth, and the painter copies nature in her cheating by artificially giving the appearance of death. (*একটা ছবিতে প্রকৃতপক্ষে কেবল দৈর্ঘ্য ও প্রস্থই থাকে। কিন্তু চিত্রকর ছবিখানিতে কৃত্রিমভাবে গভীরতার ভাব ফলিয়ে প্রকৃতির প্রতারণা অনুকরণ করে থাকে।*) আমরা জানি একজন চিত্রকর যখন ক্যানভাসে ছবি আঁকে, সেই ছবিতে শুধু দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ থাকে, ছবি একটা দ্বিমাত্রিক জিনিস বলা যেতে পারে। কিন্তু এমন নিপুণ ভাবে রঙ দেওয়া হয় যে, তাতে গভীরতা এসে যায়, দ্বিমাত্রিককে একটা ত্রিমাত্রিক ভাবে নিয়ে আসছে। বলছেন, ইন্দ্রিয়গুলিকে কিভাবে প্রতারণা করে দিচ্ছে, অথচ জিনিসটা দ্বিমাত্রিক। একটা ছবিতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, গাছটা অনেক দূরে আছে, আর এই বাড়িটা কাছে, এই গভীরতাটা নিয়ে আসছে। এখানেই চিত্রকর আমাদের ইন্দ্রিয়কে প্রতারণা করে দিচ্ছে।

জন্ম-মৃত্যু, গতি, পরিবর্তন – এটাই মায়া

No two people see the same world. (*দুজন লোক কখনও জগৎকে এক রকম দেখে না।*) কোন পরিস্থিতিতে দুজন মানুষ কোন একটা সত্যকে একই রকম দেখছে, তা হতে পারে না। The highest knowledge will show you that there is no motion, no change in anything; that the very idea of it is all Maya. (*চূড়ান্ত জ্ঞান লাভ হলে তুমি দেখতে পাবে, কোন বস্তুর কোন প্রকার গতি নেই – কোন প্রকার পরিণাম নেই; কোন প্রকার গতি বা পরিবর্তন আছে, আমাদের এই ধারণাই মায়া।*) সেখান থেকে স্বামীজী এবার মায়া জিনিসটাকে টেনে আনছেন। যখন উচ্চতম জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, তখন দেখবে কোথাও কোন গতি নেই, কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না, গতি বা পরিবর্তন যা কিছু হচ্ছে বলে যে তুমি মনে করছ, এটাই মায়া। যিনি অনন্ত তিনি কোথায় যাবেন, তাঁর যাওয়ার তো কোন জায়গাই নেই। আমাদের সমস্যা হল, অনন্ত বললেই আমাদের বিরাট এক সমুদ্রের কথা বা আকাশের ছবি মনে ভেসে ওঠে। কিন্তু সমুদ্রের উপর জায়গা আছে, সেইজন্য ঢেউ খেলতে পারে। আর সমুদ্রেরও সীমা আছে, ইচ্ছে করলে সে কিনারায় চলে আসতে পারে। কিন্তু যিনি সচ্চিদানন্দ, আত্মা, তিনি অনন্ত, তাঁর যাওয়ার কোন জায়গা নেই; সেইজন্য কোন গতি নেই। কিন্তু আমরা তো সব সময় গতি দেখছি, মানুষ জন্মাচ্ছে, মরছে, এটাই মায়া। যদি কেউ সেই উচ্চতম অবস্থায় পৌঁছে যেতে পারে, তখন সে দেখবে, না আছে জন্ম, না আছে মৃত্যু, না আছে পূণ্য, না আছে পাপ, না আছে ধর্ম, না আছে অধর্ম।

Study nature as a whole, that is, study motion. Mind and body are not our real self; both belong to nature, but eventually we can know the *Ding an sich*. Then mind and body being transcended, all that they conceive goes. (*প্রকৃতিকে সমষ্টিভাবে আলোচনা কর অর্থাৎ গতির তত্ত্ব আলোচনা কর। দেহ ও মন কোনটাই আমাদের যথার্থ আত্মা নয় – দুই-ই প্রকৃতির অন্তর্গত, কিন্তু কালে আমরা এদের ভিতরের সারসত্য – যথার্থ তত্ত্বকে জানতে পারি। তখনই আমরা দেহ-মনের পারে চলে যাই, সুতরাং দেহ-মনের দ্বারা যা কিছু অনুভব হয়, তাও চলে যায়।*) *Ding an*

sich এটা একটা জার্মান শব্দ, যার অর্থ জিনিসটা যে কি সেটাকে জানা, অর্থাৎ জিনিসটার সারতত্ত্ব। সমস্যা হল, আমরা সব সময় একটা জিনিসকেই দেখি। আমি যখন মাইক্রোফোনকে দেখছি, তখন মাইক্রোফোনকেই দেখছি, পুরো জগৎকে একসাথে নিই না। আমি যখন জীবনকে দেখছি তখন আমার জীবনকে বা আমার খুব কাছে যারা আছে তাদের জীবনকেই শুধু দেখছি, তার বাইরে আশেপাশে কিছু দেখছি না। ফলে আমরা গতি দেখছি। কিন্তু যেমনি আমরা পুরো জিনিসটাকে একসাথে নিয়ে দেখব, তখন দেখা যাবে ধীরে ধীরে আমাদের ধারণাগুলি পাল্টাতে থাকবে। হস্টেলের একটা ছাত্র পূজার ছুটি কাটিয়ে হস্টেলে ফিরেছে। তার শিক্ষক তাকে জিজ্ঞেস করছে, 'কিরে পূজা কেমন কাটল'? ছাত্রটি বলছে, 'দারুণ, খুব মস্তি মেরেছি'। 'কি মস্তি মারলে'? 'প্রচুর চুরি করেছি'। 'যাক এতদিনে তোমার কিছু শক্তি হল। তা কি চুরি করলে'? 'বাড়ি থেকে মিষ্টি'। 'কার বাড়ি থেকে'? 'নিজের বাড়ি থেকে'। 'তোমরা ক ভাইবোন'? 'আমি একা'। 'তুমি একা! সব সম্পত্তি তো তোমারই, এটা চুরি কি করে হল'! 'দশমীতে যারা বিজয়া করতে আসবে তাদের জন্য মা কিছু মিষ্টি আলাদা করে রেখে দিয়েছিল, আমি ওখান থেকে লুকিয়ে কিছু খেয়েছি'। শিক্ষক বলছেন, 'তোমার চুরিটা কি রকম জানো – তুমি বুক পকেটে টাকা রেখেছ, বুক পকেট থেকে টাকা সরিয়ে প্যান্টের পকেটে রাখলে, আর বলে বেড়াতে লাগলে, আমি নামী চোর, বুক পকেট থেকেও টাকা বার করে নিতে পারি। কার পকেট থেকে? নিজের পকেট থেকে'। যখন আমরা ব্রহ্ম, মায়া, গতি, জন্ম-মৃত্যু এই জিনিসগুলিতে যাই; যদি বলে পকেট থেকে টাকা চুরি করে নিয়েছে। ঠিকই, চুরি করেছে। নামকরা চোর, একেবারে ঠিক। কিন্তু কার পকেট থেকে টাকা চুরি করেছে? নিজের ডান পকেট থেকে চুরি করে বাম পকেটে রেখেছে। পুরো কাহিনীটাই চুপসে গেল। আলাদা করে যখন দেখছি, তখন জন্ম, মৃত্যু, সব কিছু হচ্ছে। যখন সবটাকে মিলিয়ে দেখব, তখন কিসের জন্ম, কিসের মৃত্যু, কে যাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে? কিছুই হচ্ছে না। এই ঘর থেকে সেই ঘর, ডান পকেট থেকে বাম পকেটে। শোনার সময় এগুলো খুব ভাল লাগে, তাই তো ঠিকই বলা হচ্ছে। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে অনুশীলনের করার সময় দম বেরিয়ে যায়, এর মত কঠিন কিছু আছে বলে মনে হয় না। কঠিন তো মনে হওয়ারই কথা, প্রথম অ আ ক খ লিখেতে গিয়ে তোমাকে কত খাটতে হয়েছে। যেখানে যে জিনিসগুলো আমার আপনার জীবনকে পাল্টে দেবে, আমাদের আশেপাশের সবার জীবনকে পাল্টে দেবে, সেখানে সেই জিনিসগুলো জীবনে অনুশীলন করা কি করে সহজ হবে!

বলছেন, এই জিনিসটাকে যখন দেখতে শুরু করে, তখন একটা সময় আসে যখন মানুষ সব গতির পারে, আপেক্ষিক জিনিসগুলির পারে চলে যায়। জিনিসটা যেমন সেটাকে তেমন দেখতে শুরু করে। যেমন সোনার গয়না, গয়না দেখে দেখে আমরা এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে, আসলে যে ওটা একটা সোনা, সেটা মাথা থেকে নেমে গেছে। একজন রসায়নবিদের কাছে গয়নার কোন দাম নেই, তার কাছে দাম হল সোনার। সেইজন্য আমাকে আগে ঠিক করতে হবে, আমি গতি চাই, নাকি স্থিতি চাই। গতি চাওয়া মানেই, আমি মায়াকে চাইছি, গতিতে আমার মজা লাগছে, লাগুক। কিন্তু তত দিন আমি জিনিসটার স্বরূপকে জানতে পারব না। স্বরূপ জানার জন্য পুরো প্রকৃতিকে একসাথে নিয়ে আসতে হবে, তখনই স্বরূপকে জানা যাবে, তখনই সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে।

When you cease utterly to know and see the world, then you realize Atman. (*যখন তুমি এই জগৎ-প্রপঞ্চকে দেখতে পাবে না, বা জানতে পারবে না, তখনই তোমার আত্মোপলব্ধি হবে।*) আমরা এখন যে জগৎকে দেখছি, এই দেখাটা যেদিন পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে, সেদিনই আত্মার জ্ঞান হবে, তার আগে হবে না। এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে, জগৎ বলতে জগতে যত পরিবর্তন হচ্ছে, সব ধরণের পরিবর্তন – আমার শরীর, আমার মনও তার মধ্যে, আমার মনের মধ্যে যত চিন্তা-ভাবনা আসছে, সেটাও তার মধ্যেই। আমি যখন ঠাকুরের ধ্যান করছি, সেটাও তার মধ্যে। আমি ঠাকুরের নাম জপ করছি, সেটাও তার মধ্যে। যে কোন পরিবর্তন যেখানে চলছে, চিন্তা-ভাবনার পরিবর্তন, ধ্যান করার সময়েও একটার পর একটা চিন্তাগুলো চলছে, সব চিন্তাগুলো একটা চিন্তাতেও যদি চলে, যে কৃষ্ণভক্ত, সে কৃষ্ণের ধ্যান করতে করতে শুধু কৃষ্ণের চিন্তা করে যাচ্ছে, যিনি শিবের ভক্ত তিনি শিবের ধ্যান করছেন, সেখানেও পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। কি রকম পরিবর্তন? সিনেমাতে যেমন ফ্রেম বাই ফ্রেম জিনিস চলে, এখানেও ফ্রেম বাই ফ্রেম চলে, শুধু তফাৎ, এখানে প্রত্যেকটা ফ্রেমে একটা ছবি রয়েছে। যতক্ষণ এই গতি থাকবে, ততক্ষণ তুমি প্রকৃতিকে ছাড়া কিছু

জানতে পারবে না। এই গতি যখন থামবে, তখনই তুমি জানবে, সব কিছুর পিছনে আছেন সেই ঈশ্বর বা সেই আত্মা।

The superseding of relative knowledge is what we want. There is no infinite mind or infinite knowledge, because both mind and knowledge are limited. We are now seeing through a veil; then we reach the'X', which is the Reality of all our knowing. (*আমাদের বাস্তবিক প্রয়োজন এই দ্বৈত বা আপেক্ষিক জ্ঞানকে অতিক্রম করা। অনন্ত মন বা অনন্ত জ্ঞান বলে কিছুই নেই, কারণ মন ও জ্ঞান – উভয়ই সসীম। আমরা এখন আবরণের মধ্য দিয়ে দেখছি – তারপর ক্রমশঃ আবরণকে অতিক্রম করে আমরা আমাদের সমুদয় জ্ঞানের সারসত্য-স্বরূপ সেই আসল বস্তুর কাছে পৌঁছব।*) নিত্য আর আপেক্ষিক, আপেক্ষিকের মধ্যে যতক্ষণ আমরা আছি, ততক্ষণ আমরা নিত্যে যেতে পারব না। মজার ব্যাপার হল, নিত্যে পৌঁছে গেলে দেখাবে আপেক্ষিক বলে কিছু নেই। এটা আপেক্ষিক সত্য আর এটা নিত্য সত্য, তা নয়। আপেক্ষিক যতক্ষণ আছে ততক্ষণ নিত্যকে সত্য বলে মনে হয় না, নিত্যে চলে যাওয়ার পর দেখে আপেক্ষিক বলে কিছু নেই। স্বামীজীর আগে অনেকে ছিলেন, যাঁরা একটা বিশ্বমনের ধারণা এনেছিলেন। আমাদের যেমন মহৎ আছে, ওদেরও ধারণা যে একটা বিশ্বমন বলে কিছু আছে। স্বামীজী বলছেন, না, সেই রকম কিছু নেই। এখানে আমরা যা কিছু দেখছি, সব প্রকৃতির মধ্যে, সব কিছুই পরিবর্তনশীল। সেই সমস্ত পরিবর্তনের নীচে যে অপরিবর্তনশীল জিনিসটা রয়েছে, সেটা সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। এটাকে বোঝানর জন্য স্বামীজী একটা উপমা নিয়ে আসেছেন, এই উপমাটা তিনি তাঁর অনেক লেকচারে ব্যবহার করেছেন।

If we look at a picture through a pin hole in a cardboard, we get an utterly mistaken notion; yet what we see is really the picture. (*যদি আমরা একটা কার্ডবোর্ডের ছোট ফুটোর মধ্য দিয়ে একটা ছবিকে দেখি, তা হলে আমরা ঐ ছবির সম্বন্ধে একটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা লাভ করি; তথাপি আমরা যা দেখি, তা বাস্তবিক ছবিটাই দেখি।*) একটা ছবি আছে সেই ছবিকে যদি একটা কার্ডবোর্ডের ছোট ফুটোর মধ্য দিয়ে দেখি, ছবিটার ব্যাপারে আমাদের পুরো একটা ভুল ধারণা হবে, অথচ দেখছি ছবিটাই। As we enlarge the hole, we get a clearer and clearer idea. Out of the reality we manufacture the different views in conformity with our mistaken perceptions of name and form. (*ছিদ্রটা যত বড় করতে থাকি, ততই আমরা ছবিটার সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা পেতে থাকি। আমাদের নামরূপের ভ্রমাত্মক উপলব্ধি অনুসারে আমরা সত্য জিনিসটারই সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা করতে থাকি।*) ছবির উপমাকে সরিয়ে আমরা এই উপমাটাও নিতে পারি – কোন পাহাড়ে গেছি, সেখানে ঘরের জানালা দিয়ে পাহাড়ের বিশাল দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আমি ঘরের সব জানালা বন্ধ করে জানালার একটা ছোট ফুটোর মাঝখান দিয়ে আমি বাইরের নৈসর্গিক দৃশ্য দেখতে চাইছি। কিন্তু পুরো দৃশ্যটা আমি দেখতে পাবো না। ছিদ্রটা যত বড় করা হবে দৃশ্য তত পরিষ্কার দেখা যাবে। সামনের বাধাটা পুরোটা সরিয়ে দিলে দৃশ্য যেমনটি আছে ঠিক তেমনটিই দেখা যাবে। আমাদের মন হল সেই ফুটো, যে ফুটো দিয়ে আমরা সেই অনন্তকে দেখতে চাইছি। আমাদের মন এত ক্ষুদ্র, মনের ক্ষমতা এত সীমিত যে, ঈশ্বরকে আমরা এই মাইক্রোফোন রূপে দেখি, আমার সন্তান রূপে, স্ত্রী বা স্বামী রূপে দেখছি। যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, যিনি সকল গুণনিধান, তাঁকে আমরা এই ভাল, এই মন্দ রূপে দেখি। কারণ আমাদের মনটা ক্ষুদ্র। সেখান থেকে আমরা নাম, রূপ এগুলো কল্পনা করে নিচ্ছি, এর একটা নাম, ওর একটা নাম দিয়ে দিচ্ছি।

When we throw away the cardboard, we see the same picture, but we see it as it is. (*আবার যখন আমরা কার্ডবোর্ডটা ফেলে দিই, এখনও আমরা সেই একই ছবি দেখে থাকি, কিন্তু এবার ছবিটা যেমন, ঠিক তেমনটাই দেখতে পাই।*) চোখের সামনে থেকে পর্দাটা সরিয়ে দিলে আবার সেই একই ছবি দেখব, কিন্তু পুরো perceptionটাই এবার পাল্টে যাবে। একটা নামকরা ঘটনা আছে, একবার এক চার্চে দেওয়াল জুড়ে যীশুর একটা বড় ছবি রঙ করা হচ্ছিল। তখনকার দিনে চার্চগুলির অনেক ক্ষমতা ছিল, তারা একজন বড় চিত্রকরকে এনে বলছে, তুমি এই জায়গাটায় হলুদ রঙ দিয়ে শুরু কর। চিত্রকর দেওয়াল জুড়ে হলুদ রঙ করেই যাচ্ছে, করতে করতে সে বিরক্ত হয়ে গেছে। কি একটা ম্যাটম্যাটে হলুদ রঙ পছন্দ করেছে। তখন চার্চের বিশপ ব্যাপারট লক্ষ্য করলেন, বুঝলেন চিত্রকরের একঘেঁয়েমি এসে যাচ্ছে।

বিশপ তখন চিত্রকরকে নিয়ে গিয়ে আসল জিনিসটা দেখাল, যীশু কিভাবে আছেন, যিশুর ব্যাকগ্রাউণ্ডে হলুদ রঙের সূর্যোদয়ের কোমল আলোর একটা আভা। কোথাও দেখা গেল, চিত্রকর একটা ক্যানভাসে কালো রঙ দিয়ে যাচ্ছে। দেখে মনে হবে আর কোন রঙ পেলো না, কি একটা কালো রঙ লাগাচ্ছে। তারপর দেখা গেল, মা সরস্বতী বা মা লক্ষ্মীর ছবি আঁকা হচ্ছে। ওই কালোটা হল মায়ের চুল, ওই কালো রঙ ছাড়া ছবি সম্পূর্ণ হবে না। জগতে যত দুঃখ, কষ্ট, অশান্তি, রোগ, শোক, মৃত্যু, সবটাই বিরাট ক্যানভাসে ছবির এক একটা অঙ্গ। আমরা অতটুকু দেখি বলে আমাদের এত সমস্যা, এত কান্নাকাটি। কিন্তু ওই বিশাল ছবিকে দেখলে তখন আর এগুলোকে কিছুই মনে হবে না।

We put in all the attributes, all the errors; the picture itself is unaltered thereby. (*আমরা ঐ ছবিতে যত বিভিন্ন প্রকার গুণ বা ভ্রমাত্মক ধারণা আরোপ করি না কেন, তার দ্বারা ছবিটার কিছু পরিবর্তন হয় না।*) আমরা যেখানে যেখানে যত দোষ দেখছি, জগতে এত অশান্তি কেন, এত রাহাজানি কেন, এগুলো তো আমরাই তাঁর উপর চাপিয়ে যাচ্ছি, এগুলোর সাথে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। That is because Atman is the reality of all; all we see is Atman, but not as we see it, as name and form, they are all in our veil, in Maya. (*আত্মাই সকল বস্তুর মূল সত্যস্বরূপ; আমরা যা কিছু দেখছি, সবই আত্মা – কিন্তু আমরা যেভাবে এদের নামরূপের আকারে দেখছি, সেভাবে নয়। ঐ নামরূপ আবরণের অন্তর্গত – মায়ার অন্তর্গত।*)

আত্মার আলো

উপমাতে একটা জিনিস আমাদের মানতে হয়, পুরো মিল কোন কিছুর সঙ্গে হবে না, আমরা যে মনে করব এটার সঙ্গে সেটার মিল আছে, কিন্তু তা হয় না। সেইজন্য স্বামীজী কখন ছবির উপমা নিয়ে আসছেন, কখন আলোর উদাহরণ আনছেন, আবার কখন সেইজন্য contradictory উদাহরণ এসে যায়। ছবির উদাহরণ থেকে সরে এসে স্বামীজী এবার সূর্যের আলোর উপমা এনে বলছেন, আত্মা সূর্যের প্রকাশের মত। চোখে চশমা লাগিয়ে সূর্যের আলোর দিকে তাকাচ্ছি, চশমার কাঁচে একটা ডট্। যেদিকেই তাকাচ্ছি দেখছি ডট্। মনে করছি পুরো জিনিসটা যেন গোলমেলে হয়ে গেছে। উর্দুতে একটা নামকরা সায়ের আছে, ধুলো আমার চেহারায় জমে ছিল, আর আমি আয়না পরিষ্কার করতে থাকলাম। তোমার চেহারায় যদি নোংরা লেগে থাকে, যতই তুমি আয়না পরিষ্কার কর, তোমার চেহারা নোংরাই দেখাবে। কারণ দোষ তোমার আয়নাতে নেই, দোষ তোমার চেহারাতে। চারিদিকে আমরা যে দোষ দেখছি, নোংরামো দেখছি, ঈশ্বরে কোন দোষ নেই, আত্মাতে কোন দোষ নেই, দোষ রয়েছে আমাদের মাথায়। পরের প্যারাগ্রাফে স্বামীজী এটাকে টেলিস্কোপের উদাহরণ দিয়ে আরও ব্যাখ্যা করছেন।

They are like spots in the objects glass of a telescope, yet it is the light of the sun that shows us the spots; we could not even see the illusion save for the background of reality which is Brahman. (*ওগুলো যেন দূরবীনের কাচের উপরের দাগ; আবার যেমন সূর্যের আলোকের দ্বারাই আমরা ঐ দাগগুলিকে দেখতে পাই, সেইরূপ ব্রহ্মরূপ সত্যবস্তু পশ্চাতে না থাকলে আমরা মায়াকেও দেখতে পেতাম না।*) টেলিস্কোপে দুটো লেন্স থাকে, একটা সামনে থাকে, আরেকটা পিছনে থাকে, যেটা দিয়ে চোখ দেখছে, একটা আই পিসের লেন্স আরেকটা অবজেক্ট দেখার লেন্স। লেন্সে কয়েকটা দাগ লেগে গেছে। এবার যখনই কোন বস্তুকে দেখতে যাচ্ছি, দেখছি দৃশ্য বস্তুতে দাগ লেগে আছে। আসলে বস্তুতে তো কোন দাগ নেই, দাগ দূরবীনের লেন্সে। বাইরে সূর্যের আলো না থাকলে আমরা কোন দিন লেন্সের ওই দাগগুলিকে জানতে পারব না। সূর্যের আলো আছে বলেই ওই দাগগুলোকে জানা যাচ্ছে। আমরা যা কিছু দেখছি, জন্ম দেখছি, মৃত্যু দেখছি, একে ভাল দেখছি, ওকে মন্দ দেখছি, ওকে পুরুষ দেখছি, তাকে নারী দেখছি, এই মায়ার রাজ্যে যা কিছু আছে, এগুলো দেখছি কারণ সবের পিছনে আত্মার জ্যোতি রয়েছে, ব্রহ্ম রয়েছেন, ঈশ্বর রয়েছেন। ব্রহ্ম না থাকলে এই জিনিসগুলি দেখা যেত না। Swami Vivekananda is just the speck on the object glass; I am Atman, real, unchangeable and that reality alone enables me to see Swami Vivekananda. (*'স্বামী বিবেকানন্দ' বলে মানুষটা ঐ দূরবীনের*

কাচের উপর একটা দাগমাত্র। প্রকৃত 'আমি' সত্যস্বরূপে অপরিণামী আত্মা আর কেবল সেই সত্যবস্তুই আমাকে (নামরূপাত্মক) স্বামী বিবেকানন্দ রূপে দেখতে সমর্থ করছে।) স্বামীজী তাঁর পাশ্চাত্য শিষ্যদের সামনে দূরবীনের উদাহরণ এনে বলছেন, দূরবীনের কাচের উপর একটা দাগ আছে। এবার ঐ দাগকেই তুমি বড় করে দেখছ। এই স্বামী বিবেকানন্দ কে? তোমাদের মন, মনটা যেন একটা দূরবীন, স্বামী বিবেকানন্দ সেই দূরবীনে একটা ছোট দাগ। কিন্তু এর পিছনে ব্রহ্মের আলো রয়েছে বলে স্বামী বিবেকানন্দ দেখাচ্ছে। স্বামী বিবেকানন্দের কোন অস্তিত্ব নেই, অস্তিত্ব রয়েছে দূরবীনের লেন্সের দাগের, স্বামী বিবেকানন্দ তোমাদের মনের উপর একটা দাগমাত্র। কারুর কোন অস্তিত্ব নেই, শুদ্ধ ব্রহ্ম ছাড়া কোন কিছু নেই। যা কিছু রয়েছে সব আমাদের মনে। যা কিছু দেখছি সবই সেই দূরবীণের লেন্সে দাগ লেগে আছে। আমাদের ভিতরে ব্রহ্মের আলো, আত্মা আছেন বলে আমরা ওই দাগটা দেখতে পাচ্ছি। সেই আলোটাই আমি, আমি সেই শুদ্ধ আত্মা, আমি সত্যস্বরূপ, চিরমুক্ত, অপরিণামী।

Atman is the essence of every halluciation; but the sun is never identified with the spots on the glass, it only shows them to us. (*প্রত্যেকটি ভ্রমেরও সারসত্তা আত্মা – আর – যেমন সূর্য কখন ঐ কাচের উপরের দাগগুলির সঙ্গে এক হয়ে যায় না, দাগগুলিকে আমাদের দেখিয়ে দেয় মাত্র, সেই রূপ আত্মাও কখনই নামরূপের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দেন না।)* আমরা যে দিনরাত ভ্রম দেখে যাচ্ছি, রজ্জুতে যে সাপ দেখছি, সেখানেও যে একটা জ্ঞান হচ্ছে, মিথ্যা জ্ঞান বা আর যাই জ্ঞান হোক, সেটাও হত না, যদি না আত্মার আলো থাকত। আমাদের রজ্জুরও জ্ঞান আছে সর্পেরও জ্ঞান আছে, তাই আমরা রজ্জুতে সর্প দেখছি। মরুভূমিতে যে জলের ভ্রম হয়, সেখানেও সেই আসল জ্ঞানটা আছে বলেই মিথ্যা জ্ঞানটা হয়। আত্মার জ্ঞান আছে, আত্মার আলো আছে বলেই এই জগতের জ্ঞান হয়, কিন্তু তাতে আসল জ্ঞান কখন এই ভ্রম দ্বারা প্রভাবিত হয় না। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলছেন, ঈশ্বর যদি থাকেন, তাহলে চেঙ্গিস খাঁ এত লোকের প্রাণ হরণ করেছিল কি করে? ইদানিং কালেও মাঝে মাঝে সোস্যাল মিডিয়াতে এই ধরণের অনেক প্রশ্ন উঠে আসছে। ঈশ্বর যদি থেকে থাকেন, তাহলে সংসারে এত দুঃখ কষ্ট কেন? দ্বৈতবাদের মধ্যে দিয়ে চললে, এই ধরণের প্রশ্নের ব্যাখ্যা করা সত্যিই খুব মুশকিল হয়ে যায়। ঠাকুরও এক জায়গায় বলছেন, কখন মনে করি তিনি ভাল, কখন মনে করি তিনি মন্দ। কিন্তু অদ্বৈত বেদান্তে ঈশ্বর আলোর মত, সেই আলোতে কেউ ভাগবত পাঠ করছে, আবার সেই আলোতে কেউ টাকা জাল করছে, তাতে আলোর কোন দোষ হয় না।

মনের লেন্সের দাগগুলো পরিষ্কার করো

বলছেন, Our action, as they are evil or good, increase or decrease the 'spots'; but they never affect the God within us. (*আমাদের শুভ ও অশুভ কর্মসমূহ ঐ দাগগুলিকে যথাক্রমে কমায় বাড়ায় মাত্র, কিন্তু তারা আমাদের অন্তর্যামী ঈশ্বরের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।)* আমরা যদি এই মুহূর্ত থেকে তপস্যা করতে শুরু করে দিই, বা সাধনার পথে নেমে পড়ি, তাহলে কিন্তু এখনই ওই দাগগুলো পরিষ্কার হতে শুরু হয়ে যাবে। আমাদের মনের মধ্যে অসংখ্য দাগ, বড় দূরবীনের লেন্সের ভিতর দিয়ে কোন দূরের বস্তুকে দেখার চেষ্টা করছি, কিন্তু লেন্সের উপর শুধু দাগ আর দাগ, দাগে ভর্তি হয়ে আছে। বস্তুকে দেখার বদলে শুধু দাগ আর দাগ দেখে যাচ্ছি। বস্তুকে ঠিক ঠিক দেখার জন্য লেন্সের ঐ দাগগুলিকে আগে পরিষ্কার করতে হবে। যত দাগ পরিষ্কার করা হবে তত বস্তুকে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাবে। ধর্ম সাধন মানেই তাই, নিজের মনকে পরিষ্কার করা। মন যত পরিষ্কার হবে চৈতন্যের আলো, আত্মার আলো তত পরিষ্কার দেখা যাবে, আত্মার আলো যত পরিষ্কার দেখা যাবে, আত্মাকে তত ভাল ভাবে জানা যাবে। মন পরিষ্কার হওয়া মানেই, মন্দ জিনিসগুলোর দিকে নজর দেওয়া বন্ধ হয়ে যাবে, মন্দ কাজ করার প্রবৃত্তিটা চলে যাবে।

মন্দ জিনিস কিভাবে পরিভাষিত হয়? পাঁচজন যে জিনিসগুলিকে, যে ধরণের কাজ করাকে মন্দ কাজ বলছে, আর নিজের মন যেটা জানে যে, এটা মন্দ। আচার্য শঙ্কর খুব সুন্দর ও সহজ ভাবে ধর্ম ও অধর্মকে পরিভাষিত করে দিচ্ছেন। ধর্ম কি? যে কাজ সবার সামনে করা যায়। সবার সামনে যে কাজ করা যায় না, সেটা তাহলে ধর্ম নয়। আমরা অনেক কাজ সবার সামনে না করে আড়ালে লুকিয়ে করতে চাই, তার মানে এই

কাজটা অধর্ম। প্রথমে এই অধর্মকে পরিষ্কার করতে হয়। অধর্ম পরিষ্কার হয়ে গেলে অনেকগুলো দাগ পরিষ্কার হয়ে গেল। তারপরে যে যা ধর্ম পালন করছে, সেটাও কিন্তু এক একটা দাগ, পরে ওগুলোও ধীরে ধীরে মুছে যায়। ভিতরের দাগ যে পরিষ্কার করছি, তাতেও কিন্তু ঈশ্বরের, যিনি আমার ভিতরে আছেন, তাঁর কিছু আসে যায় না। দাগ থাকলেও যা, না থাকলেও তা, তুমি কি দেখতে চাও নিজে ঠিক কর। যদি তুমি পরিষ্কার করতে চাও তাহলে ভাল দেখবে, যদি না করতে চাও ভ্রম দেখবে। এই আলোচনাটা সেই জায়গা পর্যন্ত চলতে থাকবে, যেখানে ধীরে ধীরে যেন পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এসে বসবে।

Perfectly cleanse the mind of spots and instantly we see, 'I and my Father are one'. (*মনের দাগগুলো পরিষ্কার করে ফেলো। তা হলেই আমরা দেখব – 'আমি ও আমার পিতা এক'।*) স্বামীজী খ্রাইস্টের কথা নিয়ে আসেছেন, যেখানে যীশুখ্রীষ্ট নিজেকে ঈশ্বরের সঙ্গে এক বলছেন, 'আমি ও আমার পিতা এক'। মন পুরো পরিষ্কার হয়ে গেলে নিজেই দেখবে, *অহং ব্রহ্মাস্মি*। যদি কেউ উপলব্ধি করতে চায়, *অহং ব্রহ্মাস্মি* বা আমি ঈশ্বরের সাথে এক বা যদি কেউ আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হতে চায়, তাহলে আগে মনের সব দাগ বা জঞ্জালগুলিকে পরিষ্কার করতে হবে।

আমাদের শাস্ত্রে এই জিনিসগুলিকে বিভিন্ন ভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। শুদ্ধ আত্মা আর মন, এই দুটো ছাড়া তৃতীয় কিছু নেই। এই দুটোকেই বিভিন্ন ফর্মেটে সামনে রাখা হয় – আত্মা ও তাঁর কি কি স্বভাব, মন ও তার কি কি স্বভাব, মন আর আত্মার সাথে কি সম্পর্ক। তার মানে, সংসার, আমার দেহ, আমার মন, আমার চরিত্র, সবার সাথে আমার পারস্পরিক যে আদান-প্রদান, সবটা মন আর আত্মার উপরেই নির্ভর করে। আমার যত রকম অশান্তি সব মনকে কেন্দ্র করেই হয়। এগুলোকে একটা বাক্যেই বলে দেওয়া যায়, তখন আবার মনে হবে, এত বিভিন্ন ভাবে ঘুরে ঘুরে কেন বলা হচ্ছে। এইজন্যই বলা হয়, যত শুনছে তত তার ধারণাটা গভীর হয়। খ্রীশ্চানরা সব সময় বলে, Jesus loves you। কিছু দিন আগে পেপারে যে শীলহানীর খবর বেরিয়েছে, যেখানে এক বিশপ তার চার্চের নানের শ্লীলতাহানি করেছে। এখন সবাই বলতে শুরু করেছে, যীশু কি এই নানকে ভালবাসেননি? যদি ভালবাসতেন, তাহলে কি বিশপ এতদিন ধরে তার শ্লীলতাহানি করে যেতে পারত? Personal Godএ এই জিনিসগুলো খুব সমস্যা হয়ে যায়, যেখানে মন্দ জিনিসগুলিকে ব্যাখ্যা করা তখন খুব মুশকিল হয়ে যায়। আমরা জানি ভগবান সর্বশক্তিমান, কিন্তু তিনি কি করেন, কেন করেন, আমাদের কাছে এর কোন উত্তর নেই, সত্যিই আমরা জানি না। কিন্তু অদ্বৈত বেদান্তের কাছে এগুলো কোন সমস্যাই না। ভাল মন্দ যা কিছু হচ্ছে, সব তোমার মনের এলাকাতেই হচ্ছে, এই সমস্যা তোমার নিজের, সবার সমস্যা নয়। এখানে সবটাই তোমার মনের ব্যাপার, এই মন দিয়ে তুমি ভাগবত পাঠ করবে, নাকি টাকা জাল করবে, সেটা তোমার ব্যাপার।

প্রত্যক্ষানুভূতিই বাস্তবিক ধর্ম - ধর্ম অনুশীলনের উদ্দেশ্য চিত্তশুদ্ধি করা

জীবনের উদ্দেশ্য, যে লেন্স দিয়ে দেখা হচ্ছে, সেই লেন্সকে পরিষ্কার করা। এটাকেই টেনে নিয়ে স্বামীজী বলছেন, We first perceive, the reason later. (*আগে আমরা অনুভব করি, যুক্তিবিচার তারপরে আসে।*) যে কোন জিনিসকে প্রথমে আমরা দেখি, সেখান থেকে যুক্তিবিচার এসে থাকে। বাচ্চারাও প্রথমে জিনিসটাকে দেখবে, তারপর যুক্তিবিচার হয়। উচ্চমানের যুক্তিবিচারেও, প্রথমে তাঁরা কিছু দেখেছেন, সেখান থেকে বিচার করতে করতে উপরের দিকে চলে যান। We must have this perception as a fact, and it is called religion, realization. (*আমাদের এই অনুভূতি লাভ করতে হবে, আর এই প্রত্যক্ষানুভূতি হল বাস্তবিক ধর্ম।*) এটা একটা মজার ব্যাপার, একদিকে এখানে একটা হিউমার আবার সাথে সাথে এর মধ্যে বিরাট এক তত্ত্ব লুকিয়ে আছে। জীবনের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, মানুষ প্রথমে কোন জিনিসকে observe করে, সেখান থেকে আসে যুক্তিবিচার। এর খুব সহজ উদাহরণ হল এক দুই মাসের ছোট বাচ্চা। এই ধরণের বাচ্চারা নিজেদের কিছু জৈবিক ক্রিয়া ছাড়া নিজে থেকে একটাই কাজ করে, তা হল মায়ের স্তন পান করা। কেউ বাচ্চাকে কোলে করে গালের কাছে মুখটা রাখলে ওই গালকেই সে স্তন পান করার মত টানতে শুরু করে দেবে। দুধ খাওয়া ছাড়া বাচ্চার অন্য কোন সচেতন ক্রিয়া হয় না। একটু বড় হতে হতে প্রথমে বুঝতে চেষ্টা করে এটা মা, এটা বাবা। তার মানে বোঝার ব্যাপারটা প্রথম, তারপর আসে

বিচার। যেমন আইনস্টাইনের থিয়োরী অফ রিলেটিভিটি, কবে নিউটন কিছু দেখেছিলেন, সেখান থেকে তিনি মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম বার করলেন, সেখান থেকে দেখছেন যে বুধ গ্রহের কক্ষ পথটা ঠিক মত মিলছে না, সেটাকে আধার করে বিচার করতে করতে বেরিয়ে এলো তাঁর থিয়োরী অফ রিলেটিভিটি। তার মানে দেখাটা আগে, তারপর আসে বিচার।

ধর্মের ক্ষেত্রে এসে আমরা উল্টোটা করি, যুক্তিবিচার আগে করি, পরে অনুভব করি। তা কি কখন হতে পারে! যে কোন ক্ষেত্রে, ভোটের সময় আগে আমরা জানার চেষ্টা করি এই প্রার্থী কেমন, সব খোঁজ খবর নিয়ে আমরা বিচার করি এই দুজনের মধ্যে কাকে ভোট দেব। সব কিছুতে আমাদের observation আগে, reasoning পরে। ধর্মের ব্যাপারে reasoningটা আমরা আগে করি, অথচ আমাদের কোন observation নেই। ধর্মে observation কি হবে? উপলব্ধি। ঈশ্বরকে আগে তুমি দেখ, দেখার পরেই তুমি যুক্তিতর্ক করবে। যে জিনিসটাকে তুমি কোন দিন দেখইনি, অনুভব কখন করোনি, সেটাকে নিয়ে কিসের তুমি যুক্তি-বিচার করতে চাইছ! যারা ঈশ্বরের পক্ষে তারা ঈশ্বরকে নিয়ে যুক্তি দেখাচ্ছে, যারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে তারাও যুক্তি নিয়ে আসছে, সাধুবাবারা বলছেন, আমি প্রমাণিত করে দিতে পারি যে, ঈশ্বর আছেনই আছেন। কিন্তু এরা কেউ ঈশ্বর দেখেনি, অনুভবও করেনি।

ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ চলার সময় ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ঠাকুরকে বলছেন, তুমি আমার কথা শোন। ঠাকুর প্রচণ্ড রেগে গেলেন, বলছেন, তোমার কথা কি শুনব, তুমি কামী, লোভী, অহঙ্কারী। অন্য দিকে গিরিশ ঘোষ বলছেন, আমি প্রমাণিত করে দেব যে কৃষ্ণ অবতার, তা নাহলে আমি আমার জিভ কেটে দেব। ঠাকুর বিরক্ত হয়ে বলছেন, উগুনো কিছু না। ঠাকুর বলতে চাইছেন, দুটো বক্তব্যের কোনটাই কিছু না। যে বলছে, ঈশ্বর বলে কিছু নেই, সেও বকওয়াশ করছে, আর যে বলছে, ঈশ্বর আছেনই আছেন, সেও বকওয়াশ করছে। দুজনই যুক্তিবিচার করছে, দুজনের কারুরই অনুভূতি নেই। যুক্তিবিচারে মস্তিষ্ক তখনই ঠিক ঠিক কাজ করবে, যখন তার অনুভূতি হয়ে থাকবে।

No matter if one never heard of creed or prophet or book. Let him get this realization, and he needs no more. (*কোন ব্যক্তি শাস্ত্র, ধর্মমত বা অবতারের কথা কখনও না শুনে থাকতে পারে, কিন্তু তার যদি প্রত্যক্ষ অনুভূতি হয়ে থাকে, তবে আর কিছু দরকার নেই।*) যেমন ঠাকুর অদ্বৈত বেদান্ত শোনেননি, তিনি শাস্ত্র পড়েননি, প্রথমে গ্রামে এবং পরে দক্ষিণেশ্বরে কিছু কিছু শুনেছিলেন ঠিকই, কিন্তু সেটাও যদি না শুনে থাকতেন, সরাসরি যদি তাঁর প্রত্যক্ষ অনুভূতি হয়ে থাকে, এগুলোর কোন কিছুরই আর দরকার হয় না। টলস্টয়ের খুব সুন্দর একটা গল্প আছে, একটা দ্বীপে তিনজন থাকে, শুধু প্রার্থনা করে করে কিভাবে তারা উচ্চ অবস্থায় চলে গেছে। প্রার্থনা করে করে চিত্তশুদ্ধি হয়ে গেলে তার অনুভূতি হবেই, তিনি দেখা দেবেনই। তারপরে শাস্ত্র এসে যাবে, যুক্তি বিচার এসে যাবে, সব কিছু নিজে থেকেই এসে যাবে। কিন্তু কেউ যদি মনে করে আমি আগে বিচার করে, যুক্তি দিয়ে ভাল করে জিনিসটাকে জেনে নিতে চাই, এই জিনিস যুক্তিতেই দাঁড়াবে না। একটা কিছু দেখে থাকলে, জানা থাকলে তবেই যুক্তিবিচার করা যাবে, বিচার করে করে জিনিসটাকে দাঁড় করানো সম্ভব। কিন্তু যে জিনিসটা কোন দিন দেখিনি, যার ব্যাপারে কিছুই জানা নেই, সেটাকে নিয়ে যুক্তিবিচার করতে যাওয়ার কোন অর্থই হয় না। ঈশ্বরের ব্যাপারে আমাদের কোন অনুভূতি নেই, ঈশ্বর ব্যাপারে আমরা কিছুই জানি না, কিন্তু খালি যুক্তিতর্ক করে যাচ্ছি। সেইজন্য স্বামীজী বলছেন, যে করেই হোক আগে ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ কর। স্বামীজী নিজের খুব কাছের লোকদের এক জায়গায় বলছেন, ঈশ্বর দর্শন করতে এসেছিস, অন্ততঃ একটা ভূত দেখ, তাহলে বিশ্বাস হবে যে, মৃত্যুর পরেও কিছু আছে, এই জীবনের বাইরেও কিছু আছে।

Cleanse the mind, this is all of religion; and until we ourselves clear off the spots, we cannot see the Reality as it is. The baby sees no sin; he has not yet the measure of it in himself. Get rid of the defects within yourself, (*চিত্ত শুদ্ধ কর – এটাই ধর্মের সার কথা, আর আমরা নিজেরা যতক্ষণ না মনের ঐ দাগগুলো দূর করছি, ততক্ষণ আমরা সেই সত্যস্বরূপকে ঠিক ঠিক দর্শন করতে পারব না। শিশু কোথাও কোন পাপ দেখতে পায় না, কারণ বাইরের*

পাপের পরিমাণ নির্ণয় করার কোন মাপকাঠি তার নিজের ভিতর নেই। তোমার ভিতর যে দোষগুলি আছে, সব দূর করে ফেলো – তা হলেই তুমি বাইরে কোন দোষ দেখতে পাবে না।) এখানে আধ্যাত্মিকতাকে নিয়ে কিছু বলা হচ্ছে না, এখানে ধর্মকে নিয়ে বলছেন। ধর্ম মানে, মনকে পরিষ্কার করা, চিত্ত শুদ্ধ করা ছাড়া ধর্মের আর কোন কাজ হতে পারে না। আমাদের যত ধর্মীয় অনুশীলন আছে, পূজা, অর্চনা, জপ, ধ্যান, স্বাধ্যায় বা শাস্ত্র অধ্যয়ন করা, শাস্ত্রের মনন করা, সাধুসঙ্গ করা, এ সবেরই উদ্দেশ্য একটা – মনকে শুদ্ধ পবিত্র করা।

অনেকে এসে আমাদের জিজ্ঞেস করে, এখানে যে যারা সবাই শাস্ত্র কথা শুনতে আসছে, এতে এদের কি কোন উন্নতি হচ্ছে? কিসের উন্নতি হবে, শাস্ত্র কথা না শুনলে কি তার উন্নতি হত? শাস্ত্র শুনছে মানেই, কোথাও তার ইচ্ছা জেগেছে যে, আমার মনকে পরিষ্কার করতে হবে। একদিন দুদিন শাস্ত্রের কথা শুনলেই মন পরিষ্কার হয়ে যাবে না! কিন্তু তারা এটাতেই লেগে রয়েছে, দুপুরের ঘুম নষ্ট করে, টিভি সিরিয়াল দেখা ত্যাগ করে, পয়সা খরচা করে, সমস্ত রকম আমোদ-আহ্লাদ ছেড়ে দিনের পর দিন শাস্ত্রের কথা শুনেই যাচ্ছে। এই ভোগসর্বস্ব যুগে, ভোগের সংসারে থেকে বলতে পারছে যে, আমি আমার মনটাকে পরিষ্কার করতে চাই, দূরবীনের লেন্সের দাগগুলো মিটিয়ে দিতে চাই। এর চাইতে বড় উন্নতি আর কি আছে! বাচ্চা ছেলে কখন কোন পাপ দেখতে পায় না, পাপ আমাদের ভিতরে আছে বলে বাইরে পাপ দেখছি। নদীর ধারে একজন ভোরবেলায় উলটে পড়ে আছে, এক মাতাল দেখে ভাবছে, ব্যাটা সারা রাত মদ খেয়ে এখন বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে; আর একজন সাধু দেখে ভাবছে, আহা! বেচারী সারা রাত জপ-ধ্যান করে এখন ঘুমিয়ে পড়েছে। A baby sees robbery done, and it means nothing to him, (*ছোট বাচ্চাদের সামনে চুরি-ডাকাতি হয়ে যাচ্ছে, তার কাছে এর কোন অর্থই নেই, সে এর কিছুই বোঝে না*)।

বিদেশীরা খুব সুন্দর চিন্তা-ভাবনা করেন বলে, তাঁদের সাহিত্যও খুব উচ্চমানের হয়। একটা খুব নামকরা চোরের কাহিনীতে আছে যে, তার ইচ্ছা একটা বড়লোকের বাড়িতে চুরি করবে। চোরটার একটা কুকুর ছিল, সেই কুকুরটা কয়েকটা বাচ্চা দিয়েছে। বাচ্চা কুকুরের অভ্যাসই হল, অন্য কিছু দেখলেই ঘেউ ঘেউ করা। একটা কুকুরের বাচ্চা কোন কিছু দেখে যেই চেঁচাতে শুরু করে, চোরটা ওকে বকাবকি করে থামিয়ে দিচ্ছে, তার মানে চেঁচাবে না। এরপর চোরটা নিজের ঘরে সেই বাচ্চা কুকুরটাকে রেখে সব সময় জানলা দিয়ে ঘরে ঢোকে। কুকুরটাকে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে, আমি যদি জানলা দিয়ে ঢুকি তুমি চেঁচাবে না। ধীরে ধীরে কুকুরটা ভাল ট্রেনিং প্রাপ্ত করে নিয়েছে। এরপরই মজার কাহিনী। চোরটা কায়দা করে এই কুকুরের বাচ্চাটা ঐ বড়লোকের বাড়িতে বিক্রি করেছে। ভাল জাতের কুকুর, তারপর ট্রেনিং পাওয়া, বড়লোকের বাড়ির লোক আরামসে কিনে নিয়েছে। এরা তো আর জানে না যে কুকুরের মালিক একটা নামকরা চোর। এরপর লোকটি রাত্রিবেলা ওই বাড়িতে জানলা দিয়ে ঢুকছে চুরি করবে বলে। কুকুরটার ট্রেনিং আছে, জানলা দিয়ে ঢুকলে চেঁচাবে না, কুকুরটাও চোরটাকে দেখে চেঁচাচ্ছে না। কিন্তু কুকুরটার আনন্দের আর শেষ নেই, আমার পুরনো মালিক এসেছে। কুকুরটা তাড়াতাড়ি গিয়ে ওর নূতন মালিকের পোষাক টানতে শুরু করেছে। মালিক অঘোরে তখন ঘুমোচ্ছে। কুকুরটা বলতে চাইছে, এই দেখে যাও, আমার পুরনো মালিক এসেছে, তোমাকে দেখা করিয়ে দিচ্ছি। কুকুরটা ভাল মন নিয়ে বলতে চাইছে। খুব হিউমারাস ভাবে লেখা হয়েছে। মালিক ওকে বকাবকি করছে, কুকুরটাও তাকে ছাড়তে চাইছে না। মুখে কোন আওয়াজ করছে না। কারণ ওকে আওয়াজ না করার ট্রেনিং দেওয়া আছে, পুরনো মালিক ঢোকার সময়েও আওয়াজ করেনি, নূতন মালিককে ডাকার সময়েও কোন আওয়াজ করছে না। যার ফলে, ও যে মালিককে ঘুম থেকে তুলে নিয়ে আসতে চাইছে, চোর জানতে পারছে না। কুকুরটাও নূতন মালিককে না নিয়ে আসা পর্যন্ত থামতে চাইছে না, টেনেই যাচ্ছে। যাই হোক, কোন রকমে টেনে নিয়ে এসেছে। এসে দেখে সেই চোর, যে কুকুরটা তার কাছে বিক্রি করেছিল। নূতন মালিক বুঝতে পেরেছে, ও তোমার এটাই চাল ছিল, যাতে তুমি নির্বিঘ্নে ঘরে ঢুকে চুরি করে নিয়ে যেতে পার। কুকুরটা নিজের মত ভাবছে, এ তো তোমার বন্ধু, কত ভাল মানুষ, বাচ্চা বয়স থেকে আমাকে ট্রেনিং দিয়ে বড় করেছে, তুমি চল চল ওর সাথে আলাপ করবে। বাচ্চারাও ঠিক এই রকম, ডাকাতি চুরি ওরা বুঝতেই পারবে না। কিন্তু ইদানিং কালের সব বাচ্চারা বাবা-মার মোবাইল ও টিভি, ইন্টারনেটে বাচ্চাদের কার্টুন দেখে দেখে বুঝে গেছে, কে দুষ্টু লোক, কে ভাল লোক, কোনটা চুরি, কোনটা ডাকাতি, কোনটা খুন সব কিছুর আইডিয়া পেয়ে যাচ্ছে।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়ঃ

বলছেন, Once you find the hidden object in a puzzle picture, you see it ever more; so when once you are free and stainless, you see only freedom and purity in the world around. (*ধাঁধার ছবির ভিতর লুকানো জিনিসটা একবার যদি দেখতে পাও, তাহলে পরেও সর্বদাই দেখতে পারবে। এইরূপ যখন তুমি একবার মুক্ত ও দোষশূন্য হয়ে যাবে তখন জগৎপ্রপঞ্চের ভিতর তুমি মুক্ত ও শুদ্ধতা ছাড়া আর কিছু দেখতে পাবে না।*) এটাই বলতে চাইছেন, একবার তোমার যখন জ্ঞান হয়ে যাবে, তখন পবিত্রতা ছাড়া জগতে তুমি আর কিছু দেখতে পাবে না। That moment all the knots of the heart cut asunder, all crooked places are made straight, and this world vanishes as a dream, (*সেই মুহূর্তেই হৃদয়ের সব গ্রন্থি ছিন্ন হয়ে যায়, সব বাঁকাচোরা সরল হয়ে যায়, আর এই জগৎপ্রপঞ্চ স্বপ্নের মত মিলিয়ে যায়*)। স্বামীজী মুণ্ডকোপনিষদের মন্ত্রের উল্লেখ করছেন, *ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়ঃ*, একবার আত্মার জ্ঞান হয়ে গেলে হৃদয়ের সমস্ত গ্রন্থিগুলো খুলে যায়। And when we awake, we wonder how we ever came to dream such trash! (*আর ঘুম ভাঙলে ভেবে আশ্চর্য হই যে, কি করে এই-সব আজেবাজে স্বপ্ন আমরা দেখছিলাম।*) দেখা যায় অনেক সময় মন অশান্ত থাকলে আমরা খুব আজেবাজে স্বপ্ন দেখি। ঘুম ভাঙলে, ঘুম না ভাঙলেও স্বপ্ন দেখতে দেখতে এমন ঘাবড়ে যাই যে, ঘুমটা ভেঙে যায়, তখন অবাক হয়ে ভাবতে থাকি, কি করে আমি এই স্বপ্ন দেখছিলাম! অনেক আগেকার ঘটনা, একজন মহারাজ ছিলেন, তিনি খুব জপ-ধ্যান, তপস্যাদি করতেন। একদিন রাত্রিবেলা ঘুমের মধ্যে জোর চিৎকার করে উঠে বসে পড়েছেন। পাশের ঘর থেকে একজন মহারাজ দৌড়ে এসেছেন। জিজ্ঞেস করাতে জানা গেলে যে, উনি স্বপ্নে নারীর রূপ দেখেছেন। ওনার অবচেতন মন এত সজাগ যে, স্বপ্নের মধ্যে কোন নারীকে দেখছেন, তাতেই তিনি আঁৎকে উঠেছেন; আমি এমন কি করলাম যে স্বপ্নে মেয়ের ছবি ভেসে এসেছে। মন শুদ্ধ পবিত্র হয়ে গেলে, সমস্ত সংশয় কেটে গিয়ে আত্মজ্ঞান হয়ে গেলে এটাই ভাবেন, আমি কেন এই নশ্বর জগতের কথা ভাবছিলাম; যেমন আমরা বাজে স্বপ্ন দেখলে ভাবি, কেন আমি এই বাজে স্বপ্ন দেখলাম।

Getting whom, misery mountain high has no power to move the soul. (*যাঁকে লাভ করলে পর্বতপ্রমাণ দুঃখও হৃদয়কে বিচলিত করতে পারে না; তাঁকে লাভ করতে হবে।*) এই কথাই ভগবান গীতাতে বলছেন *যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে*। একবার যদি কারুর আত্মজ্ঞান হয়ে যায়, হৃদয়ের সমস্ত গ্রন্থি যদি ছিন্ন হয়ে যায়, তখন যত দুঃখই আসুক, সেই আত্মজ্ঞানীকে বিচলিত করতে পারবে না। স্বামীজী গীতা ও উপনিষদকে মিলিয়ে অনেক কিছু বলে যাচ্ছেন।

With the axe of knowledge cut the wheels asunder, and the Atman stands free, even though the old momentum carries on the wheel of mind and body. (*জ্ঞানকুঠার দ্বারা দেহমনরূপ চক্রদ্বয়কে পৃথক্ করে ফেলো, তা হলেই আত্মা মুক্তস্বরূপ হয়ে পৃথকভাবে দাঁড়াতে পারবে – যদিও পুরাতন বেগে তখনও দেহমনরূপ চক্র খানিকক্ষণের জন্য চলবে।*) একটা রথ খুব গতিতে চলে যাচ্ছে। হঠাৎ তার একটা চাকা খুলে গেল, ঐ খোলা ঘুর্ণিয়মান চাকা বেশ কিছুক্ষণ গড়াতে গড়াতে একটা জায়গায় এসে থেমে যাবে। যাঁর আত্মজ্ঞান হয়ে যায়, তার মানে, সংসার থেকে ওই চাকাটা কেটে বেরিয়ে গেল। মোমেন্টামে কিছুক্ষণ চলবে, কিন্তু এই গাড়িটার সঙ্গে জুড়ে থাকবে না। আর গাড়ির কোন প্রপার্টি চাকার সাথে লাগবে না। The wheel can now only go straight, can only do good. (*তবে তখন চাকাটি সোজাই চলবে, অর্থাৎ এই দেহমনের দ্বারা তখন শুভ কর্মই হবে।*) গাড়ি কখন ডানদিকে যায় কখন বামদিকে যায়, কিন্তু চাকা যেটা খুলে গেল, সেটা সোজা চলে যাবে। ঠিক তেমনি, যিনি যোগী, যিনি সন্ন্যাসী, যিনি আত্মজ্ঞানী, তাঁর জীবনটাও একেবারে সোজা চলে যাবে।

আত্মজ্ঞান স্বসংবেদ্য

বলছেন, If that body does anything bad, know that the man is not Jivanmukta; he lies if he makes that claim. (*যদি সে শরীরের দ্বারা কিছু মন্দ কার্য হয়, তা হলে জেনো, সে ব্যক্তি*

জীবনমুক্ত নয় – যদি সে নিজেকে জীবনমুক্ত বলে দাবি করে, তবে সে মিথ্যা কথা বলছে।) আত্মজ্ঞান মানে নিজেকে বা আত্মাকে জেনেছেন, ঈশ্বরকে জেনেছেন। আত্মজ্ঞান বিভিন্ন অবস্থায় হয়। যিনি এখনও শরীর ধারণ করে আছেন, কিন্তু জ্ঞানী, অর্থাৎ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, তাঁকে জীবনমুক্ত বলা হয়। আত্মজ্ঞান যাঁর হয়েছে, একমাত্র তিনিই জানেন যে তাঁর জ্ঞান হয়েছে, অন্য কারুর জানার উপায় নেই। সেইজন্য সংস্কৃতে বলা হয় স্বসংবেদ্য, যিনি আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, একমাত্র তিনিই জানেন যে আমি আত্মাকে বা নিজেকে জেনেছি। কোন শঠ, মিথ্যাচারী ব্যক্তি যদি আগামীকাল দাঁড়িয়ে বলে, আমি ঈশ্বরকে জেনেছি, আমরা তাহলে কি করে বুঝব যে সে ঈশ্বরকে জেনেছে বা জানেনি? এটা জানার আসলে কোন পথ নেই। একজন লোক সত্যিকারের জ্ঞানী কিনা, কেউ সত্যি ঈশ্বর দর্শন করেছেন কি করেননি – এটা জানার কোন পথ নেই। পথ না থাকলেও তাঁর কিছু ক্রিয়া দিয়ে বোঝা যায়। ঠাকুর যেমন বলছেন, জ্ঞানীর একটা লক্ষণ – তাঁর কাছে কোন বই থাকে না। কারণ সে সব জেনে গেছে, তাই তার আর বইয়ের দরকার হয় না। তার সাথে আরেকটা লক্ষণ হল, সে কোন এলেমেলো কথা বলে না। কিন্তু এলেমেলো কথা তো আমরা বুঝতে পারব না। ভক্ত মানেই বোকা, স্বামীজী বলছেন, তোমরা হলে মোচওয়ালা সব শিশু। বড় বড় গোঁফ আছে, কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতে তোমরা শিশু। এদের তাই বোকা বানানো খুব সহজ। বলছেন, যাঁরা আত্মজ্ঞানী, যাঁদের পরমহংস বলা হচ্ছে, আমাদের ভাষায় যাঁরা জীবনমুক্ত, এনাদের জানার একটাই পথ – এনারা কখনই জীবনে সৎপথ ছাড়া অন্য কোন পথ অবলম্বন করবেন না। ঠাকুরে ভাষায়, সাধুকে দিনে দেখবি, রাতে দেখবি, তবে তাঁকে সাধু মানবি। বলছেন, জীবনমুক্ত পুরুষ কখন কোন পরিস্থিতিতে কোন অসৎ কর্ম করেন না। ঠাকুর এটাকেই তাঁর স্বভাবসুলভ ভাষায় সহজ করে বলছেন, তাঁর বেতালে কখন পা পড়ে না। তার মানে সমাজ যে ক্রিয়াগুলিকে ঠিক মনে করে, তিনি সব সময় সেই ক্রিয়াগুলিই করবেন।

একবার একজন ভদ্রলোক, তিনি ঠিক ভক্ত নন, কিন্তু বইটই পড়েছেন, বলছেন, 'দেখুন ঠাকুর অবতার, তিনি কেন সমাজকে এতো মানতে যাবেন, সারদাদেবী বিধবা হয়ে যাওয়ার পর তিনি তো বলে দিতে পারতেন, তুমি সাদা শাড়ি পরবে না, যেমন শাঁখা সিঁদুর পর সেভাবেই পরবে; তাহলে কত বিধবা বেঁচে যেত'। ভদ্রলোক বুঝতে পারছেন না যে, অবতার কখনই এই ধরণের কাজ করবেন না। কারণ তাহলে বেতালে পা পড়ে যাচ্ছে। যে কোন ধর্মে যা যা পরিবর্তন হয়, সবটাই সময়ের অপেক্ষায় থেকে ধীরে ধীরে পরিবর্তন হয়। অবতার যখনই আসেন, তখন তাঁর একটাই কাজ, আধ্যাত্মিক জ্ঞান দেওয়া। তাঁর কোন আচরণই প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতির বিরোধী বা সমাজের পরিপন্থি হবে না। আর তৎকালীন সমাজে চরিত্র বলতে যা বোঝায়, তার বিরুদ্ধে হবে না। তিনি তিনটে জিনিস কক্ষণ করবেন না, কামিনী অর্থাৎ নারীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকবে না। তাঁকে সব সময় মহিলারা ঘিরে রয়েছেন, কখনই এই দৃশ্য দেখা যাবে না। কাঞ্চন, অর্থাৎ টাকা-পয়সাতে ডুবে আছেন, কখনই তা দেখা যাবে না। কারণ জগৎ এই দুটোর উপরেই চলছে। তৃতীয় – কখনই তিনি কোন হিংসা কার্য করবেন না। গীতাতে জ্ঞানীকে পরিভাষিত করতে গিয়ে ছ-বার এই কথা বলছেন – *সর্বভূতে হিতে রতাঃ*, ছোট্ট একটা পিঁপড়ে থেকে শুরু করে মানুষ পর্যন্ত, যত কীটপতঙ্গ, পশু, পাখি আছে, সবার প্রতি তাঁর সন্তান ভাব থাকবে। নিজের শরীর ধারণের জন্য যতটুকু দরকার, তার বাইরে উনি কোন প্রাণীর হিংসা তো দূরের কথা, সব সময় কিভাবে তার হিত করা যায়, তার মঙ্গল করা যায়, সেই চেষ্টায় রত থাকেন। ধর্মের নামে কাউকে কষ্ট দেওয়া, ধর্মের নামে কাউকে সংহার করা, এ-ধরণের কোন চিন্তাই তাঁর মনে উদয় হবে না, অসম্ভব।

কলঙ্ক আরোপিত একটা মেয়েকে সবাই পাথর মারতে চাইছে, যীশু গিয়ে তাকেও রক্ষা করছেন – *সর্বভূতে হিতে রতাঃ*। যে নিজেকে মনে করে আমার ঈশ্বরের জ্ঞান হয়ে গেছে, আজকাল তো এই ধরণের বাবাজী, গুরুতে ভারতবর্ষ ছেয়ে গেছে, সবাই সবাইকে শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছে। তোমার যদি বেতালা পা না পড়ে, তাহলে তোমার কথা মানব। আর যদি তোমার বেতালা পা পড়ে, তাহলে বুঝব যে তুমি ভাওতা মারছ। কি রকম বেতালা পা পড়া? মেয়েরা যদি ঘিরে থাকে, টাকা-পয়সা, বিষয়-সম্পত্তি যদি ঘিরে থাকে, আর দেহ, মন ও বাক্য দ্বারা কারুর না কারুর তিনি হিংসা করছেন। এই কটি জিনিস দিয়ে বোঝা যাবে, তাঁর বেতালা পা পড়ছে কি পড়ছে না। যত যুক্তি নিয়ে আসা হোক, এই তিনটে জিনিস – *সর্বভূতে হিতে রতাঃ*, সমস্ত প্রাণীর হিতে লেগে থাকবেন, আর সংসারের যে দুটো সব থেকে শক্তিশালী বস্তু – কামিনী আর কাঞ্চন, এই দুটোতে

তিনি কখনই জড়াবেন না। এই তিনটের কোন একটাতে যদি কেউ জড়িয়ে থাকে, বা এই তিনটের আনুষাঙ্গিক যে জিনিসগুলো আছে, তার একটার সাথে যদি জড়িয়ে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে তিনি আর যাই হয়ে থাকুন, তিনি আত্মজ্ঞানী নন, জীবনমুক্ত নন, এখনও তাঁর ঈশ্বরের জ্ঞান হয়নি।

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া

স্বামীজী বলছেন, But it is only when the wheels have got a good straight motion (from cleansing the mind) that the axe can be applied. All purifying action deals conscious or unconscious blows on delusion, (*এটাও বুঝতে হবে যে যখন চিত্তশুদ্ধি দ্বারা চক্রের বেশ সরল গতি এসে গেছে, সেই সময়ই তার উপর কুঠার প্রয়োগ সম্ভব। সকল শুদ্ধিকর কর্মই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ভ্রম বা অজ্ঞানকে নষ্ট করছে।*) মুণ্ডকোপনিষদে যেখানে বলছে, *দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে*, বৃক্ষে দুটো পাখি বাস করে, একটা পাখি বৃক্ষের নীচের ডালে থাকে, আরেকটা পাখী বৃক্ষের একেবারে উপরের ডালে বসে থাকে। উপরের পাখিটা নিষ্কাম ভাবে বসে আছে, সব কিছুতে নির্বিকার, কোন ফল খায় না। নীচের পাখিটি আমাদের মত সাধারণ জীবের প্রতিনিধি, আমরা সংসার বৃক্ষে কখন মিষ্টি ফল খাচ্ছি, কখন কটূ ফল খেয়ে নিচ্ছি। মিষ্টি ফল খেলে আমরা উৎফুল্ল হই, ওই জায়গাতেই আরামসে আমরা বসে থাকতে চাই। মানুষ যে জায়গায় সুখ পায়, আমোদ-আহ্লাদ করতে পারে, সেই জায়গা থেকে সে আর নড়ানড়ি করতে চায় না। জীবন একটা দীর্ঘ যাত্রপথ, এই পথ আমাদের সবাইকে মুক্তির দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। মিষ্টি ফল খেলে কখন তা মুক্তির দিকে নিয়ে যাবে না। জীবনের যাত্রাপথে এগিয়ে যাওয়ার জন তিক্ত ফল খেতে হয়। তিক্ত ফল খেলে তখন বলে ওঠে, মা-গো! আমার আর লাগবে না। তখন সে আবার এগতে থাকে। তুমি বলছ তুমি ধর্মপথে এসেছ, এখনও তোমার বাড়িতে চারজনের মৃত্যু হয়নি, বাড়িতে এখনও আগুন লেগে যায়নি, তোমার কোন সর্বনাশ হয়ে যায়নি, আর এখনও তুমি বলতে চাইছ যে, তুমি ধর্মপথে আছ! ধর্মপথ মানেই, শুধু তিক্ত ফলের আস্বাদ করে যেতে হচ্ছে, তেড়েফুড়ে এমন সব অশান্তি এসে তোমার জীবনকে তছনছ করে দিচ্ছে যে, তুমি তিতিবিরক্ত হয়ে বলতে শুরু করেছ, আমার আর এই সংসার লাগবে না, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। ঠাকুর বলছেন, সংসারকে যখন পাতকুয়া আর আপনজনদের কালসর্প বলে মনে হবে তখন ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ভাব জাগতে শুরু হবে। তার মানে, সংসার তোমাকে কতটা কষ্ট দিলে সংসারকে পাতকুয়া বলে মনে হবে, আর আপনজনদের কালসর্প বলে মনে হবে। ওখান থেকেই ধর্ম শুরু হয়। বেদান্তে বলছেন, তপ্ত শিরোবৎ না হলে তুমি ধর্মপথে আসতে পারবে না। মাথার চুলে আগুন লেগে গেছে, এবার মরি বাঁচি করে দৌড় লাগিয়েছে একটু জলের সন্ধানে।

বক্তব্য হল, আমাদের জীবনে যা কিছু দুঃখ-কষ্ট আসে, ঐ দুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়ে লড়াই করে করে আমরা উঁচু ডালে পৌঁছাই। আর যদি দেখা যায় সে ওই কষ্ট নিতে পারছে না, তখন ভগবান তাড়াতাড়ি একটা সুরক্ষা দিয়ে দেন, কারণ এখনও সে এই কষ্টটা নেওয়ার জন্য প্রস্তুত নয়। মার সবাইকেই খেতে হবে, কষ্ট আজ আসুক আর কালই আসুক। ঠাকুর বলছেন, হাসপাতালে একবার নাম লেখালে, রোগের কসুর না হওয়া পর্যন্ত তিনি ছাড়বেন না। কিন্তু তিনি দেখেন, একে এক্ষুণি ছাড়া যাবে কিনা। স্বামীজীর শিষ্য স্বামী কল্যাণানন্দজী ও স্বামী নিশ্চয়ানন্দজীরা মিলে কঙ্খলে, হরিদ্বারে সাধুদের সেবার জন্য হাসপাতাল শুরু করেন। তখনকার দিনে ঐ সব অঞ্চলের সাধুরা খুব কষ্টে থাকতেন। একবার এক সাধুবাবাকে খুব অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসার জন্য কঙ্খলের হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। সেবা শুশ্রুষা করে সাধুবাবাকে সুস্থ করে দেওয়া হয়েছে। ওখানে রোগীদের মোটামুটি ভাল খাবারই দেওয়া হত। স্বামী কল্যাণানন্দজী মহারাজ একদিন নিজে দেখতে এসেছেন সাধুবাবাটি সুস্থ হয়ে গেছেন কিনা। মহারাজকে দেখেই সাধুবাবা আঃ উঃ করতে শুরু করে দিয়েছে। মহারাজ বুঝে গেছেন, সাধুবাবার এখান থেকে এক্ষুণি চলে যাওয়ার ইচ্ছা নেই। উনি সঙ্গে সঙ্গে লিখে দিলেন, এনাকে যেন আরও দুদিন এখানে রাখা হয়। সাধুবাবাও জানেন উনি সুস্থ হয়ে গেছেন, কিন্তু ছেড়ে যেতে চাইছেন না। একদিন তাঁকে হাসপাতাল ছেড়ে যেতেই হবে।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী ঠাকুরের নামে বলছেন, ঠাকুর কিছু মাছ ভাজছেন, কিছু মাছ রাখা আছে যাকে ভাজা হবে। কিছু লোক এখন সংসারের জ্বালায় জ্বলেপুড়ে মরছে, অন্যরা ভাবছে আমি বেশ আছি বাবা। ঘুটে

পোড়ে গোবর হাসে। পুড়তে হবে সবাইকে। আমরা কষ্ট নিতে পারি না, অত্যন্ত দুর্বল মন কিনা। ইঞ্জেকশান নিতে ভয় পাই, ট্যাবলেট খেতে তেতো লাগে, এর থেকে হোমিওপ্যাথিই ভাল, মিষ্টি মিষ্টি ওষুধ। সেইজন্য আমরা চেষ্টা করি, কিভাবে একজন ভাল হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের কাছে যাওয়া যায়। আমরা চাই কিভাবে আমার জীবনটা মিষ্টি মিষ্টি করে, ঝড়-ঝাপ্টা বিহীন ভাবে কাটিয়ে দিতে পারা যায়। তা হয় না। কেশব সেনের নামে ঠাকুর বলছেন, কেশবের যোগ ভোগ দুইই আছে। সেই কেশব সেনের শেষ অবস্থায়, আর কদিন পরেই তাঁর শরীর চলে যাবে, ঠাকুর দেখতে গেছেন, দেখছেন কেশবের শরীরটা কঙ্কালসার হয়ে গেছে। ঠাকুর বলছেন, বসরাই গোলাপ গাছকে মালি মাটি থেকে শেকড় শুদ্ধু উপড়ে ফেলে রাখে শিশির পাবে বলে, শিশির পেলে ফুল ভাল হবে। যাঁকে বলছেন, যাঁর যোগ আর ভোগ দুইই আছে, তাঁরই এই অবস্থা। এমন তাঁর কাশির দমকা, যে শুনছে সেই ঘাবড়ে যাচ্ছে। একটা সময় সবাইকে মার খেতেই হবে। অনেকের জীবন খুব শ্লথ গতিতে চলে, তাদের জীবনে মার গুলো ধীরে ধীরে হাল্কা ভাবে আসে। গঙ্গোত্রী থেকে যখন গঙ্গা নামে তখন তার ধারা একভাবে প্রবাহিতে হয়ে যায়। কলকাতার দিকে এসে যখন সমুদ্রের কাছাকাছি চলে আসে, তখন তার জোয়ার-ভাটা শুরু হয়ে যায়। যতক্ষণ তোমার সব কিছু ভাল ভাল চলছে, বুঝবে তোমার শুরু হতে এখনও অনেক দেরী আছে। স্বামী যতীশ্বরানন্দজী বলছেন, তোমার জীবনে সব কিছু যদি ঠিক চলে, তাহলে বুঝবে তোমার আধ্যাত্মিক জীবনে সব কিছুতেই গোলমাল আছে। আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি মানেই, প্রচুর ঘা পড়বে, ঘা যদি না পড়ে, বুঝবে তুমি যেখানে ছিলে সেখানেই আটকে আছ, এক চুলও তুমি এগোওনি। এটাই জীবনের সত্য। সৈন্যবাহিনীতে নাম লিখেয়েছে, একটা দুটো চোট আঘাত পাবে না, দুটো গুলি খাবে না, তা কি কখন হয়। যুদ্ধ যখন চলে তখন এভাবেই চলে। ঠিক তেমনি মানুষের জীবন-যুদ্ধ যখন চলে তখন এভাবেই চলে। জীবনের উপর যখন আঘাত, ঝড়-ঝাপ্টা নেমে আসে তখন ঐ delusions গুলি কেটে যায়।

All purifying action deals conscious or unconscious blows on delusion. (*সকল শুদ্ধিকর কর্মই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ভ্রম বা অজ্ঞানকে নষ্ট করছে।*) To call another a sinner is the worst thing you can do. Good action done ignorantly produces the same result and helps to break the bondage. (*অপরকে পাপী বলাই সবচেয়ে গর্হিত কাজ। ভাল কাজ না জেনে করলেও তার ফল একই প্রকার হয় – তা বন্ধন মোচনের সহায়তা করে।*) এর উপর আমরা আগেও আলোচনা করেছি। পাপ বলে কিছু হয় না, পথ চলতে গিয়ে একটু ডানদিক বামদিক সবারই হবে। আর ভাল কাজ জেনেশুনেই করা হোক আর অজান্তেই করা হোক, আমাদের উপর যে বন্ধন পড়ে আছে, সেটাকে ভাঙতে ভাল কাজ সব সময় সাহায্য করে। দান করা, সেবা করা, মিষ্টি কথা বলা, কটূ কথা না বলা, সহ্য করে নেওয়া, এই কাজগুলো জেনে করুক আর না জেনেই করুক, মঙ্গল তার হবেই।

স্বামীজী আবার দূরবীনের উদাহরণ নিয়ে আসছেন। To identify the sun with the spots on the object glass is the fundamental error. (*দূরবীনের কাচের দাগগুলি দেখে সূর্যকেও দাগযুক্ত মনে করাই আমাদের মৌলিক ভ্রম।*) একটা বাচ্চা ছেলেকে দূরবীন দিয়ে সূর্যকে দেখানো হচ্ছে, দূরবীনের লেন্সে অনেক দাগ, সূর্যকেও দাগযুক্ত দেখাচ্ছে, বাচ্চা ছেলে দেখে নিয়ে বলছে, আমি সূর্যকে দেখে নিয়েছি, শুধু দাগ আর দাগ, দাগে সূর্য ভর্তি। অশ্বত্থমার মা আটা গুলে দুধ বলে ছেলেকে খাওয়াচ্ছেন, ছেলেও ভাবছে আমি দুধ খাচ্ছি। Know the sun, the 'I', to be ever unaffected by anything, and devote your self to cleansing the spots. Man is the greates being that ever can be. The highest worship there is, is to worship man as Krishna, Buddha, Christ. What you want, you create. Get rid of desire. (*সেই 'আমি' রূপ সূর্য কোনপ্রকার বাহ্যদোষে লিপ্ত নন – এইটি জেনে রাখো, আর নিজেকে ঐ দাগগুলি তুলতে নিযুক্ত কর। যত প্রাণী আছে, তার মধ্যে মানুষই শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও খ্রীষ্টের ন্যায় মনুষ্যের উপাসনাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা। তোমার যা কিছুর অভাব বোধ হয়, তাই তুমি সৃষ্টি করে থাক; - বাসনামুক্ত হও।*) এই জিনিসগুলি আমরা আগে আলোচনা করে নিয়েছি। বক্তব্য হল আমি যেটা চাই, সেটাকে আমিই সৃষ্টি করি। আমি ঠাকুরকে কেন ভক্তি করি? কারণ আমি ঠাকুর হতে চাই। মানুষ কেন কৃষ্ণকে ভক্তি করে? এনারা খুব সুন্দর নাম দিয়েছেন Krishna consciousness। কারণ কৃষ্ণ চেতনা, আমি সেটা হতে চাই। শিবের ভজনা মানে, শিব একটা আদর্শ, মনের ভিতর কোথাও এই ইচ্ছেটা আছে, আমি

শিবের মতই হতে চাই। এই ইচ্ছে তখনই হয় যখন মানুষ বুঝে নেয়, মানুষই শেষ কথা, মানুষই খ্রাইস্ট হয়, মানুষই বুদ্ধ হয়। কিন্তু ভক্তরা বলবেন, ভগবান খ্রীষ্ট হয়ে এসেছেন, ভগবান বুদ্ধ হয়ে এসেছেন, তাতেও কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু আমরা যখন শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের দিকে তাকাই, তাঁরা যত লীলা করেছেন, সেই লীলার যখন অনুধ্যান করছি, তখন এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মানুষ সারা জীবন চেষ্টা করেও তো ওই জায়গায় যেতে পারবে না। উনি একটা জন্মে করেছেন, সেখানে আমার হয়ত দশ জন্ম লাগবে। ঠাকুর এক একটা যে সাধনা তিন দিনে শেষ করেছেন, সেখানে আমার হয়ত একটা সাধনা করতে তিন জন্ম লাগবে। লাগুক, কিন্তু করা যায়।

মনুষ্য জন্ম, মুমুক্ষুত্ব ও মহাপুরুষের সংশ্রয়

এখান থেকে স্বামীজী এবার চলে আসছেন spirit worldএ। The Angels and the departed are all here, seeing this world as heaven. (*দেবতারা বা পরলোকগত ব্যক্তিরা সকলে এখানেই রয়েছেন – এই জগৎকেই তাঁরা স্বর্গ বলে দেখছেন।*) আমাদের পূর্বপুরুষরা যাঁরা অনেক আগে মারা গেছেন বা যে দেবতারা রয়েছেন, খ্রীশ্চানরা যাদের *Angels* মনে করছে, তারা এই জগৎকেই দেখে, আর স্বর্গরূপে দেখে। The same 'X' is seen by all according their mental attitude. (*এই অজ্ঞাত বস্তুকে সকলে নিজ নিজ মনের ভাব অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখছে।*) এই প্রচলিত কথা আমরা প্রায়ই শুনতে পাই – স্বর্গ, নরক যা কিছু আছে সব এখানেই আছে, বাইরে কোথাও নেই। দুষ্ট আত্মারা মারা যাবার পর এই জগৎকেই নরকরূপে দেখে। আর যারা সদাত্মা, তারা মরে গিয়ে এই জগৎকেই স্বর্গরূপে দেখে। এই জগৎকেই কেউ স্বর্গ রূপে দেখে, কেউ নরক রূপে দেখে, আমরা মর্ত্যলোক রূপে দেখছি। The best vision to be had of the 'X' is here on this earth. (*এই পৃথিবীতে কিন্তু ঐ অজ্ঞাত বস্তুর উৎকৃষ্ট দর্শনলাভ হতে পারে।*) ঠিক ঠিক মর্ত্যলোকটা কেমন হতে পারে, সেটা আমরাই ভাল দেখছি। দেবতারা এটাকে এক রকম দেখেন, মর্ত্যবাসীরা আরেক রকম দেখছে, যারা পাতাললোকে বা নরকে আছে, তারা অন্য রকম দেখছে। Never want to go to heaven, that is the worst delusion. (*কখনও স্বর্গে যাবার ইচ্ছা করো না – এটাই সবচেয়ে নিকৃষ্ট ভ্রম।*) স্বামীজী খ্রীশ্চানদের সামনে এই কথা বলছেন বলে, এইভাবে বলছেন। মৃত্যুর পর স্বর্গে যাবে বলে তুমি ভাবছ, এটাই হল সব থেকে অজ্ঞানপ্রসূত।

Even here, too much wealth and grinding poverty are both bondages and hold us back from religion. (*এই পৃথিবীতেও খুব বেশী পয়সা থাকা ও ঘোর দারিদ্র্য, দুই-ই বন্ধন – দুই-ই আমাদের ধর্মপথ থেকে, মুক্তিপথ থেকে দূরে রাখে।*) প্রচুর টাকা-পয়সা যদি হয়ে যায় বা এত দরিদ্র যে সব সময় পেটের চিন্তায় ব্যস্ত, এদের দুজনকে কখনই আধ্যাত্মিক হতে দেবে না। ঠিক তেমনি স্বর্গলোকের সুখপ্রাপ্তির ইচ্ছা বা এখানে আমোদ-আহ্লাদের মধ্যে থাকলে আধ্যাত্মিক হতে পারবে না। নচিকেতা যেমন বলছেন, আমার স্বর্গসুখ লাগবে না। কি রকম স্বর্গসুখ? *স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি ন তত্র ত্বং জরয়া বিভেতি। উভে তীর্ত্বাঽশনায়াপিপাসে শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে।।* সেখানে ভয় নেই, জরা নেই, মৃত্যু নেই, ক্ষুধা নেই, পিপাসা নেই, শোক নেই, শুধু সুখ আর সুখ। সেইজন্য মানুষ ওখানে ঈশ্বর চিন্তন করতে পারে না। এরই বিপরীত, নরকে মানুষের এত যন্ত্রণা, এত কষ্ট যে মানুষ ঈশ্বর চিন্তন করতে পারে না।

সেইজন্য স্বামীজী বলছেন, ঈশ্বরের কৃপা হলে, দেবতাদের অনুগ্রহ হলে তিনটে জিনিস হয় – মানব জন্ম, ঈশ্বর লাভের ইচ্ছা আর মহাপুরুষের সংশ্রয়। এটাই স্বামীজী বলছেন, Three great gifts we have, - first, a human body. (The human mind is the nearest reflection of God, we are 'His own image'.) Second, the desire to be free. Third, the help of a noble soul, who has crossed the ocean of delusion, as a teacher. (*তিনটে জিনিস এই পৃথিবীতে বড় দুর্লভ – প্রথম মনুষ্যদেহ (মনুষ্যমনেই ঈশ্বরের উৎকৃষ্ট প্রতিবিম্ব বিদ্যমান – বাইবেলে আছে, 'মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি-স্বরূপ'।) দ্বিতীয় – মুক্ত হওয়ার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা। তৃতীয় – মহাপুরুষের আশ্রয়লাভ, যিনি স্বয়ং মায়ামোহ-সমুদ্র পার হয়ে গেছেন, এমন মহাত্মাকে গুরু রূপে পাওয়া।*) তুলসীদাস খুব সুন্দর বলছেন – বিনু সতসঙ্গ বিবেক ন হই, বিবেক, যার দ্বারা সৎ অসৎ বিচার হয়, সাধুসঙ্গ ছাড়া কখনই বিবেক আসে না।

রামকৃপা বিনু সুলভ ন সঙ্গ, ঈশ্বরের কৃপা, শ্রীরামের কৃপা না হলে মানুষ কখনই সাধুসঙ্গ করার সুযোগ পায় না। When you have these three, bless the Lord; you are sure to be free. (*এই তিনটি যদি পেয়ে থাকো, তবে ভগবানকে ধন্যবাদ দাও, তুমি মুক্ত হবেই।*) আমরা এখানে যারা স্বামীজীর এত উচ্চমানের আধ্যাত্মিক সত্যগুলির আলোচনা শুনছি, আমাদের তিনটিই আছে, মানবজন্ম আছে, মুক্তির ইচ্ছা আছে আর ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর সঙ্গ আছে। এই তিনটে জিনিসই লাগে, আমাদের তিনটেই আছে, মুক্তি আমাদের কে আটকাবে।

What you only grasp intellectually may be overthrown by a new argument; but what you realize is yours for ever. Talking, talking religion is but little good. Put God behind everything, man, animal, food, work; make this a habit. (*কেবল তর্কযুক্তির দ্বারা তোমার যে সত্যের জ্ঞান লাভ হয়, তা একটা নূতন যুক্তি-তর্কের দ্বারা উড়ে যেতে পারে; কিন্তু তুমি যা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ অনুভব কর, তা তোমার কোন কালে যাবার নয়। ধর্ম সম্বন্ধে কেবল বচনবাগীশ হলে কিছু ফল হয় না। যে কোন বস্তুর সংস্পর্শে আসবে – যেমন মানুষ, জানোয়ার, আহার, কাজকর্ম – সকলের উপর ব্রহ্মদৃষ্টি করাকে একটা অভ্যাসে পরিণত কর।*) আচার্য শঙ্করও বারবার এই কথা বলছেন, যুক্তিতর্ক দিয়ে কখনই ঈশ্বরকে প্রমাণিত করা যায় না। আজকে তুমি মন দিয়ে, বুদ্ধির ধারালো যুক্তি দিয়ে যে সত্যের জ্ঞান লাভ করছ, আগামীকাল ওর থেকে আরেকটা ধারালো যুক্তি এসে তোমার ওই জ্ঞানকে উড়িয়ে দেবে। বই পড়া, যুক্তিতর্ক করা, ঠিক আছে, একটু যা হওয়ার হল, কিন্তু এগুলো মন্দের ভাল। সেইজন্য সব কিছুর পিছনে ঈশ্বরকে নিয়ে আসতে হবে – মানুষ দেখছি, তাকে ঈশ্বরীয় সত্তা রূপে দেখ, পশু দেখছ, ঈশ্বরীয় সত্তারূপে দেখ, তেমনি সাপ-বিছে যা দেখছি সব ঈশ্বরীয় সত্তা রূপে দেখছি। ঠিক তেমনি আহার করছি, খাদ্যটা ঈশ্বরের প্রসাদ রূপে গ্রহণ করছি।

আমার মৃত্যু নেই, তাই আমার কোন তাড়াহুড়ো নেই

এরপর স্বামীজী ইঙ্গারসোলের ঘটনাটা বলছেন। আগেও ইঙ্গারসোলের কথা আমাদের আলোচনায় এসেছে। রবার্ট ইঙ্গারসোল আমেরিকার একজন নামকরা অজ্ঞেয়বাদী ছিলেন। তিনি আমেরিকাতে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা ও লেখার মাধ্যমে খ্রীশ্চান ফাদারদের তীব্র আক্রমণ করে বেড়াতেন। স্বামীজীর সঙ্গেও তাঁর দেখা হয়েছিল। ইঙ্গারসোল সেই সময় স্বামীজীকে একটা কমলালেবু দেখিয়ে বলছেন, দেখো, আমি এই কমলালেবুকে বিশ্বাস করি, এই কমললেবুকে নিংড়ে এর শেষ রসটুকু পর্যন্ত খেতে চাই। মেরি লুইবার্কের রচনায় যে বিবরণী পাওয়া যায়, তাতে স্বামীজী বলছেন, আমি প্রাচ্য দেশের লোক বলে আমি আমকে বেছে নেব, আমিও আমের শেষ রসটুকু পর্যন্ত নিংড়ে খেতে চাই। স্বামীজী তাঁকে বলছেন, I know a better way to squeeze the orange of this world than you do, and I get more out of it, আমি এই আমকে নিংড়ে খাচ্ছি আর তোমার থেকে ভাল নিংড়াতে জানি। কারণ, I know I cannot die, so I am not in a hurry, আমি জানি আমার মৃত্যু নেই, সেইজন্য আমার কোন তাড়াহুড়ো নেই। তুমি তো দৌড়াচ্ছ। স্বামীজী বলছেন, আমার যেহেতু মৃত্যু নেই, সেইজন্য আমার তাড়াহুড়া করার নেই, খেদ করারও কিছু নেই। মরে যাব? তাতে কি আছে, আবার আসবো। আরামসে নিংড়ে খেতে থাকো, এখন যেটুকু ভোগ করার করে নাও, সামনের জন্মে আবার ওটাই আরও ভাল করে আরামসে ভোগ করব।

বড় বড় পার্টিতে ফ্রেঞ্চরা, রাশিয়ানরা যখন লাঞ্চ করে, সেখানে দু ঘন্টা, তিন ঘন্টা ধরে লাঞ্চ চলতে থাকে। ঐ লাঞ্চের মাঝখানেই মিটিং চলছে, তার মধ্যে আরেকটা কোর্স এলো, তাড়াহুড়োর কিছু নেই। আমাদের সব সময় তাড়াহুড়ো, প্লেটে এক কাপ চা দিলে, প্লেটের মধ্যে চা ঢেলে নিয়ে ফু দিয়ে সুড়ুক সুড়ুক করে টেনে চা কোন রকমে শেষ করে দৌড় দেব। সব সময় দৌড়াচ্ছে। বাবুরা, যাদের সময়ের কোন অভাব নেই, চায়ের কাপ নিল, এক চুমুক খেয়ে প্লেটের উপর কাপটা রাখল, রেখে বলল, আঃ কি দারুণ চা। আবার অনেকক্ষণ পর আরেকটা চুমুক দিল। চা যদি ঠাণ্ডা হয়ে যায়, কাপটা সরিয়ে রেখে দেবে – ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আবার এক কাপ চা এলো; পয়সা আছে, সময় আছে, তার সাথে আভিজাত্য ও সংস্কৃতিটাও আছে। সেইজন্য স্বামীজী বলছেন, I know there is no fear, so I enjoy the squeezing. I have no duty, no

bondage of wife and children and property; I can love all men and women. Everyone is God to me. Think of the joy of loving man as God! Squeeze your orange this way and get ten thousand-fold more out of it. Get every single drop, (*আমি জানি, ভয়ের কোন কারণ নেই; সুতরাং বেশ করে ধীরে ধীরে আনন্দ করে নিংড়োচ্ছি। আমার কোন কর্তব্য নেই, আমার স্ত্রী-পুত্রাদি ও বিষয়-সম্পত্তির কোন বন্ধন নেই, আমি সকল নরনারীকে ভালবাসতে পারি। সকলেই আমার ব্রহ্মস্বরূপ। মানুষকে ভগবান বলে ভালবসলে কি আনন্দ –একবার ভেবে দেখুন দেখি। কমলালেবুটা এইভাবে নিংড়ান দেখি –অন্য ভাবে নিংড়ে যা রস পান, তার চেয়ে দশ হাজার গুণ রস পাবেন –এক ফোটাও বাদ যাবে না। প্রত্যেকটা ফোটাই পাবেন।*)

আমরা ভাবি, স্ত্রী-সন্তানেই আনন্দ, exclusivenessটাই আনন্দ। আমরা ভুলে যাই যে, স্ত্রী-সন্তান পরিবারেই আনন্দ হয় না। আনন্দটা আমাদের ভিতরেই রয়েছে, ওই আনন্দটাই বাইরে বেরিয়ে গিয়ে স্বামী/স্ত্রী-সন্তানকে বিষয় করে নিচ্ছে। আনন্দের ব্যাপারে যদি আমি সচেতন হয় যাই, আর সমস্ত জগৎটাই যদি আমার নিজের হয়ে যায়, তখন আমার আনন্দ কোটিগুণ বেড়ে যাবে। এই কথা আবার যারা নিম্ন মানসিকতার, কুতর্ক করা যাদের স্বভাব, তাদের কাছে বলা যাবে না। এটাকেই ঘুরিয়ে দিয়ে বলবে, এ কি বলছেন! জগতের সমস্ত মেয়েকে নিজের স্ত্রী বানাতে চাইছেন? স্ত্রী বানিয়ে তুমি যে আনন্দ পাচ্ছ, ওটা তোমার নিজের আনন্দ। উট যখন কাঁটা ঘাস খায় তখন তার মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসে, নিজের সেই রক্তকে সে আস্বাদ করে, তাতেই তার আনন্দ। কাউকে দেখে, কারুর সঙ্গ করে আমি যদি আনন্দ পাই, ওটা আমার নিজেরই আনন্দ, তার উপরে গিয়ে প্রতিবিম্বিত হয়ে আমার কাছে ফেরত আসছে – তাকেই আমরা স্বামী বলি, স্ত্রী বলি, সন্তান বলি। এটাই কিন্তু সমস্ত জগৎ, জগৎটাকেই যদি আমি প্রতিবিম্ব বানিয়ে দিই, তখন আমি যেখানেই আনন্দ ছাড়ছি ওখান থেকে যখন আমার কাছে আনন্দ ফেরত আসছে, তখন কত হাজার গুণ হয়ে ফেরৎ আসবে, আমাদের ধারণাই নেই।

আত্মা সর্বশক্তিমান, আত্মার ইচ্ছাতেই সব হয় – আমি সেই আত্মা

That which seems to be the will is the Atman behind, it is really free, (*যাকে আমাদের 'ইচ্ছা' বলে মনে হচ্ছে, সেটা প্রকৃতপক্ষে আমাদের অধিষ্ঠান-স্বরূপ আত্মা, এবং বাস্তবিকই তা মুক্তস্বভাব।*) Freedom, free will, আর God's will এই তিনটেকে নিয়ে আমরা আগে অনেকবার আলোচনা করেছি। যাকে আমরা আমাদের ইচ্ছা বলে মনে করি, আমরা মনে করি, আমার মন ইচ্ছা করছে বলে এটা হচ্ছে। আসলে কিন্তু তা নয়, আসলে সেই আত্মা, যিনি শুদ্ধ চৈতন্য, যিনি সর্বদা মুক্ত; তাঁর ক্ষমতার কোন সীমা-পরিসীমা নেই, তাঁর ইচ্ছাতেই সব কিছু হয়। ঠাকুর বলছেন, তাঁর ইচ্ছা বিনা গাছের পাতাটি পর্যন্ত নড়তে পারে না। তিনিই আছেন, তিনিই চৈতন্য, তাঁরই ইচ্ছাতেই সব কিছু চলে। জগতে যা কিছু হচ্ছে, পিছনে আত্মা রয়েছেন বলেই তা হচ্ছে। আত্মা যদি না থাকেন, কিছুই হবে না। শক্তি একমাত্র আত্মারই আছে। সেই আত্মা আমি, সেইজন্য আমি হলাম সর্বশক্তিমান, আমার ইচ্ছাতেই সব কিছু হয়। আমেরিকা জাপানে যে এ্যটম বোমা ফেলেছিল, সেটাও আমার ইচ্ছাতেই ফেলেছে। আজকে কোথাও যদি কোন নারীর শ্লীলতাহানি হয়, সেটা আমার ইচ্ছাতেই হচ্ছে। এই জিনিস ধারণা করা যায়! অসম্ভব। আমরা মানতেও রাজী নই। সেইজন্য সবার জন্য অদ্বৈত নয়, কিন্তু এটুকু আমাদের জেনে রাখা দরকার – এটাই সত্য। স্বামীজী এখানে ঘুরে ঘুরে আত্মজ্ঞানের ব্যবহারিক দিকটাকে নিয়ে আলোচনা করে গেলেন। মানুষ যদি আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তাত্ত্বিক ভাবেও যদি জেনে যায়, তখন তার জীবন কেমন হয় – এটাকে নিয়ে স্বামীজী আলোচনা করলেন। এরপর স্বামীজী এই দিনেই অপরাহ্ণে যে আলোচনা করেছেন, তার উপর আলোকপাত করা হচ্ছে।

ঐদিন, অপরাহ্ণ

মানবচরিত্রের দুর্বলতা অবতারের উপর চাপানো যায় না

২৯শে জুলাই সোমবার ছিল, সোমবার দিন সকালে স্বামীজী অনেকগুলো কথা বলেছিলেন। ঐদিন দুপুরেও তিনি শিষ্যদের সাথে অনেক কথা বলেছিলেন। যে জায়গা থেকে স্বামীজী আলোচনা শুরু করছেন, ঐ

জায়গার কথাগুলিকে খুব সামলে আলোচনা করতে হয়, কারণ এই কথাগুলি সবার সামনে বলা উচিত হবে না, কথাগুলো শুধু আমাদের বুঝে নিতে হবে। থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে স্বামীজীর সঙ্গে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা সংখ্যায় কখন দশ, কখন বারো। এনারা সবাই আমেরিকার যে গোঁড়া ধর্ম, সেই ধর্মকে নিয়েই বড় হয়েছিলেন। অবতারী পুরুষের মধ্যে তাঁরা যীশুখ্রীষ্টকে মানেন, তিনি তাঁদের কাছে ভগবান। তার থেকেও বড় কথা হল, তাঁদের কাছে যীশু হলেন জগতের একমাত্র রক্ষাকর্তা। এখনও অনেক খ্রীশ্চান তাই মনে করে। তখনকার দিনে তাঁরা যে এই ধারণা পোষণ করতেন, তার পিছনে কারণ ছিল, সেই সময় যীশু ছাড়া তাদের সামনে আর কেউ ছিলেন না, আমাদের মত তাদের ঋষি পরম্পরা ছিল না। খ্রীশ্চানিটির প্রভাব যখন চারিদিকে বিস্তার লাভ করতে শুরু হয়েছে, তখন তারা দেখছে যীশুর কথাগুলো যেন অন্য জগৎ থেকে আসছে। এইভাবে সামাজিক চেতনার মধ্যে যীশু প্রবেশ করে গেলেন, আর সমস্ত কিছুকে তারা ঐভাবে দেখছে। স্বামীজীর শিষ্যরা, বিশেষ করে যাঁরা থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে স্বামীজীর সাথে ছিলেন, তাঁরা স্বামীজীর অন্তরঙ্গ। অন্তরঙ্গের কাছে প্রাণ খুলে অনেক কথাই বলা যায়, যেসব কথা বাইরে বলা যায় না।

আজকের অপরাহ্ণের আলোচনায় প্রথম দুটি লাইনে স্বামীজী তাঁর অন্তরঙ্গদের দেখিয়ে দিচ্ছেন, যীশু আর বুদ্ধ দুজনই কিভাবে imperfect। কোন জিনিসকে যখন out of context নিয়ে নেওয়া হয়, তখন জিনিসটাকে একটু অন্য রকম মনে হয়। দ্বিতীয় আরেকটা জিনিস হল, কোন মানুষের বক্তব্য যদি সামগ্রিক ভাবে না নেওয়া হয়, তখন কোথাও যেন মনে হয়, কথাগুলো যেন এলেমেলো হয়ে যাচ্ছে। স্বামীজী যীশুকে প্রচণ্ড শ্রদ্ধা করতেন। স্বামীজী বলতেন, যীশুর পায়ের জুতোর ফিতে বাঁধারও আমি যোগ্য নই। ভগবান বুদ্ধকেও তিনি এভাবেই তাঁর অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা জানাতেন। কিন্তু স্বামীজী এখানে শুরুই করছেন, Jesus was imperfect. (*যীশুখ্রীষ্ট অসম্পূর্ণ ছিলেন।*) কিন্তু তারপরেই তার কারণ দর্শাতে গিয়ে স্বামীজী বলছেন, because he did not live up fully to his own ideal। (*কারণ তিনি যে আদর্শ প্রচার করেছিলেন, তদনুসারে সম্পূর্ণভাবে জীবনযাপন করেননি।*) তিনি যে আদর্শ দিয়েছেন, যে উপদেশ দিয়েছেন, সেই অনুসারে যে তিনি নিজে জীবনযাপন করেছেন, তা বলা যায় না। এই কথা বলার পর স্বামীজী আরও বলছেন, and above all because he did not give woman a place equal to man, (*আর সর্বোপরি তিনি নারীগণকে পুরুষের তূল্য মর্যাদা দেননি।।*)

তিনটে যে প্রাচীন ধর্ম, জুহুদি ধর্ম, পার্সি ধর্ম আর হিন্দু ধর্ম, এই তিনটে ধর্মে অনেক কিছু ব্যাপারে মিল পাওয়া যায়। তার মধ্যে সবচেয়ে যে সাযুজ্য, তা হল, তিনটে ধর্মই পুরোহিত প্রাধান্যের দ্বারা চালিত। জহুদিদেরও আছে, পার্সিরা এখনও পুরো priest class, আর হিন্দুদের ব্রাহ্মণ। এই তিনটে ধর্মই মহিলাদের ঐ অধিকার দেয় না। হিন্দুরা তাই মহিলাদের জন্য আলাদা ধর্মই করে দিল – সেটা হল ব্রত। যতগুলি ব্রত হয়, যেমন ষষ্ঠিব্রত বা ইদানিং ছট্, এগুলোকে ঠিক পূজা বলা যায় না, এগুলো হল ব্রত। ব্রত পালন করার জন্য কোন মন্ত্র লাগে না, কোন শাস্ত্রীয় আচার লাগে না, পুরোপুরি পারিবারিক বিধিবদ্ধ আচারে ব্রত পালন করা হয়, আবার যেমনটি মনে করবে তেমনটি করতে পারে। কিন্তু পূজার ক্ষেত্রে এসব চলবে না। ইদানিং অবশ্য পেপারে, টিভিতে খবরে জানা যায় যে, অনেক মন্দিরে মহিলারাও পুরোহিতের কাজ করছেন। কিন্তু তিনটে পুরনো ধর্মেরই এই সমস্যা আছে। এখানে স্বামীজীর বক্তব্য হল, যীশুর জন্য মহিলারা অনেক কিছু করলেন, মেরি, মার্থার মত নারীদের নাম খ্রীশ্চান ধর্মে রীতিমিত আলোচিত; কিন্তু ঠিক ঠিক শিষ্য বলতে যেটা বোঝায়, সেইভাবে কোন নারীকে তিনি স্থান দিলেন না। পরে একটা বাক্য আসবে, সেখানে গিয়ে এই জিনিসটা আরও পরিষ্কার হবে।

আমরা শুনে থাকি, মেয়েদের নিয়ে ভারতবর্ষে একটা ভুল ধারণা তৈরী হয়েছিল যে, মেয়েদের বেদ পাঠ করার অধিকার নেই, মেয়েদের গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারণ করতে নেই। অথচ বেশির ভাগ লোক জানেই না যে, বেদের অনেকগুলো সূক্ত ঋষিকারা রচনা করেছেন। যদি তাঁদের বেদ পাঠ করার অধিকার নাই থাকত, তাহলে তাঁরা বেদের মন্ত্র রচনা করলেন কি করে? সমাজে কিছু কিছু জিনিস চলতে চলতে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে একটা বিচিত্র রূপ ধারণ করে নেয়, তখন লোকেরা মনে কর এটাই ঠিক। দেববাণীতে এই জিনিসটা বারবার ঘুরে ঘুরে আসবে। সেখানে তখন আসল জিনিসটা কি বুঝতে হয়, আর দেখতে হয় সামাজিক ব্যাপারের মধ্যে সময়

সাপেক্ষে কোন কোন জিনিসগুলো ঢুকে গেছে। অবতার যখন আসেন তিনি তখন এই জিনিসগুলোকে কেটে উড়িয়ে দেন। সামাজিক জিনিসটাকে উড়িয়ে দেন, আর সময়ের জন্য যে একটা দুরবস্থা হয়, যেমন গীতায় বলছেন, *স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ*, ভগবান বলছেন, আমি তো বারবার এসে ধর্মস্থাপনা করে দিয়ে চলে যাই, কিন্তু অনেক দিন চলতে চলতে ঐ জিনিসটা আবার নিজে থেকেই নষ্ট হয়ে যায়; সেটাকে আমিই এসে আবার পুনঃস্থাপিত করি। আচার্য শঙ্কর গীতার ভাষ্য লিখতে গিয়ে প্রথমেই বলছেন, ভগবান এসে ধর্ম সংস্থাপন করে দেন ঠিকই, কিন্তু সেই ধর্ম যারা পালন করে তাদের মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ থাকার জন্য ধর্মের অধোগতি হবেই, এখানে কিছু করার নেই। এই জিনিস সব ধর্মের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কোন ধর্মের কোন মহাপুরুষ এসে যদি বলে দিয়ে থাকেন, আমি যে ধর্ম দিয়ে গেলাম, এই ধর্ম চিরদিন ঠিক এভাবেই চলতে থাকবে, এর থেকে বড় ভুল কথা আর হতে পারে না। কালের নিয়মানুসারে প্রত্যেক ধর্মেরই সংস্কারসাধন দরকার, আর যে ধর্মের সংস্কারসাধন করা হয় না, সেই ধর্ম ধীরে ধীরে বিলুপ্তির দিকে চলে যায়।

জুইস ধর্মের যে প্রথাগুলি চলে আসছিল, যে কোন কারণেই হোক যীশু সেগুলোকে ভাঙতে চাননি। স্বামীজী এখানে যীশুর কোন রকম সমালোচনা করছেন না, এগুলোকে বলে higher criticism of religion, দেববাণীর এই লাইনগুলিকে সরাসরি তুলে নিয়ে গিয়ে যদি কোথাও বলতে থাকে, সবাই ধারণা করবে যে, স্বামীজী সেই খ্রাইস্টের বিরুদ্ধে বলছেন, যাঁকে খ্রীশ্চানরা ভগবান বলছে। কিন্তু স্বামীজী একেবারেই তা করছেন না। অবতাররাও এসে ধীরে ধীরে পরিবর্তনই করেন। ঠাকুর আসার পর সবে একশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। পাঁচশ বছর যাওয়ার পর ঠাকুরের নামে কি কি নিন্দা যে শুরু হবে ভগবান জানেন। কারণ পাঁচশ বছর পর কি ধরণের সমাজ আসবে, এক্ষুণি আমরা কল্পনা করে বলতে পারি না। Higher criticismএ এই ধরণের জিনিসগুলিকে ধরে নিয়ে আসে, আপনি কোথায় কোথায় গোলমাল করেছেন। স্বামীজী যে কথাগুলো বলছেন, এটাও higher criticism থেকেই আসছে।

এখানে উদ্দেশ্য হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যে যীশু এই জগতে পরিবর্তন নিয়ে আসছেন, সেই যীশুকে তুমি যদি মানুষ রূপে দেখ, তাহলে জানবে তাঁরও দোষ আছে। এখানে শুধু যীশুই নন, আমরা যাঁকেই মানুষ রূপে নিয়ে আসি না কেন, একই জিনিস হবে। যারা শ্রীরামচন্দ্রের সমালোচনা করে, তারা প্রশ্ন তোলে, সীতাকে কেন তিনি বনে পাঠালেন, বালিকে কেন লুকিয়ে বধ করলেন? এই প্রশ্নগুলি করছে, কারণ তারা সেখানে শ্রীরামকে মানুষ রূপে দেখছে। শ্রীকৃষ্ণকে রাধা ও গোপীদের সাথে মিলিয়ে যে নিন্দা করা হয়, কারণ সেখানেও তারা শ্রীকৃষ্ণকে মানুষ রূপে দেখছে। ভগবান রূপে দেখলে তখন আর কোন কিছুই আসে যায় না। একটা খুব সাধারণ কথা হল, হিংসা করা, কাউকে হত্যা করা পাপ সবাই জানে। বলা হয়ে থাকে যে, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ সব ভগবানের হাতে। তাহলে যত মৃত্যু হয় সব ভগবানই দিচ্ছেন। তাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে এত লোক যে মরছে, এত লোককে মারছে, এর সব পাপ তো ভগবানের গিয়ে লাগার কথা। এরপর ভগবানের থেকে বড় পাপী আর কেউ হতে পারে! কিন্তু ভগবান এই সব কিছুর পারে। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ এগুলোর কোন কিছুই ভগবানের গায়ে লাগে না। সংসারে যা কিছু হচ্ছে, তার সাথে ভগবানের কোন সম্পর্ক নেই। গীতা, উপনিষদ, ঠাকুর, স্বামীজীরা বারবার এই জিনিসটাকে আমাদের বোঝানর চেষ্টা করছেন। সেইজন্য যীশুকে ভগবান রূপে দেখলে এই সমস্যা গুলো হবে না। কিন্তু যীশুকে মানুষ রূপে দেখলে এক গুচ্ছ সমস্যা দাঁড়িয়ে যাবে। কিন্তু আরও সমস্যা হল, আমাদের মত লোকেদের নিয়ে, যারা মনে করছে আমি তাঁকে ভগবান রূপে ভাবছি, অথচ দেখছি মানুষ রূপে।

উচ্চ দর্শন, উচ্চ ভাব ধরে রাখা অত্যন্ত কঠিন। একজন মহারাজ মজা করে বলতেন, স্বামীজী ও শঙ্করাচার্য বাদে যাঁরা মনে করেন আমি অদ্বৈতী, আসলে তাঁরা সবাই বিশিষ্টাদ্বৈতী আর যাঁরা বলেন আমি বিশিষ্টাদ্বৈতী, আসলে তাঁরা দ্বৈতবাদী, যাঁরা দ্বৈতবাদী হয় তাঁরা সবাই একপ্রকার প্রবঞ্চক। কারণ তারা নিজেদের সুবিধামত সব জায়গায় ঠাকুরের ইচ্ছা বলে চালিয়ে দেয়। আসলে আদর্শকে ধরে রাখা অত্যন্ত কঠিন। যাঁরা ধর্ম বা আধ্যাত্মিক পথে আছেন, বিশেষ করে সন্ন্যাসীরা জানেন একটা ভাবকে, একটা আদর্শকে ধরে রাখা কত কঠিন, বিশেষ করে অদ্বৈত ভাব। লেকচার দেওয়ার সময়, ধর্মকে নিয়ে, অদ্বৈতকে নিয়ে ভাষার ফুলঝুড়ি দিয়ে বড় বড় অনেক কথাই বলে দেওয়া যায়, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে নামলে বোঝা যাবে কে কতটা সেই

ভাবকে ধরে রেখেছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, *হত্বাপি স ইমাল্লোঁকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে*, যে ঠিক ঠিক অদ্বৈতে আছে, সে সমস্ত লোকের নাশ করে দিলেও তার কিছু আসে যায় না, আর তার নিজের নাশ হয়ে গেলেও কিছু আসে যায় না; ঠাকুর যেটা আরও সহজ ভাষায় বলছেন, হাত কেটে গেছে, দরদর করে রক্ত পড়ছে, বলছে, আমার তো কিছু হয়নি, আমি তো শরীর নই, আমি তো শুদ্ধ আত্মা, আমার কেন কিছু হবে! এই ভাব যে রাখতে পারছে না, অদ্বৈতের কথা বলা তার মুখে শোভা পায় না। আমরা একদিকে মনে করি আমরা ভক্ত, অন্য দিকে আমাদের মন বিষয়াসক্ত। আমরা একদিকে ঠাকুরকে অবতার বলে মানছি, কিন্তু আসলে আমরা ঠাকুরকে মানুষ রূপে ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে চাইছি না। যখনই ঠাকুরের সম্বন্ধে কিছু বলতে যাচ্ছি, তখন বলছি, ঠাকুর এটা খেতে ভালবাসতেন, সেটা করতে ভালবাসতেন, শ্রীমা এটা খেতে ভালবাসতেন, ঠাকুর এই করেছেন, সেই করেছেন, আমাদের মন ঠাকুরকে মানবচরিত্রের বাইরে কল্পনাই করতে পারে না।

থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে যাঁরা স্বামীজীর সঙ্গে আছেন, এনারা হলেন খুব বিশিষ্ট মানুষ। এনাদের মধ্যে যে ধারণাগুলো খুব দৃঢ় হয়ে গেছে, যে ধারণাগুলো তাঁদের ধর্ম পথে কখনই এগোতে দেবে না, এই দিনকার স্বামীজীর লেকচারটা শুনলে বোঝা যাবে, তিনি শিষ্যদের সেই ধারণাগুলির উপর কুঠারাঘাত করছেন। সেইজন্য তিনি এইভাবে বলছেন। কিন্তু দুম্ করে যদি তুলে এনে বলে দেওয়া হয় Jesus was imperfect, তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। এর পশ্চাৎপট কি, কেন বলছেন, এগুলোকে আগে বুঝতে হয়। স্বামীজীর একটা খুব নামকরা ঘটনা আছে, একজন বয়স্ক মানুষ বেলুড় মঠে এসেছেন, স্বামীজীকে বলছেন, 'স্বামীজী মহারাজ! আমি ধর্ম বলতে রোজ গঙ্গা স্নান করি, এটাই আমার কাছে ধর্মের সব'। স্বামীজী বলছেন, 'গঙ্গাস্নান দিয়ে কিছু হয় না, ঐ দিয়ে ধর্ম হয় না'। বয়স্ক ভদ্রলোক চলে গেলেন। কিছু দিন পর এক যুবক ছেলে এসে বলছে, 'স্বামীজী আমি গঙ্গাস্নান-টান এসব কিছু মানি না'। স্বামীজী তাকে বলছেন, 'না না, গঙ্গাস্নানই সব, রোজ গঙ্গাস্নান করবে, তাতেই সব হবে'। একজন সাধু, তিনি স্বামীজীর সব কথা শুনছেন, হাসতে হাসতে বলছেন, 'স্বামীজী ওকে কি বললেন! বয়স্ক ভদ্রলোককে বললেন, গঙ্গাস্নান কিছু না, আর একে বলছেন, গঙ্গাস্নানই সব! কোনটা ঠিক'? স্বামীজী সেই সাধুকে বলছেন, 'আমি হলাম আচার্য, যার যেটা দরকার তাকে সেটা বলি। তোমার কি দরকার বল, আমি তোমাকে সেই রকম বলব'। এই জিনিসটা যদি ঠিক বোধগম্য না হয়, তারপর যদি কথামৃত পড়তে যায়, দেববাণী পড়ে, তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। দেখতে হবে, ঐ কথাটা ব্যক্তি বিশেষকে বলা হয়েছে, নাকি জনগণকে বলা হয়েছে। স্বামী অভেদানন্দজীর একটা ঘটনা আছে, আমেরিকাতে তিনি এক জায়গায় লেকচার দিচ্ছেন, একজন প্রশ্ন করল, অভেদানন্দজী এক রকম উত্তর দিলেন। প্রশ্নকর্তা শান্ত হয়ে বসে গেলেন। পরে একজন বলছে, 'এই উত্তরটা ঠিক জমল না, উত্তরটা অন্য রকম হওয়া উচিত ছিল'। স্বামী অভেদানন্দজী বলছেন, 'আমি জানি উত্তরটা অন্য রকম হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু যে প্রশ্ন করেছে, তার মনে যে প্রশ্ন ছিল তার উত্তর এই রকমই হওয়া উচিত, সেইজন্য এটা বলা হল, ওকে আমার যা বোঝাবার বুঝিয়ে দিয়েছি। বাকিদের কাছে হয়ত তাদের মনের মত হচ্ছে না'। স্বামীজীর এই ধরণের অনেক কথা সংবাদ রূপে নোট করা আছে। এগুলোর মধ্যে অনেগুলো জিনিস আছে যেটা স্বামীজী ব্যক্তি বিশেষকে বা গ্রুপ বিশেষকে বলছেন, যাকে বলছেন, তার মন একটা কোথাও আটকে আছে, সেটাকে ভেঙে দেওয়ার জন্য তিনি ঐ ভাবে বলছেন।

এই কথা বলার পরেই স্বামীজী বলছেন, Still he was the greatest character next to Buddha, who in his turn was not fully perfect. (*তথাপি উচ্চতম চরিত্র হিসাবে বুদ্ধের পরেই যীশুর স্থান – আবার বুদ্ধও এ একেবারে সম্পূর্ণ নিখুঁত ছিলেন, তা নয়।*) এখন এই তুলনাগুলো চলে না। যীশু আর ভগবান বুদ্ধ দুজনকেই স্বামীজী প্রচণ্ড সম্মান করতেন। কোথাও কোথাও তিনি বুদ্ধকে নিয়েও এই ধরণের তাঁর নিজস্ব কিছু কথা বলেছেন। ভগবান বুদ্ধকে নিয়েও কিছু জিনিস আছে, ঠিক যেভাবে রাম বা কৃষ্ণকে নিয়ে বলা হয়। Buddha, however, recognized woman's right to an equal place in religion, and his first and one of the greatest disciple was his own wife, who became the head of the whole Buddhistic movement among the women of India. (*যাই হোক, বুদ্ধ ধর্মরাজ্যে পুরুষের সাথে স্ত্রীলোকের সমানাধিকার স্বীকার করেছিলেন, আর তাঁর নিজের স্ত্রীই তাঁর প্রথম ও একজন প্রধানা শিষ্যা। তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদের অধিনায়িকা হয়েছিলেন।*) আসলে তিনি ঠিক ঠিক দিয়েছিলেন

তাঁর সৎমাকে। পরে অবশ্য বুদ্ধের পরিবারের সবাই সন্ন্যাসী হয়ে যান, ছেলেও সন্ন্যাসী হয়ে যান। এই তথ্যগুলোর খুব একটা গুরুত্ব নেই, ধর্মে নারীর সমনাধিকারের কথা বলতে গিয়ে স্বামীজী এই কথা বলছেন।

এরপরেই স্বামীজী আবার বলছেন, But we ought not to criticize these great ones, we should only look upon them as far above ourselves. (*আমাদের কিন্তু এই-সকল মহাপুরুষদের সমালোচনা করা উচিত নয়, আমাদের শুধু উচিত – তাঁদের আমাদের চেয়ে অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ মনে করা।*) এর মধ্যে দুটো তিনটে চলিত কথা আছে, যার অর্থ আমরা খুব সহজেই অনুধাবন করতে পারি। বলছেন, এনারা এমন উচ্চস্তরের মহাপুরুষ যে, এনাদের নিয়ে কোন আলোচনা করাই আমাদের ঠিক নয়, শুধু এটা বুঝতে হবে যে, এনারা আমাদের থেকে অনেক উপরে। ধর্মের দিক থেকে বা বেদান্তের দিক থেকে আমরা বলতে পারি যে, আমরা শুদ্ধ আত্মা, আমরা বলতে পারি যে, সমস্ত শক্তি, সমস্ত জ্ঞান আমার ভিতরেই আছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে নামার পর আমরা নিজেদের সীমাবদ্ধতাগুলি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়ে যাই। তখন আমাদের একটা আশ্রয়কে অবলম্বন করে বড় হতে হয়। ঠাকুর বলছেন, চারাগাছকে প্রথমে বেড়া দিয়ে গরু-ছাগল থেকে রক্ষা করতে হয়ে। আমরা সবাই জানি বেড়া না দিলে, সব কিছু যদি ছেড়ে দিয়ে রাখা হয়, একটা ধাপের পর থেকে সে বড় হতে পারবে না, এই কারণে বেড়াটা দিতেই হবে। সমাজে ঠিক এই জিনিসটাই হয়। যাঁকে সমাজ স্বীকৃতি দিয়ে দিল, ইনি বড়, আমার নিজের জীবন চালাবার জন্য আমাকেও ততক্ষণ মেনে নিতে হবে উনি বড়, যতক্ষণ না আমি তাঁর সমান হয়ে তাঁকে অতিক্রম করে না চলে যাচ্ছি। পেরিয়ে আসার পর আমার ভিতর সব সময় এই কৃতজ্ঞতা বোধটুকু থাকতে হবে যে, এনার সাহায্যেই আমি বড় হয়েছি।

ইদানিং মাঝে মাঝেই সংবাদ মাধ্যমে, মিডিয়াতে কিছু কিছু সাধু-সন্ন্যাসীদের নামে অনেক স্ক্যাণ্ডাল বেরোচ্ছে। সেখান থেকে একটা কথা বেরিয়ে আসছে, সব সাধুরাই ভণ্ড। এখানে কিন্তু এবার সাধু ভণ্ড হোক আর ভণ্ড নাই হোক, 'সব সাধুই ভণ্ড' বলা মানে সে তার জীবনকে সর্বনাশের পথে ঠেলে দিল। কারণ তার আর দাঁড়াবার কোন জায়গা থাকল না। নেতাদের নামে কিছু বেরোলে আমরা বলে দিচ্ছি, সব নেতারাই চোর। সবাই চোর কিনা জানা নেই, সে তার জীবনটা সর্বনাশ করে দিল। অনেক আগে, আমেরিকার প্রেসিডেন্টের নামে বলতে গিয়ে একজন সেনেটর বলে বসলেন, He is stupid, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দলের লোকেরাই তাঁকে আপত্তি জানিয়ে বলছেন, এটা বলা যায় না, তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট, একটা জায়গায় গিয়ে মুখের লাগাম টানতে হয়। আমরা তাঁর নীতিকে নিয়ে আলোচনা করতে পারে, তাঁর নীতির সাথে একমত না হতে পারি, কিন্তু একটা অবস্থায় গিয়ে শ্রদ্ধার জায়গাটা যদি উড়িয়ে দেওয়া হয় তখন অনবস্থা দোষ হয়ে যায়। অনবস্থা দোষ মানে, যার উপর দাঁড়িয়ে আছি, সেই অবলম্বনটাই থাকবে না, পায়ের তলার মাটিটা সরে যাবে। লোকেরা এই জিনিসটাকে কিছুতেই বুঝতে পারে না, যারা বুঝতে পারে তারা আবার মানতে চায় না। ঠাকুর সহজ করে বলছেন, যদ্যাপি আমার গুরু শুঁড়িবাড়ি যায়, তদ্যাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়। আমাদের যদি বাঁচতে হয়, যদি বড় হতে হয়, তাহলে একবার আমি যাঁকে বড় মনে করেছি, কোন পরিস্থিতিতে সেখান থেকে আর আমার সরে আসা যাবে না। কেউ যখন যীশু বা বুদ্ধ বা রাম বা কৃষ্ণকে বড় মনে করে নিয়েছে, আরও দশজন যাঁকে বড় মনে করছে, সেখানে ওই অবলম্বনটাকে কখনই ছাড়া যাবে না। যারা মনে করে আমি এনার সাহায্যে বড় হয়েছি, কিন্তু পরে দেখছে, লোকটা তো আমার মত নয়। ঠিক আছে, তুমি অবশ্যই মনে করতে পারো যে, তোমার স্ট্যাণ্ডার্ডে এখন উনি দাঁড়াতে পারছেন না, কিন্তু তুমি এটা ভুলে যেও না যে, এক সময় এনার সাহায্য নিয়ে তুমি এমন জায়গায় পৌঁছালে, যেখানে তুমি আজকে ভাবতে পারছ যে, আমি তাঁকে পার করে এসেছি।

আগেকার দিনে গ্রামের কোন ছেলে বড় হয়ে আইপিএস বা আইএএস অফিসার হয়ে গেছে, কিন্তু দেখা যেত সেই ছেলে গ্রামে যে পাঠাশালা থেকে পড়াশোনা করে বড় হয়েছে, সেই পাঠাশালার শিক্ষকদের প্রচণ্ড শ্রদ্ধার চোখে দেখে, নিজের গ্রামে এলে তাঁদের পা ছুঁয়ে প্রণাম করবে। কখনই সে বলবে না যে, আমার প্রাইমারী স্কুলের টীচার মাধ্যমিক পাশ, আর আমি আজকে আইপিএস হয়েছি, উনি আমার কাছে কিছুই না। কারণ সে জানে, ঐ মাধ্যমিক পাশ একজন প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক ছিলেন বলেই আজকে আমি এই অবস্থায় পৌঁছাতে পেরেছি। শুধু নিজের ক্ষেত্রেই নয়, এমনকি আমরা যে বিভিন্ন ব্যবস্থার নিন্দা করি, শিক্ষা ব্যবস্থা, চিকিৎসার ব্যবস্থা, রাজনীতি, ধর্ম নিয়ে নিন্দা করি তখনও আমাদের ভেবে দেখা দরকার। অনেকে হয়ত

বলবে, সমালোচনা না করলে তো কোন উন্নতিই হবে না। উন্নতি না হওয়ার কথা কখনই বলা হচ্ছে না, আগে তুমি ঐ লেভেলে যাও, ওই লেভেলে গিয়ে ঐ লেভেলকে অতিক্রম করে তুমি নূতন কোন ব্যবস্থা নিয়ে এসে সেটাকে প্রয়োগ করে দেখাও। আগেকার দিনে প্রায় নব্বই শতাংশ মায়েরা বেশি দূর পড়াশোনা এগিয়ে নিয়ে যেতেন না। পরে তাঁরই ছেলে বিরাট পণ্ডিত হয়ে যেত। সেই ছেলে স্কুলে পড়ার সময় হয়ত মাকে বলতে পারে, মা তুমি কিছুই জানো না। কিন্তু বড় হয়ে যাওয়ার পর, গ্রাজুয়েট হয়ে গেল, মাস্টার ডিগ্রি পেল, তখন কিন্তু মাকে কক্ষণ এই ধরণের কথা বলবে না। সবাই কিন্তু বলে, আমার প্রথম শিক্ষা মায়ের হাতে। এটা তো গেল একজন বেশি লেখাপড়া না জানা মায়ের কথা। আর অন্য দিকে যাঁরা প্রফেট, যীশু, মহম্মদ, ভগবান বুদ্ধ, শ্রীরামকৃষ্ণ, এনারা এত উঁচু যে, আমাদের মত লোকেদের পক্ষে ঐ জায়গায় পৌঁছানর কোন সম্ভবনাই নেই।

সেইজন্য স্বামীজী বলছেন, অবতারদের সম্বন্ধে এই ধরণের কথা চলে না। প্রথমে স্বামীজী ঐ কথা বলছেন ঠিকই, যীশুকে নিয়ে যেসব গোঁড়ামি আছে, সেই গোঁড়ামি গুলিকে ভাঙার জন্য স্বামীজী এই কথা বলছেন। বলার পর তিনি আবার সাবধানও করে দিচ্ছেন। আজকের দিনে সমাজের দিকে তাকালে দেখা যাবে, শ্রদ্ধা জিনিসটার প্রচণ্ড অভাব সবার চোখে পড়বে। ইদানিং সোস্যাল মিডিয়া হওয়াতে সবাই সবার নামে অপবাদ, নিন্দা, কুৎসা, সমালোচনা করে যাচ্ছে, শ্রদ্ধা জিনিসটাকে একেবারে তলানিতে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। যার নামে তুমি লিখছ, তাঁর কি কিছু হচ্ছে? কিছুই হচ্ছে না। যারা লিখছে তাদের মানসিকতাটাই দূষিত হয়ে যাচ্ছে। আমরা এই জিনিসটা বুঝতে পারছি না, ক্ষতি তাঁর হচ্ছে না, ক্ষতি হচ্ছে আমার। এরপরেই আবার স্বামীজী বলছেন, Nonetheless we must not pin our faith to any man, however great; we too must become Buddhas and Christs. (*তা হলেও যিনি যত বড়ই হোন না কেন, কোন মানুষের উপর আমাদের শুধু বিশ্বাস করে পড়ে থাকলে চলবে না, আমাদেরও বুদ্ধ ও খ্রীষ্ট হতে হবে।*) স্বামীজী এই আলোচনায় ভগবান বুদ্ধ, ভগবান যীশুকে মানুষ রূপে ধরে নিয়ে বলছেন। কোন মানুষ? যিনি পূর্ণতা অর্জন করেছেন; ভগবান রূপে নিচ্ছেন না। খ্রীষ্টকে ভগবান রূপে নিলে, তখন কিন্তু এই আলোচনা হবে না। স্বামীজী এখানে বিশ্বাসের কথা বলছেন, আমরা যদি মনে করে বসে থাকি যে, যীশু খ্রীষ্ট এসে আমাকে উদ্ধার করবেন, ঠাকুর শেষে আমাকে উদ্ধার করবে, উচ্চ দর্শন এই ধরণের অন্ধ বিশ্বাসের অনুমতি দেয় না। ভক্তি, শ্রদ্ধা বাড়ানোর জন্য কোথাও কোথাও এই কথাগুলো বলা হয় ঠিকই, ঠাকুর অবশ্যই তোমাকে কৃপা করবেন। যে কোন খ্রীশ্চানরা বলবে, যীশু তোমাকে ভালবাসেন। ফাদার ও নানকে নিয়ে যখন সমস্যা হয় তখন তখন কি যীশু তাদের ভালবাসছেন না, বা যে নারীরা শীলহানির শিকার হয় তখন কি যীশু সেই মেয়েদের ভালবাসছেন না? এই সমস্যাগুলো সব ধর্মেই আসবে। প্রথমের দিকে আধ্যাত্মিক জীবন যখন শুরু হয়, তখন এই ভাবগুলি থাকতে পারে। কিন্তু একটু এগিয়ে যাওয়ার পর এগুলিকে এক পাশে ফেলে দিয়ে নিজের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হয়।

দুর্বলতাটাই স্বাভাবিক, দুর্বলতা দিয়ে কাউকে মাপা যায় না

স্বামীজী ঐ আলোচনা থেকে সরে এসে এবার বলছেন, No man should be judged by his defects. (*কোন ব্যক্তিকে তার দোষ বা অসম্পূর্ণতা দেখে বিচার করা উচিত নয়।*) যদিও এতক্ষণ খ্রীষ্ট ও বুদ্ধের ত্রুটি নিয়ে আলোচনা চলছিল, সেই দোষ নিয়ে এখনও বলছেন, কিন্তু সেই দোষ ভগবান বুদ্ধ ও যীশু থেকে সরে এসেছে মানুষের উপরে। The great virtus a man has are his especially, his errors are the common weakness of humanity and should never be counted in estimating his character. (*মানুষের যে বড় বড় গুণগুলি দেখা যায়, সেগুলি তার নিজের, কিন্তু তার দোষগুলি মনুষ্যজাতির সাধারণ দুর্বলতা মাত্র – সুতরাং তার চরিত্র বিচার করবার সময় সেগুলিকে কখনও গণনার মধ্যে আনতে নেই।*) একটা খুব নামকরা প্রবাদ বাক্য আমরা সবাই শুনে থাকি – Error is human, forgive is Divine। স্বামীজী এই ভাবটাই অন্য ভাবে বলছেন – To be weak is human, to be great is divine। খ্রীশ্চান পম্পরায় বড় হওয়া কোন লোক, বাইবেল যার খুব ভাল করে পড়া আছে আর সে পাদরিদের কাছ থেকে অনেক খ্রীশ্চান ধর্মের কথা শুনেছে, তার সাথে যদি খুব মনোযোগ সহকার স্বামীজীর রচনাবলী পড়ে থাকে, তাহলে সে এই দুটোর মধ্যে একটা বিরাট তফাৎ ধরতে পারবে। তা হল, পাপ। যারা

ঘোর দ্বৈতবাদী, তা সে বৈষ্ণবরাই হোন আর ঠাকুরের ভক্তরাই হোন বা খ্রীশ্চানরাই হন, অর্থাৎ দ্বৈতবাদী যে কোন ধর্মে পাপ জিনিসটার প্রচণ্ড গুরুত্ব।

আমেরিকাতে স্বামীজীকে একজন বলতেন, আপনার ধর্মে পাপ নেই, পাপ না থাকলে সেটা আর কিসের ধর্ম হবে, পাপ না থাকলে ধর্ম চলবে কি করে? আমাদের একটা বিচিত্র সমস্যা আছে, মানুষকে যখনই আমরা বিচার করি, আমরা তার দুর্বলতাগুলি দিয়ে বিচার করি। এটা আমাদের স্বভাব। ইংরাজীতে এটাকে বলে Mising tiles syndrom। বাথরুমের দেওয়ালে টাইলস লাগানো থাকে, তার থেকে একটা টাইল যদি পড়ে গিয়ে থাকে, আমাদের দৃষ্টি সব সময় টাইল না লাগানো জায়গাতে গিয়ে পড়বে। অতগুলি টাইলস লাগানো আছে তার একটাতেও আমাদের দৃষ্টি পড়বে না, একটা টাইল লাগানো নেই সেটাতেই আগে দৃষ্টি পড়বে। স্কুলের পড়ার সময় ক্লাশে দুষ্টুমি করার জন্য যদি আমার নাম উঠে থাকে আর আমাকে হেডমাস্টার যদি ডেকে পাঠায়, তখন প্রথমেই তিনি বলবেন, তোমার মত বদমাইশ ছাত্র আজ পর্যন্ত আমার স্কুলে আসেনি; তুমি এই এই এই দুষ্টুমি করেছ। ভাল করে দেখলে দেখা যাবে, দশটা দোষের কথা বললে, তার মধ্যে খুব বেশি করে হলে তিন চারটে দোষকেই ঘুরিয়ে দশ ভাবে বলা হয়েছে। তখন যদি জিজ্ঞেস করা হয়, আচ্ছা আমার মধ্যে কি কোন গুণ নেই? যদিও এই প্রশ্ন করার সাহস কোন ছাত্রই পাবে না। কিন্তু এটাই মনুষ্যজাতির সমস্যা। নিজের অত্যন্ত প্রিয়জন, এত প্রিয়জন যে ওর জন্যই তার হৃৎস্পন্দন হয়, তাকে ছাড়া যে কোন লোকের নামে কিছু বলা শুরু হতেই তার চারটে দুর্গুণের কথা চলে আসবে – 'হ্যাঁ ভাল, তবে তার কথাবার্তা গুলো এতো রুক্ষ......' 'তবে' একটা লাগাবেই। এই জিনিসটা আমাদের জীবনকে এত হয়রান করে যে, সেইজন্য স্বামীজী এটার উপর বারবার বলতেন। একটা শিকল যতই মজবুত হোক, ওর যদি একটা জায়গা দুর্বল থাকে, সেখানে এক ঘা মারলে শিকল ভেঙে বেরিয়ে যাবে, বলাই হয় যে, Strength of a chain is measured by its weakest length। সব থেকে দুর্বল লিঙ্ক দিয়েই মাপা হয় শিকলের কত জোর।

মানুষের ক্ষেত্রে জিনিসটা ঠিক উল্টো হয়ে যায়। যেমন আম গাছ, আম গাছে কাঁচা আম হয়, আম পেকে গেলে মাটিতে পড়ে থেকে পচে যায়, কেউ খায় না। দামী গাছ কোনটা? গাছ যদি চারটে ফলও দেয়, যে ফল সব দিক দিয়ে উৎকৃষ্ট, সেই ফল দিয়ে গাছের দাম হয়। যে ফল পাখি ঠুকরে দিয়েছে, পোকা ধরেছে, পচে গেছে, ওই ফল দিয়ে গাছকে মাপা হয় না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাজার হাজার কবিতার মধ্যে যেগুলো অতটা উচ্চমানের নয়, সেই কবিতা দিয়ে রবীন্দ্রনাথের বিচার করা হয় না, তাঁর শ্রেষ্ঠতম রচনাগুলি দিয়ে তাঁর সাহিত্যকে মাপা হয়। যেমন সাহিত্যের বড় বড় সব নামকরা সমালোচকরা অনেক জায়গায় সমালোচনা করে বলে যে, সেক্সপিয়ারের বেশির ভাগ কবিতাগুলো অখাদ্য, কিন্তু কিছু কিছু রচনা আছে যেগুলো সত্যিই সাহিত্য জগতে ব্যতিক্রম। ঠিক তেমনি মানুষকে যখন মাপা হয়, তখন তাকে মাপতে হয়, শ্রেষ্ঠ কি কি জিনিস সে করছে, তার জীবনে কি কি উপলব্ধি হয়েছে, জীবনে কি কি কীর্তি সে অর্জন করেছে, এই জিনিসগুলিকে দিয়ে; তার দুর্বলতাকে দিয়ে কখনই মাপা হয় না। কারণ যে কোন মানুষের মহত্ত্ব বিচারের একটা জিনিসই মাপকাঠি, তা হল আধ্যাত্মিকতা।

মহৎ কে, মহাপুরুষ কে? যিনি আধ্যাত্মিক ভাবে দিব্য অবস্থায় পৌঁছেছেন। দিব্যত্ব মানেই যিনি জাগতিক ভাবকে ত্যাগ করেছেন। জাগতিক ভাব মানেই এই সংসার, সংসার মানেই কামিনী-কাঞ্চন, যার মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ জড়িয়ে আছে, এটাই সংসার। আমরা এই রকমই, এটাই আমার স্বভাব, আমি এই রকমই থাকব, যদি এটাকে আমি একটুও ছাড়তে পারি, জানব যে আমার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা জেগেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মনের একটা গভীর অবস্থায় গিয়ে কবিতা লিখছেন, তিনি যে তখন ভেবে ভেবে শব্দ চয়ন করে লিখছেন তা নয়, তিনি সাধারণ শব্দের উপরে চলে যাচ্ছেন, সেখানে এক অফুরন্ত শব্দের ভাণ্ডার তাঁর সামনে খুলে যাচ্ছে, এই অবস্থা আধ্যাত্মিকতা না হলে হয় না। একজন চিত্রকর, যতক্ষণ সংসারের সব কিছু, কামিনী-কাঞ্চন, আহার, নিদ্রা, মৈথুন ছেড়ে না দেয়, ততক্ষণ মন একাগ্র করে ক্যানভাসে ছবির মাধ্যমে একটা গভীর ভাবকে ফুটিয়ে তুলতে পারবেন না; একজন সঙ্গীতজ্ঞ সঙ্গীত তৈরী করতে পারবেন না, সৎ চরিত্রের হতে পারবেন না। সৎ চরিত্র যা, কবিতা লেখাও তাই, সৎ চরিত্র যা, ছবি আঁকাও তাই। আর সৎ চরিত্র যা,

একজন বড় চিকিৎসকও তাই, সৎ চরিত্র যা, একজন বড় উকিলও তাই। কারণ সবটাতে একটাই জিনিস হয়, সাংসারিকতার ভাবকে ছেড়ে তিনি উঠে যাচ্ছেন।

আমরা জানি রাইট ভ্রাতৃদ্বয় এ্যারোপ্লেন আবিষ্কার করেছিলেন। ওরা বেশ কিছু দিন ধরে অনেক কিছু নিয়ে পরীক্ষা করে যাচ্ছিল। ওদের বাবা ছিলেন একজন খ্রীশ্চান ফাদার। তিনি যখন শুনলেন তাঁর ছেলেরা আকাশে ওড়ার জন্য পরীক্ষা করছে, তখন তিনি ওদের বকে দিয়েছেন, 'দেখো, ঈশ্বর যদি চাইতেন মানুষের ওড়ার ক্ষমতা হোক, তাহলে তিনি মানুষকে ডানা দিতেন'। বাড়িতে ওদের সাইকেলের একটা ছোট গ্যারেজ ছিল, সেই গ্যারেজে সারাদিন বসে দুই ভাই নানা রকমের পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে। কিসের একটা ইঞ্জিন লাগিয়ে ওরা প্রথম যখন আকাশে উড়ল, সেটা ছিল কয়েক সেকেণ্ডের জন্য। তাতেই ওদের কী আনন্দ। মাটিকে ছেড়ে নিজের ওজন নিয়ে আকাশে পা রাখা, কী অসীম ক্ষমতা হয়ে গেল। প্লেন আকাশে দশ ঘন্টা আছে কি এক সেকেণ্ড আছে, সিদ্ধান্তের দিক থেকে সমান। নিজের শক্তিতে, নিজের ওজন নিয়ে সে মাটি ছেড়ে আকাশে দাঁড়িয়ে আছে। এরপর দুই ভাই মিলে এই ধরণের মেশিনকে কাজে লাগিয়ে বানাতে থাকল। তারপর তারা লোকেদের নিয়ে উড়তে শিখল। একবার তার মধ্যে একজন ভিআইপি ছিলেন, তিনি এ্যক্সিডেন্টে মারা গেলেন। এতক্ষণ পর্যন্ত কেউ এদেরকে কোন গুরুত্ব দিচ্ছিল না। এখন একজন ভিআইপি মারা যেতে খবর কাগজে বেরিয়ে গেছে। সবাই জানতে চাইল, কি করে মারা গেল। বলা হল আকাশে উড়ছিল, সেখান থেকে পড়ে গিয়ে মারা গেছে। কি উড়ছিল, জিনিসটা কি? তখন লোকেদের ঐদিকে দৃষ্টি গেল। বড় বড় কোম্পানী গুলিও নেমে গেল খোঁজখবর নিতে। যখন জানল সাইকেল গ্যারেজ থেকে এই পরীক্ষামূলক কাজ চালিয়েছে, ওরা অবাক হয়ে গেল। একটা সাইকেল গ্যারেজ থেকে যদি ওরা দুজন এই কাজ করতে পারে, আমরা কেন পারব না! তারপরই এসে গেল Aviation Industry। এই যে মাটি ছেড়ে দেওয়া, এক সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের সময়ের জন্যও যে একবার মাটি ছেড়েছে, এটাই সিদ্ধান্ত যে সে মাটি ছেড়ে দিয়েছে।

কোন মানুষের মধ্যে অল্প কিছুক্ষণের জন্যও যদি একটা সৎ গুণ এসে থাকে, যার এই দেববাণীতে স্বামীজীর গভীর উচ্চতম আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলি শোনার আগ্রহ হয়েছে, তার মানে কোথাও সে মাটি ছেড়ে দিয়েছে। মাটি ছেড়ে দেওয়া মানেই, সংসারকে সে ছেড়ে দিয়ে আধ্যাত্মিকতার আকাশে পা রাখছে। এরপর তার যত দোষ থাকুক, তার কোন দাম নেই। গীতাতেও ভগবান বলছেন, *যথৈধাংসি সমিদ্ধোহগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেহর্জুন*, কাঠের স্তুপাকারে একটা আগুনের ফুলকি লাগলে পুড়ে ছাই। জাতটাই পাল্টে গেল, ছিল কাঠ, হল আগুন। মাটি ছেড়ে দিয়েছে। সেইজন্য স্বামীজী বলছেন, মানুষকে কক্ষণ তার দুর্বলতা দিয়ে মাপবে না। কারণ দুর্বলতা যেটা রয়েছে, এটাই স্বাভাবিক, এই রকমই তার হওয়ার কথা। ভাল যেটুকু সে করছে, এটাই তার দিব্য গুণ, এতেই তাঁর আত্মার শক্তির প্রকাশ। কবিতার মাধ্যমেই হোক, ছবি আঁকার মাধ্যমেই হোক, বা যে কোন ভাল কাজের মাধ্যমেই হোক, এটা তার নিজস্ব কীর্তি, বাকি সব কিছু হল তার সমষ্টি অজ্ঞান, যেটা তার জাতির স্বাভাবিক গুণ। কারণ মানুষের মধ্যে দুর্বলতাটাই তার স্বাভাবিক। তার মধ্যেই একটু যদি তার কোন কীর্তি থাকে, সেটাই তার আত্মার প্রকাশ।

অনেক আগেকার ঘটনা, একজন সন্ন্যাসীর নামে কিছু অভিযোগ এসেছে। কর্তৃপক্ষ ঠিক করে নিলেন, একে সঙ্ঘ থেকে বহিষ্কার করে দিতে হবে, মঠে থাকার যোগ্য নয়। তৎকালীন অধ্যক্ষ মহারাজ সব ঘটনা শুনলেন। তিনি জানতে চাইলেন, 'আচ্ছা, ছেলেটার মধ্যে কি কোন গুণ নেই? একটুও কি কোন গুণ নেই'? কর্তারা শুনলেন, বললেন, 'হ্যাঁ গুণ তো আছেই'। 'গুণ যদি আছে, তাহলে এটা কি? ঠাকুরেরই প্রকাশ, থাক, এখানেই থাক। গুণ আছে মানে বাকিটা ও জয় করে নেবে'। আরেকটা ঘটনা আছে, এটাও অনেক আগেকার কথা। বেলুড় মঠের ঠাকুরের একটা ভাণ্ডার ঘর আছে। তখন ভক্তের সংখ্যা কম ছিল, যার জন্য ফল মিষ্টিও কম আসত। একজন ভক্ত ঠাকুরের জন্য একটা আম নিয়ে এসেছেন। পুরো আমটাই পচা ছিল। জুনিয়র সেবক বলছেন, 'মহারাজ এই আমটা পচে গেছে, ফেলে দিচ্ছি'। তখন পূজারী মহারাজ বলছেন, 'এ কী বলছ! একজন ভক্ত কত আশা নিয়ে ঠাকুরকে দিয়েছে'। তিনি নিজেই একটা ছুরি নিয়ে ওই পচা আমের যতটুকু অংশ একটু ভাল আছে ততটুকু কেটে ঠাকুরের ভোগে সাজিয়ে দিলেন। দেখছেন আমটা একেবারেই পচে গেছে, কিন্তু তার মধ্য থেকেও যদি একটু ভাল অংশ পাওয়া যায়, সেটা ঠাকুরের সেবায় লাগবে। ফল ধীরে

ধীরে পচে যায়, কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে তা হয় না; মানুষের ক্ষেত্রে উল্টোটা হয়। মানুষ ধীরে ধীরে পূর্ণতার দিকে যাচ্ছে। ফুল সব পাপড়ি মেলে দেওয়ার পর ঝড়তে শুরু করে, ফল পুরোটা পেকে যাওয়ার পর পচতে শুরু করে। মানুষ এভাবে কখনই শেষ হয়ে যায় না। তার মধ্যে একটু যে গুণ এসেছে, বুঝতে হবে এবার সে যীশু বা বুদ্ধ হওয়ার পথে এগিয়ে পড়েছে।

এরপর স্বামীজী একটা ছোট্ট প্যারাগ্রাফে ভার্চু (virtue) আর বীর (vira) এই দুটোকে নিয়ে বলতে গিয়ে বলছেন বীর থেকেই ভার্চু শব্দ এসেছে। সংস্কৃত আর ইউরোপিয়ান ভাষায় অনেক মিল পাওয়া যায়, এই মিল পাওয়াকে নিয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে, অনেক ঠাট্টা মজাও হয়। যারা এই নিয়ে দিনরাত গবেষণা করে যাচ্ছে, কোন শব্দ কোন ভাষা থেকে এসেছে খুঁজে যাচ্ছে, তাদের ব্যঙ্গ করে আবার একজন বার করল; ইণ্ডাস্ট্রী শব্দ কোথা থেকে এসেছে? ইন্দ্রের স্ত্রী থেকে, ইন্দ্রের ছিল বজ্র, বজ্র তৈরীর কারখানা ছিল, সেই কারখানার সুপারভাইজারি করতেন ইন্দ্রের স্ত্রী, সেখান থেকে এসে গেল ইণ্ডাস্ট্রী। স্বামীজী এখানে একটা শব্দকে নিয়েই বলছেন, আগেকার দিনে মনে করা হত যে, যারা যোদ্ধা হত তারা সাধারণতঃ ভাল মানুষ হত, তারা বীর, বীর থেকেই ভার্চু শব্দ এসেছে। স্বামীজীর সময় তখনও দুটো ভাষার মিল, শব্দের উৎপত্তি কোথা থেকে এসেছে, এগুলোকে নিয়ে ইদানিং কালের মত এত গবেষণা শুরু হয়নি, কিন্তু বেশ কিছু বছর আগে থেকে প্রচুর গবেষণা হয়ে আসছে, এখনও হয়ে যাচ্ছে। এখানে এসেই ২৯শে জুলাইয়ের ক্লাশ শেষ হয়ে যায়। এরপর আসছে ৩০শে জুলাই মঙ্গলবারের স্বামীজীর ক্লাশ।

<u>মঙ্গলবার, ৩০শে জুলাই</u>

আমাদের যেটা দুর্বলতা, সেটাই আমাদের শক্তি

আজকের ক্লাশে প্রথমে স্বামীজী যেটা বলছেন, এর উপর আমরা আগে আগে আলোচনা করেছি। স্বামীজী বলছেন, Christs and Buddhas are simply occasions upon which to objectify our own inner powers. We really answer our own prayers. (*খ্রীষ্ট ও বুদ্ধের মত মহাপুরুষেরা কেবল বহিরবলম্বন; তাঁদের উপর আমাদের ভিতরের শক্তিগুলি আমরা আরোপ করে থাকি মাত্র।*) খুব উচ্চ আধার না হলে সবার সামনে এই ধরণের কথা বলাটা ঠিক হবে না, ভুলভাল বুঝে নিয়ে চিন্তা-ভাবনাগুলো সব এলেমেলো হয়ে যাবে। আমাদের উপনিষদেও প্রতীকের ধারণা দেওয়া আছে। মানুষ যতই নিজেকে শক্তিমান মনে করুক, আর যাই মনে করুক না কেন, সে কিছুতেই নিজের অন্তর্জগতের দিকে দৃষ্টি দিতে চাইবে না। কঠোপনিষদে বলছেন, *পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণাৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্*, ভগবান যখন সৃষ্টি করলেন, তখন আত্মাকে ভিতরে রেখে দিলেন, আর বাইরে দিকে সব দরজাগুলি খুলে রেখে ভিতরের সাথে সম্পর্কটা কেটে রেখে দিলেন। সেইজন্য মানুষ বাইরে জগতের বস্তুসমূহকে দেখে, ভিতরের জিনিসকে দেখতে চায় না। মানুষ তাই আত্মাকে কখনই দেখতে পায় না, দেখতে পায় শুধু বাইরের জগৎকে।

তাহলে উপায় কি? তখন বলছেন, *কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মনমৈক্ষদ আবৃতচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন*, কিন্তু কোন কোন ধীর পুরুষ ইচ্ছা করেন যে, আমি আমার আত্মাকে দেখতে চাই, তখন তিনি নিজের সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে আবৃত করে দেন, আবৃত করে দিয়ে তারপর *প্রত্যগাত্মনম্*, ভিতরে যিনি আছেন, সেই আত্মার অনুসন্ধানে নিজেকে পুরোপুরি ঢেলে দেন। তার আগে পর্যন্ত আমরা সবাই বাইরের আত্মা, পরাগাত্মকে দেখে যাচ্ছি। সংসার, দেহ, মন এগুলোও আত্মা, আত্মা মানেই আমি, এগুলোকে আমরা সবাই আত্মা রূপেই দেখি, অর্থাৎ আমি রূপে দেখি। আসল যে শুদ্ধ আত্মা, যিনি ভিতরে রয়েছেন, যিনি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা, তাঁকে আমরা কেউ দেখতেই পাই না, যেহেতু আমাদের চেতনা বহির্মুখী। ভিতরে অনুসন্ধান করার অনেকগুলো পথ আছে; যার মধ্যে একটা পথ হল নেতি নেতি। নেতি নেতি পথ মানে, বাইরের সব কিছু বন্ধ করে দাও, সংসারের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে অন্তর্দৃষ্টি কর, ভিতরের দিকে অনুসন্ধান কর। কিন্তু আরেকটা সহজ পথ হল, পরাগাত্মন্এর যে বাইরের দিকে তাকানো স্বাভাবিক স্বভাব, এই স্বভাবটাকেই কাজে লাগিয়ে আত্মজ্ঞান লাভ করা। জুডো বা অন্যান্য কিছু খেলাতেও প্রতিদ্বন্দ্বীর শক্তিটাকেই কাজ লাগানো হয়। সেইজন্য আমার প্রতিযোগীর যত বেশি শক্তি হবে, তত আমার সুবিধা হবে, কারণ ওর শক্তিটাই লড়াইতে কাজ লাগানো হবে। বিপক্ষের গায়ের জোর

যত বেশি হবে তত সে তাকে সহজে হারাবে। ওর নিজের শক্তিতেই মারা যাবে। এখানে এনারা ঠিক একই জিনিস করছেন। আমার যেটা শত্রু, সেই শত্রুকেই এবার নিজের অনুকূলে কাজে লাগানো হবে। সমুদ্রে যদি বাতাস খুব এলেমেলো চলে, কুশল নাবিক সেটাকেও কাজে লাগিয়ে নেয়।

বলছেন, তোমার দুর্বলতা হল বহির্মুখী ইন্দ্রিয় মন। খুব ভাল কথা, তুমি একটা প্রতীক নিয়ে এসো, শিবলিঙ্গ, শালগ্রাম শিলা, যীশু, বুদ্ধ, রামকৃষ্ণ। এরপর তোমার ভিতরে যত ভালবাসা আছে, সব ভালবাসা ওখানে ঢেলে দাও। আমাদের পরম্পরাতে নারীদের সন্ন্যাস দেওয়ার প্রথা রাখা হয়নি। এই নিয়ে অনেক আলোচনা হয়ে আসছে। স্বামীজীই, যিনি প্রথম বেদান্ত মতে সন্ন্যাসীনিদের নিয়ে মঠ স্থাপন করতে চাইলেন। নারীদের যে একেবারেই সন্ন্যাস দেওয়া হত না, তা নয়। ব্যক্তিগত ভাবে এদিক সেদিক অনেক নারীরা সন্ন্যাস নিয়েছেন, উত্তরকাশীর ওদিকে অনেক সন্ন্যাসীনি আছেন। এই নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে, আমরা ওর মধ্যে যাচ্ছি না। কিন্তু আমার কাছে কেউ যদি এসে জানতে চায় পথ কি, আমি তার কাছে প্রথমে জানতে চাইব, তোমার দুর্বলতা কি? কারণ যে কোন মানুষের শক্তি শক্তি নয়, যে কোন মানুষের দুর্বলতাটাই তার শক্তি। এই কথা কাউকে বোঝান খুব মুশকিল ঠিকই, কিন্তু এটাই সত্য। যেটাই আমাদের দুর্বলতা, সেটাই আমাদের শক্তি, শুধু ওর মুখটা ঘুরিয়ে দিতে হয়। যে ব্যাপারে আমি যত দুর্বল, যে দুর্বলতা আমাকে পাগল করে দেয়, যেটা ছাড়া আমি থাকতে পারব না, ওই জিনিসটাই আমাকে মুক্তির দিকে নিয়ে যাবে। জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ, রাজযোগ কোন যোগই আমাকে মুক্তির দিকে নিয়ে যাবে না, নিয়ে যাবে স্বয়ংযোগ, আমার নিজের যেটা। কোনটা নিয়ে যাবে? আমার দুর্বলতা।

আমার দুর্বলতা কি? খাওয়ার ব্যাপারে দুর্বলতা আছে। খাওয়া-দাওয়া করতে খুব ভাল লাগে? খুব ভাল কথা। ভাল করে রান্না কর, ঠাকুরকে অর্পণ কর, প্রসাদ রূপে গ্রহণ কর, আরও পাঁচজনকে প্রসাদ খাওয়াও। ঠাকুরকে একজন বৃদ্ধা এসে বলছে, আমার নাতির প্রতি খুব দুর্বলতা, নাতিকে আমি খুব ভালবাসি। ঠাকুর তাকে বলছেন, খুব ভাল কথা, নাতিকে কৃষ্ণ দেখ। আমাদের সমস্যা হল, আমরা সবাই এক একজন চরিত্রবান গরু। গরুর মালিক এসে বলছে, 'এই গরুর বিরাট দাম'। 'কেন এত দাম'? 'এই গরু বাছুর দেয়নি, বাছুর দেবে না, দুধ দেয়নি, দুধ দেবে না, কোন ষাঁড়ের সাথে পাল খায়নি, কোন দিন পাল খাবে না'। 'এই গরু নিয়ে আমি কি করব'? 'আপনি তা কেন বলছেন, চরিত্র বলেও তো একটা জিনিস হয়'। আমরা সবাই হলাম সেই চরিত্রবান গরু। আমি চুরি করি না, মিথ্যা কথা বলি না, কোন দুষ্কর্ম করি না। যদি কাউকে তার দুর্বলতা কি বলতে বলা হয়, সে বেচারি ভাবতে শুরু করে দেবে। দেখে মনে হবে সে একজন মহাপুরুষ, কোন দুর্বলতা নেই। এরাই চরিত্রবান গরু, কোন কাজেই লাগবে না। তারপর যদি জিজ্ঞেস করা হয়, আপনার শক্তি কি? তখন উনি নিজে তো নয়ই, পুরো পাড়ার লোকেরাও সবাই মিলেও বলতে পারবে না কি গুণ আছে। ঐ যে দুর্বলতা আছে, ঐ দুর্বলতাকেই শক্তি বানিয়ে যে প্রতীক সামনে রাখা হয়েছে, ওর মধ্যে ঢেলে দিতে হয়। ঢালার পর মন এবার একটা উঁচু অবস্থায় যেতে শুরু করবে, সেখান থেকে মন ধীরে ধীরে অন্তর্মুখী হতে থাকবে।

শেষ পর্যন্ত সব্বাইকে ইন্দ্রিয়ের ছটফটানি বন্ধ করতেই হবে, আবৃতচক্ষু ছাড়া ছটফটানি বন্ধ হবে না। যে নিজের ভাইপো কিংবা নাতিকে গোপাল রূপে দেখছে, আর নাতি ছাড়া যে কাউকে জানে না, সে গোপাল ছাড়া কি দেখবে! এটাই আবৃতচক্ষু, সে তখন নিজেকেও দেখতে পাবে না। শ্রীমতি রাধা শ্রীকৃষ্ণকে এতো ভালবাসছেন, সেখানে কিসের রাধা, কিসের কৃষ্ণ। ভাগবত আদি এত প্রামাণিক গ্রন্থ, সেখানে রাধার নাম পর্যন্ত নেই, লীলার তো প্রশ্নই আসে না। কিন্তু রাধা আজকে আমাদের আদর্শ। ঠাকুর রাধাও বলছেন না, শ্রীমতি বলছেন। পরা ভক্তি লাভের উদ্দেশ্য যাদের, তাদের আদর্শ হলেন রাধা। প্রথমে নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে, আমি কি সত্যিই ধর্ম লাভ করতে চাই? দ্বিতীয় দেখতে হবে, আমার মধ্যে কি কি দুর্বলতা আছে। ঐ দুর্বলতাকে এবার ঐদিকে ঘুরিয়ে দেওয়াটা অত্যন্ত সহজ ব্যাপার। গান্ধীজী দেখলেন ইংরজেদের সাথে আমি লড়াই করে পারব না। ঠিক আছে আমি মার খাবো। কত মার খাবো? যত মারই খাই না কেন, আমি হাত পর্যন্ত তুলব না। কিছু বছর আগে পর্যন্ত গ্রামে মেয়েদের উপর কত অত্যাচার হত। তারা সহ্য করে যাচ্ছে। গান্ধীজী ঐটাকে আরেক ধাপ এগিয়ে দিলেন, সহ্য করার যে সীমা হতে পারে, সেটাকেও ছাড়িয়ে গেলেন, সেই

দুর্বলতাটাই তাঁর শক্তি হয়ে গেল। মহৎ হওয়ার জন্য প্রথমে একটা কিছু আরোপ করতে হয়। আর স্বামীজী এখানে কোন সাধারণ জিনিসকে নিয়ে বলছেন না, আলোচনা করছেন আধ্যাত্মিক জিনিসকে নিয়ে। সেইজন্য বলছেন, যীশু, বুদ্ধ এনারা হলেন সেই অবলম্বন, আমার ভিতরে যে জ্ঞান ভক্তির সৎগুণগুলি আছে, তাঁদের উপর এগুলো ঢালতে শুরু করলাম। ঢাললেই যে তাঁরা খুশী হয়ে আমাকে কৃপা করতে থাকবেন, তা একেবারেই না; আমি নিজে ধীরে ধীরে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে থাকব।

It is blasphemy to think that if Jesus had never been born, humanity would not have been saved. It is horrible to forget thus the divinity in human nature, a divinity that must come out. (*যীশু যদি না জন্মাতেন, তবে মনুষ্যজাতির কখনও উদ্ধার হত না – এরূপ ভাবা ঈশ্বরনিন্দার সমান। মনুষ্য-স্বভাবের ভিতর যে ঐশ্বরিক ভাব অন্তর্নিহিত রয়েছে, তাকে ঐরূপে ভুলে যাওয়াটা বড় ভয়ানক – ঐ ঐশ্বরিক ভাব কোন-না-কোন সময়ে প্রকাশিত হবেই হবে।*) এখানে স্বামীজীর বক্তব্য হল, খ্রীশ্চানিটিতে এটা একটা মৌলিক চিন্তা যে, Jesus is the savior, যীশু যদি না আসতেন তাহলে মানবজাতির রক্ষা হত না। আর মানবজাতিকে তারা আদম আর ঈভের original sinএ নিয়ে যান। এটা যে মানবজাতির প্রতি কত বড় অন্যায় ও অপমানজনক মন্তব্য কল্পনা করা যায় না, কারণ মানুষের যে দিব্য স্বভাব, তোমরা এটাকে মাঝখানে ভুলে যাচ্ছ। বেদান্তের সাথে অন্যান্য ধর্মের সব থেকে বড় পার্থক্য এই জায়গাতে। প্রত্যেকটি ধর্মে সৃষ্টি ঈশ্বরের, আর সৃষ্টিতে ভাল মন্দ মিশে আছে। বেদান্ত মতে মন্দ বলে কিছু নেই। ভালটাই আছে, মন্দটা তোমার কল্পনা, তার মানে মানুষ স্বভাবে দিব্য। এখানে একটা উপমা দেওয়া যেতে পারে, উপমা দিয়ে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না ঠিকই, কিন্তু একটা জিনিসকে বোঝান যায়। বাদশা আকবর শাহেন শা, প্রচণ্ড ক্ষমতাবান লোক। এখন আকবরের ছেলে সেলিম পদে পদে বাবার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে, এমনকি বাবার বিরুদ্ধে সৈন্য নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু শেষমেশ বাবা সেলিমকে ক্ষমা করল না, সেই জাহঙ্গীরই সম্রাট হল। তার মানে, যে রাজার ব্যাটা সে যত যাই করে নিক, সে রাজার ব্যাটা, থাকবে সে রাজার ব্যাটা হয়ে। বেদান্ত মতে আমরা ঈশ্বরের সন্তান না, আমরা ঈশ্বরের সাথে এক। পতন তার হতে পারে, কিন্তু যতই পতন হোক, আজ হোক বা কাল হোক উঠে সে দাঁড়াবেই দাঁড়াবে। তার মানে, Jesus the savior, Sri Ramkrishna is the savior, Vivekananda is the savior, গোঁড়া বৈষ্ণবরা বলে কৃষ্ণ ছাড়া গতি নাই, এই ধরণের কথা বলা মানে, স্বামীজীর ভাষায় ঈশ্বর নিন্দা। এনারা শুধু একটা processকে একটু এগিয়ে দেন। মানবজাতি মুক্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, এরা এগোবেই, এই এগিয়ে যাওয়াকে কেউ আটকাতে পারবে না। অবতাররা এসে ওটাকে একটা ধাক্কা দিয়ে ত্বরান্বিত করে দেন। ঠাকুর বলছেন, অন্নপূর্ণার ভাণ্ডারে সবাই খাওয়া পাবে, কেউ সকালে, কারুর খাওয়া পেতে পেতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে, পাবে সকলেই, মুক্তি সকলেরই হবে, কেউ আগে, কেউ একটু পরে। এটাই হিন্দুদের ঠিক ঠিক ভাব।

আমরা আমাদের অন্তরাত্মার কাছেই প্রার্থনা করি

Never forget the glory of human nature. We are the greatest God that ever was or ever will be. (*মনুষ্য-স্বভাবের মহত্ত্ব কখনও ভুলো না। ঈশ্বর অতীতে যা হয়েছেন, ভবিষ্যতে যা হবেন, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রকাশ আমরাই।*) আমরাই শ্রেষ্ঠ গড্, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। Christs and Buddhas are but waves on the boundless ocean which I am, (*'আমি'ই সে অনন্ত মহাসমুদ্র – খ্রীষ্ট ও বুদ্ধগণ তারই উপরে তরঙ্গ মাত্র।*) আমাদের আগের আগের আলোচনায় এই জিনিসগুলো এসেছে। স্বামীজী এখানে আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে বলছেন, সমুদ্রটা আমি নিজে। অদ্বৈত বেদান্ত শুনতে ভাল লাগে, কিন্তু এটা জানে না যে, অদ্বৈত বেদান্তকে গ্রহণ করা মানে, জগতে যত খুনী, বদমাইশ আছে, সব আমি নিজে। জগতের সব রকম জঘন্যতম কাজকে যে নিজের উপরে নিতে পারবে, তখনই সে বেদান্তের কথা বলতে পারবে, তার আগে পর্যন্ত বলার কোন অধিকার নেই। খ্রীষ্ট ও বুদ্ধ সেই সমুদ্রের একটা বড় ঢেউ, সেই সমুদ্রটা যে আমি, তা নয়। শুধু যীশু বা বুদ্ধই নন, যত খুনী, ধর্ষণকারী, চোর, ডাকাত আছে, এরাও সেই সমুদ্রেরই এক একটা ঢেউ, যে সমুদ্রটা আমি নিজে। এটাই একমাত্র সত্য। Bow down to nothing but your own higher Self. Until you know that you are that very God of gods, there will never be any

freedom for you. (*তোমার নিজের অন্তরাত্মা ব্যতীত আর কারও কাছে মাথা নত করো না; যতক্ষণ না তুমি নিজেকে সেই দেবতাদেরও দেবতা বলে জানতে পারছ, ততক্ষণ তোমার মুক্তি হতে পারে না।*) যতক্ষণ আমরা এই শেষ কথাটা না জানতে পারছি, আমিই সেই ঈশ্বর – এই অনুভূতি যতক্ষণ না হয়, ততক্ষণ আমাদের যত যাই হয়ে যাক, আমরা স্বর্গে যাই, ব্রহ্মলোকে যাই, আমাদের মুক্তি হবে না। এটাই অদ্বৈত বেদান্তের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত, যদিও দ্বৈতবাদীরা, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা এটা মানবে না, তাতে আমাদের কিছু আসে যায় না, কারণ স্বামীজী এই কথা বলে দিয়েছেন, আমাদের এই সিদ্ধান্তকে মেনেই এগোতে হবে। ধর্মের শেষ কথা একমাত্র তাঁরাই বলতে পারেন, যাঁদের আধ্যাত্মিক জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হয়েছে। তাঁরা জিনিসটাকে যেভাবে দেখেছেন, যেভাবে বুঝেছেন, যেভাবে সাধনা করেছেন, যেভাবে বুঝতে চেয়েছেন, সেটাই শেষ কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর সাধনার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য

ধর্মের ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা একটা মজার জিনিস দেখতে পাই, যেটা অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না, খ্রীষ্ট সারা জীবন যেটা সাধনা করে গিয়েছিলেন, শিক্ষা তিনি সেটাই দিয়েছেন। মহম্মদও তাই, যেটা সাধনা করেছেন, সেটাই তিনি প্রচার করেছেন। ভগবান বুদ্ধও যেটা সাধনা করেছেন, সেটাই তিনি সবাইকে শিখিয়েছেন। জুদাইজিমে জুরাথ্রুষ্টের সময়েও তাই হয়েছে। আর হিন্দু ধর্মেও তাই হয়েছে। একমাত্র নিজের ইষ্টের সাথে লড়াই শুধু বিবেকানন্দ আর শ্রীরামকৃষ্ণের হয়েছে। আর কেউ করেননি। সমস্ত ধর্ম ইতিহাসের পাতার পর পাতা খুলে গেলে কোথাও এই জিনিস পাওয়া যাবে না। সবাই যেটা দিয়ে শুরু করেছেন, সেটা দিয়েই শেষ করেছেন, একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ আর স্বামী বিবেকানন্দ যেটা দিয়ে শুরু করেছেন, সেটা দিয়ে শেষ করেননি। এর অর্থ হল, এনারা আধ্যাত্মিকতার প্রত্যেকটি ইঞ্চিকে জানেন। ঠাকুর শুরু করেছিলেন, কে জানে কালী কেমন দিয়ে। আর কোথায় গিয়ে শেষ করছেন? যেখানে কালী উড়ে গিয়ে কখন অদ্বৈত, কালী উড়ে গিয়ে কখন কৃষ্ণ, কালী উড়ে গিয়ে কখন রাম, কালী উড়ে গিয়ে সব কিছু এসে যাচ্ছে, যীশু, আল্লা সব। কালীকে নিয়ে ঠাকুর পরে কোথাও কোন কিছুই করেননি। ঠাকুর অদ্বৈত দিয়ে শুরু করেননি, ঠাকুরের জীবনে অদ্বৈত অনেক পরে এসেছে। অন্য সমস্ত অবতার, প্রফেট যেটা দিয়ে সাধনা শুরু করেছিলেন, সেটা দিয়েই শেষ করেছেন, সেটারই প্রচার করলেন। একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ দুজনেই যেটা দিয়ে শুরু করেছিলেন, শেষ করেছেন আরেকটা দিয়ে।

স্বামীজী ঠাকুরের কাছে আসছেন, কখন কি ভাব নিয়ে আসছেন, আমরা এখনও ঠিক ঠিক বলতে পারব না। কখন তিনি অদ্বৈতের বিরুদ্ধে বলছেন, কখন দ্বৈতের বিরুদ্ধে বলছেন। আবার যিনি ব্যঙ্গের ছলে ঠাকুরকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, 'উনি এখনও কালীঘরে যান', সেই তিনিই আবার পরে কী দুর্ধর্ষ কবিতা রচনা করছেন Kali the Mother। তিনিও আবার কালীঘরে যাচ্ছেন, আবার রাম রাম করতে করতে সারারাত উন্মত্তের মত নৃত্য করে যাচ্ছেন। আধ্যাত্মিক জীবনে সাধনা বা অনুশীলন একটা জিনিস, কিন্তু একটা জিনিসকে নিয়ে শুরু করে শেষ আরেকটা কোথায় পৌঁছে যাচ্ছি। তার মানে উনি ঐ এলাকার প্রত্যেকটি ইঞ্চিকে জানেন। রেলগাড়ি রেল লাইনকে ধরে ধরে এগোয়, সে আমাদের ঠিক জায়গাতেই নিয়ে যাবে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যে পায়ে হেঁটে এখান থেকে সেখানে, সেখান থেকে ওখানে যাচ্ছে, সে মাটিকে অনেক ভাল জানে। সেইজন্য আধ্যাত্মিক রাজ্যের সব খুটিনাটির ব্যাপারে ঠাকুর স্বামীজীর exposure সাংঘাতিক, যেটা অন্য কোন প্রফেট বা অবতারের নেই। আমরা এখানে বলতে চাইছি না যে, ঠাকুর কেন অবতারবরিষ্ঠায়, আমাদের উদ্দেশ্য হল, স্বামীজী এখানে যে কথাগুলো বলছেন, প্রত্যেকটি কথা ঋষিবাক্য; যে কথাগুলোর তুলনা একমাত্র আমরা উপনিষদ ও গীতার সঙ্গে করতে পারি। এমনকি শঙ্করাচার্য, রামানুজদের সঙ্গে এর তুলনা হবে না। কারণ এনাদের সাধনা, সিদ্ধি আর শিক্ষা তিনটে এক। রামানুজ প্রথমে সাধনা ও অধ্যয়ন অদ্বৈতকে নিয়ে করলেন, কিন্তু মাঝপথে পথ পাল্টে বিশিষ্টাদ্বৈতে গেলেন, তার সাথে অদ্বৈতের একজন কট্টর সমালোচক হয়ে গেলেন, এবং শেষ পর্যন্ত তিনি বিশিষ্টাদ্বৈতকেই ধরে রাখলেন। মাধ্বাচার্য প্রথম থেকেই দ্বৈতকে ধরে রাখলেন। যার দিকেই আমরা তাকাবো, সবাই যেটাকে নিয়ে শুরু করেছেন, সেটাকে দিয়েই শেষ করেছেন। সেইজন্য স্বামীজী যখন এই কথাগুলো বলছেন, you know that you are that very God of gods, এই কথাগুলিকে

আমরা যদি একজন চিন্তাবিদের কথা বলে উড়িয়ে দিই, তাহলে কিন্তু সর্বনাশ হয়ে যাবে। এগুলো কোন চিন্তাবিদের কথা নয়, এগুলো কোন দার্শনিকের কথা নয়, এগুলো একজন ঋষির সিদ্ধবাক্য।

সব কর্মই আমাদের মুক্তির দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে

এরপর স্বামীজী বলছেন, All our past actions are really good, because they lead us to what we ultimately become. (*আমাদের সকল অতীত কর্মই বাস্তবিক ভাল, কারণ কর্মগুলিই আমাদের চরম আদর্শ লাভ করিয়ে দেয়।*) যা কিছু আমরা অতীতে করেছি, সেটাই আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। স্বামীজী এর আগে বলেছিলেন আর মনুস্মৃতিতে মনুও বলছেন, যাঁরা ধর্মপথে যান, তাঁদের কাছে সম্মান বিষবৎ, আর অপমান অমৃতবৎ। আমরা তো অনেক সময়ই অপমানিত হই, কখন কি আমাদের অমৃতবৎ মনে হয়? কখনই মনে হয় না। আমাদের উদ্দেশ্য হল স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকা, সেইজন্য যখন অপমানিত হই, মার খাই তখন আমাদের যে ধর্ম, সেই ধর্মে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। আমরা যখন অপমানিত হচ্ছি, জগৎ থেকে যখন মার খাচ্ছি, তখন সংসার থেকে আমরা নিজেদের একটু গুটিয়ে আনি, গুটিয়ে আমাদের আরও স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত হতে হয়। কোন শিশু যখন তার দাদা, দিদি, বাবা, কাকা, জ্যাঠার কাছে মার খায় তখন সে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে, কিন্তু মা নিজে যখন মারে তখন মায়ের আঁচলকে আরও বেশি করে জড়িয়ে ধরে, আঁচলের ভিতরেই ঢুকে যায়। যে ঠাকুরকে ধরে আছে, সে জগতের কাছে মার খেলে ঠাকুরের কাছেই যাবে। জগৎ যদি আরও বেশি করে মারে, বা ঠাকুর যদি মার দেয়, তখন সে কোথায় যাবে? ঠাকুরকেই আরও বেশি জোরে শক্ত করে জড়িয়ে ধরবে। মনু এটাই বলতে চাইছেন। মনু এটা বলছেন না যে, এরপর বিরাট ভাল আসবে। স্বামীজীও একই কথা বলছেন। উদ্দেশ্য যদি তোমার আত্মজ্ঞান লাভ হয়, উদ্দেশ্য যদি তোমার ঈশ্বর লাভ হয়, তাহলে জগৎকে তোমায় ছাড়তে হবে। ছাড়া মানেই মার। অনেক মার যতক্ষণ না খাও, অপমান যতক্ষণ না হচ্ছ, কলঙ্কিত যতক্ষণ না হচ্ছ, তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা যদি না হয়ে থাকে, তুমি জগৎকে ছাড়বে কি করে! সেইজন্য বলছেন, All our past actions are really good।

তাহলে ভাল হওয়াটা কি খারাপ? কখনই না, ভালটা কেন খারাপ হতে যাবে, ভাল হচ্ছে মানে, তোমাকে একটু দম নেওয়ার সুযোগ দিচ্ছে। যাঁরা প্রাণপনে ঈশ্বরের দিকে এগোচ্ছেন, সব কিছু ছেড়ে আত্মজ্ঞান লাভের জন্য যার উঠে পড়ে লেগে আছেন, তাঁদের জীবনে ভাল কিছু হওয়া মানে, এবার তাঁকে একটু দম নেওয়ার সময় দেওয়া হল, কিছুক্ষণের জন্য হাঁফ ছেড়ে জিরোবে। তারপরে আবার মার খাবে। পুলিশ অপরাধীদের লক-আপে যখন ডাণ্ডা দিয়ে খুব মারতে থাকে, মারতে মারতে যখন দেখে লোকটা আর নিতে পারছে না, তখন একটু জল খেতে দেয়। জল এইজন্য খেতে দিচ্ছে, পরে আবার মারবে। আধ্যাত্মিক জীবনেও ঠিক তাই হয়, যদি কিছু ভাল হয়, তখন বুঝতে হয় যে, আরও জোর মার আসছে। এই ভয়ে যারা বলবে, দরকার নেই আমার আধ্যাত্মিকতার দিকে যাওয়ার। তাহলে কি তোমার মার খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে? তা কি কখন হয়! এই জগতে যে পা রেখেছে, সবাইকে মুক্তির দিকে যেতে হবে। হাসপাতালে নাম লেখানো আর এই জগতে আসা একই জিনিস। রোগ ভাল না হওয়া পর্যন্ত হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবে না। এই জগতে যত দিন তুমি মুক্তি লাভ না করতে পারছ, তোমাকে মারের পর মার খেয়ে যেতে হবে। শুধু যাঁরা ত্যাগী, সব ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে গেছে, তাঁরা জানেন আমার ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ নেই। যখন মার খান তাঁরা আরও বেশি বেশি করে ঈশ্বরকে আঁকড়ে ধরেন। সংসারীরা মনে করে আমার অমুক নেতার সাথে পরিচয় আছে, অমুক বড়লোক আমার আত্মীয়, অমুক পুলিশ অফিসার আমার বন্ধুর ছেলে, আমার অনেক বন্ধুবান্ধব আছে, আমার কিছু বিপদ হলে এদের সাহায্য পেয়ে যাব। এরা জন্মজন্মান্তর ধরে মার খায়, ধীরে ধীরে কোন জন্মে বুঝতে পারে ঈশ্বর ছাড়া আমার কেউ নেই।

Of whom to beg? I am the real existence, and all else is a dream save as it is I. I am the whole ocean; do not call the little wave you have made 'I'; know it for nothing but a wave. (*কার কাছে আমি ভিক্ষা করব? আমিই যথার্থ সত্তা, আর যা কিছু আমার স্বরূপ থেকে ভিন্ন বলে প্রতীয়মান হয়, তা স্বপ্নমাত্র। আমি সমগ্র সমুদ্র; তুমি নিজে ঐ সমুদ্রে যে একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গের সৃষ্টি করেছ, সেটাকে 'আমি' বলো না। সেটা ঐ তরঙ্গ ছাড়া আর কিছুই নয় বলে জেনো।*) সচ্চিদানন্দ সাগর,

সেই সাগরে ছোট্ট একটা ঢেউ, সেই ঢেউকে বলছি 'আমি', সেটা অবশ্যই আমি, কিন্তু আমিই এই সচ্চিদানন্দ সাগর। আমি যে ঐ ছোট্ট ঢেউকে মনে করছি আমি, তাতে কোন ভুল নেই। এই দেহটা কি আমি নই? অবশ্যই আমি এই দেহ। এই মন, এই অহঙ্কার কি আমি নই? অবশ্যই আমি এই মন, এই অহঙ্কার। কিন্তু এগুলো হল সচ্চিদানন্দ সাগরে ছোট্ট ছোট্ট ঢেউ। আসল সমুদ্র যেটা, সেটাও আমি। সেই সমুদ্রের ঢেউ আমি, আপনি, সে, এই মাইক্রোফোন, ফ্যান, টেবিল, চেয়ার সব। আর সেই ঢেউগুলিও আমি। এগুলোকে ধারণা করা সত্যিই কঠিন, কিন্তু দুর্ভাগ্য যে এটাই কঠোর ভাবে সত্য। আজ হোক, কাল হোক, এই সত্যেই একদিন আমাদের সবাইকে যেতে হবে। এরপর স্বামীজী ছান্দোগ্য উপনিষদ থেকে বলছেন।

Satyakama (lover of truth) heard the inner voice telling him, 'You are the infinite, the universal is in you. Control yourself and listen to the voice of your true Self'. (*সত্যকাম অর্থাৎ সত্যলাভের জন্য যাঁর প্রবল আকাঙ্ক্ষা হয়েছে শুনতে পেলেন – তাঁর অন্তরের বাণী তাঁকে বলছে, 'তুমি অনন্তস্বরূপ, সেই সর্বব্যাপী সত্তা তোমার ভিতরে রয়েছে'। নিজেকে সংযত কর, আর তোমার যথার্থ আত্মার বাণী শ্রবণ কর।*) ছান্দোগ্য উপনিষদে সত্যকামের কাহিনী আছে। সত্যকামের ইচ্ছা হয়েছে বেদের শিক্ষা লাভ করবে। গুরুর কাছে যাবার আগে সত্যকাম তার মাকে জিজ্ঞাসা করেছে, 'মা, গুরু নিশ্চয় আমাকে আমার গোত্র কি জিজ্ঞেস করবে, তুমি আমাকে আমার গোত্রটা বলে দাও'। মা বলছেন, 'বাবা, আমি কাজকর্মে সব সময় এত ব্যস্ত থাকতাম যে তোমার বাবাকে আমাদের গোত্রের কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে যাই। তুমি আমার নাম নিয়ে বলো, জাবালা'। গুরুর কাছে সত্যকাম গেছেন, গুরু তাঁর গোত্র জানতে চাইলেন। সত্যকামও ঠিক ঐভাবে বলেছেন, 'মা বলেছেন, আমার গোত্র জানা নেই, মা বলে দিয়েছেন, তুমি আমার নাম নিয়ে বলো, জাবালা'। গুরু শুনে বলছেন, 'ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কেউ এই রকম সত্য কথা বলতে পারে না, আজ থেকে তোমার নাম সত্যকাম'। এরপর গুরু সত্যকামকে কয়েকটা গরু দিয়ে বলে দিলেন, এই গরু নিয়ে চলে যাও, যখন হাজারটা গরু হয়ে যাবে তখন আমার কাছে ফেরত চলে আসবে। অবশ্য গুরু কিছু তো সত্যকামকে শিখিয়ে দিয়েছেন, তা নাহলে থাকবেন কি করে।

সত্যকাম ও অন্তরাত্মার বাণী

সত্যকাম কত দিন জঙ্গলে ছিলেন, কিভাবে ছিলেন, কেউ জানে না। বছরের পর বছর জঙ্গলে থাকতে থাকতে হঠাৎ একদিন প্রধান ষাঁড় এসে বলছে, 'সত্যকাম আমরা সংখ্যায় হাজার হয়ে গেছি, এবার চলো আমরা ফেরত যাই'। এই বলে ষাঁড় সত্যকামকে একটা উপদেশ দিল। উপদেশ দিয়ে বলল, 'এরপর তোমাকে হাঁস উপদেশ দেবে, অগ্নি উপদেশ দেবে, মদ্গুল পাখি উপদেশ দেবে'। ছান্দোগ্য উপনিষদে খুব সুন্দর বর্ণনা আছে। সত্যিই কি ষাঁড় এইভাবে উপদেশ দিতে পারে। ষাঁড়ের শিষ্য কেমন হবে? বাছুরের মতই হবে। সত্যকাম কি তাহলে বলদ? আসলে এটা সত্যকামের অন্তরাত্মার বাণী। আমাদের সমস্ত জ্ঞান আমাদের ভিতরে। বাইরে থেকে কোন জ্ঞান আসে না। এই টপিকের উপর আগেও আমরা আলোচনা করেছি। ষাঁড়, পাখি, অগ্নি ঐগুলো এক একটা প্রতীক রূপে সামনে এসে গেছে। বলছেন, তুমিই সেই অনন্তস্বরূপ, তোমার ভিতরেই সব। নিজেকে সংযমিত কর এবং তোমার নিজের অন্তরাত্মার বাণী শ্রবণ কর। হাজারটা গরু নিয়ে সত্যকাম গুরুর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। গুরু সত্যকামকে দেখেই বলছেন, 'আরে তোমার চেহারা তো ব্রহ্মজ্ঞানীর মত ঝকঝক করছে, তুমি কাকে গুরু করেছ'? 'আমি তো আপনাকে ছাড়া কাউকে জানিও না, আর আমি তো জঙ্গলে ছিলাম'। 'কিন্তু যা কিছু জানার তুমি জেনে গেছ, আমার তো তোমাকে নূতন কিছু জানানোর নেই। তবে তুমি আশ্রমে কিছু দিন থেকে যাও, আমরা আত্মতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করব'। এখন আত্মজ্ঞানের জ্ঞান গুরুর যা, শিষ্যেরও সেই একই জ্ঞান। অথচ সত্যকামের কোন গুরু নেই। এটাই হিন্দু ধর্মের শেষ কথা।

দুই ধরণের প্রফেট - বেদ মানে সমস্ত জ্ঞানরাশি - সত্যকে নির্ভিক ভাবে বলা - ধর্মের শিশুসুলভ ভাব

The great prophets who do the fighting have to be less perfect than those who live silent lives of holiness, thinking great thoughts and so helping the world. These man passing out one after another, produce as final outcome the man of

power who preaches. (*যে সকল মহাপুরুষ প্রচারকার্যের জন্য প্রাণপাত করে যান, তাঁরা – যে সকল মহাপুরুষ নির্জনে নীরবে মহাপবিত্র জীবনযাপন করেন, বড় বড় ভাব চিন্তন করে যান এবং ঐরূপে জগতের সাহায্য করেন – তাঁদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অসম্পূর্ণ। ঐ সকল শান্তিপ্রিয় নির্জনবাসী মহাপুরুষ একের পর এক আবির্ভূত হন – শেষে তাঁদের শক্তিরই চরমফল-স্বরূপ এমন এক শক্তিসম্পন্ন পুরুষের আবির্ভাব হয়, যিনি আধ্যাত্মিকতার সেই চরম সত্যগুলি চারিদিকে প্রচার করে বেড়ান।*) আগেকার দিনে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যেত, যেমন জুদাইজিমে এবং আরও অনেক ট্রাডিশান আছে যাঁদের প্রফেটরা নিজেদের ধর্ম প্রচারের জন্য প্রচুর লড়াই করতেন। প্রফেট মহম্মদও যোদ্ধা ছিলেন, তাঁকেও প্রচুর লড়াই করতে হয়েছে। জুইশ ট্রাডিশানেও এই রকম কিছু প্রফেট যোদ্ধা ছিলেন। আমাদের যেমন শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্রকে লড়াই করতে হয়েছে, তবে শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরাম এনারা যোদ্ধা ছিলেন না, একটা ধর্মকে অবলম্বন করে লড়াই করতেন। স্বামীজী বলছেন, এনারাও প্রফেট, কিন্তু আধ্যাত্মিকতার জ্ঞানের মশাল চলতে চলতে পৌঁছে যায় তাঁর কাছে, যিনি একান্তে, নির্জন স্থানে পবিত্র জীবনযাপন করতে করতে শান্ত হয়ে গেছেন; সত্ত্বগুণের প্রকাশ যেখানে বেশী, সেই অবতার যেন ঐ শৃঙ্খলের শেষ কথা। যেমন আমাদের ঠাকুর, তিনি একটা জায়গায় চুপচাপ বসে আছেন, কোন রকম ক্রিয়াকলাপ নেই। স্বামীজীর একটা মত ছিল, যারা সক্রিয় তাদের একটা দাম আছে, কিন্তু যাঁরা শান্ত হয়ে গেছেন, তাঁদের দাম পুরো অন্য রকম। স্বামীজী এইভাবে একজন সক্রিয় প্রফেট আর একজন প্রফেট যিনি শান্ত হয়ে গেছেন, শুধু উচ্চ চিন্তন আর গভীর ধ্যানে ডুবে আছেন, এই দুজনের একটা তুলনা করলেন।

Knowledge exists, man only discovers it. The Vedas are the eternal knowledge through which God created the world. They talk high philosophy (the highest) and make this tremendous claim. (*জ্ঞান স্বতই বর্তমান রয়েছে, মানুষ কেবল সেটা আবিষ্কার করে মাত্র। বেদসমূহই এই চিরন্তন জ্ঞান – যার সহায়তায় ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেছেন। ভারতের দার্শনিকগণ উচ্চতম দার্শনিক তত্ত্ব বলে থাকেন, আর এই প্রচণ্ড দাবি করে থাকেন।*) এই টপিকটা আগেও এসেছে, যার উপর আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সমস্ত জ্ঞান আগে থেকেই আছে, মানুষ সেটাকে শুধু আবিষ্কার করে, নূতন করে কিছুই বার করে না। সমস্ত জ্ঞানরাশি যেটা, এটাই বেদ, সেইজন্য মেডিসিনকে আমাদের এখানে আয়ুর্বেদ বলা হয়, ধনুর বিদ্যাকে ধনুর্বেদ বলছেন; যে কোন জ্ঞান, তার নাম বেদ। সমস্ত জ্ঞান ভগবানের কাছে থাকে, সেইজন্য বেদ অপৌরুষেয়। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু হয়, সব জ্ঞানের মাধ্যমেই হয়। এখানে যে অর্থে বেদ বলছেন, সেই অনুসারে আমাদের চারটে বেদকেই বেদ বলা হচ্ছে না, এখানে সমস্ত জ্ঞানরাশিকে বেদ বলা হচ্ছে।

সেখান থেকে স্বামীজী আবার বলছেন, Tell the truth boldly, whether it hurts or not. Never pander to weakness. (*সত্য যা, তা সাহসপূর্বক নির্ভীকভাবে লোকের কাছে বলো, - ঐ সত্য প্রকাশের জন্য কারুর কষ্ট হল বা না হল, সেদিকে তাকিও না। দুর্বলতাকে আমল দিও না।*) স্বামীজী এখানে আধ্যাত্মিক সত্যের কথা বলছেন, জাগতিক সত্যকে নিয়ে বলছেন না। যারা বলে আমি শুধু সত্যই বলি, এরা আসলে খুবই অসংস্কৃত, অভদ্র। মনু বলছেন, *সত্যং ব্রুয়াৎ প্রিয়ং ব্রুয়ান্ন ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্*, সত্য কথা বলবে, মিষ্টি কথা বলবে কিন্তু অপ্রিয় সত্য কখনই বলবে না। একটা হল পিশুনি বৃত্তি, একজনের আড়ালে তার নিন্দা করা, এর কথা ওর কাছে লাগাবে, ওর কথা তার কাছে লাগাবে, আর যাদের পিশুনি বৃত্তি নেই তারা ঔদ্ধত হয়ে যায়। ঔদ্ধত হল, আমি কাউকে ভয় পাই না, যা বলার আমি মুখে সবার সামনে বলব। এদের চক্ষুলজ্জাটাও চলে গেছে। যার পিশুনি বৃত্তি আছে, তার একটু চক্ষুলজ্জা আছে। ঠাকুরও বলছেন, পাগল, মাতাল, ষাঁড়, কুকুর এদেরকে দেখলে তু তু করে ঠাণ্ডা করতে হয়, তা নাহলে এরা ক্ষতি করে দিতে পারে। ক্ষমতাবানদের সামনে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। এই ধরণের সামাজিক লৌকিকতাকে নিয়ে স্বামীজী এখানে বলছেন না, স্বামীজী বলছেন ধর্ম ও আধ্যত্মিকতাকে নিয়ে। আধ্যাত্মিকতায় যখন আসে তখন বলছেন, be bold, tell the truth। If truth is too much for intelligent people and sweeps them away, let them go; the sooner the better. (*সত্যের জ্যোতি বুদ্ধিমান লোকদের পক্ষেও যদি অতিমাত্রায় প্রখর বোধ হয়, তাঁরা যদি তা সহ্য করতে না পারে, সত্যের বন্যা যদি তাদের ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তা যাক – যত শীঘ্র যায়, ততই ভাল।*) গীতায় ভগবান বলছেন *ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ অজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্*,

মুর্খদের বুদ্ধি বিচলিত করতে নেই, কিন্তু যাদের বুদ্ধি আছে, যাদের পড়াশোনা আছে, তাদের সামনে আধ্যাত্মিক সত্যকে স্পষ্ট করে বলতে পার। যদি তারা সেই সত্যকে না নিতে পারে, তাহলে তাদের যেতে দাও। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর কাউকে কোন দিন কটূ কথা বলতেন না। ঠাকুরের নাম শুনে দক্ষিণেশ্বরে অনেকে আসত। একটি বাচ্চা ছেলে কিভাবে ঠাকুরের কাছে পৌঁছে গেছে। এসে বলছে, 'হ্যাঁগো! তুমি নাকি উপদেশ দাও? আমাকেও উপদেশ দাও না'। ঠাকুর রামলালকে ডেকে বলছেন, 'ওরে রামলাল তাকের উপর অনেক উপদেশ আছে, ওকে দুটো উপদেশ দেতো'। তাকে সন্দেশ রাখা ছিল, রামলাল সেখান থেকে দুটো সন্দেশ বাচ্চা ছেলেটির হাতে দিয়েছে। তারপর ঠাকুর জিজ্ঞেস করছে, 'উপদেশটা কেমন'? 'খুব ভাল'। কত রকম লোকই আসতো। তার মধ্যে নরেনও আছে, তারকও আছে। ঠাকুর যখন দেখতেন এর মধ্যে সার নেই, তখন মনে মনে হয়ত বলতেন যত তাড়াতাড়ি যায় তত ভাল। কাউকে বলছেন, 'তোমরা রাণী রাসমণীর বিল্ডিং দেখোগে যাও, খুব সুন্দর বাগান'। কিন্তু যার মধ্যে একটু সার আছে দেখছেন, তাকে জাপটে ধরে রাখছেন, আর ছাড়ছেন না। আসতে দেরী করলে খবর পাঠাচ্ছেন, নিজে দেখা করতে দৌড়ে যাচ্ছেন। যে জায়গাতে আধ্যাত্মিকতা, সেখানে কোন আপোষ করা চলবে না, সেখানে সত্য যেটা সেটা বলতেই হবে।

Childish ideas are for babies and savages; and these are not all in the nursery and the forests, some of the have fallen into the pulpits. (*ছেলেমানুষি ভাব – শিশুদের ও বুনো অসভ্যদেরই শোভা পায়; কিন্তু দেখা যায়, ঐ-সব ভাবের অনেকগুলি ধর্মপ্রচারকদেরও কুক্ষিগত।*) ১৮৯৫ সালে স্বামীজী এই কথা বলছেন, দেড় বছর আমেরিকায় কাটিয়ে দিয়েছেন, এই কদিনের মধ্যে আমেরিকানদের hypocracy দেখে তিনি হতাশ হয়ে গেছেন। বিখ্যাত ইতিহাসবিদ্ উইল ডুরাণ্ডের একটা খুব নামকরা বই আছে, যার নাম – A Case for India। উনি চল্লিশের দশকে ভারতবর্ষে এসে ভারতবর্ষের দুর্দশা দেখে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলেন; বৃটিশরা ভারতের কী দুরবস্থা করে দিয়েছে, এক মহান সভ্যতাকে বৃটিশরা কোথায় নিয়ে গিয়ে নামিয়ে দিয়েছে! বইটাকে ইংরেজ সরকার বাজায়েপ্ত করে দেয়, ছাপতেই দেয়নি। মাঝখানে নাকি পাণ্ডুলিপিটাই হারিয়ে গিয়েছিল। যাই হোক, ইংরেজ সরকার চলে যাওয়ার পর, বইটাকে বার করা হয়। বইটা না পড়লে কল্পনাই করা যাবে না যে, বৃটিশরা যে ভারতে কী অত্যাচার করে এসেছে। হিন্দুরা নরম প্রকৃতির মানুষ ছিল তাই সব সহ্য করে এসেছে। কিন্তু স্বামীজীর মত পুরুষ আর নিতে পারছেন না। স্বামীজী ধর্মকে নিয়ে শিশুসুলভ ভাবগুলিকে নিয়ে যে চর্চা চলছে, সেগুলোকে নিয়ে বলছেন। তুমি চার্চে প্রেয়ার করতে যাওনি তো, তুমি ভুগবে, মন্দিরে প্রণাম করতে যাওনি তো, তোমার কি হয় দেখবে! ভগবানের ইচ্ছা মানোনি তো, ভগবান একদিন এমন মার দেবেন বুঝবে; এগুলো সবই childish idea। এগুলো কাদের জন্য, বাচ্চাদের জন্য আর অসভ্য গেঁয়ো লোকেদের জন। তারপরেই স্বামীজী বলছেন, ওর মধ্যে কিছু ধর্মপ্রচারকরাও ঢুকে পড়েছে।

সব অবলম্বন ছেড়ে মুক্তির বাতাস নাও

এরপর স্বামীজী খুব নামকরা কথা বলছেন, It is bad to stay in the church after you are grown up spirituality. Come out and die in the open air of freedom. (*আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভের পর সম্প্রদায়ের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকা খারাপ। তা থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীনতার মুক্ত বাতাসে দেহপাত কর।*) স্বামীজী এই কথা বার বার বলতেন, একটা চার্চে জন্ম নেওয়া ভাল, কিন্তু চার্চে মরা ভাল নয়। চার্চ মানে এখানে চার্চ না, চার্চ মানে কিছু ধারণা বা বিশ্বাস। যেসব পরিবারে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি, সব পরিবারেই ধর্মকে নিয়ে কিছু কিছু আশ্চর্য রকমের ধারণা রয়েছে, সেই ধারণাগুলিকেই নিয়ে আমরা বড় হয়েছি। খুব ভাল, বড় হওয়ার পথে একটা জায়গায় পর্যন্ত এই ধারণাগুলি আমাদের এগিয়ে দিয়েছে ঠিকই। গ্রামের পাঠশালাতে আমরা প্রাথমিক শিক্ষা পাই ঠিকই, কিন্তু তাই বলে কি কেউ কখন বলতে যায় যে, আহা এই স্কুল আমাকে শিক্ষা দিয়েছে, আমি এই স্কুল ছেড়ে অন্য কোন স্কুলে আর যাবো না? তাহলে তো তার বিদ্যাচর্চা, জ্ঞানের বিকাশ ওখানেই থমকে যাবে। ওখান থেকে তুমি এবার বেরিয়ে এসো, আরও মুক্ত বাতাস গ্রহণ করে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাও। এখানে স্বামীজী এই কথাগুলো নিজের শিষ্যদের বলছেন, যাঁরা খ্রীষ্ট ধর্মের পরম্পরাতে বড় হয়ে এসেছেন, তাঁদেরও সেই অনুযায়ী বিশ্বাস হয়ে আছে যে, Jesus is the savior,

Christinity is the only religion। তুমি যখন শুরু করেছিলে তখন অবশ্যই এগুলো তোমার জন্য ভাল ছিল, কিন্তু এবার একটু বেরিয়ে আসার জন্য লাগো। যে পথ, যে ধর্ম, যে গুরু, যে অবতার তোমাকে আসল মুক্তির আস্বাদ দেবে, সেই মুক্তিকে আস্বাদ করার জন্য তোমার পায়ের শৃঙ্খলগুলি ভাঙতে হবে। পায়ের শৃঙ্খল ভেঙে দেওয়া মানে এই নয় যে তুমি যা খুশী করার স্বাধীনতা পেয়ে গেলে। এর আগেই স্বামীজী বলেছেন, ঠিক ঠিক ধর্মের লোক কখনই কোন অনৈতিক কাজ করবে না। আধ্যাত্মিক ভাবে তুমি মুক্ত, আধ্যাত্মিক মুক্তি মানে তোমার আর কোন কিছু অবলম্বন রইল না, রয়েছে একমাত্র শুদ্ধ চৈতন্য। শুদ্ধ চৈতন্যকে তুমি ঈশ্বর রূপে দেখতে পারো, ব্রহ্ম বা আত্মা রূপে দেখতে পারো, নিজের স্বরূপ রূপে দেখতে পারো, তাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু অবলম্বন আর কারুর নেই – এটাই মুক্তি, মুক্ত মানে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত। শেষ যে আশ্রয় ঈশ্বরের উপর নির্ভরতা, সেটাকেও ত্যাগ করে দিচ্ছে। আচার্য শঙ্কর গীতার ভাষ্যে এক জায়গায় বলছেন, কেউ কেউ মনে করেন, আমি আছি, আমার ইষ্ট আছেন, তিনিই আমার মুক্তির কাণ্ডারী – আর এটাই বেদান্ত। এটা বলার পর আচার্য বলছেন, এই রকম কোন কথা আমরা আমাদের পরম্পরায় শুনিনি, যারা এই রকম কথা বলে, এরা মুর্খেরও মুর্খ, পরম্পরাগত শিক্ষা এরা পায়নি। মুক্তি মানে, আর কোন অবলম্বন নেই – নিজের গুরু, নিজের ইষ্ট এবং নিজে, সব এক হয়ে সচ্চিদানন্দে মিলে যাবে। সেই সচ্চিদানন্দ তুমি নিজে; এটাই মুক্তি।

একমাত্র মানবদেহেই আপেক্ষিক অস্তিত্বকে ভাঙা সম্ভব

হিন্দুদের চারটে পুরুষার্থ, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। অর্থ আর কাম মানুষকে এই জগতের সুখ দেয় আর ধর্মাচরণের মাধ্যমে মানুষ পরলোকের সুখ প্রাপ্ত করে। পরলোকের সুখ মানে মৃত্যুর পর ভাল স্বর্গে যাওয়া বা পিতৃলোকে যাওয়া, যাঁরা প্রচুর যজ্ঞাদি করেছেন তাঁরা আরও উচ্চ স্বর্গে চলে যান বা দেবতাদের রাজা হয়ে যান, অনেকে অশ্বেমেধাদি যজ্ঞ করে ব্রহ্মালোকে চলে যান। যাঁরা বলেন আমি ইহলোক পরলোক কোন লোকের সুখ চাই না, তাঁরা মোক্ষ পথ অবলম্বন করে মুক্তির দিকে এগিয়ে যান। এটা হিন্দুদের একটা চিন্তা বা ভাবনা। অন্যান্য ধর্মের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম নির্বাণের কথা বলে, জৈন ধর্মও মুক্তির কথা বলে, কিন্তু সবারই স্বর্গাদির ধারণা আছে। মানুষের মন শরীরকে বাদ দিয়ে কিছু চিন্তা করতে পারে না। শুধু শরীরই নয়, নিজের শরীরের যে সম্প্রসারিত রূপ, বাবা-মা, ঠাকুরমা-ঠাকুর্দা, আর অন্য দিকে স্বামী-স্ত্রী-সন্তানাদি, সেটাকেও ছাড়তে পারে না। বটবৃক্ষ একাই বড় মহীরূহ রূপে দাঁড়ায়, কিন্তু তারপর কিছু দিন পর তার শিকড়গুলি নীচের দিকে নামতে থাকে। কয়কে বছর পর বোঝাই যায় না, বটবৃক্ষের মূল শিকড় কোনটা। সংসাররূপী বৃক্ষে যিনি একেবারে নিমজ্জ হয়ে আছেন, পরে বুঝতে পারেন না আসল উনি কোনটা। মানুষ নিজেকেই সব থেকে বেশী ভালবাসে। এখানে এখন 'আমি'টা ডালপালা বিস্তার করে, ঝুড়ি নেমে নেমে সম্প্রাসারিত হয়ে গেছে। আগেকার দিনে বহুবিবাহের প্রথা ছিল, সেখানে আরও যত স্ত্রী ছিল, সেগুলিকেও ধরে নিচ্ছে। মানুষ প্রথমে মনে করে এদেরকে নিয়ে এই সংসারে ভোগ করব, তারপর মনে মনে ভাবে, মৃত্যুর পরেও যেন এরা আমার সঙ্গে থাকে। বাল্মীকি রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র বালীকে বধ করলেন, বালীর স্ত্রী তারা এসে শ্রীরামচন্দ্রকে বলছে, যে বাণ দিয়ে আপনি আমার স্বামীকে মারলেন, সেই বাণ দিয়ে আমাকেও মেরে দিন। কারণ পরলোকে আমাকে ছাড়া তিনি সুখে থাকতে পারবেন না। আর কয়েক দিন পরে সেই তারা দেবর সুগ্রীবের সাথে ভোগ লালসায় লিপ্ত হয়ে গেছে। এটাই মানব জীবনের বাস্তব চিত্র।

এখানে মানুষ গুরুত্ব নয়, বাবা-মা, স্বামী-স্ত্রী, সন্তানাদি কেউই গুরুত্ব নয়, গুরুত্ব একমাত্র আমার, আমি নিজে গুরুত্বপূর্ণ। আমি নিজেকে কার সাথে জুড়ে রেখেছি, সেটাই গুরুত্ব হয়ে যায়। কত দিনের জন্য জুড়েছি সেটারও কোন গুরুত্ব নেই, কারণ আমরা যতই দিব্যি খাই না কেন যে, আমাদের জুড়ি সারা জীবনের মত, এসব দিব্যি কিছুই না, এগুলোর কোন দাম নেই। কিছু দিন আগে পর্যন্ত মানুষের এই বিশ্বাস ছিল যে, আর সবাই তোমাকে ছাড়ুক আর নাই ছাড়ুক, তোমার মা কোন দিন তোমাকে ছাড়বে না। *কুপুত্রো জায়তে ক্বচদপি কুমাতা ন জায়তে*, কুপুত্র জন্মান সম্ভব, কিন্তু কুমাতা কখনও হয় না। অথচ ইদানিং কত মায়েরা সন্তানকে ছেড়ে দিয়ে আরেকজনকে বিয়ে করে দিব্যি আলাদা থাকছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিয়ের জন্য এমন পাগল হয়ে যায় যে, দরকার হলে সন্তানকে খুন করে দিতেও কোন দ্বিধা করে না। মা সন্তানের যে একটা সম্পর্ক ছিল, সেটাও যেন আজ কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে। ঘুরেফিরে শেষ কথা আমি। আমি যার সাথে জুড়ে

থাকব, পরকালেও যেন এমন থাকে। আর এখানে সুখ যতটা পাচ্ছি তার শত গুণ সুখ যেন মৃত্যুর পরে পাই, তার জন্য ধর্মাচরণ। বিশ্বের সব ধর্মই মানুষকে এই দিকেই চালিত করে, যাতে এই জগৎ আর পরের জগৎ, দুটো জগৎই যেন আমার সুখ ও সমৃদ্ধিতে ভরপুর থাকে। ধর্মকে আক্রমণ করে যে ধরণের সাধারণ লেখা বেরোয়, সেগুলি দিয়ে ঠিক বোঝা যায় না; কিন্তু বিদেশে ধর্মকে নিয়ে এমন ধরণের সব আক্রমণ করা হয়, ধর্মীয় কোন সংস্থা থেকে তার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলা হয় না। সেখানে তাদের আক্রমণের মূল লক্ষ্যই হল ধর্মের এই ধরণের জনদরদী আইডিয়াসগুলি, ধর্মের মাধ্যমে ভোগ চরিতার্থ করার ভাবগুলি। স্বামীজীও এইবার হিন্দু ধর্মই হোক, আর বিশ্বের যে কোন ধর্মই হোক, যে ধর্ম স্বর্গ নরকাদির জনদরদী ধারণাগুলিকে মানুষের মধ্যে সংক্রমিত করে, এই জিনিসগুলিকে আক্রমণ করে বলছেন। কারণ স্বামীজী হলেন মুক্তির ফেরিওয়ালা, প্রফেট অফ ফ্রীডম্, এছাড়া স্বামীজী অন্য কোন কথাই নেই।

স্বামীজী বলছেন, All progression is in the relative world. (*উন্নতি যা কিছু, তা এই আপেক্ষিক জগতেই হতে থাকে।*) আমাদের যা কিছু ভাল মন্দ হবে, যা কিছু উন্নতি হওয়ার, তা এই ব্যবহারিক জগতেই হবে। The human form is the highest and man the greatest being, because here and now we can get rid of the relative world entire, can actually attain freedom, and this is the goal. (*মানবদেহই সর্বশ্রেষ্ঠ দেহ এবং মানুষই সর্বোচ্চ প্রাণী, কারণ এই মানবদেহে এই জন্মেই আমরা সম্পূর্ণরূপে এই আপেক্ষিক জগতের বাইরে যেতে পারে, সত্য-সত্যই মুক্তির অবস্থা লাভ করতে পারি, আর ঐ মুক্তিই আমাদের চরম লক্ষ্য।*) হিন্দু ধর্ম আগাগোড়া বলে আসছে, মানবজীবন দুর্লভ, মানবজাতি শ্রেষ্ঠ জাতি; এই কারণে বলে না যে আমরা বেশি উন্নত। পশুপাখীদের লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, তাদের কিছু কিছু ইন্দ্রিয় মানুষের থেকে অনেকাংশেই উন্নত, তা সত্ত্বেও মানুষ শ্রেষ্ঠতম। কারণ এই যে মানুষের আপেক্ষিক অস্তিত্ব, যেখানে আজ ভাল, কাল মন্দ, আজ সুখ, কাল আনন্দ, এটা গ্রহণীয়, এটা অগ্রাহ্য, এই জিনিসটাকে পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া যায় শুধু এই মানবদেহের সাহায্যে। যার জন্য বলা হয়, এই ভূলোক হল কর্মভূমি, এখানে কর্মের স্বাধীনতা আছে। গীতার ত্রয়োদশধ্যায় ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞযোগে বলছেন, এটা হল ক্ষেত্র, এই ক্ষেতে চাষ করা যায়, চাষের ফলও পাওয়া যায়। স্বামীজী এটাই বলছেন, এখানে এই মানবশরীর দিয়ে ভোগও করা যায় আবার অপবর্গ, মুক্তির দিকেও যাওয়া যায়। এই শরীর দিয়ে আমরা এমন আচরণ করতে পারি, যার দ্বারা এখানে আমরা সুখভোগ করতে পারি, মৃত্যুর পরেও সুখ পেতে পারি, আর জীবন আর মৃত্যু, এই দুটোর পারেও চলে যেতে পারি। মানবশরীর আর মানবজীবন এই জন্যই শ্রেষ্ঠ, অন্য কোন কারণ নেই।

ভাগবত আদি গ্রন্থেও ঘুরে ঘুরে বলা হচ্ছে, দেবতারাও মানুষকে ঈর্ষা করে। কেন ঈর্ষা করে? এই জগতে যেদিকে তাকাই সেদিকেই দুঃখ আর দুঃখ, মানুষের কষ্টের আগুন জ্বলছ তো জ্বলছেই, কী কষ্ট চারিদিকে, কষ্টের শেষ আর নেই। যে কোন মানুষ নিজের মনের কথা খুলে বলার কাউকে পেলে তাকে নিজের দুঃখের কথাই বলতে থাকে, তার দুঃখের আর শেষ নেই। এই যে বলা হয়, চিতায় উঠলে শান্তি, তার মানে মানবজীবনে কোন সুখ নেই। কিন্তু মানবজীবনই শ্রেষ্ঠ, এমনই শ্রেষ্ঠ যে দেবতারাও এই শ্রেষ্ঠত্বকে হিংসা করতে বাধ্য হয়। কেন শ্রেষ্ঠ? এই পৃথিবীতে সুখ পাওয়া যায়, স্বর্গের সুখ পাওয়া যায় আর মুক্তির পথে এগিয়ে যাওয়া যায়, এই তিনটে একমাত্র মানবশরীরের মাধ্যমেই সম্ভব। ফ্রান্সে অনেক আগে একজন স্কুলের শিক্ষক বাচ্চাদের আপনি করে সম্বোধন করতেন। সবাই অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করত, আপনি একজন শিক্ষক হয়ে ছোট ছোট বাচ্চাদের আপনি করে কেন সম্বোধন করেন? তখন উনি বলছেন, আমার এক ছাত্র নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ছিলেন। নেপোলিয়ন ওনার ছাত্র ছিলেন, পরে সেই নেপোলিয়ন এত বড় সম্রাট হয়ে গেলেন। এদের মধ্যে কে কোথাকার কোন সম্রাট হয়ে যাবে আমি জানি না, তাই আগে থেকেই আমি এদের সবাইকে আপনি করে সম্বোধন করি। এটাকেই ইদানিং ব্যঙ্গ করে বলে, পুলিশদের বলা হয়, একটু সামলে ক্রিমিনালদের সাথে ব্যবহার করবে, এদেরই কেউ যে পরে ভোটে জিতে মন্ত্রী হয়ে আসবে না, কেউ বলতে পারে না। এটা হল রসিকতা, কিন্তু সদর্থে বলতে গেলে বলতে হয়, সত্যিই যদি কারুর মধ্যে একটু পোটেনশিয়ালিটি থাকে, তাহলে কেউ বলতে পারবে না যে, একদিন সে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। মানবজীবনের এটাই বৈশিষ্ট্য, শত হতাশা, তার মধ্যেই মানুষ কোথায় চলে যেতে পারে কেউ জানে না।

এখন ভারত নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে গেছে, কিন্তু স্বামীজীর সময় পুরো দেশ ক্ষুধার্ত, তার উপর শিক্ষা নেই, চিকিৎসা নেই। পঞ্চাশ বছর আগেও ভারতের life expectancy ছিল পঁয়ত্রিশ বছর, আজ বেড়ে হয়েছে পয়ষট্টি। তার মানে স্বামীজীর সময় তিরিশেরও নীচে ছিল। সেই সময়েও স্বামীজী বারবার বলে যাচ্ছেন, বিশ্বকে বাঁচাবে ভারতবর্ষ। তখনকার দিনের লোকেরা স্বামীজীর কথাকে যে পাগলের প্রলাপ বলে ভাবেনি, এটাই একটা অবাককাণ্ড। অবাক হয়ে যেতে হয়, যীশু নিজেকে সেভিয়ার বলাতে তখনকার লোকেরা তাঁকে ক্রুশিফাই করে দিল, স্বামীজীকে কেন সেই রকম ক্রুশিফাই করে দেয়নি, এটাই আশ্চর্যের। যে দেশে খাওয়া নেই, শিক্ষা নেই, চিকিৎসা নেই, তার উপর দেশটা ইংরেজদের গোলাম, তা সত্ত্বেও স্বামীজী বলে যাচ্ছেন, এই দেশ বিশ্বকে বাঁচাবে। কারণ স্বামীজী ভারতের শক্তির সম্ভাবনাটা দেখতে পাচ্ছিলেন। আমাদের চোখ এমন যে, আমরা সামনেরটাই দেখি, সম্ভবনাটা দেখতে পাই না। ক্লাশের পরীক্ষায় প্রথম হয়ে আসছে, ওটাকে দেখেই আমাদের চোখ টাঁটিয়ে ওঠে। সারা জীবনটা তার পড়ে আছে, এই সাফল্য কতটা সে টানতে পারবে দেখ! যে ছেলে ফাঁকি মারছে, পড়াশোনা করছে না, পরীক্ষায় ফেল করছে, নয়তো কোন রকমে পাশ করেছে; আমরা সঙ্গে সঙ্গে বলে দিই, এর দ্বারা কিছু হবে না। বোর্ডে প্রথম হয়েছে, দশ বছর পর কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে খুঁজেই পাওয়া যাবে না। ভিতরে দমই নেই। হিন্দীতে একটা কথা আছে, লম্বি রেস কা ঘোড়া, লম্বা রেসের ঘোড়া সমান ভাবে চলতে থাকে। হঠাৎ প্রথমের দিকে কিছু কাঠ খুব জোর জ্বলে ওঠে, ওগুলো সুন্দরী কাঠ। ঠাকুর বলছেন, প্রথমের দিকে হুশ করে জ্বলে ওঠে, তারপরে কিছুক্ষণ পর জল বেরিয়ে ছ্যাঁৎছোঁৎ করে নিভে যাবে। লম্বি রেস কা ঘোড়া আলাদা জিনিস, মানুষ মাত্রই হল লম্বি রেস কা ঘোড়া। হিন্দু ধর্ম, ভারতবর্ষ হল লম্বি রেস কা ঘোড়া; অনেক ঝড়ঝাপ্টা আসবে, ওর মধ্যেই নিজের মত পথ করে বেরিয়ে গিয়ে সারা বিশ্বকে পথ দেখাবে। এখানে স্বামীজী এটাই বলছেন, The human form is the highest and man the greatest being। কারণ মানবজাতিরই একমাত্র ক্ষমতা আছে যে, এই আপেক্ষি অস্তিত্বকে মানব শরীরেই ভেঙে দিতে পারে। তার থেকেও বড় হল, মুক্তি পেতে পারে। অন্য কোন প্রজাতি, ইন্দ্রাদি দেবতা হোক, ব্রহ্মাদি কয়েকজন ছাড়া, যাঁরা মুক্ত হয়ে আছেন, কারুর দম নেই যে মুক্তি লাভ করতে পারবে। একটা দুটো বাক্যের পর এই জিনিসটা আরও পরিষ্কার হবে।

স্বামীজী আরও বলছেন, Not only we can, but some have reached perfection; so no matter what finer bodies come, they could only be on the relative plane and could do no more than we, for to attain freedom is all that can be done. (*কেউ এই দেহ ত্যাগ করে যতই সূক্ষ্ম – সূক্ষ্মতর দেহ লাভ করুক, সে তখনও এই আপেক্ষিক জগতের ভিতরেই রয়েছে, সে আর আমাদের চেয়ে বেশী কিছু করতে পারে না, কারণ মুক্তিলাভ করা ছাড়া আর কি উচ্চাবস্থা লাভ করা যেতে পারে।*) যত সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করার ক্ষমতা আমাদের আসুক না কেন, যত সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর দেহ ধারণ করি না কেন, স্বর্গের সুখ হয়তো কোটিগুণ পেতে পারি, কিন্তু সবটাই হল এই আপেক্ষিক জগতের ভিতর। আমাদের সবাইকে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোথাও না কোথাও গিয়ে জন্ম নিতে হবে, মুক্তি কেউ দিতে পারবে না। উদ্দেশ্য যদি মুক্তি হয়, তাহলে আমরা যে শরীরই পাই না কেন, আমাদের কোন কাজে দেবে না। পূর্ণতা এর আগেও মানুষ পেয়েছে, এই শরীরে, পরেও পাবে একমাত্র এই মানবশরীরে। কেন?

স্বামীজী বলছেন, The angels never do wicked deeds, so they never get punished and never get saved. (এ্যঞ্জেলরা *কখন কোন অন্যায় কাজ করেন না, কাজেই তাঁরা শাস্তিও পান না; সুতরাং তাঁরা মুক্ত হতেও পারেন না।*)। স্বামী যতিশ্বরানন্দজী বলতেন, তোমার আধ্যাত্মিক জীবনের সব কিছু যদি খুব মসৃণ ভাবে চলে, তাহলে বুঝবে তোমার আধ্যাত্মিকতায় কিছু গোলমাল আছে। স্বামীজী তাঁর বিদেশী শিষ্যদের উপদেশ দিচ্ছেন, তাই বিদেশী উপমা এ্যঞ্জেল নিয়ে আসছেন। এ্যঞ্জেলরা কখন ভুল কাজ করবেন না। ভুল কাজ করেন না বলে তাঁদের কোন saviorএর দরকার হয় না। ওখানে স্বামীজীর সব খ্রীশ্চান শিষ্যরা আছেন, আর খ্রীশ্চান ধর্মে বলে Christ the savior, সেইজন্য বলছেন, যীশু যদি save করতে আসেন কাকে save করবেন। Save তাদেরই করবেন যারা মাটিতে পড়ে আছে। তোমাদের এ্যঞ্জেলরা কোন গোলমাল করে না, তাঁদের বাঁচাবার জন্য কারুর দরকার হয় না। স্বামীজী এটা একদিক থেকে একভাবে

বলছেন, কিন্তু ব্যাপারটা আবার অন্য দিক দিয়ে পুরো অন্য রকম হয়। মানুষ যখন ভুল করে তখন মার খায়, যখন মার খায় তখনই তার মধ্যে ত্যাগের স্পৃহা আসে। মার না খাওয়া পর্যন্ত ত্যাগের ইচ্ছা আসবে না। মনে করা যাক একটা জঙ্গল, যে জঙ্গলে কোন শিকারী আসে না, সেই জঙ্গলে একটা বাঘ জন্ম নিল, জন্ম নেওয়ার পর বড়দের সঙ্গে সঙ্গে থেকে শিকার করতে শিখে গেল। সারা জীবন শিকার করে আর খায়, এই ভাবে একদিন সে মরে গেল। ওর যে লাইফ প্যাটার্ন সেটা এর মধ্যেই বাঁধা, এই প্যাটার্নের মধ্যে ওর নিজেকে উন্নত করার কোন সুযোগ নেই। এখানেও তাই, মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে চলে গেল, সেখানকার মত শরীর পেল, চরিত্রবান গরুর মত থাকল। তারপর কি হবে? *ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি*, যেমনি তার পূণ্য ক্ষয় হয়ে আসবে, আস্তে আস্তে তাকে ওখান থেকে নেমে আসতে হবে। যেমন যেমন নামতে থাকে, তেমন তেমন শরীর স্থূল হবে, ওখানকার মতই ভোগ, তার তো আর নূতন করে কিছু হচ্ছে না। সেইজন্য আবার এখানেই আসতে হবে। পশুপাখিরা কখন ভুল কাজ করে না। আমরা সব সময় দেখি বলে আমাদের কাছে কিছু মনে হয় না, কিন্তু ওরা করতেই পারবে না, ওরা ভুল কাজ কি জানেই না। ওরা যা কিছু করে নিজের জীবন চালানোর জন্য করে, এর বাইরে ওরা কিছু করে না। ঠিক তেমনি এ্যঞ্জেলার ভুল কাজ করেন না, করতেই পারবেন না। তাঁরা নিজেদের স্বভাবে আবদ্ধ। ঋষিরা, সিদ্ধরা, কোন একটা সময় সেই সিদ্ধিটা পেয়ে গেছেন, যার জন্য তাঁরা বলতে পারেন, আমার ভাল মন্দ কোনটাই আর লাগবে না, আমি শুধু ঈশ্বর চিন্তনে ডুবে আছি। ঈশ্বর চিন্তনে ডুবে থাকা আর একটা শরীরে আবদ্ধ হয়ে গতানুগতিক জীবন চালানো দুটো আলাদা জিনিস। স্বামীজী বলছেন, এই মার খাওয়াটা একমাত্র হয় মানবশরীরে, মার খায় বলে তার ভিতরে ত্যাগের ইচ্ছা জাগে, ত্যাগ করতে পারে বলে বলে সে মহৎ হয়। একটু আগে যে মানবজীবনের সম্ভাবনার কথা বলা হল, সম্ভাবনাটা কিসের? সম্ভাবনা বল বৈরাগ্যের, অন্য আর কোন কিছু না। কারণ বৈরাগ্যই মানুষকে মহৎ বানায়। তুমি যত যা কিছু সংগ্রহিত কর, যত রকম ভোগ কর, এগুলো দিয়ে কেউ কোন দিন বড় হয়নি, হবে না; একমাত্র ত্যাগ দিয়ে মানুষ মহান হয়।

Blows are what awaken us and help to break the dream. They show us the insufficiency of this world and make us long to escape, to have freedom. (*সংসারের ধাক্কাই আমাদের জাগিয়ে দেয়, এই জগৎস্বপ্ন ভাঙবার সাহায্য করে। ঐরূপ ক্রমাগত আঘাতই এই জগতের অসম্পূর্ণতা বুঝিয়ে দেয়, আমাদের এ সংসার থেকে পালাবার – মুক্তিলাভ করবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দেয়।*) ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমরা কত মিষ্টি মিষ্টি স্বপ্ন দেখি, আবার কত বিভীষিকাময় স্বপ্নও দেখতে থাকি। এ্যলার্ম বেজে উঠল, সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়ে আবার বাস্তব জগতে ফিরে আসি। সুখের জীবন, মনের মত পার্টনার, মনের মত বাড়ি, মনের মত ইনকাম, মনের মত গাড়ি, সোস্যাল স্ট্যাটাস, সবটাই সুস্বপ্ন। এটা ঠিক সেই রকম, স্বর্গে যেমন দেবতারা, অপ্সরাগুলো আবদ্ধ, উন্নতি কারুরই হচ্ছে না। Growth একমাত্র তখনই হবে যদি তার লক্ষ্য আধ্যাত্মিকতা থাকে। এখানে সব জায়গায় আমাদের এই পয়েন্টটা মাথায় রাখতে হবে, আধ্যাত্মিকতা যাদের লক্ষ্য তাদের জন্য স্বামীজী এই কথাগুলো বলছেন। যাদের আধ্যাত্মিকতা লক্ষ্য নয়, তাদের জন্য ঠিক আছে, কারণ ওরা বলবে আমি বাপু বেশ আছি, আমার মুক্তি-ফুক্তি লাগবে না। লাগবে না যখন তখন ঠিক আছে। কিন্তু আজ হোক কাল হোক তোমার জীবন ঘড়িতে মৃত্যুর এ্যলার্ম বাজবেই, স্বপ্ন তোমার একদিন ভাঙবেই। বার্দ্ধক্য আসবেই, জড়া তোমাকে গ্রাস করবেই, শোক আসবেই, চোখে তোমার জল আসবেই, চোখের জল শুকোতে না শুকোতে মৃত্যু আসবেই। তুমি যত যা কিছু করার করে নাও, এই জিনিসগুলি থেকে তোমার রেহাই নেই, স্বপ্ন তোমার ভাঙবেই – কারুর একটু দেরীতে ভাঙে কারুর তাড়াতাড়ি ভাঙে। এর মূল বক্তব্য হল, স্বর্গ কামনা, যেটা হিন্দুদের পূর্বমীমাংসকদের দৃঢ় মত, বেশ কিছু ধর্মের শেষ কথা মৃত্যুর পর স্বর্গে যাওয়া, স্বামীজী এই ধারণাটাকেই এখানে আক্রমণ করছেন। আগে আগে স্বামীজী দেখিয়েছেন যে, আধ্যাত্মিকতার শেষ কথাই মুক্তি, মুক্তির নীচে কোন কথা নেই। এরপর স্বামীজী এই প্রসঙ্গ থেকে সরে একটু অন্য প্রসঙ্গে গিয়ে বলছেন।

নৈতিক প্রকৃতির সাথে ইচ্ছাশক্তি ও উপলব্ধির সম্পর্ক

A thing dimly perceived we call by one name; the same thing when fully perceived we call by another. The higher the moral nature, the higher the perception and the stronger the will. (*কোন বস্তু – যখন আমরা অস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করি, তখন আমরা তার এক নাম দিই, আবার সেই জিনিসকেই যখন সম্পূর্ণ উপলব্ধি করি, তখন অন্য নাম দিই। আমাদের নৈতিক প্রকৃতি যত উন্নত হয়, আমাদের উপলব্ধিও তত উৎকৃষ্ট হয়, আমাদের ইচ্ছাশক্তিও তত অধিক বলবতী হয়।*) শেষ লাইনটাই খুব গুরুত্বপূর্ণ। অন্ধকারে কোন জিনিস দেখলে আমাদের এক রকম মনে হয়, আবছা আলোতে দেখলে আরেক রকম মনে হয়, আর দিবালোকে দেখলে তখন একেবারে অন্য রকম মনে হয়। আমরা এখন অজ্ঞান অন্ধকারে আছি, জগৎ এক রকম দেখাচ্ছে, ঈশ্বর এক রকম দেখাচ্ছে। একটু শাস্ত্র পড়ছি, শাস্ত্রের কথা শুনছি, জীবনটা তখন অন্য রকম লাগছে। আর যখন জ্ঞান হয়ে যায়, জগৎটা তখন পুরো অন্য রকম দেখায়।

নৈতিক প্রকৃতি বা নৈতিক স্তরটা যখন মানুষের উন্নত হয়ে যায়, তখন এতক্ষণ যে জিনিসটা যেভাবে দেখে আসছিল, সেটা এবার তার কাছে পুরো অন্য রকম হয়ে যাবে। তার সাথে ইচ্ছাশক্তিটাও সাংঘাতিক হয়ে যাবে। পাঁচ-সাত বছরের বাচ্চা বাদে, যে কেউ এসে যদি বলে আমার ইচ্ছাশক্তি নেই, খোঁজ নিলে অবশ্যই ওর চরিত্রে গোলমাল পাওয়া যাবে। চরিত্র আলগা না হলে, ইচ্ছাশক্তি কখনই কমজোরি হবে না। ব্রাহ্মণ সন্তানদের আগেকার দিনে সাত আট বছর হতেই উপনয়ন করিয়ে গায়ত্রীমন্ত্র দিয়ে দেওয়া হত। গায়ত্রীমন্ত্র দিয়ে দেওয়া মানে এবার তাকে সকাল সন্ধ্যা জপ করতে হবে, খাওয়া-দাওয়া, ঘুম, ওঠা-বসা, পোশাক, মেলামেশা সব কিছু এখন নিয়ন্ত্রিত হয়ে গেল। ক্ষত্রিয় বংশের সন্তানদের একটু বয়স হতেই অস্ত্র হাতে দিয়ে গুরুর কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা নিতে পাঠিয়ে দিত। এমন ট্রেনিং দেওয়া হতে থাকে যে, ঐ ট্রেনিংই তার নৈতিক চরিত্রের মান উন্নত করিয়ে দিত; এবং ফলস্বরূপ তাদের ইচ্ছাশক্তিটাও বেড়ে যেত। ইচ্ছাশক্তি বেড়ে যাওয়া মানে, এবার তাকে আর কে আটকাবে! যদি কারুর মনে হয়, আমার জীবনের সম্ভবনাগুলি সাফল্যের মুখ দেখতে পেল না। এখানে অনেকগুলো relative term আছে, যেমন সুখের জীবন, স্বপ্নের মত জীবন চলছে, মনে করছে বেশ সুখে আছি। যেমন একটা রেলওয়ে স্টেশনের ভিখারী দিনে পঞ্চাশ টাকা করে আয় করে, একদিন ষাট টাকা পেয়ে গেল, সে তাতেই বেজায় খুশী। আমরা এটাকে নিয়ে আলোচনা করছি না, আরেকটু অন্য স্তরে আলোচনা করছি। যদি মনে হয় আমার সম্ভাবনা জীবনে পুরো অঙ্কুরিত হওয়ার সুযোগ পেল না, আমি যা পারতাম তা করে দেখাতে পারলাম না। তারা যদি বলে আমি সুযোগ পায়নি, বুঝতে হবে সে ডাহা মিথ্যা কথা বলছে। জীবন আমাদের পদে পদে সুযোগই দিয়ে যায়, জীবনের কাজই সুযোগ দিয়ে যাওয়া। আমরা সুযোগ নিই না। কেন নিইনি? নিতে পারিনি। কেন পারিনি? ইচ্ছাশক্তিটা নেই। ইচ্ছাশক্তি কেন নেই? নৈতিকতা নেই। নৈতিকতা মানে কি? নিত্য-অনিত্য বিবেক। স্বামীজী শিক্ষার সংজ্ঞা দিচ্ছেন – man making character building।

গান্ধীজীর জীবনী যদি পড়া থাকে তাহলে দেখা যাবে যে, গান্ধীজী সারাক্ষণ নৈতিকতা নিয়ে এমন করতেন যে লোকেদের মাথা খারাপ করে ছেড়ে দিতেন। ইন্দিরা গান্ধীর বিবাহ হয়েছে, গান্ধীজীর সাথে দেখা করতে গেছেন, গান্ধীজী বললেন, ফিরোজ গান্ধীর সাথে ভাইবোনের মত থাকবে। ইন্দিরা গান্ধী শোনার পর এমন এমন সব কথা গান্ধীজীকে বললেন, ভাইবোনের মতই যদি থাকতে হয় তাহলে বিয়ে করা কেন? গান্ধীজীর কথা শোনেননি, দুটো সন্তানও হল। ইন্দিরা গান্ধীকে যা বলেছিলেন, তিনি জয়প্রকাশ নারায়ণকেও তাই বললেন, জয়প্রকাশ নারায়ণ তাই করলেন। স্বামীজীর এসব ছিল না। ঠাকুরও এভাবে কিছু কাউকে বলছেন না। যা একটু বলছেন তাদেরকেই, যারা পুরোপুরি আধ্যাত্মিক পথে যাচ্ছে। কিন্তু গান্ধীজীর একটা বয়সের পরে শুধু সবাইকে ব্রহ্মচর্যের কথা বলতে শুরু করলেন।

স্বামীজী যখন character নিয়ে বলছেন, তখন অন্য লেভেলে বলছেন। কি বলছেন – Man making character building। Man makingএর মানেই হয় শক্তি। শক্তি যদি তোমার ভিতরে না থাকে, তোমার দ্বারা কিছু হবে না। আর শক্তির সাথে যদি character না থাকে, তাহলে হয় ঐ শক্তি আসবে না, আর এলেও চলে যাবে। আমাদের কাছে রাবণের কাহিনী আছে, সেখানে একই জিনিস হচ্ছে। রাবণের শক্তি ছিল, কিন্তু সেই characterটা ছিল না বলে সীতাকে দেখে প্রলুব্ধ হয়ে তাঁকে টেনে নিয়ে চলে এলো।

ফলে রাবণের সমস্ত শক্তিটাই নাশ হয়ে গেল। হিটলারেরও একই জিনিস হল, character নেই। Character নেই মানে, কোনটা ঠিক কোনটা ভুল, এই বিবেকটা নেই। আমাদের কাছে সব সময় character মানে পুরুষ-নারীর সম্পর্ক, সেক্সটাই আমাদের কাছে characterএর মানদণ্ড। সেক্স একটা খুব ছোট্ট ভূমিকা characterএ পালন করে। কিন্তু সৃষ্টিকার্যে কাম জিনিসটা বিরাট ভূমিকা নেয়, ঠাকুর বলছেন ওটা আছে বলেই সৃষ্টি চলছে। ব্রহ্মাই নিজেকে পুরুষ আর নারীতে বিভক্ত করে সব কিছু সৃষ্টি করলেন। যৌন মিলন জিনিসটা খারাপ না, খারাপ হল কাম, তোমাকেই চাই; গোলমালটা এখানেই।

যখনই Character শব্দটা আসে, তখন আমি যে সমাজে আছি, যে ধর্মে আছি, সেই ধর্ম ও সমাজে যে যে মূল্যবোধকে পরিষ্কার করে বলে দেওয়া হয়েছে, সেই সেই মূল্যবোধের উপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করাটাই character বা inclusiveness। Inclusiveness that alone is character, everything else is characterless। একটা মানুষ কখন চরিত্রহীন? যখন সে inclusive নয়, exclusive হওয়া মানেই সে চরিত্রকে হারিয়ে ফেলেছে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ ও মাৎসর্য, এই ছটি রিপু মানুষকে exclusive করে, এগুলোই চরিত্রের দুর্বলতা। এই ছটি জিনিস characterকে define করে দেয়। কিন্তু তার সাথে আছে, যেমন মানুষ মিথ্যা কথা বলে। মিথ্যা কথা মানুষ কেন বলে? কামের জন্য বলে, লোভের জন্য বলে, বদনামের ভয়ে বলে, ঈর্ষা আছে বলে মিথ্যা কথা বলে। সব জিনিসগুলি ঘুরে একই জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায়। যোগশাস্ত্র অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, অপরিগ্রহ ও ব্রহ্মচর্য এই পাঁচটাকে গুণ রূপে বলছেন। যে রূপেই আমরা নিতে চাই না কেন, ষড়রিপু রূপে নিতে চাই, যম-নিয়ম রূপে নিতে চাই, সবটাতেই আইডিয়া হল inclusiveness। যত আমরা সংসারের সবার সাথে নিজেকে সবার আপনজন রূপে জুড়ব, তত আমার চরিত্র উন্নত হচ্ছে, তত আমার একাগ্রতা বাড়বে। একাগ্রতা যত বাড়বে, মনের ইচ্ছাশক্তি তত বাড়বে। ইচ্ছাশক্তি যত বাড়বে তত আমার অর্জন করার ক্ষমতা বাড়বে। ঠাকুর বলছেন, কেশবের ধ্যানটুকু ছিল বলে তার এত নামযশ হল। ধ্যান করা মানেই সে inclusive হয়ে যাচ্ছে। চঞ্চল মানেই সে exclusive হয়ে যাচ্ছে, কোন একটা জিনিস মনের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করছে। নৈতিকতা হল ভিত্তি, যার উপর সে দাঁড়িয়ে আছে।

এথেন্স শহরে সক্রেটিস মরালিটির শিক্ষা দিতেন। মরালিটির শিক্ষার কথা শুনে শুনে মনে হত পুরো এথেন্স শহরটারই গোলমালে ভরে গেছে। এথেন্সের পুরনো লোকেরা তাই সক্রেটিসের মৃত্যুদণ্ড চাইল। তখনকার দিনে মৃত্যুদণ্ড মানে, তাকে বিষপান করতে হবে। শিষ্য প্লেটোর ভাল যোগাযোগ ছিল, তিনি ঠিক করে ফেললেন, রাতের মধ্যে সক্রেটিসকে জেলে থেকে নিয়ে পালিয়ে যাবেন। সক্রেটিস শুনে বলছেন, 'জেল থেকে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যাওয়া, কোন প্রশ্নই নেই। আমি সারা জীবন সত্যের যে শিক্ষাটা দিয়ে এলাম, এই এতটুকুর জন্য সেই সত্যকে আমি কি করে ছেড়ে দেব'! এই হল চরিত্র। ভগবান বুদ্ধের জাতক কথাতে ঠিক এই রকম একটা ঘটনা আছে। জাতক কথাতে একবার তিনি এক শহরের বণিক হয়ে জন্ম নিয়েছিলেন। সেই শেঠ বাড়িতে কোন অতিথি এলে তাকে ভিক্ষা দিতেন। শেঠের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য দেবতারা একটা অগ্নিকুণ্ড সৃষ্টি করে দিয়ে বলছেন, তুমি যদি এখন ভিক্ষা দিতে যাও তাহলে তুমি এই অগ্নিকুণ্ডে পড়ে ভস্ম হয়ে যাবে। শেঠ বলছেন, অতিথিকে ভিক্ষা দেওয়াটা আমার ধর্ম, আমি নরকে যাই, অগ্নিকুণ্ডে যাই, আমি আমার ধর্মকে ছাড়ব না। এটাই character, character মানে আমার এটা value system, আমি এই system এর উপর দাঁড়িয়ে আছি। তুমি যাই করে নাও, যা কিছু হয়ে যাক, আমি এই system থেকে নড়ব না। মানুষ যত তার value systemএর উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তত তার ইচ্ছাশক্তি বাড়ে। মনের শক্তি বেড়ে গেলে তার পক্ষে কোন কিছুকে অর্জন করাটা কিছুই না। তিনটে জিনিস – নৈতিকতা, ইচ্ছাশক্তি আর সাফল্য, এক অপরের সাথে জুড়ে আছে। কিন্তু আমরা চারিদিকে একটু চোখ খুলে তাকালে দেখছি, যারা বেশি দুর্নীতিপরায়ণ, কপট, ঠগ, জোচ্চর তারাই তো দিনে দিনে ফুলে ফেঁপে যাচ্ছে। ঠিকই, তার পিছনে অনেক ধরণের কর্ম আছে, যেটা তাকে ফল দিচ্ছে। কিন্তু দেখা যায়, আস্তে আস্তে তারা শেষ হয়ে যায়, সাফল্যটা ধরে রাখতে পারে না। নৈতিকতা না থাকলে সাফল্য ধরে রাখা যাবে না। এরপর স্বামীজী ঐদিনেই মঙ্গলবার দুপুরবেলা ক্লাশ নিয়েছিলেন।

<u>ঐদিন, অপরাহ্ন</u>

বস্তুর আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক রূপ

দুপুরবেলার ক্লাশেও স্বামীজী বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন। The reason of the harmony between thought and matter is that they are two sides of one thing, call it 'X', which divides itself into the internal and the external. (*আমরা যে জড় ও চিন্তারাশির ভিতর সামঞ্জস্য দেখতে পাই, তার কারণ উভয়ই এক অজ্ঞাত বস্তুর দুটি দিক, সেই জিনিসটাই দুভাগ হয়ে বাহ্য ও অন্তর হয়েছে।*) আমি বললাম 'পেন', পেন একটা শব্দ। আমরা দেখছি 'পেন' শব্দ আর পেন একটা বস্তু, এই দুটোর মধ্যে একটা কোথাও যেন সামঞ্জস্য আছে। রাম কারুর নাম আর রাম, দুটোর একটা যেন কোথাও যোগ আছে। জপধ্যান করার জন্য দীক্ষার সময় একটা মন্ত্র দিয়ে দেওয়া হয়। দীক্ষার পর বলে দেওয়া হয় যে, মন্ত্র আর ইষ্ট এক। কেন দুটো এক? তার কারণ, একটা বস্তুর আভ্যন্তরীণ রূপ, আরেকটা সেই বস্তুর বাহ্যিক রূপ। ভাব, বস্তু আর শব্দ, এই তিনটেই সত্য। আগেকার দিনে ভাব আর শব্দ দুটোই শব্দ রূপে নেওয়া হত, ভাবও শব্দ আর শব্দ শব্দই। শব্দ মানে ভাব, শব্দ মানে শব্দ। বস্তু যা তার নামও তাই, আমাদের পরম্পরায় বলা হয় নাম আর নামী অভেদ। স্বামীজী এখানে এটাই বলছেন, নাম আর নামী অভেদ। কারণ ওই একই জিনিস, তার আভ্যন্তরীণ জিনিসটা হল ভাব আর তার বাহ্যিক জিনিসটা হল বস্তু। মূলতঃ বস্তু আর তার ভাবে কোন তফাৎ নেই। আমরা তাহলে বলতে পারি, যদি কোন তফাৎ নাই থাকে, তাহলে আমি যদি খাওয়া খাওয়া করি তাতে কি আমার পেট ভরে যাবে? সেখানেও বলছেন, হ্যাঁ যাবে।

এটা একটা খুব মজার বিষয়, এর উপর অনেক গবেষণা, তর্ক-বিতর্ক চলে আসছে। বলছেন যে, যোগীরা অনেক বছর ধরে ধ্যানেই বসে আছেন, শরীরটাও শুকিয়ে আসে, সেই সময় ওনাদের শরীরের সিস্টেমটা পুরো অন্য রকম হয়ে যায়। এটাতে যেমন শরীর আর মনের একটা সম্পর্ক দেখা যায়, তেমনি আবার একজন নামকরা দৌড়বীরকে নিয়ে একটা ঘটনা আছে। একজন নামকরা দৌড়বীর কোন ভাবে দুর্ঘটনায় তার একটা পা জখম হয়ে যায়। চিকিৎসার জন্য কয়েক মাস তাকে হাসপাতালে থাকতে হয়। একজন মনস্তাত্ত্বিক তখন হাসপাতালেই তাকে ট্রেনিং দিতে শুরু করলেন। তুমি স্বাভাবিক অবস্থায় যেমন ভাবে দৌড়ের প্র্যাক্টিস করতে, এটাকেই তুমি এখন মনে মনে প্র্যাক্টিস করতে থাক। তুমি মনে মনে চিন্তা করতে থাক, বিছানা থেকে উঠলে, রানিং শু পরলে, তারপর তুমি চলতে শুরু করলে, স্পোর্টস গ্রাউণ্ডে পৌঁছালে, সেখানে ট্র্যাকে দৌড়াতে শুরু করলে। এইভাবে সে দিনের পর দিন যেভাবে বাস্তবে প্র্যাক্টিস করত, যতক্ষণ করত, ঠিক ততক্ষণ সেইভাবে প্র্যাক্টিস করতে থাকল, সবটাই মনে মনে। এইভাবে কয়েক মাস যাওয়ার পর ওর ভাঙা পা ঠিক হয়ে গেল, প্লাস্টার খোলা হল। তারপর দেখা গেল পা যেমন স্ট্রং ছিল, এখনও ঠিক সেই একই রকম স্ট্রং রয়েছে। তার মানে ওই ভাবকে ধরে নিয়ে যদি কেউ তাতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেতে পারে, তখন সেটাই তার কাছে বাস্তব হয়ে যাবে। খুব নামকরা মনস্তাত্ত্বিক ও দার্শনিক উইলিম জেমস্ যখন এগুলোকে নিয়ে রিসার্চ করতে শুরু করলেন, তখন দেখছেন যে, শুধু তাই না, বস্তু থেকে ভাব অনেক শ্রেষ্ঠ। যার জন্য আনন্দের প্রত্যাশা অনেক বেশি হয় আসল আনন্দ থেকে। কোথাও বেড়াতে যাওয়ার আগে সেই জায়গার কথা ভেবে ভেবে ঢের বেশি আনন্দ হবে বাস্তবে ওখানে গিয়ে যে আনন্দ হবে।

ভাব আর বস্তু, দুটোর মধ্যে এমন একটা সম্পর্ক যে, যারা কল্পনার জগতে বেশি বিচরণ করে, তারা যদি সফলতাকে নিয়ে বেশি বেশি মনে মনে চিন্তা করে, দেখা যাবে বাস্তবে অতটা তারা সাফল্য পায় না। যারা মনে মনে সারাক্ষণ ভেবে যাচ্ছে, আমি এক বিরাট কিছু, তারা কোন দিন বিরাট কিছু হতে পারে না। এই যে বলে, You dream and your dream will come true, বাস্তবে কোন দিন হবে না। যে শুধু স্বপ্ন দেখে, সে স্বপ্নের জগতের বাসিন্দাই হয়ে থেকে যায়, কোন দিন স্বপ্ন আর বাস্তবায়িত হবে না। কারণ, স্বপ্ন জগতের enjoyment far superior than the actual world। যারা পাগল হয়ে যায়, যারা স্কিজোফেনিয়ায় ভোগে তাদের কল্পনা জগতের enjoyment অনেক বেশী। এনাদের কোটেশানের বক্তব্য হল, তুমি সামনে একটা আদর্শ রাখো, আর সেই আদর্শে পৌঁছাও। কিন্তু ড্রীম বলতে আমরা যেটা ভাবি, যখন যে কোন জিনিসকে নিয়ে মনে মনে কল্পনা করতে শুরু করে, যেমন একজনের ইচ্ছা যে সে একজন নামকরা

গায়ক হবে। সে এবার গান শিখতে বসে গেল, আর কল্পনা করতে শুরু করে দিল, আমি গান করব আর লক্ষ লক্ষ লোক হলে বসে আমার গান শুনবে, গান শুনে করতালি দেবে; আমাদের নিশ্চিত ভাবে জেনে নিতে হবে যে, কোন দিন সে গায়ক হতে পারবে না। কারণ ঐ কল্পনা তাকে মনের জগতে এত আনন্দ দিচ্ছে যে, তাকে আর চেষ্টা করতে হচ্ছে না, চেষ্টা না করেই সে আনন্দ পেয়ে যাচ্ছে। সেইজন্য যারা বড় বড় লেকচার মারে, ওরা কোন দিন জীবনে সফল হয় না। কারণ বড় বড় লেকচার দেওয়া মানেই তারা চিন্তা করছে, চিন্তা করতে গিয়ে, মুখে বলতে গিয়ে তাদের খাটতে হচ্ছে না। কিন্তু সাফল্য পাওয়ার জন্য খাটতে হয়। চিন্তার জগতে ওই খাটনি থেকে বেঁচে যায়।

স্থূল শরীর না সূক্ষ্ম শরীর, কার গুরুত্ব বেশী?

The English word 'paradise' comes from the Sanskrit para-desa, which was taken over into the Persian language and means literally 'the land beyond,' of the other world. (*ইংরাজী 'প্যারাডাইস' শব্দটি সংস্কৃত 'পরদেশ' শব্দ থেকে এসেছে, ঐ শব্দটা পারস্য ভাষায় চলে গিয়েছিল – (ফারদৌস)এর শব্দার্থ হল দেশের পারে, অথবা অন্য দেশ বা অন্য লোক।*) স্বামীজী এখানে সংস্কৃত শব্দ পরদেশ নিয়ে বলছেন, পরদেশ মানে নিজের দেশের বাইরে। স্বামীজী বলতে চাইছেন, ইংরাজী শব্দ 'paradise'এই পরদেশ থেকে এসেছে, কারণ স্বর্গ হল পরদেশ। এই পরদেশ শব্দই পারস্যে গিয়ে হয়ে যায় ফর-দৌস। ইন্দো-ইরানীয়ান ল্যাঙ্গোয়েজে অনেক মিল পাওয়া যাবে। স্বামীজী বলছেন, The old Aryans always believed in a soul, never that man was body. Their heavens and hells were all temporary, because no effect can outlast its cause and no cause is eternal; therefore all effects must come to an end. (*প্রাচীন আর্যেরা বরাবরই আত্মায় বিশ্বাস করতেন, তাঁরা মানুষকে কেবল দেহ বলে কখনও ভাবতেন না। তাঁদের মতে স্বর্গ নরক – দুই-ই অনিত্য ও সান্ত, কারণ কোন কার্যই কখনও তার কারণনাশের পর স্থায়ী হতে পারে না, আর কোন কারণই কখনও চিরস্থায়ী নয়; সুতরাং কার্য বা ফলমাত্রের নাশ হবে।*) স্বামীজী আবার সেই স্বর্গ-নরক নিয়ে বলছেন। ভারতবর্ষের আর্যরা সব সময়ই মানতেন যে, মানুষ কখনই কোন পরিস্থিতিতেই দেহ নয়, দেহের ভিতর যেটা আছে সেটাই আসল। যদিও এই দেহ দিয়েই সব কিছু অর্জিত করা সম্ভব হয়, কিন্তু দেহটা একটা নিমিত্তমাত্র, এছাড়া কিছুই না।

মহাভারতের বেশির ভাগ চরিত্রই তারা নিজের পিতার সন্তান না – ধৃতরাষ্ট্র তাই, পাণ্ডব তাই, কৌরবরা তাই, পাণ্ডবরা পাঁচ ভাই, কেউ তারা নিজের পিতার সন্তান না। কিন্তু সবাই নিজের পিতার নাম নিয়ে গর্ব করছেন। মহাবীর হনুমান উনি গর্ব করে বলছেন আমি পবনপুত্র হনুমান। আজকের দিনে কেউ যদি বলে, আমার বাবার নাম অমুক আর genetically আমি অমুকের ছেলে; সবাই বলবে bustard child, একটা লজ্জার ব্যাপার। কিন্তু রামায়ণ, মহাভারতে সবাই গর্ব করে বলছেন। অর্জুন ইন্দ্রপুত্র, গর্ব করে বলছেন। দুর্যোধন অবশ্য যখন পাণ্ডবদের গালাগাল দিচ্ছে, তখন এটাই বলছে, এই পাঁচটা তো নিজের বাপেরও ছেলে না, এদের কিসের সিংহাসনের অধিকার আছে! তাহলে শাস্ত্র কি করে এইভাবে লিখছে? তার কারণ হল, বাহ্য শরীরটার কোন দাম নেই, ভিতরে যে জীব সূক্ষ্ম শরীর রূপে রয়েছে, সেটারই দাম। ঐ সূক্ষ্ম শরীর একদিন এই বাহ্য শরীরটাকে ছেড়ে বেরিয়ে যাবে। এরপর সে স্বর্গে যাক, নরকে যাক, এই লোক, সেই লোক, যেখানেই যাক, সূক্ষ্ম শরীরটা একই ভাবে থাকবে। আমি এখন যে শরীর ধারণ করে আছি, আমার যে সূক্ষ্ম শরীর, সেটা আমার জন্মের আগেও ছিল, যতক্ষণ না আমার মুক্তি হয়ে যায়, ততক্ষণ আমার মৃত্যুর পরেও থাকবে। এখন এই সূক্ষ্ম শরীরকে একটা বাহ্য শরীর ধারণ করার জন্য কোন গর্ভে ঢুকতে হবে। গর্ভে ঢোকার জন্য নারী পুরুষের সংযোগ দরকার হতে পার, নাও হতে পারে। যেমন দুর্যোধনাদি, গান্ধারী যখন জন্ম দিলেন তখন একটা মাংসপিণ্ড জন্ম দিলেন। ব্যাসদেব এসে সেই মাংসপিণ্ডকে একশ টুকরো করে তেলের মধ্যে রেখেছে, সেখান থেকে কৌরবরা জন্ম নিয়েছে। এই ধরণের অনেক বিচিত্র ঘটনা আছে, যেখানে সবার জন্মগুলিকে কেমন অন্য রকম দেখানো হয়েছে। আসলে কে বৈধ সন্তান, কে অবৈধ সন্তান, সেটার কোন দাম নেই, দাম হল সূক্ষ্ম শরীরটার।

আমাদের এমন দুর্ভাগ্য যে, যে সমাজে আমরা বাস করি, সেই সমাজে স্থূল শরীরটাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়, যার জন্য সূক্ষ্ম শরীরের দিকে কারুর দৃষ্টি নেই। ভারতবর্ষে আজকে আমরা যত রকম অশান্তি দেখছি, সব অশান্তির মূলে এটাই। কোথাও আমাদের মনের মধ্যে ঢুকে গেছে যে, আমি মরব আর সব শেষ, আর কোন চিন্তা নেই। তাতো হচ্ছে না, আবার ঘুরে কোন মায়ের গর্ভে দশ মাস গর্ভবাস করে আবার একটা দেহ নিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। আর সন্তান তুমি যেভাবেই হয়ে থাকো, যজ্ঞ দিয়েই সন্তান হও, যেমন শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন, মাটি থেকেই বেরিয়ে এসো, যেমন সীতা ছিলেন, বায়ুর পুত্র হও, যেমন হনুমান ছিলেন, যেভাবেই তুমি আসো, তোমার সূক্ষ্ম শরীরটারই মূল্য। হিন্দুরা এই জিনিসটাকে প্রথম থেকেই জানতেন। সেইজন্য স্বর্গ বলো, পাতাল বলো, নরক বলো, কোনটারই কোন দাম নেই, দাম একমাত্র এই সূক্ষ্ম শরীরের। এই সূক্ষ্ম শরীর সব সময় ঘুরে চলেছে, কখন স্বর্গে গিয়ে এক রকম শরীর নিচ্ছে, এখানে এসে আরেক রকম শরীর নিচ্ছে, তীর্যক যোনিতে গিয়ে সাপ, বিছের মত শরীর নিচ্ছে। সেইজন্য ঋষিরা অন্যান্য ধর্মের মত স্বর্গ, নরক এগুলোকে বেশি গুরুত্ব দেননি। অন্যান্য ধর্মে বলে, ভগবান এই শরীরটা তৈরী করে এর মধ্যে ফুঁ মেরে দিয়ে স্পিরিট ঢুকিয়ে দিলেন। সেইজন্য তাদের কাছে এই বাহ্য শরীরের সাথে স্বর্গ, নরক এগুলো এত গুরুত্ব পেয়ে গেছে।

মূল বক্তব্য হল, পাশ্চাত্য ধর্মগুলির সাথে ভারতীয় ধর্মের এখানে এসে বিরাট তফাৎ হয়ে যায়। ওদের কাছে স্থূল শরীরের বিরাট দাম, এমনকি যখন মারা যায় তখন বলবে, He gave up his spirit। সেখানে আমরা বলি, তিনি দেহত্যাগ করেছেন। এখানেই বোঝা যায় যে, পাশ্চাত্য মন ও প্রাচ্য মনের চিন্তায় কত তফাৎ। কিন্তু বলবে যে, কেন তাদেরও তো স্পিরিট গুলো থাকে, সেখানে বলে, May his soul rest in peace। ঠিকই বলে, কিন্তু শরীরের দাম তাদের কাছে এতো বেশী যে, এই পৃথিবীর দাম এত বেশী হয়ে যায় যে, সেটার জন্য স্বর্গ নরকের দামও অনেক বেশী হয়ে যায়। এরপর স্বামীজী মুণ্ডকোপনিষদের খুব নামকরা মন্ত্র *দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া*, নিয়ে আসছেন।

দুঃখ আঘাতই আমাদের উপরের দিকে নিয়ে যায়

স্বামীজী বলছেন, The whole of the Vedanta Philosophy in in this story. (*সমগ্র বেদান্ত দর্শনের সার এই রূপক কাহিনীতে রয়েছে।*) স্বর্গ, নরকের কথা বলার পর শেষে নিয়ে আসছেন বেদান্ত। মুণ্ডকোপনিষদের মন্ত্রে খুব সুন্দর বলছেন, সোনালি পালকযুক্ত দুটো পাখির একটা পাখি বৃক্ষের একেবারে উপরের ডালে চুপচাপ বসে আছে, আরেকটা পাখি বৃক্ষের নীচের ডালে বসে বৃক্ষের কখন মিষ্টি ফল খাচ্ছে, কখন কটূ ফল খাচ্ছে। যখন মিষ্ট ফল ভক্ষণ করে তখন সে খুব আনন্দ পায়, তিক্ত ফল খেয়ে ফেললে বিরক্ত হয়ে আরেকটু উপরে ডালে চলে যায়। সেখানেও আবার তিক্ত ফল ভক্ষণ করার পর, আরেক ডালে চলে যায়। পাখিটা তাই সব সময় চঞ্চল। নীচের পাখি দেখছে, উপরের পাখিটা কোন ফল খায় না, স্থির, শান্তভাবে স্বমহিমায় বসে থাকে। এটাই আমাদের জীবন। যতক্ষণ সুখে আছি মনে করছি, তার মানে ঐ ডালেই বসে আছি আর মিষ্ট ফল খেয়ে যাচ্ছি। যখন তিক্ত ফল খেয়ে ফেলি, তখন জোঁকের মুখে যেন লবণ পড়ে গেছে। হতাশা, বিরক্তি, দুঃখ-যন্ত্রণায় তখন বলি, আমার আর এসব লাগবে না, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।

শেষে স্বামীজী বলছেন, He found all at once that there had never been two birds, but that he was all the time that upper bird, serene, majestic, and immersed in his own glory. (*অমনি সে বুঝল যে, দুটো পাখি কোন কালেই ছিল না, সে নিজেই বরাবর শান্ত – স্থিরভাবে নিজ মহিমায় নিজে মগ্ন – উপরের পাখিই ছিল।*) নীচের পাখিটা একটু একটু করে কটূ ফল খেয়ে ফেলে আর সে টুপ টুপ করে লাফিয়ে উপরের পাখিটার দু-এক ডাল কাছে চলে গেল। এইভাবে অনেকবার উপর নীচে হতে হতে অবশেষে নীচের পাখিটা একেবারে উপরের পাখির জায়গায় গিয়ে বসল, আর নিজেকে হারিয়ে ফেলল। তখন সে দেখে, আরে এখানে তো কোন কালেই দুটো পাখি ছিল না, তখন তার জ্ঞান হল যে, সে নিজেই উপরের পাখিটা ছিল, যে নিজের স্বমহিমায়, শান্ত ভাবে বিরাজ করে থাকত। এই কাহিনীটা যদিও মুণ্ডকোপনিষদে একটু অন্য ভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে, কিন্তু বক্তব্যটা তাই। মানুষ সংসারের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে সাধনার পথে পা রাখে, তারপর এগোতে এগোতে এমন উঁচু অবস্থায় চলে যায় যে, তখন দেখে এতক্ষণ যাঁর দিকে তাকাচ্ছিল, সেটা তো আমিই ছিলাম। তার মানে, আমরা দেখছি জীবনে আমরা

কিভাবে কত সুখ-দুঃখ ভোগ করছি। বেশি দুঃখ ভোগ করলে সংসার থেকে সরে আসতে চাই, সরে এসে উপরে ঈশ্বরের দিকে তাকাই। আমরা যখন ঈশ্বরের দিকে তাকাই, তখন দেখি ঈশ্বর সব সময় কেমন নির্লিপ্ত। আগেকার দিনে স্ত্রী মারা গেলে অনেকেই সংসার থেকে মন তুলে নিত। রত্নাবলী, তুলসীদাসের স্ত্রী, তুলসীদাসকে বললেন, আমার প্রতি তোমার এই ভালবাসা যদি রামের প্রতি থাকত, এতদিনে তুমি রামের দর্শন পেয়ে যেতে। তুলসীদাস রত্নাবলীকে সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন শ্রীরামের সাধনায়। আজকের দিনে যদি কোন স্ত্রী স্বামীকে এই কথা বললে, স্বামী সঙ্গে সঙ্গে বলবে, আমার অনুপযুক্ত স্ত্রী, ডিভোর্সের কেস করে আরেকটা বিয়ে করে নেবে। সংসারে সবারই দুঃখ-কষ্ট আসবে, সমস্যা একই রকম হবে, কিন্তু তার প্রভাবে মনে ত্যাগ বৈরাগ্যের উদয় হবে নাকি আরও ভিতরে সেঁদোবে, কিছু বলা যায় না। আরও যে ভিতরে ঢুকছে, তার মানে এর এখনও অনেক মার খাওয়া বাকি। ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে, যে হাসছে, তার মানে তোমার এখনও অনেক দেরী। এখানেই তিরিশ তারিখের ক্লাশ শেষ হয়ে যায়। এরপর আমরা ৩১শে জুলাইয়ের ক্লাশের লেকচার নিয়ে আলোচনা করব।

<u>বুধবার, ৩১শে জুলাই</u>

মার্টিন লুথার কিং

স্বামীজী ৩১শে জুলাইএর থেকে পর পর কয়েকটা ক্লাশে ভক্তির উপর প্রচুর আলোচনা করেছেন। দেববাণীর আলোচনা শুরুর প্রথমের দিকে আমাদের একটা overview আলোচনাতে বলা হয়েছিল যে, আচার্য শঙ্করকে নিয়ে আলোচনা হয়েছে, রামানুজকে নিয়ে আলোচনা হয়েছে আর যাঁরা শ্রোতা ছিলেন তাঁদের কাছে রামানুজই বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হল। এতদিন অদ্বৈতের কথা বলতে বলতে স্বামীজী এবার ভক্তির দিকে যাচ্ছেন। তার মাঝখানে স্বামীজী দুটো বাক্য বলছেন, ধর্মকে নিয়েই বলছেন, আর খুব নামকরা কথা, Luthar drove a nail into religion when he took away renunciation and gave us morality instead. (*প্রোটেস্টান্ট ধর্ম-সংস্থাপক লুথার ধর্মসাধনের ভিতর থেকে সন্ন্যাস বা ত্যাগ বাদ দিয়ে তার স্থানে কেবল নীতিমাত্র প্রচার করে ধর্মের সর্বনাশ করে গেলেন।*) মার্টিন লুথার খুব গোঁড়া খ্রীশ্চান ছিলেন। আমরা অনেক সময় এমন অনেক কিছু করে বসি, যার ব্যাপারে আমরা নিজেরাও কিছু স্পষ্ট করে বলতে পারব না, কেন এইরকম করছি। হয় কারুর সাথে জুড়ে যাচ্ছি, নয়তো একটা পথ ধরে চলতে চলতে সেই পথ থেকে সরে যাচ্ছি। আমরা যে নিজের ইচ্ছায় ঐ রকম করছি, তাও না, কিন্তু কে যেন টেনে নেয়। কেন টেনে নেয়? কারণ ভিতরে যে সূক্ষ্ম শরীর, ওর শক্তি পুরো আলাদা। স্থূল শরীর যেখানেই জন্মাক, সূক্ষ্ম শরীর তার নিজের শক্তি দিয়ে ঠিক এগিয়ে যাবে। ঠাকুর বলছেন, ছোলা বিষ্ঠার মধ্যে পড়লেও ছোলা গাছ হয়েই জন্মাবে।

মার্টিন লুথার ভিতর থেকে এক অত্যন্ত শক্তিমান ব্যক্তিত্ব। তিনি গোঁড়া খ্রীশ্চান পরম্পরায় বড় হয়েছেন। লুথারের লেখাগুলোও খুব নামকরা লেখা। অনেক সুন্দর সুন্দর আর্টিকেলস লিখেছেন। মার্টিন লুথারকে নিয়েও প্রচুর ভাল ভাল লেখা আছে, সমালোচনাও আছে। তিনি যখন রোমের ভ্যাটিকান সিটিতে গেলেন, তখন ইতিমধ্যে তিনি খুব পরিচিত হয়ে গেছেন। খুব শ্রদ্ধা ভক্তি নিয়ে রোমে গেলেন। যাওয়ার পর তাঁর সব শ্রদ্ধা ভক্তি উড়ে গেল, ওখানকার ধর্মের নামে নোংরা ব্যবসা দেখে মনে হল পুরো চার্চ ব্যবস্থাটার মধ্যে যেন পচন ধরে গেছে। এটা ঠিকই যে, যে কোন সংগঠিত ধর্মকে সামলে রাখা খুব মুশকিল। সংগঠিত ধর্ম মানে, যে ধর্মের উপর একজন মাথা আছে, যার নির্দেশে সেই ধর্মের সব কিছু চলছে, এই ধর্মকে সামলে রাখা যায় না, পচন ধরবেই ধরবে। ধর্ম যখন জনগণের হয়ে যায়, তখনই ধর্মটা ঠিক থাকে, এলেমেলো একটু হয় ঠিকই। ইসলাম ঐ অর্থে সংগঠিত ধর্ম নয়, religion of book। যেখানে central authority থাকে সেখানে একটি শুধু গোলমেলে লোক ঢোকা দরকার, ঐ একটা লোক গোটা ধর্মটাকে শেষ করে দেবে। একটা পচা আম যদি থাকে, ঝুড়ির সব আমকে পচিয়ে দেবে। লুথারের সময় চার্চের প্রায় চোদ্দ পনেরশ বছর হয়ে গেছে, পুরো সিস্টেমটাতেই ঘুন ধরে গেছে।

খ্রীশ্চানদের মধ্যে পাপের স্বীকারোক্তির ব্যাপার আছে। সেখানে অনেক সময় ফাদাররা ক্ষমা করে দেন, সঙ্গে একটা প্রায়শ্চিত্তের বিধান বলে দেন, তুমি এই রকমটি করো। রোমের পোপ ক্ষমা করছেন, আমি যাই

করি না কেন, তিনি ক্ষমা করে দেবেন। খুন করেছে, ক্ষমা পেয়ে যাবে। চুরি করেছে, ডাকাতি করেছে, ক্ষমা পেয়ে যাবে। বদলে একটা প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। কি প্রায়শ্চিত্ত? এত টাকা চার্চকে দান করে দাও। এখন তাদের কাছে এত দরখাস্ত জমা হয়ে আছে যে, চার্চের পক্ষে সব সই করা সম্ভব না। তাই পোপের সীল মেরে ফাঁকা সময় সই মেরে ওটা ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। ওটাই আবার ব্ল্যাকে বিক্রি হচ্ছে। মনে করা যাক, বেলুড় মঠের অধ্যক্ষ একটা ক্ষমাপত্রে সই করে দিয়ে দিলেন। এবার সেই কাগজ লক্ষ লক্ষ ছাপা হয়ে বেলুড় মঠের বাইরে যে দোকান গুলো আছে সেখানে ঢালাও বিক্রি হচ্ছে। খুনের জন্য ক্ষমাপত্র এক লাখ টাকা। যে খুনী সে ওটা কিনে নিল, কিনে ওখানে শুধু নিজের নামটা লিখে নিল। আসলে তো ওটা পোপের লিখে দেওয়ার কথা। এবার ও যেখান থেকে এসেছিল সেখানে দেখিয়ে দেবে, ক্ষমা হয়ে গেল। রোমে পুরো একটা ব্যবসা দাঁড়িয়ে গেল শুধু এটার উপর। তার সাথে সম্পত্তি, বৈভব দেখে লুথার কেমন হতাশ হয়ে গেলেন। আরও অনেক কিছু ছিল, লোকেরা অনেকে বলতে লাগল, লুথারের ভিতরে কামের ইচ্ছা ছিল, যেটা তাঁকে হতাশার দিকে ঠেলে দিল। যাই হোক, এরপর তিনি ধীরে ধীরে আলাদা হতে শুরু করলেন। সেখান থেকে খ্রীশ্চান ধর্মে ফাটল ধরে গেল। যে কোন ধর্মেই একটা সময় ফাটল ধরে। আমাদের নামে যেমন ওরা বলে, হিন্দু ধর্ম কোন ধর্মই নয়, কারণ হিন্দুদের সব আলাদা আলাদা মত, পথ। সে তো তোমাদেরও আছে, তোমাদেরও ক্যাথলিক আছে, প্রোটেস্টান্ট আছে, প্রেসবেটিরিয়ান আছে। তোমাদের যেমন বাইবেল, আমাদের এখানে বেদ সেই এক।

মার্টিন লুথার ত্যাগ বৈরাগ্যকে কোন গুরুত্ব দিলেন না, গুরুত্ব দিলেন নৈতিকতাকে। নৈতিকতা সক্রেটিসের সময় থেকেই চলে আসছে। মার্টিন লুথার এসে যখন নূতন উদ্যমে শুরু করলেন, তখন তিনি এই নৈতিকতাকে প্রচণ্ড গুরুত্ব দিতে লাগলেন। মার্টিন লুথারের জন্য অনেক কিছু ভাল হল। পাশ্চাত্য দুনিয়ায় যে একটা জাগরণ হয়েছিল, তাতে মার্টিন লুথারের একটা বিরাট ভূমিকা আছে। তিনি প্রোটেস্টান্ট ধর্ম চালু করলেন। সেখানে তিনি ত্যাগ বৈরাগ্যকে কোন গুরুত্ব না দেওয়াতে তাদের সবাই বিবাহ করতে পারে আবার ধর্মপ্রচারও করতে পারে। স্বামীজী এরপর বলছেন, Atheists and materialists can have ethics, but only belivers in the Lord can have religion, (নাস্তিক ও জড়বাদীরাও নীতিপরায়ণ হতে পারে, কেবল ঈশ্বর-বিশ্বাসীরাই ধর্মলাভ করতে পারে।) নৈতিকতা যে কোন লোক অনুশীলন করতে পারে। যেখানে বর্বর আদিবাসীরা থাকে, যেখানে এখনও বিজ্ঞানের উন্নতির প্রভাব পৌঁছায়নি, সেখানেও দেখা যাবে একটা নীতিশাস্ত্র আছে। আদিবাসী অধ্যুসিত জনজাতির একটা আদিবাসীও জানে আমি এটা করতে পারি না, সেটা করতে পারি না, এই রকম করলে খুনোখুনি হয়ে যাবে। আর যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, তারাও নীতিপরায়ণ হতে পারে। যারা জড়বাদী, ভোগই যাদের শেষ কথা, তারাও নীতিপরায়ণ হতে পারে। কিন্তু কেউ যদি ধর্মপরায়ণ হতে চায়, তাহলে তাকে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতে হবে। মৃত্যুর পরে এই জীবন অন্য কোন না কোন ভাবে চলতেই থাকবে, এই জিনিসটাকে তাকে মানতেই হবে। মৃত্যুর পরে কোন জীবন যদি নাই থাকে, তাহলে কেন আমি ধর্ম পালন করতে যাবো! ধর্মের আর তখন কোন প্রয়োজন থাকবে না, শুধু নীতিশাস্ত্র দিয়েই চলে যাবে। আর নীতিশাস্ত্র, নৈতিকতাই যখন শেষ কথা হয়ে যায়, তখন তো ধর্মের কোন দরকার হবে না। সেইজন্য আমরা যাঁদের ধার্মিক লোক বলি, ধর্ম পালন করেন, তাঁরা সবাই মূলতঃ নৈতিকপরায়ণ, নীতিপরায়ণ হন, ভদ্রলোক হন। কিন্তু সব ভদ্রলোক বা নীতিপরায়ণ লোক ধার্মিক হয় না। ধার্মিক হওয়ার জন্য ঈশ্বরে বিশ্বাস, অন্ততঃ মৃত্যুর পরে একটা সত্তা চলে, এটাতে বিশ্বাস থাকতে হবে।

মার্টিন লুথার যীশুকে মানছেন আর তাঁর সব কিছুকেই মানছেন ঠিকই, কিন্তু ঈশ্বরকে যখন মানছেন, তখন যে বৈরাগ্য ছাড়া ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না, এই জিনিসটাকে মানতে পারছেন না। ঠাকুরকে অনেকে এসে জিজ্ঞেস করত, আচ্ছা সংসারে থাকলে কি ঈশ্বর দর্শন হবে না? ঠাকুর বলছেন, হবে না কেন! বলার পর যে যে শর্ত আরোপ করছেন, দেখা যাচ্ছে যে সংসারীরা সেগুলো পালন করতে পারছে না। এখানে সন্ন্যাসী হওয়াটা বড় কথা না, গুরুত্ব হল বৈরাগ্য। সংসার মানে সাংসারিকতা। ঘর-সংসার নিয়ে আছে, আপনজনদের নিয়ে আছে, সেখানে মন কতটুকু ডুবে আছে। একটা সমীক্ষায় বলছে যে, ভারতে বয়স্ক লোকের সংখ্যা অনেকে বেড়ে গেছে, আর তার সাথে বলছে যে, সত্তর শতাংশ বৃদ্ধরা অসুখী। ওরা নাকি কোন পথ খুঁজে পাচ্ছে না। ভারত চিরদিন সবাইকে পথ দেখিয়ে এসেছে, বয়স হয়ে গেলে কিভাবে জীবন কাটাতে হয় দেখিয়ে দিয়েছে, আর আজকে তুমি বলছ, তোমার পথ নেই! কোথায় গেল তোমার রামনাম, কোথায় গেল তোমার

কৃষ্ণ নাম। সারা জীবন করোনি কেন? আজ এই বয়সে এসে কেন হতাশাগ্রস্ত হচ্ছ? আর্টিকেলে লিখছে, যারা বড়লোক তারা বয়স্ক লোকেদের বাড়ির ভিতরে পুরনো আসবাবের মত রেখে দেয়। সাধারণ লোকেরা নিজের বৃদ্ধ বাবা-মাকে হরিদ্বার, বারণসী, বৃন্দাবনে ছেড়ে দিয়ে আসে। এই সমস্যা আগেও ছিল। কিন্তু তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ছিল, গ্রামে গঞ্জে যেটা আমরা দেখেছি, একটা বয়সের পর সংসার থেকে ধীরে ধীরে সরে এসে মানুষ ভগবানের দিকে মন দিত। এখনও এই ধরণের মানুষ দেখা যায়।

একজন ভদ্রলোক বলছিলেন, তাঁর বাবার বয়স হয়ে গিয়েছে। বাবা সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ নিজের ঘরের দরজা খুলে বাইরে আসেন। সবার সাথে বসে ব্রেকফাস্ট করে নেন। ব্রেকফাস্ট শেষ করে বলবেন, 'আমাকে কি তোমাদের এখন কোন প্রয়োজন আছে'? ওরাও জানে, বাবা কি বলতে চাইছেন, বলে দেয়, 'না এখন তোমাকে লাগবে না'। এরপর তিনি নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে স্নানাদি সেরে, টানা চার পাঁচ ঘন্টা পূজা, জপধ্যান, শাস্ত্রপাঠ নিয়ে বসে গেলেন। তিনটের সময় বেরিয়ে একটু কিছু খাবেন। খেয়ে আবার দরজা বন্ধ করে জপধ্যান শাস্ত্রপাঠে ডুবে গেলেন। রাত্রে কোন দিন খেলেন, কোন দিন খেলেন না। ঘুমিয়ে পড়লেন, পরের দিন সকালে উঠে ঐ একই রুটিন চলতে থাকল। এই রুটিন ধরে চলা হঠাৎ একদিনে সম্ভব না, অনেক আগে থেকে এর প্রস্তুতি শুরু করতে হয়। আরেকজন ভদ্রলোকের কথা আমরা জানি, বিহারের একজন বয়স্ক ডাক্তার, ঠাকুরের ভক্ত, খুব হাসিখুশী। ওখানকার স্থানীয় মঠে ওনার খুব যাতায়াত ছিল। মহারাজরাও ওনাকে খুব ভালবাসতেন। একদিন এসে জনৈক মহারাজকে তিনি বলছেন, 'সব বৃদ্ধরা এসে বলে সারাদিন সময় কাটানোটাই এখন সমস্যা। কিন্তু আমার এমন অবস্থা যে আমি সময়ই বার করতে পারছি না। ভোর চারটের সময় আমি উঠি, স্নান করে জপ করতে বসি। তারপর পুরো গীতা পাঠ করি, চণ্ডী পাঠ করি, এইসব করতে করতে আমার কম করে সাড়ে আটটা নটা হয়ে যায়, তারপর আমি ব্রেকফাস্ট করি। এখন এই বয়সে আমার পক্ষে সম্ভব না যে কারুর সাথে কথা বলব'। অনেক সময় মঠে অনুষ্ঠানাদি থাকলে ওনাকে আটটার সময় যদি আসতে বলা হত, উনি হাতজোড় করে বলে দিতেন, আমার পক্ষে সম্ভবই না, আমার সময়ই নেই। ব্রেকফাস্ট করে রোগী দেখতেন। যেমনি বিকেল হয়ে যেত, সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ করে জপধ্যান পাঠে বসে যেতেন। উনি বলছেন, সবাই কি করে বলে, সারাদিন সময় কি করে কাটাবো। আর আমি সময়ই পাচ্ছি না। বৃদ্ধরা যারা পার্কে গিয়ে বসে, সেখানেও শুধু পরিনিন্দা আর পরচর্চা ছাড়া আর কোন কথা বলবে না। বেলুড় মঠে স্বামীজীর সমাধি মন্দিরের পাশে বিকালবেলা অনেকে মিলে রামনাম করে। লোকেরা দেখে হাসে। গিয়ে বসুন, বসবে না। আবার বলবে, আমার খুব ডিপ্রেশান। এখন নূতন একটা ডিপার্টমেন্ট খুলেছে, যাদের কাজ হল বৃদ্ধদের কিভাবে ট্রিটমেন্ট করবে। কিসের ট্রিটমেন্ট করবে, মাথার ভিতরেই তো গোলমাল হয়ে গেছে। ঠাকুর কত সহজ করে দিয়ে গেছেন, সন্ধ্যাবেলায় সব কিছু ছেড়ে হাততালি দিয়ে হরিনাম করতে হয়। আধঘন্টা হরিনাম করুক দেখি, তারপর দেখুক কোথায় থাকে ডিপ্রেশান আর স্ট্রেস।

সবাই হল, আমি পড়াশোনা করব না, পরীক্ষায় খাতায় লিখব না, কিন্তু নম্বর আমার চাই। আমি জপধ্যান করব না, হরিনাম করব না, সৎপ্রসঙ্গ করব না, কিন্তু আমার ডেপ্রেশান, স্ট্রেস, ব্লাড সুগার যেন না থাকে। তা কি কখন হয়! সবাই মৃত্যুর প্রস্তুতি নিয়ে নিয়েছে, তাই অথর্ব হয়ে বিছানায় পড়ে ভুগতে ভুগতে মরতে থাকে। ছেলেরা দেখে না, বৌমারা দেখে না, নাতিনাতনীরা এখন আর ফিরেও তাকায় না। বৃদ্ধদের জন্য কারুর কোন সহানুভূতি নেই, এটাই এই যুগের বাস্তবচিত্র। ঈশ্বরে যদি বিশ্বাস না হয়, জীবন এভাবেই অশান্তিপূর্ণ হয়ে উঠবে। ঈশ্বরে যদি বিশ্বাস না হয়, প্রথমে লোকে মনে করতে পারে নৈতিক হতে পারি, সচ্চরিত্র হতে পারি। হয় না তা নয়, হয় ঠিকই, কিন্তু তার সংখ্যা অনেক কম। কিন্তু তারপরেই স্বামীজী একটা ভিন্ন টপিকের উপর বলছেন, এই পুরো অনুচ্ছেদটা বোঝা বা ধারণা করা খুব কঠিন। এই কথা স্বামীজী আরও কয়েকবার বলেছেন।

মহাপুরুষদের পবিত্রতার জন্য সমাজকে মূল্য দিতে হয়

স্বামীজীর বক্তব্য হল, ভাল যাঁরা হন, বিশেষ করে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে যাঁরা ভাল হন, তার মূল্য সাধারণ লোকেদের দিতে হয়। The wicked pay the price of the great soul's holiness. (*সমাজে যারা ইতর শ্রেণীর মানুষ, তারা মহাপুরুষদের পবিত্রতার জন্য মূল্য দেয়।*) যে সমাজে বা যে দেশে মহাপুরুষ জন্ম

নিয়েছে, বুঝে নিতে হবে যে সেই সমাজ বা সেই দেশের সাধারণ মানুষদের তার জন্য মূল্য দিতে হয়েছে। Think of that when you see a wicked man. (*সুতরাং তাদের দেখে ঘৃণা না করে ঐ কথাই ভাবা উচিৎ।*) স্বামীজী আরেক জায়গায় বলছেন, যেখানে কোন বেশ্যানারী দেখবে, তখন তুমি জানবে যে, এই নারীরা আছে বলে সতীর সতীত্ব রক্ষা পাচ্ছে। বিশ্বের সব বন্দর এলাকাগুলিতে, যেখানে এক একটা জাহাজ মাসের পার মাস সমুদ্রে পারি দিয়ে মাল ওঠানামা করতে আসত, তার আশেপাশে সব পতিতালয় থাকত। কারণ জাহাজের লোকগুলো যদি শহরের ভিতরের দিকে ঢুকে আসে, গোলমাল লেগে যাবে। স্বামীজী এটাই বলছেন, ওরা আছে বলে আমাদের বাড়ির মায়েরা বোনেরা সুরক্ষিত আছে। ইতর শ্রেণীর মানুষরা আছে বলেই মহাত্মাদের মাহাত্ম্য।

স্বামীজী বলছেন, Just as poor man’s labour pays for the rich man’s luxury, so as it in the spiritual world. The terrible degradation of the masses in India is the price nature pays for the production of great souls like Mirabai, Buddha, etc. (*যেমন গরীব লোকের পরিশ্রমের ফলে বড় লোকের বিলাসিতা সম্ভব হয়, আধ্যাত্মিক জগতেও সেইরূপ। ভারতের সাধারণ লোকের যে এত অবনতি দেখা যায়, সেটা মীরাবাঈ, বুদ্ধ প্রভৃতি মহাত্মাদের উৎপন্ন করার জন্য যে প্রকৃতিকে তার মূল্য ধরে দিতে হয়েছে।*) এই কথা স্বামীজী অন্য জায়গাতেও বলেছেন। Psychic force নিয়ে এই সিদ্ধান্ত আমরা অন্য আর কোথাও পাই না। ক্ষেতে খামারে চাষীরা খাটছে, মজুররা খাটছে, ফসল উৎপন্ন করছে, সেই ফসল বাজারে আসছে, কাঁচামাল রূপে ফ্যাক্টরিতে গিয়ে অন্য প্রোডাক্ট হয়ে বেরিয়ে আসছে। বড় বিজনেসম্যান বা মিডলম্যানরা মাঝখান থেকে এই পুরো জিনিসটাকে convert করে নেয় শুধু নিজের লাভের জন্য। স্বামীজী বলছেন, মা প্রকৃতি কি করেন, যদি কোন সমাজে বড় কোন আধ্যাত্মিক পুরুষের আবির্ভাব হয়, প্রকৃতি কিন্তু ছাড়বেন না, সাধারণজনের থেকে এর মূল্যটা টেনে নেন। ফলে সেই সমাজটা অনেক নীচে চলে যায়। একটা সমাজে যত বেশি মহাপুরুষের আবির্ভাব হবে, সেই সমাজ তত বেশী নীচে যাবে। স্বামীজীর এই থিয়োরী অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না। এই জিনিসটা আমরা দেখতে পাই যে, গাঁদাফুল বা ডালিয়া গাছে অনেক ফুলের কুড়ি আসে, যদি বেশির ভাগ কুড়িকে কেটে একটা কি দুটো কুড়ি রেখে দেওয়া হয়, তাহলে ঐ গাছের ফুলটা বিরাট সাইজের হয়। তার মানে, ঐ গাছের ভিতরে কোথাও এমন একটা শক্তি আছে, যে শক্তি হয় দশটা ফুলে ছড়াবে, নয়তো একটা কি দুটো ফুলে বিস্তার করে দেবে। পছন্দ যার যার নিজের, কেউ একটা ফুল চাইবে, কেউ বা অনেক ফুল ফুটতে দিতে চাইবে। ঠিক তেমনি যে কোন সমাজকে পছন্দমত বেছে নেবার এই স্বাধীনতাটা দেয় – তুমি কয়েকজন মহাপুরুষ চাও, নাকি অনেক সাধারণ মানুষ চাও। ঠাকুর বলছেন, সিংহী বারো বছর পর গর্ভধারণ করে, আর চড়ুই পাখি সব সময় বাচ্চা দিয়ে যাচ্ছে। তুমি কি চাইছ, সিংহ চাইছ না চড়ুই পাখি চাইছ।

স্বামীজীর এই থিয়োরীর পিছনে একটা কারণ থাকতে পারে, ভারতে দারিদ্রতা, অশিক্ষা, কুসংস্কার হওয়ার কারণ দেখাবার জন্য তিনি যেন বলতে চাইছেন, আমরা দরিদ্র, অশিক্ষিত হয়েছি কারণ আমাদের এখানে অনেক বেশি মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে। অনেক বেশি মহাপুরুষ হওয়ার জন্য আমাদের অনেক pshychi energy বেরিয়ে গেছে, সেইজন্য ভারতে এই দারিদ্রতা রয়েছে। আরেকটা কারণ হতে পারে, কেল্লা জয় করার সময় যদি একশজন সৈন্য দৌড়ে যায়, নব্বই জন মারা যায়। ঐ নব্বই জন মারা যায় বলে দশজন ওখানে গিয়ে জয়ী হতে পারে। সমাজে যদি কোন উচ্চ আদর্শের জন্ম হয়, তখন সেই উচ্চ আদর্শের জোরে বেশির ভাগ মানুষ টিকতে পারে না, কিন্তু যারা টিকে যায় তারাই মহাপুরুষ হয়ে যান।

অনেকে এবার বলতে পারে, অনেক দেশ আছে যেখানে অনেক ধনীলোক আছে, কিন্তু সেইভাবে গরীব লোক পাওয়া যাবে না। সেটা হত যদি এটা zero-sum game হয়। Zero-sum game মানে, দশজন লোক আছে, সবারই পকেটে একশ করে টাকা। এই দশজন মিলে জুয়া খেলছে, তার মানে কারুর টাকা অন্যের পকেটে যাবে। এমনও হতে পারে একজনের পকেটে সবার টাকা এসে গেল। ঠিক তেমনি একজন যত বড়লোক হবে, বাকিরা তত সাধারণ হবে। কিন্তু এখনও বিশ্বের দেশগুলি zero-sum game নয়, প্রকৃতির যে সম্পদ, সেটা এখনও পর্যন্ত মনে হয় অনন্ত, এটা আগামীকাল থাকবে কিনা বলা যায় না। প্রকৃতির সম্পদকে যে

যেভাবে ব্যবহার করবে, তারা তত বড়লোক হবে। আমেরিকাতে যে বিলিনিয়ার্স অনেক রয়েছে তা নয়, তাদের মাথাপিছু আয়ও অনেক বেশি। আমেরিকার খুব সাধারণ লোকও ভারতের মধ্যবিত্তদের থেকেও বড়লোক। তাহলে কি স্বামীজীর এই সিদ্ধান্তটা খাটছে না? তা নয়, zero-sum gameএর কথা অন্য পরিপ্রেক্ষিতে বলা হল। একটা আদর্শে যখন সমাজ চলতে শুরু করে, টাকা আয় করাটা আদর্শ নয়, শুধু ডিগ্রীর শিক্ষা পাওয়াটা আদর্শ নয়, কিন্তু যখন ধর্মজীবনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, তখন বলছেন ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত হও। আধ্যাত্মিক হওয়ার জন্য তাকে সমস্ত কিছু ছাড়তে হবে। আদর্শ এখন হয়ে গেল সব কিছু ছাড়।

আমেরিকানরা বিলগেটসের দিকে সবাই তাকিয়ে থাকে আর ভাবে আমাকেও বিলগেটসের মত ধনী হতে হবে। আর আমাদের দেশের শিশুরা ছোটবেলা থেকে দেখে আসছে, বাড়িতে কোন কৌপিন পরা, খালি গায়ে, কপালে তিলক, মাথায় জটা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, পায়ে খড়ম, হাতে একটা কমণ্ডলু নিয়ে এক সাধুবাবা এসেছেন; আর বাড়ির লোকেরা তাঁর পায়ে পড়ে প্রণাম করে ঘরে এনে আদর করে বসাচ্ছে, আশীর্বাদ নিচ্ছে। বাচ্চারা ভাবছে কি সম্মান, আমাকেও এই রকম হতে হবে। হিন্দুদের সবার গোত্র এই রকমই ভিখারী কাঙালীর মত ঋষি মুনিদের নামে। আমরা যাঁকে আদর্শ করি আমরা তাঁর মতই হতে চাই। এখন মানুষ ভাবছে, আমার যিনি ইষ্ট, আমার যিনি গুরু, আমি তাঁর মত থাকব। তারপর ত্যাগ করতে শুরু করে, কিন্তু ভিতরে ত্যাগ করার সেই শক্তি নেই। কিন্তু ঐ আদর্শটাকে যদি না জাগিয়ে রাখা হয়, তাহলে ধীরে ধীরে আদর্শটা হারিয়ে যাবে। কয়েক দশক আগে দিল্লী আর কলকাতায় বড়লোক হওয়ার মাপকাঠি ছিল, দিল্লীতে বড়লোক হওয়া মানে কার কত বড় দামী গাড়ি, আর কলকাতায় বড়লোক হওয়া মানে সত্যজিৎ রায় যাকে নাম ধরে ডাকেন। কালচারের তফাৎ হয়ে যায়। কলকাতা সেই কালচারকে নষ্ট করে দিল। একটা কালচারকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য পুরো সমাজকে ওর সাথে যুক্ত থাকতে হয়।

আমরা ভারতবাসীরা গর্ব করে বলি, আমাদের আর্যভট্ট ছিলেন, ভাস্করাচার্য ছিলেন, চরক ছিলেন, শুশ্রুত ছিলেন। তাহলে আজকে তোমার মেডিকেল সাইন্সের এই দুরবস্থা কেন, বিজ্ঞানে এত দুরবস্থা কেন? ভূগোলের কোন আইডিয়া নেই, ইংরেজরা আসার পর আমরা জানলাম যে ভূগোল বলে কোন বিষয় আছে। ভূগোলের মত, ইতিহাস, মেডিকেল সাইন্স, ম্যাথমেটিক্স, বিজ্ঞান, ইংরেজরা আসার আগে আমরা জানতামই না যে এই ধরণের কোন সাবজেক্ট হতে পারে। এখন আমরা মেকলের নামে গালাগাল দিয়ে যাচ্ছি। যারা গালাগাল দেয় তাদের কোন ধারণাই নেই যে, মেকলে না থাকলে এখনও আমাদের পাঠশালা আর টোলে গিয়ে ডুকৃঙ করণে করতাম। মেকলে এসে দেশটাকে বাঁচালেন, তিনি আমাদের জানালেন, ভূগোল কি, ইতিহাস কি, সাইন্স কি, জিওমেট্রি কি, গণিত কি। তাহলে আর্যভট্ট, ভাস্করাচার্যরা কোথায় গেলেন? ওটা ফ্রিক্, ফ্রিক মানে হয়, কালচার নেই কিন্তু হঠাৎ একটা ট্যালেন্ট বেরিয়ে চলে এসেছে। পাশ্চাত্য দুনিয়া পুরো মেডিক্যাল সাইন্স, বিজ্ঞান, সাহিত্যে নিজেদের পুরো dedicate করে দিয়েছে, সেইজন্য পর পর সব লাইনে গ্রেট স্কলাররা বেরিয়ে আসছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের spiritual way of life নয়। কিন্তু আমাদের এখানে way of lifeটাই হল spirituality। কিন্তু তা সত্ত্বেও যেমন হঠাৎ হঠাৎ কয়েকজন খুব উচ্চ আধ্যাত্মিক সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব বেরিয়ে আসছে, এখানেও মাঝে মাঝে হঠাৎ একজন ম্যাথমেটিশিয়ান দাঁড়িয়ে গেলেন, একজন বড় লেখক বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু আমাদের dedication সেখানে নেই, আমাদের dedication spiritualityতে।

দুর্ভাগ্যবশতঃ আধ্যাত্মিকতায় প্রথম আবশ্যিক শর্ত হল, তুমি সব কিছু ছাড়। সব কিছু ছাড়া আবার সবার পক্ষে সম্ভব না। ফলে ন ঘরকা ন ঘাটকা; না হলো ভোগ, না হলো যোগ। মাঝখান থেকে হিন্দু ধর্মটা হয়ে গেল নরসিংহ অবতার, অর্দ্ধ পশু অর্দ্ধ মানুষ। কিন্তু এই আদর্শটা আছে বলে, প্রত্যেক কিছু দিন পর একজন করে মহাপুরুষ আসেন। অন্যান্য ধর্মের লোকেরা হিন্দু ধর্মের নিন্দা করে বলে, 'তোমাদের ধর্মের এমন দুরবস্থা যে, কিছু দিন পরে পরে অবতারকে আসতে হয়। আমাদের ধর্ম পারফেক্ট, আমাদের ধর্মে আসতে হয় না'। এরা সব মুর্খের দল, তোমাদের সেই কালচারটাই নেই যে, এই রকম আধ্যাত্মিক মহামানব তৈরী করবে। তুমি যাঁকে তোমাদের একমাত্র spiritual giant মনে করছ, আমাদের এখানে প্রত্যেক একশ বছর অন্তর ঐ রকম spiritual giant তৈরী হয়। বিলগেটসের যত টাকাই থাকুক, কুবেরের ভাণ্ডারে ঢুকলে থ হয়ে যাবে। সেই কুবের আবার পার্বতীতনয় গণেশকে নিজের বৈভব দেখানোর জন্য নিমন্ত্রণ করে নিয়ে তার পেট

ভরাতে পারছে না, সেই গণেশকে মা পার্বতী দুবেলা পেট ভরে খাইয়ে যাচ্ছেন। বিলগেটসের কাছে যেটা বিরাট কিছু সেটা কুবেরের কাছে কিছুই না, আবার কুবেরের কাছে যেটা বিরাট কিছু সেটা ভগবান শিবের কাছে কিছুই না। অন্যান্য ধর্ম যাঁকে বিরাট মহাত্মা বলছে, আমাদের কাছে ওটা কিছুই না, আমাদের এখানে ভুরি ভুরি ঐরকম মহাত্মা পাওয়া যায়।

বারাণসীকে বলা হয় সঙ্গীত নগরী। পণ্ডিত বিসমিল্লা খাঁ সকালবেলা গঙ্গার ধারে এসে সানাই বাজাতেন। ওনাকে একবার বিদেশে বলা হয়েছিল, আপনি বিদেশে এসেই থাকুন না কেন! তখন বিসমিল্লা বলেছিলেন, আমি সকালবেলা বারাণসীর ঘাটে সানাই বাজাই। বাচ্চা ছেলে উপর থেকে গঙ্গায় ঝাঁপ দেয়, ঝাঁপ দেওয়ার আগে বলে, বাঃ ওস্তাদ কেয়া বাজায়া! আর ওদিকে পানওয়ালা বসে বসে পান বানাচ্ছে আর ওখান থেকে বলতে থাকে, কেয়া ওস্তাদজী আজকি রাগ গরবরী হো গয়া। যেখানে যে বাচ্চা গঙ্গায় ঝাঁপ মারছে সেও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বোঝে, আর যে পান বানাচ্ছে সেও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বোঝে, ঐ রকম জায়গায় আমি থাকি। ঐ জায়গা ছেড়ে কি করে আমি বিদেশে এসে থাকি! তোমার কাছে যেটা বিরাট পারফরমেন্স মনে হচ্ছে, ওই রকম এখানে রোজই হয়। তোমার ওখানে দু হাজার বছর আগে একজন অবতার এসেছিলেন। আমাদের এখানে মুরি-মুরকির মত এমনই পড়ে আছে।

কিন্তু তার জন্য সমাজকে মূল্য দিতে হয়। ধনী হওয়ার ক্ষেত্রে দিতে হয় না। কেন? যেদিন zero-sum game হয়ে যাবে, তখন ওদেরও ঐ অবস্থা হবে। কিন্তু এখন এত বেশী resource রয়েছে, তাই বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু ইতালী, এক সময় ছিল, all roads lead to Rome, আজকে তার কি অবস্থা, কিছুই নেই। গ্রীসের রাজধানী এথেন্স জ্ঞান, সম্পদের কি প্রাচুর্যের ভরপুর ছিল, আজকে কিছুই নেই। হয় কি, psychic energyর sum total একই থাকে। স্বামীজী হয়ত ঐ sum totalএর আইডিয়া থেকেই এই কথা বলছেন। কিন্তু খুব যুক্তি দিয়ে যদি দেখা হয়, তখন এটা খুব সহজ মনে হবে। যে কোন সমাজ যদি পুরোপুরি আধ্যাত্মিকতাতে ঢেলে দেয়, তখন বেশির ভাগ মানুষ সেটা নিতে পারে না। ভোগ করতে পারে না, কারণ লজ্জা পায়। অনেক বছর আগেকার কথা, একজন মহারাজের পেটে আলসার হয়েছিল, খুব বাড়াবাড়ি পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। যাই হোক চিকিৎসা করে সামলানো হয়েছে, ডাক্তার কিন্তু বলে দিয়েছেন বেশিক্ষণ খালি পেটে থাকা চলবে না। উনি একবার ঐ অবস্থায় এক ফ্লাড রিলিফের কাজে গেছেন। সেখানে খিচুরি দেওয়া হচ্ছে। খিচুরি ওনার একেবারেই সহ্য হয় না। তিনি তাই পকেটে করে একটা আপেল নিয়ে গেছেন, সেই আপেল খাচ্ছেন। একজন কেউ সেটার একটা ছবি তুলে কাগজে ছাপিয়ে দিয়েছে। রিলিফে খিচুরি আর নিজে আপেল খাচ্ছে। তখনকার দিনে আপেলের অনেক দাম ছিল। মানুষ এই রকমই হয়। কারুর দরকার থাকতে পারে, সেটাকেও লুকিয়ে করতে হয়। লুকিয়ে কেন করছেন, সামনে এসে করুন। কি করে করবে, সমস্যা আছে। আমাদের দেশে ঠিক এই সমস্যা। ভোগ করতেও পারে না, কারণ মনে হয় আদর্শচ্যুত হয়ে যাচ্ছে। যোগে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দম সবার হয় না।

স্বামীজী সেইজন্য আনলেন concept of diluted materialsim। ভোগ থাকবে কিন্তু diluted, পাতলা করে। সেইজন্য বেলুড় মঠ হওয়ার পর বলে দেওয়া হল, সন্ন্যাসীরা সবাই খাটে শোবে, চা খাবে। সেই নিয়ে বালি মিউনিসিপ্যালিটি থেকে বলা হল, এরা খাটে শোয়, চা খায়, ইত্যাদি। বেলুড় মঠের নামই হয়ে গেল স্বামী বিবেকানন্দের বাগানবাড়ি। কারণ সাধুবাবা খাটে কেন শোবে, সাধুবাবা চা কেন খাবে? স্বামীজী যেটা সন্ন্যাসীদের দিয়ে শুরু করলেন, আজ একশ বছরে ধীরে ধীরে সমাজের মধ্যে ছড়াতে শুরু হয়ে গেছে। আগে যেখানে এসিতে যাওয়া বিলাসিতা ছিল, সেটা এখন স্বাভাবিক হয়ে গেছে। আগে প্লেনে যাওয়ার কথা চিন্তাই করা যেত না, দেবতারা ছাড়া আকাশে কে যেতে পারবে! সবাই এখন প্লেনেই যাতায়াত করতে চাইছে। স্বামীজী তাই নিয়ে এলেন diluted materialism। সেখানেও তিনি বলছেন, এতেও কিন্তু আধ্যাত্মিকতা হারিয়ে যাবে, কোন সন্দেহ নেই। আদর্শকে একটু নীচু করলে একটু তো আপোষ হবে। কিন্তু স্বামীজী এখানে যা বলছেন, এটা দিয়ে তিনি আমাদের দুরবস্থার একটা কারণ দেখিয়েছেন। তার সাথে একটা চরম সত্যকে তুলে ধরেছেন, প্রথম কথা হল ধর্মে উৎসর্গিকৃত থাকলে এই রকম হয়, আর দ্বিতীয় উনি psychic

energyকে নিয়ে বলতে গিয়ে বলছেন, একটা সমাজে যদি খুব আধ্যাত্মিক ট্যালেন্টেড মানুষ বেরিয়ে আসে, অন্যরা একটু নীচে চলে যাবে। এটা একটা ক্যাজুয়াল কমেন্ট, এরপরে পুরোপুরি ভক্তিতে ঢুকে যাচ্ছেন।

ঈশ্বরই সব করেন, আমরা নিমিত্তমাত্র

স্বামীজী ভক্তির উপর বলতে গিয়ে বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি নিয়ে আসছেন, কিন্তু শুরু করছেন গীতা থেকে। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়কে বলা হয় ভক্তিযোগ, কিন্তু ভক্তির কথা গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় থেকেই শুরু হয়ে যায়, যেখানে ভগবান নিজের স্বরূপের কথা বলছেন। পঞ্চম অধ্যায়, ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভক্তির কথা প্রায় কিছু নেই। সপ্তম অধ্যায় থেকে ভাল ভাবে ভক্তির কোথা শুরু হয়ে যায়। আর দশম, একাদশ অধ্যায় তো পুরো ভক্তিযোগের কথা, কিন্তু শুধু নামে দ্বাদশ অধ্যায়কে ভক্তিযোগ বলা হয়েছে। সব কিছুকে একত্র করে স্বামীজী একটা জায়গায় এনে বলছেন, ‘I am the holiness of the holy’ (Gita). I am the root, each uses it in his on way, but all is I. ‘I do everything, you are but the occasion’. (*‘আমিই পবিত্রাত্মাদের পবিত্রতা আমিই সকলের মূল, প্রত্যেকে নিজের মতো করে সেটি ব্যবহার করে থাকে, কিন্তু সবই আমি’। ‘আমিই সব করছি, তুমি নিমিত্তমাত্র’।*) দই মন্থন করে মাখন তোলা হয়, গীতাকে যদি সেই রকম মন্থন করা হয়, তাহলে একটা মূল বক্তব্য বেরিয়ে আসবে, তা হল – ঈশ্বরই আছেন, যা কিছু দেখা যাচ্ছে, সব ঈশ্বর। আমরা যেটা শুভ সেটারই পূজা করি, সেইজন্য মূলতঃ দশম অধ্যায়ে ভগবান বলছেন, যা কিছু শুভ আছে এগুলো সব আমি। কিন্তু তার সাথে অন্যান্য জিনিসগুলিও বলছেন। ছলবিদ্যা, যেখানে মানুষকে ঠকানো হচ্ছে, সেখানে বলছেন ছলবিদ্যার মধ্যে আমি হলাম জুয়া। গুহ্যবিদ্যাকে নিয়েও বলছেন। পরে তন্ত্রে যে মা কালীকে মৃত্যুরূপা রূপে দেখানো হয়েছে, একাদশ অধ্যায়েও সেটা এসে যাচ্ছে, যেখানে দেখাচ্ছেন, মৃত্যুর যে সংহার রূপ, সেটা ভগবান নিজে। এত কিছু বলার একটাই উদ্দেশ্য হল, ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই। আর যখন বলছেন, বিশেষ করে দশম অধ্যায়ে, একেবারে চরমে নিয়ে গিয়ে বলছেন। যেমন অনেক কিছুই আমাদের পবিত্র করে, কিন্তু এখানে চরমে নিয়ে গিয়ে বলছেন, গঙ্গা। এর যে কোন যুক্তি আছে তা না। মানুষ সব সময় যেটা শ্রেষ্ঠ, সেটাকেই বেশি সম্মান দেয়। ভগবান সেইজন্য প্রথমে সব শ্রেষ্ঠকে এনে দেখাচ্ছেন, এটা তিনি নিজে। সেখান থেকে ধীরে ধীরে নিয়ে যাচ্ছেন, যাবতীয় যা কিছু আছে সব আমি। স্বামীজী বলছেন, আমি হলাম মূল, এটাকে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করে, কিন্তু বাস্তবে আমিই একমাত্র আছি। আর আমিই সব করি, লোকেরা নিমিত্তমাত্র।

বলছেন ঈশ্বরই একমাত্র কর্তা। ঈশ্বর কর্তা মানে, আমি কর্তা। কারণ আমার আসলটা হল আত্মা, অন্তর্যামী। অন্তর্যামীর ইচ্ছা ছাড়া কিছুই চলে না – অন্তর্যামীকে কেউ আত্মা বলছে, যে ঠাকুরের ভক্ত সে ঠাকুর বলবে, যে বিষ্ণুভক্ত সে বিষ্ণু বলবে, খ্রীশ্চানরা যীশু বলবে, যার যা খুশী বলতে পারে, অন্তর্যামীর ইচ্ছা ছাড়া কিছু চলে না। শুধু শরীরেই না, যে কোন বস্তুতে। ভগবান যেখানে নেই, সেটা অনীশ্বর হয়ে যায়। অনীশ্বর হয়ে গেলে তার অস্তিত্বই থাকবে না। ঠাকুর যখন বলছেন, তাঁর ইচ্ছা বিনা গাছের পাতাটিও নড়তে পারে না, তখন ঠাকুর অনেক বেশি বলে দিলেন। নড়া তো দূরের কথা, ঈশ্বর না থাকলে গাছের পাতাই থাকবে না। যেখানে ঈশ্বর থাকবে না, সেটা অনীশ্বর, অসৎ হয়ে যাবে, অসতের কোন অস্তিত্বই নেই, যেমন বন্ধ্যাপুত্র।

কিন্তু আমরা হলাম পৃথিবী লোকের মানুষ, আমরা ক্রিয়াতে বিশ্বাস করি, বড় বড় কাজে বিশ্বাস করি, উপলব্ধিতে বিশ্বাস করি। সেইজন্য বলছেন, যা কিছু হচ্ছে সব তাঁর ইচ্ছাতে হচ্ছে। তুমি যদি এটা না বুঝতে পারো, তাহলে প্রথমে তুমি নিজেকে দাস রূপে দেখ। আচার্য শঙ্কর বলছেন, নিজেই করছ মনে করো, কিন্তু মনে করবে *অহং কর্তা ঈশ্বরায় ভৃত্যবৎ করোমি*, কর্তা আমি কিন্তু ঈশ্বরের জন্য তাঁর ভৃত্যের মত কাজ করছি। তার পরের ধাপে আসবে, ঈশ্বরই সব করেন, আমি কিছু করি না। তৃতীয় ধাপে, ঈশ্বরই আছেন, ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই – এই তিনটে ধাপে চলে। সাধারণ মানুষ মনে করে আমিই সব করছি। ওখানে থেকে পরের ধাপে আসে, আমি করছি ঠিকই কিন্তু মালিক হলেন ঈশ্বর। সেখান থেকে আসে, আসলে তিনিই সব কিছু করান এবং শেষে আসে, তিনিই আছেন। আমাদের ভাল যা কিছু হচ্ছে, তিনিই করাচ্ছেন, মন্দ যা কিছু হচ্ছে, সেটাও তিনিই করাচ্ছেন, কাউকে নিমিত্ত করে করাচ্ছেন। আমরা সাধারণ মানুষ, আমরা প্রায়ই বলি ঐ লোকটা আমার সব শেষ করে দিল, তুমি আমার জীবন শেষ করে দিলে। কে আমাকে শেষ করবে? আমি ঈশ্বরের সন্তান।

সাধারণ মানুষ নিজেকে আত্মা বা আমি ঈশ্বর বলতে পারবে না। আমি ঈশ্বর বললে মুসলমানরা বলবে এটা ঈশ্বর বিরোধী কথা। যদি আমাদের মনে হয় ঈশ্বর বিরোধী কথা বলতে পারব না, তাহলে আরেক ধাপ নীচে বলতে পারি, আমি ঈশ্বরের সন্তান, আমি ঈশ্বরের সৃষ্টি। আমি ঈশ্বরের সৃষ্টি, আমাকে কে কি করে দিতে পারবে! যা করার তিনিই একমাত্র করতে পারেন। করতে গেলে একটা নিমিত্ত লাগে। ভগবান ম্যাজিক্যালি কিছু করবেন না। যদি আমার মাথা ফাটার থাকে, তাহলে ছাদ থেকে হয়ত একট ইট এসে মাথায় পড়বে, ইটটা নিমিত্ত। জীবনে মার যেটা খাই, সেটা ঈশ্বরই মারছেন। যখন আমরা বলি, আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ, সেখানেও ঈশ্বরই করছেন। মা যখন সন্তানকে প্রতিপালন করে বড় করছে, সেখানেও ভগবানই করছেন। মায়ের মধ্যে যে মাতৃত্ব বোধ সেটা তিনি। মাতৃত্ব বোধ যদি নারীর মধ্যে না থাকত জগতে কোন শিশু সাবালক হতে পারত না। যখন কাউকে মারার থাকে তখন তিনি ভাল মানুষের মধ্যেও ক্রোধ সঞ্চার করে দেবেন। দুষ্ট শিষ্ট বলে কিছু হয় না। সিংহ দেখলে আমরা ভয় পেয়ে যাবো। কিন্তু সিংহেরও যখন বাচ্চা হয় তখন সে কত আদর করে, স্নেহের পরশ দিয়ে তার শাবককে ধরে রাখে। সাপের মত হিংস্র কিছু হয় না, সেই সাপ যখন ডিম দেয়, সেই ডিমকে কত সাবধানে পাহাড়া দিয়ে রাখে, ডিমের কোন ক্ষতি হতে দেবে না। তার মানে, আমার জন্য যে দুষ্ট, অপরের জন্য সে দুষ্ট নাও হতে পারে। আর আমার সঙ্গে যে শিষ্ট, আমার জন্য যে শিষ্ট, অপরের জন্য সে শিষ্ট নাও হতে পারে। একই লোকের মধ্যে যে দুষ্ট ভাব আসে, সেটা তাঁরই দেওয়া, আবার সেই লোকের মধ্যে যখন শিষ্ট ভাব আসে, সেটাও তাঁরই দেওয়া। কাউকে যখন কিছু দেওয়ার থাকে, ভগবান তো ম্যজিকালি এসে আমাকে দিয়ে কিছু করাবেন না, কারুর মাধ্যমে করিয়ে নেবেন।

স্বামীজী এটাই বলছেন, I do everything, you are but the occasion, শ্রীকৃষ্ণ এটা অর্জুনকে নিমিত্ত নিয়ে বলছেন। এগুলো উঁচু কথা ঠিকই, কিন্তু আমরা নীচু কথা নিয়ে থাকব কেন। অন্য কোন ব্যাপারে তো আমরা নীচু জিনিস নিয়ে ভাবতে চাই না, একটা ফোন যখন কিনবে, আগে থেকে খোঁজ নেবে নূতন নূতন কি মডেল এসেছে, কম্প্যুটার কিনতে গেলে লেটেস্ট কনফিগারেশনের খোঁজ নেবে। বাজারে আনাজ কেনার সময়ও আমরা টাটকা ভাল দামী আনাজের দিকে যায়। কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে আমরা বলি, যেটা সব থেকে সহজ, নিম্নতম ধাপ, সেটাই আমাকে দিন। নিম্নতম কি? তিনি আছেন, সকাল বিকাল নমো নমো করে একটু তাঁর নাম নিয়ে নিলাম আর বিশেষ বিশেষ দিনে একটু ভাল ভোগ দিয়ে নিজেরা প্রসাদ খেলাম। ঠাকুর বলছেন, অধম ভক্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে, তিনি ঐ ওখানে আছেন। এটা ধর্মের নিম্নতম, বাজারের সব থেকে সস্তা আনাজ। উঁচু কথা, শেষ কথা বলে দেওয়া হয়ে গেছে। ঠিক আছে আমি এখন পারছি না, তার মানে এই নয় যে, ঐ সত্যকে আমি অস্বীকার করে দেব। এসব কথা শুনে রাখতে হয়, সময় না হলে কিছু হয় না, শুনতে শুনতেও হয়। কিভাবে হয়?

নিজের আত্মাকে অনুভব করাই জ্ঞান, বাকি সব অজ্ঞান

স্বামীজী ভক্তিকে নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছেন। তার আগে তিনি ঈশ্বরের ব্যাপারে দুটো উচ্চ সত্যকে বলে দিলেন, সেই সত্যকে কিভাবে উপলব্ধি হবে বলতে গিয়ে বলছেন, Do not talk much, but feel the spirit within you; then you are a Jnani. This is knowledge, all else is ignorance. All that is to be known is Brahman. It is the all. (*বেশী কথা বলো না, তোমার নিজের ভিতর যে আত্মা রয়েছেন, তাঁকে অনুভব কর, তবেই তুমি জ্ঞানী হবে। এই হল জ্ঞান, বাকি সব অজ্ঞান। জানবার বস্তু একমাত্র ব্রহ্ম, তিনিই সব।*) আমাদের সমস্য হল, আমাদের সবটাই চাই। বিচার করে দেখলে দেখতে পাই, এই জগতে মাত্র তিনটে সত্তা আছে – জীব, জগৎ আর ঈশ্বর। এই তিনটের বাইরে চতুর্থ কোন সত্তা নেই। জীব হল আমার ভিতরে যিনি আছেন, যাঁকে আত্মা বলি, সোল বলি, পরে স্বামীজী এটাকে জীব রূপে পরিভাষিত করবেন। জগৎ হল, যেখানেই কোন জড় পদার্থ রয়েছে, যেমন আমাদের এই দেহ, এটাও একটা জগত বা জগতেরই অংশ। মৃত্যুর পর পুড়িয়ে দিলে দেহটা জগতেরই অংশ হয়ে যায়। আকাশ, তারা, গ্যালাক্সি, গ্যালাক্সির পরে যা কিছু আছে, সবটাই জগৎ। যেখানে জড় পদার্থ আছে, যে কোন আকারে, সেটাই জগৎ। আর যেখানে জীব আর জগৎকে জুড়ে এক হয় যায়, সেটাই ঈশ্বর। যিনি এটা বুঝে

নিয়েছেন যে এই তিনটের বাইরে জানার মত কিছু নেই, তিনিই জ্ঞানী। যিনি এটাকে বোধে বোধ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন, তিনিও জ্ঞানী।

কিন্তু আমাদের সমস্যা হল, জীব আর জগৎ যেখানে জুড়ে যায়, আমরা সেটাকে জানতে চাই না। আমরা জানতে চাই শুধু জগৎকে, জীবকেও না। মানুষ যদি শুধু জীবকেও রাখে, আত্মা ছাড়া যদি জীবকে নেয়, তখন মরার পর আমি অন্য কোন লোকে যাবো বা অন্য কোন দেহে প্রবেশ করব। সেইজন্য আমাকে এমন ভাল কর্ম করতে হবে, যাতে ভাল যোনিতে জন্ম নিতে পারি, এটা তাও অনেক ভাল। কিন্তু সেটাও আমরা করতে চাই না। ঈশ্বরের কথা আমরা ছেড়েই দিলাম, ঈশ্বরে মন দিলে মুক্তির দিকে আমাদের নিয়ে যাবে; শুধু জীবকেও যদি ধরে রাখে, আমি মরব, মরার পর আমার ভিতরে যিনি আছেন, সেই জীবাত্মা আরেকটা দেহে যাবে, অন্য কোন লোকে যাবে, সেইজন্য আমাকে ঠিক ঠিক পথে চলতে হবে, ধর্মের কথা মেনে চলতে হবে। সেইদিকেও আমাদের কোন চেষ্টা নেই। আমাদের চেষ্টা শুধু জগৎকে নিয়ে। জগৎ মানে বহির্জগৎ যেটা আছে আর এই দেহজগৎ যেটা আছে, লুটে পুটে খাবো। আগের নিজেরটা ঠিক রাখতে হবে। কিভাবে আমি মানুষকে বোকা বানিয়ে প্রভাবিত করতে পারব, কিভাবে আমি টাকা-পয়সা ক্ষমতা অর্জন করতে পারব। এই চিন্তা ভাবনা থেকে সাধারণ মানুষ কিছুতেই বেরিয়ে আসতে পারে না। এদের থেকে যারা একটু উন্নত, তারা বলে, আমার এখন চল্লিশ পঞ্চাশ বয়স হয়ে গেছে, যা ভোগ করার হয়ে গেছে, এবার আমাকে একটু পরজন্মের কথা ভাবতে হবে, ঠাকুরের নাম করি, পূজা অর্চনায় একটু বেশি মন দিতে হবে।

আর যারা সব জীব আর জগৎকে ছেড়ে ঈশ্বরের দিকে যেতে চাইছে, তারা তো অন্য ধাতুর হয়ে গেছে। কিন্তু যদি কেউ ঈশ্বরের দিকে চায়, তাদের জন্য বলছেন, কারুর সাথে বেশি কথা বলতে যেও না, আর feel the spirit within you, স্বামীজীর এই কথাটাই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ, এই কথাটা বলার জন্য এত কথা বলছেন। এখানে একটা উপমা নিলে আমরা জিনিসটাকে বুঝতে পারব। এ্যকুইরিয়ামের মত একটা কাচের পাত্র আছে। আমি দিনরাতই দেখছি, কিন্তু বুঝতে পারছি না যে একটা বিরাট কাচের জার আছে। আমি এবার হঠাৎ সুইচ অন্ করে দিলাম, লাইট জ্বলে উঠল, এ্যকুইরিয়ামের ভিতরটা পুরো আলোকিত হয়ে গেল। এবার এই জিনিসটাকে আমি নিজের দেহের উপর নিয়ে আসব। আমার দেহটা যেন একটা কাচের বাক্স, সেখানে সুইচ অন্ করে দেওয়া হল, চৈতন্যের আলো জ্বলে উঠল। আলো ওখানে আগে থেকেই আছে, সুইচ, অন্ করে দেওয়া হয়েছে। এই রকম আমরা অনুভব করতে পারি যে, আমার ভিতরটা আলোকিত হয়ে আছে, ভিতরটা চৈতন্যের আলোয় আলোকিত। আমি শুদ্ধ আত্মা, সেই আত্মার আলো সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে আছে। শরীরটা যেন ফাঁকা, হাড়, মজ্জা, রক্ত কিছু নেই। যেন কাচের মত স্বচ্ছ, লাইট অন্, আত্মার আলো জ্বলে উঠল। এই জিনিসটা মাঝে মাঝে যদি আমরা অনুভব করি, নিজের জীবনটাই পাল্টাতে শুরু হয়ে যাবে। যাঁরা মন্ত্রদীক্ষা নিয়েছেন, জপ করছেন, তাঁরা এভাবে অনুশীলন করতে পারেন, কিন্তু এটাকে প্র্যাক্টিক্যাল লাইফে নামানো যায় না। যায় না এই কারণে, আমরা চেষ্টা করি না বলে। যিনি শিবের মন্ত্র নিয়েছেন, তিনি কল্পনা করছেন, আমার ভিতরে শিব বসে আছেন, খুব ভাল। এবার একবার শুধু মনে করা যে, ওটা একটা চৈতন্যের জ্যোতি, জ্যোতিস্বরূপ। ভগবান তো জ্যোতিস্বরূপই হবেন, চৈতন্যও জ্যোতিস্বরূপই হবেন। সেই ভগবান আমাদের ভিতরে বসে আছেন, এমনিতেই তো আলোকিত হয়ে যাওয়ার কথা। আর এই আলো তো কোন জড় আলো নয়, আমাদের শরীরে যত রোম ছিদ্রগুলি আছে, সমস্ত ছিদ্র দিয়ে যেন আত্মার আলো বেরিয়ে আসছে। যাঁরা ঋষি, মুনি, তাঁরা কত শুদ্ধ পবিত্র, দেখলেই বোঝা যায়, পবিত্র আলো যেন তাঁর সমস্ত শরীর দিয়ে বেরিয়ে আসছে।

স্বামীজী এখানে এটাই বলতে চাইছেন, এগুলোকে নিয়ে এত আলোচনা করারও দরকার নেই, শাস্ত্র পড়ছ, ক্লাশ শুনছ, এগুলোরও কোন দরকার নেই, একটু অনুভব করার চেষ্টা কর। রান্নার বই যত পড়া থাক, রান্নার ব্যাপারে যত জ্ঞানই থাকুক না কেন, যখন ক্ষুধার জ্বালা অনুভব হয় তখন এক মুঠো ডাল ভাত হলেই ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়ে যায়, তখন আর ঐ স্টাইল মারা রান্নার আর কোন দরকার হয় না। ক্ষুধার জ্বালায় আমার পেট জ্বলছে, আমার আর কিছু লাগবে না, দু মুঠো ডাল-ভাত দাও। আধ্যাত্মিক জীবনেও তাই, সেখানে যত জ্ঞানই থাকুক, জ্ঞান থাকা ভাল, এতে কোন সন্দেহই নেই; কিন্তু যেটা দিয়ে আমার খিদে মিটবে, যেটা দিয়ে

আমার আধ্যাত্মিক জীবন চলবে, সেটারই বেশি গুরুত্ব, সেটা হল এই অনুভূতি লাভ – আমার ভিতরে আত্মার জ্যোতি আছে। এটাই জ্ঞান, এছাড়া বাকি যা কিছু আছে সব অজ্ঞান। জগতের ব্যাপারে আমাদের যত যা জ্ঞান আছে, আসলে সবটাই অজ্ঞান। কিন্তু করতে হবে সবটাই। আমাদের ভারতবর্ষে এটাই সমস্যা। এর আগের আলোচনায় যেটা বলা হয়েছিল, সিদ্ধান্ত বাক্য যদি আমি আগে জেনে যাই, তাহলে আমার দু কুলই যাবে। শুধু যে সংসার করে যাচ্ছে, তার অন্ততঃ একটা কুল থাকছে, সংসারটা থাকছে। পুরো দমে যদি ঈশ্বরের দিকে যায়, তাহলেও সংসারটা থাকছে। কিন্তু সংসারে বসে যদি মনে করে, ঈশ্বরই শেষ কথা, তার মানে সব দিক থেকে তার শেষ হয়ে যাবে। যে কোন জিনিস যদি না খেটে পেয়ে যায়, রাজসিংহাসনও যদি না খেটে পেয়ে যায়, দু দিনও ধরে রাখতে পারবে না। শুধু যায় না, যেগুলো আগে থেকে আছে, সেগুলোকেও সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে চলে যায়। ধর্মের ক্ষেত্রেও তাই, না খেটে যদি সিদ্ধান্ত বাক্য ধরে নেওয়া হয়, সেই সিদ্ধান্ত বাক্য সর্বনাশ ছাড়া কিছু করবে না। অহং ব্রহ্মাস্মি, সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, বেদান্তের এই মহাবাক্যগুলিকে যদি প্রস্তুতি না নিয়ে ধরে থাকে, ওর সর্বনাশ নিশ্চিত। কেন? ওটার জন্য প্রস্তুতি নেয়নি।

আবার অন্য দিকে সংসারের জন্যও খাটবে না। কেন খাটবে না? সংসার তো মিথ্যা, কেন আমি সংসারের জন্য মিছিমিছি খাটতে যাবো। কিন্তু নিজের সুখ-সুবিধা ঠিকমত চাই, খাওয়া-দাওয়া মনের মত চাই। অপরে যখন দুঃখ-কষ্ট পাচ্ছে, তখন বলবে, ঠাকুরের ইচ্ছায় হচ্ছে, মেনে নাও। ঠাকুর বলছেন, তোমার এই বেদান্ত জ্ঞানে আমি ইত্যাদি করি। একটু যদি আমরা অনুভব করার চেষ্টা করি, আত্মজ্যোতি কি, চেতনা কি, তখন জীবন পাল্টাতে শুরু হয়। এখানে কিন্তু কোন কল্পনা কিছু করা হচ্ছে না, কোন হিপনোটাইজ কেউ কাউকে করছে না। এরপর স্বামীজী সত্ত্ব, রজো ও তমো নিয়ে আলোচনা করছেন।

লক্ষ্য ত্রিগুণাতীত হওয়া - ভক্তিপথ সহজ পথ

দেববাণীতে সাংখ্য দর্শনের কথা যেখানে বলা হয়েছিল, সেখানে আমরা এই তিনটে গুণের উপর মোটামুটি বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছিলাম। যেমন বলা হয়, তিনটে রঙের সংমিশ্রণে জগতে সমস্ত রঙের সৃষ্টি, ঠিক তেমনি সত্ত্ব, রজো ও তমো এই তিনটে গুণের সংমিশ্রণে এই জগতের সৃষ্টি। সংসার মানেই সবাইকে বাঁধবে, সত্ত্বও বাঁধে, রজোও বাঁধে আর তমোগুণও বাঁধে। ঠাকুর তিন ডাকাতের গল্প বলছেন। সত্ত্ব কিভাবে বাঁধে? *সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ*, জ্ঞানের প্রতি স্পৃহা আর সুখের প্রতি স্পৃহা দিয়ে বাঁধে। Sattva binds through the search for happiness and knowledge. (*সত্ত্ব মানুষকে সুখ ও জ্ঞানের অন্বেষণে বদ্ধ করে দেয়।*) স্বামীজী পুরোটাই গীতা থেকে বলছেন, সত্ত্বগুণের এটাই স্বভাব যে, যখনই কোন জিনিস ভাল লাগছে, আমি খুব সুখে আছি, জানব সত্ত্বগুণ আমাকে বেঁধে ফেলেছে, বই পড়তে খুব ভাল লাগছে, সত্ত্বগুণ বেঁধেছে। কি করে বেঁধেছে? আমাকে জপধ্যান করতে দেবে না। আবার জপধ্যান যদি করি, তখন জপধ্যানটাই সত্ত্বগুণ হয়ে বাঁধে। আসল যে লড়াই, যে লড়াই মানুষকে উপরের দিকে নিয়ে যাবে, সত্ত্বগুণ সেটা করতে দেবে না। কারণ সুখ দিয়ে বেঁধে নেবে, যেখানেই সুখ পাবে, সেখানেই বসে যাবে। কোন সাধারণ মানুষ, কুঁড়েঘরে থাকে, তাকে যদি বলা হয়, তোমার বাড়িটা ভেঙে দিচ্ছি বদলে তোমাকে ভাল পাকা বাড়িতে নিয়ে যাবো, সে যাবে না। কারণ ওখানেই সে সুখ পাচ্ছে। কথামৃতে ঠাকুর খুব সুন্দর গল্প বলছেন। একটা গুবরে পোকাকে দেখে নারদের খুব করুণা হয়েছে, কি কষ্টে গোবরের মধ্যে সব সময় পড়ে থাকে। গুবরে পোকাকে বলল, 'চল তোকে আমি বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাব'। 'যেতে তো পারি কিন্তু ওখানে প্রচুর ভাল গোবর পাওয়া যাবে তো'? গোবর হোক, সে ওখানে সুখে আছে। ওই সুখ তাকে গোবরে বেঁধে রেখেছে। ঠিক তেমনি পণ্ডিত সে বেরোতে পারবে না, বিজ্ঞানী বেরোতে পারবে না, জ্ঞানের স্পৃহা তাদের বেঁধে রেখেছে।

Rajas binds through desire, Tamas binds through wrong perception and laziness. (*রজো বাসনা দ্বারা বদ্ধ করে, তমো ভ্রমজ্ঞান আলস্য প্রভৃতির দ্বারা বদ্ধ করে।*) রজোগুণ কামনা-বাসনা দিয়ে বদ্ধ করে। আমি এটা করব, সেটা করব, আমার মত এই কাজ কেউ করতে পারবে না, এগুলো সব রজোগুণের লক্ষণ। দুর্গা পূজা এত পবিত্র পূজা, আমরা মনে করি মা নিজের স্থান থেকে আমাদের জন্য নেমে আসছেন। আর এখানে পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে, কোন পূজার প্যাণ্ডেলটা শ্রেষ্ঠ। পূজা ঠিক ঠিক হচ্ছে কিনা, পূজাতে নিষ্ঠা আছে কিনা, পূজার মাধ্যমে ভক্তি জাগছে কিনা, এসবের দিকে কারুর দৃষ্টি নেই। আমার

প্যাণ্ডেলের বেস্ট প্রাইজ পেতে হবে, এটাই রজোগুণের লক্ষণ। তমোগুণ মানুষকে অলস তৈরী করে দেয় আর জিনিসটা যেমন তেমন না দেখে ভুল দেখে। তমোগুণ আর রজোগুণকে জয় করার জন্য সত্ত্বগুণের দরকার। সত্ত্বগুণ দিয়ে রজো আর তমোগুণকে দাবিয়ে দেওয়া হয়। আর শেষে সমস্ত কিছু ঈশ্বরের চরণের সমর্পণ করে এই তিনটে গুণের পারে বেরিয়ে যেতে হয়, ত্রিগুণাতীত হয়ে যাওয়াটাই লক্ষ্য। তিনটে গুণের পারে মানেই অখণ্ড, অখণ্ড মানেই অদ্বৈত। অদ্বৈত মানে সেখানে ভাল নেই, মন্দ নেই, অলসতা নেই, কর্মও নেই, সুখও নেই দুঃখও নেই। আমাদের পক্ষে ঐ অবস্থার ধারণা করা খুব কঠিন। কারণ আমরা এমন একটা স্তরে আছি, এই স্তরে আমাদের দেহ খুব প্রিয়, আমাদের মন খুব প্রিয়। দেহ প্রিয় মানেই, আমাদের শরীরের বিশ্রাম লাগবে, আরাম লাগবে আর দেহের সুখ লাগবে। দেহের সুখ মানেই খাটতে হবে, রজোগুণ এসে গেল। মনের সুখ মানেই সত্ত্বগুণ। দেহের বিশ্রাম, দেহের সুখ আর মনের সুখ, এই তিনটে স্তরে চলে। এই কথা বলে স্বামীজী ধীরে ধীরে ভক্তিযোগ নিয়ে বলতে শুরু করছেন।

এই যে তিনটে গুণ, সত্ত্ব, রজো ও তমো, এর আলোচনা গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় থেকেই শুরু হয়ে যায়, এরপর দ্বাদশ অধ্যায়, চতুর্দশ অধ্যায়, ষোড়শ অধ্যায়ে এর উপর বার বার আলোচনা করা হয়েছে। ধর্ম কি, সাধনা কি, সিদ্ধি কি, এর অনেক রকম পরিভাষা আছে, তার মধ্যে একটা পরিভাষা হল ত্রিগুণাতীত। ধর্ম কি? ত্রিগুণাতীত হওয়া। জপধ্যান করা কেন? সাধনা কেন? ত্রিগুণাতীত হওয়া। ত্রিগুণাতীত হতে বা এই তিনটে গুণের পারে কিভাবে যেতে হবে, এর কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। বিভিন্ন ধর্ম বলে, তুমি যদি আমার এই ধর্ম পালন কর, তাহলে তুমি এই জায়গাতে পৌঁছাবে। আমরা যদি খুব গভীরে যাই, তাহলে দেখতে পারবো যে, সব ধর্ম ত্রিগুণাতীতের দিকেই নিয়ে যাচ্ছে। মজার ব্যাপার হল, ওরা যখন অন্য ধর্মের নিন্দা করে, তখন বলবে, ওরা তোমাকে ত্রিগুণাতীত বানাবে না, আমরা কিন্তু বানিয়ে দেব। ওরা হয়ত সরাসরি এই ভাষায় বলবে না, কিন্তু বক্তব্য এটাই। হিন্দুদের মধ্যে যখন আসে, তখন সেখানেও শত শত পথ, সবারই উদ্দেশ্য ত্রিগুণাতীত বানানো। যখনই আমরা কোন বই পড়তে যাবো, বা কোন পথ ঠিক করতে যাচ্ছি, তখন যদি সংশয় হয় এই পথটা ঠিক না ভুল, তখন একটু বিচার করে দেখতে হবে, এই পথ আমাকে ত্রিগুণাতীত বানাবে, না কি বানাবে না।

একটা খুব সহজ উপমা নিলে আমরা বুঝতে পারব। ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর মহেশ আমাদের এই তিনজন মূল দেবতা। বিষ্ণুর দুই অবতার, রাম আর কৃষ্ণ, এনারা হলেন মূল অবতার আর অন্য দিকে শক্তি, দূর্গা, কালী, এনারাই আমাদের পূজ্য। পুরাণে সৃষ্টি মানেই ব্রহ্মা। বেদেও সৃষ্টির কথা বলে, বেদের শব্দটা হল 'হিরণ্যগর্ভ', যেখান থেকে সৃষ্টি হচ্ছে। এবার আমরা যদি সারা ভারত ঘুরে আসি, কদাচিৎ কোথাও একটা হয়ত ব্রহ্মার মন্দির পেতে পারি। কিন্তু শিবের মন্দির সব জায়গায় পাওয়া যাবে, বিষ্ণুর মন্দিরও সব জায়গায় পাওয়া যাবে, শক্তির মন্দির সব জায়গায় পাওয়া যাবে, রাম ও কৃষ্ণের মন্দির তো ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। মাঝখান থেকে যিনি আসল, তিনিই হারিয়ে গেছেন। আমরা যদি বিচার করতে যাই, আচ্ছা ব্রহ্মার মন্দির ভারতবর্ষে নেই কেন? কারুর কাছে কোন উত্তর নেই। অথচ এর উত্তর খুবই সহজ। মুসলমানরা বলে হিন্দুরা পৌত্তলিক, মূর্তির পূজা করে, বৌদ্ধরাও হিন্দুদের বলে পৌত্তলিক, মূর্তি পূজক। কিন্তু একেবারেই তা নয়, আমরা যদি পৌত্তলিক হতাম তাহলে আমরা ব্রহ্মার পূজা করতাম। শীতলার পূজা হয়, মনসার পূজা হয়, কিন্তু ব্রহ্মার পূজা হয় না। কারণ ছোটখাটো দেবী দেবতাদের আমরা আমাদের দৈনন্দিন সমস্যার থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য পূজা করি, মায়ের কাছে প্রার্থনা করি, মা আমি যখন ঈশ্বর রূপে কাউকে পূজা করি, তখন তুমি বিঘ্ন সৃষ্টি করো না। ঈশ্বর রূপে যদি কাউকে আমরা পূজা করি, যে কাউকেই করি না কেন, যদি ঈশ্বর রূপে পূজা করতে হয়, পূজা তবেই হবে যদি তাঁকে ত্রিগুণাতীত করেন। ত্রিগুণাতীত না হলে তাঁর পূজা হবে না। ব্রহ্মা ত্রিগুণাতীত করেন না, কারণ তিনি সৃষ্টি কর্তা, তিনি সৃষ্টিতে বেঁধে রাখেন, সেইজন্য তাঁর পূজা হবে না। ঠিক একই কারণে হিরণ্যগর্ভেরও পূজা হবে না, সৃষ্টিতে বেঁধে রাখছেন। যে কোন মহাপুরুষ, যত বড় মহাপুরুষই হন না কেন, গান্ধীজী এত বড় মহাপুরুষ, কিন্তু পূজা তাঁর হয় না। কারণ এনারা আমাদের ত্রিগুণাতীতে অবস্থায় নিয়ে যেতে পারবেন না। গান্ধীজী আর স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে কি তফাৎ? তফাৎ শুধু এই ত্রিগুণাতীতকে নিয়ে।

যতক্ষণ একটা আদর্শ আমাকে তিন গুণের পারে না যেতে পারছে, ততক্ষণ সেই আদর্শের পূজা ভারত করবে না। আর যে পথ শেষ পর্যন্ত আমাকে ত্রিগুণাতীত অবস্থায় না নিয়ে যেতে পারে, ভারতবর্ষ সেই পথকে ঠিক ঠিক ধর্ম পথ রূপে গ্রহণ করবে না। আর যে পথে যত বিঘ্ন আসার সম্ভবনা কম, সেই পথ তত কম নেবে। যেমন তন্ত্র, আমি তোমার পথ নিতে রাজি আছি, তুমি বলছ আমাকে তিন গুণের পারে নিয়ে যাবে। কিন্তু তোমার পথে পতন হয়ে গেলে তিন গুণের মধ্যে আরও আবদ্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা অনেক বেশী, সেইজন্য তোমার পথ আমি নেবো না। আমি সেই পথটাই নেব, যে পথে আমি যতটা পারলাম এগোলাম, না এগোতে পারলে আমি ছেড়ে দেব, কিন্তু তিনটে গুণ আমাকে বেশী করে আগের মত আবদ্ধ করতে পারবে না। প্রথম শর্ত হল আমাকে তিন গুণের পারে যেতে হবে। দ্বিতীয়, তিন গুণের পারে যদি নাও যাই, কোন পরিস্থিতিতে আমি যেন তিনটে গুণের মধ্যে আরও বেশি জড়িয়ে না পড়ি; এটাই ধর্ম। শিবের পূজার মন্ত্র, পূজার বিধি যদি দেখা হয়, সেখানে দেখা যাবে শিবের পূজা আমাকে তিনটে গুণের পারে নিয়ে যাচ্ছে। বিষ্ণু পূজা, রামের পূজা সব পূজাতে একই জিনিস হচ্ছে, মন্ত্র, আদর্শ আমাদের তিন গুণের পারে নিয়ে যাচ্ছে। জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, কর্ম এগুলো তিনটে গুণের পারে নিয়ে যায়, সেইজন্য এই জিনিসগুলোর সম্মান এত বেশী। যে পথ তিনটে গুণের পারে নিয়ে যায় না, বা সফল না হলে আরও আবদ্ধ করবে, সেই পথকে ভারত কখনই মানে না, গ্রহণ করা তো দূরের কথা।

এরপর থেকে স্বামীজী ভক্তির কথা বলতে শুরু করছেন, The Bhakti yogi realizes Brahman very soon and goes beyond the three qualities. (*ভক্তিযোগের দ্বারা সাধক অতি শীঘ্র ব্রহ্মোপলব্ধি করেন ও তিনি গুণের পারে চলে যান।*) স্বামীজী এখানে গীতা থেকে এনে দেখাচ্ছেন, কেউ যদি ভক্তিযোগের পথ অনুশীলন করে, সে সহজে তিন গুণের পারে চলে যাবে। চতুর্দশ অধ্যায়ে একেবারে স্পষ্ট করে ভগবান বলছেন, *মাঞ্চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে*।। যিনি ঐকান্তিক ভক্তিযোগ সহায়ে আমার অর্থাৎ সর্বভূতস্থ নারায়ণের সেবা করেন, তিনি এই তিনগুণকে অতিক্রম করে ব্রহ্মত্বলাভে সমর্থ হন। দ্বাদশ অধ্যায়েও ভগবান এই জিনিসটার উপর খুব জোর দিয়ে বলছেন। যাদের দেহবোধ আছে তারা অব্যক্তের উপাসনা করতে পারে না, তাদের জন্য দরকার ভক্তি। ভক্তি কিভাবে তিন গুণের পারে নিয়ে যায়, সেটাকে স্বামীজী এবার ব্যাখ্যা করছেন।

The will, the consciousness, the senses, desire, the passions, all these combined make what we call the soul. (*ইচ্ছা, চেতনা, ইন্দ্রিয়, বাসনা, রিপু, এইগুলো মিলিত হয়ে যা হয়েছে, তাকেই আমরা জীবাত্মা বলে মনে করি।*) আমরা যাকে সোল বলছি, জীবাত্মা বলতে যেটা বুঝি সেটাকেই আমরা আসল আমি বলে মনে করছি। এই আমিটা কিভাবে তৈরী হয়? গীতায় বলছেন, *ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ*, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত, চেতনা, এই জিনিসগুলি মিলে আমি তৈরী হয়। এটা কিন্তু শুদ্ধ আমি না, ঠাকুর যে কাঁচা আমির কথা বলছেন, এটাই সেই কাঁচা আমি। এই আমির মধ্যে ইচ্ছা রয়েছে, কামনা রয়েছে, হিংসা রয়েছে, আবার সুখ-দুঃখের বোধ রয়েছে ও চেতনাও রয়েছে। এই আমি অনেক রকম হয়। স্বামীজী বলছেন, There is first, the apparent self (body); second, the mental self who mistakes the body for himself (the Absolute bound by Maya); third, the Atman, the ever pure, the ever free. (*প্রথম হল প্রতীয়মান আত্মা (দেহ); দ্বিতীয়, মানস আত্মা – সে ঐ দেহটাকে আমি বলে মনে করে (এটি মায়াবদ্ধ ব্রহ্ম); তৃতীয়, যথার্থ আত্মা, যিনি নিত্যশুদ্ধ – নিত্যমুক্ত।*) তিনটে আত্মার কথা বলছেন, প্রথম হল পরাগ্ আত্মন্, বাইরের আত্মা, এটা হল দেহ। যখন ভিতরের দিকে আসে, যাকে বলা হয় প্রত্যগ্ আত্মা, সেটা আবার দুটো – প্রথমটা হল সেই জীবাত্মা যে এই স্থূল শরীরকে নির্মাণ করে। সাধারণ ভাবে আমরা সব সময় যে আত্মার কথা বলি, আসলে এটাই জীবাত্মা, মৃত্যুর সময় স্থূল শরীরটা ছেড়ে এই জীবাত্মাই বেরিয়ে যায়। যখন বলছি তোমার আত্মাকে কষ্ট দিও না, তখন আমরা এই জীবাত্মার কথাই বলছি। কিন্তু এই জীবাত্মারও পিছনে আছেন সেই অনন্ত, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, যিনি নিত্যশুদ্ধ, নিত্যমুক্ত। এই আত্মাই আসল আমি। তিনটেই আমি, দেহটাও আমি, জীবাত্মাও আমি আর শুদ্ধ, মুক্ত আত্মাটাও আমি। জীবাত্মার সঙ্গে একাত্ম থাকলে মানুষ সুখ-দুঃখ ভোগ করে, কিন্তু শুদ্ধ আত্মাতে পৌঁছে গেলে মানুষের কোন দুঃখ-কষ্ট কিছু থাকে না। দেহটা জড়, এর কোন চেতনা নেই, দেহের সাথে আত্মা জুড়ে গেলে

সেটাই হয়ে যায় দেহাত্মা, তবে দেহ কোন বোধ না পেলেও যা কিছ সব এই দেহ দিয়েই হয়। কাজকর্ম দেহ দিয়েই হয়, ভোগটাও দেহ দিয়েই হয়। দেহটাই তাই প্রধান হাতিয়ার, দেহ না থাকলে জীবাত্মা কিছু করতে পারবে না। এমনকি জীবাত্মা যখন কোন লোকে বা দেবলোকে গেলে দেবতাদের যে শরীর হয়, জীবাত্মাকে সেই রকম একটা শরীর ধারণ করতে হয়। যতক্ষণ জীবাত্মা কোন শরীর না পায় ততক্ষণ সে কোন কিছুই ভোগ করতে পারবে না। ঋষিরা বলে গেছেন তাই আমাদের মানতে হয়, এটাকে প্রমাণ করার কোন পথ নেই আর অপ্রমাণ করারও কোন উপায় নেই।

ঋষিরা বলছেন, যে পঞ্চ মহাভূত দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে, সেই পঞ্চ মহাভূত পুরোদমে আমাদের শরীরে রয়েছে। সেইজন্য এখানে এই শরীর দিয়ে সেইভাবে কাজ করা যায়, ভোগও সেই অনুসারে হয়। তাহলে কেন বলা হয় দেবতাদের ওখানে ভোগ অনেক সূক্ষ্ম হয়, আর অনেক তীব্র হয়? তার কারণ আমাদের শরীরে পঞ্চ মহাভূতের পৃথিবীর অংশ অনেক বেশী। স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, কুকুর যেভাবে আনন্দের সাথে মাংস খায়, মানুষ সেই ভাবে কোন দিন ভোগ করতে পারবে না। কিন্তু আমরা জানি মানুষের ভোগ ও আনন্দ অনেক তীব্র এবং অনেক সূক্ষ্ম। এর সহজ অর্থ হল, যিনি যত সূক্ষ্ম তার সুখ তত তীব্র। একদিকে পশুযোনি, আরেক দিকে মানবযোনি এবং অন্য দিকে দেবযোনি, এখানে পরিষ্কার বোঝা যায়, স্থূল থেকে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম থেকে আরও সূক্ষ্ম হচ্ছে। সেই যুক্তিতেই বোঝা যায় যে, দেবতাদের সুখ মানুষের থেকে অনেক বেশী হবে। কিন্তু আমরা যে ধরণের সুখ পাচ্ছি, দেবতাদের সেই সুখটা থাকবে না। যেমন একটা শূকর পাঁকের মধ্যে যে সুখ পায়, তাকে যদি পাঁক ছেড়ে দিতে বলা হয়, সে ছাড়তেই পারবে না। কিন্তু একবার যদি মানব শরীর পেয়ে যায়, তখন আর ঐ পাঁকের মধ্যে যেতে চাইবে না, কারণ এখন সে মিছরির পানার স্বাদ পেয়ে গেছে, চিটে গুড়ের পানাতে যেতে চাইবে না। একটা কুকুর বা শূকরের আনন্দের সাথে মানুষের আনন্দের যে তফাৎ, মানুষের আনন্দের সাথে দেবতাদের আনন্দের ঠিক ঐ রকমই তফাৎ। কিন্তু জীবাত্মার দেহ থাকতে হবে, দেহ না থাকলে, শুধু জীবাত্মা থাকলে সেখানে সুখ ভোগ হবে না, দুঃখ ভোগ হবে না, স্মৃতিটা শুধু থাকবে।

এরপর বলছেন, Seen partially, It is nature, seen wholly, all nature goes, even the memory of it is lost. (*তাঁকে আংশিক ভাবে দেখলে ‘প্রকৃতি’ বলে বোধ হয়, আবার তাঁকেই পূর্ণভাবে দেখলে সমস্ত প্রকৃতি উড়ে যায়; এমন-কি তাঁর স্মৃতি পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে যায়।*) আমরা যখন খণ্ডিত রূপে দেখি, তখন আমরা দেখি এটা জীব, এটা জগৎ, এটা ঈশ্বর। কিন্তু পুরোটাকে মিলিয়ে দেখলে এটাকেই ঈশ্বর রূপে দেখবে। বিজ্ঞান আর ধর্মে এখানেই তফাৎ। বিজ্ঞান ঈশ্বরকেও জগৎ রূপে দেখে, কিন্তু ধর্ম জগৎকেও ঈশ্বর রূপে দেখে। কারণ ঈশ্বর ছাড়া তো কিছু নেই, জগৎটাও ঈশ্বরেরই একটা রূপ। কিন্তু জড়বাদীদের কাছে, বিজ্ঞানীদের কাছে ঈশ্বর জড় বস্তুরই একটা আকার। স্টিফেন হকিং এত বড় বিজ্ঞানী, তিনিও বলছেন ঈশ্বর বলে কিছু নেই। নূতন কথা কি বলছেন। বিজ্ঞানীরা ম্যাটার ছাড়া তো আর কিছু জানে না। Material God বলে কখন কিছু হয় না, গড্ যদি হন তিনি স্পিরিচুয়ালই হবেন। সেটা বিজ্ঞানের কোন ক্যালকুলেশান, কোন অবজারভেশান, কোন ইক্যুয়েশান দিতে পারবে না। যেখানেই ইক্যুয়েশান রয়েছে, যেখানেই ক্যালকুলেশান রয়েছে, ওটা এই জগতের। তার মানে তুমি একটা অংশ দেখছ, অংশ দেখা মানেই জগৎকে দেখা, পূর্ণকে দেখা মানেই ঈশ্বরকে দেখা। যতক্ষণ মানুষ পূর্ণকে দেখতে না শেখে, ততক্ষণ মানুষ কোন দিন ঈশ্বরকে দেখতে পারবে না।

তার সাথে বলছেন, There is the changeable (mortal), the eternally changeable (nature), and the Unchangeable (Atman). (*প্রথম পরিণামী ও অনিত্য মরণধর্মী বা বিনাশশীল, দ্বিতীয় সদা পরিবর্তনশীল, কিন্তু প্রবাহরূপে নিত্য প্রকৃতি, তৃতীয় – কূটস্থ নিত্য আত্মা।*) পরিবর্তনশীল, যেমন জীব এখানে যাচ্ছে, সেখানে যাচ্ছে, আর সদা পরিবর্তনশীল, যেমন দেহ, সব সময় পাল্টাচ্ছে – দেহাত্মা, জীবাত্মা আর শুদ্ধাত্মা। এটাকে আরও উচ্চস্তরে নিয়ে যাচ্ছেন। Be perfectly hopeless, that is the highest state. What is there to hope for? (*আশা সম্পূর্ণ ত্যাগ কর, এই হল সর্বোচ্চ অবস্থা। আশা করবার আছে কি?*) সমস্ত আশা ত্যাগ কর, কোন কিছুর আশা করতে যেও না, কোন কিছুর উপর ভরসা করতে যেও না। কারণ জগতে আছেটা কি, যার আশা তুমি করছ? Burst asunder the bonds of hope,

stand on your Self, be at rest, never mind what you do, give up all to God, but have no hypocrisy about it. (*আশার বন্ধন ছিঁড়ে ফেল, নিজের আত্মার উপর দাঁড়াও, স্থির হও; যাই কর না কেন, সব ভগবানে অর্পণ কর, কিন্তু তার ভিতর কোন কপটতা রেখো না।*) পাওয়ার মত এই জগতে কিছু নেই। তুমি মনে করছ তোমার পাওয়ার অনেক কিছু আছে, তাই তোমার চোখে এতো জল, আর একটু কিছু পেয়ে গেল ঠোঁটের কোণে তোমার হাসি ফুটে উঠছে। যদি তুমি ঈশ্বরকে পেতে চাও, সব ছেড়ে দাও, সঙ্কল্প, আশা সব ছাড়ো। গীতায় ভগবান বলছেন, *সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যাক্ত্বা সর্বানশেষতঃ,* পূর্বসংকল্পজাত সব কামনা-বাসনা নিঃশেষে ত্যাগ কর। ত্যাগ করে তোমার উপর যত বন্ধন আছে সব ছিঁড়ে ফেল। এর মধ্যে কোন চালাকি, কপটতা যেন না থাকে।

তাহলে তুমি স্বস্থ হবে, স্বস্থ মানে নিজেতে অবস্থান করা। 'স্ব' মানে আমি, 'স্থ' মানে স্থিত থাকা, আমিতে স্থিত থাকা, এটাই স্বস্থ। স্বামীজী এটাই বলছেন, Swastha, the Sanskrit word for 'standing on your own Self', is used colloquially in India to inquire, 'Are you well, are you happy?' And when Hindus ould express, 'I saw a thing', they say, 'I saw a word-meaning (Padarth).' Even this universe is a 'word-meaning'. (*ভারতে কারও কুশল জিজ্ঞাসা করতে 'স্বস্থ' (যা থেকে স্বাস্থ্য কথাটি এসেছে) – এই সংস্কৃত শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। স্বস্থ শব্দের অর্থ – স্ব অর্থাৎ আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত থাকা। কোন জিনিস দেখেছি, এটা বুঝতে হলে হিন্দুরা বলে থাকে 'আমি একটা পদার্থ দেখেছি'। পদার্থ কি না পদ বা শব্দের অর্থ, অর্থাৎ শব্দপ্রতিপাদ্য ভাববিশেষ। এমন-কি এই জগৎপ্রপঞ্চ তাদের কাছে একটা পদার্থ অর্থাৎ শব্দের অর্থ।*) তুমি স্বস্থ তো? এই জগতে কেউই স্বস্থ না, কারণ নিজের মধ্যে কেউ-ই অবস্থান করছে না, সবাই অন্য কিছুর মধ্যে অবস্থান করছে। আমি শুদ্ধাত্মা কিন্তু জীবাত্মা রূপে বাস করি। আরও জঘন্য অবস্থা, দেহাত্মা রূপে ভোগ করি। তার থেকেও জঘন্য হল, গীতায় বলছেন, *অসক্তিরনভিসঙ্গঃ,* অভিসঙ্গ মানে, শুধু যে নিজের দেহের প্রতি আসক্তি আছে তা না; এই আমার স্ত্রী, এই আমার স্বামী, এই আমার পুত্র, এই আমার বাবা-মা, এই আমার বন্ধু, এই আমার কম্প্যুটার, এই আমার ফোন, এই আমার কুকুর, এখন পোষ্য ছাড়া জীবন চলে না, এত কিছুর সঙ্গে অভিসঙ্গ হয়ে আছে। তোমার দুঃখে আমার দুঃখ, তোমার সুখে আমার সুখ। নিজের দেহের আসক্তিতেই এত ঝামেলা, এবার আরও জঘন্য অবস্থায় পড়ে গিয়েছে, কত কিছুর প্রতি অভিসঙ্গ হয়ে আছে।

স্বস্থ মানে, প্রথমে যত কিছুর সাথে তোমার অভিসঙ্গ হয়ে আছে, সব কটাকে ছাড়ো, তারপর নিজের দেহের প্রতি আসক্তি ছাড়ো, জীবাত্মাকেও ছাড়ো, সব ছেড়ে তুমি আসল যেটা সেখানে গিয়ে স্থিত হও। ভারতে কারুকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে আপনি কি সুখী, আপনি স্বস্তঃ তো? অর্থাৎ তুমি আসল যেটা সেটাতে অবস্থিত কিনা? নাকি রোগ, শোকে গিয়ে বাস করছ? আমরা তো সব সময়ই রোগ শোকেই বাস করছি। কিন্তু আত্মাতে গিয়ে যে বাস করছে, তার কখন রোগ, শোক, মোহ হবে না। আগেকার দিনে উত্তরাখণ্ডে একটা প্রচলন ছিল, সাধুর সাথে সাধুর দেখা হলেই জিজ্ঞেস করবে, দর্শন সাফ্ হ্যায় না? সাধারণ ভাবে দর্শনের অর্থ করলে দাঁড়ায়, আপনার চোখ ঠিক আছে কিনা, কিন্তু এখানে এর অর্থ হল জীবনের যে দর্শন, ঐ দর্শনটা আপনার পরিষ্কার আছে কিনা, দর্শন সাফ্ হ্যায় না। তুমি সন্ন্যাসী হয়েছ, ঘরবাড়ি ছেড়েছ, ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু, এটাই তোমার জীবন দর্শন, এই ভাবটাকে ধরে রাখতে পারছ তো? সেই ভাবটা ঠিক আছে তো? জীবনের দর্শনটা ঠিক আছে কিনা।

স্বস্থের পর স্বামীজী পদার্থ নিয়ে আসছেন। And when Hindus would express, 'I saw a thing,' they say, 'I saw a word-meaning (Padarth).' Even this universe is a 'word-meaning', এটা একটা পেন, সাধারণ ভাষায় বলবে, এটা পদার্থ। পদার্থ হয় পদ আর অর্থ সন্ধি করে। পদ মানে শব্দ, আর অর্থ, তার মানে পদার্থ মানে একটা শব্দের অর্থ। সব বাচ্চাদের মনে জিজ্ঞাসা জাগে, আমি কোথা থেকে এসেছি, আমি কে। বাচ্চা বয়সে প্রশ্ন করার আগেই কাহিনীতে এসে শুনছি ভগবান আমাদের মাটি দিয়ে তৈরী করলেন। খ্রীশ্চানরা এখনও এই বিশ্বাসকে নিয়েই চলেছে। ভগবান কিভাবে আমাদের সৃষ্টি করলেন? কুমোররা যেভাবে মাটির ঘটি বাটি বানায়, সেইভাবে সৃষ্টি করলেন। ভগবানের কাছে বিশাল এক

মাটির ভাণ্ডার আছে, সেই মাটির ভাণ্ডার থেকে মাটি নিয়ে আমাকে, আপনাকে সবাইকে সৃষ্টি করলেন। কুমোররা মাটির তৈরী জিনিসগুলিকে আগুনে পুড়িয়ে ব্যবহারের উপযোগী করে দেয়। তেমনি ঈশ্বরও মাটি দিয়ে মানুষ তৈরী করে আগুনে দিয়ে ফিনিশিং দেবেন। এই নিয়ে একটা খুব মজার কাহিনী তৈরী হয়েছে, ভগবান প্রথমবার আগুনে দেওয়ার পর বেশী পুড়ে গেছে, ভগবান বার করে দেখলেন সব মানুষগুলো কালো হয়ে গেছে, তিনি সব কটাকে আফ্রিকাতে পাঠিয়ে দিলেন। এবার সাবধানে পোড়াবেন, কিন্তু একটু তাড়াহুড়ো করাতে কাঁচা অবস্থায় বার করে আনলেন, সব কটা সাদা রঙের থেকে গেছে, তিনি সেগুলোকে ইউরোপে পাঠিয়ে দিলেন। এবার ভগবান আরও সাবধান হয়ে গেলেন, অভ্যাস করতে করতে ভগবানের পারফেকশান এসে গেছে। এবার তৃতীয় বার উনুনে দেওয়ার পর ভারতীয়রা বেরিয়ে এলো। ভারতীয়রাই হলেন ভগবানের the best products। ভারতীয়রা কালোও না, সাদাও না, ব্রাউন। এই সব গল্প পড়ে পড়ে আমরা বড় হয়েছি, কিন্তু আসলে তো তা নয়।

তাহলে ভগবান কিভাবে সৃষ্টি করলেন? তিনি চিন্তা করলেন, সৃষ্টি হয়ে গেল। এই চিন্তাকে সংস্কৃতে বলা হয় শব্দ, প্রাচীন গ্রীক সভ্যতায় লোগোস বলা হত। আগেও আমরা বলেছি যে, শব্দের দুটি রূপ, একটা অন্তঃরূপ, আরেকটা বহিঃরূপ। দুটোকেই শব্দ বলা হয়। ইংরাজীতে এই দুটো ideas and words হয়ে যায়, কিন্তু common words হল লোগোস; তারই বহিঃরূপ হল স্থূল পদার্থ। পদের অর্থ কি? পদার্থ। ভগবান বললেন পেন, সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেল পেন। ভাব, শব্দ ও বস্তু, এই তিনটে আলাদা মনে হয়, কিন্তু তিনটেই এক। আমরা বলছি, বস্তু, কিন্তু বস্তুর একটা নাম পদার্থ, পদের অর্থ। যেমন ভাত, ভাত একটা আইডিয়া বা ভাব, ভাত আবার একটা শব্দ আর থালায় যখন ভাত দেওয়া হয় তখন ওটা একটা খাদ্য বস্তু বা পদ, ঐ পদের অর্থ হল ভাত। সেইজন্য আমরা বলি পদার্থ। স্বামীজী দেখাতে চাইছেন, শব্দ, শব্দের যে অর্থ আর তার যে জ্ঞান, সব এক। তিনটের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যদিও এগুলো খুব উচ্চস্তরের আলোচনা, কিন্তু মাঝখানে বলা হল, আমরা পারছি না বলে ছোটর সাথে আপোষ করে নেবো না, রামকে পেলুম না বলে শ্যামের সাথে ঘর করতে যাবো না।

A perfect man’s body mechanically does right; it can do only good because it is fully purified. The past momentum that carries on the wheel of body is all good. All evil tendencies are burt out, (*জীবনমুক্ত সিদ্ধ পুরুষের দেহ আপনা-আপনি ন্যায় কার্যই করে থাকে (তার দ্বারা অন্যায় কার্য হয় না)। তাঁর শরীর কেবল শুভ কার্যই করতে পারে, কারণ তা সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে গেছে। অতীত সংস্কাররূপ যে বেগের দ্বারা তাঁদের দেহচক্র পরিচালিত হয়ে থাকে, তা সব শুভ সংস্কার। মন্দ সংস্কার সব দগ্ধ হয়ে গেছে।*) ঠাকুর বলছেন, সিদ্ধ পুরুষের বেতালা পা পড়ে না। কারণ সাধনা করার সময় তিনি এত শুভ কর্ম করেছেন যে, রজোগুণ তমোগুণকে সত্ত্বগুণ দিয়ে এমন ক্ষীণ করে দিয়েছেন যে, তিনি সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন। এরপর তাঁর ঈশ্বর জ্ঞান হয়ে গেল, কিন্তু ঈশ্বর জ্ঞান হয়ে গেলেই যে তাঁর বেতালা পা পড়বে না, তা নয়। কিন্তু ভগবানকে পাওয়ার জন্য তিনি যে সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, যার ফলে তাঁর পুরো শরীরটাই শুদ্ধ সত্ত্বগুণের হয়ে যায়। ফলে তিনি আর কিছু অন্যায় কাজ করতে পারবেন না, কারুর ক্ষতি করতে পারবেন না, হিংসা করতে পারবেন না, তমোগুণে যেতে পারবেন না, কোন রজোগুণে যেতে পারবেন না। যে জিনিসটাকে দিয়ে তিনি সিদ্ধিতে পৌঁছালেন, সেই জিনিসটাই চলতে থাকে।

যীশু সব কিছু ছেড়ে ফাদার ইন হেভেনকে নিয়ে যখন সাধনা করলেন, এবং সিদ্ধির পর তাঁর সারাটা জীবন হয়ে গেল যোগের জীবন আর ফাদার ইন হেভেন। ভগবান বুদ্ধের সাধনাতেও একই জিনিস, সমস্ত ভোগের জীবন ত্যাগ করে যোগের জীবন নিয়ে সাধনা করলেন। জ্ঞানলাভের পর শরীর রাখার কোন দরকার থাকে না, কিন্তু শরীর যদি থেকে যায়, তখন শরীরটা মোমেন্টামে টেনে বেরিয়ে চলে যাবে। কতটা টানবে? নিউটনের first law of motion অনুযায়ী, জিনিসটা যে বেগে যাচ্ছে, ঐ রকমই চলতে থাকবে। যে ঈশ্বর লাভ করেছে, ঈশ্বর লাভের আগে তার যে মানসিকতা ছিল, ঈশ্বর লাভের পরেও সেই মানসিকতা নিয়েই সে চলবে। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভাঙে, স্বভাব পাল্টাবে না।

পরমপ্রেম বা ভক্তি একমাত্র ঈশ্বরের প্রতিই হয়

স্বামীজী এবার পুরোপুরি ভক্তিযোগের আলোচনা করতে একটা প্রচলিত কথা দিয়ে শুরু করছেন, বলছেন, 'That day is indeed a bad day when we do not speak of the Lord, not a stormy day'. (*সেই দিনকেই যথার্থ দুর্দিন বলা যায়, যে দিন আমরা ভগবৎ-প্রসঙ্গ না করি; কিন্তু যে দিন মেঘ-বৃষ্টি-ঝড় হয়, সেদিনকে প্রকৃতপক্ষে দুর্দিন বলা যায় না।*) এই ধরণের কথা আমরা অনেক পুস্তকে, আলোচনায় উল্লেখ পাই। কথাটা হল, যেদিন ঝড়-ঝঞ্ঝা হয় সেদিন কোন দুর্দিন নয়, সেই দিনটাই দুর্দিন যেদিন আমরা হরিনাম করতে পারি না। তারপরেই স্বামীজী বলছেন, ঠিক ঠিক ভক্তি হল ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণ প্রেম। ভক্তিকে পরিভাষিত করতে গিয়ে নারদ তাঁর ভক্তিসূত্রে বলছেন, *সা ত্বস্মিন্ পরম প্রেমরূপা*, ঈশ্বরের প্রতি পরম প্রেম – এটাই ভক্তি। স্বামীজী একটা বইকে অনুসরণ করে চলছেন না, তিনি নানা রকম বইকে অনুসরণ করে চলছেন। কিন্তু ভক্তির একটাই অর্থ – ঈশ্বরের প্রতি পরম প্রেম; যেখানে বলছে, আমি ঈশ্বরকে ভালবাসি, ঈশ্বর বৈ আমি আর কিছু জানি না, এটাই ভক্তি।

Love for any other thing, however great, is not Bhakti. (*অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি ভালবাসাকে, তিনি যত বড়ই হোন না কেন – ভক্তি বলা যায় না।*) মাঝখানে একটা কথা খুব উঠেছিল, বিজ্ঞান হল এক নূতন ধর্ম, কিন্তু বিজ্ঞান তো কখনই ধর্ম হতে পারে না; কারণ ধর্মের একটা নিজস্ব পরিভাষা আছে, যে পরিভাষাতে ধর্মের এই সংজ্ঞা হতে পারে না। ভক্তিরও একটা নিজস্ব পরিভাষা আছে। এই পরিভাষার বাইরে ভক্তির উপর অনেক রকম সংজ্ঞা দেওয়া হয়, কিন্তু সবই শাস্ত্রীয় পরিভাষার বাইরে। ধর্মের একটা মান ছিল বলে সবাই নিজের সাবজেক্টকে ধর্মের সাথে জুড়ে দিতে চাইত, যেমন বলা হত socialism is religion, human is religion, science is religion। আর এই জিনিসগুলিকে নিয়ে প্রচুর আলোচনা শুরু হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দাঁড়ালো যে, they cannot be religion। ঠিক তেমনি, ভক্তি একমাত্র ঈশ্বরের প্রতিই হয়। অন্য কারুর প্রতি ভক্তিকে ভক্তি বলা যায় না। ভালবাসা হতে পারে, কিন্তু ভক্তি ঈশ্বর ছাড়া আর কারুর প্রতি হতে পারে না।

The 'Supreme Lord' here means Ishvara, the concept of which transcends what you in the West mean by the personal God. (*এখানে 'পরম প্রভু' বলতে পরমেশ্বরকে বোঝাচ্ছে, তোমরা পাশ্চাত্য দেশে ব্যক্তিভাবাপন্ন ঈশ্বর (Personal God) বলতে যা বোঝ, তাকে অতিক্রম করে আছে এই ধারণা।*) শুনলে মনে হবে খুব সাধারণ কথা, কিন্তু এই ধরণের কথাগুলি খুব গভীর ভাবব্যঞ্জক। একটা বয়স থেকে আমরা যখন ঈশ্বরের কথা ভাবতে শুরু করি, তখন আমরা জানতাম ঈশ্বর সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করেন, আর তিনি মানুষের মতন একজন বড় কেউ, তিনি সব কিছুকে একজন রাজার মত নিয়ন্ত্রণ করছেন, তিনি একজন দয়াময় পুরুষ, ইত্যাদি। ঈশ্বরকে আমরা সেখানেই সীমাবদ্ধ করে দিচ্ছি। হিন্দু ধর্মেও কিছু কিছু মানুষ আছেন, যাঁরা বলেন ইনিই ঈশ্বর। বৈষ্ণবরা আগাগোড়া বলে আসছে, কৃষ্ণই একমাত্র ঈশ্বর, আর কেউ না। এগুলো হল, এই ধরণের চিন্তা কোথাও আমাদের Personal Godএ নিয়ে যায়। Personal God মানে, যেখানে বলছেন, ইনি ঈশ্বর, আর কিছু ঈশ্বর নয়। যেমন ভারতে দুই প্রধানমন্ত্রী হতে পারে না, দুই রাষ্ট্রপতি হতে পারে না, তেমনি ঈশ্বর দুই হতে পারেন না, সেইজন্য আমার ঈশ্বরই ঈশ্বর। ভারতবর্ষের আসল ধর্মে যেমনি ঢুকবে, তখন বলে, কৃষ্ণ অবশ্যই ঈশ্বর, সেই কৃষ্ণই শিব, সেই কৃষ্ণই নৃসিংহ, সেই কৃষ্ণই রাম, সেই কৃষ্ণই সব। Personal God আর Impersonal Godএ এই তফাৎ হয়ে যায়।

যে কটি বিদেশী ধর্ম আছে, পার্সি ধর্মই হোক, জুহুদি ধর্মই হোক, খ্রীশ্চান আর ইসলাম ধর্মই হোক, সব ধর্মের ঈশ্বর হলেন Personal God। Personal God মানে, ঈশ্বরকে কোথাও পরিভাষিত করে সীমিত করে দেওয়া হচ্ছে। ঈশ্বরকে পরিভাষিত করে দিলে অনেক রকম সমস্যা এসে যাবে। ঈশ্বর তখন হয়ে যান স্রষ্টা, হিন্দুদের ঈশ্বর কিন্তু স্রষ্টা নন। 'কিন্তু তা কি করে হবে, আমরা তো ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি, তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই বিষ্ণু, তিনিই মহেশ্বর, তিনিই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন'। 'ঠিকই শুনেছ, কিন্তু যখন তুমি মূল ধর্মে যাবে, তখন দেখতে পাবে, ঈশ্বর সৃষ্টি কার্য থেকে পুরোপুরি আলাদা'। সেইজন্য বলা হয় শক্তি সৃষ্টি করে। সেখানে বলা হয়, ঈশ্বরের শক্তি দিয়ে সৃষ্টি হয়, আরও গভীরে যখন যায় তখন বলা হয়, এই সৃষ্টিটা

মরুভূমিতে মরিচীকার জলের মত। মরুভূমিতে জল দেখা যাচ্ছে, ঐ জল দিয়ে মরুভূমির একটি বালিকণাকেও সিক্ত করা যাবে না, ঠিক তেমনি এই সৃষ্টি কখনই ঈশ্বরকে স্পর্শ করতে পারে না। সাপের মধ্যে বিষ আছে, কিন্তু বিষ সাপকে ছোঁয় না। ঈশ্বর, সৃষ্টি, সৃষ্টিকার্য যদি এ-ভাবে না হয়ে থাকে, তাহলে একটা বিরাট সমস্যা হয়ে যাবে; এই জগতের যা কিছু শুভ অশুভ হচ্ছে, সবটাই ঈশ্বরের উপর চলে যাবে, ঈশ্বর তখন সংসারী হয়ে যাবেন। আচার্য শঙ্কর গীতার ভাষ্য রচনা করতে গিয়ে তিনি এই পয়েন্টটাকে বারবার তুলে ধরেছেন। যদি এ-ভাবে না দেখা হয়, তাহলে কিছু ক্ষমতা ছাড়া এক সাধারণ আত্মা আর ঈশ্বরের মধ্যে কোন তফাৎ থাকবে না। ঈশ্বর তখন সংসারী হয়ে যাবেন, তখন শুভ কর্ম, অশুভ কর্মের বন্ধনে তিনি পড়ে যাবেন। যেখানেই ঘোর দ্বৈতবাদ চলে, অর্থাৎ যেখানে বলা হয়, আমার ঈশ্বরই ঈশ্বর, আর কোন সত্তা নেই, তখনই এই সমস্যা আসে। গল্প কাহিনীতে ঈশ্বরকে নিয়ে এই জিনিসগুলি আসতে পারে। যেমন ছোটবেলায় আমরা কাহিনী শুনতাম যে, নারদ একবার ভগবান বিষ্ণুকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, যার জন্য বিষ্ণুকে রাম হয়ে জন্ম নিতে হয়েছিল। বাচ্চাদের কাহিনী রূপে এগুলো ঠিক আছে। কিন্তু ধর্ম-দর্শন যখন আসে, সেখানে যদি ভগবান অভিশপ্ত হতে পারেন, সেই ভগবান ভগবান নন।

স্বামীজী এখানে পাশ্চাত্যের পার্সোনাল গডের ধারণাকে নিয়ে বলছেন। শব্দটা নির্দিষ্ট, পার্সোনাল গড্। এর অর্থ হল, ঈশ্বর আছেন, তিনি দেখছেন, তাঁর ইচ্ছাতে সব হচ্ছে। তাঁর ইচ্ছাতেই সব যদি হয়, তাহলে জগতে যত পাপকার্য সম্পাদিত হচ্ছে, সব পাপ ঈশ্বরের লাগার কথা। এত মানুষ মরছে, এর সব পাপ ভগবানের লাগবে। এত মেয়ের শীলহানি হচ্ছে, সব পাপ তাঁর লাগা উচিৎ। বিদ্যাসাগর বলছেন, চেঙ্গিস খাঁ এত লোককে কচু কাটা করল, ঈশ্বর তখন কি করছিলেন? পাশ্চাত্যে ঈশ্বরের যে পরিভাষা, তাতে ঈশ্বর পাপী হয়ে যান। যে ঈশ্বর পাপী হয়ে যান, সেই ঈশ্বর কিসের ঈশ্বর! আমরা এভাবে ঈশ্বরকে ভাবি না। আগেকার দিনে যাঁরা পণ্ডিত ব্রাহ্মণরা ছিলেন, যাঁরা ধর্ম-দর্শনকে নিয়ে সব সময় ডুবে থাকতেন, তাঁরা পরিষ্কার জানতেন, এভাবে ঈশ্বরকে পরিভাষিত করা যায় না, পাশ্চাত্যের ধারণা বা যে কোন দ্বৈতবাদীদের ধারণার সাথে আমাদের ধারণার তফাৎ আছে। তফাতটা সহজে বোঝানো যাবে না। একটা খুব স্থূল উপমা দিয়ে বোঝান যায়, মাঝে মাঝে আমরা এই উপমাটা নিয়ে আসি। বিদ্যুতের ট্রান্সফরমারে প্রাইমারি কয়েল আর সেকেণ্ডারি কয়েল থাকে। সেকেণ্ডারি কয়েলের সাথে প্রাইমারি কয়েলের কোন সংযোগ থাকে না। কিন্তু প্রাইমারি কয়েল থাকাতে সেকেণ্ডারি কয়েলে কারেন্ট এসে যায়। আমাদের ঘরে যে বিদ্যুৎ আসছে, আমরা মনে করি এই বিদ্যুৎ মাইথন থেকে আসছে। কিন্তু মাইথন থেকে আসছে না। আমাদের এই কারেন্ট বেলুড় সাব-স্টেশন থেকে আসে। বেলুড় সাব-স্টেশনে যে হাইটেনশান লাইন আসছে সেখানে তারের কোন লিঙ্ক নেই, মাঝখানে একটা গ্যাপ থাকে। চুম্বক যদি লোহার কাছে থাকে, বোঝা যাবে যে চুম্বক লোহাকে টানছে, কিন্তু দুটোর কোন লিঙ্ক নেই। ঠিক তেমনি, ইলেক্ট্রিসিটি একটা তারের জড়ানো কয়েলে আসছে, সেইজন্য বলা হয় স্টেপ আপ স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার। মাইথন ড্যাম যদি না থাকে, আমরা কিন্তু ইলেক্ট্রিসিটি পাবো না। কিন্তু মাইথন ড্যাম আমাদের সরাসরি কারেন্ট সাপ্লাই করে না, মাঝখানে গ্যাপ আছে। ঠিক তেমনি ঈশ্বর যদি না থাকেন সৃষ্টি থাকবে না। কিন্তু তিনি সরাসরি সৃষ্টি পরিচালনা করেন না।

এই যে পার্সোনাল গড, যেখানে আমরা ভগবানকে সীমিত করে দিচ্ছি, সেই ভগবানের প্রতি ভক্তি আর যাই হোক ওটা ভক্তি নয়। মা কালী পাঁঠা খাবেন, খেলে তিনি আমাদের উপর খুশী হয়ে আমাদের মঙ্গল করবেন। তাহলে হয় মা কালী ঈশ্বর নন, তা নাহলে আমাদের বুঝতে কোথাও ভুল হচ্ছে। সেইজন্য যখন উচ্চ দর্শনে যায়, সেখানে তখন অন্যান্য ধর্ম দাঁড়াতে পারে না। আজকের দিনে তাই বেদান্ত, বৌদ্ধ ধর্ম ধীরে ধীরে অনেক মানুষকে আকর্ষিত করছে। বুদ্ধি জাগ্রত হচ্ছে, প্রশ্ন করতে শুরু করেছে। অন্যান্য ধর্ম বিশ্বাসে চলে ঠিকই, কিন্তু বেদান্ত আর বৌদ্ধ ধর্ম বিশ্বাসের উপর চলে না, চলে প্রখর যুক্তিতে। এই যুক্তি ম্যাথামেটিক্যাল লজিকের মত শুষ্ক নয়। আমরা যখনই ভক্তির কথা বলি, আমরা মনে করি বিশ্বাস না থাকলে ভক্তি হবে না। কিন্তু একেবারেই তা না, ভক্তিকে প্রথমেই পরিভাষিত করে দেওয়া হয়েছে, শুদ্ধ চৈতন্য যিনি, ঈশ্বর যিনি, তাঁর প্রতি যে ভালবাসা, এটাই ভক্তি। তাঁকে আত্মা রূপেই দেখা হোক, ব্রহ্ম রূপেই দেখা হোক, ঈশ্বর রূপেই দেখা হোক, তাতে কিছু যায় আসে না। শুদ্ধ চৈতন্য ছাড়া অন্য কোন কিছুর প্রতি যদি আমাদের আস্থা থাকে, বিশ্বাস

থাকে, সেটা কখনই ভক্তি হবে না। ঠিক সেই রকম পার্সোনাল গডের প্রতিও যদি ভক্তি থাকে, এটা ভক্তি না। ভক্তি মানেই শুদ্ধ চৈতন্য, ঈশ্বরের প্রতি পরমপ্রেম।

এবার স্বামীজী ভগবানকে পরিভাষিত করছেন, 'He from whom this universe proceeds, in whom it rests, and to whom it returns, He is Ishvara, the Eternal, the Pure, The All-merciful, the Almighty, the Ever-free, the All-knowing, the Teacher of all teachers, the Lord who of His own nature is inexpressible Love'. (*'যা হতে এই জগৎপ্রপঞ্চের উৎপত্তি হচ্ছে, যাঁতে এর স্থিতি, আবার যাঁতে লয় হয় তিনিই ঈশ্বর – নিত্য, শুদ্ধ, সর্বশক্তিমান, সদামুক্তস্বভাব, দয়াময়, সর্বজ্ঞ, সকল গুরুর গুরু, অনির্বচনীয়-প্রেমস্বরূপ'।*) এই যে স্বামীজী ঈশ্বরের কি কি গুণ হয়, তার যে বর্ণনা করছেন, তিনি দয়াময়, তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি সর্বজ্ঞ, গুরুর গুরু; অন্যান্য ধর্মেও তো তাই বলছে। না, তফাৎ হয়ে যায়। আমরা যে পার্সোনাল গডের কথা বললাম, যেটা পাশ্চাত্যের ঈশ্বরের ব্যাপারে ধারণা, সেখানে মুসলমানদের ঈশ্বর আর খ্রীশ্চানদের ঈশ্বর, দুটোর তফাৎ হয়ে যায়; এরা ওকে মানবে না, ওরা একে মানবে না। আবার জুহুদিদের ধর্মে গিয়ে একটা তৃতীয় ঈশ্বর হয়ে যায়। আমাদের এখানে কোন সমস্যাই নয়, যিনি ঈশ্বর তিনি যে কোন রূপে আসতে পারেন, তাঁকে সীমিত করা যায় না। বাচ্চা বয়সে আমরা যে পূজা করতাম, সেখানে যে প্রতিমা থাকত, আমরা সেটাকেই ঈশ্বর বলে মনে করতাম। এই ধারণাটা বাচ্চা বয়সে ঠিক আছে, কিন্তু বুদ্ধির বিকাশের সাথে সাথে এই ধারণাকে ছেড়ে দিতে হয়। কথামৃতে মাস্টারমশাই ঠাকুরকে বলছেন, লোকেদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে, প্রতিমা ঈশ্বর না। ঠাকুর বলছেন, তুমি বোঝাবার কে? যাঁর সংসার তিনিই দরকার মনে করলে বুঝিয়ে দেবেন। কিন্তু এটা যে সত্য, এটাকে জানা দরকার; ঈশ্বরই আছেন, তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। সৃষ্টি সেখান থেকেই বেরোবে, তাঁর মধ্যেই অবস্থান করে আবার তাঁর মধ্যেই লয় হয়। খ্রীশ্চান ধর্মের বড় বড় চিন্তকরা এই ধরণের কিছু কিছু চিন্তা ভাবনা এনেছেন, এর জন্য কিছু শব্দও আনছেন, যেমন বলছেন, তিনি এর বাইরেও আছেন, তিনি এর ভিতরেও আছেন, ইত্যাদি। কিন্তু সাধারণের মধ্যে তাদের যেসব শাস্ত্র চলে, সেখানে এই চিন্তা-ভাবনাগুলি আসে না। তার সাথে এরপর আরও ঠেলতে থাকলে, তখন খুব উচ্চ সমালোচনায় দেখা যাবে ওরা দাঁড়াতে পারছে না। মুসলমানদের ক্ষেত্রেও তাই হয়, উচ্চ দর্শনে ঠেলে নিয়ে গিলে ওরা অনেক কিছুর উত্তর দিতে পারে না।

ভক্তিশাস্ত্রে যে ঈশ্বরের প্রতি পরমপ্রেমের কথা বলছে, সেই ঈশ্বরের মধ্যে এই গুণগুলি রয়েছে। তাঁর কোন পক্ষপাতিত্ব নেই, তিনি খ্রীশ্চানদের স্বর্গে পাঠাবেন আর বাকিদের সবাইকে নরকে পাঠাবেন, তা কখনই হয় না। ঠাকুরের ভক্তরা কখনই এই কথা বলবেন না যে, ঠাকুরের ভক্তরা স্বর্গে যাবে আর বাকিরা গোল্লায় যাবে। এখানেই পার্সোনাল গড্ আর আসল গডের তফাৎ হয়ে যায়। ওরা বলতে পারে, আমরা কেন তোমার কথা মানব? আমি জানি, আপনারা মানবেন না। স্বামীজী এখানে তাঁদেরকেই বলছেন, যাঁরা শুনবে। ধর্মের কথা সেইজন্য সবার কাছে মাইক বাজিয়ে বলা হয় না, যারা জানতে চায়, বুঝতে চায়, তাদেরকেই বলা হয়।

স্বামীজী আবার খ্রীশ্চান ধর্মকে আক্রমণ করে বলছেন, Man does not manufacture God out of his own brain; but he can only see God in the light of his own capacity, and he attributes to Him the best of all he knows. (*মানুষ নিজের মস্তিস্ক থেকে ভগবানকে সৃষ্টি করে না; তবে তার যতদূর শক্তি, সে সেইভাবে তাঁকে দেখতে পারে, আর যার যত ভাল ভাল ধারণা তাঁতে আরোপ করে।*) স্বামীজীর এটা একটা খুব মূল্যবান মন্তব্য। পাশ্চাত্যে এই ধরণের অনেক আইডিয়াস আছে। ফরাসী বিপ্লবের পর সব বড় বড় চিন্তাবিদরা নানা রকমের আইডিয়াস নিয়ে আসতে শুরু করলেন, তাদের বেশির ভাগেরই ধারণা হল, ঈশ্বর হলেন মানুষের মনের রচনা। ঈশ্বর আমার মনের সৃষ্টি নন, কিন্তু আমার মনের যা যা ক্ষমতা আছে, আমার শুভ যা কিছু আছে, সেগুলো আমি সব ঈশ্বরের উপরে চাপিয়ে দিই। আমরা সবাই জানি গঙ্গোত্রীর গোমুখ থেকে গঙ্গা বেরিয়েছে, কিন্তু পুরাণ বলছে, ভগবান বিষ্ণুর পাদপদ্ম থেকে গঙ্গা বেরিয়েছে। কিন্তু একটা বাচ্চা ছেলেও জানে গঙ্গা গোমুখ থেকে বেরিয়েছে। তাহলে হঠাৎ পুরাণ এই কথা বলছে কেন? এইজন্যই বলছেন, গঙ্গা হিন্দুদের কাছে প্রাণ। সাহেবরা এই দেশে প্রথম আসার পর যখন দেখল গঙ্গার প্রতি হিন্দুদের কী প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ভক্তি, আর গঙ্গার প্রতি হিন্দুদের শ্রদ্ধা ভক্তি কত প্রাচীন, এত প্রাচীন যে

বাল্মীকি রামায়ণেই গঙ্গাকে অনেক উচ্চমানের শ্রদ্ধার জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। শ্রীরামচন্দ্রকে যখন পরিচয় করানো হচ্ছে, তখন বলছেন, আপনার পূর্বজরা এই গঙ্গাকে নিয়ে এসেছেন। আর তখন থেকেই গঙ্গাকে পতিতপাবনী বলা হত। গঙ্গার প্রতি হিন্দুদের এত শ্রদ্ধা যে, ইংরেজরাও দেখে এমন অভিভূত হয়ে গেল যে, ঐ ১৭০০ সালে যত নামকরা চিত্রকর, লেখক ছিলেন, তাঁরা বিভিন্ন জায়গায় ঐ ছবি বার করতে শুরু করলেন, বিশেষ করে কাশীতে। আর যখনই কিছু লিখছেন, ইংরেজরাও লিখছেন – পতিতপাবনী। হিন্দুদের কাছে পবিত্র জলের মধ্যে যেটা শ্রেষ্ঠতম, সেটা গঙ্গা। গঙ্গা কোথা থেকে বেরিয়েছে? ভগবানের কাছ থেকে। ভগবান এমনই পবিত্র যে, যখন কোন শুদ্ধ পবিত্র জিনিস বেরিয়ে আসে, সেটা ভগবানের পা থেকে বেরিয়ে আসে।

জাতিপ্রথা নিয়ে হিন্দুদের যারা প্রচুর সমালোচনা করে, তারা বলে যে, পুরুষসূক্তমে শূদ্রদের অপমান করা হয়েছে। কিভাবে? পুরুষসূক্তমে বর্ণনা আছে, ভগবানের কোন কোন অংশ থেকে কি কি জিনিস বেরিয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, শূদ্ররা ভগবানের পা থেকে বেরিয়েছে। তাহলে গঙ্গাও ত অচ্ছ্যুৎ হওয়ার কথা, গঙ্গাকে তাহলে ফেলে দাও। সেটাকে নিয়ে কেউ আলোচনা করতে যেও না। আসলে এগুলো কিছুই না, এখানে বক্তব্যটা হল, আমার যেটা শ্রেষ্ঠতম হতে পারে, সেটা ভগবানের। গঙ্গা আমাদের শ্রেষ্ঠতম পতিতপাবনী, সেই গঙ্গা ভগবানের পা থেকে বেরিয়েছে। শ্রীশ্রীমায়ের জানার কথা নয় গঙ্গা কি, কোথায় বাংলার এক অজ গাঁ জয়রামবাটী, কোথায় গঙ্গা। কিন্তু ছোটবেলা থেকে মা গঙ্গা গঙ্গা করে আসছেন। হিন্দুরা যেখানেই থাকুক, পরম্পরা ভাবে সবাই গঙ্গার কথা শুনে আসছে, গঙ্গার জল পবিত্রস্বরূপ, গঙ্গা পতিতপাবনী। অন্যান্য ধর্মে একটা ছোট বই আছে, ঐ ছোট বইতে চারটে জিনিসকে যুক্ত করে বলা হয়েছে, সেখানেই সব শেষ। কিন্তু হিন্দু ধর্মে সব কিছু খোলা। গ্রামের বাচ্চারাও জানে, গঙ্গার জল আমার কাছে পবিত্র, গঙ্গাজল সব কিছুকে পবিত্র করে দেয়। এই ভাব, আর সেখান থেকে হচ্ছে, আমার শ্রেষ্ঠ জিনিস আমি ঈশ্বরকে অর্পণ করছি, বিশেষণ রূপে। বিদ্যাসাগরের সাথে কথা বলার সময় ঠাকুর বিদ্যাসাগরকে বলছেন, তোমার ভিতর দয়া আছে। দয়া একটা বিরাট গুণ, যে আমাকে ভালবাসে, আমি তার কাছে যাই, যাকে ভয় পাই, তার থেকে আমি দূরে থাকি। ভালবাসা হল আমার কাছে অমূল্য, সেইজন্য ভগবানকে আমি দেখব ভালবাসা রূপে। মাকে আমরা ভরসা করি, মাকে সেইজন্য ভালবাসি। ভগবানকে সেইজন্য দেখব মা রূপে। যাঁরা ন্যায়প্রিয়, ঠিক ঠিক বিচার করে রায় দান করেন, তাঁদের আমরা সম্মান করি, ভগবানকে সেইজন্য আমরা ন্যায়পরায়ণ মনে করি।

এখন যেমন যেমন আমাদের বয়স বাড়বে, আমাদের বুদ্ধিও তেমন তেমন বিকশিত হবে, যেমন যেমন বুদ্ধি বিকশিত হবে তেমন তেমন ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ধারণাও পাল্টাতে থাকবে। অন্যান্য ধর্মে এই পাল্টানোটা কখনই মানবে না। ওদের যেখান থেকে শুরু হয়, সেখানে গিয়েই শেষ হয়। ওরা কোন দিন evolve করতে চাইবে না। আমাদের এখানে প্রতিটি ক্ষণে evolve করে। একজন বয়স্ক মহারাজ ছিলেন, অনেক বয়স হয়ে গেছে, বেশি হাঁটাচলা করতে পারতেন না। দক্ষিণ ভারতে তাঁর পূর্বাশ্রম ছিল, এখানকার খাওয়া, পানীয় কোনটাই তাঁর শরীর নিতে পারত না। উনি বৃদ্ধ বয়সে সবাইকে বলতেন, 'ভাই এই শরীর দিয়ে জীবনে কত কি কাজ করলাম, কত লেকচার দিয়েছি, কত মানুষকে ঠাকুরের কাছে নিয়ে এসেছি। কিন্তু আজ এই বয়সে এসে আমার সমস্ত সম্বল ঢিলে হয়ে যাচ্ছে, এখন দেখছি মা ছাড়া আমাদের আর কোন গতি নেই'। মহারাজ এই বয়সে এসে অসহায় হয়ে যাচ্ছেন। এখন ওনার একটা আশ্রয় দরকার, মা হলেন সেই আশ্রয়, ঠাকুরকে এখন মা রূপেই দেখতে চাইছেন। তাহলে কি ঈশ্বরের কোন পরিবর্তন হচ্ছে? কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। পরিবর্তন যা হবার সেটা আমাদের মনের হচ্ছে। যেমন যেমন আমি উন্নত হচ্ছি তেমন তেমন ঈশ্বরের প্রতি আমার ধারণা পাল্টাচ্ছে।

স্বামীজী বলছেন, Each attribute is the whole of God, and this signifying the whole by one quality is the metaphysical explanation of the personal God. (*এই এক-একটি গুণই ঈশ্বরের সবটাই, আর এই এক-একটি গুণের দ্বারা সবটাকে বোঝনই বাস্তবিক ব্যক্তি-ঈশ্বরের দার্শনিক ব্যাখ্যা।*) পার্সোনাল গড্ যখন হয়, যার কথা মুসলমানরা বা খ্রীশ্চানরা বলে, তাতে কি হয়, আমরা যখন একটা গুণের কথা বলি, স্বামীজী বলছেন ঐ গুণটাতে ঈশ্বরের পুরোটাই দেখাচ্ছে। ঠাকুর খুব সহজ করে বলছেন, গরুর আমি লেজ ধরি, শিং ধরি, বাঁট ধরি, পেট ধরি, যাই ধরি না কেন, গরুকেই ধরা হয়ে যায়।

কিন্তু আমি যদি দুধ চাই তাহলে আমাকে বাঁট ধরতে হবে। ঈশ্বরের যে কোন একটা গুণকে ধরলে ঈশ্বরকেই ধরা হয়। সমস্যা হল মানুষ মনে করে যে ঈশ্বর এতটুকুই এর পরে আর কিছু না। ব্যক্তি-ঈশ্বর মানে এটাই, একটা যেটা ঈশ্বরের গুণ, যে একটা গুণ দিয়ে ঈশ্বরকে ধরা হচ্ছে। স্বামীজী এটাই বলছেন, একটা গুণ দিয়ে ধরা হলে, পুরোটাই ধরা হয়। কিন্তু আমরা মনে করি ঐ গুণটাই শেষ, তখন ব্যক্তি-ঈশ্বর হয়ে যায়। নৈর্ব্যাক্তিক-ঈশ্বর মানে, ঐ যে একটা গুণ দিয়ে ধরা হচ্ছে, ঐ গুণটাই অন্যান্য গুণের সাথে জড়িয়ে আছে। সেইজন্য বলা হয় সকলগুণনিধান।

Ishvara is without form yet has all forms, is without qualities yet has all qualities. (*ঈশ্বর নিরাকার, অথচ সব আকারে তিনি আছেন, ঈশ্বর নির্গুণ, অথচ তাঁর সব গুণ আছে।*) গীতাতেও ভগবান এই কথা বলছেন, ঈশ্বরের কোন শরীর নেই, হতে পারে না, অথচ সব শরীর তাঁর শরীর; তাঁর কোন গুণ নেই, কিন্তু আমরা যত রকম গুণের কথা ভাবতে পারি, সমস্ত গুণ তাঁর মধ্যে আছে। তার মানে, যত জীবজন্তু, পশু, পাখি, মানুষ আছে, সব শরীর তাঁর শরীর। আর সমস্ত জীবজন্তুর মধ্যে যে বিশেষ গুণ দেখতে পাওয়া যায়, সেই গুণগুলি তাঁরই গুণ। অন্য দিকে তিনি নিরাকার, নির্গুণ আবার আরেক দিকে তিনি সগুণ, সাকার। যিনি নির্গুণ নিরাকার, তিনিই সগুণ সাকার হয়ে দেখান। বেদের ভাষ্য লেখার সময় সায়নাচার্য এবং শঙ্করাচার্যও যে ভাষ্য রচনা করেছেন, সেখানেও তাঁরা এই জিনিসটার উপরেই আলোকপাত করছেন। সমস্ত শরীর, সমস্ত মন, তাঁরই শরীর, তাঁরই মন। As human beings, we have to see the trinity of existence – God, man, nature, and we cannot do otherwise. (*আমরা যতক্ষণ মানবভাবাপন্ন, ততক্ষণ ঈশ্বর, প্রকৃতি ও জীব – এই তিনটে সত্তা আমাদের দেখতে হয়। তা না দেখে থাকতেই পারি না।*) আমাদের মন তিনি এমন ভাবে নির্মাণ করে দিয়েছেন যে, আমরা কোন অবস্থাতেই তিনটেকে আলাদা ছাড়া দেখতেই পারব না। চেষ্টা করেও আমরা এই তিনটেক এক দেখতে পারব না। এক দেখাটাই আধ্যাত্মিকতা। আধ্যাত্মিকতা মানে হয়, to see the whole। মন মানেই, to see the part। বিজ্ঞান হোক, কলা হোক, যে কোন বিদ্যা, সব সময় অংশকে দেখে, পূর্ণকে কেউ দেখতে পারে না।

জ্ঞানীদের সম্বন্ধে ভক্তিমার্গীদের কয়েকটি প্রচলিত যুক্তি

But to the Bhakta all these philosophical distinctions are mere idle talk. (*কিন্তু ভক্তের পক্ষে এই-সকল দার্শনিক পার্থক্য বাজে কথা মাত্র।*) He cares nothing for argument, he does not reason, he 'senses,' he perceives. (*সে যুক্তি বিচার গ্রাহ্যই করে না, সে বিচার করে না – সে দেখে, প্রত্যক্ষ অনুভব করে।*) ভক্তের কাছে কিছুই লাগে না, কোন প্রয়োজনই নেই তাঁর। ঠাকুর বার বার বলছেন, তোমার কথা কি শুনব, আমি তো এই রকম দেখেছি। আমার ভিতরে ভাব আসছে, আমি দেখছি জিনিসটা এই রকমই, তখন তর্ক করতে কেন যাবো! He wants to love himself in pure love of God, and there have been Bhaktas who maintain that this is more to be desired than liberation, who say, 'I do not want to be sugar; I want to taste sugar; I want to love and enjoy the Beloved. (*সে ঈশ্বরের শুদ্ধ প্রেমে আত্মহারা হয়ে যেতে চায়; আর এমন অনেক ভক্ত হয়ে গেছেন, যাঁরা বলেন, মুক্তির চেয়ে ঐ অবস্থাই অধিকতর বাঞ্ছনীয়। যাঁরা বলেন, 'আমি চিনি হতে চাই না, চিনি আস্বাদ করতে চাই' – আমি সেই প্রেমাস্পদকে ভালবাসতে চাই, তাঁকে সম্ভোগ করতে চাই।*) আমরা হলাম অতি সাধারণ, ঠাকুরের ভাষায় পচা কাঠ, একটা কাক বসলেও ডুবে যায়। কোন রকমে নিজে ভেসে চলেছি। আমাদের কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, আপনি যে এত লেকচার দিয়ে যাচ্ছেন, এই ব্যাপারে আপনার কোন ধারণা আছে? সত্যিই কোন আইডিয়া নেই। আমরা দেববাণীর ব্যাখ্যা করতে এসেছি, যেমনটি বুঝেছি, সেই রকম ব্যাখ্যা করে যাচ্ছি। সেইজন্য ঈশ্বরের যে কোন কথাই যখন আমরা বলব, তখন বলব, বেদ মতে, গীতার মতে, ঠাকুরের মতে, আমার মতে নয়। অন্যান্য ধর্মে, যেমন বাইবেলের কথাতে বলা যায়, বাইবেলে যদি একটা ঈশ্বরের বর্ণনা থাকে, লোকেদের বলার সময় যারা এই বর্ণনার কথা বলবে, তারা বলবে না যে বাইবেলের মতে ঈশ্বর এই রকম। তারা বলবে, ঈশ্বর এই রকম। এই তফাৎটা হয়ে যায়।

যে কোন ধর্মে গেলে দেখা যাবে, যারাই ধর্মের কথা চারিদিকে বলে বেড়ায়, তাদের বেশীর ভাগেরই কোন অনুভূতিই নেই। যারা ধর্মের নামে মারামারি করে যাচ্ছে, তা যে কোন ধর্মেরই হোক, হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, খ্রীশ্চান হোক, যেই হোক, উপলব্ধি কারুরই নেই। কিন্তু এতটুকুও বলার মুরদ নেই যে বলবে, আমি এই কথাটা অমুক জায়গা থেকে নিয়েছি। স্বামীজী এখানে বলছেন, ভক্তরা বলে যে, জ্ঞান থেকে ভক্তি অনেক শ্রেষ্ঠ। এই কথাকে কে বিচার করবে? ভক্তিশাস্ত্র পড়ে বলবে, জ্ঞানী কিছুই না, ঠাকুরও বলছেন, জ্ঞান ভগবানের বৈঠকখানা পর্যন্ত যেতে পারে, কিন্তু ভক্তি অন্তঃপুর পর্যন্ত চলে যেতে পারে। আবার জ্ঞানীরা ভক্তিকে ফু মেরে উড়িয়ে দেবে। ভক্তকে বলবে, তোমার সবটাই মনের কল্পনা, সবাটাই মায়া। জ্ঞানীরা ভক্তদের তাই পাত্তাই দিতে চাইবে না। কিন্তু আমাদের মত সাধারণ লোক এইসব কথার বিচার কি করে করবে! করা সম্ভব নয়। স্বামীজী এই বিতর্কে যাচ্ছেনই না। স্বামীজী বলছেন, এমন এমন ভক্ত আছেন, যাঁরা বলেন জ্ঞান থেকে ভক্তি অনেক শ্রেষ্ঠ, আর বলেন, আমি চিনি হতে চাই না, আমি চিনি খেতে চাই। চিনির এই কোটেশান ঠাকুরের নয়, এটা রামানুজের পরম্পরা থেকে এসেছে। মজার ব্যাপার হল, আমি চিনি হতে চাই না যখন বলছেন, সেখানে কিন্তু অদ্বৈত বেদান্ত একবারও বলছে না যে, তুমি চিনি হবে; কারণ সেখানে তুমি থেকে যাচ্ছে। তখন আমি, চিনি, এই শব্দগুলিই আসবে না। তবে ভক্তির দিক থেকে যেটাই বলা হবে, সেখানে 'আমি' সব সময় থেকে যায়। যেহেতু আমিটা থেকে যায়, সেইজন্য ভক্ত বলবে, আমি ঈশ্বরের লীলা আস্বাদ করতে চাই, আমার প্রেমাস্পদকে ভালবাসতে চাই, তাঁকে সম্ভোগ করতে চাই। বাচ্চা যেমন বলে, আমার মা ছাড়া কিছু লাগবে না, ভক্তও সেই রকম বলে, আমার প্রেমাস্পদকে ছাড়া আমার কিছু লাগবে না। তোমার জ্ঞান শ্রেষ্ঠ হতে পারে, তোমার যোগ শ্রেষ্ঠ হতে পারে, কিন্তু আমার ওসব লাগবে না, আমি তাঁকে ভালবাসি, আমি তাঁকে নিয়েই থাকতে চাই।

এখানে আমরা সাধারণ মানুষ, ঠাকুর চিনির পাহাড়ে পিঁপড়ের কথা বলছেন, আমরা সেও পিঁপড়েও না। আমাদের মুখে তাই এইসব কথা শোভা পায় না, শাস্ত্রে ওনারা বলেছেন, ঠাকুরও বলেছেন, আমরা তাই মেনে আসছি। যেমনি এগুলোকে নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাটি করতে যাবো, তখন দেখা যাবে এই আচার্যের কথার সাথে সেই আচার্যের কথা মিলছে না, একজন আচার্য যেটা বলছেন, অন্য একজন আচার্য এসে যুক্তি দিয়ে তাঁর কথাকে কেটে দিচ্ছেন। আসলে এগুলো কিছুই না, যার যে ভাব, সে সেটাকে শ্রেষ্ঠ মনে করে। যুক্তিতর্ক দিয়ে এটাকে কোন দিন পরিষ্কার করা যাবে না। ঠাকুর বলছেন, অদ্বৈত শেষ কথা, আবার বলছেন, ভক্ত অন্দরমহল পর্যন্ত যেতে পারে। এসবের মধ্যে গিয়ে আমাদের কোন লাভ নেই, কোন মীমাংসা হয় না। একটাই কথা, যার যা ভাব সেটাই তার কাছে শেষ কথা। স্বামীজীও তাই বলছেন, এমন ভক্ত আছেন, যাঁরা বলেন জ্ঞান থেকেও ভক্তি শ্রেষ্ঠ। কারণ, ভক্তরা বলেন, যাঁর যিনি ইষ্ট, তিনি চাইলে তাঁর ভক্তকে জ্ঞান দিয়ে দিতে পারেন, মুক্তিও দিয়ে দিতে পারেন। জ্ঞানীরা কোন দিনই ভক্তি পাবে না। এটাই ভক্তিমার্গের প্রধান যুক্তি।

প্রথম যুক্তি ওনারা নিয়ে আসেন, ভক্তি পথ সহজ পথ। গীতায় ভগবান বলছেন, যাঁরা জ্ঞানের পথ নেন তাঁদের পথ কঠিন এবং শুধু কষ্টই কষ্ট। দ্বিতীয় যুক্তি, আমি যদি ইষ্টকে পেয়ে যাই, তিনি চাইলে আমাকে জ্ঞান দিতে পারেন, মুক্তিও দিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু জ্ঞানী কোন দিন ভক্তি পাবে না। এটা ভক্তদের যুক্তি। কিন্তু জ্ঞানীর কেন ভক্তি হবে না, আজ পর্যন্ত এর যুক্তিটা বোঝা যায়নি। কারণ আমরা শঙ্করাচার্যকে জানি, যিনি অদ্বৈত বেদান্তের প্রবক্তা, অথচ সুললিত ছন্দে ভক্তিরসে ভরপুর যত ভক্তিমার্গের স্তব আছে, তার বেশির ভাগই শঙ্করাচার্যের রচনা। ঠাকুরকে যেমন বলা তিনি একাধারে জ্ঞানী ও ভক্ত। শুকদেবকে ঠাকুর বলছেন, শুকদেবের মত জ্ঞানী হয় না, অথচ ভক্তিমার্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর গ্রন্থ ভাগবত শুকদেব পরীক্ষিৎকে ব্যাখ্যা করছেন। কি করে যে জ্ঞানী আর ভক্তের তফাৎ হয় আর কি করে যে জ্ঞানীর ভক্তি হয় না, সত্যিই বোঝা যায় না। ভক্তিমার্গের গ্রন্থগুলি যাঁরা রচনা বা ব্যাখ্যা করেন, মনে হয় তাঁরা যেন কোথাও ইমোশানের অধীনে চলে যান। যাঁরাই ইমোশান দিয়ে পরিচালিত হন, তাঁদের বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে যায়। স্বামীজীও তাই এসবের মধ্যে না গিয়ে শুধু বলে দিচ্ছেন, ভক্তরা এই রকম বলেন।

আমাদের মূল গ্রন্থগুলি, বেদ, উপনিষদ, গীতা বলছেন, ভগবানকে যে যেমন ভাবে চায় ভগবান তাকে সেইভাবে কৃপা করেন। তাহলে ভক্তি এভাবে কেন জ্ঞানীদের সম্বন্ধে বলে? বা জ্ঞানীরাই বা কেন ভক্তদের নীচু

দৃষ্টিতে দেখে? আজকে বিজ্ঞানের বিরাট সম্মান, কিন্তু নিউটন যখন মডার্ন সাইন্স নিয়ে এলেন, অর্থাৎ যেখানে তিনি ইক্যুয়েশান ঢোকালেন; তখন অনেকেই নিউটনকে খুব তাচ্ছিল্য করতে শুরু করল। তখন পর্যন্ত বিজ্ঞান মানে ফিলজফি, সেখানে তুমি একটা দুটো ইক্যুয়েশান দিলে ঠিক আছে, কিন্তু এত ইক্যুয়েশান তারা মানতে চাইছিল না। গ্যালিলিওদের কেউ ফিলজফিতে ধরত না, ওরা বিজ্ঞানী, কিন্তু নিউটন বিজ্ঞানী হলেও ওরা তাঁকে ফিলজফির লোক বলে মনে করত, কিন্তু তিনি এটা কি করছেন! কিন্তু নিউটন এত পাওয়ারফুল লোক ছিলেন যে, আর সব কিছুতে ওনার এত অবদান যে, কেউ টুকটাক কিছু প্রশ্ন তোলা ছাড়া বেশী কিছু করতে পারেনি। বিজ্ঞানের থেকে তখন শ্রেষ্ঠ ছিল ফিলজফির লোকেরা।

আবার আজ থেকে ষোল সতেরশ বছর আগে ইউরোপের চার্চগুলিতে সৈন্যদের ঢুকতে দেওয়া হত না, কারণ যীশু হিংসা করতে নিষেধ করেছেন, সৈন্যরা হিংসা করে। সৈন্যরা তাই পিছনের একটা দরজা দিয়ে মুখ লুকিয়ে চার্চে ঢুকত, সারমন শুনে আবার পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেত। যীশু হিংসা করতে বলেননি, তোমরা তাই সম্মান পাবে না। কিছু দিন আগেও সার্জনদের নাপিতদের মত সম্মান দেওয়া হত, কারণ আগেকার দিনে নাপিতরাই সার্জারি করত। বেদের সময় থেকে ভারতে বৈদ্যরা ছিল উপহাসের পাত্র। সমাজে বিভিন্ন পেশার সম্মান, অবজ্ঞা এগুলো পাল্টাতে থাকে। সেইজন্য কে শ্রেষ্ঠ, কে নগণ্য কেউ ঠিক ঠিক বলতে পারে না। যে যখন শক্তিশালী হয়ে যায়, বিশেষ করে যারা রাজ ক্ষমতার আনুকল্য পায়, তখন বাকিদের বিদ্রুপ করে। বংশে যদি কেউ খুব বড় কিছু হয়ে গেলে, সে বলতে শুরু করে আমি তোমাদের বংশ থেকে উঁচু। বেদান্তের বংশে থেকে থেকে অনেক মহাপুরুষরা এসেছেন, ভক্তিমার্গেও এসেছেন। বংশে যেমন কেউ বড় হয়ে গেলে, তাকে আশ্রয় করে অন্যদের অহঙ্কার হয়ে যায়। যে যেমন শক্তিশালী হয়ে যায় সে তখন অপরকে দাবাতে চাইবে। অন্য দিকে অন্যান্য ধর্মের তুলনা হিন্দু ধর্মের সিস্টেম খুব আলগা। একেবারে খুব কঠোর ভাবে যে বলবেন, জিনিসটা এই, এর চেষ্টা অনেকে করেছেন; যেমন মনু যখন স্মৃতি প্রণয়ন করলেন, তিনি সব কিছুকে একটা জায়গায় বেঁধে দিতে চেষ্টা করলেন, তোমাকে এই এই করতে হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও হয়নি। একটা হল যার যখন ক্ষমতা তখন সে নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করে, দ্বিতীয় হিন্দু ধর্মের centralized কোন অথরিটি নেই আর তৃতীয় হল বইএর সেই রকম যোগান নেই। ফলে যে যেখানে আছে, সে সেখানে মনে করছে আমরা শ্রেষ্ঠ। ঠাকুর যখন বিভিন্ন মতের কথা বলছেন, যাদের সাথে তিনি ঘর করেছিলেন, সেখানে একটা জিনিস খুব পরিষ্কার দেখা যাবে, এরা যখন নিজেদের মহৎ বলছে, সেখানে তখন অজ্ঞতা একটা বিরাট ভূমিকা পালন করছে। অপরের মতকে জানে না বলে নিজের মতকে বিরাট বলে মনে করছে। মানুষ যতক্ষণ না অন্য দেশ দেখছে, ততক্ষণ মনে করে আমার দেশের সব কিছুই ভাল। ঠিক তেমনি যারা নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যেই আছে, তারা মনে করে এটাই শ্রেষ্ঠ, এর বাইরে আর কিছু নেই। কুয়োর ব্যাঙের মত। অজ্ঞতা ছাড়া এর অন্য কোন কারণ নেই। অজ্ঞতার সাথে আরেকটা বড় কারণ, হিন্দু ধর্মের কোন centralized authority নেই। খ্রীশ্চানরা বলে আমরা বাইবেলকে আধার করে বলছি, মুসলমানরা বলবে আমি কোরাণকে আধার করে বলছি। আর এখানে বলবে, আমি শাস্ত্রই পাল্টে দিচ্ছি। সুফিদের সাথে মুসলমানদের যে লড়াই, তার কারণ সুফিরা বলছে, কোরাণে মহম্মদ যা বলেছেন, এগুলো আল্লার কথা ঠিকই, কিন্তু এগুলো সাধারণের জন্য। কিন্তু যেগুলো আসল আল্লার কথা, সেগুলো মহম্মদ তাঁর বাড়ির সামনে যে দরবেশরা বসে থাকতেন, শুধু তাঁদেরকেই বলেছেন। সুফিরা বলে, মহম্মদের সেই শিক্ষা আমাদের কাছে আছে, সেইজন্য আমরাই শ্রেষ্ঠ। মুসলমানরা মানবে না, তোমরা শ্রেষ্ঠ বলছ তো, ঠিক আছে, এই বলে সুফিদের গলা কেটে দিয়ে সব সমস্যা মিটিয়ে দিল। কোন ঝামেলাই আর রাখল না। ভারতবর্ষে এই ধরণের কোন কিছু হয়নি। এখানে একটু তর্কাতর্কি, ধস্তাধস্তি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু একাধারে সবার গলা কেটে রেখে দেবে, এই জিনিস এখানে কল্পনাই করা যায় না। ছাপাখানা এসে গেছে, শাস্ত্রের বই যে কেউ হাতে পেয়ে যেতে পারে, তারপর অন্যান্য ধর্মের সাথে মতের আদানপ্রদান হচ্ছে, যার ফলে এখন বুঝতে পারছে, আমি যে সর্বশ্রেষ্ঠ তা নয়। কিন্তু শেষ কথা হল, স্বামীজী আসার পর বেদান্ত গ্ল্যামারাস হয়ে গেছে। স্বামীজীর মত কোন পুরুষ যেমনি ভক্তিমার্গে এসে যাবেন, তখন বেদান্ত আবার পিছিয়ে যাবে। জগৎ এভাবেই চলতে থাকবে। যে কোন সিস্টেমের গ্ল্যামারের জন্য দরকার, সেই সম্প্রদায়ে একজন বড় কোন মহাপুরুষকে আসতে হবে, আর তাঁর শিষ্যদেরও সেই রকম মেধাবী হতে হবে।

বেদান্তে অনেক বড় বড় মহাপুরুষরা এসেছেন, সেইজন্য বেদান্তের সম্মান বেশী। যাই হোক, আমরা আবার দেববাণীর মূল আলোচনায় ফেরত যাচ্ছি।

ভক্তিযোগে যেটা বিশেষ প্রয়োজন - মানুষ কখন ঈশ্বরের অন্বেষণ করে

এতক্ষণ স্বামীজী কিছুটা গীতা, কিছুটা নারদীয় ভক্তিসূত্র বা কিছুটা ভাগবত থেকে নিয়ে সবটাকে মিলিয়ে মিশিয়ে নিজের মত করে ভক্তি সম্বন্ধে বললেন। এরপর স্বামীজী ভক্তি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলছেন, In Bhakti Yoga the first essential is to want God honestly and intensely. (*ভক্তিযোগে বিশেষ প্রয়োজন হল, অকপটভাবে ও প্রভলভাবে ঈশ্বরের অভাব বোধ করা।*) আমরা মনে করি ঠাকুর যেকালে বলে গেছেন ভক্তি পথ সহজ পথ, সেকালে আমরা ভক্তির দিকেই যাব। কিন্তু যারা ঠিক ঠিক ভক্তি চাইছে, তাদের জন্য প্রথম দরকার ঈশ্বরের জন্য একটা গভীর অভাব বোধ। ঠাকুর যেমন বলছেন, মাইরি বলছ আমি ঈশ্বর বৈ কিছু জানি না। আবার কথামৃতে বলছেন, লোকেরা এত এত জপ করে, কিন্তু কিছুই হয় না কেন! কারণ সেই গভীর ভাবে ঈশ্বরকে চাওয়ার ব্যাপারটা নেই, আমি এটাই চাইছি এই তীব্র ব্যাকুলতা আর ওতেই নিজেকে পুরোপুরি ঢেলে দেওয়াটা থাকে না। এখানে লোক দেখানোর কিছু নেই, হয় তুমি চাও, আর না হলে তুমি চাও না। আমরা সবাই কোথাও না কোথাও থেকে দীক্ষা নিয়েছি, আমাদের যদি কেউ একটু কষ্ট দিয়ে দেয়, তখন আমাদের মনের মধ্যে যে কী মাত্রায় ক্রোধ জন্ম নেয়, ভাবতেই পারি না। ক্ষমতা থাকলে আমি তার সর্বনাশ করে ছাড়ব। আর ক্ষমতা যদি না থাকে, তখন অভিশাপের পর অভিশাপ দিয়ে যেতেই থাকি। জীবনে দুঃখ-কষ্ট হলে আমরা কত চোখের জল ফেলি, আমার এই হল না, আমার সব চলে গেল বলে কত হা হুতাশ করি। এই তীব্রতার এক শতাংশও ঈশ্বরের প্রতি কি আমাদের আছে? এত সহজ না, ভক্তি খুব সহজ পথ এগুলো মুখে বলা খুব সোজা।

কারণ We want everything but God, because our ordinary desires are fulfilled by the external world. So long as our needs are confined within the limits of the physical universe, we do not feel any need for God; it is only when we have had hard blows in our lives and are disappointed with everything here that we feel the need for something higher, then we seek God. (*আমরা ঈশ্বর ছাড়া আর সবই চাই, কারণ বহির্জগৎ থেকেই আমাদের সব চাহিদা পূর্ণ হয়ে থাকে। যতদিন আমাদের প্রয়োজন বা অভাববোধ জড়জগতের ভিতরেই সীমাবদ্ধ, ততদিন আমরা ঈশ্বরের জন্য কোন অভাববোধ করি না; কিন্তু যখন আমরা এই জীবনে চারদিক থেকে প্রবল ঘা খেতে থাকি, আর ইহজগতের সকল বিষয়েই হতাশ হই, তখনই উচ্চতর কোন বস্তুর জন্য আমাদের প্রয়োজনবোধ হয়ে থাকে, তখনই আমরা ঈশ্বরের অন্বেষণ করে থাকি।*) আমাদের মন সংসার নিয়েই আছে, মন মানেই সংসার, সেই কারণে বলা হয়, সত্তা দুটি মন আর আত্মা। সেইজন্য আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে না থাকলে তাকে আবার সেই সংসারে অর্থাৎ মনের জগতেই নামতে হয়। তিনি অবতারই হন, বড় মহাত্মাই হন, থাকতে হবে এই সংসারেই। ঠাকুর অবতার, কিন্তু একজন বাঙালী ব্রাহ্মণের আচরণের বাইরে তিনি কোন দিন গেলেন না, যেতেও পারলেন না। শ্রীশ্রীমা, তাঁকে আমরা জগজ্জননী বলছি, ভগবতী বলছি, আরও কত কিছু বলছি, কিন্তু তিনি এক ব্রাহ্মণী বিধবা নারীর আচরণের বাইরে এক চুলও কিছু করেননি। বলছেন, শরতও আমার ছেলে, আমাজাদও আমার ছেলে, সেই মা শেষের দিকে বলছেন, মেম নার্সরা আমার ঘরে জুতো পায়ে খট্ খট্ করে ঘুরবে হবে না, আবার পাউরুটি খাওয়ার ব্যাপারে বলছেন, এই শেষ বয়সে আমাকে আর তোমরা মুসলমানী রুটি খাইয়ো না। যে গুণকে আধার করে এনারা শরীর ধারণ করে থাকেন, ঐ গুণ শেষ পর্যন্ত থাকবে।

মন হল জড়, এর উপর আগে আমরা অনেকবার আলোচনা করেছি। এই পেন যেমন জড়, মনও সেই রকম জড়। এই পেনের উপর বাহ্যিক শক্তি যেভাবে কাজ করে, মনের উপরেও সেই ভাবে বাহ্যিক শক্তি কাজ করতে পারে। মনের কামনা-বাসনা গুলিও বাহ্যিক শক্তি। এগুলোও জড়। ফলে কামনা-বাসনা পূরণের জন্য মন বহির্জগৎ থেকেই পদার্থ সংগ্রহ করে। মন এখন অবসাদগ্রস্ত, চলো কোথাও ঘুরে আসি, বা চলো ইন্টারনেটে একটা সিনেমা দেখে নিই। এগুলো ঠিক মত করে নিতে পারলে আমাদের জীবনের যা যা দরকার

সব মিটে যায়। ফলে ভগবানের আর দরকার হয় না। ভগবানের দরকার তখনই হবে, যখন বলবে তপ্তশিরোবৎ; মাথার চুলে আগুন লেগে গেছে, আমার এখন আর কিছু করার নেই, কোথায় জল, কোথায় একটা জলাশয়, সেদিকে দৌড় লাগাবে। ঐ অবস্থায় না এলে ভগবানের দিকে মন যায় না। আর একটু বিচার করে যদি দেখা হয়, আমরা দেখি যে, চাহিদা ছাড়া আমরা ঈশ্বরের কাছে যাই না। কখন সখনও যদি কোন আশ্রম বা মন্দিরে পৌঁছে যাই, সেখানেও আমাদের চাহিদার একটা লম্বা তালিকা থাকে। কিন্তু আমরা ভাল করেই জানি যে, এই চাহিদাগুলো সংসার থেকেই পুরণ হয়ে যেতে পারে। আমাদের বিশ্বাস যে সাধু মহাত্মারা একটু আশীর্বাদ করে দিলেই আমাদের সব সমস্যা মিটে যাবে। কিন্তু রোগ শোক এগুলো সব জগতের জিনিস, এই জগৎ থেকেই এর সমাধান হয়। এখন কদাচিৎ কারুর অন্য রকম হয়ে থাকলে, সেটাকেই আমরা ধরে বসে থাকি যে আমারও এই রকম হবে। ঠাকুর নিজেই তাঁর ক্যান্সার রোগ সারাতে পারলেন না। হয়ত তিনি সারাতে পারতেন, হয় পারেননি, নয়তো চেষ্টা করেননি। যে কোন ক্ষেত্রে, রোগ শোক হলে তার সমাধান এই জগৎকে দিয়েই হবে। এটাই স্বামীজী বলতে চাইছেন, আমাদের যা কিছু দরকার আমরা এই জগৎ থেকেই তা পূরণ করে নিতে পারি, এর জন্য ঈশ্বরকে লাগে না। যদি দেখে আমার সব কিছু ভাল চলছে, তার ঈশ্বর লাগবে না, যদি বলে আমার সব কিছু ভাল চলুক, তাহলেও ঈশ্বর লাগবে না। তন্ত্র মতে বলে ভোগ যোগ দুটোই হবে, কিন্তু মাঝখান থেকে দেখা গেল খোলাখুলি এর অনুশীলন কেউ করে না।

তাহলে মানুষ কখন ঈশ্বরের অন্বেষণ করে? শেষ লাইনে বলছেন, it is only when we have had hard blows in our lives and are disappointed with everything here that we feel the need for something higher, then we seek God, যখনই মানুষ জীবনে প্রচুর ধাক্কা খেতে শুরু করে, ভিতরটা ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে থাকে, তখনই মানুষ ঈশ্বরকে চায়। একটা কাহিনীর মধ্যে একজন জেল পালানো লোকের মুখ দিয়ে একটা খুব দামী কথা বলানো হয়েছে, কথাটা হল, A man on run never trusts anybody. He takes the help of others but never trusts anybody, যে জেল থেকে পালিয়েছে সে আর কোন দিন কারুকে বিশ্বাস করবে না। পালানোর জন্য কারুর সাহায্য সে হয়তো নিতে পারে, কিন্তু বিশ্বাস করবে না কাউকে। সংসারের জেলখানা থেকে কেউ পালিয়েছে বা পালাবার চেষ্টা করছে, এরপর তার পক্ষে কাউকে বিশ্বাস করা যাবে না। জগতে এখনও যদি তোমার কেউ থাকে যাকে তুমি বিশ্বাস করো, জগতে এখনও যদি কেউ থাকে যাকে তুমি ভালবাসো, তোমার আর যাই হোক, ঈশ্বরের প্রতি তোমার ভক্তি হবে না। ঠাকুর তো আরও কড়া ভাষা ব্যবহার করছেন, যতক্ষণ সংসার পাতকুয়া আর নিজের লোকেদের সবাইকে কালসাপ মনে না হবে, ততক্ষণ ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি হবে না। কবীর দাসের খুব নামকরা কথা আছে, যে নিজের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিতে পারবে, সে আমার সাথে চলে আসুক। আমাদের দ্বারা সম্ভব না, আমাদের ঘরও চাই, সংসারও চাই আর হে ঈশ্বর তুমিও থাকো। ঈশ্বরকে রাখবো কোথায়? ঠাকুর যদি এসে বলেন, 'আমি তো তোমার কাছে থাকতে চাই, কোথায় রাখবে আমাকে? এই ঘরটা তো বেশ সাজানো, তাহলে এখানেই থাকি'। 'না না ঠাকুর, এটা আমার ছেলের ঘর, তোমাকে এই ঘরে ঢোকালে তুলকালাম লেগে যাবে'। 'তাহলে পাশের ঘরটায়? এটাতে আমার শাশুড়ী মা থাকে, তার একটু অসুবিধা হলে স্ত্রী আমাকে আর আস্ত রাখবে না'। 'আর এই ঘরটা'? 'এই ঘরে আমার কুকুর থাকে'। 'তাহলে আমাকে কোথায় রাখবে'? 'কি আর করা যাবে, তুমি মাঝে মাঝে ঘুরে যাবে, পারমানেন্টলি থাকলে অনেক ঝামেলা হয়ে যাবে'। যতক্ষণ ঐ উচ্চ অবস্থায় না যাওয়া হয়, উচ্চ অবস্থা মানে, আমার আর কিছু লাগবে না আর জগতের কাউকে আমি বিশ্বাস করি না। যতক্ষণ যে সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে আছো, ঐ ধাপটা না ছাড়ছ, ততক্ষণ তুমি উচ্চ অবস্থায় যেতে পারবে না। তাহলে ভক্তি কি সব কিছু নাশ করে দিচ্ছে?

সব বৃত্তিকে ঈশ্বরাভিমুখী করা

কিছুই নাশ করছে না, Bhakti is not destructive, it teaches that all our faculties may become means to reach salvation. We must turn them all towards God and give to Him that love which is usually wasted on the fleeting objects of sense. (*ভক্তি আমাদের কোন বৃত্তিকে ভেঙেচুরে দেয় না, বরং ভক্তিযোগের শিক্ষা এই যে, আমাদের সব ভক্তিই মুক্তিলাভ*

করবার উপায়স্বরূপ হতে পারে। ঐসব বৃত্তিকেই ঈশ্বরাভিমুখী করতে হবে – সাধারণতঃ যে ভালবাসা অনিত্য ইন্দ্রিয়-বিষয়ে নষ্ট করা হয়ে থাকে, সেই ভালবাসা ঈশ্বরকে দিতে হবে।) খুব নামকরা ঘটনা, স্বামীজী প্রথমবার বিদেশ থেকে ফিরছেন, সাথে অনেকেই আছেন। জাহাজ কায়রো বন্দরে থেমেছে, এখানে বেশ কয়েক ঘন্টা জাহাজ দাঁড়াবে। স্বামীজী কায়রো শহরটা একটু ঘুরে দেখতে চাইলেন। যে গাইড ছিল, সে কি করে ভুল রাস্তায় চলে গেছে। একটু পরেই সবাই বুঝতে পারল যে আমরা রেড লাইট এরিয়ায় ঢুকে পড়েছি। মেয়েগুলো নানা রকম ইঙ্গিত ইশারা করতে শুরু করে দিয়েছে। গাইড তাড়াতাড়ি সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছেন। হঠাৎ স্বামীজী মেয়েদের একটা বিশেষ দলের দিকে তাকিয়ে দেখছেন, সবাই কেমন খিঃ খিঃ করে হাসাহাসি করছে। স্বামীজী কাউকে না বলে ওদের দিকে এগিয়ে গেলেন। ওদের দেখে স্বামীজী চোখের জল ফেলতে শুরু করেছেন। তখন স্বামীজী তাঁর সঙ্গীদের খুব নামকরা একটা কথা বলছেন, এদের যে দিব্য ভাব, সেই দিব্য ভাবকে এরা কেমন নিজের শরীরের উপর ঢেলে দিয়েছে, আর আজকে এদের দুরবস্থাটা দেখ। যীশু কাহিনীর মাধ্যমে শিক্ষা দিতেন, তাঁর একটা কাহিনী আছে, কয়েকজন কুমারী মেয়ে রাত জেগে প্রদীপ জ্বেলে বসে আছে, ওদের বর আসবে। ওরা সারা রাত প্রদীপ জ্বেলে বসে আছে, প্রদীপের তেল শেষ হয়ে প্রদীপ নিভে গেছে। এখন বর আসার সময় হয়েছে, ওরা সবার কাছে এসে তেল চাইছে, কেউ তেল দিল না। বলতে চাইছেন, নিজের ভিতরে যে দিব্য শক্তি আছে, সেটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। দিব্য শক্তিকে শরীরে নামানোটা দিব্য শক্তির সব থেকে জঘন্য ব্যবহার। শরীরে নামানো মানে আহার, নিদ্রা, মৈথুনের মত যে কোন জিনিসে পুরোপুরি নিজেকে দিয়ে দেওয়া, এগুলো অমূল্য মনুষ্য জীবনকে একেবারে শেষ করে দেয়। মনের উপর দিলে, অল্প একটু ভাল হলেও, সেটাও দিব্য শক্তির অপচয়। দিব্য শক্তি যদি পুরোপুরি ঈশ্বরের দিকে দিয়ে দেওয়া হয়, তখনই দিব্য শক্তি ফল দেয়। ইন্দ্রিয়গুলির নিজস্ব কোন শক্তি নেই, আত্মার শক্তিই সব ইমোশানকে চালায়। আমি রেগে গিয়ে মারধোর করতে লাগলাম, গালাগালি দিতে শুরু করলাম, এখানেও শক্তি সেই আত্মারই, আত্মার শক্তি ইমোশানে রূপান্তরিত হয়ে সেটা কয়েকটা শব্দে পাল্টে যাচ্ছে, সেই শব্দ মুখ দিয়ে গালাগাল হয়ে বেরিয়ে এলো। সেই একই শক্তি কিন্তু অন্য খাতে বেরিয়ে গিয়ে অপচয় হয়ে যাচ্ছে।

ঐ আত্মারই শক্তির মুখকে যদি ভিতরের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়, তখন অন্তর্জগতের অনেক কিছু রহস্যের উন্মোচন করা সম্ভব হবে, এবং জীবনটাই অন্য রকম হয়ে যাবে। ঠাকুর যেমন মোড় ফিরিয়ে দিতে বলছেন। এগুলোকে নিয়ে বড় বড় মনস্তাত্ত্বিকবিদরা অনেক কাজ করেছেন। কাম, ক্রোধ, লোভ এই জিনিসগুলো সবার ভিতরেই থাকবে। মহাভারতেও অনেক কাহিনীর মাধ্যমে দেখানো হয়েছে, ভিতরের ক্রোধকে কিভাবে বাইরে বার করে দেওয়া হয়। মা যদি নিজের সন্তানের উপর খুব রেগে যায়, তখন হয়ত মা বিছানা ঝাড়ছে, বিছানার চাদরটাকে এমন জোর ঝাড়তে থাকে যে, তাতেই রাগটা বেরিয়ে যায়। একটা যুবতী মেয়ের নানা রকম ইমোশান থাকে, বিয়ের পর তার সব ইমোশান, তার যে ভালবাসা, ক্রোধ সবই স্বামীর উপর চলে যায়। ঠিক তেমনি যে ঈশ্বরকে ভালবেসেছে, তার সমস্ত ইমোশান ঈশ্বরের দিকে চলে যায়। এখানে বলছেন না যে, তোমার কামকে জয় কর, ক্রোধকে সম্বরণ কর, কখনই এই ধরণের কথা বলবেন না। সেইজন্য ঠাকুরও বলছেন ভক্তি তিন প্রকার, সাত্ত্বিক ভক্তি, রাজসিক ভক্তি ও তামসিক ভক্তি। ঋষিদের মধ্যেও দুর্বাসার মত ক্রোধী ঋষি আছেন, আবার সাত্ত্বিক, রাজসিক ঋষিরাও আছেন। কারণ ইমোশানগুলি কোথাও যাবে না, এগুলো সবার মধ্যেই থাকবে। কিন্তু আমি মনে মনে ঠিক করে নিলাম, ইমোশান বশতঃ-ই হোক আর যে ভাবেই হোক, যা কিছু করব ঈশ্বরের জন্যই করব। মনুস্মৃতিতে মনু পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন, মাংস মানুষ খাবেই, মদ যারা খায় তারা মদ খাবেই, ভিতরে যে ভোগের ইচ্ছা রয়েছে সেটা তো চলে যাবে না, যা কিছু ভোগ করবে তুমি ঈশ্বরকে অর্পণ করে ভোগ কর। মাংস খেতে হলে, মায়ের উদ্দেশ্যে পাঁঠাবলি দিয়েই খাও। এখন অবশ্য আইন বলছে, এভাবে পশুহত্যা পশুর প্রতি নৃশংসতা। ঠিকই বলছে, কিন্তু আমাদের মূল উদ্দেশ্যটা ছিল, যখন তোমার মাংস খাওয়ার ইচ্ছা হবে, তখন মাকে নিবেদন করে খাও। ঐ উদ্দেশ্যটা উঠে গেছে, এখন কালীপূজায় পাঁঠাবলি দিতেই হবে, না দিলে পূজা অসম্পূর্ণ হয়ে যাবে। কিন্তু জিনিসটা তা নয়। যত কালী মন্দির আছে, সব মন্দিরে বলি দিতেই হবে। এখন হাইকোর্ট থেকে নিষেধাজ্ঞা জারি করে দিয়েছে, ইদানিং তাই কোথাও বলি দেওয়া যায় না। উদ্দেশ্য ছিল একটা, সেটা ঘুরে অন্য আরেকটা দিকে চলে গেছে। এনারা বলতে চাইছিলেন, তোমার ইমোশানগুলিকে ঈশ্বরাভিমুখী করে দাও। এটা বলছেন না যে, তুমি মাংস খাবে না। আমাদের এখানে

কোথাও বলা হয় না যে, তুমি এটা করতে পারবে না, সেটা করতে পারবে, নেগেটিভ ভাবে কোন কিছুকে নিষেধ করা হচ্ছে না। তুমি বিবাহ করবে না, কোথাও বলা হচ্ছে না। অবশ্যই তুমি বিবাহ করবে, তোমার কাম-বাসনা নিশ্চয়ই চরিতার্থ করবে, কিন্তু কাম ভাবকে নিয়ন্ত্রিত করে ভোগ কর। সেইজন্য বেদের ঋষিরাই বিবাহকে একটা যজ্ঞের রূপ দিয়ে দিলেন। সন্তানোৎপত্তি হবে, সেটাকেও যজ্ঞ রূপে করতে হবে। সন্তানকে সাক্ষাৎ বালকৃষ্ণ, নাড়ুগোপাল রূপে দেখবে।

ভক্তিতে ভয়ের কোন স্থান নেই

ভক্তি এটাই বলে, তুমি মোড় ফিরিয়ে দাও। জ্ঞানমার্গে এই সুযোগ দেবে না, তারা বলবে সব ছাড়ো। সেইজন্য স্বামীজী বলছেন, ভক্তিযোগ কোন বৃত্তিকে, কোন ইমোশানকে ভেঙেচুরে দিতে বলে না। আর বলছেন ভক্তির মধ্যে ভয়ের কিছু নেই, Bhakti differs from your Western idea of religion in that Bhakti admits no elements of fear, no Being to be appeased or propitiated. (*তোমাদের পাশ্চাত্য ধর্মের ধারণা থেকে ভক্তির এইটুকু তফাৎ যে, ভক্তিতে ভয়ের স্থান নেই – ভক্তি দ্বারা কোন পুরুষের ক্রোধ শান্ত করতে বা কাউকে সন্তুষ্ট করতে হবে না।*) জুহুদিরা ভগবানকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলে, ভগবান খুব কড়া ধাঁচের, তাঁকে সব সময় খুশী করতে হবে। আমরাও ভাবি মা কালীকে বলি না দিলে মা রেগে যাবেন। ঠাকুরও বলছেন, মা লক্ষ্মী যদি রেগে গিয়ে খ্যাঁট বন্ধ করে দেন। কিন্তু সেখানে অন্য একটা অর্থে ঠাকুর বলেছিলেন। কোন বস্তুর অপমান করা যায় না। টাকাকে ঐভাবে ফেলে দেওয়া সেই বস্তুর অপমান। কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের যে ধ্যান-ধারণা, যেটা জুদাইজিম্ থেকে এসে খ্রীশ্চানিটিতে ঢুকে গেছে, তা হল আমাদের ভগবানকে খুশী করতে হবে; জেহোবাকে খুশী করতে হবে, আল্লাকে খুশী করতে হবে। এই ধারণা আমাদের এখানে নেই, আমাদের বলা হয়েছে, তুমি ঈশ্বরকে ভালবাসো। খ্রীশ্চানিটি প্রথমে ভালবাসা নিয়েই এসেছিল। স্বামীজী বলছেন, এখানে ভক্তিতে ভয়ের কোন উপাদান নেই। আমাদের যে নেই তা না, উপনিষদেই বলছেন, *ভয়দাস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ।* কিন্তু এই ভয় মানুষকে ভয় দেখানোর জন্য বলছেন না। দেখাচ্ছেন, আত্মা বা ব্রহ্ম কি রকম, ইনি সব জায়গায় আছেন, এনার ক্ষমতা অসীম এবং সবার উপর ক্ষমতা, তাঁর অনুশাসন ও নিয়মকে কেউ অতিক্রম করতে পারবে না।

There are even Bhaktas who worship God as their own child, so that there may remain no feeling even of awe or reverence. (*এমনকি এমন সব ভক্তও আছেন, যাঁরা ঈশ্বরকে নিজের সন্তান বলে উপাসনা করে থাকেন – এই উপাসনার উদ্দেশ্য এই যে, ঐ উপাসনায় ভয় বা ভয়মিশ্র ভক্তির কোন ভাব না থাকে।*) স্বামীজী বলছেন, এমন এমন ভক্ত আছেন, যাঁরা নিজের শিশু সন্তানকে ঈশ্বর রূপে পূজা করেন। দূর্গাপূজাতে বেলুড় মঠ ও অন্যান্য জায়গায় কুমারী পূজা করা হয়, এই পূজা স্বামীজীই প্রথম প্রবর্তন করছেন না, আমাদের পরম্পরাতে প্রাচীন কাল থেকেই কুমারী পূজার প্রচলন চলে আসছে, যেখানে নিজের মেয়েকেই কুমারী রূপে পূজা করা হয়। যার জন্য দেখা যায়, বাঙ্গালীরা, দক্ষিণ ভারতীয়রা নিজের মেয়েকে মা বলে সম্বোধন করে। সারা ভারতে কিছু কিছু উৎসব আছে, বিশেষ করে যেখানে শক্তি পূজার প্রচলন আছে, সেখানে বিশেষ দিনে কুমারী মেয়েকে পূজা করে বসিয়ে খাওয়ানো হয়। নিজের সন্তানকে ঈশ্বরী রূপে, বা ঈশ্বর রূপে পূজাতে ভয়ের কিছু থাকে না, আর বিশেষ ভাবে অভ্যর্থনা করারও কিছু নেই। কারণ নিজের সন্তানকে দেখছে ঈশ্বর রূপে। এটাই হিন্দু ধর্মের মাধুর্য্য, ভক্তিকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, যেখানে ভয় নেই, ভয়মিশ্রিত কোন ভাব নেই, কারণ আমি আমার নিজের সন্তানকেই এভাবে দেখছি।

There can be no fear in true love, and so long as there is the least fear, Bhakti cannot even begin. In Bhakti there is also no place for begging or bargaining with God. (*প্রকৃত ভালবাসায় ভয় থাকতে পারে না, আর যতদিন পর্যন্ত এতটুকু ভয় থাকবে, ততদিন ভক্তির আরম্ভই হতে পারে না, আবার ভক্তিতে ভগবানের কাছে ভিক্ষা চাওয়ার, আদান-প্রদানের ভাব কিছুই নেই।*) একমাত্র ভালবাসাতেই ভক্তি হয়, ভক্তি মানেই ভালবাসা। যেখানে ভালবাসা সেখানে ভয় নেই, কোন চাওয়া-পাওয়া নেই, কোন লেনাদেনা নেই। নারদ তাঁর ভক্তিসূত্রে এটাকেই এইভাবে পরিভাষিত করছেন – *সা ন কাময়মান নিরোধরূপত্বাৎ,* ভক্তিতে কোন ধরণের কামনা থাকে না, কারণ ভক্তি নিরোধরূপ। নিরোধরূপ মানে

ভক্তি মনকে, চিত্তবৃত্তিকে আটকে দেয়। তাহলে ভক্ত ধ্রুবকে আপনি কি বলবেন? ধ্রুব তো রাজ্য চাইতেই ভগবানের কাছে গিয়েছিলেন। আর ভগবান ধ্রুবকে রাজ্য দিয়েছেনও'। এই দৃষ্টান্তগুলি দিয়ে দেখাচ্ছেন, তোমার ভিতরে যদি কামনাও থাকে, সেটা দিয়েও ভক্তি পাওয়া যায়। কি ভাবে? সেই কামনাকে আগে পুরোপুরি ঈশ্বরাভিমুখী করতে হবে, আমি আর কারুর কাছে চাইব না, আমার যা চাওয়ার ভগবানের কাছেই চাইব। সেখানে মন সম্পূর্ণ ভাবে থাকবে ভগবানের প্রতি। কিন্তু আমরা ধ্রুবের মত নই, আমাদের ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণ শরণাগতি নেই, ফলে চাওয়া-পাওয়া, দেনা-পাওনা, ভয় এগুলো এসে যায়। ভক্তিতে এই জিনিসগুলির একটুও স্থান নেই। এই একই জিনিস খ্রীশ্চানদের মধ্যেও দেখা যায়, তাঁরা মাদার মেরি, যিনি ছোট্ট যীশুকে কোলে করে আছেন, তাঁর পূজা করেন। এই ভাবটাই আমাদের বালকৃষ্ণ, নাড়ুগোপালের পূজার মাধ্যমে প্রস্ফুটিত হয়।

সুরদাস ছিলেন কৃষ্ণভক্ত, তাঁর ইষ্ট ছিলেন বালকৃষ্ণ। অন্য দিকে তুলসীদাস শ্রীরামের উপাসক। বারাণসীতে দুজনের দেখা হয়েছে। হঠাৎ রব উঠল যে একটা পাগলা হাতী ছুটে আসছে। তুলসীদাস রাস্তা থেকে একটুও নড়লেন না, 'আমার রাম আমাকে রক্ষা করবেন'। সুরদাস বলছেন, 'আমার কৃষ্ণ ছোট্ট শিশু, সে নিজেকেই রক্ষা করতে পারে না, আমাকেই যার সব কিছু করে দিতে হয়, সে আমার কি রক্ষা করবে', এই বলে বগলে পুটলিটা নিয়ে তাড়াতাড়ি একটা গলিতে ঢুকে গেলেন। এগুলো কাহিনী, কতটা সত্যি কতটা কল্পনা, আমরা জানি না। কিন্তু একটা আইডিয়াকে কাহিনীর মাধ্যমে তুলে ধরছেন। কেউ একটা দিন নিজের বাড়িতে যদি কোন এক থেকে পাঁচ ছয় বছরের বাচ্চা থাকে, আর যদি না থাকে, পাড়ার বা বন্ধু-বান্ধবদের কোন বাচ্চাকে এক ঘন্টার জন্য যদি মনে করে, এ আমার গদাই, শিশু রূপী রামকৃষ্ণ, এরপর ঐ বাচ্চা যাই করুক, দুষ্টুমি করছে, অবাধ্য হচ্ছে, সবটাই দেখুক শ্রীরামকৃষ্ণের লীলা রূপে, সে দেখতে পাবে যে এক ঘন্টার মধ্যে তার ভিতরটা আনন্দে ভরে উঠেছে। ভাগবতের দশম স্কন্ধে এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণের এত দুষ্টুমির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। আমাদের বাড়ির বাচ্চারা যত রকমের দুষ্টুমি করে, কৃষ্ণ এর থেকে বেশী দুষ্টুমি করে গেছে। যশোদা কিন্তু কৃষ্ণকে নিজের কৃষ্ণ রূপেই দেখছেন। ঠিক তেমনি যে নিজের শিশু সন্তানকে ইষ্ট রূপে দেখে, তাতেই তার ভক্তির উদয় হয়ে যাবে। হিন্দুরা একাধারে যেমন ধর্মকে অনেক উচ্চস্তরে নিয়ে গেছেন, তেমনি অন্যদিকে ধর্মের অনুশীলনকে এত সহজ করে দিয়েছেন যে, যে কেউ ভক্তি এইভাবে অনুশীলন করতে পারবে। হিন্দুরা মনের কোন কিছুকেই দুর্বলতা মনে করে না, হিন্দুরা মনে করে, আমার যেটা দুর্বলতা সেটাই আমার শক্তি। আহার, নিদ্রা, মৈথুন, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ যেটাই আমার দুর্বলতা, সেটাকে আরও বাড়িয়ে বাড়িয়ে ঈশ্বরের দিকে দিয়ে দিলে, অন্যরা প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়েই থাকবে, আমি ট্রেনে চেপে গন্তব্য স্থলে পৌঁছে যাব।

ভক্তের দৃষ্টিতে যেটা মহা অপরাধ

The idea of asking God for anything is sacrilege to a Bhakti. He will not pray for health or wealth or even to go to heaven. (*ভগবানের কাছে কোন কিছুর জন্য প্রার্থনা করা ভক্তের দৃষ্টিতে মহা অপরাধ। ভক্ত কখনও ভগবানের নিকট আরোগ্য বা ঐশ্বর্য, এমন-কি স্বর্গ পর্যন্ত কামনা করে না।*) এই যে একটা শিশুকে ইষ্ট রূপে দেখার কথা বলা হল, আমি কি ঐ ছোট্ট শিশুর কাছে কি কিছু চাইতে পারব? কখনই চাইতে পারব না। আমার নিজের ভিতরে যা কিছু আছে, সেটা তাঁর জন্য। আর আমার শ্রেষ্ঠ যেটা আছে সেটাও তাঁর জন্য। ঈশ্বরের সাথে ঠিক এই সম্পর্কটা দাঁড় করাতে হয়, যেখানে কোন চাওয়া নেই, কোন আদান-প্রদান নেই। তাহলে বাকিরা কি ঈশ্বরের কাছে কিছু চাইবে না? অবশ্যই চাইবে। একজন নেতা বলছেন, আমি অমুক বাবাজীর ভক্ত। কেন ভক্ত? আমাকে মন্ত্রী হতে হবে, আমাকে প্রধানমন্ত্রী হতে হবে। দেশে কোন নির্বাচন এলেই সব নেতারা বিভিন্ন মন্দিরে পূজো দেওয়ার জন্য লাইন দিতে শুরু করে। অনেক আগে একটা কার্টুন বেরিয়েছিল, একজন চাষা খালি গায়ে মাঠে চাষ করছে, একজন মন্ত্রী রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে মাঠে চাষীর কাছে গিয়ে হাত জোড় করে বলছে, পাঁচ বছর খুব ব্যস্ত ছিলাম দেখা করতে পারিনি, আপনার কখন সময় হবে বলুন, আমি দেখা করতে আসব। নেতারা এখন মন্দিরে গিয়ে ঠাকুর দেবতাদের সামনে হাতজোড় করে বলছে, আপনার কখন সময় হবে বলুন, আমি আসব আপনার কাছে, ভোট এসে গেছে কিনা। এগুলো ভক্তি নয়, তবে ঈশ্বরের সাথে জুড়ে থাকার একটা রূপ। গীতায় ভগবান চারটে রূপের কথা বলছেন, আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী আর জ্ঞানী। এরা অর্থার্থী, টাকা চাইছে, ক্ষমতা চাইছে, ঈশ্বরের কাছেই

চাইছে, অন্য কারুর কাছে চাইছে না, আর নিশ্চয় মন্দিরে যাবে, কিন্তু এগুলো আর যাই হোক, ভক্তি কোন ভাবেই না।

রাজাপ্রাসাদে প্রবেশের জন্য রাজপোশাক চাই

স্বামীজী এরপর বলছেন, One who wants to love God, to be a Bhakta, must make a bundle of all these desires and leave them outside the door and then enter. (*যিনি ভগবানকে ভালবাসতে চান, তাঁকে ঐ-সব বাসনা একটি পুঁটলি করে দরজার বাইরে ফেলে দিয়ে ভিতরে ঢুকতে হবে।*) ঠাকুরের ভাষায় বেনেবুদ্ধি, যে বুদ্ধি দিয়ে আমরা ঠাকুরের কাছে জাগতিক বস্তু প্রার্থনা করি, এখানে এই ধরণের ভক্তির আলোচনা করা হচ্ছে না। যাদের মধ্যে কামনা-বাসনা রয়েছে, সেই কামনা-বাসনা পুর্তির জন্য যে ঠাকুরকে ভক্তি করছে, সেই ভক্তির কথাও এখানে স্বামীজী বলছেন না। এখানে পরাভক্তি বা প্রেমাভক্তি যেটা শুদ্ধাভক্তি, সেই ভক্তিকে নিয়ে আলোচনা করছেন। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি, আমি যেন পরীক্ষায় ভাল ফল করি, একটা ভাল চাকরি যেন পাই, এটা প্রার্থনা, ভক্তি কোন ভাবেই নয়। ভগবান আদৌ এই ধরণের জাগতিক প্রার্থনা শোনেন কিনা আমরা জানি না।

একটা গল্পের মাধ্যমে এই আইডিয়াটাকে বোঝান যেতে পারে। এক রাজার বাড়িতে রাজমহলে এক বিরাট উৎসব চলছে। সবাই আমোদ আহ্লাদে ব্যস্ত। ওর মধ্যে রাজকুমার কিভাবে রাজবাড়ির পিছনের একটা গোপন দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছে। বেরিয়ে এদিক সেদিক ঘুরতে ঘুরতে পথ হারিয়ে ফেলেছে। হারিয়ে গিয়ে বন জঙ্গলের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে তার রাজপোশাক জীর্ণ ময়লা হয়ে গেছে। কোথায় কার পরিত্যক্ত একটা পোশাক পরে নিয়ে সে ঘুরতে ঘুরতে আবার রাজবাড়ির সিংহদুয়ারে এসে পৌঁছে গেছে। সে বুঝতে পেরেছে, আমি তো এই বাড়িতেই থাকি, আমি রাজকুমার। পাহাড়াদারের কাছে গিয়ে বলছে, আমি রাজকুমার, আমি ভিতরে যাবো। দারোয়ান তাকে ভাগিয়ে দিল, 'এই রকম অনেকেই এসে বলে'। এখন সে চেষ্টা করে যাচ্ছে কিভাবে রাজমহলে ঢুকবে। এরপর সে বিভিন্ন রকম পোশাক পরে আসছে, আর দারোয়ানরা যে পোশাকেই আসে ওকে ভাগিয়ে দেয়। একবার সৈনিকের পোশাক পরে আসছে, ভাগিয়ে দিচ্ছে। একবার পণ্ডিতের পোশাক পরে আসছে, তাও ভাগিয়ে দিচ্ছে। যে পোশাকেই আসছে, ভাগিয়ে দিচ্ছে। ব্যাপারটা একজন দূর থেকে দেখে যাচ্ছিল, সে কিন্তু তাকে চিনতে পারল যে এই সেই হারিয়ে যাওয়া রাজকুমার। লোকটি তখন তাকে গিয়ে বলল, 'রাজমহলের ভিতরে যদি তোমাকে যেতে হয়, তোমাকে রাজকুমারের বেশেই যেতে হবে'। রাজকুমারের পোশাক জোগাড় করতে হবে, কিন্তু তার জন্য অনেক টাকার দরকার, তার কাছে তো অত টাকা নেই। এবার সে কাজকর্ম করে টাকা জোগাড় করার চেষ্টায় লেগে গেল। যাই হোক যখন দেখল তার কিছু টাকা হয়েছে, সেই টাকা দিয়ে একটা রাজপোশাক কিনল। রাজকুমারের পোশাক পরে রাজমহলের দরজায় গিয়ে দারোয়ানদের বলল, আমি রাজকুমার। দেখেই তার চমকে উঠল, আরে এই তো আমাদের হারিয়ে যাওয়া রাজকুমার। আসুন আসুন করে তারা রাজকুমারকে ভিতরে নিয়ে গেল।

আমাদের জীবনটাও ঠিক তাই। কোন ভাবে আমরা ঈশ্বরের রাজ্য থেকে পতিত হয়ে গেছি। এ্যব্রাহামিক ট্রাডিশানে বলে, ভগবান ভাগিয়ে দিয়েছেন। বেদান্ত ট্রাডিশানে আমি নিজের ইচ্ছায় বেরিয়ে এসেছি। আমার ভিতরে অবিদ্যা এসে গেল, আমি নিজেকে ভুলে গেলাম, আমার সর্বনাশ হয়ে গেল। এবার আমাকে ঈশ্বরের রাজমহলের ভিতরে ফেরত যেতে হবে। ভিতরে যাওয়ার জন্য আমরা কখনো জেনে, কখনো না জেনে বিভিন্ন রকম রূপ ধারণ করছি। কখন ব্যাক্টেরিয়া, কখন এ্যমিবার রূপ ধারণ করছি, কখন সাপ, কখন ব্যাঙ, কখন কুকুর, কখন বেড়াল, কখন আমার এই বর্তমান মানুষ রূপ নিয়ে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করছি। কিন্তু গেটের কাছে গেলেই আমাকে ভাগিয়ে দিচ্ছে। রাজপ্রাসাদের সিংহদুয়ার দিয়ে যদি ভিতরে ঢুকতে হয়, একমাত্র ঈশ্বর রূপেই ঢুকতে হবে। ঈশ্বরের যে গুণ, সেই গুণের বিকাশ যতক্ষণ না আমার মধ্যে প্রস্ফুটিত হচ্ছে, ততক্ষণ আমি, তুমি কেউই ঈশ্বরের সান্নিধ্য পেতে পারব না। এবার আমাকে নিজেই চিন্তা করে দেখে নিতে হবে, ঈশ্বরের কি কি গুণ আছে। কিছু গুণের কথা তো আমার মনে আসবে, ঈশ্বর বলতে কি। তিনি দয়াময়, করুণাময়, প্রেমময় যেটাই হোক, জ্ঞানস্বরূপ, ভক্তিস্বরূপ, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, যা যা গুণ হতে পারে। এতগুলো গুণের মধ্যে একটা গুণ যদি আমার মধ্যে পুরোপুরি না আসে, কারণ একটা গুণ হওয়া যা, বাকি গুণ হওয়াও

তাই; প্রকাশ হয়ত হয় না, কিন্তু একটা গুণ হওয়া যা, বাকি গুণ হওয়া তাই। জ্ঞান যা, ভক্তিও তাই, ভক্তি যা দয়াও তাই, দয়া যা করুণাময়ও তাই, একই জিনিস। এই একটি গুণ যদি থাকে, সব গুণ এসে যাবে।

সত্যে প্রতিষ্ঠিত হলে ধর্ম করা যায় না। এই কথা শুনলে সন্ন্যাসী থেকে ভক্ত সবাই রে রে করে উঠবে, কেন করা যাবে না, ঠাকুর বলেছেন সত্য কলির তপস্যা। ঠাকুর ঠিকই বলছেন, কিন্তু ধর্মের কথা ঠাকুর বলছেন না, তপস্যার কথা বলছেন। সত্য হল কলির তপস্যা, সত্য ধর্ম না। ধর্ম আর তপস্যা দুটো আলাদা জিনিস। মহাভারত বলে দিচ্ছে ধর্মের সংজ্ঞা কি। সেখানে বলা হচ্ছে, এই এই অবস্থায় মিথ্যা কথা অবশ্যই বলবে, তা নাহলে সেটা ধর্ম হবে না। ঐসব ক্ষেত্রে সত্য কথা বলাটাই অধর্ম। যিনি তপস্যা করছেন জগতের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই, তিনি সত্য বলতে পারেন। সমাজে চলতে গেলে দিনে পাঁচটা মিথ্যা কথা এমনিই বলতে হয়, তা নাহলে সমাজে কেউ চলতে পারবে না। হিন্দু ধর্ম একেবারে প্র্যাক্টিক্যাল ধর্ম। যাই হোক, আমরা সত্য বলারও চেষ্টা করেছি, আহার সীমিত করার চেষ্টা করেছি, কাম ক্রোধ দমন করারও চেষ্টা করেছি। কিন্তু এইবার আমি বলছি, আমি ঈশ্বরের দিকে যেতে চাই। এবার তাহলে আমাকে ঈশ্বরের একটা গুণকে ধরতে হবে।

আমি ঈশ্বরকে কিভাবে দেখছি? যিনি কৃষ্ণের ভক্ত, তিনি কৃষ্ণকে, যিনি শিবের ভক্ত, তিনি শিবকে কিভাবে দেখছেন? যারা ঠাকুরের ভক্ত তারা ঠাকুরের মধ্যে কি দেখছেন? কেন, ঠাকুর জিলিপি খেতে ভালবাসতেন। জিলিপি খেতে ভাল লাগাটি কি কোন গুণ হল? সব বাচ্চাই জিলিপি খেতে ভালবাসে, এটা কি কোন গুণ হতে পারে? গুণটা কি, বুঝে নিয়ে এইবার সেই গুণে আমাকে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। তখন দেখবে স্বর্গের দ্বার নিজে থেকেই খুলে গেছে। কয়েকটা ক্লাশ আগে স্বামীজী বলেছিলেন, মানুষ মাত্রেই তার মধ্যে দুর্বলতা থাকবে, কিন্তু কোন গুণ যদি তার মধ্যে আসে সেটাই তাকে কৃতকৃত্য করে দেবে। ঠিক সেই রকম কেউ যদি মনে করে আমি জানি এটা ঈশ্বরের গুণ, এই গুণ আমার মধ্যেও নিয়ে আসতে চাই, এবার আর তাকে কেউ আটকাতে পারবে না। কারণ ঐ গুণে সে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়া মানে সে ঈশ্বরের সাথে এক হয়ে গেছে। কি গুণকে সে আয়ত্ত করবে, সেটা তাকেই ঠিক করতে হবে। কারণ আমার মধ্যে যে গুণগুলি আছে, সেই গুণগুলিই মানুষ ঈশ্বরের মধ্যে খোঁজে, সেই গুণগুলিই দেখে। একটা গুণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে তখনই মানুষের মধ্যে ভক্তি ভাব জাগে। তার আগে পর্যন্ত ভগবানের দরবারে ঢুকতে দেবে না। শরণাগত হয়ে যদি খুব কাকুতি মিনতি করে, তাহলে ভিখারীকে যেমন দুটো পয়সা দিয়ে বিদায় করে দেয়, এর বেশি কিছু হবে না। ঠাকুর বলছেন, কেউ যদি পুরো রেলভাড়া চেয়ে বসে, তা কি কখন কাউকে দেওয়া যায়, না দেওয়া যায় না। ঠাকুর মা কালীর যখন দর্শন করছেন, তখন তিনি পূর্ণ ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত, জগৎ পুরো খসে পড়ে গেছে। ঠাকুরের সাধনাটাই ত্যাগের, শেষটাও ত্যাগে। এই জিনিসটাকেই স্বামীজী এবার খুব সহজ ভাবে ব্যাখ্যা করছেন।

One who wants to love God, to be a Bhakta, must make a bundle of all these desires and leave them outside the door and then enter, কারণ কামনা যদি থাকে তাহলে সে তো ভিখারী হয়ে গেল। এরপর বলছেন, He who wants to enter the realms of light must make a bundle of all 'shop-keeping' religion and cast it away before he can pass the gates. (*যিনি সেই জ্যোতির রাজ্যে প্রবেশ করতে চান, তাঁকে এর দরজা দিয়ে ঢুকতে গেলে আগে দোকানদারি ধর্মের পুঁটলিটা বাইরে ফেলে আসতে হবে।*) দোকানদারি ধর্ম মানে, প্রভু তুমি আমাকে এটা দাও, আমি তোমাকে অমুক অমুক জিনিস দিয়ে বড় করে পূজা দেবো। যারা মানত করে, মন্দিরে মন্দিরে কোন দেওয়ালে বা গাছে লাল সুতো ঢিলের সাথে পেঁচিয়ে বেঁধে দেয়, আর বলে, ঠাকুর আমার যদি এটা হয়ে যায় আমি এসে এই সুতো খুলে দেব। এগুলোই দোকানদারি ধর্ম। আগের দিনে ডাকাতি করতে যাওয়ার আগে মা কালীকে খুব ধুমধাম করে পূজা দিয়ে বলবে, মা আমি ডাকাতি করতে যাচ্ছি, ভাল ভাবে যেন ডাকাতি করে ফিরে আসতে পারি। এ-সব কিছু আর যাই হোক, এগুলো কোন ভাবেই ভক্তি নয়। তাহলে যারা কামনা-বাসনা নিয়ে ঈশ্বরকে ভক্তি করে, এরা কি কোন দিন ঈশ্বরের দিকে যেতে পারবে না? এদের কি বাদ দিয়ে রাখতে হবে? অবশ্যই তারা ঈশ্বরের দিকে যেতে পারবে। কোথাও থেকে তো আমাদের শুরু করতে হবে, কিন্তু জানতে হবে ওটাই শেষ নয়। ডাকাতি করার আগে মা কালী প্রার্থনা করছ, ভাল করেই করো। কিন্তু জানবে এটা

তোমার একটা শুরু, এখানেই শেষ না। ধীরে ধীরে তোমাকে ডাকাতি করাটা ছেড়ে দিতে হবে, ছেড়ে দিয়ে শুধু মা কালীকে নিয়েই চব্বিশ ঘন্টা থাকতে হবে।

It is not that you do not get what you pray for; you get everything, but it is low, vulgar, a beggar's religion. (*এটা এই নয় যে, ভগবানের কাছে যা চাওয়া যায়, তা পাওয়া যায় না – সবই পাওয়া যায়, কিন্তু ঐরূপ প্রার্থনা অতি নিম্ন মানের ধর্ম, ভিখারীর ধর্ম।*) প্রার্থনা করলে যে একেবারেই কিছু পাওয়া যাবে না, তা না, অবশ্যই পাবে। কিন্তু ওটা কাঙালীদের ধর্ম। হাজরা মশাই ঠাকুরের কাছে যাঁরা আসতেন তাঁদের বলতেন, ঈশ্বর ঐশ্বর্যবান, তিনি চাইলে ভক্তকে ঐশ্বর্যও দিতে পারেন। ঠাকুর শুনে বলছেন, হাজরা আগের জন্মে কাঙাল ছিল, তাই খালি ঐশ্বর্য ঐশ্বর্য করে। স্বামীজী একটা উদ্ধৃতি দিয়ে বলছেন, 'Fool indeed is he, who, living on the banks of the Ganga, digs a little well for water. Fool indeed is the man, who, coming to a mine of diamonds, begins to search for glass beads'. (*সে ব্যক্তি বাস্তবিকই মূর্খ, যে গঙ্গাতীরে বাস করে জলের জন্য আবার কূপ খনন করে। হীরের খনিতে গিয়ে কাচের পুতি যে খুঁজে বেড়ায়, সে যথার্থই মুর্খ।*) ঠাকুর বলছেন কল্পতরুর মূলে গিয়ে কি কেউ লাউ কুমড়ো চাইবে!

These prayers for health and wealth and material prosperity are not Bhakti. They are the lowest form of Karma. (*এই সব আরোগ্য, ঐশ্বর্য ও ঐহিক অভ্যুদয়ের জন্য প্রার্থনাকে ভক্তি বলা যায় না – এগুলো অতি নিম্নস্তরের কর্ম।*) একজন কালীঘাটে ছাগ বলি দিল, বলি দেওয়ার উদ্দেশ্য, মা যেন আমার এটা করে দেন; এও এক ধরণের কর্ম, তবে নিকৃষ্ট কর্ম, ভক্তি কোন ভাবেই না। তবে এই কর্মের একটা ফল হবে, সে একটা কিছু অর্পণ করেছে, তার ফল সে একটা পাবেই। Bhakti is a higher thing. We are striving to come into the presenc of the King of kings. We cannot get there in a beggar's dress. If we wanted to enter the presenc of an emperor, would we be admitted in a beggar's rags? (*ভক্তি এর চেয়ে উঁচু জিনিস। আমরা রাজাধিরাজের সামনে আসবার চেষ্টা করছি। সেখানে আমরা ভিখারীর বেশে যেতে পারি না। যদি আমরা কোন সম্রাটের সামনে উপস্থিত হতে ইচ্ছা করি ভিখারীর মতো ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরে গেলে সেখানে কি দ্বারপাল ঢুকতে দেবে?*) একটু আগে আমরা সেই রাজকুমারের কাহিনী দিয়ে এই জিনিসটাকেই তুলে ধরেছি। রাজার কাছে আমরা কখনই কাঙালী, ভিখারীর বেশে যেতে পারি না। একজন মহারাজ কোন কারণে কারুর উপর খুব রেগে গিয়েছিলেন, সেই রাগ নিয়ে এখন তিনি মন্দিরে সন্ধ্যা আরতিতে যাচ্ছেন। একজন খুব সিনিয়র মহারাজের সাথে তাঁর দেখা হয়েছে। তিনি যার উপর রেগে ছিলেন তার সম্বন্ধে সিনিয়র মহারাজকে বলছেন, 'উনি আমাকে কি ভাবছেন, আচ্ছা করে একদিন কড়া কথা বলে একটা শিক্ষা দিয়ে দিতে হবে'। সিনিয়র মহারাজ অবাক হয়ে ওনার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন, তারপর খুব মোলায়েম করে বললেন, 'তুমি এখন মন্দিরে ঠাকুরের কাছে আরতিতে যাচ্ছ, তিনি রাজাধিরাজ, তাঁর কাছে তুমি এই নোংরা মন নিয়ে যাচ্ছ'? রাজাধিরাজ কেমন হন আমাদের কোন অভিজ্ঞতাই নেই। কিন্তু আমরা প্রাইম মিনিস্টারকে জানি, মুখ্যমন্ত্রীকে জানি, এনাদের কথা না হয় ছেড়ে দিলাম; একজন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছেও যদি আমাকে যেতে হয়, কাঙালীর বেশে গেলে তাঁর দারোয়ানই আমাকে ঢুকতে দেবে না। ঠাকুর পিএম, সিএম, ডিএম সবাইকে ওঠান বসান, দরকারে আবার ঘুম পাড়িয়েও রাখেন, তাঁর কাছে কাঙালীর বেশে যাওয়া! কাঙালীর বেশ মানে, মনে কামনা-বাসনা নিয়ে। যদি কোন ডিএমের ঘরে একটা দরখাস্ত নিয়ে তিনবারও চলে যাই, চতুর্থবার আমাকে ঢুকতে দেবে না।

কিন্তু তার থেকে বড় কথা হল, আমার কি কোন ডিগনিটি নেই, সব সময় কাঙালীর বেশে গিয়ে দাঁড়াবো? জন্মের পর যবে থেকে লিখতে শিখেছি, তবে থেকে আমরা দরখাস্ত দিয়েই যাচ্ছি। খিদে পেয়েছে, আমি কাঁদছি, এটাও একটা দরখাস্ত। কথা বলতে শিখলাম, বলতে লাগলাম, মা খেতে দাও, শুরু হয়ে গেল দরখাস্ত জমা দেওয়া। তারপর স্কুলে ভর্তি হতে চাই, দরখাস্ত দিলাম, কলেজে ভর্তি হতে চাই, দরখাস্ত দিলাম, হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে, দরখাস্ত দিলাম, বেড়াতে যাব – রেলের টিকিটের জন্য ফর্ম ফিলাপ করে দরখাস্ত

দিলাম। জীবনটা শুরুই হয় দরখাস্ত দিয়ে, আর সারা জীবন সব জায়গায় শুধু দরখাস্ত জমা দিয়েই যাচ্ছি। আর ভগবানের কাছে যখন যাওয়া শুরু করলাম, তখনও দরখাস্ত জমা দিয়ে যাচ্ছি। হে ভগবান আমার চাকরি হচ্ছে না, চাকরি দাও; হে ভগবান আমার একটা বিয়ে হচ্ছে না, বিয়ের ব্যবস্থা করে দাও, ভগবান আমার সন্তান চাই, ভগবান আমার স্ত্রী আমার বশে নয়, সন্তান অবাধ্য, আমার এই চাই, সেই চাই, বদলে আমি তোমাকে সাষ্টাঙ্গ করব। একটা থানার বড় দারোগার কাছে কিছু চাইতে গেলে তিনবারের বেশী দেখা করলে চতুর্থবার পাত্তাই দেবে না, সেখানে ভগবান আমাকে কিসের পাত্তা দেবেন। নিজের আত্মসম্মানটাকে নিয়ে একটু ভাবতে হয়, আত্মসম্মানটা বজায় রাখতে হয়। কারুর কাছে কিছু চাওয়া মানে তার কাছে হাত পাতা, হাত পাতা মানে সে এবার তার মাথাটা বিকিয়ে দিল। অপরের কাছে কেন আমরা মাথা বিকিয়ে দিতে যাব! ভগবান বেচারী আমাদের কি করবেন? তিনি কি আমার বাড়ি জ্বালিয়ে দেবেন, আমার চাকরি নিয়ে নেবেন, বাড়ির দু চারজনকে মেরে দেবেন? এসব করতে তাঁর ভারি বয়ে গেছে। আর করলেও তাতে কি হবে! তাই বলে আমি আমার আত্মসম্মান কেন বিসর্জন দেব! মাথা নত কেন করতে যাব! কারণ তুমিও যা আমিও তাই। যিনি ঈশ্বর, আমি তাঁর সন্তান। ঈশ্বরের যে সম্মান আমারও সেই একই সম্মান। ঈশ্বরের কাছে মাথা নত করব ভালবেসে। সম্মানের জন্য, ভক্তিতে ঈশ্বরের কাছে মাথা নত করব, কাঙালী ভিখারীর মত না।

এখানে আলোচনা চলছে ভক্তিকে নিয়ে। যদি তুমি ঠিক ঠিক ভক্তি চাও, তুমি যদি আধ্যাত্মিক পুরুষ হতে চাও, যদি তুমি ঠাকুরের পথে, স্বামীজীর পথে চলতে চাও; তাঁরা যে অবস্থায় পৌঁছেছেন সেই অবস্থায় যদি তুমি পৌঁছাতে চাও, তাহলে এই আলোচনা তোমার জন্য। আর যদি তুমি বলো, আমার এসব লাগবে না, লাউ কুমড়ো হলেই আমার চলে যাবে, ভগবান তোমাকে তাই দেবেন। কিন্তু ঠাকুর, মা ও স্বামীজী যারা লাউ কুমড়ো চায়, তাদের জন্য আসেননি। তাদেরকে এটা বোঝানর জন্য তাঁরা বলেন, লাউ কুমড়োরও প্রয়োজন আছে ঠিকই, কিন্তু তার উপরেও আরও অনেক কিছু আছে।

This is the Emperor or emeperors and never can we come before Him in a beggar's garb. Shop-keepers never have admission there, buying and selling will not do there at all. You read in the Bible that Jesus drove the buyers and seller out of the temple. (*ভগবান রাজার রাজা – আমরা তাঁর সামনে কখনও ভিক্ষুকের বেশে যেতে পারি না। দোকানদারদের সেখানে প্রবেশাধিকার নেই – সেখানে কেনাবেচা একেবারেই চলবে না। তোমরা বাইবেলেও পড়েছ, যীশু ক্রেতা-বিক্রেতাদের মন্দির থেকে বার করে দিয়েছিলেন।*) যীশুর সময়ে জিউসদের প্রথা অনুযায়ী মন্দিরে ঘুঘু বলি দেওয়া হত। আর ছিল money-changers, মন্দিরে এরা বসে থাকত, ওদের এক টাকা দিলে পচানব্বুই পয়সা দিত। কারণ সব মন্দিরে পাঁচ পয়সা করে দিতে হবে, অত খুচরা পাবে কোথায়। ওটাও তখন একটা ব্যবসা হয়ে গিয়েছিল। যীশু যখন প্রফেট হয়ে ওখানে গেলেন, ঘুঘু পাখিগুলিকে খাঁচা থেকে মুক্ত করে দিলেন, ওদের চাদরের উপর যত পয়সা ছিল, চাদর শুদ্ধু ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলছেন, এখান থেকে তোমরা বেরিয়ে যাও, তোমরা আমার পিতার পবিত্রস্থানকে কলুষিত করছ।

এমন কেউ যদি থাকতেন যিনি আমাদের মনের ভিতরটা স্পষ্ট দেখতে পারতেন, আর তিনি যদি বেলুড় মঠের মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে যারা মন্দিরে ঠাকুরকে দর্শন করতে যাচ্ছে, তাদের মনগুলি দেখতেন, তিনি দেখতেন সবার মনের মধ্যে কত হাজার রকমের কামনা-বাসনা গিজগিজ করছে, আর উনি ভাবতেন, তোমরা এই মন নিয়ে রাজাধিরাজের কাছে যাচ্ছ! মন, যেটা আসল জিনিস, সেই মন কত অশুদ্ধ, ওই মন নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সেটাকে ধরার কোন উপায় নেই। তিরুপতী মন্দিরে সবাই কামনা-বাসনা নিয়েই যাচ্ছে। ওখানে গিয়ে মাথা কামাবে, লাড্ডু কিনবে, হুণ্ডি চড়াবে, সবই করবে, কিন্তু মন যত অশুদ্ধ হতে পারে, তত অশুদ্ধ মন নিয়ে যাবে। আর ভগবানও এতই বোকা যে, তিনি সবার কথা শুনবেন! এগুলো কোন ভক্তিই নয়।

ভক্ত ইহলোক পরলোক, কোন লোকেরই সুখ চায় না

স্বামীজী বলছেন, So it goes without saying that the first task in becoming a Bhakta is to give up all desires of heaven and so on. (*সুতরাং বলাই বাহুল্য যে, ভক্ত হবার*

জন্য আমাদের প্রথম কাজ হল, স্বর্গাদির কামনা একেবারে দূর করে দেওয়া।) বেদান্ত এটাই বলে, *ইহামুত্রফলভোগবিরাগ*, এই জগতের যত রকমের সুখ আর মৃত্যুর পর স্বর্গাদির যত সুখ, সব কিছুর প্রতি বৈরাগ্য, তার মানে, আমি স্বর্গে যাবো, এই কামনাটাও ছাড়তে হবে। স্বামীজী যাঁদের সামনে এই কথাগুলো বলছেন, তাঁরা সবাই ছিলেন খ্রীশ্চান। খ্রীশ্চানদের কাছে শেষ কথা হল, স্বর্গে যাওয়া। বাইবেলকে যদি খুব গভীর ভাবে কেউ পড়েন, উনি দেখতে পাবেন যে, যীশু কখন ঐ অর্থে বাইবেলে কোথাও স্বর্গের কথা বলেননি। বাইবেলেই যীশু বলছেন, Kingdom of heaven is within you। কিন্তু মানুষ একদিকে যেমন স্থূল প্রকৃতির, অন্য দিকে বহির্মুখী, এরাই বহির্জগতে সুখের অন্বেষণ করে যায়, সুখ পাওয়ার জন্য এরা ভাল হতে চেষ্টা করে, আর মৃত্যুর পরেও স্বর্গে যেতে চায়।

স্বামীজী খ্রীশ্চান ধর্মের এই জায়গাতে আক্রমণ করছেন। Such a heaven would be like this place, this earth, only a little better. The Christian idea of heaven is a place of intensified enjoyment. (*এই ধরণের স্বর্গ এই জায়গারই – এই পৃথিবীরই মতো, না হয় এর চেয়ে একটু ভাল। খ্রীষ্টানদের স্বর্গের ধারণা এই যে, সেটা একটা তীব্র ভোগের জায়গা।*) খ্রীশ্চানদের যে স্বর্গ বা আমাদের বেদ আদিতে যে স্বর্গের বর্ণনা করা হয়েছে, আমরা এখানে যে সুখ ভোগ করি, সেই একই সুখ সেখানে। মহাভারতে একটা খুব মজার ঘটনার বর্ণনা আছে। অর্জুন কিছু দিনের জন্য স্বর্গে গেছেন। প্রথম দিন তিনি লক্ষ্য করলেন, স্বর্গের অপ্সরাদের শরীরে ঘামের কোন গন্ধ নেই। আমাদের পৃথিবীতে গরমে ঘামের গন্ধ একটা বিরাট সমস্যা। ঠাকুরও বলছেন, সুন্দরী মেয়ে কিন্তু গায়ে বোঁটকা গন্ধ। অর্জুন দেখছে এখানে অপ্সরাদের গায়ে গন্ধ নেই, গন্ধ না থাকাটা স্বর্গের বিশেষ একটা মাহাত্ম্য, এ কিসের স্বর্গ! How can that be God? All this desire to go to heaven is a desire for enjoyment. This has to be given up. The love of Bhakta must be absolutely pure and unselfish, seeking nothing for itself either here or hereafter. (*তা কি করে ভগবান হতে পারে? এই যে সব স্বর্গে যাবার বাসনা – এ সুখভোগেরই কামনা। এ বাসনা ত্যাগ করতে হবে। ভক্তের ভালবাসা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও নিঃস্বার্থ হওয়া চাই – নিজের জন্য ইহলোক বা পরলোক কোন কিছু আকাঙ্ক্ষা করা হবে না।*) ঠিক ঠিক যে ভক্ত, তাঁর ভক্তিতে কোন চাহিদা থাকে না, কোন কামনা থাকে না, ভয় বলে কোন পদার্থ থাকে না।

এরপর স্বামীজী বলছেন, 'Giving up the desire of pleasure and pain, gain or loss, worship God day and night; not a moment is to be lost in vain', আর বলছেন, 'Giving up all other thoughts, the whole mind day and night worships God. Thus being worshipped day and night, He reveals Himself and makes His worshippers feel Him', (*সুখদুঃখ, লাভক্ষতি – এ সকলের বাসনা ত্যাগ করে দিবারাত্র ঈশ্বরোপসনা কর, এক মূহূর্তও যেন বৃথা নষ্ট না হয়। আর সব চিন্তা ত্যাগ করে দিবারাত্র সর্বন্তঃকরণে ঈশ্বরের উপাসনা কর। এইরূপ দিবারাত্র উপাসিত হলে তিনি নিজ স্বরূপ প্রকাশ করেন, তিনিই তাঁর উপাসকদের শক্তি দেন – যাতে তারা তাঁকে অনুভব করতে পারে।*) স্বামীজী দুটো কোটেশান দিচ্ছেন, যার বক্তব্য, ভক্ত যখন সব কিছু ছেড়ে, ষড়রিপু, কামনা-বাসনা ত্যাগ করে দিবারাত্র শুধু ঈশ্বরের ভজনা করে, তখন ভক্তের ঈশ্বরের সাক্ষাৎ হয়। কিভাবে সাক্ষাৎ হয়, দর্শন কেমন হয়, ওটা আবার পুরো অন্য বিষয়। এখানে এসে ৩১শে জুলাইয়ের ক্লাশ শেষ হয়ে যায়। পরের দিন অর্থাৎ ১লা আগস্টের ক্লাসে স্বামীজী গুরু ও শাস্ত্র নিয়ে বলবেন।

বৃহস্পতিবার, ১লা আগস্ট

আধ্যাত্মিক গুরু

স্বামীজী এই দিন দু-বার ক্লাশ নেন, একবার সকালে এবং দ্বিতীয় বার বিকালে ক্লাশ নিয়েছিলেন। সকালের ক্লাশের নোট যে কটি প্যারাগ্রাফে আছে, সেগুলো সব আলাদা আলাদা। আলাদা আলাদা হলেও স্বামীজীর বক্তব্য একটাই। ঐ বক্তব্যটা যদি বুঝে নেওয়া যায়, তাহলে স্বামীজী কি বলতে চাইছেন বুঝতে কোন অসুবিধা হবে না। এখানে স্বামীজী ঠাকুরকে নিয়ে বলছেন। ঠাকুরকে তিনি প্রথমে গুরু রূপে বর্ণনা করছেন।

গুরুর দুটি রূপ হয়, একটি হল মানব রূপ, দ্বিতীয়টি হল ইষ্ট রূপ। গুরু এই দুই রূপেই আসেন, মানুষ রূপেও আসেন, ইষ্ট রূপেও আসেন। স্বামীজীর বক্তব্য হল, গুরুকে যদি মানুষ রূপে দেখা হয় বা মানুষের কোন গুণ যদি তাঁর উপর আরোপিত করা হয়, তাহলে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনে উত্থান হয় না। এখানে শুধু আধ্যাত্মিক গুরুর কথাই বলা হচ্ছে। যিনি বিজ্ঞান পড়াচ্ছেন, অঙ্ক শেখাচ্ছেন, তাঁর কথা বলা হচ্ছে না। যিনি আমার আধ্যাত্মিক গুরু, তাঁকে সব সময় ইষ্ট রূপেই দেখতে হবে। আমরা যদি ঠাকুরের জীবনকে খুব ভাল করে লক্ষ্য করি, তাহলে দেখতে পাবো যে, ঠাকুরের মধ্যে মানবীয় গুণ বা আরও ভাল করে যদি বলা হয়, মানবিক দুর্বলতা বলে কিছু ছিল না। তাঁর মানে গুরু রূপে ঠাকুর একেবারে আদর্শ গুরু। সেইজন্য রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পরম্পরায় ঠাকুরকে গুরু মহারাজ বলে সম্বোধিত করা হয়। যিনি গুরু তিনিই ইষ্ট, ঠাকুর হলেন এই ভাবের প্রকৃষ্ট আদর্শ। এখানে কল্পনা বা চিন্তা-ভাবনা করে কিছু করতে হয় না। ঠাকুর যেমন বলছেন, যদ্যাপি আমার গুরু শুঁড়ি বাড়ি যায়, তদ্যাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়। এখানে যদ্যাপি, তদ্যাপি এই শব্দগুলোকে নিয়ে আসা হয়েছে। ঠাকুরের ক্ষেত্রে যদ্যাপি, তদ্যাপি এই জিনিসগুলো নেই। আমাদের বলতে হবে না, ঠাকুরের মধ্যে এই দুর্বলতা ছিল, এই এই জিনিস ছিল, তবুও তিনি আমার গুরু, এভাবে ঠাকুরকে গুরু রূপে ভাবার কোন অবকাশই নেই। কেন ঠাকুরকে এভাবে ভাবা যাবে না? এই জিনিসটাকে নিয়েই স্বামীজী এখন আলোচনা করবেন।

অন্যান্য মহাপুরুষ যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যেও কোথাও কোথাও যেন আদর্শের ব্যাপারে একটু, দুর্বলতা শব্দটা এখানে বলা যাবে না, মসৃণতা ছিল না। ঠাকুরের ক্ষেত্রে এটাও নেই। সামাজিক দৃষ্টি থেকে অনেকে বলতে পারে যে, ঠাকুরের কোন পুঁথিগত বিদ্যা ছিল না। ঠিকই বলছে, কিন্তু আধ্যাত্মিকতায় পুঁথিগত বিদ্যার কোন ভূমিকাই নেই। শুঁড়ি বাড়ি যাওয়াটা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে বেমানান লাগবে। কামিনী-কাঞ্চনে গুরু যদি আসক্ত থাকে, আধ্যাত্মিকতায় প্রশ্ন উঠবে। কিন্তু একজন গুরু ইংরাজী ভাষা জানেন না, সেটা আধ্যাত্মিকতাকে কোন স্পর্শ করবে না। যদ্যাপি আমার গুরু সংস্কৃত জানেন না, তদ্যাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়, এই ছড়া কখনই কেউ রচনা করবে না। ছড়া তখনই হবে, যখন ওটা আধ্যাত্মিক দুর্বলতা হবে। এই জিনিসটাকেই স্বামীজী আলোচনায় দেখাবেন, আর দেখাবেন আমাদের মন যতক্ষণ শুদ্ধ না হয় ততক্ষণ একটা জিনিসকে বোঝা বা ধারণা করা কতটা মুশকিল হয়।

আলোচনা শুরু করার আগে আরেকটা ব্যাপারে সামান্য একটু আলোকপাত করা দরকার। একটা জায়গায় আমরা আলোচনা করেছিলাম, আমাদের সামনে যে মানুষকে দেখতে পাচ্ছি, তার তিনটি রূপ থাকে – ব্যক্তি, ব্যক্তিত্ব ও সিদ্ধান্ত বা আইডিয়া। যে কোন মানুষের এই তিনটে রূপ থাকবে। আমরা যখন ঈশ্বরের দিকে তাকাই, তখন ব্যক্তি থাকে না, শুধু ব্যক্তিত্ব আর সিদ্ধান্ত থেকে যায়। যেমন কৃষ্ণভক্ত বলে, আমার কৃষ্ণ। যারা ঠিক ঠিক ধর্ম পথে যেতে চাইছে বা আধ্যাত্মিক হতে চাইছে, তাদের ব্যক্তিকে ছেড়ে দিতে হয়, ব্যক্তিত্বকেও একটা জায়গায় ছেড়ে দিতে হয়, শুধু সিদ্ধান্তকে নিয়ে চলতে হয়। দেববাণীর প্রথমের দিকে যে আলোচনা চলছিল, সেখানেও বলা হয়েছিল যে, যেমনি সিদ্ধান্ত ছেড়ে ব্যক্তিত্বে নেমে যাবে, তখনই অনেক গোলমাল হয়ে যাবে। আর যদি ব্যক্তিত্ব থেকে ব্যক্তিতে নেমে যায়, তখন অধ্যাত্মের আর কিছুই থাকবে না। আদর্শ যদি আধ্যাত্মিক জীবন হয়, তাহলে মানুষের সাথে মেলামেশাতে ব্যক্তিকে ছেড়ে দিতে হবে। ব্যক্তি সম্পর্কিত যা কিছু হতে পারে, ব্যক্তি সম্পর্কিত প্রশ্ন, ব্যক্তি সম্পর্কিত আলোচনা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। একমাত্র শুদ্ধ বিচার, শুদ্ধ ভাবের উপর নিজেকে ছেড়ে দিতে হবে। এই জিনিসটাকে যদি আমরা মাথায় রাখি, তাহলে স্বামীজীর এই পর্বের আলোচনাটা আমাদের বুঝতে অনেক সহজ হবে।

গুরুর উপর আলোচনা করতে গিয়ে শুরুতেই স্বামীজী বলছেন, The real Guru is the one through whom we have our spiritual descent. He is the channel through which the spiritual current flows to us, the link which joins us to the whole spiritual world. (*প্রকৃত গুরু তিনি, আমরা যাঁর আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী। তিনিই সে প্রণালী, যাঁর মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক প্রবাহ আমাদের মধ্যে প্রবাহিত হয়, তিনিই সমগ্র আধ্যাত্মিক জগতের সঙ্গে আমাদের সংযোগসূত্র।*) আমাদের বাইরে যে পঞ্চভূতের জগৎ, এই জগৎকে আবার ওতপ্রোত ভাবে ছেয়ে আছে মনের জগৎ। আমরা যে জগৎ দেখছি,

এখানেও মন রয়েছে। যদি আমরা কল্পনা করি, একটা নদী আছে, সেই নদীর তলায় পাথর আছে, তার মানে জল আছে আবার পাথরও আছে, জল ও পাথর ওতপ্রোত ভাবে রয়েছে। কাদাতে মাটি ও জল ওতপ্রোত ভাবে মিশে আছে। মনের জগৎ আর এই পঞ্চ ভূতের জগৎ ওতপ্রোত ভাবে মিশে আছে। পঞ্চ ভূতের জগৎকে আমরা দেখতে পাই, মনের জগৎকে দেখতে পাই না, কারণ আমাদের মন সব সময় চঞ্চল। আমাদের মন সব সময় বহির্জগতের দিকে তাকিয়ে আছে, আমরা ওটা ধরতে পারি না। এই দুটো জগতের পারে আছে আধ্যাত্মিক জগৎ, সেই জগৎ আবার এই দুটো জগতের মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে মিশে আছে। আধ্যাত্মিক জগৎকে বেদান্ত কারণ জগৎ বলে, আর মনের জগৎ এবং পঞ্চ ভূতের জগৎ, এই দুটোকে যথাক্রমে বলে সূক্ষ্ম জগৎ আর স্থূল জগৎ। আমাদের মনের গঠন যেমন, জ্ঞান যেমন, সেই অনুসারে আমরা কেউ স্থূল জগতের বাসিন্দা হই, কেউ সূক্ষ্ম জগতের বাসিন্দা হই আবার কেউ কারণ জগতের বাসিন্দা হই। পিতৃলোক, স্বর্গলোক, মৃত্যুর পর যত লোক আছে, এগুলো সব সূক্ষ্ম জগৎ। যোগীরা যোগের শক্তিতে এই শরীরে থেকেও সূক্ষ্ম জগতে বিচরণ করতে পারেন। যোগী স্থূল শরীরেই আছেন, কিন্তু যেমনি ধ্যানে বসলেন, তিনি সূক্ষ্ম জগতে চলে গেলেন। কারণ জগতে ঈশ্বরকে সগুণ ঈশ্বর রূপে সাক্ষাৎ দেখা যায়।

কারণ জগতে বিচরণ করা অনেক দূরের ব্যাপার, কদাচিৎ কোন উচ্চমানের যোগীরাই পারেন, দেবতারাও পারেন না। শ্রীশ্রীমা এনাদের নামেই বলছেন, চোখ খুলে কে ঈশ্বরকে দেখেছে? যাঁরা কারণ জগতের বাসিন্দা, একমাত্র তাঁরাই ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ দেখতে পারেন। কারণ জগতের পারে মহাকারণ, সেখানে আর কিছু নেই, শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই আছেন, যেখানে আমি তুমির কোন ভেদ নেই। আমরা সবাই হলাম সেই মহাকারণের লোক। বিদেশীদের ফ্যান্টাসি মানেই, অন্য কোন গ্রহ থেকে লোক আসা। ভারতবর্ষে ফ্যান্টাসি মানে, স্বর্গলোক থেকে নেমে এসেছে। গোটা পাশ্চাত্য জগৎ এমন সংসারী যে, পঞ্চ ভূতের বাইরে কোন কিছু কল্পনাও করতে পারে না। ওদের কল্পনাতেও যদি কোন বিচিত্র কেউ আসে, সে আসবে অন্য কোন গ্রহ থেকে। আমাদের এখানে গ্রহের কোন দাম নেই। চাঁদে বা মঙ্গলগ্রহে যদি মানুষ থাকে, তারা আমাদের মতই হবে, এদিক সেদিক এক আধটুকু তফাৎ হবে। কিন্তু দেবলোক থেকে যে আসবে, তার সব কিছুই অন্য রকম হবে। যোগশক্তিটাই তাদের অন্য রকম। তার মানে মনুষ্যলোক, দেবলোক, ব্রহ্মলোক, আমি আপনি সবাই ওখানকার। পাশ্চাত্যের যে ধারণা অন্য গ্রহের বাসিন্দা, ওরা যাকে ইটি বলে, আমরা তারও পারে, হিন্দুদের যে দেবলোক, তারও পারে। আমরা সবাই সেই অসীম দেশের বাসিন্দা; কিন্তু সীমার মধ্যে সবাই হারিয়ে গেছি। যতক্ষণ পর্যন্ত অসীম জগতের আনন্দের একটু আস্বাদ না পাওয়া যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই সীমিত দেশের বাইরে যেতে চাইব না, কেন যাব, ভালটা না জানলে মন্দকে কেন ছাড়বে! গুবরে পোকা নারদ ঋষিকে বলছেন, বৈকুণ্ঠে ভাল গোবর পাওয়া যাবে তো? আমার যতটুকু আইডিয়া, তার বাইরে আমরা কোন কল্পনাই করতে পারি না। গুরু হলেন সেই সংযোগকারী, যিনি দেখিয়ে দেন, এই দেখ, আমিও যা তুইও তাই।

স্বামীজী এই যে বলছেন, আধ্যাত্মিক জগতের সাথে গুরু সংযোগ করিয়ে দেন, ঠাকুর তাঁর প্রত্যেক শিষ্যকে তাই করেছেন। যার বিস্তারিত বর্ণনা পাই নরেনকে নিয়ে ঠাকুরের কার্যকলাপে। ঠাকুর একটু ছুঁয়ে দিলেন, নরেন চিৎকার করছেন, তুমি আমার একি করলে, আমার যে, বাবা, মা, ভাই-বোন আছে। আসলে ঠাকুর দেখিয়ে দিতে চাইছেন, তুমি এখন যেটা নিজেকে দেখছ, এটা তোমার আসল পরিচয় নয়, তোমার আসল পরিচয় ঐটা। একবার দুবার এই রকম দেখিয়ে দেওয়ার পর নরেন যখন বলছে, আমি বুঝলাম আমি কে, আমি চললাম। ঠাকুর বলছেন, না, তোমাকে আনা হয়েছে মায়ের কাজের জন্য, মানুষের মঙ্গলের জন্য। বাকি সন্তানদেরও ঠাকুর প্রত্যেকের ঐ আধ্যাত্মিক জগৎটাকে দেখিয়ে দিয়ে তাঁদেরও ধরে রাখলেন, মানুষের মধ্যে এই চেতনাটা জাগাতে হবে, এরপর অন্যান্য যারা এখানে সন্ন্যাসী হয়ে আসবে, তাদের জন্য এই ত্যাগী সন্তানরা এবং শ্রীশ্রীমা সঙ্ঘজননী রূপে সবাইকে একটা জায়গায় ধরে রাখলেন। ঠাকুরের এটাই ছিল উদ্দেশ্য, কিন্তু সেই উদ্দেশ্য কার্যকর করার জন্য নিজের ত্যাগী শিষ্যদের আগে তাঁকে দেখাতে হয়েছে, তুমি এই। কারণ এখানে এলে মায়ার আবরণ সবারই উপর পড়বে, তুমি যাই হয়ে থাকো আবরণ সবারই উপর পড়বে। গুরু ঐ আবরণটা একটু সরিয়ে এক ঝলক দেখিয়ে দেন।

আমরা বলতে পারি, আমাদের গুরু তো কই আমাদের সেই রকম কিছু করে দেখিয়ে দেননি। কিন্তু এখানে স্বামীজী বলছেন, গুরু হলেন সেই সংযোগসূত্র। ওভারহেড ট্যাঙ্ক থেকে বাথরুমে যে পাইপের মাধ্যমে জল আসছে, গুরু হলেন সেই পাইপ। কিন্তু আমাদের গুরু কি সেই লিঙ্ক করে দিচ্ছেন? আমাদের সবারই উত্তর, আমাদের সেই রকম কিছু করে দেখিয়ে দেওয়া হয়নি। কিন্তু আমরা রামকৃষ্ণ মিশনের ব্যাপারে বলতে পারি, যাঁরাই রামকৃষ্ণ মিশন থেকে দীক্ষা নিয়েছেন, সবাইকে গুরু কিন্তু দেখিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু কই আমি তো জানি না। আপনি না জানলে কি হবে, আমি জানি যে আপনি জানেন। এই যে বিশ্বাস, ছোটবেলায় বই পড়ে হোক বা আরেকটু বয়সে বই পড়ে হোক, কিংবা সবাই দীক্ষা নিচ্ছে দেখে আমারও মনে ইচ্ছা হল, আমিও রামকৃষ্ণ মঠ থেকে দীক্ষা নেব। দীক্ষা নেওয়ার আগে দুটো চটি বই পড়তে হল, আর দীক্ষার পর ভিতরে একটা অনুভূতি হল যে, ঠাকুরই সত্য। ক্ষণিকের জন্যও যদি আমাদের মনে হয়ে থাকে যে, ঠাকুর সত্য; তার মানে গুরুতো আমাকে দেখিয়ে দিলেন। এবার এটাকেই আমাকে নিজে থেকে জপ-ধ্যান সাধনা করে স্থায়ী করে নিতে হবে। নরেনকেও ঠাকুর ক্ষণিকের জন্য দেখিয়েছিলেন, বাকিটা পরে নরেন সাধনা করে স্থায়ী করে নিল। নরেন তখনও ঈশ্বরের সম্বন্ধে একটা ভাসা ভাসা ধারণা নিয়ে চলছে। এখন বিশ্বাস হয়ে গেল যে, ঈশ্বর আছেন। ঠাকুর তাঁকে দেখিয়ে দিলেন, এই ভৌতিক জগতের বাইরেও একটা জগৎ আছে। এই বিশ্বাস এসে যাওয়াটাই তো বড় কথা। তবে ঐ বিশ্বাসটা ক্ষণিকের জন্য, সেটা যেভাবেই হোক, বই পড়ে বা কোন সাধুর সাথে কথা বলে বা গুরুর কাছে দীক্ষা নেওয়ার সময় হোক, যেভাবেই হোক, ক্ষণিকের জন্য ঐ বিশ্বাসটা এসেছে যে ঠাকুরই সত্য।

এই ধরণের ব্যাপার তো অনেকেরই হয়। না, হয় না। আমরা ছোটবেলা থেকেই জানি শ্রীরামচন্দ্র ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, কিন্তু এনারা কখন যে ভগবান আর কখন যে পৌরাণিক পুরুষ, এই তফাতের মধ্যে আমরা হারিয়ে যাই। অনেক কাঠখড় পোড়ালে তবে গিয়ে মানুষের বিশ্বাস হয় শ্রীরামচন্দ্র ভগবান। তার বাইরে আমরা মুখে বলে দিই শ্রীরামচন্দ্র ভগবান কিন্তু মনের মধ্যে তিনি এক পৌরাণিক পুরুষ হয়ে বসে আছেন। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরলে দেখা যাবে সবাই ঠাকুরের নাম শুনেছে, সবাই বলবে উনি একজন বড় মহাত্মা ছিলেন, কালী সাধক ছিলেন। কিন্তু আমাদের কোন একটা সময়, তা বই পড়েই হোক বা সাধুসঙ্গেই হোক, গুরুর কাছ থেকে দীক্ষা নেওয়ার সময়েই হোক, এক সেকেণ্ডের জন্যও একবার মনে হবে, ঠাকুর ভগবান। এই যে ক্ষণিকের বোধ, এটাই হল সেই সংযোগ। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের যিনি অধ্যক্ষ, তিনিই গুরু, ঠাকুর সাক্ষাৎ বসে আছেন। তার সাথে এখানে বাকি যত সন্ন্যাসীরা আছেন, যত গ্রন্থ রয়েছে, এরা সবাই আমাদের গুরু রূপে ঠাকুর যে ভগবান, ঠাকুর সত্য, এই আভাসটা দিয়ে দেন। এই বোধ যেটা এসেছে, গুরু কৃপা না হলে এটা হবে না। স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলছেন, ঠাকুরের কৃপায় আমরা আধ্যাত্মিক রাজ্যের সব কিছুই পেয়েছি, কিন্তু এবার নিজেকে সেটা আপন করে নিতে হবে। ঠিক তেমনি সঙ্ঘের কৃপায় আমাদের ঐ বোধটা হয়ে গেছে, এবার আমাদের ওটাকে নিজের করে নিতে হবে। গুরু এতটাই করে দেন, এর বেশি করবেন না, এরপর নিজেকে খেটে সব করতে হবে। এই যে জ্ঞানটা পেয়ে গেলাম এটাকে প্রত্যক্ষ বিজ্ঞানে পরিণত করতে হবে। প্রত্যক্ষ বিজ্ঞানে না পরিণত করলে, এই জন্মে হয়ত জ্ঞান নাও চলে যেতে পারে, কিন্তু পরের জন্মে জ্ঞান চলে যাবেই যাবে। গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই কথাই ভগবান বলছেন, *তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্*, কোন জন্মে বুদ্ধির সংযোগ হবে কেউ জানে না। সৌভাগ্য থাকলে আবার কোন পরিবারে জন্ম হবে, যেখানে আবার ঐ জ্ঞানের সাথে বুদ্ধির সংযোগ হয়ে যাবে। সংস্কার তৈরী হবে সাধনার তীব্রতা অনুসারে, যতটুকু সাধনা করে সংস্কার তৈরী হয়েছে, ততটুকু থেকে যাবে। তীব্র থাকলে এই জন্মেই তার বিজ্ঞান হয়ে যাবে, তীব্রতা একটু কম থাকলে, পরের জন্মে ভুলে যাবে, কিন্তু সংযোগটা তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। সাধনা যত ঢিলে হবে সংযোগ হতে তত সময় বেশী লেগে যাবে।

এবার স্বামীজী বলছেন, গুরু বলতে সিদ্ধান্ত। কিন্তু গুরু আমাদের কাছে ব্যক্তি রূপেই আসেন। ব্যক্তির উপর বেশি জোর দিলে ধর্ম ও আধ্যাত্মিক জীবনে অনেক গোলমাল লেগে যাবে। Too much faith in personality has a tendency to produce weakness and idolatry, but intense love for the Guru makes rapid growth possible, he connects us with the internal Guru. Adore your Guru if there be real truth in him; that Guru-bhakti (devotion to the

teacher) will quickly lead you to the highest. (*ব্যক্তিবিশেষের উপর অতিরিক্ত বিশ্বাস থেকে দুর্বলতা ও পৌত্তলিকতা আসতে পারে; কিন্তু গুরুর প্রতি প্রবল অনুরাগ থাকলে খুব দ্রুত উন্নতি সম্ভবপর হয়, তিনি আমাদের ভিতরের গুরুর সঙ্গে সংযোগ করিয়ে দেন। যদি তোমার গুরুর ভিতর যথার্থ সত্য থাকে, তবে তাঁর আরাধনা কর, ঐ গুরুভক্তিই তোমাকে অতি সত্বর চরম অবস্থায় নিয়ে যাবে।*) ভারতবর্ষে হিন্দুদের অনেক আদর্শের মধ্যে গুরু হলেন এক আদর্শ। ফলে আমাদের গুরুভক্তির পরম্পরা খুব শক্তিশালী। আর গুরুভক্তির পরম্পরা থেকে চলে আসে, আমার গুরু শ্রেষ্ঠ। ঠাকুরের ভক্তদের মধ্যেও খুব দেখা যায়, বলবে আমি অমুকের শিষ্য। অমুকের শিষ্য মানে, আপনি ওনার কাছ থেকে মন্ত্র পেয়েছেন।

আগেকার দিনে যখন কেউ নিজেকে শিষ্য রূপে পরিচয় দিত, তখন শিষ্যের অর্থ ছিল, আমি কোন পরম্পরায় শিক্ষা পেয়ে বড় হয়েছি। যেমন আরুণী উদ্দালক, ঐ আশ্রমে যাঁরা বড় হয়েছেন, তাঁরা ঐ পরম্পরাতে বড় হয়েছেন, ওটা যেন তাঁর গোত্র। ঠিক তেমনি বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমে যাঁরা বড় হয়েছেন, তাঁরা ঐ পরম্পরাতে বড় হয়েছেন, ওটাই যেন তাঁর গোত্র। যদি কেউ জানতে চায়, আপনি কোথায় শিক্ষা পেয়েছেন, তখন বলবেন, বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমে। সেখান থেকে পরবর্তি কালে এসে গেল কুলগুরুর প্রথা, সেখানেও একই জিনিস হয়। তারা বলবে, আমাদের গুরু ঐ বংশের। রামকৃষ্ণ মিশন থেকে দীক্ষা নেওয়ার পর আমরা যে গুরুর নাম বলি, ওটার কোন দাম নেই, এখানে ঠাকুরই গুরু। বেলুড় মঠ থেকে যাঁরাই দীক্ষা নেন, তাঁরা তখন হয়ে গেলেন রামকৃষ্ণ পরম্পরার। গুরুর অর্থ তখনই আসে, যখন পরম্পরার ব্যাপারটা আসে। রামকৃষ্ণ মিশনের একজন অধ্যক্ষ আছেন, আমি হয়ত তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছি। ওনার প্রতি স্বাভাবিক ভাবেই আমার একটা আলাদা শ্রদ্ধা ও ভালবাসা থাকবে। এই শ্রদ্ধা ও ভালবাসার জন্য আমার ভিতরে যিনি গুরু আছেন, তিনি জাগ্রত হয়ে ওঠেন, আর সেখান থেকে সাধনা শুরু হয়। কিন্তু নিজের দীক্ষাগুরুর প্রতি যদি অতিরিক্ত আকর্ষণ এসে যায় বা ওনাকে ছাড়া যদি আর কিছু না ভাবি, তাহলে সেখান থেকে পৌত্তলিকতার ভাব এসে যাবে।

ইদানিং কালে একটা ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছে, আমার গুরুর জন্মস্থানে একটা মন্দির করতে হবে। রামকৃষ্ণ মিশনের এটা পরম্পরা নয়, এই পরম্পরাতে ঠাকুরই গুরু, তিনি যে কথাগুলি বলে দিয়েছেন, সেটাই সিদ্ধান্ত। গুরু ঘরবাড়ি ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে চলে এলেন, যেটাকে তিনি ত্যাগ করে দিলেন, সেটাই এদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেল। স্বামীজী বলছেন, ব্যক্তির উপর যদি বেশি জোর দেওয়া হয়, তাহলে সেখান থেকে দুর্বলতা এসে যায় আর পৌত্তলিক ভাব এসে যায়। তাঁকে এমন ভালবাসবে, যাতে তোমার ভিতরে যিনি ইষ্ট তিনি জীবন্ত হয়ে ওঠেন। ঠাকুর বলছেন, যদ্যাপি আমার গুরু শুঁড়ি বাড়ি যায়, তার মানে তুমি তাঁকে এতো ভক্তি কর যে, তোমার ভিতরে যিনি গুরু আছেন, তিনি জেগে যাবেন। ভিতরের গুরু জেগে গেলে বহির্গুরুর আর দরকার হয় না। মাঝখানে তুমি এমন বড় একজন মহাত্মা হয়ে গেলে তোমার গুরু বলবে, ও আমার শিষ্য ছিল। যেমন ঠাকুর কেনারাম ভট্টাচার্যের কাছে মন্ত্র নিয়েছিলেন। কিন্তু কজন কেনারাম ভট্টাচার্যকে আজ জানে! ভৈরবী ব্রাহ্মণীর কাছে ঠাকুর এত কিছু শিখলেন, কিন্তু ভৈরবী ব্রাহ্মণীকেও চলে যেতে হল। আমরা তাও বলি ঠাকুর তোতাপুরীর শিষ্য। কিন্তু তোতাপুরীকেও চলে যেতে হল। কোন গুরুই ঠাকুরের সাথে থাকলেন না। কিন্তু আমরা যদি কল্পনা করি। আজকে যদি তিনজনই আসেন, বলবেন, আমি তোমাদের ঠাকুরকে প্রথম মন্ত্র দিয়েছি। কিন্তু ঠাকুর তাঁদের কবেই ছাড়িয়ে গেছেন। ঠাকুরের শিষ্যরা কিন্তু কেউই ঠাকুরকে ছাড়িয়ে যাননি। কিন্তু ঠাকুর তাঁর যে কজন গুরু পেয়েছিলেন, সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন। তার মানে, বাইরের গুরু নিমিত্ত, যেখান থেকে ভিতরের গুরু জেগে যাচ্ছেন। এখন এতে দুটো জিনিস হতে পারে, হয় আমি নিজের গুরুকে ছাপিয়ে যেতে পারি, আবার নাও যেতে পারি। ঠাকুর যদি আমার গুরু হন, আমি ছাপিয়ে যেতে পারব না। অন্য কোন গুরুকে হয়ত ছাপিয়ে যেতে পারব। গুরুকে ছাপিয়ে যেতে পারা না পারার মধ্যে কোন গুরুত্ব নেই। বৈশম্পায়ন খুব নামকরা ঋষি ছিলেন, তাঁর শিষ্য ছিলেন যাজ্ঞবল্ক্য। কোন একটা কারণে গুরু-শিষ্যের মধ্যে এমন ঝগড়া লাগল যে, যাজ্ঞবল্ক্য বলে দিলেন, আপনার মত গুরু আমার আর লাগবে না। এই বলে, যা কিছু গুরুর কাছে শিক্ষা পেয়েছিলেন, সব বমি করে বার করে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। বৈশম্পায়নের নাম অনেক জায়াগায় আসে, কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য নূতন বেদ দিয়ে দিলেন। গুরু বিরোধিতা করলে যে সর্বনাশ হয়ে যাবে, তা নয়, আসলে ভিতরটা জাগতে হবে। স্বামীজী এটাই বলছেন। গুরু হলেন সেই স্পার্ক, সেই স্পার্ক তোমাকে

নিজেকেই তৈরী করতে হবে। ভিতরের গুরু জেগে গেল, বাইরের গুরু থাকল কি থাকল না, তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু ঠাকুরের মত গুরু যদি কারুর থাকে, তার পক্ষে সম্ভব হবে না যে, তাঁকে ছাপিয়ে চলে যাবে।

গুরুরূপী শ্রীরামকৃষ্ণ

এরপর স্বামীজী ঠাকুরের উপর আলোচনা কেন্দ্রিত করছেন। Sri Ramakrishna's purity as that of a baby, একটা শিশুর মধ্যে যেমন কামিনী-কাঞ্চন, নাম-যশের লেশ মাত্র থাকে না, ঠাকুর সেই রকম শিশুর মত। সেইজন্য ঠাকুরকে যদি কেউ গুরু মনে করে, তাঁকে যদি কেউ ইষ্ট মনে করে, সেখানে তার আর কোন সমস্যা হবে না, কারণ দুর্বলতার কোন কিছুই নেই। He never touched money in his life, and lust as absolutely annihilated in him. (*তিনি জীবনে কখনও টাকা স্পর্শ করেননি, আর তাঁর ভিতরে কাম একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।*) তার মানে, ঠাকুর ছিলেনে একেবারে কামিনী-কাঞ্চনের পারে। সেইজন্য বলছেন, Do not go to great religions teachers to learn physical science, their whole energy has gone to the spiritual. (*বড় বড় ধর্মাচার্যদের কাছে জড়বিজ্ঞান শিখতে যেও না, তাঁদের সমগ্র শক্তি আধ্যাত্মিক বিষয়ে প্রযুক্ত হয়েছে।*) যাঁরা আধ্যাত্মিক পুরুষ, একটা সময় সবাই তাঁরা আমাদের মতই মানুষ। আমরা এখানে অবতারের কথা বলছি না, সর্বসাধারণকে নিয়ে বলা হচ্ছে। লৌকিক দৃষ্টিতে দেখলে ঠাকুরও এক শিশু রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, মায়ের স্তন্য পান করেছেন, সব শিশু যেভাবে বড় হয় সেভাবেই বড় হয়েছেন। আমি, আপনি, যীশু, ঠাকুর সবারই ভিতরে একটা sum total of psychic energy থাকে। সেই এনার্জিকে আমি কোথায় লাগাবো, তার উপর নির্ভর করে আমি কি কি পাবো। আধ্যাত্মিক পুরুষরা নিজের পুরো শক্তিটাই লাগিয়ে দেন আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের জন্য। ঠাকুর নিজেকে বলছেন, এক ডেলে গাছ, সোজা একটা ডাল উঠে গেছে, কোন শাখা-প্রশাখা নেই। আবার বহুশাখা বিশিষ্ট গাছও আছে। যেমন স্বামীজীর অনেক কিছু ছিল, ভাল গাইতে জানতেন, বাজাতে জানতেন, ছবি আঁকতে জানতেন, পড়াশোনা করেছিলেন, তার সাথে তিনি একজন আধ্যাত্মিক মহাপুরুষ। সবাই একডেলে হয় না। দেববাণীতেই আমরা দেখছি, স্বামীজী কত ধরণের বিষয়কে নিয়ে বলছেন, তার সাথে তিনি আধ্যাত্মিকতাকে নিয়েও বলছেন। আবার আমরা এটাও জানি, যদি আমাকে বিজ্ঞান জানতে হয়, অঙ্ক জানতে হয়, ভূগোল জানতে হয়, দর্শন জানতে হয়, তাহলে আমাকে সেই সেই বিষয়ের শিক্ষকের কাছেই যেতে হবে। যদি ভাল ইংরাজী বা সংস্কৃত শিখতে হয় তাহলে আমাকে সংস্কৃতের পণ্ডিতের কাছেই যেতে হবে। আমরা কি কখন ভেবে দেখেছি, আমাদের যে sum total of energy রয়েছে, সেই এনার্জিকে আমরা কোথায় কোথায় লাগাচ্ছি? বলা হয় যে, যারা খুব কর্মঠ হয়, ভিতরে যাদের প্রচুর রজোগুণ আছে, এই রকম লোকদের বিশ্বাস করা যায় না; কারণ তার ভিতরের শক্তিটা অনেক কিছুর মাধ্যমে বেরিয়ে যাচ্ছে। ঠাকুরও বলছেন, যে একটা দিকে বেশি এগিয়ে গেছে, তার দ্বারা ঈশ্বর লাভ হয় না। কারণ যে sum total of energy নিয়ে জন্মেছি, তার বেশির ভাগটা বেরিয়ে গেছে অন্য কিছুকে আয়ত্ত করতে গিয়ে। একজন গানের জগতে অনেক এগিয়ে গেছে, এমনকি সন্ন্যাসীরা যাঁরা গান-বাজনা শিখতে বেশি আগ্রহী হন, তাঁদের দ্বারা আধ্যাত্মিক জীবনের চরম অবস্থায় এগিয়ে যাওয়াটা আর হয়ে ওঠে না। কারণ একজন মায়ের পাঁচটা শিশু, ঐ পাঁচটা শিশু মায়ের পুরো শক্তিটাকে টেনে নেবে, সে আর কি করে অন্য বড় কাজ করতে পারবে। কদাচিৎ একটা দুটো ব্যতিক্রম যে হয় না তা নয়, ব্যতিক্রম দিয়ে আইন তৈরী হয় না। স্বামীজী বলছেন, Do not go to great religions teachers to learn physical science, their whole energy has gone to the spiritual, সেইজন্য যখন কোন আধ্যাত্মিক পুরুষের কাছে যাওয়ার সৌভাগ্য আমাদের হয়, তখন সেখানে তাঁর কাছে গিয়ে আমাদের কোন সাংসারিক শিক্ষা লাভের প্রত্যাশা করা কখনই উচিত হবে না।

স্বামীজী আবার বলছেন, In Sri Ramakrishna Paramahansa the man was all dead and only God remained; he actually could not see sin, he was literally 'of purer eyes than to behold iniquity'. (*শ্রীরামকৃষ্ণের ভিতর মানুষের ভাবটা মরে গিয়েছিল, কেবল ঈশ্বরত্ব অবশিষ্ঠ ছিল। বাস্তবিকই তিন পাপ দেখতে পেতেন না – যে-চোখে মানুষ পাপ বা অন্যায় দেখে, তার চেয়ে*

তাঁর দৃষ্টি পবিত্রতর ছিল।) স্বামীজীর এটা খুব মূল্যবান কথা, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের যে ব্যক্তিত্ব, তার মধ্যে মানুষ ভাবটা পুরো মরে গেছে, শুধু ঈশ্বরটুকু আছেন। ঠাকুর কখন কখন বলছেন, মাইরি বলছি, আমার আমি খুঁজে পাই না। আবার কখন বলছেন, মাইরি বলছি, আমি ঈশ্বর বৈ কিছু জানি না। আবার কদাচিৎ বলছেন, এর ভিতরে এক তিনি আছেন, আর তাঁর ভক্ত আছে। জগতের উপর তিনি যখন নামছেন, খুব কম পক্ষে তখন তিনি নিজেকে একজন ভক্ত বলছেন। এই ভক্ত মানে, যেখানে ভক্ত আর তার ইষ্ট এক। শ্রীকৃষ্ণ আর শ্রীমতি রাধাকে বাইরে থেকে যে দেখবে, সে আলাদা দেখবে, ভিতর থেকে দুজন এক, তাই বলে রাধাকৃষ্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণের ভিতরের মানুষটা পুরো পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। মানুষ মানে, যার মানে হুঁশ আছে, এটা ঠাকুরেরই পরিভাষা। মান মানে অহঙ্কার, অর্থাৎ আমি, আমিত্বের হুঁশ, ঠাকুর নিজেই বলছেন, আমি আমার আমি খুঁজে পাই না। মানুষ হলেই, তার মধ্যে পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা আর লোকৈষণা এই তিনটে এসে যাবে, এই তিনটে এষণা দিয়েই মানুষ মানুষ হয়। ঠাকুরের মধ্যে এই তিনটে এষণার লেশ মাত্র নেই। আমাদের ভাষায়, কামিনী-কাঞ্চন আর নাম-যশের ছিটেফোঁটাও ঠাকুরের মধ্যে নেই। মানুষ মানে, যার আমিত্বের বোধ আছে, আমিত্বের সংজ্ঞা নিরূপিত হয় কামিনী-কাঞ্চন, নামযশ দিয়ে।

যোগশাস্ত্রে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ আর অভিনিবেশের কথা বলছেন। অবিদ্যাটা মূল, অবিদ্যাকে সরিয়ে দিলে থাকছে অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ আর অভিনিবেশ। অস্মিতা মানে আমিত্বের বোধ, রাগ আর দ্বেষটা কামিনী-কাঞ্চনে গিয়ে কাজ করে, আর থাকল অভিনিবেশ – বেঁচে থাকার ইচ্ছা। ঠাকুরের বেঁচে থাকারও ইচ্ছে নেই, রাগ দ্বেষ নেই, আর বার বার বলছেন, আমার আমি খুঁজে পাই না। তাই ঠাকুরের মধ্যে মানুষের ভাব পুরো মুছে গেছে, একমাত্র রয়েছেন শুদ্ধ ঈশ্বর। তিনি এত শুদ্ধ পবিত্র ছিলেন যে, তাঁর দৃষ্টিতে পাপ বলে কিছু ছিল না। আমরা আগে রাবাইয়ার জীবনের একটা ঘটনার কথা বলেছিলাম, রাবাইয়াকে বলছে, তুমি শয়তানের নিন্দা করো না কেন? রাবাইয়া বলছেন, আমার মন আল্লাকে নিয়ে এমন ভরে আছে যে, সময়ই পাচ্ছি না শয়তানের কথা ভাবব। যিনি সব কিছুতে ঈশ্বর দেখছেন, তিনি কি করে আর কোথায় পাপ দেখবেন। ঠাকুর যে এটা চেষ্টা করে ঐ অবস্থায় পৌঁছেছেন তা না। আমরা যেমন সকালে উঠি মনে মনে ঠিক করি, আজকে আমি কোন মিথ্যা কথা বলব না, আজ থেকে কারুর সাথে ঝগড়া করব না, কারুর উপর রাগ করব না। বেলা হতেই সব উড়ে যায়। একটু পরে এর ওর সাথে কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে যাবে। ঠাকুর এভাবে ঐ জায়গায় পৌঁছাননি। যতক্ষণ মানুষ রূপে থাকব ততক্ষণ আমি বোধ, তুমি বোধ থাকবে, আমি আলাদা তুমি আলাদা থাকবে, ততক্ষণ রাগ-দ্বেষ, অহঙ্কার, ঝগড়া, মারামারি সব থাকবেই থাকবে, কিছু করার নেই।

কিন্তু যখন দেখবে সবটাই আমি হয়েছি, তখন আমি কার নিন্দা করব, কাকে হিংসা করব, দ্বেষ করব আর কারই বা স্তুতি করতে যাব। আমরা এই উপমা অনেক সময় নিয়ে থাকি, বাম পকেটটাও আমার, ডান পকেটটাও আমার, যে পকেটেই টাকা থাক, ওটা আমারই টাকা। ঠাকুর একবার নয় বহুবার বলছেন, তোমাদের সবাইকে আমি নারায়ণ দেখছি, সেই মানুষের দৃষ্টিতে পাপ কোথা থেকে আসবে। এগুলোকে আমরা একটু যদি বোধ না করি, ধারণা করা খুব মুশকিল। যখনই বলছি, তিনি পাপ দেখতেন না, আমাদের মনে হয় আমার মনে কত পাপ রয়েছে, আমার ভিতরে কত হিংসা রয়েছে, কত রাগ আছে, যদি এগুলো চলে যেত। কিন্তু কোন দিন যাবে না, এভাবেই থাকবে। আমরা যত চেষ্টাই করি না কেন, যত মনস্তাত্তিকের কাছে যাই না কেন, কোন দিন এগুলো যাবে না। কারণ ভূতটা সরষের মধ্যে রয়েছে। যে সরষে দিয়ে ভূত ছাড়াবো, সেই সরষের মধ্যেই ভূত রয়েছে। অর্থাৎ আমরা জগৎকে জগৎ রূপে দেখছি, মানুষকে মানুষ রূপে দেখছি; মানুষ রূপে যতক্ষণ দেখব ততক্ষণ আমি তুমির ভেদ থাকবে, আমি তুমির ভেদ থাকলে রাগ-দ্বেষ, হিংসা, লোভ, অহঙ্কার এগুলো থাকবে। এগুলো থাকলে মারামারি থাকবে, বাদবিতণ্ডা থাকবে। ঠাকুর তাহলে কি করলেন? ঠাকুর কিছুই করেননি। তিনি সত্যটা দেখছেন, নারায়ণই সব হয়েছেন। সব নারায়ণ হলে, তিনি কার দোষ দেখবেন, পাপ কোথায় দেখবেন, কার নিন্দা, কার স্তুতি করবেন।

The purity of these few Paramahanmsas is all that holds the world together. (*এই অল্প কয়েকজন পরমহংসের পবিত্রতাই সমগ্র জগৎকে ধারণ করে রেখেছে।*) মুষ্টিমেয় কয়েকজন পরমহংস, হংস শুধু দুধ খেয়ে জলটাকে ছেড়ে দেয়, আসল পরমহংসও তাই করেন, আধ্যাত্মিক শক্তিকেই

এনারা নিজের ভিতরে ধারণ করেন, আর সেই শক্তি দিয়ে পুরো জগৎকে এনারা ধরে রাখছেন। যীশু একজন পরমহংস, ভগবান বুদ্ধ একজন পরমহংস, শ্রীরামকৃষ্ণ একজন পরমহংস, এনাদের ভিতরে যে কী শক্তি আমরা সাধারণ মানুষ কল্পনাই করতে পারি না। আজকে বিশ্বে গণতন্ত্র এসেছে, লিবারিজম, সোস্যালিজম, কম্যুউনিজম্ কত কিছু এসেছে। একটু যদি এদের কার্যাবলীর দিকে তাকানো যায়, এদের থিয়োরির দিকে তাকাতে হবে না, শুধু এরা কি কি করছে, সেটার দিকে একটু তাকালে দেখা যাবে, সবাই চাইছে আমি কি করে আরও ক্ষমতা অর্জন করব, তার জন্য একশটা লোকের মুণ্ডু যায় তাতে আমার কিছু আসে যায় না। ভাবলে আমাদের আতঙ্ক হয়ে যেতে হয়, আমরা যদি ভাবি, যীশু বলুন, ভগবান বুদ্ধ বলেন, রাম বলুন, কৃষ্ণ বলুন, রামায়ণ, মহাভারত বলুন, বাইবেল বলুন, সব কটাকে যদি জগৎ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে আমাদের মানবজাতির অবস্থা কী হত! বাকি সমস্ত কিছু আছে, আধ্যাত্মিকতাটা নেই, তাহলে কি হত? সাপ আর সিংহের সংমিশ্রণে যদি কোন একটা আকৃতি আনা হয়, আমরা তাই হতাম। অন্যরা বাঁচুক মরুক আমার কিছু আসে যায় না, আমাকে বাঁচতে হবে। সেটাই স্বামীজী পরের বাক্যে বলছেন।

স্বামীজী বলছেন, If they should all die out and leave it, the world would go to pieces. They do good by simply being, and they know it not; they just are. (*যদি এনাদের ধারা লুপ্ত হয়ে যায়, সকলেই যদি জগৎটাকে ত্যাগ করে যান, তা হলে জগৎ খণ্ড খণ্ড হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। তাঁরা কেবল নিজে মহান পবিত্র জীবন যাপন করে লোকের কল্যাণ বিধান করেন, কিন্তু তাঁরা যে অপরের কল্যাণ করছেন, তা তাঁরা টেরও পান না; তাঁরা নিজেরা আদর্শ জীবনযাপন করেই সন্তুষ্ট থাকেন।*) গুরু দিয়ে শুরু করে স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণে নিয়ে এলেন। সেখান থেকে বলছেন, এই ধরণের শুদ্ধ পবিত্র কয়েকটি জীবন আছে বলে জগৎটা দাঁড়িয়ে আছে। তাঁরা নিজেরাও জানেন না যে, জগতে তাঁরা কি ভূমিকা পালন করে গেছেন, কিন্তু আমরা জানি, তাঁরা আছেন বলেই এই জগৎটা জগতের মত এখনও চলছে। এনারা না থাকলে আমরা সবাই মানুষ রূপী পশু হয়ে থাকতাম।

সত্য লাভে শাস্ত্র আর গুরুর ভূমিকা

স্বামীজী আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন, Books suggest the inner light and the method of bringing that out, but we can only understand them when we have earned the knowledge ourselves. (*আমাদের ভিতর যে জ্ঞানজ্যোতিঃ বর্তমান রয়েছে, শাস্ত্র তার আভাস দিয়ে থাকে আর তাকে অভিব্যক্ত করবার উপায় বলে দেয়, কিন্তু যখন আমরা নিজেরা সেই জ্ঞানলাভ করি, তখনই আমরা ঠিক ঠিক শাস্ত্র বুঝতে পারি।*) আমরা আগেও এর উপর আলোচনা করেছি, যে কোন গ্রন্থ পড়ে আমরা কোন দিন বুঝতে পারব না, হাজারটা লেকচার শুনি, কিছুই বুঝতে পারব না; লক্ষ লক্ষ জপ করি, কিছুই হবে না। যেটা আমি নিজে অর্জন করেছি, তার বাইরে আমি কিছু বুঝতে পারব না। ঠাকুর তাই বলছেন, সময় না হলে কিছু হয় না, তবে শুনে রাখা ভাল। রুডিয়ার্ড কিপ্লিং একজন অসাধারণ লেখক, তাঁর যে কোন লেখা একবার পড়তে শুরু করলে শেষ না হওয়া পর্যন্ত ছাড়তে ইচ্ছে করবে না। জঙ্গল স্টোরি খুবই নামকরা, কিন্তু ওনার কিং বইটাও খুব বিখ্যাত একটা বই। রুডিয়ার্ড কিপ্লিং খুব অল্প বয়সে মারা যান, ভারতবর্ষে কিছু দিন ছিলেন। ভারতবর্ষের সংস্কৃতি, আধ্যাত্মিক ব্যাপারগুলো তিনি বুঝতেন। আমরা কোন গল্প উপন্যাসকে কাহিনী রূপে পড়ে যাই, কিন্তু ওর মধ্যে যে বিভিন্ন প্রথা, মানুষের আচরণ, তার মনস্তাত্ত্বিক যে দিকগুলো আছে, সেদিকে আমাদের নজর যায় না। এই কারণেই নজর যায় না, ওগুলোর ব্যাপারে আমাদের কোন ধারণাই নেই। রুডিয়ার্ড কিপ্লিংএর বইগুলো, বিশেষ করে কিং কাহিনী, যারা ছোটবেলায় পড়েছিলেন, কাহিনী রূপে তাদের কাছে খুব অসাধারণ লেগে থাকবে। কিন্তু বয়সের সাথে সাথে অভিজ্ঞতা যত হবে, যত জ্ঞান অর্জন হবে, এরপর কিং পড়তে গেলে তাদের কাছে একেবারে নূতন একটা কাহিনী মনে হবে। কারণ জ্ঞানটা এবার সে নিজে অর্জন করেছে। আমরা যত কথামৃত পড়ে যেতে থাকি, বাণী ও রচনা পড়তে থাকি, কিছুই হবে না। এইজন্যই হবে না, অর্জন যদি আমি নিজে না করে থাকি, আর ওর সমান সমান যদি না হই, বুঝতে পারব না। ক্লাশ থ্রী ফোরের বইগুলিকে আমাদের সেই সময় কত কষ্ট করে পড়তে হয়েছিল। আজকে যদি বলা হয়, সারাদিন ঐ বইগুলো পড়তে হবে, আমাদের মাথা খারাপ হয়ে যাবে। তার মানে আমরা ক্লাশ থ্রী ফোরের

বইগুলিকে অতিক্রম করে এসেছি। যদি কোন বই একবার পড়ার পর মনে হয় আরেকবার পড়ি, বুঝতে হবে আমি ঐ বইয়ের লেখকের সমকক্ষ হইনি। যার জন্য আমরা গীতা, উপনিষদ নিয়মিত পাঠ করি, যার জন্য আমরা কথামৃত রোজ নিয়মিত ভাবে পাঠ করে যাচ্ছি। কারণ আমরা ঐ অবস্থায় পৌঁছাতে পারছি না। যখন আমি নিজে সেই অবস্থায় পৌঁছে যাব, আবার পড়ার সময় তখনই ঐ গ্রন্থ ঠিক ঠিক বোঝা যায়।

দক্ষিণেশ্বরে হলধারী বিভিন্ন গ্রন্থ বিশেষ করে অধ্যাত্ম রামায়ণ পাঠ করতেন, ঠাকুরও বসে শুনতেন আর থেকে থেকে বলতেন, জানো আমি এইগুলো সব নিজে অনুভব করেছি, নিজে দেখেছি। হলধারী বিরক্ত হয়ে বলতেন, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে, এইগুলো তোমার অনুভব হবে! ঠাকুর এই যে ভাগবত থেকে, অধ্যাত্ম রামায়ণ থেকে অনেক কথা বলে যাচ্ছেন, এর একটা কারণ হল, ঠাকুরের এই জিনিসগুলিকে অনুভব করেছেন। আমরা এতদিন ধরে দেববাণীর আলোচনা করে যাচ্ছি, প্রথম দিকের দুটো তিনটে আলোচনায় আমরা কি বলেছি ভুলে গেছি, ভুলে যাবারই কথা। যদি বুঝে যাই, আমরা কোন দিন ভুলে যাবো না। কারণ দেববাণী পুরোটাই আধ্যাত্মিকতাকে নিয়ে, সেইজন্য না বোঝারই কথা। যদি বৌদ্ধিক ব্যাপার হত তাহলে হয়ত বুঝতে পারতাম। আধ্যাত্মিক জিনিসগুলো বোঝার জন্য নয়, এগুলো প্রত্যক্ষ করার জিনিস, যিনি প্রত্যক্ষ করে নিতে পারবেন, তিনিই বুঝবেন। সেইজন্য স্বামীজী বলছেন, যতক্ষণ না তুমি জ্ঞান নিজে অর্জন করছ, ততক্ষণ তুমি গ্রন্থের কথা বুঝতে পারবে না।

When the inner light has flashed for you, let the books go, and look only within. (*যখন তোমার ভিতরে সেই অন্তর্জ্যোতির প্রকাশ হয়, তখন আর শাস্ত্রে কি প্রয়োজন? – তখন কেবল অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত কর।*) যেমনি আমাদের ভিতরের আলোটা জ্বলে যাবে, তখন আর বইয়ের কোন প্রয়োজন থাকে না। আধ্যাত্মিক পথে সাধনা করে করে মন যখন অনেক উঁচুতে উঠে যায়, তখন শাস্ত্র, গ্রন্থ এগুলো খুব নীচে পড়ে থাকে। গীতার কোন শ্লোক বা উপনিষদের কোন মন্ত্রকে নিয়ে যখন আমরা চিন্তা করি, তখন আমরা মন্ত্রের শব্দের মধ্যেই পড়ে থাকি। শব্দ বলি, অর্থ বলি, বস্তু বলি, এগুলো এখনও খুলছে না। দক্ষিণেশ্বরে এক সাধুবাবা সারাদিন গঙ্গার তীরে আকাশের দিকে তাকিয়ে, ঝাউ বাগানে ঘুরে বেড়াতেন আর বলত, বাঃ কেয়া বানায়া, কিংবা ঠাকুর বড় বড় গাছে ফুল ফুটে আছে, দেখে বলতেন, বিরাটের পূজা চলছে। গীতার যে কোন শ্লোক বা উপনিষদের কোন মন্ত্রের যে গভীর তাৎপর্য, তার কথা ভাবতে ভাবতে জগৎ যেখানে ভুল হয়ে যায়, তখন মন্ত্রের শব্দের অর্থ না, শুধু তার অর্থটাই সত্য হয়ে যায়, সেই সত্যটাই শুধু আছে। এই বোধ যখন আসে, তখন বুঝবে যে সে ঠিক ঠিক বুঝেছে।

You have in you all and a thousand times more than is in all the books. (*যখন তুমি তোমার মধ্যে অবস্থান করবে তখন দেখবে, সমুদয় শাস্ত্রে যা আছে, তার চেয়ে হাজার গুণ বেশি তোমার মধ্যে আছে।*) যা কিছু শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে, তার হাজার গুণ জ্ঞান তোমার ভিতরে আগে থেকেই আছে। এইসব কথা আমাদের বিশ্বাস হয় না, কিন্তু এটাই সত্য। যবে থেকে সৃষ্টি হয়েছে তবে থেকে আমরা সম্মোহিত হয়ে নিজেকে দেহ মনে করছি, দেহের প্রতি আসক্তি, এই অভিনিবেশ আমাদের এমন সম্মোহিত করে রেখেছে যে, দেহ আর দেহ সম্বন্ধীয় ছাড়া অন্য কিছু ভাবতেই চাইছি না। ঠাকুর যে বলছেন, এখানকার অনুভূতি বেদ-বেদান্তকে ছাড়িয়ে গেছে, শুধু ঠাকুরের ছাড়াবে না, সবারই ছাড়াবে। হিন্দুরা এই সত্যকে হাজার হাজার বছর আগে আবিষ্কার করে রেখেছেন, যেখানে সাক্ষাৎ অনুভূতি হয় সেখানে শব্দ অনেক নীচে পড়ে থেকে যায়। বেদ, উপনিষদ, কথামৃত এগুলো শব্দ মাত্র। একজন একটা ডায়মণ্ড নেকলেস তার প্রিয়জনকে উপহার দেবে। সে এখন ডায়মণ্ড নেকলেস কিনবে, কিনে একটা সুন্দর গিফট প্যাকিংএ রাখবে আর উপরে সুন্দর করে লিখবে, ডায়মণ্ড নেকলেস উইদিন ফ্রম এ লাভিং পার্সন টু হিজ্ লাভিং ফ্রেণ্ড। ঐ যে প্যাকিংএর গায়ে লেখা আছে ডায়মণ্ড নেকলেস আর ভিতরে যে ডায়মণ্ড নেকলেস রয়েছে, দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। শব্দের দিক থেকে দুটো একই, এটাও ডায়মণ্ড নেকলেস, ওটাও ডায়মণ্ড নেকলেস। দুনিয়ায় যত বই আছে, যত উইকিপেডিয়ায় ডায়মণ্ড নেকলেস থাকুক, আসল ডায়মণ্ড নেকলেসের সামনে ওগুলোর কোন দাম নেই।

Never lose faith in yourself, you can do anything in this universe. Never weaken, all power is yours. (*নিজের উপর বিশাস কখনও হারিও না, এ জগতে তুমি সব করতে*

পারো। কখনও নিজেকে দুর্বল ভেবো না, সব শক্তি তোমার ভিতরে রয়েছে।) এই যে স্বামীজী বলছেন Never weaken, all power is yours, প্রথম প্রথম শুনলে আমাদের মন বিশ্বাস করতে চায় না, কিন্তু সেই আমরাই অনেক দিন সাধুসঙ্গ করে করে একটু চেতনা যখন জাগ্রত হয়, তখন বিশ্বাস হয় যে, ঠিকই বলছেন। কিন্তু দৈনন্দিন কাজের মধ্যে নেমে যাওয়ার পর আর হুঁশ থাকে না। সে যাই হোক, কিন্তু তার থেকেও বেশি অবাক লাগে, হিন্দুদের এতো ধর্মশাস্ত্র রয়েছে, জগতে এত ধর্মগ্রন্থ রয়েছে, কেউ-ই কিন্তু এই কথা বলছেন না। খুব কাছাকাছি যে বাক্য আছে তা হলো অহং ব্রহ্মাস্মি, কিন্তু এখানে এর কোন অর্থই হয় না। যারাই অহং ব্রহ্মাস্মি বলে বেড়ায়, তাদের সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভাল। যারা বলছে তারা কি বুঝে বলছে? এটা শঠতা। ভগবান বুদ্ধ বলছেন আত্মদীপো ভব, যীশু বলছেন, Kingdom of Heaven is within you, এগুলো হল অনেকটা কাছাকাছি। কিন্তু ব্যবহারিক স্তরে এসে যখন বলছেন, তোমার মধ্যে সব জ্ঞান, সব শক্তি তোমার মধ্যেই, এর মত এত স্পষ্ট ও বলিষ্ট exepression কোথাও পাওয়া যাবে না। এটাই আশ্চর্যের যে কোন শাস্ত্র এই কথা বলেনি। সবাই একই কথা বলছেন, যখন উপনিষদ অহং ব্রহ্মাস্মি বলছেন, তখন মূলতঃ এটাই বলতে চাইছেন যে, জগতের সমস্ত ক্ষমতা, সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত শক্তি তোমার ভিতরে। আত্মদীপো ভব ভগবান বুদ্ধ যখন বলছেন, তিনিও ঐ একই ভাব নিয়ে বলছেন। যীশুও যখন বলছেন, Kingdom of Heaven is within you, একই কথা বলছেন। কিন্তু স্বামীজীর মত এত স্পষ্ট ও সহজ সরল ভাবে কেউ বলেননি। ধর্মের ইতিহাসে প্রথম কেউ একজন এই ভাবে বলছেন।

আমাদের মনে দুঃখ হলে, কষ্ট হলে বন্ধুবান্ধবদের কাছে যাই, আরেকটু বেশি কষ্ট হলে কাউনসেলিং করতে যাই, সাইকিয়াট্রিস্টদের কাছে যাই, বাড়িতে পাওয়ার পজিটিভ থিঙ্কিং নিয়ে কত বই আছে, সোস্যাল মিডিয়ায় কত লেখা আসে। আর জেহাদীদের শুধু এটুকু বিশ্বাস আল্লা আমাকে দেখবেন, তাতেই সুইসাইড বোম্বার হয়ে নিজেকে এবং বিধর্মীদের উড়িয়ে দিচ্ছে। একবার যদি আমরা বিশ্বাস করতে পারে, all power is within you, তাহলে কি হবে ভাবা যায়! যারা জীবনে কিছুই করতে পারে না, তারা positive thinking, how to success in life নিয়ে বই লেখে। বিল গেটস্ লিখলে না হয় বোঝা যেত, ভদ্রলোক জীবনে কিছু করে দেখিয়েছেন। ঐ বইগুলোক পড়েই লোকেরা নিজেদের প্রেরণা সংগ্রহ করছে। এদের কথাকে সবাই বিশ্বাস করে নিজেকে কিনা কি ভাবতে শুরু করে। আর তোমার ভিতরেই সব শক্তি, সব জ্ঞান, এই কথাকে একবার বিশ্বাস করে দেখো। জগতে এমন কোন কিছু নেই যেটা তুমি পারবে না। তুমি একটু এই বিশ্বাসটাকে জাগাও, কাজে নেমে দেখো হয় কিনা।

ডেল কার্নিগে নামে একজন লেখক একটা বই লিখেছিলেন How to win Friends, বইটা দশ লক্ষ না কুড়ি লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছিল। ভিতরে সবাই জ্বালা-যন্ত্রণায় জ্বলছে, জ্বালা-যন্ত্রণা কমাতে সবাই বন্ধু বানাতে চাইছে। ডেল কার্নিগে শেখালেন জ্বালা-যন্ত্রণাকে চাপা দিয়ে কিভাবে সবাইকে হ্যালো, হাই বলতে হয়, আর শেষে লেখক নিজেই জ্বালা-যন্ত্রণায় জ্বলে আত্মহত্যা করলেন। এদের কথাকে মানুষ বিশ্বাস করতে রাজী আছে, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছে না, তোমার ভিতরেই সমস্ত শক্তি, সমস্ত জ্ঞান। যারা অশিক্ষিত, যারা অর্দ্ধ বিক্ষিপ্ত, তারা না হয় বিশ্বাস করতে পারে যে, ভগবান আমাকে দেখছে, ভগবান তাকে মারবে। কিন্তু পড়াশোনা করা শিক্ষিত, সুস্থ মনের, তারা কেন এটা বিশ্বাস করতে পারছে না যে – তোমার ভিতরেই সব শক্তি? ভাবলে সত্যিই অবাক হয়ে যেতে হয়। মাত্র কজন লোক যদি সত্যিই এই বিশ্বাস নিয়ে আসে – তোমার ভিতরেই সব শক্তি, এই অল্প কজনই জগৎকে তোলপাড় করে দেবে। সত্যিই তোলপাড় হয়ে যাবে, কারণ এগুলো তো কোন মুখের কথা নয়। একজন জেহাদী এভাবে নিজেকে শেষ করে দিয়ে আমেরিকাতে অত বিশাল বাড়ি শুদ্ধ সবাইকে উড়িয়ে দিতে পারে, শুধু এই বিশ্বাসের জোরে, বিধর্মীদের মেরে আমি স্বর্গে যাবো, যেখানে আল্লা আমার জন্য বাহাত্তর জন হুরী নিয়ে অপেক্ষা করে আছেন, আর সেখানে এই একটা কথা, তোমার ভিতরেই অনন্ত শক্তি, তোমার ভিতরেই অনন্ত জ্ঞান, যদি সত্যিই বিশ্বাস করে নেয়, তখন কি অবস্থা হবে, আমরা এখন কল্পনাই করতে পারব না। কিন্তু ভারতের লোকেদের এমন দুরবস্থা যে, স্বামীজী নিজেই তাঁর ভাববার কথায় বলছেন, ভারতের লোকের এইসব কথা শুনেই বলবে, 'বাঃ খুব সুন্দর কথা'! ঘুমোচ্ছিল, বলেই পাশ ফিরে শুয়ে পড়বে।

If religion and life depend upon books or upon the existence of any prophet whatsoever, the perish all religion and books. (*প্রকৃত ধর্ম এবং জীবন যদি শাস্ত্রের উপর বা কোন প্রফেটের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে, তবে চুলোয় যাক সব ধর্ম, চুলোয় যাক সব শাস্ত্র।*) ধর্ম যদি কোন গ্রন্থ বা ঋষির উপর দাঁড়িয়ে থাকে, সেই ধর্ম একদিন নষ্ট হয়ে যাবে। Religion is within us, ধর্ম আমাদের ভিতরে আছে বলে সত্য, বাইরে আছে বলে সত্য নয়। যীশু যখন বলছেন, Kingdom of Heaven is within you, স্বর্গ সেইজন্যই সত্য, বাইরে আছে বলে সত্য নয়। ঈশ্বর কেন সত্য? আমার ভিতরে আছেন বলেই ঈশ্বর সত্য। জীবনে আমাকে কেন ভাল হতে হবে? ভাল হওয়াটা আমার স্বভাবে আছে, আমার ভিতরে আছে, সেইজন্য এটা সত্য। ভালবাসা কেন সত্য? ভালবাসা আমার ভিতরে আছে, তাই ভালবাসা সত্য।

বলছেন No books or teachers can do more than help us to find it, and even without them we can get all truth within. (*কোন শাস্ত্র বা কোন গুরু আমাদের তাঁকে লাভ করার জন্য সাহায্য করা ছাড়া আর কিছু করতে পারেন না। এমন-কি তাঁদের সহায়তা ছাড়াও আমাদের নিজেদের ভিতরেই সব সত্য লাভ করতে পারি।*) এটা স্বামীজীর খুব নামকরা কথা, শাস্ত্র, গুরু আমাদের তাঁকে পেতে সাহায্য করে, আর যদি সাহায্য নাও পাওয়া যায় তাও আমরা ওই সত্যের উপলব্ধি করতে পারি। ঠাকুর যখন মা কালীর সাধনা করছেন, তখন তাঁর কোন বই নেই, কোন গুরু নেই। উপনিষদে সত্যকামের যে সাধনা, গুরুর আদেশে কয়েকটা গরু নিয়ে জঙ্গলে চলে গেলেন, সেখানে তাঁর কোন বই নেই, কোন গুরু নেই, কিন্তু তাও সত্য তিনি নিজেই পেয়ে গেলেন। প্রফেট মহম্মদেরও কোন গুরু ছিল না, কোন বই ছিল না, সত্যকে পেয়েছেন। যদি একজনও কেউ এ-ভাবে বইয়ের সাহায্য ছাড়া, কোন গুরুর সাহায্য ছাড়া সত্যকে পেয়ে থাকেন, তবে জানতে হবে সবাই পেতে পারবে। শাস্ত্র, বই, শিক্ষক এরা আমাদের শুধু সংযোগটা করিয়ে দেন, এর বেশি এরা আর কিছু করতে পারেন না।

You have gratitude for books and teachers without bondage to them; and worship your Guru as God, but do not obey him blindly. (*তথাপি শাস্ত্র ও আচার্যগণের প্রতি কৃতজ্ঞ হও, কিন্তু এনারা যেন বদ্ধ না করেন; তোমার গুরুকে ঈশ্বর বলে উপাসনা কর, কিন্তু অন্ধভাবে তাঁর অনুসরণ করো না।*) আইনস্টাইনের মত মানুষও প্রাইমারি স্কুলে পড়েছিলেন, পরে বিজ্ঞান জগতে একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী রূপে গণ্য হয়ে গেলেন, কিন্তু তখনও প্রাইমারী স্কুলে যে শিক্ষকদের কাছে তিনি যে প্রাথমিক শিক্ষা পেয়েছিলেন, সেই শিক্ষকদের প্রতি, সেই স্কুলের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা থাকবে। আইনস্টাইন কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলবেন, আপনারা ছিলেন বলে আমি আজ এতদূর এগোতে পেরেছি, কিন্তু আপনারাই আমার শেষ নন, সেইজন্য কোন বন্ধন থাকবে না। তবে জেনে রাখা ভাল যে, যারা বলে মায়ের আশীর্বাদেই আজ আমি এখানে পৌঁছাতে পেরেছি, হয় তারা বোকা আর তা নাহলে মিথ্যা কথা বলছে। বেশির ভাগ মায়ের ছেলেরাই তো এক একটা অপদার্থ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাদের হচ্ছে না কেন? তাদের উপর মায়েদের কি আশীর্বাদ নেই? সব মায়েরা কি সন্তানদের আশীর্বাদ দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে? যার হয় নিজের ক্ষমতার জোরেই হয়। মা মিষ্টি করে দুটো ভাল কথা বলে দেন, তারপর এগিয়ে গেল, এর বেশী কিছু হয় না। স্কুলেও তাই, যার হয় নিজে থেকেই হয়, শিক্ষকের সাহায্যে কিছু হয় না। তবে যে শিক্ষকদের সাহায্য পেয়েছে, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা থাকবে, বন্ধন কখনই থাকবে না। আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রেও তাই।

No blind belief can save you, work out your own salvation. Have only one idea of God – that He is an eternal help. (*কোন রূপ অন্ধবিশ্বাস তোমায় মুক্তি দিতে পারে না, তুমি নিজেই নিজের মুক্তি-সাধন কর। ঈশ্বর সম্বন্ধে এই একটি মাত্র ধারণা পোষণ কর যে, তিনি আমাদের চিরকালের সহায়।*) যদি গুরুকে মনে রাখতে হয়, ঈশ্বরকে যদি মনে রাখতে হয়, তাহলে মনে করতে হবে তিনি সব সময়ই আমার সাথে আছেন। গুরুকৃপা সদা সর্বদা রয়েছে, স্বামীজী এটাই বলছেন। যে পাল তুলে দেবে, কৃপা বাতাস তার পালে লাগবে, আর সেও তর তর করে এগিয়ে যাবে। যে পাল তুলবে না, সে কোন দিন কৃপা বাতাসকে কাজে লাগাতে পারবে নে। ঠাকুর বারবার বলছেন, কৃপা বাতাস সব সময় বইছে। যারা

বলে আমার ঈশ্বরের বা আমার গুরুর আশ্রয় নিলেই কৃপা পেয়ে যাবে, তার মানে তিনি আপনাকে কৃপা করবেন আর আমাকে ছেড়ে দেবেন – আমি তো বলব, আমি যদি এই রকম একজন গুরু, এই রকম একজন ঈশ্বরকে জানতে পারি, আমি বলে দেব, নমস্কার আপনি আপনার নিজের জায়গায় থাকুন, আমার এই রকম গুরু, এই রকম ঈশ্বর লাগবে না। ঐ ভগবান তোমাকে স্বর্গে নিয়ে যাবেন, আর আমি মানি না বলে আমাকে নরকে পাঠাবেন, আমার এই ঈশ্বর লাগবে না।

স্বাধীন ভাব ও উচ্চতম প্রেম - আমাদের যথার্থ স্বরূপ - সেবার মাহাত্ম্য - রাজা রামমোহন রায়

Freedom and highest love must go together, then neither can become a bondage. (*স্বাধীনতার ভাব এবং উচ্চতম প্রেম – দুই-ই একসঙ্গে থাকা চাই, তা হলে এদের মধ্যে কোনটাই আমাদের বন্ধনের কারণ হতে পারে না।*) ভালবাসা আর মুক্তি দুটো একসাথেই চলে। জ্ঞান আর ভক্তি কখনই আলাদা কিছু না। ভক্তি আর জ্ঞান যদি একসাথে না চলে, তাহলে বুঝতে হবে কিছু গোলমাল আছে। সেইজন্য যে ভালবাসা আমাকে মুক্তি দেয় না, পরিবর্তে যে ভালবাসা আমাদের আরও বেঁধে ফেলে, ওটা ভালবাসা নয়, আসলে তা ঘোর আসক্তি। যে বিদ্যা আমাদের অহঙ্কারী করে দেয়, আমি জ্ঞানী, ঐ বিদ্যা কোন বিদ্যাই নয়। *সা বিদ্যা যঃ অভিমুক্তয়ে*, যে বিদ্যা মুক্তির দিকে নিয়ে যায়, সেটাই বিদ্যা। স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, সত্যিকারের বন্ধুত্বের দ্বারা মানুষ ঈশ্বরকেও পেতে পারে – এটাই ভালবাসা। আমি ভালবাসি, অথচ আমি এখনও একজন মহাপুরুষ হয়ে যায়নি, ভালবাসায় গোলমাল আছে। আমি ভালবাসি, কিন্তু আমার ব্যবহারে, কথাবার্তায় মাধুর্য নেই, আমার মন কোমল হয়ে যায়নি, ভালবাসায় অবশ্যই গোলমাল আছে। ভালবাসা তা ঈশ্বরের প্রতিই হোক, গুরুর প্রতিই হোক, মানুষের প্রতি হোক, বন্ধুর প্রতি হোক, স্বামী বা স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা হোক, সন্তানের প্রতি হোক, ঐ ভালবাসা যদি আমাকে মহাপুরুষ না তৈরী করে দেয়, ভালবেসে আমি যদি মহৎ না হয়ে যাই, তাহলে এই ভালবাসা আর যাই হোক, কখনই ভালবাসা নয়।

We can give nothing to God; He gives all to us. He is the Guru of our Gurus. Then we find that He is the 'Soul of our souls', our very Self. (*আমরা ভগবানকে কিছু দিতে পারি না, তিনি আমাদের সব দিয়ে থাকেন। তিনি সকল গুরুর গুরু, তিনি আমাদের আত্মার আত্মা, আমাদের যথার্থ স্বরূপ।*) ঈশ্বরকে আমরা কিই বা দিতে পারি, আর তাঁর কি কাজই বা করতে পারি। তিনি আমাদের আত্মারও আত্মা, গীতাতেও ভগবান বারবার এই কথা বলছেন – *জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্*; জ্ঞানী আমার আত্মা আর জ্ঞানীর আত্মা আমি। এরপর আর কিছু বলার থাকে না। সেইজন্য তিনি গুরুরও গুরু, এই কথা যোগশাস্ত্রেই বলছে। তিনি পরমগুরু। সেইজন্য আমরা ভালবাসি, কারণ মানুষ নিজের আত্মাকেই ভালবাসে, নিজেকেই ভালবাসে। ঈশ্বর আমাদের আত্মা সেইজন্য আমরা ঈশ্বরকে ভালবাসি। মানুষ নিজের সন্তানকে ভালবাসে, কারণ সে জানে সন্তান আমার আত্মা। সেইজন্য কি হয়? We want to be the 'steady flame, burning without heat and without smoke'. To whom can you do good, wen you see only God. (*আমরা হতে চাই স্থির অগ্নিশিক্ষা – যার তাপ নেই, ধোঁয়া নেই। যখন তোমরা কেবল ব্রহ্মকেই দেখবে, তখন আর কার উপকার করতে পারবে।*) যখন সবাইকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর দেখছি, বা যিনি ব্রহ্মকেই শুধু দেখেন, তখন তিনি কার ভাল করবেন, কোথায় মন্দ দেখবেন, কোথায় ভাল দেখবেন? You cannot do good, রাজা মহারাজ তাঁর শিষ্যদের বলছেন, আমারও ইচ্ছা হয় যে তোদের উপদেশ দিই, কিন্তু যখন দেখছি তোমরা সবাই নারায়ণ, তখন আমি কাকে উপদেশ দেব!

All doubts goes, all is, 'sameness'. If you do good at all, you do it to yourself; feel that the receiver is the higher one. (*তখন সব সংশয় চলে যায়, সর্বত্র সমত্বভাব এসে যায়। যদি তখন কারও কল্যাণ কর তো নিজেরই কল্যাণ করবে।*) আমি লোকের ভাল করব, এ-কথা কখনই বলা যায় না, কারণ তুমি কার ভাল করবে! সবাইকে তুমি যদি সাক্ষাৎ ঈশ্বর দেখো, তখনই তোমার সব সংশয় সন্দেহ মিটে যাবে। Your serve the other because you are lower than he, not because he is low and you are high. (*এইটি অনুভব কর যে দানগ্রহীতা তোমার চেয়ে বড়। তুমি যে তার সেবা করছ, তার কারণ – তুমি তার চেয়ে ছোট; এ নয় যে, তুমি বড় আর সে ছোট।*) আমরা আগেও

এর উপর আলোচনা করেছি, আর মনুস্মৃতিতে মনুও একই কথা বলছেন। খ্রীশ্চানদের এই সমস্যা ছিল, আমাকে অপরের ভাল করতে হবে, অশিক্ষিত, দরিদ্রের ভাল করতে হবে। তোমাকে কারুর কিছু ভাল করতে হবে না, যদি করতে হয় সেবা কর। Give as the rose gives perfume, because it is its own nature, utterly unconscious of giving. (*গোলাপ যেমন নিজের স্বভাবেই সুগন্ধ বিতরণ করে, আর সুগন্ধ দিচ্ছে বলে সে মোটেই টের পায় না, তুমিও সে ভাবে দিয়ে যাও।*) গোলাপ এই অহঙ্কার করে না যে, দেখো আমি তোমাদের কেমন সুগন্ধ বিতরণ করছে, কারণ সুগন্ধ ছড়ানোটাই তার স্বভাব। এটা উপমার জন্য বলছেন, যেটাই তোমার দেওয়ার আছে সেটাই গোলাপের মত শুদ্ধ মনে, পবিত্র মনে দিয়ে যাও। বিনিময়ে কিছু প্রত্যাশা করা ছেড়ে দাও, উপরন্তু তুমি জানবেই না যে, তুমি দিয়ে যাচ্ছ।

এরপর স্বামীজী রাজা রামমোহন রায়কে নিয়ে বলছেন। এটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। স্বামীজী তাঁর পাশ্চাত্যের শিষ্যদের দেখাচ্ছেন, রাজা রামমোহন কিভাবে দেশের তৎকালীন সামাজিক কুসংস্কারাচ্ছন্ন পরিস্থিতির মধ্যেও অনেক পরিবর্তন নিয়ে এলেন। স্বামীজী বলছেন, ভারতের সমাজ ব্যবস্থায় অনেক পরিবর্তন আনার জন্য ইংরেজরা অনেক কৃতিত্ব নেয়, কিন্তু তা না, রাজা রামমোহন রায় অনেক আগে থাকতেই বিভিন্ন কুসংস্কার ও কু-প্রথার বিরুদ্ধে প্রচুর আন্দোলন করেছিলেন, যার মধ্যে সতীদাহ প্রথাকে তিনি আইনগত ভাবে বন্ধ করলেন। আমরা সবাই এর ইতিহাস জানি। শেষে বলছেন, He cared nothing for fame or for results to himself, এত কিছু বলার পর স্বামীজী রাজা রামমোহনের সম্বন্ধে এই কথা বলছেন যে, তিনি যে এইসব করেছেন, এর জন্য তিনি কোন নাম-যশ চাইতেন না, নিজের জন্য কোন রকম ফলাকাঙ্ক্ষা করতেন না। সমগ্র আলোচনার মূল বক্তব্য হল, যেখানে ঠাকুরকে কেন্দ্র করে বলছেন, যদিও সব কিছু তোমার ভিতরে, কিন্তু তা সত্ত্বেও গুরুও দরকার পড়ে, শাস্ত্রও দরকার পড়ে, ইষ্টও দরকার পড়ে। কিন্তু জানবে, এর সবটাতেই ব্যক্তির কোন গুরুত্ব নেই, ব্যক্তিত্বেরও কোন দাম নেই, দাম হল সিদ্ধান্তের, আর সমস্ত সিদ্ধান্ত তোমার ভিতরেই রয়েছে। যদি কেউ সাহায্য করে থাকেন, তাঁর প্রতি তোমার কৃতজ্ঞতা থাকবে, কিন্তু কোন বন্ধন থাকবে না। এই দিনেই স্বামীজী সকালে আর বিকালে দুবার ক্লাশ নিয়েছেন। আমরা এতক্ষণ সকালের ক্লাশের উপর আলোচনা করলাম, এবার বিকালের ক্লাশকে নিয়ে বলা হচ্ছে।

ঐদিন অপরাহ্ণ

আলোচনা শুরু করার আগে একটা খুব সাধারণ কথা বলা হচ্ছে। বেলুড় মঠের বেশির ভাগ সন্ন্যাসীই ঠাকুর স্বামীজীকে পড়েই বড় হয়েছেন। সন্ন্যাসীরা তাই ঠাকুরকে বড় করে দেখবেন, স্বামীজীকে বড় করে দেখবেন, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি আমরা ভাবি, স্বামীজী যখন দেববাণীর উপর বলছেন, তখন সালটা হল ১৮৯৫, স্বামীজী তখন মাত্র তিত্রিশ বছরের একজন যুবক সন্ন্যাসী। যে কোন সন্ন্যাসী যখন দেববাণীতে স্বামীজীর কথাগুলো পড়েন, তখন তাঁরা অবাক হয়ে ভাবেন – জীবনে আমরা এত বই পড়েছি, তার মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বই হল ঠাকুর ও স্বামীজীর বই। কারণ এনারা পুরো হিন্দু ধর্মকে এক জায়গায় এনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেছেন। স্বামীজী যখন ছিলেন তখন সব কিছুই ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, এক জায়গায় কিছু ছিল না। কিন্তু মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে একজন মানুষ একটা ধর্মের সব কিছুকে গুছিয়ে এক জায়গায় এনে দিলেন, আর তার সাথে আধ্যাত্মিক জগতের সূক্ষ্ম জিনিসগুলো কি হতে পারে, সমাজের সূক্ষ্ম জিনিসগুলো কি রকম, অবাক লাগে কি করে একটা মানুষের এই রকম ট্যালেন্ট হতে পারে। এর আভাস আমরা দেববাণীতে খুব ভাল ভাবে দেখতে পাই।

ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যত জানার পথ

এই আলোচনায় স্বামীজীর বক্তব্যকে লাইন ধরে ধরে দেখতে গেলে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হবে। জীবন কি, আমরা কেন এই জগতে এসেছি, এই শরীরে কেন এসেছি; বিভিন্ন ঋষি ও পণ্ডিতরা এই প্রশ্নগুলির বিভিন্ন উত্তর দিয়েছেন। বিভিন্ন ধর্মের প্রবর্তকরা, প্রচারকরা বিভিন্ন ভাবে উত্তর দিয়েছেন। শুধু হিন্দু ধর্মেই দ্বৈতবাদীরা, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর, ভক্তিবাদীরা, অদ্বৈতবাদীরা সবাই আলাদা আলাদা রকমের উত্তর দিয়েছেন, কারুর সাথে কারুরটা মেলে না। এনাদের সব বক্তব্যকে এক জায়গায় জড়ো করে প্রশ্নগুলির একটা যুক্তি

সম্মত সঠিক উত্তর দিয়ে জিনিসটাকে দাঁড় করানো খুব মুশকিল, কিন্তু স্বামীজী অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। তার সাথে এটাকে উপমা দিয়ে বোঝান আরও কঠিন। স্বামীজী এখানে একটা উপমা এনে পুরো জিনিসটাকে বোঝাচ্ছেন।

তার আগে আমরা কল্পনা করতে পারি, আমি হাওড়া থেকে আসানসোল স্টেশন গেছি। আসানসোল স্টেশনটা খুব অদ্ভূত স্টেশন, যেখানে একই জায়গা থেকে পিছনের দিকে যে ট্রেনগুলো ঢুকছে, সেগুলো আবার সামনের দিক দিয়ে বিভিন্ন গন্তব্যে বেরিয়ে যাচ্ছে। গয়া থেকে ট্রেন আসছে, সেটা আবার সামনের দিকে পুরুলিয়ার দিকে চল যাবে, কোনটা পুরী, আবার কোনটা হাওড়ার দিকে বেরিয়ে যাবে। স্টেশনে লোকাল ট্রেনও ঢুকছে, দূরপাল্লার ট্রেনও ঢুকছে, রাজধানীও আসছে, আবার শর্ট রুটের ট্রেন ব্ল্যাকডায়মণ্ড, কোলফিল্ডও আসছে, শতাব্দীও আসছে, অনেক রকমের ট্রেন আসছে। আসানসোল স্টেশনে একজন যাত্রীর সাথে কোন পাঁচ বছরের বাচ্চা যদি থাকে, যে কোন ট্রেন আসতে দেখলেই বাচ্চা প্রশ্ন করবে, 'বাবা আমরা কি এই ট্রেনে উঠব? এই ট্রেনেই চলো'। বাবা বলল, 'এই ট্রেন যাবে আমাদের গন্তব্য জায়গায় যাবে না'। 'কেন এই ট্রেন যাবে না? আমরা তো দিল্লী যাবো, ঐদিকেই তো যাচ্ছে, যাবে না কেন'? এত প্রশ্ন করতে থাকবে যে, বাবা বিরক্ত হয়ে উঠবে। বাচ্চাকে বোঝান যাবে না যে, এটা লোকাল ট্রেন, এটা এ্যক্সপ্রেস ট্রেন। শুধু তাই না, হয়ত একটা ট্রেন এলো, ট্রেনের গায়ে লেখা হাওড়া-দিল্লী এ্যক্সপ্রেস। এইতো এটা দিল্লী যাবে। কিন্তু এই ট্রেন পাটনা হয়ে যাবে। ওরা গয়া হয়ে যেতে চাইছে। বাচ্চারা এই তফাৎটা বুঝতেই পারবে না। বিহার ইউপির দিকে আরও মজার ব্যাপার হয়, ঐদিকে একটা একটা জংশনকে অতিক্রম করতে থাকে আর ট্রেন তার রুট পাল্টাতে থাকে। মোঘলসরাই আসতে আসতে ট্রেন যে কত দিকে ছিটকে বেরিয়ে যাবে, কিছুই বোঝা যাবে না। কোন ট্রেন আবার ওখান থেকে পিছনের দিকে চলতে শুরু করবে তারও ঠিক নেই। বাচ্চারা এগুলো কিছু বুঝতে পারে না। কিন্তু যারা নিয়মিত যাতায়াত করে তার জানে। যারা শুধু লোকাল ট্রেনেই যাতায়াত করে, তারাও আবার অবাক হয়ে যায়, শতাব্দী, রাজধানী এত তাড়াতাড়ি কি করে চলে যাচ্ছে।

আসানসোল জংশনকে আমরা যদি এখন আরও বড় করে দেখি, আসানসোলের পরে যে যে জংশনগুলি থেকে ট্রেনগুলি অন্য দিকে চলে যায়, সব জংশনগুলিকে আমরা টেনে আসানসোলে নিয়ে আসছি। এবার যেমনি একটা ট্রেন এসে ঢুকছে, আর একটু পরেই আলাদা হতে শুরু হয়ে যাবে। যিনি জানেন তিনি বলে দেবেন, আরে এই ট্রেনটা তো জম্মু চলে যাবে, এই ট্রেন রাজকোট চলে যাবে। একটা একটা ট্রেন স্টেশন থেকে বেরিয়ে ট্র্যাক পাল্টে বিভিন্ন দিকে চলে যাচ্ছে। হাওড়া থেকে বর্ধমান চারটে লাইন পাশাপাশি যায়। দুটো ট্রেন পাশাপাশি যেতে থাকে। একই গতিতে পাশাপাশি চলতে থাকলে আমরা পাশের ট্রেনের যাত্রীর সাথে কথাও বলতে পারি – আপনি কোথায় যাচ্ছেন, আমি অমুক জায়গায়, আর আপনি, অমুক জায়গায়। পাশাপাশি অনেকক্ষণ যাচ্ছে, তাও দুটো ট্রেন একটা জায়গায় গিয়ে আলাদা হয়ে গিয়ে অন্য দিকে চলে যাবে। তারপর যত ট্রেন এগিয়ে যেতে থাকবে তত বাইরের দৃশ্য, গাছপালা, বাড়িঘর সব পাল্টাতে শুরু হয়ে যাবে। প্রথমের দিকে হুগলী, বর্ধমান জেলার মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় সবুজ ধানক্ষেত, আসানসোল আসতে আসতে পুরো রুক্ষ ভূমি দেখা যেতে লাগল। এই ভাবে পর পর ল্যাণ্ডস্কেপ পাল্টাচ্ছে। হাওড়া থেকে দিল্লী যাওয়ার অনেকগুলো রুট আছে, প্রত্যেকটা রুটে ল্যাণ্ডস্কেপ পুরো আলাদা। আবার এমনও হতে পারে যে, সেই ট্রেনগুলো লুপ করে হাওড়া স্টেশনে ফেরত চলে আসছে।

আমরা জীবনকে বোঝানর জন্য ট্রেনের উপমা নিলাম। স্বামীজী ট্রেনের উপমা নিচ্ছেন না। জীবন বলতে আমরা পুরো অস্তিত্বের কথা বলছি, শুধু এই জীবনকে নিয়ে বলা হচ্ছে না। আমার অস্তিত্ব হল, যবে থেকে এই সৃষ্টিতে আমি এসেছি আর যতদিন না আমার মুক্তি হয়ে যাচ্ছে, পুরোটাকে নিয়ে এখানে বলা হচ্ছে। এটা যেন একটা ট্রেন যাত্রার মত। যখনই একটা ট্রেনে চাপলাম, আমার নানা রকম অভিজ্ঞতা হতে শুরু হয়ে যাবে। ঐ ট্রেনে যারা যারা আছে, সবারই অভিজ্ঞতা কম বেশি এক রকম হবে। হঠাৎ আমার কি মনে হল, আরে এই ট্রেন কোথায় যাচ্ছে, আমার যে ট্রেনে যাওয়ার কথা, এটা সেই ট্রেনটাই তো? প্রায়ই লোকাল ট্রেনে আমাদের এই ধরণের ভুল হওয়ার অভিজ্ঞতা হয়। তাড়াহুড়োতে উঠে পড়লাম, তারপর দেখছি এটা কর্ড লাইনে না গিয়ে মেইন লাইন ধরে এগোচ্ছে। তাড়াতাড়ি পরের স্টেশনে নেমে পড়লাম, আমাকে অন্য ট্রেনে

যেতে হবে। সন্ন্যাসীরা জন্ম নেওয়ার পর প্রথমে একটা ট্রেনে চেপে থাকেন। সেই ট্রেনে বাবা-মা, ভাই-বোন আর তাদের সাথে পরিবারের একটা অভিজ্ঞতা সাথে সাথে চলতে থাকে। হঠাৎ একটা সময় তাঁর মনে হল এটা আমার ট্রেন নয়, সেই ট্রেন ছেড়ে অন্য ট্রেনে উঠে পড়ল। এতক্ষণ একসাথে ট্রেনে আসছিল, হঠাৎ ট্রেন ছেড়ে নেমে পড়তেই অন্যরা চিৎকার চেঁচামেচি করতে থাকে, আরে তুমি একি করছ, এটাই তোমার ট্রেন। হয়ত দুটো ট্রেন পাশাপাশি চলছে, এক অপরকে দেখতে পাচ্ছে, আর চেঁচাতে থাকে, আরে তুমি কি করলে! কিন্তু আস্তে আস্তে দুটো ট্রেন ট্র্যাক পাল্টে আলাদা হয়ে গেল। পরে যাদের সাথে থাকছে, তাদের থেকেও ট্র্যাক পাল্টে নেবে। এই যে বিভিন্ন রকম ট্রেন, কোনটা ঘুরে তাকে হাওড়া স্টেশনে নামিয়ে দেবে, আবার কোনটা লক্ষ্ণৌ হয়ে হরিদ্বারে পৌঁছে দেবে। কোন ট্রেন আমাকে দিল্লী নিয়ে চলে যাবে, কোন ট্রেন চেন্নাই নিয়ে চলে যেতে পারে, যে কোন দিকে চলে যেতে পারে। জীবন রূপী ট্রেন, কোন ট্রেন আমাকে আবার পুনর্জন্মে মাতৃগর্ভে নিয়ে আসবে, ঐ মা থাকবে না, অন্য মা থাকবে। কোন ট্রেন আবার আমাকে ইষ্ট দর্শনে নিয়ে চলে যাবে। আবার কোন একটা ট্রেন আমাকে ব্রহ্মজ্ঞানে নিয়ে চলে যাবে। মানুষ যেমন ঠিক করে রাখে, আমাকে এই জায়গায় যেতে হবে, ঐ জায়গার যেতে আমাকে এই ট্রেনেই চাপতে হবে, অন্য ট্রেনে চাপলে আমি আমার নির্দিষ্ট জায়গায় যেতে পারব না।

জীবনের যে আদর্শ, সেই আদর্শকে ঠিক ঐ ভাবেই নিতে হয়। আমাকে সচেতন থাকতে হবে, আমি যে ট্রেনে চাপতে যাচ্ছি, ঐ ট্রেন আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু আমাদের বেশির ভাগ মানুষই এই ব্যাপারে সজাগ নই। একটা ট্রেনে আছি, বসার জায়গা পাওয়া গেছে, কোথাও না কোথাও তো নিয়ে যাবে। যিনি ট্রেনের ব্যাপার-স্যাপারগুলো ভাল করে জানেন, তিনি ট্রেনের ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকেন, আমার নির্দিষ্ট ট্রেনেই যেন চাপতে পারি, ভুলভাল ট্রেন যেন চেপে না পড়ি। আসানসোলে ট্রেন যেমনি ঢুকছে, প্ল্যাটফরমে ছেলে বাবাকে জিজ্ঞেস করছে, 'বাবা এই ট্রেন কোথা থেকে আসছে'? বাবা বলে দিল, 'হাওড়া থেকে আসছে'। 'আর এই ট্রেনটা'? 'বর্ধমান থেকে আসছে'। 'এই ট্রেনটা কোথায় যাবে'? 'পাটনা যাবে। এই ট্রেনটা মাঝ রাতে গিয়ে পাটনায় পৌঁছাবে, এটাতে গিয়ে কাজ নেই'। 'তুমি কি করে জানলে'? 'আমি ট্রেনের ব্যাপারে সব জানি'।

আমরা কোথাও বেড়াতে যাওয়ার আগে, ট্রেনের টাইম-টেবিল দেখে ট্রেনের গন্তব্য, পৌঁছানর সময়, পৌঁছে ওখানে ট্যাক্সি পাওয়া যাবে কিনা, সব রকম প্ল্যানিং করে বেড়াতে যাই। কিন্তু ট্রেনটা ওখানে নাও পৌঁছাতে পারে, আর সত্যিই এই রকম হয়, কোন এ্যক্সিডেন্ট হয়ে যেতে পারে, লাইনে ফাটল থাকতে পারে, আবহাওয়া প্রতিকূল হতে পারে। কিন্তু তার থেকেও বড় কথা হল, লোকেরা জানে এই ট্রেনে যদি চাপা হয়, এই রেলওয়ে ট্র্যাক অন্ততঃ আমাকে হরিদ্বার পর্যন্ত নিয়ে যাবেই যাবে। একটু দেরী হতে পারে, কিন্তু নিয়ে যাবে আমাকে হরিদ্বারেই। যাঁরা টাইম-টেবিল নিয়ে খুব ঘাঁটাঘাটি করেন, তাঁরা মোটামুটি সব ট্রেনের সব রকম খবরাখবর জানেন। কিন্তু আজ থেকে তিরিশ চল্লিশ বছর আগে গ্রামের লোকেরা এত খবরাখবর জানত না। যতটুকু তার জানার দরকার, সেটুকু কারুর মুখ থেকে জেনে নিত। ঐটুকু জেনে তারা বেরিয়ে পড়ত। কিন্তু যারা প্রায়ই লম্বা সফরে চলাচল করে, এই ধরণের অভিজ্ঞ যাত্রীরা এগুলো সব বিস্তারিত ভাবে জানে। এখন কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি কোন এক জংশন স্টেশনে দাঁড়িয়ে একজন গেঁয়ো লোককে বলে দিচ্ছে, এই ট্রেন এই জায়গা থেকে আসছে, আর এই জায়গায় যাবে। তার মানে সে ভূতটাও বলে দিচ্ছে, ভবিষ্যতটাও বলে দিচ্ছে। অথচ হয়ত সে কোন দিন ঐ ট্রেনে চাপেনি আর ঐ জায়গাতেও যায়নি। টাইম-টেবিল দেখে দেখে বা কোথাও কোন বইতে পড়ে সে জেনে গেছে। এই জন্যই জানে যে, একটা জিনিসের যদি প্যাটার্ন জানা থাকে, তাহলে সে এর বাকি সব কিছু জেনে যাবে, কারণ যে কোন প্যাটার্ন সব সময় ঐ ভাবেই চলবে। ঠিক তেমনি রেলওয়ের ট্র্যাকের সিস্টেম যদি জানা থাকে, তাহলে সে ঘরে বসেই বলে দিতে পারবে, এই ট্রেন কোথা থেকে আসছে, অমুক জায়গায় কখন যাবে আর শেষে কোথায় যাবে।

তাহলে ভূত, বর্তমান আর ভবিষ্যত, এই তিনটে বাস্তবে কি তিন, নাকি তিনটেই এক? ব্যাপারটা বিরাট বড় সমস্যা তৈরী করে দেবে। আমরা সবাই জানি, গতকাল একটা ছিল, আজকে একটা আছে, আগামীকাল আরেকটা থাকবে। আমরা অনেকবার বলেছি উপমা দিয়ে সত্যে পৌঁছান যায় না, কিন্তু ট্রেন

এ্যানালজিটা উপমা না, এটাই সত্য। যদি এটা সত্য হয়, যে সত্যকে বোঝানর জন্য উপমা নেওয়া হল, তখন জিনিসটা অন্য রকম হয়ে যায়। তাহলে গতকাল যেটা হয়েছে, সেটা একটা আলাদা জিনিস, আগামীকাল যেটা হবে সেটা কি আলাদা জিনিস? নাকি এই বর্তমান যেটা আছে, এটাই সব? ব্যাপারটা বিরাট বিতর্কের জিনিস। সাধারণ মানুষ বলবে, তিনটে আলাদা জিনিস। ঋষিরা, মনীষীরা বলবেন, সবটা বাস্তবে এক। কারণ প্যাটার্ন। হাওড়া থেকে অমৃতসর মেলে দিল্লী যাচ্ছি, প্যাটার্ন জানা আছে। কিছু কিছু ট্রেন আছে রোজই লেটে চলে। ছোটবেলায় আমরা জানতাম কালকা মেল একেবারে ঘড়ি ধরে চলে। অমৃতসর মেল ঘড়ি মেপে চলে। এখন কালকা মেলের টিকিট কাটলে অন্যরা নিষেধ করে, ভুলেও কালকা মেলে যাবেন না, মিনিমাম চার ঘন্টা রোজ লেট থাকে। এটাই কালকা মেলের এখন প্যাটার্ন, আগে থেকেই জানা আছে। এটা উপমা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু যে কোন দুটো জিনিস কখন এক হয় না, এক হলে আর উপমা আনা হত না। এটা বোঝান হচ্ছে যে, যখন প্যাটার্ন এক রকম থাকে, তখন আমরা তার ভূতটাও জানি, ভবিষ্যতটাও জানি। আমাকে জানতে হবে শুধু বর্তমান। উল্টোটাও, যদি আমি ভূতটা জানি, তাহলে আমি বর্তমানটাও জানব। ছোটবেলা আমার এক বন্ধু ছিল, বন্ধুটি খুব ট্যালেন্টেড ছিল। অনেক বছর ওর কোন খবরাখবর আমি জানি না, কোন যোগাযোগও নেই। কোন পুরনো বন্ধুর সাথে দেখা হতে ঐ বন্ধুটির ব্যাপারে কথা উঠতেই আমি বললাম, আচ্ছা আমাদের ওই বন্ধু ও এখন নিশ্চয়ই অনেক উঁচুতে উঠে গেছে! কারণ আমি ওর ভূতটা জানি, বর্তমানটাও জানি ও কেমন হবে।

মাণ্ডুকাকারিকা, ঘোর অদ্বৈতবাদ, যেখানে অজাতবাদকে নিয়ে চলে, সেখানে আবার অন্য রকম বলবে, যার ভূত নেই, ভবিষ্যত নেই, সেটা বর্তমানে কোথা থেকে আসবে। সৃষ্টির আগে, অর্থাৎ তোমার জন্মের আগে তুমি ছিলে না, মৃত্যুর পরেও তুমি থাকবে না, তাহলে বর্তমানে তুমি কি করে আছ। হিন্দু ধর্মের যে চিন্তা ধারা, হিন্দুদের যে দর্শন, সেখানে এটাই বলছে যে, একটা শৃঙ্খলের একটা পাবকে ধরে নাও পুরো জিনিসটাকে তুমি জেনে যাবে। রেলওয়ের ট্র্যাকে ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকলেই বোঝা যাবে, এই ট্রেন কোথা থেকে আসছে আর কোথায় যাচ্ছে। এই জিনিসটাকেই স্বামীজী এবার জীবনদর্শনে নামাচ্ছেন। এই উপমাটা মনে রাখলে মূল বক্তব্যটা বুঝতে কোন অসুবিধা হবে না।

There are endless series of manifestations, like ‘merry-go-round’, in which the souls ride, so to speak. (*জগৎপ্রপঞ্চ অনন্তভাবে অভিব্যক্ত হয়ে ক্রমাগত চলেছে, যেন নাগরদোলা – আত্মা যেন ঐ নাগরদোলায় চড়ে ঘুরছে।*) একটা দুটো না, অনন্ত সংখ্যায় জীবাত্মা নাগরদোলায় ঘুরে চলেছে। The series are eternal; individual souls get out, but the events repeat themselves eternally; and that is how one’s past and future can be read, because all is really present. (*এই ক্রম চিরন্তন। এক একজন লোক ঐ নাগরদোলা থেকে নেমে পড়ছে বটে, কিন্তু চিরকাল সেই এক রকম ঘটনাই বার বার ঘটছে, আর এই কারণেই লোকের ভূত-ভবিষ্যৎ সব বলে দেওয়া যেতে পারে, কারণ প্রকৃতপক্ষে সবই তো বর্তমান।*) ট্রেনে যাত্রীরা উঠছে, আবার নেমে যাচ্ছে, ট্রেন কিন্তু থেমে থাকছে না, ট্রেন চলে যাচ্ছে। আজকে যে ট্রেনটা চলে গেল, পিছন থেকে আবার কাল ট্রেন আসবে, পরের দিন আবার সেই ট্রেন আসবে। যতই যাত্রী ট্রেনে উঠুক, যত যাত্রী নামতে থাকুক, ট্রেন একই ভাবে আজকেও গেছে, কালকেও যাবে। ইদানিং আবার রেলওয়েতে রেটিং দিয়ে দেয়, ট্রেন পরিষ্কার কেমন থাকে, ট্রেন কতটা ঠিক সময়ে চলে, খাবার-দাবার মান কত উন্নত, আগে থাকতেই সব দেওয়া থাকে, এটাই প্যাটার্ন। যে এই ট্রেনে উঠবে সে জেনে যাবে এই ট্রেনে এই এই জিনিস আছে।

জীবনটাও নাগরদোলার মত অনন্তভাবে ঘুরে চলেছে। নাগরদোলা এই উপরে উঠছে, এই নীচে নামছে। একই জিনিসের পুনারাবৃত্তি হয়ে চলেছে, সেইজন্য কারুর বর্তমান যদি দেখে নেওয়া যায়, তাহলে তার অতীত ও ভবিষ্যত খুব সহজে বলে দেওয়া যায়। এখন গেটের বাইরে রাস্তায় তিন চারটে কুকুর ঘুরে বেড়ায়, আমি গেট থেকে বেরোলে কুকুরগুলো আমাকে ঘেউ ঘেউ করবে কি করবে না বলতে পারব না, কিন্তু এখান থেকে বেরিয়ে আমি বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারব এটা বলতে পারি, এটা বলার জন্য জ্যোতিষ বিদ্যা জানতে হয় না। জ্যোতিষীরা এই একই জিনিস করছেন, চিরন্তন প্যাটার্ন রয়েছে, সেখান থেকে বলছেন। জ্যোতিষী যদি সৎ হন, তিনি বলবেন, আপনার এখন গ্রহের দশা এই রকম, আপনার এখন এই রকম চলবে। এই রকম চলবে

এর কি গ্যারান্টি আছে? কোন গ্যারান্টি নেই। কিন্তু অতীতে এর উপর যে লক্ষ্য করা হয়েছে, সেখানে দেখা গেছে, যাদের যাদের এই রকম গ্রহের দশা হয়, তাদের সবারই এই রকম হয়েছে। তার মানে এরা আমাদের এই রকম ভাবে প্ররোচিত করে দেবে। এই ধরণের ঘটনা অনেক ধর্মেই পাওয়া যাবে। রাজজ্যোতিষীরা থাকত, তারা গ্রহের সব অবস্থান দেখে বলে দিতে পারত, 'রাজা এই রকম কিন্তু হতে যাচ্ছে'। তবে একশ ভাগ ঠিক হবে কিনা বলা মুশকিল। কিন্তু বিজ্ঞান মতে যদি যাওয়া হয় সেখানে পঞ্চাশ শতাংশ যদি মিলে যায়, ওরা ওটাকে মেনে নেবে। যদি পুরোটা পর্যবেক্ষণ করে থাকে, তাহলে বলে দেবে, গ্রহের অবস্থান যদি এই রকম হয় তাহলে এই রকমটি হবে।

Because all is really present, স্বামীজীর এটা একটা খুব দামী কথা। আমরা যদি খুব গভীরে যাই, তখন দেখা যাবে অতীত বলে আলাদা কিছু নেই, ভবিষ্যত বলে আলাদা কিছু নেই, যা আছে সবটাই বর্তমান। বর্তমানে যা আছে, ওরই বিস্তার অন্য কোন আকারে অতীত, ওরই বিস্তার একটা অন্য কোন আকারে ভবিষ্যত। বাগানে একটা আম গাছের চারা লাগানো হয়েছে। আমরা জানি এই আমের চারাটা কিছু দিনে আগে পর্যন্ত বীজাকারে ছিল, এখন চারা হয়েছে, কিছু দিন বাদে ফল দেবে, আর একদিন গাছটা মরে যাবে। তাই মূলতঃ ভূত ভবিষ্যত বলে আলাদা কিছু নেই, যা আছে বর্তমানই আছে। এই জিনিসটাই যখন আরও গভীরে যায়, বিশেষ করে অদ্বৈত বেদান্তে, ওনারা বলেন আত্মা ছাড়া কিছু নেই। আত্মার সামনে যে দৃশ্যগুলি আসছে, ওগুলো কিছুই না, একটা প্যাটার্ন শুধু নিয়ে আসছে।

When the soul is in a certain chain, it has to go through the experiences of that chain. (*যখন আত্মা একটা শৃঙ্খলের ভিতর এসে পড়ে, তখন তাকে সেই শৃঙ্খলের যা কিছু অভিজ্ঞতা তার ভিতর দিয়ে যেতে হবে।*) আমরা যে ট্রেনে চাপছি, সেই ট্রেনের অভিজ্ঞতা গুলো আমাদের জানা আছে, বাজে ট্রেনে উঠলে খারাপ খাবার পাওয়া যাবে, দামী ট্রেনে উঠলে ভাল খাবার পাওয়া যাবে, ভাল ট্রেনের আরাম এক রকম হবে, সেই ট্রেনের সফর অন্য রকম হবে, তার গন্তব্য অন্য রকম হবে। এই জন্মে আমি যে দেহে আছি, যে বংশে জন্ম নিয়েছি, বংশের যে শিক্ষা পেয়েছি, এটা একটা শৃঙ্খল। আমি যতই চেষ্টা করি এই শৃঙ্খল থেকে আমি বেরিয়ে যেতে পারব না। যদি আমাকে এই শৃঙ্খল থেকে বেরোতে হয় তাহলে, সব ছেড়ে ছুড়ে অন্য একটা সিস্টেমের মধ্যে যেতে হবে। যতক্ষণ অন্য সিস্টেমকে যদি না ধরা হয়, ততক্ষণ আমার কোন কিছুই পাল্টাবে না। From one series souls go to other series; from some series they escape for ever by realizing that they are Brahman. (*ঐরূপ একটা শৃঙ্খল বা শ্রেণী থেকে জীবাত্মা আর একটা শৃঙ্খল বা শ্রেণীতে চলে যায়, আর কোন কোন শ্রেণীতে এলে তার আপনাদের ব্রহ্মস্বরূপ অনুভব করে একেবারে তা থেকে বেরিয়ে যায়।*) এটাই হল মূল কথা। আমাদের জন্ম-মৃত্যু বিভিন্ন কারণে হয়, কঠোপনিষদের মতে যেমন কর্ম, যেমন অনুভূতি সেই অনুসারে আমি একটা সিরিজ থেকে আরেকটা সিরিজে পাল্টাতে থাকব, একটা ট্রেন থেকে আরেকটা ট্রেনে পাল্টাচ্ছি। ওর মধ্যে কিছু সিরিজ আছে, যাতে আমি জেনে যাবো যে আমি ব্রহ্ম, আমি অনন্ত, আমার অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি। আমার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই; আর আমার জন্ম-মৃত্যু কখনই ছিল না। বাকি যে কটি ট্রেন আছে, সব ট্রেন আমাকে ঘুরে ঐ জায়গায় নিয়ে যাবে। এগুলো উপমা, উপমা দিয়ে জিনিসটাকে বোঝান হচ্ছে। অন্য উপমাও নেওয়া যায়। আমি যদি কোন পাখির উপর বসে থাকি, পাখি কিছুটা উড়ে আবার আমাকে ওখানে নিয়ে আসবে, আরও বড় পাখির উপর বসলে আরও অনেক উঁচুতে নিয়ে যাবে, কিন্তু আবার ঘুরে নীচে নামিয়ে আনবে। প্লেনে যদি যাওয়া যায়, আরও উপরে যাবো, কিন্তু নেমে আসতে হবে। সুপারসনিকে যদি যাই আরও উপরে যাবো, কিন্তু আবার নেমে নীচে চলে আসতে হবে। কিন্তু যদি একটা স্পেস রকেটে বসে যাই, পৃথিবীর কক্ষ পথকে অতিক্রম করে মহাকাশে চলে যাবো, আর আমাকে ফেরত আসতে হবে না। এর সব কটা সিরিজ আগে থেকেই ঠিক করা আছে। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের সিরিজ আমাকে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

By getting hold of one prominent event in a chain and holding on to it, the whole chain can be dragged in and read. (*ঐরূপ শ্রেণীর বা ঘটনা-পরম্পরার একটি প্রধান ঘটনাকে অবলম্বন করে সমুদয় ঘটনা-শৃঙ্খলটাই টেনে আনা যেতে পারে, আর তার ভিতরে সমুদয় ঘটনাই*

যথাযথ পাঠ করা যেতে পারে।) কোন একটা প্রধান ঘটনাকে যদি ধরে নেওয়া হয়, যে কোন জিনিস ধরে নিলে হবে না, একটা লোককে দেখে তার ভূত, ভবিষ্যত, বর্তমান সব বুঝে নেব, এ হয় না, ঠাকুর বুঝে নিতে পারেন। কিন্তু যে কোন লোকের জীবনধারা, দেশের যে গতিপ্রকৃতি, এর কোন একটা প্রধান জিনিসকে, যেটা ওকে চিহ্নিত করে দিচ্ছে, যদি সেটা ধরে নেওয়া হয়, তাহলে ওটা দিয়ে ওর ভূত, ভবিষ্যত, বর্তমান সব বলে দেওয়া যাবে। একটা মানুষের জীবনের প্রধান ঘটনাকে জেনে নিলে তার ব্যক্তিত্ব জানা যাবে, তার ভূত কি, ভবিষ্যত কি, বর্তমান কি, সব জানা যাবে। আর যার মন যত পরিষ্কার তিনি তত ভাল সব কিছু পড়ে নিতে পারবেন। সেইজন্য মানুষের জীবনধারা এমন আহামরি কিছু না। জীবনধারা তো মাত্র কয়েকটি আছে। হিন্দুদের চারটে বর্ণ, মানুষের হয় ব্রাহ্মণের মত বিদ্যার প্রতি, জ্ঞানের প্রতি স্পৃহা থাকবে, নয়তো ক্ষত্রিয়ের মত দেশ ভক্তির জন্য বা সম্মান রক্ষার্থে নিজের প্রাণ দিয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকবে, আর তা নাহলে বৈশ্যদের মত টাকা-পয়সা রোজগারের দিকে পুরোদমে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এই তিনটের একটাও না হলে, জীবন কোন রকমে চলে গেলেই হল, শূদ্রের ভাব। ঋষিরা এই চারটে বিভাজন করে দিলেন, অন্য কেউ চাইলে এর মধ্যে আরও কয়েকটা বিভাজন করে নিতে পারে। কেউ যদি একটা লাইফ স্টাইলকে ধরে নেয়, বাকিটা বুঝতে কোন অসুবিধাই হবে না।

This power is easily acquired, but it is of no real value; and to practice it takes just so much from our spiritual forces, Go not after these things, worship God. (*এই শক্তি সহজেই লাভ করা যায়, কিন্তু এতে বাস্তবিক কোন লাভ নেই, আর ঐ শক্তিলাভের সাধনায় আমাদের সমপরিমাণ আধ্যাত্মিক শক্তি ব্যয়িত হয়ে যায়। সুতরাং ও-সব বিষয়ের চেষ্টা না করে ভগবানের উপাসনা কর।)* স্বামীজী এবার বলছেন, যারা জপ-ধ্যান নিয়ে আছে তারা এই শক্তিটা এমনিতেই পেয়ে যান, দেখলেই বুঝতে পারে। মনস্তত্ব বিদ্যায় এগুলোকে নিয়ে অনেক পড়াশোনা করা হচ্ছে। আসলে মানুষকে বোঝা এমন কিছু জটিল নয়। প্রায়ই লোকেরা বলে, তুমি আমার সাথে এতদিন আছ, কিন্তু আমাকে তুমি চিনতে পারলে না। চেনার মত কিছুই তো নেই, তিন থেকে চারটে তো তোমার মোট আইডিয়া। জগতে একটি লোক পাওয়া যাবে না, যে কখন না কখন কাউকে না কাউকে বলেনি যে, তুমি আমাকে চিনতে পারলে না! বলবেই বলবে, কারণ সবাই নিজেকে বিরাট বড় মনে করে। কিন্তু এটা বোঝে না যে, অপরের দৃষ্টিতে সে কিছুই না, খুবই সাধারণ। আর অপরের দৃষ্টিতে আমি যা, সেটাই কিন্তু আমার আসল পরিচয়, নিজের দৃষ্টিতে যেটা আমি নিজেকে ভাবছি, সেটা আমার আসল পরিচয় নয়। আমি নিজেকে নিয়ে যেটা ভাবছি, ওটা আমি কখনই না। মানুষের স্বভাব এমন যে তার বহির্দৃষ্টিটাই ঠিক দৃষ্টি, অন্তরদৃষ্টি মানুষের ঠিক হয় না। নিজেকেও যখন আমি দেখছি, তখন বাইরে থেকেই দেখছি। ফলে যারা আমাকে দিনরাত দেখছে, আমার যারা মূল্যায়ন করছে, আমার ব্যাপারে তাদের মূল্যায়নটাই ঠিক। আমি নিজেকে নিয়ে যেটা ভাবছি, ওটা কখনই ঠিক নয়। কারণ আমাদের মস্তিষ্ক ওভাবে তৈরীই নয়, যে ওভাবে আমাকে মাপতে পারবে। তবে যিনি যোগী, যাঁর মানুষের ভূত, ভবিষ্যত, বর্তমান পড়তে পারার ক্ষমতা আছে, এই কাজ করতে গিয়ে তাঁদের আধ্যাত্মিক শক্তিটা ক্ষয় হয়ে যায়। সেইজন্য যোগীরা এই ক্ষমতার কখন অপব্যবহার করতে যান না। স্বামীজী তাই এই কথা বলে এই প্রসঙ্গের ইতি করছেন, এই ধরণের সিদ্ধাইগুলি কোন কাজের না, তাই এগুলোর পিছনে গিয়ে তোমার সময় ও শক্তির অপচয় হতে দিও না, ঈশ্বরের উপাসনা করে যাও। জ্যোতিষ বিদ্যা, আগাম কিছু বলে দেওয়ার ক্ষমতা, এগুলো আহামরি কিছু না। যার মন একটু শুদ্ধ পবিত্র, সে যদি চায়, যে কারুর জীবনের একটা কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে তার জীবনের ভূত ভবিষ্যত সবে বলে দিতে পারে। স্বামীজী এই জিনিসটাকে প্রসঙ্গক্রমে বললেন। এরপর স্বামীজী পরের দিন শুক্রবার, ২রা আগস্টের ক্লাশে অন্য বিষয় নিষ্ঠা নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছেন।

শুক্রবার, ২রা আগস্ট

আধ্যাত্মিক জীবনে এগোবার জন্য চাই ইষ্টের প্রতি গভীর নিষ্ঠা। যে কোন ভক্তিমার্গে নিষ্ঠার উপর খুব জোর দেওয়া হয়, আর নিষ্ঠাটাই প্রথম। ইষ্টের প্রতি নিষ্ঠা না থাকলে কোন ভাবেই আধ্যাত্মিক জীবনে এগোতে পারবে না। নিষ্ঠা মানে, যতই প্রলোভন আসুক, দুর্বলতা আসুক, বিঘ্ন আসুক একটা জিনিসকে ধরে রাখা। সংসার জীবনেও তাই হয়, দাম্পত্য জীবনেও তাই হয়, আধ্যাত্মিক জীবনেও তাই হয়। আমরা অনেককে জানি,

যাদের তিন জায়গা থেকে দীক্ষা নেওয়া আছে। অনেক আবার বলবে, কলিযুগ কিনা, এই যুগে একজন গুরু দিয়ে হয় না, তিন চারজন গুরু না হলে হবে না। আসলে এদের কারুরই নিষ্ঠাটা নেই। নিজের নিষ্ঠাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য, বেশী লোকের সাথে মেলামেশা করতে নেই, তর্কাতর্কির মধ্যে নামতে নেই; আর কেউ তর্ক করতে এলে তুলসীদাসের মত হাঁ জী হাঁ জী করে কাটিয়ে দিতে হয়। যীশুও বলছেন, বেশী সংসারের কথা আলোচনা করো না। বিশেষ করে বিষয়ীরা তোমার নিজের ধর্মের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে এলে কাটিয়ে দিতে হয়। কিন্তু নিজের সাধনার ব্যাপারে কোন আপোষ করা যাবে না। একজন শিবের ভক্ত, তাকে এক বিষ্ণু ভক্ত এসে বলতে শুরু করল, তোমার শিব কিছুই না, বিষ্ণুই আসল। তাকে তখন হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিকই, বলে কাটিয়ে দিতে হয়, তর্ক করতে যেতে নেই। কিন্তু সাধনা করার সময়, জপ করার সময় শিবের জপ, ধ্যান করার সময় শিবই আমার সব কিছু, এই নিষ্ঠাটা ছাড়তে নেই। স্বামীজীর এই অংশটা ভক্তি উপর জোর দেওয়া হয়েছে, তাই এখানে নিষ্ঠাকে নিয়ে আলোচনা করছেন।

দুর্বল ও সবল ব্যক্তির নিষ্ঠা যেভাবে চলে

স্বামীজী বলছেন, A higher stage is actually to take the position of the other, (*উচ্চতর অবস্থা হল – অপরের ভাবে নিজেকে যথার্থ ভাবিত করা।*) এই জায়গা থেকে জীবনদর্শন অল্প একটু পাল্টে যায়। জীবনদর্শনে যদি আমি উচ্চ একটা অবস্থায় গিয়ে থাকি, এটা হল প্রথম, কিন্তু তারও আগে দ্বিতীয় হল, আমি যদি উচ্চ অবস্থায় যেতে চাই, তাহলে আমাকে ধীরে ধীরে মনকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে, নিজেকে অপরের মধ্যে প্রবেশ করে আমার দিকে তাকানো বা তার মনের ভাবকে বোঝা। If I am all, why can I not really and actively sympathise with my brother and see with his eyes? (*যদি আমিই সব হই, তবে আমার ভাইয়ের সঙ্গে যথার্থ ভাবে এবং কার্যতঃ সহানুভূতি করতে পারব না কেন?*) স্বামীজী অদ্বৈত বেদান্তকে তত্ত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য বারবার বলে গেছেন, এখানেও তিনি সেটাই বলছেন। অদ্বৈত যদি সত্য হয়, আর এটাই যদি সত্য হয়ে থাকে যে, আমি সব কিছু হয়েছি, তাহলে আমি কেন নিজেকে তার মধ্যে প্রবেশ করে তার মত জিনিসটাকে দেখতে পারব না! আমরা সব সময় এর নিন্দা করে, ওর প্রশংশা করি, যাকে ভালবাসি তার সাথে মিষ্টি করে কথা বলি, যাকে পছন্দ করি না, তাকে গালাগাল দিই। কিন্তু একবার যদি এভাবে চিন্তা করি, আচ্ছা লোকটার মধ্যে কি হচ্ছে, ও কেন এই রকম চিন্তা করল। আরও গভীরে গিয়ে যদি ভাবার চেষ্টা করি, ভাবার থেকেও বেশি বোঝার চেষ্টা, তার মত যদি ভাবি, তখন সত্যিই দেখতে পাবো, সে অন্যথা কিছু করতে পারে না, ওই রকম না করে সে থাকতেই পারবে না। এই রকমও হয়, আমার সাথে একজন খুব খারাপ ব্যবহার করল। আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল, কেন সে এই রকম খারাপ ব্যবহার করল, আমি তো তাকে কিছু করিনি। কিন্তু আমি যদি ওর ভিতরের খবর নেওয়ার চেষ্টা করি, তখন দেখতে পাবো যে, সেই সময় ওর এমন কিছু একটা সমস্যা চলছিল, যে সমস্যার জন্য তার মানসিক অবস্থা এমন একটা অবস্থায় ছিল, যা তাকে ঐ রকম করতে বাধ্য করল। তারও খারাপ লাগছে, এই রকম ব্যবহার করার জন্য। এবার যদি আমি তার মনের অবস্থায় গিয়ে দেখি, তখন জিনিসটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। স্বামীজী তাই বলছেন, অপরের মনের ভিতরে গিয়ে তার মত করে জিনিসটাকে ভাবতে হয়।

While I am weak, I must stick to one course (Nishtha), but when I am strong, I can feel with every other and perfectly sympathise with his ideas. (*যতক্ষণ আমি দুর্বল, ততক্ষণ আমাকে নিষ্ঠা করে একটা রাস্তা ধরে থাকতে হবে; কিন্তু যখন আমি সবল হবো, তখন অপর সকলের মতো অনুভব করতে পারব, তাদের সকলের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহানুভূতি করতে পারব।*) স্বামীজী এবার একাধারে নিষ্ঠা ও অদ্বৈতের সঙ্গে সবটাকে মিলাচ্ছেন। গীতাতে যেমন বলছেন, *ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্*, যাদের এখনও অজ্ঞানতা দূর হয়নি, তাদের বুদ্ধিভেদ করতে নেই। তাদের কখন প্রথমেই বলতে নেই, তুমি যা করছ সব ভুল। যদি তুমি ভাল না করতে পারো তাহলে ওর থেকে তুমি দূরে থাকো, আর যদি তুমি ভাল করতে চাও, তাহলে প্রথমে তুমি তার মতন হয়ে যাও। তার মতন হয়ে গিয়ে এবার তুমি তাকে ধীরে ধীরে ঐ অবস্থা থেকে তুলে নিয়ে এসো। এখানে স্বামীজী যখন নিষ্ঠার সঙ্গে অদ্বৈতকে

আনছেন, তখন বলছেন, মানুষ যদি দুর্বল থাকে তখন সে তাকে নিজের মত করে নিতে চায়। কিন্তু যখন শক্তি এসে যায়, তখন বুঝতে পারে, জিনিসটা এই রকমই। ক্লাশ ফাইভের ছেলে ক্লাশ ফোরের বা ক্লাশ থ্রীর ছেলেদের বলবে, ওরা কিছুই না। কিন্তু যিনি মাস্টার ডিগ্রী করে নিয়েছেন, তিনি কখনই ঐ রকম কথা বলবেন না, ও তুমি ক্লাশ ফোরে উঠে গেছ, দারুণ ব্যাপার। যদি শক্তি এসে যায়, তখন সে সবাইকে দারুণ দারুণ বলে বেরিয়ে যাবে। শক্তি যতক্ষণ না হবে ততক্ষণ অপরকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখবে। হিন্দুরা কখনই ধর্মান্তরণ করে না, জুহুদিরাও করে না, পার্সিরাও করে না। জুহুদি ও পার্সিরা আগে ধর্মান্তরণ করত, পরে ওদের সংখ্যা এত কমে গেল যে, ওরা ধর্মান্তরণ করা বন্ধ করে দিয়েছে, ওরা নিজেদের পবিত্রতাকে ধরে রাখতে চায়। হিন্দুরা তা করে না, হিন্দুরা বলবে, ভাই তুমিও ঠিক, সেও ঠিক।

খবরে কদিন ধরে দেখা যাচ্ছে, আন্দামানের একটা দ্বীপের আদিবাসীরা কোন দিন বাইরের জগতের কারুর সাথে সম্পর্ক রাখতে চায় না। দ্বীপের কাছাকাছি বাইরের কোন মানুষ এগোবার চেষ্টা করলে তারা তীর মেরে ওখানেই তাকে শেষ করে দেবে। ওদের অনেক রকম সমস্যা আছে। আমেরিকা থেকে একুশ বাইশ বছরের একটি ছেলে সেই দ্বীপে গেল তাদের মধ্যে খ্রীশ্চান ধর্মের প্রচার করতে। ছেলেটির পরিণতি বাকিদের মতই হল। সেই ছেলেটি ধর্ম সম্বন্ধে যতটুকু জানে, আমরা কি তার থেকে কম জানি? অন্যান্য ধর্মের কথা ছেড়েই দিচ্ছি। এমনকি তার ধর্ম সম্বন্ধে যদি বলা হয়, আমরা কি বাইবেল পড়িনি, আমরা কি যীশুকে সম্মান দিই না? কিন্তু কাঁচা মন। কাঁচা মন মানেই দুর্বল মন, দুর্বল মনে অপরের প্রতি করুণা থাকে না। যাঁরা শক্তিমান, ভিতরে যাঁদের সত্যিকারের শক্তি আছে, ওনারা কখনই এভাবে কাউকে শিক্ষা দিতে যাবেন না, ঠিক আছে, সময়ের সাথে সাথে পরে তোমার সব ঠিক হয়ে যাবে। যেখানেই অসহিষ্ণুতা, কোন কিছু নিতে পারে না, বুঝতে হবে সেখানে দুর্বলতা বিরাজ করছে, ধর্মের ব্যাপারে আরও বেশি তারা দুর্বল। যেখানেই গোঁড়ামি, ধর্মের নামে মারামারি কাটাকাটি করে, সব বোমা মেরে উড়িয়ে দিচ্ছে, বুঝতে হবে, ধর্মের ব্যাপারে কোথাও এদের প্রচণ্ড দুর্বলতা কাজ করছে।

এর আগে আমরা একটা ঘটনার কথা বর্ণনা করেছি, যেটা স্বামীজী একটা বই থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে আরেকজনকে বলছেন। বারাণসীর ঘাটে বসে একজন খ্রীশ্চান ফাদার আচ্ছা করে হিন্দুদের নামে গালাগাল দিয়ে যাচ্ছি। আর ঘাটে বসে অনেক লোক ফাদারের কথা শুনেও যাচ্ছে। ফাদার বলে যাচ্ছে, তোমরা পৌত্তলিক, তোমরা কুসংস্কারে ভরা, তোমরা সবাই নরকে যাবে। ঘাটে বসে লোকগুলো শুনে যাচ্ছে, কোন প্রতিবাদ করা, প্রশংসা করা, কিছুই প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে না। মাঝে মাঝে আবার একজন হাত তুলে বলছে, আচ্ছা তুমি এটা যেটা বললে, এটাকে আরেকটু পরিষ্কার করে বলো তো। ওখানেই আরেকজন বিদেশী পুরো ঘটনাটা দেখে যাচ্ছিল, সেই ভদ্রলোক পরে তার বইতে দুঃখ করে বলছে – এদেরকে কে ধর্মান্তরণ করবে! এরা নিজেদের ধর্মের বিশ্বাসে এমন প্রতিষ্ঠিত যে, ওদের ধর্মকে গালাগাল দিলেও রাগে না। ওরা জানে যে তুমি মুর্খের মত, বাচ্চা ছেলের মত কথা বলছ। এদেরকে কে ধর্মান্তরণ করবে! আর সত্যিই ভারতে ওরা ধর্মান্তরণ করতে পারেনি। হয় কাউকে ভয় দেখিয়, বা লোভ দেখিয়ে কয়েকজনকে করেছে। কিন্তু সামনা-সামনি তর্কে এলে দাঁড়াতেই পারছে না, ফুঁ মেরে উড়িয়ে দিচ্ছে। ভারত তখন ছিল খুব গরীব দেশ, গরীব দেশের লোকেরা ভয় পায়, আর গরীবরা একটু লোভেও পড়ে। এরপর স্বামীজী অন্য বিষয়কে নিয়ে বলছেন।

মনের একাগ্রতা আত্মোন্নতির যথার্থ উপায়

আমরা ইংরাজীটা আর পাঠ করছি না, সরাসরি স্বামীজীর মূল বক্তব্যে চলে যাচ্ছি। স্বামীজী পরের প্যারাগ্রাফে মূলতঃ তিনটে জিনিসকে নিয়ে বলছেন, জীবনে এগোনর তিনটে পথ। প্রথম পথ বলছেন, একটা পথকে ধরে নিয়ে এগিয়ে চলে যাও, বাকি সব পথ ছেড়ে দাও। দ্বিতীয় পথ বলছেন, তুমি সব বিষয়ে সামঞ্জস্য রেখে উন্নতির লক্ষ্যে এগিয়ে চল। ধর্মের ব্যাপারে প্রথমটা হবে, তুমি যে ভাবকে ধরে আছো, ওটাকে ধরে এগিয়ে যাও, কিংবা জ্ঞানোন্নতির পথে একটাকে ধর, তারপর এগিয়ে চলে যাও। যাঁরা পিএইচডি করেন, তাঁরা একটা সাবজেক্টকে ধরে এগিয়ে চলে গেছেন। সেখান থেকে বলছেন, harmonious development, সব কিছু এক সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলতে বলছেন। কিন্তু তৃতীয় যে পথ, যে পথ স্বামীজী সব সময়ই চাইতেন, তা

হল – মনকে তুমি একাগ্র করতে থাক, এত একাগ্র কর যে মনের শক্তিকে প্রচণ্ড বাড়িয়ে দিতে সক্ষম হবে, তারপর সেই মনকে যে জিনিসের উপর রাখবে, সেই জিনিসটাকে অর্জন করে নিতে পারবে।

অদ্বৈতের মধ্যেই দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত রয়েছে

This is developing yourself in the truest way. (*এটি হল আত্মোন্নতির যথার্থ উপায়।*) যদি নিজেকে আত্মোন্নতির দিকে নিয়ে যেতে হয়, তাহলে তার ঠিক ঠিক পথ হল, নিজের মনকে একাগ্র করা। মনকে এমন একাগ্র করতে হবে যে, যে জিনিসটাকে তোমার জানার ইচ্ছা হবে, সেই জিনিসটাকে জানতে পারবে। বলছেন, Learn concentration and us it in any direction. Thus you lose nothing. (*একাগ্রতা শিক্ষা কর, আর যে দিকে ইচ্ছা তাকে প্রয়োগ কর। এরূপ করলে তোমার কিছুই ক্ষতি হবে না।*) মনকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় যদি এই শিক্ষাটা পেয়ে যাও, তখন তোমাকে এই পথ নেব নাকি সেই পথ নেব, এসব কিছু ভাবতে হবে না। এটা বলার পর বলছেন, He who gets the whole must have the parts too. Dualism is included in Advitism (monism). (*যে সমগ্রকে পায়, সে অংশকেও পায়। দ্বৈতবাদ অদ্বৈতবাদের অন্তর্ভুক্ত।*) দ্বৈত অদ্বৈতকে নিয়ে যাদের মনে অনেক প্রশ্ন আসে, তাদের শুধু স্বামীজীর এই দুটো লাইনকে মাথার মধ্যে বসিয়ে নিলেই সব প্রশ্নের সমাধান হয়ে যাবে। যিনি সমগ্রকে নেন, তিনি অংশকেও নেন। বাজারে আলু কিনতে গিয়ে আমি আলুওয়ালাকে বললাম পুরো আলুর বস্তাটাই দিয়ে দাও। এখন ওর মধ্যে ভাল আলু, ছোট আলু, পচা আলু সব রকম আলুই চলে এলো। যদি আমি আলুর বস্তা থেকে বেছে বেছে অংশ নিই, তখন আমার কাছে পুরো আলু আসছে না, আলুর অনেকটাই বস্তায় থেকে যাবে। ধর্মের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়। আমি যখন একটা কিছু নিচ্ছি, তখন শুধু ওটাই নিচ্ছি, যখন অন্যটা নিচ্ছি তখন শুধু ওটাই নিচ্ছি। কিন্তু পুরোটা যখন নিচ্ছি, তখন পুরোটাই আমার কাছে চলে আসছে।

এরপর স্বামীজী বলছেন, Dualism is included in Advitism (monism), এটা ধর্মের জগতে একটা অত্যন্ত সাংঘাতিক কথা। এই বাক্য আমরা সহজে আর কোথাও পাবো না। ঠাকুরও এইভাবে পরিষ্কার করে বলেননি যে, অদ্বৈতের মধ্যেই দ্বৈত রয়েছে, অদ্বৈতের মধ্যেই বিশিষ্টদ্বৈত রয়েছে, কিন্তু এটাই সত্য। আমাদের মনে মাঝে মাঝে প্রশ্ন জাগে, রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতে এতো ঈশ্বর ঈশ্বর করছেন, আচার্য শঙ্কর তো ঈশ্বরকে পুরোদমে মানছেন; শুধু মানছেনই না, যখন আচার্য শঙ্কর ভক্তির কথা বলছেন, তখন ভক্তিকে শেষ পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে বলছেন। মাধ্বাচার্য, রামানুজ যা বলতে চাইছেন, সেই কথা আচার্য শঙ্করও বলছেন। তাহলে এতো যে লড়াই, এটা কি? এর উত্তর স্বামীজীর এই বাক্যের মধ্যে দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য আচার্যরা অংশকে দেখছেন, আচার্য শঙ্কর সমগ্রটা দেখেন। হিন্দুদের যত পথ আছে, যত দর্শন আছে, আচার্য শঙ্করের অদ্বৈতে সবটাই রাখা আছে। আচার্য শঙ্করের গীতার ভাষ্যটা পড়লেই এই জিনিসটাকে খুব ভাল ভাবে বোঝা যায়। হিন্দুদের ধর্মটাই synthetic religion, হিন্দুদের জীবনদর্শও synthetic religion। হিন্দুরা inclusive, সবাইকে নিয়ে চলে। তা সত্ত্বেও ব্যাসদেবের যে মহাভারত, ব্যাসদেবের যে গীতা হিন্দুদের সব কিছুকে এক জায়গায় নিয়ে আসছেন। আচার্য শঙ্করও সমস্ত দর্শনকে এক জায়গায় নিয়ে আসছেন। আচার্য শঙ্করের পর ঠাকুর, স্বামীজী এসে তাই করলেন, সমস্ত ধর্ম, সমস্ত পথ, সমস্ত দর্শন একটা জায়গায় নিয়ে এলেন। এক জায়গায় নিয়ে আসা, তার মানে পুরো পিকচারটাকে নিচ্ছেন। ব্যাসদেব পুরো ভারতে যা কিছু আছে, সমাজ ব্যবস্থা, সামাজিক প্রথা, ধর্ম, দর্শন, কাহিনী, সব কিছুকে মহাভারতের মধ্যে এনে এক জায়গায় রেখে দিলেন। আর গীতাতে ভারতে যত রকম ধর্মের অনুশীলন হয়ে আসছে, যত দর্শন ভারতের মাটিতে সৃষ্টি হয়ে এসেছে, ব্যাসদেব সব কটাকে রেখে দিলেন। গীতাকে তাই বলাই হয় সমন্বয় শাস্ত্র। আচার্য শঙ্করের আবির্ভাব হতে হতে গীতার উপর এত রকম ব্যাখ্যা, এত রকম দর্শন দাঁড়িয়ে গেছে যে, লোকেদের মনে সংশয় হতে লাগল, কোনটা ঠিক, গীতা ঠিক কি বলতে চাইছে। যদিও ব্যাসদেব সব কিছুকে এক জায়গায় করে দিয়েছিলেন, কিন্তু কোথাও পরম্পরায় ওটা হারিয়ে গিয়েছিল। আচার্য শঙ্কর আবার সব কটাকে এক জায়গায় এনে বেঁধে সমন্বয় করে দিলেন। এরপর রামানুজ, মাধ্বাচার্য এসে সব কিছুকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিলেন। ঠাকুর, স্বামীজী এসে আবার ওটাকে এক জায়গায় নিয়ে এলেন।

স্বামীজী অবশ্য অদ্বৈত শব্দ কম বলতেন, তিনি বেদান্ত বলতেন। স্বামীজী যখন অদ্বৈত বলতেন, তখন তিনি শুদ্ধাদ্বৈত, যেখানে ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যার ধারণা আসে, সেই ধারণাকে নিয়ে আসতেন। আচার্য শঙ্কর কিন্তু জগৎকে মিথ্যা বলে প্রথমেই একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছেন না। আচার্য শঙ্করের অদ্বৈত ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা নয়, তাঁর মত হল, ব্রহ্ম সত্য, জগৎও নিজের জায়গায় সত্য। যার মূল বক্তব্য পারামার্থিক সত্য ব্রহ্ম, ব্যবহারিক সত্য জগৎ। যতক্ষণ ব্যবহারিক সত্তায় থাকবে ততক্ষণ জগৎ সত্য, কিন্তু এই সত্য শেষ সত্য নয়, ব্রহ্মই শেষ সত্য। কিন্তু পরে পরে আচার্য শঙ্করের কিছু অনুগামীরা এলেন, তাঁরা বলতে শুরু করলেন, ব্রহ্মই সত্য, বাকি সব কিছু মিথ্যা। কেন বলতে লাগলেন আমরা জানি না, হয়তো লজিক্যালি জিনিসটাকে ইউনিফর্ম রাখার জন্য বা যে কোন কারণেই হোক বা আরও যেটা খারাপ, তাঁরা হয়তো আচার্যকে বুঝতেই পারেননি। কিন্তু খুব গভীরে গিয়ে পড়াশোনা করলে আর অহেতুক তর্কাতর্কিতে না নামলে, পরিষ্কার বোঝা যায়, আচার্য যে অদ্বৈতম্ বলছেন, এখানে ব্রহ্ম সত্য, জগৎও জগতের নিজের জায়গায় সত্য। ঠাকুরও খুব সহজ ভাবে বলে দিলেন, অদ্বৈত শেষ কথা। যদি অদ্বৈত শেষ কথা হয়, তাহলে হয় ঠাকুর অদ্বৈতবাদী ছিলেন, আর তা নাহলে ছিলেন না। যদি না ছিলেন, তাহলে তিনি শেষ কথা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেননি। শ্রীশ্রীমা কিন্তু বলছেন, তোমাদের ঠাকুর অদ্বৈতবাদী ছিলেন, তোমরাও অদ্বৈতবাদী। ঠাকুর যদি অদ্বৈতী হয়ে থাকেন, তাহলে এটা কখনই হতে পারবে না যে, আজকে তিনি অদ্বৈতী আর আগামীকাল অন্য কিছু। তখনই হতে হবে যখন পুরো জিনিসটা সমন্বয় হয়ে থাকে। তাহলে ঠাকুরের যত সাধনা, পুরো কথামৃতে যা যা বলা হয়েছে, যেখানে ঠাকুর তন্ত্রের কথা বলছেন, ভক্তির কথা বলছেন, গান করছেন, নৃত্য করছেন, সবটাই অদ্বৈতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বলতে হবে। ঠাকুর কিন্তু কখনই বলছেন না, ভক্তিপথ যেমন একটা পথ, অদ্বৈতও একটা পথ। বলা যাবেই না, কারণ অদ্বৈত শেষ কথা। অদ্বৈতকে নেওয়া মানে, পুরো পিকচারটাকে নেওয়া।

দুই প্রকার সমাধি প্রসঙ্গে - বিশেষ বিশেষ ভাব থেকে উচ্চ ভাবে যাওয়া

স্বামীজী কোট করে বলছেন, ‘I first saw him and he saw me, There was a flash of eye from me to him and from him to me’. This went on until the two souls became so closely united that they actually became one). (*‘আমি তাকে প্রথমে দেখলাম, সেও আমায় দেখল; আমিও তার প্রতি দৃষ্টিপাত করলাম, সেও আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করল’ – এই রূপ চলতে লাগল। শেষে দুটি আত্মা এমন সম্পূর্ণভাবে মিলিত হয়ে গেল যে, তারা প্রকৃতপক্ষে এক হয়ে গেল।*) জীবাত্মা আর ঈশ্বর যখন এক হয়ে যান, তখনই অদ্বৈত। আচার্য শঙ্কর বারবার বলছেন, শেষ অবস্থায় দুটোকে এক হয়ে যেতে হবে, আলাদা করে কোন সত্তা থাকবে না। এই এক হওয়াটা ব্যবহারিক জগতে কখনই হবে না, ব্যবহারিক জগতে ঈশ্বর হলেন স্রষ্টা, তিনি ভর্তা, তিনি আমাদের নিয়ন্তা। কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে সব এক। স্বামীজী এই আলোচনাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন।

There are to kinds of Samadhi, - I concentrate on myself, then I concentrate and there is a unity of subject and object. (*সমাধির দুটি ভাব আছে : এক ভাবে আমি নিজেই ধ্যান করি, আর এক ভাবে বাইরের বস্তুর ধ্যান করি। তারপর ধ্যানে ধ্যাতা ধ্যেয় অভেদ হয়ে যায়।*) একটা বস্তুর উপর আমি মনকে একাগ্র করে ধ্যান করছি, সেটা এক রকম জিনিস, আরেকটা হল, এমন ভাবে মনকে একাগ্র করছি, যেখানে ধ্যাতা আর ধ্যেয় মিশে এক হয়ে যায়। সবিকল্প সমাধি আর নির্বিকল্প সমাধির পার্থক্যটা দেখাচ্ছেন। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, যখন একটা জিনিসকে নিয়ে ধ্যান করছি, যেমন আমি এই পেনকে নিয়ে ধ্যান করছি। ধ্যান করতে করতে মন যেমন যেমন সূক্ষ্ম হবে, এই পেন তেমন তেমন অন্য রকম মনে হতে থাকবে। প্রথমে পেন একটা বস্তু রূপে মনে হবে, তারপর এই পেন যে পঞ্চভূত দিয়ে নির্মিত সেটা মনে হবে, মন আরও সূক্ষ্ম হলে দেখব পঞ্চভূত এসে পঞ্চ তন্মাত্রা থেকে, সেখান থেকে আরও সূক্ষ্ম হলে দেখব এটা একটা আইডিয়া, আরও সূক্ষ্ম হলে দেখবে এই পেন সেই প্রকৃতিরই অংশ, যেখানে শুধু সত্ত্ব, রজো আর তমো এই তিনটে গুণ আছে। যেমন যেমন ধ্যানের ক্ষমতা বাড়তে থাকে তেমন তেমন বস্তুর সত্তা পাল্টাতে থাকে। শেষ সত্তায় প্রকৃতি আর আমি আলাদা হয়ে যাবে, আমি এক আর প্রকৃতি আমার থেকে

আলাদা। ঐ জায়গা থেকে বেশির ভাগ সাধক আর এগোতে পারে না। কদাচিৎ কোনও সাধক ওখান থেকে এগিয়ে গিয়ে দেখেন, প্রকৃতি আর পুরুষ আলাদা বলে কিছু নেই, দুটো এক।

স্বামীজী নিষ্ঠা, অদ্বৈত, নির্বিকল্প, সবিকল্প বলার পর, সেখান থেকে পুরো জিনিসটাকে সমন্বয় করে সাধকদের জন্য বলছেন, You must be able to sympathise fully with each particular, then at once to jump back to the highest monism. (*প্রত্যেক বিশেষ বিশেষ ভাবের সঙ্গে তোমাকে সহানুভূতি-সম্পন্ন হতে হবে, তারপর একেবারে উচ্চতম অদ্বৈতভাবে লাফিয়ে যেতে হবে।*) যখন যার সাথে আমি আছি তখন তার ভাবের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন হতে হবে। ঠাকুর যেমন যখন বৈষ্ণবদের সঙ্গে তখন তিনি বৈষ্ণব, শাক্তদের সঙ্গে শাক্ত, কিন্তু আসলে তিনি একজন অদ্বৈতী। ঠাকুর তো বলছেন, নরেন, রাখালের মত শুদ্ধ আধারের উপর মন না রাখলে মন অখণ্ডে বিলীন হয়ে যাবে। ঠাকুর তো অখণ্ডের সঙ্গে এক, কিন্তু যখন যে ভাবের মানুষ আসছে, তখন তার ভাবের সাথে এক হয়ে তার মত কথা বলছেন। After having perfected yourself, you limit yourself voluntarily. (*নিজে সম্পূর্ণ মুক্ত অবস্থা লাভ করে তারপর ইচ্ছা করলে নিজেকে আবার সীমাবদ্ধ করতে পারো।*) প্রথমে তিনি নিজেকে মুক্ত অবস্থায় নিয়ে গেছেন, তারপর তিনি বলছেন, এখন আমি বৈষ্ণব, এখন আমি শাক্ত। আর যদি দুজনই একসাথে এসে যায়, তখন বৈষ্ণব দেখবে উনি আমারই মত বৈষ্ণব, শাক্ত দেখবে উনি একজন শাক্ত। আমি আগে বন্ধনে ছিলাম, মুক্ত হওয়ার পর আমি নিজেকে নিজের ইচ্ছায় যেন একটা বন্ধনে নিয়ে আসছি। প্রথমের দিকে আমরা বলছিলাম, জীবন যেন একটা ট্রেনের সফর, জীবন যেন একটা শৃঙ্খল। সেখানে বিষ্ণুর ট্রেনে যে বসে আছে, যেখানে তাকে ভগবান বিষ্ণুর ভক্ত বানাবে, সে হয়ে গেল বৈষ্ণব। যে শৈবের ট্রেনে বসে আছে সে শৈব। কিন্তু একজন ওস্তাদ আছেন, যিনি অখণ্ডে লীন হয়ে গেছেন, তিনি নিজের ইচ্ছামত ট্রেন থেকে নেমে অন্য একটা ট্রেনে উঠে পড়েন, আবার সেই ট্রেন থেকে নেমে অন্য একটা ট্রেনে উঠে পড়ছেন। তাঁর কাছে এটা যেন কোন ব্যাপারই নয়।

এই কথা বলার পর বলছেন, Take the whole power into each action, (*প্রত্যেক কাজে নিজের সমুদয় শক্তি প্রয়োগ কর।*) সমস্ত শক্তি একটা জায়গাতে লাগিয়ে দিতে হয়। Be able to become a dualist for the time being and forget Advaita, yet be able to take it up again at will. (*খানিকক্ষণের জন্য অদ্বৈতবাদ ভুলে দ্বৈতবাদী হবার শক্তিলাভ করতে হবে, আবার যখন খুশি যেন ঐ অদ্বৈতভাব আশ্রয় করতে পারা যায়।*) এটাই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পরম্পরার শেষ কথা। শ্রীমা বলছেন, বাবা তিনি অদ্বৈতী ছিলেন, তোমরাও অদ্বৈতী। শুধু অদ্বৈতী না, আমরা অদ্বৈতে পুরো প্রতিষ্ঠিত। অদ্বৈতীদের সমস্যা কি হয়, একবার যিনি অদ্বৈতে ঢুকে যান, উনি আর এই জগতে নামতে পারেন না বা নামতে চান না। ঠাকুর বলছেন, সা রে গা মা করে 'নি'তে চলে গেলে 'নি'তে বেশিক্ষণ থাকা যায় না। সেইজন্য বলে, নির্বিকল্প সমাধির পর একুশ দিনের মাথায় শরীর চলে যায়। কিন্তু যিনি নীচে নেমে আসেন, তিনি দেখেন যেখান থেকে সা তৈরী হচ্ছে, সেখান থেকে নি তৈরী হয়েছে। ছাদ যে ইট সিমেন্ট দিয়ে তৈরী, সিঁড়িও সেই জিনিস দিয়ে তৈরী, কোন তফাৎ নেই। তখন নিজের ইচ্ছা মত বাচ খেলতে পারেন। এই দ্বৈতবাদী, এই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, এই শাক্ত, এই বৈষ্ণব আবার ঝুপ্ করে একেবারে অখণ্ডে বিলীন হয়ে যাচ্ছেন, নিজের ইচ্ছা মত বাচ খেলে যাচ্ছেন। এটা যে তিনি কোন নাটক করছেন তা না, সবটাই সত্য। এনারা হলেন ওস্তাদ খেলোয়াড়, লুডো খেলায় যেমন ওস্তাদ খেলোয়াড়রা পুট্ বললে পুট্, ছক্কা বললে ছক্কার দান ফেলে দেন। এটা অন্যরা পারে না, যিনি বৈষ্ণব, তিনি কখনই শাক্ত হয়ে যেতে পারবেন না, শাক্ত কখন শৈব হয়ে যেতে পারবেন না। আদপে যদি কেউ পারেন, একমাত্র অদ্বৈতবাদীরাই পারবেন। তত্ত্বগত ভাব নিয়ে যাঁরা অদ্বৈতবাদী তাঁদের কথা বলা হচ্ছ না, অদ্বৈতে যিনি উপলব্ধিবান পুরুষ, তাঁর কথা বলা হচ্ছে। উপলব্ধিবান অদ্বৈতী যিনি, তিনিই পারবেন অখণ্ড থেকে মনকে নামিয়ে এই তিনি হয়ে গেলেন বৈষ্ণব, আবার ইচ্ছা করলে এই হয়ে গেলেন শাক্ত। বহুরূপীর মত যে ভেক বদল করছেন তাও না, যখন যে ভাবে থাকছেন, তখন বাস্তবিক তিনি ঐ ভাবে একেবারে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকছেন, ঐ ভাবের লোক দেখলে মনে করবে, উনি তো আমাদেরই লোক; আমরা যে জায়গায় পৌঁছাতে চাইছি, উনি তো ঐ জায়গাতে পৌঁছে বসে আছেন, উনি আর আমার ইষ্ট তো এক হয়ে গেছে। ঠাকুর তাই বারবার বলছেন, মতুয়ার বুদ্ধি করতে যেও না, আমার মতটাই শেষ কথা, অন্যরা ভুল; এই

জিনিসটা কক্ষণ করতে যেও না। এই বিষয়টা এখানেই স্বামীজী শেষ করছেন। এরপর স্বামীজী অন্য বিষয়ের উপর আলোচনা করতে যাচ্ছেন।

কর্মবাদের রহস্য

এর আগের আলোচনায় স্বামীজী বললেন, অদ্বৈতের মধ্যেই কিভাবে দ্বৈত রয়েছে। যিনি Absolute দেখেন তিনি Relativeকেও দেখেন; পারমার্থিককে যিনি জানেন, তিনি ব্যবহারিককেও জানেন। সেখান থেকে স্বামীজী এবার পুরাণের উপর আসছেন, যেখানে এবার তিনি পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত এগুলোকে নিয়ে ব্যাখ্যা করছেন। আমরা অনেকবার মনে করিয়ে দিয়েছি যে, স্বামীজী ক্লাশে অনেক কথাই বলেছিলেন, কিন্তু যিনি নোট নিতেন, তিনি পুরোটা নোট নিতে পারেননি, সম্ভবও না; পরে গুডউইন এসে শর্টহ্যাণ্ডে স্বামীজীর পুরো লেকচারকে ঠিক ঠিক ভাবে লিপিবদ্ধ করলেন। এখানে তিনি বক্তব্যের সার অংশটা নোট করে গেছেন। সেইজন্য দেববাণীর প্রত্যেকটি বাক্যেরই প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা দরকার। প্রথমেই শুরু করছেন, Cause and effect are all Maya, and we shall grow to understand that all we see is as disconnected as the child's fairy tales now seem to us. (*কার্য-কারণ সব মায়া, আর আমরা যত বড় হবো ততই বুঝব যে, ছোটদের পরীর গল্প এখন যেমন আমাদের কাছে বোধ হয় তেমন যা কিছু আমরা দেখছি, সবই ঐরূপ অসম্বদ্ধ।*) স্বামীজী এই ধরণের এক একটা বাক্য পড়লে আঁৎকে উঠতে হয়। ভাবতে অবাক লাগে, স্বামীজী কি করে এই ধরণের কথা বিদেশীদের সামনে বলেছিলেন। প্রত্যেকটা বাক্য সত্য হলেও, মেনে নিতে কত বুকের পাটা লাগে। স্বামীজী এখানে এক কথায় বলতে চাইছেন, কর্মবাদ বলে কিছু নেই। আমরা কর্মফল, কর্মবাদ নিয়ে কত কথা বলছি, স্বামীজী বলছেন, এগুলো কিছুই নেই; আর বাস্তবিকই কিছু নেই। মাণ্ডুক্যকারিকাতে যখন ঘোর অদ্বৈতবাদ পড়ানো হয়, সেখানে ওনারা খুব systematically দেখান, কার্য কারণের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা অত উচ্চ দর্শনের আলোচনায় যাচ্ছি না, আমরা অত্যন্ত সাধারণ স্তর থেকে জিনিসটাকে দেখার চেষ্টা করছি। হিন্দুদের ধর্ম পুরো কর্মবাদের উপর দাঁড়িয়ে আছে, কর্মবাদ হিন্দুদের একটা খুব জোরালো ভিত্তি। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, কর্মবাদ আমরা মানি ঠিকই, কিন্তু যে সত্যগুলিকে নিয়ে কোন প্রশ্ন করা যাবে না, সেই রকম কোন সত্য নয়।

যদিও আগে এর উপর আলোচনা করা হয়েছে, মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য এখানে আবার খুব সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে। ঠাকুর বলছেন, লঙ্কা খেলে ঝাল লাগবে, এটাই ঈশ্বরের বিধান। ঈশ্বরের বিধানই হোক বা লঙ্কায় যে রাসায়নিক উপাদানগুলি আছে, বিজ্ঞানীরা যেটা এখন আবিষ্কার করছেন, সেই রসায়নের দরুণ ঝাল লাগছে, যাই হোক না কেন, মূল হল কিছু কিছু লঙ্কা আছে যেটা খেলে মারাত্মক ঝাল লাগে, সিমলা মিরচার মত কিছু লঙ্কা আছে, যা খেলে ঝাল লাগে না, আবার কিছু মিরচা আছে প্রচণ্ড ঝাল লাগে। সাগরদ্বীপে এক ধরণের ছোট ছোট লঙ্কা হয়, যার নাম সাগরসুন্দরী লঙ্কা। ছোট্ট লঙ্কা, কিন্তু মুখে দিলেই মনে হবে গায়ে আগুন লেগে গেছে। আর আসামে আছে ভূতঝল্কা লঙ্কা, বলা হয় বিশ্বের সব চাইতে ঝাল লঙ্কা হল ভূতঝল্কা লঙ্কা। একটা লঙ্কা দিয়ে চল্লিশ জনের রান্না করে দেওয়া যায়, তাতেই বলে নাকি মুখ পুড়ে যায়। লঙ্কা খেলে ঝাল লাগবে, এটা সবাই জানে। আমাদের মস্তিষ্কের গঠন এমন, প্যাটার্ন ছাড়া আমরা কিছু দেখতে পারি না, ব্রেনও নিতে পারে না। যার জন্য দেখা যায়, যেখানে কোন প্যাটার্ন নেই, আমাদের মস্তিষ্ক সেখানেও একটা প্যাটার্ন তৈরী করে নেয়।

এর আগের আলোচনায় স্বামীজী যেমন বললেন, একটা শৃঙ্খল চলছে, যদি আমরা বর্তমানকে ধরে নিতে পারি, তাহলে ভূত ভবিষ্যতকে বলে দিতে পারব। তাই বলে ভূল হবে না তা নয়, ভুল হতেও পারে। আমরা দেখছি, সবাই জানে কার্য-কারণের সম্পর্ক আছে, নিউটনের ফিজিক্স পুরোটাই দাঁড়িয়ে আছে কার্য কারণের উপর। ওটাকেই যখন আমরা জীবনের উপর নামিয়ে দিচ্ছি, তখন বলছি, আমি আগে কিছু করেছিলাম তাই এই রকম হয়েছে। কিন্তু জীবনকে যদি খুব কাছ থেকে দেখা যায়, তখন দেখা যাবে কিছু জিনিস মিলছে, আবার কিছু জিনিস মিলছে না। জীবনে অনেক দোষ করেছি যার জন্য কোন শাস্তি পেতে হয়নি, আবার জীবনে

অনেক শাস্তি পেতে হয়েছে, যেখানে আমি কোন দোষ করিনি। কত লোক কত গোলমাল করছে, কেউ ধরা পড়ছে, কেউ ধরা পড়ছে না, দিব্যি তারা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শুধু তাই না, অনেক শ্রদ্ধেয় মহারাজদের জীবনে দেখা যায়, অনেক সময় যেটা হওয়ার কথা নয়, তিনি বলছেন, না এটা এই রকমই হবে, ঠাকুর অন্যথা করবেন না। কিন্তু পরে দেখা গেল, যেটা হওয়ার কথা নয় সেটাই হয়েছে। মহারাজদের কথা না হয় আমরা ছেড়ে দিচ্ছি, ঠাকুর নিজেই বলছেন, আগে সব কেমন মিলত, এখন তেমন আর মেলে না। আমরা স্বামীজীকে নিয়ে বলি যে, তিনি আগে থেকেই ভবিষ্যত বাণী করে গেছেন, আর সত্যিই দেখা যাচ্ছে, স্বামীজীর কথা মিলে গেছে। কিন্তু স্বামীজীর অনেক কথা যে মিলছে না, সেই ব্যাপারে কেউ কিছু বলে না। এর কারণটা আমরা আগের আলোচনাতে বলেছিলাম, এনারা শৃঙ্খলকে ধরে ভূত আর ভবিষ্যতকে জানতে পারেন, সেখানে কিন্তু ভুল হতেই পারে।

দ্বিতীয়তঃ, জুহুদিরা বা খ্রীশ্চানরা যেমন মনে করে, ঈশ্বর যদি সৃষ্টি করেন তাহলে তাতে কিন্তু কার্য-কারণের সম্পর্ক থাকবে। গ্যালিলিওর সময় থেকে যখন মডার্ন ফিজিক্স আসতে শুরু হল, তখন এনারা বলতে শুরু করলেন, God is the great watchmaker। আগেকার দিনে যে ঘড়ি তৈরী হত, সেখানে ঘড়ি বানাতে গেলে সঠিক একটা পদ্ধতিতে নির্ভুল ভাবে সব কিছু করতে হবে। ভগবানও যেন এই জগৎটাকে নির্ভুল ভাবে তৈরী করেছেন। ফিজিক্সে এ্যটমের ভিতরে ঢুকলে সেখানে নিউটনের সিদ্ধান্তগুলি আর চলে না। তারও আগে আইনস্টাইনই দেখিয়ে দিলেন এই সিদ্ধান্ত চলে না; Space is curved, তখন আর কোন কিছু মিলছে না। বস্তুর গতি বেড়ে গেলে নিউটনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কিছু হয় না। ঠিক তেমনি জীবনের ক্ষেত্রে দেখছি, আরে এখানে সব কিছু তো ভগবানের নিয়মে চলে না। আজ পর্যন্ত কেউ জানে না, ভগবানের কি আইন। কোরাণ এক রকম বলছে, ওল্ড টেস্টামেন্ট আরেক রকম বলছে, বাইবেল অন্য রকম বলছে, এখানে আমরা আধ্যাত্মিক সত্যের কথা বলছি না। এই জায়গাতে ধর্মের খুঁটিনাটি জিনিসকে নিয়ে বলা হচ্ছে। ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমানদের জীবন যদি আমরা দেখি, সব কিছুই যেন আলাদা। একজন যেটা করবে, অন্যজন সেটা করবে না। একজন বলছে আমার ধর্ম এই রকম বলে, অন্যজন বলবে আমার ধর্ম এই রকম করতে নিষেধ করে। কিন্তু উচ্চস্তরে গেলে দেখা যাবে, যদি ঈশ্বর সৃষ্টি করে থাকেন, ঈশ্বর যদি সত্য হয়, সৃষ্টি যদি সত্য হয়, তাহলে ঈশ্বর হয়ে যাবেন great watchmaker, তার মানে সব কিছু নির্ভুল ভাবে চলবে। সব কিছু যদি নির্ভুল ভাবে চলে, তাহলে ভগবানের আইনকে ভগবানও ভাঙতে পারবেন না। এবার যদি আমরা দেখি, একটা শিশু জন্ম নিয়ে ছ-ঘন্টার মধ্যে মারা গেল। এখানে কোথায় গেল ভগবানের আইন। দশ মাস মায়ের গর্ভে রেখে জন্ম দিলেন কেন? জন্মই যদি দিলেন, তিনি মেরে ফেললেন কেন? আর ভগবান কেন একজনকে কোটিপতি আর আরেকজনকে নিঃস্ব করে দিচ্ছেন? তার মানে, জগতে যা কিছু গোলমাল আছে, সবটার জন্য ভগবানই দায়ী। কিন্তু ভগবান কেন এই রকম করছেন? এসব প্রশ্নের কোন সদুত্তর নেই।

অদ্বৈত বেদান্তের কাছে এগুলো কোন সমস্যাই নয়, কারণ অদ্বৈত বেদান্তের দৃষ্টিতে ঈশ্বরই সত্য, ঈশ্বরের বাইরে কিছু নেই, তখন দেখা যাবে এই জগৎটা মিথ্যা। মিথ্যা মানে, যেভাবে খ্রীশ্চানরা জগৎকে সত্য বলে মনে করছে, সেই সত্যটা আর থাকতে পারে না। তখন এই সত্যটা আপেক্ষিক সত্য হয়ে যায়। আপেক্ষিক সত্য মানে, কখন সত্য মনে হয়, কখন মিথ্যা মনে হয়, কখন মনে হয় জগৎ আছে, কখন মনে হয় নেই, এই রকম হয়ে যায়। এই রকম যখন হয়ে যায়, তখন আমরা বলতে পারবো না যে, এটা হলে ওটা হবে। তখন বলতে হবে, কোন সময় হবে, কোন সময় হবে না।

আমাদের জীবনের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, এমন অনেক কিছু আমার জীবনে হয়েছে যেটা হবার কথা নয়, মাথা ঠুকে প্রার্থনা করলে কখন আমার প্রার্থনা অনুযায়ী হবে, কখন হবে না। সেখানে আমরা বলতে পারি, তোমার লোভ আছে, ঈর্ষা আদি আছে। কিন্তু খুব সাধারণ ব্যাপার, একটা শিশু জন্ম নিয়ে ছয় ঘন্টার মধ্যে মারা গেল, সে কার দোষে মারা গেল? ভগবানের এই ধরণের পক্ষপাত কেন? সত্যিই এগুলোর কোন উত্তর নেই। আবার হয়ত দেখা গেল, বিবাহের আগে থেকে কত প্রার্থনা করে যাচ্ছে, যখন জানল আমার সন্তান আমার স্ত্রীর গর্ভে এসেছে, তখন থেকে সে সন্তানের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করে যেতে লাগল। এই ধরণের কত কি করে যাচ্ছে। সন্তান জন্ম নিল, কয়েক ঘন্টার পর মারা গেল। তাহলে প্রার্থনার সঙ্গে শিশুর

বেঁচে থাকার কোন সম্পর্ক আছে কি নেই? কি করে বলব, কেউ-ই জানে না। কিন্তু আমাদের মস্তিষ্ক তো নিতে পারবে না। যদি বলে দেওয়া হয়, এই রকমই হয়, সব কিছু এলোপাতাড়ি চলে, মস্তিষ্ক এটাকে নিতে পারবে না। কারণ মস্তিষ্ক সব সময় চাইছে প্যাটার্ন। বাচ্চাদের আচরণ, পাগলদের আচরণ সবটাই অসঙ্গত, সঙ্গতিবিহীন লোকদের দেখলে আমরা ঘাবড়ে যাই, কখন কি বলে বসবে, কি করে বসবে কোন ঠিক নেই। যে ভদ্রলোকের ব্যবহার, কথাবার্তা একই রকম, তাকে দেখে আমাদের মনে শান্তি আসে, আমরা নিশ্চিত এর দ্বারা খারাপ কিছু হবে না। এখন এগুলো কিভাবে হয়, কেন হয়, কেউ জানে না? ঈশ্বরের ইচ্ছায় হয়, কর্মফলের জন্য হয়, কিংবা সবটাই এলোপাতাড়ি হয়, কেউ বলতে পারবে না।

কর্মবাদের থিয়োরী খুব উচ্চমানের থিয়োরী। কর্মবাদ বলে, এই জিনিসটা এই রকম কেন হল, এর বিচার করতে গেলে তোমার মাথা খারাপ হয়ে যাবে; কোন দিন এর উত্তর খুঁজে পাবে না। একজন নির্দোষ মানুষ, শান্ত পবিত্র মনের মানুষ, সে কেন মার খেয়ে যাচ্ছে? সীতা পবিত্রতা স্বরূপিণী, তাঁকে কেন বনবাসেই জীবন কাটাতে হল। যজ্ঞ থেকে যাঁর জন্ম, সেই দ্রৌপদীকে কেন পদে পদে লাঞ্ছনা সইতে হচ্ছে? এগুলোর কোন উত্তর নেই। কিন্তু জীবন আমাদের চালিয়ে যেতে হবে, জীবন চালাবার জন্য আমাদের অনেক কিছুর অবলম্বন দরকার। জীবন চালানোর জন্য কিছু কিছু সিদ্ধান্ত লাগে, তার সাথে একজন জীবনসঙ্গী দরকার, সময় কাটাবার জন্য বই লাগে, টিভি লাগে, খেলা লাগে। আর আশপাশের সব কিছুকে সুন্দর ভাবে মনের মত গুছিয়ে রাখার জন্য জীবনের একটা সিদ্ধান্ত দরকার। যতগুলো সিদ্ধান্ত আছে, তার মধ্যে কর্মবাদ সব থেকে ভাল সিদ্ধান্ত। কর্মবাদে দায়ীত্ব নিজের উপর আসে, শক্তি দেয়, তুমি অসহায় নও, গোলাম নও। এই সিদ্ধান্তকে নিয়ে যখন ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে যায়, একটা অবস্থায় গিয়ে দেখে, কর্মবাদ কিছু না, সব তাঁর ইচ্ছা। আরও এগিয়ে গিয়ে যখন অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তখন দেখে সৃষ্টিই যেখানে হয়নি সেখানে কিসের কার্য, কিসের কারণ, কিসের কর্মফল। ঠাকুরের তো মুহুর্মুহু মা কালীর দর্শন হচ্ছে, অর্হনিশি নির্বিকল্প সমাধিতে চলে যাচ্ছেন, মা বলছেন, তোমাদের ঠাকুর অদ্বৈতী ছিলেন, তোমরাও অদ্বৈতী। তারপরেও তো ঠাকুর বলছেন, লঙ্কা খেলে ঝাল লাগবে। কারণ এই জগতে জীবন চালানোর জন্য এই জিনিসগুলো দরকার। এই ভাবটাকে স্বামীজী এবার ব্যাখ্যা করছেন।

এই ব্যবহারিক জগতে কার্য-কারণের সম্পর্ক সব মায়া। আমরা যে স্বপ্ন দেখি, সেখানে আমাদের মনে হবে স্বপ্নে সব কিছুর সঙ্গে একটা যেন সামঞ্জস্য আছে। কিন্তু ঘুম ভেঙে গেলে মনে হবে, স্বপ্নে কোনটার সাথে কোন মিল নেই, সবটাই কেমন এলোপাতাড়ি। যে জিনিসটাতে আমি খুব অভ্যস্ত, সেটাকেও স্বপ্নে এলেমেলো দেখি। বাচ্চাদের রূপকথার যে কাহিনী, সেখানেও সব এলেমেলো। কিন্তু শৈশবে রূপকথার গল্প পড়তে আমাদের দারুণ লাগত। ঠিক তেমনি ধর্ম জগতে যারা শিশু, তাদের কাছে কর্মবাদ দারুণ লাগে, এর বেশি আর কিছু না। যেমন যেমন উপরে উঠে আসবে, তখন দেখবে সব এলেমেলো। কোন কিছুর সাথে, কোনটার সাথে কোন মিল নেই। সেইজন্য নিজের মনকে বোঝানর জন্য, শান্তির জন্য, একটা সিদ্ধান্তকে নিয়ে এগিয়ে যেতে হয়। কিন্তু আমরা যদি বিচার করে দেখি, কর্মবাদও মিলছে না, ঠাকুরের ইচ্ছাও মিলছে না, মনে হবে ঠাকুর কেন এই রকম এলেমেলো করছেন। আর সবটাই এলেমেলো ধরে নিয়ে জীবনে চলতে গেলে, তখন আমরা পাগল হয়ে যাবো। আমাদের পক্ষে তখন জীবন চালানোটাই বিরাট সমস্যার হয়ে যাবে।

এরপর স্বামীজী বলছেন, There is really no such thing as cause and effect and we shall come to know it, আসলে কার্য-কারণের কোন সম্পর্ক হয় না। যারাই কার্য-কারণের সম্পর্কের কথা বলে, কর্মবাদের কথা বলে, খারাপ কিছু হলে তারা বলবে, তুমি আগের জন্ম এমন কিছু করেছিলে যার জন্য তোমার দিনকাল এত খারাপ যাচ্ছে। তখন আমার নিজেকে মনে হবে, আমি একজন পাপী, আজ তাই আমার এই দুরবস্থা। একদিকে কর্মবাদ যেমন একটা শক্তি নিয়ে আসে, আমার দোষেই সব, আজকে আমি ভাল কাজ করলে আগামীকাল অবশ্যই আমার সব ভাল হয়ে যাবে। ঠিক তেমনি কর্মবাদের একটা নেতিবাচক দিক আছে। আমাদের প্রায়ই শুনতে হয়, আমাকে কি কপাল নিয়েই জন্মাতে হয়েছে যে, সব সময় মার খেয়েই যাচ্ছি, দুঃখ হয়, হতাশায় ভারাক্রান্ত হয়ে খারাপ কিছু করে ফেলতে ইচ্ছে হয়। তাহলে কর্ম আছে কি নেই? থাকত যদি সবাই এটাকে স্বীকার করে থাকত। কিন্তু যখন বোঝার চেষ্টা করা হবে বা ঘোর অদ্বৈতে চলে যাবে,

তখন দেখবে কার্য নেই, জগৎ নেই। স্বামীজী এই কথাই বলছেন, There is really no such thing as cause and effect। অথচ বিভিন্ন জায়গায় স্বামীজী কর্মবাদ নিয়ে কত কিছু বলেছেন। কিন্তু স্বামীজী কর্মবাদ নিয়ে যখন বলছেন, সেখান বারবার একটা কথা বলছেন, সিদ্ধান্ত রূপে কর্মবাদ সব থেকে একটা ভাল থিয়োরী। যদি বলি সব ঈশ্বরের ইচ্ছায় হচ্ছে, তখন মনে হবে ঈশ্বর এই রকম পক্ষপাত কেন করলেন, আমাকে গরীব আর আরকজনকে কোটিপতি করে দিলেন। যদি বলি কারুর ইচ্ছাতে নয়, সব এলোপাতাড়ি হয়, তাহলে সবার মাথাটা খারাপ হয়ে যাবে। কিন্তু কর্মবাদ এই জায়গায় একটা শক্তি যোগায়।

আমরা এমনই দুর্বল যে, আমার যা কিছু খারাপ হবে তার জন্য অপরকে দোষারোপ করতে শুরু করে দেব, তোমার জন্য আমার আজ এই দুরবস্থা। আর কাউকে না পেলে প্রকৃতিকে দোষ দিতে থাকি, বৃষ্টি হওয়ার আর সময় পেলো না, যখনই বাইরে বেরোতে যাবো তখনই বৃষ্টি হতে হবে! ঠাণ্ডা পড়লে, উঃ কি ঠাণ্ডা, গরম পড়লে বাপরে কী গরম পড়েছে, টেকা দায়। আর সবাই সবাইকে দোষ দিয়েই যাচ্ছে। রাজ্য কেন্দ্রকে দোষ দিচ্ছে, কেন্দ্র রাজ্যের উপর দোষ চাপাচ্ছে, বিরোধীরা সিবিআইকে দোষ দিচ্ছি, সিবিআই আরেকজনকে দোষ দিচ্ছে, সবাই সবাইকে দোষ দিয়ে যাচ্ছে। কর্মবাদ প্রথমে এই দুর্বলতাগুলি কেটে দেয়। নিজের উপর সব দোষ নিয়ে দাঁড়িয়ে যে কেউ বলতে পারবে, সেই দম কারুর নেই। কর্মবাদ আমাদের এই শক্তিটা দেয়। ঈশ্বরের ইচ্ছা এটাও একটা সিদ্ধান্ত, সব এলেমেলো চলে এটাও একটা সিদ্ধান্ত, কর্মবাদটাও সিদ্ধান্ত। কর্মবাদের সিদ্ধান্ত বাকি সিদ্ধান্ত থেকে এই কারণে শ্রেষ্ঠ, কর্মবাদ মানুষকে শক্তি দেয়।

রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের চিরন্তন গুরুত্ব

Then if you can, lower your intellect to let any allegory pass through your mind without questioning about connection. (*যদি পার তো যখন কোন রূপক-গল্প শুনবে, তখন তোমার বুদ্ধিবৃত্তিকে একটু নামিয়ে এনো, মনে মনে ঐ গল্পের পূর্বাপর সঙ্গতির বিষয়ে প্রশ্ন তুলো না।*) একবার যদি আমরা বুঝে নিতে পারি, ও এই রকমই এলেমেলো, এ কিছুই না, তখন আর সমস্যা হবে না। যখন আমরা রূপকথার কাহিনী বা কোন পৌরাণিক কাহিনী পড়ি তখন সবটাই আজগুবি, এলেমেলো জানলেও আমরা কিছু মনে করি না। আচ্ছা রাজা রামচন্দ্র কি চৌদ্দ হাজার বছর রাজত্ব করেছিলেন? অবশ্যই করেছিলেন, না করার তো কিছু নেই। কিন্তু যে সবে নূতন নূতন বিজ্ঞান পড়ছে সে বলবে, এইসব গাঁজাখুড়ি কাহিনী কেন বলছ? এই জিনিসটাকে বোঝা, আসলে কার্য-কারণের কোন সম্পর্ক নেই। ঠাকুর কাহিনী বলছেন, একজন বৈকুণ্ঠধাম দেখে এসেছে। আরেকজন জিজ্ঞেস করছে, ওখানে কি দেখলে? ভগবানকে দেখলাম তিনি ছুঁচের ফুটোর ভিতর দিয়ে হাতি, উট, ঘোড়া এইসব পার করাচ্ছেন। তুমি ধাপ্পা মারছ, আদপেই তুমি বৈকুণ্ঠে যাও নাই। আরকেজন বলছে, হতেই পারে, ভগবান কি না পারেন! একবার যখন বুঝে নিলাম কার্য-কারণের কোন সম্পর্ক নেই, তখন আর পুরাণ বলুন, মহাভারত বলুন, রামায়ণ বলুন কোন কাহিনীকে নিয়ে আর সমস্যা থাকে না।

এটা বলার পর স্বামীজী বলছেন, Develop love of imagery and beautiful poetry and then enjoy all mythologies as poetry. (*হৃদয়ে রূপক-বর্ণনা ও সুন্দর কবিত্বের প্রতি অনুরাগের বিকাশ কর, তারপর সমুদয় পৌরাণিক বর্ণনাগুলিকে কবিতা মনে করে উপভোগ কর।*) রুচিটা পাল্টাতে হবে আর সাহিত্য, বিজ্ঞান, পুরাণ, কবিতা সব কিছুর রসাস্বাদন করার ক্ষমতা আনতে হবে। পড়াশোনা করতে করতে জ্ঞান আস্বাদন করার ইচ্ছাটা বাড়তে থাকে, গভীরে চিন্তা-ভাবনা করতে করতে আস্বাদনের ক্ষমতা বাড়ে। আলেকজাণ্ডারও গ্রীক সাহিত্য ও গ্রীক চিন্তা-ভাবনা নিয়ে পড়াশোনা করেছিলেন। জুলিয়াস সিজারেরও এই স্পৃহাটা ছিল, তিনি আবার একজন ক্রীতদাস কিনলেন, যিনি এই জিনিসগুলো তাঁর মেয়েকে পড়াতেন। বাচ্চা বয়স থেকে জ্ঞানের প্রতি স্পৃহাটা জাগাতে হয়। রামকথা, কৃষ্ণকথা এগুলো কবিতা, ভাবের রাজ্য। এই কথা স্বামীজী বিদেশীদের বলছেন এটা বোঝানর জন্য যে, আমাদের রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ এগুলোর একটা দাম আছে। কবিতা, সাহিত্য রসের প্রতি একবার যদি ভালবাসা জেগে যায়, তখন কোন পুরাণ কথা, রামকথা আজগুবি বা এলেমেলো লাগবে না।

এরপর স্বামীজী খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন, Come not to mythology with ideas of history and reasoning. (*পুরাণ-চর্চার সময় ইতিহাস ও যুক্তিবিচারের দৃষ্টি নিয়ে এসো না।*) বাল্মীকি রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ইতিহাস নয়, এগুলো শাস্ত্র। রামায়ণ-মহাভারত বা পুরণের ঘটনাকে যদি কেউ বলতে শুরু করে এগুলো ঐতিহাসিক ঘটনা, এগুলো ভৌগলিক ব্যাপার, এগুলো বিজ্ঞানভিত্তিক, তাহলে সে নিজেরও সর্বনাশ করছে, আর যাদেরকে বলছে, তাদেরও সর্বনাশ করে দিচ্ছে। ভুলে গেলে চলবে না যে, এগুলো শাস্ত্র, তার থেকেও বড় হল এগুলো পৌরাণিক। তাহলে রূপকথার কাহিনী আর মিথলজি এক? রূপকথার কাহিনী বিনোদনের জন্য, মিথলজি বিনোদনের জন্য নয়। মিথলজিতে আধ্যাত্মিক সত্যগুলিকে কাল্পনিক ঘটনা, কবিত্ব দিয়ে উপস্থাপন করা হয়। এর মধ্যে যদি তোমরা ইতিহাস, ভূগোলকে মেলাতে যাও, যদি যুক্তি দিয়ে এই কাহিনীগুলিকে বুঝতে চাও, তাহলে ভাই তুমি এগুলো পড়তে যেও না। শ্রীরামচন্দ্র চৌদ্দ হাজার বছর রাজত্ব করেছিলেন, রাবণের দশটি মাথা, এগুলি তোমাকে মেনে নিয়ে পড়তে হবে। ভাগ্যিস যে স্বামীজী এই কথাগুলো বলে গিয়েছিলেন, তাই আমরা এসব কথা এখন বলতে পারছি। তা নাহলে বলা যেত না, বললে বলবে, হয় এরা সব মুর্খ সাধু, আর নাহলে বলবে সব ভণ্ড সাধু।

তার সাথে বলছেন, Let it flow as a current through your mind, let it be whirled as candle before your eyes, without asking who holds the candle, and you will get the circle; the residuum of truth will remain in your mind. (*ঐ-সব পৌরাণিক ভাবগুলি তোমার মনের ভিতর দিয়ে প্রবাহকারে চলে যাক। তোমার চোখের সামনে তাকে মশালের মত ঘোরাও, কে মশালটা ধরে রয়েছে – এ প্রশ্ন করো না, তা হলেই একটা আলোক-চক্র দেখতে পাবে; এতে যে সত্যের কণা অন্তর্নিহিত রয়েছে, তা তোমার মনে থেকে যাবে।*) পুরাণের এই কাহিনীগুলোকে তোমার মনের মধ্যে ঘুরতে দাও। একটা মশালকে নিয়ে জোরে ঘোরালে একটা আলোক-বর্ত্তিকা মনে হবে। এই মশাল কে ঘোরাচ্ছে সেটার কোন গুরুত্ব নেই। ঠিক তেমনি, পুরাণ, রামায়ণের কাহিনীকে যদি মনের ভিতরে ঘোরান হয়, তখন এর পিছনে যে সত্য রয়েছে, শুধু ঐ সত্যটাই থাকবে, বাকি সব কিছু খসে পড়ে যাবে।

The writers of all mythologies wrote in symbols of what they saw and heard, they painted flowing pictures. Do not try to pick out the themes and so destroy the pictures; take them as they are and let them act on you. Judge them only by the effect and get the good out of them. (*পুরাণ-লেখকরা সকলেই – তাঁরা যা যা দেখেছিলেন বা শুনেছিলেন, সেইগুলি রূপকভাবে লিখে গেছেন। তাঁরা কতকগুলি প্রবাহকার-চিত্র এঁকে গেছেন। তার ভিতর থেকে কেবল তার প্রতিপাদ্য বিষয়টা বার করবার চেষ্টা করে ছবি-গুলিকে নষ্ট করে ফেলো না। সেগুলিকে যথাযথ গ্রহণ কর, সেগুলি তোমার উপর কাজ করুক। এদের ফলাফল দেখে বিচার কর – তাদের মধ্যে যেটুক ভাল আছে, সেটুকুই নাও।*) কাহিনীর ঘটনাগুলিকে নিয়ে যদি যৌক্তিকতা দিয়ে বেশি বিচার করতে শুরু করে দেওয়া হয়, এই দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করা হোক, ঐভাবে বিচার করা হোক –এতে এই ধরণের কাহিনী রচনার মূল উদ্দেশ্যটাকে সে বানচাল করে দেবে, দ্বিতীয়ত এতে সে তার দুর্বলতাকে সামনে নিয়ে আসছে। অনেক আগে বিজ্ঞানের ধর্মের সাথে কোন লড়াই ছিল না, বিজ্ঞানের সাহিত্যের সাথে কোন লড়াই নেই, আর দর্শনের সাথেও বিজ্ঞানের কোন লড়াই ছিল না। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিন থেকে বিজ্ঞানের রমরমা শুরু হয়, আর সেই থেকে সমস্যারও শুরু হল, ধর্মের নেতা, সাহিত্যের নেতা, দর্শনের নেতারা নিজেদের দুর্বল মনে করতে শুরু করল, যার জন্য এরা বিজ্ঞানকে বলতে শুরু করল, আমি কিন্তু আপনারই মত। যে লোক বলে, আমিও আপনার মত, বুঝতে হবে লোকটি দুর্বল। ধর্ম বলতে শুরু করল, আমরা বিজ্ঞানসম্মত; দর্শনও বলতে শুরু করল, আমাদের সব কিছু বিজ্ঞানসম্মত, সাহিত্যিকরাও বলতে লাগল আমার সাহিত্য বিজ্ঞানভিত্তিক। অথচ ধর্ম, দর্শন ও সাহিতের সাথে বিজ্ঞানের কোন সম্পর্কই নেই। বিজ্ঞান ওদের আগেও কোন গ্রাহ্য করত না, এখনও হিসাবের মধ্যে আনে না, বরং হাসাহাসি করে। একজন দুটো তিনটে প্রজন্ম ধরে বিরাট বড়লোক, কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি রয়েছে। তার কোন আত্মীয়, যে খুবই গরীব, সে কোন কিছু করে কিছু টাকা-পয়সা পেয়েছে। এবার সে দুটো ভাল দামী পোষাক পরে তার বড়লোক আত্মীয়ের বাড়িতে যদি

আসতে দেখে, লোকেরা হাসাহাসি করবে। সামনে হয়ত হাসাহাসি করবে না, কিন্তু তার আড়ালে সবাই হাসবে। তুমি নিজের মত থাকো, তুমি এমনিই সম্মান পাবে।

ঠাকুরের সময় তখনকার দিনের বিভিন্ন সংগঠন থেকে যে লেখাগুলো বেরিয়ে আসত, যেমন ব্রাহ্ম সমাজের লোকেরা যে লেখাগুলো পাঠকদের জন্য ছাড়তেন, ভাল করলে দেখা যাবে সেই লেখার মধ্যে দিয়ে তাঁরা যেন ইংরেজদের খুশী করার চেষ্টা করছেন – আমাদের অনেক দোষ আছে ঠিকই, কিন্তু আমরা অনেকটা আপনাদের মতই। ঠাকুরকে উপস্থাপন করতে গিয়ে মাস্টারমশাই তো কথায় কথায় কখন খ্রীশ্চানদের সাথে ঠাকুরকে মেলাতে যাচ্ছেন, কখন ঐ শাস্ত্র, কখন সেই শাস্ত্রের সাথে মেলাতে যাচ্ছেন। মাস্টারমশাই যেন ঠিক ধরতে পারছেন না, ঠাকুরকে কিভাবে উপস্থাপন করলে লোকেরা ঠাকুরকে ধরতে পারবে। স্বামীজী কিন্তু এই ক্ষেত্রে কোন তোয়াক্কাই করছেন না। এটাই হল সেই শক্তি, আমি জানি তাঁর কি অবস্থান, সেখানে তিনি স্বতন্ত্র, কারুর সাথে মেলাতে যাওয়ার কোন প্রশ্নই নেই। যারাই ধর্ম ও বিজ্ঞানকে মেলাবার জন্য ভাষণ দিয়ে যাচ্ছেন, পুরোটাই বকওয়াস্। ইদানিং তো কত সাবজেক্ট এসে গেছে, Religion and Management, Gita & Management, এগুলোর কোন দরকার নেই, কোন কিছুর সাথে মেলাবার প্রয়োজন নেই। এটাই স্বামীজী এখানে বলতে চাইছেন, যখনই আমরা রামকথা, কৃষ্ণকথা থেকে একটা সুসম্বদ্ধ কিছু দাঁড় করাবার চেষ্টা করছি, তখন আমরা কিন্তু একটা বিরাট বোকামো করে ফেলছি।

একটা নামকরা ঘটনা আছে, আমেরিকার এক বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন অধ্যাপক গ্রীক কবিতা পড়াচ্ছেন। একজন কবিকে নিয়ে প্রথম লাইনেই বলছেন, এটা হল একটা খুব সুন্দর কবিতা। সুন্দর কেন? কারণ গ্রামারের নিয়মে যত ভুল হতে পারে, সব কটা ভুল এই কবিতাতে আছে। কি দুরবস্থা! একটা কবিতাকে গ্রামার দিয়ে বিচার করা হচ্ছে। তার মানে প্রফেসর দেখাতে চাইছে প্যাটার্ন কত বেশি দরকার। কবিতা হল কবিতা, কবিতা কখনই গ্রামারকে অনুসরণ করে রচিত হয় না। কবিতা একটা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। পুরাণ বা রামায়ণেও ঠিক একই জিনিস হয়, এগুলো সম্পূর্ণ আলাদা একটা জিনিস, এর মধ্যে ইতিহাস, ভূগোল, যুক্তি খুঁজতে যাওয়াটা বৃথা, কোন অর্থই হয় না। কারণ এই জিনিসগুলো হল কাব্যিক সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ, এর থেকে কাব্যিক রস আস্বাদন করতে হয়, তার থেকেও বড়, একটা গূঢ় আধ্যাত্মিক সত্যকে ইঙ্গিত করছে। পৌরাণিক সাহিত্যের কাহিনীগুলি যখন অনেক দিন ধরে মনের মধ্যে বিচরণ করতে থাকবে, তখন হঠাৎ একদিন স্পষ্ট হয়ে যাবে, ও এই জায়গাতে এই জিনিসটাকে আমাদের বোঝাতে চাইছেন। যেমন ভাগবতে কত রকম কাহিনী আছে, আজকালকার ছেলেমেয়েরা পড়লেই বলবে সব গাঁজাখুরি। অথচ ভাগবত ধর্মজগতে একটি অত্যন্ত উচ্চমানের গ্রন্থ, যেখানে পরাভক্তির কথা বলছেন। কিন্তু বেশির ভাগ কথাকাররা, ভাগবতের আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই দশম স্কন্ধে চলে যাবেন, দশম স্কন্ধে আবার রাসলীলাতে নেমে যাবেন, আরও নেমে গিয়ে গোপীদের চেহারা, রূপের বর্ণনায় নেমে যাবেন। আর সেটাকে রসিয়ে রসিয়ে পাঠকদের সামনে নেচে নেচে বলবেন। ভাগবত তো গোপীদের চেহারা বর্ণনা করার জন্য নয়। এখানে পরাভক্তি, ঈশ্বরের প্রতি পরমপ্রেম কেমন, সেটাকে বোঝাতে চাইছেন। ভাষা দিয়ে পরাভক্তিকে বর্ণনা করতে পারছেন না, তাই ব্যাসদেব ভগবানের প্রতি গোপীদের ভালবাসাকে রাসলীলার উপর চাপিয়ে পরাভক্তি কি, ঈশ্বরের প্রতি পরমপ্রেম কি জিনিস, সেটাকে দেখিয়ে দিচ্ছেন।

স্বামীজী তাই বলছেন, এত সুন্দর ছবির প্রতিপাদ্য বিষয়টাকে তুমি গ্রহণ করো, যুক্তি বিচার করতে গিয়ে ছবিটাকে নষ্ট করে দিও না। ছবির সৌন্দর্যটাকে আগে ভিতরে নিয়ে বসাও, আর সেটাকে নিয়ে মনের মধ্যে ঘোরাও, মনন করে যাও, দেখবে ছবির মর্মার্থ তোমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এটা ঠিকই যে, এর জন্য একটা আলাদা রুচি ও সংস্কৃতির দরকার, একটা আলাদা মানসিকতার দরকার। পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতকে যদি বিচার করতে হয়, তাহলে ভাল করে দেখো, দেশের উপর, সমাজের উপর, মানুষের উপর এই গ্রন্থগুলির কি প্রভাবে ফেলেছে, তারপর তুমি বিচার করো। কোন এক রাজার জীবনে খুব বিপর্যয় নেমে এসেছিল, তিনি খুব দুঃখ করছেন। পরেই তিনি একজনকে বলছেন, শুনেছি অনেক আগে রামচন্দ্র নামে একজন রাজা ছিলেন, তাঁরও জীবনে নাকি অনেক দুঃখ নেমে এসেছিল, তা সত্ত্বেও তিনি আবার সব কিছু জয় করে নিজের অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন, আমাকেও তাই হতে হবে। এই জিনিসটাকে স্বামীজী বলছেন,

রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ কিভাবে মানুষকে যে উজ্জিবীত করে চলেছে, আমরা ভাবতেই পারি না। গত দশ বারো বছরে ভারতে যা কিছু হচ্ছে, এটাকে নিয়ে আমরা এখানে কিছু বলতে যাচ্ছি না, কারণ, দেশের কি হতে যাচ্ছে আমরা সত্যিই জানি না। আমরা যদি একবার গভীর ভাবে চিন্তা করি, ভারতের মুসলমাদের এখানে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে, এর বাইরে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, আর ঐদিকে আসাম থেকে কচ্ছ পর্যন্ত যেখানেই একবার শুধু রাম শব্দ বললেই লোকের ভিতরে যেন আগুন জ্বলে উঠছে, কৃষ্ণ নামটা শুনলেই ভিতরটা যেন কেমন ভাব, ভক্তিতে বিহ্বল হয়ে যায়। বাংলায় একটা গ্রাম আছে, সেখানে বংশ পরম্পরায় সবারই নাম রাম দিয়ে। পুরো একটা দেশকে এই ছোট্ট একটা নাম 'রাম' ধরে আছে। আর তার সাথে আছে এই 'কৃষ্ণ' নাম। ভারতে কত মেয়ের নাম রাধা। বর্তমানের লোকেরা রাধা আর কৃষ্ণকে নিয়ে কত আজেবাজে নোংরা কথা বলে, তাহলে লোকেরা নিজের মেয়ের নাম রাধা কেন রাখছে! লোকেরা মেয়ের নাম মীরা রাখে কেনে? কারুর নামে নিজের সন্তানের নাম রাখা মানে, সেই নামের মানুষটিকে কত উচ্চ সম্মান জানাচ্ছে।

ফ্রয়েড একটা ধারণা নিয়ে এসেছিলেন, যার নাম Collective Unconscious। একটা সমাজের একটা চেতনা থাকে, সেই চেতনার ব্যাপারে তারা সজাগ থাকে না। সমাজের চেতনাটা মানুষের মনে এত গভীরে বসে যায়, সেটার উপরেই আধার করে বাকি সব কিছু পরিচালিত হয়। রাম আর কৃষ্ণ এই দুটো নামে ভারতের মানুষের গভীরে এমন ভাবে ঢুকে আছে যে, এটার উপরেই সব কিছু চলছে। এর ফলস্বরূপ আমরা কি দেখছি? হাজার হাজার বছর ধরে ভারতের মানুষ অত্যন্ত শান্তিপ্রিয়, কোন রকম ঝামেলায় তারা যাবে না, কিন্তু দুর্বল না। দরকার হলে তারা লড়াই করতে ঝাঁপিয়ে পড়তে জানে। যারা লড়াই করছে তারাও নিজের নাম রাম রাখে, যারা শান্তিপ্রিয় নিরীহ ব্রাহ্মণ তারাও নিজের নাম রাম রাখে, যারা শূদ্র, মানুষের সেবা করছে, আগেকার দিনে যারা ধর্ম সেইভাবে পালন করত না, তারাও নিজের নাম রাম রাখছে। এই একটা দেশ, যেখানে তুমি যে কাজই কর, তোমার স্বভাব যাই হয়ে থাকুক, নাম তোমার 'রাম' কিংবা 'কৃষ্ণ'। স্বামীজী বলছেন, এখানে শিব ষাঁড়ে পিঠে চড়ে ডমুরু বাজাবেন, কৃষ্ণ বাঁশি বাজিয়ে যাবেন, আর মা কালী পাঁঠা খাবেন, যারা মানবে তারা থাকবে, তা নাহলে তোমরা দেশ ছেড়ে চলে যাও। পৌরাণিক কাহিনীই আমাদের জীবনধারাকে এই রকমটি বানিয়ে দিয়েছে। আমরা গরীব ঠিকই, তারও অনেক কারণ আছে। কিন্তু চরিত্রের দিক থেকে এক আদর্শ জাতি। যার জন্য উইল ডুরাণ্ড শেষ বয়সে ভারতে এসে দুঃখ করে লিখছেন, বৃটিশরা এই দেশটার কি দশা করে দিয়ে গেছে।

বহির্জগৎ, মনের কল্পনা ও বাস্তব জগৎ

২রা আগস্টের ক্লাশের শেষ দিকের অংশে স্বামীজী আলোচনা শুরু করতে গিয়ে ঈশ্বরের কাছে আমরা যে দৈনন্দিন প্রার্থনা করছি, সেই প্রার্থনার উত্তর আমরা কিভাবে পাই, এই জিনিসটাকে নিয়ে বলছেন। আমাদের আলোচনা শুরু করার আগে একটা ছোট ব্যাখ্যার দরকার আছে, যদিও আগে আগে আমরা এর উপর আলোকপাত করেছি, তবুও আরেকবার মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বহির্জগতে আমরা যা কিছু দেখছি, এটাকে নিয়ে দর্শন শাস্ত্রে অনেক রকম আলোচনা ও বিতর্ক আছে। বহির্জগৎ কতটা সত্য, কতটা সত্য নয়, অন্তর্জগৎ কি, এগুলোকে নিয়ে প্রচুর আলোচনা আছে। রাজযোগ যেমন বহির্জগৎকে কোন দামই দেয় না। সেইজন্য আমাদের কাছে এটাই আশ্চর্যের যে, আমরা সবাই যোগশাস্ত্র পড়তে চাই, যোগের অনুশীলন করতে চাই, অথচ আমাদের কাছে বহির্জগতের বিরাট দাম। বেদান্তও বহির্জগৎকে কোন দাম দেয় না, বৌদ্ধ ধর্মের কিছু কিছু সম্প্রদায়ের কাছেও তাই। বহির্জগৎ আছে, বহির্জগৎকে ওনারা কেউ-ই অস্বীকার করছেন না। কিন্তু স্বামীজী তাঁর নিজের স্টাইলে বলছেন, বহির্জগৎ সব সময় সিগন্যাল দিয়ে যাচ্ছে, যেটাকে অন্তর্জগৎ নিজের মত করে বুঝে নিতে থাকে। আগেও আমরা এই বিষয়টাকে নিয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছি। ইদানিং কালে বেশ কিছু মনস্তাত্ত্বিকরা এর উপর অনেক আলোকপাত করতে শুরু করেছেন। অবশ্য তার আগেই এর উপর অনেক বই লেখা হয়েছে, সিনেমাও হয়েছে, যেখানে বহির্জগতের সত্যতাকে অনেক কম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

সম্প্রতি একটা মতে বলা হচ্ছে যে, মনের কল্পনা আর যেটাকে বাস্তব মনে করছে, এই দুটোর মধ্যে আসলে কোন তফাৎ নেই। একজন বড় মনস্তাত্ত্বিক তাঁর অভিজ্ঞতার বর্ণনা করতে গিয়ে একটা বইতে এক মহিলার কথা বলছেন, কোন কারণে কিছু একটা সমস্যা হয়ে যাওয়ার জন্য সেই মহিলা আর কোন দিন মা

হতে পারবে না। কিছু দিন পর সেই মহিলার শরীরে কিছু লক্ষণ দেখা গেল, যাতে বোঝা যাচ্ছে সে অন্তঃসত্ত্বা। পরের ধাপে তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে, সে ডাক্তারকে বলছে, আমি কুকুরের বাচ্চা জন্ম দিয়েছি। পুরোপুরি কল্পনাতে সব কিছু চলছে। এরপর সে বলতে লাগলো, আমার বাচ্চারা কোথায়? ডাক্তার তার মন রাখার জন্য, দুটো মৃত বাচ্চাকে রেখে দিয়ে বলছে, এই তো তোমার বাচ্চারা। ব্যাপারটা ওখানে মিটে গেল। কদিন পর বলতে শুরু করল, আমি সিংহের বাচ্চা জন্ম দিয়েছি। ভদ্রমহিলার কাছে যেটা আসছে ওটা বাস্তব রূপে আসছে, আর এই ঘটনা সত্যিকারের ঘটনা। অন্য আরেকজন মনস্তাত্ত্বিক তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন, একজন মহিলা বাচ্চার জন্ম দিতে গিয়ে তার বাচ্চাটি মারা যায়, তাতে মহিলা পুরো বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। বিক্ষিপ্ত হয়ে এমন অবস্থা হয়ে গেলে যে, ভদ্রমহিলাকে পাগলা গারদে রাখতে হল। রোজ ঐ মহিলা তার ডাক্তারকে এসে বলে, 'জানেন ডাক্তারবাবু কাল রাত্রে আমি তিনটে শিশুর জন্ম দিয়েছি, আর তিনটে শিশুই খুব সুন্দর দেখতে আর খুব ভাল স্বাস্থ্য'। ডাক্তারবাবু শুনে বললেন, 'বাঃ খুব ভাল, আমি অবশ্যই গিয়ে তোমার বাচ্চাদের দেখে আসব'। রোজ ঐ মহিলা এসে কোন দিন একটা সন্তান, কোন দিন দুটো, কোন দিন তিনটে সন্তানের কথা বলবে আর ডাক্তারবাবুও একই কথা বলেন। মনস্তাত্ত্বিকটির এক বন্ধু ছিল, সে দেখছে তার বন্ধু ডাক্তারটি রোজ মহিলাকে একই কথা বলে যাচ্ছে। একদিন বন্ধু তাকে বলল, 'তুমি মহিলাকে বুঝিয়ে দিচ্ছ না কেন যেন, এটা সত্য নয়'। ডাক্তার ভদ্রলোক তাকে বলছেন, 'দেখো আমি নিজেই বুঝতে পারছি না, কোনটা সত্য আর কোনটা কল্পনা। এখন আমি তুমি জানছি যে এটা একটা স্রেফ কল্পনা, কিন্তু এই কল্পনাটা ওর কাছে তো সত্য, আর সেই সত্যকে নিয়ে খুব খুশী আছে। আমি ইচ্ছে করলে ওষুধ খাইয়ে ওর এই সত্যটা ভেঙে দিতে পারি, তাতে আমারই কি লাভ হবে, আর তারই বা কি লাভ হবে, রুগীকে সুখী রাখাটাই আমার কাম্য। আমি তাই ওর এই কল্পনাটাকে ভাঙতে চাইছি না'।

এগুলোকে নিয়ে অনেক গবেষণা আছে, বিতর্ক আছে। আমরা জানি না কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল। কিন্তু ইদানিং বেশির ভাগ মনস্তাত্ত্বিকরা এই নিয়ে অনেক কথা বলছেন। আমাদের যে মস্তিষ্ক, যার ভিতর কোশিকাগুলি আছে, এই মস্তিষ্কের ব্যাপারে বলতে গিয়ে বিদেশীরা বিবর্তনবাদ নিয়ে আসবে, হিন্দুরা পূর্বজন্মকে নিয়ে আসবে। কিন্তু যখন physical brain আসবে তখন evolution চলে আসবে, আর মন যখনই আসবে তখনই এসে যাবে পূর্বজন্ম। এই দুটোকে মিলিয়ে যদি চলা হয়, তখন সেখানে evolutionও ঢুকবে, পূর্বজন্মও ঢুকবে। যারা ভূত দেখে, তাদের যতই যুক্তি দিয়ে বোঝান হোক, ওরা কখনই মানবে না যে ওরা ভুল দেখছে। অনেকে বলছেন যে, তাদের মস্তিষ্কের সারকিটস্ গুলো গোলমাল হয়ে যায় বলে ঐ রকম অনেক কিছু দেখতে পায়। কিন্তু বাকি সময় ওরা সব কিছু তো ঠিকই দেখছে। সেইজন্য এখন একটা মজার থিয়োরী এসেছে, যাতে বলছে, সবটাই কল্পনা। কি রকম হয়? যেমন এই পেন আছে, পেনের প্রতি দৃষ্টি গেল, দৃষ্টি দিয়ে মনের ভিতরে গেল, মন তখন নিজের মত করে একটা সত্যকে তৈরী করে দিচ্ছে। ঐ সত্যে একটা বাচ্চার কাছে অন্য জিনিস হবে, একজন লেখকের কাছে আরেকটা জিনিস হবে, বিভিন্ন লোকের কাছে বিভিন্ন রকম সত্য হবে। এই জিনিসটা পুরোপুরি নির্ভর করে, বিবর্তনের কোন স্তরে সে আছে, তার নিজের সংস্কার কেমন, আর এই জন্মে সে জিনিসটাকে কিভাবে গ্রহণ করছে। কিন্তু শেষ সত্যটা একেবারেই বহির্জগতের নয়, শেষ সত্যটা সব সময় হয় মনের জগতের। আমি জিনিসটাকে যেমন দেখছি, সত্যটা পুরোপুরি তেমন। তবে আমরা যা কিছু দেখছি সব মনের জগতেই দেখি, বহির্জগতে কিছু দেখা হয় না। এই পেন আমার বাইরে, অর্থাৎ বহির্জগতে আছে, কিন্তু পেন আছে, এই বোধ সব সময় আমার ভিতরেই হয়। তার মানে, যে কোন কিছুর জ্ঞান আমরা মনের ভিতরেই পেয়ে থাকি। এখন মনের জগতের এই জ্ঞান, বাস্তবিক কতটা ঠিক, কল্পনা কতটা, এটা আমি ছাড়া কেউ বলতে পারবে না।

আরেকটা থিয়োরীতে বলছে, সবাই মিলে যখন একই জিনিস কল্পনা করতে থাকে তখন ওটাকেই বাস্তব বলছে, আর যখন মাত্র একজন দেখছে তখন ওটাকে কল্পনা বলছে। যদি সবাই মা কালীকে মা কালী রূপে দেখতে পেত, তখন ঠাকুরকে কেউ পাগল বলত না। কিন্তু ঠাকুর ছাড়া আর কারুর অন্তর্জগতের সেই প্রস্তুতি নেই, যাতে সবাই মা কালীকে জীবন্ত দেখতে পারবে। ঠাকুরের অন্তর্জগৎ এমন হয়ে গেছে যে, তিনি মা কালীকে জীবন্ত দেখছেন, একাধারে পাষাণও দেখছেন আবার চিন্ময়ী রূপেও দেখছেন। এখন কে ঠিক করবে, একজন মাত্র মানুষ মা কালীকে চিন্ময়ী দেখছেন তিনি ঠিক দেখছেন, নাকি বাকিরা যারা কেউই মা কালীকে

জীবন্ত না দেখে পাষাণ দেখছে, তারা ঠিক? এই প্রশ্নের এখন পর্যন্ত কোন উত্তর নেই। আমরা জানি থিয়োরীতে বলছে, সবাই মিলে যদি কোন ভুল কিছু দেখে, সেটা সত্য। বাজারে গিয়ে দেখছি হঠাৎ সবজীর দাম বেড়ে গেছে। আমি দোকানদারকে বলব তুমি আমাকে বোকা বানাতে চাইছ? দোকানদার বলবে, আপনি আরও চারটে দোকান দেখে আসুন। সব দোকানদাররা যদি আমাদের ঠকায়, তখন বলি জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেছে। একজন দাম বেশি নিলে বলছি, দোকানদার আমাকে ঠকাচ্ছে। ঠিক তেমনি একজনই যদি জিনিসটাকে দেখে থাকে, তখন বলছি ওটা কল্পনা বা পাগলামো, সবাই যদি দেখে থাকে তাহলে ওটা সত্য। ঠিক তেমনি একজন যদি অন্য রকম দেখে তখন বলছি ওটা পাগলামো। এটা পেন কেন? কারণ সবারই অন্তর্জগতে এই পেন একই রকম সিগন্যাল দিচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্যের যে, আমি এই পেনকে যেভাবে দেখছি, আপনিও ঐভাবে দেখছে কিনা, এটাকে জানার কোন পথ নেই। ছোটবেলা আমাদের বলে দেওয়া হয়েছে এটা লাল রঙ, ওটা নীল রঙ। কিন্তু যারা রঙকানা, তার জিনিসটার অন্য রঙ দেখে, সেই অনুসারে তারা নিজের মত ওর ব্যাখ্যা নিয়ে আসে।

স্বামীজীর দর্শনে এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ – বহির্জগৎ থেকে আমার ভিতরে একটা টোকা দিল, এরপর বাকি যা কিছু হওয়ার সব অন্তর্জগতে হবে। বেশ কিছু বছর আগে আমেরিকাতে এক মহিলা থানাতে কেস করেছেন, অমুক লোক তার শীলহানি করেছে। পরে পুলিশ অনুসন্ধান করে দেখছে অনেক কিছু ঘটনা মহিলার কথার সাথে মিলছে না। বলছে সে বাসে ছিল, কিন্তু তার কাছে বাসের টিকিট ছিল না। কিন্তু মহিলা দেখিয়ে দিল, এই লোকটিই করেছে। তখন কিছু কিছু টেস্ট করা হল, তাতে বোঝা যাচ্ছে এই লোকটাই করেছে। লোকটির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়ে গেল। কিন্তু সেই লোকটা বারবার বলে যাচ্ছে সে নির্দোষ, সে এই রকম কিছুই করেনি। লোকটি নিজেকে নির্দোষ সাব্যস্ত করতে অনেক কথা বলে যাচ্ছে, কিন্তু কোন প্রমাণ দিতে পারছে না। কিন্তু মহিলাটি বারবার বলে যাচ্ছে এই লোকটাই করেছে। অথচ কেউ কাউকে চিনত না। তখনও ডিএনএ টেস্টিং আসেনি। এরপর বারো চোদ্দ বছর হয়ে যাওয়ার পর ঠিক এই ধরণের আরেকটা কেস এলো। একই কেস, যে লোকটি ধরা পড়ল, তার ছবি দেখে আগের মহিলার মনে হল, একে যেন তার খুব চেনাচেনা লাগছে। যে লোকটি এখন জেল খাটছে, তার সাথে এর মুখের অনেক মিল আছে। তারপর আবার নূতন করে পুরনো কেসটা খোলা হল। ইতিমধ্যে ডিএনএ টেস্টিং পদ্ধতি এসে গেছে। ডিএনএ টেস্টিং করতেই দেখা যাচ্ছে, এই লোকটা তো কিছু করেনি, করেছে এখন যে লোকটা ধরা পড়েছে। তখন ঐ মহিলা এগিয়ে এলেন ওকে ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য। ইতিমধ্যে বারো বছরের উপর তার জেল খাটা হয়ে গেছে। পরে এরা দুজন বন্ধু হয়ে গেল। ওরা দুজন মিলে এখন আমেরিকার বিভিন্ন জায়গায় লেকচারের অর্গানাইজ করে। লেকচার অর্গানাইজ করার উদ্দেশ্য হল, মানুষকে এটা বোঝান যে, চাক্ষুস প্রমাণ বা প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর পুরোপুরি ভরসা করা যায় না। যে মহিলাটি এই ধরণের দুর্ভোগের শিকার হয়েছিল, আর তার চাক্ষুস প্রমাণের উপর ভিত্তি করে একজন নির্দোষ লোককে বারো বছর জেল খাটতে হল। সেই মহিলাই এখন ঐ ভদ্রলোককে সাথে নিয়ে প্রচার করে যাচ্ছেন প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর কোন ভরসা করা যায় না।

আমাদের এই সমস্যা, একটু জ্ঞান হয়ে গেলেই আমরা মনে করি সব জেনে গেছি। রুডিয়ার্ড কিপ্লিং তখন জঙ্গল বুকস্ লিখেছেন। তিনি বানরের কথা লিখছেন, খুব সুন্দর বর্ণনাকরে লিখছেন – বানর একটু অন্য রকম কিছু যদি পেয়ে যায়, সে তখন চিন্তা করতে থাকবে এটা কি ভাবে হয়, সঙ্গে সঙ্গে নিজের মত করে জিনিসটাকে সাজাতে শুরু করবে। তারপর পুরো জিনিসটা ধপাস্ করে পড়ে যাবে। আমাদেরও ঠিক এই রকম হয়, অল্প কিছু জিনিস জেনে যাই, সেখান থেকে আমরা আমাদের মত জিনিসগুলিকে গুছিয়ে নিতে থাকি। আমাদের মন যেভাবে তৈরী, তাতে মনের কাছে সব সময় একটাই প্রশ্ন চিহ্ন হয়। এই যে তথ্যটা এলো, এটা কোথায় খাপ খাচ্ছে? পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে সব সময় আমাদের কাছে তথ্য এসে যাচ্ছে। মন বলে দেয় এটাকে কোথাও বসাতে হবে। কোথায় বসাবে? আমাদের বিবর্তনের ইতিহাস যবে থেকে শুরু হয়েছে, সেই সময় থেকে যাবতীয় যা কিছু হয়েছে, তার সাথে আমাদের যে পূর্ব পূর্ব সংস্কারগুলি রয়েছে অথবা ছোটবেলা থেকে আমাদের যেমন প্রশিক্ষণ হয়েছে, ওর মধ্যে কোথাও নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেবে। যেমনি একটা কোন কিছুকে বসাতে পারলো না, ওকে বলে দিচ্ছে এটা ওর কল্পনা। কারণ ওর মস্তিষ্ক ঐ জিনিসটাকে নিতে পারছে না।

আগামীকাল যদি চেষ্টা করে নিজে দেখে নেয়, তখন বলবে, ওর তো এটা কল্পনা নয়, ওতো ঠিকই বলছে। আর অনেক সময় যারা ভীতু প্রকৃতির, তার সত্য দেখে নিলেও চুপ করে যায়।

ঠিক তেমনি, একশ বছর বা দুশো বছরে যখন কোন মহাপুরুষ এসে যান, এনারা তখন বলেন, শাস্ত্রের কথা মিথ্যা না, কল্পনা না, তুমিই কল্পনার অলীক রাজ্যে বাস করছ। এই জগৎকে তুমি যেটা দেখছ, তুমিই এটাকে অলীক কল্পনা করছ। এখন স্বামীজী যে কথাগুলো পর পর বলবেন তার কিছু কিছু কথা এই লাইনে যাবে। আমাদের এই জিনিসটাকে আগে বুঝতে হবে, আমাদের মন শুধু এই পরিদৃশ্যমান জগৎকেই নিতে পারে, জগতের বাইরে কোন কিছুকে নিতে পারে না। বাচ্চারা সবাইকে আঙ্কেল বলে ডাকে, বাবা-মার বাইরে এই দুটো শব্দকে ওরা জানে, আঙ্কেল আর আন্টি। যাকেই দেখবে ও জানে আঙ্কেল নয়তো আন্টি। সন্ন্যাসীদের দেখলেও আঙ্কেল বলে ডাকবে, জানে না যে সন্ন্যাসীদের মহারাজ বা স্বামীজী বলে সম্বোধন করতে হয়। বাবা-মাকে যদি বলা হয় ওকে সন্ন্যাসীদের আঙ্কেল না বলে স্বামীজী বা মহারাজ ডাকতে শেখান। তখন বলবে, এখন না, আরেকটু বড় হোক, এখন শেখাতে গেলে ওর সব গোলমাল হয়ে যাবে। আবার ভক্ত বাড়িতে বাচ্চা বয়স থেকেই ট্রেনিং দিয়ে দেন, ইনি আঙ্কেল নন, ইনি মহারাজ। অনেক আগে দিল্লীতে বাসের একটা লাইনে একজন লোক ধাক্কা দিচ্ছিল, একটা বাচ্চা এসে লোকটিকে বলছে, 'ধোপা আঙ্কেল তুমি লাইন থেকে সরে যাও'। লোকটি বাচ্চাটির কথায় খুব অপ্রস্তুতে পড়ে গেছে। লোকটি জিজ্ঞেস করছে, 'তুমি কি করে জানলে আমি ধোপা'? বাচ্চাটি সঙ্গে সঙ্গে বলছে, 'মা বলে ধোপা ছাড়া এত পরিষ্কার জামা কেউ পরে না'। লোকটি ধোপা ছিল কি ছিল না কেউ জানে না। কিন্তু ঐ বাচ্চার অন্তর্জগতে একটা ধারণা তৈরী হয়ে গেছে। একটা তথ্য এলো, সঙ্গে সঙ্গে ঐ ধারণার সাথে মিলিয়ে বলে দিল। আমরাও ঠিক তাই করি। আমাদের জ্ঞান এতোই সীমিত যে, অন্য রকম কিছু দেখলে আমরা নিতে পারি না। আমরা জানি পাথরের প্রাণ নেই, ঠাকুর দেখছেন পাথরের প্রাণ আছে, ঠাকুর তাই পাগল। আসলে আমরা বলতে চাইছি, আমার যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানের মধ্যে এই জিনিসটা খাপে খাপে বসছে না।

ম্যানেজমেন্টে একটা খুব নামকরা গল্প আছে। এক বড় কোম্পানীতে একজন সৎ, দক্ষ ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সিনিয়র ম্যানেজার দরকার। ইন্টারভিউতে অনেকে এসেছে। কোম্পানীর চীফ ম্যানেজার সবাইকে একটা করে বীজ দিলেন, একটা টবও দিয়ে দিলেন। বললেন, 'তোমরা এগুলো নিয়ে যাও, গাছ তৈরী করে, জল দাও; পঞ্চাশ দিন পরে আমি দেখব কার গাছ কেমন বড় হয়েছে, ওটা দেখে আমি ঠিক করব কাকে সিনিয়র ম্যানেজারের চাকরি দেব'। কুড়ি একুশ জনকে বীজ আর টব দেওয়া হয়েছে। পঞ্চাশ দিন পর ওরা সবাই টব নিয়ে এসেছে। সবারই গাছ খুব সুন্দর, পুষ্ট চেহারার গাছ। শুধু একজনের কিছু নেই। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, 'তোমার কেন গাছ হল না'? সে বলছে, 'আমি এত খাটলাম, খেটে সব কিছুই করলাম, কিন্তু কিছুই হল না'। ভদ্রলোক তখন বললেন, 'তুমিই তাহলে আমাদের কোম্পানীর ঠিক ঠিক লোক'। সবাইকে তিনি ভাজা বীজ দিয়েছিলেন। যেমনি দুদিন তিন দিন পর চারা বেরোচ্ছে না দেখল, তখন বাজার থেকে বীজ এনে টবে দিয়ে জল দিল, চারা বেরিয়ে এলো, সবারই সুন্দর গাছ হয়েছে। ঐ বেচারি সৎ লোক, যত জল ঢালে চারা আর বেরোয় না। ভদ্রলোক বলছেন, 'এতগুলো লোকের মধ্যে তুমিই একজন সৎ লোক বেরিয়ে এলে'।

এই রকমই আরেকটা ঘটনা আছে, একজন ডাক্তার মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রদের পড়াচ্ছেন। একদিন এক রোগীর বুকে স্টেথো লাগিয়ে ছাত্রদের বলছেন, 'এই দেখো রোগীর বুকে কেমন ধুক্ ধুক্ আওয়াজ হচ্ছে'। সব ছাত্ররা কানে লাগিয়ে বলছে, 'সত্যিই তাই কেমন ধুক্ ধুক্ করছে'। উনি তখন ছাত্রদের সামনে স্টেথোটা খুললেন, স্টেথোর কানে লাগানোর পাইপের মুখ থেকে দুটো তুলো বার করে আনলেন। 'এই দেখো, আমি এর মধ্যে আগেই তুলো গুজে রেখেছি। আমি বলছি ধুক্ ধুক্ আওয়াজ আসছে আর তোমরাও আমার কথা সায় দিয়ে একই কথা বলে দিলে! অথচ কোন শব্দই আসছে না, ওখানে তুলো দেওয়া রয়েছে'। এখানে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে সবাই মিথ্যার উপর আশ্রিত হয়ে আছে। আমাদের পুরো জগৎটাও তাই, দশজন বলে দিল, অমুক মহারাজ কি সুন্দর বক্তব্য রাখেন, বাকিরাও বলবে, মহারাজ কি ভাল বক্তৃতা দেন। দশজন যদি বলে অমুক মহারাজ কিছু না, বাকিরাও বলতে শুরু করবে অমুক মহারাজ কিছু না। নিজস্ব কোন দৃষ্টিভঙ্গী নেই, কারণ যদি নিজস্ব কোন দৃষ্টিভঙ্গী থাকে, তাহলে সে সবার থেকে আলাদা হয়ে যাবে। যেমনি সে আলাদা

হয়ে গেল, তখন তাকে নিয়ে এমন এমন আজেবাজে কথা শুরু হয়ে যাবে যে, বেচারা আর মুখ দেখাতে পারবে না। সত্যটাকে সামনে নিয়ে আসার ঐ দম আর তার থাকে না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলছেন, যদি তো ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে, কারণ লোকেদের একলা চলার দম নেই। পুরো জিনিসটা যদি খাপে খাপে না বসাতে পারি, আমি চলতেই পারব না।

স্বামীজী এখন ঐ আইডিয়াকে নিয়ে বলছেন। মনে আমরা এখন যা দেখছি, ওটা সত্য না। কারণ আমার কাছে যে তথ্য আসছে এগুলো সম্পূর্ণ তথ্য নয়। তথ্য যদি অসম্পূর্ণ হয়, তখন ঐ তথ্যকে আধার করে আমি যে আইডিয়া তৈরী করব, সেটাও অসম্পূর্ণ হবে। আর সেইজন্য আমাদের জ্ঞানটাও অসম্পূর্ণ হবে। এখানেই শাস্ত্র ও আচার্যের দরকার হয়। জপ-ধ্যান, সাধনা করে করে আমি একটা জিনিস জানলাম, এই জানাটা কতটা ঠিক কতটা ভ্রান্ত আমি জানি না, আচার্য বলে দেবেন এটা এই রকম। দীক্ষা নিয়ে সাতদিন জপ করেই ভক্তরা ঠাকুরের দর্শন পেতে শুরু করে দেন। এরা সব বদ্ধ পাগল। এরা যে কাউন্টার চেক করবে, যাচাই করবে, সেই আচার্যই এদের কাছে নেই। এরা মনে মনে সব কিছু ধরে নিচ্ছে। এখন জপধ্যান করলে কল্পনা শক্তি একটু বাড়ে। এরা কল্পনা করে নিচ্ছে, কল্পনার সাথে বাস্তবটা মিলছে না। কল্পনাকে বাস্তবের সাথে মেলানোর জন্য দরকার আচার্য, সেই আচার্যই এদের কাছে নেই।

নিজের ইচ্ছাশক্তিতেই প্রার্থনার উত্তর আসে

স্বামীজী এই বলে শুরু করছেন, Your own will is all that answers prayer, only it appears under the guise of different religious conception to each mind. We may call it Buddha, Jesus, Krishna, Jehovah, Allah, Agni, but it is only the Self, the 'I'. (*তোমার নিজের ইচ্ছাশক্তিই তোমার প্রার্থনার উত্তর দিয়ে থাকে – তবে বিভিন্ন ব্যক্তির মনের ধর্মসম্বন্ধীয় ধারণা অনুসারে সেটা বিভিন্ন আকারে প্রকাশ পায়। আমরা তাকে বুদ্ধ, যীশু, কৃষ্ণ, জিহোবা, আল্লা, অগ্নি – যেমন ইচ্ছা নাম দিতে পারি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই হচ্ছে আমাদের 'আমি' বা আত্মা।*) তোমার ইচ্ছাশক্তি থেকেই সমস্ত কিছু আসে। ঠাকুর কেশব সেনের নামে বলছেন, কেশবের ঐ ধ্যানটুকু ছিল বলে কেশবের এত নামযশ খ্যাতি হল। আমেরিকা, ইউরোপ ওখানকার লোকেরা তো ঈশ্বর মানে না, তাও ওদের এতো সাফল্য কোথা থেকে আসছে? ওদের মধ্যে ঐ অদম্য ইচ্ছাশক্তিটা আছে তাই। আর আমরা দেবীদেবতাদের কাছে মাথা ঠুকেই যাচ্ছি, মা কালীর সামনে পাঁঠাবলী দিয়েই যাচ্ছি, শিবের মাথায় জল ঢেলেই যাচ্ছি, কিছুই হচ্ছে না আমাদের; যেমন আহাম্মকের দেশ ছিল, সেই আহাম্মকের দেশই আছে। আসল জিনিসটা সেই ইচ্ছাশক্তিটাই নেই। আমরা যা কিছু করি, যা প্রার্থনা করি, আমার ইচ্ছাশক্তি, আমার মনের শক্তিই ঐ প্রার্থনার উত্তর দেয়। কোন কোন ভগবানের কাছে আমরা পূজা প্রার্থনা করি, স্বামীজী তার পুরো একটা লিস্ট দিয়ে দিয়েছেন। আমার এই ইচ্ছা, আমি পূজা করব, পূজা করছি আসলে নিজেকেই, পূজা ও প্রার্থনার পুর্তি হচ্ছে আমার নিজের ইচ্ছা থেকেই। কিন্তু বাইরে এর একটা নাম দিয়ে দিই, আল্লা, যীশু, কৃষ্ণ ইত্যাদি। আমেরিকার এক যুবক আন্দামানে গিয়েছিল, তার মনে হল এই ট্রাইবালরা অভাগা, এরা এখনও নাকি যীশুর নাম শোনেনি। তুমি নিজে যীশুকে ভাল করে আগে বুঝেছ কি? তুমি তো ওদের থেকেও অভাগা।

আগে থেকে একটু প্রস্তুতি না থাকলে, যারাই স্বামীজীর এই ধরণের কথা শুনবে, তারা বলবে, স্বামী বিবেকানন্দ যিনি একজন ধর্মরক্ষক, এটা কি তাঁর কথা, নাকি একজন ঘোর নাস্তিকের কথা। কারণ অদ্বৈতই শেষ সত্য, এই অদ্বৈত যখন চলতে শুরু করে সব কিছুকে বিনাশ করে দেয়। যার জন্য অদ্বৈতদের একটা নামই হল, সর্ববৈনাশিক। কারণ আমরা হলাম সীতার মত, আমার সোনার হরিণ চাই, আমরা সব কিছু ভাল হতে হবে। আমরা ভুলে যাচ্ছি আমরা যে ঠাকুর দেবতার যা কিছু পূজা করছি, আচার অর্চনা করছি, সবটাই সোনার হরিণ। আসলে সব কিছু তো আমার ভিতরে, বাইরে আদৌ কিছু আছে নাকি! তাহলে আমরা পূজা অর্চনা করি কেন? আগে আগেও বলা হয়েছে, কারণ পূজা অর্চনা যদি না থাকে, আমাদের মন এমন ভাবে তৈরী যে, বাইরে আড়ম্বর না থাকলে অন্তর্জগৎ কাজ করবে না। অন্তর্জগৎ হল রাজার ঐশ্বর্যের রত্নভাণ্ডার। কিন্তু রত্নভাণ্ডার খোলার জন্য চাবি চাই। বহির্জগৎ ঐ চাবিটা দেয়, বহির্জগৎ যেমনি টোকা মারল, অন্তর্জগৎ তখন খুলে যায়, এরপর বাকি সব কাজ এরাই করবে। কিন্তু ঐটা সেখান থেকে খুলতে হবে। সাধারণ মানুষদের

ক্ষেত্রে যদি অন্তর্জগতের সাজেশানস্ নিয়ে করতে যাওয়া হয় তখন একটু এলেমেলো হওয়ার সম্ভবনা থাকবে। কিন্তু ভগবান বুদ্ধ, যীশু, ঠাকুর এনারা ঐ অবস্থাটা ছাড়িয়ে যান, ওনাদের বহির্জগতের কোন কিছুর উপর ভরসা করতে হয় না, করেনও না। স্বামীজী যখন বলছেন, কারুর উপর নির্ভর করবে না, তখন বক্তব্য হল বহির্জগতের উপর কোন নির্ভর করো না। কারণ শেষ পর্যন্ত যা করার সবটাই অন্তর্জগৎ করবে। তাহলে উপায় কি? তাহলে তালা দেওয়াটা বন্ধ করে দাও। ঠাকুর যেমন সব সময় দরজা খুলে রাখতেন, তুমিও খুলে রাখো। তা সত্ত্বেও আমরা দেখছি, ঠাকুর সারকাসে, মিউজিয়ামে গিয়ে একটা কিছু দেখতেই তাঁর অনেক কিছু খুলে যাচ্ছে, সমাধিস্থ হয়ে যাচ্ছেন। সেইজন্য স্বামীজী বলছেন, যেখানেই প্রার্থনা করছ, যাঁর কাছেই প্রার্থনা করছ, মনে রাখবে সমস্ত কিছুর উত্তর কিন্তু আসছে তোমার ভিতর থেকেই। ঠাকুর বলছেন, আন্তরিক প্রার্থনা করলে তিনি শুনবেনই শুনবেন। অবশ্যই শুনবেন, কারণ উত্তরটা ভিতর থেকেই আসছে কিনা, বাইরে থেকে কিছু আসছে না।

স্বামীজী বলছেন, Concepts grow, but there is no historical value in the allegories which present them. Moses' visions are more likely to be wrong than ours are, because we have more knowledge and are less likely to be deceived by illusions. (*আমাদের ধারণার ক্রমে উৎকর্ষ হতে থাকে, কিন্তু ঐ ধারণা যে-সকল রূপক আকারে আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়, তাদের কোন ঐতিহাসিক মূল্য নেই। আমাদের অলৌকিক দর্শনসমূহ অপেক্ষা মুশার অলৌকিক দর্শনে ভুলের সম্ভবনা অধিক, কারণ আমাদের জ্ঞান অধিকতর এবং মিথ্যা ভ্রম দ্বারা প্রতারিত হবার সম্ভাবনা আমাদের অনেক কম।*) মোজেসের অনেক অলৌকিক দর্শন হত। এখন এগুলোকে নিয়ে পিছনে অনেকে অনেক রকম প্রশ্ন করে। হিন্দুদের কাছে এগুলো কোন সমস্যা নয়, কারণ এখানে ভুরি ভুরি এই ধরণের দর্শন হয়ে থাকে। কিন্তু ঐ অলৌকিক দর্শনগুলির মধ্যে কোনটা ঠিক দর্শন, কোনটা কল্পনা, কোনটা অলীক বলা খুব কঠিন। আজকে আমাদের জ্ঞানের পরিধি অনেক বেড়ে গেছে, আজকের দিনে এই ধরণের কোন অলৌকিক দর্শন হলে ধরে নেওয়া খুব সহজ হবে। মোজেসের কাছে অনেক কিছু দর্শন চমৎকার মনে হয়েছে, হয়ত আদপে সেগুলো চমৎকার ছিল না। সেইজন্য স্বামীজী বলছেন, আমাদের আইডিয়া ধীরে ধীরে উৎকর্ষ হতে থাকে, আর একটা একটা ক্ষেত্রে যেমন যেমন সমাজ উন্নত হতে থাকে, তেমন তেমন তার জ্ঞান বৃদ্ধি হতে থাকে। আমরা আর্যভট্ট, ভাস্করের কথা বলি, অন্য দিকে চরক, শুশ্রুত এনাদের কথা বলি। কিন্তু আজকের দিনে যদি চরক, শুশ্রুতের পদ্ধতিতে আমরা চলি, তাহলে সবাইকে পাচন খেয়ে রোগ সারাতে হত, আর পাচন তৈরী করতে করতেই রোগীর এদিক হয়ে যেত। ঠাকুরও বলছেন, এখন আর পাচন চলে না। কারণ ঐ কালচারটাই এখন আর নেই। চরক, শুশ্রুত চিকিৎসা জগতে বিরাট মাপের পুরুষ ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু আমাদের সমাজ চরক, শুশ্রুতকেই ধরে থাকল, ফলস্বরূপ ভারতবর্ষে চিকিৎসা জগতের নূতন নূতন পদ্ধতির উদ্ভাবনার উন্নতির সম্ভবনা থমকে গেল। আর্যভট্ট, ভাস্কর এনারা বিরাট মাপের জ্যোতির্বিজ্ঞানী, গণিত বিশারদ ছিলেন, কোন সন্দেহ নেই। এখানেও একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি হল, পরে পরে জ্যোতির্বিজ্ঞানে, গণিতে শাস্ত্রে নূতন আইডিয়ার বিকাশই হতে পারল না। ভারতবর্ষে একটা ধারণারই বিকাশ হতে দেওয়া হয়েছে, তা হল ধর্ম। ঠাকুর যেমনি দাঁড়িয়ে গেলেন, তাঁর আশেপাশে যাঁরাই ছিলেন এখন সবারই একটা করে মঠ আছে। লক্ষ্মীদিদি ঠাকুর-মায়ের সাথে ছিলেন, তাঁরও পরে প্রচুর শিষ্য-শিষ্যা হয়ে গিয়েছিল। ধর্মের ক্ষেত্রে আমরা হলাম একেবারে শ্রেষ্ঠ, একজন কেউ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে নিলে, তার সঙ্গে আরও দশজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব দাঁড়িয়ে যাবে। ভগবান বুদ্ধের সময় তাঁর খুড়তুতো ভাই, দেবদত্ত তিনিও পাশাপাশি আরেকটা সন্ন্যাসী সম্প্রাদায় চালিয়ে গেছেন। কারণ হিন্দুরা ধর্মেই পুরোপুরি উৎসর্গিকৃত। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে আমাদের কিছু নেই। সংস্কৃত ভাষায় ছিল, অনেক কবি, সাহিত্যিক, কত বড় বড় পণ্ডিতরা সংস্কৃত ভাষাকে নিয়ে প্রচুর চর্চা করেছেন। কিন্তু জনগণের ভাষার দিকে কেউ দৃষ্টি দিল না। ভারতবর্ষের এটা দুর্ভাগ্য, কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে গেছে, অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রকে পুরো অবহেলা করে গেছে।

তোমার হৃদয়-রূপ শাস্ত্রটা নিত্য পাঠ করো

গ্রন্থের উপর স্বামীজী আগেও বলেছেন, এখানে আবার তিনি গ্রন্থকে নিয়ে বলছেন। স্বামীজীর বক্তব্য হল, আমরা যে গ্রন্থ পড়ছি, ঐ গ্রন্থের জ্ঞান যতক্ষণ আমার ভিতরে আগে থেকে না এসে থাকে, ততক্ষণ আমরা

ঐ গ্রন্থের কিছুই বুঝব না। স্বামীজী বলছেন, Books are useless to us until our own book opens; then all other books are good so far as they confirm our book. (*যতদিন না আমাদের হৃদয়-রূপ শাস্ত্র খুলছে, ততদিন শাস্ত্রপাঠ বৃথা। তখন ওই শাস্ত্রগুলি আমাদের হৃদয়শাস্ত্রের সঙ্গে যতটা মেলে, ততটাই তাদের সার্থকতা।*) এখানেই সেই একই কথা বলা, বহির্জগৎ বলে কিছু নেই, যা কিছু আছে সব অন্তর্জগৎই আছে, বহির্জগৎ শুধু টোকা মেরে যাচ্ছে। অন্তর্জগতটাই আমাদের আসল বই, নিজের ভিতরের ঐ বই যখন খুলে যাবে, ভিতরের বইগুলো পড়া হয়ে গেল। এবার বাইরের বইগুলো যখন পড়বে তখন বলবে, ইনিও তো সেই একই কথা বলছেন, যেটা আমি বলছি। গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকার সময় টলস্টয়ের লেখাগুলো পড়েছিলেন। টলস্টয় স্বামীজীর বই পড়েছিলেন, কেউ হয়ত ওনাকে দিয়েছিলেন। টলস্টয় স্বামীজীর বই পড়ে খুব অভিভূত হয়ে বলছেন, See see! How this person thinks exactly like I think। যারা স্বামীজীর ভক্ত প্রথমবার টলস্টয়ের এই কথাটা পড়ার পর তাদের অনেকের মনটা খারাপ হয়ে যেতে পারে, এই ভেবে যে টলস্টয় নিজেকে স্বামীজীর সাথে তুলনা করছেন। কিন্তু পরিপক্কতা হয়ে গেলে তখন বুঝতে পারে যে এটাই সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী। স্বামীজীও অনেক জায়গায় বলছেন, ভগবান বুদ্ধ অনেক সত্য বলে গেছেন বলেই তিনি মহৎ নন, কারণ আমি যেটা ভাবি উনিও তাই ভেবেছেন। এই জিনিসগুলোকে সব জায়গায় উপস্থাপিত করা যায় না, কারণ আমরা সাধারণ মানুষ, সাধারণ হয়েই থাকতে চাই, আমি যে সিংহ এই জিনিসটাকে আমরা মানতে রাজী নই। হৃদয়ের জ্ঞানরাশি যেমনি খুলে যাবে, তখন নিজের ভিতরের বইটা খুলে গেল। নিজের ভিতরের বইটা যেমনি খুলে গেল, এরপর যেমনি ঐ ভাবের সঙ্গে মিল কোন বই পড়তে যাবো, তখন নিজেই চমকে উঠব, আরে এতো আমারই মনের কথা বলছে। ছোটবেলা নন্টে-ফন্টে, বাঁটুল দি গ্রেট পড়তে কত মজা লাগতো, একটা বয়সের পর আগের মত অতটা ভাল লাগে না। বয়সে হয়ে গেছে, এখনও নন্টে-ফন্টে পড়তে ভাল লাগছে, টিনটিন পড়ে মজা পাচ্ছে, পুরাণের গল্পগুলি এখনও ভাল লাগছে, তাহলে বুঝতে হবে এখনও তার মানসিক পরিপক্কতা হয়নি। সাধু সন্ন্যাসীদের মধ্যে অনেক হাসিমজা হয়। একজন খুব সিনিয়র সাধুর শরীর যাবে, খুবই অসুস্থ, একটা সময় উনিও খুব রসিকতা করতেন। উনি একজন ইয়ং সন্ন্যাসীকে বললেন, 'তাকে ঐ ওষুধটা রাখা আছে, আমাকে দাও'। ইয়ং মহারাজও খুব রসিক ছিলেন, 'তিনি মজা করে বলছেন, মহারাজ! এখনও ওষুধ, অহং ব্রহ্মাস্মি কবে করবেন'? শুনে অসুস্থ সন্ন্যাসীও খুব হাসছেন। আইডিয়াটা তাই, কোন একটা সময় তো আসবে, জিনিসটাকে যখন আমাদের ছাড়তে হবে। ঠাকুর উপমা দিচ্ছেন, মেয়েরা বাচ্চা বয়সে কত আবেগ নিয়ে পুতুল খেলে, বিয়ের পর সেই পুতুলগুলোকে গুছিয়ে তুলে রাখে, পরে যে আসবে সে খেলবে, নিজের জন্য যা হওয়ার হয়ে গেছে। বাচ্চা বয়স থেকে আজ পর্যন্ত আমরা যা কিছু করে এসেছি, এগুলো সব পুতুল। একটা সময়তো ছাড়তে হবে। কম্প্যুটারের হার্ডডিস্কে সমস্ত জ্ঞান ইনপুট করা আছে, তাই বলে কম্প্যুটার কোন দিন জ্ঞানী হয়ে যাবে না। তেমনি বই পড়ে পড়ে আমরা কতকগুলো তথ্য মস্তিষ্কে স্তুপিকৃত করে রেখেছি, ঐ দিয়ে কোন দিন কিছু হবে না।

শক্তিমানই বুঝতে পারে শক্তি কি - আধ্যাত্মিকতা ও অলৌকিকতা - আমরাই জীবন্ত শাস্ত্র - দেহভাব দূর কর

It is the strong that understand strength, it is elephant that understands the lion, not the rat. (*শক্তি কি, তা শক্তিমান ব্যক্তিই বুঝতে পারে; হাতিই সিংহকে বুঝতে পারে, ইঁদুর কখনও সিংহকে বুঝতে পারে না।*) নব্বুইএর দশকে বিহার কোন এক নির্বাচনের সময় একজন বড় নেতা ওখানকার কোন আশ্রমে এসেছেন। ওখানকার মহারাজ ঐ নেতার কাছে মঠের কিছু কাজের জন্য ডোনেশান চাইলেন। নেতা ভদ্রলোক বললেন, 'এখন ভোটের সময় তাই এখন দিতে পারছি না, আমাকে পাঁচ লাখ টাকার গুলি বন্দুক কিনতে হবে'। মহারাজ শুনে আঁৎকে উঠেছেন, 'এত বন্দুক'! 'হ্যাঁ, এসব রাখতে হয়, আমাদের বিরোধী দলের কাছেও তো আছে। ওরাও খবর রাখছে আমার কাছে কত বন্দুক আর কত গুলি আছে। আমার যদি কম থাকে তাহলে ভোটের দিন ফায়ারিং হবেই হবে, সমান সমান যদি থাকে কক্ষণ ফায়ারিং হবে না'। শক্তি সমান সমান হলে লড়াই হয় না। যে কোন একজনের শক্তি কমে গেলে তবেই লড়াই হয়। স্বামী-স্ত্রীরও যদি ঝগড়া হয়, তখন বুঝতে হবে একজনের শক্তি একটু কমে গেছে। দুজনের শক্তি সমান থাকলে কক্ষণ ঝগড়া হবে না, উল্টে একজন আরেকজনকে সম্মান দেবে। হাতী আর সিংহ কখন লড়াই করে না। কদাচিৎ

কখন সিংহ যদি বুঝে যায় হাতির শক্তি একটু কমে গেছে, তখন লড়াই করতে যায়। স্বামীজী এটাই বলছেন, একটা ইঁদুর কখনই বুঝতে পারবে না সিংহে কি ভয়ঙ্কর শক্তি।

স্বামীজী বলে যাচ্ছেন, How can we understand Jesus until we are his equals? (*আমরা যতদিন না যীশুর সমান হচ্ছি, ততদিন আমরা যীশুকে কেমন করে বুঝব?*) এই জিনিস কখনই সম্ভব নয়। বেদ উপনিষদে বারবার এই জিনিসটাকে বোঝানর চেষ্টা করছেন। আমি যার সামনেই হাতজোড় করে দাঁড়াব, সে সব সময় আমাকে একজন তার ভারবাহক ভৃত্য রূপেই কাজে লাগাবে। কক্ষণ কারুর সামনে মাথা নত করতে নেই, মাথা নত করেছে তো, মাথা বেচে দিয়েছে। গাধা ঘোড়া যেমন মানুষের ভারবাহক পশু, তেমনি যার কাছে মানুষ মাথা নত করেছে, তার ভারবহক হবে। যদি সমান সমান না হয় তাহলে আমি কি করে বুঝব! আমরা ভগবান বিষ্ণুর পূজা করছি, আমরা কোথাও তো মানছি যে, আমরা ভগবান বিষ্ণুর সন্তান, ভগবান বিষ্ণুরই আমরা যেন অংশ। যতক্ষণ আমরা আধ্যাত্মিকতায় অগ্রসর না হতে পারছি, আধ্যাত্মিকতায় এগোন মানেই, ত্যাগ বৈরাগ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া। যত ত্যাগ বৈরাগ্য আসবে তত ভাল আমরা ঈশ্বরকে বুঝতে পারব। দীক্ষার মন্ত্র দিয়ে গুরু বলে দেন ইনি তোমার ইষ্ট, শ্রীরামকৃষ্ণ তোমার ইষ্ট, শ্রীকৃষ্ণ তোমার ইষ্ট, শিব তোমার ইষ্ট, মা কালী তোমার ইষ্ট, শ্রীরাম তোমার ইষ্ট। ইষ্টকে দেখিয়ে দিয়ে বলতে চাইছেন তুমি স্বরূপতঃ ঈশ্বরের সাথে এক। এরপর সে ঠাকুরের গান করে বেড়াচ্ছে, খুব ভাল, ঠাকুরও ভাবছেন এ গান করে বেড়াচ্ছে, বেড়াক। শুধু এখানেই গান করাবেন না, মৃত্যুর পর স্বর্গে গান করার দায়ীত্ব দিয়ে দেবেন। যেটা এখন করছে মৃত্যুর পর ওটাই করতে থাকবে। ওনারাও আমাদের মত মুর্খদের খোঁজেন। যিনি লেকচার দিয়ে যাচ্ছেন, তিনি মরার পরেও লেকচার দিতে থাকবেন। ঠাকুর বলছেন, আমার হাত কেন ভাঙল, এর উপর একটা লেকচার দাও তো। ভিতর থেকে যদি উপরে না উঠে আসতে পারে, আর তাঁর মত যদি না হয়ে যায়, তাহলে এখন যেটা নিয়ে আছে, সেটা নিয়েই সে থেকে যাবে। ঠাকুর চুসনির কথা বলছেন, মা বাচ্চার মুখে চুসনি দিয়ে সংসারের কাজকর্ম করে। এগুলো সব কটাই চুসনি। এই সমগ্র সৃষ্টিতে জন্ম নেওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত যা কিছু করছি, সবটাই চুসনি। সাধনা করছি, এটাও চুসনির মধ্যে পড়ে। যতক্ষণ যীশুর সমান সমান না হচ্ছে, শ্রীরামকৃষ্ণের সমান না হয়, ঠাকুর তুমি রাজা আমি রাজকুমার, তুমি সিংহ, আমি সিংহের শাবক, এই ভাব যদি না আসে, ততক্ষণ পর্যন্ত কিছু হবে না। আর যদি সারাক্ষণ ঠাকুরের কাছে গিয়ে বলতে থাকে, আমি দীন হীন কাঙালী, আমাকে কৃপা কর। ঠাকুরও বলবেন, থাকো বাবা তুমি দীন হীন কাঙালী হয়ে, দীন হীন কাঙালী দিয়ে আমার কোন কাজ হবে না। এগুলো শুনলে আমাদের আতঙ্ক লাগে ঠিকই, কিন্তু কিছু করার নেই, সত্যের মুখোমুখি হতে বুকের পাটা থাকা চাই, শক্তি লাগে।

এরপর স্বামীজী যীশুর ঘটনা বলছেন, সারমন অন দা মাউন্টে আছে, যীশু যেখানে যেখানে যাচ্ছেন, সেখানে সেখানে লোকেরা তাঁর পিছনে পিছনে দৌড়ে চলেছে। সেখানে আবার নানা রকমের ঘটনা আছে, কয়েকটা পাউরুটিকে পাঁচ হাজার লোকের মধ্যে খাইয়ে দিলেন, আবার পাথরকে পাঁউরুটি বানিয়ে দিলেন, এই ধরণের অনেক অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা আছে। সেটাকে নিয়ে স্বামীজী এখানে বলছেন, It is all in the dream to feed five thousand with two loaves, or to feed two with five loaves; neither is real and neither affects the other. (*দুখানা পাউরুটিতে পাঁচ হাজার লোক খাওয়ানো, অথবা পাঁচখানা পাউরুটিতে দুজন লোক খাওয়ানো – এই দুই-ই মায়ার স্বপ্নরাজ্যে। এদের মধ্যে কোনটাই সত্য নয়, সুতরাং এই দুটোর কোনটাই অপরটির দ্বারা বাধিত হয় না।*) দেড়শ বছরও হয়নি ঠাকুর চলে যাওয়ার পর, এর মধ্যেই কাহিনী তৈরী হয়ে গেছে যে, গিরিশ ঘোষের মদের বোতলকে ঠাকুর ডি গুপ্তের ওষুধ বানিয়ে দিয়েছেন। অবতারের কি এটাই কাজ? দুটো পাউরুটি দিয়ে পাঁচ হাজার লোককে খাওয়ালো, আর পাঁচটা পাউরুটি দিয়ে দুজন লোককে খাওয়ালো, এগুলোর সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। যারা এই ধরণের মিরাকেল, চমৎকারী খুঁজে বেড়ায় সে একজন মুর্খ, আর যে এদের ইচ্ছা মিটিয়ে দিতে এই ধরণের কাহিনী বানিয়ে যাচ্ছে, সে আরও বড় মুর্খ। কিন্তু কিছু করার নেই, আমরা এত দুর্বল যে, আমরা এগুলোর বাইরে যেতেই পারি না। আমরা সব সময় চাইছি চমৎকারী, কোথায় একটা তাবিজ পাওয়া যাবে, কোথায় একটু জড়িবুটি পাওয়া যাবে তার অন্বেষণ করে যাচ্ছি। আর এই সুযোগে অসাধু কিছু লোক ব্যবসা ফেঁদে পয়সা লুটে

যাচ্ছে। এরা তো দুর্বল, এদের কি হবে ভগবান জানেন; কিন্তু যারা বোকা বানাচ্ছে, তাদের যে কী হবে ভাবলে আতঙ্ক লাগে।

Only grandeur appreciates grandeur, only God realizes God. (*মহত্ত্বই কেবল মহত্ত্বের আদর করতে পারে, ঈশ্বরই ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে পারেন।*) মুণ্ডকোপনিষদের ঋষি বলছেন, *স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি*, ব্রহ্মকে যিনি জেনে গেছেন, একমাত্র তিনিই ব্রহ্ম হয়ে যান, এছাড়া কেউ হতে পারবে না। ঈশ্বরকেও জানতে হলে আগে ঈশ্বর হতে হবে। যতই আমরা হাতজোড় করে বলতে থাকি, ঠাকুর কৃপা কর, প্রভু কৃপা কর; কাউকেই করেননি, আমাদেরও করবেন না। The dream is only the dreamer, it has no other basis. It is not one thing and the dreamer another. (*স্বপ্ন সেই স্বপ্নদ্রষ্টাই – তা ছাড়া আর কিছু নয়, তার অন্য কোন ভিত্তি নেই। ঐ স্বপ্ন আর স্বপ্নদ্রষ্টা পৃথক বস্তু নয়।*) আমরা যখন স্বপ্ন দেখছি, তখন আমিও যা আমার স্বপ্নও তাই, আমি একটা আর আমার স্বপ্ন আরেকটা আলাদা বলে কিছু হয় না। ঠিক তেমনি ঈশ্বর আর তাঁর সৃষ্টি আলাদা বলে কিছু হয় না; সবটা মিলে এক। The keynote running through the music is 'I am He, I am He', all other notes are but variations and do not affect the real theme. (*সৃষ্টির যে সঙ্গীত, এর ভিতর শুধু 'সোহহম্ সোহহম্' – এই এক সুর বাজছে, অন্যান্য সুরগুলি তারই ওলট-পাল্ট মাত্র, সুতরাং তাতে মূল সুরের – মূল তত্ত্বের কিছু এসে যায় না।*) তত্ত্বমসি তত্ত্বমসি বা অহং ব্রহ্মাস্মি এই সুর অনুক্ষণ অনুরণিত হয়ে চলেছে। এই জগতে যাবতীয় যা কিছু আছে, সবার মূল সুর অহং ব্রহ্মাস্মি। জগতে আমরা বাকি যা কিছু দেখছি, এই ঘর, এই মানুষ, টেবিল, চেয়ার, মাইক্রোফোন ঐ মূল সুরেরই সা রে গা মা।

We are the living books and books are but the words we have spoken, আমরা যে শব্দগুলো মুখে বলি, আমরা যে চিন্তন করি, এগুলোই শাস্ত্র, আমরা হলাম জীবন্ত শাস্ত্র। Everything is the living God, the living Christ; see it as such. যা কিছু দেখছি, জানব সব কিছুই জীবন্ত ঈশ্বর, সবই জীবন্ত খ্রীষ্ট – এইভাবে সব কিছু দেখো। Read man, he is the living poem, কি তুমি বইয়ে কবিতা পড়ছ, মানুষকে অধ্যয়ন কর, মানুষই জীবন্ত কাব্য। We are the light that illumines all the Bibles and Christs and Buddhas that ever were, যে ধর্মগ্রন্থগুলিকে আমরা এত সম্মান দিচ্ছি, যে মানুষকে আমরা এত সম্মান জানাচ্ছি, সব কিছুকে আমরাই আমাদের আলোকে আলোকিত করছি। Without that, these would be dead to us, not living. (*এই আলোক ব্যতীত ঐগুলি আমাদের পক্ষে আর জীবন্ত থাকবে না, মৃত হয়ে যাবে।*) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার কত দাম, কত সম্মান। সবাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতাকে কত সম্মান জানায়। যতক্ষণ আমাদের পড়াশোনা না থাকে, সংস্কৃতি মনস্কতা যদি তৈরী না হয়, ততক্ষণ কিন্তু আমরা রবীন্দ্রনাথের কবিতার সম্মান করতে পারব না। ঐ জিনিসগুলিকে যে মূল্য দেওয়া হয় তাতে ঐ জিনিসের নিজস্ব মূল্যটা কম, আমরা যে মূল্য দিচ্ছি সেটার মূল্য অনেক বেশী। আর বেশির ভাগ লোকের কাছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেন বড় কবি, বেশির ভাগ লোকেরা বলছে তাই বড়, এছাড়া কিছু না। সমস্ত কিছুতেই তাই, যখন যেটাকে মানুষ বলবে দারুণ, সবাই বলতে শুরু করবে দারুণ। কিন্তু যিনি নিজে সত্যিই জিনিসটাকে দারুণ মনে করছেন, কারণ তিনি নিজের ভিতরে যে সংস্কৃতি ও শিক্ষার বিকাশ হয়েছে, সেই শিক্ষাকে ওর মধ্যে দিতে পারছেন বলেই দারুণ মনে করছেন। আমার নিজের মধ্যে বিকাশ না হতে থাকলে কোন দিন আমরা কোন জিনিসের প্রশংসা করতে পারব না। সেইজন্য বলছেন, stand on your own Self, নিজের উপর না দাঁড়াতে পারলে কোন শিক্ষা হবে না, কোন কিছুই হবে না।

আর অন্য দিকে ঘুরিয়ে বলছেন, The dead body resents nothing, let us make our bodies dead and cease to identify ourselves with them. (*মৃতদেহের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহারই কর না, তাতে সে ক্ষুব্ধ হবে না। আমাদের দেহকে ঐরূপ মৃতবৎ করে ফেলতে হবে, আর দেহের সঙ্গে যে আমাদের অভিন্ন ভাব রয়েছে, সেটা দূর করে ফেলতে হবে।*) আমাদের সমস্যা হল, আমরা এক গুচ্ছ জিনিসের সাথে নিজেদের জুড়ে রেখেছি। আমাদের শরীর যেমন দশটা জিনিসকে ভোগ করে, ঠাণ্ডার সময় ঠাণ্ডা লাগে, গরমের সময় গরম লাগে, ঠিক সেইভাবে আমাদের জীবনকে দশজনের সাথে জুড়ে রেখেছি। যার জন্য,

কোথাও কারুর কিছু হলে আমাদের মন উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। স্বামীজী এর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আমাদের সবাইকে বলছেন, নিজেকে মড়া মানুষের মত মনে কর। মৃত শরীর যেমন কোন কিছু অনুভব করে না, কোন প্রতিক্রিয়া করতে পারে না, তুমিও কোন কিছু অনুভব করা বন্ধ কর, প্রতিক্রিয়া করা বন্ধ কর। পরে আবার এই আলোচনাটা আসবে। সাধারণ মানুষকে এসব কথা বললে অনেক সমস্যা হয়ে যাবে। এগুলো খুবই উচ্চ মানের অদ্বৈত।

আজকের ক্লাশে স্বামীজী বলতে চাইছেন, এই জগৎ আকারে ইঙ্গিতে বিভিন্ন ভাবে আমাদের টোকা দিয়ে যাচ্ছে। ঐ টোকা ভিতরে যাওয়ার পর আমাদের মধ্যে যা কিছু প্রতিক্রিয়ার জন্ম হয়, সেটাই সব কিছু। প্রথমে আমাদের ভিতরটা ঠিক করতে হবে, আর দ্বিতীয়তঃ মনে রাখতে হবে সামনে যা কিছু আছে সবটাই সিগন্যাল। আর বলছেন, ঠাকুরের বিগ্রহকে যে মাথা নত করে প্রণাম করছে আর বলে যাচ্ছে, ঠাকুর কৃপা কর, এখানে মনে রাখতে হবে তুমি ঠাকুরের সামনে মাথা নত করছ মানে তোমার মধ্যে শ্রদ্ধা আছে, যার মধ্যে শ্রদ্ধা নেই সে মাথাই নোয়াবে না। আর যখন প্রার্থনা করছি, তখনও কোথাও না কোথাও আমরা সেই শ্রদ্ধার সামনে মাথা নত করছি। আর আমাদের যে কামনার পুর্তি হবে, সেটাও আমার ভিতরে যে শ্রদ্ধা, যে শক্তি, সেটা দিয়েই পুর্তি হবে। বাচ্চা বয়সে আমরা স্কুলে যাওয়ার সময় কত কাতর হয়ে প্রার্থনা করতাম, হে ঠাকুর আজকে যেন খুব বৃষ্টি হয় যাতে আমাকে আর স্কুল যেতে না হয়, আজকে যেন অঙ্কের মাস্টারের অসুখ হয়ে স্কুলে না আসতে পারে। কোন দিন আমাদের এই ধরণের কোন প্রার্থনার পুর্তি হত না। কারণ বাচ্চাদের মধ্যে সেই শক্তি নেই যে, তার ইচ্ছাতেই বৃষ্টি এসে যাবে বা মাস্টারের অসুখ হয়ে যাবে। যোগীদের এই শক্তি সব সময়ই থাকে। মহাভারতে আছে, যোগী গাছের উপরে কাকের দিকে তাকাতেই কাক ভস্ম হয়ে গেল। ঠাকুরও বলছেন, ঝড় উঠেছে, যোগী বলল ঝড় থেমে যাক, ঝড় থেমে গেল। আমরাও যে পূজা নিজের জন্য বা অপরের জন্য করি, এর উত্তর একদিন অবশ্যই আসবে। উর্দুতে একটা খুব ভাল কথা আছে, তোমার ইচ্ছাশক্তি এমন দৃঢ় কর, খোদা যখন এসে জিজ্ঞেস করবে, কি চাও, তখন সেটাই হবে। বক্তব্য হল, খোদা নিজের মত কাউকে কিছু দেন না, তোমার যেমন ইচ্ছাশক্তি দৃঢ় হবে সেই অনুসারেই দেন। তোমার ভিতরের শক্তিকে এমন বাড়িয়ে দাও, যাতে ভগবান নিজেই বলবেন, বলো কি চাও। ঠাকুর কথায় কথায় গল্পচ্ছলে বলছেন, বর লও, কি বর নেব। বিশ্বামিত্র তপস্যা করে যাচ্ছেন, এমন ঘোর তপস্যার উদ্দেশ্য একটাই, বশিষ্ঠ মুনির কাছে তাকে অপমানিত হতে হয়েছিল, বশিষ্ঠের তিনি ক্ষতি করে ছাড়বেন। ঐ একটা জিনিসকে কেন্দ্র করে তাঁর ইচ্ছাশক্তি এমন দৃঢ় হয়ে গেল যে, একটা রাক্ষস তৈরী হয়ে গিয়ে বশিষ্ঠের ছেলেকে মেরে ফেলল। ঠিক ঠিক ইচ্ছাশক্তি, যে ইচ্ছাশক্তি সাধু মহাত্মাদের হয়, তিনি যেখানে খুশী সেই শক্তির প্রয়োগ করে কারুর হয়ত মঙ্গল করে দিলেন। যেমন মায়েরা, মায়েদের ব্যক্তিত্ব কেবল মাত্র নিজের সন্তানের মঙ্গল কামনাকে কেন্দ্র করেই ঘুরতে থাকে। সন্তানের একটু যে ভাল হয়, সেটা পুরোপুরি হয় মায়ের মঙ্গল কামনার জন্য। মায়েদের যত ব্রত, যত উপোস, যত পূজা অর্চনা, যত প্রার্থনা, সবটাই সন্তানের মঙ্গল কামনাকে কেন্দ্র করে চলে। মা যদি রেগে সন্তানকে গালাগালও দেয়, তখনও কিন্তু সেখানে তার সন্তানের মঙ্গল কামনাটাই থাকে। অমঙ্গল কামনা কখনই মায়েরা করবে না। যদি অমঙ্গল কামনা করে, তাহলে হয় সন্তানটি মারা যাবে, আর তা নাহলে মহিলাটি অধঃপাতে যাবে।

শনিবার, ৩রা অগস্ট

আধ্যাত্মিক বৈষম্য কেন

১৮৯৫ সালে স্বামীজী আমেরিকাতে যখন এই কথাগুলো বলছেন, তখন ডারউইনের বির্তনবাদের থিয়োরী পুরোদমে চলতে শুরু হয়ে গেছে। আর মানুষের মন এমন যে, যখন যেটা এসে যায় সেটাকেই মনে করে শেষ কথা। কেবল সাধারণ মানুষরাই না, বড় বড় বিজ্ঞানীদেরও মনোভাব এই রকমই, একটা আইডিয়াকে ধরে নিয়ে প্রথমে বলবেন, এতদিনে একটা ভাল থিয়োরী এসেছে। কিছু দিন যেতে না যেতে, আরেকটা অন্য রকম থিয়োরী এসে গেলে বলবেন, আগের থিয়োরীটাকে এখন বিচার করা হচ্ছে ঠিক না ভুল। ডারউইনের থিয়োরীকে আধার করে কিছু দিন পরে মিৎসে একটা super evolutionএর থিয়োরি নিয়ে

এলেন, সেখানে তিনি নিয়ে এলেন সুপারম্যানের ধারণা। স্বামীজী পাশ্চাত্যের শ্রোতাদের বোঝাতে চাইছেন, সেখানকারা শ্রোতারা সবাই অত্যন্ত শিক্ষিত, আমাদের দেশের যারা বিরাট পড়াশোনা করা লোক, ওখানকার মেয়েরা তাদের থেকেও বেশী পড়াশোনায় এগিয়ে। স্বামীজী তাই অনেক সময় এই আইডিয়াগুলিকে ওদের ভাষাতেই উপস্থাপিত করেছেন। সব সময় যে ঐ কথাগুলোই শেষ কথা তা না, বোঝানর জন্য বলতেন। তাতে কিন্তু মূল কথাটা পাল্টায় না। যেমন সবারই যদি একই সঙ্গে সৃষ্টি হয়ে থাকে, একই সঙ্গে উন্নতি হয়ে থাকে, তাহলে মুক্তিটাও একই সঙ্গে হবে। কিন্তু তা যে হচ্ছে না পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে; খ্রীষ্ট, ভগবান বুদ্ধ, ঠাকুর, স্বামীজী এনাদের সবার আগে মুক্তি হয়ে গেল, বাকিরা এখনও পড়ে আছে। কিংবা, কারুর অনেক টাকা আছে, কারুর কিছুই নেই, কারুর সৌন্দর্য আছে, কারুর সৌন্দর্য নেই। এই বৈষম্যকে আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করব? এখানে সামাজিক বৈষম্য স্বামীজীর উদ্দেশ্য নয়, স্বামীজীর উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক বৈষম্য। অনেকে আছেন যাঁরা আধ্যাত্মিক জগতে অনেক এগিয়ে গেছেন, অনেকে অনেক পিছনে পড়ে আছেন, কেউ বা মুক্ত হয়ে গেছেন, কেউ মুক্তির চেষ্টা করে যাচ্ছেন, আমাদেরও মাঝে মাঝে জানতে ইচ্ছে করে, এই আধ্যাত্মিক বৈষম্য কেন। স্বামীজী এবার এই জিনিসটাকে ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছেন।

Individuals who are to get freedom in this life have to live thousand of years in one lifetime. (*যারা এই জন্মেই মুক্তিলাভ করতে চায়, তাদের এক জন্মেই হাজার বছরের জীবন যাপন করতে হয়।*) এক জন্মের ভিতরেই আমি যদি হাজার বছরের জীবন যাপন করছি, তাহলে বুঝতে হবে আধ্যাত্মিক জগতে আমি এগোচ্ছি। আমার সব কিছুই ভাল চলছে, জীবন নির্বিঘ্নে শান্তিতে চলছে, বুঝতে হবে এই জন্মে আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে আমার কিছু হবে না, এখনও অনেক জন্ম বাকি আছে। স্বামীজী হাজার বছর বলছেন, হাজার বছর না হলেও আমরা পাঁচশ বছর বা দুশো বছর যদি নিয়ে থাকি, একশ জন্ম না হয়ে তিনটে জন্মতেই নাহয় নিয়ে আসছি। তিনটে জন্মের যে সমষ্টি ভোগ, ভাল আর মন্দ দুটোই, এক জন্মে যদি ভোগ করতে হয়, তাহলে কি হবে একবার ভেবে দেখতে পারি। সময় সেই অতটুকুই, আশি থেকে নব্বুই বছর আয়ু ধরা যেতে পারে। ধরে নিচ্ছি পঁচিশ বছর বয়সে আমি আধ্যাত্মিক সাধনা শুরু করলাম। আর আমি আশি বছরে শেষ। পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন বছর আমার মোট সাধনার কাল।

এই পঞ্চাশ বছরে এবার আমাকে তিন জন্ম, জন্ম মানে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, অর্থাৎ আশি গুণিতক তিন, মানে দুশো চল্লিশ, এই দুশো চল্লিশ বছরের ভাল মন্দ সব রকম ভোগকে ঐ পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ঢোকাতে হবে। দ্রুতগতিতে জীবন এগিয়ে চলবে, তার মানে বছরে ছয় থেকে সাত বছরের ভোগ, দিনে সাত দিনের ভোগ, সব কিছুই চটপট করে এগিয়ে যাবে। ইদানিং কালের মেয়েরা যেমন আজকে বিয়ে করল আর আগামীকাল ডিভোর্স করল, ঐ রকম না। কিংবা একসাথে তিন জন্মের তিনটে বিয়ে করে নিল, ঐ রকমও না। সত্যিকারের ভোগ, আনন্দ যখন আসবে তখন সেটা গভীর তীব্র ভাবে আসবে, আর কষ্ট যখন আসবে মনে হবে যেন কামারশালায় লোহাকে গলিয়ে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে সাড়াশি বানানো হচ্ছে। মান-সম্মান, বদনাম এই জিনিসগুলোর ক্ষেত্রেও একই জিনিস হবে। ফলে তাঁদের জ্ঞান অর্জনটাও প্রচণ্ড দ্রুতগতিতে হতে থাকে। এখানে স্বামীজী অবতারবাদকে নিচ্ছেন না; না নিয়ে তিনি বলতে চাইছেন খ্রীষ্ট বলুন, ভগবান বুদ্ধ বলুন, ঠাকুর বলুন, সবাই যেন এই জন্মেই এসে পূর্ণতা লাভ করেছেন, আর আগের আগের জন্মের সংস্কারগুলিকে নিয়ে এসেছেন। স্বামীজীর মত মহামানবরা এই জন্মেই প্রচণ্ড দ্রুতগতিতে মুক্তির পথে এগিয়ে গেছেন। স্বামীজী অন্যান্য জায়গাতেও যেমন জিনিয়াস সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলছেন, জিনিয়াস বলতে কি বোঝায়, জিনিয়াস মানে, যে জিনিসটা আয়ত্ত বা ধারণা করতে মানুষ অনেক বছর লাগিয়ে দেয়, সেই জিনিসটাই জিনিয়াসরা খুব কম সময়ে আয়ত্ত করে নেয়। আইনস্টাইন বিজ্ঞানের জগতে যা কিছু করেছেন, অন্যরাও চেষ্টা করলে করে দিতে পারবে কিন্তু প্রচুর সময় লাগিয়ে দেবে, কিন্তু আইনস্টাইন খুব কম সময়ে করে দিয়েছেন। আজকে ষাট বছর বয়সে মানুষ অনেক কিছু বুঝে নিতে পারে। ক্লাশ ফাইভ সিক্সে যেটা পড়ত তখন বুঝতে পারত না, এখন ষাট বছর বয়সে খুব সহজে বুঝে নিচ্ছে। যে জিনিসটাকে বুঝতে পঞ্চাশ বছর লাগলো, সেই জিনিসটাকেই জিনিয়াসরা একই বয়সে বুঝে নিয়েছিল। সংস্কৃতে মেধার সংজ্ঞাও তাই – *গ্রহণ ধারণ সামর্থম্*। একটা জিনিসকে ধরার ক্ষমতা দিয়েই জিনিয়াসকে বোঝা যায়। আধ্যাত্মিক মানেই তাই – যে জিনিসের অভিজ্ঞতা অর্জন করার জন্য কয়েক জন্ম লেগে যাওয়ার কথা, আধ্যাত্মিকতা মানে ঐ জিনিসকে এক জন্মে অর্জন করে নেওয়া।

They have to be ahead of their times, but the masses can only crawl. Thus we have Christs and Buddhas. (*তারা যে যুগে জন্মেছে, সেই যুগের ভাবের চেয়ে তাদের অনেক এগিয়ে যেতে হয়; কিন্তু সাধারণ লোক কোন-রকমে হামাগুড়ি দিয়ে অগ্রসর হতে পারে। খ্রীষ্ট ও বুদ্ধগণের উৎপত্তি এইরূপেই।*) অন্যরা যেন মালগাড়ির মত যাচ্ছে, খ্রীষ্ট, বুদ্ধ এনারা যেন রাজধানী এ্যক্সপ্রেসের মত সাঁ করে বেড়িয়ে চলে যান। যোগশাস্ত্রে বলছেন, চেষ্টা যেমন হয় যোগের ফলও তেমন ভাবে আসে। চেষ্টা মানে দিনে কতক্ষণ জপধ্যান করলাম তা না, তীব্রতা কত। চেষ্টা যত তীব্র হবে তত আমার আর মুক্তির মধ্যে যে সময়ের ব্যবধান রয়েছে, সেই ব্যবধান তত কমতে থাকবে। কোন কিছুই বাদ চলে যাবে না, গত গত জন্মের যত ভোগভোগান্তি জমে আছে, যেটাকে মেটাতে হয়ত আরও পাঁচ জন্ম কি দশ জন্ম লাগত, তীব্রতা যদি সেই রকম থাকে, তাহলে এক জন্মেই সেটা হয়ত মিটে যেতে পারে। তবে কলঙ্ক যেটা আসার সেটা জোড়াল ভাবে আসবে, কাম-ক্রোধের সংস্কার যেটা আছে সেটাও তীব্র ভাবে আসবে। সব সময় মনে হবে, এই বুঝি সব শেষ হয়ে গেল, তারপরেই দেখল আবার সে দাঁড়িয়ে গেল। হঠাৎ প্রচুর সম্মান আসতে শুরু হয়ে গেল, এত সম্মান আসতে শুরু হল যে সম্মানের চূড়ায় চলে গেছে, হঠাৎ একদিন এমন এক কলঙ্ক এলো যে সঙ্গে সঙ্গে সেই সম্মানের চূড়া থেকে একেবারে নীচে পতন হয়ে গেল, আবার দাঁড়িয়ে গেল। শেষ কোন ভাবেই হয়ে যাবে না, কারণ টিকিটা তো ঠাকুরের কাছে বাঁধা হয়ে আছে কিনা। শেষ হয়ে যাবে না ঠিকই, কিন্তু ঘুরিয়ে যাবে। তুলসীদাস তাই প্রার্থনা করছেন, হে রাম এতদিন আমাকে নাচালে, আর নাচিও না। এই নাচানো মানে, কুমোরের চাকে ফেলে যেমন ঘোরায় তেমনি ঘোরাবে।

এটা কিভাবে হয় বলতে গিয়ে স্বামীজী মদালসার খুব নামকরা গল্প বলছেন, There was once a Hindu queen, who so much desired that all her children should attain freedom in this life that she herself took all the care of them; and as she rocked them to sleep, she sang always the one song to them – 'Tat tvam asi, Tat tvam asi' ('That you art, that you art). (*একদা এক হিন্দু রানী ছিলেন, তাঁর ছেলের এই জন্মেই মুক্তিলাভ করুক – এ বিষয়ে তাঁর এত আগ্রহ হয়েছিল যে, তিনি নিজেই তাদের লালন-পালনের সম্পূর্ণ ভার নিয়েছিলেন। তাদের শৈশবে যখন তিনি তাদের দোল দিয়ে দিয়ে ঘুম পাড়াতেন, তখন সর্বদা তাদের কাছে এই একটি গান গাইতেন – 'তত্ত্বমসি, তত্ত্বমসি' – তুমিই সেই আত্মা, তুমিই সেই ব্রহ্ম।*) স্বামীজী এখানে গল্পটা একটু অন্য ভাবে বলছেন। বলছেন, Three of them became Sannyasins, but the fourth was taken away to be brought up elsewhere to become a king. (*তাদের তিনজন সন্ন্যাসী হয়ে গেল, কিন্তু চতুর্থ পুত্রকে রাজা করবার জন্য অন্যত্র নিয়ে গিয়ে মানুষ করা হতে লাগলো।*) রানী এমন শিক্ষা দিলেন যে একটু বড় হতেই তিনজন সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে গেলেন। রাজা খুব অসন্তুষ্ট হয়ে গেলেন, সবাই যদি সন্ন্যাসী হয়ে চলে যায়, তবে রাজ্য চালাবে কে! তিনি চতুর্থজনকে রানীর কাছ থেকে সরিয়ে আনলেন, একে রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারীর যোগ্য করে তৈরী করতে হবে। বিদায় নেওয়ার সময় ওর মা রানী মদালসা একটা ছোট্ট চিরকুট দিয়ে তাকে বললেন, 'বড় হলে পড়বে এতে কি লেখা আছে'। সেই কাগজে লেখা ছিল, স্বামীজীর ভাষায়, God alone is true, All else is false. The soul never kills or is killed. Live alone or in the company of holy ones, যার অর্থ, ঈশ্বর বা ব্রহ্মই সত্য আর সব মিথ্যা। আত্মা কখন মরেন না, কখনও কাউকে মারেনও না। নিঃসঙ্গ হও, অথবা সৎসঙ্গে বাস কর।

রাজপুত্র বড় হয়ে পরিস্থিতি বশাৎ চিরকুটটা খুলে লেখাটি পড়ল, পড়েই তার চেতনা হয়ে গেল। সেও তখনই রাজ্য, রাজসিংহাসন, রাজ ঐশ্বর্য সব ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে গেল। মদালসার এই কাহিনী স্বামীজীর খুব প্রিয় ছিল। উনিও চাইতেন, আমাদের মায়েরাও যেন তাদের সন্তানকে বাচ্চা বয়স থেকে এই শিক্ষা দিতে থাকে। উদ্দেশ্য সন্ন্যাসী করে দেওয়া নয়, উদ্দেশ্য সন্ত মহাত্মা তৈরী করা নয়, উদ্দেশ্য হল সন্তানের ভিতরে শক্তির জাগরণ হওয়া। আমাদের রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের দ্বারা অনেক স্কুল পরিচালিত হয়। মিশনের স্কুলে অনেক ছেলেরা পড়তে আসে, সন্ন্যাসীরা তাদের দেখাশোনা করেন, ক্লাশে পড়ান। কিছু কিছু মায়েরা ভিতরে ভিতরে একটু ভীত থাকে, ছেলে সন্ন্যাসীদের সঙ্গে মেলেমেশা করে সন্ন্যাসী হয়ে যাবে না তো!

একজন মহিলা তার ছেলেকে বলতে শোনা গেছে, তুমি মহারাজদের সঙ্গে যখন মেলামেশা করবে তখন তিনি পড়াশোনার ব্যাপারে যা যা বলবেন খুব মন দিয়ে শুনবে, পড়াশোনার বাইরে যা বলবেন ওগুলো কিন্তু শুনতে যেও না। ছেলেটি আবার মজা করে মহারাজদের কাছে নিজের মায়ের কথা বলত।

শক্তি সব সময় common থাকে, ভিতরে আঁট সব সময় common। ঐ শক্তিটাকে নিয়েই মানুষ জগতে সাফল্য পায়, আর ঐ শক্তিকেই যখন ঈশ্বরের দিকে দেয়, তখন সে ঐ পথে এগিয়ে চলে যায়। যদি সংসারে মনটা প্রথমে ঢুকে যায়, আর সেখানে যদি নাম-যশের দিকে খুব এগিয়ে গিয়ে থাকে, তখন আর ওখান থেকে ফেরত এসে আধ্যাত্মিকতা জগৎকে বরণ করা খুব কঠিণ, otherwise আসা যাবে। আগেকার দিনের মা-বাবারা তাও অনেক খোলা মনের ছিলেন। বর্তমানের কালের মা-বাবারা নিজেরা অপরিণত, তারা আবার সন্তানদের বড় করছে। কজন বাবা-মা সন্তানকে বলে, দুর্দান্ত হও? কজন বাবা-মা সন্তানদের বলে, নম্বরের দিকে তাকিও না, জ্ঞান অর্জন করে যাও, সময়ের সাথে তোমার সাফল্য আসবে। এখনতো ক্লাশ ওয়ান, টু, থ্রী থেকেই নম্বর নিয়ে খেয়োখেয়ি করছে। আর এর পরিণাম চারিদিকে আমরা সবাই দেখছি।

স্বামীজী মদালসার যে কাহিনী বলছেন, এখানে তিনি একবারও বলতে চাইছেন না যে তোমরা সবাই সন্ন্যাসী হয়ে যাও। হিন্দুরা বারবার বলেন ঈশ্বর আর তাঁর শক্তি, শিব-শক্তি। হয় ঈশ্বর আর তা নাহলে শক্তি, মাঝামাঝি কিছু নেই। এই জগতে তুমি যেখানেই থাকো, সেখানে তোমাকে শ্রেষ্ঠতম হওয়া চাই। এর বাইরে ঈশ্বরের পথে শ্রেষ্ঠতম হওয়া, যদি সে সংসারের পথ ছেড়ে দেয়। যার আছে হেথা তার আছে সেথা। যে এখানে ব্যর্থ সে ওখানেও ব্যর্থ হবে। জগতে যে ব্যর্থ হবে, আধ্যাত্মিক জগতেও সে ব্যর্থ হবে। জগতে সাফল্য পাওয়ার জন্য যে শক্তি দরকার, সেই শক্তিকে নিয়েই তো সে এদিকে আসবে। স্বামীজী মদালসার কাহিনী চরিত্রবান হওয়ার জন্য বলছেন না, শক্তিকে জাগাবার জন্য বলছেন। একবার যদি কেউ জেনে যায়, আমার জন্ম নেই, আমার মৃত্যু নেই আর আমার ভিতরেই সমস্ত শক্তি, আমার ভিতরেই সমস্ত জ্ঞান, আর এটা আমার অধিকার, এটা আমি না পাওয়া পর্যন্ত ছাড়ছি না; এরপর সে কি কখন নিজেকে দুর্বল মনে করতে পারবে বা কখন দুর্বল হয়ে যাবে? আমরা এই কথাগুলো এই কান দিয়ে শুনে ঐ কান দিয়ে বার করে দিই, বার করে দেওয়ার আগে আমাদের এই ডায়লগটা অবশ্যই থাকবে – কথা গুলো কি সুন্দর, মহারাজ কী সুন্দর বলেন। এটাকে যে কাজে লাগাতে হবে, নিজের জীবনে নামাতে হবে তার ছিটেফোঁটা চেষ্টাও আমাদের নেই।

এরপর স্বামীজী বলছেন, Give up, renounce the world, স্বামীজী যে বলছেন renounce the world আসলে বলতে চাইছেন, সংসারের সমস্ত কিছুর সাথে যে নিজেকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছ, এই জড়িয়ে রাখা থেকে নিজেকে মুক্ত কর। Now we are like dogs strayed into a kitchen and eating a piece of meat, looking round in fear lest at any moment some one may come and drive them out. Instead of that, be a king and know you own the world, (*আমরা যেন এখন একপাল কুকুর – রান্নাঘরে ঢুকে পড়েছি, এক-টুকরো মাংস খাচ্ছি, আর ভয়ে এদিক ওদিক চেয়ে দেখছি, পাছে কেউ এসে আমাদের তাড়িয়ে দেয়। তা না হয়ে রাজার মত হও – জেনো যে, সমুদয় জগৎ তোমার।*) একটা কুকুর কিভাবে রান্নাঘরে ঢুকে খাবার থেকে একটা মাংসের টুকরো নিয়ে খাচ্ছে আর ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, কেউ না আসে লাঠির বাড়ি মারে – রাজার মত খাও, কিসের তাড়াহুড়ো, কিসের ভয়! অনেকদিন আগেকার একটা ঘটনা, যার কথা আগেই আমরা বলেছি, একজন ভদ্রলোক নিজের মেয়ের জন্য পাত্র দেখতে ছেলের বাড়িতে গেছেন। সেখানে সবাইকে চা দেওয়া হয়েছে। ছেলেটির বাবা কাপ থেকে চা প্লেটে ঢেলে খেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক মেয়েকে বলছেন, চলো মা, আর কিছু দেখার নেই। প্লেটে চা ঢেলেছো মানেই, তুমি একটা uncultured। কেন? ঠাণ্ডা করতে চাইছো তো, তার মানে তোমার তাড়াহুড়ো আছে। যে রাজার ব্যাটা তার আবার কিসের তাড়াহুড়ো। যে সেবক, যারা মজুরবর্গ, দৌড়াচ্ছে তারা। দৌড়াচ্ছে মানে কাজের জন্যই দৌড়াচ্ছে। যে ট্রেন ড্রাইভার, যে পাইলট যে সব সময় সজাগ, কিন্তু যখন চা খাবে, সেখানে তার একটা রাজকীয় স্বভাব থাকবে। নিজের রাজকীয় স্বভাবটা কেন ছাড়তে যাবে!

স্বামীজী নিজের একটা ঘটনা বলছেন, তিনি ঘোড়াগাড়ী করে আমেরিকায় এক শহর থেকে আরেক শহরে যাচ্ছেন। যেতে যেতে একটা জায়গায় দেখছেন দুটো বাচ্চা, তাদের সুন্দর রাজকীয় পোশাকে রাস্থার

পাশে দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ীর চালক গাড়ী থামিয়ে নেমে দুটো বাচ্চাকে খুব আদর করল, চুমো খেলো। স্বামীজী অবাক হয়ে ভাবছেন, এই ঘোড়াগাড়ির চালক কত ভদ্র বংশের! পরে চালক নিজেই বলছে, আমরা রাজবংশের লোক ছিলাম। পরিস্থিতি খারাপ হয়ে যাওয়াতে ঘোড়াগাড়ী চালাতে হচ্ছে। কিন্তু নিজের সন্তানকে রাজবংশের বাচ্চারা যেভাবে বড় হয়, সেইভাবে রেখেছে। স্বামীজী বলছেন, This is practical Vedanta। তুমি দৌড়াচ্ছ, ঠিক আছে, দৌড়ানোটা তোমার কাজ; কিন্তু যে জিনিসটা যেমন ভাবে হওয়ার সেটা যাতে তেমন ভাবেই হয় দেখতে হবে। ঠাকুর কামারপুকুরে গেছেন, সেখানে বলছেন, যেটাতে যে মশলা দেওয়ার সেটাতে তা দিতে হবে। ঠাকুরের সাথে বটুয়া থাকত, যাতে কাবাবচিনি মশলাদি থাকে। একদিন সেটা একজন সঙ্গে নিতে ভুলে গেছে, ঠাকুর বলছেন, আমি সমাধিতে থাকি, নিজের পরনের কাপড় ঠিক থাকে না, তাও আমি কোন কিছু ভুলি না, আর তোদের এই অবস্থা! আমাদের মনে হতে পারে, এগুলো অতি সাধারণ জিনিস, এসব নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করার কি আছে! কিন্তু সাধারণ হলেও ঐ একটা সাধারণ জিনিসকে দিয়ে বোঝা যাবে তুমি কতটা সংস্কৃতিসম্পন্ন। ডাক্তারের কাছে রোগী গেলে, রোগীকে ডাক্তার বলবে, একটু কাশুন তো, একটা কাশিতে ডাক্তার ধরে নেবে রোগীর কি সমস্যা, প্লেটে চা ঢালাতে বুঝে যাবে তুমি কত অসংস্কৃতিসম্পন্ন। ইঁদুরগুলো যখন খায় সব সময় তড়বড় করতে থাকে আর এদিক ওদিক তাকাতে থাকে, ভয় আছে, যদি বেড়াল এসে পড়ে, যদি কেউ এসে পড়ে। যে রাজা তার কিসের তাড়াহুড়ো, কিসের ভয়! সে মালিক। যখন দাঁত ব্রাশ করছি তখনও আমাদের তাড়াহুড়ো। কে তোমাকে তাড়া দিচ্ছে, তুমি তো সম্রাট। যখন যেটা করব, ঐ সময়টার আমি হলাম মালিক। অপরের সঙ্গে যখন আছি, আমি ওটা আমার ইচ্ছা অনুসারে নিয়েছি, তাই এখন সময় তোমার। কিন্তু যেমনি ওখান থেকে আলাদা হয়ে গেলাম, সেখানে তোমার আর নিয়ন্ত্রণ নেই। যেখানেই যে কাজে নিযুক্ত থাকবে সেখানে নিজের ব্যক্তিত্বের পুরোটাকে ঢেলে দিতে হয়।

একবার একজন মহারাজ এক বড় সাধুর ঘরের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় হ্যালো বলে চলে যাচ্ছিলেন। ভিতর থেকে সেই সাধু জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার, কোথায়'? 'মহারাজ আমি একটু ব্যস্ত আছি'। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মহারাজকে দাঁড় করালেন, বললেন, 'কক্ষণ ব্যস্ত বলবে না, বলবে সমস্ত'। এটাই বড় সাধু বলতে চাইছেন, যেটাই করবে, পুরো, সমস্তটাই ঐ জায়গাটাতে থাকবে। ব্যস্ত মানে, একটু ওটাতেও আছি, একটু সেটাতেও আছি, আবার একটু এটাতেও আছি। গীতায় ভগবান বলছেন, *বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্*, জীবনে কারা ব্যর্থ হয়? যারা ব্যস্ত থাকে। সাফল্যের মুখ কারা দেখতে পায়? যারা সমস্ত থাকে। সামান্য একটা সই করার সময়েও যদি তোমার মনের সমস্ত চেতনা ওর মধ্যে না থাকে, বুঝতে হবে তোমাকে এখনও অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। যে কোন কাজে, দাঁত ব্রাশ করছি, স্নান করছি, গামছা দিয়ে গা মুছছি, সব কাজে মনের সমস্ত চেতনা সেই কাজের মধ্যে থাকতে হবে। যদি না থাকে, তখন বুঝতে হবে সে আর রাজার মত নেই, একটা ইঁদুরের মত। একজন লোক নিজেকে মনে করত আমি ইঁদুর। একজন সাইকাট্রিস্টের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সাইকাট্রিস্ট তাকে ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছে যে সে ইঁদুর নয়। লোকটিও বুঝে গেছে আমি ইঁদুর নই। ওখান থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামছে, আবার সে লুকিয়ে গেছে। বাড়ির লোকেরা বলছে, 'তোমাকে ডাক্তার এত করে বুঝিয়ে দিল যে তুমি ইঁদুর নও, তাও তুমি অমন লুকোচ্ছ কেন'? লোকটি বলছে, 'আমি তো জেনে গেছি আমি ইঁদুর নই, কিন্তু ঐ যে বেড়ালটা ওখানে বসে আছে, সেতো জানে না যে, আমি ইঁদুর না'। এখানে স্বামীজীর কথা শুনে আমাদেরও মনে হচ্ছে আমরা সবাই সিংহ। কিন্তু এখান থেকে বেরিয়ে যেই বাইরে যাবো, বাইরের লোকেরা তো জানে না যে আমি সিংহ। ফলে আবার গোলমাল লেগে যাচ্ছে। কাউকে জানতে হবে না, তোমার হাঁটা দেখেই সবাই বুঝে যাবে, সিংহ হাঁটছে।

তারপর বলছেন, This never comes until you give it up and it ceases to bind, (*যতক্ষণ না তুমি সংসার ত্যাগ করছ, ততক্ষণ সংসার তোমায় বাঁধতে থাকবে।*) জগৎকে আমরা এমন আষ্টপৃষ্টে আঁকড়ে ধরে আছি যে, যার ফলে আমি যে সিংহ, এই ভাবটা আনতে পারছি না। Give up mentally, if you do not physically. (*যদি বাইরে ত্যাগ করতে না পারো, তবে মনে মনে ত্যাগ করো।*) খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা। ঠাকুর বার বার বলছেন, সন্ন্যাসীর বহিঃত্যাগ, সংসারীদের মনে ত্যাগ। মন থেকে যে ত্যাগ করে দিয়েছে, বুঝে নিতে হবে তার কেল্লা ফতে হয়ে গেছে। সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়া মানে সব বন্ধন থেকে পুরো মুক্তো হয়ে যাওয়া। আবার উল্টোটাও হয়, সন্ন্যাসী বহিঃত্যাগ হয়ে গেল, কিন্তু মনে সবটাই দাঁড়িয়ে

আছে। আগে আগে বলেছেন, মনটাই আসল, ত্যাগ আগে মন থেকে করতে হবে। কবীর দাসের খুব সুন্দর দোঁহা আছে, মন না রাঙায়ে, রাঙায়ে যোগী কপড়া, যোগী নিজের মনকে ঈশ্বরের রঙে রাঙালো না, কিন্তু জামাটাকে ঈশ্বরের রঙে রাঙিয়ে দিল। গেরুয়া হল ঈশ্বরের রঙ। বহিঃত্যাগ অপরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য, যেটা সন্ন্যাসীদের কাজ, গৃহস্থদের ত্যাগ সব সময় মনে। স্বামীজীও এখানে তাই বলছেন, বাইরের ত্যাগ যদি না পারো, মন থেকে সমস্ত কিছু ত্যাগ করো, মনটাই সব কিছু। সন্ন্যাসীদের শুদ্ধি মনেও আবার বাইরেও, সেইরকম ত্যাগ বাইরেও আবার মনেও। গৃহস্থদের শুদ্ধিটা মনের হলেই হবে।

সব ত্যাগ কর, বৈরাগ্য সম্পন্ন হও

বলছেন, Give up from the heart of your hearts. Have Vairagya (renunciation). This is the real sacrifice and without it, it is impossible to attain spirituality. (*অন্তরের অন্তর থেকে সব ত্যাগ কর। বৈরাগ্য সম্পন্ন হও। এই হল যথার্থ আত্মত্যাগ – এ না হলে ধর্মলাভ অসম্ভব।*) পূর্ণ বৈরাগ্যে যদি প্রতিষ্ঠিত না হওয়া যায়, জগতের প্রতি আকর্ষণ যদি না চলে যায়, সত্যিকারের ভিতর থেকে যদি না বলতে পারে আমার জগতের কিছু লাগবে না, ততক্ষণ আধ্যাত্মিকতার কোন প্রশ্নই নেই। তাহলে আমরা কেন এইসব করছি? কারণ আমরা ফেঁসে আছি। দু-ভাবে আমরা সবাই ফেঁসে আছে, একভাবে হল সংসারের দায়ীত্ব চাপিয়েছি, সেখানে ফেঁসে আছি, আর দ্বিতীয়তঃ জন্ম জন্মান্তর ধরে আমার কর্মাশয়ে কর্মের যে পাহাড় জমে আছে, সেই কর্ম এখন আমাকে দিয়ে সব করাচ্ছে, কিন্তু আমি এই রকম চাইছি না। তার মানে, এবার তোমার আধ্যাত্মিক অভিযান শুরু হল। খুব ভাল করে আগে বিচার করে দেখতে হবে, আমার মন, অর্থাৎ আমি কি চাইছি। তখন হয়তো বলবে, আমার এখনও অমুকের প্রতি বা অমুক জিনিসে মন পড়ে আছে। ঠিক আছে এগুলো করে নাও, কোন সমস্যা নেই। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করো, যাতে ওটা চলে যায়। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করলে ঠিক চলে যাবে, মন থেকে একবার যেটা চলে যাবে, তার সবটাই চলে যাবে। তারপরে বাইরে ত্যাগ হলো কি হলো না, তাতে কিছু আসে যায় না। যার ভিতর থেকে ত্যাগ হয়ে গেছে, তার চেহারাতেই বোঝা যায়। সেইজন্য কেউ যদি এসে বলে আমি ভিতরে ভিতরে সব ত্যাগ করে দিয়েছি, তার চেহারাই বলে দেবে সে মিথ্যা কথা বলছে কি বলছে না।

বলছেন, Do not desire, for what you desire you get, and, with it comes terrible bondage. (*কোন প্রকার বাসনা করো না; কারণ যা বাসনা করবে তাই পাবে। আর সেটাই তোমার ভয়ানক বন্ধনের কারণ হবে।*) এটাও একটা মারাত্মক কথা। কক্ষণ কোন কিছু কামনা করতে নেই। মনে মনে কামনা যদি করা হয়, ঐ ইচ্ছাটা যদি এখন পূরণ না হয়, পড়ে থাকবে। আজকে মনে শক্তি নেই, আজকে হয়ত ফল দেবে না। দশ বছর পরেও শক্তি নেই – ফল দেবে না। আরও কয়েক জন্ম পর যখন শক্তি হবে, তখন ফল অবশ্যই দেবে। আমাদের মনে হাজার, দশ হাজার, কুড়ি হাজার জন্মে কবে কোন জন্মে যত কামনা-বাসনা জেগেছিল, সব জমে থাকবে, আর সব কামনারই পুর্তি হবে, তা এই জন্মেই হোক বা আরও দশ হাজার জন্মের পরেই হোক, ও ফল হবেই হবে। আর প্রত্যেক ইচ্ছার যখন পুর্তি হবে, তখন ওর বন্ধনটা আরও জোড়ালো হয়ে আসবে।

বিখ্যাত ফরাসী লেখক ভালজাক ঠিক এই আইডিয়াকে নিয়েই একটা উপন্যাস লিখেছেন, বিভিন্ন নামে উপন্যাসটার নামের অনুবাদ করা হয়েছে। কাহিনীটিতে একটি ইয়ং ছেলের জীবনকে নিয়ে শুরু করা হয়েছে, ছেলেটি যেমন যেমন ইচ্ছা করছে, সমস্ত ইচ্ছা তার পূরণ হয়ে যাচ্ছে। যত ইচ্ছা পূরণ হচ্ছে, আর ইচ্ছার আকার অনুযায়ী তার আয়ুটাও কমে যাচ্ছে। আইডিয়াটা একই, যখনই কোন ইচ্ছা করল, এখন ওটাকে কাটানোর যত চেষ্টাই করুক ও যাবে না, দাঁড়িয়ে থাকবে। আজ হোক, আগামীকাল হোক, দশ জন্ম, হাজার জন্ম পরে হোক ইচ্ছাটা পূরণ হবেই। মার্চেন্ট অফ ভেনিসে যেমন বলছে, ওর রক্ত, মাংস বার করে ছাড়বে, ও ছাড়বে না।

এর পর স্বামীজী সেই গল্পটা বলছেন, It is nothing but bringing 'noses on us', as in the case of the man who had three boons to ask. We never get freedom until we are self-contained. 'Self is the Saviour of self, none else'. (*যেমন সেই গল্পে আছে – এক ব্যক্তি তিনটি বর লাভ করেছিল এবং তার ফলে তার সর্বাঙ্গে নাক হয়ে গিয়েছিল, বাসনা করলে ঠিক সেই রকম হবে। যতক্ষণ না আমরা আত্মরত ও আত্মতৃপ্তি হচ্ছি, ততক্ষণ মুক্তিলাভ করতে পারছি না। 'আত্মাই আত্মার মুক্তিদাতা অন্য কেউ নয়।*) একটা লোক ছিল, তার আর তার স্ত্রীর নাকটা বোঁচা ছিল। লোকেরা তাদের ঠাট্টা বিদ্রুপ করত। একবার লোকটি তিনটে বর লাভ করেছিল। স্ত্রীর সাথে আলোচনা করতে বসল, কি বর চাওয়া যেতে পারে। আমাদের নিয়ে সবাই ব্যঙ্গ করে, তাই বর চাওয়া যাক আমাদের যেন নাক হয়। সঙ্গে সঙ্গে ওদের সারা গায়ে নাক হয়ে গেল। এতো মহা কেলেঙ্কারী হয়ে গেল। দ্বিতীয় বরে চাইল, আমাদের নাকগুলো যেন চলে যায়। সব নাক চলে গেল ঠিকই, সঙ্গে ওদের আসল নাকটাও চলে গেল। আরও কেলেঙ্কারী। আর মাত্র একটা বর থাকল। তখন ওরা বলল আমাদের যেমন নাক ছিল তেমনই হয়ে যাক। তিনটে বর লাভ করল, তিনটে বরই বেকার চলে গেল, মাঝখান থেকে কিছুই হলো না। আমাদের জীবনে এভাবেই সব কিছু হয়, কয়েকটা বোকা ইচ্ছা নিয়ে চলি, ওটাকেই পূর্ণ করে বেড়াই। আমরা সাধারণ ভাবে কিসের ইচ্ছা জীবনে করে থাকি? আমাকে ও যেন ভালবাসে, আমার যেন প্রশংসা করে, আমার এই হবে, সেই হবে ইত্যাদি। একমাত্র অদ্বৈতই এটাকে ব্যালেন্স করে। সেটাই এখন স্বামীজী বলছেন।

Learn to feel yourself in other bodies, to know that we are all one. (*এইটি অনুভব করতে শিক্ষা করা যে, তুমি অন্য সকলের দেহেও বর্তমান – এইটি জানবার চেষ্টা কর যে আমরা সকলেই এক।*) নিজের সত্তাকে সবার সাথে জুড়ে দাও। যাকে তুমি হিংসা করছ, মনে কর তুমি নিজেই সে, তখন মনে হবে, আরে আমি নিজেকে নিজে হিংসা করছি! এমপি, এমএলএরা, প্রাইম মিনিস্টার, চিফ্ মিনিস্টারকে নিয়ে হিংসা করছে। কিছু না, নিজেই মনে করুক আমিই প্রাইম মিনিস্টার, আমিই মুখ্যমন্ত্রী, অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী যা কিছু করছেন, এই ভাবা যে সব আমিই করছি। মায়েরা যেমন করে, নিজেকে সন্তানের সাথে এমন জুড়ে নেয়, সন্তানের যত যা কিছু ভাল হয় তাতেই মায়েরা আনন্দ অনুভব করে। এই কথা কিন্তু এমপি, এমএলএদের জন্য বলা না। যাঁরা আধ্যাত্মিক হতে চান, আধ্যাত্মিক পথে এগোতে চান, তাঁদের জন্য বলা হচ্ছে। নিজেকে সবার সাথে জুড়ে নিয়ে অপরের আনন্দকে নিজের আনন্দ, অপরের সুখকে নিজের সুখ মনে করা আবার উল্টোটাও অপরের দুঃখে নিজের দুঃখ অনুভব হওয়া, এই ভাবে নিজেকে না নিয়ে যেতে পারলে কোন দিন কেউ আধ্যাত্মিক পথে আসতে পারবে না। অন্যরাও একটু করে দেখতে পারে, যার প্রতি হিংসা আছে, রাগ আছে, একটু শুধু মনে করুক, ওটা আমি। সঙ্গে সঙ্গে ঐ ভাবগুলি চলে যাবে। কারণ ঐ শরীর দিয়ে, ঐ মন দিয়ে সে-ই ভোগ করছে। খেলার মতও এই জিনিসটা আমরা একটু করে দেখতে পারি। যাকে ভালবাসি, তারও শরীরকে মনে করছি ওটা আমি, যাকে পছন্দ করি না, তার যা যা ভাল হয়, সেখানেও নিজেকে জড়িয়ে নিয়ে ভাববো আমারই এই ভাল হয়েছে।

বাসনা ও ভগবান, দুটো একসাথে থাকতে পারে না

Throw all other nonsense to the winds. Spit out your actions, good or bad, and never think of them again. What is done is done. (*আর সব বাজে জিনিস ছেড়ে দাও। ভালমন্দ কাজ যা করেছ, সেগুলি সম্বন্ধে একদম ভেবো না – সেগুলি থু থু করে উড়িয়ে দাও।*) আগে ভালমন্দ যা হয়ে গেছে, সব ফেলে দাও, অর্থাৎ অতীতের কার্যকলাপ নিয়ে ভাবতে বসো না। Throw off superstition. Have no weakness even in the face of death. (*কুসংস্কার দূর করে দাও। সম্মুখে মৃত্যু এলেও দুর্বলতা আশ্রয় করো না।*) Do not repent, do not brood over past deeds, and do not remember your good deeds; be azad (free). (*অনুতাপ করো না – পূর্বে যে-সব কাজ করেছ, সে-সব নিয়ে মাথা ঘামিও না। এমন কি – যে সব ভাল কাজ করেছ, তাও স্মৃতিপথ থেকে দূর করে দাও। আজাদ হও।*) একই কথা বলছেন, ভাল কি করেছ ভুলে যাও, মন্দ কি করেছ ভুলে যাও। ভালমন্দের পারে চলে গিয়ে তুমি আজাদ হয়ে যাও। কিন্তু আমাদের স্বভাব। কারুর ভাল কিছু করে থাকলে, ঘুরে ঘুরে

তাকে সেটা মনে করাতে থাকি। The weak, the fearful, the ignorant ill never reach Atman. (*দুর্বল, কাপুরুষ ও অজ্ঞ ব্যক্তিরা কখনও আত্মাকে লাভ করতে পারে না।*) মুণ্ডকোপনিষদে বলছেন, নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য, দুর্বলরা কোন দিন আত্মার জ্ঞান পাবে না। আমরা যদি আমাদের দুর্বলতার একটা তালিকা প্রস্তুত করি, দেখা যাবে এই জগতে হেন জিনিস নেই যাতে আমাদের দুর্বলতা নেই। You cannot undo, the effect must come, face it, but be careful never to do the same thing again. (*তুমি কোন কর্মের ফলকে নষ্ট করতে পার না – ফল আসবেই আসবে; সুতরাং সাহসী হয়ে তার সম্মুখীন হও, কিন্তু সাবধান, পুনর্বার যেন সেই কাজ না কর।*) যেটা আগে করা হয়ে গেছে, পরে তুমি মন থেকে ত্যাগ করে দিয়েছ, তাও ঐ কর্ম ফল নিয়ে আসবে, আসতে দাও, ঐ নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।

Give up the burden of all deeds to the Lord; give all both good and bad. Do not keep the good and give only the bad. God helps those who do not help themselves. (*সকল কর্মের ভার ভগবানের উপরে ফেলে দাও, ভাল-মন্দ – সব দাও। নিজে ভালটা রেখে কেবল মন্দটা তাঁর ঘাড়ে চাপিও না। যে নিজেকে সাহায্য করে না, ভগবান তাকেই সাহায্য করেন।*) মানুষ যখন ভাল-মন্দ সব ঈশ্বরের উপর ছেড়ে দেয়, তখনই ভগবান তাকে সহায়তা করার জন্য এগিয়ে আসেন। উর্দুতে একটা নামকরা কথা আছে, হিম্মতে মরদা মদতে খোদা, যে লোকের দম আছে খোদা তাকেই সাহায্য করেন। এগুলো শুনতে ভাল লাগে, কিন্তু আসলে উল্টোটা হয়। যে শক্তিমান ভাল-মন্দ সমস্ত ছেড়ে দিয়ে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে থাকে, ঈশ্বর তাকেই দেখেন। কারণ ভগবান তখন তার ভিতরে পুরোদমে আছেন। ভগবান যে বাইরে থেকে এসে কিছু করে দিচ্ছেন তা তো নয়। আমরা যখন ভাল জিনিস, মন্দ জিনিস কিছু আশ্রয় করছি, তখন সমুদ্রের বিরাট জলরাশি একটা পাইপের মধ্য দিয়ে বেরোবার চেষ্টা করা হচ্ছে। পাইপগুলিকে ফাটিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হল, তখন সমুদ্রের জলরাশি ছাড়া তো আর কিছু আসবে না। বাইরের একটা দৃশ্যকে জানালার একটা ছোট্ট ফোকর দিয়ে দেখছি, জানালাটাকে ভেঙে উড়িয়ে দেওয়া হল, পুরো দৃশ্যটাই চোখের সামনে ভেসে উঠল। আমাদের সমস্যা হল, আমরা মনে করছি, ঈশ্বর বাইরে থেকে আমাদের জন্য সব কিছু করে দিচ্ছেন। কিন্তু ঈশ্বর তো আমাদের ভিতরে। তিনি আমাদের জন্য অনেক কিছুই করতে চাইছেন, কিন্তু আমরাই তো করতে দিচ্ছি না। জলের বিশাল ট্যাঙ্ক, সেখানে একটা ছোট ফুটো, সেখান দিয়ে ফোঁট ফোঁটা করে জল পড়ছে। এতে কতটুকু জল আসবে! ট্যাঙ্কের দেওয়ালে যত বড় ফুটো করে দেবে তত জলের তোড় বাড়তে থাকবে, পুরো দেওয়ালটা ভেঙে দিলে জলের বন্যা হয়ে যাবে। মানুষ যখন পুরোপুরি ঈশ্বরের উপর ছেড়ে দেয়, তখনই ঈশ্বরের শক্তি কাজ করতে শুরু করে। আমাদের উল্টোটা হয়, আমরাও সব সময় ছেড়ে আছি, কিন্তু তার সাথে বলতে ছাড়ি না যে, ঠাকুর এটা আমি ছেড়ে দিলাম এবার তুমি এটা করে দাও। পুরো ছেড়ে দেওয়া মানে, ভাল-মন্দ সব ছেড়ে দেওয়া। আর কবে হবে, আদৌ হবে কিনা, এই চিন্তাটাও ছেড়ে দেওয়া, তার মানে, আত্মার পুরো শক্তি পুরো দমে এবার পুরো প্রকাশ; ভগবান একমাত্র তখনই দেখেন। ঠাকুর এক ভক্ত আর বিষ্ণুর গল্প বলছেন, ভক্ত ভগবানের নাম করতে করতে যাচ্ছে, ধোপারা কাপড় শুকোতে দিয়েছে সেটাকে মাড়িয়ে চলে যাচ্ছে। ধোপা ভক্তকে একটা ইট তুলে মারতে যাচ্ছে, তখন ভক্তও একটা ইট তুলে নিয়েছে। ভক্ত তখন নিজেকেই নিজে রক্ষা করতে নেমে গেছে। ভক্ত যখন পুরোপুরি ঈশ্বর চিন্তনে হারিয়ে যায়, তখনই তার ভিতরটা জেগে থাকে, আর তখনই ঈশ্বর তাকে দেখেন। এখানে ভাল-মন্দের সাথে কোন সম্পর্ক নেই, বলতে চাইছেন, তুমি মনের জগতের পারে যাও। মনের বাইরে আত্মাই আছেন।

'Drinking the cup of desire, the world becomes mad'. Day and night never come together, so desire and the Lord can never come together. Give up desire. (*বাসনা-মদিরা পান করে সমস্ত জগৎ মত্ত হয়ে আছে। 'যেমন দিবা ও রাত্রি কখনই এক সঙ্গে থাকতে পারে না, সেইরূপ বাসনা ও ভগবান – দুই কখনও এক সঙ্গে থাকতে পারে না'। সুতরাং বাসনা ত্যাগ কর।*) মদ খেয়ে লোকে মত্ত হয়ে যায়, বাসনা-মদিরা পান করে সবাই মত্ত। মদ্যপান করলে মত্ত হয় আর পাগল হলে উন্মত্ত হয়। আমরা সবাই মত্ত উন্মত্ত। মদ খাওয়ার সময় সবাই পরস্পরের মদের গ্লাশ ঠেকিয়ে চিয়ার্স করে। আমরাও ঠিক তাই করি। আমাদের এই জীবন মদের গ্লাশ, এর মধ্যে ঢালা আছে কাম, এক অপরকে চিয়ার্স

বলে পান করছি আর মত্ত উন্মত্তের মত সারা জীবনটাকে লাগাম ছাড়া ভাবে কাটিয়ে দিচ্ছি। আধ্যাত্মিকতার মানে, এই ভাব থেকে বেরিয়ে আসা।

ঈশ্বর দর্শন ও ঈশ্বর দর্শন হলে কি হয়

৩রা অগস্ট স্বামীজী অনেক কথা বলেছিলেন, অথবা এভাবেও বলা যেতে পারে, যিনি নোট নিতেন, ঐদিন তিনি অনেকটাই নোট নিতে পেরেছিলেন। এরপর স্বামীজী দুটো গুরুত্বপূর্ণ জিনিসকে নিয়ে বলছেন – ঈশ্বর দর্শন আর ঈশ্বর দর্শন হলে কি হয়। একটা ছোট্ট উদাহরণ দিলে জিনিসটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। ঠাকুর কুপ খননের উদাহরণ দিচ্ছেন। কুয়া খনন করতে কোদাল, খুরপি, ঝুড়ি এই ধরণের অনেক কিছু লাগে। অনেকে আছে যারা কুয়ো খনন করেছে, জল বেরিয়ে আসার পর কোদাল ঝুড়ি সব কুয়োর মধ্যেই ফেলে দেয়। অনেক আছে, কুয়ো খননের পরেও কোদাল ঝুড়ি সব রেখে দেয়, যদি পরে কারুর দরকার হয়। আমরা যখন অবতার বা মহাপুরুষদের কথা শুনি, এটা অনেকটা কুপ খননের মত। যে চাইছে আমার কুয়োর জল দরকার, তার জন্য তাকে একটা কুয়ো খুড়তে হবে। যেমনি কুয়ো খুড়তে শুরু করল তখনি একজন এসে বলল, আরে এখানে আগে আরেকজন কুয়ো খুড়েছিল কিন্তু জল পায়নি। সে তখন ঐ জায়গা ছেড়ে আরেকটা জায়গায় খুড়তে শুরু করল। সেখানে একটু খুড়তেই শুধু বালি বেরোতে থাকল। সেই জায়গা ছেড়ে আরেকটা জায়গাতে গেল, সেখানে পাথর বেরোতে লাগল। এই ভাবে সে চারটে জায়গায় দশ হাত করে খুড়ে দিয়েছে। এর থেকে বরং যদি একটা জায়গাতেই খুড়তে থাকত, জল পেয়ে যেত। দ্বিতীয় ধাপে, কুয়ো খননের কার্যে যে জিনিসগুলি অপরিহার্য, সেগুলোকে সামলে রেখে দেওয়া, যাতে ভবিষ্যতে অপরের কাজে লাগে। ধর্ম জীবনও ঠিক তাই, একটা ভাবকে আশ্রয় করে এগিয়ে গেলো, আমি মরি বাঁচি এটাই আমার অবলম্বন, এটাই আমার আশ্রয়, এই ভাবকে আমি কোন দিন ছাড়ব না।

একটু বিচার করলে দেখা যাবে, এখানে যুক্তিগুলি খুবই সহজ, জটিলতার কিছু নেই। যদি এই জন্ম দিয়েই আমার জীবন শুরু হয়ে থাকে, আর মৃত্যুতেই যদি সব কিছু শেষ হয়ে যায়, তাহলে এই জীবনের আর কি দাম থাকল, জীবনটাকে যদি ঈশ্বরকেই দিয়ে দিই তাতে এমন কি আহামরি ক্ষতি হয়ে যাবে! হিন্দীতে বলে জিন্দেগী না মিলি দো বারা, এটাকেই অনেকে ডিসেম্বরের দু তারিখে মজা করে মেসেজ পাঠায় জিন্দেগী না মিলি দো বারা(২/১২)। এর উত্তরে আবার অনেকে মেসেজ পাঠায়, জিন্দেগী না মিলি দো বারা তো জিন্দেগী আয়েগী বার বার, হয় দো বারা নয়তো বারবার। সেটার থেকে বড় কথা, তুমি যদি মনে করে থাক একটাই জীবন তোমার, তাহলে জীবনে এত কান্নাকাটি করার কি আছে! তুমি বলছ, আমার আনন্দ চাই, ঠিক কথা, ভগবানের নামেই যদি আমার আনন্দ হয়, ত্যাগেই যদি আনন্দ হয়, তাহলে দোষ কোথায়, আমি তো আনন্দ করেই এসেছি, আনন্দ করতে করতেই চলে যাব। আর জীবন যদি বার বার হয়, তাহলে একটা জীবন না হয় একটা ভুল আদর্শেই চলে গেল, তাতে এমন কি ক্ষতি আছে। আমরা সবাই শূন্য থেকে শূন্যের দিকে যাচ্ছি, মাঝখানে কয়েকটা দিন, না হয় সেটা শূন্যেই গেল, তাতে কি ক্ষতি হয়ে যাবে! যার একটা রাজপ্রাসাদের মত বাড়ি ভূমিকম্পে ধুলিসাৎ হয়ে গেছে, সেখানে একটা ছেঁড়া কাঁথাকে বাঁচাবার জন্য তার কি চিন্তা থাকবে! ধুর্, যা গেছে যাক। জড়বাদীরা বলে আমরা শূন্য থেকে শূন্যে বিলীন হয়ে চলেছি। তাহলে মাঝখানে কয়েকটা দিনের জন্য এসে এতো কান্নাকাটি করার কি আছে! আর বার বার যদি আমার জন্ম হতে থাকে, যেটা হিন্দুরা বলে, তাতে একটা জন্ম না হয় আমি ঈশ্বরের জন্য দিয়ে দিলাম, তাতে কি অসুবিধা হবে! না হয় ভুল জায়গাতেই গেল, তাতে আমার এমন কি ক্ষতি হবে! কোন দিক দিয়েই কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু আমরা বেশির ভাগ মানুষ সঙ্কীর্ণ চিন্তাজগতের বাসিন্দা, আমাদের সব কিছুই ভাসা ভাসা। আমরা ভিতরে ডুব দিতে চাই না, সেইজন্য আমাদের এতো অশান্তি, অশান্তি নিয়ে থাকছি বলে আমাদের শক্তিটুও হয় না।

একজন ইষ্টকে নিয়ে যদি পুরোদমে নেমে পড়ে, আজ হোক বা কাল হোক, সে ফল পাবেই। যখন সে ফল পেয়ে যাবে, তখন দুটো জিনিস ঘটবে – প্রথম হল, সে বলবে আমার আর কিছু লাগবে না, আমি আমার ইষ্টকে নিয়ে থাকবো। দ্বিতীয় হল – আমি ইষ্টকে পেয়েছি, আরও দুজনে যে পেতে পারে, আমি তাদের পথ দেখিয়ে দেবো। এই দুটো জিনিসকে এবার স্বামীজী বিভিন্ন ভাবে বক্তব্যের মাধ্যমে রাখছেন। There is a vast difference between saying 'food, food' and eating it, between saying 'water,

water' and drinking it. So by merely repeating the words 'God, God' we cannot hope to attain realization. We must strive and practice. (*'খাবার, খাবার' করে চেঁচানো এবং খাওয়া, 'জল, জল' বলে চেঁচানো এবং জল পান করা – এই দুটোর ভিতর আকাশ-পাতাল তফাৎ; সুতরাং কেবল 'ঈশ্বর, ঈশ্বর' বলে চেঁচালে কখনও ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির আশা করতে পারা যায় না। আমাদের ঈশ্বরলাভ করার চেষ্টা ও সাধন করতে হবে।*) ঠাকুর বলছেন, এমনি সময় টিয়া পাখি 'রাম, রাম' করে কিন্তু বেড়ালে যখন ধরে তখন 'ট্যাঁ ট্যাঁ' করে চেঁচায়। কিছুক্ষণের জন্য হয়তো ঈশ্বরের নাম করল, বাকি সময়টা যে কি করে, আমরা নিজেরাই ভেবে দেখতে পারি। স্বামীজী তো বলছেন না যে, তোমরা ঈশ্বরের নাম করো না। অবশ্যই করতে বলছেন, কিন্তু জানবে, ফল যদি পেতে হয়, তাহলে পুরোটাই ঈশ্বরের নামে ডুবে থাকতে হবে। ঠাকুর বলছেন, মুখে সিদ্ধি সিদ্ধি বললেও কিছু হয় না, গায়ে সিদ্ধি ঘষলেও কিছু নেশা হয় বা। সিদ্ধিকে বাটতে হয়, তারপর খেতে হবে, খাওয়ার পর নেশা হয়। বিছানায় শুয়ে আছে, শুয়ে থাকতে থাকতে তার খিদে পেয়ে গেছে। ফ্রীজে খাওয়ার আছে, সেটাকে বার করে রান্নাঘরে গিয়ে গ্যাস ধরিয়ে ওভেনে গরম করতে হবে, তারপর খেলে তার খিদেটা মিটবে। কিন্তু বিছানায় শুয়ে যতই ঠাকুরের নাম করুক, যতই ঠাকুরের শরণাগত হয়ে থাকুক, আমি দীন হীন, আমি তোমার ভক্তবৎসল, আমায় কৃপা করুন বলে যতই প্রার্থনা করুক, গরম খাবার কোন দিন তার কাছে এসে হাজির হয়ে যাবে না – *ন হি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশ্যন্তি মুখে মৃগা*, ঘুমন্ত সিংহের মুখে কোন হরিণ এসে ঢুকে যাবে না। মৃগকে মুখে নিয়ে আসার জন্য সিংহকে জাগতে হবে, জেগে শিকারে যেতে হবে।

মূল কথা খাটতে হয়, না খাটলে কিছুই জুটবে না। প্রত্যেক ধর্মই এই বিষয়ের উপর কথা বলে। যারা বা যে শাস্ত্র ঈশ্বর লাভের শর্টকাট পথের কথা বলে, বুঝতে হবে এরা সব গোলমেলে। ভারতে ঘুরলে এই ধরণের যোগী, বাবাজী প্রচুর পাওয়া যাবে, যারা তিন দিনে ঈশ্বর লাভ, তিন দিনে নির্বিকল্প সমাধি করিয়ে দেওয়ার কথা বলে। খুব সিরিয়াস কোন সাধু বা সন্ন্যাসীরা যদি বলেন, ঈশ্বর দর্শনের সহজ উপায় আছে, শুনতেই সহজ মনে হবে, কিন্তু তাঁদের সহজ উপায়ের উপর লেখা পড়ার পর অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে, তখন মনে হবে, এতো মোটেই সহজ পথ না। কিন্তু বাকিরা যারা তিন দিনে ঈশ্বর লাভ করিয়ে দিচ্ছে, এরা সবাই কিন্তু সরাসরি মানুষকে ধাপ্পা দিচ্ছে। সব ধর্মের গ্রন্থই বলছে, খাটতে হয়। সেইজন্য যেখানেই সহজ উপায় বাতলে দিচ্ছে, তাদের একেবারেই বিশ্বাস করা যায় না।

এরপর বলছেন, Only by the wave falling back into the sea can it become limited, never as a wave can it be so. Then after it has become the sea, it can become the wave again and as big a one as it pleases. Break the identification of yourself with the current and know that you are free. (*সমুদ্রের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেলেই তরঙ্গ অসীমত্ব লাভ করতে পারে, কিন্তু তরঙ্গরূপে নয়। তারপর সমুদ্রস্বরূপ হয়ে গিয়ে আবার তরঙ্গাকার ধারণ করতে পারে ও যত বড় ইচ্ছা তত বড় তরঙ্গ হতে পারে। নিজেকে তরঙ্গপ্রবাহ বলে মনে করো না, জেনো যে তুমি মুক্ত।*) স্বামীজীর এটা একটা খুব interesting statement। আমরা যাঁদের সিদ্ধ পুরুষ মনে করি, সেই সিদ্ধ পুরুষরা দুই প্রকার হন – এক হলেন, যিনি সাধনা করে সিদ্ধি লাভ করেছেন; দ্বিতীয় হলেন, যাঁরা ঠাকুরের মত বা যীশু খ্রীষ্টের মত, যেখানে ভগবান নিজেই এনাদের দেহ নিয়ে অবতীর্ণ হন এবং মানুষকে দেখিয়ে দেন কিভাবে সাধনা করবে। তার মানে যাঁদের সিদ্ধি হয়েছে অর্থাৎ যাঁদের ঈশ্বর দর্শন হয়েছে, তাঁর দু ধরণের হয়ে যান, এক যাঁরা ঠাকুরের মত আর যাঁরা লাটু মহারাজের মত। সমুদ্র আর তার তরঙ্গ স্বামীজীর খুব প্রিয় উপমা, শুধু দেববাণীতেই না, পুরো বাণী ও রচনাতে এই উপমাকে তিনি অনেকবার নিয়ে এসেছেন। স্বামীজী এক একটা ব্যক্তিত্বকে সমুদ্রের তরঙ্গের মত দেখছেন। আবার সৃষ্টির এক একটা চক্রকে ঢেউএর মত দেখছেন। আবার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে একটা ঢেউএর মত দেখছেন। ব্যাখ্যা করার জন্য তিনি এভাবে ঢেউএর উপমা নিয়ে আসছেন।

এখানে এক একটি ব্যক্তিকে তিনি ঢেউ রূপে দেখাচ্ছেন, সচ্চিদানন্দ সাগরে তুমি একটা ঢেউ। তুমি নিজেকে যত বড় ঢেউ মনে করে নিতে পারো, করে নাও, কিন্তু জানবে যত বড় ঢেউ-ই হও না কেন, তুমি

সীমিত। আমরা সবাই শরীর, ইন্দ্রিয়, মন দিয়ে সীমিত। তুমি এবার শক্তি বাড়াতে চাইছ। আগে আমরা আলোচনা করেছি, জপ-ধ্যান করলে শক্তি বৃদ্ধি হয়, মন একাগ্র করলে শক্তি বাড়ে। তাছাড়া একটা কাজ অনেক দিন ধরে করে গেলে সেই কাজে শক্তি বাড়বে। নানা ভাবে শক্তি বৃদ্ধি করা যেতে পারে। স্বামীজী বলছেন, তুমি যে এখন নিজেকে সংসারের সব কিছুর সাথে নিজেকে জুড়ে রেখেছ, জো সো করে এই জুড়ে রাখাটা ভাঙো। সমুদ্রের একটা ঢেউকে যদি ভেঙে দেওয়া হয়, ঢেউএর যে ঢেউ-ত্ব, তার যে আকার রয়েছে, তার যে জল রয়েছে, তার যে একটা নাম রয়েছে, এগুলো যখন ভেঙে গেল তখন ঢেউটা কি হবে? কি আর হবে, সমুদ্র হয়ে যাবে। যেটা এতক্ষণ সীমিত ছিল, সেটাই এখন হয়ে গেল অসীম। এখানে কি পরিবর্তন হল? কোন পরিবর্তন হয়নি। যখন ঢেউ ছিল, তখনও জল ছিল, যখন ঢেউ নেই তখনও জল। ওর উপর যে কতকগুলি উপাধি চাপিয়ে ওকে সীমিত করে দেওয়া হয়েছিল, সেই উপাধি চলে গিয়ে অনন্ত হয়ে গেল। আমরা সবাই ঈশ্বরের সঙ্গে এক, কিন্তু আমাদের উপর নাম-রূপ আর উপাধি চাপিয়ে একটা সীমা টেনে দেওয়া হয়েছে। নাম-রূপ থাকলেই গুণ থাকবে, গুণ থাকলে দুর্গুণ থাকবে, নাম-রূপ, গুণ-দুর্গুণ থাকলে কর্ম থাকবে। কর্ম থাকলেই সুকর্ম, দুষ্কর্ম, কুকর্ম সব আসবে। সুকর্ম কুকর্ম যত আসবে ওর অনন্ত ভাবের উপর সান্তের ভাব আরও চাপতে থাকবে, সঙ্কীর্ণ থেকে সঙ্কীর্ণতম, ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম হতে থাকবে। ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ হতে যদি চাই তাহলে এই সঙ্কীর্ণতাকে ভাঙতে হবে। যত নিজেকে ভাঙবো, তত দেখব আমি বৃহৎ হয়ে যাচ্ছি।

কাঠগোলায় প্রচুর কাঠ রাখা আছে, সেখানে কাঠ কাঠ হয়েই পড়ে থাকে। একজন মিস্ত্রি একটা কাঠকে নিয়ে গিয়ে চেয়ার বানিয়ে দিল। অর্থাৎ ঐ কাঠকে পরিশ্রম করে ওর উপর যে একটা সীমিত ভাব ছিল, সেই ভাবকে সরিয়ে দেওয়া হল। কাঠের একটা স্বতন্ত্র ভাব এসে গেল। ঐ চেয়ার এখন চেয়ার, তার সাথে একটা কাঠ। কাঠ রূপেও ওর একটা দাম আছে, চেয়ার রূপেও একটা দাম আছে। ঐ চেয়ারকে যদি সুন্দর করে আরও অনেক রকম নকশা করে বানানো হয়, যত ওর উপর কাজ হচ্ছে তত specialized হয়ে যাচ্ছে। আমরা বলছি ওটা special, কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি না যে, ওটা আরও universal হয়ে যাচ্ছে। কারণ কাঠ রূপেও ওর identity আছে, চেয়ার রূপেও identity আছে, অলঙ্কৃত চেয়ার রূপেও identity আছে। এবার ঐ চেয়ারকে একটা রাজসিংহাসন বানিয়ে দেওয়া হল, ওর দাম আরও বেড়ে গেল। দাম বেড়ে যাওয়াটা শুধু specialityর জন্য না, দাম এই জন্য বাড়ছে, কারণ সে আরও universal হয়ে যাচ্ছে। আসল universal যেটা, সেটা হল individual। আমরা যে অর্থে individual মনে করি সেই অর্থ এই individual নয়; সত্যিকারের যিনি individual তিনি সব সময় universal।

মধ্যপ্রদেশে এক অজানা অচেনা জায়গায় একটা বড় সেমিনার হচ্ছে, সেমিনার হচ্ছে জগদীশচন্দ্র বোসকে নিয়ে। জগদীশচন্দ্র বোস উনি কলকাতায় বড় হলেন, কলকাতায় পড়াশোনা করলেন, কিন্তু আসলে তিনি সারা দেশের, পুরো দেশের লোকেরা তাঁকে নিজেদের লোক মনে করে। স্বামীজী কলকাতার ছেলে, কলকাতায় বড় হলেন, কিন্তু আমেরিকায় তাঁর যারা ভক্ত তারা স্বামীজীকে নিজের লোক মনে করছে। সাধনা করে, খাটা-খাটনি করে যত বড় হবে তত একদিকে সে কিন্তু জনগণ থেকে আলাদা হচ্ছে। জনগণ থেকে যতটা আলাদা হবে, ততটাই তার বিস্তার হচ্ছে। এটা লোকেরা কিছুতেই বুঝতে পারে না যে, individuality আর inclusiveness দুটো এক জিনিস। Individuality যদি exclusive বানায় তাহলে বুঝতে হবে কিছু গোলমাল আছে। যখন এমন একটা তার বৈশিষ্ট্য যেটা আর কোন কাজে লাগবে না, তার দাম আর বাড়বে না, তখন বুঝতে হবে কিছু একটা গোলমাল হচ্ছে। আধ্যাত্মিক জীবনেও এই জিনিসটাই হয়। যখন সাধনা করতে শুরু করে, ধীরে ধীরে সে লোকজনদের থেকে আলাদা হতে শুরু করে। কিন্তু যত আলাদা হচ্ছে ওর দাম তত কিন্তু বাড়ছে। দাম বাড়ছে এই জন্য, সে আরও বিশ্বজনীন হয়ে যাচ্ছে বলে।

সমুদ্রের ক্ষেত্রে কি হয়, ঢেউটা নিজেকে ধীরে ধীরে নাশ করছে, নিজের আমিত্বকে যত নাশ করছে তত সে ইউনিভার্সাল হয়ে যাচ্ছে। ইউনিভার্সাল হলো বুঝলাম কিন্তু তা হলোটা কি? কি হলো, সেটাই স্বামীজী এখানে বলছেন। হিন্দুদের মতে মৃত্যুর পর আবার জন্ম নিতে হবে। যতক্ষণ মুক্তি না হয়ে যাচ্ছে, ততক্ষণ জন্মালে মরতে হবে, মরলে আবার জন্ম নিতে হবে। তাহলে ঢেউটা তো সমুদ্রে মিশে গেল, তাত কি হল? আবার যখন উঠবে সেটাও তো একটা ঢেউ হয়েই উঠে আসবে। না, স্বামীজী বলছেন, এবার যখন তুমি উঠবে,

as big a one as it pleases, এবার যখন দাঁড়াবে তখন সে যেমন শক্তি চায় তেমন শক্তি নিয়ে উঠবে। যদি শ্রীরামচন্দ্র হয়ে উঠতে চায়, সেই রামচন্দ্রের শক্তি নিয়ে উঠে আসবে। ভগবান বুদ্ধের মৈত্রী, করুণা, ভালবাসা নিয়ে যদি উঠতে চায়, তখন ঐ ভালবাসা নিয়েই উঠবে। যেটা চাইবে, সেটা নিয়েই উঠবে। সেইজন্য বলা হয়, অবতার যখন আসেন, তিনি সত্ত্বগুণ, রজোগুণ বা তমোগুণের একটা বা এগুলোর মিশ্রণ করে ওটাকে আশ্রয় করে আসেন। তাহলে সাধু মহাত্মাদের কি হয়? ঐ একই জিনিস হয়। যখন সচ্চিদানন্দ সাগরে ডুব মারে, যদি পুরোপুরি সে সচ্চিদানন্দ সাগরে মিশে যেতে পারে, তিনি তো বেঁচেই আছেন, মরার তো কথাই নেই, পরের বার যখন উঠবেন তখন তিনি যেমনটি শক্তি চান, তেমনটি শক্তি নিয়ে উঠবেন।

ঠাকুরের কাছে আসার আগে স্বামীজীর সবই ভাল ছিল, কিন্তু ঠাকুরের সম্পর্কে আসার পর তিনি যে ভাবে নিজেকে পাল্টালেন; আজ একশ বছরের উপর পার হয়ে গেছে স্বামীজীর মহাসমাধির পর, ভারতবর্ষের এখনও উনি হলেন single idol। স্বামীজীর আদর্শকে নিয়ে দেশে বেশী বাগবিতণ্ডা হয় না। কম্যুনিস্টরা স্বামীজীকে নিজের মত করে নিয়ে দেখে, কংগ্রেসরা নিজের মত করে দেখে, বিজেপি নিজের মত করে দেখে। দুদিন আগে জানা গেল জেএনইউতে স্বামীজীর মূর্তি বসানো ফাইনাল হয়ে গেছে। এখন জেএনইউ হল মার্কিস্টদের দখলে, তাদেরও এখন কিছু করার নেই, স্বামীজীর বিরুদ্ধে তো সরাসরি কিছু বলতে পারছে না। এই সেই শক্তি, এমন এক শক্তি নিয়ে উঠলেন যে ভারতে কেউ দাবাতে পারছে না। রামকৃষ্ণ মিশনকে নিয়েও স্বামীজী বলে গেছেন, অন্তত ভারতে কেউ একে দাবাতে পারবে না। এগুলো কোন আবেগবশতঃ আলোচনা নয়, একটা ঘটনার ভিত্তিকে আধার করে বলা হচ্ছে। স্বামীজীর মত উচ্চকোটির মানুষরা যখন সচ্চিদানন্দ সাগরে ডুব মারেন, তখন তাঁদের উপরে আসার আর কোন দরকার থাকে না। যেমন আমরা আগে কুয়োর কথা বললাম, যে কুয়ো খনন করে নিয়েছে তার আর ঝুড়ি, কোদাল, দড়ি লাগবে না। যিনি জেনে গেছেন তিনি আত্মা, তাঁর আর ঘুরে এই জগতে আসার দরকার নেই। কিন্তু তিনি যদি ঠিক করেন আমাকে জগতের মঙ্গল করার জন্য আসতে হবে, তখন তিনি কি করতে চান, কিভাবে করতে চান, এবং এর জন্য কতটা শক্তি দরকার, সব কিছু তিনি নিজের মত ঠিক করে চলে আসেন। জগতে আসার পর তাঁকে আর কেউ দাবাতে পারবে না। তাঁকে লোকেরা ফাঁসি দিয়ে দিতে পারে, ক্রুশিফাই করে দিতে পারে, হাজারটা রোগ হয়ে যেতে পারে, না খাইয়ে রাখতে পারে কিন্তু ঐ শক্তির সামনে সবাইকে মাথা নোয়াতে হবে।

একটা খুব মজার কথা আছে। কেউ যদি আমার সাথে কখন অবিচার করে থাকে, তার কাছে আমি ভবিষ্যতে যতই বিচার চাই, কোন দিন সুবিচার পাবো না। তাহলে উপায় কি? উপায় হল শক্তি অর্জন করা, যাতে সে আমাকে মানতে বাধ্য হয়। সংসার অবিচার করে, মহাপুরুষরা যখন দেখেন সংসার মানব ও মানবতার প্রতি অবিচার করছে, তখন তাঁরা জানেন সংসারের কাছে বিচার চেয়ে কোন লাভ হবে না। বন্দুকের নলই শক্তির উৎস, এই মতবাদের বিশ্বাসীরা বন্দুক নিয়ে সমাজের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। কেন? আমাদের বিচার চাই। যে সমাজ সবাইর অবিচার করে গেছে, সেই সমাজ করবে বিচার! কোন দিন করবে না, যতই তুমি বল বন্দুকের নলই হবে শক্তির উৎস। কারণ সমাজের ক্ষমতায় এবার যে আসবে, সে এবার অবিচার করবে। বন্দুকের নল থেকে শক্তি বেরিয়ে আসবে ঠিকই, কিন্তু ট্রিগারে কার আঙুল ঢুকে আছে, আর নল কার দিকে তাক করা আছে, সেটার উপর বিচার নির্ভর করে। ক্ষমতাটা পাল্টাতে থাকে, কিন্তু প্যাটার্নটা কোন দিন পাল্টাবে না। তখন উপায় হল, অন্য ধরণের শক্তি অর্জন করতে হয়। আধ্যাত্মিক শক্তিই অন্য ধরণের শক্তি, এই শক্তিকে যখন অর্জন করে আনা হয়, তারপর যখন উঠবে, ঐ শক্তির সামনে কেউ দাঁড়াতে পারবে না।

সচ্চিদানন্দ অনন্ত, তাঁর শক্তিও অনন্ত, তিনি চাইলে সমুদ্রের পুরো শক্তিকে নিয়ে আসতে পারেন। শীতকালে নদীগুলোকে কত শান্ত, স্নিগ্ধ লাগে, তির্ তির্ করে মৃদু মৃদু জল বয়ে যাচ্ছে। আর বর্ষাকালে যখন দু কুল ছাপিয়ে বন্যা হয় তখন সেই নদীর চেহারাটাই পুরো পাল্টে যায়। লোহার বড় বড় বীম্, কংক্রীটের ঐ বিশাল বিশাল থাম নিমেষে দুমড়ে মুচড়ে ভাসিয়ে নিয়ে চলে যায়। ঐ শক্তি একজোট হয়ে বন্যার সময় যখন ধাক্কা মারে সব তছনছ করে দিয়ে বেরিয়ে যায়। স্বামীজী তাই বলছেন, break the identification, কিন্তু এখানে এসেই আমরা হয়ে যাই সিংহ থেকে ইঁদুর, আমাদের শক্তি নেই, কারণ আমি নিজেকে কয়েকটা জিনিস মধ্যে ধরে রেখে বলছি, আমি এই, আমি অমুক, আমি সেই, ইত্যাদি। আমার সোনার হরিণ চাই, সোনার

হরিণের বাইরে আমরা কিছুতে যাবো না, সেইজন্য আমাদের শক্তি নেই। ঐ identification গুলিকে ভাঙলে আমাদের মধ্যেও শক্তি আসতে শুরু হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা সবাই চাইছি, আমার সব কিছু যেন ঠিক থাকে – আমি নিজে যেন ঠিক থাকি, আমার স্ত্রী, সন্তানরা যেন ঠিক থাকে, আমার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স যেন ঠিক থাকে, এগুলোকে ঠিকঠাক রাখতে যেটুকু শক্তি দরকার, ঐটুকু শক্তি পেয়ে গেলেই হল। এনারাও মিষ্টি করে বলে দেন, হ্যাঁ সব ঠিক থাকবে, তাঁরাও জানেন এদের কিছুই হবে না। কিছু হবে না, বলে দিলে আরও ভেঙে পড়বে, তাই ঐভাবে বলে দিতে হয়। রোগীকে দেখে ডাক্তার বুঝে যান যে, এর রোগ ভাল হওয়ার নয়, কিন্তু তাও বলেন, চিন্তার কিছু নেই, ওষুধ খেয়ে যাও সব ঠিক হয়ে যাবে।

স্বামীজী ঈশ্বর ও তাঁর দর্শন নিয়েই বলে যাচ্ছেন, True philosophy is the systematizing of certain perception. (*প্রকৃত দর্শনশাস্ত্র হল – কতকগুলি প্রত্যক্ষানুভূতিকে প্রণালীবদ্ধ করা।*) প্রত্যক্ষ অনুভূতিকে নিয়ে আমরা আগেও অনেক আলোচনা করেছি, সেখানে বলা হয়েছিল, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমরা যা কিছু অনুভূতি পাই, সেটা জ্ঞানে কিভাবে রূপান্তরিত হয়। আমাদের কাছে প্রচুর তথ্য আছে, যেমন ইন্টারনেটে প্রচুর তথ্য দেওয়া আছে, যা যা জানতে চাই, সবটাই দেওয়া আছে। ইন্দ্রিয়ের কাছেও তাই, কিন্তু এখানে আমরা সবটা প্রণালীবদ্ধ করে দিচ্ছি, যেগুলোকে আমরা সামলাতে পারব না, বা যেগুলো আমার কোন কাজে লাগবে না, সেগুলোকে আমরা সরিয়ে দিই। ইন্টারনেটেও আমরা তাই করি, ইন্টারনেটে কোটি কোটি সাইটস্‌ রয়েছে, কিন্তু আমরা কয়েকটা সাইটসের মধ্যেই ঘোরাফেরা করি। ইন্দ্রিয়ের কিছু অনুভূতিকে যখন প্রণালীবদ্ধ ভাবে রাখা হয়, আমরা তখন ওটাকে দর্শন বলি। বেদান্ত দর্শনও একই জিনিস, বেদান্ত দর্শন, অদ্বৈত দর্শনকে নিয়েও প্রচুর সমালোচনা আছে। গোঁড়া বৈষ্ণব ভক্তরা তো দিনরাত অদ্বৈত দর্শনকে গালাগাল দিয়ে যাচ্ছে। মনুস্মৃতিকে নিয়ে সবাই সব সময় গালাগাল দিয়েই যাচ্ছে। খোঁজ নিলে দেখা যাবে আদৌ তারা মনুস্মৃতি পড়েনি। কোথায় কোন লেকচারে, কোন ম্যাগাজিনে কে কি লিখেছে সেটা পড়ে মনুকে গালাগাল দিয়ে যাচ্ছে। এভাবে তো কোন জ্ঞান হয় না। যার সমালোচনা করবে, আগে তার দর্শনটা, তার বক্তব্যটা ভাল করে জানো, তবে তো তুমি তার বিরুদ্ধে বলতে পারবে।

খুব উচ্চমানের নামকরা এক ম্যাগাজিনে একটা আর্টিকেল বেরিয়েছে, সেখানে লেখক বলছেন, আমি কয়েকজন বড়লোককে জিজ্ঞেস করেছি, যদি আপনি ইতিহাসে গিয়ে জন্মাতে চান, তাহলে আপনি কি পরিবর্তন করতে চাইবেন? অনেকে ভাল ভাল কথা বলছেন, একজন বলছেন, আমি মনুর সময়ে জন্মাতে চাই, আর মনুকে বলব, আপনি যে এই আলতু-ফালতু কথা লিখেছেন, এই ধরণের কথা যেন আর না লেখেন। যিনি এই কথা বলছেন, তিনি আসলে জানেনই না যে, মনু আদৌ কিছু লেখেননি। অত নামকরা জার্নাল, তার মধ্যে এই ধরণের ভুলভাল কথা ছাপাচ্ছে। যে ভদ্রলোক এই কথা বলছেন, সে কি আদৌ মনুস্মৃতি একবারও পড়ে দেখেছেন। সারা বিশ্বের lawgiverরা বলেন মনুর মত এত লিবারাল মানুষ আজ পর্যন্ত কেউ হয়নি। এ এল বসন নামকরা ঐতিহাসিক, তিনি লিখছেন মনুর মত আজ পর্যন্ত সারা বিশ্বে lawgiver হয়নি। একজন শিল্পী স্বামীজীর একটা মূর্তি বানাচ্ছিল। মডেল বানানোর সময় একটা গাল ঠিক হয়তো আরেকটা গাল অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে। কিছুতেই দুটো গাল মেলানো যাচ্ছিল না। শেষ কলকাতা থেকে একজন বড় শিল্পীকে নিয়ে যাওয়া হল। উনি পান চিবোতে চিবোতে একটা গাল সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করে দিলেন। তখন তাঁকে বলা হল, 'এটাতো ঠিক করে দিলেন, এবার এই গালটাকে ঠিক করুন'। তখন ওটাকে ঠিক করতে গিয়ে আগের গালটা বেঁকে যাচ্ছে। একটাতে সবাই ওস্তাদি করে দেবে, একটা আইন, একটা বিষয়কে নিয়ে যে কোন লোক বলে দিতে পারে। তুমি পুরো পিকচারটাকে নিয়ে এসো। বাক্‌স্বাধীনতা সবাই চায়, কিন্তু আমারও তো বাঁচার স্বাধীনতা আছে। তোমার গালাগাল দেওয়ার যদি অধিকার থাকে, তাহলে আমারও অধিকার আছে তোমাকে গালাগাল দেওয়ার। তুমি গালাগাল দেওয়ার সময় সব ঠিক আছে, আমি গালাগাল দেওয়ার সময় সব অন্য রকম হয়ে যাবে। এভাবে কিছু চলতে পারে না। বড় বড় সব পণ্ডিতরা মিলে ভারতের সংবিধান রচনা করলেন। পঞ্চাশ বছরে একশোটার উপর তার সংশোধন হয়ে গেল। ইন্দিরা গান্ধী তার fundamental principlesকেই পাল্টে দিলেন। তারা আবার মনুকে গালাগাল দিচ্ছে।

বলছেন, শেষ পর্যন্ত আমরা প্রত্যক্ষানুভূতিকে যেভাবে প্রণালীবদ্ধ করি, সেটাই দর্শন হয়ে যায়। কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে আর কোন কিছুকে প্যাটার্নে ফেলা যায় না। যতক্ষণ প্যাটার্নে আসতে থাকবে, ততক্ষণ ওটা কোন ধর্মই না। সেটাই স্বামীজী পরের বাক্যে বলছেন, Intellect ends where religion begins, খুব নামকরা কথা। যতক্ষণ আমাদের মস্তিষ্ক কাজ করছে, যতক্ষণ আমাদের মস্তিষ্ক প্যাটার্ন খুঁজে যাচ্ছে, বুঝতে হবে ধর্ম এখনও শুরু হয়নি। তাহলে শাস্ত্র পড়া? শাস্ত্র পড়াটাও মস্তিষ্কের কাজের মধ্যেই, ধর্ম শুরু হয়নি। জপ-ধ্যান? ওটাও মস্তিষ্কের কাজের আওতায় পড়ে, ধর্ম শুরু হয়নি। ধর্ম কখন শুরু হয়? মনের কাজকর্ম যখন কমতে শুরু হবে। কমতে কমতে একটা জায়গায় পোঁছে যাবে, যেখানে ঠাকুর বলছেন, তুমিই আছো, তুমি ছাড়া আর কিছু নেই। মন তখন কোন কিছুকেই তার খাপে খাপে রাখার চেষ্টা করছে না। কথামৃতে ঠাকুর বলছেন, যেখানেই শান্তি, সেখানেই 'তিষ্ঠ'। মন পুরোপুরি শান্ত হয়ে গেছে; শুধু একটা কিংবা দুটো চিন্তনকে নিয়ে আছে। এবার তার ধর্ম শুরু হয়ে গেছে। এদিক ওদিক ঘোরাঘুরিটা বন্ধ হয়ে গেছে। এটা কি, ওটা কেন, সেটা কিভাবে, এই ধরণের হাজারটা জিনিস যতক্ষণ চলছে মানে, মন এখনও তথ্য সংগ্রহ করে যাচ্ছে; ধর্ম এখনও শুরু হয়নি। সেইজন্য স্বামীজী বলছেন, Inspiration is much higher than reason, but it must not contradict it. (*সমাধি বা ঈশ্বরভাবাবেশ যুক্তিবিচারের চেয়ে ঢের বড়, কিন্তু ঐ অবস্থায় উপলব্ধ সত্যগুলি কখনও যুক্তিবিচারের বিরোধী হবে না।*) আগে আমরা এর উপর একটা লম্বা আলোচনা করেছি।

একটা খুব সাধারণ জিনিস শুধু মনে রাখলেই হয়ে যাবে। বেদান্তের দৃষ্টিতে বিচার করলে দুটো সত্তা আসে, একটা মনের সত্তা, আরেকটা আত্মার সত্তা। মন যত সক্রিয় থাকবে, আত্মার প্রকাশ তত কম হবে। মন যত শান্ত হয়ে আসবে, আত্মার প্রকাশ তত বেশি হতে থাকবে। মনের সক্রিয়তাকে আমরা সব সময় বলি self effort। মন বলতে আমরা সব সময় বলছি চেষ্টা, মন বলতে আমরা বলি কর্ম, মন বলতে আমরা বলি পূর্বজন্মের কর্ম। তার মানে মন যতক্ষণ আছে ততক্ষণ চারিদিকে আমরা যত রকম কথা শুনি সবটাই মন। জপধ্যান মন, শাস্ত্রপাঠ মন, পূজা অর্চনা মন, যোগাভ্যাস মন, সব কিছু মনের আওতার মধ্যে আসছে। আত্মা মানে, যেখানে মনের সক্রিয়তা থেমে গেল।

যখন বলছি, সব ঠাকুরের ইচ্ছা, এই কথা কে বলছে? মন বলছে। তার মানে, ঠাকুরের ইচ্ছা, এটা তার মুখের কথা। সব ঠাকুরের ইচ্ছা ঠিক ঠিক যে জেনে গেছে, সেখানে এই কথা তার মন বলবে না। যতক্ষণ বিচার করছে, এটা ঠাকুরের কৃপায় হয়েছে, বুঝতে হবে ওটা ঠাকুরের কৃপায় হয়নি, মনের কৃপায় হয়েছে। কারণ মন ধরে নিচ্ছে যে, এটা ঠাকুরের কৃপায় হয়েছে। তার মানেই এটা ঠাকুরের কৃপায় হয়নি। শেষ পর্যন্ত বিচারে গিয়ে দাঁড়ায়, সবটাই ঠাকুরের কৃপা বা ঠাকুরের ইচ্ছাতে হচ্ছে। কিন্তু যতক্ষণ আমি মনকে মানছি, ততক্ষণ মনের চেষ্টা থাকবে, ঠাকুরের কথায় কাঁচা আমিত্ব রয়েছে, আর এগুলো সব কাঁচা আমির মধ্যে পড়ে। আমরা যখন বলছি সব ঠাকুরের ইচ্ছা, ওটাও কাঁচা আমির মধ্যে পড়ে, কারণ আমার মন গিয়ে ওটাকে ধরছে। যখন কিছুতে ধরা যায় না, এটা কি করে সম্ভব হল, তখন ঐ জায়গাতে মন থেমে যায়। তখন ঠাকুরের ইচ্ছা হতে পারে। ঠিক ঠিক ধর্ম কখনই যুক্তিতর্ক দিয়ে হয় না, শাস্ত্র পাঠে হয় না, শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনে বা করে হয় না, ভিতর থেকেই ধর্ম ওঠে। কোন ভিতর থেকে? যখন জপধ্যান, সাধনা, তপস্যাদি করে করে মন শুদ্ধ পবিত্র হয়ে গেছে। জপধ্যান করে করে মন একাগ্র হয়ে গেছে। তখন যে thoughts গুলো ওঠে, সেটাই হল inspiration, সেটাই হল intuition, সেটাই হল ঈশ্বরীয় কথা। তার আগে পর্যন্ত আমরা যা কিছু বলছি, সবটাই অপরের কথা বলছি। সবাই যাঁরা ঈশ্বরীয় কথা বলছেন, সবটাই তাঁরা কোথাও না কোথা থেকে বলছেন, কথামৃত থেকে বলছেন, স্বামীজীর বাণী ও রচনা থেকে বলছেন, এটা গীতা থেকে বলছেন, ওটা উপনিষদ থেকে বলছেন। ঈশ্বরীয় কথা কোথায়? ঈশ্বরীয় কথা হবে যখন তুমি বলবে। তুমি কি করে বলবে, তোমার তো মন এখনও শান্ত হয়নি। একই কথা তখন অন্য ভাবে আসবে, অন্য একটা শক্তি নিয়ে আসবে। ঠাকুরের কথাগুলো যে ঈশ্বরীয় কথা, কথামৃত পড়লেই বোঝা যায়। ঠাকুরের একটি কথা নেই যে শাস্ত্র থেকে আসছে, অথচ একটি কোন কথা নেই যেটা শাস্ত্রের বাইরে। স্বামীজীর যে কথাগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করে আসছি, তার একটি কথা নেই যে শাস্ত্র থেকে আসছে, অথচ একটি কোন কথা নেই যেটা শাস্ত্রের বাইরে। কারুর বোধ হয়েছে কি হয়নি, তার দুটো কথা শুনলেই বোঝা যায়।

স্বামীজী বলছেন, Reason is the rough tool to do the hard work; inspiration is the bright light which shows us all truth. The will to do a thing is not necessarily inspiration. (*যুক্তিবিচার মোটা হাতিয়ারের মতো, তা দিয়ে শ্রমসাধ্য কাজগুলি করতে পারা যায়, আর সমাধি বা ঈশ্বরভাবাবেশ উজ্জ্বল আলোকের মতো সমগ্র সত্য দেখিয়ে দেয়। কিন্তু আমাদের ভিতর একটা কিছু করবার ইচ্ছা বা প্রেরণা আসাকেই ঈশ্বরভাবাবেশ বলতে পারা যায় না।*) যেমনি ইচ্ছা এসে গেল, আমাকে এটা করতে হবে, এটা কখনই inspiration না। সাধারণ ভাবে আমরা কাজ করার সময় বলি, পুরো inspire নিয়ে এসে কাজ কর, যদি আধ্যাত্মিক ভাষা প্রয়োগ করে বলা হয়, তোমার অদম্য ইচ্ছাশক্তিকে লাগাও, এটা কখনই inspiration হবে না। Inspiration হল পুরো অন্য জগৎ। স্বামীজী দুটো বলছেন, একটা হল পরিশ্রম সাপেক্ষ কাজ, আমি খেটে কাজ করছি, এটা আমার ইচ্ছার উপরে, অর্থাৎ মনের এলাকা। কিন্তু জ্ঞান আসবে inspiration দিয়ে। পরিশ্রম করলে, পড়াশোনা করলে, যুক্তিতর্ক করলে কখনই জ্ঞান আসবে না। এগুলো সবই খাটনি, খাটনি মানে আবর্জনা পরিষ্কার করা। আসলটা কি আছে জানার জন্য প্রকাশ দরকার, সেই প্রকাশটাই inspiration।

The will to do a thing is not necessarily inspiration, যদি কেউ এসে বলে, জানেন, ঠাকুরের কথামৃত পড়ে মনে হয় ঠাকুরের ভাবে ডুবে যাই, বুঝতে হবে এটা ড্রামা, কথামৃত পড়ে একটা উদ্দীপন এসেছে, কিছুক্ষণ থেকে উড়ে যাবে, এটা inspiration নয়। কারণ এখানে will এসে গেছে। কেশব সেন বলছেন, ইচ্ছা করে সচ্চিদানন্দ সাগরে ডুবে থাকি। ঠাকুর শুনে বলছেন, তাহলে চিকের পিছনে যারা আছে তাদের কি হবে? ঠাকুর কিন্তু চিকের পিছনে যে মেয়েরা আছে তাদের নিয়ে বলছেন না। ঠাকুর কেশব সেনকে ব্যঙ্গ করে বলছেন, তুমি যেটা বলছ এটা inspired কথা না, এটা তোমার মুখের কথা। মনের কথা আর মুখের কথা একই। ভিতরের কথা হলে ঠাকুর কখনই এই রকম কথা বলতেন না। আবার ঠাকুরকে একজন বলছেন, আমি স্বপ্নে এই রকম দেখলাম। ঠাকুর শুনে বলছেন, শুনে আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে, তুমি শীঘ্রই মন্ত্র লও। কিন্তু কেশব সেনকে কেন এই রকম বলছেন? কারণ সেখানে কেশবের ইচ্ছা রয়েছে, ইচ্ছা মানে মন রয়েছে। নূতন বছরের প্রথম দিনে আমরা কত রকম প্রতিজ্ঞা করে থাকি, এই বছর এই ভাবে চলব, এই এই করব না, কত রকম প্রতিজ্ঞা। কিন্তু দুদিন যেতে না যেতেই সব প্রতিজ্ঞা এক পাশে পড়ে থাকে আর আমরা যেমন ভাবে দিন কাটাচ্ছিলাম, তেমন ভাবেই দিন গুজরান করতে থাকি। কারণ এগুলো কোনটাই inspire না, সবটাই ইচ্ছা। Inspiration যখন হয়, তখন সে আর ফিরে তাকাবে না, তার জ্ঞান হয়ে গেল। একটা জিনিস দিনের পর দিন দেখে যাচ্ছি বলেই যে আমার জ্ঞান হয়ে যাবে, তাতো হয় না। জ্ঞান যখন হয়ে যাবে, তখন আর সে পিছনে ফিরে তাকাতে যাবে না।

স্বামীজী এরপর বলছেন, Progression in Maya is a circle that brings you back to the starting point; but you start ignorant and come to the end with all knowledge. (*মায়ার ভিতর উন্নতি করা বা অগ্রসর হওয়াকে একটি বৃত্ত বলে বর্ণনা করা যেতে পারে – এতে এই হয় যে, যেখান থেকে তুমি যাত্রা করেছিলে, ঠিক সেখানে এসে পৌঁছাবে। তবে প্রভেদ এই যে, যাত্রা করবার সময় তুমি অজ্ঞান ছিলে, আর যখন সেখানে ফিরে আসবে তখন তুমি পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেছ।*) এখানেও আমরা আরেকবার ঢেউ আর সমুদ্রের উপমাটা মনে করতে পারি, ঢেউ আছে আর সমুদ্র আছে। মায়ার ভিতরে যে উন্নতি হয় তাতে আমাদের শুরু হয় অজ্ঞান থেকে, অগ্রসর হতে হতে মায়াকে ছাড়িয়ে আবার যখন মায়াতে ফেরত আসছি, তখন কিন্তু অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে, অজ্ঞান থেকে পূর্ণ জ্ঞান লাভ হয়ে গেছে। প্রথমে অজ্ঞানে পড়ে ছিলাম এখন পূর্ণ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, এই পরিবর্তনটা হয়ে যায়।

Worship of God, worship of the holy ones, concentration and meditation, and unselfish work, these are the ways of breaking away from Maya's net; but we must first have the strong desire to get free. (*ঈশ্বরোপসনা, সাধু-মহাপুরুষদের পূজা, একাগ্রতা, ধ্যান, নিষ্কাম কর্ম – মায়ার জাল কেটে বেরিয়ে আসবার এই-সব উপায়; তবে প্রথমেই আমাদের তীব্র মুমুক্ষুত্ব থাকা চাই।*) মায়ার জাল থেকে বেরিয়ে আসার জন্য, কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি, যোগ এগুলো দরকার, কিন্তু সবার

আগে দরকার একটা ইচ্ছা। ঈশ্বরকে জানার ইচ্ছা, ঈশ্বরকে পাওয়ার ইচ্ছা জাগা কি এতই সোজা! মুখে বলা যায়, লেকচারে বলা যায়, অপরকে ঠকানো যায়, নিজেকে ঠকানো যায়, কিন্তু এই কথা বলা, 'মাইরি বলছি আমি ঈশ্বর বৈ কিছু জানি না, জানতে চাই না', অত সহজ নয়। আমরা ঠাকুরের নাম করছি আমরা নিশ্চয়ই এগোচ্ছি। একজন মহারাজ বলতেন, একজনও সন্ন্যাসী নেই, যে কখনও না কখন ঠাকুরের জন্য দু ফোঁটা চোখের জল ফেলেনি, অবশ্যই ফেলেছে। যখন চোখের জল ফেলেছে, তখন তার মনে এই বিরাট ভাবটা জেগেছিল, আমি ঠাকুরের ভাব ছাড়া কিছু চাই না। ঐ ভাব তাকে একটা শক্তি দেবেই, কারণ কিছুক্ষণের জন্য সে সেই অনন্ত শক্তির কাছে চলে গিয়েছিল। সেই শক্তির জন্য তার অনেক কিছুতে সাফল্য আসবে, কিন্তু তাই বলে আমি ঈশ্বর বৈ কিছু চাই না, এই ভাবকে সব সময়ের জন্য ধরে রাখবে, অসম্ভব। স্বামীজী এটাই বলছেন, প্রথমে দরকার মুমুক্ষুত্ব।

জ্ঞান আমাদের স্বভাব, জন্মগত অধিকার নয়

The flash of light that will illuminate the darkness for us is in us; it is the knowledge that is our nature, (there is no 'birthright', we were never born), (*যে জ্যোতি দপ্ করে প্রকাশ হয়ে আমাদের হৃদয়ান্ধকার দূর করে দেবে, তা আমাদের ভিতরেই রয়েছে – এ হচ্ছে সেই জ্ঞান, যা আমাদের স্বভাব বা স্বরূপ ঐ জ্ঞানকে আমাদের 'জন্মগত অধিকার' বলা যেতে পারে না, কারণ প্রকৃতপক্ষে আমাদের জন্মই নেই।*) এটা খুব মজার ও হাস্যরসাত্মক। 'জন্মগত অধিকার' বলে কিছু হয় না, কারণ যার জন্মই নেই তার আবার জন্মগত অধিকার কি। যে অজ্ঞান আমাদের ঘিরে আছে, এই অজ্ঞান অন্ধকারকে দূর করার যে আলো, ঐ আলো আমাদের কাছেই আছে, কিন্তু আমরা ব্যবহার করি না। বাইবেলে যীশু সেই মেয়েদের কথা বলছেন, যারা বর আসার জন্য অপেক্ষা করে আছে, কিন্তু ওরা বর আসার আগেই প্রদীপের তেল জ্বালিয়ে শেষ করে দিয়েছে। যখন বর এসেছে, তখন তারা এর ওর কাছে তেল চেয়ে বেড়াচ্ছে, যাতে প্রদীপে জ্বেলে বরের মুখ দেখতে পায়, কিন্তু কে তাদের তেল দিতে যাবে! এর অর্থ হল, আমাদের মধ্যে সেই শক্তি বা আলো রয়েছে, যে আলো অন্ধকারকে সরিয়ে দেবে। তবে বাইবেলে যীশু একটা কাহিনী বলছেন, কাহিনীকে এখানে পুরোপুরি আক্ষরিক অর্থে নেওয়া যাবে না।

সেই শক্তি, সেই ক্ষমতা আমাদের মধ্যে সব সময় আছে, ফলে আমরা যখন চাইব অন্ধকার সরিয়ে দিতে পারব। শুধু দরকার, All that we have to do is to drive away the clouds that cover it. (*কেবল যে মেঘগুলো ঐ জ্ঞানসূর্যকে ঢেকে রেখেছে, সেইগুলো আমাদের দূর করে দিতে হবে।*) আবরণ আমাদের ভিতরের আলোকে আচ্ছাদন করে রেখেছে, ওটাকে সরিয়ে দিলেই আলো বেরিয়ে আসবে। কারণ জ্ঞান আমাদের স্বভাব। জন্মগত অধিকার আর স্বভাব, দুটোতে তফাৎ আছে। পৈতৃক সম্পত্তিতে আমাদের অধিকার থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের ভিতরে যে স্বভাব, যেমন একজন ভাল মানুষের ভিতরে দয়া আছে, তিনি কোন দিন বলতে যাবেন না, অপরে সেবা করা আমার জন্মগত অধিকার; কারণ সেবা করাটাই তার স্বভাব। জ্ঞান কখনই আমার জন্মগত অধিকার নয়, এটা আমার প্রকৃতি।

বেদান্তের অধিকারী

Give up all desire for enjoyment in earth or heaven. (*ইহলোকে এবং স্বর্গলোকে সর্বপ্রকার ভোগ করার বাসনা ত্যাগ কর ইহামুত্র-ফল-ভোগ-বিরাগ।*) বেদান্তের অধিকারী কে, এর উপর অনেক আলোচনা রয়েছে। কিন্তু অধিকারীর সংজ্ঞা এই একটি বাক্যে বলে দেওয়া হয়েছে, কে বেদান্ত পথে এগোতে পারবে – ইহামুত্র-ফল-ভোগ-বিরাগ। এখানে বা এই জগতে ভোগের বাসনা এবং মৃত্যুর পর স্বর্গসুখের কামনা, এই ধরণের সমস্ত কামনা-বাসনা যেন ত্যাগ হয়ে যায়। কামনা মানেই, আমরা ওখানে নিজেদের বেঁধে সীমিত করে রেখেছি, নিজেকে unlimited করতে হয়। মনের যে কোন কিছুর জন্য ইচ্ছা, বাসনাকে ত্যাগ করে নিজেকে unlimited করতে হয়। কেন, আমি তো কখনই স্বর্গ কামনা করি না। স্বর্গ তো কামনা করছ না ঠিকই, কিন্তু রাত্রিবেলা কানের কাছে রাস্তার একটা কুকুর সারাক্ষণ চিল্লাতে থাকে, ইচ্ছে করে ব্যাটাকে ডাণ্ডা দিয়ে আচ্ছা করে পেটাই, তবে গিয়ে আমি একটু শান্তি পাই। আমাদের বাসনা তো ঐ জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে

আছে। ভালমন্দ রান্না না হলে, চায়ে চিনি কম হলে মেজাজ গরম হয়ে যায়, আর এরা নাকি বলে আমার স্বর্গসুখ লাগবে না। পাঁচ মিনিট একটু একা একা শান্তিতে কাটাতে পারে না, এরা নাকি আবার আত্মজ্ঞান লাভ করতে চাইছে। পাড়ার একটা লোককে ভালবাসতে পারে না, সে নাকি বলছে আমি ঈশ্বরকে ভালবাসব। একজন যীশু খ্রীষ্টের কাছে এসেছে, যীশু তাকে বলছেন, আগে বাড়িতে গিয়ে ভাইয়ের সাথে ঝগড়া বিবাদটা মিটিয়ে এসো, তারপর আমার কাছে আসবে। বাড়ির বাবা-মার দেখাশোনা করতে চায় না, সে আবার নাকি সমাজসেবা করে। একজনের টাকা-পয়সা আছে কিনা, ক্ষমতা আছে কিনা, তার পোশাক, চেহারা দেখলে, গাড়ি-বাড়ি দেখলে লোকেরা বুঝে যাবে। কিন্তু ধর্ম ভাব ভিতরে কতটুকু আছে বাইরে থেকে দেখলে বোঝা যায় না, সেইজন্য ধর্মের ক্ষেত্রে ধাপ্পা দেওয়ার বিরাট সুযোগ পাওয়া যায়। আর মানুষ কি মাত্রায় যে ধর্মের নামাবলী গায়ে দিয়ে লোকেদের ঠকিয়ে যাচ্ছে, দেখলে আতঙ্ক লেগে যায়। যে পাঁচ মিনিট শান্ত ভাবে বসতে পারে না, সে নাকি অনন্ত কালের জন্য নির্গুণ নিরাকার হয়ে থাকতে চায়। আর এখন সবাই দু একটা লেকচার শুনে নেওয়ার পর অদ্বৈতের নীচে কোন কথা বলবে না, অদ্বৈতের নীচে সবটাই মিথ্যা। একবার এক ছটফটে ভক্ত এসে বলছে, I don’t believe in God with form, I believe formless God, ঠাকুর বলছেন, এদিকে তাঁতি আবার লম্বা লম্বা কথা; ইনি কোন কৃষ্ণ মানেন। কথামৃতে খুব সুন্দর বর্ণনা আছে। একটু নিজের দিকে তাকাও, নিজের মধ্যে কিছু পরিবর্তন অন্তত নিয়ে এসো, তারপর অদ্বৈতের কথা, বেদান্তের কথা বলো।

Control the organs of the senses and control the mind. Bear every misery without even knowing that you are miserable. (*ইন্দ্রিয় ও মনকে সংযত করদম ও শম। সর্বপ্রকার দুঃখ সহ্য কর, মন যেন জানতেই না পারে যে, তোমার কোনরূপ দুঃখ এসেছে তিতিক্ষ।*) দম ও শম, বাইরের ইন্দ্রিয়গুলি এবং ভিতরে মনের কামনা বাসনাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা। আর তিতিক্ষার কথা বলছেন, যে ধরণের কষ্টই আসুক সহ্য করে যাও, শুধু সহ্যই না, একেবারে নির্বিকার; কারুর বিরুদ্ধে কোন অনুযোগ, অভিযোগ পর্যন্ত মনের মধ্যে উঠবে না। আগে আগে আমরা কয়েকবার ষাঁড়ের গল্প বলেছিলাম। একটা ষাঁড়ের শিঙে একটা মশা এসে অনেকক্ষণ ধরে বসে আছে। পুরো নির্বিকার, কে নিন্দা করল, কে প্রশংসা করল, ঠাণ্ডা লাগছে, গরম লাগছে, কোন দিকেই নজর নেই। মনকে সব কিছু থেকে সরিয়ে, Think of nothing but liberation, চিন্তা একটাই থাকবে, আমি মুক্তি চাই, ওর নীচে আর কোন চিন্তা না, ভাবনা না, কথা না। Have faith in Guru, in his teachings, and in the surety that you can get free. Say ‘Soham, Soham’ whatever comes, (*গুরু ও তাঁর উপদেশের উপর বিশ্বাস রাখ। তুমি যে নিশ্চয়ই মুক্ত হতে পারবে, এটিও বিশ্বাস করশ্রদ্ধা। যাই হোক না কেন, সর্বদা বলো ‘সোহহম্, সোহহম্’।*) ভাল মন্দ জীবনে যাই আসুক, সর্বদা বলো সোহহম্, সোহহম্, তোমার ইষ্টমন্ত্র সব সময় জপ করে যাও। মনের মধ্যে ভাল মন্দের কোন চিন্তা আসতেই দিতে নেই। Tell yourself this even in eating, walking, suffering; tell the mind this incessantly, - that what we see never existed, that there is only ‘I’. (*খেতে, বেড়াতে, কষ্টে পড়েও বলো, সোহহম্ সোহহম্; মনকে অবিরতভাবে বলো – এই যে জগৎপ্রপঞ্চ দেখছি, কোন কালে এর অস্তিত্ব নেই, কেবল আমি-মাত্র আছি সমাধান।*) আমরা কেউই অদ্বৈতী নাই বা হলাম, কিন্তু সবাই তো আমরা নিজের নিজের ইষ্টমন্ত্র জপ করি, কারুর ইষ্ট শিব, কারুর ইষ্ট কৃষ্ণ। যার ইষ্ট শিব, সে শিব ছাড়া আর কিছু দেখবে না, সে খাচ্ছে, জেগে আছে, শুয়ে আছে, ঘুরছে, যাই করুক শিব বাদে কিছু নেই। ঠিক সেই রকম, যারা ঠাকুরের ভক্ত, ঠাকুরের মন্ত্র নিয়েছে, তাদেরও শুধু ঠাকুর আর ঠাকুর, ঠাকুর ছাড়া কিছু নেই। কিসের ভাল, কিসের মন্দ, কে আমাকে মারবে, যে মারছে, সেও তো ঠাকুর। যে আমার প্রশংসা করছে, সেও ঠাকুর। যাকে আমি আদর করতে যাচ্ছি, সেও ঠাকুর। এই ভাবকে জাগিয়ে না রাখতে পারলে মানুষ কখনই ধর্ম পথে এগোতে শুরু করবে না। এক সেকেণ্ডের যদি ফাঁক হয়ে যায়, সেখান দিয়ে মনের মধ্যে সংসার ঢুকে নৃত্য করতে শুরু করে দেবে।

Flash, - the dream will break! Think day and night, this universe is zero, only God is. Have intense desire to get free. (*দেখবে – একদিন দপ্ করে জ্ঞানের প্রকাশ হয়ে বোধ হবে – জগৎ শূন্যমাত্র, কেবল ব্রহ্মই আছেন। মুক্ত হবার জন্য প্রবল ইচ্ছাসম্পন্ন হও মুমুক্ষুত্ব।*) এইভাবে চিন্তা করতে করতে হঠাৎ একদিন দেখবে সব মোহভঙ্গ হয়ে গেছে, জগৎটা শূন্যমাত্র বোধ হবে। বেদান্তের

অধিকারী কে আলোচনা করতে গিয়ে মুমুক্ষুত্বকে নিয়ে বলছেন। সব সময় মনে রাখবে জগৎ যেটা দেখছ এটা শূন্য, ঠাকুরই সত্য। ঈশ্বরকে তুমি ব্রহ্ম রূপে দেখ, আত্মা রূপে দেখ, আর যাই রূপে দেখ তাতে কিছু আসে যায় না। সংসারকে শূন্য করতে হবে। আমরা অনেক সময় বলি, ওকে একটা শিক্ষা দিতে হবে, তেমন বলতে হবে জগৎকে একটা শিক্ষা দিতে হবে। কি ভাবে? জগৎকে উড়িয়ে দিতে হবে। কি করে উড়িয়ে দেবে? জগৎতো আছে, সামনে সব সময় দেখছি। ত্রিকাল মে জগৎ নহি হ্যায়, যে বেদান্তীরা বলে, ওদের থেকে ধাপ্পাবাজী আর কেউ হতে পারে না। ত্রিকাল মে জগৎ পুরা হ্যায়, কিন্তু ঈশ্বরই এই জগৎ হয়েছেন, তিনি নিজেই সংসার রূপ ধারণ করে সব কিছু হয়েছেন। এই জিনিসটাকে শুধু বুঝলেই হবে না, ব্যবহারিক জীবনেও এর প্রয়োগ করার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে, কিছু হলে আমাদের বলতে হবে, যা হয়েছে এটা ঈশ্বর, এটাও যা হয়েছে এটা ঈশ্বর। হঠাৎ একদিন দেখলো পর্দাটা সরে গেল। তখন দেখে, এতদিন ভেবে ভেবে যা করছিলাম, শাস্ত্র পড়ে পড়ে যে ধারণা গুলো তৈরী হয়েছিল, সত্যটাও তাই। কোথাও বেড়াতে যাবার আগে আমরা নেটে, বইতে সেই জায়গার ব্যাপারে কত খোঁজ খবর নিই। তারপর ম্যাপ দেখা হচ্ছে, ছবি দেখা হচ্ছে, কত রকমের রিসার্চ করি। সেই জায়গায় যাওয়ার পর দেখছি তাই তো, এই রকমই সব জেনেছিলাম। সব কিছু মিলে যাবে, কিন্তু ওখানে গিয়ে দেখার ব্যাপারটা পুরো অন্য রকম বোধ হবে, তার আনন্দটাই আলাদা।

সংসাররূপী পাতকুয়া - সমস্যা –সময় কাটানো

একই বিষয়ের উপর স্বামীজী বলে যাচ্ছেন। All relatives and friends are but 'old dry wells;' we fall into them and get dreams of duty and bondage, and there is no end. (*আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধব সব পুরানো অন্ধকূপের মতো; আমরা ঐ অন্ধকূপে পড়ে কর্তব্য, বন্ধন প্রভৃতি নানা স্বপ্ন দেখে থাকি – ঐ স্বপ্নের আর অন্ত নেই।*) ঠাকুর সংসারকে পাতকুয়ার সাথে তুলনা করেছেন, স্বামীজী সেই সংসারকে 'old dry wells' বলছেন। ঠাকুর বলছেন সংসারকে যখন পাতকুয়া আর আপনজনদের কাল সাপ মনে হবে, তখন ঈশ্বরে ভক্তি হবে। স্বামীজী আরেকটু নরম করে বলছেন, যত তোমার ভালবাসার জন আছে এরা সব পাতকুয়ার মত। এই পাতকুয়ার বিশেষত্ব হল, স্বপ্ন তৈরী করা। কিসের স্বপ্ন? যত রকম কর্তব্যের স্বপ্ন, বন্ধনের স্বপ্ন। বাবা-মায়ের প্রতি কর্তব্য, স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য, সন্তানের প্রতি কর্তব্য, বন্ধুবান্ধবদের প্রতি কর্তব্য। এই কর্তব্যের স্বপ্ন তৈরী করে আমাদের আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলে। এই ধরণের কথা শুনলে আমাদের আতঙ্ক লাগারই কথা, আর এই কারণেই মানুষ ধর্মের দিকে আসতে চায় না। কিন্তু এটাই সত্য। ঠাকুর হোমাপাখির গল্প বলছেন, আকাশে ডিম পাড়ে, আকাশেই ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোয়, তারপর মাটিতে পড়তে থাকে, যখন দেখে আমি মাটিতে গিয়ে পড়ছি, মাটিতে পড়লে আমি শেষ, তখন সে চোঁ চাঁ করে মায়ের দিকে দৌড় মারে।

তারপর বলছেন, Do not create illusion by helping anyone, আমরা মনে করছি আমি আমার বাবা-মাকে সাহায্য করছি, সন্তানকে বড় করছি; কিন্তু অরফ্যানরা কি বড় হয় না! ঠিক কেউ না কেউ এসে দেখাশোনা করে। আমাদের মনে রাখতে হবে, এই কথাগুলো সবার উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে না। এই কথা তাদের উদ্দেশ্যেই বলা হচ্ছে, যারা মন প্রাণ দিয়ে ঈশ্বরের দিকে এগোতে চাইছে। ঠাকুরের কাছে অনেকেই আসত, তাদের কাউকে তিনি বলছেন, অনেক কিছুই তো করা হয়ে গেছে, এখন কি ঈশ্বরের দিকে মন যাচ্ছে? বাবা-মায়ের দেখাশোনার একটা ব্যবস্থা হয়ে গেছে, সন্তানরা দাঁড়িয়ে গেছে, অর্থেরও চিন্তা নেই, চাকরি থেকে অবসর নিয়েছে। সব দিক দিয়ে একটা সুখের ব্যবস্থা হয়ে গেছে, কিন্তু এরপরেও কি ঈশ্বরের দিকে মন যায়?

'লাইফ অফ পাই' নামে একটা সিনেমা হয়েছিল। সেখানে পাই নামে একটি ইয়ং ছেলে ফ্যামিলির সাথে জাহাজে করে আমেরিকায় যাচ্ছে, সঙ্গে তার নিজের সখের চিড়িয়াখানাটাও নিয়ে যাচ্ছে। মাঝ সমুদ্রে এসে জাহাজটা গেল ভেঙে। কোন রকমে পাই একটা লাইফবোটে আশ্রয় পেয়ে গেছে। বাবা, মা সহ সবাই মারা গেছে। দু-চারটে পশুও ঐ লাইফবোটে আশ্রয় নিয়েছে। একদিন পর দেখছে ওর মধ্যে একটা বাঘও আছে। বাঘটা এক এক করে সব কটা পশুকে খেয়ে নিয়েছে। এখন পাইকে বাঁচতে হবে। বাঘটাকেও বাঁচিয়ে রাখছে, তাকে জল খাওয়াচ্ছে, টুকটাক কিছু খাবারও দিচ্ছে, নিজেও বেঁচে থাকছে; সাংঘাতিক বর্ণনা। যাই হোক এইভাবে ভাসতে ভাসতে অনেক দিন পর একটা দ্বীপে গিয়ে পৌঁছাল। ওখানে নেমেই পাই সেখান থেকে

পালিয়ে গেল। একজন আবার এই ঘটনাকে নিয়ে লিখছেন, ঐ বাঘটা যদি লাইফবোটে না থাকত, দুদিনের মধ্যেই লোকটি মারা যেত। সারাটা সময় ধরে করবে'টা কি! কিন্তু সব সময় দুশ্চিন্তা, বাঘটাকে দেখতে হবে, বাঘ থেকে বাঁচতে হবে, এই চিন্তা করে করে এতটা দিন তার কেটে গেল।

এটা সত্যিই খুব মজার জিনিস। আজকাল বেশীর ভাগ মায়েদের সমস্যা হল বাচ্চারা খেতে চায় না, ডাল-ভাত তো কোন মতেই খাবে না। আগেকার দিনেও এই সমস্যা ছিল। বাচ্চাকে খাওয়াবার সময় ওর পুরো খাবারটা তখন ছোট ছোট গ্রাস তৈরী করে এক নম্বর, দুই নম্বর বা রাম, শ্যাম, যদু, মধু বলে বলে খাওয়াতে হত। তোমাকে এতটুকু খেয়ে নিতে হবে, এই এক নম্বর, এই দু নম্বর, এই তিন নম্বর ব্যস্, তারপরেই আমরা বেড়াতে যাবো, এই করে করে বাচ্চাকে খাওয়ানো হত। বাচ্চাকে খাওয়ানো একটা বিরাট বড় সাধনা, কিছুতেই বাচ্চারা খেতে চাইবে না। আমাদের কাছে সময় ঠিক তাই। কি বিশাল লম্বা সময়! আমি জন্ম নিলাম, ধরা যাক বারো বছর বয়সে আমার চেতনা জাগলো। সেখান থেকে আজ আমার ষাট কি সত্তর বছর বয়স হয়েছে। বারো বছর থেকে সত্তর বছরের সময়, ভাবলে পাগল হয়ে যেতে হবে। এই দীর্ঘ সময়টা আমরা করব কি, কিছু না করে বসে বসে কাটালে যে কাউকে সুইসাইড করতে হবে। বুড়ো বয়সে ডিপ্রেসান হয় কেন? করবে কি এত সময় দিয়ে। তখন সময়টাকে টুকরো টুকরো করে দিতে হয়। বাচ্চাদের খাওয়াবার সময় যেমন ছোট ছোট গ্রাস করে দেওয়া হয়, ঠিক সেই রকম সময়কেও ছোট ছোট টুকরো করে দিতে হয়। প্রথমে আশি বছরকে টুকরো করা হল, বছর, মাস, দিন এইভাবে। এবার দিনকেও টুকরো করতে হবে, সকালবেলা উঠে কিছুক্ষণ জপধ্যান। তারপর কিছুক্ষণ শাস্ত্রপাঠ, স্নান, চা-খাওয়া, বাজার যাওয়া, খবরকাগজ পড়া, ফোন করা, আড্ডা মারা, এইভাবে দিনকে টুকরো করে দিচ্ছি।

একটা বই আছে যার নাম পার্কিনসনস ল, হাস্যরসাত্মক বই। তাতে লেখক বলছেন, works stretches to fill the available time। কাজ কতটা হয়, ততটাই হয় যতটা দিয়ে সময়কে ভরা যায়। যখন কিছু করার নেই তখন দাঁত মাজছে তো মাজছেই। তাড়া থাকলে হুড়মুড় করে ব্রাশ করে মুখ ধুয়ে বেরিয়ে আসবে। আমার হাতে সময় কতটা আছে, সেই হিসাবে কাজ ততটাই লম্বা হয়। পার্কিনসনস একটা উপমা দিচ্ছেন, এক বৃদ্ধা মহিলা একটা চিঠি লিখবে। চিঠি লিখতে গিয়ে দেখছে কাগজ নেই। এবার বৃদ্ধা চলল বাজারে কাগজ কিনতে। কাগজ কিনে আনার পর দেখছে পেনে কালি নেই। আবার বাজারে গেল কালি আনতে। এই করে সেদিন গেল, তারপরের দিন গেল। চিঠি লেখার পর দেখছে স্ট্যাম্প নেই। স্ট্যাম্প আনতে আবার পোস্ট অফিস গেল। এই করে আরও কয়েকটা দিন গেল। দেখা যাবে একটা চিঠি লিখতে তার সাতদিন সময় লাগলো। অথচ অফিসে যারা কাজ করে, তার তিন মিনিটে একটা চিঠি লিখে ছেড়ে দেবে। আমাদের হাতে এত অঢেল সময়, এই সময়কে ভরাট করব কি দিয়ে? বাচ্চাকে ভাত মেখে সামনে রেখে দিলে খাবে কি করে, গোল্লা গোল্লা করে পাঁচ ছটা গ্রাস করে দেওয়া দরকার।

সন্ন্যাস জীবনে প্রথম ট্রেনিং শুরুই হয় এইভাবে। সারাটা দিন তুমি কাটাবে কি করে? সকালে উঠবে, ভাল করে হাত-পা ধোবে। সাধুরা আবার ভোর সাড়ে তিনটেয় ওঠেন। মঙ্গলারতিতে যাবেন, মঙ্গলারতির পর সেখানে বসে জপধ্যান করবেন। হিন্দুদের এত রকম পূজা উপাচারের পিছনেও এই একই কারণ। আগেকার দিনে বৃষ্টি যদি ভাল হত, তাহলে দেশের লোকেরা মোটামুটি খাওয়া-পড়া পেয়ে যেত। জাতিপ্রথা এমন ভাবে ছিল যে, কাউকে না খেয়ে মরতে দেবে না। নিজের বর্ণের লোকেরাই তাদের বর্ণের লোকেদের মরতে দেবে না। সবাই মরলে সেটা অন্য জিনিস। এরপর সময় কাটাবে কি করে? চাষবাশ তো হয়ে গেছে, বাকি সময় কি করবে? নানা রকমের পূজা পার্বণের মধ্যে সময়টাকে লাগিয়ে দাও। প্রত্যেক মাসে একটা না একটা পার্বণ, কথাই আছে, হিন্দুদের বারো মাসে তেরো পার্বণ। চাষবাশ হয়ে গেল, ফসল হয়ে গেল, এবার আশ্বিন কার্তিক মাসে বিরাট করে চার পাঁচ দিন ধরে চলবে দূর্গাপূজা। কারণ সময়টা বেশি আছে, এখন আর চাষবাশ নেই। পূজা কতটা হবে? যতটা সময় সেইভাবে পূজাটাও টেনে নিয়ে যাবে। যদি সময় কম থাকে, পূজাটাও সংক্ষেপে সেরে দেবে। পূজা, পার্বণ, উৎসব, এগুলোর প্রধান উদ্দেশ্য হল সময়ের fill up the gap। আত্মীয়-কুটুম্বের কাজ হল এটাই, সময়টাকে আমরা শেষ করতে পারব না, সেইজন্য একগাদা আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব দরকার। বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের তাই নাতি-নাতনী দরকার। শাশুড়ীরা বৌমাদের বলবে, কবে আমি নাতির মুখ দেখব। নাতির মুখ

দেখতে কোন আগ্রহ নেই, মূল উদ্দেশ্য হল, সময় আমার কাটবে কি করে। একজন কেউ এসে গেলে সময়টা কাটানো যাবে। সন্তান বৃদ্ধি হবে, সে তর্পণ করবে, আমাকে নরক থেকে উদ্ধার করবে, এই ভাবগুলো নেই। মূল হল, আমার সময় কাটছে না, একটা কিছু উপায় করে দাও।

ভাল করে বিচার করে দেখলে দেখা যাবে, সংসারে এক অপরকে আমরা চুষে যাচ্ছি, চুষে যাওয়ার একটা দিক হল জীবন চালানো, কিন্তু তার থেকেও বেশী হল সময় কাটানো। ছেলে হস্টেলে থাকে। গরমের ছুটিতে বাড়ি যাওয়ার পর মায়েরও খুব আনন্দ, ছেলেরও খুব আনন্দ। কিন্তু কদিন পর মা বলে, কবে যে ওর স্কুল খুলবে, কবে যে হোস্টেল যাবে! ছেলে বাড়ির লোকদের জ্বালিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে। একটা কার্টুন ছবিতে বাচ্চা মেয়ে স্কুলে দাঁড়িয়ে বলছে 'ছুটিতে আমি বাবা-মাকে পাগল করে ছেড়ে দিয়েছে'। ছুটির পর স্কুলে এসেছে, ক্লাশে সবাইকে প্রশ্ন করা হয়েছে, ছুটি কেমন কাটালে। মেয়েটি তখন এই কথা বলছে। আমরা যদি বিচার করে দেখি, আমরা যাকে কর্তব্য বলি, আমরা যাকে দায়ীত্ব বলে, এগুলো কিছুই না, সময়কে ভরাট করার ব্যবস্থা; তা না হলে সময় কিভাবে কাটাবো, এটাই আমাদের প্রধান সমস্যা। মানুষ আধপেটা খেয়ে থাকতে পারবে, কম ঘুমিয়ে থাকতে পারবে, কিন্তু ফাঁকা সময়ের ভারকে সে বহন করে নিয়ে যেতে পারবে না। বেশির ভাগ আত্মহত্যার পিছনে এটা একটা অন্যতম কারণ। সারাদিন খুটুর খুটুর করে এক অপরকে মেসেজ করে যাচ্ছে, আই লাভ ইউ। হঠাৎ দেখছে সে তাকে ছেড়ে দিয়েছে। এখন সে বুঝতে পারছে না, সারাটা দিন করবেটা কি, ঝুলে গেল। ইদানিং স্মার্টফোন এসে গেছে, এক মুহুর্ত মোবাইল ফোন ছাড়া কেউ থাকতে পারবে না। কারণ সময়টা ফোনের মাধ্যমে দিব্যি কেটে যায়, একে ওকে ফোন করে, মেসেজ করে, হোয়াটস্যাপ করে কোথা দিয়ে সময় চলে যাচ্ছে কেউ টেরও পায় না।

স্বামীজী এটাকে নিয়েই বলছেন, মোহ, বিভ্রম, এই জিনিসগুলোকে আসতে দিও না। আমরা মনে করছি আমি অমুককে সাহায্য করতে যাচ্ছি; কিসের সাহায্য, কাকে সাহায্য, কেন সাহায্য, এগুলোকে নিয়ে কেউ ভেবে দেখে না। স্বামীজী রামকৃষ্ণ মিশন, কর্মযোগ, দেশ সেবা এত কিছু করলেন। পরে শ্রীশ্রীমার কাছে গিয়ে বলতে লাগলেন, এগুলো কিছুই না, শুধু কাজে জড়ানো ছাড়া আর কিছু না। শুনে মা বলছেন, বাবা! এই যে নূতন নূতন ছেলেরা সব ত্যাগ করে মঠে আসছে, এরা সারাদিন করবেটা কি! কাজকর্ম করলে এদের মনটা ঠিক থাকবে। কাজ হল নিজেকে ব্যস্ত রাখা, কাজ না থাকলে মানুষ পাগল হয়ে যাবে, সে সন্ন্যাসীই হোক আর গৃহীই হোক। সরকারী অফিসে কোন অফিসার বা কর্মচারীকে যদি শাস্তি দিতে হয়, প্রথমে সব রকম দায়ীত্বগুলি তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়। বড় বড় আইএএস, আইপিএস অফিসারদের পোস্টে রাখবে, মাইনেও দেবে কিন্তু কোন ফাইল তার কাছে যাবে না, তার মানে কোন কাজ দেবে না। কদিন বিরক্ত হয়ে নিজেই কাজ ছেড়ে চলে যাবে।

It is like a banyan tree, that spreads on and on, এই মোহ, ভ্রম বটবৃক্ষের মত বাড়তেই থাকে। তারপরেই খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন, আগেও আমরা এর আলোচনা করেছি, আসলে আমাদের জীবনদর্শন নেই বলে অনেক সমস্য, বলছেন, If you are a dualist, you are a fool to try to help God. If you are a monist, you know that you are God; where find duty? (*যদি তুমি দ্বৈতবাদী হও, তবে ঈশ্বরকে সাহায্য করতে যাওয়াই তোমার মূর্খতা। আর যদি অদ্বৈতবাদী হও, তবে তুমি তো স্বয়ংই ব্রহ্মস্বরূপ – তোমার আবার কর্তব্য কি?*) দ্বৈতবাদী যদি হও, ভক্ত যদি হও, তাহলে সবটাই তো ঈশ্বরের সংসার, তাঁর সংসার তিনি দেখবেন। তুমি ঈশ্বরের কাজে সাহায্য করার কে! আর যদি তুমি অদ্বৈতবাদী হও, তাহলে তুমি নিজেই স্বয়ং ঈশ্বর, তোমার আবার কিসের কর্তব্য, কর্তব্য তো বন্ধনে হয়, তুমি তো মুক্ত, তোমার কর্তব্য কোথা থেকে আসবে! শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, *ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন*, এই তিন লোকে আমার কর্তব্য কর্ম বলে কিছু নেই। বড় বড় কোম্পানীর মালিকরা সব সময় ফাঁকা বসে থাকে। ওদের কাজই হল, উপযুক্ত লোককে দায়ীত্ব দিয়ে নিজে মুক্ত হয়ে থাকা। মালিকের থেকে যত নীচের দিকে যারা থাকে, তারা তত ব্যস্ত থাকে। ব্যস্ত থাকা মানেই, তার মাথার উপর একজন বসে আছে। যার প্রচুর অর্থ আছে, বিরাট ক্ষমতা আছে, সে কার অধীনে থাকতে যাবে, সে তো মুক্ত। যিনি ঈশ্বর, তাঁর আবার কিসের বন্ধন, তাঁর কিসের কর্তব্য, কোন কর্তব্যই নেই। আর যদি তুমি মনে কর, আমি ঠাকুরের ভক্ত,

আমি ঠাকুরের সন্তান; তাহলে ঠাকুরই সব দেখবেন, তুমি দেখার কে! তাহলে সারাদিন যে এত কাজকর্ম করতে হয়? পূজা রূপে অবশ্যই করতে পারো। সেইজন্য মুনি-ঋষিরাও পাল্টে দিয়ে বললেন, যা করবে পূজা রূপে, যজ্ঞ রূপে করবে। কিন্তু পূজা রূপে কখন করবে? চেষ্টা কর ঠাকুরকে ঠাকুর রূপে পূজা করার, মানুষ রূপে পূজা করতে নিষেধ করছেন। তা নাহলে কদিন পরেই বাৎসল্য থেকে তাচ্ছল্য ভাব চলে আসবে। কবে সেবা করতে করতে মেওয়া খেতে শুরু করে দেবে বুঝতেই পারবে না। You have no duty to husband, child, friend, একেবারে স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করে বলে দিচ্ছেন, কারুর প্রতি তোমার কোন কর্তব্য নেই।

Take things as they come, lie still, and when your body floats, go; rise with the rising tide, fall with falling tide. Let the body die; this idea of body is but a worn-out fable. 'Be still and know that you are God'. (*যা হচ্ছে হয়ে যাক্, চুপচাপ করে পড়ে থাকো; রামপ্রসাদ বলে – ভব-সাগরে বসে আছি ভাসিয়ে ভেলা; যখন আসবে জোয়ার উজিয়ে যাব, ভাটিয়ে যাব ভাটার বেলা।। শরীর মরে মরুক – আমার যে একটা দেহ আছে, এটা তো একটা পুরনো উপকথা বই আর কিছু নয়। চুপচাপ করে থাকো, আর জানো – আমি ব্রহ্ম।*) শরীরকে এমন ভাবে ছেড়ে দাও, তুমি এই ভব-সাগরে ভেসে চলেছ, শরীর ঢেউএর সাথে উঠছে, আবার ঢেউএর সাথে নামছে। আর তুমি ভাল করে জেনে নাও – তুমি সেই ঈশ্বর। শরীরের দিকে তাকিও না। এই ভাল আসছে, ভাল; এই মন্দ আসছে, মন্দ; কোনটাতেই শরীরের দিকে তাকিও না। এতক্ষণ স্বামীজী কর্তব্য আদি, শরীর আদির দিক দিয়ে বললেন। অদ্বৈতে এই জিনিসটার উপর বার বার জোর দেওয়া হয়। যতক্ষণ তোমার কর্তব্য বোধ আছে, যতক্ষণ তোমার দায়ীত্ব বোধ আছে, ততক্ষণ তুমি অদ্বৈতের জন্য প্রস্তুত নও। অদ্বৈতের কথা ছেড়েই দাও, ধর্ম পথের জন্যই প্রস্তুত নও। এবার সময়কে নিয়ে স্বামীজী বলছেন।

বর্তমানই সত্য, অতীত ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই

The present only is existent. There is no past or future even in thought, because to think it, you have to make it the present. (*কেবল বর্তমান কালই বিদ্যমান – আমরা চিন্তায় পর্যন্ত অতীত ও ভবিষ্যতের ধারণা করতে পারি না; কারণ চিন্তা করতে গেলেই তাকে 'বর্তমান' করে ফেলতে হয়।*) যখন আমরা ব্রহ্ম চিন্তন করছি, তখন ওটা চিরন্তন অস্তিত্ব রূপে বিরাজ করে। তার মানে, যে জায়গাতে ঈশ্বরের অবস্থান, যে জায়গাতে শুদ্ধ ব্রহ্ম, সেখানে অতীত ও ভবিষ্যত বলে কিছু থাকে না। বোঝানর জন্য স্বামীজী বলছেন, এই যে আমরা নানা রকম বিভাজন করি, গতকাল ছিলাম, আজ আছি, আগামীকাল থাকব ইত্যাদি ইত্যাদি। স্বামীজী বলছেন, না। আমরা যখন ভবিষ্যতকে নিয়ে ভাবি, যখন অতীতকে নিয়ে ভাবি, তখন আমরা কিন্তু অতীত ও ভবিষ্যতকে বর্তমানের মধ্যে এনেই ভাবি। তার মানে বর্তমানই একমাত্র সত্য। এই যে সচ্চিদানন্দের সৎ, শুদ্ধ অস্তিত্ব, এ ছাড়া আর কিছু নেই। সৎ কোথায় আছে? কঠোপনিষদে যমরাজ নচিকেতাকে খুব সুন্দর বলছেন, *স এবাদ্য স উ শ্বঃ*, গতকাল ওটাই ছিল, আগামীকালও ওটাই থাকবে। কোনটা? যেটা এখন আছে। এখন যেটা আছে, গতকালও তার পরিবর্তন ছিল না, আগামীকালও কোন পরিবর্তন হবে না। পরিবর্তন যদি না হয়, তাহলে সময় কোথা থেকে আসবে! কারণ সময় মানেই, দুটো ঘটনার পরিমাপ, আর ঘটনা মানেই পরিবর্তন।

আমরা সময় বলতে জানি, সকালে সূর্যোদয় হচ্ছে, বিকালে সূর্যাস্ত হয়ে যাচ্ছে; আমরা সময় বলতে জানি, ঘড়ির সেকেণ্ডের কাঁটা, মিনিটের কাঁটা আর ঘন্টার কাঁটা ঘুরে যাচ্ছে। যদি কোন অন্ধকার ঘরে আমাকে অনেক দিন আটক করে রাখা হয়, তাহলে কি সময় থাকবে? যদি বুদ্ধি একটু কাজে লাগিয়ে খাটানো যায় তখনও সময় পেয়ে যাব। কিভাবে? নিজের নাড়ির গতিকে মাপতে থাকবে, বা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস গুনতে থাকব, সময় পেয়ে যাব। কিন্তু আমরা ঘুমিয়ে পড়তে পারি, ঘুমিয়ে পড়লে সময় তখন আবার এলোমেলো হয়ে যাবে। কাউকে কিডন্যাপ করে অন্ধকার ঘরে আটকে রাখলে সত্যিই তাদের সময়ের গোলমাল লেগে যায়। কারণ আমাদের মনের জগতে সময়ের একটা বোধ আছে, বহির্জগতে সময়ের বোধ অন্য রকম হয়, দুটো সময়কে মিলিয়ে সঠিক সময় জেনে নিই। তার মানেই দাঁড়ায়, সময় মানেই ঘটনার পরিমাপ, স্বামীজীও বলছেন সময় মানে measure of events। ওনারা সেইজন্য সব সময় দেখেন, এমন events গুলো বার কর, যেটা সব

সময় একই রকম চলবে। যার জন্য প্রথমের দিকে যে ঘড়িগুলো এসেছিল, সেগুলো স্প্রিং ক্লক হত, দেখা গেলো মোটামুটি ভাল। ওনারা আরও অনেক কিছু, সূর্য, চন্দ্রের গতিকে নিয়ে সময় ঠিক করলেন। এ্যটমিক ক্লকে ওনারা দেখলেন এক সেকেণ্ডে এত কোটিবার নড়ে, সেইজন্য সময়কে মাপার নির্ভুল একটা পন্থা পাওয়া গেল। সময়ের গোলমাল হওয়ার সম্ভবনা অনেক কমে গেল, দেখছেন এক কোটি বছরে হয়ত এক সেকেণ্ডের সামান্য একটু তফাৎ হবে। কিন্তু যাই হোক না, সবটাই হল measure of events।

কোন event যদি না থাকে? Events মানেই ঘটনা ঘটছে, পরিবর্তন হচ্ছে। কিন্তু ব্রহ্মের তো কোন পরিবর্তন নেই। কোন পরিবর্তন যদি না থাকে কোন ঘটনা ঘটছে না, কোন ঘটনাই যদি না হয়, তাহলে সময়ের পরিমাপ কি করে হবে! তাই সময় নেই, অত্যন্ত সহজ যুক্তি। আমরা বলি ঈশ্বর কালের অতীত, ঠিকই তো, কালাতীত না হলে ঈশ্বর হবেই না। কালাতীত মানেই কোন দেশ নেই। কারণ যেখানে ঘটনা নেই, সময় নেই, পরিবর্তন নেই, সেখানে দেশ আসবে কোথা থেকে! সেইজন্য দেশ, কাল ও ঘটনা, তিনটেকে একসঙ্গে মিলিয়ে বলা হয়। সৃষ্টি মানেই – দেশ, কাল ও নিমিত্ত। এটাই মায়া। তিনটে একসাথে আসে, দেশের উৎপত্তি হয়, সময়েরও সৃষ্টি হয় আর তার সাথে ঘটনা। ঘটনা হলেই সময়ের পরিমাপ হয়, ঘটনা ঘটার জন্য স্থান দরকার, তাই দেশ হয়। কিন্তু আত্মার জন্য কিছুই নেই। যদি কল্পনা করে নিই যে, আত্মার জন্য দেশ, কাল সবই আছে, কিন্তু কোন পরিবর্তন তো হবে না। শাস্ত্র বার বার বলছেন, আনন্দময়, আনন্দ ছাড়া আর কিছু নেই, আনন্দস্বরূপ, আনন্দময়। কোন কারণে যদি দেশ থাকেও, জানার কোন পথ নেই। কারণ একটা জিনিস নড়াচড়া করলে আমরা চেতনার দ্বারা বুঝতে পারি দেশ আছে কিনা। কোন নড়াচড়া যদি নাই হয়, আমরা জানব কি করে যে দেশ আছে! জীবনের একটা সাংঘাতিক দাম, যারা আত্মহত্যা করে তাদেরকেও এই জীবনেরই সাহায্য নিতে হয়। যারা মুক্তি পেতে চায়, তাদেরও এই জীবনের সাহায্য নিতে হয়। যারা ভোগ করতে চায়, তাদেরও এই জীবনেরই সাহায্য নিতে হয়; জীবনটা গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক তেমনি বর্তমানটাই গুরুত্বপূর্ণ, অতীত ও ভবিষ্যতের কোন দাম নেই। অতীত ও ভবিষ্যতের যা কিছু চিন্তা করি, সেটাকেও বর্তমানে এনে চিন্তা করতে হয়।

এখানেই তুমি স্বর্গলোক তৈরি কর - ভিক্ষুকের বেশ ফেলে দাও, মুক্তির পতাকা গৈরিক বস্ত্র ধারণ কর

বলছেন, Give up everything, and let it float where it will. (*সব ছেড়ে দাও, তার যেখানে যাবার ভেসে যাক।*) যা আছে সব বর্তমানেই আছে, অতীত আর ভবিষ্যতের কোন দাম নেই। This world is all a delusion, do not let it fool you again. You have known it for what it is not, now know it for what it is. (*এই সমগ্র জগৎটাই একটা ভ্রমমাত্র, এটা যেন তোমায় আর প্রতারিত করতে না পারে। জগৎটা যা নয়, তুমি তাকে তাই বলে জেনেছ, অবস্তুকে বস্তু জ্ঞান করেছ; এখন এটা বাস্তবিক যা, একে তাই বলে জানো।*) নেতি নেতি করে আগে সব বাদ দাও – আমার কর্তব্য বলে কিছু নেই, সময় বলে কিছু নেই, দেশ বলে কিছু নেই, নিমিত্ত বলেও কিছু নেই। এইভাবে সব কিছু বাদ দিয়ে এবার তুমি জানো – আসল জিনিসটা কি। If the body is dragged anywhere, let it go; do not care where the body is. This tyrannical idea of duty is a terrible poison and is destroying the world. (*যদি দেহটা কোথাও ভেসে যায়, যেতে দাও, দেহ যেখানেই যাক না কেন, কিছু গ্রাহ্য করো না। কর্তব্যের নিদারুণ ধারণা ভীষণ কালকূট-স্বরূপ, জগৎ ধ্বংস করে ফেলছে।*) সন্ত্রাসবাদীদের যেমন দায়ীত্ব হলো, আমার ইষ্টের কাছে সবাইকে নিয়ে আসতে হবে, এটাকেই তারা নিজেদের কর্তব্য বলে মনে করছে। কম্যুনিস্টরা মনে করে, তাদের কর্তব্য হলো জগতের ভাল করতে হবে, তারপর তারা নিজেদের মত করতে শুরু করে দিল। রাশিয়া আর চীনে একমাত্র কমিউনিজমকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রায় ষাট থেকে সত্তর লক্ষ লোকের জীবন শুধু না খেয়ে, অভুক্ত থেকে চলে গেল। কারণ খাদ্য যোগানের ব্যবস্থাটা পুরোপুরি হাতের বাইরে চলে গিয়েছিল। অথচ তার আগে এই রকম ব্যবস্থা ছিল না। ঐ নিজের আইডিয়াকে প্রয়োগ করতে হবে, আমি তোমার ভাল করতে চাই। ভাল করে যদি দেখা হয়, তাহলে দেখা যাবে, যারা আমাদের ক্ষতি করতে চায়, তারা আমাদের কম ক্ষতি করেছে, কিন্তু যারা আমাদের ভাল করতে চায়, যারা মনে করছে আমাদের প্রতি তাদের একটা কর্তব্য আছে, তারাই অনেক বেশি ক্ষতি করে। যখন কিছু করার থাকে না, তখন

বলবে, আমাদের দেশের প্রতি একটা কর্তব্য আছে। একটা নামকরা কথাই আছে, Patriotism is the last refuse of the scoundrels। যত বদমাইশ গুলো দেশভক্তির আড়ালে গিয়ে সব রকম অত্যাচার করতে শুরু করে। অপদার্থরা বলবে, মানবজাতির প্রতি আমার দায়ীত্ব আছে। কিছু করার নেই, আমরা সবাই এই রকমই। এখন যারা স্বামীজীর কথা শুনছে, শোনার পর মনের মধ্যে যদি চেতনা জাগে, যদি একটু নিজের মধ্যে পরিবর্তন আনতে পারে, তাহলে ভাল।

Do not wait to have a harp and rest by degrees; why not take a harp and begin here? Why wait for heaven? (*স্বর্গে গেলে একটা বীণা পাবে, আর তাই বাজিয়ে যথাসময়ে বিশ্রাম-সুখ অনুভব করবে – এর জন্য অপেক্ষা করো না।*) হার্প এক ধরণের বাদ্যযন্ত্র। এই বাদ্যযন্ত্র আমরা ভারতবর্ষে ব্যবহার করি না, কিছু কিছু বাদ্যযন্ত্রের সাথে একটু মিল থাকলে থাকতেও পারে, ওর স্টাইলটাই পুরো আলাদা। বলছেন, যখন আমার আর কিছু করার থাকবে না, ফাঁকা থাকব, তখন একটা হার্প জোগাড় করব, তারপর আমি ওটাকে বাজিয়ে বাজিয়ে বিশ্রামের সুখ পাবো। কি দরকার, কবে তুমি ফাঁকা হবে, কবে তুমি স্বর্গে যাবে আর হার্প পাবে, তারপর তুমি বাজাবে, এক্ষুণি নিয়ে এসো। Make it here. In heaven there is no marrying or giving in marriage; why not begin at once and have none here? (*এখানেই একটা হার্প নিয়ে আরম্ভ করে দাও না কেন? স্বর্গে যাবার জন্য অপেক্ষা করা কেন? ইহলোকটাকেই স্বর্গ করে ফেলো। স্বর্গে বিবাহ করা নেই, বিবাহ দেওয়ারও নেই – তাই যদি হয়, এখনই তা আরম্ভ করে দাও না কেন?*) তুমি স্বর্গে যেতে চাইছো তো? স্বর্গে গিয়ে কি হবে! এই লোককেই স্বর্গলোক তৈরী করে নাও। তুমি স্বর্গে যেতে চাইছো তো? স্বর্গে তো কারুর বিয়ে হয় না, বিয়ে দেওয়াও হয় না, তাই এখানেই তুমি বিয়ে করবে না, তখন এটাই স্বর্গ হয়ে যাবে। স্বামীজী এই কথাগুলো খ্রীশ্চানদের কাছে বলছেন, খ্রীশ্চানদের জীবনের উদ্দেশ্য স্বর্গে যাওয়া। এই ধরণের কথাগুলো যখনই স্বামীজী বিদেশে বলতেন, খুব বলিষ্ঠ ভাবে আর খুব মজা করে করে বলতেন। স্বর্গে যেতে চাইছ তো? স্বর্গে তুমি কি পাবে? যেটা পাওয়ার সেটা এখানেই করে নাও না কেন। স্বর্গে তো কোন বিয়ে-থার ব্যাপার নেই, তা এখানেই তুমি বিয়ে-থার ব্যাপারটা বন্ধ করে দাও, এটাই তোমার কাছে স্বর্গ হয়ে যাবে।

মহাভারতেও ঠিক এই আইডিয়াটা আসে, অর্জুন কিছু দিনের জন্য ইন্দ্রের কাছে গিয়েছিলেন। সেই সময় ঊর্বশী কামভাব নিয়ে অর্জুনের দিকে এগিয়ে এসেছিল। অর্জুন তখন আঁৎকে উঠেছেন, আপনি আমার পূর্বপুরুষের একজন মাতৃস্থানীয়া, আমাদেরই বংশের মহারাজ পুরুর আপনি স্ত্রী, যেখান থেকে আমাদের বংশ এসেছে, আমি আপনার বংশজ। অর্জুনের কথা শুনে ঊর্বশী প্রচণ্ড রেগে যায়, বলছে, 'স্বর্গে এসব হয় না, কে মা, কে বোন, কে স্ত্রী এই ধরণের কোন সম্পর্ক এখানে হয় না'। অর্জুন সদ্য পৃথিবী থেকে সশরীরে গেছেন, তিনি অপ্সরা ঊর্বশীর কথা মানবেন না। ঊর্বশীও রেগেমেগে অর্জুনকে অভিশাপ দিয়ে দিল, তুমি মর্ত্যে ক্লীব হয়ে থাকবে। ভাবটা হল এই, স্বর্গে এসব কিছু মানা হয় না। মহাভারতে ইন্দ্রের স্বর্গের কথা বলা হয়েছে, আর এখানে স্বামীজী খ্রীশ্চানরা যেটাকে spiritual heaven বলে, যেখানে ঈশ্বরের কাছাকাছি থাকছে, সেটাকে নিয়ে বলছেন। দুটো স্বর্গ আলাদা। স্বামীজী একটা আদর্শকে নিয়ে বলছেন, যারা আধ্যাত্মিক জীবন অতিবাহিত করতে চাইছে, ঈশ্বরের কাছাকাছিই যদি তোমাকে যেতে হয়, সেখানে তো বিবাহ জিনিসটা নেই, ফ্যামিলি লাইফ নেই, তাহলে তুমি এখানেই ঐ জীবন শুরু করে দিয়ে ঈশ্বরের সান্নিধ্য পেতে চাইছ না কেন?

The yellow robe of the Sannyasin is the sign of the free. Give up the beggar's dress of the world; wear the flag of freedom, the ochre robe. (*সন্ন্যাসীর গৈরিক বসন মুক্তপুরুষের চিহ্ন। সংসারিত্ব-রূপ ভিক্ষুকের বেশ ফেলে দাও। মুক্তির পতাকা – গৈরিক বস্ত্র ধারণ কর।*) গেরুয়া বস্ত্র মুক্তির পতাকা, বাকি যত পোশাক আছে, তা যতই ফ্যাশানেবল্ ড্রেস হোক, সব কাঙালী ভিখারীর ড্রেস। পোশাকের দাম অনেক বেশী হতে পারে, কিন্তু কাঙালীর বেশ। সন্ন্যাসীদের গেরুয়া পোষাকের দাম বেশী না, কিন্তু এটাই সব থেকে মূল্যবান পোশাক, এটাই মুক্তির পতাকা। এই তারিখে যে দশ বারোজন শিষ্য স্বামীজীর কাছে আছেন, থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ডের সময়ও শেষের দিকে চলে এসেছে। এখান থেকে এবার তাঁরা

এবার নিজের নিজের কর্মক্ষেত্রে ফেরত চলে যাবেন, তাঁদের স্বামীজী বলছেন, কাঙালী-ভিখারীর পোশাক ছেড়ে রাজার পোশাক পরিধান করে নাও।

রবিবার, ৪ঠা আগস্ট

'New Discoveries, Swamiji in West', মেরি লুই বার্কের বিখ্যাত গবেষণামূলক গ্রন্থ; এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কের বিস্তারিত বর্ণনা আছে। এই অসাধরণ বর্ণনা আমাদের অভিভূত করে দেয়। যাঁরা ওখানে ছিলেন, সবাই স্বামীজীর কথার মধ্যে ডুবে গেছেন, স্বামীজীও আধ্যাত্মিক ভাবরাজ্যে ডুবে আছেন। স্বামীজী সেখানে প্রায় সাত সপ্তাহ, প্রায় পঞ্চাশ দিন ছিলেন। ঐ পঞ্চাশ দিনে স্বামীজী থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড ছেড়ে কোথাও যাননি। একটা আমন্ত্রণ এসেছিল, আর একদিনের ব্যাপারে একটু সংশয় আছে, কিন্তু যতদূর জানা যায় উনি কোথাও যাননি। মাঝে মাঝে ওখানকার গ্রামে, নদীর ধারে ঘুরতে যেতেন। কয়েকটা চিঠিতে জানা যায় যে, তখন সবারই খুব উচ্চ অবস্থা। তাতে বর্ণনা আছে, ওখানে দু-একজন পরের দিকে গেছেন, তাদের চলে আসার কথা, কিন্তু আরও দু চারদিন থেকে যাচ্ছেন, ছেড়ে আসতে মন চাইছে না। দু-তিনজন ওখানেই সন্ন্যাস নেওয়ার জন্য ছটফট করছেন। স্বামীজীর বিখ্যাত 'সন্ন্যাসীগীতি' এখানেই রচনা করেছেন। স্বামীজী মূলতঃ বেদান্ত বলে যাচ্ছেন। বেদান্ত বলতে গিয়ে কখন তিনি বৃহদারণ্যক থেকে বলছেন, কখন ছান্দোগ্য উপনিষদ থেকে বলছেন, আবার কখন অষ্টাবক্র-সংহিতা থেকে বলছেন।

আস্বাদ গ্রহণে অভ্যস্ত হওয়া

অদ্বৈত শব্দটা শুনলে আমাদের কোথাও যেন মনে হয়, জগৎকে উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। স্বামীজী কিন্তু কোথাও জগৎকে উড়িয়ে দিচ্ছেন না। আজকের ক্লাশে এই জিনিসটা আরও পরিষ্কার হবে, স্বামীজী অদ্বৈত বলতে ঠিক কি বোঝাতে চাইতেন। আগে আগে অবশ্য আমরা অনেক আলোচনা করেছি। কিন্তু এই জায়গাতে আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে। অন্যান্য বিষয়ের যে জ্ঞান, পদার্থ, রসায়ন, অঙ্ক, ইত্যাদির যে জ্ঞান, এই জ্ঞান বহির্জগতের জ্ঞান, কিন্তু আধ্যাত্মিক বিষয় মানেই অন্তর্জগতের জ্ঞান। দুটোর পদ্ধতি আলাদা, একটাতে মনকে খুব সক্রিয় করে একটা জিনিসকে ধরা হয়, আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে পুরো উল্টোটা করতে হয়, মনকে পুরোপুরি শান্ত করতে হয়। একটা জিনিসকে চালিয়ে দিলে তার এক রকম পার্শ্বক্রিয়া পাওয়া যাবে, থামিয়ে দিলে অন্য রকম পরিণাম পাওয়া যাবে। মনকে যখন একটা বিশেষ পথে চালানো হয়, তখন পদার্থ বিজ্ঞানের জ্ঞান হয়, রসায়ন শাস্ত্রের জ্ঞান হয়। মনকে যখন শান্ত করা হয়, তখন ধীরে ধীরে আধ্যাত্মিক জ্ঞান আসতে শুরু হয়। ধর্মের কথা মুখে একবার দুবার শুনে নিলাম ঠিক আছে, তার বেশী নিতে গেলে খুব মুশকিল হয়ে যায়।

আমাদের ছোটবেলায় কোকাকোলা, ফান্টা এসব পাওয়া যেত, আর ঐ সময় এগুলো খুব ঝাঁঝালো ছিল। তখনকার দিনে এগুলো খাওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল; রীতিমত রুটিন করে, প্ল্যান করে খেতে হত। ছোটবেলায় একবার দুবার খাওয়ার সুযোগ হত, একটু খেয়েই এমন ঝাঁঝ লাগতো যে খাওয়াই যেত না। তারপর ভয়ে কয়েক বছর খেতাম না। কিন্তু পরে ধীরে ধীরে মানিয়ে নেওয়া গেল। প্রথম যখন চাউমিন এলো, শোনা গেল যে এগুলো নাকি ব্যাঙের ঠ্যাঙ দিয়ে তৈরী। দেখেই বমি এসে যেতো, খাওয়া তো দূরের। যাই হোক, তারপর সবাই খাচ্ছে, আমিও খেতে শুরু করলাম, তখন দেখছি ভালই লাগছে। এখনতো চাউমিন বাচ্চাদের প্রিয় খাবার হয়ে গেছে। অনেক আগেকার কথা, জয়রামবাটীতে একজন মহারাজ ছিলেন। সারাজীবন ওখানেই ছিলেন, খুবই ভাল মহারাজ। একবার উনি গোলপার্কে গেছেন, সেখানে অজান্তায় মজা করে ওনাকে কফি দেওয়া হয়েছে। কফি খেয়ে বাঙাল ভাষায় বলছেন, 'চা-টা পুইড়া গ্যাছে'। কফির পোড়া তেতো গন্ধ, সেটাকে উনি মনে করছেন, চা করতে গিয়ে পুড়ে গেছে। ওনাকে কিছুতেই বোঝানো গেলো না যে, এটা কফি, এটা একটা পুরো আলাদা জিনিস। প্রথম যিনি কফি খাবেন, সবারই এই স্বাদটা লাগবে, কেমন একটা বিশ্রী পোড়া পোড়া গন্ধ, তেতো। ধীরে ধীরে যখন taste develop করে যায়, তখন দিনে একবার দুবার কফি দিলে খুব খুশীই হয়।

আধ্যাত্মিক জীবনেও ঠিক একই জিনিস হয়। এগুলোকে বলে taste develop করা। আধ্যাত্মিক জীবনেও taste develop করতে হয়। প্রথমের দিকে হয়ত ভাল লাগবে না। মন্ত্র নিয়েছে, খুব ভাল, নিজেকে ধন্য মনে করছে। কিন্তু প্রথম প্রথম জপ করতে বসলেই দুনিয়ার সব রকম চিন্তা এসে জড়ো হবে, তার সাথে পিঠ চুলকানি, কান চুলকানি, চোখ কচলানি সবই হবে, হাঁটুতে ব্যাথা হবে, পায়ে ঝিন্ ধরবে, কত কিছু হবে। এত কিছুর পরেও ধরে রাখতে হয়, ছেড়ে দিলে যেটা হওয়ার সেটাও হবে না। ধরে রাখতে রাখতে আসনে বসে জপ করার মধ্যে একটা রসের জন্ম হয়। যখন রস ছাড়তে শুরু করল, তখন আর সে জপধ্যান করা ছাড়তে পারবে না। অদ্বৈত জ্ঞানের সাধনা আরও মারাত্মক। ধর্ম জীবন না হয়, ঠাকুর-ঠুকুর করে নমো নমো করে কোন রকমে ম্যানেজ হয়ে যায়। অদ্বৈত জ্ঞানকে ধরে রাখা প্রায় অসম্ভব। অদ্বৈতের উপর লেকচার শুনতে খুবই ভাল লাগে। ইদানিং অনেক মহাত্মারা তো অদ্বৈতের নীচে কোন কথাই বলেন না। এদের ভক্তের সংখ্যাও প্রচুর। এদের কাছে শিব নিয়ে, কৃষ্ণ নিয়ে কেউ কিছু বলতে গেলে গোঁড়া বলে উড়িয়ে দেবে। কিন্তু লোকেরা বোঝে না যে, শিব আর কৃষ্ণ দিয়েই সবাইকে শুরু করতে হবে। অদ্বৈতের কথা বলতে শুরু করলে শুনতে খুব ভাল লাগবে, কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে নামাতে গেলেই দম বেরিয়ে যাবার উপক্রম হয়। তখন বলবে, ওসব কথা শাস্ত্রে আছে, জীবনে থোরাই নামাতে যেতে হবে! আমরা যে কথাগুলো আলোচনা করতে যাচ্ছি, এগুলোও ঐ রকম, যেমনি জীবনে অনুশীলন করতে যাবো, দম বেরিয়ে যাবে। কিন্তু একটু যদি অনুশীলন করার কেউ চেষ্টা করতে থাকে, ধীরে ধীরে দেখবে ওটাই তার জীবনদর্শন হয়ে গেছে।

আধ্যাত্মিক জীবনে আমরা সাধনার কথা বলি ঠিকই, কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবন সাধনা দিয়ে হয় না। আধ্যাত্মিক জীবন পুরোপুরি স্বভাবে, এটাই আমার স্বভাব, এটাই আমি, এটাই আমার জীবনধারা। যেমন জল, জলের একটা স্বভাব আছে, যেভাবেই বলি না কেন, শীতল বলতে পারি, তরল বলতে পারি, এটাই তার স্বভাব। স্বভাব পাল্টে দিলে ওটা আর জল না হয়ে অন্য কিছু হয়ে যাবে। আত্মচিন্তন যখন মানুষের স্বভাব হয়ে গেল, তার মানে আত্মচিন্তন ছাড়া সে আর থাকতেই পারবে না। আত্মচিন্তন যা, সেও তাই, সে যা, আত্মচিন্তনও তাই। এসব কথা শুনতে ভাল লাগে, কিন্তু ধারণা করতে একটু কঠিন মনে হবে, আর অনুশীলন করা প্রায় অসম্ভব। অনেকে মনে করতে পারে যে, যদি অনুশীলনই না করি, তাহলে এসব কথা শুনে কি লাভ! ঠিকই, স্বামীজীও যে এখন অদ্বৈতের কথা বলতে যাচ্ছেন, সেখানেও মূল কথাতে বলছেন, যাবতীয় যা কিছু আছে সব ছাড়ো। তুমি যেটাকে আঁকড়ে ধরে আছো, সেটাকে আগে ছাড়ো। সেকি সম্ভব! ঘর, পরিবার, নিজের আস্থা, নিজের ধর্মগ্রন্থ, নিজের ইষ্ট, নিজের বিশ্বাস, নিজের মন, নিজের শরীর, অদ্বৈত বলছে সবটাই ছাড়ো। সবটা যদি না ছাড়ো, যতটা কম ছাড়বে, ততটা তোমার কমতি পড়বে। কারণ এরা কেউই তোমার স্বরূপ না।

তাহলে এখন এই মুহুর্তে আমার স্বরূপ কি? আমি এই শরীর, আমি এই মন। আমার স্বরূপ কি? আমি তো এই সংসারের সাথে জুড়ে আছি, তাহলে কি আমার জ্ঞান কি হবে? হবে, সংসারের জ্ঞানই হবে। ঠাকুরের যদি দর্শন হয়, তাহলে ঠাকুরকে কি দেখব? ঠাকুর ম্যজিকের মত আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে যাবেন। এই দর্শনও শতকরা একশ ভাগ মনের ভুলই হবে। সূক্ষ্ম শরীরে যদি দর্শন হয়, সূক্ষ্ম শরীরটাও এই জগতেরই একটা রূপ। আমি এই জগতের, আমার জ্ঞান এই জগতের, আমার আধ্যাত্মিক চেতন এই জগতের। এর বাইরে আমরা কখনই যেতে পারব না। এরপর যখন ছাড়তে শুরু হবে, হাঁ জী হাঁ জী করতে রহিয়ে বৈঠে আপনে থান্। নিজের জায়গাতে বসে আছে আর সব কিছুতেই হ্যাঁ হ্যাঁ করে যাচ্ছে, কিন্তু কারুর সাথেই জুড়ে নেই। এবার কিছুটা ছাড়া শুরু হল। যেমন যেমন ছাড়বে, জ্ঞানটাও তেমন তেমন পাল্টাবে, আধ্যাত্মিক উপলব্ধিও সেই রকম পাল্টাবে। তখন কি দেখবে? সেই শুদ্ধ চৈতন্য, তাঁকে আত্মা বলি, ব্রহ্ম বলি, ঈশ্বর বলি, যেটা ইচ্ছা সেটাই বলুক, সেই তিনি ছাড়া আর কিছু নেই।

'আমি'র ভাব সবারই আছে

'Whom the ignorant worship, Him I preach unto thee',(*'অজ্ঞ ব্যক্তিরা যাঁকে না জেনে উপাসনা করছে, আমি তোমার নিকট তাঁরই কথা প্রচার করছি'।*) পরের দিকে স্বামীজী যে বিরাটের পূজার ধারণা নিয়ে এলেন, মানুষ রূপেও যে তাঁর পূজা হয় সেটাকেই তিনি এখানে উল্লেখ করছেন। ঠাকুরও বলছেন, ঈশ্বর সব কিছু হতে পারেন, আর তিনি মানুষের মধ্যে নেই! তা কি কখন হতে পারে! বিগ্রহের পূজা

হতে পারে, পাথর বা মাটির মূর্তির পূজা হতে পারে আর জীবন্ত মানুষের পূজা হবে না! এই ধারণা কোন ধর্মেই নেই, একমাত্র হিন্দু ধর্মই সেই স্তরে নিয়ে যায়, যেখানে মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের পূর্ণ প্রকাশকে দেখতে পাওয়া যায়। This one and only God is the ‘knowest’ of the known. He is the one thing we see everywhere. All know their own Self, all know, ‘I am’, even animals. All we know is the projection of the Self. Teach this to the children, they can grasp it. Every religion has worshipped the Self, even though unconsciously, because there is nothing else, (*এই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই সকল জ্ঞাত বস্তুর চেয়ে আমাদের অধিক জ্ঞাত। তিনিই সেই এক বস্তু যাঁকে আমরা সর্বত্র দেখছি। সকলেই তাদের নিজ আত্মাকে জানে; সকলেই – এমন-কি পশুরা পর্যন্ত জানে যে, ‘আমি আছি’। আমরা যা কিছু জানি, সব আত্মারই বহিঃক্ষেপ – বিস্তার-স্বরূপ। ছোট ছোট ছেলেদের শেখাও, তারাও এ তত্ত্ব ধারণা করতে পারে। অজ্ঞাতসারে হলেও প্রত্যেক ধর্ম এই আত্মাকেই উপাসনা করে এসেছে, কারণ আত্মা ছাড়া আর কিছু নেই।*) সবাই নিজের আত্মাকে জানে, ‘আমি আছি’ এই জিনিসটাকে নিয়েই আমাদের উপনিষদ চলে, ছান্দোগ্য উপনিষদ এই জিনিসটার উপর বিশেষ ভাবে জোর দিয়েছে। এমনকি আচার্য শঙ্করও বার বার এই জিনিসটার উপর জোর দিচ্ছেন। অন্য কোন ব্যাপারে মানুষের চেতনা থাকুক আর নাই থাকুক, ‘আমি আছি’ এই চেতনাটা তার কক্ষণ যায় না। কয়েক ঘন্টা আগে যে শিশুর জন্ম হয়েছে, তারও এই বোধটুকু আছে যে আমি শরীর। যার জন্য, গর্ভ থেকে বেরিয়েই সামনে এই জগতের সম্মুখীন হয়ে সে এই জগৎকে নিতে পারে না, কান্না দিয়ে তার ভিতরের প্রতিক্রিয়াটা জানিয়ে দেয়। অহং অস্মি, আমির ভাব সবারই ভিতরে আছে। পিঁপড়ে থেকে শুরু করে হাতির মত বড় প্রাণী সবারই আছে। একটা ছাগলকে কাটতে নিয়ে যাওয়ার সময় ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে চেঁচাতে থাকে। একটা মশাকে মারতে গেলে প্রাণ ছেড়ে পালাবে। প্রত্যেকের চেতনার স্তরে আমিত্বের ভাব আছে। ঠিক তেমনি, যীশু, ভগবান বুদ্ধ তাঁদেরও আমিত্বের ভাব আছে, কিন্তু আমার আপনার চেতনার মত না। সবারই আমিত্বের ভাব আলাদা। কিন্তু আমিত্বের ভাব থাকবেই থাকবে।

স্বামীজী এখানে এটাই বলতে চাইছেন, এই আমি ছাড়া আর কিছু নেই। জগতে আমরা যা কিছু দেখছি, সবই এই ‘আমি’রই বহিঃপ্রকাশ। এবার এটাকে আমরা একটু অন্য ভাবে দেখতে পারি, যদিও এই যুক্তি ওনারা ব্যবহার করেন না, কিন্তু খুবই সহজ যুক্তি। আমি এখানে বসে আছি, আমি আমার ব্যাপারে সচেতন। আমি আমার আমিত্বকে নিয়ে বসে আছি, তুমি তোমার আমিত্বকে নিয়ে বসে আছ, সে তার আমিত্বকে নিয়ে বসে আছে। সবাই সবার আমিত্বকে নিয়ে বসে আছে। তার মানে আমি যখন তোমাকে দেখছি, তখন আমি তোমার আমিকে দেখছি। তাহলে দাঁড়াচ্ছে, আমিকে আমি দেখছে। তোমার আমি আমার আমিকে দেখছে, আর আমার আমি তোমার আমিকে দেখছে। অন্যরা বলতে পারে, এই ধরণের যুক্তি শাস্ত্রে আসে না। ঠিকই শাস্ত্রে আসে না। ওনারা শাস্ত্রে যুক্তিকে অন্য দিক দিয়ে নিয়ে যান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জিনিসটা এই জায়গাতেই গিয়ে দাঁড়ায়। আপনি আপনার ব্যাপারে সচেতন, আপনার আমিত্ব সব সময় বজায় থাকছে, আপনি হলেন আপনার জন্য আমি। তার মানে আমি যখন আপনার সাথে আদান-প্রদান করছি, তখন আপনার আমির সাথেই আমার আমি আদান-প্রদান করছে। আমরা মনে করতে পারি, এটা তো ইগো। ইগো হোক, কিন্তু আমিত্বের সাথেই তো হচ্ছে। তার মানে এখানে যে কজন আছেন, সবাই আমিত্বের সাথে ইন্টার‍্যাক্ট করছে, আমি আমিকে জানছে। তার মানে, আমি ছাড়া কিছু নেই। সেই আমিরই বহিঃপ্রকাশ আমি, সেই আমিরই বহিঃপ্রকাশ আপনি। এই আমিকে স্বামীজী এখানে বলছেন ‘Self’। কিন্তু এই ‘self’ সীমিত এই জন্য, কারণ মন বুদ্ধির সাথে জড়িয়ে আছে। মহাপুরুষরা যখন দেখেন তখন তাঁরাও সেই আমিকেই দেখেন, কিন্তু সেই আমি অন্য ধরণের আমি হয়।

স্বামীজী বলছেন, এই জিনিসটাকে ছোট বাচ্চা থেকে সবাইকে শেখাও, আমি ছাড়া কিছু নেই। যেটা তুমি, সেটাও তোমার জন্য আমি, আর আমি যখন দেখছি তুমি, সেটা আসলে আমি দেখছি আমি, আমি ছাড়া কিছু নেই। সমস্ত ধর্ম জেনে হোক, না জেনে হোক, এই আত্মারই পূজা করে, কারণ আত্মা ছাড়া তো কিছু নেই। আমাদের যত উপদেশ আছে, যত নীতি কথা আছে, সব এই আত্মাকেই কেন্দ্র করে নির্দেশিত। সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, এই একটি সিদ্ধান্ত বাক্য হল আমাদের সমস্ত নীতি কথা, সমস্ত মূল্যবোধের উৎস। মা বলছেন,

সবাইকে আপন করে নিতে শেখ, জগতে পর কেউ নেই। কারণ ব্রহ্ম বা আত্মা ছাড়া তো কিছু নেই, পর কেউ হতেই পারে না। নীতিতে বলে কাউকে হিংসা করবে না। আমি ছাড়া তো কেউ নেই, কে কাকে, কিসের জন্য হিংসা করবে। নীতিতে আরও বলে কারুর ক্ষতি করতে যেও না। কেন ক্ষতি করবে, আমিই তো আছি; জগতে নিজের ক্ষতি কে করতে চায়! সমস্ত ধর্মের শিক্ষা এই একটি সাধারণ সত্যকে আধার করে চলে। আত্মাই আছেন, আত্মাই আত্মার পূজা করেন। কিভাবে করেন? মানুষ হয়ে মন্দির নির্মাণ করে, বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে সেই বিগ্রহের পূজা করে। বাইরে থেকে যে দেখবে, সে বলবে, এই লোকটি মন্দিরে শ্রীরামের পূজা করছে। আসলে কিন্তু আত্মা আত্মারই পূজা করছে।

জীবনকে সত্য রূপে নেওয়ার পরিণাম

এবারে স্বামীজী যোগশাস্ত্রের অভিনিবেশকে নিয়ে বলছেন। অভিনিবেশ মানে কোন জিনিসকে আঁকড়ে ধরে নেওয়া। যোগশাস্ত্রে অভিনিবেশ হল, নিজের জীবনের প্রতি একান্ত স্পৃহা, যোগের পঞ্চ ক্লেশের মধ্যে অভিনেবেশ একটি অন্যতম ক্লেশ। এটাকেই স্বামীজী এবার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন, This indecent clinging to life as we know it here, is the source of all evil. It causes all this cheating and stealing. (*আমরা এই জীবনটাকে এখানে যেমন ভাবে জানি, তার প্রতি এরূপ অশোভন আসক্তি সমুদয় অনিষ্টের মূল। এর থেকেই যত সব প্রতারণা ও চুরি হয়ে থাকে।*) আমরা কিন্তু ঐ আমিত্ব থেকে সরে যাচ্ছি। যদি আত্মা রূপেই হোক বা ইগো রূপেই হোক, একমাত্র আমিই যদি সব কিছু হয়ে থাকি, তাহলে আমি কখনই কারুর ক্ষতি করতে চাইব না, কারুর কাছ থেকে কিছু কেড়ে নিতে চাইব না। কিন্তু সমস্যা হল, আমির সাথে জড়িয়ে আছে জীবন। এই জীবনকে এমন ভাবে আমরা আঁকড়ে ধরে আছি যে, এই জীবন আমাদের দিয়ে সমস্ত রকম অসাধু কাজ করিয়ে নিচ্ছে। হিন্দী এলাকায় একটা খুব সুন্দর স্লোগান আছে, পাপী পেটকা সওয়াল হ্যায়। পেটকে ওরা বলছে পাপী। দক্ষিণেশ্বর মাইকেল মধুসূদন দত্ত এলে ঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কেন নিজের ধর্ম ছাড়লে? মধুসূদন দত্ত বলছেন, পেটের জন্য। পেটের জন্য আসলে কেউ করে না, করে জীবনের জন্য। জীবন আমাদের কাছে এত মূল্যবান যে, জীবনকে আমরা ছাড়তে চাই না। কারণ আত্মা যে এই জগতে মানুষ রূপে এসেছেন, তিনি একটা শরীরকে আশ্রয় করে জীবনধারণ করে এসেছেন, যে শরীরের মধ্য দিয়ে এসেছেন, সেই শরীরকে তিনি কি করে ছেড়ে দিতে চাইবেন! কিন্তু সেখান থেকেই সমস্ত পাপের সৃষ্টি। তাহলে কি আত্মহত্যা করে নেওয়াটা ঠিক? আত্মহতা এই জন্যই করছে যে, সে জীবনের বোঝাটা আর টানতে পারছে না। যারা আত্মহত্যা করছে, আসলে জীবনের প্রতি তাদের মোহ অনেক বেশী। তারা জীবনকে এতই দাম দেয় যে, একটা ছোট্ট সামান্য কিছুর জন্য তার এমন কিছু অঘটন ঘটে গেছে, ওটাকে আর মেনে নিতে পারছে না।

It makes money a god and all vices and fears ensue. (*এরই জন্য লোকে টাকাকে দেবতার আসন দেয়, আর তা থেকেই যত পাপ ও ভয়ের উৎপত্তি।*) আমরা এই জীবনকে সত্য রূপে নিয়েছি, আমাদের কাছে তাই টাকা হয়ে গেছে দেবতা। আমেরিকা বলছে, ইরাণ হল terrorist country, আর ইরাণ আমেরিকার নামে বলছে, আমেরিকা করছে economic terrorism। এ ওকে সন্ত্রাসবাদী বলছে, সে তাকে সন্ত্রাসবাদী বলছে। একটু যদি ঘুরে দেখা হয়, সবটাই হল পাশার খেলা। আগেকার দিনে, সবাই না, তবে অনেকেই সিদ্ধান্তের জন্য জীবন-যাপন করতেন। একজন আচারী ব্রাহ্মণ, তার উপর যত অত্যাচারই করা হোক, সে কোন অবস্থাতেই নিজের ধর্ম ছাড়বে না। নিজের প্রাণ দিয়ে দেবে, তবু ধর্ম ছাড়বে না। দেশ বিভাজনের সময় যে দাঙ্গা হয় তাতে অনেক হিন্দু, শিখদের ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করা হয়, ওরা প্রাণ দিয়ে দিল তবুও ধর্মান্তরিত হল না। কিন্তু পরবর্তি কালে, ধর্মকে নিয়ে ছেড়ে দিন, কোন সিদ্ধান্তকে নিয়ে কি কেউ বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে? কেউ না। এখন একজন মিডলম্যানকে নিয়ে এসেছে, সে বলছে, এয়ারফোর্সের যিনি চিফ্ তিনিও নাকি জড়িয়ে ছিলেন। আমাদের তো বিশ্বাস করতে মন চাইছে না, আপনার শরীরের প্রতি এত বেশী আসক্তি! এই ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার জন্য এত লোক বলিদান দিলেন। যে দেশের রক্ষার জন্য হাজার হাজার লোক সীমান্তে প্রাণ দিচ্ছে, রোজ কত সৈন্য মারা যাচ্ছে; আর তার এয়ারচিফ নাকি ঘুষ খেয়েছেন! বিশ্বাস হয় না।

মনে হয় এই ধরণের দুর্নীতিকে যদি সরকার বাইরে প্রকাশ করতে না দিত ভাল হত, কারণ মানুষের আস্থা এতে নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু এর জন্য, আমাদের সিদ্ধান্ত চলে গেল, ধর্ম চলে গেল, দেশ চলে গেল, সব চলে গেল। থেকে গেল শুধু টাকা, যে হল আমাদের দেবতা। ইউনিভার্সিটির বড় বড় প্রফেসারদের দু লাখ টাকা মাইনে। শুনলে অনেকেই আঁৎকে উঠবে, কিছু দিন আগেও একজন শিক্ষক জীবনে এত টাকা একসঙ্গে দেখেননি। ঠিক আছে, দিনকালের সাথে সবার মাইনে বাড়ছে, ওদেরও মাইনে বেড়েছে, কিন্তু সারাদিনে কটা ক্লাশ করেন? তারপর এটা সেটা অনেক কিছুই করছে। যারা পারে না তারা টিউশিনি করছে। ডাক্তাররা তাই করছে, ইঞ্জিনিয়াররা তাই করছে, সার্ভিস ক্যাডারের অফিসাররা তাই করছে। কেন করছে? শরীরের প্রতি আমাদের মোহ এত বেশী, শরীরের চাহিদা মেটাতে এখন তাই টাকাই আমাদের দেবতা। এখানে গুরুত্ব হল, অপরে কি করছে সেটার দিকে তাকিও না, তুমি কি করতে চাইছ সেটা দেখ।

স্বামীজী তাই তাঁর শিষ্যদের উদ্দেশ্য করে আমাদের সবাইকে বলছেন, Value nothing material and do not cling to it. If you cling to nothing, not even life, then there is no fear. 'He goes from death to death who sees many in this world. (*কোন জড়বস্তুকে মূল্যবান বলে মনে করো না, আর তাতে আসক্ত হয়ো না। তুমি যদি কিছুতে, এমন-কি জীবনে পর্যন্ত আসক্ত না হও, তা-হলে আর কোন ভয় থাকবে না। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি', যে এই জগতে নানা দেখে, সে মৃত্যুর পর মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়, বার বার মৃত্যুর কবলে পরে।*) সমস্ত ভয়ের আসল মূল হল, কোন জিনিসকে ধরে রাখা। কত জিনিসকে আমরা আঁকড়ে আছি, কত প্রিয় বস্তু ও ব্যক্তির সাথে আমাদের জীবন নিবিড় ভাবে জড়িয়ে আছে, এরা যদি আমার জীবন থেকে হারিয়ে যায়, এই ভয় আমাদের সব সময় তাড়া করে যাচ্ছে। আমাদের জীবনটা একগুচ্ছ হুক বিশিষ্ট একটা জামা বিশেষ, কত হুক বেরিয়ে আছে আমরা নিজেদেরও কোন হুঁশ নেই; আর কোন হুক কোথায় কিসের সঙ্গে আটকে গিয়ে আমাকে বেঁধে ফেলবে আমরা জানি না। কঠোপনিষদে বলছেন, *মৃত্যুঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি*, যতক্ষণ বহু দেখতে থাকব ততক্ষণ আমাদের এই নির্মম জন্ম-মৃত্যুর মাঝখান দিয়ে বার বার যাতায়াত করতে হবে। স্বর্গলোক, মর্ত্যলোক, পাতাললোক, আবার আছে প্রেতযোনী, তির্যকযোনী, কত হাজার রকমের যোনী, এগুলোর মধ্যেই আমাদের আসা আর যাওয়া করে যেতে হবে, কিছু করার নেই, কারণ আমরা বহু দেখছি।

একত্ব যেখানে সেখানে দেহ ও মনের মৃত্যু নেই

খুব দামী ও সুন্দর কথা বলছেন স্বামীজী, There can be no physical death for us and no mental death, when we see that all is one. (*আমরা যখন সবই এক দেখি, তখন আমাদের শারীরিক মৃত্যুও থাকে না, মানসিক মৃত্যুও থাকে না।*) সব যদি এক হয়ে যায়, সেখানে মৃত্যু হবে কি করে, সম্ভবই না। All bodies are mine; so even body is eternal, because the tree, the animal, the sun, the moon, the universe itself is my body; then how can it die? (*জগতের সমস্ত দেহই আমার, সুতরাং আমার দেহ চিরকাল থাকবে; কারণ গাছপালা, জীবজন্তু, চন্দ্রসূর্য, এমন-কি সমস্ত জগদ্ব্রহ্মাণ্ডই আমার দেহ – ঐ দেহের আর নাশ হবে কি করে!*) আত্মা রূপে আমার মৃত্যু তো হবেই না, শরীর রূপেও মৃত্যু হবে না। আমরা প্রায়ই বলি, তোমার শরীর চলে যাবে, কিন্তু আত্মা রূপে তুমি কোথাও যাবে না। খুব জনপ্রিয় প্রচলিত কথা হল, মৃত্যু দেহের আত্মার নয়। কিন্তু লোকেদের এটা বোঝান যায় না যে, যার আত্মার মৃত্যু নেই, তার দেহেরও মৃত্যু হয় না। কারণ যতক্ষণ কেউ পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাথে এক মনে না করছে, ততক্ষণ তার আত্মজ্ঞানই হবে না। যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাথে এক মনে করছে, যাকে আমরা আত্মজ্ঞান বলছি, তার এই দেহটা চলে যাবে, কিন্তু তার বৈষয়িক দেহটা তো থেকেই যাবে। তার মানে দেহটাও যাবে না। এই হাত, এই পা, এই চোখ হয়ত থাকবে না, কিন্তু এর পদার্থগুলো কোথায় যাবে? কোথাও যাবে না, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেই থাকবে। কারণ এই চন্দ্রসূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, গাছপালা, পশুপক্ষী সব তো তুমি, তুমি নিজে, তাই তোমার দেহেরও মৃত্যু নেই। আর আত্মারও মৃত্যু নেই, তাই যার আত্মার মৃত্যু নেই, তার দেহেরও মৃত্যু হয় না। ঠাকুর বলছেন, এই ঘর আর সেই ঘর। খুব সহজ যুক্তি, এমন আহামরি কিছু না। আমরা মনে করি, আত্মা এই দেহের ভিতরে আছে, আত্মা এই শরীর ছেড়ে বেরিয়ে গেলে এই দেহটা পড়ে থাকবে। এই জ্ঞান

কোন জ্ঞানই নয়, কিছুই নয়, আত্মজ্ঞান তো নয়ই। আত্মা সর্বব্যাপী, তাহলে কি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নেই? অবশ্যই আছে, যার আছে তার জন্য আছে। কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে, তুমিই তো সব কিছু হয়েছ, তাই আত্মা রূপে তুমি থাকবে, শরীর রূপেও তুমি থাকবে। তাই যদি সত্য হয়, তাহলে তোমার কিসের ভয়! কাকে ভয়! ভয়ের কোন স্থানই নেই।

Every mind, every thought is mine, then how can death come? The self is never born and never dies. When we realize this, all doubts vanish. 'I am, I know, I love' – these can never be doubted. (*প্রত্যেক মন, প্রত্যেক চিন্তাই যে আমার – তবে মৃত্যু আসবে কি করে? আত্মা কখন জন্মানও না, মরেনও না – যখন আমরা এইটি প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করি তখন সকল সন্দেহের অবসান হয়; 'আমি আছি', 'আমি অনুভব করি', 'আমি ভালবাসি' – 'অস্তি, ভাতি, প্রিয়' – এগুলির উপর কখনই সন্দেহ করা যেতে পারে না।*) আমি আছি, সেইজন্য আমি জানি, সেইজন্য আমি ভালবাসি। যে জায়গাতে আচার্য শঙ্করের অদ্বৈতের উপর আলোচনা হয়েছিল, সেখানে আমরা এর উপর একটা দীর্ঘ আলোচনা করেছিলাম। সেইজন্য আমরা আর দ্বিতীয়বার ব্যাখ্যায় যাচ্ছি না। মানুষ সেটাকেই ভালবাসে, যেটাকে সে জানে, আর যেটাকে জানে, সেটাই আছে। এমনকি যেটা কল্পনা করছে, সেটাও তার কাছে আছে। এখন যদি আমরা বিচার করি, জগতে কি আছে? যেমন এর আগে আমিকে নিয়ে মজা করে বলা হল, আমি আমিকে জানে। ঠিক তেমনি এটাকেও বিচার করে আরও আরও পিছনের দিকে যদি নিয়ে যাওয়া হয়, তখন দেখা যাবে, এক বিশুদ্ধ সত্তা বা অস্তি ছাড়া কিছু নেই। সৎ ছাড়া যদি কিছু নাই থাকে, তাহলে যখন কিছু জানা হয়, তখন সৎকেই জানা হয়। তার মানে, যে জানছে, সেও সৎ; যাকে জানছে, সেটাও সৎ - তার মানে সৎটাই চিৎ। আর মানুষ সেটাতেই আনন্দ পায়, যেটাকে জানে। জানার মত আছে শুধু সৎ, তাই সেখানেও এক আর দুই নেই, সেইজন্য সেই সৎটাই আনন্দ। তাই সৎও যা, চিৎও তাই, আনন্দও তাই। এটাকেই স্বামীজী বলছেন, 'I am, I know, I love' – these can never be doubted।

তার সাথে আরও বলছেন, There is no hunger, for all that is eaten is eaten by me. If a hair falls out, we do not think we die; so if one body dies, it is but a hair falling. (*আমার ক্ষুধা বলে কিছু থাকতে পারে না, কারণ জগতে যে-কেউ যা কিছু খাচ্ছে, তা আমিই খাচ্ছি। যদি একটি চুল উঠে যায়, আমরা মনে করি না যে আমি মরে গেলাম। সেই রকম যদি একটা দেহের মৃত্যু হয়, সে তো ঐ একটি চুল উঠে যাওয়ারই মত।*) একটা চুল মাথা থেকে পড়ে গেলে আমরা টেরও পাই না, তেমনি এই দেহটা পড়ে গেলে আমরা টের পাবো না। কি করে টের পাবো, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটাই তো আমার শরীর। প্রায়ই অনেকে বলে, ঝড়, মহামারি, ভূমিকম্পে এত মানুষ মরছে, ভগবান কি দেখতে পাচ্ছেন না? কোথা থেকে ভগবান দেখবেন। ভগবানের শরীরের একটা রোম, সেই রোমের যে অগ্রভাগ তার সাথেও আমাদের অস্তিত্বের তুলনা করা যায় না। আর এমনিতেও ভগবানের কাছে যাবেটা কোথায়, যে মারছে সেও ভগবানের মধ্যে, যে মরছে সেও ভগবানের মধ্যে। ভগবানের উপর দোষারোপ করা, এর থেকে বোকামো আর কিছু হতে পারে না। আমার টাকা জামার ডান পকেটে থাকলেও আমার, বাম পকেটে থাকলেও আমার; যেখানেই রাখি না কেন আমার কাছেই থাকছে। একজন লোক এই পৃথিবীলোকে আছে নাকি স্বর্গলোকে আছে বা অন্য কোন লোকে আছে, ভগবানের তাতে কিছু আসে যায় না। আমাদের আসে যায়, সমস্যা আমাদেরকে নিয়ে। সমস্যা আমাদের আর দোষ দিচ্ছি ভগবানকে। এরপর স্বামীজী ভগবানকে ব্যাখ্যা করছেন।

অস্তিমাত্র বা সৎস্বরূপে থাকা – এটাই সর্বোচ্চ অবস্থা

The superconscious is God, is beyond speech beyond thought, beyond consciousness, এর ব্যাখ্যাও আমরা আগে আগে করেছি। জগতে কি হয় বলতে গিয়ে বলছেন, সত্ত্ব, রজো ও তমো, এই যে তিনটে গুণ, জগতে যা কিছু হচ্ছে সব এই তিনটে গুণের খেলা। There are three states – burtuality, (Tamas), humaninty (Rajas), and divinity (Sattva), তমস একটা হিংস্র ভাব, রজো মানবীয় ভাবের মত আর সত্ত্ব দেবত্ব ভাবের মত। Those attaining the highest state simply are. (*যাঁরা সর্বোচ্চ অবস্থা লাভে করেন, তাঁরা অস্তিমাত্র বা সৎস্বরূপ হয়ে থাকেন।*) একটু

আগে আমরা আলোচনা করেছিলাম, আমাদের কাছে ঈশ্বর দর্শন মানে কোন কিছু একটা দর্শন করছে। আবার অনেকে জিজ্ঞেস করে সাধন-ভজন কেমন চলছে? কেমন চলছে মানে, এটাই আমার জীবনধারা, এর আবার চলার কি আছে! আমরা কারুর কাছে জানতে চাই না, আপনার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস কেমন চলছে। অবশ্য রোগীদের কাছে ডাক্তারবাবুরা জানতে চান। আমাদের বদ্ধ ধারণা যে, আমি একজন, ঠাকুর আরেকজন, এখান থেকে আমাকে ওখানে পৌঁছাতে হবে – এই হল আমাদের সাধন-ভজনের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা। কিন্তু এর থেকে বোকা বোকা ধারণা আর কিছু হতে পারে না। যাদের মন এখনও উন্নত হয়নি, তাদের জন্য এগুলোর অবশ্যই গুরুত্ব আছে। কিন্তু একটু যাঁরা অনেকদিন ধরে জপধ্যান করে আসছেন, তাঁরা বুঝতে পারেন এটাই আমার জীবন, এ-ছাড়া আমার আর কিছু নেই। ভাসা ভাসা শুনলে মনে হবে এগুলো শব্দের খেলা, কিন্তু কোন শব্দের খেলা না। আমরা বাড়ি থেকে সাজগোজ করে এখানে দেববাণীর আলোচনা শুনতে এসেছি। আলোচনা শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমরা সবাই যে যার বাড়ি ফিরে যাব। বাড়ি গিয়ে এই সাজগোজ এক এক করে ছেড়ে ফেলব। তখন কি আমরা কিছু হয়ে যাচ্ছি বা কিছু একটা হয়ে গিয়েছিলাম, সেখান থেকে এবার আমি নিজে যা তাই হয়ে যাচ্ছি? বাইরে যখন গিয়েছিলাম, তখন কিছু একটা হয়েই গিয়েছিলাম। জামা, প্যান্ট, জুতো, মোজা, সোয়েটার পরে অন্য কিছু হয়েছিলাম। বাড়ি ফিরে এক এক করে সব খুলে আমি যা তাই হয়ে গেলাম। ধর্মজীবনে যখন কেউ প্রবেশ করে, তখন সে কিছু হয়ে যায় না, সে যা, সেটাই হয়ে যায়। আলতু-ফালতু যে জিনিসগুলিকে সে জড়িয়ে রেখেছিল, সেগুলোকে ছেড়ে ফেলে দেয়। ঐ ফেলে দেওয়াটাকে যদি সাধনা বলা হয়, তবে ঠিকই, ওটা সাধনাই বটে। উপলব্ধিটা সাধনা নয়, উপলব্ধিটা হল তার স্ব-অবস্থান, নিজেতে অবস্থান করা। স্বামীজী বলছেন, যাঁরা সর্বোচ্চ অবস্থায় আছেন, তাঁরা যেমনটি, তেমনটিই আছেন। ওখানে কোন পরিবর্তন নেই, কোন কর্তব্য, দায়ীত্ব কিছু নেই, কিছু হওয়ার নেই, এখান থেকে ওখানে কোথাও যাওয়ারাও কিছু নেই।

স্বামীজী বলে যাচ্ছেন, Duty dies there; they only love and as a magnet draw other to them. This is freedom. (*তাঁদের পক্ষে কর্তব্য একেবারে শেষ হয়ে যায়, তাঁরা মানুষকে কেবল ভালবাসেন, আর চুম্বকের মতো অপরকে তাঁদের দিকে আকর্ষণ করেন। এরই নাম মুক্তি।*) মুক্তি মানে এটাই, ঈশ্বর দর্শন মানে এটাই, তিনি আর কোন কিছুতে জড়িয়ে নেই। কিন্তু তিনি ভালবাসার একটা চুম্বক পাথর হয়ে গেছেন, তাঁর আকর্ষণে স্বভাব-বশতই লোকেরা তাঁর কাছে আসবে। No more you do moral acts, but whatever you do is moral. (*তখন আর চেষ্টা করে কোন সৎকার্য করতে হয় না, তখন তুমি যেটা করবে সেটাই সৎকার্য হয়ে যাবে।*) ভক্তিশাস্ত্রেও একই কথা বলেন। এখন পূর্ণ একত্ব এসে গেছে, এই অবস্থায় ভাল-মন্দ বলে কিছুই থাকে না, তিনি যা করবেন সেটাই ঠিক, সেটাই নৈতিক। The Brahmavit (knower of God) is higher than all gods, ব্রহ্মজ্ঞানীরা দেবতাদের থেকেও শ্রেষ্ঠ। গীতায় বলছেন, *সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ*, সিদ্ধরাও দেবতাদের থেকে অনেক উপরে। The angels came to worship Jesus when he had conqured delusion and had said, 'Get thee behind me, Satan', (*যীশুখ্রীষ্ট যখন মোহকে জয় করে বলেছিলেন, 'শয়তান, আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যা,' তখনই দেবতারা তাঁকে পূজা করতে এসেছিলেন।*) বাইবেল থেকে স্বামীজী এই কথা বলছেন। যীশু ব্রহ্মবিৎ, যত ক্ষমতাই থাকুক, সবাইকে ব্রহ্মবিদের পিছনে চলে আসতে হবে।

বলছেন, None can help a Brahmavit, the universe itself bows down before him. His every desire is fulfilled, his spirit purifies others; therefore worship the Brahmavit if you wish to attain the high. (*ব্রহ্মবিৎকে কেউ কিছু সাহায্য করতে পারে না, সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চ তাঁর সামনে প্রণত হয়ে থাকে, তাঁর সকল বাসনাই পূর্ণ হয়, তাঁর আত্মা অপরকে পবিত্র করে থাকে। অতএব যদি ঈশ্বরলাভের কামনা কর, তবে ব্রহ্মবিদের পূজা কর।*) ব্রহ্মবিৎকে কে সাহায্য করবে! তিনি যা চাইবেন সেটাই পাবেন, যা ইচ্ছা করবেন সেটাই হবে, কারণ সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এখন তাঁর। এই ব্রহ্মবিদের কেউ যদি সেবাদি করে, সেও ধন্য হয়ে যায়। নারদীয় ভক্তিসূত্রে বলছেন, ভক্ত আর ঈশ্বর এক হয়ে যায়। সেইজন্য সিদ্ধপুরুষ, মহাত্মার সেবা করলে ঈশ্বরেরই সেবা করা হয়ে যায়। কিন্তু এখানে ভক্ত না, ব্রহ্মবিৎদের কথা বলছেন।

তিনটি দেবানুগ্রহ - নির্বাণ - বেদান্তের শ্রেষ্ঠত্ব - হীনযান ও মহাযান - বিশ্বাস ও অবিশ্বাসে আত্মার নাশ হয় না

বিবেকচূড়ামণি থেকে বলছেন, When we have the three great 'gifts of God,' a human body, intense desire to be free, and the help of a great soul to show us the way, then liberation is certain for us. Mukti is ours. (*যখন আমরা তিনটি দেবানুগ্রহ – মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্ব ও মহাপুরুষসংশ্রয় লাভ করি, তখনই বুঝতে হবে – মুক্তি আমাদের করতলগত।*) মানবজীবন, মুক্তি লাভের প্রবল আকাঙ্খা আর মহাপুরুষের সংশ্রয়, এই তিনটে যদি কেউ পেয়ে যায়, তার মুক্তি এবার হবেই হবে। সাধারণ ভাবে দুটো দেবানুগ্রহ আমরা বেশির ভাগ ভক্তরাই পাই, মানবজীবনটা পাই আর মহাপুরুষসংশ্রয়ও পাই, যেমন যাঁরা দীক্ষাদি নিয়েছেন। রামকৃষ্ণ মিশন হওয়াতে ইদানিং বিরাট সুবিধা হয়ে গেছে। গুরু সশরীরের না থাকলেও কোন সমস্যা নেই, কারণ সঙ্ঘই এখন গুরু। কিন্তু তৃতীয় অনুগ্রহটা থাকে না, মুক্তির ইচ্ছা। এখন কারুর যদি সত্যিকারের মুক্তির ইচ্ছা হয়, বাকি দুটো তো আছেই। মানুষ ছাড়া মুক্তির ইচ্ছা কারুর হতে পারে না। ঠাকুরের মহাসমাধির সময় হয়ে আসছে, স্বামীজী তখন গুরুভাইদের বলছেন, ভাই! যা করার এখনই করে নাও। যদি আমাদের মুক্তি না হয়, পরের জন্মে মানবজীবনই পাবো, মুক্তি পাওয়ার ইচ্ছাও থাকবে, কিন্তু এই রকম মহাপুরুষ, ঠাকুরকে আমরা পাবো না। এই জিনিসটাকে স্বামীজী আরেকটু এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

Death of the body for ever is Nirvan. (*চিরকালের জন্য দেহের মৃত্যুর নামই 'নির্বাণ'।*) এবার স্বামীজী এই জিনিসটাকেই বৌদ্ধ দর্শনের দৃষ্টিতে দেখাচ্ছেন। আগে আমরা বিরাট শরীরের কথা বললাম। সেখান থেকে চলে যাচ্ছেন জীবাত্মার উপর, জীবাত্মা একটা দেহকে আশ্রয় করে, আর এক দেহ থেকে আরেক দেহে, সেই দেহ থেকে অন্য দেহে, এই যে দেহের লম্বা সিরিজ চলছে, এই সিরিজকে ভেঙে দেওয়া, এটাই নির্বাণ। এই জীবাত্মা যেন আর শরীর গ্রহণ না করে; কিন্তু জীবাত্মার ধর্ম হল, সে শরীর ধারণ করবেই। তাহলে উপায়? জীবাত্মাকেই ভেঙে দাও। জীবাত্মাকে ভেঙে দিলে আর দেহ ধারণ করতেই পারবে না। নির্বাণ মানে নূতন দেহের নির্মাণ হওয়াটাকে ভেঙে দেওয়া। জীবাত্মা থাকলেই দেহ ধারণের ব্যাপারটাও চলতে থাকবে। তাই জীবাত্মাকেই ভেঙে দাও। তার মানে, আত্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞানও যা, জীবাত্মার নাশও তাই আর দেহের নবনির্মাণ বন্ধ হওয়াও তাই, এটাকেই নির্বাণ বলে।

It is the negative side and says, 'I am not this, nor this, nor this'. (*এই নির্বাণ-তত্ত্বের 'না'-এর দিক, এতে বলে – আমি এটা নই, আমি ওটা নই।*) নেতি নেতি বিচারের কথা বলছেন, স্বামীজী এটাকে নেতিমূলক দিক বলছেন। Vedanta takes the further step and asserts the positive side – mukti or freedom. 'I am Existence absolute, Knowledge absolute, Bliss absolute, I am He', this is Vedanta, the capstone of the perfect arch. (*বেদান্ত আরেকটু অগ্রসর হয়ে 'হাঁ'এর দিকটা বলেন – ওরই নাম মুক্তি। 'আমি সৎ-চিৎ-আনন্দ, সোঽহম্ - আমিই সেই' : এই হল বেদান্ত – নিখুঁতভাবে তৈরী একটি খিলানের যেন শীর্ষপ্রস্তর।*) বেদান্ত সমস্ত দর্শনের চূড়ামণি। তাই না, বেদান্ত বৌদ্ধ ধর্মকেও ছাড়িয়ে যায়। আসলে যত ধর্ম আছে, সব ধর্মের মধ্যে একমাত্র বৌদ্ধ ধর্মই ঘোর অদ্বৈতের কাছাকাছি চলে আসে। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম যখন নির্বাণের কথা বলে তখন তারা দেহনাশের কথা বলে, দেহনাশ মানে মনোনাশ। কিন্তু সেখানে বলছেন সর্ব-নাশ, ওদের নামই সর্ববৈনাশিক, সব কিছুকে নাশ করে দেয়। বেদান্ত কিন্তু ওখান থেকে ঘুরে ইতি ইতি অবলম্বন করছে, আমিই সব কিছু হয়েছি। আসলে দুটোর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। যিনি শুধু ব্রহ্মজ্ঞানকে নিয়ে থাকেন, তাঁর কাছে হল, আমি ছেড়ে দিয়েছি, আমার আর কিছুর দরকার নেই। ওটাও সত্য, আর আমিই এই সব কিছু হয়েছি, এটাও আরেক সত্য। ঠাকুর কথামৃতে জ্ঞানী ও বিজ্ঞানীর কথা বলছেন। যাঁরা শুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান নিয়ে বেরিয়ে গেছেন, তাঁদের জ্ঞানী বলছেন আর ঐ জ্ঞানের পরেও যাঁরা জগৎকে গ্রহণ করছেন, তাঁদের বিজ্ঞানী বলছেন। তত্ত্বের দিক থেকে কোন তফাৎ নেই।

The great majority of the adherents of Northern Buddhism believe in Mukti and are really Vedantists. Only the Ceylonese accept Nirvana as annihilation.

(*বৌদ্ধধর্মের মহাযান-সম্প্রদায়ের বেশীর ভাগ লোকই মুক্তিতে বিশ্বাসী – তারা যথার্থই বৈদান্তিক। কেবল সিংহলবাসীরাই নির্বাণের 'বিনাশ' অর্থ গ্রহণ করে।*) ভগবান বুদ্ধের মহানির্বাণের পর বিভিন্ন জায়গায় যত তাঁর শিষ্যরা ছিলেন সবাই এক জায়গায় জড়ো হলেন, বৌদ্ধদের কাছে এটা একটা মহাকুম্ভ। এই মহাকুম্ভে বিভিন্ন শিষ্যরা ভগবান বুদ্ধের কাছ থেকে কি কি শিক্ষা পেয়েছিলেন, তাঁর মুখ থেকে যে যা শুনেছিলেন, সবার শিক্ষাকে এক জায়গায় গ্রথিত করা হল। যেমন হয়ে থাকে, যে কোন আচার্যের ক্ষেত্রে হয়, পরের দিকে দেখা গেল, সাধুদের মধ্যে কিছু বিভেদ এসে গেলো। বিভেদ কিছু দর্শনকে নিয়ে ছিল, আবার কিছু জাগতিক জিনিসকে নিয়েও ছিল। এদের মধ্যে যারা খুব গোঁড়া, এনারা তাদের নাম দিলেন হীনযান, ওরা আবার নিজেদের বলত থেরাবাদ, থেরা মানে সিনিয়র বা বড় ভাই। যারা সবাইকে নিয়ে চলার পথ নিল তারা হল মহাযান। থেরাবাদ আর মহাযানের মধ্যে দর্শন নিয়ে কিছু কিছু মত পার্থক্য আছে, সংস্কৃত ও স্থানীয় ভাষাকে নিয়ে দ্বন্দ্ব আছে আর ভগবান বুদ্ধের শেষ কথা, অর্থাৎ পরিণতি কি হবে, সেটাকে নিয়েও বিরোধ আছে। স্বামীজী বলছেন উত্তরের বৌদ্ধরা মুক্তিতে বিশ্বাস করে এবং বেদান্তের সাথে ওদের দর্শনের অনেক মিল আছে। কিন্তু সিংহলে যে বৌদ্ধরা আছে, তাদের কাছে নির্বাণ মানে দেহের নাশ।

স্বামীজী বলছেন, No belief or disbelief can kill the 'I'. (*কোনরূপ বিশ্বাস বা অবিশ্বাস 'আমি'কে নাশ করতে পারে না।*) আমিত্বের নাশ হবে না। আমরা যদি কোন কিছু বিশ্বাস করি তাতেও নাশ হবে না, যদি কিছু অবিশ্বাস করি, তাও নাশ হবে না। যতক্ষণ আমরা বলছি 'আমি আত্মা', এটা আমার বিশ্বাস, তাতে আমি কোন দিন নাশ হবে না। 'আমি দেহ নই', এটাকেও যদি বিশ্বাস রূপে নেওয়া হয় বা অবিশ্বাস রূপে নেওয়া হয়, আত্মজ্ঞান কোন দিন হবে না। কারণ আত্মা মানেই দেহ-মনের অতীত। মনে যতক্ষণ বিশ্বাস-অবিশ্বাসের খেলা চলছে, ততক্ষণ আর যাই হোক, আত্মজ্ঞান কোন ভাবেই হবে না। That which comes with belief and goes with disbelief is only delusion. (*যার অস্তিত্ব বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে এবং অবিশ্বাস উড়ে যায়, তা ভ্রমমাত্র।*) মনের যে এলাকা, এটাই সংসার, মনটাই সংসার। যেখানে একটুও যদি চিন্তা-ভাবনা থাকে, বিশ্বাস আছে, এটাও মায়া, অবিশ্বাসটাও মায়া, বিশ্বাস তাও একটু ভাল। শ্রদ্ধা এটাও মায়া, অশ্রদ্ধা এটাও মায়া, ভক্তি, অভক্তি সবটাই মায়া। যেখানেই মন জড়িয়ে আছে, সেটাই মায়া। শুদ্ধ মন মানে, আমি ভক্ত, এ-ছাড়া অন্য কোন ভাব নেই, এটা কিন্তু বিশ্বাস নয়, এটা উপলব্ধি। আমি ঈশ্বরের ভক্ত, এ-ছাড়া আমি আর কিছু জানি না। যেমন ঠাকুরের জীবনে আমরা দেখছি, মীরাবাঈ যেমন বলে গেলেন, কৃষ্ণ ছাড়া আমি কিছু জানি না। এই শুদ্ধ মন আর অশুদ্ধ মনে তফাৎ আছে।

Nothing teaches the Atman, আত্মাকে কে শিক্ষা দেবে, পূর্ণ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত যিনি, তাঁকে কে শিক্ষা দিতে যাবে! 'I salute my own Self'. 'Self-illuminated, I salute myself, I am Brahman', ঠাকুরের নামে গান আছে, আপনি করিলে আপনার পূজা। তোতাপুরী তখনও ঠাকুরকে অদ্বৈত সাধনা করাননি, তার আগেই ঠাকুর পূজা করতে বসে নিজের মাথাতেই অর্ঘ্য দিয়ে নিজের পূজা করছেন। The body is a dark room; when we enter it, it becomes illuminated, it becomes alive. Nothing can ever affect the illumination; it cannot be destroyed. It may be covered, but never destroyed. (*এই দেহটা যেন একটা অন্ধকার ঘর; আমরা যখন ঐ ঘরে প্রবেশ করি, তখনই তা আলোকিত হয়ে ওঠে, তখনই তা জীবন্ত হয়। আত্মার এই স্বপ্রকাশ জ্যোতিকে কিছুই স্পর্শ করতে পারে না, একে কোনমতেই নষ্ট করা যায় না। একে আবৃত করা যেতে পারে কিন্তু কখনও নষ্ট করা যায় না।*) শরীরটা কিছুই না, শরীরটা গৌণ, মনই আসল। হ্যারি পটারের কাহিনীগুলিতে ম্যাজিকের সাহায্যে শরীরকে পাল্টে দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু মনকে পাল্টাচ্ছে না। কোন কারণে অন্য কোন দেহে ঢুকে গেলেও সেখানে সেই থাকবে। একমাত্র যোগ শিক্ষা দেয় মন কিভাবে পাল্টে দেওয়া যায়। শরীর পাল্টানো কোন ব্যাপারই না, মৃত্যুতেই আমাদের শরীর পাল্টে যাবে। ম্যাজিক দিয়ে শরীর পাল্টে দেবে, যোগশক্তি শরীর পাল্টে দেবে; কিন্তু মন পাল্টে দিতে পারবে না। মন হল সেই অন্ধকার ঘর, আত্মা যখন তাতে প্রবেশ করে তখন মন আলোকিত হয়ে যায়। সেই আলোর সাহায্যে বাকি সব কিছু চলে। মনকে শরীর, আত্মাকে মন আবৃত করে দেওয়ার ফলে আত্মার আলো ঢাকা পড়ে যায়। আত্মাকে আবৃত করা যায়, কিন্তু নাশ কখনই করা যাবে না। আমরা মনের উপর এত কিছু চাপিয়ে রেখেছি যে, আত্মার আলো প্রকাশ হতে পারছে না। বরফের দেশে এত রকমের

পোশাক গায়ে চাপিয়ে দেওয়া হয় যে, লোকটিকে চেনাই যায় না। তাই বলে কি লোকটি পাল্টে যায়? কখনই পাল্টায় না। যেমনি সব আবরণগুলোকে সরিয়ে দেওয়া হবে, তখন সে যা তাই দেখা যাবে। আত্মজ্ঞান বলতে এটাই, আমি যা আমি তা, বাকি যা আছে সব ফেলে দিলাম। কোন কিছুকে আঁকড়ে ধরে রাখা যাবে না। এখন যা কিছু আমরা ধরে রেখেছি, সব ছেড়ে দিলাম, আত্মজ্ঞান বেরিয়ে এলো।

স্বামীজী এখানে বলতে চাইছেন, আত্মজ্ঞান যাঁরা পেতে চাইছেন, আগে তাঁদের এই সংসারে বা জগতে তাঁরা যা কিছু আঁকড়ে ধরে আছেন, সব কিছুকে ছাড়তে হবে, একটা সামান্য কিছুকে ধরে রাখলেও হবে না। এখানে একটা কথা বলা দরকার, অদ্বৈত জ্ঞানের অনুশীলন করা সবার পক্ষে সম্ভব না। কারণ মানুষ মাত্রেই দেহ আর গেহ-তে পুরো মাত্রায় আসক্ত হয়ে আছে। আসক্ত হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক, আর এই আসক্তি থেকে মানুষ বেরিয়ে আসতে পারে না, সেইজন্য অদ্বৈতের অনুশীলন এদের জন্য নয়। এদের জন্য ভক্তির পথ বা অদ্বৈতের যে একটা মিশ্র পথ, এই পথই তারা নেয়। সর্বসাধারণ অদ্বৈত নিতে পারছে না বলে আদর্শকে তো ফেলে দেওয়া যায় না। অবতাররা এসে এটাই করেন, সত্য যেমনটি, তেমনটি রেখে দেন। ধীরে ধীরে মানুষ এটাকে নিজের মত করে নেয়। তারপর আবার Diluted হতে হতে এত diluted হয়ে যায় যে, সত্যটা কেমন মানুষ ভুলে যায়, আবার অবতার এসে ওটাকে ঠিক করে দেন। কোন সন্দেহই নেই যে, অদ্বৈত অত্যন্ত উচ্চমানের একটা জীবনদর্শন, যেটাকে পালন করা খুব কঠিন। ঠাকুরের কথায়, হাত কেটে দর দর করে রক্ত পড়ে যাচ্ছে, বলছে, আমার তো কিছু হয়নি, আমার হাতের হয়েছে, আমি তো হাত নই। বেদান্তে এই ধরণের প্রচুর কাহিনী আছে, এগুলোকে শুনতে হয়।

আগেকার দিনে বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রথা ছিল, তাদের বিভিন্ন যে পেশা ছিল, তাদের সবারই নিজের নিজের কাহিনী আছে। ব্রাহ্মণদের বংশে কে কবে বিরাট কিছু একটা করেছিল, সেই কাহিনী বংশ পরম্পরায় শোনান হয়, ক্ষত্রিয়রা তাদের নিজেদের কাহিনী বাচ্চা বয়স থেকে শুনে আসছে, ধোপা, কর্মকার, ছুতোর মিস্ত্রি, সবারই নিজের নিজের কাহিনী আছে। কাহিনীতে দেখায়, তাদের বংশে যিনি একটা বিরাট কাজ করেছিলেন, সেই কাজ তিনি কিভাবে করেছিলেন, তাঁর বিরাট কি উপলব্ধি হয়েছিল ইত্যাদি। সেখান থেকে বাচ্চাদের মনে একটা ছাপ পড়ে, আমিও এই রকম বড় হব। বর্ণাশ্রম ধর্ম চিরতরের মত চলে গেছে, কোন দিন আসবেও না। এখন একমাত্র ধর্ম হিন্দু ধর্ম। হিন্দু ধর্মের যত পথ আছে, সব পথের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পথ বেদান্ত। এইজন্যই শ্রেষ্ঠ পথ বলা হয়, কোন কিছু আলম্বন নেয় না, দর্শনের দিক থেকে একেবারে পরিপুষ্ট, আর যাদের বুকের পাটা আছে, তারা ছাড়া আর কেউ বেদান্তের পথ নিতে পারে না। এখন হিন্দুদের আসল ধর্ম বেদান্ত। আমার দ্বারা হবে না, আমি পারব, এসবের সঙ্গে বেদান্তের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু উচ্চতম আদর্শের কথা সবাইকে শুনতেই হবে। সবাই ক্ষুদিরাম বোস হয়ে যাবে না, কিন্তু কাহিনীটা শুনতে হয়। শুনলে ভিতরে কিছুটা বল আসে। সারাদিন যখন এই শক্তির কথা শুনছে, সারাদিন যখন এই উচ্চ আদর্শের কথা শুনছে, তখন মনে একটু ছাপ পড়ে। মহাভারতের কাহিনী অনুযায়ী আমরা জানি, অভিমন্যু মায়ের গর্ভেই শিক্ষা পেয়েছিলেন। এগুলো আগে আমাদের কাহিনী বলে মনে হত, কিন্তু এখন ডাক্তাররা একশ ভাগ নিশ্চিত যে, শিশু যখন মায়ের গর্ভে থাকে, তখন থেকেই সব শেখে। তাই নিয়ে অনেক জায়গায় অনেক মজার কাণ্ড হয়। বাড়িতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের কোন রেওয়াজ নেই, কিন্তু বাচ্চা যাতে বিরাট কিছু হয়, সেইজন্য সারাদিন ঘরে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত চলতে থাকে। লোকেরা এটা বুঝতে পারে না, মা নিজে কিছু উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বোঝে না, বিরক্ত হয়ে যায়। বাচ্চা ঐ বিরক্তিটাই শেখে, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতটা আর শেখা হয় না। আমাদের পরম্পরাতে তাই প্রথা ছিল, বাড়ির কোন মহিলা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে গেলে তিনি রামায়ণ বা কোন ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতেন বা পাঠ করে শোনান হত। প্রসব হওয়ার আগে পর্যন্ত নানা রকমের উপাচারের ব্যবস্থা ছিল, যাতে গর্ভস্থ সন্তানের উপর ভাল প্রভাব পড়ে। সে নিজেই একটা সংস্কারের পুটলি নিয়ে আসছে, বাড়ির লোকেরা যতটা সম্ভব ভাল সংস্কার দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। আমাদের যা কিছু আলোচনা করা হচ্ছে, এর একটা মূল উদ্দেশ্য সংস্কার তৈরী করা, যখন হওয়ার তখন হবে। এখন থেকেই একটু একটু করে তিল তিল করে জমছে। স্বামীজী নারী জাতিকে কিভাবে দেখছেন, আর নারী জাতি কি রকম হওয়া উচিৎ, সেই ব্যাপারে এখন বলছেন।

ভগবানকে অনন্তশক্তিস্বরূপিণী জননী-রূপে উপাসনা

নিপীড়িত, প্রতারিত সমাজ সব সময় survival modeএ চলে যায়। শরীরের ব্যাধি যখন মারাত্মক খারাপ অবস্থায় চলে যায়, তখন তাকে আইসিসিইউতে নিয়ে যাওয়া হয়। ডাক্তাররা বলবেন, আগে ওকে বাঁচাও। আইসিসিইউতে ঢোকানর সময় রোগী বা তার বাড়ির লোকেরা ভাবতে বসে না যে, সে কি রঙের জামা পরবে, মানানসই কেমন প্যান্ট পরবে, কি পারফিউম নেবে, কোন জুতোটা পরবে। ওকে এখন ওষুধ দিতে থাকো, অবজারভেশানে রাখো, আগে ওকে বাঁচাতে হবে। ভাল হয়ে যাওয়ার পর স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসে কাজকর্ম করতে শুরু করল, এরপর যদি কেউ বলতে শুরু করে, কেন তোমার মনে নেই, কদিন আগে কি অবস্থায় ছিলে, নাকে নল, মুখে নল, এসব কথা বলার কোন অর্থই হয় না। হিন্দুরা হাজার হাজার বছর ধরে নিপীড়িত, প্রতারিত জাতি। মুসলমানরা এলো, ঘোড়ার পিঠে চেপে সব জয় করতে শুরু করল, হিন্দুরা বুঝতেই পারেনি কি হচ্ছে। আর সব জায়গায় যা হয়, যারা সুরক্ষিত নয়, তাদের উপরেই অত্যাচার বেশী হয়। মহিলা আর শিশুরাই সব থেকে বেশী অরক্ষিত। যে শিশুগুলোকে দিয়ে শারীরিক ভাবে কাজ করানো যাবে, তাদের গোলামের মত কাজে লাগিয়ে দিচ্ছে। যারা পারবে না, তাদের মেরে ফেলছে। মহিলাদের তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছে। ক্ষমতাবান কোন মুসলমানের নজরে যে মহিলা পড়ে যেতে, তাকে আর কেউ বাঁচাতে পারবে না। অন্য দিকে কম বয়সে বিধবা হয়ে গেলে আতঙ্ক লেগে যেত, কে তাকে তুলে নিয়ে যাবে, কি হবে কোন ঠিক নেই। একটা ভয়ার্ত সমাজ হিন্দুদের তখন, আমাদের কি হবে, আমরা কোথায় যাবো? এই যে অত্যাচার হবে, তার থেকে আগেই তুমি মরে যাও। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমরা তাই সতীপ্রথা, বিধবা বিবাহকে নিয়ে আলোচনা করতে পারি না। আমাদের মনে রাখতে হবে, রামমোহন রায় সমাজসংস্কারের কাজ শুরু করলেন ইংরেজদের রাজত্বে। মুসলমানরা হিন্দুদের উপর যে ধরণের পাশবিক অত্যাচার করে এসেছে, ইংরেজরা কখনই হিন্দুদের উপর এই ধরণের জঘন্য অত্যাচার করেনি। সেইজন্য ভারতের সংস্কারও শুরু হয় ইংরেজরা আসার পর থেকে। মুসলমানদের সময় সংস্কার করার সাহসই কারুর ছিল না, সংস্কারের কথা বললেই তার গর্দান যাবে। হিন্দুরা তখন কোন রকমে বেঁচে থাকত। আর্য সমাজ যখন এসেছে, ঠাকুর, স্বামীজীরা যখন এসেছেন, ইংরেজদের জমানা তখন পুরোদমে দাঁড়িয়ে গেছে। ইংরেজদের অনেক দোষ ছিল ঠিকই, কিন্তু ওরা ন্যায়প্রিয় ছিল, যদি ঐ ব্যাপারে তারা না জড়িয়ে থাকে। যারা রাজা হয়, তারা কখন নিজের জাতির প্রতি কোন দোষ আসতে দেবে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা অনেক ন্যায় বিচার করেছে। ভারতবর্ষে আজকে অনেক কিছু, যেমন ন্যায়বিচার, সমান অধিকারের বোধ, সব ইংরেজদের জন্য এসেছে। পাকিস্থান আর বাংলাদেশে ছাড়া, কারণ এরা ভারতের মধ্যে ছিল বলে ভারতের প্রভাব এদের মধ্যে পড়েছে, এছাড়া অন্য যে কোন মুসলিম দেশগুলো আজও অনেক পিছিয়ে আছে। আফগানিস্থানকে দেখেই বোঝা যায়, আরব একই, এখনও ধর্ম, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কত পিছিয়ে পড়ে আছে। কেউ কদাচিৎ বিক্ষিপ্ত ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। কারণ ওরা আধুনিক শিক্ষা, প্রযুক্তি ও কারিগরি বিজ্ঞানের নূতন অগ্রগতির কোন কিছুকেই নিতে পারল না। কিন্তু তেলের দৌলতে তাদের হাতে এসে গেছে প্রচুর টাকা, এই টাকার জোরে দাঁড়িয়ে আছে ঠিকই। কিন্তু শিক্ষা জিনিসটা পুরো আলাদা, equality, sense of justice এগুলো পুরো আলাদা জিনিস। এই জিনিসটাকে মাথায় রেখে এবার যদি আমরা নারীজাতির শক্তির দিকে তাকাই, স্বামীজী কিভাবে এই জিনিসটাকে দেখছেন, এখানে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

At the present time God should be worshipped as ‘Mother’, the Infinite Energy. (*বর্তমান যুগে ভগবানকে অনন্তশক্তিস্বরূপিণী জননী-রূপে উপাসনা করা কর্তব্য।*) এতক্ষণ অদ্বৈতের উপর আলোচনা চলছিল, স্বামীজী ঘুরে চলে এলেন মাতৃশক্তির উপর। মাতৃশক্তি অনন্তশক্তি স্বরূপিণী, সারা বিশ্বে যেন তাঁরই পূজা হয়। This will lead to purity, and tremendous energy will come here in America. (*এতে পবিত্রতার উদয় হবে, আর এই মাতৃপূজায় আমেরিকার মহাশক্তির বিকাশ হবে।*) স্বামীজী আমেরিকাকে নিয়ে বিশেষ করে বলছেন, আমেরিকার বিশেষ মঙ্গল হবে যদি এখানে মাতৃপূজা শুরু হয়। Here no temples weigh us down, no one suffers as they do in poorer countries. (*এখানে আমেরিকায়া কোন মন্দির বা পৌরোহিত্য-শক্তি কাউকে দাবিয়ে রাখছে না, অপেক্ষাকৃত গরীব দেশগুলোর মত এখানে কেউ কষ্টভোগ করে না।*) স্বামীজী ১৮৯৫ সালে আমেরিকাকে নিয়ে স্বামীজী যা বলছেন, তাতে এটা পরিষ্কার যে, সেই সময়ই আমেরিকা সব দিক দিয়ে উন্মুক্ত ছিল। ভাবলে অবাক লাগে,

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী ভারত পরিক্রমা করে সারা ভারতকে দেখলেন, চারিদিকে শুধু অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য, কুসংস্কার, অজ্ঞান, দারিদ্র। অভুক্ত অবস্থায় মরছে, বিনা চিকিৎসাতে মরছে আর যাদের কাছে টাকা তারা অত্যাচার করে গরীব মানুষের থেকে রক্ত শুষে নিচ্ছে। ভারতের এই অব্যবস্থায় ইংরেজদের কোন মাথা ব্যাথা নেই। সেখান থেকে স্বামীজী পৌঁছে গেলেন আমেরিকায়, যেন একজন আলো চাইছে কিন্তু তাঁর জীবনটা অন্ধকার গুহার ভিতর, সেই গুহা থেকে বেরিয়ে হঠাৎ যেন সূর্যের আলোতে এসে দাঁড়ালেন। মাথা ঘুরে যাওয়ার কথা, আর সত্যিই মাথা ঘুরে গেল, সবাই স্বাধীনতার স্বাদ পাচ্ছে, বাক্ স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সব থেকে বেশী মেয়েদের স্বাধীনতা, ঔদ্ধত ভাব না, মেয়েরা পুরুষদের সাথে এক সঙ্গে চলছে। হিন্দুরা চিরদিনই এই রকম ছিল। যার জন্য বেদে আমরা কত ঋষিকাদের নাম পাই, ঋষিদের পাশাপাশি তাঁরাও বেদের অনেক মন্ত্র রচনা করেছেন, তাঁদের নিজেদের আশ্রম ছিল, সেখানে তাঁরাই সব কিছু, তাঁদের আবার উপনয়নও হত। উপনিষদে দেখছি গার্গি কিভাবে অত বড় একজন ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের সাথে বাগযুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছেন। মৈত্রেয়ীকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিচ্ছেন। শুধু বেদেই নয়, মহাভারতেও আমরা অনেক মহিয়ষী নারীদের বর্ণনা পাই। কিন্তু ধীরে ধীরে নারীজাতির এই তেজ স্তিমিত হয়ে যেতে শুরু করে। আর গত হাজার বছরে তো পুরো শেষ হয়ে গেল। হাজার বছর খুব কম সময় না, একটা বিরাট লম্বা সময়। কারণ একটা প্রজন্ম বারো থেকে পনের বছরের হয়, কুড়ি বছরও যদি ধরা হয়, তাহলেও পঞ্চাশ প্রজন্ম পেরিয়ে গেছে। পঞ্চাশ প্রজন্ম একটা বিরাট লম্বা সময় হয়। একটা সংস্কৃতি দাঁড়াতে কম করে সাত প্রজন্ম লাগে, সংস্কৃতি শেষ হয়ে যেতেও সাত প্রজন্ম লাগে। আমরা কি ছিলাম, আমরা ভুলে গেছি।

এখানে গ্রাম্য পুরোহিত যেটা বলে দেবে, সেটাই আমাদের কাছে সত্য। গ্রাম্য পুরোহিত আবার গ্রামে যদি কোন পণ্ডিত থাকে, যে কাশীতে গিয়ে বা অন্য কোন জায়গায় গিয়ে শাস্ত্র অধ্যয়ন করে এসেছে, তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করছে। বাকিটা পরম্পরায় চলতে থাকে, তার বাপ-ঠাকুর্দাকে যেমনটি করতে দেখেছে, সেটাই তার কাছে ধর্ম। এর নামই হল কুলধর্ম – কুলধর্ম আর জাতিধর্ম। হিন্দুদের ধর্মই কুলধর্ম, কিন্তু কুলধর্ম আসে আচার্যদের কাছ থেকে। মাঝে মাঝে যদি ঠিক না করে নেওয়া হয়, ধর্মটা হারিয়ে যায়। সব ধর্মেই এই জিনিস হয়। তবে অন্যান্য ধর্মে একটাই মূল ধর্মগ্রন্থ আছে বলে বেঁচে যায়। আমাদের এখানে কোন একটা মূল গ্রন্থ না থাকাতে এই সমস্যা গুলো দেখা দেয়। কারণ আমাদের স্বভাবেই নেই, আমরা খোলাখুলি। কুলধর্ম, আর গ্রামের যে মন্দির, তার যে আচার, সেটা সবার উপরে। ঐ আচারকে ভেঙে কেউ বেরোতে পারবে না। আজ ভারত স্বাধীন, তার নিজের সংবিধান আছে, আইন আছে, দণ্ডনীতি আছে, কিন্তু লোকেরা মানছে না। স্বামীজী বলছেন, আমেরিকাতে সেই রকম কোন মন্দির নেই যে, মানুষকে দাবিয়ে রাখবে। যে দেশে বা সমাজে দারিদ্রতা, অশিক্ষা বেশি, সেই দেশ ও সমাজের মেয়েরাই সবার আগে লাঞ্ছনা ভোগ করে। কারণ মেয়েদের অর্থোপার্জন করার সুযোগ নেই, যার কাছে টাকা থাকে সে প্রাধান্য পায়। টাকা রোজগারের জন্য খাটতে হয়, ক্ষেতে-খামারে খাটছে, অন্যান্য কর্মস্থলে খাটতে হচ্ছে, খাটার জন্য তাকে ভাল করে খেতে দিতে হবে। ফলে পরিবারের সবাই খাওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে মেয়েরা তাই খাবে। গরীব দেশ সবাইকে সমান খাওয়া দিতে পারে না, অসহায়। গ্রাম দেশে এটাই নিয়ম, পুরুষরা খাওয়ার পর মায়েরা খাবে। কারণটা সেইখানে, গরীব দেশ, তারা জানে আমি যদি সমান সমান খাওয়ার কথা বলি, আমরা দুজনেই মরব। তার থেকে বরং একজন পেটভরে খাও, একজন আধপেটা খেয়ে থাক। কিছু করার নেই, চারিদিকে শুধু অভাব আর অভাব। ঠাকুরের মত মানুষ, তিনিও মায়ের জন্য দুশ্চিন্তা করে যাচ্ছেন, আমার অবর্তমানে কি করে মায়ের খাবার ব্যবস্থা হবে। সেখানে আমেরিকা এই অবস্থা থেকে অনেক আগেই বেরিয়ে এসেছে। আজ অবশ্য ভারত অনেক পাল্টে গেছে, আজ আর ঐ রকম দুরবস্থা নেই। জওহরলাল নেহরু হয়ে ইন্দিরা গান্ধী হয়ে আজকে ভারত মোটামুটি এতটাই খাদ্যোৎপাদনে স্বনির্ভর হয়ে গেছে যে, মানুষ এখন আর না খেয়ে মরবে না। কিছু মানুষ যে মরছে সেটা অভাবে না, প্রশাসনের দোষে।

স্বামীজী বলছেন, Woman suffered for aeons, and that has given her infinite patience and infinite perserverance. She holds on to an idea. (*নারীজাতি শত শত যুগ ধরে দুঃখকষ্ট সহ্য করেছে, তাই তাদের ভিতর অসীম ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের বিকাশ হয়েছে। তারা একটা ভাব আঁকড়ে ধরে থাকে, সহজে ছাড়তে চায় না।*) মানুষ যখন ব্যক্তি রূপে, জাতি রূপে কষ্ট সহ্য করে তখন তার

মধ্যে একটা ধৃতি ভাব এসে যায়, লেগে থাকার ক্ষমতাটা এসে যায়। শুধু ভারতবর্ষেই না, আমেরিকাতেও এক সময় এই একই অবস্থা ছিল। ইদানিং অনেকে গবেষণা করছেন, একটা জাতির চেতনা কিভাবে আসে, বাবা তার ছেলেকে কিভাবে চেতনা দেয় আর মা কিভাবে তার মেয়েকে চেতনা দেয়, আবার মা কিভাবে ছেলেকে দেয় আর বাবা কিভাবে মেয়েকে দেয়; আলাদা আলাদা ভাবে চেতনা দেয়। মেয়েজাতির ডিএনএতে একটা শক্তি এসে যায়। আদিবাসীদের মধ্যে নেই, সেখানে সমান সমান আছে। কিন্তু যেখানে একটু সভ্যতা আছে, সেখানে মেয়েরা দুঃখকষ্ট সহ্য করেছে, যার ফলে তার মধ্যে একটা শক্তি এসে গেছে। ফলে যে কোন একটা আইডিয়া দিয়ে দিলে মেয়েরা সহজে সেটাকে ধরে নেয়।

It is this which makes her the support of even superstitious religions and of the priests in every land, and it is this that will free her. (*এই জন্যই সকল দেশে তারা এমন-কি কুসংস্কারপূর্ণ ধর্মসমূহের এবং পুরোহিতদের পৃষ্ঠপোষক-স্বরূপ হয়ে থাকে, আর এইটিই পরে তাদের স্বাধীনতার কারণ হবে।*) যে কোন ধর্মে যত পুরোহিতরা আছে, এদের আশ্রয় একমাত্র মেয়েরা। মন্দির, মসজিদ, গীর্জা সব জায়গায় সংখ্যায় মেয়েরাই বেশী ধর্ম করতে যায়। পূজনীয় স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী যখন হায়দ্রাবাদে ছিলেন, সেখানে তিনি অনেক আগে বলতেন, আমি হায়দ্রাবাদে যত কাজ করছি সেখানে ছেলেরা কিছুই করে না, শুধু উপরে উপরে কর্তালি করে যাবে; কিন্তু মেয়েদের যদি দায়ীত্ব দিয়ে দেওয়া হয় মাঝ পথে কখনই ছেড়ে চলে যাবে না। ছেলেগুলো কখন যে অসম্পূর্ণ ফেলে রেখে বেরিয়ে যাবে কোন ঠিক নেই। ইউটিউব হোক, টিভিতে হোক যে কজন আকর্ষক প্রচারক আছেন, সেখানে মহিলার সংখ্যা বেশী। স্বামীজী বলছেন, যেখানে অন্ধ কুসংস্কার ধর্ম, সেখানেও ঐ ধর্মকে মেয়েরাই ধরে আছে। আর মেয়েদের যদি উচ্চ ধারণা দিয়ে দেওয়া হয়, তখন এরাই সব কিছু চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। স্বামীজী তাই আমেরিকানদের উপর খুব আশাবাদী ছিলেন, এরাই বেদান্তকে ধরতে পারবে। একবার যদি এদের মধ্যে বেদান্তের ভাব চলে আসে, সমস্ত শৃঙ্খল ভেঙে বেরিয়ে এসে নিজের মহিমায়, নিজের শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। স্বামীজীও তাই বলছেন, We have to become Vedantists and live this grant thought; the masses must get it, and only in free America can this be done. (*বৈদান্তিক হয়ে আমাদের বেদান্তের এই মহান ভাবকে জীবনে পরিণত করতে হবে। জনসাধারণকেও ঐ ভাব দিতে হবে – এটা কেবল স্বাধীন আমেরিকাতেই কাজে পরিণত করা যেতে পারে।*)

একটা ক্রীতদাসের সমাজে, দরিদ্র সমাজে, অশিক্ষিত সমাজে বেদান্ত একেবারেই চলবে না। ভারতে ঠিক ঠিক বেদান্ত উপনিষদের সময়ে ছিল, ঋষিরা তখন মুক্ত। শেষ বেদান্ত এসেছে আচার্য শঙ্করের সময়ে, তখনও ভারত ছিল স্বাধীন। অষ্টাদশ শতাব্দীর পর থেকে মুসলমানরা ভারতে ঢুকতে শুরু করল, আস্তে আস্তে বেদান্তের প্রতাপ চলে গিয়ে এসে গেল, হরিবোল হরিবোল, ঠাকুর দেখবেন। ঠাকুর ছাড়া কে দেখবেন, একটা গ্রাম সেখানে খুব বেশী হলে তিরিশটা পরিবার, চাষবাশ করে খায়। দশজন ঘোড়সওয়ার তলোয়ার নিয়ে ঘিরে ফেলল, আমার ধর্ম গ্রহণ কর, নাহলে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছি। বেচারীরা কি করবে! বাকি গ্রামগুলোও ভয়ে কাঁপছে, আমাদের গ্রামের উপর কবে আক্রমণ হবে, কেউ জানে না। কে তখন বেদান্তের ভাব নিয়ে দাঁড়াতে যাবে! মুখে অনেক কিছু বলে দেওয়া যায়, উপলব্ধি তো নেই। তোমার ভিতরে ভয়, তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে চোখের জল ফেলছ। তখন ভক্তি ভাব নিয়ে, ঠাকুর দেখবেন, এছাড়া আর কোন রাস্থা থাকে না। পূজ্যপাদ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী খুব মজা করে অনেক কথা বলতেন। মহারাজ প্রচণ্ড ভাবে বৈদান্তিক ছিলেন। মহারাজ এক সময় করাচী রামকৃষ্ণ মঠের দায়ীত্বে ছিলেন। ভারত স্বাধীন হবার আগেই করাচীতে আশ্রম হয়েছে। উনি মজা করে বলতেন, করাচী থেকে ট্রেনে কলকাতায় আসছেন। করাচী থেকে লাহোরে ট্রেন ঢুকলেই খাবার নিয়ে উঠত আর জোর দিয়ে হাঁক দিত 'গো-স্ত-রোটি', 'গো-স্ত রোটি', লক্ষ্ণৌ এলে বলবে, 'গ্রম চায়ে', জোরটা অনেক কমে গেছে। আর বর্দ্ধমান এলেই মিহি কন্ঠে বলবে 'মিহিদানা' 'মিহিদানা'। খুব মজা করে বলতেন, কিভাবে আস্তে আস্তে গলার জোর কমে আসছে, গলার আওয়াজই বুঝিয়ে দিচ্ছে, মানুষের শক্তি কমে গেছে। মানুষ কি আর করবে, তাকে প্রাণ বাঁচাতে হবে মিহি কন্ঠে মিহিদানাই বলতে হবে, এই নাও ঠাকুর নকুলদানা, রক্ষা করো আমাদের।

ধর্ম, ধর্ম-দর্শন, জীবন, সব পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। জীবনদর্শন চালানোর জন্য শক্তি দরকার। বেদান্ত সেইজন্য সবার জন্য নয়। বেদান্তের জন্য সবার আগে দরকার স্বাধীন ভাব। আগে মজা করে বলা হত, বৈষ্ণব মরে নেয়ে আর সাধু মরে খেয়ে। বেদান্তী সাধুরা সব হাড্ডাগোড্ডা, সব সময় খুশী থাকে, খাবে দাবে আর সব সময় ফিটফাট। অন্য দিকে আচারী সাধুরা যারা ভক্তি করে যাচ্ছে, সব সময় এটাতে দোষ, ওটাতে পাপ, আর কিছু হলে স্নান করে নিজেকে শুদ্ধ করবে। বেদান্তে কোন আচার নেই, স্বাধীন। বেদান্তীর সব সময় এই ভাব, আমি শুদ্ধ আত্মা, আমার সামনে যে আছে সেও শুদ্ধ আত্মা। আমি কোন অবস্থায় অপবিত্র হব না, আমার সামনের লোককেও কখনই অপবিত্র হতে দেব না, I am free, you also free, you grow, I grow। স্বামীজী বলছেন, সেই সময় আমেরিকার মাটি অদ্বৈত বেদান্তের জন্য সব দিক দিয়ে প্রস্তুত। ভারতবর্ষ এখন আস্তে আস্তে সেই প্রস্তুতি নিচ্ছে। আজকে পেটে দুটো দানা জুটছে, শিক্ষা এসে গেছে, মেয়েরা কারুর উপর নির্ভর নয়। ঔদ্ধত এসে যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু কয়েক দিন পর এই ঔদ্ধত ভাব চলে যাবে। কারণ মানুষ যখন প্রথম স্বাধীনতার স্বাদ পায় তখন তার আচরণ লাগাম ছাড়া হয়ে যায়। স্কুল ছুটি হলে বাচ্চারা বাইরে বেরিয়ে কি লাফাতে থাকে, সামলানো যায় না। এখন ভারতের লোকেরা সব দিক দিয়ে স্বাধীনতা পেয়ে গেছে, আর যার হাতে ক্ষমতা সে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে আর নিজের ক্ষমতা দেখাচ্ছে। হঠাৎ মেয়েরা দেখছে পর্দা সরে গেছে, সব কিছু আলগা হয়ে গেছে, নিজেকে সামলাতে পারছে না। পরে যখন এটাই স্বাভাবিক হয়ে যাবে, তখন যেটা বাড়াবাড়ি পর্যায়ে চলে গেছে, সেটা বন্ধ হয়ে যাবে। আমেরিকা এখন ঐ জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে গেছে। স্বামীজী তাই বলছেন, আমেরিকাতে যদি বেদান্তের শিক্ষার প্রচার হয়, এর ফল খুবই ভাল হবে; আর মেয়েদের যেটা চাপা আছে, সেটা খুলে যাবে।

In India these ideas were brought out by individuals like Buddha, Shankara, and others, but the masses did not retain them. (*ভারতে বুদ্ধ, শঙ্কর ও অন্যান্য মহামনীষী ব্যক্তিরা এই সকল ভাব প্রচার করেছিলেন, কিন্তু জনসাধারণ সেগুলি ধরে রাখতে পারেনি।*) বেদান্তের জ্ঞান শেষ দিয়েছিলেন আচার্য শঙ্কর। এমন-কি মধুসূদন সরস্বতী, যিনি আচার্য শঙ্করের গীতা আদির উপর অনেক কিছু লিখলেন, তিনিও বেদান্তী কিন্তু সেই রকম জোর আসেনি। তখন মোঘল রাজত্ব চলছে, কোথায় কে কি করে দেবে, এই আতঙ্কটা সব সময় থাকত। বেদান্ত হল বিরাট বটবৃক্ষের মত, ডালপালা বিস্তারের জন্য তার জায়গা দরকার। ওকে যদি বনসাই করে দেওয়া হয়, তখন ওটা আর যাই হয়ে থাকুক বটবৃক্ষ নয়। এখন আমরা বেদান্তের যা কিছু দেখছি, সবই বনসাই বেদান্ত। একটা টবের মধ্যে রেখে তার শেকড় কেটে যাচ্ছি, এটা কোন ভাবেই বেদান্ত নয়। বেদান্ত শুধু অহং ব্রহ্মাস্মি, এই ভাবকে ধরে রেখে সব কিছুকে কেটে ছিঁড়ে এগিয়ে চলে যায়। বলছেন, The new cycle must see the masses living Vedanta, and this will have to come through women. (*এই নূতন যুগে জনসাধারণ বেদান্তের আদর্শানুযায়ী জীবনযাপন করবে, আর মেয়েদের দ্বারাই এই কাজ পরিণত হবে।*) বেদান্ত আমাদের ছিল ঠিকই, কিন্তু জনগণ এটাকে নিতে পারেনি। বেদান্ত মানুষের স্বভাব, আমি এটাই, এই ভাব, এই শিক্ষা যদি আসতে হয়, একমাত্র নারীদের মাধ্যমেই আসবে। যদিও থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে বেশীর ভাগ মহিলা শ্রোতারাই ছিলেন, কিন্তু এই ব্যাপারে স্বামীজী সব সময়ই পরিষ্কার ছিলেন। এরপর স্বামীজী একটা বাংলা মাতৃসঙ্গীত করছেন – যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে। সেখান থেকে তিনি আবার দুপুরবেলার ক্লাশে ঢুকে যাচ্ছেন।

ঐদিন, অপরাহ্ন

মনের যন্ত্র দেহ, আত্মার যন্ত্র মন - আত্মা একমেবাদ্বিতীয়ম্ - স্বাধীন ভাব ও একত্বই ভালবাসার মূল

মাতৃশক্তি থেকে স্বামীজী আবার আত্মার প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছেন, Mind is an instrument in the hand of Atman, just as body is an instrument in the hand of mind. (*দেহ যেমন মনের হাতে একটা যন্ত্রবিশেষ, মনও তেমনি আত্মার হাতে একটা যন্ত্রস্বরূপ।*) এই ভাবটা বেদান্তে ঘুরে ঘুরে আসে। শরীর পুরোপুরি মন দিয়ে চালিত হয়। ঠিক তেমনি মনের সত্তা, মনের সব কিছু আত্মার নিয়ন্ত্রণে চলে। Matter is motion outside, mind is motion inside. (*জড় হল বাইরের গতি, মন হল ভিতরের*

গতি।) এই ভাবটাকে বোঝা ও ধারণা কর খুব কঠিন। কিন্তু একবার বুঝে গেল, বেদান্ত বুঝতে অনেক সুবিধা হবে। যে কোন গতি, এনার্জি, বাইরে যখন হয়, আমরা ওটাকে জড় বলছি, ওটাই যখন মনের ভিতরে হয়, তখন সেটাকে আমরা মন বলছি। মন যা, জড়ও তাই – মন আর জড়ের common factor হল গতি বা এনার্জি। এনার্জি যখন ভিতরে কাজ করছে, আমরা সেটাকে মন বলছি। বাইরে যখন কাজ করে তখন তাকে জড় বলছি। সেইজন্য বলা হয়, mind is matter, matter is mind, মন শুধু হল খুব সূক্ষ্ম উপাদানে তৈরী। রাজযোগে এর উপর বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করে দেখানো হয়, কিভাবে সূক্ষ্ম পদার্থ দিয়ে মন তৈরী হয়, তারই স্থূল পদার্থ দিয়ে বহির্জগৎ তৈরী হয়। All change begins and ends in time. (*কালেই সমুদয় পরিবর্তন বা পরিণামের আরম্ভ ও সমাপ্ত।*) পরিবর্তন মানেই কাল, আর আমরা যেটাকে কাল বলছি, তা হল – measurement of time is measurement of events। এর উপরেও আগে আমরা আলোচনা করেছি।

তার সাথে বলছেন, If the Atman is unchangeable, It must be perfect; if perfect, It must be infinite; and if It be infinite, It must be only One; there cannot be two infinites. (*আত্মা যদি অপরিণামী হন, তিনি নিশ্চিত পূর্ণস্বরূপ; আর যদি পূর্ণস্বরূপ হন, তবে তিনি অনন্তস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ হলে অবশ্যই তিনি অদ্বিতীয়; কারণ দুটি অনন্ত থাকতে পারে না, সুতরাং আত্মা ‘একমেবাদ্বিতীয়ম্’ই হতে পারেন।*) এই যুক্তিগুলিকে স্বামীজী বিভিন্ন উপনিষদ এবং শঙ্করাচার্যের উপনিষদের ভাষ্য থেকে নিয়ে আসছেন। যেখানেই পরিবর্তন, সেটাই পদার্থ। আত্মা অনন্ত, বার বার বলা হচ্ছে আত্মাতে কোন পরিবর্তন নেই, আত্মা অপরিবর্তনশীল, নিত্য। যদি অপরিবর্তনশীল হন, নিত্য হন, তাহালে তিনি অনন্তই হবেন। আর অনন্ত যদি হন, এটা ফিজিক্যালি অনন্ত কিনা, তাহলে অবশ্যই তাঁকে একমেবাদ্বিতীয়ম্ হতে হবে। গণিতে, পদার্থ বিজ্ঞানে আমরা অনেকগুলো অনন্ত রাখতে পারি, ফিজিক্যালি অনেক অনন্ত আছে। বেদান্ত বলছে, যদি দুটো ফিজিক্যালি অনন্ত এসে যায়, তাহলে বুঝতে হবে দুটো এক। So the Atman, the Self, can be only one. Though It seems to be various, It is really only One. (*যদিও আত্মাকে বহু বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি এক।*) এটাই মায়া। সেই এক, কিন্তু বহুরূপে দৃশ্যমান। If a man were to go toward the sun, at every setep he would see a different sun, and yet it would be the same sun after all. (*যদি কোন ব্যক্তি সূর্যের অভিমুখে চলতে থাকে, প্রতি পদক্ষেপে সে এক-একটা বিভিন্ন সূর্য দেখবে বটে, কিন্তু বস্তুতঃ সবগুলি তো সেই একই সূর্য।*) স্বামীজী এই উপমা অনেক জায়গায় নিতেন, সূর্যের দিকে যদি এগোতে এগোতে সূর্যের ছবি তোলা হয়, ছবিগুলি পাল্টাতে থাকবে, কিন্তু যতই আলাদা আলাদা ছবি হোক সূর্য কিন্তু সেই এক, যারা জানে তারা জানে যে সব ছবি সেই সূর্যেরই ছবি। এরপর স্বামীজী আচার্য শঙ্কর সাধারণ ভাবে যে যুক্তিগুলি ব্যবহার করতেন, সেখান থেকে যুক্তি এনে বলছেন।

আগেও আমরা এই যুক্তিগুলি নিয়ে অনেকবার আলোচনা করেছি। যে কোন বস্তুকে সূক্ষ্ম থেকে সুক্ষ্মতর, আরও সূক্ষ্ম করতে করতে শেষে গিয়ে দাঁড়াবে সত্তামাত্রম্, অস্তি; ‘আছে’ – এছাড়া আর কিছু নেই। বলছেন, Asti, ‘is-ness’, is the basis of all unity; and just as soon as the basis to found perfection ensues. (*অস্তিভাবই হল সর্বপ্রকার একত্বের ভিত্তিস্বরূপ, আর ঐ ভিত্তিতে যেতে পারলেই পূর্ণতা লাভ হয়।*) এখানে পেন আছে, মাইক্রোফোন আছে। পেন প্লাস্টিক দিয়ে তৈরী আর মাইক্রোফোন ধাতু দিয়ে তৈরী, আকার রূপে, উপাদান রূপে দুটো এক না, কিন্তু বস্তু রূপে তারা এক। এই বস্তুটাই আবার এনার্জি রূপে এক। কিন্তু অস্তি রূপে, ‘আছে’ এই রূপে সব সময় থাকবে। এই পেন আছে, আচার্য বলছেন এর মধ্যে দুটি সত্তা আছে, পেনের সত্তা, আর এই বোধ, জিনিসটা ‘আছে’, এটাই অস্তি সত্তা। এই পেন ভবিষ্যতে একদিন নাশ হয়ে যাবে, কিন্তু ‘আছে’টা সব সময় থাকবে। এই গ্লাশ আছে, গ্লাশটা ভেঙে যেতে পারে, কিন্তু ‘আছে’ জিনিসটা থেকে যাবে। এই জগতে যা কিছু আছে, তার আকার যতই পাল্টাক, আর সব কিছু যদি নাশ হয়ে যায়, তাহলেও কিন্তু ‘আছে’ জিনিসটা থেকেই যাবে। এই ‘আছে’ জিনিসটাই অনন্ত, এটাকেই বলা হয় perfection, স্বামীজী perfection শব্দটাই ব্যবহার করতেন। Originally perfection না, originally হল এটাই চৈতন্য।

এবার স্বামীজী উদাহরণ দিচ্ছেন, If all colour could be resolved into one colour, painting would cease. (*যদি সব রঙকে এক রঙে পরিণত করা সম্ভব হত তবে চিত্রবিদ্যাই লোপ পেয়ে যেত।*) অনেক রকম রঙ থাকার জন্যই ছবি আঁকা সম্ভব হয়, একটাই যদি রঙ থাকত তাহলে ছবি আঁকা কখনই সম্ভব হত না। The perfect oneness is rest; we refer all manifestations to one Being. (*সম্পূর্ণ একত্ব হচ্ছে বিশ্রাম বা লয়, আমরা বলে থাকি – সকল প্রকাশই এক ঈশ্বর থেকে হয়েছে।*) ঠিক তেমনি সব কিছু যখন একত্বে চলে যায়, তখন আর আলাদা আলাদা সত্তা থাকে না, তখন কোন পরিবর্তন নেই, কোন গতি নেই, কিছু নেই। Taoists, Confucianists, Buddhists, Hindus, Jews, Mohammedans, Christians, and Zoroastrians, all preached the golden rule and in almost the same words; but only the Hindus have given the rationale, because they saw the reason: Man must love others because those other are himself. There is but One. (*তাও-বাদী, কনফুসিয়াস মতাবলম্বী, বৌদ্ধ, হিন্দু, ইহুদী, মুসলমান, খ্রীষ্টান ও জরথ্রুষ্ট শিষ্যরা সকলেই প্রায় একপ্রকার ভাষায় এই মহৎ নীতি প্রচার করছেন, 'তুমি অপরের কাছ থেকে যেরূপ ব্যবহার চাও, অপরের প্রতি ঠিক সেরূপ ব্যবহার কর' – কিন্তু হিন্দুরাই কেবল এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন : কারণ তাঁরা এর যুক্তি দেখতে পেয়েছিলেন। মানুষ অপর সকলকেই অবশ্য ভালবাসবে; কারণ সেই অপর সকলে যে সে নিজে, সেই এক বস্তুই রয়েছেন কিনা।*) যতগুলো ধর্ম আছে, সবাই সেই এক সত্তাতে নিয়ে যাচ্ছেন, যেখানে তারা নিজের নিজের ঈশ্বরের কথা বলছে, যেটা তাদের শেষ কথা, এটাই গোল্ডেন রুল। মুসলমানদের কাছে আল্লাই একমাত্র ঈশ্বর, খ্রীশ্চানরা ঠিক ওটাই বলছে, তাদের কাছে গড্ই শেষ কথা, তিনিই হলেন আসল সত্তা। মুসলমানরা বলে, সবাই আল্লার সন্তান, সেখান থেকে তখন গোল্ডেন রুল হয়ে গেল, আমরা সবাই ভাই, এক মুসলমান আরেক মুসলমানকে দেখবে, এক খ্রীশ্চান আরেক খ্রীশ্চানকে দেখবে। কিন্তু হিন্দুরা আরেক ধাপ এগিয়ে গেল। তারা দেখিয়ে দিচ্ছে, যা কিছু আছে, সমস্ত কিছু ঐ একের মধ্যে চলে যাচ্ছে, যেখানে আর কোন কিছুতে কোন তফাৎ থাকে না। সেইজন্য আমিও যা, তুমিও তা। তোমাকে কষ্ট দেওয়া মানে, আমাকে কষ্ট দেওয়া। যদিও রামানুজের এগুলোকে নিয়ে অনেক আলোচনা আছে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু আচার্য শঙ্করের এটাই সৌন্দর্য, যখন যুক্তির কথা আসে তখন আচার্য শঙ্করই শেষ কথা হয়ে দাঁড়ায়। বলছেন, বাকিরা সবাই একই কথা বলছেন, অনুভূতি দিয়ে। হিন্দুরা আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়ে পুরো যুক্তি দিয়ে এটাকে দাঁড় করিয়ে দিলেন। একমেবাদ্বিতীয়ম্ সেই একই আছে, সেইজন্য সবাইকেই ভালবাসতে হবে। ফলে কি হয়?

Of all the great religious teachers the world has known, only Lao-tze, Buddha, and Jesus transcended the golden rule and said, 'Do good to your enemies', 'Love them that hate you'. (*জগতে যত বড় বড় ধর্মাচার্য হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কেবল লাওৎসে, বুদ্ধ ও যীশুই উক্ত নীতিরও উপরে গিয়ে শিক্ষা দিয়ে গেছেন – 'তোমার শত্রুদেরও উপকার কর, যারা তোমায় ঘৃণা করে, তাদেরও ভালবাসো'।*) গোল্ডেন রুল অর্থাৎ বিশ্বভ্রাতৃত্ব, আমরা এক, কিন্তু লাওৎসে, বুদ্ধ, যীশু, এনারা আরেক ধাপ এগিয়ে গেলেন। এই জগতে পর বলে কেউ নেই, তোমার যে শত্রু তারও উপকার কর, তোমাকে যে ঘৃণা করে, তাকেও ভালবাসো, কারণ সেটা তুমি নিজে। স্বামীজী শুরু করলেন নারীশক্তি দিয়ে, শেষ করছেন, সবাইকে ভালবাসা দিয়ে। ভালবাসা এই নয় যে, তুমি তাকে অধিকার করে নাও। ভালবাসা বলতে আমরা বুঝি, আমি তোমাকে ভালবাসি মানে, তুমি আমার গোলাম হয়ে থাকো, তা নয়। ভালবাসা মানে, আমার উপস্থিতি মাত্রই তুমি নিজেকে একজন স্বাধীন সত্তা রূপে বোধ করে নেবে। তোমাকে আমি ভালবাসি, মানে তোমার উপস্থিতিতে আমি নিজেকে মুক্ত বিহঙ্গ মনে করছি। পাখির যেমন ওড়ার জন্য খোলা আকাশ দরকার, তুমি হলে আমার সেই খোলা আকাশ, যেখানে আমি স্বাধীন ভাবে উড়ে বেড়াতে পারব – এটাই ভালবাসা। স্বামীজী বলছেন, সবাই বড় আচার্য, সবাই মহৎ, এতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু লাওৎসে, বুদ্ধ, যীশু এনারা সেই পর্যায়ে ভালবাসাকে নিয়ে গেছেন, যেখানে শত্রু বলে কিছু নেই। সেইজন্য শত্রুকেও ভালবাসতে হয়, তার মঙ্গলের জন্যও কাজ করতে হয়। এটা কোন উপদেশ দেওয়ার জন্য না, এটা কোন আইডিয়াল রূপেও না, এটা একটা সত্য রূপে। বেদান্ত এই সত্যের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে।

ধর্মের কথা সাক্ষাৎ ভগবান না বললে জানা যাবে না

এরপর স্বামীজী কিছু ধর্মীয় কথা নিয়ে বলছেন, যে কথাগুলোর উপর ভিত্তি করে আমরা ধর্মীয় আচার আচরণ করে থাকি, যেখান থেকে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ভক্তি আসে আর যেখান থেকে ধর্মান্ধতাও আসে। সেটার উপর বলতে গিয়ে স্বামীজী বলছেন, গ্রন্থের উপর নির্ভর না করে সরাসরি তোমরা ভগবানকে জিজ্ঞেস কর, তিনিই সব বলে দেবেন। এখানে কয়েকটা কথা শুনে রাখা দরকার। আমরা যে দেববাণীর উপর আলোচনা করে যাচ্ছি, তাতে একটা জিনিসের কথা স্বামীজী একাধিকবার বলছেন, একটা পুস্তককে যদি আমরা বুঝতে চাই, তাহলে আমাদের নিজেকে ঐ স্তরে যেতে হবে। নিজেকে ঐ স্তরে না নিয়ে গেলে আমরা বুঝতে পারব না। এর অর্থ, জিনিসটাকে প্রত্যক্ষ জানা, ওটা আমাদের নিজেকে জানতে হবে কোন শব্দের মাধ্যম না গিয়ে। ধর্ম আরও জটিল বিষয়, কারণ ধর্ম মন দিয়ে আসে না, আত্মা দিয়ে আসে, সেইজন্য বলা হয় অপরোক্ষ। অপরোক্ষ শব্দের অর্থ হল, যেটা প্রত্যক্ষও না, পরোক্ষও না। ধর্মকে জানতে হলে শব্দ তো কোন কাজেই লাগবে না, মন যে জিনিস দিচ্ছে সেটাও নেওয়া যাবে না। অন্যান্য ক্ষেত্রে মন যেটা দেবে সেটা নেওয়া যাবে, ধর্মের ক্ষেত্রে সেটাও নেওয়া যাবে না। ভগবান সাক্ষাৎ এসে যদি কিছু বলে থাকেন তবেই আমরা ধর্মকে জানতে পারব, আর আগে পর্যন্ত কিছুই জানতে পারা যাবে না।

ইয়ং সাধু সন্ন্যাসীদের মনে ধর্মের ব্যাপারে অনেক প্রশ্ন থাকাটা স্বাভাবিক। ওনারা নিজের পরিচিত কোন বিদগ্ধ প্রাজ্ঞ সন্ন্যাসীদের কাছে বা যে মহারাজের কাছে ধর্মজীবনের শিক্ষা পেয়েছেন, তাঁদের কাছে অনেক প্রশ্ন নিয়ে হাজির হয়ে যান। ওনারাও প্রায়ই বিরক্ত হয়ে বলেন, ঠাকুরের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস কর। তিনি কি প্রশ্নের উত্তরটা জানেন না বলে এই ভাবে বলছেন? না, তার মানে হল, তোমার প্রশ্নের অর্থটা তুমি বুঝতে পারবে না। তাহলে কি পপুলার কাহিনী মধুসূদন দাদার মত ঠাকুর এসে যান? তা কখনই হয় না। সাধনা করে করে মন যখন শুদ্ধ পবিত্র হয়ে প্রস্তুত হয়ে যাবে, তখন দেখতে পারবে ঠাকুর তোমাকে নিজেই বলে দেবেন। আর যতক্ষণ ঠাকুর বলতে না শুরু করছেন, ততক্ষণ তুমি জানবে যে, ধর্মের ব্যাপারে তুমি যা কিছু জানো, সবটাই তোমার জন্য মিথ্যা। কারণ তোমাকে ঠাকুর এটা নাও বলতে পারেন। বেদ, উপনিষদ, গীতায় তুমি যা পড়েছ, সেগুলো ঠাকুর এসে তোমাকে নাও বলতে পারেন। কারণ ঠাকুরের যদি একই কথা বলার থাকত, তাহলে ঋষিদের, বুদ্ধকে, যীশুকে, মহম্মদকে এসে একই কথা বলতেন, কাউকে তো একই কথা বলছেন না। আর তাই পৃথিবীতে এত ধর্মগ্রন্থের উদ্ভব হয়েছে। আমাকে কি বলবেন, সেটা তিনিই জানেন। কিন্তু আমাদের শোনার কোন আগ্রহ নেই, ঠাকুরেরও তাই শোনাবার কোন আগ্রহ নেই।

স্বামীজী বলছেন, Principles exist; we do not create them, we only discover them. (*তত্ত্বসমূহ পূর্ব থেকেই রয়েছে; সেগুলি আমরা সৃষ্টি করি না, আবিষ্কার করি মাত্র।*) এর আগে মন আর মনের পারের কথা বলা হল, যে কোন কিছুর আইডিয়া, বিচার এগুলো মনের ভিতরের; মনের মধ্যে এগুলো সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু যেগুলো তত্ত্ব, সেগুলো মনের উপর নির্ভর-করা জিনিস নয়, ওটা চিরদিনই আছে। মানুষ যখন ছিল না, তখনও সূর্য ছিল, চন্দ্র ছিল, এই পৃথিবী ছিল। এখন মানুষ আছে, এখনও এগুলো আছে। মানুষ যখন থাকবে না, তখনও এরা থাকবে। আমাদের ভাষায় সূর্যোদয় তখনও হবে, সূর্যাস্ত তখনও হবে। ঠিক তেমনি, কেমেস্ট্রি, ফিজিক্স, বায়োলজিতে আজ পর্যন্ত যত সিদ্ধান্ত আমরা পেয়েছি, এর সবটাই আগেও ছিল, এখনও আছে, পরেও থাকবে। Religion consists solely in realization. Doctrines are methods, not religion. (*ধর্ম কেবল প্রত্যক্ষানুভূতি। বিভিন্ন মতামত – প্রণালী মাত্র, ওগুলি ধর্ম নয়।*) উপনিষদে এই জিনিসটার উপর অনেক জোর দেওয়া হয়েছে। তোমাকে প্রত্যক্ষ করতে হবে, বাকি সবটাই এক-একটা মেথড মাত্র। হিন্দু ধর্ম এটা একটা মেথড, খ্রীশ্চানিটি এটা একটা মেথড, এটা ধর্ম নয়। তোমাকে পথ বলে দেওয়া হচ্ছে, মনে রেখো পথ কখনই শেষ কথা নয়। যতক্ষণ প্রত্যক্ষ না করা হবে, ততক্ষণ ওট ধর্ম নয়।

ধর্ম যেভাবে ও যে কারণে পাল্টে যায় - মতবাদই ধর্মান্ধতা ও ধর্ম নিয়ে হানাহানি তৈরী করে

All the different religions are but applications of the one religion adapted to suit the requirements of different nations. (*জগতের যত ধর্ম, সব বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন প্রয়োজন*

অনুযায়ী 'ধর্মে'রই প্রয়োগ মাত্র।) এই বাক্যটি ধর্ম জগতে স্বামীজীর বিরাট বড় একটা অবদান। যুগপ্রবর্তকরা যখন আসেন, ঋষিরা যখন আসেন, ওনারা ধর্মকে নিয়েই বলেন, ধর্মে যেটা সত্য, সেই সত্যকে নিয়েই বলেন। কিন্তু তার সাথে ওনারা দশটা নূতন কথাও বলেন, যে কথাগুলো আগে বলা হয়নি। কারণ মানুষ ক্রমশঃ উন্নত হচ্ছে, উন্নত হচ্ছে মানে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় অনেক বেশী করে হচ্ছে। অভিজ্ঞতা বেশী হওয়ার ফলে, ধর্মের সত্যগুলিকে যে প্যাটার্নে ফেলা হবে সেটা অন্য রকম হবে। স্বামীজীর একটা খুব নামকরা কথা আছে। স্বামীজী ওটা আবিষ্কার করার পর দারুণ উত্তেজিত হয়ে মিঃ স্টার্ডিকে একটা চিঠিতে লেখেন, By religion it is meant Vedanta, বেদান্ত বলাও যা ধর্ম বলাও তা।

অনেক আগেকার ঘটনা, স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজ একবার দেওঘর বিদ্যাপীঠে গিয়েছিলেন। সেখানে একটা অনুষ্ঠানে ছাত্রদের সামনে হিন্দু ধর্মকে নিয়ে একটা ভাষণ দিয়েছিলেন। বিদ্যাপীঠের ছাত্ররা সেই অর্থে দুষ্টু না, কিন্তু চঞ্চল। ওদের বলা হয়েছে, গোলপার্ক থেকে একজন খুব বড় মহারাজ আসছেন, ওনার কথাগুলো খুব মন দিয়ে শুনবে। ওরা খুব মন দিয়ে মহারাজের ভাষণ শুনেছে। ভাষণের পর ক্লাশ এইটের একটি ছেলে মহারাজকে প্রশ্ন করছে, আপনার কথাগুলো সব শুনলাম, কিন্তু আমার মনে একটা প্রশ্ন এসেছে, What is the difference between religion and Hinduism? Don't you think that Hinduisim is religion? মহারাজরা যাঁরা ওখানে ছিলেন, তাঁরা নিজের চোখে দেখছেন, স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী কিছুক্ষণের জন্য যেন থমকে গেলেন, কিছু বলতে পারছেন না। ছেলেটির বুদ্ধির মাত্রা দেখার মত। হিন্দু ধর্মের উপর পুরো ভাষণটা মন দিয়ে শুনল। শোনার পর সে এই প্রশ্ন করছে। খুব মজার জিনিস। ধর্ম আর হিন্দুত্ব এক, কিন্তু আমরা যে হিন্দু ধর্মকে জানি সেই হিন্দু ধর্ম না, হিন্দু ধর্ম মানে বেদান্ত। বেদান্ত বলাও যা, ধর্ম বলাও তা। এটা স্বামীজীর আবিষ্কার। তিনি স্টার্ডিকে লিখছেন, এই বেদান্তের যে বিভিন্ন অঙ্গগুলি আছে, যেমন দ্বৈত আছে, বিশিষ্টাদ্বৈত আছে, অদ্বৈত আছে, এটাকে যখন ভারতবর্ষে প্রয়োগ করা হচ্ছে, তখন সেটা হিন্দু ধর্ম হয়ে যায়। এটাই যখন সেমেটিক ভূমিতে চলে যাচ্ছে, তখন অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে, অদ্বৈত ভাবটা যখন আরব দেশে যাচ্ছে তখন সেটা ইসলাম হয়ে যাচ্ছে। আর বেদান্তের যে যোগ, সেটাই যখন বিশেষ অবস্থায় দেওয়া হচ্ছে, তখন সেটা বৌদ্ধ ধর্ম হয়ে যাচ্ছে। স্বামীজীর এটা দৃঢ় মত ছিল, ঈশ্বর সেই এক এবং অনন্ত। ঐ অনন্ত ঈশ্বরকে যখন বোঝার চেষ্টা করবে, বেদান্ত যেভাবে ঈশ্বরের ব্যাখ্যা দেয়, যেমনি সেটাকে আলাদা আলাদা সমাজে রাখা হবে, ধর্মগুলো পাল্টে যাবে। তাহলে কত ধর্ম হতে পারে? অনন্ত ধর্ম হতে পারে। বাংলায় কত ধর্ম হতে পারে? অনন্ত ধর্ম হতে পারে। পুরো বাংলা তো একটাই সমাজ নয়, একটা পরিবারই গোটা সমাজ নয়। একটা পরিবারে দশ বছর আগে এক রকম চিন্তা-ভাবনা ছিল, দশ বছর পর আরেক রকম চিন্তা-ভাবনা এসে গেছে। এভাবেই সমাজ পাল্টে যায়। সমাজ যেমন যেমন পাল্টে যাচ্ছে, ধর্মের ঐ তত্ত্বগুলি যেমনি ঐ পরিবর্তিত সমাজে ঢুকবে, ধর্মটাও পাল্টে যাবে। স্মৃতি আদি লেখার সময়ও তাই করা হয়। স্মৃতিকাররা যে আধ্যাত্মিক সত্যগুলি আছে, সেগুলিকে তৎকালীন সমাজে ফেলে দিলেন, ফেলে দেওয়ার পর সেখান থেকে যে জিনিসটা একটা প্রণালীবদ্ধ ধারা হয়ে বেরিয়ে আসছে, সেটাই সেই সমাজের সেই সময়ের স্মৃতি হয়ে গেল। এখন মনুস্মৃতিকে যে নিন্দুকরা নিন্দা করে, অবাক হয়ে যেতে হয় যে, কি দুর্ভাগ্য যে এরা এই সামান্য জিনিসটাকে বুঝতেই পারছে না। তোমরা কি বলতে চাইছ? দু-হাজার বছরে সমাজ কি একটুও উন্নত হয়নি? সমাজ যদি উন্নত হয় তাহলে ধর্মেও পরিবর্তন আসবে।

ধর্মের পরিবর্তন আসবে, কিন্তু তাই বলে আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলি, আধ্যাত্মিক সিদ্ধান্ত বাক্যগুলি কখনই পাল্টাবে না। ইসলাম যে বলছে, আল্লাই একমাত্র ঈশ্বর, সেই সিদ্ধান্ত কখনই পাল্টাবে না। কিন্তু যখন সমাজে এটাকে অনুশীলনে নামানো হবে, ধর্ম তখন পাল্টে যাবে। তাহলে কি খ্রীশ্চান, ইসলাম, জুহুদি এরা কি সবাই আলাদা? না, আরও যখন গভীরে যাওয়া যাবে, তখন দেখা যাবে, এরা সবাই একই সিদ্ধান্ত বলছে। কি সেই সিদ্ধান্ত? ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু। সমস্ত ধর্ম কয়েকটা সিদ্ধান্ত এক রকম বলে। সমস্ত ধর্ম এই কথা বলছে – এই জীবনের গুরুত্ব আছে, কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়। কিন্তু যেমনি সমাজে নামছে, তখন এটাই বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রকম হয়ে যায়।

স্বামীজী আবার বলছেন, Theories only lead to fighting; thus the name of God that ought to bring peace has been the cause of half the bloodshed of the world. (*শুধু মতবাদ কেবল বিরোধ বাধিয়ে দেয়; দেখ না, কোথায় ঈশ্বরের নামে লোকের শান্তি হবে – তা না হয়ে জগতে যত রক্তপাত হয়েছে, তার অর্ধেক ঈশ্বরের নাম নিয়ে হয়েছে।*) মতবাদে কি বলতে চাইছে কেউ দেখছে না, মতবাদ নিয়ে সবাই শুধু মারামারিই করে যাচ্ছে। Go to the direct source. Ask God what He is. Unless He answers, He is not, but every religion teaches that He does answer. (*একেবারে মূলে যাও; স্বয়ং ঈশ্বরকেই জিজ্ঞাসা কর – তাঁর স্বরূপ কি? যদি তিনি কোন উত্তর না দেন, বুঝতে হবে – তিনি নেই। কিন্তু জগতের সকল ধর্মই বলে যে, তিনি উত্তর দিয়ে থাকেন।*) উত্তর যদি পেতে চাও, তাহলে সরাসরি ঈশ্বরকেই জিজ্ঞেস কর, তিনিই তোমার প্রশ্নের উত্তর দেবেন। তিনি যদি উত্তর না দেন, তার মানে তিনি নেই, তিনি মিথ্যা। কিন্তু সমস্ত ধর্ম বলে তিনি কথা কন। কথামৃতের এটা একটা বিশেষত্ব যে, ঠাকুর এই জিনিসটার উপর খুব জোর দিচ্ছেন, হ্যাঁগো সত্যিই তিনি কথা কন। আবার বলছেন, বই পড়ে এক রকম মনে হবে, তিনি নিজে এসে বুঝিয়ে দিলে আরেক রকম মনে হবে। তার সাথে বলছেন, ঈশ্বর দর্শনের এটাই একটা লক্ষণ, সাক্ষাৎ তিনি এসে কথা কন। এত জোরের সাথে কোথাও অবশ্য বলা হয়নি ঠিকই, কিন্তু তাও আমরা পাই যে, মহম্মদের সাথে কথা বলেছেন, যীশুর সাথে কথা বলেছেন, অনেকের সাথেই কথা বলেছেন। যদি একজনের সাথে কথা বলে থাকেন, তাহলে আমার সাথে কেন বলবেন না? আর এই জিজ্ঞাসু ভাবকে অবলম্বন করেই ঠাকুরের সাধনা শুরু, রামপ্রসাদকে দেখা দিলি, আমাকে দেখা দিবি না কেন?

বেদান্ত এটাও একটা থিয়োরী, বৈষ্ণব একটা থিয়োরী, তন্ত্র একটা থিয়োরী। তাহলে একটু আগে যে বললেন, বেদান্ত মানেই ধর্ম। ঠিকই বলা হয়েছে। বেদান্তের যেটা core truth, যেটাকে আমরা হৃদয় দিয়ে বুঝতে পারছি, এটাই সত্য, এর মতই আমাকে জীবনযাপন করতে হবে এবং করছি, তখন বেদান্তই ধর্ম। কিন্তু যেগুলো কথার কথা হয়ে আছে, সবটাই থিয়োরী। এদের মধ্যে শুধু মারামারি হয়। আর যার জ্ঞান যত কম তার তত গোঁড়ামি হয়। আইবির চীফ ছিলেন একজন মুসলিম ভদ্রলোক, তিনি ইসলামিক স্টেটকে নিয়ে বলছিলেন, যারাই ভারত থেকে ওখানে জয়েন করেছে, তাদের সাথে কথাবার্তা বলে দেখা গেল, ওরা ইসলাম ধর্মকে নিয়ে কিছুই জানে না। সত্যিকারের ধর্মের জন্য যদি তারা লড়াই করত, তখন তারা ধর্মের ব্যাপারটা জানত, কিন্তু জানে না। তিনি বলছেন, এখন একটাই পথ, ধর্মের শিক্ষা ঠিক ভাবে দেওয়া দরকার। ধর্মের শিক্ষা যদি ঠিক ভাবে দেওয়া হয় তাহলে এই ধর্মান্ধতা, গোঁড়ামি মাথা চাড়া দিতে পারত না। নিজেরা কল্পনাতে মতবাদের জন্ম দিচ্ছে, সেই মতবাদকে নিয়ে কল্পনাতে মারামারি করে যাচ্ছে।

নূতন সত্যসমূহকে গ্রহণ করার জন্য পুরনো ধ্যান-ধারণাগুলো পাল্টাও

Have something to say for yourself, else how can you have any idea of what other have said? (*তোমার নিজের যেন কিছু বলবার থাকে, তা না হলে অপরে কি বলেছে, তার কোনরূপ ধারণা করতে পারবে কেন?*) একজন খুব নামকরা বক্তা ছিলেন, তাঁর বক্তৃতা শুনতে অনেক মানুষ আসত। কিন্তু খুব ভাল করে শুনলে বোঝা যায়, বক্তার বক্তৃতায় একটি কথা নেই যেটা তিনি নিজে চিন্তা-ভাবনা করে বলছেন। খুব সুন্দর কায়দা করে, ভাষার ব্যবহার করে শুধু এর কথা তার কথা, অমুক কি বলেছেন, বলে বলে পুরো সময়টা কাটিয়ে দিতেন। আপনার নিজস্ব কি চিন্তা-ভাবনা সেটা বলুন, ধর্মের জগতে বা ধর্মের যে মন, সেই জগতের নিজে কিছু উপলব্ধি যদি করে থাকেন, সেটাকে নিয়ে বলুন? কি বলবেন! সেই রকম উপলব্ধি তো কিছুই নেই। বক্তার নিজের কাছের লোকেরাও এই জিনিসটাকে নিয়ে তাঁকে অনেক কিছু বলতেন। কিছু করার নেই, এটাই স্বভাব, এঁটো খেতে ভালবাসে। ইমোশানালি সবাই বড় বড় কথা বলে দিতে পারে, মন্দির বানায়াঙ্গে। কিসের মন্দির বানাবে, শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন পেয়েছ? শ্রীরামচন্দ্র কি তোমাকে সাক্ষাৎ বলে গেছেন, আমার একটা মন্দির বানিয়ে দাও? বক্তাও ইমোশানালি চলছে, শ্রোতারাও ইমোশানালি শুনে যাচ্ছে, সবাই ইমোশানালি চলছে। তোমার ঈশ্বর দর্শন হয়নি, তোমার বংশে কারুর ঈশ্বর দর্শন হয়নি, কবে তুলসীদাস কি একটা বলে গেছেন, সেটাকে ভাঙিয়ে ভাঙিয়ে অপরকে বোকা বানাচ্ছ, নিজেও মুর্খদের খাতায় নাম লেখাচ্ছ। এগুলো আর যাই হোক, ধর্ম কখনই নয়। ইদানিং একটা ফ্যাশান হয়েছে, মাই ড্যাডি মাম্মি ইজ বেস্ট ড্যাডি

মাম্মি। আর দুদিন পরে কিছু হলেই বলবে, তোমাদের মুখ আমি জীবনে দেখতে চাই না, বলে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাবে। শুধু ইমোশানালিজম্ চলছে, ফাঁক্কা ইমোশান ছাড়া আর কিছু নেই।

মানুষগুলো যেন পুরো একটা পাতলা টিনের চাদর। একটু ফুঁ দিয়ে দিলেও তেতে যাচ্ছে। সমাজে যে আগুন জ্বলছে, ঐ তাপে পাতলা টিন এমন তেতে যায় যে, সহ্য না করতে পারার জন্য চারিদিকে কেমন একটা গেল গেল রব উঠে গেছে। কিন্তু আগেকার দিনের মোটা শীটের লোহা দিয়ে তৈরী কড়াই সহজে গরম হতে চাইত না, আবার গরম হয়ে গেলে সহজে ঠাণ্ডা হবে না। আমরা হলাম পাতলা টিনের চাদর দিয়ে তৈরী, একটু কিছুতে তেতে উঠে বলতে শুরু করবে, আমার ধর্ম শ্রেষ্ঠ ধর্ম, বলতে শুরু করবে, মাই ড্যাডি ইজ বেস্ট ড্যাডি, কত কি বলতে শুরু করবে। কিন্তু ভিতরটা ফাঁক্কা, কিছুই নেই। সেইজন্য স্বামীজী বলছেন, Do not cling to old superstitions; be ever ready for new truths. (*পুরাতন কুসংস্কার নিয়ে পড়ে থেকো না, সর্বদাই নূতন সত্যসমূহের জন্য প্রস্তুত হও।*) উপনিষদ আসার পর পাঁচ হাজার, সাত হাজার বছর হয়ে গেছে, তুমি এখনও ধরে আছো? এর আবার অন্য দিকও আছে। অনেক আগে একজন সন্ন্যাসী ছিলেন, তিনি নিজেকে বড় পণ্ডিত মনে করতেন। তিনি একটা প্রবন্ধ লিখলেন এবং সেটা আবার একটা নামকরা জার্নালে ছাপা হয়। লেখাটা বেরোবার পর খুব হৈ চৈ পড়ে গেল। তিন বলতে চাইতেন সব কিছুতে মা, মায়ের উপাসনা ছাড়া কিছু হয় না, মা ছাড়া কিছু নেই। খুবই সুন্দর কথা। বলছেন, ঈশাবাস্যোপনিষদেও মায়ের স্তুতি – মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ ধনম্, আর গীতাতেও মায়ের কথা, ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ, এখানেও সেই মা। এই বলে বলে তিনি প্রমাণিত করলেন বর্তমানে মায়ের সাধনাটাই ঠিক ঠিক সাধনা। কিন্তু সংস্কৃতে মা মানে যে না, সেটাও তিনি ধরতে পারছেন না। লেখা বেরোবার পর খুব হৈ চৈ হওয়ার পর একজন মহারাজ গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এসব কি লিখেছেন'? তিনি বলছেন, 'পুরনো জিনিসকে কত দিন ধরে রাখবেন, নূতন কিছু দিতে হবে'। 'নূতন দেবেন বলে আপনি এই ভাবে সংস্কৃতের অর্থটাই পাল্টে দেবেন'?

হিন্দিতে একটা চালু কথা আছে, সৌখিন কা বুড়িয়া চ্যাটাই কা ল্যাঙ্গা। বুড়ি হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও খুব সৌখিন, নিত্য নূতন ফ্যাশান করবে। সে এখন কিভাবে ফ্যাশান করবে? একটা রঙিন মাদুর নিয়ে সেটাকেই ল্যাঙ্গা পড়ে বেরিয়ে গেছে। বেশির ভাগ ছেলেমেয়েরা যারা ফ্যাশান করে বেড়ায়, নূতন কিছু করতে হবে তাদের, মাদুর পরতেই বাকি আছে। এখানেও নূতন সাধনা, মা মা সাধনা। কিন্তু মা বলতে এখানে বোঝান হচ্ছে নাএর অর্থে, এটা করো না, এটা নেবে না। স্বামীজী কিন্তু এখানে সেই অর্থে নূতন সত্যের কথা বলছেন না। স্বামীজী বলতে চাইছেন, পুরনো ধ্যান-ধারণাকে পাল্টে নূতন সত্যসমূহকে গ্রহণ করা জন্য সংগ্রাম কর। নিজেকে যখন আমরা অপরের সাথে বিচার করে তুলনা করব, তখন আমি নিজেই বুঝে যাব যে, এটা আমার মানসিক কোন বিকার, নাকি এটাই সত্য।

'Fools are they who would drink brackish water from a well that their forefathers have digged and would not drink pure water from a well that other have digged' (*'মুর্খ তারা, যারা তাদের পূর্বপুরুষদের খোঁড়া কুয়ার নোনতা জল খাবে, কিন্তু অপরের খোঁড়া কুয়ার বিশুদ্ধ জল খাবে না'।*) বাপ-ঠাকুর্দা কবে একটা কুয়ো খুঁড়েছিল, যার জল এতদিনে পচে নোংরা হয়ে গেছে, সেই কুয়ার জলই খেয়ে যাচ্ছে। কেন খাবো না! আমার বাপ-ঠাকুর্দা করে গেছেন। স্বামীজী বলছেন, এগুলো ছাড়াও। অন্য লোক নূতন কুয়া খনন করেছে, তার জল একেবার শুদ্ধ, পরিষ্কার, সেই জলটা পান করো। এই ধরণের কথা নিয়ে অনেক ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ তৈরী হতে পারে। এই নিয়ে কেউ হয়ত বলতে পারে, তোমাদের হিন্দু ধর্মও তো অনেক পুরনো, বরবাদ ধর্ম, হিন্দু ধর্ম আর চলবে না। স্বামীজী ঐ অর্থে বলছেন না। সমস্যা হল, আধ্যাত্মিক সত্য যখনই আসে, তখন তা আমাদের মন দিয়েই আসে। আমার মন যেমন আছে, তার প্রকাশও তেমন আসবে। কাচের বাইরে থেকে আলো দিলে, কাচের রঙ যেমন আলো তেমন আসবে। একই আলো বিভিন্ন কাচের মাধ্যমে বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হবে। এখন আরও মজার হল, ঐ আলোটা আবার আরেকটা কাচ দিয়ে যাচ্ছে। তার মানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় যা বলেছেন, সেটা আমাদের কাছে অনেকগুলো কাচের মাধ্যমে আসছে। এই গুরু, সেই গুরুর মাধ্যমে আবার ভাষ্যের মাধ্যমে, ফলে

জিনিসটা অনেক নেমে যায়। অবতার এসে আবার নূতন করে পুরো শক্তিটা ওর মধ্যে ঢেলে দেন। স্বামীজী এখানে ঐ অর্থে বলতে চাইছেন।

প্রফেটও যা, অব্যক্ত রূপে তুমিও তা - অন্ধ বিশ্বাস নাস্তিকতা ও ঈশ্বরনিন্দার সমতুল্য

Until we realize God for ourselves, we can know nothing about Him. Each man is perfect by his nature, prophets have manifested this perfection, but it is potential in us. (*আমরা যতক্ষণ না নিজের ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করছি, ততক্ষণ তাঁর সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারি না। প্রত্যেক ব্যক্তি স্বভাবতঃ পূর্ণস্বরূপ। মহাপুরুষেরা তাঁদের এই পূর্ণ স্বরূপকে প্রকাশ করেছেন, আমাদের ভিতর এখনও ওটা অব্যক্তভাবে রয়েছে।*) এই বাক্যটাও ধর্ম জগতে স্বামীজীর একটা বিরাট অবদান। প্রফেট আর আমার মধ্যে তফাৎ কোথায়? দুজনই স্বরূপতঃ এক, পূর্ণতা তাঁর ভিতরেও আছে, পূর্ণতা আমার ভিতরেও আছে। প্রফেট তাঁর পূর্ণতাকে প্রকাশ করে দিয়েছেন, আমার পূর্ণতা এখনও প্রকাশের অপেক্ষায় অব্যক্ত অবস্থায় আছে। এই কথাগুলো শোনার পর জীবনে যদি একটুও না লাগানো হয়, তাহলে এই শোনার কোন দাম নেই। শুনতে খুবই ভাল লাগে ঠিকই। রাস্তায় একটা ভিখারী ছেলেকে দেখে, ভিখারী বৃদ্ধাকে দেখে যদি মনে হয়, অব্যক্ত রূপে যীশু, অব্যক্ত রূপী বুদ্ধ যা, এরাও তাই; তখন বুঝতে হবে একটু ধারণা হচ্ছে। আর যেদিন এই বিশ্বাস আসবে, আমার ভিতর সব শক্তি? তাহলে বাকিরা? তারা তো এই জিনিসটা জানেও না, আমি তো জেনে গেছি, তাই আমি শ্রেষ্ঠ। এগুলো কি দারুণ কথা। স্বামীজী ভাববার কথায় বলছেন, এসব কথা শুনে বলছে কি দারুণ কথা, বলেই পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল। আমরা যদি একটু বিচার করি, আমি ঠাকুরের কাছে এসেছি, ঠাকুরের মন্ত্রদীক্ষা নিয়েছি, স্বামীজীর বই পড়েছি, এত কিছু হয়ে যাওয়ার পর গত একমাসে আমি নিজেকে কিভাবে উপরের দিকে নিয়ে যেতে পেরেছি? একমাসে আমার কি অবদান আছে, যেটা আগে সাধারণ অবস্থায় সম্ভব হত না? টেলিফোন কোম্পানীগুলিতে যে টেকনিশিয়ানরা কাজ করে, পাঁচ বছর কাজ করার পর সে তার অভিজ্ঞতা দিয়ে বলে দিতে পারে কোথায় কি ফল্ট হয়েছে। একজন সন্ন্যাসী বাড়ি ছাড়ার পর ভগবানের সঙ্গে কুড়ি বছর জুড়ে থাকার পর তাঁরও তো কিছু অর্জন হয়ে থাকবে। দীক্ষা নিয়েছেন, কথামৃত কয়েকবার পড়া হয়ে গেছে, স্বামীজীর বই পড়েছেন। তিনি কি বিশ্বাস করতে পারছেন, আমার ভিতর অসীম ক্ষমতা আছে? যদি সেই বিশ্বাস থাকে, তাহলে সেই ক্ষমতার ছিটেফোঁটাও কি বেরিয়ে কোথাও একটা দারুণ ছাপ ফেলতে পেরেছে? আরও দশজনকে প্রভাবিত করতে পেরেছে? গুণগত ভাবে কি কি পরিবর্তন এসেছে? কিছুই নেই, যে কলু ছিল সেই কলুই আছে। কিছুই যদি না হয়, একটা গুণগত কিছু পরিবর্তনও যদি হয় তাও অনেক ভাল। আমি জানি আমার মধ্যে পরিবর্তন এসেছে, আর বাইরে থেকে দেখেও এই পরিবর্তন বোঝা যাচ্ছে। শুধু আমি নিজে মনে করছি যে আমার মধ্যে পরিবর্তন এসেছে তা না, অন্যরাও জানে। সেইজন্য স্বামীজী বলছেন প্রফেটও যা, তুমিও তাই কিন্তু অব্যক্ত রূপে। এই বিশ্বাসটুকুও যদি এসে যায়, আমার ভিতরেও সেই শক্তি আছে, তাতেই অনেক কিছু হয়ে যেতে পারবে।

How can we understand that Moses saw God unless we too see Him? If God ever came to anyone, He will come to me. (*আমরা কি করে বুঝব যে, মুশা ঈশ্বর দর্শন করেছিলেন – যদি আমরাও তাঁকে দেখতে না পাই? যদি ঈশ্বর কখনও মুশার কাছে এসে থাকেন তো আমার কাছেও আসবেন।*) মোজেস হন, মুশা হন, যেই হন, যদি ঈশ্বর তাঁদের দেখা দিতে পারেন, তাহলে আমাকেও দেখা দেবেন। I will go to God direct; let Him talk to me. I cannot take belief as a basis; that is atheism and blasphemy. (*আমি একেবারে সোজাসুজি তাঁর কাছে যাব, তিনি যেন আমার সঙ্গে কথা কন। বিশ্বাসকে ভিত্তি বলে আমি গ্রহণ করতে পারি না – সেটা নাস্তিকতা ও ঘোর ঈশ্বরনিন্দা।*) নরেন যখন ঠাকুরের কাছে গিয়ে বলছেন, মহাশয়! আপনি কি ঈশ্বরকে দর্শন করেছেন? হ্যাঁ করেছি, তোমাকেও দেখাতে পারি। অনেক ভক্তরা এসে সন্ন্যাসীদের জিজ্ঞেস করে, 'মহারাজ আপনার ঈশ্বর দর্শন হয়েছে'? মহারাজরাও উত্তর দেন, 'ভাই, তুমি নরেন নও আর আমিও ঠাকুর নই। তাই উত্তর দেওয়া যাবে না'। যারাই অন্ধ বিশ্বাসের উপর চলে, এরা নাস্তিক। আসলে যারাই ধর্মের অনুশীলন করে, নিজেকে ধর্মপ্রাণ মনে করে, তা সে ঠাকুরের মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে থাকুক, শিবের মন্ত্রে দীক্ষা নিক, কালীর মন্ত্রে দীক্ষা নিক,

লাইন দিয়ে সবাই নাস্তিক। কারণ সবার ধর্ম অন্ধ বিশ্বাসের উপর চলছে। হস্তামলের মত, হাতে আমলকির মত যদি আত্মা প্রত্যক্ষ না থাকে, হাতে ফল থাকার মত ঈশ্বর যদি প্রত্যক্ষ না থাকে, তাহলে নাস্তিকও যা তুমিও তাই। বিশ্বাস করে চলা আর ঈশ্বরে পুরোপুরি অবিশ্বাস হওয়া, একই জিনিস, কোন তফাৎ নেই।

If God spoke to a man in the deserts of Arabia two thousand years ago, He can also speak to me today, else how can I know that He has not died? (*ঈশ্বর যদি দু-হাজার বছর আগে আরবের মরুভূমিতে কোন ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলে থাকেন, আজ আমার সঙ্গেও তিনি কথা কইতে পারেন। তা না হলে কি করে জানব, তিনি মরে যাননি?*) ভগবান যে মরে যাননি, তার কি প্রমাণ আছে? কবে দু-হাজার বছর আগে আরবের মরুভূমিতে কার সঙ্গে তিনি কথা বলেছিলেন, এখন কি তিনি আদৌ বেঁচে আছেন কিনা আমরা বুঝব কি করে? স্বামীজীর এই God is dead এটা একটা খুব মজার বাক্য। মিৎসের একটা খুব নামকরা বই আছে, সেখানে আছে, একজন পাহাড়ে অনেক দিন সাধনা করে সমতল ভূমিতে নেমে আসছে, আসার পথে আরেকজনের সাথে দেখা হয়, সে ঈশ্বরের সাধনা করছে, তখন সে তাকে বলছে, Does’nt you know that God is dead। ওখানে অবশ্য God বলতে যীশুকে বলছেন। সেখান থেকে একটা futuristic societyর কথা বলছেন। স্বামীজী মজা করে ঐ জিনিসটাকে এখানে বলছেন, ভগবান যে এই দু-হাজার বছরে মরে যাননি, সেটা তোমাকে জানতে হবে। অনেক দিন বাড়ির দরজা ভিতর থেকে বন্ধ থাকলে লোকেদের সন্দেহ হয়, লোকটি আদৌ বেঁচে আছে নাকি মরে গেছে। দরজায় টোকা মেরে যদি কোন সাড়া না পায়, তখন সবাই মিলে দরজা ভাঙতে শুরু করে। আমাদেরও ঠিক তেমনি ভগবানের ঘরে টোকা মেরে দেখতে হবে, ভগবান সাড়া শব্দ করেন কিনা। সাড়া শব্দ যদি না দেন, তাহলে বুঝতে হবে ভগবান পটকে গেছেন। কিন্তু পুরো ধর্ম হল, ভগবান পটকে গেছেন কিনা এটা জানার জন্য। ডাক দেখি মা ডাকার মত, কেমন শ্যামা থাকতে পারে, আমাদের ঐ রকম ডাকতে হবে। সেইজন্য বলছেন, Come to God any way you can; only come. But in coming do not push anyone down. (*যে কোন উপায়ে হোক, ঈশ্বরের কাছে এসো – কিন্তু আসা চাই। তবে আসবার সময় যেন কাউকে ঠেলে ফেলে দিও না।*)

জ্ঞানী কাউকে আঘাত করবেন না

The knowing ones must have pity on the ignorant. One who knows is willing to give up his body even for an ant, because he knows that the body is nothing. (*জ্ঞানী ব্যক্তিরা অজ্ঞান ব্যক্তিদের করুণা করবেন। যিনি জ্ঞানী, তিনি একটা পিঁপড়ের জন্য পর্যন্ত নিজের দেহ ত্যাগ করতে ইচ্ছুক থাকেন, কারণ তিনি জানেন দেহটা কিছুই নয়।*) হিন্দু ধর্মের বৈশিষ্ট্য এই জায়গাতে। সিদ্ধ পুরুষ, যিনি নিজেকে ঈশ্বরের সাথে একত্ব অনুভব করছেন, তিনি যারা ঐ স্তরে আসতে পারেনি, তাদেরকে তাচ্ছিল্য করেন না, ক্ষতিও করেন না। অনেক ধর্মে বলা হয়, হয় আমার কথা মানো, তা নাহলে গলা কেটে দেব। সেমেটিক ধর্মের সবারই এই অবস্থা, কথা না মানলে গলা কেটে দেবে। এটা কিসের ধর্ম! আমি মানতে চাই না, আমি স্বর্গে যেতে চাই না, তাই বলে তুমি আমার গলা কেটে দেবে? ফরাসীর খুব নামকরা দার্শনিক ও লেখক ভল্টায়ার প্রথম থেকেই খ্রীশ্চান বিরোধী ছিলেন। ওনার প্রায় সব বই খ্রীশ্চান ধর্মের বিরুদ্ধে লেখা। মৃত্যুর সময় একজন খ্রীশ্চান ফাদার এসে ভল্টায়ারকে খবর পাঠিয়েছেন, সারা জীবন তুমি পাপ করে এসেছ, আমি তোমার শুদ্ধি করতে আসছি। সেক্রেটারি এসে ভল্টায়ারকে খবর দিয়েছে, উনি সেক্রেটারিকে বলে দিলেন, ‘ফাদারকে বলে দাও আমি বিছানায় পড়ে আছি। তারপরেও যদি আসতে চায়, বলে দিও আমার চোখ মুখ সব বন্ধ হয়ে গেছে। এরপরেও যদি আসতে চায়, তাহলে বলে দিও, আমি মরে গেছি এবং নরকে চলে গেছি, আমাকে যদি খুঁজতে হয় তাহলে সেখানে গিয়ে খোঁজ করতে’। আসলে ভল্টায়ার গালাগাল দিয়ে বলতে চাইছেন, go to hell। কিন্তু ঘুরিয়ে এভাবে বলছেন, তুমি তো আমার কথা শুনবে না, now go to hell। তাই হল, মৃত্যুর পর তাঁর কবর দিতে দিলো না, কিন্তু অনেক পরে আবার খুব সম্মান দিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল।

হিন্দুদের এই সহিষ্ণুতা অন্য কোন ধর্মে পাওয়া যাবে না। এটা ঠিক সহিষ্ণুতাও না, স্কুলের ক্লাশ ফোরের ছেলেদের দিকে আঙুল তুলে ক্লাশ ফাইভের ছেলেরা বলে, এরা কিছুই জানে না। কিন্তু সেই স্কুলেরই একজন মাস্টার ডিগ্রীধারী শিক্ষক বাচ্চাদের কখনই এভাবে খেলো করতে যাবেন না। কেউ যখন মহৎ হয়ে যান, তিনি তখন জগতের কাউকেই খেলো করবেন না। যতক্ষণ কাউকে খেলো করে যাচ্ছে, বুঝতে হবে এখনও তার মধ্যে শক্তি আসেনি। যে কোন জীবের প্রতি করুণা, দয়া, এই জিনিসগুলি তখনই মানুষের মধ্যে আসে, যখন ভিতরে সাংঘাতিক একটা ক্ষমতা এসে যায়। যে দুর্বল, সেই নিজের থেকে দুর্বল ব্যক্তিকে সব সময় দাবিয়ে রাখতে চাইবে। লড়াই ঊনিশ কুড়িতে হয়, কিন্তু একশ আর একে কখন লড়াই হবে না, তাকাতেও যাবে না। যিনি বিরাট শক্তিমান পুরুষ, তিনি কাউকেই মারতে যাবেন না, উনি জানেন আমার ক্ষমতার সাথে কারুর তুলনাই হয় না। স্বামীজী বলছেন, যাঁরা ধর্মের ঐ অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন, তাঁরা জানেন এরা কত অসহায়। সেইজন্য সবারই প্রতি তাঁদের করুণা থাকে, একটা পিঁপড়ের প্রতিও তাঁর করুণা থাকে। আমাদের ক্ষেত্রে এসে উল্টো হয়ে যায় – এই দেহ কিছু না, সেইজন্য তুমি আমার সেবার জন্য সব কষ্ট সহ্য করে যাও। নিজে কেউ কষ্ট নিতে চাইবে না, কিন্তু অপরকে কষ্ট দেওয়ার সময় আছে। এই কথা বলে স্বামীজী রবিবারের ক্লাশ শেষ করছেন।

স্বামীজী এই জায়গাতে মূলতঃ বলতে চাইছেন, যদি তুমি ধর্মপথে অবস্থিত থাক, এই ধর্মকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত করার একটাই পথ – পথে নামো, সরাসরি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ কর, ঈশ্বর তোমাকে যখন কিছু বলবেন, সেটাই তোমার ধর্ম, সেটাই আসল। যতক্ষণ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ না করছ, তোমার সাথে ঈশ্বর যতক্ষণ সরাসরি কথা না বলেন, ততক্ষণ ঐ ধর্ম কিছুই না, ততক্ষণ ওটা অন্ধ বিশ্বাস, যা নাস্তিকতার সমতুল্য।

<u>সোমবার, ৫ই অগস্ট</u>

চেতনার বিবর্তন ***(Evolution of consciousness)***

স্বামীজীর আমেরিকায় যাওয়ার বেশ কিছু আগেই Theory of Evolution এসে গিয়েছিল। বিবর্তনবাদের বিস্তার অনেকগুলো এরিয়াতে রয়েছে। তার মধ্যে একটা বিস্তার হল, আমরা যেখানে আছি, জাতি হিসাবে এর উদ্দেশ্য কি? কার্ল জুঙ একজন নামকরা মনস্তত্ত্ববিদ ছিলেন, প্রথমে তিনি ফ্রয়েডের সাথে কাজ করা শুরু করেন। পরে ফ্রয়েডের সাথে অনেক কিছুতে মতবিরোধ হওয়াতে তিনি ফ্রয়েডের থেকে আলাদা হয়ে স্বাধীন ভাবে কাজ করতে লাগলেন। কার্ল জুঙের কিছু অপ্রকাশিত কাজ আছে, যাতে কিছু কিছু নোটস্ নেওয়া আছে, এগুলো খুব মজার। সেখানে এক জায়গায় তিনি বলছেন পাশ্চাত্যের জন্য ভারত সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ পাশ্চাত্য বলে জীবনের একটা উদ্দেশ্য আছে। এর মূল কারণ হল, ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর পাগল নন, বাচ্চাও নন, সৃষ্টি যখন করেছেন, তখন তার কিছুতো একটা উদ্দেশ্য থাকতে হবে। পাগল উদ্দেশ্য ছাড়া এমনিই করে, ভগবান তো পাগল নন। তাঁর কিছু উদ্দেশ্য আছে। তার মানে, আমরা যে এখানে আছি, এরও কিছু একটা উদ্দেশ্য আছে। সেই ঈশ্বরের উদ্দেশ্য পুর্তির জন্যই আমাদের জন্ম, যেমন ইসলাম, যারা গোঁড়া, তারা বলে, আমরা আছি যাতে সবাই আমরা আল্লার পথে আসতে পারি। যে আসছে না, তার গলা কেটে দাও। নিজের মত একটা সিদ্ধান্ত দাঁড় করিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু যাঁরা ধর্ম বোঝেন, তাঁরা বলছেন, এই জিনিসটা হল ঈশ্বরের দিকে এগোনো। কিন্তু ভারতবর্ষে যখন আসছে তখন সৃষ্টি হয়ে যায় অনন্ত, ভগবান অনন্ত, জগৎ অনন্ত, আমি অনন্ত। তাহলে কিসের উদ্দেশ্য হবে? আমি গতকালও ছিলাম, আজকেও আছি, আগামীকালও থাকব। তাহলে আজকে কোথায় যাচ্ছি? কোথাও না, আর যাবেটাই বা কোথায়? যে অনন্ত সে যাবে কোথায়? কবে যাবে? আরে যাবে কি! কালও ছিল, আজকেও আছে, আগামীকালও থাকবে। কার্ল জুঙ বলছেন, ভারতবর্ষে মানুষের কাছে উদ্দেশ্য বলে কিছু নেই। বলছেন – He is the meaning and purpose of the life। একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বাক্য। কার্ল জুঙ ১৯৩০ সালে এটা বুঝতে পেরেছিলেন ভেবে আমাদের অবাক লাগে।

পাশ্চাত্যের মনের গঠন আর ভারতের মনের গঠন সম্পূর্ণ আলাদা। পাশ্চাত্যে তোমাকে সব সময় কোথাও পৌঁছাতে হবে। কারণ সেখানে তোমার জীবনদর্শনটাই অন্য রকম। তোমরা বল ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন, সেখানে আবার ডারউইনের বিবর্তনবাদ ঢুকে গেল। তার মানে আমরা বিবর্তিত হচ্ছি, বিবর্তনের মাধ্যমে আমরা

একটা জায়গায় পৌঁছাচ্ছি। ভারতবর্ষের কাছে এটা কোন ব্যাপারই না, আমি অতীতেও ছিলাম, আজও আছি, ভবিষ্যতেও থাকব। তাহলে সৃষ্টি কেন? উদ্দেশ্য কি? আমিই উদ্দেশ্য, আমি আছি বলেই এই জগৎ আছে। আর এর উদ্দেশ্য একটাই, আমার নিজস্ব জ্ঞান লাভ। অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই, কারণ ভগবান আমাদের সৃষ্টি করেননি। আগেকার দিনে কাহিনীকাররা একটা দৈত্য তৈরী করে দিতেন, দৈত্য এসে বলত, বলুন কি আজ্ঞা, কি করতে হবে? ভগবান যদি আমাদের সৃষ্টি করতেন তাহলে আমরাও বলতাম, কি আজ্ঞা বলুন, কি করতে হবে। ভগবান আমাদের সৃষ্টি করেননি, আমি চিরদিনই আছি। তাহলে কিসের উদ্দেশ্য হবে? স্বামীজী এই দুটো থিয়োরীক, যদিও স্বামীজী কার্ল জুঙের অনেক আগে এই কথা বলছেন, এই যে দুটো দৃষ্টিভঙ্গী, তুমি চিরন্তন, তুমিই এর উদ্দেশ্য, তুমিই এর অর্থ, সবটাই তুমি আর পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গীতে যেখানে পুরো জিনিসটার একটা উদ্দেশ্য আছে, এই দুটোকে সমন্বয় করে একটা সুন্দর জায়গায় নিয়ে দাঁড় করাচ্ছেন, যেটাকে স্বামীজী বলতেন, Evolution of Consciousness। স্বামীজী ডারউইনের প্রজাতির বিবর্তনকে কখনই মানতেন না। Evolution of Consciousness স্বামীজীর নিজস্ব থিয়োরী না, কারণ এই থিয়োরী পতঞ্জলি যোগসূত্রে অনেক আগেই এসে গেছে। Evolution of Consciousnessএ শুধু যে সামনের দিকে যাবে তা না, পিছনেও চলে যেতে পারে। তার মানে আজকে আমি মানুষ আছি, আগামীকাল দেবতা হয়ে যেতে পারি, আবার সেখান থেকে পরে বাঘ সিংহও হয়ে যেতে পারি, যদি আমার কর্মকে আমি ঠিক না রাখতে পারি। তার মানে, আমার মধ্যে চেতনা, এই চেতনা কখন বিস্তৃতি লাভ করছে, কখন সঙ্কুচিত হচ্ছে। এই বিস্তার আর সঙ্কোচন ততদিন চলতে থাকবে যতদিন আমি ঈশ্বরের সাথে এক না হয়ে যাচ্ছি।

আগে আমরা মিৎসের কথা বলেছিলাম। মিৎসের সব থেকে বড় অবদান হল সুপারম্যানের আইডিয়া। গদ্য আর পদ্য মিলিয়ে তাঁর যে নামকরা বই, দা স্পেগ জরাথ্রুষ্ট, সেখানে বলছেন, Does'nt he knows that God is dead। যীশুখ্রীষ্টকে নিয়ে বলছেন, God is dead। ভগবান মরে গেছেন, তাহলে এখন কি হবে? সুপারম্যান, সুপারম্যান কেমন হবে, সেখানে তিনি বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করছেন সুপারম্যানের কি কি গুণ থাকবে। পরে বার্ণার্ড'শ থেকে শুরু করে সিনেমা, নাটকে সুপারম্যানের আইডিয়াকে নিয়ে আসা হয়েছে। স্বামীজী জিনিসটাকে পুরো অন্য ভাবে নিয়ে আসছেন। কারণ তিনি জানেন পাশ্চাত্যের আইডিয়াটা ঠিক, কিন্তু সীমিত সত্য। স্বামীজী যে বিস্তার ও সঙ্কোচন নিয়ে বলছেন, সেখানে তিনি জীবাত্মাকে নিয়ে আলোচনা করছেন। শুদ্ধাত্মার তো বিস্তারও নেই, সঙ্কোচনও নেই; দেহেরও কিছু হয় না। জীবাত্মা যেমন শরীর ধারণ করবে, তার তেমন উন্নতি হবে। এরপর ডারউইনের বিবর্তনবাদ থিয়োরী এনে যদি বসিয়ে দেওয়া হয়, তখন আরামসে বসে যাবে। যদি ডারউইনের থিয়োরী ভুল প্রমাণিত হয়ে যায়, তাতেও হিন্দুদের কিছু এসে যাবে না। হিন্দুরা নিজের জায়গায় ঠিক দাঁড়িয়ে থাকবে, তাদের থিয়োরীর কোন পরিবর্তন হবে না। তুমি বলছ, আজকে যে মানুষ হয়েছে, সে অনেক আগে এ্যমিবা ছিল, সেখান থেকে বিবর্তিত হয়ে হয়ে আজকে মানুষ হয়েছে। ঠিকই, কিন্তু হিন্দুরা একটু অন্য রকম বলে। আমি কি ছিলাম, তুমি কি ছিলে, আমরা জানি না, জানার কোন আগ্রহও আমাদের নেই। বলতে পারি, আমি protozoa ছিলাম। Protozoaর আগে কি ছিলাম আমি? আমি হয়ত মানুষ ছিলাম, কিংবা দেবতা ছিলাম। এই জায়গাতে এসে গোলমাল লেগে যায়। আমি হয়ত দেবতা ছিলাম, সেখান থেকে protozoa হয়ে গেছি, সেখান থেকে বানর হয়েছি, আবার ঘুরে ঘুরে হয়ত আবার দেবতা হয়ে গেলাম, এটা এইভাবে ঘুরছে। সেখান থেকে স্বামীজী আরেকটা আইডিয়া নিয়ে এলেন, পাশ্চাত্যে যেমন সৃষ্টি একটা উদ্দেশ্য, সবারই একটা উদ্দেশ্য আছে, কোথাও গিয়ে শেষ হবে। শেষ হওয়াটা আমরাও মানি, আমাদের কাছে শেষ মানে মুক্তি। স্বামীজী ঐ জায়গায় একটা দুর্দান্ত থিয়োরী নিয়ে এলেন, যেটা কোথাও কারুর লেখাতে পাওয়া যাবে না। স্বামীজী চলে যাওয়ার পর একশ বছর হয়ে গেছে, এখনও পর্যন্ত এটাকে নিয়ে কেউ কিছু করেননি।

স্বামীজীর বক্তব্য হল, আমি, আপনি সবাই মুক্ত হব ঠিকই। ডারউইনের থিয়োরী অনুযায়ী একটার পর একটা জাতিতে আমাদের বিবর্তন হয়ে চলেছে, ছিলাম দানব, হব মানব, হব দেবতা। এখন এই থিয়োরীতে আমি কি কর্মবন্ধনে অসহায়, নাকি আমার একটা ক্ষমতা আছে? এর উত্তরে বলবেন, যতক্ষণ তুমি জানো না, ততক্ষণ তুমি অসহায়, ততক্ষণ তুমি আবদ্ধ। যেদিন তুমি জেনে গেলে, সেদিন তুমি মুক্ত। যেদিন তোমার চেতনা জেগে গেল সেদিন তুমি মুক্ত, তুমি এবার তোমার মত চেষ্টা করতে পার। চেষ্টা করলে কি হবে? পুরো

পদ্ধতিটাকে তুমি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। একটা গাড়ি করে যাচ্ছি, গাড়ির ড্রাইভার খুব ধীরে ঘুচুর ঘুচুর করে গাড়িটা চালাচ্ছে। আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, 'এই গাড়ি কি এর বেশী স্পীডে চলে না'? 'কেন চলবে না, অবশ্যই চলে'। 'কত কিলোমিটার বেগে চলে'? 'আপনি কত কিলোমিটার বেগে চালাতে চান বলুন'। 'এখন কত স্পীডে যাচ্ছে'? 'কুড়ি কিলোমিটার'। 'চল্লিশে যাবে'? 'অবশ্যই যাবে'। 'ষাটে যেতে পারবে'? 'অবশ্যই যেতে পারবে'। 'আশিতে যেতে পারবে'? 'অবশ্যই'। 'একশতে'? 'অবশ্যই'। 'চালাও তো'। চালিয়ে দিলো একশোতে, গাড়ি সাঁ করে এগিয়ে যেতে থাকল। 'আরে! এতক্ষণ তুমি কি করছিলে'? 'আমি জানতাম না যে আপনার এই স্পীড লাগবে, তাই এখন এই স্পীড করে দিলাম'। এখন আমরা সবাই ঘুচুর ঘুচুর করে চলছি। আগেকার দিনের স্টীম ইঞ্জিনগুলি চলছে তো চলছেই, থেমে থাকছে তো থেমেই থাকছে। আজকে আমি এই শরীরে আছি, গত জন্মে হয়ত বানর ছিলাম, মরে আবার হয়ত আরেকটা অন্য দেহ পাবো। একটা একটা করে দেহ আসছে আর যাচ্ছে, স্টীম ইঞ্জিনের মত প্রত্যেকটা স্টেশনে থামছে, মাঝ রাস্তাতেও থামছে। হঠাৎ স্টীম ইঞ্জিন পাল্টে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিন লাগিয়ে দিয়ে বলে দেওয়া হল স্পীড বাড়াও, আর কোথাও দাঁড়াতে হবে না। রাজধানীর মত সাঁ করে গাড়ি ছুটে বেরিয়ে গেল। আমার কোন সমস্যা নেই। স্টেশনগুলো এখনও আসবে, অনেক সিগন্যালও আসবে, কিন্তু ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যাবে। আগেকার ট্রেনে দিল্লী যেতে যেখানে তিন দিন লাগত, রাজধানী পনের ঘন্টায় পোঁছে দেবে। সবই আগের মত আছে, ট্র্যাক এক, স্টেশনগুলো এক, সিগন্যাল এক, কিন্তু ধীর গতিতে যাচ্ছিল, মনে করছিল, আমি ওটাই চাই, তাই ঐভাবেই চালাচ্ছে।

এক সাধারণ ঘরের দম্পত্তি ছিল। রোজ সকালে ওরা একটা পোচ আরেকটা অমলেট বানাত। স্বামীকে অমলেট দিত আর নিজে পোচ খেত। পঞ্চাশ বছর বিবাহ বার্ষিকীর দিন ওরা নিজেরা ঘটা করে উদ্‌যাপন করছে। সেদিন সকালে স্ত্রী স্বামীকে পোচ দিয়ে বলছে, 'পঞ্চাশ বছর ধরে আমি সহ্য করলাম, তোমার জ্বালায় রোজ আমাকে পোচ খেয়ে আসতে হয়েছে। পঞ্চাশ বছর বিয়ে হয়ে গেছে, আর আমি কারুর কথা মানব না, আজ আমি অমলেট খাব'। স্বামী তখন বলছে, 'আমার অমলেট একটুও পছন্দের না, পঞ্চাশ বছর ধরে আমাকে অমলেট খাওয়া সহ্য করে আসতে হয়েছে'। দুজন দুজনকে সহ্য করে যাচ্ছে, এ মনে করছে আমি ওকে কৃতার্থ করছি, সে মনে করছে আমি তাকে কৃতার্থ করছি। আমাদের জীবন যেটা চলছে, জীবাত্মা বলছে, 'আমি ভাবছি তুমি এভাবেই জীবন চালাতে চাইছ বলে আমি এই স্পীডে চলছি'। এখন আমি বলছি, 'আমার এই জীবনধারা লাগবে না, তুমি এক্ষুণি স্পীড বাড়াও'। 'আমার তো স্পীড বাড়িয়ে দিতে কোন অসুবিধা নেই, এই নাও স্পীড বাড়িয়ে দিলাম'। স্পীড বাড়িয়ে দিলে কি হবে? যেটা চার পাঁচ জন্ম পরে হওয়ার কথা আছে, সেটা এই জন্মেই হয়ে তুমি মুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু স্টেশনগুল প্রচণ্ড বেগে বেরিয়ে যাবে। তার মানে, মুক্তি যেটা একশ জন্ম পরে হওয়ার কথা ছিল, বা সৃষ্টির শেষ সময়ে গিয়ে হওয়ার কথা ছিল, সেটা এই জন্মেই হয়ে যাবে। স্কুলে পুল সার্ভিস থাকে। ছুটির পর একটা বাচ্চাকে বাড়িতে ড্রপ করতে হবে। ওর বন্ধুর বাবা গাড়ি চালাচ্ছে আর যতবার জিজ্ঞেস করছে তোমার বাড়ি এলো? ততবারই বাচ্চাটা উঁ উঁ করে যাচ্ছে। বন্ধুর বাবা ভাবছে এখনও ওর বাড়ি আসেনি। অনেকক্ষণ চালানোর পরে ছেলেটি বলছে, আমরা তো অনেক আগে বাড়ি ছাড়িয়ে চলে এসেছি। তুমি বলোনি কেন? মা বলেছে, মুখে খাবার থাকলে কথা বলতে নেই, মুখে খাবার ছিল তাই উঁ উঁ আওয়াজ করছিলাম। আর সে বেচারী গাড়ি ঘুরিয়েই যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। আমাদেরও এই রকম, মুখে জগতের সব খাবার ঢুকিয়ে রেখেছি, তাই বলছি না যে আমার স্পীড লাগবে। এই ভাবটাকেই স্বামীজী এখানে বলছেন, পুরো ভবিষ্যতকে টেনে একটা জায়গায় নিয়ে আসছেন।

মানব-মনের ক্রমোন্নতি

The question is: Is it necessary to pass through all the lower stages to reach the highest, or can a plunge be taken at once? (*প্রশ্ন এই; সর্বোচ্চ অবস্থা লাভ করতে গেলে কি সমুদয় নিম্নতর সোপান দিয়ে যেতে হবে, না একেবারে লাফিয়ে সেই অবস্থায় যাওয়া যেতে পারে?*) যেটা আমরা এতক্ষণ বললাম। The modern American boy takes twenty fiver years to attain that which his forefathers took hundreds of years to do. (*আমেরিকার আধুনিক বালক আজ যে বিষয়টা পঁচিশ বছরে শিখে ফেলতে পারে, তার পূর্বপুরুষদের সেই বিষয় শিখতে একশ বছর লাগত।*) ভাবতে

অবাক লাগে, ইউক্লিপ, অর্কিমিডিস থেকে শুরু করে পুরো গ্রীক ম্যাথামেটিসিয়ানস্, বিজ্ঞানী, এ্যারিস্টটল, নিউটন, এনাদের যাবতীয় যা বলার, এই হাজার হাজার বছরের বিদ্যাচর্চা, ক্লাশ এইট নাইন হতে হতে আমরা সব শিখে ফেলছি। যেটা তখনকার দিনের জন্য একটা বিরাট আবিষ্কার, সেটা আমরা ক্লাশ এইট নাইনে শিখে নিচ্ছি। আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব তখন কজন আর বুঝতেন, প্রথম কুড়ি বছর পর্যন্ত মুষ্টিমেয় কয়েকজন বুঝতেন, সেই তত্ত্বকে আজ গ্রাজুয়েশানে পড়ানো হয়। মানুষের মন কত উন্নত হয়ে গেছে। আড়াই তিন বছরের বাচ্চাকে একটা সেলফোন দিয়ে দিলে সঙ্গে সঙ্গে খুটখাট করতে করতে সব ঠিক করে দেবে। সত্যিকারের একটা ঘটনা, মাঝরাত্রে সেলফোন কাজ করছিল না, ভদ্রমহিলা হেল্প সেন্টারে ফোন করেছে। হেল্প সেন্টারে সমস্যা জানালে ওরা ভদ্রমহিলাকে বোঝাচ্ছেন আপনি এই এই করুন, দেখুন ঠিক হয়ে গেছে। ভদ্রমহিলা কিছুতেই বুঝতে পারছে না, কি বলতে চাইছে। ওরাও বিরক্ত হয়ে বলছে, 'আপনার বাড়িতে কোন বাচ্চা আছে'? 'আমার ছেলে আছে ক্লাশ টুয়ে পড়ে'। 'ওকে আমার ফোনটা দিন, ওকে বুঝিয়ে দিচ্ছি'। ফোনটা দিতেই বাচ্চাটা বলছে, 'আমাকে বলতে হবে না, আমি জানি কি প্রব্লেম, মা শুনতে চাইছে না বলে সমস্যা হচ্ছে'। এখনকার বাচ্চারা এতো ওস্তাদ হয়ে গেছে, আমাদের একটা কোন ইলেক্ট্রনিক গ্যাজেট নিয়ে নাড়াচাড়া করতেই ভয় লাগে, ওদের কাছে কোন স্মার্টফোন, কোন গ্যাজেট কিছুই না, জলভাত। কিছু না, মন evolve করে গেছে। অথচ এরা আমাদেরই সন্তান। স্বামীজী সেটাই বলছেন, আমেরিকার পঁচিশ বছরের ছেলে, পুরো ইতিহাসে যা হয়েছে, সেটাকে মাস্টারী করে নিচ্ছে।

The present day Hindu gets in twenty years to the height reached in eight thousand years by his ancestors. (*আধুনিক হিন্দু এখন বিশ বছরে সেই অবস্থায় আরোহণ করে, যে-অবস্থা লাভ করতে তার পূর্বপুরুষদের আট হাজার বছর লেগেছিল।*) স্বামীজী হিন্দু সভ্যতার ইতিহাসের কথা এলেই আট হাজার বছরের নীচে কখনই যেতেন না। স্বামীজী এখানে কুড়ি বছরের কথা বলছেন, আজকের হিন্দু আট হাজার বছরের ইতিহাসকে কুড়ি বছরে আয়ত্ত করে নিচ্ছে। On the physical side, the embryo goes from the emoeba to man in the womb. (*শরীরের দৃষ্টি থেকে দেখলে দেখা যায় গর্ভে ভ্রুণ সেই প্রাথমিক জীবাণুর অবস্থা থেকে আরম্ভ করে নানা অবস্থা অতিক্রম করে শেষে মানুষরূপ ধারণ করে।*) তখন একটা ধারণা ছিল যে, কোন নারী যখন অন্তঃসত্ত্বা হয় তখন তার ভ্রুণ যে অবস্থাগুলোকে অতিক্রম করে, তখন তা ঐভাবেই বড় হতে থাকে। These are the teachings of modern science, (*এই হল আধুনিক বিজ্ঞানের শিক্ষা।*) এগুলো চোখে দেখা যায়, যার কথা ডারউইন আদিরা বলেছেন।

Vedanta goes further and tells us that we not only have to live the life of all past humanity, but also the future life of all humanity. (*বেদান্ত আরও অগ্রসর হয়ে বলেন, আমাদের শুধু মানব-জাতির সমগ্র অতীত জীবনটা যাপন করলেই হবে না, সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যৎ জীবনটাও যাপন করতে হবে।*) এই যে স্পীড বাড়িয়ে দেওয়ার কথা বলা হল, এতে কি হচ্ছে, আমরা যে এ্যামিবা থেকে বিবর্তিত হতে হতে আজকে এখানে এসে পৌঁছেছি, সেটা আমরা যে মুহুর্তে গর্ভে এলাম এবং তখন থেকে আজ পর্যন্ত যা কিছু করেছি, তাই না, ভবিষ্যতে যা কিছু হবে সমস্তটা এখানেই নামিয়ে দেওয়া যায়। তাহলে আমরা যদি যীশু, বুদ্ধ, ঠাকুর এনাদের জীবনকে নিয়ে পর্যালোচনা করি, তাহলে আমরা এখানেই বসে বসে বলে দিতে পারব, আজ থেকে দু-হাজার বছর পর মানবসভ্যতা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। কারণ এনারা মানবজাতির পুরো ভবিষ্যৎকে টেনে কয়েকটা বছরে নামিয়ে দিয়েছিলেন। যেমন আমরা ভূতকালের সমস্ত ইতিহাসকে কয়েকটা বছরে নামিয়ে দিতে পারছি। ক্লাশ ফোর থেকে পড়াশোনা শুরু করে ক্লাশ নাইন টেন আসতে না আসতেই ছ-বছরের মধ্যে, খুব উন্নত বিজ্ঞানের জ্ঞান ছাড়া, পুরো হাজার বছরের বিজ্ঞানের ইতিহাসে যত বড় বড় বিজ্ঞানীরা যা যা জ্ঞান অর্জন করেছেন, সবটাই কয়েকটা বছরের মধ্যে এখন অর্জন করে নিচ্ছে। অনেক বিজ্ঞানীদের মতে, ভ্রুণ অবস্থা থেকে শুরু করে পুরো যে বিবর্তনের ধাপগুলি আছে, সবটাকেই অতিক্রম করে নিচ্ছে। হিন্দুরা বলেন, শুধু তাই না, তুমি যদি চাও, যে প্রজাতি এখন থেকে ভবিষ্যতে যেখানে যাবে, পুরো পরিক্রমাকে এই জীবনেই নামিয়ে দেওয়া যাবে।

The man who does the first is the educated man, the second is the Jivanmukta, for ever free (even while living). (*যিনি প্রথমটি করেন, তিনি শিক্ষিত ব্যক্তি; যিনি দ্বিতীয়টি করতে পারেন, তিনি জীবনমুক্ত।*) আমরা শিক্ষিত কাকে বলি? যিনি পুরো ইতিহাসটা জেনে গেছেন। জীবনমুক্ত কাকে বলি? ভবিষ্যতে যা কিছু হতে যাচ্ছে, সেটাকে এই জীবনেই নামিয়ে দিলেন। স্বামীজী খুব জোর দিয়ে প্রায়ই বলতেন, এমন দিন আসবে যখন জীবনমুক্ত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে। তার মানে শিক্ষিত যিনি তিনি পুরো ইতিহাসকে নিজের জীবনে নামিয়ে নিয়ে এসেছেন; জীবনমুক্ত পুরো ভবিষ্যতকে নিজের জীবনে নামিয়ে নিয়ে এসেছেন। স্বামীজী হলেন, পুরো অতীত ও ভবিষ্যতের মিলনস্থল। কারণ তাঁর ভিতরে পুরো শিক্ষাটাও ছিল আর পুরো ভবিষ্যতটাও ছিল। ঠাকুর বিজ্ঞানের ব্যাপার জানতেন না, তাঁর জানারও কোন দরকার ছিল না, কিন্তু বিজ্ঞানের মতেই জন্ম থেকে সবটাই তিনি নিয়ে আসছেন। আগে অত কিছু বোঝা যেত না, আর ডারউইনের থিয়োরীরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু জেনেটিক্যালি আমাদের ভিতরে পুরো ইতিহাসটাই রয়েছে। যেমন আমার জিন্ আর একটা ইঁদুরের জিনের মধ্যে দেখতে অনেক তফাৎ, কিন্তু শতকরা ৯৯.৮ ভাগ মিল রয়েছে। ইঁদুরের জিনের সাথে আমাদের জিনের সামান্য একটু তফাৎ, পয়েন্ট দু ভাগের তফাতেই একটা মানুষের সাথে ইঁদুরের কত বিরাট পার্থক্য হয়ে যাচ্ছে; এটা পরীক্ষামূলক ভাবে সত্য প্রমাণিত হয়ে গেছে। তাহলে আগামী দিনে যে প্রজাতিরা আসবে তারা কেমন হবে? জীব রূপে তারা অনেক উন্নত থাকবে। বিবর্তন নিয়ে পড়াশোনা করা থাকলে দেখতে পারবে, একদিনে তো সব কিছু হয়ে যাবে না; কিন্তু প্রথমে একটা আসবে সেটা হল odd, তারপর আরেকটা হল, সেটা আরেকটা odd, এইভাবে হতে হতে পুরো জিনিসটাই এসে যাবে। যেমন ক্ষেতে ফসল যখন পাকা শুরু হয় তখন একটা দুটো পাকে, তারপরে আরও দু-একটা পাকে, হঠাৎ দেখা যাবে একসাথে পুরো ফসলটাই পেকে গেছে।

সময় শুধু চিন্তার পরিমাপক

এই জিনিসটা কেন হয়, কিভাবে সম্ভব হয়, এটাকেই স্বামীজী এবার ব্যাখ্যা করছেন, Time is merely the measure of our thoughts, and thought being inconceivably swift, there is no limit to the speed with which we can live the life ahead. (*কাল বা সময় কেবল আমাদের চিন্তার পরিমাপক মাত্র, আর চিন্তার গতি অভাবনীয় ভাবে দ্রুত। কত দ্রুত আমরা ভাবী জীবনটা যাপন করতে পারি, তার কোন সীমা নির্দেশ করা যেতে পারে না।*) সবটাই আমাদের মনে। চিন্তার মধ্যে সময়ের ব্যাপারটা খুব সহজেই বোঝা যায়। আমি আর আমার বন্ধু দুজনে দেখা করব। যে জায়গায় দুজনের সাক্ষাৎ হওয়ার কথা, আমি সেখানে পৌঁছে গেছি, দেখছি বন্ধু এখনও এসে পৌঁছাতে পারেনি। আমি ঘন ঘন ঘড়ি দেখছি, পাঁচ মিনিট হল, মনে হচ্ছে এক মিনিট হল। আর বন্ধু, যে দৌড়ে দৌড়ে আসছে, এক মিনিট হয়েছে, তার মনে হচ্ছে পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে। ছটফট করছে, আমাকে সময়ে পৌঁছাতে হবে, আমাকে না দেখতে পেয়ে যদি ও ফিরে চলে যায়! বয়স্ক মানুষদের সময় কাটতে চায় না, কিছু করার নেই কিনা, মনে করে কত সময় হয়ে গেছে, ঘড়ি দিকে তাকিয়ে দেখছে, সবে দশ মিনিট গেল। মনের মধ্যে যে চিন্তা-ভাবনা একটার পর একটা হয়ে যাচ্ছে, এটাকে যে জিনিসটা মাপছে, সেটাই হল সময়। কিন্তু চিন্তার তো কোন সীমা পরিসীমা বলে কিছু নেই, চিন্তার স্রোত যে কোন গতিতে চলতে পারে। যত গতিতে চালাতে পারবে সময়ের গতিও তত বাড়বে। সময়ের গতি বাড়া মানে, যেটা একশ জন্ম পরে হওয়ার কথা সেটা কয়েকটা জন্মেই বা এই জন্মেই কয়েক বছরের মধ্যে হয়ে যাবে; খুবই স্বাভাবিক।

স্বামীজী যখন এই কথা বলছেন, তখনও আইনস্টাইনের থিয়োরী অফ রিলেটিভিটি আসেনি। থিয়োরী অফ রিলেটিভিটিতে বলছেন, যদি কেউ আলোর গতিতে চলতে থাকে, তাহলে তার সময়টাও থেমে যেতে থাকবে, সাথে সাথে তার বয়সটা বাড়বে না। অবশ্য অন্য দিকে তার শরীরটাও হয়ত একটা পয়েন্ট সাইজে চলে যাবে। এই জিনিসটাকে অনেক ভাবে পরীক্ষা করার পর বলছেন, গতি যত বাড়বে, সময় তত সঙ্কুচিত হয়ে ছোট হয়ে যাবে, জীবনটাও তত লম্বা হয়ে যাবে। ঠিক সেইভাবে আমরা যদি আমাদের thought processকে পরিবর্তন করে দিতে পারি, আমাদের ভবিষ্যতকে নামিয়ে আনা যাবে। সাধুরা যাঁরা খুব সাধনা ভজনা করেন, তাঁদের তাই-ই হয়। ফলে তাঁদের আগামী জন্মের অনুভূতিগুলি এক জন্মেই আসতে শুরু হয়ে

যায়। যদি অনেক ঝড়-ঝাপ্টা না আসে, ওঠা-নামা না হয়, তার মানে সাধন-ভজন হচ্ছে না। সাধনা মানেই, এই তাকে আকাশে তুলে দেবে, পর মুহুর্তেই আবার মাটিতে আছাড় মেরে ফেলবে। তার মানে, সময়কে সঙ্কুচিত করে দিচ্ছে। রাজধানীর মত স্পীড বেড়ে গেছে, একটা জন্মকে যেন একটা বছরে পার করে দিল; স্টেশন গুলো সাঁ সাঁ করে বেরিয়ে যেতে থাকবে।

So it cannot be stated how long it would take to live all future life. It might be in a second, or it might take fifty lifetimes. It depends on the intensity of the desire. (*সেইজন্য মানবজাতির সমগ্র ভবিষ্যৎ জীবন নিজ জীবনে অনুভব করতে কতদিন লাগবে, তা নির্দিষ্ট করে বলতে পারা যায় না। এক মুহুর্তে হতে পারে, কারও বা পঞ্চাশ জন্ম লাগতে পারে। এটা বাসনা বা ইচ্ছার তীব্রতার উপর নির্ভর করে।*) সবটাই নির্ভর করবে, কত গভীর ভাবে, কত তীব্রতা ও নিষ্ঠার সাথে আমি সাধন-ভজন করছি। একটা যানের যদি কল্পনা করা যায় যেটা মনের বেগে ছোটে। ঐ যানে চেপে আমি কোথাও যাবো। কত বেগে যাবে? যত বেগে আমি যেতে চাইব। কত বেগে আমি যাবো? যতটা বেগে যাওয়া আমার দরকার। আমরাও যখন কোথাও যাবো, আমাকে দশটার সময় দেখা করতে বলেছে, নটার সময় বেরিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটছি, জানি হাতে আমার এখনও এক ঘন্টা সময় আছে। ধীরে ধীরে যাচ্ছি। যদি দেখি হাতে মাত্র দশ মিনিট আছে, তখন স্পীডে যাই। আমার যেমন ইচ্ছা, এই ইচ্ছার উপর নির্ভর করে আমার স্পীড কত হবে।

ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা ও উপদেশের প্রয়োজনীয়তা

The teaching must therefore be modified according to the needs of the taught. (*সুতরাং শিষ্যের প্রয়োজন অনুযায়ী উপদেশও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হওয়া দরকার।*) এখান থেকে ধীরে ধীরে স্বামীজী আধ্যাত্মিক শিক্ষার দিকে আলোচনাকে নিয়ে যাচ্ছেন। অধিকারী ভেদে যার যেমন দরকার তাকে সেইভাবে শিক্ষা দিতে হবে। যার ভিতরে বৈরাগ্যের আগুন জ্বলছে, তার শিক্ষাও সেই অনুসারে হবে। যারা ঢিমে তেতালা, মন্দ বৈরাগ্য, তাদের শিক্ষাও সেই রকম হবে। একদিকে জগৎকেও চাইছে, সুখ-সুবিধাও চাইছে অন্য দিকে আধ্যাত্মিক জ্ঞানও পেতে চাইছে, তাদের শিক্ষাটাও ঐ অনুসারেই হবে। হিন্দুরা তাই সবার জন্য দিয়ে দিলেন ধর্ম, অর্থ আর কাম, কিন্তু মোক্ষকে কয়েকজনের জন্য রেখে দিলেন। The consuming fire is ready for all, even water and chunks of ice quickly consume. Fire a mass of birdshot, one at least will strike; give a man a whole museum of truths, he will at once take what is suited to him. (*জ্বলন্ত আগুন সকলের জন্যই রয়েছে – তাতে জল, এমন-কি বরফের চাঙ্গড় পর্যন্ত নিঃশেষ করে দেয়। একরাশ ছড়ুরা দিয়ে বন্দুক ছোড়, অন্ততঃ একটাও লাগবে। লোককে একেবারে এক রাশ সত্য দিয়ে দাও, তারা তার মধ্যে যেটুকু নিজের উপযোগী তা নিয়ে নেবে।*) আগুনের উপর নির্ভর করে, এমন আগুন যে তাতে দরকার হলে জল, এমনকি বরফকেও বাষ্প করে উড়িয়ে দেবে। বন্দুকের গুলি একটা একটা করে যায়, ছড়ুরা বন্দুক থেকে একসাথে দশ বারোটা করে গুলি বেরিয়ে আসে। যেখানে অনেকগুলো পাখি আছে, ছড়ুরা বন্দুক থেকে গুলি মারলে আশা করা যায় একটা পাখির গায়ে অন্ততঃ গুলি লাগবে। ঠিক তেমনি যে লাইব্রেরিতে লক্ষ লক্ষ বই আছে, সেই লাইব্রেরিতে যাকেই নিয়ে যাওয়া হোক না কেন, তার মনের মত একটা না একটা বই সে অবশ্যই পেয়ে যাবে। যার বাড়িতে একটা মাত্র বই আছে, সেই বই সবার মনের সাথে খাপ নাও খেতে পারে। কিন্তু যে লাইব্রেরিতে লক্ষ লক্ষ বই আছে, সেখানে সবাই নিজের মনের মত বই পেয়ে যাবে। যে ধর্ম একটা আদর্শকে নিয়েই চলার কথা বলে, সেই আদর্শের সাথে সবাই মানিয়ে নিতে নাও পারে। এখানেই হিন্দু ধর্ম সব ধর্ম থেকে ব্যাতিক্রমী ধর্ম, হিন্দু ধর্মে সবারই জন্য কিছু না কিছু আছে। সেইজন্য হিন্দু ধর্মকে inclusive religion বলা হয়, সবাইকে নিয়ে সে চলতে পারে।

আর বলছেন, Past lives have moulded our tendencies; give to the taught in accordance with his tendency. Intellectual, mystical, devotional, practical, make one of the basis, but teach the others with in. (*অতীত বহু জন্মের ফলে সংস্কার গঠিত হয়েছে, শিষ্যের প্রবণতা অনুযায়ী তাকে উপদেশ দাও। জ্ঞান, যোগ, ভক্তি ও কর্ম – এর মধ্যে যে-কোন একটি*

ভাবকে মূল ভিত্তি কর; কিন্তু অন্যান্য ভাবগুলিও সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা দাও।) স্বামীজী এখানে জ্ঞানযোগকে intellectual, যোগকে mystical, ভক্তিকে devotional এবং কর্মযোগকে practical, এইভাবে বিশ্লেষণ করে বলছেন – Intellect must be balanced with love, the mystical nature with reason, while practice must form part of every method. (*জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তি দিয়ে সামঞ্জস্য করতে হবে, যোগপ্রবণ প্রকৃতিকে যুক্তিবিচারের দ্বারা সামঞ্জস্য করতে হবে, আর কর্ম – তত্ত্বকে কাজে পরিণত করার সাধনা যেন সকল পথেরই অঙ্গস্বরূপ হয়।*) যারা জ্ঞানযোগী তাদের ভালবাসা, ভক্তি থাকা দরকার, যারা যোগ পথে আছে তাদের যুক্তিবিচার করা চাই, তা-নাহলে সব এলেমেলো হয়ে যাবে। কেউ এসে বলল তার ঠাকুরের দর্শন হচ্ছে, কারুর অমুক কিছু দর্শন হচ্ছে, সব মাথার গোলমাল, ভাল করে খাওয়া-দাওয়া করতে দাও। যে প্রবণতাই প্রকৃতিতে থাকুক না কেন, একটা অবস্থার পর সাধনাটা সবাইকে ধরে রাখতে হবে।

Take every one where he stands and push him forward. Religious teaching must always be constructive, not destructive. (*যে যেখানে আছে, তাকে সেইখান থেকে ঠেলে এগিয়ে দাও, ধর্মশিক্ষা যেন ধ্বংসমূলক না হয়ে সর্বদা গঠনমূলক হয়।*) ভাল আচার্য প্রথমে দেখবেন যাকে ধর্মশিক্ষা দেবেন, সে তার চিন্তা-ভাবনার কোন স্তরে দাঁড়িয়ে আছে। তার মনের অবস্থা যেমনটি আছে, সেখান থেকে তাকে এবার তুলে নিয়ে চলে যেতে হবে। সেইজন্য যিনি আচার্য হবেন, তাঁকে সবটাই জানতে হবে। আগেকার দিনে গুরুকুলে যিনি গুরু থাকতেন, তিনি একাই গুরু আর তাঁর অনেকগুলো শিষ্য। যার যেমন দরকার তাকে তিনি সেইভাবে শিক্ষা দিয়ে যেতেন, তাতে কারুর এক বছর, কারুর দু-বছর, কারুর তিন বছর লেগে যেত। কিন্তু এখন এত সাবজেক্ট হয়ে গেছে, আর এক একটা সাবজেক্টে এত স্পেশালাইজড্ যে, অমুক সাবজেক্টের ঐ চ্যাপ্টার, ঐ চ্যাপ্টারের ঐ কয়েকটা পাতাই একজন শিক্ষক মাস্টার ডিগ্রীতে পড়াতে পারবেন। তার সাথে বলছেন, আধ্যাত্মিক শিক্ষক কখনই যেন ধ্বংসাত্মমূলক মানসিকতার না হয়, তারা সাথে এই দৃষ্টিটাও রাখতে হবে যাতে আধ্যাত্মিক শিক্ষাটাও যেন সব সময় ধ্বংসাত্মমূলক না হয়ে গঠণাত্মমূলক হয়।

প্রত্যেকটি প্রবৃত্তি আমাদের পূর্ব কর্মের পরিচায়ক - সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নতি সাধন

Each tendency shows the life-work of the past, the line or radius along which that man must move. All radii lead to the centre (*মানুষের প্রত্যেক প্রবৃত্তিই তার অতীতের কর্ম-সমষ্টির পরিচায়ক। এটি যেন সেই রেখা বা ব্যাসার্ধ, যেটি ধরে মানুষকে চলতে হবে। সকল ব্যাসার্ধ ধরেই কেন্দ্রে যাওয়া যায়।*) প্রতিদিন আমরা যে ধরণের আচরণ করি, কথা বলি, যে ধরণের ক্রিয়া করি, তাতেই আমাদের পূর্বজন্মের প্রবৃত্তিগুলি বেরিয়ে আসে, যেটাকে আমরা সংস্কার বলছি। শুধু এই জীবনেই না, আগের আগের জীবনে আমরা কি করেছি, আমাদের কাজে, আচরণে, বাক্যে পরিষ্কার বোঝা যায়। আর সেটা দিয়েই বোঝা যায়, কে কিভাবে ওখান থেকে বেরোবে। আমাদের সবারই উন্নতির ধারা আলাদা, উন্নতির ধারা দিয়েই বোঝা যায় তার সংস্কার কেমন। একজনের ভিতরে হয়ত প্রচুর ভালবাসা আছে। একজনের হয়ত প্রখর বুদ্ধি, তার মানে অনেক জন্ম ধরে সে তার বুদ্ধিকে ক্ষুরধার করেছে। গুরু এই জিনিসগুলো বুঝতে পারেন, তিনি তাকে ঐ লাইনে টেনে নিয়ে যান। একটু দেখলেই বুঝে যান, কে কি রকম সংস্কার নিয়ে এসেছে। ঠাকুরের এটাই বৈশিষ্ট্য, তিনি তাঁর শিষ্যদের সবাইকে এক পথে নিয়ে যেতেন না, সবাইকে এক প্রকার সাধন-প্রণালীর উপদেশ দিতেন না।

সেইজন্য বলছেন, Never even attempt to disturb anyone’s tendencies; to do that puts back both teacher and taught. (*অপরের স্বাভাবিক প্রবণতা উল্টে দেওয়ার এতটুকু চেষ্টাও করো না, তাতে গুরু এবং শিষ্য উভয়েই পেছিয়ে যায়।*) মন্দ শিক্ষক হলে সবাইকে একটাই শিক্ষা দিয়ে যাবেন। একজন গুরু বা শিক্ষক রূপে যে ঠাকুরের বর্ণনা আমরা পাই, তাতেই স্পষ্ট বোঝা যায় একজন সত্যিকারের গুরু বা আচার্য কিভাবে তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দেবেন। When you teach Jnana, you must become a Jnani and stand mentally exactly where the taught stands. Similarly in every other Yoga. Develop every faculty as if it were the only one possessed, this is the true secret of so-called harmonious development. (*যখন তুমি ‘জ্ঞান’ শিক্ষা দিচ্ছ, তখন*

তোমাকে অবশ্যই জ্ঞানী হতে হবে আর শিষ্য যে-অবস্থায় রয়েছে তোমাকে মনে মনে ঠিক সেইখানে যেতে হবে। অন্যান্য যোগেও এইরূপ। প্রত্যেকটি বৃত্তি এমন ভাবে বিকশিত করতে হবে যে, যেন সেটি ছাড়া আমাদের অন্য কোন বৃত্তিই নেই – এই হচ্ছে তথাকথিত সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নতিসাধনের যথার্থ রহস্য।) যিনি শিক্ষক তিনি যখনই দেখলেন, যাকে আমি শিক্ষা দিচ্ছি তাঁর এই প্রবণতা, সঙ্গে সঙ্গে তিনি শিষ্যের সেই ভাবের অবস্থায় গিয়ে তাকে টেনে তুলে আনবেন। That is, get extensity with intensity, but not at its expense. We are infinite. (*অর্থাৎ গভীরতার সঙ্গে উদারতা অর্জন কর, কিন্তু গভীরতা হারিয়ে উদারতা চেও না; আমরা অনন্তস্বরূপ।*) বিরাট হবে আবার তার সাথে উদার হবে, কিন্তু গভীরতা বাদ দিয়ে উদার হওয়া যাবে না, একটার সাথে আরেকটার আপোষ যেন কখনই না হয়। বর্তমান কালে চিকিৎসা বিজ্ঞানে যিনি ডাক্তার হন তিনি একটাই জানেন। তিনি হয়ত শুধু কানের ব্যাপারটাই জানেন। তারপর দেখা যাবে উনি শুধু বাম কানের ব্যাপারেই জানেন। হয়ত দেখা যাবে বাম কানের নীচের অংশের চিকিৎসাটাই শুধু জানেন। অন্য কোন অঙ্গের ব্যাপারে আমি জানি না, আমার জানার কথাও না। এটা কি কোন শিক্ষা! There is no limitation in us, we can be as intense as the most devoted Mohammedan and as broad as the most roaring atheist. (*আমাদের মধ্যে কোন কিছুর ইতি করা যেতে পারে না; সুতরাং আমরা সবচেয়ে নিষ্ঠাবান মুসলমানের মতো গভীর, অথচ ঘোরতর নাস্তিকদের মতো উদার-ভাবাপন্ন হতে পারি।*) নাস্তিকরা খুব liberal হয়, খোলামেলা, সবটাই নিচ্ছে। আমাদের অতটাই খোলামেলা হতে হবে, আর তার সাথে গোঁড়া মুসলমানদের মত হতে হবে।

The way to do this is not to put the mind on any one subject, but to develop and control the mind itself; then you can turn it on any side you choose. (*এটিকে কার্যে পরিণত করার উপায় হল মনকে কোন বিশেষ বিষয়ে প্রয়োগ করা নয়, আদত মনটারই বিকাশ করা ও তাকে সংযত করা। তা হলেই তুমি তাকে যেদিকে ইচ্ছা ফেরাতে পারবে।*) আগেও আমরা আলোচনা করেছি, একটা জিনিসে না গিয়ে আগে মনকে শক্তিশালী তৈরী করো। মন একবার শক্তিশালী হয়ে গেল, যে বিষয়ের উপর মনকে লাগাবে, সেই বিষয়কেই সে আয়ত্ত করে নিতে পারবে। Thus you keep the intensity and extensity. Feel Jnana as if it were all there was, then do the same with Bhakti, with Raja yoga, with Karma. Give up the waves and go to the ocean, then you can have the waves as you please. (*এইরূপে তোমার গভীরতা ও উদারতা দুই-ই লাভ হবে। জ্ঞান এমনভবে উপলব্ধি কর যে, যেন জ্ঞানই একমাত্র রয়েছে। তারপর ভক্তিযোগ, রাজযোগ, কর্মযোগ নিয়েও ঐভাবে সাধন কর। তরঙ্গ ছেড়ে দিয়ে সমুদ্রের দিকে যাও, তবেই তোমার ইচ্ছামত তরঙ্গ উৎপন্ন করতে পারবে।*) থ্রী ফোরের বাচ্চাদের ভিতর প্রচুর উদ্দীপনা ও উদারতা থাকে। ওরা যখন যেটাকে নিয়ে থাকে তখন ওটাকে নিয়েই থাকে। হঠাৎ একদিন মাথায় ক্রিকেট এলো, এখন সব সময় ক্রিকেট নিয়েই আছে। যেটা নেবে ওটাতেই পুরো দমে নেমে যাবে। হঠাৎ খেয়াল হল আমাকে অভিনয় করতে হবে, সারাদিন এবার মুখে গোঁফ বানিয়ে যেতে থাকবে। যার ভিতর প্রবলতা আছে, ঐ প্রবলতা তাকে যে কোন কিছু বানিয়ে দিতে পারে। সেইজন্য বলছেন, আগে মনকে যদি শক্তিশালী করে নেওয়া যায়, তাহলে জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, কর্ম সবটাকেই ওই বলশালী মনের দ্বারা আয়ত্ত করে নেওয়া যাবে। স্বামীজীর উদ্দেশ্য হল ধর্ম, সেইজন্য বলছেন, Control the 'lake' of your own mind, else you cannot understand the lake of another's mind. (*তোমার নিজের মন-রূপ হ্রদকে সংযত কর, তা না হলে তুমি অপরের মন-রূপ হ্রদের তত্ত্ব কখনও জানতে পারবে না।*) অপরের মন যদি জানতে চাও, তা হলে নিজের মনের উপর আগে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা অর্জন কর। ঠাকুর ঈশ্বর দর্শন করেছিলেন মানে, নিজের উপর পুরো নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন, ফলস্বরূপ তিনি অপরকেও জানতে পারতেন।

আচার্য - ঈশ্বর - সাধনা ও মুক্তি

স্বামীজীর সোমবার ৫ই অগস্টের ক্লাশের শেষ তিনটে যে প্যারাগ্রাফ আছে, তাতে স্বামীজী আচার্য, ঈশ্বর আর সাধনা এই তিনটে জিনিসকে নিয়ে বলছেন। প্রথম প্যারাগ্রাফে আচার্যকে নিয়ে বলছেন, দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফে সাধনাকে নিয়ে বলছেন আর তৃতীয় প্যারাগ্রাফে বলছেন, এই জগৎকে কিভাবে অতিক্রম করে

যাওয়া যায়। আচার্যের উপর যে আলোচনা করছেন, এই আলোচনা যিনি আমাকে দীক্ষা দিয়েছেন বা যাঁদের কাছে আমরা পড়াশোনা করেছি, তাঁদেরকে নিয়ে করছেন না। এখানে ধরে নেওয়া হয়েছে, থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে যাঁরা এতদিন স্বামীজীর কথা শুনছেন, তাঁরাই এবার আচার্য হবেন। তোমরা আমার কথা এতদিন শুনেছ, এবার তোমরা কিভাবে মানুষকে শিক্ষা দেবে, এটাকে নিয়ে স্বামীজী এবার বলছেন। The true teacher is one who can throw his whole force into the tendency of the taught. (*তিনিই প্রকৃত আচার্য, যিনি তাঁর শিষ্যের প্রবণতা অনুযায়ী নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করতে পারেন।*) ঠিক ঠিক আচার্য প্রথমে নিজের শিষ্যের মনটা বুঝে নেন, তার প্রবণতা কি রকম বুঝে নিয়ে তারপর নিজের পুরো শক্তিটা সেখানে লাগিয়ে দেবেন। ঠাকুর যেমন, যার ভিতরে ভক্তির ভাব রয়েছে, তাকে তিনি ভক্তির শিক্ষা দিচ্ছেন, যাদের মধ্যে জ্ঞানের ভাব রয়েছে, তাকে বেদান্তের শিক্ষা দিচ্ছেন। Without real sympathy we can never teach well. (*প্রকৃত সহানুভূতি ব্যতীত আমরা কখনই ঠিক ঠিক শিক্ষা দিতে পারি না।*) স্বামীজী ‘we’ শব্দটা নিয়ে আসছেন। যে শিষ্য তোমার কাছে ধর্ম শিক্ষা নিতে এসেছে, শুধু ধর্মশিক্ষাই না, যে কোন শিক্ষাই হোক, তোমার ভিতরে যদি সহানুভূতি না থাকে, কোন দিন তুমি কোন শিক্ষাই তাকে দিতে পারবে না। মা যখন সন্তানকে কোন কিছু শিক্ষা দেয়, সেখানে তার পুরো সহানুভূতি থাকে, সেইজন্য সবারই জীবনের প্রথম শিক্ষক হলেন মা। মা যেভাবে শিক্ষা দেন, ঐভাবে আর কেউ শিক্ষা দিতে পারবেন না। মা বলতে এখানে ঠাকুরমা, দিদিমা সবাইকেই বোঝান হচ্ছে। ছোট্ট শিশুর প্রতি এনাদের এত করুণা, এত দরদ যে, ছোট ছোট জিনিসকেও ধরে ধরে বুঝিয়ে স্পষ্ট করে দেন। ধর্ম পথেও এই সহানুভূতির মনোভাব যদি না থাকে, তাহলে তুমি কিছু শেখাতে পারবে না। ধর্ম জগতে যাঁরা শিক্ষক বা আচার্যরা আছেন, তাঁদের বেশির ভাগই উপযুক্ত নন। উপযুক্ত এই জন্যই নয়, তাঁরা সবাই নিজের মতটা ভাল জানেন এতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু যে শুনতে এসেছে, তার প্রতি তার করুণা ও সহানুভূতি নেই।

আরও পরিষ্কার করে স্বামীজী বলছেন, Give up the notion that man is a responsible being, only the perfect man is responsible. (*মানুষ যে দায়িত্বপূর্ণ প্রাণী – এ ধারণা ছেড়ে দাও; কেবল পূর্ণতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরই দায়িত্বজ্ঞান আছে।*) এখানে আমরা যীশুর জীবনের সেই নামকরা কাহিনীটা স্মরণ করতে পারি, যেখানে অনেকে মিলে জড়ো হয়েছে একজন দোষী মহিলাকে পাথর ছোঁড়ার জন্য। যীশু গিয়ে বলছেন, যে জীবনে কোন পাপ করোনি, সে প্রথম পাথর ছুঁড়বে। এই কথা বলার পর, এক এক করে সব লোক ওখান থেকে চলে গেল। সব লোক চলে যাওয়ার পর মহিলাটি যীশুকে বলছে, ‘আপনি তো কোন দিন পাপ করেননি, আপনি এবার আমার উপর পাথর মারুন’। যীশু বলছেন, ‘তুমি বাড়ি যাও, আর কোন দিন পাপকাজ করো না, ভগবান তোমায় ক্ষমা করে দিয়েছেন’। কাহিনীটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ, এই যে স্বামীজী এখানে বলছেন, Give up the notion that man is a responsible being, আমাদের সমস্যা হল, আমরা যখন রেগে যাই তখন মনে করি লোকটা দায়িত্বহীন। যারা দোষ করে, তা যে কেউ হতে পারে, আমার স্ত্রী বা স্বামী, আমার বন্ধু, আমার সন্তান, আমি রেগে যাচ্ছি কেন? কারণ আমি মনে করছি, লোকটির কোন দায়িত্ববোধ নেই বা আরও কঠোর ভাবে আঙুল উঁচিয়ে বলতে থাকি, তুমি এই রকমটি করলে কেন? আঙুল তুলে কাউকে কিছু বলাটা সবচেয়ে অপমান সূচক, কারণ এটা হল নারাজ মুদ্রা, পূজাতে ব্যবহার করা হয়। এই মুদ্রা হল ব্রহ্মার অস্ত্র, ব্রহ্মা যখন কাউকে নাশ করতে চান, তখন তিনি আঙুলটা উঁচিয়ে নাড়েন, তার মানে তাকে ব্রহ্মা নাশ করছেন। ‘আগে বলো তুমি এই রকমটি কেন করলে, আমি কোন কথা শুনবো না’ – বলার সময় এই দুটো কথা এক সঙ্গেই বলবে। আপনি কোন কথাই শুনবেন না, আমি বলবো কি করে? কেন রেগে যাচ্ছে? কারণ সে ধরে নিচ্ছে যে তার সামনের লোকটির দায়িত্ববান না হওয়ার কথা। স্বামীজী এই জায়গাতেই বলছেন, মানুষ কক্ষণ দায়িত্বপূর্ণ হতে পারে না, তার ঐ ক্ষমতাই নেই।

স্বামীজীর জীবন যদি আমরা খুব গভীরে গিয়ে দেখি, তাহলে দেখতে পাই যে, তিনি সত্যিকারের একজন আদর্শ শিক্ষক। কাউকে তিনি কখন কোন পরিস্থিতিতে ছোট করছেন না। ঠাকুর মাঝে মাঝে রেগে যাচ্ছেন, কিন্তু কাউকে ছোট করছেন না। অনেক জায়গায় দেখা যায় ঠাকুর বলছেন, সে ঐ রকম বললে, আমি রেগে গেলুম; কিন্তু পরে ভাবলুম, বেচারি কি আর করবে, মা তাকে অতটুকুই বুদ্ধি দিয়েছেন। ‘মা তাকে অতটুকুই বুদ্ধি দিয়েছেন’, এই বোধ যতক্ষণ না আসছে, ততক্ষণ সে শিক্ষক হওয়ার যোগ্য হবে না। আমাদের

শিক্ষক তৈরী করার কত রকম প্রশিক্ষণ আছে, বিএড আদি কত রকম ডিগ্রী আছে, কিন্তু কোথাও এই ট্রেনিংটা দেওয়া হয় না যে, বলবে, ওর অতটুকুই বুদ্ধি আছে। সেইজন্য বেশির ভাগ শিক্ষকরাই একজন সফল শিক্ষক রূপে প্রতিষ্টিত হতে পারে না। ধর্ম পথে আরও বেশি অসফলতা।

বলছেন, The ignorant have drunk deep of the cup of delusion and are not sane. (*অজ্ঞান ব্যক্তিরা মোহমদিরা পান করে মাতাল হয়েছে, তাদের সহজ অবস্থা নেই।*) স্বামীজীর এটা একটি অত্যন্ত মূল্যবান বাক্য। সংসারে যারাই পড়ে আছে, সবাই মায়ামোহরূপী মদিরা পান করে টলমল করছে। ঠাকুর বর্ণনা করছেন, ব্যাঙের কাজল চোখে লাগালে চারিদিকে শুধু সাপ দেখে। মায়ামোহরূপী মদ পান করে যা করছি সবটাই উল্টোপাল্টা, সবটাই মিথ্যা। যবে থেকে আমার সৃষ্টি তবে থেকে এটাই করে যাচ্ছি। আমার জন্মের পর থেকেই বাবা-মা, স্কুল, কলেজ, সবাই আমাকে ঠেসে মদ খাইয়ে যাচ্ছে। জন্ম থেকে শুনে যাচ্ছি, মা-বাবাকে ভাল না বাসলে ভগবানের অভিশাপ লাগবে। ভাই, বোন, বন্ধু, সমাজ অনবরত আমার মুখে মদ ঢেলেই যাচ্ছে, তোমাকে বড় হতে হবে, টাকা রোজগার করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। শুধু এই জন্মেই না, প্রত্যেকটা জন্মেই এই মদ ঢেলে যাচ্ছে। তারপর আমিও নিজে থেকে অনেক রকম মোহরূপী মদ পান করে নিচ্ছি। এখন আমরা আশা করছি, ঐ লোকটি সুস্থ মানুষের মত চিন্তা ভাবনা করবে, সুস্থ মানুষের মত কাজকর্ম করবে, কখনই তা সম্ভব না। একজন মাতালকে যদি বলা হয়, তুমি এমন টলছ কেন? সে বেচারী কী উত্তর দেবে! ওর মধ্যে কোন দোষ নেই, দোষ মোহমদিরা পান করে রেখেছে বলে। আমি গিয়ে বলতে পারি, তুমি মদ খেলে কেন? এটা আমরা উপমা দিচ্ছি বলে, আমি বলতে পারি। একজন পাঁকে পড়ে গেছে, ওর সারা গায় এখন পাঁকই লেগে থাকবে, ওখানে কিছু করার নেই। এই জগতে যারাই আছে, সবাই মদের পুকুরে হাবুডুবু খাচ্ছে। সমস্ত রোমকূপের ছিদ্র দিয়ে সবার ভিতরে অজ্ঞানরূপী মদ ঢুকে আছে। মানুষ এরপর অজ্ঞান ছাড়া আর কি দেখবে! অজ্ঞানের বাইরে অন্য কিছু দেখা তার পক্ষে সম্ভবই না। যখনই আমরা কারুর মধ্যে দোষ দেখি, কাউকে শিক্ষা দিতে গিয়ে রেগে যাচ্ছি, তিতবিরক্ত হয়ে উঠছি, তখন বুঝতে হবে, ওর কোন দোষ নেই, দোষ আমাদের।

একজন পরিচিত মনোরোগ বিশেষজ্ঞ একদিন আলোচনার সময় তার নিজের এক রোগীণীর কথা খুব মজা করে বলতে গিয়ে নিজেই হেসে গড়াগড়ি দিচ্ছিলেন, অল্পবয়সী এক মহিলা রোগী এসে ডাক্তারকে বলছে, 'ডাক্তারবাবু আমার কিন্তু ঘুমটা ভাল হচ্ছে না, আমি একটুতেই রেগে যাচ্ছি, ওষুধের ডোজটা কি বাড়িয়ে দেব'? ডাক্তারবাবু বললেন, 'ঠিক আছে বাড়িয়ে দাও'। 'কিন্তু বাড়িয়ে দিলে আমার ঘুম বেড়ে যায়'। 'তাহলে খেয়ো না'। 'না খেলে আমার মনট খিটখিটে হয়ে থাকে, ঘুমটাও ভাল হয় না'। 'তাহলে ডোজটা বাড়িয়ে দিও'। 'কিন্তু ঐ যে বললাম, খেলে অন্য সমস্যা হয়, ঘুমটা ভাঙতে চায় না, যার জন্য কাজের অনেক দেরী হয়ে যায়'। 'তাহলে খেও না'। 'কিন্তু না খেলে অন্য সমস্যাগুলো হয়ে যাচ্ছে যে'! ডাক্তারবাবু বলছেন, 'তোমার যা খুশী করো'। মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে বলছে, 'ডাক্তারবাবু আমি পেশেন্ট, রাগার অধিকার আমার, আমি পেশেন্ট, আমি এই রকমই কথা বলব; আপনি ডাক্তার, আপনি রাগলে চলবে না'। ডাক্তারবাবু মজা করে বলছেন, 'পেশেন্ট আমাকেই উপদেশ দিচ্ছে'। যদি আমাকে শিক্ষা দিতে নামতে হয়, আমাকেও জেনে রাখতে হবে, ওরা ঐ রকমই করবে। তা সত্ত্বেও যদি আমি করতে চাই, তবেই আমি শিক্ষা দিতে যেতে পারব।

You, who know, must have infinite patience with these. (*তোমরা জ্ঞানলাভ করেছ – তোমাদের তাদের প্রতি অনন্তধৈর্যসম্পন্ন হতে হবে।*) ধৈর্য যদি তোমার না থাকে, তুমি শিক্ষা দিতে নামবে না। Have nothing but love for them and find out disease that has made them see the world in a wrong light, then help them to cure it and see aright. (*তাদের প্রতি ভালবাসা ছাড়া অন্য প্রকার ভাব রেখো না; তারা যে রেগে আক্রান্ত হয়ে জগৎটাকে ভ্রান্ত দৃষ্টিতে দেখছে, আগে সেই রোগ নির্ণয় কর; তারপর যাতে তাদের সেই রোগ সেরে যায়, আর তারা ঠিক ঠিক দেখতে পায়, সে বিষয়ে সাহায্য কর।*) আগে নামো, নেমে দেখো ওর ভিতর কি কি দুর্বলতা আছে, যে দুর্বলতার জন্য সে এই এই ধরণের ভুল কাজ করেছে, তারপর সেই দুর্বলতাটাকে সারাও; বৃথা ওকে দোষ দিতে যেও না। ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, ভারতের মানসিকতায় বদলা নেওয়ার ভাবটা কখনই ছিল না। মনু

বাবা যে মনুস্মৃতির বিধানগুলি সাজিয়ে দিলেন, সেখানেও বদলা নেওয়ার ভাবটা কোথাও তিনি রাখেননি। তখন এটাই ছিল – একে সংশোধন করতে হবে। ভারতের এই মানসিকতাটা কবে থেকে আর কোন জায়গা থেকে বদলে গেছে, আমাদের জানা নেই। এখন সবাই বদলা নেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। সবাই চিৎকার করে বলে যাচ্ছে, আমি যেন সুবিচার পাই। তোমার ভিতরে রাগের দাবানল জ্বলছে, ঠাকুর মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা কর যাতে তোমার মাথাটা ঠাণ্ডা হয়। কিন্তু সবাই বলছে, ওর ফাঁসি হলে তবেই আমার মাথা ঠাণ্ডা হবে। এটাই ইদানিংকালের সমস্যা। ফলে আদালত থেকে শুরু করে লোকসভা পর্যন্ত সবাই এমন আইন বানাচ্ছে, এমন বিধান দিচ্ছে যে তাতে আরও সবাই তেতে যাচ্ছে। আর একটু ডান দিক থেকে বাম দিক হয়ে গেলে বলছে, আমি ন্যায় পেলাম না। নিম্ন আদালতে না হলে হাইকোর্টে যাবে, হাইকোর্টে না হলে সুপ্রীম কোর্টে যাবে। এটা তো না হয় গেল যারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তারা চেঁচামেচি করছে। কিন্তু যাঁরা আইনবিদ, তাঁরা কিন্তু একবারও বিচার করার চেষ্টা করছেন না যে এই ধরণের অপরাধমূলক কাজ সমাজে কেন প্রতিদিন হয়ে চলেছে। ভুলেও যদি কেউ কিছু মঙ্গলদায়ক কথা বলে দেয়, আরও আগুন লেগে যাবে, বলবে, উপদেশ দেবেন না। যে কোন একটা জিনিসকে নিয়ে যদি বিচার করা হয়, যদি বলা হয় দেশে এতো শীলহানি কেন হচ্ছে? বা এত স্বেচ্ছাচার কেন হচ্ছে? অনেক সময় কেউ এর বিরুদ্ধে একটা কথা বলে দিলে তাকে নিয়ে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়বে। গোলমালটা কোথায় সেটাকে কেউ ধরতে পারছে না, সমস্যাটাকে ধরে যে তার সমাধান করবে, সেটাও কেউ করবে না। গোলমাল যখন করেছে, তখন আগে ওকে মারো। এই ধরণের মানসিকতা নিয়ে কখনই কারুর ভাল তো হয়ই না, উপরন্তু সমাজকে বিনাশের দিকে নিয়ে যায়। স্বামীজী পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন –

Remember always that only the free have free will, all the rest are in bondage and are not responsible for what they do. Will as will is bound. (*সর্বদা মনে রেখো, মুক্ত বা স্বাধীন পুরুষরেই কেবল স্বাধীন ইচ্ছা আছে, বাকি সকলেই বন্ধনের ভিতর রয়েছে – সুতরাং তারা যা করছে, তার জন্য তারা দায়ী নয়। ইচ্ছা যখন ইচ্ছারূপে প্রকাশিত, তখন তা বদ্ধ।*) স্বামীজীর এই বাক্যটিও অত্যন্ত মূল্যবান বাক্য। স্বামীজী ধর্মগুরুদের নিয়ে বলতে বলতে একটা বিশেষ জায়গায় পৌঁছে গিয়ে বলছেন, যেটা একটু আগে বলা হল। ঠাকুর বলছেন, ওর কথা শুনে ওর উপর খুব রাগ হল; তারপর ভাবলাম কি করবে বেচারা, তার অতটুকুই তো বুদ্ধি। গীতায় ভগবান বলছেন, *প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কি করিষ্যতি*, মানুষের প্রকৃতিই তাকে দিয়ে সব করাচ্ছে, কারুর কিচ্ছু করার নেই। বানর বানরের মতই আচরণ করবে, সাপ সাপের মতই থাকবে, ওদের দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু মানুষের ভিতরে বানর, গরু, মোষ, সাপ, বেড়াল সব জাতের পশুর স্বভাব এক সঙ্গে বিদ্যমান। সেও চাইছে এই স্বভাব থেকে বেরিয়ে আসি, কিন্তু শুধু যে বেরোতে পারছে না তাই না, বেরোতে পারবেও না।

নিউটনের সময় লাইভিনিজ্ নামে একজন খুব নামকরা পণ্ডিত ছিলেন। ফ্রী উইল আর গডস্ উইল নিয়ে তিনি অনেক চিঠি আদান-প্রদান করেছিলেন, কিন্তু এখনও আজ পর্যন্ত তার কোন সমাধান নেই। বক্তারা ফ্রী উইল নিয়ে অনেক রকম কথা বলেন। ওনাদের যদি জিজ্ঞেস করা হয়, আপনার এই ব্যাপারে নিজস্ব মতটা কি বলুন তো; দেখা যাবে, যেটাই উনি বলবেন, সেটাকেই যে কেউ চারটে যুক্তি দিয়ে কেটে উড়িয়ে দিতে পারবে। স্বামীজী একজন সিদ্ধ পুরুষ, তিনি আচার্য, তিনি বলছেন, যাঁর আত্মজ্ঞান হয়ে গেছে, যিনি মুক্ত পুরুষ, একমাত্র তিনিই ফ্রী, বাকি সবাই বদ্ধ। যে বদ্ধ তাকে দোষ দেওয়ার কোন মানেই হয় না। বদ্ধ মানে যে কোন বন্ধনে বদ্ধ। যারা সংসারে আছে, তাদের দশ রকমের বন্ধন আছে। স্বামীর বন্ধন, স্ত্রীর বন্ধন, সন্তানের বন্ধন, টাকার বন্ধন, দেহের বন্ধন – এরা অনেক কিছু করতে চাইলেও করতে পারে না। অনেক আগে এক জায়গায় দেববাণীতে স্বামীজী বলেছিলেন, আমরা মনে করছি, যেটা আমরা করছি স্বাধীন ইচ্ছায় করছি, সেটাও কিন্তু স্বাধীন ইচ্ছা নয়, সেখানে আমাদের বাধ্য করছে এই রকম করতে। একমাত্র স্বাধীন তিনিই, যিনি মুক্ত পুরুষ। তাহলে তিনি তো বাকিদেরও ঠিক করে দিতে পারেন। কিন্তু তিনি তা পারবেন না। কারণ, যেমনি তিনি দেখেন এরা আষ্টেপৃষ্টে একরাশ বন্ধনের মধ্যে পড়ে আছে, তিনি সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে যান। ঠাকুর এই জিনিসটাকে দু-লাইনের একটা গল্পতে ব্যাখ্যা করে দিচ্ছেন। নারদ ভগবান বিষ্ণুকে বলছেন, 'প্রভু! জীবের এত কষ্ট, ইচ্ছে করলেই তো আপনি সবাইকে মুক্তি দিয়ে দিতে পারেন'। ভগবান বলছেন, 'নারদ তোমাকে আমি মুক্তি দেওয়ার ক্ষমতা দিয়ে দিলাম, যাকে ইচ্ছা হয় তুমি মুক্ত করে দিতে পারবে'। বৈকুণ্ঠ থেকে নেমে প্রথমেই

নারদের নজর পড়ল একটা গুবরে পোকার উপর, বেচারা গোবরের মধ্যে পড়ে আছে। নারদের খুব করুণার উদয় হল, গুবরে পোকাকে বললেন, 'ছিঃ ছিঃ এই গোবরের মধ্যে পড়ে আছিস, চল তোকে আমি বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাই'। গুবরে পোকা নারদকে জিজ্ঞেস করছে, 'বৈকুণ্ঠে নিশ্চয়ই যাব, কিন্তু ওখানে কি ভাল গোবর পাওয়া যাবে'? কেউ নিজের স্বভাব থেকে কিছুতেই বেরিয়ে আসতে পারবে না। সমস্ত দরজা যদি তাকে খুলেও দেওয়া হয়, তাও সে বেরিয়ে আসতে পারবে না।

অনেক আগেকার কথা, কামারপুকুরে ঠাকুরের তিথিপূজায় বড় মেলা হয়, সাতদিন ধরে মেলা চলে, এখনও হয়। গ্রামের লোকেরা অনেক রকমের জিনিস বানিয়ে বিক্রি করতে আসে। একটা বাচ্চা ছেলে গ্রাম থেকে বাবার সাথে মেলা দেখতে এসেছে। হঠাৎ বাচ্চাটা খুব কাঁদতে শুরু করেছে, মার কাছে ফেরত যাবে। বাবা তাকে আদর করে অনেক বোঝাচ্ছে, বাচ্চার কান্না থামছে না। বাচ্চাকে বাবা বলছে, 'চল তোকে বাবা-মা কিনে দিচ্ছি'। বাবা একটা দোকানে গিয়ে প্লাস্টার অফ প্যারিসের তৈরী ঠাকুর ও মায়ের মূর্তি কিনে দিয়ে বলছেন, 'ইনি হলেন বাবা আর ইনি হলেন তোমার মা'। বাচ্চাটা তখন আরও তেতে গিয়ে মূর্তি দুটো হাতে নিয়ে মাটিতে আছাড় মেরে ফেলে বলছে, 'এই নাও তোমার বাবা আর এই নাও তোমার মা, আমাকে বাড়ি নিয়ে চলো'। আমরা যদি ঠাকুর মায়ের ছবিকে নিয়ে এই রকম ধর্মশিক্ষা দিই, ইনি তোমার বাবা আর ইনি তোমার মা, তারাও এই নাও তোমার বাবা আর এই নাও তোমার মা, বলে বেরিয়ে যাবে, নিতেই পারবে না। সেইজন্য যাঁরা মুক্ত পুরুষ তাঁরা উল্টোপাল্টা ভাবে উল্টোপাল্টা লোকেদের ধর্মশিক্ষা দেন না। তিনি জানেন, এর এখনও অনেক সময় লাগবে। ঠাকুর অনেককেই অনেক কিছু দিতে গিয়ে পিছিয়ে গেছেন, এখন থাক, পরে হবে। স্বামীজীর বক্তব্য এখানে পরিষ্কার, যেমনি উইল শব্দটা বলা হবে, তার মানেই সেখানে বন্ধন। ফ্রী উইল বলে কিছু হয় না। যিনি মুক্ত, তিনি মুক্ত, ওখানে আর উইল হয় না। উইল শব্দ আসা মানেই ওখানে বন্ধন লেগে গেল।

স্বামীজী উপমা দিয়ে বলছেন, Himalayas is free, but becoming the river, it is bound by the banks; yet the original impetus carries it to the sea, and it regains its freedom. (*জল যখন হিমালয়ের চূড়ায় গলতে থাকে, তখন স্বাধীন বা উন্মুক্ত, কিন্তু নদীরূপ ধারণ করলেই তটের দ্বারা বদ্ধ হয়ে যায়; তথাপি তার প্রাথমিক বেগই তাকে শেষে সমুদ্রে নিয়ে যায়, সেখানে ঐ জল আবার পূর্বের স্বাধীনতা ফিরে পায়।*) হিমালয়ের চূড়ায় বরফ গলে যে জল হল তখন সে মুক্ত, সমুদ্রে যখন থাকে তখনও মুক্ত, শুধু মাঝখানে যতক্ষণ নদীর মধ্যে থাকছে তখন দুই কুলের মধ্যে বদ্ধ হয়ে থাকে। কিন্তু মুক্তির যে শক্তি, ঐ শক্তি তাকে টেনে সমুদ্রে নিয়ে যাচ্ছে, সেখানে গিয়ে আবার সে মুক্ত হয়ে যায়। আমাদেরও ঠিক তাই, সবাই আমরা মুক্ত ছিলাম, আবার মুক্ত হব, এখন আমরা নদীর মাঝখানে আবদ্ধ হয়ে আছি। The first is the 'fall of man', the second is the 'resurrection'. Not one atom can rest until it finds its freedom. (*প্রথমটা যেন 'মানবের পতন' ও দ্বিতীয়টি যেন 'পুনরুত্থান'। একটা পরমাণু পর্যন্ত স্থির হয়ে থাকতে পারে না – যতক্ষণ না সেটি মুক্তাবস্থা লাভ করছে।*) স্বামীজী এটা খুব প্রিয় কথা। প্রথমে পতন হয়, পরে পুনরুত্থান হয়। প্রথমে পতন, সেখান থেকে আবার উত্থান হয়, সেখান থেকে আবার ফেরত। খ্রীশ্চানদের মধ্যে এই ভাবটা খুব জোরালো। এর উপর টলস্টয়ের খুব নামকরা উপন্যাসই আছে, 'Resurrection'।

স্বামীজী বলছেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে অণু রয়েছে, যতক্ষণ এই সৃষ্টির সীমা থেকে মুক্ত না হয়ে যায়, ততক্ষণ প্রত্যেকটি পরমাণুর প্রচেষ্টা চলতে থাকবে। কুকুর যখন ঘেউ ঘেউ করতে থাকে, সেও কিন্তু মুক্তির দিকে এগোচ্ছে। দুঃখ-কষ্টে পড়ে মানুষ যখন হতাশায় মদ খাচ্ছে, সেও কিন্তু মুক্তির পথেই আছে। যাকে তুমি লম্পট পুরুষ বলে জানছ, সেও কিন্তু মুক্তির পথে এগিয়ে চলেছে। রাস্তায় যে ভিক্ষা করছে, সেও মুক্তির চেষ্টা করছে, যে মুরিওয়ালা মুরি বিক্রি করে জীবিকা চালাচ্ছে, সেও মুক্তির চেষ্টা করছে। ধর্ম, অর্থ আর কাম, এই তিনটেও মুক্তির সাধন। লোকে চুরি চামারি কেন করে? অভাবে পড়েই করে। ঘুষ কেন নেয়, অভাব আছে বলে ঘুষ নিচ্ছে। মিথ্যা কথা কেন বলে, অভাব বলে। যখন অর্থ হয়ে যায়, তখন সে চুরি চামারি করার প্রবণতা থেকে মুক্ত হয়ে যায়, আর টাকা-পয়সা হয়ে গেলে সংসারে যে নানা রকমের চাহিদা, এই চাহিদার জ্বালা থেকে

সে মুক্ত হয়ে যায়। কাম মানে, তার ভিতরে যে নানা রকমের ইমোশানস গুলো রয়েছে, সেটা থেকে মুক্ত হয়ে যায়। যখন অর্থ আছে, সমস্ত কামের পুর্তি হওয়ার ব্যবস্থা আছে, তখন ইমোশানস গুলির তাড়না থেকে সে মুক্ত হয়ে যায়। অর্থ মানুষকে দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেয়। কাম মনের নানা রকম বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেয়। ধর্ম, যে সূক্ষ্ম শরীরটা আমাকে আবার একটা নিম্ন যোনিতে নিয়ে গিয়ে আরও বন্ধনে ফেলবে, সেটা থেকে মুক্ত করে দেয়। মোক্ষ মানুষকে তার আসল মুক্তি এনে দেয়। হিন্দুদের ধর্ম, অর্থ আর কাম ভোগের জন্য নয়, এই তিনটে তিন রকম অবস্থা থেকে আমাদের মুক্তি দিচ্ছে।

বলা হয়ে থাকে, মানুষের মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্যের যে কোন একটি আবেগ যদি থাকে, আর ওটাকে যদি বাইরে না ঢালতে পারে, তাকে পাগল করে দেবে, রাতের ঘুম কেড়ে নেবে, জীবনটাকে ওলটপালট করে দেবে। ঠাকুর কখনই এগুলো জয় করতে বলছেন না, বলছেন, এগুলো যাবে না, এগুলো থাকবে, এগুলোর মোর ফিরিয়ে দাও। আমাদের দায়িত্ব হল, যেখানেই দেখব মুক্তির চেষ্টা, সেখানে গিয়ে আরেকটু সাহায্য করা। কিন্তু আমাদের চিন্তা-ভাবনা অন্য রকম। বৃষ্টিতে বানরগুলো ভিজছিল, পাখিগুলো বলছে, তোমরা বাসা বানিয়ে নাও না কেন। বানরগুলো ভিজতে থাকল, কিছু বলল না। যেমনি বৃষ্টি থেমে গেল, সঙ্গে সঙ্গে গাছে উঠে পাখিদের সব বাসাগুলোকে দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে রেখে দিল। মানুষও ঠিক তাই, মানুষ সাহায্য চায়, উপদেশ কেউ চায় না। সবাই চাইছে পা এগিয়ে উপদেশ দিতে। আর সাহায্য চাইতে এলে বলি, জগৎ মিথ্যা, কেন তুমি ভোগের দিকে যেতে চাইছ। স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী বলতেন, আমরা ব্রহ্মচারী, আমরা সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচর্যের মন্ত্রই হল, আমি পূর্ণকাম আমার কোন কামনা নেই, কিন্তু অন্যের যে কাম রয়েছে, সেটার পুর্তি করার আমি চেষ্টা করব। মহারাজ বলতেন, অনেক ইয়ং ছেলেমেয়েরা আমার কাছে আসত যদি আমি একটা রেকমেণ্ডাশন লিখে দিই, তাহলে ওর একটা চাকরি হয়ে যাবে। মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে লিখে দিতেন। তাঁর ভাব হল, আমার চাকরি লাগবে না, কিন্তু আমার একটা রেকমেণ্ডেশানে যদি কারুর চাকরি হয়, আমি নিশ্চয়ই লিখে দেব। অনেকে এসে সন্ন্যাসীদের কাছে দুঃখ করে বলে, আমার মেয়ের বিয়ে, কিন্তু কয়েক হাজার টাকা কম পড়ে যাচ্ছে, কি করি বুঝতে পারছি না। সন্ন্যাসীর যদি সামর্থ থাকে তিনি সঙ্গে সঙ্গে টাকার ব্যবস্থা করে দেন। আমি তো বিয়ে করছি না, আমার দরকার নেই, কিন্তু তোমার দরকার, এই নাও হাজার টাকা রেখে দাও। এই ভাবটা যেন থাকে, আমার কিছু লাগবে না, কিন্তু তুমি আবর্জনার গর্তের মধ্যে পড়ে আছ, ওখান থেকে তোমার বেরিয়ে আসা দরকার। আমার সাহায্য পেলে তুমি যদি বেরিয়ে আসত পারো, আমি অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করবে। এটাই প্র্যাক্টিক্যাল বেদান্ত। এটা হল প্রথম প্যারাগ্রাফ, যেখানে গুরু, আচার্যকে নিয়ে স্বামীজী বললেন।

সগুণ ঈশ্বরই মানবের সর্বোচ্চ কল্পনা

এরপর স্বামীজী অন্য প্রসঙ্গে সরে এসে বলছেন, তুমি যে চিন্তা-ভাবনা করছ, তোমার সমস্ত চিন্তা-ভাবনা হল কল্পনা, কল্পনা না বলে এখানে চিন্তন শব্দটাই উপযুক্ত। কিছু চিন্তন তোমাকে আরও বন্ধনে নিয়ে যায়, কিছু চিন্তন বাজে থাকে, কিছু চিন্তন শুভ হয়; কিন্তু সবটাই মনের জিনিস। Some imaginations help to break the bondage of the rest. The whole universe is imagination, but one set of imaginations will cure another set. (*কতকগুলি কল্পনা অন্য কল্পনাগুলির বন্ধন ভাঙতে সাহায্য করে। সমগ্র জগৎটাই কল্পনা; কিন্তু এক রকমের কল্পনা সমষ্টি অপর প্রকারের কল্পনাসমষ্টিকে নষ্ট করে দেয়।*) এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, সৃষ্টি, সৃষ্টির সব কিছু, সবটাই কল্পনা, সবটাই মন। তোমার ঈশ্বর, তোমার ইষ্ট সব তোমার মনে, তোমার গুরু, সমস্ত শাস্ত্র, সব তোমার মনে। মন ছাড়া কিছু নেই। আমরা যদি এমন চিন্তন করি, যে চিন্তন বাকি সব চিন্তাকে উড়িয়ে দেবে; যেমন পায়ে কাঁটা ফুটলে আরেকটা কাঁটা এনে কাঁটা তুলে, দুটো কাঁটাই ফেলে দিই।

Those which tell us that there is sin and sorrow and death is in the world are terrible; but the other set; which every says ever, 'I am holy, there is God there is no pain', these are good and help to break the bondage of the others. The highest imagination that can break all the links of the chain is that or Personal God. (*যে সব*

কল্পনা বলে – জগতে পাপ-দূঃখ রয়েছে, মৃত্যু, রয়েছে, শোক রয়েছে, সেসব কল্পনা বড় ভয়ানক। কিন্তু আরেক রকমের কল্পনা বলে – আমি পবিত্রস্বরূপ, ঈশ্বর আছেন, জগতে দুঃখ নেই, এগুলিই শুভ কল্পনা, আর এগুলিই অন্যান্য কল্পনার বন্ধন ভাঙতে সাহায্য করে।) একদিকে আমরা বলছি, আমি দুর্বল, আমি পারব না, আমি এই পাপ করেছি, আমাকে অবশ্যই নরকে যেতে হবে। এগুলোও মনেরই ভাবনা, এই ভাবনা আমাদের আরও অনেক নীচে নিয়ে যাবে। এই চিন্তন কোন দিন আমাদের উপরের দিকে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে না। কিন্তু যখন বলছি, *চিদানন্দ রূপঃ শিবোহহং শিবোহহং*; ঈশ্বর আছেন, এগুলোও মনের চিন্তন, এটাও আমাদের কল্পনা। কিন্তু এই শুভ চিন্তন বাকি আজেবাজে সব কল্পনাকে ভাঙতে সাহায্য করে। দুটোই কল্পনা, দুটোই মনের জগতের চিন্তন। ওখানে স্বামীজীর শিষ্যরা সবাই খ্রীশ্চান ছিলেন, তাঁদেরকে এই কথা তিনি তাই জোর দিয়ে বলছেন। পাপ, মৃত্যু, দুঃখের কথা যখন বলছে, তখন এগুলো সব মনেরই কল্পনা, কিন্তু এই কল্পনাগুলো দুঃস্বপ্নের মত আমাদের আতঙ্কিত করে রাখে, আরও বেশী করে বেঁধে রাখে। কিন্তু যখন বলছে আমি পবিত্র, আমি ঈশ্বরের সন্তান, ঈশ্বর আমাকে দেখছেন, এগুলো শুভ চিন্তন, এই চিন্তন আমাদের মুক্তির দিকে নিয়ে যায়।

সেইজন্য বলছেন, The highest imagination that can break all the links of the chain is that of Personal God. (*সগুণ ঈশ্বরই মানবের সর্বোচ্চ কল্পনা, যা আমাদের বন্ধন-শৃঙ্খলের পাবগুলি সব ভেঙে দিতে পারে।*) আমরা যাঁকে ইষ্ট রূপে পূজা করছি, ইনিও কল্পনা, কিন্তু এই কল্পনা সমস্ত রকম কল্পনাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়ে আমার যা স্বরূপ, সেটাকে বার করে নিয়ে আসে। একটা কল্পনা করা যেতে পারে, হিমালয়ের কোন বরফের মধ্যে আমি আটকে গেছি। আমার কাছে কোন হাতিয়ার নেই, চারিদিকে বরফের দেওয়াল। আমি বেরিয়ে আসতে চাইছি, বেরিয়ে আসা সম্ভব না। এবার আমি ঐ বরফের একটা চাঁই তুলে নিলাম, বরফের চাঁই দিয়েই বরফের দেওয়ালকে ভাঙতে থাকলাম, বরফের চাঁই-ই বরফকে ভাঙবে। তারপর আমি মুক্ত হয়ে গেলাম। এই যে সব সময় বলা হয় ইষ্ট, ঈশ্বর, ব্যক্তি ঈশ্বর সব কল্পনা, এগুলো শুনতে আমাদের আতঙ্ক লাগে, কিন্তু এটাই বাস্তব।

তাহলে ব্যক্তি ঈশ্বর কি? স্বামীজী উপমা দিচ্ছেন, 'Om tat sat' is the only thing beyond Maya, but God exists eternally. (*'ওঁ তৎ সৎ' অর্থাৎ একমাত্র সেই নির্গুণ ব্রহ্মই মায়ার অতীত, কিন্তু সগুণ ঈশ্বরও নিত্য।*) ভগবান সব সময়ই আছেন, কিন্তু 'ওঁ তৎ সৎ' এই শব্দটাই একমাত্র মায়ার বাইরে। স্বামীজী নায়াগ্রা জলপ্রপাতের উপমা নিচ্ছেন, নায়াগ্রা জলপ্রপাত আমেরিকার খুব নামকরা ঝরণা। এত উঁচু থেকে জল নীচে পড়ে যে, জলের পার্টিকেলস অনেক উপরে উঠে যায়, এত উপরে উঠে যাওয়ার ফলে সূর্যের আলোর প্রতিফলনে ওখানে রামধনু ফুটে ওঠে। As long as the Niagara Falls exist, the rainbow will exist; but the water continually flows away. (*যতদিন নায়াগ্রা-প্রপাত রয়েছে, ততদিন তাতে প্রতিফলিত রামধনূও রয়েছে; কিন্তু এদিকে প্রপাতের জলরাশি ক্রমাগত প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে।*) নায়াগ্রা-প্রপাত যতদিন থাকবে, সূর্য যতদিন থাকবে, ওখানে রামধনুও ততদিন থাকবে। অথচ যে জলকণার উপর প্রতিফলিত হয়ে রামধণূ সৃষ্টি হচ্ছে, সেই জল ক্রমাগত প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে, সেখানে কোন স্থিতি নেই। এবার বলছেন, The falls are the universe, and the rainbow is personal God; and both are eternal. (*ঐ জলপ্রপাত জগৎপ্রপঞ্চ-স্বরূপ, আর রামধনু সগুণ ঈশ্বরস্বরূপ; এ দুটিই নিত্য সনাতন।*) একটা দুর্বোধ্য জিনিসকে বোঝানর জন্য শুধু স্বামীজীই না, যে কোন শাস্ত্র একটা উপমার আশ্রয় নেন। যেহেতু আমেরিকাদের কাছে বলছেন, সেইজন্য নায়াগ্র-প্রপাতের উপমা নিয়ে আসছেন। নায়াগ্রা-প্রপাতে জল সব সময়ই আসছে, রামধনুও সব সময় হচ্ছে, জগৎটাও নিত্য সনাতন, রামধনুও নিত্য সনাতন। যতক্ষণ নায়াগ্রা-প্রপাত আছে, সূর্য যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ রামধনু থাকবে। পরমব্রহ্ম সব সময়ই আছেন, আর যতক্ষণ জগৎ আছে, ততক্ষণ সগুণ ঈশ্বর থাকবেনই। তার মানে ইষ্ট থাকবেন।

ইষ্ট কে? তিনিই পরমব্রহ্ম। তাহলে ঐ রকম দেখাচ্ছেন কেন? জগৎ আছে বলে ঐ রকম দেখাচ্ছেন। জগৎ কি? মন, মন ছাড়া কিছু না। তাহলে সগুণ ঈশ্বর কি আমাদের মনের তৈরী? কখনই না। পরমব্রহ্মের প্রতিবিম্ব মনের উপর প্রতিফলিত হচ্ছে, ঐ প্রতিবিম্বই সগুণ ঈশ্বর। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরমব্রহ্মের যে প্রতিফলন

হয়, এটাই সগুণ ঈশ্বর। মন যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ জগৎ থাকবে, যতক্ষণ জগৎ থাকবে, ততক্ষণ ঠাকুরও আছেন। আমিই আত্মা, আমিই ব্রহ্ম, অহং ব্রহ্মাস্মি, কিন্তু আমি ঠাকুর নই, কোন দিন হতে পারব না। এই জগতের সব কিছুই আমি হতে পারি, কিন্তু ঠাকুর হতে পারব না, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ কখনই হতে পারব না। কেন? কারণ, যেমনি আমি বোধ এসে গেল, আমি বোধ হওয়া মানে আমার মন এসে গেল, মন এসে যাওয়া মানে সংসার এসে গেল, সংসার এসে গেল মানে সংসারের নিয়ন্তা, ঈশ্বরও এসে গেলেন। নিয়ন্তা বা ঈশ্বর যেখানে আসবেন, আমি সব সময় তাঁর অধীনে থাকব। ইনিও কি আমার মনের তৈরী? কখনই না, সেই পরমব্রহ্ম, যেটা আমি নিজে, তাঁর তিনি প্রতিবিম্ব। প্রতিবিম্বে তিনি আমার মালিক। মালিক আর সেবকের সম্পর্ক কখনই মিটে যাবে না, যেতে পারে না। আমি যা খুশী হয়ে যেতে পারি, বিশ্ব মনের সাথে এক হয়ে যেতে পারি, বিশ্ব অহমের সাথে এক হয়ে যেতে পারি, কিন্তু ঈশ্বর কোন দিন হতে পারব না। আমি আমার উপাধিগুলি সরিয়ে দিলে, আমি সেই আত্মা, আমি ব্রহ্ম, কিন্তু কখনই ঈশ্বর না। মানুষের তৈরী ভগবান হয় না, জগতের তৈরী ঈশ্বর হতে পারেন, কিন্তু ঐ সৃষ্টি সেই অর্থে নয়, এটা প্রতিবিম্ব। জগৎটা যেন একটা আয়না। ঐ বিশাল সূর্য, কিন্তু একটা আয়নাতে তার প্রতিবিম্ব হয়; তবে এটা কিন্তু আসল সূর্য না, কিন্তু তার সমস্ত প্রপার্টিজ ওখানে রয়েছে।

এটাকেই এবার স্বামীজী বলছেন, God creates the universe, and the universe creates God; and both are eternal. (*ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করছেন, আবার জগৎ ঈশ্বরকে সৃষ্টি করছেন – দুই-ই নিত্য।*) Maya is neither existence nor non-existence. (*মায়া সৎও নয়, অসৎও নয়।*) আমরা এর উপর আগেও আলোচনা করেছি। মায়া সৎও না অসৎও না, সেইজন্য বলা যাবে না যে, মায়া আছে, আবার এটাও বলা যাবে না যে, মায়া নেই। যতক্ষণ আছে মায়া ততক্ষণ আছে, যখন নেই, তখন নেই। Both the Niagara Falls and the rainbow are eternally changeable, Brahman seen through Maya. (*নায়াগ্রা-প্রপাত ও রামধনু উভয়ই অনন্ত কাল ধরে পরিবর্তন-শীল – এরা মায়ার মধ্য দিয়ে দৃষ্ট ব্রহ্ম।*) জগৎ সব সময় পরিবর্তনশীল, ব্রহ্মকে যখন মায়ার মধ্য দিয়ে দেখছি, তখন তাঁকে সগুণ ঈশ্বর রূপে দেখছি; সূর্যকে যে রঙের কাচের মাঝখান দিয়ে দেখব, সূর্যকে সেই রঙের দেখব। জলপ্রপাতের জল পাল্টাচ্ছে, সেইজন্য রামধনুও পাল্টাচ্ছে। জগৎটাও সব সময় পাল্টাচ্ছে, সেইজন্য ঈশ্বরের রূপটাও পাল্টায়, এই তাঁর দয়ার, করুণার রূপ, এই তাঁর সংহার রূপ, এই তিনি আবার পালনকর্তা, এই আবার তিনি সৃষ্টিকর্তার রূপ নিয়ে আসছেন; ব্রহ্ম কিন্তু এই সব কিছুর পারে। সৃষ্টি যখন অস্তিত্ব নিয়ে বেরিয়ে এলো, ভগবান তখন হয়ে গেলেন স্রষ্টা। পুরোদমে সৃষ্টি এগিয়ে চলছে, তিনি হয়ে গেলেন পালনকর্তা। একটা সময় সৃষ্টি নাশের দিকে চলতে শুরু করল, ভগবান তখন হয়ে গেলেন সংহার কর্তা। তোমাদের এই ভগবান কি রকম? ক্ষণে ক্ষণে তাঁর রূপ যে পাল্টাচ্ছে! পাল্টাবে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই পাল্টাচ্ছে সেইজন্য ঈশ্বরও পাল্টাচ্ছেন। এরপর স্বামীজী একটা লাইনে মায়াকে নিয়ে জরথ্রুস্ট ও খ্রীশ্চানদের যে ধারণা সেটাকে নিয়ে বলছেন, এরা মায়াকে দুটো ভাগ করে দিল, তার ভাল অর্ধেকটাকে 'গড্' আর খারাপ অর্ধেকটাকে 'শয়তান' নাম দিয়ে দিল। কিন্তু বেদান্ত মায়াকে সমষ্টি রূপে নেয়। পরের প্যারাগ্রাফের সাথে এই টপিকটার একটা সম্পর্ক আছে।

স্বামীজী এতক্ষণ তিনটে জিনিসকে নিয়ে আলোচনা করলেন। ঈশ্বর আছেন। ঈশ্বর কতক্ষণ আছেন? যতক্ষণ এই সৃষ্টি আছে। তবে এই জগৎটাও একটা চিন্তা, তাই শুভ চিন্তা নিয়ে চলতে হয়, আমি মুক্ত, আমি ঈশ্বরের সন্তান, এই ধরণের শুভ চিন্তাকে নিয়ে যদি চলে তবে সে একটা সময় এই জগৎ থেকে বেরিয়ে আসবে। যাঁরা এই জিনিসগুলোকে জানেন, বোঝেন, তাঁদের দায়িত্ব হল, যারা এগুলোকে জানে না, তাদের প্রতি একটু উদার ভাব রেখে, এদেরকে উপরে নিয়ে আসার চেষ্টা করবেন। তোমার দ্বারা হবে না, কারুর নিন্দা করা, কাউকে ছোট করা, ধর্ম পথে এই ধরণের কথা বলা কখনই উচিৎ কাজ নয়। কারণ এরা সবাই সংসারে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে, কিছু করার নেই এদের, এরা এই রকমই। ভাগবতের কালীয়দমন কাহিনীতে খুব সুন্দর একটা বর্ণনা আছে; যেখানে শ্রীকৃষ্ণকে কালীয়নাগ বলছেন, প্রভু আপনিই আমাকে বিষ দিয়েছেন, আমি বিষ ছাড়া আর কি দেব! সেইজন্য যেখানে ধর্মের উচ্চ অবস্থায় যে আলোচনা আসে, সেখানে এই জিনিসগুলিকে উত্থাপন করা হয়। যার স্বভাবেই এই ক্রূরতা রয়েছে, তাকে অযথা শাস্তি দিয়ে কার উপকার হবে! কারণ সে তো শাস্তির যোগ্য নয়। কারণ সে তার স্বভাবের কাছে অসহায়, প্রকৃতি তাকে বেঁধে রেখেছে। তখন আবার বলা

হয়, তার ভালর জন্যই করা হল, এগুলো কোন যুক্তি নয়। স্বামীজী হলেন একজন যুগাচার্য, তিনি দেখাচ্ছেন, পুরনো ধর্মের দিন কিভাবে শেষ হয়ে গেছে। নূতন ধর্ম বলছে, আগে তুমি সব কিছু বুঝে নাও, জেনে নাও, জেনে নেওয়ার পর তোমার আশেপাশে অজ্ঞানবশতঃ যারা সংসারে বদ্ধ হয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে, তাদেরকে তুমি তুলে নিয়ে এসো। তুমিও মুক্তির পথে এগিয়ে যাও, আর তার সাথে তোমার আশেপাশে যারা আছে, তাদেরকেও মুক্তির দিকে নিয়ে যাও।

প্রাচ্য ও সেমেটিক ধর্মের মূল তফাৎ

এখানে থেকে স্বামীজী ঈশ্বরের অবধারণার উপর বলতে থাকবেন, বলছেন, ঈশ্বর কি। বিশ্বের ধর্মগুলিকে আমরা দুটো শ্রেনীতে বিভক্ত করতে পারি – একটা হল Indic Religion, আরেকটা হয় West Asean Religion। এই দুটো শ্রেনীর ধর্মে মূলতঃ আমরা চারটে করে মোট আটটি ধর্ম পাই। খুব ভাল করে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, ভারতীয় যে চারটি ধর্ম, হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম আর শিখধর্ম, এদের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। আর ওদিকে যে চারটে ধর্ম পার্সি, জহুদি, খ্রীশ্চান ও ইসলাম, এদের ধর্মের বৈশিষ্ট্যে ভারতের চারটের ধর্মের সাথে একটু তফাৎ হয়ে যায়। সাধারণ স্তরে অনেক তফাৎ আছে, আমরা সাধারণ স্তরে যাচ্ছি না, তার থেকে আরেকটু উচ্চস্তরে আলোচনা করছি। প্রথম তফাৎটা আসে ভাল আর মন্দকে নিয়ে। ভারতীয় যে চারটে ধর্ম সেখানে ভাল ও মন্দের উপর খুব বেশী জোর দেয় না। পাপ-পূণ্যের কথা আমরা বলি ঠিকই, কিন্তু আমাদের ধর্মগ্রন্থ গুলিতে একটু ঢুকলেই দেখা যাবে, তারা জ্ঞানকে বলছেন পূণ্য আর অজ্ঞানকে বলছেন পাপ। গীতাতে, বিশেষ করে যেখানেই বলছেন পাপকে পেরিয়ে যাও, সব সময় তার অর্থ হয়, অজ্ঞানকে পেরিয়ে যাওয়া। অজ্ঞানকে আচার্য শঙ্কর খুব সুন্দর বলছেন, *মম এষা অহম্ এতে*, এরা আমার, আমি এদের। এরা আমার, আমি এদের, এটাই মায়া, এটাই অজ্ঞান; এই অজ্ঞানটাই পাপ, এছাড়া কোন পাপ নেই। চুরি-ডাকাতি করা, শীলহানি করা, এগুলোকে আমরা পাপের মধ্যে আনি না, এগুলো ঊনিশ আর কুড়ি। অজ্ঞান যেমনি এসে গেল, তারপর সব ঊনিশ-কুড়ি। যে মিথ্যা কথা বলছে সে ঊনিশ আর যে একজন ধর্ষণকারী, সে কুড়ি, আমাদের কাছে এগুলোর কোন দাম নেই। একজন খুব জঘন্য কর্ম করছে, বাকিরা একটু কম জঘন্য কর্ম করছে, বেদান্তের দৃষ্টিতে দুটোই সমান অপরাধ। ভারতীয় চারটি ধর্ম মানে এটাই। জৈনধর্ম একটু অন্যদের তুলনায় এদিকে বেশী নিয়ে যায় ঠিকই, কিন্তু খুব গভীরে যদি আলোচনা করা যায়, তাহলে দেখা যাবে তারাও খুব বেশী গুরুত্ব দেয় না। পাপ আর পূণ্য দুটো যেন আলাদা জিনিস, এটাকে এই চারটে ধর্ম কখনই নেবে না। দ্বিতীয় তফাৎ হল, মধ্যপ্রাচ্যের ধর্মগুলি একশ্বরবাদকে নিয়ে চলে, তাদের কাছে এক ঈশ্বর আছেন। ঈশ্বর এক বলবে না, ঈশ্বর এক আলাদা আর এক ঈশ্বর আলাদা। এক ঈশ্বর মানে, আমার ঈশ্বরই ঠিক ঈশ্বর, বাকিরা গোল্লায় যাক। ভারতীয় চারটি ধর্মে ঈশ্বর এক, তিনিই আবার বহু হয়ে যান। ঈশ্বর এক আর এক ঈশ্বর, দুজনের শুধু পরিভাষাটাই পাল্টে যায় না, সব কিছু পাল্টে যায়। এই দুটো সব থেকে বড় theological difference, যার জন্য দুজনের পুরো চরিত্রটাই পাল্টে যায়।

হিন্দু আর মুসলমানদের মধ্যে যে এত সংঘাত, সমস্ত সংঘাতের মূলে এই দুটো তফাৎ। একজন বলছে ঈশ্বর এক, আরেকজন বলছে এক ঈশ্বর। একজন বলছে পাপ-পূণ্য বলে কিছু নেই, তাদের কাছে অজ্ঞানই পাপ, আর পূণ্য যেটা তুমি বলছ, সেটাও কিন্তু অজ্ঞানের মধ্যেই পড়ে। ভারতের যে কোন ধর্মগ্রন্থই ধর্ম-অধর্মকে পার করে যাওয়ার কথা বলছে, পাপ-পূণ্যকে পার করে যাওয়ার কথা বলছে, শুভ-অশুভকে পার করে যাওয়ার কথা বলছে, কারণ সবটাই মায়া। মধ্যপ্রাচ্যের ধর্মগুলির কাছে পাপ-পূণ্য সাদা আর কালোর মত, পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছে, এটা ভাল, এটা মন্দ, এটা পাপ, এটা পূণ্য। ধর্ম কি? ভাল ও পূণ্যকে অনুসরণ কর এবং মন্দ ও পাপকে পরিহার কর। ভারতীয় চারটে ধর্মের মধ্যেও আবার অনেক ভাল মন্দ আছে, কিন্তু আমরা বেশী গুরুত্ব দিই না। মানুষ মাত্রেরই দোষ থাকে। কেউ যদি নিন্দা করতে চায়, তার কাছে যীশুকে নিন্দা করা কোন ব্যাপারই না। জহুদিরা এত বছর ধরে তাই করে গেল। ঠাকুরকে, স্বামীজীকে, ভগবান বুদ্ধকে, শ্রীকৃষ্ণকে, শ্রীরামকে নিন্দা ও অপবাদ দেওয়া এদের কাছে কোন ব্যাপারই না। সবার মধ্যে হাজারটা দোষ বার করে দেওয়া যাবে। হিন্দুরা খুব ভাল করে জানে, ভগবানও যদি অবতার হয়ে আসেন, তাঁর মধ্যেও দশটা দোষ থাকবে। কারণ তিনি তাঁর মত সব কিছু করছেন। বর্তমানকালের বুদ্ধিজীবিরা শ্রীরামচন্দ্রকে নিয়ে কত

কিছু বলে যাচ্ছেন, রাম সীতাকে কেন বনবাসে পাঠালেন, সীতাকে অগ্নিপরীক্ষা কেন দিতে হল, বালিকে লুকিয়ে কেন বধ করলেন। এগুলো আর কিছুই না, আসলে বলতে চাইছেন, ভাল হলে ভাল হবে, মন্দ হলে মন্দ হবে। রামচন্দ্র যদি ভগবান হন, তাহলে তিনি এই দোষগুলো কেন করলেন? কিন্তু হিন্দুদের কাছে এগুলো কিছুই না, আমাদের কাছে হল, আপনি ভগবান হয়ে যখন এসেছেন, আপনার দশটা দোষ থাকবেই। ইদানিং কালে ইউরোপ ও আমেরিকার জগৎ অনেক খোলামেলা হয়ে গেছে। কিন্তু আগেকার দিনে বাইবেলের বিরুদ্ধে একটি কথা বললে, তাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারত। গ্যালিলিও কোন রকমে বেঁচে গিয়েছিলেন, কিন্তু ব্রুনো বাঁচতে পারেননি, তাঁকে পুড়িয়ে মেরে ফেলা হয়েছিল। ভাবা যায়, শুধু এটুকু বলা, পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে পরিক্রমা করে, বাইবেলের বিরুদ্ধে যাওয়ার এই প্রমাণটুকুই যথেষ্ট, তাতেই খ্রীশ্চানরা ব্রুনোকে পুড়িয়ে মেরে ফেলল। সেখানে যীশুর এই দোষ, সেই দোষ বলবে, কার এমন বুকের পাটা আছে! কল্পনাই করা যায় না। শুধু তাকেই না, তার গুষ্টিশুদ্ধু সবাইকে পুড়িয়ে মারবে।

যীশুর যে দোষগুলো আছে, সেগুলোকে খ্রীশ্চানরা glorify করবে, glorify করতে তারা বাধ্য, কারণ তাদের কাছে ভাল আর মন্দের, পাপ আর পূণ্যের পরিষ্কার বিভাজন করে দেওয়া হয়েছে। আমাদের কাছে এগুলো কোন ব্যাপারই নয়, কোন সমস্যাই নয় – আমাদের কাছে পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে। আমাদের কাছে এই জগতে আসা মানেই মনের জগতের উদ্ভব, মনের জগৎ মানেই অজ্ঞান, অজ্ঞান মানেই পাপ। যেটাকে আমরা পূণ্য বলছি, সেটাও পাপ। আচার্য শঙ্কর বারবার বলছেন আত্মার দৃষ্টিতে ধর্মটাও পাপ। গীতায় ভগবান যখন অর্জুনকে বলছেন, *সর্বধর্মান্ পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*, সব ধর্ম অধর্ম ছাড়ো, ছেড়ে আমার শরণে চলে এসো। পাপ, পূণ্য সবটাই পাপ, পাশ্চাত্যের ধর্মে এ-জিনিস একেবারেই হবে না। একেশ্বরবাদ এসে যাওয়া মানেই, তিনি মালিক, রাজা যেটা বলবেন সেটাই আইন, তাঁর আইন না মানলে তোমার দণ্ডভোগ করতে হবে। এক ঈশ্বর, তাঁর আদেশ যদি না মানো, তোমার সাজা হবে, সাজা হওয়া মানে, তুমি নরকে যাবে। এক ঈশ্বর কিসের ভিত্তিতে বলে দিয়েছেন, ভিত্তি হল কোরাণ, আর জেহোবাদের ভিত্তি হল ওল্ড টেস্টামেন্ট। খ্রীশ্চানিটি কোন মাধ্যমেই বলেনি, কারণ বাইবেলের কোথাও পাপের কথা নেই, স্বর্গের কথা নেই। পরের দিকে থিওলজিস্টরা এগুলোকে দাঁড় করিয়ে আরও সর্বনাশ করে দিয়েছেন। জরথ্রুষ্ট্রিয়ানদের জেন্দবেস্তাতে এটা পাপ এটা পূণ্য একেবারে স্পষ্ট করে লাইন টেনে দিয়েছে।

আমাদের কাছে বেদান্তের দৃষ্টিতে সবটাই পাপ। তবে আমাদের কাছে যারা অজ্ঞানে পড়ে আছে, তারা সবাই কোন না কোন ভাবে, জান্তায় হোক, অজান্তায় হোক, মুক্তির দিকে এগোচ্ছে। পাহাড়ে চূড়ায় ওঠার সময় কখন আমরা উপরে যাচ্ছি, আবার কখন নীচের দিকে নামতে থাকি। যখন নীচে নামছি, তখনও কিন্তু আমরা ঐ চূড়ার দিকে এগোচ্ছি। আমরা কেউ ভুলে বলতে যাই না যে, আমি তো পাহাড়ে চূড়ায় উঠতে চাইছি, কিন্তু নীচে নেমে যাচ্ছি কেন? এই যে এখানে সেখানে, ঘুষ খাচ্ছে, চুরি-চামারি করে বেড়াচ্ছে, শীলহানি করছে, তখনও কিন্তু এরা ঐ চূড়ার লক্ষ্যে এগোচ্ছে, তবে এই মুহুর্তে এরা এখন নীচের দিকে নামছে। একটা সময় যখন ধড়া পড়ার পর প্রচণ্ড মার খাবে, তাতে যদি ওর শিক্ষা হয়ে যায়, তখন আবার পরে উঠতে শুরু করবে। আর যদি শিক্ষা না হয়, তাহলে আরও বড় ক্রাইম করে ধরা পড়ে আরও বেদম মার খাবে। একটা সময় তাকে এদিকে ফেরত আসতেই হবে। Indic Religion আর West Asean Religionএ এটাই সব থেকে বড় তফাৎ হয়ে যায়। এই তফাৎ কোন দিনই মিটে যাবে না।

আমরা বলি ঠিকই যে, সব ধর্মই ঈশ্বরের কথা বলে। সব ধর্মই বলে এই জগৎটা শেষ কথা নয়, এই জগতের পারেও আরেকটি সত্তা আছে। এই দুটো শ্রেনীর ধর্মে এই ধরণের কিছু কিছু common grounds আছে। কিন্তু বড় দুটো যে তফাৎ, যেখানে আমাদের দুটো অঞ্চলের জীবনধারাটাই পাল্টে যায়, তার মধ্যে একটা হল, এক ঈশ্বর আর ঈশ্বর এক। দ্বিতীয় হল, এক ঈশ্বর মানেই, তাঁর আদেশ আর আইন মানাটাই পূণ্য, আর তার অমান্য করাটাই পাপ, এটা ভাল, এটা মন্দ স্পষ্ট লাইন টেনে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমাদের কাছে পাপ-পূণ্য বলে কিছু নেই, অজ্ঞানতাটাই পাপ। ভগবান বুদ্ধ বললেন তৃষ্ণাই পাপ। ঐ তৃষ্ণাকে তুমি পার কর। কিন্তু পেটের জন্য আমাকে খেতে হবে, তৃষ্ণা তো আমার কিছু নেই। তিব্বত বাসিন্দাদের মাংস ছাড়া

খাওয়ার কিছু নেই, জীবন-ধারণের জন্য জীবহত্যা তাদের করতেই হয়, না করলে জীবনরক্ষা করা যাবে না। ঐটুকু তাই মেনে নেওয়া হল।

দ্বিতীয় আরেকটা বড় সমস্যা হয়ে যায়, একেশ্বরবাদের জন্য মধ্যপ্রাচ্য এশিয়ার ধর্মগুলো অনেক বেশী গোঁড়া হয়ে গেছে। জগতে থাকলেই দোষ থাকবে, সবারই দোষ থাকবে, কিন্তু ওদের ব্যক্তিত্বে যে দোষগুলি রয়েছে, সেগুলোকে ওরা justify করতে চাইবে, আর তা নাহলে যে মুখ খুলতে যাবে, তার গলাটা কেটে রেখে দেবে। স্বামীজী এবার এই জায়গাটাকে আলোচনায় নিয়ে আসছেন। এর আগের প্যারাগ্রাফের শেষ দুটো লাইনে বলছেন, Persians and Christians split Maya into two and call the good half ‘God’ and the bad half the ‘devil’. Vedanta takes Maya as a whole and recognizes a unity beyond it – Brahman. (*জরথ্রুস্টীয় ও খ্রীষ্টানেরা মায়াকে দু-ভাগে ভাগ করে ভাল অর্ধেকটাকে ‘গড্’ বলে আর খারাপ অর্ধেকটাকে ‘শয়তান’ নাম দিয়েছেন। বেদান্ত মায়াকে সমষ্টি বা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন এবং তারা পশ্চাতে ব্রহ্মরূপ এক অখণ্ড বস্তুর সত্তা স্বীকার করেন।*) আহুর মাজদা, আহিরমান্ দুটো আলাদা হয়ে গেল। এই ধারণার প্রভাব যখন খ্রীশ্চান ধর্মে গেল তখন তাদের কাছে ‘গড’ আর ‘শয়তান’ হয়ে গেল। ভাল আর শয়তান আসা মানেই বলতে চাওয়া হচ্ছে, দায়ী আমি নই, দায়ী আরেকটা সত্তা। হিন্দু ধর্মে ভাল আর মন্দের যেমন কোন তফাৎ নেই, ওদের ধর্মে পরিষ্কার এবং স্পষ্ট তফাৎ দেখান হয়। শুধু তফাৎই নয়, যিনি চালাবেন, তাঁর সত্তাকে আলাদা করে দিচ্ছে। আহুর মাজদার সত্তা আলাদা, অহিরমাণের সত্তা আলাদা। ডেভিলের সত্তা আলাদা, ভগবানের সত্তা আলাদা। হিন্দুদের প্রায়ই জিজ্ঞেস করা হয়, তোমাদের পাপের দেবতা কে? হিন্দুরা জানেই না কে তাদের পাপের দেবতা। ভগবান কাউকে ভালও দেন না, কাউকে মন্দও দেন না। এই দুটোর তফাৎ কেন হয়? বলছেন, সেই ঈশ্বরের জন্য। কারণ এক ঈশ্বর যখনই দেখা হবে, তখন তাঁর কথা আদেশমূলক হয়ে যাবে। আদেশ থেকে কেন মানুষ সরে যায়? তখন আরেকটা সত্তাকে নিয়ে আসছে। স্বামীজী এক জায়গায় বলছে, খ্রীশ্চান ধর্মকে খুব কাছ থেকে দেখলে মনে হয়, শয়তান ঈশ্বরের থেকে বেশী শক্তিশালী। যে ঈশ্বরের সৃষ্টি করার ক্ষমতা, সেই ঈশ্বরের সৃষ্ট মানুষগুলিকে শয়তান তার দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, তার মানে ঈশ্বরের থেকে তার ক্ষমতা অনেক বেশী। এই কারণে পরবর্তিকালে খ্রীশ্চান ধর্ম যখন উচ্চ দর্শনের ক্ষেত্রে সমালোচনার মুখোমুখি হল, তখন তারা দাঁড়াতে পারল না। বেশীর ভাগ খ্রীশ্চানরা নামে খ্রীশ্চান, শুধু বিয়ের সময় চার্চে যায়। পার্সি ধর্ম তো মুছেই গেল। আর ইসলামে কারুর মুখ খোলার স্পর্ধা অনেক আগে থাকতেই তলোয়ার দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, যুক্তি-বিচার গোল্লায় যাক আগে আমার জীবনটাকে বাঁচাতে হবে। ইসলামে তাই কেউ মুখ খোলে না।

খ্রীষ্টের ত্রিত্ববাদ (Trinity) ও ইসলামের চিন্তাধারা

স্বামীজী এখন বলছেন, Mohammed found that Christianity was straying out from the Semitic fold and his teachings were to show that Christianity ought to be as a Semitic religion, that it should hold to one God. (*মহম্মদ দেখলেন, খ্রীষ্টধর্ম সেমিটিক ভাব থেকে দূরে চলে যাচ্ছে, ঐ সেমিটিক ভাবের মধ্য থেকেই খ্রীষ্টধর্ম কিরূপ হওয়া উচিৎ - তার যে একমাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাস করা উচিৎ - এইটিই তাঁর উপদেশের ভাব।*) সেমেটিকদের এই চারটে ধর্মের এক ঈশ্বরকে সরিয়ে যদি আরেকটা না বলা হয়, তখন দেখা যাবে distinguish করা খুব মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। যেমন আমাদের এখানে বেদান্ত যে মুক্তির অবস্থা বলা হয়, আর বৌদ্ধ ধর্মে যে ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদের কথা বলা হয়, দুটোকে যেন একই রকম মনে হয়। যার জন্য শঙ্করাচার্যকে তাঁর নিন্দুকরা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলে গালাগাল দিতেন। কোথাও যেন মিল এসে যাচ্ছে, যদিও একটা বড় পার্থক্য আছে। বৌদ্ধদের বলা হয় সর্ববৈনাশিক, সব কিছুকে তারা বিনাশ করে দেয়। বেদান্তও সব কিছু বিনাশ করে দেয়। ঠিক এই ভাবে, সেমেটিকদের যে চারটে ধর্ম, ওদের যে nature and character, সেখানে একটা ভগবানকে সরিয়ে যদি আরেকটা ভগবানকে এনে বসিয়ে দেওয়া হয়, সহজে ধরা যাবে না। ইসলাম ধর্মের কিছু কিছু জিনিস আছে, সেটা যদি তারা না করে, তখন ধরা মুশকিল হয়ে যাবে যে, আমরা ইসলাম পড়ছি নাকি জহুদিদের ধর্মগ্রন্থ পড়ছি। অথচ ইসলাম জহুদিদের উপর প্রচণ্ড ভাবে বিদ্বেষভাবাপন্ন। অথচ আশ্চর্যের যে, ওদের দুজনের ভগবানের বৈশিষ্ট্যে প্রচুর

মিল। মাঝখান থেকে যীশুর ধর্ম ঐ ভগবানের বৈশিষ্ট্য থেকে সরে আসছে। এটা স্বামীজীর মত যে, মহম্মদ এইভাবে খ্রীশ্চান ধর্মকে দেখলেন। কারণ মহম্মদ একজন প্রফেট, আচার্য যাঁরা হন ওনারা সত্য যেভাবে দেখেন, সেইভাবেই বলেন। সমাজে যখন তিনি সেটাকে পরিবেশন করেন, তখন কিছু কিছু জায়গায় তিনি একটু বোঝানর জন্য ঐভাবে বলে থাকেন। তবে এগুলোর দিকে বেশি নজর দিতে নেই। মূল জিনিস হল, প্রথমে জহুদিরা ছিল, জহুদিদের থেকে এলো খ্রীশ্চান ধর্ম। খ্রীশ্চান ধর্ম র‍্যাডিক্যাল চেঞ্জ নিয়ে এলো। বাইবেল পড়লেই দেখা যায়, কথায় কথায় তিনি জহুদিদের অনুশীলনগুলিকে আটকে দিচ্ছেন। সেখান থেকে পরে ইসলাম এলো, ইসলামে কিছু কিছু ক্ষেত্রে খ্রীশ্চানিটির প্রভাব ছিল, আর কিছু জিনিস এলো জহুদিদের থেকে। কিন্তু জহুদিদের ভগবান খুব কড়া ধাঁচের ভগবান। ইসলামেও ভগবান খুব কড়া, কোন ডানদিক বামদিক হতে দেবেন না। অন্য দিকে খ্রীশ্চান ধর্মের ভগবান অনেক বেশী loving Father।

The Aryan idea that, ‘I and my Father are one’ disgusted and terrified him. (*‘আমি ও আমার পিতা এক’ – এই আর্যোচিত উপদেশের উপর তিনি বড়ই বিরক্ত ছিলেন।*) এটা স্বামীজীর নিজস্ব ব্যাখ্যা। বাইবেলের কথা, ‘I and my Father are one’, অহং ব্রহ্মাস্মি, এই ভাব মহম্মদ গ্রহণ করেননি, এটা সত্য। এমনকি পরে সুফিরা আনলহক যখন নিলেন, তখন মুসলমানরা তাদের গলা কেটে দিল, এটা কুফ্র, ধর্মবিরুদ্ধ কথা, এই কথা তোমরা কি করে বলছ! কিন্তু যীশুখ্রীষ্টের মূল জোরটাই ছিল, আমি আর আমার ফাদার এক, এই ভাবের উপর। আমি আর আমার ফাদার এক, এটা কি শুধু যীশুর জন্য, না অন্যদের জন্যও? এই জায়গাটায় তফাৎ হয়ে যায়। যীশুর ক্ষেত্রে, যীশু আর ভগবান এক, বাকিরা নয়। কিন্তু হিন্দু ধর্মে এই জিনিস কখনই মানবে না। তুমি ঠাকুরকে যে ভাব নিয়ে দেখ, যদি তুমি ঠাকুরকে মহাত্মা রূপে দেখ, তাহলে ঠাকুর যেভাবে মা কালীর সাথে এক, তুমিও সেই ভাবে মা কালীর সাথে এক। খ্রীষ্টানদের থেকে এখানেই আমাদের তফাৎ হয়ে যায়। আসলে ধর্মের উচ্চ জিনিসগুলো সাধারণ মানুষ নিতে পারে না, নেওয়া সম্ভবও নয়। ম্যাক্সমুলার উপনিষদের কথা লিখতে গিয়ে এক জায়গায় বলছেন, উপনিষদের ঋষিরা চিন্তনের যে উচ্চতায় চলে যেতেন, যেখানে সাধারণ মানুষের অক্সিজেনের অভাবে বুক ফেটে যাবে। ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার এই উচ্চ জিনিসকে নেওয়া একেবারেই সম্ভব না। যীশুর সময় তাঁর আশেপাশে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা সবাই জুহুদি ট্রাডিশানে বড় হয়েছেন, তাঁরা যীশুর ঐ কথা নিতে পারছেন না। সেইজন্য বলে দিলেন ওকে ক্রুশিফাই করে দাও। খ্রীষ্টধর্মের ভগবান যেন সেমিটিক ভাবধারা থেকে সরে এসেছেন। মধ্যপ্রাচ্য এশিয়ার ধর্মের ট্রাডিশানে হঠাৎ যেন অহং ব্রহ্মাস্মি এই ভাবটা তখন ঢুকতে চাইছে। ইসলাম তাই আবার ওখান থেকে সেমিটিক ধর্মকে টেনে নিয়ে আবার আগের জায়গায় বসিয়ে দিল। কারণ মানুষের পক্ষে একজন রাজার মত ভগবানকে মেনে নেওয়া সহজ। ওদের ট্রাইবালদের একজন চীফ্ আছে, ভগবানও যেন একজন ট্রাইবাল চীফ্।

স্বামীজী বলছেন, In reality the conception of the Trinity was a great advance over the dualistic idea of Jehovah, who was for every separate from man. (*প্রকৃতপক্ষে মানব থেকে নিত্য পৃথক জিহোবা-সম্বন্ধীয় দ্বৈত ধারণার চেয়ে ত্রিত্ববাদ অনেক উন্নত।*) জিহোবাদের ভাব হল, ভগবান আলাদা, তুমি আলাদা। ঠাকুর যেমন বলছেন, অধম ভক্ত মনে করে তিনি ঐ আকাশের উপরে আছেন। এটা হল ভগবানের ব্যাপারে দ্বৈত ভাব। সেখানে যীশু হঠাৎ নিয়ে এলেন ত্রিত্ববাদ (Trinity)। ত্রিত্ববাদ মানে, ভগবান আছেন, যীশু আছেন আর Holy spirit আছেন। দেববাণীর আলোচনার প্রথমের দিকে আমরা এর উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছি। কোথাও নিয়ে গিয়ে পিতা ও পুত্রকে এক করে দেওয়া হচ্ছে। জহুদিরা, তা তিনি এব্রাহমই হন আর মোজেসই হন, কখনই এটাকে মানতে পারবেন না। ইসলামও তাই, শুধু তাই না, মহম্মদকে যখন নিয়ে আসা হল, তখন তারা মহম্মদকে কখনই অবতার বলছেন না, প্রফেট বলছেন, তিনি আল্লার Messenger। ইসলাম যীশুকেও প্রফেট রূপেই দেখেন। সেই থেকে ইসলাম বলছে, মহম্মদ হলেন শেষ প্রফেট। কিন্তু খ্রীশ্চানদের পিতা আর পুত্র এক, ইসলাম কখনই এই জিনিসটাকে মানবে না, ওদের কাছে এটা পাপ। স্বামীজী বলছেন ত্রিত্ববাদ অনেক উন্নত, কারণ, তত্ত্ব দর্শন বা ঈশ্বর দর্শন কেউ করে নিতে পারেন, কিন্তু তাই বলে যে সেটাকে সমাজের সামনে উপস্থাপিত করার সময় ঠিক ভাবে রাখবেন, তা নয়। কারণ তৎকালীন সমাজ যেমন, সেই সমাজের উপযোগী করে তাঁকে বলতে হবে। বিজ্ঞানে নিউটনের যে অবদান, কখনই কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। কিন্তু আজকে বিজ্ঞান অনেক এগিয়ে গেছে, নিউটনের চিন্তা-ভাবনাকে

এখন বিজ্ঞান ছাড়িয়ে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। কিন্তু নিউটনের সময়, বিজ্ঞানের বর্তমান জিনিসগুলি মানুষের চিন্তার বাইরে। ঠিক তেমনি যখন কোন প্রফেট যে সমাজে আসেন, তখন তাঁর চিন্তা-ভাবনা অবশ্যই ঐ সময়ের সমাজের মত হতে হবে। ঠাকুর যে সমাজে এসেছেন, তিনি সেখানে সন্দেশরই উপমা দিয়ে বলবেন, সন্দেশ গলার নীচে চলে গেলে আর কিছু থাকে না। আজকের দিনে এলে বলতেন, পিৎজা গলার নীচে গেলে আর নেই। এখন এলে ঠাকুর চিটে গুড়ের পানা, মিছরির পানা আর বলতেন না, কোলড্রিঙ্কসের কথা বলতেন। ঠাকুর বলছেন, মা আমাকে এখনও নূতন নূতন অনুভূতির মধ্য দিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তখনও কোকাকোলা আসেনি, কোকাকোলার অনুভূতি তিনি পাননি, তার অনেক আগেই তাঁর মহাসমাধি হয়ে গেছে। ঠিক সেই রকম, অন্যান্য ধর্মে, অন্যান্য সমাজে যাঁরা প্রফেট হয়ে আসেন, তাঁদেরও একই সমস্যা হয়। কিন্তু গোঁড়া ভক্তরা এটা মানবে না; তারা বলবে, ঠাকুর ভগবান, ভগবান সব জানেন, ঠাকুরও জানতেন ভবিষ্যতে কোকাকোলা আসবে, পিৎজা আসবে, তার স্বাদ, অনুভূতি কেমন হবে, সেটাও তিনি জানতেন, কারণ গীতাতেই ভগবান বলছেন, আমি ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যত সব জানি। অন্যান্য ধর্মে বেশী কিছু বলতে গেলে গোঁড়া ভক্তরা গলাটা কেটে রেখে দেবে।

স্বামীজী বলছেন, ওদের ঐ দ্বৈত ভাব থেকে হঠাৎ তিন এসে গেল, আর এটা এত বিপ্লবাত্মক হয়ে গেল যে, যার জন্য এখনও অনেকের বিশ্বাস যে যীশু ভারতে এসেছিলেন, যদিও এর সত্য মিথ্যা আমরা জানি না। কিন্তু এটা সত্য, এই ভাব এত র‍্যাডিক্যাল, এটাকে এ-ভাবে বলা যেতে পারে, নিউটন তাঁর সূত্রগুলি লিখছেন, আর লিখতে লিখতে পরের লাইনে হঠাৎ কোয়ান্টাম ফিজিক্সের ইক্যুয়েশান লিখতে শুরু করলেন, যা একেবারেই অসম্ভব, হতেই পারে না। কিন্তু যীশু ঠিক তাই করলেন, দ্বৈত থেকে ত্রিত্ববাদকে এনে। আজ থেকে পাঁচশ বছর আগে একজন হাতুড়ে ডাক্তার লিখছে খুর চালিয়ে কিভাবে অপারেশন করতে হয়, আর তারপরের লাইনে লিখছেন চোখের অপারেশানে লেজার কিভাবে প্রয়োগ করতে হবে। কেউ বিশ্বাস করবে? কেউ যদি লেখে, তাহলে বলতে হবে, পুরো কল্পনার বাইরে। যীশু যেন ঠিক এই ভাবে পুরো কল্পনার বাইরে চলে গেলেন। আমাদের মনের গঠন এমন যে, আমরা সব কিছুর পিছনে কার্য কারণ সম্পর্কের অনুসন্ধান করতে নেমে পড়ি। তখন আমরা বলব, ওহে, এই ভাব তো শুধু ভারতবর্ষেই ছিল, নিশ্চয়ই যীশু ভারতবর্ষে এসেছিলেন। রাত্রিবেলা একটা হাতি গ্রামের রাস্থা দিয়ে চলে গেছে। গ্রামের লোকের কোন দিন হাতি দেখেনি। কিন্তু সকাল হতেই রাস্থায় বড় বড় পায়ের ছাপ দেখে বলছে, কেউ পায়ে উখল বেঁধে হেটেছে। আমাদের যতটুকু বুদ্ধি, ততটুকু বুদ্ধি দিয়েই বিচার করব। আমরা বুঝতে পারছি না যে, অহং ব্রহ্মাস্মি এটাই সত্য। সেইজন্য যীশু যখন এটাকে উপলব্ধি করলেন, তখন তিনি সেটাকেই নিজের ভাষায় বলেছেন। আমাদের কাছে মনে হচ্ছে, এটা যেন ফিজিক্স, কেমেস্ট্রির মত কোন একটা জাগতিক শিক্ষা, যে শিক্ষা ভারতে না এলে তিনি শিখতে পারবেন না। এর থেকে মুর্খের মত কথা কি আর হতে পারে!

এরপর স্বামীজী বলছেন, The theory of incarnation is the first link in the chain of ideas leading to the recognition of the oneness of God and man. (*যে ভাব-পরম্পরা ক্রমশঃ ঈশ্বর ও মানবের একত্বজ্ঞান এনে দেয়, অবতারবাদ তার প্রথম ভাব।*) এই যে ট্রিনিটির ভাব, ভগবান আছেন, যীশু আছেন আর হোলি স্পিরিট আছেন, এই তিন সত্তা এক, কিন্তু মায়ার জগতে এসে তিনটে যেন আলাদা সত্তা হয়ে যায়। এটাই হল প্রথম ভাব, যে ভাব চূড়ান্ত একত্বজ্ঞান, অহং ব্রহ্মাস্মির দিকে নিয়ে চলে যায়। খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা যায়, মধ্যপ্রাচ্য এশিয়ার ধর্মের সাধারণ ধারণা হল, ভগবান আছেন, আমি আছি। ভগবান মালিক আমি তাঁর গোলাম। অন্য দিকে বেদান্তে বলছে, আমিও যা তুমিও তাই। তুমি মালিক আর আমি গোলাম সেখান থেকে আমিও যা, তুমিও তাই, এই দুটো ভাবের দুম্ করে তো সংযুক্তি হয়ে যাবে না। যে প্রথম সংযুক্তি হবে, সেটা কি হতে পারে? আমি হাওড়া থেকে দিল্লী যাবো, হাওড়া থেকে ট্রেন ছাড়লো আর হঠাৎ দিল্লী এসে যাবে, তা তো হয় না। প্লেনে গেলেও প্লেনকে একটা নির্দিষ্ট রুট বা এরিয়া দিয়ে যেতে হবে। পাইলট বলতে থাকে, আমরা এখন এই জায়গার উপর দিয়ে যাচ্ছি। এরও একটা এরিয়া আছে, তার প্রথম ধাপটা হল, খ্রীশ্চানদের ত্রিত্ববাদ বা ট্রিনিটির ধারণা। কিন্তু ট্রিনিটির ধারণার কথা শুনেই পুরো মধ্যপ্রাচ্য এশিয়ার ধর্মগুলী আঁতকে ওঠে। এইটুকু শুনেই যদি আঁতকে ওঠে, তাহলে অহং ব্রহ্মাস্মিতে এলে কি অবস্থা হবে? সুফিদের মত অবস্থা হবে, যারা বলল আমি আর আল্লা এক, তাদের সবার গলা কেটে রেখে

দিল। কিন্তু স্বামীজী এখানে এটাকে খুব সুন্দর ভাবে যুক্তি দিয়ে সামনে রাখছেন। একদিকে রয়েছে ট্রাডিশানাল এ্যব্রাহিমিক রিলিজিয়ান আর অন্য দিকে রয়েছে অহং ব্রহ্মাস্মি ধর্ম। দুটোর সংযোগের প্রথম ধাপ হলেন যীশু। সেখান থেকে এবার স্বামীজী বলছেন –

God appearing first in one human form, then re-appearing at different times in other human forms, is at last recognized as being in every human, or in all men. (*লোকে প্রথমে বোঝে, ঈশ্বর একজন মানবের দেহে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তারপর দেখে বিভিন্ন সময়ে তিনি বিভিন্ন মানবদেহে আবির্ভূত হয়েছেন, অবশেষে দেখতে পায় – তিনি সব মানুষের ভিতর রয়েছেন।*) ভগবান আলাদা, আমি আলাদা – সেখান থেকে এক ধাপ উপরে হয়ে গেল ভগবান যীশু রূপে এলেন। পরের ধাপে ভগবান রাম রূপে এলেন, কৃষ্ণ রূপে এলেন, বুদ্ধ রূপে এলেন; এরপর বিশেষ বিশেষ রূপে এলেন, সেখান থেকে আরেকটা ধাপ পরে হবে – ভগবান সব মানুষের ভিতর রয়েছেন, এটাই শেষ কথা। শেষ কথা হল, ঈশ্বর ছাড়া এই জগতে কিছু নেই। তার মানে, ভগবান একা একা উপরে আকাশে বা স্বর্গে বসে ছিলেন আর মানুষ, জগৎ সব এখানে, কোন সংযোগ নেই। হঠাৎ একটা সংযোগ হয়ে গেল – ভগবান যীশুর রূপ ধারণ করে এসেছেন। আরেকটা লিঙ্ক – হিন্দুদের অবতার। সেখান থেকে আসছে – ভগবানই সব হয়েছে। ভগবান উপরে স্বর্গে আছেন আর সৃষ্টি ও সৃষ্টির সব কিছু নীচে, সেখান থেকে পরের ধাপেই যদি হঠাৎ বলে দেওয়া হয়, ভগবানই সব হয়েছেন; মারামারি, কাটাকাটি ছাড়া আর কোন রাস্তা থাকবে না। একজন খ্রীশ্চান ফাদার নিজের ধর্ম ছাড়া কিছু জানে না। ফাদার একবার ইজ্রাইলে গেছে, সেখানে গিয়ে বলছে, ভগবান যীশু হয়ে এসেছিলেন। ফাদারকে এমন পাথর ছুঁড়তে শুরু করে দিল যে, কোন রকমে ফাদারকে প্রাণ ছেড়ে পালিয়ে আসতে হয়েছিল। পালিয়ে আরবে ঢুকে গেলেন। সেখানে বলতে লাগলেন, ভগবান যীশু হয়ে এসেছিলেন। এখানে তলোয়ার নিয়ে এমন আক্রমণ করল যে, এবারও ফাদারকে প্রাণ ছেড়ে পালাতে হল। ওখান থেকে কোন রকমে এসে ভারতবর্ষে ঢুকেছেন। ফাদার যাকে পাচ্ছেন তাকেই বলছেন, ভগবান যীশু হয়ে এসেছিলেন। সবাই বলছে, খুব ভাল, তবে আমাদের এখানে ভগবান আরও অনেক রূপে এসেছেন এবং আসবেন। শোনার সাথে সাথে সেই ফাদার collapse করে যায়। এটা একটা মজার কাহিনী হতে পারে, কিন্তু সত্যিটাকে খুব সুন্দর ভাবে সামনে রেখে দেওয়া হল। এই সত্যকে ইসলাম, জুহুদি, পার্সিরা নিতে পারেনি, কোনদিন নিতে পারবে না, কারণ তাদের শাস্ত্র বাধা হয়ে এই সত্যের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। পাথরে খোদাইয়ের মত এই ভাবের বিপরীত কথা লেখা হয়ে আছে, যেটাকে ওরা কোন দিন পাল্টাতে পারবে না। তাই, ভগবান মানুষরূপে আসতে পারেন, ওদের কাছে অসম্ভব। খ্রীশ্চান ধর্মকে যীশু দিয়ে গেলেন ট্রিনিটির ধারণা। আর হিন্দুদের কাছে দশাবতার, চব্বিশ অবতার, আর অসংখ্য অবতার, অবতার আসতেই থাকবেন, আর শেষ কথা – ভগবানই সব কিছু হয়েছেন।

শেষ লাইনে এসে স্বামীজী বলছেন, Monistic is the highest stage, monotheistic is a lower stage, (*অদ্বৈতবাদ সর্বোচ্চ অবস্থা, একেশ্বরবাদ তার চেয়ে নীচের স্তর।*) এক ঈশ্বর এটা নিম্ন, আর ঈশ্বর এক, এটা উঁচু। আগের আলোচনায় কল্পনাকে নিয়ে বলছিলেন, এবার বলছেন, Imagination will lead you to the highest even more rapidly and easily than reasoning. (*বিচারবুদ্ধির চেয়েও কল্পনা তোমায় শীঘ্র ও সহজে সেই সর্বোচ্চ অবস্থায় নিয়ে যাবে।*) এটাকে নিয়ে যখনই চিন্তা-ভাবনা শুরু করব, তখন দেখা যাবে বিচারবুদ্ধির থেকে কল্পনা আরও দ্রুত ও সহজে উচ্চ অবস্থায় নিয়ে যাচ্ছে।

শিষ্যদের প্রতি স্বামীজীর উপদেশ

এরপর স্বামীজী বলছে, যখন এই বিশ্বাসগুলো পরিষ্কার ও দৃঢ় হয়ে গেল তখন, Let a few stand out and live for God alone and save religion for the world. (*অন্ততঃ কয়েকজন লোক কেবল ঈশ্বরলাভের জন্য চেষ্টা করুক, আর সমগ্র জগতের জন্য ধর্ম জিনিসটা রক্ষা করুক।*) এবার তুমি উঠে দাঁড়াও, তুমি জেনে গেছ এটাই সত্য, তাই এবার তুমি এই জগতের জন্য ধর্মকে রক্ষা করার কাজে লেগে যাও। স্বামীজী এই কথা নিজের শিষ্যদের বলছেন, কারণ আর মাত্র একটা দিন তিনি এখানে আছেন। শিষ্যদের এতদিন ধরে তৈরী করেছেন, এবার তাঁদের দায়ীত্ব বুঝিয়ে দিচ্ছেন – তোমরা নিজেরা ঈশ্বরলাভের চেষ্টা কর

আর জগতের জন্য ধর্মকে রক্ষা করার দায়িত্ব নাও। Do not pretend to be like Janaka when you are only the progenitor of delusions. (*'আমি জনক রাজার মত নির্লিপ্ত' – একথা বলে ভান করো না।*) স্বামীজী জনকের কাহিনীও শিষ্যদের বলেছিলেন নিশ্চয়ই। জনক শব্দের একটা অর্থ যিনি জন্ম দেন, আবার জনক শব্দের আরেকটা অর্থ হল জীবনমুক্ত। ঠাকুরকেও অনেকে বলতেন, আমরা রাজা জনকের মত। স্বামীজী বলছেন, তুমি নিজেকে জনকের মত নির্লিপ্ত মনে করো না। জনকের মত আগে তপস্যা করো। তা নাহলে তোমরা অজ্ঞানকেই জন্ম দেবে। বলছেন, Be honest and say, 'I see the ideal but I cannot yet approach it', but do not pretend to give up when you do not. (*অকপট হয়ে বলো, আদর্শ কি তা আমি বুঝতে পারছি বটে, কিন্তু এখনও তার কাছে এগোতে পারছি না'। বাস্তবিক ত্যাগ না করে ত্যাগ করবার ভান করো না।*) আদর্শের জন্য চেষ্টা কর, লড়াই করে যাও। আদর্শের দিকে যদি এগোতে না পারো, সত্য কথা বলো, বলো যে আমি চেষ্টা করছি, কিন্তু পেরে উঠছি না, মিথ্যা ত্যাগের ভান করে নিজেকে জাহির করতে যেও না। If you give up, stand fast. If a hundred fall in the fight, seize the flag and carry it on. (*যদি বাস্তবিকই ত্যাগ কর, তবে দৃঢ়ভাবে ঐ ত্যাগকে ধরে থাকো। লড়াইয়ে যদি এক-শ লোকের পতন হয়ে যায়, তবু তুমি পতাকা তুলে নাও এবং এগিয়ে যাও।*) তার সঙ্গে বলছেন। God is true for all that, no matter who falls. (*যে পড়ে পড়ুক না কেন, তা সত্ত্বেও ঈশ্বর সত্য।*) গীতায় ভগবান বলছেন, *মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে*, লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে কয়েকজনই ঈশ্বরের পথে আসে, তাদের মধ্যে অনেকেই আর এগোতে পারে না, তাদের মধ্যে কদাচিৎ কয়েকজন লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে। এতো লোক হেরে গেছে বলে যে ধর্ম মিথ্যা, ঈশ্বর মিথ্যা, তা কখনই না। যে কোন যুদ্ধে, যারা জয়ী হয়, তা আলেকজাণ্ডারই হোক, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকাই হোক, সৈন্য সবারই মারা যায়। মুক্তির মন্দির সোপানতলে কত প্রাণ হল বলিদান। Let him who falls hand on the flag to another to carryon; it can never fall. (*যুদ্ধে যার পতন হবে, সে যেন অপরের হাতে পতাকাটা দিয়ে যায় – যাতে সে ঐ পতাকা বহন করে নিয়ে যেতে পারে। পতাকা কখনও ভূলুণ্ঠিত হতে পারে না।*) রিলে রেসের মত পতাকাটা ধরে রাখো, একজন পড়ে যাচ্ছে, সে আরেকজনের হাতে পতাকাটা তুলে দিচ্ছে। সে এবার এগিয়ে নিয়ে যাবে।

When I am washed and clean, why shall impurity be added on to me? Seek first the kingdom of Heaven, and let everything else go. Do not want anything 'added unto you'; be only glad to get rid of it. Give up and know that success will follow, even if you never see it, Jesus left twelve fishermen, and yet those few blew up the Roman Empire. (*বাইবেলে আছে – প্রথমে ভগবানের রাজ্য অন্বেষণ কর, আর যা কিছু তা তোমাকে দিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু আমি বলি, যখন ধুয়ে পুঁছে পরিষ্কার হলাম, তখন আবার অশুচিতা আমাতে জুড়ে দেওয়ার কি দরকার? তাই বলি, প্রথমেই স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ কর, আর বাকি যা কিছু সব চলে যাক। তোমাতে নূতন কিছু আসুক – এ কামনা করো না, বরং সব কিছু ত্যাগ করতে পারলেই খুশী হও। ত্যাগ কর, আর জেনো – তুমি দেখতে না পেলেও সফলতা লাভ তুমি করবেই। যীশু বারটি জেলে শিষ্য রেখে গিয়েছিলেন, ঐ অল্প কটি লোকেই প্রবল রোমক সাম্রাজ্য উড়িয়ে দিয়েছিল।*) এখানে স্বামীজী ধর্ম স্থাপনার কথা বলছেন। দ্বৈত ভাবে যখন তুমি এক ঈশ্বরের ভাব নিচ্ছ, তখন শক্তি এক রকম আসে; ঈশ্বর এক তখন শক্তি অন্য রকম আসে। শুভ চিন্তন কর, আর এগিয়ে চলো, এখানে দায়িত্ব তোমার।

কি ভাবে আমরা ঠাকুরের কাজ করতে পারি?

আমরা রামকৃষ্ণ ভাবধারাতে যবে থেকে যুক্ত হয়েছি, তবে থেকে শুনে আসছি, সব ঠাকুরের কাজ। বড় বড় সাধুরা বলতেন, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কাজ কারুর জন্য আটকায় না। দেববাণীর প্রথম দিকের আলোচনায় আমরা 'ঠাকুরের কাজ' নিয়ে একটা বিরাট আলোচনা করেছিলাম। সেখানে বলা হয়েছিল, ঠাকুরের কাজ বা ঠাকুরের ইচ্ছা একটাই – ধর্ম সংস্থাপনা। ভগবান অবতার হয়ে কখনই কারুর দুঃখ মোচন করতে আসেন না, কারুর পার্থিব জগতের ব্যাথা যন্ত্রণা লাঘব করার জন্য আসেন না। শুধু মাত্র রাবণ বধ, কংস বধের

জন্য আসেন না। যদি শুধু এই কাজের জন্যই তিনি আসেন, তাহলে যীশু মিথ্যা হয়ে যাবেন, ভগবান বুদ্ধ মিথ্যা হয়ে যাবেন, কপিল মিথ্যা হয়ে যাবেন, সব অবতারই মিথ্যা হয়ে যাবেন। বোকা, মুর্খ কিছু মানুষের জন্য অবতার দুষ্ট দমনের জন্য আসেন। কিন্তু কখনই তিনি দুষ্ট দমনের জন্য আসেন না, তিনি আসেন মানুষের অজ্ঞান, সংশয় নাশের জন্য। আচার্য শঙ্কর তাঁর গীতার ভাষ্যে প্রথমেই বলছেন, ভগবান ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আসেন। ধর্ম প্রতিষ্ঠা মানেই, অশুভের নাশ, অধর্মের নাশ ইত্যাদি। ঠাকুরের যে আগমন, এই আগমনে তাঁর একটাই কাজ, ধর্ম স্থাপনা, এর বাইরে অবতারের আর কোন কাজ হয় না।

ধর্ম কি? স্বামীজী এই আলোচনায় ধর্মকে পরিষ্কার করে দিচ্ছেন। ধর্ম কি? অহং ব্রহ্মাস্মি, জীবনমুক্তি। জেহোবার যে ধর্ম, আমরা নীচে, ভগবান উপরে, এই ধর্ম স্থাপনার জন্য তিনি আসেননি। ঠাকুর এই কথা বলার জন্য আসেননি যে, আমি অবতার, তোমরা ভক্ত, তোমরা দিবারাত্র আমার চরণবন্দনা করে যাও। ঠাকুরের আগমন শুধু ব্রহ্মবিদ্যা স্থাপনার জন্য। আমরা এখানে অবতারের কথা বলছি, ভগবানের কথা বলছি না, তিনি এ্যব্রাহাম হন, মোজেস হন, প্রফেট মহম্মদ হন, এনাদের সবার আগমন একমাত্র ধর্ম স্থাপনার জন্য। একটু আগে বলা হল, ভারতবর্ষে ঈশ্বর এক, তিনি অবতার হয়ে আসেন, শুধু অবতার হয়েই আসেন না, সমস্ত জীবে তিনি আছেন – অবতার আসেন এই জ্ঞান, এই উপদেশ দেওয়ার জন্য। ব্রহ্মবিদ্যা স্থাপনা করা ছাড়া ঠাকুরের অন্য কোন কাজ ছিল না। তুমি এই ব্রহ্মবিদ্যা অর্জন করো, অপরকে এই ব্রহ্মবিদ্যা পাওয়ার জন্য সাহায্য কর। যারা নিজেদের ঠাকুরের ভক্ত মনে করে, ঠাকুরকে যারা আপনজন মনে করে, তাদেরও একটাই কর্তব্য, এই ব্রহ্মবিদ্যা স্থাপনার কাজে নিজেকে জুড়ে দেওয়া। স্বামীজী ব্রহ্মবিদ্যা স্থাপনা অবশ্যই করেছেন ঠিকই, কিন্তু ঠাকুর নিজে স্বামীজীকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন তারও উদ্দেশ্য হল, এই অপরকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটাকে যাতে আরও পদ্ধতিগত করে দেওয়া যায়, যেটা স্বামীজী করে দেখালেন। ঠাকুর ব্রহ্মবিদ্যাকে আমাদের সামনে রাখলেন, কিন্তু তিনি সেই ভাবেই রাখলেন যেভাবে উপনিষদ রেখে দিয়েছিলেন। স্বামীজী হলেন ঠাকুরের প্রধান বাহক।

দ্বিতীয় ধাপে তিনি নিয়ে আসছেন, ঠাকুর যেটা করে দেখালেন, এটা তোমারও কর্তব্য। কি করবে? ব্রহ্মবিদ্যা স্থাপনা। ব্রহ্মবিদ্যা রয়েছে হিন্দুদের হাতে, তাই তোমার একটা কাজ হল হিন্দু ও হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করা। হিন্দু জাতি ও হিন্দু ধর্ম যদি পৃথিবী থেকে মুছে যায়, সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মবিদ্যাটাও চলে যাবে। হিন্দুদের সাথে সাথে, বেদ চলে যাবে, উপনিষদ চলে যাবে, গীতা চলে যাবে, ব্রহ্মবিদ্যাটাই চলে যাবে। এই যে আমরা সেমিটিক ধর্মে বিরাট উন্নতি দেখলাম, এ্যাব্রাহাম থেকে শুরু হয়ে বেদান্তের ভাবে আসছে, এক ঈশ্বর ভাব পার্সিদের মধ্যে, ইসলামদের মধ্যে হয়ে হয়ে বেদান্তে কিভাবে আছে। আলাদা আলাদা জায়গায় আলাদা আলাদা ভাবে এই ভাবটা এসেছে। বাইবেলে একটা উল্লেখ আছে, যীশু আর ঈশ্বর এক, যদিও অন্যদের কথা বলা হয়নি। যদিও খ্রীশ্চান ধর্মের অনেকে যাঁরা গভীর সাধনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে অদ্বৈতের ভাব ছিল। স্বামীজী সেইজন্য হিন্দুধর্মকে এত জোর দিয়েছেন।

হিন্দুরা মূলতঃ ভারতবর্ষে থাকে, সেইজন্য ভারতের সব দিক থেকে উত্থান চাই – আর্থিক উত্থান, নৈতিক উত্থান, রাজনৈতিক উত্থান, স্বাস্থ্যের উত্থান, সব দিক দিয়ে উত্থান। ভারতের কেন উত্থান চাই? কারণ হিন্দুরা মূলতঃ এই ভূখণ্ডেই বাস করে। তাহলে ভারত থেকে অন্যদের সরিয়ে দিতে হবে? কখনই কাউকে সরিয়ে দিতে হবে না, সব ধর্মের লোকরাই থাকবে। কিন্তু হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করার জন্য ভারতবর্ষকে রক্ষা করা অত্যন্ত দরকার। আর এই ব্রহ্ম বিদ্যার উপর শিক্ষা, বৌদ্ধিক আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য স্বামীজী প্রতিষ্ঠা করলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন। স্বামীজী বলছেন, আমি এমন একটা মেশিন তৈরী করে যেতে চাই, যেটার উপর ভারতবর্ষে অন্তত কেউ হাত দিতে পারবে না। ঠাকুর হলেন এই যুগের অবতার, তিনি ব্রহ্মবিদ্যার উপর আবার প্রাণ সঞ্চার করে দিলেন। শঙ্করাচার্যের পর একমাত্র ঠাকুরই হলেন, যিনি ব্রহ্মবিদ্যাকে এত জোরের সাথে সামনে রেখেছেন, মাঝখানে আর কেউ নেই। মধুসূদন সরস্বতি এবং আরও অনেকে ছিলেন, এনারাও শাস্ত্র রচনা করে গেছেন; কিন্তু সেই উপনিষদের ঋষির পর, ব্যাসদেবের পর শঙ্করাচার্য, শঙ্করাচার্যের পর আর কাউকে আমরা সেই লাইনে পাই না। সেখান থেকে আমরা সরাসরি ঠাকুরকে দেখছি। যাঁরা মনে করেন আমি ঠাকুরের কাজ করতে চাই, যদি মনে করেন ঠাকুরের কাজ করে আমি ধন্য হতে চাই, তাহলে তাঁদের স্বামীজীর

সেই বাক্য স্মরণ করতে হবে। স্বামীজী বলছেন, জগন্নাথের রথ নিজেই চলে, দড়িতে হাত লাগিয়ে দিলে সে ধন্য হয়ে যাবে, আমি রথ টেনেছি ভেবে নিজেকে কৃতার্থ মনে করে। কিন্তু রথ নিজে থেকেই চলছে, তুমি না টানলেও রথ এগিয়ে চলবে। কিন্তু যদি কেউ রথকে আটকাবার চেষ্টা করে, তাকে পিষে দিয়ে রথের চাকা এগিয়ে যাবে। এই ব্রহ্মবিদ্যার রথ চলবে, যে এই রথকে আটকাতে যাবে, সে পিষে যাবে। যে এতে হাত লাগাবে, সে ধন্য হয়ে যাবে। স্বামীজী এটাই বলছেন, তুমি যদি পড়েও যাও চিন্তা করো না।

এই পাঁচটি আদর্শকে যদি কমিয়ে দিতে চাও, তাতে কোন অসুবিধা নেই, কিন্তু ঐ জায়গাতে ব্রহ্মবিদ্যার সাথে কোন আপোষ হবে না। জীবন আমাদের তখনই ধন্য হবে, যদি আমরা এই ব্রহ্মবিদ্যার পতাকা নিয়ে এগিয়ে যাই। ব্রহ্মবিদ্যার পতাকা হিন্দুদের কাছে, তাই হিন্দুদের সেবা। এই পতাকা ভারতবর্ষে আছে, রামকৃষ্ণ মিশনে আছে, আর ঠাকুর। ব্রহ্মবিদ্যা, হিন্দু, ভারতবর্ষ, রামকৃষ্ণ মিশন ও ঠাকুর, এই পাঁচটির মধ্যে কোন এক বা একাধিকের যদি সেবা করা হয়, এটাই একমাত্র ঠাকুরের কাজ হবে, অন্য কোন কাজ ঠাকুরের কাজ হবে না। রিলিফের কাজ ঠাকুরের কাজ, কারণ সে ভারতকে রক্ষা করছে। তা কেন হবে, অন্য দেশেও তো রিলিফের কাজ করা হয়, সেটা কেন ঠাকুরের কাজ হবে না? অবশ্যই ভাল কাজ, মানবিকতার দিক থেকে নিশ্চয়ই ভাল কাজ, কারণ ওটা ব্রহ্মবিদ্যারই একটা application। রামকৃষ্ণ মিশন কেন স্কুল, হাসপাতাল চালাচ্ছেন? দেশ সেবা করা হচ্ছে। ভারতকে যখন ভিতর থেকে শক্তি দেওয়া হচ্ছে, তখন হিন্দুরা শক্তি পাচ্ছে, হিন্দুরা শক্তি পাচ্ছে মানে ব্রহ্মবিদ্যার শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে, ব্রহ্মবিদ্যার যখন শক্তি বৃদ্ধি হচ্ছে তখন মানবজাতির আধ্যাত্মিক বিবর্তন সার্থকতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

স্বামীজী তাই বলছেন, তুমি আদর্শের জন্য লড়াই করতে গিয়ে যদি পড়েও যাও, চিন্তা করো না, ফল তুমি হয়ত এখন পাবে না, পরে পেতে পারো। যীশু বারজন অশিক্ষিত জেলে শিষ্য রেখে গেলেন, পরে তাঁরাই হাজার বছরের শক্তিশালী রোমান সাম্রজ্যের পতন ঘটিয়ে দিলেন। বারজন অশিক্ষিত জেলে যদি অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে, সেখানে শিক্ষিত মানুষ যদি এই বিশ্বাসে ভরপুর হয়ে যায়, আমার মধ্যে অনন্ত শক্তি, অনন্ত জ্ঞান, আমাকে এটা পেতে হবে। কেউ কি আর তার পথ রোধ করতে পারবে! একজন এসে ঠাকুরকে বলছে, আমি জগতের ভাল করতে চাই। ঠাকুর বলছেন, বর্ষাকালে গঙ্গায় দেখেছ কত গুঁড়ি গুঁড়ি কাঁকড়া হয়, ঐ রকম কোটি ব্রহ্মাণ্ড, তুমি কী জগতের ভাল করবে। এখানে কিন্তু ঐ ভাবে বলা হচ্ছে না, এটা অন্য জিনিস। ওখানে ঠাকুরকে যে জগতের ভাল করতে চাইছে, তার ভাব হল, তোমরা পতিত, আমি তোমাদের সাহায্য করতে চাই। কিসের পতিত! আবার বলবে, আমিও যা তুমিও তা, এটাই সত্য। আবার বলবে, ঠাকুর নিজেই করবেন। ঠিকই ঠাকুর নিজেই করবেন। একজন ভিখারী মন্দিরের গেটের কাছে ভিক্ষা করছিল। এক ভদ্রলোক ভিখারীকে উপেক্ষা করে সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছিল, সেই ভিখারী লোকটিকে বলছে, আপনি আমাকে যা তা ভিখারী মনে করবেন না। আমার লেখা একটা বই বাজারে খুব চলছে, 'কোটিপতি হওয়ার একশ উপায়'। তাহলে আপনি ভিক্ষা করছেন কেন? না, দেখিয়ে দিচ্ছি এটাও একটা উপায়। তুমি যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য এই মানবজন্ম পেয়েছ, এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের আরেকটা পথ হল, অপর সবাইকে এই পথে নিয়ে আসা। এটাকেই স্বামীজী এখানে বলছেন।

ঈশ্বর লাভের সাধনায় লেগে থাকা

ইসলাম, খ্রীশ্চান ও অন্যান্য ধর্মের সাথে হিন্দুধর্মের তুলনা করে প্রধান পার্থক্যটা স্বামীজী তুলে ধরলেন। কি সেই পার্থক্য? ঈশ্বর মানবরূপেও আসতে পারেন। এই জায়গাতে হিন্দু ধর্মের সাথে বাকি ধর্মগুলির একটা বড় তফাৎ হয়ে যায়। সেখান থেকে স্বামীজী এবার চলে আসছেন – ঈশ্বর যদি সত্য হন, আর ঈশ্বরের বেদীতে যদি তাঁর অর্চনা করতে হয় তাহলে কি কি জিনিস লাগে? যতই সবাই ধর্ম ধর্ম করুক, যতই ঈশ্বর ঈশ্বর করুক, ঠাকুর ঠাকুর করুক, ভিতরে কারুরই সেই বিশ্বাসটা নেই। শোওয়ার ঘরে একটা সাপ ঢুকে গেলে আমাদের ঘুম উড়ে যাবে। সেখানে যদি এই বিশ্বাস থাকে ঈশ্বর আছেন, তখন জীবনটাই পুরো অন্য রকম হয়ে যাবে। জীবন যে অন্য রকম হয় না, তার মানেই বিশ্বাস নেই। খ্রীশ্চানদের খুব নামকরা কথা আছে, A man is cared of dog, is not afraid of God। মানুষ কুকুরকে ভয় পায়, ভগবানকে ভয় পায় না, মানে বিশ্বাস নেই। যদি বিশ্বাস থাকে, সেই বিশ্বাস নিয়ে যদি ঈশ্বরকে দিতে যাই, যিনি আমার প্রাণেরও প্রাণ,

আত্মারও আত্মা, তখন তাঁকে আমরা কি দেব? স্বামীজী বলছেন, Sacrifice on God's altar earth's purest and best. (*ঈশ্বরের বেদীতে পৃথিবীর মধ্যে পবিত্রতম ও সর্বোৎকৃষ্ট যা কিছু, তাই বলিস্বরূপ অর্পণ কর।*) ঠাকুর বারবার ছোকরা ভক্তদের দেখিয়ে বলছেন, এরা পবিত্র, কাকে ঠোকরানো আম নয়, নূতন হাঁড়িতে নিশ্চিন্তে দই পাতা যাবে। He who struggles is better than he who never attempts. (*যিনি ত্যাগের চেষ্টা কখন করেন না, তাঁর চেয়ে যিনি করেন, তিনি অনেক ভাল।*) শুধু কথামৃত বা যে কোন শাস্ত্র পড়ে গেলেই হয় না, একটা অবস্থায় গিয়ে শাস্ত্রের কথাগুলিকে জীবনে নামাবার জন্য লাগতে হয়। দেখা যাবে যেমনি কেউ শুরু করছে, প্রথমেই হোঁচট খাবে, পা পিছলে পড়ে যাবে। অনেক ক্ষেত্রে মানুষ বলে, শাস্ত্র পড়লাম, অনেক কিছু জানলাম, এবার তিনি দেখবেন। না, তিনি দেখবেন না, আমাদেরই লেগে থাকতে হবে, সংগ্রামটা সব সময় চালিয়ে যেতে হবে। তার মধ্যে অনেকবার পতন হবে, পিছলে যাবে, আবার উঠে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে লাগতে হবে। এইজন্য স্বামীজী অনেক জায়গায় এই কথা বলছেন, He who stuggles is better than he who never attempts।

একজন পুলিশ অফিসার, পরবর্তি জীবনে তিনি পুলিশের সর্বোচ্চ পদে কর্মরত অবস্থায় অবসর নেন, খুব নামকরা পুলিশ অফিসার ছিলেন। প্রথম জীবনে গ্রাজুয়েট হয়ে পরীক্ষা দিলেন, পুলিশে ভর্তি হওয়ার জন্য হায়দ্রাবাদে পুলিশ এ্যাকাডেমিতে পরীক্ষা দিতে গেছেন। মোটাসোটা ছিলেন। তাঁকে রোপ ক্লাইম্বিং করতে হবে। উনি বুঝে গেলেন এ আমার দ্বারা হবে না, পুলিশের চাকরি আমার দ্বারা সম্ভব না। দড়িটা ছাড়ব, মাটিতে পড়ব, পা, কোমড় একটা কিছু ভাঙবে। আমাকে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হবে। সুস্থ হয়ে কলেজের লেকচারার হব, পুলিশের চাকরি আমার লাগবে না। যিনি ট্রেনিং দিচ্ছিলেন, তিনি ধুরন্ধর পুলিশ অফিসার। তিনি বুঝে গেছেন, ছেলেটির কি মতলব। তিনি ছেলেটির নাম ধরে চেঁচাচ্ছেন, লটকে রহো সাব, লটকে রহো, লটকে রহনে ভী মাসল্ বনেগা। ট্রেনিং অফিসারের ঐ একটি কথাই ওনার জীবনের টার্নিং পয়েন্ট হয়ে গেল। উনি পরবর্তি জীবনে প্রায়ই এই ঘটনা বলে বলতেন, ওর পরেই আমার জীবনটা পাল্টে গেল। এরপর তিনি একজন নামকরা আইপিএস হলেন, তাঁর বাবাও আইপিএস ছিলেন। যারা ঠাকুরের ভক্ত, যারা ঈশ্বরের নাম করছে, ঈশ্বরের নাম করাটাও ধরে রাখতে হয়। কিন্তু ধরে রাখাটাই একটা সমস্যা। ধরে রাখতে গেলে শরীরের উপর একটা চাপ পড়ে, ঐ চাপেতেই মাসল্ তৈরী হয়। ঐ ধরে রাখাটা ছেড়ে দিলে, লড়াইটা ছেড়ে দিলে সব শেষ। আরাম পাবে, লড়াই বন্ধ করা মানেই আরাম পাওয়া, কিন্তু অগ্রগতিটা থেমে গেল। জীবনের সব কিছু যদি ভাল ভাল চলে, সবটাই সুখের চলে; ঠাকুরের খুব সুন্দর বর্ণনা আছে, পায়ের উপর পা তুলে বসে আছে আর গোফে তা দিয়ে যাচ্ছে। তার মানে এ এখন লড়াইয়ে নেই। লড়াইয়ে থাকা মানেই অশান্তি থাকবে, অশান্তি মানেই দুঃখ, দৈন্য, অপমান, নানা রকম জিনিস আসবে। কিছু না এলেও মনে সব সময় অশান্তি লেগে থাকবে। কিন্তু লড়াইকে ছাড়া যাবে না।

সন্ন্যাসের মহিমা

বলছেন, Even to look on one who has given up has a purifying effect. (*একজন ত্যাগীকে দেখলেই হৃদয় পবিত্র হয়ে যায়।*) স্বামীজী সন্ন্যাসের মহিমা, ভক্তের মহিমা বলছেন। যিনি সর্বত্যাগী, তাঁর দিকে একবার যদি দৃষ্টি যায় তাতেই তার পূণ্য হয়। শ্রীশ্রীমা তাঁর শিষ্যদের বলছেন, ঠাকুরের ছবির দিকে তাকালেও হবে। জপধ্যান হচ্ছে না, পূজা অর্চনা করতে পারছে না, ঠিক আছে; ঘরে যদি ঠাকুরের ছবি থাকে সেই ছবির দিকে চুপচাপ তাকিয়ে থাকো, আর কিছু করতে হবে না, দেখা যাবে আস্তে আস্তে তার পুরো মনটাই শান্ত হয়ে যাবে। ঠাকুর হলেন সর্বত্যাগী, শ্রীশ্রীমা বলছেন তিনি ত্যাগের বাদশা, তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকলেও সিদ্ধি হবে। কিন্তু বড়লোকের দিকে তাকিয়ে থাকলেই আমি যে বড়লোক হয়ে যাবো, তা কখনই হবে না। ধর্মের জগৎ, আধ্যাত্মিক জগতের সব কিছু, তার সব নিয়ম-কানুন, সবটাই আলাদা। মনের যে জগতে আমরা ঘুরছি, অর্থাৎ যেটাকে সংসার বলছি, এই সংসারের নিয়ম, কানুন, আইন সব কিছুই আলাদা, আধ্যাত্মিক জিনিসগুলো আবার সংসারের সব কিছু থেকে অন্য রকম। ধর্ম পুরোপুরি দাঁড়িয়ে আছে ত্যাগ ও ভাবের উপর। ভক্তি সহকারে যখন কোন অবতারের কথা শুনছি বা পড়ছি, তখন অবতারের ভাব আমাদের মনে উপর ছাপ ফেলে। শ্রীরামচন্দ্র তাঁর মূল্যবোধের জন্য রাজসুখ, সংসারসুখ সব কিছুকে ত্যাগ করছেন,

মনের মধ্যে ত্যাগের ভাব জেগে উঠছে। শ্রীকৃষ্ণকে যখন দেখছি, তিনি সব কিছু করছেন, কিন্তু সব সময় কেমন অনাসক্ত। স্বামীজী বলছেন, এগুলো দেখলেও ভিতরে ত্যাগের ভাব জাগে, মন শুদ্ধ হয়। সেখান থেকে আরও এক ধাপ এগিয়ে বলছেন, সাধু, সন্ন্যাসীদের যখন দেখা হয়, তখনও আমাদের মনের মধ্যে কোথাও না কোথাও একটা বৈরাগ্যের ভাব আসে।

Stand up for God; let the world go. (*ঈশ্বরকে লাভ করব, কেবল তাঁকেই চাই – এই বলে দৃঢ়পদে দাঁড়াও, দুনিয়ার যা হবার হোক।*) ধর্ম মানে ক্রিয়া নয়। যখন প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম ও নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্মের কথা বলা হয়, তখন প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম মানেই যেখানে ক্রিয়াকর্ম, যজ্ঞ, পূজা অর্চনাদি করা হয়, এটা কিন্তু ঠিক ঠিক ধর্ম নয়। ঠিক ঠিক ধর্ম হল নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম, যার মূল ভাবই ত্যাগ। কিন্তু ঘুরিয়ে প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্মেও ত্যাগ হয়। মানুষ কত কষ্ট করে দুটো টাকা রোজগার করে, সেই টাকা দিয়ে সে একটু ফুল, ফল, মিষ্টি কিনে ভগবানকে অর্পণ করছে, কোথাও তো একটু ত্যাগ হচ্ছে। কিন্তু নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম পুরোদমে ত্যাগের দিকে চলে যায়। চারটে যে যোগ, কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান ও রাজ, সব যোগেই ত্যাগ। ত্যাগ না থাকলে ধর্ম হবে না, ধর্ম করছে কিন্তু ভিতরে ভিতরে কোন ত্যাগের ভাব নেই, বুঝতে হবে কিছু গোলমাল আছে। Have no compromise. Give up the world, then alone you are loosened from the body. When it dies, you are azad, free. (*ঈশ্বর আর সংসার – এই দুই-এর মধ্যে কোন আপস করতে যেও না। সংসার ত্যাগ কর, কেবল তা হলেই দেহবন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারবে। আর ঐরূপে দেহে আসক্তি চলে যাবার পর দেহত্যাগ হলেই তুমি আজাদ বা মুক্ত। মুক্ত হও।*) এখানে স্বামীজী এটা বিদেহী মুক্তির কথা বলছেন, দেহটা পরে গেল, তিনি মুক্ত হয়ে গেলেন। এই জিনিস সাধারণ লোকেদের হবে না।

দেহের মৃত্যুই শেষ কথা না

পরে বলছেন, Be free. Death never alone can never free us. Freedom must be attained by our own efforts during life; then, when the body falls, there will be no rebirth for the free. (*মুক্ত হও, শুধু দেহের মৃত্যু আমাদের কখনও মুক্ত করতে পারে না। বেঁচে থাকতে থাকতেই আমাদের নিজ চেষ্টায় মুক্তিলাভ করতে হবে। তবেই যখন দেহপাত হবে, তখন সেই মুক্ত পুরুষের আর পুনর্জন্ম হবে না।*) যাদের চিন্ত-ভাবনা জড়জগৎকে কেন্দ্র করে চলে, যাদের কাছে পঞ্চভূতের খেলার দাম অনেক বেশী, তাদের কাছে একটা বিরাট সমস্যা হল – এদের জীবনে যখন খুব দুঃখ-কষ্ট আসে, তখন এরা মনে করে আত্মহত্যা করে নিলে সব দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্ত হয়ে যাব। তারা মনে করে, চোখ বন্ধ করলেই সব শেষ, তাই সুইসাইডই করে নেওয়া যাক। অনেক সময় আমরা বলি, বেচারী মরে গেছে, বেঁচে গেছে। বেঁচে যাওয়াটা যদি এই অর্থে নেওয়া হয়, কঠিন রোগ-ব্যাধির জন্য শরীরের যে যন্ত্রণা ছিল, যে অস্বস্থিকর পরিস্থিতির মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছিল, ওই জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে গেল, তাহলে ঠিক আছে। কিন্তু বেঁচে যাওয়াটা যদি মনে করি আর জন্ম নিতে হবে না, তার মুক্তি হয়ে গেল, না, তা কখনই হবে না। তাকে আবার একটা শরীর ধারণ করে এই সংসারেই ফেরত আসতে হবে। এই পরিস্থিতি, দেহের এই ব্যাধি থেকে মুক্তি পেয়ে গেল ঠিক আছে, কিন্তু আবার কোথায় কোন পরিস্থিতিতে কোন শরীর নিয়ে জন্ম নিতে হবে, কোন ঠিক নেই। আমাদের এখানে মৃত্যুই শেষ না, আমাদের ঠিক ঠিক ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা ঠিক এই জায়গা থেকে শুরু হয়। এর আগে যে অন্যান্য ধর্মের কথা বলা হল, ওদের কাছেও মৃত্যু শেষ না। ওরাও বলে যে, মৃত্যুর পর সূক্ষ্ম জীবন চলতে থাকবে, সেখানে তুমি তোমার শুভকর্মের ফল পাবে, অশুভ কর্মের ফলও পাবে। আমাদের এখানে ওরা যে সূক্ষ্মের কথা বলে, ঐ সূক্ষ্ম বলতে কিছু নেই। আমাদের এখানে সবাইকে আবার একটা স্থূল শরীর ধারণ করে ফেরত আসতে হবে। যেখানে তুমি শেষ করে গিয়েছিলে, সেখান থেকেই আবার শুরু হবে তোমার নূতন জীবন, একটু সময়ের তারতম্য হবে। মরার পর অন্যান্য লোকে যতদিন আছ, ততদিন থাকতে হবে না, শুশুক যেমন ডুব মেরে জলের নীচে চলে যায়, কিছুক্ষণ পরে আবার জল থেকে অন্য জায়গায় ভুস্ করে জেগে ওঠে। কিন্তু ওর একটা ধারাবাহিকতা আছে। এই বিশ্বাসটা না আসা পর্যন্ত, ধর্ম কখনই শুরু করা যাবে না।

মৃত্যুর পর তুমি আবার জন্ম নেবে, নূতন জন্মে তোমার আগের আগের জন্মের সংস্কারগুলো একই থাকবে, ঐ সংস্কারগুলিকে নিয়েই তোমার এই জন্ম চলতে থাকবে, শুধু পারিপার্শ্বিক জিনিসগুলো পাল্টে যাবে।

যেমন যে খেতে ভালবাসে, আগেকার দিনে হলে এক রকমের খাওয়ার উপকরণ হত, এখানকার দিনে অন্য রকমের উপকরণ হবে। কিন্তু খাওয়ার প্রতি যার আসক্তি আছে, ঐ আসক্তিটা কখনই যাবে না। Death never alone can never free us, হিন্দুদের কাছে এটি স্বামীজীর একটি অত্যন্ত মূল্যবান কথা। মৃত্যুই শেষ নয়, মৃত্যু শুধুমাত্র একটা দরজা। অন্যান্য জায়গাতে স্বামীজী বলছেন, আমাদের দেহের কোষিকাগুলি সব সময় পাল্টাচ্ছে। স্নানের সময় গায়ে সাবান দিয়ে ঘষলে, শরীর থেকে কিছু সেল পড়ে গেল, আবার নূতন সেল এসে যাবে। মৃত্যুটা যেন হঠাৎ পরিবর্তন। তিল তিল করে ক্ষয় হচ্ছিল, হঠাৎ দুম্ করে পড়ে গেল। এছাড়া কিছু না, বাকি সব কিছু যেমন যেমন চলছিল, সবই তেমন তেমন ভাবে চলতে থাকবে। বলা হয় যে পরিবর্তনগুলো হতে কুড়ি বছর লাগত, বলা হয় যে বার বছরে শরীরে যত সেল আছে সব পালটে যায়। মৃত্যুর সময় বার বছরের জিনিসটা মুহুর্তের মধ্যে হয়ে যায়। আমাদের মনে রাখা দরকার, এখানে যে কথাগুলো আসছে, এই কথা আমাদের পুরনো ধর্মগ্রন্থ থেকে আসছে না, এই কথাগুলো স্বামীজীর কথা। যেটাই বলছেন, তিনি তাঁর অনুভূতি থেকে বলছেন। আর বলছেন, then, when the body falls, there will be no rebirth for the free, (*তবেই যখন দেহপাত হবে, তখন সেই মুক্ত পুরুষের আর পুনর্জন্ম হবে না।*) একবার জ্ঞান হয়ে গেলে মুক্তি হয়ে গেল, এরপর দেহ থাকলেও কি আর না থাকলেও কিছু নেই। আর একবার যখন দেহ চলে গেল, তখন সব শেষ, সে পুরো আজাদ, মুক্ত। সেখান থেকে স্বামীজী আবার সত্যকে নিয়ে বলছেন।

সত্যকে সত্যের দ্বারাই বিচার করতে হবে - সত্যকে দৃঢ় ভাবে ধরে রাখো - ধর্মের বাহ্যিক উপাচারে কিছু নেই

Truth is to be judged by truth and by nothing else. (*সত্যকে সত্যের দ্বারাই বিচার করতে হবে; অন্য কিছুর দ্বারা নয়।*) আমাদের সমস্যা হল, কোন জিনিসকে আমরা যখনই বিচার করতে যাই, তখন সেখানে আমরা নিজেদের স্বার্থের পুষ্টি ও লাভকে মাথায় রেখে বিচার করি। বেশীর ভাগ বাচ্চাদের অঙ্ক করতে কিংবা পড়তে বললে বলবে, অঙ্ক করে কি হবে, আমাকে কি চকলেট দেওয়া হবে? বেশীর ভাগ মানুষের কাছে ধর্মটাও বাচ্চাদের অঙ্ক করার মত, ধর্ম করে আমার কি হবে? ধর্ম করে কি আমি টাকা পাবো? ধর্ম করে কি আমি শান্তি পাবো? টাকাও পাবে না, শান্তিও পাবে না। তাহলে আমি ধর্ম করতে যাব কেন? ধর্ম করলে শক্তি লাভ করবে। সেই শক্তি অপরে বুঝতে পারবে, আবার নাও বুঝতে পারবে। কিন্তু তুমি নিজে জানবে যে, তোমার মধ্যে পরিবর্তন হয়ে গেছে। আমাদের একটা বিরাট সমস্যা হল, আমরা যখনই একটা জিনিসকে জানতে চাই, যেমন হায়ার ফিজিক্স, হায়ার বায়োলজি, এই জিনিসগুলি পড়ে আমার কি লাভ হবে? যেমন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তিনি ১৮৩৬ সালে ১৮ই ফেব্রুয়ারি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, অনেকেই আছেন যাঁদের মন এগুলোকে নিয়ে আলোচনা করতে চাইবে না, আবার অনেকের মন চাইবে। যাদের মন চাইছে এগুলোকে নিয়ে আলোচনা করতে তাদের যদি হঠাৎ বলা হয়, এগুলো আলোচনা করে কি তুমি টাকা পাবে? টাকা পাওয়ার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই, এটা আমার নিজের আনন্দ। সত্যকে যদি বিচার করতে হয়, সত্যের দ্বারাই বিচার করতে হবে, অন্য কিছু দিয়ে বিচার করা যাবে না।

Doing good is not the test of truth; the Sun needs no torch by which to see it. (*লোকের হিত করাই সত্যের কষ্টিপাথর নয়। সূর্যকে দেখবার জন্য আর মশালের দরকার হয় না।*) অনেক সময় আমরা বিচার করে দেখতে চাই, এটা করে কি আমার ভাল হবে। এই জিনিসগুলিই দেখিয়ে দেয় যে, এদের মন এখনও উচ্চস্তরে যায়নি। পাশ্চাত্যের লোকেরা খ্রীশ্চানিটিকে একটা স্তরে এসে মানবকল্যাণের সাথে জুড়তে শুরু করলেন। জ্ঞানের শেষ কথা হল জ্ঞান, ত্যাগের শেষ কথা ত্যাগই। জ্ঞান অন্য কোন ফল দেয় না, জ্ঞানের শেষ ফল জ্ঞান। এখন বাই-প্রোডাক্ট রূপে কারুর অন্য কিছু হয়ে গেল, সেটা অন্য জিনিস। স্বামীজী শিষ্যদের ব্যাখ্যা করে বলছেন, সূর্যকে দেখার জন্য অন্য কোন আলো দিয়ে দেখতে হয় না। Even if truth destroys the whole universe, still it is truth; stand by it. (*সত্য যদি সমগ্র জগৎকে ধ্বংস করে, তা হলেও তা সত্যই – ঐ সত্যকে ধরে থাকো।*) যেটাকে তুমি জেনে গেছ এটা সত্য, ঐ সত্যকে ধরে রাখো। এই কথা কিন্তু স্বামীজী আধ্যাত্মিকতাকে নিয়ে বলছেন। সদা সত্য কথা বলবে, সেই সত্যকে নিয়ে বলছেন না। ঈশ্বরই সত্য, এই জিনিসটাকে জোর দেওয়ার জন্য বলছেন। ঠাকুর জেনে গেছেন ঈশ্বর সত্য, ঠাকুর জেনে গেছেন ঈশ্বরই কর্তা, তারপর তিনি আর কাউকে মানছেন না। একবার তুমি এই সত্যকে জেনে

গেলে, তোমাকে আর কিছু ভাবতে হবে না। এই সত্যকে ধরে রাখো, এই সত্যকে অবলম্বন করে জীবন সংগঠিত কর, তাতে জগৎ যদি উড়ে যায় তো উড়ে যাক। সেইজন্য দেখা যায়, যাঁরা ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিকতাকে নিয়ে চলেন, তাঁরা লোকেদের খুব বেশী মানে না। যার জন্য দেখা যায় সাধুরা মিষ্টভাষী হন না। ভদ্রতার খাতিরে হয়ত সম্মান দিয়ে কথা বলবেন, কিন্তু সমাজে যে বড়লোক বা ক্ষমতাবনদের তোয়াজ করে কথা বলতে দেখা যায়, সাধুদের কক্ষণ কাউকে তোয়াজ করে কথা বলতে দেখা যাবে না।

Practising the concrete forms of religion is easy and attracts the masses; but really there is nothing in the external. (*ধর্মে বাহ্য অনুষ্ঠানগুলি করা সহজ – এগুলিই সাধারণকে আকর্ষণ করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাহ্য অনুষ্ঠানে কিছু নেই।*) ধর্মের যে কোন উপাচারকে মানুষ খুব পছন্দ করে। অনেক আগে একজন মহারাজকে আমেরিকার একটা সেন্টারের দায়ীত্ব দিয়ে পাঠানো হল। কিছু দিন পর দেখছেন, এদেরকে বেদান্ত কিছুতেই বোঝান যাচ্ছে না; একটা কিছু করতে হবে। উনি ভারত থেকে কয়েকটা ঘন্টা, শাঁখ, প্রদীপ নিয়ে গেলেন। বেশ কয়েকজন মিলে রোজ সকাল সন্ধ্যা খুব করে ঘন্টা, শাঁখ বাজাতে শুরু করলেন। এরপর সব লোকেরা আসতে শুরু করল দেখতে এখানে কি হচ্ছে। এই বাহ্য অনুষ্ঠানগুলি মানুষকে বেশী আকর্ষণ করে। যদি বলে দেওয়া হয়, সকাল বিকাল খুব করে আরতি করবে, গঙ্গাজলে আচমন করবে, ঠাকুরকে ফুল দিয়ে সাজাবে, এই এই ফল, মিষ্টি দিয়ে ভোগ দেবে, এগুলোই মানুষ খুব খুশী মনে করতে চায়। কিন্তু এই ধরণের বাহ্যিক ধর্মীয় উপাচারগুলি আধ্যাত্মিক পথে এগোতে মানুষকে খুব বেশী সাহায্য করে না। লক্ষ্য করার বিষয় হল, মন তোমার পাল্টাচ্ছে কিনা। মনকে পাল্টানোর জন্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। এরপর স্বামীজী মুণ্ডকোপনিষদ থেকে একটা মন্ত্র উল্লেখ করে আজকের দিনের ক্লাশের ইতি করছেন।

'As the spider throws her web out of herself and draws it in, even so this universe is thrown out and drawn in by God'. (*মাকড়সা যেমন নিজের ভিতর থেকে জাল বিস্তার করে, আবার তাকে নিজের ভিতর গুটিয়ে নেয়, সেইরূপ ঈশ্বরই এই জগৎপ্রপঞ্চ বিস্তার করেন, আবার নিজের ভিতর টেনে নেন।*) মুণ্ডকোপনিষদ থেকে স্বামীজী বলছেন, *যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ*, মাকড়সা যেমন তার ভিতর থেকে জাল বার করে আবার নিজের ভিতরে গুটিয়ে নেয়, ঈশ্বরের ভিতর থেকে সংসার ঠিক সেইভাবেই বেরোয়। আমরা তাঁর মতই চলি। স্বামীজী শুরু করলেন সেমিটিক ধর্মগুলি, ইসলাম, খ্রীশ্চান ধর্মকে নিয়ে। আলোচনা করতে করতে এই জায়গায় নিয়ে এসে তাঁর বক্তব্যকে খুব সহজ ভাবে গুটিয়ে নিলেন। ঈশ্বর সত্য, ঈশ্বর অবতার হয়ে আসেন, ঈশ্বর মানুষ হয়েছেন, মানুষের ভিতরেই তিনি আছেন – তোমরা এই সত্যটাকে জানো, এই সত্যকে জেনে এর উপর আচরণ কর। আচরণ করতে গিয়ে যা কিছু হবে, সেগুলোকে নিয়ে মাথা ঘামিও না, সত্যকে ধরে রাখো। এই বলে ৫ই অগস্টের ক্লাশ শেষ। এরপর শুরু হতে যাচ্ছে থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ডের স্বামীজীর শেষ দিনের ক্লাশ।

মঙ্গলবার, ৬ই অগস্ট

থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ডে শেষ দিন, এরপর স্বামীজী নিউইয়র্কে ফিরে যাবেন। এখনও স্বামীজী পুরোদমে আধ্যাত্মিকতার চড়া সুরে আছেন, তবে কোথাও কোথাও কিছু জায়গায় তিনি একটু নরম হয়ে যাচ্ছেন। এতক্ষণ যে 'নি'তে ছিলেন, সেখান থেকে মাঝে মাঝে যেন 'ধা' 'পা'তে নামছেন।

'আমি', 'তুমি' ও 'জগৎ' নিয়েই দর্শনের তর্কবিতর্ক - স্বামীজী যেভাবে সবটাকে সমন্বয় করছেন

প্রথম প্যারাগ্রাফের আলোচনা শুরু করার আগে কয়েকটা কথা বলার প্রয়োজন আছে। যখন বেদান্তে আচার্য শঙ্করকে নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছিল, তখন সেখানে ব্রহ্মসূত্র থেকে *যুস্মদ্ অস্মদ্ প্রত্যয় গোচরঃ* এর উপর বলা হয়েছিল। প্রত্যয় মানে বোধ, বোধ দুই প্রকার – আমি ও তুমি। আমি আছি আর জগৎ আছে। এটাকে আমরা যেভাবে হোক অনুবাদ করতে পারি। প্রত্যেক ভাষারই নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য থাকে, ঐ বৈশিষ্ট্যের পারে যখন ওর ভাবকে অন্য ভাষায় ব্যক্ত করতে চাইছি, কোথাও ঐ ভাবটা হারিয়ে যায়। যুস্মদ্ প্রত্যয় অস্মদ্ প্রত্যয়ের অনুবাদ করা খুব মুশকিল। আচার্য শঙ্কর বলতে চাইছেন আমিত্ব বোধ আর জগৎ বোধ। ওখানে যুস্মদ্ শব্দের অর্থ তুমি, তুমিত্ব বোধ কোন শব্দ হবে না, সেইজন্য জগৎ বোধ বলছি, আমি ছাড়া বাকি

সব কিছু। ইংলিশে ওনারা আই, ইউ, এইভাবে অনুবাদ করেন। কিন্তু এখানে গুরুত্বপূর্ণ হল, এই জিনিসগুলো অনুবাদ দিয়ে হয় না, এটাকে বুঝতে হয়, বোঝার পর ধারণা করতে হয়। প্রত্যেকটি প্রাণীর আমি বোধ আছে, আমি বোধের সাথে সবার জগতের বোধও আছে। আমি ভোক্তা, জগৎ ভোজ্য, জগৎকে আমি আমার পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে ভোগ করছি। আমি তোমার জন্য ভোজ্য, আর তুমি আমার জন্য ভোজ্য। আমার জন্য তুমি হলে তুমি, আর তোমার জন্য আমি হলাম তুমি। আমার জন্য এই মোবাইল ফোন তুমি, কিন্তু মোবাইল ফোনের সেই চেতনা নেই যে, নিজেকে আমি বলবে আর আমাকে তুমি বলবে। আপনার জন্য আমি গুরুত্বপূর্ণ, বাকিটা হল জগৎ। এই যে আমি তুমির বোধ, একটু বিচার করে যদি আমরা দেখি, তাহলে দেখব যে, আমি আর তুমির এই বোধটাকে মেটানো একেবারেই অসম্ভব। একমাত্র অদ্বৈত বেদান্ত ছাড়া এই যুস্মদ্ অস্মদ্ প্রত্যয়কে কেউ মেটাতে পারে না। ভক্তিশাস্ত্রে শেষ পর্যন্ত ঈশ্বর থেকে যাবেন, ভক্তির যত রকম ভাব নিয়ে আসা হোক না কেন, আমি দাস, আমি সন্তান, আমি সখা, তার আমি ঘুচে ঘুচে যত যাই হয়ে যাক, একটু আমি থেকে যায়, ঐ একটু থাকলে আমি তুমি এই বোধটাও থাকবে। একটা এক কোষিকা প্রাণীও জানে আমি এই আর এটা আমার খাবার। একটা গরু বা ছাগল, সেও জানে এটা আমি আর এটা আমার খাদ্য ঘাস। আমরাও জানি এটা জগৎ, যাকে আমি পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে নিচ্ছি, আর কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে এই জগতের উপর ক্রিয়া করছি। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়ে জগৎ থেকে নিচ্ছি, আর পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে জগৎকে ধাক্কা মারছি। ধাক্ক মারছি এই জন্যই যে, সে আমার থেকে আলাদা। যখনই জানছি এটা আমার থেকে আলাদা, তখন সেখানে গিয়ে আমি ধাক্কা মারব। ব্রহ্মসূত্রে এই যুস্মদ্ প্রত্যয় অস্মদ্ প্রত্যয়কে পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন। এটাকেই এবার স্বামীজী তাঁর নিজের মত ব্যাখ্যা করছেন।

Without the ‘I’ there can be no ‘you’ outside, যার আমি নেই, বাইরে তার তুমি কি করে থাকবে! আমরা জানি এই পেনের আমি বোধ নেই, পেনের তাই তুমি বোধও থাকবে না। এমনকি কোমাতে পড়ে থাকা কোন রোগী, ঐ রোগীকে নিয়ে আমরা সব কিছু করতে পারি, তাকে ওষুধ দিতে পারি, তাকে বাতাস করতে পারি, কিন্তু তার আমি বোধ নেই। আমি বোধ নেই, সেইজন্য তুমি বোধটাও নেই। কোমা থেকে সুস্থ হয়ে ফিরে আসার পর বলবে, আমি তো কিছুই জানি না যে, আমি কোমাতে পড়ে ছিলাম। নির্বিকল্প সমাধিতে যদি আমি বোধ চলে যায়, তখন তুমি বোধটাও থাকবে না। অদ্বৈত সাধনায় ঠাকুরের সামনে মা কালী এসে যাচ্ছেন, কারণ তাঁর আমি বোধটা তখনও আছে। যখন নির্বিকল্প সমাধিতে চলে গেলেন, তখন আর মা কালী নেই। কারণ ঠাকুরের আমি বোধ চলে গেছে, আমি বোধ না থাকলে তুমি বোধও থাকবে না। আমি থাকলে তুমি থাকবেই। আমরা যাই করে নিই না কেন, ভক্তির যে পরাকাষ্ঠাতেই যাই না কেন, যে কোন ধর্মের যত উচ্চ অবস্থা আছে, যত উচ্চ অবস্থাতেই চলে যাই না কেন, আমি থাকলে তুমি থাকবেই।

From this some philosophers came to the conclusion that the external world did not exist save in the subject; that the ‘you’ existed only in the ‘I’. (*এই থেকে কতকগুলি দার্শনিক এই সিদ্ধান্ত করলেন যে, ‘আমাকে’ ছাড়া বাহ্য জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। তুমি কেবল ‘আমা’তেই রয়েছে।*) সমস্যা হল, আমি আর তুমিতে যে বিভাজন, আর যেহেতু ‘আমি’ মন দিয়ে আসছে, সেইজন্য জিনিসটাকে বিচার করতে শুরু করলেই অনেক গোলমাল শুরু হয়ে যায়। আমাদের বেদান্তে খুব জোরালো আর স্পষ্ট ভাবে এই জিনিসটাকে রাখা হয়েছে, বৌদ্ধরা অনেক দূর নিয়ে গেছে, জৈনরাও নিয়ে গেছে; তার সাথে পাশ্চাত্যের দার্শনিকরা এবং এমনকি বিজ্ঞানও এটাকে অনেক দূর নিয়ে গেছে। এটাকে আধার করেই কত ‘ism’ এসে গেছে, subjectivism, objectivism, empericism, realism, আর তার মধ্যে subjective-objectivism, কত মতবাদ তৈরী হয়েছে এই একটাকে নিয়ে। ফিলজফার মানেই হয়, যাঁর চিন্তা-ভাবনা খুব সূক্ষ্ম হয়ে গেছে। একাগ্র মন খুব শক্তিমান। শক্তিমান মন মানেই একাগ্র মন। একাগ্র মন ও শক্তিমান মন মানেই সূক্ষ্ম মন। ফিলজফারদের মন খুব সূক্ষ্ম হয়। তেমনি বৈজ্ঞানিকদের মনও খুব সূক্ষ্ম হয়, যার জন্য এনারা বিমূর্ত জিনিসকে নিয়ে চিন্তা করতে পারেন, যে জিনিসটা নেই, সেই জিনিসটাকে তাঁরা মনের জগতে নিয়ে দাঁড় করাতে পারেন। মন সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতম হোক আর স্থূল থেকে স্থূলাতিস্থূল হোক, মন থাকা মানেই আমি আছি। আমি থাকলে তুমি থাকবে, এরপর আমি আর তুমির এই ধাঁধা

যখন আসবে তখন আমরা এর সমাধান বার করার চেষ্টা করবই করব। সেইজন্য যে কোন ফিলজফার তাঁর আলোচনায় আমি আর তুমির সম্পর্ককে কোন না কোন ভাবে আনবেনই আনবেন।

কিছু ফিলজফার আবার বলছেন, তুমি বলে কিছু নেই, যা আছে আমি। সত্যিই তাই, কারণ যা কিছু হচ্ছে সব মনেই হচ্ছে। চোখ বুজলে মনও নেই, সংসারও নেই, স্মৃতিতে যতটুকু আছে। তাতে অনেকে মনে করেন, জগৎ বলে কিছু নেই, জগৎ হল মনে। ফিলজফারদের মধ্যে তর্কবিতর্ক হওয়া মানেই খুব উচ্চস্তরের তর্কবিতর্ক। এই রকম একটা বিতর্কে একজন ফিলজফার খুব যুক্তি দিয়ে বললেন জগৎ বাইরে নেই, সবটাই ভিতরে। তখন আরেকজন বলছেন, 'ঐ যে পাথরটা দেখছ, ঐ পাথরটা তোমার বাইরে না ভিতরে'। 'অবশ্যই আমার ভিতরে'। 'এতে তুমি বলতে চাইছ, তোমার মাথাটা একটা পাথর'। রাজযোগে স্বামীজীও বলছেন, বাইরে জগৎ অবশ্যই আছে, কিন্তু জগৎ আমাদের suggestions দেয়, সেই suggestionটা আমাদের ভিতরে গিয়ে আমাদের মনের জগৎকে on করে দেয়। এটা গেল subject object relationship। আমরা স্বামীজীর ভক্ত আমরা এক বাক্যে স্বামীজীর কথা মেনে নেব, কিন্তু ফিলজফাররা অত সহজে ছেড়ে দেবেন না। ঠাকুর, স্বামীজীকে নিয়ে এখনও বিতর্ক শুরু হয়নি। ফিলজফাররা যখন আক্রমণ করতে শুরু করবেন, তখন বোঝা যাবে কোথায় দাঁড়াচ্ছে। স্বামীজী এখানে বলছেন, কোন কোন ফিলজফাররা মনে করেন জগৎ বলে কিছু নেই, যা আছে সব মনে। স্বপ্নে যেমন আমরা বিভিন্ন বস্তু দেখি, স্বপ্নের সেই বস্তুগুলির আসলে কোন অস্তিত্বই নেই। ঠিক তেমনি একটা বিশ্বমন আছে, ঐ বিশ্বমনের মধ্যে সব কিছু চলছে, ঐ বিশ্বমনের মধ্যে তার চিন্তা-ভাবনাগুলি খেলা করছে আর সেই চিন্তা-ভাবনাগুলির মধ্যেই এগুলো চলছে।

Others have argued that the 'I' can only be known through the 'you' and with equal logic, (*অপরে আবার ঠিক এর বিপরীত তর্ক করে প্রমাণ করবার চেষ্টা করছেন যে, 'তুমি' না থাকলে 'আমার' অস্তিত্ব প্রমাণই হতে পারে না।*) যেমন প্লেটো আর এ্যরিস্টটল, প্লেটো হলেন পুরো subjectivism, এ্যরিস্টটল হলেন তার বিপরীত objectivism। অথচ ওনারা দেখালেন, আমিকে যদি জানতে হয় তাহলে জগৎকে তোমার জানতে হবে। খ্রীশ্চান দুনিয়ায় যে থিওলজি দাঁড় করিয়েছে, তাতে ওদের সমস্ত মত, তর্ক করার স্টাইল সব কিছু এ্যরিস্টটল থেকে নিয়েছে। পরে যখন গ্যালিলিওরা এ্যরিস্টটলের মডেল মানতে রাজী হলেন না, তখন বিবাদ লেগে গেল। প্লেটোর চিন্তাধারা ও এ্যরিস্টটলের চিন্তাধারা পুরো বিপরীত, যদিও দুজনে গুরুশিষ্য। কিন্তু ওখানেই এই বিবাদ সীমাবদ্ধ থাকছে না, ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপে যে দর্শনের আবির্ভাব হয়, সেখানেও তাঁরা নানা রকমের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আসতে শুরু করলেন। এক অপরের সাথে যুক্তিতর্ক করতে গিয়ে এনাদের যুক্তিগুলো অত্যন্ত সূক্ষ্ম হতে শুরু হল। ফিলজফির খুব ভাল ছাত্র না হলে যুক্তিগুলো বুঝতেই পারবে না, এনারা কি বলতে চাইছেন।

তারপর স্বামীজী বলছেন, These two views are partial truths, each wrong in part and each right in part. (*এই দুটো মতই আংশিক সত্য – খানিকটা সত্য, খানিকটা মিথ্যা।*) এই জিনিস শুধু যে দর্শনের ক্ষেত্রেই হয় তা না, অন্যান্য লাইনেও হয়; বিশেষ করে ফিজিক্সে অনেক সময় একটা থিয়োরী এলো, তাকে আরেকটা থিয়োরী এনে ভুল প্রমাণিত করে। প্রথমে বোঝা যায় না কে ঠিক, পরে যখন পরীক্ষার দ্বারা ফল আসে, তখন বোঝা যায়, ইনি কিছুটা ঠিক, উনি কিছুটা ঠিক; ইনিও কিছুটা ভুল, উনিও কিছুটা ভুল। সেখান থেকে আবার একটা নূতন থিয়োরী বেরিয়ে এলো। স্বামীজীর যে নিজের মত বলছেন তা না, পাশ্চাত্য জগতেও এই চিন্তা-ভাবনা ছিল। এরপর স্বামীজী সমন্বয় করছেন, Thought is as much material and as much in nature as body is. (*দেহ যেমন জড় ও প্রকৃতির উপাদানে গঠিত, চিন্তাও তাই।*) এই প্রকৃতিতে শরীর আছে, বস্তু আছে, এই জগতে চিন্তা-ভাবনাও আছে। এই মাইক্রোফোন প্রকৃতিতেই আছে, আমি আপনি মাইক্রোফোনকে যা ভাবছি, সেই ভাবনাটাও এই প্রকৃতিতেই আছে। তার মানে এই মন যে প্রকৃতিতে আছে, সেখানে পদার্থও আছে। Both matter and mind exist in a third, a unity which divides itself into the two. This unity is the Atman, the real Self. (*জড় ও মন উভয়ই একটা তৃতীয় পদার্থে অবস্থিত – এক অখণ্ড বস্তু আপনাকে দু-ভাগ করে ফেলেছে। এই এক অখণ্ড বস্তুর নাম 'আত্মা'।*) গীতার সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান পরা প্রকৃতি ও অপরা প্রকৃতির কথা বলছেন। পরা প্রকৃতিকে শুদ্ধ

আত্মা বলছেন, যেটা মানুষের ভিতরে থাকে। অপরা প্রকৃতিটাই হল জগৎ। স্বামীজী এখানে পরা প্রকৃতি ও অপরা প্রকৃতির দিক থেকে বলছেন না, তিনি মন আর পদার্থকে নিয়ে বলছেন। এই দুটো আলাদা সত্তা, কিন্তু দুটোর মিলন একটা জায়গায় হয়, সেটাই আত্মা। ঐ আত্মা যখন নিজেকে দুটো ভাগে বিভাজন করে, তখন তার সূক্ষ্ম রূপটা হল মনের জগৎ, যেখানে চিন্তা-ভাবনা হয় আর তার স্থূল রূপটা হল এই স্থূল জগৎ - সূক্ষ্ম জগৎ আর স্থূল জগৎ। কিন্তু দুটো জগতের বাস্তবিক কোন তফাৎ হতে পারে না, এইজন্যই বাস্তবিক আলাদা হবে না, কারণ দুটোই একটা জায়গা থেকেই বেরিয়েছে।

তন্মাত্রা নিয়ে আলোচনা করার সময় আমরা বলেছিলাম, প্রকৃতি থেকে বিশ্বমন আর বিশ্বমন থেকে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটা সূক্ষ্ম তন্মাত্রা বেরিয়ে আসে। আমরা এখানে রূপ তন্মাত্রাকে নিচ্ছি। বেদান্তের মতে রূপ তন্মাত্রা প্রত্যেকটি বস্তুর মধ্যে থাকবে। এই মাইক্রোফোনের মধ্যেও রূপ তন্মাত্রা রয়েছে। আর আমাদের চোখেও রয়েছে রূপ তন্মাত্রা। চোখ আমাদের ইন্দ্রিয়, আর মাইক্রোফোন একটা বস্তু। মাইক্রোফোন যে রূপ তন্মাত্র ছাড়ছে, আমার চোখ রূপ তন্মাত্রা দিয়ে তৈরী, সেই চোখ মাইক্রোফোনের রূপ তন্মাত্রাকে ধরছে। রূপ তন্মাত্রা দিয়ে যখন ইন্দ্রিয় তৈরী হয়, আমরা এটাকে বলছি চোখ, আর রূপ তন্মাত্রা যখন বস্তুরূপে আসে, তখন তাকে বলছি অগ্নিতত্ত্ব। যেখানেই প্রকাশ সেখানেই অগ্নিতত্ত্ব আছে বুঝতে হবে। তার মানে, অগ্নি তত্ত্ব যা, রূপ তাই, চোখও তাই। রূপ তন্মাত্রা দুটোর মধ্যে থাকার জন্য, দুটো পরস্পর তেল আর জলের মত মিলে যায়। দুটো আলাদা পাত্রে তেল-জলের মিশ্রণ রাখা হয়েছে, এরপর দুটো পাত্রের মিশ্রণকে একটা পাত্রে ঢেলে দিলে, তেল তেলের দিকে চলে যাবে, জল জলের দিকে চলে যাবে। যে কোন রূপকে আমরা একমাত্র চোখ দিয়েই দেখতে পারব, কারণ চোখ রূপ তন্মাত্রা দিয়ে তৈরী। এই দুটোরই মিলন হয় উপরে বৈষয়িক অহঙ্কারে গিয়ে। অহঙ্কারের উপরে হল মন, এই মন আর জগৎ মেলে আত্মাতে গিয়ে। স্বামীজী এখানে অন্য ভাবে বলছেন, আত্মা যেন নিজেকে দুটো রূপে বিভক্ত করে সামনে রাখছে – সূক্ষ্ম রূপ আর স্থূল রূপ। এরপর স্বামীজী আরও বিস্তারে বলছেন –

There is being, 'X', which is manifesting itself as both mind and matter. (*সেই মূল সত্তা যেন 'ক', সেটিই মন ও জড় – উভয়রূপে নিজেকে প্রকাশ করছে।*) সেই আত্মাই, নিজেকে কখন মন রূপে অর্থাৎ সূক্ষ্ম রূপে আবার কখন জড় রূপে অর্থাৎ স্থূল রূপে আমাদের সামনে আসছে। দর্শনে একটা খুব আলোচিত বিষয় হল – একটা সাধারণ ভিত্তি যদি না থাকে তাহলে একটা জিনিসকে ধরা যাবে না। যে কোন জিনিসকে ধরতে গেলে, প্রথম কথা যে ধরছে তাকে আরও সূক্ষ্ম ও শক্তিশালী হতে হবে। শক্তিশালী না হলে ধরতেই পারবে না। আর শক্তিশালী হওয়া মানেই সূক্ষ্ম হওয়া। মন একদিকে শক্তিশালী আবার মন সূক্ষ্ম জগতের। অন্য দিকে একটা জিনিসকে অপরকে দিয়ে যখন ধরা হচ্ছে তখন দুটোকে একই হতে হবে। দুটো এক না হলে কক্ষণ ওটাকে মেলানো যাবে না। জলের সাথে জল মিলিয়ে দিলে দুটো মিলে জলই হয়ে যাবে। জল আর তেল দুটো আলাদা বলে মিশবে না। ঠিক তেমনি হাত দিয়ে বাতাসকে ধরা যাবে না, হাত আর বাতাসের প্রকৃতিই আলাদা। সেইজন্য মন যখন জড়কে ধরতে পারছে, তখন বুঝতে হবে মন আর জড়ের কোথাও একটা মিল আছে। এই জিনিসটাকে নিয়ে হিন্দু ধর্মের দর্শন অনেক দূর এগিয়ে গেছে। হিন্দু ধর্মের দর্শন দেখিয়ে দিচ্ছে, আসলে মন আর জড় একই জিনিস, কিন্তু দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে এক অপরকে গিয়ে আবার ধরছে। সেইজন্য অনেকে মনকে জড় রূপে দেখে, অনেকে জড়কে মন রূপে দেখে।

এরপর আরও মজার বলছেন, Its movements in the seen, are along certain fixed line called law. (*এই পরিদৃশ্যমান জগতে এর গতি কতকগুলি নির্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করে হয়ে থাকে, সেইগুলিকেই আমরা 'নিয়ম' বলি।*) জগৎ যে গতির উপর চলছে, ফিজিক্সে নিউটনের যে নিয়মগুলি আছে, এটাকেই আমরা নিয়ম বলছি। সেই আত্মাই বস্তু হয়ে এই জগতে আছে। বস্তুগুলি যে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরে যাচ্ছে, ওর একটা নির্দিষ্ট লাইন আছে, ওটাকেই আমরা নিয়ম বলছি। কিন্তু, As a unity, it is free; as many, it is bound by law. (*এক অখণ্ড সত্ত্বা-রূপে তা মুক্ত স্বভাব, বহু-রূপে সেটি নিয়মের অধীন।*) সেই এক যখন বহু হয়ে যায় তখন সে নিয়মে বাঁধা। নিয়মে বাঁধা মানে, বেদে এর শব্দটা হল ঋতম্। ভগবান সৃষ্টি করে সৃষ্টিতে তিনি কতকগুলি বিধান ঠিক করে দেন, ভগবানের বিধানকেই

ঋতম্ বলা হয়। সেই ঋতমই জগতের ক্ষেত্রে এসে হয়ে যায় ফিজিক্সের নিয়ম, কেমেস্ট্রির নিয়ম, বায়োলজির নিয়ম, বিভিন্ন নিয়ম হয়ে যায়। কিন্তু বহু-রূপে আছে বলে এই নিয়মে সে বাঁধা, কিন্তু যখন অখণ্ড সত্ত্বা-রূপে থাকেন, তখন না আছে কোন গতি, না আছে কোন নিয়ম। আমরা জগতে বহু দেখছি, আমি তুমির ভেদ দেখছি, সেইজন্য আমরা নানা রকমের নিয়মে বাঁধা। কি রকম নিয়ম? জন্মেছি, মরতে হবে; জন্মেছি, আমার রোগ শোক হবে, দুঃখ-কষ্ট হবে; এই রকম সব নিয়মে বাঁধা।

Still, with all this bondage, an idea of freedom is ever present, and this Nivritti, or the 'dragging from attachment'. (*তথাপি এই বন্ধন সত্ত্বেও আমাদের ভিতর একটা মুক্তির ধারণা সদাসর্বদা বর্তমান রয়েছে, এরই নাম নিবৃত্তি অর্থাৎ 'আসক্তি ত্যাগ করা'।*) নিবৃত্তি মানে, যত রকম আসক্তি গুলি আছে, সব আসক্তি থেকে সরে আসা। আমরা যেটাকে 'world view' বলি, জীবন কি, জগৎ কি; যদি বিজ্ঞানের জার্নাল গুলি পড়া হয়, তাহলে দেখতে পাবো, এর উপর রোজ নূতন নূতন থিয়োরী আসছে। বেশির ভাগ থিয়োরীগুলি আগে কেউ কখন বলেছিলেন, আবার সেই থিয়োরী আসছে, কিন্তু এমন পরিবর্তিত হয়ে আসছে যে, বোঝা যাবে না যে ওটা পুরনো থিয়োরী। যেমন এখন একটা থিয়োরী হল, প্রত্যেকটি এ্যাটমের একটা বোধ আছে, বোধটা অত্যন্ত ক্ষুদ্র মানের, কিন্তু বোধ আছে। ঐ ক্ষুদ্র বোধটা যখন মানুষের মধ্যে আসে, তখন সেটা মন রূপে আসে। তবে এত রকমের থিয়োরী আছে আর থিয়োরী এত পাল্টায় যে কারুর পক্ষে সব কিছু মনে রাখাও সম্ভব না। আবার একটা থিয়োরীতে বলছে, প্রত্যেকটি যে এ্যাটম, তার একটা স্মৃতি আছে। এই ধরণের থিয়োরীকে আধার করেই বক্তারা এখন Vedanta and Scienceএর উপর লেকচারে বিচিত্র বিচিত্র রকমের থিয়োরী দাঁড় করাচ্ছেন। এনাদের একটা থিয়োরীতে বলতে শুরু করলেন, electron is conscious, কিন্তু তা কখনই সম্ভব নয়। আবার একটা থিয়োরী হল, দুটো পার্টিকেলস্ এক সঙ্গে ছিল, একটা সময় আলাদা হয়ে গেছে। এখন একটা পার্টিকেলের যদি কিছু করা হয়, অন্য পার্টিকেলেরও পরিবর্তন হয়। এই যে information travelling, বিজ্ঞানের কাছে এখনও বিরাট ধাঁধা। আরও যখন বিজ্ঞান উন্নত হবে তখন হয়ত তাঁরা উত্তর পাবেন।

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি দুটো এক সঙ্গেই থাকে

স্বামীজী যে view নিয়ে আসছেন, যদিও বেদান্ত এত রকম কথা বলে না, স্বামীজী বারবার বলতেন, প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে দুটো জিনিস সব সময় থাকছে – প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি দুটো একসঙ্গেই থাকে। উনি উদাহরণ নিয়ে আসছে, যে কোন জিনিস যখন ঘোরে, তাতে দুটো শক্তি সব সময় একসঙ্গে কাজ করছে, একটা শক্তি তাকে সব সময় বাইরের দিকে টানছে, আরেকটা শক্তি তাকে কেন্দ্রের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ঠিক সেই রকম মানুষের ভিতরেও প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই দুটো একসাথে থাকে। যে শক্তি তাকে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায়, সেটা নিবৃত্তি, আর যেটা ঈশ্বর থেকে দূরে নিয়ে যায়, সেটা প্রবৃত্তি। অন্য দিকে আমরা দেখছি, প্রবৃত্তি থাকলেই নিবৃত্তি থাকবে। যেমন আমরা এখন এখানে দেববাণীর আলোচনা শুনছি, এখন আমরা আলোচনা শোনাতে প্রবৃত্ত; আলোচনা শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমরা বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য প্রবৃত্ত হব। তার মানে, লেকচার শোনা থেকে নিবৃত্ত হলাম বলেই বাড়ি ফেরার জন্য প্রবৃত্ত হলাম। একটা থেকে নিবৃত্তি না হলে প্রবৃত্তি হবে না। কিন্তু যেখানে পুরোটাই নিবৃত্তি, সেখানে প্রবৃত্তি থাকে না। সন্ন্যাসী সব কিছু ছেড়ে দিয়েছেন, তিনি এখন অন্য কোন কিছুতে প্রবৃত্ত হবেন না। আমরা বলতে পারি, তিনি তো ভগবানের দিকে যাচ্ছেন। না, ভগবানে তো তিনি প্রতিষ্ঠিত আছেন, ভগবানে প্রতিষ্ঠিত বাদে যাবতীয় যা কিছু আছে, সব তিনি ছেড়ে দিয়েছেন, তার মানে স্থির। স্থির হয়ে তিনি বাকি জিনিসগুলি ছেড়ে দিচ্ছেন। প্রবৃত্তিতে চলছে বলার অর্থ, এই চলার মধ্যে একটা জিনিসকে ছেড়ে আরেকটা জিনিসে প্রবৃত্ত হচ্ছে। স্বামীজী এই ধারণাটা নিয়ে এসেছিলেন, যেটা সরাসরি বেদান্তে নেই। আচার্য শঙ্করও বলছেন, মানুষ যে ধর্মের অনুশীলন করে, সেই ধর্ম দুই প্রকার, প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম ও নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম। প্রবৃত্তি মানে যখন একটা কিছুতে লেগে আছে, নিবৃত্তি মানে যখন এই লেগে থাকা থেকে সে সরে আসছে।

স্বামীজী বলছেন, আসলে আমরা স্বরূপতঃ আত্মা, সেই আত্মা বস্তু আর মন হয়ে আলাদা হয়ে গেছে, যিনি এক তিনি বহু হয়ে গেছেন। বহু হয়ে যাওয়ার পরেও তাঁর মনে কোথাও আত্মার ব্যাপারে একটা ক্ষীণ

স্মৃতি থেকে যায়। এটাকে নিয়ে ফিলজফিতে একটা বিরাট বড় সমস্যা হয়। যে জিনিসটাকে মানুষ জানে না, সেই জিনিসের দিকে মানুষ যাবে কেন? যেমন একটা শব্দ শুনছি পিৎজা, কিছু দিন আগে লোকেরা জানতই না পিৎজা কি, কিন্তু সবাই এখন পিৎজা খেতে শুরু করেছে। পঞ্চাশ বছর আগে গ্রামের কোন ছেলে যদি বাবা-মার কাছে আবদার করত, আমি পিৎজা খাবো, বাবা-মা শুধু না, গ্রামের কোন লোক বুঝতেই পারত না, ছেলে কি বলছে। কেউ শোনেনি, জানেও না যে, এটা কি জিনিস। একটা খাদ্যের স্বাদ কেমন হবে যদি জানা না থেকে, আমি কেন সেই খাবারের দিকে যাবো? ফিলজফিতে এটা একটা খুব মারাত্মক প্রশ্ন। যে জিনিসটার ব্যাপারে কোন ধারণা নেই, জানি না, সেই জিনিসের দিকে আমি যাবো কেন? মানুষ রসের পিছনে দৌড়ায়। এমনি এমনি কেউ সিগারটে খেতে শুরু করে না। কাউকে সে সিগারেট খেতে দেখেছে, দেখে তার মনে একটা দাগ কেটেছে। দ্বিতীয়বার কেন খায়? কারণ প্রথমবার সে খেয়েছে বলে। প্রথমবার কেন খায়? প্রথমবার কেউ খায় না। প্রথমবার কেউ তাকে ধরাচ্ছে। একটা স্বাদ পেয়ে গেছে বলেই মানুষ সিগারেট খেতে যায়, মদ খেতে যায়। স্বাদ যদি জানা না থাকে, কেউ কক্ষণ সেই জিনিসের দিকে যাবে না। ঈশ্বরকে নিয়ে আমাদের কাছে যতই লেকচার দেওয়া হোক, যতই ঠাকুর আসুন, আমরা কোন অবস্থাতেই ঈশ্বরের দিকে যাবো না, যতক্ষণ না ঈশ্বরের ব্যাপারে একটা বোধ থাকছে, অন্ততঃ একটা ক্ষীণ স্মৃতি থাকতে হবে। ইদানিং কালে অনেক সময় খবরে দেখা যায়, একজন অনেক ছোটবেলায় হারিয়ে গিয়েছিল। হারিয়ে যাওয়ার পর, কিভাবে কিভাবে এই দেশ, সেই দেশ ঘুরে ঘুরে কিভাবে বিদেশে চলে গেছে। কিন্তু তার ভিতরে একটা খুব হাল্কা স্মৃতি আছে যে, যেখানে খেলা করত সেখানে পাতকুয়া ছিল, পাশে একটা রেললাইন ছিল। টুকরো টুকরো কয়েকটা স্মৃতিকে ভিত্তি করে গুগুলসে সার্চ করে বার করে নিল যে, এই বাড়ির একটা বাচ্চা হারিয়ে গিয়েছিল। তারপর দেখা গেল লোকটির সাথে ঐ বাড়ির অনেক জেনেটিক মিল আছে। ছোট্ট কয়েকটা স্মৃতির টুকরোকে জোড়া লাগিয়ে লাগিয়ে আসল জায়গায় পৌঁছে গেল। ঠিক সেই রকম, আমরা বহু হয়ে গেছি ঠিকই, কিন্তু আত্মার স্মৃতিটা অত্যন্ত ক্ষীণ ভাবে থেকে গেছে। তারপর কোন সাধু, মহাত্মার কাছে কিছু কথা শুনল, বা শাস্ত্র পড়ল, তখন দেখে যে, অনেক কিছু মিলে যাচ্ছে। সেখান থেকে একটু সংস্কার তৈরী হল। দশ জন্ম ধরে একটু একটু করে সংস্কার জমল, এরপর আরও কয়েক জন্ম পার করে চেতনা একটু জাগ্রত হল। তখন বলছে, আমার মনে হচ্ছে এই রকম কিছু একটা আছে। এরপর সে তেড়েফুড়ে সেটার দিকে এগিয়ে যায়।

তাহলে এখন এই মুহুর্তে আমরা কি করছি? কিছুই করছি না। আমরা ঐ ক্ষীণ স্মৃতিটাকে আরেকটু স্পষ্ট করার চেষ্টা করছি মাত্র। আদালতে জজ সাহেব যেমন বলে, স্মৃতিতে জোর দিয়ে বল, তখন কি হয়েছিল। কিন্তু আমাদের স্মৃতি এত আবছা যে, কিছুই মনে আসতে চায় না। ঐ স্মৃতিকে বীজরূপে নিয়ে নূতন করে তৈরী করতে হবে। স্বামীজী এটাই বলছেন, টেনে আসক্তি থেকে বার করে নিয়ে আসছে, this Nivritti, or the 'dragging from attachment'। এই যে আমরা দুপুরের ঘুম ছেড়ে, আলস্য ত্যাগ করে, আমোদ আহ্লাদ ছেড়ে এখানে স্বামীজীর দেববাণী শুনছি, কিছু একটা অন্য জিনিস আছে, যেটা আমাদের টেনে এখানে নিয়ে আসছে – এটাই নিবৃত্তি।

The materializing forces which through desire lead us to take an active part in worldly affairs are called Pravritti. (*আর বাসনাবশে যে-সব জড়ত্ববিধায়িনী শক্তি আমাদের সাংসারিক কার্যে বিশেষভাবে প্রবৃত্ত করে, তাদেরই নাম প্রবৃত্তি।*) নিবৃত্তির ঠিক উল্টো প্রবৃত্তি, কিন্তু একই শক্তি। স্থূল রূপে আমাদের মনের মধ্যে কামনা জাগে, ঐ কামনা আমাদের জগতের মধ্যে টেনে নামিয়ে দেয়; এটাকেই বলছেন প্রবৃত্তি। তাহলে প্রবৃত্তি–নিবৃত্তি কি? আসলে একই জিনিস সেই আত্মাই যখন বহু হয়ে যান, একজন আরেকজনকে ভালবাসে, একটা ইয়ং ছেলে একটা ইয়ং মেয়েকে ভালবাসে। কেন ভালবাসে? এর অনেকগুলো ব্যাখ্যা আছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি এক রকম বলছেন, অন্যান্য অনেক কাহিনীতে অন্য অনেক রকম ব্যাখ্যা আছে। বেদান্তের অত্যন্ত সাধারণ দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যাবে, ছেলেটি জানে, আমি আলাদা, মেয়েটি আলাদা। আমাকে মেয়েটির সাথে কে জুড়ে দিচ্ছে? আমার কামনা। মাঝখান থেকে দেখা গেল, সামনে যে আছে তার মধ্যে কোন কামনা নেই। এবার সমস্যা, ঝামেলা শুরু হবে, যার জন্য চারিদিকে এত বাঁদরামো, বদমাইশি হচ্ছে। আমি চাইছি, তুমি চাইছো না, ঠিক আছে এই তোমার মুখে আমি এ্যাসিড ছুঁড়ে দিলাম। যত রকম গা-জোয়াড়ি হয়, তা হয় একমাত্র কামনার জন্য। আজকাল সোশ্যাল নেটওয়ার্ক,

ইন্টারনেটের দৌলতে কত কিছু হচ্ছে। একটা ছেলে একটা মেয়ের সাথে নেটে খুব চ্যাটিং করে যাচ্ছে। কেউ কাউকে চেনে না। একদিন দুজনে একটা জায়গায় মিট্ করবে। মিট্ করতে গিয়ে দেখছে, দুজনে ভাইবোন। এরপর কি হবে? তার সমস্ত কামনা-বাসনা উড়ে যাবে? কর্ণের সাথে পাণ্ডবদের কি প্রচণ্ড শত্রুতা। পাণ্ডবরা যখন জানতে পারল, কর্ণ তাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, তখন সবাই হতবাক হয়ে গেছে। বলছেন, আগে জানলে আমরা এমনিই রাজ্য দিয়ে দিতাম, কর্ণকে রাজা বানিয়ে আমরা তাঁর আজ্ঞা পালন করতাম। আবার অন্য রকমও আছে। কর্ণ জেনে গেছে পাণ্ডবরা আমার ভাই, কিন্তু তখনও বলছে, আমার লড়াই অর্জুনের সাথে। আমি রাজ্য চাই না, আমার একত্ব দুর্যোধনের সাথে, এরপর যাই হয়ে যাক, আমি দুর্যোধনকে কখনই ত্যাগ করে পাণ্ডবদের সাথে থাকতে পারব না। আগেকার দিনে গ্রীক ও ফরাসী কাহিনীতে পিতা-পুত্রের লড়াই নিয়ে অনেক সাহিত্য রচিত হয়েছে। হঠাৎ বাবা জানতে পারল এই লড়াই আমার ছেলের সাথে হতে যাচ্ছে, এরপর বাবা পিছিয়ে যাচ্ছে। যেমনি একত্ব চলে আসে তখন ইমোশানগুলি অন্য রকম ভাবে পাল্টে যায়। এর কাছ থেকে আমি সব কেড়ে নেব। কিন্তু যখন জানতে পারল সে আমার লোক, তখন সম্পূর্ণ অন্য রকম হয়ে যাবে। আমাদেরও অনেকের উপর রাগ থাকে, বিদ্বেষ ভাব থাকে, কারণ তখনও জানছি যে, সে আলাদা আমি আলাদা। যখন জেনে যাবো আমি আর সে এক, যখন জ্ঞান হয়ে যাবে, আমিও যা সেও তাই, তখন আর রাগ বিদ্বেষ কোথায় থাকবে! ঈশাবাস্যোপনিষদে এটাই বলছেন, *তত্র কো মোহ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতে*। যখন একত্বের জ্ঞান হয়ে গেল, জেনে গেল সবাই এক, তখন কিসের লড়াই, কিসের ঝগড়া, কিসের বিবাদ।

স্বামীজী এই জিনিসটাকে এক ধাপ পিছনে নিয়ে গিয়ে এটাই বলছেন, আসলে আমরা এক, এই স্মৃতিটা কোথাও আমাদের থেকে যায়। কিছু কিছু দর্শনেও এই ভাব পাওয়া যাবে। এই স্মৃতিটা আছে বলেই, আমরা কোন না কোন ভাবে ঈশ্বরের দিকে এগোতে চাই। That action is moral which frees us from the bondage of matter and vice versa. (*সেই কাজকেই নীতিসঙ্গত বা সৎ কর্ম বলা যায়, যা আমাদের জড়ের বন্ধন থেকে মুক্ত করে, তার বিপরীত যা, তা অসৎ কর্ম।*) আমাদের কাছে নৈতিকতা মানেই নিবৃত্তি, যা কিছু আমাদের জগতের আকর্ষণ থেকে টেনে বার করে আনছে, এটাই নৈতিকতা। যা কিছু আমাদের জগতের ভোগ-বাসনার মধ্যে আরও ডুবিয়ে দিচ্ছে, এটাই অনৈতিকতা। আমরা শুনে আসছি, অপরকে কষ্ট না দেওয়া পূণ্য, পরকে ঠকানো, অপরের জিনিস না বলে নেওয়া, এগুলো পাপ। বিভিন্ন ধর্মে এই ধরণের নৈতিক ও অনৈতিক কর্মের একটা লম্বা তালিকা তৈরী করে দেয়। ভগবান বলে দিয়েছেন, এই কাজ করা পাপ, এই কাজ করা পূণ্য। আগেকার দিনে ব্রাহ্মণদের এটাই কাজ ছিল, কোন কাজ করলে পাপ হবে আর কোন কোন কাজ করলে পূণ্য হবে, শাস্ত্রের বিধান অনুসারে এগুলো বিচার করতেন। রাস্থা দিয়ে যেতে যেতে থুতু ফেললাম, এক ফোঁটা থুতু একটা গাছের পাতায় পড়ে গিয়েছিল, এটা পাপ না পূণ্য হবে; এবার এটাকে নিয়ে ব্রাহ্মণরা বিচার করতে বসে গেলেন। বেদান্তের এত কিছু সমস্যা নেই, বেদান্তের খুব সহজ সমাধান, তোমার মন কি জগতের দিকে আরও আকৃষ্ট হচ্ছে, না কি জগৎ থেকে বেরিয়ে আসছে। যদি জগৎ থেকে বেরিয়ে আসে, তাহলে তুমি নিবৃত্তির দিকে যাচ্ছ। একজন এসে বলছে, 'আমি কিন্তু আপনার থেকে বড় সন্ন্যাসী'। 'কি করে বড় সন্ন্যাসী'? 'আমি বিয়ে করেছিলাম, তিন দিনের মধ্যে আমার বৈরাগ্য এসে গেছে, এবার আমি সন্ন্যাসী হব'। 'আমাদের এখানে এই রকম সন্ন্যাস হয় না। তোমার স্ত্রীর কি হবে'? 'কেন, ও সারদা মিশনে সন্ন্যাসীনি হবে'। এগুলো কোন ত্যাগ না, এগুলো কপটতা, বদমাইশি। একটা বস্তু থেকে তোমার বৈরাগ্য হয়েছে ঠিকই, কারণ প্রবৃত্তি যখন হবে, তখন আগে তাতে নিবৃত্তি হবে। এখন নিবৃত্তি হয়েছে, এবার ঠিক জায়গায় গিয়ে পড়লে প্রবৃত্তিতে পড়ে যাবে; এগুলোকে বৈরাগ্য বলে না। এগুলো momentarily হয়ে যায়, কোন কারণে একটা জিনিস থেকে সরে আসছে। কিন্তু যখন পুরো জিনিসটা থেকেই সরে গেল, এটাই ঠিক ঠিক নিবৃত্তি।

সংসারে বিশ্রাম বা শান্তি নেই, মুক্তিই একমাত্র লক্ষ্য

This world appears infinite, because everything is in circle, it returns to whence it came. The circle meets, so there is no rest or peace here in any place. We must get out. Mukti is the one end to be attained. (*এই জগৎপ্রপঞ্চকে অনন্ত বোধ হচ্ছে, কারণ এর মধ্যে সব জিনিস চক্রগতিতে চলছে; যেখান থেকে এসেছে, সেইখানেই ফিরে আসছে। বৃত্তের*

রেখাটি বর্ধিত হয়ে আবার নিজের সঙ্গে মিলে যায়, সুতরাং এখানে – এই সংসারে – কোনখানে বিশ্রাম বা শান্তি নেই। এই সংসার-বৃত্ত থেকে আমাদের বেরুতেই হবে। মুক্তিই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য – একমাত্র গতি।) এটাও স্বামীজীর একটা মত। যখন স্বামীজী এই কথা বলছেন, তখনও এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে নিয়ে খুব পরিষ্কার ধারণা ছিল না। পৃথিবীকে নিয়ে আমরা জানি, পৃথিবী গোল, এটাকে অনন্ত দেখায়, কারণ এটা একটা circle। একটা বৃত্ত বাধিত কিন্তু অনন্ত। মহাকাশ অনন্ত, কিন্তু এটা বাধিত। আমরা ঘুরতে থাকলে কোন দিন এই বৃত্ত থেকে বেরুতে পারব না। এই সংসার অনন্ত, কারণ সংসারের সব কিছু চক্রগতিতে চলছে। চক্রগতিতে যদি না চলত, তাহলে একে অনন্ত বলে বোধ হত না। কেউ যদি মনে মনে ভেবে থাকে, সংসারে আমি নানান রকম ভোগ করে এখান থেকে বেরিয়ে আসব, কোন দিন সে বেরিয়ে আসতে পারবে না। কারণ জগৎটা একটা চক্রগতিতে ঘুরছে, এখানে ঘুরতেই থাকবে, কোন দিন বেরোতে পারবে না। কিন্তু যে করেই হোক আমাদের এই চক্র থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

মনের প্রবণতার পরিবর্তন হয় না, শুধু রূপ পাল্টায়

Evil changes in form but remains the same in quality. (*মন্দের কেবল আকার বদলায়, কিন্তু তার গুণগত কোন পরিবর্তন হয় না।*) যে জিনিসগুলিকে আমরা মন্দ বলছি, বাজে বলছি, এর রূপ বদল হয়, আসলে একই থাকে। একজন রাজার কাছে এক সন্ন্যাসী গিয়ে বলছেন, আর কত সংসারে থাকবেন, এবার সংসার ছেড়ে চলুন। রাজা সন্ন্যাসীকে বলছে, সব ছেড়ে আমি জঙ্গলে গেলে সেখানেও একটা সাম্রাজ্য দাঁড়িয়ে যাবে। রাজার মনের প্রবণতা কোন দিন পাল্টাবে না। ঠিক তেমনি যে জিনিসগুলিকে আমরা বাজে মনে করছি, তার রূপ বদলাতে থাকে। In ancient times force ruled, today is cunning. (*প্রাচীনকালে যার শক্তি ছিল সেই শাসন করত; এখন ধূর্ততা শক্তির স্থান অধিকার করেছে।*) অন্যকে আমি দাবিয়ে রাখব, সবাইকে আমার মুঠোর মধ্যে রাখব, মানুষ কিছুতে এই মনোভাব থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। Erich Fromm একজন একাধারে নামকরা লেখক, মনস্তাত্ত্বিক ও দার্শনিক ছিলেন, ওনার খুব নামকরা একটা বইয়ের নাম, ‘Fear of Freedom’। সেখানে তিনি দেখাচ্ছেন, মানুষ মুক্তিকে কেমন ভয় পায়। এর উল্টো দিকটাও আছে, আমি কিছুতেই সামনের লোকটাকে ছাড়ব না। কত রকম ব্যক্তিত্বের মানুষ হয় আমরা কল্পনাও করতে পারব না। এরমধ্যে কিছু কিছু পরাশ্রয়ী মানসকিতার লোক আছে। জোঁকের মত এরা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থেকে সব সময় কষ্ট দিয়েই যাবে। যেমনি আমি ওদের মুঠো থেকে বেরিয়ে যেতে চাইব, এমন চোখের জল ফেলতে শুরু করবে আর ভালবাসা দেখাবে, আমি আর কিছুতেই বেরিয়ে আসতে পারব না। এই ধরণের মানুষ যে কেবল ছেলেই হবে বা মেয়েই হবে তা না, উভয় লিঙ্গের হতে পারে। ছেলে ছেলে, ছেলে মেয়ে, মেয়ে মেয়ে, মেয়ে ছেলে, সবটার মধ্যেই এই সম্পর্ক আছে। ব্যাক্তিত্ব এদের এমন মারাত্মক হয় যে, কিছুতেই বেরোতে দেবে না। কখনা আমাকে পায়ের তলায় রাখবে, কখন মাথায় তুলে রাখবে। যদি আমি ছটফট করে বেরিয়ে আসতে চাই, সঙ্গে সঙ্গে সে আমার পায়ের তলায় লুটিয়ে আমার পা-টাকে ধরে রাখবে। মোদ্দা কথা, ওর খপ্পড় থেকে বেরোতে দেবে না। যদি এরা বেরিয়ে আসতে দেয়, তখন বুঝতে হবে, আমার থেকে ভাল একটা শিকার সে পেয়ে গেছে। এই ধরণের ব্যক্তিত্বকে নিয়ে আজকাল প্রচুর লেখালেখি বেরোচ্ছে। স্বামীজী বলছেন, আগেকার দিনে এটাই শক্তি দিয়ে হত, ইদানিং এটাই ধূর্ততা, চালাকি দিয়ে হয়।

আগেকার দিনে যারা বড় বীরপুরুষ হত, ক্ষমতাবান হত, যে মেয়েকে তার পছন্দ হত, গায়ের জোরে সেই মেয়েকে তুলে নিয়ে যেত। এখন আইনের ভয় আছে, মার খাওয়ার ভয় আছে, এভাবে করতে পারবে না, তাই অন্য উপায়ে করছে। তার মানে, এই যে দুষ্ট মানসিকতা, আমি যাকে পছন্দ করব তাকে আমি নেব, এই মানসিকতা থেকেই গেছে। আগেকার দিনে ডাকাতি করে লোকেদের বাড়ি থেকে লুঠ করত, এখন ধুর্তামি, চালাকি দিয়ে সব কাজ উদ্ধার করে নিচ্ছে, এটিএম ফ্রড হচ্ছে, ব্যাঙ্কের এ্যাকাউন্ট থেকে টাকা ফ্রড হচ্ছে। এখন আর ঘোড়ার পিঠে চেপে, হাতে বন্দুক নিয়ে ডাকাতি করতে হয় না। চালাকি করে ডাকাতি করা আরও সুবিধা, যে কোনও লোককে বোকা বানিয়ে সর্বস্বান্ত করে দেওয়া এদের কাছে কিছুই না। একটা খবরের দৌলতে জানা গেল, হায়দ্রাবাদের পুলিশের আইজি, তিনি আবার এ্যন্টি ফ্রড সেলের কর্তা, চোরেরা নাকি তাঁরই বাড়ি থেকে সর্বস্ব চুরি করে নিয়েছে। আগেকার দিনের ডাকাতরা পুলিশকে ভয় পেত, পুলিশের বাড়িতে

ডাকাতি করা তারা চিন্তাই করতে পারত না। মূল কথা হল, এই ভাব – অপরের টাকা-পয়সা আত্মসাৎ করতে হবে, এই ভাব কোন দিন যাবে না।

বৈষম্যের অত্যাধিক তারতম্যই অশান্তি ডেকে আনে

এরপর স্বামীজী বলছেন, Misery in India is not so bad as in America, because the poor man here sees the greater contest to his own bad condition. (*দুঃখকষ্ট আমেরিকায় যত তীব্র, ভারতে তত নয়; কারণ আমেরিকায় গরীব লোক নিজেদের দুরবস্থার সঙ্গে অপরের অবস্থার খুব বেশী প্রভেদ দেখতে পায়।*) বৈষম্য সমস্ত দেশেই আছে, বড়লোক বড়লোক থাকবে, সাধারণ লোক সাধারণ লোক থাকবে, কিন্তু বৈষম্য যদি বেশী বড় হয়ে যায় তখনই অশান্তি লাগে। তিরিশ চল্লিশ বছর আগেও, গ্রামের পয়সাওয়ালা মানুষ আর সাধারণ মানুষের মধ্যে খুব বেশী তফাৎ ছিল না। খাওয়া-দাওয়া ঘরের ভিতরে কে কি করছে, কেউ জানে না। তখন বেশীর ভাগ ট্রেন সব থার্ড ক্লাশের ছিল, এমএলএ, এমপিরাও থার্ড ক্লাশে যাচ্ছে, সাধারণ লোকেরাও সেই ক্লাশে যাচ্ছে। সবার সাথে সম্পর্ক ছিল, সেইজন্য খুব বেশী অশান্তি কোথাও ছিল না। কিন্তু এখন কিছু লোকের হাতে প্রচুর টাকা, সাধারণ লোকেদের কাছে কিছু নেই। কেউ শত কোটি টাকার মালিক, আবার যার নেই তো কিছুই নেই। এখান থেকেই অশান্তি শুরু হয়। সবার আগে আসে দুঃখ, দুঃখ থেকে আসে হতাশা, হতাশা থেকে আসে লুঠতরাজ, আত্মহত্যা করার প্রবণতা। এই ধরণের অশান্তি ভারতে আগে ছিল না, কারণ তফাৎটা বেশী ছিল না। রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক স্কুলের ছাত্রদের যে খাবার-দাবার ছিল, সেটা সাধারণ মধ্যবিত্তদের থেকে একটু উচ্চমানের থাকত। এখন মধ্যবিত্তরা এত উপরে চলে গেছে যে, মিশনের স্কুল তাদেরকে টেক্কাই দিতে পারবে না। ফলে স্কুলের ছেলেদের মধ্যে অশান্তি দেখা যাচ্ছে। বৈষম্য যদি কম থাকে, বেশী অশান্তি হয় না। স্বামীজী এখানে তখনকার দিনের ভারতের কথা বলছেন। ইদানিং সেই অবস্থা পাল্টাচ্ছে, তাই সমাজে অশান্তিও অনেক বেড়ে যাচ্ছে, এটা আরও বাড়বে, কিছু করার নেই।

স্বামীজী আবার বলছেন, Good and evil are inextricably combined, and one cannot be had without the other. The sum total of energy in this universe is like a lake, every wave inevitably leads to a corresponding depression. (*ভাল ও মন্দ – এই দুটো অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, একটাকে নিতে গেলে অপরটাকে নিতেই হবে। এই জগতের শক্তিসমষ্টি যেন একটা হ্রদের মত – ওতে যেমন তরঙ্গের উত্থান আছে, ঠিক তদনুযায়ী একটা পতনও আছে।*) স্বামীজী এই কথাগুলো আগেও অনেকবার বলেছেন। এই জগতে শক্তির সমষ্টি সমান। ইদানিং কালে বিগব্যাঙ থিয়োরীকে নিয়ে ফিজিক্সে বলছেন, এনার্জি যদি সব সময় সমান থাকে, তাহলে দুম্ করে বিগব্যাঙে এনার্জি এলো কোথা থেকে? অনেকেই অনেক থিয়োরী দিচ্ছেন, কিন্তু কোন থিয়োরীই বিশ্বাসযোগ্য নয়। সমুদ্রে একটা ঢেউ ওঠা মানে, অন্য দিকে জল নীচে নেমে যাবে। The sum total is absolutely the same; so to make one man happy is to make another unhappy. External happiness is material and the supply is fixed; so that not one grain can be had by one person without taking from another. (*সমষ্টিটা সম্পূর্ণ এক – সুতরাং একজনকে সুখী করা মানেই আর একজনকে অসুখী করা। বাইরের সুখ জড়সুখ মাত্র, আর তার পরিমাণ নির্দিষ্ট। সুতরাং এককণা সুখও পেতে গেলে তা অপরের কাছ থেকে কেড়ে না নিয়ে পাওয়া যায় না।*) জড়সুখ মানেই ওটা সীমিত। সীমিত হওয়ার জন্য একজনকে বেশী দিলে আরেকজনের ভাগে কম পড়বে, কিছু করার নেই। চারিদিকে সবাই বলছে, সমতা চাই, সাম্য চাই – এগুলো পুরোটাই ভ্রান্তমূলক চিন্তা-ভাবনা। জড় জগতে সমতা কখনই হতে পারে না। জড় জগতে দুজন বেশী পাবে, দুজন কম পাবেই, এখানে কারুর কিছু করার নেই। এখন দেখতে হবে এই তফাতের তারতম্যটা যেন খুব বেশী না হয়ে যায়। বেশী বৈষম্য হয়ে গেলেই সেখানে অসন্তোষ, বিক্ষোভ, বিদ্রোহ দেখা দেবে। কিন্তু এমন সমাজের স্বপ্ন দেখা, যে সমাজে সবাই সমান সুখী থাকবে, এই স্বপ্ন কোন দিন বাস্তবায়িত হবে না। এমনকি কোন আদিম আদিবাসীদের সমাজে, যেখানে কারুর কোন টাকা-পয়সা, সম্পত্তি নেই, সেখানেও কিন্তু বৈষম্য থাকবে, তাদের সমাজের যে সর্দার, তার সম্পদ অন্যদের থেকে বেশী থাকবে।

শেষে স্বামীজী বলছেন, Only bliss beyond the material world can be had without loss to any. Material happiness is but a transformation of material sorrow. (*কেবল যা জড়জগতের অতীত সুখ, তা কারও কিছু হানি না করে পাওয়া যেতে পারে। জড়সুখ কেবল জড়দুঃখের রূপান্তর মাত্র।*) যদি আমরা চাই, সবাই সুখী হোক, সবাই খুশীতে থাকুক, শান্তিতে থাকুক, একমাত্র আত্মজ্ঞানেই তা সম্ভব হবে। আত্মজ্ঞান কোন জড়জগতের সুখ নয়, ফলে কোন দিন এই সুখের ঘাটতি পড়বে না। তবে আমাদের জেনে রাখা দরকার, যখনই জড়জগতে সুখ হয়, ঐ সুখটাই জড়জগতে পরে দুঃখে রূপান্তরিত হচ্ছে। সত্তর দশক, আশির দশকের তুলনায় ভারতের এখন অনেক সমৃদ্ধি এসেছে, আমাদের বুঝতে হবে বিশ্বের কোথাও নিশ্চয় কিছু একটা গোলমাল হচ্ছে। আমরা কি করে বুঝব কোথায় গোলমাল হচ্ছে! আফ্রিকাতে কত দেশ আছে যেখানে কত লোক না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে, আমরা তার খবর জানি না। বিশ্বের কে কোথায় না খেয়ে মারা যাচ্ছে তাতে আমার ভারি বয়ে গেছে। সেটা অন্য বিষয়। এই সংসারে একটা সীমা আছে, ঐ সীমার বাইরে আমরা যেতে পারব না। যখনই কোথাও বেশি সুখ, বেশি আনন্দ হচ্ছে, বুঝতে হবে বিশ্বের কোথাও না কোথাও সমপরিমাণ দুঃখ ও নিরানন্দ হচ্ছে। মাছ, মাংস খেয়ে আমরা আনন্দ পাই, কিন্তু সেখানে কিছু প্রাণীর হানি তো হচ্ছে। অন্য দিকে প্রাণ হানি না হলে আমরা মাছ, মাংস খেতেই পারব না।

সর্বদা ঈশ্বর চিন্তনে ডুবে থাকো

এই অংশে স্বামীজী অনেকগুলো পয়েন্টের উপর আলোচনা করছেন। আগে থেকে যদি বলে দেওয়া হয়, স্বামীজী কি বলতে চাইছেন, আর ওর পিছনে কি সিদ্ধান্ত, তাহলে আমাদের বুঝতে অনেক সুবিধা হবে। আগের অংশে স্বামীজীর একটা আলোচনাতে ছিল কিভাবে মধ্যপ্রাচ্য এশিয়ার ধর্মগুলিতে, বিশেষ করে জরাথ্রুষ্টিয়ান, ইসলাম আদি ধর্মে ভাল আর মন্দ এই দুটোকে পরিষ্কার লাইন টেনে দেওয়া হয়, যেখানে ভাল বলতে ভাল, মন্দ বলতে মন্দ। সেই থেকে ভালর প্রতি মানুষের বিরাট একটা আগ্রহ থেকে গেছে। তাদের কাছে ভাল হওয়াটাই ধর্ম, ভাল হওয়াটাই যেন শেষ কথা। বেদান্ত পুরো আলাদা, বেদান্ত ভাল আর মন্দ এই দুটোরই পারে যাওয়ার কথা বলে।

থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে স্বামীজীর শেষ দিনের ক্লাশ চলছে। প্রায় সাত সপ্তাহ, আটচল্লিশ দিন তিনি মুষ্টিমেয় কয়েকজন বাছাই করা শিষ্যদের সঙ্গে অতিবাহিত করে তাঁদের শিক্ষা দিলেন। এখন আশা করা যায়, তাঁরা স্বামীজীর অনেক কথাই ধরতে পারছেন। স্বামীজীর এই ভাব – ভাল হওয়াটাই ধর্মের শেষ কথা নয়। সেখান থেকে স্বামীজী বোঝাতে চাইছেন, শুভ মানে সত্ত্বগুণ আর অশুভ মানে রজো ও তমোগুণের মিশ্রণ। কিন্তু শুভ, যেটাতে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য, ওটাও একটা বন্ধন। গীতাতেও ভগবান বলছেন, সুখ আর জ্ঞান এই দুটো সত্ত্বগুণের বন্ধন। সেখান থেকে স্বামীজী বলবেন, মানুষ যখন ঈশ্বরের দিকে এগোতে শুরু করে, তখন প্রথমে রজোগুণ দিয়ে তমোগুণকে ফেলে দেয়, এই করে করে সে সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। সত্ত্বগুণে যে একবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, সে আর কোন দিন কারুর ক্ষতি করতে পারবে না, কাউকে কষ্ট দিতে পারবে না। এরপর তার আধ্যাত্মিক জ্ঞান হয়ে গেল। জ্ঞান লাভের পর শরীরটা আছে বলে একটা momentumএ তার শরীরটাও চলতে থাকবে। যেমন গাড়ি ব্রেক কষলে গাড়ি কিছুটা গড়িয়ে যায়। এই যে গড়াবে, এখন কোন দিকে গড়াবে? স্বামীজী বলছেন, আত্মজ্ঞান, ঈশ্বর দর্শন অশুভ লোকেদের কখনই হতে পারে না। ঠাকুরের কথায়, সুতোয় একটু আঁশ থাকলে ছুঁচের মধ্যে ঢোকান যাবে না। একটু সামান্যতম বদ্‌গুণ যদি ভিতরে থাকে, ঈশ্বর দর্শন হবে না। তার মানে, গুণগুলো রয়েছে, গুণ মানে সত্ত্বগুণও রয়েছে। এই জায়গাতে এসে আমাদের সমস্যা হয়ে যায়। আমরা যাঁকে জানি এনার ঈশ্বর দর্শন হয়েছে, যাঁকে আমরা আত্মজ্ঞানী রূপে জানি, আমরা দেখি তাঁরা ভাল মানুষ, অত্যন্ত শুভবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি। এইখানে এসে, একজন ভদ্রলোক আর একজন জ্ঞানীর ব্যাপারে আমাদের সংশয় হয়। জ্ঞানী মানে তিনি একজন ভদ্রলোক, ভাল মানুষ; কিন্তু তা নয়। জ্ঞানী ভাল মানুষের অবস্থাকে পেরিয়ে গেছেন। কিন্তু তারপরও তিনি যা কিছু করছেন, যে momentumএ গাড়িটা চলছে, তাতে পুরোটা রয়েছে সত্ত্বগুণ, কারণ তমো আর রজো পড়ে থেকে গেছে বলেই তাঁর আত্মজ্ঞান হয়েছে। এখন তিনি যে কাজই করবেন, ভাল ছাড়া কিছু করবেন না। ঠাকুর বলছেন, যাঁর ঈশ্বর দর্শন হয়েছে, তাঁর কখন বেতালায় পা পড়বে না। এইজন্যই বেতালায় পা পড়বে না, কারণ তাঁর মন পুরো সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত, সেইজন্য অশুভ

কিছু করতে পারবেন না। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণের মত মহাপুরুষরা যা কিছু করছেন সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হয়েই করেছিলেন। আমরা যদি তাঁদের কাজের অন্য রকম ব্যাখ্যা করতে যাই, তাহলে বুঝতে হবে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীতেই কোথাও গলদ আছে। এই জিনিসটাকেই এবার স্বামীজী থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ডের শেষ দিনের ক্লাশে বলছেন। প্রথমে তিনি সমুদ্রের একটা উপমা নিয়ে আসছেন। সমুদ্রের ঢেউ যত উপরে উঠবে তত একটা দিকে নীচে নামবে।

Those who are born in the wave and kept in it do not see the depression and what is there. (*যারা ঐ তরঙ্গের উত্থানাংশে জন্মেছে বা সেইখানে রয়েছে, তারা তার পতনাংশটা – আর তাতে কি আছে, দেখতে যায় না।*) ঢেউয়ের উপরে যারা আছে তারা ঢেউয়ের নীচের অংশকে কোন দিন জানতে পারবে না। যারা হিমালয়ে থাকে, তাদের ধারণাই নেই সমুদ্র কাকে বলে। আমরা যদি কল্পনা করে নিই, এমন একজন আছে, যে ঢেউতেই জন্ম নিয়েছে আর ঢেউয়েই আছে, সে ঢেউয়ের নীচে যে অংশটা আছে, সেটার ব্যাপারে কিছুই জানে না। Never think, you can make the world better and happier. (*কখনও মনে করো না, তুমি জগৎকে ভাল বা সুখী করতে পারো।*) এখন আমার দিনকাল ভাল যাচ্ছে বলে আমি মনে করছি সবারই ভাল করব, তা কখনই হয় না। The bullock in the oil mill never reaches the wisp of hay tied in front of him, he only grinds out the oil. So we chase the will-o'-the wisp of happiness that always eludes us, and we only grind nature's mill, then die, merely to begin again. (*ঘানির বলদ তার সামনে বাঁধা খড়ের গোছা পাবার জন্য চেষ্টা করে বটে, কিন্তু কোন কালে তার কাছে পৌঁছাতে পারে না, কেবল ঘানি ঘোরাতে থাকে মাত্র। আমরাও এইরূপে সুখরূপ আলেয়ার অনুসরণ করছি – সর্বদাই সেটা আমাদের সামনে থেকে সরে যাচ্ছে, আর আমরা শুধু প্রকৃতির ঘানিই ঘোরাচ্ছি। এইরুপ ঘানি টানতে টানতে আমাদের মৃত্যু হল, তারপর আবার ঘানি টানা আরম্ভ হবে।*) তেলের ঘানিতে যেখানে তেল পেষাই হয়, সেখানে বলদকে দিয়ে ঘানি টানা হয়। বলদের সামনে এক গোছা খড় বেঁধে রেখে দেওয়া হয়, বলদ সেই ঘাস খাওয়ার জন্য এগিয়ে যায়, আর ঘানিটাও ঘুরতে থাকে। এইভাবে তেল পেষাই করা হয়। সন্ন্যাসীদের অনেকেই এসে জিজ্ঞাসা করে, ভাই ঘরবাড়ি ছাড়লে, সাধু হলে, জীবনে কী সুখ পেলে? এরা বোঝে না যে, সুখ পাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে কেউ ঘরবাড়ি ছেড়ে সন্ন্যাসী হতে আসে না। কে বলেছে সন্ন্যাসী হতে আসা মানে সুখ পাওয়া আর শান্তি পাওয়া? সন্ন্যাসের সঙ্গে, জ্ঞানের সঙ্গে সুখের কোন সম্পর্ক নেই। সেই সুখটা হল আত্যন্তিক সুখ, জগতের সুখ নয়। যার জন্য দেখা যায়, যাঁরাই ধর্মের পথে ছিলেন, সারা জীবন তাঁরা শুধু কষ্টই পেয়ে গেছেন। আমরাও জীবনে অনবরত যে কষ্ট আসছে, সেটার থেকে বাঁচার জন্য সুখের অন্বেষণে ছুটে বেড়াচ্ছি। আর প্রকৃতির যে ঘানি ঘুরে চলেছে, সেই ঘানি আমরাই টানছি, প্রকৃতির বলদ আমরাই, যে ঘানিটা টানছে। বলদের মুখের সামনে যেমন খড়ের আঁটি বাঁধা থাকে, সেই খড় খাওয়ার জন্য বলদ এগিয়ে যেতে থাকে, আমরাও ঠিক সেই রকম সুখের আশায় দৌড়ে যাচ্ছি। অনেক সময় এগুলোকে নিয়ে অনেক মজার মজার কাহিনী আসে, বাচ্চাদেরও কাহিনী আছে, বড়দেরও কাহিনী আছে। একটা টোপ খাইয়ে দিল, ঐ টোপ খেয়ে নিয়ে বেচারি দৌড়াতেই থাকে।

দুই গাধার দেখা হয়েছে, একজন ধোপার গাধা, আরেকজন সার্কাসের গাধা। সার্কাসের গাধা ধোপার গাধাকে জিজ্ঞেস করছে, 'বল তোর জীবন কেমন চলছে'। 'আর বলিস না, প্রচুর খাটতে হয়, পেট ভরে খাওয়াটাও পাওয়া যায় না'। সার্কাসের গাধা বলছে, 'আমারও জীবন খুব খারাপ। তবে আমার ভবিষ্যত আছে, একদিন আমার এই অবস্থা পাল্টাবে'। 'কি রকম পাল্টাবে'? 'সার্কাসের ম্যানেজারের মেয়েকে দেখতে খুব সুন্দর। মেয়েটি যখন রোপড্যান্স করে, তখন মালিক বলে, যদি ওখান থেকে পড়েছ, এই গাধার সাথে তোমার বিয়ে দিয়ে দেব। এখনও পড়েনি, কিন্তু কতদিন না পড়ে থাকবে, একদিন না একদিন দড়ি থেকে পড়বে'। ঐ আশায় বেচারি গাধা সার্কাসটা ছাড়তে পারছে না। ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পারে, কিন্তু ঐ আশায় ছাড়তে পারছে না। আমরা সবাই গাধার মত সুখরূপী ম্যানেজারের সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করতে চাইছি, আর ঐ সুখের আশায় সবাই আমরা দৌড়ে যাচ্ছি, সংসার থেকে বেরিয়ে আসতে চাইলেও বেরিয়ে আসতে পারছি না।

If we could get rid of evil, we should never catch a glimpse of anything higher; we would be satisfied and never struggle to get free. (*যদি আমরা অশুভকে দূর করে দিতে পারতাম, তা হলে আমরা কখনই কোন উচ্চতর বস্তুর আভাস পর্যন্ত পেতাম না; আমরা তা হলে সন্তুষ্ট হয়ে থাকতাম, কখনও মুক্ত হবার জন্য চেষ্টা করতাম না।*) স্বামীজী আগে আগে এই জিনিসটাকে নিয়ে বলেছেন, আমরাও আগে এর আলোচনা করেছি। যে সুখে আছে, টাকা-পয়সা, বাড়ি, জমি, গাড়ি সব আছে, ভাল স্ত্রী, সুসন্তান, সব সুখ আছে, কোন দিক দিয়ে কোন কষ্ট নেই, জীবনে কিন্তু সে আর এগোতে পারবে না। মানুষ তখনই এগোয়, যখন জীবনে প্রচুর দুঃখ-কষ্ট পায়। যদি কষ্ট না থাকে, মানুষ কষ্ট তৈরী করে নেয়, কিভাবে আমি কষ্টে থাকব। মনস্তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীরা একটা নূতন সিদ্ধান্তে এসেছেন, মানুষ কখনই সুখী থাকতে চায় না। এটা শুধু সিদ্ধান্তই না, প্রমাণিত। সব কিছু ভাল চলছে, চোখে জল ফেলার কোন পরিস্থিতি নেই, এবার চলল পয়সা খরচ করে ট্রাজিক সিনেমা দেখতে, চোখের জল ফেলতে হবে। সব কিছু ভাল চলছে, চলল এবার এভারেস্ট শৃঙ্গে আরোহণ করার জন্য। এভারেস্ট অভিযানে যাওয়া মানে, কষ্টের শেষ নেই। কারণ কষ্টকে সহ্য করা ছাড়া মানুষ থাকতে পারবে না, সেইজন্য মানুষকে কষ্ট তৈরী করে নিতে হয়। রাজা উজিরদের কোন কষ্ট নেই, বেরিয়ে পড়ল গভীর জঙ্গলে শিকারের জন্য। জঙ্গলে কত কষ্ট, মশা, মাছির উপদ্রব আবার হিংস্র পশুর ভয় আছে। কষ্ট ছাড়া মানুষ থাকতে পারে না। আমাদের স্বভাবেই আছে, কষ্ট পেলে যেন প্রাণ জুড়িয়ে যায়। যে সুখে আছে, সত্ত্বগুণে আছে, *সুখ সঙ্গেন বধ্নাতি*, সে দুঃখকে জানতে পারবে না, কোন দিন তাই এগোতে পারবে না। সেইজন্য কেউ যদি বলে, সংসার থেকে আমি সব দুঃখ মোচন করে দেব; প্রথম কথা সে কোন দিন পারবে না, দ্বিতীয় যদি পারে, তাহলে সে জগতে সর্বনাশ ডেকে আনবে। কারণ মানবজাতি আর কোন দিন এগোতে পারবে না। কারণ মানবজাতির উদ্দেশ্য সুখ নয়, উদ্দেশ্য হল মুক্তি। সুখ মানে সে থেমে গেছে, যে দৌড়াচ্ছে তার শক্তি বৃদ্ধি হচ্ছে। বলাই হয় যে, যে বসে গেল, সে শেষ; সুখ মানেই সে শেষ।

When man finds that all search for happiness in matter is nonsense, then religion begins. All human knowledge is but a part of religion. (*মানুষ যখন বুঝতে পারে, জড়জগতের সুখ অন্বেষণের সকল প্রচেষ্টা একেবারে নিরর্থক, তখনই ধর্মের আরম্ভ। মানুষের যত রকম জ্ঞান আছে, সবই ধর্মের অঙ্গমাত্র।*) একসাথে দুটো কথা এখানে বলছেন। প্রথমটা হল, মানুষ যখন বুঝে নেয় এই পার্থিব জগতে আমার সুখের কিছু পাওয়ার নেই, অর্থাৎ বুঝে গেল এই জগতে কোন সুখ নেই, তখনই ধর্মের শুরু। আর দ্বিতীয়টা হল, যত জ্ঞান আছে, সমস্ত জ্ঞান কোন না কোন ভাবে ধর্মের সাথে জড়িয়ে আছে। কারণ ধর্ম সংসারের প্রতি মানুষের যে আসক্তি, ঐ আসক্তি থেকে মানুষকে বার করে আনছে। ফিজিক্স, কেমেস্ট্রি, বায়োলজি, যা কিছু জ্ঞান আছে, সবটাই সেই সত্যের সন্ধানে রত। মানুষ যখনই এই জ্ঞানের সন্ধানে যায়, তখন তাকে প্রচুর কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়।

In the human body the balance between good and evil is so even that there is a chance for man to wish to free himself from both. (*মানবদেহে ভাল-মন্দের এমন ভারসাম্য বজায় আছে যে, তাইতেই মানুষের এ উভয় থেকে মুক্তিলাভ করবার ইচ্ছার সম্ভবনা রয়েছে।*) একটা খুব নামকরা কথা হল, মানুষ যদি প্রচুর দুঃখ-কষ্টের মধ্যে থাকে, তাহলে ঈশ্বরের দিকে তার মন যাবে না; সব সময় সুখ আর সুখ যার জীবনে চলতে থাকে, সেও কোন মতেই ঈশ্বরের দিকে যাবে না। যার জন্য দৈত্য, দানব, ভূত, প্রেত এদের এত দুঃখ-কষ্টের জীবন যে এরা কখনই ঈশ্বরের দিকে যায় না। অন্য দিকে দেবতাদের এত বেশী সুখ, ওরাও ঈশ্বরের দিকে যায় না। কিন্তু মানুষের শরীরে যে করেই হোক, ভাল আর মন্দের ভারসাম্যটা এত সুন্দর ভাবে আছে যে, ঈশ্বরের দিকে যাওয়ার সম্ভবনা এদের অনেক বেশী। ভাল ও মন্দের ভারসাম্য না থাকলে তখন, মন্দটাকে ধীরে ধীরে সরিয়ে দিয়ে ভালটাকে ধরে সংসারের জাল ছিড়ে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু মন্দ যদি একেবারেই না থাকে, তাহলে সে আর বেরিয়ে আসতে পারবে না।

The free never became bound; to ask how he did, is an illogical question. (*মুক্ত যে, সে কোনকালেই বদ্ধ হয়নি। মুক্ত কি করে বদ্ধ হল – এই প্রশ্ন অযৌক্তিক।*) তুমি চিরন্তন মুক্ত, তুমি

বন্ধনে কখনই ছিলে না। এই বিষয়ের উপর আগে আগে আমরা আলোচনা করেছি। Where no bondage is, there is no cause and effect. (*যেখানে কোন বন্ধন নেই, সেখানে কার্যকারণ-ভাবও নেই।*) 'I became a fox in a dream and a dog chased me'. Now how can I ask why the dog chased me? The fox was a part of the dream, and the dog followed as a matter of course; but both belong to the dream and have no existence outside. (*'স্বপ্নে আমি একটা শেয়াল হয়েছিলাম, আর একটা কুকুর আমায় তাড়া করেছিল'- এখন কি করে আমি প্রশ্ন করতে পারি যে, কুকুর কেন আমায় তাড়া করেছিল? শেয়ালটা স্বপ্নেরই অংশ আর কুকুরটাও ঐ সঙ্গে আপনা হতে এসে জুটল; কিন্তু দুই-ই স্বপ্ন, বাইরে এদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই।*) স্বপ্নে আমি একটা কুকুর হয়েছি, কুকুর হয়ে একটা শেয়ালকে তাড়া করছি, সেই শেয়ালটাও স্বপ্নে আমিই হয়েছি। আমিই যদি সব হয়ে থাকি, তাহলে কার্যকারণ-সম্পর্ক কোথা থেকে আসবে! স্বপ্ন আমি তৈরী করেছি, তারপর প্রশ্ন করছি কুকুরটা কেন তাড়া করল আমাকে? এই প্রশ্নই হয় না। আমিই কর্তা, আমিই কর্ম। এই জগতেও ঠিক তাই হয়ে চলেছে। জগতে যে মার খাচ্ছে, সেও আমি আর যে মারছে, সেও কিন্তু আমি। যে ডাণ্ডা বা চাবুক দিয়ে মারছে, সেটাও আমি, মারার প্রক্রিয়াটাও আমি, মারার ফলে যে দুঃখ, যন্ত্রণা পাচ্ছে, সেটাও আমি। স্বপ্নজগতে ঠিক যেভাবে হয়, এই জাগ্রত জগতে একেবারে হুবহু সেইভাবেই হয়।

Science and religion are both attempts to help us out of the bondage; only religion is the more ancient, and we have the superstition that it is the more holy. (*আমরা যাতে এই বন্ধনের বাইরে যেতে পারি, বিজ্ঞান ও ধর্ম দুই-ই আমাদের সে-বিষয়ে সাহায্য করতে চেষ্টা করছে। তবে ধর্ম বিজ্ঞানের চেয়ে প্রাচীন, আর আমাদের এই কুসংস্কার রয়েছে যে, ধর্ম বিজ্ঞানের চাইতে পবিত্র।*) স্বামীজী বলতে চাইছেন, বিজ্ঞান আর ধর্ম দুটোই আমাদের জগতের বন্ধন থেকে মুক্তির দিকে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। বর্তমান কালে যে ধর্মকে আমরা চোখের সামনে দেখছি ও বুঝছি, এই ধর্ম কোথাও যেন আমাদের উপর আরও বন্ধন চাপিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু সাধারণ ভাবে ধর্ম মানেই, মানুষের বন্ধনগুলি সরিয়ে দিয়ে মুক্তি দিতে সাহায্য করছে। আর জ্ঞান মানেই সে মুক্তি দেয়, সেইজন্য বেদকে বলা হয় জ্ঞানরাশি। এই জ্ঞানরাশিই মানুষকে মুক্তি দেবে, যদি না সে ওটাকে আঁকড়ে ধরে বসে থাকে। আমাদের একটা কুসংস্কার আছে যে, ধর্ম যেহেতু প্রাচীন, সেইজন্য বিজ্ঞানের চাইতেও পবিত্র। আসলে পুরনো সব কিছুর প্রতি আমাদের মনে একটা পবিত্রতার ভাব থাকে। কারণ পুরনো জিনিসগুলো অনেক দিন ধরে চলে আসছে, ওটা আর ট্রাডিশান থাকে না, কেমন যেন পবিত্র হয়ে যায়। ধর্মের দিক থেকে যে জ্ঞান আসে, সেই জ্ঞানেরও এত প্রাচীন ঐতিহ্য যে, আমাদের কাছে ঐ জ্ঞানকে পবিত্র বলে বোধ হয়।

স্বামীজী আবার বলছেন, In a way it is, because it makes morality a vital point, and science does not. (*এক হিসাবে পবিত্রও বটে, কারণ ধর্ম নীতি বা চরিত্রকে তার একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ বলে মনে করে, কিন্তু বিজ্ঞান তা করে না।*) নৈতিকতা ও চরিত্রের ব্যাপারে ধর্ম আর বিজ্ঞানে বিরাট তফাৎ। ধর্মের কাছে নৈতিকতা ও চারিত্রিক শুদ্ধতা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মকে যদি বিজ্ঞান রূপে সামনে রাখা হয়, সব জায়গায় মিলে যাবে, কিন্তু এই একটা জায়গাতে এসে আর মিলবে না। আমি যা খুশী অনৈতিক কাজ করতে পারি, চারিত্রিক যত দোষ-ত্রুটি আমার থাকুক না কেন, তা সত্ত্বেও বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জন করার ক্ষেত্রে এগুলো আমার কোন বাধা হয়ে দাঁড়াবে না, কারণ বিজ্ঞানে নৈতিকতা ও চরিত্রেরর কোন দাম নেই। ধর্মের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই, আমি যা খুশী অনৈতিক কাজ করার পরেও ধর্মকে ব্যাখ্যা করে দিতে পারি, আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ছাড়া ধর্মের সব রকম উপাধি অর্জন করে নিতে পারি। মনে যদি একটুও কারুর গোলমাল থাকে, আত্মজ্ঞান তার হবে না। সেইজন্য ধর্ম সাধনে নামার আগে বলে দেওয়া হয়, পুরোপুরি পবিত্র না হলে তোমার দ্বারা ধর্ম সাধন হবে না। ধর্ম আর বিজ্ঞানের মধ্যে এটা একটা বড় তফাৎ। অপবিত্র মানেই, সে কোন জিনিসকে আঁকড়ে ধরে আছে, আঁকড়ে যদি ধরে রাখে, তাহলে কি করে সব ছেড়ে ধর্ম সাধন করবে। নৈতিকতা বলতে আমরা মনে করি, যে জিনিসগুলি শাস্ত্র করতে বলে দিয়েছে, সেই জিনিসগুলির মধ্যেই আমরা আবদ্ধ থাকব। চুরি না করা, কারুর হিংসা না করা, পরস্ত্রীর দিকে না তাকানো, এই জিনিসগুলিকে বলছেন নৈতিকতা। শাস্ত্র বলছে, এগুলো ত্যাগ করবে, এই কর্মগুলো অত্যন্ত খারাপ কর্ম। ধর্ম সাধনে পরে একটা ধাপ আসবে, যেখানে তোমার

মনকেও ত্যাগ করে দিতে হবে। আর সেই জায়গায় মন ছাড়ার কথা দূরে থাক, জগতের বস্তুগুলিকেই তুমি এখনও ধরে আছ! কি করে তুমি ধর্ম সাধনে এগোবে!

বলছেন, Blessed are the pure in heart, for they shall see God'. (*'পবিত্রাত্মারা ধন্য, কারণ তাঁরা ঈশ্বরকে দর্শন করবেন'।*) যীশু বলছেন, যাঁরা পবিত্র, তাঁরাই ঈশ্বর দর্শন করবেন। This sentence alone would save mankind if all books and prophets were lost, (*যদি সব শাস্ত্র এবং সব অবতার লুপ্ত হয়ে যায়, তথাপি এই একটি মাত্র বাক্য সমগ্র মানবজাতিকে রক্ষা করবে।*) স্বামীজী বাইবেলের গ্রন্থস্তুতি করে বলছেন, যদি এই ছোট্ট একটা কথা থেকে যায় – পবিত্র হও, তাহলেই আবার নূতন করে সব ধর্ম এসে যাবে। This purity of heart will bring the vision of God. It is the theme of the whole music of this universe. (*অন্তরের এই পবিত্রতা থেকেই ঈশ্বর দর্শন হবে। সমগ্র বিশ্বসঙ্গীতে এই পবিত্রতাই ধ্বণিত হচ্ছে।*) স্বামীজীর ভিতর কবিত্ব ভাব চিরদিনই ছিল, বক্তৃতা দেওয়ার সময় মনে হত তার মুখ দিয়ে ভাষণ না, যেন কবিতা বেরিয়ে আসছে। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটা সুরের মুর্ছনায় ছন্দোবদ্ধ, সেই সুর হল – পবিত্রতা। ভারতকে নিয়ে তিনি বলতেন, ভারতের জাতীয় সুর হল বেদ। ভারতের জীবনসূত্র বেদের সাথে জুড়ে আছে। তেমনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে বৈষয়িক সুর, সেটা হল পবিত্রতা। In purity is no bondage, পবিত্রতায় কোন বন্ধন নেই। অপবিত্রতাই বন্ধন।

যারা শ্রীকৃষ্ণের জীবন নিয়ে নিন্দাবাদ করে, শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সাথে রাসলীলা করেছেন, তাঁর ষোল হাজার স্ত্রী ছিল ইত্যাদি, তারা এই জিনিসটা ভুলে যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ কোন অবস্থাতে, কোন কিছুর সাথে কোন বন্ধনে ছিলেন না। তাহলে আজকালকার ছেলেরা যে এত লম্পটগিরি করে বেড়াচ্ছে, আজকে একজনের সাথে প্রেম করে কাল তাকে ছেড়ে দিয়ে আরেকজনকে ধরছে? এরা আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা, ঠিক জায়গায় যাচ্ছে না বলে এদের সমস্যা হচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণের কোন কিছুর সাথে কোন বন্ধন নেই। পবিত্রতা মানেই সর্বত্যাগ। যতটুকু কম ত্যাগ ততটুকু বন্ধন, যতটুকু বন্ধন ততটুকু অপবিত্র। তাহলে সন্তানের প্রতি মায়ের ভালবাসা? অপবিত্র, কারণ সেখানেও একটা স্বার্থ জড়িয়ে থাকে। কিন্তু ঠাকুর যে মায়ের সন্তানের প্রতি টানের কথা বলছেন? ঠাকুর টানের কথা বলছেন। টান জিনিসটা আলাদা, ঈশ্বরের প্রতি সেই রকম টান এলে জগৎ ভুল হয়ে যাবে, নিজের সন্তানের দিকেও ফিরে তাকাবে না। যেখানেই ভালবাসা সেখানেই বন্ধন, যেখানেই বন্ধন সেখানেই অপবিত্রতা। যেখানেই দ্বেষ সেখানেই বন্ধন, সেখানেই অপবিত্রতা। সাধারণ মানুষ এই ধরণের কথা নিতে পারবে না, সেইজন্য উপনিষদ সবাইকে বলা হত না। ঠাকুরও তাই বলে দিলেন, সন্ধ্যে হলে হাততালি দিয়ে হরিনাম করবে, আর তা না হলে বড় করে ভগবানকে একটা প্রণাম করবে। সাধারণ মানুষ এর বেশী নিতে পারে না।

Remove the veils of ignorance by purity, then we manifest ourselves as we really are and know that we were never in bondage. (*পবিত্রতার দ্বারা অজ্ঞানের আবরণ দূর করে দাও, তা হলেই আমাদের যথার্থ স্বরূপের প্রকাশ হবে, আর আমরা জানতে পারব – আমরা কোন কালে বদ্ধ হইনি।*) যেমনি আমরা পবিত্রতা দিয়ে অজ্ঞানের আবরণকে সরাতে শুরু করব, তখন আমরা নিজেরাই আমাদের আসল পরিচয়টা জানতে পারব। বাইরে থেকে কেউ এসে আমাকে জানিয়ে দিয়ে যাবে না। The seeing of many is the great sin of all the world. (*নানাত্ব-দর্শনই জগতের মধ্যে সব চেয়ে বড় পাপ।*) আমরা বহু দেখছি, এটাই আদি পাপ। ঈশাবাস্যোপনিষদের ঋষি বলছেন, যিনি একত্ব দেখছেন, তিনি কি করে কোন পাপ কর্ম করবেন! যিনি এক দেখছেন, তিনি কি করে কোন কিছু চাইবেন, কোন কিছুকে ছাড়বেন! পাপ কি? আমি তুমির বিভেদ – এটাই পাপ। এরপর বাকি যে জিনিসগুলো আছে, চুরি করা, মিথ্যা কথা বলা, ব্রহ্মচর্য পালন না করা, এগুলো অনেক নীচের। ওনারা ধরেই নেন যে, তুমি যখন এই পথে এসেছ, তার আগেই এই জিনিসগুলো তুমি বন্ধ করে দিয়েছ। আসল পাপ কি? যিনি এক, তাঁকে যখন বহু দেখা হয়, এটাই পাপ, এটাই বন্ধন। See all as Self and love all; let all idea of separateness go. (*সব কিছুকেই আত্মারূপে দর্শন কর ও সকলকেই ভালবাসো। সব ভেদভাব একেবারে দূর করে দাও।*)

The diabolical man is a part of my body as a wound or a burn is. (*পিশাচপ্রকৃতির লোকও ক্ষত বা পোড়া ঘায়ের মতো আমার দেহেরই একটা অংশ।*) স্বামীজী আবার ঐ একই জিনিসের উপর

আসছেন, কারণ পাপ জিনিসটা খ্রীশ্চানদের কাছে একটা obsession হয়ে আছে। নিজের শরীরে ঘা হয়েছে, সেই ঘা পচে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে, ঐ ঘা নিয়েই নিজেকে চলতে হবে; ঠিক তেমনি বাজে লোক, গোলমেলে লোক এরাও আমার শরীরেরই অঙ্গ। We have to nurse it and get it better; so continually nurse and help the diabolical man, until he 'heals' and is once again happy and healthy. (*দুষ্ট লোককেও ক্রমাগত সাহায্য করতে থাকো, যতক্ষণ না সে সম্পূর্ণ সেরে যাচ্ছে এবং আবার সুস্থ ও সুখী হচ্ছে।*) গোলমেলে লোককে যখন দেখছ, দেখছ এর মধ্যে নানা রকম দোষত্রুটি আছে, তুমি তার সেবা কর, শুশ্রুষা করা; কারণ সেও তোমার শরীরের অঙ্গ। তার মানে দাঁড়ায়, আমি যার সেবা করছি, তাকে আমি কৃপা করছি না, তাকে ধন্য করছি না, ভক্তিমার্গের পূজাও করছি না, আমি জানছি ওর শরীর আমারই শরীর, এটা আমি নিজে। ওকে সারিয়ে তোলা অর্থাৎ ওকে শুদ্ধ, পবিত্র করা আমারই কাজ। এখানে মনের ব্যাপারে, যাদের মনে গোলমাল আছে তাদের কথা বলা হল।

এই জায়গায় অনেকে সাধু সন্ন্যাসীদের ভুল বোঝে, তারা মনে করে সন্ন্যাসীরা জগতের কল্যাণ করে বেড়াবে। সাধু সন্ন্যাসীরা কোথা থেকে জগতের কল্যাণ করবেন, তাঁদের তো কোন ইনকাম নেই। সাধু সন্ন্যাসীরা হলেন রেলওয়ের প্ল্যাটফরম; প্ল্যাটফরমে ট্রেন আসে, যাত্রীরা ট্রেনে চেপে যায়, প্ল্যাটফরম ট্রেন আর যাত্রীদের মিলিয়ে দেয়। সাধু সন্ন্যাসীরা হলেন সেই প্ল্যাটফরম, যেখানে দাতা ও ভোক্তাকে মিলিয়ে দেওয়া হয়। কিছু লোকের কাছে টাকা আছে, তারা দান করতে চাইছে; কিছু লোক আছে যাদের টাকার দরকার আছে। রামকৃষ্ণ মিশন একটা প্ল্যাটফরম, যাঁর আছে দাতা রূপে তিনি মিশনে দান করলেন, আর যার দরকার সে মিশনের কাছে আসে, মিশন এই সেবাটুকু করে দেয়। সেখান থেকে লোকেরা মনে করে সাধুরা সেবা করে বেড়াবে। সেবা করাটা সন্ন্যাসীর কাজ না। কিন্তু যারা মনের কষ্টে আছে, সংসার জ্বালায় জ্বলেপুড়ে মরছে, এরা সাধুদের কাছে এসে সাধুদের মুখনিঃসৃত কিছু অমৃতবাণী শুনে নিজের কষ্টটা কিছু লাঘব করে। সন্ন্যাসীদের এটাই কাজ, সংসার জ্বালায় যারা দিনরাত জ্বলেপুড়ে মরছে, তারা আসবে, সাধুর কাছে বসবে, সাধুকে দেখবে। ঠাকুর বলছেন, সন্ন্যাসীর ষোল আনা ত্যাগ দেখলে গৃহস্থ এক আনা ত্যাগ করতে সাহস পাবে। কোন ভাল সংস্কার কিছু নেই, এই যে সাধুদের কাছে বসছে, সাধুকে দেখছে, সেখান থেকে ধীরে ধীরে তার মনে একটা ছাপ পড়তে শুরু হবে। যেমন যেমন ছাপ পড়তে শুরু হয়, তেমন তেমন সে বন্ধন থেকে বেরোতে থাকে। বন্ধন মানে অপবিত্রতা, অপবিত্রতা আসছে সংসারের প্রতি আসক্তি থেকে, জগতের প্রতি আসক্তিটা এবার আস্তে আস্তে তার কাটতে শুরু হল।

কিন্তু যদি মনে করে সাধুবাবার কাছে গেলে তিনি কিছু চমৎকারি দেখিয়ে দেবেন, পালানো স্ত্রী ফেরত চলে আসবে, ব্যবসায় ডুবে যাওয়া টাকাটা হাতে চলে আসবে, এই ধরণের কিছু হয় না, যেটা হয়, মনটা ঘুরে যায়। যারা সংসার জ্বালায় জ্বলছে, তাদেরকে, সেও আমার অঙ্গ, ঐ ভেবেই করুণা করতে হয়। কিন্তু তাই বলে জগতের সবার দুঃখ-কষ্ট দূর করার জন্য আমাকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, তা কখনই না। সমাজে যে এত রকমের কষ্ট, আমি কার কার কষ্ট দূর করব, আমার এটা কাজও না। এই কাজ সমাজের, সরকারের কাজ। কিন্তু আমরা প্রায়ই অনধিকার চর্চায় নেমে পড়ি। ঠাকুর বলছেন, লঙ্কায় রাবণ মলো, বেহুলা কেঁদে আকুল হলো। আমরা কেঁদে আকুল হয়ে মরছি। এগুলো আমাদের কাজ নয়। স্বামীজীর সময় ইংরেজরা দেখছিল না, সমাজ উপেক্ষা করত, রাজারাও দেখছিল না, আর স্বামীজীও চাইছিলেন ভারতের উত্থান হোক, সেইজন্য তিনি দেশে সেবার জন্য কাজ করার ভাব নিয়ে এলেন।

While we think on the relative plane, we have the right to believe that as bodies we can be hurt by relative things and equally that we can be helped by them. This idea of help, abstracted is what we call God. The sum total of all ideas of help is God. (*আমরা যতদিন আপেক্ষিক বা দ্বৈতভূমতি রয়েছি, ততদিন আমাদের বিশ্বাস করার অধিকার আছে যে, এই আপেক্ষিক জগতের বস্তু দ্বারা আমাদের অনিষ্ট হতে পারে, আবার ঠিক সে ভাবে সাহায্যও পেতে পারি। এই সাহায্য-ভাবের সূক্ষ্মতম ভাবকেই আমরা 'ঈশ্বর' বলি। ঈশ্বর বলতে আমাদের ধারণা আসে যে, আমরা যত প্রকার সাহায্য পেতে পারি, তিনি তার সমষ্টিস্বরূপ।*) দর্শনের এটি একটি খুব

কঠিন ভাব। যাদের স্বামীজীর আধ্যাত্মিক দর্শনের প্রতি আগ্রহ আছে, তাদের এই বাক্যটিকে দাগ দিয়ে রাখা দরকার। কর্মবাদের উপর আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখিয়ে ছিলাম যে, কিভাবে কর্মবাদ শেষ সত্য হতে পারে না। কর্ম যদি শেষ কথা হয়, তাহলে মুক্তি কোন দিন হবে না, কারণ কর্মের জন্য যদি মুক্তি হয়, তাহলে মুক্তি কখনই হবে না। তখন বলা হয়েছিল, লঙ্কা খেলে ঝাল লাগবে, তার মানে কার্য কারণের একটা সম্পর্ক আছে। কার্য-কারণ সম্পর্ককে যখন সূক্ষ্ম অবস্থায় নিয়ে যাচ্ছি তখন তাকে আমরা কর্মবাদ বলছি, যখন সূক্ষ্মতমে নিয়ে যাচ্ছি তখন ঋতম্ বলছি। এই জিনিসটাকে নিয়ে আগে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি, তাই এখানে আর এর বেশী আলোচনা করা হচ্ছে না।

এরপর আসছে, আমাদের যখন কষ্ট হয়, সেই কষ্ট থেকে কিভাবে আমরা বেরিয়ে আসি। বাচ্চা বয়সে খিদে পেলে মাকে বলতাম, মা আমাকে খাইয়ে দিল, অন্য কোন কষ্ট হলে মা মিটিয়ে দিল। আরেকটু বড় হওয়া পর অন্য অনেকে এসে আমাকে সাহায্য করে দিচ্ছে। আজকে আমার বয়স হয়েছে, শরীরের কোন সমস্যা হলে ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি, ডাক্তার শরীরকে সুস্থ করে দিচ্ছে। অন্য কোন অসুবিধা হলে অন্য কারুর কাছ থেকে সাহায্য নিচ্ছি। এই আপেক্ষিক জগতে দেখছি যে, কোথাও আমরা কোন কষ্ট হলে, কারুর কাছে গেলে তিনি ঐ কষ্টটা মিটিয়ে দিচ্ছেন। তার মানে আমার কষ্ট আর কষ্ট মিটিয়ে দেওয়ার মাঝখানে বাহ্যজগতের একজন প্রতিনিধি আছে। কর্মবাদের মত এই বাহ্যজগতের প্রতিনিধি, যিনি সাহায্য করেন, এটাকে যদি সূক্ষ্ম করে দেওয়া হয়, এটা আর ব্যক্তিতে থাকল না, নৈর্ব্যক্তিক হয়ে গেল, এটাই ঈশ্বর। রাজা দণ্ড দেন, স্কুলে মাস্টার আগে দণ্ড দিতেন, এখন অবশ্য বন্ধ হয়ে গেছে; তার মানে একজন আছেন, যিনি শাসন করছেন, সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন। এটাকেই যদি সূক্ষ্মতম করে দেওয়া হয়, ওটাই হয়ে গেল বিধাতা, কর্মফলদাতা। ঈশ্বর হলেন তিনি, যাঁর কাছে আমরা প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের প্রার্থনা শোনেন, প্রার্থনা অনুযায়ী তিনি ফল দেন। গীতাতে সেইজন্য আর্ত, অর্থার্থীর কথা বলছেন, যে কষ্টে আছে, কিছু চাইছে, তারা ভগবানের কাছে আসেন। তাহলে ভগবান সত্যি না মিথ্যে? কর্মবাদ যতটা সত্য ভগবান ততটাই সত্য। বিচারের শেষে কর্মবাদ থাক না, তাই ভগবানও থাকেন না। কিন্তু ব্যবহারিক জগতে পুরোদমে আছে। একটা বাচ্চা কাঁদল, কান্না শুনে মা দৌড়ে এসে তাকে খাইয়ে দিচ্ছে, এই যে বাইরে থেকে সাহায্য আসছে, বেদান্ত বলবে ওটা তোমারই আত্মা, মা হয়ে তোমাকে খাওয়াচ্ছে। ঈশ্বর তোমারই আত্মা, তোমার প্রার্থনা তিনি শুনছেন। সেটা অন্য জিনিস, কিন্তু সাধারণ ভাবে আমরা দেখছি, আমরা যে প্রার্থনা করি, সেই প্রার্থনার উত্তর আমরা দিনরাত পাচ্ছি। এই জগতে আমাদের চাহিদা অনুযায়ী যে জিনিসগুলো অহরহ পেয়ে যাচ্ছি, সেটাই যখন সূক্ষ্মস্তরে চলে যাচ্ছে আমরা তখন সেটাকে ঈশ্বর বলছি।

কর্মবাদ আর ঈশ্বর এই দুটো জিনিসকে আমাদের মনে রাখতে হবে। লঙ্কা খেলে ঝাল লাগে, এই কার্য-কারণ সম্পর্ককে সূক্ষ্মস্তরে নিয়ে গেলে কর্মবাদ হয়ে যায়। জীবন-মৃত্যু আমরা দেখছি, এই জীবন-মৃত্যুকে সূক্ষস্তরে নিয়ে চলে গেলে সৃষ্টিতত্ত্ব হয়ে যায়। ঠিক তেমনি আমরা যেটাই এই জগতে দেখছি, সেটাকে যেমনি আমরা সূক্ষ্মস্তরে নিয়ে চলে যাব, তখন ওটা দিব্য আকার নিয়ে নেয়। আমরা মাকে সব সময় দেখছি, আমরা জানি মা আমাদের কিভাবে জন্ম দিয়েছেন, মা কিভাবে আমাদের লালন-পালন করছেন, কিভাবে আমাদের শাসন করছেন। এটাকে সূক্ষ্মস্তরে নিয়ে চলে গেলে মা তখন জগদ্ধাত্রী রূপিণী মা হয়ে গেলেন। এখন যদি কেউ চায় স্বর্গে গিয়ে আমি মা সারদাদেবী দেখতে চাই, সে কোথাও মা সারদাদেবী দেখতে পাবে না, কারণ ওটা সূক্ষ্মস্তরে রয়েছে। এই সূক্ষ্মস্তরটা আমারই মনেরই তৈরী। মনের তৈরী হওয়াতে এটা ঠিক না ভুল? শতকরা একশ ভাগ ঠিক। কারণ যতক্ষণ আমি আছি, যতক্ষণ আমার মন আছে, ততক্ষণ তিনিও আছেন। এই জগতে আমরা যে সাহায্যগুলি পাই, সূক্ষ্মস্তরেও সেই সাহায্যগুলি পাচ্ছি।

God is the abstract compound of all that is merciful and good and helpful; that should be the sole idea. (*যা-কিছু আমাদের প্রতি করুণাসম্পন্ন, যা-কিছু কল্যাণকর, যা-কিছ আমাদের সহায়ক, ঈশ্বর সেই সকলের সার সমষ্টিরূপ। ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের এই একমাত্র ধারণা থাকা উচিত।*) যা-কিছু ভাল তার সার হল ঈশ্বর। গীতার দশম অধ্যায়ে ভগবান পর পর বলে যাচ্ছেন, যেখানে যা যা ভাল সেটা আমি। যার ভিতরে যা কিছু ভাল গুণ আছে, ঐ গুণটা ভগবান নিজে। আমরা আমাদের ভাষায়

বলি, ঠাকুরই তোমাকে এই গুণ দিয়েছেন। ঠাকুর ঐ গুণ দেননি, ঐ গুণটাই ঠাকুর নিজে। বিশ্বে নামকরা যত চিত্রশিল্পী আছেন, যদি আমরা তঁদের মধ্যে কাউকে শ্রেষ্ঠতম রূপে মনে করি, তাহলে ভগবান দশম অধ্যায়ের মত বলতেন, চিত্রশিল্পীদের মধ্যে আমি লিওনার্দো দা ভিঞ্চি। যেমন বলছেন, শস্ত্র যাঁরা চালায় তাঁদের মধ্যে আমি শ্রীরাম। তেমনি বলতেন, গায়কদের মধ্যে আমি তানসেন। মায়ের ভিতর সন্তানের প্রতি যে অপত্য ভালবাসা, ঐ ভালবাসা যে শুধু তিনি দিয়েছেন তা না, ওটা তিনি নিজে। জগতে আমরা যা কিছু ভাল মনে করছি, শ্রেষ্ঠতম মনে করছি, সেটা তিনি নিজে। স্রোতস্বিনীর মধ্যে তিনি গঙ্গা, ছন্দের মধ্যে গায়ত্রী, সেটা তিনি; শব্দের মধ্যে ওঁ, সেটা তিনি। আমরা অনেক সময় কোন শ্রেষ্ঠতম মানুষের সাথে দেখা হলে বলি, আপনি আমার ভগবান। সেখানে আমরা কি বলতে চাইছি? আমি যতজনকে দেখেছি, তাদের মধ্যে আপনি হলেন শ্রেষ্ঠ। শুভ যা কিছু, তা ভগবান নিজে। করুণাপূর্ণ যা কিছু সব ভগবান, কারণ করুণা আমাদের কাছে একটা বিরাট জিনিস। আমরা সব সময় প্রার্থনা করি, হে প্রভু কৃপা কর। করুণার সার ভগবান, ক্ষমার সার ভগবান, সাহায্যর সার ভগবান, ন্যায়ের সার ভগবান।

As Atman, we have no body, so to say, ‘I am God, and poison does not hurt me’, is an absurdity. (*আমরা যখন নিজেদের আত্মরূপে ভাবি, তখন আমাদের কোন দেহ নেই, সুতরাং ‘আমি ব্রহ্ম, বিষও আমার কিছু ক্ষতি করতে পারে না’ – এই কথাটাই একটা অসম্ভব বাক্য।*) আত্মার কোন শরীর নেই, আত্মার কাছে কোন সূক্ষ্মতা নেই; যত রকম সার, সূক্ষ্মতা, এগুলো শরীর যতক্ষণ আছে ততক্ষণ আছে। যে আত্মা, সে বিধাতাকেও মানবে না, কর্মকেও মানবে না, পাপও মানবে না, পূণ্যও মানবে না, কারণ তার শরীর নেই। কিন্তু তুমি যখন বলছ, ‘আমি ব্রহ্ম, বিষ আমাকে কিছু করতে পারবে না’, তোমার কথার মধ্যেই বিরোধ এসে গেল। ‘বিষ আমাকে কিছু করতে পারবে না, কারণ আমি ব্রহ্ম’, এর থেকে বালসুলভ কথা আর কিছু হতে পারে না। কারণ যেমনি তুমি বলছ, আমি ব্রহ্ম, তার মানে তোমার শরীর নেই। আর যেমনি তুমি বলছ বিষ আমাকে কিছু করতে পারবে না, তার মানে তোমার শরীর এসে গেলো, তুমি এসে গেলে, শরীর এসে গেলে ব্রহ্ম কোথায় থাকল। স্বামীজী খুব সূক্ষ্ম যুক্তি নিয়ে আসছেন, কিন্তু সেই রকম জটিল কিছুও নয়। তুমি এখনও বিষ দেখছ, এখনও শরীর দেখছ, নিজেকে দেখছ, আর তুমি নিজেকে ব্রহ্ম বলছ, তা কি কখন হয়! ঠাকুরের সময়েও এই ধরণের কিছু বেদান্তী ছিল, মেয়েদের সাথে জড়ালে বলবে, আমি তো কিছু করছি না, ওতো শরীর করছে, আমি নির্লিপ্ত। একদিকে শরীরও মানছে, অন্য দিকে মুখে বেদান্তের কথা বলে যাচ্ছ, এই দুটো একসাথে চলে না।

While there is a body and we see it, we have not realized God. Can the little whirlpool remain after the river vanishes? (*যতক্ষণ আমাদের দেহবোধ রয়েছে, আর সেই দেহটাকে আমরা দেখছি, ততক্ষণ আমাদের ঈশ্বরোপলব্ধি হয়নি। নদীটাই যখন লুপ্ত হল, তখন তার ভিতরের ছোট আবর্তটা কি আর থাকতে পারে?*) একদিকে বলছ তুমি ঈশ্বরদর্শন করেছ, অন্য দিকে দেহ দেখছ, তা কি কখন হয়! নদীটাই লুপ্ত হয়ে গেছে আর বলছে, নদীর ঘূর্ণি আছে, সেকি কখন হয়! ঈশ্বরদর্শন হওয়া মানেই জগৎ উড়ে যাওয়া, জগৎও আছে ঈশ্বরও আছেন, দুটো একসাথে কখনই হয় না। সেখানে তোমার শরীরটা যেন একটা ছোট্ট ঘূর্ণি, ঘূর্ণিটা থাকল আর নদীটা চলে গেল, তাকি কখন হয়! Cry for help, and you will get it; and at last you will find that the one carrying for help has vanished, and so has the Helper, and the play is over; only the Self remains. (*সাহায্যের জন্য কাঁদো দেখি, তা হলে সাহায্য পাবে – আর অবশেষে দেখবে, সাহায্যের জন্য কান্নাও চলে গেছে; সঙ্গে সঙ্গে সাহাজ্যদাতাও চলে গেছেন; খেলা শেষ হয়ে গেছে, বাকি রয়েছেন কেবল আত্মা।*) কেঁদে কেঁদে সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করে এগিয়ে গেলে। তুমি সাহায্য চেয়েছিলে, সাহায্য পেলে। তারপর দেখবে যিনি সাহায্য করেছিলেন তিনিও নেই, যে সাহায্যের জন্য কাঁদছিল সেও নেই, সাহায্যটাও নেই। সব খেলা শেষ। কি আছে? আত্মাই আছেন। এগুলো ধারণা করা সত্যিই কঠিন, কিন্তু এটাই সত্য।

স্বামীজী ধীরে ধীরে একেবারে শেষের দিকে চলে এসেছেন। This once done, come back and play as you will. This body can then do no evil, because it is not until the evil

forces are all burned out that liberation comes. All dross has been burned out and there remains 'flame without heat and without smoke'. (*একবার এইটি হয়ে গেলে ফিরে এসে যেমন খুশী খেলা কর। তখন আর এই দেহের দ্বারা কোন অন্যায় কাজ হতে পারে না; কারণ যতদিন না আমাদের ভিতরে কুপ্রবৃত্তিগুলো সব পুড়ে যাচ্ছে, ততদিন মুক্তিলাভ হবে না; যখন ঐ অবস্থালাভ হয়, তখন আমাদের সব ময়লা পুড়ে যায়, আর অবশিষ্ট থাকে তাপ বিহীন নির্ধূম শিখা – আলো আছে।*) আত্মজ্ঞান একবার যখন হয়ে গেল, ঠাকুরের কথায়, বুড়ি ছোঁয়া হয়ে গেলে, এবার তুমি এখানে এসে যা খুশী করো। আর তোমার বেতালায় পা পড়বে না। আত্মজ্ঞান হওয়ার আগে যত কুপ্রবৃত্তি আছে সব পোড়াতে হবে। যতক্ষণ না পোড়ান হয়, ততক্ষণ আত্মজ্ঞান হবেই না। আত্মজ্ঞান হয়ে যাওয়ার পর, তুমি আবার যখন ফেরত আসছ, এটা স্বাভাবিক যে তোমার ভিতরে একটুও গোলমাল নেই।

আরেকটু বিস্তার করে বলার সময় ওনারা বলেন, অনেক সময় কর্মগুলো থেকে যায়, কিন্তু দগ্ধবীজবৎ, বীজগুলো পুড়ে গেলে ঐ বীজ থেকে আর অঙ্কুর বেরোবে না। ঠিক তেমনি যে কর্মগুলো থেকে গেল, ঐ কর্ম দিয়ে নূতন কোন কর্ম সৃষ্টি হবে না। ঠাকুর এই জিনিসটাকেই পোড়ো দড়ির উপমা দিয়ে বোঝাচ্ছেন। তার সাথে বলছেন, জ্যোতির আলোতে না আছে আগুন, না আছে কোন তাপ, না আছে কোন ধুয়ো। মন থেকে সব কামনা-বাসনা গুলি একবার যদি পুড়ে ছাই হয়ে যায়, সেই মনে জ্যোতির আলো উদ্ভাসিত হয়, যে আলোতে কোন তাপ নেই, কোন ধুয়ো নেই। আত্মার আলোতে যে কোন ধুয়ো নেই, কঠোপনিষদে এই জিনিসটাকে খুব সুন্দর বলছেন, *জ্যোতিরিব অধূমকঃ*। ধ্যানের গভীরে হৃদয়ে যে জ্যোতি দর্শন হয়, সেই জ্যোতির আলোতে কোন তাপ নেই, চোখ ঝলসে যায় না, ধুয়ো বা মলিনতা কিছু নেই।

The past momentum carries on the body, but it can only do good, because the bad was all gone before freedom came. (*তখন প্রারব্ধ আমাদের দেহটাকে চালিয়ে নিয়ে যায়, কিন্তু তার দ্বারা তখন কেবল ভাল কাজই হতে পারে, কারণ মুক্তিলাভ হবার পূর্বে সব মন্দ চলে গেছে।*) গীতায় এই কথাটা অনেকবার ভগবান বলছেন – *সর্বভূতে হিতে রতাঃ*। এই দেহেই মুক্তি লাভ করার পর তাঁর মধ্যে আগে যে কামনা-বাসনা ছিল সব পুড়ে গেছে। তিনি চাইলেও এখন আর অন্য রকম কিছু করতে পারবেন না। এখন যে দেহটা চলছে, চলছে শুধু ভালকে নিয়ে। তিনি যা কিছু করবেন অপরের মঙ্গলের জন্যই করবেন।

The dying thief on the cross reaped the effect of his past actions. He had been a Yogi and had slipped; then he had to be born again; again he slipped and became a thief; but the past good he had done bore fruit, and he met Jesus in the moment when liberation could come, and one word made him free. (*চোর ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে মরবার সময় তার প্রাক্তন-কর্মের ফল লাভ করলে। পূর্বজন্মে সে যোগী ছিল, যোগভ্রষ্ট হওয়াতে তাকে জন্মাতে হয়; এ জন্মেও পতন হওয়াতে তাকে চোর হতে হয়েছিল। কিন্তু পূর্ব জন্মে সে যে শুভকর্ম করেছিল, তার ফল ফলল। তার তখন মুক্তিলাভের সময় হল, তখনই তার যীশুখ্রীষ্টের সঙ্গে দেখা হল, আর তাঁর এক কথায় সে মুক্ত হয়ে গেল।*) সংক্ষেপ কাহিনীটা হল, আজকে আমরা যীশুকে যেভাবে দেখছি তখনকার সমাজ সেই ভাবে দেখত না। ইজ্রায়াইলের লোকেরা মনে করছে সে আমাদের ধর্মকে নাশ করতে এসেছে। অনেক গোলমাল হওয়ার পর যীশুকে ক্রুশিফাই করতে বলা হল। বর্তমান কালে এগুলো দেখলে আমাদের খারাপ লাগবে। একটা জিনিসকে যদি বিচার করতে হয়, সেই পরিস্থিতিতে, সেই অবস্থায় গিয়ে বিচার করতে হয়। তখন মনে হবে, ঐ পরিস্থিতিতে ওটাই ঠিক ছিল। যারা সেমাইটসরা ছিল, তারা বলল ওকে ক্রুশিফাই কর। এখন রোমানদের যিনি ওখানে এজেন্ট, তিনি চাইছেন না যে, এই রকম হোক। তিনি ইজ্রায়ালীদের বোঝানর চেষ্টা করলেন। তখন ওখানে পাসওভার সেরিমনি ছিল। ওখানে ওরা মাফি দিয়ে দিত। তখন আবার বলছে, আমার ক্ষমতা আছে একজনকে ক্ষমা করে দিতে পারি, বলো কাকে? তখন একটা শেষ সুযোগ এলো, এরা যদি যীশুকে ফেরত নিয়ে নেয়। ওরা যীশুকে ছেড়ে একজন খুনী ছিল, তাকে ফেরত চেয়ে নিল। যীশুকে যখন ক্রুশিফাই করা হচ্ছে, সেই সময় তাঁর দুই দিকে দুটো চোর। তিনজনকেই ক্রুশিফাই করা হবে। তখন একজন চোর যীশুকে বলছে, 'তুমি যে বলতে ফাদার ইন হেভেন, কই তোমাকে তো এখন কেউ সাহায্য করছে না।

তুমি তো নিজেকে কিং বলতে’। ভাবতে অবাক লাগে, দুটো চোর, তাদেরকে ক্রুশবিদ্ধ করা হচ্ছে, তার মধ্যে একজন চোর ভগবানকে এই কথা বলছেন। আমাদের যখন জীবনে কষ্ট আসে, তখন একবার এই দৃশ্যটাকে ভাবলেই অবাক লাগবে। যীশু ভগবান, তাঁর কতটা অসম্মান। যীশুখ্রীষ্ট তখন সেই চোরকে বলছেন, ‘সম্মান কর, বোঝ, যেটা বলা হয়েছে সেটাই ঠিক’। তারপর দেখা গেল সেই চোরের শরীর থেকে হোলি স্পিরিট বেরিয়ে উচ্চতম স্বর্গে চলে গেল। যীশু তো স্বর্গে ভগবানের কাছে যাবেনই। তাঁর পাশে দুজন চোর। একজন চোরের মুক্তি হল না, আরেকজন চোরের মুক্তি হয়ে গেল। বাইবেলে এই কাহিনীর বর্ণনা আছে। কি করে মুক্তি হল? স্বামীজী খুব সুন্দর বলছেন, আমরা মৃত্যুর সময় যখন যাই, তখন আগে আগে যা করেছি, তারই ফল পাই। He had been a Yogi and had slipped; then he had to be born again; again he slipped and became a thief, এটা স্বামীজীর থিয়োরী, কর্মবাদ দিয়ে জিনিসটাকে ব্যাখ্যা করছেন।

হেন্স টরমেন্টাইন্স নামে একজন লেখক ছিলেন, তাঁর একটা বই আছে, Sri Ramakrishna and Jesus Christ : A paradox in incarnation, ভদ্রলোক খুব গোঁড়া খ্রীশ্চান ছিলেন। ছোটবেলা থেকে স্বপ্ন দেখতেন, সারা বিশ্বকে তিনি খ্রীশ্চান বানিয়ে দেবেন। পরে তিনি ঠাকুরের কথা, জীবনী পড়েন, পড়ার পর তিনি ঠাকুরের ভক্ত হয়ে যাননি, কিন্তু বুঝলেন খ্রীশ্চান ধর্ম খুবই সীমাবদ্ধ। উনি পরে অনেক রিসার্চ করলেন, রিসার্চ করে দাঁড় করালেন যে, যীশুখ্রীষ্ট অবতার, শ্রীরামকৃষ্ণও অবতার। কিন্তু খ্রীশ্চানরা যেভাবে যীশুকে দেখে, তাতে অনেক কিছুর ব্যাখ্যা করা যায় না। কিন্তু হিন্দুরা শ্রীরামকৃষ্ণকে যেভাবে ব্যাখ্যা করে তাতে সব কিছুকে ব্যাখ্যা করে দেওয়া যায়। উনি এই জিনিসটাকে খুব গভীরে গিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে এই বইটা লিখলেন, খুব উচ্চমানের কাজ করেছেন। এখন আমরা যখন দেখব, একজন চোরকে ক্রুশিফাই করা হচ্ছে, সে বুঝেছে যীশু কে, তাঁকে প্রশংসা করলেন, তাতেই চোরের মুক্তি। এটাকে খ্রীশ্চানদের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করা যাবে না। স্বামীজী ব্যাখ্যা করছেন, আসলে সে ছিল যোগী। স্বামীজী যোগী শব্দটা নিচ্ছেন, আসলে সে একজন ধর্মসাধক। কিন্তু কোথাও একটা অবস্থায় গিয়ে তার পতন হয়ে যায়। গীতায় যোগভ্রষ্টের কথা ভগবান বলছেন, সেও ঐ রকম যোগভ্রষ্ট ছিল। আবার সাধনা করেছে, আবার পতন হয়েছে। পতনের পর সে চোর হয়ে জন্ম নিয়েছে। কিন্তু এতদিন সে সাধনা করেছে, শুভকর্ম করেছে। আমরা কর্মবাদের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছিলাম, আত্যন্তিক দৃষ্টিতে দেখতে গেলে কর্মবাদ নেই, কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে কর্মবাদ আছে। এই চোর সাধনা করেছে, তার পতন হয়েছে, আবার সাধনা করেছে, আবার পতন হয়েছে। কিন্তু অতীতের যে শুভকর্ম করা ছিল, ঐ শুভকর্মের ফলগুলি এবার কড়া নাড়ছে। ধাক্কা দিতে দিতে এমন এক সন্ধিক্ষণে চলে গেল, যেখানে তার মুক্ত হয়ে যাওয়ার কথা। তখন যীশুর কাছে থেকে এর কাছে একটা শব্দ গেল, সে মুক্ত হয়ে গেল।

একবার এক সন্ন্যাসী এক জ্যোতিষিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘আমরা তো কর্মবাদকে মানি না, কারণ মুক্তি জিনিসটা কর্মবাদের বিরুদ্ধে। আপনার জ্যোতিষ বিদ্যাতে এটাকে কিভাবে মেলান’? জ্যোতিষী বলছেন, ‘আমাদের এর উপর খুব সুন্দর ছক আছে। এই গ্রহ আর এই জিনিসগুলো যখন একসাথে আসে, তখন আমরা এটাকে মুক্তিযোগ বলি’। ‘আপনি যদি বলেন এই রকম হলে তার মুক্তি হবেই, তাহলে তো আবার কর্মবাদ হয়ে গেল’। ‘আমরা বলি, যার মুক্তি হবে তার এই যোগটা থাকবে। যাদের এই যোগ আছে বলেই তাদের মুক্তি হবে, তা না। মুক্তি যাদের হয়, তাদের এই যোগটা থাকে’। স্বামীজী ঠিক এই জিনিসটা এখানে বলছেন। ঐ চোরের সময় হয়ে গেছে, এবার তার মুক্তি হবে। যীশু যদি সেখানে তখন না থাকত, এর আর মুক্তি হত না। লোকটির উচ্চভাব তখন তুঙ্গে, ঠিক সেই সময় তার যীশুর সঙ্গলাভ হল, যীশুর মুখে একটা কথা শুনল, মুক্ত হয়ে গেল। এরপর ওর ভালমন্দ যা কিছু ছিল, সব নিজে থেকে বেরিয়ে চলে গেল। মুক্তি মানে তাই, আগের আগের জন্মে থাকা সব শুভকর্মের একটা তোড় এলো, সেই সময় কোন সত্যিকারের জ্ঞানীর সঙ্গ হল, সেখান থেকে তাকে মুক্তির দিকে নিয়ে চলে গেল। খ্রীশ্চানদের বিশ্বাসকে স্বামীজী হিন্দুদের বিশ্বাসের সাথে সমন্বয় করে, বাইবেলের এই কাহিনীকে শিষ্যদের সামনে রাখলেন।

স্বামীজী আবার ভগবান বুদ্ধকে নিয়ে বলছেন, Buddha set his greatest enemy free, because he, by hatting him (Buddha) so much, kept constantly thinking of him; that thought purified his mind, and he became ready for freedom. (*ভগবান বুদ্ধ তাঁর*

প্রবলতম শত্রুকেও মুক্তি দিয়েছিলেন, কারণ সে ব্যক্তি তাঁকে এত দ্বেষ করত যে, ঐ দ্বেষবশে সে সর্বদা তাঁর চিন্তা করত। ক্রমাগতঃ বুদ্ধের এত চিন্তায় তার চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়েছিল, আর সে মুক্তিলাভ করবার উপযুক্ত হয়েছিল।) আমরা এই ভাবকে বৈরভাব বলি, শত্রু ভাবে সাধন। ঈশ্বরকে শত্রু রূপে ভেবে যাচ্ছে, সব সময় ঈশ্বরের চিন্তাতে সে ডুবে আছে। রাবণ, কংস এদেরও এই ভাব ছিল। Therefore think of God all the time, and that will purify you. (*অতএব সর্বদা ঈশ্বরের চিন্তা কর, ঐ চিন্তার দ্বারা তুমি পবিত্র হয়ে যাবে।*) সব সময় তাই ঈশ্বর চিন্তন করে যেতে হয়, ঈশ্বরের চিন্তা আমাদের শুদ্ধ, পবিত্র করে দেবে, মুক্ত করে দেবে। এই কথা বলে স্বামীজী থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে তাঁর প্রায় উনপঞ্চাশ দিনের ক্লাশ শেষ করলেন।

দেববাণীর উপর আলোচনা শুরু করার সময় বলা হয়েছিল, চিকাগোতে বিশ্বধর্ম সম্মেলনের পর আমেরিকাতে ঘুরে ঘুরে স্বামীজী লেকচার দিয়ে দেখলেন, এভাবে লেকচার দিয়ে কোন কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না। ক্ষণিক একটা উদ্দীপন তৈরী হয় ঠিকই, কিন্তু ঐ উৎসাহ উদ্দীপন দিয়ে কিছু হয় না। স্বামীজী চাইলেন, একটা সত্যিকারের বলিষ্ঠ কিছু কাজ দরকার। মহৎ কাজ করতে গেলে কয়েকজন সঙ্গী দরকার। ধর্মের ক্ষেত্রে আমরা বলি কয়েকজন উপযুক্ত শিষ্য দরকার। আচার্য শঙ্কর বলছেন, ভাল শিষ্য পেলে শিক্ষার প্রসার হয়। শ্রীকৃষ্ণ সেইজন্য আধার দেখে অর্জুনকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। ঠিক সেইভাবে ঠাকুর নরেনকে শিক্ষা দিলেন। নরেনেরও দরকার এখন কিছু উপযুক্ত লোক, যারা এই শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। পরে তাঁর পরিচিত মিস্ ডাচারের থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ডে একটা কটেজ ছিল, আমরা আগে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছি, তিনি কিভাবে সেখানে স্বামীজীর জন্য ব্যবস্থা করলেন। স্বামীজী রোজ সকালে হাতে একটা বই এনে সেই বই থেকে বলতেন। অনেক সময় বিকালের দিকেও ক্লাশ হত। সন্ধ্যেবেলায় বেড়ানো হত। ১৮৯৫ সালের ১৯শে জুন বুধবার থেকে ৬ই অগস্ট মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় সাত সপ্তাহ তিনি থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কের মিস ডাচারের কটেজে ছিলেন। মাঝখানে স্বামীজীর কানাডায় যাওয়ার একটা আমন্ত্রন ছিল, কাছেই জায়গাটা ছিল, জানা যায় না যে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন কিনা, যতদূর জানা যায়, তিনি যাননি।

এই দিনের ক্লাশ শেষ হয়ে যাওয়ার পরের দিন ৭ই অগস্ট বুধবার সকাল হয়েছে। দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়া হয়েছে। বিকালবেলা তিনি তাঁর দুজন শিষ্যাকে নিয়ে বেড়াতে গেলেন। এই দুজন শিষ্যা পরের দিকে শ্রোতা হয়ে এসেছিলেন, এনাদের একজন Greenstidel পরে ওনার নাম হয় সিস্টার ক্রিস্টিন, খুব উচ্চমানের মহিলা ছিলেন, আর এম সি ফ্রাঙ্কি। এই দুজন দেরীতে আসার জন্য স্বামীজীর ওদের প্রতি একটা স্নেহ ছিল, আহা, এরা কত ভাল ভাল কথা শুনতে পেল না। ওদের দুজনকে নিয়ে স্বামীজী হাঁটতে বেরোলেন। ধীরে ধীরে জঙ্গলের মধ্যে চলে যাচ্ছেন। সেখানে একটা খুব পুরনো ওক গাছের তলায় বসলেন। অনেকে বলেন যে, সেই ওক গাছটা এখনও আছে। স্বামীজী হঠাৎ বলছেন, আমরা ধ্যান করব, Let us be Buddha। স্বামীজী এই কথা বলতে বলতে বসলেন আর একেবারে যেন একটা পাথরের বিগ্রহের মত স্থির হয়ে গেলেন। মিস গ্রীনস্টিডেল, যিনি পরে সিস্টার ক্রিস্টিন হন, আর ফ্রাঙ্কি, তাঁরা এই বর্ণনা দিচ্ছেন। এতদিন যিনি এইভাবে ক্লাশ নিয়ে গেলেন, সবার সাথে ঘুরেছেন, ফিরেছেন, কথা বলেছেন, তিনি এক মুহূর্তের মধ্যে একটা মূর্তির মত স্থির হয়ে ধ্যানে ডুবে গেলেন। এতদিন ধরে স্বামীজী এই যে সর্বক্ষণ একটা আধ্যাত্মিক ভাবের মধ্যে রয়েছেন, আমরা যে বারবার শাস্ত্র অধ্যয়নের কথা বলি, এর এটাই উপযোগিতা যে, মনটাকে উপরে ধরে রাখে। একটু লাগল, মনটা ছুটে উপরে চলে গেল।

ওখানে তখন জোর ঝড় উঠেছে, বিদ্যুৎ কড়কাচ্ছে, ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি পড়তে শুরু হল। স্বামীজীর শরীরের উপর অঝোরে বৃষ্টি বর্ষিত হয়ে যাচ্ছে, আকাশে বিদ্যুতের ঝলকানি, কানফাটা আওয়াজ, তীব্র বেগে বাতাস বইছে, স্বামীজীর কোন হুঁশ নেই। একেবারে কাষ্ঠবৎ। ধ্যানের গভীরে বসেই আছেন তো বসেই আছেন। যার জন্য কোন কোন বইতে বর্ণনা পাওয়া যায়, ঠাকুর নরেনকে বলছেন, নির্বিকল্প সমাধির জন্য খুব ছটফট করছিলি তো, দেখলি তো এবার নির্বিকল্প সমাধি কি, কিন্তু এর চাবি আমার কাছে থাকল, মায়ের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আর এই চাবি পাবি না। কটেজ থেকে স্বামীজী এই দুটি মেয়েকে নিয়ে প্রায় অর্দ্ধ মাইল চলে এসেছেন। কটেজে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা ঝড়-বৃষ্টির এই দুর্যোগ দেখে চিন্তায় অস্থির হয়ে ছাতা নিয়ে দৌড়ে আসতে লাগলেন রক্ষা করার জন্য। এসে দেখছেন স্বামীজী তখনও ঐ একই ভাবে গভীর সমাধিতে ডুবে

আছেন। সমাধি ভাঙল, স্বামীজী সরল একটা হাসি দিয়ে বলছেন, বৃষ্টিতে মনে হচ্ছে যেন কলকাতায় আছি। এর একটা ব্যাখ্যা করা হয় যে, কাশীপুরে ঠাকুর যখন নরেনকে নির্বিকল্প সমাধি দিয়েছিলেন, আর এখানে গভীর সমাধিতে ডুবে যাওয়া, এই দুটো যেন এক। আরও অনেকবার হয়ত স্বামীজীর নির্বিকল্প সমাধি হয়েছে, কিন্তু ঠাকুর বলেই দিয়েছিলেন, আগে তোমার কাজ শেষ করে যেতে হবে, তার আগে এখান থেকে তুমি বেরোতে পারবে না। স্বামীজীর মত আধারের মহাত্মারা হলেন খুব শক্তিশালী বড় গ্যাস বেলুনের মত, মাটিতে বেঁধে রাখা যায় না। মাটিতে বেঁধে রাখতে গেলে, অনেক মোটা দড়ি দিয়ে খুব শক্ত করে বেঁধে রাখতে হয়। এ্যারোপ্লেন উপরে উড়ে যেতে পারে, কিন্তু একটা সময় তাকে স্পীডে নীচে নেমে আসতে হয়। বেলুনের স্বাভাবিক প্রবণতাই হল উপরে থাকার, হাইড্রোজেন গ্যাস ভরা আছে কিনা। সেইজন্য বেলুনকে মাটিতে কিছুর সাথে বেঁধে ধরে রাখতে হয়। অন্যান্য জিনিসকে শক্তি দিয়ে উপরে ধরে রাখা হয়। যেমন পাথরকে যত জোরে উপরে ছুড়ে দেওয়া হবে, তত সে উপরে যাবে। বেলুনে ঠিক উল্টো হয়। স্বামীজীর মত মহাপুরুষরা বেলুনের মত; অনেক রকম কায়দা করে কোন রকমে তাঁদের মনকে এই জগতে বেঁধে রাখা হয়। স্বামীজী সেইজন্য সব সময় নির্বিকল্প সমাধির জন্য ছটফট করছেন। পওহারি বাবার কাছে গেছেন, যদি চটপট শিখে নিতে পারেন। ঠাকুরে এসে আটকাচ্ছেন। তারপর স্বামীজী নিজেই বুঝে গেলেন যে, পওহারি বাবার সেই ক্ষমতা নেই।

যাই হোক, সন্ধ্যে হওয়ার আগেই স্বামীজী ফিরে এলেন। আধ ঘন্টা ধরে সব গোছগাছ চলল। রাত পৌনে ন'টা নাগাদ স্বামীজী মিস্ ওয়াল্ডো, যিনি দেববাণীর সব নোটস্ গুলি নিয়েছিলেন, তাঁকে নিয়ে স্টীমারে উঠলেন। নিউয়র্কের উদ্দেশ্য স্বামীজী যাত্রা করলেন। ওনাদের মধ্যে অনেকের স্মৃতিকথায় পাওয়া যায় যে, স্বামীজী যাওয়ার আগে বলছেন, I bless this Thousand Island। Blessing শব্দটা দেখলেই আমরা মনে করি, কথা দিয়ে যেন bless করলেন। কিন্তু স্বামীজী ওখানে এতদিন ছিলেন, যেখানে তিনি শিষ্যদের তৈরী করেছেন। তৈরী করাটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দিক। স্বামীজী এখানে উপদেশ দিচ্ছিলেন না। আমাদেরও স্বামীজীকে পড়ার সময় একটা জিনিস মনে রাখা দরকার, এটা যে আমাদের শুধু যে শিক্ষা তা না; স্বামীজীর শিক্ষাকে আত্মসাৎ করে আমরাও যেন অপরকে শিক্ষা দেওয়ার সামর্থ হতে পারি। স্বামীজী মানুষ তৈরী করছিলেন, স্বামীজী যখন চলে যাবেন, এরা যেন তাঁর অবর্তমানে বেদান্তের কাজটা চালিয়ে যেতে থাকে। ভগবান বুদ্ধ যেমন বেদান্ত না বলে, বৌদ্ধ ধর্মে বলে সারা এশিয়াতে ছড়িয়ে দিলেন, স্বামীজী ঠিক সেইভাবে বেদান্তকে নিয়ে গেলেন পাশ্চাত্যে। কিন্তু লোক দরকার। বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন ভাবে তিনি লোক তৈরী করছেন। এনারা শুধু শিষ্য না, একেবারে অন্তরঙ্গ থেকে অন্তরঙ্গ। এনারা স্বামীজীর বাণীর ভারী, যাঁরা ভবিষ্যতে পুরো বেদান্তকে বহন করে নিয়ে যাবেন। এনারাই বিশেষ লোক, নিজের নিজের ভাবে তাঁরা যতটা যা পেরেছেন, যতদিন পেরেছেন দিয়ে গেছেন। আর সত্যিই মিস্ ওয়াল্ডো যেভাবে স্বামীজীর ক্লাশের নোটস্ গুলো লিখলেন, তুলনাই হয় না। আজকে পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি, দেববাণী কি সাংঘাতিক এক আধ্যাত্মিক অমূল্য সম্পদ। স্বামীজী শব্দ দিয়ে যে আশীর্বাণী উচ্চারণ করলেন, তার থেকে অনেক বেশী তিনি ওখানে এত দিন ছিলেন, যেভাবে তিনি সব সময় একটা আধ্যাত্মিক ভাবে বিভোর হয়ে থাকতেন, ঐ আইল্যাণ্ড আমাদের কাছে বিরাট তীর্থ। যতগুলো জায়গার ব্যাপারে আমরা জানি, যেখানে স্বামীজী অনেক কিছু করেছিলেন, তার বেশির ভাগ জায়গায় emotional connect। থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্ক পুরোপুরি তাত্ত্বিক ভাবে যুক্ত।

রাত পৌনে ন'টা নাগাদ জাহাজ ছেড়ে দিল। শিষ্যদের কয়েকজন যাঁরা থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড থেকে গিয়েছিলেন, তাঁরা সেন্ট লরেন্স নদীর তীরে দাঁড়িয়ে আছেন স্বামীজীকে বিদায় জানাবেন। খুব আবেগ ভালবাসা দিয়ে স্বামীজী ওদের দিকে হাত নাড়লেন, শিশুর মত মজা করলেন। আস্তে আস্তে জাহাজটা সবার দৃষ্টির বাইরে অদৃশ্য হয়ে রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল, কিন্তু শিষ্যদের মধ্যে জ্বালিয়ে দিয়ে গেলেন চিরন্তন আধ্যাত্মিক জ্ঞানের এক দীপ্ত মশাল। আমরা যারা এতদিন স্বামীজীর দেববাণীর আলোচনা শুনলাম, ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছি, আমরাও যেন আমাদের ভিতর এই জ্ঞানের মশালকে প্রজ্জ্বলিত করতে পারি এবং অপরকেও এগিয়ে যাওয়ার পথে আলো দেখাতে সক্ষম হই।